স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্র

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

আজ হইতে শত বৎসর পূর্বে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের একটি পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্যে ধর্মের প্রভাব তখন কিছুটা স্তিমিত; অশিক্ষা ও কুশিক্ষায়, পরাধীনতা ও দারিদ্র্যে ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ভারতও যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে; সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রান্ত পথনির্দেশকরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁহার আগমনে শুধু যে তমসাচ্ছন্ন ভারত কর্মযোগে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহা নয়, রজোগুণে উন্মত্ত ইওরোপ-আমেরিকাও তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষায় ধ্যান-জ্ঞানের নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, আধ্যাত্মিকতার একটি শাশ্বতরূপ দেখিয়া মানুষ আজ ধর্ম-বিষয়ে নিজের ভুল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর কাল স্বামীজী এই মর্ত্যলোকে অবস্থান করেন, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর কাল। পরিব্রাজক জীবনের শেষে শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যান। সেখানে অপূর্ব সাফল্যের পর তিনি আমেরিকা ও ইওরোপে সার্বভৌম আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেন। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের কার্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন ও স্বদেশে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বজ্রনির্ঘোষে নবজাগরণের বাণী শুনাইতে থাকেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী পুনরায় পাশ্চাত্যে গমন করেন ও বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় নবযুগের উদার ভাব প্রচার করিতে থাকেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

কঠোর পরিশ্রমে তখন তাঁহার শরীর ক্লান্ত, মনও নির্বাণমুখী; তাই অতি শীঘ্র জগতের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজ যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিস্ময়-বিমুগ্ধ জগৎ বহুদিন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। বক্তৃতা এবং রচনার মাধ্যমে স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাল মাত্র সাত বৎসর (১৮৯৩-১৯০০), অবশ্য পত্র-রচনার কাল ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী (১৮৮৮-১৯০২)।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশানুরূপভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাপি তাঁহার যে-কয়টি ভাষণ ও বক্তৃতা আমরা পাইয়াছি তাহা চিরদিনই মানব-সমাজের অমূল্য সম্পদ্ রূপে পরিগণিত হইবে। বিভিন্ন দেশের বহু ব্যক্তিকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলি এবং তাঁহার কথোপকথনও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উৎস।

স্বামীজীর বাংলা পত্র ও প্রবন্ধ কিছু কিছু তাঁহার জীবৎকালেই তৎপ্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদেশে প্রদত্ত তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাবলীর কিছু কিছু সেই দেশেই পুস্তকাকারে বাহির হয়। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাতেও স্বামীজীর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

স্বামীজীর উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তাহাতেও তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী বাহির হইতে থাকে। কিছুকাল পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' হিমালয়ে স্থানান্তরিত হয়, তখন উহাতে নিয়মিতভাবে তাঁহার লেখা ও বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে।

স্বামীজীরই নির্দেশে গুরুসেবার অঙ্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এগুলি ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়; পরে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন কার্যালয় হইতে সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হইতেছে।

স্বামীজীর জন্মের শত বৎসর পরে তাঁহার ঐ সকল বাণী, রচনা ও পত্রাদি এবং আজ পর্যন্ত আরও যে-সকল অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সব একত্র করিয়া শতবর্ষ-স্মারক-গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করার কথা দুই-তিন বৎসর পূর্বে আমাদের অনেকের মনে উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজীর পরামর্শক্রমে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য মঠের কয়েকজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও আমাদের সুহৃদ্ কয়েকজন অধ্যাপককে লইয়া একটি ছোটখাট সভার অধিবেশন হয়। এই আলোচনা-সভায় সর্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয় যে, স্বামীজীর পত্রাবলী সময়ানুক্রমে সাজাইয়া এবং বক্তৃতা ও রচনা, কথোপকথন—যথাসম্ভব বিষয়ানুযায়ী সাজাইয়া ১০ম খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উদ্বোধন কার্যালয় হইতে জন্মশতবর্ষ-স্মারকগ্রন্থ-রূপে প্রকাশিত হইবে।

দশটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ ও রাজযোগ; ২য় খণ্ডে জ্ঞানযোগ; ৩য় খণ্ডে ধর্ম ও দর্শন; ৪র্থ খণ্ডে ভক্তিযোগ এবং 'দেববাণী'; ৫ম খণ্ডে 'ভারতে বিবেকানন্দ' এবং ভারত-প্রসঙ্গে বক্তৃতা ও রচনাবলী মুদ্রিত হইতেছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা (গদ্য ও কবিতা) এবং পত্রাবলী; ৭ম খণ্ডে পত্রাবলী ও ইংরেজী কবিতার অনুবাদ; ৮ম খণ্ডে

পত্রাবলী এবং ‘মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ’; ৯ম খণ্ডে ‘স্বামী-শিষ্য-সংবাদ’, স্বামীজীর সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথন এবং ১০ম খণ্ডে মেরী লুই বার্ক লিখিত গ্রন্থে (Swami Vivekananda: New Discoveries in America) প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণীর বঙ্গানুবাদ এবং বিবিধ বিষয়ের লেখা ও বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইতেছে।

স্বামীজীর সমগ্র ‘বাণী ও রচনা’র মুখবন্ধরূপে ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ভূমিকা ‘Our Master and his Message’ অনুবাদ করিয়া প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই সন্নিবেশিত হইল। প্রতি খণ্ডে স্বামীজীর রচনাদির সহিত একটি তথ্যপঞ্জী ও নির্দেশিকা দেওয়া হইয়াছে।

পুরাতন অনুবাদগুলিতে যথাসম্ভব স্বামী শুদ্ধানন্দজীর রীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু ভাষার সংস্কার করা হইয়াছে। বানানে বর্তমান রীতি অনুসৃত।

এই গ্রন্থমালার সম্পাদন-ভার সর্বসম্মতিক্রমে ‘উদ্বোধন’-পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দকে দেওয়া হয়। ইহাও স্থির হয় যে, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ-বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। প্রকাশনের অন্যান্য কার্যের ভার উদ্বোধনের প্রকাশন বিভাগের পরিচালক স্বামী অতন্দ্রানন্দের উপর অর্পিত হয়। এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সুপরিচিত স্বামী গম্ভীরানন্দের সাহায্য এবং পরামর্শও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থমালা-প্রকাশ-প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের উৎসাহে ও প্রাথমিক অর্থানুকূল্যে এই প্রকাশন-কার্য আমরা আরম্ভ করি।

শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্য শিল্পী আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয় এই গ্রন্থমালার প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়া দিয়া আমাদিগকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অনুবাদ প্রভৃতি কার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন ডক্টর রমা চৌধুরী, শ্রীযুক্তা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীতামসরঞ্জন রায়, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ. স্বামী অব্জজানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রভৃতি অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও বুধমণ্ডলী। সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

আরও অনেকে এই গ্রন্থমালা প্রকাশনে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, স্থানাভাবে সকলের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা গেল না। তাঁহাদের শ্রম ও সাহায্য ব্যতীত এত অল্পসময়ে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। গ্রন্থমালার তথ্যপঞ্জীর পৌরাণিক অংশ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ঐতিহাসিক অংশ অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর, নৃতাত্ত্বিক অংশ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই গ্রন্থমালার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। দার্শনিক অংশের তথ্যপঞ্জী ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তথ্যপঞ্জীর অন্যান্য অংশ এবং নূতন পত্রগুলির অনুবাদ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের শ্রীমান্ সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাউ-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় সমগ্র গ্রন্থাবলীর বিষয়-নির্দেশিকা (Subject Index) প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের শেষে নির্দেশিকা রচনা করিয়াছেন শ্রীমান্ তারকনাথ দে ও শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ। হিসাব-রক্ষার ব্যাপারে প্রথম হইতেই শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য।

বাগবাজার নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনের শ্রীবিজয়গোপাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার বাড়ীর অনেকটা অংশ আমাদের এই প্রকাশন বিভাগের জন্য ছাড়িয়া না দিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রন্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুষ্ঠু বিতরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

ইঁহাদের সকলের উপর শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হউক; স্বামীজীর জীবনপ্রদ ভাবধারা সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক —বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর পুণ্য বৎসরে, এই গ্রন্থাবলী প্রকাশনের শুভক্ষণে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রকাশক

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
জানুআরি, ১৯৬৩

ভূমিকা

আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী
[ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত ভূমিকার বঙ্গানুবাদ]

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারি খণ্ড[১] গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবন্ধ হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা যে শুধু জগতের জন্য সাধারণভাবে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি সনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে; প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয়া সে তাহার নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

অন্যত্র যেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করিবেন। ভারত হইতে ইংরেজী ভাষা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও ঐ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে-উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রসূ হইবে। হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের—যাহা সত্যসম্পর্কে বিগতভী। এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে। সঙ্কটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে আহরণ করিয়া বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতই ভারত যে বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

নিজের সীমান্তের বাহিরে অবস্থিত মানব-সাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের অন্ন পরিবহনের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, ইহা যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত। ইহা যে এইবারই প্রথম সংঘটিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে জাতিগঠনকারী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তাধারার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল—সেই আত্মগত একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নূতনভাবে সৃষ্টি হইল। আমরা কখনই ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশঃ 'তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের নিকট প্রচার কর।' ইহা সেই একই চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উদগত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি বলিতেছেন, 'একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে। … সেইজন্য হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও।' এবং তিনি নিজের বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ করিয়া বলেন, 'আমরা হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ্য করি, তাহা নয়, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমরা মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পারসীদিগের অগ্নির পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই। আমরা জানি নিম্নতম বস্তুরতি হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে অসীমকে উপলব্ধি এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই সকল কুসুম চয়ন করিয়া, প্রেমের সূত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পূজার জন্য একটি অপূর্ব স্তবক রচনা করি।' এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হৃদয়ে বিদেশী বা পর; তাঁহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল।

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ,' কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে কিছু নূতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য। ইওরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোতে—যেখানে মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক কালের প্রযত্ন এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহা কিছু তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে—এই নগর-রাণীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপর বিস্তৃত—উত্তরের দ্যুতিতে ভাস্বর চক্ষু লইয়া তিনি যেন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের ঐতিহ্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহা চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লাভ করে নাই। এবং এই কেন্দ্রের সৃজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতূহল বর্তমানে আমাদের কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক ঐক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে সঞ্চরমাণ।

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর—তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহা ছিল অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ। বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ পরিবেশেরই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর—বহুযুগের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত; তাঁহার পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ, যাহার কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ্ হইতে—এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের—এমন একটি জগৎ, যাহার ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ—একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে-দেশের পথের ধূলিকণা যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসন্তের পাদস্পর্শে পবিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ—

তাহার বহু সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সে পরীক্ষা করিয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অনেক কিছু, এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় সবকিছু—শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ ঐক্যমত ছাড়া, যে ঐক্যমত সে-দেশের অধিবাসিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সুতরাং এইগুলি ছিল দুই প্রকার চিত্তপ্রবাহ; যেন দুইটি বিশাল চিন্তা-তরঙ্গিণী—প্রাচ্য ও আধুনিক; ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক-পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র। ব্যক্তিত্বাভিমানশূন্য এই ব্যক্তির আধারে সংঘটিত এই অভিঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্গত হয় নাই—এমন কি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গে অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনকালে—মধ্যাহ্নসময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ ঊষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্য।

একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে—বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই যে, তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার নিকট—তাঁহার নিজেরই ভাষায়—ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 'বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা।' তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন; তাহাদের একটি বা অপরটি—এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 'এগুলি সবই সূত্রে মণিগণের মত আমাতেই অনুস্যূত। ... ... যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্য শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে 'মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।' ... এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ—সেই আদেশঃ 'ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে—ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, যিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে।

ভারতবর্ষের নিজের দিক্ দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট—যাহা সত্য তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহাদ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডারই বুঝায়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেনঃ 'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও প্রতিধ্বনির মত মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ-সমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সবকিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করিতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন হইতেছে—স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সর্বাবগাহিত্ব—প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিমা বলিয়া পরিগণিত হইত না যদি না, মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইতঃ 'শোন অমৃতের পুত্রগণ! যাহারা দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে—সকল অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে! তাঁহাকে জানিয়া তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।' এই তো সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী সবকিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে। আমাদের বর্তমান কর্তব্য-বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান—এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে-মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে-মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে—ইহার বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোষণা করেঃ সাধনার অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে নিরাকারে—কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না কেন, প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে

মহান্ ঊর্ধ্বগতির সোপান-স্বরূপ মনে করে এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাঁহার নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত। গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায়—ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্যের ন্যায় তাঁহার বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি দ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশকরূপে—ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও করিতেন, তথাপি তাঁহাদ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত; না আরও বেশী—ঐগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু থাকিত, ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত। যদি তিনি আবির্ভূত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি আজ সহস্র মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মত নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সে-বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, এবং রামানুজের মত তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।

তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। এ-কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে, দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আর একটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই, তিনি এমন এক তত্ত্ব—যাহাতে সাকার নিরাকার দুইই আছে।'

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতই দায়স্বরূপ।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে।'

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি সূত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহার সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা—সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় দুইটি ভাবজগতের যে-বৈষম্য এইভাবে তাঁহার চক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ধর্মগ্রন্থগুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে সঞ্চারিত করিয়াছিল; ইহা তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, এই অনুভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের ঋষিগণ আকস্মিকভাবে ইহা লাভ করেন নাই, যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরন্তু ইহা ছিল বিজ্ঞান প্রতিপাদ্য বিষয়—সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহা সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে থাকিয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভাব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ—তদানীন্তন 'নরেন'—তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্রসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্ত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাঁহার জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত—মনের গতি বহু হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ। তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই দিব্যদর্শন লাভ করিত। 'জ্বরভাবের মত' পরম জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা এই শিষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের কুঞ্চিকা লাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি এখনও তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল—এইভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাঁহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

সুতরাং শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—যেন তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্ সঙ্গীত। এই রত্নগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর

সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা—একই দীপাধারে প্রজ্বলিত, ভারতবর্ষ তাঁহার হাত দিয়া উহা জ্বালাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য— ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ হইতে ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বৎসরের কর্মের মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই দীপপ্রজ্বালনের জন্য ও এই যে লেখমালা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য, স্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশকে, যে-দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাঁহারা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাঁহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয়া উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা
(N. of RK-V)
৪ জুলাই, ১৯০৭

---

১ ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বর্তমানে আট খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বাংলায় এই গ্রন্থাবলী দশ খণ্ডে বিভক্ত।—সম্পাদক

চিকাগো বক্তৃতা - ভূমিকা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে যে বিশ্বমেলা[১] হইয়াছিল, ধর্ম-মহাসভা সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল যে সকল বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেগুলির সহিত সাহিত্য-কলা-এবং বিজ্ঞান-সম্মেলন সংশ্লিষ্ট করাও একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিষয়গুলি মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তাহাদের ইতিহাসে এইরূপ প্রত্যেকটি অধিবেশন যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহাও আশা করা যায়। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে মহা-সম্মেলনে একত্র-মিলিত মানবমণ্ডলী চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখার তাত্ত্বিক গবেষণা ও কার্যকর আবিষ্কারের আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়সকলের উন্নতি সাধনকেই তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। মার্কিন সাহস ও মৌলিক মনোভাব লইয়া চিকাগোবাসিগণই ভাবিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির একত্র সমাবেশই হইবে এই-সকল সম্মেলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মেলন। এই-সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকে নিজ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিবেন, আন্তরিক গভীর সহানুভূতি সহকারে তাহা শুনিতে হইবে—এরূপ সঙ্কল্পও করা হইয়াছিল। এইরূপ সমমর্যাদার ও সুনিয়ন্ত্রিত বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিগণ যে সংসদ গঠন করিবেন, তাহা হইবে একটি ধর্ম-মহাসভা। ইহার ফলে 'বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের প্রয়োজনীয়তা' জগতের মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইবে।

প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যে নিমন্ত্রণ ও যথারীতি নির্বাচনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই দক্ষিণভারতীয় অল্প কয়েকজন শিষ্য তাহাদের গুরুদেবকে বুঝাইতে তৎপর হইল যে, হিন্দুধর্মের পক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য এই সম্মেলনে তাঁহার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তাহাদের মনেই হয় নাই, তাহারা এমন কিছু দাবী করিতেছে, যাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা ভাবিয়াছিল, বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেই বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইবেন। স্বামীজীও শিষ্যগণের মতই জাগতিক রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানিলেন যে, এই কার্যে তিনি ঈশ্বরাদেশ লাভ করিয়াছেন, তখন একাজে আর কোন বাধা থাকিতে পারে, স্বামীজী একথা ভাবিলেন না। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও পরিচয় পত্রাদি ব্যতিরেকেই হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি জগতের সমৃদ্ধি ও শক্তির সুরক্ষিত দ্বারে প্রবেশ করিতে চলিলেন—এই ঘটনা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের সংঘবদ্ধহীনতার বৈশিষ্ট্য আর অন্য কোন উপায়ে স্পষ্টতর হইতে পারিত না।

চিকাগোতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। প্রেরিত ও গৃহীত আমন্ত্রণ অনুসারে কোন পরিচিত ও স্বীকৃত সংস্থা তাঁহাকে প্রেরণ করে নাই। অধিকন্তু প্রতিনিধি-সংখ্যা বাড়াইবার সময়ও উত্তীর্ণ, তালিকা পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বোষ্টনে যদি কাহারও সহিত দৈবক্রমে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটিয়া যায় এইরূপ ভাবিয়া কী গভীর নৈরাশ্য লইয়াই না তাঁহাকে চিকাগোর রুদ্ধদ্বার হইতে ফিরিতে হইয়াছিল!

এইভাবে দূরদৃষ্টি বা নিজের কোন পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচিত হইলেন। রাইট তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিলেন এবং মান্দ্রাজী শিষ্যগণের মত তিনিও অনুভব করিলেন যে, আগামী ধর্ম-মহাসম্মেলনে জগৎকে এই ব্যক্তির বাণী শুনাইতে হইবে। পরে অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার নিকট পরিচয়-পত্র দেখিতে চাওয়া আর সূর্যকে তাহার আলোকদানের কি অধিকার আছে, জিজ্ঞাসা করা একই কথা।' এইরূপ প্রীতি ও প্রভাবই স্বামীজীকে পুনরায় চিকাগোয় পাঠাইয়াছিল এবং সেখানে স্বীকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা ও আসন লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা গেল তিনি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত; সেখানে একমাত্র ভারতীয় বা একমাত্র বাঙালী না হইলেও তিনি ছিলেন যথার্থ হিন্দু ধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি।

অন্যান্য সকলে কোন সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। একমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা; সেদিন তাঁহারই মাধ্যমে ঐ ভাবগুলির সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ঐক্য ও রূপ লাভ করিয়াছিল। প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে নিজগুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণকালে যে ভারতীয় ধর্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এখানে তাহাই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। যে ভাবগুলিতে সমগ্র ভারতের ঐক্য আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ধর্ম-মহাসম্মেলনে (বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক) প্রবন্ধপাঠে সতেরো দিন সময় লাগিয়াছিল। ১৯শে (সেপ্টেম্বর) স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু যেদিন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা ও সেগুলির উত্তর প্রদত্ত হইল, সেই প্রথমদিন হইতেই স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নের শেষদিকে তিনি অভ্যর্থনার উত্তর দিলেন। যখন তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকাবাসিগণকে 'ভগিনী ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, যখন সেই প্রাচ্য সন্ন্যাসী নারীকে প্রথম স্থান দিলেন এবং সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সেই মহাসম্মেলনে আনন্দের যে শিহরণ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা তৎকালে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মুখে বহুবার আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, 'আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন করার কথা ভাবিতে পারিল না!' সেই মুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাঁহার নিশ্চিত সাফল্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ চঞ্চল শ্রোতৃবর্গকে কৌশলে শান্ত করিবার জন্য পরে অনেকবার বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি ধৈর্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে সর্বশেষে স্বামীজী একটি গল্প বলিবেন বা একটি বক্তৃতা দিবেন। এই ভাষণগুলির কিছু কিছু অংশ সুরক্ষিত হইয়া এই পুস্তকে অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই সম্মেলন এমন একটি যুগের সূচনা করিয়াছে, যাহার মূল্য ও গুরুত্ব যত দিন যাইবে ততই গভীরতরভাবে উপলব্ধ হইবে। প্রতিনিধিদের সম্মেলন কেবল বাহ্য চাকচিক্য ও আড়ম্বরের দিক্ হইতে সভার প্রারম্ভে ও অবসানে

এমন একটি দৃশ্য রচনা করিয়াছে, যাহা আমাদের সমসাময়িক কেহ আর কখনও দেখিবে না। কোটি কোটি মানুষের ধর্মমতের প্রতিনিধিগণ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন। দৃশ্যটিকে যথাযথরূপে ফুটাইবার প্রচেষ্টায় আমরা রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যবিবরণীর প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ

'নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বেই প্রাসাদটি প্রতিনিধি ও দর্শকে ভরিয়া উঠিল, এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দেশ-বিদেশের চার হাজার উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দে 'কলম্বাস হল' পূর্ণ হইল। বেলা দশটার সময় বহুজাতির উড্ডীয়মান পতাকার নীচে বিশাল জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে বারটি ধর্মের প্রতিনিধিগণ হাত ধরাধরি করিয়া বারান্দা দিয়া আগাইয়া আসিলেন। এই সময়ে মঞ্চটি ছবির মত চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করিল। কেন্দ্রস্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গীর্জার প্রধান যাজক কার্ডিনাল গিবন্স্ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উচ্চাসনে সমাসীন; কলম্বাসের এই স্মৃতিবৎসরে যথাযোগ্য বলিয়া তিনিই প্রার্থনা দ্বারা সভার উদ্বোধন করিবেন।

'তাঁহার উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের নানাবর্ণের পোষাক ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার পোষাকের সমতুলই হইয়াছিল। এইসব ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মানুগামীদের মধ্যে উপবিষ্ট, মনোরম উজ্জ্বল রক্তিম পরিচ্ছদ-পরিহিত, তাম্রাভ মুখমণ্ডল, শীর্ষে হরিদ্রাবর্ণের বৃহৎ উষ্ণীষ-ভূষিত বোম্বাই-এর বাগ্মী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বে পীত লোহিত ও শুভ্র পরিচ্ছদ ভূষিত ভারতের একেশ্বরবাদী সমিতি বা ব্রাহ্মসমাজের বি. বি. নাগরকর ও সিংহলের বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপাল বসিয়াছিলেন। ধর্মপাল চার কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার কৃশ ক্ষুদ্র দেহটি ছিল শুভ্রবাসমণ্ডিত, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম ছিল স্কন্ধ-বিলম্বিত।

'সেখানে মুসলমান, পারসী ও জৈন ধর্মযাজকগণও ছিলেন; বর্ণ বৈচিত্র্য ও গতিভঙ্গিমায় তাঁহারা প্রত্যেকেই ছবির মত দেখাইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ধর্মের ব্যাখ্যা ও সমর্থনে তৎপর হইলেন।

'সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ দেখাইতেছিল ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট রেশমনির্মিত উজ্জ্বল মূল্যবান্ বেশভূষিত জাপান ও চীনের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গকে। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম, তাও-ধর্ম, কংফুছের মত ও শিন্টো-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তাপসদের মত কৃষ্ণবর্ণের বেশ পরিধান করিয়া প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ভারতের একেশ্বরবাদীদের বা ব্রাহ্মসমাজের নেতা মজুমদার মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বীয় বাগ্মিতা ও ইংরেজী ভাষার উপর অপূর্ব অধিকারের দ্বারা বিপুল সংখ্যক শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

'আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি একটি অদ্ভুত বক্রযষ্টিতে ভর করিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি হইলেন জান্তের (Zante) গ্রীক ধর্মযাজক—তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাশি আবক্ষবিস্তৃত, মস্তকে অদ্ভুতদর্শন শিরোভূষণ, কটিদেশ হইতে একটি বৃহৎ রৌপ্যনির্মিত ক্রশ বিলম্বিত। এশিয়া মাইনর হইতে আগত রক্তিমগণ্ড দীর্ঘকেশ এক গ্রীক 'সন্ন্যাসী' তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গর্ব করিয়া বলিতেছিলেন যে, তিনি কখনও শিরোভূষণ ব্যবহার করেন নাই বা নিজ আহার-বাসস্থানের জন্য একটি কপর্দকও ব্যয় করেন নাই।

'আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট (Arnett) এবং আফ্রিকাদেশীয় এক যুবরাজের আবলুস কাঠের মত কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল মানাইয়া গিয়াছিল সম্মিলিত মহিলাদের সুন্দর বেশভূষায়; সর্বপশ্চাতে ঘনকৃষ্ণ পটভূমিরূপে ছিল প্রোটেষ্টাণ্ট প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের কৃষ্ণ পরিচ্ছদ।' (ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যাণ্ডের রেভাঃ ওয়েষ্টের ধর্মোপদেশ হইতে গৃহীত)

সর্বশেষ ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মসম্মেলনের সহিত অশোকের বৌদ্ধসংগীতি কিংবা সম্রাট্ আকবরের ধর্মসভার তুলনা করিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজমত সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ জাতির দুঃসাহসই এইরূপ বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত কার্যসূচীর পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছিল; নাগরিকগণের শক্তি-প্রাচুর্য এবং উৎসাহই এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। ধর্মসভার গঠনতন্ত্র ইহাকে হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্বয়কারী ভাবগুলি প্রচার করিবার উপযুক্ত একটি অসাধারণ ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উদ্ধত ও বর্জনশীল ধর্মগুলির প্রতিনিধিবর্গ সরল গণতান্ত্রিক সাম্য ও সৌজন্যের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর কখনও এরূপ বিরাট ভাবে এইজাতীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল ধরিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে সর্বপ্রথম নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিল।

নিবেদিতা

অভ্যর্থনার উত্তর

[১৮৯৩, ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিনাল গিবন্‌স্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ]

হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে গিয়া আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি দূরদেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারাও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' (ভাবার্থঃ বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদের এ-কথা বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, আমরাই য়াহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি; যে বৎসর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে তাহাদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়, সেই বৎসরই তাহারা দক্ষিণভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য আসিয়াছিল। জরথুষ্ট্রের অনুগামী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যাহারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহারই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিতেছিঃ 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥'[২]—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনি হে ভগবান্, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

পৃথিবীতে এযাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্মেলন এই ধর্ম-মহাসভা গীতা-প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছিঃ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥'—যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।

ভ্রাতৃভাব

[১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ধর্ম-মহাসমিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব ধর্মের প্রাধান্য-প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত হন; অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ এই গল্পটি বলিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।]

আমি আপনাদিগকে একটি ছোট গল্প বলিব। এইমাত্র যে সুবক্তা ভাষণ শেষ করিলেন, তাঁহার কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন—‘এস আমরা পরস্পরের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হই।’ মানুষে মানুষে সর্বদা এতটা মতভেদ থাকিবে ভাবিয়া বক্তা-মহাশয় বড়ই দুঃখিত। তবে আমি আপনাদের একটি গল্প বলি, হয়তো তাহাতেই বুঝা যাইবে—এই মতভেদের কারণ কি।

একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাস করিত। সে বহুকাল সেইখানেই আছে। যদিও সেই কুয়াতেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি ব্যাঙটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্রই ছিল। অবশ্য তখন বর্তমান কালের ক্রমবিকাশবাদীরা কেহ ছিলেন না, তাই বলা যায় না, অন্ধকার কূপে চিরকাল বাস করায় ব্যাঙটি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল কিনা; আমরা কিন্তু গল্পের সুবিধার জন্য ধরিয়া লইব তাহার চোখ ছিল। আর সে প্রতিদিন এরূপ উৎসাহে কুয়ার জল কীট ও জীবাণু হইতে মুক্ত রাখিত যে, সেরূপ উৎসাহ আধুনিক কীটাণুতত্ত্ববিদ্‌গণেরও শ্লাঘার বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে দেহে কিছু স্থূল ও মসৃণ হইয়া উঠিল। একদিন ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের একটি ব্যাঙ আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল।

কূপমণ্ডূক জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথা থেকে আসা হচ্ছে?’

‘সমুদ্র থেকে আসছি।’

‘সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মত বড়?’ এই বলিয়া কূপমণ্ডূক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফ দিল।

তাহাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, ‘ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করবে কি করে?’

ইহা শুনিয়া কূপমণ্ডূক আর একবার লাফ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমার সমুদ্র কি এত বড়?’

‘সমুদ্রের সঙ্গে কুয়োর তুলনা করে তুমি কি মূর্খের মত প্রলাপ বকছ?’

ইহাতে কূপমণ্ডূক বলিল, ‘আমার কুয়োর মত বড় কিছুই হতে পারে না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই থাকতে পারে না; এ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও।’

হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির বেড়া ভাঙিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হইবে। আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

হিন্দুধর্ম

[১৯ সেপ্টেম্বর, নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।]

হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয় ও য়াহুদী—এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন য়াহুদী-ধর্ম তৎপ্রসূত খ্রীষ্টধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই ঐ সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসী মাত্র এখন মহান্ জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, মনে হইয়াছে যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গেল; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত সবকিছুরই, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এগুলিরও স্থান হিন্দুধর্মে আছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই সকল বহুধা বিভিন্ন ভাব কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাতবিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিবা সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।

এ-স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। আচ্ছা, যদি এমন এক সময়ের কল্পনা করা যায়, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায়? কেহ বলিবেন যে, এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়—ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল! বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।

কোন উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ—নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে: 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'—অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মত এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি—'আমি' 'আমি' 'আমি', তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি—এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেনঃ না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা—আমি দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্তু আমি মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মরিয়া যাইবে তখনও আমি বাঁচিয়া থাকিব এবং এই দেহের জন্মের পূর্বেও আমি ছিলাম। আত্মা শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়, কারণ 'সৃষ্টি' শব্দের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ; ভবিষ্যতে এগুলি নিশ্চয়ই আবার বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট পদার্থ হন, তাহা হইলে তিনি মরণশীলও বটে। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন।

কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে—শরীর সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে—কাহারও হস্ত-পদ নাই, কেহ বা জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান্ কেন এত পক্ষপাতী? যদি বল

যে, যাহারা এজন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখী হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন দুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে এভাবে দেখিলে এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর সৃষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার চেষ্টাও লক্ষিত হয় না; পরন্তু এক সর্বশক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর আদেশেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্পষ্টতই ইহা অবৈজ্ঞানিক। অতএব স্বীকার করিতে হইবে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেই-সব কারণ।

দেহ-মনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ-মনের প্রবণতা হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ হয় না কি? দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত্তা সমান্তরাল রেখায় বর্তমান-একটি মন, অপরটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। কিন্তু জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করা যায় না, এবং যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক একত্ববাদ নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাদী একত্ববাদ ইহা কম বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুইটির কোনটিরই প্রয়োজন নাই।

আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশবস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব জীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। স্বীকার করা গেল পূর্বজন্ম আছে, কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন? ইহা সহজেই বুঝান যাইতে পারে। আমি এখন ইংরেজীতে কথা বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা নয়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-মনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরও নাই। কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহা এখনই প্রবল বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগেই চেতন-ভাব অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা সেই সমুদ্রের গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে। চেষ্টা ও সাধনা কর, ঐগুলি সব উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে।

পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ। কার্যক্ষেত্রে সত্যতা নির্ণীত হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং ঋষিগণ সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোষণা করিতেছেনঃ স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ কীরূপে আলোড়িত করিতে হয়, সেই রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সাধনা কর, তোমরাও পূর্বজন্মের সকল কথা মনে করিতে পারিবে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু নিজেকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। 'সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।'[৩] হিন্দু বিশ্বাস করেঃ সেই আত্মা এমন একটি বৃত্ত যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আর আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নন, আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। কিন্তু কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় মনে করিতেছেন।

পরবর্তী প্রশ্নঃ কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ? পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? শুনিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন—এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে পারিবেন না বলিয়া হিন্দুগণ উহা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত আত্মা ও জীব—এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চান এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না। প্রশ্ন যেমন তেমনি রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া পূর্ণকল্প হইতে পারেন? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, কেমন করিয়া তাঁহার সেই স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, 'জানি না, কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যাপারটি তো অনুভূত সত্য। প্রত্যেকেই তো নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করে।' কেন এরূপ হইল, কেনই বা আত্মা এই দেহে রহিয়াছেন, এ তত্ত্ব তাঁহারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—এরূপ বলিলে কিছুই ব্যাখ্যা করা হইল না। হিন্দুরা যে বলেন, 'আমরা জানি না', তাহা অপেক্ষা এই উত্তর আর বেশী কিছু নয়।

বেশ, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন বা দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। বর্তমান অবস্থা পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা, এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে—মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখনও বিকশিত হইয়া, কখনও সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠেঃ প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে, পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে?

আত্মা কি নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্যকারণ-স্রোতে দুর্বল অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মত কার্যকারণ চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর ঐ চক্র সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে—বিধবার অশ্রুর দিকে চাহিতেছে না, পিতামাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না?

ইহা ভাবিলে মন দমিয়া যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। তবে কি কোন আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন সমীপে উহা উপনীত হইল, সেখান হইতে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নামিয়া আসিয়া এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষি তারস্বরে জগতে এই আনন্দ সমাচার ঘোষণা করিলেন, 'শোন, শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই।'[৪]

'অমৃতের পুত্র'—কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

এইরূপে বেদ ঘোষণা করিতেছেন—কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্য-কারণের কারাবন্ধন আমাদের নিয়ন্তা নয়; কিন্তু এই-সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এক বিরাট পুরুষ অনুস্যূত রহিয়াছেন,'যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে,মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে।'[৫] তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান্—সকলের উপরেই তাঁহার করুণা। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি আমাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর'—বৈদিক ঋষিগণ এইরূপ গানই গাহিয়াছেন। আমরা কিভাবে তাঁহাকে পূজা করিব?—প্রীতি ভালবাসা দিয়া। প্রেমাস্পদরূপে—ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে।

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখা যাক হিন্দুগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া যাঁহাকে বিশ্বাস করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই প্রেমতত্ত্ব পরিপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়াছেনঃ মানুষ পদ্মপত্রের মত সংসারে বাস করিবে। পদ্মপত্র জলে থাকে,কিন্তু তাহাতে জল লাগে না; মানুষ তেমনি এই সংসারে থাকিবে,ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়া হাতে কাজ করিবে।

ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা ভাল; কিন্তু ভালবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসা আরও ভাল। তাইতো এই প্রার্থনাঃ প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা চাই না। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব; কিন্তু আমার শুধু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালবাসার জন্যই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের এক শিষ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট্ শত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাণীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে রাণী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন, 'প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা! কেমন সুন্দর ও মহান্! আমি হিমালয় বড় ভালবাসি। পর্বত আমাকে কিছুই দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান্ বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ঈশ্বরকেও ঠিক এই জন্য ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনি ভালবাসার একমাত্র পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাসি। আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি না, আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না, তাঁহার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাঁহাকে ভালবাসি। আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না।'

বেদ শিক্ষা দেনঃ আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব এই পরিত্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ঋষিদের ব্যবহৃত শব্দ 'মুক্তি'! মুক্তি, মুক্তি—অপূর্ণতা হইতে মুক্তি—মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি।

ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র-হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপালাভের উপায়। কিভাবে তাঁহার করুণা কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। 'তখনই—কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়।' মানুষ তখন আর ভয়ঙ্কর কার্যকারণ নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মস্থল, ইহাই হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, যাহা আদৌ জড় নয়,—যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন করিবে। তবেই তাহার সকল

সন্দেহ দূর হইবে। অতএব আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।' সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র, শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই—উহা জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।

এখন দেখা যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা—দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'র মত পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।

পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করেন। আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন—সকল হিন্দু এ-বিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ইহা সাধারণ ধর্ম।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পূর্ণতাই পরম তত্ত্ব, এবং সেই পরম কখনও দুই বা তিন হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন, তখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য ও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ—নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ।

আমরা প্রায়ই পড়িয়া থাকি, আত্মার এই অবস্থা—ব্যক্তিত্বের লয়—কাঠ পাথরের মত জড়াবস্থা; ইহাতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা বোধ করেন নাই, তিনি অপরের ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া পরিহাস করেন।

আমি বলিতেছি, এই অবস্থা ঐরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দেহের চেতনা উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহের চেতনা উপভোগ আরও বেশী সুখের হইবে। এইরূপে দেহসংখ্যা যতই বাড়িবে, আমার সুখও ততই বাড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায়—লক্ষ্যে উপনীত হইব।

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমি প্রাণস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণে জানিয়াছি—দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার শরীর এই নিরবচ্ছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তন হইতেছে; সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব)-জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়া যাইবেই, কারণ ঐ বিজ্ঞান তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। যথা—রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যাহা হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা চরম উন্নতি লাভ করিল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্ব প্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলিয়া 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।

এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞলোকেদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ নাই। প্রতি দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে, পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সর্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করিতেছে। ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন দেব-বিশেষের প্রাধান্যবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে না। গোলাপকে যে-কোন অন্য নামই দাও না কেন, তাহার সুগন্ধ সমানেই থাকিবে। সংজ্ঞা বা নাম দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না।

মনে পড়ে, বাল্যকালে একদা এক খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ভারতে এক ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দ্বারা আঘাত করি, তবে উহা আমার কি করিতে পারে?' জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আমি যদি তোমার ভগবানকে গালাগালি দিই, তিনিই বা আমার কি করিতে পারেন?' পাদ্রী উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর পর তোমার শাস্তি হইবে।' সেই ব্যক্তিও বলিল, 'তুমি মরিলে পর আমার দেবতাও তোমাকে শাস্তি দিবেন।'

ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের মত নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়ঃ পাপ হইতে কি কখনও পবিত্রতা

জন্মিতে পারে?

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা কেন গীর্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকান হয়? ক্যাথলিকদের গীর্জায় এত মূর্তি রহিয়াছে কেন? প্রোটেষ্টাণ্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব হয় কেন? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময় রূপবিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাবানুষঙ্গ নিয়মানুসারে জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদিত হয়। এইজন্য হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্য প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্য দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই মত জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বল তো, 'সর্বব্যাপী' বলিতে অধিকাংশ মানুষ—প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়া থাকে? ইহা একটি শব্দমাত্র—একটি প্রতীক। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি থাকে, তবে 'সর্বব্যাপী' শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয়, এই পর্যন্ত।

দেখা যাইতেছে—যেভাবেই হউক—মানুষের মনের গঠনানুসারে অনন্তের ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত; সেজন্য আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গীর্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। হিন্দুরা পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেহ কেহ সমগ্র জীবন স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের গণ্ডিবদ্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়া দেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন না, তাঁহাদের নিকট কয়েকটি মতে সম্মতি দেওয়া এবং লোকের উপকার করা ভিন্ন ধর্ম আর কিছুই নয়; কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির প্রার্থনাগৃহ, দেববিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্ম জীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র, তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেনঃ 'বাহ্যপূজা—মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা।'[৬] যে একাগ্র সাধক জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য কর—তিনি তোমাকে কী বলেন, 'সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; চন্দ্র তারা এবং এই বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই অগ্নি তাঁহাকে কীরূপে প্রকাশ করিবে? ইহারা সকলেই তাঁহার আলোকে প্রকাশিত।'[৭] তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে পাপ বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বৃদ্ধের পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বলা কি উচিত হইবে?

হিন্দুধর্মে বিগ্রহ-পূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয়। কিন্তু কেহ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার—উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মত ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিত থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান্ সূর্যে উপনীত হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেনঃ আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহায্য যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহা নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক। যাহাদের পক্ষে ইহা আবশ্যক নয়, তাহাদের বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহা অন্যায়।

আর একটি বিষয় বলা আমার অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ। হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিও, তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহ পীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু—চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্বলিত করে না; ইহাকে যদি তাহার দুর্বলতা বল, সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মেই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য-স্বরূপ—দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন—আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসিতেছে। সকলের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্য বিভিন্নতা প্রয়োজন। কিন্তু সব কিছুরই অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান্ বলিয়াছেনঃ সূত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, আমিও

সেইরূপ সকল ধর্মের মধ্যে অনুস্যূত। যাহা কিছু অতিশয় পবিত্র ও প্রভাবশালী, মানবজাতির উন্নতিকারক ও পাবনকারী, জানিবে —সেখানে আমি আছি।[৮] এই শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়। ব্যাস বলিতেছেন, 'আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।'

আর একটি কথা। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে ঈশ্বরপরায়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহান্ কেন্দ্রীয় তত্ত্ব—মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করার দিকেই তাঁহাদের ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। তাঁহারা 'জগৎপিতা'-কে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে) দেখিয়াছেন, এবং যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে।[৯]

ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু তাহার সব পরিকল্পনা হয়তো কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মত অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু—সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন, সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সশ্রদ্ধ সভয় দৃষ্টিতে দেখেন—সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অনুবর্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভা ঐ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনা মাত্র। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন—সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, য়াহুদীদের যিহোবা, খ্রীষ্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা', তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল—কখনও উজ্জ্বল, কখনও অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহা পশ্চিম গগনের দিকে চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্বগগনে স্যানপোর[১০] সীমান্তে উহা উদিত হইতেছে।

স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া,[১১] তুমি কখনও প্রতিবশীর শোণিতে নিজ হস্ত রঞ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ-রূপ ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন?

[২০ সেপ্টেম্বর, দশম দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত]

খ্রীষ্টানদের সর্বদাই স্পষ্ট কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত; আমার বোধ হয়, যদি আমি তোমাদের একটু সমালোচনা করি, তাহাতে কিছু মনে করিবে না। তোমরা খ্রীষ্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে খুব উদ্‌গ্রীব, কিন্তু বল দেখি, অনাহার ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে তাহাদের দেহগুলি বাঁচাইবার জন্য কোন চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টানেরা কিছুই কর নাই! তোমরা ভারতে সর্বত্র গীর্জা নির্মাণ কর, কিন্তু প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব—ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনান বা দর্শনশাস্ত্র শেখান, তাহাকে অপমান করা। ভারতে যদি কেহ পারিশ্রমিক লইয়া ধর্মপ্রচার করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম, খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি।

[ইহার পর সনাতনধর্মের পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করিলেন।]

[২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্মের বিষয়েই অধিক বলা হইয়াছিল। সেই দিবস স্বামী বিবেকানন্দ সনাতনধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। নানামতাবলম্বী নরনারীগণ তাঁহাকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শত শত ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ অতি নিপুণতার সহিত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন। সেদিন তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এতদুর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সনাতনধর্ম সম্বন্ধে আর একদিবস অন্যত্র বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন।]

বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ

[২৬ সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান্ গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে। আপনারা এইমাত্র শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিতে উঠিতেছি; কিন্তু আমি চাই তাহা পূর্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন; যাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।য়াহুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টানধর্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যীশুখ্রীষ্ট য়াহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, য়াহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমরা—হিন্দুরা দেখাইতে চাই, তাহা প্রধানতঃ এইঃ শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মত তিনিও 'পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই।' প্রভেদ এইটুকু যে, যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ অর্থাৎ য়াহুদীরাই তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যগণই তাঁহার শিক্ষার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। য়াহুদীরা যেমন (যীশুর মধ্যে) ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছিঃ শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ।

হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন; ইহাতে জাতিভেদ নাই। ভারতে উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, তখন উভয় জাতেই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে, লুকান বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন—ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; শুধু তাই নয়, ধর্মান্তরিত-করণের ভাব তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে।

সকলের প্রতি—বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা ছিল না। ইহা সেসময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান, তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমি দরিদ্রের জন্য—জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব।' (আজ পর্যন্ত তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ।)

দর্শনশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে।

দর্শনশাস্ত্রের দিক দিয়া সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন শৈলের অভিমুখে সবেগে পতিত হইলেন কিন্তু তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনারী সকলে সাদরে ধরিয়া থাকে, তাঁহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপসৃত করিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ বলেন।

কিন্তু এইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই সমাজসংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিককে বলিতে হইয়াছেঃ কোন হিন্দু মিথ্যা বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী—এ-কথা শোনা যায় না।

(সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেনঃ)

হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন—আমাদের এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারেন না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্যই আজ ভারতবর্ষ ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাসী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে। অতএব আসুন, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্ আত্মা এবং অসাধারণ লোক-কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই।

বিদায়

[২৭ সেপ্টেম্বর, সপ্তদশ (শেষ) দিবসের অধিবেশন]

বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন এখন সত্যই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে; এবং যাঁহারা এই মহাসভার অধিবেশনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, করুণাময় ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

যাঁহারা প্রশস্ত হৃদয় এবং সত্যানুরাগ লইয়া স্বপ্নের ন্যায় এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রথমতঃ কল্পনা করিয়া পরে কার্যে পরিণত করিয়াছেন, আমি সেই মহানুভব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ দিই। এই সভামঞ্চ হইতে পরিবেশিত উদার ভাবরাশির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী আমার প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-ভাবগুলির দ্বারা ধর্মসমূহের বিরোধ ভাব মন্দীভূত হয়, সেই ভাবগুলির প্রত্যেকটি তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। এই ঐক্যতানের মধ্যে সময় সময় কিছু শ্রুতিকটু ধ্বনি শোনা গিয়াছে, ঐগুলির জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, কারণ বিশেষ বৈষম্যদ্বারা উহারা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে সাধারণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে।

ধর্মীয় ঐক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমি এখনই এ-বিষয়ে আমার নিজের মতবাদ উপস্থাপন করিতেছি না। কিন্তু যদি এখানে কেহ এরূপ আশা করেন যে, প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা এই ঐক্য সাধিত হইবে, তাহাকে আমি বলি, 'ভাই, এ তোমার দুরাশা।' আমি কি ইচ্ছা করি যে খ্রীষ্টান হিন্দু হয়?—ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হউক?—ভগবান্ তাহা না করুন।

বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া যায়?—না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে নিজের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা বায়ু ও জল ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে বাড়িয়া উঠে।

ধর্মসম্বন্ধেও ঐরূপ। খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।

যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এইঃ সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবেঃ 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

পরিশিষ্ট

চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে স্বামীজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেনঃ

- (১) শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তদর্শন—শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, পূর্বাহ্ন ১০॥ টায়।
- (২) ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ—শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ন অধিবেশনে।
- (৩) পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয়-সম্বন্ধে—শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর।
- (৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ—সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর।

'The Chicago Daily Inter-Ocean' সংবাদপত্র ২৩ সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেনঃ

ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে গতকাল পূর্বাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ 'শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৩নং হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; শ্রোতৃবৃন্দ শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং সন্ন্যাসিপ্রবর অপূর্ব দক্ষতার সহিত প্রাঞ্জলভাবে ঐগুলির উত্তর দেন। অধিবেশনের শেষে আগ্রহান্বিত জিজ্ঞাসুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধে কোথাও একটি ছোট সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনাটির কথা ইতঃপূর্বেই তাঁহার মনে উঠিয়াছে।

প্রাচ্য নারী

[চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভায় 'মহিলা পরিচালক বোর্ড'-এর অধ্যক্ষা মিসেস পটার পামার কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় চিকাগোর জ্যাক্সন ষ্ট্রীটে মহিলা সদনে স্বামীজী এই বক্তৃতা দেন। 'Chicago Daily Inter-Ocean' সংবাদপত্রে ২৩ সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়।]

স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন: কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী-পুরুষের মর্যাদায় কোন পার্থক্য ছিল না; পূর্ণ সমতার ভাব বিরাজিত ছিল। কোন হিন্দুও বিবাহিত না হইলে পুরোহিত হইতে পারে না; ভাবটা এই যে, অবিবাহিত ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দুনারীর জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব। পত্নী যেন বৃত্তের কেন্দ্র—ঐ কেন্দ্রের স্থিরত্ব নির্ভর করে তাহার সতীত্বের উপর। এই আদর্শের চরম অবস্থায় হিন্দু বিধবারা সহমরণে দগ্ধ হইতেন। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশী ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না। যদি আমরা চরিত্রের ঐ সকল সদ্‌গুণ রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ হিন্দুনারী জগতের আদর্শস্থানীয়া হইবেন।

ধর্মীয় ঐক্যের মহাসম্মেলন

[২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 'Chicago Sunday Herald' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।]

এই ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা, কারণ আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান—এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহার ঈশ্বরের অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর স্বীকার করে না। যদি আমরা এই-সকল সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে রাখিতে চাই, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন হইবে না; যদি তাহা না চাই, তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আমাদের মিলনভূমি প্রশস্ত করিতেই হইবে। এই ধর্মমহাসভায় আরও বলা হইয়াছে—মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা আমাদের কর্তব্য, কারণ প্রত্যেক অসৎ ও হীন কার্যেরই প্রতিক্রিয়া আছে। আমার মনে হয়, এটি দোকানদারির ভাবঃ আমরাই প্রথমে, তারপর আমাদের ভাই-এরা। আমি মনে করি, ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্বে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, ভাইকে আমাদের ভালবাসিতেই হইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক মত মানুষের দিব্যভাব স্বীকার করে; কাহারও অনিষ্ট করিও না, তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত দিব্যভাবকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

ভগবৎপ্রেম

[২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 'Chicago Herald' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী]

লাফলিন ও মনরো ষ্ট্রীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতা-গৃহে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভগবৎপ্রেম; আলোচনা বাগ্মিতাপূর্ণ ও অপূর্ব হইয়াছিল। তিনি বলেনঃ

ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান্ ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সৎকার্যে প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ।

বক্তা চিকাগোতে আসা অবধি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন—আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বরপ্রেম হইতে সঞ্জাত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। বক্তা বলেনঃ

তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্বতগুহায় রাত্রি কাটাইয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বে এমন কিছু আছে, যাহা মানুষকে অসত্য বা অন্যায় হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা ঈশ্বরপ্রেম। ঈশ্বর যদি যীশু, মহম্মদ ও বৈদিক ঋষিগণের সহিত কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের অন্যতম সন্তান—তাঁহার সহিতও তিনি কেন কথা বলেন না? স্বামী আরও বলিলেনঃ সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তাঁহার সকল সন্তানের সহিত কথা বলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি এবং তাঁহার প্রেমের সীমাহীনতা দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হই এবং সেই হইতে আমাদের মঙ্গল ও শুভকর্মের প্রেরণা লাভ করি।

কর্মযোগ

প্রায় নয় বৎসর পূর্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ নামক গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ করি, তখন ধারণা ছিল যে, আমেরিকান সংস্করণখানিই উৎকৃষ্টতর; সুতরাং তদবলম্বনেই অনুবাদ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে আদ্যোপান্ত সংশোধনের ইচ্ছা থাকিলেও অন্যান্য কার্যবশতঃ সময়াভাবে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই। অনেক দিন ধরিয়া তজ্জন্য উহা অনুদ্রিত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উহা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত-ভাবেই পুনমুদ্রিত করা হয়। সম্প্রতি একটু অবকাশ পাইয়া মান্দ্রাজ-সংস্করণের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম—মান্দ্রাজ-সংস্করণে আমেরিকার সংস্করণ অপেক্ষা এত অধিক নূতন বিষয় আছে যে, বলা যায় না। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানির্বাণতন্ত্র হইতে বিস্তৃত উদ্ধৃতাংশ ও উহার উপর স্বামীজীর মন্তব্যসমূহ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'প্রতীক'-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই দুই সংস্করণের অনেক স্থলে এত পাঠান্তর যে, অনুবাদককে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। অগত্যা আমরা মান্দ্রাজ-সংস্করণে প্রাপ্ত প্রায় সমুদয় অতিরিক্ত অংশগুলির অনুবাদ বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম এবং পাঠান্তর-স্থলে উভয় সংস্করণের তুলনা করিয়া যেটি স্পষ্টতর বোধ হইল, সেইটির অনুবাদ করিয়া দিলাম। এতদ্ব্যতীত পূর্বানুবাদের ভ্রম বা ভাষার ত্রুটিসমূহ কতক কতক সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সুতরাং কর্মযোগের এই তৃতীয় সংস্করণকে পূর্ব পূর্ব সংস্করণ হইতে সম্পর্ণ পৃথক্ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইতি—

বিনীতানুবাদকস্য

আষাঢ়, ১৩১৬

কর্ম — চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব

কর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'কৃ'-ধাতুর অর্থ 'করা'; যাহা কিছু করা হয়, তাহাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ 'কর্মফল'। দার্শনিকভাবে ব্যবহৃত হইলে কখনও কখনও উহার অর্থ হয়—সেই-সকল ফল,আমাদের পূর্ব কর্ম যেগুলির কারণ। কিন্তু কর্মযোগে আমাদের 'কর্ম' শব্দটি কেবল 'কাজ' অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে। মানবজাতির চরম লক্ষ্য —জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই একমাত্র লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। সুখ ও আনন্দ তো শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য—এরূপ মনে করা ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ—মানুষ অজ্ঞের মত মনে করে, সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। কালে মানুষ বুঝিতে পারে, সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও সুখ উভয়েই তাহার মহান্ শিক্ষক, সে শুভ এবং অশুভ হইতে সমভাবে শিক্ষা পায়। সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের মনের উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এই চিত্রসমষ্টি বা সংস্কার-সমষ্টির ফলকেই আমরা মানুষের 'চরিত্র' বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের প্রবৃত্তি—মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টিমাত্র। দেখিবে, সুখ দুঃখ—দুই-ই সমভাবে তাহার চরিত্রগঠনের উপাদান; চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভাল-মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে—ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—মানুষ 'আবিষ্কার করে' (discovers) বা 'আবরণ উন্মোচন করে' (unveils)। মানুষ যাহা 'শিক্ষা করে', প্রকৃতপক্ষে সে উহা 'আবিষ্কার করে'। 'Discover' শব্দটির অর্থ—অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। মানুষ যতপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ—উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের কাছে উদ্দীপক কারণ-স্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজের মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতর পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরা আর একভাবে সাজাইয়া উহাদের ভিতর একটি নূতন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিলেন; উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেল বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব লৌকিক বা পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, বরং আবৃত থাকে; যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি 'আমরা শিক্ষা করিতেছি', এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবরণ যাঁহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাহার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান; আর যাঁহার ভিতর হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী কল্পনা সমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, মনের মধ্যেই সেইরূপ জ্ঞান রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ—জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্য সম্বন্ধেও সেইরূপ; যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি, তবে দেখিব, আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি—সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা আমাদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠন, এই আঘাত-সমষ্টিকেই বলে কর্ম। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বাহির করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে কোন মানসিক বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়, তাহাই কর্ম; 'কর্ম' অবশ্য এখানে উহার ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করিতেছি। আমি কথা বলিতেছি—ইহা কর্ম। তোমরা শুনিতেছে—তাহাও কর্ম। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছি—ইহা কর্ম, বেড়াইতেছি—কর্ম, কথা কহিতেছি—কর্ম, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা করি, সবই কর্ম। কর্ম আমাদের উপর উহার ছাপ রাখিয়া যাইতেছে।

কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি আমরা সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া শৈলখণ্ডের উপর তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনি শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্দ বলিয়া বোধ হয়! কিন্তু তবু আমরা জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি। উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা আমরা শুনিতে পাই না। যখন উহারা একত্র হইয়া প্রবল হয়, তখন আমরা শুনিতে পাই। এইরূপে হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে। কতকগুলি কার্য আমরা বুঝিতে পারি, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ধরা দেয়, তাহারা কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না। অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মত কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ—সে কি ভাবে করিতেছে; এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা উপলক্ষ্যে অতি সামান্য লোকও মহত্ত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার।

মানুষকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি সে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, ঐ কেন্দ্রেই উহাদিগকে

দ্রবীভূত করিয়া একাকার করিতেছে, তাহার পর একটি বৃহৎ তরঙ্গকারে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ একটি কেন্দ্রই প্রকৃত মানুষ, তিনি সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ; আর তিনি তাঁহার নিজের দিকে সমগ্র জগৎ আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ—সবই তাঁহার দিকে চলিয়াছে এবং তাঁহার চতুর্দিকে সংলগ্ন হইতেছে। তিনি ঐগুলির মধ্য হইতে 'চরিত্র'-নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়া উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ বাহিরে প্রক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে।

আমরা জগতে যতপ্রকার কার্য দেখিতে পাই, মনুষ্য-সমাজে যতপ্রকার আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কার্য হইতেছে, সবই চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, রণতরী—সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা চরিত্র হইতে উদ্ভূত, চরিত্র আবার কর্মদ্বারা নির্মিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ। প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে-সকল মানব জগতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে ওলট-পালট করিয়া দিতে পারিতেন। ঐ শক্তি তাঁহারা যুগযুগব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্মদ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মত প্রবল ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ করা যায় না, আর উহাকে পুরুষানুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারও (hereditary transmission) বলা যায় না; কারণ আমরা জানি তাঁহাদের পিতারা কিরূপ ছিলেন। তাঁহারা যে জগতের হিতের জন্য কখনও কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা জানা নেই। যোসেফের ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূত্রধর জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ এখনও জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন। যদি ইহা কেবল পুরুষানুক্রমিক শক্তি-সঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র সামান্য রাজা—যাঁহাকে হয়তো তাঁহার ভৃত্যেরা পর্যন্ত মানিত না, তিনি কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, যাঁহাকে জগতের অনেক লোক উপাসনা করিতেছে? সূত্রধর ও তাঁহার সন্তান—যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে—এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশানুক্রমিক মতবাদ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয় না। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য উহা যুগযুগান্তর হইতে ঐ স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। অবশেষে উহা বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্তির আকারে সমাজে আবির্ভূত হইল। এখনও ঐ শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

এই সবই কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপার্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা কখনও কখনও মনে করিতে পারি, ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে দৃঢ়বিশ্বাসী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সারা জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিতে পারে, এ জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাহার নিকট জীবন কষ্টকর ও জঘন্য বলিয়া মনে হয়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ কর্মের দ্বারা যাহা উপার্জন করি, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার। একজন নির্বোধ জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহার পুস্তকাগারে পড়িয়া থাকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়িতে পারিবে, এবং এই যোগ্যতা কর্ম হইতে উৎপন্ন। আমরা কিসের অধিকারী বা আমরা কি আয়ত্ত করিতে পারি, আমাদের কর্মই তাহা নিরূপণ করে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের বর্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাহা হইতে পারি। অতএব আমাদের জানা উচিত কিরূপে কর্ম করিতে হইবে। তোমরা বলিবে, 'কর্ম কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই তো কোন-না-কোন ভাবে এই জগতে কাজ করিতেছে।' কিন্তু 'শক্তির অনর্থক ক্ষয়' বলিয়া একটি কথা আছে। গীতায় এই কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, 'কর্মযোগের অর্থ কর্মের কৌশল—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কর্মানুষ্ঠান।' কর্ম কি করিয়া করিতে হয়—জানিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, সকল কর্মের উদ্দেশ্য—মনের ভিতরে পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আছে। এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার, ঐ মহাশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতস্বরূপ।

মানুষ নানা উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকে। কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য হইতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাহারা যশের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহারা অর্থের জন্য কার্য করে। কেহ প্রভুত্ব চায়, তাহারা প্রভুত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে স্বর্গে যাইতে চায়, তাহারা স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর নিজেদের নাম রাখিয়া যাইতে চায়। চীনদেশের রীতি—না মরিলে কাহাকেও কোন উপাধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষাকৃত ভাল প্রথা বলিতে হইবে। চীনে কোন লোক খুব ভাল কাজ করিলে তাহার মৃত পিতা বা পিতামহকে কোন সম্মানজনক উপাধি প্রদান করা হয়। কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে। কোন কোন মুসলমান-সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরে সমাহিত হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কার্য করিয়া থাকে। আমি এমন কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা জানি, যাহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমাধি-মন্দির নির্মিত হইতে থাকে; ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম এবং ঐ সমাধি-মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্যক্তি ততই ধনী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ম করিয়া থাকে; সর্ববিধ অসৎ কার্য করিয়া শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাঁহাদিগকে দিল। তাহারা মনে করে, এরূপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিষ্কার হইল, পাপ সত্ত্বেও তাহারা শাস্তি এড়াইয়া যাইবে। মানুষের কার্য-প্রবৃত্তির বহু উদ্দেশ্যের কয়েকটি মাত্র বলা হইল।

কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহাদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর; তাঁহারা কর্মের জন্যই কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রাহ্য করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়াই তাঁহারা কর্ম করেন। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিদ্রের উপকার ও মনুষ্য-জাতিকে সাহায্য করেন;

কারণ তাঁহারা সৎ কার্যে বিশ্বাসী, তাঁহারা সদ্‌ভাব ভালবাসেন। নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না; সচরাচর দেখা যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম-যশ হয়। কিন্তু যদি কেহ কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না? হাঁ, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে। নিঃস্বার্থ কর্মেই অধিক লাভ, তবে ইহা অভ্যাস করিবার সহিষ্ণুতা মানুষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা বেশী লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থপরতা—এগুলি শুধু নীতি-সম্বন্ধীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ; কারণ এগুলির মধ্যেই মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ মিনিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্তা—স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্তির ভয় অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কাজ করিতে পারেন, তাঁহার মধ্যে শক্তিমান্ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব কার্যে পরিণত করা কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আমরা উহার মূল্য জানি, জানি উহা কত শুভফলপ্রসূ। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ বিকাশ। সমুদয় বহির্মুখ কার্য অপেক্ষা আত্মসংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ। চতুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাধা না পাইয়া পাহাড়ের ঢালু পথে গড়াইয়া যাইতেছে, অথবা শকটচালক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর শক্তির বিকাশ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উহাদিগকে সংযত করা? একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে, অন্য একটি গোলা দেওয়ালে লাগিয়া বেশী দূরে যাইতে পারে না, কিন্তু এই সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমুদয় বহির্মুখ শক্তি স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, ঐগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমার শক্তি-বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু ঐগুলিকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্ধিত হইবে। এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত হইবে; উহা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মত চরিত্র সৃষ্টি করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রহস্য জানে না, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি জানে না যে, সে যদি কাজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষা করে, তবে সমুদয় জগৎ শাসন করিতে পারে। সে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুক, এবং এই অজ্ঞানসুলভ জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক। ঐ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গেলেই সে জগৎ শাসন করিতে পারিবে। অনেক পশু যেমন কয়েক পদ অগ্রে কি আছে, তাহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্প কয়েক বৎসর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমরা যেন একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ—ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহার বাহিরে আর কিছু দেখিবার ধৈর্য আমাদের নাই, এইভাবেই আমরা অসাধু ও দুর্বৃত্ত হইয়া পড়ি। ইহাই আমাদের দুর্বলতা—শক্তিহীনতা।

কিন্তু অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি উচ্চতর উদ্দেশ্যে কাজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই—নাম-যশের জন্যই কাজ করুক। প্রত্যেককে—সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং ঐগুলি কি—তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 'কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়'—ফল যাহা হইবার হউক। ফলের জন্য চিন্তা কর কেন? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময় তোমার প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভ কার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইও না।

কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। তীব্র কর্মশীলতার প্রয়োজন; সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আমরা এক মিনিটও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন-সংগ্রামে একদিকে কর্ম—যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘূর্ণিত, আর একদিকে সব ধীর স্থির; সবই যেন নিবৃত্তি-উন্মুখ, চারিদিকে শান্তিময়—কোনরূপ শব্দ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্তু বৃক্ষপুষ্প পর্বতরাজি-সমন্বিত প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই দুইটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর সমুদ্রের মৎস্য উপরে আসিবামাত্র খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়—কারণ জলের প্রবল চাপেই উহা জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে আসিবামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার যে-ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনি সংযমের রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্মসংযম করিয়াছেন। যানবাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। কর্মযোগের ইহাই আদর্শ। যদি এই অবস্থা লাভ করিতে পার, তবেই কর্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হইলে।

কিন্তু আমাদিগকে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও অধিক নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইবে, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ, কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন আমরা সত্যই নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমরা সেই অবস্থা লাভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়

সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত—সংস্কৃত ভাষায় ঐ উপাদান-ত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহ্যজগতে ইহাদের প্রকাশকে আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলতা ও জড়তা বলিতে পারি। তমোগুণের লক্ষণ অন্ধকার বা কর্মশূন্যতা; রজঃ—কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত; আর সত্ত্ব—ঐ দুই গুণের সাম্যাবস্থা।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে। কখনও তমঃ প্রবল হইয়া উঠে—আমরা আলস্যপরায়ণ হই, আমরা যেন আর নড়িতে পারি না, নিষ্কর্মা হইয়া যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আবার কখনও কখনও কর্মশীলতা প্রবল হয়। অন্য সময়ে আবার উভয় ভাবের সাম্য বিরাজ করে, মনে শান্ত ভাব আসে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে সচরাচর এই উপাদান-ত্রয়ের কোন একটির প্রাধান্য দেখা যায়। একজন হয়তো কর্মশূন্যতা, আলস্য ও জাড্যলক্ষণান্বিত; অপরের প্রধান লক্ষণ—কর্মশীলতা, শক্তি, মহাশক্তির বিকাশ; আবার কাহারও ভিতর আমরা শান্ত মৃদুমধুর ভাব দেখতে পাই—ইহা ঐ পূর্বোক্ত গুণদ্বয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার সামঞ্জস্য। এইরূপে সমুদয় সৃষ্ট জগতে—পশু উদ্ভিদ্ মানুষ—সকলের মধ্যেই আমরা এই বিভিন্ন শক্তির কম-বেশী প্রকাশ দেখিতে পাই।

এই ত্রিবিধ গুণ বা উপাদানই বিশেষভাবে কর্মযোগের আলোচ্য বিষয়। উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়া কর্মযোগ আমাদিগকে ভালভাবে কর্ম করিতে সাহায্য করে। মানব-সমাজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংগঠন। উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীতে ও বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত। সুনীতি ও কর্তব্য কাহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দেখিতে পাই—ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন। এক দেশে যাহা সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো তাহা সম্পূর্ণ দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—কোন কোন দেশে জ্ঞাতি-ভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহা অতিশয় নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষ নিজ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিতে পারে, অপর দেশে উহা নীতি-বিরুদ্ধ। কোন দেশে একবার মাত্র বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত।এইরূপে আমরা সদাচারের অন্যান্য বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, তথাপি আমাদের ধারণা—সদাচারের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে।

কর্তব্য-সম্বন্ধেও এইরূপ। কর্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন। কোন দেশে যদি কেহ কার্যবিশেষ না করে, লোকে বলিবে সে অন্যায় করিয়াছে; অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্যগুলি করিলেই লোকে বলিবে, সে ঠিক করে নাই। তথাপি আমরা জানি, কর্তব্যের একটি সর্বজনীন ধারণা অবশ্যই আছে। এইরূপে সমাজ এক শ্রেণীর কার্যবিশেষকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে, অপর এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে এবং ঐরূপ কার্য করিতে হইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি পথ খোলাঃ অজ্ঞ লোকের পথ—তাহারা মনে করে, সত্যলাভের পথ মাত্র একটি, আর সব পথ ভুল; আর একটি জ্ঞানীদের পথ—তাঁহারা স্বীকার করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথবা অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্তব্য ও সদাচারের ক্রম আছে; জীবনের এক অবস্থায়—এক পরিবেশে যাহা কর্তব্য, অপর অবস্থায়—অন্যরূপ পরিবেশে তাহা কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে না।

উদাহরণঃ সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ—অশুভের প্রতিরোধ করিও না, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সমুদয় সমাজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে—আমাদের লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। মাত্র একটি দিন যদি এইরূপ 'অপ্রতিকার নীতি' কার্যে পরিণত করা হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ ধরিবে। তথাপি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে 'অপ্রতিকার'-রূপ উপদেশের সত্যতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহাকে আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কেবল ঐ মত প্রচার করিলে মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হয়। শুধু তাহাই নয়, উহাতে তাহাদের বোধ হইবে যে, তাহারা সর্বদাই অন্যায় করিতেছে এবং তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে। ইহা তাহাদের দুর্বল করিয়া দিবে, এবং অন্যান্য দুর্বলতা অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইরূপ আত্মগ্লানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে। যে-ব্যক্তি নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য।

আমাদের প্রথম কর্তব্য—নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথমে নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, তাহার কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিতে পারে না।

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্যায় করা হইল—তাহা নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের কর্তব্য হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে তোমরা অনেকে ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া হয়তো আশ্চর্য হইয়াছ; বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং 'অহিংসাই পরম ধর্ম' এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে—প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে কাপুরুষ ও কপট বলিয়াছেন। এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রান্ত-দুইটি দেখিতে একই প্রকার। চূড়ান্ত 'অস্তি' ও চূড়ান্ত 'নাস্তি' সকল সময়েই সদৃশ। আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহা

আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতি দ্রুত কম্পনও আমরা দেখিতে পাই না। শব্দ সম্বন্ধেও ঐরূপ; অতি নিম্নগ্রামের শব্দ শোনা যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্দও শোনা যায় না। ‘প্রতিকার’ ও ‘অপ্রতিকার’-এর প্রভেদও এইরূপ। একজন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম; প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছা করিলে সে দুর্নিবার আঘাত হানিতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত করে না—তাহা নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুর্বলতাবশতঃ ‘প্রতিকার’ করে না, সে পাপ করিতেছে; সুতরাং এই ‘অপ্রতিকার’ হইতে সে কোন সুফল অর্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে। বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করিলেন—ইহা প্রকৃত ত্যাগ বটে; কিন্তু যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই—এমন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অতএব এই ‘অপ্রতিকার’ ও ‘আদর্শ প্রেম’-এর কথা বলিবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিতেছি, সেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আগে সযত্নে বুঝিতে হইবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের কাজ করিতেছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, এবং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই করিতেছি। অর্জুনও তাঁহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্যব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ‘স্নেহ-ভালবাসা’-বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কপট বলিতেছেন; ‘পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মত কাজ করিতেছ; ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।’[১]

ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ আদর্শ—তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের সোপানমাত্র। এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য—অশুভের প্রতিরোধ করা। কাজ করিতে হইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে,—যতদূর সাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া আঘাত করিতে হইবে। এই প্রতিকারের শক্তি যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম বা পুণ্যকর্ম।

আমার দেশে একবার একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে পূর্ব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়া জানিতাম, কিছু জানিবার জন্য তাহার কোন আগ্রহ ছিল না—সে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিল। আমার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ঈশ্বরলাভের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে, কি উপায়ে আমি মুক্ত হইব?’ আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পার কি?’ সে বলিল, ‘না’। তখন আমি বলিলাম, ‘তবে তোমায় মিথ্যা বলিতে শিখিতে হইবে। একটা পশুর মত বা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবনযাপন করা অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভাল। তুমি অকর্মণ্য; কর্মের অতীত যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করে এবং যাহা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তাহা লাভ কর নাই। তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কাজও করিতে পার না।’ অবশ্য যে-লোকটির কথা বলিতেছি, তাহার মত তামসিক প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আমি তাহার সহিত মজা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করিতে হইলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

আলস্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলতা অর্থে সর্বদাই ‘প্রতিরোধ’ বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্‌ভাবের প্রতিরোধ কর; যখন তুমি এই কার্যে সফল হইবে, তখন শান্তি আসিবে। এ-কথা বলা অতি সহজ যে, ‘কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কোন অমঙ্গলের প্রতিকার করিও না’; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার কি অর্থ দাঁড়ায়, তাহা আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমরা ‘অপ্রতিকার’-এর ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসনা দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের ন্যায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে। যথার্থ অপ্রতিকার হইতে প্রাণে যে শান্তি আসে, আমরা তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি; মনে হয়—প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাসনা থাকে, এবং যদি তুমি জানো যে সমগ্র জগৎ ধনলিপ্সু পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়া মনে করে, তবে তুমি হয়তো অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হইবে না, কিন্তু তোমার মন দিবারাত্রি অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে। এরূপ ভাব কপটতা মাত্র, ইহা দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয় না। সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, কিছুদিন পর যখন সংসারে সুখ-দুঃখ—যাহা কিছু আছে ভোগ করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে—তখনই শান্তি আসিবে। অতএব প্রভুত্ব-লাভের বাসনা এবং অন্য যাহা কিছু বাসনা আছে, সবই পূরণ করিয়া লও; এই-সকল বাসনা পূর্ণ হইলে পর এমন এক সময় আসিবে, যখন জানিতে পারিবে—এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিষ। কিন্তু যতদিন না তোমার বাসনা পূর্ণ হইতেছে, যতদিন না তুমি এই ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়া যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আত্মসমর্পণের ও বৈরাগ্যের ভাব লাভ করা অসম্ভব। এই ‘প্রশান্তি’ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে ইহা শুনিয়া আসিতেছে, তথাপি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব কম দেখিতে পাই। আমি তো অর্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু আমার জীবনে যথার্থ শান্ত ও প্রতিকারচেষ্টাশূন্য কুড়িজন মানুষ দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

প্রত্যেকেরই কর্তব্য—নিজ নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়তো জীবনে কখনই পরিণত করা সম্ভব হইবে না। মনে কর—আমরা একটি শিশুকে একেবারে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করিতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মরিয়া যাইবে, নয়তো হাজারে একজন বড়জোর ঐ কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে হামাগুড়ি দিয়া অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবে। সচরাচর আমরা মানুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। কোন সমাজে সকল নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ নয়; তাহাদের আদর্শগুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। ওক্‌ বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক্‌ বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার করা আবশ্যক।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম। ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পাশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী সৃষ্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য মাত্র। এই কারণে একই আদর্শ দ্বারা সকলকে বিচার করা অথবা সকলের সম্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করা উচিত নয়। এইরূপ কর্মপ্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম সৃষ্টি করে। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ধার্মিক ও সৎ হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। আমাদের কর্তব্য—প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ আদর্শ সত্যের যতটা নিকটবর্তী হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা।

আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধর্মনীতিতে এই তত্ত্বটি স্বীকৃত হইয়াছে; তাঁহাদের শাস্ত্রে ও ধর্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানব-সাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ করিতে হয়, তারপর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হয়; বৃদ্ধাবস্থায় হিন্দু গৃহস্থাশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এবং সর্বশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে বড় নয়। যিনি বিবাহ না করিয়া ধর্মকার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যত মহৎ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত মহৎ। সিংহাসনে আরূঢ় রাজা যেরূপ মহান্ ও গৌরবান্বিত, রাস্তার ঐ ঝাড়ুদারও সেইরূপ। রাজাকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাজ করিতে দাও—দেখ তিনি কতটা পারেন। আবার ঝাড়ুদারকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দাও—দেখ, সে-ই বা রাজকার্য কিরূপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর, এ-কথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস—এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে। গৃহস্থ বিবাহ করেন এবং সামাজিক কর্তব্য করিয়া যান; আর সংসারত্যাগীর কর্তব্য—তাঁহার সমুদয় শক্তি কেবল ধর্মের দিকে নিয়োজিত করা; তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা করিবেন এবং ধর্মশিক্ষা দিবেন।

‘মহানির্বাণ-তন্ত্র’ হইতে এই প্রসঙ্গ কিছু পড়িব। ঐগুলি শুনিলে তোমরা বুঝিবে গৃহস্থ হওয়া এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করা অতি কঠিন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥[২]

গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহাকে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে, তাঁহার নিজের সমুদয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই তাঁহাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।

কর্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হইতে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অথচ উহাতে নাম-যশ হইল বা না হইল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া—এইটিই এ জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য করিতে পারে, কিন্তু কাহারও স্তুতি-প্রশংসা না চাহিয়া অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়া সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥[৩]

গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন উহা সংগ্রহ না করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ॥[৪]

মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥[৫]

যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ প্রীত হন; হে পার্বতী, তুমিও তাহার প্রতি প্রীতা হও।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥[৬]

পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখনও কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সুসন্তান। পিতামাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবে, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর যতক্ষণ না তাঁহারা বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবে না।

মাতরং পিতরং পুত্ত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥[৭]

মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে।

জনন্যা বর্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ॥
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্মো হ্যেষ সনাতন॥[৮]

পিতামাতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

ন ভার্যান্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মান্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্যংন দর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥[৯]
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্যা পতিব্রতা।
সর্বো ধর্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥[১০]

ভার্যার প্রতিও গৃহস্থের অনুরূপ কর্তব্য আছেঃ গৃহী ব্যক্তি পত্নীকে কখনও তাড়না করিবে না, তাঁহাকে সর্বদা মাতৃবৎ পালন করিবে, আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ পত্নী বর্তমানে অন্য স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে স্পর্শ করিবেন না; এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জনে শয়ন বা বাস করিবেন না, স্ত্রীলোকের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেন, কখনও তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। হে পার্বতী, যে ব্যক্তির উপর পতিব্রতা ভার্যা তুষ্ট থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ করিয়াছেন এবং তিনি তোমার প্রিয়।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্ত্রান্ প্রেষয়েদ্ গৃহকর্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥[১১]

পুত্রকন্যার প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এইরূপঃ চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত পুত্রগণকে লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত নানাবিধ সদ্‌গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দিবে। বিংশতি বর্ষ বয়স হইলে তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে, তারপর আত্মতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্নপূর্বক শিক্ষা দিতে হইবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

এবংক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীর্ন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী॥
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থো পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।

পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥[১২]

গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সন্তোষ বিধান করিবেন। তারপর গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন করিবেন। হে দেবি! বিত্ত থাকা সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এরূপ আচরণ না করেন, তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে; তিনি লোকসমাজে নিন্দনীয় ও পাপী।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু॥[১৩]

গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং অশন-বসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন—এ-সকলই পরিমিত-ভাবে করিবে। গৃহস্থ অকপট, নম্র, বাহিরে অন্তরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হইবে।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।[১৪]

গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শৌর্য বীর্য অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবে।

শত্রুগণকে বীর্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোণে বসিয়া কাঁদিবে না, অপ্রতিকার-বিষয়ক বাজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ যদি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥[১৫]

নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবে না এবং সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিগণের অবমাননা করিবে না।

অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা গৃহীর কর্তব্য নয়; কারণ তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার যাঁহারা সম্মানের যোগ্য, তাঁহাদিগকে যদি গৃহস্থ সম্মান না করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে মহা অন্যায়।

সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥[১৬]

একত্রবাস ও সবিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া তবে তাহাদের উপর বিশ্বাস করিবে।

গৃহস্থ যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবে না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥[১৭]

গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন নাঃ নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, ধর্মজ্ঞ গৃহস্থ তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব করা উচিত নয়। ঐ বিষয় তাঁহার গোপনে রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞতা নয়; যদি কেহ এরূপ না করেন, তবে তাঁহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলা যাইতে পারে।

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলম্বন; তিনি প্রধান ধনোপার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোক—যাহারা (বাহিরের) কোন কার্য করে যা—সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি এমন হওয়া উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন যে, তিনি নিজ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতেছেন না। এই কারণে—

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥[১৮]

যদি গৃহস্থ কোন অন্যায় বা নিন্দিত কার্য করিয়া ফেলে অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, যাহাতে সে জানে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইবে, সে-বিষয়ও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে আত্মদোষ-প্রকাশের কোন প্রয়োজন তো নাই-ই, অধিকন্তু উহাতে নিরুৎসাহ আসিয়া তাহাকে যথাযথ কর্তব্য করিতে বাধা দেয়। সে যে অন্যায় করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ভুগিতেই হইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সে ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য, আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে, তাহাকে তো মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে।

যদি এই শহরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া ধনী না হইতেন, তাহা হইলে এই সভ্যতা—দরিদ্রালয় ও বড় বড় বাড়ী কোথায় থাকিত?

এক্ষেত্রে অর্থোপার্জন অন্যায় নয়, কারণ ঐ অর্থ বিতরণের জন্য। গৃহস্থই জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকার্যে অর্থব্যয় করা তাঁহার পক্ষে উপাসনা, কারণ যে গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন—সন্ন্যাসী নিজ কুটিরে বসিয়া উপাসনা করিলে উহা যেমন তাঁহার মুক্তিলাভের সহায় হয়—সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে; যেহেতু উভয়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার সবকিছুর উপর ভক্তিভাব-প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাবের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র দেখিতেছি।

বিদ্যাধনযশোধর্মান্ যতমান উপার্জয়েৎ
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যা দ্রোহং পরিত্যজেৎ॥[১৯]

গৃহস্থ যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবেন এবং ব্যসন (দ্যূত-ক্রীড়াদি), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করিবেন।

অনেক সময় লোকে নিজেদের সাধ্যাতীত কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা করিয়া থাকে।

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টা সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ॥[২০]

আবার চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত। অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম করিবে। সকল বিষয়েই 'সময়'-এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক সময় যাহা বিফল হইল, আর এক সময়ে হয়তো তাহাতে প্রচুর সাফল্য লাভ হইল।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ॥[২১]

ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের যশ খ্যাপন করিবেন না এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥[২২]

যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম-গৃহ ও সেতু নির্মাণ করিয়া সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন। বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই-সকল কর্ম করিয়া সেই পদলাভের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহাই কর্মযোগের এক অংশ—গৃহস্থের কর্তব্য ও কাজকর্ম। উক্ত তন্ত্রগ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়ঃ

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥[২৩]

যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত হন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া গৃহস্থের মৃত্যু হয়—যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই পদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে

স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের পক্ষে যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহা কর্তব্য নয়; পরন্তু শাস্ত্র কোনটিকেই হীন বা উন্নত বলিতেছেন না। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য রহিয়াছে এবং আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপযোগী কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

এই সমুদয় আলোচনা হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, দুর্বলতামাত্রই সর্বথা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্মের ভিতর—আমাদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর—এই বিশেষ ভাবটি আমি খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে—তাহাতে 'অভয়' শব্দটি বার বার উক্ত হইয়াছে। কোন কিছুকেই ভয় করিও না—ভয় দুর্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মানুষকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া নানা পাপ-কর্মে টানিয়া লয়। সুতরাং জগতের ঘৃণা ও উপহাসের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

যদি কেহ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া জগতের হিত-চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না; আবার যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান্। এই বিষয়টি আমি একটি গল্প দ্বারা বুঝাইব।

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু-সন্ন্যাসীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে বড়, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্তব্য করিয়া যায় সে-ই বড়?' অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'সন্ন্যাসী বড়।' রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আসিয়া বলিলেন, 'স্বধর্মপরায়ণ গৃহস্থই বড়।' রাজা তাঁহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইলেন।

অবশেষে আসিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী; রাজা তাঁহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হে রাজন্, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়।' রাজা বলিলেন, 'এ-কথা প্রমাণ করুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হাঁ, আমি প্রমাণ করিব; তবে আসুন, কিছুদিন আপনাকে আমার মত থাকিতে হইবে, তবেই যাহা বলিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।' রাজা সম্মত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহাসমারোহ-ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি এবং ঘোষণাকারীদের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে—আর ঢেঁটরা পেটা হইতেছে। রাজ ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, 'এই দেশের রাজকন্যা স্বয়ংবরা হইবেন।'

ভারতের প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্যাগণের স্বয়ংবরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে প্রত্যেক রাজকন্যারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ও ধারণা ছিল। কাহারও ভাব—বর যেন পরম সুন্দর হয়, কাহারও আকাঙ্ক্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান্ বরের, কেহ কেহ আবার চান খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবর্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখীন হইতেন। কখনও কখনও তাঁহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত; সে রাজপুত্রের গুণাবলী, কি কারণে তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্র—তাহা বর্ণনা করিত। সিংহাসনে সমাসীনা সুসজ্জিতা রাজকন্যাকে সভার চতুর্দিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত; তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের একজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেন, এবং কে কিরূপ গুণবান্ তাহা শুনিতেন। এইরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিতেন, 'আগাইয়া চল'; তখন সেই প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীদের দিকে আর কেহ চাহিয়াও দেখিত না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যার মনোমত হইতেন, তবে রাজকন্যা তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই রাজকন্যার স্বামী হইতেন।

যে-দেশে আমাদের পূর্ব-কথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সেই দেশের রাজকন্যার এরূপ স্বয়ংবর-সভা হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন; ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর রাজকন্যাই রাজ্য লাভ করিবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা সুপুরুষকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার মনের মত সুপুরুষকে পাওয়া যাইতেছিল না। অনেকবার এইরূপ স্বয়ংবর-সভা আহূত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও মনোনীত করিতে পারেন নাই। এই স্বয়ংবর-সভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। এই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হইয়াছিল, এবং এই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত হইয়াছিল।

সিংহাসনে সমাসীনা রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাহকগণ তাঁহাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতে লাগিল। রাজকন্যা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এবারেও স্বয়ংবর-সভা পূর্ব পূর্ব বারের মত ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইতে লাগিল। এমন সময় এক যুবা সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার রূপের প্রভা দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং সূর্যদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন—কি হইতেছে। রাজকন্যাসহ সেই সিংহাসন তাঁহার নিকটবর্তী হইল। রাজকন্যা সেই পরমরূপবান্ সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থামিতে বলিয়া সন্ন্যাসীর গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যাসী মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'এ কি নির্বুদ্ধিতা! আমি সন্ন্যাসী; আমার পক্ষে বিবাহের অর্থ কি?' সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না; অতএব তিনি বলিলেন, 'আমার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য।' এই বলিয়া সন্ন্যাসীর গলায় আবার মালা পরাইয়া দিলেন। 'কি বাজে

কথা! আমি বিবাহ করিতে চাই না, তবু এ কি?' বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিলেন, 'হয় আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব, নতুবা মরিব।' রাজকন্যা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুবর্তন করিলেন। তারপর আমাদের সেই অপর সন্ন্যাসী—যিনি রাজাকে সেখানে আনিয়াছিলেন—বলিলেন, 'চলুন রাজা, আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।' এই বলিয়া তাঁহারা অনেকটা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। যে-সন্ন্যাসী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক ক্রোশ গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিলেন; অপর দুইজনও তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন।

এই যুবা সন্ন্যাসী ঐ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন; উহার কোথায় কি আঁকাবাঁকা পথ আছে, সব জানিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইরূপ একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বন হইতে বাহিরে আসিবার পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও অপর সন্ন্যাসীটি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গাঢ়, তাহাতে পথ বাহির করা কঠিন, এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এস, আজ আমরা ইহার তলায় বিশ্রাম করি। প্রভাতে তোমাকে বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিব।'

সেই গাছে এক পাখীর বাসা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখী, পক্ষিণী ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত। ছোট পাখীটি নীচের দিকে চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, 'দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছেন—শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নিখণ্ডে কাঠকুটা দিয়া বেশ আগুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পাখীটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। সে তাহার পত্নীকে বলিল, 'প্রিয়ে আমরা কি করি? ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার মত কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই; কিন্তু ইঁহারা ক্ষুধার্ত, আর আমরা গৃহস্থ; ঘরে যে-কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমি নিজে যতদূর পারি করিব। ইঁহাদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তাঁহারা বাঁচাইতে পারিলেন না।

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, 'এঁরা তিনজন রহিয়াছেন, তাঁহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখী! ইহা যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর কর্তব্য—স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমার শরীরও ইঁহাদের জন্য উৎসর্গ করি।' এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং পুড়িয়া মরিয়া গেল।

শাবক-তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্যাপ্ত খাদ্য হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'আমাদের পিতামাতা যতদূর সাধ্য করিলেন, কিন্তু তাহাও তো যথেষ্ট হইল না। পিতামাতার কার্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্য; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক'—এই বলিয়া তাহারাও সকলে মিলিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিল।

ঐ তিন ব্যক্তি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্তু পাখীগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাঁহারা অনাহারে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজা ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, দেখিলেন তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চান, তবে ঐ পাখীদের মত প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি সংসার ত্যাগ করিতে চান, তবে ঐ যুবকের মত হউন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। যদি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়া লন, তবে সৌন্দর্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড় কিন্তু একজনের যাহা কর্তব্য, তাহা অপর জনের কর্তব্য নয়।'

কর্মরহস্য

শরীরগত অভাব পূরণ করিয়া অপরকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্তু অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর। যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, অবশ্যই তাহার উপকার করা হইল; যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহা অধিকতর উপকার; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার। একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে; অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। কেবল আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব-বৃত্তি চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা। মানুষকে যিনি পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক। আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিবার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ পুরুষ; কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্মপ্রচেষ্টার প্রকৃত ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছা করিলে তিনি অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি না জাগা পর্যন্ত মানুষের শারীরিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-বিষয়ে সাহায্য। অন্ন-বস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর—প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহৎ, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য, জ্ঞানই জীবন। জীবন যদি অন্ধকারে কাটাইতে হয়—অজ্ঞান ও দুঃখের মধ্য দিয়া চলাই যদি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার পর অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান। অতএব অপরকে সাহায্য করার বিষয় বিচার করিবার সময় আমরা যেন এই ভ্রমে পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। শারীরিক সাহায্যের স্থান শুধু সর্বশেষে নয়—সর্বনিম্নেও, কারণ ইহা স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত হইলে যে কষ্ট পাই, খাইলেই তাহা চলিয়া যায়; কিন্তু ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। দুঃখ তখনই নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ বা যন্ত্রণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অতএব যাহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন করে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার; তার পর মানসিক উপকার, তার পর শারীরিক।

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ-সমস্যার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মানুষ পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই জগৎ হইতে দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমরা দাতব্য আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাকিবেই থাকিবে।

গীতায় আমরা পুনঃপুনঃ পাঠ করি—আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে হইবে। সকল কর্মই স্বভাবতঃ শুভাশুভ-মিশ্রিত। আমরা এমন কোন কর্ম করিতে পারি না, যাহা দ্বারা কোথাও কিছু না কিছু ভাল হয়, আবার এমন কোন কর্ম হইতে পারে না, যাহা হইতে কোথাও না কোথাও কিছু অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক কর্মই অপরিহার্যভাবে শুভাশুভ-মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে বলিতেছেন। শুভাশুভ উভয়ই নিজ নিজ ফল প্রসব করিবে। শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইবে; কিন্তু এই শুভাশুভ উভয়ই আত্মার বন্ধন। গীতায় ইহার এই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত না হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে পারিবে না। এখন 'কর্মে অনাসক্তি' বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার মূলভাব এইঃ নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। 'সংস্কার' শব্দের প্রায় কাছাকাছি অর্থ 'সহজাত প্রবণতা'। মনকে যদি একটি হ্রদের সহিত তুলনা করা হয়, তবে বলা যায়—মনের মধ্যে যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু উহা চিত্তের উপর একটি দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবির্ভাব-সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং ঐ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার একত্র নাম—'সংস্কার'। আমরা যে-কোন কর্ম করি—আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা—চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া যায়; যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনও এত প্রবল থাকে যে, তাহারা অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করিতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। এই মুহূর্তে আমার 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমার অতীত জীবনের সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'চরিত্র' বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মন্দ কথা শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐগুলিই অজ্ঞাতসারে তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কারগুলি সর্বদাই কাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং ঐ ব্যক্তি একটি মন্দ লোক হইয়া দাঁড়াইবে—সে ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার মনের এই সংস্কার-সমষ্টি মন্দ কাজ করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উৎপন্ন করিবে। এই সংস্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে জোর করিয়া মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয়ে চিন্তা করে এবং ভাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইবে এবং অনুরূপভাবে ঐগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিবে। যখন মানুষ এত বেশী ভাল কাজ করে এবং এত বেশী সৎ চিন্তা করে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও ঐ সকল সংস্কারের সমষ্টি-স্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না, সংস্কারগুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিবে; সে তখন সৎ সংস্কারগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন

এইরূপ হয়, তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।

যেমন কূর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে—তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পার, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পার, তথাপি পা ও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলি সংযত হইয়াছে, তাহার চরিত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই সেগুলিকে বহির্মুখী করিতে পারে না। এরূপ নিরন্তর সচ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবর্তিত হওয়ায় সৎকর্ম করিবার প্রবণতা প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমরা ইন্দ্রিয়গুলি (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যন্ত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র) জয় করিতে সমর্থ হই। এভাবেই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে। এরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ; তাহার দ্বারা কোন অন্যায় অশুভ কার্য সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই রাখো না কেন, তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই সৎপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে—মুমুক্ষুত্ব। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল যোগের লক্ষ্য—আত্মার মুক্তি এবং প্রত্যেক যোগই সমভাবে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যানের দ্বারা, খ্রীষ্ট প্রার্থনা দ্বারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, মানুষ কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত; কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝা কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—যেমন অশুভ বন্ধন হইতে, তেমনি শুভ বন্ধন হইতেও মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও শিকল। আমার আঙুলে একটি কাঁটা ফুটিয়াছে, আর একটি কাঁটা দ্বারা ঐ কাঁটাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোলা হইয়া গেলে দুটি কাঁটাই ফেলিয়া দিলাম। দ্বিতীয় কাঁটাটি রাখিবার দরকার নাই, কারণ দুটিই তো কাঁটা! এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বারা ব্যাহত করিতে হইবে। মনের মন্দ সংস্কারগুলি দূরীভূত করিয়া সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে হইবে—যতদিন না যাহা কিছু মন্দ, তাহা প্রায় অন্তর্হিত হয়, অথবা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মনের এক কোণে বশীভূত ভাবে থাকে; কিন্তু তারপর শুভ সংস্কারগুলিও জয় করিতে হইবে। এরূপে 'আসক্ত' মন ক্রমে 'অনাসক্ত' হইয়া যায়। কর্ম কর, কিন্তু ঐ কর্ম বা চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আসুক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্গ উৎপন্ন হউক, কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন না করে।

ইহা করিবার উপায় কি? আমরা দেখিতে পাই, যে কার্যে আমরা আসক্ত হই, তাহারই সংস্কার থাকিয়া যায়। সারা দিনে শত শত ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাকে আমি ভালবাসি। রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্ট মুখগুলির বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু এক মিনিটের জন্য যে-মুখখানি দেখিয়াছিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখানিই আমার মনে ভাসিয়া উঠিল, আর সব মুখগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার বিশেষ আসক্তিবশতঃ অন্যান্য মুখগুলি অপেক্ষা ঐ মুখখানিই আমার মনে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। শারীরিক দিক দিয়া মুখগুলি দেখার কাজ একরূপই, যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি সবগুলির ছবিই আমার অক্ষিজালের (Retina) উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক ঐ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় নাই। বেশীর ভাগ মুখ হয়তো সম্পূর্ণ নূতন ছিল; এমন সব নূতন মুখ হয়তো দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে আমি পূর্বে কখনও চিন্তাই করি নাই; কিন্তু যে-মুখখানির একবার মাত্র চকিত দর্শন পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তো কত বৎসর ধরিয়া মনে মনে তাহার ছবি আঁকিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত বিষয় জানিতাম, এখন এই নূতন করিয়া দেখায়—মনের শত শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার পড়িয়াছে, ঐ একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সংস্কার ফেলিয়া মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে।

অতএব 'অনাসক্ত' হও, সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলি কর্ম করুক। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না করিতে পারে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য আসিয়াছ—এইভাবে কর্ম করিয়া যাও। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি, এই সংসার—এ পৃথিবী সেগুলিরই একটি। সাংখ্যের সেই মহাকাব্য স্মরণ রাখিও 'সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়।'[২৪] আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে—ইহাই প্রয়োজন। যদি সর্বদাই এ-কথা স্মরণ রাখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না; আমরা বুঝিব যে, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তকমাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভ করিবার পর, আমাদের নিকট ঐ গ্রন্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া প্রকৃতির সহিত আমরা নিজেদের মিশাইয়া ফেলিতেছি, ভাবিতেছি আত্মাই প্রকৃতির জন্য। চলিত কথায় আছে, আমরাও মনে করি—মানুষ 'খাবার জন্যই বাঁচে'; 'বাঁচার জন্য যে খায়'—তা নয়। আমরা ক্রমাগত এই ভুল করিতেছি; প্রকৃতিকেই 'আমি' ভাবিয়া উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারেই আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে না দিয়া ক্রীতদাসের মত কর্ম করায়।

এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে প্রভুর মত কর্ম করিতে হইবে, ক্রীতদাসের মত নয়। সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু দাসের মত কর্ম করিও না। সকলে কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন হইতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোক ক্রীতদাসের মত কর্ম করিয়া থাকে—তাহার ফল দুঃখ; ঐরূপ কর্ম স্বার্থপর। স্বাধীনতার সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর! 'প্রেম' শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে কখনও প্রেম আসিতে পারে না। ক্রীতদাসের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাও, সে বাধ্য হইয়া একটানাভাবে কাজ করিবে, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন ভালবাসা থাকিবে না। এইরূপ আমরাও যখন সাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মত কাজ করি, আমাদেরও অন্তরে কোন ভালবাসা থাকে না; আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম নয়। আমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম দাসসুলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য কৃত কিনা, তাহার পরীক্ষা এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাজ করা যায়, তাহাতে সুখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কাজ নাই, যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর-সম্বন্ধ—ইহারা একে তিন। ইহাদের একটি যেখানে আছে, অপরগুলি সেখানে অবশ্য থাকিবে। ইহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ! যখন সেই (নিরপেক্ষ) সত্তা আপেক্ষিকভাবাপন্ন হয়, তখন উহাকে আমরা জগৎরূপে দেখিয়া থাকি। সেই জ্ঞানই আবার জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহৃদয়ে সর্ববিধ ভালবাসার ভিত্তিস্বরূপ। অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক অথবা প্রেমাস্পদ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

মনে কর, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালবাসে। সে একাই তাহাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায়; তাহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির মনে ঈর্ষার উদয় হয়। সে চায়—মেয়েটি তাহার কাছে বসুক, তাহার কাছে দাঁড়াক, তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক। সে ঐ মেয়েটির ক্রীতদাস, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া রাখিতে চায়। ইহা ভালবাসা নয়, ইহা একপ্রকার দাসসুলভ অনুরাগের বিকার। ভালবাসার মত দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ইহা ভালবাসা নয়। উহা ভালবাসা হইতে পারে না, কারণ উহা যন্ত্রণাদায়ক। যদি মেয়েটি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালবাসায় কোন দুঃখকর প্রতিক্রিয়া নাই। ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়া থাকে। ভালবাসিয়া যদি আনন্দ না হয়, তবে উহা ভালবাসা নয়; অন্য কিছুকে আমরা ভালবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামীকে, স্ত্রীকে, পুত্রকন্যাকে, সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভালবাসিতে সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত কর্ম হইতে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। কর্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন?—জগৎকে ভালবাসি বলিয়া।'[২৫] ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত। প্রকৃত ভালবাসা আমাদিগকে অনাসক্ত করে। যেখানেই দেখিবে আসক্তি—পার্থিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণ, সেখানেই জানিবে উহা প্রাকৃতিক আকর্ষণ, কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্ষণ মাত্র—কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে; আর উহারা পরস্পর খুব নিকটবর্তী হইতে না পারিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব হয়; কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এরূপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভালবাসা অটুট থাকিবে, উহা বিনষ্ট হইবে না এবং উহা হইতে কখনও কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হইবে না।

এই অনাসক্তি লাভ করা একরূপ সারা জীবনের সাধনা বলিলেও হয়, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলাম এবং মুক্ত হইলাম। তখন আমাদের প্রকৃতিজাত বন্ধন খসিয়া পড়ে এবং আমরা প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের জন্য আর বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না; আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি এবং কর্মের ফলাফল আর গণ্য করি না। কি ফল হইল, কে তখন গ্রাহ্য করে?

শিশুসন্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য—ঐখানেই উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা কর, তাহা করিয়া যাও, কিন্তু সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা করিও না। যদি সর্বদা দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পার, প্রত্যুপকারের কোন আশা না রাখিয়া জগৎকে শুধু দিয়া যাইতে পার, তবেই সেই কর্ম হইতে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আসিবে না। যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই আসক্তি আসে।

যদি ক্রীতদাসের মত কাজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, তাহা হইলে প্রভুর ভাবে কাজে করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ আসিয়া থাকে। আমরা অনেক সময় ন্যায়ধর্ম ও নিজ নিজ অধিকারের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই—এ-সংসারে ঐগুলি শিশুসুলভ বাক্যমাত্র। দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে—ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতাপ্রয়োগ চিরকালেই স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। সকল নরনারীই—তাহাদের শক্তি ও সুবিধা যতটা আছে, তাহার যতটা পারে তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। দয়া স্বর্গীয় বস্তু; ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেই দয়াবান্ হইতে হইবে। এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক; শুধু তাই নয়, পরিণামে ইহা দুঃখের কারণ হয়। আর এক উপায় আছে, যাহা দ্বারা এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে; যদি আমরা সগুণ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কর্মকে 'উপাসনা' বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকি |এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিলে আমাদের কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রভু স্বয়ং সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং তাঁহার আসক্তি নাই। জল যেমন পদ্মপত্র ভিজাইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎপন্ন করিয়া কর্ম তেমনি নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অহং-শূন্য ও অনাসক্ত ব্যক্তি জনপূর্ণ পাপসঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন, তাহাতে তিনি পাপে লিপ্ত হইবেন না।

এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে: কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাণ্ডব এক মহাযজ্ঞ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বস্তু দান করিলেন। সকলেই এ-যজ্ঞের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, জগতে পূর্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই। যজ্ঞশেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধশরীর সোনার মত রঙ, বাকী অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, 'তোমরা সব মিথ্যাবাদী, ইহা যজ্ঞই নয়।' তাহারা বলিতে লাগিল, 'কি তুমি বলিতেছ—ইহা যজ্ঞই নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে

দরিদ্রদিগকে কত ধনরত্ন প্রদত্ত হইয়াছে, সকলেই ধনবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে? ইহার মত অদ্ভুত যজ্ঞ আর কেহ কখনও করে নাই।' নকুল বলিলঃ

শুনুন—এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরীব ছিলেন; শাস্ত্রপ্রচার ও ধর্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিকা। সেই দেশে একদা পর পর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল, গরীব ব্রাহ্মণটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেই পরিবারকে পাঁচ দিন উপবাসে থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দিনে পিতা কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহা চার ভাগ করিলেন। তাঁহারা উহা খাদ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। পিতা দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে, এক অতিথি দাঁড়াইয়া। ভারতবর্ষে অতিথি বড় পবিত্র ও মাননীয়; সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে 'নারায়ণ' মনে করা হয় এবং তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 'আসুন, মহাশয় আসুন, স্বাগত!' ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছি—এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে আমার জঠরাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল!' তখন ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, 'আমার ভাগও উঁহাকে দিন।' স্বামী বলিলেন, 'না, তা হইবে না।' কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নী জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এ দরিদ্র অতিথি আমাদের নিকট উপস্থিত, আমরা গৃহস্থ—আমাদের কর্তব্য তাঁহাকে খাওয়ানো, আপনার যখন আর কিছু দিবার নাই, তখন সহধর্মিণীরূপে আমার কর্তব্য তাঁহাকে আমার ভাগ দেওয়া।' এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'আমি এখনও ক্ষুধায় জ্বলিতেছি।' তখন পুত্রটি বলিল, 'আপনি আমার ভাগও গ্রহণ করুন। পুত্রের কর্তব্য—পিতাকে তাঁহার কর্তব্যপালনে সহায়তা করা।' অতিথি তাহারও অংশ খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুত্রবধূও তাঁহার ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে ঐ চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেল। ঐ ছাতুর গুঁড়া কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলাম, তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল; আপনারা সকলে তো ইহা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; আমার ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ সুবর্ণে পরিণত হইল না। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নয়।

ভারত হইতে এরূপ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে; মহৎ ব্যক্তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। নূতন ইংরেজী শিখিবার সময় আমি একটা গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল—কর্তব্যপরায়ণ বালকের গল্প; সে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহার কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বই-এর তিন-চার পৃষ্ঠা ধরিয়া বালকের এই কাজের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব কি আছে? এই গল্প যে কি নীতি শিক্ষা দেয়, কোন হিন্দু বালকই তাহা ধরিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাব—'প্রত্যেকেই নিজের জন্য' শুনিয়া আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি! এদেশে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা নিজেরাই সব ভোগ করে, বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্রদিগের একেবারে ভাসাইয়া দেয়। কোথাও কখনও গৃহস্থের এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

এখন তোমরা বুঝিতেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ—মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোক তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না, এবং তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করিও না, বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। যথার্থ ত্যাগীর জীবন অপেক্ষা যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন।

কর্তব্য কি?

কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের জানা আবশ্যক, কর্তব্য কাহাকে বলে। আমাকে যদি কিছু করিতে হয়, তবে প্রথমেই জানিতে হইবে—ইহা আমার কর্তব্য, তবেই তাহা করিতে পারিব। কর্তব্য-জ্ঞান আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাঁহার শাস্ত্র কোরানে যাহা লিখিত আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। হিন্দু বলেন, তাঁহার বেদে যাহা আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। খ্রীষ্টান আবার বলেন, তাঁহার বাইবেলে যাহা আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। সুতরাং আমরা দেখিলাম, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে কর্তব্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন। অন্যান্য সার্বভৌম-ভাববোধক শব্দের ন্যায় 'কর্তব্য' শব্দেরও স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কর্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল জানিয়াই আমরা উহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

যখন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই সেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কার্য করিবার জন্য স্বাভাবিক অথবা পূর্বসংস্কার অনুযায়ী ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। কখনও মনে হয়, এরূপ অবস্থায় এইভাবে কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অন্য সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইলেও সেভাবে কর্ম করা অন্যায় বলিয়া মনে হয়। সর্বত্রই কর্তব্যের এই সাধারণ ধারণা দেখা যায় যে, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই নিজ বিবেকের আদেশ অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ কোন্ গুণ কর্মকে কর্তব্যে পরিণত করে? যদি একজন খ্রীষ্টান সম্মুখে গোমাংস পাইয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আহার না করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে না দেয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেলা হইয়াছে। কিন্তু একজন হিন্দু যদি ঐরূপ ক্ষেত্রে উহা ভোজন করিতে সাহস করে অথবা অপর হিন্দুকে উহা খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় সমভাবে বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্য পালন করা হইল না। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার হৃদয়ে ঐরূপ ভাব আনিয়া দিবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত দস্যুদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল—যাহাকে পাইবে, তাহাকেই মারিয়া সর্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য; আর যে যত বেশী লোক মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সধারণতঃ একজন পথে বাহির হইয়া আর একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলে অন্যায় কার্য করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শুধু একজনকে নয়, বিশজনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে সে আনন্দিতই হয় এবং ভাবে—সে অতি সুন্দররূপে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কি করা হইয়াছে, বিচার করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না।

সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া একেবারে অসম্ভব; এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য—এরূপ নির্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে ব্যক্তি (Subjective) বা অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে-কোন কার্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, তাহাই সৎ কার্য; এবং যে-কোন কার্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায়, তাহা অসৎ কার্য। অধ্যাত্মভাবের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও মহান্ করে, আর কতকগুলি কার্যের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কার্যের দ্বারা কিরূপ ভাব আসিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তব্যসম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং উহা ঐ সংস্কৃত শ্লোকার্ধে বর্ণিত হইয়াছেঃ পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।

ভগবদ্গীতা জন্ম ও অবস্থা (বর্ণাশ্রম)-গত কর্তব্যের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্ ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা ঐ ব্যক্তির বর্ণ আশ্রম ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই অনেকটা নিরূপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে এমন কাজ করা, যাহা দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ। একজন মার্কিন ভাবেন, তাঁহার দেশের রীতিনীতি অনুসারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল এবং যে-কেহ ঐ রীতি অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। একজন হিন্দু (ভারতবাসী) ভাবে, তাহার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও সত্য, সুতরাং যে-কেহ উহা অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। আমরা সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্রমে পড়িয়া থাকি। ইহা বড়ই অনিষ্টকর; সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখা যায়, তাহার অর্ধেক এই ভ্রম হইতেই উৎপন্ন।

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন চিকাগো মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলাম, পিছন হইতে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরিয়া এক টান মারিল। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, তাঁহাকে বেশ ভদ্রলোকের মত দেখিতে। আমি তাহার সহিত দু একটি কথা বলিলাম; আমি ইংরাজী জানি বুঝিবামাত্র লোকটি খুব লজ্জিত হইল। আর একবার ঐ মেলাতেই আর একজন লোক আমাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দেয়। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সেও লজ্জিত হইল, শেষে আমতা আমতা করিতে করিতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'আপনি এইরূপ পোষাক পরিয়াছেন কেন?' এই-সকল ব্যক্তির সহানুভূতি তাঁহাদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ—দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে-সকল অত্যাচার করে, সেগুলির অধিকাংশেরই কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্জাত। ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ্য নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি তাঁহার মত পোষাক পরি না কেন, এবং আমার বেশের জন্য আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে চাহিলেন, তিনি হয়তো খুব ভাল লোক; হয়তো তিনি সন্তানবৎসল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি; কিন্তু যখনই তিনি ভিন্নবেশপরিহিত কাহাকেও দেখিলেন, তখনই তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা লুপ্ত হইয়া

গেল। সকল দেশেই আগন্তুক বিদেশীদের শোষণ করা হয়, কারণ তাহারা যে জানে না, নূতন অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, এইজন্য তাহারাও ঐ দেশের লোকেদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা লইয়া যায়। নাবিক, সৈন্য ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবহার করিয়া থাকে, নিজেদের দেশে ঐরূপ করিবার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধহয় চীনারা ইওরোপীয় ও মার্কিনগণকে 'বিদেশী শয়তান' বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল দিকগুলি দেখিলে তাহারা এরূপ বলিতে পারিত না।

সুতরাং একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি, যেন অপর জাতির আচার-ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবর্তিত হয়; কোন বিশেষ সময়ে যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা করাই এ জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রথমেই যেন আমরা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত কর্তব্য অনুসারে কাজ করি; তারপর সমাজে ও জীবনে আমাদের পদমর্যাদা অনুসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। মনুষ্য-স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে, মানুষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা করে না। সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। যদি বা সে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। তবেই তাহার উপর উচ্চতর কর্তব্যের ভার অর্পিত হইবে। এ সংসারে যখন আমরা আগ্রহ সহকারে কাজ করিতে আরম্ভ করি, তখন প্রকৃতিই আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীঘ্রই আমরা আমাদের যথার্থ মর্যাদা খুঁজিয়া পাই, বুঝিতে পারি—কোথায় কাহার স্থান। যে যে-কার্যের উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সন্তোষজনকভাবে সেই পদে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি যেরূপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাজ করিতেছে বলিয়াই যে একজন নিম্নস্তরের মানুষ, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও বিচার করা উচিত নয়; যে যেভাবে সেই কর্তব্য নিষ্পন্ন করে, তাহা দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হইবে।

পরে আমরা দেখিব, কর্তব্যের এই ধারণাও পরিবর্তিত হয়; আরও দেখিব—যখন কর্মের পশ্চাতে স্বার্থপ্রেরণা থাকে না, তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম করিতে পারে। তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মই আমাদিগকে কর্তব্যজ্ঞানের অতীত কর্মে লইয়া যায়; তখন কর্ম উপাসনায় পরিণত হয়, শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহা লাভ করিবার উপায় এই 'কর্তব্য'। আমরা দেখিব, কর্তব্যের তত্ত্ব—নীতি বা প্রেম—যে-কোন রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, ইহা অন্যান্য যোগের মতই; ইহার উদ্দেশ্য—'কাঁচা আমি'কে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করা, যাহাতে 'পাকা আমি' নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারেন; ইহার উদ্দেশ্য—নিম্নস্তরের শক্তিক্ষয় নিবারণ করা, যাহাতে আত্মা উচ্চতর ভূমিতে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। নীচ বাসনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ বা অস্বীকার করিলেই আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বাসনা কমাইতে কমাইতে আমরা মানুষের প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দিই। ভিতরের দিক্ হইতে দেখিলে কর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা হইতে পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব, আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মসংযম হইতে ধর্মের বিকাশ।

কর্তব্য বিশেষ রুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য-চক্রকে স্নেহসিক্ত করিলে তবেই উহা বেশ সহজভাবে চলিতে থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ! অন্যথা কিভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালন করিতে পারে? আমরা কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতেছি না? প্রেমমিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাতেই দীপ্তি পায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষার দাস আরও যে শত শত ছোট ছোট ঘটনা জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই, সেইগুলির দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা? আমরা জীবনে যে সব ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সম্মুখীন হই, ঐগুলি সহ্য করাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। নারীগণ নিজেদের ঈর্ষাপূর্ণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়া স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং মনে করে, তাহারা যেন নিজেদের স্বধীনতা জাহির করিতেছে। তাহারা জানে না যে, এইরূপে তাহারা নিজেদের দাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। যে-সকল স্বামী সর্বদাই স্ত্রীর দোষ দেখে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম; এমন মানুষ নাই বলিলেই হয়—তা সে যতদূর বিপথগামীই হউক না কেন—যাহাকে নম্রা প্রেমিকা সতী স্ত্রী সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে না পারেন। জগৎ এখনও এতটা মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমরা নৃশংস পতি এবং পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, নৃশংস ও অপবিত্র নারীর সংখ্যা যত, ঐরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা যেরূপ সগর্বে বলেন—এবং তাহা শুনিয়া লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে—যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি আছে, যাহা পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না? যে কল্যাণী সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতন দেখেন, এবং তাহাদের প্রতি জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা-শক্তিতে অতিশয় উন্নত হন; এমন পশুপ্রকৃতি মানুষ একটিও নাই, যে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া অনুভব না করিবে। প্রত্যেক পুরুষও সেইরূপ নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে-ব্যক্তি আবার ধর্মাচার্য হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিবেন, এবং সর্বদা সেরূপ ব্যবহার করিবেন।

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চতর, আর সব ভালবাসা নিম্নতর। মাতার কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয় চিন্তা করা, তারপর নিজের বিষয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন—তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখী এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মত। পাখীর ছানাদের ডানা উঠিলে তাহারা আর

বাপ-মাকে চিনিতে পারে না। সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি নারীকে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূর্তিরূপে দেখিতে সমর্থ। সেই নারীও ধন্য, যাঁহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক। সেই সন্তানেরাও ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের সত্তারূপে দেখিতে সমর্থ।

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়ঃ আমাদের হাতে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, যে পর্যন্ত না আমরা সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, সেই বড়—অবশ্য তাহার নিজ ব্যবসায় ও কার্যের দৃষ্টিতে।

এক যুবক সন্ন্যাসী বনে গিয়া বহুকাল ধ্যান-ভজন ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। উপরের দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, একটি কাক ও একটি বক গাছের উপর লড়াই করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, 'কি! তোরা আমার মাথায় শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিস?' এই কথা বলিয়া ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া পক্ষীগুলিকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বারা তাঁহার এমনই শক্তি হইয়াছিল! তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল, নিজের এইরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, 'একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক-বক ভস্ম করিতে পারি!' কিছু পরে ভিক্ষা করিতে তাহাকে শহরে যাইতে হইল। একটি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, 'মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।' ভিতর হইতে উত্তর আসিল—'বৎস একটু অপেক্ষা কর।' যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হতভাগিনী, তোর এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস না।' তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন; আবার সেই কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, 'বৎস! এত অহংকার করিও না, এখানে কাক বা বক নাই।' তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে সেই নারী বাহিরে আসিলেন, যোগী তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, 'মা, আপনি কিরূপে উহা জানিলেন?' তিনি বলিলেন, 'বাবা, আমি তোমার যোগ-তপস্যা কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্যা নারী। তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। সারা জীবন আমি কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে মাতাপিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য পালন করিয়াছি। এখন বিবাহিত হইয়া স্বামীর প্রতি আমার কর্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য করিয়াই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে চাও তো অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহা শিক্ষা করিলে তোমার পরম আনন্দ হইবে।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'ঐ নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাইব?'

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নগরের নিকটে আসিয়া বাজার দেখিতে পাইলেন। সেখানে দূর হইতে দেখিলেন, এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া বড় ছুরি লইয়া মাংস কাটিতেছে, নানা লোকের সহিত কথা বলিতেছে ও কেনাবেচা করিতেছে। যুবক ভাবিলেন, 'হায় ভগবান্, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে! এ তো দেখিতেছি একটা পিশাচের অবতার!' ইতোমধ্যে ঐ লোকটি চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'স্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন? আমার বেচা-কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া একটু বসুন।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'এখানে আমার কি হইবে?' যাহা হউক, তিনি উপবেশন করিলেন। ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ হইলে পর সে টাকাকড়ি সব লইয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, 'আসুন, মহাশয়, আমার বাটীতে আসুন।' গৃহে উপনীত হইলে ব্যাধ তাঁহাকে একটি আসন দিয়া বলিল, 'একটু অপেক্ষা করুন।' তারপর বাটীর ভিতরে গিয়া তাহার পিতামাতার হাত-পা ধোয়াইয়া দিল, তাঁহাদিগকে খাওয়াইল, সর্বপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিল। তারপর সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া একটি আসনে উপবেশন করিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, বলুন—আমি আপনার কি করিতে পারি?' তখন সন্ন্যাসী তাহাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, মহাভারত-গ্রন্থের অংশরূপে তাহা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত—দর্শনের চরম সীমা। তোমরা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, 'আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিত কর্ম করিতেছেন কেন?' তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 'বৎস, কোন কর্মই অসৎ নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কার্য আমার জন্মগত, ইহা আমার প্রারব্ধ-লব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। অনাসক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্টা করি; আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী করিবার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্ন্যাসীও হই নাই। আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই নাই। তথাপি সমাজে আমার অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অনাসক্তভাবে করিয়াই আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে।'

ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী।[২৬] আমি জীবনে যে-সব অতি বিস্ময়কর মানুষ দেখিয়াছি, ইনি তাঁহাদের একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি; কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন না; কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত—কখনও উহা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থাপন করিবেন এবং ঐ তত্ত্ব-সম্বন্ধে অপূর্ব আলোকসম্পাত করিবেন। তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের রহস্য সম্বন্ধে বলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'[২৭]—যখন তুমি কোন

কার্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না; পূজারূপে—সর্বোচ্চ পূজারূপে উহার অনুষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ কর।

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও সর্বান্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম করিতেন, ফলে তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস—যে-কোন আশ্রমের কর্তব্যই হউক না কেন, যথার্থ অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমরা আত্মজ্ঞান-বিষয়ক চরম অনুভূতি লাভ করিব।

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্মীই—তাহার অদৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং ঐগুলিই অমোঘ অস্ত্র হইয়া তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমরা যে কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ—আমরা সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা নিম্ন-অবস্থানির্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিও ঠিক ঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে-সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম চিন্তা উঠিত—কখনও ভাবিতাম, আমি একটা মস্তবড় সম্রাট্; কখনও বা নিজেকে অন্য কোনরূপ একটা বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও বাল্যকালে এরূপ চিন্তা করিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র; প্রকৃতিই সর্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধান করিয়া থাকে—তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে—যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে—তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়া থাকি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছিতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কর্তব্য পালন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখনও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, এবং তাহার জীবনটা বিফলতায় পর্যবসিত হইবে। এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে-কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি—সর্বদাই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে পাইব।

পরোপকারে নিজেরই উপকার

কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়তা হয়, সে-বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে 'কর্ম' বলিতে ভারতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি করিয়া ভাগ আছে, যথা-দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ঐ দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র; উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ঐ দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ঐ দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ—যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্থূলতর রূপ। এই অনুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক ধর্মেই ইহা প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই—যতদিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে, ততদিন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহারা সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়—সূক্ষ্ম ভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধারণা করিবার প্রণালী আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

স্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে আমরা প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি না; শব্দসমূহ তো চিন্তারই প্রতীক। অন্য হিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই প্রতীকরূপে দেখা যাইতে পারে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার পশ্চাতে মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞান পুরাপুরিভাবে মানব-সৃষ্ট নয়। কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বসিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি প্রতীকের সৃষ্টি করিলেন—এরূপ নয়। প্রতীকগুলি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। তোমাদের অনেকের ধারণা—খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শেই ক্রুশ-চিহ্ন প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্মের বহু পূর্ব হইতে, মুশা জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব হইতে—এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল। আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির মধ্যেও যে ক্রুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব, সকল জাতিই এই ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহার করিত।

আবার ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার—ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ একটি মানুষের—প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক 'স্বস্তিক' রহিয়াছে। এক সময়ে লোকে ভাবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহা ছড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাবিলন ও মিশরে ইহা দেখা যাইত। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে?—এই প্রতীকগুলি শুধু রীতিগত বা কল্পনাপ্রসূত নয়। নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মনুষ্য-মনের সহিত উহাদের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একটা কৃত্রিম বস্তু নয়। কয়েকজন লোক একত্র হইয়া কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবে—এইরূপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা সত্য নয়। কোন ভাবই তাহার অনুরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অথবা কোন শব্দই তাহার অনুরূপ ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেদ্য। ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ-বা বর্ণ-প্রতীক—উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। বধির ও মূক ব্যক্তিদিগকে শব্দপ্রতীক ছাড়া অন্য প্রতীকের সাহায্যে চিন্তা করিতে হয়। মনের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিপূরক হিসাবে একটি করিয়া রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদিগকে 'নাম-রূপ' বলা হয়। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব, সেরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রতীক সৃষ্টি করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকগুলির মধ্যে মানবজাতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্যান্য বাহ্য আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই—এ-কথা বলা খুব সহজ। আজকাল ছোট শিশুও এ-কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই অতি সহজেই দেখা যায়—যাহারা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না, তাহাদের চেয়ে যাহারা মন্দিরে উপাসনা করে, তাহারা অনেক বিষয়ে অন্যরূপ। এই কারণে কোন কোন ধর্মের সহিত যে-সব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থূল ক্রিয়াকলাপ জড়িত আছে, তাহা সেই সেই ধর্মাবলম্বীর মনে—ঐ স্থূল বস্তুগুলি যে-সব ভাবে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই-সব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। আর অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবারে উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। এই সকল বিষয়ের চর্চা ও অভ্যাস স্বভাবতই কর্মযোগের একটি অংশ।

এই কর্ম-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি এই—'ভাব' ও 'শব্দ'-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে এবং শব্দশক্তিদ্বারা কি সাধিত হইতে পারে, তাহা জানা। সকল ধর্মে শব্দশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি কোন কোন ধর্মে সমগ্র সৃষ্টিই 'শব্দ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহ্যভাব 'শব্দ'; আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সঙ্কল্প ও ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু 'শব্দ' হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। এই জড়বাদী ইহসর্বস্ব জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নায়ুগুলি অচেতন ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যতই আমরা বৃদ্ধ হই, যতই আমরা এই জগতে ঘা খাইতে থাকি, ততই আমরা অনুভূতিহীন হইয়া পড়ি; আর যে-সকল ঘটনা বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলিকেও আমরা অবহেলা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজস্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমরা এই-সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়া বিস্মিত হই ও সেগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর এইরূপ বিস্ময়ই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির প্রথম সোপান। শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় করিয়া থাকে। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আমি

তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। আমার কথা দ্বারা বায়ুর যে কম্পন হইতেছে, তাহা তোমার কর্ণে গিয়া তোমার স্নায়ুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পার না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে 'মূর্খ' বলিল—অমনি সে উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তাহার নাকে ঘুষি মারিল। দেখ—শব্দের কি শক্তি! ঐ এক নারী দুঃখে-কষ্টে কাঁদিতেছে; আর এক নারী আসিয়া তাহাকে দুই-চারিটি মিষ্টকথা শুনাইলেন। অমনি সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইল, তাহার শোক-দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি! উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচণ্ড শক্তি। এ-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধান না করিয়াও আমরা দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি। এই শক্তির প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং যথাযথভাবে উহার ব্যবহার করা কর্মযোগের অঙ্গবিশেষ।

অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ—অপরকে সাহায্য করা,জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেদেরই সাহায্য করিতেছি। আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়; কিন্তু যদি আমরা বিশেষ বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিব,আমাদের নিকট হইতে এই জগতের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নাই। তুমি আমি আসিয়া উপকার করিব বলিয়া এই জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। আমি একবার এক (খ্রীষ্টীয়) ধর্মোপদেশে পড়িয়াছিলাম, 'এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ এখানে আমরা অপরকে সাহায্য করিবার সময় ও সুবিধা পাই।' বাহ্যতঃ ইহা অতি সুন্দর ভাব বটে, কিন্তু জগতে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন—এইরূপ বলা কি ঈশ্বরনিন্দা নয়? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যত কাজ করি, তাহার মধ্যে অপরকে সাহায্য করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখিব—পরকে সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা। বাল্যকালে আমার কতকগুলি সাদা ইঁদুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে, তাহাতে ছোট ছোট চাকা ছিল। ইঁদুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিত, অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইঁদুরগুলি আর অগ্রসর হইতে পারিত না। এই জগৎ এবং উহাকে সাহায্য করাও সেইরূপ। তবে এইটুকু উপকার হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি জগৎ-সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার কাছে জগৎ—হয় নরম বা শক্ত, ঠাণ্ডা বা গরমরূপে প্রতিভাত হইবে। আমরা একরাশ সুখ বা দুঃখের সমষ্টিমাত্র। আমরা জীবনে শত শত বার ইহা অনুভব করিয়াছি। যুবকেরা সাধারণতঃ সুখবাদী (optimist), এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী (pessimist) হইয়া থাকে। যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে; বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে—তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে, শত শত বাসনা তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, কিন্তু এখন সেগুলি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্খ। আমরা যেরূপ মন লইয়া জীবনকে দেখি, উহা সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নতুবা স্বরূপতঃ এই জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়। স্বরূপতঃ অগ্নি জিনিষটি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন উহা আমাদিগকে সুখতপ্ত রাখে, তখন আমরা বলি—অগ্নি কি সুন্দর! আবার যখন উহা আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, তখন আমরা অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি। অগ্নি কিন্তু স্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয়। আমরা উহার যেমন ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব জাগ্রত করে; জগৎ-সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ; এ-কথার অর্থ—জগৎ নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলিয়া যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না।

তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে; ইহাই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্তু আমাদের সর্বদাই জানা উচিত যে,পরোপকার করা এক পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া গরীবকে বলিও না,'এই নে বেচারা', বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও—ঐ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও। সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। আমরা খুব বেশী কি করিতে পারি?—একটা হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতব্য আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি! গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তো আমরা বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার মধ্যে দশ লক্ষ টাকায় একটা হাসপাতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাকা নাচ-তামাশা-মদে খরচ করিতে পারি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরীবদের কাছে পৌঁছিল। কিন্তু তাহাতেই বা হইল কি? এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে। তবে করিব কি? এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ী সব উড়িয়া যাইতে পারে। অতএব এস, জগতের উপকার করিব—এই অজ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, সর্বদাই লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের পক্ষে এক আশীর্বাদস্বরূপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। আমরা যে-সব ভিখারীকে সাহায্য করি, তাহারা কেহই আমাদের এক পয়সা ধারে না; আমরাই তাহাদের নিকট ঋণী, কারণ সে তাহার উপর আমাদের দয়াবৃত্তি অনুশীলন করিতে অনুমতি দিয়াছে। আমরা জগতের কিছু উপকার করিয়াছি বা করিতে পারি, অথবা অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি—এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা মূর্খের চিন্তা, আর ঐরূপ চিন্তা দুঃখজনক। আমরা মনে করি, আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি; এবং আশা করি, সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে; আর সে ধন্যবাদ না দিলে আমরা মনে কষ্ট পাই। আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশা করিব? যাহাকে সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। মানুষকে সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়? যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম, তবে এই বৃথা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাম এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল করিতে পারিতাম। আসক্তিশূন্য হইয়া কাজ করিলে অশান্তি বা দুঃখ কখনই আসিবে না। এই জগৎ সুখ-দুঃখ লইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে এবং আমরা উহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছু করি বা না করি, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছিঃ

একজন গরীব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াছিল যে, কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়া সে অর্থ বা যাহা কিছু চায়,সবই পাইতে পারে। অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাকে ভূত দিতে পারে এমন একটি লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে মহা-যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন এক সাধুর সহিত তাহার দেখা হইল। সে ঐ সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিল। সাধু বলিলেন, 'ভূত লইয়া তুমি কি করিবে?' সে বলিল,'আমার একটি ভূত চাই। সে আমার হইয়া কাজকর্ম করিবে। কিরূপে একটি ভূত পাইব তাহার উপায় শিখাইয়া দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়োজন।' সাধু বলিলেন, 'অত বিক্ষুব্ধ হইও না, বাড়ী যাও।' পরদিন সে পুনরায় সাধুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে একটি ভূত দিন। কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাই-ই-চাই।'

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,'এই যাদুমন্ত্র লও; ইহা জপ করিলে একটি ভূত আসিবে—তাহাকে যাহা আদেশ করিবে,সে তাহাই করিবে। কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রাণী—তাহাকে অবিরত কাজে ব্যস্ত রাখিতে হয়; তাহাকে কাজ দিতে না পারিলে সে তোমার প্রাণ লইবে!' লোকটি বলিল, 'ইহা তো অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাহাকে তাহার জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পারি।' এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনেক দিন ধরিয়া ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার সম্মুখে এক বিরাট ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,'আমি ভূত—আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াছি; কিন্তু আমাকে সর্বদা কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। যে মুহূর্তে কাজ দিতে না পারিবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব।' লোকটি বলিল, 'আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দাও।' ভূত বলিল, 'হাঁ, প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে।' লোকটি বলিল, 'টাকা আনো।' ভূত বলিল, 'এই লও টাকা।' লোকটি বলিল, 'এই বন কাটিয়া এখানে একটি শহর তৈরি কর।' ভূত বলিল, 'তাহাও হইয়াছে। আর কিছু করিতে হইবে?' তখন লোকটির ভয় হইল; সে ভাবিতে লাগিল,—'ইহাকে তো আর কোন কাজ দিবার নাই, এ তো দেখিতেছি এক মুহূর্তে সব সম্পন্ন করে!' ভূত বলিল, 'আমাকে কিছু কাজ দাও, নইলে তোমায় খাইয়া ফেলিব।' ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বেচারা অতিশয় ভয় পাইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাধুর নিকট পৌঁছিয়া বলিল, 'প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।' সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' লোকটি বলিল, 'ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি যা বলি তাই সে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে; আর যদি তাহাকে কাজ না দিই তাহা হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।' ঠিক তখনই 'তোমাকে খাইয়া ফেলিব' বলিতে বলিতে ভূত আসিয়া হাজির হইল। খায় আর কি! লোকটি ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার জীবন-রক্ষার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাধু বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি; ঐ কুকুরটির দিকে চাহিয়া দেখ—উহার বাঁকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া উহার লেজটি কাটো, তারপর ভূতটিকে উহা সোজা করিতে দাও।' লোকটি কুকুরের লেজ কাটিয়া ভূতকে দিয়া বলিব, 'ইহা সোজা করিয়া দাও।' ভূত উহা লইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সোজা করিল, কিন্তু যেমনি ছাড়িয়া দিল, অমনি উহা গুটাইয়া গেল। আবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া লেজটি সোজা করিল—ছাড়িয়া দিতেই উহা গুটাইয়া গেল। আবার সে ধৈর্য সহকারে লেজটি সোজা করিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিবামাত্র উহা বাঁকিয়া গেল। এইরূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'জীবনে কখনও এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই। আমি পুরাতন পাকা ভূত, কিন্তু জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই।' অবশেষে লোকটিকে বলিল, 'এস তোমার সঙ্গে আপস করি। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমিও তোমাকে যাহা যাহা দিয়াছি সবই রাখিতে দিব, এবং প্রতিজ্ঞা করিব—কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না।' লোকটি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত এই চুক্তি স্বীকার করিল।

এই জগৎটা কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের মত; মানুষ শত শত বৎসর যাবৎ ইহা সোজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যখনই একটু ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহা আবার গুটাইয়া যায়। অন্যথা আর কিরূপ হইবে? প্রথমেই জানা উচিত, আসক্তিশূন্য হইয়া কিভাবে কাজ করিতে হয়; তাহা হইলেই আর গোঁড়ামি আসিবে না। যখন আমরা জানিতে পারি, এই জগৎ কুকুরের কোঁকড়ান লেজের মত, এবং উহা কখনও সোজা হইবে না, তখনই আমরা আর গোঁড়া হইব না।

অনেক প্রকার গোঁড়া আছে—মদ্যপান-নিবারক, চুরুট-নিবারক ইত্যাদি। এক সময়ে এই ক্লাসে একজন যুবতী মহিলা আসিতেন। তিনি এবং আর কয়েকজন মহিলা মিলিয়া চিকাগোয় একটি হল-বাড়ী করিয়াছেন; সেখানে শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। একদিন তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এই-সকল দোষের প্রতিকারের উপায় তিনি জানেন। আমি সে উপায়টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি কি হল-বাড়ীটির কথা জানেন না?' তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার মতে মানবজাতির যাহা কিছু অশুভ, ঐ 'হল-বাড়ী'টি তাহার অব্যর্থ মহৌষধ। ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাঁহারা মনে করেন, মেয়েদের যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। এই সবই গোঁড়ামি; আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও গোঁড়া হইতে পারেন না।

গোঁড়ারা ঠিক ঠিক কাজ করিতে পারে না। জগতে যদি গোঁড়ামি না থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিত। গোঁড়ামি দ্বারা মানবজাতির উন্নতি হয়—এরূপ চিন্তা করা ভুল। পক্ষান্তরে বরং উহাতে উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া যায়। আমরা যাহা করি বা আমাদের যাহা আছে, মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা আমাদের নাই, তাহার কোন মূল্য নাই।

অতএব যখনই গোঁড়ামির ভাব আসিবে, তখন সর্বদাই সেই কুকুরের লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোমার উদ্বিগ্ন অথবা বিনিদ্র হইবার প্রয়োজন নাই; তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে। যখন তোমার এই গোঁড়ামি থাকিবে না, কেবল তখনই তুমি ভালভাবে কাজ করিতে পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা উত্তমরূপে বিচার করিয়া কাজ করে, যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাজ করে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গোঁড়ারা নির্বোধ—সহানুভূতিহীন; তাহারা জগৎকে তো সোজা করিতে পারেই না, নিজেরাও

পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তোমাদের নিজেদের ইতিহাসে 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত ব্যক্তিদের কথা কি স্মরণ নাই? যখন তাঁহারা প্রথমে এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা 'পিউরিটান' ছিলেন, নিজেদের খুব পবিত্র ও সাধু প্রকৃতি মনে করিতেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহারা অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়। যাহারা নিজেরা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসে, তাহারাই আবার সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আমি দুইটি অদ্ভুত জাহাজের কথা শুনিয়াছি—প্রথম 'নোয়ার আর্ক' ও দ্বিতীয় 'মে-ফ্লাওয়ার'। য়াহুদীরা বলেন, সমুদয় সৃষ্টি 'নোয়ার আর্ক' হইতে আসিয়াছে; আর মার্কিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আসিয়াছে। এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আসেন নাই। এ আর এক রকমের গোঁড়ামি। গোঁড়াদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ নব্বইজনের যকৃত দূষিত, অথবা তাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অথবা তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেরাও বুঝিবেন যে, গোঁড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ—আমি ইহা যথেষ্ট দেখিয়াছি। প্রভু আমাকে গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করুন।

এই গোঁড়ামি-সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের কোনপ্রকার গোঁড়া বা একঘেয়ে সংস্কার কার্যের সহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা কি বলিতে চাও যে, মদ্যপান-নিবারক গোঁড়ারা মাতাল-বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে? গোঁড়াদের গোঁড়ামির কারণ এই যে, তাহারা এই গোঁড়ামি করিয়া নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ইহারা লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়। এই গোঁড়ার দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই শিখিবে—কিরূপে প্রকৃতভাবে ভালবাসিতে হয় এবং সহানুভূতি করিতে হয়, তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহানুভূতি করা সম্ভব হইবে; তখনই বুঝিবে—সেও তোমার মত একজন মানুষ; তখনই তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নানা অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার মত অবস্থায় পড়িতে, হয়তো আত্মহত্যা করিতে। আমার একটি নারীর কথা মনে হইতেছে—তাহার স্বামী ছিল ঘোর মাতাল। স্ত্রীলোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত পানদোষ-সম্বন্ধে অভিযোগ করিত। আমার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা—অধিকাংশ লোক তাহাদের স্ত্রীর দোষে মাতাল হইয়া থাকে। তোষামোদ করা আমার কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে-সকল অবাধ্য মেয়েদের মন হইতে সহ্যগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুঠোর ভিতর রাখিবে, এবং যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলে, তখনই চীৎকার করিতে থাকে—এরূপ মেয়েরা জগতের মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এই নারীগণ অর্ধাশনপীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে; আর তাহারাও বলিতেছে, 'মহিলাগণ, আপনারাই জগতের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব।' তখন আবার ঐ রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে 'ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক' আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে, কিন্তু জীবনটা তো এরূপ একটা তামাশা নয়; জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় অনেক আছে।

এখন তোমাদিগকে আজিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি পুনরালোচনা করিতে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন বিশ্ব জগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কাজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য—দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা। এ জগৎ একটি বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশালা—এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে দিন দিন আমরা আরও বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারি। চতুর্থতঃ আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিপরীত। গোঁড়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসে, 'আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে, এমন মানুষ দেখিবার জন্য আমি দূর-দূরান্তরে যাইতেও প্রস্তুত। ঐরূপ বলা খুব সহজ! যদি আমরা উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারি, তবে তো আমরা সিদ্ধ হইয়া যাই! ঐরূপ করা বড় সহজ নয়। অধিকন্তু যতই আমরা ধীরস্থির হইব এবং আমাদের স্নায়ুসমূহেও যতই শান্ত হইবে, ততই আমরা অধিকতর প্রেমসম্পন্ন হইব এবং আরও ভালরূপে কর্ম করিতে সমর্থ হইব।

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কায় মন ও বাক্য দ্বারা কৃত প্রত্যেক কার্যই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের কার্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তোমরা হয়তো সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কেহ যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সে ক্রমশঃ আরও মন্দ হইতে থাকে এবং যখন সৎকার্য করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে—সর্বদাই ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আর এক মনের উপর কার্য করে—এই তত্ত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্তিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, আমি যখন কোন কর্ম করিতেছি, তখন আমার মন কোন নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একসুরে বাঁধা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও সেই সুর বাজিয়া উঠিবার প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইরূপ যে-সকল মন একসুরে বাঁধা, একরূপ চিন্তা তাহাদের উপর সমভাবে কার্য করিবে। অবশ্য দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হইবে, কিন্তু মনের প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদা থাকিবে। মনে কর, আমি কোন মন্দ কাজ করিতেছি, আমার মন কম্পনের এক বিশেষ সুরে রহিয়াছে, তাহা হইলে জগতের সেইরূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এইরূপে যখন আমি কোন ভাল কাজ করি, তখন আমার মন আর এক সুরে বাজিতেছে এবং সেই সুরে বাঁধা সকল মনই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। তানশক্তির তারতম্য অনুসারে মনের উপর মনের এই প্রভাব-বিস্তারের শক্তিও কম-বেশী হয়।

এই উপমাটি লইয়া আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা যাইবে যে, আলোকতরঙ্গগুলি যেমন কোন বস্তুতে প্রতিহত হইবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারে, এই চিন্তাতরঙ্গগুলিও যতদিন না সমভাবে স্পন্দিত হইবার মত একটি বস্তু লাভ করে, ততদিন হয়তো শত শত বৎসর ঘুরিতে থাকিবে। খুব সম্ভব আমাদের এই বায়ুমণ্ডল এইরূপ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত প্রত্যেকটি চিন্তাই যেন এইরূপ স্পন্দিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে—যতদিন না উহা একটি উপযুক্ত আধার প্রাপ্ত হয়। যে-কোন চিত্ত এই আবেগসমূহের কিছু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত শীঘ্রই ঐভাবে স্পন্দিত হয়। সুতরাং যখন কেহ কোন অসৎ কর্ম করে, তখন তাহার মন এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়; আর সেই সুরের যে-সকল তরঙ্গ পূর্ব হইতেই বায়ুমণ্ডলে রহিয়াছে, সেগুলি তাহার মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই যে অসৎ কাজ করে, সে সাধারণতঃ দিন দিন আরও বেশী অসৎ কাজই করিতে থাকে। তাহার কর্ম ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। যে ভাল কাজ করে, তাহার পক্ষেও এইরূপ। তাহার বায়ুমণ্ডলে শুভতরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাহার শুভকর্মগুলি অধিক শক্তিলাভ করিবে। অতএব অসৎ কর্ম করিতে গিয়া দুই প্রকার বিপদে আমরা পড়িতে পারি—প্রথমতঃ আমাদের চারিদিকের অসৎ প্রভাবগুলিতে আমরা যেন গা ঢালিয়া দিই; দ্বিতীয়তঃ আমরা নিজেরা এরূপ সব অশুভ তরঙ্গ সৃষ্টি করি, যেগুলি শত শত বৎসর পরেও অপরকে আক্রমণ করিতে পারে। হইতে পারে আমাদের অশুভ কার্য অপরকে আক্রমণ করিবে। অসৎ কর্ম করিয়া আমরা নিজেদের এবং অন্যেরও অনিষ্ট করি; সৎ কর্ম করিয়া নিজেদের এবং অন্যেরও উপকার করি। অন্যান্য শক্তির ন্যায় মানুষের অভ্যন্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির হইতে বল সঞ্চয় করে।

কর্মযোগের মত কৃতকর্ম ফল প্রসব না করিয়া কখনই নষ্ট হইতে পারে না; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কোন অসৎ কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব; জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা উহাকে রোধ করিতে পারে। এইরূপে কোন সৎকর্ম করিলেও জগতে কোন শক্তিই উহার শুভ ফল রোধ করিতে পারে না। কারণ থাকিলে কার্য হইবেই; কিছুই উহাকে বাধা দিতে পারে না—রোধ করিতে পারে না। এখন কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতেছে, যথা—আমাদের এই-সকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আমরা একটি সীমারেখা টানিয়া বলিতে পারি না—এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ মন্দ। এমন কোন কর্ম নাই, যাহা একই কালে শুভ অশুভ দুই প্রকার ফলই প্রসব না করে। একটি নিকটের উদাহরণ লওয়া যাকঃ আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি; তোমাদের মধ্যে হয়তো কেহ কেহ ভাবিতেছ, আমি ভাল কাজ করিতেছি। কিন্তু ঐ একই সময়ে হয়তো আমি বায়ুমণ্ডলস্থ সহস্র সহস্র কীটাণু ধ্বংস করিতেছি। এইরূপে আমি কাহারও অনিষ্ট করিতেছি। যখন আমাদের কাজ নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমরা ঐ কাজকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমরা ভাল বলিতে পার, কীটাণুগুলি কিন্তু তা বলিবে না। কীটাণুগুলিকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, নিজেদেরই দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর কথা বলার প্রভাব প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগুলির উপর উহার প্রভাব তত প্রত্যক্ষ নয়। এইরূপে যদি আমরা আমাদের অসৎ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব—ঐগুলি দ্বারাও হয়তো কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে। যিনি শুভ কর্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আবার অশুভের মধ্যে কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম-রহস্য বুঝিয়াছেন।[২৮]

কিন্তু ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ অপবিত্র—এখানে হিংসা বা অহিংসা এই অর্থে 'অপবিত্রতা' অথবা 'পবিত্রতা' গ্রহণ করিতে হইবে। অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমরা বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুনই অপর কতকগুলি প্রাণীর কষ্ট হইতেছে; হইতে পারে তাহারা মানুষ অথবা প্রাণী অথবা কীটাণু, কিন্তু যাহারই হউক না, আমরা কোন-না-কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কুচিত করিতেছি, স্থানসঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। এইরূপই যদি হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্মদ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ করা যায় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার-রূপ গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইবে না; তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া

যাইতে পার, কর্মফলে শুভ ও অশুভের অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নাই।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এইঃ কর্মের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময়ে এই জগৎ পূর্ণতা লাভ করিবে; তখন ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ বা দুর্নীতি থাকিবে না। ইহা খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহা খুবই প্রেরণা যোগায়, কিন্তু যদি আমরা এক মুহূর্ত চিন্তা করি, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিব, এরূপ কখনও হইতে পারে না। কিরূপে ইহা হইতে পারে?—ভাল-মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কিরূপে পাওয়া যায়? পূর্ণতার অর্থ কি? 'পরিপূর্ণ জীবন' একটি স্ব-বিরোধী বাক্য। প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তুর সহিত আমাদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমরা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছি, যদি আমরা ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহার ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা—এই তো জীবন! আহার বা বায়ু না পাইলেই আমাদের মৃত্যু। জীবন একটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, উহা রীতিমত একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে যে জটিল সংগ্রাম, তাহাকেই আমরা জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে।

আদর্শ সুখ বলিতে বুঝায়—এই সংগ্রামের সমাপ্তি। কিন্তু তাহা হইলে জীবনও শেষ হইবে, কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ হইতে পারে যখন জীবনের শেষ। এই অবস্থার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমরা থাকিব না। অতএব অন্যত্র হয় হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ—এই আদর্শ যুগ—কখনই আসিতে পারে না।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য করি, তাহার মুখ্য ফল—আমাদের চিত্তশুদ্ধি। সর্বদা অপরের কল্যাণচেষ্টা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি। এই আত্মবিস্মৃতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। মানুষ মূর্খের মত মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে, এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

পরোপকার-মূলক প্রতিটি কার্য, সহানুভূতিসূচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে আমরা যেটুকু সাহায্য করি—এরূপ প্রত্যেকটি সৎকার্য আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'র গরিমা কমাইতেছে এবং আমাদের ভাবিতে শিখাইতেছে, আমরা অতি সামান্য, সুতরাং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদর্শ—অনন্তকালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোন 'আমি' নাই, সব 'তুমি'। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মানুষকে ঐ লক্ষ্যেই লইয়া যায়।

একজন ধর্মপ্রচারক নির্গুণ (ব্যক্তিভাবশূন্য) ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ভয় পাইতে পারেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব—এগুলির তাৎপর্য তিনি যাহাই বুঝুন—অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে নৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাই সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই ভাবটি মনুষ্যে পশুতে বা দেবতায়—সর্বত্র সমভাবে একমাত্র 'মাপকাঠি'রূপে প্রয়োগ করিতে পার; এই আত্মত্যাগই সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে অনুস্যূত একমাত্র মূল তত্ত্ব—ইহাই প্রধান ভাব।

এ জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ দেবপ্রকৃতি মানব—ইঁহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করেন। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি কোন দেশে এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিগণ—যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইঁহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক—ইহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু-মহাত্মারা ভাল করিয়া থাকেন, তেমনি সর্বনিম্ন প্রান্তে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাহাদের স্বভাব।

দুইটি সংস্কৃত শব্দ আছেঃ একটি—'প্রবৃত্তি', সেইদিকে আবর্তিত হওয়া অর্থাৎ যাওয়া; আর একটি—'নিবৃত্তি, সেইদিক হইতে নিবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ ফিরিয়া আসা। 'সেইদিকে বর্তিত হওয়া'কে সংসার বলি। এই 'আমি আমার'—যাহা কিছু এই 'আমি'কে টাকা-কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বারা সর্বদাই সমৃদ্ধ করিতেছে—এইগুলি সব প্রবৃত্তির অন্তর্ভূত। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি সব কিছু আঁকড়াইয়া ধরা। সর্বদাই সব জিনিষ এই 'আমি'-রূপ কেন্দ্রে জড়ো করা। ইহাই প্রবৃত্তি—ইহাই মনুষ্যমাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, চারিদিক হইতে যাহা কিছু সব গ্রহণ করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ো করা। সেই কেন্দ্র তাহার নিজের মধুর 'আমি'। যখন এই প্রবণতা ভাঙিতে থাকে, যখন নিবৃত্তি বা 'সেইদিক হইতে চলিয়া যাওয়ার ভাব' আসে, তখনই নীতি এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' উভয়ই কর্ম; প্রথমটি অসৎ কর্ম, দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার পূর্ণতাই সম্পূর্ণ 'আত্মত্যাগ'—পরের জন্য মন, শরীর, এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎ কর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র জীবনে একটি দর্শনশাস্ত্রও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনও কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তো সারা জীবনে একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাঁহার জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাসনা দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং দেখি—জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত সকলে একই স্থানে উপনীত হইলেন, মিলিত হইলেন। এই একস্থান—আত্মত্যাগ। মানুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধর্মবিষয়ক পদ্ধতি

যতই ভিন্ন হউক না কেন, পরার্থে আত্ম-বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র মানবজাতি সসম্ভ্রমে ও ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার মতবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না,—এমন কি যাহারা সর্বপ্রকার ধর্মভাবের বিরোধী, তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জনের কোন কাজ দেখে, তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা করিতেই হইবে। তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া খ্রীষ্টানও যখন এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলোক' (Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন—যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই প্রচার করেন নাই? ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে, তাহার ও যাহাদের সহিত তাহার মতবিরোধ, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। উপাসক ভক্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরের ভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ রক্ষা করিয়া অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। ইহাই আত্মত্যাগ। দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা দেখেন—এই আপাতপ্রতীয়মান 'আমি' ভ্রমমাত্র, এবং সহজেই উহা পরিত্যাগ করেন। ইহাও সেই আত্মত্যাগ। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারকগণ যে শিখাইয়াছেন 'ভগবান্ জগৎ নন'—তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ। জগৎ এক জিনিষ, ভগবান্ আর এক জিনিষ—এই পার্থক্য অতি সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর। এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। তাহা হইলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন। আর একজন হয়তো কুটীরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই; তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন।

এখন আমাদের মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক। আমরা বলি, ভাল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তার সঙ্গে কিছু ভাল না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা জানিয়া আমরা কর্ম করিব কিরূপে? এই তত্ত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহারা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে আত্মহত্যা করাই সংসার হইতে মুক্তি হইবার একমাত্র উপায়; কারণ জীবনধারণ করিতে গেলেই মানুষকে ছোট ছোট জীবজন্তুর ও বৃক্ষলতার জীবন নষ্ট করিতে হইবে, অথবা কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—মৃত্যু। এই মতবাদকে জৈনগণ তাঁহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গীতাতেই ইহার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়—ইহাই অনাসক্তির তত্ত্ব, জীবনে কাজ করিয়া কিছুতেই আসক্ত না হওয়া। জানিয়া রাখো—যদিও তুমি জগতে রহিয়াছ, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; যাহাই কর না কেন, তাহা নিজের জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কার্য যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ করিতে হইবে, অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন কার্যই হউক, তাহা যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যঞ্জক একটি বাক্য পাওয়া যায়: 'যদি কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াও হত্যা করেন না, বা হত হন না।'[২৯] এইজন্যই কর্মযোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়, 'সংসার ত্যাগ করিও না; সংসারে বাস কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা গ্রহণ কর; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্য কাজ একেবারেই করিও না।' ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে মারিয়া ফেল, তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া দেখ, যেমন প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা বলিতেন, 'পুরাতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।' 'পুরাতন মানুষ' শব্দের অর্থঃ জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নির্মিত হইয়াছে—এই স্বার্থপর ভাব। অজ্ঞ পিতামাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শেখান, 'হে প্রভো, তুমি এই সূর্য চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ।' প্রভুর যেন এই-সব শিশুর জন্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না! ইহা শুধু আমাদের কামনারূপ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করা। সন্তানদিগকে এমন বাজে কথা শিখাইও না। তারপর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আবার আর এক ধরনের নির্বোধ। তাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন, আমরা মারিয়া খাইব বলিয়াই এই-সকল জীবজন্তু সৃষ্টি হইয়াছে, আর এই জগৎ মানুষের ভোগের জন্য। এও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা। বাঘও বলিতে পারে, 'মানুষ আমার জন্য সৃষ্ট' এবং ভগবান্‌কে বলিতে পারে, 'প্রভো, মানুষগুলি কি দুষ্ট! তাহারা স্বেচ্ছায় আমাদের সম্মুখে আহাররূপে আসিয়া হাজির হয় না, তাহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে।' যদি জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরাও জগতের জন্য সৃষ্টি হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—এই অতি দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবৎসর ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে, জগতের সেদিকে খেয়ালই নাই। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। জগৎ যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখানি জগতের জন্য।

অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হইলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হৈচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও না; নিজে সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও। আমার গুরুদেব বলিতেন, 'নিজ সন্তানদের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর।' দাসী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে, অতি যত্নের সহিত লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান; কিন্তু দাসীকে বিদায় দিবামাত্র সে গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যায়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাব পোষণ কর। তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর, যাহা কিছু তোমার মনে কর, সবই তাঁহার। অত্যধিক দুর্বলতাই অনেক সময় মহত্তম কল্যাণ ও শক্তির ছদ্মবেশে দেখা দেয়। আমার উপর কেহ নির্ভর করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত দুর্বলতা। এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তি জন্মায় এবং এই আসক্তি হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব। আমাদের মনকে জানানো উচিত যে, এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিই সকলকে সাহায্য করিতেছে। আমরা কোটি কোটি মানুষ না থাকিলেও এইরূপ সাহায্য চলিবে। তোমার আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অপরকে সাহায্য করিয়া আমরা নিজেরাই শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাই

তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য। সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ শিক্ষাই শিখিতে হইবে। যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে ইহা শিক্ষা করিতে পারিব, তখন আর আমাদের দুঃখ থাকিবে না, তখন আমরা সমাজে যেখানে খুশী সেখানে গিয়া মিশিতে পারিব, কোন ক্ষতি হইবে না। তোমাদের পতি-পত্নী, দাস-দাসী, রাজ্য—এ-সব থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্ত্বটি হৃদয়ে রাখিয়া কাজ কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্য নয়, আর তুমি সাহায্য না করিলে চলিবে না—এমনও নয়, তবেই ঐসকল বস্তু তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই বৎসরই হয়তো তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগৎ কি স্বীয় গতি রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহার স্রোত কি বন্ধ হইয়া আছে? না ইহা ঠিকই চলিয়া যাইতেছে। অতএব তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়া দাও যে, তোমাকে জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্যই আমার জন্ম—এ-কথা চিন্তা করা কোন মানুষের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। উহা নিছক অহঙ্কার। উহা স্বার্থপরতা—ধর্মের রূপ ধরিয়া প্রতারণা করিতেছে। তোমার অথবা অন্য কাহারও উপর জগৎ নির্ভর করে না—এই ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য যখন তোমার স্নায়ু ও পেশীগুলিকে গঠিত করিবে, তখন কর্মজনিত কোন প্রতিক্রিয়া তোমাকে পীড়িত করিবে না। যখন তুমি কোন লোককে কিছু দাও এবং পরিবর্তে কিছুই আশা না কর, সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকুক এটুকুও না চাও, তখন তাহার অকৃতজ্ঞতা তোমার উপর কোন প্রতিক্রিয়া করিবে না, কারণ তুমি কিছুই প্রত্যাশা কর নাই, কখনই চিন্তা কর নাই যে, তোমার প্রতিদান পাইবার কোন অধিকার আছে। তাহার যাহা প্রাপ্য ছিল, তুমি তাহাই দিয়াছিলে। তাহার নিজ কর্মের ফলেই সে উহা পাইয়াছে, তোমার কর্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মাত্র। কিছু দান করিয়া তুমি গর্ববোধ করিবে কেন—তুমি তো উহার বাহক মাত্র? জগৎ নিজ কর্মের দ্বারা উহা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিল। ইহাই তোমার অহঙ্কারের কারণ কি? জগৎ কে তুমি যাহা দিতেছ, তাহা এমন একটা বড় কিছু নয়। অনাসক্তির ভাব লাভ করিলে তোমার পক্ষে আর ভাল বা মন্দ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। স্বার্থই কেবল ভাল-মন্দের প্রভেদ করিয়া থাকে। এইটি বুঝা বড় কঠিন, কিন্তু সময়ে বুঝিবে—যতক্ষণ না তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও, ততক্ষণ জগতের কোনকিছুই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যতক্ষণ না আত্মা অজ্ঞের মত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা হারায়, ততক্ষণ কোন শক্তিই আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অতএব অনাসক্তির দ্বারা তুমি তোমার উপর কোন কিছুর প্রভাব জয় কর—অস্বীকার কর। কোন জিনিসের তোমার উপর কিছু করিবার অধিকার নাই—এ-কথা বলা খুব সহজ; কিন্তু যিনি বাস্তবিকই কোন শক্তিকে তাহার উপর কাজ করিতে দেন না, বহির্জগৎ যাঁহার উপর কাজ করিলে যিনি সুখীও হন না, দুঃখিতও হন না—সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি? লক্ষণ এই যে, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য কিছুই তাঁহার মনে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না; সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে থাকেন।

ভারতে ব্যাস-নামক এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বেদান্ত-সূত্রের লেখকরূপে পরিচিত, তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। ইঁহার পিতা সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই; তাঁহার পিতামহও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও পারেন নাই; এইরূপে তাঁহার প্রপিতামহও চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র শুকদেব সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্যাস সেই পুত্রকে জ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। নিজে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া তিনি শুকদেবকে জনক-রাজার সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি একজন বড় রাজা ছিলেন এবং 'বিদেহ জনক' নামে অভিহিত হইতেন; 'বিদেহ' শব্দের অর্থ 'দেহজ্ঞানশূন্য', যদিও তিনি একজন রাজা, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্বদা 'আত্মা' বলিয়াই অনুভব করিতেন।

বালক শুককে শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। রাজা জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তিনি পূর্ব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন এই বালক গিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরিগণ তাঁহার কোন খবরই লইল না। তাহারা কেবল তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি আসন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না; তিনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন—কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না! তিনি এত বড় একজন ঋষির পুত্র, তাঁহার পিতা সমগ্র দেশে সম্মানিত, তিনি নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহসা রাজার মন্ত্রিগণ এবং বড় বড় কর্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিতরে এক সুশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন, সুগন্ধি জলে স্নান করাইলেন, খুব ভাল ভাল পোষাক পরিতে দিলেন, আট দিন ধরিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিলাসের ভিতর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু এই ব্যবহারের পরিবর্তনে শুকের শান্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল না। দ্বারে অপেক্ষা করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-সকল বিলাসের মধ্যেও তিনি ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল। রাজা তাঁহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাটি দুধ দিয়া বলিলেন, 'এই দুধের বাটিটি লইয়া সাতবার রাজসভা প্রদক্ষিণ করিয়া এস; সাবধান, যেন এক ফোঁটা দুধও না পড়ে।' বালকও সেই বাটিটি লইয়া এইসব গীতবাদ্য ও সুন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয়া সাতবার সভা প্রদক্ষিণ করিলেন, এক ফোঁটা দুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছু দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে না। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়া আসিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার পিতা তোমাকে যাহা শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলব্ধি করিয়াছ; এখন গৃহে গমন কর।'

অতএব দেখা গেল, যে ব্যক্তি নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, বাহিরের কোন বস্তু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবার যোগ্য। আমরা সচরাচর দুই মতের মানুষ দেখিতে পাই। কেহ কেহ দুঃখবাদী—তাঁহারা বলেন, এ পৃথিবী কি ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতগুলি ব্যক্তি সুখবাদী—তাঁহারা বলেন, এই জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব! যাঁহারা নিজেদের মন জয় করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখে পূর্ণ, অথবা সুখদুঃখমিশ্রিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা যখন আমাদের মনকে বশীভূত করিতে পারিব, তখন এই সংসার আবার সুখের বলিয়া মনে হইবে। তখন কোন কিছুই আমাদের মনে ভাল বা মন্দ ভাব উৎপন্ন করিতে পারিবে না। আমরা সবই

বেশ যথাস্থানে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিতে পাইব। যাহারা প্রথমে সংসারকে নরককুণ্ড বলিয়া মনে করে, তাহারাই আত্মসংযমে সমর্থ হইলে এই জগৎকে স্বর্গ বলিবে। আমরা যদি প্রকৃত কর্মযোগী হই এবং নিজদিগকে এই অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা যেখানেই আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় উপনীত হইবই; যখনই এই কল্পিত 'অহং' চলিয়া যায়, তখনই যে-জগৎ প্রথমে অমঙ্গলপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহা পরমানন্দে পূর্ণ এবং স্বর্গ বলিয়া বোধ হইবে। ইহার হাওয়া পর্যন্ত শান্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে, প্রত্যেক মানুষের মুখচ্ছবি ভাল বলিয়া বোধ হইবে। ইহাই কর্মযোগের চরম গতি ও উদ্দেশ্য, এবং ইহাই কর্মজীবনে পূর্ণতা বা সিদ্ধি।

অতএব দেখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগ পরস্পর-বিরোধী নয়। প্রত্যেকটিই আমাদিগকে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটিই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসই সিদ্ধির সমগ্র রহস্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস—প্রত্যেক যোগ সম্বন্ধেই ইহা সত্য। প্রথমে শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে; অনেক বিষয় যাহা একেবারে বুঝিতে পার না, তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ ও মননের ফলে স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সব বিষয় শোনামাত্রই বুঝা বড় কঠিন। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে—বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ-সকল তত্ত্ব অনুভব করিব এবং এই অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতে এমন প্রবল কর্মের শক্তি আসিবে যে, তাহা প্রতি শিরায়, প্রতি স্নায়ুতে, প্রতি পেশীতে ক্রিয়া করিতে থাকিবে—যতক্ষণ না তোমার সমুদয় শরীরটি এই নিষ্কাম কর্মযোগের একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ—পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। ইহা কোন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। খ্রীষ্টানই হও, য়াহুদীই হও আর জেণ্টাইলই হও, তাহাতে কিছু আসে যায় না; একমাত্র জিজ্ঞাসা—তুমি কি স্বার্থশূন্য? যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি ধর্মপুস্তকও না পড়িয়া এবং কোন গীর্জায় বা মন্দিরে না গিয়াও সিদ্ধ হইবে। আমাদের বিভিন্ন যোগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র সহায়তা না লইয়া মানুষকে পূর্ণ করিতে সমর্থ; কারণ প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য একই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—সকল যোগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ ও অন্যনিরপেক্ষ উপায়। 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ'[৩০]—অজ্ঞেরাই কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নয়। জ্ঞানীরা জানেন আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শেষ পর্যন্ত ঐ দুই পথ মানুষকে পূর্ণতারূপ একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

মুক্তি

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'কার্য' এই অর্থ ব্যতীত 'কর্ম'-শব্দদ্বারা মনোবিজ্ঞানে কার্য-কারণ-ভারও বুঝাইয়া থাকে। যে কোন কার্য বা যে কোন চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাকেই 'কর্ম' বলে। সুতরাং 'কর্মবিধান'-এর অর্থ কার্য-কারণের নিয়ম—অর্থাৎ কারণ ও কার্যের অনিবার্য সম্বন্ধ। আমাদের (ভারতীয়) 'দর্শন'-এর মতে এই 'কর্মবিধান' সমগ্র বিশ্বজগতের পক্ষেই সত্য। যাহা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, অথবা যে-কোন কাজ করি—বিশ্বজগতে যাহা কিছু কাজ হইতেছে—সবই একদিকে পূর্বকর্মের ফলমাত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কারণ হইয়া অন্য ফল উৎপাদন করে। এই সঙ্গে বিচার করা আবশ্যক 'বিধি' বা 'নিয়ম' বলিতে কি বুঝায়। ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমরা দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা ঘটিতেছে, কখন বা ঘটনা-দুইটি যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমরা আশা করি, সর্বদাই এরূপ ঘটিবে। আমাদের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'ব্যাপ্তি' বলিতেন। তাঁহাদের মতে নিয়ম-সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণার কারণ 'অনুষঙ্গ'। ঘটনাপরম্পরা আমাদের মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত থাকে। সেইজন্য যখনই আমরা কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলির সহিত ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব—অথবা আমাদের মনোবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। মনোবিজ্ঞানে ইহাকেই 'ভাবানুষঙ্গ-বিধান' বলে, আর 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' এই ব্যাপক বিধানের একটি দিকমাত্র। ভাবানুষঙ্গের এই ব্যাপকতাকেই সংস্কৃতে 'ব্যাপ্তি' বলে। অন্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতেও তেমনি বিধান বা নিয়মের ধারণা একই প্রকার; একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটিবে—তাহা এবং ঘটনাপরম্পরা বার বার ঘটিতে থাকিবে, আমরা এইরূপই আশা করি। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই। কার্যতঃ ইহা বলা ভুল যে, মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথবা প্রকৃতির কোন স্থলে বস্তুগতভাবে কোন নিয়ম আছে। যে প্রণালীতে আমাদের মন কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা ধারণা করে, সেই প্রণালীই নিয়ম; এই নিয়ম আমাদের মনে অবস্থিত। কতকগুলি ঘটনা একটির পর আর একটি অথবা একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে পুনঃপুনঃ এইরূপ ঘটিবে; ঘটনাপরম্পরা কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের মন এইভাবেই তাহা ধরিতে পারে ইহাকে বলা হয়—নিয়ম।

এখন জিজ্ঞাস্য—'নিয়ম সর্বব্যাপক' বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের জগৎ অনন্ত সত্তার সেইটুকু অংশ, যাহাকে আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ 'দেশ-কাল-নিমিত্ত' বলেন এবং ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাহা স্থান কাল ও কারণ (space, time, causation) বলিয়া পরিচিত। এই জগৎ সেই অনন্ত সত্তার এতটুকু অংশমাত্র, একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা, দেশ-কাল-নিমিত্তে গঠিত। ঐরূপে ছাঁচে ঢালা অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। অপরিহার্যভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই কার্য-কারণ-নিয়ন্ত্রিত জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। যখন আমরা এই জগতের কথা বলি, তখন আমরা বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, যে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ আমরা অনুভব করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্তা করি এবং কল্পনা করি, সেইটুকুই কেবল নিয়মাধীন; কিন্তু ইহার বাহিরের সত্তা নিয়মের অধীন নয়, যেহেতু কার্য-কারণ-ভাব আমাদের মনোজগতের বাহিরে আর যাইতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের অতীত কোন বস্তুই এই কার্য-কারণ-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়, কারণ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভাবানুষঙ্গ-সম্বন্ধ নাই, এবং ভাব-সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। নাম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা বা চৈতন্য কার্য-কারণ-নিয়ম মানিয়া চলেন এবং তখনই বলা হয় উহা নিয়মের অধীন, যেহেতু কার্য-কারণ-সম্বন্ধই সকল নিয়মের মূল। এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; ঐ শব্দগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কারণ ইচ্ছা জ্ঞানের অন্তর্গত এবং যাহা কিছু আমরা জানি সে-সবই আমাদের জগতের অন্তর্গত। আবার জগতের অন্তর্গত সব-কিছুই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে ঢালা। যাহা কিছু আমরা জানি বা যাহা কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সবই কার্য-কারণের অধীন; এবং যাহা কিছু কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন, তাহা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্যান্য বস্তু ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং ইহাও আবার অপরের কারণ হয়, এইরূপ চলিতেছে। যাহা পূর্বে 'ইচ্ছা' ছিল না, কিন্তু ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে পড়িয়া মানুষের ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মুক্তস্বভাব; আর যখন এই ইচ্ছা কার্য-কারণ-চক্র হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন আবার স্বাধীন বা মুক্ত হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা আসে, এই বন্ধনের ছাঁচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আসে, কোথায় অবস্থান করে এবং কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে—মুক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি, বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যখন আমরা বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হইবে সেই সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মানুষ। এই দেহ ও এই মন—যাহা আমরা দেখিতেছি, এগুলি সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই সেই অনন্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমাদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, আনন্দ ও বিষাদ, আমাদের সুখ ও আশা—সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। আমাদের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতে সীমাবদ্ধ। অতএব দেখিতেছ, আমাদের মনের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্র জগৎ চিরকাল থাকিবে—এরূপ আশা করা এবং স্বর্গে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করা কি ছেলেমানুষি! স্বর্গের অর্থ—আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। স্পষ্টই দেখিতেছ, অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা কি ছেলেমানুষি ও অসম্ভব বাসনা! অতএব যখন মানুষ বলে, সে এইভাবেই চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে, তাহা লইয়াই চিরদিন থাকিবে, অথবা আমি যেমন কখনও কখনও বলি, যখন মানুষ 'আরামের ধর্ম' চায়, তখন তোমরা নিশ্চয় জানিও—তাহার এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নততর কিছুই ধারণা করিতে পারে না; সে নিজের অনন্ত স্বরূপ ভুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিন্তা এই-সব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ এবং সাময়িক ঈর্ষায় আবদ্ধ। এই সান্ত জগৎকেই সে অনন্ত বলিয়া মনে করে। শুধু তাই নয়, সে এই মূর্খতা কোনমতে ছাড়িবে না। সে প্রাণপণে 'তৃষ্ণা'কে—জীবন-বাসনাকে আঁকড়াইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'তঞ্‌হা বা তিস্‌সা'

বলে। আমাদের জ্ঞাত ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে অসংখ্য প্রকার সুখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতি এবং অসংখ্য প্রকার কার্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু এ-সবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশমাত্র।

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'বুদ্ধির অতীত শান্তি' বলিয়া থাকেন, তাহা এই জগতে পাওয়া যাইতে পারে না—স্বর্গেও নয়, অথবা এমন কোন স্থানেও নয়, যেখানে আমাদের চিন্তাশক্তি ও মন যাইতে পারে, যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করিতে পারে, অথবা কল্পনা-শক্তি যাহা কল্পনা করিতে পারে—এরূপ কোন স্থানেই সেই মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এ-সকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের অন্তর্গত হইবে এবং সেই জগৎ দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্থান থাকিতে পারে যেখানে ভোগ তীব্রতর, কিন্তু সে-সকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, সুতরাং নিয়মের বন্ধনের ভিতর; অতএব আমাদিগকে এ-সকলের বাহিরে যাইতে হইবে এবং যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান—সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। যতদিন না আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জন দিতে পারি, যতদিন না এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন জগতের অতীত সেই অনন্ত মুক্তির এতটুকু আভাসও পাইবার আশা আমাদের নাই। অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্য-জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য 'মুক্তি' লাভ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, সে উপায়—এই ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র জগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বর্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু সীমাবদ্ধ—সব ত্যাগ করা। যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা এখনই মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়—সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্য-কারণ-শৃঙ্খল বর্তমান।

কিন্তু এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকেই এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আসক্তি-ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে বলে নিবৃত্তিমার্গ—উহাতে 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) করিয়া সব ত্যাগ করিতে হয়; আর একটিকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ—উহাতে 'ইতি ইতি' করিয়া সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল উন্নতমনা অসাধারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারা শুধু বলেন, 'না, আমি ইহা চাই না'; শরীর ও মন তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে, এবং তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হন। কিন্তু এরূপ মানুষ অতি বিরল। অধিকাংশ লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ—সংসারেরই পথ বাছিয়া লয়; এবং বন্ধনগুলিকেই ঐ বন্ধন ভাঙিবার উপায়রূপে ব্যবহার করে। ইহাও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে—ক্রমশঃ ত্যাগ করা হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিয়া, এইরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইয়া মন অবশেষে ঐগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্তি-লাভের প্রথমোক্ত মার্গের সাধন—বিচার, আর শেষোক্ত পথের সাধন—কর্ম ও অভিজ্ঞতা। প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকার কর্ম করিতে অস্বীকার করাই এ পথের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি নাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, যাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চান না, যাঁহাদের মন কখনও আত্ম হইতে অন্যত্র গমন করে না, আত্মাই যাঁহাদের সর্বস্ব, শুধু তাঁহারাই কর্ম করিবেন না।[৩১] অবশিষ্ট সকলকে অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে।

একটি জলস্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে নামিতেছে। একটি গর্তের ভিতর পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে পরিণত হইল; সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বাহির হইয়া দুর্বারবেগে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্য-জীবন এই প্রবাহের মত। উহাও ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে—নাম-রূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ 'আমার পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ' প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করে, অবশেষে বাহির হইয়া নিজের মুক্ত-ভাব ফিরিয়া পায়। সমুদয় জগৎ ইহাই করিতেছে, আমরা জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই জগৎরূপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্য কাজ করিতেছি। সংসার-আবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

কর্মযোগ কি?—কর্ম-রহস্য অবগত হওয়াই কর্মযোগ। আমরা দেখিতেছি সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে। কিসের জন্য? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভের জন্য। পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা। সকল বস্তুই সর্বদা মুক্তিলাভ করিতে এবং বন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ—সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎটাকে এই কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি বলা যাইতে পারে। কর্মযোগ আমাদিগকে কর্মের রহস্য—কর্মের প্রণালী শিখাইয়া দেয়। জগতের চতুর্দিকে ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বিচার-বিবেকের পর শেখার পরিবর্তে আমরা কর্মযোগ হইতে কর্মের রহস্য, কর্মের প্রণালী এবং কর্মের সংগঠনীশক্তি সম্বন্ধে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। ব্যবহার করিতে না জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্মযোগ কাজ করাকে একটি রীতিমত বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে। এই বিদ্যা দ্বারা জানিতে পারিবে, এই জগতের সকল কর্মের সদ্ব্যবহার কিভাবে করিতে হয়। কর্ম করিতেই হইবে, ইহা অপরিহার্য—কিন্তু উচ্চতম উদ্দেশ্যে কর্ম কর। কর্মযোগের সাধনায় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহার মধ্য দিয়াই আমাদের চলিতে হইবে; আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। জগতের বন্ধনের বাহিরে যাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে নিশ্চিতভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। এমন সব অসাধারণ মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, যাঁহাদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তাঁহারা একেবারে জগতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন—যেমন সর্প উহার ত্বক পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া থাকে। এই-সব অসাধারণ মানুষ কয়েকজন আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশিষ্ট মানবগণকে ধীরে ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। অল্প শক্তি নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্য ও উপায় দেখাইয়া দেয় কর্মযোগ।

কর্মযোগ কি বলে?—বলে, 'নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ কর।' কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও না। মনকে মুক্ত রাখো। যাহা কিছু দেখিতেছ, দুঃখ-কষ্ট—সবই জগতের অপরিহার্য পরিবেশ মাত্র; দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহারা মোটেই আমাদের স্বভাবগত নয়। আমাদের স্বরূপ দুঃখ ও সুখের পারে—প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি আমাদিগকে সর্বদাই কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। 'আসক্তি হইতেই দুঃখ আসে, কর্ম হইতে নয়।'

যখনই আমরা কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই আমরা দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মের সহিত ঐরূপ এক না হইয়া গেলে সেই দুঃখ অনুভব করি না। কাহারও একখানি সুন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাহার নিজের ছবিখানি পুড়িয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? দুইখানিই সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্রে অপেক্ষা অন্যক্ষেত্রে অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ—একক্ষেত্রে মানুষ ছবির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। এই 'আমি ও আমার' ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই স্বার্থ আসে এবং স্বার্থপরতা হইতেই দুঃখ আরম্ভ। প্রতিটি স্বার্থপর কার্য বা চিন্তা আমাদিগকে কোন-না-কোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর দাস হইয়া যাই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ হইতে 'আমি ও আমার' ভাব উত্থিত হয়।, তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করে, যতই আমরা 'আমি ও আমরা' বলি, ততই দাসত্ব বাড়িতে থাকে, ততই দুঃখও বাড়িতে থাকে। অতএব কর্মযোগ বলে—জগতে যত ছবি আছে, সবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কিন্তু কোনটির সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিও না; 'আমার' কখনও বলিও না। আমরা যখনই বলি, 'এটি আমার', তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিবে। 'আমার সন্তান'—এ-কথা মনে মনেও বলিও না; ছেলেকে আদর কর, তাহাকে নিজ আয়ত্তে রাখো, কিন্তু 'আমার' বলিও না। 'আমার' বলিলেই দুঃখ আসিবে। 'আমার বাড়ী', 'আমার শরীর' এরূপও বলিও না। এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে, যাইতেছে; কিন্তু আমরা মুক্ত—সাক্ষিস্বরূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, শরীরের তদপেক্ষা বেশী নাই। একটা শরীরের প্রতি আমরা এত আসক্ত হইব কেন? যদি কেহ একখানি ছবি আঁকে, সেটি শেষ করিয়া অন্যটিতে হাত দেয়। 'আমি উহা অধিকার করিব'—বলিয়া স্বার্থজাল বিস্তার করিও না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ।

অতএব কর্মযোগে বলা হয়ঃ প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার করিবার প্রবণতা বিনষ্ট কর, যখন উহা দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, তখন মনকে আর স্বার্থপরতার তরঙ্গে পরিণত হইতে দিও না। তারপর সংসারে গিয়া যত পার কর্ম কর, সর্বত্র গিয়া মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছা যাও, মন্দের স্পর্শ তোমাকে কখনই দূষিত করিতে পারিবে না। পদ্মপত্র জলে রহিয়াছে, জল যেমন কখনও উহাতে লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে; ইহাই 'বৈরাগ্য' বা অনাসক্তি। মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসক্তি ব্যতীত কোন প্রকার 'যোগ'ই হইতে পারে না। অনাসক্তি সকল যোগেরই ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং সুখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিতে গিয়া থাকে, সে অতিশয় আসক্ত হইতে পারে; তাহার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বস্ব হইতে পারে; ক্রমশঃ তাহাকে তাহার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। অনাসক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়া নয়, অনাসক্তি মনে। 'আমি ও আমার'—এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই রহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ না থাকে, তবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যাহাই হই না কেন, আমরা অনাসক্ত। একজন—সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়তো ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত হইয়াই ভয়ানক আসক্ত। প্রথমে আমাদিগকে এই অনাসক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইবে, তারপর নিরন্তর কার্য করিতে হইবে। যে কর্মপ্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে সাহায্য করে, কর্মযোগ আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা অতি কঠিন।

সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি—যাহারা ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য। তাহারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে হইবে—তাহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি নিশ্চয় অনাসক্ত হইব।' অন্যটি—যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, অনুভব করেন, শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য। আমরা যে-কোন ভাল কাজ করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংসা বা সুবিধা দাবী না করি। উহা প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমরা প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃত্তি প্রতি মুহূর্তে তাঁহা হইতেই আসিতেছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥[৩২]

'যাহা কিছু কাজ কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু পূজা হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর।' আমরা নিজেরা যেন সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সব-কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহং'কে আহুতি-দানরূপ মহাযজ্ঞ কর।

'জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনস্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজিতে গিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।' দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে: আমার জন্য কিছুই নয়; কোন বস্তু শুভ, অশুভ বা নিরপেক্ষ—যাহাই হউক না কেন, আমার পক্ষে সবই সমান;

আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না, আমি সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।

দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান 'অহংভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে পর্যন্ত না ঐ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পর্যন্ত না উহা শিরায় শিরায়, মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে ঐ আত্মত্যাগরূপ ভাবের অনুগত হইয়া যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের গর্জন-ও কোলাহল-পূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত ও শান্ত।

কর্মযোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—কর্তব্যের সাধারণ ভাব কেবল নিম্নভূমিতেই বর্তমান; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই অদ্ভুত কর্তব্যবোধ অনেক সময় আমাদিগকে দুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগ-বিশেষ হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সর্বদা টানিয়া লইয়া যায়। কর্তব্য আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। ইহা মনুষ্য-জীবনের ধ্বংসের কারণ। এই কর্তব্য—এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন-সূর্য; উহা মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য ক্রীতদাসদের দিকে ঐ চাহিয়া দেখ! কর্তব্য—বেচারাদের ভগবানকে ডাকিবার অবকাশটুকুও দেয় না, স্নানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না! কর্তব্য যেন সর্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহারা বাড়ীর বাহিরে গিয়া কাজ করে, তাহাদের মাথার উপর কর্তব্য! তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে; কর্তব্যের হাত হইতে মুক্তি নাই! এ তো ক্রীতদাসের জীবন—অবশেষে ঘোড়ার মত গাড়ীতে জোতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথেই পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ! কর্তব্য বলিতে লোকে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় কর্ম করা এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য। আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের। আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়াছি, সেজন্য আমরা ধন্য। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যাইতেছি; কে জানে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে কর্ম করিলেও আমরা ফল ভোগ করিব না, মন্দভাবে করিলেও চিন্তান্বিত হইব না। শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা কর, কেন তাহারা উহা করিতেছে, তাহারা বলিবে, 'ইহা আমাদের কর্তব্য।' বাস্তবিক উহা কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা কতকগুলি ফুল দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

তবে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহা কেবল দেহ-মনের আবেগ—আসক্তির তাড়না। কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা তাহাকে কর্তব্য বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ যে-সব দেশে বিবাহ নাই, সে-সব দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কর্তব্যও নাই। সমাজে যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিবশতঃ একত্র বাস করে। পুরুষানুক্রমে এরূপ থাকার পর একত্র বাস করা রীতিতে পরিণত হয়, তখন উহা কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার পুরাতন ব্যাধি। রোগ যখন প্রবলাকারে দেখা দেয়, তখন আমরা উহাকে 'ব্যারাম' বলি; যখন উহা স্থায়ী দাঁড়াইয়া যায়, উহাকে আমরা 'স্বভাব' বলিয়া থাকি। যাহাই হউক, উহা রোগমাত্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়া যায়, তখন উহাকে 'কর্তব্য'-রূপ আড়ম্বরপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই, তদুপলক্ষে তুরীভেরীও বাজানো হয়, উহার জন্য শাস্ত্র হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ ঐ কর্তব্যের অনুরোধে সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ-সহকারে অপহরণ করিতে থাকে।

কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভাল যে, উহাতে পশুভাব কিছুটা সংযত হয়। যাহারা অতিশয় নিম্নাধিকারী, যাহারা অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে; কিন্তু যাঁহারা কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই। জগৎকে যাহা দিবার আছে অবশ্যই দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয়। উহার জন্য কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হইয়া কিছু করিও না। বাধ্য হইয়া কেন করিবে? বাধ্য হইয়া যাহা কিছু কর, তাহা দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয়। কর্তব্য বলিয়া তোমার কিছু থাকিবে কেন?

'সবই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।' এই সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহে—যেখানে কর্তব্যরূপ অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই অমৃত পান করিয়া সুখী হও। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতেছি, সেখানে এই অমৃত পান করিয়া সুখী হও। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতেছি, পুরস্কার বা শাস্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাকে শাস্তিও লইতে হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায়—পুরস্কার ত্যাগ করা। দুঃখ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সুখের ভাবও ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে একসূত্রে গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন, অপরদিকে মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার উপায়—জীবনের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিষ, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে দেখা। অতএব 'দুঃখশূন্য সুখ' এবং 'মৃত্যুহীন জীবন' কথাগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, বাক্যগুলি স্ববিরোধী, সুতরাং তিনি দুই-ই পরিত্যাগ করেন। যাহা কিছু কর, তার জন্য কোন প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি, অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করি। যখনই আমরা কোন চাঁদা দিই, অমনি আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি—কাগজে আমাদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাঁহারা জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যান; সময়ে তাঁহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মত মহামানবে ব্যক্তভাব ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হন। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য কোন নাম-যশ আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয়া যান, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু দাবী করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমত স্থাপন করিয়া যান না। ঐরূপ করিতে তাঁহাদের সমগ্র প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়। তাঁহারা শুদ্ধসাত্ত্বিক; তাঁহারা কখনও কোন

আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন যোগী[৩৩] দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত আমিত্বের ভাব এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, তাঁহার মনুষ্যভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তে শুধু ব্যাপক ঈশ্বরীয় ভাব তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাঁহার একহাত দংশন করে, তিনি তাঁহাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত, এবং বলেন—ইহা প্রভুর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাঁহার কাছে আসে, তিনি মনে করেন—সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লোকের সম্মুখে বাহির হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিসম্পন্ন বা সংগ্রামশীল পুরুষগণের স্থান। তাঁহারা সিদ্ধপুরুষগণের ভাবরাশি গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার করেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহান্ ভাবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, এবং বুদ্ধ-খ্রীষ্টগণ সেই সব ভাব স্থানে স্থানে গিয়া প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করেন। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্বে যে চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহারা অপরিচিত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ তাঁহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরই নিজ ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা জানেন—ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদূর। তাঁহারা নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাঁহারা কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি সৎ চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সত্যই সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, যাঁহারা জীবনে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্যে পরিণত করিবেন। পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়া জগতে পরোপকার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি কর্ম করা সম্ভব নয়। কর্মীরা যতই ভাল হউন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবে একটু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কর্ম করিতে পারি—কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা অভিসন্ধি ও আসক্তি দ্বারা চালিত হয়। সদাক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াই-পাখীটির পতন পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন; তাঁহার সমক্ষে মানুষ তাহার নিজ কার্যের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির পর্যন্ত খবর রাখিতেছেন, তখন ঐরূপ করা কি একপ্রকার ঈশ্বরনিন্দা নয়? আমাদের শুধু কর্তব্য সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলা—'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেরা কর্ম করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মনে কোন আসক্তি নাই। 'যিনি আত্মাতেই আনন্দ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কার্য নাই।'[৩৪] ইঁহারাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইঁহারা কার্য করিতে পারেন না, তা-ছাড়া প্রত্যেককেই কার্য করিতে হইবে। এইরূপ কার্য করিবার সময় আমাদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জগতের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পারি; তাহা আমরা পারি না। এই জগৎরূপ শিক্ষালয়ে পরোপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার করিয়া থাকি। কর্ম করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্তব্য। যদি আমরা এইভাবে কার্য করি, যদি আমরা সর্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম করিতে সুযোগ পাওয়া আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, তবে আমরা কখনও উহাতে আসক্ত হইব না। তোমরা আমার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করে, এ জগতে আমরা সব মস্ত লোক, কিন্তু আমরা সকলেই মরিয়া যাই, তারপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের ভুলিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের জীবন অনন্ত—'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'[৩৫] যদি সেই সর্বশক্তিমান্ প্রভু ইচ্ছা না করিতেন, তবে কে এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিত, কে এক মুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত? তিনিই নিয়ত-কর্মশীল বিধাতা। সকল শক্তিই তাঁহার এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥[৩৬]

তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সর্বেসর্বা; তিনিই সব, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমরা কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎকর্মের জন্যই সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। এইরূপে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, এবং আমরা পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযোগের লক্ষ্য।

কর্মযোগের আদর্শ

বেদান্ত-ধর্মের মহান্ ভাব এই যে, আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া থাকি: কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবাঁধা নয়, অত্যন্ত পৃথক্ নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায়; তবে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ। এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি ব্যতীত যাহার অন্য কোন শক্তি নাই, যে শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্যে। আমরা দেখিয়াছি, শেষ পর্যন্ত এই চারিটি পথ একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন-প্রণালীই আমাদিগকে সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।

সেই চরম লক্ষ্যটি কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি—ঐ লক্ষ্য মুক্তি। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি, পরমাণু হইতে মনুষ্য, অচেতন প্রাণহীন জড়কণা হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান সর্বোচ্চ সত্তা—মানবাত্মা পর্যন্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎ এই মুক্তির সংগ্রাম বা চেষ্টার ফল। সকল যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুই অন্যান্য পরমাণুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং অপরগুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্যের নিকট হইতে এবং চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক পদার্থই অনন্ত বিস্তারের জন্য উন্মুখ। আমরা জগতে যা-কিছু পদার্থ দেখিতেছি, এই জগতে যত কার্য বা চিন্তা আছে, সব-কিছুর একমাত্র ভিত্তি—এই মুক্তির চেষ্টা। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাসনা করেন এবং চোর চুরি করে। যখন কর্মপ্রণালী যথাযথ হয় না, তখন আমরা তাহাকে মন্দ বলি, এবং যখন কর্মপ্রণালীর প্রকাশ যথাযথ ও উচ্চতর হয়, তখন তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণা উভয়ত্র সমান—সেই মুক্তির চেষ্টা। সাধু নিজের বন্ধনের বিষয় ভাবিয়া কষ্ট পান; তিনি বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে চান, সেজন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন। চোরও এই ভাবিয়া কষ্ট পায় যে, তাহার কতকগুলি বস্তুর অভাব; সে ঐ অভাব হইতে মুক্ত হইতে চায় এবং সেইজন্য চুরি করে। চেতন, অচেতন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য এই মুক্তি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগৎ ঐ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সাধুর ঈপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়া অনন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়ীতে থাকে।

প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। ইহা সমুদয় নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তি। নিঃস্বার্থপরতার অর্থঃ 'আমি এই ক্ষুদ্র শরীর'—এইভাব হইতে মুক্ত হওয়া। যখন আমরা দেখিতে পাই, কোন লোক ভাল কাজ করিতেছে, পরোপকার করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—সেই ব্যক্তি 'আমি ও আমার' রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। এই স্বার্থপরতার গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার কোন সীমা নাই। চরম স্বার্থত্যাগ সকল বড় বড় নীতিশাস্ত্রেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচারিত। মনে কর, একজন এই চরম স্বার্থত্যাগের অবস্থা লাভ করিল, তখন তাহার কি হইবে? তখন সে আর ছোটখাট শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক থাকে না; সে তখন অনন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে তাহার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়। সে তখন অনন্ত-স্বরূপ হইয়া যায়। এই অনন্ত বিস্তৃতিই সকল ধর্মের, সকল নীতিশিক্ষার ও দর্শনের লক্ষ্য। ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্ত্বটি দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত দেখেন, তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। নীতি প্রচার করিতে গিয়া তিনি নিজেই আবার সেই একই তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনিও মানুষের নিঃস্বার্থপরতার কোন সীমা নির্দেশ করেন না। মনে কর, এই ব্যক্তিত্ববাদ-মতে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইলেন। তাঁহাকে তখন অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিব কি করিয়া? তিনি তখন সারা বিশ্বের সহিত এক হইয়া যান; এইরূপ হওয়াই তো চরম লক্ষ্য। হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তাহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিবার সাহস পায় না। নিঃস্বার্থ কর্মদ্বারা মানব-প্রকৃতির চরম লক্ষ্য এই মুক্তিলাভ করাই কর্মযোগ। সুতরাৎ প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্যই আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে বাধাস্বরূপ, আর প্রত্যেক নিঃস্বার্থ কর্মই আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়। এইজন্য নীতির এই একমাত্র সংজ্ঞাঃ যাহা স্বার্থশূন্য, তাহাই নীতিসঙ্গত; আর যাহা স্বার্থপর, তাহা নীতিবিরুদ্ধ।

খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাপারটি এত সহজ দেখাইবে না। অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একই কার্য এক ক্ষেত্রে স্বার্থশূন্য এবং অপর ক্ষেত্রে সত্যই স্বার্থপ্রণোদিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা কেবল কর্তব্যের একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে পারি; বিশেষ বিশেষ কর্তব্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া নিরূপিত হইবে। এক দেশে একপ্রকার আচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। অপর দেশে আবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার কারণ— পরিবেশ পৃথক্। সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর এই মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা হইতেই লাভ করা হয়। আর প্রত্যেক স্বার্থশূন্য কার্য, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে ঐ আদর্শের অভিমুখে লইয়া যায়; সেইজন্যই ঐ কার্যকে নীতিসঙ্গত বলা হয়। ক্রমশঃ বুঝিবে—এই সংজ্ঞাটি সকল ধর্ম এবং সকল নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধেই খাটে। নীতিতত্ত্বের মূলসম্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। কোন কোন প্রণালীতে নীতি কোন উন্নততর পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'মানুষ কেন এ-কাজ করিবে এবং ও-কাজ করিবে না?' উত্তরে ঐ-সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলিবেন—'ইহাই ঈশ্বরের আদেশ!' কিন্তু যেখান হইতেই তাঁহারা ইহা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের নীতিতত্ত্বের মূল কথা—'নিজের' চিন্তা না করা, 'অহং'কে ত্যাগ করা। এই প্রকার উচ্চ নীতিতত্ত্ব সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে ভয় পান। যে ব্যক্তি এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ভাব আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়, তাহাকে বলিতে পারি, এমন এক জনের চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ—যাহার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, যে নিজের জন্য কিছু করে না, যে নিজের পক্ষে কোন কথা বলে না; এখন বল দেখি, তাহার 'নিজত্ব' কোথায়? যতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা করে, কাজ করে বা

কথা বলে, ততক্ষণই সে তাহার ‘নিজেকে’ বোধ করে। সে যদি কেবল অপরের সম্বন্ধে—জগতের সকলের সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তাহা হইলে তাহার ‘নিজত্ব’ কোথায়? তাহার ‘নিজত্ব’ তখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।

অতএব কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মযোগীর কোন প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, আত্মা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই হইবে উহার উপলব্ধি, কারণ জ্ঞানী যুক্তিবিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা সমাধান করিতেছেন, তাঁহাকে কোনপ্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্মদ্বারা সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে।

এখন পরবর্তী প্রশ্নঃ এই কর্ম কি? ‘জগতের উপকার করা’-রূপ এই ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের কোন উপকার করিতে পারি? উচ্চতম দৃষ্টি হইতে বলিলে বলিতে হইবে,‘না’; কিন্তু আপেক্ষিকভাবে ধরিলে ‘হাঁ’ বলিতে হইবে। জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার করা যাইতে পারে না; তাহা যদি করা যাইত, তাহা হইলে ইহা আর এই জগৎ থাকিত না। আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারি, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত হইবে। আমরা মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য-আবর্তনশীল সুখ-দুঃখরাশি একেবারে চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে না। জগতে কি কাহাকেও কোন নিত্যসুখ দেওয়া যাইতে পারে? না, তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। সমুদ্রের কোথাও গহ্বর সৃষ্টি না করিয়া একটি তরঙ্গও তুলিতে পারা যায় না। মানুষের প্রয়োজন ও লোভের অনুপাতে জগতে ভালর সমষ্টি বরাবর একই প্রকার,সর্বদাই সমান। উহা বাড়ানো বা কমানো যায় না। বর্তমানকাল পর্যন্ত পরিজ্ঞাত মনুষ্যজাতির ইতিহাস আলোচনা কর। সেই পূর্বের মতই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পদমর্যাদার তারতম্য দেখিতে পাই না কি? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ নিম্নপদস্থ; কেহ সুস্থ, কেহ বা অসুস্থ—তাই নয় কি? প্রাচীন মিশরবাসী, গ্রীক ও রোমানদের যে-অবস্থা ছিল, আধুনিক আমেরিকানদেরও সেই এক অবস্থা। জগতের ইতিহাস যতটা জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, মানুষের অবস্থা বরাবর একই প্রকার; তথাপি আবার ইহাও দেখিতে পাই, সুখ-দুঃখের এই দুরপনেয় বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি দূর করিবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এমন সহস্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবনের পথ সহজ করিবার জন্য কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন; তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন? আমরা একটি বলকে (ball) একস্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাওয়া-রূপ খেলাই খেলিতে পারি। আমরা শরীর হইতে দুঃখবেদনা দূর করিলাম, উহা মনে আশ্রয় লইল। ইহা ঠিক দান্তের (Dante) সেই নরক-চিত্রের মত—পাহাড়ের উপর ঠেলিয়া তুলিবার জন্য কৃপণদিগকে রাশীকৃত সুবর্ণ দেওয়া হইয়াছে। যতবার তাহারা একটু ঠেলিয়া তুলিতেছে, ততবারই উহা গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে। সুখের স্বর্ণযুগ (millennium) সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হয়, সে-সবই স্কুলের ছেলেদের উপযোগী সুন্দর গল্প, তদপেক্ষা ভাল কিছু নয়। যে-সকল জাতি এই সুখের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহারা আবার এরূপও ভাবিয়া থাকে যে, ঐ সময়ে তাহারাই সর্বাপেক্ষা সুখে থাকিবে। এই স্বর্ণযুগ-সম্বন্ধে ইহাই বড় অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব!

আমরা এই জগতের সুখ এতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারি না; তেমনি ইহার দুঃখও বাড়াইতে পারি না। এই জগতে প্রকাশিত সুখদুঃখের শক্তিসমষ্টি সর্বদাই সমান। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মাত্র, কিন্তু উহা চিরকালই একরূপ থাকিবে, কারণ এইরূপ থাকাই উহার স্বভাব। এই জোয়ার-ভাঁটা, এই উঠা-নামা জগতের স্বভাবগত। অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করা—‘মৃত্যুহীন জীবন সম্ভব’ বলার মতই অযৌক্তিক।

মৃত্যুশূন্য জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ জীবনের ধারণার মধ্যেই মৃত্যু নিহিত রহিয়াছে, সুখের মধ্যেই দুঃখ নিহিত। এই আলোটি ক্রমাগত পুড়িয়া যাইতেছে,ইহাই উহার জীবন। যদি জীবন চাও তবে ইহার জন্য তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মরিতে হইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিষের দুইটি বিভিন্ন রূপ মাত্র—শুধু বিভিন্ন দিক্ হইতে উহারা একই তরঙ্গের উত্থান ও পতন এবং দুইটি একত্র করিলে একটি অখণ্ড বস্তু হয়। একজন পতনের দিকটা দেখিয়া দুঃখবাদী হন; আর একজন উত্থানের দিকটা দেখেন এবং সুখবাদী হন। বালক যখন বিদ্যালয়ে যায়—পিতামাতা তাহার যত্ন লইতেছেন, তখন বালকের পক্ষে সবই সুখকর মনে হয়। তাহার অভাব খুব সামান্য, সুতরাং সে খুব সুখবাদী। কিন্তু বৃদ্ধ—বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হইবে। এইরূপে প্রাচীন জাতিগুলি—যাহাদের চতুর্দিকে কেবল পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ—তাহারা নূতন জাতিগুলি অপেক্ষা কম আশাশীল। ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে—‘হাজার বছর শহর, আবার হাজার বছর বন।’ শহরের এই বনে পরিবর্তন এবং বনের শহরে পরিবর্তন সর্বত্র চলিয়াছে। মানুষ এই চিত্রের যখন যে দিকটা দেখে, তখন সে তদনুযায়ী সুখবাদী বা দুঃখবাদী হয়।

এখন আমরা সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। এই স্বর্ণযুগের ধারণা অনেকের পক্ষে কর্ম করিবার শক্তি—প্রচণ্ড প্রেরণাশক্তি। অনেক ধর্মেই ধর্মের একটি অঙ্গরূপে প্রচারিত হয়: ঈশ্বর জগৎ শাসন করিতে আসিতেছেন, এবং মানুষের ভিতর আর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে না। যাহারা এই মতবাদ প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া, এবং গোঁড়ারাই সর্বাপেক্ষা অকপট। খ্রীষ্টধর্ম ঠিক এই গোঁড়ামির মোহ দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, ইহারই জন্য গ্রীক ও রোমক ক্রীতদাসগণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল—এই ধর্মে তাহাদিগকে আর দাসত্ব করিতে হইবে না, তাহারা যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবে; সেইজন্যই তাহারা খ্রীষ্টধর্মের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে যাহারা উহা প্রচার করিয়াছিল, তাহারা অবশ্য গোঁড়া অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহারা প্রাণের সহিত ঐসব কথা বিশ্বাস করিত। বর্তমানকালে এই স্বর্ণযুগের আকাঙ্ক্ষা—সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাও গোঁড়ামি। যথার্থ সাম্যভাব জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কখনও হইতেও পারে না। এখানে কি করিয়া আমরা সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলিতে সমষ্টি বিনাশই বুঝায়! জগতের এই যে বর্তমান রূপ, তাহার কারণ কি?—সাম্যের অভাব। জগতের আদিম অবস্থায়—সৃষ্টির পূর্বে সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকে। তবে বিশ্বগঠনকারী

বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় কিরূপে?—বিরোধ, সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা। মনে কর, পদার্থের পরমাণুগুলি সব সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে কি সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে? বিজ্ঞানের সাহায্যে জানি, ইহা অসম্ভব। জলাশয়ের জল নাড়িয়া দাও, দেখিবে প্রত্যেক জলবিন্দু আবার শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আর একটির দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই একইভাবে —'বিশ্বজগৎ' বলিয়া কথিত এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চ—ইহার অন্তর্গত সকল পদার্থই তাহাদের পূর্ণ সাম্যভাবে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আবার বিক্ষোভ দেখা দেয়, আবার সংযোগ হয়—সৃষ্টি হয়। বৈষম্যই সৃষ্টির ভিত্তি। সৃষ্টির জন্য সাম্যভাব-বিনাশকারী শক্তির যতটা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকারী শক্তিরও ততটা প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ সাম্যভাব—যাহার অর্থ সর্বস্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির পূর্ণ সামঞ্জস্য, তাহা এ-জগতে কখনই হইতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই জগৎ জীব-বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এখানে আর কেহই থাকিবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, এই স্বর্ণযুগ বা পূর্ণ সাম্যভাব-সম্বন্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহা নয়, পরন্তু যদি আমরা ঐ ধারণাগুলি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রলয়ের দিন ঘনাইয়া আসিবে। মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ কি?—প্রধানতঃ মস্তিষ্কের ভিন্নতা। আজকাল পাগল ছাড়া আর কেহই বলিবে না যে, আমরা সকলেই একরূপ মস্তিষ্কের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া আমরা জগতে আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ বা সামান্য হইয়া আসিয়াছি, জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ অতিক্রম করা যায় না। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ এই দেশে বাস করিতেছিল, আর তোমাদের অতি অল্পসংখ্যক পূর্বপুরুষ এদেশে আসিয়াছিলেন, দেশের চেহারায় তাঁহারা কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। যদি সকলেই সমান, তবে রেড ইণ্ডিয়ানরা নানাপ্রকার উন্নতি এবং নগরাদি নির্মাণ করে নাই কেন? কেনই বা তাহারা চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইল? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারসমষ্টি আসিয়া একযোগে কাজ করিয়া নিজেদের উন্নতি করিয়াছে। আত্যন্তিক বৈষম্যশূন্যতাই মৃত্যু। যতদিন এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্য থাকিবে; সৃষ্টিচক্র যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের স্বর্ণযুগ আসিবে। তাহার পূর্বে সাম্যভাব আসিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমাদের এক প্রবল প্রেরণাশক্তি। সৃষ্টির জন্য যেমন বৈষম্য প্রয়োজন, তেমনি ঐ বৈষম্য সীমাবদ্ধ করার চেষ্টাও প্রয়োজন। বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকিত না, আবার সাম্য বা মুক্তিলাভের ও ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও সৃষ্টি থাকিত না। এই দুই শক্তির তারতম্যেই মানুষের অভিসন্ধিগুলির প্রকৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের এই বিভিন্ন প্রেরণা চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে।

এই সংসার 'চক্রের ভিতরে চক্র'—এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহাতে যদি হাত দিই, তবে আটকা পড়িলেই সর্বনাশ! আমরা সকলেই ভাবি কোন বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই আমরা বিশ্রাম লাভ করিব; কিন্তু ঐ কর্তব্যের কিছুটা করিবার পূর্বেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বিশাল ও জটিল জগৎ-যন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটিমাত্র উপায় আছেঃ একটি—এই যন্ত্রের সহিত সংস্রব একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়া দাঁড়ানো—সকল বাসনা ত্যাগ করা। ইহা বলা খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ অসম্ভব। দুই কোটি লোকের মধ্যে একজন ইহা করিতে পারে কিনা, জানি না। আর একটি উপায়—এই জগতে ঝাঁপ দিয়া কর্মের রহস্য অবগত হওয়া—ইহাকেই 'কর্মযোগ' বলে। জগৎ-যন্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না; উহার ভিতরে থাকিয়া কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাকিয়া যথাযথভাবে কর্ম করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার বাহিরে যাইবার পথ।

আমরা এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ম প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ—কর্মপ্রবাহ সর্বদাই বহিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহারা জানেন—ঈশ্বর এমন একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন। যদিও এই জগৎ চিরকাল চলিতে থাকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য স্বার্থশূন্যতা। কর্মযোগ অনুসারে কর্মের দ্বারাই আমাদিগকে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। এই জন্যই আমাদের কর্মরহস্য জানা প্রয়োজন। জগৎকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার যাবতীয় ধারণা গোঁড়াদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে ভালই হইতে পারে; কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, গোঁড়ামি দ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মযোগী জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম করিবার জন্য মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রেরণার প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'[৩৭] কর্মযোগী বলেন, মানুষ এ তত্ত্ব অবগত হইয়া অভ্যাস করিতে পারে। যখন লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন আর তাহার বাহিরের কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার কেন করিব?—ভাল লাগে বলিয়া। আর কোন প্রশ্ন করিও না। ভাল কাজ কর, কারণ ভাল কাজ করা ভাল। কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে বলিয়া যে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এতটুকু স্বার্থযুক্ত অভিসন্ধি লইয়া যে কর্ম করা যায়, তাহা মুক্তির পরিবর্তে আমাদের পায়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে আমরা স্বর্গ-নামক একটি স্থানে আসক্ত হইব। আমাদিগকে স্বর্গে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হইবে; উহা আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনস্বরূপ হইবে।

অতএব একমাত্র উপায়—সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত হওয়া। এইটি জানিয়া রাখোঃ জগৎ আমরা নয়, আমরাও এই জগৎ নই; বাস্তবিক আমরা শরীরও নই, আমরা প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমরা আত্মা—চিরস্থির, চিরশান্ত। আমরা কোন কিছুর দ্বারা বদ্ধ হইব? আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই নাই। এমন কি, অপরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কাঁদিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ কান্নাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমরা কল্পনা করি যে, ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাঁদিতেছেন। ঈশ্বর কাঁদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন তো বন্ধনের চিহ্ন—দুর্বলতার চিহ্ন। একবিন্দু চোখের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? 'সম্পূর্ণ অনাসক্ত হও'—বলা খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া যে-কোন ভাল কাজ করি, তাহা আমাদের পায়ে একটি নূতন শৃঙ্খল সৃষ্টি না করিয়া যে শৃঙ্খলে আমরা

বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি শিকলি ভাঙিয়া দেয়। আমরা প্রতিদানে কিছু পাইবার আশা না করিয়া যে-কোন সৎচিন্তা চারিদিকে প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে—আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটি শিকলি চূর্ণ করিবে, এবং আমরা ক্রমশই পবিত্রতর হইতে থাকিব—যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই। কিন্তু লোকের নিকট ইহা যেন কেমন অস্বাভাবিক ও অত্যধিক দার্শনিক এবং কার্যকর অপেক্ষা বেশী তাত্ত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়াছেন—অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষ কাজ করিতে পারে না। ইহারা গোঁড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন 'নিঃস্বার্থ' কার্য কখনও দেখে নাই, সেইজন্যই এইরূপ বলিয়া থাকে।

উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব; একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ এই একটি ব্যক্তি ছাড়া জগতের মহাপুরুষগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ এক শ্রেণী বলেন—তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন—তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ; উভয়েরই কার্যের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আসে; আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জগৎ হইতেই পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।'

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত-অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন! সমুদয় মনুষ্যজাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র উদ্ভূত হইয়াছে, যেখানে এত উন্নত দর্শন ও এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান্ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে—যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ—অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত! জগতে তিনিই প্রথম একজন মহান্ সংস্কারক। তিনিই প্রথম সাহসপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'কোন প্রাচীন পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যকাল হইতে তোমাকে বিশ্বাস করিতে শেখানো হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না; বিচার করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ—উহা সকলের পক্ষে উপকারী, তবেই উহা বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর।'

যিনি অর্থ,যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত।

কর্মযোগ-প্রসঙ্গ

কর্ম ও তাহার রহস্য

[১৯০০ খ্রীঃ ৪ জানুআরী ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেসে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমার জীবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম এই যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা আমি যাঁহার নিকট লাভ করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ, এবং তাঁহার জীবন ছিল এই মহতী নীতির বাস্তব রূপায়ণ। এই একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদা মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছি; এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের রহস্য সেখানেই—অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়ি—লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হইয়া যায় যে, আমরা উপায়গুলি খুঁটিনাটিভাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু যখনই বিফলতা আসে, তখন যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই বলিয়াই আমরা বিফল হইয়াছি। উপায়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করার দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। উপায়গুলি যথাযথ হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবেই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন করে; কার্য কখনই নিজে নিজে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণগুলি ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী না হইলে কার্য কখনও উৎপন্ন হইবে না। একবার যখন আদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর আদর্শের কথা না ভাবিলেও পারি; কারণ উপায়গুলি নিখুঁত করিতে পারিলে আদর্শের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি; যেখানে কারণ আছে, সেখানে কার্য সম্বন্ধে আর কোন বাধা নাই, কার্য অবশ্যই হইবে; আমরা যদি কারণ-বিষয়ে যত্নবান হই, তাহা হইলে কার্যও হইবে। আদর্শের উপলব্ধিই কার্য, উপায়গুলিই কারণ; সুতরাং উপায়ের প্রতি মনোযোগ-দানই জীবন-সমস্যাসমাধানের রহস্য। এই বিষয়টি আমরা গীতাতেও পাঠ করিয়া থাকি; সেখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের কাজ করিতে হইবে, সমগ্র শক্তি দিয়া নিয়ত কাজ করিয়া যাইতে হইবে; এবং যে-কোন কাজেই আমরা নিযুক্ত হই না কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমাহিত করিতে হইবে; অথচ দেখিতে হইবে, আমরা যেন কর্মে আসক্ত হইয়া না পড়ি, অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর প্রভাব যেন কর্ম হইতে সরিয়া না যাই, কিন্তু তবু সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমরা কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই।

আমরা যদি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এইঃ আমরা কোন কার্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি; হয়তো তাহা নিষ্ফল হইল, তথাপি আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা জানি, কর্ম আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আসক্ত আমাদের কেবল দুঃখই দিতেছে—তথাপি আমরা ঐ কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মক্ষিকা মধুপান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পাগুলি মধুভাণ্ডে আটকাইয়া গেল! সে আর বাহির হইতে পারিল না। বার-বারই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। আমাদের সমগ্র জীবনই এইরূপ একটা রহস্যে আবৃত। কেন আমরা এ-জগতে আসিয়াছি? আমরা এখানে মধুপান করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি—আমাদের হাত-পা উহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে! আমরা জগৎকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই ধৃত হইয়া পড়িলাম! ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমরাই ভুক্ত হইতেছি! শাসন করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই শাসিত হইতেছি! কাজ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু অপরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়িতেছি! এরূপ ব্যাপার আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। আমাদের জীবনে প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। অপরের মন-বুদ্ধি দ্বারা আমরা চালিত হইতেছি; আবার আমরা সর্বদাই অপরের মন-বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তির ক্ষয় করিয়া ফেলে। আমরা চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে, কিন্তু পরিণামে দেখিতে পাই, প্রকৃতিই আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লয়—আমাদিগকে একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়! যদি এইরূপ না হইত, তবে জীবন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এগুলি কখনও গ্রাহ্য করিও না। আমরা যদি বিষয়ে জড়িত হইয়া না পড়ি, তাহা হইলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে।

দুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমরা আসক্ত হই; আমরা নিত্য আবদ্ধ হইতেছি। এইজন্য গীতা বলিতেছেনঃ নিয়ত কর্ম কর; কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত হইও না; কর্মে বদ্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিবার শক্তি সঞ্চিত রাখো—কোন বস্তু যত প্রিয়ই হউক না কেন, তাহা পাইবার জন্য মন যত বেশীই ব্যাকুল হউক না কেন, তাহা ত্যাগ করিতে গেলে যত তীব্র বেদনা অনুভব কর না কেন, প্রয়োজনকালে তাহা পরিত্যাগের শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখো। এই জীবনেই হউক বা অন্য জীবনেই হউক দুর্বলের স্থান নাই, দুর্বলতা দাসত্ব আনে। দুর্বলতা সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু। শতসহস্র জীবাণু আমাদের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু যে পর্যন্ত না আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, যে পর্যন্ত না আমাদের দেহ ঐগুলি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত ঐ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারিদিকে ভাসমান থাকিতে পারে; ঐগুলিকে গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। যে পর্যন্ত আমাদের মন দুর্বল না হয়, সেগুলি আমাদের নিকট আসিতে সাহস করিবে না; আমাদিগকে আয়ত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এইঃ শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ; শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।

এই জীবনে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখের উৎস আসক্তি। আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আসক্ত হই; নিজেদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আসক্ত হই; যাবতীয় বাহ্যবস্তুতে আসক্ত হই, যাহাতে ঐগুলির সাহায্যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কী আছে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে আমাদিগকে আসক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছামাত্র অনাসক্ত হইবার শক্তি যদি আমাদের থাকিত, তবে কোন দুঃখই থাকিত না। কেবল সেই ব্যক্তিই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুলাভে সমর্থ হইবেন, যিনি সমগ্র শক্তি দিয়া কোন বস্তুতে আসক্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসক্ত করিবারও শক্তি ধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই—যতটুকু আসক্ত হইবার ক্ষমতা থাকা দরকার ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থাকা উচিত। আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোনকিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তাহারা ভালবাসিতে পারে না; তাহারা কঠিনহৃদয় ও উদাসীন; অবশ্য জীবনের অধিকাংশ দুঃখ তাহারা এড়াইয়া যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনও দুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঘাত পায় না; তাহা হইলেও উহা দেওয়ালই থাকে। নিতান্ত অনুভূতিহীন দেওয়াল হওয়া অপেক্ষা কোন-কিছুর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব করা বরং ভাল। যে কখনও কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাষাণতুল্য, সে জীবনের অধিকাংশ দুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ অবস্থা আমরা কামনা করি না। ইহা দুর্বলতা, ইহা মৃত্যুতুল্য। যে-হৃদয় কখনও দুর্বলতা অনুভব করে না, দুঃখ অনুভব করে না, সে-হৃদয় কখনই জাগ্রত হয় নাই। তাহা স্পন্দনহীন জড়াবস্থা; এরূপ অবস্থা আমরা চাই না।

এইসঙ্গে কেবল প্রেমের এই মহাশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ, একটিমাত্র বস্তুর উপর সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নিজ সত্তাকে যেন অপরের জন্য নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার শক্তি—যাহা দেবতাদেরই শক্তি—আমাদের কাম্য নয়; পরন্তু আমরা দেবগণ অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর হইতে চাই। পূর্ণজ্ঞানী প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও অনাসক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরূপে আসে? আর এই একটি রহস্যই আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। সে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে থাকে করুণা ও ঘৃণা; ভিক্ষুক যে নীচ ব্যক্তি, অন্ততঃ এইরূপ মনোভাব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা কখনও যথার্থরূপে উপভোগ করিতে পারে না।

আমরা সকলেই ভিক্ষুক। আমরা যাহাই করি, তাহারই একটা প্রতিদান চাই। আমরা সকলেই জীবন ও ধর্ম লইয়া ব্যাবসা করি! হায়, আমরা প্রেম লইয়াও ব্যাবসা করি!

তোমরা যদি ব্যবসা করিতে আসিয়া থাক, আদান-প্রদান—ক্রয়-বিক্রয় প্রশ্নই যদি তোমাদের প্রধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ কর। ব্যবসাক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, মূল্যের উত্থান-পতনও আছে, সব সময়ে আঘাতের আশঙ্কাও আছে। ব্যাপারটি দর্পণে মুখ দেখার মত; তোমার মুখ প্রতিবিম্ব হইল: মুখভঙ্গি কর, দর্পণেও মুখভঙ্গি দেখা যাইবে; তুমি যদি হাসো, দর্পণও হাসিবে—তাহাতে হাসি প্রতিবিম্বিত হইবে। ইহাই ক্রয়-বিক্রয়, ইহাই আদানপ্রদান।

আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কি প্রকার আবদ্ধ হইয়া পড়ি? যাহা দিই তাহার জন্য নয়, পরন্তু যাহা আশা করি তাহার জন্যই। প্রেমের প্রতিদানে পাই আমরা দুঃখ—ভালবাসি বলিয়া নয়, পরন্তু প্রতিদানে ভালবাসা চাই বলিয়া। আকাঙ্ক্ষা যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে থকে না। বাসনা—অভাববোধই সকল দুঃখের মূল। সফলতা ও বিফলতার নিয়মে বাসনাসমূহ আবদ্ধ। বাসনা অবশ্যই দুঃখ আনিবে।

সুতরাং প্রকৃত সফলতা, প্রকৃত সুখের শ্রেষ্ঠ রহস্য এইঃ যিনি প্রতিদান চান না—যিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য। কথাটি হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। আমরা কি জানি না—প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত হন, আঘাতপ্রাপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই বটে। 'যীশুখ্রীষ্ট নিঃস্বার্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন'—সত্য বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, এক মহান্ বিজয়ের—কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মণ্ডিত করিবার জন্যই তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতা।

কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহা তোমার দিবার আছে দাও; ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ইহা ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ কর; দাও—ব্যস, সেখানেই শেষ। শিক্ষা কর—দান করিবার জন্যই এ-জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—যাহা দেয়, তাহা দিতেই হইবে। তুমি এই সংসারে আসো সঞ্চয় করিবার জন্য। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তুমি গ্রহণ করিতে চাও; কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপিয়া তোমাকে দান করিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই হইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, 'আমি দিব না', সেই মুহূর্তই আঘাত আসিয়া তোমাকে দুঃখ দিবে। এমন কেহই নাই, যে পরিণামে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য না হইবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশী সংগ্রাম করিবে, সে তত বেশী দুঃখ অনুভব করিবে। আমরা ত্যাগ করিতে সাহস করি না বলিয়াই, প্রকৃতির এই বিরাট দাবী বিনীতভাবে মানিয়া লইতে স্বীকার করি না বলিয়াই দুঃখ পাই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ আমরা সূর্যের উত্তাপ পাই। সূর্য সাগর হইতে জল আহরণ করিয়া বৃষ্টিধারারূপে উহা প্রত্যর্পণ করে। তুমি আদান-প্রদানের যন্ত্রস্বরূপ; তুমিও দান করিবার জন্যই গ্রহণ কর। সুতরাং প্রতিদানে কিছুই চাহিও না; যতই দান করিবে, ততই সব-কিছু তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যত শীঘ্র এই কক্ষটি বায়ুশূন্য করিবে, তত শীঘ্র ইহা বাহিরের বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইবে; কিন্তু সমস্ত দরজা, সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকিবে, বাহিরের বায়ু কখনও ভিতরে আসিবে না; ফলে ভিতরের বায়ু গতিহীন হইয়া দূষিত ও বিষাক্ত হইবে। নদী অবিরত সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছে এবং পূর্ণ হইতেছে। সাগরের মধ্যে নদীর নির্গমন রুদ্ধ করিও না; যে মুহূর্তে ইহা করিবে, সেই মুহূর্তে তুমি মৃত্যুর কবলে পড়িবে।

সুতরাং ভিক্ষুক হইও না; অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের সর্বাধিক দুষ্কর কার্য। এই পথের যে কি বিপদ, তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না। এমন কি, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই পথের বাধাবিঘ্নগুলি অবগত হইয়াও যতক্ষণ না মনেপ্রাণে অনুভব করি, ততক্ষণ ঐগুলিকে ঠিক ঠিক আমরা জানিতে পারি না। দূর হইতে একটি প্রমোদউদ্যানের সাধারণ দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যখন আমরা উদ্যানের মধ্যে থাকি, তখনই উহা কিরূপ অনুভব করি, এবং যথার্থরূপে জানিতে পারি। যদিও আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং আমরা মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হই, তথাপি সকল বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে সতেজ রাখিতে হইবে—এই সমস্ত বিঘ্ন-বিপর্যয়ের মধ্যেও আমাদের অভ্যন্তরীণ দেবত্বকে দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রকৃতি চায়—আমরা প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি, প্রতারণার বিনিময়ে প্রতারণা করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই, আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা আঘাতের সমুচিত উত্তর দিই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত না করিতে হইলে নিজেকে সংযত করিতে—সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্য শক্তির প্রয়োজন।

প্রতিদিন আমরা নিত্য নূতনভাবে অনাসক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হই। আমরা আমাদের অতীত ভালবাসা ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে তাকাই এবং অনুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিরূপ দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের 'ভালবাসা'র জন্যই আমরা নৈরাশ্যের অতলগর্ভে চলিয়া গিয়াছি! বুঝিতে পারিলাম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত ক্রীতদাস; আমাদের টানিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থায় নামানো হইয়াছে! আবার আমরা নূতনভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হই: এখন হইতে আমি নিজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব। কিন্তু কার্যকালে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়! আবার জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে, আর বাহির হইতে পারে না। জীব পক্ষী জালে আবদ্ধ—পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ইহাই আমাদের জীবন!

আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কষ্টকর! বাধাবিপত্তিগুলি প্রচণ্ড; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি; কালক্রমে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখবাদী হইয়া সাধুতা, প্রেম এবং জীবনে যাহা কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তাঁহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ-পরা মিথ্যাচারীতে পরিণত হন। তাঁহাদের মন যেন স্তূপীকৃত জটিলতা! হয়তো বা তাঁহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ্য বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, তাঁহারা উগ্র-মস্তিষ্ক নন; তাঁহারা বিশেষ কথা বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ দেন না, ক্রুদ্ধও হন না; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতে পারাও তাঁহাদের পক্ষে ভাল ছিল, অভিশাপ দিতে পারাও সহস্রগুণ ভাল ছিল। তাঁহারা তাহা পারেন না; তাঁহাদের হৃদরবৃত্তি স্তব্ধ, কারণ তাঁহাদের দেহে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগিয়াছে, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়, এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না।

এ-সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। তাই বলি—আমাদের অসাধারণ ঐশী শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, অসাধারণ ঐশী শক্তিই একমাত্র উপায়—মুক্তির একমাত্র পথ। একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমরা সব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি—অক্ষতদেহে অজস্র দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খণ্ডবিখণ্ড হইতে পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে।

ইহা খুবই কঠিন, কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আমরা ইহা অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের বুঝিতে হইবে—আমাদের কোন বিপদই ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমরা নিজদিগকে উহার অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত করি। এইমাত্র বলিয়াছি, যতক্ষণ দেহে রোগের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ কোন রোগ কাছে আসিতে পারে না; রোগ কেবল জীবাণুর উপর নির্ভর করে না, পরন্তু দেহস্থ রোগপ্রবণতার উপরও নির্ভর করে। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পাইয়া থাকি। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ইহাই যেন আমরা উপলব্ধি করি—সঙ্গত কারণ ছাড়া কেহ কখনও দুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনও কোন আঘাত অকারণে আসে নাই; কখনও এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয় নাই, যাহার জন্য আমি নিজহস্তে পথ প্রস্তুত করি নাই। ইহাই আমাদের জানিতে হইবে। নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন আঘাত পাইয়াছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলে বলিয়াই তাহা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা করিয়াছ অর্ধেক প্রস্তুতি, বাকী অর্ধ করিয়াছে বহির্জগৎ। এইপ্রকারই আঘাত আসিয়াছিল। এই উপলব্ধিই আমাদিগকে শান্ত করিবে। একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই একটি আশার বাণী আসিবে এবং সেই আশার বাণী এইরূপঃ বাহ্য প্রকৃতির উপর আমার কোন প্রভাব নাই। কিন্তু যাহা আমার ভিতরে, যাহা আমরা নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগৎ, তাহা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনে ব্যর্থতা ঘটাইতে যদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে আঘাত দিতে যদি উভয়েরই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই দুইটির মধ্যে যাহা আমার হাতে, তাহা আমি ছাড়িয়া দিব না; এক্ষেত্রে কেমন করিয়া আঘাত আসিতে পারে? আমি যদি নিজের উপর যথার্থ প্রভাব বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলে আঘাত কখনই আসিবে না।

শৈশব হইতে সর্বদাই আমরা বাহিরের কোন বস্তুর উপর দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা সর্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সংশোধন করিতে প্রস্তুত নই, দুর্দশায় পড়িলে আমরা বলি, 'হায়! এ জগৎ দানবের রাজ্য।' আমরা অন্য লোককে অভিশাপ দিয়া বলি, 'কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূর্খের দল!' কিন্তু আমরা নিজেরা যদি প্রকৃতই এত সৎ হই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ যদি শয়তানের-রাজ্য হয়, তবে আমরাও দানব; নতুবা কেন আমরা এ জগতে থাকিব? 'হায়! এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর!'—এ-কথা সত্য, কিন্তু আমরা যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমরা বাস করিব? এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ।

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আছে, সেইটুকুই আমরা পাইয়া থাকি। এ-কথা বলা মিথ্যা যে, জগৎ অসৎ আর আমরা কেবল সৎ। ইহা কখনই হইতে পারে না; এইরূপ আমরা বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহা সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ।

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয়ঃ বাহিরের কোনকিছুকে অভিসম্পাত না দিতে অথবা কাহারও উপর দোষারোপ না করিতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ হও, উঠিয়া দাঁড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদা সত্য পথ। নিজেকে বশে আনো।

ইহা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখনও কখনও নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা বলি, বলিয়া থাকি আমরা দেবস্বরূপ, ঘোষণা করি আমরা সব-কিছুই জানি, আমরা সব-কিছুই করিতে পারি, আমরা নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ; আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র-প্রস্তরখণ্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়; কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও আমাদিগকে পীড়া দেয়—পথের যে-কোন নির্বোধ ব্যক্তিও 'এই-সব দেবতাদের' জীবন দুঃখময় করিয়া তোলে! আমরা যদি সত্যই দেবস্বরূপ হই, তাহা হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরাবস্থা হওয়া উচিত? বাহ্য জগৎই আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী—এইরূপ অভিযোগ কি সত্য? যে-ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তিনি কি আমাদের কোন ছল-চাতুরী দ্বারা দুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? তোমরা যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহা হইলে বলিতে হইবে—তোমরা ঈশ্বরতুল্য। কোন্ বহির্জগৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে পারে? তোমরা অক্ষতদেহে সপ্তম নরকও অতিক্রম করিতে পার, কিছুই তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিযোগ কর, বহিঃপ্রকৃতির উপর দোষারোপ কর—তাহাই প্রমাণ করে যে, তোমরা বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদের এইরূপ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের স্বরূপ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তোমরা যে দাবী কর, বস্তুতঃ তোমরা তাহা নও। দুঃখের উপর দুঃখ স্তূপীকৃত করিয়া, কেবল বহিঃপ্রকৃতি তোমাদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং 'হায়! কি ভীষণ শয়তানের জগৎ! 'লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, ঐ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিতেছে' ইত্যাদি চীৎকার করিয়া তোমরা নিজেদের অপরাধ, দুঃখ দুর্দশা বাড়াইয়া তুলিতেছ। একে তো দুঃখ পাইতেছ, তদুপরি মিথ্যা আরোপ করিতেছ। কিছুকালের জন্য অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে; এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। এস, আমরা কর্মের উপায়গুলি নিখুঁত করিয়া তুলি; তাহা হইলে উদ্দেশ্যও স্বতই ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদের জীবন যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পারে। জগৎ কার্য-স্বরূপ, আমরা কারণ-স্বরূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের নিষ্কলুষ ও পূর্ণ করিয়া তুলি।

কর্মযোগ-প্রসঙ্গে

যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই অবস্থা লাভ হইলে বোধ হইবে, আত্মা সর্বকালে একাই বিদ্যমান ছিলেন—তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। সুখী হইবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকিবে, ততদিন আমরা ক্রীতদাস। 'পুরুষ' যখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাঁহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই এবং এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তখন মুক্তি বা 'কৈবল্য' লাভ হয়।

কয়েকটা ডলারের প্রত্যাশায় মানুষ ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে তাহার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে যে, তখন তাহারা ইচ্ছা করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করিতে পারিবে। তখন তাহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। কিন্তু আমরা সব বড়ই নির্বোধ!

একজনের ভুলত্রুটির কথা সর্বসমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবে ত্রুটি সংশোধিত হয় না। কারণ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্যই চেষ্টা করিয়া উন্নতিলাভ করিতে হইবে। যাহারা দৃঢ় এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহানুভূতিশীল। যে-কাজ মানবজাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে করিয়া দেওয়া হয়, তাহাই আসক্তি বা বন্ধনের কারণ হয় না।

কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিম্নতর কার্য করে বলিয়াই একজন—যে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিম্নস্তরের হয় না। কে কিরূপ কর্তব্য করিতেছে দেখিয়া মানুষকে বিচার করা উচিত নয়; সেই কর্তব্য সে কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বিচার করা উচিত। ঐ কার্য করিবার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ ব্যবসায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতে পারে, সে বড়।

প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। বদ্ধ ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানালোক দিতে কর্তব্য প্রভূত সহায়তা করে, সন্দেহ নাই।

আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে—যাহা এখন আমাদের হাতে আছে, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সম্মানজনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমরা লাভ করিব।

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়া থাকে।

সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল বা মন্দ কোনটিই নয়।

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্যতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বর্তমান। ইহাই তাহার জীবনে বিরাট সফলতার হেতু। সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইতে পারে নাই, কিন্তু সে ক্রমশঃ এই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইতে পারিত, তবে তাহার জীবন বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবনের মত মহান্ ও সার্থক হইতে পারিত। স্বার্থশূন্যতার তারতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার তারতম্য নির্ভর করে।

মানবজাতির মহান্ নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর কর্মক্ষেত্রের জন্যই আসেন।

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ পবিত্র বা একেবারে অপবিত্র—এখানে 'পবিত্রতা' অথবা 'অপবিত্রতা' হিংসা বা অহিংসা অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা অপরের অনিষ্ট না করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমাদের বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাভাব হইতেছে—হয়তো কোন মানুষের বা অপর প্রাণীর বা কোন ছোট উদ্ভিদের—কিন্তু যাহারই হউক না কেন, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কর্মের দ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার-যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পথ পাইব না; আমরা ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু কাজ কখনও শেষ হইবে না।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাসকে চাবুক মারার প্রয়োজন হয়; ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ। জনসভার কোন বক্তা একটু বাহবা চায়। এইগুলি না দিয়া যদি তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেন-না এইগুলি তাহার প্রয়োজন। ইহাই ক্রীতদাসের ভাবে কাজ করা। এরূপ অবস্থায় প্রতিদানে কিছু আশা করা অভ্যাস হইয়া পড়ে। ইহার পর ভৃত্যের মত কর্ম করা। ভৃত্যের প্রয়োজন

পারিশ্রমিকের—'আমি ইহা দিতেছি, তুমি উহা দাও।' 'কর্মের জন্য কর্ম করি'—এ-কথা বলার মত সহজ আর কিছুই নাই। কিন্তু এইভাবে কর্ম করার মত কঠিন আর কিছুই নাই। কর্মের জন্য কর্ম করে—এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও বহুদূর যাইতে রাজী আছি। কোথাও হয়তো একটি অভিসন্ধি থাকে। যদি অর্থের অভিসন্ধি না হয়, তবে প্রভুত্বের মতলব। যদি প্রভুত্ব না হয়, তবে লাভের উদ্দেশ্য। কোনরূপে কোথাও একটি প্রেরণা থাকিবেই। তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমার জন্য তোমার সহিত কাজ করিতে চাই। এ পর্যন্ত বেশ চমৎকার এবং প্রতিমুহূর্তে আমি আমার আন্তরিকতা ঘোষণা করিতে পারি। কিন্তু সাবধান, তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইতে হইবে। যদি তুমি একমত হইতে না পার, তবে আমি আর তোমায় দেখিব না বা তোমায় সাহায্য করিব না! এরূপ অভিসন্ধিমূলক কর্ম দ্বারা দুঃখ হয়। মনকে বশে রাখিয়া আমরা যে কাজ করি, সে কাজই অনাসক্তি ও আনন্দের কারণ হয়।

একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে বিচার করিলে চলিবে না। প্রত্যেক লোককে তাহার ভাব অনুযায়ী বিচার করিতে হইবে, প্রত্যেক জাতিকে উহার আদর্শ অনুযায়ী এবং প্রতিটি প্রদেশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজস্ব যুক্তি ও অবস্থা অনুসারে বিচার করিতে হইবে। আমেরিকানরা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করে, তাহার প্রভাবেই আমেরিকাবাসীদের রীতি-নীতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ভারতবাসীদের পরিবেশের ফলেই ভারতীয় রীতি-নীতির উদ্ভব। এইভাবে চীন জাপান প্রভৃতি দেশের পক্ষেও এ-কথা প্রযোজ্য।

আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের পরিবেশ গড়িয়া উঠে। খেলার সময় প্রতিটি গোলক উহার যথানির্দিষ্ট গর্তে গিয়া পতিত হয়। যদি একজনের কর্মক্ষমতা অপরের চেয়ে বেশী হয়, তবে সাংসারিক বিন্যাসে তাহা ধরা পড়িবেই। সুতরাং অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন একজন ধনী হয়তো দুষ্ট, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে, যাহার ফলে সে ধনী হইয়াছে। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকিলে সেও ধনশালী হইতে পারিবে। পরস্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করিয়া কি ফল? ইহা দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিব না। কাহাকেও ছোট কিছু করিতে হইতেছে বলিয়া যদি সে অভিযোগ করে, তবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অভিযোগ করিবে। সর্বক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত কিছুই পণ্ড হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য কর্মে নিয়ত অবিচল থাকিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, সে-ই আলোকের সন্ধান পায় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্তব্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

কর্মই উপাসনা

শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন না—কারণ তাঁহার মধ্যে কোন বন্ধনের ভাব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ এক চুম্বকের পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল। জাহাজের লোহার স্ক্রু পেরেক নাট বোল্টগুলি আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল এবং জাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। অজ্ঞানের অবস্থাতেই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই নাস্তিক। যথার্থ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ম করিতে পারেন না। আমরা অল্পবিস্তর নাস্তিক। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও নাই। তিনি আমাদের নিকট কথার কথা মাত্র, অর্থাৎ 'ঈশ্বর' এই শব্দমাত্র, ইহার বেশী কিছু নন। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্তু তারপর আবার পূর্বাবস্থায় পতিত হই। তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহার জন্য কর্ম করিবে? ঈশ্বরকে সাহায্য করা! আমাদের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যাহার অর্থঃ বিশ্বকর্মাকে কি শিখাইতে হইবে, কি করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়? সুতরাং মানবজাতির মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা কোন কর্ম করেন না। অতঃপর যখন তোমরা জগৎ সম্বন্ধে এবং ভগবান্‌কে আমরা কিরূপে সাহায্য করিতে পারি, তাঁহার জন্য ইহা করিতে পারি, উহা করিতে পারি ইত্যাদি মূর্খের মত কথাগুলি শুনিবে, তখন ঐ উক্তি মনে রাখিও। এইরূপ কোন চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতর স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত। তুমি যে-সকল কর্ম কর, সবই তোমার নিজের জন্য, এগুলি তোমার নিজের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাক। ঈশ্বর এমন কিছু খানায় পড়িয়া যান নাই যে, তুমি বা আমি একটি হাসপাতাল বা অনুরূপ কিছু নির্মাণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইব। তিনি তোমাকে কর্মের সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার এই বিরাট ব্যায়ামশালায় তোমার পেশীসমূহ চালনা করিবার জন্যই তিনি তোমাকে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়; তুমি যাহাতে নিজেকে সাহায্য করিতে পার, এইজন্য। তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাও তোমার সাহায্য ব্যতীত মরিয়া যাইবে? ইহা পুরাদস্তুর ঈশ্বরনিন্দা! জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। জগৎ চলিতে থাকিবে—তুমি এই মহাসমুদ্রে একটি বারিবিন্দু মাত্র। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না—বাতাস বহিতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি—তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়। 'সাহায্য' এই শব্দটি তোমরা মন হইতে মুছিয়া ফেল। সাহায্য তুমি করিতে পার না। এরূপ বলা ঈশ্বরের নিন্দা করা। তাঁহার কৃপাতেই তোমার অস্তিত্ব—তুমি কি মনে কর, তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তাঁহার উপাসনা করিতেছ। যখন কুকুরকে একটুকরা খাবার দাও, তখন ঐ কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। ঐ কুকুরের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন। তিনি কুকুররূপে প্রকাশিত। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র। সমগ্র বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ, তবেই পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। ইহাই তোমার কর্তব্য হউক। ইহাই কর্মের যথার্থ কর্মের মনোভাব। কর্মযোগ রহস্যই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

স্বার্থরহিত কর্ম

[১৮৯৮ খ্রীঃ ২০ মার্চ কলিকাতা বাগবাজার ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২ তম অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় এইভাবে বলিয়াছিলেনঃ]

গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং ঐ প্রকার কর্মসমূহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানমার্গী। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষের একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁহার নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর-বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিলেন। অনেকের ধারণা যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই—পরবর্তী কালে মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি মহাভারতের অংশ হিসাবে বিবেচিত না হয় এবং বাদ দেওয়া হয়, তবে মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেইগুলিও সমভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এখন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহা এই অর্থে বুঝেন যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ বা দুঃখ কোনটিই কর্মীর মন স্পর্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে, বলিতে হইবে। কোন কোন প্রাণী তাহাদের শাবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখই হয় না। দস্যুরা অন্যের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করে। এই কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন প্রকার অনুভূতি তাহাদের না থাকে, তবে তাহারাও তো নিষ্কাম হইয়া কাজ করে বলিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। দেওয়ালের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি নাই, একটি প্রস্তরখণ্ডেরও ঠিক তাই—এই কারণে এ-কথা বলা যায় না যে, উহারাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে। ঐভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহারা দুষ্কর্ম করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিতেছে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীতা একটি ভয়াবহ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ নয়। অধিকন্তু গীতাপ্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অর্জুন যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণকে বধ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি, বাসনা এবং ক্ষুদ্র আমিত্বকে লক্ষবার বিসর্জন দিয়াছিলেন।

গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং'-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করিলে 'আমি ইহা করিতেছি, উহা করিতেছি'—এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বলে যে, যদি এই 'অহং'-বোধ না থাকে, যদি ইহা বিলুপ্ত হয়, তবে মানুষ কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে। আমরা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি; অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপে যেন সমাধিমগ্ন হইয়া করি। চিত্রকর যদি অহংবোধ ভুলিয়া চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রসমূহ আঁকিতে পারিবে। উত্তম পাচক যে-সকল খাদ্যবস্তু লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্য বোধসকল তিরোহিত হয়। এইরূপেই তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন না; এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহারা এইভাবে কর্ম করেন, তাঁহারা নিজের জন্য কখনও কিছু করেন না।

প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভাশুভ-মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, যাহাতে অশুভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুর্দিকে যেমন ধূম থাকে, তেমনি কর্মের সহিত কিছু অশুভ সর্বদাই থাকে। আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়। অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না, অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ—কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের জন্য করেন নাই। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দীপালোকে আমরা গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু কিছুসংখ্যক পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। যাঁহারা কাঁচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাঁহারা কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও মুক্তিলাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের এই রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন।

জ্ঞান ও কর্ম

[১৮৯৫ খ্রীঃ ২৩ নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি পাওয়া যায়। বস্তু যত সূক্ষ্ম, ইহার শক্তিও ততই বেশী। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মানুষকেও প্রভাবিত করে, কারণ মন এক, আবার বহু। জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, মনগুলি যেন মাকড়সা।

এই জগৎ সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তারই প্রকাশ। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই সত্তা এই জগৎ। ইহাই মায়া। অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, আংশিক প্রকাশ—প্রভাতে যেমন সূর্যকে একটা লাল বলের মত দেখায়। এইভাবে যা কিছু অশুভ ও মন্দ, তা প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা মাত্র, ভালরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ।

সরলরেখাকে অনন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। ভালর সন্ধান আত্মানুসন্ধানেই ফিরিয়া আসে। 'আমি'ই রহস্যের সমগ্র রূপ—ঈশ্বর। কাঁচা আমিই দেহ; আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর।

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হইবে কেন?—কারণ ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হইবে। যাহা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনন ও ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, তাহাই নৈতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, তাহাই দুর্নীতি। দেশভেদে ব্যক্তিভেদে ইহার মানও পৃথক্। মানুষকে বিধিনিষেধ শাস্ত্রবচন প্রভৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হইব, তখন ইচ্ছা স্বাধীন। সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার নামই ত্যাগ। ইন্দ্রিয়-দ্বারেই ক্রোধ আসে, দুঃখ অনুভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া যাও।

একদা আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল, আমি জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম এবং মরিয়া গেলাম: কি ভয়াবহ প্রহেলিকা! দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তির জন্য কাতর ক্রন্দন!

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে? তাহা হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? ত্যাগের অর্থ তপস্বী হওয়া নয়। সকল ভিক্ষুকই কি খ্রীষ্ট? দারিদ্র্য ও সাধুতা সমার্থক নয়; অনেক সময় ঠিক বিপরীত। প্রকৃত ত্যাগ মনের ব্যাপার। কিভাবে এই ত্যাগ আসে? মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি একটি হ্রদ দেখিলাম—চারিদিকে মনোরম দৃশ্যাবলীতে বৃক্ষরাজির বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই মরীচিকা বলিয়া প্রমাণিত হইল। তখন বুঝিলাম, মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্য দেখিয়াছি; শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি ঠেকিয়া শিখিলাম যে, উহা মিথ্যা। পরেও—প্রতিদিনই আমি ইহা আবার দেখিব, কিন্তু সত্য বলিয়া আর কখনও স্বীকার করিব না। সুতরাং আমরা যখন ঈশ্বরলাভ করি, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে। এগুলি পরে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তখন এগুলি মিথ্যা বলিয়াই জানিব।

পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মত মহাপুরুষদের জীবনেতিহাস। নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ করেন। দীনদরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কথা ভাবো। দুঃখের পারে স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভাই সব, তোমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান।' তাঁহার কর্ম শান্ত, নীরব। দুঃখের কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই জানিবে যে, এই কর্ম নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু করিতে পারিবে। এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে কৃত হয়, ততই ভাল হয়, কারণ তাহা হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরো ঊর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন হয়। ভাল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও মঙ্গল দুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষা সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা কাঁটা বিঁধিয়াছিল, আর একটি কাঁটা সে ইহা তুলিয়া ফেলিল। এই প্রথম কাঁটাটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্মা সেই শান্তি, যাহা ভাল ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে। বিশ্বসংসার বিলীন হইয়া যায়, তখনই মানুষ ভগবানের নিকটবর্তী হইতে থাকে। ক্ষণেকের জন্য সে স্বরূপ ফিরিয়া পায়, ঈশ্বরই হইয়া যায়। আবার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরূপে তিনি আবির্ভূত হন; তখন জগৎ-সংসার তাঁহার সম্মুখে কাঁপিতে থাকে। মূর্খ নিদ্রিত হয়, মূর্খরূপেই জাগরিত হয়। অজ্ঞান মানুষ—অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া, অনন্ত শক্তি পবিত্রতা ও প্রেমের অধিকারী হইয়া দেব-মানবরূপে ফিরিয়া আসে। অতীন্দ্রিয় অবস্থার ইহাই কার্যকারিতা।

যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধনা করা চলে। গীতা তো এইভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছেঃ সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত। নিষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং শান্তভাবের বৈশিষ্ট্য তীব্রতর স্পন্দন। আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। দেহ রথ, ইন্দ্রিয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম, এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবেই মানুষ মায়া অতিক্রম করে; সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির অধীন, ততক্ষণ সে এই সংসারের। যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় করে, তখন সে যথার্থ ত্যাগী।

দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না; সেক্ষেত্রে সংগ্রামই ভাল। পার্থসারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, 'আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত' এবং বলিয়াছিলেন, 'অর্জুন, তুমি মহাজ্ঞানীর মত কথা বলিতেছ, কিন্তু তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ।' জলে থাকিয়াও যেমন পদ্মপত্র জলদ্বারা সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকিবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র—এখান হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে থাক। সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলাভের একটি প্রয়াস। ত্যাগের বলে বলীয়ান্ ইচ্ছাশক্তির বিকাশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া তোল। জ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে।

প্রথম সোপান হইল জীবনযাপনের আনন্দ। কৃচ্ছ্রসাধন পৈশাচিক। প্রার্থনা করা অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া হাসা অনেক ভাল। গান কর। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই দুঃখের ভাব সংক্রামিত করিও না। কখনও ভাবিও না যে, ঈশ্বর একটু সুখ বা একটু দুঃখ লইয়া ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টিত হইয়া থাক। মুনিঋষিরা প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশিখরে যাইতেন।

দ্বিতীয় সোপান পবিত্রতা।

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সদসৎ বিচার কর। অনুভব কর, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। যদি ক্ষণেকের জন্যও মনে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 'মহদ্‌ভয়ে' আক্রান্ত হইবে। যখনই চিন্তা করিবে 'সোঽহং' তখনই অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত কর। কেহ আমাকে অভিশাপ দিলেও তাহার মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। আমার দুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাপকারী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির তুমি উপকার কর, সেও তোমাকে উপকার করার সুযোগ দিতেছে। ঈশ্বরই কৃপাবশতঃ তোমাকে ঐভাবে তাঁহার পূজা করিবার অধিকার দেন।

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পার। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্নবান হও না বলিয়াই বিফল হও। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ।

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভদ্র গালাগালির দ্বারা দাবানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই মুষ্টিমেয় 'গ্রীক' কথা বলে। ভুল-ত্রুটি কিছু না কিছু সর্বদাই থাকিবে, সেজন্য দুঃখ করিও না। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আহা! যদি আরও ভাল হইত!' মানুষের মধ্যে যদি দেবত্ব না থাকিত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা করিতে করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত।

কেহই পড়িয়া থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে না। সকলেই পরিণামে পূর্ণতা লাভ করিবে। দিনরাত বল, 'ভ্রাতৃগণ, ওঠ, এস। তোমরাই পবিত্রতার অনন্ত সাগর! দেবতা হইয়া যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও।'

সভ্যতা কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অনুভব করাই সভ্যতা। যখনই সময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কর। এরূপ করিলেই সব হইবে। যাহা কিছু ঈশ্বর নয়, তাহা অস্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বরভাবান্বিত, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কর। দিনরাত মনে মনে এ-কথা বল। এভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আবরণ পাতলা হইয়া যাইবে।

আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই; আমি স্ত্রী বা পুরুষ নই; আমার কোন সীমা নাই। আমি চিৎ-স্বরূপ—আমি সেই ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আমার দুঃখ বা সুখ নাই। জন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই, কারণ আমি যে জ্ঞানস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ। হে আমার আত্মা, আমি সেই, 'সোঽহং'।

নিজেকে দেহভাবশূন্য অনুভব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল না। ইহা আগাগোড়া কুসংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, রোগপীড়িত—সকলের মধ্যে দিব্য চেতনা জাগাইয়া তোল।

বাহ্যতঃ প্রায় প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাব-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উত্থিত হয়; কিন্তু একটি অন্যগুলি গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে। যে ভাব-তরঙ্গের পিছনে সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইরূপ করিয়া থাকে।

কনফ্যুসিয়স, মুসা, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার, ক্যালভিন, ও শিখগুরুগণ এবং থিওসফি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্নিহিত ভাব—দেবত্ব প্রচার করা।

কখনও বলিও না, মানুষ দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতই। প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা করে না। প্রেমই ঈশ্বর। সুতরাং এই ভক্তির পথেও আমরা আত্মা-স্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করি। 'সোঽহম্'। নগর, দেশ, জীব, জগৎকে ভাল না বাসিলে কি ভাবে কাজ করা যায়? বিচারের দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরা সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করুক। এইভাবেই ঈশ্বর অনুভূত হন।

কিন্তু একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবে: কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। জানিও—ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই ধর্ম, অনুভূতিই ধর্ম। মানুষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। সর্বনিম্নস্তরের মানুষ পশু, উচ্চতম মানুষ সিদ্ধ বা পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব্দ, বর্ণ, মতবাদ ও আচারঅনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতে হয়।

পৌত্তলিকতা যে শেষ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষাঃ যখন বল, 'আমি', তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না? যদি শরীর-চিন্তা আসে, তবে তুমি এখনও পুতুলপূজক। ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়—ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। যদি ঈশ্বর-বিষয়ে 'চিন্তা' কর, তবে তুমি নিতান্তই মূর্খ। অজ্ঞ সাধক প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করিতে পারে। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। অপরের বিশ্বাস নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি সর্বতোভাবে আন্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিলেই আসক্তি ও কামনা উদ্ভূত হয়, তাহা হইতেই মানুষ

দুঃখ পায়। এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোনা দেখিয়া সোনার আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিস্বরূপ হও। যাহাতে কখনও কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর।

কর্মবিধান ও মুক্তি

মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের অর্থ কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ সৃষ্টি করে।

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থাকিয়া আমরা যে প্রকার মুক্তি অনুভব করি, উহা মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়।

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি—এ ধারণার সহিত আমি একমত নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, উচ্চতর নিয়মের দ্বারা নিম্নতর নিয়ম জয় করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; এবং যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় করিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই। ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না। তাই বলিয়া ইহারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা; এবং এই নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বস্তু করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজ অতি-মাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয় জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখিবে হিন্দুদের মত আর কোন জাতির এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাতি-হিসাবে বিনাশ। কিন্তু হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব—তাঁহারা ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ বা গোঁড়ামির সৃষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে। নিয়ম চিরন্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ 'চিরন্তন বস্তু নিয়মের অন্তর্গত',—এ-কথা বলিলে চিরন্তনকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মানুষের সমান হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহা দ্বারা বদ্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপঃ গালিচা-নির্মাতা একখণ্ড গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল (যাহা সে গালিচায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে)। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক যেমন বড় বড় সম্রাটগণ কখনও বা পুতুল লইয়া খেলা করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা করেন; এবং ইহাকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ সেটুকু বেশ চলে। আমরা ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই; সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবদ্ধ। এ-কথা বলা মূর্খতা যে, নিয়ম অনন্ত—প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে। সকল যুক্তিই যদি অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? সুতরাং বিধি বা নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমরা আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি—মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। বেদান্ত সর্বদা মুক্তির বাণীই ঘোষণা করে। বেদান্তবাদী নিয়মকে বড় ভয় পায়; চিরন্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্তু। কারণ তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, তবে তৃণখণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমরা বস্তুসম্পর্কশূন্য নিয়মে বিশ্বাস করি না।

আমরা বলি মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবানই সেই মুক্তি। অন্যান্য বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ; কিন্তু সসীম বস্তুতে খুঁজিলে মানুষ সুখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে যে-আনন্দ লাভ করে, চোর চুরি করিয়া সেই একই আনন্দ পায়; কিন্তু চোর দুঃখরাশির সহিত সুখের কণামাত্র পায়। ভগবানই প্রকৃত সুখ। প্রেমই ভগবান্, মুক্তিই ভগবান্। যাহা কিছু বন্ধন, তাহা ভগবান্ নয়।

মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহা আবিষ্কার করিতে হইবে। মানুষ তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ-কথা ভুলিয়া যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করাই প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবন। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞলোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহা জ্ঞাতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞলোক আবিষ্কার করে অজ্ঞাতসারে। প্রত্যেকেই—অণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত—মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাঁহাকে আরও দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি রেড ইণ্ডিয়ানের স্বাধীন ভাবকে মোটেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন না।

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত ভাব, এবং মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য। ইহার জন্যই মানুষ চেষ্টা করিতেছে। শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ বিজ্ঞানী কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি ঐ তরঙ্গাঘাত অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পারে। তবে আমরা প্রকৃতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করি না কেন? নিয়ম আমরা চাই না, আমরা চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য। আমরা বিধিবহির্ভূত হইতে চাই। নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইলে মৃৎপিণ্ড হইয়া যাইবে। তুমি

নিয়মের বাহিরে গিয়াছ কিনা—সেইটি প্রশ্ন নয়; কিন্তু আমরা নিয়মের ঊর্ধ্বে—এই চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, একজন বনে বাস করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষা পায় নাই। সে একটি পাথরের টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল—এ তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা, সে কিন্তু ভাবে, ইহা মুক্তি; সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে; ইহার অন্তর্নিহিত ভাব মুক্তি। কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের টুকরাটি অবশ্যই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে স্বভাব বলে, অচেতন যন্ত্রবৎ কর্ম বলে। আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই মানুষ-হিসাবে আমার গৌরব। যদি আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন ওখানে যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া আমি যন্ত্রে পরিণত হই। অনন্ত শক্তি সত্ত্বেও প্রকৃতি একটি যন্ত্রমাত্র; মুক্তিই সচেতন জীবনের উপাদান।

বেদান্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। সে এই প্রকৃতিকে মুক্ত বলিয়া মনে করে, নিয়মের দ্বারা শাসিত মনে করে না। মানব-জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার পরই আমরা এই প্রকার চিন্তা করিতে শিখিব, কিন্তু আরও দার্শনিক অর্থে। উদাহরণস্বরূপঃ আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই। ইচ্ছার প্রেরণা পাইলাম, তারপর থামিয়া গেলাম; ইচ্ছা হওয়া ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে-সময়টুকুর ব্যবধান, সেই সময়ে আমি সমভাবে কাজ করিতে থাকি। কর্মের সঙ্গতিকেই আমরা নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেজন্যই আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পাঁচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের আবেগ দিয়াছিল। সুতরাং মানুষ বলে যে সে স্বাধীন, কারণ তাহার সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়; এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সে-সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা স্বাধীনতা ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খণ্ডগুলি দেখিতে পাই; কিন্তু আদি ও অন্ত অবশ্যই স্বাধীন আবেগ। প্রথমেই মুক্তির প্রেরণা হইয়াছিল, উহাই বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমাদের কার্যকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, আমরা স্বাধীন বা মুক্ত নই। তথাপি এই চেতনা থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। এই চেতনা কিভাবে আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের মধ্যে এই দুইটি প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে, সব কার্যেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণাদ্বারা আমরা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই—মুক্তি বা স্বাধীনতা ভিতরেই আছে, আত্মা যথার্থই মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের ভিতর দিয়া পরিস্রুত হইয়া আসিতেছে; এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়।

যখনই আমরা কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। ঐ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত-স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তু বা অতি দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা মুনি জন্তু বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহজীবনেই তাঁহারা আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব বা সমদর্শনের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি, প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতি, মানবজাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই প্রচেষ্টা। যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে—দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্বই উপাসনা করিতেছে; মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও সে আর একভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহারা অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কখনও ভাবে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করা কঠিন।

আমরা সীমাবদ্ধ—এই বিশ্বাস বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই হয়. তবে শক্তি বর্ধিত কর, এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্য অবগত হইয়া মাত্র বারো বৎসরে উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত বৎসর।

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

স্বামীজী আমেরিকার তাঁহার শিষ্য সারা সি. বুলের (Mrs. Sara C. Bull) বাড়ীতে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহিত 'যোগ' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, মিসেস বুল তাহা লিখিয়া রাখেন। পরে ভক্ত, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণের জন্য আমেরিকার বন্ধুগণ ১৯৯৩ খ্রীঃ তাহা প্রকাশ করেন। বর্তমান পুস্তিকা তাহারই ভাষান্তর।

* * *

ভারতীয় ইংরেজী সংস্করণ (Six Lessons on Raja Yoga) ১৯২৮ খ্রীঃ ফেব্রুআরি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের নিবেদন হইতে শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তির অনুবাদ দেওয়া হইলঃ

এই পাঠগুলি সম্বন্ধে বলা যায়—আধ্যাত্মিক সাধনার কথা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত, উপরন্তু আছে—বিশেষতঃ রাজযোগসাধনার বহু মূল্যবান্ ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ।

* * *

আমেরিকান সংস্করণে পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট এইরূপে মুদ্রিতঃ
RAJA YOGA
Six Lessons
By
Swami Vivekananda
Gift Edition
1913

প্রস্তাবনা

রাজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মত একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মনের বিশ্লেষণ; অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যসংগ্রহ দ্বারাই এতে আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলা হয়। সকল দেশের মহান্ আচার্যেরাই বলে গেছেন, 'দেখেছি ও জানি।' যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, তাঁদের প্রচারিত সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগ-লব্ধ।

স্মৃতি বা চেতনা সত্তার সীমা হতে পারে না; কেননা আর একটা অতীন্দ্রিয় অবস্থা আছে; সেখানে এবং অচেতন অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নেই, কিন্তু এই দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত, যেমন—জ্ঞান আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেটা ঠিক বিজ্ঞানের মতই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

যোগ আমাদের শিক্ষা দেয়—কিভাবে জড়কে অধীন করে রাখা যায়; জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে।

'যোগ' মানে (Yoke) জুড়ে দেওয়া; অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করে দেওয়া।

মন চেতন-ভূমিতে ও তার নিম্নস্তরে কাজ করে। আমরা যাকে চেতনা বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা শিকলি-মাত্র।

একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই 'আমি', আর তার চারদিকে বিরাট অচেতন সত্তা; এই 'আমি'র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি।

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যোগ অভ্যাস করলে মনের স্তর একটার পর একটা উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের সামনে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়। আমরা দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্তু মাঝ-রাস্তায় আমরা যেন থেমে না যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাঁচের পুঁতি যেন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে না দেয়।

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারলে আমাদের বিনাশ।

যাঁরা সাধক—সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁদের তিনটি জিনিষ দরকার।

প্রথমঃ ইহলোকের ও পরলোকের সব ভোগ-বাসনা ছাড়তে হবে; চাইতে হবে শুধু ভগবান্ আর সত্য।

দ্বিতীয়ঃ সত্য আর ভগবান্‌কে লাভ করবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই। যে-মানুষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি ব্যাকুল হও; সত্য ও ভগবানের জন্য ঐরকম অধীর হও।

তৃতীয়ঃ ছ-টি শিক্ষা। ১ম—মনকে বহির্মুখ হতে না দেওয়া। ২য়—মনকে অন্তর্মুখ করে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা। ৩য়—প্রতিবাদ না করে সব জিনিষ সহ্য করা। ৪র্থ—শুধু ঈশ্বরকে চাও, আর কিছুই নয়। আপাত-মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাতে না পারে। সব ত্যাগ করে শুধু ভগবান্‌কেই চাও। ৫ম—উপস্থিত কোন একটা বিষয় নাও, তার শেষ পর্যন্ত বিচার কর, সমাধান না করে ছেড়ো না। সময়ের হিসাব কর না। আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জন্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুরা করুক, আমরা কখনও তাদের মত ভোগ করতে পারি না। মানুষ মননশীল; মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের সন্ধান পায়, ততদিন সে সংগ্রাম করবেই। নিষ্ফল বৃথা কথাবার্তায় সে নিজের শক্তিক্ষয় করবে না। সামাজিকতা ও লোকমতের পূজাই হচ্ছে পৌত্তলিকতা। আত্মা—লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ষ্ঠ—সর্বদা নিজের স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কারের পারে যাও। ক্রমাগত ‘আমি ছোট, আমি ছোট’—এই ভেবে নিজেকে ছোট করে ফেল না; যতদিন না ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বল—তোমার স্বরূপের কথা।

এই সব কঠোর সাধননিষ্ঠা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়।

নিরপেক্ষ পরব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনও তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না; যে মুহূর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাঁকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি; ফলে অনন্ত হয়ে পড়েন সান্ত।

ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে হবে; আর এ শক্তি আমাদের কাছে।

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস করে শিষ্য গুরুকে জানাবে।

প্রস্তাবনা

রাজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মত একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মনের বিশ্লেষণ; অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যসংগ্রহ দ্বারাই এতে আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলা হয়। সকল দেশের মহান্ আচার্যেরাই বলে গেছেন, ‘দেখেছি ও জানি।’ যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, তাঁদের প্রচারিত সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগ-লব্ধ।

স্মৃতি বা চেতনা সত্তার সীমা হতে পারে না; কেননা আর একটা অতীন্দ্রিয় অবস্থা আছে; সেখানে এবং অচেতন অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নেই, কিন্তু এই দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত, যেমন—জ্ঞান আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেটা ঠিক বিজ্ঞানের মতই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

যোগ আমাদের শিক্ষা দেয়—কিভাবে জড়কে অধীন করে রাখা যায়; জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে।

‘যোগ’ মানে (Yoke) জুড়ে দেওয়া; অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করে দেওয়া।

মন চেতন-ভূমিতে ও তার নিম্নস্তরে কাজ করে। আমরা যাকে চেতনা বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা শিকলি-মাত্র।

একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই ‘আমি’, আর তার চারদিকে বিরাট অচেতন সত্তা; এই ‘আমি’র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি।

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যোগ অভ্যাস করলে মনের স্তর একটার পর একটা উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের সামনে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়। আমরা দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্তু মাঝ-রাস্তায় আমরা যেন থেমে না যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাঁচের পুঁতি যেন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে না দেয়।

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারলে আমাদের বিনাশ।

যাঁরা সাধক—সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁদের তিনটি জিনিষ দরকার।

প্রথমঃ ইহলোকের ও পরলোকের সব ভোগ-বাসনা ছাড়তে হবে; চাইতে হবে শুধু ভগবান্ আর সত্য।

দ্বিতীয়ঃ সত্য আর ভগবান্‌কে লাভ করবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই। যে-মানুষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি ব্যাকুল হও; সত্য ও ভগবানের জন্য ঐরকম অধীর হও।

তৃতীয়ঃ ছ-টি শিক্ষা। ১ম—মনকে বহির্মুখ হতে না দেওয়া। ২য়—মনকে অন্তর্মুখ করে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা। ৩য়—প্রতিবাদ না করে সব জিনিষ সহ্য করা। ৪র্থ—শুধু ঈশ্বরকে চাও, আর কিছুই নয়। আপাত-মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাতে না পারে। সব ত্যাগ করে শুধু ভগবান্‌কেই চাও। ৫ম—উপস্থিত কোন একটা বিষয় নাও, তার শেষ পর্যন্ত বিচার কর, সমাধান না করে ছেড়ো না। সময়ের হিসাব কর না। আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জন্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুরা করুক, আমরা কখনও তাদের মত ভোগ করতে পারি না। মানুষ মননশীল; মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের সন্ধান পায়, ততদিন সে সংগ্রাম করবেই। নিষ্ফল বৃথা কথাবার্তায় সে নিজের শক্তিক্ষয় করবে না। সামাজিকতা ও লোকমতের পূজাই হচ্ছে পৌত্তলিকতা। আত্মা—লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ষ্ঠ—সর্বদা নিজের স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কারের পারে যাও। ক্রমাগত ‘আমি ছোট, আমি ছোট’—এই ভেবে নিজেকে ছোট করে ফেল না; যতদিন না ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বল—তোমার স্বরূপের কথা।

এই সব কঠোর সাধননিষ্ঠা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়।

নিরপেক্ষ পরব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনও তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না; যে মুহূর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাঁকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি; ফলে অনন্ত হয়ে পড়েন সান্ত।

ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে হবে; আর এ শক্তি আমাদের কাছে।

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস করে শিষ্য গুরুকে জানাবে।

প্রথম পাঠ

প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে হবে। সকলেই এক কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হবে।

‘কল্পনাই প্রেরণার উৎস ও চিন্তার ভিত্তি।’

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথর পড়ে—এটা বাইরের ঘটনা, কিন্তু ‘মাধ্যাকর্ষণ’-আবিষ্কারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, বাইরে নয়।

যে বেশী খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় বা যে খুব কম ঘুমোয়, সে যোগী হতে পারে না।[১]

অজ্ঞান, চঞ্চলতা, ঈর্ষা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি—এই ক-টি যোগাভ্যাসের পরম শত্রু। যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়ঃ

প্রথম—দেহ ও মনের পবিত্রতা। সব রকমের মলিনতা, যা মনকে নীচে নামিয়ে দেয়, যোগী তা পরিত্যাগ করবে।

দ্বিতীয়—ধৈর্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য দর্শনাদি হবে, তারপর সে-সব বন্ধ হয়ে যাবে। এটিই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু ধরে থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই।

তৃতীয়—অধ্যবসায়। সম্পদে বিপদে, স্বাস্থ্যে রোগে—সব সময় যোগ অভ্যাস করে যাও, একটি দিনও বাদ দিও না।

যোগ-সাধনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ—সে-সময় দেহ ও মন খুব শান্ত থাকে, চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই তখন প্রাবল্য থাকে না। যদি সে-সময় না পার, তা হলে ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে যাবার আগে সাধন অভ্যাস করবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা খুব পরিপাটিভাবে প্রয়োজন (প্রত্যহ স্নান করবে)।

স্নানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে, মনে করবে তুমি যেন পাহাড়ের মত অটল, কোন কিছুই তোমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের উপর জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা ঋজুভাবে রাখবে। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়েই সব ক্রিয়া হয়, কাজেই সেটিকে দুর্বল করা চলবে না।

পায়ের আঙুল থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা কর, দরকার মনে হয় তো প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করবে।

মাথায় না পৌঁছনো পর্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের প্রতি অঙ্গ স্থির করতে করতে ওপরের দিকে আসবে, যেন একটি অঙ্গও বাদ না যায়। তারপর সমস্ত দেহটি স্থির করে রাখবে। সত্য লাভ করবার জন্য ভগবান্ তোমায় এই দেহ দিয়েছেন; এই নৌকা আশ্রয় করেই সংসার-সমুদ্রের পারে চিরন্তন সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে।

এটি করা হয়ে গেলে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবে, তারপর দুই নাসা দিয়েই নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তারপর যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে পার, শ্বাস রুদ্ধ করে থাকবে। এইরকম চারবার করা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নেবে এবং জ্ঞানালোকের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে।

‘যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন’—আসনে বসে দশ-পনর মিনিট এই মন্ত্রটির২ অর্থ চিন্তা কর।

যে-সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে, গুরু ছাড়া আর কাকেও তা বলবে না।

যতটা সম্ভব কম কথা বলবে।

সৎ চিন্তা করবে; আমরা যা চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎ চিন্তা মনের সকল মলিনতা দগ্ধ করতে সাহায্য করে।

যোগী ছাড়া আর সকলেই যেন ক্রীতদাস। মুক্তিলাভের জন্য বন্ধনের পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে।

অতীন্দ্রিয় সত্তাকে সকলেই জানতে পারে। ভগবান্ যদি সত্য হন, তবে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে; আত্মা যদি থাকে, তবে নিশ্চয় আমরা তাঁকে দর্শন ও অনুভব করতে পারবো।

আত্মবস্তু আছে কিনা, তা বোঝার একমাত্র উপায়—এমন একটা কিছু হওয়া, যা দেহ নয়।

যোগীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় (অথবা জ্ঞান ও কর্ম)।

অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের স্তর চারটি।

প্রথম—মনঃ, মনন বা চিন্তাশক্তি। একে সংযত না করলে এর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়—বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি (তাকে বোধশক্তিও বলা যায়)।

তৃতীয়—অহংকার বা 'অহং'-বুদ্ধি।

চতুর্থ—চিত্ত, এটিই হল উপাদান, যাতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে, মনের ভিত্তিতল, সকল বৃত্তির আধার। এ যেন সমুদ্র, আর বৃত্তিগুলি যেন এরই তরল।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নামই যোগ—'যোগ' এক প্রকার বিজ্ঞান, যার সাহায্যে আমরা চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া বন্ধ করতে পারি। সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আত্মার প্রতিবিম্বও তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মত শান্ত হয়, তখনই তাতে চাঁদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই; তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত হয়, তখনই আত্মদর্শন ঘটে।

মনের উপাদান চিত্ত, শরীর নয়—সূক্ষ্মতর জড়বিশেষ, এবং চিরকাল দেহ দ্বারা আবদ্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে আমাদের দেহ-বন্ধন যে শিথিল হয়ে যায়, তা-ই এর প্রমাণ। ইন্দ্রিয়সমূহ বশে এনে আমরা ইচ্ছামত এই অবস্থালাভ করবার অভ্যাস করতে পারি।

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে আমরা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কারণ ইন্দ্রিয়গণ যে-সব বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়, সেগুলি নিয়েই তো আমাদের জগৎ। স্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহ্ন। ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ।

যে ইন্দ্রিয়ের অধীন, সেই সংসারিক, সেই ক্রীতদাস।

চিত্তবস্তুর বিভিন্ন বৃত্তি-তরঙ্গে ভেঙে পড়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলেই আমাদের দেহবোধ চলে যায়। এই দেহগুলি তৈরি করতে কোটি কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সেই প্রচেষ্টার মধ্যে এই দেহপ্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাভ করা, তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ভাবি, এই দেহটাকে তৈরি করাই বুঝি আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য; এই-ই মায়া। এই মায়া আমাদের ভাঙতে হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরতে হবে; আর উপলব্ধি করতে হবে—আমরা দেহ নই, দেহ আমাদের ভৃত্য।

মনকে দেহ থেকে আলদা করে দেখতে শেখ, ভাব—মন দেহ থেকে পৃথক্। এই জড় দেহটাকে আমরাই চেতনা ও জীবন দিই, তারপর ভাবি এটা চেতন ও বাস্তব। আমরা এত দীর্ঘকাল ধরে এই পোষাকটা প'রে আসছি যে, এখন ভুলে গেছি—আমরা ও এই পোষাক অভিন্ন নই, এবং ইচ্ছামত এই পোষাক ছেড়ে ফেলা যায়। যোগ এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে। দেহ একটা যন্ত্রমাত্র, আমাদের দাস—প্রভু নয়; মনঃশক্তিসমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাভ্যাসের মুখ্য ও মহান্ উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—যে-কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে মনের শক্তিগুলি নিয়োগ করা।

যদি বেশী কথা বল, তাহলে যোগী হতে পারবে না।

দ্বিতীয় পাঠ

এই যোগের নাম অষ্টাঙ্গযোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি। যথা—

প্রথম—যম। যোগের এই অঙ্গটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ

- (১) কায়মনোবাক্যে হিংসা না করা।
- (২) কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।
- (৩) কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা।
- (৪) কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া।
- (৫) কায়মনোবাক্যে বৃথা দান গ্রহণ না করা (অপ্রতিগ্রহ)।

দ্বিতীয়—নিয়ম। শরীরের যত্ন, স্নান, পরিমিত আহার ইত্যাদি।

তৃতীয়—আসন। মেরুদণ্ডের উপর জোর না দিয়ে কটিদেশ, স্কন্ধ ও মাথা ঋজুভাবে রাখতে হবে।

চতুর্থ—প্রাণায়াম। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযম।

পঞ্চম—প্রত্যাহার। মনকে বহির্মুখ হতে না দিয়ে অন্তর্মুখ করে কোন জিনিষ বোঝবার জন্য বারংবার আলোচনা।

ষষ্ঠ—ধারণা। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

সপ্তম—ধ্যান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

অষ্টম—সমাধি। জ্ঞানের আলোক লাভ করাই আমাদের সকল সাধনার লক্ষ্য।

যম ও নিয়ম সারা জীবন ধরে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। জোঁক যেমন একটা ঘাস দৃঢ়ভাবে না ধরা পর্যন্ত আর একটা ছেড়ে দেয় না, তেমনি একটি সাধন ছাড়বার আগে অপরটি বেশ করে বোঝা এবং অভ্যাস করা চাই।

আজকের আলোচ্য বিষয়—প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মন। রাজযোগের সাধনায় প্রাণবায়ু চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়ে যায়। প্রাণবায়ু বা শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে সমগ্র দেহ-যন্ত্রের নিয়ামক মূল চক্র (Fly-wheel)। প্রাণ প্রথমে ফুসফুসে, ফুসফুস থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে রক্ত-প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে, সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ করে। ইচ্ছা-শক্তি বাহ্য সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে, বাহ্য সংবেদনও ইচ্ছা-শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। আমাদের ইচ্ছা দুর্বল; আমরা এতই বদ্ধ যে, ইচ্ছার যথার্থ শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমাদের অধিকাংশ কার্যের প্রেরণা আসে বাইরে থেকে; বহিঃপ্রকৃতি আমাদের অন্তরের সাম্যভাব নষ্ট করে, কিন্তু আমরা তার সাম্যভাব নষ্ট করিতে পারি না (যেটা আমাদের পারা উচিত)। কিন্তু এ-সবই ভুল, প্রকৃতপক্ষে অধিকতর শক্তি রয়েছে আমাদের ভেতরে।

যাঁরা নিজেদের অন্তরের চিন্তারাজ্য জয় করেছেন, তাঁরাই বড় বড় সাধু ও আচার্য, তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী। উচ্চ দুর্গে আবদ্ধ কোন মন্ত্রীকে তাঁর স্ত্রী গুবরে-পোকা, মধু, রেশমের সুতো, দড়ি ও কাছি দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন—এই রূপকেরও সাহায্যে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে—প্রাণের নিয়মন থেকে কি করে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় করা যায়। প্রাণায়াম-রূপ রেশমসুতোর সাহায্যেই একটার পর একটা শক্তি আয়ত্ত করে আমরা একাগ্রতা-রূপ রজ্জু ধরব, আর সেই রজ্জুর সাহায্যে দেহ-কারাগার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ ক'রব। মুক্তি লাভ করে তার সাধনগুলি আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটিঃ ১মঃ পূরক—শ্বাসগ্রহণ। ২য়ঃ কুম্ভক—শ্বাসরোধ। ৩য়ঃ রেচক—শ্বাসত্যাগ।

দুটি শক্তি-প্রবাহ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ড বয়ে তার শেষভাগে পরস্পরকে অতিক্রম করে আবার মস্তিষ্কে ফিরে যায়। প্রবাহ-দুটির একটির নাম সূর্য (পিঙ্গলা), এটি মস্তিষ্কের দক্ষিণার্ধ থেকে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের বাঁদিকে মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার মেরুর নীচে চার (৪)-এর অর্ধেকের মত আকারে আর একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে যায়।

অন্য প্রবাহটির নাম চন্দ্র (ঈড়া), এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উলটো এবং ৪-এর আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে চার (৪)-এর মত হলেও এর নীচের দিকটা উপরের দিকের চেয়ে অনেকটা লম্বা। এই দুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, আর বিভিন্ন কেন্দ্রে যাকে আমরা 'চক্র' (plexuses) বলি, এরা প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে, কিন্তু তা আমরা প্রায় জানতে পারি না। একাগ্রতার দ্বারা এই শক্তিসমূহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অনুভব করতে পারি। এই 'সূর্য-ও চন্দ্র'-এর প্রবাহ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করে আমরা সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়া এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রথী আত্মা ও সারথি বুদ্ধি সেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিরূপ ঘোড়াকে সংযত করতে না পারে, তা হলে কখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, দুষ্ট ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয়গুলি রথকে যেখানে খুশী টেনে নিয়ে গিয়ে রথীকে ধ্বংস করেও ফেলতে পারে। কিন্তু এই দুটি শক্তি-প্রবাহ (ঈড়া ও পিঙ্গলা) দুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগামের মত; এ দুটি (লাগাম) আয়ত্তে রেখে সারথি ওগুলিকে (অশ্ব) নিয়ন্ত্রণ করবে। নীতিপরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হলে আমাদের কর্মগুলিকে আমরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। নীতিশিক্ষাগুলি কি করে কর্মে পরিণত করতে পারা যায়, যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য। জগতের বড় বড় আচার্যমাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শক্তিপ্রবাহকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ-দুটিকে যোগীরা মেরুর নিম্নভাগে (মূলাধারে) সংযত করে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই তা জ্ঞান-প্রবাহে পরিণত হয়, এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাধন-প্রণালী—সকলের পক্ষে এক রকম নয়। প্রাণায়াম—একটা ছন্দের তালে তালে নিয়মিতভাবে করতে হবে এবং তা করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণনা করা, তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মত হয়ে পড়ে, তাই গণনার নির্ধারিত সংখ্যায় আমরা পবিত্র 'ওঁ'কার মন্ত্র জপ করি।

এই প্রাণায়ামে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে বাম নাসায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়।

তারপর বাম নাকে তর্জনী রেখে দুটি নাসাই বন্ধ কর, মাথাটিকে বুকের উপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার 'ওঁ' জপ করতে করতে শ্বাস রোধ করে রাখ।

তারপর মাথা ফের সোজা করে দক্ষিণ নাসা থেকে অঙ্গুষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেল।

যখন শ্বাস ফেলা শেষ হয়ে যাবে, তখন ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দেবার জন্য তলপেট সঙ্কুচিত করবে। তারপর বাম নাসা বন্ধ করে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে দক্ষিণ নাসা দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে।

তারপর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসা বন্ধ করে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস রোধ করে আটবার 'ওঁ' জপ করবে। তারপর আবার মাথা সোজা করে বাম নাসা খুলে দিয়ে চারবার 'ওঁ'জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। সেই সময় আগের মত তলপেট সঙ্কুচিত করা চাই।

যখনই বসবে, এইরকম দুবার করবে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় দুবার ও বাম নাসায় দুবার—মোট চারবার প্রাণায়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা করে নিলে ভাল হয়।

এক সপ্তাহ ধরে এইরকম অভ্যাস প্রয়োজন। তারপর ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও; সঙ্গে সঙ্গে জপের (শ্বাস-গ্রহণ, রোধ ও ত্যাগের) সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে, অর্থাৎ যদি ছ-বার প্রাণায়াম কর, তা হলে শ্বাস নেবার সময় ছ-বার, নিশ্বাস ফেলবার সময় ছ-বার ও কুম্ভকের সময় বারো বার 'ওঁ' জপ করতে হবে। এই প্রাণায়াম-অভ্যাসের দ্বারা আমরা আরও বেশী পবিত্র, নির্মল ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হবো। বিপথে চালিত হয়ো না; কোন শক্তি (সিদ্ধাই) চেও না। প্রেমই একমাত্র শক্তি, যা চিরকাল থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যারা রাজযোগের পথে ভগবানের কাছে আসতে চায়—তাদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত সবল হতে হবে। প্রতিটি পা ফেলবে আলোকিত পথে।

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে, 'এই সংসার অতিক্রম করে আমি ভগবানের কাছে পৌঁছব।' সত্যের সম্মুখীন হতে পারে, এমন লোক খুব কম, কিন্তু তবু কোন-কিছু করতে গেলে সত্যের জন্য আমাদের মরতেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয় পাঠ

কুণ্ডলিনী। আত্মাকে জড় বলে জানলে চলবে না, তার যথার্থ স্বরূপ জানতে হবে। আমরা আত্মাকে দেহ বলে ভাবছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও চিন্তা থেকে পৃথক্ করে ফেলতে হবে; তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমরা অমৃতস্বরূপ। পরিবর্তন মানেই কার্যকারণের দ্বৈতভাব; আর যা কিছু পরিবর্তনশীল, তাই নশ্বর। সুতরাং দেহ বা মন অবিনাশী; কারণ তার উপর ক্রিয়া করতে পারে, এমন আর কিছু নেই।

আমরা সত্য-স্বরূপ হয়ে যাই না, চিরকালই আমরা সেই সত্যস্বরূপ। কিন্তু যে অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, তা সরিয়ে দিতে হবে। দেহ হচ্ছে চিন্তার বাহ্য বস্তুগত রূপ। সূর্য (পিঙ্গলা) চন্দ্রের (ঈড়া) গতি দেহের সর্বাংশে শক্তিসঞ্চার করছে; অবশিষ্ট শক্তি মেরুদণ্ডের (সুষুম্নার) অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে—সাধারণ ভাষায় স্নায়ুকেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। এই গতিগুলি মৃতদেহে দেখা যায় না, কেবল সুস্থ সবল শরীরেই থাকে।

যোগীর এই সুবিধা—তিনি যে শুধু এগুলি অনুভব করেন তা নয়, সত্য সত্যই এগুলি দেখতেও পান। এগুলি প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময়; চক্রগুলিও ঠিক তাই।

কার্য সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন—এই দু প্রকার। যোগীদের আর এক প্রকার কর্ম আছে, সেটি অতিচেতন; এটিই হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকালে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস। সহজাত জ্ঞানের ক্রমবিকাশই আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। অতিচেতন অবস্থায় কোন ভুল হয় না; কিন্তু সহজাত জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেও তা নিছক যান্ত্রিক, কারণ এ স্তরে সজ্ঞান ক্রিয়া থাকে না। একে ‘প্রেরণা’ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যোগীরা বলেন, ‘এই শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে আছে’, কাল সকলেই এই শক্তির অধিকারী হবে।

চন্দ্র ও সূর্যের (ঈড়া ও পিঙ্গলা) গতিকে একটা নতুন দিকে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য একটা নতুন পথ খুলে দিতে হবে। যখন এই ‘সুষুম্না’-পথ দিয়ে তাদের গতি সহস্রার পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহজ্ঞান একবারে চলে যাবে।

মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে যে ‘মূলাধার-চক্র’ আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানটি হচ্ছে প্রজনন-শক্তিবীজের আধার। একটি ত্রিকোণ-মণ্ডলে একটি ছোট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে—যোগীরা এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই নিদ্রিত সর্পই কুণ্ডলিনী, এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে রাজযোগের একটিমাত্র লক্ষ্য।

পাশব কার্য থেকে যে যৌনশক্তি উত্থিত হয়, তাকে ঊর্ধ্বদিকে মানবশরীরে মহাবিদ্যুদাধার মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে তা ‘ওজঃ’ বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সকল সৎ চিন্তা, সকল প্রার্থনা ঐ পশুশক্তির কিছুটা ওজঃশক্তিতে পরিণত করে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিলাভে সাহায্য করে। এই ‘ওজস্’ হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, একমাত্র মনুষ্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। যাঁর ভেতরে সমগ্র পাশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা। তাঁর কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করে।

যোগীরা মনে কল্পনা করেন যে, এই কুণ্ডলিনী সর্প সুষুম্না-পথে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ করে সহস্রারে উপনিত হয়। মনুষ্যশরীরের শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌনশক্তি যে পর্যন্ত না ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে পর্যন্ত নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে না।

কোন শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না; তবে তাকে শুধু ঈপ্সিত পথে চালিত করা যেতে পারে। অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের অধিকারে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ঐ শক্তিকে পাশব হতে না দিয়ে আধ্যাত্মিক করে তুলতে হবে। এইভাবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পবিত্রতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ রাজযোগে কায়মনোবাক্য সম্পূর্ণ পবিত্রতা অপরিহার্য; বিবাহিত বা অবিবাহিত—উভয়ের পক্ষে একই নিয়ম। দেহের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্তুর যে অপচয় করে, সে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে না।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, সর্বযুগের বড় বড় সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিগণ হয় সাধুসন্ন্যাসী, না হয় তাঁরা বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেছেন। যাঁদের জীবন পবিত্র, কেবল তাঁরাই ভগবানের দর্শন পান।

প্রাণায়ামের পূর্বে ঐ ত্রিকোণ-মণ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ করে এর ছবি মনে মনে স্পষ্টরূপে কল্পনা করবে। ভাবো, এর চারপাশে আগুনের শিখা, আর তার মাঝখানে কুণ্ডলীকৃত সর্প ঘুমিয়ে রয়েছে। ধ্যানে যখন এই কুণ্ডলিনীশক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন কল্পনায় তাকে মেরুদণ্ডের মূলাধারে স্থাপন কর; কুম্ভক-কালে শ্বাস রুদ্ধ রাখার সময় (সুপ্ত) কুণ্ডলিনীকে জাগাবার জন্যে ঐ রুদ্ধ বায়ু সবলে তার মস্তকে নিক্ষেপ করবে। যার কল্পনা-শক্তি যত বেশী, সে তত শীঘ্র ফল পায়, আর তার কুণ্ডলিনীও তত শীঘ্র জাগেন। যতদিন তিনি না জাগেন, ততদিন কল্পনা কর—তিনি জেগেছেন। আর ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি অনুভব করবার চেষ্টা কর, জোর করে তাদের সুষুম্না-পথে চালাতে সচেষ্ট হও। এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে।

চতুর্থ পাঠ

মনকে সংযত করবার পূর্বে মনকে জানতে হবে।

চঞ্চল মনকে সংযত করে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে স্থির করে রাখতে হবে। বারবার এইরকম করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সংযত করে, রুদ্ধ করে ভগবানের মহিমা চিন্তা কর।

মনকে সংযত করবার সব চেয়ে সোজা উপায় চুপ করে বসে কিছুক্ষণের জন্য মনকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে সে ভেসে যেতে চায় যাক—দৃঢ়ভাবে চিন্তা করবে, 'আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী; বসে বসে মনের ভাসাডোবা—ভেসে-যাওয়া দেখছি। মন আমি নয়!' তারপর মনটাকে দেখ। ভাবো, মন থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে চিন্তা কর, জড়বস্তুর বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেল না।

কল্পনা কর—মন যেন তোমার সম্মুখে প্রসারিত একটা নিস্তরঙ্গ হ্রদ, এবং যে চিন্তাগুলি মনে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি যেন হ্রদে বুদ্‌বুদ্ উঠছে আর তার বুকে লয় পাচ্ছে। চিন্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন চেষ্টা কর না, কল্পনার চক্ষে সেগুলি কেবল সাক্ষীর মত দেখে যাও—কেমন করে তারা ভেসে চলেছে। একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন তরঙ্গ ওঠে, তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তরঙ্গ তত কমে আসে; তেমনি মনকে ঐভাবে ছেড়ে দিলে তার চিন্তার পরিধি যত বেড়ে যাবে, মনোবৃত্তি তত কমে আসবে। কিন্তু আমরা এই প্রণালী উল্টে দিতে চাই। প্রথমে একটা চিন্তার বড় বৃত্ত থেকে আরম্ভ করে সেটাকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির করে রাখতে হবে। এই ভাবটি ধারণা করঃ আমি মন নই; আমি দেখছি—আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। এইরকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে অভিন্নভাব, তা দিন দিন কমে আসবে; শেষ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করে ফেলতে পারবে, এবং ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার থেকে পৃথক্।

এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার চাকর, তাকে তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। যোগী হওয়ার প্রথম স্তর—ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করা; আর যখন মনকে জয় করা হয়ে গেছে, তখন সাধক সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে।

যতদূর সম্ভব একলা থাকবে। আসন নাতি-উচ্চ হওয়া উচিত; প্রথমে কুশাসন, তারপর মৃগচর্ম, তারপর রেশম বা পট্টবস্ত্র বিছাবে। হেলান দেবার কিছু না থাকাই ভাল, আার আসন যেন দৃঢ় হয়।

সর্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ করে মনকে খালি করে ফেল; যখনই কোন চিন্তা মনে উঠবে, তখনই তাকে দূর করে দেবে। এই কাজ সম্পন্ন করতে গেলে জড় বস্তুকে ও আমাদের দেহকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই ঐ অবস্থা আনবার একটি অবিরাম চেষ্টা।

চিন্তাগুলি ছবি, ওগুলি আমরা সৃষ্টি করি না। প্রত্যেক ধ্বনির বা শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে; আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি জড়িত।

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্। তাঁকেই ধ্যান কর। আমরা জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমাদের স্বরূপই যে তিনি। অশুভ দেখি বলেই অনর্থের সৃষ্টি আমরা নিজেরাই করি। আমরা ভিতরে যা, বাইরে তাই দেখি, কেন না জগৎটা আমাদের আয়নার মত। এই দেহটা আমাদের সৃষ্টি একখানি ছোট আয়না, প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বই হচ্ছে আমাদের শরীর। সর্বদা এই চিন্তা করতে হবে, তবেই বুঝতে পারবো—আমরা মরি না বা কাকেও আঘাত করতে পারি না, কারণ যাকে আঘাত করব সেও যে আমিই। আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই; আমাদের কর্তব্য শুধু সকলকে ভালবেসে যাওয়া।

'এই বিশ্বজগৎ আমার শরীর; সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই; কারণ সবই যে বিশ্বের ভেতর।' বল, 'আমি এই বিশ্বজগৎ।' অবশেষে বুঝতে পারি—যা কিছু কর্মব্যাপার, সবই আমাদের থেকে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

যদিও মনে হচ্ছে, আমরা ছোট তরঙ্গের মত, আমাদের সকল পশ্চাতে এক অখণ্ড সমুদ্র, এবং আমরা সকলেই তার সঙ্গে মিলিত। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ একা থাকতে পারে না।

ঠিকভাবে নিয়োজিত হলে কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। কল্পনা যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, এবং একমাত্র কল্পনার আলোই আমাদের সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে।

প্রেরণা আমাদের ভেতর থেকে ওঠে, তাই নিজ নিজ উচ্চতর শক্তি দ্বারা আমাদের নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

পঞ্চম পাঠ

প্রত্যাহার ও ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে যে-পথ দিয়েই সন্ধান করুক, সকলেই আমার কাছে পৌঁছবে—সকলেই আমার কাছে পৌঁছবে।'[4] প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈপ্সিত বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ—মনকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর নজর রাখা এবং দেখা—মন কি ভাবে। যখনই কোন চিন্তার উপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি সে চিন্তা বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তাগুলিকে জোর করে বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রো না, কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। মন তো আর আত্মা নয়, মন হচ্ছে জড়ের একটু সূক্ষ্ম অবস্থামাত্র। স্নায়ুশক্তি দিয়ে একে আয়ত্ত করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনকে কাজে লাগানোর উপায় শিখে নিতে পারি।

দেহ হচ্ছে মনের (ব্যক্তিভাবের) বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা আত্মা, দেহ-মনের অতীত; আমরা অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। দেহটা চিন্তারই ঘনীভূত রূপ।

যখন বাম নাসা দিয়ে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন দক্ষিণ নাসা দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নাসা দিয়েই পড়বে তখন ধ্যানের সময়। যখন দেহ-মন শান্ত হয়ে আসবে আর দুই নাসা দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। প্রথমেই জোর করে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। চিন্তার নিয়ন্ত্রণ আপনিই হবে।

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাস করবার পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঐরকম করা যেতে পারে।

প্রাণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার। যে-সব সাধক ইষ্টমন্ত্র পেয়েছে, তারা রেচক ও পূরকের সময় 'ওঁ'কারের পরিবর্তে ইষ্টমন্ত্র এবং কুম্ভকের সময় 'হুঁ' মন্ত্র জপ করবে।

কুম্ভকের সময় যখন 'হুঁ' মন্ত্র জপ করবে, তখন মনে মনে কল্পনা করবে, সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃপুনঃ কুণ্ডলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তার দ্বারা তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন। শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে কর। ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমরা বুঝতে পারব যে, চিন্তাগুলি আসছে; কি করে চিন্তাগুলি উঠছে আর আমরা কি-ই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাও বুঝতে পারব। জাগ্রত অবস্থায় যেমন আমরা তাকিয়ে দেখতে পাই যে, একটা লোক আসছে, এও অনেকটা তেমনি। যখন আমরা মন থেকে আত্মাকে পৃথক্ করতে পারবো, যখন আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা ও আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ, তখনই আমরা ঐ অবস্থায় পৌঁছেছি। চিন্তাগুলি যেন তোমাকে পেয়ে না বসে; সর্বদা তাদের পাশ কাটাবে, তা হলেই তারা আপনি বিলীন হয়ে যাবে।

সৎ চিন্তাগুলি অনুসরণ কর; তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও। যখন তারা স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্বশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীচরণ দেখতে পাবে। এই হচ্ছে অতিচেতন অবস্থা। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তার অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও।

দ্যুতি হচ্ছে অন্তর্জ্যোতির প্রতীক, যোগী তা দেখতে পান। কখনও কখনও এমন একখানি মুখ আমরা দেখতে পাই, তা যেন জ্যোতি দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে আমরা চরিত্র পাঠ করে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভাবচক্ষে হয়তো ইষ্টমূর্তি আমাদের সামনে আসতে পারেন, সহজেই তাঁকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করে আমরা মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করতে পারি।

যদিও আমরা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কল্পনা করতে পারি, তথাপি চোখ দিয়েই বেশীর ভাগ কল্পনা করি। এমন কি, কল্পনা পর্যন্ত অর্ধেক জড়। আর এক ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, মানসিক চিত্র ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। পশুরা চিন্তা করে বলে বোধ হয়, কিন্তু তাদের যখন ভাষা নেই, তখন মনে হয়—ভাব ও প্রতীকের মধ্যে কোন বিশেষ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই।

যোগের সময় কল্পনাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, তা যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট্য আছে; তোমার পক্ষে যে পথ খুব স্বাভাবিক, তাই অনুসরণ কর; সেটাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে সোজা হবে।

পূর্ব পূর্ব সব জন্মের কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন। বৌদ্ধেরা বলেন, 'এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ জ্বলে ওঠে।' প্রদীপ আলাদা, কিন্তু আলো সেই একই।

সর্বদা প্রফুল্ল ও সাহসী থাকবে, রোজ স্নান করবে; ধৈর্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়—এই সব থাকলে তবে ঠিক ঠিক যোগী হতে পারবে। কখনও তাড়াতাড়ি কর না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে ওগুলি বিপথ; তারা যেন তোমায় লুব্ধ করে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য—ভগবান্, তাঁকেই ধরে থাকবে। কেবল সেই চিরন্তনকে খোঁজ, যাঁর সন্ধান পেলে আমাদের চিরবিশ্রাম লাভ হয়। পূর্ণত্ব লাভ করবার পর আর কিছুই কাম্য থাকে না, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে; তখন আমরা চিরমুক্ত—সত্তাস্বরূপ।

সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

ষষ্ঠ পাঠ

সবিকল্প ও সুষুম্না। সুষুম্নার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন। ভাব-চক্ষে কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পার, এটিই সবচেয়ে ভাল উপায়। ঐভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তার ধ্যান করবে। সুষুম্না একটি অতি সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ময়, সূত্রাকার, প্রাণময় পথ—মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, মুক্তির এই পথ দিয়েই কুণ্ডলিনীকে ওপরে তুলতে হবে।

যোগীর ভাষায় সুষুম্নার দুটি প্রান্ত দুটি পদ্মে; নীচের পদ্মটি কুণ্ডলিনীর ত্রিকোণকে ঘিরে আছে, আর উপরের পদ্মটি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারকে ঘিরে আছে। এ-দুটির মাঝখানে আরও পাঁচটি[৫] পদ্ম আছে।

উপরের দিক থেকে নিম্নের স্তর বা অবস্থাগুলি, চক্র বা পদ্মের নামঃ

সপ্তম—সহস্রার—মস্তকে।

ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে।

পঞ্চম—বিশুদ্ধ—কণ্ঠে।

চতুর্থ—অনাহত—বক্ষে বা হৃদয়ে।

তৃতীয়—মনিপুর—নাভিদেশে।

দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান—উদর-নিম্নে।[৬]

প্রথম—মূলাধার—মেরুদণ্ডের নিম্নে।

প্রথমে কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হবে, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ করে ওপরে তুলতে হবে, যে-পর্যন্ত না মস্তিষ্কে পৌঁছানো যায়। প্রত্যেক অবস্থা বা ভূমি হচ্ছে মনের নতুন নতুন স্তর।

রাজযোগ

(অথবা অন্তঃপ্রকৃতি—জয়)

আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

ভূমিকা

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে মনুষ্যসমাজে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান কালেও যে-সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনা সাক্ষ্যপ্রদানকারী মানুষের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাগুলি অনুকরণমাত্র। কিন্তু ঐগুলি কিসের অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নয়। যাহারা ভাসাভাসা বৈজ্ঞানিক, তাহারা মনোরাজ্যের নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে-সকল ব্যক্তির বিশ্বাস—মেঘলোকের ঊর্ধ্বে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাগণ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী। কারণ শেষোক্তেরা বরং অজ্ঞতা বা বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিতে পারে, এই শিক্ষা তাহাদিগকে এইরূপ দেবতাদের উপর নির্ভর করিতে শিখাইয়াছে, এই নির্ভরতা এখন তাহাদের অবনত স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াছে এবং পরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগ-রূপ বিজ্ঞান। যে-সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা দুরূহ, কতকগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অমার্জনীয় ধারা অবলম্বন করিয়া রাজযোগ সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, বরং ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি—এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এ-সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়—এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহা আরও শিক্ষা দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, তেমনি মানুষের ভিতরেই ঐ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে; যখন সেখানে কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতেই এইসব প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়। অপ্রাকৃত পুরুষের ধারণা মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে জাগ্রত করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে। ইহার ফলে স্বাধীনতা চলিয়া যায়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়া হৃদয় অধিকার করে ঐভাব শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যে—মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল। যোগী বলেন, অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্মকে সেরূপ করা যায় না। রাজযোগ অভ্যাস করিলে সূক্ষ্মতর অনুভূতি অর্জিত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে যত বেদানুগ দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহাদের সকলেরই এক লক্ষ্য—পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার উপায় যোগ। 'যোগ' শব্দ বহুব্যাপক। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন-না-কোন আকারে যোগের সমর্থন করে।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় 'রাজযোগ' নামে পরিচিত যোগ। রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ 'পাতঞ্জলসূত্র'। কোন কোন দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ সকলেই কার্যক্ষেত্রে একবাক্যে তাঁহার

সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউ ইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যে-সকল বক্তৃতা দেন, সেইগুলি গ্রথিত হইল। দ্বিতীয়াংশে পতঞ্জলির সূত্রগুলির ভাবানুবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যতদূর সাধ্য, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিবার ও কথোপকথনের সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমাংশে সাধনার্থিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষা করিতে হইলে গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকা আবশ্যক। যদি কথাবার্তার ছলে প্রদত্ত এই-সকল উপদেশ লোকের মনে এই-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব হইবে না।

পাতঞ্জল—দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই দুই মতে প্রভেদ অতি সামান্য। দুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এই—প্রথমতঃ পতঞ্জলি আদিগুরু-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যেরা কেবল প্রায়-পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি—যাঁহার উপর সাময়িকভাবে কোন কল্পে জগতের শাসনভার প্রদত্ত হয়, এইরূপ অর্থাৎ জন্য-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যোগীরা মনকে আত্মা বা 'পুরুষ'-এর ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সাংখ্যেরা তাহা করেন না।

গ্রন্থকার

অবতরণিকা

আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আনুমানিক জ্ঞান, যেখানে সামান্য (general) হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ (particular) জ্ঞানে উপনীত হই, তাহারও ভিত্তি—অভিজ্ঞতা। যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান[১] বলে, সেগুলির সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে, কারণ ঐগুলি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা স্পর্শ করে। বৈজ্ঞানিক তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না, তিনি নিজে কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; যখন তিনি আমাদিগকে তাঁহার সেই সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি কোন এক সর্বজনীন অনুভূতির নিকটই আবেদন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক নিশ্চিত-বিজ্ঞানেরই (exact science) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহা হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ ঠিক না ভুল, তাহা আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই—ধর্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কিনা? ইহার উত্তরে আমাকে 'হাঁ' এবং 'না'—দুই-ই বলিতে হইবে।

পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়—ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; একজন বলিলেন, মেঘের উপর এক মহান্ পুরুষ বসিয়া আছেন, তিনিই সমগ্র জগৎ শাসন করিতেছেন; বক্তা আমাকে তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই উহা বিশ্বাস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে, আমি অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাঁহারা কোন যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে পারি না। এইজন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, 'এই-সব ধর্ম তো দেখছি কতকগুলো মত মাত্র, এগুলোর সত্যাসত্য-বিচারের কোন মানদণ্ড নেই, যার যা খুশী সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত।' এ-সব সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে—উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণাসমূহের নিয়ামক। ঐগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলির শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে, কতকগুলির তাহা নাই। যেগুলি শাস্ত্রের উপর স্থাপিত, সেগুলি সুদৃঢ়; উহাদের অনুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্মসকল প্রায়ই লুপ্ত, কতকগুলি নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু খুব কম লোকই ঐগুলির অনুগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই মতের এই ঐক্য দেখা যায় যে, উহাদের শিক্ষা বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। খ্রীষ্টান তাঁহার ধর্মে, যীশুখ্রীষ্টে ও তাঁহার অবতারত্বে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে এবং আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলিবেন—'ইহা আমার বিশ্বাস।' কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্টধর্মের মূল উৎসে গমন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, উহাও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর স্থাপিত। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।' তাঁহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন, 'আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।' এইরূপ আরও অনেকের কথা শুনা যায়।

বৌদ্ধধর্মেও এইরূপ; বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষানুভূতির উপর এই ধর্ম স্থাপিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, সেই-সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋষি-নামধেয় গ্রন্থকর্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি।' তাঁহারা সেইগুলিই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে জগতে সকল ধর্মেই জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি—প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন; সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন—অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধর্মেই—বিশেষতঃ ইদানীং—একটি অদ্ভুত দাবী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা এইঃ বর্তমানে এই-সকল অনুভূতি অসম্ভব। যাঁহারা ধর্মের প্রথম স্থাপয়িতা, পরে যাঁহাদের নামে সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, শুধু এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব ছিল। আজকাল আর এরূপ অনুভূতি কাহারও হয় না, অতএব ধর্ম এখন বিশ্বাস করিয়াই লইতে হইবে—এ-কথা আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেহ কখন কোন একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেও কোটি কোটি বার ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, পরেও অনন্তকাল ধরিয়া বার বার ঐরূপ সম্ভাবনা থাকিবে। একরূপতাই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম; একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে।

যোগ-বিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, 'ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই-সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এই-সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'যোগ'।' ধর্ম যতদিন না অনুভূত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথা বলাই বৃথা। ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদানুবাদ কেন? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মের মূল উৎসে যায় নাই। সকলেই পূর্বপুরুষগণের কতকগুলি আচার অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা চাহিত, অপরেও তাহাই করুক। আত্মা অনুভূতি না করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর দর্শন না করিয়া 'ঈশ্বর আছেন' বলিবার কী অধিকার মানুষের আছে? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আজকালকার 'বিদ্বান্' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদের মনোভাব এই যে, ধর্ম, দর্শন ও

পরমপুরুষের অনুসন্ধান—সবই নিষ্ফল। অপর দিকে যাঁহারা অর্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই, তবে ঐগুলির এই মাত্র উপযোগিতা যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-সাধনের বলিষ্ঠ প্রেরণাশক্তি—যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না; কারণ তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা পায়, তাহা অসংলগ্ন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ-বাক্যের মত অনন্ত শব্দসমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বলা হয়। তাহারা কি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে মানব-প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত্য অনুভব করিতে চায়; সত্যকে ধারণা করিতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিতে, অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে চায়। 'কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলিয়া যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সকল বক্রতা সরল হইয়া যায়।'[২] বেদ এইরূপ ঘোষণা করেনঃ

'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, শ্রবণ কর—আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমসার পারে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সেখানে যাওয়া যায়—মুক্তির আর কোন উপায় নাই।'[৩]

রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য—এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ-প্রণালী আছে। তুমি যদি জ্যোতির্বিদ্ হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল 'জ্যোতিষ, জ্যোতিষ' বলিয়া চীৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইবে না। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (laboratory) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে; ঐগুলি মিশাইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে ঐগুলি লইয়া পরীক্ষা করিলে তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্বিদ্ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়া দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে তুমি জ্যোতির্বিদ্ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক-একটি নিদিষ্ট প্রণালী থাকা উচিত। আমি তোমাদিগকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্মিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধ-স্বভাব জ্ঞানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের হিতসাধন ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কামনা ছিল না। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে যে সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি।' তাঁহারা সকলকে সেই সত্য পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহারা আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া আন্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাবে সাধনা করিয়া যদি আমরা এই উচ্চতর সত্য লাভ না করি, তখন আমরা বলিতে পারি, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ নয়। কিন্তু তাহার পূর্বে এই-সকল উক্তির সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া নিষ্ঠাপূর্বক সাধন করিতে হইবে, আলোক নিশ্চয়ই আসিবে।

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্যীকরণের সাহায্য লইয়া থাকি; সামান্যীকরণ আবার পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে আমরা ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করি, শেষে তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মূলনীতি উদ্ভাবন করি। যতক্ষণ না মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততক্ষণ আমরা মন সম্বন্ধে, মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্য জগতের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ঐ উদ্দেশ্যে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিতে সাহায্য করে, এমন কোন যন্ত্র আমাদের নাই। তথাপি আমরা নিশ্চয় জানি যে, কোন বিদ্যাকে প্রকৃত বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া ভিত্তিহীন অনুমানমাত্রে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনোবিৎ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছেন মাত্র।

রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই ঐ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করিয়া অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলেই উহা মনকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে, এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব, আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, মনের শক্তিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিসদৃশ। উহারা কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলোকিত করে, ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জগতে, সকলেই এই শক্তি ব্যবহার করিতেছে; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিৎকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাস প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে আমরা কেবল বাহিরের বস্তুতেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, অন্তর্জগতের বস্তুতে নয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্তর্যন্ত্রের পর্যবেক্ষণশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। মনকে অন্তর্মুখ করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা—যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য। কিন্তু এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায়।

এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার। দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাও আছে; ইহা সমস্ত দুঃখ দূর করিবে। যখন মানুষ নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, যাহার কোন কালে নাশ নাই—যাহা স্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ, তখন আর তাহার দুঃখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে না। ভয় ও অপূর্ণ বাসনাই সকল দুঃখের কারণ। পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ করিলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে অসার বাসনা আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণদ্বয়ের অভাব হইলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না, তৎপরিবর্তে এই দেহেই পরমানন্দ লাভ হইবে।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়নবিৎ নিজের পরীক্ষাগারে মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া—যে সকল বস্তু তিনি বিশ্লেষণ করিতেছেন, সেগুলির উপর প্রয়োগ করেন, এইরূপ ঐ-সকল রহস্য অবগত হন। জ্যোতির্বিদ্ নিজের মনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাহা আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র—সকলেই নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে-বিষয়ে এখন তোমাদের নিকট বলিতেছি, সে-বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারিব। তোমরা আমরা কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ-বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে।

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই-সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে—কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয় ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং ইহাই রহস্য।

মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহির্মুখ; ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনবিষয়ে মন স্থির করা সহজ নয়, কারণ এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে জ্ঞানের বিষয় একটি অভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে জ্ঞানের বিষয়। মনকে পর্যবেক্ষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। আমরা জানি, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বারা উহা নিজের ভিতরটি দেখিতে পারে—উহাকে অন্তঃপর্যবেক্ষণশক্তি বলা হয়। আমি তোমাদের সহিত কথা কহিতেছি; আবার ঐ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক—বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি, তাহা জানিতেছি ও শুনিতেছি। একই সময়ে তুমি কাজ করিতেছ ও চিন্তা করিতেছ, আবার তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—তুমি কি চিন্তা করিতেছ। মনের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব, ইহাই প্রকৃত ধর্ম। তখনই আমরা অনুভব করিব—আত্মা আছে কিনা, জীবন ক্ষণস্থায়ী না অনন্তকালব্যাপী, বুঝিব—জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কিনা। সবই আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে। রাজযোগ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজযোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য—কি ভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কি ভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কার করা যায়, শেষে মনের ভিতরের ভাবগুলি হইতে কিভাবে একটা সাধারণ ভাবে আসা যায় এবং তাহা হইতে নিজের একটা সিদ্ধান্ত করা যায়। এইজন্যই রাজযোগ জিজ্ঞাসা করে না, 'তোমার ধর্ম কি?'—তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা মানুষ—ইহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তরও পাইতে পারে। তবে এজন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

তাহা হইলে এ-পর্যন্ত দেখিলাম, এই রাজযোগের আলোচনায় কোন প্রকার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছ, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না—রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। তোমরা কি বলিতে চাও যে জাগ্রত অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার সাহায্য আবশ্যক? কখনই নয়। এই রাজযোগ-সাধনে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন। এই অভ্যাসের কিছু অংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। ক্রমশঃ আমরা বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি, মন শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ, আর মন শরীরের উপর কার্য করে, তাহা হইলে ইহাও যুক্তসঙ্গত যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ এবং সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মন উত্তেজিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের মন অতি অল্প-বিকশিত। তোমরা যদি কিছু মনে না কর তবে বলি—অধিকাংশ মানুষ পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। শুধু তাই নয়, অনেক স্থলে ইতর প্রাণী অপেক্ষা তাহাদের সংযম-শক্তি বড় বেশী নয়। মনের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই নাই। মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জন্য, শরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের—দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপে মনকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে পারিব, ইচ্ছামত উহাকে দিয়া কাজ করাইতে পারিব এবং মনের শক্তিগুলি একাগ্র করিতে পারিব।

রাজযোগীদের মতে বহির্জগৎ অন্তর্জগতের বা সূক্ষ্মজগতের স্থূল রূপ মাত্র। সর্বত্রই সূক্ষ্ম কারণ ও স্থূল কার্য। অতএব এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। অনুরূপভাবে বহির্জগতের শক্তিগুলি অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূলভাগ মাত্র। যিনি এই অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি আবিষ্কার করিয়া ইচ্ছামত উহাদিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করার—প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে 'প্রকৃতির নিয়মাবলী' বলি, সেগুলি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি ঐ-সব অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি আন্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিবেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ—শুধু এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন একই সমাজের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্যপ্রকৃতি, আবার কেহ অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চায়; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্যপ্রকৃতি, কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সব বশীভূত করা হয়;

কাহারও মতে বাহ্যপ্রকৃতি বশীভূত করিলে সবই বশীভূত করা হয়। এই দুইটি চিন্তাধারার শেষ পর্যন্ত যাইলে বুঝা যায়, উভয়ের সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ প্রকৃতিতে বাহ্য বা আন্তর বলিয়া কোন ভেদ নাই, ইহা কাল্পনিক বিভাগ মাত্র; এইরূপ বিভাগের অস্তিত্ব কখনও ছিল না।বহির্বাদী বা অন্তর্বাদী যখন নিজ নিজ জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিবেন, তখন উভয়ে একই স্থানে উপনীত হইবেন। ঠিক যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া গেলে দেখিতে পান—বিজ্ঞান দর্শনে মিশিয়া যাইতেছে, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, যেগুলিকে তিনি মন ও জড় বলিতেছেন, সেগুলি আপাত প্রতীয়মান ভেদমাত্র—প্রকৃতপক্ষে সত্তা একই।

যাহা হইতে এই 'বহু' উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। রাজযোগীরা বলেন, 'আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রকৃতিকেই বশীভূত করিব।' প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয়ে কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা ভাবিত, যাঁহারা ইহা অভ্যাস করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ডাইনি, যাদুকর, ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথবা অন্যরূপে মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া বাকী অংশটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জানেন না।

এই-সব যোগ-প্রণালীতে গুহ্য ও অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, তাহা বর্জন করিতে হইবে; যাহা কিছু বলপ্রদ, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন ধর্মেও তেমনি—যাহা কিছু তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাগ কর। রহস্যস্পৃহাই মানব-মস্তিষ্ক দুর্বল করিয়া ফেলে। ইহারই জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান যোগশাস্ত্র প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চার হাজার বছরেরও আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। আশ্চর্য এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও সেই পরিমাণে তত অধিক। লেখক যত প্রাচীন, তাঁহার লেখা ততই যুক্তিসঙ্গত। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নানা প্রকার রহস্যের কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপে যোগ অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়া পড়িল, তাহারা ইহাকে গোপনীয় বিদ্যা করিয়া তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রকাশ্য দিবালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল না।

প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহা কিছু শিক্ষা দিই তাহার ভিতর গোপনীয় কিছুই নাই। সামান্য যাহা কিছু আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। যুক্তি দ্বারা ইহা যতদূর বুঝানো যায়, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষভাবে জানি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলে শুধু তাহাই বলিব। অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি খাটাইতে হইবে; সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত তাহা সত্য কিনা। অন্যান্য বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন রহস্য কিছু নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই; ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে সেটুকু সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা উচিত। এ-সকল সাধনা রহস্যাবৃত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলে অনেক বিপদ হইতে পারে।

আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধে কিছু বলিব; এই সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর রাজযোগ-বিদ্যা স্থাপিত। সাংখ্যদর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞান এইভাবে হয়—প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট উহা প্রেরণ করে; বাহিরের শব্দ-রূপ প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাব বহিরিন্দ্রিয়ের নিজ নিজ মস্তিষ্ককেন্দ্রে বা প্রকৃত ইন্দ্রিয়ে নীত হয়, ইন্দ্রিয়গণ মনের নিকট ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন এবং বিষয়ের অনুভূতি হয়। অতঃপর ঐগুলি যে-পথে আসিয়াছিল, পুরুষ সেই পথেই ঐগুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়, তবে চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা মন সূক্ষ্মতর। মন যে উপাদানে নির্মিত, তাহা সূক্ষ্ম তন্মাত্রাও উৎপন্ন করে। ঐগুলি স্থূল হইলে জড়বস্তুর উৎপত্তি হয়। ইহাই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান। সুতরাং বুদ্ধি ও স্থূলভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্তনশীল, সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, সিদ্ধ অবস্থায় মন কখনও সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিতে লগ্ন, কখনও বা একটিতে, আবার কখনও বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মন যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, তখন দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। কিন্তু সিদ্ধপুরুষের মন একই সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ দেখিতে পারে। এই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদয় শক্তিকে একাগ্র করিয়া, ভিতরের দিকে ফিরাইয়া ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি জানিতে চান। ইহাতে নিছক বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রকৃত দর্শনের ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, উহা মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদয় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত। সাংখ্যেরাও এই কথাই বলিয়া থাকেন; তবে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া, আর বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা হইলেও উভয়ের কথা এক। আমাদের গবেষণার রাজ্য ইহাকে অতিক্রম করিয়া।

যোগী এমন সূক্ষ্মানুভূতির অবস্থা লাভ করিতে চান, যাহাতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঐগুলির মানস অনুভূতি অবশ্যই সম্ভব। বিষয়সমূহ কর্তৃক বহিরিন্দ্রিয়ে উৎপন্ন বেদন কিরূপে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায় —এই সমুদয় ব্যাপারগুলি অনুভব করা যায়। সকল বিষয় শিক্ষারই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার

জন্য কিন্তু প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, উহার নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, তবে উক্ত বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবে; রাজযোগ সম্বন্ধেও সেইরূপ।

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক। যাহাতে মন খুব পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। কোন পশুশালার ভিতরে গিয়া দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারা যায় আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ। হস্তী অতি বৃহদাকার জন্তু, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর সিংহ বা বাঘের খাঁচার দিকে গিয়া দেখিবে—তাহারা অস্থির, চঞ্চল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, সবগুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, প্রথমতঃ তোমার শরীর দুর্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলি হ্রাস পাইবে, কয়েকদিন পরে মানসিক শক্তিগুলিও হ্রাস পাইতে থাকিবে। তারপর স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না, যুক্তিবিচার করা তো দূরের কথা। সেইজন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে যখন আমাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যখন আমরা সাধনায় বেশ অগ্রসর হইয়াছি, তখন ঐ বিষয় আর তত সাবধানতার প্রয়োজন নাই। চারা গাছ যতদিন বাড়ীতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, পাছে কেহ উহার ক্ষতি করে; গাছ বড় হইয়া গেলে বেড়া সরাইয়া লইতে হয়, তখন সমুদয় আক্রমণ অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি উহার হইয়াছে।

যোগী অধিক বিলাস ও কঠোরতা—দুই-ই পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অত্যধিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি নিজেকে অনর্থক ক্লেশ দেন তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না। অতিভোজনকারী, একান্ত উপবাসী, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্মপরায়ণ, অথবা একেবারে নিষ্কর্মা—ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।[৪]

সাধনার প্রথম সোপান

রাজযোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত। ১ম—যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। ২য়—নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। ৩য়—আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী। ৪র্থ—প্রাণায়াম। ৫ম—প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়া উহাকে অন্তর্মুখী করা। ৬ষ্ঠ—ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। ৭ম—ধ্যান। ৮ম—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন; ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাঁহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এগুলির অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে কাহারও প্রতি কখনও অনিষ্টভাব পোষণ করিবেন না। করুণার ভাব কেবল মনুষ্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়া সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে।

পরবর্তী সোপান 'আসন'। যতদিন না কিছুটা উচ্চ অবস্থা লাভ হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া পর পর অভ্যাস করিতে হয়। অতএব দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, এমন একটি আসন অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহার যে আসনে বসিলে সুবিধা হয়, তিনি সেই আসন বাছিয়া লইবেন। একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে হয়তো সেভাবে বসা কঠিন বোধ হইবে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকার কার্য চলিতে থাকিবে। স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলির গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে নূতন প্রকারের স্পন্দন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে; সমগ্র শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; সুতরাং আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্যক—ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে, আর বক্ষ গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে—দেহের সমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির উপর পড়ে। বক্ষোদেশ কুঞ্চিত থাকিলে কোনরূপ উচ্চতর চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাহা সহজেই দেখিতে পাইবে।

রাজযোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত কিছুটা মিলে। হঠযোগ কেবল স্থূলদেহ লইয়াই ব্যস্ত, ইহার উদ্দেশ্য কেবল স্থূলদেহকে সবল করা। হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি অতি কঠিন। উহা একদিনে শিক্ষা করা যায় না। আর উহা দ্বারা শেষ পর্যন্ত বেশী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। এই-সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই ডেলসার্ট ও অন্যান্য ব্যায়ামাচার্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির দ্বারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে স্থির রাখা যায়। এগুলিরও উদ্দেশ্য—দৈহিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক নয়। শরীরে এমন কোন পেশী নাই, যাহা মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না; হৃদ্‌যন্ত্র তাহার আদেশে রুদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে, শরীরের প্রত্যেক অংশই ঐ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।

মানুষকে দীর্ঘজীবী করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যই মুখ্য ভাব ইহাই হঠযোগীদের একমাত্র লক্ষ্য। 'আমার যেন পীড়া না হয়'—ইহাই হঠযোগীর দৃঢ়সঙ্কল্প; তাঁহার পীড়া হয়ও না; তিনি দীর্ঘজীবী হন; শতবর্ষ জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে কিছুই নয়। দেড়শত বৎসর বয়সে তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ থাকেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় না; কিন্তু এই পর্যন্তই। বটবৃক্ষও কখনও কখনও পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা বটবৃক্ষই থাকিয়া যায়, তার বেশী কিছু নয়। দীর্ঘজীবী মানুষ একটি সুস্থকায় প্রাণী, এইমাত্র।

হঠযোগীদের দুই-একটি সাধারণ উপদেশ খুব উপকারী। শিরঃপীড়া হইলে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া শীতল জলপান করিবে, তাহা হইলে সারা দিনই তোমার মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার ও শীতল থাকিবে, তোমার কখনই সর্দি লাগিবে না। নাসিকা দিয়া জল পান করা কিছু কঠিন নয়, অতি সহজ। নাসিকা জলের ভিতর ডুবাইয়া নাসা দিয়া জল টানিতে থাক, গলার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জল আপনা-আপনি ভিতরে যাইবে।

আসন সিদ্ধ হইলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। রাজযোগের অন্তর্গত নয় বলিয়া অনেকে ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমি মনে করি, ইহা উল্লেখ করা উচিত। আমি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ-বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব—'প্রাণায়াম দ্বারা যে-মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করিবার শক্তি আসে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া বাম নাসা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারি বার অর্থাৎ ঊষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচরার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণায়ামে অধিকার হইবে।'[৫]

অভ্যাস একান্তই আবশ্যক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার কথা শুনিতে পার। কিন্তু অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে পারিবে না। সবই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষানুভূতি না হইলে এ-সকল তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেক বিঘ্ন আছে। প্রথম বিঘ্ন ব্যাধিগ্রস্ত দেহ—শরীর

সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্যই শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। কিরূপ পানাহার করি, কাজকর্ম করি, এ-সকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। শরীর সবল রাখিবার জন্য সর্বদা মনের শক্তি প্রয়োগ কর—'কৃশ্চান সায়েন্স' (Christian Science)[৬]মতাবলম্বীরা সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া থাকে। ব্যস্, শরীরের জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্যসাধনের একটি উপায় মাত্র—ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য হইতে, তবে তো আমরা পশুতুল্য হইতাম। পশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না।

দ্বিতীয় বিঘ্ন—সন্দেহ। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, সে-সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; এই কারণে যোগশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও মাঝে মাঝে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই সাধনবিষয়ে উৎসাহ বর্ধিত হয়। যোগশাস্ত্রের জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন, 'যোগশাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি একটি অতি সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাতেই সমগ্র যোগশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হইবে।' উদাহরণস্বরূপ কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়তো তাহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ-সকল ব্যাপার অতি অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। উদাহরণস্বরূপ যদি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম কর, তবে অল্প দিনের মধ্যেই দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে; তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখনও কখনও বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই-সকল সিদ্ধির স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, এগুলি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের সহায়-মাত্র। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তি। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা ছোট কোন আদর্শ আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রকৃতির ক্রীতদাস হইব না। শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে; আর ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে—শরীর আমার, আমি শরীরের নই।

এক দেবতা ও অসুর আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া এক জ্ঞানীর (ব্রহ্মার)[৭] নিকট গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, তোমরাই সেই পুরুষ।' তাহারা ভাবিল, তবে দেহই 'আত্মা'। তখন তাহারা উভয়েই 'আমাদের যাহা পাইবার, তাহা পাইয়াছি' মনে করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'যাহা শিক্ষা করিবার তাহা সবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এখন চল, পান ভোজন করি ও আনন্দে মত্ত হই—আমরাই সেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই।'অসুরের স্বভাব অজ্ঞানমেঘে আবৃত ছিল, সুতরাং সে আর এ-বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। নিজেকে আত্মা বা ঈশ্বর ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইল; 'আত্মা' বলিতে সে দেহই বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, 'আমি' অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখ, সুন্দর বসনভূষণে সাজাও, সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ কর। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাঁহার প্রতীতি হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ এরূপ নয়, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, আপনার শিক্ষার তাৎপর্য কি এই যে, শরীরই আত্মা?—কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? দেখিতেছি, শরীরমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আত্মা তো মরিতে পারে না।' আচার্য বলিলেন, 'তুমি নিজে ইহার অর্থ উপলব্ধি কর; তুমিই সেই আত্মা।' তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন?' গুরু বলিলেন, 'স্বয়ং ইহার অর্থ নির্ণয় কর, তুমিই সেই।' সেই দেবতা ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তবে মনই 'আত্মা' হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখনও সাধুবৃত্তি আবার কখনও বা অসদ্‌বৃত্তি উঠিতেছে; মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমার তো মনে হয় না—মনই আত্মা; আপনি কি ইহাই উপদেশ দিয়াছেন?' গুরু বলিলেন, 'না, তুমিই তাহা। তুমি নিজে উহা খুঁজিয়া বাহির কর।' দেবতা ফিরিয়া গেলেন; অবশেষে তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইল: 'আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা; আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না; আমি অনাদি, অনন্ত, অচল, অস্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পুরুষ। আত্মা শরীর বা মন নয়; আত্মা এ সকলেরই অতীত।' এইরূপে সেই দেবতার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু অসুর-বেচারার সত্যলাভ হইল না কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল।

এই জগতে অনেক অসুরপ্রকৃতির লোক আছে; কিন্তু দেবতা যে একেবারেই নাই, তাহাও নয়। যদি কেহ বলে, 'এস, তোমাদিগকে এমন এক বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয়সুখ অনন্তগুণে বর্ধিত হইবে, তাহা হইলে অগণিত লোক তাহার নিকট ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ বলেন, 'এস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয় শিখাইব', তবে তাঁহার শ্রোতাই জুটিবে না। উচ্চ তত্ত্ব শুধু ধারণা করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; সত্যলাভ করিবার জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা তো আরও বিরল। কিন্তু সংসারে আবার এমন কিছু লোক আছেন, যাঁহারা জানেন, শরীর হাজার বৎসর বাঁচাইয়া রাখা গেলেও চরমে সেই একই গতি। যে-সকল শক্তিতে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, সেগুলি অপসৃত হইলে দেহ থাকিবে না। এক মুহূর্তের জন্যও শরীরের পরিবর্তন নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। 'শরীর' আর কি? উহা কতকগুলি পরিবর্তনের পরম্পরা মাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। 'যেমন তোমার সম্মুখে নদীর জলরাশি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিন্তু দেখিতে ঠিক পূর্বের মতই। এই শরীরও সেইরূপ।' তথাপি শরীর

সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক, কারণ শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শরীরই আমাদের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমন কি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই। দেবতাদিগকেও আবার নামিয়া আসিতে হয় এবং মানবদেহের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ-বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসলমানদিগের মতে—দেবদূত ও অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তারপর দেবদূতদের ডাকিয়া মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; ইব্লিশ ব্যতীত সকলেই প্রণাম করিয়াছিলেন, এই জন্য ঈশ্বর ইব্লিশকে অভিশাপ দিলেন; সে 'শয়তান'-এ পরিণত হইল। এই রূপকের আবরণে একটি মহৎ সত্য লুকাইয়া আছে, জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। পশ্বাদি নিম্নতর সৃষ্টি তমঃপ্রধান। পশুরা কোন উচ্চ তত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। দেবতারাও মনুষ্যজন্ম না লইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। এইরূপে মনুষ্যসমাজেও আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নয়, আবার একেবারে নিঃস্ব হইলেও উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই স্তরেই বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাক। আমাদিগকে এবার 'প্রাণায়াম' বা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দেখা যাক, মনের শক্তিগুলি একাগ্র করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? শ্বাসপ্রশ্বাস যেন এই দেহ-যন্ত্রের গতি-নিয়ামক মূল-চক্র (fly-wheel)। একটি বড় এঞ্জিনে দেখিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে সেই এঞ্জিনের অতি সূক্ষ্মতম যন্ত্রগুলি পর্যন্ত গতিশীল হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস সেই গতিনিয়ামক মূল-চক্র, উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন প্রকার শক্তি আবশ্যক, তাহা যোগাইতেছে এবং শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে।

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে সে রাজার অপ্রিয় পাত্র হওয়ায় রাজা তাঁহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের চূড়ায় একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল; মন্ত্রীও সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রতা ভার্যা ছিলেন, রজনীযোগে তিনি সেই দুর্গের সমীপে আসিয়া দুর্গশীর্ষস্থিত পতিকে বলিলেন, 'আমি কি উপায়ে আপনার সাহায্য করিতে পারি, বলিয়া দিন।' মন্ত্রী বলিলেন, 'আগামী কাল রাত্রে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, এক বাণ্ডিল সুতা, খানিকটা সূক্ষ্ম রেশমের সুতা, একটা গুবরে পোকা ও খানিকটা মধু আনিও।' তাঁহার সহধর্মিণী পতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক তিনি পতির আজ্ঞানুসারে প্রার্থিত দ্রব্যগুলি আনিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে রেশমের সূত্রটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহার শুঁড়ে একবিন্দু মধু মাখাইয়া, মাথাটি উপরের দিকে রাখিয়া উহাকে দুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় নির্দেশ পালন করিলেন। তখন সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর আঘ্রাণ পাইয়া মধুলাভের আশায় সে ধীরে ধীরে দুর্গের শীর্ষদেশে উপনীত হইল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন, সেই সঙ্গে রেশমের সুতাটিও ধরিলেন, তারপর তাঁহার স্ত্রীকে রেশম-সূত্রের অপর প্রান্তে শক্ত সুতাটি জুড়িয়া দিতে বলিলেন। পরে শক্ত সুতা হস্তগত হইলে ঐ উপায়ে তিনি দড়ি ও অবশেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন। বাকী কাজ সহজ। ঐ রজ্জুর সাহায্যে মন্ত্রী দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রেশম-সূত্রের মত। উহাকে ধারণ বা সংযম করিতে পারিলেই স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ-রূপ (nervous currents) শক্ত সুতা, তারপর মনোবৃত্তিরূপ শক্ত দড়ি, পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পারা যায়। প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

আমরা নিজেদের শরীর-সম্বন্ধে কিছুই জানি না; কিছু জানিতে পারিও না। আমাদের সাধ্য এই পর্যন্ত যে, মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে, আমরা দেখিতে পারি; কেহ আবার জীবিত প্রাণী লইয়া তাহার দেহব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ নিজ শরীরের কোন সংস্রব নাই। আমরা নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। জানি না কেন? ইহার কারণ আমাদের মন এত সূক্ষ্ম নয় যে, আমাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে-সব গতি রহিয়াছে, সেগুলি আমরা ধরিতে পারি। মন যখন আরও সূক্ষ্ম হইয়া যেন দেহের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখনই আমরা ঐ গতিগুলি জানিতে পারি। এইরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমগ্র শরীরযন্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহা প্রাণ; শ্বাসপ্রশ্বাসই ঐ প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এখন শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব; জানিতে পারিব যে, স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলি কিভাবে শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আর যখনই আমরা ঐগুলি মনে মনে অনুভব করিতে পারিব, তখনই ঐগুলি এবং সেই সঙ্গে শরীরযন্ত্র আমাদের আয়ত্তে আসিতে থাকিবে। মনও এই-সকল স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, শেষ পর্যন্ত শরীর ও মন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে; উভয়েই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া যায়। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করিতে হইবে। সুতরাং শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ সর্বদা চলিতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং আমাদিগকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থৎ 'প্রাণায়াম' বা প্রাণের সংযম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এই 'প্রাণায়াম' একটি দীর্ঘ বিষয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা প্রয়োজন। আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচনা করিব।

আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যে-সকল ক্রিয়া করা হয়, সেগুলির হেতু কি, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় দেহের মধ্যে কি কি শক্তির প্রবাহ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ এ-সব আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহাতে নিরন্তর অভ্যাসের সাধন আবশ্যক। সাধন দ্বারাই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আমি এ-বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, এগুলি তোমাদের দ্বারা গৃহীত হইবে না, যতদিন না নিজেরা প্রত্যক্ষ করিবে। যে মুহূর্তে সারা দেহে এই-সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর অভ্যাস আবশ্যক। প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার অভ্যাস করিবে; আর ঐ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ন। যখন রজনীর অবসান হইয়া দিবার প্রকাশ হয়, এবং

দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রত্যূষ ও গোধূলি, এই দুইটি প্রকৃতির শান্ত মুহূর্ত। এই দুই সময়ে শরীরও স্বভাবতঃ শান্ত হইতে চায়। এই দুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকটা সহায়তা করিবে, সুতরাং এই দুই সময়েই সাধন করা উচিত। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আলস্য দূর করিয়া দিবে। স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার করিবে না, ভারতবর্ষে বালকদের এইরূপ শিক্ষাই দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহাদের যতক্ষণ না স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ বালক ক্ষুধার্ত হয় না।

তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, সাধনের জন্য তাহারা একটি স্বতন্ত্র ঘর রাখিতে পার তো ভাল হয়। এই ঘর শয়নের জন্য ব্যবহার করিও না, ইহা পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিও না। এ-ঘরে সর্বদা পুষ্প রাখিবে; যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। সুন্দর চিত্রও রাখিতে পার। প্রাতে ও সায়াহ্নে সেখানে ধূপ-ধুনা প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ বা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। ইহাই ছিল মন্দির গীর্জা প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এখনও অনেক মন্দির ও গীর্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তা সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে।

যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহারা যেখানে ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। সর্বপ্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দাও। মনে মনে বল; 'জগতে সকলেই সুখী হউক; সকলেই শান্তি লাভ করুক; সকলই আনন্দ লাভ করুক।'[৮] এইরূপে পূর্বে, উত্তরে, দক্ষিণে পবিত্র চিন্তা প্রবাহিত কর। যতই এইরূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভাল বোধ করিবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপরে সুস্থ থাকুক, এই ভাবনাই স্বাস্থ্য-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউক—এইরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায়। তারপর যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন—অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নয়, জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা করিবেন। ইহা ব্যতীত আর সব প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তারপর ভাবিতে হইবে—আমার দেহ দৃঢ়, সবল ও সুস্থ। এই দেহই আমার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, শ্রেষ্ঠ সহায়। চিন্তা করিবে—ইহা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। চিন্তা কর, এই শরীরের সাহায্যে এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। দুর্বল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। শরীরকে বল—তুমি বলিষ্ঠ। মনকে বল—তুমি শক্তিধর; এবং নিজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরসা রাখ।

প্রাণ

অনেকে মনে করেন, প্রাণায়াম শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন ব্যাপার, বাস্তবিক তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি অল্পই। প্রকৃত প্রাণায়াম-সাধন করিতে হইলে অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সেগুলির একটি। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমগ্র জগৎ দুইটি উপাদানে নির্মিত। তাহাদের মধ্যে একটির নাম 'আকাশ'। এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত সত্তা। যে-কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য, পৃথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীর শরীর—পশুশরীর, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যে-সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল বস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে-কোন বস্তু আছে, সে-সকলই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন আকার ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে। আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থ—সবকিছুই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এইপ্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী উপাদান, প্রাণও সেইরূপ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী প্রকাশিকা শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সব বস্তুই আকাশে পরিণত হয়, জগতের সব শক্তিই আবার প্রাণে লয় পায়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সব শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়ু-শক্তিপ্রবাহরূপে (nerve current), চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সবকিছুই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাদের সমষ্টিকেই 'প্রাণ' বলে। যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?[৯] এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের গতি রুদ্ধ ছিল, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, ঐ শক্তিগুলি কল্পান্তে শান্ত ভাব ধারণ করে—অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর আঘাত করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে বিবিধ রূপ বিকশিত হয়; আর আকাশ পরিণামপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই প্রাণেও নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা এবং উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের নিকট অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং উহাকে জয় করিতেও সক্ষম হইলেন, তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য-নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য পর্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ শক্তিলাভ করা প্রাণায়াম-সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; মৃতব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সব শক্তিই ক্রীতদাসের মত তাঁহার আদেশ পালন করে। অজ্ঞলোকেরা যোগীর এই-সকল কার্যকলাপ দেখিয়া বলে, এগুলি অলৌকিক। হিন্দুমনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যে-কোন তত্ত্ব আলোচনা করুক না কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি রাখিয়া দেয় পরে মীমাংসার জন্য। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,'এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সবকিছু জানা যায়?'[১০] এইরূপে আমাদের সব শাস্ত্র, সব দর্শন—যে-বস্তুকে জানিলে সবকিছু জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কেহ জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চায়, তাহা হইলে তো অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে এক এক কণা বালুকাকে পর্যন্ত পৃথক্ ভাবে জানিতে হইবে। তথাপি সে সবকিছু জানিতে পারে না। তবে কিভাবে জ্ঞানলাভ সম্ভব? এক-একটি বিষয় পৃথক পৃথক জানিয়া মানুষের সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ ভাব রহিয়াছে। উহাকে ধরিতে পারিলেই সবকিছু আয়ত্ত করা যায়। এইভাবেই বেদে সমগ্র জগৎকে এক পূর্ণ সত্তায় পর্যবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'সৎ' স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমগ্র জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। এইভাবেই সমুদয় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সাধারণ শক্তিতে পর্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি 'প্রাণ'কে ধরিয়াছেন, তিনি জগতে যতকিছু মানসিক বা দৈহিক শক্তি আছে, সবকিছুকেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সবই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির মূল।

কিভাবে এই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধকই—যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই সাধন আরম্ভ করিবে, তাহার খুব নিকটে যাহা কিছু আছে, সবই জয় করিতে শিক্ষা করা উচিত। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত, আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রিয়া করিতেছে, তাহার যে অংশ এই শরীর ও মন চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত। যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ জয় করিতে পারিলে আমরা সমগ্র প্রাণসমুদ্র জয় করিবার

আশা করিতে পারি। যে যোগী এ-বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ হন। আমরা প্রত্যেক দেশেই এরূপ কিছু কিছু সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দেশেই (আমেরিকায়) আমরা মনঃ-শক্তি দ্বারা আরোগ্যকারী (mind-healer), বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্যকারী (faith-healer), প্রেত-তত্ত্ববিৎ (spiritualist), ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্টিস্ট (christian scientist), সম্মোহন-বিদ্যাবিৎ (hypnotist) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, এগুলির মূলে রহিয়াছে প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ—তাহারা এ-কথা জানুক বা নাই জানুক। তাহাদের সব মতের মূলে একই জিনিষ রহিয়াছে। তাহারা সকলে একই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, তবে অজ্ঞাতসারে—এইমাত্র। তাহারা হঠাৎ যেন একটি শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞাতসারেই উহা ব্যবহার করিতেছে। যোগী ঐ শক্তিরই পরিচালনা করেন। উহা প্রাণেরই শক্তি।

এই প্রাণই সকল প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে রহিয়াছে। চিন্তাই প্রাণের সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া; চিন্তার যতটুকু আমরা দেখিয়া থাকি, সেইটুকু উহার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-শূন্য চিন্তাও আছে, তাহা আমাদের নিম্নতম কার্যক্ষেত্র। একটি মশক দংশন করিলে আমার হাত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহাকে আঘাত করিবে। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমার বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ইহা চিন্তারই এক প্রকার অভিব্যক্তি। শরীরে জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়া-মাত্রেই (reflex action)[১১] চিন্তার এই স্তরের অন্তর্গত। চিন্তার আর একটি স্তর আছে, উহাকে সজ্ঞান (conscious) বলা যাইতে পারে। আমি যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, কতকগুলি বিষয়ের দুইদিক আলোচনা করি, কিন্তু ইহাই শেষ নয়; আমরা জানি, যুক্তিবিচার সীমাবদ্ধ। যুক্তি আমাদিগকে কিছুদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তারপর আর পারে না। যে স্থানটুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই, নানাবিধ বিষয় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতুর মত কতকগুলি বিষয় কখনও কখনও ভিতরে আসিয়া পড়ে। ইহাও নিশ্চিত যে, অনেক তত্ত্ব ঐ সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ঐ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, সেগুলির কারণ অবশ্য ঐ সীমার বাহিরে অবস্থিত; আমাদের বিচারযুক্তি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু যোগীরা বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা, তাহা কখনই হইতে পারে না। মন আরও উচ্চতর ভূমিতে—জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। যখন মন সমাধি-নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন উহা যুক্তির সীমার বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তিগুলি প্রাণেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি; ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ঐগুলি মনকে প্রেরণা দেয় এবং উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত ভূমিতে লইয়া যায়, এবং মন সেখান হইতে কার্য করিতে থাকে।

বিশ্বে অস্তিত্বের প্রত্যেক স্তরেই এক অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে। প্রাকৃতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই বিশ্বজগৎ এক ও অখণ্ড। তোমার সহিত সূর্যের কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ একটি কল্পনা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে যথার্থ কোন ভেদ নাই। টেবিলটি অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দু, আর আমি উহার অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের এক-একটি আবর্ত। আবর্তগুলি আবার একটিও স্থির থাকে না। কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতিটি আবর্তে প্রতি মুহূর্তেই নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং নূতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎও এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাশি-মাত্র, যাবতীয় বস্তু উহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তস্বরূপ। কিছু জড়রাশি একটি আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল—ধর মানবদেহে—কিছুদিন ঐ আবর্তে ঘুরিয়া, পরিবর্তিত হইয়া, বাহির হইয়া আর একটি আবর্তে প্রবেশ করিল—এবার হয়তো কোন জন্তুর দেহে, কয়েক বৎসর পরে খনিজ পদার্থ-নামে আর একপ্রকার আবর্তে প্রবেশ করিল। ক্রমাগত পরিবর্তন! কোন কিছুই স্থির নয়। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক বিরাট জড়রাশির একটি বিন্দুর নাম চন্দ্র, আর একটি বিন্দুকে বলা হয় সূর্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ্, অপর কোন বিন্দু হয়তো একটি খনিজ পদার্থ। ইহাদের একটিও সর্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্লেষণ, আবার বিশ্লেষণ, চলিতেছে। মন বা অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তুই 'ইথার' হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তুর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই 'ইথার'কেই মনেরও প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। তথাপি 'ইথার' এক অখণ্ড জড়বস্তুরূপেই থাকিবে। যদি সেই সূক্ষ্ম স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পার, তবে অনুভব করিবে—সমগ্র জগৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দনে সংগঠিত। কখনও কখনও কোন ঔষধের শক্তিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে থাকিয়াও ঐরূপ অবস্থায় নীত হই। তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যার হাম্ফ্রি ডেভি-র (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাষ্প (laughing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের জন্য স্থূলকম্পনগুলি (gross vibration) যেন থামিয়া গিয়াছিল, কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনগুলি—যেগুলিকে তিনি 'ভাবরাশি' বলিয়া অভিহিত করেন শুধু সেইগুলিই তাঁহার অনুভূতিতে বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল সূক্ষ্ম কল্পনাগুলি দেখিতে পাইতেন। সবকিছু চিন্তারূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট সব যেন এক মহা ভাবসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক-একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত।

এইরূপে আমরা চিন্তাজগতেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম, অবশেষে যখন আমরা সেই আত্মাকে লাভ করি, তখন অনুভব করি—সেই আত্মাই এই অখণ্ড 'এক'। সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ের স্পন্দনের অতীত—গতির ঊর্ধ্বে সেই এক অখণ্ড সত্তা বিরাজ করিতেছেন। এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান গতিসমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান। এ-সকল তথ্য এখন আর অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, এই বিশ্বে শক্তিসমষ্টি সর্বত্র সমান। আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি দুই ভাবে অবস্থান করে—কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত, পরে ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই-

সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে, আবার শান্ত অব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, আবার ব্যক্ত হয়। এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখনও বিকশিত, কখনও বা সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই শক্তিরূপী প্রাণের নিয়ন্ত্রণের নামই প্রাণায়াম।

ফুসফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বোঝা যায়। ফুসফুসের গতি বন্ধ হইলে দেহের সকল ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেন যে, তাঁহাদের ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হইয়া গেলেও শরীর জীবিত থাকে।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শ্বাসপ্রশ্বাস না লইয়া কয়েক মাস মাটির নীচে নিজেকে চাপা দিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থূলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম শক্তি লাভ করিতে করিতে শেষে আমরা চরম লক্ষ্যে উপনীত হই। যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। উহা যেন যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্ররূপে অপর শক্তিগুলি চালাইতেছে। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ—ফুসফুসের এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা; এই গতির সহিত শ্বাসযন্ত্রও জড়িত। শ্বাসপ্রশ্বাস যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই গতিই শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে। এই বেগই পাম্পের মত বায়ুকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই ফুসফুসকে চালিত করিতেছে। এই ফুসফুসের গতি বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রাণায়াম শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুসফুসকে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি স্নায়ু-মণ্ডলীর ভিতর দিয়া মাংশপেশীতে যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুসফুসকে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়াম-সাধনে এই প্রাণকেই বশে আনিতে হইবে। যখনই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব—শরীরের মধ্যে প্রাণের অন্যান্য সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তে আসিয়াছে। আমি নিজেই এমন সব লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাদের শরীরের পেশীগুলি বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ ইচ্ছামত সেগুলি চালনা করিতে পারেন। কেনই বা না পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমার ইচ্ছা অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে প্রত্যেকটি পেশী ও স্নায়ু আমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব না কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই নিয়ন্ত্রণ শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর ঐ পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি যে পশুরা ঐরূপ করিতে পারে। এই শক্তি চালনা করি না বলিয়াই আমাদের এ শক্তি নাই। ইহাকেই পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব (atavism) বলা হয়।

আর ইহাও আমরা জানি, যে শক্তি এখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনা যায়। খুব দৃঢ় পরিশ্রম ও অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেক সুপ্ত শক্তিকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী করা যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, বরং খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহা করিয়া থাকেন। তোমরা হয়তো যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমগ্র শরীর 'প্রাণ'-এর দ্বারা পূর্ণ কর। ইংরেজী অনুবাদ প্রাণ-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শ্বাস। ইহাতে তোমরা সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পার, 'শ্বাসের দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে?' ইহা অনুবাদকেরই দোষ। শরীরের প্রত্যেকটি অংশই প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনীশক্তি দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে; আর যখনই তুমি এরূপ করিতে পারিবে, তখনই সমগ্র শরীর তোমার বশে আসিবে। দেহে অনুভূত সকল ব্যাধি, সকল দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আসিবে। শুধু তাই নয়, তুমি অপরের শরীরও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। পৃথিবীতে ভাল মন্দ সবই সংক্রামক। তোমার শরীরে যদি কোন এক বিশেষ ভাবের উত্তেজনা থাকে, অপরের ভিতরও সেই ভাবের প্রবণতা দেখা দিবে। তুমি সবল ও সুস্থ হও, তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও সুস্থ ও সবল ভাব আসিবে। তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, তবে দেখিবে তোমার নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ যেন একটু রুগ্ন ও দুর্বল হইতেছে। তোমার সুস্থ শরীরের স্পন্দন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। যখন একজন অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন প্রথমে তাহার ভাবটি এইরূপ হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিব। ইহা এক প্রকার আদিম চিকিৎসা-প্রণালী। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একজন আর একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্ ব্যক্তি যদি কোন দুর্বল লোকের সঙ্গে সর্বদা বাস করে, তাহা হইলে সেই দুর্বল ব্যক্তি জানুক বা না জানুক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। যখন এই প্রক্রিয়া জ্ঞাতসারে করা হয়, তখন ইহার ফল অপেক্ষাকৃত ত্বরান্বিত ও ভাল হইয়া থাকে। আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে স্বয়ং খুব সুস্থকায় না হইলেও একজন অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ আরোগ্যকারীর প্রাণের উপর প্রভুত্ব কিছুটা বেশী। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রাণ উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট অবস্থায় উন্নীত করিয়া অপরের শরীরে ঐ স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারেন।

অনেকস্থলে প্রক্রিয়াটি দূর হইতেও সংসাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ (break) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই। এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ—কিছুমাত্র যোগ নাই? সূর্য ও তোমার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে—তুমি তাহার এক অংশ, সূর্য তাহার এক অংশ। নদীর এক অংশ ও অপর অংশের মধ্যে কি ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তাহা হইলে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে তো কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। দূর হইতে রোগ আরোগ্য করার ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। এই প্রাণকে বহুদূরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ-বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি। লোকে এই আরোগ্য-প্রণালীকে যত সহজ ভাবে—তত সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার সুযোগ লইতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া সব লোকই মারা পড়ে। এমন কি, বিসূচিকা-মহামারিতেও যদি কিছুদিন শতকরা ৬০ জন মরে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার কমিয়া শতকরা ৩০ হয়, পরে ২০ তে দাঁড়ায়, অবশিষ্ট সকলে রোগমুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিলেন, তাঁহার ঔষধ দিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার ঔষধ দিলেন,

হয়তো এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিলেন, কারণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর শরীরে কোন গোলযোগ না বাধাইয়া প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কাজ করিতে দেন। বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও রোগী আরোগ্য করিবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্বাসবলে রোগীর সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া দেন।

কিন্তু বিশ্বাসবলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি ভুল হইয়া থাকে—তাঁহারা মনে করেন, সাক্ষাৎভাবে বিশ্বাসই মানুষকে রোগমুক্ত করে। বাস্তবিকপক্ষে কেবল বিশ্বাসই যে একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না। এমন সব রোগ আছে, যেগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ লক্ষণ এই—রোগী নিজে আদৌ মনে করে না যে, তাহার সেই রোগ হইয়াছে। রোগীর নিজের রোগহীনতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, সচরাচর ইহা আশু মৃত্যুরই সূচনা করে। এ-সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয়—এ তত্ত্ব খাটে না। যদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত, তাহা হইলে এই-সকল রোগীও আরোগ্য লাভ করিত; প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। যে পবিত্রাত্মা পুরুষ নিজ প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়া গিয়া অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে পারেন। প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পার। আমি বক্তৃতা দিতেছি, বক্তৃতা দিবার সময় কি করিতেছি? আমি আমার মনকে একপ্রকার কম্পনের অবস্থায় আনিতেছি; এবং এই-বিষয়ে আমি যতই কৃতকার্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্য দ্বারা প্রভাবিত হইবে। তোমরা সকলেই জানো, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাতিয়া উঠি, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের বেশী ভাল লাগে, আর আমার উৎসাহ অল্প হইলে আমার বক্তৃতা শুনিতে তোমাদেরও তত ভাল লাগে না।

জগৎ-আলোড়নকারী তীব্র-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রাণ এক অতি উচ্চ কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারেন; প্রাণ এত অধিক শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহা অন্যকে মুহূর্তমধ্যে স্পর্শ করে, সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের অর্ধেক লোক তাঁহাদের ভাবানুসারে ভাবিত হইয়া থাকে। জগতের মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাণ জয় করিয়াছিলেন। এই প্রাণসংযমের ফলে তাঁহারা প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণকে উচ্চতম কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিয়াই তাঁহারা জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি লাভ করেন। জগতে যতপ্রকার শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই প্রাণের সংযম হইতে উৎপন্ন। মানুষ ইহার গোপন তথ্য না জানিতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তোমার শরীরে এই প্রাণশক্তির সরবরাহ কখনও এক দিকে বেশী, অন্য দিকে কম পড়িয়া যায়—সাম্য নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণের অসামঞ্জস্যেই রোগের উৎপত্তি। অতিরিক্ত প্রাণটুকু সরাইয়া যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে, সেখানকার অভাব পূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, কোথায় বা অল্প প্রাণশক্তি আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ। অনুভবশক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে—পায়ের আঙুলে বা হাতের আঙুলে যতটুকু প্রাণ আবশ্যক তাহা নাই এবং ঐ প্রাণের অভাব পূরণ করিবার শক্তিও মনের থাকিবে। প্রাণায়ামের এইরূপ নানা অঙ্গ আছে। ঐগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণকে সংযত করা এবং চালনা করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য। যখন কেহ নিজের সব শক্তিকে সংহত করিয়াছে, তখন সে নিজ দেহস্থ প্রাণকেই আয়ত্ত করিয়াছে। যখন কেহ ধ্যান করে, সে প্রাণকেই সংযত করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

মহাসমুদ্রে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ, আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গসমূহ, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদও রহিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের পশ্চাতে এক অনন্ত মহাসমুদ্র; ঐ ক্ষুদ্র বুদ্বুদটি একদিকে অনন্ত সমুদ্রের সহিত, আবার অন্যদিকে সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এইরূপে সংসারে কেহ বা মহাপুরুষ কেহ বা ক্ষুদ্র জল-বুদ্বুদতুল্য সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাশক্তি-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এই মহাশক্তিতে জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। যেখানেই জীবনীশক্তির প্রকাশ, সেখানেই পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক (fungus)—হয়তো এত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা উহা দেখিতে হয়—তাহা হইতে আরম্ভ কর, দেখিবে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ শক্তি সংগ্রহ করিয়া সেটি আর এক আকার ধারণ করিতেছে। কালে উহা উদ্ভিদ্‌রূপে পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধারণ করিল, পরে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরে পরিণত হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু এই সময়ই বা কি? সাধনার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়া দিলে সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে। যোগীরা বলেন, যে কার্য করিতে সাধারণভাবে অধিক সময় লাগে, কার্যের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে। মানুষ এই বিশ্বের অনন্ত শক্তিরাশি হইতে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে। এভাবে চলিলে একজনের দেবত্ব লাভ করিতে হয়তো লক্ষ বৎসর লাগিবে। আরও উচ্চাবস্থা লাভ করিতে হয়তো পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিবে। আবার পূর্ণ বা সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিবে। উন্নতির বেগ বাড়াইলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে। যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাসে অথবা ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? যুক্তি দ্বারা ইহা বুঝা যায়। কোন বাষ্পীয়যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা দিলে প্রতি ঘণ্টায় দুই মাইল করিয়া যাইতে পারে; আরও অধিক কয়লা দিলে আরও শীঘ্র যাইবে। এইরূপে তীব্রসংবেগসম্পন্ন[১২] হইলে জীবাত্মা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে কেন? সকলই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই ক্ষণেই, এই শরীরেই—এই মনুষ্যদেহেই মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ হইবে? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনই লাভ করিব না কেন?

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল মানুষ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, একটু একটু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়, যোগীরা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। জগতের সকল মহাপুরুষ—সাধু ও সিদ্ধপুরুষ কি করিয়াছেন? এক জীবনেই তাঁহারা মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করেন, সাধারণ মানুষের পূর্ণত্ব লাভ করিতে যে দীর্ঘকাল লাগে, সেই কাল তাঁহারা এই জীবনেই অতিক্রম করেন। এক জন্মেই তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আর কিছুই চিন্তা করেন না, অন্য কোন ভাবের জন্য একমুহূর্ত সময় কাটান না।এইরূপেই তাঁহাদের সময়

সংক্ষিপ্ত হয়। একাগ্রতা বলিতে বুঝায়—শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতাবৃদ্ধি; এইভাবেই সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়। রাজযোগ-বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেয়—কিভাবে এই একাগ্রতা-শক্তি করা যায়।

প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্ত্বের সম্বন্ধ কি? প্রেততত্ত্ব প্রাণায়ামেরই এক প্রকার শক্তি বিকাশ। যদি ইহা সত্য হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব আছে, আমরা শুধু উহাদিগকে দেখিতে পাই না, তাহা হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে, এখানেই হয়তো শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না। আমরা হয়তো সর্বদাই তাহাদের শরীরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছি। আর ইহাও খুবই সম্ভব যে, তাহারাও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। ইহা—একটি বৃত্তের ভিতর আর একটি বৃত্ত, একটি জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। যাহারা এক ভূমিতে (plane) থাকে, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পায়। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণী, আমাদের প্রাণের স্পন্দন এক বিশেষ স্তরের। তাহাদের প্রাণের স্পন্দন একই প্রকারের, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি এমন কোন প্রাণী থাকে যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্পন্দনশীল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব না। আলোকের তীব্রতা অতিশয় বর্ধিত হইলে আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষু এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, তাহারা ঐরূপ আলোকও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের স্পন্দন অতি মৃদু হয়, তখনও উহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু পেচক বিড়ালাদি জন্তুগণ উহা দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টির সীমা এই প্রাণস্পন্দনের একটি স্তরেই অবস্থিত। অথবা বায়ুরাশির কথা ধর; বায়ু স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর, তাহা উপরের স্তর অপেক্ষা অধিক ঘন; আরও ঊর্ধ্বদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বায়ু ক্রমশঃ পাতলা হইতেছে। অথবা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লও; সমুদ্রের যতই গভীর হইতে গভীরতর স্তরে যাইবে, জলের চাপ ততই বাড়িতে থাকিবে। যে-সকল জন্তু সমুদ্রতলে বাস করে, তাহারা কখনই উপরে আসিতে পারে না, কারণ আসিলেই খণ্ডখণ্ডরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

সমগ্র জগৎকে 'ইথার'-এর একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। প্রাণের শক্তিতে যেন উহা স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন গ্রামে স্পন্দিত হইয়া উহা যেন স্তরে অবস্থিত। যে কেন্দ্র হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই সেই স্পন্দন মৃদুভাবে অনুভূত হয়। কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। এক-এক প্রকারের স্পন্দনে এক-একটি স্তর। তারপর মনে কর, এই-সকল স্পন্দনের স্তর বিভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত হইল—লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি স্তর, আবার লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত আর একটি উচ্চতর স্পন্দনের স্তর এইরূপ চলিতে থাকিবে। এইভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি যেমন আমরা অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির সীমা বাড়াইতে পারি, সেইরূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনবিশিষ্ট করিয়া অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ সেখানে কি হইতেছে, জানিতে পারি। মনে কর, এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহাদের আমরা দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দনের ও আমরা আর এক প্রকার স্পন্দনের ফলস্বরূপ। মনে কর, তাহারা অধিক স্পন্দনবিশিষ্ট ও আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনশীল। তাহারা প্রাণ-রূপ মূলবস্তু হইতে গঠিত, আমরাও তাই। সকলেই এক প্রাণ-সমুদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, তবে বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের বেগে। যদি মনকে দ্রুত স্পন্দনবিশিষ্ট করিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তর পরিবর্তিত হইবে, আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না, তোমরা আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে ও অপরে আবির্ভূত হইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানো যে, এই ব্যাপার সত্য। মনকে উচ্চতর স্পন্দনের স্তরে উন্নীত করাকেই যোগশাস্ত্রে এক কথায় 'সমাধি' বলা হয়। এ-সকল উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থাকে, মনের অতিচেতন স্পন্দনকে 'সমাধি' নামক একটি শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; সমাধির নিম্নতর অবস্থাতেই ঐ-সব প্রেতাত্মা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমরা সত্যস্বরূপকে দর্শন করি, তখন আমরা দেখিতে পাই, কি উপাদানে এই সব নানা স্তরের জীব গঠিত। 'একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে জগতের সকল মৃত্তিকাই জানা হইয়া যায়।'

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ত্ববিদ্যায় যেটুকু সত্য আছে, তাহাও এই প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ যখনই দেখিবে, কোন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যবিদ্যা বা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে—তাহারা প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাণে এই রাজযোগই সাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই কোনরূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই দেখিবে—এই প্রাণের অভিব্যক্তি। জড়বিজ্ঞানগুলিও প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বাষ্পীয় যন্ত্রকে কে চালিত করে? প্রাণই বাষ্পের মধ্য দিয়া উহাকে চালাইয়া থাকে। তড়িৎ প্রভৃতির যে অত্যদ্ভুত ক্রিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণশক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পদার্থ-বিজ্ঞানই বা কি? উহা বাহ্য উপায়ে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম-বিজ্ঞান। প্রাণ যখন মনঃশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মানসিক উপায়েই উহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। প্রাণায়াম-বিজ্ঞানের যে অংশে প্রাণের স্থূল প্রকাশগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর প্রাণায়ামের যে অংশে মনঃশক্তিরূপ প্রাণের বিকাশগুলিকে মানসিক উপায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহাকেই 'রাজযোগ' বলে।

প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ

যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও ‘সুষুম্না’ নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নিম্নপ্রান্তে ‘কুণ্ডলিনী পদ্ম’ অবস্থিত, যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগীদের রূপক ভাষায় ঐ স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা। যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, এবং যতই তিনি এক-এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের যেন স্তরের পর স্তর খুলিয়া যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক্ হইয়া যান এবং তাঁহার আত্মা স্বীয় মুক্তভাব উপলব্ধি করে।

আমরা জানি সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, 8—এই অক্ষরটিকে যদি লম্বালম্বি ভাবে (∞) লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার দুইটি অংশ রহিয়াছে এবং ঐ দুইটি মধ্যদেশে সংযুক্ত। এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাজাইলে যেরূপ দেখায়, সুষুম্নাকাণ্ড কতকটা সেইরূপ। উহার বামভাগ ‘ইড়া’, দক্ষিণ ভাগ ‘পিঙ্গলা’ এবং যে শূন্য নালী সুষুম্না-কাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে—তাহাই ‘সুষুম্না’। কটিদেশের নিকট মেরুদণ্ডের কতকগুলি অস্থির পরেই সুষুম্নাকাণ্ড শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও একটি অতিসূক্ষ্ম তন্তু বরাবর নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সুষুম্না নালী ঐ তন্তুর মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে ঐ নালীর মুখ বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (sacral plexus) অবস্থিত। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের (physiology) মতে—উহা ত্রিকোণাকৃতি। বিভিন্ন স্নায়ুজালের কেন্দ্র সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত; ঐগুলিকেই যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যোগী কল্পনা করেন, সর্বনিম্নে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা ঐ পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত স্নায়ুজাল (plexus) বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে। আমরা জানি, আমাদের স্নায়ুমধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে; তাহাদের একটিকে অন্তর্মুখ ও অপরটিকে বহির্মুখ, একটিকে সংবেদাত্মক (sensory) ও অপরটিকে চেষ্টাত্মক (motor), একটিকে কেন্দ্রাভিগ ও অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কের অভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া যায়। ঐ স্পন্দন-প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। পরবর্তী ব্যাখ্যা সুগম ও স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের অন্যান্য কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ক-মজ্জায় একটি কন্দে (bulb) শেষ হইয়াছে; কিন্তু উহা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত নয়, মস্তিষ্কের অন্তর্গত তরল পদার্থ ভাসমান। মাথায় যদি কোন আঘাত লাগে, তবে ঐ আঘাতের শক্তি ঐ তরল পদার্থেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আরও জানিতে হইবে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্বনিম্নস্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহস্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র—এই তিনটির কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমরা সকলেই তড়িৎ ও তৎসম্পর্কে অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথা শুনিয়াছি। তড়িৎ কি, তাহা কেহই জানে না; তবে আমরা এই পর্যন্ত জানি যে, তড়িৎ একপ্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্যান্য নানাবিধ গতি আছে, তড়িতের সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল নড়িতেছে—যে পরমাণুগুলি দ্বারা উহা গঠিত, সেগুলি বিভিন্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে। যদি উহাদিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা তড়িৎশক্তির দ্বারাই সম্ভব হইবে। তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থের পরমাণুগুলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, তাহার সব পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে ঘরটি এক বিরাট বিদ্যুদাধারযন্ত্রে (battery) পরিণত হইবে।

শারীরবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। তত্ত্বটি এইঃ যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রগুলি নিয়মিত করে, স্নায়ুপ্রবাহগুলির উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে; ঐ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত, উহা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করে এবং অন্যান্য যে-সকল স্নায়ুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার আমরা প্রাণায়াম-ক্রিয়া সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা শরীরের সমুদয় পরমাণুই একদিকে গতিসম্পন্ন হইবার প্রবণতা লাভ করিবে। যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় স্নায়ুপ্রবাহও এক প্রকার তড়িৎ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়; কারণ, দেখা গিয়াছে—স্নায়ুগুলির উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাব স্নায়ুর উভয় প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন উহা তড়িতের মত কোন শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। যখন শরীরের সমুদয় গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত হয়, তখন শরীরে যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিদ্যুদাধার-স্বরূপ হইয়া পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম-ক্রিয়াটি এইরূপে শারীরবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে ছন্দের মত একপ্রকার গতি উৎপাদন করে ও শ্বাসপ্রশ্বাসকেন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য—মূলাধারে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করা।

আমরা যাহা কিছু দেখি বা কল্পনা করি অথবা যখন স্বপ্ন দেখি আকাশে অনুভব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন বা অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ অনুভব করেন,

তখন তিনি ঐগুলি আর এক প্রকার আকাশে—চিত্তাকাশে বা মানস আকাশে দেখিতে পান। আর যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শূন্য হয়, যখন আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন, তখন উহার নাম 'চিদাকাশ' বা জ্ঞানের আকাশ। যখন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া সুষুম্না-নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে-সকল বিষয় অনুভূত হয়, সেগুলি চিত্তাকাশেই হইয়া থাকে। ঐ নালীর শেষ সীমা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে চিদাকাশে এক বিষয়শূন্য জ্ঞান অনুভূত হইয়া থাকে।

এইবার তড়িৎ-শক্তির উপমা আবার লওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তড়িৎপ্রবাহ এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করিতে পারে।[১৩] কিন্তু প্রকৃতি তাহার নিজের প্রচণ্ড শক্তিপ্রবাহ প্রেরণ করিতে কোন তারের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রবাহ চালাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবশ্যকতা নাই, তবে আমরা উহা ছাড়া কাজ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের তার প্রয়োজন।

তড়িৎপ্রবাহ যেমন তারের সাহায্যে প্রেরিত হয়, ঠিক তেমনি স্নায়ুতন্তুরূপ তারের সাহায্যে শরীরের সর্ববিধ সংবেদন মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে ও মস্তিষ্ক হইতে কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিন্দ্রিয়ে প্রেরিত হইতেছে। সুষুম্না-মধ্যস্থিত জ্ঞানাত্মক ও কর্মাত্মক স্নায়ুতন্তুগুলিই যোগিগণের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। প্রধানতঃ ঐ দুইটি নাড়ীর ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ শক্তিপ্রবাহদ্বয় চলাচল করিতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে, কোন তারের সাহায্য ব্যতীত মন কেন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে না অথবা প্রতিক্রিয়া করিবে না? প্রকৃতিতে তো এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইতেছে। যোগীরা বলেন, এরূপ করিতে পারিলেই জড়ের বন্ধন অতিক্রম করা যাইতে পারে। ইহা করিবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুষুম্নার ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালাইতে পার, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। মনই এই স্নায়ুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই ঐ জাল ছিন্ন করিতে হইবে। কোনরূপ তারের সাহায্য ছাড়াই কাজ করিতে হইবে। তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্যই সুষুম্না নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন। যদি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া নাড়ীজালের সাহায্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পারি, যোগীরা বলেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। যোগীরা আরও বলেন, ইহা করিতে পারা যায়।

সাধারণ লোকের শরীরে সুষুম্না নিম্নদিকে বন্ধ; উহার দ্বারা কোন ক্রিয়াই হয় না। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্নাদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উহার মধ্য দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য হইলে স্নায়ুপ্রবাহ উহার মধ্য দিয়া চালাইতে পারা যায়। বাহ্য বিষয়স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন কেন্দ্রে উপনীত হয়, তখন ঐ কেন্দ্র হইতে এক প্রতিক্রিয়া (reaction) উপস্থিত হয়। স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রগুলিতে ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলে গতি উৎপন্ন হয়; চৈতন্যময় কেন্দ্রগুলিতে (conscious centres) কিন্তু প্রথমে অনুভব, পরে গতি উৎপন্ন হয়। সমুদয় অনুভূতিই বাহির হইতে আগত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে স্বপ্নে অনুভূতি হয় কিরূপে? তখন তো বাহিরের কোন ক্রিয়া নাই, তবে তো বিষয়াভিঘাত-জনিত স্নায়বীয় গতিগুলি শরীরের কোথাও কুণ্ডলীকৃতভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি নগর দেখিলাম; সেই নগরের বহির্বস্তুরাজির আঘাতের প্রতিঘাতেই আমার সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহির্বস্তুনিচয় দ্বারা আমার অন্তর্বাহী স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা মস্তিষ্কমধ্যস্থ পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন—অনেক দিন পরেও ঐ নগরটি মনে করিতে পারি। স্মৃতিতেও ঠিক ঐ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে, তবে মৃদুতরভাবে। কিন্তু যে ক্রিয়া মস্তিষ্কের ভিতর অনুরূপ মৃদুতর স্পন্দন তোলে, তাহাই বা কোথা হইতে আসে? উহা সেই প্রথম সংবেদন-জনিত, তাহা কখনই বলা যায় না। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ঐ সংবেদন-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরে কোথাও কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং উহাদের অভিঘাতের ফলে স্বপ্নকালীন অনুভূতিরূপ মৃদু প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়।

যে কেন্দ্রে সংবেদনগুলির অবশিষ্টাংশ বা সংস্কারসমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, তাহাকে 'মূলাধার' বলে, আর ঐ কুণ্ডলীকৃত ক্রিয়াশক্তিকে 'কুণ্ডলিনী' বলে। সম্ভবতঃ চেষ্টাশক্তির অবশিষ্টাংশও এই স্থানেই কুণ্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে; কারণ, বাহ্যবস্তুর দীর্ঘকাল চিন্তা ও গভীর অধ্যয়নের পর শরীরের যে স্থানে ঐ মূলাধার চক্র (সম্ভবতঃ ত্রিকাস্থি-স্নায়ুজাল = Sacral Plexus) অবস্থিত, তাহা উষ্ণ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া ক্রিয়াশীল করা যায়, তারপর জ্ঞাতসারে সুষুম্না-নালীর ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া যায়, তবে উহা যেমন যেমন এক কেন্দ্রের পর আর এক কেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইবে। যখন কুণ্ডলিনী-শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু যখন ঐ দীর্ঘকালসঞ্চিত বিপুল শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে সুষুম্নামার্গ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন বা কল্পনাকালীন প্রতিক্রিয়া হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, জাগ্রৎকালীন বিষয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হইতেও অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর এই অবস্থায় মন জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে বলা যায়। আবার যখন উহা সমুদয় জ্ঞানের—সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদয় মস্তিষ্ক ও উহার অনুভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে; ইহার ফল জ্ঞানলোকের পূর্ণ প্রকাশ বা আত্মানুভূতি। কুণ্ডলিনী-শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যায়, অমনি যেন মনের এক-একটি স্তর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং তখন যোগী এই জগতের সূক্ষ্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকেন। তখনই সংবেদন ও উহার প্রতিক্রিয়ারূপে জগতের কারণসমূহের যথার্থ জ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের সর্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হইবে। কারণটি জানিতে পারিলেই কার্যের জ্ঞান নিশ্চয়ই আসিবে।

এইরূপে দেখা গেল যে, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করাই দিব্যজ্ঞান—জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভের একমাত্র উপায়।

কুণ্ডলিনী জাগরণের অনেক উপায় আছেঃ কাহারও ভগবৎপ্রেমবলে, কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপায়, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞানবিচার দ্বারা। লোকে যাহাকে অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথাও তাহার কিছু প্রকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুণ্ডলিনী-শক্তি কোন মতে সুষুম্নার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়া হঠাৎ এমন কোন সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে কুণ্ডলিনীশক্তির কিয়ৎপরিমাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিয়াছে। সর্বপ্রকার উপাসনাই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই একই লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দেয়। যিনি মনে করেন, প্রার্থনার উত্তর পাইতেছে, তিনি জানেন না যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃত্তি দ্বারা তিনি তাঁহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং মানুষ না জানিয়া যাঁহাকে নানা নামে—ভয়ে ও দুঃখের ভিতর দিয়া উপাসনা করে, তাঁহার নিকট কিভাবে অগ্রসর হইতে হয় জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত শক্তিরূপে কুণ্ডলকারে বিরাজমান এবং তিনি সকল সুখের জননী—যোগিগণ জগতের সমক্ষে ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। উহাই সকল উপাসনা, সকল প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম

এখন আমাদের প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অঙ্গই ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের উদ্দেশ্য—শরীরের মধ্যে যে-সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতি আছে, সেগুলি অনুভব করা। আমাদের মন বহির্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, উহা ভিতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতিগুলিকে মোটেই ধরিতে পারে না। অনুভব করিতে পারিলেই সেগুলিকে আমরা জয় করিতে পারিব। এই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে; প্রতি পেশীতে উহারা প্রাণ ও জীবনশক্তি সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু আমরা সেই প্রবাহগুলি অনুভব করিতে পারি না। যোগীরা বলেন, চেষ্টা করিলে আমরা ঐগুলি অনুভব করিতে শিখিতে পারি। কিভাবে? প্রথমে ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমরা সূক্ষ্মতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব।

এখন প্রাণায়ামের সাধন ও ক্রিয়াগুলি কথা সমালোচনা করা যাক। সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে, শরীরকে ঠিক সোজাভাবে রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকাণ্ডটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত তথাপি মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নয়। বক্র হইয়া বসিলে সুষুম্নাপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়; অতএব দেখিতে হইবে, উহা যেন স্বচ্ছন্দভাবে থাকে। বক্র হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হয়। শরীরের তিনটি ভাগ—বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সর্বদা এক রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা শ্বাসপ্রশ্বাস ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে। তারপর স্নায়ুগুলি বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশাস-যন্ত্রের কার্য নিয়মিত করে, অপরাপর স্নায়ুগুলির উপরও তাহার কতকটা প্রভাব আছে। এই জন্যই শ্বাসপ্রশ্বাস তালে তালে (rhythmical) হওয়া আবশ্যক। আমরা সচরাচর যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যেও একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে।

প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়া এইঃ নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর ও নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে দেহযন্ত্রটির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর এই শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় 'ওঙ্কার' অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল হয়। প্রাণায়ামের সময় এক, দুই, তিন, চার—এই ক্রমে সংখ্যা গণনা না করিয়া ভারতে আমরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ (বীজমন্ত্র) ব্যবহার করিয়া থাকি। এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় 'ওঁ' অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে; এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ছন্দের তালে তালে চালিত হইতেছে। তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নয়। একবার এই বিশ্রামের অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত স্নায়ুগুলি পর্যন্ত জুড়াইয়া যাইবে, আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রাম লাভ কর নাই।

এই সাধনে প্রথম ফল দেখা যায়—মুখভাবের পরিবর্তনে, মুখের শুষ্কতা বা কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলি অন্তর্হিত হইবে। মনের শান্তি মুখে ফুটিয়া বাহির হইবে। তারপর গলার স্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী একজনও দেখি নাই, যাঁহার গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস সাধনার পরই এই-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। এই প্রথম (পূর্বোক্ত প্রকারের) প্রাণায়াম কিছুদিন অভ্যাস করিয়া উচ্চতর প্রাণায়ামের আর একটি সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। উহা এই—ইড়া অর্থাৎ বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে ফুসফুস বায়ুতে পূর্ণ কর। ঐ সঙ্গে স্নায়ুপ্রবাহের উপর মনঃসংযম কর; ভাবো, তুমি যেন স্নায়ুপ্রবাহকে মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে প্রেরণ করিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তির আধারভূত মূলাধারস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ; তারপর ঐ স্নায়ুপ্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তারপর কল্পনা কর যে, সেই স্নায়ু প্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক বা পিঙ্গলার দ্বারা উপরে টানিয়া লইতেছে। পরে দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে বাহিরে নিক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাস করা তোমার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হইবে। সহজ উপায়—প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ কর। তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাসা বন্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি বায়ুপ্রবাহটিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছ এবং সুষুম্নার মূলদেশে আঘাত করিতেছ, তারপর অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। তারপর বাম নাসা তর্জনী দ্বারা বন্ধ রাখিয়াই দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ কর ও পুনরায় পূর্বের মত উভয় নাসারন্ধ্রই বন্ধ কর। হিন্দুদিগের মত প্রাণায়াম অভ্যাস করা এদেশের (আমেরিকার) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই ইহা অভ্যাস করে, তাহাদের ফুসফুস ইহাতে অভ্যস্ত। এখানে চারি সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভাল হয়। চারি সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, ষোল সেকেণ্ড বন্ধ কর, পরে আট সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাতেই একটি প্রাণায়াম হইবে। ঐ সময়ে মূলাধারস্থ ত্রিকোণাকার পদ্মটি চিন্তা করিতে করিতে ঐ কেন্দ্রে মন স্থির করিবে। এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক সুবিধা হইবে।

পরবর্তী (তৃতীয়) প্রাণায়াম এইঃ ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, পরে সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিয়া বাহিরেই কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখো, সংখ্যা—পূর্ব প্রাণায়ামের মত। পূর্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়াম পূর্বাপেক্ষা সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নয়। উহা প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পার। ক্রমশঃ দেখিবে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা—চার হইতে ছয়—বৃদ্ধি করিতে পার। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে।

নাড়ীশুদ্ধির জন্য বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়া-দুইটি কঠিন নয়, এবং উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা

নাই। প্রথম ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শান্তভাব আসিবে। উহার সহিত ‘ওঙ্কার’ যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি কোন কার্যে নিযুক্ত আছ, তখনও তুমি উহা অভ্যাস করিতে পারিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয়তো খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইবেন। যাঁহারা দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ হইবে, গলার স্বর মধুর হইবে। কিন্তু যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইবেন; তাঁহাদের নিকট সমগ্র প্রকৃতিই আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তখন আর গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করিতে হইবে না, মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের কাজ করিবে। আমি পূর্বেই মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি শক্তিপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যস্থ সুষুম্নার কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে। তবে যোগীরা বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে সুষুম্না বন্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের কার্য শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন করা।

কেবল যোগীরই এই সুষুম্না উন্মুক্ত থাকে। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া গিয়া তাহার মধ্য দিয়া স্নায়ুশক্তিপ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমরা বুদ্ধিরও অতীত দেশে চলিয়া যাই, যেখানে তর্ক পৌঁছিতে পারে না। এই সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্বে যে-সকল শক্তিবহনকেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে সেগুলি সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাষায় সেগুলিকেই পদ্ম বলে। সর্বনিম্নে সুষুম্নার নিম্নভাগে অবস্থিত পদ্মটির নাম (১ম) মূলাধার, তার ঊর্ধ্বে (২য়) স্বাধিষ্ঠান, (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা, সর্বশেষে (৭ম) মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম।

ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা আবশ্যক—সর্বনিম্নে মূলাধার ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রে অবস্থিত সহস্রার। সর্বনিম্ন চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মস্তিষ্কস্থ সর্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত তাহাদের মধ্যে মহত্তম শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। যাহার মস্তকে যে পরিমাণ ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্ হয়। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাহা নয়, তবু তাহার কথায় লোকে মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি।

সকল মানুষের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহা আমাদের সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ অভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পেশীর শক্তিগুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে। যোগীরা বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সংযত হইলে সহজেই ওজোরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। যোগীরা সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাতুতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিত্র হইলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই জন্যই বিবাহত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হইয়াছে। কায়মনোবাক্যে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা নিত্যন্ত কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত রাজযোগসাধন বড় বিপৎসঙ্কুল; উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস করে অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, সে কিরূপে যোগী হইবার আশা করিতে পারে?

প্রত্যাহার ও ধারণা

সাধনার পরবর্তী সোপানকে বলা হয় 'প্রত্যাহার'। এই প্রত্যাহার কি? তোমরা জানো কিরূপে বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের বাহিরের যন্ত্রগুলি, তারপর ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি—ইহারা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শরীরের উপর কার্য করিতেছে, তারপর আছে মন। যখন এইগুলি একত্র হইয়া কোন বহির্বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত রাখা কঠিন; কারণ মন (বিষয়ের) ক্রীতদাস।

আমরা জগতের সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, 'সৎ হও, ভাল হও।' বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যাহাকে বলা হয় নাই, 'মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না' ইত্যাদি, কিন্তু কেহ তাহাকে এই-সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় হয় না। কেন সে চোর হইবে না? আমরা তো তাহাকে চৌর্যকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, 'চুরি করিও না।' মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়। যখন মন ইন্দ্রিয়-নামক বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, মানুষের মন ঐ কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন হইতে বাধ্য হয়। এই জন্যই মানুষ নানাপ্রকার দুষ্কর্ম করে এবং দুঃখ পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই ঐরূপ কর্ম করিত না। মন সংযত করিলে কি ফল হইত? তাহা হইলে মন আর তখন নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না, ফলে অনুভব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আসিবে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল। ইহা কার্যে পরিণত করা কি সম্ভব?—সর্বতোভাবে সম্ভব। তোমরা বর্তমানকালেও দেখিতে পাইতেছে—বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারীরা রোগীকে দুঃখ, কষ্ট, অশুভ প্রভৃতি অস্বীকার করিতে শিক্ষা দেয়। অবশ্য ইহাদের যুক্তিতে সে ব্যাপারটি কতকটা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপে তাহারা উহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্র তাহারা দুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য হয়, বুঝিতে হইবে, সে-সকল ক্ষেত্রে তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কিছুটা শিক্ষা দিয়াছে, কারণ তাহারা সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়া দেয়, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়গুলিকে উপেক্ষা করে। সম্মোহন-বিদ্যাবিদ্‌গণও (hypnotists) প্রায় পূর্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ইঙ্গিত (suggestion)-বলে সাময়িকভাবে রোগীর ভিতরে একপ্রকার অস্বাভাবিক প্রত্যাহারের ভাব আনয়ন করে। তথাকথিত বশীকরণ-ইঙ্গিত শুধু দুর্বল মনেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণকারী যতক্ষণ না স্থিরদৃষ্টি অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার বশ্যব্যক্তির মন নিষ্ক্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিত বা আদেশে কোন কাজ হয় না।

বশীকরণকারীরা বা বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্যব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলি বশীভূত করিয়া থাকে, তাহা অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম, কারণ উহা ঐ বশ্যব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। ইহা তো স্বীয় ইচ্ছাশক্তিবলে মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ নয়, অপরের ইচ্ছাশক্তির সহসাপ্রদত্ত আঘাতে বশ্যব্যক্তির মনকে কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করিয়া রাখা। উহা লাগাম ও পেশী-শক্তির সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত করা নয়, বরং উহা অপরকে সেই অশ্বগণের উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়া শান্ত করিয়া রাখা। এই-সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটিতে বশ্যব্যক্তি তাহার মনের শক্তি কিছু কিছু করিয়া হারাইতে থাকে, পরিশেষে মন নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা দূরে থাক, ক্রমশঃ একপ্রকার শক্তিহীন কিম্ভূতকিমাকার জড়ে পরিণত হয়, এবং বাতুলালয়ই তাহার একমাত্র গন্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার পরিবর্তে মনকে অন্য উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টাদ্বারা কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহা নয়, উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা প্রভুত্ব—জড়বস্তু ও চিন্তার দাসত্ব হইতে মুক্তি, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব। কিন্তু সেই লক্ষ্যে না পৌঁছাইয়া, অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ, উহা যেভাবেই প্রযুক্ত হউক না কেন—সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া বা অস্বাভাবিক ভাবে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াই হউক—পূর্ব হইতে বিদ্যমান চিন্তা ও কুসংস্কারগুলির গুরুভার শৃঙ্খলের উপর উহা আর একটি শিকলি আটকাইয়া দেয়। অতএব সাবধান, যখন অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও। সাবধান, যখন অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ কর। সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের কল্যাণসাধনে কৃতকার্য হন, কিন্তু আবার চারিদিকে অজ্ঞাতসারে এই ইঙ্গিত (suggestion)-শক্তি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে একরূপ বিকৃত, নিষ্ক্রিয় ও মোহের ভাব জাগাইয়া তুলেন, পরিণামে তাহারা আত্মার অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিস্মৃত হইয়া যায়, অতএব যে-কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, অথবা নিজের উচ্চতর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ-শক্তিদ্বারা বহু লোককে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বাধ্য করে, সে ইচ্ছা না করিলেও মনুষ্যজাতির অনিষ্ট করিয়া থাকে।

অতএব নিজের শরীর ও মন সংযত করিতে সর্বদাই নিজ মনের সহায়তা লইবে, এবং সর্বদা স্মরণ রাখিবে, যে পর্যন্ত না রোগগ্রস্ত হও, ততক্ষণ বাহিরের কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর কার্য করিতে পারিবে না; আর যে কেহ তোমায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, সে যতই মহৎ ও ভাল হউক না কেন, তাহার সঙ্গ পরিহার করিবে। জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রদায় আছে—যাহাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ—নৃত্য, লম্ফ-ঝম্ফ ও চীৎকার। তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগের মত লোকের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। তাহারাও একপ্রকার সম্মোহনকারী। তাহারা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর সাময়িকভাবে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু হায়! পরিণামে সমগ্র জাতিকে একেবারে অধঃপতিত করিয়া দেয়। হাঁ, এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃশক্তিবলে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং মন্দ থাকাও

অধিকতর সুস্থতার লক্ষণ। এই সকল দায়িত্বহীন অথচ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিগণ মানুষের যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে যেন হৃদয় দমিয়া যায়। তাহারা জানে না যে, যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গীত-স্তবাদির সহায়তায় নিজেদের শক্তিপ্রভাবে এইরূপ সহসা ভগবদ্ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহারা কেবল নিজদিগকে নিষ্ক্রিয়, বিকৃত ও শক্তিশূন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ যে-কোন ভাবের, এমন কি অসৎ ভাবেরও অধীন হইয়া পড়িবে। এই অজ্ঞ, আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও ভাবে না যে, মনুষ্যহৃদয় পরিবর্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া তাহারা যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তখন তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ততা ও মৃত্যুর বীজ বপন করিতেছে। তাহারা মনে করে ঐ ক্ষমতা মেঘের ওপার হইতে কোন দিব্যপুরুষ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন। অতএব যাহা কিছু তোমার স্বাধীনতা নষ্ট করে, এমন সবকিছু হইতে সাবধানে থাকিবে—জানিবে উহা বিপজ্জনক, প্রাণপণ চেষ্টায় সর্বতোভাবে উহা পরিহার করিবে।

যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে অথবা সেগুলি হইতে সরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ 'একদিকে আহরণ'—মনের বহির্মুখী শক্তি রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হইতে উহা মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে কৃতকার্য হইলে তবেই আমরা ঠিক ঠিক চরিত্রবান্ হইব; তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব; ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যন্ত্রের মতই জড় পদার্থ।

মনকে সংযত করা কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল—যেমন সব বানর হইয়া থাকে। যেন ঐ স্বাভাবিক অস্থিরতা যথেষ্ট ছিল না, তাই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা মদ খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমরা অবশ্যই জানো, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে কেবল ছটফট করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ঐ বানর-বেচারার দুরবস্থার চূড়ান্ত হইল। পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই এক ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে দুর্দমনীয় চঞ্চলতা দেখা দিল, ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মনুষ্য-মন ঐ বানরের তুল্য, স্বভাবতই অবিরত ক্রিয়াশীল, আবার বাসনারূপ মদিরাপানে মত্ত হইলে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। যখন বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন অপরের সফলতা-দর্শনে ঈর্ষারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে। শেষে আবার যখন অহঙ্কাররূপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!

অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোপান—কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেওয়া। মন সদা চঞ্চল। উহা সেই বানরের মত সর্বদা লাফাইতেছে। মন-বানর যত ইচ্ছা লম্ফ-ঝম্ফ করুক ক্ষতি নাই; ধীরভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও। লোকে বলে, জ্ঞানই শক্তি—ইহা অতি সত্য কথা যতক্ষণ না জানিতে পারিবে—মন কি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে সংযত করিতে পারিবে না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। অনেক বীভৎস চিন্তা হয়তো মনে উঠিবে; তোমার মনে এত অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ভাবিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই-সকল খেয়াল প্রতিদিনই কিছু কিছু করিয়া আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, তোমার মনে অসংখ্য চিন্তা আসিতেছে, ক্রমশঃ দেখিবে চিন্তা কিছুটা কমিয়াছে, আরও কয়েক মাস পরে আরও কমিয়া গিয়াছে, অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইবে; কিন্তু প্রতিদিনই আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ উহা চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় অনুভব করিতেই হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনের মত যন্ত্রমাত্র নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইতে হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযত করা এবং উহাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে না দেওয়াই 'প্রত্যাহার'। ইহা অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা খুব কঠিন কাজ, একদিনে হইবার নয়, ধৈর্যের সহিত ক্রমাগত বহু বর্ষ অভ্যাস করিলে কৃতকার্য হওয়া যায়।

কিছুকাল 'প্রত্যাহার' সাধন করিবার পর পরবর্তী সাধন অর্থাৎ 'ধারণা' অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখাই 'ধারণা'। মনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখার অর্থ কি? ইহার অর্থ—মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন একটি বিশেষ অংশ অনুভব করিতে বাধ্য করা; উদাহরণস্বরূপ শরীরের অন্যান্য অবয়ব অনুভব না করিয়া কেবল হাতটি অনুভব করিবার চেষ্টা কর। যখন চিত্ত অর্থাৎ মন কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ—সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে 'ধারণা' বলে। এই 'ধারণা' নানাবিধ। এই ধারণা-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়ের মধ্যে এক বিন্দুর উপর মনকে 'ধারণা' করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব সহজ উপায় হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহা যেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়! সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তকে সহস্রদল কমল অথবা পূর্বোক্ত সুষুম্নার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতির্ময়রূপে চিন্তা করিবে।

যোগী প্রতিনিয়তই সাধনা অভ্যাস করিবেন। তাঁহাকে নিঃসঙ্গভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে; নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। তাঁহার বেশী কথা বলা উচিত নয়, কারণ বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়। বেশী কাজ করাও ভাল নয়, কারণ বেশী কাজ করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করা যায় না। যিনি এই-সকল নিয়ম পালন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। যোগের এমনই শক্তি যে, অতি অল্পমাত্র সাধন করিলেও মহৎ ফল লাভ করা যায়। ইহাতে কাহারও অনিষ্ট হইবে না, বরং সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে স্থিরতা আসিবে এবং সকল বিষয় আরও স্পষ্টভাবে দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। মেজাজ আরও ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভাল হইবে। যোগ-অভ্যাসকালে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতা সেই প্রথম চিহ্নগুলির অন্যতম। স্বরও সুন্দর মধুর হইবে, স্বরের দোষ বা বৈকল্য চলিয়া যাইবে; প্রথমে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, ইহা তাহাদের অন্যতম। যাঁহারা কঠোর সাধনা করেন, তাঁহাদের আরও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখনও কখনও দূর হইতে যেন ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ শুনা যাইবে—যেন

অনেকগুলি ঘণ্টা দূরে বাজিতেছে, এবং সেইসকল শব্দ একত্র মিলিয়া কর্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ আসিতেছে। কখনও কখনও নানা বস্তু দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে, ক্রমশ একটু একটু করিয়া বড় হইতেছে। যখন এই-সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন জানিও তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ।

যাঁহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং দৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে যত্ন লওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহারা অন্যান্য দৈনিক কাজের সঙ্গে অল্পস্বল্প অভ্যাস করিতে চায়, তাহাদের বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা ইচ্ছামত খাইতে পারে।

যাঁহারা কঠোর সাধন করিয়া শীঘ্র উন্নতি করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। কয়েক মাস দুধ ও শস্যজাতীয় আহারই তাঁহাদের সাধন-জীবনের সহায়ক হইবে। দেহযন্ত্র উত্তরোত্তর যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই প্রথম প্রথম দেখা যাইবে যে, অতি সামান্য অনিয়মে শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। যতদিন পর্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহারের সামান্য ন্যূনাধিক্য সমগ্র শরীরযন্ত্র বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে, মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর ইচ্ছামত খাইতে পারা যায়।

যখন কেহ মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করে, তখন একটি সামান্য পিন পড়িলে বোধ হইবে যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বজ্র চলিয়া গেল। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি যত সূক্ষ্ম হয়, অনুভূতিও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে। এই-সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যাহারা অধ্যাবসায়সহকারে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকার্য হইবে। সর্বপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে কি ফল? উহা কেবল সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে। সূক্ষ্মস্তরের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। কথায় কি তাহা হইবে? অতএব সর্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর। যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

শক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষ একটি সুন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—আকাশে যখন স্বাতীনক্ষত্র উঠিতেছে, তখন যদি বৃষ্টি হয় এবং ঐ বৃষ্টিজলের এক বিন্দু যদি কোন শুক্তির উপর পড়ে, তাহা একটি মুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগুলি ইহা অবগত আছে; সুতরাং ঐ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে তাহারা জলের উপর আসিয়া ঐ সময়কার একবিন্দু মহামূল্য বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর পড়ে, অমনি ঐ জলকণা নিজের ভিতরে লইয়া শুক্তি মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়; সেখানে সহিষ্ণুতাসহকারে বৃষ্টিবিন্দুকে মুক্তায় পরিণত করিবার সাধনায় মগ্ন হয়। আমাদেরও ঐরূপ করিতে হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে বহির্জগতের প্রভাব ও সর্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকাশ করিবার জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। শুধু নূতনত্বের জন্য একটি ভাব গ্রহণ করিয়া আর একটি নূতন ভাব পাইলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া—এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের শক্তি বৃথা ক্ষয় হইয়া যাইবে। সাধনকলে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই সাধনা কর; উহার শেষ পর্যন্ত দেখ, উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটি ভাব লইয়া পাগল হইয়া যাইতে পারেন, তিনিই সত্যের আলো দেখিতে পান। যাহারা এখানে একটু, ওখানে একটু আস্বাদ করিয়া বেড়ায়, তাহারা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্নায়ু একটু উত্তেজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। তাহারা চিরকাল প্রকৃতির দাস হইয়া থাকিবে, কখনই ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যাঁহারা যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় একটু একটু করিয়া আস্বাদ করার ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। একটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদা উহাই চিন্তা করিতে থাক। ঐ ভাব অনুযায়ী জীবন যাপন কর। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এই ভাবে পূর্ণ হইয়া যাক। অন্য সমুদয় চিন্তা দূরে থাকুক। ইহাই সিদ্ধিলাভের উপায়; এই উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে। বাদ বাকী সকলে তো শুধু কথা কওয়ার যন্ত্রমাত্র। যদি আমরা নিজেরা সত্যই কৃতার্থ হইতে চাই ও অপরের জীবন ধন্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রথম সোপান—মনকে কোনমতে বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাহাদের সঙ্গে কথা বলিলে মনের চঞ্চলতা আসে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা না করা। তোমরা সকলেই জানো যে, কতকগুলি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি ও খাদ্য তোমাদের নিকট বিরক্তিকর। ঐগুলি এড়াইয়া চলিবে। যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর। মর বা বাঁচ—কিছুই গ্রাহ্য করিও না। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি খুব নির্ভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা অল্পস্বল্প সাধনা করে, সব বিষয়েরই একটু আধটু চাখে, তাহারা কোনই উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফল হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাদের মন কোন একটি বিষয়ে কখনও স্থির হয় না, যাহারা একটু আমোদের জন্য কোন কিছু চায়, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন চিত্তবিনোদনেরই উপাদান। ইহারা সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহারা ধর্মকথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ এ তো বেশ! তারপর বাড়ী গিয়া সব ভুলিয়া যায়। সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

ধ্যান ও সমাধি

এতক্ষণ আমরা রাজযোগের সূক্ষ্ম সাধনগুলি ব্যতীত বিভিন্ন সোপানসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ সাধনগুলির উদ্দেশ্য—একাগ্রতা-সাধন। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করাই রাজযোগের লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজাতির যত কিছু জ্ঞান, সেগুলি সবই সচেতন অহংবুদ্ধির। এই টেবিল ও তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা চেতনা হইতে আমি জানি, টেবিলটি এখানে রহিয়াছে এবং তুমিও এখানে আছ। আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, আমার সত্তার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে পারি না। শরীরের ভিতর বিভিন্ন যন্ত্র, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান নাই।

যখন আহার করি, তখন তাহা জ্ঞানপূর্বক করি; কিন্তু যখন উহা পরিপাক করি, তখন অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি। খাদ্য যখন রক্তে পরিণত হয়, তখনও অজ্ঞাতসারেই ঐ ক্রিয়া হইয়া থাকে। আবার যখন ঐ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ শক্ত-সবল হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলি আমাদ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। এই শরীরের মধ্যে তো আর বিশটি লোক নাই যে তাহারা ঐ কাজগুলি করিতেছে। কিন্তু কি করিয়া জানিতে পারি যে আমিই ঐগুলি করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ-বিষয় তো জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, আহার ও পরিপাক করা আমার কাজ; খাদ্য হইতে শক্ত-সবল শরীর গঠন করার কাজ আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে—ইহা হইতে পারে না; কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে-সকল কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, ঐগুলির প্রায় সবই সাধনবলে আমাদের চেতনভূমিতে আনা যাইতে পারে। আপাততঃ মনে হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আমাদের অধীন নয়, উহা নিজের গতিতে চলিতেছে। কিন্তু অভ্যাসবলে এই হৃদ্‌যন্ত্রকেও এরূপ বশে আনা যাইতে পারে যে, আমাদের ইচ্ছা অনুসারে উহা শীঘ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরের প্রায় প্রত্যেক অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যায় যে, এখন যে-সকল ক্রিয়া অবচেতনভাবে হইতেছে, সেগুলিও আমরাই করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্য-মন দুই স্তরে কাজ করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে সজ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে, এখানে সকল কাজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, আর একটি ভূমির নাম নির্জ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি) বলা যাইতে পারে, এখানকার কাজের সহিত 'আমি'-বোধ থাকে না।

আমাদের মানস কার্যকলাপের যে অংশে 'অহং'ভাব থাকে না, তাহা অজ্ঞানভূমির ক্রিয়া, আর যে অংশে অহংভাব থাকে, তাহা জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া। নিম্নজাতীয় জীবজন্তুতে এই অজ্ঞানভূমির কার্যগুলিকে সহজাতবৃত্তি (instinct) বলে। উচ্চতর জীবে ও উচ্চতর জীব মনুষ্যে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াই প্রবল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে মন কার্য করিতে পারে। মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞানভূমিতে কৃত কার্য যেমন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে ঘটে, ঠিক সেইরূপ আর এক প্রকার কাজ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হইয়া থাকে। উহাতেও কোনরূপ অহংভাব থাকে না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে। যখন মন এই স্তরের ঊর্ধ্বে বা নিম্নে থাকে, তখন আমি-রূপ কোন বোধ থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন মন এই অহংবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন তাহাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলে। সমাধি-অবস্থায় মানুষ সজ্ঞানভূমির নিম্নস্তরে চলিয়া যায় নাই, অবনত হইয়া যায় নাই—ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? এই দুই অবস্থার কাজই অহংভাবশূন্য। ইহার উত্তর এই—ফল দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে, কে সজ্ঞানভূমির নিম্নে আর কেই বা ঊর্ধ্বে। যখন কেহ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন সজ্ঞানভূমির নিম্নে অবচেতন ভূমিতে চলিয়া যায়। তখনও তাহার শরীরের সমুদয় ক্রিয়া চলিতে থাকে, সে শ্বাসপ্রশ্বাস লয়, এমন কি নিদ্রার মধ্যে শরীর সঞ্চালনও করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার এইসকল কার্যে অহংভাবের কোন সংস্রব থাকে না, তখন তাহার চেতনা থাকে না; নিদ্রা হইতে যখন উত্থিত হয়, তখন সে যে-মানুষ ছিল, সেই মানুষই থাকিয়া যায়। নিদ্রা যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই থাকে; উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়—মূর্খ ও যদি সমাধিস্থ হয়—সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।

এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আসিল; আর এক অবস্থা হইতে মানুষ জ্ঞানী হইয়া ফিরিল—এক সাধুমহাপুরুষে পরিণত হইল, তাহার স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার জীবনও রূপান্তরিত হইয়া গেল, সে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল। এই তো দুই অবস্থার বিভিন্ন ফল! ফল যখন ভিন্ন কারণও অবশ্যই ভিন্ন হইবে। সমাধি-অবস্থায় লব্ধ এই জ্ঞানালোক যেহেতু নির্জ্ঞান-অবস্থার অনুভূতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, বা জ্ঞানভূমিতে যুক্তিবিচারলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, তখন উহা অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আসিতেছে। সেইজন্যই সমাধি 'জ্ঞানাতীত অবস্থা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই সমাধিতত্ত্ব। এই সমাধির কার্যকারিতা কি? এখানেই ইহার কার্যকারিতা। আমরা জ্ঞাতসারে যে-সকল কর্ম করিয়া থাকি, যাহাকে বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্র বলা যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই মানুষের বিচারবুদ্ধি নড়াচড়া করিতে বাধ্য, তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। উহার বাহিরে যাইবার সামান্য চেষ্টাও অসম্ভব। অথচ মানুষ যাহা অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহা ঐ যুক্তিবিচারের বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কিনা, ঈশ্বর আছেন কিনা, এই জগতের নিয়ন্তা পরমচৈতন্যস্বরূপ কেহ আছেন কিনা এ-সকল প্রশ্ন যুক্তির এলাকার বাহিরে। যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলেঃ আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি 'হাঁ' বা 'না' কিছুই জানি না। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর না পাইলে মানবজীবন উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে। আমাদের সমুদয় নৈতিক মত,

সর্ববিধ মনোভাব, মনুষ্য-স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও ভাল, সে-সবই যুক্তিরাজ্যের বাহির হইতে যে উত্তর আসে, তাহা দ্বারা গঠিত হয়। অতএব, এই-সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। জীবন যদি শুধু একটি নাটিকা হয়, বিশ্বজগৎ যদি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক মিলনমাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের উপকার কেন করিব? দয়া, ন্যায়পরতা অথবা সহানুভূতির প্রয়োজন কি? তবে তো সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লও—এই নীতিই এ পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট হইত। যদি আশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রাতার গলা না কটিয়া তাহাকে ভালবাসিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত কোন সত্তা না থাকে, যদি মুক্তি বলিয়া কিছু না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর প্রাণহীন নিয়মেই সব হইয়া পড়ে, তবে তো যাহাতে ইহলোকে সুখী হইতে পারি, শুধু তাহারি চেষ্টা করিব। আজকাল দেখা যায় অনেকে বলে, তাহাদের নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility)। এই নীতির ভিত্তি কি? সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা—কেন এরূপ করিব? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব না কেন? হিতবাদিগণ (Utilitarians) এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি আমার সুখের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহার তৃপ্তিসাধন করিলাম, উহা আমার স্বভাব, উহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। আমার এইসব বাসনা আছে, আমি এগুলি পূর্ণ করিব, তোমার আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে? নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সর্বোপরি নিঃস্বার্থতা—মনুষ্যজীবনের এই-সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি কোথা হইতে আসিল?

সমুদয় নীতি-শাস্ত্র, মানুষের সকল কাজকর্ম ও চিন্তা এই নিঃস্বার্থতারূপ একটি মাত্র ভাবের উপর নির্ভর করে, মানবজীবনের সমুদয় ভাব 'নিঃস্বার্থতা', এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। কেন আমরা স্বার্থশূন্য হইবে? নিঃস্বার্থ হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? শক্তি ও প্রেরণাই বা কোথায়? তুমি নিজেকে যুক্তিবাদী-হিতবাদী বলিয়া থাক; কিন্তু তুমি যদি হিতসাধন করিবার যুক্তি দেখাইতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে অযৌক্তিক বলিব। আমি কেন স্বার্থপর হইব না, তাহার যুক্তি দেখাও। অবশ্য কবিত্ব হিসাবে নিঃস্বার্থতা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তো যুক্তি নয়। আমাকে যুক্তি দেখাও—কেন আমি নিঃস্বার্থ হইব, কেন আমি সৎ হইব? অমুক এই কথা বলে—এরূপ কথার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার উপযোগিতা কোথায়? 'হিত' বলিতে যদি 'অধিকতম সুখ' বুঝায়, তবে স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে হিত। ইহার কি উত্তর? হিতবাদিগণ ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহার উত্তর—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অনন্ত সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু, অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র শিকলি। যাঁহারা নিঃস্বার্থতা প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? আমরা জানি, ইহা সহজাত বৃত্তি নয়। সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন পশুগণ ইহা জানে না, বিচার বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়া যায় না, যুক্তিদ্বারা এই-সকল তত্ত্বের কিছুমাত্র জানা যায় না। তবে ঐ-সকল তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল?

ইতিহাস-পাঠে দেখিতে পাই, জগতের মহান্ ধর্মাচার্যগণ সকলই একটি তথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, জগতের বাহির হইতে তাঁহারা এই সত্য লাভ করিয়াছেন, তবে তাঁহারা অনেকেই জানেন না, এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইয়াছেন। কেহ হয়তো বলিলেন, এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকারে আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'ওহে মানব, শোন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছে, গ্রহণ কর।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন, স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্বলাভের কথা বলিলেও ইঁহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা উহা লাভ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে যোগশাস্ত্র কি বলে? যোগশাস্ত্র বলে, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা যে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ-কথা ঠিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান আসিয়াছে।

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা আছে, যাহা যুক্তিবিচারের ঊর্ধ্বে-জ্ঞানাতীত অবস্থা। এই উচ্চাবস্থায় পৌঁছিলে মানব তর্কের অতীত এই জ্ঞান লাভ করে—বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করে। যুক্তিবিচারের অতীত অবস্থা লাভ করা, সধারণ মানবীয় স্বভাব অতিক্রম করা—কখনও কখনও মানুষের জীবনে অতর্কিতে সম্ভব হইতে পারে, সে ব্যক্তি এ ঘটনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে; সে যেন হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ করে; ঐরূপে হঠাৎ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলাভ হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, ঐ জ্ঞান বাহির হইতে আসিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই দিব্যপ্রেরণা—পারমার্থিক জ্ঞান বিভিন্ন দেশে একই প্রকারের হইতে পারে; কোন দেশে মনে হইবে দেবদূত হইতে আসিয়াছে, কোন দেশে দেববিশেষ হইতে, আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ মন নিজ স্বভাব অনুয়ায়ী নিজের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যিনি উহা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে ঐ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইঁহারা সকলেই ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন।

যোগীরা বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোর বিপদের আশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝেন নাই, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত সাধারণতঃ কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া যায়। তাঁহারা অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন।

* * *

যাহা ইউক আমরা অনেক মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, সমাধিলাভের পথে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-কোন ভাবেই হউক, ঐ

জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। যখনই কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবোচ্ছ্বাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছুটা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহাতে দেখা দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষার মহত্ত্ব দ্বারা যেমন জগতের উপকার হইয়াছে, ঐ কুসংস্কারাদির দ্বারা তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনুষ্যজীবনে কিছু সামঞ্জস্য ও যুক্তি দেখিতে হইলে আমাদিগকে সাধারণ যুক্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিকভাবে ধীরে ধীরে নিয়মিত সাধনাদ্বারা করিতে হইবে এবং সমুদয় কুসংস্কার বিসর্জন দিতে হইবে। অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, সমাধিতত্ত্বশিক্ষার সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যুক্তির উপরই আমাদের ভিত্তিস্থাপন করিতে হইবে, যুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া যায় ততদূর যাইতে হইবে; যুক্তি যখন আর চলিবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট', অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ এই তিন অবস্থা—সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা অথবা নির্জ্ঞান, সজ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—একই মনের অবস্থাবিশেষ। একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্তু মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত অবস্থায় পরিণত হয়; সুতরাং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী নয়। প্রকৃত প্রেরণা যুক্তিবিরোধী নয়—বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন করে। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, 'আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি—'সেইরূপ প্রেরণাও যুক্তিকে পরিপূর্ণ করে, যুক্তির সহিত উহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্যই যোগের বিভিন্ন সোপানগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু এটি বুঝা বিশেষ আবশ্যক যে, এই অতীন্দ্রিয় প্রেরণালাভের শক্তি প্রাচীন মহাপুরুষগণের ন্যায় প্রত্যেক মানুষের স্বভাবেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণ পৃথক্—অতুলনীয় কিছু ছিলেন না, তাঁহারা তোমার আমার মতই মানুষ ছিলেন। তাঁহারা উচ্চাঙ্গের যোগী ছিলেন এবং এই জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। চেষ্টা করিলে তুমি-আমিও উহা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা কোন বিশেষ-প্রকারের অদ্ভুত লোক ছিলেন না। একজন ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন—এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ঐ অবস্থা লাভ করা সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব তাহা নয়, সকলকেই কালে ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইবে, এবং ইহাই ধর্ম। অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। আমরা সারা জীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজেরা প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্র বুঝিতে পারিব না। কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া আমরা দেশ দেখিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই। শুধু পুস্তকের উপর নির্ভরতা মানুষের মনকে অবনতির দিকেই লইয়া যায়। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা ঐ শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ—এরূপ বলা অপেক্ষা ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা আর কি হইতে পারে? মানুষ ভগবান্‌কে অনন্ত বলে, আবার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের গণ্ডিতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায়!—কি তাহার স্পর্ধা! কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থে যাহা আছে, তাহা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া, 'একখানি গ্রন্থের মধ্যে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ'—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অবশ্য এই নিধনের ও হত্যার যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জগৎ এখনও ধর্মগ্রন্থে অন্ধবিশ্বাস দ্বারা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে তোমাদিগকে রাজযোগবিষয়ে যে-সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার বিভিন্ন সোপান দিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যাহার ও ধারণার পর, এখন ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব। দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাখিতে পারিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ঐ দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ করিবে। এই অবস্থার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় যে, সাধক অনুভবের বহির্ভাগ বর্জন করিয়া শুধু উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ অর্থের ধ্যানই করেন, তখন সেই অবস্থায় নাম 'সমাধি'। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটিকে একত্রে 'সংযম' বলে; অর্থাৎ প্রথমতঃ যদি কেহ কোন বস্তুর উপর মন একাগ্র করিতে পারে, পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ একাগ্রতার ভাব রক্ষা করিতে পারে, অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা, যে অভ্যন্তরীণ কারণ হইতে ঐ বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, যদি শুধু তাহারই উপর মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সবকিছুই এইরূপ মনের বশীভূত হইয়া যায়।

এই ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা। যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ যথার্থ সুখ সম্ভব নয়, কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষিরূপে সবকিছু পর্যালোচনা করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়ছেন, তাঁহার নিকটই জগৎ যথার্থ সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। যাঁহার বাসনা নাই, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিপ্ত করেন না, তাঁহার নিকট প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্তন সুন্দর ও মহান্ ভাবের এক অফুরন্ত চিত্রপট!

ধ্যানের এই তত্ত্বগুলি বুঝিতে হইবে। মনে কর, একটি শব্দ শুনিলাম। প্রথমে বাহিরে একটি কম্পন উঠিল, তারপর স্নায়বীয় গতি উহাকে মনের কাছে লইয়া গেল, পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উদিত হইল; এই বাহ্যবস্তুটিই ইথারে কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কারণ। যোগশাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় ঐগুলিকে ইথারের কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ঐগুলির প্রভেদ অতি অস্পষ্ট। বাস্তবিক আমরা এখন ঐ তিনটির কোনটিকেই অনুভব করিতে পারি না, উহাদের সম্মিলিত ফল অনুভব করি এবং সেটিকেই বাহ্যবস্তু বলি। প্রত্যেক অনুভবক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে; উহাদিগকে পৃথক্ করিতে না পারার কোন কারণ নাই।

প্রাথমিক প্রস্তুতি দ্বারা যখন মন দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সূক্ষ্মতর অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য। প্রথমতঃ স্থূল বস্তু লইয়া ধ্যান করিতে হইবে। পরে ক্রমশঃ ধ্যান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, শেষে বিষয়শূন্য ধ্যানে

পরিণত হইবে। মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি, পরে স্নায়ুমধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। মন যখন বেদনা বা অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় সূক্ষ্ম-জড় পদার্থ, সমুদয় সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা হইবে। মন যখন অভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে, তখন নিজের ও অপরের মানসিক তরঙ্গগুলি জড়-শক্তিরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই মন ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। যখন মন মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে পৃথক্‌ভাবে অনুভব করিবে, তখন যোগী সবকিছুর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন; কারণ অনুভবযোগ্য প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি চিন্তা এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিবে। যোগীর তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তিলাভ হয়; যদি তিনি এই সকল শক্তির কোন একটি দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়। কিন্তু যদি এই-সকল অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুদ্রে বৃত্তি-তরঙ্গ সম্পূর্ণ নিরোধ-করা-রূপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন। তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ শরীরের নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে। তখন যোগী তাঁহার শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন—তিনি জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও সর্বব্যাপী।

এই সমাধিতে প্রত্যেক মানুষের, এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর অধিকার আছে। নিম্নতর জীবজন্তু হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন সময় এই অবস্থা লাভ করিবে; যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই তাহার প্রকৃত 'ধর্ম' আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা শুধু ঐ অবস্থার দিকে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি। যাহাদের কোন 'ধর্ম' নাই, তাহাদের সহিতে আমাদের এখন কোন প্রভেদ নাই, কারণ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদেরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপনীত করা ব্যতীত এই একাগ্রতা-সাধনের কি প্রয়োজন? এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেকটি সাধন-সোপান যুক্তিপূর্বক বিচার করা হইয়াছে, যথাযথভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক সাধন করা হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে। তখন সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে, সকল যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইবে, কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে।

সংক্ষেপে রাজযোগ

কূর্মপুরাণ[14] হইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়া রাজযোগের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যোগাগ্নি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে; তখন চিত্তশুদ্ধি হয়, সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানও আবার যোগীকে সাহায্য করে। যাঁহার মধ্যে যোগ ও জ্ঞান সমন্বিত, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। যাঁহারা প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদাসর্বদা 'মহাযোগ' অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। যোগ দুই প্রকার—একটিকে বলে অভাব, অন্যটি মহাযোগ। যখন নিজেকে শূন্য ও সর্বপ্রকার গুণবিরহিতরূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 'অভাবযোগ' বলে। যে যোগে আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা হয়, তাহাকে 'মহাযোগ' বলে। যোগী প্রত্যেকটি দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার করেন। আমরা অন্যান্য যে-সব যোগের কথা শাস্ত্রে পাঠ করি বা শুনিতে পাই, সে-সব যোগ এই মহাযোগের সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। এই মহাযোগে যোগী নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অনুভব করেন। ইহাই সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

রাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। উহাদের মধ্যে 'যম' বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। এই যম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কায় মন ও বাক্য দ্বারা কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করাকে 'অহিংসা' বলে। অহিংসা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব হইতে মানুষ যে সুখ লাভ করে, তদপেক্ষা উচ্চতর সুখ আর নাই। সত্যের দ্বারাই আমরা কর্মের ফল লাভ করি, সত্যের ভিতর দিয়াই সবকিছু পাওয়া যায়। সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ কথনকেই 'সত্য' বলে। চৌর্য বা বলপূর্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করার নাম 'অস্তেয়'। কায়মনোবাক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা করার নামই 'ব্রহ্মচর্য'। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে 'অপরিগ্রহ' বলে। অপরিগ্রহ-সাধনের উদ্দেশ্য এই—কাহারও নিকট কিছু লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়; গ্রহীতা হীন হইয়া যান, নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলেন, এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়েন।

তপঃ স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই কয়েকটিকে 'নিয়ম' বলে। নিয়ম-শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত-পালন। উপবাস বা অন্য উপায়ে দেহসংযমকে 'শারীরিক তপস্যা' বলে।

বেদপাঠ অথবা অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ, যাহা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয়, তাহাকে 'স্বাধ্যায়' বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক জপ সর্বনিম্নে এবং মানস জপ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে জপ এত উচ্চস্বরে করা হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে 'বাচিক' বলে। যে জপে কেবল ওষ্ঠে স্পন্দনমাত্র হয়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না, তাহাকে 'উপাংশু' বলে। যে মন্ত্রজপে কোন শব্দ শোনা যায় না, জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাহাকে 'মানস জপ' বলে। উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে 'বাহ্য শৌচ' বলে; যথা স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মানুশীলন দ্বারা মনের শুদ্ধিকে 'আভ্যন্তর শৌচ' বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর—উভয় শুদ্ধিই আবশ্যক। কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়া বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল না। যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না।

ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ ভক্তির নাম 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। তারপর 'আসন'। আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, বক্ষঃস্থল গ্রীবা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর প্রাণায়াম। 'প্রাণ' শব্দের অর্থ—নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, এবং 'আয়াম' শব্দের অর্থ—উহার সংযম বা নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম তিন প্রকার—অধম, মধ্যম ও উত্তম। প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করা যায়, তাহাকে 'অধম প্রাণায়াম' বলে। ২৪ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে 'মধ্যম প্রাণায়াম' ও ৩৬ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে তাহাকে 'উত্তম প্রাণায়াম' বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম ও মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন হয়; উত্তম প্রাণায়ামে শরীর লঘু হইয়া আসন হইতে উত্থিত হয় এবং ভিতরে পরম আনন্দ অনুভূত হয়।

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে, উহা বেদের অতি পবিত্র মন্ত্র। উহার অর্থঃ 'আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়া দিন।' এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়ামের সময় মনে মনে তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথা—রেচক (বাহিরে শ্বাসত্যাগ), পূরক (শ্বাসগ্রহণ) ও কুম্ভক (ভিতরে ধারণ করা, সুস্থির রাখা)। অনুভূতির যন্ত্র ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ হইয়া কার্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐগুলিকে ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনাকে 'প্রত্যাহার' বলে, অথবা নিজের দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করাই প্রত্যাহার-শব্দের অর্থ।

হৃদ্-পদ্মে, মস্তকের কেন্দ্রে বা দেহের অন্য স্থানে মনকে স্থির করার নাম 'ধারণা'। মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া, সেই স্থানটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এক বিশেষ প্রকার বৃত্তিতরঙ্গ উত্থিত করা যাইতে পারে। অন্য প্রকার তরঙ্গ এগুলিকে গ্রাস করিতে পারে না, পরন্তু ধীরে ধীরে এগুলিই প্রবল হয়। অন্যগুলি দূরে সরিয়া যায়—শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। অবশেষে এই বহু-বৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে; ইহাকে 'ধ্যান' বলে। যখন কোন অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, মনের সেই একরূপতার নাম 'সমাধি'। তখন আর কোন বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের

সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; সেগুলির সাহায্য ব্যতীতই তখন কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন কেন্দ্রে ১২ সেকেণ্ড স্থির করা যায়, তাহাতে একটি 'ধারণা' হইবে; এইরূপ ১২টি ধারণা হইলে একটি 'ধ্যান' এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে একটি 'সমাধি' হইবে।

যেখানে অগ্নি আছে, জলে, শুষ্কপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বল্মীকপূর্ণ স্থানে, বন্যজন্তুসমাকুল বনে, যেখানে বিপদাশঙ্কা আছে এমন স্থানে, চতুষ্পথে, অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অথবা যেখানে বহু দুর্জনের বাস, সে-স্থানে যোগ সাধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য। যখন শরীর অতিশয় ক্লান্ত বা অসুস্থ বোধ হয়, অথবা মন যখন অতিশয় দুঃখপূর্ণ ও বিষণ্ণ থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি সুগুপ্ত ও নির্জন স্থানে, যেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না, এমন স্থানে গিয়া সাধন কর। অশুচি স্থান নির্বাচন করিও না, বরং সুন্দর দৃশ্যযুক্ত স্থানে অথবা তোমার নিজগৃহে একটি সুন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। প্রথমেই প্রাচীন যোগিগণকে, তোমার নিজ গুরু ও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখো। ক্রমশঃ আমরা জানিব, কিভাবে ইহাদ্বারা মন একাগ্র হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা আয়ত্তে আনা যায়, এইভাবে উহাদ্বারা ইচ্ছাশক্তিও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এইবার কয়েকপ্রকার ধ্যানের কথা বলা যাইতেছে। কল্পনা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার কেন্দ্র, জ্ঞান উহার মৃণাল, যোগীর অষ্টসিদ্ধি ঐ পদ্মের অষ্টদল, আর বৈরাগ্য উহার অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকা। যদি যোগী বাহিরের শক্তি (অষ্টসিদ্ধি) পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বাহিরের অষ্টদলরূপে এবং অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের অভ্যন্তরে—হিরণ্ময়, সর্বশক্তিমান্, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে। চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর ঐ আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; ঐ শিখাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তা কর, আবার ঐ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আলোকের চিন্তা কর; উহা তোমার আত্মার আত্মা—পরমাত্মা, ঈশ্বর। হৃদয়ে এই ভাবটি ধ্যান কর। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা অর্থাৎ সকলকে—এমন কি মহাশত্রুকেও ক্ষমা করা, সত্য, আস্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্রতস্বরূপ। ইহাদের সবগুলিতেই যদি তুমি সিদ্ধ হইতে না পার, তাহা হইলে দুঃখিত বা ভীত হইও না। চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই আসিবে। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভগবানে তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহারই শরণাগত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহা কিছু চান, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, ভক্তি অথবা বৈরাগ্যযোগে উপাসনা কর।

'যিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যাঁহার নিজস্ব বলিতে কিছু নাই, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ধৈর্যশীল, যিনি অহংকারমুক্ত হইয়াছেন, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করেন, যতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয়, যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, ক্রোধ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না, যিনি শুচি, দক্ষ, সুখদুঃখে উদাসীন, যাঁহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিজের জন্য সকল কর্মচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহশূন্য—যাঁহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই যাঁহার গৃহ, যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই আমার ভক্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী হইতে পারেন।'[১৫]

নারদ নামে এক মহান্ দেবর্ষি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে ঋষি অর্থাৎ বড় বড় যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্যে দিয়া যাইতে যাইতে সেখানে দেখিলেন একজন লোক ধ্যান করিতেছে; সে এত গভীরভাবে ধ্যান করিতেছে, এত দীর্ঘকাল একাসনে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বল্মীক-স্তূপ নির্মিত হইয়া গিয়াছে। সে নারদকে বলিল, 'প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন?' নারদ উত্তর করিলেন, 'বৈকুণ্ঠ যাইতেছি।' তখন সে বলিল, 'ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি কবে আমায় কৃপা করিবেন, কবে আমি মুক্তিলাভ করিব।' আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। সে ব্যক্তি লম্ফ-ঝম্ফ নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল, সেও বলিল, 'ও নারদ, কোথায় চলেছ?' তার কণ্ঠস্বর ও ভাব-ভঙ্গি পাগলের মত। নারদ তাহাকেও বলিলেন, 'স্বর্গে যাইতেছি।' সে বলিল, 'তা-হলে ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কবে মুক্ত হব।' নারদ চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নারদ আবার সেই পথে যাইবার সময় বল্মীক-স্তূপ মধ্যে ধ্যানস্থ সেই যোগীকে দেখিতে পাইলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবর্ষে, আপনি কি আমার কথা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?' 'হাঁ, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।' 'তিনি কি বলিলেন?' নারদ উত্তর দিলেন, 'ভগবান্ বলিলেন—মুক্তি পাইতে তোমার আর চার জন্ম লাগিবে।' তখন সেই ব্যক্তি বিলাপ ও আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে বল্মীক-স্তূপ হইয়া গিয়াছে, এখনও আমার চার জন্ম অবশিষ্ট!' নারদ তখন অপর ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?' নারদ বলিলেন, 'হাঁ, এই তোমার সম্মুখে তেঁতুল গাছ দেখিতেছ? এই গাছে যত পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তবে তুমি মুক্তিলাভ করিবে।' এই কথা শুনিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, 'এত অল্প সময়ে মুক্তিলাভ করব!' তখন এক দৈববাণী হইল, 'বৎস, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাভ করিবে।' সে ব্যক্তি এইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার ঐ পুরস্কারলাভ হইল। সে ব্যক্তি বহু জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুই তাহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ প্রথম ব্যক্তি চার জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। যে ব্যক্তি মুক্তির জন্য শত শত যুগ অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার ন্যায় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে।

উপক্রমণিকা

যোগসূত্র-ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোগীদের সমগ্র ধর্মমত যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, আমি সেই বিরাট প্রশ্নটির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ সকলেই এ-বিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, আর জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক নির্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বরূপ; আবার সেই নির্বিশেষভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই—উক্ত নির্বিশেষ অবস্থা উচ্চতর, না বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যিনি মনে করেন এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা। অনেক শক্তিমান্ মনীষীর মত—আমরা এক নির্বিশেষ সত্তার ব্যক্তভাব, এবং নির্বিশেষ অবস্থা অপেক্ষা এই সবিশেষ অবস্থা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা মনে করেন, নির্বিশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে পারে না, সুতরাং উহা নিশ্চয়ই অচৈতন্য, জড় ও প্রাণশূন্য। তাঁহারা আরও মনে করেন, এই জীবনেই কেবল সুখভোগ সম্ভব, সুতরাং ইহাতেই আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত। প্রথমেই আমরা অনুসন্ধান করিতে চাই, জীবন-সমস্যার আর কি কি সমাধান আছে? এ সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ পূর্বের মতই থাকে, তবে তাহার অশুভগুলি থাকে না, কেবল যেগুলি ভাল, সেগুলি সবই চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। যুক্তি বা ন্যায়ের ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, মানুষের লক্ষ্য এই জগৎ। এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা এবং ইহার মন্দ অংশ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে। এই মতটি যে অসম্ভব ও বালজনোচিত তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়; কারণ এরূপ হইতে পারে না। ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, বা মন্দ নাই অথচ ভাল আছে—এরূপ হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল—এরূপ জগতে বাস করার কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ 'আকাশ-কুসুম' বলিয়া বর্ণনা করেন। আধুনিককালে আর একটি মত অনেক সম্প্রদায় কর্তৃক উপস্থাপিত হয়, তাহা এই—মানুষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনও সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে না, ইহাই মানুষের নিয়তি। এই মতও আপাততঃ অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইলেও অসম্ভব, কারণ সরল রেখার কোন গতি হইতে পারে না। সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ কর, তারপর যদি তুমি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাক ও প্রস্তরটি কোন বাধা না পায়, তবে উহা ঠিক তোমার হাতে ফিরিয়া আসিবে। একটি সরল রেখাকে অসীমভাবে বর্ধিত করা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত হইয়া শেষ হইবে। অতএব মানুষ ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, কখনও থামে না—এইরূপ মত অসম্ভব। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি মন্তব্য করিতে পারি, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, সকলকে ভালবাসিও'—নীতিশাস্ত্রের এই মতবাদটি পূর্বোক্ত মতদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। যেমন তড়িৎ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, ঐ শক্তি বিদ্যুদাধার-যন্ত্র (dynamo) হইতে বহির্গত হইয়া আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়—ঘৃণা ও ভালবাসা ঠিক সেইরূপ। সমুদয় শক্তিই আবার উৎসমুখে ফিরিয়া আসিবে। অতএব কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কারণ যে ঘৃণা তোমা হইতে বহির্গত হয়, তাহা কালে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। যদি তুমি ভালবাসো, তবে সেই ভালবাসাও তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। ইহা অতি নিশ্চিত যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে ঘৃণা বহির্গত হয়, তাহার অণুপরমাণু ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে। কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। একইভাবে ভালবাসার প্রতিটি স্পন্দনও ফিরিয়া আসিবে।

'অনন্ত উন্নতি'-সম্বন্ধীয় মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, তাহা আরও অন্যান্য প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে—বিনাশই পার্থিব সকল বস্তুর চরম গতি, অতএব অনন্ত উন্নতির মতটি কোনমতেই টিকিতে পারে না। আমাদের নানাপ্রকার চেষ্টা, আমাদের এই-সব আশা, এত ভয়, এত সুখ—এ-সবের পরিণাম কি? মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম পরিণাম। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর কিছুই নাই। তবে এই সরল রেখায় গতির কি হইল? অনন্ত উন্নতির কি হইল?—কিছুদূর যাওয়া, আবার যেখানে হইতে গতি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া আসা। দেখ—নীহারিকা (nebulae) হইতে সূর্য, চন্দ্র, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পরে নীহারিকাতেই ফিরিয়া আসিতেছে। সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, আবার যখন সংগঠন ভাঙিয়া যায়, তখন মাটিতেই সব ফিরাইয়া দিতেছে। যাহা কিছু আকার পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার সেই পরমাণুতেই ফিরিয়া যাইতেছে।

একই নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে কার্য করিবে, তাহা হইতে পারে না। নিয়ম সর্বত্রই একরূপ। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই নাই। ইহা যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতেও এ নিয়ম খাটিবে। চিন্তা ইহার উৎপত্তি-স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে—পরমসত্তা ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাঁহাকে যে নামেই ডাক না কেন—তাঁহাকে 'গড' বা ঈশ্বর বল, নির্বিশেষ বা পরম সত্তা বল, আর প্রকৃতিই বল, উহা সেই একই বস্তু। 'যাঁহা হইতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমুদয় প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও যাঁহাতে আবার সব কিছু ফিরিয়া যাইবে।'[১] ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে কার্য করিয়া থাকে। এক স্তরে যে কার্য হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ স্তরেও তাহাই পুনরাবর্তিত হয়। গ্রহসমূহে যাহা দেখিতে পাও, এই পৃথিবীতে—সকল মনুষ্যে ও সর্বত্র সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। বৃহৎ তরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু তরঙ্গের এক মহাসমষ্টি মাত্র। জগতের জীবন বলিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবনের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। আর জগতের মৃত্যু বলিতে এই-সকল লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবের মৃত্যুই বুঝায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কিনা? যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, 'হাঁ, উহা উচ্চাবস্থা।' তাঁহারা বলেন, 'মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত অবস্থা।' জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা বলে—মানুষ পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত

অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহার নীচে সে আর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকিবে এবং বৃত্ত-গতি সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ব স্থানে উপনীত হইবে। বৃত্তাকারে গতি পূর্ণ করিতেই হইবে। মানুষ যত নীচেই নামিয়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঊর্ধ্বগতি লাভ করিয়া আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মানুষ প্রথমে ভগবান্ হইতে আসে, মধ্যে সে মনুষ্যরূপ লাভ করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বৈতবাদের ভাষায় তত্ত্বটি এইভাবেই বলা হয়। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়ঃ মানুষই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মভাবে ফিরিয়া যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপার সকল রহিয়াছে কেন? আর ইহার অন্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার শেষ হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেটি কখনও সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে পারে না। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন—এত অতৃপ্তিকর কেন? এই-বিষয়ে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটি উচ্চতর পথে উঠিতেছি। নবজীবন লাভ করিবার জন্যই এই অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া দাও, উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া কিছুকাল পরে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট অবস্থা হইতে এক মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ঐ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই 'মানব'-সংজ্ঞক অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। তবে কি আত্মহত্যা করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করিব? কখনই নয়। উহাতে বরং আরও অনিষ্ট হইবে। শরীরকে অনর্থক পীড়া দেওয়া, অথবা জগৎকে গালাগালি দেওয়া, ইহার বাহিরে যাওয়ার উপায় নয়। আমাদিগকে নৈরাশ্যের পঙ্কিল হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; আর যত শীঘ্র ইহা অতিক্রম করিতে পারি—ততই মঙ্গল। কিন্তু এটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই মনুষ্য-অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নয়।

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্তবিক কঠিন যে, নির্বিশেষ অবস্থাকে সর্বোচ্চ অবস্থা বলা হয়, তাহা অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করেন—প্রস্তর বা স্পঞ্জ প্রভৃতির অবস্থার মত নয়। তাঁহাদের মতে জগতে মাত্র দুই প্রকার অস্তিত্ব আছে—এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট। অস্তিত্বকে এই দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিবার কি অধিকার তাঁহাদের আছে? চিন্তা হইতে অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি মৃদু হইলে আমরা দেখিতে পাই না, যখন ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়—তখনই আমাদের চক্ষে উহা আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। যখন আরও তীব্র হয়, তখনও আমরা উহা দেখিতে পাই না, উহা আমাদের চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকার কি ঐ প্রথমোক্ত অন্ধকারেরই মত? নিশ্চয়ই নয়। উহারা দুই মেরুপ্রান্তের ন্যায় ভিন্ন। প্রস্তরের চিন্তাশূন্যতা ও ভগবানের চিন্তাশূন্যতা কি একই প্রকারের? কখনই নয়। ভগবান্ চিন্তা করেন না; বিচার করেন না। কেন করিবেন? তাঁহার নিকট কি কিছু অজ্ঞাত আছে যে, তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে পারে না, আর ঈশ্বর বিচার করেন না—এই পার্থক্য। পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা মনে করেন যে, চিন্তার বাহিরে যাওয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার, তাঁহারা চিন্তার অতীত কিছু খুঁজিয়া পান না।

যুক্তিবিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি—সমুদয় অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, তখনই তুমি ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের প্রকৃত আরম্ভ। যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলা হয়, তাহা প্রকৃত জীবনের ভ্রূণাবস্থা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ—যাহারা কেবল বাক্য-ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তিগণ—নিজ শক্তিবলে যাঁহারা সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তায় স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না, তাঁহারা সকলেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, এই জীবন সেই অনন্তস্বরূপে পৌঁছিবার পথে একটি ছোট সোপান মাত্র। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা কেবল এইরূপ বলেন তাহা নয়, পরন্তু তাঁহারা সকলকেই সেই পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের সাধন-প্রণালী বুঝাইয়া দেন, যাহাতে সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ আর কোন পথ নাই। জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? কোন্ যুক্তি দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা হইয়া থাকিবে। ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাঁহাকেই যথার্থ অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে শূন্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা কোথাও দাঁড়াইতে পারি না। কেবল অর্থ, যশ, নামের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অপর সব বিষয়ে যদি কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট (Kant) নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথাঃ আমরা যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি। যোগীরা অতি সাহসের সহিত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং এমন এক বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহা যুক্তির ঊর্ধ্বে, সেখানেই আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যাহা আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া যায়, এমন বিষয় শিক্ষা করিবার ইহাই ফল। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে।'[২] ইহাই ধর্মবিজ্ঞান, অন্য কিছু নয়।

সমাধি-পাদ

অথ যোগানুশাসনম্‌ ॥ ১॥

সূত্রার্থ—এখন যোগ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২॥

সূত্রার্থ—চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ।

ব্যাখ্যা—এখানে অনেক কথা বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, চিত্ত কি ও বৃত্তিগুলিই বা কি। আমার এই চক্ষু আছে। চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রটি—দর্শনেন্দ্রিয়—অপসৃত কর, তখন তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের অক্ষিজাল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে-ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাও পড়িতে পারে, তথাপি চক্ষু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্রমাত্র। উহা প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নয়। দর্শনেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অন্তর্গত একটি স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। কেবল চক্ষু-দুইটিই যথেষ্ট নয়। কখনও কখনও লোকে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা যায়। আলো (এবং দর্শনেন্দ্রিয়) রহিয়াছে, বাহিরে চিত্র রহিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই। সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ বহির্যন্ত্র, মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র ও মন—এই তিনটি জিনিসের আবশ্যক। রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অনুভবক্রিয়ার জন্য চাই—প্রথমতঃ বাহিরের যন্ত্র, তারপর ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ উভয়েতে মনের যোগ। বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে মন আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষের (বা প্রকৃত আত্মার) নিকট অর্পিত হয়। তিনি তখন এই মিশ্রণটিকে একটি বস্তুরূপে উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়া যাহা হয়, তাহাকে ‘অন্তঃকরণ’ বলে। উহারা মনের উপাদান—চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াস্বরূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই-সকল চিন্তাতরঙ্গকে বৃত্তি (আক্ষরিকভাবে আবর্ত বা ঘূর্ণি) বলে। এখন জিজ্ঞাস্য—চিন্তা কি? ম্যাধ্যাকর্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির ন্যায় চিন্তাও একপ্রকার শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে চিত্ত-নামক যন্ত্রটি কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া অঙ্গীভূত করে এবং চিন্তারূপে প্রেরণ করে। খাদ্য হইতে আমাদের এই শক্তি সংগৃহীত হয়। ঐ খাদ্য হইতেই শরীর গতিশক্তি প্রভৃতি লাভ করে। অন্যান্য সূক্ষ্মতর শক্তিও খাদ্য হইতেই চিন্তারূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন চৈতন্যময় নয়, অথচ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ—মন কেবল একটি যন্ত্র, ইহাদ্বারা তুমি বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকখানির কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহা আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। উহা মনে আঘাত করে, মনও পুস্তকরূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্গাকারে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে প্রতিঘাত করে; সুতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। পুস্তকাকার, গজাকার বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের ইঙ্গিত বা উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, ‘ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিত্য সম্ভাব্যতার নাম জড়পদার্থ।’[৩] বাহিরে ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি শুক্তি লওয়া যাক। তোমরা জান, মুক্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়। এক বিন্দু বালুকণা, কীটাণু বা আর কিছু উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে; তখন সেই শুক্তি ঐ বালুকার চতুর্দিকে এক প্রকার এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে; তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। অনুভূতির এই জগৎ যেন আমাদের নিজেদের এনামেলস্বরূপ; বাস্তব জগৎ ঐ বালুকণা বা অন্যকিছু। সাধারণ লোকে কখনও ইহা বুঝিতে পারিবে না, কারণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ মনেরও অতীত। মন তাঁহার হস্তে একটি যন্ত্রতুল্য। তাঁহারই চৈতন্য মনের ভিতর দিয়া আসিতেছে। তুমি যখন মনের পশ্চাতে দ্রষ্টারূপে থাক, তখনই উহা চৈতন্যময় হইয়া উঠে। যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, তখন উহা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়, উহার অস্তিত্বই থাকে না। ইহা হইতে বুঝা গেল—চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। উহা মনের উপাদানস্বরূপ—বৃত্তিগুলি উহার তরঙ্গস্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য করে, তখনই উহা ঐ তরঙ্গস্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য করে, তখনই উহা ঐ তরঙ্গরূপ ধারণ করে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদের জগৎ।

আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন তরঙ্গগুলি শান্ত হয়, জল স্থির হইয়া যায়, তখনই কেবল উহার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোলা থাকে বা উহা ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই দেখা যাইবে না। যদি উহা নির্মল থাকে এবং উহাতে একটিও তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। হ্রদের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—হ্রদটি চিত্ত এবং উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তিস্বরূপ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্রিবিধ ভাবে অবস্থান করে; প্রথমটি অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও মূর্খদিগের মন; উহার কার্য কেবল অপরের অনিষ্ট করা; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদিত হয় না। দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা রজঃ—এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছা থাকে; আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্রভুত্ব করিব, তখন এই ভাব থাকে। তারপর যে অবস্থা, তাহাকে বলা হয় ‘সত্ত্ব’—ইহা শান্ত; এ অবস্থায় সকল তরঙ্গ থামিয়া যায়, মন-রূপ হ্রদের জল নির্মল হইয়া যায়—ইহা নিষ্ক্রিয় নয়, বরং অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা। শান্ত ভাব শক্তির উচ্চতম বিকাশ; ক্রিয়াশীল হওয়া তো সহজ। লাগাম

ছাড়িয়া দিলে অশ্বেরা তোমাকে সুদ্ধ লইয়া ছুটিতে থাকিবে।

যে-কেহ এরূপ করিতে পারে; কিন্তু যিনি এইরূপ লম্ফমান অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর পুরুষ। ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ সংযত করা—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তি অলস ব্যক্তির মত নয়। সত্ত্বভাবকে জড়তা বা অলসতা মনে করিও না। যিনি মনের এই তরঙ্গগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলতা নিম্নতর শক্তির ও শান্তভাব উচ্চতর শক্তির প্রকাশ।

এই চিত্ত সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। চিত্তকে দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরানো—ইহাই যোগের প্রথম সোপান; কারণ, কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে যাইতে পারে।

যদিও উচ্চতম হইতে নিম্নতম সকল প্রাণীর মধ্যেই এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মনুষ্যদেহেই উহাকে আমরা বুদ্ধিরূপে বিকশিত দেখিতে পাই। চিত্ত যতদিন না বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে এই-সকল বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। গোরু বা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ যদিও উহাদের মন (চিত্ত) আছে, উহা এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

এই চিত্ত অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র।[৪] মন এই চারি অবস্থায় চারি প্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। প্রথম 'ক্ষিপ্ত'—যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, যে অবস্থায় কর্মবাসনা প্রবল থাকে। এইরূপ মনের চেষ্টা—কেবলই সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হওয়া। তারপর 'মূঢ়' অবস্থা—উহা তমোগুণাত্মক; উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট করা। 'বিক্ষিপ্ত' অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকেই যাইবার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের ও মূঢ়াবস্থা অসুরদিগের স্বাভাবিক। 'একাগ্র' অবস্থায় চিত্তই কেন্দ্রীভূত হইতে চেষ্টা করে, এই অবস্থাই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া যায়।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥৩॥

তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) নিজের (অপরিবর্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত।

যখনই তরঙ্গগুলি শান্ত হইয়া যায় ও হ্রদ শান্তভাব ধারণ করে, তখনই আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই। মন সম্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে; যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি; তখন আমরা ঐ তরঙ্গগুলির সহিত নিজেদের মিশাইয়া ফেলি না, কিন্তু নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

অন্যান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে) দ্রষ্টা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন।

যেমন কেহ আমার নিন্দা করিল, ইহা এক প্রকার পরিণাম—এক প্রকার বৃত্তি—আমি উহার সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতেছি; উহার ফল দুঃখ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

বৃত্তি পাঁচ প্রকার—(কয়েকটি) ক্লেশ-যুক্ত ও (অপরগুলি) ক্লেশ-শূন্য।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিন্দা-স্মৃতয়ঃ ॥৬॥

প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিন্দা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান, শব্দভ্রম, নিন্দা ও স্মৃতি—বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ আপ্ত বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য—এগুলিই প্রমাণ।

যখন আমাদের দুইটি অনুভূতি পরস্পরের বিরোধী না হয়, তখন তাহাকেই 'প্রমাণ' বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাম; যদি উহা পূর্বানুভূত কোন বিষয়ের বিরোধী হয়, তবে আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, কখনই উহা বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ অনুভব বা 'প্রত্যক্ষ'—ইহা এক প্রকার প্রমাণ। যদি আমরা কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ 'অনুমান'—তুমি কোন চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখিলে, তাহা হইতে উহা যে-বিষয়ের সূচনা করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে। তৃতীয়তঃ 'আগম' বা আপ্তবাক্য—যাঁহারা প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে

আমাকে উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচাররূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিরক্তিকর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সকলের পারে গিয়াছেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সব এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সবই যেন একখানি পাঠ্যপুস্তক। আমাদের মত জ্ঞানলাভের কষ্টকর প্রণালীর ভিতর দিয়া তাঁহকে যাইতে হয় না। তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই জ্ঞানস্বরূপকে উপলব্ধি করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, আর এই জন্যই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। যদি বর্তমান সময়ে এরূপ কেহ জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার কথা অবশ্যই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে, অন্যান্য দার্শনিকেরা এই আপ্তবাক্য-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আপ্তবাক্য সত্য কেন? আপ্তবাক্যের প্রমাণ—উহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যেমন পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হইলে তুমি যাহা দেখ বা আমি যাহা দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আপ্তবাক্যের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; যখন ঐ জ্ঞান যুক্তি ও মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায়। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পারে, 'আমি চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি'—উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে না। প্রথমতঃ উহা সত্যজ্ঞান হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ উহা যেন আমাদের পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়; তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহা নির্ভর করে। অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি এরূপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ—দেখিবার আবশ্যক নাই, সে কি বলে, সেইটি জানাই বিশেষ আবশ্যক—সে কি বলে, তাহা আগে শুনিতে পাইবে। অন্যান্য বিষয়ে এ-কথা সত্য হইতে পারে; কোন লোক দুষ্ট-প্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা; কারণ কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত সত্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি নিজেকে 'আপ্ত' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কিনা। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কিনা। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত সে ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা মনুষ্যজাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা। কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে উহা পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়া যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহা দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে দেখিতে পারে, উহা সত্য কিনা। যিনি নিজের অর্জিত জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপ্ত নন। এই-সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে হইবে সেই ব্যক্তি পবিত্র, এবং তাঁহার কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নাই, তাঁহার লাভ অথবা যশের আকাঙ্ক্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার আমাদিগকে এমন কিছু দেওয়া আবশ্যক, যাহা আমরা ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পারি না ও যাহা জগতের কল্যাণকর। তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, উহা অন্যান্য সত্যের বিরোধী না হয়; অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ সেই ব্যক্তিই যে কেবল ঐ বিষয়ের অধিকারী, আর কেহ নয়, তাহা হইবে না। অপরের পক্ষেও যাহা লাভ করা সম্ভব, তিনি নিজের জীবনে তাহা কেবল কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকারঃ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অনুমান ও আপ্তবাক্য। এই 'আপ্ত' কথাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারিতেছি না। ইহাকে 'inspired' (অনুপ্রাণিত) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ এই অনুপ্রেরণা বাহির হইতে আসে বলিয়া মনে হয়, আর ঐ জ্ঞান ভিতর হইতে আসে। 'আপ্ত'-শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি পাইয়াছেন।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥

বিপর্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়।

আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রান্তি। ইহাকে 'বিপর্যয়' বলে; যাহা শুক্তিতে রজত-ভ্রম।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৯॥

কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্রম বলে।

বিকল্প-নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। ইহা চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন। সংযম-বিষয়ক মতবাদটি এখন বেশ বুঝা যাইবে। মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার সংযমের ক্ষমতা ততই কম। সর্বদা এই সংযমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিবে। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথবা দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখ যে, কোন একটি সংবাদ তোমার নিকট আসিবামাত্র কেমন করিয়া তোমার মন একটি বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥১০॥

যে বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা।

আর এক প্রকার বৃত্তির নাম 'নিদ্রা'—স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আমরা যখন জাগিয়া উঠি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম। অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্মৃতি হইতে পারে। যাহা আমরা অনুভব করি না, আমাদের সেই বিষয়ের কোন স্মৃতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই চিত্তহ্রদের একটি তরঙ্গ। নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন অনুভূতিই থাকিত না, সুতরাং আমরা উহা স্মরণও করিতে পারিতাম না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে পারি, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার তরঙ্গ ছিল। 'স্মৃতি' আর এক প্রকারের বৃত্তি।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥১১॥

অনুভূত বিষয়সকল যখন আমাদের মন হইতে চলিয়া না যায় (যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়), তাহাকে স্মৃতি বলে।

পূর্বে যে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেই স্মৃতি আসিতে পারে। মনে কর, তুমি একটি শব্দ শুনিলে। ঐ শব্দটি যেন চিত্তহ্রদে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করে। ইহাই স্মৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যখন নিদ্রা-নামক তরঙ্গবিশেষ চিত্তের ভিতর স্মৃতিরূপ তরঙ্গপরম্পরা উৎপন্ন করে, তখন উহাকে 'স্বপ্ন' বলে। জাগ্রৎকালে যাহাকে 'স্মৃতি' বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ তরঙ্গকেই 'স্বপ্ন' বলে।

অভ্যাসবইরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥১২॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়।

এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচারপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? কারণ প্রত্যেক কার্যই হ্রদের উপরিভাগে কম্পনশীল স্পন্দনস্বরূপ। এই কম্পন কালে মিলাইয়া যায়; থাকে কী? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেক সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব'—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সান্ত্বনা আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাস দূর করিতেও পারি। আমাদের মনের ভিতর দিয়া যে চিন্তাস্পন্দগুলি চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক-একটি দাগ রাখিয়া যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের চরিত্র এই-সকল সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। যখন কোন বিশেষ বৃত্তিতরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবান্বিত হয়। যখন সদগুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়; যদি মন্দভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ সুখী হইয়া থাকে। অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য করিয়া যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশা নাই; কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা ঐগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। পুনঃপুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥১৩॥

ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে 'অভ্যাস' বলে।

অভ্যাস কাহাকে বলে? চিত্তরূপী মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ উহার তরঙ্গাকারে বহির্গমন নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যাস।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

দীর্ঘকাল সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির) চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া যায়।

এই সংযম একদিনে আসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে পর আসে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে একটি অপূর্ব ভাব আসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে 'বৈরাগ্য' বা অনাসক্তি বলে।

দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক—(১) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অভিজ্ঞতা। এই দুই শক্তি আমাদের মনোহ্রদে নানা তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে। বৈরাগ্য এই শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিস্বরূপ। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন—এই কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তি-দ্বয়কে ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করা। মনে কর, আমি একটি পথ দিয়া যাইতেছি, একজন লোক আসিয়া আমার ঘড়িটি কাড়িয়া লইল। ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি, আমি নিজে দেখিলাম, উহা আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে পরিণত করিল। ঐ ভাব আসিতে দিবে না। যদি উহা নিবারণ করিতে না পার, তবে তোমার কোনই মূল্য নাই। যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝা যাইবে। আবার সংসারী লোক যে বিষয়ভোগ করে, তাহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, বিষয়ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য। এগুলি আমাদের ভয়ানক প্রলোভন। ঐগুলিকে অস্বীকার করা ও ঐগুলি লইয়া মনকে বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই বৈরাগ্য। স্বানুভূত ও পরানুভূত বিষয় হইতে আমাদের যে দুই প্রকার কার্যপ্রবৃত্তি জন্মায়, সেগুলিকে দমন করা ও এইরূপে চিত্তকে উহাদের বশীভূত হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। প্রবৃত্তিগুলি যেন আমার আয়ত্তে থাকে, আমি যেন উহাদের আয়ত্তাধীন না হই—এই প্রকার

মানসিক শক্তিকে বৈরাগ্য বলে; এই বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র উপায়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥১৬॥

যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।

যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে পুরুষ বা আত্মা কী ও গুণগুলিই বা কী, তাহা আমাদের জানা উচিত। যোগদর্শনের মতে সমুদয় প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে; ঐ গুণগুলির একটির নাম তমঃ অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সত্ত্ব। এই তিন গুণ বাহ্যজগতে অন্ধকার বা অলসতা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ও উহাদের সামঞ্জস্য—এই ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, সবই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মা ইহাদের সবগুলির বাহিরে—প্রকৃতির বাহিরে; উহা স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ; আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরে। চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি স্থূলতম ভূত পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত—প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রকৃতি মনুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; পঞ্চদশ সূত্রে বর্ণিত এই বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতি বশীভূত হয় বলিয়া উহা আত্মার প্রকাশের পক্ষে অতিশয় সাহায্যকারী। পরের সূত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাই যোগীর চরম লক্ষ্য।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ[৫] 'সম্প্রজ্ঞাতঃ'॥১৭॥

যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক সমাধি বলে।

সমাধি দুই প্রকার। একটিকে 'সম্প্রজ্ঞাত' ও অপরটিকে 'অসম্প্রজ্ঞাত' বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার সমুদয় শক্তি আসে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার। প্রথম প্রকারকে 'সবিতর্ক সমাধি' বলে। এই সমাধিতেই মনকে অন্যান্য বিষয় হইতে সরাইয়া বিষয়বিশেষের পুনঃপুনঃ অনুধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় দুই প্রকারঃ (১) চতুর্বিংশতি (জড়) তত্ত্ব ও (২) চেতন পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই সাংখ্যদর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার—ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে। উহাকে 'চিত্ত' বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে। আবার শক্তি ও ভূত উভয়েরই কারণস্বরূপ এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাকে 'অব্যক্ত' বলে—উহা সৃষ্টির প্রাক্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা। কল্পান্তে সমুদয় প্রকৃতিই উহাতে প্রত্যাবর্তন করে, আবার কিছুকাল পরে পরকল্পে উহা হইতেই সব পুনরাবির্ভূত হয়। এই সমুদয়ের অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃতি শক্তি। কোন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। যে প্রকার সমাধিতে বাহ্য স্থূল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। 'বিতর্ক' অর্থে প্রশ্ন—'সবিতর্ক' অর্থে প্রশ্নের সহিত। যে প্রকার ধ্যানে ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি ঐরূপ ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে—যেন এইজন্যই ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা—তাহাকে 'সবিতর্ক' বলে। কিন্তু শক্তি লাভ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহা কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র। আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগসুখ হইতেই পারে না। ভোগসুখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন উপদেশ; কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতি কঠিন। যখন সে ইহার ধারণা করিতে পারে, তখন সে জড় জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহ্যশক্তি বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পরিশেষে তাহা হইতে আবার যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিয়া পতঞ্জলি এই গুহ্যশক্তিলাভ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেও তিনি ভুলেন নাই।

আবার সেই ধ্যানেই যখন ঐ ভূতসমূহকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্ করিয়া ঐগুলির স্বরূপ চিন্তা করা করা যায়, তখন সেই সমাধিকে নির্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন ধ্যান আর এক সোপান অগ্রসর হয় এবং তন্মাত্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় করিয়া উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তখন ঐ ধ্যানকে 'সবিচার সমাধি' বলে। আবার ঐ সমাধিতে যখন ঐ সূক্ষ্মভূতগুলিকে দেশকাল-বিবর্জিত উহাদের স্বরূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 'নির্বিচার সমাধি' বলে। পরবর্তী সোপানে সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার ভূতের চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে—মনকেই ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজস্তমোগুণ হইতে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা হয়, তখন উহাকে 'সানন্দ সমাধি' বলে। যখন মনই ধ্যানের বিষয় হয়, যখন ঐ সমাধি একাগ্র ও পরিপক্ক হইয়া যায়, যখন স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক অহঙ্কার মাত্র বর্তমান থাকে, তখন উহাকে 'অস্মিতা-সমাধি' বলে। এই অবস্থাতেও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বেদে 'বিদেহ' বলিয়া থাকে। তিনি নিজেকে স্থূলদেহশূন্যরূপে চিন্তা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজেকে সূক্ষ্মশরীরধারী বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই। যাঁহারা এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরমপদ লাভ না করিয়া প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলে; কিন্তু যাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নন, তাঁহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষো ঽন্যঃ॥১৮॥

অন্যপ্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের দৃঢ় সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'; ঐ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না—আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। এক ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীত অবস্থায় (সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরও বাহিরে) যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। যদিও এই ধ্যানের প্রণালী খুবই সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এইঃ মনকেই ধ্যানের বিষয় কর; যখনই মনে কোন চিন্তা আসিবে, তখনই উহা দমিত কর; মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আসিতে না দিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য কর। যখনই আমরা যথার্থরূপে ইহা সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই আমরা মুক্তি লাভ করিব। পূর্ব সাধন যাহাদের আয়ত্ত হয় নাই, তাহারা যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের চিত্ত অজ্ঞানস্বভাব তমোগুণ দ্বারা আবৃত্ত হইয়া যায়, তমোগুণ তাহাদের মনকে অলস ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। তাহারা কিন্তু মনে করে—আমরা মনকে শূন্য করিতেছি। ইহা ঠিকঠিকভাবে সাধন করিতে পারা উচ্চতম শক্তির প্রকাশ—সংযমের চূড়ান্ত। যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়, তখন ঐ সমাধি নির্বীজ হইয়া যায়।—ইহার অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহারা সংস্কার বা বীজাকারে থাকে, আবার সময় আসিলে পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন সংস্কারগুলিকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসে, তখনই সমাধি নির্বীজ হইয়া যায়। তখন মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে এই জীবন-লতিকা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে—যাহা হইতে এই অবিরাম জন্মমৃত্যু আবর্তিত হইতে পারে।

অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, যেখানে জ্ঞান থাকিবে না, যেখানে মন থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা? যাহাকে আমরা 'জ্ঞান' বলি, তাহা ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় এক নিম্নতর অবস্থামাত্র। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রান্তদ্বয় প্রায় একই প্রকার দেখায়। ইথারের কম্পন মৃদুতম হইলে উহাকে 'অন্ধকার' বলে, মধ্য অবস্থায় 'আলোক' উহার উচ্চতম কম্পন আবার অন্ধকার। কিন্তু ঐ দুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি —প্রকৃত অন্ধকার, অপরটি—অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহারা দেখিতে একই প্রকার। এইরূপে অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, আর ঐ জ্ঞানের অতীত একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা দেখিতে একই প্রকার। আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, তাহা এক উৎপন্ন দ্রব্য—উহা একটি মিশ্র পদার্থ, উহা প্রকৃত সত্য নয়।

এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভ্যাস করিলে কি ফল হইবে? উহার ফলে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে মনের যে একটা প্রবণতা ছিল, তাহা তো নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া যাইবে। অপরিষ্কৃত সুবর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির করিবার জন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। যখন খনি হইতে উত্তোলিত ধাতুকে গলান হয়, তখন যে রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশান হয়, সেগুলি ঐ খাদের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই সর্বদা সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ও সৎপ্রবৃত্তিগুলিও চলিয়া যাইবে। এইরূপে সদসৎ প্রবৃত্তিদ্বয় পরস্পরকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ভালমন্দ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া আত্মা স্ব-মহিমায় সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞরূপে অবস্থান করিবেন। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মা সর্বশক্তিমান্ হন; জীবনে অভিমান ত্যাগ করিয়াই জীবাত্মা মৃত্যু অতিক্রম করেন, কারণ তখন তিনি মহাপ্রাণরূপে অবস্থান করেন। তখনই জীবাত্মা জানিতে পারিবেন, কোনকালে তাঁহার জন্মমৃত্যু ছিল না, তাঁহার কখনই স্বর্গ বা পৃথিবী কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন তিনি বুঝিবেন, তিনি কখনও আসেন নাই, কোথাও যান নাই, আসা-যাওয়া—কেবল প্রকৃতির। আর প্রকৃতির ঐ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। দেওয়াল যেন ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি! আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ; চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা নিজেকে নানারূপে পরিণত করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিয়া যাইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন—প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয়, আজ্ঞা করিবেন—তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে; তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। সাংখ্যদর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এই দর্শনের মতে জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আবার আত্মা হয় বদ্ধ, না হয় মুক্ত। যে আত্মা প্রকৃতিদ্বারা বদ্ধ বা বশীভূত, তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি তো নিজেই ক্রীতদাস। অপর পক্ষে আত্মা যদি মুক্তই হন, তবে মুক্ত আত্মা কেন সৃষ্টি করিবেন, কেনই বা এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ করিবেন? উঁহার কোন বাসনা নাই, সুতরাং উঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতবাদ অনাবশ্যক। প্রকৃতি স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা করা যায়, তখন ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, যাঁহারা সিদ্ধাবস্থার প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মন কিছুকাল প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাঁহারা প্রকৃতির প্রভুরূপে পুনরাবির্ভূত হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, আনন্দময় বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, 'না, ঈশ্বর একজন আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্মা—সমুদয় পুরুষ হইতে পৃথক্ একজন বিশেষ পুরুষ আছেন; তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সকল গুরুর গুরু।' সাংখ্যেরা যাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলেন, যোগীরা তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ যোগী। কিছুকালের জন্য তাঁহাদের চরমলক্ষ্য-প্রাপ্তি ব্যাহত হয়, তাঁহারা সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের নিয়ন্তারূপে অবস্থান করেন।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ ॥১৯॥

(এই সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে ঐ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ নন।

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ॥২০॥

অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়।

যাঁহারা দেবত্বপদ অথবা কোন কল্পের শাসনভার প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে। তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥২১॥

যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাঁহারা অতি শীঘ্রই যোগে কৃতকার্য হন।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষঃ ॥২২॥

আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা অনুসারে যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥২৩॥

অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি লাভ হয়)।

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ কর্ম কর্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর (পরম নিয়ন্তা)।

আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাংখ্যাদর্শনের উপর স্থাপিত, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। যোগীদিগের 'ঈশ্বর' অর্থে জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সূচিত হন নাই, বেদমতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা। বেদের অভিপ্রায় এই—জগতে যখন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য একজনের ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে।

যোগীরা ঈশ্বরাস্তিত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহাদের নিজস্ব এক নূতন ধরনের যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥২৫॥

অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ (মাত্র) আছে, তাহা তাঁহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে।

অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতর মনকে ভ্রমণ করিতেই হইবে। তুমি অবশ্য সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে পার, কিন্তু উহা চিন্তা করিতে গেলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে ঐ দেশরূপ ক্ষুদ্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার চতুর্দিকে অনন্ত-বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে। কাল সম্বন্ধেও ঐ কথা। মনে কর, তুমি এক সেকেণ্ড সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্তকালের কথা চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ, মানুষে কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে। যোগীরা সেই অনন্ত জ্ঞানকেই ঈশ্বর বলেন।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬॥

তিনি পূর্ব পূর্ব (প্রাচীন) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

আমাদের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে জাগরিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্তু উহাকে জাগাইতে হইবে। আর যোগীরা বলেন, ঐরূপে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। প্রাণহীন অচেতন জড়ের প্রভাবে কখনও জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণের আমাদের নিকট থাকা

প্রয়োজন, সুতরাং এই গুরুগণের প্রয়োজন সর্বদাই ছিল। পৃথিবী কখনও এই প্রকার আচার্য-বিরহিত হয় নাই। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ঈশ্বর সকল গুরুর গুরু, কারণ এই-সকল গুরু যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা দেবতাই হউন, অথবা দেবদূতই হউন সকলেই বদ্ধ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বারা বদ্ধ নন।

যোগীদিগের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দুইটিঃ প্রথমটি এই যে, সান্ত বস্তুর চিন্তা করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। আর যদি ঐ মানসিক অনুভূতির এক অংশ সত্য হয়, তবে উহার অপর অংশও সত্য হইবে। কারণ—দুইটিই যখন সেই একই মনের অনুভূতি, তখন দুইটি অনুভূতির মূল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্পজ্ঞ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে—যদি এই দুইটি অনুভূতির একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ করিব না কেন? যুক্তি বলে—উভয়কে গ্রহণ কর, নতুবা উভয়কে পরিত্যাগ কর। যদি বিশ্বাস করি যে, মানব অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার নিজের ভিতর হইতেই বিকাশিত হয়—এ-কথা সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কতকগুলি অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। গুরু ব্যতীত আমরা কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এখন কথা হইতেছে, যদি মনুষ্য দেবতা বা স্বর্গীয় দূতবিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই তো সসীম; তাঁহাদের পূর্বে কে গুরু ছিলেন? বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতেই হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবিচ্ছিন্ন নন। সেই এক অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরু, যাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাঁহাকেই 'ঈশ্বর' বলে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥২৭॥

প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাঁহার প্রকাশক শব্দ।

তোমার মনে যে-কোন ভাব আছে, তাহারই একটি প্রতিরূপ শব্দও আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যায় না। একই বস্তুর বাহ্যভাগটিকে 'শব্দ' ও অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা 'ভাব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্লেষণবলে কেহই চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক্ করিতে পারে না। কতকগুলি লোক একত্র বসিয়া কোন্ ভাবের জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে করিতে ভাষা উৎপন্ন করিয়াছে—এইরূপ অনেকের মত; কিন্তু ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, ততদিন শব্দ ও ভাষা দুইই রহিয়াছে। ভাব ও শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ কি? যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাকা চাই-ই চাই, কিন্তু এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, তাহা নয়। কুড়িটি ভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য একটি না একটি শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক প্রকার ধ্বনিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেইজন্য আমাদের টীকাকার বলিয়াছেন, 'যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাইতেছে না।'[৬] এই সমস্ত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলা যায়, তাহা না হইলে সেই বাচক শব্দ কখনই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বাচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক। যদি সে বাচ্য বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ব হইতে থাকে, আর আমরা যদি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাই যে, ঐ বাচক শব্দটি ঐ বস্তুকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ বাচ্য-বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি ঐ পদার্থগুলি উপস্থিত নাও থাকে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহাদের বাচকের দ্বারাই সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী; অতএব যখন ঐ বাচক শব্দটি উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহা ঐ বাচ্য-পদার্থটির কথা মনে জাগাইয়া দিবে। সূত্রকার বলিতেছেন, 'ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক'। কেন তিনি এই শব্দটির উপর জোর দিলেন? 'ঈশ্বর' ভাবটি বুঝাইবার জন্য তো শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি ভাবের সহিত সহস্র সহস্র শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর-ভাবটি শত শত শব্দের সহিত রহিয়াছে, উহার প্রত্যকটিই তো ঈশ্বরের বাচক। বেশ কথা, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। ঐ বাচকগুলির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান—সাধারণ শব্দ-ভূমি বাহির করিতে হইবে, আর যে বাচক শব্দটি সাধারণ বাচক হইবে, সেই শব্দটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই সকলের প্রতিনিধিরূপে উহার যথার্থ বাচক হইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে আমরা কণ্ঠনালী ও তালুকে শব্দোচ্চারণের আধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশ, যাহা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক শব্দ? —'ওঁ' (অউম্) এই প্রকার শব্দ; উহাই সমুদয় শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ। উহার প্রথম অক্ষর 'অ' সমুদয় শব্দের মূল—উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাস্বরূপ, উহা জিহ্বা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। 'ম'-বর্গীয় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিতে হয়। আর 'উ' এই শব্দ জিহ্বামূল হইতে মুখ-মধ্যবর্তী শব্দাধারের শেষ সীমা পর্যন্ত যেন গড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে 'ওঁ' শব্দটি দ্বারা সমুদয় শব্দোচ্চারণ-ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাচক শব্দ—উহাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বরূপ। যত প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে—আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্দ-উচ্চারণের সম্ভাবনা আছে, উহা সেই সকলেই সূচক।

এই-সকল আনুমানিক গবেষণা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, সব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহও এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ উত্তর এই—সর্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, 'ওঙ্কার' তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি

নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শপ্রকাশের জন্য এই 'ওঙ্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই 'ওঙ্কার' মানব জাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরেজী 'গড়্' (God) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), পূর্ণ বা পরম (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; ঐগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু 'ওঁ'-শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥২৮॥

এই ওঙ্কারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের উপায়)।

পুনঃপুনঃ উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? অবশ্য আমাদের সংস্কারবিষয়ক মতবাদের কথা স্মরণ আছে; সংস্কার-সমষ্টিই আমাদের মনের মধ্যে বাস করে; ক্রমশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হইয়া তাহারা অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই ব্যক্তভাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনই থামিবে না। যখন এই বিশ্বজগৎ লয় পাইবে, তখন বিরাট বিরাট স্পন্দন সব অন্তর্হিত হইবে; সূর্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী—সবই লয় হইয়া যাইবে; কিন্তু স্পন্দন—পরমাণুগুলির মধ্যে থাকিবে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কার্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণুতে সেই কার্যই সাধিত হইতেছে। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে যেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ। চিত্তের স্পন্দন যখন স্তিমিত হইবে, তখনও পরমাণু-স্পন্দন চলিতে থাকিবে, উত্তেজক কারণ পাইলেই ঐগুলি পুনঃপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। জপ বা পুনঃপুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বুঝা যাইবে। আমাদের ভিতর যে-সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জপ সেগুলিকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ ভবসমুদ্রপারের একমাত্র নৌকাস্বরূপ হয়।[৭] সঙ্গের এতদূর শক্তি! বাহ্য সৎসঙ্গের যেমন শক্তি, আন্তর সৎসঙ্গেরও তেমনি শক্তি। এই ওঙ্কারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। পুনঃপুনঃ উচ্চরণ কর এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহা হইলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক আসিবে এবং আত্মা প্রকাশিত হইবেন।

কিন্তু যেমন 'ওঁ'—এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, সেই সঙ্গে উহার অর্থও চিন্তা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখা দেয়। একই ভাবে আমাদের ভিতরে যে-সকল শুভ সংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত থাকিলেও সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে—ব্যক্তভাব ধারণ করিবে। সৎসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, কারণ সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায়—চিত্তহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার উপক্রম করে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমো ঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

উহা হইতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় ও যোগবিঘ্নসমূহ নাশ হয়।

এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল অনুভব করিবে—অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে এবং মানসিক ও শারীরিক যোগবিঘ্নসমূহ দূরীভূত হইতেছে। এখন প্রশ্ন—এই যোগবিঘ্নগুলি কি কি?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা স্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥

রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যমরাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, ঐ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে পতিত হওয়া—এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপকর অন্তরায়।

ব্যাধিঃ জীবন-সমুদ্রের অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য এই শরীরই আমাদের একমাত্র নৌকা। বিশেষভাবে ইহার যত্ন করিতে হইবে। অসুস্থ ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না। স্ত্যানঃ মানসিক জড়তা আসিলে আমাদের যোগবিষয়ক প্রবল অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়; উহার অভাবে সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে না। সংশয়ঃ আমাদের এই যোগবিজ্ঞান-বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন দূরদর্শন-দূরশ্রবণাদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, ততদিন এই বিদ্যার সত্যতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে। এইগুলির একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে সাধক আরও অধ্যবসায়শীল হয়। অনবস্থিতত্বঃ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন করিবার সময় দেখিবে—মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে; বোধ হইতেছে তুমি সাধনপথে দ্রুত উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে হঠাৎ তোমার এই উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল। জাহাজ চড়ায় ঠেকিলে যেরূপ অসহায় হইয়া যায়, তোমার সেইরূপ হইয়াছে। এরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্য হইও না। এইরূপে বারবার উত্থান-পতন পথেই অগ্রগতি হইয়া থাকে।[৮]

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুব ॥৩১॥

দুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

যখনই একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তখনই মন ও শরীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে। সাধন যখন ঠিক পথে চালিত না হয়, অথবা যখন চিত্ত যথেষ্ট সংযত না থাকে, তখনই এই বিঘ্নগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। ওঙ্কার জপ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে মন দৃঢ় হয়, এবং দেহে মনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়। সাধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্নায়বীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ওদিকে খেয়াল না করিয়া সাধন করিয়া যাও। সাধনের দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥

ইহা নিবারণের জন্য 'এক-তত্ত্ব' অভ্যাস আবশ্যক।

কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন একটি বিষয়বিশেষের আকারে আকারিত করিবার চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত বিঘ্নগুলি চলিয়া যায়। এই উপদেশটি খুব সাধারণভাবে দেওয়া হইল। পরবর্তী সূত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে।এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, এইজন্য নানাপ্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে পারেন—কোন্‌টি তাঁহার পক্ষে খাটে।

মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপু ণ্যা-
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥৩৩॥

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও পাপীর প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্যক। আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি দয়াবান্ হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে দেখিলে সুখী হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, তখন সেইগুলির প্রতিও আমাদের ঐরূপ ভাব ধারণ করা আবশ্যক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি 'মৈত্রী' অর্থাৎ অনুকূল ভাব ধারণ করা আবশ্যক। এইরূপে যদি কোন দুঃখকর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি 'করুণা'ভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকল ভাব আসিলে মন শান্ত হইয়া যাইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ গোলযোগ ও অশান্তির কারণ মনের ঐ-সকল ভাব ধারণ করিবার অক্ষমতা। মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতিকার করিতে উদ্যত হইলাম। আর আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না লইয়া থাকিতে পারি না, তাহার কারণ আমরা চিত্তকে সংযত রাখিতে পারি না। চিত্ত উহার প্রতি তরঙ্গাকারে ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। আমাদিগের মনে ঘৃণা অথবা অপরের প্রতি অনিষ্টভাব-পোষণরূপ যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা শক্তির অপচয়-মাত্র। আর কোন অশুভ চিন্তা বা ঘৃণাপ্রসূত কার্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকারী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নয়, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের অনুকূল শুভশক্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য॥৩৪॥

যথাযথ রেচক ও কুম্ভক দ্বারা (চিত্ত স্থির হয়)।

এখানে 'প্রাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নয়। সমগ্র জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম 'প্রাণ'। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, যাহা কিছু কাজ করিতে পারে, অথবা যাহার জীবন আছে, তাহাই এই প্রাণের বিকাশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে। কল্পারম্ভের প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ গতিহীন অবস্থায় (অব্যক্ত) থাকে, আবার কল্পারম্ভ-কালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে; ইহাই মনুষ্যজাতি অথবা অন্যান্য প্রাণীতে স্নায়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, ঐ প্রাণই আবার চিন্তা ও অন্যান্য শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মনুষ্যদেহেও ঐরূপ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সকল পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, আর বিভিন্ন শক্তি প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই 'প্রাণায়াম'। যোগশাস্ত্রের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটি মহতী বিদ্যা করিয়া তুলিয়াছেন। পতঞ্জলির মতে ইহা চিত্তবৃত্তিনিরোধের বহু উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। তাঁহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার ভিতরে টানিয়া লইবে এবং কিছুক্ষণ উহা ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত একটু স্থির হইবে। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা হইতেই 'প্রাণায়াম' নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরবর্তী যোগিগণ কি বলেন, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আবশ্যক।

এ-বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের মনে রাখিবার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই 'প্রাণ' বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না; যে শক্তিবলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাসপ্রশ্বাসেরও প্রাণস্বরূপ, তাহাকে 'প্রাণ' বলে। আবার সমুদয় ইন্দ্রিয় বুঝাইতেও এই 'প্রাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়কেই 'প্রাণ' বলে। মনকেও আবার 'প্রাণ' বলে। অতএব দেখা গেল যে, 'প্রাণ'= শক্তি। তথাপি আমরা ইহাকে শক্তি-নামে অভিহিত করিতে পারি না, কারণ শক্তি ঐ প্রাণের বিকাশস্বরূপ। শক্তি ও নানাবিধ গতিরূপে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। মনের উপাদান চিত্ত যন্ত্রবৎ

চতুর্দিক হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করে এবং এই প্রাণ হইতেই শরীর-রক্ষার হেতুভূত ভিন্ন ভিন্ন জীবনীশক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে। এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াদ্বারা আমরা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। আমরা প্রথমতঃ ঐগুলিকে চিনিতে আরম্ভ করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করি, এবং ঐগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।

পতঞ্জলির পরবর্তী যোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ আছে। একটিকে তাঁহারা 'ইড়া' অপরটিকে 'পিঙ্গলা' ও তৃতীয়টিকে 'সুষুম্না' বলে। তাঁহাদের মতে—পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণদিকে, ইড়া বামদিকে, আর ঐ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শূন্য নালী সুষুম্না আছে। তাঁহাদের মতে—ইড়া ও পিঙ্গলা নামক শক্তিপ্রবাহদ্বয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবাহিত, উহাদের সাহায্যেই আমরা শরীরের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতেছি। সুষুম্না সকলের মধ্যেই আছে বটে, তবে কেবল যোগীর শরীরেই উহার কাজ হয়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যোগী যোগসাধনবলে নিজের দেহ পরিবর্তিত করেন। যতই সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; সাধনের পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে আর সেরূপ থাকিবে না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়; ইহা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা যাহা কিছু নূতন চিন্তা করি, তাহাই যেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া একটি নূতন প্রণালী নির্মাণ করিয়া দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, মনুষ্যস্বভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; মানুষের স্বভাবই এই যে, উহা পূর্বাবর্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, কারণ উহা অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে করা যায়—মন একটি সূচি আর মস্তিষ্ক উহার সম্মুখে একটি কোমল পিণ্ডমাত্র, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্কমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ ঐ পথটিকে পৃথক্ রাখিবার জন্য উহার একটি সীমানা প্রস্তুত করিয়া দেয়। যদি ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোন স্মৃতি সম্ভব হইত না, কারণ স্মৃতির অর্থ—পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার উপর দাগা বুলান। হয়তো তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সকলের পরিচিত কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া ঐগুলিরই ঘোরফের করিয়া কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা সহজেই আমার কথা বুঝিতে পার; ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এই চিন্তার পথ বা প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, কেবল ঐগুলিতে ফিরিয়া আসিতে হয়, এইমাত্র। কিন্তু যখনই কোন নূতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, তখনই মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী নির্মাণ করিতে হয়; এইজন্য তত সহজে উহা বুঝা যায় না। এইজন্য মস্তিষ্ক—মানুষেরা নয়, মস্তিষ্কই—অজ্ঞাতসারে এই নূতন ধরনের ভাব দ্বারা পরিচালিত হইতে অস্বীকার করে, উহা যেন উহার গতিরোধ করে। প্রাণ নূতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তিষ্ক তাহা করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী ইহাই তাহার গূঢ় রহস্য। মস্তিষ্কের মধ্যে এই প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে থাকে, আর প্রাণরূপ সূচি উহার ভিতর যত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত করে, মস্তিষ্ক ততই রক্ষণশীল হইবে, ততই উহা নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। মানুষ যতই চিন্তাশীল হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথগুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে, ততই সহজে সে নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করিবে ও বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক নূতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। মস্তিষ্কে একটি নূতন ভাব আসিলেই মস্তিষ্কের ভিতর নূতন প্রণালী নির্মিত হয়। এইজন্য যোগ-অভ্যাসের সময় আমরা প্রথমে এত শারীরিক বাধা প্রাপ্ত হই, কারণ যোগ নূতন চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ধর্মের যে অংশ প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহা বহু লোকের গ্রাহ্য হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, যাহা কেবল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া ব্যাপৃত, তাহা সাধারণতঃ অবহেলিত হয়।

আমাদের এই জগতের সংজ্ঞা কি, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক; জগৎ আমাদের সজ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত (প্রক্ষেপিত) অনন্ত সত্তামাত্র। অনন্তের কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা আমাদের 'জগৎ' বলিয়া থাকি। তাহা হইলেই দেখা গেল, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। অনন্তের যেটুকু ভাগ আমাদের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, যেটুকু দেশকালনিমিত্তরূপ পিঞ্জরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, এইটুকু লইয়া ধর্মের যে অংশ ব্যাপৃত, তাহা সহজে বোধগম্য হয়, কারণ, আমরা তো পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে রহিয়াছি, আর এই জগতের ভাব প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ধর্মের যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন; সেইজন্য উহার চিন্তায় মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন বিপর্যস্ত হয়; সেইজন্য সাধন করিতে গিয়া সাধারণ মানুষ প্রথমটা চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যথাসম্ভব এই বিপর্যয়ের ভাব কমাইবার জন্যই পতঞ্জলি এই-সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন; যাহাতে এগুলি হইতে নির্বাচন করিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী একটি সাধন-প্রণালী আমরা অভ্যাস করিতে পারি।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥৩৫॥

যে-সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি হয়, সেই-সকল সমাধি মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে।

ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই ইহা আপনা-আপনি আসিতে থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ অনুভব করা যায়। এইরূপে জিহ্বামূলে মনকে একাগ্র করিলে, সুন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে দিব্য রসাস্বাদ হয়, জিহ্বামধ্যে মনঃসংযম করিলে বোধ হয়, কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। তালুতে মনঃসংযম করিলে দিব্যরূপসকল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়া উহার সত্যতায় সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই-সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না; তখন সে অধ্যবসায়-সহকারে সাধন করিতে থাকিবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥৩৬॥

শোকরহিত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়।

ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন একটি পদ্ম রহিয়াছে, তাহার পাপড়ি অধোমুখে; উহার মধ্য দিয়া সুষুম্না গিয়াছে। তারপর পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, পাপড়ির সহিত ঐ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হইয়াছে, আর ঐ পদ্মের মধ্যে মহাজ্যোতিঃ রহিয়াছে। ঐ জ্যোতির ধ্যান কর।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥৩৭॥

অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

কোন সাধুপুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, যাঁহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, যাঁহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া জানো, তাঁহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবে। ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় আছে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥৩৮॥

অথবা স্বপ্নাবস্থায় কখনও কখনও যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার (এবং নিদ্রা বা সুষুপ্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্ত্বিক সুখের) ধ্যান করিলেও চিত্ত প্রশান্ত হয়।

কখনও কখনও লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, সে তাহা শুনিতেছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে। জাগরণের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে যে-কোন পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥৩৯॥

অথবা যে-কোন জিনিষ তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই ধ্যান দ্বারা (সমাধি লাভ হয়)।

অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাস—যে-কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, যে-কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাস, যে-কোন ভাব তুমি খুব ভালবাস, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর।

পরমা ণু-পরমমহত্ত্বা ন্তোঽস্য বশীকারঃ ॥৪০॥

এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পর্যন্ত তাঁহার মন অব্যাহত গতি লাভ করে।

মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই (মনোবৃত্তিরূপ) মনের তরঙ্গগুলিও ক্ষীণতর হইয়া আসে।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহী তৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু
ততস্থ-তদঞ্জনতা -সমাপত্তিঃ ॥৪১॥

যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় (বশীভূত হয়), তাঁহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তুতে (অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি লাভ হয়? আমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, পূর্বে এক সূত্রে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থূল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া; পরে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বস্তু আমাদের সমাধির বিষয় হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই-সকল সমাধির অভ্যাস দ্বারা স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ও আমরা সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় যোগী তিনটি বস্তু দেখিতে পান—গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থূল, যথা—শরীর বা জড় পদার্থসমুদয়। দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম বস্তুসমুদয়, যথা—মন বা চিত্তাদি। তৃতীয়তঃ গুণবিশিষ্ট পরুষ অর্থাৎ অস্মিতা বা অহঙ্কার। এখানে 'আত্মা' বলিতে উহার যথার্থ স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। অভ্যাসের দ্বারা যোগী এই-সকল ধ্যানের দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার এতাদৃশী একাগ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই অন্যান্য বস্তু মন হইতে সরাইয়া দিতে পারেন। তিনি যে-বিষয় ধ্যান করেন, সে-বিষয়ের সহিত এক হইয়া যান (তৎস্থিততা ও তদঞ্জনতা); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন একখণ্ড স্ফটিকতুল্য হইয়া যান; পুষ্পের নিকট স্ফটিক থাকিলে, ঐ স্ফটিক যেন পুষ্পের সহিত প্রায় এক হইয়া যায়; যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ফটিকটিও

লোহিত দেখায়, যদি পুষ্পটি নীল হয়, তবে স্ফটিকটিও নীল দেখায়।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥৪২॥

শব্দ, অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

এখানে 'শব্দ' অর্থে কম্পন। 'অর্থ' অর্থে যে স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর 'জ্ঞান' অর্থে প্রতিক্রিয়া। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা শুনিলাম, পতঞ্জলি এ-সবগুলিকেই সবিতর্ক বলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিতে আমরা বিষয়ী ও বিষয়—এই দ্বৈতভাব রক্ষা করি; শব্দ উহার অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞানের মিশ্রণে উহা উৎপন্ন হয়। প্রথম বাহ্যকম্পন—শব্দ; উহা ইন্দ্রিয়-প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত হইলে তাহাকে 'অর্থ' বলে। তারপর চিত্তে এক প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ আসে, উহাকে 'জ্ঞান' বলা যায়। যাহাকে আমরা জ্ঞান (বাহ্যবস্তুর অনুভূতি) বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির মিশ্রণ বা সমষ্টি (সঙ্কীর্ণ) মাত্র। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা পাইয়াছি, তাহার সবগুলিতে এই মিশ্রণই আমাদের ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হইবে, তাহা উচ্চতর।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥৪৩॥

যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক থাকে না, যখন উহা ধ্যেয় বস্তুর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি।

পূর্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, এই তিনটি একত্র অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আসে, যখন উহারা আর মিশ্রিত হয় না, তখন আমরা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। এখন প্রথমতঃ এই তিনটি কি, তাহা আমরা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। চিত্তের কথা ধরা যাউক—পূর্বের সেই হ্রদের উপমার কথা স্মরণ কর; চিত্তকে হ্রদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তুর কম্পন যেন উহার উপর একটি তরঙ্গের ন্যায় আসিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই ঐ স্থির হ্রদ রহিয়াছে। মনে কর, আমি 'গো' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার চিত্তহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঐ তরঙ্গটি 'গো'শব্দ-সূচিত ভাব; আমরা উহাকেই আকার বা অর্থ বলিয়া থাকি। তুমি যে মনে করিয়া থাক, আমি একটি 'গো'কে জানি, উহা কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তরঙ্গমাত্র। উহা বাহ্য ও আভ্যন্তর শব্দপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গটিও লয় পায়। একটি বাক্য বা শব্দ ব্যতীত তরঙ্গ থাকিতে পারে না। অবশ্য তোমার মনে হইতে পারে যে, যখন কেবল 'গো'-বিষয়ে চিন্তা কর অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কানে আসে না, তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন ঐ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাক। তুমি তখন নিজের মনে-মনেই 'গো' এই শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে থাক, তাহা হইতেই তোমার অন্তরে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন তরঙ্গ উঠিতে পারে না; যখন বাহির হইতে ঐ উত্তেজনা আসে না, তখন ভিতর হইতেই উহা আসে। আর যখন শব্দটি থাকে না, তখন তরঙ্গটিও থাকে না। তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উহাই জ্ঞান। এই তিনটি আমাদের মনে এত দৃঢ়সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, তখনই ইন্দ্রিয়গণ কম্পিত হইয়া থাকে, আর প্রবাহসকল প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারা একটির পর আর একটি এত শীঘ্র আসিয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়া লওয়া অতি কঠিন; এখানে যে সমাধির কথা বলা হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে সকল সংস্কারের আধারভূমি স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই আমরা ঐগুলির মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে পৃথক্ করিতে পারি, ইহাকেই নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি বলে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথা বলা হইল, তদ্দ্বারাই সবিচার ও নির্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় সূক্ষ্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল।

এখানে পূর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্বোক্ত দুইটি ধ্যানের বিষয় স্থূল, এখানে ধ্যানের বিষয় সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গ- -পর্যবসানম্ ॥৪৫॥

সূক্ষ্মবিষয় অলিঙ্গে অর্থাৎ অব্যক্ত বা প্রধানে (প্রকৃতিতে) পর্যবসিত হয়।

ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থূল বলে। সূক্ষ্মবস্তু তন্মাত্র হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিস্বরূপ), অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব (যাহা সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান (প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত), এ-সবই সূক্ষ্ম বস্তুর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর পড়েন না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥৪৬॥

পূর্বোক্ত সমাধিগুলি সবই সবীজ সমাধি।

এই সমাধিগুলিতে পূর্বকর্মের বীজ নাশ হয় না। সুতরাং ঐগুলি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। তবে এগুলি দ্বারা কি হয়? তাহা পরবর্তী সূত্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

নির্বিচার-বৈশারদ্যে ঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥৪৭॥

নির্বিচার সমাধিতে সত্ত্বগুণপ্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়—(ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা)।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা॥৪৮॥

উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে ঋতম্ভর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে। পরসূত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য (আপ্ত বাক্য) ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা সাধারণ বস্তুবিষয়ক। পূর্বকথিত সমাধি হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা উহা অপেক্ষা উচ্চতর। ইহা যেখানে পৌঁছায়, বিশ্বস্ত জনের বাক্য বা অনুমান সেখানে পৌঁছাতে পারে না।

ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণ-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষানুভব, তদুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। 'বিশ্বস্ত লোক' অর্থে যোগীরা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, 'ঋষি' অর্থে বেদবর্ণিত ভাবগুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ যাঁহারা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এইজন্য যে, উহা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাঁহারা বলেন, শুধু শাস্ত্র আমাদিগকে সত্য অনুভব করাইতে কখনই সমর্থ নয়। আমরা সমগ্র বেদ পাঠ করিলাম, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্তু যখন আমরা সেই শাস্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কার্য করি, তখনই আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে-অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান যেখানে ঘেঁষিতে পারে না, উহা সেখানেও প্রবেশ করিতে সমর্থ, সেখানে আপ্তবাক্যেরও কোন কার্যকারিতা নাই। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম, উহাই ধর্মের সার, আর অবশিষ্ট যাহা কিছু—যথা ধর্মবক্তৃতাশ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তকপাঠ বা বিচার—কেবল ঐ পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নয়। কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সায় দেওয়া বা না-দেওয়া প্রকৃত ধর্ম নয়। যোগীদের মূল ভাব এই যে, আমরা যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি, ধর্মও তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বরং ধর্ম আরও গভীরভাবে অনুভূত হইতে পারে। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্মের যে-সকল প্রতিপাদ্য সত্য আছে, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ঐগুলি প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে না। চক্ষুদ্বারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বা হস্তদ্বারা ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারি না। আর ইহাও জানি যে, বিচার আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে না; উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সমস্ত জীবন আমরা বিচার করিতে পারি, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে পারিব না। এইরূপ বিচার তো সহস্রবর্ষ ধরিয়া চলিতেছে; আমরা যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি, তাহাই ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়া থাকি। অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়ানুভূতিরূপ গণ্ডির ভিতরেই ভ্রমণ করিতে হইবে; উহা তাহার বাহিরে কখনই যাইতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতির ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে। যোগীরা বলেন, মানুষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি দুই-ই অতিক্রম করিতে পারে। নিজ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের আছে, আর এই শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জীবে অন্তর্নিহিত। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তর্কের অগম্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করে।

তজ্জঃ সংস্কারো ঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥৫০॥

এই সমাধিজাত সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না।

আমরা পূর্বসূত্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র উপায়—একাগ্রতা। আমরা দেখিয়াছি, পূর্বসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের ঐ প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আসে। যখনই ঈশ্বরচিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই ঐ-সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য সময়ে এগুলি তত প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই এগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা কর, তখনই উহারা নিশ্চয় আসিবে; তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই এগুলি এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি ঐগুলিকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ বলিয়াই উহারা সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য সময়ে উহারা ঐভাবে বল প্রকাশ করে না। এ-সকল পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই বা কত! চিত্তের কোন স্থানে উহারা জড়ো হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঐগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেই ভাবটিই আসে, অন্যান্য ভাবগুলি চলিয়া যায়। তাহা না হইয়া ঐগুলি ঐ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মনের একাগ্রতা-শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা সংস্কারসমূহের আছে। সুতরাং যে সমাধির কথা এইমাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ উহা ঐ সংস্কারগুলি দমন করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধি-অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উত্থিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে যে, অন্যান্য সংস্কারের কার্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিবে।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব নিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥৫১॥

(অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ করে) তাহারও অবরোধ করিতে পারিলে সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নির্বীজ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহা প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত। আত্মা এই-সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হন কেন? চিত্তে নানাপ্রকার তরঙ্গ উঠিয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমরা কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। যদি ক্রোধরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধযুক্ত মনে করি; বলিয়া থাকি আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি প্রেমের একটি তরঙ্গ চিত্তে উত্থিত হয়, তবে ঐ তরঙ্গে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মনে করি, আমি ভালবাসিতেছি। যদি দুর্বলতারূপ তরঙ্গ আসে, উহাতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয় এবং মনে করি আমি দুর্বল। এই সংস্কারগুলি আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিলেই এই-সব বিভিন্ন ভাব উদিত হইয়া থাকে। চিত্তহ্রদে যতদিন পর্যন্ত একটি তরঙ্গও থাকিবে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হইবে না। যে পর্যন্ত না সকল তরঙ্গ একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমেই শিক্ষা দেন, এই তরঙ্গ-রূপ বৃত্তিগুলি কি; তার পর বলেন, ঐগুলি দমন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি। তৃতীয়তঃ শিক্ষা দিলেন—যেমন এক বৃহৎ অগ্নি ক্ষুদ্র অগ্নিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি তরঙ্গকে কিভাবে এত প্রবল করা যায়, যাহাতে অপর তরঙ্গগুলি একেবারে উহাতে লুপ্ত হইয়া যায়। যখন একটি মাত্র তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহাকেও দমন করা সহজ হইবে। যখন উহাও চলিয়া যাইবে, তখনই সেই সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলে। তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজ-স্বরূপে নিজ-মহিমায় অবস্থান করিবেন। আমরা তখনই জানিতে পারিব, আত্মা মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ নন, আত্মাই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র মৌলিক পদার্থ, সুতরাং আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আত্মা অমর, অবিনশ্বর, নিত্য, চৈতন্যঘন সত্তা-স্বরূপ।

সাধন পাদ

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥১॥

তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল-সমর্পণকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে।

পূর্ব অধ্যায়ে যে-সকল সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করা অতি কঠিন। এইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে ঐ-সকল সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার প্রথম সোপানকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ-কর্মদ্বারা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেন অশ্ব, মন তাহার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, আত্মা সেই রথের আরোহী আর এই শরীর রথস্বরূপ।[৯] মানুষের আত্মাই গৃহস্বামী, রাজা-রূপে এই রথে তিনি বসিয়া আছেন। অশ্বগণ অতি প্রবল হয়, রশ্মিদ্বারা সংযত না থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিরূপ সারথি ঐ অশ্বগণকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে তাহা না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সংযত থাকে, আর মনরূপ রশ্মি বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তে দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে, তবে ঐ রথ ঠিক উহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে। এখন এই তপস্যা-শক্তির অর্থ কি? 'তপস্যা' শব্দের অর্থ—এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কার্য করিতে না দিয়া আত্মবশে রাখা।

পাঠ বা স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, উপন্যাস বা গল্পের বই পড়া নয়—যে-সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তিবিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ আছে, সেই সকল গ্রন্থপাঠ। আবার 'স্বাধ্যায়' বলিতে বিতর্কমূলক পুস্তকপাঠ মোটেই বুঝায় না। বুঝিতে হইবে যোগী বিতর্কমূলক পাঠ ও আলোচনা শেষ করিয়াছেন; তিনি তৃপ্ত, উহাতে আর তাঁহার রুচি নাই। তিনি পাঠ করেন শুধু তাঁহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার জন্য। দুই প্রকার শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছেঃ 'বাদ' (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক) ও সিদ্ধান্ত (মীমাংসাত্মক)। অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ প্রথমোক্ত প্রকার জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, উহা তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ—প্রত্যেক বিষয়ের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়া বিচার করা; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায়—সমাধানে উপনীত হন। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্তবিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে। শাস্ত্র অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব সকল বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করা জ্ঞানলাভের গোপন রহস্য। ঐ সারটুকু লইয়া ঐ উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ[১০] প্রচলিত আছে—যদি তুমি কোন রাজহংসের সম্মুখে একপাত্র জলমিশ্রিত দুগ্ধ ধর, তবে সে দুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া অসারটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্যক। অন্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। যোগী এই তর্কযুক্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য—ঐ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, বিচার করিও না; যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আসে, তুমি তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। কোন তর্কের উত্তর না দিয়া শান্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ তর্ক কেবল মনকে চঞ্চল করে। তর্কের প্রয়োজন ছিল কেবল বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য; অযথা বুদ্ধিকে চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি দুর্বল যন্ত্রমাত্র, উহা আমাদিগকে শুধু ইন্দ্রিয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে। যোগী চান ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির রাজ্যে যাইতে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এই বিষয় তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং আর তর্ক করেন না মৌন অবলম্বন করেন। তর্ক করিতে গেলে মনের সাম্য নষ্ট হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; ইহা তাঁহার পক্ষে বিঘ্নমাত্র। এই-সব তর্ক ও যুক্তি শুধু প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে। এই তর্কযুক্তির অতীত রাজ্যে উচ্চতর তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে। সমগ্র জীবনটা কেবল বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় বিবাদ করিবার বা বিতর্কসমিতি লইয়া কাটাইবার জন্য নয়।

ঈশ্বরে কর্মফল-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্য নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্তিতে অবস্থান করা বুঝায়।

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥২॥

ঐ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন সমাধি-অভ্যাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং ক্লেশজনক বিঘ্নসমুদয় ক্ষীণ করা।

আমরা অনেকেই মনকে আদুরে ছেলের মত করিয়া ফেলিয়াছি। উহা যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি। এই জন্য সর্বদা ক্রিয়াযোগের অভ্যাস আবশ্যক, যাহাতে মনকে সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যায়। এই সংযমের অভাব হইতেই যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ও তাহাতেই ক্লেশের উৎপত্তি। এগুলি দূর করিবার উপায়—ক্রিয়াযোগের দ্বারা মনকে বশীভূত করা, মনকে উহার কার্য করিতে না দেওয়া।

অবিদ্যা ঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥৩॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (জীবনে আসক্তি) এইগুলিই পঞ্চক্লেশ।

ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনরূপে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে। অবশ্য অবিদ্যাই কারণ এবং অন্য চারটি ফল। অবিদ্যাই আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ দুঃখ দেয়? আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ;

আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণম্ ॥৪॥

অবিদ্যাই পরবর্তীগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র; এগুলি কখনও লীন (সুপ্ত) ভাবে, কখনও সূক্ষ্মভাবে, কখনও অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া থাকে, কখনও বা প্রকাশিত (বিস্তারিত) থাকে।

অবিদ্যাই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের (জীবনে আসক্তির) কারণ। ঐ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। কখনও ঐগুলি 'সুপ্ত' ভাবে থাকে। তোমরা অনেক সময় 'শিশুতুল্য নিরীহ' এই বাক্য শুনিয়া থাক, কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়তো দেবতা বা অসুরের ভাব রহিয়াছে। ঐ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। যোগীর হৃদয়ে পূর্বকর্মের ফলস্বরূপ ঐ সংস্কারগুলি 'তনু' (সূক্ষ্ম)—ভাবে থাকে। ইহার তাৎপর্য এই, ঐগুলি খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে; যোগী ঐগুলি দমন করিয়া রাখিতে পারেন—যাহাতে উহারা ব্যক্ত হইতে না পায়। 'বিচ্ছিন্ন' অবস্থায় কতকগুলি প্রবল সংস্কার অন্য কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের জন্য অভিভূত বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু যখনই ঐ কারণগুলি চলিয়া যায়, তখনই আবার অন্য সংস্কারগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই শেষ অবস্থাটির নাম 'উদার' (বিস্তৃত)। ঐ অবস্থায় সংস্কারগুলি অনুকূল পরিবেশ পাইয়া শুভ বা অশুভরূপে প্রবলভাবে কার্য করিতে থাকে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥৫॥

অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে 'অবিদ্যা' বলে।

এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্যা। আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিদ্যা কি। আমরা সকলেই মনে করি, 'আমি শরীর; শুদ্ধ জ্যোতির্ময় নিত্যআনন্দস্বরূপ আত্মা নই'—ইহাই অবিদ্যা। আমরা মানুষকে শরীর বলিয়াই ভাবি এবং সেই ভাবেই দেখি, ইহা মহা ভ্রম।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবা ঽস্মিতা ॥৬॥

দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিতা।

আত্মাই যথার্থ 'দ্রষ্টা', তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনন্ত ও অমর। আর 'দর্শনশক্তি' অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি? চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি মন ও ইন্দ্রিয়গণ—এইগুলি আত্মার যন্ত্র। এইগুলি তাঁহার বাহ্য জগৎ দেখিবার যন্ত্রস্বরূপ, আর আত্মার সহিত ঐগুলির একীভাবকে অস্মিতারূপ অবিদ্যা বলে। আমরা বলিয়া থাকি, 'আমি চিত্ত', 'আমি চিন্তা', 'আমি রুষ্ট হইয়াছি', অথবা 'আমি সুখী'। কিন্তু কিরূপে আমরা রুষ্ট হইতে পারি বা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি? আত্মার সহিত নিজেকে অভেদ জানিতে হইবে। আত্মার তো কখনও পরিণাম হয় না। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে কখনও সুখী, কখনও দুঃখী হইতে পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। কে তাঁহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে? আত্মা সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কে তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে? জগতের কোন কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য করিতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতাবশতঃ নিজদিগকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিয়া ফেলি এবং সুখ বা দু্ঃখ অনুভব করিতেছি মনে করি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥৭॥

যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে।

আমরা কোন কোন বিষয় সুখ পাইয়া থাকি; যে-সব বিষয়ে আমরা সুখ পাই, সেগুলির দিকে মন একটি প্রবাহের মত প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ-কেন্দ্রের দিকে ধাবমান আমাদের মনের ঐ প্রবাহকেই 'রাগ বা আসক্তি' বলে। আমরা যাহাতে সুখ পাই না, এমন কোন বিষয়ে আমরা কখনই আকৃষ্ট হই না। অনেক সময়ে আমরা নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহা সর্বত্রই খাটে। আমরা যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হই।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥৮॥

দুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষকে দ্বেষ বলে।

যাহাতে আমরা দুঃখ পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাই।

স্বরসবাহী বিদুষো ঽপি তথারূঢ়ো ঽভিনিবেশঃ ॥৯॥

যাহা পূর্ব পূর্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা।

এই জীবনের প্রতি মমতা প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর পরজন্ম-সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, মানুষ জীবনকে এত বেশী ভালবাসে বলিয়া ভবিষ্যতেও সে একটি জীবন আকাঙ্ক্ষা করে। অবশ্য ইহা বলা

বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্যদেশসমূহের মতে এই জীবনের প্রতি মমতা হইতে যে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাব্যতা সূচিত হয়, তাহা কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, অন্যান্য জন্তুর পক্ষে নয়। ভারতবর্ষে—জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিস্বরূপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা যাহা কখনও প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখনও কল্পনাও করিতে পারি না বা বুঝিতেও পারি না। কুক্কুটশাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটী দ্বারা হংসডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে; কুক্কুটিমাতা মনে করে, শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে কুক্কুটশাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল অথবা ঐ হংসশাবকগুলি কোথায় শিখিল জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান? যদি বল, ইহা সহজাত জ্ঞান (instinct), তবে তো কিছুই বুঝা গেল না—কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ করা হইল, ব্যাখ্যা কিছুই হইল না। এই সহজাত জ্ঞান কি? এইরূপ সহজাত জ্ঞান আমাদেরও অনেক আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন; আপনাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির পর আর একটিতে কত যত্নের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহু বৎসরের অভ্যাসের পর এখন আপনারা হয়তো কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর আঙ্গুলগুলি আপনা-আপনি চলিতে থাকিবে। উহা এখন আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য যে-সব কাজ আমরা করিয়া থাকি, সেগুলি সম্বন্ধেও ঐরূপ। অভ্যাসের দ্বারা কোন কাজ স্বাভাবিক হইয়া যায়, স্বয়ংক্রিয় হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এখন যে ক্রিয়াগুলিকে স্বভাবজ বলি, সেগুলি পূর্বে বিচার-সহিত করিতে হইত, এখন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদের ভাষায় সহজাত জ্ঞান যুক্তি-বিচারের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র। বিচার-জনিত জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান বা সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব আমরা যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা যে বিচারজনিত জ্ঞানের সঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র, এরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত যুক্তিবিচার সম্ভব নয়, সুতরাং সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। কুক্কুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, এ-দুইটিই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এখন প্রশ্নঃ এই অনুভূতি—জীবাত্মার অথবা কেবল শরীরের? হংস এখন যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা কেবল ঐ হংসের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতা হইতে আসিতেছে, না উহা হংসের নিজের অভিজ্ঞতা? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা কেবল তাহার শরীরের ধর্ম। কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা মনের অনুভূতি—শরীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে মাত্র। ইহাকেই পুনর্জন্মবাদ বলে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—আমাদের সমুদয় জ্ঞান, যেগুলিকে প্রত্যক্ষ, বিচারজনিত বা সহজাত জ্ঞান বলি, সে-সবই জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল, উহাই এখন নিম্নস্তরে নামিয়া সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানে উন্নীত হইয়া থাকে। সমুদয় জগতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জন্মবাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। পুনঃপুনঃ অনুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কালক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে দুঃখযন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা জানেন, এই শরীর চলিয়া যাইবে, যাঁহারা বলেন, 'ভয় নাই, চিন্তা নাই; আমাদের শত শত শরীর হইয়া গিয়াছে, আত্মা কখনও মরে না', তাঁহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে আমরা এই জীবনের প্রতি আসক্তি দেখিতে পাই। কেন এই জীবনের প্রতি আসক্তি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের সহজাত বা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা 'সংস্কার'-এ পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। এই সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম বা গুপ্তভাবে চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্বমৃত্যুর এই-সব অভিজ্ঞতা, যেগুলিকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, সেগুলি অবচেতন-ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। ঐগুলি চিত্তেই বাস করে; এগুলি নিষ্ক্রিয় নয়, মনের গভীরতর প্রদেশে থাকিয়া কাজ করিয়া চলে।

এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ যেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশিত, সেগুলিকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি; ঐগুলিকে দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই সূক্ষ্মতর সংস্কারগুলির সম্বন্ধে কি করা যায়? ঐগুলি দমন করা যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই, তখন আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাট তরঙ্গাকার ধারণ করে। আমি উহা অনুভব করিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়া নাড়িতে পারি, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীরে উহার কারণে যাইতে না পারি, তবে কখনই আমি উহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলিল, আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি উত্তেজিত হইতেছি, সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, আত্মবিস্মৃত হইলাম, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন নিজেকে মিশাইয়া ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল—আমি যেন ক্রুদ্ধ হইতেছি। তখন ক্রোধ একটি ও আমি একটি, পৃথক্ পৃথক্ ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। ঐ বৃত্তিগুলিকে মূলে বীজভাবেই সূক্ষ্মাবস্থাতেই সংযত করিতে হইবে। ঐগুলি আমাদের উপর ক্রিয়া করিতেছে—আমরা ইহা বুঝিবার পূর্বেই ঐগুলিকে সংযত করিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নয়। যে অবস্থায় ঐ বৃত্তিগুলি অবচেতনভূমি হইতে একটু একটু করিয়া উদিত হয়, তাহাকেই বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা বলা যায়। যখন কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্বুদ উত্থিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই না; শুধু তাহা নয়, উপরিভাগের খুব নিকটে আসিলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না; যখনই উহা উপরে উঠিয়া মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখনই জানিতে পারি—একটি তরঙ্গ উঠিতেছে। যখন আমরা সূক্ষ্মাবস্থাতেই তরঙ্গগুলিকে ধরিতে পারিবে, তখনই ঐগুলিকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইব। এইরূপে স্থূলভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই সূক্ষ্মাবস্থায় ঐ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি যত দিন না আমরা সংযত করিতে পারি, ততদিন আমাদের কোন বৃত্তিই পূর্ণভাবে জয় করার আশা নাই। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইলে ঐগুলিকে মূলে সংযত করিতে হইবে। কেবল তখনই আমরা বৃত্তিগুলির বীজ পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব; যেমন ভর্জিত বীজ মৃত্তিকায় ছাড়াইয়া দিলে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি

এই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি আর উদিত হইবে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মা ॥১০॥

সেই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা (কার্যকে কারণে পরিণত করিয়া) নাশ করিতে হয়।

ধ্যানের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে সূক্ষ্মসংস্কার বা বাসনা বলে। উহা নাশ করিবার উপায় কি? উহাকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোমপরিণামের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। প্রতিলোম-পরিণাম অর্থ—কার্যের কারণে লয়। চিত্তরূপ কার্য যখন সমাধিদ্বারা অস্মিতা বা অহঙ্কার-রূপ স্বকারণে লীন হইবে তখনই চিত্তের সহিত সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে। ধ্যানের দ্বারা এগুলি নষ্ট করা যায় না।

ধ্যানহেয়াস্তদ্ বৃত্তয়ঃ ॥১১॥

ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থূলাবস্থা নাশ করিতে হয়।

ধ্যানই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মন বৃত্তিরূপ তরঙ্গগুলি প্রশমিত করিতে পারে। যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাস কর, যতদিন না উহা তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, যতদিন না ঐ ধ্যান আপনা হইতেই আসে, ততদিন যদি এরূপ কর, তাহা হইলে ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে, সংযত হইবে।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥১২॥

কর্মের আশয় বা আধারের মূল এই পূর্বোক্ত ক্লেশগুলি; বর্তমান অথবা পর-জীবনে উহারা ফল প্রসব করে।

কর্মাশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সমষ্টি। আমরা যে-কোন কাজ করি না কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। আমরা মনে করি কাজটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও শেষ হইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। উহা সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, ঐ স্থানেই রহিয়াছে। যখন আমরা ঐ কার্যের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্বার উদিত হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। অতএব উহা মনের ভিতরই গূঢ়ভাবে ছিল; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত। সুতরাং প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে; সুখকর অথবা দুঃখকর—সকল প্রকার চিন্তাকেই 'ক্লেশ'-জনক বাধা বলে, কারণ যোগীদের মতে উভয়েই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে-সব সুখ পাওয়া যায়, পরিণামে সেগুলি দুঃখ আনিবে। ভোগে ভোগতৃষ্ণা বাড়িতেই থাকে, তাহার ফল দুঃখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাসনা করিতেছে; বাসনা করিতে করিতে যখন সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, কোনমতে তাহার বাসনা আর পূর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীরা শুভ ও অশুভ সংস্কারসমষ্টিকে 'ক্লেশ' বলিয়া থাকেন, এগুলি আত্মার মুক্তিপথে বাধা দেয়।

সকল কার্যের সূক্ষ্মমূলস্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে; তাহারা কারণস্বরূপ হইয়া ইহজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে (দৃষ্ট-বা অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়)। বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন ঐ সংস্কারগুলি খুব প্রবল হয়, তখন শীঘ্রই ফল দান করে; অত্যুৎকট পুণ্য বা পাপকর্ম ইহজীবনেই ফল উৎপন্ন করে। যোগীরা বলেন যে-সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, তাঁহারা ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। যোগীদের গ্রন্থে এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইঁহারা নিজেদের শরীরের উপাদান পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, দেহের পরমাণুগুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাঁহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাঁহাদের নিকট আসিতে পারে না। এরূপ হইবে না কেন? শারীরবিজ্ঞানে খাদ্যের অর্থ—সূর্য হইতে শক্তিগ্রহণ। ঐ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদ আবার কোন পশুতে ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আমরা সূর্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লই। যদি এইরূপ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার একটিমাত্র উপায় থাকিবে কেন? আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তিসংগ্রহের উপায় ঠিক তাহা নয়; আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যোগীরা বলেন, তাঁহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও তাঁহারা যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। ঊর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বিস্তার করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে সেই তন্তু অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের উপাদান পদার্থ হইতে এই স্নায়ুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই স্নায়ুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কাজ করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এই তত্ত্বটি আর একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর যে-কোন দিকে তড়িৎশক্তি প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদিগকে উহা তারের ভিতর দিয়া পাঠাইতে হয়। প্রকৃতি তো বিনা তারেই বহু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করিতেছে। আমরাই বা কেন তাহা করিতে পারিব না? আমরা চতুর্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, তাহা প্রায় তড়িৎশক্তির মত। স্নায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যে কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আছে ইহা অতি স্পষ্ট, কারণ তড়িতের ন্যায় উহারও দুই প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের ধর্মগুলি উহাতে দেখা যায়। এই

তড়িৎশক্তিকে এখন আমরা কেবল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা কেন ইহা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইব না? যোগী বলেন, ইহা খুবই সম্ভব এবং ইহা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকার্য হইলে তুমি সমগ্র জগতে এই শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্য না লইয়াই যেখানে ইচ্ছা যে-কোন শরীরের দ্বারা কার্য করিতে পারিবে। যখন কোন জীবাত্মা এই স্নায়ুপ্রণালীর ভিতর দিয়া কাজ করে, আমরা তখন বলি মানুষটি জীবিত, এবং যখন এই যন্ত্রগুলির দ্বারা কাজ হয় না, তখন বলি মানুষটি মৃত। কিন্তু যখন কেহ এই-সকল স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে বা স্নায়ু ব্যতীতই কাজ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু—এই দুই শব্দের আর কোন অর্থই নাই। জগতে সব শরীরই তন্মাত্র দ্বারা রচিত, প্রভেদ কেবল বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই ঐ বিন্যাসের কর্তা হও, তাহা হইলে তুমি যেরূপে ইচ্ছা, ঐ তন্মাত্রগুলির বিন্যাস করিয়া শরীর রচনা করিতে পার। এই শরীর—তুমি ছাড়া আর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়া দিত, তবে তোমাকে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। ঐ খাদ্য হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমি। ঐ রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। আমরাই দেহের প্রভু এবং উহাতে বাস করিতেছি। দেহ কিভাবে আবার তরুণ করিয়া তোলা যায়, সেই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যন্ত্রতুল্য স্বয়ংক্রিয়—অধনত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা দেহের পরমাণুগুলির বিন্যাসপ্রণালী ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা যন্ত্রের মত যাহা করিতেছি, তাহা জ্ঞাতসারে করিতে হইবে। আমরাই দেহের প্রভু, সুতরাং আমাদিগকেই সেই বিন্যাসপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত দেহকে আবার তরুণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু—কিছুই থাকিবে না।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥১৩॥

মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখদুঃখাদি ভোগ হয়।

মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপ কারণগুলি ভিতরে থাকে, তাহারাই ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়া কার্যের উদয় হয়, আবার কার্য সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া পরবর্তী কার্যের কারণস্বরূপ হয়। বৃক্ষ বীজ প্রসব করে, বীজ আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হয়; এইরূপেই কার্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমাদের এখানকার কাজকর্ম সবই পূর্বসংস্কারের ফলস্বরূপ। এই কার্যগুলি আবার সংস্কারে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্যের কারণ হইবে; এই ভাবেই চলিতে থাকে। এইজন্যই এই সূত্র বলিতেছে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্য অবশ্যই হইবে। এই ফল প্রথমতঃ 'জাতি'রূপে প্রকাশ পায়; কেহ বা মানুষ হইবে, কেহ দেবতা, কেহ পশু, কেহ বা অসুর হইবে। তারপর এই কর্ম আবার আয়ুকেও নিয়মিত করে। একজন হয়তো পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে, আর একজন একশত বৎসর, আবার কেহ হয়তো দুই বৎসর বয়সেই মরিয়া যায়; সে আর পূর্ণবয়স্ক হয় না। জীবনের এই-সব বিভিন্নতা পূর্বকর্মদ্বারাই নিয়মিত হয়। কেহ যেন সুখভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদি সে বনে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সুখ তাহাকে অনুসরণ করিবে। আর একজন যেখানেই যায়, দুঃখ তাহাকে অনুসরণ করে, সবই তাহার নিকট দুঃখময়। এই-সবই তাহাদের নিজ নিজ পূর্বকর্মের ফল। যোগীদিগের মতে পুণ্যকর্ম হইতে সুখ, পাপকর্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, সে নিশ্চয়ই দুঃখকষ্টরূপে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥১৪॥

পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল যথাক্রমে আনন্দ ও দুঃখ।

পরিণামতা প-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধা চ্চ
দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥১৫॥

কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগ-ব্যাঘাতের আশঙ্কায় অথবা সুখ-সংস্কারজনিত নূতন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং গুণবৃত্তি (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই যেন দুঃখ বলিয়া বোধ হয়।

যোগীরা বলেন, যাঁহার বিবেকশক্তি আছে, যাঁহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সুখ ও দুঃখ নামধেয় সর্ববিধ বস্তুর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন উহারা সর্বদা সর্বত্র সমভাবে রহিয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মানুষ সমগ্র জীবন কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে কখনই তাহার বাসনাপূরণে সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, 'জীবনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্তেই প্রাণিগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও মনে করিতেছি, আমরা কখনই মরিব না।'[১১] চতুর্দিকে মূর্খদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পণ্ডিত—শুধু আমরাই মূর্খশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। সর্বপ্রকার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাসা। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও স্বার্থপরতা-মিশ্রিত। যোগী বলেন, 'পরিণামে দেখিতে পাইবে, এমন কি পতিপত্নীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুদের প্রীতি—সবই অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া আসে।' এই সংসারে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখনই সংসারের সকল বাসনা, এমন কি ভালবাসা পর্যন্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় মানুষ বুঝিতে পারে এই জগৎ কিভাবে ব্যর্থ, কতখানি স্বপ্নসদৃশ! তখনই তাহার চোখে বৈরাগ্যের ক্ষণিক আলো দেখা দেয়, তখনই সে অতীন্দ্রিয় সত্তার যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই জগদতীত তত্ত্বটি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এমন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহাকে এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সুখভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধই দুঃখের কারণ। একটি মানুষকে একদিকে

অপরটি আর একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥১৬॥

যে দুঃখ এখনও আসে নাই, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

কর্মের কিঞ্চিদংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমরা বর্তমানে ভোগ করিতেছি, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমাদের যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে, তাহা তো চুকিয়া গিয়াছে। আমরা বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে, কেবল যে-কার্য ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে, তাহাই আমরা জয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। এই দিকেই আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। এজন্যই পতঞ্জলি বলিয়াছেন (২।১০)-সংস্কারগুলিকে কারণে লয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥১৭॥

এই যে হেয়, অর্থাৎ যে দুঃখকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ।

এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মানুষের আত্মা—পুরুষ। দৃশ্য কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্যন্ত সমুদয় প্রকৃতি। এই পুরুষ ও (প্রকৃতির) মনের সংযোগ হইতে সমুদয় সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধস্বরূপ; যখনই উহা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুখ বা দুঃখ অনুভব করে বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥১৮॥

'দৃশ্য' বলিতে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা প্রকাশ-ক্রিয়া-ও স্থিতিশীল। উহা দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য।

দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা গঠিত; ভূত বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম বা গুণ আবার তিন প্রকার, যথা—প্রকাশ, কার্য ও জড়তা। ইহাদিগকেই অন্য ভাষায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—যাহাতে পুরুষ সমুদয় ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার মহান্ ঐশ্বরিক ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন; এ-বিষয়ে একটি বড় সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া কর্দমের ভিতর বাস করিতেন, তাঁহার অবশ্য একটি শূকরী ছিল, সেই শূকরী হইতে তাঁহার অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। দেবতারা তাঁহার দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপনি দেবরাজ, দেবতারা আপনার শাসনে বাস করেন; আপনি এখানে কেন?' ইন্দ্র উত্তর দিলেন, 'আমি বেশ আছি, কিছু ভাবিও না; এই শূকরী ও শাবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না।' তখন সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহারা স্থির করিলেন, একে একে শাবকগুলি সব মারিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া শাবকগুলি সব নিহত হইলে দেবগণ অবশেষে সেই শূকরীকেও মারিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; দেবতারা ইন্দ্রের শূকরদেহটি চিরিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শূকরদেহ হইতে নির্গত হইয়া হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমি দেবরাজ, আমি এই শূকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম; শুধু তাই নয়; সমগ্র জগৎ শূকরদেহ ধারণ করুক,—আমি এইরূপ ইচ্ছাও করিতেছিলাম।' পুরুষও এইভাবে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া বিস্মৃত হন যে, তিনি শুদ্ধস্বভাব ও অনন্তস্বরূপ। পুরুষকে 'অস্তিত্ববান্' বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্বস্বরূপ। পুরুষ বা আত্মাকে 'জ্ঞানী' বলিতে পারা যায় না, কারণ আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাকে 'প্রেমসম্পন্ন' বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। আত্মা অস্তিত্ববান্, জ্ঞানযুক্ত অথবা প্রেমময়—এরূপ বলা ভুল। প্রেম, জ্ঞান ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নয়, ঐগুলি তাঁহার স্বরূপ। যখন ঐগুলি কোন বস্তুর উপর প্রতিবিম্বিত হয়, তখন ঐগুলিকে সেই বস্তুর গুণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু এগুলি পুরুষের গুণ নয়, এগুলি সেই মহান্ আত্মার—অনন্ত পুরুষের স্বরূপ—তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি স্বরূপ ভুলিয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয়া বল, 'তুমি শূকর নও', তিনি চীৎকার করিতে থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন।

মায়ার মধ্যে—এই স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। এখানে কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল হাহাকার—এখানে কয়েকটি সুবর্ণগোলক গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহা পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। তুমি কোন নিয়মেই কখনও বদ্ধ ছিলে না। প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, ধৈর্যের সহিত ইহা শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, কিরূপে—এই প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, মন ও জগতের সহিত এক করিয়া ফেলিয়া পুরুষ নিজেকে দুঃখী ভাবিতেছেন। যোগী আরও বলেন, এই দুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহিত পাইবার উপায় অভিজ্ঞতা-অর্জনের মধ্য দিয়া। অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে যত শীঘ্র উহা শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা নিজেদের এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা নিজেরা এই ফাঁদে পা দিয়াছি, নিজ চেষ্টাতেই আমাদিগকে ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। অতএব এই পতিপত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি ও অন্যান্য যেসকল ছোটখাট স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্বদা স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই নির্বিঘ্নে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কখনও ভুলিও না—এই অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। অভিজ্ঞতাই—আমাদের একমাত্র মহান্ শিক্ষক, কিন্তু ঐ সুখদুঃখগুলিকে কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা

বলিয়াই যেন মনে থাকে। এগুলি ধাপে ধাপে আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের মত মনে হইবে, এবং উহা আপনিই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতেই হইবে, কিন্তু আমরা যেন আমাদের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত না হই।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥১৯॥

গুণের এই কয়েকটি অবস্থা আছে, যথা—বিশেষ, অবিশেষ, চিহ্নমাত্র (মহৎ) ও চিহ্ন-শূন্য (প্রকৃতি)।

আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত; এখানেও পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের জগৎসৃষ্টি-প্রকরণ আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—দুই-ই। এই প্রকৃতিতে আবার ত্রিবিধ উপাদান আছে, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃ উপাদানটি অন্ধকার, যাহা কিছু অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্থ সবই তমোময়। রজঃ ক্রিয়াশক্তি। সত্ত্ব শান্তভাব—প্রকাশস্বভাব। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে বলে 'অব্যক্ত'—অবিশেষ বা অবিভক্ত; ইহার অর্থ—যে অবস্থায় নামরূপের বিভাগ নাই, যে অবস্থায় ঐ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে। তারপর ঐ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, এই তিন উপাদান বিবিধভাবে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিনটি উপাদান বিরাজমান। যখন সত্ত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়; রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলস্য ও অজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করে। সাংখ্যমতানুসারে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ 'মহৎ' অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহাকে সমষ্টি-বুদ্ধি বলা যায়, ব্যষ্টি মনুষ্যবুদ্ধি উহারই একটি অংশমাত্র। সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে 'মন' ও 'বুদ্ধি'র মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। মনের কার্য কেবল বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি মহতের সমীপে উপনীত করা। বুদ্ধি ঐ-সকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে অহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্মভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া এই বাহ্য স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি; সাংখ্যদর্শনের মত—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া একখণ্ড প্রস্তর পর্যন্ত সবই এক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা লইয়াই উহাদের প্রভেদ। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রকৃতির বাহিরে—তিনি জড় নন; বুদ্ধি, মন, তন্মাত্র অথবা স্থূলভূত কোন কিছুর সদৃশ নন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্, ইঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্যই মৃত্যুরহিত, কারণ তিনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহা মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখনও নাশ হইতে পারে না। এই পুরুষ বা আত্মা-সমূহের সংখ্যা অসীম।

এখন আমরা এই সূত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। 'বিশেষ' অর্থে স্থূলভূত—যেগুলিকে আমরা। ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। 'অবিশেষ' অর্থে সূক্ষ্মভূত—তন্মাত্র, এই তন্মাত্র সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না। পতঞ্জলি বলেন, 'যদি তুমি যোগাভ্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অনুভব-শক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি তন্মাত্রগুলি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে।' তোমরা শুনিয়াছ, প্রত্যেক ব্যক্তির চারিদিকে এক প্রকার জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, কেবল যোগীই উহা দেখিতে পান। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই সূক্ষ্মকণা নির্গত হয়, যেগুলি দ্বারা আমরা আঘ্রাণ পাই, সেইরূপ আমাদের শরীর হইতেও সর্বদাই এই তন্মাত্রসকল বাহির হইতেছে। প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ শক্তি ও ভাবরাশি বাহির হইতেছে; এবং আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই পরিবেশ এই তন্মাত্রয় পূর্ণ থাকে। ইহার প্রকৃত রহস্য না জানিলেও এইভাবেই অজ্ঞাতসারে মানুষের মনে মন্দির, গীর্জাদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবান্‌কে উপাসনা করিবার জন্য মন্দিরনির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা কর না কেন? কারণ না জানিলেও মানুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সকলে প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মানুষ পবিত্র হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির অন্তরে বেশী সত্ত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহারও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষ মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়—অশ্বের সম্মুখে শকট যোজনা করে। প্রথমে মানুষই এই স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াছে, তারপর সেই স্থানের পবিত্রতা আবার কারণ হইয়া অপরকেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্বদা অসাধু লোকই যাতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের মতই অপবিত্র হইয়া যাইবে। বাড়ীঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু এটি আমরা সর্বদা ভুলিয়া যাই। এই কারণেই সমধিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দিকে ঐ সত্ত্বগুণ বিকিরণ করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের উপর দিনরাত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন স্পর্শ করা যায়। সাধুর শরীর পবিত্র, তিনি যেখানে বিচরণ করেন, সেখানেই পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হয়। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই পবিত্র হইয়া যায়।

এখন 'লিঙ্গমাত্র'-এর অর্থ কি, দেখা যাক। 'লিঙ্গমাত্র' বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায়; উহা প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহা হইতেই অন্যান্য সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে। গুণের শেষ অবস্থাটির নাম 'অলিঙ্গ' বা চিহ্নশূন্য। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ কিনা, এ বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাদের তাৎপর্য এই যে, চৈতন্যই সৃষ্টির আদি বস্তু; তাহা হইতেই স্থূলভূতের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, চৈতন্য সৃষ্টির শেষ বস্তু। তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তুসকল অল্পে অল্পে জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে, এই জীবজন্তু ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মনুষ্যরূপে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, জগতে সমুদয় বস্তু যে চৈতন্য হইতে

প্রসূত হইয়াছে তাহা নয়, বরং চৈতন্যই সৃষ্টির সর্বশেষ বস্তু। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও দুইটি সিদ্ধান্তই সত্য। একটি অনন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ-ইত্যাদি; প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা খ আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্য 'ক' কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু যদি তুমি উহাকে খ-ক এইভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে 'খ' কেই আদি ধরিতে হইবে। আমরা যে দিক দিয়া দেখিতেছি, তাহার উপর উহা নির্ভর করে। চৈতন্য পরিণামপ্রাপ্ত ইহয়া স্থূলভূতের আকার ধারণ করে, স্থূলভূত আবার চৈতন্যরূপে পরিণত হয়, এইভাবেই চলিতে থাকে। সাংখ্যেরা ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ চৈতন্যকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে ঐ শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা—প্রথমে চৈতন্য, পরে জড়। বৈজ্ঞানিক জড়কে গ্রহণ করিয়া বলেন, 'প্রথমে জড়, পরে চৈতন্য'। উভয়েই একই শৃঙ্খলের কথা বলিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্য ও জড়—উভয়েরই পারে পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা বুদ্ধির অতীত; বুদ্ধি তাঁহারই প্রতিফলিত আলোক।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০॥

দ্রষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্রস্বরূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন।

এখানেও সাংখ্যদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের এই মত যে, নিম্নতম বিকাশ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত; পুরুষগণ প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে আত্মা দুঃখী বা সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হন কেন? প্রতিফলনের দ্বারা। একখণ্ড স্ফটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে ঐ স্ফটিকটিকে লাল দেখাইবে; সেইরূপ আমরা যে সুখ বা দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহা বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এ-সকল কিছুই নাই। আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রকৃতি এক বস্তু, আত্মা এক বস্তু, এই দুই চিরদিন পৃথক্। সাংখ্যেরা বলেন যে, (বুদ্ধিজাত) জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে, উহা পরিবর্তনশীল; শরীরের ন্যায় উহাও ক্রমশঃ পরিণামপ্রাপ্ত হয়, শরীরের যে-সকল ধর্ম, উহাতেও প্রায় সে-সকল ধর্ম বিদ্যমান। শরীরের পক্ষে নখ যেমন, এই জ্ঞানের পক্ষে দেহও সেইরূপ। নখ শরীরের একটি অংশ, উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর বাঁচিয়া থাকে। সেইরূপ এই শরীর বহুবার পরিত্যক্ত হইলেও (বুদ্ধিজাত) জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশী হইতে পারে না, কারণ উহা পরিবর্তনশীল, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। আর যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা কখনও অবিনাশী হইতে পারে না। এই জ্ঞান অবশ্যই জন্যপদার্থ। আর ইহা হইতেই বুঝাইতেছে, অন্য আর এক পদার্থ আছে। জন্যপদার্থ কখনও মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং চিরকালের জন্য বদ্ধ। তবে মুক্ত কে? যিনি কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত। তুমি যদি বল, মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, আমি বলিব, বন্ধনের ভাবটিও ভ্রমাত্মক। আমাদের জ্ঞানে এই দুই ভাবই সদা বিরাজিত, পরস্পরের আশ্রিত—একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে ইহাই আমাদের ধারণা। যদি দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে চাই, আমাদের মাথা দেওয়ালে ধাক্কা খায়; তাহা হইলে বুঝিলাম, আমরা ঐ দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমাদের একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। এবং মনে করি, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারি। প্রতিপদে এই বিরোধী ভাব-দুইটি আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে আমরা মুক্ত; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দেখিতেছি, আমরা মুক্ত নই। দুইটি ভাবের মধ্যে একটি যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও ভ্রমাত্মক হইবে, আর একটি যদি সত্য হয় তবে অপরটিও সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অনুভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী বলেন, এই দুইটি ভাবই সত্য, বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমরা বদ্ধ। কিন্তু আত্মা হিসাবে আমরা মুক্ত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ—কার্যকারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে। এই আত্মার মুক্তস্বভাবটি জড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পরিস্রুত হইয়া বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে। আত্মারই জ্যোতিঃ সবকিছুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির নিজের কোন আলো নাই। মস্তিষ্কে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক-একটি কেন্দ্র আছে। সকল ইন্দ্রিয়ের যে একটিমাত্র কেন্দ্র, তাহা নয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র পৃথক্ পৃথক্। তবে আমাদের এই অনুভূতিগুলি সামঞ্জস্য লাভ করে কিভাবে? কোথায় তাহারা একত্ব লাভ করে? মস্তিষ্কে যদি তাহারা এই একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। মানুষ কিন্তু একই সময়ে দেখিতে ও শুনিতে পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই একটি একত্ব আছে। বুদ্ধি মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ—কিন্তু এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একত্বস্বরূপ। তাঁহার নিকট গিয়াই সমুদয় বেদনা ও অনুভূতি মিলিত হয় ও একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি মিলিত ও একীভূত হয়। সেই আত্মা মুক্তস্বভাব। এই আত্মার মুক্ত স্বভাবই তোমাকে প্রতি মুহূর্তে বলিতেছে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ। সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুক্তস্বভাব নয়। তুমি তখন সেই মুক্ত স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন, তুমি আবার ভুল করিয়াছ। এই জন্যই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্ত ও বদ্ধ, উভয় অবস্থাই বিশ্লেষণ করেন; এবং তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত, জ্ঞানঘন; বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়া তিনিই এই সান্ত (সীমাবদ্ধ) জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥২১॥

দৃশ্যের (অর্থাৎ প্রকৃতির) আত্মা (স্বভাব, প্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন আকারে পরিণাম) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও মুক্তির) জন্য।

প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাহার শক্তি প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রের আলোক যেমন তাহার নিজের নয়, প্রতিফলিত—প্রকৃতির শক্তিও তদ্রূপ। যোগীদের মতে প্রকৃতির সমুদয় অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন;

কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করা ছাড়া প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥

যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি (বা অজ্ঞান) নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, কারণ অপরের পক্ষে উহা থাকে।

আত্মা যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহা জানানোই প্রকৃতির সব কাজের একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহা জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই সমুদয় প্রকৃতি লয় পায়। কিন্তু অনন্ত কোটি আত্মা বা পুরুষ চিরকালই থাকিবে, তাহাদের জন্য প্রকৃতি কার্য করিয়াই যাইবে।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

দৃশ্য ও উহার প্রভু দ্রষ্টার শক্তিদ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপ) স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

এই সূত্রানুসারে—আত্মা ও প্রকৃতি যখন সংযুক্ত হন, তখনই (এই সংযোগবশতঃ) উভয়ের (যথাক্রমে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব) দুই শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখনই এই জগৎপ্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু। আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দুঃখ বা সুখের কারণ—শরীরের সহিত সংযোগ। যদি আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমার শীত-গ্রীষ্ম বা অন্য কিছুই খেয়াল থাকিত না। এই শরীর একটি সংহতি মাত্র। আমার একটি দেহ আছে, তোমার অন্য একটি দেহ আছে, সূর্যের আবার একটি পৃথক্ দেহ—এরূপ বলা কেবল রূপকথা-মাত্র। সমগ্র জগৎ জড়ের এক মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের এক বিন্দুর নাম 'তুমি', এক বিন্দুর নাম 'আমি' ও আর এক বিন্দুর নাম 'সূর্য'। আমরা জানি, এই জড়রাশি সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করিতেছে। আজ যাহা সূর্যের উপাদানভূত, কাল তাহা আমাদের শরীরের উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥২৪॥

এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।

আমরা অজ্ঞানবশতঃ এক নির্দিষ্ট শরীরে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। 'আমি শরীর' এই ধারণা একটি কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারই আমাদিগকে সুখী বা দুঃখী করিতেছে। অজ্ঞান-প্রসূত এই কুসংস্কার হইতে আমরা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ—এই সব বোধ করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্রম করা। কি করিয়া ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া দেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন বিশেষ অবস্থায় শরীর দগ্ধ হইলেও মানুষ কোন যন্ত্রণা বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ আকস্মিক উচ্চাবস্থা হয়তো এক নিমিষের জন্য ঘূর্ণাবর্তের মত আসে, আবার পরক্ষণেই চলিয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাভ করি, তাহা হইলে আমরা স্থায়িভাবে অনুভব করিব—শরীর হইতে আত্মা পৃথক্।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥২৫॥

এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই হান (অজ্ঞানের পরিত্যাগ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি বা মুক্তি।

যোগদর্শনের মতে আত্মা অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাই সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র। যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যতদিন না আমরা প্রকৃতির প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে পারি, ততদিন তো আমরা ক্রীতদাস; প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেইভাবে চলিতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি জড়কেও বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, সুতরাং উহার সহিত সংগ্রাম করা—উহাকে জয় করা—অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি জয় করিয়াছেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার বশীভূত, তাঁহার দাসস্বরূপ। প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় রাজযোগে উপস্থাপিত হইয়াছে। আমরা বাহ্যজগতে যে-সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে আনিতে হইবে। এই শরীর মনের একটি বাহ্য আবরণ মাত্র। শরীর ও মন যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহা নয়, উহারা শুক্তি ও তাহার কঠিন আবরণের মত। উহারা এক বস্তুরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা। শুক্তির অভ্যন্তরীণ পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়া ঐ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করে। এইভাবেই মনোনামধেয় এই অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম-শক্তিসমূহও বাহির হইতে স্থূল পদার্থ লইয়া তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং যদি আমরা অন্তর্জগৎ জয় করিতে পারি, তবে বাহ্যজগৎ জয় করা খুব সহজ হইয়া পড়ে। আবার এই দুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন, তাহা নয়। কতকগুলি শক্তি শারীরিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নয়। যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ সূক্ষ্মজগতের স্থূল প্রকাশ মাত্র, তেমনি বাহ্য শক্তিগুলিও সূক্ষ্ম-শক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥২৬॥

নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায়।

সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক—একটি বিশেষরূপে জানা যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষ জড়ও নন, মনও নন; আর উনি প্রকৃতি নন বলিয়া উঁহার কোনরূপ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কেবল প্রকৃতিই সর্বদা পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ও পুনঃসংশ্লেষ ঘটিতেছে। যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান চলিয়া যাইবে। তখনই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপিরূপে প্রতিভাত হইবেন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥২৭॥

তাঁহার (জ্ঞানীর) বিবেকজ্ঞানের সাতটি উচ্চতম স্তর আছে।

যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা একটির পর আর একটি করিয়া সপ্তস্তরে আসিতে থাকে। যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি। প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে হইবে—'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি'; মনে তখন আর কোনরূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যতক্ষণ আমাদের জ্ঞানপিপাসা থাকে, ততক্ষণ আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানেই কিছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, অমনি সেদিকে ধাবিত হই। সেখানে উহা না পাইলে মনে অশান্তি আসে, আবার অন্য একদিকে সন্ধান করি। যতদিন না অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, যতদিন না বোধ করি, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভে সাহায্য করিতে পারে না, আমাদের নিজেদের নিজেকে সাহায্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যান্বেষণই বৃথা। বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমরা যে সত্যের নিকটবর্তী হইতেছি, তাহার প্রথম এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যে, ঐ অসন্তোষের ভাব চলিয়া যাইবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইবে, আমরা সত্য পাইয়াছি এবং ইহা সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্যস্বরূপ সূর্য উদিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞান রজনী প্রভাত হইতেছে। তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে—যতদিন না সেই পরমপদ লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত দুঃখ চলিয়া যাইবে। বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিব, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্তব্যের অবসান হইবে। তারপর 'চিত্তবিমুক্তি' অবস্থা আসিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের বিঘ্নবিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে। যেমন কোন পর্বতের চূড়া হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড নিম্নে উপত্যকায় পতিত হইলে আর কখনও উপরে উঠিতে পারে না, সেইরূপ মনের সংগ্রাম ও চঞ্চলতা সব নীচে পড়িয়া যাইবে, আর মনে উঠিবে না। পরবর্তী অবস্থায়—চিত্ত বুঝিতে পারিবে, ইচ্ছামাত্রেই উহা স্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে। অবশেষে দেখিতে পাইব, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আছি; দেখিব, এতদিন জগতে একাকী আত্মারূপে কেবল আমরাই ছিলাম। মন বা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। উহারা তো আমাদিগের সহিত কখনই যুক্ত ছিল না। উহারা আপন কাজ করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ নিজদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা একাকী, নিঃসঙ্গ, কেবল, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সদানন্দ। আমাদের আত্মা এত পবিত্র ও পূর্ণ যে, আমাদের আর কিছুরই আবশ্যক ছিল না। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরাই সুখস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব, এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইবে। ইহাই যোগীর চরম অবস্থা; যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়া যান, আর কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না, আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত হন না এবং দুঃখ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানিতে পারেন, 'আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বরূপ ও সর্বশক্তিমান্।'

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮॥

যোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের মলিনতা দূর হইয়া গেলে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; উহার শেষ সীমা বিবেক-খ্যাতি।

এখন সাধনের কথা বলা হইতেছে। এতক্ষণ যাহা বলা হইতেছিল, তাহা অনেক উচ্চতর ব্যাপার। উহা অনেক দূরে, অনেক ঊর্ধ্বে, কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ। প্রথমতঃ শরীর ও মন সংযত করা আবশ্যক। তখনই পূর্বোক্ত আদর্শের উপলব্ধি স্থায়ী হইতে পারে। আদর্শ কি, তাহা আমরা জানিয়াছি; এখন উহা লাভের জন্য সাধন করিতে হইবে।

যম-নিয়মাসন -প্রাণায়াম -প্রত্যাহার -ধারণা -ধ্যান -সমাধয়ো ঽষ্টাবঙ্গানি ॥২৯॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসা -সত্যাস্তেয় -ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥৩০॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এইগুলিকে 'যম' বলে।

পূর্ণ যোগী হইতে গেলে সাধককে স্ত্রী-পুরুষ-লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই; তবে লিঙ্গাভিমান দ্বারা নিজেকে অবনমিত করিবে কেন? পরে আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই-সকল ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে

হইবে। চৌর্য যেমন অসৎকার্য, পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাও সেইরূপ অসৎ কর্ম। যিনি অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাঁহার মন দাতার মন দ্বারা প্রভাবিত হয়, সুতরাং যিনি দান গ্রহণ করেন, তাঁহার পতিত হইবার সম্ভাবনা। অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে, আমরা ক্রীতদাসতুল্য হইয়া পড়িতে পারি। অতএব কোন দান গ্রহণ করিও না।[১২]

এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৩১॥

এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় (অর্থাৎ সাময়িক কর্তব্য বা উদ্দেশ্য) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইলে সার্বভৌম (অর্থাৎ সর্বজনীন) মহাব্রত বলিয়া কথিত হয়।

এই সাধনগুলি অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-নির্বিশেষে অনুষ্ঠেয়।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥

বাহ্য ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ বা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রপাঠ) ও ঈশ্বরোপাসনা এইগুলি 'নিয়ম'।

বাহ্যশৌচ অর্থে শরীরকে পবিত্র রাখা; অশুচি ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবশ্যক। পূর্বে সমাধিপাদ, ৩৩শ সূত্রে যে ধর্মগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ আসে। অবশ্য বাহ্যশৌচ অপেক্ষা অন্তঃশৌচ অধিকতর প্রয়োজন, কিন্তু উভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্যশৌচ কোন কাজে আসে না।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৩॥

যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে ঐগুলির বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

পূর্বে যে-সকল ধর্মের কথা বলা হইল সেগুলি অভ্যাস করিবার উপায়—মনে বিপরীত প্রকারে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করা; অন্তরে চৌর্যের ভাব আসিলে অচৌর্যের চিন্তা করিতে হইবে। দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইলে উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা
দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৪॥

পূর্বসূত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপঃ বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি—কৃত, কারিত অথবা অনুমোদিত; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ-ভাবনা বলে।

আমি নিজে মিথ্যা কথা বলিলে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা বলিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা বলিলে তাহা অনুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণ পাপ হয়। মিথ্যা সামান্য হইলেও উহা মিথ্যা। পর্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি পাপ চিন্তা করিয়া থাক, যদি কাহারও প্রতি অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপর প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহা প্রবলবেগে তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি ঈর্ষা ও ঘৃণার ভাব পোষণ কর এবং ঐ ভাব চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে বর্ধিতভাবে উহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। জগতের কোন শক্তিই উহা নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যখন একবার ঐ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। এইটি স্মরণ করিলে তুমি অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥৩৫॥

যাহার অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সমীপে অপরের স্বাভাবিক বৈরিতাও পরিত্যক্ত হয়।

যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন, তবে, তাঁহার সম্মুখে যে-সকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র, তাহারাও শান্তভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেঘ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি অহিংসভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥৩৬॥

হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন কর্ম না করিয়াই যোগী নিজের জন্য বা অপরের জন্য সেই কর্মের ফল লাভ করিবার শক্তি অর্জন করেন।

যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নেও তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কায়মনোবাক্যে সত্য

আচরণ করিবে, তখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও বল, 'তুমি কৃতার্থ হও', সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বল, 'রোগমুক্ত হও', সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া যাইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥৩৭॥

অচৌর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধনরত্নাদি আসিয়া থাকে।

তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই তোমার অনুসরণ করিবে; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥৩৮॥

ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা শক্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মচর্যবান্ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। পবিত্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা মানুষের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। মানবসমাজের ধর্ম-নেতাগণ সকলেই ব্রহ্মচর্যবান্ ছিলেন, এই ব্রহ্মচর্য হইতেই তাঁহারা শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; অতএব যোগী অবশ্যই ব্রহ্মচর্যবান্ হইবেন।

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥৩৯॥

অপরিগ্রহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

যখন কেহ অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, তখন তাঁহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা হয় না, তিনি স্বাধীন ও মুক্তই থাকেন। তাঁহার মন শুদ্ধ হইয়া যায়। প্রতিটি দানের সহিত দাতার মন্দ ভাবগুলিও গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া যায়, আর ইহা হইতে যে-সকল শক্তি লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রথম—পূর্বজন্মকথা মনে করিতে পারা। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজ আদর্শে দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান, বহুবার তিনি কেবল যাওয়া-আসা করিতেছেন। সুতরাং তিনি তখন হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আর যাওয়া-আসা করিব না, আর প্রকৃতির দাস হইব না।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥৪০॥

শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, অন্যের সঙ্গ করিতেও আর প্রবৃত্তি থাকে না।

যখন বাস্তবিক বাহ্য ও আন্তর—উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আসে; কিসে উহা ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহা সুন্দর দেখাইবে, এ-সকল ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর অতি সুন্দর বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মনে করিবেন। এই দেহতৃষ্ণা মনুষ্যজীবনে সর্বনাশের কারণ। সুতরাং শৌচ-প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলিয়া ভাবিতে চাহিবে না। আমাদের মধ্যে যখন এই শৌচ বা পবিত্রতা আসে, তখনই আমরা এই দেহভাব অতিক্রম করিতে পারি।

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥৪১॥

এই শৌচ হইতে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

এই শৌচ-অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইবে, সুতরাং মনও একাগ্র ও প্রফুল্ল হইবে। তুমি যে ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি বেশ প্রফুল্ল হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম নয়। সুখই সত্ত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম; সাত্ত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সবই সুখময় বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি যোগসাধনায় উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা তমোগুণপ্রসূত, সুতরাং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। বিষণ্ণতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, সুস্থকায়, যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর দৃষ্টিতে সবই সুখময়। যে-কোন মনুষ্যমুখ তিনি দেখেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ হয়। ইহাই ধার্মিক লোকের লক্ষণ। পাপই কষ্টের কারণ, আর অন্য কিছু নয়। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা ভয়ঙ্কর! এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সারাদিন ঘরে কাটাইয়া দাও। সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন তুমি সমুদয় শরীরও বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর তুমি এই যন্ত্রের ক্রীতদাস থাকিবে না; এই দেহযন্ত্রই তোমার ভৃত্য হইয়া থাকিবে। দেহযন্ত্র আত্মাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে না, বরং উহাই মুক্তিপথে শ্রেষ্ঠ সহায় হইবে।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥৪২॥

সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥৪৩॥

অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্যা হইতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে।

তপস্যার ফল কখনও কখনও সহসা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

মন্ত্রাদির পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা করিবে, সাধনাও সেই পরিমাণে কঠোর করিতে হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥৪৫॥

ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বারা সমাধি ঠিক পূর্ণা হয়।

স্থিরসুখামাসনম্ ॥৪৬॥

যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন।

এখন আসনের কথা বলা হইবে। যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনে কিছুতেই কৃতকার্য হইবে না। আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি শরীরের অস্তিত্ব মোটেই অনুভব করিবে না। এইরূপ হইলে বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বলা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, শরীরে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিতে থাকিবে, কিন্তু যখনই তুমি এই স্থূলদেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়া ফেলিবে। তখন আর তুমি সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার শরীরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন অনুভব করিবে, যেন অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ। যদি শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে জয় করিয়া উহাকে দৃঢ় রাখিতে পারিবে, তখন তোমার সাধনাও দৃঢ় হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার শারীরিক বিঘ্নবাধাগুলি আসিতে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার স্নায়ুমণ্ডলী চঞ্চল থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥৪৭॥

শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ন আছে, তাহা শিথিল করিয়া দিয়া ও অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে।

অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমরা সেই নিরপেক্ষ অনন্ত (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু আমরা অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিতে পারি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥৪৮॥

এইরূপে আসন-জয় হইলে দ্বন্দ্ব-পরম্পরা আর কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।

দ্বন্দ্ব অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী দুই দুই পদার্থ। এগুলি আর তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥৪৯॥

এই আসন-জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত করাকে ‘প্রাণায়াম’ বলে।

যখন এই আসন-জয় সমাপ্ত হইয়াছে, তখন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এখান হইতে প্রাণায়ামের বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম কি? শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনা। যদিও ‘প্রাণ’ শব্দ সচরাচর শ্বাসপ্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক উহা শ্বাসপ্রশ্বাস নয়। ‘প্রাণ’ অর্থে জাগতিক শক্তিসমষ্টি। উহা প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তি, এবং উহার বাহ্যপ্রকাশ—এই ফুসফুসের গতি। প্রাণ যখন শ্বাসকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি আরম্ভ হয়; ‘প্রাণায়াম’-এ আমরা উহাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই। এই প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিবার সহজতম উপায়রূপে আমরা প্রথমে

শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করি।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥৫০॥

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম হওয়াতে উহাদেরও আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে।

এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম—যখন আমরা শ্বাসকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করি; দ্বিতীয়—যখন আমরা উহা বাহিরে নিক্ষেপ করি; তৃতীয়—যখন শ্বাস ফুসফুসের মধ্যেই ধৃত হয় বা বাহির হইতে শ্বাসগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। উহারা আবার দেশ, কাল ও সংখ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 'দেশ' অর্থে—প্রাণকে শরীরের কোন অংশবিশেষে আবদ্ধ রাখা। 'সময়' অর্থে—প্রাণ কোন্ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং 'সংখ্যা' অর্থে—কতবার ঐরূপ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে। এইজন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকাদি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামের ফল 'উদ্ঘাত' অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥৫১॥

চতুর্থ প্রকার প্রাণায়ামে বাহ্য বা আন্তর বিষয় চিন্তা দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ করা হয়।

ইহা চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত চিন্তাসহ দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা স্বাভাবিক কুম্ভক (স্তম্ভবৃত্তি) হইয়া থাকে। অন্য প্রাণায়ামগুলিতে চিন্তার সংস্রব নাই।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥৫২॥

তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়।

চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সত্ত্বপদার্থ দ্বারা নির্মিত, কিন্তু উহা রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত্ত রহিয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের এই আবরণ দূরীভূত হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥৫৩॥

(তাহা হইতেই) 'ধারণা' বিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়।

এই আবরণ চলিয়া গেলে আমরা মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হই।

স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৫৪॥

যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে 'প্রত্যাহার' বলা যায়।

এই ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক ঐ পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই, উহা মনেই অবস্থিত বাহিরের কোন কিছু ঐ আকৃতি জাগাইয়া দেয় মাত্র; বাস্তবিক রূপ বা আকৃতি চিত্তেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি, তাহাদের সম্মুখে যাহা আসিতেছে, তাহারই সহিত মিশিয়া গিয়া তাহারই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে এবং ইন্দ্রিয়গুলিও শান্ত হইবে। ইহাকেই 'প্রত্যাহার' বলে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥৫৫॥

তাহা (প্রত্যাহার) হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া থাকে।

যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহির্বস্তুর আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহাদিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকার্য হন, তখনই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। আর যখন ইন্দ্রিয়গণ সর্বতোভাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রত্যেকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয়া থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়গণই সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্যের কেন্দ্রস্বরূপ। এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্যকে জয় করিতে পারিবেন; সমগ্র শরীরটিই তাঁহার বশীভূত হইবে। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলেই মানুষ দেহধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিক ঠিক বলিতে পারে, 'জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমি সুখী।' যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক এই শরীর অতি আশ্চর্য পদার্থ।

বিভূতি-পাদ

এই অধ্যায়ে যোগের বিভূতি (শক্তি বা ঐশ্বর্য) আলোচিত হইবে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥১॥

চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে ধরিয়া রাখার নাম ‘ধারণা’।

যখন মন শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয় ও কিছুকাল ঐ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণা (একাগ্রতা) বলে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥

সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাকে ‘ধ্যান’ বলে।

মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয়ে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, মস্তকের উপরে অথবা হৃদয়ে নিজেকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি মন শরীরের কেবল ঐ অংশ দিয়াই সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের সকল অঙ্গকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, তবে তাহার নাম ‘ধারণা’; আর মন যখন কিছুক্ষণ নিজেকে ঐ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে বলা হয় ‘ধ্যান’।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩॥

তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্রকে প্রকাশ করে, তখন ‘সমাধি’ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহ্যভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই সমাধি-অবস্থা আসে। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি, ধীরে ধীরে আমি উহার উপর মন একাগ্র করিতে কৃতকার্য হইলাম, তখন কেবল ভিতরের ভাবগুলি অনুভব করিব, অর্থটুকু বুঝিব, কোনরূপ আকারে উহা প্রকাশিত হইবে না। ধ্যানের ঐ অবস্থাকে ‘সমাধি’ বলে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪॥

এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ একই বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে।

যখন কেহ তাঁহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া কোন বস্তুর উপর স্থির করিতে পারেন, পরে অন্তর্ভাগ হইতে বাহ্য বস্তু পৃথক্ করিয়া তাহার উপর মনকে অনেকক্ষণ রাখিতে পারেন, তখনই ‘সংযম’ হইল। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এইগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে এক বস্তুর উপরে অভ্যস্ত হইয়া একত্র হয়। তখন বস্তুর বাহ্য আকার অন্তর্হিত হয়, মনে তাহার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥৫॥

এই সংযমের দ্বারা যোগীর মনে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়।

যখন কেহ এই সংযমসাধনে কৃতকার্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার আয়ত্ত হয়। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্র। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। উহারা স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থূলের জ্ঞানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে উহা সূক্ষ্মতর বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥৬॥

এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা উচিত।

খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সূত্র এইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥৭॥

এই তিনটি পূর্বকথিত সাধনগুলি অপেক্ষা আরও অন্তরঙ্গ সাধন।

পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে। উহারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধির তুলনায় বহিরঙ্গ। এই

‘ধারণা’দি অবস্থা লাভ করিলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ হইতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা বা সর্বশক্তিমত্তা তো মুক্তি নয়। ঐ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন নির্বিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশূন্য হইতে পারে না, ঐ ত্রিবিধ সাধন আয়ত্ত হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে। যোগীদের ভাষায় সেই বীজগুলি ‘ভর্জিত’ হইয়া গেলেই তাহাদের নূতন অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিভূতিসমূহ বীজগুলি ভর্জিত করিতে পারে না।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥৮॥

কিন্তু এই ‘সংযম’ও (ধারণা ধ্যান সমাধি একত্র) নির্বীজ সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গস্বরূপ।

এই কারণে নির্বীজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে এইগুলিকেও বহিরঙ্গ বলিতে হইবে। আমরা এখনও প্রকৃত সর্বোচ্চ সমাধি-অবস্থা লাভ না করিয়া একটি নিম্নতরভূমিতেই আছি; সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এখনও আছে, বিভূতি বা সিদ্ধিসকল এই জগতেরই অন্তর্গত।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ

নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥৯॥

যখন ব্যুত্থান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব (নাশ) ও নিরোধসংস্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত হয়, উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে।

ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়; কারণ তাহা হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদিত হইয়াছে, যাহা মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী ঐ বৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এ অবস্থায় ঐ সংযমচেষ্টাটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে হইবে। একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গ দ্বারা নিবারিত হইল, সুতরাং উহা সর্ব তরঙ্গের নিবৃত্তিরূপ সমাধি নয়, কারণ ঐ সংযমটিও একটি তরঙ্গ। তবে যে অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা এই নিম্নতর সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির খুবই নিকটবর্তী।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥১০॥

অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়।

দিনের পর দিন অভ্যাস করিলে মনঃসংযমের এই নিরন্তরচেষ্টাপ্রবাহ স্থির হইয়া যায় এবং মন সর্বদা একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥

মনে সর্বপ্রকার বস্তু গ্রহণ করা ও এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা, এই দুইটির যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে।

মন সর্বদাই নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বপ্রকার বস্তুতেই যাইতেছে—ইহা নিম্ন অবস্থা। ইহা অপেক্ষা মনের একটি উচ্চতর অবস্থা আছে, সেখানে মন একটিমাত্র বস্তু গ্রহণ করে এবং আর সকল বস্তু ত্যাগ করে। এই এক বস্তু গ্রহণ করার ফল সমাধি।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥১২॥

যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্যপ্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

কি করিয়া জানা যাইবে—মন একাগ্র হইয়াছে? মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞাতসারে যতই সময় অতিবাহিত হয়, বুঝিতে হইবে, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের দিকে আমাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না; আবার যখন পুস্তকপাঠে বিরত হই তখন ভাবিয়া আশ্চর্য হই, কতখানি সময় চলিয়া গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্র হইয়া বর্তমানে একীভূত হইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, যখন অতীত ও বর্তমান আসিয়া একত্র মিলিত হয়, তখনই মন একাগ্র হইয়া থাকে।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩॥

ইহা দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল।

পূর্ব তিনটি সূত্রে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ তিন

প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল। মন ক্রমাগ্রত বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের ‘ধর্মরূপ’ পরিণাম। উহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের মধ্য দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের ‘লক্ষণরূপ’ পরিণাম; আর কখনও যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্বল অথবা তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের ‘অবস্থারূপ’ পরিণাম। মনের এই পরিণামত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্রিবিধ পরিণামও বুঝিতে হইবে। যথা, মৃত্তিকারূপ ধর্মীর পিণ্ডরূপ ধর্ম গিয়া উহাতে যে ঘটাকার ধর্ম আবির্ভূত হয়, তাহা ধর্ম-পরিণাম। ঐ ঘটের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থারূপ পরিণামকে লক্ষণ-পরিণাম এবং উহার নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে।

পূর্ব পূর্ব সূত্রে যে-সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য যোগী যাহাতে মনের বৃত্তি বা পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী ॥১৪॥

শান্ত (অর্থাৎ অতীত), উদিত (বর্তমান) ও অব্যপদেশ্য (ভবিষ্যৎ) ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধর্মী।

ধর্মী তাহাকেই বলে যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য করিতেছে, যাহা সর্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥১৫॥

ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিন্নতা (পূর্বাপর পার্থক্য)।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥১৬॥

পূর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহা যেন বিস্মৃত না হই। যখন মন-বস্তুর বাহ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার অভ্যন্তরীণ ভাবগুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কেবল সংস্কারের পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতকগুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ
সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥১৭॥

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভূতের রুত (শব্দ) জ্ঞান হইয়া থাকে।

‘শব্দ’ বলিলে বুঝিতে হইবে বাহ্যবিষয়, যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়; ‘অর্থ’ বলিলে বুঝিতে হইবে, যে শরীরাভ্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা লব্ধ বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে লইয়া গিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় তাহাকে; আর ‘জ্ঞান’ বলিলে বুঝিতে হইবে মনের সেই প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ানুভূতি হয়। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে একটি স্পন্দন হইল, তারপর একটি আন্তরবেদনাপ্রবাহ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা মনে নীত হইলে, তখন মন প্রতিঘাত করিল, এবং আমি (অর্থ সহ) শব্দটি জানিতে পারিলাম। আমি ঐ যে শব্দটি জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ—প্রথম কম্পন, দ্বিতীয় বেদনাপ্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ এই তিনটি পৃথক্ করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারেন। সাধক যখন এগুলিকে পৃথক্ করিবার শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যে-কোন শব্দের উপর ‘সংযম’ প্রয়োগ করেন তাহার উদ্দিষ্ট অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন—তা ঐ শব্দ মনুষ্যকৃতই হউক বা অন্য কোন প্রাণিকৃতই হউক।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥১৮॥

সংস্কারগুলি ধরিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সবই আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে আসিয়া থাকে, উহা আবার চিত্তেই মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহা সেখানে অতি সূক্ষ্ম আকারে থাকে, যদি আমরা ঐ তরঙ্গটি পুনরায় উত্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই ‘স্মৃতি’ হইল। সুতরাং যোগী যদি মনের এই-সকল পূর্বসংস্কারের উপর ‘সংযম’ করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার পূর্ব পূর্ব সকল জন্মের কথা স্মরণ করিতে থাকিবেন।

প্রত্যয়স্য পরচিত্ত-জ্ঞানম্ ॥১৯॥

অপরের শরীরে যে-সকল চিহ্ন আছে, সেগুলিতে সংযম করিলে ঐ ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই কতকগুলি বিশেষ প্রকার চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিহ্নগুলির উপর 'সংযম' করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের গঠন বা অবস্থা জানিতে পারেন।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥২০॥

কিন্তু ঐ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা জানিতে পারেন না, কারণ উহা তাঁহার সংযমের বিষয় নয়।

শরীরের উপর 'সংযম' করিয়া মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। সেজন্য দুইবার 'সংযম' করিবার আবশ্যক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমূহের উপর ও তারপর মনেরই উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনে কি আছে, সবই জানিতে পারিবেন।

কায়রূপসংযমাত্তদ্ গ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে

চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগে ঽন্তর্ধানম্ [১৩] ॥২১॥

দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তি স্তম্ভিত (বাধাপ্রাপ্ত) ও চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী লোকসমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন।

মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক অন্তর্হিত হন তাহা নয়, তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না এইমাত্র। শরীরের আকৃতি ও শরীর এই দুইটিকে তিনি যেন পৃথক্ করিয়া ফেলেন। এটি যেন স্মরণ থাকে, যোগী যখন এরূপ একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর আকার ও বস্তুকে পরস্পর পৃথক্ করিতে পারেন, তখনই তিনি ঐভাবে অদৃশ্য হইতে পারেন। যোগী আকার ও ঐ আকারবান্ বস্তুর পার্থক্যের উপর সংযম প্রয়োগ করেন এবং ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তিকে বাধা দেন। আকৃতি ও আকারবান্ বস্তুর সংযোগ হইতেই আমরা আকৃতি উপলব্ধি করি।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥২২॥

ইহার দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্ধান অর্থাৎ শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে না দেওয়াও ব্যাখ্যা করা হইল।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ -
পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥২৩॥

কর্ম দুই প্রকার, এক প্রকারের ফল শীঘ্র লাভ হইবে, অন্য প্রকার বিলম্বে ফল প্রসব করিবে। ইহাদের উপর 'সংযম' করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীরা দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন।

যখন যোগী তাঁহার নিজ কর্মের উপর অর্থাৎ তাঁহার মনের ভিতর যে সংস্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলি দ্বারা জানিতে পারেন—কবে তাঁহার শরীরপাত হইবে। কোন্ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। মৃত্যু যে সর্বদা আসন্ন—এইটি জানা হিন্দুরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, কারণ গীতায় এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত্যুকালীন চিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ শক্তিশালী।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥২৪॥

মৈত্রী করুণা ইত্যাদি (১।৩৩) গুণগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগী ঐ গুণগুলির প্রকর্ষতা লাভ করেন।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥২৫॥

হস্তী প্রভৃতির বলের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর শরীরে সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে।

যখন যোগী এই সংযমশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে ঐ শক্তি লইয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী উহা লাভ করিবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥২৬॥

(পূর্বকথিত) মহা-জ্যোতির (১।৩৬) উপর সংযম করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্তী বস্তুও তিনি দেখিতে পান। যদি কোন বস্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুও তিনি দেখিতে পারেন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ ॥২৭॥

সূর্যে সংযমের দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞানলাভ হয়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥২৮॥

চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞানলাভ হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥২৯॥

ধ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহ-জ্ঞানম্ ॥৩০॥

নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥৩১॥

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়।

অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ঠকূপে চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয়।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্ ॥৩২॥

কূর্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের স্থিরতা আসে।

যখন তিনি সাধনা করেন, তখন তাঁহার শরীর চঞ্চল হয় না।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥৩৩॥

মস্তিষ্কের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয়।

সিদ্ধগণ ভূতযোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের। যোগী যখন তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই সিদ্ধগণের দর্শন পান। এখানে 'সিদ্ধ' শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না, যদিও সচরাচর উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্ ॥৩৪॥

অথবা প্রতিভা-শক্তিদ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়।

যাঁহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ-জ্ঞান-বিশেষ আছে, (পূর্বোক্ত) কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই তাঁহারা এই সমুদয় জ্ঞানের অধিকারী হন। যখন মানুষ উচ্চ প্রতিভা-শক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট সবই স্পষ্ট হইয়া যায়। কোন প্রকার 'সংযম' ব্যতীতই, সমুদয় জ্ঞান স্বতই তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥৩৫॥

হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্
ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥৩৬॥

পুরুষ ও বুদ্ধির বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপরের বা পুরুষের জন্য। বুদ্ধির অন্য এক অবস্থার নাম 'স্বার্থ'; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহার সহিত আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এবং তাহাতেই নিজেকে সুখী বা দুঃখী বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে 'পরার্থ' বলে, কারণ উহার সমুদয়

ভোগ নিজের জন্য নয়—পুরুষের জন্য। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে—উহার নাম 'স্বার্থ'। যখন বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান হইয়া অতিশয় নির্মল হয়, তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইয়া পুরুষমাত্রাবলম্বন হয়। সেই স্বার্থ-নামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষমাত্রাবলম্বনবুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই—শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাত বলিয়া কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥৩৭॥

তাহা হইতে প্রাতিভ[১৪] (অলৌকিক) শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥৩৮॥

ইহারা সমাধির পথে বাধা, কিন্তু সংসার-অবস্থায় উহারা সিদ্ধির স্বরূপ।

যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগ হইতে হইয়া থাকে, যদি তিনি 'আত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্ বস্তু' এই সত্যের উপর চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তিনি 'পুরুষ'-এর জ্ঞান লাভ করেন। তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান উদিত হয়। যখন তিনি এই 'বিবেক' লাভে কৃতকার্য হন, তখন তাঁহার প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই শক্তিসমুদয় সেই উচ্চতম লক্ষ্যের পথে বাধা অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মার জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। পথিমধ্যে যেন এগুলির সহিত সাক্ষাৎ হয়। যোগী যদি এগুলি পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাভ করিতে প্রলুব্ধ হন, তবে তাঁহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য

পরশরীরাবেশঃ ॥৩৯॥

যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ শিথিল হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচারস্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে) অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া সেই দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে উঠাইয়া গতিশীল করিতে পারেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়া সাময়িকভাবে সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে 'সংযম' প্রয়োগ করিলেই ইহা সিদ্ধ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মাই যে সর্বব্যাপী তাহা নয়, তাঁহার মনও সর্বব্যাপী—অবশ্য যোগীদিগের মতে। উহা সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র। এখন কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্য করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন স্নায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্যান্য বস্তু বা শরীরের দ্বারাও কার্য করিতে পারেন।

উদানজয়াজ্জল -পঙ্ক-কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৪০॥

উদান-নামক স্নায়ুপ্রবাহ জয় করিতে পারিলে যোগী জলে বা পঙ্কে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন।

'উদান'-নামক যে স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুসফুস ও শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন তাহা জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে চলিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাত্র এই শরীর ত্যাগ করিতে পারেন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥৪১॥

সমান-প্রবাহকে জয় করিলে তিনি জ্যোতিঃ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন।

এ-অবস্থায় তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥৪২॥

কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়।

এই আকাশ (ইথার) ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্রস্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে। ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমুদয় শব্দ শুনিতে পান। বহুদূরে কোন কথাবার্তা বা শব্দ হইলে তাহাও তিনি শুনিতে পান।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥৪৩॥

শরীরের ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্তসংযম করিয়া এবং তুলা প্রভৃতির ন্যায় আপনাকে লঘু ভাবনা করিয়া যোগী আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারেন।

আকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই এক বিশেষরূপে এই শরীর হইয়াছে। যদি যোগী শরীরের উপাদান ঐ আকাশ-ধাতুর উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও বায়ুর মধ্য দিয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥৪৪॥

দেহের বাহিরে মনের যে 'যথার্থ বৃত্তি' অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার নাম 'মহাবিদেহ'; তাহার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহা ক্ষয় হইয়া যায়।

মন অজ্ঞতাবশতঃ বিবেচনা করে, সে এই দেহের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমি কেবল এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে কেন, অথবা এই অহংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? ইহার তো কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগী চান, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি এই 'আমিত্ব' অনুভব করিবেন। অহংভাব চলিয়া গিয়া যে মানসিক বৃত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিত হয়, তাহাকে 'অকল্পিতা বৃত্তি' বা 'মহাবিদেহ' বলে। যখন তিনি উহার উপর 'সংযম' করিতে পারেন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সমস্তই তাঁহার নিকট জ্ঞানময়-চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব--সংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥৪৫॥

ভূতগণের স্থূল স্বরূপ, সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ভূতজয় হয়।[১৫]

যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্থূলভূতের উপর, তারপর উহার সূক্ষ্ম অবস্থার উপর 'সংযম' করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই সংযমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। খানিকটা কাদার তাল লইয়া তাঁহারা উহার উপর 'সংযম' প্রয়োগ করেন, ক্রমশঃ উহা যে-সকল সূক্ষ্মভূতে নির্মিত, তাহা দেখিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা ঐ সূক্ষ্মভূতের বিষয় জানিতে পারেন, তখনই তাঁহারা ঐ ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই এইরূপ বুঝিতে হইবে—যোগী এগুলি সবই জয় করিতে পারেন।

ততোঽণিমাদি -প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎতদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥৪৬॥

তাহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয় (অর্থাৎ ধ্বংস হয় না)।

ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্টসিদ্ধি[১৬] লাভ করেন। তিনি নিজেকে ইচ্ছামত 'অণু' করিতে পারেন, খুব বৃহৎ করিতে পারেন, পৃথিবীর ন্যায় গুরু ও বায়ুর ন্যায় লঘু করিতে পারেন, যাহার উপর ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই জয় করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছায় সিংহ তাঁহার পদতলে মেষের ন্যায় শান্তভাবে বসিয়া থাকিবে ও তাঁহার সমুদয় বাসনাই তাঁহার ইচ্ছামত পরিপূর্ণ হইবে।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥৪৭॥

কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকান্তি, বল ও বজ্রবৎ দৃঢ়তা বুঝায়।

তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যায়, কিছুই উহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কিছুই তাঁহার শরীর বিনাশ করিতে পারে না, কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে সশরীরে বাস করেন। বেদে লিখিত আছে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন ক্লেশ হয় না।[১৭]

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥৪৮॥

ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব—এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয়।

বাহ্য বস্তুর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অস্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে 'সংযম' প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে-কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ—যথা একখানি পুস্তক—তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। তারপর পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে।

তেতো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥

তাহা হইতে দেহে মনের ন্যায় বেগ, ইন্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে।

যেমন ভূতজয় দ্বারা কায়সম্পৎ লাভ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা পূর্বোক্ত শক্তিসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং
সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥৫০॥

পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়।

যখন প্রকৃতি জয় করা হইয়া গিয়াছে ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ জানা গিয়াছে যে,

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥৫১॥

এগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়।

এই অবস্থায় সাধক কৈবল্য লাভ করেন, স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যান। যখন তিনি সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—শক্তি-দুইটিও ত্যাগ করেন, তখন সমুদয় ভোগ, এমন কি দেবগণকৃত প্রলোভনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী এই-সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে বড় নয়। সর্বশক্তিমত্তাও স্বপ্নতুল্য। উহা কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই সর্বশক্তিমত্তা বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনেরও পারে।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥৫২॥

দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া বা আনন্দ বোধ (স্ময়) করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

আরও অনেক বিঘ্ন আছে। দেবতা ও অন্যেরা যোগীকে প্রলুব্ধ করিতে আসেন; তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যায়। আমরা যেমন ঈর্ষাপরায়ণ, দেবতারাও সেইরূপ, বরং কখনও কখনও আমাদের অপেক্ষা অধিক। পাছে পদভ্রষ্ট হন, সেই ভয়ে তাঁহারা অতিশয় ভীত। যে-সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, মৃত্যুর পর তাঁহারাই দেবতা হন। তাঁহারা সোজা পথ ছাড়িয়া পাশের এক গলিপথে চলিয়া যান এবং এই ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তাঁহাদের আবার জন্মাইতে হইবে, কিন্তু যিনি এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলিও প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনি একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥৫৩॥

ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি এড়াইবার উপায় কি? বিবেকবলে যখন সদসৎবিচার শক্তি হয়, তখনই এই-সকল বিঘ্ন চলিয়া যাইবে। যাহাতে বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের সূক্ষ্মতর অংশের এবং উহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযমের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥৫৪॥

জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না, এবং সেজন্য তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগকেও ঐ পূর্বোক্ত সংযমের দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে।

আমরা যে দুঃখ ভোগ করি, তাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যদৃষ্টির অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সকলেই মন্দকে ভাল বলিয়া ও স্বপ্নকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য, ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্নমাত্র; আমরা ভাবি, আমরা শরীর। সুতরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ। এই অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রসূত। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে বলও আসে, তখনই আমরা এই শরীর, স্বর্গ ও দেবাদির কল্পনা পরিহার করিতে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমরা বস্তুগুলিকে পৃথক্ করিয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ একটি গাভীর কথা ধরা যাক। কুকুর হইতে গাভীর ভেদ জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়া থাকি? চিহ্নের দ্বারা। আবার দুইটি বস্তু সর্বাংশে সমান হইলে আমরা স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। কিন্তু যখন বস্তুসকল এমন মিশাইয়া থাকে যে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি কোন কাজে আসে না, তখন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ বিবেক-বলে আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং বিশ্বজগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র 'অমিশ্র' বস্তু। শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, তথাপি আমরা সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের

সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের মহাভ্রম এই যে, ঐ পার্থক্যটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যখন এই বিবেকশক্তি লাভ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায় যে, জগতের বাহ্য ও আন্তর—সকল বস্তুই মিশ্র পদার্থ, সুতরাং ঐগুলি 'পুরুষ' হইতে পারে না।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥৫৫॥

যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর সর্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 'তারকজ্ঞান' বলে।

'তারক' অর্থে যাহা যোগীকে সংসার (জন্ম-মৃত্যুর সাগর) হইতে তারণ করে। সমগ্র প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্থূল সর্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে। এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা সমুদয় বস্তুকে যুগপৎ—-একদৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারে।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥৫৬॥

যখন সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্যলাভ হয়।

কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারা যায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারেন যে, তিনি চিরকাল একাকী, 'কেবল' (শুদ্ধ); তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আর কাহারও প্রয়োজন নাই। যতদিন আমরা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাই, ততদিন আমরা দাসমাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন—তিনি মুক্তস্বভাব ও তাঁহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না—আর এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই তিনি মুক্তিলাভ করেন, তখনই তাঁহার এই কৈবল্যলাভ হয়। যখন আত্মা জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে দেবতা পর্যন্ত কোন কিছুরই উপর তিনি নির্ভর করেন না, তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে কৈবল্য (পৃথকত্ব) ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত 'সত্ত্ব' অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষেরই মত শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই এই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে, তখন সেই শুদ্ধবুদ্ধি কেবল নির্গুণ পবিত্রস্বরূপ পুরুষকেই প্রতিফলিত করে।

কৈবল্য-পাদ

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধায়ঃ ॥১॥

সিদ্ধি (শক্তি)-সমূহ জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়।

কখনও কখনও মানুষ পূর্বজন্মলব্ধ সিদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে সে যেন তাহাদের ফলভোগ করিতেই আসে। সাংখ্যদর্শনের পিতাস্বরূপ কপিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ[১৮] হইয়া জন্মিয়াছিলেন। 'সিদ্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যিনি সফল বা কৃতকার্য হইয়াছেন।

যোগীরা বলেন, রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা এই-সকল শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। তোমরা সকলেই জানো যে, রসায়নবিদ্যার প্রারম্ভ আলকেমি (alchemy) হইতে। মানুষ পরশ-পাথর (philosopher's stone), সঞ্জীবনী অমৃত (elixir of life) ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে 'রসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মত ছিলঃ সূক্ষ্মতত্ত্বপ্রিয়তা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম—এ সব খুবই ভাল, কিন্তু এ-গুলি

লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর। যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেই চরমলক্ষ্যে পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে ইচ্ছুক। কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ লইয়া পুনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, আবার তাহার মৃত্যু হইল; এইরূপে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হইয়া গেল। যদি শরীরকে এরূপ সবল ও নিখুঁত করিতে পারা যায় যে, উহার জন্মমৃত্যু একেবারে বন্ধ হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। এই কারণে এই রাসায়নেরা বলিয়া থাকেন, 'প্রথমে শরীরকে খুব সবল কর।' তাঁহারা বলেন, শরীরকে অমর করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর গঠন করিবার কর্তা যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত শক্তিপ্রকাশের এই একটি বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তি সংগ্রহ করিবার কোন সীমা নির্দিষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পারিব না কেন? যত শরীর আমরা ধারণ করি, সব আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যখনই এই শরীরের পতন হইবে, তখন আবার আমাদিগকেই আর একটি শরীর গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমতা থাকে, তবে এই শরীর হইতে বাহিরে না গিয়া আমরা এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকার্য করিতে পারিব না কেন? তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহা যদি সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পরও (কোন একভাবে) জীবিত থাকি এবং নিজ নিজ শরীর গঠন করি, তবে শরীরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিয়া কেবল উহাকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত করিয়া এই পৃথিবীতে (নূতনতর) শরীর গঠন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? তাঁহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারদে ও গন্ধকে অত্যদ্ভুত শক্তি লুক্কায়িত আছে। এই দ্রব্যগুলি হইতে প্রস্তুত কোন বিশেষ 'রসায়ন' দ্বারা মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীরকে অবিকৃত রাখিতে পারে। অপর কেহ বিশ্বাস করিত যে, ঔষধবিশেষের সেবনে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ঔষধই, বিশেষতঃ ঔষধে ধাতুর ব্যবহার, আমরা এই রসায়নবিদ্যা হইতে পাইয়াছি। কোন কোন যোগিসম্প্রদায় দাবী করেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান গুরুরা অনেকে এখনও তাঁহাদের পুরাতন শরীরেই বিদ্যমান আছেন। যোগসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণভূত (যাঁহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই) পতঞ্জলিও ইহা অস্বীকার করেন না।

মন্ত্রশক্তিঃ মন্ত্র-নামক কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে; নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে এগুলি হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হইয়া থাকে। আমরা দিনরাত অদ্ভুত ঘটনারাশির মধ্যে বাস করি, সেগুলির বিষয় কিছু চিন্তাও করি না। মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা নাই।

তপস্যাঃ তোমরা দেখিবে, প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন আছে। ধর্মের এই দিকটিতে হিন্দুরাই সর্বদা চরম সীমায় গিয়া থাকেন। দেখিবে—এমন অনেকে আছে, যাহারা সারা জীবন ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া রাখে, যে পর্যন্ত না উহা শুকাইয়া অবশ হইয়া যায়। অনেকে দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের পা ফুলিয়া যায়; যদি তারপরও তাহারা জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের পা এত শক্ত হইয়া যায় যে, তাহারা আর পা মুড়িতে পারে না। বাকী জীবন তাহাদিগকে দাঁড়াইয়াই থাকিতে হয়। আমি একবার এক ঊর্ধ্ববাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যখন প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতেন, তখন কিরূপ বোধ করিতেন?' তিনি বলিলেন, 'প্রথম প্রথম ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইত। এত যন্ত্রণা হইত যে নদীতে গিয়া জলে ডুব দিয়া থাকিতাম; তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল না।' এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।

সমাধিঃ মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা, ইহাই প্রকৃত যোগ; এই বিজ্ঞানের ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়; আর ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলি গৌণ। সেগুলির দ্বারা উচ্চতম অবস্থা লাভ করা যায় না। সমাধিদ্বারাই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সবই আমরা লাভ করিতে পারি।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥২॥

প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত শক্তিগুলি কখনও জন্ম দ্বারা, কখনও রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা অথবা তপস্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা করা যাইতে পারে। এখন তিনি বলিতেছেনঃ এই শরীর একজাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হয় কেন? তাঁহার মতে—ইহা প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা হইয়া থাকে। পরবর্তী সূত্রে তিনি ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥৩॥

সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, কিন্তু ঐগুলি উহার বাধাভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র—যেমন কৃষক জলের গতিপথে বাধা বাঁধ ভাঙিয়া দিলে জল নিজের স্বভাববশেই প্রবাহিত হয়।

যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল রুদ্ধ আছে। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয় এবং জল স্বতই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে। পূর্ণতা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব; কেবল উহার দ্বারা রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত হইবে; তখন মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং প্রকৃতির শক্তি অপ্রতিহত ভাবে ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা যাহাদিগকে দুষ্ট বলি, তাহারা সাধু হইয়া যায়। স্বভাব বা প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে, কালে এই প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় লইয়া যাইবে। ধার্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্যমাত্র—কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দেওয়া, জন্মগত অধিকারস্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া—পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব।

প্রাচীন যোগীদিগের পরিণামবাদ আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও সহজে ও ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে এবং যোগীদের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে অনেক ভাল। আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটি কারণ—যৌন-নির্বাচন (sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন (survival of the fittest)।[১৯] কিন্তু এই দুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও সঙ্গী নির্বাচন করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আধুনিকদিগের মতে মানুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভর্ৎসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা নিজেদের দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং যত দুষ্ট ও অনুপযুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিতে চান (তাঁহারাই যেন মানুষের যোগ্যতা-অযোগ্যতার একমাত্র বিচারক)—এইভাবে তাঁহারা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিবেন! কিন্তু সেই মহান্ প্রাচীন পরিণামবাদী পতঞ্জলি ঘোষণা করিয়াছেনঃ ক্রমবিকাশ বা পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে পূর্ণতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহারই বিকাশ মাত্র; ঐ পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং বাধার ওপারে অনন্ত তরঙ্গস্রোত নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। বাঁধের বাহিরে যে অনন্ত তরঙ্গ-স্রোত রহিয়াছে তাহা নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ; কেবল জীবন-ধারণের অথবা ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য প্রতিযোগিতা অজ্ঞানজাত ক্ষণিক অনাবশ্যক বাহ্য ব্যাপার মাত্র। সকল প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া গেলেও যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের এই অন্তর্নিহিত পূর্ণস্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। অতএব প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর 'মানুষ' চাপা রহিয়াছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি সবেগে 'মানুষ' বহির্গত হয়; এইরূপে মানুষের ভিতরও দেবতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গলে ও শৃঙ্খলে তিনি বন্দী হইয়া আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভাঙিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশিত হন।

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥৪॥

যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত সৃজন করিতে পারেন।

কর্মবাদের তাৎপর্য এই যে, আমরা আমাদিগের সদসৎ কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি, আর সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য—মানুষের নিজ মহিমা অবগত হওয়া। সকল শাস্ত্রেই মানবের আত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাদ প্রচার করিতেছেঃ শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি শুভাশুভ কর্ম আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা তো কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্ম কেবল পুরুষের স্বরূপ প্রকাশে বাধা দেয়; শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দূর করিয়া দেয়; তখনই পুরুষের মহিমা প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কখনই পরিবর্তিত বা পরিণামপ্রাপ্ত হন না। তুমি যাহাই কর না কেন, কিছুই তোমার মহিমা—তোমার নিজ স্বরূপ নষ্ট করিতে পারে না; কারণ কোন বস্তুই আত্মার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, আত্মার উপর কেবল একটি আবরণ পড়ে এবং উহার পূর্ণতা আচ্ছাদিত হয়।

যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য 'কায়ব্যূহ' অর্থাৎ একসঙ্গে বহু দেহ সৃজন করেন। এই-সকল দেহের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব হইতে অনেকগুলি মন সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথকত্ব বুঝাইবার জন্য এই নির্মিত চিত্তসমূহকে 'নির্মাণচিত্ত' বলা হয়।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥৫॥

যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি মনের কার্য নানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক আদি মনই সবগুলির নিয়ন্তা।

ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে 'নির্মাণচিত্ত' এবং এই শরীরগুলিকে 'নির্মাণদেহ' বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত শরীর ও মন। ভূত (মূল উপাদান) ও মন যেন দুইটি অফুরন্ত ভাণ্ডারগৃহের মত। যোগী হইলেই তুমি এ-দুটিকে জয় করিবার রহস্য অবগত হইবে। এই জ্ঞান বরাবরই তোমার ছিল, তুমি শুধু উহা ভুলিয়া গিয়াছ। যোগী হইলে উহা তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখন তুমি উহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মাণচিত্তই সেই উপাদান হইতে নির্মিত। মন এক পদার্থ আর ভূত এক পৃথক্ পদার্থ, তাহা নয়; উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন দিক মাত্র। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা হইতে যোগীর এই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যখনই যোগী প্রকৃতির এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা-নামক উপাদান হইতে যত ইচ্ছা মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥৬॥

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে-চিত্ত সমাধি দ্বারা লব্ধ, তাহা বাসনাশূন্য।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের পূর্ণ একাগ্রতা বা সমাধি-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি ঔষধ, মন্ত্র অথবা কৃচ্ছ্রতাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসনা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত।

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥৭॥

যোগীদের কর্ম কৃষ্ণও নয়, শুক্লও নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র।

যখন যোগী সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার কার্য ও ঐ কার্য দ্বারা যে-সব কর্মফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না; কারণ তিনি তো ঐগুলি চান নাই। তিনি কেবল কর্ম করিয়া যান। তিনি পরহিতের জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ-কর্ম করেন, কিন্তু ফলের দিকে তাকান না, অতএব কর্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা আলদা; যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—কৃষ্ণ (অসৎ বা অশুভ কর্ম), শুক্ল (সৎ বা শুভ কর্ম) ও মিশ্র।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥৮॥

এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত। (অন্যগুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে।)

মনে কর, আমি সৎ, অসৎ, ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার কর্মই করিলাম; তারপর মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। মনুষ্যদেহের বাসনা আর দেবদেহের বাসনা একরূপ নয়। দেবশরীর ভোজন বা পান কিছুই করে না। তাহা হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম আহার ও পানের বাসনা সৃজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশিত হইতে পারে। যে-সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হইয়াছে, কেবল সেগুলিই প্রকাশ পাইবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব বাসনা রহিয়াছে। আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলি ফলোন্মুখ হইবে, কারণ ঐগুলি প্রকাশের জন্য পরিবেশ উপযুক্ত হইয়াছে। আমি যদি পশু দেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব বাসনাগুলিই আগাইয়া আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে এই বাসনাগুলি আমরা দমন করিতে পারি। কেবল যে কর্ম সেই বিশেষ পরিবেশের উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পরিবেশের শক্তিতে কর্মকেও নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥৯॥

স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্য হইবে।

অনুভূতিসমূহ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে পরিণত হয়, জাগরিত সংস্কারকেই 'স্মৃতি' বলে। বর্তমানে জ্ঞাতসারে কৃত কর্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্বানুভূতিসমূহের মনের অগোচরে যে সমন্বয় হয়, তাহাও এই স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে যে-সকল সংস্কার লব্ধ হইয়াছে, কেবল সেগুলি সেই দেহে কর্মের কারণ হইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার তখন স্তিমিতভাবে থাকিবে। প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি শরীরের উত্তর-পুরুষরূপে কার্য করিবে। এইরূপে বাসনার পৌর্বাপর্য নষ্ট হয় না।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥১০॥

সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি।

আমাদের সকল ভোগ ও অভিজ্ঞতা সুখী হইবার বাসনা হইতেই উৎপন্ন। এই ভোগের কোন আদি নাই; কারণ প্রত্যেক নূতন ভোগই পূর্বভোগের দ্বারা আমাদের চিত্তে যে এক প্রকার প্রবণতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥১১॥

এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার বিষয়—এইগুলি দ্বারা একত্র গ্রথিত বলিয়া ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়।

এই বাসনাগুলি কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত[২০]; মনে কোন বাসনা উদিত হইলে উহা স্বীয় ফলপ্রসব না করিয়া বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সংস্কাররূপে পরিণত অতীত বাসনাসমূহের আধার—বৃহৎ ভাণ্ডারস্বরূপ; যতক্ষণ না ঐগুলি কর্মরূপে নিঃশেষিত হইতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। আবার যতদিন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নূতন বাসনা উত্থিত হইবে। যদি এইগুলি (কার্য, কারণ, আধার ও বিষয়) হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই বাসনার বিনাশ হইতে পারে।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥১২॥

বস্তুর ধর্ম (বা গুণ) সকলই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ (বর্তমানে দৃষ্টি না হইলেও) তাহাদের স্বরূপেই অবস্থিত আছে।

তাৎপর্য এই যে, অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে কখনও সৎ (অস্তিত্ব) উৎপন্ন হয় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্ম গুণাত্মানঃ ॥১৩॥

উহারা কখনও ব্যক্ত, কখনও বা সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করে, আর গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ।

গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন উপাদানকে বুঝায়, উহাদের স্থূল অবস্থাই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥১৪॥

পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু বাস্তবিক এক।

যদিও উপাদান তিনটি—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তথাপি তাহাদের পরিণাম ও পরিবর্তনের ভিতরে একটি সম্বন্ধ থাকায় সকল বস্তুতেই একত্ব আছে, বুঝিতে হইবে।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥১৫॥

বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা ও অনুভূতি হইয়া থাকে। একই বস্তু সম্পর্কে যেহেতু অনুভূতি ও বাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব মন ও বিষয় ভিন্নস্বভাব।[২১]

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥১৬॥

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্তু কখনও জ্ঞাত ও কখনও অজ্ঞাত থাকে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ ॥১৭॥

চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী।

এতক্ষণ ধরিয়া যে মতের কথা বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক—এই উভয় প্রকারই। আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকার চলিয়াছে। এই পুস্তকখানি কি? ইহা নিত্যপরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কতকগুলি বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আসিতেছে, উহা একটি আবর্তস্বরূপ। কিন্তু এই একত্ববোধ কি করিয়া হইতেছে? এটি যে সেই একই পুস্তক, এই বোধ কি করিয়া হইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে তালে হইতেছে; তালে তালে উহারা আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ করিতেছে। যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদা

পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে। মনও এইরূপ সদা পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন গতিশীল একই পদার্থের দুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটি মৃদু ও অপরটি দ্রুততর বলিয়া অবশ্য আমরা ঐ দুইটি গতির মধ্যে পার্থক্য অনায়াসে ধরিতে পারি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে এবং একখানি গাড়ী তাহার পাশ দিয়া যাইতেছে। কিছুদূর পর্যন্ত এই উভয়েরই গতি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্তু একটি থাকিলেই গতিকে অনুভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই-তিনটি বস্তু বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তখন আমরা প্রথমে দ্রুততরটির, পরিশেষে মৃদুতর গতিশীল বস্তুটির গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি করিয়া অনুভব করিবে? উহাও নিয়ত গতিশীল। সুতরাং অপর একটি বস্তু থাকা প্রয়োজন, যাহা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে গতিশীল; পরে তদপেক্ষা মৃদুতর, তদপেক্ষা মৃদুতর এইরূপ চলিতে চলিতে ইহার আর সীমা পাওয়া যাইবে না। সুতরাং যুক্তি তোমাকে কোন একস্থানে থামিতে বাধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়া তোমাকে এই পর্যায়ের শেষ করিতেই হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে আলোক আসিয়া স্থির বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাতে নানা বর্ণের চিত্র উৎপন্ন করে, অথচ কোনরূপেই উহাকে মলিন বা রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এই-সব সংস্কার স্থির পুরুষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥১৮॥

মন দৃশ্য (পদার্থ) বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ নয়।

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতি স্বপ্রকাশ নয়, স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ নয়। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্যোতিতেই প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহারই শক্তি জড় ও অন্যান্য শক্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতেছে।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥১৯॥

এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নয়।

মন যদি স্বপ্রকাশ হইত, তবে একই সময়ে উহা নিজেকে ও উহার প্রকাশ্য বস্তুগুলিকে অনুভব করিতে পারিত; মন তো তাহা পারে না। যদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অন্য বস্তুতে মন এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া উহা স্বপ্রকাশ নয়, পুরুষই স্বপ্রকাশ।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥২০॥

যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত ঐ চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না এবং স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে।

মনে কর—আর একটি মন রহিয়াছে, উহা এই সাধারণ মনটিকে অনুভব করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন একটি মনের আবশ্যক,যাহা আবার ঐ মনটিকে অনুভব করিবে, সুতরাং কোথাও ইহার শেষ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে স্মৃতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ স্মৃতির কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার থাকিবে না।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্ ॥২১॥

চিতি (পুরুষের শক্তি) অপরিণামী (পরিবর্তিত হয় না, অপরের দিকে সঞ্চারিত হয় না); যখন মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ করে, তখনই উহা জ্ঞানময় হয়।

জ্ঞান যে পুরুষের গুণ নয়, ইহা স্পষ্টতর ভাবে বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বলিলেন। মন যখন পুরুষের নিকট আসে, তখন যেন পুরুষ মনের উপর প্রতিফলিত হন আর মন সাময়িকভাবে জ্ঞানবান্ হয়, আর বোধ হয় যেন মনই পুরুষ।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥২২॥

মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত (রঞ্জিত) হয়, তখন উহা সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে।

একদিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাহ্য জগৎ মনের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপর দিকে দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছেন; এইভাবেই মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আসে।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥২৩॥

সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হইলেও সংহত পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য করে।

মন নানাপ্রকার পদার্থের সংহতি; সুতরাং উহা নিজের জন্য কার্য করিতে পারে না। এই জগতে যত সংহত পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্তুতে—এমন কোন তৃতীয় বস্তুতে—যাহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং

নানাপ্রকার বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন মনও পুরুষের জন্য।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা -বিনিবৃত্তিঃ ॥২৪॥

বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের পক্ষে মনে আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়।

বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নন।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রা গ্‌ভাবং[22] চিত্তম্ ॥২৫॥

তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে।

এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়া যায়, আমরা তখন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের জন্য এই-সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে। আমরা তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি জগতের প্রভু নয়। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতি কেবল আমাদের হৃদয়সিংহাসনে সমাসীন রাজা পুরুষকে এই-সব দৃশ্য দেখাইবার জন্য। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের উদয় হয়, ভয় চলিয়া যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥২৬॥

উহার বিঘ্নরূপে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য চিন্তা মনে উঠে, তাহা সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হয়।

আমাকে সুখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্তু আবশ্যক—এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে-সকল ভাব হইতে আসে, সেগুলি সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক। পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ ও আনন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান পূর্বসংস্কারের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্যক।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥২৭॥

(অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি) ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা ধ্বংস করার কথা বলা হইয়াছে (২।১০), এগুলিকেও ঠিক সেই উপায়েই নাশ করিতে হইবে।

প্রসংখ্যানে ২প্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥২৮॥

তত্ত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানলাভের ঠিক পূর্বে ঐশ্বর্যরূপ ফলও যিনি ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞানের ফলে তাঁহার ধর্মমেঘ-নামক সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট পূর্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্রকৃত যোগী এগুলি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তখন তিনি এক বিশেষ আলোক দেখিতে পান—তিনি ধর্মমেঘ-নামক এক আশ্চর্য জ্ঞানের অধিকারী হন। ইতিহাস যে-সকল ধর্মগুরুর কথা বর্ণনা করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ধর্মমেঘ-সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের ভিতরেই জ্ঞানের বিশাল ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সত্য তাঁহাদের নিকট বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তিসমূহের অভিমান ত্যাগ করাতে শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা তাঁহাদের স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥২৯॥

তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়।

যখন এই ধর্মমেঘ-সমাধি হয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাঁহাকে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, আর তাঁহার কোন দুঃখকষ্ট থাকে না।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥৩০॥

তখন সর্বপ্রকার আবরণ ও অশুদ্ধি-শূন্য হওয়ায় জ্ঞান অনন্ত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে।

জ্ঞান তো ভিতরেই রহিয়াছে, উহার আবরণ সরিয়া গিয়াছে। কোন বৌদ্ধশাস্ত্র 'বুদ্ধ' (ইহা একটি সূচক) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন—অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান। যীশু ঐ অবস্থা লাভ করিয়া 'খ্রীষ্ট' হইয়াছিলেন। তোমরা সকলেই ঐ অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যাইবে। সর্বপ্রকার জ্ঞেয়বস্তু-সমন্বিত সমগ্র জগৎ পুরুষের নিকট যেন শূন্যে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করে, কারণ তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া বোধ হয়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩১॥

যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির পর পর যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়া যায়।

তখন গুণগুলির এই-সব বিবিধ পরিণাম—এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণতি—সব একেবারে শেষ হইয়া যায়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥৩২॥

যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্তসম্বন্ধ লইয়া অবস্থিত ও যাহাকে একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে) যাইয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্রম।

পতঞ্জলি এখানে 'ক্রম'-শব্দের সংজ্ঞা দিতেছেন। যে পরিণামগুলি মুহূর্তকালসম্বন্ধে সম্বন্ধ, 'ক্রম' শব্দ দ্বারা সেগুলিকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, ইহারই মধ্যে কতক মুহূর্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তেই ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু আমরা ঐ পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীর অন্তে (অর্থাৎ অনেক পরিণামশ্রেণীর পর) ধরিতে পারি। ইহাকে 'ক্রম' বলে। কিন্তু যে-মন সর্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর 'ক্রম' নাই। তাহার পক্ষে সবই বর্তমান হইয়া গিয়াছে। কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তখন সেই মন কালকে জয় করে, আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সবই তাহার নিকট বিদ্যুতের মত এক ঝলকে প্রকাশ পায়।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥৩৩॥

গুণসকলে যখন পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে 'কৈবল্য' বলে, অথবা উহাকে চিৎশক্তির (চৈতন্যশক্তির) স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

প্রকৃতির কার্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদচিহ্নহীন জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।

যাঁহারা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক! তাঁহারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

পাদটীকা

পাদটীকা - চিকাগো বক্তৃতা

১	পাঠকের অবগতির জন্য এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই বিশ্বমেলা উপলক্ষ্যে চারিটি সমাবেশ হইয়াছিল।
২	শিবমহিম্নিঃ স্তোত্রম
৩	গীতা, ২।২৩
৪	শ্বেতাশ্ব. উপ., ২।৫
৫	কঠ উপ., ২।৩।৩
৬	মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।১২
৭	কঠ, উপ., ২।২।১৫; শ্বেঃ., ৬।১৪; মু, ২।২।১০
৮	তুলনীয় গীতা; ৭।৭, ১০।৪১
৯	Bible
১০	'সাংপো' ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতী নাম।
১১	কলম্বাস-কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম 'কলম্বিয়া'।

পাদটীকা - কর্মযোগ

১	তুলনীয়ঃ গীতা—২/১১, ৩৭
২	মহানির্বাণতন্ত্র—৮।২৩
৩	ঐ—৮।২৪
৪	ঐ—৮।২৫
৫	ঐ—৮।২৬
৬	ঐ—৮।৩০-৩১
৭	ঐ—৮।৩৩-৩৪
৮	ঐ—৮।৩৬-৩৭
৯	ঐ—৮।৩৯-৪২
১০	ঐ—৮।৪৪
১১	ঐ—৮।৪৫-৪৭
১২	ঐ—৮।৪৮-৫০
১৩	ঐ—৮।৫১-৫২
১৪	ঐ—৮।৫৩
১৫	ঐ—৮।৫৩
১৬	ঐ—৮।৫৪
১৭	ঐ—৮।৫৬
১৮	ঐ—৮।৫৭
১৯	ঐ, ৮।৫৮
২০	ঐ, ৮।৫৯
২১	ঐ, ৮।৬২
২২	ঐ, ৮।৬৩
২৩	ঐ, ৮।৬৭
২৪	তুলনীয়ঃ সংহতানাং পরার্থত্বাৎ।
২৫	তুলনীয়ঃ গীতা, ৩।২২-২৪ ২
২৬	গাজিপুরের পওহারী বাবা; ১৮৯৮ খ্রীঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।
২৭	যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি—উদ্দেশ্য ও উপায় এক।
২৮	তুলনীয়ঃ গীতা, ৪।১৮
২৯	তুলনীয়ঃ গীতা, ২/২; কঠ-উপ. ১/২/১৮
৩০	গীতা, ৫।৪
৩১	তুলনীয়ঃ গীতা, ৩।১৭
৩২	গীতা, ৯।২৭
৩৩	গাজীপুরের পওহারী বাবা।
৩৪	গীতা, ৩।১৭
৩৫	তৈত্তিরীয় উপ, ২।৭
৩৬	কঠ উপ, ২।৩।৩
৩৭	গীতা, ২।৪৭

পাদটীকা - সরল রাজযোগ

১	গীতা, ৬।১৬
২	গায়ত্রী মন্ত্র
৩	এই খণ্ডেই 'রাজযোগ' গ্রন্থের ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪	'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম'— গীতা, ৪।১১
৫	ইংরেজী সংস্করণে আছেঃ 'four other lotuses'।
৬	ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্র ধরা হইয়াছে।

পাদটীকা - রাজযোগ

(অথবা অন্তঃপ্রকৃতি-জয়)

১	Exact Science—নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে-সব বিজ্ঞানের তত্ত্ব এতদূর সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়। যথা—গণিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি।
২	ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডক উপ, ২।২।৮
৩	শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ শ্বেঃ উঃ, ২।৫ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেঃ উঃ, ৩।৮
৪	নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জু ন॥ যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥—গীতা, ৬।১৬-১৭
৫	প্রাণায়াম-ক্ষরিত-মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তব্যম্। ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণ-নাসিকাপুটঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পুরুয়েদ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎসৃজ্যৈবং দক্ষিণন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পুরুয়িত্বা সব্যেন সমুৎসুজেৎ যথাশক্তি। তৃঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যস্যতঃ সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে পূর্বরাত্রেঽর্ধরাত্রে চ পক্ষাস্মাসাদ্বিশুদ্ধির্ভবতি।—শাঙ্করভাষ্য, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২।৮
৬	Christian Science—এই সম্প্রদায় মিসেস এড্ডি(Mrs. Eddy) নামক এক আমেরিকান মহিলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার মতে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহা কেবল আমাদের মনের ভ্রমমাত্র। বিশ্বাস করিতে হইবে—আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইব। ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই যে, এই মতাবলম্বীরা বলেন, ‘আমরা খ্রীষ্টের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি। খ্রীষ্ট যে-সকল অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন আমরাও তাহাতে সমর্থ এবং সর্বপ্রকার দোষশূন্য জীবনযাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য।’
৭	ইন্দ্রবিরোচন-সংবাদ—ছান্দোগ্য উপ., (৮।৭।১৫) দ্রষ্টব্য।
৮	তুলনীয়ঃ 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ ...সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥'
৯	নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্—ইত্যাদি তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেত—ইত্যাদি।—ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম মণ্ডল
১০	‘কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?’ মুণ্ডক উপ., ১।৩
১১	বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনি কার্য করে, সেই কার্যকে reflex-action বলে।
১২	যোগসূত্র, ১।২১
১৩	পাঠক স্মরণ রাখিবেন, বেতার-আবিষ্কারের পূর্বে ইহা লিখিত।
১৪	কূর্মপুরাণ, উপবিভাগ—একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৫	গীতা, ১২।১৩-১৯

পাদটীকা - পাতঞ্জল -যোগসূত্র

১	'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যতিসংবিশন্তি'—তৈত্তি উপ, ৩।১
২	'ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি'—প্রশ্নোপনিষদ্, ৬।৮
৩	'Matter is the permanent possibility of sensation.'—J. S. Mill
৪	এখানে নিরুদ্ধ অবস্থার কথা বলা হয় নাই, কারণ ঐ অবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বলা যাইতে পারে না।
৫	পাঠান্তরঃ বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ
৬	সর্বে এব শব্দাঃ সর্বাকারার্থাভিধানসমর্থা—ইতি স্থিত এবৈষাং সর্বাকারৈরথৈঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ। —ব্যাসভাষ্যের বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকা
৭	ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥—মোহমুদ্গর, শঙ্করাচার্য
৮	এই সূত্রের ব্যাখ্যার 'প্রমাদ', 'আলস্য', 'অবিরতি', 'ভ্রান্তিদর্শন', 'অলব্ধভূমিকত্ব' বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। সূত্রার্থে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী বুঝিতে হইবে।
৯	তুলনীয়ঃ কঠ উপ., ১/৩/৩-৪
১০	অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।। —পঞ্চতন্ত্রম্
১১	অনন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম—মহাভারত, বনপর্ব
১২	'যম'-এর প্রথম তিনটি সাধনের জন্য 'সংক্ষেপে রাজযোগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৩	পাঠান্তরঃ ...চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগঽন্তর্ধানম্
১৪	প্রাতিভাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টাতীতানাগত জ্ঞানং, শ্রাবণাদ্ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদনাদ্ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্ দিব্যরূপসম্বিৎ। আস্বাদাদ্ দিব্যরসসম্বিৎ, বার্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানম্ ইতোতানি নিত্যং জায়ন্তে।—ব্যাসভাষ্য
১৫	স্বরূপ—পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তারল্যাদি। অন্বয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক ভূতে অন্বিত রহিয়াছে, ইহা জানা। অর্থবত্ত্ব—বিশেষ ভোগপ্রদান-সামর্থ্য।
১৬	অষ্টসিদ্ধিঃ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি (দূরস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওয়া), প্রাকাম্য (ইচ্ছার অনভিঘাত), বশিত্ব, ঈশিত্ব ও কামবসায়িত্ব (সত্যসংকল্পতা)।
১৭	তুলনীয়ঃ ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্—শ্বেতাশ্বতর উপ., ২।১২

১৮	তুলনীয়ঃ 'সিদ্ধানং কপিলো মুনিঃ'—গীতা, ১০।২৬
১৯	ডারউইন ও তৎপরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণের মতঃ প্রাণিগণের শরীর পরিবর্তনের কারণ নিজ নিজ যৌন সঙ্গী নির্বাচনের ইচ্ছা; এই জীবন সংগ্রামে যাহারা যোগ্যতম তাহারাই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া যায় ও অপরে ধ্বংস হয়।
২০	এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ যোগসূত্রের ২।৩, ২।১৩ ও ৪।৭ সূত্র।
২১	কোন কোন গ্রন্থে এইখানে আরেকটি সূত্র আছে। এই সূত্রটি বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ব্যাসভাষ্যে আছেঃ ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ॥ (দৃশ্য) বস্তু একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, কারণ যখন সেই চিত্তের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে (যখন ঐ চিত্ত বিষয়ান্তরে মগ্ন বা সুষুপ্তি বা সমাধিতে লীন হইবে), তখন ঐ বস্তুর কি হইবে?—তখন কি উহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না?
২২	পাঠান্তর—কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং।—তখন অর্থ হইবে, মনে বিবেকজ্ঞান গভীর হয়, এবং উহা কৈবল্যের অভিমুখে ধাবিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
দ্বীতিয় খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’র দ্বিতীয়খণ্ডে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, আলোচনা ও লেখা সন্নিবেশিত হইল। স্বামীজী এখানে সহজ সরল স্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে অদ্বৈত বেদান্তের আত্মতত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

‘জ্ঞানযোগ’ পুস্তকের উদ্বোধন-সংস্করণই আমরা অনুসরণ করিয়াছি। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য—‘উদ্বোধন’ হইতে জ্ঞানযোগের একটি মূল ইংরেজী সংস্করণও বহুদিন যাবৎ প্রকাশিত ছিল। বাঙলা ‘জ্ঞানযোগ’ তাহারই অনুবাদ। ‘অদ্বৈত আশ্রম’-সংস্করণের সহিত কোথাও কোথাও সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হইবে।

‘জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে’ প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব এবং বেদান্ত-বিষয়ক অন্যান্য বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলির অনুবাদ এই প্রথম পুস্তকাকারে গ্রথিত হইল। অনুবাদগুলি সবই প্রায় নূতন।

তৃতীয় অংশে ‘হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যলয়ে বেদান্ত’ উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত Vedanta Philosophy at the Harvard University পুস্তিকার অনুবাদ। মধ্যের অংশটি এতদিন বাঙলা ‘কথোপকথন’ পুস্তকের অন্তর্গত ছিল। ‘বেদান্ত-দর্শন’ বক্তৃতাটি ও শেষের উত্তরগুলি নূতন অনুবাদ। তথ্যপঞ্জীতে বিভিন্ন দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় টীকা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; বর্তমান গ্রনহাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’ প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
জানুআরি, ১৯৬৩

মায়া

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

‘মায়া’ কথাটি আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। সাধারণতঃ ‘কল্পনা’ বা ‘কুহক’ বা এইরূপ কোন অর্থে মায়া-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। মায়াবাদ-রূপ অন্যতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া মায়ার যথার্থ তাৎপর্য বুঝা আবশ্যক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, এজন্য আপনারা কিঞ্চিৎ ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে ‘কুহক’ অর্থেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া-শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তখন প্রকৃত মায়াবাদের অভ্যুদয় হয় নাই। বেদে আমরা এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই, ‘ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে’—ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়া-শব্দ ইন্দ্রজাল বা অনুরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে মায়া-শব্দ ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। অতঃপর কিছুদিনের জন্য মায়া-শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই অবকাশে ঐ শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, প্রশ্ন করা হইতেছে, ‘আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন?’ ইহার এইরূপ গভীরভাব-ব্যঞ্জক উত্তর পাওয়া যায়ঃ আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি—‘নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরংতি!’
১
এস্থলে মায়া-শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু উহাতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইতেছে—আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ, তাহা সত্য এবং আমাদের মধ্যে কুজ্ঝটিকাবৎ বর্তমান।

অনেক পরবর্তী কালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে মায়া-শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে ইহার প্রভূত রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহার সহিত নূতন অর্থ সংযোজিত হইয়াছে, নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরালোচিত হইয়াছে; অবশেষে মায়া-বিষয়ক ধারণা একটি নির্দিষ্ট ভাব পাইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, ‘মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্’—মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এই মায়া-শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়া-শব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে
২
পরিণত হইয়াছিল এবং ‘মায়া’ কথাটি এইরূপ অর্থেই এখন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন বলেন, ‘জগৎ মায়াময়’, তখন সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, জগৎ কল্পনামাত্র। বৌদ্ধ দার্শনিকদের এইরূপ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে, কারণ এক শ্রেণীর দার্শনিক বাহ্যজগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপূর্ণরূপ বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ
৩
বা কোন মতবাদ নহে। আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র।

আপনাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি, বেদ যাঁহাদের হৃদয়নিঃসৃত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্বের অনুধাবন ও আবিষ্কারেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই-সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্য অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর গভীরতম প্রদেশে উপনীত হইতে ব্যগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত, আধুনিক বিজ্ঞানে আলোচিত বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূলতত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর (ether) বা আকাশ-বিষয়ক অভিনব-তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্টভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্বেই পর্যবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশতত্ত্বের কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় শক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশমাত্র, সেই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব বেদে—উহার ব্রাহ্মণাংশেই পাওয়া যায়। সংহিতার একটি দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির অভিব্যক্তির মূল কারণ প্রাণের প্রশংসা আছে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়তো জানিয়া আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুযায়ী এই পৃথিবীতে যেভাবে জীব-সৃষ্টি হইল, তাহা বৈদিকদর্শনেও পাওয়া যায়। আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসে—কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির বিশ্বাস।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সাধারণ তত্ত্বসকল বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য-জগৎ হইতে এই বিশ্বরহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে যথাসম্ভব উত্তর তাঁহারা পাইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ঐরূপে যে-সকল মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে যখন জগৎ-রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা হইল না, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণসকল উহার মীমাংসায় যে অধিকতর সহায়তা করিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্য-উদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অনুশীলন দ্বারা আমরা সত্যের অভিমুখে অধিক অগ্রসর হইতে পারিব না। যদি এই সর্বব্যাপী প্রাণতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক; কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি বলিতে চাই, তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক

পণ্ডিতদিগের ন্যায় এবং কখনও কখনও তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এমন অনেক ব্যাপক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি আজও সম্পূর্ণ নূতন; এবং তাঁহাদের গ্রন্থে এইরূপ অনেক মতবাদ আছে, যেগুলি বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আজও মতবাদরূপে চিন্তা করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও অগ্রসর হইয়া সমষ্টি-মনকেও সূক্ষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহারও পরে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুরই মীমাংসা হইল না। এই-সকল তত্ত্ব রহস্যের উত্তরদানে অক্ষম। ব্যর্থ জগদ্বিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তর দিতে পারিবে না। মনে হয় যেন কিছুটা জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে। বেদান্তবাদী মনের সসীমতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন, অতএব উত্তর দেন, 'না, সীমার বাহিরে যাইবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা দেশ-কাল-নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না।' যেরূপ কেহই স্বকীয় সত্তা অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে-সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। দেশকালনিমিত্ত-সম্বন্ধীয় রহস্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা বিফল, যেহেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে এই তিনেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভব? জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহা হইলে কি বলা যায়? 'এই জগতের অস্তিত্ব নাই'—এ কথা বলার অর্থ কি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, ইহাই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধেই ইহার আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় অধিক থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আরও কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে ইহা আরও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার বাস্তব সত্তা নাই—সেই অপরিবর্তনীয় অচল অনন্ত সত্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্যও বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থূল কার্য পর্যন্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎ-রূপ বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ। আমাদের জ্ঞানলাভ-বিষয়েও এই বিরুদ্ধভাব বর্তমান। এইরূপ মনে হয়, যেন মানুষ জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর না হইতেই এরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পায়, যাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। তাহার সমস্ত কার্য একটি বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং সেই বৃত্তসীমা তাহার পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে। তাহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্যসকল তাহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত করিতেছে, মীমাংসার জন্য তাহাকে প্রতিদিন আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম; কারণ নিজ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। তথাপি বাসনা তাহার অন্তরে গভীরভাবে নিহিত; কিন্তু এই-সকল উত্তেজনা দমন করাই যে মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে বলিতেছে। অপরদিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে, শুধু নিঃস্বার্থতাই মঙ্গলকর। প্রত্যেক বালক জন্ম হইতেই আশাবাদী; সে সুখের স্বপ্নই দেখে। যৌবনে সে অধিকতর আশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয় বা অপমান বলিয়া কিছু আছে—কোন যুবকের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আসিল—জীবন ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইল, সুখস্বপ্ন আকাশে বিলীন হইল; বৃদ্ধ নৈরাশ্যবাদ অবলম্বন করিলেন। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশাশূন্য ও উদ্দেশ্যহীনের মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। এ সম্বন্ধে 'ললিতবিস্তরে' লিখিত বুদ্ধচরিতের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত আমাদের মনে পড়ে। এইরূপ বর্ণিত আছে—বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য দেবকন্যাগণ একটি সঙ্গীত গাহিয়াছিল। সে সঙ্গীতের মর্মার্থ এইঃ 'আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।' এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না—অবিরত চলিয়াছে। এখন উপায় কি? যাঁহার অন্ন-পানের প্রাচুর্য আছে, তিনি আশাবাদী হইয়া বলেন, 'ভীতি-উৎপাদক দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না।' তাঁহার নিকট গিয়া বল, 'সকলই মঙ্গল।' তিনি বলেন, 'সত্যই আমি নিরাপদে আছি; এই দেখ, কেমন সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি! আমার শীতের ভয় নাই, অন্নের অভাব নাই! অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না।' কিন্তু অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে! যাও, তাহাদিগকে শিখাও যে, সমস্তই মঙ্গল। কিন্তু ঐ যে একজন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে তো সুখের সৌন্দর্যের মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, 'সকলকেই ভয় দেখাও; আমি যখন কাঁদিতেছি, তখন অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই আমার সহিত কাঁদাইব; কারণ আমি দুঃখ-পীড়িত, সকলেই দুঃখ-পীড়িত হউক—ইহাতেই আমার শান্তি।' এইরূপে আমরা আশাবাদ হইতে নৈরাশ্যবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুর মুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ, সমাজ-সংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের শেষ গতি। একমাত্র ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি গড়িতেছে ভাঙিতেছে; সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে; গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া, ধূলির মত চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অনাদি কাল ধরিয়াই এইরূপ চলিতেছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে—সকলেই মৃত্যুর পথে ধাবমান। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম আসক্তি! জানি না, কেন আমরা এ জীবনের প্রতি আসক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না! ইহাই মায়া।

জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি আসক্ত। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়তো কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপি পুত্রের প্রতি আসক্ত। যখন তাঁহার বিচারশক্তি জাগরিত হয়, তখন তিনি সে শক্তিকে স্নেহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি মোটেই জানেন না, ইহা স্নেহ নহে—এক অজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া।

আমরা সকলেই কল্পিত সুবর্ণলোমের
৪
অন্বেষণে ছুটিয়া চলিয়াছি, প্রত্যেকের মনে হয়, আমিই ইহা পাইব; জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই সুবর্ণলোমলাভের সম্ভাবনা তাঁহার হয়তো বিশ লক্ষের মধ্যে এক। তথাপি প্রত্যেকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন। ইহাই মায়া।

ইহসংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্বে বিচরণ করিতেছে; অথচ আমাদের বিশ্বাস—আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কি? রাজা উত্তর দিয়াছিলেন, 'প্রত্যহই চারিদিকে মানুষ মরিতেছে, অবশিষ্ট মানুষ মনে করে, তাহারা কখনই মরিবে না।' ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই এই বিষম বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে। সুখ দুঃখের এবং দুঃখ সুখের অনুগামী হইতেছে। একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতিবিশেষের দোষসমূহ প্রতিকার করিবার জন্য যত্নবান হইলেন; প্রতিকারের পূর্বেই অপর দিকে অন্য সহস্রপ্রকার দোষ দেখা দিল। এ যেন পতনোন্মুখ অট্টালিকা, এক স্থানে জীর্ণসংস্কার করিতে করিতে অপরদিকে ভাঙন ধরে। ভারতীয় নারীগণের বাধ্যতামূলক বৈধব্যজনিত দুঃখ প্রতিকারের জন্য আমাদের সংস্কারকগণ প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্যে বিবাহের পাত্র পাওয়া যায় না, ইহাই বিষম সমস্যা। একস্থানে কুমারীদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা দু্ঃখ পাইতেছে; অন্যস্থানে বিধবাদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা কষ্ট পাইতেছে। দেহের পুরাতন বাতব্যাধির মত মাথা হইতে তাড়িত হইয়া ইহা শরীরের অন্য স্থান আশ্রয় করিতেছে; আবার সেখান হইতে পাদদেশ আক্রমণ করিতেছে। সংস্কারক আসিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন—বিদ্যা ধন সংস্কৃতি কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাঁহারা এগুলি সকলের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কেহ কেহ এক হিসাবে কতকটা সুখী হইল বটে, কিন্তু সংস্কৃতি যতই বাড়িতে লাগিল, শারীরিক সুখ হয়তো ততই কমিতে লাগিল। সুখের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের জ্ঞানও আসিতেছে! কোন্ পথে যাইব? আমরা যে সামান্য সুখ ভোগ করিতেছি, তাহাই হয়তো অন্য কোথাও সমপরিমাণ দুঃখ উৎপন্ন করিতেছে। ইহাই নিয়ম। যুবকেরা হয়তো ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া।

দিবারাত্র এই-সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্থাপিতই হইতে পারে না; যাহা ঘটিতেছে তাহার না আছে 'কেন', না আছে 'কিভাবে'; আমরা শুধু জানি ইহা ঘটিতেছে, আমরা আর কিছুই করিতে পারি না। আমরা ইহাকে এক মুহূর্তও স্থির রাখিতে পারি না—প্রতি মুহূর্তেই ইহা আমাদের সাধ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কিভাবে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিব? আমরা যে কখনও কখনও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছি, পরোপকারের চেষ্টা করিয়াছি, সেইগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিতে পারি—'কেন, ঐ কাজগুলি তো আমরা বুঝিয়া-সুঝিয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়াছিলাম'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সেগুলি না করিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই ঐভাবে করিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে হইতেছে আর আপনাদিগকে বসিয়া উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে—ইহাও আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই করিতেছি। আপনারা গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, হয়তো কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিবেন, অপরে হয়তো মনে করিবেন—লোকটা অনর্থক বকিতেছে। আমি বাড়ী যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি। ইহাই মায়া।

অতএব এই সংসারগতি-বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শুনিয়া ভয় পায়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগের প্রতিকার হইবে না। শিকারী কুকুর দ্বারা অনুসৃত শশক যেরূপ মাটিতে মাথা লুকাইয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে, আমরা আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী হইয়া অবিকল সেই শশকের মত আচরণ করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে।

অপর পক্ষে ইহজীবনের প্রাচুর্য-সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগিগণ এই মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেন। এদেশে—ইংলণ্ডে নৈরাশ্যবাদী হওয়া কঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন, জগতের কাজ কি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইতেছে! জগৎ কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা নিজেদের জীবনকেই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উঠিতেছেঃ খ্রীষ্টধর্মই পৃথিবীমধ্যে একমাত্র ধর্ম, কারণ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু এইরূপ উক্তি স্ববিরোধী, যেহেতু অখ্রীষ্টান জাতিদের দুর্ভাগ্যই খ্রীষ্টানজাতির সৌভাগ্যের কারণ। শোষণযোগ্য কতকগুলি জাতি যে চাই। সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইলে, শিকার-স্বরূপ অখ্রীষ্টান জাতির অস্তিত্ব না থাকিলে খ্রীষ্টানজাতিগুলিই দরিদ্র হইয়া যাইবে। সুতরাং এ যুক্তি নিজেকেই খণ্ডন করিতেছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির খাদ্য, মনুষ্য পশ্বাদির ভোক্তা, এবং সর্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার—মনুষ্য পরস্পরের, দুর্বল বলবানের ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্বত্রই বিদ্যমান। ইহাই মায়া।

এ রহস্যের তুমি কী মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি শুনিয়া থাকি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। স্বীকার করিয়া লইলাম—এরূপ সম্ভব, কিন্তু এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল উৎপন্ন হইয়ার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি ব্যতীত শুধু মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গল সাধিত হয় না? মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুখী হইবে, কিন্তু এখন কেন এই ভয়ানক দুঃখ-যন্ত্রণা! ইহার মীমাংসা নাই। ইহাই মায়া।

এরূপ শোনা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের
৫
একটি বিশেষত্ব; সংসার হইতে ক্রমাগত এইরূপ দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুর্য আছে, যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, যাহাদিগকে তথাকথিত

ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের দাম্ভিকতা বাড়াইতে পারে। সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকে যন্ত্রণা ভোগ করুক—তাহাদের ক্ষতি কি? সাধারণ লোক মারা যায়—সেজন্য তাহাদের কি? বেশ কথা, কিন্তু এ যুক্তি আগা-গোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা দোষাবহ এ-কথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান এবং অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট, অতএব এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল-ভাগ এইরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তখন কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ বলা অতি সহজ। কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? অমঙ্গল কি ক্রমশই বাড়িতেছে না? একজন অরণ্যবাসী মানুষ, যে মনোবৃত্তি-পরিচালনায় অনভিজ্ঞ—একখানি পুস্তকপাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে তাহা শোনে নাই, আজ তাহাকে ক্ষতবিক্ষত কর, কাল সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আন, তথাপি সে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবে; কিন্তু পথ চলিতে একটু আঁচড় লাগিলেই আমরা মরিয়া যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ হইতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে; একজন ধনশালী হইতেছে, একই কালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে, দলকে দল মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে। এইভাবেই চলিয়াছে। পশুমানবের অনুভূতি ইন্দ্রিয়েই আবদ্ধ; যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিংবা যদি তাহার শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ইন্দ্রিয়েই তাহার সুখ-দুঃখের আরম্ভ ও শেষ। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখের পরিধিও সমপরিমাণে বর্ধিত হয়। অরণ্যবাসী মানুষ ঈর্ষা জানে না, বিচারালয় জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিক মানবপ্রকৃতি-সম্ভূত যে ভীষণ শাসনযন্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের মনের গোপন কথাও জানিয়া লইতে চায়, তাহা দ্বারা সে দিবারাত্র শাসিত হইতে জানে না। সে জানে না—ভ্রান্ত গর্বিত মানুষ কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত দুঃখানুভবের শক্তিও বিকশিত হয়। স্নায়ুমণ্ডল সূক্ষ্মতর হইয়া অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সকল সমাজেই অহরহঃ দেখা যাইতেছে—মূর্খ সাধারণ মানুষ তিরস্কৃত হইলে বেশী দুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক কিন্তু একটি কথার তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্ম হইয়াছে! তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দুঃখও বাড়িয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের—ক্রমবিকাশবাদীদের মতটি ইহার দ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণাভোগের শক্তিও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে। কখনও কখনও আমার মনে হয়, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তান্তর শ্রেণীর
৬
নিয়মে অগ্রসর হয়, তবে অপর পক্ষে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর
৭
নিয়মে বর্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানুষ সমাজ সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানি, যতই আমরা উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখদুঃখের অনুভবশক্তি তীব্র হইবে। ইহাই মায়া।

অতএব আমরা দেখিতেছি—মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি মতবাদ নহে; সংসারের ঘটনা যেভাবে চলিতেছে, মায়া তাহারই বর্ণনামাত্র অর্থাৎ ইহাই বলা যে, বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল। যেখানে অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, সেইখানেই ছায়ার মত মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকে কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সে হাসিবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি—যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না; যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই-সকল কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, তখন এরূপ সঙ্ঘটন স্বতই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি আছে, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোৎপাদক শক্তি বর্তমান, দুঃখজনক শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নহে। বেদান্ত এই দুই মতবাদই প্রচার করিতেছে; ঘটনাসকল যেভাবে বর্তমান, বেদান্ত সেভাবে সেগুলি গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ বেদান্তমতে এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ; একটিকে বর্ধিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহারহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথক্ সত্তা নহে। এই সংসারের এমন একটি বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা আজ শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল তাহাই আবার অশুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু—যাহা একজনকে দুঃখী করিতেছে তাহাই আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহাই আবার অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উপাদেয় আহার রন্ধন করিতে পারে। যে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল-নিবারণের একমাত্র উপায় মঙ্গল-নিবারণ; উপায়ান্তর নাই, ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও দুঃখহীন সুখ স্ববিরোধী বাক্য, কোনটিকেই একা পাওয়া যায় না। দুই-ই এক বস্তুর বিকাশ। গতকাল যাহা ভাল মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা ভাল মনে করি না। যখন আমরা অতীত জীবন পর্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচনা করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করি। এক সময়ে তেজস্বী অশ্বযুগল চালনা করাই ছিল আমার জীবনের আদর্শ। এখন এরূপ চিন্তা করি না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্ন-বিশেষ প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি খুব সুখী হইব। অন্য সময়ে মনে হইত, স্ত্রী-পুত্র ও প্রচুর টাকাকড়ি হইলেই যথার্থ সুখী হইব। এখন এগুলিকে ছেলেমানুষি মনে করিয়া হাসিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আমরা পিছনের দিকে তাকাইব, এবং যে-সকল ভাবাদর্শের জন্য

আমরা ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয় পাইতেছি, সেগুলিকে আমরা বিদ্রূপ করিব। সকলেই নিজ দেহ বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যতকাল ইচ্ছা ততকাল রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এ কথা স্মরণ করিয়া আমরা হাসিয়া উঠিব। অতএব যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা সত্যও নয়, অসত্যও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ—দুঃখও নয়, সুখও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ—এইরূপ বিষমবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়, তবে বেদান্তের আবশ্যকতা কি? অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মমতগুলিরই বা প্রয়োজন কি? সর্বোপরি শুভকর্ম করিবারই বা কি প্রয়োজন? —এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। লোকে জিজ্ঞাসা করিবে—যদি অশুভ ছাড়া শুভ হয় না, যদি সুখ উৎপন্ন করিতে গেলেই সর্বদা দুঃখও উৎপন্ন হয়, তবে এ-সকলের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ দুঃখ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম করিতেই হইবে, কারণ নিজেকে সুখী করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক কিছু সত্বর, জড়বুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। জড়বুদ্ধি লোক উৎকট যন্ত্রণাভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, কারণ সুখদুঃখময় বিপরীতভাবপূর্ণ জীবনের বাহিরে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। সুখ ও দুঃখ—উভয় শক্তিই জগৎকে আমাদের জন্য জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্ন হইতে জাগরিত হই এবং এই মাটির পুতুল গড়া পরিত্যাগ করি। আমাদের এ শিক্ষালাভ করিতেই হইবে; আর ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে।

'অনন্তই সান্ত হইয়াছেন'—জার্মানীতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র-প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই-সকল দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—অনন্তস্বরূপ

৮

নিজেকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একদিন অনন্ত নিজেকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অতি শ্রুতিমধুর, এবং আমরা—অনন্ত, বিকাশ, অভিব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করেনঃ সান্ত যে অনন্তকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিবে—এ সিদ্ধান্তের ন্যায়সঙ্গত মূলভিত্তি কি? নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। এ জগতের সবকিছুই সীমাবদ্ধ। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকে স্বতই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে; অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ বা অনন্ত সত্তা নিজেকে সান্তরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই প্রত্যাবর্তন বা বৈরাগ্যই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ। আজকাল বৈরাগ্যবিষয়ে কথা বলা বড় অপ্রীতিকর। আমেরিকায় আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আসিয়া বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডের দার্শনিকগণও হয়তো এইরূপই বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্যই সত্য এবং ধর্মলাভের একমাত্র পথ। চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি অন্য পথ খুঁজিয়া পাও; কখনই পাইবে না। এমন সময় আসিবে, যখন অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিবে, এই দীর্ঘ বিষাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগ্রত হইবে; শিশু খেলা ছাড়িয়া জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইবে, বুঝিবেঃ

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
৯

কাম্যবস্তুর উপভোগে বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির মত বাসনা বরং বাড়িতেই থাকে। এইরূপ কি ইন্দ্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মার উপভোগ্য সর্ববিধ সুখ—সবই শূন্য, সকলই মায়ার অন্তর্গত। সকলই এই সংসার জালের অন্তর্গত, আমরা উহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। আমরা মায়াজালের মধ্যে অনন্তকাল ছুটাছুটি করিতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না; এবং যখনই এক কণা সুখ পাইবার চেষ্টা করিব, তখনই রাশি রাশি দুঃখ আমাদিগকে চাপিয়া ধরিবে। কি ভয়ানক অবস্থা! যখন আমি ব্যাপারটি ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, ইহা মায়াবাদ—সকলই মায়া; এই বাক্যই ইহার একমাত্র এবং সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই না বিদ্যমান! যদি আপনারা বিবিধ জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, বুঝিতে পারিবেন যে, এক জাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপর জাতি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হয় নাই। যদি দোষগুলি ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া একদিকে নিবদ্ধ করা যায়, অপরদিকে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার গতিই এইরূপ। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে সতীত্ব-ধর্মের আদর্শ কতকটা উচ্চে স্থাপন করিবার জন্য বাল্যবিবাহ দ্বারা তাহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে অধঃপাতিত করিয়াছে। কিন্তু এ-কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে পবিত্রতায় ভূষিত করিয়াছে। কি চাও? যদি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের শরীর দুর্বল করিতে হইবে। অপরদিকে ইংলণ্ডে তোমাদের অবস্থাই কি খুব ভাল? কখনই নয়। কারণ পবিত্রতাই জাতির জীবনীশক্তি। তুমি কি ইতিহাসে লক্ষ্য কর নাই যে, অপবিত্রতার মধ্য দিয়াই জাতির মৃত্যুচিহ্ন দেখা দেয়? যখন যৌন অপবিত্রতা কোন জাতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই বুঝিতে হইবে উহার বিনাশ আসন্ন। এই-সকল দুঃখজনক সমস্যার মীমাংসা কোথায়? যদি পিতা-মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই দোষ অনেকটা নিবারিত হয়। ভারতের কন্যাগণ যতটা ভাবপ্রবণ তদপেক্ষা অধিক বাস্তববাদী, কিন্তু তাহাদের জীবনে কবিত্বের বিশেষ অবকাশ থাকে না। আবার যদি লোকে নিজেরাই স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহাতেও অধিক সুখ হয় না। ভারতীয় নারীগণ সাধারণতঃ বেশ সুখী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ খুব বেশী হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে—যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিদ্যমান, সেখানে অসুখী পরিবার ও দুঃখকর বিবাহের সংখ্যা অনেক। আমি যে-কোন সভায় গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি—সভায় উপস্থিত এক-তৃতীয়াংশ নারী তাহাদের পতি-পুত্রকে দূর করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্বত্র। ইহাতে কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ পাইতেছে যে, এই-সকল আদর্শ দ্বারা অধিকতর সুখ অর্জিত হয় নাই। আমরা সকলেই সুখের

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু সুখ পাইতে না পাইতেই অন্যদিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা শুভ কর্ম করিব না? করিব বইকি—পূর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহের সহিত আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান আমাদের উৎকট বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্ধতা দূর করিবে। ইংরেজ আর উত্তেজিত হইয়া 'ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে!'—এই বলিয়া হিন্দুকে অভিশাপ দিবে না। সে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি মান্য করিতে শিখিবে। ধর্মান্ধতা অল্প হইবে এবং কাজ বেশী হইবে। ধর্মান্ধ লোকেরা কাজ করিতে পারে না। তারা শক্তির তিন-চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয় করে। ধীর প্রশান্তচিত্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কাজ করেন; অতএব এই জ্ঞান দ্বারা কাজ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অবস্থা এইরূপই জানিয়া তিতিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। দুঃখ ও অমঙ্গল আমাদিগকে ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না এবং ছায়ার পিছনে ধাবিত করিবে না। সুতরাং সংসারগতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। ধরা যাক, সকল মানুষই দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ববৎ সব অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদদিগেরও গতি ঐরূপ। কিন্তু কেবল একটা জিনিষ সুনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, উহার জলবিন্দুগুলির প্রত্যেকটি অনন্ত বারিধিবক্ষে বিলীন হইবে। অতএব সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত জীবন যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত। তুমি আমি, জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবাণু পর্যন্ত, যে যেখানে রহিয়াছে, সকলেই সেই অনন্ত জীবন-সমুদ্রে উপনীত হইবে, মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ করিবে; ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ।

পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবল অমঙ্গলময়—এইরূপ মত বেদান্ত ব্যক্ত করে না। বেদান্ত বলিতেছে, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই মূল্য সমান। ইহারা এইরূপে পরস্পর-সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসার এইরূপ জানিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম কর। কি জন্য কর্ম করিব? যদি সংসারের অবস্থা এইরূপ, আমরা কি করিব? অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন? আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন, এ রহস্যের মীমাংসা নাই; বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সন্তুষ্ট হইয়া জীবন ভোগ কর। এখানেও একটি অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে-জীবন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, সেই জীবন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কিরূপ? জীবন বলিতে তুমি কি কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ জীবনই বুঝ? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এখানে উপস্থিত এমন কেহ নাই, যাঁহার জীবন কেবল ইন্দ্রিয়েই আবদ্ধ। অতএব আমাদের বর্তমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আরও কিছু বেশী বুঝায়। আমাদের সুখদুঃখের অনুভব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাশক্তিও তো আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ; আর সেই উচ্চ আদর্শ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেয়বাদীদের
১০
মতে জীবন যেভাবে আছে, সেইভাবেই উহা ভোগ করা কর্তব্য। কিন্তু জীবন বলিলে সর্বোপরি আদর্শ অন্বেষণের—পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয়, সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শভাগ বর্জন করিয়া বাকীটুকু সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। এই আদর্শ লাভ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি ইহার অন্বেষণই পরিত্যাগ করেন। এই প্রকৃতিকে—এই জগৎপ্রপঞ্চকেই তো বলে 'মায়া'।

বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা প্রতীকোপাসনা বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্বক আচরিত ধর্ম, অথবা দেবতা পিশাচ প্রেতের গল্প, সাধু ঋষি মহাত্মা বা অবতারের চরিতকথার সাহায্যে অনুষ্ঠিত অপরিণত বা উন্নত ধর্মমতগুলির উদ্দেশ্য একই। সকল ধর্মই ইহাকে—এই প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করিবার অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় সকলেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ বুঝিয়াছে, সে বন্দী। সে যাহা হইতে ইচ্ছা করে, সে তাহা নয়। যে সময়ে—যে মুহূর্তে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তাহাকে শেখান হইয়াছে, তখনই সে অনুভব করিয়াছে—সে বন্দী! সে আরও বুঝিয়াছে, এই সীমাশৃঙ্খলিত হইয়া তাহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহ যেখানে যাইতে পারে না, সেখানে যাইতে চাহিতেছেন। দুর্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-স্বজনের গৃহসন্নিধানে গোপনে অবস্থিত, হত্যাপ্রিয় ও তীব্র সুরাপ্রিয়, মৃত পিতৃপুরুষ বা অন্য ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী অতি নিম্ন ধর্মমতগুলিতে আমরা সেই একই প্রকার মুক্তির ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা দেবতার উপাসনা ভালবাসেন, তাঁহারা সেই-সকল দেবতার মধ্যে নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা দেখিতে পান—গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও দেবতারা প্রাচীরের মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই মুক্তির ভাব ক্রমেই বর্ধিত হইয়া অবশেষে সগুণ ঈশ্বরের আদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর প্রকৃতির পারে, ঈশ্বর মায়াতীত—ইহাই সেই আদর্শের কেন্দ্রগত ভাব।

আমি যেন শুনিতেছি, সম্মুখে কোন কণ্ঠস্বর উত্থিত হইতেছে, যেন অনুভব করিতেছি—ভারতের সেই প্রাচীন আচার্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই-সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন। বৃদ্ধ ও পবিত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু একটি যুবক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছেঃ হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি; যিনি অন্ধকারের পারে, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়।
১১

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ॥
*
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

উপনিষদ্ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, মায়া আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং উহা অতি ভয়ঙ্কর। তথাপি মায়ার মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হইবে। যিনি বলেন, 'এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, সমস্ত জল যখন সমুদ্রে চলিয়া যাইবে তখন নদী পার হইব', তিনি যেমন সফল হন, আর যিনি বলেন, 'পৃথিবী পূর্ণমঙ্গলময় হইলে পর কাজ করিব এবং জীবন উপভোগ করিব', তিনিও সেইরূপ সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। মায়ার অনুকূলে পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধে গমনই পথ—এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সহায়ক হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, তাহার প্রতিযোগী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্তা হইয়াও নিজদিগকে বদ্ধ করিতেছি। এই বাড়ী কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি ইহা দেয় নাই। প্রকৃতি বলিতেছে—'যাও, বনে গিয়া বাস কর।' মানব বলিতেছে—'আমি বাটী নির্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।' সে তাহাই করিতেছে। তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত অবিরাম সংগ্রামই মানবজাতির ইতিহাস এবং মানবই অবশেষে জয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা পশু-মানব ও আধ্যাত্মিক মানবের সংগ্রাম, আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম; মানুষ এখানেও বিজেতা। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ আপনার মুক্তির পথ করিয়া লয়।

অতএব আমরা দেখিতেছি, এই মায়া অতিক্রম করিয়া বৈদান্তিক দার্শনিকগণ এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে; যদি আমরা সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, আমরাও মায়ার পারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্মের আরম্ভমাত্র, শেষ নহে। যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, যিনি মায়াধীশ, মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বরের জ্ঞান এই বেদান্তভাবের শেষ কথা নহে। এই জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অবশেষে বৈদান্তিক দেখেন, যাঁহাকে বাহিরে বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন। যিনি সীমার মধ্যে নিজেকে বদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্ত-স্বরূপ।

মানুষের যথার্থ স্বরূপ (১)

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মানুষ এতটা আসক্ত যে, সহজে উহা ছাড়িতে চায় না। কিন্তু এই বাহ্য জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন একটি সময় আসে, যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়ঃ জগৎ কি সত্য? যে ব্যক্তি তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্র সময় পায় না, যাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়ঃ জগৎ কি সত্য? এই প্রশ্নেই ধর্মের আরম্ভ এবং ইহার উত্তরেই ধর্মের পরিসমাপ্তি। এমন কি প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসেরও পূর্বে, সুদূর অতীতকালে, সভ্যতার অস্ফুট ঊষাকালেও—সেই রহস্যময় পৌরাণিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছেঃ 'জগৎ কি সত্য?'

কবিত্বময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাইঃ কেহ বলেন, 'মানুষ মরিয়া গেলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না'; আবার কেহ বলেন, 'না, তখনও তাহার অস্তিত্ব থাকে'—ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য?
১২

এ প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। যাবতীয় দর্শন ও ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নেরই বিভিন্ন প্রকার উত্তরে পরিপূর্ণ। 'এর পরে কি? প্রকৃত সত্য কি?' অনেকে আবার এই প্রশ্নকে, প্রাণের এই অশান্ত জিজ্ঞাসাকে থামাইয়া দিতে—দাবাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন এই দাবাইয়া দিবার চেষ্টা সর্বদা বিফল হইবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি—জগৎপ্রপঞ্চের অতীত সত্তার অন্বেষণ করিব না, বর্তমান মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ রাখিব, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর চিন্তা করিব না বলিয়া খুব চেষ্টা করিতে পারি, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের সব কিছু আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে, সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্তমানের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে দৃষ্টিপ্রসারণে বাধা দিতে পারে; কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসিত হইবেঃ আমরা এই যে-সকল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের সার বলিয়া ঐগুলির প্রতি আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম? জগৎ তো এক মুহূর্তেই ধ্বংস হইয়া কোথায় চলিয়া যায়! গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ পর্বত, নিম্নে অতল গহ্বর—যেন মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই পাহাড়ের ধারে দাঁড়াইয়া যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে আর জিজ্ঞাসা করিবে—'এ-সব কি সত্য?' কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি সারা জীবন ধরিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া একটু একটু করিয়া যে আশার সৌধ নির্মাণ করিলেন, এক মুহূর্তে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। এগুলি কি সত্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে। কালক্রমে এই প্রশ্নের শক্তি হ্রাস পাইবে না, বরং কালস্রোতে যতই উহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহা হৃদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে—মানুষের সুখী হইবার ইচ্ছা। আপনাকে সুখী করিবার জন্য মানুষ সব কিছুর পশ্চাতে ধাবিত হয়—ইন্দ্রিয়ের পিছনে পিছনে ছুটিয়া উন্মত্তের ন্যায় বহির্জগতের কাজ করিয়া যায়। যে যুবক জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে—এই জগৎ সত্য; সব কিছু তাহার সত্য বলিয়া মনে হয়। হয়তো সেই যখন বৃদ্ধ হইবে, ভাগ্যদ্বারা বারংবার বঞ্চিত হইয়া হয়তো সেই ব্যক্তিই জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবে, 'সবই অদৃষ্ট।' সে এতদিনে দেখিতে পাইল—বাসনা পূর্ণ হয় না। সে যেখানেই যায়, সেখানেই দেখে এক বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধ্য তাহার নাই। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কর্ম প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখ-দুঃখ, বিলাস-বিভব, ঐশ্চর্য-দারিদ্র্য—এমন কি জীবন পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

এই সমস্যার দুইটি সিদ্ধান্ত আছে। একটি শূন্যবাদীদের মত বিশ্বাস কর যে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানি না; আমরা ভূতভবিষ্যৎ, এমন কি বর্তমান সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারি না। কারণ ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিয়া, কেবল বর্তমান স্বীকার করিয়া উহাতেই যে আবদ্ধ থাকিতে চায়, সে বাতুল। তেমন ব্যক্তি তো পিতা-মাতাকে অস্বীকার করিয়াও সন্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে। এ কথাও তো তুল্যরূপে যুক্তিসঙ্গত। ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিলে বর্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক সিদ্ধান্ত—ইহা শূন্যবাদীর মত। কিন্তু আমি এমন লোক কখনও দেখি নাই, যে এক মিনিটের জন্য শূন্যবাদী হইতে পারে; মুখে বলা তো খুব সহজ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এইঃ এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অন্বেষণ কর, সত্যের অন্বেষণ কর, এই নিত্যপরিবর্তনশীল নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অন্বেষণ কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি জড় পদার্থের অণুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? মানব-মনের ইতিহাসে বরাবর এই তত্ত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তত্ত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তখন হইতেই মানুষ স্থূলদেহের অতীত অন্য একটি দেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সেটি অনেকাংশে ঐ দেহেরই মত বটে, কিন্তু স্থূলদেহ অপেক্ষা পূর্ণ ও নিখুঁত—শরীরের ধ্বংস হইলেও উহার ধ্বংস হইবে না। আমরা ঋগ্বেদের সূক্তে মৃতশরীর-দহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্তব দেখিতে পাইঃ 'হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হাতে ধরিয়া মৃদুভাবে লইয়া যাও—ইহার শরীর সর্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতির্ময় কর; ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই।'

দেখিবে, সকল ধর্মেই এই একই প্রকার ভাব বিদ্যমান, এবং তাহার সহিত আমরা আর একটি তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্যের

বিষয়, সকল ধর্মই সমস্বরে ঘোষণা করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিল, এখন তাহার অবনতি হইয়াছে—এ ভাব তাঁহারা রূপকের ভাষায়, কিংবা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা সুন্দর কবিত্বের ভাষায়, যেভাবেই প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু ঐ এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অবনত হইয়া পড়িয়াছে। য়াহুদীদের শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে-গল্প আছে, ইহাই তাহার সারাংশ। হিন্দুশাস্ত্রে এই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্যযুগ বলিয়া যে-যুগের বর্ণনা করিয়াছেন—যখন মানুষের ইচ্ছামৃত্যু ছিল, তখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর রক্ষা করিতে পারিত, তখন লোকের মন শুদ্ধ ও সংযত ছিল, তাহাতেও এই সর্বজনীন সত্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, আর বর্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থারই অবনত ভাব। এই বর্ণনার সহিত আমরা সর্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্মই বর্তমান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে জলপ্লাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইয়া গেল। আবার উন্নতি আরম্ভ হইল। মানুষ আবার উহার সেই পূর্ব পবিত্র অবস্থা লাভ করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

আপনারা সকলেই ওল্ড টেষ্টামেণ্টের জলপ্লাবনের গল্প জানেন। ঐ একই প্রকার গল্প প্রাচীন বাবিল, মিশর, চীন এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে জলপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

মহর্ষি মনু একদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বলিল, 'আমাকে আশ্রয় দিন।' মনু তৎক্ষণাৎ উহাকে সন্নিহিত একটি জলপাত্রে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও?' মৎস্যটি বলিল, 'এক বৃহৎ মৎস্য আমাকে অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' মনু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন, মৎস্য ঐ পাত্রপ্রমাণ হইয়াছে। সে বলিল, 'আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না।' মনু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় রাখিলেন। পরদিন সে ঐ চৌবাচ্চার সমান হইয়া বলিল, 'আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না।' তখন মনু তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেনঃ প্রাতে যখন দেখিলেন, মৎস্যের কলেবর নদী ভরিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। তখন মৎস্য বলিতে লাগিল, 'মনু, আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা। জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব; তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। তুমি একখানি সুবৃহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সর্বপ্রকার প্রাণী এক এক জোড়া করিয়া রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে জলের মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে, তাহাতে তোমার নৌকা বাঁধিবে। পরে জল কমিয়া গেলে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিও।' এইরূপে ভগবানের কথা অনুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্বপ্রকার জন্তুর এক এক জোড়া এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন এবং প্লাবনের অবসানে তিনি ঐ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন—আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া 'মানব' নামে অভিহিত।
১৩

এখন দেখ, মানবভাষা সেই অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টামাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস—এই-সকল গল্প আর কিছু নয়, একটি ছোট বালক—অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা—সে যেন সেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে; শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অন্য কোনরূপ উপায় নাই। উচ্চতম দার্শনিকের এবং শিশুর ভাষার কোন প্রকারগত ভেদ নাই, শুধু মাত্রাগত ভেদ আছে। আজকালকার বিশুদ্ধ প্রণালীবদ্ধ গণিতের মত সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অস্ফুট রহস্যময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্য। এই-সকল গল্পের পিছনে একটি মহৎ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক সময় এই-সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের ভিতরে মহামূল্য সত্য থাকে, আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের সুন্দর মার্জিত ভাষার ভিতরে অনেক সময় শুধু অসার জিনিষ পাওয়া যায়। অতএব পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা আবৃত বলিয়া এবং আধুনিক কালের অমুক মহাশয় কি তমুক মহাশয়ার মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিষই একেবারে ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

'অমুক ঋষি বা মহাপুরুষ বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর'—এইরূপ বলাতে যদি ধর্মগুলি উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিকতর উপহাসের পাত্র। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয়; কিন্তু হাক্সলি, টিণ্ডাল বা ডারুইনের নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে নির্বিচারে গলাধঃকরণ করে। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন'—অনেকের পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে! আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত; আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতি ঘৃণিত ধন, নাম-যশ বা ক্ষমতার উপাসনা। ইহাই প্রভেদ।

এখন পূর্বোক্ত পৌরাণিক গল্পগুলি সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাক। সকল গল্পের ভিতরেই এই একটি প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিককালের গবেষকগণ বোধ হয় যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাঁহারা যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল প্রাণী-বিশেষের (mollusc) ক্রমবিকাশমাত্র, অতএব পূর্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ-মতে সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে—এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেই দেখা যাইবে, সহজ সরল ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ উৎপন্ন হইতে পারে না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াকেও ধরিতে

হইবে। বিজ্ঞান বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে-পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পার। অসৎ (কিছু-না) হইতে সৎ (কিছু) কখনও হইতে পারে না। যদি মানব, পূর্ণমানব, বুদ্ধ-মানব খ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র প্রাণী-বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণীকেও ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে ঐ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে তো কখনও সৎ-এর উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে-শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখনও শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহা কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল; এবং যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মোলাস্ক বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ পর্যন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চিত যে, উহাতেই ঐ শক্তি কোন না কোনরূপে অবস্থিত ছিল।

আজকাল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছেঃ জড়পদার্থের সমষ্টি এই দেহই কি 'আত্মা' 'চিন্তা' প্রভৃতি বলিয়া কথিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহের কারণ? অবশ্য জগতের সকল ধর্মই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরকে ব্যক্ত করে—ইহার বিপরীত মত তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মতে
১৪
চিন্তাশক্তি কেবল শরীর-নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষ ধরনের সন্নিবেশে উৎপন্ন। যদি এই দ্বিতীয় মতটি স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায়—এই আত্মা বা মন বা উহাকে যে আখ্যাই দাও না কেন, উহা এই জড়দেহরূপ যন্ত্রেরই ফলস্বরূপ, যে-সকল জড়পরমাণু মস্তিষ্ক ও শরীর গঠন করিতেছে, তাহাদেরই রাসায়নিক মিলন বা সাধারণ মিশ্রণে উহা উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়—শরীর-গঠন কে করে? কোন্ শক্তি পদার্থের অণুগুলিকে শরীরাকারে পরিণত করে? কোন্‌ শক্তি চারিদিকের জড়রাশি হইতে কিয়দংশ লইয়া তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর একরূপে গঠন করে? এই-সকল বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মা-নামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে 'গাড়ীর পিছনে ঘোড়া জোতা'র ন্যায় হয়। কিরূপে এই সংযোগ হইল? কোন্ শক্তি উহা করিল? যদি বলা যায়, অন্য কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিয়াছে, আর আত্মা—যাহা এখন জড়রাশি-বিশেষের সহিত সংযুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার ঐ জড়পরমাণু-সকলের সংযোগের ফলরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে-মত অন্যান্য মতকে খণ্ডন না করিয়া—সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা—অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত, যে-শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে শরীর গঠন করে আর যে-শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, উভয়ে অভেদ। অতএব যে চিন্তাশক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড়-অণুর সংযোগে উৎপন্ন, সুতরাং তাহার দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই—এ-কথার কোন অর্থ হয় না। আর শক্তি কখনও জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা বরং ইহা প্রদর্শন করা সম্ভব—যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঠিন্য প্রভৃতি জড়ের গুণসকল বিভিন্ন প্রকার গতি ও স্পন্দনের ফল—ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড়-পরমাণুর ভিতর প্রবল আবর্তগতি উৎপাদন করিলে উহা কঠিনপদার্থবৎ শক্তিলাভ করিবে। বায়ুরাশি যখন ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়, তখন উহা কঠিন পদার্থের মত হইয়া যায়, কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।—কেবল গতিশীলতা দ্বারাই উহাতে এই কাঠিন্য-ধর্ম উৎপন্ন হইবে। এই ভাবে বিচার করিলে ইহা প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, যাহাকে আমরা পদার্থ বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই; কিন্তু বিপরীত মতটি প্রমাণ করা যায় না।

শরীরের ভিতর এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহা কি? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি, ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমাণুগুলি লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ—মনুষ্য-দেহ গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্য শরীর গঠন করে না। কখনও দেখি নাই—অপরে আমার হইয়া খাইতেছে। আমাকেই ঐ খাদ্যের সার শরীরে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি—সব কিছুই গঠন করিতে হয়। কি এই রহস্যময় শক্তিটি? ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবল আনুমানিক ব্যাপারমাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বর্তমানে কি হয়, সেইটিই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা এখন বিষয়টি আলোচনা করিব। সে শক্তিটি কি, যাহা এইক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছে? আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরের মত শরীরসম্পন্ন একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ বলিয়া মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত—এই শরীর গেলেও উহা থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ শক্তি জ্যোতির্ময় দেহমাত্র বলিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, আর একটি উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে—তাহা এই যে, ঐ জ্যোতির্ময় শরীর শক্তির প্রতিরূপ হইতে পারে না। যাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংযোগমাত্র, সুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন। যদি এই শরীরের গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই জ্যোতির্ময় দেহের গঠন ও পরিচালনে ঐ দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজন হইবে। এই 'অন্য কিছুই' আত্মা-শব্দ দ্বারা অভিহিত হইল। আত্মাই ঐ জ্যোতির্ময় দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থূল শরীরের উপর কার্য করিতেছেন। ঐ জ্যোতির্ময় দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কার্য করেন এবং মনের মধ্য দিয়া শরীরের উপর কার্য করেন। তোমার একটি আত্মা আছে, আমার একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ এক একটি আত্মা আছে এবং এক একটি সূক্ষ্ম শরীরও আছে; ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে আমরা স্থূলদেহের উপর কার্য করিয়া থাকি। এখন এই আত্মা ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। শরীর ও মন হইতে পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ কি? অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইতে লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, নানাপ্রকার দার্শনিক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—এই আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন এই একটি বিষয়ে একমত দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আকৃতি নাই, তাহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গত, দেশও মনের অন্তর্গত। কাল ব্যতীত কার্যকারণ-ভাব থাকিতে পারে না। ক্রমানুবর্তিতার ভাব ব্যতীত কার্যকারণ-ভাবও থাকিতে পারে না। অতএব দেশকালনিমিত্ত মনের অন্তর্গত, আর এই আত্মা মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া উহাও অবশ্য দেশকালনিমিত্তের অতীত। আর যদি উহা দেশকালনিমিত্তের অতীত হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্য

অনন্ত হইবে। এইবার হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। 'অনন্ত' কখনও দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে একটি মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে—তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা—ইহা সত্য নহে।

অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী, আর এই ব্যাবহারিক জীব মানুষের প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্বোক্ত পৌরাণিক তত্ত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, ব্যাবহারিক জীব যত বড় হউন না কেন, তিনি মানুষের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ 'আত্মা'—কার্যকারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া অবশ্যই মুক্তস্বভাব। তিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই ব্যাবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয়—তিনি যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন।' আমাদের আত্মার ভিতরে যথার্থ সত্য এইটুকু—এই সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যস্বভাব; উহাই আমাদের স্বভাব—চেষ্টা করিয়া আর আমাদিগকে এরূপ হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত, সুতরাং জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন আসিতে পারে না। কতকগুলি বালক-বালিকা পরীক্ষা দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্নটি ছিল—'পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না?' তিনি মহাকর্ষের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর আশা করিতেছিলেন! অধিকাংশ বালক-বালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু উত্তর দিল। তাহাদের মধ্যে একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল—'কোথায় উহা পড়িবে?' এই প্রশ্নই যে ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশের উঁচু-নীচু বলিয়া কিছুই নাই; উহা কেবল আপেক্ষিক। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে?

যখন মানুষ অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে দেহকে সীমাবদ্ধ—সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশশীল—জানিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়। দেহ আত্মা নয়, মনও আত্মা নয়, কারণ উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। জড় জগতের অতীত আত্মাই অনন্তকাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল—এগুলি পরিবর্তনশীল ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র; নদীর প্রত্যেক জলবিন্দুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল প্রবাহের অন্তর্গত; তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত পরিবর্তনশীল; কোন ব্যক্তির শরীরই কয়েক মুহূর্তের জন্যও একইরূপ থাকে না। তথাপি মনের একপ্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে সেই এক শরীর বলিয়াই মনে করি। মন সম্বন্ধেও এইরূপ; উহা ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী, ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্বল। নিয়ত-পরিবর্তনশীল ঘূর্ণিবিশেষ। সুতরাং উহাও আত্মা হইতে পারে না, আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন কেবল সসীম বস্তুতেই সম্ভব। অনন্তের কোনরূপ পরিবর্তন হওয়া—অসম্ভব কথা। তাহা কখনও হইতে পারে না। শরীর-হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই সদা-পরিবর্তনশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে উহাতে গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব। গতি সর্বত্রই আপেক্ষিক। তুমি বা আমি যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাই, তাহা অপর একটি স্থির বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে; জগতের কোন পরমাণু অপর একটি পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমষ্টিভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্তন করিবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত তো আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অপরিণামী অচল ও পূর্ণ, উহাই পারমার্থিক সত্তা—মানুষের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং সর্বব্যাপী অনন্তই সত্য, সান্ত সসীম সত্য নয়। আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব—এই ধারণাটি যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, ইহা পুরাতন ভ্রম মাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্বব্যাপী অনন্ত-পুরুষ, সে ভয় পায়। সকলের ভিতর দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকলের চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দ্বারাই তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য নির্বাহ করিতেছ—লোককে ইহা বলিলে সে ভয় পায়। সে তোমায় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমার এই আমিত্ব বজায় থাকিবে কিনা?' লোকের এই 'আমিত্ব' কোন্‌টি—তাহা দেখিতে চাই।

ছোট শিশুর গোঁফ নাই, বড় হইলে তাহার গোঁফ-দাড়ি হয়। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে তো বালকের 'আমিত্ব' নষ্ট হইয়া গেল। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে আমার একটি চোখ বা হাত নষ্ট হইলে 'আমিত্ব'ও নষ্ট হইয়া গেল। মাতালের মদ ছাড়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার 'আমিত্ব' যাইবে! চোরের সাধু হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে সে তাহার 'আমিত্ব' হারাইবে! অতএব কাহারও এই ভয়ে নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়। অনন্ত ব্যতীত আর 'আমিত্ব' কিছুতেই নাই। এই অনন্তেরই কেবল পরিবর্তন হয় না, আর সবই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। 'আমিত্ব' স্মৃতিতেও নাই। 'আমিত্ব' যদি স্মৃতিতে থাকিত, তবে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া অতীত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেলে আমার 'আমিত্ব' নষ্ট হইত, আমি একেবারে লোপ পাইতাম! ছেলেবেলায় দুই-তিন বৎসর আমার মনে নাই; যদি স্মৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ দুই-তিন বৎসর আমার অস্তিত্ব ছিল না—বলিতেই হইবে। তাহা হইলে আমার জীবনের যে-অংশ আমার মনে নাই, সেই সময়ে আমি জীবিত ছিলাম না, বলিতে হইবে।

ইহা অবশ্য 'আমিত্ব'-সম্বন্ধে খুব সঙ্কীর্ণ ধারণা। আমরা এখনও 'আমি' নহি! আমরা এই 'আমিত্ব'—প্রকৃত ব্যক্তিত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছি, উহা অনন্ত; উহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। যাহার জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত; আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পদার্থে কেন্দ্রীভূত করি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন যতক্ষণ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যতক্ষণ উহা অপরের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, ততক্ষণই আমরা জীবিত, আর এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবনযাপনই মৃত্যু এবং এইজন্যই আমাদের মৃত্যুভয় দেখা দেয়। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, যতদিন এই জগতে একটি জীবনও রহিয়াছে, ততদিন সেও জীবিত। এরূপ উপলব্ধি হইলে মানুষ বলিতে পারেঃ 'আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্তমান; সকল জীবের মধ্যেই আমি বর্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর! যতদিন একটি পরমাণু রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি?' এইভাবেই মানুষ নির্ভীক অবস্থায় উপনীত হয়। নিয়ত-পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অমরত্ব আছে, এ-কথা বলা বাতুলতা। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেনঃ আত্মা

অনন্ত, সুতরাং আত্মাই ‘আমি’ হইতে পারেন। অনন্তকে ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্টিস্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ ‘আমি’, তিনিই ‘প্রকৃত মানুষ’। মানুষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা শুধু ঐ ‘আমি’কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফল মাত্র; আর আত্মাতে কখনও ‘ক্রমবিকাশ’ থাকিতে পারে না। এই যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মানুষ হইতেছে—এ সকল কখনও আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটি যবনিকা রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া আমার সম্মুখস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখ দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সম্মুখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর যখন ঐ ছিদ্রটি সমগ্র যবনিকা ব্যাপ্ত করে, তখন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এ-স্থলে তোমাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই—তোমরা যাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর সেই সঙ্গে তোমাদের প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণই আছ। চেষ্টা করিয়া পূর্ণত্ব পাইতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই-সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল? মানুষ ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর’ করিয়া বেড়ায় কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে সকল সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অন্বেষণ করে—উহা মনুষ্যে, ঈশ্বরে বা অন্য যাহাতেই হউক? তাহার কারণ—পূর্ণ আদর্শ তোমার মধ্যেই বর্তমান। তোমার নিজের হৃদয়ই ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ—বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে, তোমার নিজের মধ্যে ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে প্রেরণা দিতেছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে গীর্জায়, স্বর্গে মর্তে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই বৃত্তপথে ঘুরিয়া আসি এবং দেখিতে পাই—যাঁহার জন্য আমরা সমুদয় জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাঁহার জন্য আমরা মন্দির গীর্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলাম, যাঁহাকে আমরা সুদূর আকাশে মেঘরাশি দ্বারা আবৃত—অব্যক্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতর, প্রাণের প্রাণ; তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা। ‘তুমিই আমি—আমিই তুমি।’ ইহাই তোমার স্বরূপ—ইহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি পবিত্রস্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। প্রকৃতিই যবনিকার ন্যায় অন্তরালে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তুমি যে কোন সৎচিন্তা বা সৎকার্য কর, তাহা যেন শুধু আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অন্তরালে শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন।

ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। আবরণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অন্তরালে সেই জ্যোতি নিজ স্বভাববশতই ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্ত হইতে থাকেন, কারণ তাঁহার স্বভাবই এইভাবে দীপ্তি পাওয়া। তাঁহাকে জানা যায় না, আমরা তাঁহাকে জানিতে বৃথাই চেষ্টা করি। যদি তিনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাবের বিলোপ হইত, কারণ তিনি নিত্যজ্ঞাতা। জ্ঞান তো সসীম; কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে—বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি তো সকল বস্তুর জ্ঞাতাস্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মাস্বরূপ। বিষয়-জ্ঞান যেন একটি নিম্নতর অবস্থা—একটা অধঃপতন। আমরাই সেই আত্মা, আত্মাকে আবার জানিব কিরূপে? প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; তাহা না হইলে এত নীতি-পদ্ধতি কোথা হইতে আসিল? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য কি? সকল নীতিপ্রণালীতে একটি মূল ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, ভাবটি—অপরের উপকার করা। মানবজাতির সকল সৎকর্মের মূল উদ্দেশ্যঃ মানুষ, জীব, জন্তু—সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এ-সবই ‘আমিই জগৎ, এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ’—এই চিরন্তন সত্যের বিভিন্ন ভাবমাত্র। তাহা না হইলে অপরের হিত করিবার যুক্তি কি? কেন আমি অপরের উপকার করিব? কিসে আমাকে অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে? সর্বত্র সমদর্শনজনিত সহানুভূতির ভাব হইতেই এরূপ হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কখনও কখনও অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি এই আপাতপ্রতীয়মান ‘অহং’ প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক ‘অহং’-এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কার্য—যে ব্যক্তি এই-সকল কথা শুনিলে ভয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে—সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই সকল নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আত্মত্যাগ কি? এই আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান ‘অহং’-এর ত্যাগ, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা-বর্জন। এই অহঙ্কার ও মমতা পূর্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই ‘অহং’ ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্যস্বরূপে নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ, ইহাই সমুদয় নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে, অল্পাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকে। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। এই ‘আমি’ ও ‘আমার’ প্রকৃত আত্মা নহে—ইহা জানিয়া তাহারা এই ত্যাগ আচরণ করুক। এই ব্যাবহারিক জীব সীমাবদ্ধ। এখন যাহাকে ‘মানুষ’ বলা যাইতেছে, সে জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাসমাত্র, সেই সর্বস্বরূপ অনন্ত অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি? আজকাল এই ফল—এই উপকার দেখিয়াই সব ব্যাপারেরই গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়? অর্থাৎ মোট কথা এই—উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পয়সা হয়? লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে? ‘সত্য’ কি উপকার বা অর্থের মাপকাঠি লইয়া বিচারিত হইবে? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না।
১৫
যাহা হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকার এবং প্রয়োজন আছে। আমরা দেখিতেছি—সকলেই সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক নশ্বর মিথ্যা বস্তুতেই উহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কখনও সুখ পায় নাই। সুখ কেবল আত্মাতেই পাওয়া যায়। অতএব এই আত্মাতে সুখলাভ করাই মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। আর এক কথা—অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি—সেই অনন্ত স্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয়

স্বার্থপরতার মূল। যখনই আমি নিজেকে একটি ক্ষুদ্র দেহ বলিয়া মনে করি, তখনই জগতের অন্যান্য শরীরের সুখদুঃখের দিকে না চাহিয়া আমি দেহটিকে রক্ষা করিতে এবং উহার সৌন্দর্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তখন তুমি ও আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান দেখা দেয়, তখনই উহা সর্বপ্রকার অমঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকার হইবে যে, যদি আজ মনুষ্যজাতির খুব সামান্য অংশও স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিতে পারে তবে কালই এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে—নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং বাহ্য-জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে তাহা কখনও হইবে না। যেমন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্ধিত হয়, তেমনি এগুলি দুঃখই বৃদ্ধি করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যাবতীয় জড়ের জ্ঞান অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র। জড়বিজ্ঞান—স্বার্থপর লোকের হাতে পরস্ব কাড়িয়া লইবার এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ না করিয়া অপরকে শোষণ করিবার আর একটি যন্ত্র তুলিয়া দেয় মাত্র।

আর এক প্রশ্ন—এই ভাব কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্তমান সমাজে ইহা কি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই, সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক। সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে না। নিঃস্বার্থতার ন্যায় একটি মহৎ সত্য যদি সমাজে কার্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর। তাহা হইলেই বুঝিব, তুমি সাহসী। সাহস দুই প্রকারেরঃ এক প্রকারের সাহস কামানের মুখে যাওয়া; আর এক প্রকার—আধ্যাত্মিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন—অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট। সম্রাট্‌ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, 'আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।' সম্রাট্‌ বলিলেন, 'আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট্‌। আমি আপনাকে ধন ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদা প্রদান করিব।' সাধু বলিলেন, 'ঐশ্বর্য পদমর্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।' তখন সম্রাট্‌ বলিলেন, 'আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' সাধু তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি মহামূর্খের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার করিতে পার না। সূর্য আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না, কারণ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যবিদ্যমান, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্‌ আত্মা।' ইহা আর এক প্রকারের সাহসিকতা। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একটি মুসলমান সৈনিক একজন মহাত্মা সন্ন্যাসীকে প্রচণ্ডভাবে অস্ত্রাঘাত করে। হিন্দু বিদ্রোহিগণ ঐ মুসলমানকে সন্ন্যাসীর নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'বলেন তো, ইহাকে হত্যা করি।' কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার দিকে ফিরিয়া 'ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই' বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি এমনভাবে সমাজ গঠন না করিতে পার—যাহাতে সেই সর্বোচ্চ সত্য স্থান পায়, তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর?—তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলির কি গৌরব কর? তোমাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাত্র বলিতে থাক—ইহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব? টাকা-আনা-পাই ছাড়া আর কিছুই কি কার্যকর নহে? যদি তাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত গর্ব কর কেন? সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পার ততই মঙ্গল। হে নরনারীগণ, এই ভাব লইয়া দণ্ডায়মান হও, সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহসী হও, সত্য অভ্যাস করিতে সাহসী হও। জগতে কয়েক শত সাহসী নরনারী প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। সেই সাহসিকতা অভ্যাস কর, যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে চায় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে; যাহা মৃত্যুকে ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে 'স্বাগত' বলিতে পারে, যাহাতে মানুষ জানিতে পারে—সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন অস্ত্রেরই সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, সমুদয় মিলিত বজ্রশক্তিরও সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে—তবেই তুমি মুক্তপুরুষ, তবেই তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে। ইহা এই সমাজে—প্রত্যেক সমাজেই অভ্যাস করিতে হইবে। 'আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।'

আজকাল কর্মবিষয়ে বেশী কথা বলা এবং চিন্তাকে উড়াইয়া দেওয়ার খুব ঝোঁক। কর্ম খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত। শরীরের ভিতর দিয়া ব্যক্ত শক্তির ক্ষুদ্র প্রকাশকেই কর্ম বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তায়—উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, দিবারাত্র মনের সম্মুখে ঐগুলি স্থাপন কর, তাহা হইলেই বড় বড় কার্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল—আমরা শুদ্ধস্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব—এই চিন্তায় আমরা নিজেদের একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি এবং সেজন্য সর্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

একটি আসন্নপ্রসবা সিংহী একবার শিকার-অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। দূরে একদল মেষ চরিতেছে দেখিয়া যেমন সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ দিল, অমনি তাহার মৃত্যু হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সে-ও মেষগণের সহিত একত্র বড় হইতে লাগিল, মেষগণের ন্যায় ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল; যদিও সে রীতিমত একটি সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময় আর একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ শিকার-অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হইল; কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য হইল যে, ঐ মেষদলের মধ্যে একটি সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেষধর্মী হইয়া বিপদের সম্ভাবনামাত্রই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহ উহার নিকট গিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল যে, সে সিংহ, মেষ নহে; কিন্তু যেমনি সে অগ্রসর হয়, অমনি মেষপাল পলাইয়া যায়—তাহাদের সঙ্গে মেষ-সিংহটিও পলায়। যাহা হউক, ঐ সিংহ মেষ-সিংহটিকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে ঐ মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে; দেখিয়াই সে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, 'ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব ভুলিলে কেন? তুমি তো মেষ নও, তুমি যে সিংহ।' মেষ-সিংহটি বলিয়া উঠিল, 'কি বলিতেছ, আমি যে মেষ, সিংহ হইব

কিরূপে?' সে কোনমতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে সিংহ, বরং সে মেষের মত চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল, 'এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব।' তখন সে সেই দুইটির তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, সত্যিই তো আমি সিংহ। তখন সে সিংহ-গর্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহস্বরূপ—তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। 'হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু তোমার নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগ-দুঃখ কিছুই নাই; তুমি অনন্ত-আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।'—এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে অসৎ-ভাব দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটি স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিল—ওটি এক পাহারাওয়ালা নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটি শিশু উহা দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহা সেই স্থাণু—শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও সেইরূপ দেখিয়া থাকি। মনে কর ঘরে একটি শিশু আছে, এবং টেবিলের উপর এক থলে মোহর রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটি কি বুঝিতে পারিবে—উহা অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহাই দেখিয়া থাকি। শিশুটির মনে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ। জগতের পাপ-অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, সেজন্য রোদন কর। নিজে কাঁদ যে, তোমাকে এখনও সর্বত্র পাপ দেখিতে হইতেছে। যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ করিও না, উহাকে আরও বেশী দুর্বল করিও না। এই-সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?—এগুলি তো দুর্বলতারই ফল। মানুষ ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগৎ এইরূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ কল্যাণ হইবে। দুর্বলতা ও কর্মশক্তিলোপকারী চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে। সৎ-চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, নিজের মনকে সর্বদা বল—'আমি সেই, আমিই সেই'; তোমার মনে দিনরাত্রি ইহা সঙ্গীতের মত বাজিতে থাকুক, আর মৃত্যুর সময়েও 'সোঽহং, সোঽহং' বলিয়া দেহত্যাগ কর। ইহাই সত্য ... জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছে, তাহা দূর করিয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া তাহা জীবনে পরিণত কর। চরম লক্ষ্য অনেক দূর হইতে পারে, কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।'

মানুষের যথার্থ স্বরূপ (২)

[নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমরা এখানে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, অনেক সময় আমরা বহু দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। মানুষও যতদিন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন এইরূপ করিতেছে। মানুষ সর্বদাই সম্মুখে—ভবিষ্যতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, সে জানিতে চাহে—এই শরীর ধ্বংস হইলে মানুষ কোথায় যায়? এই রহস্য-ভেদের জন্য বহু প্রকার মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, একের পর এক বহু মত উপস্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, কতকগুলি গৃহীত হইয়াছে; আর যতদিন মানুষ এই জগতে বাস করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে। এই মতগুলির প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে, আবার সবগুলিতেই এমন অনেক কিছু আছে, যাহা সত্য নয়। এই সম্বন্ধে ভারতে যে-সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহারই সার—তাহারই সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের এই-সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, সেগুলির সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তদর্শনের একটি উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের
১৬
প্রতি বড় মন দেন না; তাঁহারা সর্বদাই সামান্যের
১৭
—শুধু তাহাই নহে—সর্বব্যাপী সার্বভৌম বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন। 'এমন কি পদার্থ আছে, যাহা জানিলে সবই জানা হয়?'—গবেষণার ইহাই একমাত্র বিষয়বস্তু। 'যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে জগতের সমুদয় মৃত্তিকা জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে জগতের সব কিছু জানা যাইবে?' ইহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা
১৮
।

তাঁহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে উহা একমাত্র 'আকাশ' নামক পদার্থে পর্যবসিত হয়। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করি বা আস্বাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করি—সবই আকাশের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় সকল পদার্থ, সর্বপ্রকার আকৃতি ও শরীর, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা—সবই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিল? আকাশের সঙ্গে একটি সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত 'প্রাণ' নামক একটি মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কল্প-প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে সুপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিহীন অবস্থায় ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ—কত সূর্য, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী মানুষ জন্তু উদ্ভিদ ও নানা শক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার পদার্থ আকাশের বিভিন্ন রূপমাত্র। কল্পান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হইবে, সেই তরল পদার্থ আবার বাষ্পে পরিণত হইবে, তাহা আবার তেজরূপ ধারণ করিবে; অবশেষে সব কিছু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই 'আকাশে' লীন হইবে। আর আকর্ষণ বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি ধীরে ধীরে মূল 'প্রাণে' পর্যবসিত হইবে। কিছুকালের জন্য এই 'প্রাণ' যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে; কল্প আরম্ভ হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিবে, কল্পাবসানে সকলই আবার লয় পাইবে। এইরূপে সৃষ্টি-প্রণালী চলিয়াছে; আসিতেছে, যাইতেছে—একবার পশ্চাতে, আবার যেন সম্মুখের দিকে দুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কিছুকাল স্থিতিশীল, কিছুকাল গতিশীল হইতেছে; একবার সুপ্ত আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তন অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণও আংশিক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও এই পর্যন্ত জানিয়াছে। ইহার উপরে ঐ বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে না। কিন্তু এই অনুসন্ধানের এখানেই শেষ হয় না। এ পর্যন্ত আমরা এমন জিনিষ পাই নাই, যাহা জানিলে সব জানা যায়। আমরা সমুদয় জগৎকে পদার্থ ও শক্তিতে, অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলিতে গেলে—আকাশ ও প্রাণে পর্যবসিত করিয়াছি। এখন আকাশ ও প্রাণকে উহাদের আদিকারণে পর্যবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে 'মন' নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্যবসিত করা যাইতে পারে; 'মহৎ' বা সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ—উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই দুইটি শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়। আদিতে এই সর্বব্যাপী মন ছিলেন। ইনিই পরিণত হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আর এই দুইটির সংযোগে ও মিলনে সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

এবার মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা যাক। আমি তোমাকে দেখিতেছি; চক্ষু দ্বারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহা অনুভূতিজনক স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে, উহা বাহিরের যন্ত্রমাত্র; কারণ দর্শনের প্রকৃত সাধন—যাহা মস্তিষ্কে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহা যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে আমার বিশটি চক্ষু থাকিলেও তোমাদের কাহাকেও

দেখিতে পাইব না। অক্ষিজালের (retina) উপর সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। সুতরাং প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক্; প্রকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় অবশ্য চক্ষু-যন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়ানুভূতি সম্বন্ধেই এরূপ বুঝিতে হইবে। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে; উহা যন্ত্রমাত্র, উহার পশ্চাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহ্যযন্ত্রগুলি অবস্থিত, তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি যথেষ্ট হইল না। মনে কর—আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটি ঘণ্টা বাজিল, তুমি হয়তো সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। ঐ শব্দতরঙ্গ তোমার কানে পৌঁছিয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ুর দ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদ-বহন পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, এই শ্রবণ-প্রক্রিয়ার জন্য আরও কিছু আবশ্যক—এ ক্ষেত্রে মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ থাকে, ইন্দ্রিয় উহার কাছে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদগ্রহণ সম্ভব। কিন্তু উহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ আনিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না; আর একটি জিনিষ আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করিল, বুদ্ধি পূর্বানুভূত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়াপ্রবাহ প্রেরণ করিল, ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, তাহাকে 'বুদ্ধি' বলে। তথাপি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর—একটি ক্যামেরা (ম্যাজিক লণ্ঠন) রহিয়াছে, আর একটি বস্ত্রখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানা প্রকার আলোক-কিরণ ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিয়া ঐগুলি ঐ স্থানে একত্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল বস্তুর আবশ্যক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তু প্রয়োজন। আমি যে-সকল আলোকরশ্মি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি সচল; এই সচল আলোকরশ্মি কোন অচল বস্তুর উপর একত্র—একীভূত করিয়া মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যে-সকল অনুভূতি ভিতরে লইয়া গিয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন স্থির বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্র মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিষয়ানুভূতি-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কি সেই বস্তু, যাহা আমাদের পরিবর্তনশীল সত্তাকে একটি একত্বের ভাব প্রদান করে? কি সেই বস্তু, যাহা বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহূর্তে ঐক্য রক্ষা করিয়া থাকে? কি সেই বস্তু, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র গ্রথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাস করে এবং একটি অখণ্ড ভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম, এমন একটি বস্তু আবশ্যক, এবং শরীর-মনের তুলনায় সেই বস্তুটিকে স্থির হইতে হইবে। যে বস্ত্রখণ্ডের উপর ঐ ক্যামেরা চিত্র নিক্ষেপ করিতেছে তাহা ঐ আলোকরশ্মির তুলনায় স্থির, নতুবা কোন চিত্র উৎপন্ন বা অনুভূত হইবে না; অর্থাৎ অনুভবিতা একটি 'ব্যক্তি' হওয়া আবশ্যক। এই বস্তু, যাহার উপর মন এই-সকল চিত্র আঁকিতেছে—যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ানুভূতিসকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র হয়, তাহাকেই মানুষের 'আত্মা' বলে।

আমরা দেখিলাম, সমষ্টি-মন বা মহৎ—আকাশ ও প্রাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আর মনের পশ্চাতে আত্মা রহিয়াছেন। সমষ্টি-মনের পশ্চাতে যে আত্মা, তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলে। ব্যষ্টিতে ইহা 'মানবের আত্মা'। বিশ্বজগতে যেমন সমষ্টি-মন আকাশ ও প্রাণরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ বিশ্বাত্মাও মনরূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ব্যষ্টি-মানব সম্বন্ধেও কি ঐরূপ? মানুষেরও মন কি তাহার শরীরের স্রষ্টা, তাহার আত্মা তাহার মনের স্রষ্টা—অর্থাৎ মানুষের শরীর, মন ও আত্মা তিনটি বিভিন্ন বস্তু, অথবা ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথবা ইহারা এক পদার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র? আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমরা এতক্ষণে পাইলাম—প্রথমতঃ এই স্থূলদেহ, তৎপশ্চাতে ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। প্রথমতঃ আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। এই স্থান হইতেই ধর্মজগতে মতভেদ দেখা যায়। দ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা সগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ভোগের সব অনুভূতিই যথার্থতঃ আত্মার ধর্ম; অদ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা নির্গুণ।

আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত—আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণনা করিয়া পরে যে-মত উহাকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণনা করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশ ও প্রাণ দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন? মরত্বের বা নশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই নশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগ দ্বারা লব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে-পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন নয়, তাহা কখনও বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ কখনও হইতে পারে না, তাহা অবিনাশী; তাহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখনও সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি—কেহ কখনও দেখে নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, উহা পূর্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলন মাত্র। যদি তাহাই হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নন বলিয়া অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া ছিলেন এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবেন। এই শরীর-পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীরের পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় পায়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান।

এই সূক্ষ্মশরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি? মন যেন হ্রদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে—পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না; উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, উহাদের

অস্তিত্ব থাকে, প্রয়োজন হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই 'স্মৃতি' বলে। এইরূপে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে রহিয়াছে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে—উহারা আবার সূক্ষ্মশরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে। আত্মা এই-সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান এবং এই বিভিন্ন সংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

যাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্যরশ্মির অনুসরণ করেন; সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্যালোকে উপনীত হন, তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এইস্থানে তাঁহারা সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে—তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে—কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সূক্ষ্ম- শরীর—দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের পুরাতন কর্ম বলবান হয়, সুতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্যলোকে জন্ম হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করে।

যাহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐস্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে বাস করিয়া [মৃত্যুর পর] তাহারা আবার মানুষ হয়—আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পৌঁছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব সামান্য অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই সূর্যকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা মাঝারি রকমের, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তাঁহারা সেই স্থানের স্বর্গে বাস করেন, সেখানে দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তারপর তাহারা পশু হয়; পরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে 'কর্মভূমি' বলে। ভাল-মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য করিলে মানুষ স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে কৃত তাঁহার সৎকর্মের ফলভোগ করেন। আর এই সৎকর্ম যেমনি শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে-সকল অসৎ কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল বেগে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে যাহারা ভূতপ্রেত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম না করিয়াই কেবল অতীত কর্মের ফলভোগ করে, তাহার পর পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া সেখানেও কোন নূতন কর্ম করে না, তারপর তাহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর—কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কাজ করিল, কিন্তু একটি খুব ভাল কাজও করিল, তাহা হইলে সেই সৎকর্মের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্যের ফল শেষ হইবামাত্র অসৎ কর্মগুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যাহারা কতকগুলি ভাল ও মহৎ কাজ করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের জীবনের সাধারণ ধারা পরিশুদ্ধ নয়, তাহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পন্ন হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছুকাল সম্ভোগ করিয়া আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সৎকর্মের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসৎকার্যগুলির ফল ফলিতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসৎকর্ম করে, তাহাদিগকে ভূত-শরীর দানব-শরীর গ্রহণ করিতে হইবে; আর যখন ঐ অসৎকার্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সৎকর্মটুকু অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্বারা তাহারা আবার মানুষ হইবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যেখান হইতে পতন বা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে 'দেবযান' বলে আর স্বর্গ গমনের পথকে 'পিতৃযান' বলে।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এইখানেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এখন এই মতের বিরোধী মত আলোচনা করা যাক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেনঃ এই শরীর-মনের পশ্চাতে 'আত্মা' বলিয়া একটি পদার্থ আছে, তাহা মানিবার আবশ্যকতা কি? 'এই শরীর ও মনরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ' বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার একটি তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে ততদূর বোধ হয়, এই শরীর ও মনরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ, অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্ত্বটি এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত, অথচ শরীর-মনের আশ্রয়স্বরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? শুধু শরীর-মন বলিলেই তো যথেষ্ট হয়; নিয়ত পরিণামশীল জড়স্রোতের নাম 'শরীর', আর নিয়ত-পরিণামশীল চিন্তাস্রোতের নাম 'মন'। এই দুয়ের একত্ব-প্রতীতি হইতেছে কিসের দ্বারা? বৌদ্ধ বলেনঃ এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জ্বলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক, একটি অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপে আমাদের জীবনেও একত্ব নাই; জড়রাশি ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাশিকে 'এক' বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তাই;

প্রত্যেকটি চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবল চিন্তাস্রোতই এই একত্বের ভ্রম রাখিয়া যাইতেছে। সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা নাই। দেহ-মনের বিশ্বপ্রপঞ্চ এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু অনুমান করিও না। আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজেদের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ-দর্শনেরই মোট কথাটা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পর্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সব—কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? সবই গুণসমষ্টি। এমন একটি আনুমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি প্রয়োজন আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? গুণরাশির দ্রুত আদান-প্রদানবশতই পদার্থের জ্ঞান হয়, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি কি চমৎকার! আর এগুলি মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে সহজেই নাড়া দেয়। বাস্তবিক পক্ষে একজনও এই দৃশ্যজগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কিনা, সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণামশীল। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই পটভূমিস্থ সেই স্থির সমুদ্রের সামান্য আভাস পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি—এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে; আর একটি মত—এই জগতে অচল অপরিণামী বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল পরিবর্তনশীল; সবই পরিণাম ছাড়া কিছু নয়! যাহা হউক অদ্বৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী বলেনঃ 'জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় আছে'—দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণাম কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণামিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটি পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, যখন উহা শান্ত ও নিঃশব্দ ছিল, যখন বিপরীত শক্তিগুলি সাম্যাবস্থায় ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তির জন্য দ্রুতবেগে চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তবে এই বিষয়েই আছে। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন; কিন্তু উহা যে শরীর-মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—এ-কথা বলা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদয় জগৎ পরিণামপ্রবাহ মাত্র—এ কথাও সত্য; কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছু দেখি—মোট কথা যতদিন দ্বৈতভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা—এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর—তিনটি পৃথক্ বস্তু নহে উহারা একই। একই বস্তু কখনও দেহ, কখনও মন, কখনও বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্যন্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর ও মন উভয়ই কোথায় চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি পরম শান্ত স্থিরভাব দেখিতে পান না; আর যিনি সেই পরম শান্তভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি ও চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া যায়! সর্পে রজ্জুভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়, আর ভ্রান্তি দূর হইলে সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তখন তাহার পক্ষে সর্প আর থাকে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, একটিমাত্র বস্তুই আছে—তাহাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাকে আত্মাই বল আর বস্তুই বল বা অন্য কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র তাহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ 'বহু' প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটি তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে! তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন? নাম ও রূপ—তরঙ্গের আকৃতিই রূপ, আর আমরা উহার নাম দিয়াছি 'তরঙ্গ', এই নাম-রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম-রূপ চলিয়া গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমগ্র জগৎ এক সত্তা। নাম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তেমনি সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা অসংখ্য নাম-রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা রূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল—সবই আমি, না হয় বল—সবই তুমি। দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। বিচার-জ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্তু নাই, একটি বস্তুই আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—সে নিজেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নির্গুণ নিত্যপূর্ণ নিত্যানন্দময়।

অতএব নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন, তাঁহার কখনও পরিণাম হয় নাই, আর এই-সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতে শুধু প্রতীত হইতেছে। উহার উপরে নাম-রূপ এই-সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র আঁকিয়াছে। রূপ বা আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই 'নাম-রূপকে'ই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন 'ব্যক্তি' সৃষ্টি করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথক্ মনে করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। 'রূপে'র বা আকৃতির অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, এ-কথাও বলা যায় না, কারণ উহাই এই-সকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নাম-রূপ—ইওরোপীয়গণের মতে দেশকাল-নিমিত্ত—সেই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎসত্তা দেখাইতেছে, পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত কেহ দুইটি

বস্তুর কল্পনা করেন, ততদিন তিনি ভ্রান্ত। যখন তিনি জানিতে পারেন—একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি ঠিক ঠিক জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে; কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্মজগতে—সর্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি আমি সূর্য চন্দ্র তারা—এ-সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নাম মাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্বে সূর্যে ছিল, আজ হয়তো তাহা মনুষ্যের ভিতর আসিয়াছে, কাল হয়তো উহা পশুর ভিতরে, আবার পরশু হয়তো কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্বদাই আসিতেছে, সর্বদা যাইতেছে। উহা এক অখণ্ড জড়রাশি—কেবল নাম-রূপে পৃথক্। উহার এক বিন্দুর নাম সূর্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু উদ্ভিদ—এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, এগুলি ভ্রমাত্মক; কারণ এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর একভাবে দেখিলে ইহা চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক-একটি বিন্দু এক-একটি মন; তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক-একটি মন-মাত্র। আবার এই জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে—অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হয়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ অপরিণামী অবিনাশী অখণ্ড পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইবে।

তবে দ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায় অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসৎলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়—এ-সব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেনঃ কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না—তোমার পক্ষে যাওয়া-আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায়?

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটিও ছিল। পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটির উত্তর দিল—'কোথায় পড়িবে?' প্রশ্নটিই তো ভুল। জগতে উঁচু-নীচু বলিয়া তো কিছুই নাই। উঁচু-নীচু জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আত্মার জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন একেবারে অর্থহীন। কে যায়, কে আসে? তুমি কোথায় নাই? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব হইতেই অবস্থিত নও? মানুষের আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্মা তো সর্বত্র! সুতরাং জ্ঞানী বা সিদ্ধপুরুষের পক্ষে এগুলি শিশুর কল্পনা; এই জন্মমৃত্যুরূপ বালসুলভ ভ্রম, এই স্বর্গ নরক—সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়; যাঁহারা প্রায়সিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে উহারা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অজ্ঞানীর পক্ষে ঐগুলি থাকিয়া যায়।

স্বর্গে যাওয়া, মরা, জন্মগ্রহণ করা—পৃথিবীর সকলে এ-সব কথা বিশ্বাস করে কি করিয়া? আমি একখানি বই পড়িতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া যাইতেছি। আর এক পৃষ্ঠা আসিল, তাহাও উলটান হইল। কাহার পরিণাম হইতেছে? কে যায় আসে? আমি নই—ঐ বইটিরই পাতা উলটান হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখে একখানি পুস্তকের মত। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও পাতা উলটান হইতেছে, নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল এবং উলটান হইল। আবার নূতন অধ্যায় আসিল; কিন্তু আত্মা যেমন, তেমনই—অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না। জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নয়। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে—আমরা জন্মাইতেছি মরিতেছি, প্রকৃতি নয়; যেমন ভ্রান্তিবশতঃ আমরা মনে করি—সূর্যই চলিতেছে, পৃথিবী নয়। সুতরাং এ-সব কিছুই ভ্রান্তিমাত্র, যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি। জন্ম-মৃত্যুর ভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা ঐরূপ মনোভাবসম্পন্ন, তাহারও ঠিক তাহাই দেখে! তোমার আমার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখনও দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখনও দেখিতে পাইব না। একপ্রকার-চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন, একই লোকে অবস্থিত প্রাণীকেই আমরা দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি একসুরে বাঁধা, সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অন্যগুলি বাজিয়া উঠিবে। মনে কর, আমরা এখন যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা 'মানবকম্পন' নাম দিতে পারি; যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, পরিবর্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিবে—হয়তো দেবতা ও দেবজগৎ কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্তু ঐ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে ইহাই নরক বা শাস্তি-স্থানরূপে প্রতীত হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গরূপে দেখিবে। যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তস্থ ঐ-বিষয়ই দেখিবে। এই জগৎই তাহাদের চক্ষে একটি বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে; তাহারা দেখিবে—নানাপ্রকার পক্ষযুক্ত দেবদূত উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর ঈশ্বর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সবকিছুই মানুষের সৃষ্টি। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেনঃ দ্বৈতবাদীর কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ-সকল তাহার নিজেরই সৃষ্টি। এই-সব লোক, এই-সব দৈত্য, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই। কেবল ঐগুলি রূপক, আর মানবজীবন সত্য—তাহা হইতে পারে না। মানুষ সর্বদাই এই ভুল করিতেছে। অন্যান্য জিনিষ—যথা স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোনমতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাত-প্রতীয়মান সবই রূপকমাত্র; আর 'আমরা শরীর'—এই জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা; আমরা কখনই শরীর নহি, কখনও শরীর হইতেও পারি না। আমরা কেবল মানুষ—ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি।

তুমি জন্ম হইতে পাপী ও অসৎ—এইটি সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে পাপী, তিনি কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর, এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক থলি মোহর রাখিলে। মনে কর, একজন চোর আসিয়া ঐ মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্ধান উভয়ই সমান; তাহার ভিতরে চোর নাই, সুতরাং সে

বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু পাপ দেখিতে পান না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকরূপে দেখে; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গরূপে দেখে; আর যাঁহারা পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে দর্শন করেন, তখনই কেবল তাঁহার দৃষ্টি হইতে আবরণ সরিয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল দুঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়, আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখনও ঊর্ধ্বে কখনও নিম্নে, কখনও পৃথিবীতে, কখনও স্বর্গে, কখনও বা অন্যত্র অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান—বাস্তবিক তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নহেন, কাল তাঁহার অধীন; সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন; আর মানুষ এ পর্যন্ত যত দেবতার উপাসনা করিয়াছে, সবই তাহার ভিতরে; মানুষ কোন দেবতার ভিতরে অবস্থিত নয়, মানুষই দেব-অসুর মানুষ-পশু উদ্ভিদ্-প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, আর তখনই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাহার নিকট বিশ্বজগৎ অপেক্ষা পূর্ণতর, অনন্তকাল অপেক্ষা সীমাহীন এবং সর্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষা ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, সব ভয় একবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়, শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন অন্তর্হিত হয়। এই যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও পদার্থরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টা রূপে—যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ-পৃথিবী উদ্ভিদ্-পশু মানুষ-দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই-সব এক অনন্ত অচ্ছেদ্য অপরিণামী সত্তারূপে প্রতিভাত হয়; আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান—তিনি সেই সত্তার সহিত অভিন্ন। যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী স্বর্গ চন্দ্রলোক দেবতা সুখদুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে, কিন্তু উহারা সেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখনও পরিণামপ্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণামপ্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি—আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত; আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ।

এখন দুইটি প্রশ্ন দেখা দিতেছে। প্রথমটি এইঃ অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্ত মতের কথা হইল; কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব? হাঁ, সম্ভব। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কি এই প্রকার উপলব্ধির পরক্ষণেই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। একটি কাষ্ঠদণ্ডে সংযোজিত দুইটি চাকা একত্র চলিতেছে। যদি আমি একখানি চাকা ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠদণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চাকাখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে; কিন্তু অপর চাকার উপর পূর্বার্জিত গতিবেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যাইবে। পূর্ণ শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একখানি চাকা, আর শরীর-মন-রূপ ভ্রান্তি আর একটি চাকা—কর্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগদণ্ড ছিন্ন করিয়া দেয়। যখন আত্মারূপ চাকা থামিয়া যাইবে, তখন আত্মা আসিতেছেন যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইতেছে—এ-সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যক্ত হইবে; আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাব, অভাব, বাসনা—সব চলিয়া যাইবে; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ—বাসনারহিত। কিন্তু শরীর-মন-রূপ অপর চাকার প্রাক্তন কর্মের বেগ থাকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহারা থাকিবে; ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীর-মনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা নাই, এমন কি ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত নাই; কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এ-অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও এই সংসারদৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদান্ত-সাধকের লক্ষ্য।

এক সময়ে আমি ভারত-মহাসাগরের উপকূলে পশ্চিম-ভারতের মরুখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে মরুভূমিতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম যে, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রহিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত, আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। মনে মনে বলিতাম কি অদ্ভুত দৃশ্য! লোকে ইহাকে মরুভূমি বলে! এই-সকল অদ্ভুত হ্রদ ও বৃক্ষরাজি দেখিয়া একমাস ভ্রমণ করিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, সুতরাং আমি ঐ সুন্দর নির্মল হ্রদসমূহের একটির দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল, আর আমার মনে তখন এই জ্ঞানের উদয় হইল—যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারাজীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা! আর সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিল—সারা মাস প্রত্যহ আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে, ইহা মরীচিকা। পরদিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্বের মতই হ্রদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও হইতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা—সত্য হ্রদ নহে। এই জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতিবৎসর এই জগৎ-রূপ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার দেখা দিবে। শরীর প্রাক্তন কর্মের অধীন থাকিবে, সুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে। যতদিন আমরা কর্ম দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে। নর-নারী, পশু, উদ্ভিদ্, আসক্তি কর্তব্য—সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্বের মত আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না। এই নূতন জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নষ্ট হইবে, উহার বিষ দূরীভূত হইবে; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; কারণ যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদজ্ঞানও দেখা দিবে।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তবে এইরূপ জ্ঞান-সাধনে একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, 'আমি ধর্মাধর্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, সুতরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।' এই দেশেই দেখিবে, অনেক নির্বোধ ব্যক্তি বলিয়া থাকে, 'আমি বদ্ধ নহি, আমি

স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ; আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।' ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা শারীরিক মানসিক বা নৈতিক—সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত। ইহা সত্য যে, নিয়মের মধ্যেই বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব জড়ের আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্তই তুমি নিজেকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা নিজেকে মুক্ত অনুভব না করিয়া এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার অল্প চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে আমরা যন্ত্রের মত, আমরা মুক্ত নহি। তবে কোন্‌টি সত্য? এই যে 'আমি মুক্ত'—এই ধারণাটিই কি ভ্রমাত্মক? একদল বলেন, 'আমি মুক্ত-স্বভাব'—এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন, 'আমি বদ্ধভাবাপন্ন'—এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। ইহা কিভাবে সম্ভব? মানুষ প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। মানুষ পরমার্থতঃ মুক্ত ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কিন্তু যখনই তিনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নাম-রূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া যান। 'স্বাধীন ইচ্ছা'—কথাটিই ভুল। ইচ্ছা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। কি করিয়া হইবে? 'প্রকৃত মানুষ' যখন বদ্ধ হইয়া যান, তখনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু উহার মূল অধিষ্ঠান নিত্যকালের জন্য মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও এই মনুষ্যজীবনেই হউক, দেবজীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থানকালেই হউক আর মর্ত্যে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের বিধিদত্ত অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির স্মৃতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই সেই মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মানুষ মুক্তিলাভ করে, তখন আর সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারে? জগতের কোন নিয়মই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না; কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যে তাহার।

মানুষ তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। হয় বল—তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বল—তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী-পুরুষবোধ, দেশ-বিদেশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন—এ-সব মিথ্যা। তখন তিনি এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি নারীর অধিকার—একথা কিরূপে বলিবেন? কাহারও কোন অধিকার নাই, কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী, অথবা আমি অমুক-দেশবাসী—এরূপ বলা মিথ্যা কথা মাত্র। সারা পৃথিবী আমার দেশ, সমুদয় জগৎই আমার; কারণ ইহারই দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত্ত করিয়াছি, জগৎই আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—অনেকে দার্শনিক বিচারের সময় এইসব কথা বলিয়া কাজের সময় নোংরা কাজ করিয়া বেড়ায়; আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন তোমরা এইরূপ করিতেছ?' তাহারা উত্তর দিবে, 'এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অন্যায় কার্য হওয়া অসম্ভব।' এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় এইঃ যদিও ভাল-মন্দ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসৎভাব আত্মার বাহ্য আবরণ, আর সৎভাব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা—তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসৎ'-এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন সৎ-এর স্তরে পৌঁছিতেই পারিবে না; আর যতদিন না মানুষ সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন আত্মার নিকট পৌঁছিতেই পারিবে না। আত্মার নিকট পৌঁছিলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অতি সামান্য কর্ম, অতীত জীবনের কার্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ—শুভকর্মেরই বেগ। যতদিন না অসৎ কর্মের গতিবেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্বের অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং যিনি আত্মার নিকট পৌঁছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল অতীত-জীবনের শুভ সংস্কার—শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম করিলেও তিনি কেবল সৎ কর্ম করেন; তাঁহার মুখ সকলের উদ্দেশ্যে কেবল আশীর্বাদ বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎ কার্যই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ, তাঁহার উপস্থিতিই—তিনি যেখানেই যান না কেন—সর্বত্র মানবজাতির মহাকল্যাণকর। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কোন অসৎকর্ম কি সম্ভব?

তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত 'প্রত্যক্ষানুভূতি' এবং 'শুধু মুখে বলা'র মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে। তোতাপাখীও ঐরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, উপলব্ধি আর এক। দর্শন-মতামত-বিচার, শাস্ত্র-মন্দির-সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছুই মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ও-সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তারপর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন দেখিবে কত প্রভেদ! সুতরাং যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্ক প্রভৃতি মানসিক ব্যায়ামের আশ্রয় লইতে হয় না। উহা তাঁহাদের মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে—উহা তাঁহাদের জীবনের জীবন। বেদান্তবাদীর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাঁহার 'করামলকবৎ' হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসঙ্কোচে বলিতে পারেন, 'এই যে-আত্মা রহিয়াছে।' তুমি তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক কর না কেন, তাঁহারা তোমার কথায় শুধু হাসিবেন, তাঁহারা উহা শিশুর আবোল-তাবোল বলিয়া মনে করিবেন। শিশুর আধ-আধ কথায় তাঁহারা বাধা দেন না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া 'ভরপুর' হইয়া আছেন। মনে কর, তুমি একটি দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর অপর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল—ঐ দেশের কোন অস্তিত্বই নাই; এইভাবে সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার এই মনোভাব হইবে যে, এ ব্যক্তি উন্মাদাগারে যাইবারই উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন 'জগতে ধর্ম সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনা যায়, সেগুলি কেবল শিশুর আধ-আধ কথামাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্মের সার কথা।' ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ? তুমি কি ধর্ম উপলব্ধি করিতে চাও? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে ও নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট; কিন্তু যে বলে, 'ধর্ম—আমি বিশ্বাস করি', অথচ কখনও উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।

পরবর্তী প্রশ্ন এই—উপলব্ধির পরে কি হয়? মনে কর, জগতের এক অখণ্ড সত্তা উপলব্ধি করিলাম; আমরাই যে সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ, ইহা অনুভব করিলাম; মনে কর আমরা জানিতে পারিলাম—আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনি বিভিন্ন ভাবে

প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে আমাদের কি হইবে? তাহা হইলে আমরা কি এক কোণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া মরিয়া যাইব? ইহা দ্বারা জগতের কি উপকার হইবে? আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন! প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন?—ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, 'ইহাতে কি লোকের উপকার হইবে?' ইহার অর্থ কি? ছোট ছেলে মিষ্টান্ন ভালবাসে। মনে কর, তুমি তড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ; শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায়? তুমি বলিলে, 'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?' তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিলেও লোকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে?' 'না'। 'তবে ইহাতে আর উপকার কি?' জগতের হিত করা অর্থে মানুষ এইরূপই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের যথার্থ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন সে উপলব্ধি করিবে—সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে; জীবনের যাহা কিছু মূল্যবান—সব চলিয়া যাইবে; ইহজীবনে ও পরজীবনে তাহাদের ভালবাসার আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু লোকে একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে-সকল ব্যক্তি নিজ সুখচিন্তায় একরূপ উদাসীন, তাহারাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হইয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, যখন সে দেখিতে পায়—তাহার ভালবাসার জিনিষ কোন ক্ষুদ্র মর্ত্যজীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়—তাহার ভালবাসার পাত্র খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, তাহার প্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান্। স্ত্রী যদি ভাবেন—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তবে তিনি স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন—স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেইরূপ মাতাও সন্তানগণকে বেশী ভালবাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। যিনি জানেন—ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি তাঁহার মহাশত্রুকেও ভালবাসিবেন। যিনি জানেন—সাধু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই সাধুকে ভালবাসিবেন। সেই লোকই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানেন—অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাঁহার জীবনে এই ক্ষুদ্র 'অহং' একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঈশ্বর সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীকে নাড়া দিয়া যান। তাঁহার নিকট সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। দুঃখকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুকরা রুটির জন্য ঝগড়া-মারামারি করি—সেই জগৎ তখন তাঁহার পক্ষে কারাগার না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তখন জগৎ কি সুন্দর ভাবই না ধারণ করিবে! এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে—'এই জগৎ কি সুন্দর!' তিনিই কেবল বলিতে পারেন, সবই মঙ্গলস্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহৎ কল্যাণ হইবে যে, সকল বিবাদ গণ্ডগোল দূর হইয়া পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। যদি সকল মানুষ আজ এই মহান্ সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সারা পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিবে; অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি অপর সকলকে অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে; উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষা ও সকল প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন, তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে। আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কাজ, যখন দেবতায় দেবতায় প্রেম, তখন কি আর অশুভ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তোমরা আর কোন অন্যায়কারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, যে দুঃখিনী নারী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আপনারা আর তাহার দিকে ঘৃণাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিবেন না; কারণ আপনারা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবেন। তখন আপনাদের মনে আর ঈর্ষা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদিত হইবে না; ঐ সবই চলিয়া যাইবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি পৃথিবীর নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগ শুধু চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন, 'তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, পশুগণ, সর্বপ্রকার প্রাণিগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ', তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দিকে ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ না করিয়া ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে মন্দ না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া মন্দ দেখিবে? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে খুনীকে দেখিবে কিরূপে? সাধু হও, তাহা হইলে তোমার অসাধু ভাব একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ইহাই মহৎ লাভ।

ভারতে প্রাচীনকালে এই-সকল ভাব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে অনেকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদাতা গুরুগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই-সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও এগুলি মহাসত্য; যেখানেই এগুলির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সেইখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইতেছে। এইরূপ একজন দেবপ্রকৃতির মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; ইঁহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এখন এই-সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দার্শনিক গ্রন্থগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া ঐগুলি সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে; যাহাতে ঐ-সকল ভাব সাধু, পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এই-সকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যে বায়ু গ্রহণ করিতেছি, তাহা প্রত্যেক তালে তালে ধ্বনিত হইবে—'তত্ত্বমসি'। এই অসংখ্য চন্দ্রসূর্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ভাষণক্ষম প্রত্যেক জীবের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইবে—'তত্ত্বমসি'।

মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতাঃ ২০ অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্তের অন্যতম মূলসূত্রস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর উপনিষদে যে-সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে সেগুলির সবই কোন না কোন আকারে বর্তমান। আপনারা অনেকেই এতদিনে মায়াবাদের তত্ত্ব ভালরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেক সময়ে লোকে ভুলবশতঃ মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করে; অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে 'মায়া' বলেন, তখন উহাকে 'ভ্রম' বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক নহে। 'মায়া' কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যথার্থ বর্ণনামাত্র। সেই মায়াকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সংহিতা পর্যন্ত যাইতে হইবে এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহাও দেখিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতা-জ্ঞান কিরূপে আসিল; বুঝিয়াছি, এই দেবতারা প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। গ্রীক, হিব্রু, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতারা এমন সব কার্য করিতেছেন, যেগুলি আমাদের দৃষ্টিতে অতীব ঘৃণিত, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া আপনারা অনেকে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আর এই-সব দেবতা অনেক সহস্র বৎসর পূর্বের জীব; আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐ-সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে অসঙ্গত কিছু দেখিতে পাইতেন না, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ সেই-সকল দেবতা তাঁহাদেরই মত ছিলেন। সারা জীবন ধরিয়া আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শ অনুসারে নয়। তাহা না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চারিপাশের মানুষের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বদাই এই ভুল করি, আর আমার ধারণা—অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ-বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণেই হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরের আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা এবং অপরের উদ্দেশ্য আমাদের নিজ উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়তো কোন বিশেষ কার্য করিতে পারি, আর যখন দেখি—আর একজন লোক সেইরূপ কার্য করিতেছে, মনে করিয়া লই—তাহারও সেই এক উদ্দেশ্য; আমার মনে একবারও এ-কথা উদিত হয় না যে, ফল সমান হইলেও অন্য বহু কারণ সেই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য অন্য উদ্দেশ্যে করিতে পারেন। সুতরাং ঐ-সকল প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার সময় আমরা যেন আমাদের মানসিক প্রবণতা দ্বারা বিচার না করি; আমরা যেন সেই প্রাচীনকালের জীবন ও চিন্তাধারার ভাবে নিজদিগকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের নিষ্ঠুর যিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হয়; কিন্তু কেন? লোকের এরূপ কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন য়াহুদীদিগের যিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন? আবার আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা যেভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হাসিয়া থাকি, আমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বর বিষয়ক ধারণাগুলিও সেইভাবে উপহাস করিবেন। তাহা হইলেও এই-সকল বিভিন্ন ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক একটি স্বর্ণ-সূত্র বিদ্যমান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য—সেই সূত্রটি আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন এক সূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ এই-সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও একটি সূত্র রহিয়াছে।'১৯ আর আধুনিক ধারণানুসারে সেগুলি যতই বীভৎস ভয়ানক বা ঘৃণিত বলিয়া মনে হউক না কেন, বেদান্তের কর্তব্য—ঐ-সকল ধারণা ও বর্তমান ধারণাগুলির ভিতর এই যোগসূত্র আবিষ্কার করা। অতীতকালের পটভূমিকায় সেগুলি বেশ সঙ্গতই ছিল, আমাদের বর্তমান ভাব ও ধারণা অপেক্ষা সেগুলি বেশী বীভৎস ছিল না। যখন আমরা প্রাচীন পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, শুধু তখনই ঐগুলির বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীন পরিবেশ এখন তো আর নাই। যেমন প্রাচীন য়াহুদী বর্তমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি য়াহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন; সেইরূপ যিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা এইটুকু ভুল করি যে, আমরা উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু উপাস্যের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতির জন্য উপাসকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসা করি, উপাস্য ঈশ্বরকে সেটুকু করি না। কথাটা এই—তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক বলিয়া ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের আশ্চর্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরেরও উন্নতি হয়! তোমাদের ধারণা—ঈশ্বরের উন্নতি হয় না, তিনি অপরিবর্তনীয়। এইভাবে তো ইহাও বলা যায় যে, প্রকৃত মানুষেরও কখনও উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব—এই মানুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ আছেন, তিনি অচল অপরিণামী শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়ামাত্র, সেইরূপ আমাদের ঈশ্বর-ধারণা আমাদের মনেরই সৃষ্টি, উহা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ—আভাসমাত্র। ঐ-সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্যশুদ্ধ—অপরিণামী। কিন্তু ঐ-সকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল—ঐগুলি উহাদের অন্তরালে অবস্থিত সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র; সেই সত্য যখন অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে 'উন্নতি', আর উহার অধিকাংশ আবৃত থাকিলে তাহাকে 'অবনতি' বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যেমন আমাদের উন্নতি হয়—আমাদের স্বরূপের যেমন ক্রমশঃ প্রকাশ হয়, দেবগণও তেমনি তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

এখন আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। পৃথিবীর সকল ধর্মই এক প্রশ্ন করিয়াছেনঃ জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন?—এই অশুভ কেন? আমরা ধর্মভাবের প্রথম সূচনাকালে এই প্রশ্ন দেখিতে পাই না; তাহার কারণ—আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কেবল তাহাদের হৃদয়ে দুইটি জিনিষের সংগ্রাম হইত। একটি বলিত—'এই কাজ কর', আর একটি বলিত—'করিও না।' আদিম মানুষ আবেগপ্রবণ ছিল। তাহার মনে যাহা উদিত হইত, সে তাহাই করিত। সে নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহা সংযত করিবার চেষ্টা মোটেই করিত না। এই-সকল দেবতা সম্বন্ধেও সেইরূপ; ইঁহারাও আবেগের অধীন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যবল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। যিহোভা কাহারও প্রতি তুষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, মানুষের তখনও অনুসন্ধানের অভ্যাসই হয় নাই; সুতরাং সে যাহা করে, তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারণাই হয় নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাজ করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই—ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা অনেক মন্দ কাজ করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে সেগুলি পাপ বা অসৎ বলিয়া মনেই হইত না, সুতরাং তাহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করিত না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এক দ্বন্দ্ব বাধিল, মানুষের ভিতরে যেন একটি নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে; কেহ বলেন—উহা ঈশ্বরের বাণী; কেহ বলেন—উহা পূর্বশিক্ষার ফল। যাহাই হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটি প্রবৃত্তি বলে—'এই কাজ কর' আর একটি বলে—'করিও না।' আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে; আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটি স্বর বলিতেছে—'বাহিরে যাইও না।' এই দুইটি ব্যাপার দুইটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম আরম্ভ হয় এই 'করিও না' হইতে; আধ্যাত্মিকতাও ঐ 'করিও না' হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই 'করিও না' নাই সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যুধ্যমান দেবতার উপাসনা করিতে থাকিলেও এই 'করিও না' বা নিবৃত্তি হইতে মানুষের ধারণাগুলি উন্নত হইতে লাগিল।

এখন মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা জাগিল। অবশ্য খুব অল্প ভালবাসাই তাহার হৃদয়ে আসিয়াছিল; আর এখনও যে উহা বড় বেশী তাহা নহে। প্রথম উহা 'জাতি'তে আবদ্ধ ছিল। এই দেবগণ কেবল উপাসকদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভালবাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতামাত্র ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্র ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোকেরা নিজদিগকে এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহারা নিজদিগকে সূর্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে আপনারা সূর্যবংশের বড় বড় বীর সম্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রথমে চন্দ্র-সূর্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা নিজদিগকে ঐ চন্দ্র-সূর্যের বংশধর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন এই 'জাতীয়'-ভাব আসিতে লাগিল, তখন একটু ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল, আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল—'আমরা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া কিরূপে একত্র বাস করিতে পারি?' মানুষ কি করিয়া অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযত না করিয়া অপরের—এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত বাস করিতে পারে? ইহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমারূপ মহতী শিক্ষা আয়ত্ত করে নাই, সে অতিকষ্টে জীবন যাপন করে।

অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস দেখা দিল। তখন তাঁহাদের ঐ প্রাচীন দেবতাগণকে—চঞ্চল, যুধ্যমান, মদ্যপায়ী, গোমাংসভুক দেবগণকে—যাঁহাদের পোড়া মাংসের গন্ধ এবং তীব্র সুরার আহুতিতেই পরম আনন্দ হইত—কেমন সামঞ্জস্যহীন ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ—বেদে বর্ণিত আছে যে, কখনও কখনও ইন্দ্র হয়তো এত মদ্যপান করিয়াছেন যে, তিনি মাটিতে পড়িয়া অস্পষ্টভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতাকে সহ্য করা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হইল না। তখন উদ্দেশ্য-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইল; দেবতাদেরও কার্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু হইল। অমুক দেবতার অমুক কার্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না, সুতরাং লোকে এই-সকল দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতা সম্বন্ধে আরও উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্যগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল, যেগুলি তাহারা সামঞ্জস্য করিতে পারিল, সেগুলি সব একত্র করিল; আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না সেগুলিকেও পৃথক্ করিল; এই ভাল ভাবগুলির সমষ্টিকে তাহারা 'দেবদেব' আখ্যা প্রদান করিল। তাহাদের উপাস্য দেবতা তখন কেবলমাত্র শক্তির প্রতীক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবতা হইলেন, তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। তাহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা ও শক্তি বর্ধিত করিল মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বশক্তিমান্ হইলেন।

কিন্তু জোড়াতালি দিয়া বেশীদিন চলে না। যেমন জগদ্‌রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি উহা যেন আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেভাবে বাড়িতে লাগিল, সন্দেহ তদপেক্ষা বহুগুণ বাড়িতে লাগিল। যখন লোকের যিহোভা নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্যবিধান করিতে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্য সাধন করা কঠিনতর হইয়া পড়িল। সর্বশক্তিমান্ ও প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে? কেন সুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী? সাধু ভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধু ভাব এত বেশী কেন? আমরা এ-সব দেখিব না—বলিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু তাহাতে

জগৎ যে বীভৎস—এ-সত্য এতটুকু পরিবর্তিত হয় না। খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, এই জগৎ ট্যাণ্টালাসের
২০
নরকস্বরূপ, তাহা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবলতর বাসনা রহিয়াছে, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উঠে—তাহা আমাদিগকে কোন কার্যে অগ্রসর করিয়া দেয়, আর আমরা যেই একপদ অগ্রসর হই, অমনি বাধা পাই। আমরা সকলেই ট্যাণ্টালাসের মত এই জগতে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে বাধ্য। অতীন্দ্রিয় আদর্শসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে পাই সেগুলি কখনই কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় না, বরং আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাচক্রে পিষ্ট হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই। আর যদি আমি এই আদর্শের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিকভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, আমি অবনত হইয়া যাই। সুতরাং কোনদিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতে জন্মাইয়া জাগতিক জীবনেই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে দুঃখ। যাহারা আবার সত্যের জন্য—এই পশু-জীবন অপেক্ষা কিছু উন্নত জীবনের জন্য—অগ্রসর হইতে সাহস করে, উচ্চতর আদর্শ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের আবার সহস্রগুণ দুঃখ। ইহা বাস্তব ঘটনা; ইহার কোন ব্যাখ্যা নাই, কোন ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না। তবে বেদান্ত এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। মাঝে মাঝে আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, যাহাতে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা স্মরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং জীবনে সত্য পালন করিতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যাণ্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা সত্য ঘটনার বর্ণনামাত্র—আমরা এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না; আবার জানি না—এ-কথাও বলিতে পারি না। যখন মনে করি—আমি জানি না, তখন বলিতে পারি না, এই বন্ধন আছে। সবটাই আমার মাথার ভুল হইতে পারে। আমি হয়তো সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, তোমরা আমার কথা শুনিতেছ। কেহই প্রমাণ করিতে পারে না যে, ইহা স্বপ্ন নয়। 'আমার মস্তিষ্ক' ইহাও একটি স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিক নিজের মস্তিষ্ক তো কেহ কখনও দেখে নাই। আমরা সকলেই উহা মানিয়া লই। সকল ব্যাপারে এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা, এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কেহ জানে না। আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি—অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত, সারা জীবন এক অস্পষ্টতায় কাটিয়া যায়—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের নিয়তি! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঐ নিয়তি। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের—যেগুলিকে লইয়া আমাদের এত অহঙ্কার, সেগুলিও এই নিয়তি—এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড—বিশ্বজগৎ।

ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, যে কোন নামই দাও না কেন, ব্যাপার সেই একই; আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে; উহাদের অস্তিত্ব নাই—এ-কথাও বলিতে পারি না। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো-অন্ধকারে খেলা, এই এলোমেলো অবিচ্ছেদ্য ভাব সর্বদা রহিয়াছে। সমুদয় ব্যাপার একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার বোধ হইতেছে—মিথ্যা। একবার বোধ হইতেছে আমরা জাগরিত, একই কালে বোধ হইতেছে—আমরা নিদ্রিত। ইহা বাস্তবের বর্ণনামাত্র এবং ইহাকেই বলে 'মায়া'। আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা মায়াতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, মায়াতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, এই মায়াতেই আমরা কখনও দানব, কখনও বা দেবতা হইতেছি। ভাব ও ধারণাকে যতদূর পার বিস্তৃত কর, উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে 'অনন্ত' বা যে-কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। অন্যরূপ হইতেই পারে না; আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান—কেবল বিশেষ ধারণা হইতে সামান্যে আসা, উহার প্রতীয়মান স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করা। এই মায়া নাম-রূপের কার্য। যে-কোন বস্তুর আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোনপ্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত। জার্মান দার্শনিকগণ বলেন, সবই দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন; আর উহাই মায়া!

ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রাচীন ধারণায় একটু ফিরিয়া যাই। পূর্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়, একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন—একজন অনন্ত সর্বশক্তিমান্ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন। পূর্বোক্ত এই ঈশ্বর-ধারণা দ্বারা মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কোথায় তোমার ন্যায়পরায়ণ দয়াময় ঈশ্বর? দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিতেছেনঃ তিনি কি মনুষ্য বা পশু-রূপী তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না? কারণ এমন কে আছে, যে এক মুহূর্তও অপরকে না মারিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটি নিঃশ্বাসও গ্রহণ করিতে পার? লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস—যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র জীবের মৃত্যুস্বরূপ এবং তোমার প্রত্যেকটি গতি লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুস্বরূপ। কেন তাহারা মরিবে? এ সম্বন্ধে পুরাতন মিথ্যা-যুক্তি—'উহারা তো অতি নিম্নস্তরের জীব।' মনে কর, যেন তাহাই হইল—যদিও উহা অমীমাংসিত বিষয়, কারণ কে বলিতে পারে—কীট মনুষ্য অপেক্ষা বড়, না মনুষ্য কীট অপেক্ষা উচ্চতর? কে প্রমাণ করিতে পারে—এটি ঠিক, কি ওটি ঠিক? যাক সে কথা, তাহারা অতি নিম্নস্তরের জীব ধরিয়া লইলেও তাহারা মরিবে কেন? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই তো বাঁচিয়া থাকা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না? তাহাদের জীবন ইন্দ্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ সুখ-দুঃখ বোধ করে। কুকুর বা বাঘ যেরূপ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে, আমরা কি সেরূপ করি? করি না, কারণ আমাদের কর্মশক্তি শুধু ইন্দ্রিয়ে নহে, বুদ্ধিতে—আত্মায়। কিন্তু পশুদের প্রাণ ইন্দ্রিয়েই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য উন্মত্ত হয়; তাহারা এত আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে যে, মানুষ সেরূপ কল্পনাও করিতে পারে না; আর তাহার এই সুখ ও দুঃখ সমপরিমাণ।

যতখানি সুখ, ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যেতর প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য যে তাহাদের

দুঃখবোধও তেমনি তীব্র—মনুষ্যের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্র, তথাপি তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ কষ্ট ভোগ করিবে; তথাপি তাহাদের কষ্টের বিষয় না ভাবিয়া আমরা তাহাদিগকে হত্যা করি। ইহাই মায়া। আর যদি আমরা মনে করি—একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মত, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যে-সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতিতে বলা হয়, মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইতেছে, সেগুলি যথেষ্ট নয়। হউক না শত সহস্র উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া কেন উহা আসিবে? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। মন্দের মধ্য দিয়া কেন ভাল হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। কিন্তু এই প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সকল প্রকার ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বেদান্তই অধিকতর সাহসের সহিত সত্য-অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত মধ্যপথে কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার একটি সুবিধাও ছিল। বেদান্তধর্মের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষিগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভারতে সঙ্কীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রণালীতে। এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্মমত সম্বন্ধে ছিল। এখানে লোকে পোষাক যেরূপ পরুক না কেন, কিংবা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না; কিন্তু চার্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই নানা কথা উঠে। এখানে সত্য চিন্তা করিবার সময় মানুষকে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হয়। পূর্বপুরুষেরা যেরূপ পোষাক পরিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথক্‌রূপ পোষাক পরিলেই ব্যস্, তাহার সর্বনাশ! আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ী দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল। না হয়, মানিয়া লইলাম, ইহা সত্য নহে। কিন্তু আবার ধর্মবিষয়ে দেখিতে পাই—নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ, সকল রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের ভয়ানক ভয়ানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, শুনিতেছে শিখিতেছে—এমন কি মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন! তাঁহাদের এই উদারতা অবশ্য স্বীকার্য।

বুদ্ধ খুব বৃদ্ধবয়সেই দেহরক্ষা করেন। আমার একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুটি ভালবাসিতেন না; কারণ বুদ্ধদেব ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভুল ধারণা! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব ভারতের দেবদেবী—এমন কি জগতের ঈশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, আর তিনি অর্ধেক দেশকে তাঁহার ধর্মে আনিয়াছিলেন।

চার্বাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—ঊনবিংশ শতাব্দীতেও লোকে এরূপ স্পষ্ট জড়বাদ প্রচার করিতে সাহস করে না। এই চার্বাকগণ মন্দিরে মন্দিরে নগরে নগরে প্রচার করিতেনঃ ধর্ম মিথ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায়মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরদের রচনা—ঈশ্বর নাই, আত্মাও নাই। যদি আত্মা থাকে, তবে স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসার আকর্ষণে কেন ফিরিয়া আসে না? তাঁহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকে, তবে মৃত্যুর পরও তাহার ভালবাসা থাকে; ভাল খাইতে, ভাল পড়িতে চায়। এইরূপ ধারণা সত্ত্বেও কেহই চার্বাকদিগের উপরে কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও আমরা ধর্মজগতে মহাশক্তির অধিকারী। তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফলে তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, তাই আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ। তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্ম-বিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক, তরবারি বাহির হইত! তাহার ফল—ইওরোপে ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইওরোপে ধর্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি—উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই সব আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে—সব বিজ্ঞান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, জগতের আর সব জিনিষও ঐরূপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইওরোপে এই-সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সকল সমাজেই দুইটি বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায়। একদল জড়বাদী, বিরুদ্ধবাদী, আর একদল নিশ্চিতবাদী সংগঠনকারী। মনে কর—সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা অনেক সময় গোঁড়া হইয়া দাঁড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে; আর মেয়েরা প্রায়ই এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। যে-কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙা সহজ; একজন পাগল সহজেই যাহা ইচ্ছা ভাঙিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এরূপ মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে—কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে। কোন জিনিষ তো আর একদিনে হয় না। সমাজ-ব্যবস্থা একদিনে নির্মিত হয় নাই; পরিবর্তন করিতে হইলে—কারণ দূর করিতে হইবে। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, মূলে যাইতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। শুধু প্রতিবাদে—চীৎকারে কোন ফল হইবে না, তাহাতে বরং অনিষ্টই হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্যন্ত যাইতে হইবে। বড় বড় সাধু-মহাত্মাদের লইয়াই এই শ্রেণী গঠিত। একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই বলিয়া গিয়াছেন—আমরা নষ্ট করিতে আসি নাই, পূর্বে যাহা ছিল তাহা পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া মনে করে, তাঁহারা প্রচলিত মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অনুপযুক্ত কার্য করিয়াছেন; এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইঁহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই-সকল একদেশদর্শীরা মহাপুরুষদের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। মহাপুরুষগণ জগতের নরনারীকে তাঁহাদের সন্তান-স্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের অন্তরে প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি ও ক্ষমা ছিল—তাঁহারা সর্বদা সহ্য ও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, কি করিয়া মানবসমাজ গঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবন-ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা লোককে গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরে একটির পর একটি পা ফেলিয়া উন্নতির পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উপনিষদের রচয়িতা। তাঁহারা বেশ জানিতেন—ঈশ্বরীয় প্রাচীন ধারণাগুলি উন্নত নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না। তাঁহারা জানিতেন—বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যেও অনেক মহৎ সত্য আছে; কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন—যাহারা পূর্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চায়, যাহারা যে সূত্রে মালা গ্রথিত তাহা ছিন্ন করিতে চায়, যাহারা শূন্যের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চায়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা বস্তুর স্থান পরিবর্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত শান্তভাবে সত্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে; যে সত্য পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, তাহারই পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে, নূতন সত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে হইবে না। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বর-ধারণা বর্তমানকালের অনুপযোগী বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহাই তাঁহারা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাহারই ফল বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল ও বিশ্বনিয়ন্তা এক ঈশ্বরের ভাব অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—এইরূপে তাঁহারা যে উচ্চতম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নির্গুণ পরব্রহ্ম নামে অভিহিত। এই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণায় তাঁহারা জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

'যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞান-পূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি, আর কাহারও নহে।'
২১

মায়া ও মুক্তি

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতাঃ ২২ অক্টোবর, ১৮৯৬]

কবি বলেন, 'পিছনে হিরণ্ময় জলদজাল লইয়া আমরা জগতে প্রবেশ করি।' কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে আমরা সকলেই এরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না; অনেকেই কুজ্ঝটিকার কালিমা লইয়া জগতে প্রবেশ করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে; সম্মুখে আমরা অগ্রসর হই, পিছনে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপেই আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী হইলাম, না পরাজিত হইলাম, তাহাও আমরা জানি না; ইহাই মায়া। বালকের হৃদয়ে আশাই বলবতী। তাহার উন্মেষশীল নয়নের সম্মুখে সবকিছুই যেন একটি সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়; সে ভাবে—সকলের উপর আমার ইচ্ছাই চলিবে। কিন্তু যেই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মত দাঁড়ায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎ গতি রোধ করে। বার বার এই প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে তদুপরি সে বেগে পতিত হইতে পারে। সারা জীবন যতই সে অগ্রসর হয়, ততই তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়—শেষে মৃত্যু আসে, তখন হয়তো নিস্তার; ইহাই মায়া।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা। এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি ত্যাগ করিতে না পারেন, কোন সংগ্রামই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া একটির পর একটি প্রকৃতির গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন—প্রকৃতির গভীরতম অন্তস্তল হইতে আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যসকল উদ্ঘাটন করিতেছেন—কিন্তু কেন? এ-সব করিবার উদ্দেশ্য কি? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? মানুষ যাহা করিতে পারে, প্রকৃতি কি তাহা অনন্তগুণে অধিক করিতে পারে না? তাহা হইলেও প্রকৃতি জড়—অচেতন। অচেতন জড়ের অনুকরণে গৌরব কি? বজ্র যত বিরাট হউক, প্রকৃতি উহাকে বহু দূরদেশে নিক্ষেপ করিতে পারে। যদি কোন মানুষ তাহার তুলনায় সামান্য এতটুকু করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অনুকরণ, মৃত্যুর অনুকরণ, জড়ের অনুকরণ, অচেতনের অনুকরণের জন্য কেন তাহার প্রশংসা করিব?

মহাকর্ষশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অনুকরণে কি গৌরব? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি; ইহাই মায়া।

ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়; যেখানে কোনক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই উপদেশ শুনিতেছি—এ-সব বৃথা; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া শেখাও অসম্ভব। উপদেশ কাজে লাগাইতে হইবে—হয়তো তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই কি আমরা শিখিব? না, তখনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃপুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃপুনঃ বিষয়সমূহের দিকে বেগে পতিত হইতেছি—যদি কিছু সুখ পাই। বার বার নূতন উৎসাহে ফিরিয়া যাইতেছি। এইরূপে আমরা চলিয়াছি, যতক্ষণ না দেহমন ভাঙিয়া যায়, শেষে প্রতারিত হইয়া মরিয়া যাই—ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও একই কথা। আমরা জগতের রহস্য-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি, আমরা এই জিজ্ঞাসা—এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না; কিন্তু আমাদের ইহা জানিয়া রাখা উচিত—জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে; কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই দেখা যায়, অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর দণ্ডায়মান, উহা আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়—উহাও অতিক্রম করা যায় না; সবই অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। আমরা এগুলিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি, চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয়—ইহাই মায়া।

প্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা মনে করি—আমরা স্বাধীন, আবার সেই মুহূর্তেই আমরা দেখিতে পাই—আমরা স্বাধীন নই; ক্রীতদাস—প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা; শরীর, মন, সর্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস—ইহাই মায়া।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অসাধারণ শিশু—প্রতিভাবান পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন, সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সারা মনপ্রাণ পড়িয়া থাকে। ছেলেটি বড় হইল—হয়তো মাতাল পশুতুল্য হইয়া উঠিল, জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যতই এই অসদ্ব্যবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও ততই বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিয়া খুব প্রশংসা করে; তাহারা স্বপ্নেও মনে করে না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটি ক্রীতদাসী মাত্র—তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়—তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি উহার উপর পুষ্পরাশি ছড়াইয়া, উহাকে আশ্চর্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন—ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'প্রভু, তোমার মায়া কেমন, তাহা দেখাও।' কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে লইয়া গেলেন। অনেক দূর গিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, 'নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পার?' নারদ বলিলেন, 'প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া নারদ

চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিছুদূরে একটি গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের সন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহার সম্মুখে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই নারদ সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভু যে জলের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত, হয়তো তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, নারদ এ-সব ভুলিয়া গেলেন। তিনি সব ভুলিয়া সেই কন্যাটির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, ক্রমে পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার হইল। তখন নারদ সেই কন্যার পিতার নিকট কন্যাটির পাণি প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল, তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইল। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্র-কলত্র ভূমি-পশু সম্পত্তি-গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল—তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। এই সময়ে সেই দেশে বন্যা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী দুই কূল প্লাবিত করিল, আর সমগ্র গ্রামটিই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—মানুষ পশু সব ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল, স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া গেল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হাতে দুইটি ছেলেকে ধরিলেন, কাঁধে আর একটি ছেলেকে লইয়া সেই ভয়ঙ্কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ কাঁধের শিশুটিকে কোন রকমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায় দুঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেটিকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একটি—যাহার তিনি হাত ধরিয়া ছিলেন—সে হাত ফস্‌কাইয়া ডুবিয়া গেল। তাঁহার পত্নীকে তিনি তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের স্রোত অবশেষে তাহাকেও তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল, তিনি স্বয়ং কূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, 'বৎস, কই জল কই? তুমি যে জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।' আধ ঘণ্টা! নারদের মনে দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এইসমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর ঘটিয়া গিয়াছে—ইহাই মায়া।

কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার, বুঝা বড় কঠিন—বিষয়টিও বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার তাৎপর্য এই—ব্যাপার বড় ভয়ানক; সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সব কিছুই বৃথা, সবই মিথ্যা।

সর্বসংহারক কাল আসিয়া সবই গ্রাস করে, কিছু আর অবশিষ্ট রাখে না—পাপকে গ্রাস করে, পাপীকে গ্রাস করে; রাজা প্রজা, সুন্দর কুৎসিত—সকলকেই কাল গ্রাস করে, কাহাকেও ছাড়ে না। সকলেরই এক চরমগতি—সকলেই বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান শিল্প বিজ্ঞান—সবই সেই এক অনিবার্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশমুখী গতিকে এক মুহূর্তের জন্যও রোধ করিতে পারে না। আমরা মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মদ্যপান নৃত্য ও অন্যান্য বৃথা আমোদ-প্রমোদে লোকে সবকিছু ভুলিবার চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত চলচ্ছক্তিরহিত হয়। আমরাও এইরূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি—সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু নিবারিত হয় না।

লোকের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি পথ সকলেই জানেন, তাহা এইঃ জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে—সব সত্য, কিন্তু ও-সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' দুঃখ আছে বটে কিন্তু ওদিকে নজর দিও না! যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও; এই সংসারের অন্ধকার দিকটা লক্ষ্য করিও না—কেবল উজ্জ্বল দিকটাই লক্ষ্য করিও। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহা আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত রাখে। আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। 'সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যতদূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার থাক; দুঃখ-কষ্ট আসিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; আঘাত পাইলে বল—ইহা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি; দাসবৎ পরিচালিত হইলেও বল—আমি মুক্ত, স্বাধীন; অপরের নিকট এবং নিজের নিকট দিনরাত মিথ্যা বল, কারণ সংসারে থাকিবার, জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়'—যাঁহারা এ-কথা বলেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া অবশেষে সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাকেই অবশ্য পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত প্রচলিত, কোনকালে এতটা ছিল না; তাহার কারণ এই—লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোনকালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কখনও এত তীব্র ছিল না; মানুষ এখন তাহার ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত নিষ্ঠুর কখনও ছিল না, আর এইজন্যই এখন এই সান্ত্বনা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় না, কোনকালেই হয় নাই। গলিত শবকে কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—ইহা সম্ভব নহে; একদিন ঐ ফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব পূর্বাপেক্ষা বীভৎসরূপে দেখা দিবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পুরাতন পচা ঘা সোনার আচ্ছাদনে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একদিন আসিবে—যখন সেই সোনার পাত খসিয়া পড়িবে আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে প্রকাশিত হইবে।

তবে কি কোনই আশা নাই? এ-কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা মায়াতেই জন্মিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত। তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটি কারাগার, আমাদের তথাকথিত পূর্বপ্রাপ্ত মহিমাও যে একটি কারাগৃহ মাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাগার-স্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জানে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, এমন কেহই নাই, যে কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে

অনুভব না করিয়াছে। বৃদ্ধেরা এটি আরও তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাঁহাদিগকে বড় বেশি ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন-অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র থাকিলেও এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই—যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক—এখানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যেন ধ্বনিত হইতেছেঃ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
২২
—আমার এই দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়। যাহারা আমার শরণাপন্ন, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে। 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জীবগণ, আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব'
২৩
—এই বাণীই আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। মানুষ ইহা শুনিয়াছে এবং অনন্ত যুগ ধরিয়া শুনিতেছে। যখন মানুষের সবই নষ্টপ্রায় বলিয়া মনে হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যায়, যখন সবই যেন তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায় এবং জীবন একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়, তখন সে এই বাণী শুনিতে পায়। আর ইহাই ধর্ম।

অতএব, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে, এ-সব কিছুই নয়, এ-সবই মায়া—ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু সেই সঙ্গে এই আশার বাণী যে, 'মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে।' অপর দিকে, সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, 'ধর্ম, দর্শন—এ-সব বাজে জিনিষ লইয়া মাথা ঘামাইও না। সংসারে বাস কর; এই সংসার নিতান্ত অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পার, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও।' সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, দিবারাত্র ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও প্রতারণার জীবন যাপন কর—তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পার ঢাকিয়া রাখ। তালির উপর তালি দাও, শেষে প্রকৃত জিনিষটিই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটি জোড়াতালির সমষ্টিতে পরিণত হও। ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখনও ধর্মলাভ করিতে পারিবে না! যখন জীবনের বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ 'তালি' দেওয়ার উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্মের আরম্ভ। বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা যে প্রাণ হইতে বলিতে পারে, সে-ই কেবল ধার্মিক হইবার যোগ্য। সংসারী হইবার ইচ্ছা তাঁহারও হৃদয়ে একবার উদিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই অবস্থাঃ তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন, এই সাংসারিক জীবনটা একেবারে ভুল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রলোভন একবার তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল; সে যেন বলিল—সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া পূর্বেকার মত প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিষকে তাহার ভুল নামে ডাক, নিজের নিকট ও সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাক। কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহাকে জয় করিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন, 'কেবল খাইয়া পরিয়া মূর্খের মত জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ; পরাজয়ের জীবনযাপন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেয়ঃ।' ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বরলাভ করিবার পথে চলিয়াছে—বুঝিতে হইবে। ধার্মিক হইবার জন্যও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সত্য জানিব অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব; কারণ সংসারের দিকে তো আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শূন্য—ইহা প্রতিদিন লয় পাইতেছে। আজিকার সুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ আগামীকাল বৃদ্ধ। আজিকার আশা আনন্দ সুখ—এ-সকল মুকুলের মত আগামীকাল শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। ইহা যেমন একদিকের কথা, অপরদিকে তেমনি জয়ের আশাও রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অশুভ জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন ও জগতের উপর পর্যন্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে; এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জয়লাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই ঠিক পথে রহিয়াছে এবং বেদসকল ইহাই প্রচার করেন—'নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ—জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও।'
২৪

বিভিন্ন ধর্মসমূহ যে আকারেই মানুষের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূলভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই সকল বিভিন্ন ধর্মের উদ্দেশ্য—সংসার ও ধর্মের মধ্যে একটা আপস করিয়া লওয়া নহে, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা, সংসারের সঙ্গে আপস করিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলা নহে। প্রত্যেক ধর্মই এ-কথা প্রচার করিতেছে, আর বেদান্তের কর্তব্য—বিভিন্ন ধর্মভাবের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন; যেমন এইমাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমরা যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্বোচ্চ দর্শন, সবগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয় এবং এই সকল ধর্মের অধিকাংশই প্রপঞ্চাতীত পুরুষবিশেষের—প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নহেন এরূপ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষের—সাহায্যে এই মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বিরোধ ও মতভেদ সত্ত্বেও—সেই ব্রহ্ম সগুণ বা নির্গুণ, মানুষের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কিনা, তিনি পুরুষ, স্ত্রী বা উভয় ভাব-বর্জিত, এইরূপ অনন্ত বিচারসত্ত্বেও—বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্ত্বেও উহাদের সকলের মধ্যেই একত্বের যে সুবর্ণসূত্র উহাদিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই; সুতরাং ঐসকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না; আর এই বেদান্তদর্শনে এই সুবর্ণসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহাতে প্রথমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। সকল ধর্মেরই এই সাধারণ ভাব।

আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-কষ্টের অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই

মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইলঃ এই জগৎটা বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায় বা ইহার লয়? আর ইহার উত্তরঃ 'মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়।' এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত—এই মহান্ ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত আমাদের সকল কার্য, এমন কি জীবন পর্যন্ত বৃথা। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদিত হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আহত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি হইতেছে, আমরা মুক্ত। আমাদের ভিতর যেন কিছু আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে-সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন সর্বদা বলিতেছে—আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্মমত আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে—তাহাদের সবগুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম নয়—ধর্ম শব্দটিকে আপনারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না—সমগ্র সামাজিক জীবনটি কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। যেন সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর দিবারাত্র বলিতেছে, 'পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার কাছে এস।'
২৫
একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গিতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সেই বাণী কোন না কোনরূপে চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর জন্য; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্য। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন সেই মোহন বংশীবাদক
২৬
বংশীধ্বনি দ্বারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, আমরাও তেমনি না জানিয়াই এক মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি।

যতক্ষণ সেই বাণী অনুসরণ করি, ততক্ষণই আমরা নীতিপরায়ণ। কেবল জীবাত্মা নয়, সেই নিম্নতম জড়পরমাণু হইতে উচ্চতম মানব পর্যন্ত সকলেই সে স্বর শুনিয়াছে, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছে। আর এই চেষ্টায় পরস্পর মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে আর এইভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দ চেষ্টা সুখ জীবন মৃত্যু—সবকিছুর উৎপত্তি; আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার উন্মত্ত চেষ্টার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই প্রকৃতির অভিব্যক্তি।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সম্মুখের দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার, বুঝিতে পার—উহা কি, তখন সম্মুখের সকল দৃশ্যই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই জগৎ, যাহা পূর্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা একটি সুন্দর ও মনোরম স্থানে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার প্রয়োজন তখন আর আমাদের থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এসবই বৃথা—ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন ঐ বাণীর মর্ম বুঝিতে পারি, তখনই বুঝি—এইসকল চেষ্টা, এই যুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা, এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-সম্ভোগের প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতই ঘটিয়া থাকে—আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটিয়া থাকে।

অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র; সূর্যও সেইদিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও ঐজন্য সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং বায়ুও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্য চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাধু সেইদিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও চলিয়াছে; দানশীল ব্যক্তি সেই বাণী লক্ষ্য করিয়া সোজা সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তিও সেই লক্ষ্যে চলিয়াছে। মহান্ হিতকারী ব্যক্তিও অন্তরের অন্তরে সেই বাণী শুনিয়াছেন; তিনি সেই হিতকর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও সেইরূপ। একজনের অপেক্ষা অপর ব্যক্তির পদস্খলন বেশী হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্খলন হয়, তাহাকে আমরা 'মন্দ' বলি; আর যাহার পদস্খলন অল্প হয়, তাহাকে আমরা ভাল বলি। ভাল-মন্দ এই দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিষ; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এখন দেখ, যদি এই মুক্তরূপ শক্তির বিকাশ বাস্তবিক সমগ্র জগতে কার্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ ধর্মে উহা প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সব ধর্মই ঐ এক ভাব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অতি নিম্নস্তরের ধর্মগুলির কথা ধর, সেইসকল ধর্মে হয়তো কোন মৃত পূর্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন; কিন্তু তাহাদের উপাসিত এই দেবতা বা মৃত পুরুষদের মোটামুটি ধারণাটা কি? সেই ধারণা এই যে—তাঁহারা প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত, এই মায়া দ্বারা তাঁহারা বদ্ধ নন। অবশ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা খুব সামান্য। উপাসক একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার ধারণা খুব স্থূল, সে গৃহ-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অথবা শূন্যে উড়িতে পারে না। সুতরাং এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত শক্তি সম্বন্ধে তাহার উচ্চতর ধারণা নাই; সুতরাং সে এমন সব দেবতার উপাসনা করে, যাঁহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিকভাবে লক্ষ্য করিলে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে? রহস্য এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিচিত প্রকৃতির ধারণা অপেক্ষা উন্নত। আবার যাহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাহাদেরও সেই একই মুক্তির সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ধারণা। প্রকৃতি

সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেমন উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইনিই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদের ভাব উদিত হয়, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত উহা অপেক্ষাও গভীরতম তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও সকলে যে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই; এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে (Psalms) আছে—'হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার আরও নিকটে', বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন—'হে আমার ঈশ্বর, আমি আমার আরও নিকটে।' 'আমাদের চরম আদর্শ আমাদের অনেক দূরে প্রকৃতির পারে; উহা আমাদিগকে ক্রমশঃ আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে', এই দূরত্বব্যঞ্জক ধারণাটিকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে ও সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবমন্দিররূপে পরিণত হন, তিনিই যেন শেষে জীবাত্মা ও মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। এইখানেই বেদান্তের শেষ কথা।

যাঁহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলেন—তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য; তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে চল নাই। মুক্তির যে মহান্ আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমার কাছে আরও কাছে অনুভব কর, যতদিন না তুমি জানিতে পার যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই বদ্ধ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ নয়। ভয়গ্রস্ত বালকের মত তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছে, এই প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। ইহা শুধু বুদ্ধি দ্বারা জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষভাবে অনুভব করা—আমরা এই জগৎকে যত স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সকল কুটিলতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বের ভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি—এই মায়া এখনকার মত ভয়ানক অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র-রূপে প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে-সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, সেগুলিও ব্রহ্মভাবে রূপায়িত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত রূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে সারসত্তারূপে তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মা।

ব্রহ্ম ও জগৎ

অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে?—অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন। এই প্রশ্ন মানুষ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু এই প্রশ্ন চিরকাল থাকিবে—যিনি অনন্ত অসীম, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে? আমি এখন এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য এই চিত্রটির সাহায্য গ্রহণ করিব।

চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সূক্ষ্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—স্বর্গ-নরক, এককথায় যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে সে-সবই বুঝিতে হইবে।

(ক) ব্রহ্ম
(গ) কাল নিমিত্ত দেশ
(খ) জগৎ

একপ্রকার পরিণামের নাম ‘
একপ্রকার পরিণামের নাম ‘
ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সব লইয়
ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন
নিমিত্তের (গ-এর) মধ্য দিয়া
ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল
দেশকালনিমিত্ত-রূপ কাঁচের
ব্রহ্মকে আমরা দেখিতেছি, অ
নীচের দিক হইতে দেখিলে

‘অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥’

আমার বরাবর ধারণা এই যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এক জায়গায় ভুল করিয়াছেন; তিনি এই ‘ইচ্ছা’কেই সর্বস্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই ‘ইচ্ছা’কেই বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে কখনও ‘ইচ্ছা’ (Will) বলিয়া বর্ণনা করা

দিয়াই প্রকৃতিকে জয় করা হইতেছে। এই তত্ত্বটি ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে এখানেও 'অশুভ-জয়' নিজের ভিতরে পরিবর্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। অদ্বৈত বেদান্তের সমগ্র শক্তি মানুষের নিজের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে। 'অশুভ, দুঃখ'—এসকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণ পুনঃপুনঃ ঘটিলেও ঐসকল ঘটনায় স্থির থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার কখনও ক্রোধের উদ্রেক হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক,

তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। মানুষের শুধু বিশ্বাস থাকিলে চলিবে না, এমন বিশ্বাস থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে বলা হয়—যাহা দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস কর, তবে শীঘ্রই তাহাকে উন্মাদাগারে যাইতে হইবে।

যাহা হউক, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও 'আমার পিতৃপিতামহের ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই মিথ্যা'—বহু স্থানে এইরূপ ধারণা বর্তমান থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ভিতর এখনও কতকটা দুর্বলতা রহিয়াছে; এই দুর্বলতা দূর করিতে হইবে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এই দুর্বলতা শুধু এই দেশেই (ইংলণ্ডে) আছে—ইহা সকল দেশেই আছে; আর আমাদের দেশে যেমন, তেমন আর কোথাও নাই—সেখানে ইহা অতি ভয়ানক আকারে বিদ্যমান। সেখানে অদ্বৈতবাদ কখনও সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই, সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেইজন্যই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক'। অবশেষে ভগবৎকৃপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমগ্র জাতি বৌদ্ধধর্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমগ্র জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন জ্ঞানিগণ দেখিলেন—অদ্বৈতবাদই ভারতকে এই জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। দুইবার এই অদ্বৈতবাদ ভারতকে জড়বাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রথম, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে জড়বাদ অতি প্রবল হইয়াছিল—ইওরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যে ধরনের জড়বাদ আছে, উহা সেরূপ নহে, উহা অপেক্ষা অনেক জঘন্য। আমি একপ্রকারের 'জড়বাদী',

নাম ছিল—'লোকায়ত-দর্শন'। এই অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার

করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বৎসর পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডাল বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাপ্রকার মানুষ ও জাতি বৌদ্ধ হইল। অনেকের কৃষ্টি অতি হীন হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহারা বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানা মন্ত্রতন্ত্রে, ভূত ও দেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্মপ্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানাপ্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার জড়বাদের মেঘে ভারত-গগন আচ্ছন্ন হইল—উচ্চশ্রেণীর লোকে যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য আসিয়া বেদান্তকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি বিচারের সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে।

এই দর্শন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চ কবিত্বে পূর্ণ; এই সকল উপনিষদ্‌প্রণেতা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। ঋষিগণ যেন কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতার দ্বারা মনোনীত হইয়াছিলেন। উঁহারা সাধু ও মহাপুরুষ ছিলেন, সর্বত্যাগী ছিলেন; কখনও প্রচার করিতেন না, দার্শনিক বিচার করিতেন না, অথবা লিখিতেন না; তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীত-উৎস প্রবাহিত হইত। বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ী গিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন—সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। তাহা হইলেও নিশ্চয় জানিবেন, আধুনিক বিজ্ঞানকে এই পথেই আসিতে হইবে—এখনই প্রায় এই পথে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্তন করিতেছেন?

যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তদ্রূপ সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন। বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের গতি কখনই বন্ধনের দিকে হইতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ নীতিই মুক্তির এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ।

অদ্বৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই, প্রথম হইতেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অন্য ধর্ম বা অন্য মতকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা অদ্বৈতবাদের আর একটি মহত্ত্ব; এই ভাব প্রচার করা মহা সাহসের কার্য যে,

জ্ঞানীরা অজ্ঞ ও কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, বিদ্বান ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার কর্মে যুক্ত করিবেন।

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলে—কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অদ্বৈতবাদ যে-ঈশ্বর প্রচার করে, সেই ঈশ্বর জগতের সমষ্টিস্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই সকল মতকে গ্রহণ করিবে। যদি এমন কোন সর্বজনীন ধর্ম থাকে, যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহা হইলে তাহাকে কেবল কতকগুলি লোকের গ্রহণোপযোগী ঈশ্বরের ভাব প্রচার করিলে চলিবে না, উহা সর্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যক।

অন্য কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নহে। তাহা হইলেও তাঁহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এইজন্য যে, উহা সর্বদাই সমষ্টি হইবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্যই অদ্বৈতবাদের সহিত ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন; তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। কারণ দ্বৈতবাদ কম-শিক্ষিত লোকের মন স্বভাবতই আকর্ষণ করে। দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, দ্বৈতবাদ জগতের খুব স্বাভাবিক সুবিধাজনক ব্যাখ্যা, কিন্তু এই দ্বৈতবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদীর কোন বিরোধ নাই। দ্বৈতবাদী বলেনঃ ঈশ্বর জগতের বাহিরে, স্বর্গে—স্থানবিশেষে আছেন। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ ঈশ্বর জগতের আত্মার অন্তরাত্মা; ঈশ্বরকে দূরবর্তী বলাই যে নাস্তিকতা। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বল কি করিয়া? ঈশ্বর হইতে মানুষ পৃথক—ইহা মনে করাও যে ভয়ানক। তিনি অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর সন্নিহিত। ‘তুমিই তিনি’—এই একত্বসূচক বাক্য ব্যতীত কোন ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা এই নিকটত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান, মনে করেন—উহা ঈশ্বর-নিন্দা, অদ্বৈতবাদীও তেমনি দ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও বলেন, ‘মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে?’ তাহা হইলেও তিনি জানেন, ধর্মজগতে দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়; তিনি জানেন, দ্বৈতবাদী তাঁহার দৃষ্টিকোণ হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কোন বিবাদ নাই; যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই বহু দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে অবশ্যই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে—এরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইতে পারে না। দ্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে আমাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলে এই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইখানেই দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদী স্বভাবতই এমন এক সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র এবং মানুষের যেমন কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় ব্যক্তি থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তেমনি আছে। তিনি বিনা কারণেই কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বিরক্ত। আপনারা দেখিবেন—সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, ‘আমরাই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন, যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিবেন।’ আবার কতকগুলি দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক। তাঁহারা বলেন, ‘ঈশ্বর যাহাদের প্রতি সদয়, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাহারা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি ঐ অন্তরঙ্গ-দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’ আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। এইজন্যই এইসকল ধর্ম চিরকাল

বুদ্ধদেব দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে মন দিতেন না। সাধারণ লোক তাঁহাকে নাস্তিক ও জড়বাদী আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটি সামান্য ছাগশিশুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোনপ্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক লক্ষ্য করিবে। জগতের এই সকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিকে তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এখন মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে, যাহা শতবর্ষ পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; এখন এমন জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এ সময় কি আর লোককে ঐ ধরনের সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়? লোকে পশুর মত চিন্তাশক্তিহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা অসম্ভব। এখন প্রয়োজন—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর বলেন, এই তিনটি এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখনও থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা,

জগৎ (১)(বহির্জগৎ)

[নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ১৯ জানুআরি, ১৮৯৬]

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দিকে সুবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতের সূর্য অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছে। সমগ্র জগৎই সুন্দর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতেছে। গম্ভীর-ভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক শৈলমালা, খরস্রোতা সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনী, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকামণ্ডিত গগন—এ-সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক, অথচ মনোহর; প্রকৃতি-নামক সমুদয় সত্তা স্মরণাতীত কাল হইতে মানবমনের উপর কাজ করিতেছে, মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্রমাগত মানবহৃদয়ে প্রশ্ন উঠিতেছেঃ এগুলি কি? এগুলির উৎপত্তিই বা কোথায়? মানবের অতি প্রাচীন রচনা বেদের প্রাচীনতম ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে দেখিতে পাইঃ কোথা হইতে ইহা আসিল? যখন 'অস্তি, নাস্তি' কিছুই ছিল না, 'অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত'৩২ ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃষ্টি করিল? কেমন করিয়াই বা করিল? কে এই রহস্য জানে? বর্তমান সময় পর্যন্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে; লক্ষ লক্ষ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আরও লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেকটি উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেকটি উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্য ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিতেছে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা বর্তমান কালের জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আপনাদের সমক্ষে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্বেই মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথম বিষয় এইঃ এমন এক সময় ছিল, যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, জগৎ ছিল না, এই গ্রহ-জ্যোতিষ্কগণ, সাগর, মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর, গ্রাম, মনুষ্য, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ্, বিহঙ্গসহ আমাদের জননী বসুন্ধরা, এই অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি ছিল না—এ বিষয় পূর্ব হইতেই জানা ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ? কি করিয়া মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ নিজের চতুর্দিকে কি দেখে? একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ লও। মানুষ দেখে, উদ্ভিদ্‌টি ধীরে ধীরে মাটি ঠেলিয়া উঠিতেছে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়তো একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। বীজ হইতে উহা আসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজেই উহার পুনঃপরিণতি। একটি পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিম হইতে জন্মায়, সুন্দর পাখীর রূপ ধরে, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল কতকগুলি ডিম—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্যগ্‌জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন কতকগুলি বীজ—কতকগুলি মূল উপাদান—কতকগুলি সূক্ষ্ম আকার হইতে আরম্ভ, এগুলি স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, কিছুকালের জন্য ঐরূপে চলে, পুনরায় সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া উহাদের লয় হয়। বৃষ্টির ফোঁটাটি, যাহার মধ্যে সুন্দর সূর্যকিরণ খেলা করিতেছে, বাতাসে অনেক দূরে চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌঁছায়, সেখানে বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে মিলিত হয়। আমাদের চারিদিকের প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি বর্তমানকালে হিমবাহ ও নদীগুলি বড় বড় পর্বতের উপর কাজ করিতেছে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে পর্বতগুলি চূর্ণ করিতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের মত শক্ত হইতেছে, স্তূপীকৃত হইয়া ভবিষ্যতে পর্বত হইবে। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপই চলিবে। বালুকা হইতে এই শৈলমালার উদ্ভব, আবার বালুকায় পরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেও এই এক কথা; আমাদের এই পৃথিবীও নীহারিকাময় পদার্থ হইতে আসিয়াছে—ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়া বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট আমাদের বাসভূমি হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, শেষে সেই মূল নীহারিকাময় সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইবে। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই এইরূপ হইতেছে। ইহাই মানুষের ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্রই একরূপ; যদি ইহা সত্য হয় এবং এ পর্যন্ত কোন মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে নাই যে, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা যে-প্রণালী ও যে-নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য তারা, এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডও সেই একই প্রণালীতে—একই নিয়মে সৃষ্ট; ইহা যদি সত্য হয় যে, একটি পরমাণু যে-কৌশলে নির্মিত, সমুদয় জগৎও সেই কৌশলে নির্মিত; যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত—তবে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি, 'একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগতের সমস্ত মৃত্তিকাকে জানিতে পারি।'
৩৩
একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ লইয়া উহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি। একটি বালুকণার গতি পর্যবেক্ষণ করিলে সমুদয় জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনার ফল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ ইহাই পাইতেছি যে, আদি ও অন্ত প্রায় সদৃশ। পর্বতের উৎপত্তি বালুকা হইতে, আবার বালুকায় উহার পরিণতি; নদী বাষ্প হইতে আসে, আবার বাষ্পে পরিণত হয়; উদ্ভিদ্‌-জীবন আসে বীজ হইতে, আবার বীজেই পরিণত হয়; মনুষ্য-জীবন আসে জীবাণু হইতে, আবার জীবাণুতেই ফিরিয়া যায়। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ-উপগ্রহ নীহারিকাময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, আবার সেই নীহারিকায় লয় পায়। ইহা হইতে আমরা কি শিখি? শিখি এই যে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য; আর সূক্ষ্মভাব উহার কারণ। সর্ব দর্শনের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্বে প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশঃ কারণলয়ঃ।'

যদি এই টেবিলটির নাশ হয় তো উহা কেবল উহার কারণরূপে ফিরিয়া যায় মাত্র—সেই সূক্ষ্মরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া যাইবে,

যাহাদের সম্মিলনে এই টেবিল নামক পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছিল। মানুষ যখন মরে, তখন যে-সকল পদার্থে তাহার দেহ নির্মিত, সেগুলিতেই সে ফিরিয়া যায়। ধ্বংস হইলে এই পৃথিবী যে পদার্থ-সমষ্টি ইহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতেই ফিরিয়া যাইবে। ইহাকেই বলে নাশ—কারণে লয়। সুতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য কারণের সহিত অভিন্ন—কারণ হইতে পৃথক্ নহে, কারণটিই রূপ-বিশেষ ধারণ করিয়া 'কার্য' নামে পরিচিত হয়। যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি, তাহাই কারণ, আর টেবিলটি কার্য, ঐ কারণগুলিই এখানে টেবিলরূপে বর্তমান। এই গেলাস একটি কার্য—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্যে এখনও বর্তমান দেখিতেছি। কাঁচ নামক কতকটা জিনিষ আর সেই সঙ্গে গঠনকারীর হাতের শক্তি—উপাদান ও নিমিত্ত এই দুইটি কারণ মিলিয়া গেলাস-নামক এই আকারটি হইয়াছে। ঐ দুই কারণই ইহাতে বিদ্যমান। যে শক্তিটি কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল, তাহা সংহতিশক্তিরূপে ইহাতে রহিয়াছে, তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির সব খসিয়া পড়িবে এবং উহার উপাদান কাঁচও ইহাতে রহিয়াছে। গেলাসটি কেবল ঐ সূক্ষ্ম কারণগুলির আর একরূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটি ভাঙিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটি সংহতিরূপে উহাতে ছিল, তাহা ফিরিয়া গিয়া নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্বরূপ ধরিবে এবং সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নূতন আকার লাভ করে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম—কার্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন নয়; উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তাহার পর আমরা শিখিলাম, এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপ বা আকৃতি—যেগুলিকে আমরা উদ্ভিদ্, তির্যগ্‌জাতি বা মানব বলি, সেগুলি অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা এক বৃক্ষ হয়—আবার অন্য বীজ হয়, আবার এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা বাহিয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার সমুদ্রে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছে, পড়িতেছে—চক্র ঘুরিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ—সমুদয় অস্তিত্ব, যাহা কিছু দেখিতে শুনিতে ভাবিতে বা কল্পনা করিতে পারি, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে তাহাই এই ভাবে চলিতেছে ঠিক মনুষ্যদেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত। সমুদয় সৃষ্টিই এইরূপে চলিয়াছে, একটি তরঙ্গ উঠিতেছে, একটি পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া গহ্বর, প্রত্যেক গহ্বরের সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া তরঙ্গ। সর্বত্র একরূপ বলিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতি থাকার দরুন একই নিয়ম খাটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন এককালে কারণে লীন হইতে বাধ্য; সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা পৃথিবী মন শরীর—যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সকল বস্তুই যেন নিজ সূক্ষ্ম কারণে লীন বা অন্তর্হিত হইবে—আপাতদৃষ্টিতে বিনষ্ট হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহারা সূক্ষ্মরূপে উহাদের কারণেই থাকিবে; এইসব সূক্ষ্মরূপ হইতে আবার তাহারা পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারা রূপে বাহির হইবে।

এই উত্থান-পতন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানিবার আছে। বৃক্ষ হইতে বীজ আসে। বীজ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি সূক্ষ্ম অব্যক্ত কার্যের জন্য সময় প্রয়োজন। বীজকে খানিকক্ষণ মাটির নীচে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। বীজ নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, নিজেকে যেন খানিকটা অধঃপতিত করে, এবং ঐ অবনতি হইতে উহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য ও অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কার্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বলে, তাহার পর আবার সৃষ্টি হয়। জগতের প্রকাশের এক-একটি বিভিন্ন কালকে—অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে ইহার পরিণতি, কিছুকাল সেই অবস্থায় স্থিতি এবং পুনরাবির্ভাবকে সংস্কৃতে 'কল্প' বলে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে কল্পে কল্পে চলিয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্বর্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্যন্ত সব জিনিষই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে।

এখন আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি—সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য অভিন্ন—কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কিছুই আসিতে পারে না; শুধু তাহা নহে, কারণই কার্যের ভিতর আর একরূপে বর্তমান। তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? পূর্ববর্তী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে। মানুষ কোন্ বস্তু হইতে উদ্ভূত? পূর্ববর্তী সূক্ষ্মরূপ হইতে। বৃক্ষ কোথা হইতে আসিল? বীজ হইতে। সমুদয় বৃক্ষটি বীজে বর্তমান ছিল—উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই জগতেরই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। উহা পুনরায় ঐ সূক্ষ্মরূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এখন আমরা দেখিলাম, সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূল হইতে স্থূলতর হয়, যতদিন না উহারা উহাদের চরম সীমায় পৌঁছে; চরমে পৌঁছিলে তাহারা আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়। এই সূক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণতি কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান-পরিবর্তন—ইহাকেই বর্তমানকালে 'ক্রমবিকাশ'-বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 'ক্রমবিকাশ'বাদীদের সহিত বিবাদ করিবেন না। কিন্তু আমাদিগকে আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, আর বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল ঐ বীজমাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই একটি জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই 'সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড' ছিল। সবই কারণে—উহার সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমবিকাশ'বাদ সত্য। তবে ঐ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের (Darwin's Evolution) সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশক না হইয়া সহায়ক হইবেন।

আমরা দেখিলাম শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিষই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল তরঙ্গের ন্যায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ, সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখি দুইটি বিষয় একত্র মিলিত হইয়াই ঐ উদ্ভিদ্‌কে এক অখণ্ড বস্তুরূপে প্রতীত করাইতেছে—উহার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই দুইটি মিলিয়াই উদ্ভিদ্-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে ঐ উদ্ভিদ্-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের একটি পর্ব বলিয়া ধরিয়া আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি—জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটি পর্ব; আর যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন—নানারূপ বানর, তারপর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌গণ যেন ঐ প্রাণ শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্ব। এখন যে ক্ষুদ্রতম কোষ হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেখান হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর, আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই যে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান, ইতঃপূর্বে লব্ধ ঐ নিয়ম এস্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি নিম্নতম জন্তু হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীই অবশ্য অপর কিছুর ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। কিসের ক্রমসঙ্কোচ? ইহাই প্রশ্ন। কোন্ পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী বলিবেনঃ ইহা যে ঈশ্বরের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা—তোমাদের এই ধারণা ভুল। কারণ তোমরা বল, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আসে। মানুষে ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই ক্রমবিকাশবাদীদের আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা এই মাত্র যে নিয়ম আবিষ্কার করিলাম, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক—কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়। বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব, আবার বীজে উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম একই। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আমরা দেখিতেছি, আদি অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপে অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। এই সমুদয় 'ক্রমবিকাশশীল'' জীব-প্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণমানব—এই-সবকে একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণমানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'শক্তির নিত্যতা নিয়ম' (Law of Conservation of Energy) যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তুমি কোন যন্ত্রে পূর্ব হইতেই কোন শক্তি না প্রয়োগ করিয়া থাক, তবে তুমি উহা হইতে কোন কার্যই পাইতে পার না। তুমি ইঞ্জিনে জল ও কয়লারূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে ঠিক ততটুকু কার্য পাইয়া থাক, এতটুকু বেশী নয়, কমও নয়। আমি আমার দেহের ভিতর বায়ু খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থরূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য করিতে সমর্থ হই। কেবল ঐ শক্তিগুলি অন্যরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহাকে অবশ্যই অকস্মাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, 'অসৎ' (কিছু-না) হইতে 'সৎ'-এর (কিছুর) উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে—যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখা যায়, যেখানে আরম্ভ সেইখানেই শেষ—তবে কখনও অব্যক্ত, কখনও বা ব্যক্ত—সেইরূপ পূর্ণমানব মুক্তপুরুষ দেবমানব, যিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাকে আর এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতে হয় না, যাঁহাকে খ্রীষ্টানরা 'খ্রীষ্টমানব' বলেন, বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধমানব' বলেন, যোগীরা 'মুক্ত' বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত।

এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল—আলোচনা করা যাক। জগৎ-সম্বন্ধে মানুষের চরম ধারণা কি? চৈতন্য—এক অংশের সহিত অপর অংশের সামঞ্জস্য-বিধান, বুদ্ধির বিকাশ। প্রাচীন 'উদ্দেশ্যবাদ' (Design Theory) এই ধারণারই অস্ফুট আভাস। আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু—সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষ বিকাশ, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয়, তবে আদিতেও ইহা বর্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে পারেন—বেশ কথা, কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তখন তো চৈতন্যের অস্তিত্ব ছিল না। এ-কথায় আমাদের উত্তর এই, ব্যক্ত চৈতন্য তখন ছিল না বটে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল; আর সৃষ্টির শেষ—পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য। তবে আদিতে কি ছিল? আদিতেও সেই চৈতন্য। প্রথমে সেই চৈতন্যই ক্রমসঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে এখন যে চৈতন্য বা জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম 'ঈশ্বর'। উহাকে অন্য যে-কোন নামে অভিহিত কর না কেন ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই নিজেকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না পূর্ণমানব, খ্রীষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন। তখন তিনি নিজ উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া আসেন। এইজন্য সকল শাস্ত্রই বলেন, 'আমরা তাঁহাতেই জীবিত, তাঁহাতেই চলি ফিরি, তাঁহাতেই আমাদের সত্তা।'
৩৪
এইজন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন, 'আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব।' বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না—পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইবে না। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকেন।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেনঃ আপনি পুরাতন শব্দ 'ঈশ্বর' (God) ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর এই —পূর্বোক্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বুঝাইতে যত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উহা অপেক্ষা ভাল শব্দ আর খুঁজিয়া পাইবে না, কারণ মানুষের সকল আশা-ভরসা, সকল সুখ ঐ এক শব্দে কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড় সাধু-মহাত্মা ঐরূপ শব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞ লোকেরা ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুলির মহিমা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। 'ঈশ্বর' শব্দটি স্মরণাতীত কাল হইতে আসিয়াছে, আর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের ধারণা এবং যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, তাহা ঐ শব্দের সহিত জড়িত রহিয়াছে। কোন নির্বোধ ঐ শব্দ-ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যাগ করিতে বল? একজন আসিয়া বলিবে—আমার এই শব্দটি লও, অপরে আবার তাহার শব্দটি লইতে বলিবে। সুতরাং এই ধরনের বৃথা শব্দের কোন অন্ত থাকিবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটিই ব্যবহার কর, কিন্তু মন হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি—তাহা ভালভাবে বুঝিয়া ঐ শব্দ আরও ভালভাবে ব্যবহার কর। যদি তোমরা 'ভাবানুষঙ্গবিধান' (Law of Association of Ideas)-এর শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হও, তবে জানিবে এই শব্দের সহিত নানাপ্রকার মহান্‌ ওজস্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে; লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঐ শব্দের পূজা করিয়াছে, আর উহার সহিত যাহা কিছু অতি উচ্চ ও সুন্দর, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্য-প্রকৃতিতে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহা ঐসকল ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ, সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। অথচ এই-সকল বিচারের পর আমরা সেই প্রাচীন পরম পুরুষের নিকটেই পৌঁছিলাম।

আমরা এখন দেখিলাম—জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে 'পরম প্রভু' বলিয়া অভিহিত করিব। যাহা কিছু দেখ, শোন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি; ঠিক বলিতে গেলে তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি স্বয়ং। তিনি সূর্য ও তারকারূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী বসুন্ধরা, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। তিনিই মৃদু বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই সেই মৃদু বাতাস, যাহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই দেহে শক্তিরূপে কার্য করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই এই বক্তৃতা-মঞ্চ, যাহার উপর আমি দণ্ডায়মান; তিনিই ঐ আলোক, যাহা দ্বারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি,—এ-সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন, তিনিই নীচে নামিয়া আসিয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন; আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপে পুনর্মিলিত হন—ইহাই জগতের রহস্য। 'তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্বে ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া কোনরূপে চলিতেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সবকিছু'
৩৫
—জগৎপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই কেবল মানবযুক্তি মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাতেই জীবিত এবং তাঁহাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করি।
৩৬

জগৎ (২) (ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড)

[নিউ ইয়র্কে প্রদত্তঃ ২৬ জানুআরি, ১৮৯৬]

মনুষ্য-মন স্বভাবতই বহির্মুখী। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষে অন্যান্য পদার্থ নিচয়, পৃথিবী নদী পর্বত সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাই। প্রথমে মানবমন অন্ধকারে অনুসন্ধান করিতে করিতে বাহিরে যাহা কিছু দেখিত, তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে সে—নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী একজন, আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতায় বিশ্বাসী হইল। যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, সেগুলিই সচেতন পদার্থে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই সব বাহ্য দেবতায় আর মানুষের তৃপ্তি হইল না। তখন মানুষের সমগ্র শক্তি তাহার নিজের ভিতরে চালিত হইল—তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহির্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জগতে পৌঁছিল। বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চতর সভ্যতার স্তরে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়।

এই ভিতরের মানুষই আজিকার অপরাহ্ণের আলোচ্য বিষয়। এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতখানি প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত দেশে কত লক্ষ বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী, প্রত্যেক নরনারী সকলেই কোন-না-কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেনঃ এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে নিত্য কি কিছুই নাই? এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না? যখনই এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছুই জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে পর তাহার আর কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি? উহা যায় কোথায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, যতদিন মানব-মস্তিষ্ক চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। ইহার উত্তর যে কখনও পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে; যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আসিয়াছে; আর যত সময় যাইতেছে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর চিরদিনের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, আর পরবর্তী সময়ে ঐ উত্তরই আবার কথিত, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। অতএব আমাদিগকে কেবল ঐ উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। সকলের চিত্তাকর্ষক এই সমস্যাগুলির উপর নূতন আলোকপাত করিব, এমন ভান করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, সেই সনাতন মহান্ সত্য বর্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব—দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা দুর্বল মানুষের ভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে। কারণ আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ-সকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলি সৃজন করিয়াছিলেন তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজেই ইহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দর্শনক্রিয়ার জন্য কতকগুলি জিনিষের আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু অবশ্যই থাকা চাই। আমার অন্যান্য ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব প্রথমতঃ অবশ্যই আমার চক্ষু থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ চক্ষুর পশ্চাতে আর একটা কিছু থাকা আবশ্যক, সেটিই প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়। তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়া অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রিয় নয়, উহা দর্শনের যন্ত্রমাত্র; যথার্থ ইন্দ্রিয়টি চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত—উহা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র। যদি ঐ কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া যায়, তবে মানুষের অতি নির্মল দুটি চক্ষু থাকিতেও সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব দর্শনক্রিয়ার জন্য ঐ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি থাকা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও সেইরূপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র। উহা মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে পৌঁছানো চাই। তবু ইহাই শ্রবণক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। কখনও কখনও এরূপ হয়, তুমি তোমার গ্রন্থাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ—এমন সময় ঘড়িতে বারোটা বাজিল, কিন্তু তুমি শুনিতে পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে না? এখানে কিসের অভাব ছিল? মন ঐ ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম বাহ্যযন্ত্র; তারপর এই বাহ্যযন্ত্রটি ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন ঐ বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায়, তারপর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কর্ণ-যন্ত্রে এবং মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ আরও ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। তবু যথেষ্ট হইল না। বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের অধীশ্বর আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তবে তিনি আদেশ করেন—'কর' অথবা 'করিও না'। তখন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বাহিরে আসে—প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ককেন্দ্রে, তারপর বহির্যন্ত্রে; তখনই বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, বলা যায়।

যন্ত্রগুলি মানুষের স্থূলদেহে—বাহিরেই অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বুদ্ধিও নহে। হিন্দু দর্শনে উহাদের নাম 'সূক্ষ্ম শরীর', খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে 'আধ্যাত্মিক শরীর'। উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূল শরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে এবং তাহাতেই উহা ধ্বংস

হইয়া যাইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু উহাও কখনও সবল, কখনও বা দুর্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই—বৃদ্ধ লোকের মনে তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই মনের উপর কার্য করে, আবার মনও বাহ্য জগতের উপর কার্য করিয়া থাকে। শরীরের যেমন উন্নতি-অবনতি আছে, মনেরও তেমনি আছে; অতএব মন কখনও আত্মা হইতে পারে না। কারণ আত্মার ক্ষয় বা অধঃপতন নাই। আমরা কিভাবে উহা জানিতে পারি? কি করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে? কারণ স্বপ্রকাশ জ্ঞান বা চৈতন্য কখনও জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড়বস্তু দেখা যায় না, চৈতন্য যাহার স্বরূপ। অচেতন জড়পদার্থ কখনও নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। চৈতন্যই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সম্মুখে হল (hall) দেখিতেছ, জ্ঞান বা চৈতন্যই ইহার মূল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া উহার অস্তিত্বই জানা যাইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। তাহা যদি হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত। মন বা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখনও ক্ষয় হয় না। যাহা অপরের আলোকে আলোকিত, তাহার আলোক কখনও থাকে, কখনও থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ, তাহার আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব, হ্রাস-বৃদ্ধি আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলাবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাহার কারণ উহা সূর্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে লোহিত-তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেরই সম্ভব যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ তাহার নহে।

আমরা দেখিলাম এই স্থূলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা নিজেকে নিজে জানিতে পারে না। মনও নিজেকে নিজে জানিতে পারে না। কেন? কারণ মনের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে; কখনও উহা সবল, আবার কখনও দুর্বল হয়; বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য করিয়া উহাকে সবল বা দুর্বল করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা মনের নিজের নহে। তবে ঐ আলো কাহার? উহা অবশ্যই এমন কাহারও যাহার পক্ষে উহা নিজস্বরূপ, যাহা অপর আলোকের প্রতিফলন নহে, কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ; অতএব সেই আলোক বা জ্ঞান সেই পুরুষের স্বরূপ বলিয়া তাহার কখনও নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখনও প্রবল বা কখনও মৃদু হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেন—তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে—তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা সুখী—তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ। যে সুখী, তাহার সুখ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহা অপর কাহারও অস্তিত্বের প্রতিফলন। যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব, বা আনন্দ—এগুলি আত্মার ধর্ম নহে, আত্মার স্বরূপ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারেঃ আমরা এ-কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ-অস্তিত্ব ও জ্ঞান আত্মার স্বরূপ, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে? ইহার উত্তর এই—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে; যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে আর দেহের প্রকাশ থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে মন চলিয়া গেলে তোমাদের কথা মোটেই শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে। আবার মন সম্বন্ধেও সেইরূপ। বহির্জগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলযোগ হইলেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ আমরা সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। কেবল যাহা অপর বস্তুর ধর্ম, যাহা অপর বস্তু হইতে গৃহীত, তাহারই পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না কেন? এইরূপ স্বীকার করিলে দোষ
৩৭
এই হইবে যে, এরূপ স্বীকৃতির কোন অন্ত পাওয়া যাইবে না। আবার প্রশ্ন উঠিবে, সে কাহার নিকট হইতে আলোক পাইল? যদি বল, অপর কোন আত্মা হইতে, তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে, সেই বা কোথা হইতে আলোক পাইল? অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় আসিতে হইবে, যাহার আলো অপরের নয়, নিজের। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই—যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইখানে থামা, আর অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রহিয়াছেন; আমরা দেখিয়াছি, স্থূল দেহের সমুদয় গুণ ও শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ—এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতই প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ—অপর বস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কখনও শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগৎও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা তো দূরের কথা। অতএব সর্বদাই উহার অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখনও ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ যদি বল—এক সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে 'কাল' কোথায় অবস্থিত ছিল; কাল তো আত্মার মধ্যেই অবস্থিত। যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিফলিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তখনই কালের উৎপত্তি। সুতরাং যখন আত্মা ছিল না, তখন চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা না থাকিলে কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা যে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে নিজেকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। আত্মা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য করিয়া নিজ

মহিমা বিকাশ করিতেছে, এবং শরীরের দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিয়া উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটি শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার করিতেছে, এবং যখন সেই শরীরের দ্বারা আর কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আত্মা আর এক শরীর গ্রহণ করে।

এখন আবার আত্মার পুনর্জন্ম
৩৮
সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বিশ্বাস করিবে—আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার চমৎকার যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব। যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই শূন্যে যাইবে। তুমি আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আসি নাই, সুতরাং শূন্যে যাইব না। আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদিগকে শূন্যে পরিণত করিতে পারে। এই পুনর্জন্মবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকালব্যাপী অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; অন্য কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, তথাপি ঐগুলির উত্তর দিতে হইবে, কারণ কখনও কখনও আমরা দেখিতে পাই, মহাচিন্তাশীল ব্যক্তিও অতি মূর্খোচিত কথা বলিয়া থাকেন। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন করিবার জন্য কোন-না-কোন দার্শনিক অগ্রসর না হন'—এ-কথা অতি সত্য। এ-বিষয়ে প্রথম আপত্তি এইঃ জন্মান্তরের কথা আমাদের স্মরণ থাকে না কেন? আমরা কি এই জন্মেরই অতীত ঘটনা সব স্মরণ করিতে পারি? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা মনে পড়ে? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারও মনে পড়ে না; আর যদি স্মৃতিশক্তির উপর তোমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার মনে নাই বলিয়া ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না—এই কথা বলিতে হইবে। আমরা যদি স্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা। আমাদের পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ থাকিবেই—ইহার কি কোন হেতু আছে? সেই মস্তিষ্ক নাই, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং নূতন একটি মস্তিষ্ক হইয়াছে। অতীতে অর্জিত সংস্কারগুলির সমষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—উহা লইয়া মন এই শরীরে বাস করিতেছে।

এইক্ষণে আমি ঠিক যেমনটি আছি, তাহা আমার অনাদি অতীতের কর্মের ফলস্বরূপ। আর সেই সমগ্র অতীতকে স্মরণ করারই বা আমার কি প্রয়োজন? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই আবার বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম; কিন্তু তাহাদের বানর-জন্ম কেন স্মরণ হয় না—এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেও ভরসা করে না। যখন শুনি, কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা আধুনিকেরা তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া থাকি; কিন্তু যদি কেহ বলে, হাক্সলি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ডাল ইহা বলিয়াছেন, তখন আমরা বলি উহা অবশ্যই সত্য হইবে—অমনি আমরা তাহা মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, স্মৃতি সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যে গুরুতর আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যাহা বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও দেখিয়াছি, পুনর্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও থাকিবে—ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এরূপ স্মৃতি দেখা যায়, আর তোমরাও সকলে যে-জন্মে মুক্তিলাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। কেবল তখনই জানিতে পারিবে—জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, আমরা এই জগতে অভিনেতামাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমি, তখনই প্রবলবেগে অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর আসিবে, তখনই যত কিছু ভোগতৃষ্ণা—জীবনের উপর এই তীব্র আগ্রহ—এই 'সংসার' চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা স্বামী-স্ত্রী বন্ধু ঐশ্বর্য শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। কতবার এই-সকল আসিয়াছে, কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার-তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্মৃতি তোমার নিকট এইসকল আনিয়া দিবে, তখনই কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে, এবং জগৎ তোমায় ভ্রূভঙ্গী করিলে তুমি শুধু হাসিবে। তখনই তুমি বীরের মত দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে—'মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও?' যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। আর সকলেই কালে এই অবস্থা লাভ করিবে।

আত্মার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কানিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম—পুনর্জন্মবাদ খণ্ডন করিবার যুক্তিগুলি অকিঞ্চিৎকর। এখন পুনর্জন্মের পক্ষে যে-সব যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুর দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্বসংস্কারগুলি মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—আমার যাবতীয় পূর্বসংস্কার স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্র আমি সেটিকেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইয়া দেখি। যখনই দেখি, সেই ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি ঐগুলিকে সেগুলির সহিত মিলাই, তখনই আমার তৃপ্তি আসে। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারি, কারণ উহা পূর্বাবস্থিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মেলে। যখন উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে দেখিতে পাই না, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে, এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে। যখন একটি আপেল পড়িল, তখনই মানুষের মধ্যে অতৃপ্তি আসিল। তারপর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনার মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাইল। কি সেই শ্রেণী? সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম—পূর্বে কতকগুলি অনুভূতি না

থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব, কারণ ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব কতিপয় ইওরোপীয় দার্শনিক যে বলেন, 'বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে'—এই মত যদি সত্য হয়, তবে এরূপ বালক কখনও কিছুমাত্র মানসিক শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না, কারণ তাহার নূতন অনুভূতিগুলি মিলাইবার জন্য আর কোন সংস্কার নাই। অতএব দেখিলাম, এই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক আমাদের সকলকেই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানলাভ হয়, আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকি, তবে অবশ্যই অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব। মৃত্যুভয় সর্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটি কুক্কুট এইমাত্র ডিম হইতে বাহির হইয়াছে—একটি বাজপাখী আসিল, অমনি সে ভয়ে মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে ঐ কুক্কুটশাবকটি শিখিল যে, কুক্কুট বাজের ভক্ষ্য? ইহার একটি পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে 'স্বাভাবিক জ্ঞান' (instinct) বলা হয়। যে ক্ষুদ্র কুক্কুটটি এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে? ডিম্ব হইতে সদ্য বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন? উহা কখনও সাঁতার দেয় নাই, অথবা কাহাকেও সাঁতার দিতে দেখে নাই। লোকে বলে, উহা 'স্বাভাবিক জ্ঞান'। 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলিলে একটা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলা হইল বটে, কিন্তু উহা আমাদিগকে নূতন কিছুই শিখাইল না।

এই 'স্বাভাবিক জ্ঞান' কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। মনে কর, একজন পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাকে প্রত্যেক পর্দার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা-আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে ইহাতে জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, এখন আর উহার প্রয়োজন থাকে না, জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে, ইহাকেই বলে 'স্বাভাবিক জ্ঞান'। প্রথমে ইহা ইচ্ছাসহ কৃত ছিল, পরে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু 'স্বাভাবিক জ্ঞানের' তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বলা হয় নাই, অর্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকী আছে। যে-সকল কার্য এখন আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই আমাদের ইচ্ছার অধীনে আনা যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনা যাইতে পারে। এ বিষয়টি আজকাল সাধারণের ভালভাবেই জানা আছে। অতএব অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—দুই উপায়েই প্রমাণিত হইল যে, যাহাকে আমরা 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যখন সমুদয় প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব করিতেছে, তখন সমগ্র সৃষ্টিতে 'উপমান'-প্রমাণের প্রয়োগ করিয়া অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, নিম্নতর প্রাণীতে ও মানুষে যাহা 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাবমাত্র।

আমরা বহির্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচন প্রক্রিয়া বিদ্যমান, আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই উহার সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে—এই নিয়ম খাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা লাভ করি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্বক কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলিলেই স্বীকার করা হইল—পূর্বে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। পূর্বকৃত কার্য হইতে ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্তমান। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব কার্য ও পূর্ব অনুভূতির ফল—এখন স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

এতক্ষণ আমরা বিচারে বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতটুকু প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিলে, ততটুকুতে কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জীবজন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এইসকল কার্য পূর্ব অনুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, তাহা বলিবার আবশ্যকতা কি? উহা কেবল শরীরের ধর্ম বলিলেই তো হয়। উহা 'বংশানুক্রমিক সঞ্চার' (Hereditary transmission)—এ কথা বলিলেই তো হয়। ইহাই শেষ প্রশ্ন। আমি যে-সব সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, সেগুলি আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বল না কেন? ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্যন্ত সকলেরই কর্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চারবশেই আমাতে আসিয়াছে। এইরূপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটি অতি সুন্দর। আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল এইটুকু যে, উহা আমাদিগকে ভবিষ্যৎ শরীরের উপাদান প্রদান করে; আমরা আমাদের পূর্বকর্মের দ্বারা শরীর-বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি, আর যে-সকল পিতা-মাতা তাঁহাদের কর্মের গুণে ঐ আত্মাকে সন্তানরূপে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই নূতন শরীরের উপাদান সংগৃহীত হয়।

বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ বিনা প্রমাণেই একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে সঞ্চিত হইতে পারে। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহ্রদে একটি তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম-তরঙ্গাকার থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি। শরীরের সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর যখন নষ্ট হয়, তখন মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, ইহার প্রমাণ কি? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়?—মনে কর, মনের প্রত্যেক সংস্কারের শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর, আদিম মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া বংশানুক্রমে সকল পূর্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে আছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কেমন করিয়া? তোমরা বলিবে—জীবাণুকোষের (bio-plasmic cell) দ্বারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, কারণ পিতার শরীর তো সন্তানে সম্পূর্ণভাবে আসে না? একই পিতা-মাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে। সুতরাং এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে যে, পিতা-মাতা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ হারাইবেন,

কারণ তাঁহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য এক অর্থাৎ ভৌতিক; আর যদি বল, তাঁহাদের মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয়—প্রথম সন্তানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া যাইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কার-সমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় কিরূপেই বা থাকে? ইহা একটি অত্যন্ত অসম্ভব দৃষ্টিভঙ্গী। আর যতদিন না এই জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, যতদিন না তাঁহারা বুঝাইতে পারেন, এবং 'মনোবৃত্তি শরীর-কোষে নিদ্রিত থাকে', এই বাক্যেরই বা অর্থ কি, ততদিন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাস করে, মনই জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর যে মন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম করিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত না সে তাহা নির্মাণ করিবার উপযোগী উপাদান পাইতেছে, ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব আত্মার দেহ-গঠনের উপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্যন্তই বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্তু জন্মান্তর গ্রহণ করেন—শরীরের পর শরীর নির্মাণ করেন; আর আমরা যে-কোন চিন্তা করি, যে-কোন কার্য করি, তাহাই সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়, আবার সময় হইলেই উহারা স্থূল ব্যক্তভাব ধারণ করিতে উন্মুখ হয়।

আমার যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যখনই আমি তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটি তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিত্তহ্রদের ভিতর ডুবিয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহার একেবারে নাশ হয় না। যে-কোন মুহূর্তে স্মৃতিরূপ তরঙ্গাকারে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উহা মনের মধ্যেই থাকে। এইরূপেই এই সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমার মনেই রহিয়াছে, আর মৃত্যুকালে উহাদের সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া যায়। মনে কর, এই ঘরে একটি বল রহিয়াছে, আর আমরা প্রত্যেকেই হাতে একটি ছড়ি লইয়া সব দিক্ হইতে ইহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলাম; বলটি ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পৌঁছিবামাত্র, উহা বাহিরে চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তি লইয়া বাহিরে চলিয়া যায়?—যতগুলি ছড়ি দ্বারা আঘাত করা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তি লইয়া। উহার গতি কোন্ দিকে হইবে, তাহাও ঐসকলের সমবেত ফলে নির্ণীত হইবে। এইরূপ—শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্ দিকে গতি হইবে, তাহা কে নির্ণয় করে? ঐ আত্মা যে-সকল কার্য করিয়াছে, যে-সকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। ঐ আত্মা নিজের মধ্যে ঐ-সকলের সংস্কার লইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্বার ভোগের জন্য উহাকে একটি নূতন শরীর গড়িতে হইবে, তবে উহা এমন পিতা-মাতার নিকট যাইবে, যাঁহাদের নিকট হইতে সেই শরীর-গঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেই সকল উপাদান লইয়া উহা একটি নূতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে ঐ আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, কখনও স্বর্গে যাইবে, আবার পৃথিবীতে আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে; অথবা অন্য কোন উচ্চতর বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে উহা অগ্রসর হইতে থাকিবে, যতদিন না উহার অভিজ্ঞতা-অর্জন শেষ হয় এবং পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখনই উহা নিজের স্বরূপ জানিতে পারে। তখন সমুদয় অজ্ঞান চলিয়া যায়, নিজের শক্তিসমূহ প্রকাশিত হয়। জীবাত্মা তখন সিদ্ধ হইয়া যান, পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্থূলশরীরের সাহায্যে কার্য করার কোন প্রয়োজন থাকে না—সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা কার্য করিবারও প্রয়োজন থাকে না। তখন তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও মুক্ত হইয়া যান, তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না।

এ সম্বন্ধে আমরা এখন আর বিশেষ আলোচনা করিব না। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় দুর্বলতার দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোটা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা। আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখনও নিজেকে দেখিতে পায় না। উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানুষ আমরা, যতক্ষণ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারি, ততক্ষণ নিজেদের দুর্বলতা—নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে বড় নারাজ। মানুষ সাধারণতঃ নিজের দোষগুলি—নিজের ভ্রমত্রুটিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়; তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপায়; তাহা না হইলে অদৃষ্ট নামক একটি ভূতের কল্পনা করে এবং তাহারই উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু কথা এই, 'অদৃষ্ট' নামে এই বস্তুটির স্বরূপ কি এবং উহা থাকেই বা কোথায়? আমরা তো যাহা বপন করি, তাহারই ফসল পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের নির্মাতা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলে কাহাকেও দোষী করিতে পারা যায় না, আবার ভাল হইলে প্রশংসাও অপর কেহ পায় না। বাতাস সর্বদাই বহিতেছে। যে-সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেইগুলিতে বাতাস লাগে—তাহারাই পালভরে অগ্রসর হয়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদের উপর বাতাস লাগে না। ইহা কি বায়ুর দোষ? আমরা কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী—ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ? তাঁহার কৃপা-বাতাস দিবারাত্র অবিরত বহিতেছে, তাঁহার দয়ার শেষ নাই। আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। তাঁহার সূর্য তো দুর্বল বলবান—সকলের জন্য উদিত হয়। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী—সকলের জন্যই সমভাবে বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু—আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা আমরা ছোট ছোট কুকুরছানার মত এখানে জীবন-মরণ সংগ্রাম করিতেছি এবং নির্বোধের মত মনে করিতেছি, ভগবানও ঐ বিষয়গুলি ঠিক তেমনি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিবেন। এই কুকুরছানার খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার উপর সব দোষ চাপানো, তাঁহাকে দণ্ড-পুরস্কারের কর্তা বলা নির্বুদ্ধিতামাত্র। তিনি কাহারও দণ্ডবিধান করেন না, কাহাকেও পুরস্কার দেন না।
৩৯
সর্ব দেশে, সর্ব কালে—সর্ব অবস্থায় সকলেই তাঁহার অনন্ত দয়া পাইবার অধিকারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব তাহা আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিও না। যখন কষ্ট পাও, তখন নিজেকেই দোষী বলিয়া স্থির কর এবং যাহাতে তোমার নিজের মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্বোক্ত সমস্যার ইহাই মীমাংসা। যাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্য অপরের উপর দোষারোপ করে—দুঃখের বিষয়, এমন লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে—তাহারা সাধারণতঃ হতভাগ্য দুর্বলমস্তিষ্ক লোক; তাহারা নিজেদের কর্মদোষে এই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তাহারা অন্যের উপর দোষারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না; কিছুমাত্র উপকার হয় না বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টা তাহাদিগকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলে। অতএব তোমার নিজের দোষের জন্য কাহাকেও নিন্দা করিও না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ কর। বল, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্মের ফল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখকষ্ট দূরীভূত হইবে। আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমিই ধ্বংস করিতে পারি; অপরে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কখনও আমি ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্যবান হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ কর—জানিয়া রাখ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে পরিমাণ শক্তি বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এখন এই জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। ‘গতস্য শোচনা নাস্তি’—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্বদা মনে রাখিও, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্যই সঞ্চিত থাকিবে; ইহাও স্মরণ রাখিবে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য তোমার উপর ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, তেমনি তোমার সৎচিন্তা ও সৎকার্যগুলি সহস্র দেবতার শক্তি লইয়া সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত।

অমৃতত্ব

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন অপেক্ষা আর কোন্ প্রশ্ন এত অধিকবার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে? ইহার উত্তর-সন্ধান অপেক্ষা আর কিসের জন্য মানুষ সমগ্র বিশ্বজগতে এত অধিক খুঁজিয়াছে? ঐ প্রশ্ন অপেক্ষা আর কোন্ প্রশ্ন—মানব-হৃদয়ের এত অন্তরতর ও প্রিয়তর? আমাদের অস্তিত্বের সহিত আর কোন্ প্রশ্ন অধিকতর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত? কবি ও ঋষি, পুরোহিত ও মহাপুরুষ—সকলেরই ইহা আলোচ্য বিষয়, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা ইহা আলোচনা করিয়াছেন, পথের ভিখারীও এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন—নিকৃষ্ট মানুষেরাও ইহা পাইবার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও চলিয়া যায় নাই এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি থাকিবে, ততদিন যাইবে না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে দেখা যায়, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আলোচনা একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এই প্রশ্ন চিরনূতন রহিয়া গিয়াছে। অনেক সময় জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন আমরা যেন ভুলিয়া যাই। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল—এমন কেহ যাহাকে আমি হয়তো খুব ভালবাসিতাম, যে আমার প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ মৃত্যু তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল, তখন যেন মুহূর্তের জন্য এই সংসারের দ্বন্দ্ব-কোলাহল—সব থামিয়া গেল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—ইহার পরে কি? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয়?

অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষের জ্ঞান হয়; সুখ দুঃখ সব অনুভব না করিলে আমরা কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি না। আমাদের বিচার, আমাদের জ্ঞান এই-সকল সামান্যীকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শ্রেণীবদ্ধ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই আমরা জ্ঞান লাভ করি। চতুর্দিকে চাহিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার ঘুরিয়া উহা বীজরূপে পরিণত হয়। কোন প্রাণী জন্মগ্রহণ করিল, কিছুদিন বাঁচিয়া মরিয়া গেল—এইরূপে যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষ সম্বন্ধেও তেমনি। এমন কি, পর্বতসমূহ পর্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়া যাইতেছে, নদীসকল ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, উহা আবার সমুদ্রে যাইতেছে। সর্বত্রই এক-একটি বৃত্ত; জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ—যেন নির্ভুলভাবে যথাসময়ে একটির পর আর একটি আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামরূপযুক্ত বস্তুরাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করে বলিয়া মনে করা হইত, তাহা ভাঙিয়া যাইতেছে; আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় পদার্থকে একই বস্তু বলিয়া বুঝিতেছে, কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানাভাবে ও নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, উহা যেন সবকিছুর মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্যমান—এই-সকল বিভিন্ন রূপ যেন তাহার এক-একটি অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই 'ক্রমবিকাশবাদ' বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন—'ক্রমসঙ্কোচ'। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটি তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, একবিন্দু বালুকণা কখনও বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখনও সন্তানরূপে জন্মে না। প্রশ্ন এই—এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্বের অবস্থাটি কি? বীজ পূর্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপে ছিল। ঐ বীজে ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সমস্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে বীজে রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য কি? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে 'ক্রমসঙ্কোচ' বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটি 'ক্রমসঙ্কোচ' রহিয়াছে। যাহা পূর্ব হইতেই ছিল না, তাহার কখনও ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্বদাই সমান। তুমি একবিন্দু জড় বা একটুকু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শূন্য হইতে কখনও কিছুর ক্রমবিকাশ হয় না; তবে কোথা হইতে হয়? অবশ্য ইহার পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্রমসঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের উদ্ভব। সর্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্যা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। এখন এই তত্ত্বের সঙ্গে পূর্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডত্বের বিষয়টি জুড়িয়া দাও। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্যন্ত বাস্তবিক একটি সত্তা—একটি জীবনই বর্তমান। যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব-অবস্থার পূর্বে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত যেন একটি জীবনসূত্র বিদ্যমান। ইহাকেই 'ক্রমবিকাশ' বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানবরূপে বা পৃথিবীতে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতার-রূপে ক্রমবিকশিত হয়—এই সবগুলি অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। এই সমগ্র শ্রেণীটি সেই এক জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাণুতেই অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। এই সমগ্র প্রাণশক্তি—এমন কি মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বর পর্যন্ত উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলেন, অবতার-শ্রেণীর মানব পর্যন্ত অন্তর্নিহিত ছিলেন; কেবল ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র। সর্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাও অবশ্যই জীবভাবে সূক্ষ্মাকারে উহার ভিতরে বর্তমান ছিল—তাহা হইলে যে এক শক্তি হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহা কাহার ক্রমসঙ্কোচ? সেই সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির ক্রমসঙ্কোচ আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু নানা জটিল-যন্ত্রসমন্বিত উচ্চতম বুদ্ধিশক্তির আধাররূপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্ বস্তু ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া ঐ

জীবাণু-আকারে অবস্থান করিতেছিল? উহা সর্বব্যাপী চৈতন্য—উহাই ঐ জীবাণুতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া বর্তমান ছিল। উহা প্রথম হইতে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। উহা যে একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা নয়। বৃদ্ধির ভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। বৃদ্ধি বলিলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু আসিতেছে। বৃদ্ধি মানিলে একথা অস্বীকার করিতে হয় যে, অনন্ত সকল প্রাণে অন্তর্নিহিত আছে এবং উহা সর্বপ্রকার বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের কখনও বৃদ্ধি হয় না, উহা সর্বদাই পূর্ণভাবে ছিল, কেবল এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র।

বিনাশের অর্থ কি? এই একটি গ্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রশ্ন এইঃ গ্লাসটির কি হইল? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ?—স্থূলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি। উহার উপাদান-পরমাণুগুলি একত্র হইয়া গ্লাস-নামক 'কার্যে' পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের 'কারণে' চলিয়া যায়, আর ইহারই নাম 'নাশ'—কারণে লয়। কার্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাব। নতুবা কার্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন। এই দুইটিই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান। নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি এখন উহাতে কিভাবে আছে? সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে উহার প্রত্যেকটি পরমাণু পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া যাইত। তবে এখন কার্যটি কি? উহা কারণের সহিত অভিন্ন, কেবল উহা আর এক রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। যখন কারণ নির্দিষ্ট কালের জন্য বা নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও সীমাবদ্ধ-ভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ কারণটিকেই 'কার্য' বলে। আমাদের ইহা মনে রাখা উচিত। এই তত্ত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির সহিত অভিন্ন।

কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমরা কি পাইলাম? আমরা পূর্বোক্ত বিচার হইতে এইটুকু পাইলাম যে, জগতে কিছুরই ধ্বংস হয় না। নূতন কিছুই নাই—কিছু হইবেও না। সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ন্যায় পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইতেছে। জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ হইতে প্রসূত হইতেছে—স্থূল রূপ ধারণ করিতেছে; আবার লয়প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মভাবে ধারণ করিতেছে। আবার ঐ সূক্ষ্মভাব হইতে তাহাদের স্থূলভাবে আগমন—কিছুদিনের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি, আবার ধীরে ধীরে সেই কারণে গমন। তবে নষ্ট হইয়া যায় কী? না—রূপ, আকৃতি। সেই রূপটি নষ্ট হইয়া যায়, আবার আসে। একভাবে ধরিতে গেলে—এই শরীর পর্যন্ত অবিনাশী। একভাবে সকলদেহ এবং সকলরূপও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি, ৬/৩/৯ পড়িল। আমরা আবার খেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত খেলিতে খেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, যখন আবার ৬/৩/৯ পড়িবে। আবার খেলিতে থাক, আবার ঐরূপ পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে। আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক-একটি পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এইগুলিকেই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা বারংবার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে-সকল পদার্থ রহিয়াছে, সেগুলি বহু পরমাণুর এক বিশেষ প্রকার সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা প্রভৃতি রহিয়াছে। উহারা ঐ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ—মুহূর্ত পরেই হয়তো ঐ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন আবার ঠিক ঐ সমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যখন তোমরা এখানে উপস্থিত থাকিবে, এই কুঁজা ও অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, সে-সবও যথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই বিষয়েই আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনন্ত বার এইরূপ হইবে। আমরা স্থূল, বাহ্য বস্তুসমূহের আলোচনা করিয়া উহা হইতে কি তত্ত্ব পাইলাম? পাইলাম, অনন্তকাল ধরিয়া এই ভৌতিক পদার্থসমূহের সমবায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে—ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব কিনা? আপনারা অনেকে হয়তো এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অতীত ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাতে কিন্তু আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক-একটাতে বসিতেছে। সেটি ঘুরিয়া আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর একদল আসিল। ক্ষুদ্রতম জন্তু হইতে উচ্চতম মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক রূপটিই যেন এই একটি দল, আর প্রকৃতিই এই বৃহৎ নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক-একটি আসনস্বরূপ। এক-এক দল নূতন আত্মা উহাতে আরোহণ করিতেছে এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতেছে এবং শেষে নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা সর্বদা চলিতেছে—সর্বদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; এবং যতদিন শরীরগুলি এই চক্রের ভিতর, এই নাগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন নিশ্চয়ই গণিতের মত সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে, ঐগুলি কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব। প্রকৃতির ভূত ও ভবিষ্যৎ গণিতের মত সঠিকভাবে বলা সম্ভব।

আমরা দেখিলাম, জড়-পরমাণুগুলি এখন যেভাবে সংহত রহিয়াছে, সময়-বিশেষে পুনরায় তাহাদের অনুরূপ সংহতি হইয়া থাকে। অনন্তকাল ধরিয়া এই জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। কিন্তু ইহাতে তো আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হইল না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ হয় না, কোন জড়বস্তুকে একেবারে ধ্বংস করা যাইতে পারে না।

তবে জড়বস্তুর কি হয়? উহার নানারূপ পরিণাম হইতে থাকে, অবশেষে যেখান হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইখানে উহা পুনরাবৃত্ত হয়। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ সরলরেখা অনন্তভাবে বর্ধিত করিলে বৃত্তে পরিণত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না—হইতেই পারে না। এই জগতে প্রত্যেক জিনিষই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বৃত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়া আবার নিজ উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, আমি আর এইসকল আত্মা কি? আমরা পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি—সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ; আমরা উহারই ক্রমসঙ্কোচ। সুতরাং

আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া অনুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে ফিরিয়া যাইব—ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

কিন্তু আত্মার অমরত্ব প্রমাণে ইহাও পর্যাপ্ত হইল না! এখনও অনেক সংশয়—অনেক আশঙ্কা রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই—এ-কথা শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণে উৎপন্ন; যত রূপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণে উৎপন্ন। যদি তুমি শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টিমাত্র বল, তবে তোমার ‘আমিত্ব’ থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজের উপাদান-পদার্থে লয় পাইবে; যাহা কিছু কতকগুলি কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু—বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্র বা বিলম্বে উহা বিশ্লিষ্ট হইবে, ভগ্ন হইবে, উহা উপাদান-পদার্থে পরিণত হইবে। আত্মা শারীরিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির স্রষ্টা, কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন? শরীর কখনও আত্মা হইতে পারে না; কারণ শরীর চৈতন্যবান নহে। মৃতব্যক্তি বা কসাই-এর দোকানের একখণ্ড মাংস কখনও চৈতন্যবান নহে। ‘চৈতন্য’ শব্দে আমরা কি বুঝি?—প্রতিক্রিয়া-শক্তি।

আর একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাক। সম্মুখে এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোক-কিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাদিগকে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। তথাপি তখন পর্যন্ত, দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিষ্ক-মধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্র হইতে উহা মনের নিকট যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে। একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। মনে কর, খুব একাগ্রমনে আমার কথা শুনিতেছ, আর একটি মশা তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, তুমি মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? মশাটি তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য কতকগুলি স্নায়ু আছে; ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহার ছাপ সেখানে রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্যদিকে নিযুক্ত থাকায় প্রতিক্রিয়া করে নাই, সুতরাং তুমি মশকের দংশন টের পাও নাই। আমাদের সামনে নূতন চিত্র আসিল, কিন্তু মনে প্রতিক্রিয়া হইল না—এরূপ হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই উহার জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে, শুনিতে এবং অনুভব করিতে সমর্থ হইব। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতেছি, শরীর বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না, কারণ আমরা দেখিতেছি যে, যখন আমার মনোযোগ ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ অবস্থায় একজন এমন ভাষায় কথা বলিয়াছে, যে-ভাষা সে কখনও শিখে নাই। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা ঐ ভাষায় কথা বলিত—সেই সংস্কার তার মস্তিষ্কের মধ্যেই ছিল। সেইগুলি সেখানে সঞ্চিত ছিল; তারপর কোন কারণে মনে প্রতিক্রিয়া হইল, তখনই জ্ঞান আসিল, আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা বলিতে সমর্থ হইল। ইহাতেই আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পর্যাপ্ত নয়, মনও কাহারও হাতে যন্ত্রমাত্র। ঐ লোকটির বাল্যকালে তাহার মনের ভিতরই সেই ভাষা ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—লোকটির শৈশবে সেই ‘আর কেহ’ ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল, তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তারপর মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তারপর এই মনের পশ্চাতে সেই ‘আত্মা’। আধুনিক দার্শনিকগণ যেহেতু মনে করেন, চিন্তা মস্তিষ্কস্থ পরমাণুর পরিবর্তনের সহিত অভিন্ন, সেজন্য তাঁহারা পূর্বোক্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; সেইজন্য তাঁহারা সাধারণতঃ উহা একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শরীরের নাশ হইলে উহা কার্য করিতে পারে না। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মন উহার যন্ত্রস্বরূপ; বহিঃস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার ঐ চিত্রকে ভিতরে মস্তিষ্ককেন্দ্রে লইয়া যায়—কারণ তোমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র; ভিতরের যন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহই কার্য করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্রগুলিকেই ‘ইন্দ্রিয়’ বলে—তাহারা ঐ চিত্রগুলি লইয়া মনের নিকট সমর্পণ করে; মন আবার ঐগুলিকে আরও ভিতরে নিজেরই আর এক স্তর—চিত্তের মধ্য দিয়া সিংহাসনে আসীন মহামহিমান্বিত রাজার রাজা আত্মার সম্মুখে স্থাপন করে। তিনি সব দেখিয়া যাহা আবশ্যক, তাহা আদেশ করেন। তখনই মন ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির উপর কার্য করে, উহারা আবার স্থূল শরীরের উপর কার্য করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের অনুভবকর্তা, শাস্তা, স্রষ্টা—সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীর নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন? কারণ যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই আমাদের দর্শন বা কল্পনার বিষয়। যে জিনিষ আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না, যাহা শক্তি বা পদার্থ নহে, যাহা কারণ বা কার্য কিছুই নহে, তাহা যৌগিক হইতে পারে না। মনোজগৎ পর্যন্তই যৌগিক পদার্থের অধিকার—চিন্তাজগৎ আরও ব্যাপক। যৌগিক পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে—নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উহারা থাকিতে পারে না, যদি থাকে তবে আর যৌগিক অবস্থায় নয়।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। এই গেলাস একটি যৌগিক পদার্থ—ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই কারণগুলির সংহতি-রূপ গেলাস নামক যৌগিক পদার্থটি কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্যকারণ-সম্বন্ধ দেখা যাইবে—সেখানে সেখানেই যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বাহিরে উহার অস্তিত্বের কথা বলা বাতুলতা মাত্র। উহাদের বাহিরে আর কার্যকারণ-সম্বন্ধ খাটিতে পারে না—আমরা যে-জগৎ সম্বন্ধে

চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতর কেবল নিয়ম খাটিতে পারে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমাদের জগৎ; উহা বাহ্যবস্তু হইলে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর ভিতরের বস্তু হইলে উহা মানস প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি; অতএব যাহা আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এবং যাহা কল্পনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের জগতের বাহিরে। অতএব কার্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে স্বাধীন শাস্তা আত্মা রহিয়াছেন; এবং এই আত্মা কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত সবকিছু শাসন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, সুতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব; তিনি কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারেন না অথবা কোন কারণের কার্য হইতে পারেন না। তাঁহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না, কারণ 'বিনাশ' অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় মৌলিক উপাদানে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যাহা কখনও সংযোগোৎপন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ হইবে কিরূপে? তাহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয়—এরূপ বলা নিছক প্রলাপোক্তি।

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি—বড় সূক্ষ্ম সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি—পদার্থ শক্তি ও চিন্তা-রূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া আত্মা একটি মূলবস্তু; সুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। যাহার মৃত্যু নাই, তাহার জীবনও অসম্ভব। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। অভিব্যক্তির একটি রূপকে আমরা 'জীবন' বলি, আবার উহারই অন্যপ্রকার রূপকে 'মৃত্যু' বলি। তরঙ্গের উত্থানকে জীবন, আর পতনকে মৃত্যু বলি। যদি কোন বস্তু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তাহা জীবনেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তই এখন স্মরণ কর যে, মানবাত্মা সেই সর্বব্যাপী শক্তি অথবা ঈশ্বরের প্রকাশমাত্র। আমরা এখন পাইলাম, আত্মা জন্মমৃত্যু উভয়েরই অতীত। তোমার কখনও জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কখনও হইবে না। জন্মমৃত্যু কি এবং কাহার? জন্মমৃত্যু দেহের—আত্মা তো সদা সর্বদা বর্তমান। ইহা কিরূপে সম্ভব? আমরা এই এখানে এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন আত্মা সর্বব্যাপী! নিশ্চয়, যে-জিনিষ নিয়মের বাহিরে—কার্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? এই গেলাসটি সসীম—ইহা সর্বব্যাপী নহে, কারণ চারিদিকে জড়রাশি উহাকে ঐরূপ বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে—উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চারিদিকের সমুদয় বস্তুই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে—এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সকল নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। তুমি জগতের সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে 'আমি জন্মিলাম, মরিব'—এই ভাবগুলি কি? এগুলি অজ্ঞানের কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল। তুমি কখনও জন্মাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জন্মও কখনও হইবে না। যাওয়া-আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামি মাত্র। তুমি সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া-আসার অর্থ কি? উহা কেবল সূক্ষ্ম শরীর—যাহাকে তোমরা 'মন' বল, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রসূত ভ্রমমাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয় আকাশই চলিতেছে। অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, চাঁদের উপর মেঘ চলিতেছে। তোমরা মনে কর, চাঁদই এখান হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে। আরও দেখ—যখন রেলগাড়ীতে যাও, মনে হয় সম্মুখের গাছপালা মাঠ—সব যেন দৌড়াইতেছে; যখন নৌকায় চলিতে থাক, তখন মনে হয় যে জলই চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছ না—তোমার জন্ম হয় নাই, কখনও হইবেও না; তুমি অনন্ত, সর্বব্যাপী, সকল কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বাজে কথা মাত্র—তোমরা সকলেই সর্বব্যাপী।

কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে আর এক ধাপ অগ্রসর হইতে হইবে। মধ্যপথে আপস করা চলিবে না। তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি খানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বল, 'আর পারি না, ক্ষমা করুন', তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। যখন আমরা সমুদয় নিয়মের অতীত, তখন অবশ্যই আমরা সর্বজ্ঞ, নিত্যানন্দস্বরূপ; অবশ্য সকল জ্ঞানই আমাদের ভিতর আছে, সর্বপ্রকার শক্তি—সর্বপ্রকার কল্যাণ আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবশ্য তোমরা সকলেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী; কিন্তু এমন পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি কোটি সর্বব্যাপী পুরুষ কেমন করিয়া থাকিবে? অবশ্যই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের কি হইবে? বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে সেই এক আত্মা। এক পুরুষই আছেন—যিনি একমাত্র সত্তা, যিনি নিত্যানন্দস্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যু-রহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারও ভিত্তিস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভিন্ন।
৪০
যেখানেই দুই—সেখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, সেইখানেই বিবাদ। যখন সবই এক, তখন কাহাকে ঘৃণা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিব? যখন সবই তিনি, তখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবন-সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। ইহাই সিদ্ধি বা পূর্ণতা এবং ইহাই ঈশ্বর। যখন তুমি বহু দেখিতেছ, তখনই বুঝিতে হইবে—তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ।
৪১
এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরে অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন—নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখ যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের ঈশ্বর—'তত্ত্বমসি'; আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা—যথা, আমি পুরুষ বা স্ত্রী, দুর্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ, আমি অমুককে ঘৃণা করি বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প বা আমার শক্তি অনেক—এগুলি ভ্রম মাত্র। এইসব ভাব ছাড়িয়া দাও। কিসে তোমাকে দুর্বল করিতে পারে? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও।

জানিয়া রাখ, যে-কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্বল করে, একমাত্র তাহাই অশুভ; যাহা কিছু মানুষকে দুর্বল করে, ভীত করে, একমাত্র তাহাই অশুভ; তাহাই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি শত শত সূর্য স্থানচ্যুত হয়, কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী; তুমি জগতের আত্মা, ঈশ্বর। বল, 'শিবোঽহং শিবোঽহম্, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ।' সিংহ যেমন পিঞ্জর ভাঙিয়া ফেলে, সেইরূপ এই শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেল এবং অনন্তকালের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?—কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম; আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না; তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্বোধেরাই বলিয়া থাকে—তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হাহুতাশ কর। এরূপ বলা নির্বুদ্ধিতা—দুষ্টামি ও শঠতা। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ না এবং তাঁহাকেই 'মানুষ' বলিতেছ না? অতএব যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের যদি কিছু উপকার কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র; উহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিষ আছে, যাহা তুমি নও? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে ঘৃণা করিবে? কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে? অতএব জানিয়া রাখ, তিনিই তুমি—আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে-ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানিয়া এই ভাবে তাহার জীবন গঠন করে, সে আর কখনও অন্ধকারে লুটাইয়া পড়িবে না।

বহুত্বে একত্ব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৩ নভেম্বর, ১৮৯৬]

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥
৪২

স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিকর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্যই মনুষ্য বাহিরের দিকে—বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু সংযতেন্দ্রিয় এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে জগতের যে তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধান-চেষ্টা হইয়াছিল, তারপর এই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহারা বুঝিলেন, বহির্জগতে অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে কি করিয়া জানিতে হইবে? বাহিরের দিকে চাহিয়া নয়, ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া। আর এখানে আত্মার বিশেষণ-রূপে যে 'প্রত্যক্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। 'প্রত্যক্' কিনা, যিনি ভিতর দিকে গিয়াছেন—আমাদের অন্তরতম বস্তু হৃদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্তু যাহা হইতে সবকিছুই যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্তী সূর্য—আত্মা, মন, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদের আছে, সবই যেন তাঁহার কিরণজাল।

পরাচঃ কামানুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥
৪৩

বালকবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে। এইজন্যই তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীরা অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। এখানেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট হইল যে, সসীম-বস্তুপূর্ণ বাহ্যজগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা—অনন্তেই অনন্তকে অন্বেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্বর্তী আত্মাই একমাত্র অনন্ত বস্তু। শরীর, মন অর্থাৎ যে জগৎপ্রপঞ্চ আমরা দেখিতেছি বা আমাদের চিন্তারাশি—কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলেরই কালে উৎপত্তি ও কালেই বিলয়। যে দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ সবকিছু দেখিতেছেন অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা-জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, তিনিই জগতের কারণ-স্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে অনন্ত আত্মাতেই যাইতে হইবে—সেইখানেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
৪৪

যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যিনি এখানে 'নানা' দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্যগণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যখন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন স্বভাবতই তাঁহাদের এমন একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে দুঃখ সম্পর্কশূন্য কেবল সুখ। এই স্থানগুলির নাম 'স্বর্গ'—যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে শরীর অজর অমর হইবে, মনও পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহারা সেখানে চিরকাল পিতৃগণের সহিত বাস করিবেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্ত কাল স্থানবিশেষে বিদ্যমান—এই ভাবই যে স্ববিরোধী। দেশ অবশ্যই কালে উৎপন্ন ও নষ্ট হইবে, সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। আর্যগণ ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই স্বর্গনিবাসী দেবতাগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হয়তো কোন সৎকর্মবশে দেবতা হইয়াছেন; সুতরাং এই দেবত্ব বিশেষ অবস্থা বা বিভিন্ন পদের নাম মাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই স্থায়ী ব্যক্তিবিশেষ নন।

'ইন্দ্র' বা 'বরুণ' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। ঐগুলি বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে যিনি পূর্বে ইন্দ্র ছিলেন, এখন আর তিনি ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এখন আর ইন্দ্রত্ব-পদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়া সেই পদ অধিকার করিয়াছেন। সকল দেবতার সম্বন্ধেই এরূপ বুঝিতে হইবে। যে-সকল মানুষ কর্মবলে দেবত্ব-পদের যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই এই-সকল পদে সময়ে সময়ে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইঁহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবতাগণ সম্বন্ধে এই 'অমরত্ব' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ ঋষিরা দেখিতে পাইলেন—এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন শরীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, উহা যতই সূক্ষ্ম হউক। উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ আকৃতির প্রধান উপাদান 'দেশ'। দেশব্যতীত আকৃতি ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। দেশই আকার নির্মাণ করিবার একটি বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মায়ার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মত দেশকালে সীমাবদ্ধ—এই ভাবটি উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছেঃ 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ'—যাহা এখানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এখানে। যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম, সেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে; আর সকল নিয়মের সঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে পুনঃপুনঃ ধ্বংস এবং নূতন রূপ-ধারণ। এই নিয়মের

দ্বারা সমুদয় জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে-কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার সুখের পশ্চাতে ছায়ার মত দুঃখ আসিয়া থাকে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্বদা একসঙ্গেই থাকে। কারণ উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, উহারা দুইটি পৃথক্ সত্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ, সেই এক বস্তুই জীবন-মৃত্যু, দুঃখ-সুখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু এবং উহারা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে—এই ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্নরূপ—উহা কখনও ভালরূপে, কখনও বা মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। বস্তুতঃ উহাদের প্রভেদ মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই স্নায়ুপ্রণালী ভাল-মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটি বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে না—আবার দুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। এই সুখ-দুঃখ কখনই পৃথক্ নয়, উহারা সর্বদাই যেন একত্র রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে, মাংসভোজনে ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু যে প্রাণীর মাংস খাওয়া হয়, তাহার তো ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমভাবে সুখ দিতেছে। কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অসুখী হইতেছে। এইরূপ চলিবে। অতএব স্পষ্টই দেখা গেল, দ্বৈতভাব বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? আমি পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, জগতে এমন অবস্থা কখনও আসিতে পারে না, যখন সবই ভাল হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বিপরীতটি বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যতদিন না কেহ আমাকে উহা বুঝাইয়া দিতেছে, আমি ঐরূপ বলিতে পারি না।

আমার এই দৃঢ় উক্তির বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি আছেঃ ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি, সব চলিয়া যাইবে—ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অশুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভ অবশিষ্ট থাকিবে। আপাততঃ ইহা খুবই অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটি দোষ আছে। তাহা এইঃ উহা ধরিয়া লইতেছে যে, শুভ ও অশুভ—এই দুইটির পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার এইরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর অশুভ ক্রমশঃ কমিতেছে, শুভটি কেবল অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের ন্যায় অশুভও একটি ক্রমবর্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কথা ধর—সে জঙ্গলে বাস করে, তাহার ভোগসুখ অতি অল্প, সুতরাং তাহার দুঃখও অল্প। তাহার দুঃখ কেবল ইন্দ্রয়বিষয়েই আবদ্ধ। সে যদি প্রচুর আহার না পায়, তবে সে দুঃখিত হয়। তাহাকে প্রচুর খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার করিতে দাও, সে ঠিক ঠিক সুখী হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার সুখ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্বে ইন্দ্রিয়ে যে সুখ পাইত, এখন বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই সুখ পাইতেছে; সে এখন একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব সুখ আস্বাদন করে, গণিতের কোন সমস্যার মীমাংসায় তাহার সারা জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করে নাই, তাহার স্নায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে। একটি খুব সোজা উদাহরণ লওঃ তিব্বতে বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্ষাও নাই; কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিব্বতীরা নিষ্কলঙ্ক স্বামী ও নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেমের সুখ জানে না। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানে না—একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ভয়ানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়! একদিকে এই উচ্চ ধারণায় তাহাদের সুখের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইল।

তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর—পৃথিবীতে এদেশের মত ধনী ও বিলাসিতার দেশ আর নাই—আবার কি গভীর দুঃখ-কষ্ট এখানে বিরাজ করিতেছে, তাহাও দেখ! অন্যান্য জাতির তুলনায় এ-দেশে পাগলের সংখ্যা কত অধিক! ইহার কারণ এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি তীব্র, অতি প্রবল। এখানে লোককে সর্বদাই উঁচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সারাজীবনের সম্পদ্। তোমরা অপরকে উপদেশ দিতে পার না যে, অপেক্ষাকৃত অল্প টাকায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চেষ্টা কর, কারণ এখানে সামাজিক অবস্থাই এইরূপ যে, এত টাকার কমে চলিবেই না। এই সমাজ-চক্র দিবারাত্র ঘুরিতেছে—উহা বিধবার অশ্রু বা অনাথের চীৎকারে কর্ণপাতও করিতেছে না। এখানে সর্বত্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অন্যান্য সমাজ হইতে অনেক সুন্দর। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমাদের অপেক্ষা দুঃখও অল্প। এরূপই সর্বত্রই দেখিতে পাইবে। তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই দুঃখ। একটি যেন অপরটির ছায়াস্বরূপ। অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভও চলিয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দুঃখ যেমন একদিকে কমিতেছে, তেমনি কি আবার অন্যদিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না? প্রকৃত কথা এই, সুখ যদি সমযুক্তান্তর নিয়মানুসারে বাড়িতে থাকে, দুঃখ তাহা হইলে সমগুণিতান্তর নিয়মানুসারে বাড়িতেছে বলিতে হইবে। ইহার নামই মায়া। ইহা কেবল সুখবাদ নহে, কেবল দুঃখবাদও নহে। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ কেবল দুঃখময়। এরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। এই জগৎ কেবল মধুময়—এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল সৌন্দর্য, কেবল মধু—বালকদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল। আমরা সারা জীবনটাই এইরূপ স্বপ্ন দেখি। আবার কোন ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিয়াছে

বলিয়া সবই দুঃখময়, বলাও ভুল। জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ ভাল-মন্দের খেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর একটি কথা বলেঃ মনে করিও না যে, ভাল-মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু, সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্যই হইতেছে, এই বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা। পারসীকদের মত—দুইটি দেবতা মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এ মতটি অবশ্য অতি অনুন্নত মনের পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব সুখ বিধান করিতেছেন, আর মন্দ দেবতা সব মন্দ বিষয় বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা তো স্পষ্টই বোধ হইতেছে; কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটি করিয়া অংশ থাকিবে—কখনও একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই, যে-শক্তি আমাদিগকে খাদ্য দিতেছে, তাহাই আবার দৈবদুর্বিপাক দ্বারা অনেককে সংহার করিতেছে। এই মত স্বীকার করিলে আর একটি মুশকিল হয় এই যে, একই সময়ে দুইজন দেবতা কার্য করিতেছেন। একস্থানে এক দেবতা কাহারও উপকার করিতেছেন, অন্যস্থানে অন্য দেবতা কাহারও অপকার করিতেছেন। অথচ দুইজনে আপনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতেছেন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য এ মত জগতের দ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণালীমাত্র—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখন উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক। ঐগুলিতে স্থূল তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্ম ভাবের দিক্ দিয়া বলা হয়, জগৎ কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্বে যে যুক্তিপরম্পরা বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহাও অসম্ভব।

অতএব দেখিতেছি, কেবল সুখবাদ বা কেবল দুঃখবাদ—কোন মতের দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা বা যথার্থ বর্ণনা হয় না। এ জগৎ সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। ক্রমশঃ আমরা দেখিব, সমুদয় দোষ প্রকৃতির স্কন্ধ হইতে আমাদের নিজেদের উপর লওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। বেদান্ত অমঙ্গল অস্বীকার না করিয়া জগতের সমুদয় ঘটনার সম্মুখীন হইয়া বিশ্লেষণ করে, কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না; উহা মানুষকে একেবারে নিরাশা-সাগরে ভাসাইয়া দেয় না। বেদান্ত অজ্ঞেয়বাদীও নহে। উহা এই সুখদুঃখ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর ঐ প্রতিকারের উপায় বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা এমন কোন উপায়ের কথা বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় বা তাহাদের চোখে ধূলি দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা উহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে। আমার মনে আছে—যখন আমি বালক ছিলাম, তখন কোন যুবকের পিতা মারা যায়, সে অতি দরিদ্র হইয়া পড়ে, একটি বড় পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই তাহার প্রধান শত্রু। একদিন একজন ধর্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহার নিজ দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে বলিতে লাগিল—তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধর্মযাজকটি বলিলেন, 'যাহা হইতেছে, সবই মঙ্গলের জন্য; যাহা কিছু হয়, সব ভালর জন্যই হয়।' পুরাতন ক্ষতকে সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া রাখা যেমন, ধর্মযাজকের পূর্বোক্ত বাক্যটিও ঠিক তেমনি। ইহা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। ছয় মাস বাদে সেই ধর্মযাজকের একটি সন্তান হইল, সেই উপলক্ষে উৎসবে যুবকটি নিমন্ত্রিত হইল। ধর্মযাজক ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।' তখন যুবকটি উঠিয়া বলিল, 'কি বলিতেছেন—তাঁহার কৃপা কোথা? এ যে ঘোর অভিশাপ!' ধর্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' যুবক উত্তর দিল, 'যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাকে মঙ্গল বলিয়াছিলেন। এখন আপনার সন্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গলকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা আমার নিকট মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে।' এইভাবে জগতের দুঃখ ও অমঙ্গলের বিষয় চাপিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখনিবারণের উপায়? নিজে ভাল হও এবং যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। জোড়াতালি দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে জাগতিক দুঃখ দূর হইবে না। আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।

এই জগৎ সর্বদাই ভাল-মন্দের মিশ্রণ। যেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে—তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে। কিন্তু এই-সকল ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এইসকল বিরোধী ভাবের পশ্চাতে বেদান্ত সেই একত্বই খুঁজিয়া পায়। বেদান্ত বলেঃ মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকী রহিল কি? বেদান্ত বলেঃ শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিষ রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা তোমার স্বরূপ; যাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্বপ্রকার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এই তত্ত্ব জান, তখন—কেবল তখনই তুমি পূর্ণ সুখবাদী হইতে পারিবে, তাহার পূর্বে নহে। তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যক্তভাবগুলি আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্যবস্তুকে যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে—শুভরূপেই হউক আর অশুভরূপেই হউক—যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে নিজের প্রভু হইতে হইবে। উঠ, নিজেকে মুক্ত কর, এইসকল নিয়মের বাহিরে যাও, কারণ এই নিয়মগুলি তোমাকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্য মাত্র প্রকাশ করে। প্রথমে জান—তুমি প্রকৃতির দাস নও, কখনও ছিলে না, কখনও হইবেও না; প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সসীম, উহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র; তুমিই বাস্তবিক সমুদ্রস্বরূপ, তুমি চন্দ্র সূর্য তারা—সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বুদ্বুদমাত্র। ইহা জানিলে তুমি ভাল-মন্দ দুই-ই জয় করিতে পারিবে। তখনই তোমার সমগ্র দৃষ্টি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেঃ মঙ্গল কি সুন্দর! অমঙ্গল কি অপূর্ব!

বেদান্ত ইহাই করিতে বলে। বেদান্ত বলে না, সোনার পাত মুড়িয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখ, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও বেশী সোনার পাত দিয়া মুড়িতে থাক। এই জীবন একটা কঠিন সমস্যা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বজ্রবৎ দুর্ভেদ্য মনে হয়, তথাপি যদি পার, সাহসপূর্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শক্তিমান। বেদান্ত তোমার কর্মফলের জন্য ছোটখাট দেবতাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে না, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা। তুমি নিজ কর্মফলে ভাল-মন্দ

দুই-ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চোখে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়া লও—আলো দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ—তুমি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—এখন আমরা এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব? এই মন যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুর্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়—এই মনকেও সবল করা যাইতে পারে, যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের—সেই একত্বের আভাস পায়। তখন সেই জ্ঞানই আমাদিগকে পুনঃপুনঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। 'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥'
৪৫
—উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্টি হইলে জল যেমন পর্বতসমূহের পার্শ্ব দিয়া বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি শক্তিসমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে, সে তাহাদেরই অনুবর্তন করে। বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে বহু হইয়াছে। বহুর পিছনে ধাবিত হইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥
৪৬

সেই আত্মা আকাশবাসী সূর্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিতে অবস্থিত অগ্নি ও কলসস্থিত সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্বতে আছেন; তিনি সত্য ও মহান্।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
৪৭

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ লাভ করিয়াছেন, তেমনি সেই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।

যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হইবে, তাহার পূর্বে নহে। সর্বত্র তাঁহাকে দর্শন করাই প্রকৃত সুখবাদ। এখন প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত আত্মা এসকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি অপবিত্র হইয়া দুঃখভোগ করেন? উপনিষদ্ বলেন, যে তিনি দুঃখ অনুভব করেন না।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্য॥
৪৮

সর্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা সংসারের দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি আবার জগতের অতীত। আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখি, কিন্তু তাহাতে সূর্যের কিছুই হয় না।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
৪৯

যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা; যিনি স্বকীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে-জ্ঞানিগণ নিজেদের মধ্যে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ,অন্যের নহে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
৫০

যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি সচেতনদিগের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপ, যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।

বাহ্য জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সূর্য চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে?

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

৫১

সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিষ্প্রভ, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহারই আলোতে সব আলোকিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সবকিছু দীপ্তি পাইতেছে।

‘উর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।
৫২

উর্ধ্বমূল ও নিম্নগামী শাখা সহ এই চিরন্তন অশ্বত্থবৃক্ষ অর্থাৎ সংসার বৃক্ষ রহিয়াছে। তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হন। সমুদয় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের মত এই যে, এই সকল স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন্দ্রলোকে, বরুণলোকে যাইলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্টরূপে হইয়া থাকে।

‘যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥’
৫৩

যেমন আরশিতে মানুষ আপনার প্রতিবিম্ব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন জলে লোকে আপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন আলোক ও ছায়া পরস্পর পৃথক্‌, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়; কিন্তু তথাপি পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না। অতএব বেদান্ত বলেঃ আমাদের নিজ আত্মাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, মানবাত্মাই পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সর্বপ্রকার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট অনুভব হয় না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয়, তাহা নহে। ভারতবর্ষে যখন ছিলাম, তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়তো খুব স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হইবে; দেখিলাম, তাহা নহে। তারপর ভাবিলাম, হয়তো বনে গেলে সুবিধা হইবে, তারপর কাশীর কথা মনে হইল। সব স্থানই একরূপ, কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদয় জগৎ আমার পক্ষে মন্দ বলিয়া মনে হইবে। উপনিষদ্‌ ইহাই বলেন। আর সেই একই নিয়ম সর্বত্র খাটিবে। যদি এখানে আমার মৃত্যু হয় এবং যদি স্বর্গে যাই, সেখানেও এখানকারই মত দেখিব। যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা অরণ্য বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্মল করিতে পার, তবে যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে। অতএব এখানে ওখানে যাওয়া বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্মলতা-সাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছেঃ

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
৫৪

ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

যাঁহারা আমার রাজযোগের বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলিতেছি, সে-যোগ জ্ঞানযোগ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের। জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছেঃ

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌॥
৫৫

যখন ইন্দ্রিয়গুলি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত হয়, মানুষ যখন ঐগুলিকে নিজের দাসের মত করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী পরমগতি লাভ করেন।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্‌॥
৫৬

যে-সকল কামনা মর্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়—এইমাত্র উপদেশ।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, আমাদের দার্শনিকগণ স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ ও সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা দুর্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগকে স্বর্গ-নরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় হিন্দুরাও সব হাতে-কলমে করিতে চান; তবে জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্। পাশ্চাত্যগণ বলেনঃ বেশ ভাল একখানি বাড়ী কর, উত্তম খাদ্য ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তাঁহারা খুব কাজের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জ্ঞান-অর্থে আত্মজ্ঞান—তাঁহারা সেই আত্মজ্ঞানের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন।

আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা
৫৭
আছেন—তিনি খুব ভাল লোক এবং সুবক্তা। তিনি 'ধর্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; তাহাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেনঃ জগৎরূপ এই কমলালেবুটি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহার সব রসটা আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে বলি, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত, আমারও নিকট একটি ফল রহিয়াছে—আমিও ইহার রসটুকু সব খাইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটি কি, এই লইয়া। আপনি উহাকে কমলালেবু মনে করিতেছেন—আমি ভাবিতেছি, আম। আপনি মনে করেন, জগতে আসিয়া খাইতে পরিতে পাইলেই যথেষ্ট হইল এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই চূড়ান্ত হইল; কিন্তু আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া মানুষের আর কিছু কর্তব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে কিছুই নয়।'

আপেল ভূমিতে কিরূপে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যদি কেবল এইটুকু জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে তো আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প—সর্বকিছুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই; আমার 'দর্শন' বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে—স্বর্গ নরক প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করিয়া দিতে হইবে, যদিও এই পৃথিবীর মত ঐগুলির ব্যাবহারিক সত্তা আছে। আমি এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—উহা কি, তাহা জানিব; শুধু উহা কিভাবে কাজ করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি, সেটুকু জানিলেই আমার তৃপ্তি হইবে না। আমি সকল জিনিষের 'কেন' জানিতে চাই; 'কেমন করিয়া হয়'—এ অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি? তোমাদের দেশের একজন বলিয়াছেন, 'সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে।' অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানে সহায়তা করুন, তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন; কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তখন সে নির্বোধের মত কথা বলিতেছে, বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সে কখনও জীবনের মূল রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত বস্তু কি, সে-সম্বন্ধে সে কখনও আলোচনা করে নাই। আমি অনায়াসেই যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমাদের যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া তোমরা আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, 'প্রাণ কি?', বলিবে—'জানি না'। অবশ্য তোমাদের যাহা ভাল লাগে, তাহা করিতে তোমাদিগকে কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকেও আমার ভাবে থাকিতে দাও।

আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার ভাবে খুবই কাজের লোক। অতএব অমুক কাজের লোক নয়, অমুক কাজের লোক—এসব বাজে কথা। তুমি একভাবে কাজের লোক, আমি আর একভাবে। প্রাচ্যদেশে কাহাকেও যদি বলা যায়, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্যবস্তু লাভ করিবে, তবে সে ঐ প্রণালী অবলম্বন করিবে। আর পাশ্চাত্যে কেহ যদি শোনে—অমুক জায়গায় সোনার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দিকে অসভ্য লোকের বাস, হাজার লোক সোনার আশায়
৫৮
বিপদের সম্মুখীন হইবে, হয়তো একজন কৃতকার্য হইবে। ঐ-সকল লোক এ-কথাও শুনিয়াছে—আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু তাহারা পুরোহিতবর্গের উপর উহার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিন্তু সোনার জন্য অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজী নয়। সে বলে, উহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু যদি তাহাকে বলা যায়, এভারেস্ট পর্বতের শিখরে, সমুদ্রপৃষ্ঠের ৩০,০০০ ফুট উপরে এমন একজন আশ্চর্য সাধু আছেন, যিনি তাহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি সে কাপড়-চোপড় লইয়া অথবা কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত; এই চেষ্টায় হয়তো ৪০,০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন হয়তো সত্য লাভ করিবে। ইহারাও একদিকে খুব কাজের লোক, তবে লোকের ভুল হয় এইরূপ চিন্তা করা যে, তুমি যেটুকুকে জগৎ বল, সেইটুকুই সব। তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে। আমার পথে অনন্ত শান্তি, তোমার পথে অনন্ত দুঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাজের পথ বলিতেছ, তাহা ভ্রম। তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার মতকে নিন্দা করিও না। আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্যকর পথ। এস, আমরা সকলে নিজ নিজ প্রণালীতে কাজ করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই কর্মকুশল হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল হইত। আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব—উভয় দিকেই কাজের লোক; আর আমি আশা করি, কালে সমুদয় মানবজাতি ঐভাবে উভয়ত্র কাজের লোক হইবে। মনে কর, এক কড়া গরম জল হইতেছে—সেই সময় কি হইতেছে, তাহা যদি লক্ষ্য কর, দেখিবে এক কোণে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটি উঠিতেছে। এই বুদ্বুদগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার-পাঁচটি একত্র হয়, অবশেষে সবগুলি একত্র হইয়া এক প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়। এই জগৎও এইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক-একটি বুদ্বুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্বুদের সমষ্টি। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে

মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন একদিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এখন সকলে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন এইসকল ভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই মিলন জগতে প্রকাশিত হইবে। তখন সকলে জীবন্মুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ষা, ঘৃণা, মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, খড়কুটা প্রভৃতি এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। সেইরূপ তুমি আমি—এমন কি সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার মত সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর—ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি; আমরা এদিক ওদিক যাইবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পৌঁছিব।

সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭ অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমরা দেখিয়াছি, আমরা দুঃখ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের জীবনের বেশীর ভাগই অবশ্য দুঃখপূর্ণ থাকিবে। আর এই দুঃখরাশি আমাদের পক্ষে একরূপ সীমাহীন। আমরা অনাদি কাল হইতে এই দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমরা যতই দুঃখ-প্রতিকারের উপায় বাহির করি, ততই আমরা নিজেদের সূক্ষ্মতর দুঃখরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্মই বলিয়া থাকে, এই দুঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার একমাত্র উপায় ঈশ্বর। সকল ধর্মই বলিয়া থাকে—আধুনিক কর্মকুশল লোকদের উপদেশমত জগৎকে যেমন দেখিতেছ, তেমনি গ্রহণ করিলে আমাদের ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলে—এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনই সবটুকু নয়, উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থূল ব্যাপার। উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে সেই অনন্ত রহিয়াছেন, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই—উহাকে কেহ গড্, কেহ আল্লা, কেহ যিহোভা, কেহ যোভ্, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন।

কিন্তু জগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ-কথা সত্য হইলেও আমাদিগকে এই জগতে জীবনধারণ করিতে তো হইবে! এখন ইহার মীমাংসা কোথায়?

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে—সকল ধর্মের এই উপদেশ হইতে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদিত হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই—জীবনের দুঃখরাশির প্রতিকার কি? আর তাহার যে উত্তর দেওয়া হয়, তাহাতে আপাততঃ মনে হয়—জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। ইহার উত্তরে আমাদের একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে পড়ে। একজনের মাথার উপরে একটা মশা বসিয়াছিল, তাহার এক বন্ধু ঐ মশাটিকে মারিতে গিয়া তাহার মাথায় এমন আঘাত করিল যে, সেই লোকটি মারা গেল, মশাটিও মরিল। দুঃখ প্রতিকারের যে উপায়ের কথা ধর্ম বলে, তাহা এইরূপই।

জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ—তাহা জগৎকে যে বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকল ধর্ম ইহার প্রতিকারের কি উপায় বলে? ধর্মগুলি বলে, জগৎ কিছুই নয়; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহা প্রকৃত সত্য। এইখানেই বিবাদ। উপায়টি যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সবই নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেছে। তবে কি করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় হইবে? তবে কি কোনই উপায় নাই? প্রতিকারের অন্ততঃ আর একটি উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে। বেদান্ত বলে, বিভিন্ন ধর্ম যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথার যথার্থ তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকে, ধর্মগুলিও ঐ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক—দুই-ই প্রয়োজন। হৃদয় অবশ্য খুব বড় জিনিষ—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের মহৎ প্রেরণাগুলির স্ফুরণ হয়। হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার মস্তিষ্ক না-ই থাকে, শুধু একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শতবার পছন্দ করিব। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই যথার্থ জীবন—তাহারই উন্নতি সম্ভব; কিন্তু যাহার এতটুকু হৃদয় নাই, কেবল মস্তিষ্ক আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।

কিন্তু আমরা ইহাও জানি, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই—হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন। আমার কথার তাৎপর্য এরূপ নয় যে, কিছুটা হৃদয় ও কিছুটা মস্তিষ্কের মধ্যে আপস করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয়ানুভূতি থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে? জগৎ কি অনন্ত নয়? জগতে অনন্তপরিমাণ ভাববিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ শিক্ষানুশীলন ও বিচারের অবকাশ আছে। অব্যাহতভাবে ঐ দুই ভাবই একসঙ্গে আসুক—উভয়েই সমান্তরালভাবে চলিতে থাকুক।

জগতে যে দুঃখরাশি বিদ্যমান—এ ব্যাপারটি অধিকাংশ ধর্মই বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দ্বারা—ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে দুঃখ আছে, অতএব সংসার ত্যাগ কর—ইহা খুব বড় উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সন্দেহ নাই। 'সংসার ত্যাগ কর'—সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে, ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে—এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের তাৎপর্য এই হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন—আমরা যাহাকে 'জীবন' বলিয়া জানি, জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে তো আমাদের আর কিছুই থাকে না।

যখন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তখন আমরা এই তত্ত্ব আরও ভালভাবে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত

উপদেশ কি, তাহাই বলিব—বেদান্ত শিক্ষা দেয় জগৎকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করিতে।

বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ 'আত্মহত্যা' নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ 'জগতের ব্রহ্মভাব'—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ—বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে—বেদান্ত সম্বন্ধে লিখিত প্রথম পুস্তকে—দেখিতে পাই, 'ঈশ্বাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'
৫৯
—জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে—জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে, তাহার দিকে না চাহিয়া মিছিমিছি 'সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য'—এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এই ভাবে আমাদিগকে 'সংসার' ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি?—ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই—তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে—যেমন সকল দেশে নরপশুরা করিয়া থাকে? কখনই নয়; উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা তো ধর্ম নয়। তবে কি? সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত বলেঃ তুমি জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর; কারণ তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর—খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর—আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, এতদিন যে-জগতে আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র; উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কখনই উহার সেরূপ অস্তিত্ব ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম—মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই সন্তান-সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয় মন্দে, তিনিই পাপে ও পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং মরণেও তিনিই রহিয়াছেন।

বিষম প্রস্তাব বটে! কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে চায়। ইহা তো শুধু বেদান্তের আরম্ভ!

আমরা এইভাবে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অসুখী করে কিসে? আমরা যে-সকল দুঃখভোগ করিয়া থাকি, বাসনা হইতেই সেগুলির উৎপত্তি; তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—দুঃখ। অভাব যদি না থাকে, তবে দুঃখও থাকিবে না। যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তখন কি হইবে? দেওয়ালের কোন বাসনা নাই, উহা কখনও দুঃখ ভোগ করে না। ইহা সত্য, কিন্তু দেওয়ালের কোনরূপ উন্নতিও হয় না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, কোন কষ্টও নাই, কিন্তু উহা যে চেয়ার সেই চেয়ারই থাকে। সুখভোগের ভিতরেও এক মহান্‌ ভাব আছে, দুঃখভোগের ভিতরেও আছে। যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, দুঃখেরও উপকারিতা আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি মহৎ শিক্ষা হয়। জীবনে শত শত কাজ করিয়াছি; পরে বোধ হয়, না করিলেই ছিল ভাল; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ-সকল কাজ আমাদের মহান্‌ শিক্ষকের কাজ করিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়া আমি আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কাজ করিয়াছি বলিয়াও সুখী—আমি কিছু সৎকার্য করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই আমাকে মহৎ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এখন যাহা, তাহা আমার পূর্ব কর্ম ও চিন্তা-সমষ্টির ফলস্বরূপ। প্রত্যেক কার্য ও চিন্তারই একটি না একটি ফল আছে, এবং এই ফলগুলির সমষ্টি আমার এই অগ্রগতি—এই উন্নতি। তবে এখন সমস্যা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বুঝি—বাসনা বড় খারাপ জিনিষ, কিন্তু বাসনা-ত্যাগের অর্থ কি? বাসনা ত্যাগ করিলে দেহযাত্রা-নির্বাহ হইবে কিরূপে? ইহাও কি সেই মশা মারার জন্য মানুষ মারা নয়? বাসনাকে সংহার কর, তাহার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষটাকেও মারিয়া ফেল! তবে শোন ইহার উত্তর কিঃ তোমার যে বিষয়-সম্পত্তি থাকিবে না, তাহা নহে; প্রয়োজনীয় জিনিষ, এমন কি বিলাসের জিনিষ পর্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক, এমন কি তদতিরিক্ত জিনিষ পর্যন্ত তুমি রাখিতে পার—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এই যে, সত্যকে জানিতে হইবে—প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। তুমি তো কেহ নও, আমিও কেহ নই, কেহই কিছু নয়। সবই সেই প্রভুর বস্তু; ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে—ঈশ্বরকে সর্ববস্তুর ভিতরে স্থাপন কর। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে-সকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন; তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, সেগুলির মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর অলঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইভাবে সকল জিনিষ দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে—আকৃতিতে, সকল জিনিষে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।

যীশু বলিয়াছিলেন, 'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে।' বেদান্তও বলে, উহা পূর্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সকল ধর্মই এই কথা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। 'যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে

শুনুক।’ আমরা যে-সত্য এতদিন অন্বেষণ করিতেছি, তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের অন্তরে বর্তমান, আর বেদান্ত শুধু যে উহার উল্লেখমাত্র করে তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত। অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা সত্য হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং উহা পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া, কষ্টে ভুগিয়া সমগ্র জগতে ঘুরিতেছিলাম, কিন্তু উহা সর্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে বর্তমান ছিল। এই তত্ত্বদৃষ্টি-সহায়ে জগতে জীবনযাপন করিতে হইবে।

‘সংসার ত্যাগ কর’—এই উপদেশ যদি সত্য হয়, আর যদি স্থূল এবং প্রতীয়মান অর্থে ইহা গ্রহণ করা যায়, তবে এই দাঁড়ায়—আমাদের কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই, অলস হইয়া মাটির ঢিপির মত বসিয়া থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কাজ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদিগকে অবশ্য কার্য করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ, যাহারা বৃথা বাসনায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কাজের কি জানে? যে ব্যক্তি নিজের ভাবরাশি ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, সে কাজের কি বুঝে? তিনিই কাজ করিতে পারেন, যিনি কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত নন। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐসকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র উপভোগ করিতে পারেন, যাঁহার বেচা-কেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মত। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মত সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই: তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা-ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া উপভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আনাচ-কানাচ, গলি-ঘুঁজি, অন্ধকার স্থান—যাহা আমরা পূর্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে-সকল দাগ এত কালো বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদের পূর্ব আচরণের কথা ভাবিয়া হাসিয়া উঠিব—এইসকল কান্না-চীৎকার কেবল ছেলেখেলা মাত্র, আর আমরা জননীর মত বরাবর কাছে দাঁড়াইয়া ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলে, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য করিতে সমর্থ হইব। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য করিতে নিষেধ করে না, তবে ইহাও বলে যে, প্রথমে ‘সংসার’ ত্যাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্বে বলা হইয়াছে, ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য—সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য করিতে সমর্থ হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে ভোগ করিয়া লও, কেবল ঐগুলিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন কর, স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবনযাপন কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য করিয়া জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে-ব্যক্তি সত্য কি, না জানিয়া নির্বোধের ন্যায় সংসারের বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে—সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে যে-ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটি শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর বীভৎস শুষ্ক হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে—বুঝিতে হইবে। এই দুইটিই বাড়াবাড়ি—দুইটিই ভ্রম, এদিক আর ওদিক। উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট—উভয়েই পথভ্রষ্ট।

বেদান্ত বলে, এইভাবে কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সর্বভূতেই তিনি আছেন জান, নিজের জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বর-স্বরূপ চিন্তা কর; জানিয়া রাখ—ইহাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য, কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে? প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া আমাদিগকে অবশ্য কার্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্মফল আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। কর্মফল আর আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যত কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই-সকল বৃথা বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলি ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, ঈশ্বর-স্বরূপ হইয়া যায়, তখন উহারা আর কোন অনিষ্ট করে না। যাহারা এই রহস্য জানে নাই, তাহাদিগকে ইহা না জানা পর্যন্ত এই আসুরিক জগতে বাস করিতে হইবে। লোকে জানে না, এখানে তাহাদের চতুর্দিকে সর্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আসুরিক জগতের অর্থ কি? বেদান্ত বলে—অজ্ঞান।

বেদান্ত বলে, আমরা বিশাল স্রোতস্বতীর তীরে বসিয়া তৃষ্ণায় মরিতেছি। রাশীকৃত খাদ্যের সম্মুখে বসিয়া আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি। এইখানেই আনন্দময় জগৎ রহিয়াছে, আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি, উহা সর্বদাই আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা সর্বদাই উহাকে অন্য কিছু বলিয়া ভুল করিতেছি। বিভিন্ন ধর্ম আমাদিগকে সেই আনন্দময় জগৎ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্বেষণ করিয়াছে। সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ইহা ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামান্য মতভেদ আছে, সেগুলি

ভাষার বিভিন্নতা মাত্র—বাস্তবিক কিছু নয়। একজন একটি ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন একটু অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়তো অন্য ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। কেহ হয়তো সুখ্যাতি লাভের আশায় অথবা সবকিছু নিজের মনের মত করিতে চায় বলিয়া বলে, 'এ আমার মৌলিক মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের উৎপত্তি।

এ-সম্বন্ধে আবার এখন নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা তো খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছিঃ সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি কর—সব ব্রহ্মময় দেখ, তবেই ঠিকঠিক এ সংসার উপভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু যখনই সংসারক্ষেত্রে নামিয়া কয়েকটি ধাক্কা খাই, অমনি ব্রহ্মবুদ্ধি উড়িয়া যায়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল মানুষেই ঈশ্বর বিরাজমান—একজন বলবান লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, অমনি চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম, চটপট উঠিলাম; রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল, মুষ্টি বদ্ধ হইল, বিচারশক্তি হারাইলাম, একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, স্মৃতিভ্রংশ হইল—সেই ব্যক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়া শয়তান দেখিলাম। জন্মিবামাত্র উপদেশ পাইতেছি, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। সকল ধর্মই ইহা শিখাইয়াছে—সর্ববস্তুতে, সর্বপ্রাণীর ভিতরে, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেস্টামেণ্টে যীশুখ্রীষ্টও এ-বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ পড়িয়াছি, কিন্তু কাজের বেলাতেই আমাদের অসুবিধা শুরু হয়।

ঈশপ-রচিত একটি গল্পে আছেঃ এক বৃহৎ সুন্দর হরিণ হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, 'দেখ, আমি কেমন বলবান, আমার মাথা (শৃঙ্গ) দেখ—কেমন চমৎকার! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখ—কেমন দৃঢ় ও মাংসল! আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি!' সে এ-কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। যেই শোনা, অমনি দ্রুতপদে পলায়ন। অনেক দূরে দৌড়িয়া গিয়া আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে শাবকের নিকট ফিরিয়া আসিল। হরিণশাবক বলিল, 'এইমাত্র বলিতেছিলে, তুমি খুব বলবান—তবে কুকুরের ডাকে পলাইলে কেন?' উত্তরে হরিণ বলিল, 'তাই তো, কুকুর ডাকিলেই আমার আর কিছু জ্ঞান থাকে না।' আমরাও সারাজীবন এরূপ করিতেছি। আমরা দুর্বল মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, কিন্তু 'কুকুর ডাকিলে'ই হরিণের মত পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এ-সকল শিক্ষার কি প্রয়োজন? বিশেষ প্রয়োজন আছে। বুঝিয়া রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় না।

'আত্মা বা অরে ... শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।'
৬০
—আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, পরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামান্য কীট ভূমিতে বিচরণ করে, সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত—কত দূরে রহিয়াছে, বল দেখি! ইচ্ছা করিলে তো মন সর্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ। আদর্শগুলি আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমরা কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি আমরা জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ ছাড়াই জীবনের অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি হাজার ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে তবে পঞ্চাশ হাজার ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। কথিত আছে যে, 'হৃদয় পূর্ণ হইলেই মুখ কথা বলে', সেইরূপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির প্রেরণাশক্তি। মনকে সর্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখ, দিনের পর দিন ঐসকল ভাব শুনিতে থাক, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাক। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা মানবজীবনের সৌন্দর্য। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কোন মূল্য থাকিত না। উহা না থাকিলে জীবনে কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই বা; গরুকে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বার বার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সহস্রবার ঐ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ—উদ্দেশ্য। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে না পার, অন্ততঃ যাহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাস, এমন এক ব্যক্তির মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা কর—তারপর আর এক ব্যক্তির মধ্যে; এইরূপে অগ্রসর হইতে পার। আত্মার সম্মুখে তো অনন্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে তোমার শুভ বাসনা পূর্ণ হইবে।

'অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥’
৬১

তিনি অচল, এক, মন অপেক্ষাও দ্রুত কম্পনশীল! ইন্দ্রিয়গণ পূর্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও অন্যান্য দ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্মফল বিধান করিতেছেন। তিনি সচল, তিনি স্থির; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সর্বভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের ঐ অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?

সর্ব পদার্থের এই একত্ব বেদান্তের আর একটি প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করে যে, আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞান-প্রসূত; অজ্ঞান আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের ধারণা—এই ধারণা যে, মানুষে মানুষে ভিন্ন, নর-নারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন, জাতি হইতে জাতি পৃথক্, চন্দ্র হইতে পৃথিবী পৃথক্, সূর্য হইতে চন্দ্র পৃথক্, একটি পরমাণু হইতে আর একটি পরমাণু পৃথক্। এই পৃথক্ জ্ঞানই সকল দুঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন, এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব এখনও বিরাজমান। যদি ভিতরে চলিয়া যাও, তবে এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নর-নারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব, দেবতা-মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক; যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে ইতর জীবজন্তুও—সবই এক। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌঁছিয়াছেন, ধর্মবিজ্ঞানে যাহাকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া থাকে। তাঁহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে? কিসে তাঁহার মোহ জন্মাইতে পারে? তিনি সকল বস্তুর আভ্যন্তরিক সত্য জানিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর রহস্য জানিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর দুঃখ থাকিবে কিরূপে? তিনি আর কি বাসনা করিবেন? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া জগতের কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরে পৌঁছিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর একত্ব-স্বরূপ; তিনিই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ। সেখানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। আছে কেবল পূর্ণ একত্ব—পূর্ণ আনন্দ। তখন তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন? বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই।

‘স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥’
৬২

তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল দেহশূন্য ব্রণশূন্য স্নায়ুশূন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ; তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।

যাহারা এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা এই জগৎকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহারাও অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, ইহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।
৬৩
যিনি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন।

‘হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
...যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥’
৬৪

হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্মা আমি যাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। ... আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই।

অপরোক্ষানুভূতি

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ; ইহার নাম 'কঠোপনিষদ্'। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, স্যর এডুইন আর্নল্ড-কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জগতের আদি কোথায়, সৃষ্টি কিভাবে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য সন্ধান-চেষ্টা অন্তর্জগতে প্রবেশ করিল। কঠোপনিষদে এই মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন হইতেছিল, 'কে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিল? ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল?' ইত্যাদি। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন আসিল, মানুষের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? পূর্বে লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার অন্তর্দেশে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল বড় জোর জগতের একজন শাসনকর্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্য মাত্র; হইতে পারে—মানুষের গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি একটি মনুষ্যমাত্র। এই মীমাংসা কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক সত্য বলিতে পার। আমরা মনুষ্যদৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি, আর আমাদের ঈশ্বর ইহারই মানবীয় ব্যাখ্যা মাত্র।

মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ হইল—সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে সমস্যার সমাধান গরুর ভাবেই করিবে, সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তা না-ও হইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা 'বিড়াল-জগৎ' দেখিবে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে, এক বিরাট বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মানবীয় ধারণা জগৎ সম্বন্ধে সবটুকু ব্যাখ্যা করিতে পারে না, জগৎ-সমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা! জগৎ সম্বন্ধে মানুষ যে দারুণ স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে প্রচণ্ড ভ্রমে পড়িতে হইবে। বাহ্যজগৎ হইতে জগৎ সম্বন্ধে যে মীমাংসা পাওয়া যায়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে-জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্য সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি, ততটুকু মাত্র। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি, যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। মনে কর, আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় হইল—তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, তখন চৌম্বক উপলব্ধি হইতে লাগিল। জগতে হয়তো এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, যাহা অনুভব করিবার জন্য আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ—বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ, আর ঐ সীমার মধ্যেই আমাদের সমগ্র জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের মীমাংসা মাত্র। কিন্তু তাহা কখনও যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু মানুষ তো থামিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি—সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসার কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র।

অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। অতি প্রাচীন মননশীল ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যতদূরে যাইতেছেন, ততই বিভেদ বাড়িতেছে, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই একত্ব বাড়িতেছে। আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হই, ততই আমরা একটি সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, আর যতই উহা হইতে দূরে সরিয়া যাই, ততই অপরের সহিত আমাদের পার্থক্য আরম্ভ হয়। এই বাহ্যজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বের একটি সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ বড় জোর তাহার একটি অংশ-মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার—এইরূপ আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগৎ-সমস্যার মীমাংসা করা অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ কোথাও এমন একটি কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যেখান হইতে বিভিন্ন 'লোক' উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কেন্দ্র হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে—এই মানুষের ভিতর যে-মানুষ রহিয়াছেন, তিনিই সেই কেন্দ্র। ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সবই সেই এক বিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হয়। এখানেই বাস্তবিক সবকিছুর একটি সাধারণ ভূমি—এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব 'কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?'—এই প্রশ্নটিই বড় দার্শনিকযুক্তি-সিদ্ধ নহে, এবং উহার মীমাংসাও বিশেষ কিছু কাজের নহে।

পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, উহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ। অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সর্বস্ব দান করতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান-যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্তু তিনি সব জিনিষ দান করিতেছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—তিনি কতকগুলি জরাজীর্ণ মৃতপ্রায় বন্ধ্যা কানা খোঁড়া গাভী লইয়া সেগুলিই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গ করিতেছেন দেখিয়া সে মর্মে মর্মে পীড়িত হইল। ভারতবর্ষে পিতা-মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পায় না, কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব সেই বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাঁহাকে কেবলমাত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, 'পিতা, আপনি আমায় কাহার উদ্দেশ্যে দান করিবেন? আপনি তো যজ্ঞে সর্বস্ব-দানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।' পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ও কি বলিতেছ, বৎস! পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে—এ কেমন কথা?' বালকটি দ্বিতীয়বার—তৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিল; তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিব—যমকে দিব।' তারপর আখ্যায়িকা এইরূপঃ

বালকটি সত্যই যমের নিকট গেল। মৃত্যুমুখে পতিত প্রথম মানব যমদেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছেন। সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা ইঁহার নিকট গিয়া অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন। এই যম একজন অতি শুদ্ধস্বভাব সাধুপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটি যমলোকে গমন করিল। দেবতারাও কখনও কখনও বাড়ী থাকেন না, অতএব নচিকেতাকে তিন দিন সেখানে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ী ফিরিলেন।

যম কহিলেন, 'হে বিদ্বান্, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হউক! আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া বড় দুঃখিত। কিন্তু এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকে আমি প্রতিদিনের জন্য একটি করিয়া মোট তিনটি বর দিতে প্রস্তুত, তুমি বর প্রার্থনা কর।' বালক এই প্রার্থনা করিল, 'আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়া যায়, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় দিলে যখন পিতার নিকট যাইব, তিনি যেন আমায় চিনিতে পারেন।' যম বলিলেন, 'তথাস্তু।'

নচিকেতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-বিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই—সেখানে সকলের জ্যোতির্ময় শরীর, সেখানে তাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য ভাব আসিল, কিন্তু এ-সকলে কিছুতেই মানুষ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইল না। এই স্বর্গ অপেক্ষা আরও উচ্চতর কিছুর আবশ্যক। স্বর্গে বাস এই জগতের বাস হইতে বড় কিছু ভিন্ন রকমের নহে। বড় জোর একজন সুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ, উহা সেইরূপই—উপভোগের জিনিষ অপর্যাপ্ত, আর নীরোগ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর। উহা তো এই জড়জগৎই হইল, না হয় আর একটু উঁচু স্তরের; আর আমরা পূর্বেই যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্বোক্ত সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি মীমাংসা হইবে? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। যদি এই জগৎ ঐ সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কেমন করিয়া উহার মীমাংসা করিবে? কারণ, আমাদের মনে রাখা উচিত—স্থূল প্রপঞ্চ প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের অতিসামান্য অংশমাত্র।

আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে দেখ না কেন, ইহাতে কতটা আমাদের চিন্তার ব্যাপার, আর কতটাই বা বাহিরের ঘটনা! কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর। এই জীবন-প্রবাহ কি প্রবল বেগেই চলিতেছে—ইহার কার্যক্ষেত্রও কি বিস্তৃত—কিন্তু ইহাতে মানসিক ঘটনাবলীর তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ কতটুকু! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলী কেবল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বর্গে, যেখানে জ্যোতির্ময় দেহ পাইবার কথা, সেখানে অধিকাংশ লোকের তৃপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছে। বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মানুষকে স্বর্গে লইয়া যান। সকল ধর্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিত্রতা-মণ্ডিত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জ-ত্বকে লিখিতেন, অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু আজও ভূর্জ-ত্বক্ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় নয়-দশ সহস্র বর্ষ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বিদ্যমান। যজ্ঞের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না। এশিয়াবাসী আর্যগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এখনও তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈদ্যুতাগ্নি রক্ষা করিতে ভালবাসে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্বে এইভাবে অগ্নি উৎপাদন করিত; ক্রমে ইহারা দুইখানি কাঠ ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল। পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিবার অন্যান্য উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায়গুলি তাহারা ত্যাগ করিল না; সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাঁড়াইল।

হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা পূর্বে পার্চমেণ্টে লিখিত। এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চমেণ্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ সকল জাতি সম্বন্ধেই। এখন যে-আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন মানুষ পূর্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের ধারণাসকল পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইল, কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐগুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত। তারপর একদল লোক এই যজ্ঞকার্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহারাই পুরোহিত। ইঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের যথাসর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের এই ধারণা তখন বদ্ধমূল হইল—দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে আসেন, যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক আহুতি দেওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিতে পারেন, এই প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইল। নচিকেতা

এই জন্যই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিভাবে যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, 'কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে; কেহ বলেন, থাকে না; আপনি আমাকে এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।'

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার অন্য দুইটি বর পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিলেন, 'প্রাচীনকালে দেবতাদেরও এ বিষয়ে সংশয় ছিল। এই সূক্ষ্ম ধর্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতা, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।'

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'হে যমরাজ! মৃত্যু! দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে! কিন্তু আমি আপনার ন্যায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।'

যম বলিলেন, 'শতায়ু পুত্র-পৌত্র, পশু-হস্তী, সুবর্ণ-অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীতে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাক। অন্য কোন বর যদি তুমি ইহার সমান মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর—অর্থ এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুর অধিকারী করিব। পৃথিবীতে যে-সকল কাম্যবস্তু দুর্লভ, সেগুলি প্রার্থনা কর। এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদ্যনিপুণা রমণীগণকে মানুষ লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতা, আমার প্রদত্ত এইসকল কামিনী তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।'

নচিকেতা বলিলেন, 'এসকল বস্তু কেবল দুদিনের জন্য—ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও অনন্তকালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এই-সকল হস্তী অশ্ব রথ গীতবাদ্য আপনারই থাকুক। মানুষ বিত্তদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না। আপনাকে যখন দেখিতে হইবে—মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত, তখন কি এই ধনসম্পদ রাখিতে পারিব? আপনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিনই আমরা জীবিত থাকিব। আমি যে-বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা ছাড়া আর কিছু চাহি না।'

বালকের সঙ্কল্পে সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন, 'পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেয়ঃ)—এই দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন; কিন্তু ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি দুইটির মধ্যে 'শ্রেয়'কে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য 'প্রেয়ঃ' গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি বিচার করিয়া একটি হইতে অপরটি পৃথক্ বলিয়া জানেন, তিনি 'শ্রেয়ঃ'কে 'প্রেয়ঃ' অপেক্ষা বড় বলিয়া গ্রহণ করেন; কিন্তু অ-জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের জন্য 'প্রেয়ঃ'কেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতা, তুমি আপাতরম্য বিষয়গুলির নশ্বরতা চিন্তা করিয়া সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছ।' এই কথার পর নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া অবশেষে যম তাঁহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

এখন আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির এই সমুন্নত ধারণা পাইলাম যে, যতদিন না মানুষ ভোগবাসনা জয় করিতেছে, ততদিন তাহার হৃদয়ে সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হইবে না। যতদিন এইসকল বৃথা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমুহূর্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর—এক বিন্দু রূপের, একবিন্দু আস্বাদের, একবিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে?

যম বলিতেছেন, 'যে-আত্মার সম্বন্ধে, যে-পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা চিন্তাশূন্য বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে; পরলোকের অস্তিত্ব নাই—এরূপ চিন্তা করিয়া মানুষ পুনঃপুনঃ আমার বশে আসে।'

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, এ বিষয়ের বক্তাও 'আশ্চর্য' হইবেন, শ্রোতাও অনুরূপ হইবেন। গুরুর অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, শিষ্যেরও তেমনি হওয়া চাই। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ পরমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বাসের উপর খুব জোর দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিষ, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটিকে একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিব, ইহার পশ্চাতে একটি মহান্ সত্য আছে। যাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই 'অপরোক্ষানুভূতি'—আমরা এখন ইহার আলোচনা করিতেছি। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কদ্বারা কখনও ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। এইগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বে যে-সকল বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে 'যুক্তি' বলে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি সম্ভব নয়। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা তাহা না হইবে কেন?

আমরা পুনঃপুনঃ এই মহাভ্রমে পড়িয়া থাকি, আমরা স্বীকার করিয়া লই, বহির্বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। সেখানে কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না; প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই ঐগুলি লব্ধ হয়। আবার সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ্ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদরাও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি-বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক—বিশেষতঃ বর্তমানকালে ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই;

যদি ধর্ম লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার নয়—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বল না কেন, তাহা দ্বারা ধর্মলাভ হইবে না। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। জগতের অস্তিত্ব আছে কিনা—এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের (Realism and Idealism) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি—জগৎও রহিয়াছে এবং চলিতেছে। আমরা কেবল একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেও তাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। অবশ্য ধর্মের যে-কোন মতবাদ হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে—এই অযৌক্তিক দাবী স্বীকার করা অসম্ভব, ইহা মানুষের মন অবনত করে। যে-ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকে অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তুমিও অবনত হইবে। জগতের সাধুপুরুষগণের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্য লাভ করিব। সত্য লাভ করিলে তখনই আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মূল ভিত্তি এইখানে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিবে—যাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টাই করে নাই। অতএব ধর্মের বিরুদ্ধে তাহদের যুক্তির কোন মূল্যই নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, 'তোমরা, যাহারা সূর্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত'—তাহার কথার মূল্য যতটুকু, ইহাদের কথার মূল্যও ততটুকু। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবার উড়াইয়া দিতে—লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। ধর্ম লইয়া এইসকল গণ্ডগোল, মারামারি, বিবাদ-বিসংবাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমরা বুঝিব, ধর্ম—গ্রন্থে বা মন্দিরে আবদ্ধ নয় অথবা ইন্দ্রিয়দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নয়। ধর্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি। যিনি ঈশ্বর ও আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। প্রত্যক্ষানুভূতিশূন্য উচ্চতম ধর্মশাস্ত্রবিদ, যিনি অনর্গল ধর্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক—ইহা স্বীকার করি না কেন? কেবল তর্ক বিচার করিয়া ধর্মের তত্ত্বগুলিতে সম্মতি দিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। একজন খ্রীষ্টান বা মুসলমান অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর কথা ধর; খ্রীষ্টের সেই 'শৈলোপদেশ'-এর কথা মনে কর; যে-কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্যতঃ পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়; তথাপি লোকে বলে, পৃথিবীতে কোটি কোটি খ্রীষ্টান আছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলে খ্রীষ্টান? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন-না-কোন সময়ে এই উপদেশানুযায়ী কার্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। দুই কোটি লোকের ভিতর একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও বলা হয়, ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক আছেন; যদি প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে-ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করে, তাহার সহিতই আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। সকলেই আমরা অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম আমাদের কাছে যেন কিছু নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতের অনুমোদন মাত্র, কেবল কথার কথা—অমুক বেশ ভাল বলিতে পারে, অমুক পারে না। কিন্তু ইহা ধর্ম নয়; 'শব্দ যোজনা করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোকব্যাখ্যা—এইসকল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের নিমিত্ত, মুক্তির জন্য নয়।'
৬৫
যখনই আত্মা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে। তখনই তুমি ধার্মিক হইবে, তখন—কেবল তখনই নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এখন পশুদের অপেক্ষা বড় বেশী নীতিপরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসন-ভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলে, চুরি করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি চুরি করিতে ছুটিব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ—পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তি-লোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুদের চেয়ে অতি সামান্যই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া নিজেদের ভিতরটা অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝিতে পারি, একথা কতদূর সত্য। অতএব এস, আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি; এস, স্বীকার করি—আমরা ধার্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘৃণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ, আর আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর, তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমায় কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি নিজের অন্তরের অন্তরে কখনও একথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই দেশ দেখ নাই। অবশ্য অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পার বটে—আমি সেই দেশ দেখি নাই; কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহ্যজগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও স্পষ্টভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন কিছুই তোমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না, তখনই প্রকৃত বিশ্বাস আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা, 'যাহার একসর্ষপ-পরিমাণ বিশ্বাস আছে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড় তাহার কথা শুনিবে'
৬৬
—এই কথার তাৎপর্য এই, তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে, কেবল বিচারপূর্বক সত্যে

সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই।

একমাত্র প্রশ্ন এই—প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? ইহাই বেদান্তের মূলকথা—ধর্ম সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে না; কিন্তু সাক্ষাৎকার বড় কঠিন। যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ প্রত্যেক মানবহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।
৬৭
সাধুগণ তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ উভয়েরই পারে গিয়াছেন। আমরা যাহাকে ধর্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম বলি—শুভাশুভ সকল কর্ম, সৎ-অসৎ—সকলেরই পারে তিনি গিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তিনি যথার্থই সত্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল? স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা দুঃখশূন্য সুখ; অর্থাৎ আমরা চাই সংসারের সব সুখ, উহার দুঃখগুলিকে কেবল বাদ দিতে চাই। অবশ্য ইহা অতি সুন্দর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভুল, কারণ চরম সুখ বা চরম দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 'তবে আমি কাল কি করিব?'—বলিয়াই আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাঁহার পক্ষে দারিদ্র, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। বাস্তবিক সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? উহারা ক্রমাগত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন আমার মনে হইত—কোচোয়ান হইতে পারিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন সুখকে ধরিয়া থাকিবে? এইটি আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে; প্রত্যেকের সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন একতাল আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়তো ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিম-নির্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে-স্বর্গ বড় সুবিধাজনক হইবে না। আমরা আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, সেখানে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে অত্যন্ত অধিক জল, প্রতি বৎসর অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি জলপ্লাবনে মারা যায়। অতএব আমার স্বর্গ নিম্নদেশে নদী-প্রবাহযুক্ত উদ্যানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গে অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হইবে। আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সেই ব্যক্তিই আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্মাতা, আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে না—যাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি—একটু হাসিকান্না, তার পর কুকুরের মত মৃত্যু? যখন এই-সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ তুমি জান না—প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র আনন্দ বা সুখ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা—উহা একটি ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে সকলে ওডিন (Odin) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে—কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহ-শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা নিজেরাই যুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতগুলি আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারা তখন একটি বৃহৎ কক্ষে গিয়া সেই শূকরের মাংস পোড়াইয়া ভোজন করে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে। পরদিন আবার সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শিকারাদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটি না হয় একটু মার্জিত। আমরা সকলেই এইরূপ 'শূকর' শিকার করিতে ভালবাসি—আমরা এমন একস্থানে যাইতে চাই, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেখানে ঐ নরওয়েবাসীরা যেমন কল্পনা করে—যাহারা স্বর্গে যায়, তাহারা প্রতিদিন বন্যশূকর শিকার করিয়া উহা খাইয়া থাকে, আবার পরদিন শূকরটি পুনরায় বাঁচিয়া উঠে—সেইরূপ ঘটিবে।

দর্শনশাস্ত্রের মতে, নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়া কিছু আছে, অতএব আমরা সাধারণতঃ যে ঐহিক সুখভোগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ-সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার বেদান্তই প্রমাণ করে যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ বাস্তবিক সেই ব্রহ্মানন্দেরই অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রতিমুহূর্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানি না। যেখানেই দেখিবে কোনরূপ আনন্দ, এমন কি চোরের চৌর্য-কার্যে যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ, কেবল উহা কতকগুলি বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে। কিন্তু সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদয় ঐহিক সুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ হইবে। প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছু মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণা করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই—ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সকল পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সে-সব ত্যাগ করিতেই হইবে; পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার সেগুলি গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিণতরূপে। অতএব আমাদিগকে ছোটখাট সুখ-দুঃখ—সব ত্যাগ করিতে হইবে। এগুলি একই অনুভূতির বিভিন্ন মাত্রা। 'বেদসকল যাঁহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্যা যাঁহাকে পাওয়ার জন্য

অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে তোমাকে বলিব—তিনি ওঁ।'
৬৮
বেদে এই ওঁকারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষিত হইয়াছে।

যম নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেনঃ মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়?—'বিপশ্চিৎ' বা অবিলুপ্তচৈতন্য আত্মা কখনও মরেন না, কখনও জন্মানও না; ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না; ইনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না।'
৬৯
'হন্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হনন করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভয়কেই সত্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না অথবা নিজেও হত হন না।'এ তো ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 'বিপশ্চিৎ'-শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। ক্রমশঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়তো উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রভেদ। মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন বস্তুর পার্থক্য প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দময় নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই সেই আত্মা—তিনি পুণ্যবান্ পাপী, সুখী দুঃখী, সুন্দর কুৎসিত, মনুষ্য পশু—সর্বত্র একরূপ। তিনিই জ্যোতির্ময়। তাঁহার প্রকাশের তারতম্যেই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি বেশী প্রকাশিত, কাহারও ভিতর অল্প; কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থই নাই। কাহারও পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর একজনের পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে—ইহাতে শরীরে কোন পার্থক্য হইতেছে না। কেবল দেহের অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্য অনুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এইখানেই বুঝিয়া রাখা ভাল যে, বেদান্তদর্শনে ভাল-মন্দ বলিয়া দুইটি পৃথক্ বস্তু নাই। সেই এক জিনিষই ভাল-মন্দ—দুই হইতেছে, আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত, এবং বাস্তবিক কার্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে-জিনিষকে আমি সুখকর বলিতেছি, কাল আবার একটু ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া ঘৃণা করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তুটির বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্যই ভেদের উপলব্ধি হয়, সেই জিনিষটিতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভাল-মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যে-অগ্নি আমার শীত-নিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ? অতএব যদি আত্মা শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে-ব্যক্তি অসৎকার্য করিতে যায়, সে স্বরূপের বিপরীত আচরণ করিতেছে—সে নিজ স্বরূপ জানে না। ঘাতক-ব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উহাকে আবৃত রাখিয়াছে মাত্র, উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে-ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কখনও তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না।
৭০
'অণুর অণু, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গভীরে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়া শোকশূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে অবস্থিতের ন্যায়, সেই অনন্ত ও সর্বব্যাপী আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা একেবারে দুঃখশূন্য হন।'
৭১
'এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না।'
৭২

এই যে 'বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না,'—এ-কথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা চিন্তাজগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীষ্টানরা বাইবেলকে কখনও সেরূপ ভাবে দেখে নাই। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মনুষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া উহা লিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা জগতে যে-সকল বিভিন্ন পদার্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ—বেদে ঐসকল বস্তুর নামের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস—বেদের দ্বারাই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেকটি শব্দ পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্তার মনের সমুদয় ভাবই যেন এই গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এই কার্য নীতিসঙ্গত কেন? না, বেদ উহা বলিতেছেন। এই কার্য অন্যায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতটা শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই ঋষিগণের সত্যানুসন্ধানে কি সাহস দেখ, তাঁহারা বলিলেন, 'না', বারংবার বেদপাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন।'
৭৩
কিন্তু ইহাতে এই এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, তাঁহার পক্ষপাতিত্বদোষ হইল। এইজন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে। 'যাহারা অসৎ-কর্মকারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা কখনও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।'
৭৪
কেবল যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, যাঁহাদের কার্য পবিত্র, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, তাঁহাদিগের নিকটেই সেই আত্মা প্রকাশিত হন।
৭৫

আত্মা সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে-রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে-রথের লাগাম খুব মজবুত ও সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে-রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, সেই রথ অবশেষে বিনষ্ট হয়।

৭৬
সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা—চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান।
৭৭
যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাহার আদি-অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাঁহাকে যে উপলব্ধি করে, সে মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়।
৭৮
কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন—এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপৎসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হও, 'উঠ, জাগো এবং যে পর্যন্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পার, সে পর্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।'
৭৯

এখন দেখিতেছি, সমগ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই 'অপরোক্ষানুভূতি'। এই বিষয়ে সময়ে সময়ে মনে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের মনে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে—আরও নানা সন্দেহ উঠিবে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে দেখিব, আমরা আমাদের পূর্ব-সংস্কারের দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্ব-সংস্কারের প্রভাব খুব বেশী। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য কর্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা ঐগুলি শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করি, তবে সেগুলি আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা—কার্যকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল এক-ই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজনবাদীদের মতে সুখের অন্বেষণ করা মানুষের কর্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের সুখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় সুখ অন্বেষণ করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিষয়সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর সুখী কেবল আহারে ও পানে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কয়েকটি তারার অবস্থান জানিবার জন্য হয়তো কোন পর্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন; তিনি যে অপূর্ব সুখের আস্বাদ লাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিবে, তাঁহাকে পাগল মনে করিবে। হয়তো বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্যন্ত করিবার সঙ্গতি নাই। তিনি হয়তো কয়েক টুকরা রুটি ও একটু জল খাইয়াই পর্বতচূড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিলেন, 'ভাই কুকুর, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ; তুমি ঐ সুখ ভোগ করিতেছ; উহা হইতে উচ্চতর সুখ তুমি কিছুই জান না; কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা সুখকর। আর তোমার যদি নিজের ভাবে সুখ অন্বেষণ করিবার অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।' এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমগ্র জগৎকে নিজের ভাবে চালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমগ্র জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার সুখও যে ঐভাবেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখন তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক উপযোগবাদীর (Utilitarian) সহিত ধর্মতত্ত্ববাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক উপযোগবাদী বলেন, 'দেখ, আমি কেমন সুখী! আমার কিছু টাকা আছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। ধর্ম অনুসন্ধানের অতীত; উহার অন্বেষণে না যাইয়া আমি বেশ সুখে আছি।' বেশ, ভাল কথা। উপযোগবাদিগণ, তোমরা যাহাতে সুখে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট না করিয়া সুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করুন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহার মতানুযায়ী কার্য করিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে, 'যদি এরূপ না কর, তবে তুমি মূর্খ'; আমিও বলি, 'তুমি ভ্রান্ত, কারণ তোমার পক্ষে যাহা সুখকর, তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। যদি আমাকে কয়েক টুকরা সোনার পিছনে দৌড়াইতে হয়, তবে আমার জীবনধারণ বৃথা হইবে।' ধার্মিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এই মাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, যাহাদের এই নিম্নতর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধর্মাচরণ সম্ভব। ভোগ করিয়া ঠেকিয়া আমাদিগকে শিখিতে হইবে; যতদূর আমাদের দৌড়, ততদূর দৌড়াইয়া লইতে হইবে। যখন আমাদের এই সংসারের দৌড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ইহার অতীতলোক প্রতিভাত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ সমস্যা আমার মনে উদিত হইতেছে। কথাটা শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সত্য কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কখনও কখনও আর এক রূপ ধারণ করিয়া উদিত হয়—তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, অথচ উহা আপাতরমণীয়। এ-কথা তোমরা সকল সময়েই শুনিতে পাইবে। অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। উহা এই যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে, কেবল সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে, আর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিবে। অবশ্য এ-কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু না বলিয়া তো আর পথ দেখিতেছি না। জগতের দুঃখ দেহের পুরাতন বাতব্যাধির মত; দেহের এক অঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দিলে বাত পায়ে যাইবে, পা হইতে তাড়াইয়া দিলে অন্যত্র যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন, উহা কোনমতে দূর হইবে না, কোথাও না কোথাও থাকিবেই। দুঃখও সেইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত। বর্তমানকালে পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা খুব উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, তাহাও তো আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি। যদি আমি কোন বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা এই যে, বাসনা কেবল দুঃখই আনে—উহা তো ভিক্ষুকের অবস্থা। ভিক্ষুক সর্বদাই কিছু চায়, কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না—অমনি পাইবার ইচ্ছা হয়; কেবল চাই—চাই—সব জিনি চাই। সমগ্র জীবন কেবল তৃষ্ণাতুর যাচকের অবস্থা—বাসনার দুরপনেয় তৃষ্ণা। বাসনা পূরণ করিবার শক্তি যে-নিয়মে বর্ধিত হয়, বাসনার শক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ বেগে বর্ধিত হইয়া থাকে। অনন্ত জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে কোথাও যদি একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটি গহ্বর উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের সুখ উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন মানুষের অথবা কোন জীবজন্তুর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—পশুর সংখ্যা

কমিতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা তাহাদের সমুদয় খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করিয়া বলিব—সুখ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্বল জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি বেশী সুখী হইবে? না, তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে। কিভাবে সুখের যুগ আসিবে, তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। ইহা তো প্রত্যক্ষের বিষয়। আনুমানিক বিচার দ্বারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কখনও হইবার নয়।

পূর্ণতা সর্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তস্বরূপ—সেই নিজস্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। তুমি, আমি—সকলেই সেই নিজ নিজ অনন্ত স্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্যন্ত বেশ কথা, কিন্তু ইহা হইতে কয়েকজন জার্মান দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ ব্যক্ত হই, যতদিন না আমরা সকলে পূর্ণমানব হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা—অতএব ইহার এই তাৎপর্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীমভাবে সসীম হইব—এ-কথা তো অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এই মতে সন্তুষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জরিত করা হয়—ধর্মের পক্ষে ইহা মহা অনিষ্টকর। আমাদের জানা উচিত, জগৎ এবং মানব—ঈশ্বরের অবনত ভাবমাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে—আদম প্রথমে পূর্ণমানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই নাই, যাহা শিক্ষা দেয় না যে, মানুষ পূর্বাবস্থা হইতে হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা পশু হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখনও অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু দেখিব—ইহা অসম্ভব। এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব; তখন আমরা যেদিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক হইতে ফিরিয়া মূল অবস্থা—অনন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।

ইহারই নাম ত্যাগ। আমরা যে-জালের ভিতর পড়িয়াছি, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তখনই নীতি ও দয়াধর্ম আরম্ভ হইবে। সমুদয় নৈতিক অনুশাসনের মূলমন্ত্র কি? 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত রহিয়াছেন, তিনি নিজেকে বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই 'অহং'-এর আকার ধারণ করিয়াছেন। সেই অনন্ত হইতেই এই ক্ষুদ্র আমি-তুমির উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় ইহার উৎপত্তি—এখন এই 'আমি'কে আবার পিছু হঠিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, এতদিন তিনি বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন, নিজেকে চক্রে ফেলিয়াছেন—তাঁহাকে ঐ চক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বল—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু,' ততবারই ফিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি অনন্তকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—'আমি আমি; তুমি নও।' ইহা হইতে জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। 'আমি' মরিয়া যাইবে। 'আমার' জীবনের জন্য তখন কে যত্ন করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন উপভোগ করিবার যে-সব বৃথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাসনা—সর্বদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে-বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয়? তোমরা দেখিয়াছ, ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল এইঃ নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর জন্মে নাই? দুদিকেই যুক্তি সমান—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হইতে পার? যাহা হউক, আমি যে-কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বেশ বুঝা গেল।

'অনন্ত'—জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে? অবশ্য ইহা এইরূপই হইবে, তবে হয়তো পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক-ওদিক হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্বদা পুরাতন ভাবকেই ধরিয়া থাকি। যখন দেখি—কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল সকলেই বলিতেছেনঃ এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খুব জোর, উহা সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ অনুকৃতি—ছায়ামাত্র। সকল জ্ঞানহীন ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করিবার জন্য দৌড়াইতেছে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের পুরাতন অভ্যাসের বশবর্তী থাকিয়া কেবল পানাহারে মত্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এইসকল সুখকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ মত সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের মৃত্যু আছে—আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কখনও সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের ভিত্তিই ত্যাগ। আমার জীবনের সেই সেই মুহূর্তেই বাস্তবিক সাধুভাবাপন্ন হই এবং প্রকৃত জীবন যাপন করি, যে যে মুহূর্তে আমরা 'আমি'র চিন্তা হইতে বিরত হই। 'আমি'র যখন বিনাশ হয়—আমাদের ভিতরের 'পুরাতন মানুষ'—ক্ষুদ্র আমিত্বের মৃত্যু হয়, তখনই আমরা সত্যে উপনীত হই। আর বেদান্ত বলেন—সেই সত্যই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তিনি সর্বদাই আমাদের সহিত আছেন, শুধু তাহাই নহে, আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন। তাঁহাতেই আমরা সর্বদা বাস করিব। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে।

তখন আমরা দেখিব, তাঁহাতে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃত্যু। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের বর্তমান জীবনকে—শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়মাত্র বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে।

আত্মার মুক্তস্বভাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা; ৫ নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমরা পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা এখন যাহার আলোচনা করিব, সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদগুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন—অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহাদের মধ্যে—অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদটিতে বেদের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্ধাংশের বেশী এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদগুলি পাঠ করিলে একটি পরম লাভ হইয়া থাকে। লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবগুলি একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত—উদাহরণস্বরূপ আমরা ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবদ্গীতাকে সর্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্র নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন-না-কোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐসকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইবে না।

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটি বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সত্য কথা, কারণ বেদকে লোকে এত পবিত্র চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের ভিতর যেমন নানাবিধ গোঁজামিল আছে, বেদে তাহা নাই। বেদে অতি উচ্চ চিন্তা, আবার অতি নিম্ন চিন্তার সমাবেশ—সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্য খুঁটিনাটি—সবই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন ভাব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মূল যেমন তেমনই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা জানি, লোকের চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহারা প্রত্যেকটি ধর্মের পূর্বভাব পরিবর্তিত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন উচ্চ ভাবের সংযোজন করিতে থাকে। এখানে একটি, ওখানে একটি নূতন কথা বসানো হয়—কোথাও বা এক-আধটি কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তারপর টীকাকারেরা তো আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখনও করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা ধরাই যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তি-স্থলে যাইতে পারি—দেখিতে পাই, কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থূল আধিভৌতিক ধারণা হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণাগুলির বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিভাবে বেদান্তে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে ঐসকলের বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ যেন কেবল কতকগুলি ঘটনা মনে রাখিবার উপায়স্বরূপ লিখিতেছেন; তাঁহাদের যেন ধারণা—এসকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুশকিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই—ঐগুলি যাঁহাদের সময়ে লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এখন সেগুলির কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই—আর সামান্য যেটুকু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। ঐগুলির এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে ঐসকলের বিবরণ পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই সেগুলি উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলির রাজনীতিক উন্নতির বিষয়ে আমরা একটি বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোনপ্রকার স্বেচ্ছাতন্ত্র বা একনায়কত্ব সহ্য করিতে পারে না; সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করিয়া তাহারা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বাহ্য স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে; ভারতেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তবে দর্শন ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে—এইমাত্র প্রভেদ। বহুদেববাদ হইতে ক্রমশঃ মানুষ একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসনকর্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের অসহ্য হইল তাহা নহে; একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন—এ ধারণাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে গিয়া এইটিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদের শেষেই দেখিতে পাই—জগতের 'একেশ্বর' সিংহাসনচ্যুত!

ঈশ্বরের সগুণ ধারণা দূর হইয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর আর জগতের শাসনকর্তা পুরুষবিশেষ নন, তিনি আর অনন্তগুণসম্পন্ন মনুষ্যধর্মবিশিষ্ট কেহ নন, তিনি তখন ভাবমাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন—আমাদের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণা হইতে নির্গুণ ধারণায় পৌঁছান গেল, তখন মানুষও আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের সগুণত্বও তিরোহিত হইল, মানুষেরও একটি ভাবরূপ গড়িয়া উঠিল। সগুণ ব্যক্তি বাহিরে দৃশ্যমান, প্রকৃত তত্ত্ব অন্তরে। এইরূপে উভয় দিক্ হইতেই ক্রমশঃ সগুণভাব চলিয়া যাইতে থাকে এবং নির্গুণ ভাবের আবির্ভাব হয়। সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ নির্গুণের কাছে আসিতে থাকেন; এবং সগুণ মানুষও নির্গুণ মানুষভাবের কাছে আসিতে থাকে; তারপর ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কয়েকটি স্তরের অনুভূতির পর নির্গুণ মানুষভাব ও নির্গুণ ঈশ্বরভাব মিশিয়া যায়। আর এই দুইটি ধারা যে-যে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মিলিত হয়, উপনিষদ্ তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ

এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ বাণী—‘তত্ত্বমসি’। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই আছেন, এবং সেই পরমতত্ত্বই এই জগৎরূপে—বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিষদের কার্য এইখানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিচার দার্শনিকদিগের জন্য রহিল। স্বভাবতই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। যদি স্বীকার করা যায়, এক নির্গুণভাবই পরিদৃশ্যমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্য—‘এক’ কেন ‘বহু’ হইল? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মানুষের অমার্জিত বুদ্ধিতে স্থূলভাবে উদিত হয়ঃ জগতে দুঃখ—অশুভ রহিয়াছে কেন? সেই প্রশ্নটিই স্থূলভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে—দার্শনিক দৃষ্টিতে ঐ প্রশ্নের বিচার। সেই ‘এক তত্ত্ব’ কেন ‘বহু’ হইল? আর উহার উত্তর—শ্রেষ্ঠ উত্তর ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ; বাস্তবিক সেই এক তত্ত্ব বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব আপাতপ্রতীয়মান মাত্র, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্গুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত নির্গুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদ, অবশ্য তাঁহাদের ঐ মত বড় উন্নত বা মার্জিত নয়। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না—ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে তাঁহারা উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেনঃ তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই—কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—শান্তভাবে আমাদিগকে উহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সবই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি সুখ-দুঃখ ভোগ করিব—সবই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আছে; আমাদের কর্তব্য—ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরও বেশী কষ্ট পাইব। কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে?—বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তাঁহাদের মতানুযায়ী বেদের অর্থও আছে; প্রমাণ বলিয়া তাঁহারা সেইগুলিই সকলকে মানিতে বলেন এবং তদনুসারে উপদেশ দেন।

আরও অনেক দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মায়াবাদী ও দ্বৈতবাদিগণের মাঝামাঝি। তাঁহারা পরিণামবাদী। তাঁহারা বলেনঃ সমুদয় জগৎ যেন ভগবানের শরীর। ঈশ্বর সমগ্র প্রকৃতির ও সকল আত্মার আত্মা। সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ—কিছুকাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই সঙ্কোচের কারণ অসৎকর্ম। মানুষ অসৎকার্য করিলে তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন না সে আবার সৎকর্ম করিতে আরম্ভ করে; সৎকর্ম আরম্ভ করিলে আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে। ভারতীয় এইসকল বিভিন্ন মতের ভিতর—এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল মতের ভিতরই—একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি উহাকে ‘মানুষের দেবত্ব’ বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, এমন কোন যথার্থ ধর্ম নাই, যাহা কোন-না-কোনরূপে—পৌরাণিক বা রূপকভাবে হউক অথবা দর্শনের মার্জিত সুস্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব প্রকাশ না করে যে, জীবাত্মা যেই হউক অথবা ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উহা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আনন্দ ও শক্তি—দুঃখ ও দুর্বলতা নয়। এই দুঃখ কোনরূপে তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জিত মতগুলি এই দুঃখকে মূর্তিমান্ অশুভ, শয়তান বা আহ্রিমান বলিয়া কল্পনা ও ব্যাখ্যা করিতে পারে। অন্যান্য মত একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ‘মায়াবাদ’ প্রভৃতি দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সকল মতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্তস্বভাব। এইসকল দার্শনিক মত ও প্রণালী কেবল মনের ব্যায়াম—বুদ্ধির চালনামাত্র। একটি মহৎ উজ্জ্বল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের ও সকল ধর্মের কুসংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত বলেন, অন্য যাহা কিছু তাহা উপাধি মাত্র। কিছু যেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতি সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনি উহা বর্তমান। ঐ দেব-স্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবেই উহার কার্য হইতে থাকিবে। আমাদের ঐ দেবভাবকে আহ্বান করিতে হইবে, তবেই উহা নিজে নিজেই প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমকি-পাথরে আগুন ঘুমাইয়া থাকে, সে আগুনকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্যক। অগ্নি দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে বাস করে, উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কেবল ঘর্ষণ আবশ্যক। অতএব এই অগ্নি—এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে; কারণ গুণ উপার্জন করা যাইতে পারে, সুতরাং উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্তস্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মার স্বভাব—আমাদের জন্মগত অধিকার; আমরা যে-সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, সেগুলি আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—উহা কখনও নিজেকে মৃদু, কখনও বা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার প্রকাশমাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি—সকলই সেই এক অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এইরূপ আমাদের সাধারণ জ্ঞানও—উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরূপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিৎ-এর—জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পায়ের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞান এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। এই কারণে বৈদান্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে-সকল সুখভোগ করি, এমন কি অতি ঘৃণিত সুখ পর্যন্ত, তা সবই আত্মার

স্বরূপ সেই এক ব্রহ্মানন্দেরই প্রকাশমাত্র।

এই ভাবটিই বেদান্তের সর্বপ্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয়; আর আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্মেরই এই মত। আমি এমন কোন ধর্মের কথা জানি না, যাহার মূলে এই ভাব নাই। সকল ধর্মের ভিতরেই এই সার্বভৌম ভাব রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বাইবেলের কথা ধর—উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্র ছিলেন, অবশেষে পাপকার্যের দ্বারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপক-বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ গ্রন্থের লেখকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের—অথবা তাঁহারা উহা যেভাবেই বর্ণনা করুন না কেন—প্রকৃত মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে-সকল দুর্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে-সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি, সেগুলি তাহার উপর আরোপিত আবরণ বা উপাধিমাত্র এবং খ্রীষ্টধর্মেরই পরবর্তী ইতিহাস দেখা যায়—খ্রীষ্টানেরা সেই পূর্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনায়, শুধু তাই নয়, তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন। পুরাতন ও নূতন 'টেস্টামেণ্ট' লইয়া সমগ্র বাইবেলেরও এই ইতিহাস। মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারাও আদম ও আদমের জন্মের পবিত্রতায় বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা—মহম্মদের আগমনের পর হইতে সেই লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাই, তাঁহারাও নির্বাণ-নামক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী; উহা এই দ্বৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্বাণ অবস্থাও ঠিক তাই; আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম এই—সেই বিনষ্ট নির্বাণ-অবস্থা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্মেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—যাহা তোমার নয়, তাহা তুমি কখনও পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নও। তুমি তোমার নিজের জন্মগত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য এই ভাবটি তাঁহার নিজকৃত কোন গ্রন্থের নামপ্রদানচ্ছলে বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ' অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় উহা লাভ করিতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ ব্যাপারটি ভ্রমমাত্র, তুমি কখনও রাজ্যভ্রষ্ট হও নাই—এই মাত্র প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা উহা ফিরিয়া পাইবার উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা-অর্চনা করিলে এবং নিজে কোন বিশেষ নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, 'প্রকৃতির অতীত কোন পুরুষের সম্মুখে তুমি যদি পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।' আবার কেহ কেহ বলেন, 'তুমি যদি ঐরূপ পুরুষকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে পার, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।' উপনিষদে এই বিভিন্ন রকমের উপদেশই পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে উপনিষদ্ বুঝাইব, ততই ইহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ—রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমাদের এইসকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, কারণ তোমাদের রাজ্য কখনও নষ্ট হয় নাই। যাহা তোমরা কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্টা করিবে কি? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। যদি তোমরা নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমরা এই মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আর যদি নিজেদের বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নয়; এইবার যাহা বলিব, তাহা আমাকে অতি সাহসের সহিত বলিতে হইবে—এইসকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তোমাদিগকে সে-কথা বলিয়াছি। ইহা শুনিয়া তোমাদের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে, ততই দেখিবে আমার কথা সত্য কিনা। মনে কর—মুক্তভাব তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়, তাহা হইলে তোমরা কোনরূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর—তোমরা মুক্ত ছিলে, এখন কোনরূপে সেই মুক্তভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতে মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত ছিলে, তবে কিসে তোমাদিগকে বদ্ধ করিল? যে স্বতন্ত্র, সে কখনও পরতন্ত্র হইতে পারে না; যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল—সে কখনও স্বতন্ত্র ছিল না; এই স্বাতন্ত্র্য-প্রতীতিই ভ্রম ছিল।

তাহা হইলে এই দুই পক্ষের কোন্‌টি গ্রহণ করিবে? উভয় পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ যদি বল, আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহা আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে—আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, সুতরাং তুমি যে আত্মাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, তাহা তোমার ভ্রমমাত্র। অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই মুক্ত। অন্যরূপ হইতে পারে না। মুক্তস্বভাবের অর্থ—বাহ্য সকল বস্তুর অধীনতা হইতে মুক্ত। অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কারণরূপে কোন কার্য করিতে পারে না। আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত—এইভাব হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা আসিয়া থাকে। আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করা চলে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই আত্মার উপর কার্য করিতে পারে না। কারণ মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর কিছু কার্য করিতে পারে; আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল; ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষ নামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য করিতে পারে। যদি আত্মা সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে আত্মা মুক্তস্বভাব, তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য করিতে পারে না—কখনও পারিবে না। তাহা হইলে আত্মা কখনও মরিবেন না, আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত। আত্মার মুক্তভাব, অমরত্ব এবং আনন্দ—সকলই এই ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, মায়ার অতীত। ভাল কথা; যদি বল, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এখন বদ্ধ হইয়াছে; তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্তস্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মুক্তস্বভাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্তু অপর পক্ষে পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্তস্বভাব; এই যে বদ্ধ হইয়াছি বোধ হইতেছে, ইহাই ভ্রান্তিমাত্র। এই দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ লইব? হয় বলিতে হইবে—প্রথমটি ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত;

বদ্ধভাব সত্য আর মুক্তভাব ভ্রমাত্মক—ক্ষণকালের জন্যও আমি এ-কথা মানিয়া লইতে পারি না।

সকল দর্শনেই কোন-না-কোন ভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খুব আধুনিক দর্শনেও এই আলোচনার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই দল আছেন; এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, আত্মার ধারণা ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণাগুলির পুনঃপুনঃ স্থানপরিবর্তন; এই সংহতি—যাহাকে তোমরা শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছ, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশগুলির ক্রমাগত স্থানপরিবর্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কয়েকটি বৌদ্ধসম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন—একটি মশাল লইয়া চতুর্দিকে দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে একটি আলোকের বৃত্ত দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ঐ মশাল প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। সেইরূপ আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিমাত্র, উহাদের দ্রুত ঘূর্ণনে এই 'অহং'-ভ্রান্তি জন্মিতেছে।

অতএব একটি মত হইল এই যে, শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিন্তাশক্তির দ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতেছে, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই দুই পক্ষ আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিতেছে—একজন বলিতেছেন, আত্মা ভ্রমমাত্র; অপরে আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। কোন্ মতটি লইব? অবশ্যই আত্মবাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া জড়বাদ অস্বীকার করিব। যুক্তি উভয়ত্র অনুরূপ, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল; কারণ জড় কি, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। আমরা কেবল নিজদিগকেই অনুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখি নাই, যিনি নিজের বাহিরে গিয়া জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখনও লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারে না। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ আত্মবাদ জগতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, জড়বাদ পারে না। জড়বাদের দিক্ হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্বে যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত ও বদ্ধভাব-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাহারই স্থূলভাবমাত্র। দর্শনসমূহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শনসমূহেও আমরা অন্য আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই। এক দল বলেন, মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্ত স্বভাব ভ্রমমাত্র—অপরে আবার বদ্ধভাবকেই ভ্রমাত্মক বলেন। এখানেও আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত, বদ্ধভাব যে ভ্রমাত্মক—আমরা এই মতই পোষণ করি।

অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্তই এই—আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্যমুক্ত। শুধু তাই নয়, আমরা বদ্ধ—এই কথা বলা বা ভাবাই বিপজ্জনক, উহা ভ্রম; উহা নিজেকে নিজে সম্মোহিত করা মাত্র। যখনই তুমি বল—আমি বদ্ধ, আমি দুর্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটি শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না।

আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি—তিনি বনে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্' উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল এবং শুনিল—সেই ব্যক্তির কণ্ঠনিঃসৃত 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্' ধ্বনি। যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি 'শিবোঽহম্' উচ্চারণ করিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা শত্রু কর্তৃক খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। 'সোঽহং সোঽহং'—আমি সেই, আমি সেই, তুমিও সেই। আমি নিশ্চয়ই মুক্ত পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তাই। 'তুমিই তিনি; আমিও তিনি'—ইহাই বীরের কথা।

তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ব মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আমাদের উপাস্য ও প্রেমাস্পদ সগুণ ঈশ্বর বিষয়ক মতবাদ অতি অপূর্ব, অনেক সময় এগুলি প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; কিন্তু বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিং-এর নেশার মত অস্বাভাবিক। ইহা আবার দুর্বলতা আনয়ন করে; জগতে পূর্বে যত না প্রয়োজন ছিল, এখন তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজন এই বলসঞ্চার—শক্তিসঞ্চার। বেদান্ত বলেন, দুর্বলতাই সংসারের সমুদয় দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলিয়াই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলিয়াই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করিয়া থাকি। দুর্বল বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদিগকে দুর্বল করিবার কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই দুঃখভোগ করিতেছি। এই ভ্রান্তি ত্যাগ কর, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা তো খুব সহজ সাদা কথা। এই-সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অদ্বৈত বেদান্ত যেভাবে আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। ভারতে এবং অন্যত্র এ বিষয়ে একটি গুরুতর ভুল হইয়াছিল। বেদান্তের আচার্যগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সর্বজনীন করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহারা যে-সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছিলেন, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে-প্রণালীতে তাঁহারা ঐ-সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিলেন—অবশ্য ঐ প্রণালী অতিশয় জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক উক্তিগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শিক্ষা করা যাইতে পারে না, আর এরূপ দর্শনের আবরণে অত্যন্ত নৈতিক শিথিলতা দেখা দিবে।

কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইহাই দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণ করিবার একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, তখন লোকে পঙ্কিল জল পান করিতেছে কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে শুদ্ধস্বরূপ, তবে এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা দাও না কেন? সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোট—সকলকেই বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও না কেন? যে-কোন ব্যক্তি জগতে দেহধারণ করিয়াছে, এবং যাহারা ভবিষ্যতে করিবে—সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা, ঝাড়ুদার, ধনী, দরিদ্র—সকলকেই ইহা শিক্ষা দাও না কেন—'আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই।

আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই।'

এখন ইহা বড় কঠিন কার্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কারের জন্য, অন্য কারণে নহে। সকল প্রকার কদর্য ও দুষ্পাচ্য খাদ্য খাইয়া এবং উপবাস করিয়া করিয়া আমরা নিজদিগকে সুখাদ্য খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে দুর্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এ ঠিক ভূত-মানার মত। লোকে সর্বদা বলিয়া থাকে, আমরা ভূত মানি না; কিন্তু খুব কম লোক দেখিবে, অন্ধকারে যাহাদের গা একটু ছমছম না করে। ইহা কেবল কুসংস্কার। এই প্রকার সব ব্যাপারেই এইরূপ।

আনন্দসহকারে বার বার বল—সত্যানুভূতির শক্তি লইয়া বল—আমি মুক্ত, আমি মুক্ত ছিলাম, চিরদিন মুক্ত থাকিব। বেদান্ত হইতেই এই মহান্ ভাবটি সঞ্চারিত হইবে এবং ঐভাব চিরদিন প্রাণবন্ত থাকিবার যোগ্যতাসম্পন্ন। বেদান্তের গ্রন্থগুলি কালই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই ভাবটি প্রথমে হিব্রুদের অথবা উত্তরমেরুনিবাসীদের মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই তত্ত্বটি সত্য, আর যাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহা বিশেষ সম্পত্তি নয়। মানুষ পশু দেবতা—সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহাদিগকে এই সত্য শিখাও। জীবনকে দুঃখময় করিবার প্রয়োজন কি? লোককে নানাপ্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নয়, এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে বেদান্তের উপদেশ দাও, তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলেঃ ইহা সন্ন্যাসীদের জন্য—সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা বনে বাস করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ঠিক; কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন-না-কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ অনেক দিন জগৎকে শাসন করিয়াছে, আর ইহাই তাহার ফল। ভাল, একটি নূতন পরীক্ষা কর না কেন? হয়তো সকল ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটি লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কাজ করিলাম।

ভারতবর্ষে আবার একটি মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহা পূর্বোক্ত তত্ত্বপ্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। তাহা এইঃ 'আমি শুদ্ধ, আমি আনন্দস্বরূপ'—এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে তো আমি সর্বদা ইহা দেখাইতে পারি না। এ কথা আমরা স্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন। জগতে যত শিশু জন্মিয়াছে, প্রত্যেকেই দেখে তাহার মাথার উপরের আকাশ বহুদূরে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা মোটেই আকাশের দিকে যাইতে চেষ্টা করিব না? কুসংস্কারের দিকে গেলেই কি সব ভাল হইয়া যাইবে? যদি অমৃত লাভ করিতে না পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে? আমরা এখনই সত্য অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে?

নানাপ্রকারের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে-কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী, বালক-বালিকা যখন দৈহিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন শিক্ষা পায়, তাহাদিগকে আমি এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ আমি জানি, একমাত্র সত্যই বল বা শক্তি প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে আমরা কিছুতেই বীর্যবান হইব না, আর বীর না হইলে সত্যেও যাওয়া যাইবে না। এইজন্যই যে-কোন মত, যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকলপ্রকার বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত অসম্ভব আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়—আমি সেই প্রণালীগুলি পছন্দ করি না, কারণ মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি নিতান্ত নিষ্ফল।

যাঁহারা ঐগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলি মনুষকে বিকৃত ও দুর্বল করিয়া ফেলে—এত দুর্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্যলাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তি এই পার্থিব দুর্ভোগের একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ঔষধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই শক্তিই মূর্খের একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপীরা অন্য পাপীদের দ্বারা, উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। যখন সকল দায়িত্ব আমাদের উপরে পড়ে, তখন আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যত ভালভাবে কাজ করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই তেমন পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, বল দেখি, যদি একটি ছোট শিশুকে তোমাদের হাতে দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্তে তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের স্বভাব যেমন হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরূপ যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখনই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবের স্ফুরণ হইবে; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও উপর চাপাইতে হয় না, যখন শয়তান বা ঈশ্বর—কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, তখনই আমরা যথাশক্তি ভালভাবে কাজ করি। আমিই আমার অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভের কর্তা, আমিই শুদ্ধ ও আনন্দস্বরূপ। বিরোধী ভাবগুলি বর্জন করিতে হইবে।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
৮০

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র উপায়—নিজেকে এবং সকলকে বলা যে, আমিই সেই। পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে শক্তি আসে। যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পায়ে বল পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। 'শিবোঽহং'-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে, পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞানসূর্যের কিরণ যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, ততই মোহ চলিয়া যায়, অজ্ঞানরাশি দূর হয়—ক্রমশঃ এমন এক সময় আসে, যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় এবং একমাত্র জ্ঞান-সূর্যই অবশিষ্ট থাকে।

অবশ্যই এই বেদান্ততত্ত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই (ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগকে যদি আমি বলি শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম গেল। অনেক লোক আমাকে বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিলে ধর্ম কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে পরিচালিত করিবার কেহ না থাকিলে আর ধর্ম কি হইল? কেহ আমাদিগকে শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব কিরূপে? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে চাই। আমরা এইভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমাদের ভাল লাগে। প্রতিদিন কেহ না কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এখন ইহা যত ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে-সকল কুসংস্কার আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটি স্মরণ করিয়া হাসিব, এবং আনন্দ ও দৃঢ়তার সহিত সত্যই বলিব—আমিই সেই আত্মা, চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং সর্বদা তাহাই থাকিব।

কর্মজীবনে বেদান্ত - প্রথম প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত —১০ নভেম্বর, ১৮৯৬]

কর্মজীবনে বেদান্তদর্শনের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকে আমাকে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মতবাদ হিসাবে খুব ভাল হইলেও কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা যাইবে, তাহাই প্রকৃত সমস্যা। যদি কার্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বু্দ্ধির একটু ব্যায়াম ব্যতীত কোন মতবাদের কোন মূল্যই নাই। অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন; বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। ধর্মের আদর্শসমূহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে বেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কল্পিত, সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতবাদগুলির বিষয়েই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্বতগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে মতবাদগুলি আবার কর্মমুখর নগরীর রাজপথে কার্যে পরিণত হইতেছে। আমরা এই মতগুলির আরও একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জন অরণ্যবাসের ফল নহে, পরন্তু যে-সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই রাজারাই এগুলির প্রণেতা।

শ্বেতকেতু
৮১
আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থী ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চাল-জনপদের সভায় রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জান?'—'না'। 'কিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান?—'না'। 'তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ?' রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কিছুই জান না।' বালক পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, 'আমিও এসকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না?' তখন পিতা রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজাকে এই রহস্য-বিদ্যা শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, 'এই বিদ্যা—এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজারাই জানেন, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহা জানিতেন না।' যাহা হউক, তিনি এসম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক সার্বভৌম রাজা অপেক্ষা অধিকতর কর্ম-ব্যস্ত মানুষ আর কল্পনা করা যায় না, তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে নানাদিক্ হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন করা অবশ্যই সম্ভব, আর যখন আমরা পরবর্তী কালের ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করি—আপনারা অনেকেই বোধ হয় এই গ্রন্থখানি পড়িয়াছেন, ইহা বেদান্তদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য—তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্র এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চির শান্তভাব! এই তত্ত্বকে 'কর্মরহস্য' বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা 'অকর্ম' বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তবে তো আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেয়ালগুলিই পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা তো নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের গুঁড়ি—এইগুলিই তো তাহা হইলে জগতে মহাতপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারাও তো নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলেই যে নিশ্চেষ্টতা কর্মে পরিণত হয়, তাহাও নয়। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখনও নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের সে সমতা কখনও নষ্ট হইবার নয়। আর আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, কার্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা ভাল।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কাজের জন্য যেমন একটা আকর্ষণ বোধ করিয়া থাকি, তেমন আকর্ষণ না থাকিলে কেমন করিয়া কাজ করিব? আমিও পূর্বে এইরূপ মনে করিতাম, কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কাজের ভিতরে যত কম আকর্ষণ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দরভাবে কাজ করিতে সমর্থ হই। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, ততই আমরা আরও বেশী কাজ করিতে পারি। যখন আমরা ভাবাবেগ সংযত করিতে পারি না, তখনই আমাদের শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হয়, মন চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু কাজ খুব কমই হয়। যে-শক্তি কার্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা শুধু হৃদয়াবেগেই পর্যবসিত হয়। মন যখন খুব শান্ত ও স্থির থাকে, কেবল তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যদি তোমরা জগতে বড় বড় কর্মকুশল ব্যক্তির জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাঁহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, কিছুই তাঁহাদের চিত্তের সমতা নষ্ট করিতে পারিত না। এইজন্য যে-ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা কাজ করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে-ব্যক্তি ক্রোধ ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে,

সে এ-জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে নিজেকেই যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সে বড় একটা কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত ক্ষমাশীল স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকেন।

বেদান্ত আমাদিগকে আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ অবশ্য 'বাস্তব' হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমরা 'কার্যকর' বলিতে পারি, তাহা হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে—নিজেদের মত করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হই। আমার ধারণা, আমি কোন এক বিশেষ ধরনের কাজ করিতে পারি; হয়তো তাহার অধিকাংশই মন্দ। অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়তো ক্রোধ, ঘৃণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে। এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা—আত্মসুখ ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেন, যাহা আমার সমুদয় স্বার্থপরতার—সমুদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ। আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। 'শাস্ত্রনিষ্ঠা' কথাটির অর্থ যেমন নিজ উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল করিয়া করা হয়, অর্থাৎ আমি যাহা বুঝি তাহাই শাস্ত্রীয়, আর তোমার মত অশাস্ত্রীয়—'কার্যকর' (practical) কথাটির অর্থও ঐরূপ হইয়া থাকে। আমি যাহা কাজে লাগাইবার মত বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে করি, দোকানদারিই একমাত্র কার্যকর ধর্ম। আমি যদি চোর হই, আমি মনে করি—চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম কার্যকর ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা সকলে কেমন যাহা পছন্দ করি ও করিতে পারি, শুধু সেই বিষয়েই এই 'কার্যকর' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই হেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে; উহা আদর্শ-হিসাবে কার্যকর। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শই 'আদর্শ' নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই ব্রহ্ম'—ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি—নানাবিধ তর্ক বিচারের পর এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, মানবাত্মা শুদ্ধস্বভাব ও সর্বজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখনও জন্মান নাই, কখনও মরিবেন না; আমি মরিব বা মরিতে ভীত—এসব কুসংস্কার মাত্র। আমি ইহা করিতে পারি বা পারি না—ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতে কোন কোন ধর্ম বলে—যে-ব্যক্তি নিজ হইতে পৃথক্ সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন—যে-ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন। অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর আমরা অনেকেই মনে করি, আমরা কখনই এই আদর্শে পৌঁছিতে পারিব না, কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, বালক-বালিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে—কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে—পূর্ব হইতেই রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত দিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে—প্রথম হইতেই আলোক ছিল। অন্ধকার কখনই ছিল না, দুর্বলতা কখনই ছিল না, আমরা নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি—'আমরা দুর্বল'; আমরা নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি—'আমরা অপবিত্র'। এইরূপে বেদান্ত শুধু যে বলেন—আদর্শকে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা নহে, উপরন্তু বলেন—উহা পূর্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ; আর যাহাকে আমরা এখন আদর্শ বলিতেছি, তাহাই বাস্তব সত্তা—তাহাই আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই মিথ্যা। যখনই তুমি বল, 'আমি মর্ত্য—ক্ষুদ্র জীবমাত্র', তখনই তুমি মিথ্যা বলিতেছ; তুমি যেন নিজেকে সম্মোহিত করিয়া অসৎ, দুর্বল, দুর্ভাগা করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এইঃ নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা; এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ যখনই তুমি ঐরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্ব হইতে অধিক মায়ার আবরণে আবৃত করিতেছ। অতএব যে-কেহ নিজেকে দুর্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত; যে-কেহ নিজেকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত; সে জগতে একটি অসৎ চিন্তার স্রোত বিস্তার করে। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে: বেদান্তে আমাদের এই বর্তমান জীবনকে—এই মায়াময় মিথ্যা জীবনকে আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই। কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহার অন্তরালে যে সত্যজীবন সদা বর্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। মানুষ পূর্বে কিছুটা পবিত্র ছিল, আরও পবিত্র হইল—এমন নহে; বাস্তবিক সে পূর্ব হইতেই শুদ্ধ—তাহার সেই শুদ্ধ স্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য পূর্ব হইতেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

বেদান্ত আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা বনে অথবা পর্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ মানুষও ছিলেন না—আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তাঁহারা অত্যন্ত কর্মময় জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত, সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত। তখনকার কালে রাজারাই সর্বময় কর্তা ছিলেন, এখনকার মত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব চিন্তা করিবার সেগুলি জীবনে পরিণত করিবার ও মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ঐসকল তত্ত্ব অনুভব করা তো অনেক সহজ,

কারণ তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবনে অনেক অবসর, সুতরাং আমাদের যখন কাজ এত কম, আমরা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, তখন আমরা যে ঐসকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। পূর্বকালীন সর্বময় সম্রাটগণের সহিত তুলনায় আমাদের সময়ের অভাব তো কিছুই নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অক্ষৌহিণী-পরিচালক অর্জুনের তুলনায় আমার কাজের তাড়না কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনিবার এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার সময় পাইলেন; সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরামের জীবনে ইহা পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সদ্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব—আমরা যতটা ভাবি, তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটি আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি, কিন্তু আদর্শকে কখনই নীচু করা উচিত নয়। এ আমাদের জীবনের একটি প্রলোভন। অনেকে আছে—তাহারা আমাদের মিথ্যা অভাব ও বাসনাগুলির জন্য নানাপ্রকার আপত্তি দেখায় আর আমরা মনে করি, উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা কখনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত মিলাইতে হইবে, বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, বেদান্তের মূলকথা—এই একত্ব বা অখণ্ডভাব। দুই কোথাও নাই, দুইপ্রকার জীবন নাই, অথবা দুইটি জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ও-সকল কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। একটিমাত্র জীবন আছে, একটিমাত্র জগৎ আছে, একটিমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই একটি সত্তা; প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নহে। পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—এরূপ কথা বেদান্ত একেবারে অস্বীকার করেন।

কতকগুলি লোক দয়াপরবশ হইয়া 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারণী সভা'(Anti vivisection Society) স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই সভার জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বন্ধু, আপনারা খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দু-একটি পশুহত্যার এত বিরোধী কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগুলি আমাদের খাদ্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে।' কি ভয়ানক কথা! বাস্তবিক পশুগুলিও তো সেই অখণ্ড সত্তারই অংশ। যদি মানুষের জীবন অমর হয়, পশুর জীবনও অমর। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন—প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক্ হইতে দেখিলে এ প্রভেদও দেখা যায় না। অবশ্য তৃণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু যদি অতি উচ্চে আরোহণ কর, তবে ঐ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ সমান বোধ হইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টিতে এ-সবই সমান; আর যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমাকে মানিতে হইবে, নিম্নতম পশু এবং উচ্চতম প্রাণী সমান, তাহা না হইলে প্রতিপন্ন হয়—ভগবান্ মহা পক্ষপাতী। যে-ভগবান্ মনুষ্যনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আর পশুনামক তাঁহার সন্তানের প্রতি এত নির্দয়, তিনি মানুষ অপেক্ষাও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও প্রস্তুত। আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ ঈশ্বর তো এরূপ নহেন। যাহারা এরূপ বলে, তাহারা জানে না, তাহারা কত দায়িত্বহীন—হৃদয়হীন! তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এক্ষেত্রে আবার 'কার্যকর'-শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রকৃত কথা এই, আমরা খাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ-ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনাবিশেষে উহা খাইতে বাধ্য হইলেও আমি জানি—উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এইঃ মাংসভোজন না করা, কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা; কারণ পশুমাত্রই আমার ভাই—বিড়াল কুকুরও। যদি তাহাদিগকে এরূপ ভাবিতে পার, তবে তুমি সর্বপ্রাণীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের দিকে একধাপ অগ্রসর হইয়াছ—মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাবের তো কথাই নাই। উহা তো ছেলেখেলা-মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি যদি এমন কোন মতের কথা বল, যাহাতে তাহাদের বর্তমান কার্যের—বর্তমান আচরণের সহিত খাপ খায়, তবেই তাহারা বলে, ইহা কার্যকর।

মনুষ্য-স্বভাবে ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আমরা সম্মুখে এক পা-ও অগ্রসর হইতে চাই না। তুষারমগ্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যেমন পড়া যায়, মনুষ্যজাতি সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই বোধ হয়। শুনা যায়, ঐরূপ অবস্থায় লোক ঘুমাইতে চায়। যদি তাহাদিগকে জোর করিয়া জাগাইতে চাও, তাহারা নাকি বলে, 'আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে ঘুমাইতে বড় আরাম!' তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হয়। আমাদের প্রকৃতিও তেমনি; আমরাও সারাজীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে উপরের দিক্ বরফে জমিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাই। অতএব সর্বদাই আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে; যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে খাট করিয়া তোমার স্তরে নামাইয়া আনিতে চায়, যদি কেহ শিক্ষা দেয়—ধর্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। ঐরূপ ধর্মাচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমায় বলে, 'ধর্মই জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়াস', তবে আমি তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ দুর্বলতা সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে তো ইন্দ্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া নিজদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তারপর আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্বোক্তভাবে শিক্ষা দিতে চায় এবং তুমি ঐ উপদেশ অনুসরণ কর, তবে কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ-সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমার দেশে ধর্মসম্প্রদায়গুলি ব্যাঙের ছাতার মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতন নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, যে-সম্প্রদায়গুলি সংসার ও ধর্ম একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে, আর যেখানে উচ্চতম আদর্শ সাংসারিক অনিত্য বাসনার সহিত মিলিত করার—ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে টানিয়া আনার ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেখানেই রোগ প্রবেশ করে। মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—

তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর একটি দিক্ আছে। আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। আমরা সকলেই সেই লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি। দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত; যে-কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল মাত্রাগত—পরিমাণগত; প্রকারগত নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই সেই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। সবই এক—চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মা-রূপেই হউক, সবই এক; প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। তাই অন্যে ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহারও নিন্দা করিও না, সাহায্য করিতে পার তো কর; যদি না পার হাত গুটাইয়া লও; সকলকে আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতিই হয় না। এভাবে কখনও কাহারও উন্নতি হয় না। অন্যের নিন্দা করিলে কেবল বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। সমালোচনা ও নিন্দা দ্বারা বৃথা শক্তিক্ষয় হয় মাত্র; আর শেষে আমরা দেখিতে পাই—অন্যে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক সেই দিকেই চলিতেছি; আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতা-মাত্র।

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের ধারণা এবং 'মানুষ পাপী' ইত্যাদি ধারণা—এই দুইটি ভাবই কার্যতঃ এক, তবে একটি ভুল দিকে চলিয়াছে। প্রচলিত মত নেতিভাবাপন্ন, বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। একটি মত মানুষকে তাহার দুর্বলতা দেখাইয়া দেয়, অপরটি বলে—দুর্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিও না; আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে। মানুষ যখন প্রথম জন্মিয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি—জানা গিয়াছে। সকলেই জানে, নিজের কি রোগ; অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জগতের সমক্ষে কপট আচরণ করিতে পারি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি। বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলে বিশেষ কিছু উপকার হইবে না, তাহাকে ঔষধ দাও, মানুষকে কেবল সর্বদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নয়—রোগপ্রতিকারের উপায় নয়। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতিকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে-শক্তি পূর্ব হইতে বিরাজিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দাও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ দেখাইয়া বলেনঃ তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ; তুমি যাহাকে পাপ বল, তাহা তোমাতে নাই। পাপগুলি তোমার অতি নিম্নভাবের প্রকাশ; যদি পার, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিষ আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও 'না' বলিও না, কখনও 'পারি না' বলিও না। ওরূপ কখনও হইতে পারে না, কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নয়। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, তুমি সর্বশক্তিমান্।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মূলসূত্র মাত্র। আমাদিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে—প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, মানুষ যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মতবাদরূপেই থাকিয়া যাইবে। ধর্ম দ্বারা যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে হয়, তবে ধর্মকে এমন হইতে হইবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেইখানেই ধর্মের সাহায্য পাইতে পারে; দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চশিখরে—সর্বদা সমভাবে ধর্ম যেন মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই বেদান্তের তত্ত্বগুলি অথবা 'ধর্মের আদর্শ' বা উহাদের যে-নামই দাও না কেন, কাজে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসস্বরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির বেশীর ভাগই দূরীভূত হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা অধিকতর শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস। তাঁহারা এই চেতনাসহ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহৎ হইবেন, এবং তাঁহারা মহৎ হইয়াছিলেন। মানুষ যতই অবনত হউক না কেন, এমন এক সময় অবশ্য আসিবে, যখন ঐ অবস্থায় বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, তখন সে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে শিখিবে। গোড়া হইতেই আমাদের ইহা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বাস শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব? আমরা বুঝিতে পারি, মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ—তাহাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসের ভাব অথবা ইহার অভাব। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিতঃ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছেঃ যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নয়, কারণ বেদান্ত 'একত্ববাদ' শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ সকলের মধ্যেই 'তুমি' রহিয়াছ। আত্মপ্রীতির অর্থ সর্বভূতে প্রীতি—সকল জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি, সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি। এই মহান্ বিশ্বাস-বলেই জগতের উন্নতি হইবে। ইহা আমার ধ্রুব ধারণা। তিনিই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেনঃ আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সব জানি; তোমরা কি জান, তোমাদের এই দেহের ভিতর কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে? কোন্ বৈজ্ঞানিক একটি মানুষের ভিতরে যাহা আছে, তাহা সবই জানিয়াছেন? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে মানুষ পৃথিবীতে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার শক্তির অতি সামান্য অংশই এ-যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তুমি নিজেকে দুর্বল বল কি করিয়া? আপাত-প্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, তাহা কি তুমি জান? তোমার ভিতরে কি আছে, তাহা জান কি? তোমার পশ্চাতে অনন্ত শক্তি ও আনন্দের সমুদ্র রহিয়াছে।

'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ'—এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে হইবে। দিনরাত্রি শ্রবণ কর, তুমিই সেই আত্মা। দিনরাত্রি পুনঃপুনঃ

বলিতে থাক, যে পর্যন্ত না ঐ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরায় ধমনীতে স্পন্দিত হয়, যে পর্যন্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যায়। সমুদয় দেহটিই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল; 'আমি জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্মা'—দিবারাত্র এই চিন্তা কর—যে পর্যন্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া যায়। ঐ ভাব ধ্যান করিতে থাক—উহা হইতেই পরে কর্ম আসিবে। 'হৃদয় পূর্ণ হইলে মুখ কথা বলে'—হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপ অবস্থাতেই যথার্থ কার্য করিতে সক্ষম হইবে। নিজেকে ঐ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—যাহা কিছু কর, পূর্বে সে সম্বন্ধে ভালভাবে চিন্তা কর। তখন ঐ চিন্তাশক্তি-প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। জড় যদি শক্তিশালী হয়, চিন্তা তবে সর্বশক্তিমান্। সেই চিন্তা—সেই ধ্যান লইয়া আইস, নিজেকে নিজের সর্বশক্তিমত্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের মাথায় কুসংস্কারপূর্ণ ভাবগুলি যদি মোটেই প্রবেশ না করিত। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব, দুর্বলতা ও নীচতার দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইতাম! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পৌঁছিতে পারিত! কিন্তু মানুষকে এই-সকলের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়; যাহারা তোমার পরে আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর করিও না।

অনেক সময় এই-সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। আমি জানি, অনেকে এই-সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা যথার্থই এই ভাব কার্যে পরিণত করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম শিক্ষা। নিজেকে অথবা অপরকে দুর্বল বলিও না। যদি পার লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। অন্তরের অন্তরে জান যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব—নিজদিগকে কাল্পনিক ব্যক্তির সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা—কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন একটি উদাহরণ দেখাও, যেখানে বাহির হইতে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাওয়া গিয়াছে। যাহা কিছু উত্তর আসিয়াছে, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা অনেকেই জান যে—ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে গা একটু ছমছম করিতে থাকে। ইহার কারণ অতি শৈশবকাল হইতেই এই-সব ভয় মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে—এই ভয়ে, বন্ধু-বান্ধবের ঘৃণার ভয়ে, অতি প্রিয় কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরকে এগুলি শিখাইবে না। প্রবৃত্তি জয় কর। ধর্মবিষয়ে শিখাইবার আর বেশী আছে কি?—কেবল বিশ্বের একত্ব ও নিজের উপর বিশ্বাস।

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ এই একত্ব অনুভব করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। আমরা জানি, তোমরাও এখন ইহা শিক্ষা দিতেছ। সকল দিক্ হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নয়, জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পার, যিনি আজ জগতের একত্ব অস্বীকার করিতে পারেন? জগতের নানাত্ব প্রচার করিতে কে এখন সাহস করে? এই সবই তো কুসংস্কার-মাত্র! একমাত্র প্রাণ বিদ্যমান, একমাত্র জগৎ বিদ্যমান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে 'নানা' রূপে প্রতিভাত হইতেছে—যেমন স্বপ্নদর্শনকালে একটি স্বপ্নের পরে আর একটি স্বপ্ন আসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা তো সত্য নয়। একটি স্বপ্নের পর আর একটি স্বপ্ন আসে—বিভিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। এখন ইহা পনর আনা দুঃখ ও এক আনা সুখরূপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়তো কিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা সুখে পরিপূর্ণ মনে হইবে—তখন আমরা ইহাকে 'স্বর্গ' বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে—উহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের আত্মাকেও আমরা ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিব। অতএব নানা জগৎ, নানা জীবন বলিয়া কিছু নাই। এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—জড় বা চৈতন্য, মন বা চিন্তাশক্তি অথবা অন্য কোনরূপে। সেই একই নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন—নিজেকে ও অপরকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া।

পৃথিবীতে এই মহান্ আদর্শের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কারগুলি দূর হউক। দুর্বল মানুষকে শুনাইতে থাক, ক্রমাগত শুনাইতে থাকঃ তুমি শুদ্ধস্বরূপ; ওঠ, জাগো হে মহান্, এই নিদ্রা তোমার সাজে না। ওঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিও না। হে সর্বশক্তিমান্, ওঠ, জাগো; স্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি নিজেকে পাপী বলিয়া মনে কর, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। তুমি নিজেকে দুর্বল বলিয়া ভাব, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। এই কথা জগৎকে বলিতে থাক, নিজেকে বলিতে থাক—দেখ ইহার কি শুভফল হয়, দেখ কেমন বিদ্যুৎ-ঝলকে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সবকিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যজাতিকে ঐ কথা বলিতে থাক—তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলেই দৈনন্দিন জীবনে ইহা অনুশীলন করিতে শিখিব।

'বিবেক' সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। তখন শিখিব, জীবনের প্রতি মুহূর্তে, আমাদের প্রতি কার্যে কিভাবে সদসৎ-বিচার করিতে হয়, কিভাবে সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হয়। আমাদের জানিতে হইবে—পবিত্রতা ও একত্বেই সত্যের পরীক্ষা। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেমই সত্য, কারণ উহা মিলনকারক; ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্বের ভাব আনে—পৃথক্ করে। ঘৃণাই তোমা হইতে আমাকে পৃথক্ করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য, ইহা একটি বিভাজনী শক্তি, ইহা পৃথক্ করে—বিনষ্ট করে।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক। তোমরা সকলে এক হইয়া যাও—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবারগুলি নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রাণীর সহিত এক হইয়া যায়। কারণ প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান্ আর সবই প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে, কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব দেখিতে হইবে, আমাদের কর্মগুলি একত্বসম্পাদক না বহুত্ববিধায়ক। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে ঐগুলি ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে ঐগুলি সৎকর্ম বলিয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হইবে, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক; দেখিতে হইবে—উহা আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি

উৎপাদন করিতেছে কিনা। যদি তাহা করে, তবে ঐরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে; যদি না করে, তবে উহা পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু শিখায়ও না; কিন্তু সেণ্ট পল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন তেমনি বলে, 'যাঁহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি।' আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার 'আমি'র জ্ঞান হয়, তারপর চেয়ারটির জ্ঞান হয়। আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটি জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞান লাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপ-মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও, সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে; আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আসে,
৮২
অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমিই'—যাহাকে তুমি 'আমি' বল। তোমরা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে পার যে, আমার 'আমি' আবার তোমার 'আমি' হইবে কিরূপে? তোমরা আশ্চর্য বোধ করিতে পার, এই শান্ত 'আমি' কিরূপে অনন্ত অসীম হইবে? কিন্তু বাস্তবিক তাই; শান্ত 'আমি' গল্পকথা-মাত্র। সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে, আর উহার কতকাংশ এই 'আমি'-রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসীম কখনও সসীম হন না—'সসীম' কথার কথা মাত্র। অতএব সেই 'আত্মা' নর-নারী, বালক-বালিকা, এমন কি পশু-পক্ষী—সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্বেশ্বর প্রভুকে না জানিয়া আমরা একটি নিশ্বাস ফেলিতে বা জীবনধারণ করিতে পারি না; আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন—সকলই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত। বেদান্তের ঈশ্বর সর্বাধিক জ্ঞাত—কখনও কল্পনাপ্রসূত নন।

যদি এই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হন, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর কি? ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য। যাঁহাকে আমি সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা হইতেও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও? কারণ তুমিই তিনি—সেই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর! আর যদি বলি, তুমি তাহা নও, তবে আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই এক অখণ্ড সত্তা, সর্ববস্তুর একত্ব-স্বরূপ, সমুদয় জীবন ও অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ।

বেদান্তের এই-সকল ভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষতঃ জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা যায় দেখিতে হইবে, আর ইহাও দেখিতে হইবে, কিভাবে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শসমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে, কিভাবে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হইতেছে; সব দিক্ দিয়া এগুলি আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাহা হইলে আমরা আর বিপদে পড়িব না। কিন্তু সমগ্র জগৎ তো আর নিম্নতম আদর্শ হইতে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিবার সময় নাও পাইতে পারে; কিন্তু উচ্চতর সোপান-আরোহণে কি সার্থকতা—যদি পরবর্তিগণকে আমরা ঐ সত্য সহজে শিক্ষা না দিতে পারি? অতএব বিষয়টি বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক, আর প্রথমত উহার জ্ঞানভাগ—বিচারাংশ বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক, যদিও আমরা জানি, বিচারের বিশেষ কিছু মূল্য নাই, হৃদয়েরই প্রয়োজন বেশী। হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মত রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়—উহা গৌণভাবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি প্রহরীর মত, কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রহরীর বেশী প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোলমাল থামাইতে হয়, অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্যও ততটুকু। এইরূপ বুদ্ধি-বিচারের পুস্তক যখন পড়া হয়, তখন একবার উহা আয়ত্ত হইলে সকলেরই তো মনে হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। কারণ বিচারশক্তি অন্ধ, উহার নিজের গতিশক্তি নাই, হাত-পাও নাই। হৃদয়—অনুভবই বাস্তবিক কাজ করে, উহা বিদ্যুৎ অথবা আরও দ্রুতগামী বস্তু অপেক্ষা দ্রুত গমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই—তোমাদের হৃদয় আছে কি? যদি থাকে, তবে তুমি তাহা দ্বারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার হৃদয়ে এতটুকু অনুভব-শক্তি আছে, তাহাই প্রবল হইবে, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে—দেবভাবাপন্ন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সবকিছুতে, সর্ববস্তুতে একত্ব অনুভব করিতে পারে—নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারে। বুদ্ধি তাহা পারে না। 'বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন প্রণালী কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।'
৮৩

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশা-অনুসরণ' পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় লেখক কেমন অনুভবের উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতে প্রায় সকল মহাপুরুষই অনুভবের উপর জোর দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক, বিচার না করিলে আমরা নানাপ্রকার ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারের ভিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটি নিষ্ক্রিয় গৌণ সহায়মাত্র; প্রকৃত সাহায্য অনুভবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্ধিত হইতেছে। যদি না কর, তবে তুমি একজন বড় বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধিবাদী হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?—বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকতক কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়বান্ হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। হৃদয়ই জীবন, হৃদয়ই বল, হৃদয়ই তেজ—হৃদয় ব্যতীত যতই বুদ্ধির

চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন হৃদয় তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং এই বিষয়টি তোমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটি বিশেষ কার্যকরী শিক্ষা; কারণ বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলে মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকে মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন্ শাস্ত্র কি সত্য বলিতেছে—তাহা কি করিয়া জানিতে পার? তুমিও সেইরূপ অনুভব কর বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, তুমি-আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি, তাহাতেই তুমি-আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্মা তাঁহাদের দিব্য-আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার দেবত্বই ঈশ্বরের প্রমাণ। যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বর নাই, কখনও হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই আদর্শ অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর স্বরূপতঃ তুমি মহাপুরুষই আছ; কেবল উহা অবগত হও। কখনও ভাবিও না—আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে 'আমি দুর্বল' বা 'ওরা দুর্বল' এরূপ বলাই একমাত্র পাপ।

কর্মজীবনে বেদান্ত - দ্বিতীয় প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা—১২ নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি গল্প
৮৪
বলিব—একটি বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। গল্পটি প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটি সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন।'

তাহার মাতা বিবাহিতা ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা নারীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা তো দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, 'আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করিতাম, সেই অবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাহা জানি না; এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা।'

বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিলে ঋষিগণ তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার গোত্র কি?' বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিলাম—তোমাকে শিষ্য করিব।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম রাখিলেন 'সত্যকাম', —অর্থাৎ যে সত্য কামনা করে।

প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গরুর সেবার ভার দিয়া বলিয়া দিলেন, 'এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে যাও—যখন সর্বসুদ্ধ সহস্র গরু হইবে, তখন ফিরিয়া আসিবে।' সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গরুগুলির মধ্যে একটি প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, 'আমরা এখন এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে লইয়া তোমার গুরুর নিকট ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।' সত্যকাম বলিল, 'বলুন প্রভু!' বৃষ বলিল, 'উত্তরদিক্ ব্রহ্মের এক অংশ; পূর্বদিক্, দক্ষিণদিক্, পশ্চিমদিকও তাঁহার এক এক অংশ। চারিদিক ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরও কিছু শিক্ষা দিবেন।' তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নিচয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় অগ্নি হইতে একটি বাণী শুনিতে পাইল—'সত্যকাম!' সত্যকাম বলিল, 'প্রভু, আজ্ঞা করুন।' তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ওল্ড টেস্টামেণ্টে এইরূপ একটি গল্প আছে—স্যামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, অগ্নি বলিলেন, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটি হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।' একটি হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম! এই অগ্নি, তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎও এক অংশ। মদ্গু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।' একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।' তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল; গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি। কে তোমাকে শিক্ষা দিল?' সত্যকাম বলিল, 'কোন মানুষে নয়; কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু শিক্ষা দিন, কেন না আমি শুনিয়াছি—আপনাদের ন্যায় গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে বিদ্যা কল্যাণের কারণ হয়।' দেবতাগণ পূর্বে তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ঋষি তাহাকে সেই শিক্ষাই দিলেন। বালক গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিবার জন্য বলিল। তিনি বলিলেন, 'ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু তো পূর্বেই জানিয়াছ।'

এই-সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল, আর সকলে কি শিখাইল—এই-সব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতে এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই-সকল বাণী আমাদেরই ভিতরে। আমরা আরও অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে উত্থিত। শিষ্য বরাবরই সত্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা বাহির হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—কর্মজীবনেই ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্যাবহারিক জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগ। ধর্ম হইতে কার্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সকলে সর্বদা অন্বেষণ করিতেছে; আর এই-সব গল্প পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, একত্বের ধারণা কিভাবে দিন দিন ব্যাবহারিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হইত, সেগুলির মধ্যেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন। যে অগ্নি তাঁহারা উপাসনা করিতেন, তাহাই ব্রহ্ম—এই পৃথিবী সেই ব্রহ্মের একাংশ ইত্যাদি।

পরবর্তী উপাখ্যানটি
৮৫
সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয়। ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার নিকট কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম

কার্যবশতঃ কোন স্থানে গিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটি একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। যখন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন?’ তখন বালক বলিলেন, ‘আমার মন এত খারাপ যে, কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।’ এমন সময় তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উত্থিত হইল, ‘প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জান।’ তখন তিনি বলিলেন, ‘প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ—সুখ-স্বরূপ, তাহা আমি জানি না।’ তখন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, ‘এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য—তুমি যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও সুখী হন। যিনি দিক্‌সকলে বাস করেন, আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।’

এখানেও আমরা কর্মজীবনে ধর্মানুভূতির কথা পাইতেছি। যাহাদিগকে তাঁহারা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেন, যে-সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদেরই একটি উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর বাস্তবিক ইহাই বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, ব্যাখ্যা করে—আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ বৃথা অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, বরং বলে—জগৎ কি তাহা বুঝ, যাহাতে জগৎ তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে।

সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে একথা বলে নাই যে, অগ্নি সূর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু—যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল, কিন্তু বলিয়াছিল, যে-চৈতন্য সূর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চক্ষে সবই আর এক রূপ ধারণ করিল। যে-অগ্নি পূর্বে কেবল হোম করিবার জড় অগ্নি ছিল, তাহা এক নূতন রূপ ধারণ করিল এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ হইল। পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর এক রূপ ধারণ করিল; সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যুৎ—সকলই আর এক রূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা গেল। কারণ আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্য এই-সকল বস্তুতে ভগবান্ দর্শন করা; বস্তুগুলি যেরূপ আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, সেগুলিকে সেভাবে না দেখিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জানা।

তারপর আর একটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। ‘যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি সুন্দর ও জ্যোতির্ময়; তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।’ এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষপ্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্বব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে এবং সূর্য-চন্দ্র-তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এখন এই-সব প্রাচীন উপনিষদে বিবৃত জন্মমৃত্যু-সংক্রান্ত কতকগুলি অদ্ভুত মতের
৮৬
কথা বলিব। হয়তো ইহা তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু পাঞ্চালরাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ‘তুমি কি জান, মৃত্যু হইলে লোকেরা কোথায় যায়? তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে? তুমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না কেন, শূন্যই বা হয় না কেন?’ বালক বলিল, ‘না, আমি এই-সকল কিছুই জানি না।’ সে তখন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, ‘আমিও ঐ-সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবগত নই।’ তখন পিতা রাজার নিকট গেলেন। রাজা বলিলেন, ‘এই জ্ঞান পূর্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই ঐ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেই জ্ঞানবলেই তাঁহারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।’

তখন পিতা কিছুদিন রাজার গৃহে বাস করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ‘হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্নস্তরের। এই পৃথিবী সেই অগ্নিস্বরূপ, সম্বৎসর উহার কাষ্ঠ, রাত্রি উহার ধূম, দিক্‌সকল উহার শিখাস্বরূপ, কোণসকল উহার বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিরূপ আহুতি দিয়া থাকেন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।’ রাজা এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই-সকল উপদেশের তাৎপর্য এইঃ তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎ সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন—‘হে গৌতম, মনুষ্যশরীরই সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি।’

আমরা এখানেও আবার দেখিতেছি—ধর্মকে কার্যে পরিণত করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে সংসারের ভিতর আনা হইতেছে। আর এই-সকল গল্পের রূপকে এই একটি তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মনুষ্য-কৃত প্রতিমা লোকের হিতকর ও সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা তো রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে চাও তো বেশ, কিন্তু পূর্ব হইতেই উহা অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির তো রহিয়াছে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়-সময়ে কর্মকাণ্ড এত জটিল ও বর্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যে প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের ভিতর একটি উচ্চতর গভীরতর অর্থ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই-সকল যাগযজ্ঞ কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের যুগে জ্ঞানিগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের মত তাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া ঐগুলিকে একেবার মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু ঐগুলির উচ্চতর তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে একটা ধরিবার জিনিষ দিলেন।

তাঁহারা বলিলেন 'অগ্নিতে হোম কর—অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হোম হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে—বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যে আমার মন্দির, যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্মাণ করিয়া থাক, কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনুষ্যদেহরূপ বেদীতে পূজা অন্যান্য অচেতন প্রতীকের পূজা অপেক্ষা অনেক বড়।'

এখানে আর একটি বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশই বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের ঐ অংশ পাঠ করিতেছি; যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে অর্চিপথে, তারপর ক্রমান্বয়ে দিন শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ-ষণ্মাসের নিকট গমন করে; মাস হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্যলোকে, সূর্যলোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করে। সেখানে কোন অমানব সত্তা তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই গতিরই নাম 'দেবযান'। যখন ঋষি ও জ্ঞানীদের মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন—এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন, এই-সব বাজে কথা মাত্র। এই চন্দ্রলোক, সূর্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব ব্যক্তি আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহারই বা অর্থ কি? হিন্দুদের মধ্যে একটি ধারণা ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে। ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয় তাহারা প্রথমে ধূমপথে গমন করে, পরে রাত্রি, তারপর কৃষ্ণপক্ষ, তারপর দক্ষিণায়ন-ষণ্মাস, তারপর বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। চন্দ্রলোকে দেবতাদের ভোগ্যরূপে পরিণত হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন চন্দ্রলোকে বাস করিতে থাকে। আর কর্মফল শেষ হইলে পুনর্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয়; তারপরে বায়ু, তারপরে ধূম, তারপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। সেখানে শস্যক্ষেত্রে শস্যরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্য-কর্তৃক খাদ্যরূপে গৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরূপে জাত হয়। যাহারা সৎকর্ম করিয়াছিল, তাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচজন্ম হয়, এমন কি তাহাদিগকে কখনও কখনও শূকরজন্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে-সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃপুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শূন্যও হয় না। আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি, আর পরে হয়তো আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া জীব আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলি অপেক্ষা যেন কিছু স্পষ্টতর বোধহয়, কিন্তু এই-সকল উক্তির তাৎপর্য বোধহয় এই যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বৃথা। মনে কর, অনেকে আছেন—তাঁহারা এখনও ব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম আবার ফল-কামনায় করা হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানা স্থান দিয়া গিয়া স্বর্গে উপস্থিত হন; আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাঁহাদের পুণ্যের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়—যাহা কিছুর নাম-রূপ আছে, তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ সেখানেও নাম-রূপ আছে। 'অনন্ত স্বর্গ' স্ববিরোধী বাক্যমাত্র, যেমন এই পৃথিবী কখনও অনন্ত হইতে পারে না; কারণ যে-কোন বস্তুর নাম-রূপ আছে, তাহার কালে উৎপত্তি, কালেই স্থিতি এবং কালেই বিনাশ। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির; সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নিচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আরবের মরুতে জল একটি অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এই জন্য মুসলমানেরা স্বর্গকে সর্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়তো স্বর্গকে শুষ্ক বলিয়া কল্পনা করিব, ইংরেজরাও তাহাই করিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনন্ত, মৃত ব্যক্তিরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। তাহারা সেখানে সুন্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে চিরকাল বাস করিতে থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয়; সকলে সর্বাংশে এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের স্বর্গের ধারণা এই যে, এই জীবনে সুখের যে-সকল বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলি সব চলিয়া যাইবে, কেবল সুখকর অংশগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে। স্বর্গের এই ধারণা আমাদের খুব সুখকর বটে, কিন্তু সুখকর ও সত্য—এ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্। বাস্তবিক চরম সীমায় না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না। মানুষের স্বভাব বড় রক্ষণশীল—মানুষ একবার কোন বিশেষ কার্য করে, আর একবার আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাহার মন কোন নূতন চিন্তা গ্রহণ করিতে চায় না, কারণ উহা বড় কষ্টকর।

উপনিষদে আমরা পূর্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতেছি। উপনিষদে কথিত হইয়াছে—এই-সকল স্বর্গ, যেখানে গিয়া মানুষ পিতৃপুরুষের সহিত বাস করে, সেগুলি কখনও নিত্য হইতে পারে না, কারণ যে-বস্তুর নাম-রূপ আছে, তাহা বিনাশশীল। যদি রূপময় স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতোমধ্যে লোকের মনে উদিত হইয়াছে যে, এই-সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, এবং স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্মের ফলভোগের স্থানমাত্র। এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। একটি কথা বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য-কারণের তত্ত্ব জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই-সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি সবই অন্তরের অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে কিনা, আমি বলিব, ইহা আগে

কার্যে পরিণত হইয়াছে, তারপর দর্শনে রূপায়িত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি কথা বলিত; পশুপক্ষী—চন্দ্রসূর্য তাঁহাদের সহিত কথা বলিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিষ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দ্বারা বা বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিংবা আধুনিক কালের প্রথা অনুযায়ী অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তাঁহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাও করেন নাই; তাঁহাদিগকে সত্য আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। অভ্যাসই ইহার সাধন ছিল, আর চিরকালই এরূপ থাকিবে। ধর্ম চিরকালই ব্যাবহারিক বিজ্ঞানরূপে থাকিবে। এমন ধর্ম কখনও ছিল না, যাহা শুধু দেবতাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঐরূপ ধর্ম কখনও থাকিবেও না। প্রথমে অভ্যাস, তারপর জ্ঞান। জীবাত্মা যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা উপনিষদেই রহিয়াছে। যাহারা ফল কামনা করিয়া কোন সৎকর্ম করে, তাহারা সেই সৎকর্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ফল নিত্য নহে। কার্যকারণবাদ এখানে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—কথিত হইয়াছেঃ কারণ অনুসারেই কার্য হইয়া থাকে; কারণ যাহা, কার্যও তাহাই হইবে; কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্যও নিত্য হইবে। কিন্তু 'সৎকর্ম করা'-রূপ কারণগুলি অনিত্য—সসীম, সুতরাং তাহার ফল কখনই নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর একদিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে, যে-কারণে 'অনন্ত স্বর্গ' হইতে পারে না, সেই কারণেই 'অনন্ত নরক' হওয়াও অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব খারাপ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্তে অন্যায় কর্ম করিতেছি, তথাপি এই জীবনটা অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সসীম কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল, এই জীবনের কর্মরূপ সান্ত কারণ দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। সারা জীবন সৎকর্ম করিলেও অনন্ত স্বর্গলাভ হয় না; হয়—মনে করিলে ঐ একই ভুল হইয়া থাকে। পূর্বে যে-সকল পথের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া—যাঁহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আর একটি পথ আছে। ইহাই মায়ার আবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—'সত্যকে অনুভব করা'; আর উপনিষদসমূহ বুঝাইতেছেন—এই সত্যানুভব কাহাকে বলে।

ভাল-মন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্যই আত্মা হইতে প্রসূত বলিয়া চিন্তা করিবে। আত্মা সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন। বল—জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, স্বর্গ-নরক সর্বত্র সেই প্রভুকে দেখ। কি মৃত্যু, কি জীবন—সর্বত্রই তাঁহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয় আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, জীবাত্মা জগতে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তখন উহা স্বর্গেই যাক, নরকে বা অন্যত্র যেখানেই যাক, কিছুই আসে যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি অথবা স্বর্গেই যাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থই নাই; কারণ আমার পক্ষে তখন সব জায়গা সমান, সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র; কারণ স্বর্গে, নরকে বা অন্যত্র আমি ভগবানের সত্তাই অনুভব করিতেছি। ভাল-মন্দ বা জীবন-মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই—শুধু এক অনন্ত ব্রহ্মই আছেন।

বেদান্তমতে—মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, আর বেদান্ত বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অন্যে নহে। যে-ব্যক্তি জগতে অন্যায় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি এখানে নানা বাধা বিঘ্ন বিপদ দেখে, তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি প্রতি বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপ দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সে-ই কেবল বলিতে পারে—'আমি এই জীবন উপভোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী।' এখানে আমি বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদে সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা। প্রথম হইতেই ব্যক্তিহীন ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাব খুবই জড়ভাবাত্মক, আর কেবল মনুষ্যোচিত গুণসম্পন্ন এমন এক ঈশ্বরের সঙ্গেই ইহার সঙ্গতি আছে, যিনি আমাদেরই মত একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বর-ধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এইরূপ ছিলেন। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে; ইহার সহিত নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই ব্যক্তি-ভাবশূন্য নির্গুণের ধারণা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় মনীষী—অন্ততঃ জগৎ যাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নির্গুণবাদের উপর বিরক্ত, কিন্তু মানবদেহধারী ঈশ্বরের চিন্তা করা আমার নিকট অবাস্তব, আমার নিকট এই সগুণবাদ অতিশয় হাস্যাস্পদ, নিম্নভাবাপন্ন, অতি স্থূল, এমন কি অধর্ম বলিয়া বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে ভগবানকে স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্‌টি—জীবিত ঈশ্বর, না মৃত ঈশ্বর? যে-ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, যাঁহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না—সেই ঈশ্বর অথবা অনুভূত ঈশ্বর? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে ধ্বংস! তিনি নিজে আসিয়া—আমাদের কি করিতে হইবে বলিয়া দেন না কেন? কেন তিনি ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেকে সন্তুষ্ট। আমাদের কল্পনার কি দীনতা!

অপরপক্ষে—নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি; তিনি একটি তত্ত্বমাত্র। সগুণ নির্গুণের মধ্যে প্রভেদ এই—সগুণ ঈশ্বর ব্যক্তিমাত্র, আর নির্গুণ ঈশ্বর দেবদূত, মানুষ, পশু এবং আরও কিছু, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। কারণ নির্গুণের

মধ্যে সব সগুণ ভাবই রহিয়াছে—উহা জগতের সমুদয় বস্তুর সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু। 'যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে',
৮৭
নির্গুণও তদ্রূপ।

আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দেখি নাই; তুমিও দেখ নাই; এই চেয়ারখানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বর দেখিতে হয়, তারপর তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ারখানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া 'আমি আছি, আমি আছি', বলিতেছেন। যে মুহূর্তে তুমি বল—'আমি আছি', সেই মুহূর্তেই তুমি সেই সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, সকল প্রাণীর ভিতরে না দেখিতে পাও, যদি তাঁহাকে—ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছে, তাহার মধ্যেও না দেখিতে পাও?

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥'
৮৮

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমিই জগতে জন্মগ্রহণ করিতেছ। তুমি এই সব; তুমিই অপূর্ব জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু—ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক ইহা প্রচলিত ঈশ্বর-ধারণার বিরোধী; সেই ঈশ্বর কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই কখনও দেখিতে পায় না। পুরোহিতরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলি, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি এবং তাঁহাদিগকে পূজা করি, তাহা হইলে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একখানি ছাড়পত্র দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিব! এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়—এই স্বর্গবাদ প্রভৃতি পুরোহিতদের মূর্খতা ছাড়া আর কি?

অবশ্য নির্গুণবাদ অনেক কিছু ভাঙিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের নিকট হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়—উহাতে মন্দির গীর্জা প্রভৃতি সব উড়িয়া যায়। ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু সেখানে এমন অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরাজহরত রহিয়াছে। যদি লোককে এই নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় শেখান যায়, পুরোহিতদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে। তথাপি পৌরোহিত্য বাদ দিয়া নিঃস্বার্থভাবেই ইহা শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও ঈশ্বর—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোন মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমরা প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা, কিন্তু এইখানে তোমার উপাসনা অপেক্ষা আর কি অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভব করিতেছি, আর জানিতেছি—তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই; কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির-গীর্জা নির্মাণ করিতেছ, আর সর্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্য সবকিছুই অন্তর্হিত হইবে, আমি মুক্ত হইব।

ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী উপাসনা। মতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নয়। তাহারা তাহাদের পিতামহেরা কি বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথা লইয়া মতবাদ রচনা করিবে। পিতামহেরা আবার বিশ হাজার বৎসর পূ্র্বেকার প্রপিতামহদের নিকট শুনিয়াছিলেন, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহাদের মতে—ইহাই কাজের কথা, আর আমাদের ভাবগুলি কার্যে পরিণত করা যায় না। বেদান্ত অবশ্য বলেন, সকলেই নিজ নিজ পথে চলুক—ক্ষতি নাই, কিন্তু পথই তো লক্ষ্য নয়। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নয়, কিন্তু ইহা সত্যে পৌঁছিবার সোপানমাত্র। ঐগুলিতে সুন্দর মহৎ ভাব আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেনঃ বন্ধু, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগতে যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তিনি সর্বদা এখানেই রহিয়াছেন। তুমি যে জীবিত আছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া—তিনি জগতের নিত্য সাক্ষী। সমুদয় বেদ যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'তে সদা বর্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্যকেও দেখিতে পাইতে না, সবকিছুই তোমার নিকট শূন্য অন্ধকার জড়রাশি বলিয়া প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন করা হইয়া থাকে—ইহাতে তো ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের সকলেই মনে করিবে, 'আমি ঈশ্বর—অতএব যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল; ঈশ্বরের আবার পাপ কি?' প্রথমতঃ এই প্রকার অপব্যাখ্যার আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অপর পক্ষে অনুরূপ আশঙ্কা নাই? লোকে পৃথক্‌ স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জন্মিয়াছে এবং সারা জীবনই এইভাবে কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? অপর পক্ষকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

কর। যাঁহারা ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, এবং যাঁহারা ব্যক্তিভাবশূন্য নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, উভয়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতে বড় বড় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে? বড় বড় কর্মী ও চরিত্রবান্ ব্যক্তির আবির্ভাব অবশ্যই নির্গুণ সাধকদের মধ্য হইতে হইয়াছে। ভয় হইতে উচ্চ নৈতিকশক্তিসম্পন্ন মানুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? ইহা কখনই হইতে পারে না। 'যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরকে হিংসা করে, সেখানেই মায়া। যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মময় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।'
৮৯
তখন সবই তিনি, অথবা সবই আমি—তখন আত্মা মলিনতা-মুক্ত হইয়াছে। তখন—কেবল তখনই আমরা বুঝিতে পারি, প্রেম কাহাকে বলে। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি মুক্তভাব। মুক্তস্বভাব হইলে তবেই প্রেম দেখা দেয়, তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্বে নহে।

অতএব এই মত অনুসরণ করিলে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, এমন কথা বলা উচিত নয়; যেন অপর মতটি কখনও মানুষকে অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় না, উহা যেন সমস্ত জগৎ রক্তে প্লাবিত করে না, উহা যেন মানুষকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না! 'আমার ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ; এস, যুদ্ধ করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করি।'—দ্বৈতবাদ হইতে জগতে এই তো ফল হইয়াছে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ হইতে প্রশস্ত উদার দিবালোকে এস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? আমাদের সম্মুখে এই আলোকময় বিশ্বজগৎ রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটি বস্তু আমাদের। বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখনও এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে সেই অংশটি তোমাদের অবশ্যই মনে আছে, তিনি কিরূপে উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে, অধঃ ঊর্ধ্বে—সর্বত্র প্রেমের চিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান্ অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত। যখন সেই ভাব তোমাদের মধ্যে আসিবে, তখনই বুঝিবে যথার্থ ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে। সমুদয় জগৎ তখন এক ব্যক্তি হইয়া যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের প্রতি আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখও তোমায় ছাড়িতে হয় না, কারণ তোমাদের মনে থাকিতে পারে, পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি—সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই। মানুষ—অনন্তস্বরূপ নির্গুণ মানুষও নিজেকে সগুণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন নিজদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বলা যায় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের কর্মদ্বারা নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকেও বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেল, মুক্ত হও; নিয়মকে পদদলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই; কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে কোন বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে? স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত অধিকার। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও; তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের মত অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু যে বাস্তবিক ভিক্ষুক, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। দৃশ্য উভয়ত্র সমান, কথাবার্তাও হয়তো এক, কিন্তু কি পার্থক্য! ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া একজন আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অন্যজন দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছে। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ একজন মুক্ত, অন্যজন বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নয়—শুধু অভিনয়ের জন্য তিনি ইহা অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক জানে—এ তাহার চিরকালের অবস্থা—ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এ দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা বিধির বিধান, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি—যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ আমরা ভিক্ষুকমাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে পৌরাণিক কাল্পনিক প্রাণীদের নিকটও সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু এই সাহায্য কখনও পাইলাম না, তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি; এইভাবে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে থাকে।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে—তোমরা সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কখনও সাহায্য পাও নাই; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, সব নিজের ভিতর হইতে। যে-কাজে তুমি নিজে চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে। দেখিবে, উহা সর্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে-দল রহিয়াছে, সে-দলকে আর দ্বিতীয়বার দেখিবে না—সর্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই কিছু করিতে পারিতেছে না। আমাদের জীবনও সেইরূপ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাটস্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া নিজ দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়?' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার সন্ধান পাইবেন না, কারণ তিনি নিজেই যে রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার সন্ধান পাইবেন না, কারণ তিনি নিজেই যে রাজা। আমরাই ঈশ্বর—এরূপ জানা এবং ঈশ্বর অন্বেষণরূপ এই অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করাই বরং শ্রেয়ঃ। বেদান্ত বলেন, এইরূপে নিজদিগকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলেই আমরা সুখী ও সন্তুষ্ট হইতে পারি। নির্বোধের মত এ-সব অন্বেষণ ছাড়িয়া দিয়া শিশুর মত জগতে খেলা করিতে থাক।

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ-জগৎ ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্বে যে জগৎ নরককুণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাই যেন স্বর্গে পরিণত হয়। বদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ—স্বর্গ অন্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্বত্র বিরাজিত। পুনর্জন্মাদি যাহা কিছু—সব এখানেই হইয়া থাকে। দেবতা প্রভৃতি সবই এখানে—তাঁহারা মানুষেরই প্রতিরূপ। দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে! এখানে ইন্দ্র আছেন, তাঁহার চতুর্দিকে বিশ্বের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদেরই এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং এই জন্যই ইহা যথার্থ কাজে লাগাইবার যোগ্য। অবশ্য আমরা যখন মুক্ত হইব, তখন উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে পার্থক্য হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব দৃশ্য—সবই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি—বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটি কেবল আমাদের প্রকৃতির একদিক, অপর দিকে মুক্তি সর্বদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারী কর্তৃক অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটিতে নিজেদের মুখ লুকাইয়া নিজদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, ভ্রমবশতঃ আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভুলিতে পারি নাই, সর্বদাই উহা কোন-না-কোনরূপে আমাদের সম্মুখে আসিতেছে! আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জগতে স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকি, এ-সব আর কিছুই নয়—আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন-না-কোনরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা সর্বদাই আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভাবিতেছি—কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে; তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী অগ্নি সূর্য চন্দ্র তারা বা কোন দেবতা হইতে উত্থিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদেরই ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী—অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই পৃথিবী, এই নিয়ম, এই বিশ্বজগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এই সঙ্গীত—এই ধ্বনি সর্বদা আমাদের নিজেদেরই ছিল, এবং চিরকাল তাহাই থাকিবে। এক কথায় বেদান্তের আদর্শ—জগতে মনুষ্যের যথার্থ স্বরূপের উপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপকে—তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পার, তবে অন্য কোথাও তোমার অন্য কোন উপাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাইঃ যদি তুমি তোমার ভ্রাতাকে—যাহাকে তুমি দেখিয়াছ—ভালবাসিতে না পার, তবে যে-ঈশ্বরকে কখনও দেখ নাই, তাঁহাকে ভালবাসিবে কি করিয়া? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মনুষ্যের মুখে না দেখিতে পার, তবে তাঁহাকে মেঘে অথবা অন্য কোন জড় পদার্থে অথবা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে দেখিবে কি করিয়া? যে-দিন হইতে তোমরা সকল নরনারীর মধ্যে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্মিক বলিব, তখনই তোমরা বুঝিবে—ডান গালে কেহ চড় মারিলে তাহার দিকে বাঁ গাল ফেরানোর অর্থ কি। যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে, তখন সকল প্রাণী—এমন কি ব্যাঘ্র পর্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তাহাকে স্বাগত জানাইবে। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু। আমাদের আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানকে 'পিতা' বলা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব আছে; সাধকেরা তাঁহাকে 'মাতা' বলিয়া থাকেন। তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভাব আছে—তাঁহাকে 'প্রিয়সখা' বলা। সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব—তাঁহাকে 'আমার প্রেমাস্পদ' বলা। ইহার কারণ এই—প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন। প্রশ্ন হইল, 'কে?' প্রেমিক বলিলেন, 'আমি।' দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি আসিয়াছি' কিন্তু দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইলেন, 'কে?' তখন তিনি বলিলেন, 'প্রিয়, আমি তুমিই'; তখন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ভগবান্ এবং আমাদের মধ্যেও তেমনি। 'তুমি সকলেতে, তুমিই সব কিছু।' প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় ঈশ্বরের রূপ। 'কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্তকালের জন্য বাস করিতেছি; অনন্তকালের জন্য বিজ্ঞাত, অনন্তকাল ধরিয়া উপাসিত তোমাকে আমরা সর্বত্র পাইয়াছি।'

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভুল নয়। এই বিষয়টি কোনমতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে—আমরা ঐগুলিকে যতই অপরিণত মনে করি না কেন—তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নয়। কারণ মানুষ সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প ভাল; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প পবিত্রতা। অতএব সত্য-ধারণার ইহাও একটি দিক্ যে, অন্যকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরা যে-পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে—তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে। আর যখন তুমি মুক্তই হইলে, তখন অনিত্য কিছু দেখ কি করিয়া? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিভাবে? কারণ যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজেদের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে কখনই অপবিত্রতা দেখিতে পাইতাম না। বেদান্তে ইহা সাধনার একটি দিক্। আশা করি, আমরা সকলে ইহা জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য সারা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই-সকল বিচার-আলোচনায় আমরা এই ফল লাভ করিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পরিবর্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কার্য করিব। কারণ আমরা জানিলাম, সবকিছুই—আমাদের ভিতরে, আমাদেরই রহিয়াছে, আমাদের জন্মগত অধিকার।

আমাদের কাজ শুধু এই সত্য প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা।

কর্মজীবনে বেদান্ত - তৃতীয় প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা—১৭ নভেম্বর, ১৮৯৬]

পূর্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে 'সোপানারোহণ-ন্যায়ে' ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্বে উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ হইতে মহত্তর, কারণ আকাশে চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ তারা—সকলেই রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি।'
৯০
এখন প্রশ্ন হইতেছে—আকাশ হইতে মহত্তর কিছু আছে কিনা? সনৎকুমার বলিলেন—প্রাণ আকাশ হইতেও বড়। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটি সর্বব্যাপী তত্ত্ব, আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য। প্রাণ আকাশ হইতেও মহত্তর। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানা বিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, 'এই-সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া একত্র করে এবং এই একীভূত বিভিন্ন মধু যেমন জানে না, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াও ভুলিয়া গিয়াছি। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু সমুদ্রে পড়িলে তাহারা যেমন জানে না, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা তাহাই। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।'
৯১
পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এখন কথা এই, সকল জ্ঞান-লাভের দুইটি মূলসূত্র আছে। একটি সূত্রঃ বিশেষকে সাধারণে এবং সাধারণকে আবার সার্বভৌম তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্রঃ যে-কোন বস্তু ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রথম সূত্রটি ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন দেখান যায়—সেই একই ঘটনা পুনঃপুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত হই এবং উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটি প্রস্তর বা আপেল পড়িতে দেখি, তখন আমরা অতৃপ্ত হই; কিন্তু যখন দেখি, সকল প্রস্তর ও আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে 'মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম' বলি এবং তৃপ্ত হই। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইয়া থাকি। যদি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে চাই, সেখানেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে করিতে গেলে আমাদিগকে এই মূলসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ্, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে এই ভাবের উদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই—কিভাবে দেবতাগণ ক্রমশঃ পরস্পর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও প্রাচীনগণ ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে তাঁহারা সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কিভাবে সেখান হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণ-নামক সর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই-সকলের ভিতরে আমরা এই এক তত্ত্বই পাইতেছি যে, একটি বস্তু অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

সগুণ ঈশ্বর এই মূলসূত্রের আর একটি উদাহরণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্যীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটি শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা তো পর্যাপ্ত সামান্যীকরণ হইল না! আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার একটা দিক্ অর্থাৎ জ্ঞানের দিক্‌টি লইলাম, তাহা হইতে সামান্যীকরণ-প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকী প্রকৃতির অন্য এক দিক্ বাদ গেল। সুতরাং এই সামান্যীকরণ প্রথমতঃ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি ত্রুটি আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজের স্বরূপ অবলম্বনেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয়তো এক সময়ে ভাবিত, মাটিতে যাহা কিছু পড়ে, তাহা ভূতেই ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই ইহার যথার্থ ব্যাখ্যা; আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, তথাপি ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে অনেক ভাল তাহা নিশ্চয়; কারণ একটি ব্যাখ্যা বস্তুর বহিঃস্থ কারণ হইতে, অন্যটি বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই। যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক; আর যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এখন 'সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা'—এই তত্ত্বটিকেও এই সূত্র দ্বারা পরীক্ষা করা যাক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে সেই ঈশ্বরের আজ্ঞায় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকাল সগুণ-ঈশ্বরবাদের ইহাই একটি দুর্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, শুধু মানবীয় গুণগুলি বহু পরিমাণে বর্ধিত। ঈশ্বর শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—একেশ্বরবাদে এই দুইটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সগুণ-ঈশ্বরবাদ পর্যাপ্ত সামান্যীকরণ নয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রকৃতি হইতে লব্ধ তথ্য দ্বারা প্রকৃতির ব্যাখ্যা নয়। এই মতবাদে কারণ হইতে কার্য সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার এই ধারণা বাড়িতেছে যে, কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে, আর আধুনিক সর্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। এই কারণও আবার এক পুরাতন কারণের কার্য। শূন্য হইতে সৃষ্টি—আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট উপহাসের বিষয়।

পূর্বোক্ত দুইটি পরীক্ষার পর ধর্ম কি টিকিয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্মমত থাকে, যাহা এই দুইটি পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মন গ্রহণ করিবে। যদি আজকালকার মানুষকে পুরোহিত, গীর্জা অথবা কোন শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া কোন মত বিশ্বাস করিতে বলা যায়, তবে সে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবে না; তাহার ফল দাঁড়াইবে—ঘোর অবিশ্বাস। যাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহারা বাস্তবিক ভিতরে প্রচণ্ড অবিশ্বাসী। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন ধর্মের সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, ধর্মকে তাহারা পুরোহিতদের জুয়াচুরি মনে করে।

ধর্ম এখন একপ্রকার 'জাতীয়' ভাবে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি মহান্ উত্তরাধিকার, অতএব ইহাকে থাকিতে দাও—ইহাই আমাদের ভাব। কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্বপুরুষ ধর্মের জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এখন তাহা নাই; লোকে ধর্মকে এখন আর যুক্তিসঙ্গত মনে করে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্মেই 'একেশ্বরবাদ' বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না; আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে একেশ্বরবাদ প্রবল হইতে পারে নাই; এবং এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন যে, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে তর্ক-বিচার চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার ক্রিয়াশীল রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইওরোপে মধ্যযুগে, এমন কি—দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে—তাহার অনেকদিন পরেও একটি বিশেষ বিচারের বিষয় ছিলঃ গুণগুলি কি দ্রব্যের ভিতরে আছে, না গুণ ব্যতীতই দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড় পদার্থ-নামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে? আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটির অস্তিত্ব থাকে কিনা? বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেনঃ এরূপ একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই; এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীদের মত, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে, এবং ইহার পিছনে এমন কিছু আছে, যাহার কখনও পরিণাম হয় না; কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা 'দৃশ্য' মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখনও দ্রষ্টারূপে—কখনও বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে অপরিণামী বস্তু রহিয়াছে; সেই এক অপরিণামী বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

বুঝিবার উপযুক্ত একটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, তখন রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি—মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান থাকে না; আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যাবহারিক সত্তা দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না; আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবশ্যই ব্যাবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হয় না।

এখন আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Realist and Idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যাবহারিক সত্তা দেখেন, আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিক্ দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা—পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার বলিবার অধিকার আছে যে, এ-সবই সত্য।

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, ঈশ্বরের সগুণ ধারণা যথেষ্ট নয়। আমাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নয়। সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—এরূপ প্রমাণ

করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ-নির্গুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটে, আবার নির্গুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা—তাঁহাকে কেবল একটি ব্যক্তি বলিয়া ধারণা—অবশ্যই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ মানুষকে যেভাবে সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতরভাবে ঈশ্বরকেও তেমনি সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই আমাদিগকে অবশেষে নির্গুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নির্গুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে আরও ব্যাপক। কেবল নির্গুণই অনন্ত হইতে পারে, সগুণ সান্ত মাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা সগুণকে রক্ষাই করিলাম, উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আসে—নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নির্গুণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে; বাস্তবিক কিন্তু বেদান্তমতে 'আমিত্ব'-এর নাশ হয় না, উহাকে যথার্থভাবে রক্ষা করা যায়। আমরা সেই অনন্ত সত্তার সমাধান না করিয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কোনরূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই ঐরূপ করিতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও ঐরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরও কঠিন ও দুর্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। সামান্যীকরণ-প্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তদনুযায়ী যদি সকল বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নির্গুণ পুরুষ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে আমরা তিনিই। 'হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি'
৯২
—তুমি তিনিই, তুমিই সেই নির্গুণ সত্তা; তুমিই সেই ব্রহ্ম, যাঁহাকে সমুদয় জগতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সর্বদাই তুমি সেই! কিন্তু 'ব্যক্তি'-অর্থে নয়, নির্গুণ-অর্থে 'তুমি'। আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি সগুণ ব্যক্তি হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নির্গুণ অব্যক্ত। এই সগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নির্গুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নির্গুণ সত্তাই সত্য, তিনিই মানুষের আত্মা—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে কখনও সেই সত্য বলা হয় নাই।

এ-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেইগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কূট প্রশ্ন উঠিবে, কিন্তু ঐগুলির মীমাংসার পূর্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি—অদ্বৈতবাদ কি বলেন। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, সত্যের অন্বেষণ অন্যত্র করিতে হইবে না। স্থূল সূক্ষ্ম—সবই এখানে; কার্য কারণ—সবই এখানে, জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্বানুস্যূত সত্তারই সূক্ষ্ম পুনরাবৃত্তি-মাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহির্জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গ নরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, সেগুলিও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিরূপে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা এক অখণ্ড বস্তু, আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্ত-জীবভাবে আমরা যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ; আর যতই আমরা নিজেদের উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে নিজেদের পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের দুঃখ বাড়িবে। এই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই আমরা নীতির মূল ভিত্তি পাই; আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না। আমরা জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষের বা কতকগুলি পুরুষের ইচ্ছা। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নয়; কারণ উহা আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। হিন্দুরা বলেন—এই কার্য করা উচিত নয়, কারণ বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীষ্টান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীষ্টান আবার বলেন—এ-কাজ করিও না, ও-কাজ করিও না, কারণ বাইবেলে ঐসকল কার্য নিষিদ্ধ। যাহারা বাইবেল মানে না, তাহারা অবশ্য একথা শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে, যাহা এই নানাবিধ ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ সগুণ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে ঐ ধারণা পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু চাহিয়াছেন; আর যখনই ধর্মসম্প্রদায়গুলি এই মনীষিগণকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিবার মত উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি সংগঠিত ধর্মবিশ্বাস (organised faith) ত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্তমান কালে বিশেষতঃ ইওরোপে ইহা যত স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, আর কখনও কোথাও সেভাবে দেখা যায় নাই।

মনীষিদিগকে ধর্মের ভিতর রাখিতে হইলে ধর্মকে অবশ্য খুব উদার হইতে হইবে। ধর্ম যাহা কিছু বলে, সবই যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেহই বলিতে পারে না, সকল ধর্মই কেন এই এক দাবি করিয়া থাকে যে, তাহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে বাধ্য নয়। বাস্তবিক ইহার কারণ—গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কোন ধর্ম হয়তো কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল। ... মনে কর, মুসলমান-ধর্মের কোন আদেশের প্রতি তুমি (খ্রীষ্টান) দোষারোপ করিলে, তাহাতে মুসলমান স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবে 'কি করিয়া তুমি জানিলে আদেশটি ভাল কি মন্দ? তোমার ভাল-মন্দের ধারণা তো তোমার শাস্ত্র হইতে! আমার শাস্ত্র বলিতেছে, 'ইহা সৎকার্য।' যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন—তাঁহাদের শাস্ত্র আরও প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন—তাঁহার শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহার দ্বারা তুমি তুলনা করিতে পার? খ্রীষ্টান বলিবেন, ঈশার 'শৈলোপদেশ' দেখ; মুসলমান বলিবেন, 'কোরানের নীতি' দেখ। মুসলমান বলিবেন—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভাল, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরানে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারে না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। কোন গ্রন্থ মীমাংসক হইতে পারে না, সার্বভৌম কোন-কিছুর দ্বারাই মীমাংসা হওয়া চাই। যুক্তি অপেক্ষা সার্বভৌম আর কি আছে? কেহ কেহ বলেন, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানুসন্ধানে সমর্থ নহে। অনেক সময় যুক্তি ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কোন পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। ... আমি

কিন্তু বলি, যুক্তি যদি দুর্বল হয়, তবে পুরোহিত-সম্প্রদায় আরও দুর্বল, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তিই শুনিব, কারণ যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অন্য উপায়ে সত্যলাভের কোন আশা নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তিই অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ করিয়াও কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, তাহাদের প্রতিও আমাদিগকে সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল। আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ বড় হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে, আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফল। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখনও চিন্তা করে না; মানিয়া লওয়া যাক যে, মৃত্তিকা সবই বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাই থাকিয়া যায়। একটি গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্বাপেক্ষা বিচার বিবেচনাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে-কুকুর, গাভী ও মৃত্তিকা, তাহাই থাকিয়া যায়; কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব এই যে, সে মননশীল জীব; পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি, শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি; কারণ আমি যে-দেশে জন্মিয়াছি, সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাস করার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটি গরু যে আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ 'গো' শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে, কি করিয়া জানিলে? কারণ বেদে 'মনুষ্য' শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত!—আমি যে ভাবে আলোচনা করিয়াছি, সেভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কয়েকজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা লইয়া কয়েকটি অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, এবং সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই-সব তত্ত্ব কার্যে রূপায়িত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। লোকের কথার উপর বিশ্বাসের শক্তি অনেক, উহাতে বিপদও অনেক! এরূপ বিশ্বাস মনুষ্যজাতির উন্নতির স্রোত রুদ্ধ করে, আর আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, উন্নতিই আমাদের আবশ্যক। আপেক্ষিক সত্যের ক্ষেত্রেও সত্যলাভ অপেক্ষা সত্যের অনুসন্ধিৎসাই আমাদের নিকট প্রয়োজন। সত্যানুসন্ধিৎসাই তো জীবন।

অদ্বৈতবাদের এইটুকু গুণ যে, ধর্মমতের ভিতর এই মতটিই অনেকটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়। নির্গুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নির্গুণ পুরুষের পরিণাম, এই তত্ত্বগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য, আর অন্য সমুদয় ভাব—যথা ঈশ্বরের আংশিক ক্ষুদ্র ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ধারণাগুলি—বিচারসহ নয়। যুক্তিসঙ্গত এই ঈশ্বরবাদের আর একটি গুণ এই যে, ঐ আংশিক ধারণাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে—অনেকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, তথাপি ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা শখের ধর্ম চায়; আর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকই সত্যের বিমল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা তো দূরের কথা। অতএব এই শখের ধর্মও থাকা দরকার; ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখনও উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। ক্ষুদ্র ক্ষদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নির্গুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নির্গুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত; তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নির্গুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিকই জগৎটা কি? বিভিন্ন মন সেই নির্গুণেরই যতদূর ধারণা করিতে পারে, তাহাই; উহা যেন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত এক একখানি পুস্তকস্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে, আর প্রত্যককেই নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা একরূপ, সেইজন্য মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিষ একই প্রকার মনে হয়। তুমি আমি উভয়েই একখানা চেয়ার দেখিতেছি। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর, অপর কোন ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল; সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা এক প্রকৃতির, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগৎই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা; আর ব্যাবহারিক সত্তা তাহাকেই ভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ—প্রথমতঃ ব্যাবহারিক সত্তা সর্বদাই সসীম। আমরা যে-কোন ব্যাবহারিক সত্তা, অনুভব করি বা চিন্তা করি, দেখিতে পাই—উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া থাকে; আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যাবহারিক সত্তা। কার্যকারণ-ভাব কেবল ব্যাবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাকে সসীমরূপে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎই আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ সত্তা-মাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই সত্তা, আর এই টেবিলের আকৃতি ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই সদৃশ মানব-বুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যাবহারিক সত্তার উহা নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্বভৌম পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ গতি বা পরিণাম আপেক্ষিক ভাবমাত্র, আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই দুইটি পদার্থের আবশ্যক। সমুদয় সমষ্টিজগৎ এক অখণ্ডসত্তাস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার

পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টি সত্তা নিরপেক্ষ, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি অণুই নিরন্তর গতিশীল; একই সময়ে উহা পরিণামী ও অপরিণামী, সগুণ নির্গুণ—দুই-ই। ইহাই আমাদের জগৎ, গতি ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, 'তত্ত্বমসি'র অর্থও ইহাই। আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি, আর অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে এই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান জগৎ পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি—তাহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমুদ্র—সমুদ্রের অংশ নয়, উহা সমুদ্রস্বরূপ; কারণ যে অনন্ত শক্তিরাশি ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তাহার সবটাই তোমার ও আমার। তুমি আমি, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত—যেগুলির ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে; আর এই যে পরিবর্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তির বিকাশ মাত্র। যে পর্যন্ত না অনন্ত অনুভূত হয়, ততক্ষণ আমরা থামিতে পারিব না—আমাদের সকল শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া অনন্ত স্বরূপ লাভ করিবে। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। ঐগুলি যে আমরা অর্জন করিব, তাহা নয়; ঐগুলি আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। এখন আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে শুধু আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে-জ্ঞান লাভ করি, তাহা কোথা হইতে আসে? উহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?—আমাকে একবিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান—কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই; মানুষ ইহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ঐ সর্ষপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য একটি ক্ষুদ্র বীজে ছিল—মহাশক্তিরাশি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি—প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি আছে, তাহা ঐ জীবাণুকোষেই কুণ্ডলীকৃত হইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়! আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই নিহিত ছিল—অব্যক্তভাবে, কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এইঃ মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে ঐ অনন্তশক্তিমান সত্তা যেন জাগরিত হইয়া নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের পর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যখন এই অনন্তজ্ঞান অনুভূত হইবে, তখন জ্ঞানবান ও শক্তিমান হইয়া এই মানুষ দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে সেই অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য সাহায্য করি।

কর্মজীবনে বেদান্ত - চতুর্থ প্রস্তাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা—১৮ নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমরা এ পর্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অদ্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ-বিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মতগুলিতে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটি নির্দিষ্ট সসীম আত্মা আছে; প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল এই যে, প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি সেদিন তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইওরোপে দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মত। এক দলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর এক মতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণগুলি নিজেরাই থাকিতে পারে। অবশ্য আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন মত 'আমি আমিই' আত্মার অভিন্নতা-রূপ যুক্তির উপর স্থাপিত; কল্যকার যে-আমি, আজও সেই আমি, আর অদ্যকার আমি আবার আগামী কল্যের আমি হইব, শরীরে যে-সকল পরিণাম হইয়াছে, সেগুলি সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বদাই একরূপ। যাঁহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, আমরা কেবল এই পরিণামগুলিই জানি এবং এই পরিণামগুলি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অপরিবর্তনীয় ও অপরিণামী দ্রব্য স্বীকার করা বাহুল্যমাত্র, আর বাস্তবিক যদি এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপে কখনও উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্তমানকালেও ইওরোপে ধর্মবাদী ও বিজ্ঞানবাদী এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের
৯৩
ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে। একদলের বিশ্বাস, অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে—ইঁহাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি হার্বার্ট স্পেন্সার। তিনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি কোম্‌তের বর্তমান শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্বে মিঃ ফ্রেডেরিক হ্যারিসন ও মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে ইহাতেও সেই পুরাতন সমস্যা বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল এরূপ অনুমান করিবার আবশ্যকতাই অস্বীকার করিতেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না; অপর দল যুক্তি দেখানঃ এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি; অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতে এই মহান্‌ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে পাওয়া যায় নাই, কারণ আমরা দেখিয়াছি—গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না; শুধু তাই নয়, 'আত্মার অভিন্নতা-রূপ প্রমাণ, স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি—কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি—এই যুক্তিও কোন কাজের নয়। আর একটি যুক্তি, যাহা সচরাচর উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ। 'আমি যাই', 'আমি খাই', 'আমি স্বপ্ন দেখি', 'আমি ঘুমাই', 'আমি চলি'—এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেনঃ করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ-সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে 'আমি'টি অপরিবর্তিত রহিয়াছে, এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই 'আমি' নিত্য ও নিজেই একটি ব্যক্তি, আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপ্যাঁচের উপর স্থাপিত। এই 'আমি' এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে-কলমে পৃথক্‌ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহারকার্যের সহিত আমার একাত্মভাব হইয়া যায়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন 'আমি' ও 'দৌড়ানো' দুইটি পৃথক্‌ ভাব থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি স্মৃতিদ্বারা অস্তিত্বের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে-সকল অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছি, সেই-সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না—বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেক বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীতের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। দেখা যায়—অনেক উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেদের কাঁচনির্মিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবে। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাঁচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে; কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই স্মৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর অহংভাবের অভিন্নতা স্থাপন করিতে পারি না। তবে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে, গুণসমূহ হইতে পৃথকভাবে বিদ্যমান এমন কোন অহং-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা চলে না, যাহা সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও চিরকাল অভিন্ন। আমরা এমন কোন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না, যাহাতে কতকগুলি গুণ লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণসমূহের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা, আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সমন্বয় সাধিত হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এইঃ আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথকরূপে চিন্তা করিতে পারি না—এ-কথা সত্য, এবং পরিণাম ও অপরিণাম—এ দুইটিও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না; এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকে দ্রব্য বলা হইতেছে, তাহাই গুণ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই অপরিণামী সত্তা পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। পারমার্থিক সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নয়, সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যাবহারিক সত্তা হইয়াছে। অপরিণামী আত্মা আছেন, আর আমরা যেগুলিকে অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি বলিয়া থাকি, এমন কি এই শরীর পর্যন্ত সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু বাস্তবিক আমরা এক সময়ে দুই বস্তু অনুভব করি না, একটিই করিয়া থাকি।

যখন আমি নিজেকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা বৃথা। আর যখন আমি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখনও আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে কেহই বস্তু অনুভব করিতে পারে না।

এইটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের পুরাতন রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায়; আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটিই অবশিষ্ট থাকে। বিশ্লেষণ-প্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর এগুলি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ—দুয়েরই একত্র অনুভব হইয়া থাকে; বাস্তবিক তাহা কখনও হয় না। হয় দেহ, না হয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজের মনে মনেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

তুমি নিজেকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—ইহা প্রায় অসম্ভব, আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব, তাঁহারা যখন নিজেদের আত্মা-রূপে অনুভব করেন, তখন তাঁহাদের দেহবোধ থাকে না। তোমরা হয়তো দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি সম্মোহন (hypnotism)-প্রভাবে অথবা মৃগীরোগ বা অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে একপ্রকার বিশেষ অবস্থা লাভ করে। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারা যায়, তখন তাহারা ভিতরে কিছু অনুভব করিতেছিল, এবং তাহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হয়—অস্তিত্ব একটি, দুইটি নয়। সেই 'এক' নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, আর এ সকলের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কার্যকারণ-সম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটি অপরটিতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে কার্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যখন শরীরভাব অন্তর্হিত হয়, তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। আত্মা ও শরীর দুইটি পৃথক্—এই অনুমানের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা তর্ক করিতেছিলেন। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈতভাব অস্বীকৃত হওয়ায় এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টি-সম্বন্ধেই প্রমাণিত হইতে পারে, ব্যষ্টি-সম্বন্ধে নয়। পরিণাম—গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী; অপর কোন সসীম পদার্থের বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্ত সমষ্টি অপরিণামী; সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া সমষ্টির পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে; পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পপরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদ-মতে সর্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণ করা যাইতে পারে। ব্যষ্টি-সম্বন্ধেই গোলমাল। আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক মতগুলির কি হইবে, যেগুলি আমাদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মা সম্বন্ধে কি হইবে?—ইহাই প্রশ্ন।

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু সমস্যা এই—আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি-হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। তাহার কি হইবে? আমরা দেখিয়াছি—আমরা অনন্ত, আর উহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই-সকল ক্ষুদ্র জীবাত্মাকেই ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া রাখিতে চাই। সেই-সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হইবে? প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব ক্রমবিকাশশীল; এক বটে, অথচ ঠিক এক নহে, কল্যকার 'আমি' অদ্যকার 'আমি' বটে, আবার না-ও বটে। একটু পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তনের ভিতরে অপরিবর্তনীয় কিছু আছে—এই দ্বৈতবাদী মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু উহারই ভিতরে একটি অভিন্নভাব রহিয়াছে, যাহা সতত বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জীববিশেষের (mollusc) পরিণামমাত্র, তবে সেই জীব ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মোলাস্ক বহুপরিমাণে বিকশিত হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র জীব ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এখন মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও 'ব্যক্তি' বলা যাইতে পারে; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পৌঁছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

পূর্ববর্তী মতবাদগুলির সমন্বয়-সাধন করাই অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম বিশেষত্ব। অনেক সময় এই সমন্বয় দ্বারা এই দর্শনের অনেক উপকার হইয়াছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিও হইয়াছে। বর্তমান কালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তাহা জানিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, দর্শন-চিন্তাও ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে। এই কারণেই পূর্ব পূর্ব দর্শনপ্রণালীর মধ্যে

একটি সামঞ্জস্য বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। কোন ভাবই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধদের একটি বিশেষ দোষ এই যে, তাঁহারা ক্রমোন্নতি বুঝিতেন না, সুতরাং আদর্শে পৌঁছিবার পূর্ববর্তী সোপানগুলির সহিত নিজেদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই; বরং পূর্বমতগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্মজগতে এই প্রকার মনোভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। কোন ব্যক্তি একটি নূতন ও ভাল ভাব পাইল। তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে—ঐগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক। সে কখনও ভাবে না যে, তাহার বর্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলি যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, তাহার পক্ষে এক সময়ে ঐগুলি অত্যাবশ্যক ছিল, তাহার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে ঐগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আর আমাদের প্রত্যেককে ঐভাবেই আত্মবিকাশ করিতে হইবে, প্রথমে স্থূলভাব গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে উপকৃত হইয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এইজন্য প্রাচীনতম মতগুলির সহিত অদ্বৈতবাদের কোন বিরোধ নাই, এবং দ্বৈতবাদ ও যে-সব মত তাহার পূর্বে ছিল, সকলেরই উপর অদ্বৈতবাদীর প্রীতির ভাব—কোনরূপ অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতার ভাব নয়। অদ্বৈতবাদীর ধারণা—সেগুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ, আর অদ্বৈতবাদ যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে, অন্যান্য মতবাদও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

অতএব মানুষকে যে-সকল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়, সেগুলিকে অভিশাপ না করিয়া আশীর্বাদসহ রক্ষা করিতে হইবে। এজন্য বেদান্তে এই-সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। এইজন্যই দ্বৈতবাদসম্মত সসীম অথচ পূর্ণজীবাত্মার ধারণাও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

মৃত্যু হইলে মানুষ অন্যান্য লোকে গমন করে, দ্বৈতবাদ-সম্মত এই-সকল ভাবও বেদান্তে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখ, তবে একটি দিক্—একটি অংশই তোমার চোখে পড়ে, এবং জগৎ তোমার নিকট এইভাবেই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইতে পারে—এই জগৎ কেবল পদার্থ ও শক্তি দ্বারা সৃষ্ট; উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা যাইতে পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথক্ রূপেই দেখা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানুষ নিজেকে আত্মা ও দেহ, এই দুয়ের সমষ্টিরূপেই চিন্তা করে; এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এইজন্যই এই মতগুলি বেদান্তে সুরক্ষিত হইয়াছে এবং এইজন্যই দ্বৈতবাদীদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট বলা প্রয়োজন।

এই মতানুসারে অবশ্য আমাদের একটি স্থূল শরীর আছে; এই স্থূলশরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নির্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কর্মের আধারস্বরূপ। সমুদয় কর্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্তমান—সংস্কারগুলি সর্বদাই ফল প্রদান করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে-কোন কার্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে—যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, এবং এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার বাহিরে প্রকাশিত হইয়া ফল প্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে নিজের অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর অন্য কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়, সে আপনার নিয়মে—আপনার জালেই বদ্ধ। আমরা যে-সকল কর্ম করি, আমরা যে-সকল চিন্তা করি, সেগুলি আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালাইয়া দিলে তাহার শেষ পরিণতি পর্যন্ত আমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ইহাই কর্মবিধান। এই সূক্ষ্মশরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কিনা, ইহা অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের—এ-বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা বিভু। এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, আর উহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে। উহা অনাদি, উহা সেই সর্বব্যাপী সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। উহা অনন্ত। আর উহা নিজের প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানা দেহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে-কার্যের দ্বারা এই প্রকাশ ব্যাহত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য বলে; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর যে-কার্য বা যে-চিন্তা দ্বারা তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের অতি স্থূল দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী—সকলেরই মত এই যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে, অন্য কোন স্থান হইতে আসে না, আত্মাতে ঐ শক্তিপুঞ্জ অব্যক্তভাবে থাকে, আর আমাদের সমুদয় জীবনের কার্য কেবল ঐ অব্যক্ত শক্তিগুলিকে বিকশিত করা।

তাঁহারা পুনর্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবে, আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ, এইরূপই চলিবে। জীব এই পৃথিবীতে জন্মাইতে পারে, অন্য কোন লোকেও জন্মাইতে পারে। তবে এই পৃথিবীকেই সকলের আগে পছন্দ করা হয়—আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান। অন্যান্য লোকে দুঃখ-কষ্ট খুব সামান্য আছে বটে, কিন্তু সাধকেরা বলেন, ঐজন্যই সেই-সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগও অল্প। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে—অনেক দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখনও না কখনও মোহনিদ্রা ভাঙিবার সম্ভাবনা, কখনও না কখনও তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছা জাগিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেমন এই পৃথিবীতে খুব ধনী ব্যক্তিদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ অতি অল্প, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে যায়, সেখানে তাহার আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই। শুধু এখানে যে-সুখ, সেখানে তাহাই তীব্রতর; সূক্ষ্মদেহে কোন ব্যাধি থাকিবে না, ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিবে না, সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে সুখের পর সুখ উপভোগ করে এবং নিজের স্বরূপ ও উচ্চভাব—সব ভুলিয়া যায়। তথাপি এই-সকল উচ্চতর লোকে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই-সকল ভোগসত্ত্বেও সেখান হইতে আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন। একপ্রকার স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন, জীবাত্মাগণ সেই স্বর্গে চিরকাল

ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সেখানে তাঁহারা দিব্যদেহ লাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে; এবং তাঁহারা চিরকাল সেখানে ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণ সকলেই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহাদের মত। পূর্বেই মুক্ত হইয়া এই লোকগুরুগণ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত কৃপাবশতঃ তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথ-সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাঁহারা অন্যান্য উচ্চতর—দেবতাদের লোকসমূহেও গমন করিয়া থাকেন।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখনও আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দেহশূন্য-ভাবই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ কখনও সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের চরম আদর্শ হইতে পারে না, কিন্তু দেহ তো কখনও অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ সীমাবদ্ধ ভাব হইতেই শরীরের উৎপত্তি। চিন্তাও অনন্ত হইতে পারে না, কারণ সসীম ভাব হইতে চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি, অদ্বৈতবাদের মতে—মুক্তি লভ্য নয়, উহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। আমরা কেবল ভুলিয়া যাই ও উহা অস্বীকার করি। পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে না, ঐগুলি পূর্ব হইতেই বিদ্যমান—ঐগুলি আমাদের বরাবরই রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার—'আমি মুক্ত', এই মুহূর্তে তুমি মুক্তই হইবে। যদি তুমি বল—'আমি বদ্ধ', তবে তুমি বদ্ধই থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যান্য দার্শনিকদের মত ইহার বিপরীত। তোমরা ইহার মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার।

বেদান্তের এই আদর্শটি বুঝা বড় কঠিন, আর সাধারণ লোকে সর্বদা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুশকিল এইঃ ইহার মধ্যে যে একটি মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া সেই মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব—এই সসীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা অনায়াসে রাখিতে পার, তোমার সকল বাসনাই রাখিতে পার এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পার। যদি মানুষভাবে থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা রাখিয়া দাও, কারণ তুমি জান তুমি তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিয়া কিছু করাইতে পারে না; তোমার যতদিন ইচ্ছা ততদিন মানুষরূপে থাকিতে পার, কেহই তোমাকে অন্য কিছু করিতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর, দেবতাই হইবে—সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য। কিন্তু এমন অনেক মানুষ থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেবতা হইতেও অনিচ্ছুক। তাঁহাদিগকে তোমার বলিবার কি অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহাদের পৃথিবীতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইয়া গেলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এই ধরনের মানুষ পূর্বকালে অনেক ছিলেন, এখনও অনেক আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে যাও কেন? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন? তুমি যেমনটি চাও তেমনটি পাইবে; কিন্তু তুমি ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না, তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চান, জগতের কিছুই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ ও উহার সমুদয় ভোগরাশি তাঁহাদের পক্ষে খানা-ডোবার মত। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন? এই ভাবটি একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে নিজের ভাবে চলিতে দাও।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'সচিত্র লণ্ডন সমাচারে' (Illustrated London News)-এ একটি সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ
৯৪
প্রশান্ত মহাসাগরে 'সাউথ সী' দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় জাহাজগুলির একটি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সবগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই জাহাজখানিই ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। ছবিতে দেখা যায়—যে-জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, সেগুলির মজ্জমান আরোহী দল ডেকের উপর দাঁড়াইয়া অন্য জাহাজটির লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছে। অপরকে টানিয়া নিজের স্তরে নামাইয়া আনিও না।

আর একপ্রকার নির্বুদ্ধিতা আছেঃ যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশা-ভরসা থাকিবে না। যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদের যেন মনুষ্যজাতির জন্য সর্বদা প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। যদি প্রত্যেক দেশে মানুষের যথার্থ কল্যাণকামী অন্ততঃ দুই শত নরনারী থাকে, তবে পাঁচদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। আমরা জানি, মনুষ্যজাতির জন্য আমাদের প্রাণ কিরূপ ছটফট করিতেছে। এ সব অভিসন্ধি-প্রণোদিত লম্বা লম্বা কথামাত্র। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে যাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর নরনারী যত বেশী নিজেদের কথা ভাবিবে, তত কম পরের উপকার করিতে পারিবে। দুটি ভাবের মধ্যে একটি নিঃস্বার্থতা, অন্যটি স্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগসুখে আসক্ত থাকা এবং চিরকাল এইভাবে চলা এবং একই অবস্থার পুনরাবর্তন ঘোর স্বার্থপরতা। উহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নয়, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নয়—উহার কারণ ঘোর স্বার্থপরতা; অপর কাহারও দিকে না তাকাইয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব—এই ভাব হইতে উহার উৎপত্তি। আমার তো এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবান পুরুষ আরও দেখিতে চাই—তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র পশুর উপকারের জন্য শত শত জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা তো আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবান লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐ

বিষয়ে কখনও কোন প্রশ্নই করেন নাই, যিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন কিসে অপরের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বনে গিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের মুক্তির জন্য নয়। জগৎ জ্বলিয়া গেল—বাঁচিবার পথ বাহির করিতেই হইবে। জগতে এত দুঃখ কেন?—তাঁহার সারাজীবন এই এক চিন্তা ছিল। তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ?

* * *

যীশুখ্রীষ্ট যে-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্টধর্মে ও বেদান্তধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ। সেই খ্রীষ্টধর্মে বিকৃতভাব অতি অল্পই ছিল। যীশু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, আবার সাধারণের উপযোগী এবং উচ্চতম আদর্শ ধারণা করিবার সোপানরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া যিনি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার প্রচার করিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক'; আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই এই বোধ আসিয়া থাকে যে 'আমি ও আমার পিতা এক' তখন ঐ ধর্মে ছিল কেবল প্রেম ও আশীর্বাদ, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মত উহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া অবনত হইল।

এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি'—এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ধর্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে বলেন, ইহাই নিঃস্বার্থতা—ইহাই নীতির ভিত্তিস্বরূপ। ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি! আর যে-সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিকতর জ্ঞানের আশা করি, তাঁহারা ঐ কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং মনে করেন এই ক্ষুদ্র 'আমি'র নাশ হইলে সব নীতি একেবারে ধ্বংস হইবে। সর্বপ্রকার শুভভাবের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র—'আমি নয়, তুমি'।

কে ভাবিতে যায়—স্বর্গ নরক আছে কিনা? কে ভাবিতে যায়—আমার আত্মা আছে কিনা? কে ভাবিতে যায়—কোন অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে কিনা? এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের মত এই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। দুঃখ লাঘব করিবার জন্য—হয় সংগ্রাম কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দাও। আস্তিক হও বা নাস্তিক হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও, নিজেকে ভুলিয়া যাও—ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—অহংনাশ ও প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ।

দুইটি শক্তি সর্বদা সমান্তরালভাবে কার্য করিতেছে। একটি 'অহং', অপরটি 'নাহং'। শুধু মানুষের ভিতর নয়, জীবজন্তুর ভিতরও এই দুইটি শক্তির বিকাশ দেখা যায়— এমন কি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মধ্যেও এই দুই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহ্ব ব্যাঘ্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি অধঃপতিত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভ্রাতৃ-সমান অন্যান্য মানুষকে হত্যা করিতে পারে, সেও অনাহারে মুমূর্ষু স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অথবা দেখা যায়ঃ সৃষ্টির ভিতরে এই দুই শক্তি পাশাপাশি কার্য করিতেছে—যেখানে একটি শক্তি দেখিবে, সেখানে অপরটিও দেখিবে। একটি স্বার্থপরতা, অপরটি নিঃস্বার্থতা। একটি গ্রহণ, অপরটি ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদয় কার্য ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির অন্যতম শুধু স্বার্থ-শক্তির উপর—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের উপর স্থাপিত? জগতের সমুদয় কার্য রাগ-দ্বেষ, বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত, এ-কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? এই-সকল প্রবৃত্তি যে আছে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু অপর শক্তিটির অস্তিত্ব ও ক্রিয়া অস্বীকার করিবার কি অধিকার তাঁহাদের আছে? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম—এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র পরা শক্তি? অপর শক্তিটি এই প্রেমশক্তিরই অপপ্রয়োগের ফল, এবং এই ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি। অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থতা হইতে—অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল কল্যাণ শক্তির অপব্যবহার মাত্র। এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাও হয়তো নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহের প্রেরণায়—তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিবে বলিয়া। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ঐ একটি শিশু-সন্তানের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক, অসীমই হউক, ভালবাসা সেই ভগবান্, অন্য কিছুই নহে।

অতএব সমগ্র জগতের প্রেরণাশক্তি, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত ভাব—উহা যে-কোন আকারে ব্যক্ত হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থতা, ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। বেদান্ত এইজন্যই অদ্বৈতভাবের উপর ঝোঁক দেন, দ্বৈতভাবের উপর নয়। আমরা এই ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই, কারণ আমরা জানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহমিকা সত্ত্বেও আমাদের মানিতে হইবে—যেখানে একটি কারণ দ্বারা কতকগুলি কার্য ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্যগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া সেই একটি কারণই সত্য বলিয়া স্বীকার্য। এখানে যদি আমরা স্বীকার করি যে, সেই এক অপূর্ব সুন্দর প্রেমই সীমাবদ্ধ হইয়া অশুভ বা অসৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেমশক্তি দ্বারাই সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের দুইটি কারণ মানিতে হয়—একটি শুভশক্তি, অপরটি অশুভ শক্তি—একটি প্রেমশক্তি, অপরটি দ্বেষশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টি অধিক যুক্তিসঙ্গত? অবশ্য একটি কারণ মানিয়া লওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

আমি এমন সব বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদীদের অধিকার-বহির্ভূত। ভয় হইতেছে, দ্বৈতবাদের আলোচনা লইয়া আমি বোধ হয় বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত নীতি ও

নিঃস্বার্থতার উচ্চতম আদর্শ পাশাপাশি যাইতে পারে। আমার দেখানো উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাট করিতে হয় না; বরং নীতির ভিত্তিভূমি লাভ করিতে হইলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন হইতে হইবে। মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে; জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ—অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে-প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার অপর প্রান্তে অসীম হইয়া ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। অতিপ্রাকৃত কোন সত্তার উপর দোষারোপ করিও না, নিরাশ বা বিষণ্ণ হইয়া পড়িও না, অথবা মনে করিও না আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমরা আর উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, এ-ধারণা ঠিক নহে; আমরা গুটিপোকার মত! নিজের শরীর হইতে বন্ধনের সূত্র প্রস্তুত করিয়া কালক্রমে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। গুটির মধ্যে প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া আমরা বাহিরে আসিব, মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কর্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি—আমরা যেন বদ্ধ, আর কখনও কখনও সাহায্যের জন্য চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের সকল দেবতার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছি; অবশেষে দেখিলাম, সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভুলবশতঃ এতদিন যাহা করিতেছিলাম, তাহা নষ্ট করিতে হইল। ইহাই একমাত্র উপায়। নিজের চারিদিকে যে-জাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে, আর তাহা করিবার শক্তিও আমার ভিতরে রহিয়াছে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের ভাল-মন্দ কোন ভাবই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয়বিধ কর্মেরই সমষ্টি-স্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু ঐগুলির একটিও যদি বাদ পড়িত, তাহা হইলে আমি আজ যাহা হইয়াছি, তাহা হইতাম না। আমার জীবনে আমি বেশ সন্তুষ্ট। আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমরা বাড়ী গিয়া নানাপ্রকার অন্যায় কাজ করিতে থাক, আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্যরূপ হইতে পারে না, কারণ মঙ্গল ও পবিত্রতা আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির অন্যথা হয় না। আমাদের যথার্থ স্বরূপ সর্বদা একই প্রকার।

আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, আমরা দুর্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্বল। আমি 'পাপ'-শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'ভ্রম'-শব্দ ব্যবহার করাই পছন্দ করি। আমাদিগকে ভ্রমে বা অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা নিজেরাই। আমরা নিজ নিজ চোখে হাত দিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে আলোক আমাদের জন্য সর্বদাই রহিয়াছে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ আলোক। দেখিতে পাইতেছ না—আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন? এই-সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসনা। কোন জীবজন্তু যে ভাবে আছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতে চায়—সে দেখে, তাহার পরিবেশ উপযোগী নহে, সুতরাং সে একটি নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। নিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্। বলিতে পার, ইচ্ছাই যদি সর্বশক্তিমান্, তবে অনেক কিছুই আমি করিতে পারি না কেন? যখন তুমি এ-কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'র দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, এগুলির দুর্বলতা নয়।

অতএব যদি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার প্রকৃতিই অসৎ আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরও মন্দ হইবার পথ দেখানো হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকার থাকে, আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া 'হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার!' বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটি দিয়াশলাই জ্বালিলে এক মুহূর্তেই ঘর আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছি' বলিয়া অনুশোচনা করিলে কি তোমার উপকার হইবে? আমরা নানা দোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে—সেই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে প্রকাশ কর; প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে দর্শন কর। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই এমন অবস্থা লাভ করুক যে, অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অন্তর্যামী সৎস্বরূপকে দেখিতে পারে, আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারে, 'হে স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময় ওঠ! হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, ওঠ! হে অজ, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান্, ওঠ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে-সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।' অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ-স্মরণ, সদা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্বদা অনন্ত সর্বশক্তিমান্ সদামঙ্গলময় বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর এই প্রার্থনা নিঃস্বার্থ বলিয়াই ভয়শূন্য ও শক্তিসম্পন্ন; কারণ স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের অন্য কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদিগকে অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত হইতেই 'মৃত'। তখন আমাদের পুরাতন ব্যক্তি-পরিচয় চলিয়া যায়, ওগুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র; অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ-স্বরূপ এবং সব ভয় চলিয়া যায়। সর্বব্যাপী 'আমার' অনিষ্ট কে করিতে পারে? এই রূপে আমার সমুদয় দুর্বলতা চলিয়া যায়, তখন অপর সকলের ভিতর এই ভাব জাগাইয়া তোলাই আমার কার্য হয়। আমি দেখিতেছি, সকলেই সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু সকলে তাহা জানে না। সুতরাং প্রত্যেককে ইহা শিখাইতে হইবে, সেই অনন্তশক্তির জাগরণে তাহাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে এই ভাব প্রচার করাই

বিশেষ প্রয়োজন। এই-সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্বত অপেক্ষা পুরাতন। সকল সত্যই সনাতন। সত্য কাহারও একার সম্পত্তি নয়। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই সত্যকে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে না। সত্যই সকল আত্মার যথার্থ স্বরূপ। সত্যের উপর কে বিশেষ দাবী করিতে পারে? কিন্তু উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহা প্রচার করিতে হইবে, কারণ তোমরা দেখিবে—উচ্চতম সত্য অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহা প্রচার করিতে হইবে, যাহাতে ঐ ভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়, যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনেরও অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা একই কালে উহা বুঝিতে পারে। এই-সকল ন্যায়ের কূটবিচার, দার্শনিক মতবাদ, এই-সকল দেবতাতত্ত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড একসময়ে উপকার করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এস আমরা একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হইবে, আর প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্তা—সেই সৎস্বরূপই উপাস্য হইবেন।

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে

আত্মা

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

অনন্ত-কল্যাণ-গুণাধার, ন্যায়বান, করুণাময় পরমেশ্বরের শাসনাধীন এই জগতে কিরূপে এরূপ অসংখ্য পাপের উদ্ভব হইতে পারে—ইহাই হইল সকল দ্বৈতবাদীর প্রথম সমস্যা। সকল দ্বৈতবাদী ধর্মেই এই প্রশ্ন উদয় হয়; কিন্তু ইহার উত্তরে হিন্দুগণ কোনদিনই একজন 'শয়তান' সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা সমস্বরে মানুষকেই ইহার জন্য দায়ী করেন এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা করাও সহজ। কারণ আমি আপনাদের এইমাত্র বলিয়াছি, 'শূন্য হইতে জীবের সৃষ্টি হইতে পারে'—একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এই জীবনে দেখিতেছি, আমরাই সর্বদা আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারি; আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যহ আগামীকল্যকে গড়িতে চেষ্টা করি। অদ্য আমরা আগামীকল্যের ভাগ্য নির্ধারণ করি; কল্য আমরা তাহার পরের দিনের ভাগ্য স্থির করি—এইভাবেই আমাদের জীবন চলে। এই যুক্তিপ্রণালী আরও অতীতে প্রয়োগ করা খু্বই যুক্তিসঙ্গত। যদি আমাদের নিজেদের কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য গঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে সেই একই নিয়ম কেন অতীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে না? যদি একটি অনন্ত শৃঙ্খলের কয়েকটি অংশ কিছু পরে পরে আবর্তিত হইতে থাকে এবং উহার একটি অংশ আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র পর্যায়টির ব্যাখ্যা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। এই ভাবেই যদি অনন্ত কাল-প্রবাহের একটি অংশকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার সম্যক্‌ ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, আর পৃথিবীতে যদি সর্বদাই একই কারণ একই কার্য সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই সমগ্র কাল-প্রবাহেরও ব্যাখ্যা আমরা অবশ্যই করিতে পারিব। যদি ইহা সত্য হয় যে, এই পৃথিবীতে অল্পকাল থাকিবার সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, এবং যদি ইহাও সত্য হয় যে,

আপনারা অনেকেই ম্যাক্সমূলারের সুবিখ্যাত পুস্তক 'Three Lectures on the Vedanta Philosophy' (বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা) পাঠ করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ আপনারা কেহ কেহ অধ্যাপক ডয়সনের জার্মান ভাষায় লিখিত এই একই দার্শনিক মতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থটিও পাঠ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রতীচ্যে বর্তমানে যাহা লিখিত হয়, বা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা প্রধানতঃ একটি মাত্র মতবাদ—অদ্বৈতবাদ, অথবা ভারতীয় ধর্মের 'এক-তত্ত্ব'বাদ সম্বন্ধেই; এবং কেহ কেহ মনে করেন, বেদের সমগ্র তত্ত্ব এই একটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক্ আছে, সম্ভবতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অদ্বৈত-মতাবলম্বীরাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; এবং স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ অথবা সর্বজনসম্মত কোন ধর্মকেন্দ্র অথবা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় তত্ত্ব-নির্দেশকারী কোন মণ্ডলী এই দেশে কোনদিনও না থাকায় জনসাধারণ নিজ নিজ পন্থাবলম্বন, নিজ নিজ দর্শনবিস্তার, এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়-স্থাপনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে আমরা দেখি, প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ। আমি জানি না, বর্তমানে ভারতবর্ষে কত শত সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেক বৎসরই কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে। মনে হয়, এই জাতির আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সত্যিই অফুরন্ত।

এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; একটি আস্তিক বা বৈদিক, অপরটি নাস্তিক বা অবৈদিক। যাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্র বেদকে নিত্য-তত্ত্ব-প্রকাশকরূপে প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বলা হয় 'আস্তিক' এবং যাঁহারা বেদ বর্জন করিয়া অন্যান্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহারাই হইলেন ভারতীয় 'নাস্তিক'। ভারতের দুইটি প্রধান আধুনিক 'নাস্তিক' সম্প্রদায়—জৈন এবং বৌদ্ধ। আস্তিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতি অধিকতর প্রামাণ্য; আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রুতির যুক্তিসম্মত অংশই কেবল গ্রহণীয়, অবশিষ্ট অংশ বর্জনীয়।

সাংখ্য, ন্যায় এবং মীমাংসা—এই তিনটি আস্তিক মতবাদের মধ্যে প্রথম দুইটি দার্শনিক মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সম্প্রদায়-গঠনে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে একটি মাত্র সম্প্রদায় আছে, তাহা হইল উত্তর-মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদান্তিক সম্প্রদায়। তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের নামই 'বেদান্ত'।

হিন্দু দর্শনের সকল মতবাদেরই উদ্ভব হইল বেদান্ত অথবা উপনিষদ্‌ হইতে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষভাবে এই নামটি নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনকে কেবলমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতেই স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। কালক্রমে কেবল বেদান্তই স্থায়ী হয়, এবং ভারতবর্ষের বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি এই বেদান্তেরই কোন-না-কোন শাখার অন্তর্গত। তথাপি এই-সকল সম্প্রদায় একমতাবলম্বী নয়।

প্রত্যেক বস্তুরই একটি কারণ থাকা অতি আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা বর্তমানে যাহা আছি, তাহা যে আমাদের সমগ্র অতীতেরই ফল, ইহাও সত্য হইবে। এই কারণে মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। পৃথিবীতে যা-কিছু অমঙ্গল আছে, সেগুলির কারণ আমরা নিজেরাই; আমরাই এই-সকল সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা যেমন সর্বদাই দেখি যে, অশুভকর্ম হইতেই দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হয়, তেমনি আমরা দেখি যে, বর্তমান দুঃখক্লেশের অধিকাংশই মানুষের অতীত অসৎকর্মের ফল। এই মতানুসারে একমাত্র মানুষই এক্ষেত্রে দায়ী, ঈশ্বরকে সেইজন্য দোষ দেওয়া চলে না। সেই নিত্য-করুণাময় পিতাকে কোনক্রমেই দোষ দেওয়া চলে না; 'আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপই ফল পাই।'

দ্বৈতবাদীদের অপর একটি অভিনব মতবাদ এইঃ প্রত্যেক জীবই পরিশেষে মুক্তিলাভ করিবে। একজনও বাকী থাকিবে না। নানা অবস্থা-বিপর্যয় ও নানা সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া প্রত্যেকেই অবশেষে বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু কোথা হইতে বাহির হইবে? সকল হিন্দু সম্প্রদায়েরই অভিমত—সকল জীবই এই সংসারচক্র হইতে বাহির হইয়া আসিবে। যে-বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি এবং অনুভব করিতেছি, বা যে-বিশ্বের বিষয় আমরা কল্পনা করিতেছি—তাহাদের কোনটিই প্রকৃত সত্য হইতে পারে না, কারণ উভয়ের মধ্যেই ভাল-মন্দ সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এরূপ একটি স্থান আছে, যেখানে কেবলই সুখ, কেবলই পুণ্য চিরবিরাজমান। সেই স্থান লাভ করিলে জীবের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না; এবং এই ধারণা তাঁহাদের অতি প্রিয়। সেই স্থানে রোগ নাই, মৃত্যু নাই, নিত্য সুখ বিরাজমান; এবং সেই স্থানে তাঁহারা নিত্যই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবেন, নিত্যই তাঁহাকে উপভোগ করিবেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, নিম্নতম কীটপতঙ্গ হইতে উচ্চতম দেবদূত এবং দেবতা পর্যন্ত সকলেই—শীঘ্রই হউক বা বিলম্বে হউক—সেই স্থান

আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদান্তিকগণের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ আছে। অবশ্য একটি বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত, অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এই-সকল বৈদান্তিক ইহাও বিশ্বাস করেন যে, বেদ অতিপ্রাকৃত উপায়ে ব্যক্ত ঈশ্বরের বাণী। তাঁহাদের এই বিশ্বাস ঠিক ইসলাম ও খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের বিশ্বাসের মত নহে—ইহা একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস। তাঁহাদের ধারণা এইঃ বেদসমূহ ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশ; ঈশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানও তাঁহার মধ্যে নিত্য বিরাজমান এবং সেইজন্য বেদও নিত্য। অপর একটি সাধারণ বিশ্বাসও তাঁহাদের আছে—সৃষ্টি-প্রবাহে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সমুদয় সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে, জগৎ আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ স্থূলতর হয়, এবং কল্পকালের শেষে ক্রমাগত সূক্ষ্মতর হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়; ইহার পরে আসে বিশ্রামের সময়। তাহার পর পুনরায় জগতের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়, এবং সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন ঘটে। তাঁহারা 'আকাশ' নামক একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ইহা বৈজ্ঞানিকগণের 'ইথার'-এর মত। অপর একটি শক্তির অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন, যাহাকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ'। তাঁহারা বলেন, এই বিশ্বজগৎ প্রাণের স্পন্দন হইতেই উদ্ভূত। একটি কল্পের শেষ হইলে প্রকৃতির সকল প্রকাশই ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়। এই 'আকাশ'কে প্রত্যক্ষ অথবা স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু আকাশ হইতেই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্ট হয়। প্রকৃতিতে যতকিছু শক্তি দেখি—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং চিন্তা, অনুভব ও স্নায়বিক ক্রিয়া-শক্তি—এইসব বিভিন্ন প্রকারের শক্তি এই প্রাণে এই বিলীন হইয়া যায়, এবং প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়। জগৎ এই অবস্থাতেই বিরাজ করে, যতদিন পর্যন্ত না নূতন কল্পের আরম্ভ হয়। সেই সময়ে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হয়, এই স্পন্দন আকাশে সঞ্চারিত হয়, যাহার ফলে এই-সকল বস্তু ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়।

যে-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি আপনাদের প্রথম বলিব, তাহার নাম 'দ্বৈত-সম্প্রদায়'। দ্বৈতবাদিগণের মতে—জগতের স্রষ্টা ও শাসক ঈশ্বর সর্বদাই জীব-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর নিত্য, জগৎ নিত্য, জীবগণও নিত্য। জীব-জগৎ কখনও বিকশিত এবং পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই সেই একই রহিয়াছেন। পুনরায় দ্বৈতবাদিগণের মতে—গুণের জন্যই ঈশ্বর ব্যক্তিভাবাপন্ন, দেহের জন্য নয়। তাঁহার মানবীয় গুণ আছে। তিনি করুণাময়, ন্যায়বান, শক্তিমান। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁহার নিকটে যাওয়া যায়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা যায়, তাঁহাকে ভালবাসা যায়। তিনিও প্রতিদানে ভালবাসেন ইত্যাদি। এক কথায় তিনি মানবীয়গুণসম্পন্ন দেবতা, যদিও মানব অপেক্ষা অনন্তগুণে মহৎ। মানবের দোষগুলির কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই। 'তিনি অনন্তকল্যাণ-গুণাধার'—ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বরের সংজ্ঞা। কিন্তু তিনি তো উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃতিই তাঁহার উপাদান—যাহা হইতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

এমন কয়েকজন দ্বৈতবাদীও আছেন যাঁহারা বেদান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তাঁহাদের বলা হয় 'পরমাণুকারণবাদী'। তাঁহাদের মতে জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমাহার-মাত্র, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় এই-সকল পরমাণু হইতে 'সৃষ্টি' হয়। বৈদান্তিকগণ এই মতবাদ স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে এই মতবাদ একেবারে অযৌক্তিক। জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় পরমাণুরও অংশ অথবা আয়তন নাই; কিন্তু যাহার অংশ বা আয়তন নাই, তাহাকে অনন্তবার গুণ করিলেও তাহা পূর্ববৎই থাকিয়া যায়। যাহার অংশ নাই, তাহা কোনদিন অংশযুক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না; এবং বহুসংখ্যক শূন্যকে যোগ দিলে একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় না। সেইজন্য পরমাণুসমূহের যদি অংশ বা আয়তন না থাকে, তাহা হইলে এরূপ পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সেইজন্য বৈদান্তিক দ্বৈতবাদিগণের মতে—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। ভারতীয় জনসাধারণ অধিকাংশই দ্বৈতবাদী। সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর

লাভ করিবে, যেখানে আর কোন দুঃখের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু আমাদের পরিচিত এই সংসারের শেষ হইবে না, ইহা অনন্তকাল চলিতে থাকিবে; তরঙ্গভঙ্গে চলিলেও, চক্রাকারে চলিলেও ইহার শেষ নাই। অসংখ্য জীবাত্মাকে মুক্তি এবং পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। কিছু জীবাত্মা আছে বৃক্ষের মধ্যে, কিছু আছে পশুর মধ্যে, কিছু আছে মানুষের মধ্যে, কিছু দেবতার মধ্যে, কিন্তু প্রত্যেকেই এমন কি উচ্চতম দেবতারাও অপূর্ণ, বদ্ধ। এই বদ্ধাবস্থা বা 'বন্ধন' কিরূপ? বদ্ধাবস্থা জন্মমরণশীল অবস্থা। উচ্চতম দেবতাগণও মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই-সকল দেবতার অর্থ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পদ। যেমন ইন্দ্রত্ব একটি বিশেষ পদ-মাত্র। একজন অতি উচ্চ জীব বর্তমান কল্পের আরম্ভে এই পৃথিবী হইতেই এই পদ অলঙ্কৃত করিতে গিয়াছেন এবং বর্তমান কল্প শেষ হইলে তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই পৃথিবীর অপর এক অতিশয় পুণ্যবান ব্যক্তি পরবর্তী কল্পে ঐ পদ অধিকার করিবেন। অন্যান্য সকল দেবতার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাঁহারাও সেই-সকল বিভিন্ন পদধারী, যে-পদসমূহ লক্ষ লক্ষ জীব পর্যায়ক্রমে অধিকার করিয়াছে এবং পরে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা এই পৃথিবীতে পুণ্যকর্মাদি করেন এবং অন্যদের সাহায্য করেন, কিন্তু কিছুটা সকামভাবে, পুরস্কারের আশায় অথবা অন্যদের প্রশংসার লোভে, তাঁহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে সেই-সকল পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিবেন—তাঁহারাই এই সকল দেবতা হইবেন। কিন্তু ইহা তো মুক্তি নয়, পুরস্কারের আশায় কৃত সকাম কর্ম দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হয় না। মানুষ যাহা কিছু কামনা করে, ঈশ্বর সে-সবই তাহাকে দান করেন। মানুষ শক্তি কামনা করে, সম্মান কামনা করে, দেবতারূপে ভোগসুখ কামনা করে; তাহাদের এইসকল কামনা পূর্ণ হয়; কিন্তু কোন কর্মের ফলই নিত্য নহে। কিছুকাল পরে উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়; বহুকাল স্থায়ী হইলেও উহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবেই; এবং সেই সকল দেবতা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; এইভাবে তাঁহারা মুক্তিলাভের আর একটি সুযোগ লাভ করিবেন। পশুগণ উচ্চতর স্তরে উঠিয়া হয়তো মনুষ্যরূপে দেহধারণ করিবে, দেবতারূপও ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পর সম্ভবতঃ পুনরায় মনুষ্যরূপ ধারণ করিবে, অথবা পূর্বের মত পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে—এইরূপে যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের সকল ভোগ-বাসনা, পার্থিব জীবনের জন্য সকল তৃষ্ণা, এবং অহং-মমত্ববুদ্ধি লোপ পাইবে, ততদিন পর্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকিবে। এই 'অহং-মম'-ভাবই পার্থিব সকল বন্ধনের কারণ। আপনি যদি একজন দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার সন্তান কি সত্যই আপনার?'—তিনি উত্তর দিবেন, 'সে ঈশ্বরের। আমার সম্পত্তি আমার নহে, ঈশ্বরের।' সকল বস্তুকে ঈশ্বরেরই বস্তুরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।

কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়। আমরা দেখি, পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই দ্বৈতবাদী। ইওরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার সকল ধর্মই দ্বৈতমূলক—ইহা ব্যতীত তাহাদের অপর কোন উপায়ই নাই। সাধারণ মানুষের পক্ষে নামরূপ-বিহীন কোন কিছুর ধারণা করাই অসম্ভব। যাহা তাহার বুদ্ধিগম্য, তাহাই সে আঁকড়াইয়া থাকিতে ভালবাসে। অর্থাৎ উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়কে সে নিজের স্তরে নামাইয়া আনিয়া সেই ভাবেই কেবল ধারণা করিতে পারে। নামরূপ-বিহীনকে কেবল নামরূপ-বিমণ্ডিতরূপেই সে চিন্তা করিতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র ইহাই হইল জনসাধারণের ধর্ম। দ্বৈতবাদীরা এরূপ একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি মানুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি যেন একজন মহান্ সম্রাট্, একজন সর্বশক্তিমান্ রাজা। কিন্তু দ্বৈতবাদীদের মতে—তিনি পার্থিব সম্রাট্ অপেক্ষা পবিত্রতর; তাঁহারা তাঁহাকে নিখিল-কল্যাণগুণ-বিমণ্ডিত এবং অখিল-দোষ-বিবর্জিতরূপে দর্শন করিতে চান। কিন্তু মন্দ ব্যতীত ভালর অস্তিত্ব, অন্ধকারের ধারণা ব্যতীত আলোর ধারণা কি কোনদিন সম্ভব?

ভারতবর্ষের এই-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় নিরামিষভোজী, খুব অহিংসা প্রচার করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের মতবাদ বৌদ্ধ মতবাদ হইতে ভিন্ন। আপনি যদি একজন বৌদ্ধ-মতাবলম্বীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন পশুহত্যার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন?'—তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন, 'প্রাণী হত্যা করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই।' কিন্তু আপনি যদি একজন দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন পশুহত্যা করেন না?'—তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন, 'কারণ পশুও ঈশ্বরের।' সেইজন্য দ্বৈতবাদিগণের মত—এই 'অহং-মম'-ভাব কেবলমাত্র ঈশ্বর-বিষয়েই প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য। একমাত্র তিনিই 'অহং' এবং সকল বস্তুই তাঁহার। যখন মানুষ 'অহং-মম'-ভাব বিসর্জন দেয়, যখন সে সবকিছুই ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করে, যখন সে সকলকেই ভালবাসে, এবং পুরস্কারের কোনরূপ আশা না করিয়া একটি পশুর প্রাণরক্ষার জন্যও প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, এবং এরূপ বিশুদ্ধ চিত্তেই ঈশ্বরপ্রীতির উদয় হয়। ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবের আকর্ষণ-কেন্দ্র; এবং দ্বৈতবাদী বলেনঃ মৃত্তিকায় আবৃত সূচ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলেই তাহা আকৃষ্ট হইবে। ঈশ্বর চুম্বক, জীব সূচ, তাহার পাপকর্মই ধূলি ও ময়লা, যাহা তাহাকে আবৃত করে। জীব বিশুদ্ধ হইলেই স্বভাবজ আকর্ষণ বলে ঈশ্বরের নিকট আসিবে, ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বিরাজ করিবে, কিন্তু চিরকাল ঈশ্বর হইতে সে পৃথক্ হইয়াই থাকিবে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব ইচ্ছানুসারে যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে; ইচ্ছা করিলে সে একই সঙ্গে একশত দেহ ধারণ করিতে পারে, অথবা একটিও দেহ ধারণ না করিতে পারে। এরূপ জীব প্রায় সর্বশক্তিমান্ হয়, সে শুধু সৃষ্টি করিতে পারে না—সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল ঈশ্বরেরই আছে। যতই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হউক না কেন, কেহই জগৎ-ব্যাপার পরিচালনা করিতে পারে না। এই কার্য কেবল ঈশ্বরের। কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে সকল জীবই অনন্তকাল আনন্দপূর্ণ হয়, এবং অনন্তকাল ঈশ্বরের সহিত বাস করে। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত।

দ্বৈতবাদিগণ আর একটি মতও প্রচার করেন। 'প্রভু! আমাকে ইহা দাও, উহা দাও'—ঈশ্বরের নিকট এ ধরনের প্রার্থনা করার তাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের মতে এরূপ করা কখনই উচিত নহে। যদি কেহ কোন পার্থিব দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিতে চায়, তাহা হইলে নিম্নতর কাহারও নিকটেই সেই প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত—কোন দেবতা, দেবদূত অথবা পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুক্ত জীবের নিকটই কেবল পার্থিব বস্তু চাহিতে হয়। ঈশ্বরকে কেবল ভালবাসা কর্তব্য। 'প্রভু! আমাকে ইহা দাও, উহা দাও'—এইভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা ধর্মের দিক্ হইতে ঘোরতর অন্যায়। অতএব দ্বৈতবাদীদের মতে—দেবতাদের একজনকে আরাধনা করিয়া মানুষ যাহা কামনা করে, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে লাভ করে, কিন্তু যদি সে মুক্তি চায়, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের জনসাধারণের ধর্ম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতবাদে প্রকৃত বেদান্ত-দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে—কার্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কার্য কারণেরই রূপভেদ মাত্র। যদি জগৎ কার্য হয় এবং ঈশ্বর কারণ হন, তাহা হইলে জগৎ ঈশ্বর স্বয়ং; জগৎ—ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ; তিনিই স্রষ্টা, এবং তিনিই সেই উপাদান—যাহা হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আপনাদের ভাষায় যাহাকে 'সৃষ্টি' বলা হয়, তাহার কোন প্রতিশব্দ সংস্কৃতে নাই, যেহেতু ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য মতানুযায়ী শূন্য হইতে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করেন না। মনে হয়, এক সময়ে এই মতবাদের সমর্থক কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মতবাদ অতি শীঘ্রই নিরাকৃত হইয়া যায়। বর্তমানে আমি এমন কোন সম্প্রদায় জানি না, যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'সৃষ্টি' বলিতে আমরা বুঝি—যাহা পূর্ব হইতেই আছে, তাহারই বহিঃপ্রকাশ। এই সম্প্রদায়ের মতানুসারে সমগ্র জগৎ স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই জগতের উপাদান। আমরা বেদে পাঠ করিঃ ঊর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ হইতে তন্তু বয়ন করে, তেমনি সমগ্র জগৎ সেই পরম সত্তা হইতে বাহির হইয়াছে।
১

কার্য যদি কারণের রূপান্তর হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠেঃ যিনি জড় নন, যিনি নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ, সেই ঈশ্বর হইতে কিরূপে জড় অচেতন জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে? যদি কারণ শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কার্য অশুদ্ধ ও অপূর্ণ হয় কি করিয়া? এ বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি বলেন? তাঁহাদের মতবাদ একটু অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর জীব ও জগৎ—এই তিনটি ভাব বা সত্তা অভিন্ন। ঈশ্বর যেন আত্মা, জীব-জগৎ তাঁহার দেহ। যেমন আমাদের দেহ আছে, আত্মাও আছে, তেমনি সমগ্র জগৎ এবং সকল জীবই ঈশ্বরের দেহ, এবং ঈশ্বর সকল আত্মার আত্মা। এইরূপে ঈশ্বরই জগতের উপাদান-কারণ। দেহ পরিবর্তিত হইতে পারে, তরুণ বা বৃদ্ধ হইতে পারে, সবল বা দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। আত্মা সর্বদাই সেই চিরন্তন সত্তা, যাহা দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। দেহ আসে যায়; কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন নাই। তেমনি সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের দেহ, এবং সেই অর্থে জগৎ স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু জাগতিক পরিবর্তনে ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না। এরূপ উপাদান হইতেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং একটি কল্পের শেষে তাঁহার দেহ সূক্ষতর হইয়া যায়, সঙ্কুচিত হয়; আর একটি কল্পের প্রারম্ভে তাহা আবার প্রসারিত হয় এবং তাহা হইতেই এই-সকল বিভিন্ন বিশ্ব প্রকাশিত হয়।

দ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—উভয়েই স্বীকার করেন, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু স্বকর্মদোষে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। দ্বৈতবাদিগণ অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ আরও সুন্দরভাবে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, জীবের শুদ্ধতা এবং পূর্ণতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় বিকশিত হয়। আমরা বর্তমানে আত্মার এই স্বভাবগত জ্ঞান, শুদ্ধতা ও শক্তি পুনঃপ্রকাশিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছি। আত্মার বহু গুণ আছে, কিন্তু এই জীবাত্মা সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ নয়। প্রত্যেক অসৎ কর্ম আত্মার স্বরূপকে সঙ্কুচিত করে, এবং প্রত্যেক সৎ কর্ম তাহাকে প্রসারিত করে, সকল জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ। জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, অনন্তরূপ ঈশ্বর হইতেও তেমনি এই-সকল আত্মা নির্গত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের ঈশ্বরও ব্যক্তিভাবাপন্ন, অনন্ত-কল্যাণ-গুণাধার; কেবল তিনি জগতের সর্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব বস্তুতে, সকল স্থানে অন্তর্লীন হইয়া আছেন; যখন শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বরই সব, ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তিনি যে দেওয়াল হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি দেওয়ালের মধ্যে নিহিত হইয়া আছেন। পৃথিবীতে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ, এমন একটি অণু-পরমাণু নাই, যাহাতে তিনি নাই। সকল জীবাত্মাই সসীম, তাহারা সর্বব্যাপী নয়। যখন তাহাদের শক্তি বিকশিত হয় এবং তাহারা পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহাদের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না; তাহারা ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বাস করিতে থাকে।

এইবার আমরা অদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গে আসিলাম। আমরা মনে করি, ইহাই হইল সকল দেশের, সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের শেষ ও সুন্দরতম পুষ্প—ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম বিকাশ দৃষ্ট হয়; যে-রহস্য অভেদ্য বলিয়াই বোধ হয়, তাহাও অদ্বৈতবাদ ভেদ করিয়াছে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী বেদান্ত। অদ্বৈতবাদ এরূপ নিগূঢ়—এরূপ উচ্চ যে, ইহা জনসাধারণের ধর্ম হইতে পারে না। যে-ভারতবর্ষে ইহার জন্ম এবং যেখানে ইহা বিগত তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতেছে, সেখানেও ইহা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। আমরাও ক্রমশঃ দেখিব যে, যে-কোন দেশের অতি চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষেও অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমরা নিজেদের এরূপ দুর্বল, এরূপ হীন করিয়া ফেলিয়াছি যে, আমরা বড় বড় দাবী করিতে পারি, কিন্তু স্বভাবতঃ আমরা অন্যের উপর নির্ভর করিতে চাই। আমরা যেন ক্ষুদ্র দুর্বল চারাগাছের মত—সর্বদাই একটা অবলম্বন চাই। কতবার একটি সহজ আরামের ধর্ম সম্বন্ধে বলিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অতি অল্প লোকই সত্যের কথা শুনিতে চায়, অল্পতর লোক সত্য জানিতে সাহস করে, অল্পতম লোক সেই সত্যকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহসী হন, ইহা মানুষের দোষ নয়, ইহা মস্তিষ্কের দুর্বলতা। যে-কোন নূতন তত্ত্ব—বিশেষ করিয়া উচ্চ তত্ত্ব—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কের ভিতর যেন একটি নূতন চিন্তা-প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করে; এবং ইহাতে মানুষের সমগ্র জীবন বিপর্যস্ত হইয়া যায়, এবং মানুষ সমতা হারাইয়া ফেলে। তাহারা পূর্ব হইতেই বিশেষ ধরনের পরিবেশে অভ্যস্ত; এবং সেই জন্য তাহাদের প্রাচীন পারিবারিক, নাগরিক—শ্রেণীগত, দেশগত, বহু এবং বিবিধ কুসংস্কার, সর্বোপরি প্রত্যেক মানুষের স্বীয় অন্তর্নিহিত বহু কুসংস্কার জয় করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এরূপ জনকয়েক সাহসী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিতে সাহসী হন, সত্য গ্রহণ করিতে সাহসী হন, শেষ পর্যন্ত সত্য অনুসরণ করিতে সাহসী হন।

অদ্বৈতবাদী কি বলেন? তিনি বলেনঃ যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। তিনি যে কেবল স্রষ্টা—তাহাই নহে, সৃষ্ট কার্যও তিনি। তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইহা কিরূপে সম্ভব? শুদ্ধ আত্মা ঈশ্বরই কি জীবজগতে পরিণত হইয়াছেন? হাঁ, তবে আপাতদৃষ্টিতে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে বিশ্ব-সংসাররূপে গ্রহণ করে, তাহার কোন প্রকৃত সত্তা নাই। তাহা হইলে তুমি, আমি এবং অন্যান্য দৃষ্ট বস্তুসমূহ কি? সব কেবল আত্মসম্মোহন—প্রকৃতপক্ষে অনন্ত অসীম নিত্য-মঙ্গলময় সত্তাই একমাত্র সত্তা। এই সত্তাতেই আমরা এই-সকল স্বপ্ন দেখি। তিনিই আত্মা—সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে, অনন্ত অসীম, সকল

জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঊর্ধ্বে। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে দেখি। তিনিই একমাত্র সত্তা। তিনিই এই 'টেবিল'; তিনিই এই সম্মুখস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী, তিনিই এই কক্ষপ্রাচীর, তিনিই সকল বস্তু, কেবল ঐগুলির বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন নাম ও রূপ তাঁহাতে নাই। এই 'টেবিল'-এর নাম বর্জন কর, বিশেষ রূপ অথবা আকারাদি বর্জন কর; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তিনি। বৈদান্তিক তাঁহাকে পুরুষও বলেন না, নারীও বলেন না—এই-সকল বর্ণনাই কল্পনা, মনুষ্য-মস্তিষ্কজাত মোহ-ভ্রান্তি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে আত্মার মধ্যে নরনারী-ভেদ নাই। যাহারা মোহগ্রস্ত ভ্রান্ত, যাহারা পশুবৎ, তাহারাই কেবল নারীকে নারী, পুরুষকে পুরুষরূপে দর্শন করে। যাঁহারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁহারা নরনারীর মধ্যে ভেদ করিবেন কিরূপে? সকল বস্তু, সকল জীবই আত্মা—লিঙ্গবিহীন, শুদ্ধ, চিরমঙ্গলময় আত্মা। নাম, রূপ—দেহই কেবল জড়; এবং এগুলিই সকল ভেদের স্রষ্টা। নাম ও রূপ—এই উভয় প্রকারের ভেদ যদি বর্জন করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া যাইবে। কোন স্থানেই 'দুই' নাই, সর্বত্রই আছে মাত্র সেই 'এক'। তুমি ও আমি এক। প্রকৃতি নাই, ঈশ্বরও নাই, বিশ্বও নাই; আছে কেবল এই এক অনন্ত অসীম সত্তা, যাঁহা হইতে নাম-রূপের মাধ্যমে সকল বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে? ইহা জানা যায় না। তোমার আত্মাকে তুমি দেখিবে কিরূপে? তুমি কেবল নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিতে পার। এই ভাবেই সেই এক নিত্য সত্তা আত্মার প্রতিবিম্বই সমগ্র বিশ্ব; এবং ভাল-মন্দ দর্পণের উপর পড়িলে ভাল-মন্দ প্রতিবিম্বের উদ্ভব হয়। হত্যাকারীর ক্ষেত্রে প্রতিফলক-দর্পণটিই মলিন বা মন্দ, আত্মা নহেন। একজন সাধুর ক্ষেত্রে দর্পণটি শুদ্ধ। আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ। জগতে ইনিই সেই এক—সেই একক সত্তা, যিনি নিম্নতম কীট-পতঙ্গ হইতে উচ্চতম প্রাণীতে পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিতেছেন। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব দিক্ দিয়া সমগ্র বিশ্ব সেই এক অখণ্ড সত্তারূপে বিরাজমান। আমরা এই এক সত্তাকে বিভিন্নরূপে দর্শন করি, সেই এক সত্তার উপরেই বিভিন্ন আকৃতি সৃষ্টি করি। যিনি নিজেকে মানব-স্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সত্তা মানুষের জগৎরূপেই প্রতিভাত হন। যিনি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সত্তা স্বর্গরূপে প্রতিভাত হন। বিশ্বজগতে কেবল একটি সত্তাই রহিয়াছে, দুইটি নাই। তাঁহার আসাও নাই, যাওয়াও নাই। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পুনরায় দেহধারণও নাই। তাঁহার মৃত্যু হইবে কিরূপে? তিনি কি কোন স্থানে গমন করিতে পারেন? এই-সকল স্বর্গ, এই-সকল ভুবন, এই-সকল স্থান মনের মিথ্যা কল্পনা মাত্র। ঐগুলির কোন অস্তিত্বই নাই, অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না।

আমি সর্বব্যাপী, নিত্য। আমি কোথায় গমন করিতে পারি? আমি কোথায় না আছি? আমি প্রকৃতির এই পুস্তকটি পাঠ করিতেছি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া শেষ করিতেছি, এবং পাতা উলটাইয়া যাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এক-একটি স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইতেছে। জীবনের আর একটি পৃষ্ঠা উলটানো হইল, আর একটি স্বপ্নও উদিত হইল, ইহাও বিলীন হইয়া যাইতেছে, ক্রমান্বয়ে চলিয়া যাইতেছে, আমি আমার পাঠ শেষ করিতেছি। আমি এগুলিকে চলিয়া যাইতে দিই, একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াই। পুস্তকটি ফেলিয়া দিই, এবং সমস্ত ব্যাপারটি পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী কি প্রচার করেন? অতীতে যে-সকল দেবতা ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন মানবাত্মাকে, যে আত্মা সূর্য-চন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর, স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চতর, এই বিশাল জগৎ অপেক্ষাও বিশালতর।

যে আত্মা জীবাত্মা-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার মহিমা কোন গ্রন্থ, কোন শাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান কল্পনাও করিতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমময় দেবতা, যিনি চিরদিন বিরাজমান; তিনি একমাত্র দেবতা, যিনি অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। সুতরাং আমাকে একমাত্র আমার আত্মাকেই উপাসনা করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ আমি আমার আত্মাকেই উপাসনা করি। কাহার সম্মুখে আমি প্রণত হইব? আমি আমার আত্মাকেই প্রণাম করি। কাহার নিকট আমি সাহায্যের জন্য যাইব? বিশ্বব্যাপী অসীম সত্তা 'আমাকে' কে সাহায্য করিতে পারে? এ সব কেবল মূর্খের স্বপ্ন, ভ্রান্তি মাত্র। কে কবে কাহাকে সাহায্য করিয়াছে? কেহই নহে। যখনই দেখিবে একজন দুর্বল ব্যক্তি—একজন দ্বৈতবাদী স্বর্গ হইতে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া রোদন ও আর্তনাদ করিতেছে, তখনই জানিও সে এরূপ করিতেছে, কারণ সে জানে না—সেই স্বর্গ তাহার নিজেরই মধ্যে বিরাজমান। সে স্বর্গ হইতে সাহায্য চায়, এবং সেই সাহায্য সে পায়। আমরা দেখি সেই সাহায্য আসে; কিন্তু তাহা আসে তাহার নিজের ভিতর হইতে, যদিও সে ইহাকে বাহিরের সাহায্য বলিয়া ভ্রম করে। কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, শয্যাশায়ী অসুস্থ ব্যক্তি দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে উঠিয়া দ্বার খোলে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় না। তখন সে শয্যায় ফিরিয়া আসে; কিন্তু পুনরায় সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে আবার উঠিয়া দ্বার খোলে। সেখানে কেহ নাই। অবশেষে সে আবিষ্কার করে, তাহার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দকেই সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ বলিয়া মনে করিতেছিল। একইভাবে দেবতাকে বাহিরে বৃথা অন্বেষণ করিবার পর মানুষের পরিক্রমা সমাপ্ত হয়, যে-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানেই সে ফিরিয়া আসে—সেই মানবাত্মায়; তখন সে বুঝিতে পারে, যে-ঈশ্বরকে সে এতকাল ধরিয়া সর্বত্র অন্বেষণ করিতেছে—বনে পর্বতে, প্রত্যেক নদী-নালায়, প্রত্যেক মন্দিরে গীর্জায় এবং স্বর্গে, সেই ঈশ্বর—যাঁহাকে সে এতকাল ধরিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্য-শাসনকারী বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছে, সেই ঈশ্বর সে নিজেই। আমিই তিনি, এবং তিনিই আমি। 'আমি' ব্যতীত অপর কোন ঈশ্বর ছিলই না এবং এই 'ক্ষুদ্র আমি'র অস্তিত্বও কোনদিন ছিল না।

তাহা সত্ত্বেও সেই পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন? তিনি কদাপি মোহগ্রস্ত হন নাই। পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে স্বপ্ন দেখিতে পারেন? তিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন নাই। সত্য কখনও স্বপ্ন দেখে না। 'কোথা হইতে এই মিথ্যা মোহের উৎপত্তি হইল?'—এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক। মোহ হইতেই মোহের উৎপত্তি। সত্য-দর্শন হইলেই মিথ্যা মোহের বিলয় ঘটে। মোহের ভিত্তিতেই মোহের স্থিতি—ঈশ্বরের, সত্যের অথবা আত্মার ভিত্তিতে নহে। তুমি কখনও মোহে বিরাজ কর না, মোহই তোমার মধ্যে থাকে। একটি মেঘ ভাসিতেছে, অপর একটি মেঘ আসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে তাহার স্থান অধিকার করে। তারপর অপর একটি মেঘ আসিয়া তাহাকেও সরাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যেরূপ শাশ্বত নীল আকাশে নানা বর্ণের মেঘ আসে, অল্পক্ষণের জন্য থাকে, তার পর চলিয়া যায়, আকাশ পূর্বের মত নীলই থাকে, সেইরূপ তোমরাও চিরকাল শুদ্ধ,

চিরকাল পূর্ণ। তোমরাই পৃথিবীর প্রকৃত দেবতা; না, দ্বিতীয় কোনকালেই নাই—কেবল 'একই' সর্বদা আছেন। 'তুমি এবং আমি'—এরূপ বলাই তো ভুল। বল, 'আমি'। 'আমিই' লক্ষ লক্ষ মুখে খাইতেছি; আমি কিরূপে ক্ষুধার্ত হইতে পারি? এই 'আমিই' অসংখ্য হস্তে কার্য করিতেছি; আমি কিরূপে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারি? 'আমিই' সমগ্র বিশ্বে জীবন যাপন করিতেছি; আমার মৃত্যু কোথায়? আমি সমস্ত জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। আমি কোথায় মুক্তি অন্বেষণ করিব? কারণ আমি স্বরূপতই চিরমুক্ত। কে আমাকে বন্ধন করিতে পারে—বিশ্বের ঈশ্বর কি? পৃথিবীর শাস্ত্রসমূহ কেবল ক্ষুদ্র মানচিত্র—যে-আমি বিশ্বের একমাত্র সত্তা, তাহারই মহিমা ইহারা বর্ণনা করিতে প্রয়াসী। সুতরাং এই-সকল গ্রন্থের মূল্য আমার নিকট আর কতটুকু?—অদ্বৈতবাদী এইরূপই বলেন।

'সত্যকে জান এবং এক নিমেষেই মুক্ত হইয়া যাও।' তখন সব অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যাইবে। যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বের অনন্ত অসীম সত্তার সহিত এক বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়। যখন সকল নর-নারী, সকল দেবতা-দেবদূত, সকল পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই একত্বে দ্রবীভূত হইয়া যায়—তখন সমস্ত ভয়ও দূর হইয়া যায়। আমি কি নিজেকে আঘাত করিতে পারি? আমি কি নিজেকে হত্যা করিতে পারি? আমি কি নিজেকে আহত করিতে পারি? কাহাকে ভয় করিব? তুমি কি কোনদিন নিজেকেই ভয় করিতে পার? তখন সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। কী আমার দুঃখের কারণ হইতে পারে? আমিই তো পৃথিবীর একমাত্র সত্তা। তখন সকল ঈর্ষা দূর হইয়া যাইবে। কাহাকে আমি ঈর্ষা করিব? নিজেকে? তখন সকল মন্দ ভাব দূর হইয়া যাইবে। কাহার বিরুদ্ধে আমার মন্দ ভাব থাকিবে? নিজের বিরুদ্ধে? পৃথিবীতে 'আমি' ছাড়া আর কেহই নাই। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইহাই হইল জ্ঞানের একটিমাত্র পন্থা। জগতে যে বহু আছে—সেই ভেদ, সেই কুসংস্কার ধ্বংস করিয়া ফেল। 'এই বহুবস্তুপূর্ণ জগতে সেই এককেই যিনি দর্শন করেন—এই জড় জগতের মধ্যে সেই চেতন সত্তাকেই যিনি দর্শন করেন, এই ছায়াময় পৃথিবীতে সেই সত্যকেই যিনি ধারণ করেন, তিনিই শাশ্বত শান্তি লাভ করেন, অন্য কেহ নহে, অন্য কেহই নহে।'
২

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যে তিনটি স্তর আছে, এগুলি তাহারই মূলসূত্র। আমরা দেখিয়াছি, ইহার আরম্ভ হইয়াছে 'জগদ্‌বহির্ভূত ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর'-এর মতবাদ লইয়া। তারপর বাহির হইতে ভিতরে গিয়া ইহা 'জগতের অন্তর্যামী ঈশ্বর'-এর মতবাদে স্থিতি লাভ করে। পরিশেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক ও অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া এবং সেই এক আত্মাকে পৃথিবীর বহুরূপ প্রকাশের ভিত্তি নির্দেশ করিয়া এই আধ্যাত্মিক চিন্তা শেষ হইয়াছে। ইহাই বেদের চরম ও পরম কথা। দ্বৈতবাদের ভাব লইয়া ইহার আরম্ভ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া ইহা অগ্রসর হয় এবং অদ্বৈতবাদে সমাপ্ত হয়। আমরা জানি, পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন, এমন কি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন এবং তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যক্তি এই ভাব অনুসারে কার্য করিতে পারেন। তাহা সত্ত্বেও আমরা জানি, ইহারই মধ্যে আছে বিশ্বের সকল নীতি-তত্ত্ব, সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা। 'অপরের মঙ্গলসাধন কর'—ইহা সকলেই বলেন; কিন্তু কেন? ইহার ব্যাখ্যা কি? কেন সকল মহৎ ব্যক্তিই সমগ্র মানবজাতির এবং মহত্তর ব্যক্তিগণ সকল প্রাণিজগতেরই ভ্রাতৃত্বের বিষয় বলিয়াছেন? কারণ তাঁহারা না জানিলেও এই-সকলের পশ্চাতে, তাঁহাদের অযৌক্তিক এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কারের মধ্যেও সকল বহুত্ববিরোধী সেই আত্মার শাশ্বত আলোকই অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতেছিল—সমগ্র বিশ্বই এক।

জ্ঞানের চরম কথাঃ এক অখণ্ড বিশ্ব—যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া জড়রূপে, বুদ্ধির মধ্য দিয়া জীবরূপে, আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। পৃথিবীতে যাহাকে পাপ বা অন্যায় বলা হয়, তাহারই আবরণে যে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহার নিকট এই জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং বিকট আকার ধারণ করে। একজন ভোগসুখকামীর নিকট এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া স্বর্গের আকার ধারণ করে, এবং পূর্ণ মানবের নিকট সবই তিরোহিত এবং সব কিছু তাঁহার নিজেরই আত্মা হইয়া যায়।

বস্তুতঃ সমাজের বর্তমান অবস্থায় পূর্বোক্ত স্তরেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। একটি স্তর অপর স্তরকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে না; একটি স্তর অপর স্তরের পূর্ণতর রূপ মাত্র। অদ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এ কথা বলেন না যে, দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক। ইহাও সত্য, কিন্তু নিম্নস্তরের সত্য; ইহাও পূর্ণ সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তাহার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করিতে দাও; কাহাকেও আঘাত করিও না, কাহাকেও স্থান দিতে অসম্মত হইও না, যে যেখানে দণ্ডায়মান আছে, সেখানেই তাহাকে গ্রহণ কর এবং যদি পার, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দাও, তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত কর, কিন্তু তাহাকে আঘাত করিও না, ধ্বংস করিও না। পরিশেষে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। 'যখন হৃদয়ের সকল কামনা পরাভূত হইবে, তখনই মর্ত্য জীব অমৃতত্বের অধিকারী হইবে'
৩
—তখন জীবই স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া যাইবে।

আত্মাঃ তাহার বন্ধন ও মুক্তি

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

অদ্বৈতবাদীর মতে জগতে সত্য বস্তু একটিই আছে, তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। অন্যান্য সকল বস্তুই মিথ্যা—মায়া-শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভাবিত। আমাদের উদ্দেশ্য হইল পুনরায় সেই ব্রহ্মভাবে ফিরিয়া যাওয়া। আমরা প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্ম, সেই সত্য, কিন্তু মায়া-সমন্বিত। যদি এই মায়া বা অজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই হইব। এই দর্শন অনুসারে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ আত্মার বাহিরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ। এই আত্মাই প্রকৃত জ্ঞাতা, প্রকৃত ভোক্তা; এই আত্মাই অন্তঃকরণের সাহায্যে দেহকে পরিচালিত করিতেছে।

জড় দেহের মধ্যে একমাত্র আত্মাই জড় নয়। যেহেতু আত্মা জড় নয়, অতএব আত্মা যৌগিক বস্তু হইতে পারে না; এবং যৌগিক পদার্থ নয় বলিয়া আত্মা প্রাকৃতিক কার্য-কারণ-নিয়মের অধীনও নয়, সেজন্য আত্মা অমর। যাহা অমর তাহা অনাদি, কেন না যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা নিরাকার; জড় ছাড়া আকার থাকিতে পারে না। সকল সাকার বস্তুরই আদি অন্ত আছে। আমরা কেহই এমন সাকার বস্তু দেখি নাই, যাহার আদি ও অন্ত নাই। শক্তি ও জড়ের সমন্বয়ে আকারের উদ্ভব হয়। এই 'চেয়ারটির' একটি বিশেষ আকার আছে; ইহার অর্থ এই যে, কিছু পরিমাণ জড়ের উপর কিছু পরিমাণ শক্তি কার্য করিয়া ঐ জড়কে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এই আকারটি জড় ও শক্তির সংযোগ। এ সংযোগ শাশ্বত হইতে পারে না, এরূপ সংযোগ কালক্রমে ভাঙিয়া যায়। এই কারণে সকল আকারই আদি এবং অন্ত-বিশিষ্ট। আমরা জানি, আমাদের দেহ বিনষ্ট হইবে; ইহার আরম্ভ বা আদি ছিল, একদিন ইহার শেষ হইবে। কিন্তু আকার নাই বলিয়া আত্মা এই আদি-অন্তের নিয়মাধীন নয়। আত্মা অনাদিকাল হইতেই আছে; 'কাল' যেমন শাশ্বত, মানবের 'আত্মা'ও তেমনি শাশ্বত। দ্বিতীয়তঃ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বব্যাপী। কেবল সাকার বস্তুই দেশকাল দ্বারা সৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ; যাহা নিরাকার, তাহা দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তমতে—আমার, তোমার, সকলের মধ্যে আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি যেমন পৃথিবীতে আছ, তেমনি সূর্যেও আছ; যেমন আমেরিকায় আছ, তেমনি ইংলণ্ডেও আছ। কিন্তু আত্মা দেহমনের মাধ্যমেই কার্য করে, এবং যেখানে দেহমন আছে, সেখানে তাহার কার্যও দৃষ্ট হয়।

আমাদের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা মনে একটি ছাপ রাখিয়া যায়, এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় 'সংস্কার'; এবং এই-সকল সংস্কার মিলিত হইয়া একটি প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করে, যাহাকে বলা হয় 'চরিত্র'। মানুষের চরিত্র মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে; চরিত্র তাহার নিজের মানসিক এবং দৈহিক কার্যাবলীর ফল মাত্র। সংস্কারসমূহের সমন্বয়ই হইল সেই শক্তি, যাহা মৃত্যুর পরে মানুষের পরবর্তী জীবনের দিক নির্ণয় করে। একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তাহার দেহপাত হয় এবং সেই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কারসমূহ মনের ভিতর থাকিয়া যায়। এই মন সূক্ষ্মতর জড় বস্তু বলিয়া বিলীন হয় না, কারণ বস্তু যত সূক্ষ্ম হয়, তত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরিশেষে মনও লয় পায়, এবং এই লয়ের জন্যই আমরা চেষ্টা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট যে উদাহরণটির কথা আমার মনে পড়িতেছে, তাহা ঘূর্ণিবায়ু। বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন বায়ু-প্রবাহ আসিয়া একস্থানে সমবেত হয়, এবং ঘুরিতে আরম্ভ করে। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা নিকটের কাগজ, খড়কুটা প্রভৃতি টানিয়া লইয়া একস্থানে ধূলিময় আকার ধারণ করে; আবার তাহা ফেলিয়া দিয়া, অন্য স্থানে যাইয়া অন্য আকারে ঘুরিতে থাকে, এইরূপে সম্মুখে যাহা আছে, তাহা আকর্ষণ করিয়া পুনরায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে। সংস্কৃতে যাহাকে 'প্রাণ-শক্তি' বলে, তাহাও এইভাবে একত্র হইয়া জড়-পদার্থ হইতে দেহ ও মন সৃষ্টি করে; যতক্ষণ না ঐ দেহের পতন হয়, ততক্ষণ সে সক্রিয়ভাবে কার্য করিতে থাকে; ঐ দেহনাশের পর নূতন উপাদান হইতে প্রাণশক্তি অপর একটি দেহ সৃষ্টি করে, সেই দেহের বিনাশের পর আবার অপর একটি দেহ সৃষ্টি করে—এইভাবেই এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। শক্তি জড়-পদার্থ ব্যতীত চলিতে পারে না। সেইজন্য দেহপাতের পরেও মনের উপাদান থাকে, সংস্কাররূপে প্রাণ-শক্তি মনের উপর কার্য করে;

মনে করুন, এই কক্ষে একটি 'বল' আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া লাঠি আছে। আমরা সেই লাঠি দিয়া বলটিকে শতবার আঘাত করিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঠেলিয়া দিতেছি, যতক্ষণ না বলটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়। কিরূপ বেগে এবং কোন্ দিকে বলটি যাইবে? কক্ষের ভিতর যে-সকল শক্তি এ-যাবৎ বলটির উপর কার্য করিতেছিল, সেগুলির দ্বারাই ইহা নিরূপিত হইবে। বলটির উপর যে-সকল বিভিন্ন আঘাত

চেষ্টা করিতেছে; যেরূপ ডায়নামো (dynamo) হইতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ একটি বৃত্ত (circuit) সম্পূর্ণ করিয়া ডায়নামোতেই প্রত্যাবর্তন করে। আত্মার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া আত্মা বিবিধ উদ্ভিদ্ ও পশুর মধ্য দিয়া অবশেষে মনুষ্যশরীরে উপস্থিত হয়, এবং মানবই ব্রহ্মের নিকটতম। যে-ব্রহ্ম হইতে আমরা বাহির হইয়া আসিয়াছি, তাঁহাতে ফিরিয়া যাওয়াই মহান্ জীবন-সংগ্রাম। মানুষ ইহা জানুক বা নাই জানুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পৃথিবীতে আমরা যাহা কিছু গতিময় দেখি, খনিজ পদার্থে, বৃক্ষ-লতায় অথবা পশুপক্ষীতে যাহা কিছু সংগ্রাম দেখি, সবই সেই এক কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রাম-লাভের প্রচেষ্টা মাত্র। পূর্বে সাম্যাবস্থা ছিল, পরে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সকল অংশ—অণু-পরমাণু সেই বিনষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সংগ্রামে তাহারা মিলিত হইয়া নূতন নূতন ভাবে সৃষ্ট হইতেছে, এইভাবেই প্রকৃতির সকল অত্যাশ্চর্য বস্তুর উদ্ভব হইতেছে। প্রাণিজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সকল সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা, সকল সামাজিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধ, সেই সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য শাশ্বত সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নহে।
জন্ম হইতে মৃত্যুর দিকে এই গতি—এরূপ বিচরণকেই সংস্কৃতে বলা হয় 'সংসার'; আক্ষরিক অর্থে বলা হয়—জন্ম-মরণ-চক্র। সকল সৃষ্ট বস্তুই এই চক্র পরিক্রমণ করিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে মোক্ষলাভ করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আমরা সকলেই ভবিষ্যতে মুক্তিলাভে অধিকারী হই, তাহা হইলে তাহার জন্য আবার সংগ্রামের প্রয়োজন কি? যদি প্রত্যেকেই মুক্ত হইবে, তাহা হইলে আমরা বসিয়া থাকিব এবং অপেক্ষা করিব। ইহা সত্য যে, শীঘ্র হউক বা বিলম্বেই হউক, প্রত্যেক জীবই মুক্তিলাভ করিবে; কেহই পিছনে পড়িয়া থাকিবে না, কাহারও ধ্বংস হইবে না; প্রত্যেক বস্তু নিশ্চয়ই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইবে। যদি তাই হয়, তবে আমাদের সংগ্রামের প্রয়োজন কি? প্রথমতঃ সংগ্রামই হইল একমাত্র উপায়, যাহা আমাদিগকে কেন্দ্রস্থলে আনিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি না, কেন সংগ্রাম করিতেছি। সংগ্রাম আমাদের করিতেই হইবে। 'সহস্র লোকের মধ্যে কয়েকজনই মাত্র বুঝিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন।' অধিকাংশ মানুষ জড় দ্রব্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; কিন্তু কয়েকজন আছেন, যাঁহারা জাগ্রত হন—ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করিতে চান, যাঁহারা মনে করেন—পৃথিবীর লীলাখেলা যথেষ্ট হইয়াছে। ইঁহারাই সজ্ঞানে সংগ্রাম করেন; অন্যান্য সকলে সংগ্রাম করে অজ্ঞানে।

বেদান্তদর্শনের আরম্ভ ও শেষ হইলঃ অসত্যকে ত্যাগ এবং সত্যকে গ্রহণ করিয়া 'সংসার ত্যাগ করা'। যাঁহারা পার্থিব মোহে মুগ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা হয়তো বলিতে পারেনঃ কেন আমরা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব এবং কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতে চেষ্টা করিব? মনে করুন, আমরা সকলেই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, এই জগৎ সুন্দর ও সুখদায়ক; অতএব কেন আমরা জগৎকেই আরও বেশী উপভোগ করিতে চেষ্টা করিব না? কেন আমরা সংসারের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিব? তাঁহারা বলেনঃ পৃথিবীতে প্রত্যহই যে উন্নতি সাধিত হইতেছে, সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর; জগতে কতই না বিলাসদ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে! জগৎ অতিশয় সুখজনক। কেন আমরা তাহা ছাড়িয়া যাইব, এবং যাহা উপভোগ্য নয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিব? ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবীর ধ্বংস সুনিশ্চিত; পৃথিবী নিশ্চয়ই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে। পূর্বে বহুবার আমরা একই প্রকার সুখ উপভোগ করিয়াছি। বর্তমানে আমরা যে-প্রকার দেখিতেছি, সে-সকলই পূর্বে বহুবার প্রকটিত হইয়াছে; এবং এখন আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করিতেছি, সে-পৃথিবীও পূর্বে বহুবার এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। আমিও পূর্বে বহুবার এখানে আসিয়াছি, তোমাদের সহিত বহুবার কথা বলিয়াছি। তোমরাও জানিতে পারিবে—ইহা সত্য; এবং যে-সকল কথা তোমরা বর্তমানে শুনিতেছ, সেগুলি তোমরা পূর্বেও বহুবার শুনিয়াছ, এবং ভবিষ্যতেও বহুবার এরূপ ঘটিবে। আত্মা সর্বদাই এক ও অভিন্ন; দেহই কেবল অবিরত বিনষ্ট ও পুনরাবির্ভূত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই-সকল ঘটনা পর্যায়ক্রমে ঘটে। মনে কর, তিন-চারটি পাশা আছে; তুমি সেইগুলি ফেলিলে—একটিতে পাঁচ, একটিতে চার, একটিতে তিন, একটিতে দুই দেখা গেল। যদি এইভাবে ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আবার এরূপ হইবে, এই সংখ্যাগুলি পুনঃপুনঃ দেখা যাইবে। ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া যাও এবং যতই দেরী হউক না কেন, এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই আবার দেখা যাইবে। অবশ্য কতবার পরে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না—ইহা দৈবাধীন। জীবাত্মাদের একত্র হওয়ার ব্যাপারেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যতই বিলম্ব হউক না কেন, সেই একই সংযোগ এবং বিয়োগ বারংবার ঘটিবে।

ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক জীবশরীরই চিকাগোর 'ফেরিস্ হুইল'-এর এক-একটি গাড়ীর মত—চক্রটি সর্বদাই চলিতেছে, কিন্তু প্রতি গাড়ীর আরোহী পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মানুষ একইভাবে একটি গাড়ীতে উঠিতেছে, চক্রের ঘূর্ণনের সহিত ঘুরিতেছে, আর পরে নামিয়া যাইতেছে। চক্রটি ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিয়াছে। এক-একটি জীবাত্মা এভাবে এক-একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহার মধ্যে কিছুকাল বাস করিতেছে, তারপর উহা ত্যাগ করিয়া অন্য একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাও ত্যাগ করিয়া তৃতীয় একটি ধারণ করিতেছে। এইভাবে জন্মমৃত্যুর চক্র ঘুরিয়া চলিতেছে, যতদিন না জীব সেই চক্র হইতে বাহির হইয়া মুক্তিলাভ করে।

সেই একই জন্ম, সেই পানাহার, তারপর মৃত্যু—বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। কেহ কেহ সাংসারিক ভোগসুখ অপেক্ষা উচ্চতম আর কিছুই কোনদিন পায় না ; কিন্তু যাঁহারা উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে চান, তাঁহারা দেখেন—এই-সকল ভোগসুখ চরম লক্ষ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র।

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে মানুষের জীবনে অতীত এবং ভবিষ্যৎ জানিবার অতি আশ্চর্য শক্তির কথা সকলে শুনিয়াছ। ইহার ব্যাখ্যাঃ যতদিন পর্যন্ত আত্মা কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন থাকে, যদিও আত্মার স্বভাবগত স্বাধীনতা কখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না, এবং সেজন্য আত্মা নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এমন কি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলকেও অতিক্রম করিতে পারে, যেরূপ মুক্তাত্মার ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে, তথাপি ততদিন তাহার কর্ম কার্য-কারণ নিয়মের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয় এবং এরূপে কর্মফল-পরম্পরা সম্বন্ধে যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁহাদের পক্ষে অতীত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব হয়।

যতদিন কোন বাসনা কামনা বা অভাবের অস্তিত্ব থাকে, ততদিন অপূর্ণতাও থাকে। পূর্ণ মুক্তাত্মার কোন বাসনা-কামনা থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের কোন অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার যদি কোন বাসনা-কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে তিনি অপূর্ণ হইয়া পড়েন। এই কারণে 'ঈশ্বর ইহা কামনা করেন, উহা কামনা করেন; তিনি কখনও রুষ্ট, কখনও তুষ্ট'—এরূপ বলা শিশুর মুখের আধ-আধ বুলি, অর্থহীন কথা। সেইজন্য সকল আচার্য ইহাই শিক্ষা দিয়াছেনঃ কোন কিছু কামনা করিও না; সকল বাসনা ত্যাগ কর, পূর্ণভাবে তৃপ্ত হও।

দন্তহীন শিশু 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে পৃথিবীতে আসে; এবং বৃদ্ধও 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে দন্তবিহীন অবস্থায় পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়। এরূপে জীবনের আরম্ভ ও শেষ—চরম দুটি প্রান্ত একই প্রকার; তবে শিশুর এই জীবন সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই, বৃদ্ধের কিন্তু জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। যখন আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন অতি মৃদু হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না; যখন তাহা অতি দ্রুত হয়, তখনও তাহার ফল হয় অন্ধকার। এইভাবে চরমসীমা-দুইটি একই প্রকার হয়, যদিও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দেওয়ালের বাসনা-কামনা নাই, পূর্ণ মুক্তমানবেরও নাই। কিন্তু দেওয়ালটির কোন চেতনা নাই, যে, উহা কামনা করিবে; আর পূর্ণ মুক্তমানবের কামনা করিবার কিছুই থাকে না। জড়বুদ্ধি লোকদের এই জগতে কোন কামনা থাকে না, যেহেতু তাহাদের মস্তিষ্ক অপূর্ণ। একই সঙ্গে—উচ্চতম অবস্থাতেও আমাদের কোন কামনা থাকে না। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একজন পশুর নিকটবর্তী, অন্যজন ঈশ্বরের।

পুনর্জন্ম

[নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত দার্শনিক পত্রিকা 'Metaphysical Magazine' এর জন্য লিখিত, মার্চ, ১৮৯৫]

‘অতীতে তোমার ও আমার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে, হে শত্রুনাশকারী (অর্জুন), আামি সে-সবই অবগত আছি, কিন্তু তুমি অবগত নও।’—গীতা
৪

সকল দেশে ও সকল কালে যে-সকল কূট সমস্যা মনুষের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল মানুষ নিজে। যে অগণিত রহস্য ইতিহাসের আদি যুগ হইতে মানুষের শক্তিকে সমাধানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ঐ কার্যে ব্রতী করিয়াছে, তন্মধ্যে গভীরতম রহস্য হইল মানুষের নিজ স্বরূপ। ইহা একদিকে যেমন সমাধানের অসাধ্য একটি প্রহেলিকা, অপরদিকে তেমনি সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যাও। মানুষের এই স্বরূপটিই আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান, সর্বপ্রকার অনুভূতি ও সর্বপ্রকার কার্যকলাপের মূল উৎস ও শেষ আধার। এমন কোন সময় ছিল না, এমন কোন সময় আসিবেও না—যখন মানুষের নিজের স্বরূপ তাহার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না।

মানুষের সকল প্রকার ক্ষুধার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসারূপ যে-ক্ষুধা মানুষের নিজ সত্তার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে, বহির্বিশ্বের মূল্যায়নকল্পে অন্তঃরাজ্য হইতে কোন মানদণ্ড আবিষ্কারের জন্য যে সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, এবং এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে একটি অপরিবর্তনীয় স্থির বিন্দু আবিষ্কার করিবার জন্য যে অনিবার্য ও স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যদিও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকণিকা-ভ্রমে ধূলিমুষ্টি ধরিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এমন কি যুক্তি ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উচ্চতর রাজ্যের কোন বাণীর প্রেরণা পাইয়াও সে অনেক সময়ই অন্তর্নিহিত দেবত্বের মর্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি যতদিন হইতে এই অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কোন সময় দেখিতে পাওয়া যায় না, যখন কোন-না-কোন জাতি বা কতিপয় ব্যক্তি সত্যের বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন নাই।

অতীতে অথবা আধুনিক কালে—বিশেষতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন লোকের কখনও অভাব ঘটে নাই, যাঁহারা পারিপার্শ্বিক ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে একদেশদর্শী, বিবেচনাহীন এবং কুসংস্কারপূর্ণ অভিমত স্বীকার করিবার ফলে, কখনও বা বিবিধ দর্শনমত ও সম্প্রদায়ের বক্তব্যের অস্পষ্টতার দরুন বিরক্তির ফলে, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হয়, অনেক সময় সঙ্ঘবদ্ধ পৌরোহিত্যের ভয়াবহ কুসংস্কারাদির প্রভাবে চরম বিপরীত মতে উপনীত হইয়াছেন; এবং এই-সকল কারণে হতাশ হইয়া শুধু যে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, এই কার্য নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। দার্শনিকেরা ক্ষোভ বা বিদ্রূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবংপুরোহিতগণ তরবারির সাহায্য পর্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু সত্য একমাত্র তাঁহাদেরই নিকট আবির্ভূত হয়, যাঁহারা সত্যের জন্যই লাভালাভের চিন্তা ছাড়িয়া নির্ভীক হৃদয়ে সত্যেরই পীঠস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মানুষের বুদ্ধি যখন জ্ঞানপূর্বক কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাঁহাদের নিকট আলোক উদ্ভাসিত হয়; এবং ধীরে ধীরে হইলেও ক্রমশঃ তাহা অজ্ঞাতভাবে অনুস্রুত হইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসারিত হয়। দার্শনিকগণ দেখাইয়া দেন, কিরূপে মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছায় অবিরাম সাধনায় রত হন; এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কিরূপে নীরবে ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজে তাঁহাদের সাধনালব্ধ সত্য অনুপ্রবেশ করে।

মানুষ তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যতগুলি মত আজ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে, তন্মধ্যে এই মতটিই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে, ‘আত্মা’ নামক একটি সত্যবস্তু আছে এবং উহা দেহ হইতে ভিন্ন ও অমর। যাঁহারা এইরূপ আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবান, তাঁহাদের মধ্যে আবার চিন্তাশীল অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে, আত্মা এই জন্মের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান।

আধুনিক মানবসমাজে যাঁহাদের ধর্ম সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহা বিশ্বাস করেন, এবং যে-সব দেশ ভগবানের আশীর্বাদে সর্বাধিক উন্নত, সে-সব দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদিও আত্মার অনাদিত্বে বিশ্বাস করার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা আত্মার পূর্বাস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ইহা ভিত্তিস্বরূপ। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণী ইহাতে বিশ্বাস করিতেন, প্রাচীন পারসীকগণ এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন; গ্রীক দার্শনিকগণ এই ধারণাকে তাঁহাদের দর্শন-চিন্তার ভিত্তি-প্রস্তররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিব্রুগণের মধ্যে ফ্যারিসিগণ (আচারনিষ্ঠ প্রাচীন য়াহুদী ধর্মসম্প্রদায়) ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সুফীরা প্রায় সকলেই এই সত্য স্বীকার করেন।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাসের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মনে হয়, বিশেষ ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর পরে শরীরের এতটুকু মাত্র অংশও জীবিত থাকে—এই ধারণায় উপস্থিত হইতেই প্রাচীন জাতিসমূহের কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে।

আবার দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর পরও জীবিত থাকে, এইরূপ কোন বস্তু সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হইতে আরও কত যুগ-যুগান্তের প্রয়োজন হইয়াছে। এমন একটি সত্তা আছে, দেহের সহিত যাহার সম্পর্ক সাময়িক, এইরূপ ধারণায় উপনীত হওয়া যখন সম্ভব হইল, কেবল তখনই এবং যে-সকল জাতির মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের উদয় হইতে পারিল, একমাত্র তাহাদের মধ্যে এই অনিবার্য প্রশ্নটি উত্থিত হইয়াছিলঃ কোথায়, কখন?

প্রাচীন হিব্রুগণ আত্মা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া মনের স্থৈর্য নষ্ট করেন নাই। তাঁহাদের মতে মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়। কার্ল হেকেল যথার্থই বলিয়াছেনঃ 'ইহা যদিও সত্য যে, (য়াহুদীদের) নির্বাসনের পূর্ববর্তী বাইবেলের প্রাচীন অংশে হিব্রুগণ দেহ হইতে পৃথক্ প্রাণ-তত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহারা কখনও 'নেফেস' অথবা 'রুয়াখ' অথবা 'নেশামা' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি এই-সকল শব্দ চৈতন্য বা আত্মার ধারণার দ্যোতক না হইয়া বরং প্রাণবায়ুরই দ্যোতক। আবার প্যালেস্টাইনের অধিবাসী য়াহুদীগণের নির্বাসনোত্তর কালের রচনায় কোথাও কোন পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট অমর আত্মার উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত শুধু এমন একটি প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা শরীর ধ্বংস হইলে দিব্য সত্তা 'রুয়াখ'-এ অন্তর্হিত হয়।'

আত্মা সম্বন্ধে প্রাচীন মিশর ও ক্যাল্ডিয়ার অধিবাসিগণের আত্মা সম্বন্ধে নিজস্ব বহু অদ্ভুত ধারণা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানবের কোন একটি অংশ জীবিত থাকে বলিয়া তাহারা যে ধারণা পোষণ করিত, তাহার সহিত প্রাচীন হিন্দু, পারসীক, গ্রীক বা অন্য কোন আর্যজাতির এ-সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিকে যেন মিশাইয়া ফেলা না হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই আত্মার ধারণা সম্পর্কে আর্য ও অ-সংস্কৃতভাষাভাষী ম্লেচ্ছদিগের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যতঃ মৃতদেহের শেষকৃত্য-অনুষ্ঠানের রীতি যেন ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্লেচ্ছগণ শবকে সযত্নে প্রোথিত করিয়া অথবা তদপেক্ষা জটিলতর বিরাট প্রক্রিয়া অবলম্বনে শবকে 'মমি'-তে পরিণত করিয়া মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত, আর আর্যগণ সাধারণতঃ মৃতদেহকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিতেন।

ইহারই মধ্যে আমরা একটি গভীর রহস্যের সন্ধান পাই: আর্যজাতির—বিশেষতঃ হিন্দুদের সহায়তা ব্যতীত মিশরীয় হউক, এসিরীয় হউক বা ব্যাবিলনবাসীই হউক—কোন ম্লেচ্ছজাতিই এই ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই যে, আত্মা-নামক এমন এক পৃথক্ বস্তু আছে, যাহা শরীর-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে পারে।

যদিও হেরোডোটাস বলেন, মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণা করিতে পারিয়াছিল; এবং তিনি মিশরীয়গণের মতবাদ-প্রসঙ্গে এইরূপ বলেন, 'আত্মা দেহ-নাশের পরেও বারংবার এক-একটি জীবদেহে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে ঐ জীব বাঁচিয়া উঠে; অতঃপর জলচর স্থলচর ও খেচর—যত প্রাণী আছে—সকলের মধ্য দিয়া সে যাতায়াত করে, এবং তিনসহস্র বৎসরকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পুনর্বার মানব-দেহে ফিরিয়া আসে', তথাপি মিশর-তত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান কালে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলে অদ্যাবধি মিশরীয় জনসাধারণের ধর্মের মধ্যে আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-বিষয়ে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বরং ম্যাসপেরো[৫], আর্মান[৬] এবং অপরাপর খ্যাতনামা মিশরতত্ত্ববিদের আধুনিকতম এই অনুমানই অনুমোদিত হয় যে, পুনর্জন্মবাদের সহিত মিশরীয়গণ সুপরিচিত ছিল না।

প্রাচীন মিশরীয়গণের মতে আত্মা একটি অন্যসাপেক্ষ বিকল্প সত্তা মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং কোনদিনই দেহের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যতদিন দেহ থাকে, কেবল ততদিনই উহা জীবিত থাকে, যদি কোন আকস্মিক কারণবশতঃ মৃতদেহটি বিনষ্ট হয়, তবে বিদেহ আত্মাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু ও ধ্বংস বরণ করিতে হয়। মৃত্যুর পর আত্মা সমগ্র পৃথিবীময় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রতি রাত্রে মৃতদেহটি যেখানে আছে সেখানে তাহাকে ফিরিতে হয়; সে সর্বদা দুঃখমগ্ন, সর্বদা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং আর একবার জীবনকে উপভোগ করিবার জন্য তীব্র বাসনাযুক্ত, অথচ কোনমতেই তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয় না। উহার পুরাতন শরীরের কোন অংশ কোন প্রকারে আহত হইলে আত্মার অনুরূপ অংশও অনিবার্যভাবে আহত হয়। এই ধারণা- বশতই প্রাচীন মিশরীয়গণ মৃতদেহ সংরক্ষণ করিবার জন্য অতিরিক্ত ভাবে ব্যাকুল ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে মরুভূমিকে শবক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করা হইয়াছিল, কারণ তথায় বায়ুর শুষ্কতা-হেতু মৃতদেহ সহজে বিনষ্ট হইত না, এবং এইরূপে বিদেহ প্রেতাত্মা দীর্ঘজীবন লাভের সুযোগ পাইত।

কালক্রমে জনৈক দেবতা শবদেহ সংরক্ষণের এমন এক উপায় আবিষ্কার করিলেন, যাহার সাহায্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বজনবর্গের মৃতদেহ প্রায় অনন্তকালের জন্য সংরক্ষণ করিবার আশা পোষণ করিত; এবং নিদারুণ দুঃখের হইলেও আত্মার জন্য এইরূপ অমরত্বের ব্যবস্থাই তাহারা করিত।

পৃথিবীর সহিত আর কোন নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হইলেও একটি শাশ্বত খেদ সেই মৃত আত্মাকে সর্বদাই পীড়িত করিত; বিদেহী আত্মা সখেদে বলিতঃ 'হে ভ্রাতঃ, তুমি কখনও পানাহার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না, মাদকতা, ভালবাসা, সর্বপ্রকার সম্ভোগ এবং দিবারাত্র বাসনার অনুসরণ হইতে বিরত হইও না। দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিও না, কারণ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল কতটুকু? পশ্চিমে যে (প্রেত-) লোক আছে, উহা সুপ্তিময় ও ঘন ছায়ায় আবৃত; উহা এমন একটি স্থান, যেখানে একবার অধিষ্ঠিত হইলে সেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের 'মমি'তে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়, পুনর্বার আর কোনদিনই স্বজনবর্গকে দেখিবার জন্য জাগ্রত হয় না, আর তাহারা তাহাদের পিতা-মাতাকে চিনিতে পারে না, এবং তাহাদের হৃদয়ে স্ত্রী ও সন্তানবর্গের

কোন স্মৃতি থাকে না। পৃথিবী তাহার অধিবাসীদিগকে যে প্রাণবন্ত জলধারা দান করে, তাহা আমার নিকট পঙ্কিল ও প্রাণহীন; পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহারা সকলেই জলধারার অধিকারী; অথচ আমার নিকট ঐ জলধারাই এখন এক পূতিগন্ধময় গলিত ধারায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুর এই উপত্যকায় আসিয়া অবধি আমি বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি কে এবং কোথায় আছি। আমাকে স্রোতস্বিনীর জল পান করিতে দাও ... উত্তরাভিমুখে মুখ করিয়া আমাকে জলাশয়ের ধারে রাখ, যাহাতে মৃদুবায়ু আমাকে স্নেহস্পর্শ দান করিতে পারে এবং আমার হৃদয় দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সজীব হইতে পারে।'

৭

ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত্যুর পরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মিশরীয়দের মত অত গবেষণা না করিলেও তাহাদের মতে আত্মাকে দেহের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করা হয়, এবং ঐ আত্মা কবর-স্থানেরই সহিত জড়িত। তাহারাও এই দেহ-নিরপেক্ষ কোন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই এবং আশা পোষণ করিত, মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত হইবে। যদিও দেবী ইস্থার নানা বিপদ আপদ ও রোমাঞ্চকর অভিযানের অন্তে ইয়া ও দমকিনার পুত্র—তাঁহার মেষপালক স্বামী দমুজিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি 'অতি ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাও তাহাদের প্রিয়জনদের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত দেবালয় হইতে দেবালয়ে বৃথাই কাতর আবেদন জানাইয়াছিল।'

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন মিশরীয় বা ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত ব্যক্তির শবদেহ হইতে কিংবা কবর-স্থান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মা সম্পর্কে কখনও ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই। সব দিক্ বিবেচনা করিলে এই পার্থিব জীবনই সর্বোত্তম, এবং মৃত ব্যক্তি সর্বদাই আর একবার এই জীবন পাইবার সুযোগের জন্য লালায়িত এবং যাহারা জীবিত তাহারাও দুঃখিত, দেহের উপর নির্ভরশীল এই দ্বিতীয় আত্মার অবস্থিতিকাল বৃদ্ধি করিবার গভীর আশা পোষণ করিয়া তাহারা মৃত ব্যক্তিদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

এইরূপ পরিবেশে আত্মা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত স্থূল জড়বাদ—তদুপরি ভয় ও যন্ত্রণা-পূর্ণ। অসংখ্য অশুভ শক্তির দ্বারা ত্রস্ত হইয়া, ঐগুলিকে এড়াইবার নৈরাশ্যজনক ও উদ্বিগ্ন চেষ্টায় জীবিতদের আত্মাও তাহাদের ধারণানুযায়ী মৃতের আত্মার মত সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কিছুতেই গলিত শব ও শবাধারের গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিতেছে না।

এখন আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার মূল আবিষ্কারের জন্য অপর একটি জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, যাহাদের নিকট ঈশ্বর সর্বকরুণানিলয় সর্বব্যাপী পুরুষ, যাহাদের নিকট তিনি জ্যোতির্ময় দয়ালু ও সহায়ক বিভিন্ন দেবতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন; মানবজাতির মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'পিতা যেমন তাহার প্রিয় পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনিও তেমনি আমার হস্ত ধারণ করুন'; যাহাদের নিকট জীবন ছিল আশার বস্তু, নৈরাশ্যের নয়; ধর্ম যাহাদের নিকট জীবনের প্রমত্ত উত্তেজনার অবসরে বেদনার্ত ব্যক্তির মুখ হইতে অকস্মাৎ নিঃসৃত কতকগুলি সবিরাম আর্তনাদ মাত্র নয়, পরন্তু যাহাদের ধারণাসমূহ আমাদের নিকট শস্যক্ষেত্রের সুগন্ধে ও বনানীর সৌরভে আমোদিত হইয়া আসে; যাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বাধাহীন আনন্দপূর্ণ বন্দনাগীতি দিনমণির প্রথম কিরণে উদ্ভাসিত এই শোভাময়ী ধরণীকে অভিনন্দন করিবার কালে পক্ষিকণ্ঠ হইতে যেরূপ কাকলী নিঃসৃত হয়, তাহারই সদৃশ—আজও তাহা অষ্টসহস্র বৎসরের সরণী ধরিয়া আমাদের নিকট দিব্যধামের নবীন আহ্বানের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়; আমরা এবার প্রাচীন আর্যজাতির কথাই বলিতেছি।

আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের প্রার্থনা-মন্ত্র এইরূপে লিপিবদ্ধ আছেঃ 'আমাকে সেই মৃত্যুহীন অক্ষয় ধামে স্থান দাও, যেখানে দিব্যলোকের জ্যোতিঃ বিদ্যমান এবং যেখানে চিরন্তন দীপ্তি জাজ্বল্যমান।' 'আমাকে সেই ধামে অমর করিয়া রাখ, যেখানে রাজা বিবস্বানের পুত্র বাস করেন, যেখানে দিব্যধামের রহস্যাবৃত অর্চনালয় বর্তমান।' 'আমাকে সেই লোকে অমর করিয়া রাখ, যেখানে তাঁহারা সানন্দে যদৃচ্ছ বিহার করেন।' 'পৃথিবী ও আন্তরীক্ষের ঊর্ধ্বে সর্বাপেক্ষা অন্তর্বর্তী যে তৃতীয় দ্যুলোকে নিখিল বিশ্ব জ্যোতির্ময়রূপে অবস্থিত, সেই আনন্দ-লোকে আমাকে অমর করিয়া রাখ।'

এইবারে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আর্যজাতি ও ম্লেচ্ছগণের ধারণার মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। একের দৃষ্টিতে এই দেহ এবং এই পার্থিব জগৎই একমাত্র সত্য ও কাম্য বস্তু। তাহারা এই বৃথা আশা পোষণ করে যে, মৃত্যুকালে যে জীবনীশক্তি দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হইয়া নির্যাতন ও দুঃখ অনুভব করে, মৃতদেহকে সযত্নে রক্ষা করিলে ঐ জীবনীশক্তিকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়। এইরূপে তাহাদের নিকট জীবন্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃতদেহই অধিকতর যত্নের বস্তু হইয়া পড়িল। অপরে দেখিল, শরীর ত্যাগ করিয়া যাহা প্রস্থান করে, তাহাই মানবের প্রকৃত সত্তা এবং শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহা এমন উচ্চতর সুখানুভবের স্তরে উপনীত হয়, শরীরে অবস্থানকালে তেমন সুখ সে কখনও পায় নাই। তাই তাহারা ধ্বংসোন্মুখ শবদেহকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল।

এখানেই আমরা এমন একটি ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি, যাহা হইতে আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত মানবকে কেবল শরীর না ভাবিয়া আত্মা-রূপে ভাবা হইয়াছে, যেখানে প্রকৃত মানব ও তাহার শরীরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য কোন সম্বন্ধ একেবারেই নাই—সেখানেই আত্মার মুক্তি-সম্বন্ধীয় মহান্ ভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই স্তরে উঠিয়া আর্যগণের দৃষ্টি যখন মৃত ব্যক্তির আবরণভূত বস্ত্রসদৃশ জ্যোতির্ময় দেহকে ভেদ করিয়া তদতীত স্তরে উপনীত হইল এবং আত্মার নিরাকার, পৃথক্, স্বতন্ত্র সত্তার প্রকৃত তত্ত্ব তাহারা বুঝিল, তখনই প্রশ্ন উঠিল—'কোথা হইতে?'

এই ভারতবর্ষে এবং আর্যদিগের মধ্যেই আত্মার পূর্বাস্তিত্বের, অমরত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয়। প্রাচীন মিশর সম্পর্কে সম্প্রতি যত গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সেখানে কখনও স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ও

পার্থিব জীবন লাভের পূর্বে বিদ্যমান আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল। কোন কোন রহস্যবিদ্যাবিদ্ অবশ্য এই তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়, ঐ ভাব ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছিল।

কার্ল হেকেল বলেন, 'আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি, যতই গভীরভাবে মিশরীয় ধর্ম অনুধাবন করা যাইবে, ততই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, মিশরীয় জনসাধারণ যে-ধর্মের অনুসরণ করিত, উহার সহিত পুনর্জন্মবাদের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন কি রহস্যবিদ্যাবিদ্ কেহ কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইয়া থাকিলেও ইহা ওসিরিস-শিক্ষার নিজস্ব বস্তু নহে, প্রত্যুত উহা হিন্দুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।'

পরবর্তী কালে দেখা যায়, আলেকজান্দ্রিয়াবাসী য়াহুদীগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী হইয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার পৃথক্ সত্তা আছে; এবং পূর্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, যীশুর সমসাময়িক ফ্যারিসীরা (প্রাচীন আচারনিষ্ঠ য়াহুদী ধর্মসম্প্রদায়) শুধু যে আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা বিভিন্ন শরীরে যাতায়াত করে। এইরূপে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা কেমন করিয়া যীশুকে প্রাচীন এক মহাপুরুষের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং যীশু স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন, ব্যাপ্টিস্ট জন-এর মধ্যে মহাত্মা ইলিয়াস পুনরাবির্ভূত হইয়াছেন—'যদি আপনাদের বুঝিবার মত ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে জানিবেন, যে ইলিয়াসের পুনরাগমনের কথা ছিল, ইনিই তিনি।'
৮

হিব্রুগণের মধ্যে আত্মা ও তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে সব ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই উচ্চতর রহস্যবিদ্যাবিদ্ মিশরীয়গণের নিকট হইতে আসিয়াছিল; মিশরীয়গণ আবার সেগুলি হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এগুলি যে আলেক-জান্দ্রিয়ার মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৌদ্ধদের লিপি ও পুস্তকাদি হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও এশিয়া-মাইনরে তাহাদের প্রচারকার্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ কথিত আছে যে, গ্রীকদের মধ্যে পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম গ্রীকদের নিকট আত্মার পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেন। গ্রীকরা আর্যজাতিরই অন্তর্গত বলিয়া ইতঃপূর্বেই মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করিত এবং প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। অতএব পিথাগোরাসের শিক্ষার ফলে পুনর্জন্মবাদ মানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল। এপুলিয়াসের মতে পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত আমরা এইটুকু জানিয়াছি যে, যেখানেই আত্মাকে কেবল শরীরের চৈতন্যপ্রদ অংশবিশেষ না বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতেছে এবং উহাকেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বলা হইতেছে, সেখানেই ইহার পূর্বাস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অপরিহার্যরূপেই আসিয়া পড়িয়াছে; এবং আমরা ইহাও জানিয়াছি, যে-সকল জাতি আত্মার স্বাধীন পৃথক্-সত্তায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঐ বিশ্বাসের বাহ্য প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যদিও আর্যজাতিদের মধ্যে প্রাচীন পারসীকগণ সেমিটিক প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়াও মৃতদেহ-সৎকারের একটি অদ্ভুত প্রথা আবিষ্কার করিয়াছিল, তথাপি যে-নামে তাহারা তাহাদের 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'
৯
-কে অভিহিত করে, তাহা হইতেই জানা যায়, উহা দহনার্থ দহ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে-সকল জাতি মানুষের স্বরূপ-নির্ধারণে অধিক মনোযোগ দেয় নাই, তাহারা এই জড়দেহকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই; এবং যদি-বা কখনও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকে তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে, তথাপি তাহারা শুধু এই সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, সুদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারে এই দেহই অবিনশ্বর হইবে।

অপরদিকে আর একটি জাতি ছিল, যাহারা মানবকে মননশীল জীবরূপে গণ্য করিয়া তাহার স্বরূপ-অনুসন্ধানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল; সেই আর্য হিন্দুজাতি শীঘ্রই দেখিতে পাইল—এই দেহকে অতিক্রম করিয়া, এমন কি পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষিত তেজোময় দেহকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মানব-সত্তা বিরাজ করিতেছে; সেই মূলতত্ত্ব— সেই অবিভাজ্য স্বতন্ত্র সত্তাই নিজেকে এই দেহ দ্বারা আবৃত করে, এবং জীর্ণ হইলে উহা ত্যাগ করে। সেই মূলতত্ত্বটি কি কোন সৃষ্ট পদার্থ? যদি 'সৃষ্ট' বলিলে 'অভাব' হইতে 'ভাব'-এর সৃষ্টি বুঝায়, তাহা হইলে তাহাদের নিশ্চিত উত্তর 'না'; এই আত্মা জন্মমৃত্যুহীন, ইহা যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ নয়, কিন্তু স্বাধীন ও পৃথক্ সত্তাবান; সেই হেতু তাহাকে উৎপন্নও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, ইহা কেবল বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেঃ ইতঃপূর্বে (দেহগ্রহণের পূর্বে) আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছিল? হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা নানা দেহ অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল; অথবা প্রকৃত বা দার্শনিক অর্থে ইহা বিভিন্ন মানসিক স্তর অতিক্রম করিতেছিল।

বেদ ভিন্ন এমন অপর কোন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি আছে কি, যাহার উপর হিন্দু দার্শনিকগণ তাঁহাদের পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন?—আছে। আশা করি, আমরা পরে দেখাইতে পারিব যে, সর্বজনগৃহীত যে-কোন মতবাদেরই মত ইহারও পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে; কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা দেখিতে চাই, আধুনিক কালের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

ফিকটে
১০
আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেনঃ ‘ইহা সত্য যে, আত্মার স্থায়িত্বের ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সেই সর্বজনবিদিত যুক্তি—কালে যাহার আরম্ভ হইয়াছে, কোন-না-কোন কালে তাহার অবসানও হইবে; অতএব অতীতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মার-পূর্বাস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহা আত্মার স্থায়িত্বের বিপক্ষে প্রযোজ্য যুক্তি না হইয়া বরং তাহার নিত্যত্বের পক্ষেই একটি অতিরিক্ত যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বস্তুতঃ কেহ যদি এই অধ্যাত্ম ও শারীর-বিদ্যার অন্তর্গত স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন-কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা হইলে এই সত্যও ধরিতে পারিবেন যে, এই স্থূল শরীর অবলম্বনে দৃশ্যমান হইবার পূর্ব হইতেই আত্মা বিদ্যমান ছিল।’

শোপেনহাওয়ার
১১
তাঁহার 'Die Welt als Wille Und Vorstellung' নামক গ্রন্থে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে বলিতেছেনঃ ‘ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝায়, ‘ইচ্ছাশক্তি’র পক্ষে মৃত্যু বলিতেও তাহাই বুঝায়। কারণ স্মৃতিশক্তি ও নিজ স্বাতন্ত্র্য যদি সর্বদা ইহার সহিত লাগিয়া থাকিত, তবে প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই অনন্তকাল ধরিয়া একই কর্মানুষ্ঠান ও যন্ত্রণাভোগ করার জন্য টিকিয়া থাকিত না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি উহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেয়, এবং ইহাই লিথি-নামক বিস্মরণের নদী; এই মৃত্যুরূপ নিদ্রার ভিতর দিয়া ইচ্ছাশক্তি পুনর্বার অপর একটি নূতন বুদ্ধির দ্বারা সজ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন জীবরূপে আবির্ভূত হয়; এক নূতন দিন তখন তাহাকে নূতন এক তটভূমির দিকে প্রলুব্ধ করে।

‘এইরূপে দেখা যাইতেছে, এই নিরন্তর জন্মপ্রবাহই পর পর সেই অবিনাশী ইচ্ছাশক্তির জীবন-স্বপ্নগুলি রচনা করিতে থাকে; এবং যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের বিচিত্র ও নিত্যনূতন উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ইচ্ছাশক্তি নিজেই নিজের বিলোপ ও বিনাশ সাধন করিতেছে, ততদিন এইরূপই চলিতে থাকে। ... ইহাও উপেক্ষা করা যায় না যে, ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত যুক্তিও এইরূপ পুনর্জন্ম সমর্থন করে। বস্তুতঃ যাঁহারা জীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর সহিত—যাহারা নবাবির্ভূত, তাহাদের জন্মের একটি সম্পর্ক আছে। ব্যাপক মহামারীর পরে মানবজাতির মধ্যে শিশুজন্মের যে আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। চতুর্দশ শতকে প্লেগ মহামারীর (Black Death) ফলে যখন পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন মানবজাতির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং প্রায়ই যমজ-শিশুর জন্ম হইত। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই সময়ে যে-সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের কেহই পূর্ণসংখ্যক দন্ত লাভ করে নাই; এইরূপে প্রকৃতি আপন শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮২৫ খ্রীঃ লিখিত 'Chronik der Seuchen' নামক গ্রন্থে স্নুরার
১২
ইহার বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাসপারও
১৩
তাঁহার ১৮৩৫ খ্রীঃ লিখিত 'Ueber die Wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen' গ্রন্থে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিয়াছেন যে, যে-কোন একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে দেখা যায়, তাহাদের জন্মসংখ্যার হার তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা ও আয়ুষ্কালের হারের উপর অতি সুনিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কারণ জন্মের সংখ্যা সর্বদা মৃত্যুর হারের সহিত সমতা রক্ষা করে; ইহার ফলে সর্বদা সর্বত্র মৃত্যু ও জন্ম সমান হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। বিভিন্ন দেশ এবং উহাদের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সন্দেহাতীতরূপে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি ইহা অসম্ভব যে, আমার অকালমৃত্যুর সহিত এমন একটি বিবাহের ফলপ্রসূতার কোন প্রত্যক্ষ বা কার্যকারণাত্মক সম্পর্ক থাকিবে, যে-বিবাহের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই; ইহাও অসম্ভব যে, ঐ বিবাহের সহিত আমার মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এইরূপে এক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-তত্ত্বই অনস্বীকার্যরূপে এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক নবজাত ব্যক্তি সজীবতা ও প্রফুল্লতা লইয়া নবজীবনে আবির্ভূত হয় এবং ঐগুলি উপঢৌকনের মত উপভোগ করে; কিন্তু জগতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না, পাওয়া যাইতে পারে না। এই নবীন জীবনের জন্য অপর একটি নিঃশেষিত জীবনকে বার্ধক্য ও জরা-রূপ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই এমন এক অবিনশ্বর বীজ নিহিত থাকে, যাহা হইতে নূতন জীবনের উৎপত্তি হয়—উভয়ে একই সত্তা।’

শূন্যবাদে বিশ্বাসী হইলেও সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হিউম
১৪
অমৃতত্ব বিষয়ে সংশয়াত্মক এক প্রবন্ধে বলেনঃ ‘অতএব এই জাতীয় মতবাদসমূহের মধ্যে একমাত্র পুনর্জন্মবাদই দার্শনিকদের প্রণিধানযোগ্য।’ দার্শনিক লেসীং
১৫
কবিজনোচিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে প্রশ্ন করিতেছেনঃ ‘ইহা প্রাচীনতম—একমাত্র এই দাবীতে স্বীকৃত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের কুতর্কের প্রভাবে মানুষের বোধশক্তি যে-অতীতকালে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া যায় নাই, সেই অতীতকালে এই মতবাদটি মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কি ইহা এতই পরিহাসের বিষয়? ... যতক্ষণ আমি নূতন জ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখি, ততক্ষণ কেন আমি বারংবার ফিরিয়া আসিব না? একবার জন্মগ্রহণ করিয়াই আমি এত বেশী কী পাইয়াছি যে, দ্বিতীয়বার আগমন-জনিত ক্লেশের পরিবর্তে আমার আর কিছুই পাইবার থাকিবে না?’

পূর্ব হইতে বিদ্যমান একই আত্মা বহুজীবনে বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে—এইরূপ মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি আছে, এবং সর্বকালেই চিন্তানায়কদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন; আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে

মনে হয়, আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু থাকিলে ইহাও অনিবার্য যে, উহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া উহাকে 'স্কন্ধ' (ধারণা)-সমূহের সমষ্টি বলিয়া মানিলেও বৌদ্ধদের মধ্যে মাধ্যমিকদিগকে নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আত্মার পূর্বাস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

যে যুক্তিবলে প্রমাণ করা হয়, কোন অসীম বস্তুর আদি থাকা অসম্ভব, তাহা অকাট্য। যদিও ইহার খণ্ডনকল্পে এই যুক্তিবিরুদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যে, অনন্তশক্তি ভগবানের পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুঃখের বিষয়—এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ যেহেতু ঈশ্বর প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারের সর্বজনীন এবং সাধারণ কারণ, অতএব মানবাত্মার নিজের মধ্যে যে-সব বিশেষ রকমের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সেগুলির প্রাকৃতিক (অসাধারণ) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন উঠিতেছে; কাজেই এক্ষেত্রে ঈশ্বর এই জগদ্রূপ যন্ত্রের নির্মাতা—এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ইহা অজ্ঞতার স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ মানবীয় জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কেই আমরা ঐ এক উত্তর দিতে পারি এবং এইরূপে সকল প্রকার অনুসন্ধিৎসা বন্ধ করিয়া ফলতঃ জ্ঞানের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সর্বদা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার দোহাই দেওয়ার অর্থ কতকগুলি শব্দের প্রহেলিকা সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণকে কারণরূপে ঠিক তখনই জানা হয় এবং জানিতে পারা যায়, যখন ঐ কারণটি তাহার কার্য-উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি যে, আমরা একদিকে যেমন অনন্ত ফলের চিন্তা করিতে পারি না, অপরদিকে তেমনি সর্বশক্তিমান্ কারণেরও ধারণা করিতে পারি না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণাই সসীম; তাঁহাকে কারণ বলিয়া মানিলেও এই কারণত্বের দ্বারা ঈশ্বর-ধারণা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ ঐরূপ মতবাদ তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও যতক্ষণ আমরা ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে না পারিব, ততক্ষণ এমন কোন অসম্ভব কথা মানিতে বাধ্য নই যে, 'অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়' অথবা 'অসীম বস্তু কোন কালের মধ্যে আরম্ভ হয়'।

পূর্বাস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই একটি তথাকথিত দৃঢ় যুক্তি খাড়া করা হয় যে, অধিকাংশ মানুষ এ-সম্পর্কে সচেতন নয়। এই যুক্তির উপস্থাপয়িতাকে ইহার সারবত্তা প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ করিতে হইবে, সমগ্র মানবাত্মাটি শুধু স্মরণকার্যেই ব্যাপৃত থাকে। কোন জিনিষের স্মৃতি যদি তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জীবনের যে যে অংশ এখন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি গভীর মূর্ছাকালে বা বিকারের অন্য কোন অবস্থায় স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, সে তখন নিশ্চয়ই নিজের অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলে।

আত্মার পূর্বাস্তিত্ব অনুমানের জন্য, বিশেষতঃ সচেতন কার্যকলাপের স্তরে তাহার প্রমাণার্থে হিন্দু দার্শনিকগণ যে-সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ—

প্রথমতঃ ইহা ব্যতীত এই বৈষম্যময় জগতের ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইবে? একজন দয়ালু ও ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে—সদ্‌ভাবে ও মানবসমাজের সম্পদ্‌রূপে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগের মধ্যে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল, এবং হয়তো সেই একই মুহূর্তে একই মহানগরে অপর একটি শিশু এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল, যাহা তাহার ভাল হইয়া উঠিবার পক্ষে প্রতিকূল। দেখিতে পাই—এমন শিশুও জন্মায় যে শুধু কষ্ট ভোগ করে, হয়তো সারা জীবনই কষ্ট পায়, অথচ এজন্য তাহার কোন দোষ নাই। কেন এরূপ হইবে? ইহার কারণ কি? ইহা কাহার অজ্ঞতা-প্রসূত? যদি শিশুটির দোষ নাই থাকে, তাহা হইলে সে কেন তাহার পিতা-মাতার কর্মের ফলে এই কষ্ট ভোগ করিবে? বর্তমান দুঃখের অনুপাতে ভবিষ্যতে সুখ লাভ হইবে—এই প্রলোভন দেখাইয়া বা রহস্যের অবতারণা করিয়া প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা অজ্ঞতা স্বীকার করা অনেক ভাল। কাহারও পক্ষে আমাদের উপর অসঙ্গত ক্লেশভার বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া নীতি-বিগর্হিত তো বটেই, উহাকে অবিচারও বলা চলে; শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ হইবে—এইরূপ মতবাদটিও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন।

যাহারা দুঃখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কয়জন উচ্চতর জীবনের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য সংগ্রাম করে? কতজনই বা যে-অবস্থার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে আত্মসমর্পণ করে? যাহারা বাধ্য হইয়া মন্দ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার জন্য অধিকতর মন্দস্বভাব এবং নীতিহীন হইয়া উঠে, তাহারা কি তাহাদের আজীবন নীতিহীনতার দরুন ভবিষ্যতে পুরস্কৃত হইবে? সে-ক্ষেত্রে যে এখানে যত দুর্বৃত্ত হইবে, ভবিষ্যতে তাহার পুরস্কার ততই অধিক হইবে।

সুখদুঃখভোগের সকল দায়িত্ব উহার ন্যায়সঙ্গত কারণের উপর, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন কর্ম বা কর্মফলের উপর আরোপ না করিলে মানবাত্মার মহিমা ও মুক্তভাব প্রমাণ করার এবং সংসারের এই অসাম্য ও ভয়াবহতার সামঞ্জস্য স্থাপন করার আর কোন উপায় নাই। শুধু তাহাই নয়, শূন্য হইতে আত্মার সৃষ্টি-বিষয়ে যত মতবাদই প্রচার করা হউক না কেন, উহাদের প্রত্যেকটি আমাদিগকে অনিবার্যরূপে অদৃষ্টবাদে বা সমস্তই পূর্ব হইতে সুনির্দিষ্ট—এইরূপ মতবাদে লইয়া যাইবে, এবং এক করুণাময় পিতার পরিবর্তে এক বিকটদর্শন, নিষ্ঠুর এবং সদাক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে আমাদের উপাস্যরূপে উপস্থাপিত করিবে। অধিকন্তু শুভাশুভ-সাধনে ধর্মের যতটুকু শক্তি আছে, তাহা অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, 'আত্মা সৃষ্ট বস্তু'—এই মতবাদের সহিত তাহারই অনুসিদ্ধান্ত—অদৃষ্টবাদ ও ঈশ্বর কর্তৃক ভাগ্যনির্ধারণ—খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণের মধ্যে এই এক ভয়াবহ ধারণা জন্মাইবার জন্য দায়ী যে, ঐ ঐ ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে বিধিসঙ্গতভাবে তাহাদের তরবারি দ্বারা হত্যা করা চলে; আরও এই মতবাদের ফলে যতপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, সেগুলির জন্যও এই মতবাদই দায়ী।

কিন্তু ন্যায়দর্শন-প্রণেতারা পুনর্জন্ম-তত্ত্বের সমর্থনে যে-যুক্তিটি বহুবার উপস্থিত করিয়াছেন এবং যাহা আমাদের দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল এই যে, আমাদের অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয় না। আমাদের কার্যকলাপ (কর্ম) যদিও বাহ্যতঃ বিলুপ্ত হয়, তথাপি 'অদৃষ্ট'রূপে বর্তমান থাকে, এবং পুনর্বার কার্যের মধ্যে প্রবৃত্তির আকারে আবির্ভূত হয়, এমন কি ছোট শিশুরাও কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা মৃত্যুভয়।

এখন যদি প্রবৃত্তিকে বারংবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ফল বলা হয়, তাহা হইলে যে-সকল প্রবৃত্তি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহার অর্থ সেই দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়। স্পষ্টতঃ আমরা ঐগুলি এই জন্মে পাই নাই, সুতরাং অতীতেই সেগুলির মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। এখন ইহাও স্পষ্ট যে, আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি মনুষ্যোচিত সচেতন প্রয়াসের ফল। ইহা যদি সত্য হয় যে, আমরা এই-সকল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তবে অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয়—অতীতের সচেতন সকল প্রযত্নই ইহার কারণ, অর্থাৎ আমরা যাহাকে মানবীয় স্তর বলি, বর্তমান জন্মের পূর্বেও আমরা সেই মানবোচিত মানস স্তরেই ছিলাম।

অন্ততঃ বর্তমান জীবনের প্রবৃত্তিসমূহ অতীতের সচেতন প্রয়াসের দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার ব্যাপারে ভারতের পুনর্জন্মবাদিগণ এবং আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ একমত; একমাত্র পার্থক্য এই যে, যেখানে অধ্যাত্মবাদী হিন্দুরা এগুলির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র আত্মার সচেতন প্রয়াসের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেখানে জড়বাদী ক্রমবিকাশবাদীরা ঐগুলিকে বংশপরম্পরায় একদেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত বলিয়া অভিহিত করেন। যে মতবাদিগণ 'অভাব' বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের স্থান কোথাও নাই।

তাহা হইলে এই বিষয়ে দুইটি মাত্র পক্ষ দাঁড়াইতেছে—পুনর্জন্মবাদ এবং জড়বাদ; ইহারই কোন একটি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। পুনর্জন্মবাদী বলেনঃ অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা অনুভব-কর্তার মধ্যে—অর্থাৎ প্রত্যেক পৃথক্ আত্মার মধ্যে প্রবৃত্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক আত্মা যখন তাহার অবিচ্ছেদ্য পৃথক্ সত্তা লইয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করে, তখন ঐ প্রবৃত্তিগুলিও তাহাতে সঞ্চারিত হয়। আর জড়বাদী বলেনঃ মানুষের মস্তিষ্কই সকল কর্মের কর্তা এবং জীবকোষ অবলম্বনে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে (পুরুষানুক্রমে) ঐ প্রবৃত্তিগুলি সঞ্চারিত হয়।

এইরূপে পুনর্জন্মবাদ আমাদের নিকট অসীম গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হয়, কারণ আত্মার পুনর্জন্ম ও দেহ-কোষ অবলম্বনে প্রবৃত্তির সঞ্চারণ-বিষয়ে যে বিবাদ চলিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সংগ্রাম। যদি কোষের মাধ্যমে সঞ্চারণই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে জড়বাদ অনিবার্য, এবং তখন আত্মতত্ত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহা যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মার একটি নিজস্ব সত্তা আছে এবং আত্মা তাহার বর্তমান জীবনে অতীতের অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে—এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য। এই দুই বিকল্প—পুনর্জন্মবাদ ও জড়বাদ; এই উভয়ের মধ্যে আর কোন কিছুর স্থান নাই। ইহার কোন্‌টি আমরা গ্রহণ করিব?

আত্মা কি অমর?

[The New York Morning Advertiser পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে আলোচনা হয়, তাহাতে যোগ দিয়া স্বামীজী এই প্রবন্ধটি লিখেন।]

‘বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।’—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২/১৭

তাহা হইলে এই স্থায়িত্ব কোথায় নিহিত?

আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন আর একটি আশ্চর্য বিষয়ের সংযোগ রহিয়াছে, যেটিকে বাদ দিলে ‘কে বাঁচিতে পারে, কে এক মুহূর্তের জন্যও জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে?’
১৬
—সেটি হইল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

সংস্কৃত ভাষার সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য মহাভারতে বর্ণিত আছে—কিরূপে (বকরূপী) ধর্ম কর্তৃক জগতের আশ্চর্যতম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ মহাকাব্যের [অন্যতম] নায়ক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেনঃ জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে মৃত্যু ঘটিতেছে দেখিয়াও মানুষের অটল বিশ্বাস যে, সে নিজে মৃত্যুহীন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মানব-জীবনের প্রচণ্ড বিস্ময়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনে ইহার বিপক্ষে অশেষ প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও এবং ইন্দ্রিয়গত ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে চিরবিদ্যমান রহস্য-যবনিকা যুক্তিসহায়ে ভেদ করিতে অক্ষম হইলেও মানুষ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে যে, সে কখনও মরিতে পারে না।

আমরা সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অনুশীলন করিতে পারি, তথাপি শেষ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাটিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন যুক্তিমূলক প্রমাণের স্তরেই দাঁড় করাইতে পারি না। মানব-সত্তার স্থায়িত্ব বা অনিত্যতার পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা যত খুশী লিখিতে, বলিতে, প্রচার করিতে বা শিক্ষা দিতে পারি; ইহার যে-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রচণ্ড বিরোধে মত্ত হইতে পারি; ইহার পূর্ব পূর্ব নাম অপেক্ষা শত শত জটিলতর নূতন নূতন নাম আবিষ্কার করিয়া আমরা ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে এই শান্তি লাভ করিতে পারি যে, আমরা চিরকালের জন্য সমস্যাটির সমাধান করিয়া ফেলিয়াছি; আমরা পূর্ণ উদ্যমে ধর্মরাজ্যের কোন একটি অদ্ভুত কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক কোন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারকে মানিয়া লইতে পারি, কিন্তু অবশেষে দেখিতে পাই—আমরা যুক্তিরূপ এক সঙ্কীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রে এমন একটি অফুরন্ত কন্দুক-ক্রীড়ায় লিপ্ত রহিয়াছি, যাহাতে বুদ্ধিরূপ খুঁটিগুলিকে বারংবার দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতেছি, আর পরক্ষণেই উহারা কন্দুকাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছে।

কিন্তু এই যে মানসিক শ্রম ও কষ্টভোগ, যাহা বহুক্ষেত্রে ক্রীড়া অপেক্ষা অধিকতর সঙ্কট উৎপন্ন করে, উহার পশ্চাতে এমন একটি সত্য আছে, যাহা লইয়া বাদানুবাদ করা চলে না, যাহা সমস্ত বিসংবাদের অতীত। আর ইহাই হইল মহাভারতে উল্লিখিত সেই সত্য—সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার: মানুষের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব যে, সে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। এমন কি আমার নিজের বিনাশের কথা ভাবিতে গেলেও আমাকে সাক্ষিরূপে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বিনাশক্রিয়াটি দেখিতে হইবে।

এখন এই অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থ বুঝিবার পূর্বে এই একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন সমগ্র জগৎ এই একটি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহির্জগতের সত্তা অপরিহার্য-রূপে

অন্তর্জগতের সত্তার সহিত বিজড়িত। এই উভয় সত্তার কোন একটিকে বাদ দিয়া এবং অপরটিকে স্বীকার করিয়া জগৎ সম্বন্ধে যে-কোন মতবাদ গড়িয়া তুলিলে উহা আপাততঃ যতই বিশ্বাসযোগ্য মনে হউক, ঐ মতবাদের স্রষ্টা নিজেই দেখিতে পাইবেন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এই উভয় জগতের স্থায়িত্বকে যদি প্রেরণা শক্তির অন্যতম কারণরূপে স্বীকার না করা হয়, তবে তাঁহার স্বকল্পিত প্রক্রিয়া অবলম্বনে একটিও সচেতন ক্রিয়া সম্ভব নয়। যদিও ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, যখন মানব-মন আপন সীমাবদ্ধ ভাব অতিক্রম করে, তখন সে দেখে—দ্বৈত জগৎ এক অখণ্ড একত্বে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঐ নিরপেক্ষ সত্তাকে তখনও ইহজগতের দৃষ্টিতে দেখা হয়, এবং সমগ্র দৃশ্য জগৎ—অর্থাৎ আমাদের পরিচিত এই জগৎ, জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়মাত্ররূপেই জ্ঞাত হয় ও জ্ঞাত হইতে পারে। সুতরাং এই জ্ঞাতার ধ্বংস কল্পনা করিতে পারার পূর্বে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের ধ্বংস কল্পনা করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত তো খুবই সহজ। ইহার পর ব্যাপারটি কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সাধারণতঃ আমরা নিজদিগকে শরীর ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারি না। আমি যখনই নিজেকে অমর বলিয়া ভাবি, তখন 'আমি' বলিতে দেহরূপ আমাকেই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীর যে সমগ্র প্রকৃতির মতই অস্থায়ী এবং ইহা সর্বদা বিনাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য।

এই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়মিত করে, আমাদের গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শুধু তাহাই নয়, ইহা যেন মানবজীবনরূপ বস্ত্রের টানা ও পোড়েন। বুদ্ধিলব্ধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিতে চায়, এবং (মানুষের) প্রতিটি অগ্রগতি কার্য-কারণরূপ রেলপথের লৌহবন্ধনে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করে। কিন্তু আমাদের এ-সব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাসিয়া ওঠে, আর কি আশ্চর্য! মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্য-কারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনও নিজেকে ঐগুলির ঊর্ধ্বে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরূপে হইতে পারে? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদাই তাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে। বদ্ধ অবস্থা কেবল মুক্ত অবস্থা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যাহা কার্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে কার্যাতীত বস্তু দ্বারা। এখানে আবার সেই একই অসুবিধা আসিয়া পড়িল। মুক্ত কে?—শরীর, অথবা মনই? ইহা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে বিশ্বের অন্যান্য যে-কোন বস্তুর ন্যায় এই দুইটিও নিয়মের অধীন।

এখন সমস্যাটি এক উভয়-সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। হয় বল, সমগ্র বিশ্ব এক সদা-পরিবর্তনশীল জড়সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়, ইহা কার্য-কারণের অনিবার্য নিগড়ে চির আবদ্ধ, ইহার একটি কণিকারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অথচ অচিন্তনীয়রূপে ইহা নিত্যত্ব ও মুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য প্রহেলিকা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। অথবা বল, এই বিশ্ব ও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা নিত্য এবং মুক্ত। ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, মানুষের মনে নিত্যত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে যে স্বভাবসিদ্ধ মৌলিক বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা প্রহেলিকা নয়। বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল উচ্চতর সামান্যীকরণের সাহায্যে জাগতিক ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করা। সুতরাং কোন ব্যাখ্যা-কালে যদি অপরাপর তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত নূতন তথ্যের কিয়দংশ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তবে ঐ ব্যাখ্যা আর যাহা কিছুই হউক, বিজ্ঞান-নামধেয় হইতে পারে না।

অতএব যে ব্যাখ্যায় এই সদা-বিদ্যমান এবং সর্বদা-আবশ্যক মুক্তির ধারণাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা উপরি-উক্ত প্রকারে ভ্রান্ত, অর্থাৎ অপর তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে উহা নূতন তথ্যের একাংশ অস্বীকার করে, সুতরাং উহা ভ্রান্ত। অতএব আমাদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একমাত্র অপর বিকল্পটি স্বীকার করা চলে, তাহা এই যে—আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা মুক্ত এবং নিত্য।

কিন্তু তাহা শরীর নহে, মনও নহে। শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু এই স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমন কি মনের সূক্ষ্মতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যাহা চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাহারই মুক্ত স্বভাব মানুষের চিন্তা এবং বস্তুর স্তরের মধ্য দিয়া অনুস্রুত হইতেছে এবং নামরূপে রঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় বন্ধনহীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ সত্ত্বেও তাঁহারই অমরত্ব, তাঁহারই পরমানন্দ, তাঁহারই শান্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ।

যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের —সমস্ত নিয়মের এবং কার্য-কারণের নিয়ন্ত্রণের অতীত। অর্থাৎ অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়—যে অবিকারী, সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্যই সে অমর হইতে পারে। মুক্ত অবিকারী ও বন্ধনহীন—এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ; ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ‘এই মানবাত্মা অজ, অমর, শাশ্বত ও সনাতন।’

[illegible]। একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিত, এবং উভয়ই সসীম হইয়া যাইত। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইল—অসীম এক, বহু নয়; একই অসীম আত্মা হাজার হাজার দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আত্মা-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিশ্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ অসীম আত্মাকেই আমরা বলি ‘ঈশ্বর’। মানব মনের অধিষ্ঠান সেই একই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি ‘মানবাত্মা’।

প্রকৃতি ও মানুষ

বিশ্বজগতের যেটুকু অংশ ভৌতিক স্তরে অভিব্যক্ত, শুধু সেইটুকুই প্রকৃতি-বিষয়ক আধুনিক ধারণার অন্তর্গত। মন বলিতে সাধারণতঃ যাহা বোঝায়, তাহা প্রকৃতিরূপে বিবেচিত হয় না।

ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া দার্শনিকগণ মনকে প্রকৃতি হইতে বাদ দিয়া থাকিবেন, কারণ প্রকৃতি নিয়মের—কঠোর অনমনীয় নিয়মের শাসনে আবদ্ধ, প্রকৃতির অন্তর্গত বিবেচিত হইলে মনও নিয়মের অধীন হইয়া পড়িবে। ফলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মতবাদ দাঁড়াইতে পারিবে না; কেন না যাহা কোন নিয়মের অধীন, তাহা কিরূপে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইতে পারে?

যুক্তি ও তথ্যের উপর দণ্ডায়মান ভারতীয় দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী এ-বিষয়ে বিপরীত। তাঁহাদের মতে—ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত সমগ্র বাস্তব জীবনই নিয়মের অধীন। তাঁহাদের মতেঃ মন ও বাহ্য প্রকৃতি, দুই-ই নিয়মের—একই নিয়মের অধীন। মন যদি নিয়মের অধীন না হয়, আমরা এখন যাহা চিন্তা করিতেছি, তাহা যদি পূর্ব চিন্তার অনিবার্য ফলস্বরূপ না হয়, যদি একটি মানসিক অবস্থা আর একটি মানসিক অবস্থার অনুসরণ না করে, তবে মনকে অযৌক্তিক বলিতে হইবে। এমন কে আছে, যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি স্বীকার করিয়া যুক্তির ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারে? অপর পক্ষে মন কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা স্বীকার করিয়া কে বলিতে পারে যে, ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন?

নিয়মই কার্য-কারণের ক্রিয়া। পূর্ববর্তী কতকগুলি ব্যাপার অনুসারেই পরবর্তী কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। প্রতিটি পূর্বগামী ঘটনার বা কারণের অনুবর্তী কার্য আছে। প্রকৃতি এইরূপেই চলিয়াছে। এই নিয়মের শাসন যদি মনের স্তরেও চালু থাকে, তাহা হইলে মন বদ্ধ—স্বাধীন নয়। না, ইচ্ছাশক্তিও স্বাধীন নয়। ইহা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা সকলেই জানি, অনুভব করি যে, আমরা স্বাধীন। স্বাধীন না হইলে আমাদের জীবনে কোন অর্থ থাকে না, জীবনযাপন বৃথা হইয়া যায়।

প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকগণ এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, বা বলা যায়—উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, মন এবং ইচ্ছাশক্তি দেশকালনিমিত্তের দ্বারা তথাকথিত জড়বস্তুর মতই বদ্ধ; সুতরাং ঐ দুইটি কার্য-কারণের নিয়মে শাসিত। আমরা কালের মধ্যে চিন্তা করি, আমাদের চিন্তাগুলি কালের দ্বারা সীমিত; যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সে সবই দেশে ও কালে বর্তমান। সবকিছুই কার্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহা এবং মন—এ দুই-ই এক উপাদানে গঠিত। প্রভেদ কেবল কম্পনের তারতম্যে। মনের অতি নিম্নগ্রামের স্পন্দনকেই আমরা জড়বস্তু বলিয়া জানি। আবার জড়পদার্থের দ্রুত স্পন্দনকে আমরা মন বলিয়া বুঝি। উভয়ের উপাদান একই। অতএব জড়পদার্থ এবং দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমিত বলিয়া জড়ের দ্রুত স্পন্দন মনও একই নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ।

প্রকৃতির উপাদান সর্বত্র সমজাতীয়। প্রভেদ কেবল বিকাশের তারতম্যে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইল 'প্রকৃতি' এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ 'পৃথক্‌করণ'। সবই এক উপাদান, কিন্তু বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত।

মন জড়ে রূপান্তরিত হয়, আবার জড়ও মনে রূপান্তরিত হয়, ইহা শুধু কম্পনের তারতম্য।

একটি ইস্পাতের পাত লও, উহাকে কম্পিত করিতে পারে—এইরূপ একটি শক্তি ইহাতে প্রয়োগ কর; তারপর কি ঘটিবে? যদি একটি অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, তবে প্রথম তুমি শুনিতে পাইবে একটি শব্দ—একটি গুনগুন শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত কর, দেখিবে ইস্পাতের পাতটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি আরও বর্ধিত কর, ইস্পাতের দণ্ডটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি আরও বর্ধিত কর, ইস্পাতটি একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। উহা মনে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

আর একটি উদাহরণ লওঃ দশদিন আহার না করিলে আমি কোনপ্রকার চিন্তা করিতে পারি না। শুধু কয়েকটি এলোমেলো চিন্তা আমার মনে থাকিবে। আমি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িব এবং সম্ভবতঃ আমার নামও ভুলিয়া যাইব। তারপর কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিব; আমার মনের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। খাদ্যই মনে রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমনি স্পন্দনের গতিবেগ কমাইয়া মন দেহে অভিব্যক্ত হয়, জড়ে পরিণত হয়।

জড় ও মন—এ দুইটির কোন্‌টি প্রথম? একটি উদাহরণসহ বুঝাইতেছি—একটি মুরগী ডিম পাড়িল, ডিমটি হইতে আর একটি মুরগীর জন্ম হইল; মুরগীটি আর একটি ডিম পাড়িল; ডিমটি হইতে আবার আর একটি মুরগী জন্মিল; অনন্ত কার্য-কারণ-পরম্পরা এইরূপ চলিতে থাকিবে। এখন কোন্‌টি প্রথম—ডিম না মুরগী? এমন কোন ডিমের কথা কল্পনা করিতে পার না, যাহা কোন মুরগী হইতে জন্মে নাই; অথবা এমন কোন মুরগীর বিষয় চিন্তা করিতে পার না, যাহা ডিম হইতে ফুটে নাই। যেটিই প্রথম হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের প্রায় সব চিন্তাধারাই এই ডিম ও মুরগীর ব্যাপারের মত।
১৯

মহত্তম সত্যগুলি অত্যন্ত সরল বলিয়াই বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া যায়। মহৎ সত্যগুলি সহজ,

কারণ এগুলির প্রয়োগ সার্বকালিক। সত্য নিজে সর্বদা সহজ ও সরল। যাহা কিছু জটিল, তাহা কেবল মানুষের অজ্ঞতার জন্য।

মানুষের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব মনেতে নাই, যেহেতু মন বদ্ধ। সেখানে কোন স্বাধীনতা নাই। মানুষ মন নয়, আত্মা। এই আত্মা সর্বদা মুক্ত, সীমাহীন ও চিরন্তন। এইখানেই—এই আত্মাতেই মানুষের মুক্তস্বভাব। আত্মা সর্বদাই মুক্ত; কিন্তু মন উহার ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গগুলির সহিত নিজেকে এক মনে করিয়া আত্মাকে দেখিতে পায় না এবং দেশকালনিমিত্ত-রূপ গোলকধাঁধায়—মায়ায় নিজেকে হারাইয়া ফেলে।

ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা সর্বদা মন এবং মনের অদ্ভুত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে নিজেদের এক ভাবিতেছি।

মানুষের স্বতন্ত্রভাব আত্মাতেই অবস্থিত এবং আত্মা নিজেকে মুক্ত উপলব্ধি করিয়া মনের বন্ধন সত্ত্বেও সর্বদা ঘোষণা করিতেছেঃ আমি মুক্ত! আমি যা, আমি তাই; আমি সেই। ইহাই আমাদের মু্ক্তি। সদামুক্ত সীমাহীন চিরন্তন আত্মা যুগে যুগে তাঁহার মন-রূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর ব্যক্ত হইতেছেন।

তাহা হইলে মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক কি? জীবের নিম্নতম বিকাশ হইতে মানব পর্যন্ত —সর্বত্রই প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতেছেন। নিম্নতম অভিব্যক্ত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত আছে, ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করিতেছেন।

ক্রমবিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াই আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করিবার সংগ্রাম। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করিয়া নয়, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই মানুষ আজ বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনধারণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা রক্ষা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। এরূপ ধারণা ভ্রম। এই টেবিলটি, এই জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, ঐ বৃক্ষ—ইহারা সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে। সেখানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান—কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ নিশ্চেষ্টতা, মৃত্যু। মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়াছে—প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহা নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি, প্রকৃতির অনুগত হইয়া নয়।

আত্মা—ইহার স্বরূপ ও লক্ষ্য

প্রাচীনতম ধারণা এই যে, মানুষের মৃত্যু হইলে সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পরও একটা সত্তা অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাই বাঁচিয়া থাকে। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন হিন্দু—সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম তিনটি জাতির মধ্যে তুলনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এই ধারণাটি গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দিগের মধ্যে একটি আত্মা-বিষয়ক ধারণা—একটি যুগ্ম-সত্তার ধারণা দেখিতে পাই। তাহাদের মতে এই দেহের অভ্যন্তরে অপর একটি দেহ আছে, যাহা এখানে বিচরণ করিয়া কর্মাদি সম্পাদন করিতেছে। যখন বাহ্যদেহটির মৃত্যু হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় দেহটি বাহিরে আসে এবং কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিতীয় দেহটির জীবনকাল বাহ্যদেহটির উপর নির্ভর করে। প্রথম দেহটির কোন অঙ্গ আহত হইলে দ্বিতীয়টিরও সেই অঙ্গ সমভাবে আহত হইবে। এই কারণেই প্রাচীন মিশরীয়দিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির দেহকে সুগন্ধ আরক প্রভৃতির দ্বারা সুবাসিত করিয়া, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সংরক্ষণ করিবার আগ্রহ দেখিতে পাই। আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন মিশরীয়দিগের মতে—এই দ্বিতীয় দেহটি অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; বড় জোর ইহা কিছুকাল থাকিতে পারে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত বাহ্যদেহটি যতদিন সংরক্ষিত হয় ততদিন।

পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এই দ্বিতীয় দেহ-সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে একটি ভয়ের ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহা সর্বদাই অসুখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তীব্রতম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ইহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যাহারা জীবিত, তাহাদের নিকট সে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসে এবং খাদ্য, পানীয় ও ভোগ্য বস্তুসমূহ, যেগুলি সে এখন পাইতেছে না, সেগুলি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করে। নীলনদের স্বচ্ছ জল, যাহা সে এখন পান করিতে পারে না, তাহা পান করিতে চায়। জীবিত থাকিতে যে-সব দ্রব্য সে ভোগ করিত, সেগুলি পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে। যখন দেখে, সে এইগুলি পাইবে না, তখন অত্যন্ত হিংস্র হইয়া ওঠে এবং সময়ে সময়ে ঐ-সকল খাদ্য না পাইলে জীবিত ব্যক্তিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে।

আর্যগণের চিন্তাধারা আলোচনা করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। এখানেও একটি দ্বিতীয়-দেহের ধারণা রহিয়াছে; কিন্তু ঐটি একপ্রকার অধ্যাত্ম দেহ। অপর একটি বড় প্রভেদ এই যে, এই অধ্যাত্ম-দেহ বা আত্মা বা যাহাই আমরা বলি না কেন, এইটির জীবনকাল পরিত্যক্ত দেহের সহিত বিজড়িত নয়। বরং আত্মা পূর্বদেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়াই মৃতদেহ দাহ করিবার অপূর্ব পদ্ধতিটি আর্যদের মধ্যে বর্তমান। মৃতের পরিত্যক্ত দেহ হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইতে চায়, আর মিশরীয়গণ এই দেহকে সুগন্ধ আরক দ্বারা সুবাসিত করিয়া, কবরে প্রোথিত করিয়া, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া উহাকে সংরক্ষিত করিতে চায়। মৃতের দেহকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার এই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রথা ছাড়াও কতকটা উন্নত জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ বিনষ্ট করিবার যে রীতি দেখা যায়, তাহা দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে, উহাদের মধ্যে আত্মার ধারণাটি বর্তমান। যেখানেই দেহবিযুক্ত আত্মার ধারণাটি দেহের ধারণার সহিত যুক্ত, সেখানেই আমরা মৃতদেহ সংরক্ষিত করিবার এবং যে-কোন ভাবে ইহাকে প্রোথিত করিবার আগ্রহ লক্ষ্য করি। অপর পক্ষে যাহাদের মধ্যে এই ধারণা পরিস্ফুট হইয়াছে যে, আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং মৃতদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা আহত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাদের মধ্যেই মৃতদেহ দাহ করিবার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাই আমরা প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে এই মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা দেখিতে পাই, যদিও পারসীকরা এই প্রথা পরিবর্তন করিয়া একটি উচ্চস্থানে অনাবৃতভাবে মৃতদেহ রাখিবার প্রথা অনুসরণ করে। কিন্তু এই উচ্চস্থান বা দখ্ম (dakhma)-নামের অর্থ 'দাহ করিবার স্থান', ইহার দ্বারা প্রতীত হয় যে, প্রাচীনকালে তাহারাও মৃতদেহ পোড়াইত। আর্যজাতির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের এই দ্বিতীয়-দেহগুলির ধারণার সঙ্গে কোন ভীতির ভাব জড়িত ছিল না। দ্বিতীয়-দেহগুলি খাদ্য বা সাহায্যের জন্য এই পৃথিবীতে নামিয়া আসে না, বা ঐ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে হিংস্র

এই দুইটি ভাবধারা লক্ষ্য করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি, ভাব-দুইটি স্বরূপতঃ এক; প্রাথমিকভাবে—একটি আশাবাদী, অপরটি নৈরাশ্যবাদী; একটি অপরটির ক্রমবিকাশ মাত্র। ইহা খুবই সম্ভব যে, অতি প্রাচীন কালে আর্যগণও মিশরীয়দের ন্যায় একই ভাবধারা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিলে আমরা এই কথার সম্ভাব্যতা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভাবটি যথার্থই সুন্দর এবং অপূর্ব। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন এই আত্মা পিতৃপুরুষগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত সুখৈশ্বর্য উপভোগ করে। পিতৃপুরুষগণ

[illegible] উপাদানের দ্বারা গঠিত। যাহা কিছু কোনপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই সীমিত, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যাহা অবয়ববিশিষ্ট, তাহাই পরিবর্তনশীল, আর যাহা পরিবর্তনশীল তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? সুতরাং এই জ্যোতির্ময় দেহের পশ্চাতে তাঁহারা যেন একটি সত্তাকে অনুভব করিয়াছেন, যাহাকে মানুষের আত্মা-নামে অভিহিত করা যায়। ইহাকেই 'আত্মা' বা 'জীবাত্মা' বলা হইয়া থাকে। আত্মা-সম্বন্ধীয় ধারণা এইখানেই আরম্ভ হইল। প্রতিকে ও অবশ্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহাতে হইয়াছে। কেহ চিন্তা করিলেন, এই জীবাত্মা নিত্য; কেহ ভাবিয়াছেন, ইহা অতি সূক্ষ্ম, প্রায় একটি অণুর মত সূক্ষ্ম, ইহা শরীরের একটি বিশেষ অংশে বাস করে এবং যখন একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার জীবাত্মা জ্যোতির্ময় দেহটিকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হয়। আবার অন্য একদল আছেন, তাঁহারা স্বীকার করেন না যে জীবাত্মা আণবিক প্রকৃতিবিশিষ্ট; জ্যোতির্ময় দেহ যে জীবাত্মা নয়, এ-কথা বলিতে গিয়া তাঁহারা যে-যুক্তি দেন, জীবাত্মার আণবিক প্রকৃতি অস্বীকার করিতে গিয়াও তাঁহারা সেই একই যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সব মানুষই ক্রমোন্নতিশীল—অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই। তাহারা পবিত্রতা, শক্তি এবং জ্ঞানের পথে উন্নতি করিয়াছে। প্রশ্ন হইল—এই জ্ঞান, এই পবিত্রতা এবং এই শক্তি মানুষের মধ্যে কোথা হইতে বিকশিত হইয়াছে? একটি শিশুর কোন জ্ঞান নাই। এই শিশুটি বড় হইয়া শক্তিমান, ক্ষমতাপন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কোথা হইতে এই শিশুটি তাহার জ্ঞান ও শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল? উত্তর—ঐ জ্ঞান ও শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল; শিশুর আত্মার মধ্যেই তাহার জ্ঞান, তাহার শক্তি প্রথমাবধি বিদ্যমান। এই শক্তি, এই পবিত্রতা এবং এই ক্ষমতা তাহার আত্মাতে ছিল—অবিকশিত অবস্থায় ছিল, তাহাই এখন বিকশিত। এই বিকশিত এবং অবিকশিত অবস্থা বলিতে আমরা কি বুঝি? সাংখ্যবাদীরা বলেনঃ প্রত্যেক আত্মাই পবিত্র, পূর্ণ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ; কিন্তু ইহা যেরূপ মনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হয়, সেইরূপেই বিকশিত হইতে পারে। মন যেন আত্মার প্রতিফলনের একটি আয়না মাত্র। আমার মন আমার আত্মার শক্তির কিছুটা যেমন প্রতিফলিত করে, তেমনি তোমার এবং অপরের আত্মাও করিতেছে। যে আয়না যত বেশী স্বচ্ছ, তাহাতে আত্মা তত বেশী সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি যেরূপ মনের অধিকারী, তাহার আত্মিক বিকাশও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল আত্মাই পবিত্র এবং পূর্ণ।

শব্দের ব্যাখ্যার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। যে-মতে আত্মার যন্ত্র-স্বরূপ মনের গঠনের উপরেই আত্মার বিকাশের তারতম্য নির্ভর করে, সেই মতটি নিঃসন্দেহে ভাল বলা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্কোচন ও প্রসারণ-মতবাদী এই দুইটি শব্দের আশ্রয় লইতে চায়। তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন করা কর্তব্য, আত্মার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ বলিতে তাঁহারা কি বুঝিয়া থাকেন? আত্মা চেতন বস্তু—প্রশ্ন করিতে পার, স্থূল জড়পদার্থ বা সূক্ষ্ম চেতনবস্তু মন-সম্পর্কে সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলিতে কি বুঝায়? কিন্তু ইহা ছাড়া যাহা জড় নয়, যাহা দেশ-কালের অতীত, তাহার সম্বন্ধে এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ শব্দ-দুইটি কিরূপে প্রযুক্ত হইবে? সুতরাং মনে হয়, যে-মতবাদে আত্মা সর্বদাই পবিত্র ও পূর্ণ, শুধু মানসিক গঠনের তারতম্য অনুসারে আত্মার প্রতিফলনের তারতম্য ঘটে, সেই মতই অপেক্ষাকৃত ভাল। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার প্রকৃতিও যেন ক্রমশঃ আরও শুদ্ধ হইতে থাকে এবং আত্মার বিকাশও উন্নততর হয়। যতদিন না মন শুদ্ধ হয়—তাহাতে অন্তর্নিহিত আত্মার সব গুণই পূর্ণবিকশিত না হয়, ততদিন এরূপ চলিতে থাকে; তারপর আত্মা মুক্ত হয়।

চেষ্টা করিতেছে এবং যতদিন না আত্মা স্বাধিকার—সেই অসীম, অনন্ত, মুক্তস্বভাব—লাভ করিতেছে, ততদিন সে নিরস্ত হইবে না। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যে-সব সংযোগ, পুনঃসংযোগ এবং বিকাশ দেখিতে পাইতেছি, সেগুলি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়—পথের ক্ষণিক ঘটনা মাত্র। পৃথিবী সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্র, শুভ অশুভ, হাসি কান্না, আনন্দ ও দুঃখ প্রভৃতি সংযোগ আমাদিগকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই আত্মা সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজ পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে; আত্মা তখন অন্তঃ ও বহিঃ-প্রকৃতির কোন নিয়মের দ্বারাই বদ্ধ হয় না; আত্মা তখন সব বন্ধন, সব নিয়ম ও সমগ্র প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে; প্রকৃতিই তখন আত্মার অধীন হইয়া পড়ে। আত্মা এখন যেমন প্রকৃতির অধীন বলিয়া মনে হইতেছে, তখন আর তেমন হয় না। ইহাই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। যে অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতেছে, তাহার লক্ষ্য—মুক্তিলাভ। অভিজ্ঞতাগুলি আত্মার জন্ম ও জীবন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আত্মা যেন একটি নিম্নতর দেহ ধারণ করিয়া উহার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। আত্মা নিকৃষ্ট দেহটি অপর্যাপ্ত মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং একটি উন্নত ধরনের দেহ গ্রহণ করিতেছে। সেটিকেও অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করে এবং আরও উন্নততর দেহ ধারণ করে, অবশেষে আত্মা এমন একটি শরীরের

দেহে বাস করে—এরূপ বলা অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা। যাহা অসীম, তাহা সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিবে

[illegible] হইতে থাকে, তখন বইয়ের পাতাগুলি পুনঃপুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে, কিন্তু পাঠক যথাস্থানেই অবস্থান করে, আত্মার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সমগ্র প্রকৃতিই আত্মার নিকট একখানি পুস্তকের মত—আত্মা যেন উহা পাঠ করিতেছে। এক একটি জীবন যেন সেই পুস্তকের এক-একটি পাতা, ঐ পাতাটি পড়া হইয়া গেলে সে পরপর পাতা উলটাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে—যতদিন না ঐ পুস্তক পড়া শেষ হয়, এবং চরাচর বিশ্বের সমগ্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আত্মা পূর্ণ হয়। তথাপি একই কালে এই আত্মা কখনও নড়ে নাই, আসে নাই, যায়ও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল। কিন্তু আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, আমরা যেন ঘুরিতেছি। পৃথিবী আবর্তিত হইতেছে, তথাপি আমরা মনে করি, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্য ঘুরিতেছে; আমরা জানি ইহা একটি মনের ভুল—ইন্দ্রিয়ের ছলনামাত্র। আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং মরি, আমরা আসি এবং যাই—ইহাও ভ্রান্তিমাত্র। আমরা আসিও না, যাইও না; আমরা জন্মগ্রহণও করি না। কেন না আত্মা কোথায় যাইবে? উহার গমনের কোন স্থান নাই। এমন কোন স্থান আছে, যেখানে আত্মা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান নাই?

অতএব প্রকৃতির বিবর্তন এবং আত্মার বিকাশের তত্ত্বটি আসিয়া পড়িল। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি—উচ্চ হইতে উচ্চতর সংযোগ বা সংহতি আত্মায় নাই। আত্মা যেমন তেমনই আছে। এইগুলি প্রকৃতিতে অবস্থিত; কিন্তু প্রকৃতি উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্যায়ে বিবর্তিত হইতেছে বলিয়া আত্মার মহিমাও ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। মনে কর, এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে, এবং পর্দার পশ্চাতে একটি আশ্চর্য দৃশ্য বিদ্যমান। এই পর্দায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে যাহার ভিতর দিয়া ঐ দৃশ্যের কিয়দংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মনে কর, ছিদ্রটি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি আমাদের দৃষ্টিপথে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে থাকে; যখন সমস্ত পর্দাটি অপসারিত হয়, তখন দৃশ্য ও তোমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না, তুমি উহার সবটুকুই দেখিতে পাও। এই পর্দাটি হইল মানুষের মন। ইহার পশ্চাতে আত্মার সেই মহিমা, সেই পবিত্রতা, সেই অনন্ত শক্তি বিদ্যমান; এবং মন যতই স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইতে থাকে, আত্মাও স্বমহিমায় ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া ওঠে। ইহার কারণ এই নয় যে, আত্মা পরিবর্তিত হয়—পরিবর্তন যাহা কিছু হইতেছে, তাহা এই পর্দায়। আত্মা সেই অপরিবর্তনীয়, অমৃত স্বরূপ, পবিত্র আনন্দময় অদ্বৈত সত্তা।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি এইরূপ দাঁড়াইলঃ উচ্চতম হইতে নিম্নতম ও অতি দুষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে ঐ বিচরণশীল কীটাণু পর্যন্ত—সকলেই সেই পবিত্র পূর্ণস্বরূপ, অসীম আনন্দময় সত্তা। কীটের মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তির স্বল্প বিকাশ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে আত্মার শক্তি সর্বাধিক বিকশিত হইতেছে। প্রভেদ শুধু বিকাশের তারতম্যে, মূলতঃ আত্মা একই। সকল জীবের মধ্যে সেই পবিত্র পূর্ণ আত্মা অবস্থান করিতেছে।

স্বর্গ বা অনুরূপ স্থানসমূহের যে উল্লেখ আছে, সেগুলি গুরুত্বের দিক্ দিয়া নিম্নতর বলা যাইতে পারে। স্বর্গের ধারণাকে একটি নিম্নস্তরের ধারণা বলা যাইতে পারে। ভোগপূর্ণ একটি স্থানের ধারণা হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা নির্বোধের মত বিশ্ব চরাচরকে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত করিয়া রাখিতে চাই। শিশুরা মনে করে, সমগ্র বিশ্ব শিশুতেই পরিপূর্ণ; উন্মাদের নিকট সমগ্র পৃথিবী একটি উন্মাদাগার। সুতরাং যাহাদের নিকট পৃথিবী কেবল ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য, যাহাদের সমগ্র জীবন আহার এবং আমোদ-প্রমোদে ব্যয়িত হয়, যাহাদের সঙ্গে পশুর ব্যবধান অতি সামান্য, তাহারা স্বভাবতই এই জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব লক্ষ্য করিয়া এমন একটি স্থানের কল্পনা করে, যেখানে তাহারা আরও ভোগসুখ লাভ করিবে। তাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা অসীম, সুতরাং তাহারা এমন একটি স্থানের কল্পনা করিতে বাধ্য, যেখানে অবিরত ইন্দ্রিয়সুখ রহিয়াছে, এবং যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই দেখি, যাহারা ঐ-সকল স্থানে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের অবশ্যই সেখানে যাইতে হয়। তাহারা স্বপ্নের মধ্য দিয়া চলে—একটি স্বপ্ন শেষ হইলে অপর একটি স্বপ্নের মধ্যে গিয়া পড়ে, যেখানে ইন্দ্রিয়ভোগের প্রাচুর্য বর্তমান। তারপর যখন তাহাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তাহারা অন্য একটি জিনিষের জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে তাড়িত হইতে থাকিবে।
তারপর শেষ তত্ত্ব—আত্মা সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা। যদি আত্মা পবিত্র ও স্বরূপতঃ পূর্ণ

হয়, যদি প্রতি আত্মা অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বব্যাপী হয়, তবে বহু আত্মার কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একই সঙ্গে বহু অনন্তের কল্পনা সম্ভব নয়। বহুর কথা ছাড়িয়া দাও, একই সঙ্গে দুইটি অনন্তও কল্পনা করা যায় না। যদি দুইটি অনন্ত থাকিত, তবে একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইত, ফলে দুইটিই সীমিত হইত। অনন্ত কেবল একটিই হইতে পারে এবং সাহসের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অনন্ত এক—দুই কখনও নয়।

দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছে—একটি শীর্ষদেশে, অপরটি নিম্নে। উভয়ই বিচিত্র বর্ণের; একটি ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু অপরটি শান্ত, মহিমময় হইয়া নিজ গৌরবে অবস্থান করিতেছে। নিম্নতর পক্ষীটি ডালে ডালে ভাল ও মন্দ ফল ভক্ষণ করিতেছে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ছুটিতেছে। যখনই সে একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, তখনই ঊর্ধ্বগামী হয়; ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, অপর পক্ষীটি সেখানে শান্ত সংযত হইয়া অবস্থান করিতেছে; ভাল বা মন্দ কোন ফলেরই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান না করিয়া, সে আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছে। নিম্নস্থ পক্ষীটি ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী পক্ষীটিকে দেখিয়া ক্রমশঃ উহার সমীপবর্তী হইবার চেষ্টা করে। একটু ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, কিন্তু পূর্বপূর্ব সংস্কারসমূহ বলবৎ থাকায় সে একই ফল আবার ভক্ষণ করে। আবার একসময়ে একটি অত্যন্ত তিক্ত ফল খাইয়া মর্মাহত হয় এবং ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করে। সেখানে সেই শান্ত সংযত পক্ষীটিকে আবার দেখে। সে উহার নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্ব-সংস্কার-প্রভাবে পুনঃপুনঃ নিম্নগামী হইয়া স্বাদু এবং তিক্ত ফল ভক্ষণ করিতে থাকে। আবার একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া সে ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখে এবং ঐ পক্ষীটির আরও সমীপবর্তী হয়। এইরূপে যতই সে নিকটে যায়, ততই অপর পক্ষীটির দেহ-বিচ্ছুরিত আলোক তাহার উপর পড়িতে থাকে। উহার নিজের পালকগুলি যেন খসিয়া পড়িতে থাকে। যখন সে আরও নিকটবর্তী হয়, তখন সমস্ত দৃশ্যটি পরিবর্তিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ নিম্নের পক্ষীটি কোন দিনই ছিল না, যাহা ছিল, তাহা শুধু ঐ ঊর্ধ্বের পক্ষীটি; নিম্নের পক্ষী বলিয়া যাহা এতক্ষণ মনে হইয়াছিল, তাহা উহারই এক সামান্য প্রতিবিম্ব মাত্র।

আত্মার প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। এই মানুষের আত্মা পার্থিব ইন্দ্রিয়ভোগ ও অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছে। পশুর মত ইহা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ, কেবল স্নায়ুর ক্ষণিক উত্তেজনার পশ্চাতে ধাবমান। যখন আঘাত আসে, মুহূর্তের মধ্যে মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং সবকিছুই তখন অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন পৃথিবীকে সে যেরূপ ভাবিয়াছিল, জীবনটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিল, আর সেরূপ দেখিতে পায় না। ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখে, সেই পরম পুরুষের ক্ষণিক অনুভূতি লাভ করে, আরও একটু সমীপবর্তী হয়, কিন্তু অতীত কর্মের দ্বারা আবার নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। অপর একটি আঘাত আসিয়া তাহাকে আবার সেই স্থানে প্রেরণ করে। সে আর একবার সেই পূর্ণসত্তার ক্ষীণ আলোক লাভ করে এবং আরও সমীপবর্তী হয়। এইরূপে সে যতই নিকটে যাইতে থাকে, দেখিতে পায় তাহার ব্যক্তিত্ব—হীন নিকৃষ্ট অত্যন্ত স্বার্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ব—ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে ক্ষুদ্র সত্তাকে সুখী করিতে গিয়া সে সংসারের সবকিছু ত্যাগ করিতে তৎপর হইয়াছিল, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ লয় পাইতেছে; এবং আরও যতই অগ্রসর হয়, ততই ধীরে ধীরে প্রকৃতি অপসৃত হইতে থাকে। যখন সে যথেষ্ট নিকটবর্তী হয়, তখন সমগ্র দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে, এবং সে দেখিতে পায় অপর পক্ষীটি—সেই অনন্ত সত্তা, যাহাকে সে এতদিন দূর হইতে দেখিতেছিল, যাহার অপূর্ব মহিমা এবং গৌরবের আভাস সে পাইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ তাহারই আত্মার, এবং উহা সেই নিত্যবস্তু। যাহা সর্ব বস্তুতে সত্যরূপে অধিষ্ঠিত, যাহা প্রতি অণুতে বিরাজিত ও সর্বত্র প্রকাশিত, যাহা সমস্ত বস্তুর মূল সত্তা—যাহা এই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বর, আত্মা তখন তাহাকেই খুঁজিয়া পায়। জান 'তত্ত্বমসি'—তুমি সেই; জান—তুমি মুক্ত।

পরম লক্ষ্য

[১৯০০ খ্রীঃ ২৭ মার্চ স্যান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতা। মাঝে মাঝে বিন্দু (...) গুলির অর্থ—লিপিকার কিছু ভাব ধরিতে পারেন নাই।]

এই জীবনে যত কিছু নির্যাতন ভোগ করি, সব আমরা আর একটি জায়গায় পুঞ্জীভূত করিয়া কল্পনা করি, উহাই আমাদের নরক। ...

একেবারে আদিতে তোমরা মুক্ত ছিলে, এখনও আছ, চিরদিন থাকিবে। যে জানে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত; যে মনে করে আমি বদ্ধ, সেই বদ্ধ।

আমি সূর্যে আছি, চন্দ্রে আছি, নক্ষত্রমণ্ডলীতে আছি। আমি পরমেশ্বরের সঙ্গে আছি—আছি সব দেবতার মধ্যে। আমার আত্মাকেই আমি পূজা করি।

'লোকে বলে এরূপ, লোকে বলে ওরূপ। ...'

'বন্ধু, আপনি কি বলেন?'

'আমি কিছুই বলি না।'

তিনি শুধু উদ্ধৃত করেন অন্যের চিন্তা; কিন্তু নিজে কিছুই করেন না। এই যদি শিক্ষা হয়, তাহা হইলে পাগলামি আর কাহাকে বলে? যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে চাও! ... এই-সব আধুনিক লেখকগণ—দুইটি বাক্যও তাঁহাদের নিজেদের নয়! সবই উদ্ধৃতি! ...

'বহুর মধ্যে যিনি এককে দেখেন, বহু মৃত্যুর মধ্যে যিনি দেখেন সেই এক জীবনকে, বহুর মধ্যে যিনি তাঁহাকে দেখেন, যিনি নিজের অপরিবর্তনীয় আত্মাকে দেখেন, তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী।' ২৫

আমরা দেখি, মানুষ যেন সর্বদাই তাহার নিজের অপেক্ষা মহত্তর কোন কিছুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহারই অর্থ অনুধাবন করিতে সদা সচেষ্ট। মানুষ চিরদিনই শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান করিবে। সে জানে, সে-আদর্শ আছে এবং সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসন্ধান করাই ধর্ম। পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের যতটুকু জ্ঞান ছিল, তদনুসারে প্রথমদিকে তাহার সকল অনুসন্ধানই বাহিরের স্তরে—কখনও স্বর্গে, কখনও-বা বিভিন্ন স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল।

পরে মানুষ নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে আরম্ভ করিল; বুঝিল—'আমি' বলিতে সাধারণতঃ সে যাহা বোঝে, তাহা প্রকৃত 'আমি' নয়। তাহার ইন্দ্রিয়গোচর সত্তা আর প্রকৃত সত্তা এক নয়। সে তখন নিজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজিতে লাগিল; সে আবিষ্কার করিল, ... যে-আদর্শকে সে এতকাল বাহিরে খুঁজিতেছিল তাহা অন্তরেই আছে; বাহিরে যাহাকে সে পূজা করিতেছিল, সে তাহারই অন্তরের সত্য স্বরূপ। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্য এইঃ আদর্শকে যখন নিজের বাহিরে স্থাপন করা হয়, তখন দ্বৈতবাদ। আর ঈশ্বরকে যখন নিজের অন্তরে সন্ধান করা হয়, তখন অদ্বৈতবাদ।

প্রথমতঃ সেই পুরাতন প্রশ্ন—কেন এবং কোথা হইতে ...? মানুষ কেমন করিয়া সীমিত হইল? অসীম কেমন করিয়া সসীম হইল, পবিত্র কেমন করিয়া অপবিত্র হইল? প্রথমতঃ কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, কোন দ্বৈতবাদী কল্পনা দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না।

ঈশ্বর কেন এই অপবিত্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন? পূর্ণ অসীম দয়ালু পরম-পিতার সৃষ্টি হইয়াও মানুষ কেন এত দুঃখী? কেন এই স্বর্গ আর মর্ত্য, যাহার দিকে চাহিয়া আমরা নিয়মের ধারণা লাভ করি? না দেখিয়া কোন কিছু সম্বন্ধেই কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

অসীম ঈশ্বর কেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন? দ্বৈতবাদী বলেন, যেভাবে কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করে, ঠিক সেইভাবে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর কুম্ভকার; আমরা ঘটমাত্র। দার্শনিকের ভাষায় প্রশ্নটি এইঃ স্বরূপতঃ মানুষ পবিত্র, পূর্ণ এবং অসীম—এ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল কেমন করিয়া? অদ্বৈতবাদমূলক যে-কোন চিন্তাপ্রণালীতে ইহাই একটি প্রধান সমস্যা। অন্যান্য সব পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, প্রশ্নটি স্ববিরোধী।

দ্বৈতবাদের কথাই ধরা যাক। প্রশ্ন হইবে ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করিলেন? ইহা স্ববিরোধী? কেন? কারণ—ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি? ঈশ্বর এমন এক সত্তা, যাঁহার উপরে বাহির হইতে কোন প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না।

তুমি বা আমি মুক্ত নই। আমি তৃষ্ণার্ত; তৃষ্ণা বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, যাহা আমাকে জলপান করিতে বাধ্য করে। আমার দেহের প্রতিটি কর্ম, এমন কি আমার মনের প্রতিটি চিন্তা আমার বাহিরের শক্তিদ্বারা প্রভাবিত। আমাকে ইহা করিতেই হইবে। সেই জন্যেই তো ... এইরূপ করিতে আমি বাধ্য, ইহা পাইতে আমি বাধ্য। ... আবার ‘কেন’ এবং ‘কোথা হইতে’, এই প্রশ্ন দুইটিরই বা অর্থ কি? বাহিরের শক্তির অধীন হওয়া। তুমি কেন জলপান কর? কারণ তৃষ্ণা তোমাকে বাধ্য করে। তুমি দাস। কোন কিছুই তুমি নিজের ইচ্ছায় কর না, কারণ সবকিছু করিতেই তুমি বাধ্য। তোমার কাজের একমাত্র প্রেরণা কোন শক্তি ...।

কোন কিছুর দ্বারা চালিত না হইলে এই পৃথিবীও কখনও চলিত না। আলো জ্বলে কেন? কেহ

আসিয়া একটি দেশলাই না জ্বালিলে আলো জ্বলে না। প্রকৃতির সর্বত্র সর্বকিছুই বাধ্যতামূলক। দাসত্ব, দাসত্ব! প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া চলার অর্থই দাসত্ব। প্রকৃতির দাস হইয়া সোনার খাঁচায় বাস করিয়া লাভ কি? মানুষ যে আসলে মুক্ত এবং স্বর্গীয়—এই জ্ঞানই তো শ্রেষ্ঠ নিয়ম ও শৃঙ্খলা। কাজেই 'কেন এবং কোথা হইতে?'—এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে অজ্ঞানেই। অন্য কোন কিছুর মাধ্যমেই আমি কিছু করিতে বাধ্য হইতে পারি।

তুমি বল, 'ঈশ্বর মুক্ত'; আবার প্রশ্ন কর, 'ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করেন?' স্ববিরোধী কথা বলিতেছ। ঈশ্বরের অর্থই হইল সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা। যুক্তিশাস্ত্রের ভাষায় বলিলে প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়ায়ঃ যাঁহাকে কেহ কখনও বাধ্য করিতে পারে না, তিনি কাহার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন? তোমরা একই সঙ্গে প্রশ্ন কর, ঈশ্বরকে কে বাধ্য করিল? প্রশ্নটি অর্থহীন। স্বরূপেই তিনি অসীম—তিনি স্বাধীন। তোমরা যখন যুক্তিশাস্ত্রের ভাষায় প্রশ্ন করিতে পারিবে, তখনই আমরা সে প্রশ্নের জবাব দিব। যুক্তিই তোমাদের বলিয়া দিবে—সত্তা এক, দ্বিতীয় নাই। যেখানেই দ্বৈতবাদ দেখা দিয়াছে, সেখানেই অদ্বৈতবাদ প্রবল হইয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছে।

এ কথা বুঝিবার পথে একটিমাত্র অসুবিধা আছে। ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বুদ্ধির বিষয়। দার্শনিকের ভাষায় না বলিয়া তুমি যদি সাধারণ মানুষের ভাষায় বল, তাহা হইলে যে-কেহ ইহা বুঝিতে পারে; মানুষের স্বভাবই এই যে, সে নিজের ধারণাগুলি বাহিরে প্রক্ষেপ করে। ক্ষুদ্র শিশুর সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া লইবার কথা ভাব। তাহার সহিত নিজে এক হইয়া যাও, দেখিবে তোমারই যেন দুইটি দেহ। ঠিক তেমনি তোমার স্বামীর মনের ভিতর দিয়াও তুমি দেখিতে পার। কোথায় থামিবে তুমি? অসংখ্য শরীরের মধ্যে তুমি নিজেকে দেখিতে পার।

মানুষ প্রতিদিন প্রকৃতিকে জয় করিয়া চলিয়াছে। জাতি-হিসাবে মানুষ তাহার শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। কল্পনায় মানুষের এই শক্তির একটা সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা কর। তোমরা তো স্বীকার কর যে, জাতি হিসাবে মানুষ অসীম শক্তির—একটি অসীম দেহেরও অধিকারী। এখন একমাত্র প্রশ্ন হইতেছে, তুমি কি? তুমি কি জাতি, না একটি ব্যক্তি? যে-মুহূর্তে তুমি নিজেকে পৃথক্ করিয়া দেখিবে, সবকিছুই তোমাকে আঘাত করিবে। যে-মুহূর্তে তুমি নিজেকে প্রসারিত করিয়া অন্যের কথা ভাবিবে, অমনি তুমি সাহায্য পাইবে। স্বার্থপর মানুষই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় জীব। যে মোটেই স্বার্থপর নয়, সেই সর্বাপেক্ষা সুখী। সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গেই, সমগ্র জাতির সঙ্গে সে তখন এক; ঈশ্বর তখন তাহার মধ্যে আবির্ভূত হন। ... সেইরূপ দ্বৈতবাদে—খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি সব ধর্মেই—নীতির বিধান ... এইঃ স্বার্থপর হইও না। নিঃস্বার্থ হও। অন্যের জন্য কাজ কর! নিজেকে প্রসারিত কর! ...

অজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথা বোঝানো খুব সহজ, আর বিদ্বানকে বোঝানো যায় আরও সহজে; কিন্তু যে অতি সামান্য শিক্ষা পাইয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহাকে বুঝাইতে পারিবেন না। আসল কথা, তুমি এই পৃথিবী হইতে পৃথক্ নও, যেমন তোমার আত্মা তোমার অন্য সবকিছু হইতে পৃথক্ নয়। তাহা যদি না হইত, তুমি কিছুই দেখিতে পাইতে না, কিছুই বুঝিতে পারিতে না। বস্তুর সমুদ্রে আমাদের দেহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র। জীবন একটি মোড় ঘুরিয়া অন্যরূপে বহিয়া চলিয়াছে ... সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, তুমি, আমি—সকলেই আবর্তমাত্র। কেন আমি একটি বিশেষ মনকে আমার বলিয়া বাছিয়া লইলাম? মনের সমুদ্রে ইহা একটি মানস আবর্ত মাত্র।

তাহা না হইলে এই মুহূর্তে আমার স্পন্দন যে তোমার কাছে পৌঁছিতেছে, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? হ্রদের মধ্যে একটি পাথর নিক্ষেপ কর, দেখিবে—একটি স্পন্দন শুরু হইবে এবং সমস্ত জলটাকে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। আমার মনকে আনন্দের অবস্থায় লইয়া গেলাম, ফলে তোমার মনেও সেই আনন্দ সঞ্চারিত হইবে। এমন কত সময়েই তুমি তোমার মনে বা হৃদয়ে কিছু ভাবিয়াছ এবং মুখে না বলিলেও অন্যেরা তোমার সে ভাবনার স্পর্শ পাইয়াছে। সর্বত্রই আমরা এক। ... অথচ সেই কথাটাই আমরা কখনও বুঝিতে পারি না। সমগ্র জগৎই দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা গড়া। ঈশ্বরও সেই বিশ্বরূপেই প্রকট হন। ... প্রকৃতি শুরু হইল কখন? ... তুমি যখন তোমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া দেশ কাল এবং নিমিত্তে বাঁধা পড়িলে।

ইহাই তোমার দেহের চক্রাবর্ত। আবার ইহাই তোমার অসীম প্রকৃতি ... ইহাই তো প্রকৃতি—দেশ কাল ও নিমিত্ত। প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। তুমি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে কাল বা সময়ের সূত্রপাত হয়; তুমি যখন দেহলাভ করিলে, অমনি দেশ বা স্থান দেখা দিল; অন্যথা দেশকাল বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। তুমি যখন সীমাবদ্ধ হইলে, তখনই দেখা দিল কার্য-কারণ সম্পর্ক। কোন-না-কোন একটা উত্তর আমাদের চাই। এই সেই উত্তর। আমাদের সীমাবদ্ধ হওয়া তো খেলা মাত্র—খেলার আনন্দ মাত্র। কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না; কিছুই তোমাকে বাধ্য করিতে পারে না। তুমি কখনও বদ্ধ নও। আমাদের নিজেদের এই কল্পিত অভিনয়ে নিজ নিজ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেছি মাত্র।

ব্যক্তি-সত্তার আর একটি সমস্যার কথা তাহা হইলে তোলা যাক। অনেকে আবার ব্যক্তি-সত্তাকে হারাইবার ভয়েই ভীত! শূকর-ছানা যদি দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার শূকর-সত্তাকে হারানো কি তাহার পক্ষে ভাল নয়? নিশ্চয়। কিন্তু বেচারা শূকর তখন তাহা মনে করে না। কোন্ অবস্থাটি আমার ব্যক্তি-সত্তা? যখন আমি একটি ছোট শিশু ছিলাম এবং ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়া আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম? সেই সত্তাকে হারাইতে কি আমার দুঃখিত হওয়া উচিত? আজ যেমন আমার শৈশবকালের দিকে তাকাইয়া আমি হাসি, আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাইয়াও সেইরূপ হাসিব। ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি-সত্তাটিকে আমি রক্ষা করিব? ...

ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ... দুইটি বিপরীত ভাবধারা আছেঃ একটি ব্যক্তি-সত্তা সংরক্ষণ, অপরটি ব্যক্তি-সত্তা বিসর্জন দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ... শিশুর প্রয়োজনে মা তাঁহার সব বাসনাই ত্যাগ করেন। ... শিশুকে যখন কোলে নেন, ব্যক্তি-সত্তার ডাক, আত্ম-রক্ষার ডাক তখন আর তাঁহার কানে আসে না। নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে গ্রহণ করিয়া সন্তানকে দেন উত্তম খাদ্য। যাহাকে ভালবাসি, তাহার জন্য আমরা মরিতেও প্রস্তুত।

একদিকে এই ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কঠোর সংগ্রাম করিতেছি, আবার অন্য দিকে ইহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহার ফল কি হইতেছে? টম ব্রাউন কঠোর সংগ্রাম করিতেছে। স্বীয় ব্যক্তি-সত্তার জন্য সে যুদ্ধ করিতেছে। তারপর টমের মৃত্যু হইল; কিন্তু পৃথিবীর বুকে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিল না। উনিশ শত বছর আগে একটি য়াহুদী জন্মগ্রহণ করিলেন; স্বীয় ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি অঙ্গুলিও তিনি হেলন করিলেন না। ... তাঁহার কথা ভাব! সেই য়াহুদী ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য কখনও সংগ্রাম করেন নাই; আর সেই জন্যই পৃথিবীতে তিনি মহত্তম। এই কথাটাই পৃথিবীর মানুষ জানে না।

যথাসময়ে আমাদিগকে 'ব্যক্তি' হইতে হইবে। কিন্তু কোন্ অর্থে? মানুষের ব্যক্তিত্ব কি? টম ব্রাউন নয়; মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি-সত্তা। মানুষ যতই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই নিজের মিথ্যা ব্যক্তি-সত্তা সে ত্যাগ করিবে। নিজের জন্য সবকিছু সংগ্রহ করিতে, সবকিছু পাইতে যত বেশী চেষ্টা সে করিবে, ততই সে ব্যক্তি হিসাবে ছোট হইয়া যাইবে। নিজের কথা সে যত কম ভাবিবে, জীবিতকালে নিজের ব্যক্তিত্ব সে যত বেশী ত্যাগ করিবে, ... ততই সে ব্যক্তি-হিসাবে বড় হইবে। পৃথিবীর মানুষ এই নিগূঢ় তত্ত্বটি বুঝিতে পারে না।

আমাদের প্রথম বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি। ব্যক্তি-সত্তা হইল আদর্শে পৌঁছানো। তুমি এখন পুরুষ বা নারী। তোমার পরিবর্তন ঘটিবেই। তোমরা কি থামিয়া থাকিতে পার? তোমাদের মন আজ যেমন আছে, সেই রকমই কি রাখিতে চাও? রাখিতে চাও—ক্রোধ ঘৃণা ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনের সহস্রপ্রকার বৃত্তি? তোমরা কি বলিতে চাও, সে-সবই তোমরা অক্ষুণ্ণ রাখিবে? ... কোথাও তোমরা থামিতে পার না ... যতদিন না জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়, যতদিন না তোমরা পবিত্র এবং পূর্ণ হও।

যখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইবে, তখন আর তোমার ক্রোধ থাকিবে না। তোমার কোন্ দেহকে তুমি রক্ষা করিবে? যে জীবনের শেষ নাই, সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি থামিতে পার না। অসীম জীবন! সেইখানে তুমি থামিবে। আজ তোমরা কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছ; আরও জ্ঞানলাভ করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেছ। কোথায় থামিবে? জীবনের সঙ্গে একাত্ম যতদিন না হইবে, ততদিন কোথাও থামিবে না। ...

অনেকে সুখলাভকেই লক্ষ্য মনে করে। সেই সুখের জন্য তাহারা শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে। উচ্চতর স্তরে আরও অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর আত্মিক স্তরে। তারপর নিজের মধ্যে—জীবের মধ্যে যিনি শিব, তাঁহার মধ্যে। যে মানুষের সুখ বাহিরে, বাহিরের জিনিষ চলিয়া গেলেই সে অসুখী হইয়া পড়ে। সুখের জন্য তুমি এই পৃথিবীর কোন কিছুর উপর নির্ভর করিতে পার না। আমার সব সুখ যদি আমার নিজের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে সুখ আমি সর্বদাই ভোগ করিতে পারি, কারণ আমার আত্মাকে তো আমি কখনও হারাইব না। ... মাতা, পিতা, সন্তান, স্ত্রী, দেহ, সম্পদ—সব আমি হারাইতে পারি, শুধু হারাইতে পারি না আমার আত্মাকে ... আত্মাই আনন্দ। সব বাসনাই আত্মায় বিধৃত। ... ইহাই ব্যক্তিত্ব। ইহার পরিবর্তন নাই; ইহাই পূর্ণ।

... কেমন করিয়া ইহাকে পাওয়া যায়? এই পৃথিবীর মনীষীরা—শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ—সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা যাহা পাইয়াছেন, সকলেই তাহা পাইতে পারে। ... বিশটি বা ত্রিশটি দেবতায় বিশ্বাসী দ্বৈতবাদী মতগুলির কথা বলিতেছ? উহাতে কিছু যায় আসে না। একটি সত্য সকলেই মানে—এই মিথ্যা ব্যক্তি-সত্তাটি ছাড়িতে হইবে। ... এই যে অহং—ইহা যত হ্রাস পাইবে, ততই আমি আমার প্রকৃত স্বরূপের সান্নিধ্যে পৌঁছিব; সেটি আমার বিশ্বময় দেহ। নিজের মনের কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি সেই বিশ্বব্যাপী মনের নিকটতর হইব। নিজের আত্মার কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি বিশ্বব্যাপী আত্মার নিকটতর হইব।

আমরা একটি দেহে বাস করি। আমরা কিছুটা দুঃখ ভোগ করি, কিছুটা সুখ ভোগ করি। এই দেহে বাস করিয়া যে সামান্য সুখ আমরা পাই, তাহার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য জগতের সব কিছু ধ্বংস করিতেই আমরা প্রস্তুত। যদি আমার দুইটি শরীর থাকিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত না কি? এমনি করিয়াই আমরা আনন্দের পথে অগ্রসর হই। সকলের মধ্যেই

আমি। সকলের হাত দিয়া আমি কাজ করি; সকলের পায়ে ভর দিয়া আমি হাঁটি। সকলের মুখে আমি কথা বলি; সকলের দেহে আমি বাস করি। আমার দেহ অসীম, আমার মনও অসীম। নাজারেথের যীশুর মধ্যে, বুদ্ধের মধ্যে, মহম্মদের মধ্যে—অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মহৎ এবং শুভ—সকলের মধ্যেই আমি বাস করিয়াছি। আমার পরে যাহা কিছু আসিবে, তাহার মধ্যেও আমি বাস করিব। এ কি মতবাদ মাত্র? না, ইহাই সত্য।

এই সত্য যদি উপলব্ধি করিতে পার, সে যে অসীম আনন্দের কথা হইবে! আনন্দের সে কী উচ্ছ্বাস! কোন্ দেহ এত বড় যে, পৃথিবীতে আমাদের শরীরের সকল প্রয়োজন মিটিয়া যায়? অন্য সকলের শরীরে বাস করিয়া, পৃথিবীর সব শরীর ভোগ করিয়া আমাদের কি অবস্থা হয়? আমরা অসীমের সঙ্গে এক হইয়া যাই, আর সেইটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই একমাত্র পথ। একজন বলেন, 'আমি যদি সত্যকে জানি, তবে মাখনের মত আমি গলিয়া যাইব।' মানুষ যদি সত্যই তেমনি গলিয়া যাইত! কিন্তু মানুষ বড়ই কঠিন, এত তাড়াতাড়ি গলিয়া যাইবে না!

মুক্তির জন্য আমাদের কি করিতে হইবে? তোমরা তো মুক্তই। ... যে মুক্ত, সে কি কখনও বদ্ধ হয়? মিথ্যা কথা। তোমরা কখনও বদ্ধ ছিলে না। যে সীমাহীন, সে কি কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে? অসীমকে অসীম দিয়া ভাগ কর, অসীমের সঙ্গে অসীম যোগ কর, অসীমকে অসীম দিয়া গুণ কর, অসীম অসীমই থাকে। তুমি অসীম; ঈশ্বর অসীম। তোমরা সকলেই অসীম। সত্তা কখনও দুই হইতে পারে না, সত্তা কেবল এক। অসীমকে কখনও সসীম করা যায় না। তোমরা কখনও বদ্ধ নও। এই শেষ কথা। ... তোমরা মুক্তই আছ। লক্ষ্যে তোমরা পৌঁছিয়াছ। সকলকেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছাও নাই—এ কথা কখনও ভাবিও না। ...

আমরা যাহা (ভাবি), তাহাই হই। যদি মনে ভাব যে, তোমরা পাপী, তাহা হইলে মোহগ্রস্তের মত ভাবিবে—আমি একটি বিচরণশীল হতভাগ্য কীট। যাহারা নরকে বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে তাহারা নরকেই যায়; আর যাহারা বলে—স্বর্গে যাইবে, তাহারা স্বর্গেই যায়।

সবই লীলা। ... তোমরা বলিতে পার, 'কিছু যখন করিতেই হইবে, তখন ভালই করি না

কেন।’ কিন্তু ভাল-মন্দের কথা কে শুনিতেছে? লীলা! সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর লীলা করিতেছেন। ব্যস্।... তুমিই তো সেই লীলারত সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। যদি খেলায় [অভিনয়ে] নামিয়া ভিক্ষুকের ভূমিকা গ্রহণ কর, তুমি ভূমিকা-নির্বাচনের জন্য অন্যকে দোষী করিতে পার না। ভিক্ষুক হওয়াতেই তোমার আনন্দ। তোমার প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ তো তুমি অবগত আছ। তুমি রাজা, অভিনয়ে নামিয়া ভিক্ষুক সাজিয়াছ মাত্র। ... সবই তো কৌতুক। সব জানিয়া শুনিয়া খেলায় নাম। এই তো সব। তারপর অভ্যাস কর। সারা জগৎ তো একটা বিরাট খেলা। সবই ভাল, কারণ সবই মজা। ঐ নক্ষত্রটি কাছে আসিল এবং আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল—আমরাও সবাই মরিয়া গেলাম। এটাও তো কৌতুক। যে-সব ছোট জিনিষ তোমাদের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়, শুধু সেগুলিকেই তোমরা কৌতুক মনে কর! ...

আমাদের বলা হয়—এখানে একজন ভাল ঈশ্বর আছেন, এবং একজন মন্দ ঈশ্বরও ওখানে আছেন, ভুল করামাত্র আমাকে পাকড়াও করিবার জন্য যিনি ওঁত পাতিয়া আছেন। ... আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কে যেন আমাকে বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সবকিছুই দেখিতে পান। শুইতে যাইয়া আমি উপরে চাহিয়া রহিলাম। মনে আশা ছিল, ঘরের ছাদ খুলিয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। নিজেরা ছাড়া আর কেহই আমাদের উপর লক্ষ্য রাখে না। নিজের আত্মা ছাড়া অপর কোন প্রভু নাই; আমাদের অনুভূতি ছাড়া অপর কোন প্রকৃতি নাই। অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব বা প্রকৃতি; ইহা প্রথম প্রকৃতিও বটে। প্রকৃতির এই শেষ কথা। কোন কাজ আমি দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করি, অমনি উহা আমার প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া যায়। অসুখী হইও না! অনুশোচনা করিও না! যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। যদি অনুতাপ কর, ফল ভোগ করিতে হইবে।

... বুদ্ধিমান্ হও। আমরা ভুল করি; তাহাতে কি হইল? সবই তো কৌতুক বা মজা। অতীতের পাপের জন্য লোকে এমন পাগল হইয়া ওঠে, এমনভাবে আর্তনাদ করে ও কাঁদে যে, কি বলিব! অনুশোচনা করিও না। কাজ করিবার পরে আর ঐ কাজের কথা ভাবিও না। অগ্রসর হও! থামিও না! পিছনে তাকাইও না! পিছনে তাকাইয়া কি লাভ হইবে? ক্ষতিও নাই, লাভও নাই। তুমি তো আর মাখনের মত গলিয়া যাইতেছ না। স্বর্গ, নরক আর অবতার—সব অর্থহীন কথা!

কে জন্মায় আর কে মরে? মজা করিতেছ, পৃথিবীকে লইয়া খেলা করিতেছ মাত্র। যতদিন ইচ্ছা শরীরটাকে ধারণ করিতেছ। যদি পছন্দ না হয়, করিও না। অসীমই সত্য; সসীম তো খেলামাত্র। তুমি একাধারে অসীম ও সসীম দেহবান্, ইহা নিশ্চয় জানিও। জ্ঞানের উদয় হইলেও কোন পার্থক্য হইবে না; খেলা চলিতেই থাকিবে। ... দুইটি শব্দ—আত্মা ও দেহ—যুক্ত করা হইয়াছে। আংশিক জ্ঞানই ইহার কারণ। নিশ্চয় জানিও তুমি সর্বদাই মুক্ত। জ্ঞানের আগুনে—যত কিছু কলুষ ও অসম্পূর্ণতা সব পুড়িয়া যায়। আমিই সেই অসীম। ...

তাহা হইলে ঈশ্বর, পূজা-অর্চনা প্রভৃতির কি হইবে? এগুলিরও প্রয়োজন আছে। আমি নিজেকে ঈশ্বর ও আমি—এই দুই অংশে ভাগ করিয়াছি; আমিই পূজিত হই এবং নিজেকে পূজা করি। কেন করিব না? ঈশ্বরই তো আমি। আমার আত্মাকে কেন পূজা করিব না? সর্বেশ্বর ভগবান্ যিনি, তিনি তো আমার আত্মাও। সবই খেলা, সবই কৌতুক; আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

জীবনের পরিণাম ও লক্ষ্য কি? কিছুই না, কারণ আমি জানি—আমিই সেই অসীম। তোমরা যদি ভিক্ষুক হও, তোমাদের লক্ষ্য থাকিতে পারে। আমার কোন লক্ষ্য নাই, কোন অভাব নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি, বক্তৃতা করিতেছি—নিছক মজার খেলা, আর কোন অর্থ নাই। কি অর্থই বা থাকিতে পারে? একমাত্র ক্রীতদাসেরাই অপরের জন্য কাজ করিয়া থাকে। তোমরা তো অপরের জন্য কাজ কর না। যখন প্রয়োজন হয়, পূজা কর। খ্রীষ্টান, মুসলমান, চীনা, জাপানী—সকলের সঙ্গেই যোগ দিতে পার। যত ঈশ্বর আছেন আর যত ঈশ্বর আসিবেন, সকলকেই তোমরা পূজা করিতে পার। ...

ইহার আর একটি দিক্ আছে। সেটি আমি এখনও বলি নাই। আমার ফাঁসি হইবে। আমিই দুষ্ট। নরকে আমিই শাস্তি পাইতেছি। সে-সবও মজার খেলা। আমি অসীম—এই জ্ঞানলাভ করাই দর্শনের চরম পরিণতি। লক্ষ্য, প্রেরণা, উদ্দেশ্য, কর্তব্য—সব পিছনে পড়িয়া থাকে। ...

এই সত্য—প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন। যুক্তি কর, যত প্রকারে পার তর্ক কর। বিদ্বান্ লোক ইহা অপেক্ষা অধিক জানে না। নিশ্চিত জানিও, সবকিছুতেই তুমি আছ। সেই জন্যই কাহাকেও আঘাত করিও না, কারণ অন্যকে আঘাত করিলে তুমি নিজেকেই আঘাত করিবে। ... সবশেষে এই সত্য ধ্যান করিতে হইবে। এই সত্য চিন্তা কর। তুমি কি ভাবিতে পার—এমন এক সময় আসিবে, যখন সবকিছু ধূলায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আর তুমি একাকী দাঁড়াইয়া থাকিবে? উচ্ছ্বসিত আনন্দের সেই মুহূর্তটি কখনও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। তুমি প্রকৃতই দেখিতে পাইবে, তোমার দেহ নাই। তোমার দেহ কোন কালে ছিল না।

অনন্তকাল ধরিয়া আমি এক—একাকী। কাহাকে আমি ভয় করিব? সবই তো আমার আত্মা। এই সত্য অবিরাম ধ্যান করিতে হইবে। ইহার ভিতর দিয়াই উপলব্ধি আসিয়া থাকে, সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়াই তুমি হইবে অপরের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। ...

'ব্রহ্মবিদের মুখের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল প্রতিভাত হইতেছে'
২১
—এই অবস্থাই লক্ষ্য। আমি যেভাবে প্রচার করিতেছি, ইহা সেভাবে প্রচার করিবার বস্তু নয়। 'একটি গাছের নীচে আমি একজন গুরুকে দেখিয়াছিলাম—ষোড়শবর্ষীয় এক যুবক; শিষ্য এক অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ। গুরু নীরবে শিক্ষা দিতেছেন, আর শিষ্যের সব সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে।'
২২
কে কথা বলে? সূর্য দেখিবার জন্য কে মোমবাতি জ্বালায়? সত্য যখন প্রকাশ পায়, কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। তোমরাও তাহা জান। ... তোমরাও তাহাই করিবে ... উপলব্ধি করিবে। প্রথমে ইহা লইয়া চিন্তা কর। যুক্তি দিয়া বোঝ। কৌতূহল চরিতার্থ কর। তারপর আর কিছু ভাবিও না। কোন কিছুই যদি আমরা না পড়িতাম! ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন! একজন শিক্ষিত লোকের অবস্থা দেখ।

পুঁথির মূল্য খুব বেশী নয়, আর পরের মুখে শোনা ধর্মের তো কোন মূল্যই নাই। ইহা ঠিক আহারের মত। তোমার ধর্ম আমাকে সন্তুষ্ট করিবে না। যীশু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বুদ্ধও করিয়াছিলেন। তুমি যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়া থাক, তুমি নাস্তিক অপেক্ষা বেশী কিছু নও। তবে সে নির্বাক্। আর তুমি কেবলই বকবক কর ও পৃথিবীকে বিরক্ত কর। পুঁথি, বাইবেল ও ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নাই। বাল্যকালে আমি একটি প্রৌঢ়কে দেখিয়াছিলাম, তিনি কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু স্পর্শদ্বারা তিনি অপরের মধ্যে ঈশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে পারিতেন।

'হে পৃথিবীর আচার্যবৃন্দ, তোমরা চুপ কর। স্তব্ধ হও, গ্রন্থরাজি! হে প্রভু, তুমি শুধু কথা বল, আর তোমার ভৃত্য শুনুক।'
২৩
... যদি সত্য না থাকে, তাহা হইলে এ জীবনের আর প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই ভাবি, সত্যকে ধরিতে পারিব, কিন্তু পারি না। আমরা অনেকেই শুধু ধূলিমুষ্টি ধরিয়া থাকি। ঈশ্বর সেখানে নাই। ঈশ্বরই যদি নাই, তবে জীবনের দরকার কি? এই পৃথিবীতে কি বিশ্রাম-স্থান কোথাও আছে? আমাদিগকেই সে-সন্ধান করিতে হইবে; কিন্তু তীব্রভাবে আমরা তাহা করি

না। আমরা স্রোত-তাড়িত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত।

সত্য যদি থাকে, ঈশ্বর যদি থাকেন, আমাদের অন্তরেই আছেন। ... আমাকে বলিতে হইবে, 'তাঁহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' নতুবা আমার কোন ধর্ম নাই। কতকগুলি বিশ্বাস, মতবাদ আর উপদেশে ধর্ম হয় না। উপলব্ধি—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করাই একমাত্র ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব যাঁহাদের পূজা করে, সেই মহাপুরুষদের গৌরব কিসে? তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর একটি মতবাদ মাত্র নয়। পিতামহ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া কি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন? না। নিজেদের দেহ, মন—সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে অসীম, তাঁহার উপলব্ধিতেই তাঁহাদের গৌরব। সেই ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র প্রতিবিম্ব আছে বলিয়াই এ পৃথিবী সত্য। আমরা ভাল লোককে ভালবাসি, কারণ তাঁহার মুখে সেই প্রতিবিম্ব আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। নিজেদেরই উহা ধরিতে হইবে। অন্য কোন পথ নাই।

সেই তো লক্ষ্য। তাহার জন্য সংগ্রাম কর। নিজের বাইবেল রচনা কর। নিজের খ্রীষ্টকে আবিষ্কার কর। নতুবা তোমরা ধার্মিক নও। ধর্ম বিষয়ে কথা বেশী বলিও না। মানুষ কথার পর কথা বলিয়া যায়। 'তাহাদের মধ্যে অনেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়াও অন্তরের গর্বে ভাবে—সেই আলোক তাহারা পাইয়াছে। আর শুধু তাহাই নয়, অপরেরও ভার তাহারা লইতে চায় এবং উভয়েই গর্তে পড়িয়া যায়।'
২৪

শুধু গীর্জা কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। মন্দির বা গীর্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেখানেই যাহার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য। সে কথা থাক! ... সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ভালই হইয়াছে; কিন্তু এখন উহা ছাড়িয়া দাও; উহা তো ছিল শৈশবের স্থান ... তা বেশ ছিল। ... এখন ঈশ্বরের কাছে সোজা চলিয়া যাও। কোন ধারণা নয়, কোন মতবাদ নয়। একমাত্র তাহা হইলেই সব সন্দেহ দূর হইবে। ... যাহা কিছু বাঁকা, তাহা তখনই সোজা হইবে। ...

সুবিদিত রহস্য

[ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেস্-এ প্রদত্ত বক্তৃতা]

বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া আমরা যে-উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, গভীর বিশ্লেষণের ফলে আমরা দেখিতে পাই, অবশেষে আমরা এমন এক অদ্ভুত স্তরে উপস্থিত হই, যেখানে বস্তুটিকে আপাততঃ স্ববিরোধী বলিয়া মনে হয়; বোধ হয় যেন উহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য অথচ সত্য। প্রাথমিক দৃষ্টিতে যে-কোন বস্তুই সসীম বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে—কি গুণের দিক্ দিয়া, কি সম্ভাবনার দিক্ দিয়া, কি শক্তির দিক্ দিয়া, কি সম্বন্ধের দিক্ দিয়া উহার কোন অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বিচারের দৃষ্টিতে উহা অসীম হইয়া দাঁড়ায়। একটি ফুলের কথাই ধরা যাক। ফুল তো ক্ষুদ্র—সসীম পদার্থ; কিন্তু কে বলিতে পারে যে, ফুলের সম্বন্ধে সে সবই জানে? সামান্য একটি ফুলের সম্বন্ধেও জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছান কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ফুলটি প্রথমে সসীম বলিয়া প্রতীত হইলেও বিচারের দৃষ্টিতে অসীমে পরিণত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বালুকণাকে বিশ্লেষণ করিলেও বুঝা যায়, আপাতদৃষ্টিতে সসীম হইলেও বস্তুতঃ উহা অসীম; তথাপি বালুকণাকে আমরা সসীম পদার্থ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছি, ফুলও তেমনি আমাদের কাছে সসীম পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের অন্তরের এবং বাহিরের সকল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই একই কথা। আমরা প্রথমে সামান্য জিনিষ মনে করিয়া যাহা কিছু চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, অতি অল্পকাল-মধ্যেই তাহা আমাদের জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিয়া অনন্তের গভীরে ডুবিয়া যায়। অনুভূত বস্তুর মধ্যে আমরা নিজেরাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ। অস্তিত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ধাঁধায় পড়িতে হয়। আমাদের অস্তিত্ব আছে। আমরা সসীম জীব। আমরা জীবনধারণ করি এবং মরিয়া যাই। আমাদের দিগন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা জানি—আমাদের সত্তা সসীম, আমাদের জীবনের পরিণতি মৃত্যু, আমাদের দিঙ্মণ্ডল স্বল্পপ্রসারী; আমরা চারিদিকে জগৎ-পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করিতেছি। বিশ্বপ্রকৃতি যে-কোন মুহূর্তে আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া আমাদের সত্তার বিলোপ ঘটাইতে পারে। বিশাল বিশ্বের সম্মুখে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলি কোনমতে টিকিয়া আছে, মুহূর্তমধ্যে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। আমরা জানি, কর্মক্ষেত্রে আমরা কত শক্তিহীন। প্রতিনিয়তই আমাদের ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে। কত শত ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে চাই, কিন্তু কয়টি ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের বাসনা অনন্ত। আমরা সবকিছুই কামনা করিতে পারি। অন্য বাসনা তো তুচ্ছ, সুদূর নীলাকাশের লুব্ধক নক্ষত্রে যাইব—এরূপ বাসনাও আমরা পোষণ করিতে পারি। কিন্তু কয়টি বাসনা আমরা পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের দেহ অপটু, বহিঃপ্রকৃতি ইচ্ছার প্রতিকূল, আমরা দুর্বল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমাদের আর একটি দিক আছে। ক্ষুদ্র ফুলটি কিংবা সূক্ষ্ম বালুকণাটি যেমন একাধারে সসীম ও অসীমের দ্যোতক, আমাদের স্বরূপও সেইরূপ। আমরা সমুদ্রের তরঙ্গের মত। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তরঙ্গটি সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু নয়, আবার অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে তরঙ্গ এবং সমুদ্রের পার্থক্য স্পষ্ট। তরঙ্গের এমন কোন অংশ নাই, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না যে, ইহা সমুদ্র। 'সমুদ্র' নামটি শুধু তরঙ্গ সম্বন্ধে নয়, সমুদ্রের সকল অংশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তথাপি সমুদ্র তরঙ্গ হইতে পৃথক। সেইরূপ বিরাট সমুদ্রের মধ্যে আমরা এক-একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মত, কিন্তু আমরা যখন আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যাই, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের সত্তাকে ধরা সম্ভব নয়, কারণ আমরা অসীম হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা যেন স্বপ্নে বিচরণ করিতেছি। যতক্ষণ মন স্বপ্নাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু যখনই স্বপ্নের বিষয়কে বাস্তব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করা হয়, তখনই উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। কেন? স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া নয়, স্বপ্নের স্বরূপ আমাদের যুক্তি বিচার ও বুদ্ধির অগোচর বলিয়া। জীবনে অনুভূত প্রত্যেকটি বস্তু এত বিরাট যে, তাহার তুলনায় আমাদের বুদ্ধি অতি তুচ্ছ। বুদ্ধি চায় নিজের উদ্ভাবিত কতকগুলি নিয়মের মধ্যে বস্তুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে। কিন্তু বস্তু কখনও বুদ্ধির নিগড়ে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় না। বস্তুকে নিয়মের জালে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধির এই প্রচেষ্টা মানবাত্মার ক্ষেত্রে আরও সহস্রগুণ ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যে 'আমরা নিজেরাই' সর্বাধিক রহস্যময়।

সব কিছুই বিস্ময়কর! মানুষের চক্ষুর দিকে তাকাও! কত সহজে ইহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অথচ তোমার চক্ষু দেখিতেছে বলিয়াই প্রকাণ্ড সূর্যের অস্তিত্ব। সেই রহস্যের কথা ভাব! ক্ষুদ্র অসহায় চক্ষু-দুটি! একটা তীব্র আলোক কিংবা একটা কাঁটা উহা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তবু সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বংসকারী যন্ত্র, প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহাবিস্ময়কর চন্দ্র সূর্য তারকা পৃথিবী প্রভৃতির অস্তিত্ব এই দুইটি ক্ষুদ্র চক্ষুর উপর নির্ভর করে! তোমার

চক্ষুই বিশ্বের অস্তিত্বের সাক্ষী। চক্ষু বলে, 'এই তো বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি সম্মুখে রহিয়াছে'; আমরা চক্ষুর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়াই প্রকৃতির বিচিত্র রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এইভাবে ক্ষুদ্র কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিপুল বিশ্বের পরিচয় লাভ করি।

কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কে ক্ষুদ্র, কে মহৎ, কে দুর্বল, কে সবল, কে উচ্চ, কে নীচ—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই, কারণ এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের পরস্পর-নির্ভরশীলতা এমন অদ্ভুত যে, ক্ষুদ্রতম পরমাণুটির সত্তাও সমগ্র জগতের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কেহই ছোট নয়, কেহই বড় নয়। সবকিছুই এক অসীম পরম সত্যের সহিত বিজড়িত, সবকিছুই অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান, সবকিছুই তত্ত্বতঃ অসীম। স্থূল বৃক্ষাদি ও সূক্ষ্ম বালুকাদি যাহা দেখা যায়, সুখ-দুঃখাদি যাহা অনুভব করা যায়—সবকিছুই বস্তুতঃ অসীম। প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি পরিচ্ছন্ন সত্তাই স্বরূপতঃ অসীম। আমাদের সত্তার রহস্য এই যে, আমরা অসীম হইয়াও সসীম এবং সসীম হইয়াও অসীম।

ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অসীমের এই উপলব্ধি আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। আমরা যে আমাদের অসীমত্ব ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা নয়, কারণ নিজের স্বরূপ কেহই ভুলিতে পারে না। কেহ কি কখনও নিজের ধ্বংস কল্পনা করিতে পারে? কে ভাবিতে পারে, সে মরিয়া যাইবে?—কেহই এইরূপ চিন্তা করিতে পারে না। অসীমের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-বোধ অজ্ঞাতসারেও আমাদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি এবং ইহাই আমাদের সকল দুঃখের মূল।

দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে দেখা যায় যে, আমরা সামান্য কারণেই ব্যথিত হই, ক্ষুদ্র সত্তার দাসত্ব স্বীকার করি। আমরা মনে করি, আমরা সসীম—ক্ষুদ্র জীব। এই ধারণা হইতেই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি। তথাপি আমরা যে অসীম—এই ধারণা পোষণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমরা যখন দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হই, আমরা যখন তুচ্ছ বিষয়ে বিচলিত হই, তখন আমাদের এই বিশ্বাস জাগ্রত করা উচিত যে, আমরা অসীম। বস্তুতঃ আমরা অসীমই। জ্ঞাতসারে হউক কিংবা অজ্ঞাতসারে হউক, আমরা তো অসীম অনন্তের সন্ধানেই ছুটিতেছি; আমরা সর্বদা এমন কিছু খুঁজিতেছি, যাহা মুক্ত।

জগতে কোনদিন এমন জাতি ছিল না, যাহাদের ধর্ম ছিল না বা যাহারা কোন না কোন প্রকার ঈশ্বর অথবা দেবতার পূজা করিত না। ঈশ্বর আছেন কিনা, দেবতারা আছেন কিনা—এই-

সকল প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আসল প্রশ্ন—মানুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে কোন্ তথ্য আবিষ্কৃত হয়? সারা জগতের লোক একজন ঈশ্বরের খোঁজ করে কেন? মানুষের কত বাধা, কত বন্ধন! নিয়মের ভয়াবহ নিষ্পেষণ তাহাকে কোন দিকে নড়িতে দেয় না। সে যাহা কিছু করিতে চায়, তাহাতেই নিয়মের বাধা। সর্বত্রই নিয়ম। কিন্তু এত বাধা এবং নিষ্পেষণ সত্ত্বেও মানুষের আত্মা তাহার স্বাধীনতা বিস্মৃত হয় না, সে খোঁজে মুক্তি। জগতে যত ধর্মমত আছে, সেগুলির সকলেরই লক্ষ্য এক—সকল ধর্মই খোঁজে মুক্তি। মানুষ জানুক আর নাই জানুক, স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারুক আর নাই পারুক, মুক্তির ধারণা, স্বাধীনতার ভাব তাহার স্বভাবগত। মানুষের মধ্যে যাহারা অতি সাধারণ, যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারাও এমন কিছু খোঁজে, যাহা প্রকৃতির নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। কেউ দানবের খোঁজ করে, কেউ ভূতের খোঁজ করে, কেউ বা দেব-দেবীর খোঁজ করে। এই দানব, ভূত বা দেবতার নিকট প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী নয়, তাহাদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম তুচ্ছ, তাহারা প্রকৃতিকে দমন করিতে পারে। মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাঃ আহা, যদি এমন কাহাকেও পাওয়া যাইত, যিনি নিয়মের নিগড় ভাঙিয়া দিতে পারেন! আমরা তো সর্বদা তাঁহারই খোঁজ করিতেছি, যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন। একটি ধাবমান ইঞ্জিন রেলপথে অগ্রসর হইতেছে, আর উহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র কীট সরিয়া যাইতেছে। তখনই আমরা বলিঃ ইঞ্জিনটি যত প্রকাণ্ডই হউক, উহা জড় পদার্থ, উহা একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; উহা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, উহাকে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; মানুষ যে দিকে চালাইতে চায়, সেই দিকেই উহাকে চলিতে হয়; উহা কখনও নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু কীটটি ক্ষুদ্র হইলেও নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ইহাই তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অসীমত্ব বা ঐশী সত্তার লক্ষণ।

নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীন ইচ্ছার এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মার এই মুক্তিপ্রবণতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বা কোন দেবতার আকারে ইহা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ইহা সবই বাহিরের—যাহারা দেবতাকে কেবল বাহিরেই দেখে, এ তাহাদের জন্য। মানুষ প্রথমে নিজেকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে করিয়াছিল; তাহার ভয় হইয়াছিল, সে হয়তো কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিবে না। এইজন্য সে প্রকৃতির বাহিরে এমন একজনের খোঁজ করিতেছিল, যিনি স্বভাবতঃ মুক্ত। তারপর তাহার মনে হইল, বাহিরে এইরূপ অসংখ্য মুক্ত সত্তা বা দেবতা আছেন। ক্রমে মানুষ সকল দেবতাকে এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরে মিলিত করিল। কিন্তু তাহাতেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে নাই। সে যখন চরম সত্যের দিকে আরও অগ্রসর হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে নিজে যাহাই হউক না কেন, যিনি সকল দেবতার দেবতা, যিনি সকল প্রভুর প্রভু, তাহার সহিত তাহার নিজের একটা সম্বন্ধ আছে। বদ্ধ, হীনমতি এবং দুর্বল হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে মানুষের দৃষ্টি খুলিল, চিন্তার উন্মেষ হইল এবং জ্ঞানের প্রসার হইল। মানুষ ক্রমশঃ সেই পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে সে বুঝিল, এক সর্বশক্তিমান্ মুক্ত আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া তাহার মানসপটে পরমেশ্বর ও নানা দেবতার যে দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে, সেই দৃশ্য তাহার নিজেরই সম্বন্ধে নিজভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সত্য আবিষ্কৃত হইল—সে বুঝিল, পরমেশ্বর নিজের অনুরূপ করিয়া মানুষকে গড়িয়াছেন, শুধু ইহাই সত্য নয়; মানুষ নিজের মত করিয়া পরমেশ্বরকে গড়িয়াছে, ইহাও সত্য। এইরূপেই এই বোধ জাগ্রত মানুষ স্বরূপতঃ মুক্ত। সেই পরমেশ্বর সদা অন্তরে বিরাজমান—আমাদের নিকটতম। এতকাল আমরা তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিলাম, অবশেষে বুঝিলাম—তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরে।

গল্পে আছে, এক ব্যক্তি তাহার নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দকে গৃহের দরজায় আঘাত বলিয়া ভুল করিয়াছিল। প্রথমে একবার দরজা খুলিয়া সে দেখিল, বাহিরে কেহ নাই। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে আবার সেই দরজায় আঘাতের শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইল। এবারও দরজা খুলিয়া বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল, উহা তাহার নিজেরই হৃৎস্পন্দনের শব্দ। মানুষের অবস্থা এই গল্পের লোকটির মত। এক অনন্ত মুক্ত সত্তার সন্ধানে বাহির হইয়া মানুষ যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এতদিন সে বহির্জগতে যাঁহাকে অনন্ত মুক্ত সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছে, তিনি তাহার স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ—সকল আত্মার আত্মা। এই সত্যস্বরূপ সে নিজেই।

এইরূপেই মানুষ একদিন বুঝিতে পারে, তাহার সত্তার মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বৈতভাব বিদ্যমান। সে একাধারে অসীম ও সসীম। যিনি অসীম, তিনিও তাহারই আত্মা। অসীম অনন্ত পরব্রহ্ম যেন বুদ্ধির জালে পড়িয়া সসীম জীবকুলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপে কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই। তিনি অবিকৃতই রহিয়াছেন।

যিনি আমাদের আত্মার আত্মা, তাঁহাকে নিত্য মুক্ত আনন্দময় ও নির্বিকার পরব্রহ্ম বলিয়া জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, আমাদের আশ্রয়স্থল; ইহার মধ্যেই মৃত্যুর চির অবসান, দুঃখের চির নিবৃত্তি এবং অমৃতত্বের আবির্ভাব। বহুর মধ্যে এক, পরিণামশীল জগতের মধ্যে এক অপরিণামী সত্তা—তাঁহাকে যিনি নিজের আত্মা-রূপে উপলব্ধি করেন, শুধু তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অপর কেহ নহে।

মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশার গভীরে আচ্ছন্ন হয়, তখন আত্মা স্বীয় জ্যোতির প্রভাবে তাহাকে জাগ্রত করে; মানুষ জাগিয়াই বুঝিতে পারে, যাহা সত্য-সত্যই তাহার নিজস্ব, তাহা সে কখনও হারাইতে পারে না। না, যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা আমরা হারাইতে পারি না। কে তাহার স্বরূপ হারাইতে পারে? যদি আমি ভাল হই, তাহা হইলে আমার সত্তাই প্রথম স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই 'ভাল'-গুণে রঞ্জিত হয়। যদি আমি মন্দ হই, তাহা হইলেও আমার সত্তাই প্রথম স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই দোষদ্বারা রঞ্জিত হয়। আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে—সর্বত্রই এক অদ্বিতীয় সত্তা বা 'সৎ' বিদ্যমান। সৎ-এর ধ্বংস নাই।

অতএব সকলেরই আশা আছে। কেহই বিনষ্ট হইতে পারে না; কেহই চিরকাল হীন থাকিতে পারে না। জীবন একটা ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়—ক্রীড়া যতই স্থূল হউক না কেন। আমরা যতই দুঃখ-ক্লেশ ও আঘাত পাই না কেন, তাহাতে আত্মার কোন অনিষ্ট হয় না, আত্মা স্থির অচল ও সনাতন। আমরা সেই নিত্য আত্মা।

বৈদান্তিক বলেন, 'আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই; আমার পিতা নাই, মাতা নাই; আমার কখনও জন্ম হয় নাই। আমার শত্রুই বা কে? আমিই যে সব কিছু। আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, কুচিন্তা প্রভৃতি আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।'

এই ভাবনাই সকল ব্যাধির মহৌষধ, ইহাই মৃত্যুহর অমৃত। আমরা এই জগতে আছি; আমাদের স্বরূপ সেই জগৎকে মানিয়া লইতে চায় না, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এস, আমরা বার বার বলিঃ আমি সেই, আমি সেই। আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই। আমি স্ত্রী নই, পুরুষ নই; আমার সম্প্রদায় নাই, বর্ণও নাই। আমার কি মত থাকিতে পারে? এমন কোন্ সম্প্রদায় আছে, আমি যাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি? কোন্ সম্প্রদায় আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? আমি তো সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান! দেহ যতই প্রতিকূল আচরণ করুক, মন যতই বিদ্রোহী হউক, যখনই চারিদিক হইতে গভীরতম অন্ধকার, তীব্র বেদনাময় উৎপীড়ন এবং অকূল নৈরাশ্য আসিয়া ঘিরিবে, তখনই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, 'আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম'—একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বার বার।

বার বার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। কতবার—দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছে, হাঁটিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিয়াছি, মনে হইয়াছে—এখানেই জীবনলীলা শেষ হইবে। কথা বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু অবশেষে ঐ মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছেঃ আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই; আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই; আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নাই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন্, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরাধিকার কর। ওঠ, চল, থামিও না।—এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ আমি সশরীরে এখানে বর্তমান। সুতরাং যখনই অন্ধকার আসিবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিও, দেখিবে—সকল বিরুদ্ধ শক্তি বিলীন হইয়া যাইবে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তো স্বপ্ন মাত্র। জীবনপথের বাধাবিঘ্নগুলি পর্বতপ্রমাণ, দুর্লঙ্ঘ্য ও বিষাদময় বলিয়া মনে হইলেও এগুলি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয় করিও না, দেখিবে উহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। বাধা চূর্ণ করিয়া ফেল, দেখিবে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; পদদলিত কর, দেখিবে মরিয়া গিয়াছে। ভীত হইও না। বার বার বিফল হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। কাল নিরবধি, অগ্রসর হইতে থাক, বার বার তোমার শক্তি প্রকাশ করিতে থাক, আলোক আসিবেই। জগতে প্রত্যেকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? কে তোমাকে সাহায্য করিবে? মৃত্যুর হাত কে এড়াইতে পারিয়াছে? কে তোমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে? তোমার উদ্ধার-সাধন তোমাকেই করিতে হইবে। তোমাকে সাহায্য করার সাধ্য অপর কাহারও নাই। তুমি নিজেই তোমার পরম শত্রু, আবার তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আত্মাকে জান, ওঠ, জাগ, ভীত হইও না। দুঃখ ও দুর্বলতার মধ্যে আত্মাকে প্রকাশ কর—প্রথমে ইহা যতই ক্ষীণ ও অনুভবের অতীত বলিয়া মনে হউক না কেন। তোমার এমন সাহস হইবে যে, তুমি সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিবেঃ আমিই আত্মা, আমিই ব্রহ্ম। আমি পুরুষ নই, স্ত্রীও নই, দেবতা নই, দৈত্যও নই, কোন প্রাণী বা বৃক্ষাদিও নই। আমি ধনী নই, দরিদ্রও নই, পণ্ডিত নই, মূর্খও নই। আমার স্বরূপের তুললায় এই-সকল উপাধি অতি তুচ্ছ। আমি পরমাত্মা, আমি ব্রহ্ম। ঐ যে দেদীপ্যমান চন্দ্র-সূর্য গ্রহনক্ষত্রনিচয় দেখিতেছ, উহারা আমার প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াই আলোক বিস্তার করিতেছে। অগ্নির যে রূপ, তাহা আমিই; বিশ্বের যে শক্তি, তাহাও আমি; কারণ আমিই পরমাত্মা, আমিই ব্রহ্ম।

আমাদেরই জনৈক কবি বলিয়াছেন—আমার প্রকৃত সুখ জাগতিক পদার্থে নাই; পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কোন কিছু আমাকে আনন্দ দিতে পারে নাই। আমি অনন্ত নীলাকাশের মত। কত বিচিত্র মেঘ আকাশের বুকে খেলা করিয়া মুহূর্তমধ্যে দূরে চলিয়া যায়। আবার সেই একই নীলাকাশ। সুখ-দুঃখ শুভাশুভ আত্মাকে আবৃত করিয়া আমাকে মুহূর্তের জন্য অভিভূত করিতে পারে; কিন্তু ইহারা স্থায়ী নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি সকল অবস্থাতেই আছি। আমি নিত্য, আমি অপরিণামী, আমি চির-ভাস্বর। দুঃখ আসে আসুক, আমি জানি—উহা সসীম, অতএব উহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অশুভ আসে আসুক, আমি জানি—উহাও বিনষ্ট হইবে, কারণ উহাও সসীম, ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র আমিই অসীম,

আমাকে কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। আমি চিরন্তন, অসীম, অব্যয় পরমাত্মা।

এস, আমরা এই জ্ঞানামৃত পান করি; ইহাই আমাদিগকে অমৃতত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। ইহাই অক্ষয় ব্রহ্মলাভের পথ। মা ভৈঃ। আমরা পাপী, আমরা সসীম, আমরা মৃত্যুর অধীন—এ কথা বিশ্বাস করিও না। ইহা সত্য নয়।

‘আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে।’ হাত যখন কাজ করিবে, মন যেন তখন জপ করিতে থাকে—‘আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।’ যতদিন না এই সত্য তোমার অস্থি-মাংসের সহিত মিশিয়া যায়, যতদিন না তোমার অন্তর হইতে নিজের ক্ষুদ্রতা দুর্বলতা দুঃখ এবং অমঙ্গলের ভয়াবহ স্বপ্ন চিরতরে তিরোহিত হয়, ততদিন জাগরণে ও স্বপ্নে ইহা চিন্তা কর এবং তখনই পরম সত্য তোমার নিকট আর ক্ষণকালও আত্মগোপন করিয়া থাকিবে না।

জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী

[আমেরিকায় বেদান্ত-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা]

জ্ঞানমার্গের সাধকের সর্বপ্রথম আবশ্যক—শম ও দম। এই দুইটির ব্যাখ্যা একসঙ্গেই করা যাইতে পারে। ইহাদের অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে ধরিয়া রাখা। আমি প্রথম তোমাদের বলিব 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ কি। ধর, চক্ষু রহিয়াছে; এই চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় নয়, ইহারা দর্শনক্রিয়ার যন্ত্রমাত্র। যখন দর্শনেন্দ্রিয় না থাকে, তখন চক্ষু থাকিলেও দেখিতে পারি না। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় রহিয়াছে, দর্শনের যন্ত্র চক্ষুও রহিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ মন এই দুইটির সহিত সংযুক্ত না হইবে, ততক্ষণ দর্শনক্রিয়া হয় না। সুতরাং প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে তিনটি বস্তু আবশ্যক—প্রথমত বাহ্য কারণগুলি, তারপর অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ এবং সর্বশেষে মন। ইহাদের যে-কোন একটি না থাকিলে কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে—বাহ্য ও আন্তর দুইটি কারণ-সহায়ে মন কাজ করে। যখন আমি কোন কিছু দেখি, আমার মন বাহির হইয়া যায় এবং বাহ্য বস্তুর আকার ধারণ করে। কিন্তু মনে কর, আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলাম; মন তখন বাহিরে যায় না; ইহা ভিতরেই সক্রিয় থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে। যখন আমি তোমাদের দিকে তাকাই এবং তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, তখন ইন্দ্রিয়গুলি ও উহাদের যন্ত্রসমূহ কার্যরত থাকে। যখন আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে, কিন্তু ইহাদের যন্ত্রগুলি সক্রিয় থাকে না। এই ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া ব্যতীত কোন চিন্তা বা মনন-ক্রিয়া হয় না। তোমরা লক্ষ্য করিবে, তোমাদের কেহই কোন প্রতীকের সাহায্য ছাড়া চিন্তা করিতে পার না। অন্ধলোককেও কোন একটি আকারের মাধ্যমে চিন্তা করিতে হয়। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় সাধারণতঃ অত্যন্ত সক্রিয়। তোমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ মস্তিষ্ক-স্থিত স্নায়ুকেন্দ্র। চক্ষু ও কর্ণ—দর্শন ও শ্রবণের যন্ত্রমাত্র; ইন্দ্রিয়গুলি রহিয়াছে ভিতরে। ইন্দ্রিয়গুলি যদি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চক্ষু-কর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। সুতরাং মনকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে মনের গতিরোধ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব স্থানে সংযত রাখা—ইহাই হইল 'শম' ও 'দম' শব্দের অর্থ। মন বা অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম হইল শম এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম।

তারপর আবশ্যক—উপরতি। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা না করাকে 'উপরতি' বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়—যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, যাহা দেখিব বা শুনিব, যাহা খাইয়াছি, খাইতেছি বা খাইব, যে যে স্থানে বাস করিয়াছি ইত্যাদি বিষয়েই আমাদের মন ব্যাপৃত। আমরা প্রায় সর্বদাই এই সব বিষয়ে চিন্তা করি ও কথা বলি। যিনি বেদান্তী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে এই অভ্যাস অতি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পরবর্তী সাধন হইল 'তিতিক্ষা'। দার্শনিক জীবন দুঃসাধ্য সাধন!—এই সাধনটি সর্বাধিক দুষ্কর। সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ বলিতে যে অন্যায়ের অপ্রতিরোধ বোঝায়, তিতিক্ষা বলিতেও ঠিক তাহাই বোঝায়। বিষয়টি একটু পরিষ্কারভাবে বোঝানো দরকার। বাহ্যতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ না করিলেও আমরা অন্তরে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করিতে পারি। কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, সেজন্য বাহ্যতঃ তাহাকে ঘৃণা না করিতে পারি, তাহার কথার প্রত্যুত্তর না দিতে পারি এবং নিজেকে সংযত করিয়া আপাততঃ ক্রোধ প্রকাশ করিতে না পারি, তথাপি আমার অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণা থাকিতে পারে এবং আমি ঐ লোকটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারি। ইহা আদর্শ অপ্রতিরোধ নয়। এই আদর্শানুসারে আমার মনেও কোন ঘৃণা অথবা ক্রোধের ভাব থাকা উচিত নয়, এমন কি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকিবে যেন কিছুই ঘটে নাই। কেবল সেই অবস্থায় উপনীত হইলেই, আমি অপ্রতিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হই; ইহার পূর্বে নহে। দুঃখ প্রতিরোধ করিবার অথবা দূর করিবার চিন্তামাত্র না করিয়া, মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখময় অনুভূতি বা অনুশোচনা না রাখিয়া সর্ববিধ দুঃখের যে সহন—তাহাই তিতিক্ষা। মনে কর, অশুভের প্রতিরোধ না করার ফলে গুরুতর অনিষ্ট হইল। আমার যদি তিতিক্ষা থাকে, তাহা হইলে অশুভ প্রতিরোধ না করার জন্য আমার অনুশোচনা বোধ করা উচিত নয়। সেই অবস্থায় উন্নীত হইলে বলা যায়, মন 'তিতিক্ষা'য় প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবাসীরা এই তিতিক্ষা অভ্যাসের জন্য অপূর্ব সাধনায় রত হন। তাঁহারা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া তীব্র শীত ও উষ্ণ সহ্য করেন; তাঁহারা তুষারও গ্রাহ্য করেন না, কেন না দেহ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন চিন্তাই থাকে না। দেহের ভাবনা দেহই করে, উহা যেন একটি বাহিরের জিনিষ।

অতঃপর যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা 'শ্রদ্ধা'; ধর্ম ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। যতক্ষণ এই বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ কেহ জ্ঞানী হইবার উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারে না। এক সময় একজন মহাপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই জগতে দুই কোটি লোকের মধ্যে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'মনে কর, এই ঘরে একটি চোর রহিয়াছে এবং সে জানিতে পারিল, পাশের ঘরে রাশীকৃত

সোনা আছে এবং ঘর-দুইটির মাঝে যে দেয়াল রহিয়াছে, তাহা খুব পাতলা। আচ্ছা, সেই চোরটির কি অবস্থা হইবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'চোরটি একেবারে ঘুমাইতে পারিবে না; তাহার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে সেই সোনা হস্তগত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিবে এবং তাহার অন্য কোন চিন্তা থাকিবে না।' তখন তিনি বলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, কোন মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াও ঈশ্বর লাভের জন্য পাগল না হইয়া থাকিতে পারে? যদি কোন লোক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, এক অসীম অনন্ত আনন্দের আকর রহিয়াছে এবং তাহা লাভ করা যায়, তাহা হইলে উহা লাভ করিবার চেষ্টায় সে কি পাগল হইবে না?' ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অনুরূপ আগ্রহকেই বলে 'শ্রদ্ধা'।

তারপর 'সমাধান', অর্থাৎ মন ঈশ্বরে একাগ্র করিবার নিয়ত অভ্যাস। কোন কিছুই একদিনে সম্পন্ন হয় না। ধর্ম একটি বটিকার আকারে গিলিয়া ফেলা যায় না। ইহার জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলন প্রয়োজন। কেবল ধীর ও নিয়ত অভ্যাস দ্বারা মনকে জয় করা যায়।

তারপর মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা। তোমাদের মধ্যে যাহারা এডুইন আর্নল্ডের 'Light of Asia' (এশিয়ার আলো) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছ, বুদ্ধের প্রথম উপদেশের অনুবাদ নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। সেখানে বুদ্ধ বলিয়াছেনঃ

'তোমরা নিজদোষেই দুঃখভোগ করিয়া থাক; অন্য কেহই তোমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করে না। তুমি যে জীবনধারণ কর, মৃত্যুমুখে পতিত হও, সংসার-চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া দুঃখের চক্রশলাকা, অশ্রুর চক্রবেষ্টনী এবং অসারতার চক্রনাভিকে আলিঙ্গন কর—ইহাতে অন্য কেহই তোমাকে বাধ্য করে না।'

আমাদের যাবতীয় দুঃখ আমরা নিজেরাই বাছিয়া লইয়াছি। ইহাই আমাদের প্রকৃতি। একজন বৃদ্ধ চৈনিক ষাট বৎসর কারারুদ্ধ ছিল; কোন নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে

তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার হইতে বাহির হইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমি এখানে বাঁচিতে পারিব না।' তাহাকে আবার সেই মূষিকাদিপূর্ণ ভীষণ রুদ্ধ কারাগারে যাইতে হইবে। সে আলোক সহ্য করিতে পারে নাই। সে রাজকর্মচারিগণকে বলিল, 'তোমরা আমাকে মারিয়া ফেল অথবা কারাগারেই পাঠাইয়া দাও।' তাহাকে কারাগারেই পাঠানো হইল। মানুষ-মাত্রেরই অবস্থা ঠিক এইরূপ। আমরা উদ্দামগতিতে সর্বপ্রকার দুঃখের পিছনে ছুটি, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমরা অনিচ্ছুক। প্রতিদিন আমরা সুখের পশ্চাতে ধাবিত হই, নাগাল পাইবার পূর্বেই দেখি, উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে, আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তবুও আমরা উন্মত্তভাবে সুখান্বেষণ হইতে বিরত হই না, বরং আরও আগাইয়া চলি। এমন মোহান্ধ নির্বোধ আমরা!

ভারতবর্ষের কোন কোন তেলের কলে বা ঘানিতে বলদ ব্যবহার করা হয়। বলদগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৈলবীজ পেষণ করে। বলদের কাঁধে একটি জোয়াল থাকে। একটুকরা কাঠ জোয়াল হইতে সামনের দিকে লম্বমান রাখা হয় এবং তাহাতে এক গোছা খড় বাঁধা থাকে। বলদের চোখ দুইটি এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে, সে কেবল সম্মুখের দিকেই তাকাইতে পারে; সুতরাং খড়টুকুর নাগাল পাইবার জন্য সে আপন গলদেশ বাড়াইয়া দেয়, এইরূপ করিতে গিয়া সে কাঠটিকেই খানিকটা সামনে ঠেলিয়া দেয়। সে আবার চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় একই। এই ভাবে বার বার চেষ্টা চলিতে থাকে। বলদটি কখনই খড়ের নাগাল পায় না, কিন্তু ইহা পাইবার আশায় বার বার ঘুরিতে থাকে এবং এইভাবেই সে তৈলবীজ পেষণ করে। তুমি ও আমি প্রকৃতির দাসরূপে, সম্পদের দাসরূপে, স্ত্রীপুত্র-পরিজনের দাসরূপে জন্মিয়াছি; এবং আমরা এইভাবেই একটি কল্পিত অবাস্তব তৃণগুচ্ছের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতেছি, অথচ যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা পাই না। ভালবাসাই আমাদের মহান্ স্বপ্ন; আমরা সকলেই ভালবাসিবার জন্য এবং ভালবাসা পাইবার জন্য লালায়িত; আমরা সকলেই সুখী হইতে চাই, কখনই দুঃখ চাই না; কিন্তু যতই আমরা সুখের দিকে অগ্রসর হই, সুখ ততই আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। এইভাবেই জগৎ চলিয়াছে, সমাজ চলিয়াছে। আমরা অজ্ঞানান্ধ, বিষয়ের দাস; অজ্ঞাতসারেই আমাদিগকে বিষয়াসক্তির মূল্য দিতে হয়। তোমরা নিজেদের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ কর, দেখিবে তাহাতে সুখের মাত্রা কত অল্প এবং জগৎপ্রপঞ্চের পশ্চাৎ উন্মাদবৎ ধাবিত হইয়া বাস্তবিকপক্ষে কত অল্পই লাভ করিয়াছ।

সোলন ও ক্রিসাসের (Solon and Croesus) কথা তোমাদের মনে আছে তো? রাজা সেই মহান্ জ্ঞানী পুরুষকে বলিলেন, 'এশিয়া মাইনর খুব সুখের স্থান।' সোলন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সবচেয়ে সুখী কে? বিশেষ সুখী একটি লোকও তো আমি দেখি নাই।' ক্রিসাস বলিলেন, 'ইহা একেবারে বাজে কথা! জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী।' সোলন তখন বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার জীবনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না।' এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কালক্রমে সেই নৃপতি পারসীকদের নিকট পরাজিত হন এবং তাহারা জীবন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দেয়। চিতা প্রস্তুত; ক্রিসাস ইহা দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'সোলন! সোলন!!' তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?' উত্তরে তিনি সোলনের বিষয়টি বিবৃত করিলেন। পারস্য-সম্রাটের মনে লাগিল; তিনি ক্রিসাসের জীবন রক্ষা করিলেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনকাহিনী এইরূপ। আমাদের উপর প্রকৃতির এইরূপই প্রবল প্রভাব। ইহা বার বার পদাঘাত করিয়া আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তবু আমরা অদম্য উত্তেজনা-বশে ইহাকেই অনুসরণ করিতেছি। নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমরা সর্বদা অন্তরে আশা পোষণ করিতেছি। এই কুহকিনী আশা আমাদিগকে পাগল করিয়া তোলে; আমরা সর্বক্ষণ সুখের আশা করি।

প্রাচীন ভারতে একজন মহান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন চারিটি প্রশ্ন করা হয়; ইহাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলঃ ‘জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু কি?’ উত্তরে তিনি বলেন, ‘আশা।’ সত্য, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক বস্তু। দিবারাত্র আমরা দেখিতে পাই, আমাদের চারিদিকে মানুষ মরিতেছে; তথাপি আমরা মনে করি, আমরা মরিব না। আমরা কখনও মনে করি না যে, আমরা মরিব বা দুঃখকষ্ট পাইব। প্রত্যেকেই মনে করে, সে জীবনে সাফল্য লাভ করিবেই—সর্বপ্রকার নৈরাশ্য, বিপর্যয় ও সুচিন্তিত যুক্তি উপেক্ষা করিয়াও সে অন্তরে আশা পোষণ করে। এ জগতে কেহই যথার্থ সুখী নয়। ধর, কোন ব্যক্তি ধনবান, তাহার প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহার পরিপাক-শক্তির গোলমাল আছে এবং সে খাইতে পারে না। আর একজনের ভাল পরিপাক-শক্তি আছে, এবং সে সামুদ্রিক পক্ষী ‘কর্‌মোর‍্যান্ট’ (Cormorant)-এর মত হজম করিতে পারে, কিন্তু মুখে দিবার মত কোন খাদ্যই তাহার জোটে না। কেহ আবার ধনী, কিন্তু নিঃসন্তান। কেহ আবার দরিদ্র—ক্ষুধায় কাতর, কিন্তু তাহার একপাল ছেলেমেয়ে, তাহাদের লইয়া কি যে করিবে, সে বুঝিতে পারে না। এইরূপ হয় কেন? সুখ ও দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যে সুখকে গ্রহণ করে, তাহাকে দুঃখও গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের সকলের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমরা দুঃখকে বাদ দিয়া সুখ লাভ করিতে পারি। এই ধারণা আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে পারি না।

আমি যখন বস্টনে ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে আসে। সে আমাকে একটুকরা কাগজ দিল; ইহার উপর সে একটি নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিল। নীচে লেখা ছিলঃ ‘যদি পাইবার উপায় তোমার জানা থাকে, তবে জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য ও সুখ তোমারই। আমার কাছে আসিলে বলিয়া দিব, কিভাবে লাভ করা যায়। ইহার জন্য পাঁচ ডলার দিতে হইবে।’ সে আমাকে কাগজখানি দিয়া বলিল, ‘এ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?’ আমি বলিলাম, ‘ভাই, ইহা ছাপিবার জন্য তুমি অর্থের ব্যবস্থা কর না কেন? এইটুকু ছাপিবার মত অর্থও তোমার নাই।’ সে আমার কথা বুঝিতে পারিল না। কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার না করিয়া সে প্রচুর সুখ ও অর্থ লাভ করিতে পারিবে—এই ধারণায় সে ছিল মশগুল। মানুষ দুইটি চরম সীমার দিকে ছুটিতেছেঃ একটি চূড়ান্ত শুভবাদ—যাহাতে সবকিছুই শুভ, সুন্দর ও গোলাপী বলিয়া মনে হয়। অপরটি চূড়ান্ত দুঃখবাদ—যাহাতে প্রতীত হয় সবকিছুই তাহার বিরুদ্ধে। অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্ক কমবেশী অপরিণত। দশ লক্ষের মধ্যে একজনের মস্তিষ্ক সুপরিণত দেখা যায়। বাকী সকলে—হয় অদ্ভুত খেয়ালী, না হয় বাতিকগ্রস্ত।

স্বভাবতই আমরা সর্ববিষয়ে বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলি। যখন আমরা সুস্থ থাকি ও আমাদের বয়স অল্প, তখন আমরা মনে করি—জগতের সমস্ত ধন আমাদের করায়ত্ত হইবে; কিন্তু পরে সমাজ যখন আমাদিগকে ফুটবলের মত চারিদিকে ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত করে, এবং আমাদের বয়স বাড়িতে থাকে, তখন এক কোণে বসিয়া বিরক্তির অস্ফুট শব্দ উচ্চরণপূর্বক আমরা অপরকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকি। অল্প লোকেই জানে যে, সুখের সঙ্গে দুঃখ আসে, এবং দুঃখের সঙ্গে সুখ আসে। দুঃখ যেমন বিরক্তিকর, সুখও তাই, কারণ সুখ দুঃখের যমজ ভ্রাতা। মানুষ দুঃখের পশ্চাতে ছুটিবে—ইহা তাহার মর্যাদার পক্ষে হানিকর; আবার সে সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইবে—ইহাও সমভাবে অসম্মানজনক। যাহাদের বিচারবুদ্ধি সাম্যে স্থিত, তাহারা উভয়কেই পরিত্যাগ করিবে। অপরে যাহাতে কোন ব্যক্তির দুর্বলতার সুযোগ না গ্রহণ করে সেজন্য সে চেষ্টা করিবে না কেন? এইমাত্র হয়তো পিঠে চাবুক পড়িল; আর যেই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, প্রকৃতি একটি ডলার দিয়া দিল। আবার চাবুক খাইলাম, আবার কাঁদিতে লাগিলাম—প্রকৃতি তখন আমাদিগকে একখণ্ড পিষ্টক দিল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমরা হাসিতে লাগিলাম।

জ্ঞানী চান মুক্তি। তিনি দেখেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি সব অসার, এবং সুখ-দুঃখের অন্ত নাই। জগতে কত ধনীই না নূতন নূতন সুখ লাভ করিতে চায়! সব সুখই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহারা নূতন সুখ চায়। দেখিতে পাইতেছ না—মুহূর্তের স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য প্রতিদিন তাহারা কতই হাস্যাস্পদ বস্তু আবিষ্কার করিতেছে? তারপর লক্ষ্য করিয়াছ, ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে? অধিকাংশ লোক চলে গড্ডলিকা প্রবাহের মত। দলের প্রথম মেষটি নর্দমায় পড়িলে বাকী সবগুলি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বিপন্ন হয়। ঠিক এই ভাবেই সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাহা করে, অন্য সকলে নিজেদের কাজের পরিণাম না ভাবিয়াই তাহা করিতে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি পার্থিব বস্তুর অসারতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, সে অনুভব করে, এইভাবে তাহার পক্ষে প্রকৃতির ক্রীড়নক হওয়া অথবা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়; ইহা দাসত্ব। কোন ব্যক্তিকে দুই-চারিটি মধুর কথা বলিলে সে তৃপ্তির হাসি হাসিতে থাকে; কিন্তু গোটা-কয়েক কড়া কথা শুনিলে সে

কাঁদিতে থাকে। সে এক মুঠা অন্ন, একটু শ্বাস-প্রশ্বাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, দেশপ্রেম, দেশ, নাম ও যশের দাস। এই ভাবে সে দাসত্বের মধ্যে বাস করে এবং দাসত্ব-হেতু তাহার প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়িয়া যায়। তুমি যাহাকে মানুষ বল, সে একটি ক্রীতদাস। এই সব দাসত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিলেই মুক্ত হইবার ইচ্ছা জাগে, মুক্তির একটি উদগ্র বাসনা আসে। যদি কাহারও মাথায় একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হয়, তাহা হইলে উহা দূরে ফেলিয়া দিবার জন্য সে কিরূপ চেষ্টা করে! যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে প্রকৃতির ক্রীতদাস—তাহার মুক্তির সংগ্রামও এইরূপ হইবে।

আমরা এইমাত্র দেখিলাম—'মুমুক্ষুত্ব' অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা কি। সাধনার পরবর্তী সোপানটিও খুব শক্ত। ইহা হইল—'নিত্যানিত্য-বিবেক' অর্থাৎ সত্য ও অসত্য, 'নিত্য ও অনিত্যের বিচার'। কেবল ঈশ্বরই নিত্য, আর সবকিছুই অনিত্য। সবকিছুই মরণশীল—দেবদূত, মানুষ, জীবজন্তু সব মরিয়া যায়, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারকা সব ধ্বংস হইয়া যায়। প্রতিটি বস্তু প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। অদ্যকার পর্বতগুলি অতীতে মহাসাগর ছিল; আগামী কাল তাহারা মহাসাগরে পরিণত হইবে। প্রত্যেক বস্তুই প্রবাহাকারে চলিতেছে। সমগ্র বিশ্ব নিত্যবিকারী এক জড়সমষ্টি। কিন্তু এক অপরিণামী বস্তু আছেন, তিনিই ঈশ্বর। আমরা যতই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, ততই আমাদের কম পরিবর্তন হইবে, প্রকৃতি আমাদের উপর তত কম ক্রিয়া করিবে। আমরা যখন তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিব এবং তাঁহার সঙ্গে একত্ব অনুভব করিব, তখনই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিব, জগৎপ্রপঞ্চের উপর প্রভুত্ব করিব; আর আমাদের উপর তাহাদের কোন প্রভাব থাকিবে না।

দেখিতে পাইতেছ, যদি সত্য সত্যই আমরা উপরি-উক্ত শমদমাদি-সাধনে প্রতিষ্ঠিত হই, তাহা হইলে আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজনই হয় না। সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আত্মার মধ্যে সমগ্র পূর্ণতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে; কিন্তু এই পূর্ণতা প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। স্তরে স্তরে আপনাকে বিন্যস্ত করিয়া প্রকৃতি আত্মার এই শুদ্ধ রূপকে আবৃত করিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের কি করিতে হইবে? প্রকৃতপক্ষে আমরা মোটেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করি না। পূর্ণের উৎকর্ষ-সাধন আবার কিরূপে হইবে? আমরা শুধু আবরণটিকে সরাইয়া লই। তখন আত্মা আদিম শুদ্ধরূপে, স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ মুক্তস্বরূপে প্রকাশিত হন।

এখন প্রশ্ন ওঠেঃ এই-সব সাধনের এত প্রয়োজন কি? কারণ আধ্যাত্মিকতা কর্ণ চক্ষু বা মস্তিষ্ক দ্বারা লাভ করা যায় না। কোন শাস্ত্রগ্রন্থই আমাদিগকে ধার্মিক করিয়া দিতে পারে না। জগতে যত গ্রন্থ আছে, সবই আমরা পড়িয়া ফেলিতে পারি, তবু হয়তো ধর্ম বা ঈশ্বর-বিষয়ে একবর্ণও বুঝিতে পারিব না। সমগ্র জীবন আমরা ধর্মের কথা বলিতে পারি; তাহাতেও আমাদের কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি নাও হইতে পারে। আমরা পৃথিবীর মধ্যে অসাধারণ মনীষী হইতে পারি, তথাপি আমরা ঈশ্বর লাভ নাও করিতে পারি। পক্ষান্তরে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির চরম অনুশীলনের ফলে কত ধর্মহীন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য কর নাই? ইহা তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি দোষ যে, তোমরা কেবল বুদ্ধির উন্মেষকারী শিক্ষার পশ্চাতে ধাবিত; হৃদয়বৃত্তির দিকে তোমরা তাকাও না। শুধু বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে দশগুণ অধিক স্বার্থপর করিয়া তোলে; এবং এইরূপেই তোমাদের ধ্বংস হইবে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে হৃদয়কেই মানিবে, কেন না মস্তিষ্কের একটি মাত্র বৃত্তি—যুক্তিবিচার ইহার মধ্যেই সে কাজ করে, ইহার বাহিরে যাইতে পারে না। হৃদয়ই মানুষকে এমন উচ্চতম স্তরে লইয়া যায়, যেখানে 'মন' কখনও পৌঁছিতে পারে না। ইহা বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া বোধির স্তরে উপনীত হয়। বুদ্ধিতে কখনও প্রেরণাবোধ জাগিতে পারে না। কেবল প্রজ্ঞালোকে আলোকিত হৃদয়ই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষ কখনও প্রেরণা লাভ করিতে পারে না। প্রেমিক পুরুষের মধ্যে হৃদয়েরই বাণী শোনা যায়। বুদ্ধি অপেক্ষা সর্বদা হৃদয় উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করে—সেই যন্ত্র হইল প্রেরণা-যন্ত্র। বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের যন্ত্র, হৃদয় তেমনি প্রেরণার যন্ত্র। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্তরে বুদ্ধি অপেক্ষা এই যন্ত্রটি অনেকটা দুর্বলতর। অজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিছুটা আবেগপ্রবণ। তাহাকে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত তুলনা কর—অধ্যাপকটির কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কিন্তু তিনি তাঁহার বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ; এবং একই সময়ে তিনি শয়তান ও প্রখরবুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু হৃদয়বান ব্যক্তি কখনও শয়তান হইতে পারে না। আবেগে-পূর্ণ কোন ব্যক্তি কখনও শয়তান হয় না। ঠিক ঠিক অনুশীলন করিলে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন

এগুলিই হৃদয়ের প্রস্তুতি—সেই প্রেম, হৃদয়ের সেই গভীর সহানুভূতির প্রস্তুতি। ভগবানের নিকট পৌঁছিবার জন্য শিক্ষিত অথবা পণ্ডিত হইবার প্রয়োজন একেবারেই নাই। জনৈক মহাপুরুষ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অপরকে বধ করিবার জন্য ঢাল-তরবারির প্রয়োজন, কিন্তু নিজেকে বধ করিবার জন্য একটি সূচই যথেষ্ট; তেমনি অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন থাকিলেও এগুলি আত্মশিক্ষার জন্য নয়।' তুমি কি পবিত্র? তুমি যদি পবিত্র হও, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবে। 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ধন্য, কেননা তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবে।' তুমি যদি পবিত্র না হও,

[illegible]

বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সর্বাবস্থাতেই নির্মল হৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবে—যদিও মনে

[illegible]

এবং মানুষের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্বন্ধে মহাসত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই-সকল বিষয় কিরূপে জানিয়াছিলেন? হৃদয়বৃত্তির সাহায্যেই জানিয়াছিলেন। তাঁহারা হৃদয়কে নির্মল করিয়াছিলেন। বর্তমানেও আমরা ইহা করিতে পারি—পথ আমাদের জন্য প্রশস্তই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন নয়, হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনই বিশ্বের দুঃখ-দৈন্য হ্রাস করিতে পারে।

তোমাদের মনে আছে, ওল্ড টেষ্টামেণ্টে (Old Testament) মুশাকে বলা হইয়াছিল, 'তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।' ধর্মানুশীলনকালে আমাদিগকে সর্বদা এরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যে-ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় ও শ্রদ্ধালু মনোভাব লইয়া আসেন, তাঁহার হৃদয় খুলিয়া যাইবে; অনুভূতির দ্বার তাঁহার জন্য উদ্ঘাটিত হইবে এবং তিনি 'সত্য' দর্শন করিবেন।

শুধু বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হইলে তোমার কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তির কসরত হইবে, বুদ্ধিপ্রসূত কয়েকটি মতবাদ লাভ করিবে, কিন্তু সত্যলাভ হইবে না। সত্যের এমন একটি রূপ আছে যে, তাহা দেখিলেই দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া যায়। সূর্যকে দেখাইবার জন্য কোন মশালের প্রয়োজন হয় না; সূর্য স্বয়ম্প্রকাশ। সত্যের যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণের প্রমাণ কি? সত্যের সাক্ষিরূপে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই সাক্ষীর আবার সাক্ষী কোথায়? আমাদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের হৃদয় জাগরিত হইয়া বলিবে, 'ইহা সত্য, এবং উহা অসত্য।'

ধর্মের ক্ষেত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত, এমন কি আমাদের চেতনারও ঊর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না। কেহই চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন করে নাই, কখনও করিবেও না। কাহারও ইন্দ্রিয়-চেতনার মধ্যে ঈশ্বর নাই। আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নই, তুমিও নও, কেহই নয়। ঈশ্বর কোথায়? ধর্মের ক্ষেত্র কোথায়? উহা ইন্দ্রিয়ের অতীত—চেতনার ঊর্ধ্বে। আমরা যে-সকল বিভিন্ন স্তরে কাজ করিয়া থাকি, চেতনা শুধু

তাহাদের অন্যতম। তোমাকে চেতনার ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে হইবে; ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে যাইতে হইবে; তোমাকে নিকট হইতে নিকটতররূপে স্বীয় আত্মকেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আর যতই তুমি এইরূপ করিতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? অপরোক্ষ অনুভূতি। এই প্রাচীরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ—ইহা আমি প্রত্যক্ষ করি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এইভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং যাঁহারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই নিকট তিনি প্রত্যক্ষ হইবেন। কিন্তু এই অনুভূতি মোটেই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নয়। ইহা অতীন্দ্রিয়—অতিচেতন। সুতরাং নিজেদের অতীন্দ্রিয়-লোকে উন্নীত করিবার জন্য এইসব যমনিয়মাদির অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সর্বপ্রকার অতীত কর্ম ও বন্ধন আমাদিগকে নিম্নে টানিয়া লইতেছে। এই-সকল প্রস্তুতি আমাদিগকে পবিত্র ও বন্ধনমুক্ত করিবে। বন্ধনগুলি আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং যে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের স্তরে আমরা বদ্ধ হইয়া আছি, তাহার ঊর্ধ্বে উন্নীত হইব। তখনই আমরা এমন সব বস্তু দেখিব শুনিব এবং অনুভব করিব, যাহা মানুষ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-রূপ তিনটি সাধারণ স্তরে দেখে না, শোনে না বা অনুভব করে না। তখন আমরা যেন একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলিব। লোকে আমাদের ভাষা বুঝিতে পারিবে না; কারণ তাহারা তো ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু জানে না। যথার্থ ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের। জগতের প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করিবার সহজাত শক্তি রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত একদিন ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবে। কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর; আমরা জানি, সোজাসুজি কোন অগ্রগতি হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মা যেন বৃত্তাকারে চলিতেছে; তাহাকে এই বৃত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। কোন জীবাত্মাই চিরতরে নিম্নগামী হইতে পারে না; এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাকে ঊর্ধ্বগামী হইতেই হইবে। কাহারও বিনাশ নাই। আমরা সকলেই একটি সাধারণ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়াছি—উহাই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে-সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারা অতি উচ্চই হউক বা অতি নীচই হউক—সকলেই সর্ব জীবনের জনক ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিবে। 'যাঁহা হইতে সকল প্রাণী জাত, যাঁহাতে সকলে অবস্থিত এবং যাঁহার নিকট সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, তিনিই ঈশ্বর (ব্রহ্ম)।'
২৮

জ্ঞানযোগ - প্রবেশিকা

পূর্ণ প্রকৃতির যে-রূপ আমাদের নিকট সর্বদা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ঈশ্বর (ব্রহ্ম)ই এবং তাহাই চরম সত্য।

ভেদ-রহিত সত্তাই যথার্থ পূর্ণ সত্তা—অন্য সবকিছুই নিম্নতর পর্যায়ের এবং অনিত্য।

ইহাই (জ্ঞানযোগই) যোগশাস্ত্রের দার্শনিক ও যুক্তিসম্মত দিক্। যোগশাস্ত্রের এই অংশটি খুবই কঠিন; আমি ধীরে ধীরে তোমাদিগকে ইহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিব।

যোগের অর্থ মানুষ ও ঈশ্বরকে যুক্ত করার পদ্ধতি। এই বিষয়টি বুঝিলে মানুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সংজ্ঞা অনুযায়ী চিন্তা করিতে পারিবে এবং তোমরা দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে 'যোগ' কথাটি খাপ খায়। সর্বদা মনে রাখিও বিভিন্ন মানসিক গঠন অনুযায়ী যোগও বিভিন্ন প্রকারের, ইহাদের একটি না হইলে অন্যটি হয়তো তোমার উপযোগী হইতে পারে। সব ধর্মের দুইটি ভাগ—তত্ত্ব ও সাধন। পাশ্চাত্যেরা তত্ত্বের দিক্‌টিই অনুসরণ করে, এবং সাধন অর্থে শুধু সৎকার্য করাই বুঝিয়া থাকে। 'যোগ' বলিতে ধর্মের ব্যাবহারিক দিক্ বা সাধন-অঙ্গকে বুঝায় এবং উহা দেখাইয়া দেয় যে, কেবল সৎকাজ করা বাদ দিলেও ধর্ম একটি কার্যকরী শক্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানুষ যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফলে 'ঈশ্বরবাদ' (Deism)-এর উৎপত্তি। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু অনুভবসিদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা হয়। এই মতবাদ-প্রবর্তনের ফলে ধর্মের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ডারুইন ও মিলের মতবাদ দ্বারা ধ্বংস হইল। ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ধর্ম তখন মানুষের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল, প্রাকৃতিক শক্তির পূজা হইতেই ধর্মের উদ্ভব। সূর্য-উপাখ্যান প্রভৃতি সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। অন্যদলের সিদ্ধান্ত হইল, পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে; এ বিষয়ে হার্বার্ট স্পেন্সার দ্রষ্টব্য। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই-সকল মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কোন বহিরঙ্গ পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে না।

'এক-টুকরা মাটি সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে সমস্ত মাটি সম্বন্ধেই জ্ঞান হয়।'
২৯
সমগ্র বিশ্ব-জগৎও ঠিক একই পরিকল্পনা অনুসারে রচিত। মানুষ মৃত্তিকাখণ্ডের মত। আমরা যদি অণুস্বরূপ একটি মানবাত্মাকে জানিতে পারি, যদি তাহার আরম্ভ ও সাধারণ ইতিহাস জানিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র প্রকৃতিকেই জানা হইল। জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় ও মৃত্যু—সমগ্র প্রকৃতিতে এই একই অনুক্রম; উদ্ভিদ্-জগৎ এবং মানুষের বেলায়ও সেই একই কথা। প্রভেদ শুধু কালে। একটি ক্ষেত্রে সমস্ত কল্পটি একদিনে সম্পূর্ণ হইতে পারে, আবার

অন্য ক্ষেত্রে সত্তর বৎসর লাগিতে পারে; পদ্ধতিগুলি এক। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সঠিক বিশ্লেষণে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়—আমাদের নিজ নিজ মন বিশ্লেষণ করা। ধর্ম বুঝিবার জন্য মানব-মনের যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শুধু যুক্তির সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব, কারণ অসম্পূর্ণ যুক্তি নিজস্ব মূল ভিত্তিই অনুধাবন করিতে পারে না। অতএব মনকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল—প্রকৃত তথ্যে পৌঁছানো, তবেই বুদ্ধি সেগুলিকে সম্বন্ধ করিয়া মূলনীতিসমূহের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে। বুদ্ধির কাজ নির্মাণ করা, কিন্তু ইট ছাড়া তো গৃহনির্মাণ সম্ভব নয়, আর বুদ্ধি নিজে 'ইট' তৈরী করিতে পারে না। প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার নিশ্চিত উপায় জ্ঞানযোগ।
প্রথমত আমাদের মনের একটি গঠন-রীতি আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ আছে; ইহারা কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইন্দ্রিয় অর্থে বাহ্য ইন্দ্রিয়-যন্ত্রকে বুঝাইতেছি না। মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রটিই দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ অভ্যন্তরীণ। একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয়প্রকার স্নায়ুই (sensory and motor nerves) প্রয়োজন।

তারপর আছে মন স্বয়ং। ইহা একটি নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত; কোন কিছু, যেমন একটি প্রস্তরখণ্ড পড়িলেই উহাতে কম্পন শুরু হয়। সেই কম্পনগুলি একত্র হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হয় এবং সমস্ত হ্রদে বিস্তৃত হইয়া সর্বত্র অনুভূত হইতে থাকে। মন (চিত্ত) এই হ্রদের মত, ইহাতে সর্বক্ষণ কম্পন চলিতে থাকে, এবং সেই কম্পন মনের উপর নানা রেখাপাত করে। আমাদের অহং-বোধ বা ব্যক্তিসত্তা বা 'আমি' এই রেখাপাতেরই ফল। অতএব এই 'আমি' শক্তির একটি দ্রুত সঞ্চরণ মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন বাস্তব সত্তা নাই।

মনের মূল উপাদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি জড়যন্ত্র মাত্র, প্রাণকে ধারণ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার দেহেরই মৃত্যু ঘটে, কিন্তু সবকিছুই যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন মনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বীজাকারে অবশিষ্ট থাকে। ইহাই নূতন দেহের বীজ-স্বরূপ, সেন্ট পল ইহাকেই 'আত্মিক শরীর' (spiritual body) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মনের জড়ত্ব-সংক্রান্ত মতবাদটি আধুনিক সর্বপ্রকার মতবাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূর্খের বুঝিবার শক্তি বড়ই কম, কারণ তাহার মানস- উপাদান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জড়বস্তুর মধ্যে চৈতন্য থাকিতে পারে না অথবা জড়বস্তুর কোন সমবায়ের দ্বারা চৈতন্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে চৈতন্য থাকে কোথায়? উহা থাকে জড়ের অন্তরালে—উহাই তো জীব, প্রকৃত সত্তা; জড়ের মাধ্যমে সেই তো কাজ করে। জড় ব্যতিরেকে শক্তির সঞ্চরণ সম্ভব নয়। যখন মৃত্যুর পর সমগ্র মনের কিয়দংশ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যায়, জীব একাকী ভ্রমণ করিতে পারে না বলিয়া মনের ঐ কিয়দংশ তাহার সঞ্চরণের মাধ্যমরূপে অবশিষ্ট থাকে।

প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? আমার সামনের দেওয়ালটি আমার উপর একটি ছাপ ফেলিতেছে, কিন্তু আমার মন সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঐ দেওয়ালটি দেখিতে পাই না, অর্থাৎ শুধু দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই মন দেওয়ালটিকে জানিতে পারে না। যে প্রক্রিয়ার ফলে মন ঐ দেওয়ালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, তাহা একটি বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া। এই ভাবে সমগ্র

বিশ্বজগৎকেই আমরা আমাদের চক্ষু ও মন (বা মনন-শক্তি) দ্বারা দেখি, অবশ্য ইহাতে আমাদের নিজ নিজ প্রবণতার রঙ নিশ্চয়ই লাগে। প্রকৃত দেওয়ালটি অথবা প্রকৃত বিশ্ব মনের বাহিরেই অবস্থিত, ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমরা যদি বিশ্বজগৎকে 'ক' বলি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাঁড়াইবে এইরূপঃ দৃশ্যমান জগৎ=ক+মন।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। মনও নিজেকে জানিতে চায়, কিন্তু এই সত্তাকে জানিতে হইলে মনের মাধ্যমেই জানিতে হইবে এবং উহাও সেই দেওয়ালের মত অজ্ঞাত। এই সত্তাকে যদি আমরা 'খ' বলিয়া ধরি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাঁড়াইবেঃ খ+মন=অন্তর্জগৎ। ক্যাণ্ট-ই প্রথম মনের এই প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদে বহু পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে। অতএব এখন ইহা দাঁড়াইয়াছে যে, 'ক' এবং 'খ'-এর অন্তর্বর্তী হইয়া মনই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া করিতেছে।

'ক' যদি অজ্ঞাত হয়, তবে আমরা ইহার প্রতি যে-কোন গুণই আরোপ করি না কেন, সেগুলির সবই আমাদের মন হইতে উদ্ভূত। দেশ, কাল এবং কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে মনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়া থাকে। কাল ব্যতীত চিন্তার সঞ্চরণ এবং স্থান ব্যতীত স্থূলতর বিষয়ের কম্পন সম্ভব নয়। কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা হইতেছে একটি ক্রম, যাহার মধ্যে কম্পনগুলি আসিয়া একত্র হয়। এইগুলির মাধ্যমেই মন বিষয়ানুভূতি লাভ করে। অতএব যাহা কিছুই মনের অতীত, তাহাই দেশকাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত।

অন্ধ ব্যক্তি স্পর্শ এবং শব্দের দ্বারা এই জগৎ অনুভব করিয়া থাকে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী আমাদের কাছে এই জগৎ অন্ধের জগৎ হইতে ভিন্নরূপ। আমাদের মধ্যে যদি কেহ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দেখিবার মত শক্তি অর্জন করে, তড়িৎ-ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়, তবে তাহার নিকট জগৎ ভিন্ন রূপে প্রতীত হইবে। অথচ এই বহির্জগৎ, যাহাকে 'ক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা ইহাদের সকলের সম্মুখে সর্বদা সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন লইয়া জগৎকে দেখিতেছে, জগৎও প্রত্যেকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইতেছে। মনুষ্য-জগতে দেখা যায়—কোথাও বা ক+১টি ইন্দ্রিয় , কোথাও ক +২টি ইন্দ্রিয় এবং এইভাবে ক+৫টি ইন্দ্রিয় পর্যন্ত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার তারতম্যের জন্য অনুভূতিও সর্বক্ষণই পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু 'ক' সর্বদাই অপরিবর্তিত। 'খ'ও আমাদের মন এবং দেশ, কাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বাহিরে অবস্থিত।

কিন্তু তোমরা প্রশ্ন করিতে পারঃ কিরূপে আমরা বুঝিব যে 'ক' ও 'খ'—এই দুইটি দেশ,

কাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বাহিরে বর্তমান? সত্য কথা, কালই প্রভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে, কালের অতীত হইলে কোন প্রভেদ থাকে না—উভয়েই কালাতীত বলিয়া উহারা প্রকৃতই এক। মন যখন এই এক-কে বহির্জগৎরূপে প্রত্যক্ষ করে, তখন মন ইহাকে নানা ভাবে বলে 'ক', এবং অন্তর্জগৎরূপে যখন দেখে, তখন বলে 'খ'। এই একত্ব বর্তমান রহিয়াছে এবং মনরূপ কাঁচের মাধ্যমেই ইহা বিভিন্নরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

যাহা ভেদ-রহিত, তাহা ভেদযুক্ত হইয়া কেমন করিয়া মনের গোচরীভূত হয়? ইহা এমন একটি প্রশ্ন, যাহা 'পাপ এবং স্বাধীন ইচ্ছার আরম্ভ কোথায়?'—এই প্রশ্নেরই অনুরূপ। প্রশ্নটি স্ববিরোধী এবং অসম্ভব, কারণ ইহাতে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভেদ-রহিত অবস্থায় কোন কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই। এই প্রশ্নটিতে কল্পনা করা হইয়াছে যে, ভেদ-রহিত ও ভেদযুক্ত সত্তা একই প্রকার অবস্থার অধীন। 'কেন' এবং 'কি হেতু',—এই-সকল প্রশ্ন শুধু মনেই বর্তমান। সেই আত্মা সমস্ত কার্য-কারণের ঊর্ধ্বে এবং তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—স্বাধীন। আত্মা আত্মারই আলোক, প্রত্যেক প্রকার মনের মধ্য দিয়াই এই আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে, প্রতিটি কার্যে ঘোষণা করিতেছে—আমি মুক্ত; তথাপি প্রতি কার্যেই প্রমাণিত হইতেছে—আমি বদ্ধ। আত্মা স্বরূপতঃ স্বাধীন, কিন্তু দেহ-মনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। ইচ্ছাশক্তিতেই যথার্থ স্বরূপের প্রথম প্রকাশ, সুতরাং এই যথার্থ স্বরূপের প্রথম বন্ধনই হইল ইচ্ছাশক্তি। যথার্থ স্বরূপ ও মনের যৌগিক সমবায়ই ইচ্ছাশক্তি —কোন যৌগিক সমবায়ই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং বাঁচিবার ইচ্ছা করিলেও আমাদের মরিতে হইবে। 'অমর জীবন'—একটি স্ববিরোধী উক্তি, কেন না জীবন, যাহা একটি যৌগিক সমবায়ের ফলে উদ্ভূত, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সেই সত্যস্বরূপ ভেদবিরহিত এবং চিরন্তন—সর্বদা বর্তমান। এই পূর্ণস্বরূপ—মন, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে কেমন করিয়া মিশ্রিত হইল? ইহা কখনই মিশ্রিত হয় নাই। তুমিই তোমার প্রকৃত সত্তা—আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের 'খ'। তোমার কখনও ইচ্ছাশক্তি ছিল না, কখনও তোমার মধ্যে পরিবর্তন হয় নাই, জীব হিসাবে তোমার কখনও অস্তিত্ব ছিল না—এইগুলি ভ্রম মাত্র। তবে তোমরা বলিবে এই ভ্রমাত্মক জগৎ কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? ইহাও একটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন। ভ্রম শুধু ভ্রমের উপর ছাড়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই-সকল ভ্রমের পারে ফিরিয়া যাইবার জন্য, প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হইবার জন্য সকলেই সংগ্রাম করিতেছে। তাহা হইলে জীবনের মূল্য কি?—অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়। এই মতবাদ কি বিবর্তনবাদের বিরোধী? না, বরং বিবর্তনবাদকে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা জড়ের সংস্কার সাধনের জন্য একটি প্রক্রিয়া। ইহার ফলে আত্মার যথার্থ স্বরূপ-বিকাশের অবকাশ ঘটে। আমাদের এবং অন্য একটি বস্তুর মধ্যে যেন একটি পর্দা বা আবরণ রহিয়াছে। পর্দাটি যেমন ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে, বস্তুটিও তেমনি ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথে আসিতেছে। এই প্রশ্নটি পরমাত্মার বিকাশের প্রশ্নমাত্র।

জ্ঞানযোগ - কথা

[স্বামীজীর এই আলোচনাগুলি আমেরিকার মিস ওয়াল্ডো-নাম্নী তাঁহার শিষ্যা কর্তৃক লিপিবদ্ধ। স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন (১৮৯৮), তখন উক্ত শিষ্যার নোটবুক হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যেই এগুলি পাওয়া যায়।]

১

২

অভ্যাস হইতে যোগ, যোগ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে প্রেম, প্রেম হইতে আনন্দ।

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

ওঁ তৎ সৎ। ওঁকার-তত্ত্ব জানাই জগৎ-রহস্য জানা। ভক্তিযোগ ও রাজযোগের মত জ্ঞানযোগের লক্ষ্য একই, তবে সাধনপ্রণালী ভিন্ন। এই যোগ শক্তিমান্ সাধকদের জন্য, অষ্টাঙ্গিক যোগী বা ভক্তের জন্য নয়, যুক্তিনিষ্ঠের জন্য। শুদ্ধ প্রেম ও পরাভক্তি আশ্রয় করিয়া ভক্তিযোগী যেরূপ ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করিবার পথে অগ্রসর হন, জ্ঞানযোগীও সেইরূপ শুদ্ধ বিচার সহায়ে পরমাত্মা লাভের পথ করিয়া লন। প্রাচীন যুগের যাবতীয় মূর্তি-কল্পনা, সব পুরাতন ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার মন হইতে দূর করিবার জন্য তাঁহাকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে; ইহামুত্রফলভোগ-কামনা ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি আমাদের করতলগত হইবে না। স্বরূপ-উপলব্ধি—আমরা যে জন্ম মৃত্যু ও ভীতির অতীত—এই উপলব্ধিই জ্ঞান। আত্মানুভূতিই পরম কল্যাণ—ইহা ইন্দ্রিয় ও চিন্তার অতীত অবস্থা। প্রকৃত 'আমি' ধারণাতীত। ইনি নিত্য জ্ঞাতা (eternal subject), কখনও জ্ঞানের বিষয় (object) হইতে পারেন না, কারণ জ্ঞান আপেক্ষিক বিষয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নিরপেক্ষ পুরুষ-সম্বন্ধে নয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সীমাহীন কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার পরম্পরা মাত্র। আমাদের এই জগৎ ব্যাবহারিক সত্তা—বাস্তবের ছায়া; তবুও সুখ ও দুঃখ এই স্তরে প্রায় ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বলিয়া এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান লাভ করিতে পারে।
এই জগৎ প্রকৃতির বিবর্তন, ঈশ্বরের ব্যক্ত অবস্থা, মায়া বা আপাত প্রতীয়মান জগৎপ্রপঞ্চের আবরণে দৃষ্ট ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক পুরুষের মানবীয় জ্ঞানগম্য ব্যাখ্যামাত্র। এ জগৎ শূন্য নয়, ইহার কিছুটা সত্তা আছে; ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই জগৎ প্রতীয়মান হয়।

জ্ঞাতা-বিষয়ক জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? বেদান্ত-মতে আমরাই সেই জ্ঞাতা; ইনি জ্ঞানের বিষয়ভূত নন, তাই আমরা কখনও ইঁহাকে জানিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানও এই কথা বলিতেছে। ইঁহাকে জানা যায় না। তবুও কখনও কখনও আমরা ইঁহার অস্তিত্বের আভাস পাইয়া থাকি। যখনই একবার এই জগৎস্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তখনই সেই অনুভূতি আমরা ফিরিয়া পাই। তখন আর জগৎ আমাদের চোখে সত্য নয়; আমরা জানিতে পারিব—ইহা মরীচিকা-মাত্র। এই মায়া-মরীচিকার ওপারে যাওয়াই সকল ধর্মের লক্ষ্য। জীব ও ব্রহ্ম যে এক, সকল বেদ অহরহ এই কথা ঘোষণা করিতেছেন; কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া এই চরম সত্য উপলব্ধি করিবার অবস্থায় উপনীত হইতেছেন।

জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে ভয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ভয়ই আমাদের অন্যতম

প্রবল শত্রু। তারপর কোন বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া বিশ্বাস করিও না। সর্বদা বল—'আমি শরীর নই, মন নই, চিন্তা নই, চেতনাও নই; আমি আত্মা।' সবকিছু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে শেষে শুধু আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। জ্ঞানীর ধ্যান দুই প্রকারঃ (১) আমরা যাহা নই, সেই ভাব অস্বীকার করা, সেই ভাব মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া। (২) আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা, এক পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ—দৃঢ়তাসহ এই কথা বলা। যথার্থ বিচারমার্গী নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া বিচারের চরম সীমায় উপনীত হইবেন। পথে কোথাও থামিলে চলিবে না, 'নেতি'-বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিলে সবকিছুই দূর হইবে; অবশেষে যাহা অপরিহার্য, যাহা আর অস্বীকার করা যায় না, সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মায় আমরা উপনীত হইব। সেই 'আমি' জগতের সাক্ষী—অব্যয়, সনাতন, অসীম। অজ্ঞানের মেঘাবরণ স্তরে স্তরে এই আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে, আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু আত্মা সর্বদা সমভাবে বিরাজমান।

দুইটি পাখী একই গাছের বিভিন্ন শাখায় উপবিষ্ট। উপরের শাখার পাখীটি ধীর স্থির মহিমময় সুশোভন ও পূর্ণস্বভাব। নীচের শাখার পাখীটি মিষ্টফল খাইয়া কখনও হৃষ্ট, আবার তিক্তফল আস্বাদন করিয়া কখনও-বা বিষণ্ণ; এইরূপে সে শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিতেছে। সচরাচর সে যেরূপ কটু ফল আস্বাদন করে, একদিন তদপেক্ষা কটু একটি ফল খাইয়া, উপরের শান্ত শোভাময় পাখীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তা করিল, 'হায়! আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা—ঐ পাখীর মত হই।' তারপর কয়েক ধাপ উপরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শীঘ্রই আবার ঐ পাখীটির মত হইবার বাসনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পুনরায় মিষ্ট ও তিক্ত ফলের আস্বাদনে তুষ্ট ও রুষ্ট মনোভাব লইয়া পূর্বের মত বিচরণ করিতে লাগিল। আবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, আবার শান্ত স্নিগ্ধ মহিমামণ্ডিত উপরের পাখীটির দিকে কয়েক ধাপ অগ্রসর হইল। এইরূপ ব্যাপার বহুবার সংঘটিত হইলে অবশেষে উপরের পাখীটির সান্নিধ্য লাভ করিয়া সে দেখিল, উহার পক্ষজ্যোতি তাহার চোখ ধাঁধাইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। পরিশেষে দেখিতে পাইল—কি আশ্চর্য! কেবল একটি পাখীই সেখানে রহিয়াছে, সে নিজেও তো চিরকালই ঐ উপরের পাখী; তবে এইমাত্র সে এ সত্য বুঝিতে পারিল।
৩০

মানুষও নিম্নশাখাবিহারী ঐ পক্ষীর মত, কিন্তু সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলে সে বুঝিতে পারিবে, সেও সর্বদাই সেই আত্মারূপেই ছিল, আত্মা ছাড়া যাহা কিছু, সবই স্বপ্নমাত্র। এই জড় ও জড়ের সত্যতায় বিশ্বাস হইতে নিজেদের একেবারে পৃথক্ করিয়া ফেলাই প্রকৃত জ্ঞান। ওঁ তৎ সৎ—'ওঁ'ই একমাত্র প্রকৃত সত্তা, জ্ঞানী সর্বদা ইহা মনে জাগরূক রাখিবেন। নিরপেক্ষ একত্বই জ্ঞানযোগের ভিত্তি। ইহা দ্বৈতভাব-বর্জিত অদ্বৈতবাদ। ইহাই বেদান্তদর্শন-সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর, বেদান্তের আদি ও অন্ত। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—অহরহ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে উহাকে আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। কেবল এই উপায়েই সকল দ্বৈতভাব, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ অতিক্রম করিয়া এক অদ্বিতীয় সনাতন অব্যয় অসীম ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্-'রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ হইব।

জ্ঞানযোগীকে সঙ্কীর্ণতম সাম্প্রদায়িকের মত একাগ্র, আবার আকাশের মত উদার হইতে হইবে; সম্পূর্ণভাবে চিত্ত সংযত করিয়া বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে; স্বেচ্ছায় এই সব বিভিন্ন ধর্মভাবের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াও চিরন্তন সমন্বয়ের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিতে হইবে। নিয়ত অভ্যাস দ্বারাই এই সংযম অর্জিত হইতে পারে। এক হইতেই সকল বৈচিত্র্য উদ্ভূত, কিন্তু কর্মের সহিত আমরা যাহাতে নিজেদের এক করিয়া না ফেলি, সেই শিক্ষা আমাদের লাভ করিতে হইবে। আর সম্মুখে উপস্থিত বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি যেন আমাদের না থাকে। সমস্ত মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া আমাদিগকে একাগ্র হইতে হইবে। দিনরাত্রি নিজেকে বল—'সোঽহং, সোঽহং'।

বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহায়ে বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়; ব্রহ্মনির্দেশক পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন, একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্তাই আছেন। আরও দেখাইয়াছেন, চড়াই-পথে অগ্রগতি ধীরে-ধীরেই সম্ভব, এবং মানুষের ধারণা-শক্তির তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মনির্দেশক বৈচিত্র্য বর্ণনাগুলিও অতি প্রয়োজনীয়। খ্রীষ্ট তাঁহার শ্রোতাদের যোগ্যতা অনুসারে যে-উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ। প্রথমতঃ তিনি স্বর্গে আসীন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইবার উপদেশ দেন। তারপর একধাপ ঊর্ধ্বে উঠিয়া বলেন, 'আমি দ্রাক্ষালতা; তোমরা শাখা-প্রশাখা!' পরিশেষে চরম সত্য প্রচার করিয়া বলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক', 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরেই অবস্থিত।' শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেনঃ দেবতার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ তিনটি— (১) মনুষ্যদেহ, (২) ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ আচার্য। এই তিনটি লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আমাদের করতলগত। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলি তিরোহিত হইবে।

এক অদ্বিতীয় সত্তাই জগতে বিদ্যমান, প্রত্যেক জীবই সেই পূর্ণ সত্তা, শুধু অংশ নয়; ইহাই বেদান্তের সারমর্ম। প্রতিটি শিশির-কণাতে সূর্য পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত। 'দেশ-কাল নিমিত্ত'-আশ্রয়ে সেই সত্তাই মনুষ্যরূপে প্রকাশিত, কিন্তু দৃশ্যজগতের অন্তরালে এক চরম তত্ত্ব বিরাজমান। নিঃস্বার্থতার ভাব দৃঢ় হইলেই কাঁচা 'আমি' মন হইতে চলিয়া যায়। আমরা দেহ—এই দুঃখকর স্বপ্ন হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। 'আমি ব্রহ্ম'—এই সত্য জানিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকেই পূর্ণ অনন্ত মহাসমুদ্র; জলবিন্দু নই যে সাগরে মিশিয়া অস্তিত্ব হারাইব। মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই এই পূর্ণত্ব ও অসীমত্বের জ্ঞান লাভ করিব। অসীমকে ভাগ করা যায় না, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সবই সেই এক ব্রহ্ম। এই জ্ঞান সকলেই লাভ করিবে, কিন্তু এই জীবনেই ঐ জ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ ঐ জ্ঞানলাভ না করিলে আমরা মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতসাধনে সমর্থ হইব না। জীবন্মুক্তই কেবল যথার্থ প্রেম ও প্রকৃত সত্য বিতরণ করিতে—ঠিকঠাকভাবে দান করিতে সমর্থ; একমাত্র সত্যই মুক্তি দিতে পারে। বাসনা আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। এই বাসনা এক অতৃপ্ত রাক্ষসী; ইহার কবলে যাহারা পড়ে, তাহাদের শান্তি নাই; কিন্তু জীবন্মুক্ত অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করিয়া সব বাসনা জয় করিয়াছেন, তাঁহার কাম্য আর কিছুই নাই।
দেহ, স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞান, জাতি, বর্ণ, বন্ধন—এই সব মোহ মনই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, সুতরাং সত্যের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত মনকে অহরহ এই সত্য বলিতে হইবেঃ আমরা আনন্দস্বরূপ; যাহা কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা এই আনন্দেরই আভাস; প্রকৃত স্বরূপের সংস্পর্শেই এই কণামাত্র সুখ আমরা লাভ করিয়া থাকি। সেই ব্রহ্ম সুখদুঃখের অতীত, তিনি জগতের সাক্ষিস্বরূপ, জীবনগ্রন্থের অপরিবর্তনীয় পাঠক; তাঁহার সম্মুখে জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি একে একে খুলিয়া যাইতেছে।

'আমি ও আমার' একটি কুসংস্কার; ইহার বেষ্টনে আমরা এত দীর্ঘকাল রহিয়াছি যে, ইহাকে ত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। তবুও অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে হইলে এই কুসংস্কার ত্যাগ করিতেই হইবে। আমাদিগকে আনন্দময় ও প্রফুল্ল হইতে হইবে। অপ্রসন্ন মুখভাব লইয়া ধর্মলাভ হয় না। যাবতীয় পার্থিব বস্তু অপেক্ষা ধর্ম বেশী আনন্দপ্রদ, কারণ ইহা সর্বোৎকৃষ্ট। কঠোর তপশ্চর্যা আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রেমিক ও পবিত্রাত্মা কেন বিষণ্ণ হইবেন? তিনি হইবেন আনন্দময় শিশুর মত প্রকৃত ঈশ্বর-সন্তান। অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করাই ধর্মের সার। স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে, কিন্তু বিশুদ্ধাত্মাই সে রাজাধিরাজ-দর্শনের অধিকারী। জগতের চিন্তা করিলে জগৎই থাকিয়া যায়; জগৎরূপে তিনিই প্রকাশিত—এইভাবে চিন্তা করিলে আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিব। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, শত্রু-মিত্র, ব্যক্তি বা বস্তু—সকলের উপরেই এই ঈশ্বরভাব আরোপ করিতে হইবে। যদি আমরা

জ্ঞানতঃ এই জগৎকে ঈশ্বরময় দেখি, তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু অনুভব না করি, ভাবিয়া দেখ—তাহা হইলে সমগ্র জগৎ আমাদের চক্ষে আর একরূপে প্রতিভাত হইবে, তখনই আমাদের সকল দুঃখ—সকল সংগ্রাম—সকল যন্ত্রণার চিরতরে অবসান হইবে।

জ্ঞান সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে, তাই বলিয়া জ্ঞান ধর্মবিশ্বাসের অশ্রদ্ধা করে না। জ্ঞানলাভ বলিতে বুঝায়—ধর্মমতের ঊর্ধ্বে এক উন্নত অবস্থা-লাভ। জ্ঞানী ধ্বংস চান না; পরন্তু সকলকে সাহায্য করিতে চান। সকল নদীর জল যেমন সাগরে মিশিয়া এক হইয়া যায়, যাবতীয় ধর্মও তেমনি জ্ঞানে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

সকল বস্তুর সত্তাই ব্রহ্মের সত্তার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে বুঝিতে পারিব, যথার্থ সত্য আমরা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছি। বৈষম্য-দৃষ্টি যখন সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাইবে, তখনই বোধ হইবে—'আমি ও জগৎ-পিতা অভিন্ন'।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অতি সুন্দর জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণিরূপে পরিগণিত। ইহা বেদের ভাষ্যস্বরূপ। গীতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছেন, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদিগকে জয়ী হইতে হইবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া সবটুকু প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। গীতা উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের রূপক, তাই যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা-বর্ণনার স্থান নির্ণীত হওয়ায় অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিরুদ্ধ যুযুৎসুদলের অন্যতম নায়ক অর্জুনের সারথি-বেশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিষণ্ণ না হইতে এবং মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; কারণ তিনি তো জানিতেন—তিনি অবিনাশী, আর পরিবর্তনশীল যাহা কিছু, সবই মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই-সকল উপদেশই গীতাকে পরমাশ্চর্য কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদান্তদর্শনই গীতায় নিবদ্ধ। বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা অবিনাশী, দেহের মৃত্যুতে আত্মা কোনরূপেই বিকৃত হন না। বৃত্তরূপ আত্মার পরিধি কোথাও নাই, কেন্দ্র জীবদেহে। তথাকথিত মৃত্যু এই কেন্দ্রের পরিবর্তন-মাত্র। ঈশ্বর একটি বৃত্ত, এই বৃত্তের পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। যখনই আমরা এই সঙ্কীর্ণ দেহরূপ কেন্দ্র হইতে বাহিরে যাইতে পারি, তখনই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—এই ঈশ্বর উপলব্ধ হন।

বর্তমান কাল—অতীত ও ভবিষ্যতের সীমারেখা, ভেদ-পরিচায়ক রেখা-মাত্র; সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে বর্তমানের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিয়া কেবল বর্তমানই গ্রাহ্য—এ-কথা নির্বিচারে বলিতে পারি না। এই তিন কালই একত্র মিলিয়া এক অখণ্ড সমষ্টি। সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির তারতম্য অনুসারে আরোপিত একটি অবস্থা-মাত্র।

জ্ঞানের শিক্ষা এই যে, জগৎ ছাড়িতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিবে না। জগতে থাকিবেন, অথচ জগতের হইয়া যাইবেন না—ইহাই সন্ন্যাসীর পক্ষে একটি চরম পরীক্ষা। এইরূপ ত্যাগের ধারণা যে-কোন আকারেই হউক, সকল ধর্মেই স্থান পাইয়াছে। আমাদের নিকট জ্ঞানের দাবী এই যে, আমরা শুধু 'সমত্ব' দেখিব, সমদর্শী হইব। নিন্দা-স্তুতি, ভাল-মন্দ, এমন কি শীত-উষ্ণও তুল্যরূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের নিকট দ্বন্দ্বাতীত এই সাম্যভাব বর্ণে বর্ণে সত্য। সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহ ও আপাততঃ একেবারে শীত-উষ্ণ-বৈষম্যবোধহীন অবস্থায় তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ হিমালয়-শৃঙ্গে অথবা উত্তপ্ত মরুভূমিতে তাঁহারা ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আমরা 'দেহ নই'—দেহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার সর্বাগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর 'মন নই'—মনের সংস্কারও ছাড়িতে হইবে। আমরা মন নই; এই মন 'রেশমের মত সূক্ষ্ম শরীর-মাত্র', আত্মার কোন অংশ নয়। প্রায় সকল পদার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য ইংরেজী 'body'-শব্দটি দ্বারা সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত একটি সাধারণ কিছু বুঝায়। ইহাই অস্তিত্ব। আমাদের দেহ উহার অন্তরালে অবস্থিত চিন্তারই প্রতীক; আবার চিন্তাগুলি স্বয়ং পর্যায়ক্রমে দেহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন কিছুর প্রতীক। সেই 'কোন কিছু'ই পারমার্থিক সত্তা, আমাদের আত্মার আত্মা, বিশ্বাত্মা, প্রাণের প্রাণ, আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত এই জ্ঞান থাকিবে যে, ঈশ্বর হইতে আমরা অণুমাত্র পৃথক্, ততদিন ভয় থাকিবে। আবার ঈশ্বরের সহিত একত্ববোধ হইলেই ভয় দূর হইবে। কিসের ভয়? কেবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে জ্ঞানী দেহমনের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া এই বিশ্বকে শূন্যমাত্রে পরিণত করেন। এইরূপে অবিদ্যা নাশ করিয়া তিনি তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে জানেন। সুখদুঃখ শুধু ইন্দ্রিয়জনিত, এগুলি আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, সেই হেতু অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বত্র বিরাজমান।

জ্ঞানী সমস্ত বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে গিয়া, স্মৃতির অনুশাসন ও ধর্মশাস্ত্রের অতীত হইয়া নিজেই নিজের শাস্ত্র হইবেন। বিধি-নিষেধের মধ্যে আমরা জড়ীভূত হইয়া মৃত্যু বরণ করি। তবুও যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিতে অসমর্থ, জ্ঞানী তাহাদের দোষ দর্শন করিবেন না; এমন কি 'আমি তোমা অপেক্ষা পবিত্র'—অন্যের সম্বন্ধে জ্ঞানী কখনও এরূপ মনে করিবেন না।

এইগুলি প্রকৃত জ্ঞানযোগীর লক্ষণঃ (১) জ্ঞানী জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২) তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশীভূত। উন্মুক্ত আকাশতলে অনাবৃত ধরাই তাঁহার শয্যা হউক বা রাজপ্রাসাদেই তিনি অবস্থান করুন, উভয় অবস্থাতেই তুল্য সুখী হইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া সবকিছুই তিনি সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। যেহেতু আত্ম-ব্যতিরিক্ত

সব কিছু হইতেই তিনি মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সেইজন্য দুঃখকষ্টের হাত এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া সেগুলির সম্মুখীন হইয়াই দুঃখকষ্ট সহ্য করেন। (৩) জ্ঞানী বুঝিয়াছেন—এক ব্রহ্ম ছাড়া সবই অনিত্য। (৪) মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে মনকে উচ্চ বিষয়ে নিবিষ্ট করিয়া তিনি শান্তির অধিকারী হন। শান্তি লাভ করিতে না পারিলে আমরা পশু অপেক্ষা বেশী উন্নত নই। সর্বকর্মফল বিসর্জনপূর্বক ইহকাল বা পরকালের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া জ্ঞানী পরার্থে ও ঈশ্বরার্থে কর্ম সম্পাদন করেন। আত্মজ্ঞান ব্যতীত জগৎ আমাদিগকে আর কি দিতে পারে? আত্মজ্ঞান-লাভ হইলেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা এক অখণ্ড সত্তা। আমরা জানি, এই আত্মা—মন, স্মৃতি, চিন্তা, এমন কি চেতনারও অতীত। সবকিছুই আত্মা হইতে আসিয়াছে। আত্মারই মধ্য দিয়া অথবা আত্মা আছেন বলিয়াই আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি এবং চিন্তা করি। ওঁ—এই অদ্বিতীয় সত্তার সহিত একত্ব উপলব্ধিই জীবজগতের লক্ষ্য। জ্ঞানীকে সকল ধর্মীয় মতবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে; তিনি হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান কিছুই নন, কিন্তু তিনি একাধারে এই তিন। জ্ঞানী সর্বকর্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি ঈশ্বরে শরণাগত; কর্ম আর জ্ঞানীকে বদ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানী কঠোর বিচারবাদী, নেতিবিচার সহায়ে তিনি সবই অস্বীকার করেন। তিনি দিবারাত্র মনে মনে বলেন, 'ধর্মবিশ্বাস নাই, মন্ত্রতন্ত্র নাই, স্বর্গ-নরক নাই, ধর্মমত নাই, মন্দির নাই—কেবল আত্মাই আছেন।' সর্ব বস্তু পরিহার করিয়া যে অপরিহার্য পরমতত্ত্ব লাভ হয়, তাহাই আত্মা। সমস্ত ব্যবহারিক ও সম্বন্ধমূলক ভাবের বিলোপ অবস্থা—সেই নির্বাণ অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী স্বতঃসিদ্ধরূপে কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া শুদ্ধ বিচার ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সবকিছু বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থার বর্ণনা বা ধারণাও অসম্ভব। পার্থিব ফলাফলের দ্বারা জ্ঞানের ভাল-মন্দের বিচার হয় না। শকুনি যেমন শূন্যে বহু ঊর্ধ্বে উড়িয়া অদৃশ্য হইলেও সামান্য গলিত দেহ দেখিয়া সবেগে নামিয়া আসিতে সর্বদা উন্মুখ, তেমন হইও না। স্বাস্থ্য, পরমায়ু বা সম্পদ—কিছুই চাহিও না, কেবল মুক্তিকামী হও।

আমরা সচ্চিদানন্দ। সৎ বা অস্তিভাব জগতের শেষ বস্তুনির্দেশক ব্যাপার। তাহাই আমাদের অস্তিত্ব, তাহাই আমাদের জ্ঞান। আর অস্তিত্বের অবিমিশ্র স্বাভাবিক ফল—আনন্দ। কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্য আমরা সেই পরমানন্দ অনুভব করি, সেই সময় আনন্দ ছাড়া আমরা কিছুই চাই না, কিছুই দিই না, এবং কিছুই জানি না। তারপর এ আনন্দ অন্তর্হিত হয়, আবার জগতের যাবতীয় দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে এবং আমরা জানি, 'এই বিশ্বছবি সর্বাশ্রয় ঈশ্বরেরই উপর বিন্যস্ত শিল্পরচনা মাত্র।' সংসারে ফিরিয়া আসিলেই দেখিতে পাই—সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যবহারিক সত্তারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, সচ্চিদানন্দকে দেখি—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই ত্রিমূর্তিরূপে। সৎ অর্থাৎ সৃজনী-শক্তি, চিৎ—পরিচালিকা-শক্তি, আনন্দ—আত্মানুভব-শক্তি; এই শক্তিই আবার আমাদিগকে সেই এক ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করে। জ্ঞান বা চিৎ ব্যতীত 'সৎ'কে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই তত্ত্বেরই মধ্যে 'পুত্রের ভিতর দিয়া ব্যতীত কেহ পরমপিতাকে দর্শন করিতে পারে না'—খ্রীষ্টের এই কথার তাৎপর্য নিহিত। বেদান্তের শিক্ষা এই যে—ইহলোকেই এবং এই দেহেই নির্বাণ লাভ করা যায়, নির্বাণ লাভ করিবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। নির্বাণ শব্দের অর্থ আত্মানুভূতি। এক মুহূর্তের জন্যও আত্মানুভূতি লাভ হইলে 'ব্যক্তিত্ব-এর মরীচিকা দ্বারা আর মুগ্ধ হইতে হইবে না। চক্ষু আছে, অতএব আপাতপ্রতীয়মান বস্তু দেখিতেই হইবে; কিন্তু আমরা ইহার স্বরূপ জানিয়াছি, অতএব সর্বদাই বুঝি যে উহা প্রকৃতপক্ষে কী। এই জগৎ-রূপ আবরণই অবিকারী আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে। এই আবরণ অপসারিত হইলেই আত্মদর্শন হয়। পরিবর্তন যাহা কিছু—তাহা এই আবরণেই সংঘটিত হয়, আত্মায় নয়। সাধুর নিকট এই আবরণ অতি সূক্ষ্ম, ইহার ভিতর দিয়া বাস্তব সত্তা প্রায় প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু পাপীর নিকট এই আবরণ অতি স্থূল, সুতরাং পাপীর মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছেন, এবং সাধুর মধ্যে যে আত্মা আছেন—এই সত্যও সহসা অনুধাবন করিতে পারা যায় না।

একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়। সুতরাং আমরা প্রথমতঃ বিশ্লেষণ (analysis), তারপর সমন্বয় (synthesis) অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায়, একটি অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানের ফলে শক্তিগুলির সংখ্যা কমিতে থাকে। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে উপনীত হয়। একত্বে পৌঁছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা।

সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহুপূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই একত্বে—অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিশ্বময় এক পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি তাঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। অতএব পরমাত্মা তাঁহার অভিব্যক্তিগুলি অপেক্ষা অনন্তগুণে বৃহৎ। সবকিছু পরমাত্মা বা ব্রহ্মই। সাধু, পাপী, মেষ, ব্যাঘ্র—এমন কি হত্যাকারী পর্যন্ত সত্তার দিক্ দিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়, যেহেতু ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই জ্ঞান ব্যতীত উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই, এবং যোগদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিতেই এই জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হয়। যিনি যত বেশী এই যোগ ও ধ্যানের দ্বারা বিশুদ্ধ ও যোগ্য হইয়াছেন, আত্মানুভূতির আলোক তাঁহার নিকট তত বেশী স্পষ্ট। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান চারি সহস্র বর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প কয়েকজনেরই অধিকারে আসিয়াছে; এখনও ইহা জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হইতে পারে নাই।

তথাকথিত মনুষ্যনামধারী সকল ব্যক্তিই প্রকৃত 'মানুষ' আখ্যার যোগ্য নয়। প্রত্যেকেই

অবশেষে ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঈশ্বর সকল মানুষেরই প্রাণিজগতে অভিব্যক্তির তিনটি স্তর বিদ্যমানঃ (১) অবচেতন—যন্ত্রবৎ, অভ্রান্ত; (২) সচেতন—বিচারময়, ভ্রান্ত; (৩) অতিচেতন বা তুরীয়—স্বজ্ঞ, অভ্রান্ত। এই অবস্থাগুলি যথাক্রমে জন্তু মানুষ ও ঈশ্বরে প্রকাশিত। কারণ যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, বোধশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত তাঁহার অন্য কিছু থাকে না। তিনি নিজের জন্য কিছু কামনা না করিয়া জীবের মঙ্গলার্থেই জীবনধারণ করেন। যাহা কিছু ভেদ সৃষ্টি করে, তাহাই নাস্তিবাচক বা অভাবাত্মক; যাহা অস্তিবাচক, তাহাই ব্যাপক। যাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক—সেইটিই, ‘সত্তা’।

প্রত্যক্ষগম্য। প্রতীচ্যবাসীদের ‘পাপ’ সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা, হিন্দুগণ সেইভাবে পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কুকার্য বলিতে ‘পাপ’ বুঝায় না। কুকার্য দ্বারা আমরা কোন শাসক ঈশ্বরের বিরাগভাজন না হইয়া শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিয়া থাকি, এবং সেজন্য আমাদিগকে নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আগুনে হাত দেওয়া পাপ নয়, কিন্তু যে ঐরূপ করে সে নিশ্চয়ই পাপীর মত যন্ত্রণা ভোগ করিবে। সকল কর্মেরই কিছু ফল আছে, এবং ‘প্রত্যেক কর্মের ফলই কর্তার নিকট ফিরিয়া আসে।’ ‘ত্রিত্ববাদ’
৩১
‘একত্ববাদ’
৩২
অপেক্ষা উন্নত; একত্ববাদ দ্বৈতবাদ—এই মতে ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক্। ‘আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান’ এই জ্ঞান হইলে বুঝিতে হইবে—ধর্মের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে; অদ্বৈতভাবে উপনীত হইলে অর্থাৎ যখন আমরা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করি, তখনই চরমোন্নতি বুঝিতে হইবে।

‘প্রাকৃতিক নিয়ম’ হইতেছে জগৎ-ব্যাপারের পারম্পর্য ব্যাখ্যা করিবার একটি মানসিক সঙ্কেত সূত্র, কিন্তু এমন কথাও বলা চলে যে, বাস্তবিক সত্তারূপে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। এই জগৎপ্রপঞ্চে সংঘটিত কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা ‘নিয়ম’ শব্দ ব্যবহার করি। নিয়মকে আমরা যেন এমন কোন অপরিহার্য বস্তু বা কুসংস্কাররূপে গণ্য না করি, যাহার নিকট মস্তক অবনত করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ভ্রান্তি বিচারবুদ্ধির নিত্যসঙ্গী, তবুও প্রাণপণ সংগ্রামের দ্বারা ভ্রান্তি জয় করিবার চেষ্টাই আমাদিগকে দেবত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের দেহ হইতে অনিষ্টকর পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতির যে প্রয়াস, তাহাই ব্যাধি। পাপও তেমনি আমাদের অন্তর্নিহিত দেবভাব হইতে পশুভাব দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। দেবত্বে উন্নীত হইবার জন্য আমাদিগকে ‘পাপ’ অর্থাৎ ভুল করিতে হইবে।

কাহাকেও কৃপার চোখে দেখিও না। সকলকে তোমার সমান বলিয়া দেখিবে, অসাম্য-রূপ মুখ্য পাপ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেল। আমরা সকলেই সমান। ‘আমি ভাল, তুমি মন্দ; আমি তোমাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি’—এই-সব ভাব যেন আমাদের মনে উদিত না হয়। সমত্বই মুক্ত মানুষের লক্ষণ। যীশু ঘৃণ্য পাপীদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন। তিনি কখনও উচ্চ বেদীতে বসিয়া থাকিতেন না। পাপীরাই কেবল পাপ দেখিতে পায়। মানুষকে মানুষরূপে দেখিও না, তাহার মধ্যে শুধু ঈশ্বরকেই দর্শন কর। আমরাই নিজেদের স্বর্গ সৃষ্টি করি, এবং নরককেও স্বর্গে পরিণত করিতে পারি। নরকেই পাপীদের দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আমরা আমাদের আশেপাশে পাপীদের দেখি, ততদিন আমরা নিজেরাই নরকে আছি। আত্মা দেশকালের অতীত। ‘আমি সচ্চিদানন্দ, সোঽহং’—ইহা উপলব্ধি কর। জন্ম-মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই আনন্দে থাক, ঈশ্বরপ্রেমে সদা মাতোয়ারা হও। দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হও। আমরা দেহের দাস হইয়াছি, শৃঙ্খলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে শিখিয়াছি, এবং দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা এতদূর দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, এই দেহবন্ধনকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করি, এবং চিরদিন দেহবুদ্ধি লইয়াই থাকিতে চাই। দেহাত্মবুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া থাকিও না। কিছুতেই বর্তমান জীবনের মত আর একটি ভাবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি অতি প্রিয়জনের দেহও ভালবাসিও না, বা তাহাদের দেহ কামনা করিও না। এই জীবনই আমাদের শিক্ষাদাতা, মৃত্যু সেই শিক্ষা নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার সুবিধা দেয় মাত্র। এই দেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত, কিন্তু আত্মহত্যা কেবল নির্বুদ্ধিতা, ইহা শুধু শিক্ষককে হত্যা করার মত কাজ। আবার অন্য দেহধারণ করিতে হইবে, সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধির অতীত অবস্থায় উন্নীত না হইলে বারংবার দেহধারণ করিতেই হইবে, তাই একটি দেহ নষ্ট করিলে অন্য একটি দেহ আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবুও আমরা যেন কিছুতেই দেহাত্মবুদ্ধি না রাখি, দেহটিকে যেন শুধু পূর্ণতা লাভ করিবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করি। রামের ভক্ত হনুমান স্বীয় অনুভূতি সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ‘হে প্রভু, যখন দেহবুদ্ধি থাকে, তখন আমি তোমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমি তোমার দাস। যখন আমার জীব-বুদ্ধি হয়, তখন আমি জ্যোতির্ময় তোমার অংশ, একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কিন্তু যখন আত্মবুদ্ধি হয়, তখন আমি ও তুমি এক।’ তাই জ্ঞানী অন্য কোন

চিন্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না ‘যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী’—যাহার যেমন চিন্তা, তাহার তেমনি সিদ্ধি। জনৈক সাধু বৃক্ষতলে বসিয়া লোককে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি শুধু দুধ ও ফলমূল আহার করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিয়া নিজেকে খুব পবিত্র মনে করিতেন। সেই গ্রামে এক চরিত্রহীনা নারী বাস করিত। দুষ্কার্যের জন্য নরকে যাইতে হইবে—এই বলিয়া সাধু প্রত্যহ ঐ নারীর নিকট গিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। হতভাগিনী তাহার জীবিকা উপার্জনের একমাত্র পথ পরিবর্তন করিতে অক্ষম হইয়া সাধু-কথিত ভয়াবহ পরিণামের চিন্তায় শঙ্কিত হইয়া থাকিত। নিরুপায় ঐ নারী কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিত। এই সাধু ও ভ্রষ্টা নারীর মৃত্যু হইলে দেবদূতেরা আসিয়া সেই নারীটিকে স্বর্গে লইয়া গেল, আর যমদূতেরা আসিয়া সাধুর আত্মা দাবী করিল। সাধু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘একি? আমি কি কঠোর সাধুজীবন যাপন করিয়া

নিঃস্বার্থতাই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে। অধিকারের ভাব একটি সীমাবদ্ধ ভাব; 'আমার' 'তোমার' বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, কারণ 'আমিই তুমি', 'তুমিই আমি'। আমাদের 'দায়িত্ব' আছে, 'অধিকার' নাই। 'আমি জন্' বা 'আমি মেরী' না বলিয়া বলা উচিত 'আমিই বিশ্ব'। এই সীমাবদ্ধ ভাবগুলিই ভ্রান্তি, এগুলিই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 'আমি জন্'—এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র যেন আমি কতকগুলি বাস্তব অধিকার চাই এবং বলিতে থাকি 'আমি ও আমার' এবং ক্রমাগত নূতন পার্থক্য সৃষ্টি করি। এরূপে নূতন পার্থক্যের সঙ্গে আমাদের দাসত্ব বা বন্ধন বাড়িতে থাকে এবং আমরা সেই সর্বগত অখণ্ড [illegible]

[illegible] দেখিতে পাই প্রাচীন রীতিনীতি ও ঐতিহ্যগুলির বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বিদ্রোহ ঘোষণা করার মধ্যেই উহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আধুনিক মানুষ এই প্রাচীন মতবাদগুলি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কেন তাহারা এগুলি গ্রহণ করিবে, তাহার কারণ দর্শন করিবার জন্য স্পর্ধার সহিত দাবী করিতেছে। আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের অধিকাংশ মতবাদই প্রাচীন পৌত্তলিকতা ও রীতিনীতিগুলির উপর নূতন নাম ও অর্থের প্রয়োগমাত্র। যদি প্রাচীন মূল সূত্রগুলি রক্ষিত হইত এবং পরিবর্তনের কারণগুলি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইত, তাহা হইলে অনেক বিষয়ই সুবোধ্য হইত। বেদে ধর্মের প্রাচীন ভাবগুলি রক্ষিত আছে, এই কারণে ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিতে বিপুল ভাষ্য-প্রণয়নের, এবং ভাবগুলি কেন রাখা হইয়াছে, তাহাও বলার প্রয়োজন হইয়াছে। এদিকে আবার অর্থ না বুঝিয়া বহু প্রাচীন মত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার দরুন অনেক কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে, অধুনা-বিস্মৃত ভাষায় মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে, এখন আর ঐ মন্ত্রগুলির কোন প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বেই ক্রমবিকাশবাদ বেদে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ডারউইন এই মতবাদটি সত্য বলিয়া স্বীকার না করা পর্যন্ত, ইহা হিন্দুদিগের একটি কুসংস্কাররূপে পরিগণিত হইত।

প্রার্থনা ও উপাসনার বাহ্য রীতিনীতিগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এবং শুধু বাহ্য আচারমাত্রে পর্যবসিত হইতে না দিলে এগুলি কল্যাণপ্রদ। এগুলি চিত্তকে শুদ্ধ করে। কর্মযোগী চায় প্রত্যেকেই তাহার পূর্বে মুক্তি লাভ করুক। অন্যকে মুক্ত হইতে সাহায্য করাই তাহার একমাত্র মুক্তি। 'কৃষ্ণভক্তদের সেবাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।' কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, 'সমগ্র জগতের পাপ গ্রহণ করিয়া আমাকে নরকে যাইতে দাও, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ হউক।' এইভাবের প্রকৃত উপাসনা আত্মোৎসর্গে পরিণত হয়। কথিত আছে, একজন মহাজ্ঞানী তাঁহার বন্ধুদিগের বিশ্বস্ত কুকুরটি যাহাতে স্বর্গে যাইতে পারে, সেজন্য স্বেচ্ছায় নিজের পুণ্য কুকুরকে দান করিয়া সানন্দে নরকে যাইতে উদ্যত হন।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞানই একমাত্র পরিত্রাতা; ইহার অর্থ এই—মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। জ্ঞানই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞাতা নিজেকেই জানেন। একমাত্র আত্মাই নিজেকে প্রকাশ করিবার এবং জানিবার চেষ্টা করে। দর্পণ যতই স্বচ্ছ হইবে, প্রতিবিম্ব ততই স্পষ্ট হইবে। ঐরূপ মানুষও শ্রেষ্ঠ দর্পণ; তাহার অন্তঃকরণ যত বেশী শুদ্ধ হইবে, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তত বেশী প্রতিবিম্বিত হইবেন। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করিয়া এবং দেহাত্মবুদ্ধি আনিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মায়া হইতে এই ভ্রমের উৎপত্তি। মায়া ঠিক ভ্রান্তি নহে; যে বস্তু প্রকৃতই যাহা, তাহাকে সেইরূপ না দেখিয়া অন্যরূপে দেখাকেই 'মায়া' বলে। এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই ভেদ; ভেদ হইতেই দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ। এই ভেদবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন আমরা কখনও সুখী হইতে পারি না। জ্ঞানী বলেন, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি—এই দুইটি হইতেই দুঃখ উৎপন্ন। সংসারে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া মানুষ মুক্তির জন্য সজাগ হয় এবং জন্মমৃত্যুর ভীষণ আবর্তন হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া জ্ঞানের পথ আশ্রয় করে এবং স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। মুক্তিলাভের পর মানুষ সংসারকে একটি প্রকাণ্ড যন্ত্ররূপে দেখে এবং যাহাতে নিজের হাতটি যন্ত্রের চক্রের মধ্যে না পড়ে, সে বিষয়ে সাবধান হয়। এইরূপে মুক্ত-পুরুষের কর্মনিবৃত্তি হয়। কোন শক্তি মুক্ত-পুরুষকে কর্মে আবদ্ধ [illegible]

[illegible]

সিঞ্চন না করিলেই সমগ্র বৃক্ষ সিঞ্চিত হইবে। প্রতি পত্রে জলসেচন দ্বারা সময় নষ্ট হইবে মাত্র, উপকার কিছুই হইবে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা কর; তাঁহাকে লাভ করিলেই আমাদের সব পাওয়া হইল। গীর্জা, ধর্মমত, পূজাপদ্ধতি— এগুলি ধর্মের অপরিণত চারাগাছকে রক্ষা করিবার বেড়া মাত্র; কিন্তু পরে চারাগাছটি যাহাতে মহীরুহ হইয়া উঠিতে পারে, সেজন্য এই বেড়াগুলি তুলিয়া ফেলিবে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, বাইবেল, বেদ, শাস্ত্র এই ধর্মের চারাগাছের টবের মত; কিন্তু চারাগাছটি টবের বাহিরে গিয়া বিস্তার লাভ করিবে।

কয়েকটি গরীব জেলেনী প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া এক ধনীর উদ্যানবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনী তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন এবং মনোহর পুষ্প-সৌরভে আমোদিত এক গ্রীষ্মাবাসে বিশ্রামের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। জেলেনীরা এই সুবাসিত উদ্যানবাটীতে শয়ন করিল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। তাহারা যেন আকাঙ্ক্ষিত কোন-কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেটি ফিরিয়া না পাওয়া পর্যন্ত সুস্থ বোধ করিতেছিল না। অবশেষে তাহাদের একজন উঠিয়া গিয়া যেখানে মাছের ঝুড়িগুলি রাখা ছিল, সেখান হইতে সেগুলি ঘরে লইয়া আসিল, তখন সেই চিরাভ্যস্ত গন্ধ পাইবামাত্র সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

আমাদের নিকট এই জগৎটি যেন সেই মাছের ঝুড়ির মত না হয়; আমরা যেন সুখের জন্য ইহার উপর নির্ভর না করি। এটি তামসিক অর্থাৎ তিন গুণের মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট, তাহার দ্বারা বদ্ধ হওয়া। ইহার ঠিক উপরের স্তরটি 'অহং' ভাবপূর্ণ; সেখানে অহরহ 'আমি'র প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রকৃতির লোকেরা সময় সময় সৎকার্য করে এবং ধার্মিক হয়; ইহারা রাজসিক বা কর্মশীল প্রকৃতির। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা শুধু আত্মাতেই বাস করেন। এই তিন প্রকার গুণ অল্পবিস্তর সকল মানুষেই আছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণ প্রবল হয় মাত্র। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং পরে দুইটিকেই সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

'সৃষ্টি' অর্থে নূতন কিছু গড়া নয়, সাম্যবাদ ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা। খণ্ড খণ্ড সোলা একপাত্র

জলের তলদেশে নিক্ষেপ করিলে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ও একযোগে সবেগে উপরের দিকে উত্থিত হয়; সকল সোলা উপরে উঠিয়া সাম্যভাব লাভ করিলে গতি বা জীবনসংগ্রাম থামিয়া যায়। সৃষ্টি ব্যাপারেও এইরূপ। সমত্বে পৌঁছিলে অস্থির ভাবগুলি নিবৃত্ত হয় এবং তথাকথিত জীবনযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের সঙ্গে মন্দ জড়িত থাকিবেই, কারণ সাম্যভাব ফিরিয়া পাইলে জগৎ লোপ পাইবে; যেহেতু সাম্য ও ধ্বংস একই বস্তু। দুঃখশূন্য সুখ বা অশুভশূন্য শুভ কোন কালেই সম্ভব নয়, কেন না সাম্যভাবের অভাবই জীবন। আমরা চাই মুক্তি; জীবন বা সুখ বা মঙ্গল আমাদের কাম্য নয়। সৃষ্টি নিত্য, ইহার আদি বা অন্ত নাই; ইহা যেন অনন্ত হ্রদের বক্ষে চিরচঞ্চল তরঙ্গপ্রবাহ। এই হ্রদের অনেক স্থল অতলস্পর্শ, অনেক স্থল শান্ত, কিন্তু সদাই তরঙ্গভঙ্গ চলিতেছে, সাম্য অবস্থা লাভের জন্য সংগ্রাম অনন্ত। জীবন ও মৃত্যু একই সত্যের নামান্তর মাত্র, একই মুদ্রার দুই পিঠ। দুই-ই মায়া—এই মুহূর্তে প্রাণধারণের, পরমুহূর্তেই প্রাণত্যাগের দুর্বোধ্য চেষ্টা। এ-সকলের ঊর্ধ্বে আত্মাই প্রকৃত স্বরূপ। আমরা সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করি এবং পরে আমাদেরই জন্য উহা জীবন্তভাব ধারণ করে। বিষয়গুলি স্বয়ং প্রাণশূন্য, আমরাই তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি, এবং পরে আমরাই কখনও-বা বিষয় উপভোগ করি, আবার কখনও মূঢ়ের ন্যায় বিষয় হইতে ত্রস্তভাবে পলায়ন করি। এই জগৎ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—সত্যের ছায়া মাত্র।

কবি বলিয়াছেন, 'কল্পনা সত্যের সোনালী আভাস।' অন্তর্জগৎ—প্রকৃত সত্তা—বহির্জগৎ হইতে অনন্তগুণ বড়। বহির্জগৎ প্রকৃত সত্তার ছায়াময় অভিক্ষেপ। রজ্জুদর্শনকালে সর্পদর্শন হয় না, আবার সর্প দৃষ্ট হইলে রজ্জুদৃষ্টি তিরোহিত হয়। এই সময়ে রজ্জু ও সর্প-জ্ঞান অসম্ভব। ঠিক তেমনি যখন আমরা জগৎ দেখি, তখন আত্মাকে উপলব্ধি করি না, ইহা কেবল বুদ্ধির ধারণা। ব্রহ্মানুভূতিতে 'অহং'-জ্ঞান ও জগৎ-বোধ লোপ পায়। আলো কখনও অন্ধকার জানে না, আলোতে অন্ধকার নাই; (ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই) ব্রহ্মই সব। যখন একজন ঈশ্বর স্বীকার করি, তখন বুঝিতে হইবে—প্রকৃতপক্ষে আত্মাকেই নিজেদের হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া আমাদের বাহিরে অর্চনা করিতেছি; কিন্তু সর্বাবস্থাতেই তিনি আর অন্য কেহ নন—আমাদেরই যথার্থ স্বরূপ, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।

যেখানে আছে সেখানেই থাকা পশুর প্রকৃতি; ভালকে গ্রহণ এবং মন্দকে বর্জন করাই মানুষের প্রকৃতি; গ্রহণ বা বর্জন না করিয়া নিত্যানন্দে থাকাই দৈবী প্রকৃতি। আসুন, আমরা দৈবী প্রকৃতি লাভ করি; আমাদের হৃদয়কে সমুদ্রের মত উদার করিয়া, অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বস্তুগুলির অতীত হইয়া জগৎকে শুধু চিত্রের মত দেখি। কেবল তখনই আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে জগৎকে উপভোগ করিতে পারি।

জগতে ভালর সন্ধান কর কেন, এখানে কি তাহা পাইতে পারি? সংসার যত উৎকৃষ্ট বস্তুই দিক্ না কেন, ইহা ঘোলা জলে খেলিতে খেলিতে শিশুদের কয়েকটি কাঁচের (পুঁতির) মালা পাওয়ার মত; মালাগুলি বার বার তাহাদের হাত হইতে পড়িয়া যায়—আবার অনুসন্ধান চলে। ধর্ম ও ঈশ্বর অসীম শক্তিপ্রদ। মুক্ত অবস্থায় আমরা শুধু আত্মা; মুক্ত হইলেই অমৃতত্বে স্থিতি; ঈশ্বরও মুক্ত হইলেই ঈশ্বরপদবাচ্য।

'অহং'-সৃষ্ট সংসার-বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না; অতীতে কেহ কখনও পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখনও পারিবে না। সংসার-ত্যাগের অর্থ সম্পূর্ণভাবে 'অহং'-কে ভুলিয়া যাওয়া, 'অহং'-কে একেবারে না বোধ করা, দেহে বাস করিয়াও দেহের অধীন না হওয়া। এই ধূর্ত অহমিকা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মানবজাতির হিত করিবার শক্তি কেবল সেই নীরব কর্মীদেরই আছে, যাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া পরকে ভালবাসিবার জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁহারা কখনও 'আমি, আমার' বলেন না, অন্যের হিতসাধন করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ এক হইয়াছেন, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না বা জ্ঞাতসারে কোন কর্মও করেন না। তাঁহারাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত—সম্পূর্ণ নিষ্কাম, ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অতীত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত তাঁহারা ব্যক্তিত্বহীন তত্ত্ব মাত্র। ক্ষুদ্র 'আমি' যতই বিসর্জন করিব, ততই আমরা ঈশ্বরভাবাপন্ন হইব। চলুন, আমরা ক্ষুদ্র 'আমি'-কে পরিত্যাগ করি, তবেই আমাদের অন্তরে বৃহৎ 'আমি' আসিবে। যখন আমাদের মন হইতে 'অহং'-ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়, তখনই আমরা উৎকৃষ্ট কর্মী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হই। বাসনাশূন্য ব্যক্তিদের কর্মই মহৎ ফল প্রসব করে। যাহারা তোমার নিন্দা করে, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর; চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার মিথ্যা 'অহং' দূর করিতে সাহায্য করিয়া নিন্দাকারীরা তোমার কি মহৎ উপকার করিতেছে! যথার্থ 'আমি'কে আঁকড়াইয়া থাক, শুধু সৎ চিন্তা কর, দেখিবে ধর্মপ্রচারকদের অপেক্ষা তুমি অনেক বেশী কাজ করিতেছ। পবিত্রতা ও নীরবতা হইতেই মহা শক্তিময়ী বাণী আসে।

ব্যক্ত ভাব কার্যতঃ নিম্নতর অবস্থা বা অধঃপতন, যেহেতু ভাব কেবল অক্ষরের সাহায্যেই ব্যক্ত হয়। তাই সেণ্ট পল বলিয়াছেন, 'অক্ষর ভাবকে নষ্ট করে।' ৩৭ অক্ষরের মধ্যে জীবন থাকিতে পারে না। অক্ষর ভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। তথাপি ভাবপ্রকাশের জন্য ভাবকে জড়ের দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। আবরণের মধ্যে আমরা প্রকৃত সত্য দেখিতে পাই না, আবরণকে প্রতীক না ভাবিয়া যথার্থ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি। এই ভ্রম প্রায় সকলেরই হয়। প্রত্যেক মহান্ আচার্য ইহা জানেন এবং সাবধান হন, কিন্তু জনসাধারণ অপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষের পূজা করিতেই বেশী উন্মুখ। ব্যক্তিত্বের পিছনে তত্ত্বের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং সময়োপযোগী নূতন ভাব দিবার জন্যই মহাপুরুষদের আবির্ভাব। সত্য চিরদিন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু ইহাকে শুধু নূতন আকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে, অথবা মানবজাতি তাহাদের উন্নতি অনুসারে যেভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সেভাবেই সত্যের প্রকাশ হয়। নাম-রূপ হইতে মুক্ত হওয়াই, বিশেষতঃ যখন সুস্থ-অসুস্থ, সুন্দর-কুৎসিত কোনপ্রকার শরীর ধারণ করারই প্রয়োজন বোধ করি না, তখনই আমাদের এই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে। 'অনন্ত উন্নতি' হইলেই অনন্ত বন্ধনও হইবে। সমস্ত ভেদভাব অতিক্রম করিয়া অনন্ত অভেদভাব, একত্ব বা ব্রহ্মভাব আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। আত্মা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মিলনভাব, আত্মা নির্বিকার ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আত্মা জীবন নন, কিন্তু জীবনধারণ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবন-মৃত্যু এবং শুভাশুভের অতীত—নির্বিশেষ একত্ব। নরকের মধ্য দিয়াও সত্যানুসন্ধান করিতে সাহসী হও। নাম-রূপ বা সবিশেষ বস্তু সম্বন্ধে মুক্তি প্রযোজ্য নহে। 'আমি দেহধারী-রূপে মুক্ত'—এ-কথা কোন দেহবান্ ব্যক্তিই বলিতে পারে না। দেহভাব মন হইতে অপগত না হইলে মুক্তি হইবে না। আমাদের মুক্তি অন্যের ক্লেশকর হইলে আমরা সেখানে মুক্ত নই। আমরা যেন কাহারও ক্লেশের কারণ না হই। প্রকৃত অনুভূতি এক হইলেও আপেক্ষিক অনুভূতি বহু। সমগ্র জ্ঞানের উৎস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, পিপীলিকার মধ্যেও যেরূপ, শ্রেষ্ঠ দেবতার মধ্যেও সেইরূপ। প্রকৃত ধর্ম এক, সকল দ্বন্দ্ব কেবল রূপ, প্রতীক ও উদাহরণ লইয়া। যে দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে স্বর্গরাজ্য বা স্বর্ণযুগ চিরকালই বর্তমান। ফলকথা, আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি—এ সংসার গোল্লায় গিয়াছে। মূঢ়! শুনিতে পাও না কি, তোমার হৃদয়মধ্যেই সেই অনাদি সঙ্গীত—'সচ্চিদানন্দ—সোঽহং, সোঽহং' অহরহ ধ্বনিত হইতেছে?

ছায়ামূর্তির (phantasm) সাহায্য ছাড়া চিন্তা করিবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা একই প্রকার। প্রত্যেক ভাবেরই দুইটি অংশ—মানস ও শাব্দ। এ দুটিই আমাদের প্রয়োজন। বিজ্ঞানবাদী (idealist) বা জড়বাদী—কেহই জগৎব্যাপারনিরূপণে সমর্থ নয়। এ-বিষয়ে ভাব ও অভিব্যক্তি দুয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। দর্পণে নিজের মুখ দেখার মত জগৎ-রূপে প্রকাশিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অতএব কেহই স্বীয় আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই সেই আত্মা, এবং এই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য ঐ প্রতিবিম্বরূপেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। দর্শনের অতীত তত্ত্বের উদাহরণগুলি দেখাই তথাকথিত প্রতীকোপাসনা—সচরাচর যতটা অনুমান করা যায়, প্রতীকের প্রসার তদপেক্ষা বেশী ব্যাপক।

দারু ও শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষ পর্যন্ত ইহা ব্যাপৃত। সাকারোপাসনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সতত বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেই ভারতে মূর্তিপূজার সূত্রপাত হইয়াছে। বেদে মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই। স্রষ্টা এবং সখারূপে ঈশ্বরের অভাববোধের প্রতিক্রিয়া হইতেই শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের মূর্তিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। বুদ্ধমূর্তিও ঠিক এইভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা অর্চিত হইতেছেন। হিংসামূলক সংস্কার-চেষ্টার দ্বারা প্রকৃত সংস্কার সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্চনার প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতিগত; উচ্চতম দার্শনিকতার সাহায্যেই শুধু শুদ্ধ ভাবময় অবস্থায় আরোহণ করা যায়। কাজেই পূজা করিবার জন্যই মানুষ তাহার ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন করিয়া লইবে। প্রতীক যেরূপই হউক না কেন, ইহার অন্তরালে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন—এইভাবে প্রতীকোপাসনা অতি উত্তম, শুধু প্রতীকের উপাসনা নয়।

‘শাস্ত্রে আছে’—শুধু এই বিশ্বাসের কুসংস্কার হইতে সর্বোপরি নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিকে কোন শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া লইতে বাধ্য করা অতি ভীষণ অত্যাচার। শাস্ত্রপূজা নিকৃষ্ট পুতুলপূজা। কোন গর্বিত ও স্বাধীনচিত্ত হরিণ তাহার শাবকটিকে কর্তৃত্বের ভাবে বলিতেছিল, ‘আমার দিকে চাহিয়া আমার এই সুদৃঢ় শৃঙ্গ-দুইটি দেখ। ইহাদের এক আঘাতেই আমি মানুষ মারিতে পারি। হরিণ হওয়া কি সুখের বিষয়!’ ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে শিকারীর ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র কোনদিকে না চাহিয়া হরিণ বেগে পলাইতে লাগিল, বিস্ময়াবিষ্ট শাবকটিও তাহার পিছন পিছন ছুটিতে লাগিল। নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া শাবক জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনি এত বলশালী ও সাহসী, তবু মানুষের শব্দ শুনিয়া পলায়ন করেন কেন?’ হরিণ বলিল, ‘বৎস, নিজের বল-বিক্রমের উপর আস্থা থাকিলেও কেন যে ঐ শব্দ শুনিলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কি-একটা ভাবের বশে পলাইতে বাধ্য হই, তাহা জানি না।’ আমাদের দশাও ঐরূপ। শাস্ত্রনিবদ্ধ বিধির ‘ভেরী-রব’ শ্রবণমাত্রই প্রাচীন অভ্যাস ও সংস্কারগুলি যেন আমাদিগকে পাইয়া বসে এবং ইহা জানিবার পূর্বেই আমরা যেন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপ—মুক্ত অবস্থা বিস্মৃত হই।

জ্ঞান চিরন্তন। আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কারককে আমরা ‘প্রত্যাদিষ্ট’ বলি এবং তিনি জগৎকে যাহা দান করেন, তাহা ঐশ্বরিক বাণী। কিন্তু ঐশ্বরিক বাণী বা প্রত্যাদেশ চিরকালই আছে, সুতরাং কোন একটিকে চরম মনে করিয়া উহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। যিনি নিজেকে উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরেই ঐ ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ হইতে পারে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, কেন না ‘যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবেন।’ সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব, আর এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানেই মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ। মানুষই ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোচ্চ কল্পনা। যত কিছু গুণ ঈশ্বরে অর্পণ করি, সবই অল্পমাত্রায় মানুষে বিদ্যমান। যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করি এবং এইরূপ ঈশ্বর-ধারণার অতীত হই, তখন দেহ, মন ও কল্পনার বাহিরে আর এ জগৎ দেখি না। সেই পরম নিত্য ভাবে আরূঢ় হইলে আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ থাকে না; তখন সবই বিষয়শূন্য বিষয়ীতে পর্যবসিত হয়। আমাদের অনুভবগম্য ‘জগৎ’-এ মানুষই শীর্ষ স্থানের অধিকারী। যাঁহারা সমত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ‘ঈশ্বরে বাস করেন’ বলিয়া কথিত। ঘৃণা—আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন করা; অতএব প্রেমই জীবনের নীতি। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়াই পূর্ণত্ব লাভ করা; কিন্তু আমরা যত বেশী পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইব, ততই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিব। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এ-জগৎকে শিশুর খেলা বলিয়া দেখেন ও জানেন, এবং ইহা লইয়া মাথা ঘামান না। দুইটি কুকুরছানাকে পরস্পর মারামারি ও কামড়াকামড়ি করিতে দেখিলে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না। আমরা জানি ইহা গুরুতর ব্যাপার নয়। পূর্ণ-মানব জানেন এই সংসার মায়ার খেলা। জীবনকেই সংসার বলে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলির যে ক্রিয়া আমাদের উপর হইতেছে, তাহারই ফল জীবন। জড়বাদী বলে—মুক্তির কথা ভ্রমমাত্র। আদর্শবাদী বলে—বন্ধনের কথা স্বপ্নমাত্র। বেদান্ত প্রচার করেন—একই কালে আমরা মুক্তও বটে, বদ্ধও বটে। ইহার অর্থ এই যে, জাগতিক স্তরে আমরা কখনই মুক্ত নই, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে চিরমুক্ত। আত্মা—মুক্তি ও বন্ধন দুইয়ের অতীত। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমরা ইন্দ্রিয়াতীত অবিনশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ—আমরা পরমানন্দস্বরূপ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

আমেরিকান সংস্করণের ভূমিকা

J.P.F.
(মিঃ ফক্স)

এই বক্তৃতা ও পরবর্তী আলোচনাটি সাঙ্কেতিক লিপি অনুসারে গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী এগুলির উপর শুধু একবার চোখ বুলাইতে পারিয়াছিলেন; আশা করা যায়, কোন ভুল নাই। অধ্যাপক ল্যানম্যান ও অধ্যাপক রাইট অনুগ্রহপূর্বক চূড়ান্ত সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন। আলোচনাংশের বিবৃতিতে কয়েকটি প্রশ্ন অপরিহার্যভাবে হারাইয়া গিয়াছে। প্রথম চারিটি টীকা স্বামীজী দ্বারাই সংযোজিত। মূল বক্তৃতায় হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতিগুলি স্বামীজী প্রথমে সংস্কৃতেই বলেন, পরে অনুবাদ করিয়া দেন। অনুবাদগুলি যেভাবে বলিয়াছিলেন, সেইভাবেই রাখা হইল।

বক্তৃতা ও আলোচনার পর সন্নিবেশিত হইয়াছে—২২ ও ২৪ মার্চ বৈকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত স্বামীজীর কথাগুলি। উত্তরগুলি সাঙ্কেতিকভাবে গৃহীত, কিন্তু প্রশ্নগুলি নয়। কয়েকটি অপ্রকাশিত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশও সংযোজিত হইয়াছে। কতকগুলি উত্তর এবং নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু একই, তবে বর্ণনাভঙ্গির বৈচিত্র্যের জন্য সেগুলিও সব রাখা হইল।

মাত্র একটি ভাষণে বেদান্তদর্শনের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আশা করা যায়, প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তা বিষয়ে যাঁহারা আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের কাছে এই বক্তৃতা, আলোচনা এবং সঙ্গের প্রশ্নোত্তর ও নির্বাচিত অংশগুলি মূল্যবান।

বেদান্ত-দর্শন

[১৮৯৬ খ্রীঃ ২৫ মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আজকাল যাহাকে সাধারণভাবে ‘বেদান্ত-দর্শন’ বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতের বর্তমান বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সবই তাহার অন্তর্গত। সেজন্য নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং আমার মনে হয়, ক্রমোন্নতির ধারায় অগ্রসর হইয়া দ্বৈতবাদে সেগুলির আরম্ভ এবং অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বেদান্তের শব্দগত অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ—বেদ হিন্দুদের শাস্ত্র।
১
পাশ্চাত্যে কখনও কখনও ‘বেদ’ বলিতে উহার স্তোত্র ও আনুষ্ঠানিক অংশ-মাত্র বুঝায়। কিন্তু

বর্তমানকালে বেদের এই অংশের ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেই চলে; ভারতে এখন 'বেদ' বলিতে প্রায়শঃ বেদান্তই বুঝায়। সব ভাষ্যকারই শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিবার সময় সাধারণতঃ বেদান্ত হইতেই উহা লইয়া থাকেন, ভাষ্যকারগণের কাছে বেদান্তের আর একটি পারিভাষিক নাম 'শ্রুতি'

২

। 'বেদান্ত' নামে পরিচিত সব গ্রন্থই বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পরে রচিত হয় নাই। যেমন 'ঈশোপনিষদ্' নামক বেদান্ত-গ্রন্থ বেদের প্রাচীনতম অংশের অন্তর্ভুক্ত যজুর্বেদের চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে রহিয়াছে। বেদের 'ব্রাহ্মণ' বা অনুষ্ঠানমূলক অংশেও অপর কয়েকখানি উপনিষদ্ রহিয়াছে; বাকী উপনিষদ্গুলি স্বতন্ত্র—বেদের ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সেগুলি যে বেদের অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এ কথা ভাবিবার কোন হেতু নাই; কারণ ইহা তো জানাই আছে যে, এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং বহু ব্রাহ্মণ-অংশও লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই ইহা খুবই সম্ভব যে, এই উপনিষদ্গুলি কোন না কোন 'ব্রাহ্মণ'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ-অংশগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু উপনিষদ্গুলি রহিয়া গিয়াছে। এই উপনিষদ্গুলি 'আরণ্যক' নামেও অভিহিত।

৩

বেদান্তই কার্যতঃ হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং ভারতীয় দর্শনে যতগুলি আস্তিক মতবাদ আছে, তাহাদের সবগুলিকেই স্বীয় ভিত্তিরূপে বেদান্তকে গ্রহণ করিতে হয়। এমন কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযোগী হইলে বৌদ্ধ এবং জৈনেরা পর্যন্ত প্রমাণরূপে বেদান্তের বাক্য উদ্ধৃত করেন। ভারতের সব দার্শনিক মতবাদই বেদকে ভিত্তি বলিয়া দাবী করিলেও প্রত্যেক মতই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। সর্বশেষটি ব্যাসের মত, ইহা পূর্ববর্তী অন্যান্য দার্শনিক মতগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বেদানুগ; এবং ইহা সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি পূর্ববর্তী দর্শনগুলির সঙ্গে বেদান্তের মতসমূহের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্য বিশেষভাবে ইহাকেই 'বেদান্ত-দর্শন' বলা হয়, এবং বর্তমান ভারতে 'ব্যাসসূত্র' গুলিই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ আবার এই ব্যাসসূত্রগুলির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভারতে মোটামুটি তিন শ্রেণীর ভাষ্যকার

৪

আছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে তিনটি দার্শনিক মত ও সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে—প্রথমটি দ্বৈত, দ্বিতীয়টি বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৃতীয়টি অদ্বৈত। ইঁহাদের মধ্যে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সংখ্যাই ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী; তাঁহাদের তুলনায় অদ্বৈতবাদীর সংখ্যা অতি অল্প। এই তিনটি মতবাদেরই ভাবধারা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব, তবে আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখি [illegible] তিনটি বিষয়ে সব বেদান্তবাদীই একমত [illegible] ঈশ্বরে [illegible] বেদে [illegible]

সৃষ্টিতত্ত্ব [illegible] সাংখ্যদর্শনের [illegible]

[illegible] যাহা কিছু জড়পদার্থ আছে, সে-সবই 'আকাশ' নামক একটি মূল পদার্থ হইতে সৃষ্ট; এবং সব শক্তিই—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, জীবনীশক্তি বা যে-কোন শক্তি হউক না কেন, সবই 'প্রাণ'-নামক একটি মূল শক্তি হইতে উদ্ভূত। আকাশের উপর প্রাণের ক্রিয়ার ফলেই এই বিশ্ব সৃষ্ট বা বহিঃপ্রক্ষিপ্ত—বহিঃ-নিসৃত

৫

হইয়াছে। কল্পারম্ভে আকাশ গতিহীন, অনভিব্যক্ত থাকে। তারপর উহার উপর প্রাণের ক্রিয়া শুরু হয়, আর প্রাণ যতই ক্রিয়াশীল হয়, আকাশ হইতে ততই গ্রহ প্রাণী মানুষ নক্ষত্র প্রভৃতি স্থূল ও স্থূলতর পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। গণনাতীত কালের পর এই অভিব্যক্তি থামিয়া যায়, এবং বিলয় শুরু হয়; প্রত্যেক বস্তুই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুতে বিলীন হইতে হইতে পুনরায় মূল আকাশ ও প্রাণে পরিণত হয়। তখন নূতন 'কল্প' আরম্ভ হয়। প্রাণ এবং আকাশের পরেও কিছু আছে, উভয়কে বিরাট মন বা 'মহৎ' নামক তৃতীয় সত্তায় বিলীন করা যাইতে পারে। বিরাট মন—আকাশ বা প্রাণ সৃষ্টি করে না, নিজেকেই প্রাণ ও আকাশে পরিবর্তিত করে।

এখন মন, আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ে বিশ্বাস লইয়া আমরা আলোচনা করিব। সর্বজনগ্রাহ্য সাংখ্য মনস্তত্ত্ব অনুসারে অনুভূতির ক্ষেত্রে—যেমন কোন-কিছু দেখার সময়—প্রথমেই রহিয়াছে দেখিবার যন্ত্র বা 'করণ' চক্ষু। চক্ষুযন্ত্রের পিছনে আছে দর্শনের ইন্দ্রিয়—চক্ষুর স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র; এগুলি বাহিরের যন্ত্র নয়, কিন্তু এগুলি ছাড়া চক্ষু দেখিতে পারিবে না। অনুভূতির জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। মন থাকা চাই এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগও চাই। এ ছাড়াও সংবেদনাকে বুদ্ধির—মনের প্রতিক্রিয়াশীল নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই; বুদ্ধির নিকট হইতে প্রতিক্রিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ প্রতিভাত হয় এবং অহং-বোধও জাগ্রত হয়। তারপর আসে ইচ্ছা; কিন্তু তবু সব হইল না। ধারাবাহিক আলোর স্পন্দনে প্রতিস্ফুট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্রকে লইয়া একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইলে সেগুলির প্রত্যেকটিকে যেমন কোন একটি স্থির বস্তুর উপর ফেলিতে হয়, সেইরূপ মনের প্রত্যেকটি ভাবকেও একত্র করিয়া দেহ ও মনের তুলনায় যাহা স্থির, সেরূপ কোন একটি পদার্থের উপর প্রক্ষেপ করিতেই হইবে; এই স্থির পদার্থটিকেই বলে জীবাত্মা—পুরুষ বা আত্মা।

সাংখ্যদর্শনের মতে 'বুদ্ধি' নামক মনের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি 'মহৎ' বা বিরাট মনের পরিণাম, রূপান্তর বা একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। মহৎ-ই স্পন্দনশীল চিন্তায় রূপান্তরিত হয়; এবং উহা এক অংশে পরিবর্তিত হইয়া ইন্দ্রিয় হয়, অপর অংশে হয় সূক্ষ্ম ভূত (তন্মাত্র)। এই সবকিছুর সমবায়ে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে এই মহৎ-এরও পরে আর

একটি অবস্থা আছে, যাহার নাম ‘অব্যক্ত’ বা অপ্রকাশিত; সেখানে মনেরও প্রকাশ নাই, শুধু কারণগুলি থাকে। এই অবস্থার আর একটি নাম ‘প্রকৃতি’। এই প্রকৃতির পারে প্রকৃতি হইতে চির-স্বতন্ত্র পুরুষ রহিয়াছেন; ইনিই সাংখ্যের নির্গুণ সর্বব্যাপী আত্মা। পুরুষ কর্তা নন, সাক্ষী-মাত্র। পুরুষকে বুঝাইতে স্ফটিকের উদাহরণ দেওয়া হয়। পুরুষ বর্ণহীন স্বচ্ছ স্ফটিকের মত; উহার সম্মুখে বিভিন্ন বর্ণ রাখিলে উহাকে সেই-সব বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক তাহাতে রঞ্জিত হয় না।

বেদান্তবাদীরা সাংখ্যের ‘পুরুষ ও প্রকৃতি’-বিষয়ক মত নাকচ করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, ঐ দুটি তত্ত্বের মধ্যে এমন এক বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, যাহার মধ্যে সংযোগ-সেতুর প্রয়োজন। একদিকে সাংখ্য-সিদ্ধান্ত প্রকৃতিতে পৌছায়, পৌছিয়াই প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষের কাছে আসিবার জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ একলাফে অন্য প্রান্তে যাইতে হয়। সাংখ্য-দৃষ্টান্তে উক্ত বিভিন্ন বর্ণগুলি স্বরূপতঃ বর্ণহীন আত্মার উপর ক্রিয়াশীল হইতে সমর্থ হয় কি করিয়া? সেজন্য বেদান্তবাদীরা প্রথম হইতেই নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, এই আত্মা ও এই প্রকৃতি এক।
৬

এমন কি দ্বৈতবেদান্তবাদীরাও স্বীকার করেন, আত্মা বা ঈশ্বর বিশ্বের শুধু নিমিত্তকারণই নন, তিনি উপাদানকারণও। কিন্তু তাঁহাদের কাছে ইহা কথার কথা মাত্র, প্রাণের কথা নয়; কারণ তাঁহারা নিজ সিদ্ধান্তকে এইভাবে এড়াইতে চানঃ তাঁহারা বলেন, বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ; এই অর্থেই বলা চলে যে, ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব এক। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব পরস্পর স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। কেবল কল্পারম্ভে তাহারা অভিব্যক্ত হয়, এবং কল্পান্তে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বীজাকারে থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা জীব বা আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেন; এবং উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশ স্বপক্ষে পাইয়া তাহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজেদের মত গড়িয়া তোলেন। সব উপনিষদেরই একমাত্র কাজ এই বিষয়টি প্রমাণ করা—‘একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে যখন বিশ্বের সমস্ত মৃত্তিকাই জানা যায়, তেমনি এমন কোন বস্তু আছে, যাহা জানিলে বিশ্বের সব-কিছুই জানা যায়?’
৭
অদ্বৈতবাদীর ভাব হইল সমগ্র বিশ্বকে এমন একটি সাধারণ তত্ত্বে লইয়া যাওয়া, যে তত্ত্বটি যথার্থই বিশ্বের সামগ্রিক সত্তা। তাঁহারা দাবী করেন—সমগ্র বিশ্বে একত্ব রহিয়াছে, এবং একটি সত্তাই নিজেকে এই-সব বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। সাংখ্য যাহাকে প্রকৃতি বলেন, অদ্বৈতবাদীরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন যে, প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। এই সত্তাই—এই সৎ-ই বিশ্ব মানুষ জীব এবং যাহা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহাতে রূপায়িত হইয়াছেন। মন ও মহৎ সেই এক সৎ-এরই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাতে অসুবিধা এই যে, ইহা সর্বেশ্বরবাদ হইয়া দাঁড়ায়। যে বস্তুকে তাঁহারা অপরিবর্তনীয় ‘সৎ’ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা এই পরিবর্তন ও বিনাশশীল পদার্থে রূপায়িত হয় কেমন করিয়া?—যাহা চরম সত্য তাহার তো পরিবর্তন নাই।
এ-বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা আপাত-অভিব্যক্তিবাদ বলিয়া একটি মত আছে।

দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সর্বকিছুই মূল প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশ। একদল অদ্বৈতবাদী ও একদল দ্বৈতবাদীর মতে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বর হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে। শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে বিকশিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্তু সত্যই তাহা নন, ঐরূপ প্রতীত হন মাত্র। এ-বিষয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। রজ্জু সর্প বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, বস্তুতঃ সর্প হয় নাই; রজ্জু কখনও সর্পে পরিণত হয় নাই। ঠিক তেমনি সেই সৎ-স্বরূপই এই দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, আমরা যে-সব পরিবর্তন ইহাতে দেখি, সেগুলি আপাতপ্রতীয়মান। দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই পরিবর্তন ঘটায়; অথবা মনোবিজ্ঞানের উচ্চতর সামান্যীকরণ অনুসারে বলা যায় যে, নাম ও রূপের দ্বারাই ইহা ঘটে। নাম ও রূপই একটি পদার্থকে অপরটি হইতে পৃথক্ করে; নাম ও রূপ-ই পার্থক্য সৃষ্টি করে। আসলে সবই এক ও ভিন্ন।

বেদান্তবাদীরা আরও বলেন, কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং শুধু বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য এইরূপ দুইটি বিভিন্ন বস্তু একই কালে বর্তমান নাই। রজ্জু সর্পে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র, ইহা সত্য পরিবর্তন নয়; যখন ভুল ভাঙিয়া যায়, তখন সর্প শূন্যে লীন হয়; মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্ট জগৎ-ই দেখে, ঈশ্বরকে দেখে না। যখন সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, তখন তাহার কাছে জগৎ একেবারে লোপ পায়। যাহাকে 'অবিদ্যা' বা 'মায়া' বলা হয়, উহাই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কারণ, উহারই প্রভাবে চরম সত্যকে—অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অভাবমাত্র নহে। সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে—এ-কথাও বলা চলে না, আবার নাই—এ-কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে 'সৎ' বলা যাইতে পারে; সেদিক দিয়া দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মায়া অসৎ—এ-কথাও বলা যায় না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে ইহা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্তদর্শনে ইহাকে 'অনির্বচনীয়' অর্থাৎ বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ্য বলা হইয়াছে।

ফলতঃ মায়া-ই এই বিশ্বের আসল কারণ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে যাহা উপাদান লাভ করে, মায়া তাহাতে দেয় নাম ও রূপ; এবং ব্রহ্মই এই সবকিছুতে রূপান্তরিত বলিয়া প্রতীত হন। কাজেই অদ্বৈতবাদীদের কাছে স্বতন্ত্র জীবাত্মার কোন স্থান নাই। তাহাদের মতে জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি; আসলে জীবাত্মার কোন (পৃথক্) অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদি সর্বব্যাপী একটি মাত্র সত্তা থাকে, তবে আমি একটি সত্তা, তুমি একটি সত্তা, সে আর একটি সত্তা—ইত্যাদি কিরূপে সম্ভব? আমরা সকলেই এক; দ্বৈতজ্ঞানই অনর্থের মূল। বিশ্ব হইতে আমি পৃথক্—এই বোধ যখনই জাগিতে শুরু করে, তখনই প্রথমে আসে ভয়, তারপর আসে দুঃখ। 'যেখানে একে অপরের কথা শোনে, একে অপরকে দেখে, তাহা অল্প। যেখানে একে অপরকে দেখে না, একে অপরের কথা শোনে না—তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম। সেই ভূমাতেই পরম সুখ, অল্পে সুখ নাই।'
৮

কাজেই অদ্বৈত-দর্শনের মতে জড় বস্তুর এই বিবিধ অবস্থান বা এই দৃশ্যরাশি যেন সাময়িকভাবে মানুষের যথার্থ স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বরূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটে নাই। নিম্নতম কীট এবং উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্তা বিদ্যমান। কীটের দেহ একটি নিম্নতর রূপ, যেখানে মায়া দ্বারা দেবত্ব অনেক বেশী পরিমাণে আবৃত রহিয়াছে; আর যেখানে দেবত্বের উপর আবরণ ক্ষীণতম, তাহাই উচ্চতম রূপ বা দেহ। সবকিছুর পিছনে সেই এক দেবত্বই বিরাজমান; এই সত্য অবলম্বন করিয়াই নীতির ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরের অনিষ্ট করিও না। প্রত্যেককে আপনার মত ভালবাসো, কারণ সমগ্র বিশ্বই এক। অপরের অনিষ্ট করিলে নিজেরই অনিষ্ট করা হয়; অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হয়। এই সত্য হইতেই অদ্বৈত-নীতির সেই মূলতত্ত্বটির উদ্ভব হইয়াছে, যাহাকে সংক্ষেপে বলা হয়—আত্মত্যাগ।

অদ্বৈতবাদী বলেন, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববোধই আমার সব দুঃখের মূল কারণ। এই অহং-বোধই আমাকে অপর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই ঘৃণা, দ্বেষ, দুঃখ, সংগ্রাম এবং আরও সব অনর্থের সৃষ্টি করে। এই বোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়, সব দুঃখ চলিয়া যায়। কাজেই এই পৃথক্ আমিত্ব-বোধ ত্যাগ করিতে হইবে। নিম্নতম জীবের জন্যও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন কেহ একটি ক্ষুদ্র কীটের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, বুঝিতে হইবে সে তখন অদ্বৈতবাদীর কাম্য পূর্ণত্বে পৌঁছিয়াছে; যে মুহূর্তে সে এভাবে প্রস্তুত হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসৃত হয়, সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। এই জীবনেই সে অনুভব করিবে যে, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সে এক। কিছুক্ষণের জন্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন তাহার কাছে লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সে নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের কর্ম—প্রারব্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে দেহধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

এই অবস্থাকে—যে-অবস্থায় মায়ার আবরণ অপসৃত হইয়াছে অথচ শরীরটা কিছুদিন থাকিয়া যায়—বেদান্তবাদীরা ‘জীবন্মুক্তি’ বলেন। সকলেই মরীচিকা দেখিয়া কিছুদিন বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু একদিন সে মরীচিকা অদৃশ্য হইয়া যায়; তার পরদিন বা কিছুদিন পরে সম্মুখে আবার মরীচিকার আবির্ভাব হইলেও উহা দেখিয়া তখন আর ভুল হইবে না। মরীচিকাভ্রম প্রথমবার দূর হইবার পূর্বে যে ব্যক্তি বাস্তব ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিত না, মরীচিকা একবার অদৃশ্য হইলে, ভুল একবার ভাঙিলে চক্ষু ও ইন্দ্রিয় যতদিন কর্মক্ষম থাকিবে, ততদিন সে আবার মরীচিকা দেখিবে বটে, কিন্তু উহাকে বাস্তব বলিয়া আর কখনও ভুল করিবে না। বাস্তব জগৎ ও মরীচিকার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে, মরীচিকা আর কখনও তাহার ভ্রান্তি জন্মাইতে পারিবে না। তেমনি বেদান্তবাদী যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ লুপ্ত হইয়া যায়। জগৎ আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ-রূপে নয়। দুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে—নিত্য সত্তায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য আনন্দে—পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা লাভ করাই অদ্বৈত-বেদান্তের লক্ষ্য।

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

[১৮৯৬ খ্রীঃ ২৫ মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (U.S.A) গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটির সভায় বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতার পর শ্রোতাদের সহিত স্বামীজীর নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর অনুসারে আলোচনা হইয়াছিল।]

প্র। ভারতে দার্শনিক চিন্তা বর্তমানে কিরূপ ক্রিয়াশীল, তাহার কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। এ সকল বিষয় আজকাল কতটা আলোচিত হইয়া থাকে?

প্র। 'গোঁড়ামি' বলিতে হিন্দুগণ কি বুঝেন?

প্র। আপনাদের হিন্দুদর্শন গ্রীকদের স্টোয়িক৯ (stoic) দর্শনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

প্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের কি বিরোধ?

প্র। কিন্তু আপনাদের জ্ঞানার্জনের প্রণালী কি ভিন্ন?

প্র। একাগ্র অবস্থায় কি এইসব তত্ত্বের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়?

প্র। অদ্বৈতবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন?

প্র। অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদের বিরোধী?

প্র। মায়া বা অজ্ঞান আছে কেন?

প্র। সগুণ ঈশ্বর কি মায়ার অন্তর্গত?

প্র। সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তাকে জানিবার বিশেষ প্রণালী কি?

প্র। ইহা তাহা হইলে বিষয়ীকে (জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা=subject) বিষয়ে (জ্ঞেয় বা দৃশ্য=object) নিমজ্জিত করার অবস্থা?

উ। বিষয়ীকে বিষয়ে নয়, বিষয়কে বিষয়ীতে লীন করা। বাস্তবিক এই জগৎ লোপ পায়, কেবল 'আমি' থাকি—একমাত্র আমিই বর্তমান।

প্র। আমাদের কয়েকজন জার্মান দার্শনিকের মত—ভারতের ভক্তিবাদ খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল।

প্র। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ভারতবাসীর কিরূপ ধারণা?

উ। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের অধিকাংশ লোকই কার্যতঃ দ্বৈতবাদী, অতি অল্পসংখ্যকই অদ্বৈতবাদী। তবে আলোচনার প্রধান বিষয়—মায়াবাদ ও জীবতত্ত্ব। আমি এদেশে আসিয়া দেখিলাম, এখানকার শ্রমজীবীরা বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ধর্ম বলিতে তোমরা কি বোঝ, অমুক অমুক সম্প্রদায়ের ধর্মমত কি প্রকার?'—তাহারা বলিল, 'আমরা জানি না, তবে গীর্জায় যাই।' ভারতে কিন্তু কোন কৃষককে যদি জিজ্ঞাসা করি, 'তোমাদের শাসনকর্তা কে?'—সে বলিবে, 'তা জানি না; তবে খাজনা দিয়া থাকি।' কিন্তু যদি তাহাকে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, সে অমনি বুঝাইয়া দিবে—'আমি দ্বৈতবাদী', এবং মায়া ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার ধারণা বিস্তারিতভাবে বলিতে প্রস্তুত হইবে। সে লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু এসকল সে সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে শিখিয়াছে এবং ঐসব বিষয় আলোচনা করিতে খুব ভালবাসে। সারাদিন কাজের পর কৃষকেরা গাছতলায় বসিয়া ঐ-সব তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকে।

উ। বর্তমান কালে আহার পান ও বিবাহ সম্বন্ধে জাতিগত বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালন করাকেই 'গোঁড়ামি' বলে। তারপর হিন্দু যে-কোন মতে বিশ্বাস করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভারতে কখনও সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মমণ্ডলী বা চার্চ ছিল না, সুতরাং গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দুমত গঠিত ও বিধিবদ্ধ করিবার জন্য একদল লোক কোনকালেই ছিল না। মোটামুটিভাবে আমরা বলিয়া থাকি, যাহারা বেদবিশ্বাসী, তাহারাই নিষ্ঠাবান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের অনেকেই বেদ অপেক্ষা পুরাণেই বেশী বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

উ। খুব সম্ভবতঃ আলেকজান্দ্রিয়া-বাসিগণের মধ্য দিয়া হিন্দুদর্শন উহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিথাগোরাস যে সাংখ্যমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। যাহাই হউক, আমাদের ধারণা—সাংখ্যদর্শনই বেদ-নিবদ্ধ দার্শনিক-তত্ত্বসমূহকে যুক্তিবিচার দ্বারা সামঞ্জস্য করিবার প্রথম চেষ্টা। এমন কি বেদেও 'কপিল' নামের উল্লেখ দেখিতে পাইঃ ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
১০
... অর্থাৎ যিনি পূর্বে জাত সেই কপিল ঋষিকে জ্ঞানে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

উ। কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং আমাদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে।

প্র। সকল হিন্দুই কি জাতিভেদে বিশ্বাসী?

উ। বাধ্য হইয়া জাতিগত নিয়ম মানিতে হয়। আস্থা না থাকিলেও সামাজিক নিয়ম তাহাদের মানিতেই হয়।

প্র। এই প্রাণায়াম ও একাগ্রতার অভ্যাস কি সর্বসাধারণে করিয়া থাকে?

প্র। আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথা বলেন, উহা কি কেবল আদর্শমাত্র, না কেহ ঐ অবস্থা সত্যই লাভ করিয়াছেন?

প্র। আপনি যদি কখনও এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, তবে আপনি কি উহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিবেন?

‘ন তত্র সূর্যো ভাতি না চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারাও নয়; বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥’
১৫

মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া আর কোন ভয় থাকে না। ইহাই মোহ অপসারণ।

‘ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই; আমার মন্ত্র, তীর্থ, বেদ বা যজ্ঞ কিছুই নাই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা কিছুই নই। আমি চিদানন্দরূপ শিব—আমিই শিব (মঙ্গলস্বরূপ)।

প্র। আপনারা ‘আতিবাহিক দেহ’ (astral body) কাহাকে বলেন?

আমাদের পরিণামবাদ এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঠিক আপনাদের আধুনিক দর্শনের সিদ্ধান্তের মত। আপনাদের পরিণামবাদ বা ক্রমবিকাশ আমাদের যোগ ও সাংখ্যদর্শনের ভিতর রহিয়াছে। যথা, পতঞ্জলি প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতির অন্য জাতিতে পরিণত হইবার কথা বলিয়াছেন।—‘জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।’
১১
তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে পতঞ্জলির মতের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পার্থক্য আছে। তাঁহার পরিণামের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক। তিনি বলেন, ক্ষেত্রে নিকটবর্তী জলাশয় হইতে জলসেচনের জন্য যেমন কৃষককে কেবল জলাবরোধকটি তুলিয়া ফেলিতে হয়—‘নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ’
১২
—সেইরূপ সকল মানবই পূর্ব হইতেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন, কেবল এই-সকল বিভিন্ন অবস্থাচক্ররূপ প্রতিবন্ধক বা বাধা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই তাহার সেই অনন্ত শক্তি মহাবেগে বাহির হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইতর প্রাণীর ভিতর মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রহিয়াছে; যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মানুষরূপে অভিব্যক্ত হয়। [illegible] উ। উহারা আবার বলেন, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ে মনকে একাগ্র করিতে হয়, আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। [illegible] দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি-ব্যাপারে সাংখ্যমতের সহিত আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) পার্থক্য অতি অল্প।

উ। যোগীরা এই একাগ্রতা-শক্তির ফল অনেক বেশী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দাবী করেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের প্রত্যেক সত্য—বাহ্য ও আন্তর সকল সত্য করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

উ। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ এই-সব সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই মায়ার—এই আপাতপ্রতীয়মান প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে উহাদের অস্তিত্ব নাই। তবে আমরা যতদিন মায়াবদ্ধ, ততদিন আমাদিগকে এই-সকল দৃশ্য দেখিতে হয়। এই দৃশ্যজগতে ঘটনাবলী কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ঘটিয়া থাকে। উহাদের বাহিরে আর কোন নিয়ম বা ক্রম নাই, সেখানে মুক্তি—স্বাধীনতা।

প্র। যোগীরা কি কি ব্যাপার দেখাইতে পারেন, তাহার কোন দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি?

‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥’
১৮

এখানেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন, যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

প্র। যোগীরা কি জাতিভেদকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন?

উ। না; জাতিভেদ অপরিণত মনের শিক্ষালয়-মাত্র।

প্র। এই অতিচেতন ভাবের (সমাধিতত্ত্বের) সহিত ভারতীয় গ্রীষ্মের কি কোন সম্বন্ধ নাই?

উ। কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তো আমার বোধ হয় না। কারণ, সমুদ্র-পৃষ্ঠের পনর হাজার ফুট উপরে প্রায় মেরুপ্রদেশের আবহাওয়ায় হিমালয় পর্বতে এই যোগবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। ঠাণ্ডা জলবায়ুতে কি যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব?

‘বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥’
১৯

অনর্গল সদ্বাক্যযোজনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল—এ-সব কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, উহার দ্বারা মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি আমরা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারি, তবেই মুক্তিলাভ করিব।

প্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্বসাধারণের এই স্বাধীনতার সহিত জাতিভেদ-স্বীকারের কি সামঞ্জস্য আছে?

প্র। সভ্যতা সম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণা কিরূপ?

উ। উপনিষদ্ প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত নয় বলিয়া দার্শনিকেরা যখন কোন মতবাদ গঠন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদের মধ্য হইতে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্রুতিগুলি বাছিয়া লইয়াছেন। সেই কারণে সকল দর্শনকারই উপনিষদ্‌কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের দর্শনের কোনরূপ ভিত্তিই থাকিত না। তথাপি প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাপ্রণালীর ভিত্তি দেখিতে পাই, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের বিরোধী নয়। আমরা বলি, সত্য বা ধর্ম লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় সোপানের মধ্যে দ্বৈতবাদ অন্যতম সোপান মাত্র; প্রথমটিই দ্বৈতবাদ। তারপর মানুষ আরও উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়—উহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অবশেষে সে দেখিতে পায়, সে বিশ্বের সহিত অভিন্ন। সুতরাং এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক।

উ। কার্য-কারণ-সংঘাতের সীমার বাহিরে ‘কেন’ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না। মায়ার ভিতরেই কোন বস্তু সম্বন্ধে ‘কেন’ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা বলি, প্রশ্নটিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেই আমরা উহার উত্তর দিব। তৎপূর্বে উত্তর দিবার অধিকার আমাদের নাই।

উ। হাঁ, এই সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নন। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে ‘জীবাত্মা’ বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই ‘ঈশ্বর’ বা সগুণ ব্রহ্ম। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য দেখিবার জন্য এখান হইতে যাত্রা করে, সে প্রথমে সূর্যকে ছোট দেখিবে; যতদিন না আসল সূর্যের নিকট পৌঁছিতেছে, ততদিন উহাকে ক্রমশঃ বড় হইতে বড় দেখিবে। যতই সে অগ্রসর হয়, ততই সে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে এক সূর্যই দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র, সুতরাং সেই হিসাবে সেগুলি সত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটিই মিথ্যা নয়, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এগুলি নিম্নস্তরের অবস্থা মাত্র।

উ। আমরা বলি, দুইটি প্রণালী আছে। একটি ইতিবাচক প্রবৃত্তিমার্গ, অপরটি নেতিবাচক নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমোক্ত মার্গেই সমগ্র জগৎ চলিতেছে—ইহা প্রেমের পথ। যদি প্রেমের পরিধি অনন্তগুণ বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে আমরা সেই এক সর্বজনীন প্রেমে উপনীত হই। অপর পথ ‘নেতি, নেতি’ অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপ সাধন দ্বারা চিত্তের যে যে তরঙ্গ মনকে বহির্মুখী করিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই নিবারণ করিতে হয়। পরিশেষে মনের যেন মৃত্যু হয়, তখন সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা এই অবস্থাকে ‘সমাধি’ বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া থাকি।

প্র। বৌদ্ধদের কি কোন জাতিবিভাগ আছে?

প্র। সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান, শাস্ত্র—এ-সকল কি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সহায়ক?

উ। আমি ইঁহাদের সহিত একমত নই, এরূপ অনুমান মুহূর্তমাত্রও টিকিতে পারে না। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্য ভক্তির মত নয়। ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ধারণা এই যে, উহাতে ভয়ের ভাব আদৌ নাই—কেবল ভগবানকে ভালবাসা। ভয়ে উপাসনা হয় না, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বদা শুধু ভালবাসার ভিতর দিয়াই উপাসনা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ভক্তির কথা অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহেও রহিয়াছে; ঐ উপনিষদ্‌গুলি খ্রীষ্টানদের বাইবেল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যেও ভক্তির বীজ রহিয়াছে। 'ভক্তি' শব্দটিও পাশ্চাত্য শব্দ নয়। বেদ-মন্ত্রে উল্লিখিত 'শ্রদ্ধা' শব্দ হইতে ক্রমশঃ ভক্তিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

উ। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে মানুষ সব ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র যতটা সেই অবস্থায় পৌঁছিবার উপায়-স্বরূপ হয়, ততটা উহাদের উপকারিতা আছে। কিন্তু যখন উহাদের দ্বারা ঐ সহায়তা আর পাওয়া যাইবে না, তখন অবশ্য উহাদিগের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং
কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ
সমাচরন্॥
২০

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি
ভারত।
কুর্যাদ বিদ্বান্
তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
২১

উ। খুব ভাল বলিয়াই ধারণা। বেদান্ত সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতে একটি বিশেষত্ব আছে। মনে করুন, আমার একটি ছেলে আছে। আমি তাহাকে কোনপ্রকার ধর্মমত শিক্ষা দিব না—তাহাকে প্রাণায়াম শিখাইব, মনকে একাগ্র করিতে শিখাইব, এবং সামান্য একটু প্রার্থনা শিখাইব। আপনারা প্রার্থনা বলিতে যেরূপ বুঝেন, সেরূপ নহে, কেবল কতকটা এইভাবের প্রার্থনা শিখাইবঃ 'যিনি এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ধ্যান করি—তিনি আমার মনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করুন।'
১৩

তাহার ধর্মশিক্ষা এইরূপ চলিবে, তারপর সে বিভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিক ও আচার্যগণের মত শুনিতে থাকিবে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার মত সে নিজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকেই গ্রহণ করিবে—তিনি তাহার গুরু হইবেন, সে শিষ্য হইবে। সে তাঁহাকে বলিবে, 'আপনি যে-দর্শন প্রচার করিতেছেন, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব ইহা আমাকে শিখাইয়া দিন।' আমাদের মূল কথাটা এই যে, আপনার মত আমার উপযোগী হইতে পারে না, আবার আমার মত আপনার উপযোগী হইতে পারে না। প্রত্যেকের সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন। আমার কন্যার সাধনপথ এক প্রকার, আমার পুত্রের অন্য প্রকার, আমার আবার সম্পূর্ণ [illegible] । একজন এইরূপ পূজা করিয়া উঠিয়া গেল, আর একজন আসিয়া সেই আসনে বসিয়া পূজা করিতে লাগিল—সকলেই নিস্তব্ধভাবে নিজের নিজের পূজা করিয়া চলিয়া গেল। সময়ে সময়ে একই ঘরে তিন-চার জন বসিয়া উপাসনা করে, কিন্তু প্রত্যেকের উপাসনা-প্রণালী হয়তো পৃথক। এইরূপ পূজা প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া করিতে হয়।

প্র। 'আমিত্ব' ও 'চারিত্রনীতি'র ব্যাখ্যা বেদান্ত কিরূপে করিয়া থাকেন?

প্র। চারিত্রনীতির অধিকাংশই কি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাপৃত নয়?

উ। চারিত্রনীতির সবটাই ঐ। পূর্ণব্রহ্ম কখনও মায়ার গণ্ডির ভিতর আসিতে পারেন না।

প্র। আপনি বলেন, 'আমি'ই সেই পূর্ণব্রহ্ম; আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলামঃ এই 'আমি'র জ্ঞান আছে কিনা?

উ। 'আমি' সেই পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ; আর এই ব্যক্ত অবস্থায় তাহাতে যে প্রকাশ-শক্তি কার্য করে, তাহাকেই আমরা 'জ্ঞান' বলি। অতএব সেই পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ সম্বন্ধে 'জ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ নয়, কারণ ঐ পূর্ণাবস্থা আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত।

উ। আমরা বলি, উহা প্রত্যেকের অন্তর্গত ব্যাপার—ঐ অবস্থা উপলব্ধি করিবারই বিষয়। যদি উহা কেবল কথার কথা হইত, তবে তো উহা কিছুই নয়। বেদ ঐ তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনটি উপায়ের কথা বলেনঃ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ত্ব প্রথম শুনিতে হইবে, শুনিবার পর ঐ বিষয়ে বিচার করিতে হইবে—যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস না করা হয়; বিচার করিয়া জানিয়া শুনিয়া যেন বিশ্বাস করা হয়, এইরূপে নিজ স্বরূপ বিচার করিয়া তবে উহার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে—তখন উহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধর্ম। শুধু বিশ্বাস করা ধর্মের অঙ্গ নয়। আমরা বলি, এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই

প্র। আপেক্ষিক জ্ঞান কি পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত?

ধর্ম।

উ। না, কিন্তু সমাধি-অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানভূমি যে লাভ হইয়াছে, তাহা আমরা জীবনের উপর উহার ফলাফল দেখিয়া জানিতে পারি। একজন মূর্খ নিদ্রিত হইল—নিদ্রাভঙ্গে সে যে-মূর্খ, সেই মূর্খই থাকিবে, হয়তো আরও খারাপ হইতে পারে। কিন্তু কেহ সমাধিস্থ হইলে সমাধিভঙ্গের পর—সে একজন তত্ত্বজ্ঞ, সাধু মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বুঝা যায়, এই দুই অবস্থা কতদূর ভিন্ন।

প্র। আমি অধ্যাপক—র প্রশ্নের অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাইঃ আপনি এমন সব সম্প্রদায়ের বিষয় জানেন কি, যাঁহারা আত্মসম্মোহন-তত্ত্বের (self-hypnotism) কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন? অবশ্য প্রাচীন ভারতে নিশ্চয় এই বিদ্যার খুব চর্চা ছিল, এখন আর ততদূর নাই। আমি জানিতে চাই, যাঁহারা এখন উহার চর্চা করেন, তাঁহারা ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে কি মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উহার কিরূপ অভ্যাস বা সাধন করিয়াছেন?

উ। আপনারা পাশ্চত্যদেশে যাহাকে সম্মোহনবিদ্যা (hypnotism) বলেন, তাহা আসল ব্যাপারের সামান্য অঙ্গমাত্র। হিন্দুরা উহাকে আত্মসম্মোহ-দূরীকরণ (self-de-hypnotization) বলেন। তাঁহারা বলেন, আপনারা তো সম্মোহিতই (hypnotized) রহিয়াছেন—এই সম্মোহিত ভাবকে দূর করিতে হইবে, বিগতমোহ (de-hypnotized) হইতে হইবে।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥’
১৪

ইহা তো সম্মোহন (hypnotization) নয়—মোহ দূরীকরণ বা অপসারণ (de-hypnotization)। আমরা বলিয়া থাকি, অন্য সকল ধর্মই এই প্রপঞ্চের সত্যতা শিক্ষা দেয়, অতএব তাহারা একপ্রকার সম্মোহন প্রয়োগ করিতেছে। কেবল অদ্বৈতবাদীই সম্মোহিত হইতে চান না। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন যে, সর্বপ্রকার দ্বৈতবাদ হইতেই সম্মোহন বা মোহ আসিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এমন কি বেদকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, সগুণ ঈশ্বরকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এই বিশ্ব জগৎ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি তোমার নিজের দেহ-মনকেও ফেলিয়া দাও—কিছুই যেন না থাকে, তবেই তুমি সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হইবে।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ব ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥
১৬

আমরা সম্মোহনবিদ্যার সমুদয় তত্ত্ব অবগত আছি। আমাদের যে মনস্তত্ত্ববিদ্যা আছে, তাহা পাশ্চাত্যগণ সবে জানিতে আরম্ভ করিয়াছে; তবে দুঃখের বিষয়—যতটা প্রয়োজন এখনও ততটা জানিতে পারে নাই।

উ। আমরা উহাকে ‘লিঙ্গশরীর’ বলিয়া থাকি। যখন এই দেহের পতন হয়, তখন অপর

দেহপরিগ্রহ কিরূপে হয়? শক্তি কখনও জড়পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, দেহত্যাগের পরে সূক্ষ্মভূতের কিয়দংশ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যায়। অন্তঃস্থ (internal) ইন্দ্রিয়গুলি ঐ সূক্ষ্মভূতের সাহায্য লইয়া আর একটি দেহ গঠন করে, কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহ গঠন করিতেছে—মনই শরীর গঠন করিয়া থাকে। যদি আমি সাধু হই, তবে আমার মস্তিষ্ক জ্ঞানী সাধুর মস্তিষ্কে পরিণত হইবে। আর যোগীরা বলেন, এই জীবনেই তাঁহারা নিজ দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন।

যোগীরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। রাশি রাশি মতবাদ অপেক্ষা সামান্য একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং আমি নিজে এটা বা ওটা হইতে দেখি নাই বলিয়া সেটা মিথ্যা—এ-কথা বলিবার অধিকার আমার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাসের দ্বারা সর্বপ্রকার বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যে অল্প-স্বল্প ফল পাওয়া যায়—তাহাতেই জানিতে পারা যায়, এ ব্যাপারের ভিতর কোন ভণ্ডামি নাই। আর সর্বশাস্ত্রেই যে-সকল অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে, এই যোগীরা সেইগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রশ্ন এইঃ প্রত্যেক জাতির ভিতর এই-সব অলৌকিক কার্যের বিবরণ প্রবেশ করিল কিরূপে? যে বলে—এ সমুদয় মিথ্যা, এগুলির ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে যুক্তিবাদী বা বিচারপরায়ণ বলিতে পারা যায় না। যতদিন না সেগুলিকে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছ, ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার অধিকার তোমার নাই। তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এগুলির কোন ভিত্তি নাই, তবেই তুমি ঐগুলি অস্বীকার করিবার অধিকারী হইবে। কিন্তু তাহা তো তোমরা কর নাই। অন্য দিকে যোগীরা বলিতেছেন, সেগুলি বাস্তবিক অলৌকিক ব্যাপার নয়, তাঁহারা এখনও ঐ-সব করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন। ভারতে আজ পর্যন্ত অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের কোনটিই অপ্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। মনস্তত্ত্ব-আলোচনার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ব্যতীত যদি এ-বিষয়ে আর কিছুই সাধিত না হইয়া থাকে, তবে এটুকুর গৌরবও যোগীদেরই প্রাপ্য।

উ। অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চা করিতে হইলে সেগুলির উপর যতটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, যোগী তাঁহার যোগ-বিদ্যার উপর তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। কোন বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভদ্রলোকে যতটুকু বিশ্বাস করিয়া থাকে, যোগী তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। যোগীর আদর্শ অতি উচ্চ। মনের শক্তি দ্বারা যে-সব ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, সেগুলির মধ্যে নিম্নতর বিষয়গুলি আমি দেখিয়াছি, সুতরাং উচ্চতর ব্যাপারগুলি যে হইতে পারে, এ-বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার অধিকার আমার নাই। যোগীর আদর্শ—সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার সহায়তায় শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের অধিকারী হওয়া। আমি একজন যোগীকে জানি, তাঁহাকে গোখুরা সাপে কামড়াইয়াছিল, দংশনমাত্র তিনি অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসে। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি হইয়াছিল?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল।' এই যোগীর

১৭

সমুদয় ঘৃণা, ক্রোধ ও হিংসার ভাব একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তিনি সর্বদা অনন্ত প্রেমস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, প্রেমের শক্তিতে তিনি সর্বশক্তিমান্। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। আর এইসব অলৌকিক শক্তির
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
প্রকৃত বেদান্তবাদী। আপনারা নীতিপরায়ণ, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ, তাহা জানেন না। বেদান্ত-দর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানুষকে জ্ঞাতসারে নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছে। বেদান্ত সকল ধর্মের সার।

প্র। আপনি কি বলেন, আমাদের—পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতর এমন একটা অসামাজিক ভাব আছে, যাহা আমাদিগকে এত বহুত্ববাদী (pluralistic) করিয়াছে, আর প্রাচ্যদেশীয় লোক কি আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন?

উ। আমার মতে পাশ্চাত্য জাতি অধিকতর নিষ্ঠুর, প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিগণ সর্বভূতের প্রতি অধিকতর করুণাসম্পন্ন। তাহার কারণ শুধু এই যে, প্রাচ্যের তুলনায় আপনাদের সভ্যতা খুবই আধুনিক। কোন স্বভাবকে দয়াবৃত্তির প্রভাবে আনিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু যে পরিমাণে শক্তি-সংগ্রহ চলিয়াছে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের শিক্ষা চলে নাই, বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও খুব অল্প পরিমাণেই অনুশীলন করা হইয়াছে। আপনাদিগকে সাধু ও ধীরপ্রকৃতি করিতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই ভাব প্রবাহিত। যদি আমি ভারতের কোন গ্রামে গিয়া সেখানকার লোককে রাজনীতি শিখাইতে চাই, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তাহাদিগকে বেদান্ত উপদেশ করি, তাহারা অমনি বলিবে, 'হাঁ স্বামিন্, এখন আপনার কথা বুঝিতেছি—আপনি ঠিক বলিতেছেন।' আজ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র সেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন খুবই পতিত, কিন্তু এখনও বৈরাগ্যের প্রভাব এত অধিক বিদ্যমান যে, রাজারাজড়া পর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিনা সম্বলে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান।

কোন কোন স্থানে সাধারণ গ্রাম্য বালিকাও চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে বলিয়া থাকেঃ আমাকে দ্বৈতবাদের কথা বলিও না; আমার চরকা বলিতেছে, 'সোঽহং, সোঽহম্—আমি সেই ব্রহ্ম, আমিই সেই ব্রহ্ম।' এই-সব লোকের সহিত গিয়া কথা বলুন, এবং জিজ্ঞাসা করুন, 'তোমরা এইরূপ বলিয়া থাক, অথচ ঐ পাথরটাকে প্রণাম কর কেন?' তাহারা বলিবে, 'আপনারা ধর্ম বলিতে শুধু মতবাদ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি—প্রত্যক্ষ অনুভূতি।' তাহাদের মধ্যে কেহ হয়তো বলিয়া উঠিবে, 'আমি তখনই যথার্থ বেদান্তবাদী হইব, যখন আমার সম্মুখ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তর্হিত হইবে এবং আমি সত্য দর্শন করিব। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমার সহিত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন প্রভেদ নাই। সেইজন্যই আমি এই-সব প্রস্তরমূর্তির উপাসনা করিতেছি, মন্দিরে যাইতেছি, যাহাতে আমার প্রত্যক্ষানুভূতি হয়। আমি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে দেখিতে—প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।'

উ। কখনই নাই। লোকে বলিয়া থাকে, জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। এমন কি যাহারা বিভিন্ন জাতিভুক্ত তাহারাও বলে, জাতিবিভাগ একটা খুব উঁচুদরের জিনিষ নয়। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলে যে, আমাদের ইহা অপেক্ষা ভাল অন্য কোন জিনিষ দাও, আমরা ইহা ছাড়িয়া দিব। তাহারা বলে, তোমরা ইহার বদলে আমাদিগকে কি দিবে? জাতিভেদ কোথায় নাই? তোমরাও তো তোমাদের দেশে ক্রমাগত এইরূপ একটা জাতিবিভাগ গড়িবার চেষ্টা করিতেছ। কোন ব্যক্তি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই বলিয়া বসে, কয়েক শত ধনীর মধ্যে আমিও একজন। আমরাই কেবল একটা স্থায়ী জাতিবিভাগ গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি। অপরে উহার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত এখনও সফল হয় নাই। আমাদের সমাজে অবশ্য যথেষ্ট কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষ আছে। আপনাদের দেশের কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষগুলি আমাদের দেশে চালাইয়া দিতে পারিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে? জাতিভেদ

আছে বলিয়াই এই ত্রিশ-কোটি লোক এখনও খাইবার জন্য এক টুকরা রুটি পাইতেছে। অবশ্য রীতিনীতি হিসাবে ইহা যে অসম্পূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতিবিভাগ না থাকিলে আজ আপনারা পড়িবার জন্য একখানিও সংস্কৃত বই পাইতেন না। এই জাতিবিভাগের দ্বারা এমন একটি দৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, জাতির উপর [illegible]

উ। বৌদ্ধদের কখনই বড় বিশেষ জাতিবিভাগ ছিল না, এবং ভারতে বৌদ্ধসংখ্যা অতি অল্প। বুদ্ধ একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তথাপি আমি বৌদ্ধ দেশসমূহে দেখিয়াছি, সেখানে জাতিবিভাগ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। বৌদ্ধদের জাতিবিভাগ কার্যতঃ কিছুই নয়, কিন্তু তাহারা মনে মনে নিজেদের উচ্চ জাতি বলিয়া গর্ব করিয়া থাকে।

বুদ্ধ অন্যতম বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, যেমন আজকালও অনেক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে-সব ভাব এখন বৌদ্ধধর্ম বলিয়া অভিহিত, সেগুলি তাঁহার নিজের নয়। সেগুলি অতি প্রাচীন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন, এবং ভাবগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের নূতনত্ব উহার সামাজিক ভাগ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই চিরদিন আমাদের আচার্যের আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছেন; অধিকাংশ উপনিষদ্ই ক্ষত্রিয়গণের লেখা এবং বেদের কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণদের কীর্তি। সমগ্র ভারতে আমাদের যে-সব বড় বড় আচার্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় ছিলেন; তাঁহাদের উপদেশও উদার ও সর্বজনীন, কিন্তু দুইজন ছাড়া ব্রাহ্মণ আচার্যগণের মধ্যে সকলেই অনুদারভাবাপন্ন। ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীদের অবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন না, আর তাহাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবেন না, কিন্তু যথার্থভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, এবং তিনি স্বয়ং যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় পৌঁছিবার পথ প্রদর্শন করিবেন।

উ। প্রকৃত 'আমিত্ব' সেই পূর্ণব্রহ্ম—মায়া দ্বারাই উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে উহা সর্বদাই সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বিদ্যমান—মায়া দ্বারাই উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদবোধ হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্রনীতির ভিতর ঐ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ ইহা জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে ঐরূপ চেষ্টায় ঐ একত্ব লাভ করিতেছে আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমরা 'চারিত্রনীতি'-নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সর্বদা নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

উ। হাঁ, একভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। যেমন একটা মোহর ভাঙাইয়া তাহা হইতে পয়সা সিকি দুয়ানি টাকা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মুদ্রা পাওয়া যায়, সেইরূপ ঐ পূর্ণ অবস্থা হইতে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। উহা অতিচেতন, জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা—সাধারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই ইহার অন্তর্গত। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করে, আমাদের পরিচিতি 'জ্ঞানাবস্থা'টিও তাহার সম্যক্‌রূপে থাকে। যখন সে জ্ঞানের ঐ অপর অবস্থা অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জ্ঞানাবস্থার ন্যায় অবস্থা অনুভব করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে এক ধাপ নামিয়া আসিতে হয়। এই সাধারণ জ্ঞান একটি নিম্নতর অবস্থা—মায়ার ভিতরেই কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনার অংশ

[১৮৯৬ খ্রীঃ ২২ ও ২৪ মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৈকালীন আসরে প্রশ্নোত্তর হইতে গৃহীত; এবং স্বামীজীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও আলোচনা হইতেও কিছু সংযোজিত হইয়াছে।]

১২. পুনর্জন্ম—প্রকৃতির ক্রমবিকাশ এবং অন্তর্নিহিত দেবত্বের অভিব্যক্তি।

১৪. মুক্ত মানুষের কাছে এই মুক্তি-সংগ্রামের মূল্য কখনও ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম এবং রূপই তো জগৎ সৃষ্টি করে।

১৫. প্রথম হইতেই সকল জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে—এই কথার ব্যতিক্রম কিভাবে হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারি না। যদি তুমি এবং আমি সাগরের ছোট ছোট তরঙ্গ হই, তবে সেই সাগরই তো অলক্ষ্যে সকলের পিছনে রহিয়াছে।

১৬. (গীতার) এই কয়টি কথায় আত্মাকে বর্ণনা করিতে পারিঃ এই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, বর্শা ভেদ করিতে পারে না, আগুন দগ্ধ করিতে পারে না, জলও তাঁহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে না। আত্মা অবিনাশী ও সর্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং আত্মার জন্য শোক করিও না।

পৃথিবীতে এমন একটা সময় আসিবে, যখন সব অশুভ অন্তর্হিত হইবে—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাহা কেমন করিয়া হইবে? নদী বহিয়া চলিয়াছে—একদিকে জলরাশি চলিয়া যাইতেছে, অপরদিকে আবার জলরাশি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

১৮. বেদান্ত বলেঃ তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ; শুভ ও অশুভের অতীত একটি অবস্থা আছে, সেটিই তোমার স্বভাব। এই অবস্থা শুভ অপেক্ষাও উচ্চতর। 'মন্দ' অপেক্ষা 'ভাল'—অল্প-বিচ্যুত অবস্থা-মাত্র।

পাপ বা খারাপ সম্পর্কে আমাদের কোন মতবাদ নেই। আমরা ইহাকে 'অজ্ঞান' বলি।

২২. মায়িক জগতে আমরা মুক্তির

১. যুক্তি-বিচারের সহিত যতটুকু মেলে, ব্যক্তিগতভাবে আমি বেদের ততটুকুই গ্রহণ করি। বেদের কোন কোন অংশ স্পষ্টই পরস্পরবিরোধী। বেদসমূহ পাশ্চাত্য অর্থে 'প্রত্যাদিষ্ট' বলিয়া মনে করা হয় না, উহারা জ্ঞানসমষ্টি বলিয়াই সর্ববিজ্ঞান। এই জ্ঞান কল্পারম্ভে আত্মপ্রকাশ করে এবং কল্পশেষে অব্যক্ত হয়। যখন কল্প পুনঃপ্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানও কল্পের সহিত প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তত্ত্বটি ঠিক আছে। কিন্তু শুধু বেদ-নামক শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতেই এইসব জ্ঞান আছে—এ-কথা কুতর্কমাত্র। এক স্থলে মনু বলিয়াছেন, বেদের যে-অংশ যুক্তি-বিচারের সহিত মেলে, সেই অংশই বেদ, বাকী অংশ নয়। আমাদের দার্শনিকগণ অনেকেই এই মত পোষণ করেন।

২. অদ্বৈত-দর্শনের বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনা এই কয়টি কথায় সংক্ষেপে বলা যায়ঃ এই দর্শন ইন্দ্রিয়-ভোগের সহায়ক নয়। আমরা সানন্দে ইহা স্বীকার করি।

৩. বেদান্ত-মতের আরম্ভ প্রচণ্ড দুঃখবাদে এবং সমাপ্তি প্রকৃত আশাবাদে। আমরা ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক আশাবাদ অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যের সহিত সম্বন্ধ প্রকৃত আশাবাদ স্বীকার করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে নাই, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় আছে; এবং প্রত্যেকের মধ্যেই সেই প্রকৃত সুখ আছে। সংসারে আমরা যে ধরনের আশাবাদ লক্ষ্য করি, উহা ইন্দ্রিয়-পথে মানুষকে বিনাশের দিকেই লইয়া যায়।

৪. দর্শনশাস্ত্রে আত্মত্যাগের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই ত্যাগের অর্থ যথার্থ স্বরূপকে স্বীকার করা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অস্বীকার করে বলিয়া এই ত্যাগ দুঃখবাদাত্মক, কিন্তু প্রকৃত জগৎকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহা আশাবাদী।

যে ভাব অনুভব করি, তাহা আভাস মাত্র—যথার্থ মুক্তি নয়।

২৪. বেদান্ত মানুষের যুক্তি-বিচার অনেকখানি স্বীকার করে—যদিও এই মতে বুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর আরও কিছু আছে; কিন্তু বুদ্ধির মধ্য দিয়াই সেখানে পৌঁছিবার পথ।

৫. পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র বেদই ঘোষণা করেন, বেদাধ্যয়নও গৌণ। সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা আমরা অক্ষর বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করি।
২২
সেই বিদ্যা শুধু পাঠ নয়, শুধু বিশ্বাস বা বিচার নয়, পরন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা সমাধি।

৬. মায়ার কারণ কি?—গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইতেছে। ইহার একমাত্র উত্তরঃ যখন যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্নটি উত্থাপিত হইবে, তখনই আমরা ইহার উত্তর দিব। প্রশ্নটি স্ববিরোধী। আমাদের বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্ম যেন আপেক্ষিক জগৎ হইয়াছেন। সেই নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম শুধু মায়াতে যেন কার্যকারণে বদ্ধ হইয়াছেন। যখন স্বীকার করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, তখনই মানিয়া লইতে হইবে—পরব্রহ্মে কোন-কিছু ক্রিয়াব্যাপার হইতে পারে না। ব্রহ্ম কারণাতীত। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কোন কিছু ব্রহ্মের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম যদি কারণাতীত হন, তবে কোন কিছুই তাঁহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। নিত্যমুক্ত ব্রহ্মে দেশ-কাল-নিমিত্ত থাকিতে পারে না। ইহা মানিয়া লইলে প্রশ্নটি দাঁড়াইবেঃ যাহার কোন কারণ নাই, তাহার কারণ কি? তাহা কিভাবে এইরূপে পরিবর্তিত হইল? কার্য-কারণের জগতেই তোমার এই প্রশ্ন সম্ভব। তুমি কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে এই প্রশ্ন করিতে চাহিতেছ। কেবল যখন পরব্রহ্ম কার্য-কারণাত্মক জগতে রূপান্তরিত হন এবং দেশ-কাল-নিমিত্তের আবির্ভাব হয়, তখনই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, অবিদ্যাই ভ্রম সৃষ্টি করে। এই প্রশ্ন অসম্ভব। ব্রহ্মের উপর কোন কিছুর ক্রিয়া সম্ভব নয়।

না, কোন কারণ ছিল না। আমরা জানি না বা আমরা অজ্ঞ, তাহা নয়—ব্রহ্ম জ্ঞানের বাহিরে; এবং তাঁহাকে জ্ঞানের রাজ্যে আনা যাইতে পারে না। 'আমি জানি না'—এই শব্দগুলি দুই অর্থে ব্যবহার করিতে পারি। একভাবে ইহাদের অর্থ এই যে, আমরা জ্ঞানের নিম্নে আছি, অন্যভাবে ইহাদের অর্থ—এই বস্তু জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। রঞ্জনরশ্মি এখন সুবিদিত। ইহার কারণ সম্বন্ধে দ্বিমত আছে, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই একদিন ইহার কারণ জানিতে পারিব। রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, উহার কারণ আমরা জানি না। কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ে আমরা জনিতে পারি না। রঞ্জনরশ্মির ক্ষেত্রে আমরা জানি না, যদিও উহা জ্ঞানের অন্তর্গত; শুধু এখন পর্যন্ত আমরা জানি না। কিন্তু ব্রহ্ম পরোক্ষ-জ্ঞানের এত ঊর্ধ্বে যে, তিনি কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। জ্ঞাতা কি করিয়া জ্ঞেয় হইতে পারে?
২৩
তুমি সতত স্বয়ংপূর্ণ, এবং নিজেকে বিষয়ীভূত করিতে পার না। অমৃতত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই যুক্তিটি আমাদের দার্শনিকেরা ব্যবহার করিতেনঃ যদি আমি চিন্তা করিতে চেষ্টা করি যে, আমি শায়িত মৃতদেহ, তাহা হইলে আমাকে কি কল্পনা করিতে হইবে? আমিই দাঁড়াইয়া নিজেকেই দেখিতেছি—দেখিতেছি, একটা 'মৃতদেহ' পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব আমি নিজেকে আমার দর্শনের বিষয়ীভূত করিতে পারি না।
৭. ক্রমবিকাশঃ স্থূল বিকাশে—আকাশ এবং প্রাণের অভিক্ষেপ ও উহাদের সূক্ষ্ম অবস্থায়

প্রত্যাবর্তন-ব্যাপারে—ভারতীয় চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বকীয় মত আছে, যোগীদেরও আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, যোগীদের ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ‘প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে পরিণত হয়।’

২৪

মূল ভাবটি এই যে, আমরা এক প্রজাতি হইতে অপর এক প্রজাতিতে পরিণত হইতেছি এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ প্রজাতি। ‘চাষী যেমন জমিতে জলসেচ করে’—এই উপমার দ্বারা পতঞ্জলি প্রকৃতির আপূরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২৫

আমাদের শিক্ষা ও প্রগতির একমাত্র অর্থ হইতেছে অন্তরায়গুলি অপসারিত করা, তাহা হইলে স্বভাবতই দেবত্ব বিকশিত হইবে। ইহা দ্বারা জীবন-সংগ্রামের মতবাদ খণ্ডিত হয়। জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতাগুলি পথিমধ্যেই অনুভূত হয়, এবং ঐগুলি নিঃশেষে অপসারিত করা যায়। ক্রমবিকাশের জন্য অভিজ্ঞতাগুলি প্রয়োজন হয় না। ঐগুলি না থাকিলেও আমাদের অগ্রগতি হইবে। বস্তুর স্বভাবই হইল বিকশিত হওয়া। গতিবেগ বা প্রেরণা (momentum) [illegible] সেগুলি না থাকিলেও মানুষ অগ্রসর হইবে এবং ঈশ্বররূপে বিকশিত হইবে, কারণ ঈশ্বরের স্বভাবই বাহির হইয়া আসা ও নিজেকে বিকাশ করা। প্রতিযোগিতার ভয়াবহ ভাবের পরিবর্তে এই ভাবটি আমার অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যতই ইতিহাস পাঠ করি, ততই মনে হয়, প্রতিযোগিতার ভাবটি ভুল। কেহ কেহ বলে যে, মানুষ যদি মানুষের সহিত যুদ্ধ না করিত, তাহা হইলে সে উন্নতি করিতে পারিত না। আমিও অনুরূপ চিন্তা করিতাম। কিন্তু এখন দেখি যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধ মানুষের উন্নতি ত্বরান্বিত না করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া দিয়াছে। একদিন আসিবে, যখন মানুষ নূতন আলোকে ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে এবং দেখিবে যে, প্রতিযোগিতা (প্রগতির) কারণ বা কার্য কিছুই নয়। প্রতিযোগিতা পথের একটি দৃশ্য মাত্র, ক্রমবিকাশের জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি মনে করি—পতঞ্জলির সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যাহা যুক্তি-বিচারশীল মানুষ গ্রহণ করিতে পারে। আধুনিক মতবাদ কত অশুভ সৃষ্টি করে! এই চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দুষ্ট ব্যক্তি যেন দুষ্ট হইবার ছাড়পত্র পাইয়াছে। এই দেশে (মার্কিনে) এমন সব পদার্থবিজ্ঞানী দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন, সমস্ত অপরাধীদের নির্মূলভাবে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে—সমাজ হইতে অপরাধপ্রবণতা দূর করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

পরিবেশগুলি বাধা দিতে পারে, কিন্তু প্রগতির জন্য সেগুলি প্রয়োজন নয়। প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, একজন হয়তো পারিপার্শ্বিক অবস্থা জয় করিতে পারে, কিন্তু একজনের জয়ের অর্থ সহস্রজনকে বিতাড়িত করা। সুতরাং ইহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। যাহা একের সহায়ক ও বহুর প্রতিবন্ধক, তাহা কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না। পতঞ্জলি বলেন, আমাদের অজ্ঞানের জন্যই এই-সকল সংগ্রাম এখনও রহিয়াছে। সংগ্রাম মানুষের ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজন নয়, অথবা উহার অঙ্গ নয়। আমাদের অসহিষ্ণুতাই সংগ্রাম সৃষ্টি করে। পথ রচনা করার ধৈর্য আমাদের নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারেঃ একটি নাট্যশালায় আগুন লাগিয়াছে; অল্প কয়েকজনই বাহির হইতে পারে। অবশিষ্ট সকলে বাহিরে যাইবার চেষ্টায় পরস্পরকে পিষিয়া ফেলে। গৃহটি রক্ষা করিবার জন্য, অথবা যে দুই-তিন জন পলাইয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য এই প্রচণ্ড হুড়াহুড়ির প্রয়োজন ছিল না। যদি সকলে ধীরে ধীরে বাহিরে যাইত, তবে একজনও আহত হইত না। জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম ব্যতীতই আমরা সকলে বাহিরে যাইতে পারি। তথাপি আমরা সংগ্রাম করি।

আমাদের অজ্ঞান ও অধৈর্যের দ্বারা আমরা এই সংগ্রাম সৃষ্টি করি। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ততার ভিতর থাকি। নিজেকে শান্ত রাখা এবং স্বাবলম্বী হওয়া শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

৮. প্রতিটি জীব একটি বৃত্ত। বৃত্তের কেন্দ্র শরীরেই অবস্থিত এবং কার্য-শক্তি সেখানেই প্রকাশিত। তুমি সর্বত্র বিদ্যমান, যদিও তুমি বোধ কর—তুমি শুধু একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। সেই কেন্দ্রটি জড়কণাগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য একটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছে। যাহার মাধ্যমে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাকেই 'শরীর' বলে। তুমি সর্বত্র বিরাজমান। যখন একটি দেহ বা যন্ত্র তোমার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, তখন কেন্দ্রটি সরিয়া গিয়া অন্য সূক্ষ্ম বা স্থূল জড়কণা সংগ্রহ করে এবং সেগুলির মাধ্যমে কাজ করে। এই হইল জীব বা মানুষ। আর ঈশ্বর কি? ঈশ্বর একটি বৃত্ত, যাহার পরিধির সীমা নাই এবং কেন্দ্র সর্বত্র। সেই বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দু জীবন্ত, সচেতন, সক্রিয় এবং সমভাবে কর্ম করিতেছে। আমাদের সীমাবদ্ধ জীবাত্মাসমূহের কেবল একটি বিন্দু চেতনাময় এবং সেই বিন্দুটি সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হয়।

আত্মা একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি সীমাহীন, কিন্তু কেন্দ্র কোন একটি দেহে অবস্থিত। মৃত্যু শুধু এই কেন্দ্রের সামান্য পরিবর্তন। ঈশ্বর একটি বৃত্ত, যাহার পরিধির সীমা নাই এবং কেন্দ্র সর্বত্র অবস্থিত। আমরা যখন সীমাবদ্ধ দেহের এই কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসিতে পারিব, তখনই আমাদের যথার্থ স্বরূপ—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

৯. প্রত্যেক আত্মায় দেবত্ব অন্তর্নিহিত। বাহ্য ও অন্তঃ-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—ইহাদের যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া অথবা একাধিক বা সকলগুলির সাহায্যে এই দেবত্ব বিকাশ কর এবং মুক্ত হও। ইহাই তো ধর্মের আদি অন্ত। মতবাদ, বদ্ধ ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্র-মন্দির বা পদ্ধতি ধর্মের গৌণ অঙ্গমাত্র।

১০. ধর্মবিষয়ক কোন বিশেষ মতে বিশ্বাস না থাকাই জ্ঞান; কিন্তু এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জ্ঞান কোন ধর্মমতকে ঘৃণা করে। জ্ঞানের দ্বারা বোঝায় যে, ধর্মমতের ঊর্ধ্বে একটি অবস্থা লাভ করা গিয়াছে। জ্ঞানী (যথার্থ দার্শনিক) কোন কিছুই ধ্বংস করিতে চান না, বরং সকলকেই সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন। নদী যেমন তাহাদের জলধারা সাগরে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সেখানে সব এক হইয়া যায়, তেমনি সকল ধর্মমতের গতি জ্ঞানের অভিমুখে এবং সেখানেই এক হইয়া যায়।

জ্ঞানযোগ সংসার ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাই বলিয়া পরাজিত মনোভাব লইয়া সংসার ছাড়িতে বলে না। ত্যাগের প্রকৃত পরীক্ষা—সংসারে থাকিয়াও সংসারের না হওয়া।

১১. বেদান্তী বলেনঃ মানুষের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই; মানুষ স্বর্গেও যায় না। আত্মার সম্পর্কে পুনর্জন্ম-প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে যেন একটি পৌরাণিক কাহিনী। একখানি পুস্তকের পৃষ্ঠা উলটানোর উদাহরণ দেওয়া হয়। পুস্তকের বিষয়বস্তুরই ক্রমিক প্রকাশ হয়, মানুষের নয়। আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং তাহার আবার আসা-যাওয়া কোথায়? এই জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত পরিবর্তন মাত্র। এগুলিকে আমরা নিজেদের পরিবর্তন বলিয়া ভুল করি।

১৩. বেদান্ত বলেনঃ অতীতের ভিত্তির উপরই এই জীবন গঠিত হইয়াছে এবং যখনই আমাদের সমগ্র অতীতকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। শৈশব হইতেই মুমুক্ষুত্ব বা মুক্ত হইবার ইচ্ছা ধর্মভাবের আকার ধারণ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে যেন সকল তত্ত্ব স্পষ্ট হইয়া যায়। এই দেহত্যাগের পর পরবর্তী জীবনের জন্য অপেক্ষমাণ জীবাত্মা—প্রাকৃতিক জগতেই বাস করে।

১৭. যদি কেহ খুব খারাপ হইয়া থাকে, আমরা বিশ্বাস করি, সে ভবিষ্যতে আবার ভাল হইবে। মূল তত্ত্ব এই—সকলকেই শাশ্বত মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। মুক্তিলাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাদের মুক্ত হইবার বাসনা ব্যতীত আমাদের অন্য সব বাসনাই ভ্রান্তিজনক। বেদান্তমতে প্রত্যেক সৎকর্মই মানুষের সেই মুক্তভাবের প্রকাশ।

১৯. মানুষের সঙ্গে যা কিছু ব্যবহার ও সমগ্র নীতিশাস্ত্র—সবই জাগতিক ব্যাপার। সত্য বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে বলা যায়ঃ তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি, তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ; ঈশ্বরের উপর অজ্ঞান আরোপ করার কথা চিন্তাই করিব না। চিন্তা বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার সকল প্রয়াসই সেই পরব্রহ্মকে জাগতিক করিয়া ফেলে। ইহাতে ব্রহ্মভাবের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়।

২০. একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, ইন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে ঐ ভাবের কথা জোর করিয়া বলা চলে না। কারণ তুমি যদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে থাকিয়া বল, 'আমিই ঈশ্বর', তবে কে তোমাকে অন্যায় কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে? সুতরাং তোমার দেবত্ববিষয়ক দৃঢ় ঘোষণা কেবল পারমার্থিক জগতেই খাটে। আমিই যদি ঈশ্বর হই, তবে তো আমি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বহু ঊর্ধ্বে। সুতরাং কোন অন্যায় কাজ আমি করিতে পারি না। নৈতিকতা অবশ্য মানুষের লক্ষ্য নয়, তবে ইহাই ঐ মুক্তভাব লাভ করিবার উপায় মাত্র। বেদান্তমতে 'যোগ' মানুষের এই দেবত্ব (ব্রহ্মত্ব) অনুভব করিবার একটি উপায় মাত্র। বেদান্ত বলেন, অন্তর্নিহিত মুক্তভাব উপলব্ধি করিলেই ঐ দেবত্ব অনুভব করা যায়। যাহা কিছু বাধা দেয়, সব দূরীভূত হয়। ধার্মিক আচরণ ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি—যে যাহার আসন যথাস্থানে করিয়া লইবে।

২১. বেদান্তে সাধনার স্থান আছে, ভয়ের স্থান নাই। সব ভয় তখনই চলিয়া যাইবে, যখন তুমি তোমার স্বরূপ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিবে। যদি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, বদ্ধই হইয়া থাকিবে; আর মুক্ত বলিয়া মনে করিলে মুক্ত হইয়া যাইবে।

২৩. বাস্তবিক পক্ষে—জড়, মন ও আত্মায় কোন ভেদ নাই। ঐগুলি সেই একই বস্তুকে অনুভূতি করার বিভিন্ন দিক্ মাত্র। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিলে এই জগৎকেই জড় বস্তু বলিয়া মনে হয়; দুষ্ট লোকের কাছে জগৎটা নরক—সৎ লোকের কাছে স্বর্গ, আর জ্ঞানীর কাছে ইহা ঈশ্বররূপে অনুভূত হয়।

২৫. মনের চিন্তাগুলি (চিত্তবৃত্তি) থামাইতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা চিন্তার পারে। 'নেতি নেতি' করিয়া আমরা এ অবস্থায় পৌঁছিতে পারি। 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা ব্যাবহারিক জগৎ লোপ পাইলে যাহা থাকে, তাহাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যথার্থ স্বরূপ কখনই ব্যক্ত করা যায় না—প্রকাশ করা যায় না, কারণ প্রকাশ করিতে গেলেই তো আবার ইচ্ছার উৎপত্তি হইবে।

২৬. এটি ঠিক যে, আমরা (চিন্তার) একটি প্রণালী সৃষ্টি করি, কিন্তু কোন প্রণালীই যে পূর্ণ নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ সত্য অবশ্যই সকল প্রণালীর অতীত বস্তু। ইহার সহিত অন্যান্য প্রণালীর তুলনা করিতে আমরা প্রস্তুত এবং আলোচনায় এ-কথাও প্রমাণ করা যাইবে যে, এই প্রণালীই সর্বাপেক্ষা যু্ক্তিসম্মত; তথাপি এ প্রণালীটি পূর্ণ নয়, কারণ বিচার কখনই পূর্ণ নয়। যাহা হউক, এই জ্ঞানযোগই মানবীয় অনুভূতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত উপায়।

এ কথা কিছুটা সত্য যে, কোন পদ্ধতি নিজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রসারশীল হইবেই। কোন চিন্তাপ্রণালী বেদান্তের মত এত বেশী বিস্তার লাভ করে নাই। আজও ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মাধ্যমেই শিক্ষালাভ অত্যন্ত কার্যকর হইয়া থাকে। বহু গ্রন্থপাঠ করিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না। যাঁহারা সত্যিকারের মানুষ ছিলেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত সংস্পর্শ পাইয়াই বড় হইয়াছিলেন। প্রকৃত মানুষের সংখ্যা সত্যই অত্যন্ত কম, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হইয়া যাইব। এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন পৃথিবীতে শুধু সুখই থাকিবে, কোন দুঃখ থাকিবে না।

২৭. বেদান্ত-দর্শনই বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্যান্য দর্শনগুলির ভিত্তি। কিন্তু অদ্বৈত-দর্শনের

আধুনিক সম্প্রদায় বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহারা বৌদ্ধদের অনেকগুলি সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য হিন্দুগণ—অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুগণ কখনই তাহা স্বীকার করিবে না, কারণ তাহাদের কাছে বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু সমগ্র অদ্বৈতবাদ সম্প্রসারিত করিয়া বিরুদ্ধবাদীদেরও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার একটা প্রচেষ্টা সচেতনভাবেই চলিয়াছে।

২৮. বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। সকল মতের সমন্বয়-সাধনই বেদান্তের ভাব। উত্তরদিকের (মহাযান) বৌদ্ধগণের সহিত আমাদের মোটেই কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও দক্ষিণাংশের (হীনযান) বৌদ্ধগণের মতে এই ব্যাবহারিক জগৎ সত্যই আছে এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেনঃ এই জগতের পিছনে পারমার্থিক জগৎ সৃষ্টি করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? এ বিষয়ে বেদান্তের উত্তর এই যে, বিবৃতিটি ভ্রমাত্মক। কারণ বেদান্ত কখনই বিবাদ করিয়া বলে না যে, একটি পারমার্থিক জগৎ ও একটি ব্যাবহারিক জগৎ বিদ্যমান। বেদান্তের মতে সত্য এক, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ব্যাবহারিক জগৎ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই পারমার্থিক। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। হয় রজ্জু, নয় সর্প, কিন্তু একই সময়ে কখনই দুইটি নয়। সুতরাং আমরা দুইটি জগতের অস্তিত্ব মানি—আমাদের মতবাদ সম্পর্কে বৌদ্ধদের এই বিবৃতি একেবারেই অমূলক। যদি তাহারা চায়, তাহাদের বলিবার অধিকার আছে, জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের এরূপ বিবাদ করিবার অধিকার নাই যে, অপরের ইহাকে পারমার্থিক বলিবার কোন অধিকার নাই।

২৯. ইচ্ছাশক্তিঃ বৌদ্ধধর্ম এই ব্যাবহারিক জগৎ চায় না। এই মতে ব্যাবহারিক জগতেই তৃষ্ণা (বাসনা) বিদ্যমান, এবং এই তৃষ্ণাই এ সকল সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক বৈদান্তিকগণ এ কথা একেবারেই স্বীকার করেন না। আমরা বলি, কিছু একটা আছে, যাহা ইচ্ছা (বাসনা)-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বাসনা সৃষ্ট পদার্থ—যৌগিক; মৌলিক নয়। বাহ্য বিষয় না থাকিলে কোন বাসনার সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি, বাসনাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—এই মতটি একেবারেই অসম্ভব। কেমন করিয়া তাহা হইবে? বাহ্য বিষয়ের প্রেরণা ব্যতীত তুমি কি কখনও ইচ্ছা বা বাসনার অস্তিত্ব বোধ করিয়াছ? প্রেরণা ব্যতীত অথবা আধুনিক দার্শনিক পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত কোন বাসনার উদ্রেক হয় না। ইচ্ছা বা বাসনা মস্তিষ্কের একপ্রকার প্রতিক্রিয়া মাত্র—সাংখ্য-দার্শনিকদের মতে ইহা 'বুদ্ধি'। এই প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং ক্রিয়া মানিলেই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব না থাকিলে ইচ্ছাও থাকিতে পারে না; তথাপি তোমাদের মত অনুসারে বাসনাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। বাসনা কে সৃষ্টি করে? যেখানে বাসনা, সেখানেই জগৎ। যে প্রেরণা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই প্রেরণা হইতেই জাত বহু সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অন্যতম বাসনা। কিন্তু দর্শন এখানেই ক্ষান্ত হয় না। বাসনা বা ইচ্ছা একেবারেই ব্যক্তিগত, সুতরাং আমরা শোপেনহাওয়ারের সঙ্গে মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক সৃষ্টি—অন্তরের ও বাহিরের মিশ্রণে উৎপন্ন। মনে কর, কোন লোক জ্ঞানেন্দ্রিয়-বর্জিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ফলে তাহার কোন ইচ্ছাই থাকিবে না। ইচ্ছার বিকাশের জন্য প্রথমতঃ বাহিরের কোন বস্তু থাকা চাই। তারপর ভিতর হইতেও মস্তিষ্ক কিছু শক্তি সংগ্রহ করে। সুতরাং ইচ্ছা এই দেওয়াল বা অন্যান্য বস্তুর মতই একটি যৌগিক পদার্থ। এই-সকল জার্মান দার্শনিকের ইচ্ছা-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমরা মোটেই একমত নই। ইচ্ছা নিজেই ব্যাবহারিক, সুতরাং উহা কখনই পরম সত্য হইতে পারে না। বাসনা বা ইচ্ছা বহু প্রক্ষেপের অন্যতম। এমন একটা কিছু আছে, যাহা ইচ্ছা নয়, কিন্তু নিজেকে ইচ্ছারূপে প্রকাশ করিতেছে—এ-কথা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছাই সবকিছু হইয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতেছে—এ-কথা বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা তো জগৎ হইতে পৃথক কোন ইচ্ছার অস্তিত্বের কল্পনাই করিতে পারি না। যখন সেই মুক্ত সত্তা ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, দেশ-কাল-নিমিত্তের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। ক্যাণ্টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে দেখিব যে, ইচ্ছা—দেশ কাল ও নিমিত্তের মধ্যেই বর্তমান। তাহা হইলে কেমন করিয়া উহা পরম সত্য হইবে? কালের মধ্যে ছাড়া কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না।

৩০. ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্যবস্তু—তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরীক্ষার দ্বারা দেখাইতে আমরা পারিব না। তবে নির্দেশ করিতে পারিব যে, ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত—যাহাতে উপনীত হওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ এই একত্ব সকল বস্তুতে, এমন কি সাধারণ পদার্থের মধ্যেও অবশ্যই অনুস্যূত আছে। মানববুদ্ধিপ্রসূত সামান্যীকরণ পদ্ধতিকে উদাহরণস্বরূপ নিতে পারি: যাহা কিছু বিভিন্নতা, তাহা নাম ও রূপের দ্বারাই হইয়াছে; তথাপি যখনই আমরা এই নাম-রূপকে ধরিতে যাই, পৃথক করিয়া বুঝিতে যাই, তখনই দেখি, ইহাদের অস্তিত্ব কোথাও নাই। নাম-রূপ বা কারণকে পৃথকভাবে আমরা কখনও দেখিতে পাই না। তাই এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়া—ব্রহ্মের সত্তার উপরই নির্ভরশীল একটা কিছু, ব্রহ্ম ব্যতীত তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। দৃষ্টান্তরূপে সাগরের তরঙ্গকে লওয়া যাক। যতক্ষণ নির্দিষ্ট পরিমাণ জল তরঙ্গের আকারে থাকে, ততক্ষণই তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকিবে। কিন্তু যখনই (জলরাশির) ঐ আকার মিলাইয়া যায়, উহা সমুদ্রই হইয়া যায়, তখন আর তরঙ্গ থাকে না। সমগ্র জলরাশি তরঙ্গের আকারের উপর নির্ভরশীল নয়। সাগর সর্বদাই বিদ্যমান, কেবল (মাঝে মাঝে) তরঙ্গের আকৃতি একেবারে শূন্য হইয়া যায়।

৩১. সত্য বস্তু এক। মনই সেই এককে বহুরূপে প্রতিভাত করিতেছে। যখন আমরা বিভিন্নতা অনুভব করি, তখন এক-বোধ থাকে না, এবং যখনই একত্বের উপলব্ধি করি, তখন বিভিন্নতা লোপ পায়। ঠিক যেমন প্রাত্যহিক জীবনে—যখন একত্ব অনুভব কর, তখন বিভিন্নতা অনুভব কর না। তোমরা প্রথমে একত্ব হইতে শুরু কর। ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে, প্রথম প্রথম কোন চীনা একজন আমেরিকাবাসীর সঙ্গে অপর আমেরিকাবাসীর আকৃতিগত কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে না; এবং তোমরাও (আমেরিকাবাসীরা) বিভিন্ন চৈনিকের পার্থক্য ধরিতে পার না।

৩২. আমাদের মনই যে সকল পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া দেয়, তাহা দেখানো যাইতে পারে। যে-সব পদার্থের বিশেষ ধর্ম বা গুণ আছে, সেগুলিই জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের পর্যায়ে পড়ে। যাহার কোন ধর্ম বা গুণ নাই, তাহা অজ্ঞেয়। মনে কর, 'ক' নামে কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বহির্জগৎ বর্তমান। যখন আমি এই বহির্জগতের দিকে তাকাইব, তখনই তাহা হইবে 'ক'+মন। যখন আমি জগৎকে জানিতে চাই, তখন আমার মনই হইবে জ্ঞানের তিন-চতুর্থাংশ উপাদান। অন্তর্জগৎ হইবে 'খ'+মন, এবং বহির্জগৎ='ক'+মন। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা মনেরই সৃষ্টি, বাকী যাহা কিছু আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহা জ্ঞানের পরিধিরও বাহিরে এবং যাহা কিছু জ্ঞানের অতীত, তাহার বিভাজন বা পৃথক্করণ অসম্ভব। সুতরাং বাহিরের 'ক' ও ভিতরের 'খ' একই বস্তু। অতএব সত্যবস্তু এক।

৩৩. মায়ার আবরণের মধ্য দিয়ে দৃষ্ট পরব্রহ্মই ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর। যখন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাঁহাকে ধরিতে চাই, তখনই তাঁহাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকাররূপে দেখিতে পাই। কিন্তু ভাবটি এই যে, আত্মাকে কখনই জ্ঞানের বিষয় করা যায় না। জ্ঞাতা কিভাবে নিজেকে জানিতে পারে? কিন্তু আত্মা যেন একটি ছায়া প্রক্ষেপ করিতে পারেন—এই ছায়াপাতকেই জ্ঞানের বিষয়ীকরণ (objectification) বলা যাইতে পারে। এই ছায়াসত্তার চরম প্রকাশ পরমাত্মার নিজেকে নিজের জ্ঞানের বিষয় করার চেষ্টাই ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকার ঈশ্বর। আত্মাই শাশ্বত জ্ঞাতা (subject)। আমরা সর্বদাই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি। আর এই সংগ্রামের ফলস্বরূপ এই বিশ্বজগৎ, এবং যাহাকে আমরা জড়বস্তু ও অন্য অনেক নামে অভিহিত করি—এই-সবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি সব দুর্বল প্রচেষ্টার ফল; আমাদের পক্ষে সম্ভব—আত্মার সর্বোচ্চ প্রকাশ ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকার ঈশ্বর। এই বিষয়ীকরণ আমাদের স্বরূপ-প্রকাশেরই এক প্রচেষ্টা। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই পুরুষকে এই-সকল বিষয় দেখাইতেছে, এবং যখন পুরুষের যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তখনই সে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বহু সাধনার পর আত্মা দেখেন যে, জ্ঞাতা (বিষয়ী=subject) সর্বদা জ্ঞাতামাত্রই থাকিবেন এবং তখনই অনাসক্তি আরম্ভ হয় এবং আত্মা মুক্ত হন।
কোন ব্যক্তি যখন সেই পূর্ণ অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর-স্বরূপ হন। 'আমি ও আমার পিতা এক।' তিনি জানেন যে, ব্রহ্মের সহিত তিনি এক এবং সাকার ঈশ্বরের ন্যায় নিজেকে অভিক্ষেপ করেন। তিনিও খেলা করেন—মহিমান্বিত রাজাও যেমন মাঝে মাঝে পুতুল লইয়া খেলা করেন।

৩৪. কতকগুলি কল্পনা মানুষের বাকী বন্ধন ছিন্ন করিতে সাহায্য করে। গোটা বিশ্বই একটা কল্পনা। কিন্তু একধরনের কল্পনা অন্য ধরনের কল্পনা দূরীভূত করিতে পারে। যে-সব কল্পনা আমাদের বলে যে, জগতে পাপ আছে, দুঃখ ও মৃত্যু আছে, সেগুলি ভয়ঙ্কর। আর যে-সব কল্পনা বলে, তুমি পবিত্র, ঈশ্বর সত্য, জগতে কোন দুঃখ নাই—সেগুলি শুভ এবং অপরের বন্ধন দূর করিতে সাহায্য করে। মানব-মনের উচ্চতম কল্পনা—ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর-ভাবই শৃঙ্খলের সব-কয়টি শিকলি ভাঙিয়া ফেলিতে পারে।

৩৫. পরম আনন্দের মুহূর্ত আমাদের জীবনে কখনও কখনও আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা আনন্দ ছাড়া কোন-কিছুই চাই না, কোন-কিছু দিই না, কোন-কিছু বুঝিও না। সে-ভাব কাটিয়া যায়, আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্যে চোখের সামনে আবর্তিত দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সবকিছুর আধাররূপে অবস্থিত ঈশ্বর-সত্তার উপর বিরচিত বিচিত্র কারুকার্য।

বেদান্ত শিক্ষা দেয়—এখানে এইক্ষণেই নির্বাণ লাভ করা যায়; এ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। নির্বাণ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি—এক মুহূর্তের জন্য যদি কেউ একবার এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সে আর ব্যক্তিত্বের মরীচিকার দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে না। চক্ষু থাকিলে আপাতপ্রতীয়মান জগৎ দেখিতেই হইবে। কিন্তু জগৎটা যে কি, তাহা আমরা সর্বক্ষণ জানি; আমরা ইহার প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারিয়াছি। (মায়ার) পর্দাই অপরিণামী আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পর্দা সরিয়া যাইলেই অন্তরালবর্তী আত্মাকে দেখিতে পাইব। যাহা কিছু পরিবর্তন, তাহা পর্দাতেই। মহাপুরুষদের অন্তরে এই আবরণ খুবই পাতলা, সত্য তাহার মধ্য দিয়া প্রায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। আর পাপীর মধ্যে এই আবরণ বেশ পুরু, ইহার অন্তরালে যে আত্মা আছেন, তাহা দেখাই যায় না। যখন পর্দা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তখন বুঝিতে পারি যে, পর্দা সেভাবে কোন কালেই ছিল না, এবং আমরা আত্মাই ছিলাম, তাছাড়া আর কিছুই ছিলাম না; তখন ঐ আবরণের কথাও আমরা ভুলিয়া যাই।

৩৬. জীবনের দুইটি বিশিষ্ট ধারা এইঃ প্রথমতঃ যে-মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপকে জানিয়াছে, সে কখনই জাগতিক বস্তু দ্বারা বিচলিত হইবে না; দ্বিতীয়তঃ কেবল সেই ব্যক্তিই জগতের কল্যাণ করিতে পারে; সেই কেবল অপরের হিত করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে, কারণ কেবল একটি (আত্মা)ই আছেন। ইহাকে ‘অহংভাব’ বলা চলে না, কারণ তাহাতে ভেদবুদ্ধি আসিবে। ইহা কেবল অহংশূন্যতা। বিশ্বাত্মার (সমষ্টি-) বোধই তখন থাকিবে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (ব্যষ্টি) ভাব নয়। প্রেম ও সহানুভূতি—প্রতি ক্ষেত্রে এই বিশ্বাত্মাভাবই প্রমাণ করে। ‘নাহং, তুঁহু’—আমি নই, তুমি। অপরকে সাহায্য করি, কারণ আমি তাহাতে এবং সে

আমাতে—এভাবেই এই তত্ত্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়। প্রকৃত বেদান্তবাদীই কোনরূপ মর্ম-পীড়া বোধ না করিয়া অপরের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে পারেন; কারণ তিনি জানেন, তাঁহার মৃত্যু নাই। যে পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি কীট জীবিত থাকিবে, সে পর্যন্ত তিনিও থাকিবেন; যতক্ষণ একটি মুখও আহার গ্রহণ করে, ততক্ষণ তিনিও আহার করেন। সুতরাং তিনি লোককল্যাণে কাজ করিয়া যান, শরীরের যত্ন লইবার আধুনিক ভাব দ্বারা তিনি কোনরূপ ব্যাহত হন না। সাধন যখন আত্মত্যাগের এই স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি সকল নৈতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে—সকল বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে চলিয়া যান। ‘তিনি বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গাভীতে, কুকুরে এবং অতি দুঃখপূর্ণ স্থানে [illegible] ব্রাহ্মণ, গাভী, কুকুর বা দুঃখপূর্ণ স্থান দেখেন না, পরন্তু সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রকাশিত দেখিতে পান।’ তিনিই একমাত্র সুখী; তিনি এ জীবনেই এই সাম্যভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি [illegible] জয় করিয়াছেন। ঈশ্বর নির্দোষ, সুতরাং [illegible] যীশু বলিয়াছেন, ‘এব্রাহামের পূর্বে আমি ছিলাম।’ ইহার অর্থ এই যে, ইঁহারা নিত্যমুক্ত আত্মা। অতীত কর্মফলে বাধ্য হইয়া ন্যাজারেথের যীশু মানবদেহ ধারণ করেন নাই, পরন্তু লোককল্যাণের জন্যই করিয়াছেন। মানুষ মুক্ত হইলে স্তব্ধ বা জড়বৎ হইয়া যায় না, বরং অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী ক্রিয়াশীল হয়, কারণ অপর সকলে শুধু বাধ্য হইয়া কাজ করে, মুক্ত পুরুষই কেবল স্বাধীনভাবে কর্ম করেন।

৩৭. ব্যক্তিত্ব: আমরা যদি ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হই, তবে কি আমাদের ব্যক্তিত্ব নাই? হাঁ, আছে। সেই তো ঈশ্বর। আমাদের ব্যক্তিত্বই ঈশ্বর। বর্তমানে তোমার যাহা আছে, তাহা ব্যক্তিত্ব নয়, তবে তুমি ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছ। ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ [illegible] যাহা আর ভাগ করা যায় না। বর্তমান অবস্থাকে তুমি কেমন করিয়া ব্যক্তিত্ব বলিতে পার? এই মুহূর্তে তুমি একভাবে চিন্তা করিতেছ, পরমুহূর্তে অন্যভাবে, আবার দুই-ঘণ্টা পরে আর একভাবে চিন্তা করিতেছ। যাহা পরিবর্তনীয় নয়, তাহাই ব্যক্তিত্ব—সর্ব বস্তুর পারে অপরিবর্তনীয়। চিরকাল একই অবস্থায় আবদ্ধ থাকা তো অতি ভয়াবহ ব্যাপার, কারণ তাহা হইলে যে চোর, সে চিরকাল চোরই থাকিয়া যাইবে, আর যে অভদ্র, সে অভদ্রই থাকিয়া যাইবে। একটি শিশু মারা গেলে তাহাকে চিরকাল শিশুরূপেই থাকিতে হইবে। যাহার কখনও পরিবর্তন হয় না এবং হইবে না, তাহাই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব—আর তাহাই আমাদের অন্তর্যামী ভগবান্।

৩৮. ঈশ্বর যুক্তি-বিচার করেন না। কোন বিষয় জানা থাকিলে তুমি তর্ক করিবে কেন? কতকগুলি তথ্য পাইবার জন্য আমাদিগকে কীটের মত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে হইবে, আবার খানিক বাদেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সবকিছু তালগোল পাকাইয়া যাইবে—এ দুর্বলতার চিহ্ন। আত্মা প্রতিফলিত হন মনে ও প্রত্যেক বস্তুতে। আত্মার জ্যোতিঃই মনকে চেতনাশীল করে। সবকিছুই চৈতন্যের প্রকাশ; মনগুলি তাঁহার দর্পণ মাত্র। যাহাকে তোমরা প্রেম, ভয়, ঘৃণা, পুণ্য ও পাপ বল, সবই আত্মার প্রতিফলন মাত্র। যখন প্রতিফলক নিকৃষ্ট হয়, তখন প্রতিফলনও মন্দ হইবে।

৩৯. এক সময়ে আমরা নিম্নতর জীব ছিলাম। আমরা মনে করি, তাহারা আমাদের অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। আমি পাশ্চাত্য দেশে লোকদের বলিতে শুনিয়াছি, ‘এ জগৎ আমার জন্যই সৃষ্ট।’ যদি বাঘেরা বই লিখিতে পারিত, তাহারা লিখিত—মানুষ তাহাদেরই জন্য সৃষ্ট, এবং মানুষ অত্যন্ত পাপী জীব, কারণ তাহারা সহজে বাঘের কাছে ধরা দেয় না। যে-কীট আজ তোমার পায়ের তলা দিয়া চলিয়াছে, সেও ভাবী ঈশ্বর।

৪০. প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি—এই মত আমি মানি না। ইহার যে কি অর্থ, তাহাও আমি বুঝিতে পারি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই মানুষ প্রগতিশীল হইয়াছে।

এ কথা বলা যাইতে পারে যে, উচ্চতর নিয়ম দ্বারাই নিম্নতর নিয়ম জয় করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও জয়শীল মন মুক্তির চেষ্টাই করিতেছে এবং যেই মাত্র বোঝা গিয়াছে, সংগ্রামও নিয়মের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে, তখনই উহাকে জয় করার চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রে মুক্তিই ছিল উদ্দেশ্য। গাছ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই, শুক্তি-ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না—তথাপি তাহারা মানুষের চেয়ে উচ্চতর নয়। এই জীবনই মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা! কি সমাজে, কি রাজনীতিতে, কি ধর্মজীবনে নিয়মানুবর্তিতা বেশী দূরে লইয়া গেলে আমরা জড়ে পরিণত হইব। খুব বেশী নিয়ম মৃত্যুরই নিশ্চিত চিহ্ন। যেখানেই সমাজে নিয়মের আধিক্য দেখা দেয়, সেখানে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমাজ শীঘ্রই মরিবে। যদি তোমরা হিন্দুভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর, তবে দেখিবে হিন্দুর মত অন্য কোন জাতির জীবনে এত বেশী নিয়ম প্রচলিত নাই, এবং ফলে জাতি-হিসাবে হিন্দুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের একটি বিশেষ ভাব ছিল এই যে, তাহারা কখনও ধর্ম-বিষয়ে কোন মতবাদ বা গোঁড়ামি সৃষ্টি করে নাই, ফলে (তাহাদের) ধর্মের সর্বাধিক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। চিরন্তন নিয়ম কখনও 'মু্ক্তি' হইতে পারে না, কারণ চিরন্তনকে নিয়মের মধ্যে ফেলার অর্থই হইতেছে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা।

৪১. ভগবানের দৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ তাঁহার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তিনি ঐ বৃক্ষটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু হইতেন না। কেন তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিবে? যদি তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তো তিনি সেই উদ্দেশ্য দ্বারাই বদ্ধ হইয়া পড়িতেন। মনে কর, একজন গালিচা প্রস্তুতকারী একটি গালিচা বুনিতেছে, বাহিরের কোন মহত্তর ভাবকে রূপ দিতেছে। এখন কোথায় সেই ভাব, যাহার সঙ্গে ভগবান্ নিজেকে খাপ খাওয়াইবেন? বড় বড় সম্রাটগণও যেমন মাঝে মাঝে পুতুলখেলা করেন, তেমনি ঈশ্বরও এই প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করিতেছেন। আমরা বলি, 'ইহাই নিয়ম'। আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ ইহার খুব সামান্য অংশই—যাহা সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে—আমরা দেখিতে পাই। নিয়ম সম্পর্কে আমাদের সকল ধারণাই এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিয়ম অনন্ত—অর্থাৎ অনন্তকাল ধরিয়াই প্রস্তর পড়িতে থাকিবে, ইহা একেবারেই বাজে কথা। সব যুক্তি যদি অভিজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে পাথর পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে উপস্থিত ছিল? সুতরাং নিয়ম মানুষের স্বভাবগত বস্তু নয়। মানুষ সম্বন্ধে ইহাই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত যে, আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি। কার্যতঃ আমরা ধীরে ধীরে নিয়মের বাহিরে যাই এবং অবশেষে সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া একেবারে নিয়মাতীত হই। ঈশ্বর ও মুক্ত অবস্থা হইতেই আমাদের আরম্ভ, আবার ঈশ্বর ও মুক্ত অবস্থাতেই আমাদের পরিসমাপ্তি। নিয়মগুলি যাত্রার মধ্যপথে অবস্থিত, এবং এই-সকল নিয়মের মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। আমাদের বেদান্তে সর্বদাই মুক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নিয়মের ভাবটি বেদান্তবাদীকে ভীত করে, আর ঐ চিরন্তন নিয়ম তাঁহার কাছে অতি ভয়াবহ ব্যাপার, কারণ তাহা হইলে মুক্তির আর কোন উপায়ই থাকে না। যদি এমন কোন চিরন্তন নিয়ম তাঁহাকে সর্বদাই বাঁধিয়া রাখে, তবে মানুষ ও একখণ্ড তৃণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমরা নিয়মের সেই বস্তু-নিরপেক্ষ (abstract) ভাবটি বিশ্বাস করি না।

৪২. আমরা বলি যে, মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে। আর সেই মুক্তিই ঈশ্বর বা ভগবান্। সেই এক আনন্দই মানুষ সর্বত্র উপভোগ করে, কিন্তু যখন কেহ সসীম কিছুতে আনন্দ পাইতে চায়, তখন সে তাহার কণিকা মাত্রই পায়। ঈশ্বরের মধ্যে সাধক যে আনন্দ লাভ করে, চুরি করিয়া চোর সেই এক আনন্দই পায়; কিন্তু চোর সেই আনন্দের কণামাত্রই পায়, তাহাও দুঃখরাশির সহিত মিশ্রিত। প্রকৃত আনন্দই ভগবান্। প্রেমই ভগবান্, মুক্তিই ভগবান্। আর যাহা কিছু মানুষকে বদ্ধ করে, তাহা ভগবান্ নয়।

৪৩. প্রকৃত সত্তা অব্যক্ত, অভিব্যক্তিশূন্য। আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না, কারণ ধারণা

করিতে গেলে মন দিয়াই করিতে হইবে, আর মন তো নিজেই ব্যক্ত পদার্থ। প্রকৃত সত্তার মহিমাই এই যে, তিনি ধারণাতীত, মনেরও অগোচর। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনে তীব্রতম ও ক্ষীণতম আলোক-স্পন্দন আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহারা একই সত্তার বিরোধী দুইটি প্রান্ত। এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যেগুলি এখন আমরা জানি না, কিন্তু সেগুলি আমরা জানিতে পারি; অজ্ঞানবশতই সেগুলি জানিতে পারি না। আবার এমন অনেক জিনিষ আছে, যেগুলি আমরা কখনও জানিতে পারি না, কারণ সেগুলি আমাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্পন্দন অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চগ্রামের। কিন্তু যদিও বুঝিতে পারি না, তথাপি আমরা সর্বদাই সেই শাশ্বত সনাতন সত্তা। জ্ঞান সেখানে অসম্ভব। ধারণা বা চিন্তার সসীমত্বই তাহার অস্তিত্বের ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমার মধ্যে আমিত্বের চেয়ে নিশ্চিত আর কিছুই নাই, তথাপি শরীর ও মন, সুখী বা দুঃখী, পুরুষ বা স্ত্রীরূপেই কেবল আমিত্বের কথা ভাবিতে পারি, এবং যখনই আমি নিজ যথার্থ স্বরূপের ধারণা করিতে চেষ্টা করি, তখনই স্বরূপকে শরীর বা মনের নিম্ন স্তরে না নামাইয়া অন্য কোন উপায় দেখিতে পাই না; তথাপি আমি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত। 'প্রিয়ে, পতির জন্যই কেহ পতিকে ভালবাসে না, ভালবাসে—কারণ তাঁহার মধ্যে আত্মা রহিয়াছেন। পতির আত্মায় এবং আত্মার মাধ্যমেই পত্নী পতিকে ভালবাসে। প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই কেহ পত্নীকে ভালবাসে না, পরন্তু আত্মায় ও আত্মার মাধ্যমেই ভালবাসে।'

৪৩. [illegible]
[illegible]
[illegible] যদি আমরা জ্ঞাতাকে জানিতেই পারিতাম, তবে তো সে আর জ্ঞাতা থাকিবে না, জ্ঞেয় হইয়া যাইবে—জ্ঞানের বিষয় হইয়া যাইবে।

৪৪. পুরাতন সংস্কারগুলি দূর করিবার জন্য আমাদের যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন, আর সংস্কারগুলি বিদূরিত হইলে যাহা থাকে, তাহাই বেদান্ত। একটি সুন্দর কবিতায় ঋষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'বন্ধু, তুমি কেন কাঁদছ? তোমার কোন ভয় নেই, মরণ নেই; কেন তুমি কাঁদছ? তোমার কোন দুঃখ নেই, কারণ সুনীল অনন্ত আকাশের মত [illegible]
[illegible]
[illegible]

আমাদের শুধু জলাবরোধক কপাটগুলি খুলিয়া দিতে হইবে, এবং পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। জলরাশি স্বভাবতই সবেগে প্রবেশ করিবে এবং খাতগুলি পূর্ণ করিয়া দিবে, কারণ জলরাশি তো সেখানে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে।

৪৫. মানুষ অনেকটা সচেতন প্রাণী, কতকটা অচেতন, আবার চেতনার অতীতে যাইবার সম্ভাবনাও তাহার আছে। কেবল যখন আমরা ঠিক ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য হই, তখন আমরা যুক্তি-বিচারের বাহিরে যাইতে পারি। 'উচ্চতর' বা 'নিম্নতর' ইত্যাদি শব্দগুলি কেবল ব্যাবহারিক জগতেই প্রয়োগ করা যায়। পারমার্থিক জগৎ সম্বন্ধে এরূপ বলা স্ববিরোধী উক্তি, কারণ সেখানে কোন পৃথক্করণ সম্ভব নয়। ব্যাবহারিক জগতে মনুষ্যত্ব-রূপ বিকাশই চরম অভিব্যক্তি। বেদান্তবাদী বলেন, মানুষ দেবতা অপেক্ষাও উচ্চে। দেবতাদেরও একদিন মরিতে হইবে এবং মানুষ হইয়া জন্মাইতে হইবে। দেবতারা মানব-শরীরেই সিদ্ধ বা পূর্ণ হইতে পারেন।

৪৬. মুক্তি তো মানুষের করতলগত, তবে তাহাকে এ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে। সে মুক্তই, কেবল প্রতি মুহূর্তে সে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সত্যকে আবিষ্কার করাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক মানুষের সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টা। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী জ্ঞাতসারে ইহা করেন, আর অজ্ঞানী করে অজ্ঞাতসারে। প্রত্যেকেই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে—পরমাণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত। অজ্ঞানী একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলেই সন্তুষ্ট হয়—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই সে খুশী; কিন্তু জ্ঞানী বোধ করেন, তাঁহাকে দৃঢ়তর বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের স্বাধীনতার ভাবকে মুক্তি বলিয়া মনে করেন না।

৪৭. আমাদের দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান যৌগিক পদার্থ। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রণ। একমাত্র মুক্তিই আমাদের কাম্য। ইহারই জন্য মানুষ চেষ্টা করিতেছে। কেবল শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিজ্ঞানী একটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে একমাইল দূরে প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি উহাকে অসীম দূরত্বে পাঠাইতে পারে। তাহা হইলে কেন আমরা প্রকৃতির পূজা করিব না? নিয়ম আমরা চাই না; নিয়ম ভাঙিবার শক্তি চাই। আমরা নিয়মাতীত হইতে চাই। যদি তুমি নিয়মবদ্ধ হও তো এক তাল কাদার সমান হইবে। এই মুহূর্তেই তুমি নিয়মাতীত কিনা—এটি প্রশ্ন নয়; কিন্তু আমরা যে নিয়মাতীত, এই ভাবের উপরেই সকল মানব-প্রগতির ইতিহাস রচিত। উদাহরণস্বরূপ মনে করঃ একটি লোক অরণ্যে বাস করে; সে কোন বিদ্যাশিক্ষা করে নাই, তাহার কোন জ্ঞানও নাই। সে দেখিতেছে, একটি পাথর নীচে পড়িতেছে—একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিতেছে, আর ভাবিতেছে ইহাই মুক্তি। সে ভাবে—পাথরটার আত্মা আছে, তাহার কেন্দ্রীয় ভাবটি হইতেছে মুক্তি। কিন্তু যেই মাত্র সে জানিবে যে, পাথরটা নীচে পড়িতে বাধ্য, সে বলিবে, ইহা প্রকৃতি—ইহা জড় যান্ত্রিক কর্ম। আমি পথে বাহির হইতে পারি, নাও পারি। মানুষ হিসাবে এই স্বাতন্ত্র্যই আমার মহিমা। কিন্তু যখনই আমি নিশ্চয়ই জানি যে আমি সেখানে যাইবই, তখনই আমি নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া যন্ত্রে পরিণত হই। অনন্ত শক্তি সত্ত্বেও প্রকৃতি একটি যন্ত্রমাত্র; মুক্তিই চেতন জীবের মূল উপাদান। বেদান্তমতে অরণ্যচারী মানুষের ভাবটি ঠিক—তাহার দৃষ্টি ঠিক, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। সে এই প্রকৃতিকে স্বাধীন মনে করে, নিয়মদ্বারা পরিচালিত ভাবে না। যাবতীয় মানবিক অভিজ্ঞতার পর আমরা আবার ঠিক এই কথাই চিন্তা করিব, কিন্তু অধিকতর দার্শনিক অর্থে। উদাহরণস্বরূপঃ আমি পথে বাহির হইতে চাই; ইচ্ছা-শক্তির প্রেরণা লাভ করিলাম, তারপর থামিলাম; আমার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা ও পথে যাওয়া—এই দুইটির অন্তর্বর্তী কালে আমি একইভাবে কাজ করিয়াছি। কর্মের এই একতানতাকেই আমরা 'নিয়ম' বলিয়া থাকি। আমি দেখিতেছি, আমার কর্মের এই একতানতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়; সুতরাং আমি আমার কর্মকে নিয়মবদ্ধ বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। আমি পাঁচ মিনিট হাঁটিয়াছি। কিন্তু ঐ একটানা পাঁচমিনিট হাঁটার পূর্বক্ষণে ইচ্ছা-শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল—যাহা আমাকে হাঁটার প্রবৃত্তি দিয়াছিল। তাই মানুষ মনে করে সে স্বাধীন, কারণ তাহার সমুদয় কাজকর্মকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালে ভাগ করা যায় এবং ঐ ক্ষণগুলির মধ্যে একটা একতানতার রেশ থাকিলেও ঐ কালের বাহিরে এ-ধরনের ঐক্য ছিল না। এই অনৈক্যবোধেই মানবের মুক্তভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা দীর্ঘকালস্থায়ী ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু প্রারম্ভে ও শেষে অবশ্য মুক্তির প্রেরণা থাকিবে। আদিতেই মুক্ত হইবার এই প্রেরণা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু এ আবর্তন-কাল আমাদের কালের তুলনায় খুবই দীর্ঘ। দার্শনিক রীতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা দেখি যে, আমরা মুক্ত নই। কিন্তু এই চেতনা সব সময়েই থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। এ ভাব কেমন করিয়া আসে, এটিকেই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দুইটি বৃত্তি আছে। আমাদের বিচারবুদ্ধি বলে, আমাদের সকল কাজেরই কারণ আছে, আবার প্রত্যেকটি প্রেরণার সঙ্গে আমরা আমাদের মু্ক্তভাব ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই যে, আমাদের ভিতরে মুক্তভাব আছে—কারণ আত্মা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, কিন্তু আত্মার ক্রিয়া যে শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই শরীর ও মন মুক্ত নয়।

পাদটীকা

পাদটীকা - জ্ঞানযোগ

১	ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৭ম ঋক্।
২	আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র, উহাদের বাস্তব সত্তা নাই—এই মতকেই বিজ্ঞানবাদ বা Idealism বলে।
৩	জগৎ আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তব সত্তা আছে—এই মতকে বাস্তববাদ বা Realism বলে।
৪	Golden Fleece: গ্রীকপুরাণে উহা Argonautic Expedition নামে খ্যাত
৫	Darwin's Theory of Evolution.
৬	A.P. (Arithmetical Progression) : ২, ৪, ৬, ৮, ১০..
৭	G.P. (Geometrical Progression) : ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২..
৮	Hegel's Absolute Mind
৯	বিষ্ণুপুরাণ—৪/১০/৯
১০	Spencer's Agnosticism
১১	শ্বেতাশ্বতর উপ., ২/৫ ও ৩/৮
১২	যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। কঠ. উপ., ১।১।২০
১৩	মন ধাতু হইতে 'মনু' শব্দ সিদ্ধ; মন ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা।
১৪	Comte's Positivism
১৫	Bentham's Utilitarianism and James' Pragmatism
১৬	Particular
১৭	General ৬।১।৪
১৮	ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪
১৯	গীতা, ৭।৭
২০	গ্রীকপুরাণে বর্ণিত ট্যাণ্টালাসের কাহিনী—তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য।
২১	কঠ. উপ., ২/২/১৩
২২	গীতা, ৭/১৪
২৩	St. Matthew, Ch. II, 28
২৪	কঠ. উপ., ১/৩/১৪
২৫	St. Matthew, Ch. II 28
২৬	The Pied Piper of Hamelin, R. Browning
২৭	কো হ্যেবান্যাৎ ... । তৈত্তিরীর উপ., ২/৭
২৮	ছান্দোগ্য উপ., ৬/১৩/৩
২৯	কঠ. উপ., ২/২/৯
৩০	গীতা, ৩/২৬
*	(যোজয়েৎ ইতি বা পাঠঃ)।
৩১	'অখণ্ডং সচ্চিদানন্দম্'
৩২	ঋগ্বেদ—নাসদীয় সূক্ত
৩৩	ছান্দোগ্য উপ., ৬/১/৪
৩৪	তৈত্তি. উপ., ৩/১ ৫
৩৫	শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪/৩
৩৬	তৈত্তি. উপ., ৩/১
৩৭	দার্শনিক বিচারে ইহাকে 'অনবস্থা-দোষ' বলে।
৩৮	Reincarnation of transmigration of the Soul
৩৯	গীতা, ৫/১৫
৪০	বৃহ. উপ., ৪/৫/১৫ ; ছান্দোগ্য উপ., ৭/২৪
৪১	কঠ. উপ., ২/১/১১
৪২	কঠ. উপ., ২/১/১

৪৩	ঐ., ২/১/২
৪৪	কঠ. উপ., ২/১/১০
৪৫	কঠ. উপ., ২।২।১৪
৪৬	কঠ. উপ., ২।২।২
৪৭	কঠ. উপ., ২/২/৯-১০
৪৮	ঐ., ২/২/১১
৪৯	কঠ. উপ., ২/২/১২
৫০	ঐ., ২/২/১৩
৫১	ঐ., ২/২/১৫
৫২	ঐ., ২/৩/১
৫৩	ঐ., ২/৩/৫
৫৪	কঠ. উপ., ২/৩/৯
৫৫	ঐ., ২/৩/১০
৫৬	কঠ. উপ., ২/৩/১৪-১৫
৫৭	কঠ. উপ., Robert Ingersol
৫৮	Gold-rush—তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য।
৫৯	ঈশ উপ., ১ম শ্লোক
৬০	বৃহ. উপ., ২/৪/৫; ৪/৫/৬
৬১	ঈশোপনিষৎ, ৪-৭
৬২	ঈশ উপ., ৮
৬৩	ঈশ উপ., ৯-১২
৬৪	ঐ, ১৫-১৬
৬৫	বিবেকচূড়ামণি, ৬০
৬৬	St. Matthew, Ch. 17, V. 20
৬৭	কঠ. উপ., ১/২/২০ ; শ্বেতাশ্ব. উপ., ৩/২০
৬৮	কঠ. উপ., ১/২/১৫
৬৯	কঠ উপ., ১/২/১৮
৭০	কঠ উপ., ১/২/২০
৭১	কঠ. উপ., ১/২/২২
৭২	ঐ, ১/২/২৩
৭৩	ঐ, ১/২/২৩
৭৪	ঐ, ১/২/২৪
৭৫	ঐ, ১/৩/৮
৭৬	ঐ, ১/৩/৩-৯
৭৭	ঐ, ১/৩/১২
৭৮	ঐ, ১/৩/১৫
৭৯	ঐ, ১/৩/১৪
৮০	নির্বাণষট্‌কম্‌ ৫, ৪—শঙ্করাচার্য
৮১	ছান্দোগ্য উপ.—৫/৩
৮২	কেন উপ., ২/৪
৮৩	বিবেকচূড়ামণি, ৬০
৮৪	ছান্দোগ্য উপ., ৪/৪-৯
৮৫	ছান্দোগ্য উপ,৪। ১০-১৭
৮৬	ছান্দোগ্য উপ., ৫/৪-১০
৮৭	কঠ. উপ., ২/২/৯
৮৮	শ্বেতাশ্বতর উপ., ৪/৩
৮৯	তুলনীয়ঃ বৃহদারণ্যক উপ., ৪/৫/১৫ ও ২/৪/১৪ ; ছান্দোগ্য উপ., ৭/২৪/১
৯০	ছান্দোগ্য উপ., ৭/১২/১
৯১	ছান্দোগ্য উপ, ৬/ ৯-১০

৯২	ছান্দোগ্য উপ, ৬/ ৮/৭
৯৩	Religionist, Idealist, Realist, Agnostic
৯৪	প্রশান্ত মহাসাগরে সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিওপি (Calliope) ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ।

পাদটীকা - জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে

১	মুণ্ডক উপ., ১/১/৭
২	কঠ. উপ., ২/২/১৩
৩	কঠ. উপ., ২/৩/১৪
৪	বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥—গীতা, ৪/৫
৫	Maspero
৬	A. Erman
৭	প্রাচীন লেখা হইতে ম্যাসপেরো কর্তৃক ফরাসীতে, ব্রুগ্শ্ কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত।
৮	ম্যাথু. ৯/১৪
৯	পার্শীদের মৃতদেহ যে বেদীতে স্থাপন করিয়া পক্ষীদের আহারের জন্য ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়, তাহাকে Tower of Silence (দখ্ম) বলে
১০	I. H. Fichte
১১	Schopenhauer
১২	F. Schnurrer
১৩	Casper
১৪	Hume
১৫	Lessing
১৬	তুলনীয়ঃ তৈত্তি. উপ., ২/৭
১৭	গীতা, ৩/৪২
১৮	মুণ্ডক. উপ., ২/১/১
১৯	তুলনীয়ঃ বীজাঙ্কুর-ন্যায়
২০	মুণ্ডক উপ., ৩/১/১; শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪/৬
২১	ছান্দোগ্য উপ., ৪/৯/২
২২	দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্ ১২
২৩	Imitation of Christ
২৪	কঠ. উপ., ১/২/৫
২৫	ঐ, ২/২/১২
২৬	তুলনীয় মীরাভজনঃ মাখনঘৃত কাড়িলেত ছাঁচ পিয়ে কোই
২৭	Sermon on the Mount, St. Matt. V. 8.
২৮	তুলনীয়ঃ তৈত্তি. উপ., ৩/১
২৯	ছান্দ. উপ., ৬/১/৪
৩০	মুণ্ডক উপ., ৩/১/১
৩১	Trinitarianism
৩২	Unitarianism
৩৩	Instinct
৩৪	Reason
৩৫	Intuition
৩৬	ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥—বিষ্ণুপুরাণ
৩৭	‘the letter killeth.’—St. Paul, Corinth 3, vi.

পাদটীকা - হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

১ বেদ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্তঃ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। প্রসিদ্ধ স্তোত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠানবিধি বা ব্রাহ্মণগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। ক্রিয়ানুষ্ঠানবিধি হইতে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ বেদের যে-সব অংশে রহিয়াছে, সেগুলির নাম উপনিষদ্। উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। সব উপনিষদ্ই যে বেদের স্বতন্ত্র অংশরূপে রচিত, তাহা নয়। উহার কতকগুলি ব্রাহ্মণ অংশের মাঝে মাঝে ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর অন্ততঃ একটি রহিয়াছে সংহিতাংশে। কখনও কখনও বেদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন গ্রন্থকেও 'উপনিষদ' বলা হয়, যথা—গীতা; কিন্তু বেদে নানাস্থানে যে-সকল দার্শনিক তথ্যপূর্ণ আলোচনা ছড়ানো আছে, সেগুলিকেই সাধারণতঃ 'উপনিষদ্' বলা হয়। এই আলোচনাগুলি সংগৃহীত হইয়া 'বেদান্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে।

২ 'শ্রুতি'র অর্থ—যাহা শ্রুত হইয়াছে। 'শ্রুতি' বলিতে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য বুঝাইলেও ভাষ্যকারগণ প্রধানতঃ উপনিষদ্ অর্থেই ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

৩ বলা হয়, উপনিষদের সংখ্যা একশত আট। এগুলির রচনাকাল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, উপনিষদ্ বৌদ্ধযুগের পূর্বে রচিত। কতকগুলি অপ্রধান উপনিষদে অবশ্য পরবর্তী যুগের ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সেই উপনিষদ্গুলি সর্বাংশে পরবর্তী কালে রচিত। সংস্কৃতসাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রন্থের মূল অংশ অতি প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্তী কালের বহু ঘটনা ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে; সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব বাড়াইবার জন্য এরূপ করেন।

৪ ব্যাখ্যা নানা ধরনের আছেঃ যেমন—ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, চূর্ণী ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ভাষ্য ছাড়া আর সবগুলিই গ্রন্থের মূল পাঠের, অথবা তদন্তর্গত কঠিন শব্দের সরলার্থ। ভাষ্যকে ঠিক শব্দার্থ-ব্যাখ্যা বলা যায় না; মূলগ্রন্থ-অবলম্বনে একটি দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য—শুধু শব্দার্থ-প্রকাশ নয়। একটি দর্শন—স্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য। ভাষ্যকার মূল গ্রন্থের বিষয়কে নিজ মতবাদের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া সেই মতবাদেরই বিস্তার করেন।
বেদান্তের উপর বহু ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছে। ব্যাস-রচিত দার্শনিক সূত্রগুলির (ব্যাস-সূত্র বা বেদান্ত-সূত্র) মধ্যেই বেদান্তের তত্ত্বগুলি শেষ ও চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ব্যাস-রচিত 'উত্তর-মীমাংসা'-নামক এই গ্রন্থখানিই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য গ্রন্থ—বেদান্তই বা বলি কেন, হিন্দু শাস্ত্রের বক্তব্য বুঝিবার প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। সর্বাধিক বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকেও ব্যাস-সূত্র গ্রহণ করিতে এবং তাহার সহিত নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যকারগণ হিন্দুদের তিনটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। প্রাচীন ভাষ্যগুলি বোধ হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আধুনিককালে বুদ্ধের পরবর্তী যুগের ভাষ্যকারগণ—শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব সেগুলির পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছেন। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্তন করেন, রামানুজ করেন প্রাচীনকালের বোধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের, আর মধ্ব দ্বৈতবাদের। ভারতে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রভেদ প্রধানতঃ দার্শনিক বিষয় লইয়া; অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে প্রভেদ অতি সামান্য, কারণ, দর্শন ও ধর্মের ভিত্তি সকলেরই এক।

৫ তোমাদের ইংরেজী ভাষায় 'ক্রিয়েশন' (Creation—সৃষ্টি) শব্দটি সংস্কৃত ভাষার 'বহিঃপ্রক্ষেপ' (Projection) শব্দটির ঠিক অনুরূপ। কারণ ভারতে এমন কোন ধর্মসম্প্রদায় নাই, যাহারা 'শূন্য (বা অসৎ) হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে'—পাশ্চাত্যের এই ধারণায় বিশ্বাস করে। পূর্ব হইতে বিদ্যমান কোন সৎ-বস্তুর প্রক্ষেপকেই আমরা 'সৃষ্টি' বলিয়া বুঝি।—(স্বামীজীর 'আত্মা' নামক বক্তৃতা হইতে)

৬ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। সাংখ্যের পুরুষই বেদান্তের ঈশ্বর হইয়াছেন। সব মতবাদই সাংখ্যের মনস্তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েই অসীম আত্মায় বিশ্বাসী; প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, সাংখ্য বলে আত্মা বহু। সাংখ্যমতে জগতের ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোনকিছুর প্রয়োজন নাই। বৈদান্তিক বিশ্বাস করেন, অদ্বিতীয় আত্মাই রহিয়াছেন, তিনিই বহু রূপে প্রতীত হন। সাংখ্যের বিশ্লেষণের উপরেই আমাদের মতবাদ বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত।—(১৮৯৬, ২৪ মার্চের কথোপকথন হইতে)

৭ ছান্দোগ্য উপ., ৬, ১-৪; মুণ্ডক, ১/৩

৮ ছান্দোগ্য উপ., ৭, ২৪/১

৯ খ্রীঃপূঃ ৩০৮-এ গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno)-কর্তৃক এই দর্শন প্রচারিত হয়। এই মতে সুখ-দুঃখে ভাল-মন্দে সমভাবাপন্ন হওয়া এবং সহ্য করিয়া যাওয়াই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ।

১০ শ্বেতাশ্বতর উপ., ৫/২

১১ যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ২

১২ ঐ, ৩

১৩ গায়ত্রী-মন্ত্রের সরলার্থ

১৪ কঠ. উপ., ২/২/১০; শ্বেতঃ উঃ, ৬/১৪ মুঃ উঃ ২/২/১০

১৫ তৈত্তি. উপ., ২/৯

১৬ নির্বাণষট্কম্—শঙ্করাচার্য

১৭ পওহারী বাবা

১৮ গীতা, ৫/১৯

১৯ বিবেকচূড়ামণি, ৬০—শঙ্করাচার্য

২০ গীতা, ৩/২৬

২১ গীতা, ৩/২৫

২২ মুণ্ডক উপ., ১/১/৫

২৩ বৃহদারণ্যক উপ., ২/১৪; ১/১৫

২৪ জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।—যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ২

২৫ নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।—ঐ, ৩

২৬ তুলনীয়ঃ গীতা, ৫/১৮-১৯

২৭ বৃহদারণ্যক উপ., ২/৪/৫

২৮ তুলনীয়—অবধূতগীতা ৩/৩৪

২৯ গীতা, ৫/১৮-১৯

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

স্বামীজীর বাণী ও রচনার তৃতীয় খণ্ডে ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক বক্তৃতা ও লেখা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকাংশই বক্তৃতা, কয়েকটি মাত্র পত্র ও প্রবন্ধাকারে লেখা।

প্রথমাংশ 'ধর্মবিজ্ঞান' পুস্তকাকারে উদ্বোধন-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত; ইহা স্বামী সারদানন্দ সম্পাদিত 'Science and Philosophy of Religion' গ্রন্থের অনুবাদ। প্রথমে ইহা 'জ্ঞানযোগ—২য় ভাগ' নামে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়।

''ধর্মসমীক্ষা' উদ্বোধন প্রকাশিত 'Study of Religion' গ্রন্থের নূতন বাংলা অনুবাদ। তৃতীয়াংশ 'ধর্ম, দর্শন ও সাধনা'—ইংরেজী গ্রন্থাবলী (Complete Works) হইতে সংগৃহীত।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক বহু তথ্য ও টীকা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুক্তি হইবে বলিয়া আর এই খণ্ডে দেওয়া হইল না।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; বর্তমান গ্রন্হাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
(১৭ইজানুআরি, ১৯৬৩)

অনুবাদকের নিবেদন হইতে

এই গ্রন্থখানি উদ্বোধন আপিস হইতে প্রকাশিত 'The Science and Philosophy of Religion' নামক সমগ্র পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহার অন্তর্গত বক্তৃতাগুলি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিউ ইয়র্কে একটি ক্ষুদ্র ক্লাসের সমক্ষে প্রদত্ত হয়। ঐগুলি তখনই সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা গৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্পদিন মাত্র 'জ্ঞানযোগ—২য় ভাগ' নামে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। তাহারই কিছু পরে উহা স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক সংশোধিত হইয়া উদ্বোধন আপিস হইতে বাহির হয়। এতদিন 'উদ্বোধন'-এ উহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। ...

এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে ঐক্য ও কোন্ কোন্ বিষয়েই বা অনৈক্য, তাহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে, আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যেগুলি না বুঝিলে ধর্ম-জিনিসটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না—আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া এই গ্রন্থে আলোচিত হওয়াতে গ্রন্থের 'ধর্মবিজ্ঞান' নামকরণ বোধ হয় অনুচিত হয় নাই। অনুবাদ মূলানুযায়ী অথচ সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। যে-সকল স্থানে সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই মূল পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে ঐ-সকল উদ্ধৃতাংশের অনুবাদ যথাযথ নয়—সেই-সকল স্থলে প্রায় কোন্ গ্রন্থের কোন্ স্থান অবলম্বনে ঐ অংশ লিখিত হইয়াছে, পাদটীকায় তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। কয়েকটি স্থলে স্বামীজীর লেখায় আপাততঃ অসঙ্গতি বোধ হয়—অনুবাদে সেই স্থলগুলির কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া অনুবাদকের বুদ্ধি-অনুযায়ী পাদটীকায় উহাদের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি আবশ্যকীয় পাদটীকাও প্রদত্ত হইয়াছে। ... ইতি

মাঘ, ১৩১৬

বিনীতানুবাদকস্য

সম্পাদকীয় ভূমিকা হইতে

কোন বিজ্ঞান একত্বে উপনীত হইলে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না—ঐক্যই চূড়ান্ত। যে অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তা হইতে বিশ্বের সব কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার অতীত কোন বস্তু চিন্তা করা যায় না। ... অদ্বৈতভাবের শেষ কথা—'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমি সেই। গ্রন্থের শেষে (লেখকের) এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের ঋষিগণ এই সুস্পষ্ট ও অসমসাহসিক দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্মরাজ্যে এরূপ একত্বে পৌঁছিয়া ধর্মকে একটি পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান যে-সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে, ঋষিগণও সে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পদ্ধতিগুলি এইঃ আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, এবং সেই সত্যগুলি আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয়। কপিল, ব্যাস, পতঞ্জলি এবং ভারতের সকল দার্শনিক ও অধিকাংশ বৈদিক ঋষিই যে তাঁহাদের আবিষ্কারে পৌঁছিতে এ-সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই বিষয়টি গ্রন্থকার তাঁহার বিভিন্ন যোগ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে দাবিগুলি বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য মনে হইলেও সেগুলি খণ্ডন করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কাহারও নাই। যে-সকল দার্শনিক পথ হারাইয়া এ-বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষা, উহার প্রকাশভঙ্গী ও কল্পনা, সূত্রগুলির অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাব এবং কালসঞ্চিত আবর্জনা দ্বারা সর্বদা বিব্রত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইয়াছে; আর ভারতীয় মন মহৎ আবিষ্কারের অমানুষিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ শ্রান্ত হইয়া যুগযুগান্ত-ব্যাপী নিদ্রায় কাল কাটাইতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়, এই কার্য সাধনের জন্য এবং ভারতে ও বিদেশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মহান্ সত্য প্রয়োগ করিবার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য ধর্মভূমি ভারতের বর্তমান পুনর্জাগরণ এবং তৎসহ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন ও স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, কারণ একান্ত ভারতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য সর্বদাই ভারতীয় মন আবশ্যক।

স্বামীজীর মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রথমভাগে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষুদ্র সমাবেশে কোন নোট ছাড়াই এই সাতটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সাঙ্কেতিক লিপিতে বক্তৃতাগুলি লিখিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই এত দীর্ঘকাল পরে আমাদের পক্ষে এগুলি বর্তমান আকারে মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। ১৮৯৭ খ্রীঃ প্রথমভাগে যখন সম্পাদক[১] আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি সম্পাদনার কাজ করিতে অনুরুদ্ধ হন, এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

১ স্বামী সারদানন্দ

ধর্মবিজ্ঞান

সূচনা

(সাংখ্য ও বেদান্ত-মতের আলোচনা)

আমাদের এই জগৎ—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—যাহার তত্ত্ব আমরা যুক্তি ও বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারি, তাহার উভয় দিকেই অনন্ত, উভয় দিকেই অজ্ঞেয়—'চির-অজ্ঞাত' বিরাজমান। যে জ্ঞানালোক জগতে 'ধর্ম' নামে পরিচিত, তাহার তত্ত্ব ইহারই মধ্যে অবস্থিত; ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে যত অনুসন্ধান, যত জিজ্ঞাসা, যত ঘটনা পরম্পরা। স্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকারভুক্ত, ইন্দ্রিয়-রাজ্যের নয়। উহা সর্বপ্রকার যুক্তিরও অতীত, সুতরাং উহা বুদ্ধির রাজ্যেরও অধিকারভুক্ত নয়। উহা যেন এমন এক দিব্যদর্শন, এক দৈবী অনুপ্রেরণা, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে এমন এক ঝম্পপ্রদান, যাহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষাও অধিক পরিচিত করিয়া দেয়, কারণ উহা কখনও 'জ্ঞাত' হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানবসমাজের প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে এই ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি এক জগদতীত বস্তুর জন্য এই অনুসন্ধান—এই প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে—এই মানব-মনে—আমরা দেখিতে পাই, একটি চিন্তার উদয় হইল; কোথা হইতে উহার উদয় হইল, তাহা আমরা জানি না; আর যখন উহা তিরোহিত হইল, তখন উহা যে কোথায় গেল, তাহাও আমরা জানি না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যেন একই পথে চলিয়াছে, এক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া যেন উভয়কেই চলিতে হইতেছে, উভয়েই যেন এক সুরে বাজিতেছে।

এই বক্তৃতাসমূহে আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব যে, ধর্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত; উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজ দেহমনকে অস্বীকার করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ করিতে পারে, ততদিন তাহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব। যতদিন মানবের চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন-না-কোন আকারে তাহার ধর্ম থাকিবেই থাকিবে। এই জন্যই আমরা জগতে নানা প্রকারের ধর্ম দেখিতে পাই। অবশ্য এই আলোচনা আমাদের হতবুদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যে এরূপ চর্চাকে বৃথা কল্পনা মনে করেন, তাহা ঠিক নয়। নানা আপাতবিরোধী বিশৃঙ্খলার ভিতর সামঞ্জস্য আছে, এই-সব বেসুরা-বেতালার মধ্যেও ঐক্যতান আছে; যিনি উহা শুনিতে প্রস্তুত, তিনিই সেই সুর শুনিতে পাইবেন।

বর্তমান কালে সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এইঃ মানিলাম, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের উভয় দিকেই অজ্ঞেয় ও অনন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ অনন্ত অজ্ঞাতকে জানিবার চেষ্টা কেন? কেন আমরা জ্ঞাতকে লইয়াই সন্তুষ্ট না হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাণ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকি? এই ভাবের কথাই আজকাল চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। খুব বড় বড় বিদ্বান্ অধ্যাপক হইতে আধ-আধ-কথা-বলা শিশুর মুখেও আমরা আজকাল শুনিয়া থাকি—জগতের উপকার কর, ইহাই একমাত্র ধর্ম, জগদতীত সত্তার সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করায় কোন ফল নাই। এই ভাবটি এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া থাকিবার যো আমাদের নাই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যেন সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ—যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জগদতীতকে না জানিলে কিরূপে উহার এই ক্ষুদ্র প্রকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝা যাইতে পারে? কথিত আছে, সক্রেটিস একদিন এথেন্সে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়—ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। সক্রেটিস সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্বোচ্চ কর্তব্য—মানবই মানবের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু।' ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানিতেছেন, ততক্ষণ মানুষকে কিরূপে জানিবেন?' এই ঈশ্বর, এই চির অজ্ঞেয় বা নিরপেক্ষ সত্তা, বা অনন্ত, বা নামের অতীত বস্তু—অথবা অপর যে-কোন নামে তাঁহাকে ডাকা হউক, বর্তমান জীবনে ইনিই যাহা কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলেরই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে-কোন বস্তুর কথা—নিছক জড়বস্তুর কথা ধরুন। কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটির, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।

এইরূপে মানুষকে বাধ্য হইয়া জগদতীত সত্তার আলোচনা করিতে হয়। যদি আমরা ঐ তত্ত্ব জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, মানবজীবন বৃথা হইবে। এ-কথা বলিতে ভাল যে, বর্তমানে যাহা দেখিতেছ, তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাক; গরু, কুকুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট, আর ঐ ভাবই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানুষ বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগদতীত সত্তার অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ধর্মই—জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়া থাকে। এটি অতি সুন্দর কথা, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই

স্বভাবতঃ উপরের দিকে চাহিয়া দেখে; অন্যান্য সকল জন্তুই স্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই ঊর্ধ্বদৃষ্টি, ঊর্ধ্বদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অনুসন্ধানকেই 'পরিত্রাণ' বা 'উদ্ধার' বলে; আর যখনই মানুষ উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে এই পরিত্রাণ-রূপ সত্যের ধারণার দিকে নিজেকে উন্নীত করে। অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে মানুষের মস্তিষ্কস্থ আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের তারতম্যের উপর। উহাতেই মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ববিধ উন্নতির মূল; ঐ প্রেরণাশক্তিবলে—ঐ উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

প্রচুর অন্ন-পানের মধ্যে ধর্ম নাই, সুরম্য হর্ম্যেও ধর্ম নাই। বারংবার ধর্মের বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শুনিতে পাইবেনঃ ধর্মের দ্বারা কী উপকার হইতে পারে? উহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে? মনে করুন, পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল? মনে করুন, আপনি একটি জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—একটি শিশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি মনোমত খাবার পাওয়া যায়?' আপনি উত্তর দিলেন—'না, পাওয়া যায় না।' তখন শিশুটি বলিয়া উঠিল, 'তবে ইহা কোন কাজের নয়।' শিশুরা তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন ভাল খাবার প্রস্তুত হয় কিনা, এই হিসাবেই সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, সংসারের সেই শিশুদের বিচারও ঐরূপ। নিম্নভূমির দৃষ্টি হইতে উচ্চতর বস্তুর বিচার করা কখনই কর্তব্য নয়। প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজস্ব মানের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। অনন্তের দ্বারাই অনন্তকে বিচার করিতে হইবে। ধর্ম সমগ্র মানবজীবনে অনুস্যূত, শুধু বর্তমানে নয়—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সর্বকালে। অতএব ইহা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে চিরন্তন সম্বন্ধ। অতএব ক্ষণিক মানবজীবনের উপর কার্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্যায়সঙ্গত?—কখনই নয়। এগুলি সব নেতিমূলক যুক্তি।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ধর্মের দ্বারা কি প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য নিষ্পন্ন হয়? হাঁ হয়; উহা দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যাহা, তাহা এই ধর্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মনুষ্য-নামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। ধর্মই ইহা করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দাও—কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে এই সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়সুখ মানব-জীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দ্রিয়সুখে যতটা প্রীতি অনুভব করে, মানুষ বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ অধিকতর সুখবোধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে। জাগতিক সকল বস্তুই সেই প্রকৃত জ্ঞান ও আনন্দের ছায়ামাত্র—শুধু তিন চারি ধাপ নিম্নের প্রকাশ।

আর একটি প্রশ্ন আছেঃ আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে—ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই 'ক্রমাগত নিকটবর্তী হওয়া অথচ কখনই লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছান'—ইহার অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভুত হউক, ইহা যে অসম্ভব তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখনও কোন প্রকার গতি হইতে পারে? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেখানেই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি সেখানেই অবশ্য শেষ করিতে হইবে; আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্যই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তবে ইতোমধ্যে আর করিবার কি থাকে? ঐ অবস্থায় পৌঁছিবার উপযোগী বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটি কার্যগুলি করিতে হয়—অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়।

আর একটি প্রশ্ন এইঃ আমরা উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে কি ধর্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। আপনারা দেখিবেন, জগতের সকল ধর্মাবলম্বীই বলিয়া থাকেন, আমাদের সকলের মধ্যে একটি একত্ব বিদ্যমান। ঈশ্বরের সহিত যখন সকলের একত্ব পূর্ব হইতেই আছে, তখন ঐ অর্থে আর অধিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান-অর্থে এই একত্ব-আবিষ্কার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে পৃথক্ দেখিতেছি—ইহাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুইটি ভাবকে একত্র করিয়া দেখি এবং আপনাদিগকে কেবল 'মানবজাতি' বলিয়া অভিহিত করি, তখন উহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরণস্বরূপ রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরুন। রাসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে-এক উপাদান হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় তাঁহারা কখনও উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ হইবে। ধর্মবিজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহার পর আর কোন উন্নতি হইতে পারে না।

তার পরের প্রশ্ন এইঃ এইরূপ একত্বলাভ কি সম্ভব? ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম ও দর্শনের বিজ্ঞান আবিষ্কার করার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ পাশ্চাত্যদেশে যেমন এইগুলিকে পৃথক্ ভাবে দেখাই রীতি, হিন্দুরা ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রভেদ দেখেন না। আমরা ধর্ম ও দর্শনকে একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন দিক্ বলিয়া বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা—উভয়েরই তুল্যভাবে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পরবর্তী বক্তৃতাসমূহে আমি প্রথমে ভারতের—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের সর্বপ্রাচীন দর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম 'সাংখ্যদর্শন' বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কপিল সমুদয় হিন্দু-মনোবিজ্ঞানের জনক, আর তিনি যে প্রাচীন দর্শনপ্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বর্তমান ভারতে প্রচলিত দর্শনপ্রণালীসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। এই সকল দর্শনের অন্যান্য বিষয়ে যত মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন।

তারপর আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, সাংখ্যের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বেদান্ত কিভাবে উহারই সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কপিল কর্তৃক উপদিষ্ট সৃষ্টি-বা ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের সহিত একমত হইলেও বেদান্ত দ্বৈতবাদকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়, বিজ্ঞান ও ধর্ম—উভয়েরই লক্ষ্যস্বরূপ চরম একত্বের অনুসন্ধান বেদান্ত আরও আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। কি উপায়ে ইহা সাধিত হইয়াছে, তাহা এই বক্তৃতাবলীর শেষের বক্তৃতাগুলিতে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব

দুইটি শব্দ রহিয়াছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড; অন্তঃ ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারা এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি—আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত; আর বাহ্য অনুভূতি হইতে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পূর্ণ সত্য, তাহার সহিত এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যতাবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই। তথাপি আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, এই-সকল সত্যের অধিকাংশই সর্বদা পরস্পর বিরোধী। পৃথিবীর ইতিহাসের একযুগে দেখা যায়, 'অন্তর্বাদী'র প্রাধান্য হইল; অমনি তাঁহারা 'বহির্বাদী'র সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বর্তমান কালে 'বহির্বাদী' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ ও দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই, মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত সারভাগের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

প্রকৃতি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি দেন নাই; এইজন্য একই জাতি সর্বপ্রকার বিদ্যার অনুসন্ধানে সমান শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আধুনিক ইওরোপীয় জাতিগুলি জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, কিন্তু প্রাচীন ইওরোপীয়গণ মানুষের অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যেরা বাহ্য জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে তত দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু অন্তর্জগতের গবেষণায় তাঁহারা খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচ্য মতবাদের সহিত পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের মিল নাই, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাচ্যজাতির ঐ-বিষয়ক উপদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচ্য জড়বিজ্ঞানীদের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, যে-কোন বিদ্যাতেই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখনও পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্য সত্যের সমন্বয় আছে।

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তাহা আমরা জানি; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদিগণের কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক-একটি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতির মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কি ধারণা ছিল, তাহা আলোচনা করিব; তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্যভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়ার সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে; আর যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকেই। ইংরেজীতে আমরা সকলে Nature (নেচার) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন হিন্দুদার্শনিকগণ উহাকে দুইটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতেন; প্রথমটি 'প্রকৃতি'—ইংরেজী Nature শব্দের সহিত ইহা প্রায় সমার্থক; আর দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম—'অব্যক্ত', যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নয়, উহা হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা হইতে অণু-পরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উহা হইতেই জড়বস্তু ও শক্তি, মন ও বুদ্ধি—সব আসিয়াছে। ইহা অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ অনেক যুগ পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, মন সূক্ষ্ম জড়মাত্র। 'দেহ যেমন প্রকৃতি হইতে প্রসূত, মনও সেরূপ'—ইহা ব্যতীত আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা আর অধিক কি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাই; ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রসূত।

প্রাচীন আচার্যগণ এই অব্যক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেনঃ তিনটি শক্তির সাম্যাবস্থা। তন্মধ্যে একটির নাম সত্ত্ব, দ্বিতীয়টি রজঃ এবং তৃতীয়টি তমঃ। তমঃ—সর্বনিম্নতম শক্তি, আকর্ষণস্বরূপ; রজঃ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর—উহা বিকর্ষণস্বরূপ; আর সর্বোচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংযমস্বরূপ—উহাই সত্ত্ব। অতএব যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয় সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি বা বিকার থাকে না; কিন্তু যখনই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, এবং উহাদের মধ্যে একটি শক্তি অপরগুলি অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠে; তখনই পরিবর্তন ও গতি আরম্ভ হয় এবং এই সমুদয়ের পরিণাম চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে। অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তিসমুদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে, এবং তখনই এই ব্রহ্মাণ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তুই সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়, আবার এমন সময় আসে, যখন সকল অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং শক্তিগুলি বহির্দিকে প্রসূত হইবার উপক্রম করে, আর ব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইতে থাকে। জগতের সকল গতিই তরঙ্গাকারে হয়—একবার উত্থান, আবার পতন।

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কিছুদিনের জন্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়; আবার অপর কাহারও মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মনে করুন, আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান্য সহস্র সহস্র জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে। আমি দ্বিতীয় মতটির অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে—এই মতটিরই অধিকতর পক্ষপাতী। যাহাই হউক, মূল কথাটা উভয়ত্রই এক, অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, এই সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতনের নিয়মে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় গমনকে 'কল্পান্ত' বলে। সমগ্র কল্পটিকে—এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচকে—ভারতের ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর নিঃশ্বাস ত্যাগ

করিলে তাঁহা হইতে যেন জগৎ বাহির হয়, আবার উহা তাঁহাতেই প্রত্যাবর্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের কী অবস্থা হয়? তখনও উহা বর্তমান থাকে, তবে সূক্ষ্মতররূপে বা কারণাবস্থায় থাকে। দেশ-কাল-নিমিত্ত সেখানেও বর্তমান, তবে উহারা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে ক্রমসঙ্কোচ বা 'প্রলয়' বলে। প্রলয় ও সৃষ্টি বা ক্রমসঙ্কোচও ক্রমাভিব্যক্তি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব আমরা যখন আদি বা আরম্ভের কথা বলি, তখন আমরা এক কল্পের আরম্ভকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বহির্ভাগকে—আজকাল আমরা যাহাকে স্থূল জড় বলি, প্রাচীন হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদগণ (পঞ্চ) 'ভূত' বলিতেন। তাঁহাদের মতে ঐগুলিরই একটি অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূত 'আকাশ' নামে অভিহিত। আজকাল 'ইথার' বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা কতকটা তাহারই মত, যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। আকাশই আদিভূত—উহা হইতেই সমুদয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে আর উহার সহিত 'প্রাণ' নামে আর একটি বস্তু থাকে—ক্রমশঃ আমরা দেখিব, উহা কি। যতদিন সৃষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাকে। তাহারা নানারূপে মিলিত হইয়া এই-সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে কল্পান্তে ঐগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্তন করে। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সৃষ্টিবর্ণাত্মক একটি সূক্ত
১
আছে, সেটি অতিশয় কবিত্বপূর্ণঃ 'যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?'

আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছেঃ 'ইনি—সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ—গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন।'

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে 'অব্যক্ত' বলে—উহার ঠিক শব্দার্থ স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত। একটি নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত করে, আকাশ ঘনীভূত হইতে থাকে, আর ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও ঘনীভূত হইয়া দ্ব্যণুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত, সেই-সকল বিভিন্ন স্থূল ভূতে পরিণত হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এইগুলির অতি অদ্ভুত ইংরেজী অনুবাদ করিয়া থাকে। অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের টীকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদেরও এত বেশী বিদ্যা নাই যে, নিজে-নিজেই ঐগুলি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা 'পঞ্চভূত'-এর অনুবাদ করিয়া থাকেন বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি। যদি তাঁহারা ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, ভাষ্যকারগণ ঐগুলি লক্ষ্য করেন নাই। প্রাণের বারংবার আঘাতে আকাশ হইতে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয়, উহা হইতেই বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর হইতে থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া শীতল হইতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারণ করে, উহাকে 'অপ্' বলে; অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম 'ক্ষিতি' বা পৃথিবী। সর্ব প্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর উহা তরল হইয়া যাইবে, আর যখন আরও ঘনীভূত হইবে, তখন উহা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করিবে। ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তুসকল তরল পদার্থে পরিণত হইবে, তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং সর্বশেষে সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য-অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়—এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্যের সেই অবস্থা-পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ করিবে।

আকাশের সাহায্য ব্যতীত প্রাণ একা কোন কার্য করিতে পারে না। প্রাণ-সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, উহা গতি বা স্পন্দন। আমরা যা-কিছু গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকার, এবং জড় বা ভূত-পদার্থ যা-কিছু আমরা জানি, যা-কিছু আকৃতিযুক্ত বা বাধাদান করে, তাহাই এই আকাশের বিকার। এই প্রাণ এককভাবে থাকিতে পারে না বা কোন মাধ্যম ব্যতীত কার্য করিতে পারে না, আর উহার কোন অবস্থায়—উহা কেবল প্রাণরূপেই বর্তমান থাকুক অথবা মহাকর্ষ বা কেন্দ্রাতিগা শক্তিরূপ প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তিতেই পরিণত হউক—উহা কখনও আকাশ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। আপনারা কখনই জড় ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত জড় দেখেন নাই। আমরা যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি, সেগুলি কেবল এই দুইটির স্থূল প্রকাশমাত্র, এবং ইহাদের অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকেই প্রাচীন দার্শনিকগণ 'প্রাণ' ও 'আকাশ' নামে অভিহিত করিয়াছে। প্রাণকে আপনারা জীবনীশক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে বুঝিলেও চলিবে না। অতএব সৃষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন, এবং উহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উহার আদি-অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ অনন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি চলিয়াছে।

তারপর আর একটি অতি দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে। কয়েকজন ইওরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, 'আমি' আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে, এবং 'আমি' যদি না থাকি তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখনও কখনও ঐ কথা এইভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে—যদি জগতের সকল লোক মরিয়া যায়, মনুষ্যজাতি যদি আর না থাকে, অনুভূতি ও বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগৎপ্রপঞ্চও আর থাকিবে না। এ-কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে আমরা স্পষ্টই দেখিব যে, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ইওরোপীয় দার্শনিকগণ এই তত্ত্বটি জানিলেও মনোবিজ্ঞান অনুসারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। তাঁহারা এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ আমরা এই প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদগণের আর একটি সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিব—উহাও একটু অদ্ভুত রকমের—তাহা

এই যে, স্থূল ভূতগুলি সূক্ষ্ম ভূত হইতে উৎপন্ন। যাহা কিছু স্থূল, তাহাই কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তুর সমবায়। অতএব স্থূল ভূতগুলিও কতকগুলি সূক্ষ্মবস্তু-গঠিত—ঐগুলিকে সংস্কৃত-ভাষায় 'তন্মাত্র' বলে। আমি একটি পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি; উহার গন্ধ পাইতে গেলে কিছু একটা অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐ পুষ্প রহিয়াছে—উহা যে আমার দিকে আসিতেছে, এমন তো দেখিতেছি না; কিন্তু কিছু যদি আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া থাকে, তবে আমি গন্ধ পাইতেছি কিরূপে? ঐ পুষ্প হইতে যাহা আসিয়া আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্র, ঐ পুষ্পেরই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু; উহা এত সূক্ষ্ম যে, যদি আমরা সারাদিন সকলে মিলিয়া উহার গন্ধ আঘ্রাণ করি, তথাপি ঐ পুষ্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। তাপ, আলোক এবং অন্যান্য সকল বস্তু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই তন্মাত্রগুলি আবার পরমাণুরূপে পুনর্বিভক্ত হইতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ লইয়া বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু আমরা জানি—ঐগুলি মতবাদ-মাত্র, সুতরাং বিচারস্থলে আমরা ঐগুলিকে পরিত্যাগ করিলাম। এইটুকু জানিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—যাহা কিছু স্থূল তাহা অতি সূক্ষ্ম পদার্থদ্বারা নির্মিত। প্রথমে আমরা পাইতেছি স্থূল ভূত—আমরা উহা বাহিরে অনুভব করিতেছি; তারপর সূক্ষ্ম ভূত—এই সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারাই স্থূল ভূত গঠিত, উহারই সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির স্নায়ুর সংযোগ হইতেছে। যে ইথার-তরঙ্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি জানি—আলোক দেখিতে পাইবার পূর্বে চাক্ষুষ স্নায়ুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন। শ্রবণ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রগুলি আসিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমরা জানি—সেগুলি অবশ্যই আছে। এই তন্মাত্রগুলির আবার কারণ কি? আমাদের মনস্তত্ত্ববিদগণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তন্মাত্রগুলির কারণ 'অহঙ্কার'—অহং-তত্ত্ব বা 'অহং-জ্ঞান'। ইহাই এই সূক্ষ্ম ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয়গুলিরও কারণ। ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। চক্ষু যদি দেখিত, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তো চক্ষু অবিকৃত থাকে, তবে তখনও তাহারা দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছুর পরিবর্তন হইয়াছে। কোন-কিছু মানুষের ভিতর হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর সেই কিছু, যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয়। এইরূপ এই নাসিকাও একটি যন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি ইন্দ্রিয় আছে। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আপনাদিগকে বলিয়া দিবে, উহা কি। উহা মস্তিষ্কস্থ একটি স্নায়ুকেন্দ্র মাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যযন্ত্র। অতএব এই স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান।

নাসিকার জন্য একটি, চক্ষুর জন্য একটি, এইরূপ প্রত্যেকের জন্য এক-একটি পৃথক্ স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটিতেই কার্য সিদ্ধ হয় না কেন? এইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইতেছে। আমি কথা কহিতেছি, আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন; আপনাদের চতুর্দিকে কি হইতেছে, তাহা আপনারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ মন কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়াছে। যদি একটিমাত্র স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মনকে একই সময়ে দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রাণ করিতে হইত। আর উহার পক্ষে একই সময়ে এই তিনটি কার্য করা অসম্ভব হইত। অতএব প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। অবশ্য আমাদের পক্ষে একই সময়ে দেখা ও শুনা সম্ভব, কিন্তু তাহার কারণ—মন উভয় কেন্দ্রেই আংশিকভাবে যুক্ত হয়। তবে যন্ত্র কোন্‌গুলি? আমরা দেখিতেছি, উহারা বাহিরের বস্তু এবং স্থূলভূতে নির্মিত—এই আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি। আর এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিসে নির্মিত? উহারা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্মিত; যেহেতু উহারা অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ, সেই জন্য উহারা ভিতরের জিনিষ। যেমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থূল শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেহ স্থূলভূতে গঠিত হইয়াছে, তেমনি এই শরীরের পশ্চাতে যে স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে সূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্মিত। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ (বা সূক্ষ্ম) শরীর বলে।

এই সূক্ষ্ম-শরীরের প্রকৃতপক্ষে একটি আকার আছে, কারণ যাহা কিছু জড় তাহারই একটি আকার অবশ্যই থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে মন অর্থাৎ বৃত্তিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে চিত্তের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা বলা যাইতে পারে। যদি স্থির হ্রদে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা কম্পন উপস্থিত হইবে, তারপর উহা হইতে বাধা বা প্রতিক্রিয়া উত্থিত হইবে। মুহূর্তের জন্য ঐ জল স্পন্দিত হইবে, তারপর উহা ঐ প্রস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিত্তের উপর যখনই কোন বাহ্যবিষয়ের আঘাত আসে, তখনই উহা একটু স্পন্দিত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে 'মন' বলে। তারপর উহা হইতে প্রতিক্রিয়া হয়, উহার নাম 'বুদ্ধি'। এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটি জিনিষ আছে, উহা মনের সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্তমান, উহাকে 'অহঙ্কার' বলে; এই অহঙ্কার-অর্থে অহংজ্ঞান, যাহাতে সর্বদা 'আমি আছি' এই জ্ঞান হয়। তাহার পশ্চাতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, উহা প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চাতে পুরুষ, ইনিই মানবের যথার্থ স্বরূপ—শুদ্ধ, পূর্ণ; ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা এবং ইঁহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম। পুরুষ এই-সকল পরিণাম-পরম্পরা দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নন, কিন্তু অধ্যাস বা প্রতিবিম্বের দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সমক্ষে একটি লাল ফুল রাখিলে স্ফটিকটি লাল দেখাইবে, আবার নীল ফুল রাখিলে নীল দেখাইবে। প্রকতপক্ষে স্ফটিকটির কোন বর্ণই নাই। পুরুষ বা আত্মা অনেক, প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ। আর এই স্থূল, সূক্ষ্ম নানাপ্রকারে বিভক্ত পঞ্চভূত তাঁহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখাইতেছে। প্রকৃতি কেন এ-সকল করিতেছেন? প্রকৃতির এই-সকল পরিণাম পুরুষ বা আত্মার ভোগ ও অপবর্গের জন্য—যাহাতে পুরুষ নিজের মুক্ত স্বভাব জানিতে পারেন। মানুষের সমক্ষে এই জগৎপ্রপঞ্চ-রূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহাতে মানুষ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণামে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে জগতের বাহিরে আসিতে পারেন। আমাকে এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আপনারা যে অর্থে সগুণ বা ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আমাদের অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ সেই অর্থে তাঁহাতে বিশ্বাস করেন না। কপিল মনস্তত্ত্ববিদ্গণের পিতাস্বরূপ, তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহার ধারণা এই যে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; যাহা কিছু ভাল, প্রকৃতিই তাহা করিতে সমর্থ। তিনি তথাকথিত 'কৌশলবাদ' (Design Theory) খণ্ডন করিয়াছেন। এই মতবাদের ন্যায় ছেলেমানুষী মত জগতে আর কিছুই প্রচারিত হয় নাই। তবে তিনি এক বিশেষপ্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া

থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা যাইতে পারে। এইরূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারিব। কপিল বলেন, এইরূপ 'জন্য ঈশ্বর' হইতে পারা যায়, কিন্তু 'নিত্য ঈশ্বর' অর্থাৎ নিত্য সর্বশক্তিমান্—জগতের শাসনকর্তা কখনই হইতে পারা যায় না। এইরূপ ঈশ্বর-স্বীকারে এই আপত্তি উঠিবেঃ ঈশ্বরকে হয় বদ্ধ, না হয় মুক্ত—এই দুই-এর একতর ভাব স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন না, কারণ তাঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব; কারণ বদ্ধ বলিয়া তাঁহার শক্তির অভাব, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখা গেল, নিত্য সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই হেতু কপিল বলেন, আমাদের শাস্ত্রে—বেদে যেখানেই ঈশ্বর-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে সকল আত্মা পূর্ণতা ও মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। সাংখ্যদর্শন নিখিল আত্মার একত্বে বিশ্বাসী নন। বেদান্তের মতে সকল জীবাত্মা ও ব্রহ্ম-নামধেয় এক বিশ্বাত্মা অভিন্ন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি অবশ্য জগতের বিশ্লেষণ যতদূর করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাদিগণের জনক-স্বরূপ, পরবর্তী দর্শন-শাস্ত্রগুলি তাঁহারই চিন্তাপ্রণালীর পরিণাম মাত্র।

সাংখ্যদর্শন-মতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা-রূপ স্বাভাবিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল। সাংখ্য বলেন, ইহা অনাদি। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন অনাদি হয়, তবে উহা অনন্তও হইবে, আর তাহা হইলে আমরা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই 'অনাদি' বলিতে 'নিত্য অনাদি' বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত; কিন্তু আত্মা বা পুরুষ যে অর্থে অনাদি অনন্ত, সে অর্থে নয়; কারণ প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নূতন নূতন জলরাশি আসিতেছে, এই সমুদয় জলরাশির নাম নদী, কিন্তু নদী কোন ধ্রুব বস্তু নয়। এইরূপ প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু, সর্বদা তাহার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু আত্মার কখনই পরিবর্তন হয় না। অতএব প্রকৃতি যখন সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

সাংখ্যদিগের একটি মত তাহাদের নিজস্ব, যথাঃ একটি মনুষ্য বা কোন প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে বিরচিত। সুতরাং আমার যেমন একটি মন আছে, সেইরূপ একটি বিশ্ব-মনও আছে। যখন এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, পরে অহঙ্কার, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়—সকলের শেষে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। কপিলের মতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি শরীর। যাহা কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সব স্থূল শরীর, উহাদের পশ্চাতে আছে সূক্ষ্ম শরীর এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি অহংতত্ত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি-বুদ্ধি। কিন্তু এ-সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতির বিকাশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে সকলেই সেই মহত্তত্ত্বের অংশ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ জগতের ভিতরে সমষ্টি মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজনমত লইতেছি। কিন্তু দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া চাই। ইহাতে বংশানুক্রমিকতা (Heredity) ও পুনর্জন্মবাদ উভয় তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আত্মাকে দেহনির্মাণ করিবার জন্য উপাদান লইতে হয়, কিন্তু সে উপাদান বংশানুক্রমিক সঞ্চারের দ্বারা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, সাংখ্যমতানুযায়ী সৃষ্টিপ্রণালীতে সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসঙ্কোচ—এই উভয়টিই স্বীকৃত হইয়াছে। সমুদয় সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, আবার ঐ সমুদয়ই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকিতে পারে না, মহত্তত্ত্বের অংশবিশেষ যাহার উপাদান নয়। উহাই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় প্রপঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে। তবে এখন আমি এইটুকু দেখাইব, কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই টেবিলটির স্বরূপ কি, তাহা আমি জানি না, উহা কেবল আমার উপর একপ্রকার সংস্কার জন্মাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে চক্ষুতে আসে, তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ে গমন করে, তারপর উহা মনের নিকটে যায়। তখন মন আবার উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই আমরা 'টেবিল' আখ্যা দিয়া থাকি। ইহা ঠিক একটি হ্রদে একখণ্ড প্রস্তর-নিক্ষেপের ন্যায়। ঐ হ্রদ প্রস্তরখণ্ডের অভিমুখে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে; আর ঐ তরঙ্গটিকেই আমরা জানিয়া থাকি। মনের তরঙ্গসমূহ—যেগুলি বহির্দিকে আসে, সেগুলিই আমরা জানি। এইরূপেই এই দেওয়ালের আকৃতি আমার মনে রহিয়াছে; বাহিরে যথার্থ কি আছে, তাহা কেহই জানে না; যখন আমি কোন বহির্বস্তুকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন উহাকে আমারই প্রদত্ত উপাদানে পরিণত হইতে হয়। আমি আমার নিজমনের দ্বারা আমার চক্ষুকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা আছে, তাহা উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণ আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—আমরা সকলেই এক বস্তু কিরূপে দেখিয়া থাকি? ইহার কারণ—আমাদের সকলের ভিতর এই বিশ্ব-মনের এক এক অংশ আছে। যাহাদের মন আছে তাহারাই ঐ বস্তু দেখিবে; যাহাদের নাই, তাহারা উহা দেখিবে না। ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া জগৎ আছে, ততদিন মনের—সেই এক বিশ্ব-মনের—অভাব কখনও হয় নাই। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক প্রাণী সেই বিশ্ব-মন হইতেই নির্মিত হইতেছে, কারণ বিশ্ব-মন সর্বদাই বর্তমান থাকিয়া উহাদের নির্মাণের জন্য উপাদান যোগাইতেছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ

আমরা যে তত্ত্বগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলাম, এখন সেইগুলির প্রত্যেকটিকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ উহাকে ‘অব্যক্ত’ বা অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাদান-সকলের সাম্যাবস্থাকেই উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। আর ইহা হইতে স্বভাবতই পাওয়া যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামঞ্জস্যে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সবই জড় ও গতির সমবায় মাত্র। এই প্রপঞ্চ-বিকাশের পূর্বে আদিম অবস্থায় যখন কোনরূপ গতি ছিল না, যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ছিল, তখন এই প্রকৃতি অবিনাশী ছিল, কারণ সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পারে। আবার সাংখ্যমতে পরমাণুই জগতের আদি অবস্থা নয়। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি-ভূতই পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তাহা আবার স্থূলতর পদার্থে পরিণত হয়, আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে, তাহা ঐ মতের পোষকতা করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ—ইথার-সম্বন্ধীয় আধুনিক মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথারও পরমাণুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা মোটেই হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই বিষয় বুঝান যাইতেছেঃ বায়ু অবশ্য পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। আর আমরা জানি, ইথার সর্বত্র বিদ্যমান, উহা সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ও সর্বব্যাপী। বায়ু এবং অন্যান্য সকল বস্তুর পরমাণুও যেন ইথারেই ভাসিতেছে। আবার ইথার যদি পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে দুইটি ইথার-পরমাণুর মধ্যেও কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিবে। ঐ অবকাশ কিসের দ্বারা পূর্ণ? আর যাহা কিছু ঐ অবকাশ ব্যাপিয়া থাকিবে, তাহার পরমাণুগুলির মধ্যে ঐরূপ অবকাশ থাকিবে। যদি বলেন, ঐ অবকাশের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর ইথার বিদ্যমান, তাহা হইলে সেই ইথার-পরমাণুর মধ্যেও আবার অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইথার কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্ধান্ত কিছুই পাওয়া যাইবে না—ইহাকে ‘অনবস্থা-দোষ’ বলে। অতএব পরমাণুবাদ চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী, উহা এক সর্বব্যাপী জড়রাশি, তাহাতে—এই জগতে যাহা কিছু আছে—সমুদয়ের কারণ রহিয়াছে। কারণ বলিতে কি বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বুঝায়—যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই অব্যক্ত অবস্থা। ধ্বংস বলিতে কি বুঝায়? ইহার অর্থ কারণে লয়, কারণে প্রত্যাবর্তন—যে সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস-শব্দের এই অর্থ ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে ‘কারণে লয়’ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহা দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ‘সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন’ ব্যতীত ধ্বংসের আর কোন অর্থ নাই। আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে—জড়বস্তুও অবিনশ্বর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যদি একটি কাঁচনলের ভিতর একটি বাতি ও কষ্টিক (Caustic Soda) পেন্সিল রাখা যায় এবং সমগ্র বাতিটি পুড়াইয়া ফেলা হয়, তবে ঐ কষ্টিক পেন্সিলটি বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পেন্সিলটির ওজন এখন উহার পূর্ব ওজনের সহিত বাতিটির ওজন যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে। ঐ বাতিটিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া কষ্টিকে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের আধুনিক জ্ঞানোন্নতির অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, কোন জিনিষ সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে সে নিজেই কেবল উপহাসাস্পদ হইবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই ঐরূপ কথা বলিবে, আর আশ্চর্যের বিষয়—সেই প্রাচীন দার্শনিকগণের উপদেশ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিতেছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক ভাগটির বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং উহা দ্বারা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আর আধুনিক বিজ্ঞান উহার ভৌতিক (physical) ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। উভয় প্রকার বিশ্লেষণই একই সত্যে উপনীত হইয়াছে।

আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, এই জগতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশকে সাংখ্যবাদিগণ ‘মহৎ’ বলিয়া থাকেন। আমরা উহাকে ‘সমষ্টি বুদ্ধি’ বলিতে পারি, উহার ঠিক শব্দার্থ—মহৎ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি; উহাকে অহংজ্ঞান বলা যায় না, বলিলে ভুল হইবে। অহংজ্ঞান এই বুদ্ধিতত্ত্বের অংশ মাত্র, বুদ্ধিতত্ত্ব কিন্তু সর্বজনীন তত্ত্ব। চেতনা, অবচেতনা, অতিচেতনা—এগুলি সবই উহার অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপঃ প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন মানবীয় বোধশক্তিরই আয়ত্ত নয়। এই উভয়প্রকার পরিবর্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ঐ উভয়প্রকার পরিবর্তন সাধন করিতেছে। আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, যেগুলি আমাদের মন বা বিচারশক্তির অতীত। এই-সকল পরিবর্তনই সেই মহতের মধ্যে। ব্যষ্টি লইয়া যখন আমি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন এ-কথা আপনারা আরও ভাল করিয়া বুঝিবেন। এই মহৎ হইতে সমষ্টি অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই দুইটিই জড় বা ভৌতিক। জড় ও মনে পরিমাণগত ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভেদ নাই—একই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা, একটি আর একটিতে পরিণত হইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে; মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ একটি মন আছে—এই বিশ্বাস এবং এরূপ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানের সহিত যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, পূর্বোক্ত বিশ্বাসের দ্বারা বরং ঐ বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহৎ-নামক এই পদার্থ অহংতত্ত্ব-নামক জড় পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্ত্বের আবার দুই প্রকার পরিণাম হয়, তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলিতে এই দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝাইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সূক্ষ্মতর—যাহাকে আপনারা মস্তিষ্ককেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্র বলেন। এই অহংতত্ত্ব পরিণামপ্রাপ্ত হয়, এবং এই অহংতত্ত্বরূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র ও স্নায়ু-সকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বরূপ সেই একই উপাদান হইতে আর একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়—তন্মাত্র, অর্থাৎ সূক্ষ্ম জড় পরমাণু। যাহা আপনাদের নাসিকার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগকে ঘ্রাণ-গ্রহণে সমর্থ করে, তাহাই তন্মাত্রর একটি দৃষ্টান্ত। আপনারা এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, আপনারা কেবল ঐগুলির

অস্তিত্ব অবগত হইতে পারেন। অহংতত্ত্ব হইতে এই তন্মাত্রগুলির উৎপত্তি হয়, আর ঐ তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম জড় হইতে স্থূল জড় অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী ও অন্যান্য যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই। এটি ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ পাশ্চাত্য দেশে মন ও জড় সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। মস্তিষ্ক হইতে ঐ-সকল সংস্কার দূর করা বড়ই কঠিন। বাল্যকালে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ত্ব বুঝিতে প্রচণ্ড বাধা পাইতে হইয়াছিল।

এই সবই জগতের অন্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এই সর্বব্যাপী অখণ্ড অবিভক্ত জড়রাশি রহিয়াছে। যেমন দুগ্ধ পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া দধি হয়, সেরূপ উহা মহৎ নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়—ঐ মহৎ এক অবস্থায়
২
বুদ্ধিতত্ত্বরূপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহা অহংতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। উহা সেই একই বস্তু, কেবল অপেক্ষাকৃত স্থূলতর আকারে পরিণত হইয়া অহংতত্ত্ব নাম ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন স্তরে স্তরে বিরচিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহতে পরিণত হয়, তাহা আবার সর্বব্যাপী অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারে এবং তাহা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতে
৩
পরিণত হয়। সেই ভূতসমষ্টি ইন্দ্রিয় বা স্নায়ু কেন্দ্রসমূহে এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত হইয়া এই স্থূল জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি। সাংখ্যমতে ইহাই সৃষ্টির ক্রম, আর সমষ্টি বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবশ্য থাকিবে।

ব্যষ্টি-রূপ একটি মানুষের কথা ধরুন। প্রথমতঃ তাঁহার ভিতর সেই সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে। সেই জড়প্রকৃতি তাঁহার ভিতর মহৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের এক অংশ তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের ক্ষুদ্র অংশটি তাঁহার ভিতর অহংতত্ত্বে বা অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে—উহা সেই সর্বব্যাপী অহংতত্ত্বেরই ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই অহঙ্কার আবার ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রয় পরিণত হইয়াছে। তন্মাত্রগুলি আবার পরস্পর মিলিত করিয়া তিনি নিজ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড—দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপানস্বরূপ; আর ইহা আপনাদের জানা একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতের এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নয়। পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন। পরে ইহা 'আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক সম্প্রদায়'-এর ভিত্তিস্বরূপ হয় এবং আরও পরবর্তীকালে 'নষ্টিক দর্শন'-এর (Gnostic Philosophy) ভিত্তি হয়। এইরূপে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ ইওরোপ ও আলেকজান্দ্রিয়ায় গেল, অপর ভাগটি ভারতেই রহিয়া গেল এবং সর্বপ্রকার হিন্দুদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইল। কারণ ব্যাসের বেদান্তদর্শন ইহারই পরিণতি। এই কপিল-দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি-বিচার দ্বারা জগত্তত্ত্ব-ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম চেষ্টা। কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিত। আমি আপনাদের মনে এইটি বিশেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই যে, দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য। এমন কি, বেদেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির—এই সর্বপ্রাচীন দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার অনুভূতিসমুদয় কি অপূর্ব! যদি যোগিগণের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষশক্তির কোন প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তবে বলিতে হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাঁহার প্রমাণ। তাঁহারা কিরূপে এই-সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন? তাঁহাদের তো আর অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের অনুভবশক্তি কি সূক্ষ্ম ছিল, তাঁহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দোষ ও কি অদ্ভুত!

যাহা হউক, এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। আমরা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—মানবের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে নির্মিত, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি। তারপর উহা বৈষম্যপ্রাপ্ত হইলে কার্য আরম্ভ হয়, আর এই কার্যের ফলে যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহা মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। এখন আপনারা দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে এই বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহতের ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ। উহা হইতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব, তাহা হইতে অনুভবাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুসকল এবং সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্র। ঐ তন্মাত্র হইতে স্থূল দেহ বিরচিত হয়। আমি এখানে বলিতে চাই, শোপেনহাওয়ারের দর্শন ও বেদান্তে একটি প্রভেদ আছে। শোপেনহাওয়ার বলেন, বাসনা বা ইচ্ছা সমুদয়ের কারণ। আমাদের এই ব্যক্তভাবাপন্ন হইবার কারণ প্রাণধারণের ইচ্ছা, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মহত্তত্ত্বই ইহার কারণ। এমন একটিও ইচ্ছা হইতে পারে না, যাহা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নয়। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্তু রহিয়াছে। উহা অহং হইতে গঠিত, অহং আবার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এবং তাহা আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার।

মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। এই মহত্তত্ত্ব—আমরা যাহাকে 'অহং' বলি, তাহাতে পরিণত হয়, আর এই মহত্তত্ত্বই সেই সকল পরিবর্তনের কারণ, যেগুলির ফলে এই শরীর নির্মিত হইয়াছে। অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন অবস্থা—এই সবই মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এই তিনটি অবস্থা কি? 'অবচেতন' জ্ঞানের নিম্নভূমি—আমরা পশুদের মধ্যে দেখিয়া থাকি এবং উহাকে সহজাত জ্ঞান (Instinct) বলি। ইহা প্রায় অভ্রান্ত, তবে উহা দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা বড় অল্প। সহজাত জ্ঞানে প্রায় কখনই ভুল হয় না। একটি পশু ঐ সহজাতজ্ঞান-প্রভাবে কোন্ শস্যটি আহার্য, কোন্‌টি বা বিষাক্ত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু ঐ সহজাত জ্ঞান দুই-একটি সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ, উহা যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া থাকে। তারপর 'চেতন' আমাদের সাধারণ জ্ঞান—উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ, উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু উহার গতি এইরূপ মৃদু হইলেও উহার বিস্তৃতি অনেকদূর। ইহাকেই আপনারা যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়া থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার অধিকদূর বটে, কিন্তু সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের আশঙ্কা। ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে, 'অতিচেতন' অবস্থা—ঐ অবস্থায় কেবল যোগীদের

অর্থাৎ যাঁহারা চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অধিকার। উহা সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তিবিচার অপেক্ষাও উহার অধিক প্রসার। উহা সর্বোচ্চ অবস্থা। আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানুষের ভিতর মহৎই—অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন ভূমি—জ্ঞানের এই তিন অবস্থায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ—সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও বিচারাতীত জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত।

এখন একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্বদাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ বলি, এবং উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচার-জনিত জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উহার বাহিরে আমরা আর কিছু দেখিতে পাই না। এই প্রশ্নটিই একটি অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি এক বৃহৎ বস্তুরাশি হইতে ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতই উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ আমরাই উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে করিলাম? প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক—যুক্তিবিচার কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞান অর্থে সাদৃশ্য-অনুসন্ধান। রাস্তায় গিয়া একটি মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন—সেটি মানুষ। আপনারা অনেক মানুষ দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে একটি সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে। একটি নূতন মানুষকে দেখিবামাত্র আপনারা তাহাকে নিজ নিজ সংস্কারের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া দেখিলেন, সেখানে মানুষের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নূতন ছবিটি অবশিষ্টগুলির সহিত উহাদের জন্য নির্দিষ্ট খোপে রাখিলেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার-সকল পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই সংযোগ বা সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতে আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে ঐগুলির সহিত আর একটি অনুভূতিকে এক খোপে পোরা। আর আপনাদের পূর্ব হইতেই একটি জ্ঞান ভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞান হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। যদি আপনাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের যেমন মত—মন যদি 'অনুৎকীর্ণ ফলক' (Tabula Rasa)-স্বরূপ হয়, তবে উহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব; কারণ জ্ঞান-অর্থে পূর্ব হইতেই যে সংস্কার-সমষ্টি অবস্থিত তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণ-মাত্র। একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব হইতেই থাকা চাই, যাহার সহিত নূতন সংস্কারটি মিলাইয়া লইতে হইবে। মনে করুন, এই প্রকার জ্ঞানভাণ্ডার ছাড়াই একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা একেবারে অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ শিশুর অবশ্যই ঐরূপ একটি জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানলাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোন পথ দেখাইয়া দিন। ইহা গণিতের অভিজ্ঞতার মত। ইহা অনেকটা স্পেন্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের সিদ্ধান্তের মত। তাঁহারা এই পর্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ অসম্ভব; অতএব শিশু পূর্বজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তবে এই দার্শনিকেরা বলেন যে, শিশু যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান হইতে লব্ধ নয়, উহা তাহার পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার; 'বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ'-এর দ্বারা উহা সেই শিশুর ভিতর আসিয়াছে। অতি শীঘ্রই ইঁহারা বুঝিবেন যে, মতবাদ প্রমাণসহ নয়, আর ইতোমধ্যেই অনেকে এই 'বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ' মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই মত অসত্য নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহা কেবল মানুষের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন—এই মতানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? তাহাতে ইঁহারা বলিয়া থাকেন, অনেক কারণ মিলিয়া একটি কার্য হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটি। অপরদিকে হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়িয়া তুলি; কারণ আমাদের অতীত জীবন যেরূপ ছিল, তদনুযায়ী বর্তমান পরিবেশ লাভ করি। অন্য ভাবে বলা যায়, আমরা অতীতে যেরূপ ছিলাম, তাহার ফলেই বর্তমানে যেরূপ হইবার সেরূপ হইয়াছি।

এখন আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়। জ্ঞান আর কিছুই নয়, পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটি নূতন সংস্কারকে এক খোপে পুরিয়া নূতন সংস্কারটিকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা 'প্রত্যভিজ্ঞা'র অর্থ কি? পূর্ব হইতেই আমাদের যে সকল সদৃশ সংস্কার আছে, সেগুলির সহিত উহার সম্বন্ধ আবিষ্কার করা। জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। তাহাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রণালীতে সদৃশ বস্তুশ্রেণীর সবটুকু আমাদের দেখিতে হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন আপনাকে একটি প্রস্তরখণ্ড জানিতে হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে উহার সদৃশ প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিতে হইবে। কিন্তু জগৎসম্বন্ধে আমরা তাহা করিতে পারি না, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার একপ্রকার অনুভব-মাত্র পাইয়া থাকি—উহার এদিক ওদিক আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইয়া লইতে পারি। সেইজন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য মনে হয়, কারণ জ্ঞান ও বিচার সর্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত সংযোগ-সাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশটি—যাহা আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিন্ন, তাহা আমাদের নিকট বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, উহার সহিত মিল খাইবে—এমন কোন সদৃশ বস্তু আমরা পাই না। এইজন্য উহাকে লইয়া এত মুশকিল আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভয়ানক ও মন্দ; কখনও কখনও আমরা উহাকে ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। জগৎকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা ইহার অনুরূপ কোন ভাব বা সত্তার সন্ধান পাইব। আমরা তখনই ঐগুলি ধরিতে পারিব, যখন আমরা এই জগতের—আমাদের এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের বাহিরে যাইব, তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না আমরা তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিষ্ফল চেষ্টার দ্বারা কখনই উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ জ্ঞান-অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটি আংশিক ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমরা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যবহার্য ভাষায় যাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলি, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাঁহার সম্বন্ধে এক বিশেষপ্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণামাত্র—তাঁহার অন্যান্য সমুদয় ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতার দ্বারা আবৃত।

'সর্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্যন্ত আমার অংশমাত্র।'

৪

এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমরা তাঁহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ উহা অসম্ভব। তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায় যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়া—অহং-জ্ঞানের বাহিরে যাওয়া।

'যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা—এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই কেবল সত্য লাভ করিবে।'
৫

'শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ শাস্ত্র প্রকৃতির তত্ত্ব পর্যন্ত, প্রকৃতি যে তিনটি গুণে নির্মিত—সেই পর্যন্ত (যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) শিক্ষা দিয়া থাকে।'
৬

ইহাদের বাহিরে যাইলেই আমরা সামঞ্জস্য ও মিলন দেখিতে পাই, তাহার পূর্বে নয়।

এ-পর্যন্ত এটি স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একই নিয়মে নির্মিত, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি খুব সামান্য অংশই আমরা জানি। আমরা জ্ঞানের নিম্নভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না; আমরা কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাপী—সে নির্বোধমাত্র, কারণ সে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। সে নিজের একটি অংশমাত্র জানে, কারণ জ্ঞান তাঁহার মানসভূমির মাত্র একাংশব্যাপী। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও ঐরূপ। যুক্তিবিচার দ্বারা উহার একাংশমাত্র জানাই সম্ভব; কিন্তু প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টিমহৎ এবং তাহাদের পরবর্তী সমুদয় বিকার—এই সবগুলি বুঝাইয়া থাকে, আর এইগুলি সাধারণ জ্ঞানের বা যুক্তির অতীত।

কিসের দ্বারা প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি প্রকৃতি নিজেও জড়—অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ এবং অচেতন। মন, মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি—এ সবই অচেতন। কিন্তু এগুলি এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই সবের অতীত, আর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ ইহাকেই 'পুরুষ'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল পরিণাম হইতেছে, এই পুরুষ সেগুলির সাক্ষিস্বরূপ কারণ, অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি বিশ্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।
৭
ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যবহার্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কিরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে? ইচ্ছা—প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। সেগুলি কে সৃষ্টি করিল? ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র, আর যাহা কিছু যৌগিক, সে-সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছাও নিজে কখনও প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা একটি অমিশ্র বস্তু নয়। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছা অহংজ্ঞানের অল্পাংশমাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহা আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে। তাহাই যদি করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তো পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালন করিতেছে না। হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নয়; কারণ যদি তাহাই হইত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক—ইচ্ছা যাহার একটি বিকাশমাত্র। এই দেহকে এমন একটি শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইচ্ছা যাহার বিকাশমাত্র।সমগ্র জগৎ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না, সেজন্যই 'ইচ্ছা' বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, আমি মানিয়া লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তারপর ইচ্ছানুসারে আমি এই দেহ পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা তো আমারই দোষ, কারণ ইচ্ছাই আমাদের দেহ-পরিচালক—ইহা মানিয়া লইবার আমার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপ যদি আমরা মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ পরিচালন করিতেছে, তারপর দেখি—প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা মিলিতেছে না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুরুষ ইচ্ছা নন বা বুদ্ধি নন, কারণ বুদ্ধি একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। কোনরূপ জড় পদার্থ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। এই জড়ই মানুষের মস্তিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছে। যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন-না-কোন আকারে জড় পদার্থ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ কি? উহা মহত্তত্ত্বও নয়, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও নয়, কিন্তু উভয়েরই কারণ। তাঁহার সান্নিধ্যই উহাদের সবগুলিকে ক্রিয়াশীল করে ও পরস্পরকে মিলিত করায়। পুরুষকে সেই সকল বস্তুর কয়েকটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেগুলির শুধু সান্নিধ্যই রাসায়নিক কার্য ত্বরান্বিত করে, যেমন সোনা গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক্ থাকিয়া যায়, (শেষ পর্যন্ত) উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য হয় না, কিন্তু সোনা গলানো-রূপ কার্য সফল করিবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন।
৮
পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার কোনরূপ বিকার নয়, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা।'আমি সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত থাকায় প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সব-কিছু সৃজন করিতেছে।'
৯

তাহা হইলে প্রকৃতিতে এই চেতনা কোথা হইতে আসিল? পুরুষেই এই চেতনার ভিত্তি, আর ঐ চেতনাই পুরুষের স্বরূপ। উহা এমন এক বস্তু, যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না, কিন্তু আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, উহা তাহার উপাদান স্বরূপ। এই পুরুষ আমাদের সাধারণ জ্ঞান নয়, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক পদার্থ, তবে এই জ্ঞানে যাহা কিছু উজ্জ্বল ও উত্তম, তাহা ঐ পুরুষেরই। পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা এমন এক বস্তু,

যিনি থাকাতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে যে চিৎ, তাহা প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের নিকট ‘বুদ্ধি’ বা ‘জ্ঞান’ নামে পরিচিত হয়। জগতে যে কিছু সুখ-আনন্দ-শান্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্তু ঐগুলি মিশ্র, কেন-না উহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত আছে।

‘যেখানে কোনপ্রকার সুখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ, সেখানে সেই অমৃতস্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে।’
১০

এই পুরুষই সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, তিনি যদিও উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট ও উহার সহিত অসংসৃষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষকে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহার কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা নারী যখন স্বামীকে চায়, তখন কোন্ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান ও সেই স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী শক্তি। তিনি সকলের পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ পড়িয়াছে। অন্য কিছুই কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই অচেনাত্মক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন। ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অতএব ইহা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই সর্বব্যাপী, কারণ যাহা সর্বব্যাপী নয়, তাহা অবশ্যই সসীম। সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাবই কোন কারণের কার্যস্বরূপ, আর যাহা কার্যস্বরূপ, তাহার অবশ্য আদি অন্ত থাকিবে। যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তস্বরূপ হইলেন না, তিনি কোন কারণের কার্যস্বরূপ —উৎপন্ন পদার্থ হইলেন। অতএব যদি তিনি সীমাবদ্ধ না হন, তবে তিনি সর্বব্যাপী। কপিলের মতে পুরুষের সংখ্যা এক নয়, বহু। অনন্তসংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও একজন পুরুষ, আমিও একজন পুরুষ প্রত্যেকেই এক একজন পুরুষ—উহারা যেন অনন্তসংখ্যক বৃত্তস্বরূপ। তাহার প্রত্যেকটি আবার অনন্ত বিস্তৃত। পুরুষ জন্মানও না, মরেনও না। তিনি মনও নন, জড়ও নন। আর আমরা যাহা কিছু জানি, সকলই তাঁহার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, যদি তিনি সর্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার জন্মমৃত্যু কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি তাঁহার উপর নিজ ছায়া—জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া প্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূর্ব।

এইবার আমরা এই সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে যাহা বলিবার আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। যতদূর পর্যন্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, এই বিশ্লেষণ নির্দোষ, ইহার মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতি কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর পাইলাম—উহা সৃষ্ট নয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ অসৃষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইব। আমরা প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন করিবঃ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনন্ত কি করিয়া থাকিতে পারে? তারপর আমরা এই যুক্তি উত্থাপন করিব—উহা সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ (generalisation)
১১
নয়, অতএব আমরা শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। তারপর আমরা দেখিব, বেদান্তবাদীরা কিরূপে এই-সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। সমাপ্তপ্রায় অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ।

সাংখ্য ও অদ্বৈত

প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিতেছিলাম, এখন তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ এই বক্তৃতায় আমরা ইহার ত্রুটি কোন্‌গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া কিরূপে ঐ অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে চাই। আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস —এক কথায় সব-কিছুরই বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এইগুলি গুণ নয়—জগতের উপাদান কারণ; এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, আর যুগ প্রারম্ভে এইগুলি সামঞ্জস্যভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা 'মহৎ' (অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা 'জড়' বলি। তন্মাত্রের (অর্থাৎ যে-সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না, তাহাদের) পর স্থূল কণিকা- সকলের উৎপত্তি—এইগুলি আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই ত্রিবিধ কার্য-সমন্বিত চিত্ত প্রাণনামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির একটি কার্য মাত্র। কিন্তু এখানে 'প্রাণসমূহ' অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যেগুলি সমুদয় দেহটিকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এই প্রাণসমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না। এই প্রাণসমূহ জীবনশক্তিরূপে সমুদয় শরীরের উপর কার্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার স্নায়ুকেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

এ পর্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আর ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ভাবে ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ চেষ্টা এই চিন্তা-প্রণালীর জনক কপিল-নামক ব্যক্তির নিকট ঋণী।

এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব; কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই দেখিব, কোন না কোন বিষয়ে ইহার সহিত আমাদিগকে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার; কারণ তাঁহার মতে কার্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে, কার্য অন্যরূপে পরিণত কারণমাত্র
১২
আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম-প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়ই কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন প্রকৃতি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন সীমাবদ্ধ হয়। ঐ উপাদানটি স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্যন্ত কোনটিই 'পুরুষ' অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমপর্যায়ে নয়। একটা কাদার তাল যেমন, সমষ্টিমনও তেমনি, সমগ্র জগৎও তেমনি। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে—নিশ্চয়ই এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই-সব নানা বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল 'পুরুষ' বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাও উহাকে 'আত্মা' বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নয়। উহাই একমাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চ-বিকারই জড়। পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ককেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টিকে লইয়া আসিবে; উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে, মন আবার উহাকে অহংজ্ঞানরূপ অপর একটি পদার্থে আবৃত করিয়া 'মহৎ' বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং কার্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্তা। এইগুলি সবই ভৃত্যরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়, তখন তিনি আদেশ দিলে 'মহৎ' প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা; তিনি কোন জড়বস্তু নন। যেহেতু তিনি জড় নন, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ—এই কয়েকটি লইয়া সূক্ষ্মশরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের 'আধ্যাত্মিক দেহ' বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা-যাওয়া অসম্ভব। 'গতি'-অর্থে যাওয়া আসা আর যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখনও সর্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম-শরীরই আসে যায়।

এই পর্যন্ত আমরা কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম, আত্মা অনন্ত এবং একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নয়। একমাত্র আত্মাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেইজন্য পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, 'আমি লিঙ্গশরীর, আমি স্থূলশরীর', আর সেইজন্যই তিনি

সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ আত্মার নয়, উহারা লিঙ্গশরীরের এবং স্থূলশরীরের। যখনই কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করি, তখনই আমরা উহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমার অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও কিছু বোধ করিব না। অতএব সুখ-দুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে আমার চক্ষুযন্ত্র থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখ-দুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সুখ-দুঃখ আত্মার নয়; উহারা মনের ও দেহের।

আত্মার সুখ-দুঃখ কিছুই নাই; আত্মা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ, সকল কর্মেরই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আত্মা কোন কর্মের ফল গ্রহণ করে না। 'সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষুর দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষুর দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি।'
১৩

'যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব-দ্বারা সুখ-দুঃখে লিপ্ত বোধ হয়; কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।'
১৪

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে-ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় সেইরূপ। এই ধ্যানাবস্থাতেই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ পুরুষের সহিত আপনাদের এই একত্ববোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নয়, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

তারপর সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতির এই-সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত পরিবর্তন-পরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোন কালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন; তখন তিনি আরও দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আসা-যাওয়া কিছুই নাই; স্বর্গে যাওয়া, আবার এখানে আসিয়া জন্মানো—সবই প্রকৃতির, তাঁহার নিজের নয়; তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কার্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই সেই চরম লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে এরূপ আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। সাংখ্যের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই—জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এখন আমাদিগকে সাংখ্যদের এই তিনটি মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটি এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু তাহা আত্মার নয়, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নির্গুণ ও অরূপ। সাংখ্যের যে দ্বিতীয় মত আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই; বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের কোন প্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র এক আত্মা আছেন, এবং সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন।

প্রথমে আমরা সাংখ্যের প্রথম সিদ্ধান্তটি লইয়া আলোচনা করিব যে, বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মাতে ওগুলি নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তাস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। তবে আমরা সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, তাঁহারা যাহাকে বুদ্ধিজাত জ্ঞান বলেন, তাহা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বিষয়ানুভূতি কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটি আলোচনা করা যাক। আমাদের স্মরণ আছে যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বস্তুকে লইতেছে, উহারই উপর বহির্বিষয়ের আঘাত আসিয়াছে এবং উহা হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন বাহিরে কোন বস্তু রহিয়াছে; আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপে হইতেছে? বোর্ডটির স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহা জানিতে পারি না। জার্মান দার্শনিকেরা উহাকে 'বস্তুর স্বরূপ' (Thing in-itself) বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা 'ক' আমার চিত্তের উপর কার্য করিতেছে, আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটি হ্রদের মত। যদি হ্রদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতিক্রিয়া-রূপ একটি তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষয়ানুভূতি-কালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটিকেই দেখিয়া থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটি মোটেই সেই প্রস্তরটির মত নয়—উহা একটি তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'-ই প্রস্তরের মত মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক'-স্বরূপ; আপনি আমার মনের উপর কার্য করিতেছেন, এবং যেদিক হইতে ঐ কার্য হইয়াছিল, তাহার দিকে মন একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা 'অমুক নর' বা 'অমুক নারী' বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটি উপাদান—একটি ভিতর হইতে ও অপরটি বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটির মিশ্রণ (ক+মান) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কতক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটি বালুকাকণা

ঐ শুক্তির খোলার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি বালুকাকণার চতুর্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুইটি জিনিষে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ শুক্তির শরীর নিঃসৃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ বহির্দেশ হইতে প্রদত্ত আঘাত। আমার এই টেবিলটির জ্ঞানও সেরূপ—'ক'+মন'। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তো মনই করিবে; সুতরাং মন উহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সত্তা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে, আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা হইয়া দাঁড়াইল একটি যৌগিক পদার্থ—'ক+মন'। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে জানিতে ইচ্ছা করি, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়। উহাকে 'খ' বলা যাক। যখন আমি আমাকে শ্রীঅমুক বলিয়া জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' 'খ+মন' এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' মনের উপর একটি আঘাত করে, মনও আবার ঐ 'খ'-এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতে জ্ঞানকে 'ক+মন' (বহির্জগৎ) এবং 'খ+মন' (অন্তর্জগৎ) রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'ক' ও 'খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক—বাহ্যজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক, এবং বুদ্ধি বা অহংজ্ঞানও সেরূপ একটি যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ+মন', আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক+মন'। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান 'খ'-এর সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক'-এর সহিত মনের সংযোগের ফল। প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটি গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান 'খ'ও মনের সংযোগলব্ধ, আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপে আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক'-এর সংযোগে উৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমি আছি, আমি জানিতেছি ও আমি সুখী অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের বোধ হয় যে, আমার কোন অভাব নাই—এই তিনটি তত্ত্বে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপর বস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটি তত্ত্বই ব্যাবহারিক সত্তা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ, উদ্ভিদগণ ও নিম্নতম হইতে উচ্চতম সত্তা পর্যন্ত সকলেই ভালবাসিয়া থাকে। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই তাহারা সকলেই জগতে থাকিবে, তাহারা সকলেই জানিবে এবং সকলেই ভালবাসিবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা জানিতেছি, তাহা পূর্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল, আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল, আর প্রেমও 'খ' ও মনের সংযোগফল। অতএব এই যে তিনটি বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যাবহারিক সত্তা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা (সৎ), পারমার্থিক জ্ঞান (চিৎ) ও পারমার্থিক আনন্দ বলিয়া থাকেন।

সেই পারমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম অমিশ্র অযৌগিক, যাহার কোন পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা; আর যখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া যেন মলিন হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা মানব নামে অভিহিত করি। উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উদ্ভিদ জীবন, পশুজীবন, বা মানবজীবনরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন অনন্ত দেশ এই গৃহের দেওয়াল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনের দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই পারমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না—বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই-সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলি, যখন আরও অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলে। উহাকে 'সর্বজ্ঞতা' বলিলে উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নয়। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ আনন্দ সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা 'প্রেম' বলি—যাহা স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর বা ভাবসমূহের প্রতি আকর্ষণস্বরূপ। এইগুলি সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশমাত্র আর ঐ আনন্দ আত্মার গুণবিশেষ নয়, উহা আত্মার স্বরূপ—উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নয়, উহারা আত্মার স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটি একই জিনিষ, আমরা এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিম্বে প্রকৃতিকে চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব মনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচারযুক্তি ও বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মাধ্যমের ভিতর দিয়া উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এইজন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অতি সূক্ষ্মতর ও জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী, সেইজন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা একখণ্ড কাঁচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও এইরূপ; আমরা যে অস্তিত্বকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্ব সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্বমাত্র, এই নিরপেক্ষ সত্তাই আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ; যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ যেমন ব্যক্তভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত স্বাভাবিক স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসিলাম, তার পরদিনই আমি আপনাকে আর ভালবাসিতে নাও পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তার পরদিন আবার কমিয়া গেল, কারণ উহা একটি সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম—তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া

কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন—উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ, আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে মহত্তর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অত্যন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম-মরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ।

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে মতভেদ—তাঁহার ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টিবুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টিশরীর পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশ-শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও স্বরূপ আত্মাকে স্বীকার করা প্রয়োজন, সমষ্টিতেও—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টিবুদ্ধি, সমষ্টিমন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তারূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সমষ্টিবুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ এক সর্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা অস্বীকার করি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন—তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা একটি মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ সবই এক নিয়মে নির্মিত। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টিশ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি পুরুষ, যিনি কোন উপাদানে নির্মিত নন, তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটি চৈতন্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন হইবে। যে সর্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাতে রহিয়াছে, বেদান্ত তাহাকে সকলের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর' বলেন।

এখন পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় অপেক্ষা গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে, আত্মা একটি মাত্রই থাকিতে পারেন। যেহেতু আত্মা কোন প্রকার বস্তু দ্বারা গঠিত নয়, সেহেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে—সাংখ্যের এই মত প্রমাণ করিয়া বিবাদের প্রারম্ভেই আমরা উহাদিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে-কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমিত। এই টেবিলটি রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব হইতে এমন একটি বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ' সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে উহাকে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বাহিরে আরও 'দেশ' রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটিই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কোনটিকেই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা কাল সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দিষ্ট একটি 'কালের অতীত কাল' সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটি সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটি অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন—উহাকে অসীম হইতে পৃথক্ করা অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্বব্যাপী। এখন একটি গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি দুইটি হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্তু দুইটি হইল—তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটি অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ'-কে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ আপনি ইহা বলিতে পারেন যে, অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নয়, আবার অনন্ত 'খ'-এর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহা অনন্ত 'ক' নয়। অতএব অনন্ত একটিই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ করা যাক না কেন, তথাপি উহা অনন্তই হইবে, কারণ উহাকে স্বরূপ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। মনে করুন, একটি অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটা জলও লইতে পারেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আত্মা যে এক, ইহা অপেক্ষাও তাহার প্রবলতর প্রমাণ আছে। শুধু তাহাই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা—ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্বকথিত 'ক' ও 'খ'-নামক অজ্ঞাতবস্তুসূচক চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বলি, তাহা 'ক+মন', এবং অন্তর্জগৎ 'খ+মন'। 'ক' ও 'খ' এই দুইটিই অজ্ঞাত-পরিমাণ বস্তু—দুই-ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এখন দেখা যাক, মন কি? দেশ-কাল-নিমিত্ত ছাড়া মন আর কিছুই নয়—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখনও চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না এবং নিমিত্ত বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্বোক্ত 'ক' ও 'খ' এই তিনটি ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঐগুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নয়। এখন ঐ তিনটি ছাঁচ, যাহাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, সেগুলি তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। 'ক' ও 'খ' এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন—এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ—এই দুই রূপে ভিন্ন করিয়াছিল। 'ক' ও 'খ' উভয়ই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়। আমরা উহাদিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ বা বিশেষণ-রহিত বলিয়া উভয়ই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটি হইতে পারে না। যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তুই থাকিতে পারে। 'ক' ও 'খ' উভয়ই নির্গুণ, কারণ উহারা মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই 'ক' ও 'খ' এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে; আর সেই এক সত্তা যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম-ভূত, স্থূল-ভূত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু—কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। যখন উহার একটু অংশ এই দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে পড়ে, তখন উহা আকার গ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়; ঐ জাল সরাইয়া দেখুন

—সবই এক। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উহাকেই অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে ‘ব্রহ্ম’ বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ‘ঈশ্বর’ বলে, আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ‘আত্মা’ বলে। অতএব এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটিমাত্র পুরুষ আছেন—তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন বুঝা যায়—উভয়ই এক। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনি স্বয়ং, অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। ‘সকল হস্তে আপনি কাজ করিতেছেন, সকল মুখে আপনি খাইতেছেন, সকল নাসিকায় আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।’
১৬
সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় জগৎ; আপনিই জগতের আত্মা, আবার আপনিই উহার শরীরও বটে। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনিই মানুষ, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎ আপনিই। যাহা কিছু আছে সবই ‘আপনি’; আপনি স্বরূপতঃ সেই এক অবিভক্ত আত্মা; যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তি বিশেষকে আপনি ‘আমি’ বলিয়া মনে করেন, তাহা নয়।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিভাবে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন?—কিভাবে শ্রী অমুক, পশুপক্ষী বা অন্যান্য বস্তু হইলেন? ইহার উত্তরঃ এই-সমুদয় বিভাগই আপাতপ্রতীয়মান। আমরা জানি, অনন্তের কখনও বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র—এ-কথা মিথ্যা, উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে শ্রী অমুক—এ-কথাও কোনকালে সত্য নয়, উহা কেবল স্বপ্নমাত্র। এটি জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

‘আমি মনও নই, দেহও নই, ইন্দ্রিয়ও নই—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমি সেই, আমিই সেই।’
১৭

ইহাই জ্ঞান এবং ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান। যাহা কিছু আছে, সবই অজ্ঞান—অজ্ঞানের ফলস্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন লাভ করিব কি? আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ আমিই জীবনস্বরূপ সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নয়, যাহা আমাতে নাই এবং যাহা আমার স্বরূপে অবস্থিত নয়। আমিই পঞ্চভূত-রূপে প্রকাশিত; কিন্তু আমি এক ও মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন তো বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তির জ্ঞান। মুক্তিই সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য।

মুক্ত আত্মা

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্যবসিত—উহার সিদ্ধান্ত এই যে, চরমতত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মাসমূহ। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেহেতু উহার বিনাশ নাই, সুতরাং উহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উহা অমিশ্র, আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি-সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চজাল বিস্তার করেন, আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নন, তখনই তাঁহার মুক্তি। অপর দিকে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী। আত্মা যখন অমিশ্র পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না; কারণ সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব দেশ কাল বা নিমিত্তের মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাঁহাকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে, আর তাহার অর্থ—উহার একটি দেহ অবশ্যই থাকিবে; আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে তো আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার; আর যাহা নিরাকার তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানে আছে—এ কথা বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। সাংখ্যদর্শন ইহার উপরে আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। যদি প্রকৃতি একটি অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটি অমিশ্র বস্তু হইল, আর যে-সকল যুক্তিতে আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে মুশকিল হয় এই যে, দুইটি অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব। এ বিষয়ে বেদান্তীদের সিদ্ধান্ত কি? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিত্ত-কারণ নন, উপাদান-কারণও বটে। কারণ কখনও কার্য হইতে পৃথক্ নয়। কার্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা তো আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব ইনিই প্রকৃতির কারণস্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত—বেদান্তের যত বিভিন্ন মত বা বিভাগ আছে, সকলেরই এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্ত-কারণ নন, তিনি ইহার উপাদান-কারণও বটে; যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান—এই আত্মাগুলিও ঈশ্বরের অংশ, সেই অনন্ত বহ্নির এক-একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র; অর্থাৎ যেমন বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে।
১৮

এ পর্যন্ত তো বেশ হইল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—এ কথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা, তাহা তো অবিভাজ্য। অনন্তের কখনও অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখনও বিভক্ত হইতে পারে না। তবে যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইয়াছে—এ কথার তাৎপর্য কি? অদ্বৈতবেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক আত্মা তাঁহার অংশ নন, প্রত্যেকে প্রকৃতপক্ষে সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাইতেছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্যের মূর্তি রহিয়াছে। এইরূপে এই সকল আত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র, সত্য নয়। তাহারা প্রকৃতপক্ষে সেই 'আমি' নয়, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এই অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই-সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি প্রতিবিম্ব মাত্র, সত্য নয়। উহারা প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্ব মাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষ 'আপনি', 'আমি' ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদপ্রতীতি মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাতেই এই আপাত-প্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাঁহাকে জড়জগৎ বলিয়া দেখি; যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে পশুপক্ষী-রূপে দেখি; আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে, আরও উচ্চে যাইলে দেবরূপে দেখিয়া থাকি। তথাপি ঈশ্বর জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও সেই, আপনিও সেই—তাঁহার অংশ নয়, পূর্ণই। 'তিনি অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চস্বরূপ।' তিনি বিষয় ও বিষয়ী—উভয়ই। তিনিই 'আমি', তিনিই 'তুমি'। ইহা কিরূপে হইল?

এই বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে বুঝান যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে?
১৯
জ্ঞাতা কখনও নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা—তিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু—তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরশি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না, সেরূপ আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাস্বরূপ। আদি প্রাণকোষ (Protoplasm) তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্ব-গ্রাহক হইতে সর্বোত্তম প্রতিবিম্ব-গ্রাহক—পূর্ণ

মানবের প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটি ক্ষুদ্র কর্দমাবিল জলপল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা বাহ্য সীমারেখা দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্মল জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তারপর উজ্জ্বল ধাতুতে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিল। শেষে একখানি আরশি লইয়া তাহাতে মুখ দেখিল—তখন সে নিজেকে যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়-স্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—'পূর্ণ মানব'। আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব সহজ প্রেরণায় কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণমানবগণ কেন স্বভাবতই ঈশ্বর-রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাই বলুন না কেন, ইহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এইজন্যই লোকে খ্রীষ্ট-বুদ্ধাদি অবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-স্বরূপ। আপনি বা আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর। একজন পূর্ণমানব এই-সকল ধারণা হইতে অনেক উচ্চে। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাঁহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়; পরিবর্তে তাঁহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকাল সেই পূর্ণ পুরুষই রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল? এই পূর্ণপুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ-স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি কোনকালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানাবর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্তকাল সেখানে থাকিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখনও পরিবর্তন হয় নাই, মেঘেরই কেবল পরিবর্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব হইতেই পূর্ণস্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণই আছেন। কিছুই আপনাদের প্রকৃতিকে কখনও পরিবর্তিত করিতে পারে না, কখনও করিবেও না। আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এইসব ধারণা ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোনকালে দেহ ছিল না, আপনি কোনকালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—আপনি এই সূর্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ, আমাদের এই জগতের প্রত্যেক অংশের মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকীরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পরকে ভালবাসিতেছে এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? আপনিই সর্বেসর্বা। এই জ্ঞানের উদয় হইলে মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম; এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ—অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ-হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল—সারা জীবন ধরিয়া যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এ সেই মরীচিকা! তখন আমি আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম, গত এক মাস ধরিয়া এই যে-সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম, ঐগুলি মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জ্ঞানও আসিল যে, উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারায় উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই এই জগদ্‌ভ্রান্তি একদিন ঘুচিয়া যাইবে। এই-সকল ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহারই নাম প্রত্যক্ষানুভূতি। 'দর্শন' কেবল কথার কথা বা তামাশা নয়; ইহাই প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর যাইবে, এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু, সবই যাইবে—আমি দেহ বা আমি মন, এই বোধ কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে, অথবা যদি কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া থাকে, তবে একেবারে চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেরূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিবে। এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী—সবই আবার আসিবে, যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি ঐগুলির স্বরূপ জানিয়াছি। তখন ঐগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোন দুঃখকর বিষয় আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে—আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবন্মুক্ত-অর্থে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য—এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, সেরূপ তিনি জগতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুধু তাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সেই পূর্ণস্বরূপের সহিত অভেদভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে, ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনি জানিবেন যে, আপনিই তিনি, তাঁহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাঁহার সবটুকুই আপনি, তখন সকল ভয় দূর হইয়া যায়। 'সেখানে কে কাহাকে দেখে? কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার কথা শুনে? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরের কথা বলে, একজন অপরের কথা শুনে, উহা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকেও দেখে না, কেহ কাহাকেও বলে না, তাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম।'
২০
আপনিই তাহা এবং সর্বদাই তাহা আছেন। তখন জগতের কি হইবে? আমরা কি জগতের উপকার করিতে পারিব? এরূপ প্রশ্নই সেখানে উদিত হয় না। এ সেই শিশুর কথার মত—বড় হইয়া গেলে আমার মিঠাইয়ের কি হইবে? বালকও বলিয়া থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্বেলগুলির কি দশা হইবে? তবে আমি বড় হইব না। ছোট শিশু বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির কি দশা হইবে? এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলিও সেরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এ তিন কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি জানিতে পারি—এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্নমাত্র, উহাদের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য, পাপ-পুণ্য কিছুই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি

উহাদের অস্তিত্বই না থাকে, তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? জ্ঞানযোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, সাহসপূর্বক ততদূর অগ্রসর হউন, এবং সাহসপূর্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞানলাভ করা বড়ই কঠিন। ইহা মহা সাহসীর কার্য। যে সব পুতুল ভাঙিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ-রূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে—ইহা তাঁহারই কার্য।

এই শরীর আমি নই, ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী—ইহা তো উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার করিতে পারে। একজন লোক উঠিয়া বলিল, 'আমি দেহ নই, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক।' কিন্তু তাহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র দেহ আসুক, যাক—তাহাতে আমার কি?

'আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই; কারণ তাহারা সকলেই আমি। (আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু), আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমি সেই, আমিই সেই।'
২১

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি উপবাস করি, আবার অন্য সহস্র দেহে প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, আবার সহস্র দেহে আমি সুখ ভোগ করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাই না, কাহাকেও ত্যাগ করি না; কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। আমিই আমার স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি; আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। ইহাই জ্ঞানীর ভাব—তিনি মহা সাহসী, অকুতোভয়, নির্ভীক। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক না কেন, তিনি হাস্য করিয়া বলেন, উহার কখনও অস্তিত্বই ছিল না, উহা কেবল মায়া ও ভ্রমমাত্র। এইরূপে তিনি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে যথার্থই অন্তর্হিত হইতে দেখেন এবং বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করেন, 'এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই বা মিলাইয়া গেল?'
২২

এই জ্ঞানের সাধন-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আর একটি আশঙ্কার আলোচনা ও তৎ-সমাধানের চেষ্টা করিব। এ পর্যন্ত যাহা বিচার করা হইল, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের সীমা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সিদ্ধান্ত করে যে, একমাত্র সত্তাই বর্তমান, আর সমুদয় কিছুই নয়, ততক্ষণ তাহার থামিবার উপায় নাই। যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত-অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এইঃ যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি এই-সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নই জগতের সর্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে? সাধারণ চলিত কথায় প্রশ্নটি এইরূপে করা হয়ঃ এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল? ইহাই প্রশ্নটির চলিত ও ব্যাবহারিক রূপ, আর অপরটি অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ। কিন্তু উত্তর একই। নানা স্তর হইতে নানাভাবে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নতরভাবে উপস্থাপিত হইলে প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় না; কারণ আপেল, সাপ ও নারীর গল্পে
২৩
এই তত্ত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। ঐ অবস্থায় প্রশ্নটিও যেমন বালকোচিত, উহার উত্তরও তেমনি। কিন্তু বেদান্তে এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভ্রম কিরূপে আসিল? আর উত্তরও সেইরূপ গভীর। উত্তরটি এইঃ অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আশা করিও না। ঐ প্রশ্নটির অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটিই অসম্ভব। কেন? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, তাহাই পূর্ণ। তারপর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ণ কিরূপে অপূর্ণ হইল? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে দাঁড়ায়—'যে-বস্তু কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্যরূপে পরিণত হয়? এখানে তো আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তারপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপে উহা কার্যে পরিণত হয়? কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সীমার ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্যন্ত দেশ-কাল-নিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অতীত বস্তুসম্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক; কারণ প্রশ্নটি যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডীর ভিতরে কোনকালে উহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে কি উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা সেখানে গেলেই জানা যাইতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না। যখন লোকে পীড়িত হয়, তখন 'কিরূপে ঐ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে'—এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারিয়া যায়, তাহারই জন্য প্রাণপণ যত্ন করে।

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা একটু নিম্নতর স্তরের কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ আছে এবং ইহাতে তত্ত্ব অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটি এইঃ এই ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? কোন সত্য কি কখনও ভ্রম জন্মাইতে পারে? কখনই নয়। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, সেটি আবার একটি ভ্রম জন্মায়, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগ হইতেই রোগ জন্মায়, স্বাস্থ্য হইতে কখনও রোগ জন্মায় না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই—কার্য কারণেরই আর এক রূপমাত্র। কার্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? অবশ্য আর একটি ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটি মাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিবেঃ ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ আপনি জগতে দুইটি সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটি আপনি,

আর একটি ঐ ভ্রম। ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নয়। স্বপ্ন আসে, আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটি সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথামাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই যে-সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে?—এগুলি সবই থাকিবে। এ-সব কেবল আলোর জন্য অন্ধকারে হাতড়ানো, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা নিজেকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহার বাহিরে; এই জালের মধ্যে দাসত্ব, ইহার মধ্যে সব কিছুই নিয়মাধীন; উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর, ততদূর পর্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যে পর্যন্ত আপনি দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, সে পর্যন্ত আপনি মুক্ত—এ-কথা বলা নিরর্থক। কারণ ঐ জালের মধ্যে সবই কঠোর নিয়মে—কার্য কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে-কোন চিন্তা করেন, তাহা পূর্ব কারণের কার্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য-রূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশমাত্র, সুতরাং 'স্বাধীন ইচ্ছা' বাক্যটির কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাধীনতা বা মুক্তি-সম্বন্ধে এই-সকল বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় মনে কার্যে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মত বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন—এই উভয়ই কঠোর কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যতদিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তুই যে স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল মানুষ যতই স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাজ করাই সম্ভব নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয়া নির্মল নীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার চকিতদর্শন-মাত্র, আর নীলাকাশরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তস্বভাব আত্মা উহার বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ভ্রমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই অর্থহীন সংসারে, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ-সমন্বিত এই বিশ্বজগতে থাকিতে পারে না। এই-সকল অনাদি অনন্ত স্বপ্ন—যেগুলি আমাদের বশে নাই, যেগুলিকে বশে আনাও যায় না, যেগুলি অযথা-সন্নিবেশিত, ভগ্ন ও অসামঞ্জস্যময়—সেই-সব স্বপ্নকে লইয়া আমাদের এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটি দৈত্য আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে অসংলগ্ন মনে করেন না। আপনি মনে করেন, এ তো ঠিকই হইতেছে। আমরা যাহাকে 'নিয়ম' বলি, তাহাও এইরূপ। যাহা কিছু আপনি নিয়ম বলিয়া নির্দিষ্ট করেন, তাহা আকস্মিক ঘটনামাত্র, উহার কোন অর্থ নাই। এই স্বপ্নাবস্থায় আপনি উহাকে নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। মায়ার ভিতর যতদূর পর্যন্ত এই দেশ-কাল-নিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্যন্ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই, আর এই বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বরের ধারণা এবং পশু ও মানবের ধারণা—সবই এই মায়ার মধ্যে, সুতরাং সবই সমভাবে ভ্রমাত্মক, সবই স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা কতকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্‌গজ দেখিতে পাই। আপনারা যেন তাঁহাদের মত তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর-ধারণা ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের ধারণা সত্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধারণা একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই কেবল যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহজগৎ পরজগৎ উভয়ই অস্বীকার করেন। উভয়টিই একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব। একইপ্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করে, তাহার নিজ দেহ এবং মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান করা উচিত। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ও মন উড়িয়া যায়, আর যখন উভয়ই লোপ পায়, তখনই যাহা যথার্থ সত্তা, তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়।

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নয়। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বা জানিতেও পারি না।' ২৪

ইহার তাৎপর্য আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যতদূর বাক্য, চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত মায়ার অধিকার, ততদূর পর্যন্ত বন্ধনের অন্তর্গত। সত্য উহাদের বাহিরে। সেখানে চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পৌঁছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু বুঝা গেল, বিচারের দৃষ্টিতে তাহা ঠিক; কিন্তু এইবার সাধনের কথা আসিতেছে। এই-সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব-উপলব্ধির জন্য কোনপ্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি?—নিশ্চয়ই আছে। সাধনার দ্বারা যে আপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে তাহা নয়, আপনারা তো পূর্ব হইতেই 'ব্রহ্ম' আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, এ কথা সত্য নয়। আপনারা সর্বদা পূর্ণস্বরূপই আছেন, আর যখনই মনে করেন—আপনারা পূর্ণ নন, সে তো একটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদের বোধ হইতেছে, অমুক পুরুষ, অমুক নারী, তাহা আর একটি ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে, আর সাধন বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা একটি ভ্রম নাশ করিবার জন্য অপর একটি ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন। একখণ্ড মেঘ আসিয়া এই মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়েই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুলি কি? আমরা যে মুক্ত হইব, তাহা নয়, আমরা সদাই মুক্ত—আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। আমরা বদ্ধ—এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম; আমরা সুখী বা আমরা অসুখী—এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটিকে সরাইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানেরা শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, হিন্দুরাও তেমনি কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শিয়াল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার উপায় নাই। কোন মুসলমানের বাটীতে একটি শিয়াল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য খাইয়া পলাইল। লোকটি বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল, আর সেই ভোজ্যদ্রব্যগুলি শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল! আর তাহার খাইবার উপায় নাই। কাজেকাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল, 'সাহেব, গরীবের এক নিবেদন শুনুন। একটি শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুখাদ্য সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। এখন শিয়ালটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন।' মোল্লা মুহূর্তের জন্য একটু ভাবিলেন, তারপর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া গিয়াছে, সেই থালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো। এখন কুকুর শিয়ালে নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, সেখানে এ দুই উচ্ছিষ্টের পরস্পর ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।' আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটি ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটি ভ্রমের সাহায্য লইলাম—পূর্ণতা-লাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে। তখন একটি ভ্রম আর একটি ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটি কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটি কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে একবার 'তত্ত্বমসি' শুনিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায়, আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়।

প্রথম প্রশ্ন এইঃ জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা? যাহাদের নিম্নলিখিত সাধন-সম্পত্তিগুলি আছে। প্রথমতঃ 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ'—এই জীবনে বা পরজীবনে সর্বপ্রকার কর্মফল ও সর্বপ্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন। কেবল কাহারও শীঘ্র, কাহারও বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়; অপরের পক্ষে অতীত সংস্কারসমষ্টি তাহাদের বাসনাপূর্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগ-বাসনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম, পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে—ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ জীবন মৃত্যুরই নামান্তরমাত্র। আপনি যে জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক্ মাত্র। সুখ এই ভ্রমের এক দিক্, দুঃখ আর একটা দিক্। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ-সকলই তো মনের সৃষ্টিমাত্র। ইহাকেই 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' বলে।

তারপর 'শম' বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না। মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে—কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সাহায্য লন না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি—এই সকল সাধনেই বিশ্বাসী।

তারপর 'তিতিক্ষা'—কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্বদুঃখসহন। যখন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। পলাইবে কে? অনেক লোক আছেন যাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য হন। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন, আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাঁহারা এ-সকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেকে হিমালয়ের তুষাররাশির মধ্যে বসিয়া থাকে, কোন প্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি? শীতই বা কি? এ-সকল আসুক, যাক—আমার তাহাতে কি? 'আমি' তো শরীর নই। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু লোকে যে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও সেরূপ তাহাদের দর্শন-অনুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে এবং তদনুসারে কার্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। 'আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—সোঽহং, সোঽহম্।' দৈনন্দিন কর্মজীবনের বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ—কর্মজীবনে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম কেবল ভুয়া কথামাত্র নয়, কিন্তু এই জীবনেই ধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা—কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করা। আমি নিজে এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন, 'আমি আত্মা—আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি? সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, শীত-উষ্ণ—এ-সকল আমার পক্ষে কিছুই নয়।' ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগসুখের জন্য ধাবমান হওয়া নয়। ধর্ম কি?—ধর্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা, 'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও?' ধর্ম সম্বন্ধে এ-সকল আহাম্মকি ধারণা! যাহারা ধর্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। আমার গুরুদেব বলিতেন, 'চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে।' যাহা হউক, আপনাদের ধর্মসম্বন্ধীয় যে-সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি?—রাস্তা সাফ করা, আর ভাল অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লোক আসিতেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে—কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ-দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, ঐ-সকলের বাহিরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাহিরে চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। 'আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ—সোঽহং, সোঽহম্।'

বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা

আমরা দেখিয়াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাগই এই-সকল বিভিন্ন যোগপথের সন্ধিস্থল। কর্মী কর্মফল ত্যাগ করেন। ভক্ত সেই সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী প্রেমস্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেন; যোগী যাহা কিছু অনুভব করেন, তাঁহার যাহা কিছু অভিজ্ঞতা—সব পরিত্যাগ করেন, কারণ তাঁহার যোগশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, সমগ্র প্রকৃতি যদিও আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতার জন্য, তথাপি উহা শেষে তাঁহাকে জানাইয়া দেয়, তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত নন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য-স্বতন্ত্র। জ্ঞানী সব ত্যাগ করেন, কারণ জ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোনকালেই প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, এই-সকল উচ্চতর বিষয়ে এ প্রশ্নই করা যাইতে পারে নাঃ ইহাতে কি লাভ? লাভালাভের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই এখানে অসম্ভব, আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলেও আমরা উহা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই?—যাহা মানুষের সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে না, তাহার সুখবৃদ্ধি করে না, তাহা অপেক্ষা যাহাতে তাহার অধিকতর সুখ, তাহার অধিকতর লাভ—অধিকতর হিত হয়, তাহাই সুখের আদর্শ। সমুদয় বিজ্ঞান ঐ এক লক্ষ্যসাধনের অর্থাৎ মনুষ্যজাতিকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, আর যাহা বেশী পরিমাণ সুখ আনে, মানুষ তাহাই গ্রহণ করে; যাহাতে অল্প সুখ, তাহা ত্যাগ করে। আমরা দেখিয়াছি—সুখ হয় দেহে, না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষ্যগণের সকল সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর বা ব্যাঘ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। সুতরাং কুকুর ও ব্যাঘ্রের সুখের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মানুষের ভিতর আমরা একটা উচ্চস্তরের চিন্তাগত সুখ দেখিয়া থাকি—মানুষ জ্ঞানালোচনায় সুখী হয়। সর্বোচ্চ স্তরের সুখ জ্ঞানীর—তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। আত্মাই তাঁহার সুখের একমাত্র উপকরণ। অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্মজ্ঞানই পরম লাভ বা হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম সুখ পাইয়া থাকেন। জড়বিষয়সমূহ বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা তাঁহার নিকট সর্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানে যেরূপ সুখ পাইয়া থাকেন, উহাতে সেরূপ পান না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই সকলের একমাত্র লক্ষ্য, আর আমরা যত প্রকার সুখের বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্বোচ্চ সুখ। 'যাহারা অজ্ঞানে কাজ করিয়া থাকে, তাহারা যেন দেবগণের ভারবাহী পশু'—এখানে দেব-অর্থে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে-সকল ব্যক্তি যন্ত্রবৎ কার্য ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবনটাকে উপভোগ করে না, বিজ্ঞ ব্যক্তিই জীবনটাকে উপভোগ করেন। একজন বড় লোক হয়তো এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একখানা ছবি কিনিল, কিন্তু যে শিল্প বুঝিতে পারে, সেই উহা উপভোগ করিবে। ক্রেতা যদি শিল্পজ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা নিরর্থক, সে কেবল উহার অধিকারী মাত্র। সমগ্র জগতে বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিই কেবল সংসারের সুখ উপভোগ করেন। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনও সুখভোগ করিতে পারে না, তাহাকে অজ্ঞাতসারে অপরের জন্যই পরিশ্রম করিতে হয়।

এ পর্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ দেখিলাম, দেখিলাম তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, দুই আত্মা থাকিতে পারে না। আমরা দেখিলাম—সমগ্র জগতে একটি মাত্র সত্তা বিদ্যমান, আর সেই এক সত্তা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে উহাকেই এই জড়জগৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন কেবল মনের ভিতর দিয়া উহা দৃষ্ট হয়, তখন উহাকে চিন্তা ও ভাবজগৎ বলে, আর যখন উহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন উহা এক অনন্ত পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই বিষয়টি আপনারা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন—ইহা বলা ঠিক নয় যে, মানুষের ভিতর একটি আত্মা আছে, যদিও বুঝাইবার জন্য প্রথমে আমাকে ঐরূপ ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে কেবল এক সত্তা রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আত্মা—আর তাহাই যখন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ বলে; যখন উহা চিন্তা বা ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন বলে; আর যখন উহা স্ব-স্বরূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা আত্মারূপে—সেই এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা ঠিক নয় যে, দেহ, মন ও আত্মা—একত্র এই তিনটি জিনিষ রহিয়াছে, যদিও বুঝাইবার সময় ঐরূপে ব্যাখ্যা করায় বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল; কিন্তু সবই সেই আত্মা, আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কখনও দেহ, কখনও মন, কখনও বা আত্মা-রূপে কথিত হয়। একমাত্র পুরুষই আছেন, অজ্ঞানীরা তাঁহাকেই জগৎ বলিয়া থাকে। যখন সেই ব্যক্তিই জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তখন সে সেই পুরুষকেই ভাবজগৎ বলিয়া থাকে। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে সকল ভ্রম দূর হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায়, এ-সবই আত্মা ব্যতীত আর কিছু নয়। চরম সিদ্ধান্ত এই যে, 'আমি সেই এক সত্তা।' জগতে দুইটি অথবা তিনটি সত্তা নাই, সবই এক। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। সেই দড়িটিই সাপ বলিয়া দৃষ্ট হয়। এখানে দড়ি আলাদা ও সাপ আলাদা—এরূপ দুইটি পৃথক্ বস্তু নাই। কেহই সেখানে দুইটি বস্তু দেখে না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ অনুভূতির সময় আমরা একই-সময়ে সত্য ও মিথ্যা কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলেই জন্ম হইতে একত্ববাদী, উহা হইতে পলাইবার উপায় নাই। আমরা সকল সময়েই 'এক' দেখিয়া থাকি। যখন আমরা রজ্জু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না; আবার যখন সর্প দেখি, তখন মোটেই রজ্জু দেখি না—উহা তখন উড়িয়া যায়। যখন আপনাদের ভ্রম হয়, তখন আপনারা যথার্থ বস্তু দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছেন। আপনি তাঁহাকে অতি ভালভাবেই জানেন, কিন্তু আপনার সম্মুখে কুজ্ঝটিকা থাকায় আপনি তাঁহাকে অন্য লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে দেখিতেছেন না, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে দেখিতেছেন। মনে করুন, আপনার বন্ধুকে 'ক' বলিয়া অভিহিত করা গেল। তাহা হইলে আপনি যখন 'ক'কে 'খ' বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 'ক'কে মোটেই দেখিতেছেন না। এইরূপ সকল স্থলে আপনাদের একেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন আপনি নিজেকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন আপনি দেহমাত্র, আর কিছুই নন, আর জগতের অধিকাংশ মানুষেরই এইরূপ উপলব্ধি। তাহারা মুখে আত্মা মন ইত্যাদি কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহারা অনুভব করে, এই স্থূল দেহ—স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ কোন চেতন অবস্থায় নিজদিগকে চিন্তা বা ভাবরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। আপনারা অবশ্য স্যার হাম্ফি ডেভি সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটি জানেন। তিনি তাঁহার ক্লাসে 'হাস্যজনক বাষ্প' (Laughing gas) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা নল

ভাঙ্গিয়া ঐ বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং তিনি নিঃশ্বাসযোগে উহা গ্রহণ করেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন—যখন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম, আমি বাস্তবিক অনুভব করিতেছিলাম যে, সমগ্র জগৎ চিন্তা বা ভাবে গঠিত। ঐ বাষ্পের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল, আর যাহা পূর্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে চিন্তা বা ভাবরূপে দেখিতে পাইলেন। যখন অনুভূতি আরও উচ্চতর অবস্থায় যায়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করা যায়, তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে—সেই এক আত্মারূপে—বিরাট পুরুষরূপে দর্শন করি। 'জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকালে অনির্বচনীয়, নিত্যবোধ, কেবলানন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম, গগনসম, নিষ্কল, নির্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন।'
২৫

বিভিন্ন প্রকার স্বর্গ ও নরকের এবং আমরা বিভিন্ন ধর্মে যে নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, অদ্বৈতমত সেই সকলের কিরূপ ব্যাখ্যা করে? মানুষের মৃত্যু হইলে বলা হয় যে, সে স্বর্গে বা নরকে যায়, এখানে ওখানে নানাস্থানে যায়, অথবা স্বর্গে বা অন্য কোন লোকে দেহধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে। এ-সমুদয়ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কেহই জন্মায় না বা মরে না; স্বর্গও নাই, নরকও নাই অথবা ইহলোকও নাই; এই তিনটির কোন কালেই অস্তিত্ব নাই। একটি ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধ্যাবেলা বাহিরে যাইতে বল। ধর, একটা 'স্থাণু' রহিয়াছে। বালক কি দেখে? সে দেখে—একটা ভূত হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। মনে কর, একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—সে ঐ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডটিকে তাহার প্রণয়িনী মনে করে। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোর উহাকে পাহারাওয়ালা মনে করিবে। সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে। স্থাণুটিই সত্য, আর এই যে বিভিন্নভাবে উহাকে দর্শন করা—তাহা নানাপ্রকার মনের বিকারমাত্র। একমাত্র পুরুষ—এই আত্মাই আছেন। তিনি কোথাও যানও না, আসেনও না। অজ্ঞান মানুষ স্বর্গ বা সেরূপ কোন স্থানে যাইবার বাসনা করে, সারাজীবন সে কেবল ক্রমাগত উহারই চিন্তা করিয়াছে। এই পৃথিবীর স্বপ্ন—যখন তাহার চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই স্বর্গরূপে দেখিতে পায়; দেখে এখানে দেব ও দেবদূতেরা বিচরণ করিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন তাহার পূর্বপুরুষদিগকে দেখিতে চায়, সে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ সে নিজেই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি কেহ আরও অধিক অজ্ঞান হয় এবং ধর্মান্ধেরা চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখায়, তবে সে মৃত্যুর পর এই জগৎকেই নরকরূপে দর্শন করে, আর ইহাও দেখে যে, সেখানে লোকে নানাবিধ শাস্তি ভোগ করিতেছে। মৃত্যু বা জন্মের আর কিছুই অর্থ নাই, কেবল দৃষ্টির পরিবর্তন। আপনি কোথাও যান না, বা আপনি যাহা কিছুর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেগুলিও কোথাও যায় না। আপনি তো নিত্য, অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া-আসা কি? ইহা অসম্ভব, আপনি তো সর্বব্যাপী। আকাশ কখনও গতিশীল নয়, কিন্তু উহার উপরে মেঘ এদিক ওদিক যাইয়া থাকে—আমরা মনে করি, আকাশই গতিশীল হইয়াছে। রেলগাড়ী চড়িয়া যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও ঠিক সেরূপ। বাস্তবিক পৃথিবী তো নড়িতেছে না, রেলগাড়ীই চলিতেছে। এইরূপে আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, কেবল এই সকল বিভিন্ন স্বপ্ন মেঘগুলির মত এদিক ওদিক যাইতেছে। একটা স্বপ্নের পর আর একটা স্বপ্ন আসিতেছে—ঐগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ 'আজব দেশে এলিস' (Alice in Wonderland) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। এই শতাব্দীতে শিশুদের জন্য লেখা এ একখানি আশ্চর্য পুস্তক। আমি ঐ বইখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম—আমার মাথায় বরাবর ছোটদের জন্য ঐরূপ বই লেখার ইচ্ছা ছিল। এই পুস্তকে আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই ভাবটি যে, আপনারা যাহা সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে—কোনটির সহিত কোনটির কোন সম্বন্ধ নাই। একটা ভাব আসিয়া যেন আর একটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতেছে—পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। যখন আপনারা শিশু ছিলেন, আপনারা ভাবিতেন—ঐগুলির মধ্যে অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। এই গ্রন্থাকার তাঁহার শৈশবাবস্থার চিন্তাগুলি—শৈশবাবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত, সেইগুলি লইয়া শিশুদের জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আর অনেকে ছোটদের জন্য যে-সব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলিতে বড় হইলে তাঁহাদের যে-সকল চিন্তা ও ভাব আসিয়াছে, সেই-সব ভাব ছোটদের গিলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ বইগুলি তাহাদের কিছুমাত্র উপযোগী নয়—বাজে অনর্থক লেখামাত্র। যাহা হউক, আমরাও সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুমাত্র। আমাদের জগৎও ঐরূপ অসম্বন্ধ—যেন ঐ এলিসের আজব দেশ—কোনটির সহিত কোনটির কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কার্য-কারণ নামে অভিহিত করি, আর বলি, উহা আবার ঘটিবে। যখন এই স্বপ্ন চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে অন্য স্বপ্ন আসিবে, তাহাকেও ইহারই মত সম্বন্ধযুক্ত বোধ হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় আমরা যাহা কিছু দেখি, সবই সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নাবস্থায় আমরা সেগুলিকে কখনই অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত মনে করি না—কেবল যখন জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে পাই। এইরূপ যখন আমরা এই জগদ্রূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন ঐ সমুদয়ই অসম্বদ্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলি অসম্বদ্ধ জিনিষ যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে। আর ইহাকেই 'মায়া' বলে। এই সমুদয় পরিণামশীল বস্তু—রাশি রাশি সঞ্চরমাণ মেষলোমতুল্য মেঘের ন্যায় এবং তাহার পশ্চাতে অপরিণামী সূর্য আপনি স্বয়ং। যখন সেই অপরিণামী সত্তাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন তাহাকে 'ঈশ্বর' বলেন, আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পৃথক্ দেবতা বা ঈশ্বর নাই, আপনা অপেক্ষা—আপনি যথার্থতঃ যাহা, তাহা অপেক্ষা—মহত্তর দেবতা নাই; সকল দেবতাই আপনার তুলনায় ক্ষুদ্রতর; ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা প্রভৃতি সমুদয় ধারণা আপনারই প্রতিবিম্বমাত্র। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার প্রতিবিম্ব বা প্রতিমাস্বরূপ। 'ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিবিম্বরূপে সৃষ্টি করিলেন'—এ কথা ভুল। মানুষ নিজ প্রতিবিম্ব অনুযায়ী ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে—এই কথাই সত্য। সমগ্র জগতে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব অনুযায়ী ঈশ্বর বা দেবতা সৃষ্টি করিতেছি। আমরাই দেবতা সৃষ্টি করি, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করি, আর যখনই ঐ স্বপ্ন আমাদের নিকট আসে, তখন আমরা তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকি।

এই বিষয়টি বুঝিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, আজ সকালের বক্তৃতার সার কথাটি এই যে, একটি সত্তামাত্র আছে, আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন মধ্যবর্তী বস্তুর ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী স্বর্গ বা নরক, ঈশ্বর ভূতপ্রেত মানব বা দৈত্য, জগৎ বা এই-সব যত কিছু বোধ হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাঁহার কখনই পরিণাম হয় না, যিনি এই চঞ্চল মর্ত্য জগতের একমাত্র জীবনস্বরূপ, যে-পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে-সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়—আর কাহারও নয়।
২৬

সেই 'এক সত্তা'র সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে। কিরূপে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইবে, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। কিরূপে এই স্বপ্নভঙ্গ হইবে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারী—আমাদের ইহা চাই, ইহা করিতে হইবে, এই যে স্বপ্ন—ইহা হইতে কিরূপে আমরা জাগিব? আমরাই জগতের সেই অনন্ত পুরুষ আর আমরা জড়ভাবাপন্ন হইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীরূপ ধারণ করিয়াছি—একজনের মিষ্ট কথায় গলিয়া যাইতেছি, আবার আর একজনের কড়া কথায় গরম হইয়া পড়িতেছি—ভালমন্দ সুখদুঃখ আমাদিগকে নাচাইতেছে! কি ভয়ানক পরনির্ভরতা, কি ভয়ানক দাসত্ব! আমি, যে-সকল সুখদুঃখের অতীত, সমগ্র জগৎই যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, সূর্য চন্দ্র তারা যাহারা মহাপ্রাণের ক্ষুদ্র উৎসমাত্র—সেই আমি এইরূপ ভয়ানক দাসভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একটি চিমটি কাটিলে আমার ব্যথা লাগে। কেহ যদি একটি মিষ্টি কথা বলে, অমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে। আমার কি দুর্দশা দেখুন—দেহের দাস, মনের দাস, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস, একটা মন্দ কথার দাস, বাসনার দাস, সুখের দাস, জীবনের দাস, মৃত্যুর দাস—সব জিনিষের দাস! এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিরূপে?

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, উহা লইয়া মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, অতঃপর উহার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে।
২৭

অদ্বৈতজ্ঞানীর ইহাই সাধনপ্রণালী। সত্য সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত সেইটি মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে। সর্বদাই ভাবুন—'আমি ব্রহ্ম', অন্য চিন্তা দুর্বলতাজনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে-কোন চিন্তায় নিজেদের নর-নারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা দূর করিয়া দিন। দেহ যাক, মন যাক, দেবতারাও যাক, ভূত-প্রেতাদিও যাক, সেই এক সত্তা ব্যতীত আর সবই যাক।

যেখানে একজন অপর কিছু দেখে, একজন অপর কিছু শুনে, একজন অন্য কিছু জানে, তাহা ক্ষুদ্র বা সসীম; আর যেখানে একজন অপর কিছু দেখে না, একজন অপর কিছু শুনে না, একজন অপর কিছু জানে না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা অনন্ত।
২৮

তাহাই সর্বোত্তম বস্তু, যেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া যায়। যখন আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্তা, যখন আমিই আচার্য ও আমিই শিষ্য, যখন আমিই স্রষ্টা ও আমিই সৃষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যায়। কারণ আমাকে ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কে? দিনের পর দিন এই তত্ত্ব শুনিতে হইবে। অন্য সকল চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর সব কিছু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিন, নিরন্তর ইহাই আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ না উহা হৃদয়ে পৌঁছায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমন কি প্রত্যেক শোণিতবিন্দু পর্যন্ত 'আমি সেই, আমিই সেই'—এইভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ কর্ণের ভিতর দিয়া ঐ তত্ত্ব ক্রমাগত ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে। এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন—'আমিই সেই।' ভারতে এক সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি 'শিবোঽহং, শিবোঽহং' আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ 'শিবোঽহং, শিবোঽহং' ধ্বনি শুনা গিয়াছিল! মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্বতশিখরে, গভীরতম অরণ্যে—যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বদা মনে মনে বলিতে থাকুন—'আমিই সেই, আমিই সেই।' দিনরাত্রি বলিতে থাকুন—'আমিই সেই।' ইহা শ্রেষ্ঠ তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম।

দুর্বল ব্যক্তি কখনও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।
২৯
কখনই বলিবেন না, 'হে প্রভো, আমি অতি অধম পাপী।' কে আপনাকে সাহায্য করিবে? আপনি জগতের সাহায্যকর্তা—আপনাকে আবার এ জগতে কে সাহায্য করিতে পারে? আপনাকে সাহায্য করিতে কোন্ মানুষ, কোন্ দেবতা বা কোন্ দৈত্য সমর্থ? আপনার উপরে আবার কাহার শক্তি খাটিবে? আপনিই জগতের ঈশ্বর—আপনি আবার কোথায় সাহায্য অন্বেষণ করিবেন? যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আপনি স্বয়ং সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি সাগ্রহে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, অপর কেহ আপনাকে সাহায্য প্রেরণ করিতেছে। আপনার বাহিরে আপনার সাহায্যকর্তা আর কেহ নাই—আপনিই জগতের স্রষ্টা। গুটিপোকার মত আপনিই আপনার চারিদিকে গুটি নির্মাণ করিয়াছেন। কে আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার ঐ গুটি কাটিয়া ফেলিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে—মুক্ত আত্মারূপে বাহির হইয়া আসুন। তখনই—কেবল তখনই আপনি সত্যদর্শন করিবেন। সর্বদা নিজের মনকে বলিতে থাকুন—'আমিই সেই।' এই বাক্যগুলি আপনার মনের অপবিত্রতারূপ আবর্জনারাশি পুড়াইয়া ফেলিবে, আপনার ভিতরে পূর্ব হইতেই যে মহাশক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে, আপনার হৃদয়ে যে অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহা জাগাইয়া তুলিবে। সর্বদাই সত্য—কেবল সত্য শ্রবণ করিয়াই এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। যেখানে দুর্বলতার চিন্তা আছে, সেদিকে ঘেঁষিবেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করুন।

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, সব দূর করুন। যতদূর পারেন, যুক্তি-তর্ক-বিচার করুন। তারপর যখন মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইহাই—কেবল ইহাই সত্য, আর কিছু নয়, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বন্ধ করুন। তখন আর তর্কযুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্কযুক্তির প্রয়োজন কি? আপনি তো বিচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, আপনি তো সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে আর এখন বাকী কি? এখন সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। অতএব বৃথা তর্কে এবং অমূল্যকাল-হরণে কি ফল? এখন ঐ সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে, আর যে কোন চিন্তা আপনাকে তেজস্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যাহা দুর্বল করে, তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মূর্তি-প্রতিমাদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহাই স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী, কিন্তু ইহাতে অতি মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতে হয়। যোগীরা তাঁহাদের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কেন্দ্র বা চক্রের উপর ধ্যান করেন এবং মনোমধ্যস্থ শক্তিসমূহ পরিচালনা করেন। জ্ঞানী বলেন, মনের অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তা দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উহাদের চিন্তা করা অজ্ঞানোচিত কার্য। ঐরূপ করা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার মত। জ্ঞানীর ধ্যানই সর্বাপেক্ষা কঠিন—নেতি নেতি; তিনি সব-কিছুই অস্বীকার করেন, আর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্মক (বিলোম) সাধন। জ্ঞানী কেবল বিশ্লেষণ-বলে জগৎটাকে আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। 'আমি জ্ঞানী'—এ কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী হওয়া বড়ই কঠিন। বেদ বলিতেছেনঃ

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া ভ্রমণ; কিন্তু নিরাশ হইও না। উঠ, জাগ, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন ক্ষান্ত হইও না।
৩০

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার? জ্ঞানী দেহমন-বিষয়ক সর্বপ্রকার চিন্তা অতিক্রম করিতে চান। তিনি যে দেহ, এই ধারণা দূর করিয়া দিতে চান। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যখনই আমি বলি, 'আমি স্বামী অমুক' তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব আসিয়া থাকে। তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর সবলে আঘাত করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা।' রোগই আসুক, অথবা অতি ভয়াবহ আকারে মৃত্যুই আসিয়া উপস্থিত হউক, কে তাহা গ্রাহ্য করে? আমি দেহ নই। দেহ সুন্দর রাখিবার চেষ্টা কেন? এই মায়া এই ভ্রান্তি—আর একবার উপভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য? দেহ যাক, আমি দেহ নই। ইহাই জ্ঞানীর সাধনপ্রণালী। ভক্ত বলেন, 'প্রভু আমাকে এই জীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, অতএব যতদিন না সেই যাত্রা শেষ হয়, ততদিন ইহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে হইবে।' যোগী বলেন, 'আমাকে অবশ্যই দেহের যত্ন করিতে হইবে, যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারি।' জ্ঞানী মনে করেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। তিনি এই মুহূর্তেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবেন। তিনি বলেন, 'আমি নিত্যমুক্ত, কোন কালেই বদ্ধ নই; অনন্তকাল ধরিয়া আমি এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ করিবে কে? আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ।' যখন কোন মানুষ স্বয়ং পূর্ণতা লাভ করে, সে অপরের মধ্যেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে। যখন অপরের মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ-মনেরই ভাব বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। তাহার নিজের ভিতর যদি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে কিরূপে অপূর্ণতা দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণতা বা অপূর্ণতা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার পক্ষে উহাদের কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। যখন তিনি মুক্ত হন, তখন হইতেই তিনি আর ভাল-মন্দ দেখেন না। ভাল-মন্দ কে দেখে?—যাহার নিজের ভিতর ভাল-মন্দ আছে। দেহ কে দেখে?—যে নিজেকে দেহ মনে করে। যে মুহূর্তে আপনি দেহভাব-রহিত হইবেন, সেই মুহূর্তেই আপনি আর জগৎ দেখিতে পাইবেন না। উহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জ্ঞানী কেবল বিচারজনিত সিদ্ধান্তবলে এই জড়বন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই 'নেতি, নেতি' মার্গ।

আত্মার একত্ব

পূর্ব বক্তৃতায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ্
৩১
হইতে কিছু পাঠ করিয়া শুনাইব। তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কিরূপে এই-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত।

যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। আপনারা অবশ্য জানেন, ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বয়স হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, এই আমার যাহা-কিছু অর্থ, বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লও।'

মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'ভগবান্, ধনরত্নে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি তাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিব?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকেরা যেরূপে জীবনধারণ করে, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে; কারণ ধনের দ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।'

মৈত্রেয়ী কহিলেন, 'যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি সে উপায় আপনার জানা থাকে, আমাকে তাহাই বলুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এখন এই প্রশ্ন করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে। এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। তুমি উহা শুনিয়া ধ্যান করিতে থাক।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেনঃ

'হে মৈত্রেয়ী, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। সন্তানগণকে কেহ তাহাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতুই সন্তানগণকে ভালবাসিয়া থাকে। অর্থকে কেহ অর্থের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নয়, কিন্তু আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ব্রাহ্মণকে ভালবাসিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কেও লোকে ক্ষত্রিয়ের জন্য ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসিয়া থাকে। এই জগৎকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু জগৎ তাহার প্রিয়। দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই দেবগণের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু দেবগণও তাহার প্রিয়। অধিক কি, কোন বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নয়, কিন্তু তাহার যে আত্মা বিদ্যমান, তাহার জন্যই সে ঐ বস্তুকে ভালবাসে। অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ী, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত হয়।'

এই উপদেশের তাৎপর্য কি? এ এক অদ্ভুত রকমের দর্শন। আমরা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, সর্বপ্রকার প্রেমই স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতার যতদূর নিম্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই স্বার্থপরতাপ্রসূত; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেই হেতু অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। বর্তমানকালেও অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, 'স্বার্থই জগতে সকল কার্যের একমাত্র প্রেরণাদায়িনী শক্তি।' এ-কথা এক হিসাবে সত্য, আবার অন্য হিসাবে ভুল। আমাদের এই 'আমি' সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মার ছায়ামাত্র, যিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন। আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র 'আমি'র উপর ভালবাসা অন্যায় ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্ব-আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাই সসীমভাবে দৃষ্ট হইলে মন্দ বলিয়া বোধ হয়, স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হয়। এমন কি স্ত্রীও যখন স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসিতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতা-রূপে ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মাভাবেরই ক্ষুদ্র অংশ। যখনই কেহ কিছু ভালবাসে, তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয়।

এই আত্মাকে জানিতে হইবে। যাহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা। যাঁহারা আত্মাকে জানিয়া উহাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের ভালবাসায় কোনরূপ বন্ধন নাই, তাঁহারা পরম জ্ঞানী। কেহই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই সে ব্রাহ্মণকে ভালবাসে।

'ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; লোকসমূহ বা জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ... সকল বস্তুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাহাদিগকে, আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ ... এমন কি যাহা কিছু

জগতে আছে, সবই আত্মা।'

এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ভালবাসা বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা বুঝাইলেন। যখনই আমরা এই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি, তখনই যত গোলমাল। মনে করুন, আমি কোন নারীকে ভালবাসি, যদি আমি সেই নারীকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে, বিশেষভাবে দেখি, তবে উহা আর শাশ্বত প্রেম হইল না। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর দুঃখই উহার পরিণাম; কিন্তু যখনই আমি সেই নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখনই সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখনও বিনাশ নাই। এইরূপ যখনই আপনারা জগতের কোন বস্তুকে সমগ্র জগৎ হইতে বা আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তখনই প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভাবি ও আত্মারূপে সম্ভোগ করি, তবে তাহা হইতে কোন দুঃখ কষ্ট বা প্রতিক্রিয়া আসিবে না। ইহাই পূর্ণ আনন্দ।

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঐ অবস্থা লাভ করিবার প্রণালী বলিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত; আত্মাকে না জানিয়া জগতের প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে?

'যদি দুন্দুভি বাজিতে থাকে, আমরা উহা হইতে উৎপন্ন শব্দলহরীগুলি পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু দুন্দুভির সাধারণ ধ্বনি বা আঘাত হইতে ধ্বনিসমূহ গৃহীত হইলে ঐ বিভিন্ন শব্দলহরীও গৃহীত হইয়া থাকে।

'শঙ্খ নিনাদিত হইলে উহার স্বরলহরী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু শঙ্খের সাধারণ ধ্বনি অথবা বিভিন্নভাবে নিনাদিত শব্দরাশি গৃহীত হইলে ঐ শব্দলহরীগুলিও গৃহীত হয়।

'বীণা বাজিতে থাকিলে উহার বিভিন্ন স্বরগ্রাম পৃথক্‌ভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু বীণার সাধারণ সুর অথবা বিভিন্নরূপে উত্থিত সুরসমূহ গৃহীত হইলে ঐ স্বরগ্রামগুলিও গৃহীত হয়।

'যেমন কেহ ভিজা কাঠ জ্বালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানাপ্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেরূপ সেই মহান্ পুরুষ হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা—এই সমস্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয়। সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাস-স্বরূপ।

'যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদয় স্পর্শের একমাত্র আশ্রয় ত্বক, যেমন সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নাসিকা, যেমন সমুদয় রসের একমাত্র আশ্রয় জিহ্বা, যেমন সমুদয় রূপের একমাত্র আশ্রয় চক্ষু, যেমন সমুদয় শব্দের একমাত্র আশ্রয় কর্ণ, যেমন সমুদয় চিন্তার একমাত্র আশ্রয় মন, যেমন সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমুদয় কর্মের একমাত্র আশ্রয় হস্ত, যেমন সমুদয় বাক্যের একমাত্র আশ্রয় বাগিন্দ্রিয়, যেমন সমুদ্র-জলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত রহিয়াছে অথচ উহা চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ী, এই আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সব কিছু। তিনি বিজ্ঞানঘন। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই ডুবিয়া যায়। কারণ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই।'

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলিঙ্গাকারে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছি, আর তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই।

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, সর্বত্রই লোকে যেমন হইয়া থাকে। মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'ভগবন্, আপনি এইখানে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিলেন। দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, 'আমি'-জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যাইবে—এ-কথা বলিয়া আপনি আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছেন। যখন আমি ঐ অবস্থায় পৌঁছিব, তখন কি আমি আত্মাকে জানিতে পারিব? অহং-জ্ঞান হারাইয়া তখন অজ্ঞান-অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অথবা আমি তাঁহাকে জানিতেছি, এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাকেও জানিবার, কিছু অনুভব করিবার, কাহাকেও ভালবাসিবার, কাহাকেও ঘৃণা করিবার থাকিবে না?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'মৈত্রেয়ী, মনে করিও না যে আমি মোহজনক কথা বলিতেছি, তুমি ভয় পাইও না। এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। যে অবস্থায় 'দুই' থাকে অর্থাৎ যাহা দ্বৈতাবস্থা, তাহা নিম্নতর অবস্থা। যেখানে দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহার ঘ্রাণ লইবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিতে পারে? এই আত্মাকে কেবল 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাঁহার কখনও ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই তিনি প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। তিনি পূর্ণ, সমুদয় সুখ-দুঃখের অতীত। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে? কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি? কোন উপায়েই নয়। হে মৈত্রেয়ী, ইহাই ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইলেই তাঁহাকে লাভ করা হয়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।'

এতদূর পর্যন্ত এই ভাব পাওয়া গেল যে, এই-সমুদয়ই এক অনন্ত পুরুষ আর তাঁহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব—সেখানে কোন ভাগ বা অংশ নাই, ভ্রমাত্মক নিম্নভাবগুলির কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর আগাগোড়া সেই অনন্ত যথার্থ

আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছেঃ সমুদয়ই আত্মার অভিব্যক্তিমাত্র। কি করিয়া আমরা এই আত্মাকে লাভ করিব? যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, 'প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, তারপর বিচার করিতে হইবে, তারপর উহার ধ্যান করিতে হইবে।' ঐ পর্যন্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ববস্তুর সাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর সেই আত্মার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমনের শান্তভাব সম্বন্ধে বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞাতা আত্মাকে সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা জানা অসম্ভব। যদি আত্মাকে জানিতে না পারা যায়, তবে কি করিতে হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদিও আত্মাকে জানা যায় না, তথাপি তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীজগতেরই কল্যাণকারী; কারণ উভয়েই পরস্পরের অংশী—একের উন্নতি অপরের উন্নতির সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহায্যকারী কেহ হইতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ অনন্তস্বরূপ। জগতে যত কিছু আনন্দ আছে, এমন কি খুব নিম্নস্তরের আনন্দ পর্যন্ত, ইঁহারই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর ঐ প্রতিবিম্ব যখন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা যায়। যখন এই আত্মা কম অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে; যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভাল-মন্দ কেবল মাত্রার তারতম্য, আত্মার কম-বেশী অভিব্যক্তি লইয়া। আমাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ছেলেবেলায় কত জিনিষকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ। আবার কত জিনিষকে মন্দ বলিয়া দেখি, বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্তন হয়! একটা ভাব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। আমরা এক সময়ে যাহা খুব ভাল বলিয়া ভাবিতাম, এখন আর তাহা সেরূপ ভাল ভাবি না। এইরূপে ভাল-মন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মার প্রকাশমাত্র। আত্মা সব কিছুতে প্রকাশ পাইতেছেন; কেবল তাহার প্রকাশ অল্প হইলে আমরা মন্দ বলি এবং স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্তু স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহা কিছু আছে, সবকেই প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ সবই সেই পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি। তিনি ভালও নন, মন্দও নন; তিনি পূর্ণ, আর পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই হইতে পারে। ভাল জিনিষ অনেক প্রকার হইতে পারে, মন্দও অনেক থাকিতে পারে, ভাল-মন্দের মধ্যে প্রভেদের নানাবিধ মাত্রা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই; ঐ পূর্ণ বস্তু বিশেষ বিশেষ প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়া আমরা অভিহিত করি, অন্য প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে উহাকেই আমরা মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল, ঐ বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ—এরূপ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এই জিনিষ বেশী ভাল, ঐ জিনিষ কম ভাল, আর কম ভালকেই আমরা মন্দ বলি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই সর্বপ্রকার দ্বৈত ভ্রম প্রসূত হইয়াছে। উহারা সকল যুগের নরনারীর বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে ঘৃণা করি, তাহার কারণ শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই-সব মূর্খজনোচিত ধারণা। মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা ভাল-মন্দের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে।

এখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে কি উপদেশ দিতেছেন, শোনা যাকঃ

'এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দজনক, সকল প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু—উভয়েই পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে আসিতেছে।'

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক, পাপীতেই হউক, মহাপুরুষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হউক, দেহেই হউক, মনেই হউক বা ইন্দ্রিয়েই হউক, সেখানেই তিনি আছেন। সেই এক পুরুষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নিম্নতম ইন্দ্রিয়সুখও তিনি, আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিতেছেন। যখন আপনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন, যখন মাতালের পানাসক্তি ও সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব—এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন। তখনই কেবল আপনি বুঝিবেন—সুখ কাহাকে বলে, শান্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, মূর্খের মত ছেলেমানুষী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্বপ্রকার দুঃখ আসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিত্তিরূপে উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন—সবই তাঁহার মধুরত্বের অভিব্যক্তিমাত্র। এই দেহটিও যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—আর সেই দেহের সমুদয় শক্তির ভিতর দিয়া, মনের সর্বপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। 'এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়', কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম।

'এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, আর এই বায়ুর নিকটও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বায়ুতেও রহিয়াছেন এবং দেহেও রহিয়াছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।'

'এই সূর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় পুরুষ সূর্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদয়ই তাঁহার প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ঐ প্রতিবিম্ব-বলে আমরা আলোক দর্শনে সমর্থ হইতেছি।'এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মাস্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মন-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।'

‘এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মা-স্বরূপ আর তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ সবই সেই ব্রহ্ম।’

‘সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা সকল প্রাণীর রাজা।’

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী; ঐগুলি ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন। পৃথিবীকে চিন্তা করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে, পৃথিবীতে যাহা আছে, আমাদের দেহেও তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহ এক করিয়া ফেলুন, আর দেহস্থ আত্মার সহিত পৃথিবীর অন্তর্বর্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন। বায়ুকে বায়ুর ও আপনার অভ্যন্তরবর্তী আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। এইরূপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এ-সবই এক, শুধু বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য—এই একত্ব উপলব্ধি করা, আর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ

অদ্যকার বক্তৃতাতেই সাংখ্য ও বেদান্ত-বিষয়ক এই বক্তৃতাবলী সমাপ্ত হইবে; অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, অদ্য সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব। বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের অতি প্রাচীন ধর্মভাবের কয়েকটির বিবরণ পাইয়া থাকি। মহর্ষি কপিল খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু এই-সকল ভাব তাঁহা অপেক্ষা প্রাচীনতর। সাংখ্যদর্শন কপিলের উদ্ভাবিত নূতন কোন মতবাদ নয়। তাঁহার সময়ে ধর্মসম্বন্ধে যে-সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহা হইতে একটি যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তিনি ভারতবর্ষে এমন এক 'মনোবিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা হিন্দুদের বিভিন্ন আপাতবিরোধী দার্শনিকসম্প্রদায়সমূহ এখনও মানিয়া থাকে। পরবর্তী কোন দার্শনিকই এ পর্যন্ত মানবমনের ঐ অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের উপরে যাইতে পারেন নাই; কপিলই নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান; তিনি যতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদ আর এক পদ অগ্রসর হইল। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া চরম একত্বে পৌঁছিল।

কপিলের সময়ের পূর্বে ভারতে যে-সকল ধর্মভাব প্রচলিত ছিল—আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্মভাবগুলির কথাই বলিতেছি, কিন্তু নিম্নগুলি তো ধর্মের-নামের অযোগ্য—সেগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, প্রথমগুলির ভিতরও প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র প্রভৃতির ধারণা ছিল। অতি প্রাচীন অবস্থায় সৃষ্টির ধারণা বড়ই বিচিত্র ছিলঃ সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব বা শূন্য হইতেই এই সমুদয় আসিয়াছে। পরবর্তী সোপানে আমরা দেখিতে পাই, এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। বেদান্তের প্রথম সোপানেই এই প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়ঃ অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে সতের (অস্তিত্বের) উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি এই জগৎ সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়, তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে। প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যহস্ত দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহারই তো উপাদান-কারণ প্রয়োজন। অতএব প্রাচীন হিন্দুরা স্বভাবতই এই জগৎ যে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রাথমিক ধারণা ত্যাগ করিলেন, আর এই জগৎসৃষ্টির কারণীভূত উপাদান কি, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাস 'কোন্ পদার্থ হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় উপাদান-কারণের অন্বেষণ-মাত্র। নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা—এই প্রশ্ন ব্যতীত, চিরকালই এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 'ঈশ্বর কী উপাদান লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দর্শন নির্ভর করিতেছে।

একটি সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্মা—তিনই নিত্য বস্তু, উহারা যেন তিনটি সমান্তরাল রেখার মত অনন্তকাল পাশাপাশি চলিয়াছে; উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাঁহারা অ-স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য-মনোবিজ্ঞান প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব হইতেই এই-সকল ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঐ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ানুভূতির প্রণালী এইরূপঃ প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে (স্নায়ুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মনে, মন হইতে এবং বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ—উহাকে তাঁহারা 'আত্মা' বলেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীরবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্য-মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য এই একীভাব, যাহার উপর বিষয়ানুভূতিগুলি প্রতিবিম্বিত হইবে, এমন কিছু প্রয়োজন। সেই কিছু না থাকিলে আমি আপনার বা ঐ ছবিখানার বা অন্য কোন বস্তুরই কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের ভিতরে এই একত্ব-বিধায়ক কিছু না থাকিত, তবে আমরা হয়তো কেবল দেখিতেই লাগিলাম, খানিক পরে শুনিতে লাগিলাম, খানিক পরে স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম, আর এমন হইত যে, একজন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, কিন্তু তাহাকে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন।

এই দেহ জড়পরমাণু-গঠিত, আর ইহা জড় ও অচেতন। যাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়, তাহাও ঐরূপ। সাংখ্যের মতে সূক্ষ্ম শরীর অতি সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত একটি ক্ষুদ্র শরীর—উহার পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোনপ্রকার অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও ঐগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজন কি? আমরা যাহাকে 'মন' বলি, এই দেহ তাহার আধারস্বরূপ। যেমন এই স্থূল শরীর স্থূলতর শক্তিসমূহের আধার, সেরূপ সূক্ষ্ম শরীর চিন্তা ও উহার নানাবিধ বিকারস্বরূপ সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহের আধার। প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর—ইহা স্থূল জড় ও স্থূল শক্তিময়। জড় ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, কারণ কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে। অতএব স্থূলতর শক্তিসমূহ এই স্থূল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্য করিতে পারে এবং অবশেষে ঐগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করে। যে-শক্তি স্থূলভাবে কার্য করিতেছে, তাহাই সূক্ষ্মতররূপে কার্য করিতে থাকে এবং চিন্তারূপে পরিণত হয়। উহাদের মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তুর একটি স্থূল ও অপরটি সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যেও উপাদানগত কোন ভেদ নাই। সূক্ষ্ম শরীরও জড়, তবে উহা খুব সূক্ষ্ম জড়।

এই-সকল শক্তি কোথা হইতে আসে? বেদান্তদর্শনের মতে—প্রকৃতি দুইটি বস্তুতে গঠিত। একটিকে তাঁহারা ‘আকাশ’ বলেন, উহা অতি সূক্ষ্ম জড়, আর অপরটিকে তাঁহারা ‘প্রাণ’ বলেন। আপনারা পৃথিবী, বায়ু বা অন্য যাহা কিছু দেখেন, শুনেন বা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেন, তাহাই জড়; এবং সবগুলিই এই আকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। উহা প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখনও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, কখনও স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী—সর্ববস্তুতে অনুস্যূত। আকাশ যেন জলের মত এবং জগতে আর যাহা কিছু আছে, সবই বরফখণ্ডের মত ঐগুলি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলেই ভাসিতেছে; আর প্রাণই সেই শক্তি, যাহা আকাশকে এই বিভিন্নরূপে পরিণত করিতেছে।

পৈশিকগতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা প্রভৃতি প্রাণের স্থূলরূপ প্রকাশের জন্য এই দেহযন্ত্র আকাশ হইতে নির্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীরও সেই প্রাণের চিন্তারূপ সূক্ষ্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্য আকাশ হইতে—আকাশের সূক্ষ্মতর রূপ হইতে নির্মিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে এই স্থূল শরীর, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, তারপর জীব বা আত্মা—উহাই যথার্থ মানব। যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা আমাদের শরীরেরই অংশ, উহা হইতে পৃথক্ নয়, তেমনি আমাদের শরীর দুইটি নয়। মানুষের একটি সূক্ষ্ম শরীর আর একটি স্থূল শরীর আছে, তাহা নয়; শরীর একই, তবে সূক্ষ্মাকারে উহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকে, আর স্থূলটি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বৎসরে শতবার এই নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেরূপ এক যুগে আমি লক্ষ লক্ষ স্থূল শরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যাইবে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব অর্থাৎ যথার্থ ‘মানুষ’ সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম।

এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, যাহা অতি শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর সূক্ষ্মশরীর—উহা যুগ যুগ ধরিয়া বর্তমান থাকে, তারপর জীবাত্মা। বেদান্তদর্শনের মতে ঈশ্বর যেমন নিত্য, এই জীবও সেইরূপ নিত্য, আর প্রকৃতিও নিত্য, তবে উহা প্রবাহরূপে নিত্য। প্রকৃতির উপাদান আকাশ ও প্রাণ নিত্য, কিন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া উহারা বিভিন্ন আকারে পরিবর্তিত হইতেছে। জড় ও শক্তি নিত্য, কিন্তু উহাদের সমবায়সমূহ সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব—আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতেই নির্মিত নয়, উহা অ-জড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে। উহা প্রাণ ও আকাশের কোনরূপ সংযোগের ফল নয়, আর যাহা সংযোগের ফল নয়, তাহা কখনও নষ্ট হইবে না; কারণ বিনাশের অর্থ সংযোগের বিশ্লেষণ। যে-কোন বস্তু যৌগিক নয়, তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। স্থূল শরীর আকাশ ও প্রাণের নানারূপ সংযোগের ফল, সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। সূক্ষ্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ, সুতরাং উহা কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। ঐ একই কারণে আমরা বলিতে পারি না, জীবের কোনকালে জন্ম হইয়াছে। কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেবল যাহা যৌগিক, তাহারই জন্ম হইতে পারে।

লক্ষ কোটি প্রকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার শাসনাধীন রহিয়াছে। কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই—থাকিতেই পারে না। তিনিই শাস্তা। ইহাই দ্বৈত বেদান্তের উপদেশ।

তারপর এই প্রশ্ন আসিতেছেঃ ঈশ্বর যদি এই জগতের শাস্তা হন, তবে তিনি কেন এমন কুৎসিত জগৎ সৃষ্টি করিলেন? কেন আমরা এত কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়া থাকেঃ ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেইরূপ শস্যই পাইয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কিছু করেন না। যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, অন্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে সে ঐভাবে জন্মিবার পূর্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এইরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। জীব চিরকাল বর্তমান আছে, কখনও সৃষ্ট হয় নাই; চিরকাল ধরিয়া নানারূপ কার্য করিতেছে। আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। যদি শুভকর্ম করি, তবে আমরা সুখলাভ করিব, অশুভ কর্ম করিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব, তবে দ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞান উহার স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। যেমন অসৎ কর্মের দ্বারা উহা নিজেকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তেমনি শুভকর্মের দ্বারা উহা নিজস্বরূপ পুনরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তেমনি শুদ্ধ। প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ। যখন শুভকর্মের দ্বারা উহার পাপ ও অশুভ কর্ম ধৌত হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয়, আর যখন সে শুদ্ধ হয়, তখন সে মৃত্যুর পর দেবযান-পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। যদি সে সাধারণভাবে ভাল লোক হয়, সে পিতৃলোকে গমন করে।

স্থূলদেহের পতন হইলে বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারা যায় না; যেখানেই বাক্য, সেখানেই চিন্তা বিদ্যমান। মন আবার প্রাণে লীন হয়, প্রাণ জীবে লয়প্রাপ্ত হয়; তখন দেহত্যাগ করিয়া জীব তাহার অতীত জীবনের কর্ম দ্বারা অর্জিত পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য এক অবস্থায় গমন করে। দেবলোক-অর্থে দেবগণের বাসস্থান। ‘দেব’ শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা প্রকাশস্বভাব—খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা যাহাকে এঞ্জেল (Angel) বলেন, ‘দেব’ বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহাদের মতে—দান্তে তাঁহার ‘ডিভাইন কমেডি’ (Divine Comedy) কাব্যগ্রন্থে যেরূপ নানাবিধ স্বর্গলোকের বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা তাহারই মত নানা প্রকার স্বর্গলোক আছে। যথা পিতৃলোক, দেবলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে জীব ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার নর-জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে-সকল শ্রেষ্ঠ মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছেন, যাঁহারা সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা ও তদীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত আর কিছু করিতে চান না, তাঁহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠ গতি হয়। ইঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরের দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা শুভকর্ম করেন বটে, কিন্তু সেজন্য পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ঐ শুভকর্মের বিনিময়ে স্বর্গে যাইতে চান। মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবাত্মা চন্দ্রলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। জীবাত্মা দেবতা হন। দেবগণ অমর নন, তাঁহাদিগকেও মরিতে হয়। স্বর্গেও সকলেই মরিবে। মৃত্যুশূন্য স্থান কেবল ব্রহ্মলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমাদের পুরাণে দৈত্যগণের উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহারা সময়ে সময়ে দেবগণকে আক্রমণ করে। সর্বদেশের পুরাণেই এই দেব-দৈত্যের সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে দৈত্যেরা দেবগণের উপর জয়লাভ করিয়া থাকে। সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয়া যায় যে, দেবগণ সুন্দরী মানব-দুহিতাদের ভালবাসেন। দেবরূপে জীব কেবল তাঁহার অতীত কর্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু কোন নূতন কর্ম করেন না। কর্ম-অর্থে যে-সকল কার্য ফলপ্রসব করিবে, সেইগুলি বুঝাইয়া থাকে, আবার ফলগুলিকেও বুঝাইয়া থাকে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় এবং সে একটি দেব-দেহ লাভ করে, তখন সে কেবল সুখভোগ করে, নূতন কোন কর্ম করে না। সে তাহার অতীত শুভকর্মের পুরস্কার ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন ঐ শুভকর্মের ফল শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার অন্য কর্ম ফলোন্মুখ হয়।

বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে পুরাণকারগণ—আমাদের পরবর্তী কালের শাস্ত্রকারগণ—ভাবিয়াছিলেন, নরক না থাকিলে কোন ধর্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা নানাবিধ নরক কল্পনা করিলেন, দান্তে তাঁহার 'নরক' (Inferno)-এ যত প্রকার শাস্তি কল্পনা করিয়াছেন, ইঁহারা ততপ্রকার, এমন কি, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকার নরক-যন্ত্রণার কল্পনা করিলেন। তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া বলেন, এই শাস্তি কিছুকালের জন্য মাত্র। ঐ অবস্থায় অশুভ কর্মের ফলভোগ হইয়া উহা ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার উন্নতি করিবার সুযোগ পায়। এই মানবদেহেই উন্নতিসাধনের বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। এই মানবদেহকে 'কর্মদেহ' বলে, এই মানবদেহেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটি বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এই কারণেই অন্যান্য সর্বপ্রকার দেহ অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দেবগণ অপেক্ষাও মানুষ মহত্তর। দেবগণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই পর্যন্ত দ্বৈত বেদান্তের আলোচনা।

তারপর বেদান্ত-দর্শনের আর এক উচ্চতর ধারণা আছে—সেদিক হইতে দেখিলে এগুলি অপরিণত ভাব। যদি বলেন ঈশ্বর অনন্ত, জীবাত্মাও অনন্ত এবং প্রকৃতিও অনন্ত, তবে এইরূপ অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ করা অযৌক্তিক; কারণ এই 'অনন্ত'গুলি পরস্পরকে সসীম করিয়া ফেলিবে এবং প্রকৃত অনন্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ; তিনি নিজে ভিতর হইতে এই জগৎ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। এ-কথার অর্থ কি এই যে, ঈশ্বরই এই দেওয়াল, এই টেবিল, এই পশু, এই হত্যাকারী এবং জগতের যা কিছু মন্দ সব হইয়াছেন? ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ; তিনি কিরূপে এ-সকল মন্দ জিনিষ হইতে পারেন?—না, তিনি এ-সব হন নাই। ঈশ্বর অপরিণামী, এ-সকল পরিণাম প্রকৃতিতে—যেমন আমি অপরিণামী আত্মা, অথচ আমার দেহ আছে। এক অর্থে—এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়, কিন্তু আমি—যথার্থ আমি—কখনই দেহ নই। আমি কখনও বালক, কখনও যুবা, কখনও বা বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে আমার আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। উহা যে আত্মা, সেই আত্মাই থাকে। এইরূপে প্রকৃতি এবং অনন্ত-আত্মা-সমন্বিত এই জগৎ যেন ঈশ্বরের অনন্ত শরীর। তিনি ইহার সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তিনি একমাত্র অপরিণামী। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী এবং আত্মাগুলিও পরিণামী। প্রকৃতির কিরূপ পরিণাম হয়? প্রকৃতির রূপ বা আকার ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, উহা নূতন নূতন আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু আত্মা তো এইরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্মাই অশুভ কর্ম দ্বারা সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হয়। যে-সকল কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিত্রতা সঙ্কুচিত হয়, সেগুলিকেই 'অশুভ কর্ম' বলে। যে-সকল কর্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক মহিমা প্রকাশ করে, সেগুলিকে 'শুভ কর্ম' বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধস্বভাব ছিল, কিন্তু নিজ নিজ কর্মদ্বারা সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় ও শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইবে ও পুনরায় শুদ্ধস্বরূপ হইবে। প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তিলাভের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে এবং কালে সকলেই শুদ্ধস্বরূপ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জগৎ শেষ হইয়া যাইবে না, কারণ উহা অনন্ত। ইহাই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটিকে 'দ্বৈত বেদান্ত' বলে; আর দ্বিতীয়টি—যাহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরূপ আর ঐ তিনে মিলিয়া এক—ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত' বলে। আর এই মতাবলম্বিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। এই মতেও ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ দুই-ই। সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন। ঈশ্বর 'আত্মা-স্বরূপ' আর জগৎ যেন তাঁহার দেহস্বরূপ আর সেই দেহের পরিণাম হইতেছে—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তবে আর ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান-কারণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদান-কারণ অর্থে যে-কারণটি কার্যরূপ ধারণ করিয়াছে। কার্য কারণের রূপান্তর বৈ আর কিছুই নয়। যেখানেই কার্য দেখা যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে কারণই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি জগৎ কার্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, তবে এই জগৎ অবশ্যই ঈশ্বরের রূপান্তর মাত্র। যদি বলা হয়, জগৎ ঈশ্বরের শরীর, আর ঐ দেহ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া কারণ হয় এবং পরে আবার সেই কারণ হইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন। এখন একটি অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে। যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া থাকেন, তবে সবই ঈশ্বর। অবশ্য সবই ঈশ্বর। আমার দেহও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, আমার আত্মাও ঈশ্বর। তবে এত জীব কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর কি লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনন্ত পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিরূপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনন্তকে বিভাগ করা অসম্ভব। তবে কিভাবে সেই শুদ্ধসত্তা (সৎস্বরূপ) এই জগৎ হইলেন? যদি তিনি জগৎ হইয়া থাকেন, তবে তিনি পরিণামী, পরিণামী হইলেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত, যাহা কিছু প্রকৃতির অন্তর্গত তাহারই জন্ম-মৃত্যু আছে। যদি ঈশ্বর পরিণামী হন, তবে তাঁহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এইটি মনে রাখিবেন। আর একটি প্রশ্নঃ ঈশ্বরের কতখানি এই জগৎ হইয়াছে? যদি বলেন, ঈশ্বরের 'ক' অংশ জগৎ হইয়াছে, তবে ঈশ্বর='ঈশ্বর'—ক; অতএব সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই; কারণ তাঁহার কিছুটা অংশ জগৎ হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই, ইহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। এই দেবতা, স্বর্গ, জন্মমৃত্যু, অনন্তসংখ্যক আত্মা আসিতেছে, যাইতেছে—এই সবই কেবল স্বপ্নমাত্র। সমুদয়ই সেই এক অনন্তস্বরূপ। একই সূর্য বিবিধ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ দেখাইতেছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে সূর্যের লক্ষ লক্ষ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই সূর্যের সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি রহিয়াছে; কিন্তু সূর্য

প্রকৃতপক্ষে একটি। এই-সকল জীব সম্বন্ধেও সেই কথা—তাহারা সেই এক অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্বমাত্র। স্বপ্ন কখনই সত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য—সেই এক অনন্ত সত্তা। শরীর, মন বা জীবাত্মাভাবে ধরিলে আপনি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু আপনার যথার্থ স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই-সব জন্ম, পুনর্জন্ম, এই আসা-যাওয়া—এ-সব সেই স্বপ্নের অংশমাত্র। আপনি অনন্তস্বরূপ। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? সূর্য, চন্দ্র ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার যথার্থ স্বরূপের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্ম-মরণ কিরূপে হইবে? আত্মা কখনই জন্মান নাই, কখনই মরিবেনও না; আত্মার কোন কালে পিতা-মাতা, শত্রু-মিত্র কিছুই নাই; কারণ আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে মানুষের চরম লক্ষ্য কি?—এই জ্ঞানলাভ করা ও জগতের সহিত এক হইয়া যাওয়া। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এই সমুদয় স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, আর তাঁহারা নিজদিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা তাঁহাদের যথার্থ 'আমিত্ব' লাভ করেন—আমরা এখন যে ক্ষুদ্র অহংকে এত বড় একটা জিনিষ বলিয়া মনে করিতেছি, উহা তাহা হইতে অনেক দূরে। আমিত্ব নষ্ট হইবে না—অনন্ত ও সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখবোধ আর থাকিবে না। আমরা এখন এই ক্ষুদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া সুখ পাইতেছি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহ বলিয়া বোধ হইবে, তখন আমরা কত অধিক সুখ পাইব? এই পৃথক্ পৃথক্ দেহে যদি এত সুখ থাকে, তবে যখন সকল দেহ এক হইয়া যাইবে, তখন আরও কত অধিক সুখ! যে-ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াছে, সে-ই মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে এই স্বপ্ন কাটাইয়া তাহার পারে চলিয়া গিয়াছে, নিজের যথার্থ স্বরূপ জানিয়াছে। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের উপদেশ।

বেদান্তদর্শন একটির পর একটি সোপানত্রয় অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, আর আমরা ঐ তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ আমরা একত্বের পর আর যাইতে পারি না। যাহা হইতে জগতের সব কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণ এক-স্বরূপের ধারণার বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। এই অদ্বৈতবাদ সকলে গ্রহণ করিতে পারে না; সকলের দ্বারা গৃহীত হইবার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন। প্রথমতঃ বুদ্ধিবিচারের দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝা অতিশয় কঠিন। ইহা বুঝিতে তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির প্রয়োজন, নির্ভীক বোধশক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ উহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই উপযোগী নয়।

এই তিনটি সোপানের মধ্যে প্রথমটি হইতে আরম্ভ করা ভাল। ঐ প্রথম সোপানটির সম্বন্ধে চিন্তাপূর্বক ভাল করিয়া বুঝিলে দ্বিতীয়টি আপনিই খুলিয়া যাইবে। যেমন একটি জাতি ধীরে ধীরে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হয়, ব্যক্তিকেও সেইরূপ করিতে হয়। ধর্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে মানবজাতিকে যে-সকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল প্রভেদ এই যে, সমগ্র মানবজাতির এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তি-মানব কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করিয়া ফেলিতে পারেন, অথবা আরও শীঘ্র—হয়তো ছয় মাসের মধ্যেই পারেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই এই সোপানগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা যখন ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন, নিজেদের জীবনের সেই সময়ের কথা অবশ্যই মনে করিতে পারেন। যখনই আপনারা নিজদিগকে দেহ ও মন বলিয়া ভাবেন, তখন আপনাদিগকে এই স্বপ্নের সমগ্রটাই লইতে হইবে। একটি ভাব লইলেই সমুদয়টি লইতে হইবে। যে-ব্যক্তি বলে, জগৎ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ যদি জগৎ থাকে, তবে জগতের একটা কারণও থাকিবে, আর সেই কারণের নামই ঈশ্বর। কার্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে, অবশ্য জানিতে হইবে। যখন জগৎ অন্তর্হিত হইবে, তখনই ঈশ্বরও অন্তর্হিত হইবেন। যখন আপনি ঈশ্বরের সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিবেন, তখন আপনার পক্ষে আর এই জগৎ থাকিবে না। কিন্তু যতদিন এই স্বপ্ন আছে, ততদিন আমরা আমাদিগকে জন্মমৃত্যুশীল বলিয়া মনে করিতে বাধ্য, কিন্তু যখনই 'আমার দেহ'—এই স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে 'আমরা জন্মাইতেছি ও মরিতেছি'—এ স্বপ্নও অন্তর্হিত হইবে, এবং 'একটা জগৎ আছে'—এই স্বপ্নও চলিয়া যাইবে। যাহাকে আমরা এখন এই জগৎ বলিয়া দেখিতেছি, তাহাই আমাদের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং যে-ঈশ্বরকে এতদিন আমরা বাহিরে অবস্থিত বলিয়া জানিতেছিলাম, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা-রূপে প্রতীত হইবেন। অদ্বৈতবাদের শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'—তাহাই তুমি।

ধর্ম কি?

রেল-লাইনের উপর দিয়া একখানা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন সশব্দে চলিয়াছে; একটি ক্ষুদ্র কীট লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল, গাড়ী আসিতেছে জানিতে পারিয়া সে আস্তে আস্তে রেল-লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। যদিও ঐ ক্ষুদ্র কীটটি এতই নগণ্য যে, গাড়ীর চাপে যে-কোন মুহূর্তে নিষ্পেষিত হইতে পারে, তথাপি সে একটা জীব—প্রাণবান্ বস্তু; আর এত বৃহৎ, এত প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটি একটা যন্ত্র মাত্র। আপনারা বলিবেন, একটির জীবন আছে, আর একটি জীবনহীন জড়মাত্র—উহার শক্তি, গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক না কেন, উহা প্রাণহীন জড় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ঐ ক্ষুদ্র কীটটি যে লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং ইঞ্জিনের স্পর্শমাত্রেই যাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে ঐ প্রকাণ্ড রেলগাড়ীটির তুলনায় মহিমাসম্পন্ন। উহা যে সেই অনন্ত ঈশ্বরেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং সেইজন্য এই শক্তিশালী ইঞ্জিন অপেক্ষাও মহৎ। কেন উহার এই মহত্ত্ব হইল? জড় ও প্রাণীর পার্থক্য আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? যন্ত্রকর্তা যন্ত্রটি যেরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়া নির্মাণ করিয়াছিল, যন্ত্র সেইটুকু কার্যই সম্পাদন করে, যন্ত্রের কার্যগুলি জীবন্ত প্রাণীর কার্যের মত নয়। তবে জীবন্ত ও প্রাণহীনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপে করা যাইবে? জীবিত প্রাণীর স্বাধীনতা আছে, জ্ঞান আছে আর মৃত জড়বস্তু কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীতে বদ্ধ এবং তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার জ্ঞান নাই। যে-স্বাধীনতা থাকায় যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব—সেই মুক্তি-লাভের জন্যই আমরা সকলে চেষ্টা করিতেছি। অধিকতর মুক্ত হওয়াই আমাদের সকল চেষ্টার উদ্দেশ্য, কারণ শুধু পূর্ণ মুক্তিতেই পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে। আমরা জানি বা না জানি, মুক্তিলাভ করিবার এই চেষ্টাই সর্বপ্রকার উপাসনা-প্রণালীর ভিত্তি।

জগতে যত প্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অতি অসভ্যজাতিরা ভূত, প্রেত ও পূর্বপুরুষদের আত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। সর্পপূজা, পূর্বপুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, উপজাতীয় দেবগণের উপাসনা—এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে? কারণ লোকে অনুভব করে যে, কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দেবগণ ও পূর্বপুরুষেরা তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা অনেক বড়, বেশী শক্তিশালী এবং তাহাদের স্বাধীনতা সীমিত করিতেছেন। সুতরাং অসভ্যজাতিরা এই-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাঁহারা তাহাদের কোন উৎপীড়ন না করিতে পারেন অর্থাৎ যাহাতে তাহারা অধিকতর স্বাধীনতালাভ করিতে পারে। তাহারা ঐ-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষের পূজা করিয়া তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে প্রয়াসী এবং যে-সকল বস্তু মানুষের নিজের পুরুষকারের দ্বারা উপার্জন করা উচিত, সেগুলি ঈশ্বরের বরস্বরূপ পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। মোটের উপর এই-সকল উপাসনা-প্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আশা করিতেছে। এই আশা আমাদিগকে কখনই একেবারে পরিত্যাগ করে না, আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা সকলেই অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যাপারগুলির দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছি। জীবনের অর্থ ও রহস্যের অবিরাম অনুসন্ধান ছাড়া মন বলিতে আর কি বুঝায়? আমরা বলিতে পারি, অশিক্ষিত লোকেরাই এই আজগুবির অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে—এ প্রশ্ন তো আমরা সহজে এড়াইতে পারিব না। য়াহুদীরা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। য়াহুদীদের মত সমগ্র জগৎই হাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া এইরূপ অলৌকিক বস্তু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। আবার দেখুন, জগতে সকলের ভিতরেই একটা অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটা আদর্শ গ্রহণ করি, কিন্তু উহার দিকে তাড়াহুড়া করিয়া অগ্রসর হইয়া অর্ধপথ পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই নূতন আর একটা আদর্শ ধরিয়া বসিলাম। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্য কঠোর চেষ্টা করি, কিন্তু তারপর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বারবার আমাদের এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি শুধু অসন্তোষই আসিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনের কি অবস্থা হয়? এই সর্বজনীন অসন্তোষের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—মুক্তিই মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য। যতদিন না মানুষ এই মুক্তি লাভ করিতেছে, ততদিন সে মুক্তি খুঁজিবেই। তাহার সমগ্র জীবনই এই মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র। শিশু জন্মিয়াই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শিশুর প্রথম শব্দস্ফুরণ হইতেছে ক্রন্দন—যে-বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ দেখে, তাহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। মুক্তির এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই ধারণা জন্মে যে, এমন একজন পুরুষ অবশ্যই আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্তস্বভাব। ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রকৃতির মূল উপাদান। বেদান্তে সচ্চিদানন্দই মানবমনের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা। ঈশ্বর চিদ্‌ঘন ও স্বভাবতই আনন্দঘন। আমরা অনেকদিন ধরিয়া ঐ অন্তরের বাণীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করিয়া মনুষ্যপ্রকৃতির স্ফূর্তিতে বাধা দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমরা ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের, নিম্নস্তরের মনের সহিত উচ্চতর মনের সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এই সংগ্রাম নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব—যাহাকে আমরা আমাদের আমিত্ব বা 'ব্যক্তিত্ব' বলি—রক্ষা করিবার একটা চেষ্টা।

এমন কি নরকও এই অদ্ভুত সত্য প্রকাশ করে যে, আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য—জীবনীশক্তির চিহ্ন এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা চলিব না।' যতদিন আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন আমরা যন্ত্রের মত—ততদিন জগৎপ্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে, উহার শৃঙ্খল আমরা ভাঙিতে পারি না। নিয়মই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া যায়। যখনই আমরা প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই উচ্চস্তরের জীবনের প্রথম ইঙ্গিত বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'মুক্তি, অহো মুক্তি! মুক্তি, অহো মুক্তি!'—আত্মার অন্তস্তল হইতে এই সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে। বন্ধন—হায়, প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই জীবনের অদৃষ্ট বা পরিণাম বলিয়া মনে হয়।

অতিপ্রাকৃত শক্তিলাভের জন্য সর্প ও ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্মমত ও সাধন-প্রণালী থাকিবে কেন? বস্তুর সত্তা আছে, জীবন আছে—এ-কথা আমরা কেন বলি? এই-সব অনুসন্ধানের—জীবন বুঝিবার এবং সত্তা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার নিশ্চয়ই

একটা অর্থ আছে। ইহা অর্থহীন ও বৃথা হইতে পারে না। ইহা মানুষের মুক্তিলাভের নিরন্তর চেষ্টা। যে বিদ্যাকে আমরা এখন 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করি, তাহা সহস্র সহস্র বর্ষ যাবৎ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং মানুষ এই মুক্তিই চায়। তথাপি প্রকৃতির ভিতর তো মুক্তি নাই। ইহা নিয়ম—কেবল নিয়ম। তথাপি মুক্তির চেষ্টা চলিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণুটি পর্যন্ত সমুদয় প্রকৃতিই নিয়মাধীন—এমন কি মানুষেরও স্বাধীনতা নাই। কিন্তু আমরা এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা প্রথম হইতেই প্রকৃতির নিয়মাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তথাপি আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারি না; শুধু তাহাই নয়, বিশ্বাস করিব না যে, মানুষ নিয়মের অধীন। আমাদের আত্মার অন্তস্তল হইতে প্রতিনিয়ত 'মুক্তি! মুক্তি!'—এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। নিত্যমুক্ত সত্তারূপে ঈশ্বরের ধারণা করিলে মানুষ অনন্তকালের জন্য এই বন্ধনের মধ্যে শান্তি পাইতে পারে না। মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা যদি তাহার নিজের জন্য না হইত, তবে সে এই চেষ্টাকে এক অতি কঠোর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। মানুষ নিজের দিকে তাকাইয়া বলিয়া থাকে, 'আমি জন্মাবধি ক্রীতদাস, আমি বদ্ধ; তাহা হইলেও এমন একজন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নন—তিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু।'

সুতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেদ্য ও মূল অংশ, ঈশ্বরধারণাও তদ্রূপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেদ্য। এই মুক্তির ভাব হইতেই উভয়ের উদ্ভব। এই মুক্তির ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতরেও জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না। উদ্ভিদে অথবা কীটের ভিতর ঐ জীবনীশক্তিকে ব্যষ্টিগত ধারণার স্তরে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞাতসারে ঐ মুক্তির চেষ্টা উহাদের ভিতর কার্য করিতেছে, উদ্ভিদ্ জীবনধারণ করিতেছে—ইহার বৈচিত্র্য, নীতি ও রূপ রক্ষা করিবার জন্য, প্রকৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। প্রকৃতি উন্নতির প্রত্যেকটি সোপান নিয়মিত করিতেছে—এইরূপ ধারণা করিলে মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাবটি একেবারে উড়াইয়া দিতে হয়। জড়জগতের ভাব আগাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও আগাইয়া চলিয়াছে। তথাপি ক্রমাগত সংগ্রাম চলিতেছে। আমরা বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্তু মত ও সম্প্রদায়গুলি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক, উহারা থাকিবেই। শৃঙ্খল যতই দীর্ঘ হইতেছে, দ্বন্দ্বও স্বাভাবিকভাবে ততই বাড়িতেছে, কিন্তু যদি আমরা শুধু জানি যে, আমরা সকলে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে বিবাদের আর প্রয়োজন থাকে না।

মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকি। আপনারা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনারা এক মুহূর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে পারেন না। যদি আপনারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তবে কি কখনও এখানে আসিতেন? খুব সম্ভব, প্রাণিতত্ত্ববিৎ এই মুক্ত হইবার অবিরাম চেষ্টার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেন। এ-সবই মানিয়া লইতে পারেন, তথাপি ঐ মুক্তির ভাবটি আমাদের ভিতর থাকিয়া যাইতেছে। 'আপনারা প্রকৃতির অধীন'—এই ভাবটি যেমন আপনারা অতিক্রম করিতে পারেন না, এ-ভাবটি যেমন সত্য, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য।

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ—এ দ্বন্দ্ব থাকিবেই। বুঝিতে হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে। একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও তেমনি সত্য হইবে। এই মুক্তির ধারণা অবশ্যই থাকিবে। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর বন্ধনের ধারণা দেখিতে পাই, এবং ঐ ধারণাকে মুক্তির চেষ্টা বলিয়া এখন বুঝিতে পারি না, তথাপি ঐ মুক্তির ভাব তাহার ভিতর রহিয়াছে। অশিক্ষিত বর্বর মানুষের মনে পাপ ও অপবিত্রতার বন্ধনের চেতনা অতি অল্প, কারণ তাহার প্রকৃতি পশুভাব অপেক্ষা বড় বেশী উন্নত নয়। সে দৈহিক বন্ধন, দেহ-সম্ভোগের অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু এই নিম্নতর চেতনা হইতে ক্রমে মানসিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং বৃদ্ধি পায়। এখানে আমরা দেখিতে পাই, সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ আবরণ ঘন থাকে এবং সেই দিব্যজ্যোতি প্রায় আচ্ছাদিত থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জ্যোতি—সেই মুক্তি ও পূর্ণতার উজ্জ্বল অগ্নি সদা পবিত্র ও অনির্বাণ রহিয়াছে। মানুষ এই দিব্যজ্যোতিকে বিশ্বের নিয়ন্তা, একমাত্র মুক্ত পুরুষের প্রতীক বলিয়া ধারণা করে। সে তখনও জানে না যে, সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড বস্তু—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, ধারণার তারতম্যে।

সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপাসনা-স্বরূপ। যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-স্বরূপ। এই মুক্তি দ্বারা অবশ্যই সমগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ হয় এবং জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। আমরা যতই জ্ঞানী হই, ততই প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারি। প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিলেই আমরা শক্তিসম্পন্ন হই; এবং যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু, তাঁহার অবশ্য প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ হইবেন। মুক্তির সঙ্গে এইগুলি অবশ্য থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এইগুলি লাভ করিয়াছেন, কেবল তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন।

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে-সকল তত্ত্ব আছে, সেগুলির মূলে পূর্ণ মুক্তি। এই মুক্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ ও নিত্য শান্তি ধর্মের উচ্চতম ধারণা। ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা—যেখানে কোন কিছুর বন্ধন থাকিতে পারে না, যেখানে প্রকৃতি নাই, পরিবর্তন নাই, এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাতে কোন পরিণাম উৎপন্ন করিতে পারে। এই একই মুক্তি আপনার ভিতর, আমার ভিতর রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ মুক্তি।

ঈশ্বর সর্বদাই নিজ মহিমময় অপরিণামী স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাঁহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার, ধন, নাম-যশ, মানবীয় প্রেম এবং এ-সব পরিণামী প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, উহার প্রকাশ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, সূর্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নয়। যেখানেই কোন বস্তু প্রকাশ পায়, সূর্যের আলোকেই হউক অথবা আমাদের চেতনাতেই হউক, উহা তিনিই। তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সব

কিছু প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ; ইনি ব্যক্তি নন, অথচ সর্বজ্ঞ, প্রকৃতির জ্ঞাতা ও কর্তা, সকলের প্রভু। সকল উপাসনার মূলেই তিনি রহিয়াছেন; আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তাঁহারই উপাসনা হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই—যাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হয়, যাহাকে আমরা মন্দ বলি, তাহাও ঈশ্বরেরই উপাসনা। তাহাও মুক্তিরই একটা দিক্ মাত্র। শুধু তাহাই নয়—আপনারা হয়তো আমার কথা শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন মন্দ কাজ করিতেছেন, ঐ প্রবৃত্তির পিছনেও রহিয়াছে সেই মুক্তি। ঐ প্রেরণা হয়তো ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেরণা সেখানে রহিয়াছে। পিছনে মুক্তির প্রেরণা না থাকিলে কোনরূপ জীবন বা কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না। বিশ্বের স্পন্দনের মধ্যে এই মুক্তি প্রাণবন্ত হইয়া আছে। সকলের হৃদয়ে যদি একত্ব না থাকিত, তবে আমরা বহুত্বের ধারণাই করিতে পারিতাম না, উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ। সময়ে সময়ে এই ধারণা আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে—উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করে, যাহা দেখিয়া আমরা প্রথমে একেবারে স্তম্ভিত হই। সেই আদর্শ এই—স্বরূপতঃ আমরা ভগবানের সহিত অভিন্ন। যিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ এবং ফুটন্ত গোলাপকলি, তিনিই শক্তিরূপে চারাগাছ ও প্রজাপতিতে বিরাজমান। যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার তেজ হইতেই জীবনের আবির্ভাব, আবার ভীষণ মৃত্যুও তাঁহারই শক্তি। তাঁহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাঁহার ছায়াই অমৃতত্ব। আরও এক উচ্চতর ধারণার কথা বলি। যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই আমরা সকলে ব্যাধ-কর্তৃক অনুসৃত শশকের মত পলায়ন করিতেছি এবং তাহাদের মতই মাথা লুকাইয়া নিজেদের নিরাপদ ভাবিতেছি। সমগ্র জগৎই যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এক-সময়ে আমি কাশীতে একটা পথ দিয়া যাইতেছিলাম, উহার এক পাশে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অপর পাশে একটা উঁচু দেওয়াল। মাটিতে অনেকগুলি বানর ছিল; কাশীর বানরগুলি দীর্ঘকায় জানোয়ার এবং অনেক সময় অশিষ্ট। এখন ঐ বানরগুলির মাথায় খেয়াল উঠিল যে, তাহারা আমাকে সেই রাস্তা দিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল। তাহারা আমার আরও কাছে আসিতে থাকায় আমি দৌড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু যতই দৌড়াই, ততই তাহারা আরও নিকটে আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। বানরদের হাত এড়ান অসম্ভব বোধ হইল—এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আমাকে ডাক দিয়া বলিল, 'বানরগুলির সম্মুখীন হও।' আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি তাহারা পিছু হটিয়া পলাইল। সমগ্র জীবনে আমাদের এই শিক্ষা পাইতে হইবে—যাহা কিছু ভয়ানক, তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সাহসের সহিত উহা রুখিতে হইবে। জীবনের দুঃখ-কষ্টের ভয়ে না পলাইয়া সম্মুখীন হইলেই বানরদলের মত সেগুলি হটিয়া যায়। যদি আমাদিগকে কখনও মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই উহা লাভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলায়ন করিয়া নয়। কাপুরুষেরা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। যদি আমরা চাই—ভয় কষ্ট ও অজ্ঞান আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

মৃত্যু কি? ভয় কাহাকে বলে? এই-সকলের ভিতর কি ভগবানের মুখ দেখিতেছ না? দুঃখ ভয় ও কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন কর, দেখিবে সেগুলি তোমাকে অনুসরণ করিবে। এগুলির সম্মুখীন হও, তবেই তাহারা পলাইবে। সমগ্র জগৎ সুখ ও আরামের উপাসক; যাহা দুঃখকর, তাহার উপাসনা করিতে খুব অল্প লোকেই সাহস করে। সুখ ও দুঃখ উভয়কে অতিক্রম করাই মুক্তির ভাব। মানুষ এই দ্বার অতিক্রম না করিলে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের সকলকেই এগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ—প্রকৃতি, ভগবান্ ও আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে বজ্রের মধ্যে, লজ্জা দুঃখ দুর্বিপাক ও পাপতাপের মধ্যে তাঁহাকে উপাসনা করিতে ও ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগৎ পুণ্যের ঈশ্বরকে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। আমি একাধারে পুণ্য ও পাপের ঈশ্বরকে প্রচার করি। যদি সাহস থাকে, এই ঈশ্বরকে গ্রহণ কর—এই ঈশ্বরই মুক্তির একমাত্র পথ; তবেই সেই একত্বরূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে পারিবে। তবেই একজন অপর অপেক্ষা বড়—এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই আমরা এই মুক্তির নিয়মের সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরে শরণাগত হই, ততই আমাদের দুঃখকষ্ট চলিয়া যায়। তখন আমরা আর নরকের দ্বার হইতে স্বর্গদ্বারকে পৃথক্‌ভাবে দেখিব না, মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব না, 'আমি জগতের যে-কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।' যতদিন আমরা সেই প্রভু ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও না দেখি, ততদিন এই-সব দুঃখকষ্ট আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, এবং আমরা এই-সকল ভেদ দেখিব; কারণ সেই ভগবানেই—সেই আত্মাতেই আমরা সকলে অভিন্ন, আর যতদিন না আমরা ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, ততদিন এই একত্বানুভূতি হইবে না।

একই বৃক্ষে সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখা-স্বরূপ দুইটি পক্ষী রহিয়াছে
১
—তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটি নিম্নে। নীচের সুন্দর পক্ষীটি বৃক্ষের স্বাদু ও কটু ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে—একবার একটি স্বাদু, পরমুহূর্তে আবার কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে। যে মুহূর্তে পক্ষীটি কটু ফল খাইল, তাহার দুঃখ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটি ফল খাইল এবং তাহাও যখন কটু লাগিল, তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—অপর পক্ষীটি স্বাদু বা কটু কোন ফলই খাইতেছে না, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধীর ভাবে বসিয়া আছে। তারপর বেচারা নীচের পাখীটি সব ভুলিয়া আবার স্বাদু ও কটু ফলগুলি খাইতে লাগিল; অবশেষে অতিশয় কটু একটি ফল খাইল, কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সেই উপরের মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। অবশেষে ঐ উপরের পক্ষীটির দিকে অগ্রসর হইয়া সে যখন তাহার খুব সন্নিহিত হইল, তখন সেই উপরের পক্ষীর অঙ্গজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার অঙ্গে লাগিল ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে তখন দেখিল, সে নিজেই উপরের পক্ষীতে রূপায়িত হইয়া গিয়াছে; সে শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইয়া গিয়াছে; আর দেখিল—বৃক্ষে বরাবর একটি পক্ষীই রহিয়াছে। নীচের পক্ষীটি উপরের পক্ষীটির ছায়ামাত্র। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্তু যেমন এক সূর্য লক্ষ শিশির বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সূর্যরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঈশ্বরও বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিম্ব দূর হওয়া আবশ্যক। এই

বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পারে না। সেইজন্যই কৃপণ অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে, দস্যু অপহরণ করে, পাপী পাপাচরণ করে, তোমরা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা কর। সকলেরই এক উদ্দেশ্য। এই মুক্তি লাভ করা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই পূর্ণতালাভের চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকেই এই পূর্ণতা লাভ করিবে।

যে-ব্যক্তি পাপতাপের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, যে-ব্যক্তি নরকের পথ বাছিয়া লইয়াছে, সেও এই পূর্ণতালাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি না। ঐ পথে চলিতে চলিতে সে যখন কতকগুলি শক্ত আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে; অবশেষে ধর্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, ও আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে। সকলে অজ্ঞাতসারে যাহা করিতেছে, তাহাই আমরা জ্ঞাতসারে করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেন্ট পল এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, ‘তোমরা যে-ঈশ্বরকে অজ্ঞাতসারে উপাসনা করিতেছ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি।’ সমগ্র জগৎকে এই শিক্ষা শিখিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই-সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি এগুলি জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছিতে সাহায্য না করে? আমরা যেন বিভিন্ন বস্তুতে ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হই—মানুষ নিজেকে সকল বস্তুতে দেখিতে শিখুক। আমরা যেন ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্মমত বা সম্প্রদায়সমূহের উপাসক আর না হই, এবং জগতের সকলের ভিতর তাঁহাকে দর্শন করি। আপনারা যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে নিজেদের হৃদয়ে যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাকেই সর্বত্র উপাসনা করিবেন।

প্রথমতঃ এ-সকল সঙ্কীর্ণ ধারণা ত্যাগ কর এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিনি সকল হাত দিয়া কার্য করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বাস করেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন। তিনি স্বতঃপ্রমাণ—আমাদের নিকট হইতেও নিকটতর। ইহা জানাই ধর্ম—ইহা জানাই বিশ্বাস। প্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন। আমরা যখন সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিব, তখন অমৃতত্ব লাভ করিব। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমরা অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক। যতদিন এ জগতে একজনও বাঁচিয়া থাকে, আমি তাহার মধ্যে জীবিত আছি। আমি এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব নই, আমি সমষ্টিস্বরূপ। অতীতে যত প্রাণী জন্মিয়াছিল, আমি তাহাদের সকলের জীবনস্বরূপ; আমিই বুদ্ধের, যীশুর ও মহম্মদের আত্মা। আমি সকল আচার্যের আত্মা, যে-সকল দস্যু অপহরণ করিয়াছে, যে-সকল হত্যাকারীর ফাঁসি হইয়াছে, আমি তাহাদের স্বরূপ, আমি সর্বময়। অতএব উঠ—ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা। তুমি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন। ইহাই যথার্থ বিনয়—হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে কেবল ‘আমি পাপী, আমি পাপী’ বলার নাম বিনয় নয়। যখন এই ভেদের আবরণ ছিন্ন হয়, তখনই সর্বোচ্চ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সমগ্র জগতের অখণ্ডত্বই—একত্বই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। আমি অমুক ব্যক্তি-বিশেষ—ইহা তো অতি সঙ্কীর্ণভাব—পাকা ‘আমি’র পক্ষে ইহা সত্য নয়। আমি সর্বময়—এই ভাবের উপর দণ্ডায়মান হও এবং সেই পুরুষোত্তমকে সর্বোচ্চভাবে সতত উপাসনা কর, কারণ ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ এবং তাঁহাকে সত্য ও চৈতন্যরূপে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার নিম্নতম প্রণালী অবলম্বনে মানুষের জড়বিষয়ক চিন্তাগুলি আধ্যাত্মিক উপাসনায় উন্নীত হয়, এবং অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত ঈশ্বর চৈতন্যের মধ্য দিয়া উপাসিত হন। যাহা কিছু সান্ত, তাহা জড়; চৈতন্যই কেবল অনন্ত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনন্ত মানুষ চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং অনন্ত এবং কেবল অনন্তই অনন্তের উপাসনায় সমর্থ। আমরা সেই অনন্তের উপাসনা করিব; উহাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনা। এ-সকল ভাবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা কত কঠিন! আমি যখন কেবল কল্পনার সাহায্যে মত গঠন করি, কথা বলি, দার্শনিক বিচার করি এবং পর মুহূর্তে কোন কিছু আমার প্রতিকূল হইলে অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ হই, তখন ভুলিয়া যাই যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আর কিছু আছে; তখন বলিতে ভুলিয়া যাই যে, আমি চৈতন্যস্বরূপ, এ অকিঞ্চিৎকর জগৎ আমার নিকট কি? আমি চৈতন্যস্বরূপ। আমি তখন ভুলিয়া যাই যে, এ-সব আমারই খেলা—ভুলিয়া যাই ঈশ্বরকে, ভুলিয়া যাই মুক্তির কথা।

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, দুরধিগম্য ও কঠিন—ইহা অতিক্রম করা কঠিন।
২
ঋষিরা এ-কথা বারবার বলিয়াছেন। তাহা হইলেও এ-সকল দুর্বলতা ও বিফলতা যেন তোমাকে বদ্ধ না করে। উপনিষদের বাণীঃ ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’ উঠ—জাগ, যতদিন না সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদিও ঐ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—দুরতিক্রম্য, দীর্ঘ ও কঠিন; আমরা ইহা অতিক্রম করিবই করিব। মানুষ সাধনাবলে দেবাসুরের প্রভু হয়। আমরা ব্যতীত আমাদের দুঃখের জন্য আর কেহই দায়ী নয়। তুমি কি মনে কর, মানুষ যদি অমৃতের অনুসন্ধান করে, তৎপরিবর্তে সে বিষ লাভ করিবে? অমৃত আছেই এবং যে উহা পাইবার চেষ্টা করে, সে পাইবেই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেনঃ সকল ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে ভবসাগরের পরপারে লইয়া যাইব, ভীত হইও না।
৩

এই বাণী জগতের সকল ধর্মশাস্ত্রেই আমরা শুনিতে পাই। সেই একই বাণী আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ‘স্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তেমনি—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ সবই তোমার রাজত্ব, তোমার শক্তি, তোমার মহিমা।’
৪
কঠিন—বড় কঠিন কথা। আমি নিজে নিজে বলি, ‘হে প্রভু, আমি এখনই তোমার শরণ লইব—প্রেমময়, তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিব, তোমার বেদীতে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পুণ্য—সবই স্থাপন করিব। আমার পাপতাপ, আমার ভালমন্দ—সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিব। তুমি সব গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কখনও ভুলিব না।’ এক মুহূর্তে বলি, ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক’; পর মুহূর্তেই একটা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয় আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তখন আমি ক্রোধে লাফাইয়া উঠি। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্য বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন। এই মিথ্যা ‘আমি’-কে মারিয়া ফেল, তাহা হইলেই পাকা ‘আমি’ বিরাজ করিবে। হিব্রু শাস্ত্র বলেন, ‘তোমাদের প্রভু আমি ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর—আমার সম্মুখে তোমার অন্য দেবতাদের উপাসনা করিলে চলিবে না।’

৫
সেখানে একমাত্র ঈশ্বরই রাজত্ব করিবেন। আমাদের বলিতে হইবে—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।'—আমি নই, তুমি। তখন সেই প্রভুকে ব্যতীত আমাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; তিনি, শুধু তিনিই রাজত্ব করিবেন। হয়তো আমরা খুব কঠোর সাধনা করি, তথাপি পরমুহূর্তেই আমাদের পদস্খলন হয় এবং তখন আমরা জগজ্জননীর নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা করি; বুঝিতে পারি, জগজ্জননীর সহায়তা ব্যতীত আমরা দাঁড়াইতে পারি না। জীবন অনন্ত, উহার একটি অধ্যায় এইঃ 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' এবং জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়ের মর্মগ্রহণ করিতে না পারিলে সমগ্র জীবন উপলব্ধি করিতে পারি না। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক মন এই ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি কাঁচা 'আমি'-কে জয় করিতে হইলে বারবার ঐ কথা অবশ্য বলিতে হইবে। আমরা বিশ্বাসঘাতকের সেবা করিব অথচ পরিত্রাণ পাইব—ইহা কখনও হইতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত সকলেই পরিত্রাণ পাইবে এবং যখন আমরা আমাদের 'পাকা আমি'র বাণী অমান্য করি, তখনই বিশ্বাসঘাতক—নিজেদের বিরুদ্ধে এবং জগজ্জননীর মহিমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হই। যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের দেহ ও মন সেই মহান্ ইচ্ছাময়ের নিকট সমর্পণ করিব। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেনঃ যদি মানুষ দুইবার উচ্চারণ করে, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', সে পাপাচরণ করে। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—ইহার বেশী আর কি প্রয়োজন? উহা দুইবার বলিবার আবশ্যক কি? যাহা ভাল, তাহা তো ভালই। একবার যখন বলিয়াছি, তখন ঐ কথা ফিরাইয়া লওয়া চলিবে না। 'স্বর্গের ন্যায় মর্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ তোমারই সব রাজত্ব, সব শক্তি; সব মহিমা চিরদিনের জন্য তোমারই।'

ধর্মের প্রয়োজন

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি শক্তি কার্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ঐ সকলের মধ্যে ধর্মরূপে অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা কোন শক্তি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রভাবশালী নয়। সর্বপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে কোথাও না কোথাও সেই অপূর্ব শক্তির কার্যকারিতা বিদ্যমান এবং সকল ব্যষ্টিমানবের মধ্যে সংহতির মহত্তম প্রেরণা এই শক্তি হইতেই উদ্ভূত। ইহা আমরা সকলেই স্পষ্টভাবে জানি যে, অগণিত ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন—জাতি, জলবায়ু, এমন কি বংশের বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর। ইহা সুবিদিত সত্য যে, যাহারা একই ঈশ্বরের উপাসক, একই ধর্মে বিশ্বাসী, তাহারা একই বংশজাত লোকদের, এমন কি ভ্রাতাদের অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে। ধর্মের উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। যে-সকল প্রাচীন ধর্ম বর্তমান কালাবধি টিকিয়া আছে, ঐগুলির এই একটি দাবী যে, তাহারা সকলেই অতিপ্রাকৃত; তাহাদের উৎপত্তি যেন মানুষের মস্তিষ্ক হইতে হয় নাই; বাহিরের কোন স্থান হইতে ধর্মগুলি আসিয়াছে।

আধুনিক পণ্ডিত সমাজে এ সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—একটি ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অপরটি অনন্ত ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ। একপক্ষ বলেন, পিতৃপুরুষদের উপাসনা হইতেই ধর্মীয় ধারণার আরম্ভ; অপর পক্ষ বলেন, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে মানবধর্মের আরোপ হইতেই ধর্মের সূচনা। মানুষ তাহার মৃত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিরক্ষা করিতে চায় এবং ভাবে যে, মৃত ব্যক্তিদের দেহনাশ হইলেও তাহারা জীবিত থাকে, এবং সেইজন্যই সে তাহাদের উদ্দেশে খাদ্যাদি উৎসর্গ করিতে এবং কতকটা তাহাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এই ধারণার পরিণতিই আমাদের নিকট ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

মিশর, ব্যাবিলন ও চীনবাসীদের এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বহু জাতির প্রাচীন ধর্মসমূহ আলোচনা করিলে পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই যে ধর্মের আরম্ভ, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশরীয়দের আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ধারণা ছিল—প্রত্যেক দেহে তদনুরূপ আর একটি 'দ্বিতীয়' চেতন-সত্তা থাকে। প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় তাহারই অনুরূপ আর একটি সত্তা থাকে; মানুষের মৃত্যু হইলে এই দ্বিতীয় সত্তা দেহ ছাড়িয়া যায়, অথচ তখনও সে বাঁচিয়া থাকে। যতদিন মৃতদেহ অটুট থাকে, শুধু ততদিনই এই দ্বিতীয় সত্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে। সেইজন্যই এই দেহটাকে অক্ষত রাখিবার জন্য মিশরীয়দের এত আগ্রহ দেখিতে পাই। এইজন্যই তাহারা ঐ-সব সুবৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে মৃতদেহ রক্ষা করিত। কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে, মৃতদেহের কোন অংশ নষ্ট হইলে দ্বিতীয় সত্তারও অনুরূপ অংশটি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা স্পষ্টতই পিতৃপুরুষের উপাসনা। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই দ্বিতীয় জীবসত্তার ধারণা প্রচলিত ছিল। তাহাদের মতে—মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবসত্তায় স্নেহবোধ নষ্ট হইয়া যায়। সে খাদ্য, পানীয় এবং নানারূপ সাহায্যের জন্য জীবিত মনুষ্যদিগকে ভয় দেখায়। এমন কি, সে নিজ সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর প্রতিও সমস্ত স্নেহ-মমতা হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন হিন্দুদের ভিতরেও এই প্রকার পূর্বপুরুষদের পূজার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনজাতির মধ্যেও এই পিতৃগণের পূজাই তাহাদের ধর্মের মূলভিত্তি বলা যাইতে পারে এবং এখনও এই বিশ্বাস ঐ বিরাট দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচলিত। বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পিতৃ-উপাসনাই সমগ্র চীনদেশে ধর্মাকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে যাঁহারা এই মতবাদ বিশ্বাস করেন যে, পিতৃপুরুষের উপাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের ধারণা সুষ্ঠুভাবে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পক্ষান্তরে এমন অনেক মনীষী আছেন, যাঁহারা প্রাচীন আর্য সাহিত্য (শাস্ত্র) হইতে দেখান যে, প্রকৃতির উপাসনা হইতেই ধর্মের সূচনা। যদিও ভারতবর্ষের সর্বত্র পূর্বপুরুষের পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীনতম শাস্ত্রে তাহার কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর্যদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতাতে আমরা ইহার কোন নিদর্শন পাই না। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদে প্রকৃতির উপাসনাই দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে মানবমন যেন বহির্জগতের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর আভাস পাওয়ার জন্য চেষ্টিত বলিয়া বোধ হয়। ঊষা, সন্ধ্যা, ঝঞ্ঝা—প্রকৃতির অদ্ভুত ও বিশাল শক্তিসমূহ ও সৌন্দর্য মানবমনকে আকর্ষণ করে। সেই মানবমন প্রকৃতির পরপারে যাইয়া সেখানে যাহা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই প্রচেষ্টায় তাহারা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আত্মা ও শরীরাদি দিয়া মানবীয় গুণরাশিতে ভূষিত করে। এগুলি তাহাদের ধারণায় কখনও সৌন্দর্যমণ্ডিত, কখনও বা ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই-সব চেষ্টার অন্তে এই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিগুলি তাহাদের নিকট মানবধর্মে ভূষিত হউক বা না হউক, নিছক ভাবময় বস্তুতে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও এই প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের পুরাণসমূহ কেবল এই ভাবময় প্রকৃতির উপাসনায় পূর্ণ। প্রাচীন জার্মান, স্কাণ্ডিনেভীয় এবং অন্যান্য আর্যজাতিদের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পক্ষেও সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মতদ্বয় পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও তৃতীয় এক ভিত্তি অবলম্বনে উহাদের সামঞ্জস্য-বিধান করা যাইতে পারে; আমার মনে হয়, উহাই ধর্মের প্রকৃত উৎস এবং ইহাকে আমি 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা' বলিতে ইচ্ছা করি। মানুষ একদিকে তাহার পিতৃপুরুষগণের আত্মার অথবা প্রেতাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ শরীর-নাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চায়; কিংবা অপর দিকে এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে যে শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার স্বরূপ জানিতে সচেষ্ট হয়। এই উভয়ের মধ্যে মানুষ যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, সে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের সীমা

অতিক্রম করিতে চায়। ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যেই সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যাইতে চায়। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় যে, ধর্মের প্রথম আভাস স্বপ্নের ভিতর দিয়াই আসে। অমরত্বের প্রথম ধারণা মানুষ স্বপ্নের ভিতর দিয়া অনায়াসে পাইতে পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চর্য অবস্থা নয়? আমরা জানি যে, শিশুগণ এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে অতি অল্প পার্থক্য অনুভব করে। স্বপ্নাবস্থায় দেহ মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেও মন যখন ঐ অবস্থায়ও তাহার সমুদয় জটিল কার্য চালাইয়া যাইতে থাকে, তখন অমরত্ব-বিষয়ে ঐ-সব ব্যক্তি যে সহজলভ্য প্রমাণ পাইয়া থাকে, উহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে? অতএব মানুষ যদি তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, এই দেহ চিরকালের মত নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ববৎ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমার মতে অলৌকিক তত্ত্ব-বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর স্বাভাবিক এবং এই স্বপ্নাবস্থার ধারণা অবলম্বনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তত্ত্বে উপনীত হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, কালে অধিকাংশ মানুষই বুঝিতে পারিয়াছিল, জাগ্রদবস্থায় তাহাদের এই স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং স্বপ্নাবস্থায় যে মানুষের কোন অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাও নয়; পরন্তু সে তখন জাগ্রৎ-কালীন অভিজ্ঞতাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র।

কিন্তু ইতোমধ্যে মানব-মনে সত্যানুসন্ধিৎসা অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার গতি অন্তর্মুখে চলিয়াছে। মানুষ এখন তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থা অপেক্ষাও উচ্চতর একটি অবস্থা আবিষ্কার করিল। ভাবাবেশ বা ভগবৎপ্রেরণা নামে পরিচিত এই অবস্থাটির কথা আমরা পৃথিবীর সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যেই পাই। সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মেই ঘোষিত হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা—অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ঈশদূতগণ মনের এমন সব উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাহা নিদ্রা ও জাগরণ হইতে ভিন্ন এবং সেখানে তাহারা অধ্যাত্ম-জগৎ নামে পরিচিত এক অবস্থাবিশেষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অভিনব সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমরা জাগ্রদবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ যেভাবে অনুভব করি, তাঁহারা পূর্বোক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়া সেগুলি আরও স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণদের ধর্মকে লওয়া যাক। বেদসমূহ ঋষিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই-সকল ঋষি কতিপয় সত্যের দ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত 'ঋষি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ বৈদিক স্তুতিসমূহের বা চিন্তারাশির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। ঋষিগণ বলেন, তাঁহারা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যদি 'অতীন্দ্রিয়' বিষয় সম্পর্কে 'প্রত্যক্ষ' কথাটি ব্যবহার করা চলে। এই সত্যসমূহ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই একই সত্য য়াহুদী এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিঘোষিত হইতে দেখা যায়।

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী 'হীনযান' সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা উঠিতে পারে। জিজ্ঞাস্য এই যে, বৌদ্ধেরা যখন কোন আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তখন তাহাদের ধর্ম কিরূপে এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, বৌদ্ধেরাও এক শাশ্বত নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী এবং সেই নীতি-বিধান আমরা যে অর্থে 'যুক্তি' বুঝি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়া বুদ্ধদেব উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, এমন কি 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia) নামক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থে নিবদ্ধ অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহ এই অবস্থা হইতেই আসিয়াছে, বুদ্ধির গবেষণা হইতে নয়।

অতএব সকল ধর্মেই এই এক আশ্চর্য বাণী ঘোষিত হয় যে, মানব-মন কোন কোন সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম করে। তখন এই মন এমন সব তথ্য প্রত্যক্ষ করে, যেগুলির ধারণা সে কোন কালে করিতে পারিত না এবং যুক্তির দ্বারাও পাইত না। এই তথ্যসমূহই জগতের সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। অবশ্য এই তথ্যগুলি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবার এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার অধিকার আমাদের আছে; তথাপি জগতের সকল প্রচলিত ধর্মমতেই দাবী করা হয় যে, মানব-মনের এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে সে ইন্দ্রিয় ও বিচারশক্তির সীমা অতিক্রম করিতে পারে; অধিকন্তু তাহারা এই শক্তিকে একটি বাস্তব সত্য বলিয়াই দাবী করে।

সকল ধর্মেই স্বীকৃত এই-সকল তথ্য কতদূর সত্য, তাহা বিচার না করিয়াও আমরা তাহাদের একটি সাধারণ বিশেষত্ব দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত স্থূল তথ্যগুলির তুলনায় ধর্মের আবিষ্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম, এবং যে-সকল ধর্ম অতি উন্নত প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি সবই এক সূক্ষ্মতম তত্ত্ব স্বীকার করে; কাহারও মতে উহা হয়তো এক নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সত্তা, অথবা সর্বব্যাপী পুরুষ, অথবা ঈশ্বর-নামধেয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ, অথবা নৈতিক বিধি; আবার কাহারও মতে উহা হয়তো সকল সত্তার অন্তর্নিহিত সার সত্য। এমন কি আধুনিক কালে মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া ধর্মমত-প্রচারের যত প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতেও প্রাচীনদের স্বীকৃত পুরাতন সূক্ষ্মভাবগুলিই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে নীতি-বিধান (Moral Law), আদর্শগত ঐক্য (Ideal Unity) প্রভৃতি নূতন নামে অভিহিত করা হইতেছে এবং ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, এই-সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ-পর্যন্ত কোন আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি আমাদিগকে এরূপ এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী হইতে বলা হয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ-পর্যন্ত পূর্ণ আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি সেই আদর্শ ব্যতীত আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি না। বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক সূক্ষ্ম অখণ্ড সত্তা আছে, যাহাকে কখনও আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে, অথবা সর্বানুস্যূত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আমরা সর্বদাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেক মানুষ যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক অসীম আনন্দের আদর্শ আছে। আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি অধিকাংশই এই অনন্ত শক্তি-অর্জনের, এই অসীম আনন্দ-লাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক অচিরেই বুঝিতে পারে যে, যদিও

তাহারা অনন্ত শক্তিলাভের প্রচেষ্টায় নিরত হইয়াছে, তথাপি সেই শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নয়। তাহারা অবিলম্বে বুঝিতে পারে যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অনন্ত সুখ লাভ করা যায় না। অন্যভাবে এরূপ বলা চলে যে, ইন্দ্রিয়গুলি ও দেহ এত সীমাবদ্ধ যে, সেগুলি অসীমকে প্রকাশ করিতে পারে না। অসীমকে সীমার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব; কালে মানুষ অসীমকে সসীমের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতে শেখে। এই ত্যাগ, এই চেষ্টা করাই নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ত্যাগের ভিত্তির উপরই নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এমন কোন নীতি কোন কালে প্রচারিত হয় নাই, যাহার মূলে ত্যাগ নাই। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—ইহাই নীতিশাস্ত্রের চিরন্তন বাণী। নীতিশাস্ত্রের উপদেশ—'স্বার্থ নয়, পরার্থ।' নীতিশাস্ত্র বলে, সেই অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া লাভ করিতে সচেষ্ট মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে একটা যে মিথ্যা ধারণা আঁকড়াইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে। নিজেকে সর্বপশ্চাতে রাখিয়া অন্যকে প্রাধান্য দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহ বলে, 'আমারই হইবে প্রথম স্থান।' নীতিশাস্ত্র বলে, 'না, আমি থাকিব সর্বশেষে।' সুতরাং সকল নীতিশাস্ত্রই এই ত্যাগের—জড়জগতে স্বার্থবিলোপের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বার্থরক্ষার উপর নয়। এই জড়জগতে কখনও সেই অনন্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে না, ইহা অসম্ভব অথবা কল্পনারও অযোগ্য।

সুতরাং মানুষকে জড়জগৎ ত্যাগ করিয়া সেই অনন্তের গভীরতর প্রকাশের অন্বেষণে আরও উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিতে হইবে। এই ভাবেই বিভিন্ন নৈতিক বিধি রচিত হইতেছে; কিন্তু সকলেরই সেই এক মূল আদর্শ—চিরন্তন আত্মত্যাগ। অহঙ্কারের পূর্ণ বিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ। যদি মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্বের চিন্তা করিতে নিষেধ করা হয়, তবে সে শিহরিয়া উঠে। তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইতে অত্যন্ত ভীত বলিয়া মনে হয়। অথচ সেই-সব লোকই আবার প্রচার করে যে, নীতিশাস্ত্রের উচ্চতম আদর্শগুলিই যথার্থ; তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না, সকল নীতিশাস্ত্রের গণ্ডী, লক্ষ্য এবং অন্তর্নিহিত ভাবই হইল এই 'অহং'-এর নাশ, উহার বৃদ্ধি নয়।

হিতবাদের (বা প্রয়োজনবাদের) আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না। অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। যে-কোন নীতিশাস্ত্র মানুষকে তাহার নিজ সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য নৈতিক বিধি ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। হিতবাদীরা অনন্তকে পাইবার সাধনা এবং অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের আশা ত্যাগ করিতে বলেন; তাঁহাদের মতে ইহা অসাধ্য ও অযৌক্তিক। আবার তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে নীতি অবলম্বন এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিতে বলেন। কেন আমরা কল্যাণ করিব? হিত করা তো গৌণ ব্যাপার। আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্র তো লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। লক্ষ্যই যদি না থাকে, তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন? কেন আমি অন্যের অনিষ্ট না করিয়া উপকার করিব? সুখই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন আমি নিজেকে সুখী এবং অপরকে দুঃখী করিব না? আমাকে বাধা দেয় কিসে? দ্বিতীয়তঃ হিতবাদের ভিত্তি অতীব সঙ্কীর্ণ। যে-সকল সামাজিক রীতিনীতি ও কার্যধারা প্রচলিত অছে, সেগুলি সমাজের বর্তমান অবস্থা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিতবাদীদের এমন কী অধিকার আছে যে, তাঁহারা সমাজকে চিরন্তন বলিয়া কল্পনা করিবেন? বহুযুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইবার পথে এই সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সোপান। শুধু সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরন্তন হইতে পারে না এবং সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হিতবাদ-সম্ভূত মতগুলি বড়জোর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় কার্যকর হইতে পারে। তাহার বাহিরে উহাদের কোন মূল্য নাই। কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হইতে উদ্ভূত চরিত্রনীতি ও নৈতিক বিধির কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সমষ্টি মানবের সমগ্র দিক্। ইহা ব্যষ্টির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইলেও ইহার সম্পর্ক সমষ্টির সহিত। সমাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত, কারণ সমাজ তো ব্যষ্টিনিচয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু এই নৈতিক বিধি ব্যষ্টি ও তাহার অনন্ত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেহেতু সমাজ যে-কোন সময়ে যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা সমুদয় সামাজিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইরূপে দেখা যায় যে, মানব-জাতির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন সর্বদাই আছে। জড় যতই সুখকর হউক না কেন, মানুষ সর্বদা জড়ের চিন্তা করিতে পারে না।

লোকে বলে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী মনোযোগ দিলে আমাদের ব্যাবহারিক জগতে প্রমাদ ঘটে। সুদূর অতীতে চৈনিক ঋষি কন্‌ফ্যুসিয়াসের সময়ে বলা হইত—'আগে ইহলোকের সুব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহলোকের ব্যবস্থা হইয়া গেলে পরলোকের কথা ভাবিব।' ইহা বেশ সুন্দর কথা যে, আমরা ইহ-জগতের কার্যে তৎপর হইব, কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগের ফলে ব্যাবহারিক জীবনে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তথাকথিত বাস্তব-জীবনের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশের ফলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ভাবে চলিলে মানুষ জড়বাদী হইয়া পড়ে, কারণ প্রকৃতিই মানুষের লক্ষ্য নয়—মানুষের লক্ষ্য তদপেক্ষা উচ্চতর বস্তু।

যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে। এই প্রকৃতির দুইটি রূপ—অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি। যে নিয়মগুলি আমাদের বাহিরের ও শরীরের ভিতরের জড় কণিকাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, কেবল সেগুলিই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, পরন্তু সূক্ষ্মতর অন্তঃপ্রকৃতিও উহার অন্তর্ভুক্ত; বস্তুতঃ এই সূক্ষ্মতর প্রকৃতিই বহির্জগতের নিয়ামক শক্তি। বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা খুবই ভাল ও বড় কথা; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা আরও মহত্তর। যে-সকল নিয়মানুসারে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি জানা উত্তম, কিন্তু যে-সকল নিয়মানুসারে মানুষের কামনা, মনোবৃত্তি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি জানা অনন্তগুণে মহত্তর ও উৎকৃষ্ট। অন্তর্মানবের এই জয়, মানব-মনের যে-সকল সূক্ষ্ম ক্রিয়াশক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলির রহস্য জানা—সবই সম্পূর্ণরূপে ধর্মের অন্তর্গত। মানব-প্রকৃতি—আমি সাধারণ মানব-প্রকৃতির কথা বলিতেছি—বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিতে চায়। সাধারণ মানুষ সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করিতে পারে না। ইহা বেশ বলা হয় যে, সাধারণ লোকে সহস্র মেষশাবক-হত্যাকারী সিংহেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারা একবারও ভাবে না যে, ইহাতে এক হাজার মেষের মৃত্যু ঘটিল, যদিও সিংহটার ক্ষণস্থায়ী জয় হইয়াছে; তাহারা কেবল শারীরিক শক্তির প্রকাশেই আনন্দ অনুভব করে।

সাধারণ মানব-মনের ধারাই এইরূপ। তাহারা বাহিরের বিষয় বোঝে এবং তাহাতেই সুখ অনুভব করে; কিন্তু প্রত্যেক সমাজে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের আনন্দ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে নাই, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে; তাঁহারা মাঝে মাঝে জড়বস্তু অপেক্ষা উচ্চতর কিছুর আভাস পাইয়া থাকেন এবং উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিলে আমরা সর্বদা দেখিতে পাইব যে, এরূপ সূক্ষ্মদর্শী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি হয় এবং অনন্তের অনুসন্ধান বন্ধ হইলে তাহার পতন আরম্ভ হয়, হিতবাদীরা এই অনুসন্ধানকে যতই বৃথা বলুক না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা, এবং যখনই ঐ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়।

এইরূপ ধর্ম হইতে আমরা যে-সকল তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারি, যে-সান্ত্বনা পাইতে পারি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম অন্যতম বিজ্ঞান অথবা গবেষণার বস্তু হিসাবে মানব-মনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কল্যাণকর অনুশীলনের বিষয়। অনন্তের এই অনুসন্ধান, অনন্তকে ধারণা করিবার এই সাধনা, ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক মানবের ক্রমবিকাশ-সাধনের এই প্রচেষ্টা—অনন্তকে আমাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত করিবার এই নিরন্তর প্রয়াস—এই সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব ও মহত্ত্বের বিকাশ। কেহ কেহ ভোজনে সর্বাধিক আনন্দ পায়, আমাদের বলিবার কোন অধিকার নাই যে, তাহাদের উহাতে আনন্দ পাওয়া উচিত নয়। আবার কেহ কেহ সামান্য কিছু লাভ করিলেই অত্যন্ত সুখ বোধ করে; তাহাদের পক্ষে উহা অনুচিত—এরূপ বলিবার অধিকার আমাদের নাই। তেমনি আবার যে-মানুষ ধর্মচিন্তায় সর্বোচ্চ আনন্দ পাইতেছে, তাহাকে বাধা দিবারও উহাদের কোন অধিকার নাই। যে-প্রাণী যত নিম্নস্তরের হইবে, ইন্দ্রিয়সুখে সে তত অধিক সুখ পাইবে। শৃগাল-কুকুর যতখানি আগ্রহের সহিত ভোজন করে, কম লোকই সেভাবে আহার করিতে পারে। কিন্তু শৃগাল-কুকুরের সুখানুভূতির সবটাই যেন তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার রাজ্য আরও উচ্চতর। উহার বিষয়টি অনন্ত হওয়ায় ঐ রাজ্যও সর্বোচ্চ এবং যাহারা উহা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে ঐ স্তরের সুখও সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং 'মানুষকে সুখানুসন্ধান করিতে হইবে'—হিতবাদীর এই মত মানিয়া লইলেও মানুষের পক্ষে ধর্মচিন্তার অনুশীলন করা উচিত; কারণ ধর্মানুশীলনেই উচ্চতম সুখ আছে। সুতরাং আমার মতে ধর্মানুশীলন একান্ত প্রয়োজন। ইহার ফল হইতেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি। মানব-মনকে গতিশীল করিবার জন্য ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। ধর্ম আমাদের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, অন্য কোন আদর্শ তাহা পারে না। মানব-জাতির ইতিহাস হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে অতীতে এইরূপই হইয়াছে, এবং ধর্মের শক্তি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। কেবল হিতবাদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ, নীতিপরায়ণ এবং সরল ছিলেন। কিন্তু যে-সকল মহামানব বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের স্রষ্টা, যাঁহারা জগতে যেন চৌম্বকশক্তিরাশি সঞ্চারিত করেন, যাঁহাদের শক্তি শত সহস্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, যাঁহাদের জীবন অপরের জীবনে আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এরূপ মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণা দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রেরণাশক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে। যে অনন্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত অধিকার, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্মই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্য-সম্পাদনে, নিজের ও অপরের জীবনে শান্তিস্থাপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাশক্তি; অতএব সেই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার অনুশীলন করা উচিত। পূর্বাপেক্ষা উদার ভিত্তিতে ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক। সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও বিবদমান ধর্মভাব দূর করিতে হইবে। সকল সাম্প্রদায়িক, স্বজাতীয় বা স্বগোত্রীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব ঈশ্বর থাকিবেন এবং অপর সকলের ঈশ্বর মিথ্যা—এই-জাতীয় ধারণা কুসংস্কার, এগুলি অতীতের গর্ভেই বিলীন হওয়া উচিত। এই ধরনের ধারণাগুলি অবশ্য বর্জনীয়।

মানব-মনের যতই বিস্তার হয়, তাহার আধ্যাত্মিক সোপানগুলিও ততই প্রসার লাভ করে। এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন মানুষের চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ হইতে না হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে আমরা শুধু যান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছি, সুতরাং জগতের ভাবী ধর্মসমূহকে একদিকে যেমন সর্বজনীন, অপরদিকে তেমনি উদার হইতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু সৎ ও মহৎ, তাহার সবই ভাবী ধর্মাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে উহাতে ভাবী উন্নতির অনন্ত সুযোগ নিহিত থাকিবে। অতীতের যাহা কিছু ভাল, তাহার সবই অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে, এবং পূর্বে সঞ্চিত ধর্মভাণ্ডারে নূতন ভাবসংযোগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। অধিকন্তু প্রত্যেক ধর্মেরই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক; ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অপরের কোন বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে করিয়া নিন্দা করা উচিত নয়। আমার জীবনে আমি এমন অনেক ধার্মিক ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেখিয়াছি, যাঁহাদের ঈশ্বরে—অর্থাৎ আমরা যে-অর্থে ঈশ্বর মানি, সেই ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস নাই, হয়তো আমাদের অপেক্ষা তাঁহারাই ঈশ্বরকে ভালরূপে বুঝিয়াছেন। ভগবানের সাকার বা নিরাকার রূপ, অসীম সত্তা, নীতিবাদ অথবা আদর্শ মনুষ্য প্রভৃতি যত কিছু মতবাদ আছে, সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। সকল ধর্ম যখন এইভাবে উদারতা লাভ করিবে, তখন তাহাদের হিতকারিণী শক্তিও শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ধর্মসমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও ঐগুলি শুধু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার জন্যই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে।

বর্তমান সময়েও আমরা দেখিতে পাই, বহু সম্প্রদায় ও সমাজ প্রায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, কারণ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় যেভাবে করিতেছে ঠিক সেইভাবে নিজের আদর্শগুলি উপস্থাপিত করিতে চায় না। এইজন্য ধর্মগুলিকে উদার হইতে হইবে। ধর্মভাবগুলিকে সর্বজনীন, বিশাল ও অনন্ত হইতে হইবে, তবেই ধর্মের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে, কারণ ধর্মের শক্তি সবেমাত্র পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কখনও কখনও এইরূপ বলিতে শোনা যায় যে, ধর্মভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইতেছে। আমার মনে হয়, ধর্মভাবগুলি সবেমাত্র বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও আবিলতাশূন্য হইয়া ধর্মের প্রভাব মানব-জীবনের প্রতি স্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতদিন ধর্ম মুষ্টিমেয় 'ঈশ্বরনির্দিষ্ট' ব্যক্তিদের বা পুরোহিতকুলের হাতে ছিল, ততদিন উহা মন্দিরে, গীর্জায়, গ্রন্থে, মতবাদে, আচার-অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখনই আমরা ধর্মের যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন ধারণায় উপনীত হইব, তখন এবং কেবল তখনই উহা প্রকৃত ও জীবন্ত হইবে—ইহা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইবে, আমাদের প্রতি গতিবিধিতে প্রাণবন্ত হইয়া থাকিবে, সমাজের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিবে এবং পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণ কল্যাণকারিণী শক্তি হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উত্থান বা পতনের প্রশ্ন যখন একসঙ্গে গ্রথিত, তখন প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা হইতে উদ্ভূত সৌভ্রাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে অনেক ধর্ম যেভাবে অপর ধর্মের প্রতি সানুগ্রহ, কৃপাপূর্ণ ও কৃপণোচিত সদিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা চলিবে না। সর্বোপরি দুই প্রকার বিশেষ মতবাদের মধ্যে এই ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে প্রথম দলের ধর্মের বিবিধ বিকাশ মনস্তত্ত্বের আলোচনা হইতে উদ্ভূত হয়; দুরদৃষ্টবশতঃ এই দল এখনও দাবী করেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র 'ধর্ম' নামের যোগ্য। দ্বিতীয় আর একদল আছেন, যাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বর্গের আরও রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহাদের পদতল মাটি আঁকড়াইয়া থাকে—এখানে আমি তথাকথিত জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের কথাই বলিতেছি।

এই সমন্বয় আনিতে হইলে উভয়কে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; কখনও এই ত্যাগ একটু বেশী রকমের দরকার, এমন কি কখনও যন্ত্রণাদায়কও হইতে পারে, কিন্তু এই ত্যাগের ফলে প্রত্যেক দল নিজেকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত ও সত্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন। এবং পরিণামে যে-জ্ঞানকে দেশ ও কালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছে, তাহা পরস্পর মিলিত হইয়া দেশকালাতীত এমন এক সত্তার সহিত একীভূত হইবে, যেখানে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাইতে অক্ষম, যাহা সর্বাতীত, অনন্ত ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

যুক্তি ও ধর্ম

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

নারদ নামে এক ঋষি সত্যলাভের জন্য সনৎকুমার নামক আর একজন ঋষির কাছে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ কোন্ বিষয় ইতোমধ্যে অধ্যয়ন করিয়াছ?' নারদ বলিলেন, 'বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহু বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তৃপ্ত হইতে পারি নাই।' আলাপ চলিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে সনৎকুমার বলিলেনঃ বেদ জ্যোতিষ ও দর্শন-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা গৌণ; বিজ্ঞানগুলিও গৌণ। যাহা দ্বারা আমাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, তাহাই চরম জ্ঞান—সর্বোচ্চ জ্ঞান। এই ধারণাটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়, এবং ঐজন্যই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধর্মের দাবী চিরন্তন। বিজ্ঞানগুলির জ্ঞান যেন আমাদের জীবনের একটুখানি অংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু ধর্ম আমাদের কাছে যে জ্ঞান লইয়া আসে, তাহা চিরন্তন; ধর্ম যে সত্যের কথা প্রচার করে, সে সত্যের মত এ জ্ঞানও সীমাহীন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী লইয়া ধর্ম বারবার সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সমর্থিত হইতেও বহুবার অস্বীকার করিয়াছে। ফলে জগতের সর্বত্র ধর্মজ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের মধ্যে একটা বিরোধ লাগিয়াই আছে। একপক্ষ আচার্য, শাস্ত্র প্রভৃতির অভ্রান্ত প্রমাণকে পথ-নির্দেশক বলিয়া দাবী করিয়াছে এবং এ-বিষয়ে জাগতিক জ্ঞানের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিছুতেই কান দিতে চায় নাই। অপর পক্ষ যুক্তিরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ধর্ম যাহা কিছু বলিতে চায় তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এই সংগ্রাম চলিয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে। ধর্ম বারবার পরাজিত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসে 'যুক্তি-দেবতার উপাসনা' ফরাসী-বিপ্লবের সময়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নাই; এই জাতীয় ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছিল, ফরাসী-বিপ্লবের সময় উহার পুনরভিনয় মাত্র হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে উহা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। জড়বিজ্ঞানগুলি এখন পূর্বাপেক্ষা আরও ভালভাবে প্রস্তুত হইয়াছে; আর ধর্মের প্রস্তুতি সে-তুলনায় কমিয়া গিয়াছে, ভিত্তিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর 'বিশ্বাস' করিতে পারে না। আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে বলিয়াই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাহারা তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে 'চিন্তাহীন অনবধানতা' আখ্যা দেওয়া চলে। এই সংগ্রাম এভাবে আর বেশীদিন চলিতে পারে না; চলিলে ধর্মের সব সৌধই ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন হইল—ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় আছে কি? আরও স্পষ্টভাবে বলিলে বলিতে হয়ঃ অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি, যত শীঘ্র তা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার-মাত্র ছিল; যতশীঘ্র উহা লোপ পায়, ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উহার বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের ভিতর যা-কিছু খাদ আছে, সে-সবই দূরীভূত হইবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ধর্মের যাহা সারভাগ, তাহা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়-গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তাহাই নয়, বরং আরও বেশী জোরালো হইবে; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার মত অভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্মের তাহা আছে।

যে-সব ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগিতা অস্বীকার করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা যেন কতকটা স্ববিরোধী কাজ করিয়া থাকেন। যেমন খ্রীষ্টানরা দাবী করেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম; কারণ অমুক-অমুক ব্যক্তির কাছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমানরাও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে একই দাবী জানান যে, একমাত্র তাঁহাদের ধর্মই সত্য, কারণ এই এই ব্যক্তির কাছে তাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বলেন, 'তোমাদের নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় ঠিক বলিয়া মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিই। দেখ, ভাই মুসলমান, তোমার শাস্ত্র বলে যে, কাফেরকে জোর করিয়া মুসলমান করা চলে; আর সে যদি মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে না চায়, তবে তাহাকে হত্যা করাও চলে। আর এরূপ কাফেরকে যে-মুসলমান হত্যা করে, সে যত পাপ, যত গর্হিত কর্মই করুক না কেন, তাহার স্বর্গলাভ হইবেই।' মুসলমানরা ঐ-কথার উত্তরে বিদ্রূপ করিয়া বলিবে, 'ইহা যখন শাস্ত্রের আদেশ, তখন আমার পক্ষে এরূপ করাই সঙ্গত। এরূপ না করাটাই আমার পক্ষে অন্যায়।' খ্রীষ্টানরা বলিবে, 'কিন্তু আমাদের শাস্ত্র এ-কথা বলে না।' মুসলমানরা তাহার উত্তরে বলিবে, 'তা আমি জানি না। তোমার শাস্ত্র-প্রমাণ মানিতে আমি বাধ্য নই। আমার শাস্ত্র বলে, সব কাফেরকে হত্যা কর। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, তাহা তুমি জানিলে কিরূপে? আমার শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, নিশ্চয়ই তাহা সত্য। আর তোমার শাস্ত্রে যে আছে, হত্যা করিও না, তাহা ভুল। ভাই খ্রীষ্টান, তুমিও তো এই কথাই বল; তুমি বল যে, যিহোবা য়াহুদীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ কর্তব্য; আর তিনি তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা করা অন্যায়। আমিও তাহাই বলি; কতকগুলি বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া এবং কতকগুলি বিষয়কে অকর্তব্য বলিয়া আল্লা আমার শাস্ত্রে অনুজ্ঞা দিয়াছেন; ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের তাহাই চূড়ান্ত প্রমাণ।' খ্রীষ্টানরা কিন্তু ইহাতেও খুশী নয়। তাহারা 'শৈলোপদেশ'-এর (Sermon on the Mount) নীতির সহিত কোরানের নীতি তুলনা করিয়া দেখাইবার জন্য জিদ করিতে থাকে। ইহার মীমাংসা হইবে কিরূপে? গ্রন্থের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়, কারণ পরস্পর বিবদমান

গ্রন্থগুলি বিচারক হইতে পারে না। কাজেই এ-কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই-সব গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বজনীন কিছু একটা আছে; একটা কিছু আছে, যাহা জগতে যত নীতিশাস্ত্র আছে, সেগুলি অপেক্ষা উচ্চতর; একটা কিছু আছে, যাহা বিভিন্ন জাতির অনুপ্রেরণা-শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি আর নাই করি, পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, বিচারের জন্য আবেদন লইয়া আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছেঃ এই যুক্তির আলোক অনুপ্রেরণাগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিতে সমর্থ কিনা; যেখানে আচার্যের সহিত আচার্যের বিরোধ, সেখানেও যুক্তি নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কিনা এবং ধর্ম-সংক্রান্ত সব বিষয়ই বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আছে কিনা। যদি না থাকে, তবে আচার্যে আচার্যে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে যে জঘন্য বিরোধ যুগযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কোন কিছু দ্বারাই তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়; কারণ তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সব ধর্মই শুধু মিথ্যা ও অতিমাত্রায় পরস্পর-বিরোধী এবং সেগুলির মধ্যে নীতির কোন স্থায়ী মান নাই। ধর্মের প্রমাণ মানুষের প্রকৃতিগত সত্যের উপর নির্ভর করে, কোন গ্রন্থের উপর নয়। গ্রন্থগুলি তো মানুষের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ, তাহার পরিণাম। মানুষই এই গ্রন্থগুলির স্রষ্টা। মানুষকে গড়িয়াছে, এমন কোন গ্রন্থ এখনও আমাদের নজরে পড়ে নাই। যুক্তিও সমভাবে সেই সাধারণ কারণের, মনুষ্য-প্রকৃতির একপ্রকার বিকাশ। এই মনুষ্য-প্রকৃতির কাছেই আমাদের আবেদন জানাইতে হইবে। তবু একমাত্র যুক্তিই এই মানব-প্রকৃতির সহিত সরাসরি সংযুক্ত; সেজন্য যতক্ষণ তাহা মানব-প্রকৃতির অনুগামী হয়, ততক্ষণ যুক্তিরই আশ্রয় লওয়া উচিত। যুক্তি বলিতে আমি কি বুঝাইতে চাহিতেছি? আধুনিক কালের প্রত্যেক নর-নারী যাহা করিতে চায়, আমি তাহাই বলিতে চাহিতেছি—জাগতিক জ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে বলিতেছি। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় আরও ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা; যতক্ষণ না আমরা বিশ্বজনীনতায় গিয়া পৌঁছাই, ততক্ষণ এইভাবেই চলিতে হয়। যেমন, নিয়ম বলিতে কি বুঝায় সে ধারণা আমাদের আছে। একটা কিছু ঘটিলে আমাদের যদি বিশ্বাস হয় যে, কোন একটি নিয়মের ফলেই তাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা তৃপ্ত হই; আমাদের কাছে উহাই কার্যটির ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা-অর্থে আমরা ইহাই বুঝাইতে চাইঃ যে কার্যটি দেখিয়া আমরা অতৃপ্ত ছিলাম, এখন প্রমাণ পাইলাম যে, এই ধরনের হাজার হাজার কার্য ঘটিয়া থাকে; এটি সেই সাধারণ কার্যের অন্তর্গত একটি বিশেষ কার্য মাত্র। ইহাকেই আমরা 'নিয়ম' বলি। একটি আপেল পড়িতে দেখিয়া নিউটনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, সব আপেলই পড়ে, মাধ্যাকর্ষণের জন্য ইহা ঘটে, তখন তিনি তৃপ্ত হইলেন। মানুষের জ্ঞানের ইহা একটি নিয়ম। আমি কোন বিশেষ জিনিষকে—একটি মানুষকে রাস্তায় দেখিলাম; মানুষ সম্বন্ধে বৃহত্তর ধারণার সহিত তাহার তুলনা করিলাম এবং তৃপ্ত হইলাম; বৃহত্তর সাধারণের সহিত তুলনা করিয়া আমি তাহাকে মানুষ বলিয়া জানিলাম। কাজেই বিশেষকে বুঝিতে হইলে সাধারণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে, সাধারণকে বৃহত্তর সাধারণের সঙ্গে এবং সবশেষে সব-কিছুকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। অস্তিত্বের ধারণাই আমাদের সর্বশেষ ধারণা, সর্বাধিক বিশ্বজনীন ধারণা। অস্তিত্বই হইল বিশ্বজনীন বোধের চূড়ান্ত।

আমরা সবাই মানুষ; ইহার অর্থ—মনুষ্যজাতি-রূপ যে সাধারণ ধারণা, আমরা যেন তাহার অংশ-বিশেষ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর—এ-সবই প্রাণী। মানুষ, কুকুর, বিড়াল—এই-সব বিশেষ উদাহরণগুলি প্রাণিরূপ বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধারণ জ্ঞানের অংশ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর, লতা, বৃক্ষ—এ-সবই আবার জীবন-রূপ আরও ব্যাপক ধারণার অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে এবং সব জীব, সব পদার্থকেই আবার অস্তিত্বরূপ একটি ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়; কারণ আমরা সবাই সেই ধারণার মধ্যে পড়ি। এই ব্যাখ্যা বলিতে শুধু বিশেষজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং আরও কিছু সমধর্মী বিষয়ের সন্ধান করা বোঝায়। মন যেন তাহার ভাণ্ডারে এই ধরনের অসংখ্য সাধারণজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মনের মধ্যে যেন অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে, সেগুলির মধ্যে এই-সব ধারণা ভাগে-ভাগে সাজান থাকে; আর যখনই আমরা কোন নূতন জিনিষ দেখি, মন তৎক্ষণাৎ এই প্রকোষ্ঠগুলির কোন একটি হইতে তাহার অনুরূপ জিনিষ বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যদি কোন খোপে আমরা অনুরূপ জিনিষ খুঁজিয়া পাই, তবে নূতন জিনিষটিকে সেই খোপে রাখিয়া দিই। আমরা তখন তৃপ্ত হই ও ভাবি, জিনিষটি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলাম। জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায়, ইহার বেশী কিছু নয়। মনের কোন খোপে অনুরূপ জিনিষ দেখিতে না পাইলে আমরা অতৃপ্ত হই। ইহার জন্য মনের মধ্যে পূর্ব হইতেই বর্তমান এমন একটি শ্রেণীবিভাগ খুঁজিয়া বাহির না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই জ্ঞান বলিতে শ্রেণীবিভাগ বুঝায়; এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাছাড়া আরও আছে। জ্ঞানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কোন বস্তুর ব্যাখ্যা অবশ্যই উহার ভিতর হইতে আসা চাই, বাহির হইতে নয়। একখণ্ড পাথর উপরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা আবার নীচে পড়িয়া যায় কেন? লোকে এরূপ বিশ্বাস করিত যে, কোন দৈত্য সেটিকে টানিয়া নামাইয়া আনে। বহু ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল যে, সেগুলি কেহ অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে ঘটায়; আসলে কিন্তু সেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন দৈত্য টানিয়া নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাথর-বস্তুটির ভিতর হইতে আসিত না, আসিত বাহির হইতে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য পাথরটি পড়িয়া যায়, এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু পাথরের স্বভাবগত গুণবিশেষ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তুর অভ্যন্তর হইতে আসিতেছে। দেখা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করার ঝোঁক আধুনিক চিন্তার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এক কথায় বলা যায়, বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তুর ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে; বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না। রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য রসায়নবিদের কোন দানব বা ভূত-প্রেত বা এই ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। কোন পদার্থবিদের বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের কাছেও তাঁহাদের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য এই-সব দৈত্য-দানবাদির কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের এটি একটি ধারা; এই ধারাটি আমি ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই। দেখা যায়, ধর্মগুলির মধ্যে ইহার অভাব রহিয়াছে এবং সেইজন্য ধর্মগুলি ভাঙিয়া শতধা হইতেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান অভ্যন্তর হইতেই—বস্তুর প্রকৃতি হইতেই ব্যাখ্যা চায়; ধর্মগুলি কিন্তু তাহা দিতে পারিতেছে না। একটি মত আছে যে, ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষ এবং তিনি বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক সত্তা; এই ধারণা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান। ইহার সপক্ষে বারবার এই যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে যে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতিপ্রাকৃতিক একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন রহিয়াছে; এই ঈশ্বর ইচ্ছামাত্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ধর্ম বিশ্বাস করে, তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা। এ-সব যুক্তি তো আছেই, তাছাড়া দেখা যায় সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণাময় বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন; এদিকে আবার সেই সঙ্গে জগতে বৈষম্যও রহিয়াছে। দার্শনিক এ-সব লইয়া মোটেই মাথা ঘামান না; তিনি বলেন,

ইহার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে—এই ব্যাখ্যা বাহির হইতে আসিতেছে, ভিতর হইতে নয়। বিশ্বের কারণ কি? বাহিরের কোন কিছু—কোন ব্যক্তি এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন! শূন্যে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে পতনরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন এরূপ ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, ধর্মের ব্যাখ্যাতেও ঠিক তাই। ধর্মগুলি ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, কারণ ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা তাহারা দিতে পারে না।

প্রত্যেক বস্তুর ব্যাখ্যা উহার ভিতর হইতেই আসে, এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ; দুইটি ধারণাই একই মূল তত্ত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ—বস্তুর স্বভাব পুনঃপ্রকাশিত হয়; কারণের অবস্থান্তর ছাড়া কার্য আর কিছুই নয়, কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে; সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যই তাহার পূর্ববর্তী কোন কারণের পুনরভিব্যক্তি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুধু তাহার অবস্থান্তর ঘটে। সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া ইহাই ঘটিতেছে, কাজেই এই-সব পরিবর্তনের কারণ খুঁজিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন নাই; বিশ্বের ভিতরেই সেই কারণ বর্তমান। বাহিরে কারণ খোঁজা নিষ্প্রয়োজন। এই ধারণাটিও ধর্মকে ভূমিসাৎ করিতেছে। যে-সব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আঁকড়াইয়া ছিল, তিনি খুব বড় একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন; এই ধারণা এখন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যেন জোর করিয়া টানিয়া এ ধারণাকে ভূপাতিত করা হইতেছে; ধর্মকে ভূমিসাৎ করা হইতেছে বলিতে আমি ইহাই বুঝাইতেছি।

এই দুইটি মূলতত্ত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে, এমন কোন কর্ম থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয়, পারে। আমরা দেখিয়াছি, সর্বপ্রথমে সামান্যীকরণের মূলতত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। সামান্যীকরণের তত্ত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলিকেও তৃপ্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে এমন একটি চরম সামান্যীকরণে আসিতে হইবে, যাহা শুধু সামান্যীকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশ্বব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তাহা হইতে হওয়া চাই। উহাকে নিম্নতম কার্যের সহিত সমপ্রকৃতির হইতে হইবে; যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম—যাহা আদি কারণ, তাহাকে পরম্পরাগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম, নিম্নতম কার্যের সহিতও ভিন্ন হইতে হইবে। বেদান্তের ব্রহ্মই এই শর্ত পূরণ করেন; কারণ সামান্যীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমরা গিয়া যেখানে পৌঁছিতে পারি, এই ব্রহ্ম তাহাই। এই ব্রহ্ম নির্গুণ—অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)। আমরা দেখিয়াছি, মনুষ্য-মন যে চরম সামান্যীকরণে পৌঁছিতে পারে, তাহাই 'অস্তিত্ব' (সৎ)। জ্ঞান (চিৎ) বলিতে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা বুঝায় না; ইহা সেই জ্ঞানের নির্যাস বা সূক্ষ্মতম অবস্থা; ইহাই ক্রম-অভিব্যক্ত হইয়া মানুষ বা অপর প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানরূপে ফুটিয়া উঠে। বিশ্বের পিছনে যে চরম সত্তা রহিয়াছে—কাহারও আপত্তি না থাকিলে বলিতে পারি—এমন কি চেতনারও পিছনে যাহা রহিয়াছে, জ্ঞানের সূক্ষ্মসত্তা বলিতে তাহাই বুঝায়। 'চিৎ' বলিতে এবং বিশ্বের বস্তুসমূহের সত্তাগত একত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, উহা তাহাই। আমার মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান বার বার যাহা প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা এইঃ আমরা এক; মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক—সব দিক্ দিয়াই আমরা এক। শরীরের দিক্ হইতে আমরা পৃথক্, এ-কথাও বলা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইতেছি, আমরা জড়বাদী; সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সমগ্র বিশ্ব একটা জড়-সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর সেই জড়-সমুদ্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘূর্ণি। খানিকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘূর্ণির স্থানে আসিয়া ঘূর্ণির আকার লইতেছে, আবার জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে, আমার শরীরে যে জড়পদার্থ আছে, কয়েক বছর পূর্বে তাহা হয়তো তোমার শরীরে ছিল বা সূর্যে ছিল বা হয়তো অন্য কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও ছিল—অবিরাম গতিশীল অবস্থায় ছিল। তোমার দেহ, আমার দেহ—এ-কথার অর্থ কি? দেহ সবই এক। চিন্তার বেলাও তাই। চিন্তার একটি অসীম-প্রসারী সমুদ্র রহিয়াছে; তোমার মন, আমার মন সেই সমুদ্রেরই ভিতর দুইটি ঘূর্ণিবিশেষ। উহার ফল কি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিন্তা আমার মনে এবং আমার চিন্তা তোমার মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জীবনই এক; আমরা এক, এমন কি চিন্তার দিক্ দিয়াও এক। সামান্যীকরণের দিকে আরও অগ্রসর হইলে পাওয়া যায় জড়বস্তু ও চিন্তার সূক্ষ্মসত্তা আত্মাকে, যাহা হইতে উহারা অভিব্যক্ত হইতেছে; এই একত্ব হইতেই সবকিছু আসিয়াছে, সত্তার দিক্ হইতে সেগুলিকে এক হইতেই হইবে। আমরা সর্বতোভাবে এক, শরীর ও মনের দিক্ দিয়া এক; আর আত্মায় যদি আমাদের আদৌ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আত্মার দিক্ হইতেও যে আমরা এক, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিদিনই এই একত্বের কথা প্রমাণিত হইয়া চলিয়াছে। গর্বিত লোককে বলা হয়ঃ তুমিও যা, ঐ ক্ষুদ্র পোকাটিও তাই; তোমার ও উহার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, এ-কথা ভাবিও না। উহার সঙ্গে তুমি এক। পূর্বজন্মে তুমিও একদিন ঐরকম পোকা ছিলে; পোকাই ক্রমোন্নত হইতে হইতে কালে এই মানুষ হইয়াছে, যে-মনুষ্যত্বের গর্বে তুমি এত গর্বিত! বস্তুর একত্বরূপ এই অপূর্ব তথ্যটি—যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহারই সহিত আমাদের এক করিয়া দেয়। এ তথ্যটি একটি মহান্ শিক্ষার বিষয়; কারণ আমাদের ভিতর অধিকাংশ লোকই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করিতে পারিলে খুশী হয়। কিন্তু কেহই নিম্নতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া ভাবিতে চায় না। কাহারও পূর্বপুরুষ পশুতুল্য, দস্যু বা দস্যু-জমিদার হওয়া সত্ত্বেও যদি সমাজ-কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, তবে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার সহিত একটা সম্পর্ক খুঁজিতে তৎপর হই; মানুষের এমনই নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি সৎ এবং ভদ্র হইলেও আমরা কেহই তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে চাই না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, সত্য ক্রমেই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। আর তাহাতে ধর্মের লাভ যথেষ্ট। আমি যে-বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছি, সেই অদ্বৈততত্ত্ব ঠিক এই কথাই বলে। বিশ্বের মূল সত্তা ব্রহ্মই সব জীবাত্মার স্বরূপ। তিনিই তোমার জীবনের পরম ধন; তাই বা বলি কেন, তুমিই তিনি—'তত্ত্বমসি'। বিশ্বের সঙ্গে তুমি এক। যে বলে অপরের সহিত তাহার এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে, সে তখনই দুঃখী হয়। এই একত্বের বোধ সম্বন্ধে যে সচেতন, সে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক বলিয়া জানে, সে-ই সুখের অধিকারী।

কাজেই দেখা যাইতেছে, উচ্চতম সামান্যীকরণ এবং বিবর্তনবাদের কথা বেদান্তে আছে বলিয়া বেদান্তের ধর্ম বৈজ্ঞানিক জগতের দাবী মিটাইতে পারে। কোন বস্তুর ব্যাখ্যা যে তাহার ভিতর হইতেই আসে, বেদান্ত সে কথা আরও সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেয়। ব্রহ্মের বা বেদান্তোক্ত ভগবানের বাহিরে তদতিরিক্ত কোন সত্তা নাই, একেবারেই নাই। আসলে সবই তিনি, বিশ্বের মধ্যে তিনিই

রহিয়াছেন; তিনিই বিশ্ব। 'তুমিই নর, তুমিই নারী; যৌবন-মদ-দৃপ্তপদে বিচরণকারী যুবক তুমিই, স্খলিত-পদ বৃদ্ধও তুমি।' ৬
এই এখানেই তিনি আছেন। আমরা তাঁহাকেই দেখি, তাঁহাকেই অনুভব করি। তাঁহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি ও বিচরণ করি; তাঁহার অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব। (বাইবেলের) 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-এর ভিতর আমরা এই ভাব দেখিতে পাই। সেই একই ভাব—ভগবান্ বিশ্বে ওতপ্রোত। তিনিই বস্তুর মূল সত্তা, বস্তুর হৃদয়-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ। বিশ্বে তিনি যেন নিজেকেই অভিব্যক্ত করেন। সেই অসীম সচ্চিদানন্দ-সাগরের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি; তুমি আমি যেন সেই সাগরেরই ক্ষুদ্র অংশ, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুদ্র প্রণালী, ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি। বস্তুর দিক্ দিয়া মানুষে-মানুষে, দেবতায়-মানুষে, মানুষে-প্রাণীতে, প্রাণীতে-উদ্ভিদে, উদ্ভিদে-পাথরে কোন পার্থক্য নাই। কারণ সর্বোচ্চ দেবদূত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন ধূলিকণা পর্যন্ত—সবই সেই এক সীমাহীন সাগরের অভিব্যক্তি। তফাত শুধু প্রকাশের তারতম্যে। আমার মধ্যে প্রকাশ খুব কম, তোমার মধ্যে হয়তো তার চেয়ে বেশী; কিন্তু উভয়ের বস্তু সেই একই। তুমি আমি সেই একই অনন্ত অস্তিত্ব-সাগরে অবস্থিত—উহারই দুইটি ক্ষুদ্র অংশ, ক্ষুদ্র নির্গত পথ বা ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। কাজেই ঈশ্বরই তোমার স্বরূপ, আমারও স্বরূপ। জন্ম হইতেই তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তুমি হয়তো পবিত্রতার মূর্তি দেবদূত, আর আমি হয়তো মহাদুষ্কৃতিকারী দানব। তা সত্ত্বেও সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে আমার জন্মগত অধিকার আছে, তোমারও আছে। তুমি আজ নিজেকে অনেক বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছ। অপেক্ষা কর, আমি নিজেকে আরও বেশী অভিব্যক্ত করিব; কারণ সবই তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; কাহারও কাছে কিছু চাহিতে হইবে না। সমগ্র বিশ্বের সমষ্টি হইলেন ঈশ্বর স্বয়ং। ঈশ্বর কি তাহা হইলে জড়পদার্থ? না, নিশ্চয়ই নয়। কারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা ভগবান্‌কে যে-ভাবে অনুভব করি, তাহাই তো জড়পদার্থ। বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই মন। আবার আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বর আত্মারূপেই দৃষ্ট হন। তিনি জড়পদার্থ নন, জড়পদার্থের মধ্যে সত্যবস্তু বলিতে যাহা আছে, তিনি তাহাই। চেয়ারের মধ্যে যাহা সত্যবস্তু, তাহা ভগবানই। কারণ চেয়ারটিকে চেয়াররূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। বাহিরে কিছু একটা ছিল, যাহাকে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমার নিকট আনিয়াছে; আমার মন তাহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছে; আর সেই দুইয়ের সমবায়ে যাহা হইয়াছে, তাহাই হইল চেয়ার। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যে সত্তা চিরবিদ্যমান, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং। তাঁহারই উপর ইন্দ্রিয়গুলি চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই চিত্রিত করিতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা সকলে একই প্রকার চেয়ার দেখিতেছি কেন? ভগবানের উপর—সচ্চিদানন্দের উপর একইভাবে এইসব বিভিন্ন বস্তু আঁকিয়া চলিতেছি কেন? সকলেই যে একইভাবে অঙ্কিত করে, এমন কথা নয়; তবে যাহারা একই ভাবে আঁকিতেছে, তাহারা সকলেই সত্তার একই স্তরে রহিয়াছে বলিয়া পরস্পরের চিত্রণগুলিকে এবং পরস্পরকে দেখিতে পায়। তোমার আমার মাঝখানে এমন লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা এইভাবে ভগবান্‌কে চিত্রিত করে না। সেই-সব প্রাণী এবং তাহাদের চিত্রিত জগৎ আমরা দেখিতে পাই না। এদিকে আবার আধুনিক পদার্থবিদ্যার গবেষণাগুলি হইতে এ-কথার প্রমাণ ক্রমশঃ বেশী করিয়া পাওয়া যাইতেছে। বস্তুর সূক্ষ্মতর সত্তাই সত্য; যাহা স্থূল, তাহা দৃশ্যমান। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিয়াছি, আধুনিক যুক্তির সম্মুখে যদি কোন ধর্মীয় মতবাদ দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহা হইলে একমাত্র অদ্বৈতবাদ; কারণ এখানে আধুনিক যুক্তির দুইটি দাবী পূর্ণ হয়, ইহাই সর্বোচ্চ সামান্যীকরণ; এই সামান্যীকরণ ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে, ইহা প্রত্যেক জীবের পক্ষেই সাধারণ। যে সামান্যীকরণ সাকার ঈশ্বরে শেষ হয়, তাহা বিশ্বজনীন হইতে পারে না; কারণ সাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহাকে সর্বতোভাবে দয়াময়—মঙ্গলময় বলিতে হইবে। কিন্তু এই জগৎ ভাল মন্দ উভয়েরই মিশ্রণে গঠিত—ইহার কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ। আমরা ইহা হইতে কিছুটা বাদ দিয়া বাকী অংশকে সাকার ঈশ্বররূপে সামান্যীকরণ করি। সাকার ঈশ্বর এই-এই রূপ বলিলে এ-কথাও বলিতে হইবে যে, তিনি এই-এই রূপ নন। আর দেখিবে সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা একটি সাকার শয়তানও আসিয়া পড়িবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাকার ঈশ্বরের ধারণায় যথার্থ সামান্যীকরণ হয় না; আমাদের আরও আগাইয়া যাইতে হইবে—নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছাইতে হইবে। নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে সুখ-দুঃখ সব লইয়াই বিশ্ব রহিয়াছে, কারণ বিশ্বে যাহা কিছু বর্তমান, সে-সবই ঈশ্বরের সেই নিরাকার স্বরূপ হইতে আসিয়াছে। অমঙ্গল প্রভৃতি সব কিছুই যাঁহার উপর আরোপ করিতেছি, তিনি আবার কি ধরনের ঈশ্বর? কথা হইল, ভালমন্দ—দুই-ই একই জিনিষের বিভিন্ন দিক্, বিভিন্ন প্রকাশ। ভাল ও মন্দ যে দুইটি পৃথক্ সত্তা—এই ভুল ধারণা আদিকাল হইতে রহিয়াছে। ন্যায় ও অন্যায় দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ, উহারা পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত—এই ধারণা, এবং ভাল ও মন্দ দুইটি চির-বিচ্ছেদ্য, চির-বিচ্ছিন্ন পদার্থ—এই ধারণা আমাদের এই জগতের বহু দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে। সর্বদাই ভাল বা সর্বদাই খারাপ, এমন কোন জিনিষ দেখাইয়া দিতে পারে, এরূপ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে আমি খুশী হইতাম। যেন কোন ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া খুব ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিবে যে, আমাদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা শুধু মঙ্গল আনে, আর কতকগুলি আনে কেবল অমঙ্গল। আজ যাহা মঙ্গলকর, কাল তাহা অমঙ্গলজনক হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হইতে পারে। আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তোমার পক্ষে তাহা অকল্যাণকর হইতে পারে। সিদ্ধান্ত হইল এই যে, অন্যান্য প্রত্যেক জিনিষের মতই ভালমন্দের মধ্যেও বিবর্তন আছে। একটা কিছু আছে, যাহাকে ক্রমবিবর্তনের পথে এক অবস্থায় আমরা ভাল বলি, আবার অন্য অবস্থায় মন্দ বলি। ঝড়ে আমার এক বন্ধু মারা গেল, ঝড়কে আমি অকল্যাণকর বলিলাম, কিন্তু সেই ঝড়ই হয়তো বায়ুর দূষিত বীজাণু নষ্ট করিয়া হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইল। লোকে ঝড়কে ভাল বলিল, আমি খারাপ বলিলাম। কাজেই ভালমন্দ আপেক্ষিক জগতের অন্তর্গত—ঘটনার অন্তর্গত। যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে, তিনি আপেক্ষিক ঈশ্বর নন। কাজেই তাঁহাকে ভাল বা মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না, ভাল বা মন্দ কোনটিই নন বলিয়া তিনি এ-সবের অতীত। অবশ্য তাঁহার অভিব্যক্তি হিসাবে 'মন্দ' অপেক্ষা 'ভাল' তাঁহার স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী।

এরূপ নিরাকার সত্তা—নির্গুণ ঈশ্বর মানিলে ফল কি হইবে? আমাদের কি লাভ হইবে তাহাতে? আমাদের সান্ত্বনার স্থলরূপে, আমাদের সহায়করূপে ধর্ম কি আর মানবজীবনের অঙ্গরূপে থাকিতে পারিবে? মানুষের কাহারও সাকার ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবার যে আকূতি রহিয়াছে, তাহার কি হইবে? এ-সবই থাকিবে। সাকার ঈশ্বর থাকিবেন, দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা তিনি আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবেন। আমরা দেখিয়াছি, নিরাকার ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সাকার ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। আমরা যদি বলিতে চাই যে, সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি ইচ্ছামাত্র

শূন্য হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সে-কথা প্রমাণ করিতে পারা যায় না। ইহা অচল। কিন্তু নিরাকারের ভাব ধারণা করিতে পারিলে সেখানে সাকারের ভাবও থাকিতে পারে। সেই একই নিরাকার সত্তাকে বিভিন্নভাবে দেখিলে যাহা মনে হয়, বহু বিচিত্র এই বিশ্ব তাহাই। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যখন তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে জড়জগৎ বলি। এমন কোন প্রাণী যদি থাকিত, যাহার ইন্দ্রিয় পাঁচটিরও বেশী, তবে এই জগৎকেই সে অন্যরূপে দেখিত। আমাদের মধ্যে কাহারও যদি এমন একটি ইন্দ্রিয় হয়, যাহা-দ্বারা সে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে এই বিশ্বকেই সে আবার অন্যরূপে দেখিবে। সেই একই অদ্বয় ব্রহ্মের বহু-রূপ, তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দেখার ফলেই বিভিন্ন জগতের ধারণাগুলি উদ্ভূত হয়; মনুষ্য-বুদ্ধিতে সেই নিরাকার সত্তা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ যে ধারণা আসা সম্ভব, তাহাই হইল সাকার ঈশ্বর। কাজেই এই চেয়ারটি—এই জগৎ যতখানি সত্য, সাকার ঈশ্বরও ততখানি সত্য; কিন্তু তাহার বেশী নয়। ইহা চরম সত্য নয়। নিরাকার ব্রহ্মই সাকার ঈশ্বর; এইজন্য সাকার ঈশ্বর সত্য। যেমন মানুষ হিসাবে আমি একসঙ্গে সত্য এবং অসত্য দুই-ই। তুমি আমাকে যেভাবে দেখিতেছ, আমি যে তাহাই, এ-কথা সত্য নয়—এ-কথা তুমি নিজেই যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে পার। তুমি আমাকে যাহা বলিয়া মনে কর, আমি তাহা নই; বিচার করিয়া দেখিলে এ-বিষয়ে তুমি তৃপ্ত হইতে পারিবে, কারণ আলো, বিভিন্ন স্পন্দন, বায়ুমণ্ডলের অবস্থা, আমার ভিতরে যাবতীয় গতি—এই-সবগুলির একত্র মিলনের ফলে আমাকে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তুমি আমাকে সেইরূপই দেখিতেছ। এই অবস্থাগুলির ভিতর যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই আমি আবার অন্যরূপ দেখাইব। আলোকের বিভিন্ন অবস্থায় একই মানুষের আলোকচিত্র লইয়া তুমি এ-কথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পার। কাজেই তোমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাকে যেমন দেখাইতেছে, 'আমি' বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। এ-সব সত্ত্বেও আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থাগুলি প্রকাশ পাইতেছে। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি', তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হাজার হাজার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 'আমি' ফুটিয়া উঠিতেছে; আমি শিশু ছিলাম, আমি যুবা হইয়াছিলাম, আমি আরও বয়স্ক হইয়া চলিয়াছি। আমার জীবনের প্রতিটি দিনেই আমার দেহের ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এ-সব পরিবর্তন সত্ত্বেও সেগুলির সমষ্টির পরিমাণ কিন্তু চিরস্থির। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি'; এই-সব অভিব্যক্তি যেন তাহারই অংশস্বরূপ।

একই ভাবে এই বিশ্বের সমষ্টিফল অপরিবর্তনীয়, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এই বিশ্ব-সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই গতি আছে, সব কিছুই অবিরাম স্পন্দনশীল অবস্থায় রহিয়াছে; সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আবার সেই সঙ্গেই দেখি যে, এই বিশ্ব অনড়; কারণ গতিশব্দটি আপেক্ষিক। চেয়ারটি স্থির, আমি নড়িতেছি; আমার এই গতি ঐ স্থির চেয়ারটির সঙ্গে আপেক্ষিক। গতি-সৃষ্টির জন্য অন্ততঃ দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে যদি এক বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সেখানে গতির স্থান নাই। সে যে গতিশীল হইবে, তাহার গতি নির্ধারিত হইবে কিসের সহিত তুলনা করিয়া? কাজেই চরম সত্য অপরিবর্তনীয়, অবিচল। যাহা কিছু গতি ও পরিবর্তন, তাহা সবই ঘটে শুধু এই আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ জগতে। সমষ্টি-সত্তা নৈর্ব্যক্তিক। যাঁহার নিকট আমরা নতজানু হই, প্রার্থনা করি, সেই ভগবান্—সাকার ঈশ্বর, স্রষ্টা বা বিশ্ব-নিয়ন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অণু পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে। যথেষ্ট যুক্তি দেখাইয়া এরূপ সাকার ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা যায়। এরূপ সাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ব্রহ্মেরই সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। তুমি আমি অতি নিম্নস্তরের প্রকাশ; আমরা যতদূর ধারণা করিতে পারি, তাহার সর্বোচ্চ প্রকাশ এই সাকার ঈশ্বর। আবার তুমি বা আমি সেই সাকার ঈশ্বর হইতে পারি না। বেদান্ত যখন বলেন, 'তুমি আমি ব্রহ্ম', তখন সেই ব্রহ্ম বলিতে সাকার ঈশ্বর বুঝায় না। একটি উদাহরণ দিতেছি। একতাল কাদা লইয়া একটি প্রকাণ্ড মাটির হাতী গড়া হইল; আবার সেই কাদার সামান্য অংশ লইয়া ছোট একটি মাটির ইঁদুরও গড়া হইল। ঐ মাটির ইঁদুরটি কি কখনও মাটির হাতী হইতে পারিবে? কিন্তু দুইটিকে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে দুইটিই কাদা হইয়া যায়। কাদা বা মাটি হিসাবে দুইটিই এক; কিন্তু ইঁদুর ও হাতী হিসাবে তাহাদের মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকিবে। অসীম নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত উদাহরণের মাটির মত। স্বরূপের দিক্ দিয়া আমরা ও বিশ্বনিয়ন্তা এক, কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তিরূপে, মানুষরূপে আমরা তাঁহার চিরদাস, তাঁহার পূজক। কাজেই দেখা যাইতেছে, সাকার ঈশ্বর থাকিয়া যাইতেছেন। এই আপেক্ষিক জগতের আর সব কিছুও রহিয়া গেল; ধর্মকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল। কাজেই সাকার ঈশ্বরকে জানিতে গেলে আগে নিরাকার সত্তাকে জানা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি, তর্কযুক্তির নিয়মানুসারে 'সামান্য'-এর মধ্য দিয়াই শুধু 'বিশেষ'কে জানা যায়। কাজেই যিনি সামান্যীকরণের চরম, সেই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার, নিরাকার ব্রহ্মের মাধ্যমেই শুধু মানুষ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সব বিশেষকেই জানা যায়। প্রার্থনা থাকিয়া যাইবে, তাহার অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে মাত্র। প্রার্থনার নিম্নস্তরে আছে আমাদের মনের কামনা পূরণের জন্য শুধু 'দাও দাও' ভাব—প্রার্থনা সম্বন্ধে এইসব অর্থহীন ধারণাকে বোধ হয় সরিয়া পড়িতে হইবে। যুক্তিমূলক ধর্মে ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে বলা হয় না; প্রার্থনা করিতে বলা হয় দেবতাদের কাছে। এরূপ হওয়াই খুব স্বাভাবিক। রোমান ক্যাথলিকরা সাধু-সন্তদের কাছে প্রার্থনা করেন; এটি খুব ভাল। কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার জন্য, একপশলা বৃষ্টি হওয়ার জন্য বা বাগানে সবজি ফলাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা খুবই অস্বাভাবিক। ঈশ্বরের তুলনায় যাঁহারা আমাদেরই মত ক্ষুদ্র জীব, সেই সাধু-সন্তেরা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার নিকট আমাদের ছোটখাট সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার কথা বলা—শিশুকাল হইতেই বলা, 'হে ঈশ্বর, আমার মাথা-ব্যথা সারাইয়া দাও'—এগুলি নিতান্তই হাস্যকর। জগতে এমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা এখনও রহিয়াছে; তাঁহারা দেবতা ও দেবদূত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সাহায্য করুন না! কিন্তু এজন্য ভগবান্‌কে বলা? নিশ্চয়ই নয়। তাঁহার নিকট চাহিতে হইলে নিশ্চয়ই আরও উচ্চতর জিনিষ চাহিতে হইবে। গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য যে কূপ খনন করে, সে তো মূর্খ, হীরকের খনির কাছে বাস করিয়া যে কাঁচখণ্ডের জন্য মাটি খোঁড়ে, সে মূর্খ ছাড়া আর কি?

করুণাময়, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট আমরা যদি জাগতিক বস্তু চাহিতে যাই, তবে আমরা নির্বোধ ছাড়া আর কি? কাজেই তাঁহার নিকট জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি প্রার্থনা করিব। কিন্তু যতদিন আমাদের দুর্বলতা আছে, যতদিন 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব লইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আছে, ততদিন এ-সব নিম্নস্তরের প্রার্থনাও থাকিবে এবং সাকার

ঈশ্বরের উপাসনার ভাবও থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা এ-সব ছোটখাট প্রার্থনার ধার ধারেন না; তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু চাওয়ার কথা, নিজেদের কোন প্রয়োজনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। 'আমি নই, সখা, তুমি!'—তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাধান্য। ইঁহারাই নিরাকার উপাসনার যোগ্য ব্যক্তি। নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার অর্থ কি? তাহার অর্থ এরূপ দাসভাব নয়—'হে প্রভু, আমি অতি অকিঞ্চন, আমায় কৃপা কর!' ইংরেজী ভাষায় অনূদিত সেই প্রাচীন পারসী কবিতাটি তো আপনারা জানেনঃ আমি আমার প্রিয়তমকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে কেহ বলিল, 'তুমি কে?' বলিলাম, 'আমি অমুক।' দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া করাঘাত করিলাম, একই প্রশ্ন হইল, একই উত্তর দিলাম। সেবারও দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম, একই প্রশ্ন হইল। আমি বলিলাম, 'প্রিয়তম, আমি তুমিই!' তখন দ্বার খুলিয়া গেল। সত্যের মাধ্যমে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। সত্য কি? আমিই তিনি। আমি 'তুমি' নই—এ-কথা বলিলে অসত্য বলা হয়। তোমা হইতে আমি পৃথক্, এ কথার মত মিথ্যা, ভয়ঙ্কর মিথ্যা আর নাই। এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক, জন্ম হইতেই এক। বিশ্বের সঙ্গে আমি যে এক, তাহা আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার চারিদিকে যে বায়ু রহিয়াছে, তাহার সহিত আমি এক, তাপের সঙ্গে এক, আলোর সঙ্গে এক; যাঁহাকে বিশ্ব বলা হয়, যাঁহাকে অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব বলিয়া মনে হয়, সেই সর্বব্যাপী বিশ্বদেবতার সঙ্গে আমি অনন্তকাল এক, কারণ হৃদয়ে যিনি চিরন্তন কর্তা, প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যন্তরে যিনি বলেন, 'আমি আছি', যিনি মৃত্যুহীন চিরজাগ্রত অমর, যাঁহার মহিমার নাশ নাই, যাঁহার শক্তি চির-অব্যর্থ, তিনিই এই বিশ্বদেবতা, অপর কেহই নয়। তাঁহার সহিত আমি এক।

ইহাই নিরাকার উপাসনার সার। এই উপাসনার কি ফল হয়? ইহাতে মানুষের গোটা জীবনটাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আমাদের জীবনে যে-শক্তির একান্ত প্রয়োজন, ইহাই সেই শক্তি। কারণ যাহাকে আমরা পাপ বলি, দুঃখ বলি, তাহার একটিমাত্র কারণ আছে—আমাদের দুর্বলতাই সেই কারণ। দুর্বলতার সঙ্গে অজ্ঞান আসে, অজ্ঞানের সঙ্গে আসে দুঃখ। নিরাকারের উপাসনা আমাদিগকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিবে। আমরা তখন দুঃখকে, হীনতার উগ্রতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিব; হিংস্র ব্যাঘ্র তখন তাহার ব্যাঘ্র-স্বরূপের পিছনে আমার নিজেরই আত্মাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবে। নিরাকার উপাসনার ফল এই হইবে। ভগবানের সহিত যাঁহার আত্মা এক হইয়া গিয়াছে, তিনিই শক্তিমান্; তাছাড়া আর কেহই শক্তিমান্ নয়। নাজারেথের যীশুর যে-শক্তির কথা তোমাদের বাইবেলে আছে, যে প্রচণ্ড শক্তিবলে বিশ্বাসঘাতককে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে যাহারা হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদেরও তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন, সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? তোমাদের কি মনে হয়? এই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল এই বোধ হইতে—'আমি ও আমার পিতা এক'; এই শক্তির কারণ এই প্রার্থনা—'পিতা, আমি যেমন তোমার সঙ্গে এক, সেইরূপ ইহাদের সকলকেই আমার সহিত এক করিয়া দাও।' ইহাই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা। বিশ্বের সহিত এক হইয়া যাও, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাও। আর, এই নিরাকার ব্রহ্মের কোন বাহ্য প্রকাশের—কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা, নিজ নিজ চিন্তা অপেক্ষা তিনি আমাদের আরও নিকটে। তিনি আছেন বলিয়াই তাঁহার মাধ্যমে আমরা দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিবার পূর্বে তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। এই দেওয়ালটি দেখিতে হইলে পূর্বে তাঁহাকে দেখি, তারপর দেখি দেওয়ালটিকে; কারণ চিরকাল সব ক্রিয়ারই কর্তা তিনি। কে কাহাকে দেখিতেছে? তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রহিয়াছেন। দেহ ও মনের পরিবর্তন হয়; সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ আসে আবার চলিয়া যায়; দিন ও বৎসর আবর্তন করিয়া চলিয়াছে; জীবন আসে, আবার চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু নাই। 'আমি আছি, আমি আছি'—এই একই সুর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব জানি। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু দেখি। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু অনুভব করি, চিন্তা করি, বাঁচিয়া থাকি; তাঁহারই মধ্যে ও তাঁহারই মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব। আর যে 'আমি'কে ভুল করিয়া আমরা ছোট 'আমি', সীমায়িত 'আমি' বলিয়া ভাবি, তাহা শুধু আমার 'আমি' নয়, তাহা তোমাদেরও 'আমি', প্রাণিগণের—দেবদূতগণেরও 'আমি', হীনতম জীবেরও 'আমি'। সেই 'আমি আছি' বোধ ঘাতকের মধ্যেও যেমন, সাধুর মধ্যেও ঠিক তেমনি; ধনীর মধ্যেও যা, দরিদ্রের মধ্যেও তাই; নর ও নারী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী—সকলের মধ্যে এই বোধ এক। সর্বনিম্ন জীবকোষ হইতে সর্বোচ্চ দেবদূত পর্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরেই তিনি বাস করিতেছেন এবং চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, 'আমিই তিনি—সোঽহং, সোঽহম্।' অন্তরে চিরবিদ্যমান এই বাণী যখন আমাদের বোধগম্য হইবে, উহার শিক্ষা গ্রহণ করিব, তখন দেখিব—সমগ্র বিশ্বের রহস্য প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, দেখিব—প্রকৃতি আমাদের নিকট রহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। জানিবার আর কিছুই বাকী থাকিবে না। আমরা দেখিব, সমস্ত ধর্ম যে সত্যের সন্ধানে রত, যে সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গৌণ মাত্র, আমরা সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা আমাদিগকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দেয়।

বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ

ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা

[কিভাবে ইহা বিভিন্ন প্রকার মানুষকে আকর্ষণ করিবে]

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যে-কোন বস্তুকেই গ্রহণ করুন না কেন,
অথবা আমাদের মন যে-কোন বিষয়ে কল্পনা করুক না কেন, সর্বত্রই আমরা দুইটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই; একটি অপরটির বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দিকে জটিল ঘটনারাজি ও আমাদের অনুভূত মানসিক ভাবপরম্পরার অবিশ্রান্ত লীলাবিলাস সংঘটন করিতেছে। বহির্জগতে এই বিপরীত শক্তিদ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-রূপে অথবা কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তিরূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদ্বেষ ও শুভাশুভ-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। কতকগুলি জিনিষের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ এবং কতকগুলির প্রতি আকর্ষণ আছে। আমরা কোনটির প্রতি আকৃষ্ট হই, আবার কোনটি হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমাদের জীবনে অনেকবার এমন হইয়া থাকে যে, কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ কোন কোন লোকের প্রতি যেন আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, আবার অন্য অনেক সময় যেন কোন কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে মন বিদ্বেষে পূর্ণ হয়। এই বিষয়টি সকলেরই কাছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর এই শক্তির কার্যক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের প্রভাব ততই তীব্র ও স্পষ্ট হইতে থাকিবে। ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর; এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ যত প্রকার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে এবং মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে ধর্ম হইতে। জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্মরাজ্যের লোকদেরই মুখনিঃসৃত, এবং জগৎ কোনকালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্মরাজ্যের লোকদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্যপ্রণালী যত সুবিন্যস্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চর্য। ধর্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণায় যত চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার ন্যায় মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, নিম্নতম প্রাণিগণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্মপ্রভাবে মানুষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে মানুষ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষ হইতে উত্থিত এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল, এই বিবাদ-বিসংবাদ, এই হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন সব শক্তিশালী গম্ভীর কণ্ঠ উত্থিত হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া, যেন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সকলকে আপন বার্তা শুনিতে বাধ্য করিয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও মিলনের বাণী ঘোষণা করিয়াছে। জগতে কি কখনও এই শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে?

ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের প্রশ্ন লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যাপূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা লাঘব করা—মানুষের মধ্যে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা—মানুষ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করে। জীবনের যাহা বাহ্য স্থূল এবং বহিরাংশমাত্র, সেই বহির্জগতের সাম্য ও শান্তি বিধান করাই যদি এত কঠিন হয়, তবে মানুষের অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিন। আমি আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতে অনুরোধ করি। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা সেগুলি তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ঐরূপ না করিয়া পারি না। যে-সকল মহাপুরুষ প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে এই মহান্ তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই শব্দগুলি সৃষ্টি করেন। তখন অনেকেই এগুলির অর্থ বুঝিত। পরে অজ্ঞ লোকেরা এই শব্দগুলি লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে ধর্ম জিনিষটাকে কেবলমাত্র কথার মারপ্যাঁচে দাঁড় করান হইয়াছে—উহা যে জীবনে পরিণত করিবার জিনিষ, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা এখন 'পৈত্রিক ধর্ম', 'জাতীয় ধর্ম', 'দেশীয় ধর্ম' ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। শেষে কোন ধর্মাবলম্বী হওয়াটা স্বদেশপ্রেমের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর স্বদেশপ্রেম সর্বদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম-সমন্বয়-সমস্যার আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে—আমি অবশ্য প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত ধর্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ দার্শনিক ভাগ—যাহাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্তু অর্থাৎ উহার মূলতত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তাহা লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ অর্থাৎ দর্শনকে স্থূল রূপপ্রদান। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের অল্প-বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থূলভাবে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ভাগ—উহা ধর্মের আরও স্থূলভাগ—উহাতে পূজাপদ্ধতি, আচারানুষ্ঠান, বিবিধ অঙ্গন্যাস, পুষ্প, ধূপধুনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রয়োগ আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম এই-সকল লইয়া গঠিত। আপনারা দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্মের এই তিনটি ভাগ আছে। কোন ধর্ম হয়তো দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম অপর কোনটির উপর। এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক ভাগের কথা ধরা যাক।

সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়া

সেইগুলিকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু সেই-ধর্মাবলম্বী মনে করে, যে ঐ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে তাহার গতি ভয়াবহ হইবে। কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুর্মতিবশতঃ করিয়া থাকে, তাহা নয়—গোঁড়ামি-নামক মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাধিবিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট—মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী অকপট, কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলদেরই মত সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মত এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা-দ্বারা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।

বিভিন্ন ধর্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য আছে?—পৌরাণিক দৃষ্টিতে এমন কোন ঐক্য, এমন কোন ঐতিহ্যগত সার্বভৌমিকতা আছে কি, যাহা সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সকল ধর্মেরই নিজ নিজ পুরাণ আছে—যদিও প্রত্যেকেই বলে, 'আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি কেবল উপকথা মাত্র নয়।' এই বিষয়টি উদাহরণ-সহায়ে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আমি শুধু দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছি। কোন ধর্মকে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পৌরাণিক গল্পমাত্র নয়। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—উহা পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র। য়াহুদীগণ মনে করেন, যদি একটি বাক্সে বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বে দুইটি দেবদূতের মূর্তি স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে পবিত্রতম স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে—উহা যিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। কিন্তু মূর্তিটি যদি কোন সুন্দর নর বা নারীর আকারে গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বলে, 'উহা একটা বীভৎস পুতুল মাত্র, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলো!' পৌরাণিক দিক্ হইতে এই তো আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, 'আমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষেরা এই এই অত্যাশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন!' অপর সকলে বলিবে, 'ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র', আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও বলিবে, তাহাদের নিজেদের ঈশদূতগণ ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্যজনক কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবী করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি এই-সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই প্রকার গল্পগুলি যে-ধর্মেরই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরাণ-পর্যায়ভুক্ত, যদিও কখনও কখনও হয়তো ঐগুলির মধ্যে একটু-আধটু ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে।

তারপর অনুষ্ঠানগুলির কথা। সম্প্রদায়বিশেষের হয়তো কোন বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাঁহারা উহাকেই পবিত্র এবং অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যদি এক সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকার প্রতীকের উপাসনা করেন, তবে অপর সম্প্রদায় বলিয়া বসেন, 'ওঃ, কি জঘন্য!' একটি সাধারণ প্রতীকের কথা ধরা যাক। লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ন বটে, কিন্তু ক্রমশঃ উহার ঐ দিকটা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের প্রতীকরূপে গৃহীত হইতেছে। যে-সকল জাতি উহাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কখনও উহাকে পুংচিহ্নরূপে চিন্তা করে না, উহাও অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় একটি প্রতীক—এই পর্যন্ত। কিন্তু অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের একজন লোক উহাকে পুংচিহ্ন ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, সুতরাং সে উহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়তো তখন এমন কিছু করিতেছে, যাহা তথাকথিত লিঙ্গোপাসকদের চক্ষে অতি বীভৎস ঠেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুইটিকে ধরা যাক—লিঙ্গোপাসনা ও স্যাক্রামেণ্ট (Sacrament)-নামক খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান। খ্রীষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি কুৎসিত এবং হিন্দুগণের নিকট খ্রীষ্টানদের স্যাক্রামেণ্ট বীভৎস বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যে, কোন মানুষের সদগুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা ও রক্তপান করা তো নরখাদকের বৃত্তি মাত্র। কোন কোন বর্বর জাতি এইরূপই করিয়া থাকে। যদি কোন লোক খুব বীর হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে; কারণ তাহারা মনে করে, ইহা-দ্বারা তাহারা সেই ব্যক্তির সাহস ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করিবে। স্যার জন লাবকের ন্যায় ভক্তিমান্ খ্রীষ্টানও এ-কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বর্বরজাতিদের এই ধারণা হইতেই খ্রীষ্টান অনুষ্ঠানটির উদ্ভব। খ্রীষ্টানেরা অবশ্য উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান হইতে কিসের আভাস পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও তাঁহাদের মাথায় আসে না। উহা একটি পবিত্র ঘটনার প্রতীক—এইটুকু মাত্র জানিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই, যাহা সকল ধর্মমতেই সকলের পক্ষে স্বীকার্য ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তাহা হইলে কিঞ্চিন্মাত্র সার্বভৌমিকত্ব আছে কোথায়?—তাহা হইলে ধর্মের কোন প্রকার সার্বভৌম রূপ গড়িয়া তোলা কিরূপে সম্ভব হইবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক—তাহা কি।

আমরা সকলেই সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা শুনতে পাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিরূপ উৎসাহী, তাহাও দেখিয়া থাকি। আমার একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মদ্যপান অতি মন্দকার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই ভাই ছিল, তাহারা এক রাত্রে লুকাইয়া মদ খাইবার ইচ্ছা করিল। পাশের ঘরেই তাহাদের খুল্লতাত নিদ্রা যাইতেছিল—তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান্ লোক ছিলেন। এই কারণে মদ্যপানের পূর্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'আমাদের খুব চুপিচুপি কাজ সারিতে হইবে, নতুবা খুল্লতাত জাগিয়া উঠিবেন।' তাহারা মদ খাইতে খাইতে পরস্পরকে চুপ করাইবার জন্য একের উপর স্বর চড়াইয়া অপরে চীৎকার করিতে লাগিল, 'চুপ চুপ, খুড়ো জাগবে।' গোলমাল বাড়ার ফলে খুল্লতাতের ঘুম ভাঙিয়া গেল—তিনি ঘরে ঢুকিয়া সমস্তই দেখিতে পাইলেন। আমরা ঠিক এই মাতালদের মত চীৎকার করি—'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব! আমরা সকলেই সমান; অতএব এস আমরা একটা দল করি।' কিন্তু যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি ফলতঃ সাম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে এবং তখনই আর সাম্য বলিয়া কোন কিছু রহিল না। মুসলমানগণ 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব' করে, কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না—তাহার গলা কাটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। খ্রীষ্টানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে, কিন্তু যে খ্রীষ্টান নয়,

তাহাকে এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে তাহার ভাগ্যে চির নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে আমরা 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব' ও সাম্যের অনুসন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই-ভাবের কথা শুনিবে, তখনই আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হইবে, কারণ এই-সকল কথাবার্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোর স্বার্থপরতা লুকাইয়া থাকে। কথায় বলে, শরৎকালে কখনও কখনও আকাশে বজ্রনির্ঘোষকারী মেঘ দেখা যাইলেও গর্জন মাত্র শোনা যায়, কিন্তু একবিন্দুও বারিপাত হয় না, অপরপক্ষে বর্ষাকালে মেঘগুলি নীরব থাকিয়াই পৃথিবীকে প্লাবিত করে। সেইরূপ যাহারা প্রকৃত কর্মী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অনুভব করে, তাহারা মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলে না, ভ্রাতৃভাব-প্রচারের জন্য দলগঠন করে না, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের গতিবিধি, তাহাদের সারাটা জীবন লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের অন্তর সত্যসত্যই মানবজাতির প্রতি প্রেমে পূর্ণ, তাহারা সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার ব্যথী, তাহারা কথা না কহিয়া কার্যে দেখায়—আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে। সারা দুনিয়ায় লম্বা-চওড়া কথার মাত্রা বড়ই বেশী। আমরা চাই কথা কম এবং যথার্থ কাজ কিছু বেশী হউক।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে, ধর্মের সার্বভৌমিকতার বাস্তব রূপ বলিয়া কিছু খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন; তথাপি আমরা জানি, উহা আছে ঠিক। আমরা সকলেই মানুষ, কিন্তু আমরা সকলে কি সমান? কখনই নয়। কে বলে আমরা সমান? কেবল বাতুলেই এ-কথা বলিতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের শক্তি, আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে বেশী। যদি আমরা সকলেই সমান হই, তবে এই অসামঞ্জস্য কেন? কে ইহা করিল? আমরা নিজেরা। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য হইতে বাধ্য। তথাপি আমরা জানি, এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। আমরা সকলেই মানুষ বটে—কিন্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ, কতকগুলি নারী; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ শ্বেতকায়; কিন্তু সকলেই মানুষ—সকলেই এক মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মুখের চেহারা নানা রকমের। আমি দুইটি ঠিক এক রকমের মুখ দেখি নাই; তথাপি আমরা সকলে এক মানবজাতীয়। এই সাধারণ মনুষ্যত্বের স্বরূপটি কি? আমি কোন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিলাম যে, তাহাদের সকলের মুখে একটা ভাবময় সাধারণ মনুষ্যত্বের ছাপ আছে। যখন আমি উহাকে ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাই, যখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা দেখিতে না পাইতে পারি, কিন্তু যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ এই সাধারণভাবই সেই বস্তু। নিজ মনোমধ্যে এই মানবত্বরূপ সাধারণ ভাবটি আছে বলিয়াই তদবলম্বনে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।' আমি মণিগণের ভিতর সূত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছি—এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ মণিগুলি এইরূপ এক-একটি ধর্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই সকলের মধ্যে বর্তমান। তবে অধিকাংশ লোকই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক্। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্তু যখন আমি অমুক, তখন আমি তোমা হইতে পৃথক্। পুরুষ হিসাবে তুমি নারী হইতে ভিন্ন, কিন্তু মানুষ হিসাবে নর ও নারী এক। মানুষ হিসাবে তুমি জীবজন্তু হইতে পৃথক্, কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেই সমান; এবং সত্তা হিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট সত্তাই ভগবান্—তিনি এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম একত্ব। তাঁহাতে আমরা সকলেই এক হইলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বহির্দেশে আমাদের কার্যকলাপ বলবীর্য যেমন যেমন প্রকাশ পাইবে, সেই সঙ্গে এই ভেদ সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্বজনীন ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতে পারে না—এমন সময় কখনও হইবে না, যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে। আবার যদি আমরা আশা করি যে, সমস্ত জগৎ একই পৌরাণিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহা অসম্ভব; তাহাও কখনও হইতে পারে না। সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ ব্যাপার কোন কালে কখনও হইতে পারে না; যদি কখনও হয়, তবে সৃষ্টি লোপ পাইবে, কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূল ভিত্তি। আকৃতিবিশিষ্ট জীবরূপে আমরা সৃষ্ট হইলাম কিরূপে? বৈচিত্র্য হইতে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ করাই উত্তাপের ধর্ম; এখন মনে করুন, এই ঘরের উত্তাপ-রাশী সেইভাবে বিকীর্ণ হইয়া গেল; তাহা হইলে কার্যতঃ সেখানে উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য? সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ ঐক্য আসিতে পারে; অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়, এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। তখন যাদুঘরে অবস্থিত মিশরীয় মমিগুলির (mummies) মত আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিব—আমাদের মনে ভাবিবার মত কথাই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রসূতি। চিরকাল এইরূপই চলিবে।

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি এমন কোন সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব, কোন সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ত্ব, অথবা কোন সার্বভৌম আচার-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, যাহা সকলেই মানিয়া চলে। কারণ আমি জানি যে, নানা পাকে-চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগৎ-রূপ দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটি বরাবর এইভাবেই চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পারি?—আমরা ইহাকে সুচারুরূপে চলিতে সাহায্য করিতে পারি, ইহার ঘর্ষণ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি তৈলসিক্ত ও মসৃণ রাখিতে পারি। কিরূপে?—বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমাদিগকে আমাদের

স্বভাববশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখা চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে। সূর্যের কথা ধরা যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্যোদয় দেখিতেছে; সে প্রথমে একটি বৃহৎ গোলাকৃতি বস্তু দেখিতে পাইবে। তারপর মনে করুন, সে একটি ক্যামেরা লইয়া সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া যে পর্যন্ত না সূর্যে পৌঁছায়, সেই পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সূর্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে ভিন্ন হইবে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। আমরা কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই সূর্যের বহু প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। ভগবান্ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়—প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক জাতি—প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষ সত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুই নয়। মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি এবং আমরা নিজ নিজ পাত্রগুলি ভরিয়া লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে। যে বাটি আনিয়াছে, তাহার জল বাটির মত; যে কলসী আনিয়াছে, তাহার জল কলসীর মত আকার ধারণ করিয়াছে; এমনি সকলের পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের মত। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান্ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে জলদ্বারা পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান্ সেই জলস্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের পক্ষে ভগবদ্দর্শন সেই সেই আকারে হইয়া থাকে। তথাপি তিনি সর্বত্রই এক। একই ভগবান্ ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা সার্বভৌম ভাবের এই একমাত্র বাস্তব পরিচয় পাইতে পারি।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, মতবাদ হিসাবে তাহা বেশ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাস্তব সামঞ্জস্য স্থাপনের কি কোন উপায় আছে? আমরা দেখিতে পাই, 'সকল ধর্মমতই সত্য'—এ-কথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, ইওরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্বশেষে আমেরিকায় একটি সর্ববাদিসম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের একীকরণের এমন কোন কার্যকর উপায় তাঁহারা দেখাইয়া দেন নাই, যাহা দ্বারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও সকল ধর্ম নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই যথার্থ কার্যকর, যাহা ব্যক্তিগত ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে-সকল উপায়ে ধর্মজগতে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্মমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্যক্ষেত্রে কয়েকটি মতবিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেইহেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমান ঈর্ষাপরায়ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় রত নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

আমারও নিজের একটি ক্ষুদ্র কার্য-প্রণালী আছে। জানি না—ইহা কার্যকর হইবে কিনা, কিন্তু আমি উহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমার কার্য-প্রণালী কি? মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি—'কিছু নষ্ট করিও না', ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই করিতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙিও না, একেবারে ধূলিসাৎ করিও না, বরং গঠন কর। যদি পার সাহায্য কর; যদি না পার, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পার, অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ, এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়া সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে। এই-সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার স্বভাব অনুযায়ী একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে, আর একজন অপর একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্ধ ধরিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবশ্য একই কেন্দ্রে পৌঁছিব; এইরূপ প্রবাদ আছে যে, 'সকল রাস্তাই রোমে পৌঁছায়।' প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি করিবে; কারণ শেষে দেখা যায়, মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষা বিধান করে। তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটি শিশুকেও কিছু শিখাইতে পার?—পার না। শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করে। তোমার কর্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা। একটা গাছ বাড়িতেছে। তুমি কি গাছটিকে বাড়াও? তোমার কর্তব্য গাছটির চারিদিকে বেড়া দেওয়া, যেন গরু-ছাগলে উহাকে না খাইয়া ফেলে; ব্যস্, ঐখানেই তোমার কর্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বাড়ে। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না—কেহই তোমাকে আধ্যাত্মিক মানুষ করিয়া দিতে পারে না; তোমাকে নিজে নিজেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে; তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাদাতা কি করিতে পারেন? তিনি অন্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। ঐখানেই তাঁহার কর্তব্য শেষ। অতএব যদি পার সহায়তা কর, কিন্তু বিনষ্ট করিও না। তুমি কাহাকেও আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন করিতে পার—এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর। ইহা অসম্ভব। তোমার নিজের আত্মা ব্যতীত তোমার অপর কোন শিক্ষাদাতা নাই, ইহা স্বীকার কর। তাহাতে কি ফল হয়? সমাজে আমরা নানাবিধ স্বভাবের লোক দেখি। সংসারে সহস্র সহস্র প্রকার মন ও সংস্কার-বিশিষ্ট লোক

রহিয়াছে, তাহাদিগের সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ অসম্ভব; কিন্তু আপাততঃ আমাদের সুবিধামত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি; তিনি কর্ম করিতে চান; তাঁহার পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কাজ করা—হাসপাতাল নির্মাণ করা, সৎকার্য করা, রাস্তা প্রস্তুত করা, কার্যপ্রণালী স্থির করা ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ ভাবুক লোক—যিনি শিব ও সুন্দরকে অত্যধিক ভালবাসেন। তিনি সৌন্দর্যের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির মনোরম দিকটি উপভোগ করিতে এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবান্‌কে পূজা করিতে ভালবাসেন। তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, ধর্মাচার্য ও ভগবানের অবতারগণকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; খ্রীষ্ট অথবা বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন, এ-কথা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় কি হয় না, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না; খ্রীষ্টের প্রদত্ত 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, তাঁহাদের মনোহর মূর্তিগুলি সমধিক আদরণীয়। ইহাই তাঁহার (আদর্শ প্রেমিকের) প্রকৃতি, ভাবুকের স্বভাবই এই প্রকার। তৃতীয়তঃ অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী—তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে, মানব-মনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, অন্তরে কি কি শক্তি কার্য করিতেছে এবং কিরূপে তাহাদিগকে জানা যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত করা যায়—এই-সকল বিষয় তিনি জানিতে চান। ইহাই ঐ যোগীর (mystic) মনের স্বভাব। চতুর্থতঃ দার্শনিক—যিনি প্রত্যেকটি বিষয় মাপিয়া দেখিতে চান এবং মানবীয় দর্শনের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব, তাহারও ঊর্ধ্বে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে লইয়া যাইতে চান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্মকে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী খাদ্য-যোগানোর ক্ষমতা থাকা চাই; এবং যে ধর্মে এই ক্ষমতার অভাব, সেই ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি সবই একদেশী হইয়া পড়ে। মনে করুন, আপনি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন, যাহারা ভক্তি ও ভাবুকতা প্রচার করে, গান করে, কাঁদে এবং প্রেম প্রচার করে; কিন্তু যখনই আপনি বলিলেন, 'বন্ধু, আপনি যাহা বলিতেছেন, সবই ঠিক, কিন্তু আমি চাই ইহা অপেক্ষাও শক্তিপ্রদ কিছু—আমি চাই একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ, একটু দার্শনিকতা। আমি আরও বিচারপূর্বক বিষয়গুলি ধাপে ধাপে বুঝিতে চাই।' তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিবে, 'দূর হও' এবং শুধু যে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে তাহা নয়, পারে তো আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইয়া দিবে। ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবল ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই সাহায্য করিতে পারে। তাহারা অপরকে সাহায্য তো করেই না, পরন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে, এবং এই ব্যাপারের সর্বাপেক্ষা নীতিবিগর্হিত দিকটা এই যে, সাহায্যের কথা দূরে থাকুক, অপরে যে অকপট হইতে পারে, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। এদিকে আবার দার্শনিকদের সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই করেন এবং মনস্তত্ত্ববিষয়ক খুব লম্বা-চওড়া গালভরা শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু যদি আমার মত একজন সাধারণ লোক তাঁহাদের নিকট গিয়া বলে, 'আমাকে ধার্মিক হওয়ার মত কিছু উপদেশ দিতে পারেন কি?' তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমেই একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন, 'ওহে, তুমি বুদ্ধিবৃত্তিতে এখনও আমাদের বহু নীচে। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে?' ইঁহারা বহু উঁচুদরের দার্শনিক। তাঁহারা তোমাকে শুধু বাহিরে যাইবার দরজা দেখাইয়া দিতে পারেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা যোগমার্গী (mystic), তাঁহারা জীবের বিভিন্ন অবস্থা, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক সিদ্ধির ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাদিগকে বল, 'আমাকে এমন কোন সদুপদেশ দিন, যাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি। আমি অত কল্পনাপ্রিয় নই। আমার উপযোগী কিছু দিতে পারেন কি?' তাঁহারা হাসিয়া বলিবেন, 'নির্বোধটা কি বলে শোন; কিছুই জানে না—আহাম্মকের জীবনই বৃথা।' পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। আমি এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের একটা ঘরে একত্র পুরিয়া তাহাদের সুন্দর বিদ্রূপব্যঞ্জক হাস্যের আলোকচিত্র তুলিতে চাই।

ইহাই ধর্মের সমসাময়িক অবস্থা, ইহাই বর্তমান পরিস্থিতি। আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী হইবে—ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে 'মরমী' এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে। যদি কলেজ হইতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ আসেন, তাঁহারা যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাঁহারা যত পারেন বিচার করুন। শেষে তাঁহারা এমন একস্থানে পৌঁছিবেন, যেখানে তাঁহাদের মনে হইবে যে, যুক্তিবিচারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা বলিয়া বসিবেন, 'ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি ভাবগুলি কুসংস্কার মাত্র—উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।' আমি বলি, 'হে দার্শনিক প্রবর, তোমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, এটিকে পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য আর গৃহে বা অধ্যাপনার জন্য তোমার দর্শনবিজ্ঞানের ক্লাসে যাইও না। শরীর ছাড়িয়া দাও এবং যদি না পার, জীবনভিক্ষা চাহিয়া চুপ করিয়া বস।' কারণ যে-দর্শন আমাদিগকে জগতের একত্ব ও বিশ্বময় একই সত্তার অস্তিত্ব শিক্ষা দেয়, সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার উপায় দেখাইবার সামর্থ্য ধর্মের থাকা আবশ্যক। সেইরূপ যদি 'মরমী' যোগী কেহ আসেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও হাতে-কলমে তাহা করিয়া দেখাইতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। যদি ভক্ত লোক আসেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া ভগবানের নামে হাসিব ও কাঁদিব, আমরা 'প্রেমের পেয়ালা পান করিয়া মত্ত হইয়া যাইব।' যদি একজন উদ্যমশীল কর্মী আসেন, আমরা তাঁহার সহিত যথাসাধ্য কর্ম করিব। এই প্রকার সমন্বয়ই সার্বভৌম ধর্মের নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি সুন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি বা দুইটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎই সেইরূপ একদেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাহারা কেবল সেই রাস্তাটিই জানে, যাহাতে নিজেরা চলাফেরা করে; এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্য। এই চারিটি দিকে সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে 'যোগ' বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যায়। কর্মীর দৃষ্টিতে ইহার অর্থ ব্যক্তির সহিত সমগ্র মানবজাতির অভেদ-ভাব; 'মরমী'র দৃষ্টিতে ইহার অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সাধন; ভক্তের নিকট ইহার অর্থ নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের মিলন এবং জ্ঞানীর নিকট ইহার অর্থ নিখিল সত্তার ঐক্য-বোধ। 'যোগ' শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটি সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারিপ্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগসাধন করিতে চান, তিনিই 'যোগী'। যিনি কর্মের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'কর্মযোগী' বলে। যিনি প্রেমের মধ্য দিয়া এই

যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'ভক্তিযোগী' বলে। যিনি ধ্যানধারণার মধ্য দিয়া সাধন করেন, তাঁহাকে 'রাজযোগী' বলে। যিনি জ্ঞানবিচারের মধ্য দিয়া যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'জ্ঞানযোগী' বলে। অতএব 'যোগী' বলিতে ইঁহাদের সকলকেই বুঝায়।

এখন প্রথমে 'রাজযোগ'-এর কথা ধরি। এই রাজযোগ—এই মনঃসংযোগের ব্যাপারটা কি? ইংলণ্ডে আপনারা 'যোগ' কথাটির সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি নানারকমের কিম্ভূতকিমাকার ধারণা জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব প্রথমেই আপনাদিগকে ইহা বলিয়া রাখা আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে যে, যোগের সহিত ইহাদের কোনই সংস্রব নাই। এইগুলির মধ্যে কোন যোগেই তোমাকে যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিতে, অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে অথবা পুরোহিতকুল যে-কোন পর্যায়েরই হউন না কেন, তাঁহাদের হাতে তোমার বিচারশক্তি সমর্পণ করিতে বলে না। কোন যোগই বলে না যে, তোমাকে কোন অতিমানুষ ঈশদূতের নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকেই বলে, তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধর, তাহাতেই লাগিয়া থাক। আমরা সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাভের তিন প্রকার উপায় দেখিতে পাই। প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজন্তুর মধ্যেই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা জ্ঞানলাভের সর্বনিম্ন উপায়। দ্বিতীয় উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্তু সকলের কার্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্য করে। মানুষের বেলায় দেখা যায়, এই সহজাত জ্ঞান বহুলভাবে বিচারশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রও বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি এই বিচার-শক্তিরও যথেষ্ট অপ্রাচুর্য রহিয়াছে। বিচারশক্তি কিছুদূর পর্যন্তই মাত্র অগ্রসর হইতে পারে, তারপর সে থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না; এবং যদি তুমি ইহাকে বেশী দূর চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার ফলে এক দুরপনেয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে পরিণত হয়। যুক্তি তখন চক্রাকারে চলিতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও শক্তির কথাই ধরুন। জড় কি?—যাহার উপর শক্তি ক্রিয়া করে। শক্তি কি?—যাহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে। এই-সব কথায় গোলমালটা কোথায়, তাহা আপনারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রবিদগণ ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ বলেন—একটির (অর্থাৎ জড়ের) ধারণার জন্য অপরটির (অর্থাৎ শক্তির) উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; আবার অপরটির (শক্তির) ধারণার জন্য প্রথমটির (জড়ের) উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সুতরাং আপনারা যুক্তির সম্মুখে এক প্রবল বাধা দেখিতে পাইতেছেন, যাহাকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তথাপি এই বাধার অপর প্রান্তে যে অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে, সেখানে পৌঁছাইতে যুক্তি সর্বদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের বিষয়ীভূত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের বুদ্ধিভূমির উপর প্রতিফলিত, সেই অনন্তের এক কণিকামাত্র; বুদ্ধিরূপ জাল দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আমাদের বিচারশক্তি কার্য করে—তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। সুতরাং ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন—প্রজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয়-বোধ। অতএব সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয়-বোধ—এই তিনটিই জ্ঞানলাভের উপায়। পশুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচারশক্তি ও দেবমানবে অতীন্দ্রিয়-বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মানব-মনে থাকা চাই, এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একটি শক্তি অপরটির বিকশিত অবস্থা মাত্র; সুতরাং তাহারা পরস্পর-বিরোধী নয়। বিচারশক্তিই পরিস্ফুট হইয়া অতীন্দ্রিয়-বোধে পরিণত হয়; সুতরাং অতীন্দ্রিয়-বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নয়, পরন্তু তাহার পরিপূরক। যে-সকল স্থলে বিচারশক্তি পৌঁছিতে পারে না, অতীন্দ্রিয়-বোধ তাহাদিগকেও উদ্ভাসিত করে, এবং তাহারা বুদ্ধির বিরোধী হয় না। বার্ধক্য বালকত্বের বিরোধী নয়, পরন্তু তাহার পরিণতি। অতএব তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানোপায়কে উচ্চশ্রেণীর উপায় বলিয়া ভুলকরা-রূপ ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয়-বোধ বলিয়া জগতে চালাইয়া দেওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা সাজিবার সকল প্রকার মিথ্যা দাবী আসিয়া পড়ে। একজন নির্বোধ অথবা অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার মস্তিষ্কে যে-সকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহাকে অনুসরণ করুক। জগতে সর্বাপেক্ষা পরস্পর-বিরোধী যত প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুযায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্দ্রিয়-বোধের ভাষা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত উপদেশের প্রথম লক্ষণ এই হওয়া চাই যে, ইহা কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না; এবং আপনারা দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগ এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজযোগের কথা ধরা যাক। রাজযোগ মনস্তত্ত্ববিষয়ক যোগ, মনোবৃত্তির সহায়-অবলম্বনে পরমাত্মযোগে পৌঁছিবার উপায়। বিষয়টি খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই 'যোগ'-এর মূল ভাবটিই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। জ্ঞানলাভ করিবার আমাদের একটি মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মনুষ্য হইতে সর্বোচ্চ 'যোগী' পর্যন্ত সকলকেই সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়—একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ্ যখন তাঁহার পরীক্ষাগারে (Laboratory) কাজ করেন, তখন তিনি তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি সংহত করেন, উহাকে এককেন্দ্রিক করেন, এবং সেই শক্তিকে পদার্থবিশেষের উপর প্রয়োগ করেন। তখন ঐ পদার্থের সংগঠক ভূতবর্গ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞানলাভ করেন। জ্যোতির্বিদও তাঁহার সমুদয় মনঃশক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে এককেন্দ্রিক করেন; তারপর তাঁহার দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া ঐ শক্তিকে বস্তুর উপর প্রয়োগ করেন; তখন নক্ষত্রনিচয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘুরিয়া তাহার দিকে আসে এবং নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত করে। অধ্যাপনারত আচার্যই বল, অথবা পাঠনিরত ছাত্রই বল, যেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, উহা যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে আপনাদের মন উহার প্রতি একাগ্র হইবে; তখন যদি একটা ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহা শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম ও শক্তিসমূহকে যতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টি আপনাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞানলাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। এমন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংযোগ করে তাহা হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়া বুরুশ করিবে; পাচক একাগ্র হইলে তাহার খাদ্য আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। অর্থোপার্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক—যে-কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে, কাজটি ততই

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। কেবল এইভাবে ডাকিলে বা এইভাবে করাঘাত করিলেই প্রকৃতির ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং জগৎ আলোক-বন্যায় প্লাবিত হয়। ইহাই—এই একাগ্রতাশক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় এই বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা এতই বিক্ষুব্ধ রহিয়াছি যে, আমাদের মন শত বিষয়ে তাহার শক্তি বৃথা ক্ষয় করিতেছে। যখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই শতসহস্র অবাঞ্ছিত আলোড়ন মস্তিষ্কে দ্রুত উত্থিত হইয়া, শতসহস্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া উহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিরূপে ঐগুলি নিবারণ করিয়া মন বশে আনিতে পারা যায়, তাহাই রাজযোগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে কর্মযোগের অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয়া ভগবান্-লাভের কথা ধরা যাক। সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন-না-কোন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন শুধু চিন্তার রাজ্যেই একাগ্র হইয়া থাকিতে পারে না—তাহারা বোঝে কেবল কাজ—যা চোখে দেখা যায় এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকের জন্যও একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন কর্ম করিতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ শক্তির অপব্যবহার করিয়া থাকে; কারণ আমরা কর্মের রহস্য জানি না। কর্মযোগ এই রহস্যটি বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কিভাবে কার্য করিতে হইবে, উপস্থিত কর্মে কিভাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহা শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বিরুদ্ধে 'উহা দুঃখজনক' এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আমাদিগকে তাহারও বিচার করিতে হইবে। সমুদয় দুঃখ-কষ্ট আসক্তি হইতে আসে। আমি কাজ করিতে চাই—আমি কোন লোকের উপকার করিতে চাই; এবং শতকরা নব্বইটি স্থলেই দেখা যায় যে, আমি যাহাকে সাহায্য করিয়াছি, সেই ব্যক্তি সমস্ত উপকার ভুলিয়া আমার শত্রুতা করে; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবংবিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম হইতে বিরত হয় এবং এই দুঃখ-কষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম ও উদ্যমের অনেকটা নষ্ট করিয়া দেয়। কাহাকে সাহায্য করা হইতেছে, এবং কোন্ প্রয়োজনে সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া অনাসক্তভাবে শুধু কর্তব্যবোধে কর্ম করিতে হয়, কর্মযোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। কর্মযোগী কর্ম করেন, কারণ উহা তাঁহার স্বভাব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন এরূপ করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণজনক—ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছু প্রত্যাশা করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্তু প্রতিদানস্বরূপ কিছুই চান না। সুতরাং তিনি দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পান। যখনই দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করে, তখনই বুঝিতে হইবে, উহা 'আসক্তি'র প্রতিক্রিয়া মাত্র।

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্মের অঙ্গরূপে ক্রিয়াকলাপের এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরম্য মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করেন এবং সাধনায় তাহাদের প্রয়োগ করেন। আপনারা কি বলিতে চান, তাঁহারা ভুল করেন? আমি আপনাদিগকে একটি সত্য কথা বলিতে চাই, তাহা আপনাদের—বিশেষতঃ এই দেশে—মনে রাখা ভাল। যে-সকল ধর্ম-সম্প্রদায় অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তত্ত্বসম্পদে সমৃদ্ধ, তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে-সকল সম্প্রদায় কোন প্রতীক বা অনুষ্ঠানবিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবান্ লাভের চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা ধর্মের যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্ সমস্ত নির্মমভাবে পদদলিত করিয়াছে। খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম গোঁড়ামি মাত্র, এবং শুষ্ক। জগতের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং এই-সকল অনুষ্ঠান ও পুরাণাদিকে গালি দিও না। যে-সকল লোক ঐগুলি লইয়া থাকিতে চায়, তাহারা ঐগুলি লইয়া থাকুক। তোমরা অযথা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিও না, 'তাহারা মূর্খ, উহা লইয়াই থাকুক।' তাহা কখনই নয়; আমি জীবনে যে-সকল আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এই-সকল অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি নিজেকে তাঁহাদের পদতলে বসিবার যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিনা তাঁহাদের সমালোচনা করিতে যাইব! এই সমুদয় ভাব মানব-মনে কিরূপ কার্য করে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি আমার গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমরা উচিত অনুচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের সমালোচনা করিয়া থাকি। লোকে এই-সকল সুন্দর সুন্দর উদ্দীপনাপূর্ণ পুরাণাদি যত ইচ্ছা গ্রহণ করুক; কারণ আপনাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ লোকেরা সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া থাকিতে মোটেই পছন্দ করেন না। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট 'ধরা ছোঁয়ার' বস্তু, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁহারা ভগবান্‌কে অনুভব করেন, তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহাকে দেখেন, ভালবাসেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভগবান্ লাভ করুন। তোমরা যুক্তিবাদীরা, ভক্তের চক্ষে তেমনি নির্বোধ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর মূর্তি দেখিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া বুঝিতে চায় উহা কি পদার্থে নির্মিত। 'ভক্তিযোগ' তাহাদিগকে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছাড়িয়া ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়; লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা কিংবা অন্য কোন কামনার জন্য নয়, কিন্তু মঙ্গলময়কে মঙ্গলময়রূপে, এবং ভগবান্‌কে ভগবান্‌রূপে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবান্‌ই প্রেমস্বরূপ—ইহাই ভক্তিযোগের শিক্ষা। ভক্তিযোগ তাঁহাদিগকে ভগবান্, সৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্, শাস্তা এবং পিতা ও মাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়। মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে অথবা মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বোচ্চ ধারণা করিতে পারে, তাহা এই যে, তিনি প্রেমের ঈশ্বর। 'যেখানেই কোন প্রকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাই তিনি।' যেখানে এতটুকু প্রেম, তাহা তিনিই; ঈশ্বর সেখানে বিরাজমান। স্বামী যখন স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে তিনিই বিদ্যমান; মাতা যখন শিশুকে চুম্বন করেন, সেখানেও তিনি বিদ্যমান; বন্ধুগণের করমর্দনে সেই প্রভুই প্রেমময় ভগবান্‌রূপে বিদ্যমান। যখন কোন মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাসিয়া তাহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রভুই তাঁহার প্রেমভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে ভালবাসা বিতরণ করিতেছেন। যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। 'ভক্তিযোগ' এই-সকল কথাই শিক্ষা দেয়।

সর্বশেষে আমরা 'জ্ঞানযোগী'র কথা আলোচনা করিব; তিনি দার্শনিক ও চিন্তাশীল, তিনি এই দৃশ্য-জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের তুচ্ছ জিনিষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নন। তিনি আমাদের পানাহারাদি প্রাত্যহিক কার্যাবলীর পারে যাইতে চান; সহস্র সহস্র পুস্তকও তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না; এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে

না, কারণ ইহা বড়জোর এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি তাঁহার জ্ঞানগোচর করিতে পারে। এমন আর কি আছে, যাহা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারে? কোটি কোটি সৌরজগৎ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার চক্ষে তাহারা অস্তিত্বের সমুদ্রে বিন্দুমাত্র। তাঁহার আত্মা এই-সকলের পারে যাইয়া সকল অস্তিত্বের যাহা সার, সেই সত্যকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, সেই বিরাট সত্তার সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়। ইহাই হইল জ্ঞানীর ভাব। তাঁহার মতে ভগবান্‌কে জগতের পিতা, মাতা, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পথপ্রদর্শক ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা মোটেই সম্ভব নয়। তিনি ভাবেন, ভগবান্ তাঁহার প্রাণের প্রাণ, তাঁহার আত্মার আত্মা, ভগবান্ তাঁহার নিজেরই আত্মা। ভগবান্ ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই। তাঁহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই থাকে, তাহাই পরমাত্মা স্বয়ং।

‘দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥’
৭

গাছে দুইটি পাখী রহিয়াছে—একটি উপরে, একটি নীচে। উপরের পাখীটি স্থির, নির্বাক্, মহান্, নিজের মহিমায় নিজে বিভোর; নীচের ডালের পাখীটি কখনও সুমিষ্ট, কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া উঠিতেছে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে সুখী ও দুঃখী বোধ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখীটি একটি অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে তাকাইল এবং অপর পাখীটিকে দেখিতে পাইল—সেই অপূর্ব সোনালী রঙের পাখাওয়ালা পাখীটি—সে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খায় না এবং নিজেকে সুখী বা দুঃখীও মনে করে না, পরন্তু প্রশান্তভাবে আপনাতে আপনি থাকে—নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। নীচের পাখীটি ঐরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু শীঘ্রই ইহা ভুলিয়া গিয়া আবার ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত ফল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় দুঃখ হইল এবং সে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল এবং উপরের পাখীটির কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। আবার সে এ-কথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুকাল পরে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল। বারবার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে সুন্দর পাখীটির খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং দেখিল অপর পক্ষীর পক্ষ হইতে জ্যোতির ছটা আসিয়া তাহার নিজ দেহের চতুর্দিকে পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্তন অনুভব করিল—যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে; সে আরও নিকটে আসিল, দেখিল তাহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদৃশ্য—অন্তর্হিত হইতেছে। অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখীটি যেন উপরের পাখীটির স্থূলরূপে প্রতীয়মান ছায়া মাত্র—প্রতিবিম্ব মাত্র ছিল। সে নিজে বরাবর স্বরূপতঃ সেই উপরের পাখীই ছিল। নীচের ছোট পাখীটির এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সুখ-দুঃখ বোধ করা—এই সবই মিথ্যা—স্বপ্ন মাত্র; সেই প্রশান্ত, নির্বাক্, মহিমময়, শোকদুঃখাতীত উপরের পাখীটিই সর্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখীটি ঈশ্বর, পরমাত্মা—জগতের প্রভু; এবং নীচের পাখীটি জীবাত্মা—এই জগতের সুখ-দুঃখরূপ বিষ ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা। মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত আসে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হয়। সে তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্যজাল মাত্র। কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বহির্জগতে টানিয়া নামাইয়া আনে এবং সেও পূর্বের ন্যায় এই জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে। আবার সে এক অতি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞানালোক প্রবেশ করে। এইরূপ ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই সে নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার ‘কাঁচা আমি’ স্বতই লীন হইয়া যাইতেছে। যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই পরমাত্মা এবং বলিয়া উঠে, ‘যাঁহাকে আমি তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দ্র-সূর্যে বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তিনি আমাদের এই জীবনের অবলম্বন—আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাহাই নয়, তুমিই সেই—তত্ত্বমসি।’ ‘জ্ঞানযোগ’ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মানুষকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ পরমাত্মা। ইহা মানুষকে প্রাণিজগতের মধ্যে যথার্থ একত্ব দেখাইয়া দেয়—আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি সামান্য পদদলিত কীট হইতে যাঁহাদিগকে আমরা সবিস্ময়ে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করি, সেই-সব শ্রেষ্ঠ জীব পর্যন্ত সকলেই সেই এক পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র।

শেষ কথা এই যে, এই-সকল বিভিন্ন যোগ আমাদিগকে কার্যে পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিলে চলিবে না। ‘শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ’—প্রথমে এগুলি সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে—যেন আমাদের মনে তাহাদের একটা ছাপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে হইবে—যে পর্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম জিনিষটা আর শুধু কতকগুলি ধারণা বা মতবাদের সমষ্টি অথবা বুদ্ধির সায় মাত্র হইয়া থাকিবে না। তখন ইহা আমাদের জীবনের সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয়তো আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম কখনই পরিবর্তিত হয় না। ধর্ম অনুভূতির বস্তু—উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নয়—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম—জীবনে পরিণত করিবার বস্তু, শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিষ নয়; সমস্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম।

বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়

[১৯০০ খ্রীঃ ২৮ জানুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনাস্থিত ইউনিভার্সালিষ্ট চার্চে প্রদত্ত]

যে-অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভগবানের নিকট হইতে আলো পাই, মনুষ্য-হৃদয়ের নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তর অনুসন্ধান আর নাই। কি অতীত কালে, কি বর্তমান কালে 'আত্মা' 'ঈশ্বর' ও 'অদৃষ্ট' সম্বন্ধে আলোচনায় মানুষ যত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে, অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা আমাদের দৈনিক কাজ-কর্ম, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের কর্তব্য প্রভৃতি লইয়া যতই ডুবিয়া থাকি না কেন, আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেও কখনও কখনও এমন একটি বিরাম-মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন মন সহসা থামিয়া যায় এবং এই জগৎপ্রপঞ্চের পারে কি আছে, তাহা জানিতে চায়। কখনও কখনও সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কিছু কিছু আভাস পায় এবং ফলে তাহা পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে। সর্বকালে সর্বদেশে এইরূপ ঘটিয়াছে। মানুষ অতীন্দ্রিয় বস্তুর দর্শন লাভ করিতে চাহিয়াছে, নিজেকে বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, এবং যাহা কিছু আমাদের নিকট উন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তি নামে পরিচিত, তাহা সর্বকালে মানবজীবনের চরম গতি—ঈশ্বরানুসন্ধানের তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়াছে।

আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাতির বিবিধ প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মানবের আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামও বিভিন্ন ধর্ম-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেরূপ সর্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্মসম্প্রদায়গুলিও সর্বদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত। কোন এক বিশেষ সমাজ-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত লোকেরা দাবী করে যে, একমাত্র তাহাদেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এবং তাহারা যতক্ষণ পারে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সেই অধিকার বজায় রাখিতে চায়। আমরা জানি, এইরূপ একটি ভীষণ সংগ্রাম বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। সেইরূপ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ও এই প্রকার দাবী করিয়া আসিয়াছে যে, শুধু তাহারই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যদিও ধর্ম মানবজীবনে যতটা মঙ্গলবিধান করিয়াছে, অপর কিছুই তাহা পারে নাই, তথাপি ধর্ম আবার যেরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে, আর কিছুই এমন করে নাই। ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও প্রেম বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্মই সর্বাপেক্ষা ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার ধর্মই মানুষে মানুষে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের—এমন কি পশুর জন্য পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্মই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে। আবার আমরা ইহাও জানি যে, সব সময়েই ফল্গুধারার ন্যায় আর একটা চিন্তাস্রোতও চলিয়াছে; সব সময়েই বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় রত এমন অনেক তত্ত্বান্বেষী বা দার্শনিক রহিয়াছেন, যাঁহারা এই সকল পরস্পর-বিবদমান ও বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কোন কোন দেশে এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, যেগুলির মধ্যে এই ভাবটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান যে, সকল সম্প্রদায়ই বাঁচিয়া থাকুক; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন একটি নিজস্ব তাৎপর্য, কোন একটি মহান্ ভাব আছে, কাজেই উহা জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং উহাকে পোষণ করা উচিত। বর্তমান কালেও এই ধারণাটি আধিপত্য লাভ করিতেছে এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে। এই-সকল চেষ্টা সকল সময়ে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না, বা যোগ্যতা দেখাইতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, আমরা আরও ঝগড়া বাড়াইয়া তুলিতেছি।

এক্ষণে ধর্মান্ধ মতবাদ-অবলম্বনে আলোচনা ছাড়িয়া বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, তাঁহারা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতার কথা তুলিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যদি কোন লোক বলে, 'বহির্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে, আমি কিছুই জানি না, অতএব বহির্জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই মিথ্যা'; তাহা হইলে তাহাকে মার্জনা করা চলে না। এখন আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমগ্র জগতে অধ্যাত্মচিন্তার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, পৃথিবীর একটিও মুখ্য ধর্ম মরে নাই; শুধু তাহাই নয়, এগুলির প্রত্যেকটিই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুরা বিস্তার লাভ করিতেছে এবং য়াহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হইতেছে, এবং সংখ্যায় তাহারা দ্রুত বর্ধিত হইয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ায় য়াহুদীধর্মের গণ্ডী দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

একটিমাত্র ধর্ম—একটি প্রধান প্রাচীন ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। তাহা প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম—জরাথুষ্ট্র-ধর্ম। মুসলমানদের পারস্যবিজয়কালে প্রায় এক লক্ষ পারস্যবাসী ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের কেহ কেহ প্রাচীন পারস্যদেশেই থাকিয়া গিয়াছিল। যাহারা পারস্যে ছিল, তাহারা ক্রমাগত মুসলমানদিগের নির্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে পাইতে এখন বড়জোর দশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভারতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আশি হাজার; কিন্তু তাহারা আর বাড়িতেছে না। অবশ্য

গোড়াতেই তাহাদিগের একটি অসুবিধা রহিয়াছে—তাহারা অপর কাহাকেও নিজেদের ধর্মভুক্ত করে না। আবার ভারতে এই মুষ্টিমেয় সমাজেও স্বগোত্রীয় নিকট সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটিমাত্র ধর্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান প্রধান ধর্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি-লাভ করিতেছে। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। একটিও প্রধান ধর্ম ইওরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটিও নয়; প্রত্যেক ধর্মই এশিয়াসম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে। 'যোগ্যতম ব্যক্তি বা বস্তুই বাঁচিয়া থাকিবে'—আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই-সকল ধর্ম যে এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহারা কতকগুলি লোকের পক্ষে উপযোগী; তাহারা যে কেন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার কারণ আছে—তাহারা বহু লোকের উপকার করিতেছে। মুসলমানদিগকে দেখ, তাহারা দক্ষিণ-এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তারলাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৌদ্ধগণ মধ্য-এশিয়ায় বরাবর বিস্তারলাভ করিতেছে। য়াহুদীদের মত হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্মে গ্রহণ করে না, তথাপি ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতি হিন্দুধর্মের ভিতর আসিয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্মও যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন; তবে আমার যেন মনে হয়, চেষ্টার অনুরূপ ফল হইতেছে না। খ্রীষ্টানদের প্রচারকার্যে একটি ভয়ানক দোষ আছে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান মাত্রেই এই দোষ বিদ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি প্রতিষ্ঠানযন্ত্রের পরিচালনাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানসুলভ বিধি-ব্যবস্থা বড় বেশী। প্রচারকার্যটা প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসজ্জা, রাজ্যশাসন প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে করিবে, কিন্তু ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে তাহারা প্রাচ্যদিগের কাছে ঘেঁষিতেও পারে না, কারণ ইহা বরাবর তাহাদেরই কাজ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহারা অতিরিক্ত বিধিব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়।

অতএব মনুষ্যজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহা একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্মই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে, এবং সর্বজ্ঞ পরমকারুণিক সৃষ্টিকর্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে, ইহাদের একটিমাত্র ধর্ম থাকুক এবং অবশিষ্ট সবগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা বহু পূর্বেই সংসাধিত হইত। আর যদি এই-সকল ধর্মের মধ্যে একটিমাত্র ধর্মই সত্য এবং অপরগুলি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে ঐ সত্য ধর্মই এতদিনে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই; উহাদের কোনটিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নাই। সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য সময়ে অবনতির দিকে যায়। আর ইহাও ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দেশে ছয় কোটি লোক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র দুই কোটি দশ লক্ষ কোন-না-কোন প্রকার ধর্মভুক্ত। সুতরাং সব সময়েই ধর্মের উন্নতি হয় না। সম্ভবতঃ সকল দেশেই—গণনা করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্মগুলির কখনও উন্নতি আবার কখনও অবনতি হইতেছে। সম্প্রদায়ের সংখ্যাও সর্বদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবী যদি সত্য হইত যে, সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেই দিয়াছেন—তবে জগতে এত সম্প্রদায় হইল কিরূপে? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই পুস্তককে ভিত্তি করিয়া কুড়িটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই সমগ্র সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঝগড়া করিবার জন্য তিনি কখনই আমাদিগকে সেগুলি দেন নাই, কিন্তু বস্তুতঃ দাঁড়াইতেছে তাহাই। কেন এরূপ হয়? যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই ধর্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন, তাহা হইলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কারণ কেহই সে গ্রন্থ বুঝিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেল ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় সম্প্রদায়ের কথা ধরুন; প্রত্যেক সম্প্রদায় ঐ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রান্ত। প্রত্যেক ধর্ম-সম্বন্ধেই এই কথা। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, হিন্দুদের মধ্যে তো শত শত। এখন আমি যে-সকল ঘটনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, এগুলির উদ্দেশ্য—আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম-বিষয়ে যতবারই সমুদয় মনুষ্যজাতিকে এক প্রকার চিন্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই উহা বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এমন কি, বর্তমান কালেও নূতন মত-প্রবর্তক মাত্রেই দেখিতে পান যে, তিনি তাঁহার অনুবর্তিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দূরে সরিয়া যাইতে না যাইতে তাহারা কুড়িটি দল গঠন করিয়া বসিয়াছে। আপনারা সব সময়েই এইরূপ ঘটিতে দেখিতে পান। ইহা ধ্রুব সত্য যে, সকল লোককে একই প্রকার ভাব গ্রহণ করান চলে না এবং আমি ইহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নই, বরং নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে বলিয়া আমি খুশী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা—তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু এই যে, যদি আপনি আমি এবং এখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলে ঠিক একই প্রকার ভাবরাশি চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়ই থাকিবে না। দুই বা ততোধিক শক্তির সংঘর্ষ হইলেই গতি সম্ভব, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই—চিন্তার বৈচিত্র্য হইতেই নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়। এখন আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে আমরা যাদুঘরের মিশরদেশীয় 'মামি'তে (mummies) পরিণত হইয়া শুধু তাহাদেরই মত পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম—তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না। বেগবতী জীবন্ত নদীতেই ঘূর্ণাবর্ত থাকে, বদ্ধ ও স্রোতহীন জলে আবর্ত হয় না। যখন ধর্মগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আর সম্প্রদায়ও থাকিবে না; তখন শ্মশানের পূর্ণ শান্তি ও সাম্য বিরাজ করিবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে, ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে। বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং বৈষম্য থাকিবেই। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে যত মানুষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্মরাজ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে—তাহার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে চলিতে পারে।

কিন্তু এই ধারা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করে, কিন্তু এই স্বাভাবিক ধারা বরাবরই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এইজন্য সাক্ষাৎভাবে তরবারি ব্যবহৃত না হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নিউ ইয়র্কের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতেছেন, শুনুন—তিনি প্রচার করিতেছেন যে, ফিলিপাইনবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতঃপূর্বেই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত

হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রেসবিটেরিয়ান করিতে চান এবং ইহার জন্য তিনি রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি স্বজাতির স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত। কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাঁহার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয়। যখন এইরূপ একজন লোক সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার কদর্য প্রলাপবাক্য বলিয়া যাইতে লজ্জাবোধ করে না, তখন জগতের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন, বিশেষতঃ যখন আবার তাহার শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে উৎসাহ দিতে থাকে, তখন ভাবিয়া দেখুন জগতের স্বরূপটা কি! ইহাই কি সভ্যতা? ইহা ব্যাঘ্র, নরখাদক ও অসভ্য বন্যজাতির সেই চিরাভ্যস্ত রক্তপিপাসা বৈ আর কিছুই নয়, শুধু আবার নূতন নামে ও নূতন অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? বর্তমান কালেই যদি ঘটনা এইরূপ হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, সেই প্রাচীনকালে জগৎকে কি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইতে হইত! ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের শার্দূলসদৃশ মনোবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে মাত্র—ঐ মনোবৃত্তি একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহা লাফাইয়া উঠে এবং পূর্বের মত নিজ নখর ও বিষদন্ত ব্যবহার করে। তরবারি অপেক্ষাও—জড়পদার্থ নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষাও ভীষণতর অস্ত্রশস্ত্র আছে; যাহারা ঠিক আমাদের মতাবলম্বী নয়, তাহাদের প্রতি এখন অবজ্ঞা, সামাজিক ঘৃণা ও সমাজ হইতে বহিষ্করণরূপ ভীষণ মর্মভেদী অস্ত্র-সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কেন সকলে যে ঠিক আমার মত চিন্তা করিবে?—আমি তো ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি বিচারশীল মানুষ হই, তাহা হইলে সকলে যে ঠিক আমার ভাবে ভাবিত নয়, ইহাতে আমার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আমি শ্মশানতুল্য দেশে বাস করিতে চাই না; আমি মানুষেরই মত থাকিতে চাই—মানুষেরই মধ্যে। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই মতভেদ থাকিবে; কারণ পার্থক্যই চিন্তার প্রথম লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল হই, তাহা হইলে আমার অবশ্যই এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া উচিত, যেখানে মতের পার্থক্য থাকিবে।

তারপর প্রশ্ন উঠিবে, এই-সকল বৈচিত্র্য কি করিয়া সত্য হইতে পারে? কোন বস্তু সত্য হইলে তাহার বিপরীত বস্তুটা মিথ্যা হইবে। একই সময়ে দুইটি বিরুদ্ধ মত কি করিয়া সত্য হইতে পারে? আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর ধর্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে-সকল বাহ্য আচারে বড় বড় চিন্তাগুলি আবৃত থাকে, আমি সে-সকলের কথা বলিতেছি না। নানা ধর্মে যে-সকল বিবিধ মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না; আমি প্রত্যেক ধর্মের ভিতরকার প্রাণবস্তুর কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি করিয়া সারবস্তু বা 'আত্মা' আছে; এবং এক ধর্মের আত্মা অন্য ধর্মের আত্মা হইতে পৃথক্ হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করে, না একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে?—ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম, তখন হইতে এই প্রশ্নটির আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি এবং সারা জীবন ধরিয়া উহারই আলোচনা করিতেছি। আমার সিদ্ধান্ত হয়তো আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারে, এই মনে করিয়া উহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাহারা পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক ধর্ম যেন মহান্ সার্বভৌম সত্যের এক-একটি অংশ লইয়া তাহাকে বাস্তব রূপ প্রদান করিতে এবং আদর্শে পরিণত করিতে উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মিলনের ব্যাপার—বর্জনের নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। এক-একটি বড় ভাব লইয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আদর্শগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপেই মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। মানুষ কখনও ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরন্তু সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া থাকে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরূঢ় হইয়া থাকে—কিন্তু কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নয়। পুত্র হয়তো পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণশালী হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পিতা যে কিছু নন, তাহা তো নয়। পুত্রের মধ্যে পিতা তো আছেনই, অধিকন্তু আরও কিছু আছে। আপনার বর্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে কি আপনি এখন সেই বাল্যাবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন? আপনি কি সেই অতীত অবস্থার দিকে তাকাইয়া উহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? বুঝিতেছেন না, আপনার সেই বাল্যকালের জ্ঞানই আরও কিছু অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট হইয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

আবার ইহা তো সকলেই জানেন যে, একই জিনিষকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত একই বস্তুর আভাস দিয়া থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তি সূর্যের দিকে গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্যের এক একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে, তখন সূর্যের অনেকগুলি ফটো আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিবে। আমরা দেখিতে পাইব তাহাদের কোন দুইখানি ঠিক এক রকমের নয়, কিন্তু এ-কথা কে অস্বীকার করিবে যে, এগুলি একই সূর্যের ফটো—শুধু ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত? বিভিন্ন কোণ হইতে এই গীর্জাটির চারিখানি ফটো লইয়া দেখুন, তাহারা কত পৃথক্ দেখাইবে; অথচ তাহারা এই গীর্জার প্রতিকৃতি। এইরূপে আমরা একই সত্যকে এমন সব দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছি, যাহা আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই-সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন পাওয়া সম্ভব, ততটাই পাইতেছি—তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি। আমরা সত্যের শুধু সেইটুকুই বুঝিতে পারি, যেটুকুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বা যতটুকু গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের আছে। এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ হয়; এমন কি, কখনও কখনও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; অথচ আমরা সকলেই সেই এক সর্বজনীন সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আমার ধারণা এই যে, ভগবানের বিধানে এই-সকল ধর্ম বিবিধ শক্তিরূপে বিকশিত হইয়া মানবের কল্যাণ-সাধনে নিরত রহিয়াছে; তাহাদের একটিও মরিতে পারে না—একটিকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। যেমন কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করা যায় না, সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক শক্তিনিচয়ের কোন একটিরও বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় না। আপনারা দেখিয়াছেন, প্রত্যেক ধর্মই জীবিত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে ইহা হয়তো উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কোন সময়ে হয়তো ইহার সাজসজ্জার অনেকটা হ্রাস পাইতে পারে, কখনও উহা রাশীকৃত সাজসজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উহার

প্রাণবস্তু সর্বদাই অব্যাহত রহিয়াছে; উহা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের সেটি অন্তর্নিহিত আদর্শ, তাহা কখনই নষ্ট হয় না; সুতরাং প্রত্যেক ধর্মই সজ্ঞানে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

আর সেই সার্বভৌম ধর্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শনিকগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি কত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা এখানেই রহিয়াছে। সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, সেইরূপ সার্বভৌম ধর্মও রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নানা দেশ পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নিজেদের ভাই-বোনের পরিচয় পান নাই? আমি তো পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁহাদিগকে পাইয়াছি। ভ্রাতৃভাব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা ইহা দেখিতে না পাইয়া নূতন-ভাবে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চীৎকার করিয়া বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সার্বভৌম ধর্মও বর্তমান রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অন্যান্য যে-সব লোক বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করিবার ভাব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘাড়ে লইয়াছেন, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্য বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঐ সার্বভৌম ধর্ম পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তাঁহারা বরাবরই উহাকে প্রতিহত করিতেছেন, কারণ উহাতেই তাঁহাদের লাভ। আপনারা দেখিতে পান, সকল দেশের পুরোহিতরাই অতিশয় গোঁড়া। ইহার কারণ কি? খুব কম পুরোহিতই আছেন, যাঁহারা জনসাধারণকে পরিচালিত করেন; তাঁহাদের অধিকাংশই জনসাধারণ দ্বারা চালিত হন এবং তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। যদি কেহ বলে, 'ইহা শুষ্ক', তাঁহারাও বলিবেন, 'হাঁ শুষ্ক', যদি কেহ বলে, 'ইহা কালো', তাঁহারাও বলিবেন, 'হাঁ, ইহা কালো।' যদি জনসাধারণ উন্নত হয়, তাহা হইলে পুরোহিতরাও উন্নত হইতে বাধ্য। তাঁহারা পিছাইয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং পুরোহিতদিগকে গালি দিবার পূর্বে—পুরোহিতগণকে গালি দেওয়া আজকাল একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপনারা শুধু তেমন জিনিষই পাইতে পারেন, যাহার জন্য আপনারা যোগ্য। যদি কোন পুরোহিত নূতন নূতন উন্নত ভাব শিখাইয়া আপনাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার দশা কি হইবে? হয়তো তাঁহার পুত্রকন্যা অনাহারে মারা যাইবে এবং তাঁহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে। আপনাদিগকে যে-সকল জাগতিক বিধি মানিতে হয়, তাঁহাকেও তাহাই করিতে হয়। তিনি বলেন, 'আপনারা যদি চলেন, তাহা হইলে চলুন, চলাই যাক।' অবশ্য এমন বিরল দুই চারি জন উচ্চ ভাবের মানুষ আছেন, যাঁহারা লোকমতকে ভয় করেন না। তাঁহারা সত্য অনুভব করেন এবং একমাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—যেন তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তাঁহারা কখনও পিছনে ফিরিয়া চাহেন না এবং লোকমত গ্রাহ্যও করেন না। তাঁহাদের নিকট একমাত্র ভগবানই সত্য; তিনিই তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক জ্যোতি এবং তাঁহারা সেই জ্যোতিরই অনুসরণ করেন।

এদেশে (আমেরিকায়) আমার জনৈক মর্মন (Mormon) ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাঁহার মতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'আপনার মতের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমরা একমত নই। আমি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আপনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী। ভাল কথা, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন?' ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কি রকম, আপনি বিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নন, আর আমি বহুবিবাহের পক্ষপাতী; তথাপি আপনি আমাকে আপনার দেশে যাইতে বলিতেছেন!' আমি বলিলাম, 'হাঁ, আমার দেশবাসীরা সকল প্রকার ধর্মমতই শুনিয়া থাকেন—তাহা যে-দেশ হইতেই আসুক না কেন। আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান; কারণ প্রথমতঃ আমি সম্প্রদায়সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ সেখানে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বর্তমান সম্প্রদায়গুলির উপর আদৌ সন্তুষ্ট নন, এবং এই হেতু তাঁহারা ধর্মের কোন ধারই ধারে না; হয়তো তাঁহাদের কেহ কেহ আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন।' সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, লোকের ধর্মলাভ করিবার সম্ভাবনা ততই বেশী হইবে। যে হোটেলে সব রকম খাবার পাওয়া যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িয়া যাক, যাহাতে আরও বেশী লোক ধর্মজীবনলাভের সুবিধা পাইতে পারে। এইরূপ মনে করিবেন না যে, লোকে ধর্ম চায় না। আমি তাহা বিশ্বাস করি না। তাহাদের যাহা প্রয়োজন, প্রচারকেরা ঠিক তাহা দিতে পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা ঐ-রকম একটা কিছু বলিয়া ছাপমারা হইয়া গিয়াছে, তাহারও যদি এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাহাকে ঠিক তাহার মনের মত আদর্শটি দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে হয়তো সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। আমরা বরাবর যেভাবে খাইতে অভ্যস্ত, সেভাবেই খাইতে পারি। দেখুন না, আমরা হিন্দুরা—হাত দিয়া খাইয়া থাকি, আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আঙুল বেশী তৎপর, আপনারা ঠিক ঐ-ভাবে আঙুল নাড়িতে পারেন না। শুধু খাবার দিলেই হইল না, আপনাকে উহা নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাকে শুধু কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব দিলেই চলিবে না, আপনার পরিচিত ধারায় সেগুলি আপনার নিকট আসা চাই। সেগুলি যদি আপনার নিজের ভাষায় আপনার প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়, তবেই আপনার সন্তোষ হইবে। এমন কেহ যখন আসেন, যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন এবং আমার ভাষায় উপদেশ দেন, আমি তখনই উহা বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মত স্বীকার করিয়া লই। ইহা একটা মস্ত বড় বাস্তব সত্য।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তর এবং প্রকৃতির মানব-মন রহিয়াছে এবং ধর্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। কেহ হয়তো দুই তিনটি মতবাদ বাহির করিয়া বলিয়া বসিবেন যে, তাঁহার ধর্ম সকল লোকের উপযোগী হইয়া উচিত। তিনি একটি ছোট খাঁচা হাতে লইয়া ভগবানের এই জগদ্রূপ চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর, হস্তী এবং অপর সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হস্তীটিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াও ইহার মধ্যে ঢুকাইতে হইবে।' আবার হয়তো এমন কোন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল ভাব আছে। তাঁহারা বলেন, 'সকলকেই আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে!' 'কিন্তু সকলের তো স্থান নাই!' 'কুছ পরোয়া নেই! তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন করিয়া পার ঢোকাও। কারণ তাহারা যদি না আসে, তাহারা নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইবে।' আমি এমন কোন প্রচারকদল বা সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না, যাঁহারা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখেন, 'আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথা শোনে না, ইহার কারণ কি?' এরূপ

না করিয়া তাঁহারা কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, 'লোকগুলো ভারি পাজী।' তাঁহারা একবারও জিজ্ঞাসা করেন না, 'কেন লোকে আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে সত্য দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আমি তাহাদের বুঝিবার মত ভাষায় কথা বলিতে পারি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পারি না?' প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আরও সুবিবেচক হওয়া আবশ্যক। এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে, লোকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে না, তখন যদি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় তো তাঁহাদের নিজেদের গালাগালি দেওয়া উচিত। কিন্তু সব সময়ে লোকেরই যত দোষ! তাঁহারা কখনও নিজেদের সম্প্রদায়কে প্রসারিত করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করেন না। অতএব অংশ নিজেকে পূর্ণ বলিয়া সর্বদা দাবী করা-রূপ, ক্ষুদ্র সসীম বস্তু নিজেকে অসীম বলিয়া সর্বদা জাহির করা-রূপ এত সঙ্কীর্ণতা জগতে কেন চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ আমরা অতি সহজেই দেখিতে পাই। একবার সেই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কথা ভাবিয়া দেখুন, যেগুলি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে জাত হইয়াছে, অথচ ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্ত জানিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া উদ্ধত স্পর্ধা করে। কতদূর প্রগল্ভতা একবার দেখুন! ইহা হইতে আর কিছু না হউক, এইটুকু বোঝা যায় যে, মানুষ কত আত্মম্ভরী! আর এই প্রকার দাবী যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নয় এবং প্রভুর কৃপায় উহা চিরকালই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই বিষয়ে মুসলমানেরা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইয়াছিল—তাহাদের এক হস্তে ছিল কোরান, অপর হস্তে তরবারি; 'হয় কোরান গ্রহণ কর, নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর। আর অন্য উপায় নাই!' ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, তাহাদের অভূতপূর্ব সাফল্য হইয়াছিল। ছয়শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই; কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিল, যখন তাহাদিগকে অভিযান থামাইতে হইল। অপর কোন ধর্ম যদি ঐরূপ পন্থা অনুসরণ করে, তবে তাহারও একই দশা হইবে। আমরা এই প্রকার শিশুই বটে! আমরা মানব-প্রকৃতির কথা সর্বদাই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবন-প্রভাতে আমরা মনে করি যে, আমাদের অদৃষ্ট একটা কিছু অসাধারণ রকমের হইবে এবং কিছুতেই এ-বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস আসে না। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় আমাদের চিন্তা অন্যরূপ দাঁড়ায়। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রথমাবস্থায় যখন ধর্মসম্প্রদায়গুলি একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখন ঐগুলি মনে করে, কয়েক বৎসরেই সমগ্র মানবজাতির মন বদলাইয়া দিবে এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিতে থাকে। পরে যখন অকৃতকার্য হয়, তখন ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের চক্ষু খুলিতে থাকে। দেখা যায়, ঐগুলি যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক। একবার ভাবিয়া দেখুন, যদি এই গোঁড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িত, তাহা হইলে আজ মানুষের কি দশা হইত! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটি মহান্ সত্যের প্রতিনিধি; প্রত্যেক ধর্মই কোন একটি বিশেষ উচ্চাদর্শের প্রতিভূ—উহাই তাহার প্রাণবস্তু। একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছেঃ কতকগুলি রাক্ষসী ছিল; তাহারা মানুষ মারিত এবং নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করিত। কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মারিতে পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া বাহির করিল যে, তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখীর মধ্যে রহিয়াছে এবং যতক্ষণ ঐ পাখীগুলি বাঁচিয়া থাকিবে, ততক্ষণ কেহই রাক্ষসীদের মারিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক-একটি প্রাণ-পক্ষী আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তুটি রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের একটি আদর্শ—একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যেটি জীবনে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষই এইরূপ এক-একটি আদর্শ, এইরূপ এক-একটি উদ্দেশ্যের প্রতিমূর্তি। আর যাহাই নষ্ট হউক না কেন, যতক্ষণ সেই আদর্শটি ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার বিনাশ নাই। সম্পদ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেই লক্ষ্য অটুট রাখিয়া থাকেন, কিছুই আপনার বিনাশসাধন করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেন, এমন কি শতায়ু হইতে পারেন, কিন্তু যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জ্বল এবং সতেজ থাকে, তাহা হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্তু যখন সেই আদর্শ হারাইয়া যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে, তখন আর কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। জাতি আর কি—ব্যষ্টির সমষ্টি বৈ তো নয়? সুতরাং প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যেটি বিভিন্ন জাতিসমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যদি ঐ জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ক্ষীণ হইয়া আসে এবং ইহা অচিরেই অন্তর্হিত হয়।

ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই-সকল পুরাতন ধর্ম যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এগুলি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। ধর্মগুলির সমুদয় ভুলভ্রান্তি, বাধাবিঘ্ন, বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও সেগুলির উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দিষ্ট প্রণালীর আবর্জনাস্তূপ সঞ্চিত হইলেও প্রত্যেকের প্রাণকেন্দ্র ঠিক আছে, উহা জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে—ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ঐ ধর্মগুলির মধ্যে কোন ধর্মই, যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহা হারাইয়া ফেলে নাই। আর সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা চমকপ্রদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমান ধর্মের কথাই ধরুন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ মুসলমান ধর্মকে যত বেশী ঘৃণা করে, এরূপ আর কোন ধর্মকেই করে না। তাহারা মনে করে, এরূপ নিকৃষ্ট ধর্ম আর কখনও হয় নাই। কিন্তু দেখুন, যখনই একজন লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ আর কোন ধর্ম করে না। এদেশীয় একজন রেড ইণ্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং সে বুদ্ধিমান হইলে যে-কোন উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু এদেশে আমি এ পর্যন্ত এমন একটিও গীর্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও নিগ্রো পাশাপাশি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটি একবার ভাবিয়া দেখুন। ইসলাম ধর্ম তদন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন এইখানেই মুসলমান ধর্মের নিজস্ব বিশেষ মহত্ত্ব। কোরানের অনেকস্থলে মানবজীবন সম্বন্ধে নিছক ইহলৌকিক কথা দেখিতে পাইবেন; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমান ধর্ম জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহা সকল মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব, ইহাই মুসলমান ধর্মের অত্যাবশ্যক সারাংশ, এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা, সেগুলি মুসলমান ধর্মের সারাংশ নয়, অন্য ধর্ম হইতে উহাতে ঢুকিয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্মে—পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা এভাবে আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে না পারে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভগবৎ সত্তারই সমতুল, এবং আত্মাকে আত্মারূপে বুঝিতে হইলে উহাকে কখনও মানবত্বে পরিণত করা চলে না।

সেই একত্বের ধারণা এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই সর্বদা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি কথা হিন্দুদের নিকট অসার উক্তি বৈ আর কিছুই নহে—উহা মনুষ্য কর্তৃক ভগবানে মনুষ্যোচিত গুণাবলীর আরোপ মাত্র। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এখনই এবং এইখানেই বর্তমান। অনন্তকালের মধ্যবর্তী যে-কোন মুহূর্ত অপর যে-কোন মুহূর্তেরই মত ভাল। যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি এখনই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে একটা কিছু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেই ধর্মের আরম্ভ হয়; কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিংবা বুদ্ধি দ্বারা উহা স্বীকার করা, অথবা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করাকে ধর্ম বলে না। ভগবান্ যদি থাকেন, তবে আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? যদি বলেন, 'না', তবে আপনার তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার আছে? আর যদি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন না কেন? কেন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন না? ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটিই ভারতের মহান্ আদর্শ এবং এ দুইটি ধরিয়া আছে বলিয়াই ভারতের এত ভুলভ্রান্তিতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

খ্রীষ্টানদিগের প্রচারিত মূল ভাবটিও এইঃ 'অবহিত হইয়া প্রার্থনা কর, কারণ ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে।' অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, খ্রীষ্টানগণ ঘোর অন্ধকার-যুগেও অতি কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমূহেও অপরকে সাহায্য করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা প্রভৃতি সৎকার্যের দ্বারা সর্বদা নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই লক্ষ্যে স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম সজীব থাকিবে।

সম্প্রতি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়তো ইহা স্বপ্নমাত্র। জানি না ইহা কখনও জগতে কার্যে পরিণত হইবে কিনা। কিন্তু কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মরা অপেক্ষা কখনও কখনও স্বপ্ন দেখাও ভাল। স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত হইলেও মহান্ সত্যগুলি অতি উত্তম, নিকৃষ্ট বাস্তব অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। অতএব একটা স্বপ্নই দেখা যাক না কেন!

আপনারা জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয়তো সহজজ্ঞানে আস্থাবান্ একজন বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবাদী; আপনি আচার-অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি চান এমন সব প্রত্যক্ষ ও অকাট্য সত্য, যাহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত এবং কেবল উহাতেই আপনি সন্তোষলাভ করিতে পারেন। আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের উপাসনাস্থলে কোন প্রকার ছবি বা মূর্তি রাখিতে দিবেন না। বেশ কথা! কিন্তু আর এক প্রকার লোক আছেন, যিনি একটু বেশী শিল্পকলাপ্রিয়; ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে তাঁহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন হয়; তিনি চান সুন্দর সুঠাম নানা সরল ও বক্ররেখা এবং বর্ণ ও রূপ, আর চান ধূপ, দীপ, অন্যান্য প্রতীক ও বাহ্যোপকরণ। আপনি যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি তাঁহাকে ঐ-সকল প্রতীকের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন। আর এক প্রকার ভক্তিপ্রবণ লোক আছেন, যাঁহাদের প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবানের পূজা এবং স্তবস্তুতি করা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন চিন্তা নাই। তারপর আছেন দার্শনিক, যিনি এই-সকলের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; তিনি মনে করেন, কি সব ব্যর্থ প্রয়াস! ঈশ্বর সম্বন্ধে কি সব অদ্ভুত ধারণা!

তাঁহারা পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। এই-সকল বিভিন্ন মন, এই-সকল বিচিত্র ভাবাদর্শের প্রয়োজন আছে, যদি কখনও কোন আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে, তবে উহাকে এরূপ উদার এবং প্রশস্তহৃদয় হইতে হইবে, যাহাতে উহা এই সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাইতে পারে। ঐ ধর্ম জ্ঞানীর হৃদয়ে দর্শন-সুলভ দৃঢ়তা আনিয়া দিবে, এবং ভক্তের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিবে। আনুষ্ঠানিককে ঐ ধর্ম উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাবরাশিদ্বারা চরিতার্থ করিবে, এবং কবি যতখানি হৃদয়োচ্ছ্বাস ধারণ করিতে পারে, কিংবা আর যাহা কিছু গুণরাশি আছে, তাহার দ্বারা সে কবিকে পূর্ণ করিবে। এইরূপ উদার ধর্মের সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে ধর্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং ঐগুলি সবই গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জন নয়। কেবল পরমতসহিষ্ণুতা নয়—উহা অনেক সময়ে ঈশ্বর-নিন্দারই নামান্তর মাত্র; সুতরাং আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণ'-এ বিশ্বাসী। আমি কেন পরধর্মসহিষ্ণু হইতে যাইব? পরধর্মসহিষ্ণুতার মানে এই যে, আমার মতে আপনি অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বাঁচিয়া থাকিতে বাধা দিতেছি না। তোমার আমার মত লোক কাহাকেও দয়া করিয়া বাঁচিতে দিতেছে, এইরূপ মনে করা কি ভগবদ্বিধানে দোষারোপ করা নয়? অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে-ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেই ভাবে তাঁহার আরাধনা করি। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টানদিগের গীর্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই-সব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব, যাঁহারা সকলের হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট।

শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের বিধিশাস্ত্র কি শেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা উহা চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরূপে আজও আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, ইহা এক অদ্ভুত পুস্তক। বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ পুস্তকের

এক-একখানি পত্র এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেই-সব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-পুস্তক খুলিয়াই রাখিব। আমরা বর্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিব। অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সে-সবই আমরা গ্রহণ করিব, বর্তমানে জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিষ্যতেও যাহা উপস্থিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদিগকে প্রণাম এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকে প্রণাম।

আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম

অতীতের সুদীর্ঘ ধারার মধ্য দিয়া শত শত যুগের একটি বাণী আমাদের নিকট ভাসিয়া আসিতেছে—সেই বাণী হিমালয় ও অরণ্যের মুনি-ঋষিদের বাণী; সেই বাণী সেমিটিক জাতিদের নিকটও আবির্ভূত হইয়াছিল, বুদ্ধদেব ও অন্যান্য ধর্মবীরগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই বাণী সেই-সব মানবের নিকট হইতে আসিতেছে, যাঁহারা এমন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিলেন, যাহা এই পৃথিবীর আরম্ভ হইতেই মানুষের সহচররূপে বিদ্যমান ছিল; মানুষ যেখানেই যাক, সেখানেই উহা প্রকাশ পায় এবং সর্বদা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; সেই বাণী এখনও আমাদের নিকট আসিতেছে। এই বাণী সেই-সব পর্বতনিঃসৃত ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর মত, যেগুলি কখনও অদৃশ্য এবং কখনও আবার খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে একটি বিশাল শক্তিশালী বন্যায় পরিণত হয়। জগতের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ঈশ্বরাদিষ্ট ও পবিত্রাত্মা নরনারীর মুখ হইতে যে বাণীসমূহ আমরা পাইতেছি, সেগুলি নিজ নিজ শক্তি সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে ভেরীনিনাদে অতীতের বাণীই শুনাইতেছে। আমাদের লব্ধ প্রথম বাণীঃ তোমাদের এবং সকল ধর্মের শান্তি হউক। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাণী নয়, পরন্তু ঐক্যবদ্ধ ধর্মের কথা। আসুন আমরা প্রথমেই এই বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করি।

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ধর্মের ধ্বংস এবার অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার তীব্র আঘাতে পুরাতন কুসংস্কারগুলি চীনামাটির বাসনের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। যাহারা ধর্মকে কেবল মতবাদ ও অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিত, তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল; ধরিয়া রাখার মত কিছুই তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। এক সময়ে ইহা অনিবার্য বলিয়া বোধ হইল যে, জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের উত্তাল তরঙ্গ সম্মুখের সকল বস্তুকে দ্রুতবেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। অনেকেই এ বিষয়ে নিরাশ হইল এবং ভাবিল যে, ধর্ম এবার চিরদিনের মত লোপ পাইল। কিন্তু স্রোত আবার ফিরিয়াছে এবং উহার উদ্ধারের উপায় আসিয়াছে।—সেটি কি? সে উপায়টি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা। বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই যে, সেগুলি মূলতঃ এক। বাল্যকালে এই নাস্তিকতার প্রভাব আমার উপরও পড়িয়াছিল এবং এক সময়ে এমন বোধ হইয়াছিল যে, আমাকেও ধর্মের সকল আশা ভরসা ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যয়ন করিলাম এবং আশ্চর্য হইলাম, আমাদের ধর্ম যে-সকল মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, অন্যান্য ধর্মও অবিকল সেইগুলিই শিক্ষা দেয়। ইহাতে আমার মনে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইলঃ সত্য কী? এই জগৎ কি সত্য? উত্তর পাইলাম—হাঁ, সত্য। কেন সত্য?—কারণ আমি ইহা দেখিতেছি। যে-সব মনোহর সুললিত কণ্ঠস্বর ও যন্ত্রসঙ্গীত আমরা এইমাত্র শুনিলাম, সে-সব কি সত্য?—হাঁ সত্য; কারণ আমরা তাহা শুনিয়াছি। আমরা জানি যে, মানুষের একটি শরীর আছে, দুটি চক্ষু ও দুইটি কর্ণ আছে এবং তাহার একটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। এই আধ্যাত্মিক বৃত্তির সাহায্যেই সে বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনের ফলে বুঝিতে পারে যে, ভারতের অরণ্যে ও খ্রীষ্টানদের দেশে যত ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি মূলতঃ এক। ইহার ফলে আমরা এই সত্যেই উপনীত হই যে, ধর্ম মানব-মনের একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন। কোন এক ধর্মকে সত্য বলিতে হইলে অপর ধর্মগুলিকেও সত্য বলিয়া মানিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমার ছয়টি আঙুল আছে, কিন্তু অন্য কাহারও ঐরূপ নাই; তাহা হইলে আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহা অস্বাভাবিক। কেবল একটি ধর্ম সত্য আর অন্য ধর্মগুলি মিথ্যা—এই বিতণ্ডার সমাধানেও ঐ একই যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। জগতে মাত্র একটি ধর্ম সত্য বলিলে উহা ছয় আঙুল-বিশিষ্ট হাতের মত অস্বাভাবিকই হইবে। সুতরাং দেখা গেল যে, একটি ধর্ম সত্য হইলে অপরগুলিও অবশ্য সত্য হইবে। গৌণ অংশগুলি সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সেগুলি সব এক। যদি আমার পাঁচ আঙুল সত্য হয়, তবে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—তোমার পাঁচ আঙুলও সত্য।

মানুষ যেখানেই থাকুক, তাহার একটি ধর্মবিশ্বাস থাকিবেই, সে তাহার ধর্মভাবের পরিপুষ্টি করিবেই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা করিয়া আর একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার তিনটি বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথমতঃ সকল ধর্মই স্বীকার করে, এই নশ্বর শরীর ছাড়া (মানুষের) আর একটি অংশ বা অন্য কিছু আছে, যাহা শরীরের মত পরিবর্তিত হয় না; তাহা নির্বিকার, শাশ্বত ও অমৃত। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি ধর্মের মতে—যদিও ইহা সত্য যে, আমাদের একটা অংশ অমর, তথাপি কোন-না-কোন সময়ে ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যাহার আরম্ভ আছে, তাহার নাশ অবশ্য আছে। আমাদের অর্থাৎ আমাদের মূল সত্তার কখনও আরম্ভ হয় নাই, কখনই অন্তও হইবে না। আমাদের সকলের উপরে—এই অনন্ত সত্তারও উপরে 'ঈশ্বর'-পদবাচ্য আর একজন অনাদি পুরুষ আছেন, যাঁহার অন্ত নাই। লোকে জগতের সৃষ্টি ও মানবের আরম্ভের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু জগতের 'আরম্ভ' কথাটির অর্থ শুধু একটি কল্পের আরম্ভ। ইহা দ্বারা কোথাও সমগ্র বিশ্বজগতের আরম্ভ বুঝায় না। সৃষ্টির যে আরম্ভ থাকিতে পারে—ইহা অসম্ভব। আদিকাল বলিয়া কোন কিছুর ধারণা আপনাদের মধ্যে কেহই করিতে পারেন না। যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষ আছেই। ভগবদ্গীতা বলেনঃ

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥
৮

অর্থাৎ পূর্বে যে আমি ছিলাম না, এমন নয়; তুমি যে ছিলে না, এমন নয়; এই নৃপতিগণ যে ছিলেন না, তাহাও নয় এবং আমরা সকলে যে পরে থাকিব না, তাহাও নয়। যেখানেই সৃষ্টির প্রারম্ভের কথার উল্লেখ আছে, সেখানে কল্পারম্ভই বুঝিতে হইবে। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা চির অমর।

আত্মার এই ধারণার সহিত ইহার পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ধারণা আমরা দেখিতে পাই। আত্মা স্বয়ং পূর্ণ। য়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এ-কথা স্বীকার করে যে, মানুষ প্রথমে পবিত্র ছিল। মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে অশুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে তাহার সেই পুরাতন প্রকৃতি অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবকে আবার পাইতে হইবে। কেহ কেহ এই-সকল কথা রূপকাকারে, গল্পচ্ছলে ও প্রতীক-অবলম্বনে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই কথাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উঁহাদের সকলেরই এই এক উপদেশ—আত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ এবং মানুষকে তাহার সেই মৌলিক শুদ্ধ স্বভাব পুনরায় লাভ করিতেই হইবে। কি উপায়ে?—ঈশ্বরানুভূতির দ্বারা; ঠিক যেমন য়াহুদীদের বাইবেল বলে, 'ঈশ্বরের পুত্রের মধ্য দিয়া না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।' ইহা হইতে কি বুঝা যায়? ঈশ্বরদর্শনই সকল মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। পিতার সহিত এক হইবার পূর্বে পুত্রত্ব অবশ্য আসিবে। মনে রাখিতে হইবে, মানুষ তাহার নিজ কর্মদোষে তাহার শুদ্ধ ভাব হারাইয়াছে। আমরা যে কষ্ট পাই, তাহা আমাদের নিজেদের কর্মফলে। ইহার জন্য ভগবান্ দোষী নন। এই সব ধারণার সহিত পুনর্জন্মবাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। পাশ্চাত্যগণের হস্তে অঙ্গহানি হওয়ার পূর্বে এই মতবাদটি সর্বজনীন ছিল।

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে স্বীকার করেন নাই। 'মানবাত্মা অনাদি অনন্ত'—এই অপর মতবাদটির সহিত জন্মান্তরবাদের ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহা কোনখানে আসিয়া শেষ হয়, তাহা অনাদি হইতে পারে না এবং যাহা কোন স্থান হইতে আরম্ভ হয়, তাহাও অনন্ত হইতে পারে না। মানবাত্মার উৎপত্তিরূপ ভয়াবহ অসম্ভব ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। জন্মান্তরবাদে আত্মার স্বাধীনতার কথা বিঘোষিত হয়। মনে করুন, ইহা সুনিশ্চিতরূপে স্বীকৃত হইল যে, আদি বলিয়া একটা জিনিষ আছে। তাহা হইলে মানুষের মধ্যে যত অপবিত্রতা আছে, তাহার দায়িত্ব ভগবানের উপর আসিয়া পড়ে। অসীম করুণাময় জগৎ-পিতা তাহা হইলে সংসারের সমুদয় পাপের জন্য দায়ী! পাপ যদি এইভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে একজন অন্যের অপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিবে কেন? যদি অসীম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট হইতেই যাহা কিছু সব আসিয়া থাকে, তবে এত পক্ষপাত কেন? কেনই বা লক্ষ লক্ষ লোক পদদলিত হয়? দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টির জন্য যাহারা দায়ী নয়, তাহারা কেন অনাহারে মরে? ইহার জন্য দায়ী কে? ইহাতে মানুষের কোন হাত না থাকিলে ভগবানকেই নিশ্চিতরূপে দায়ী করিতে হয়। সুতরাং ইহার উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা এই যে, কাহারও ভাগ্যে যে-সকল দুঃখভোগ হয়, তাহার জন্য সে-ই দায়ী। কোন চক্রকে যদি আমি গতিশীল করি, তাহার ফলের জন্য আমিই দায়ী এবং আমি যখন আমার দুঃখ উৎপন্ন করিতে পারি, তখন তাহার নিবৃত্তিও আমিই করিতে পারি। অতএব এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমরা স্বাধীন। অদৃষ্ট বলিয়া কোন কিছু নাই। আমাদিগকে বাধ্য করিবার কিছুই নাই। আমরা নিজেরা যাহা করিয়াছি, আমরা তাহার নিবৃত্তিও করিতে পারি।

এই মতবাদের সম্পর্কে একটি যুক্তি আমি দিতেছি; ইহা কিছু জটিল বলিয়া আপনা-দিগকে একটু ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক শুনিতে অনুরোধ করি। অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি—ইহাই একমাত্র উপায়। যাহাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলি, তাহা আমাদের চিত্তের জ্ঞানভূমিতে ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—একটি লোক পিয়ানো বাজাইতেছে, সে জ্ঞাতসারে প্রত্যেক সুরের চাবির উপর তাহার প্রতিটি আঙুল রাখিতেছে। এই প্রক্রিয়াটি সে বার বার করিতে থাকে, যতক্ষণ না ঐ অঙ্গুলি-সঞ্চালন ব্যাপারটি অভ্যাসে পরিণত হয়। পরে সে প্রত্যেক চাবির দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়াও একটি সুর বাজাইতে পারে। সেইরূপে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, অতীতে আমরা সজ্ঞানে যে-সব কাজ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাদের বর্তমান সংস্কারসমূহ রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মায়। সেগুলি কোথা হইতে আসিল? জন্ম হইতে কোন শিশু একেবারে সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে না, অর্থাৎ তাহার মন লেখাজোখাহীন সাদা কাগজের মত থাকে না। পূর্ব হইতেই সে-কাগজের উপর লেখা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের দার্শনিকগণ বলেন, কোন শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মায় না। শিশুমাত্রই অতীতে সজ্ঞানকৃত শত শত কর্মের সংস্কার লইয়া জগতে আসে। এগুলি সে এ-জন্মে অর্জন করে নাই এবং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সেগুলি সে পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জন করিয়াছিল। ঘোরতর জড়বাদীকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সংস্কারসমূহ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মসমূহের ফলে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা কেবল এইটুকু বেশী বলেন, উহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; আমাদের পিতা-মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহীগণ বংশানুক্রমিক নিয়মানুসারে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। কেবল বংশপরম্পরা স্বীকার করিলেই যদি এ-সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে আর আত্মায় বিশ্বাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ শরীর-অবলম্বনেই আজকাল সব ব্যাখ্যা হইতে পারে। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন বিচার ও আলোচনার খুঁটিনাটির মধ্যে যাইবার এখন আমাদের প্রয়োজন নাই।—যাঁহারা ব্যষ্টি-আত্মায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য এতদূর পর্যন্ত অর্থ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বজন্ম ছিল। পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক ও সাধুমহাপুরুষদের ইহাই বিশ্বাস। য়াহুদীরাও এরূপ মত বিশ্বাস করিত। ভগবান্ যীশুও ইহাতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাইবেলে তিনি বলিতেছেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি বর্তমান ছিলাম।' এবং অন্যত্র পাওয়া যায়—'ইনিই সেই ইলিয়াস, যাঁহার আগমনের কথা ছিল।'

যে বিভিন্ন ধর্মসমূহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেগুলির আদি উৎপত্তিস্থল এশিয়া মহাদেশ এবং এশিয়াবাসীরাই সেগুলি বেশ ভালরূপে বুঝিতে পারে। ঐ ধর্মসমূহ যখন উৎপত্তিস্থলের বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সেগুলি অনেক ভ্রান্ত মতের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িল। খ্রীষ্টান ধর্মের অতি গভীর ও উদার-ভাব ইওরোপ কখনও ধরিতে পারে নাই। কারণ বাইবেল-প্রণেতাগণের ব্যবহৃত ভাব, চিন্তাধারা ও রূপকসমূহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ম্যাডোনার প্রতিকৃতিটিকে উদাহরণস্বরূপ ধরুন। প্রত্যেক শিল্পী ম্যাডোনাকে স্বীয় হৃদয়গত পূর্বধারণানুযায়ী চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যীশুখ্রীষ্টের শেষ নৈশভোজনের শত শত ছবি দেখিয়াছি; প্রত্যেকটিতে তাঁহাকে একটি টেবিলে খাইতে বসান হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও টেবিলে খাইতে বসিতেন না। তিনি সকলের সঙ্গে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতেন, আর একটি বাটিতে রুটি ডুবাইয়া উহা খাইতেন। আপনারা যে রুটি এখন খান, উহা তাহার মত নয়। এক জাতির পক্ষে অপর জাতির বহু শতাব্দী যাবৎ অপরিচিত

প্রথা-সকল বুঝিতে পারা বড় কঠিন। গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য জাতির দ্বারা সংসাধিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর য়াহুদী প্রথাসমূহ বুঝিতে পারা ইওরোপবাসীদের নিকট কতই না শক্ত ব্যাপার! যে-সকল অলৌকিক ব্যাপার ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা যীশুর ধর্ম পরিবৃত রহিয়াছে, সেগুলির মধ্য হইতে লোকে যে ঐ সুন্দর ধর্মের অতি সামান্যমাত্র ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এবং উহাকে কালে একটি দোকানদারের ধর্মে পরিণত করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

এখন আসল কথায় আসা যাক। আমরা দেখিলাম—সকল ধর্মই আত্মার অমরত্বের কথা বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, আত্মার পূর্ব জ্যোতি হ্রাস পাইয়াছে এবং ঈশ্বরানুভূতি দ্বারা উহার সেই আদি বিশুদ্ধ স্বভাবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এখন এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ? সর্বপ্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অতি অস্পষ্টই ছিল। অতি প্রাচীন জাতিরা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করিত—সূর্য, পৃথিবী, অগ্নি, জল (বরুণ) ইত্যাদি। প্রাচীন য়াহুদী ধর্মে আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ অসংখ্য দেবতা নৃশংসভাবে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন। তারপর পাই ইলোহিম দেবতাকে, যাঁহাকে য়াহুদী ও ব্যাবিলনবাসী উভয়েই পূজা করিত। পরে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন ভগবানকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হইতেছে, কিন্তু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেকেই তাহাদের দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিত এবং যুদ্ধ করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের মধ্যে যে জাতি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হইত, সে ঐ ভাবেই নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিত। সেই-সব জাতি প্রায়শঃ অসভ্য ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উচ্চতর ধারণাসমূহ প্রাচীন ধারণার স্থান অধিকার করিল। এখন সেই-সব পুরাতন ধারণা আর নাই, যেটুকু বা আছে, তাহা অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। পূর্বোক্ত সকল ধর্মই শত শত বর্ষের ক্রমবিকাশের ফল, কোনটিই আকাশ হইতে পড়ে নাই। প্রত্যেককে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তারপর একেশ্বরবাদের ধারণা আসিল, ঐ মতে ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, তিনি বিশ্বের বাহিরে স্বর্গে বাস করেন। তিনি প্রাচীন উদ্ভাবকগণের স্থূলবুদ্ধি অনুযায়ী এইরূপেই বর্ণিত হইলেন, যথাঃ 'তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদ্বয় আছে, তাঁহার হস্তে একটি পাখী আছে'—ইত্যাদি। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, গোষ্ঠী-দেবতারা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি সর্বদেবেশ্বর। এই স্তরেও তিনি বিশ্বাতীত, তিনি দুরভিগম্য, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধারণাটিও পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং ঠিক তার পরের স্তরে আমরা দেখিতে পাই এমন এক ঈশ্বর, যিনি সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন।

নিউ টেষ্টামেণ্টে আছে, 'হে আমাদের স্বর্গবাসী পিতা'; এখানেও এক ভগবানের কথা, যিনি মনুষ্য হইতে দূরে স্বর্গে বাস করেন। আমরা পৃথিবীতে বাস করিতেছি এবং তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। আরও অগ্রসর হইয়া আমরা এরূপ শিক্ষা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর চরাচর প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে আছেন। তিনি যে কেবল স্বর্গের ঈশ্বর তাহা নয়, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি আমাদের অন্তর্যামী ভগবান্। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রেরও একটি স্তরে ভগবানকে ঠিক এইভাবেই আমাদের অতি নিকটবর্তী বলা হইয়াছে। হিন্দু দর্শন এই পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়া যায় নাই; ইহার পরেও অদ্বৈতের একটি স্তর আছে। এই অবস্থায় মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে, যে ঈশ্বরকে—যে ভগবানকে সে এতদিন উপাসনা করিয়া আসিতেছে, তিনি কেবলমাত্র স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ পিতা নন, পরন্তু 'আমি ও আমার পিতা এক'; আত্মস্থ হইয়া যে ইহা উপলব্ধি করে, সে স্বয়ং ঈশ্বর; কেবল প্রভেদ এই যে, সে তাঁহার একটি নিম্নতর প্রকাশ। আমার মধ্যে যাহা কিছু যথার্থ বস্তু, তাহাই তিনি এবং তাঁহার মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই আমি। এইরূপেই ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্তী পার্থক্য দূরীভূত হয়। এই প্রকারে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কিরূপে ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হয়।

প্রথম অর্থাৎ দ্বৈতাবস্থায় মানুষ বোধ করে, সে জন, জেমস্ বা টম ইত্যাদি নামধেয় একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মা এবং সে বলে, সে অনন্তকাল ধরিয়া ঐ জন, জেমস্ ও টমই থাকিয়া যাইবে, কখনই অন্য কিছু হইবে না। কোন খুনী আসামী যদি বলে, 'আমি চিরকাল খুনীই থাকিয়া যাইব', ইহাও যেন ঠিক সেইরূপ বলা হইল। কিন্তু কালের পরিবর্তনে টম অদৃশ্য হইয়া সেই খাঁটি আদি মানব আদমেই ফিরিয়া যায়।

পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। আমরা কি ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি? অবশ্যই পারি না। আমরা কি ঈশ্বরকে জানিতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বর যদি জ্ঞাতই হন, তাহা হইলে তিনি আর ঈশ্বরই থাকিবেন না। জানা মানেই সীমাবদ্ধ করা। কিন্তু 'আমি ও আমার পিতা এক।' আত্মাতেই আমি আমার বাস্তব পরিচয় পাই। কোন কোন ধর্মে এই-সকল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্মে ইহার ইঙ্গিত-মাত্র আছে। আবার কোনটিতে ইহা একেবারে বর্জিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের ধর্ম এখন এদেশে খুব কম লোকের বোধগম্য; আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি বলিতে চাই, তাঁহার উপদেশ এদেশে কোনকালেই উত্তমরূপে বোধগম্য হয় নাই।

পবিত্রতা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ক্রমোন্নতির বিভিন্ন সোপানের সবগুলিই অত্যাবশ্যক। ধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি মূলে একই রূপ ধারণা বা ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। যীশু বলিতেছেনঃ 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান', আবার বলিতেছেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।' আপনারা কিরূপে এই উপদেশ দুইটির সামঞ্জস্য করিবেন? কেবল নিম্নোক্তরূপে ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তিনি অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ লোকদের শেষোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে তাহাদের ভাষাতেই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সাধারণ লোক চায় কতগুলি সহজবোধ্য ধারণা—এমন কিছু, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। কেহ হয়তো জগতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি ধর্ম-বিষয়ে তিনি হয়তো শিশুমাত্র। মানব যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, তখন বুঝিতে পারে যে, স্বর্গরাজ্য তাঁহার অন্তরেই রহিয়াছে। তাহাই যথার্থ মনোরাজ্য—স্বর্গরাজ্য। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ধর্মে যে-সকল আপাতবিরোধ ও জটিলতা প্রতীত হয়, তাহা শুধু তাহার ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরের সূচনা করে। সেই হেতু ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাকেও নিন্দা করিবার অধিকার আমাদের নাই। ধর্মের ক্রমবিকাশের পথে এমন সব স্তর আছে, যাহাতে মূর্তি ও প্রতীক আবশ্যক হইয়া থাকে। জীব ঐ অবস্থায় ঐরূপ ভাষা বুঝিতেই

সমর্থ।

আর একটি কথা আপনাদিগকে জানাইতে চাই—ধর্ম-অর্থে কোন মন-গড়া মত বা সিদ্ধান্ত নয়। আপনারা কি অধ্যয়ন করেন অথবা কি মতবাদ বিশ্বাস করেন, তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, বরং আপনি কি উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞাতব্য। 'পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহাদের ঈশ্বর-দর্শন হইবে।'—ঠিক কথা, এই জীবনেই দর্শন হইবে; আর ইহাই তো মুক্তি। এমন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে শাস্ত্রবাক্য জপ করিলেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন মহাপুরুষ এরূপ শিক্ষা দেন নাই যে, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলি মুক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মুক্ত হওয়ার শক্তি আমাদের মধ্যেই আছে। আমরা ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেরই মধ্যে আমাদের সব ক্রিয়াদি চলিতেছে।
৯

মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-সব শিশুদের জন্য। উহাদের প্রয়োজন সাময়িক। শাস্ত্র কখনও আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেন নাই, বরং আধ্যাত্মিকতাই শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে—এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। এ-পর্যন্ত কোন ধর্মপুস্তক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কিন্তু ঈশ্বরই সকল উচ্চতম শাস্ত্রের উদ্দীপক। আর এ-পর্যন্ত কোন ধর্মপুস্তক আত্মাকে সৃষ্টি করে নাই—এ-কথাও যেন ভুলিয়া না যাই। সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য—আত্মাতেই ঈশ্বর দর্শন করা। ইহাই একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম। ধর্মমতসমূহের মধ্যে সর্বজনীন বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে এই ঈশ্বরানুভূতিকে আমি এখানে উহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাই। আদর্শ ও রীতিনীতি ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই ঈশ্বরানুভূতিই কেন্দ্র-বিন্দুস্বরূপ। সহস্র ব্যাসার্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা এক কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং উহাই ঈশ্বরদর্শন; ইহা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত বস্তু—ইহা চিরকাল পান, ভোজন, বৃথা বাক্যব্যয় এবং এই ছায়াবৎ মিথ্যা ও স্বার্থপূর্ণ জগতের বাহিরে। এই সমুদয় গ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস ও জগতের সকল প্রকারের অসার আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে ঐ এক বস্তু রহিয়াছে, আর উহাই হইল তোমার অন্তরে ঈশ্বরানুভূতি। একজন লোক পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী হইতে পারে, এ-পর্যন্ত যত প্রকার ধর্মপুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তাহা সব স্মরণ রাখিতে পারে, এবং পৃথিবীতে সকল নদীর পূতবারিতে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহার ঈশ্বরানুভূতি না হয়, তবে তাহাকে আমি ঘোর নাস্তিক বলিয়াই গণ্য করিব। অপর একজন যদি কখনও কোন গীর্জা বা মসজিদে প্রবেশ না করিয়া থাকেন, কোন ধর্মানুষ্ঠান না করিয়া থাকেন, অথচ অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা এই জগতের অসার আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া থাকেন, তবে তিনিই মহাত্মা, তিনিই সাধু—বা যে-কোন নামে ইচ্ছা তাঁহাকে অভিহিত করিতে পার। যখন দেখিবে—কেহ বলিতেছে, 'কেবলমাত্র আমিই ঠিক, আমার সম্প্রদায়ই যথার্থ পথ ধরিয়াছে এবং অপর সকলে ভুল করিতেছে', তখন জানিবে তাহারই সব ভুল। সে জানে না যে, অপর মতসমূহের প্রামাণ্যের উপর তাহার মতের সত্যতা নির্ভর করিতেছে। সমুদয় মানবজাতির প্রতি প্রেম ও সেবাই ঠিক ঠিক ধার্মিকতার প্রমাণ। লোকে ভাবের উচ্ছ্বাসে যে বলিয়া থাকে, 'সকল মানুষই আমার ভাই', আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি না; কিন্তু ইহাই বলিতে চাই যে, সমস্ত মানবজীবনের একত্বানুভূতি হওয়া আবশ্যক। সকল সম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসই ততক্ষণ অতি সুন্দর, এবং আমি সেগুলিকে আমার বলিতে স্বীকার করিতে রাজী আছি, যতক্ষণ তাহারা অপরকে অস্বীকার না করে, যতক্ষণ তাহারা সকল মানবসমাজকে যথার্থ ধর্মের দিকেই পরিচালিত করিতেছে। আমি আরও বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডীর মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করা ভাল বটে, কিন্তু আমরণ শিশু থাকিয়া যাওয়া ভাল নয়। ধর্মসম্প্রদায়, আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীকাদি শিশুদের জন্য ভাল, কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহাকে হয় ঐ গণ্ডিসমূহের বা নিজের শিশুত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। চিরকাল শিশু থাকা আমাদের কোনক্রমেই ভাল নয়। ইহা যেন বিভিন্ন বয়সের ও আকারের শরীরে একটি মাপের জামা পরাইবার চেষ্টার মত। আমি জগতে সম্প্রদায় থাকার নিন্দা করিতেছি না। ঈশ্বর করুন—আরও দুই-কোটি সম্প্রদায় হউক, তাহা হইলে পছন্দমত আপন আপন উপযোগী ধর্মমত নির্বাচনের অধিক সুবিধা থাকিবে। কিন্তু একটি-মাত্র ধর্মকে যখন কেহ সকলের পক্ষে খাটাইতে চায়, তখনই আমার আপত্তি। যদিও সকল ধর্ম পরমার্থতঃ এক, তথাপি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্জাত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান থাকিবেই। আমাদের প্রত্যেকেরই একটি ব্যক্তিগত ধর্ম, অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশের দৃষ্টিতে একটি নিজস্ব ধর্ম থাকা আবশ্যক।

বহু বৎসর পূর্বে আমি আমার জন্মভূমিতে অতীব শুদ্ধস্বভাব এক সাধু মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা আমাদের স্বয়ম্ভু বেদ, আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরান এবং সকল প্রকার স্বপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আমাদের আলোচনার শেষে সেই সাধুটি আমাকে টেবিল হইতে একখানি পুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। এই পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই বৎসরের বর্ষণ-ফলাফলের উল্লেখ ছিল। সাধুটি আমাকে উহা পাঠ করিতে বলিলেন এবং আমি উহা হইতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন—'এখন তুমি পুস্তকটি একবার নিঙড়াইয়া দেখ তো!' তাঁহার কথামত আমি ঐরূপ করিলাম। তিনি বলিলেন—'কই বৎস! একফোঁটা জলও যে পড়িতেছে না! যতক্ষণ পর্যন্ত না জল বাহির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পুস্তকমাত্র; সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত তোমার ধর্ম তোমাকে ঈশ্বর উপলব্ধি না করায়, ততদিন উহা বৃথা। যিনি ধর্মের জন্য কেবল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার অবস্থা ঠিক যেন একটি গর্দভের মত, যাহার পিঠে চিনির বোঝা আছে, কিন্তু সে উহার মিষ্টত্বের কোন খবর রাখে না।'

মানুষকে কি এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে, সে হাঁটু গাড়িয়া কাঁদিতে বসুক আর বলুক, 'আমি অতি হতভাগ্য ও পাপী?' না, তাহা না করিয়া বরং তাহার দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। আমি একটি গল্প বলিতেছি। শিকার-অন্বেষণে আসিয়া এক সিংহী একপাল মেষ আক্রমণ করিল। শিকার ধরিবার জন্য লাফ দিতে গিয়া সে একটি শাবক প্রসব করিয়া সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সিংহশাবকটি মেষপালের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘাস খাইত এবং মেষের মত ডাকিত। সে মোটেই জানিত না যে, সে সিংহ। একদিন এক সিংহ সবিস্ময়ে দেখিল যে, মেষপালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘাস খাইতেছে এবং মেষের মত ডাকিতেছে। ঐ সিংহকে দেখিয়া মেষের পাল এবং সেই সঙ্গে ঐ সিংহটিও পলায়ন করিল। কিন্তু সিংহটি সুযোগ

খুঁজিতে লাগিল, এবং একদিন মেষ-সিংহটিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল—'তুমি সিংহ।' সে বলিল, 'না', এই বলিয়া মেষের মত ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আগন্তুক সিংহটি তাহাকে একটি হ্রদের ধারে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিল, 'দেখ তো, তোমার আকৃতি আমার মত কিনা!' সে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া স্বীকার করিল যে, তাহার আকৃতি সিংহের মত। তারপর সিংহটি গর্জন করিয়া দেখাইল এবং তাহাকেও সেইরূপ করিতে বলিল। মেষ-সিংহটিও সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই তাহার মত গম্ভীর গর্জন করিতে পারিল। এখন সে আর মেষ নয়, সিংহ। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সকলকে বলিতে চাই যে, আপনারা সকলে সিংহের মত পরাক্রমশালী। যদি আপনাদের গৃহ অন্ধকারাবৃত থাকে, তাহা হইলে কি আপনারা বুক চাপড়াইয়া 'অন্ধকার অন্ধকার' বলিয়া কাঁদিতে থাকিবেন? তাহা নয়। আলো পাইবার একমাত্র উপায় আলো জ্বালা, তবেই অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ঊর্ধ্বের আলো পাইবার একমাত্র উপায় অন্তরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলো জ্বালা। তবেই পাপ ও অপবিত্রতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইবে। তোমরা উচ্চ প্রকৃতির বিষয় চিন্তা কর; হীনতার কথা ভাবিও না।

বৈদিক ধর্মাদর্শ

আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ধর্মবিষয়ক চিন্তা—আত্মা, ঈশ্বর এবং ধর্ম-সম্পর্কীয় যা কিছু কথা। আমরা বেদের সংহিতার কথা বলিব। সংহিতা-অর্থে স্তোত্র-সংগ্রহ—এগুলিই প্রাচীনতম আর্য-সাহিত্য; যথাযথভাবে বলিতে গেলে এগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে হইবে। এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে ঠিকঠিক গ্রন্থ বা সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে না। সংগৃহীত গ্রন্থ-হিসাবে পৃথিবীতে এগুলি প্রাচীনতম এবং এগুলিতেই আর্যজাতির সর্বপ্রথম মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, সে-সব চিত্রিত আছে। একেবারে প্রথমেই আমরা একটি অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাই। এই স্তোত্রসমূহ বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তুতিগান। দ্যুতিসম্পন্ন, তাই 'দেবতা'। তাঁহারা সংখ্যায় অনেক—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পর্জন্য ইত্যাদি। আমরা একটির পর একটি বহুবিধ পৌরাণিক ও রূপক মূর্তি দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বজ্রধর ইন্দ্র—মানুষের নিকট বারিবর্ষণে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী সর্পকে আঘাত করিতেছেন। তারপর তিনি বজ্র-নিক্ষেপ করিলে সর্প নিহত হইল, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মানুষেরা ইন্দ্রকে যজ্ঞাহুতি দ্বারা আরাধনা করিতেছে। তাহারা যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিয়া সেখানে পশু বধ করিতেছে, শলাকার উপরে উহা পক্ক করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিতেছে। তাহাদের একটি সর্বজনপ্রিয় 'সোমলতা' নামক ওষধি ছিল; উহা যে ঠিক কি, তাহা এখন আর কেহই জানে না, উহা একেবারে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি, উহা নিষ্পেষণ করিলে দুগ্ধবৎ এক প্রকার রস বাহির হইত, রস গাঁজিয়া উঠিত; আরও জানা যায়, এই সোমরস মাদক দ্রব্য। ইহাও সেই আর্যেরা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণের উদ্দেশে নিবেদন করিতেন এবং নিজেরাও পান করিতেন। কখনও কখনও তাঁহারা এবং দেবগণ একটু বেশী মাত্রাতেই পান করিতেন। ইন্দ্র কখনও কখনও সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িতেন। ঐ গ্রন্থে এরূপও লেখা আছে এক সময়ে ইন্দ্র এত অধিক সোমরস পান করিয়াছিলেন যে, তিনি অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিলেন। বরুণদেবতারও একই গতি। তিনি আর একজন অতিশয় শক্তিশালী দেবতা এবং ইন্দ্রের মত তাঁহার উপাসকগণকে রক্ষা করেন; উপাসকগণও সোম আহুতি দিয়া তাঁহার স্তুতি করেন। রণদেবতা (মরুৎ) ও অপর দেবগণের ব্যাপারও এইরূপ। কিন্তু অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই-সব দেবতার প্রত্যেকের চরিত্রে অনন্তের (অনন্ত শক্তির) ভাব রহিয়াছে। এই অনন্ত কখনও কখনও ভাবরূপে চিত্রিত, কখনও আদিত্যরূপে বর্ণিত, কখনও বা অন্যান্য দেবতাদের চরিত্রে আরোপিত। ইন্দ্রেরই কথা ধর। বেদের কোন কোন অংশে দেখিতে পাইবে, ইন্দ্র মানুষের মত শরীরধারী, অতীব শক্তিশালী, কখনও স্বর্ণ-নির্মিত-বর্মপরিহিত, কখনও বা উপাসকগণের নিকট অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত আহার ও বসবাস করিতেছেন, অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সর্পকুলের ধ্বংস করিতেছেন ইত্যাদি। আবার একটি স্তোত্রে দেখিতে পাই, ইন্দ্রকে উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে; তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র বিদ্যমান এবং সর্বজীবের অন্তর্দ্রষ্টা। বরুণদেবতার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে—ইনিও ইন্দ্রের মত অন্তরীক্ষের দেবতা ও বৃষ্টির অধিপতি। তারপর সহসা দেখিতে পাই, তিনি উচ্চাসনে উন্নীত; তাঁহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বলা হইতেছে। আমি তোমাদের নিকট বরুণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে একটি স্তোত্র পাঠ করিব, তাহাতে তোমরা বুঝিতে পারিবে আমি কি বলিতেছি। ইংরেজীতেও কবিতাকারে ইহা অনূদিত হইয়াছে।

আমাদের কার্যচয় উচ্চ হ'তে দেখিবারে পান,
যেন অতি নিকটেই প্রভুদেব সর্বশক্তিমান্।
যদিও মানুষ রাখে কর্মচয় অতীব গোপন,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ হেরিছেন সব অনুক্ষণ।
যে-কেহ দাঁড়ায়, নড়ে, গোপনেতে যায় স্থানান্তর,
সুনিভৃত কক্ষে পশে, দেবতার দৃষ্টি তার'পর।
উভয়ে মিলিয়া যেথা ষড়যন্ত্র করে ভাবি মনে,
কেহ না হেরিছে দোঁহে, মিলিয়াছে অতি সঙ্গোপনে।
তৃতীয় বরুণদেব সেই স্থানে করি অবস্থান,
দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হন সর্বশক্তিমান্।
এই যে রয়েছে বিশ্ব—অধিপতি তিনি গো ইহার,
ওই যে হেরিছ নভঃ সুবিশাল সীমাহীন তাঁর।
রাজিছে তাঁহারই মাঝে অন্তহীন দুটি পারাবার,
তবু ক্ষুদ্র জলাশয় রচেছেন আগার তাঁহার।
বাঞ্ছা যার আছে মনে উঠিবারে উচ্চ গগনেতে,
বরুণের হস্তে তার অব্যাহতি নাই কোনমতে।
নভঃ হ'তে অবতরি চরগণ তাঁর নিরন্তর,
করিছে ভ্রমণ অতিদ্রুত সারা পৃথিবীর 'পর।
দূর দূরতম স্থানে লক্ষ্য তারা করিছে সতত,
পরীক্ষাকুশল নেত্র বিস্ফারিত করি শত শত।
১০

অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। তাঁহারা একের পর এক সেই একই অবস্থা লাভ করেন। প্রথমে তাঁহারা অন্যতম দেবতারূপে আরাধিত হন, কিন্তু তারপর সেই পরমসত্তারূপে গৃহীত হন, যাঁহাতে সমগ্র জগৎ অবস্থিত,

যিনি প্রত্যেকের অন্তর্যামী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা। বরুণদেব সম্বন্ধে কিন্তু আর একটি ধারণা আছে। উহার অঙ্কুর মাত্র দেখা গিয়াছিল, কিন্তু আর্যগণ শীঘ্রই উহা দমন করিয়াছিলেন—উহা 'ভীতির ধারণা'। অন্য একস্থলে দেখা যায়—তাঁহারা ভীত, তাঁহারা পাপ করিয়া বরুণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সেই ধারণাগুলি ভারতভূমিতে বাড়িতে দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ পরে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু উহার বীজগুলি নষ্ট হয় নাই, অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল—'উহা ভয় ও পাপের ধারণা।' তোমরা সকলেই জান যে, এই ধারণা 'একেশ্বরবাদ' নামে উল্লিখিত মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। এই একেশ্বরবাদ একেবারে প্রথম দিকে ভারতে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে পাই সংহিতার সর্বত্রই—উহার প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব, আর্যগণের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই, এবং হিন্দুদের বিশ্বাস, আর্যগণ উহাকে অতি প্রাথমিক ধারণাবোধে একপাশে ঠেলিয়া দেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে থাকেন। অবশ্য বেদ সম্বন্ধে ইওরোপীয়দের সমালোচনা পাঠ করিয়া হিন্দুগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা (পাশ্চাত্য জাতিরা) মাতৃদুগ্ধপানের মত সগুণ-ঈশ্বরবাদকেই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ধারণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন দেখিতে পান, যে-একেশ্বরবাদের ভাবে বেদের সংহিতাভাব পূর্ণ, সেই একেশ্বরবাদকে আর্যগণ অপ্রয়োজনীয় এবং দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে এবং অধিকতর দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ও অতীন্দ্রিয় ভাব আয়ত্ত করিতে কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্বভাবতই তাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকগণের ভাব অনুযায়ী চিন্তা করিতে সাহস করেন না।

যদিও ঈশ্বরের বর্ণনাকালে আর্যগণ বলিয়াছেন, 'সমুদয় জগৎ তাঁহাতেই আশ্রিত' এবং 'তুমি সকল হৃদয়ের পালনকর্তা', তথাপি একেশ্বরবাদ তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত মানবভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। হিন্দুরা সর্ববিধ চিন্তাধারায় সাহসী—এত সাহসী যে, তাঁহাদের চিন্তায় এক-একটি স্ফুলিঙ্গ পাশ্চাত্যের তথাকথিত সাহসী মনীষীদের ভীতি উৎপাদন করে। হিন্দুদের পক্ষে ইহা একটি গৌরব ও কৃতিত্বের কথা। এই হিন্দু মনীষিগণের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যথার্থই বলিয়াছেন, 'তাঁহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহাদেরই ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে; অপর দার্শনিকগণের ফুসফুস সেখানে ফাটিয়া যাইত।' এই সাহসী জাতি বরাবর যুক্তি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন; যুক্তি তাঁহাদের কোথায় লইয়া যাইবে, ইহার জন্য কি মূল্য দিতে হইবে, সে-কথা আর্য দার্শনিকগণ ভাবেন নাই; ইহার ফলে তাঁহাদের অতি প্রিয় কুসংস্কারগুলি চূর্ণ হইয়া যাইতে, অথবা সমাজ তাঁহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিবে বা বলিবে, সে-বিষয়ে তাঁহারা দিক্‌পাত করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা যাহা সত্য ও যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা প্রথমতঃ দু-একটি অতি আশ্চর্য বৈদিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এই-সকল দেবতা একের পর এক গৃহীত হইয়া সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অবশেষে তাঁহারা প্রত্যেকে অনাদি অখণ্ড সগুণ ঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছেন; এই অভিনব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এইরূপ উপাসনাতে হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব দেখিয়া উহাকে Henotheism বা 'দেবাধিদেব' আখ্যা দিয়াছেন। উহার ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে না, উহা ঋগ্বেদের মধ্যেই আছে। ঐ গ্রন্থের যে-স্থলে প্রত্যেক দেবতাকে ঐরূপ সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত করিয়া উপাসনা করিবার কথা আছে, যে-স্থল হইতে আর একটু অগ্রসর হইলে আমরা তাহার অর্থও জানিতে পারি। এখন প্রশ্ন আসে—হিন্দুপুরাণসমূহ অন্যান্য ধর্মের পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি হইতে এত পৃথক্, এত বিশিষ্ট কিরূপে হইল? ব্যাবিলনীয় বা গ্রীক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতা বিশেষকে উন্নীত করিবার প্রয়াস করা হইতেছে—পরে তিনি উচ্চাসন লাভ করিয়া সেখানে চির প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য দেবতারা হতশ্রী হইলেন। সকল মোলোকের (Molochs) মধ্যে যিহোবা (Jehovah) শ্রেষ্ঠ হইলেন, অন্যান্য মোলোকগণ চিরতরে বিস্মৃত ও বিলীন হইলেন। তিনিই দেবাধিদেব 'ঈশ্বর' হইলেন। গ্রীক দেবতাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে—জিউস (Zeus) অগ্রবর্তী হইলেন, উচ্চ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র জগতের প্রভু হইলেন এবং অন্যান্য দেবগণ অতি ক্ষুদ্র দেবদূতরূপে পরিণত হইলেন। পরবর্তী কালেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বৌদ্ধ ও জৈনগণ তাঁহাদের একজন ধর্মপ্রচারককে ঈশ্বররূপে আরাধনা করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তাঁহার অধীন করিয়া দিলেন। ইহাই সর্বত্র অনুসৃত পদ্ধতি, কিন্তু এ-বিষয়ে হিন্দুধর্মে বিশেষত্ব ও ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। প্রথম একজন দেবতা বন্দিত হইতেছেন, কিছুক্ষণের জন্য অন্যান্য দেবতারা তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী বলা হইয়াছে।

আবার দেখা যায়, যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইল যে, তিনি বরুণদেবের কৃপায় উচ্চাসন পাইয়াছেন, তিনিই পরবর্তী গ্রন্থে সর্বোচ্চ গৌরব লাভ করিলেন। এই দেবগণ যথাক্রমে প্রত্যেকেই সগুণ ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা ঐ পুস্তকেই আছে এবং ইহাই চমৎকার ব্যাখ্যা। যে মন্ত্রপ্রভাবে অতীত ভারতে একটি চিন্তাপ্রবাহ উঠিয়াছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে সমগ্র ধর্মজগতে চিন্তার কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সেই মন্ত্রটি এইঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—যাহা সত্য তাহা এক, জ্ঞানিগণ তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দেবতাদের বিষয়ে যেখানে যত স্তোত্র রচিত হইয়াছে, সর্বত্রই অনুভূত সত্তা এক—অনুভবকর্তার জন্যই যা কিছু বিভিন্নতা। স্তোত্র-রচয়িতা ঋষি ও কবিগণ বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন বাক্যে সেই একই সত্তার (ব্রহ্মের) স্তুতিগান করিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এই একটি মাত্র শ্রুতিবাক্য হইতে প্রভূত ফল ফলিয়াছে। সম্ভবতঃ তোমাদের কেহ কেহ ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কখনই কাহারও উপর নির্যাতন হয় নাই, যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও তাহার ধর্মবিশ্বাসের জন্য উত্যক্ত হয় নাই; সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী এবং একেশ্বরবাদী সকলেই আছেন এবং কখনও নির্যাতিত না হইয়া বসবাস করিতেছেন। সেখানে জড়বাদীদিগকেও ব্রাহ্মণ-পরিচালিত মন্দিরের সোপান হইতে দেবতাদের বিরুদ্ধে, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে দেওয়া হইয়াছে। জড়বাদী চার্বাকগণ দেশময় প্রচার করিয়াছে ঈশ্বর বিশ্বাস কুসংস্কার; এবং দেবতা, বেদ ও ধর্ম—পুরোহিতগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত কুসংস্কার মাত্র। তাহারা বিনা উৎপীড়নে এই-সব প্রচার করিয়াছে। এইরূপে বুদ্ধদেব হিন্দুগণের প্রত্যেক প্রাচীন ও পবিত্র বিষয় ধূলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াও অতি বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। জৈনগণও এইরূপ করিয়াছেন—তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহারা বলিতেনঃ ঈশ্বর আছেন—ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহা শুধু একটি কুসংস্কার। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমান আক্রমণ-তরঙ্গ ভারতে আসিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী,

তাহা কেহ কখনও জানিত না। যখন বিদেশীরা এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইল; এবং এখনও ইহা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের গীর্জা-নির্মাণে কত অধিক পরিমাণে এবং তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছে—কোথাও রক্তপাত হয় নাই। এমন কি ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল হিন্দুধর্মবিরোধী ধর্ম উত্থিত হইয়াছিল, সেগুলিও কখনও নির্যাতিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের কথা ধর—বৌদ্ধধর্ম কোন কোন বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে বেদান্ত বলিয়া মনে করা অর্থহীন। খ্রীষ্টধর্ম ও 'স্যালভেশন আর্মি'র প্রভেদ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে মহান্ ও সুন্দর ভাব আছে, কিন্তু উহা এমন এক প্রকার মণ্ডলীর হস্তে পতিত হইয়াছিল, যাহারা ঐ ভাবসমূহ রক্ষা করিতে পারে নাই। দার্শনিকগণের হস্তের রত্নসমূহ জনসাধারণের হস্তে পড়িল এবং তাহারা দার্শনিক ভাবগুলি দখল করিয়া বসিল। তাহাদের ছিল অত্যধিক উৎসাহ, আর কয়েকটি আশ্চর্য আদর্শ, মহৎ জনহিতকর ভাবও ছিল; কিন্তু সর্বোপরি সর্ববিষয় নিরাপদ রাখিবার পক্ষে আরও কিছু প্রয়োজন—চিন্তা ও মনীষা। যেখানেই দেখিবে, উচ্চতম লোকহিতকর ভাবসমূহ শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়াছে, তাহার প্রথম ফল—অবনতি। কেবলমাত্র বিদ্যানুশীলন ও বিচারশক্তি সকল বস্তুকে সুরক্ষিত করে। তারপর এই বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তৎকালীন সমুদয় সভ্য জগতের সর্বত্র ইহা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য একটি বিন্দু রক্তপাত হয় নাই। আমরা পড়িয়াছি, কিরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ নির্যাতিত হন, এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ক্রমান্বয়ে দুই তিন জন সম্রাট্ কর্তৃক নিহত হন, কিন্তু তারপর যখন বৌদ্ধদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজন সম্রাট্ উৎপীড়নকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। আমাদের এই সমুদয় তিতিক্ষার জন্য ঐ এক মন্ত্রের নিকটেই আমরা ঋণী। সেইজন্যই আমি উহা তোমাদিগকে স্মরণ করিতে বলিতেছি। যাঁহাকে সকলে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলে—সেই সত্তা একই; ঋষিরা তাঁহাকে বহু নামে ডাকেন—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'
১১

এই স্তুতি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা কেহই জানেন না; আট হাজার বৎসর পূর্বেও হইতে পারে এবং আধুনিক সকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহার প্রণয়নকাল ৯০০০ বৎসর প্রাচীনও হইতে পারে।

ধর্মবিষয়ক এই অনুধ্যানগুলির একটিও আধুনিক কালের নয়, তথাপি রচনাকালে এগুলি যেমন জীবন্ত ছিল, এখনও সেইরূপ; এখন বরং অধিকতর সজীব হইয়া উঠিয়াছে, কারণ প্রাচীনতম কালে মানবজাতি আধুনিক কালের মত এত 'সভ্য' ছিল না; এতটুকু মতের পার্থক্যের জন্য সে তখনও তাহার ভ্রাতার গলা কাটিতে শিখে নাই বা রক্তস্রোতে ধরাতল প্লাবিত করে নাই অথবা নিজ প্রতিবেশীর প্রতি পিশাচের মত ব্যবহার করে নাই। তখন মানুষ মনুষ্যত্বের নামে সমুদয় মানবজাতির ধ্বংস সাধন করিতে শিখে নাই।

সেইজন্যই 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এই মহাবাণী আজও আমাদের নিকট অতিশয় সজীব, ততোধিক মহান্, শক্তি ও জীবন-প্রদ এবং যে-কালে এগুলি লিখিত হইয়াছিল, সে-সময় অপেক্ষা অধিকতর নবীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এখনও আমাদের শিখিতে হইবে যে, সকল প্রকার ধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান—যে-কোন নামেই অভিহিত হউক না, সকলে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং যে এগুলির একটিকে ঘৃণা করে, সে তাহার নিজের ভগবানকেই ঘৃণা করে।

তাঁহারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন। কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি—এই প্রাচীন একেশ্বরবাদ হিন্দু চিত্তকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই; কারণ আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ; ইহার দ্বারা দৃশ্য জগতের ব্যাখ্যা হয় না—পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসনকর্তা দ্বারা পৃথিবীর ব্যাখ্যা হয় না।

বিশ্বের একজন নিয়ন্তা দ্বারা কখনই বিশ্বের ব্যাখ্যা হয় না, বিশেষতঃ বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত নিয়ন্তার দ্বারা ইহার সম্ভাবনা তো আরও কম। তিনি আমাদের নৈতিক গুরু হইতে পারেন—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাহা তো বিশ্বের ব্যাখ্যা নয়।

তাই প্রথম প্রশ্ন উঠিতেছে—বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে!

'এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল এবং কিরূপেই বা অবস্থান করিতেছে?'
১২
এই প্রশ্ন-সমাধানের একটি বিশিষ্ট রূপ গঠনের জন্য বহু স্তোত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্তোত্রে যেরূপ অপূর্ব কাব্যের সহিত উহা প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় নাঃ

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥
১৩

যখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, যখন অন্তরীক্ষ ছিল না, যখন কিছুই ছিল না, কোন্ বস্তু সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম করিতেছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না। অনুবাদে মূলের কাব্যমাধুরী বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যায়—'তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না!' সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক ধ্বনিটি যেন সুরময়! তখন সেই 'এক (ঈশ্বর) অবরুদ্ধ-প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না'—এই

ভাবটি উত্তমরূপে ধারণা করা উচিত যে, ঈশ্বর অবরুদ্ধ-প্রাণ (গতিহীন)-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন; কারণ অতঃপর আমরা দেখিব, কিভাবে পরবর্তী কালে এই ভাব হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দনসমষ্টি—একপ্রকার গতি মনে করিতেন, সর্বত্রই শক্তি-প্রবাহ। এই গতি সমষ্টি একটা সময়ে স্থির হইতে থাকে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন করে এবং কিছুকালের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি করে। এই স্তোত্রে ঐ অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে—এই জগৎ স্পন্দনহীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন এই সৃষ্টির সূচনা হইল, তখন উহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহা হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিল। সেই পুরুষের নিঃশ্বাস—শান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইহার বাহিরে আর কিছু নাই।

প্রথম একমাত্র অন্ধকারই ছিল। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে অথবা অন্য কোন গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশে গিয়া মৌসুমী-বায়ু-চালিত মেঘ-বিস্তার দেখিয়াছ, তাহারাই এই বাক্যের গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবে। আমাদের মনে আছে, তিনজন কবি এই দৃশ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিল্টন বলিয়াছেন, 'সেখানে আলোক নাই, বরং অন্ধকার দৃশ্যমান।' কালিদাস বলেন, 'সূচিভেদ্য অন্ধকার।' কিন্তু কেহই এই বৈদিক বর্ণনার নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই—'অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুকান ছিল।' সর্ববস্তু দহ্যমান, মর্মরিত—শুষ্ক, সমগ্র সৃষ্টি যেন ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, এবং এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর একদিন সায়াহ্নে দিক্চক্রবালের একপ্রান্তে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেঘে পৃথিবী ছাইয়া গেল, মেঘের উপর মেঘ, থরে থরে মেঘ—তারপর প্রবল ধারায় উহা যেন ফাটিয়া পড়িল, প্লাবন শুরু হইল।

এখানে সৃষ্টির কারণরূপে ইচ্ছাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা ছিল, তাহা যেন ইচ্ছারূপে পরিণত হইল এবং ক্রমে তাহা হইতেই বাসনার প্রকাশ। এইটি আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত, কারণ এই বাসনাই আমাদের যাহা কিছু প্রত্যক্ষের কারণরূপে কথিত হইয়াছে। এই ইচ্ছার ধারণাই বৌদ্ধ ও বেদান্ত চিন্তাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ এবং পরবর্তীকালে জার্মান দর্শনে প্রবিষ্ট হইয়া শোপেনহাওয়ারের দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। এইখানেই আমরা প্রথম পাইঃ

ব্যক্ত মনেতে উপ্ত সে বীজ—সে কোন্ প্রভাতে দূর জাগিয়া উঠিল ইচ্ছা প্রথম—বাসনার অঙ্কুর!
কবি-কল্পনা জ্ঞানের সহায়ে খুঁজিল হৃদয়-মাঝে,
দেখিল সেথায় সৎ ও অসৎ—বাঁধনে জড়ায়ে রাজে।
১৪

ইহা এক নূতন প্রকারের অভিব্যক্তি; কবি এই বলিয়া শেষ করিলেন, 'তিনিও বোধ হয় জানেন না, সেই অধ্যক্ষও সৃষ্টির কারণ জানেন না।'
১৫
আমরা এই সূক্তে দেখিতে পাই—ইহার কাব্যমাধুরী ছাড়া বিশ্বরচনা সম্বন্ধে প্রশ্নটি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। এবং এই-সব ঋষিদের মন এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাঁহারা আর সাধারণ উত্তরে সন্তুষ্ট নন। আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা 'পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত এই জগতের অধ্যক্ষ একজন শাসনকর্তায়' সন্তুষ্ট নন। এই বিশ্ব কিরূপে আবির্ভূত হইল—এই বিষয়টি আরও অনেক সূক্তে আছে এবং আমরা পূর্বে যেমন দেখিয়াছি যে, তাঁহারা একজন ব্যক্তিবিশেষকে এই বিশ্বের অধ্যক্ষরূপে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং ইহার নিমিত্ত এক-একটি দেবতাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই ঈশ্বরের আসনে বসাইতেছিলেন, ঠিক তেমনি এই স্তরে আসিয়া দেখিব, বিভিন্ন স্তোত্রে কোন একটি তত্ত্বকে গ্রহণপূর্বক অনন্তরূপে বর্ধিত করিয়া তাহাকেই নিখিল বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; এমন কোন একটি বিশিষ্ট তত্ত্বকে এই জগতের আধার-রূপে গ্রহণ করা হইতেছে—যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং যাহা এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে। নানা আদর্শ সম্বন্ধে এই রীতি অনুসৃত হইল। প্রাণ বা জীবনী-শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহারা এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই প্রাণতত্ত্বকে এমনভাবে বর্ধিত করিতে লাগিলেন যে, ঐ প্রাণশক্তি এক বিশ্বব্যাপী অনন্ত তত্ত্বে পরিণত হইল। এই প্রাণশক্তি সকলকে ধারণ করিতেছে—কেবল মনুষ্য-শরীরকে নয়, এই প্রাণশক্তি সূর্য ও চন্দ্রেরও আলো—ইহাই সবকিছুকে স্পন্দিত করিতেছে। ইহাই বিশ্বের প্রেরণাশক্তি।

সমস্যার সমাধানে এই-সকল চেষ্টা অতীব সুন্দর—অতিশয় কাব্যমধুর। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন 'তিনিই সুন্দরী ঊষার আগমনবার্তা ঘোষণা করেন' প্রভৃতি তাঁহারা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব গীতিময়।

এই যে 'ইচ্ছা', যাহা আমরা এই মাত্র পড়িলাম, যাহা সৃষ্টির আদিবীজরূপে উত্থিত হইয়াছিল, উহাকে তাঁহারা এমন ভাবে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন যে, উহাই শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্বে পরিণত হইল। কিন্তু এই ধারণাগুলির কোনটিই তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিল না।

এই ধারণা ক্রমে মহিমান্বিত হইয়া শেষে এক বিরাট ব্যক্তিত্বে ঘনীভূত হইল।

'তিনি সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন, তিনি সব কিছুর অধীশ্বর, তিনি বিশ্বকে ধরিয়া আছেন, তিনি জীবের স্রষ্টা, তিনি বলবিধাতা, সকল দেবতা যাঁহাকে উপাসনা করেন, জীবন ও মৃত্যু যাঁহার ছায়া—তাঁহাকে ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে আমরা উপাসনা করিব? তুষারমৌলি হিমালয় যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সমুদ্র তাহার সমগ্র জলরাশির সহিত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে'—এইভাবে তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন।
১৬
কিন্তু এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে, এই সমস্ত ধারণাও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। অবশেষে (বেদে) আমরা এক অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাই। (ঐ যুগে) আর্যমানবের মন বহিঃপ্রকৃতি হইতে এতদিন ঐ প্রশ্নের (কে সেই সর্বজ্ঞ একমাত্র স্রষ্টা?) উত্তর

অনুসন্ধান করিতেছিল। তাঁহারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাশি প্রভৃতি সর্ববস্তুর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সাধ্যানুযায়ী তাহার সমাধানও করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের শুধু এইটুকু শিখাইল—বিশ্বের নিয়ন্তা এক সগুণ ঈশ্বর আছেন। বহিঃপ্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক শিখাইতে পারে না। সংক্ষেপে বহিঃপ্রকৃতি হইতে আমরা মাত্র একজন বিশ্ব-স্থপতির অস্তিত্ব ধারণা করিতে পারি। এই ধারণা রচনাকৌশলবাদ (Design Theory) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, এইরূপ মীমাংসা খুব বেশী যুক্তিসঙ্গত নয়; এই মতবাদ কতকটা ছেলেমানুষী, তথাপি বহির্জগতের কারণানুসন্ধান দ্বারা এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারি যে, এই জগতের একজন নির্মাতা প্রয়োজন। কিন্তু ইহাদ্বারা আদৌ জগতের ব্যাখ্যা হইল না। এই জগতের উপাদান তো ঈশ্বরের আগেও ছিল এবং তাঁহার এই-সব উপাদানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহাতে এক ভীষণ আপত্তি উঠিবে যে, তিনি তাহা হইলে এই উপাদানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। গৃহনির্মাতা উপাদান ব্যতিরেকে গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি উপাদান দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন; উপাদানের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মাত্র তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন। সেইজন্য রচনাকৌশলবাদের ঈশ্বর একজন স্থপতি মাত্র এবং সেই বিশ্বস্থপতি সসীম; উপাদানের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ—একেবারেই স্বাধীন নন। এই পর্যন্ত তাঁহারা ইতঃপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহু মানবচিত্ত এইখানেই বিশ্রাম করিতে পারে। অন্যান্য দেশের চিন্তাক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিয়াছিল; মনুষ্যমন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই; চিন্তাশীল, অবধারণশীল চিত্ত আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহিল; যদিও যাহারা পশ্চাদ্‌বর্তী তাহারা উহাই ধরিয়া রহিল এবং অগ্রবর্তীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই হিন্দু ঋষিরা আঘাত খাইয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না; তাঁহারা ইহার সমাধান চাহিলেন এবং এখন আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারা বাহ্যকে ত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন।

প্রথমেই তাঁহাদের মনে এই সত্য ধরা পড়িয়াছিল যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করি না বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না; তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা সেইজন্য আমাদের শারীরিক এবং মানসিক অক্ষমতা নির্দেশ করা, ইহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। একজন ঋষি বলিলেন, 'তুমি এই বিশ্বের কারণ জান না; তোমার ও আমার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে—কেন? তুমি ইন্দ্রিয়পর বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেছ, এবং বিষয় ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিয়াছ, পক্ষান্তরে আমি ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষকে জানিয়াছি।'

আমি যে আধ্যাত্মিক প্রগতির অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অপর দিক্—যাহার সহিত আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যেজন্য আমি উহা বিশদরূপে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক নই—সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বৃদ্ধির সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। যদি আধ্যাত্মিক ধারণার প্রগতি সমান্তরে (Arithmetical Progression) বর্ধিত হয়, তাহা হইলে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রগতি সমগুণিতান্তর (Geometrical Progression) বেগে বর্ধিত হইয়াছে—প্রাচীন কুসংস্কার এক বিরাট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে; ইহা ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করিয়া হিন্দুর জীবনীশক্তিকে নিজের চাপে প্রায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে; ইহা এখনও সেখানে বর্তমান; ইহা আমাদিগকে কঠোরভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের জীবনীশক্তির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম হইতে আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। তথাপি সেই প্রাচীনকাল হইতেই আমরা দেখিতে পাই, অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধও চলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে যে একটি আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা এই—ক্রিয়াকাণ্ডে প্রীতি, নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছদ ধারণ, নির্দিষ্ট উপায়ে খাওয়া-দাওয়া—ধর্মের এই-সব বাহ্য ঘটা ও মূক নাট্যাভিনয়গুলি হইল বহিরঙ্গ ধর্ম; ইহা কেবল মানুষের ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে, মানুষকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে যাইতে দেয় না; আমাদের এবং প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়ার পথে ইহা প্রচণ্ড বাধা।

পারতপক্ষে আমরা যদি বা আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাও ইন্দ্রিয়ের উপযোগী হওয়া চাই; একজন মানুষ কয়েকদিন ধরিয়া দর্শন, ঈশ্বর, অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্বন্ধে শ্রবণ করার পর জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বেশ, এতে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে? ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ এতে কতটুকু হয়?' সম্ভোগ বলিতে ইহারা মাত্র ইন্দ্রিয়সুখই বুঝে—ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের ঋষিরা বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।' ক্রিয়াকাণ্ডে আনন্দ, ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তি এবং বিভিন্ন মতবাদ আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এই বিষয়টি আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর এক বিরাট সীমা-নির্দেশ। আমরা শেষ পর্যন্ত এই আদর্শেরই অনুসরণ করিব এবং দেখিতে পাইব, ইহা কিরূপে বর্ধিত হইয়া বেদান্তের সেই অদ্ভুত মায়াবাদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে—এই মায়ার অবগুণ্ঠনই বেদান্তের যথার্থ ব্যাখ্যা—সত্য চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল মায়া তাহার অবগুণ্ঠনের দ্বারা তাহাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন চিন্তাশীল আর্যেরা এক নূতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন, বহির্জগতের অনুসন্ধানের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। অনন্তকাল ধরিয়া বহির্জগতে অনুসন্ধান করিলেও সেখান হইতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না। এইজন্য তাঁহারা অপর পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন এবং তদনুসারে জানিলেন যে, এই ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আসক্তি, বাহ্য বিষয়ই ব্যক্তির সহিত সত্যের মিলনের মধ্যে এক ব্যবধান টানিয়া দিয়াছে, যাহা কোন ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা অপসারিত হইবার নয়। তাঁহারা তাঁহাদের মনোজগতে আশ্রয় লইলেন এবং নিজেদেরই মধ্যে সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য মনকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহির্জগতে ব্যর্থ হইয়া যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ইহা প্রকৃত বেদান্তদর্শনে পরিণত হইল; এখান হইতেই বেদান্তদর্শনের আরম্ভ এবং ইহাই বেদান্তের ভিত্তি-প্রস্তর। আমরা যতই অগ্রসর হইব, ততই বুঝিতে পারিব, এই দর্শনের সকল অনুসন্ধান অন্তর্দেশে। দেখা যায়—একেবারে প্রথম হইতেই তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন, 'কোন ধর্মবিশেষে সত্যের অনুসন্ধান করিও না; সকল রহস্যের রহস্য, সকল জ্ঞানের কেন্দ্র, সকল অস্তিত্বের খনি—এই মানবাত্মায় অনুসন্ধান কর। যাহা এখানে নাই, তাহা সেখানেও নাই।' ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যাহা বাহ্য তাহা অন্তরের বড়জোর একটা মলিন প্রতিবিম্ব মাত্র। আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহারা কেমন করিয়া জগৎ হইতে পৃথক্ এবং শাসক ঈশ্বরের প্রাচীন ধারণাকে প্রথম বহির্দেশ হইতে অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভগবান্ জগতের বাহিরে নন, অন্তরে; এবং পরে সেখান হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়া তাঁহারা নিজেদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

তিনি এখানে—এই মানব-হৃদয়ে আছেন—তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের অন্তর্যামী সত্যস্বরূপ।

বেদান্ত-দর্শনের কর্মপ্রণালী যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে কতকগুলি মহৎ ধারণা পূর্বে বুঝিতে হইবে। ক্যাণ্ট ও হেগেলের দর্শন আমরা যেভাবে বুঝি, বেদান্ত সেই ভাবের কোন দর্শনশাস্ত্র নয়। ইহা কোন গ্রন্থ-বিশেষ বা কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। বেদান্ত হইতেছে—বিভিন্ন কালে রচিত গ্রন্থসমষ্টি। কখনও কখনও দেখা যায়, ইহার একখানিতেই পঞ্চাশটি বিষয়ের সন্নিবেশ। অপর বিষয়গুলি যথাযথভাবে সজ্জিতও নয়; মাত্র চিন্তাগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই নানা বিজাতীয় বিষয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট। কিন্তু একটা বিষয় খুব প্রণিধানযোগ্য যে, উপনিষদের এই আদর্শগুলি চির-প্রগতিশীল। ঋষিগণের মনের কার্যাবলী যেমন যেমন চলিয়াছে, তাঁহারাও সেই প্রাচীন অসম্পূর্ণ ভাষায় উহা তেমনি তেমনি আঁকিয়াছেন। প্রথম ধারণাগুলি অতি স্থূল, ক্রমে সেগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ধারণায় পরিণত হইয়া বেদান্তের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে এবং পরে এই শেষ সিদ্ধান্ত এক দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন প্রথম আমরা দেখিতে পাই—দ্যোতন-স্বভাব দেবতার অনুসন্ধান, তারপর আদি জগৎ-কারণের অন্বেষণ এবং সেই সত্য একই অনুসন্ধানের ফলে আর একটি অধিকতর স্পষ্ট দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে, সকল পদার্থের একত্ব—'যাঁহাকে জানিলে সকলই জানা হয়।'

হিন্দুধর্ম

[প্রাচীন বৈদিক ঋষিদেরই প্রেম ও পরধর্মসহিষ্ণুতাপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বর সেদিন হিন্দু সন্ন্যাসী পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির নিমন্ত্রণক্রমে যাঁহারা ক্লিন্টন এভেন্যুতে অবস্থিত পাউচ্ গ্যালারীর প্রকাণ্ড বক্তৃতাগৃহ এবং তৎসংযুক্ত গৃহগুলিতে যত লোক ধরে, তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন, সেই বহু শত শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেককে সেই কণ্ঠস্বরই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।—৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীঃ।

এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী 'হিন্দুধর্ম'-নামক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দর্শনসম্মত ধর্মোপাসনার দূত ও প্রতিভূরূপে প্রতীচ্যে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার যশ পূর্ব হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপ চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, বিচারক, শিক্ষক প্রভৃতি সকল বিভাগের লোক বহু ভদ্রমহিলার সহিত শহরের নানাস্থান হইতে ভারতীয় ধর্মের এই অপূর্ব, সুন্দর ও বাগ্মিতাপূর্ণ সমর্থন শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বেই তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, তিনি চিকাগো বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসভায় কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং বুদ্ধের উপাসকদের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং সেখানে অখ্রীষ্টান প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই পড়িয়াছিলেন যে, এই দার্শনিক ধর্মের নিমিত্ত তিনি তাঁহার উজ্জ্বল সাংসারিক জীবন ত্যাগ করেন এবং বহু বর্ষের আগ্রহপূর্ণ এবং ধীর অধ্যয়নের ফলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে আয়ত্ত করিয়া ঐতিহ্যপূর্ণ হিন্দুসভ্যতার অধ্যাত্ম-রহস্যপূর্ণ ভূমিতে উহা রোপণ করেন; তাঁহারা ইতঃপূর্বে তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বাগ্মিতা, পবিত্রতা, সারল্য ও সাধুতা সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, তাই তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন।

এ-বিষয়ে তাঁহারা হতাশও হন নাই। স্বামী (রাব্বি বা আচার্য) বিবেকানন্দ তাঁহার যশ অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি যখন উজ্জ্বল লালরঙের আলখাল্লা পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন একগুচ্ছ কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তল তাঁহার কমলারঙের বহুভাঁজযুক্ত পাগড়ির পাশ দিয়া দেখা যাইতেছিল, মুখমণ্ডলের শ্যামশ্রীতে চিন্তার ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, আয়ত ভাবদ্যোতক চক্ষু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের উদ্দীপনায় ভাস্বর এবং তাঁহার সাবলীল মুখ হইতে গভীর সুমধুর স্বরে প্রায়-নিখুঁত শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় শুধু প্রেম, সহানুভূতি ও পরমতসহিষ্ণুতার বাণী উচ্চারিত হইতেছিল। তিনি ছিলেন হিমালয়ের প্রসিদ্ধ ঋষিদের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিরূপ, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিকতার সহিত খ্রীষ্টধর্মের নৈতিকতার সমন্বয়কারী এক নবীন ধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার শ্রোতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের সমর্থনকল্পে তিনি যে মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কেন শুধু সেইজন্য তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রকাশ্যভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরীতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর এক মহতী জনসভা আহূত হইয়াছিল। স্বামীজী লিখিত বক্তৃতা না দিয়া মৌখিক ভাষণ দিয়াছিলেন; বক্তৃতা সম্বন্ধে যে যাহাই সমালোচনা করুক না কেন, বাস্তবিকই উহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এথিক্যাল এসোসিয়েশনের-এর সভাপতি ডঃ লুইস্ জি. জেন্স্ স্বামীজীর পরিচয় দিবার পর শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপঃ]

শিক্ষালাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টরূপে পড়ি; তোমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অস্পষ্ট সত্য-সকল অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সর্বজনীন। যদি তোমাদের সকলের হাতে মাত্র পাঁচটি আঙুল থাকে এবং আমার হাতে থাকে ছয়টি, তাহা হইলে তোমরা কেহই মনে করিবে না যে, আমার হাতখানা প্রকৃতির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে; বরং ইহা অস্বাভাবিক এবং রোগপ্রসূত। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা।

যদি একটিমাত্র সম্প্রদায় সত্য হয় এবং অপরগুলি অসত্য হয়, তবে তোমার বলিবার অধিকার আছে, ঐ পূর্বের ধর্মটি ভুল। যদি একটি ধর্ম সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—অপরগুলিও নিশ্চয়ই সত্য। এই দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের উপর তোমাদের ঠিক ততখানি দাবী আছে, যতখানি আছে আমার। ঊনত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ খ্রীষ্টান, ৬ কোটি মুসলমান এবং বাকী সব হিন্দু।

প্রাচীন বেদের উপর হিন্দুরা তাহাদের ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; 'বেদ' শব্দটি জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি; আমাদের মতে ইহাতেই সর্বধর্মের সার নিহিত; তবে এ-কথা আমরা বলি না যে, সত্য কেবল ইহাতেই নিহিত আছে। বেদ আমাদিগকে আত্মার অমরত্ব শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এক স্থায়ী সাম্য-অবস্থার সন্ধান করা, যাহা কখনও পরিবর্তিত হয় না। প্রকৃতিতে আমরা ইহার সাক্ষাৎ পাই না, কারণ সমগ্র বিশ্ব এক অসীম পরিবর্তনের সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়।

কিন্তু ইহা হইতে যদি এইরূপ অনুমান করা হয় যে, এই জগতে অপরিবর্তনীয় কিছুই নাই, তবে আমরা হীনযান বৌদ্ধ এবং চার্বাকদের ভ্রমেই পতিত হইব। চার্বাকেরা বিশ্বাস করে, সব কিছুই জড়। মন বলিয়া কিছুই নাই, ধর্মমাত্রই প্রবঞ্চনা এবং নৈতিকতা ও সততা অপ্রয়োজনীয় কুসংস্কার। বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেয়, মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়বর্গ বর্তমানই জানিতে পারে, ভবিষ্যৎ বা অতীত পারে না; কিন্তু এই বর্তমান যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দেয় এবং ঐ তিনটিই যেহেতু কালের বিভিন্ন নির্দেশ মাত্র, অতএব যদি ইন্দ্রিয়াতীত, কাল-নিরপেক্ষ এবং অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ঐক্যবিধানকারী কোন সত্তা না থাকে, তাহা হইলে বর্তমানও অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু স্বাধীন কে? দেহ স্বাধীন নয়; কারণ ইহা বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, মনও স্বাধীন নয়, কারণ যে চিন্তারাশি দ্বারা ইহা গঠিত, তাহাও অপর এক কারণের কার্য। আমাদের আত্মাই স্বাধীন। বেদ বলেন, সমগ্র বিশ্ব, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা—মুক্তি ও দাসত্বের মিশ্রণে প্রস্তুত। কিন্তু এই-সকল দ্বন্দ্বের মধ্যেও সেই মুক্তি, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র আত্মা প্রকাশিত আছেন। যদি ইহা স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ইহার ধ্বংস সম্ভব নয়; কারণ মৃত্যু একটা পরিবর্তন এবং একটা বিশেষ অবস্থা-সাপেক্ষ। আত্মা যদি স্বাধীন হয়, ইহাকে পূর্ণ হইতেই হইবে। কারণ—অসম্পূর্ণতাও একটা অবস্থা-সাপেক্ষ, সেইজন্য উহা পরাধীন। আবার এই অমর পূর্ণ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম, ভগবান্ হইতে নিকৃষ্ট মানবে পর্যন্ত সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত; উভয়ের প্রভেদ মাত্র আত্মার বিকাশের তারতম্যে। কিন্তু আত্মা শরীর ধারণ করে কেন? যে কারণে আমি আয়না ব্যবহার করি নিজের মুখ দেখিবার জন্য—এইভাবেই দেহে আত্মা প্রতিবিম্বিত হন। আত্মাই ঈশ্বর; প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পূর্ণ দেবত্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশ করিতেই হইবে। যদি আমি কোন অন্ধকার গৃহে থাকি, সহস্র অনুযোগেও ঘর

আলোকিত হইবে না; আমাকে দীপ জ্বালিতেই হইবে। ঠিক তেমনি, শুধু অনুযোগ বা আর্তনাদের দ্বারা আমাদের অপূর্ণ দেহ কখনও পূর্ণতা লাভ করিবে না; কিন্তু বেদান্ত শিক্ষা দেয়, তোমার আত্মার শক্তিকে উদ্বোধিত কর—নিজ দেবত্ব প্রকাশিত কর। তোমার বালক-বালিকাদের শিক্ষা দাও যে, তাহারা দেবতা; ধর্ম অস্তিমূলক, নাস্তিমূলক বাতুলতা নয়; পীড়নের ফলে ক্রন্দনের আশ্রয় লওয়াকে ধর্ম বলে না—ধর্ম বিস্তার ও প্রকাশ।

প্রত্যেক ধর্মই বলে, অতীতের দ্বারাই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপায়িত হয়; বর্তমান অতীতের ফলস্বরূপ। তাহাই যদি হইল, তবে প্রত্যেক শিশু যখন এমন কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহার ব্যাখ্যা বংশানুক্রমিক ভাব-সংক্রমণের সাহায্যে দেওয়া চলে না, তাহার কি মীমাংসা হইবে? কেহ যখন ভাল পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎ শিক্ষার দ্বারা সৎ লোক হয় এবং অপর কেহ নীতিজ্ঞানশূন্য পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনলীলা শেষ করে, তাহারই বা কি ব্যাখ্যা হইবে? ঈশ্বরকে দায়ী না করিয়া এই বৈষম্যের সমাধান কি করিয়া সম্ভব? করুণাময় পিতা তাঁহার সন্তানকে কেন এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন, যাহার ফল নিশ্চিত দুঃখ? 'ভগবান্ ভবিষ্যতে সংশোধন করিবেন—প্রথমে হত্যা করিয়া পরে ক্ষতিপূরণ করিবেন'—ইহা কোন ব্যাখ্যাই নয়; আবার ইহাই যদি আমার প্রথম জন্ম হয়, তবে আমার মুক্তির কি হইবে? পূর্বজন্মের সংস্কার-বর্জিত হইয়া সংসারে আগমন করিলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই থাকে না, কারণ আমার পথ তখন অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্দেশিত হইবে। আমি যদি আমার ভাগ্যের বিধাতা না হই, তাহা হইলে আমি আর স্বাধীন কোথায়? বর্তমান জীবনের দুঃখের দায়িত্ব আমি নিজেই স্বীকার করি, এবং পূর্বজন্মে যে অন্যায় বা অশুভ কর্ম করিয়াছি, এই জন্মে আমি নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিব। আমাদের জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি এইরূপ। আমরা পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা লইয়া বর্তমান জীবনে প্রবেশ করিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান জন্মের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সেই পূর্বজন্মের কর্মের ফল; তবে উত্তরোত্তর আমাদের উন্নতিই হইতেছে এবং অবশেষে একদিন আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিব।

বিশ্বজগতের পিতা, অনন্ত সর্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের আত্মা যদি অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে, তবে তখন তাহাকে অনন্তও হইতে হইবে। কিন্তু একই কালে দুইটি নিরপেক্ষ অনন্ত সত্তা থাকিতে পারে না; অতএব আমরা বলি যে, তিনি ও আমরা এক। প্রত্যেক ধর্মই এই তিনটি স্তর স্বীকার করে। প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে কোন দূরদেশে অবস্থান করিতে দেখি, ক্রমে আমরা তাঁহার নিকটবর্তী হই এবং তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করি, অর্থাৎ আমরা তাঁহাতেই আশ্রিত আছি, মনে করি; সর্বশেষে জানি যে, আমরা ও তিনি অভিন্ন। ভেদদৃষ্টিতে যে ভগবানের দর্শন, তাহাও মিথ্যা নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে যত ধারণা আছে, সবই সত্য, এবং তাই প্রত্যেক ধর্মও সত্য; কারণ উহারা আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তর; সকলেরই উদ্দেশ্য বেদের সম্পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা। কাজেই আমরা হিন্দুরা কেবল পরমতসহিষ্ণু নই, আমরা প্রত্যেক ধর্মকে সত্য বলিয়া মানি এবং তাই মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, জরথুষ্ট্রীয়দের অগ্নির সমক্ষে উপাসনা করি, খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সমক্ষে মাথা নত করি, কারণ আমরা জানি, বৃক্ষ-প্রস্তরের উপাসনা হইতে সর্বোচ্চ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ পর্যন্ত প্রত্যেক মতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ জন্ম ও আবেষ্টনীর পরিপ্রেক্ষিতে অনন্তকে ধরিবার ও বুঝিবার জন্য ঐরূপ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে; প্রত্যেক অবস্থাই আত্মার প্রগতির এক-একটি স্তর মাত্র। আমরা এই বিভিন্ন পুষ্পগুলি চয়ন করি এবং প্রেমসূত্রে বন্ধন করিয়া এক অপূর্ব উপাসনা-স্তবকে পরিণত করি।

আমি যদি ব্রহ্মই হই, তাহা হইলে আমার অন্তরাত্মাই সেই পরমাত্মার মন্দির এবং আমার প্রত্যেক কর্মই তাঁহার উপাসনা হওয়া উচিত। আমাকে—পুরস্কারের আশা বা শাস্তির ভয় না রাখিয়া ভালবাসার জন্যই ভালবাসিতে হইবে। কর্তব্যবোধেই কর্ম করিতে হইবে। এইভাবে আমার ধর্মের অর্থ বিস্তার, বিস্তার অর্থে অনুভূতি অর্থাৎ সর্বোচ্চভাবের উপলব্ধি—বিড়বিড় করিয়া কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করা বা হাঁটুগাড়ার ভঙ্গিমা নয়। মানুষকে দেবত্ব লাভ করিতে হইবে—প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতররূপে সেই দেবত্বের উপলব্ধি করিতে করিতে অনন্ত প্রগতির পথে চলিতে হইবে।

[বক্তৃতাকালে বক্তাকে মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি সহকারে আন্তরিক অভিনন্দন জানান হইতেছিল। বক্তৃতান্তে তিনি প্রায় পনর মিনিট কাল প্রশ্নোত্তরদানে কাটান। অতঃপর তিনি সাধারণভাবে অনেকেরই সহিত মেলামেশা করিয়াছিলেন।—ব্রুকলিন স্টাণ্ডার্ড (The Brooklyn Standard)]

ধর্ম, দর্শন ও সাধনা

ধর্মের উদ্ভব

[প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে স্বামীজী-কর্তৃক লিখিত]

অরণ্যের বিচিত্র দল-মণ্ডিত সুন্দর কুসুমরাজি মৃদু পবনে নাচিতেছিল, ক্রীড়াচ্ছলে মাথা দোলাইতেছিল; অপরূপ পালকে শোভিত মনোরম পক্ষীগুলি বনভূমির প্রতিটি কন্দর মধুর কলগুঞ্জনে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—গতকাল পর্যন্ত সেগুলি আমার সাথী ও সান্ত্বনা ছিল; আজ আর সেগুলি নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কোথায় গেল তাহারা? যাহারা আমার খেলার সাথী, আমার সুখদুঃখের অংশীদার, আমার আনন্দ ও খেলার সহচর, তাহারাও চলিয়া গেল। কোথায় গেল? যাঁহারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছিলেন, যাঁহারা জীবনভোর শুধু আমার কথাই ভাবিতেন, যাঁহারা আমার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও আজ আর নাই। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি বস্তু চলিয়া গিয়াছে, চলিয়া যাইতেছে এবং চলিয়া যাইবে। কোথায় যায় সব? আদিম মানুষের মনে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য চাহিদা আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিতে পার, কেন এই প্রশ্ন জাগে? আদিম মানুষ কি লক্ষ্য করে নাই, তাহার চোখের সামনে সব কিছু বস্তু পচিয়া গলিয়া শুকাইয়া ধুলায় মিশিয়া যায়? এ-সব কোথায় গিয়াছে—সে সম্বন্ধে আদিম মানব আদৌ মাথা ঘামাইবে কেন?

আদিম মানুষের নিকট প্রথমতঃ সব কিছুই জীবন্ত, এবং মৃত্যু যে বিনাশ—ইহা তাহার কাছে একেবারেই অর্থহীন। তাহার দৃষ্টিতে মানুষ আসে, চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। কখনও কখনও তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু ফিরিয়া আসে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষায় মৃত্যুকে বলা হয়, একপ্রকার চলিয়া যাওয়া। ইহাই ধর্মের প্রারম্ভ। এইভাবে আদিম মানুষ তাহার এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল—তাহারা সব যায় কোথায়?

সুপ্তিমগ্ন পৃথিবীতে আলোক, উত্তাপ এবং আনন্দ ছড়াইয়া স্বমহিমাদীপ্ত প্রভাত-সূর্য উদিত হয়। ধীরে ধীরে সূর্য আকাশ অতিক্রম করে। হায়! সূর্যও শেষে অতি নীচে অতলে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু পরদিন আবার গৌরব ও লাবণ্য-মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হয়।

সভ্যতার জন্মভূমি নীল, সিন্ধু ও টাইগ্রিস্ নদীর উপত্যকায় অপূর্ব পদ্মফুলগুলির মুদিত পাপড়িতে প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণের স্পর্শ লাগিবামাত্র ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হয়, এবং অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে পুনরায় নিমীলিত হয়। আদিম মানুষ ভাবিত, তাহা হইলে সেখানে এমন কেহ না কেহ ছিল, যে আসিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছিল এবং সমাধিস্থান হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া আবার উঠিয়া আসিয়াছে। ইহাই হইল প্রাচীন মানুষের প্রথম সমাধান। সেইজন্য সূর্য এবং পদ্ম অতি প্রাচীন ধর্মগুলির প্রধান প্রতীক ছিল। এ-সব প্রতীক আবার কেন? কারণ বিমূর্ত চিন্তা—সে-চিন্তা যাহাই হউক না কেন—যখন প্রকাশিত হয়, তখন উহা দৃশ্য, গ্রাহ্য ও স্থূল অবলম্বনের ভিতর দিয়া মূর্ত হইতে বাধ্য হয়। ইহাই নিয়ম। তিরোধানের অর্থ যে অস্তিত্বের বাহিরে যাওয়া নয়, অস্তিত্বের ভিতরেই থাকা—এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে; ইহাকে পরিবর্তন, বিকল্প বা সাময়িক রূপায়ণের অর্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে-বস্তুটি ইন্দ্রিয়গুলিকে আঘাত করিয়া মনের উপর স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং একটি নূতন চিন্তা জাগাইয়া তোলে, সেই বস্তুটিকে অবলম্বন ও কেন্দ্র-রূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া নূতন চিন্তা অভিব্যক্তির জন্য সম্প্রসারিত হয় এবং এইজন্য সূর্য ও পদ্ম ধর্মজগতে প্রথম প্রতীক।

সর্বত্রই গভীর গহ্বর রহিয়াছে—এগুলি অতি অন্ধকার ও নিরানন্দ; তলদেশ সম্পূর্ণ তমিস্র ও ভয়াবহ। চক্ষু খুলিয়া রাখিলেও জলের নীচে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। উপরে আলো, সবই আলো—রাত্রিকালেও মনোরম নক্ষত্রপুঞ্জ আলো বিকিরণ করে। তাহা হইলে যাহাদের আমি ভালবাসি, তাহারা কোথায় যায়? নিশ্চয়ই তাহারা সেই তমসাবৃত স্থানে যায় না; তাহারা যায় ঊর্ধ্বলোকে, নিত্যজ্যোতির্ময় ধামে। এই চিন্তার জন্য একটি নূতন প্রতীকের প্রয়োজন হইল। এইবার আসিল অগ্নি—প্রজ্বলিত অদ্ভুত অগ্নির লেলিহান শিখা, যে-অগ্নি নিমেষে একটি বন গ্রাস করে, যে-অগ্নি খাদ্য প্রস্তুত করে, উত্তাপ দেয়, বন্যজন্তুদের বিতাড়িত করে। এই অগ্নি প্রাণদ, জীবনরক্ষক। আর অগ্নিশিখার গতি ঊর্ধ্বে, কখনও ইহা নিম্নমুখী হয় না। অগ্নি আরও একটি প্রতীকের কাজ করে; যে-অগ্নি মৃত্যুর পর মানুষকে ঊর্ধ্বে আলোকের দেশে লইয়া যায়, সেই অগ্নি পরলোকবাসী ও আমাদের মধ্যে যোগসূত্র। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ বলেন, 'হে অগ্নি, জ্যোতির্ময় দেবগণের নিকট তুমিই আমাদের দূত।' এইজন্য তাহারা খাদ্য, পানীয় এবং এই জ্যোতির্ময় দেহধারীদের সন্তুষ্টিবিধায়ক বলিয়া বিবেচিত সব কিছুই অগ্নিতে আহুতি দিত। ইহাই যজ্ঞের সূচনা।

এ-পর্যন্ত প্রথম প্রশ্নের সমাধান হইল, অন্ততঃ আদিম মানুষের চাহিদা মিটাইতে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু হইল। ইহার পর আর একটি প্রশ্ন আসিল। এই-সব আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নটি প্রথমেই কেন জাগিল না?—কারণ আমরা একটি আকস্মিক পরিবর্তনকে বেশী মনে রাখি। সুখ, আনন্দ, সংযোগ, সম্ভোগ প্রভৃতি আমাদের মনে যতটা না দাগ রাখে, তাহা অপেক্ষা অধিক রেখাপাত করে অসুখ, দুঃখ এবং বিয়োগ। আমাদের প্রকৃতিই হইতেছে আনন্দ, সম্ভোগ ও সুখ। যাহা কিছু আমাদের এই প্রকৃতিকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়, সে-সব স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা গভীরতর ছাপ রাখে। মৃত্যু ভীষণভাবে সব কিছু তছনছ করিয়া দেয় বলিয়া মৃত্যুর সমস্যা সমাধান করাই হইল প্রথম কর্তব্য। পরে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উঠিল অপর প্রশ্নটিঃ তাহারা আসে কোথা হইতে? যাহা প্রাণবান্, তাহাই গতিশীল হয়। আমরা চলি, আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের অঙ্গগুলিকে চালনা করে, আমাদের ইচ্ছাবশে অঙ্গগুলি নানা আকার ধারণ করে। বর্তমান কালের শিশু-মানবের নিকট যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনি

প্রাচীনকালের মানব-শিশুর নিকটও প্রতিভাত হইয়াছিল যে, যাহা কিছু চলে, তাহারই পিছনে একটা ইচ্ছা আছে। বায়ুর ইচ্ছা আছে; মেঘ—এমন কি সমস্ত প্রকৃতি—স্বতন্ত্র ইচ্ছা, মন এবং আত্মায় পূর্ণ। আমরা যেমন বহু বস্তু নির্মাণ করি, তাহারাও তেমনি এই-সব সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা অর্থাৎ দেবতারা—'ইলোহিমরা' এই-সবের স্রষ্টা।

ইতোমধ্যে সমাজেরও উন্নতি হইতে লাগিল। সমাজে রাজা থাকিতেন; কাজেই দেবতাদের ভিতর, ইলোহিমদের ভিতরেও একজন রাজা থাকিবেন না কেন? সুতরাং একজন দেবাদিদেব, একজন ইলোহিম-যিহোবা, পরমেশ্বর হইলেন, যিনি স্বীয় ইচ্ছামাত্রেই ঐসব—এমন কি দেবতাদেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যেমন বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্র নিযুক্ত করিয়াছেন, তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যসাধনের অধিনায়করূপে বিভিন্ন দেবতা বা দেবদূতকে নিয়োজিত করিলেন। কেহ হইলেন মৃত্যুর, কেহ বা জন্মের, কেহ বা অন্যকিছুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ধর্মের দুইটি বিরাট উৎস—আর্য ও সেমিটিক জাতির ধর্মের ভিতরে একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, একজন পরমপুরুষ আছেন, এবং তিনি অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী বলিয়াই পরমপুরুষ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার পরই আর্যেরা একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করিল; উহা পুরাতন ধারার এক মহান্ ব্যতিক্রম। তাহাদের দেবতা শুধু পরমপুরুষই নন, তিনি 'দ্যৌঃ পিতরঃ' অর্থাৎ স্বর্গস্থ পিতা। ইহাই প্রেমের সূচনা। সেমিটিক ভগবান্ কেবল সমুদ্যতবজ্র রুদ্র, দলের পরাক্রমশালী প্রভু। এই-সব ভাবের সহিত আর্যেরা একটি নূতন ভাব—পিতৃভাব সংযোজন করিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট হইতে লাগিল; মানবজাতির সেমিটিক শাখার ভিতর প্রগতি বস্তুতঃ এইস্থানে আসিয়াই থামিয়া গেল। সেমিটিকদিগের ঈশ্বরকে দেখা যায় না; শুধু তাহাই নয়, তাঁহাকে দেখাই মৃত্যু। আর্যদের ঈশ্বরকে শুধু যে দেখা যায়, তাহা নয়, তিনি সকল জীবের লক্ষ্য। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—তাঁহাকে দর্শন করা। শাস্তির ভয়ে সেমিটিক তাহার রাজাধিরাজকে মানে, তাঁহার আজ্ঞা ও অনুশাসন মানিয়া চলে। আর্যেরা পিতাকে ভালবাসে; মাতা এবং সখাকেও ভালবাসে। তাহারা বলে, 'আমাকে ভালবাসিলে আমার কুকুরকেও ভালবাসিতে হইবে।' সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রত্যেক জীবকে ভালবাসিতে হইবে, কারণ তাহারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সেমিটিকের নিকট এই জীবনটা যেন একটি সৈন্য-শিবির; এখানে আমাদিগকে আমাদের আনুগত্য পরীক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর্যের কাছে এই জীবন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ। সেমিটিক বলে, যদি আমরা আমাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করি, তাহা হইলে স্বর্গে আমরা একটি নিত্য আনন্দ-নিকেতন পাইব। আর্যের নিকট স্বয়ং ভগবানই সেই আনন্দ-নিকেতন। সেমিটিকের মতে ঈশ্বর-সেবা উদ্দেশ্যলাভের একটি উপায়মাত্র এবং সেই উদ্দেশ্য হইল আনন্দ ও সুখ। আর্যদের কাছে ভোগসুখ দুঃখকষ্ট—সবই উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য হইল ঈশ্বরলাভ। স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সেমিটিক ভগবানের ভজনা করে। আর্য ভগবানকে পাইবার জন্য স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করে। সংক্ষেপে ইহাই হইল প্রধান প্রভেদ। আর্যজীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন, প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার, কারণ ঈশ্বরকে ছাড়া বাঁচা যায় না। 'তুমি না থাকিলে সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের জ্যোতি থাকে না।'

ধর্মের মূলতত্ত্ব

[আমেরিকায় প্রদত্ত একটি ভাষণের সারাংশ]

ফরাসীদেশে দীর্ঘকাল ধরে জাতির মূলমন্ত্র ছিল 'মানুষের অধিকার', আমেরিকায় এখনও 'নারীর অধিকার' জনসাধারণের কানে আবেদন জানায়; ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা ঈশ্বরের বিভিন্নভাবে প্রকাশের অধিকার নিয়ে।

সর্বপ্রকার ধর্মমতই বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে আমাদের একটা স্বতন্ত্র ভাব আছে। আমার যদি একটি সন্তান থাকত, তাকে মনঃসংযমের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে একপঙ্ক্তি প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোন প্রকার ধর্মের কথা আমি শিক্ষা দিতাম না। তোমরা যে অর্থে প্রার্থনা বলো, ঠিক তা নয়, সেটি হচ্ছে এইঃ 'বিশ্বের স্রষ্টা যিনি, আমি তাঁকে ধ্যান করি; তিনি আমার ধীশক্তি উদ্বুদ্ধ করুন।' তারপর সে বড় হয়ে নানা মত এবং উপদেশ শুনতে শুনতে এমন কিছু একটা পাবে, যা তার কাছে সত্য বলে মনে হবে। তখন সেই সত্যের যিনি উপদেষ্টা, সে তাঁরই শিষ্য হবে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ—যাঁকে ইচ্ছা সে উপাসনা করিতে পারে; এঁদের প্রত্যেকের অধিকার আমরা মানি, আর সকলের নিজ নিজ ইষ্ট বা মনোনীত পন্থা অনুসরণ করবার অধিকারও আমরা স্বীকার করি। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রীষ্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।

আমরা জানি যে, সব ধর্মপথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌছান যায়—কেবল আমাদের চোখ দিয়ে ভগবানকে না দেখলে যে পৃথিবীর উন্নতি হবে না, তা নয়, আর পৃথিবী-সুদ্ধ লোক আমার বা আমাদের চোখে ঈশ্বরকে দেখলেই সব ভাল হয়ে যাবে, তাও নয়। আমাদের মূল ভাব হচ্ছে এই যে, তোমার ধর্মবিশ্বাস আমার হতে পারে না, আবার আমার মতবাদও তোমার হতে পারে না। আমি আমার নিজেরই একটি সম্প্রদায়। এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষে আমরা এমন এক ধর্মমত সৃষ্টি করেছি, যাকে আমরা একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ধর্মপদ্ধতি বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু এর যুক্তিবত্তায় আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করছে সকল ঈশ্বরান্বেষীকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার ওপর—সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতির প্রতি সম্পূর্ণ উদারতা দেখান এবং জগতে ভগবদভিমুখী চিন্তাপ্রণালীগুলি গ্রহণ করবার ক্ষমতার ওপর। আমাদের নিয়মপদ্ধতির মধ্যেও অপূর্ণতা আছে, তা আমরা স্বীকার করি, কেন না তত্ত্ববস্তু হচ্ছে সকল নিয়মপদ্ধতির উর্ধ্বে; আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে অনন্ত বিকাশের ইঙ্গিত ও প্রতিশ্রুতি। মত, উপাসনা এবং শাস্ত্র মানুষের স্বরূপোপলব্ধির উপায় হিসাবে ঠিকই, কিন্তু উপলব্ধির পরে সে সবই পরিহার করে। বেদান্তদর্শনের শেষ কথা, 'আমি বেদ অতিক্রম করেছি'—আচার-উপাসনা, যাগযজ্ঞ এবং শাস্ত্রগ্রন্থ, যার সাহায্যে এই মুক্তির পথে মানুষ পরিভ্রমণ করেছে, তা সবই তার কাছে বিলীন হয়ে যায়। 'সোঽহং, সোঽহম্'—আমিই তিনি—এই ধ্বনি তখন তার কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়। ঈশ্বরকে 'তুমি' সম্বোধন তখন অসহনীয়, কারণ সাধক তখন তার 'পিতার সঙ্গে অভিন্ন।'

ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য বেদের ততখানিই গ্রহণ করি, যতখানি যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদমতের অনেক অংশ বাহ্যতঃ পরস্পরবিরুদ্ধ। পাশ্চাত্যে যাকে 'প্রত্যাদিষ্ট বাণী' বলে এগুলি তা নয়, কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের সমষ্টি জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব, যা আমাদের ভিতরেও আছে। তা বলে যে-বইগুলিকে আমরা বেদ বলি, শুধুমাত্র ঐগুলির মধ্যেই এই জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষিত—এ-কথা বলা বাতুলতা। আমরা জানি, সব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের মধ্যেই তা বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মনু বলেন, বেদের যে অংশটুকু বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ততটুকুই যথার্থ বেদ; আমাদের আরও অনেক মনীষী এই মত পোষণ করেন। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র বেদই ঘোষণা করেন, বেদের নিছক অধ্যয়ন অতি গৌণ ব্যাপার।

স্বাধ্যায় তাকেই বলে, 'যার দ্বারা আমরা শ্বাশ্বত-সনাতন সত্য উপলব্ধি করি', এবং তা নিছক পাঠ, বিশ্বাস বা তর্ক-যুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়; সম্ভব একমাত্র অপরোক্ষানুভূতি ও সমাধির দ্বারা। সাধক যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বরের ভাব লাভ করেন। অর্থাৎ তখন 'আমি আর আমার পিতা এক।' নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে এক বলেই তিনি নিজেকে জানেন এবং সগুণ ঈশ্বরের মত নিজেই নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করেন। মায়ার আবরণ—অজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দেখলে ব্রহ্মকে সগুণ ঈশ্বর বলে বোধ হয়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়ে যখন তাঁর কাছে সমুপস্থিত হই, তখন আমরা তাঁকে শুধু সগুণ ভগবান্-রূপেই ধারণা করিতে পারি। ভাবটি হচ্ছে এই, আত্মা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারেন না। জ্ঞাতা আবার নিজেকে জানবে কেমন করে? কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনই নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে পারেন, আর এই প্রতিবিম্বের সর্বোচ্চরূপ, আত্মার এই ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য অভিব্যক্তিই সগুণ ঈশ্বর। পরমাত্মাই হচ্ছেন সনাতন জ্ঞাতা এবং তাঁকে জ্ঞেয় করবার জন্যই আমরা অনন্তকাল ধরে চেষ্টা করছি, আর এই প্রচেষ্টার ফলে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ ফুটে উঠেছে—যাকে আমরা জড় বলে থাকি। কিন্তু এ-সব খুব দুর্বল প্রয়াস; আমাদের জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মার সম্ভবপর সর্বোচ্চ প্রকাশ হচ্ছে সগুণ ঈশ্বর।

তোমাদেরই জনৈক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন, 'একটি উত্তম ভগবান্ গড়াই মানুষের মহত্তম কীর্তি'; যেমন মানুষ, তেমন ভগবান্। এই রকম মানবিক প্রকাশ ছাড়া, অন্য কোন উপায়েই মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না। যা ইচ্ছা বলো, যত খুশী চেষ্টা কর, তুমি ভগবান্‌কে মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুই কল্পনা করতে পার না এবং তিনি ঠিক তোমারই মত। একজন নির্বোধ লোককে বলা হয়েছিল—শিবের একটি মূর্তি নির্মাণ করতে; বেশ কিছুদিন দারুণ হাঙ্গামা করে অবশেষে—সে একটি বানরের মূর্তি তৈরী করতে পেরেছিল মাত্র! ঠিক তেমনই, যখনই আমরা ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তা ভাবতে চেষ্টা করি, তখনই নিদারুণ

ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, কারণ আমাদের মনের বর্তমান প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে দেখতেই আমরা বাধ্য। যদি মহিষেরা কখনও ভগবানকে পূজা করবার বাসনা করে, তবে তাদের নিজ-প্রকৃতি অনুযায়ী তারা তাঁকে মস্ত একটা মহিষ বলেই ভাববে; একটা মাছ যদি ভগবানকে উপাসনা করতে ইচ্ছা করে, তা হলে ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কল্পনা হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড এক মাছ; ঠিক সেই প্রকার মানুষ তাঁকে মানুষ বলেই চিন্তা করে। মনে কর যেন এই মানুষ, মহিষ এবং মাছ সব এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, নিজ নিজ আকার ও সামর্থ্যানুযায়ী তারা ঈশ্বররূপ সমুদ্রজলে পূর্ণ হতে চলেছে। মানুষের মাঝে সে-জল মানুষের আকার নেবে, মহিষের মধ্যে মহিষের আকার এবং মাছেতে মাছের আকার; কিন্তু প্রতি পাত্রে ঈশ্বরসমুদ্রের সেই একই জল।

দু-রকম মানুষ ভগবানকে ব্যক্তিরূপে উপাসনা করে না—নরপশু, যাদের ধর্ম বলে কিছু নেই; এবং পরমহংস, যিনি মনুষ্য-প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করেছেন। সমস্ত প্রকৃতিই তাঁর কাছে স্ব-স্বরূপ হয়ে গেছে, তিনিই শুধু ঈশ্বরকে তাঁর স্ব-রূপে পূজা করতে পারেন। সেই নরপশু উপাসনা করে না তার অজ্ঞতার জন্য, আর জীবন্মুক্তেরা উপাসনা করেন না, তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভগবানকে দেখছেন বলে। তাঁদের কোন সাধনা থাকে না, ঈশ্বরকে তাঁরা স্বীয় আত্মার স্বরূপ বলে বোধ করেন। তাঁরা বলেন, 'সোঽহং, সোঽহম্'—আমিই তিনি; তাঁরা নিজেদের উপাসনা নিজেরা আর করবেন কিভাবে?

একটা গল্প বলছি তোমাদের। একটি সিংহশিশু তার মরণাপন্ন জননীর দ্বারা কোনভাবে পরিত্যক্ত হয়ে একদল মেষের মধ্যে এসে জুটেছিল। মেষেরাই তাকে খাওয়াত আর আশ্রয়ও দিয়েছিল। সিংহটি ক্রমশঃ বড় হয়ে হাঁটতে শিখল এবং মেষেরা যখন 'ব্যা ব্যা' করে, সেও 'ব্যা ব্যা' করতে লাগল। একদিন অপর একটি সিংহ কাছাকাছি এসে পড়ে। অবাক হয়ে দ্বিতীয় সিংহটি জিজ্ঞাসা করে উঠল, 'আরে, তুমি এখানে কি করছ?' কারণ সে শুনে ফেলেছিল, সিংহ-শিশুটিও বাকী সকলের সঙ্গে 'ব্যা ব্যা' করে ডাকছে।

ছোট সিংহটি 'ব্যা ব্যা' করে বললে, 'আমি ছোট মেষশিশু, আমি নেহাৎ শিশু, বড় ভয় পেয়েছি আমি।' প্রথম সিংহটি গর্জন করে উঠল, 'আহাম্মক! চলে এসো, তোমাকে একটা মজা দেখাব।' তারপর সে তাকে একটা শান্ত জলাশয়ের ধারে নিয়ে গিয়ে, তার প্রতিবিম্বটি দেখিয়ে তাকে বলল, 'তুমি হচ্ছ একটা সিংহ—আমার দিকে তাকাও, ঐ মেষটিকে দেখ, আর তোমার নিজের চেহারাও এই দেখ।' সিংহশিশুটি তখন তাকিয়ে দেখল আর বলল, 'ব্যা ব্যা, আমি তো মেষের মত দেখতে নই—ঠিক আমি সিংহই বটে!' তারপর এমন গর্জন সে করে উঠল, যেন পাহাড়ের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা। মেষ-সংস্কারের আবরণে আমরা সকলেই সিংহ। আমাদের পরিবেশই আমাদিগকে দুর্বল ও মোহগ্রস্থ করে ফেলেছে। বেদান্তের কার্য হচ্ছে এই মোহ-বিমোচন। মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি আনুগত্য মুক্তি—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। এ-কথার অর্থ যে কী, তা আমি বুঝি না। মানুষের উন্নতির ইতিহাস অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে যাওয়াই উন্নতির কারণ। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, সাধারণ নিয়মকে জয় করা তো উচ্চতর নিয়মের সাহায্যেই হয়ে থাকে, কিন্তু বিজয়ী মন সেখানেও মুক্তিকেই খুঁজে বেড়ায়, আর যখনই জানতে পারে, নিয়মের মধ্য দিয়েই সংগ্রাম, তখনই সে তাও জয় করতে চায়। সুতরাং মুক্তিই হল সর্বকালের আদর্শ। বৃক্ষ কখনও নিয়মকে অমান্য করে না; কোন গরুকে কখনও চুরি করতে দেখিনি। ঝিনুক কদাপি মিথ্যা কথা বলে না; তথাপি তারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। নিয়মের প্রতি অনুরক্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের জড় পদার্থেই পরিণত করে—তা সমাজে হোক, রাজনীতিতে হোক বা ধর্মেই হোক। এ-জীবন তো মুক্তিরই উদাত্ত নির্ঘোষ; আচার-নিয়মের আধিক্য মানে মৃত্যু। হিন্দুদের মত অন্য কোন জাতির এত বেশী সামাজিক নিয়ম-কানুন নেই, যার ফল জাতীয় মৃত্যু। কিন্তু হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, ধর্মের মধ্যে তারা কোন মতবাদ বা নিয়মাদি আনেনি। তাদের ধর্মের তাই সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে। এই ধর্মের ক্ষেত্রেই আমরা সবচেয়ে বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন—আর তোমরা সেখানেই সবচেয়ে বাস্তবদৃষ্টিহীন।

আমেরিকাতে জনকয়েক লোক এসে বলল, 'আমরা একটা যৌথ কারবার করব', পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা হয়ে গেল। ভারতবর্ষে কুড়িজন লোক মিলে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে যৌথ কারবার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে অথচ তাতেও হয়তো তা গঠিত হবে না; কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, চল্লিশ বৎসর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করলে সে জ্ঞানলাভ করবে—তা সে তৎক্ষণাৎ করবে! কাজেই আমরা আমাদের ভাবে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, তোমরাও তেমনি তোমাদের ভাবে।

কিন্তু অনুভব-রাজ্যে প্রবেশের যত পথ, তার সেরা পথ হচ্ছে অনুরাগ। ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়, কারণ সবই তাঁর সৃষ্টি। ভক্ত বলেন, 'তাঁরই তো সব, আর তিনিই আমার প্রেমাস্পদ; আমি তাঁকেই ভালবাসি।' এমনি করে ভক্তের কাছে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে, কারণ সকল বস্তুই তাঁর। তা হলে আমরা কি করেই বা কাউকে কষ্ট দিতে পারি? কেমন করে তবে অপরকে ভাল না বেসে পারি? ঈশ্বরকে ভালবাসবার সঙ্গে সঙ্গে—তারই ফলরূপে অবশেষে প্রত্যেকের প্রতিই ভালবাসা এসে যাবে। যতই ঈশ্বরের কাছাকাছি যাব, ততই দেখতে থাকব যে, তাঁতেই সবকিছু রয়েছে, আমাদের হৃদয় হবে তখন প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ। প্রেমের দিব্যালোকে মানুষ রূপান্তরিত হয়ে যায়, আর শেষ পর্যন্ত সেই মধুর এবং উদ্দীপনাময় সত্যটি উপলব্ধি করে—প্রেম, প্রেমিক আর প্রেমাস্পদ—তত্ত্বতঃ একই।

ধর্মের দাবী

আপনাদের অনেকেরই স্মরণ আছে যে আপনারা শিশুকালে উদীয়মান জ্যোতির্ময় সূর্যকে কত আনন্দের সহিতই না অবলোকন করিতেন; আর আপনারা সকলেই জীবনের কোন না কোন সময়ে ভাস্বর অস্তাচলগামী সূর্যকে স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অন্ততঃ কল্পনাসহায়ে অদৃশ্য লোকে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টাও করেন। বস্তুতঃ এই ব্যাপারটি সমগ্র বিশ্বের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে—অদৃশ্যলোক হইতে উদয় এবং উহাতেই পুনরায় অস্তগমন, অজানা হইতে এই সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব, পুনরায় অজানার ক্রোড়ে অনুপ্রবেশ; শিশুর মত অন্ধকার হইতে হামাগুড়ি দিয়া আবির্ভূত হওয়া এবং পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে হামাগুড়ি দিয়া কোনপ্রকারে অন্ধকারের মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া।

আমাদের এই বিশ্ব, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, এই যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্রহ্মাণ্ডটি উভয় প্রান্তেই অসীম, অজ্ঞেয় ও চির অজ্ঞাতের দ্বারা আবৃত। অনুসন্ধান—এই অজ্ঞাত সম্বন্ধেই অনুসন্ধান চলে, প্রশ্ন এখানেই চলে, তথ্যও এইখানেই রহিয়াছে, ইহারই মধ্য হইতে সেই আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা জগতে 'ধর্ম' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোকের বস্তু নয়; ইহা অতীন্দ্রিয় স্তরের বস্তু। ইহা যুক্তি-বিচারের অতীত, ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা এমন একটি প্রত্যক্ষ দর্শন, এমন একটি দৈব-প্রেরণা, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের মধ্যে এমন এক আত্ম-নিমজ্জন যাহার ফলে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষাও নিবিড়ভাবে জানা যায়; কারণ লৌকিক অর্থে ইহার জ্ঞান সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস মানব-মনের এই অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির আদি হইতেই চলিয়া আসিতেছে। জগতের ইতিহাসে এমন কোন সময়েই ছিল না, যখন মানুষের বিচারশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অথচ এই প্রচেষ্টা—এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর অনুসন্ধিৎসা ছিল না। আমরা হয়তো দেখিতে পাইলাম, আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ্বে, এই মানব-মনে একটি ভাবনার উদয় হইল, কিন্তু কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল, তাহা আমরা জানি না, এবং যখন ইহা বিলুপ্ত হয়, তখনই বা ইহা কোথায় যায়, তাহাও আমরা জানি না। এই ক্ষুদ্র জগৎ ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, একই উৎস হইতে উদ্ভূত হয়, একই ধারায় চলে, একই প্রকার স্তরসমষ্টি অতিক্রম করে এবং একই পর্দায় ঝঙ্কৃত হয়।

আমি আপনাদের সম্মুখে হিন্দুদের এই মতবাদ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব যে, ধর্ম বাহির হইতে আসে না, অন্তর হইতে উৎসারিত হয়। আমার বিশ্বাস—ধর্ম মানুষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ ও মন ত্যাগ না করে, চিন্তা ও প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না করে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না। যতক্ষণ মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত—এই প্রয়াস থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের কোন-না-কোন রকম ধর্ম থাকিবেই, এইরূপে আমরা দেখিতে পাই—জগতে নানা ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এইগুলির অনুশীলনে মানুষ দিশেহারা হইয়া যায়, কিন্তু অনেকে যদিও মনে করেন যে এ জাতীয় গবেষণা বৃথা, তথাপি বস্তুতঃ উহা বৃথা নয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটি সামঞ্জস্য আছে, এই-সকল বেতাল বেসুরের মধ্যেও একটি সঙ্গীতের ছন্দ পাওয়া যায়; যিনি শুনিতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই সে ছন্দ শুনিতে পাইবেন।

বর্তমান সময়ে সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন হইল, যদি ইহাই সত্য হয় যে, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাত বস্তুর উভয় প্রান্তে অজ্ঞেয় এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অনন্তের বেষ্টন রহিয়াছে, তবে সেই অজানাকে জানিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? কেন আমরা জ্ঞাত বস্তু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না, কেন আমরা পানাহার এবং সমাজের মঙ্গলসাধনকল্পে সামান্য কিছু করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিব না? এই ধারণাই সর্বত্র আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া আছে। পণ্ডিত অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ফুট-ভাষাভাষী শিশু পর্যন্ত সকলেই বলেঃ জগতের উপকার কর; ধর্ম বলিতে এইটুকুই বুঝায়; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সম্পর্কে মাথা ঘামাইও না। এই কথা এত বেশী ক্ষেত্রে বলা হইয়া থাকে যে, এখন ইহা একটি অবধারিত সত্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা স্বভাবতই ইহারও ঊর্ধ্বে অনুসন্ধান করিতে বাধ্য। এই যে বর্তমান, এই যে ব্যক্ত, তাহা অব্যক্তের এক অংশ মাত্র। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব যেন সেই অনন্ত অধ্যাত্মলোকের এমন একটি অংশ, এমন একটি খণ্ড, যাহা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনস্তরের মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে বাদ দিয়া কেবল এই প্রসারিত ক্ষুদ্র অংশটিকে কিরূপে বুঝা যায় বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সক্রেটিস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, এথেন্স নগরীতে একদা বক্তৃতা করিবার কালে তিনি এমন একজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, যিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সক্রেটিস তাঁহাকে বলিলেন, মানুষের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় হইল 'মানুষ'। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বরকে না জানিয়া আপনি মানুষকে জানিবেন কিরূপে?' এই যে ঈশ্বর, এই যে সদা অজ্ঞেয় সত্তা, অথবা পরমতত্ত্ব, অথবা অনন্ত বস্তু, অথবা নামহীন সত্তা—আপনি তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করিতে পারেন—একমাত্র তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞাত ও জ্ঞেয় অর্থাৎ এই বর্তমান জীবনের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা বা অবস্থিতির মূল কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব। আপনার সম্মুখস্থ যে-কোন অতি-জড়বস্তুই ধরুন—যে-সব বিদ্যা অতীব জড়-বিষয়সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত, তাহার যে-কোনটি—যথা রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা প্রাণী-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন; ক্রমাগত তাহার অনুশীলন করিয়া চলুন—দেখিবেন স্থূল রূপগুলি ক্রমেই বিলীন হইয়া সূক্ষ্মে পরিণত হইতেছে, অবশেষে এমন একটি বিন্দুসদৃশ কেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিতেছে, যেখানে আপনি জড় হইতে অ-জড়ে উপনীত হইবার জন্য একটি বৃহৎ লম্ফ প্রদান করিতে বাধ্য। স্থূল বিগলিত হইয়া সূক্ষ্মাকার গ্রহণ করে, পদার্থ-বিজ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রে পরিণত হয়; জ্ঞানরাজ্যের সকল ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের যাহা কিছু আছে—আমাদের সমাজ, আমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক, আমাদের ধর্ম এবং আপনারা যাহাকে নীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করেন—সর্ব ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। কেবলমাত্র উপযোগিতার (utility) ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তুলিবার বহু প্রচেষ্টা দেখা যায়। আমি প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যে কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন ন্যায়সম্মত নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে

আহ্বান করিতেছি। তিনি হয়তো অপরের উপকার সাধন করিতে উপদেশ দিবেন। 'কেন ঐরূপ করিব? যেহেতু ঐরূপ করাই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী।' এখন ধরা যাক, কোন ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি উপযোগিতা গ্রাহ্য করি না, আমি অপরের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নিজে ধনী হইব।' আপনি তাহাকে কি উত্তর দিবেন? সে তো আপনার প্রয়োজনবাদেরই আশ্রয় লইয়া ঐ প্রয়োজনবাদকেই নস্যাৎ করিয়া দিল। আমি যদি জগতের উপকার সাধন করি, তাহাতে আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমি কি এতই নির্বোধ যে, অপরে যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করিব? যদি সমাজ ব্যতীত অপর কোন চেতন বস্তু না থাকে, পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত জগতে অপর কোন শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেই বা সুখী হইব না কেন? যদি আইন-রক্ষীদের করতল হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারি, তবে আমি কেন আমার ভ্রাতৃবর্গের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নিজে সুখী না হইব? আপনি ইহার কি উত্তর দিবেন? আপনাকে ইহার সমর্থনে কোন উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। এইরূপে যখনই আপনার যুক্তির ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, তখনই আপনি বলেন, 'ওহে বন্ধুবর, জগতে ভাল করাই ভাল।' মানব-মনের অন্তর্নিহিত যে শক্তি বলে, 'ভাল হওয়াই ভাল', যে শক্তি আমাদের নিকট অতি সমুজ্জ্বল আত্মার মহিমা প্রকাশ করে, সাধুত্বের সৌন্দর্য—পুণ্যের সর্বমনোহর আকর্ষণ প্রকটিত করে, মঙ্গলের অনন্ত শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তিটির স্বরূপ কি? তাহাকেই তো আমরা 'ঈশ্বর' বলি। তাই নয় কি?

দ্বিতীয়তঃ এবার আমি এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছি, যেখানে সাবধানে কথা বলিতে হয়। আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে আপনারা আমার বক্তব্য শুনিয়াই দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া ফেলেন। আমরা এই জগতে উপকার সাধন বিশেষ কিছুই করিতে পারি না। জগতের কল্যাণ করা ভাল কথা। কিন্তু এই জগতের কোন বিশেষ উপকার আমরা করিতে পারি কি? এই যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে কি খুব বেশী কিছু উপকার করিতে পারিয়াছি, জগতের মোট সুখের পরিমাণ কি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি? জগতে সুখ-সৃষ্টির জন্য নিত্যই অসংখ্য উপায় উদ্ভাবিত হয়, এবং এই প্রক্রিয়া শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আমি আপনাদিগকে প্রশ্ন করি, এক শতাব্দীকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মোট সুখের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পাইয়াছে? তাহা সম্ভব নয়। মহাসাগরের বুকে কোথাও না কোথাও গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াই উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে পারে। যদি কোন জাতি ধনী ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা অন্য কোন জাতির ধনসম্পদ্ ও ক্ষমতার হ্রাস করিয়াই হইয়া থাকে। প্রতিটি নবাবিষ্কৃত যন্ত্র বিশ জনকে ধনী করিতেছে আর বিশ সহস্রকে দরিদ্র করিতেছে। সর্বত্রই দেখা যায়—প্রতিযোগিতার এই সাধারণ নিয়মের অভিব্যক্তি। মোট স্ফূর্ত শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই থাকে। আরও দেখুন এই কার্যটাই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; দুঃখকে বাদ দিয়া আমরা সুখের ব্যবস্থা করিতে পারি—ইহা অযৌক্তিক কথা। ভোগের এই-সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া আপনারা জগতের অভাব বৃদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র। আর অভাবের বৃদ্ধির অর্থ হইল অতৃপ্ত বাসনা, যাহা কখনও প্রশমিত হইবে না। কোন্ বস্তু এই অভাব—এই তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকিবে, ততক্ষণ দুঃখ অনিবার্য। জীবনের স্বাভাবিক ধারাই এই যে, পর পর দুঃখ এবং সুখ ভোগ করিতে হয়। তারপর আপনি কি মনে করেন যে, পৃথিবীর মঙ্গল-সাধনের কর্ম আপনার উপরই অর্পণ করা হইয়াছে? আর কি কোন শক্তি এই বিশ্বে কার্য করিতেছে না? যিনি সনাতন, সর্বশক্তিমান্, করুণাময়, চিরজাগ্রত—যিনি সমগ্র বিশ্ব নিদ্রামগ্ন হইলেও নিজে কখনও নিদ্রিত হন না, যাঁহার চক্ষু সতত নির্নিমেষ, সেই ঈশ্বর কি আমার ও আপনার হস্তে তাঁহার বিশ্বকে সমর্পণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন বা বিশ্ব হইতে বিদায় লইয়াছেন? এই অনন্ত আকাশ যাঁহার সদা উন্মীলিত চক্ষু-সদৃশ, তিনি কি মৃত্যু-কবলিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন? তিনি কি আর এই বিশ্বের পালনাদি করেন না? বিশ্ব তো বেশ ভালভাবেই চলিতেছে, আপনার ব্যস্ত হইবার তো কোন প্রয়োজন নাই; এ-সকল ভাবিয়া আপনার দুঃখ ভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

[স্বামীজী এখানে সেই লোকটির গল্প বলিলেন, যে ভূতের দ্বারা আপনার কর্ম করাইতে চাহিয়াছিল, এবং ভূতকে ক্রমাগত কর্মের নির্দেশ দিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে আর তাহাকে নিযুক্ত রাখিবার মত কোন কর্ম না পাওয়ায় একটি কুকুরের বাঁকা লেজকে সোজা করিতে দিয়াছিল।]

এই বিশ্বের উপকার-সাধন করিতে গিয়া আমাদেরও সেই একই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরাও ঠিক তেমনি এই শতসহস্র বৎসর ধরিয়া কুকুরের লেজ সোজা করিবার কাজে লাগিয়া আছি। ইহা বাতব্যাধির মত। পাদদেশ হইতে বিতাড়িত করিলে উহা মস্তকে আশ্রয় লয়, মস্তক হইতে বিতাড়িত করিলে অপর কোন অঙ্গে আশ্রয় লয়।

আপনাদের অনেকেরই নিকট জগৎ সম্বন্ধে আমার এই মতটি ভয়াবহভাবে নৈরাশ্যজনক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ, দুই-ই ভ্রান্ত মত—দুই-ই অতিমাত্রায় চরম। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় থাকে, পরিধানে উত্তম বস্ত্র থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যন্ত আশাবাদী, কিন্তু সেই মানুষই যখন সবকিছু হারায়, তখন চরম নৈরাশ্যবাদী হইয়া উঠে। যখন কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার ধনসম্পদ্ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় এবং একেবারে দীন-দরিদ্র হইয়া যায়, কেবল তখনই মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণারাশি তাহার নিকট সবেগে আবির্ভূত হয়। সংসারের স্বরূপই এই। যতই দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া জগতের সহিত অধিক পরিচিত হইতেছি, যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি নিরাশাবাদ ও আশাবাদের মত চরম মত পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; ইহা প্রভুর জগৎ। ইহা ভাল-মন্দ উভয়ের অতীত, নিজের দিক্ হইতে ইহা সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ। ভগবানেরই ইচ্ছায় কাজ চলিতেছে, এবং এই সকল বিভিন্ন চিত্র আমাদের সম্মুখে আসিতেছে; অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা চলিতে থাকিবে। ইহা একটি সুবৃহৎ ব্যায়ামাগার তুল্য; এখানে আমাকে আপনাকে ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে আসিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে এবং নিজদিগকে সরল ও দোষশূন্য করিয়া লইতে হইবে। জগৎ এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ যে ত্রুটিহীন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না বা জগতে দুঃখের ব্যবস্থা করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, তাহা নয়।

আপনারা সেই ধর্মযাজক ও তরুণীর কাহিনী স্মরণ করুন; একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উভয়েই চন্দ্র অবলোকন করিয়া

কলঙ্করেখাগুলি দেখিতে পাইলেন। ধর্মযাজক বলিলেন, ‘ওইগুলি নিশ্চয়ই গীর্জার চূড়া।’ তরুণী বলিলেন, ‘বাজে কথা, ওরা নিশ্চয়ই চুম্বনরত তরুণ প্রণয়িযুগল।’ এই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের দর্শনও অনুরূপ। আমরা যখন জগতের ভিতরে থাকি, তখন মনে করি, উহার অন্তর্ভাগ দেখিতেছি। আমরা জীবনের যে স্তরে থাকি, তদনুযায়ী বিশ্বকে দেখি। রান্নাঘরের অগ্নি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন এই অগ্নি আপনার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, তখন আপনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন, ‘অগ্নি কত ভাল!’ অগ্নি যখন আপনার আঙুল দগ্ধ করে, তখন আপনি বলেন, ‘ইহা কি জঘন্য!’ ঠিক একইভাবে এবং সমযুক্তিসহায়ে এ-কথা বলা যায়, ‘এই বিশ্ব ভালও নয়, মন্দও নয়।’ এই সংসারটি সংসার ছাড়া আর কিছু নয়; এবং চিরকাল তাহাই থাকিবে। যখনই আমরা নিজদিগকে ইহার নিকট এমনভাবে খুলিয়া ধরিতে পারি যে, জাগতিক কার্যাবলী আমাদের অনুকূল হয়, তখন আমরা ইহাকে ভাল বলি। আবার যদি আমরা নিজেদের এমন অবস্থায় উপস্থাপিত করি যে, ইহা আমাদের দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দেয়, তাহা হইলে ইহাকে আমরা মন্দ বলি। ঠিক এইভাবে আপনারা সর্বদাই দেখিতে পাইবেন, নির্দোষ ও আনন্দময় যে শিশুর মনে কাহারও প্রতি কোন অনিষ্টচিন্তা জাগ্রত হয় নাই, তাহারা আশাবাদী হয়, তাহারা সোনার স্বপ্ন দেখে। এদিকে যেসব বয়স্ক ব্যক্তির অন্তর বাসনায় পূর্ণ, অথচ উহা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ যাহারা সংসারে প্রচুর ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তিত হইয়াছে, তাহারা নৈরাশ্যবাদী হয়। ধর্ম সত্যকে জানিতে চায়; এবং প্রথম যে তত্ত্ব সে আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা হইল এই—সত্যের অনুভূতি ব্যতীত বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই।

আমরা যদি লোকাতীতকে জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইবে, মানব-জন্ম বৃথা যাইবে। ‘বর্তমানের বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাক’—ইহা বলিতে বেশ। গাভী, কুকুর এবং অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া সম্ভব, এবং এই সন্তোষই তাহাদের পশু করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং মানুষ যদি বর্তমানেই সন্তুষ্ট থাকে এবং লোকাতীতের উদ্দেশ্যে সমস্ত অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে মানুষকে পুনরায় পশুত্বের স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই ধর্ম, এই লোকাতীতের জন্য অনুসন্ধিৎসাই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। এ-কথাটা বেশ বলা হইয়াছে যে, মানুষই একমাত্র জীব যে স্বভাবতঃ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে, অন্যান্য প্রাণী স্বভাব-বশেই নিম্নদৃষ্টি। এই যে ঊর্ধ্বদৃষ্টি এবং ঊর্ধ্বাভিমুখে গতি ও পূর্ণতালাভের আকূতি—ইহাকেই মুক্তি বলা হয়, এবং যত শীঘ্র মানুষ ঊর্ধ্বস্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে, তত শীঘ্রই সে এইরূপ ধারণায় উপনীত হয় যে, মুক্তি বলিতে সত্যকেই বুঝায়। তোমার পকেটে কত টাকা আছে, কিংবা তুমি কিরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতেছ—কিংবা কি প্রকার গৃহে বাস করিতেছ, তাহার উপর মুক্তি নির্ভর করে না, নির্ভর করে তোমার মস্তিষ্কে কতটুকু অধ্যাত্ম-চিন্তা আছে, তাহার উপর। ইহারই ফলে মানুষের উন্নতি হয়, ইহাই জড়জগতে ও বুদ্ধিজগতে সর্বপ্রকার উন্নতির উৎস; ইহাই সেই মৌলিক আকূতি, সেই উৎসাহ যাহা মানুষকে প্রগতির পথে পরিচালিত করে।

তাহা হইলে মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? সুখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগই কি লক্ষ্য? পুরাকালে বলা হইত, মানুষ স্বর্গে গিয়া তুরী নিনাদ করিবে এবং রাজ-সিংহাসনের নিকটে বাস করিবে। বর্তমান যুগে দেখিতেছি, এই ধারণাকে অতি হীন বলিয়া মনে করা হয়। বর্তমান যুগে এই ধারণাটির উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে এবং বলা হয় যে, স্বর্গে সকলেই বিবাহ করিতে পাইবে এবং ঐ জাতীয় সবকিছুই সেখানে পাইবে। এই দুইটি ধারণার মধ্যে যদি কোনটির অগ্রগতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টির অগ্রগতি হইয়াছে মন্দেরই দিকে। স্বর্গ সম্পর্কে এই যে-সকল ধারণা উপস্থাপিত করা হইল, তাহা মনের দুর্বলতারই পরিচায়ক। এবং এই দুর্বলতার কারণঃ প্রথমতঃ মানুষ মনে করে, ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের লক্ষ্য; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত কোন বস্তুর ধারণা সে করিতে পারে না। এই মতবাদীরা প্রয়োজনবাদীদের মতই যুক্তিহীন। তথাপি ইহারা অন্ততঃপক্ষে আধুনিক নাস্তিক প্রয়োজনবাদীদের তুলনায় অনেক ভাল। পরিশেষে বলিতে হয়, প্রয়োজনবাদীদের এই মতবাদটি বালকোচিত। আপনার এ-কথা বলিবার কি অধিকার আছে যে, ‘এই আমার বিচারের মাপকাঠি এবং সমগ্র বিশ্বকে এই বিচারের মাপকাঠি অনুযায়ী চলিতে হইবে?’ যে মাপকাঠির শিক্ষা হইল—শুধু অন্ন, অর্থ ও পোষাকই ঈশ্বর, সেই মাপকাঠি দ্বারা সকল সত্যকেই বিচার করিতে হইবে, এইরূপ বলিবার আপনার কি অধিকার আছে?

ধর্ম কোন খাদ্যের মধ্যে বা বাসস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আপনারা প্রায়ই এবংবিধ সমালোচনা শুনিতে পান যে, ‘ধর্ম আবার মানুষের কি হিতসাধন করিতে পারে? ইহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে, তাহাদিগকে পরিধানের বস্ত্র দিতে পারে?’ ধরুন ধর্ম তাহা পারে না, ইহা দ্বারাই কি ধর্মের অসত্যতা প্রমাণিত হইবে? ধরুন জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইতেছে, এমন সময় আপনাদের মধ্যে একটি শিশু উঠিয়া প্রশ্ন করিল, ‘এই তত্ত্ব কি কোন ভাল খাবার উৎপন্ন করিতে পারিবে?’ আপনি হয়তো বলিলেন, ‘না, পারে না।’ শিশুটি তখন বলিল, ‘তাহা হইলে ইহা নিরর্থক।’ শিশুরা সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখে—অর্থাৎ খাবার প্রস্তুতের দৃষ্টি দিয়া; আর এই সংসারে যাহারা শিশুসম, তাহারাও এইরূপ করে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এ-কথা বলিতে দুঃখ হয় যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যাঁহাদিগকে পণ্ডিত, সর্বাধিক যুক্তিবাদী, সর্বাপেক্ষা ন্যায়কুশল এবং সর্বোত্তম মনীষাসম্পন্ন বলিয়া আমরা জানি, এই-সব ব্যক্তি ঐ শিশুদেরই মধ্যে পরিগণিত। উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আমাদের এই হীন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা সঙ্গত নয়। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজস্ব মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে হইবে এবং অসীমকে অসীমেরই মান অনুসারে পরীক্ষা করিতে হইবে—অনন্তের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হইবে। ধর্ম মানুষের সমগ্র জীবন, শুধু বর্তমান নয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র জীবনধারাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব ধর্ম হইল সনাতন আত্মার সহিত সনাতন ঈশ্বরের শাশ্বত সম্পর্ক। পাঁচ মিনিটের মানব-জীবনের উপর ইহা কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে, তাহা দেখিয়া ইহার মূল্যনির্ধারণ করা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? কখনই নয়। এগুলি সমস্তই নেতিবাচক যুক্তি।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—ধর্ম কি মানুষের জন্য সত্যই কিছু করিতে পারে? পারে। ধর্ম কি সত্যই মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে? অবশ্যই পারে। ধর্ম সর্বদাই তাহা করে, এবং তদপেক্ষা অনেক বেশী কিছু করেঃ ইহা মানুষকে অনন্ত মহাজীবন আনিয়া দেয়। ইহা মানুষকে মানুষ করিয়াছে, এবং এই পশুমানবকে দেবত্বে উন্নীত করিবে। ইহাই হইল ধর্মের ফল। মানব-সমাজ

হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। যেহেতু এইমাত্র আমি তোমাদের নিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-সুখকে মানবজীবনের লক্ষ্য মনে করা অসম্ভব, সেহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেছি যে, জ্ঞানই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। আমি আপনাদের ইহাও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, এই সহস্র বৎসর ধরিয়া সত্যানুসন্ধানের জন্য এবং মানব-কল্যাণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিতে পারিয়াছি—খুবই অল্প। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের অভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। জৈব-ভোগের ব্যবস্থা করাকেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা বলা চলে না; পরন্তু পশু-মানব হইতে দেবতার সৃষ্টি করাই হইবে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অতঃপর জ্ঞানলাভ হইলে উহা হইতে স্বভাবতই পরমানন্দ আবির্ভূত হয়। শিশুগণ মনে করে, ইন্দ্রিয়সুখই হইল তাহাদের লভ্য সুখগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনারা প্রায় সকলেই জানেন যে, মানবজীবনে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ অপেক্ষা বুদ্ধিজ সম্ভোগ অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ। কুকুর আহার করিয়া যে আনন্দ পায়, আপনারা কেহ তাহা পাইবেন না। আপনারা সকলেই ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন। মানুষের মধ্যে কোথা হইতে তৃপ্তিবোধ জাগ্রত হয়? আহার হইতে শূকর বা কুকুর যে আনন্দ পায়, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। লক্ষ্য করুন—শূকর কিভাবে আহার করে। সে যখন খায়, তখন সমগ্র বিশ্ব ভুল হইয়া যায়; তাহার গোটা মন ঐ আহারের মধ্যে ডুবিয়া যায়। আহার-গ্রহণকালে তাহাকে হত্যা করিলেও সে গ্রাহ্য করিবে না। ভাবিয়া দেখুন, ঐ কালে শূকরটির আনন্দসম্ভোগ কত তীব্র। কোন মানুষেরই এই তীব্র সম্ভোগানুভূতি নাই। মানুষের সে অনুভূতি কোথায় গেল? মানুষ ইহাকে বুদ্ধিজ ভোগে পরিণত করিয়াছে। শূকর ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা উপভোগ করিতে পারে না। বুদ্ধিসাহায্যে উপভোগ অপেক্ষাও উহা উচ্চতর ও তীব্রতর স্তরে ঘটিয়া থাকে; ইহাই হইল আধ্যাত্মিক স্তর, ইহাই ঐশী বস্তুর আত্মিক সম্ভোগ, ইহা বুদ্ধি ও যুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের এই-সকল ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। জীবনে ইহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহা আমি উপভোগ করিতে পারি, অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে; এবং ইহারই দিকে আমরা সকলে ধাবমান। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণের ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তা হইতে অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখি যে, মানুষ তাহার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও আধ্যাত্মিক স্বরূপ হইতে অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই অনুভূতির সহিত আনন্দলাভও হইবে। এই জগৎ—এই যে-সকল দৃশ্যমান বস্তু—এ-সকল তো সেই প্রকৃত সত্য এবং আনন্দের ছায়ামাত্র, উহার তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের নিম্নতর বিকাশমাত্র।

মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া এই পরমানন্দই তোমাদের নিকট আসে; মানবীয় ভালবাসা এই আধ্যাত্মিক আনন্দেরই ছায়ামাত্র, কিন্তু মানবীয় আনন্দের সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলিও না। এই একটি বড় রকমের ভুল সর্বদাই হইতেছে। আমরা প্রতিমুহূর্তে আমাদের এই দৈহিক ভালবাসা, এই মানবীয় প্রেম, এই তুচ্ছ সসীমের প্রতি আকর্ষণ, সমাজের অন্তর্গত অপরাপর মানুষের প্রতি এই বিদ্যুৎসদৃশ আকর্ষণকে আমরা সর্বদাই পরমানন্দ বলিয়া ভুল করিতেছি। আমরা ইহাকেই সেই শাশ্বত বস্তু বলিয়া অভিহিত করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে ইহা সেই বস্তু নয়। ইহার ঠিক কোন সমার্থক শব্দ ইংরেজী ভাষায় না থাকায়, আমি ইহাকে bliss বা পরমানন্দ বলিব। এই পরমানন্দ শাশ্বত জ্ঞানের সহিত অভিন্ন এবং ইহাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্বের যেখানে যত ধর্ম আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে, সকলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং হইবে। এই পাশ্চাত্য দেশে তোমরা যাহাকে দিব্য প্রেরণা বল, তাহাও এই উৎস ভিন্ন আর কিছু নয়। এই প্রেরণার স্বরূপ কি? প্রেরণাই ধর্মানুভূতির একমাত্র উৎস। আমরা দেখিয়াছি, ধর্ম অতীন্দ্রিয় স্তরের বস্তু। ধর্ম সেই বস্তু 'যেখানে চক্ষু বা কর্ণ গমন করিতে পারে না, মন যেখানে পৌঁছাইতে পারে না, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।' ইহাই ধর্মের ক্ষেত্র এবং লক্ষ্য; যাহাকে আমরা প্রেরণা নামে অভিহিত করিতেছি, তাহাও এখান হইতে উদ্গত হয়। অতএব স্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ইন্দ্রিয়াতীত লোকে পৌঁছিবার কোন না কোন পথ অবশ্যই আছে। ইহা সম্পূর্ণ সত্যকথা যে, যুক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিতে পারে না, সমস্ত যুক্তি ইন্দ্রিয়ের পরিধির মধ্যে, ইন্দ্রিয়বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ইন্দ্রিয়গুলি যে-সকল তথ্যে উপস্থিত হইতে পারে, যুক্তি তাহারই ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। কোন মানুষ কি ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে? কোন মানুষ কি এই অজ্ঞেয়কে জানিতে পারে? এই একটি প্রশ্নের ভিত্তিতেই ধর্মসম্বন্ধীয় সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, ইতঃপূর্বে তাহাই করা হইয়াছে। স্মরণাতীতকাল হইতেই সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর—ইন্দ্রিয়ের বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে; স্মরণাতীত কাল হইতে শত-সহস্র নরনারী এই প্রাচীর ভেদ করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকৃতকার্য হইয়াছে; অপরদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কৃতকার্যও হইয়াছে। ইহাই হইল এই জগতের ইতিহাস। আবার আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, যাহারা এ-কথা বিশ্বাস করে না যে, সত্যই কেহ কখনও কৃতকার্য হইয়াছে। ইহারাই পৃথিবীর আধুনিক সন্দেহবাদী (sceptics)। মানুষ চেষ্টা করিলেই এই প্রাচীর ভেদ করিতে পারে। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র যে যুক্তি আছে তাহা নয়, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সমূহ আছে তাহা নয়—তাহার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। আমরা এ-কথা একটু ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। আশা করি, তোমরাও অনুভব করিতে পারিবে যে, ইহা তোমাদের মধ্যেও আছে।

আমি যখন আমার হস্ত সঞ্চালন করি—তখন অনুভব করি এবং জানি যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি। ইহাকে আমরা চেতনা বলি। আমি এ বিষয়ে সচেতন যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি। আমার হৃৎপিণ্ডও স্পন্দিত হইতেছে। সে বিষয়ে আমি সচেতন নই; তথাপি আমার হৃৎপিণ্ড কে সঞ্চালন করিতেছে? ইহাও অবশ্য সেই একই সত্তা হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যে-সত্তা হস্ত-সঞ্চালন ঘটাইতেছে, বাক্যস্ফুরণ করাইতেছে, অর্থাৎ সচেতন কর্ম সম্পন্ন করিতেছে, তাহাই অচেতন কার্যও সম্পন্ন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই সত্তা উভয় স্তরেই কার্য করিতে পারে—একটি চেতনার স্তর, অপরটি তাহার নিম্নবর্তী স্তর। অবচেতন-স্তর হইতে যে-সকল সঞ্চালন ঘটে, সেগুলিকে আমরা সহজাতবৃত্তি নামে অভিহিত করি; এবং যখনই সেই সঞ্চালন চেতনার স্তর হইতে ঘটে, আমরা তাহাকে যুক্তি বলি। কিন্তু আর একটি উচ্চতর স্তর আছে, তাহা মানুষের অতি-চেতন স্তর। ইহা আপাততঃ অচেতন অবস্থার তুল্য, কারণ ইহা চেতন স্তরের অতীত; বস্তুতঃ ইহা চেতনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত, নিম্নে নয়। ইহা সহজাত-বৃত্তি নয়, ইহা 'দিব্য প্রেরণা।' ইহার সপক্ষে প্রমাণ আছে। সমগ্র জগতে যে সকল অবতার পুরুষ ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করুন; ইহা সর্বজনবিদিত যে, তাঁহাদের জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসিয়াছে, যখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে বাহ্যজগৎ সম্পর্কে অচেতন বলিয়া মনে হয়; অতঃপর তাঁহাদের ভিতর হইতে যে জ্ঞানরাশি

উৎসারিত হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, উহা তাঁহারা অতিচেতন স্তর হইতে পাইয়াছেন। সক্রেটিস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি যখন একদা সৈনিকদলের সহিত চলিতেছিলেন, তখন অতি সুন্দর সূর্যোদয় হইয়াছিল, ঐ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে কি এক চিন্তাপ্রবাহ শুরু হইল, যাহাতে তিনি উক্ত স্থানে রৌদ্রের মধ্যে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া একাদিক্রমে দুইদিন দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সকল মুহূর্তই জগৎকে সক্রেটিসীয় জ্ঞান প্রদান করিয়াছে। এইরূপে জগতের যাবতীয় অবতার ও সাধক পুরুষদের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন তাঁহারা চেতন-স্তর হইতে উঠিয়া ঊর্ধ্বতন স্তরে আরোহণ করেন এবং যখন তাঁহারা পুনরায় চেতনার স্তরে আগমন করেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া আসেন এবং সেই সর্বাতীত লোকের সংবাদ প্রদান করেন। ইঁহারাই জগতের দিব্যভাবে আরূঢ় ঋষি।

কিন্তু এখানে একটি বড় বিপদ রহিয়াছে। অনেকেই দাবী করিতে পারেন যে, তাঁহারা দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত; প্রায়ই এইরূপ দাবী শোনা যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষার উপায় কি? নিদ্রার সময় আমরা অচেতন থাকি; ধরুন—একটি মূর্খ নিদ্রামগ্ন হইল, তিন ঘণ্টা তাহার সুনিদ্রা হইল; যখন সে উক্ত অবস্থা হইতে ফিরিল, সে যে বোকা সে বোকাই রহিয়া গেল, যদি না তাহার আরও অবনতি হইয়া থাকে। এদিকে নাজারেথের যীশু দিব্যভাবে আরূঢ় হইলেন; তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তিনি যীশুখ্রীষ্টে পরিণত হইয়া গেলেন। এখানেই যা কিছু প্রভেদ। একটি হইল দিব্য প্রেরণা, অপরটি হইল সহজাত প্রবৃত্তি। একজন শিশু, অপরজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই দিব্য প্রেরণা আমরা যে কেহ লাভ করিতে পারি; ইহা যাবতীয় ধর্মের উৎপত্তিস্থল এবং চিরকাল ধরিয়া ইহা উচ্চতর জ্ঞানের উৎস হইয়া থাকিবে। তথাপি এ পথে বহু বিপদের সম্ভাবনা। অনেক সময়েই ভণ্ডব্যক্তি জনসমাজকে প্রতারিত করিতে চায়। বর্তমান যুগে ইহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমার জনৈক বন্ধুর একখানি চমৎকার চিত্রপট ছিল, অপর একজন অনেকাংশে ধর্মভাবাপন্ন অথচ ধনী ভদ্রলোকের উহার উপর লোভ ছিল; কিন্তু আমার বন্ধু উহা বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অপর ভদ্রলোকটি একদিন আমার বন্ধুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আমি দৈব প্রেরণা লাভ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি।' আমার বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, 'ভগবানের নিকট হইতে আপনি কি আদেশ পাইয়াছেন?' 'আদেশটি এই যে, আপনাকে এই চিত্রটি আমায় অর্পণ করিতে হইবে।' আমার বন্ধুও ধূর্ততায় তাঁহার সমান; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ঠিক কথা; কি চমৎকার! আমিও ঠিক অনুরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, ছবিখানি আপনাকে দিতে হইবে। আপনি কি টাকাটা আনিয়াছেন?' 'টাকা? কিসের টাকা?' আমার বন্ধু বলিলেন, 'তাহা হইলে আপনার প্রত্যাদেশ ঠিক বলিয়া আমি মনে করি না। আমি যে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে-ব্যক্তি একলক্ষ ডলার মূল্যের চেক দিবে, তাহাকেই যেন চিত্রখানি আমি দিই। আপনাকে নিশ্চয়ই চেকখানি আগে আনিতে হইবে।' অপর ব্যক্তি দেখিলেন, তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। তখন তিনি প্রত্যাদেশের কথা পরিহার করিলেন। এই হইল বিপদ। বোষ্টন শহরে একদা এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল, তাহার এমন এক দৈবদর্শন হইয়াছে, যাহাতে তাহার সহিত হিন্দু-ভাষায় কথা বলা হইয়াছে। তখন আমি বলিলাম, 'যে যে কথা শুনিয়াছেন, সেগুলি শুনিলে আমি বিশ্বাস করিব।' কিন্তু ঐ ব্যক্তি কতগুলি অর্থহীন কথা লিখিল। আমি তাহা অনুধাবন করিবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সফল হইলাম না। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার জ্ঞানমতে এইরূপ ভাষা ভারতবর্ষে কখনও ছিল না, কখনও হইবে না। তাহারা এখনও এরূপ ভাষা লাভ করিবার মত যথেষ্ট সুসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে অবশ্য সে মনে করিল যে, আমি ভাল লোক নই এবং সংশয়বাদী; সুতরাং সে প্রস্থান করিল। ইহার পর যদি আমি শুনিতে পাই যে, ঐ ব্যক্তি উন্মাদাগারে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে বিস্মিত হইব না। সংসারে এই দুই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা সর্বদাই রহিয়াছে—এই বিপদ আসে হয় ভণ্ডদের নিকট হইতে, অথবা মূর্খদের নিকট হইতে। কিন্তু এজন্য আমাদের দমিয়া যাওয়া উচিত নয়, কারণ জগতে যে-কোন মহৎ বস্তুলাভের পথই বিপদাকীর্ণ। কিন্তু আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক সময় দেখিতে পাই, অনেক ব্যক্তি যুক্তি-অবলম্বনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অক্ষম। কেহ হয়তো আসিয়া বলিল, 'আমি এই দেবতার নিকট হইতে এই বাণী লাভ করিয়াছি' এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? ইহা কি সম্ভব নয় যে, এরূপ দেবতা আছেন এবং তিনি এরূপ আদেশ দিয়া থাকেন?' শতকরা নব্বইজন মূর্খ এ কথা গলাধঃকরণ করিয়া লইবে। তাহারা মনে করে যে, ঐরূপ যুক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু একটি কথা আপনাদের জানা উচিত, যে-কোন ঘটনাই সম্ভবপর হইতে পারে; এবং ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, লুব্ধক নক্ষত্রের সংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবী আগামী বৎসরে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমি যদি এইরূপ সম্ভাবনা উপস্থাপিত করি, তবে আপনাদেরও অধিকার আছে যে, আপনারা আমাকে ইহা প্রমাণ করিতে বলিবেন। আইনজ্ঞেরা যাহাকে বলেন, 'প্রমাণ করার দায়িত্ব', সে দায়িত্ব তাহার উপরই বর্তাইবে, যে ঐ জাতীয় মতবাদ উপস্থিত করিবে। যদি আমি কোন দেবতার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমার, আপনার নহে, কারণ আমিই আপনাদের সম্মুখে প্রকল্পটি উপস্থিত করিয়াছি। যদি আমি ইহা প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জিহ্বাকে শাসন করা উচিত ছিল। এই উভয় বিপদকে পরিহার করুন, তারপর আপনি যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন। আমরা জীবনে অনেক দৈববাণী শুনিয়া থাকি, অথবা মনে করি যে, শুনিতে পাইলাম; যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি আপনাদের নিজেদের বিষয় হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; কিন্তু সেইগুলি যদি অপরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বা অপরের প্রতি আচরণ বিষয়ে হয়, তবে সে সম্পর্কে কিছু করিবার পূর্বে একশ-বার বিবেচনা করিয়া দেখুন; তাহা হইলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমরা দেখিলাম যে, দিব্য প্রেরণা ধর্মের উৎস; অথচ উহা নানা বিপদাকীর্ণ। সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিপদ হইল অতিরিক্ত দাবী। এমন লোকও আছেন, অকস্মাৎ যাঁহাদের অভ্যুদয় হয়, আর তাঁহারা বলেনঃ ভগবানের নিকট হইতে তাঁহারা বার্তা লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা সর্বশক্তিমান্ ভগবানের বাণীই উচ্চারণ করিতেছেন এবং অপর কাহারও ঐরূপ বার্তালাভের অধিকার নাই। শুনিলেই মনে হয়, উহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এই বিশ্বে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উহা সকলের পক্ষে সমভাবে থাকা উচিত। এই বিশ্বে এমন কোন স্পন্দনই নাই, যাহা বিশ্বজনীন নয়, কারণ সমগ্র বিশ্বই নিয়মের অধীন। ইহা আগাগোড়া বিধিবদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই কোথাও যদি কোন কিছু থাকে তো তাহার সর্বত্র থাকার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার সূর্য ও নক্ষত্রাদি যেভাবে গঠিত, একটি অণুও সেইভাবে গঠিত। যদি কখনও কেহ দিব্যভাবে অনুপ্রেরিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই দিব্য-প্রেরণার সম্ভাবনা আছে। আর ইহাই হইল ধর্ম। এই-সকল বিপদ্-বিভ্রম, প্রহেলিকা ও

ভণ্ডামি এবং অতিরিক্ত দাবী পরিহার করুন; ধর্মতথ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করুন, এবং ধর্মবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসুন। ধর্ম মানে কতকগুলি মতবাদ ও বিধিনিষেধ স্বীকার করা, বিশ্বাস করা, গীর্জা বা মন্দিরে যাওয়া অথবা কোন বিশেষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করা নয়। আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? আপনার কি আত্মদর্শন হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, আপনি কি সেজন্য প্রয়াস করিতেছেন? ইহা এখনই—এই বর্তমানেই লভ্য, ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। ভবিষ্যৎ তো সীমাহীন বর্তমান ব্যতীত আর কিছু নয়। যাবতীয় সময় একটি মুহূর্তের পুনরাবর্তন ব্যতীত আর কি? ধর্ম এখানে এখনই আছে, এই বর্তমান জীবনেই রহিয়াছে।

আর একটি প্রশ্ন এইঃ মানব জীবনের লক্ষ্য কি? বর্তমানে প্রচার করা হইতেছে যে, মানুষ ক্রমেই উন্নত হইতেছে; অনন্ত প্রগতি-পথের সে যাত্রী; এই উন্নতিলাভের কোন নির্দিষ্ট সীমা বা লক্ষ্য নাই। সর্বদা সে কোন কিছুর দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, অথচ লক্ষ্যে সে কোন কালেই পৌঁছিবে না—এ-কথার অর্থ যাহাই হউক, ইহা যত বিস্ময়করই হউক না কেন, শুনিলেই মনে হয় ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার। সরলরেখা অবলম্বনে কোন প্রকার গতি কি সম্ভব হয়? কোন সরলরেখাকে অনন্তরূপে প্রসারিত করিলে ঐ রেখাটি এক বৃত্তে পরিণত হয়, যেখান হইতে রেখাটি প্রসারিত হইয়াছিল, আবার সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। এবং যেহেতু ঈশ্বর হইতেই আপনার যাত্রারম্ভ হইয়াছে, সেহেতু তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে আর কি রহিল? রহিল আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি। অনন্তকাল ধরিয়া আপনাকে এই-সকল আনুষঙ্গিক কর্ম করিয়া যাইতে হইবে।

আরও একটি প্রশ্ন আছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে কি নূতন নূতন ধর্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে? হাঁ-ও বটে, না-ও বটে। প্রথমতঃ ধর্ম সম্বন্ধে আর নূতন কিছু জানা সম্ভব নয়; তাহার সবটুকুই জানা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেখা যায়, এই দাবী করা হইয়াছে যে, আমাদেরই মধ্যে কোথাও একটি মিলন-ভূমি আছে। যেহেতু ঈশ্বরের সহিত আমরা অভিন্ন, অতএব ঐ অর্থে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। জ্ঞানের অর্থই হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দর্শন করা। আমি আপনাদিগকে বিভিন্ন নর-নারীরূপে দেখিতেছি—ইহাই বৈচিত্র্য। যখন আপনাদের সকলকে গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া একত্র মানব বলিয়া ভাবিব, তখনই তাহা বিজ্ঞান-জাতীয় জ্ঞানে পরিণত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রসায়ন-বিজ্ঞানের কথা ধরুন; রাসায়নিকেরা সমগ্র জ্ঞাত বস্তুকে মূল ভৌতিক উপাদানে পরিণত করিতে সচেষ্ট আছেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহারা এমন একটিমাত্র পদার্থ আবিষ্কার করিতে চান, যাহা হইতে এই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি দেখান যাইতে পারে। হয়তো এমন সময় আসিবে, যখন তাঁহারা উহা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। উহাই হইবে সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান। সেখানে উপনীত হইলে তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়ন-বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। আমরা যদি এই পূর্ণ ঐক্য আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে আর অধিকতর উন্নতি সম্ভব হইবে না। যখন আবিষ্কৃত হইল, 'আমি ও আমার পিতা অভিন্ন' তখনই ধর্ম সম্বন্ধে শেষকথা বলা হইয়া গিয়াছে—তারপর বাকী রহিল শুধু খুঁটিনাটি। প্রকৃত ধর্মে—অন্ধবিশ্বাসবশতঃ কোন কিছু বিশ্বাস করা বা মানিয়া লওয়ার স্থান নাই। কোন ধর্মপ্রচারক মহাত্মা এরূপ প্রচার করেন নাই। অধঃপতনের সময়ে ইহা আসিয়া জোটে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা কোন কোন ধর্মনেতাদের অনুসরণকারী বলিয়া ভান করে, এবং তাঁহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহারা মানবসমাজকে অন্ধবিশ্বাস শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। কি বিশ্বাস করিবে তাহারা? অন্ধবিশ্বাস করার অর্থ হইল মানবাত্মার অধঃপতন। নাস্তিক হইতে চাও তো তাহাই হও; কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না। মানবের আত্মাকে পশুত্বের স্তরে নামাইবে কেন? তোমরা যে ইহাতে শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছ তাহা নয়, তোমরা সমাজেরও ক্ষতি করিতেছ, এবং যাহারা তোমাদের পরে আসিবে, তাহাদের পথ বিপদসঙ্কুল করিতেছ। উঠিয়া দাঁড়াও, বিচার কর, অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্তী হইও না। ধর্মের অর্থ হইল—তদাকারকারিত হওয়া বা হইতে চেষ্টা করা, শুধু বিশ্বাস করা নয়। ইহাই ধর্ম; আর তুমি যখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখনই ধর্মলাভ করিবে। তাহার পূর্বে তুমি পশু অপেক্ষা উচ্চতর নও। মহাত্মা বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'শুনিবামাত্র কিছু বিশ্বাস করিও না; বংশানুক্রমে কোন মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিও না; অপরে যেহেতু নির্বিচারে বিশ্বাস করিতেছে, সেহেতু কোন কিছুতে আস্থা স্থাপন করিও না; কোন এক প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন বলিয়া কোন কিছু মানিয়া লইও না; যে-সকল তত্ত্বের সহিত নিজেকে অভ্যাসবশে জড়াইয়া ফেলিয়াছ, তাহাতে বিশ্বাস করিও না; শুধু আচার্য ও গুরুবাক্যের প্রমাণবলে কোন কিছু মানিয়া লইও না। বিচার ও বিশ্লেষণ কর, এবং যখন ফলগুলি যুক্তির সহিত মিলিয়া যাইবে, এবং সকলের পক্ষে হিতকারী হইবে, তখন তাহা গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন কর।'

ধর্মসাধনা

আমরা বহু গ্রন্থ, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকি। শিশুকাল হইতেই আমরা বিবিধ ভাব আহরণ করি এবং প্রায়ই ভাবের পরিবর্তনও করি। তত্ত্বের দিক্ হইতে 'ধর্ম' কাহাকে বলে, তাহা আমাদের জানা আছে। আমরা মনে করি, ধর্মের প্রয়োগের দিকও বুঝি। এখানে আমি আপনাদের নিকট 'কর্মে পরিণত ধর্ম' সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণা উপস্থিত করিব।

আমরা চারিদিকে প্রয়োগমূলক ধর্মের কথা শুনিতে পাই, এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া এই কয়টি মূল কথায় পরিণত করা যায়ঃ আমাদের সমশ্রেণীর জীবনের প্রতি করুণা করিতে হইবে। উহাই কি ধর্মের সবটুকু? এই দেশে প্রতিদিন আমরা কার্যে পরিণত খ্রীষ্টধর্মের কথা শুনিয়া থাকি; শুনিতে পাই—কোন ব্যক্তি তাহার সমশ্রেণীর জীবদের জন্য কোন হিতকর কার্য করিয়াছে। উহাই কি সব?

জীবনের লক্ষ্য কি? এই ঐহিক জগৎই কি জীবনের লক্ষ্য? আর কিছুই কি নয়? আমরা যেরূপ আছি, আমাদের কি সেরূপই থাকিতে হইবে, আর বেশী কিছু নয়? মানুষকে কি শুধু এমন একটি যন্ত্রে পরিণত হইতে হইবে, যাহা কোথাও বাধা না পাইয়া সাবলীল গতিতে চলিতে পারে? এবং আজ সে যে দুঃখের ভাগ ভোগ করিতেছে, তাহাই কি শেষ প্রাপ্য, সে কি আর কিছুই চায় না?

বহু ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ কল্পনা—ঐহিক জগৎ। বিশাল জনসমষ্টি এমন এক সময়েরই স্বপ্ন দেখিতেছে, যখন কোন রোগ, অসুস্থতা, দারিদ্র্য বা অপর কোন প্রকার দুঃখ এ জগতে আর থাকিবে না। সর্বতোভাবে তাহারা কেবল সুখময় জীবন উপভোগ করিবে। সুতরাং 'কার্যে পরিণত ধর্ম' বলিতে শুধু এইটুকু বুঝায়, 'পথঘাট পরিষ্কার রাখ, আরও সুন্দর পথঘাট নির্মাণ কর।' সকলে ইহাতে কত আনন্দ পায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যায়। ভোগই কি জীবনের লক্ষ্য? তাহাই যদি হইত, তবে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করা একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। কুকুর কিংবা বিড়াল যে লোলুপতার সহিত আহার্য উপভোগ করে, কোন মানুষ অধিকতর আগ্রহের সহিত তাহা পারে কি? আবদ্ধ বন্যপশুদের প্রদর্শনীতে গিয়া দেখ—পশুগণ কিরূপে হাড় হইতে মাংস ছিন্ন করিতেছে। উন্নতির বিপরীত দিকে চলিয়া পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ কর। মানুষ হইয়া কি ভুলই না হইয়াছে! যে বৎসরগুলি—যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমি শুধু এই ইন্দ্রিয়ভোগে পরিতৃপ্ত মানুষ হইবার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছি, (ঐ দৃষ্টিতে) তাহা বৃথাই গিয়াছে!

তাহা হইলে বাস্তব ধর্মের অর্থটি কি দাঁড়ায় এবং উহা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখ। দান করা খুব ভাল কথা, কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি বলিবে 'উহাই সব', তখনই তোমার জড়বাদীর দলে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা ধর্ম নয়, ইহা নাস্তিকতা অপেক্ষা কিছু ভাল নয়, বরং অপকৃষ্ট। তোমরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, তোমরা কি সমগ্র বাইবেল পড়িয়া অপরের জন্য কর্ম করা, কিংবা আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করা ব্যতীত অন্য কিছুই খুঁজিয়া পাও নাই? কেহ হয়তো দোকানদার; সে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবে, যীশু দোকানী হইলে কিভাবে দোকান চালাইতেন! যীশু কখনও ক্ষৌরালয় বা দোকান চালাইতেন না, কিংবা সংবাদপত্রও সম্পাদনা করিতেন না। ঐ ধরনের কার্যকর ধর্ম ভাল বটে, মন্দ নয়; কিন্তু ইহা শিশুবিদ্যালয়ের স্তরের ধর্ম। ইহা আমাদের কোন লক্ষ্যে লইয়া যাইতে পারে না। তোমরা যদি সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, যদি সত্যই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হও এবং বারংবার উচ্চারণ কর 'প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', তবে ভাবিয়া দেখ, ঐ কথাটার তাৎপর্য কি? যখনই তোমরা বল 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', তখন সত্য কথা বলিতে গেলে তোমরা বলিতে চাও 'হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা তোমার দ্বারা পূর্ণ হউক।' সেই অনন্ত পরমাত্মা তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন বলিতে চাই—তিনিও ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, আমাকে ও তোমাকে তাহা সংশোধন করিতে হইবে। এই বিশ্বের যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁহাকে কিনা কতকগুলি সূত্রধর শিক্ষা দিবে? তিনি জগৎকে একটি আবর্জনার স্তূপরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন তুমি তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইবে?

এ সকলের (কর্মের) লক্ষ্য কি? ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি কখনও লক্ষ্য হইতে পারে? সুখ-সম্ভোগ কি কখনও লক্ষ্য হইতে পারে? ঐহিক জীবন কি কখনও আত্মার লক্ষ্য হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বরং এই মুহূর্তে মরিয়া যাওয়া শ্রেয়, তবু ঐহিক জীবন চাওয়া উচিত নয়। ইহাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় যে, সে একটি ত্রুটিহীন যন্ত্রে পরিণত হইবে, তাহা হইলে তাহার তাৎপর্য হইল এইঃ আমরা পুনরায় বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতিতে পরিণত হইতে যাইতেছি। তুমি কি কখনও গাভীকে মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ, কিংবা বৃক্ষকে চুরি করিতে দেখিয়াছ? তাহারা নিখুঁত যন্ত্র। তাহারা ভুল করে না, তাহারা এমন জগতে বাস করে, যেখানে সব কিছুই নিয়মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ফেলিয়াছে। এই বাস্তব ধর্মকে যদি আদর্শ ধর্ম বলা না চলে, তবে আদর্শটি কি? ব্যাবহারিক ধর্ম কখনও সেই আদর্শ হইতে পারে না। আমরা কি উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি? আমরা এখানে আসিয়াছি মুক্তি ও জ্ঞান-লাভের জন্য। আমরা মুক্তিলাভের জন্যই জ্ঞানার্জন করিতে চাই। ইহাই আমাদের বাঁচিয়া থাকার অর্থ—এই মুক্তিলাভের জন্য সর্বব্যাপী আকূতি। বীজ হইতে বৃক্ষ কেন উদ্গত হয়? কেন সে ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ঊর্ধ্বাভিমুখে অভিযান করে? পৃথিবীর কাছে সূর্যের দান কি? তোমার জীবনের অর্থ কি? উহাও তো মুক্তির জন্য সেই একই প্রকার সংগ্রাম। প্রকৃতি আমাদিগকে চারিদিক হইতে দমন করিতে চায়, আর আত্মা চায় নিজেকে প্রকাশ করিতে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম সতত চলিতেছে। মুক্তির জন্য এই সংগ্রামের ফলে বহু জিনিষ দলিত-মথিত হইবে। ইহাই হইল তোমার দুঃখের প্রকৃত অর্থ। যুদ্ধক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণ ধূলি ও জঞ্জালে পূর্ণ হইবে। প্রকৃতি বলে, 'জয় হইবে আমার', আত্মা বলে, 'বিজয়ী হইতে হইবে আমাকেই।' প্রকৃতি বলে, 'একটু থামো। আমি তোমাকে শান্ত রাখিবার জন্য একটু ভোগ দিতেছি।' আত্মা একটু ভোগ করে, মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তে সে আবার মুক্তির জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। প্রত্যেকের বক্ষে এই যে চিরন্তন ক্রন্দন যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ? আমরা দারিদ্র্য দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, তাই আমরা ধন অর্জন করি; তখন আবার ধনের দ্বারা

প্রবঞ্চিত হই। আমরা হয়তো মূর্খ, তাই আমরা বিদ্যা অর্জন করিয়া পণ্ডিত হই; তখন আবার পাণ্ডিত্যের দ্বারা বঞ্চিত হই। মানুষ কখনই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। তাহাই দুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশীর্বাদের মূল। ইহাই জগতের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি কিরূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্তি পাইবে? যদি আগামীকাল এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়, তখনও আমরা বলিব, 'ইহা সরাইয়া লও, অপর কিছু দাও।'

এই অসীম মানবাত্মা স্বয়ং অসীমকে লাভ না করিলে কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না। অনন্ত তৃষ্ণা কেবলমাত্র অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তাহা ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা নয়। কত জগৎ যাইবে ও আসিবে। তাহাতে কি আসে যায়? কিন্তু আত্মা বাঁচিয়া আছে এবং চিরকাল ধরিয়া অনন্তের দিকে চলিয়াছে। সমগ্র জগৎকে আত্মার মধ্যে লীন হইতে হইবে। মহাসাগরের বুকে যেমন জলবিন্দু মিলাইয়া যায়, সেইরূপ বিশ্ব জগৎ আত্মায় বিলীন হইবে। আর এই জগৎ কি আত্মার লক্ষ্য? যদি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি থাকে, তবে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না—যদিও যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই ছিল কবিদের রচনার বিষয়, যদিও সর্বদাই তাঁহারা আমাদের পরিতৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি আজ পর্যন্ত কেহই পরিতৃপ্ত হয় নাই। অসংখ্য ঋষিকল্প ব্যক্তি আমাদের বলিয়াছেন, 'নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকো'; কবিরাও সেই সুরে গাহিয়াছেন। আমরা নিজেদের শান্ত ও পরিতৃপ্ত থাকিতে বলিয়াছি, কিন্তু থাকিতে পারি নাই। ইহা সনাতন বিধান যে, এই পৃথিবীতে বা ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে, কিংবা নিম্নে পাতালে এমন কিছুই নাই, যাহা দ্বারা আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে। আমার আত্মার তৃষ্ণার কাছে নক্ষত্র ও গ্রহরাজি, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ, সমগ্র বিশ্ব কতকগুলি ঘৃণ্য পীড়াদায়ক বস্তুমাত্র, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ম ইহাই বুঝাইয়া দেয়। যাহা কিছু এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয় না, তাহার সবটাই অমঙ্গলময়। প্রত্যেকটি বাসনাই দুঃখের কারণ, যদি না উহা এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দেয়, যদি না তুমি উহার প্রকৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য ধরিতে পার। সমগ্র প্রকৃতি তাহার প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র জিনিষের জন্য আকূতি জানাইতেছে—উহা হইল মুক্তি।

তাহা হইলে 'কর্মে পরিণত ধর্ম'-এর অর্থ কি? ইহার অর্থ মুক্তির অবস্থায় উপনীত হওয়া বা মুক্তি-প্রাপ্তি। এবং যদি এই পৃথিবী আমাদের ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সহায় হয়, তাহা হইলে ইহা মঙ্গলময়; কিন্তু যদি তাহা না হয়, যদি সহস্র বন্ধনের উপর ইহা একটি অতিরিক্ত বন্ধন সংযুক্ত করে, তাহা হইলে ইহা মন্দে পরিণত হয়। সম্পদ্, বিদ্যা, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের ব্যাবহারিক মূল্য আছে। যখন মুক্তিরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে আর সাহায্য করে না, তখন তাহারা নিশ্চিতরূপে ভয়াবহ। তাই যদি হয়, তাহা হইলে কার্যে পরিণত ধর্মের স্বরূপ কি? ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সব-কিছু সেই এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর, যাহাতে মুক্তিলাভ হয়। জগতে বিন্দুমাত্র ভোগ যদি পাইতে হয়, বিন্দুমাত্র সুখও যদি পাইতে হয়, তবে তাহার বিনিময়ে ব্যয় করিতে হইবে হৃদয়-মনের সম্মিলিত অসীম শক্তি।

এই জগতের ভাল ও মন্দের সমষ্টির দিকে তাকাইয়া দেখ। ইহাতে কি কোন পরিবর্তন হইয়াছে? যুগ যুগ অতিবাহিত হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া ব্যাবহারিক ধর্ম আপন কাজ করিয়া চলিয়াছে। প্রতিবার পৃথিবী মনে করিয়াছে যে, এইবার সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু সমস্যাটি যেমন ছিল, তেমনি থাকিয়া যায়। বড়জোর ইহার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ইহা বিশ সহস্র বিপণিতে স্নায়ুরোগ ও ক্ষয়রোগের ব্যবসায়ের জন্য পণ্য সরবরাহ করে, ইহা পুরাতন বাতব্যাধির মত। একস্থান হইতে বিতাড়িত কর, উহা অন্য কোন স্থানে আশ্রয় লইবে। শতবর্ষ আগে মানুষ পদব্রজে ভ্রমণ করিত বা ঘোড়া কিনিত। এখন সে খুব সুখী, কারণ রেলপথে ভ্রমণ করে; কিন্তু তাহাকে অধিকতর শ্রম করিয়া অধিকতর অর্থ উপার্জন করিতে হয় বলিয়া সে অসুখী। যে-কোন যন্ত্র শ্রম বাঁচায়, ইহাই আবার শ্রমিকের উপর অধিক গুরুভার চাপায়।

এই বিশ্ব, এই প্রকৃতি কিংবা অপর যে নামেই ইহাকে অভিহিত কর না কেন, ইহা অবশ্যই সীমাবদ্ধ, ইহা কখনও অসীম হইতে পারে না। সর্বাতীত পরম সত্তাকেও জগতের উপাদানরূপে পরিণত হইতে গেলে দেশ কাল ও নিমিত্তের সীমার মধ্যে আসিতে হইবে। জগতে যতটুকু শক্তি আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। তাহা যদি এক স্থানে ব্যয় কর, তাহা হইলে অপর স্থানে কম পড়িবে। সেই শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই থাকিবে। কোন স্থানে কোথাও যদি তরঙ্গ উঠে, তবে অন্য কোথাও গভীর গহ্বর দেখা দিবে। যদি কোন জাতি ধনী হয়, তাহা হইলে অন্য জাতিরা দরিদ্র হইবে। ভালর সহিত মন্দ ভারসাম্য রক্ষা করে। যে ব্যক্তি কোনকালে তরঙ্গশীর্ষে অবস্থান করিতেছে, সে মনে করে সকলই ভাল; কিন্তু যে তরঙ্গের নীচে দাঁড়াইয়া আছে, সে বলে—পৃথিবীর সব কিছুই মন্দ। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে, সে দেখে ঈশ্বরের লীলা কেমন চলিতেছে। কেহ কাঁদে, অপরে হাসে। আবার এখন যাহারা হাসিতেছে, সময়ে তাহারা কাঁদিবে, তখন প্রথম দল হাসিবে। আমরা কি করিতে পারি? আমরা জানি যে, আমরা কিছুই করিতে পারি না।

আমাদের মধ্যে কয়জন আছে, যাহারা জগতের হিতসাধন করিব বলিয়াই কাজে অগ্রসর হয়? এরূপ লোক মুষ্টিমেয়। তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গণা যায়। আমাদের মধ্যে বাকী যাহারা হিতসাধন করি, তাহারা বাধ্য হইয়াই ঐরূপ করি। আমরা না করিয়া পারি না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিতাড়িত হইতে হইতে আমরা আগাইয়া চলি। আমাদের করার ক্ষমতা কতটুকু? জগৎ সেই একই জগৎ থাকিবে, পৃথিবী সেই একই পৃথিবী থাকিবে। বড়জোর ইহার রঙ নীল হইতে বাদামী এবং বাদামী রঙ হইতে নীল হইবে। এক ভাষার জায়গায় অপর ভাষা, এক ধরনের কতক মন্দের জায়গায় অন্য ধরনের কতকগুলি মন্দ—এই একই ধারা তো চলিতেছে। যাহাকে বলে 'ছয়' তাহাকেই বলে 'আধ ডজন'। অরণ্যবিহারী আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা তোমাদের মত দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে পারে না, কিন্তু তাহারা খাদ্য হজম করিতে পারে বেশ। তুমি তাহাদের একজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল, পরমুহূর্তে দেখিবে, সে ঠিক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমার বা তোমার যদি সামান্য একটু ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে ছয় মাস কাল হাসপাতালে শুইয়া থাকিতে হইবে।

জীবদেহ যতই নিম্নস্তরের হইবে, তাহার ইন্দ্রিয়সুখ ততই তীব্রতর হইবে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের এবং তাহাদের স্পর্শশক্তির কথা ভাবো। তাহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ই বড়। মানুষের ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিবে, লোকের সভ্যতার স্তর যত নিম্ন, তাহার ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তত প্রবল। জীবদেহ যত উচ্চশ্রেণীর হইবে, ইন্দ্রিয়সুখের পরিমাণও তত কম হইবে। কুকুর খাইতে জানে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তায় যে অনুপম আনন্দ হয়, তাহা সে অনুভব করিতে পারে না। তুমি বুদ্ধি হইতে যে আশ্চর্য আনন্দ পাও, তাহা হইতে সে বঞ্চিত। ইন্দ্রিয়জন্য সুখ অতি তীব্র। কিন্তু বুদ্ধিজ সুখ তীব্রতর। তুমি যখন প্যারিসে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের ভোজে যোগদান কর, তাহা খুবই সুখকর, কিন্তু মানমন্দিরে গিয়া নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা, গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও বিকাশ দর্শন করা—এই-সব ভাবিয়া দেখ দেখি। এ আনন্দ নিশ্চয়ই বিপুলতর, কারণ আমি জানি, তোমরা তখন আহারের কথা ভুলিয়া যাও। সেই সুখ নিশ্চয়ই পার্থিব সুখ অপেক্ষা অধিক; তোমরা তখন স্ত্রী-পুত্র, স্বামী এবং অন্য সব কিছু ভুলিয়া যাও; ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ তখন ভুল হইয়া যায়। ইহাকেই বলে বুদ্ধিজ সুখ। সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে যে, এই সুখ ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা নিশ্চয় তীব্রতর। তোমরা সর্বদা বড় সুখের জন্য ছোট সুখ ত্যাগ করিয়া থাক। এই মুক্তি বা বৈরাগ্য-লাভই হইল কার্যে পরিণত ধর্ম। বৈরাগ্য অবলম্বন কর।

ছোটকে ত্যাগ কর, যাহাতে বড়কে পাইতে পার। সমাজের ভিত্তি কোথায়?—ন্যায়, নীতি ও আইনে। ত্যাগ কর, প্রতিবেশীর সম্পত্তি অপহরণ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, প্রতিবেশীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার প্রলোভন পরিহার কর, মিথ্যা বলিয়া অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়া যে সুখ, তাহা বর্জন কর। নৈতিকতাই কি সমাজের ভিত্তি নয়? ব্যভিচার পরিহার করা ছাড়া বিবাহের আর কি অর্থ আছে? বর্বর তো বিবাহ করে না। মানুষ বিবাহ করে, কারণ সে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। এইরূপই সর্বক্ষেত্রে। ত্যাগ কর, বৈরাগ্য অবলম্বন কর, পরিহার কর, পরিত্যাগ কর—শূন্যের নিমিত্ত নয়, নাস্তিভাবের জন্য নয়, কিন্তু শ্রেয়োলাভের জন্য। কিন্তু কে তাহা পারে? শ্রেয়োলাভের পূর্বে তুমি তাহা পারিবে না। মুখে বলিতে পার, প্রয়াস করিতে পার, অনেক কিছু করিবার চেষ্টাও করিতে পার, কিন্তু শ্রেয়োলাভ হইলে বৈরাগ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। অশ্রেয় তখন আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়ে। ইহাকেই বলে 'কার্যে পরিণত ধর্ম'। ইহা ছাড়া আর কিছুকে বলে কি—যেমন পথ মার্জনা করা এবং আরোগ্যনিলয় গঠন করাকে? তাহাদের মূল্য শুধু ততটুকু, যতটুকু উহাদের মূলে বৈরাগ্য আছে। বৈরাগ্যের কোথাও সীমারেখা নাই। মুশকিল হয় সেখানেই, যেখানে কেহ সীমা টানিয়া বলে—এই পর্যন্তই, ইহার অধিক নয়। কিন্তু এই বৈরাগ্যের তো সীমা নাই।

যেখানে ঈশ্বর আছেন, সেখানে আর কিছু নাই। যেখানে সাংসারিকতা আছে, সেখানে ঈশ্বর নাই। এই উভয়ের কখনও মিলন ঘটিবে না—যথা, আলো ও অন্ধকারের। ইহাই তো আমি খ্রীষ্টধর্ম ও তাহার প্রথম প্রচারকদের জীবনী হইতে বুঝিয়াছি। বৌদ্ধধর্মও কি তাহাই নয়? ইহাই কি সকল ঋষি ও আচার্যের শিক্ষা নয়? যে-সংসারকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা কি? তাহা এখানেই রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে সংসার লইয়া চলিয়াছি। আমার এই শরীরই সংসার। এই দেহের জন্য, এই দেহকে একটু ভাল—একটু সুখে রাখিবার জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করি। এই দেহের জন্য আমি অপরের ক্ষতিসাধন করি, ভুলভ্রান্তিও করি।

কত মহামানবের দেহত্যাগ হইয়াছে; কত দুর্বলচিত্ত মানুষ মৃত্যু-কবলিত হইয়াছে; কত দেবতারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যু, মৃত্যু—সর্বত্র মৃত্যুই বিরাজ করিতেছে। এই পৃথিবী অনাদি অতীতের একটি শ্মশানক্ষেত্র; তথাপি আমরা এই দেহকেই আঁকড়াইয়া থাকি আর বলি, 'আমি কখনও মরিব না।' জানি ঠিকই যে, দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; অথচ উহাকেই আঁকড়াইয়া থাকি। ঠিক অমর বলিতে আত্মাকে বুঝায়, আর আমরা ধরিয়া থাকি এই শরীরকে—ভুল হইল এখানেই।

তোমরা সকলেই জড়বাদী, কারণ তোমরা সকলেই বিশ্বাস কর যে, তোমরা দেহমাত্র। কেহ যদি আমার শরীরে ঘুষি মারে, আমি বলিব আমাকে ঘুষি মারিয়াছে। যদি সে আমার শরীরে প্রহার করে, আমি বলিব যে, আমি প্রহৃত হইয়াছি। আমি যদি শরীরই না হইব, তাহা হইলে এরূপ কথা বলিব কেন? আমি যদিও মুখে বলি—আমি আত্মা, তাহা হইলেও তাহাতে কিছু তফাত হয় না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তের জন্য আমি শরীর; আমি নিজেকে জড়বস্তুতে পরিণত করিয়াছি। এইজন্যই আমাকে এই শরীর পরিহার করিতে হইবে, পরিবর্তে আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। আমি আত্মা—সেই আত্মা, যাহাকে কোন অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, কোন তরবারি খণ্ডিত করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, বাতাস শুষ্ক করিতে পারে না। আমি জন্মরহিত, সৃষ্টিরহিত, অনাদি, অখণ্ড, মৃত্যুহীন, জন্মহীন এবং সর্বব্যাপী—ইহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। সমস্ত দুঃখ-উৎপত্তির কারণ যে, আমি মনে করি—আমি ছোট একতাল মৃত্তিকা। আমি নিজেকে জড়ের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহার ফল ভোগ করিতেছি।

কার্যে পরিণত ধর্ম হইল নিজেকে আত্মার সহিত এক করা। ভ্রমাত্মক অধ্যাস-চিন্তা পরিহার কর। ঐদিকে তুমি কতদূর অগ্রসর হইয়াছ? তুমি দুই সহস্র আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যদি না তুমি আত্মানুভূতি লাভ করিয়া থাক? তুমি মরিবে সামান্য কুকুরেরই মত কুকুরের অনুভূতি লইয়া। কুকুর মৃত্যুকালে চীৎকার করে আর কাঁদে, কারণ সে জানে যে, সে জড়বস্তু এবং সে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।

তুমি জান যে, মৃত্যু অনিবার্য; মৃত্যু আছে জলে বাতাসে—প্রাসাদে বন্দিশালায়—সর্বত্র। কোন্ বস্তু তোমাকে অভয় প্রদান করিবে? তুমি অভয় পাইবে তখনই, যখন তুমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে, জানিবে—তুমি অসীম, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মা; আত্মাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, কোন অস্ত্র হত্যা করিতে পারে না, কোন বিষ জর্জরিত করিতে পারে না। মনে করিও না—ধর্ম শুধু একটা মতবাদ, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান। ধর্ম কেবল তোতাপাখীর মুখস্থ বুলি নয়। আমার জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদেব বলিতেনঃ তোতাপাখীকে যতই 'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল' শেখাও না কেন, বেড়াল যখন গলা টিপে ধরে, তখন সব ভুল হয়ে যায়। তুমি সারাক্ষণ প্রার্থনা করিতে পার, জগতের সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পার, যত দেবতা আছেন, সকলের পূজা করিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মানুভূতি হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। বাগাড়ম্বর নয়, তত্ত্বালোচনা নয়, যুক্তিতর্ক নয়, চাই অনুভূতি। ইহাকেই আমি বলি

—বাস্তব জীবনে পরিণত ধর্ম।

প্রথমে আত্মা সম্পর্কে এই সত্য শ্রবণ করিতে হইবে। যদি শ্রবণ করিয়া থাক, অতঃপর মনন কর। মনন করা হইলে ধ্যান কর। বৃথা তর্কবিচার আর নিষ্প্রয়োজন। একবার নিশ্চয় কর, তুমি সেই অসীম আত্মা; তাহা যদি সত্য হয়, তবে নিজেকে দেহ বলিয়া ভাবা তো মূর্খতা। তুমি তো আত্মা এবং এই আত্মানুভূতিই লাভ করিতে হইবে। আত্মা নিজেকে আত্মারূপে দেখিবে। বর্তমানে আত্মা নিজেকে দেহরূপে দেখিতেছে। তাহা বন্ধ করিতে হইবে। যে মুহূর্তে তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্তে তুমি মুক্ত হইবে।

তোমরা এই কাঁচটিকে দেখিতেছ। তোমরা জান, ইহা ভ্রান্তিমাত্র। কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো তোমাকে বলিয়া দিবেন, ইহা শুধু আলোক ও স্পন্দন ...। আত্মদর্শন উহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে সত্য, উহা নিশ্চয়ই একমাত্র বাস্তব অবস্থা, একমাত্র সত্য সংবেদন, একমাত্র বাস্তব প্রত্যক্ষ। এই যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ—এ-সকলই স্বপ্ন। আজকালকার দিনে তাহা তুমি জান। আমি প্রাচীন বিজ্ঞানবাদীদের কথা বলিতেছি না, আধুনিক পদার্থবিদ্যাবিদও বলিবেন—দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে আছে শুধু আলোক-স্পন্দন। আলোক-স্পন্দনের সামান্য ইতরবিশেষের দ্বারাই সমস্ত পার্থক্য ঘটিতেছে।

তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। আত্মানুভূতি করিতেই হইবে, আর উহা বাস্তব ধর্ম। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া গেলেন, 'যাহাদের চিত্ত বিনয়নম্র, তাহারা ধন্য; কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই প্রাপ্য।' বাস্তব ধর্ম বলিতে তো তোমরা আর উহা মানিতে চাও না। তাঁহার ঐ উপদেশ কি শুধু একটা তামাশার কথা? তাহা হইলে বাস্তব ধর্ম বলিতে তোমরা কি বোঝ? তোমাদের বাস্তবতা হইতে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! 'যাহারা শুদ্ধচিত্ত, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বর দর্শন করিবে।'—এই কথায় কি পথ পরিষ্কার করা, আরোগ্য-ভবন নির্মাণ করা প্রভৃতি বুঝায়? যখন শুদ্ধচিত্তে এ-সকল অনুষ্ঠান করিবে, তখনই ইহা সৎকর্ম। বিশ ডলার দান করিয়া নিজের নাম প্রকাশিত দেখিবার জন্য সান ফ্রান্সিস্কোর সমস্ত সংবাদপত্র ক্রয় করিতে যাইও না। নিজেদের ধর্মগ্রন্থে কি পাঠ কর নাই যে, কেহই তোমাকে সাহায্য করিবে না? ঈশ্বরকে উপাসনা করার মনোভাব লইয়া ঈশ্বরকেই দরিদ্র, দুঃখী ও দুর্বলের মধ্যে সেবা কর। তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে ফলপ্রাপ্তি গৌণ কথা। লাভের বাসনা না রাখিয়া ঐ ধরনের কর্ম অনুষ্ঠান করিলে আত্মার মঙ্গল সাধিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। এই স্বর্গরাজ্য রহিয়াছে আমাদেরই মধ্যে। সকল আত্মার আত্মা যিনি, তিনি সেখানেই বিরাজ করেন। তাঁহাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি কর। তাহাই কার্যে পরিণত ধর্ম, তাহাই মুক্তি। পরস্পরকে প্রশ্ন করিয়া দেখা যাক, আমরা কে কতদূর এই পথে অগ্রসর হইয়াছি, কতদূর আমরা এই দেহের উপাসক, কতদূরই বা পরমাত্মস্বরূপ ভগবানে ঠিক বিশ্বাস করি, এবং কতদূরই বা আমাদিগকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করি? তখন সত্যসত্যই স্বার্থশূন্য হইব; ইহাই মুক্তি। ইহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা। আত্মাকে উপলব্ধি কর। তাহাই একমাত্র কর্তব্য। নিজে স্বরূপতঃ যাহা, অর্থাৎ নিজেকে অসীম আত্মারূপে জান, তাহাই বাস্তব ধর্ম। আর যাহা কিছু, সকলই অবাস্তব। কারণ আর যাহা কিছু আছে, সকলই বিলুপ্ত হইবে। একমাত্র আত্মাই কখনও বিলুপ্ত হইবে না; আত্মাই শাশ্বত। আরোগ্য নিকেতন একদিন ধসিয়া পড়িবে। যাহারা রেলপথ-নির্মাতা, তাহারাও একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া যাইবে, সূর্য নিশ্চিহ্ন হইবে। কিন্তু আত্মা চিরকাল ধরিয়া বিরাজ করিবেন।

কোন্‌টি শ্রেয়—এই-সকল ধ্বংসশীল বস্তুর পশ্চাদ্ধাবন, না চির অপরিবর্তনীয়ের উপাসনা? কোন্‌টি অধিক বাস্তব? তোমার জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে-সকল বস্তু আয়ত্ত করিলে, সেগুলি আয়ত্ত হইবার পূর্বে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই কি শ্রেয়, ঠিক যেমন সেই বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল? তিনি সব দেশ জয় করিলেন, পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, 'আমার সম্মুখে কলসীভর্তি দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে রাখ।' তারপর বলিলেন, 'বড় হীরকখণ্ডটি নিয়ে এস।' তখন ঐটি আপন বক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন—ঠিক যেমন একটি কুকুর করিয়া থাকে।

মানুষ সদর্পে বলে, 'আমি বাঁচিয়া আছি'; সে জানে না যে, মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াই সে এই জীবনকে ক্রীতদাসের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। সে বলে, 'আমি সম্ভোগ করিতেছি।' সে কখনও বুঝিতে পারে না যে, প্রকৃতি তাহাকে দাস করিয়া রাখিয়াছে।

প্রকৃতি আমাদের সকলকে পেষণ করিতেছে। যে সুখ-কণিকা পাইয়াছ, তাহার হিসাব করিয়া দেখ, শেষ পর্যন্ত দেখিবে—প্রকৃতি তোমাকে দিয়া নিজের কাজ করাইয়া লইয়াছে; এবং যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন তোমার শরীর দ্বারা অপর বৃক্ষলতাদির পরিপুষ্টি হইবে। তথাপি আমরা সর্বদা মনে করি, আমরা স্বাধীনভাবেই সুখ পাইতেছি। এইরূপেই সংসারচক্র আবর্তিত হইতেছে।

সুতরাং আত্মাকে আত্মারূপে অনুভব করাই হইল বাস্তব ধর্ম। অপর সবকিছু ঠিক ততটুকু ভাল, যতটুকু ঐগুলি আমাদিগকে এই এক অতি উত্তম ধারণায় উপনীত করিতে পারে। সেই অনুভূতি বৈরাগ্য ও ধ্যানের দ্বারা লভ্য। বৈরাগ্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে বিরতি এবং যত কিছু গ্রন্থি, যত কিছু শৃঙ্খল আমাদিগকে জড়বস্তুর সহিত আবদ্ধ রাখে, সেগুলি ছিন্ন করা। 'আমি এই জড়-জীবন লাভ করিতে চাই না, এই ইন্দ্রিয়ভোগের জীবন কামনা করি না, আমি কামনা করি উচ্চতর বস্তুকে'—ইহাই হইল বৈরাগ্য। অতঃপর যে ক্ষতি আমাদের হইয়া গিয়াছে, ধ্যানের দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

আমরা প্রকৃতির আজ্ঞানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য। যদি বাহিরে কোথাও শব্দ হয়, আমাকে তাহা শুনিতেই হইবে। যদি কিছু ঘটিয়া থাকে, আমাকে তাহা দেখিতেই হইবে। আমরা ঠিক যেন বানরের মত। আমরা প্রত্যেকে যেন দুই সহস্র বানরের এক-একটি ঝাঁক। বানর এক অদ্ভুত প্রাণী! ফলতঃ আমরা অসহায়; আর বলি কিনা, 'ইহাই আমাদের উপভোগ!' অপূর্ব এই ভাষা! পৃথিবীকে আমরা উপভোগই করিতেছি বটে! আমাদের ভোগ না করিয়া গত্যন্তর নাই। প্রকৃতি চায় যে, আমরা ভোগ করি। একটি সুললিত

শব্দ হইতেছে, আর আমি শুনিতেছি। যেন উহা শোনা না শোনা আমার হাতে! প্রকৃতি বলে, 'যাও, দুঃখের গভীরে ডুবিয়া যাও', মুহূর্তের মধ্যে আমি দুঃখে নিমজ্জিত হই। আমরা ইন্দ্রিয় ও সম্পদ্ সম্ভোগ করিবার কথা বলিয়া থাকি। কেহ হয়তো আমাকে খুব পণ্ডিত মনে করে, আবার অপর কেহ হয়তো মনে করে—'এ মূর্খ।' জীবনে এই অধঃপতন, এই দাসত্ব চলিয়াছে, অথচ আমাদের কোন বোধই নাই। আমরা একটি অন্ধকার কক্ষে পরস্পর মাথা ঠুকিয়া মরিতেছি।

ধ্যান কাহাকে বলে? ধ্যান হইল সেই শক্তি, যাহা আমাদের এই-সব কিছু প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা দেয়। প্রকৃতি আমাদের প্রলোভন দেখাইয়া বলিতে পারে, 'দেখ—কি সুন্দর বস্তু!' আমরা ফিরিয়াও দেখিব না। তখন সে বলিবে, 'এই যে কি সুগন্ধ, আঘ্রাণ কর।' আমি আমার নাসিকাকে বলিব, 'আঘ্রাণ করিও না।' নাসিকা আর তাহা করিবে না। চক্ষুকে বলিব, 'দেখিও না।' প্রকৃতি একটি মর্মন্তুদ কাণ্ড করিয়া বসিল; সে আমার একটি সন্তান হত্যা করিয়া বলিল, 'হতভাগা, এইবার তুই বসিয়া ক্রন্দন কর। শোকের সাগরে ডুবিয়া যা।' আমি বলিলাম, 'আমাকে তাহাও করিতে হইবে না।' আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম; আমাকে স্বাধীন হইতে হইবে। ইহা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখ না। এক মুহূর্তের ধ্যানের ফলে এই প্রকৃতিতেই পরিবর্তন আনিতে পারিবে। মনে কর, তোমার নিজের মধ্যে যদি সে ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে উহাই কি স্বর্গসদৃশ হইত না, উহাই কি মুক্তি হইত না? ইহাই হইল ধ্যানের শক্তি।

কি করিয়া উহা আয়ত্ত করা যাইবে? নানা উপায়ে তাহা পারা যায়। প্রত্যেকের প্রকৃতির নিজস্ব গতি আছে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হইল এই যে, মনকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। মন একটি জলাশয়ের মত; যে কোন প্রস্তরখণ্ড উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গগুলি আমাদের স্বরূপ-দর্শনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। জলাশয়ে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কিন্তু জলাশয়ের বক্ষ এত আলোড়িত যে, প্রতিবিম্বটি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি না। ইহাকে শান্ত হইতে দাও। প্রকৃতি যেন উহাতে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে না পারে। শান্ত হইয়া থাক; তাহা হইলে কিছু পরে প্রকৃতি তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তখন আমরা জানিতে পারিব, আমরা স্বরূপতঃ কি। ঈশ্বর সর্বদা কাছেই রহিয়াছেন; কিন্তু মন বড়ই চঞ্চল, সে সর্বদা ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিলেও তোমার ঘূর্ণিপাকের অবসান হইবে না। এই মুহূর্তে মনে করিতেছি, আমি ঠিক আছি, ঈশ্বরের ধ্যান করিব; অমনি মুহূর্তের মধ্যে আমার মন চলিল লণ্ডনে। যদি বা তাহাকে সেখান হইতে জোর করিয়া টানিয়া আনিলাম, তা অতীতে আমি নিউ ইয়র্কে কি করিয়াছি, তাহাই দেখিবার জন্য মন ছুটিল নিউ ইয়র্কে। এই-সকল তরঙ্গকে ধ্যানের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে।

ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা তামাশার কথা নয়, একদিনের বা কয়েক বৎসরের অথবা হয়তো কয়েক জন্মেরও কথা নয়। কিন্তু সেজন্য দমিয়া যাইও না। সংগ্রাম চালাইতে হইবে। জ্ঞানতঃ—স্বেচ্ছায় এই সংগ্রাম চালাইতে হইবে। তিল তিল করিয়া আমরা নূতন ভূমি জয় করিয়া লইব। তখন আমরা এমন প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হইব, যাহা কেহ কখনও আমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইতে পারিবে না; এমন সম্পদ্, যাহা কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না; এমন আনন্দ, যাহার উপর আর কোন বিপদের ছায়া পড়িবে না।

এতকাল ধরিয়া আমরা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। যখন আমি সামান্য সুখ পাইতেছিলাম, তখন সুখের কারণ যে ব্যক্তি, সে প্রস্থান করিলে অমনি আমি সুখ হারাইতাম। মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখ! আপনার সুখের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভর করে! সকল বিয়োগই দুঃখময়। ইহা স্বাভাবিক। সুখের জন্য ধনের উপর নির্ভর করিবে? ধনের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। সুখের জন্য স্বাস্থ্য অথবা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করিলে আজ অথবা কাল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

অনন্ত আত্মা ব্যতীত আর সব কিছু পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের চক্র আবর্তিত হইতেছে! স্থায়িত্ব তোমার নিজের অন্তরে ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। সেখানেই অপরিবর্তনীয় অসীম আনন্দ রহিয়াছে। ধ্যানই সেখানে যাইবার দ্বার। প্রার্থনা, ক্রিয়াকাণ্ড এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপাসনা ধ্যানের প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র। তুমি প্রার্থনা করিতেছ, অর্ঘ্যদান করিয়া থাক; একটি মত ছিল—যাহাতে বলা হইত, এ-সকলই আত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন করে; জপ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রতিমা, মন্দির, দীপারতি প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে মনে তদনুরূপ ভাবের সঞ্চার হয়; কিন্তু ঐ ভাবটি সর্বদা মানবের নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, অন্যত্র নয়। সকলেই ঐরূপ করিতেছে; তবে লোকে যাহা না জানিয়া করে, তাহা জানিয়া করিতে হইবে। ইহাই হইল ধ্যানের শক্তি। তোমারই মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান আছে। তাহা কিরূপে সম্ভব হইল? ধ্যানের শক্তি দ্বারা। আত্মা নিজের অন্তঃপ্রদেশ মন্থন করিয়া উহা উদ্ধার করিয়াছে। আত্মার বাহিরে কখনও কোন জ্ঞান ছিল কি? পরিশেষে এই ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হই; তখন আত্মা আপনার সেই জন্মহীন মৃত্যুহীন স্বরূপকে জানিতে পারে। তখন আর কোন দুঃখ থাকে না, এই পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না, ক্রমবিকাশও হয় না। আত্মা তখন জানে, আমি সর্বদা পূর্ণ ও মুক্ত।

ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীর ধর্মগুলি পর্যালোচনা করিলে আমরা সাধারণতঃ দুইটি সাধনপথ দেখিতে পাই। একটি ঈশ্বর হইতে মানুষের দিকে বিসর্পিত। অর্থাৎ সেমিটিক ধর্মগোষ্ঠীতে দেখিতে পাই—ঈশ্বরীয় ধারণা প্রায় প্রথম হইতেই স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল, অথচ অত্যন্ত আশ্চর্য যে, আত্মা সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অতি-আধুনিককালের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন য়াহুদীদের মধ্যে জীবাত্মা-সম্পর্কে কোন চিন্তার স্ফুরণ হয় নাই। (তাহাদের মতে) মন ও কতিপয় জড়-উপাদানের সংমিশ্রণে মানুষের সৃষ্টি, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়; মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। অথচ এই জাতির মধ্যেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর চিন্তাধারার বিকাশ হইয়াছিল। ইহাও অন্যতম সাধনপথ। অন্য সাধনপথ—মানুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বরাভিমুখে। এই দ্বিতীয় প্রণালীটি বিশেষরূপে আর্যজাতির, আর প্রথমটি সেমিটিক জাতির।

আর্যগণ প্রথমে আত্মতত্ত্ব লইয়া শুরু করিয়াছিলেন; তখন তাঁহাদের ঈশ্বরবিষয়ক ধারণাগুলি অস্পষ্ট, পার্থক্য-নির্ণয়ে অসমর্থ ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু কালক্রমে আত্মা সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যতই স্পষ্টতর হইতে লাগিল, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সম অনুপাতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। সেইজন্য দেখা যায়, বেদসমূহে যাবতীয় জিজ্ঞাসাই সর্বদা আত্মার মাধ্যমে উত্থাপিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্যদিগের যত কিছু জ্ঞান সবই জীবাত্মার মধ্য দিয়াই স্ফূর্তি পাইয়াছে। সেইহেতু তাঁহাদের সমগ্র দর্শন-সাহিত্যে অন্তর্মুখী ঈশ্বরানুসন্ধানের বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার একটি বিচিত্র ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে।

আর্যগণ নিজেদের অন্তরেই চিরদিন ভগবানের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কালক্রমে ঐ সাধনপ্রণালী তাঁহাদের নিকট স্বাভাবিক ও নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের শিল্পচর্চা ও প্রাত্যহিক আচরণের মধ্যেও ঐ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বর্তমানকালেও ইওরোপে উপাসনারত কোন ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকিতে গিয়া শিল্পী তাঁহার দৃষ্টি ঊর্ধ্বে স্থাপন করাইয়া থাকেন। উপাসক প্রকৃতির বাহিরে ভগবানকে অনুসন্ধান করেন, দূর মহাকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে—এইভাবে সেই প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে উপাসকের মূর্তি অন্যরূপ। এখানে উপাসনায় চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত থাকে, উপাসকের দৃষ্টি যেন অন্তর্মুখী।

এই দুইটি মানুষের শিক্ষণীয় বস্তু—একটি বহিঃপ্রকৃতি, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতি। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হইলেও সাধারণ মানুষের নিকট বহিঃপ্রকৃতিও—অন্তঃপ্রকৃতি (বা চিন্তা-জগৎ) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত। অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে, প্রথমেই অনুমিত হইয়াছে যে, জড়বস্তু এবং চেতন মন—দুইটি বিপরীতধর্মী। কিন্তু পরিণামে আমরা দেখি, উহারা বিপরীতধর্মী নয়; বরং ধীরে ধীরে উহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিবে এবং চরমে একত্র মিলিত হইয়া এক অন্তহীন অখণ্ড বস্তু সৃষ্টি করিবে। সুতরাং এই বিশ্লেষণ দ্বারা কোন একটি মতকে অপর মত হইতে উচ্চাবচ প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রায় নয়। বহিঃপ্রকৃতির সাহায্যে সত্যানুসন্ধানে যাঁহারা ব্যাপৃত, তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত নন, অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়া সত্যলাভের যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদিগকেও তেমনি উচ্চ বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। এই দুইটি পৃথক্ প্রণালী মাত্র। দুইটিই জগতে টিকিয়া থাকিবে; দুইটিরই অনুশীলন প্রয়োজন; পরিণামে দেখা যাইবে যে, দুইটি মতেরই পরস্পর মিলন হইতেছে। আমরা দেখি যে, মন যেমন দেহের পরিপন্থী নয়, দেহও তেমনি মনের পরিপন্থী নয়, যদিও অনেকে মনে করে, এই দেহটি একান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রাচীনকালে প্রতিদেশেই এমন বহু লোক ছিল, যাহারা দেহকে শুধু আধি, ব্যাধি, পাপ ও ঐ জাতীয় বস্তুর আধাররূপেই গণ্য করিত। যাহা হউক, উত্তরকালে আমরা দেখিতে পাই, বেদের শিক্ষা অনুসারে এই দেহ মনে মিশিয়া গিয়াছে এবং মন দেহে মিশিয়া গিয়াছে।

একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে, যাহা সমগ্র বেদে

১

ধ্বনিত হইয়াছেঃ যথা, যেমন একটি মাটির ডেলা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমরা বিশ্বের সমস্ত মাটির বিষয়ে জানিতে পারি, তেমনি সেই বস্তু কি, যাহা জানিলে আমরা অন্য সবই জানিতে পারি? কম-বেশী স্পষ্টতঃ বলিতে গেলে এই তত্ত্বই সমগ্র মানব-জ্ঞানের বিষয়বস্তু। এই একত্ব উপলব্ধির দিকেই আমরা সকলে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের জীবনের প্রতি কর্ম—তাহা অতি বৈষয়িক, অতি স্থূল, অতি সূক্ষ্ম, অতি উচ্চ, অতি আধ্যাত্মিক কর্মই হউক না কেন—সমভাবে সেই একই আদর্শ একাত্মানুভূতির দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তি অবিবাহিত। সে বিবাহ করিল। বাহ্যতঃ ইহা একটি স্বার্থপূর্ণ কাজ হইতে পারে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে-প্রেরণা—যে-উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাও ঐ একত্ব উপলব্ধির চেষ্টা। তাহার পুত্র-কন্যা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে; সে তাহার দেশকে ভালবাসে, এই পৃথিবীকে ভালবাসে এবং পরিণামে সমগ্র বিশ্বে তাহার প্রেম পরিব্যাপ্ত হয়। দুর্নিবার গতিতে আমরা সেই পূর্ণতার দিকে চলিতেছি—এই ক্ষুদ্র আমিত্ব নাশ করিয়া এবং উদার হইতে উদারতর হইয়া অদ্বৈতানুভূতির পথে। উহাই চরম লক্ষ্য; ঐ লক্ষ্যের দিকেই সমগ্র বিশ্ব দ্রুত-ধাবমান, প্রতি অণু-পরমাণু পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রধাবিত। অণুর সহিত অণুর, পরমাণুর সহিত পরমাণুর মুহুর্মুহুঃ মিলন হইতেছে, আর বিশালাকৃতি গোলক, ভূলোক, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে। আবার উহারাও যথানিয়মে পরস্পরের দিকে বেগে ছুটিতেছে এবং এ-কথা আমরা জানি যে, চরমে সমগ্র জড়-জগৎ চেতন-জগৎ এক অখণ্ড সত্তায় মিশিয়া একীভূত হইবে।

নিখিল বিশ্বে বিপুলভাবে যে ক্রিয়া চলিতেছে, ব্যষ্টি-মানুষেও স্বল্পায়তনে সেই ক্রিয়াই চলিতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেমন একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে অথচ উহা নিয়তই একত্বের—অখণ্ডত্বের দিকে ধাবমান, আমাদের ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ প্রতি জীব যেন জগতের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিত্য নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। যে যত বেশী মূর্খ ও অজ্ঞ, সে নিজেকে বিশ্ব হইতে তত বেশী বিচ্ছিন্ন মনে করে। যে যত বেশী অজ্ঞ, সে তত বেশী মনে করে যে, সে মরিবে অথবা জন্মগ্রহণ করিবে

ইত্যাদি—এ-সকল ভাব এই অনৈক্য বা ভিন্নতাকেই প্রকাশ করে অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবেরই অভিব্যঞ্জক। কিন্তু দেখা যায়, জ্ঞানোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, নীতিজ্ঞান অভিব্যক্ত হয় এবং মানুষের মধ্যে অখণ্ড চেতনার উন্মেষ হয়। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ঐ শক্তিই পিছনে থাকিয়া মানুষকে নিঃস্বার্থ হইতে প্রেরণা দেয়। উহাই সকল নীতিজ্ঞানের ভিত্তি; পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় বা যে-কোন ধর্মে বা যে-কোন অবতারপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মনীতিতে ইহাই সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অংশ। 'নিঃস্বার্থ হও,' 'নাহং, নাহং—তুঁহু, তুঁহু'—এই ভাবটি সকল নীতি ও অনুশাসনের পটভূমি। তুমি আমার অংশ, এবং আমিও তোমার অংশ। তোমাকে আঘাত করিলে আমি নিজেই আঘাতপ্রাপ্ত হই, তোমাকে সাহায্য করিলে আমার নিজেরই সাহায্য হইয়া থাকে, তুমি জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ আমরাও মৃত্যু হইতে পারে না—ইহার অর্থ এই ব্যক্তিভাবশূন্যতার স্বীকৃতি। যতক্ষণ এই বিপুল বিশ্বে একটি কীটও জীবিত থাকে, ততক্ষণ কিরূপে আমি মরিতে পারি? কারণ আমার জীবন তো ঐ কীটের জীবনের মধ্যেও অনুস্যূত রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, কোন মানুষকে সাহায্য না করিয়া আমরা পারি না, তাহার কল্যাণে আমারই কল্যাণ।

এই বিষয়ই সমগ্র বেদান্ত এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্য দিয়া অনুস্যূত। এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণভাবে ধর্মমাত্রই তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথমাংশ দর্শন—প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি ও সারকথা। সেই তত্ত্বগুলি পুরাণের আখ্যায়িকা—মহাপুরুষ বা বীরগণের জীবন, দেবতা উপদেবতা বা দেব-মানবদের কাহিনীর মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতঃ শক্তির প্রকাশনাই সকল পুরাণ-সাহিত্যের মূল ভাব। নিম্নস্তরের পুরাণগুলিতে—আদিমযুগের রচনায়—এই শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায় দেহের পেশীতে। পুরাণগুলিতে বর্ণিত নায়কগণ আকৃতিতে যেমন বিশাল, বিক্রমেও তেমনি বিপুল। একজন বীরই যেন সমগ্র বিশ্বজয়ে সমর্থ। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি দেহ অপেক্ষা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে মহাপুরুষগণ উচ্চতর নীতিজ্ঞানের নিদর্শনরূপে পুরাণাদিতে চিত্রিত হইয়াছেন। পবিত্রতা এবং উচ্চনীতিবোধের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র-ব্যক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ—স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতার দুর্বার স্রোত প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে। সকল ধর্মের তৃতীয় অংশ—প্রতীকোপাসনা; ইহাকে তোমরা যাগযজ্ঞ, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম বল। পৌরাণিক উপাখ্যান এবং মহাপুরুষগণের চরিত্রও সর্বস্তরের নরনারীর প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। এমন নিম্নপর্যায়ের মানুষও সংসারে আছে, যাহাদের জন্য শিশুদের মত ধর্মের 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রয়োজন। এভাবেই প্রতীকোপাসনা ও ব্যাবহারিক দৃষ্টান্তের হাতে-নাতে প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে; এগুলি ধরা যায়, বোঝা যায়—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জড়বস্তুর মত দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়।

অতএব প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি স্তর বা পর্যায় দেখা যায়; যথা—দর্শন, পুরাণ ও পূজা অনুষ্ঠান। বেদান্তের পক্ষে একটি সুবিধার কথা বলা যায় যে, সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে ধর্মের এই তিনটি পর্যায়ের সংজ্ঞাই সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি উপাখ্যান অংশের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে অপরটি হইতে স্বতন্ত্র করা বড় কঠিন। উপাখ্যানভাগ যেন তত্ত্বাংশকে গ্রাস করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ মানুষ তত্ত্বগুলি একরূপ ভুলিয়া যায়, তত্ত্বাংশের তাৎপর্য আর ধরিতে পারে না। তত্ত্বের টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি মূলতত্ত্বকে গ্রাস করে এবং সকলে এগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে ও অবতার, প্রচারক, আচার্যদের কথাই কেবল চিন্তা করে। মূলতত্ত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়—এতদূর লুপ্ত হয় যে, বর্তমানকালেও যদি কেহ যীশুকে বাদ দিয়া খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বসমূহ প্রচার করিতে প্রয়াসী হয়, তবে লোকে তাহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং ভাবিবে সে অন্যায় করিয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। অনুরূপভাবে যদি কেহ হজরত মহম্মদকে বাদ দিয়া ইসলামধর্মের তত্ত্বগুলি প্রচার করিতে অগ্রসর হয়, তবে মুসলমানগণও তাহাকে সহ্য করিবে না। কারণ বাস্তব উদাহরণ—মহাপুরুষ ও পয়গম্বরের জীবনকাহিনীই তত্ত্বাংশকে সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

বেদান্তের প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। সুতরাং স্বভাবতঃ বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের ন্যায় কোন প্রত্যাদিষ্ট বা প্রেরিত পুরুষের প্রভাব উহার তত্ত্বাংশগুলিকে সর্বতোভাবে গ্রাস অথবা আবৃত করে নাই। ...

তত্ত্বমাত্রই শাশ্বত ও চিরন্তন, এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ যেন গৌণপর্যায়ভুক্ত—তাঁহাদের কথা বেদান্তশাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। উপনিষদসমূহে কোন বিশেষ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের বিষয় বলা হয় নাই, তবে বহু মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ ও নারীর কথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন য়াহুদীদের এই ধরনের কিছু ভাব ছিল; তথাপি দেখিতে পাই মোজেস্ হিব্রু সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছেন। অবশ্য আমি বলিতে চাই না যে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কর্তৃক একটা জাতির ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া খারাপ। কিন্তু যদি কোন কারণে ধর্মের সমগ্র তত্ত্বাংশকে উপেক্ষা করা হয়, তবে তাহা জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হইবে। তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেকটা ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাইতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক্ দিয়া তাহা সম্ভব নয়। ব্যক্তি আমাদের হৃদয়াবেগ স্পর্শ করে; তত্ত্বের আবেদন উচ্চতর ক্ষেত্র অর্থাৎ আমাদের শান্ত বিচারবুদ্ধিকে স্পর্শ করে। তত্ত্বই চরমে জয়লাভ করিবে, কারণ উহাই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবাবেগ অনেক সময়ই আমাদিগকে পশুস্তরে নামাইয়া আনে। বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গুলির সহিতই ভাবাবেগের সম্বন্ধ বেশী; সুতরাং যখন তত্ত্বসমূহ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত হয়, এবং ভাবাবেগ প্রবল হইয়া উঠে, তখনই ধর্ম গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয় এবং ঐ অবস্থায় ধর্ম এবং দলীয় রাজনীতি ও অনুরূপ বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তখন ধর্মসম্বন্ধে মানুষের মনে অতি উৎকট ও অন্ধ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং হাজার হাজার মানুষ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেও দ্বিধা করে না। যদিও এ-সকল প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের জীবন সৎকর্মের মহতী প্রেরণাস্বরূপ, নীতিচ্যুত হইলে ইহাই আবার মহা অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া সর্বযুগেই মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং ধরিত্রীকে রক্তস্নাত করিয়াছে। বেদান্ত এই বিপদ এড়াইয়া যাইতে সমর্থ, কারণ ইহাতে কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের স্থান নাই। বেদান্তে অনেক মন্ত্রদ্রষ্টার কথা আছে—'ঋষি' বা 'মুনি' শব্দে তাঁহারা অভিহিত। 'দ্রষ্টা' শব্দটিও আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত। যাঁহারা সত্য দর্শন করিয়াছেন, মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহারাই দ্রষ্টা।

'মন্ত্র' শব্দের অর্থ যাহা মনন করা হইয়াছে, যাহা মনে ধ্যানের দ্বারা লব্ধ; এবং ঋষি এই-সব মন্ত্রের দ্রষ্টা। এই মন্ত্রগুলি কোন মানব-গোষ্ঠীর অথবা কোন বিশেষ নর বা নারীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তা তিনি যত বড়ই হউন। এমন কি বুদ্ধ বা যীশুখ্রীষ্টের মত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেরও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এগুলি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও যেমন সম্পত্তি, বুদ্ধদেবের মত মহামানবেরও তেমনি সম্পত্তি; অতি নগণ্য কীটেরও যেমন সম্পত্তি, খ্রীষ্টেরও তেমনি সম্পত্তি, কারণ এগুলি সার্বভৌম তত্ত্ব। এই মন্ত্রগুলি কখনও সৃষ্ট হয় নাই—চিরন্তন, শাশ্বত; এগুলি অজ—আধুনিক বিজ্ঞানের কোন বিধি বা নিয়মের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, এই মন্ত্রগুলি আবৃত থাকে এবং আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু অনন্তকাল প্রকৃতিতে আছে। নিউটন জন্মগ্রহণ না করিলেও জগতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিরাজ করিত এবং ক্রিয়াশীল থাকিত। নিউটনের প্রতিভা ঐ শক্তি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিয়াছিল, সজীব করিয়াছিল এবং মানবীয় জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে রূপায়িত করিয়াছিল মাত্র। ধর্মতত্ত্ব এবং সুমহান্ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সম্পর্কেও ঐ-কথা প্রযোজ্য। এগুলি নিত্যক্রিয়াশীল। যদি বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ মোটেই না থাকিত, যদি ঋষি এবং অবতারপ্রথিত পুরুষগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তথাপি এই ধর্মতত্ত্বগুলির অস্তিত্ব থাকিত। এগুলি শুধু সাময়িকভাবে স্থগিত আছে, এবং মনুষ্যজাতি ও মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ধীর-স্থিরভাবে ক্রিয়াশীল থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা এই তত্ত্বগুলি দর্শন ও আবিষ্কার করেন, তাঁহারাই অবতারপুরুষ—তাঁহারাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের আবিষ্কারক। নিউটন ও গ্যালিলিও যেমন পদার্থবিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, অবতারপুরুষগণও তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঋষি। ঐ-সকল তত্ত্বের উপর কোন বিশেষ অধিকার তাঁহারা দাবী করিতে পারেন না, এগুলি বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ সম্পদ্।

হিন্দুদের মতে বেদ অনন্ত। বেদের অনন্তত্বের তাৎপর্য এখন আমরা বুঝিতে পারি। ইহার অর্থ—প্রকৃতির যেমন আদি বা অন্ত বলিয়া কিছু নাই, এ-সকল তত্ত্বেরও তেমনি আরম্ভ বা শেষ বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর পর পৃথিবী, মতবাদের পর মতবাদ উদ্ভূত হইবে, কিছুকাল চলিতে থাকিবে এবং পরে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি একরূপই থাকিবে। লক্ষ লক্ষ মতবাদের উদ্ভব হইতেছে, আবার বিলয় হইতেছে। কিন্তু বিশ্ব একইভাবে থাকে। কোন একটি গ্রহ সম্পর্কে সময়ের আদি-অন্ত হয়তো বলা যাইতে পারে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ঐরূপ সীমানির্দেশ একেবারে অর্থহীন। নৈসর্গিক নিয়ম, জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি সম্পর্কেও ঐ কথা সত্য। আদি-অন্তহীন কালের মধ্যে তাহারা বিরাজমান, এবং মানুষ অতি-সম্প্রতি, তুলনামূলকভাবে বলিতে গেলে জোর কয়েক হাজার বৎসর যাবৎ মানুষ এগুলির স্বরূপ-নির্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছে। অজস্র উপাদান আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। অতএব বেদ হইতে একটি মহান্ সত্য আমরা প্রথমেই শিক্ষা করি যে, ধর্ম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সত্যের অসীম সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত। ইহা আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে, কার্যকর করিতে হইবে এবং জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। সহস্র সহস্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ভবিষ্যতে আরও লক্ষের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবে।

প্রাচীন যুগে প্রতি সমাজেই অনেক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। এমন সময় আসিবে, যখন পৃথিবীতে প্রতি নগরের পথে পথে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ এমনও বলা চলে যে, প্রাচীনযুগের সমাজ-ব্যবস্থায় অসাধারণ ব্যক্তিগণই অবতাররূপে চিহ্নিত হইতেন। সময় আসিতেছে, যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, ধর্মজীবন লাভ করার অর্থই ঈশ্বরকর্তৃক প্রত্যাদেশ লাভ করা এবং নর বা নারী সত্যদ্রষ্টা না হইয়া কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধর্মতত্ত্ব শুধু মানসিক চিন্তা বা ফাঁকা কথার মধ্যে নিহিত নয়; পরন্তু বেদের শিক্ষা এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং সমাজে উহার প্রচারের মধ্যেই ধর্মের মূল রহস্য নিহিত। প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ঋষি গড়িয়া তোলাই ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য এবং বিদ্যায়তনগুলিও সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই গড়িয়া উঠিবে। সমগ্র বিশ্ব প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণে পূর্ণ হইবে। যতদিন মানুষ সত্যদ্রষ্টা বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ না হয়, ততদিন ধর্ম তাহার নিকটে শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। দেওয়ালকে যেমন দেখি, তাহা অপেক্ষাও সহস্রগুণ গভীরভাবে ধর্মকে আমরা প্রত্যক্ষ করিব, উপলব্ধি করিব—অনুভব করিব।

ধর্মের এ-সকল বিবিধ বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে একটি মূলতত্ত্ব বিদ্যমান এবং আমাদের জন্য তাহা পূর্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক জড়বিজ্ঞান ঐক্যের সন্ধান পাইলেই শেষ হইবে, কারণ ইহার বেশী আর আমরা যাইতে পারি না। পূর্ণ ঐক্যে পৌঁছিলে তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিজ্ঞানের আর বেশী কিছুই বলিবার থাকে না। ব্যাবহারিক ধর্মের কাজ শুধু প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিগুলির ব্যবস্থা করা। উদাহরণস্বরূপ, যে-কোন একটি বিজ্ঞানশাখা—যথা রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরা যাইতে পারে। মনে করুন, এমন একটি মূল উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল, যাহা হইতে অন্যান্য উপাদানগুলি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তখনই বিজ্ঞান-হিসাবে রসায়নশাস্ত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে। তারপর বাকী থাকিবে প্রতিদিন ঐ মূল উপাদানটির নব নব সংযোগ আবিষ্কার করা এবং জীবনের প্রয়োজনে ঐ যৌগিক পদার্থগুলি প্রয়োগ করা। ধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। ধর্মের মহান্ তত্ত্বসমূহ, উহার কার্যক্ষেত্র ও পরিকল্পনা সেই স্মরণাতীত যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে-যুগে জ্ঞানের চরম এবং পরম বাণী বলিয়া কথিত—বেদের এই 'সোঽহম্' তত্ত্বটি মানুষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর মধ্যে এই সমগ্র জড়জগৎ ও মনোজগৎ সমন্বিত, ইঁহাকে কেহ ঈশ্বর, কেহ ব্রহ্ম, কেহ আল্লা, কেহ যিহোবা অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই মহান্ তত্ত্ব আমাদের জন্য পূর্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; ইহার বাহিরে যাওয়া আমাদের সাধ্য নাই। আমাদের কর্মে, আমাদের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে উহাকে সার্থক করিতে হইবে, পূর্ণ করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে—যেন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হইতে পারি। আমাদের সম্মুখে বিরাট কাজ।

প্রাচীনকালে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের তাৎপর্য অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিত না। সে-কালে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত। তাহারা মনে করিত, প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে কোন ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতেন। আধুনিক কালে আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত যে, প্রত্যেক জীবের—সে যে-ই হউক বা যেখানেই বাস করুক—এই জ্ঞানে জন্মগত অধিকার। এই জগতে আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া কিছু নাই। যে-ব্যক্তি আকস্মিকভাবে কিছু লাভ করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেও ইহা পাইবার জন্য যুগযুগব্যাপী ধীর ও অব্যাহত তপস্যা করিয়াছে। সমগ্র প্রশ্নটি আমাদের উপর

নির্ভর করে; আমরা কি সত্যই ঋষি বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হইতে চাই? যদি চাই, তবে অবশ্যই আমরা তাহা হইব।

প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ গড়িবার এই বিরাট কাজ আমাদের সম্মুখে বর্তমান। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের প্রধান ধর্মগুলি এই মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যাইতেছে। পার্থক্য শুধু এই যে, দেখিবে বহু ধর্মমত ঘোষণা করেঃ আধ্যাত্মিক সত্যের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি এ-জীবনে হইবার নয়, মৃত্যুর পর অন্য জগতে এমন এক সময় আসিবে, যখন সে সত্য দর্শন করিবে, এখন তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এ-সব কথা বলে, তাহাদিগকে বেদান্ত জিজ্ঞাসা করেঃ অবস্থা যদি বাস্তবিক এইরূপই হয়, তবে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রমাণ কোথায়? উত্তরে তাহাদের বলিতে হইবে সর্বকালেই কতকগুলি বিশিষ্ট মানুষ থাকিবেন, যাঁহারা এ জীবনেই সেই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বস্তুসমূহের আভাস পাইয়াছেন।

অবশ্য ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইবে না। যদি ঐ-সকল ব্যক্তি অসাধারণই হইয়া থাকেন, যদি অকস্মাৎই তাঁহাদের মধ্যে ঐ শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের নাই। যাহা দৈবাৎ-লব্ধ তাহা বিশ্বাস করাও আমাদের পক্ষে পাপ, কারণ আমরা তাহা জানিতে পারি না। জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞানের অর্থ—বিশেষত্ব বা অদ্ভুতত্বের বিনাশ। মনে করুন, একটি বালক রাস্তায় বা কোন পশু-প্রদর্শনীতে গিয়া অদ্ভুত আকৃতির একটি জন্তু দেখিতে পাইল। সেই জন্তুটি কি—সে চিনিতে পারিল না। তারপর সে এমন এক দেশে গেল, যেখানে ঐ জাতীয় জন্তু অসংখ্য রহিয়াছে। তখন সে উহাদিগকে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্তু বলিয়া বুঝিল এবং সন্তুষ্ট হইল। তখন মূল তত্ত্বটি জানার নামই হইল জ্ঞান। তত্ত্ব-বর্জিত কোন একটি বস্তুবিশেষের যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞান নয়। মূল সত্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন একটি বিষয় অথবা অল্প কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের জ্ঞান হয় না, আমরা অজ্ঞানই থাকি। অতএব যদি এই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ বিশেষ ধরনের ব্যক্তিই হইয়া থাকেন, যদি সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে যে-জ্ঞান, তাহা লাভ করিবার অধিকার শুধু তাঁহাদেরই হইয়া থাকে এবং অন্য কাহারও না থাকে, তবে তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ তাঁহারা বিশেষ ধরনের দৃষ্টান্ত মাত্র, মূলতত্ত্বের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। আমরা নিজেরা যদি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হই, তবেই আমরা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারিব।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমুদ্র-নাগিনী সম্পর্কে নানা কৌতুকাবহ ঘটনার কথা তোমরা শুনিয়াছ; কৌতুকাবহ কেন? কারণ দীর্ঘকাল অন্তর কয়েকজন মানুষ আসিয়া লোকসমাজে ঐ সমুদ্র-নাগিনীদের কাহিনী প্রচার করেন, অথচ অন্য কেহ কখনও উহাদিগকে দেখে নাই। তাহাদের উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ তত্ত্ব নাই; কাজেই জগৎ উহা বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ ঐ-সকল কাহিনীর পশ্চাতে কোন শাশ্বত সত্য নাই বলিয়াই জগৎ উহা বিশ্বাস করে না। যদি কেহ আমার সম্মুখে আসিয়া বলে যে, একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ তাঁহার স্থূলশরীর সহ অকস্মাৎ ব্যোমপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তাহা হইলে সেই অসাধারণ ব্যাপারটি দর্শন করিবার অধিকার আমার আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি—'তোমার পিতা কিংবা পিতামহ কি দৃশ্যটি দেখিয়াছিলেন?' সে উত্তরে বলে, 'না, তাঁহারা কেহই দেখেন নাই, কিন্তু পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।'—আর ঐরূপ ঘটনা যদি আমি বিশ্বাস না করি, তবে অনন্তকালের জন্য আমাকে নরকে দগ্ধ হইতে হইবে।

এ কী কুসংস্কার! আর ইহারই ফলে মানুষ তাহার দেব-স্বভাব হইতে পশু-স্বভাবে অবনত হইতেছে। যদি আমাদিগকে সবকিছু অন্ধভাবেই বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিচারবুদ্ধি আমরা লাভ করিয়াছি কেন? যুক্তিবিরোধী কোন কিছু বিশ্বাস করা কি মহাপাপ নয়? ঈশ্বর যে উৎকৃষ্ট সম্পদটি আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহা যথাযথ-ভাবে ব্যবহার না করিবার কী অধিকার আমাদের আছে? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরদত্ত শক্তির ব্যবহারে অক্ষম অন্ধবিশ্বাসী অপেক্ষা যুক্তিবাদী অবিশ্বাসীকে ভগবান্ সহজে ক্ষমা করিবেন। অন্ধবিশ্বাসী শুধু নিজের প্রকৃতিকে অবনমিত করে এবং পশুস্তরে অধঃপাতিত হয়—বুদ্ধিনাশের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুক্তিবিচারের আশ্রয় আমরা অবশ্য গ্রহণ করিব এবং সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত এই-সকল ঈশ্বরের দূত বা মহাপুরুষের কাহিনীকে যখন যুক্তিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিব, তখন আমরা তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিব। যখন আমাদের মধ্যেও তাঁহাদের মত প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিতে পাইব, তখনই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিব। তখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা বিচিত্র ধরনের কোন জীব নন, পরন্তু কতকগুলি তত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ মাত্র। জীবনে তাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন, কর্ম করিয়াছেন, ফলে ঐ নীতি বা তত্ত্ব স্বতই তাঁহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগকে ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইলে অবশ্য কর্ম করিতে হইবে। যখন আমরা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইব, তখনই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব। তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন, ইন্দ্রিয়ের পরিধি অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় সত্য দর্শন করিতেন—এ-সকল কথা আমরা তখনই বিশ্বাস করিব, যখন ঐরূপ অবস্থা নিজেরা লাভ করিতে সমর্থ হইব, তৎপূর্বে নয়।

বেদান্তের ইহাই একমাত্র মূলনীতি। বেদান্ত ঘোষণা করেন যে, প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত উপলব্ধিই ধর্মের প্রাণ; কারণ ইহকাল ও পরকাল, জন্ম ও মৃত্যু, ইহলোক ও পরলোকের প্রশ্ন, সবই সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রশ্ন মাত্র। কাল অনন্ত, মানুষ তাহাকে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সামান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন ভিন্ন দশ ঘটিকা এবং বার ঘটিকা সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কালপ্রবাহ অন্তহীন গতিতে চলিয়াছে। সুতরাং এই জীবন বা জীবনান্তরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উহা সময়ের প্রশ্ন মাত্র এবং সময়ের হিসাবে যেটুকু ক্ষতি হয়, কর্মের গতিবৃদ্ধিতে তাহার পূরণ হইয়া থাকে। অতএব বেদান্ত ঘোষণা করিতেছেন—ধর্ম বর্তমানেই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তোমাকে ধার্মিক হইতে হইলে সংস্কারমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন মন লইয়া কঠোর শ্রমের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে, তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রত্যেকটি বিষয় স্বয়ং দর্শন করিতে হইবে; তাহা হইলে যথার্থ ধর্মলাভ করিবে। ইহার পূর্বে তুমি নাস্তিক ছাড়া আর কিছু নও, অথবা নাস্তিক অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; নাস্তিক তবু ভাল, কারণ সে অকপট। অকপট ভাবেই সে বলে, 'আমি এ-সব জানি না।' আর অপর সকলে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজেদের জাহির করিয়া বলে, 'আমরা অতি ধার্মিক।' কেহ জানে না, তাহার ধর্ম কি, কারণ প্রত্যেকে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কতকগুলি আজগবি কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়াছে, পুরোহিতেরা তাহাদিগকে সেগুলি বিশ্বাস করিতে বলিয়াছে; না করিলে তাহাদের উদ্ধার নাই। যুগে যুগে

এই ধারাই চলিয়া আসিতেছে।

ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই একমাত্র পথ। আমাদের প্রত্যেককেই সেই-পথটি আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রশ্ন উঠিবে, বাইবেল-প্রমুখ শাস্ত্রসমূহের তবে মূল্য কি? শাস্ত্রগুলির মূল্য অবশ্য যথেষ্টই আছে, যেমন কোন দেশকে জানিতে হইলে তাহার মানচিত্রের প্রয়োজন। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্বে আমি ইংলণ্ডের মানচিত্র অসংখ্যবার দেখিয়াছি। ইংলণ্ড সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা পাইতে মানচিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, তথাপি যখন এদেশে আসিলাম, তখন বুঝিলাম মানচিত্রে ও বাস্তবদেশে কত প্রভেদ! উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য। শাস্ত্রগুলি মানচিত্র মাত্র—এগুলি অতীত মহাপুরুষগণের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা। এগুলি আমাদিগকে একইভাবে একই অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিলাভে সাহস দেয় ও অনুপ্রাণিত করে।

বেদান্তের প্রথম তত্ত্ব এই—অনুভূতিই ধর্ম; অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ধার্মিক, অনুভূতিহীন ব্যক্তিতে ও নাস্তিকে কোন পার্থক্য নাই। বরং নাস্তিক ভাল, কারণ সে নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করে। আবার ধর্মশাস্ত্রসমূহ ধর্মানুভূতিলাভে প্রভূত সাহায্য করে। এগুলি শুধু আমাদের পথ-প্রদর্শক নয়, পরন্তু আমাদিগকে সাধনপ্রণালীর উপদেশ দেয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব অনুসন্ধান-প্রণালী আছে। এ-জগতে এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা বলেন, 'আমি ধার্মিক হইতে চাহিয়াছিলাম, সত্য উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই; সুতরাং আমি কিছু বিশ্বাস করি না।' শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে। বহুলোক তোমাকে বলিবে, 'আমি ধার্মিক হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আজীবন দেখিয়াছি, উহার মধ্যে কিছু নাই।' আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার দেখিবেঃ মনে কর, একজন রাসায়নিক—বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট আসিয়া রসায়নশাস্ত্রের কথা বলিলেন। যদি তুমি তাঁহাকে বল, 'আমি রসায়নবিদ্যার কিছুই বিশ্বাস করি না, কারণ আজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই পাই নাই।' তখন বৈজ্ঞানিক তোমাকে প্রশ্ন করিবেন, 'কখন তুমি ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলে?' তুমি বলিবে, 'যখন ঘুমাইতে যাইতাম, তখন পুনঃপুনঃ এই কথা উচ্চারণ করিতাম—হে রসায়নশাস্ত্র, আমার নিকট এস। কিন্তু সে কখনও আসে নাই।' উত্তরে বৈজ্ঞানিক হাসিবেন ও বলিবেন, 'না, উহা যথার্থ প্রণালী নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়া ক্ষাররস, অম্লরস প্রভৃতি মিশাইয়া দিনের পর দিন গবেষণায় তোমার হাত পোড়াও নাই? ঐ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীরে রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতে।' ধর্মের বেলায়ও ঠিক তেমনি। ধর্ম সম্বন্ধে ঐরূপ শ্রম স্বীকার করিতে কি প্রস্তুত আছ? প্রত্যেক বিজ্ঞানশাখারই যেমন শিক্ষার একটি বিশিষ্ট প্রণালী আছে, ধর্মানুশীলনেরও সেরূপ আছে। ধর্মেরও নিজস্ব পদ্ধতি আছে। এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণের, যাঁহারা ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কিছু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্য আমরা ধর্মলাভের কোন-না-কোন শিক্ষা পাইতে পারি এবং পাইব। তাঁহারা আমাদিগকে ধর্মের বিবিধ প্রণালী, বিশেষ পদ্ধতি শিখাইবেন, এবং এগুলির সাহায্যেই আমরা ধর্মের নিগূঢ় সত্যসমূহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। তাঁহারা আজীবন সাধনা করিয়াছেন, মনকে সূক্ষ্মতম অনুভূতির উপযোগী করিয়া মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সূক্ষ্মানুভূতির সহায়তায় ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ধার্মিক হইতে হইলে, ধর্মকে উপলব্ধি ও অনুভব করিতে হইলে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইতে হইলে তাঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী সাধন করিতে হইবে। তারপরও যদি কিছু না পাওয়া যায়, তখন অবশ্য এ-কথা বলিবার অধিকার আমাদের হইবে, 'ধর্মের মধ্যে কিছুই নাই, কারণ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং বিফল হইয়াছি।'

ইহাই সকল ধর্মের ব্যাবহারিক দিক্। জগতের সকল ধর্মগ্রন্থেই ইহা পাইবে। কতকগুলি মত ও নীতিকথাতেই ধর্মশিক্ষা হয় না, পরন্তু মহাপুরুষদের জীবনে ধর্মের আচরণ বা তপস্যা দেখিতে পাও। যে-সকল আচার-আচরণের বিষয় হয়তো শাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে লিখিত নাই, সেগুলিও এই-সকল মহাপুরুষের প্রাত্যহিক জীবনে—আহারে ও বিহারে প্রতিপালিত এবং অনুসৃত হয় দেখিতে পাইবে। মহাপুরুষদের সমগ্র জীবন, আচরণ, কর্ম-পদ্ধতি প্রভৃতি সব কিছুই জনসাধারণের জীবনধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেইজন্যই তাঁহারা উচ্চতর জ্ঞান ও ভগবদ্দর্শনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর আমরাও যদি ঐরূপ দর্শন লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকেও অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তপস্যা ও অভ্যাস-যোগের দ্বারাই আমরা ঐরূপ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিব। সুতরাং বেদান্তের পদ্ধতি এইঃ প্রথমে ধর্মের মূলনীতিগুলি নির্ধারিত করিতে হয়, লক্ষ্যবস্তুটি চিহ্নিত করিতে হয়, তারপর যে-প্রণালী সহায়ে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, সেই নীতি শিখিতে হয়—বুঝিতে হয় এবং উপলব্ধি করিতে হয়।

আবার এ-সকল প্রণালীও বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রকৃতি পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র যে, একই প্রণালী আমাদের একাধিক ব্যক্তির পক্ষে ক্বচিৎ সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের রুচি ও প্রকৃতি পৃথক্, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন হওয়া উচিত। দেখিবে কেহ কেহ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, কেহ কেহ দার্শনিক ও যুক্তিবাদী, কেহ বা আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনার পক্ষপাতী—স্থূলবস্তুর সহায়তা পাইতে চান। আবার দেখিবে কেহ কেহ কোনপ্রকার রূপ, মূর্তি বা পূজা-অনুষ্ঠান পছন্দ করে না—ঐ-সব তাহাদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আবার আর একজন একবোঝা তাবিজ, কবচ সারা শরীরে ধারণ করে; সে এই-সকল প্রতীকের প্রতি এত অনুরাগী! আর একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি দানধ্যানের পক্ষপাতী; সে কাঁদে, ভালবাসে, আরও কত প্রকারে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করে। অতএব এই-সকল ব্যক্তির জন্য কখনও এই প্রণালী উপযোগী হইতে পারে না। যদি ধর্মজগতে সত্যলাভের জন্য একটি মাত্র পথ নির্দিষ্ট থাকিত, তবে ঐ পথ যাহাদের উপযোগী নয়, তাহাদের পক্ষে উহা অনিষ্টের কারণ হইত, মৃত্যুতুল্য হইত। সুতরাং সাধনপ্রণালী বিভিন্ন হইবে। বেদান্ত সেইজন্য রুচির বৈচিত্র্যে অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদনুযায়ী নির্দেশ দিয়া থাকেন। তোমার রুচি অনুযায়ী যে-কোন একটি পথ গ্রহণ কর। একটি তোমার উপযোগী না হইলে অন্য একটি হয়তো উপযোগী হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে আমরা দেখি যে, জগতে প্রচলিত একাধিক ধর্ম আমাদের পক্ষে কত গৌরবের বিষয়! বহুলোকের মনোমত মাত্র একজন আচার্য ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ না হইয়া বহু ধর্মগুরুর আবির্ভাব কত কল্যাণকর! মুসলমানগণ

সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামধর্মে, খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টধর্মে এবং বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতে চান; কিন্তু বেদান্তের ঘোষণা এইঃ জগতের প্রত্যেকটি নরনারী নিজ নিজ পৃথক্ মতে বিশ্বাসী হউক। মতগুলির পশ্চাতে একই তত্ত্ব, একই একত্ব বিদ্যমান। যত অধিক সংখ্যায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যত বেশী শাস্ত্র থাকিবে, যত বেশী মন্ত্রদ্রষ্টা থাকিবেন, যত মত ও পথ থাকিবে, জগতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে যত বেশী বৃত্তির সংস্থান থাকে, জনসাধারণের পক্ষে তত অধিক পরিমাণে কর্মলাভের সুযোগ হয়, ভাবজগতে এবং ধর্মজগতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ হওয়াতে মানসিক উৎকর্ষের কী বহুবিধ সুযোগ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! জাগতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে নানা সামগ্রী আয়ত্তের মধ্যে পাইলে মানুষের পক্ষে কত বেশী সুবিধা হয়! ধর্মজগতেও সেইরূপ। ইহা ভগবানেরই এক মহিমময় বিধান যে, জগতে বহু ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রার্থনা করি, এই ধর্মমতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক এবং কালক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সংস্কার অনুযায়ী স্বতন্ত্র ধর্মমতের অনুবর্তী হইবার সুযোগ লাভ করুক।

বেদান্ত এই নিগূঢ় প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এক সত্য প্রচার করেন এবং একাধিক সাধনপ্রণালী স্বীকার করেন। তুমি খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, য়াহুদী বা হিন্দু হও না কেন, যে-কোন পুরাণ-শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও না কেন, নাজারেথের ঈশদূত, মক্কার প্রেরিতপুরুষ মহম্মদ, ভারতের বা অন্য কোন স্থানের অবতার ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর না কেন, তুমি নিজেই একজন সত্যদ্রষ্টা হও না কেন, বেদান্ত এ-সম্বন্ধে কিছুই বলিবে না। বেদান্ত শুধু সেই শাশ্বত নীতি প্রচার করেন, যাহা সকল ধর্মের ভিত্তি এবং যাহার জীবন্ত উদাহরণ ও প্রকাশরূপে অবতারপুরুষ ও মুনি-ঋষিগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের সংখ্যা যতই বর্ধিত হউক, তাহাতে বেদান্ত কোন আপত্তি উত্থাপন করিবে না। বেদান্ত শুধু তত্ত্বটি প্রচার করে এবং সাধনপ্রণালী তোমার উপর ছাড়িয়া দেয়। যে কোন পথ অনুসরণ কর, যে-কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের অনুগামী হও—তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু লক্ষ্য রাখিও সাধনপথটি যেন তোমার সংস্কার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলেই তোমার উন্নতি নিশ্চিত।

ভারতীয় ধর্মচিন্তা

[আমেরিকার ব্রুকলিন শহরে ক্লিণ্টন এভেন্যু-এর উপর অবস্থিত পাউচ্ ম্যানসনে আর্ট গ্যালারী কক্ষে ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত বক্তৃতা।]

ভারতবর্ষ আকারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক হইলেও তাহার জনসংখ্যা ঊনত্রিশ কোটি; অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান, বৌদ্ধ[২] এবং হিন্দু এই তিনটি ধর্মমতের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছয় কোটি, দ্বিতীয়টির সংখ্যা নব্বই লক্ষ এবং প্রায় বিশ কোটি ষাট লক্ষ নরনারী শেষোক্ত ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহা ধ্যানাশ্রয়ী ও তত্ত্বচিন্তাশ্রয়ী দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বেদের নানাখণ্ডে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার উপর স্থাপিত। এই বেদ দাবী করেনঃ দেশের দিক্ হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম এবং কালের দিক্ হইতে উহা অনন্ত। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। জড়জগতে আত্মার শক্তির, সান্তের উপর অনন্ত শক্তির অসংখ্য বিকাশ ও প্রভাব ঘটিয়াছে; তথাপি অনন্ত অপরিমেয় আত্মা স্বয়ম্ভূ, শাশ্বত ও চির-অপরিবর্তনীয়। অনন্তের বক্ষে কালের গতি কোনরূপ চিহ্নই অঙ্কিত করিতে পারে না। মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ইহার অতীন্দ্রিয় স্তরে অতীত বলিয়া কিছু নাই, ভবিষ্যৎ বলিয়াও কিছু নাই। বেদ প্রচার করেন, মানবাত্মা অবিনশ্বর। শরীর ক্ষয়-বৃদ্ধির নিয়মের অধীন—যাহারই বৃদ্ধি আছে, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রত্যগাত্মার সম্পর্ক অন্তহীন শাশ্বত জীবনের সহিত; ইহার কোনদিন আদি ছিল না, আবার কোনদিন অন্তও হইবে না। হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্মের মতে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের মুহূর্তকেই প্রত্যেক মানবাত্মার আরম্ভকাল ধরা হয়; কিন্তু হিন্দুধর্ম দাবী করে যে, মানবের আত্মা সনাতন ঐশী সত্তারই বহিঃপ্রকাশ এবং ঈশ্বরের যেমন আদি নাই, আত্মারও তেমনি আদি নাই। সে এক ব্যক্তিত্ব হইতে অপর ব্যক্তিত্বে নিরন্তর গমনাগমনের পথে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের মহান্ নিয়মানুসারে অগণিত রূপ পাইয়াছে এবং পূর্ণতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকার রূপ পাইতে থাকিবে; তারপর আর পরিবর্তন ঘটিবে না।

এ-সম্পর্কে এই প্রশ্ন প্রায়ই করা হয় যে, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে অতীত জীবনসমূহের কিছুই কেন আমরা স্মরণ করিতে পারি না? আমাদের উত্তর এই যে, আমরা মানস মহাসমুদ্রের শুধু উপরিভাগের নাম দিয়াছি 'চেতনা', কিন্তু তাহার অতল গভীরে সঞ্চিত আছে আমাদের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখময় অভিজ্ঞতা। মানবাত্মা এমন কিছু পাইবার জন্যই লালায়িত, যাহা চিরস্থায়ী। কিন্তু আমাদের মন ও শরীর—বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চের সব-কিছুই নিরন্তর পরিবর্তনশীল। অথচ আমাদের আত্মার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা এমন কিছুর জন্য, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা চিরকালের জন্য পরিপূর্ণতায় স্থিতি লাভ করিয়াছে। অসীম ভূমারই জন্য মানবাত্মার এই তৃষ্ণা। আমাদের নৈতিক উন্নতি যত গভীর হইবে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইবে, এই কূটস্থ নিত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষাও ততই তীব্র হইবে।

আধুনিক বৌদ্ধেরা এই শিক্ষা দেন, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না. তাহার অস্তিত্বই সম্ভব নয় এবং মানবাত্মার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে—এ-বিশ্বাস ভ্রম মাত্র। অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদীরা (Idealist) দাবী করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এবং তাহার মনোজগতে ধারণার বাহিরে বহির্বিশ্বের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। এই দ্বন্দ্বের নিশ্চিত সমাধান এই যে, বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রপঞ্চ স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্রতার—বস্তু ও ধারণার সংমিশ্রণ। আমাদের দেহ-মন বহির্জগতের উপর নির্ভরশীল এবং বহির্জগতের সহিত দেহমনের সম্বন্ধের অবস্থানুযায়ী এই নির্ভরশীলতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর যেমন স্বাধীন, প্রত্যগাত্মাও তেমনি মুক্ত, এবং শরীর ও মনের বিকাশ অনুযায়ী তাহাদের গতিকেও অল্পাধিক নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ।

মৃত্যু বলিতে অবস্থার পরিবর্তন মাত্রই বুঝায়। আমরা সেই একই বিশ্বের মধ্যে থাকিয়া যাই এবং পূর্বের মত সেই একই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকি। এই বিশ্বকে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, জ্ঞান ও সৌন্দর্য বিকাশের উচ্চতর লোকে যাঁহারা উপনীত, তাঁহারা তাঁহাদেরই অনুগামী বিশ্বব্যাপী সৈন্যবর্গের অগ্রগামী দল ভিন্ন আর কিছুই নন। এইরূপে সর্বোত্তম বিকাশপ্রাপ্ত আত্মা সর্বনিম্ন অনুন্নত আত্মার সহিত সম্বন্ধ এবং অসীম পূর্ণতার বীজ সকলের মধ্যেই নিহিত আছে। অতএব আমাদের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলন করিতে হইবে এবং সকলের মধ্যেই যাহা কিছু উত্তম নিহিত আছে, তাহাই দেখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া শুধু আমাদের শরীর-মনের অপূর্ণতা লইয়া বিলাপ করিলে কোন লাভ হইবে না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে দমন করিবার জন্য যে বীরোচিত প্রচেষ্টা, তাহাই আমাদের আত্মাকে উন্নতির পথে চালিত করে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক উন্নতির নিয়মগুলিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করা। খ্রীষ্টানরা এ-বিষয়ে হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। হিন্দুরাও খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ইহাদের প্রত্যেকেরই মূল্যবান্ অবদান রহিয়াছে।

আপনারা সন্তান-সন্ততিদের এই শিক্ষাই দিন যে, প্রকৃত ধর্ম ইতিমূলক সৎ বস্তু, নেতিমূলক নয়; এই শিক্ষা দিন যে, শুধু পাপ হইতে বিরত থাকাই ধর্ম নয়, নিরন্তর মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম—কোন মানুষের নিকট হইতে শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্য নয়, পুস্তকপাঠের দ্বারাও লভ্য নয়; প্রকৃত ধর্ম হইল অন্তরাত্মার জাগরণ এবং এই জাগরণ বীরোচিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক শিশুই পূর্ব পূর্ব অতীত জীবন হইতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; এই-সকল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাহাদের দেহ-মনের গঠনে লক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যেই যে এক প্রকার

স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, শরীর ও মন ব্যতীত আরও কিছু আমাদের মধ্যে বিরাজমান। আমাদের সকলের অন্তরে যে-আত্মা আধিপত্য করে, তাহা স্বাধীন এবং তাহাই আমাদের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। আমরা নিজেরা যদি মুক্ত না হই, তাহা হইলে এই পৃথিবীর উন্নতিসাধনের আশা কিরূপে করি? আমরা বিশ্বাস করি যে, মানবের প্রগতি আত্মার কার্যকলাপের ফলেই সম্ভব হয়। এই পৃথিবী যাহা এবং আমরা যাহা, তাহা আত্মার মুক্তস্বভাবেরই ফল। আমাদের বিশ্বাস —ঈশ্বর এক। তিনি আমাদের সকলের পিতা, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান্ এবং তিনি তাঁহার সন্তানদের অসীম ভালবাসার সহিত পরিচালন ও পরিপালন করেন। আমরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ন্যায় সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত নই, আমরা আরও অগ্রসর হইয়া বলি যে, আমিই সেই ঈশ্বর; আমরা বলি যে, তাঁহারই ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে বিকশিত, আমাদের অন্তরে তিনিই বাস করেন এবং আমরা তাঁহাতেই অবস্থিত। আমরা বিশ্বাস করি, সকল ধর্মেই কিছু না কিছু সত্যের বীজ নিহিত আছে, এবং হিন্দুগণ সকল ধর্মের নিকটই শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করেন; কারণ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ক্রমবৃদ্ধির নিয়মেই সত্য লব্ধ হয়, অবিরাম বাদ দেওয়ার নিয়মে নয়। আমরা ভগবানের চরণে সকল ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরাশি দ্বারা সজ্জিত একটি স্তবক নিবেদন করিব। আমরা তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসিব, কোন কিছু লাভের আশায় নয়। আমরা কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিব, কোন পুরস্কারের প্রত্যাশায় নয়। আমরা সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্যের উপাসনা করিব, লাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়। এইরূপে চিত্তের পবিত্রতা লইয়াই আমরা ভগবানের দর্শন পাইব। যাগ-যজ্ঞ, মুদ্রা ও ন্যাস, মন্ত্রোচ্চারণ বা মন্ত্রজপ প্রভৃতিকে ধর্ম বলা চলে না। এ-সকল তখনই প্রশংসনীয়, যখন সেগুলি আমাদের মনে সাহসের সহিত সুন্দর ও বীরোচিত কর্ম সম্পাদনের জন্য উৎসাহ সঞ্চার করে এবং আমাদের চিত্তকে ভগবানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার স্তরে উন্নীত করে।

যদি প্রতিদিন শুধু প্রার্থনাকালে স্বীকার করি যে, ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষের সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কি লাভ? পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য শুধু আমাদের জন্য উচ্চতর জীবনের পথ নির্দেশ করা। কিন্তু কোন শুভ ফলই দেখা দিবে না, যদি না অবিচলিত পদে সেই পথে আমরা চলিতে পারি। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বকে একটি কাঁচের গোলকের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। প্রত্যেকটির কেন্দ্র একই শুভ্র জ্যোতি, ঐশী সত্তার একই প্রকার বিচ্ছুরণ; কিন্তু কাঁচের আবরণের বর্ণ ও ঘনত্বের পার্থক্যে রশ্মিনিঃসরণে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ঘটিতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত শিখাটির দীপ্তি ও সৌন্দর্য সমান, কিন্তু যে জাগতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ হয়, কেবল তাহারই অপূর্ণতাবশতঃ তারতম্যে প্রতীতি ঘটে। বিকাশের মানদণ্ড অনুসারে আমরা যতই উচ্চে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই প্রকাশযন্ত্র স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর হইতে থাকিবে।

কল্পকালীন স্থিতি ও পরিবর্তন

[প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত]

জগতের সমতা নষ্ট হইয়াছে; বিনষ্ট সাম্যাবস্থার দৃষ্টান্ত এই সমগ্র বিশ্ব। জগতের সব গতিকেই এই সাম্যাবস্থা ফিরিয়া পাইবার প্রয়াস বলা যায়; সেইজন্য ইহাকে 'গতি' আখ্যা দেওয়া চলে না। অন্তর্জগতের সাম্যাবস্থা এমন একটি জিনিষ, যাহা আমাদের চিন্তার অতীত; কারণ চিন্তা নিজেই গতিবিশেষ। প্রসার মানে পূর্ণ সমতার দিকে অগ্রসর হওয়া; আর সমগ্র জগৎ সেইদিকেই ধাবমান। কাজেই পূর্ণসাম্যাবস্থা কখনই লাভ করা যায় না—এ-কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। সাম্যাবস্থায় কোনরূপ বৈচিত্র্য থাকা অসম্ভব, উহাকে বৈচিত্র্যহীন হইতেই হইবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মাত্র দুটি পরমাণু থাকিবে, ততক্ষণ উহারা পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিয়া সাম্যভাব নষ্ট করিবে। সাম্যাবস্থা—একত্ব, স্থিতি ও সাদৃশ্যের অবস্থা। অন্তর্জগতের দিক্ হইতে এই সাম্যাবস্থা চিন্তাও নয়, শরীরও নয়, এমন কি যাহাকে আমরা গুণ বলি, তাহাও নয়। নিজের স্বরূপ বলিতে যাহা বুঝায়, এ অবস্থায় একমাত্র তাহাই থাকে; ইহাই সৎ-চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ।

একই কারণে এই অবস্থা কখনও দুই প্রকার হইতে পারে না। ইহা অদ্বিতীয়। এখানে তুমি-আমি প্রভৃতি সর্ববিধ কৃত্রিম বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হইবেই; কারণ বৈচিত্র্য পরিবর্তন বা অভিব্যক্তির অবস্থা, উহা মায়ার অন্তর্গত। অবশ্য বলিতে পার, আত্মার এই অভিব্যক্ত অবস্থা দেখিয়া আত্মা পূর্বে স্থির ও মুক্ত ছিল, এ-কথা মনে হইলেও বর্তমান ভেদপূর্ণ অবস্থাই উহার প্রকৃত স্বরূপ; যাহা হইতে আত্মা এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা আত্মার আদিম অপরিণত অবস্থা; সে অবস্থায় আবার ফিরিয়া যাওয়া মানে অধঃপতন। এ-কথা বলিতে পার বটে, তবে এ-কথার কোন মূল্য বা গুরুত্ব নাই; থাকিত, যদি প্রমাণিত হইত যে, আত্মার একরূপতা ও নানাধর্মিতা নামক অবস্থাপ্রাপ্তি মাত্র একবারই ঘটে। কিন্তু তাহা তো নয়, যাহা একবার ঘটে, বার বার তাহার পুনরাবৃত্তি হইবেই। স্থিতিকে অনুসরণ করে পরিবর্তন—জগৎ। স্থিতির পূর্বে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ছিল, এবং পরিবর্তনের পর স্থিতি আবার আসিবেই; বার বার এরূপ ঘটিবে। এ-কথা চিন্তা করা হাস্যকর যে, একদা নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি ছিল এবং তারপর নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিটি কণা দেখাইতেছে যে, ক্রমান্বয়ে স্থিতি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া উহা নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

দুইটি স্থিতিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধানের নাম কল্প। কাল্পিক স্থিতি একটি পূর্ণ সমজাতীয় অবস্থা হইতে পারে না; হইলে ভাবী বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ-কথা বলা অযৌক্তিক যে, বর্তমান পরিবর্তনের অবস্থা পূর্বের স্থিতি অবস্থার তুলনায় উন্নততর; কারণ তাহা হইলে ভাবী স্থিতি-অবস্থার কাল পূর্ববর্তী পরিবর্তন-অবস্থার কাল অপেক্ষা অধুনাতন হওয়ার জন্য সে অবস্থা পূর্ণতর হইবে! প্রকৃতি একই রূপ বারেবারে দেখাইতেছে; নিয়ম বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়। জীবাত্মাদের বেলা কিন্তু (বিভিন্ন কল্পে ক্রমশঃ) উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে; অর্থাৎ জীবাত্মারা কল্প হইতে কল্পান্তরে নিজ স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী হয়; এভাবে ক্রমোন্নত হইতে হইতে প্রতি কল্পেই অনেক জীবাত্মা মুক্ত হইয়া যায়, আর তাহাদের সংসার-চক্রে আবর্তিত হইতে হয় না।

বলিতে পার, জীবাত্মা তো জগৎ ও প্রকৃতির অংশ, জগৎ ও প্রকৃতির মত সেও তো বার বার পুনরাবর্তন করিবে, তাহার মুক্তি হইতে পারে না; জগতের ধ্বংস না হইলে তাহার মুক্তি হইবে কিরূপে? উত্তরে বলা যায়, জীবাত্মা মায়ার কল্পনা মাত্র, স্বরূপতঃ সেও যথার্থ সত্তা বা ব্রহ্ম।

জীবাত্মাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম। প্রকৃতির ভিতর যাহা সৎ বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম; মায়ার অধ্যাসের জন্য তিনিই এই নানাত্ব বা প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। মায়া দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র; সেইজন্য মায়াকে 'সৎ' বলা যাইতে পারে না। তথাপি মায়া এই দৃশ্য-জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। যদি বল, মায়া নিজে অসৎ হইয়া সৃষ্টি করে কিরূপে? তাহার উত্তরে বলা যায়—যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাও যে অজ্ঞান (অসৎ), কাজেই স্রষ্টা তো অজ্ঞানী (অসৎ) হইবেই। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান সৃষ্ট হইতে পারে কিভাবে? কাজেই বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই দুই রূপে মায়া কার্য করিতেছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করিয়া বিদ্যা নিজেও বিনষ্ট হয়। এভাবে মায়া নিজেকে নিজেই বিনাশ করে; যাহা বাকী থাকে, তাহাই সচ্চিদানন্দ—ব্রহ্ম। প্রকৃতির ভিতর যাহা সৎবস্তু, তাহাই ব্রহ্ম। প্রকৃতি তিনটি রূপে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়—ঈশ্বর, চিৎ বা জীব, এবং অচিৎ বা জড়বস্তু। এ-সবেরই প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্ম। মায়ার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া তিনি নানারূপে প্রতিভাত হন। তবে ঈশ্বর-দর্শন করাই—চরম সত্তাকে ঈশ্বররূপে দর্শন করাই চরম সত্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া, এবং ইহাই সর্বোত্তম দর্শন। সগুণ ঈশ্বরের ভাবই মানবীয় ভাবের সর্বোচ্চ অবস্থা; প্রকৃতির গুণগুলি যে অর্থে সত্য, ঈশ্বরে আরোপিত গুণগুলিও সেই অর্থে সত্য। তথাপি এ-কথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই যে, নির্গুণ ব্রহ্মকে মায়ার ভিতর দিয়া দেখিলে যেরূপ দেখায়, তাহাই সগুণ ঈশ্বর।

বিস্তারের জন্য সংগ্রাম

[প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নে লিখিত]

আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের ভিতর অনুস্যূত রহিয়াছে সেই প্রাচীন সমস্যা—বীজ বৃক্ষের পূর্বে, না বৃক্ষ বীজের পূর্বে, সত্তার অভিব্যক্তির ক্রমে চৈতন্য প্রথম, না জড় প্রথম; ভাব প্রথম, না বাহ্য প্রকাশ প্রথম; মুক্তি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, না নিয়মের বন্ধন; চিন্তা জড়ের স্রষ্টা, না জড় চিন্তার স্রষ্টা; প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন স্থিতির পূর্বের অবস্থা, না স্থিতির ভাবটি পরিবর্তনের পূর্বের অবস্থা—এই-সব প্রশ্নের সমাধান সমভাবেই দুরূহ। তরঙ্গমালার পর্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনের মত উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলিও অনিবার্য পরম্পরায় একটি আর একটিকে অনুসরণ করে এবং মানুষ তাহার রুচি, শিক্ষা বা মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন-না-কোন একটি পক্ষ সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা যায় যে, প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলির ভিতর যে-সঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়—উহা চেতনাত্মক কার্যেরই ফল; পক্ষান্তরে তর্ক করা যাইতে পারে, চৈতন্যের অস্তিত্ব জগৎ সৃষ্টির পূর্বে থাকা সম্ভব নয়, কারণ বিবর্তনের ফলে উহা জড় এবং শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। যদি বলা যায়, প্রতিটি রূপের পশ্চাতে মনে একটি ভাবাদর্শ অবশ্যই থাকিবে, তাহা হইলে সমান জোর দিয়া বলিতে পারা যায়, ভাবাদর্শের সৃষ্টিই হইয়াছিল বহুবিধ বাহ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা। একদিকে মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের চিরন্তন ধারণার প্রতি আবেদন, অপরদিকে এ ধারণাও রহিয়াছে যে, জগতে কোন কিছুই কারণহীন নয় বলিয়া কি স্থূল, কি মানসিক—সব কিছুই কার্য-কারণ-নিয়মের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। শক্তির দ্বারা উৎপন্ন শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার পর যদি স্বীকার করা যায়, চিন্তাই স্পষ্টতঃ এই শরীরের স্রষ্টা, তাহা হইলে ইহাও স্পষ্ট যে, শরীরের পরিবর্তনে চিন্তার পরিবর্তন হয় বলিয়া শরীর নিশ্চয়ই মনের স্রষ্টা। যদি যুক্তি প্রদর্শন করা যায়, সর্বজনীন পরিবর্তন নিশ্চয়ই একটি পূর্ববর্তী স্থিতির ফলস্বরূপ, তাহা হইলে সমান যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে যে, অপরিবর্তনীয়তার ভাব একটি বিভ্রমজনক আপেক্ষিক ধারণা মাত্র, গতির তুলনামূলক প্রভেদের দ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

এইরূপে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই এই বিষচক্রে পর্যবসিত হয়; কার্য ও কারণের অনির্দিষ্ট পরস্পর নির্ভরশীলতাই এই চক্র—ইহার ভিতর কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যুক্তির নিয়মে বিচার করিলে এই জ্ঞান ভুল; এবং সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কথা এই যে, এই জ্ঞান ভুল প্রমাণিত হয়, যথার্থ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া নয়, পরন্তু সেই একই বিষচক্রের উপর নির্ভরশীল নিয়মগুলিরই দ্বারা। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায়, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিজেই নিজের অপরিপূর্ণতা প্রমাণ করে। আবার আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে, এই জ্ঞান মিথ্যা, কারণ যে-সব সত্য আমরা জানি বা চিন্তা করি, সেগুলি এই জ্ঞানের ভিতর রহিয়াছে। আবার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সব কিছুর জন্যই এই জ্ঞান যে যথেষ্ট, এ-কথা অস্বীকার করিতেও পারা যায় না। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—মানবিক জ্ঞানের এই অবস্থার অন্তর্গত এবং ইহাকেই বলা হয় 'মায়া'। ইহা মিথ্যা, কারণ ইহা নিজেই নিজের অশুদ্ধতা প্রমাণ করে। আর এই অর্থে ইহা সত্য যে, ইহা পশু-মানবের সকল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

বহির্জগতে ক্রিয়াকালে মায়া নিজেকে প্রকাশ করে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তিরূপে এবং অন্তর্জগতে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপে। সমগ্র জগৎ বাহিরের দিকে ধাবিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। প্রতিটি পরমাণু উহার কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। অন্তর্জগতে প্রতিটি চিন্তা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আবার বহির্জগতে প্রতিটি কণা আর একটি শক্তি—কেন্দ্রাভিগ শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ হইতেছে; এই শক্তি কণাটিকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সেইরূপ চিন্তাজগতে সংযম-শক্তি এই-সব বহির্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতেছে। জড়ের দিকে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ যন্ত্রবৎ চালিত হইবার দিকে ক্রমশঃ নামিয়া যাইবার প্রবৃত্তি পশু-মানবের ধর্ম। যখন ইন্দ্রিয়ের বন্ধন রোধ করিবার ইচ্ছা মানুষের হয়, শুধু তখনই তাহার মনে ধর্মের উদয় হয়। এইরূপে আমরা দেখি যে, ধর্মের কার্যক্ষেত্র হইতেছে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে পড়িতে না দেওয়া এবং মুক্তিলাভের জন্য তাহাকে সাহায্য করা। সেই উদ্দেশ্যে নিবৃত্তিশক্তির প্রথম প্রয়াসকে বলা হয় নীতি। সকল নীতির উদ্দেশ্য হইতেছে এই অধঃপতনকে রোধ করা ও এই বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলা। সকল চারিত্র-নীতিকে 'বিধি' ও 'নিষেধ'—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই নীতি বলে, 'ইহা কর', না হয় বলে, 'ইহা করিও না'। যখন ইহা বলে, 'করিও না', তখন স্পষ্টই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, একটি বাসনাকে সংযত করিতে বলা হইতেছে, যে-বাসনা মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিবে। আর যখন ইহা বলে, 'কর', তখন ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে—মানুষকে মুক্তির পথ দেখান এবং যে-কোন অধঃপতন মানুষের হৃদয়কে পূর্বেই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া।

মানুষের সম্মুখে একটি মুক্তির আদর্শ থাকিলে তবেই চারিত্র-নীতির সার্থকতা। পূর্ণ মুক্তিলাভের সম্ভাবনার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বই হইতেছে বিস্তারের জন্য সংগ্রামের, বা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা; একটি পরমাণুর জন্যও এই অনন্ত বিশ্ব যথেষ্ট স্থান নয়। বিস্তারের জন্য এই সংগ্রাম অনন্তকাল ধরিয়া চলিবেই, যতদিন না মুক্তিলাভ হয়। ইহা বলা যাইতে পারে না যে, সন্তাপ এড়ান বা আনন্দলাভই এই মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য। যাহাদের ভিতর এইরূপ বোধশক্তি নাই, সেই নিম্নতম পর্যায়ের প্রাণীরাও বিস্তারের অন্য প্রয়াস করিতেছে এবং অনেকের মতে মানুষ নিজেই এই-সকল প্রাণীর বিস্তার।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

[ইওরোপে অবস্থানকালে—‘বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরের যথার্থ স্থান কোথায়?’—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ]

ঈশ্বর সকল ব্যষ্টির সমষ্টি-স্বরূপ। তথাপি তিনি ‘ব্যক্তি-বিশেষ’, যেমন মনুষ্যদেহ একটি বস্তু, ইহার প্রত্যেক কোষ একটি ব্যষ্টি। সমষ্টি—ঈশ্বর, ব্যষ্টি—জীব। সুতরাং দেহ যেমন কোষের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তেমনি জীবের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ইহার বিপরীতটিও ঠিক তেমনি। এইরূপে জীব ও ঈশ্বর যেন সহ-অবস্থিত দুইটি সত্তা—একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই। অধিকন্তু আমাদের এই ভূলোক ব্যতীত অন্যান্য উচ্চতর লোকে শুভের পরিমাণ অশুভের পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকায় সমষ্টি (ঈশ্বর)-কে সর্বমঙ্গল-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ গুণ, এবং সমষ্টির দিক্ হইতেই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম এই উভয়ের ঊর্ধ্বে, এবং একটি সপ্রতিবন্ধ বা সাপেক্ষ অবস্থা নয়। ব্রহ্মই একমাত্র স্বয়ংপূর্ণ, যাহা বহু এককের দ্বারা গঠিত হয় নাই। জীবকোষ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত যে-তত্ত্ব অনুস্যূত, যাহা ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না এবং যাহা কিছু সত্য, তাহাই সেই তত্ত্ব বা ব্রহ্ম। যখন চিন্তা করি—আমি ব্রহ্ম, তখন মাত্র আমিই থাকি; সকলের পক্ষেই এ-কথা প্রযোজ্য; সুতরাং প্রত্যেকেই সেই তত্ত্বের সামগ্রিক বিকাশ।

যোগের চারিটি পথ

[আমেরিকায় প্রথমবার অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত]

মুক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা। আমরাই পরব্রহ্ম—যতক্ষণ না আমাদের এই উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ আমরা যে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই না, এ-কথা অতি স্পষ্ট। এই অনুভূতি-লাভের বহু পথ; এই পথগুলির একটি সাধারণ নাম আছে। উহাকে বলা হয় 'যোগ' (যুক্ত করা, আমাদের সত্তার সহিত নিজেদের যুক্ত করা)। নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও এই যোগগুলিকে মূলতঃ চারিটি পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক যোগই গৌণতঃ সেই পরমকে উপলব্ধি করিবার পথ, সেইজন্য এগুলি বিভিন্ন রুচির পক্ষে উপযোগী। এখন আমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, কল্পিত মানবই প্রকৃত মানব বা 'পরম' হয় না। পরমে রূপান্তরিত হওয়া যায় না। পরম নিত্যমুক্ত, নিত্যপূর্ণ, কিন্তু সাময়িকভাবে অবিদ্যা ইহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অবিদ্যার এই আবরণ সরাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি যোগের প্রতিনিধি। যোগগুলি শুধু অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করে এবং আত্মাকে নিজের স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মুক্তির প্রধান সহায়। আসক্তিশূন্যতাকে বলা হয় 'বৈরাগ্য', কারণ ভোগৈষণা বন্ধন সৃষ্টি করে। যে কোন একটি যোগের নিয়ত অনুশীলনকে 'অভ্যাস' বলা হয়।

কর্মযোগঃ কর্মযোগ হইল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা। ভাল অথবা মন্দ কর্ম করিলে ঐ কর্মের ফল অবশ্যই ভাল বা মন্দ হইবে। যদি অন্য কোন কারণ না থাকে, কোন শক্তিই উহার কার্য রোধ করিতে পারে না। সৎ কর্মের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফল অসৎ হইবে এবং মুক্তির কোন সম্ভাবনা না রাখিয়া আত্মা চির বন্ধনের ভিতর আবদ্ধ থাকিবে। কর্মের ভোক্তা কিন্তু দেহ অথবা মন, আত্মা কখনই নয়। কর্ম কেবল আত্মার সম্মুখে একটি আবরণ নিক্ষেপ করিতে পারে। অবিদ্যা—অশুভ কর্মের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আবরণ। সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করিতে পারে এবং এইরূপে নৈতিক শক্তি দ্বারা অনাসক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি অসৎ কর্মের প্রবণতা উৎসাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে। কিন্তু যদি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে না। সুতরাং ফলাসক্তি শূন্য হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে। কর্মযোগীকে সকল ভয় ইহামুত্রফলভোগ চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। উপরন্তু এষণাবিহীন কর্ম—সকল বন্ধনের মূলস্বার্থপরতা বিনষ্ট করিবে। কর্মযোগীর মূলমন্ত্র 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এবং কোন আত্মত্যাগই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তি, নাম, যশ বা কোন জাগতিক সিদ্ধির জন্য তিনি কর্ম করেন না। এই নিঃস্বার্থ কর্মের ব্যাখ্যা ও উৎপত্তি কেবল জ্ঞানযোগেই আছে, তথাপি সব সম্প্রদায়ভুক্ত সব মতাবলম্বী মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব তাহাদের ভিতর লোক কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের অনুরাগ বাড়াইয়া তোলে। আবার অনেকের নিকট বিত্তের বন্ধন অত্যন্ত কঠিন। যে-বিত্তলালসা দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহা ভাঙিবার জন্য বিত্তকর্মীদের পক্ষে কর্মযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভক্তিযোগঃ ভক্তি বা পূজা বা কোন-না-কোন প্রকার অনুরক্তি মানুষের সর্বাপেক্ষা সহজ, সুখকর এবং স্বাভাবিক পথ। এই বিশ্বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেছে আকর্ষণ, উহা কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটি চূড়ান্ত বিচ্ছেদে পরিণত হয়। তাহা সত্ত্বেও প্রেম মানব-হৃদয়ে মিলনের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রেম নিজে দুঃখের একটি মহা কারণ হইলেও যোগ্য বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হইলে মুক্তি আনয়ন করে। ভক্তির লক্ষ্য ঈশ্বর। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ বিনা প্রেম থাকিতে পারে না। প্রথমে এমন একজন প্রেমাস্পদ থাকা চাই, যিনি আমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন। সুতরাং ভক্তের ভগবানকে এক অর্থে মানবীয় ভগবান্ হইতেই হইবে। তিনি অবশ্যই প্রেমময় হইবেন। এইরূপ ভগবান্ আছেন বা নাই—এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা সত্য যে, যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে, তাঁহাদের নিকট এই নির্গুণ ব্রহ্মই প্রেমময় ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন।

ভগবান্ বিচারক, শাস্তিদাতা বা এমন একজন, যাঁহাকে ভয়ে মানিতে হইবে—এই-সব ভাব নিম্ন পর্যায়ের পূজা। এই প্রকার পূজাকে প্রেমের পূজা বলা যায় না; এই-সব পূজা অবশ্য ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গের পূজায় রূপায়িত হয়। আমরা এখন নিরূপণ করিব, প্রেম কি বস্তু। আমরা প্রেমকে একটি ত্রিভুজের দ্বারা ব্যাখ্যা করিব, যে ত্রিভুজের পাদদেশের প্রথম কোণ ভয়শূন্যতা। যতক্ষণ ভয় থাকিবে, ততক্ষণ উহা প্রেম নয়। প্রেম সব ভয় দূর করে। শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য মাতা ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হন। দ্বিতীয় কোণ হইল—প্রেম কখনও কিছু চায় না, ভিক্ষা করে না। তৃতীয় বা শীর্ষকোণ হইতেছে—প্রেমের জন্যই প্রেম। এই প্রেম বিষয়- বিষয়ি-সম্পর্কশূন্য। ইহাই হইল প্রেমের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরমের সহিত সমার্থক।

রাজযোগঃ এই যোগ আর সব যোগের সহিত খাপ খাইয়া যায়। বিশ্বাসযুক্ত বা বিশ্বাসহীন সর্ব শ্রেণীর জিজ্ঞাসুর পক্ষে রাজযোগ উপযুক্ত। রাজযোগ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার যথার্থ যন্ত্র। যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য এক-একটি স্বকীয় ধারা থাকে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে রাজযোগ। বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী এই রাজযোগ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়। ইহার প্রধান অঙ্গ হইল প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যান। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে গুরুর নিকট হইতে লব্ধ প্রণব বা ওঁকার বা অন্য কোন মন্ত্র খুব সহায়ক হইবে। প্রণব-মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, উহা নির্গুণ ব্রহ্মের বাচক। জপের সহিত এই সব মন্ত্রের অর্থভাবনাই এখানে প্রধান সাধনা।

জ্ঞানযোগঃ জ্ঞানযোগ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) শ্রবণ, অর্থাৎ আত্মা একমাত্র সৎ পদার্থ এবং অন্যান্য সব কিছু মায়া—এই তত্ত্ব শোনা। (২) মনন, অর্থাৎ সর্বদিক্ হইতে এই তত্ত্বকে বিচার করা। (৩) নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া তত্ত্বকে

উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির চারিটি সাধন, যথা (১) 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'-রূপ দৃঢ় ধারণা; (২) সর্ব এষণা ত্যাগ; (৩) শমদমাদি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব। তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান এবং আত্মাকে উহার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেওয়া এই যোগের একমাত্র পথ। এই যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু কঠিনতম। এই যোগ অনেকের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু অতি অল্প লোকই এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

লক্ষ্য ও উহার উপলব্ধির উপায়

যদি সমগ্র মানবজাতি কেবল একটি ধর্ম—একটিমাত্র সর্বজনীন পূজাপদ্ধতিকে এবং একটিমাত্র নৈতিক মানদণ্ডকে স্বীকার ও গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তবে পৃথিবীর উপর কঠিন দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিবে। সমস্ত ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে উহা মৃত্যু-সদৃশ আঘাত হইবে। নিজেদের মতানুযায়ী সর্বোচ্চ সত্যের আদর্শটিকে সৎ বা অসৎ উপায়ে সকলকে গ্রহণ করাইবার জন্য উৎসাহ দিয়া এই ধ্বংসকারী ঘটনাটিকে বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের উচিত চলার পথের সমস্ত অন্তরায়গুলি অপসারণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যাহাতে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র মানবজাতির শেষ পরিণতি, সর্বধর্মের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি একই—ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলন, বা অন্য ভাষায় দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এই দেবত্বই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু লক্ষ্য এক হইলেও উপলব্ধির পন্থা মানুষের রুচি অনুযায়ী ভিন্ন হইতে পারে।

দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য ও পদ্ধতি উভয়কেই 'যোগ' বলা হয়। ইংরেজী 'Yoke' অর্থাৎ যুক্ত হওয়া—এই অর্থেই সংস্কৃতেও যোগ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। যোগ আমাদের স্বরূপের সহিত ঈশ্বরের যোগ করিয়া দেয়। এইরূপ যোগ বা মিলনের পদ্ধতি অনেক আছে; সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বভাব অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করিতে বাধ্য। যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটি স্বকীয় পদ্ধতি আছে, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও আছে। ধর্মে সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়কে 'যোগ' বলা হয়। মানুষের বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী যোগগুলি আমরা শিক্ষা দিই। উক্ত যোগগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করিঃ

- (১) কর্মযোগ—যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানুষ কর্ম ও কর্তব্যের মাধ্যমে স্বীয় দেবত্ব উপলব্ধি করে।
- (২) ভক্তিযোগ—সগুণ ভগবানের ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা দেবত্বের অনুভূতি।
- (৩) রাজযোগ—মনঃসংযোগের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি।
- (৪) জ্ঞানযোগ—জ্ঞানের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি।

এই বিভিন্ন পথগুলি একই কেন্দ্রে অর্থাৎ ঈশ্বর-সমীপে লইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-বিশ্বাসের বহুলতায় সুবিধাই আছে; মানুষকে ধর্মজীবন যাপন করিতে যতক্ষণ উৎসাহ দেয়, ততক্ষণ সব বিশ্বাসই শুভ। ধর্মমত যত অধিক হয়, ততই মানুষের ভিতর যে দেবত্বের সংস্কার আছে, তাহার নিকট আবেদন করিবার বেশী সুযোগ পাওয়া যায়।

Oak Beach Christian Unity-র সমক্ষে বিশ্বজনীন মিলন-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেনঃ

শেষ পর্যন্ত সকল ধর্মই এক—ইহা অতি সত্য কথা, যদিও খ্রীষ্টান চার্চ বাইবেলের উপাখ্যানের ফ্যারিসিদের মত ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়, এবং ভাবে যে, খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য, অপর ধর্মগুলি সব ভুল এবং সেগুলির খ্রীষ্টধর্মের আলোকে আলোকিত হইবার প্রয়োজন আছে; তথাপি এ-কথা সত্য যে, পরিণামে সব ধর্মই এক। সর্বজনীন উদার ভাবের জন্য জগৎ তখনই মাত্র খ্রীষ্টান চার্চের সহযোগী হইতে ইচ্ছুক হইবে, যখন খ্রীষ্টধর্ম পরমতসহিষ্ণু হইবে। ঈশ্বর সকলের হৃদয়েই আছেন; যাঁহারা যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণকারী, তাঁহাদের এই তত্ত্বটিকে স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যীশুখ্রীষ্ট প্রত্যেক সৎ মানবকে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। যে-মানুষ স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই সৎ, আর যে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে, সে সৎ নয়। সৎ হওয়া এবং সৎকর্ম করা—এই ভিত্তির উপরেই সমগ্র জগৎ মিলিতে পারে।

ধর্মের মূলসূত্র

[একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ, মিস ওয়াল্ডোর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত]

পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক, লুপ্ত বা জীবন্ত ধর্মগুলি এই চারি প্রকার বিভাগের মধ্য দিয়া ভালরূপে ধারণা করিতে পারিঃ

১. প্রতীক—মানুষের ধর্মভাব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বাহ্য সহায় অবলম্বন।

২. ইতিহাস—প্রত্যেক ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব যেভাবে দিব্য বা মানবীয় আচার্যগণের জীবনে রূপায়িত হইয়াছে। পুরাণাদি ইহার অন্তর্গত, কারণ এক জাতি বা এক যুগের পক্ষে যাহা পুরাণ, অন্য জাতি বা যুগের নিকট তাহাই ইতিহাস। আচার্যগণের সম্বন্ধেও বলা যায়, তাঁহাদের জীবনের অনেকটাই পরবর্তীকালের মানুষেরা পৌরাণিক কাহিনী বলিয়া গ্রহণ করে।

৩. দর্শন—প্রত্যেক ধর্মের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিসমূহ।

৪. অতীন্দ্রিয়বাদ—ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তি অপেক্ষা মহত্তর এমন কিছু, যাহা কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সকল ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ধর্মের অন্যান্য বিভাগেও এই অতীন্দ্রিয়বাদের কথা আছে।

পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক সকল ধর্মেই এই মূলনীতিগুলির একটি, দুইটি বা তিনটি বর্তমান দেখা যায়; অতি উন্নত ধর্মগুলিতে চারিটি তত্ত্বই আছে। অতি উন্নত ধর্মগুলির মধ্যে কতকগুলির আবার কোন ধর্মগ্রন্থ বা পুস্তক ছিল না, বা সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু যে-সকল ধর্ম পবিত্র গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি আজও টিকিয়া আছে। সুতরাং পৃথিবীর আধুনিক সব ধর্মই পবিত্র গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

বৈদিক ধর্ম (ভুল করিয়া বলা হয়, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম) প্রতিষ্ঠিত বেদের উপর;

পারসীক ধর্ম আবেস্তার উপর;

মুশার ধর্ম ওল্ড টেষ্টামেণ্টের উপর;

বৌদ্ধধর্ম ত্রিপিটকের উপর;

খ্রীষ্টধর্ম নিউ টেষ্টামেণ্টের উপর;

ইসলাম কোরানের উপর।

চীনের তাও এবং কনফুসিয়াস-মতাবলম্বীদেরও ধর্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু ঐগুলি বৌদ্ধধর্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ঐগুলিকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বলিয়া গণনা করা যায়।

আবার যদিও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে সম্পূর্ণভাবে জাতিগত কোন ধর্ম নাই, তবু বলা যায়—ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক, য়াহুদী ও পারসীক ধর্মগুলি যে-সকল জাতির মধ্যে পূর্ব হইতে ছিল, সেই-সকল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; আর বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম প্রথমাবধি প্রচারশীল।

বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জগৎজয়ের সংগ্রাম চলিবে, এবং জাতিগত ধর্মগুলিকেও অনিবার্যভাবে এই সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে। এই জাতিগত বা প্রচারশীল ধর্মগুলির প্রত্যেকটি ইতোমধ্যেই নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং নিজেকে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মগুলির মধ্যে একটিও এককভাবে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হইবার উপযোগী নয়। যে-জাতি হইতে যে-ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সেই জাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়াই যেহেতু ঐ ধর্ম গঠিত হইয়াছে এবং ঐ ধর্মই আবার ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়ায়, অতএব ঐ-সকলের কোনটিই সমগ্র মানবজাতির উপযোগী হইতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, উহাদের প্রত্যেক ধর্মে একটি নেতিবাচক ভাব আছে। প্রত্যেক ধর্ম মানব-প্রকৃতির একটি অংশের বিকাশ সাধনে অবশ্যই সাহায্য করে, কিন্তু যাহা কিছু তাহার ধর্মে নাই, সেগুলি দমন করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ একটি ধর্ম যদি বিশ্বজনীন হয়, তাহা হইলে তাহা মানবজাতির বিপদ ও অবনতির সূচনা করিবে।

পৃথিবীর ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, সার্বভৌম রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজ্য-বিষয়ক স্বপ্ন-দুইটি মানবজাতির মনে বহুকাল যাবৎ ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর সামান্য একটি অংশ বিজিত হইবার পূর্বেই অধিকৃত রাজ্যগুলি শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া মহান্ দিগ্বীজয়ীদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করিয়া দেয়, সেরূপ প্রত্যেক ধর্মই তাহার শৈশব অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন

সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

তথাপি ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে মানবজাতির ঐক্যসাধনই প্রকৃতির উদ্দেশ্য, যদিও সে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকিবে। সর্বাপেক্ষা স্বল্প বাধার পথে চলাই যদি কার্যসিদ্ধির যথাযথ উপায় হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্ম যে এইভাবে বিভক্ত হইয়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তাহা ধর্ম-সংরক্ষণেরই একটি উপায়, কারণ তাহার ফলে কঠিন একত্বের নিগড় চূর্ণ হয় এবং উহাতে আমরা যথার্থ পন্থার নির্দেশ পাই।

অতএব মনে হয়, উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়গুলির ধ্বংস নয়, বরং উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, যে পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে আবার সব ধর্ম মিলিত হইয়া একটি বিরাট দর্শনে পরিণত হইলেই ঐক্যের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়। পৌরাণিক কাহিনী বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম দ্বারা কখনও ঐক্য সাধিত হয় না, কারণ সূক্ষ্ম ব্যাপার অপেক্ষা স্থূল বিষয়েই আমাদের মতদ্বৈধ হয়। একই মূলতত্ত্ব স্বীকার করিলেও মানুষ তাহার আদর্শস্থানীয় ধর্মগুরুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে।

সুতরাং এই মিলনের ফলে এমন একটি দার্শনিক ঐক্য আবিষ্কৃত হইবে, যাহা ঐক্যের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইবে, অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ আচার্য বা সাধন-পদ্ধতি নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা পাইবে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এইরূপ মিলন স্বাভাবিকভাবে চলিয়া আসিতেছে; শুধু পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা এই মিলন মাঝে মাঝে শোচনীয়ভাবে প্রতিহত হইয়াছে।

অতএব পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া প্রত্যেক জাতির আচার্যগণকে অন্য জাতির নিকট পাঠাইয়া সমগ্র মানবসমাজকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত; ইহা দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের সহায়তা হইবে। কিন্তু খ্রীঃপূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতের মহামতি বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক যেরূপ করিয়াছিলেন, আমরাও যেন সেইরূপ অন্যের নিন্দা হইতে বিরত হই, অপরের দোষানুসন্ধান না করিয়া তাহাকে সাহায্য করি এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাহার জ্ঞানলাভের সহায় হই।

জড়বিজ্ঞানের বিপরীত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের ঐহিক জীবন ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমার বহির্ভূত সকল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অতি দ্রুত একটি ফ্যাশনে পরিণত হইতেছে, এমন কি ধর্মপ্রচারকেরাও একের পর এক এই ফ্যাশনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। অবশ্য চিন্তাহীন জনসাধারণ সর্বদা সুখাবহ ভাবরাশিই অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞান আশা করা যায়, তাঁহারা যখন নিজেদের দার্শনিক বলিয়া প্রচার করেন এবংঅর্থহীন ফ্যাশন অনুসরণ করেন, তখন উহা সত্যই শোচনীয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ স্বাভাবিক-শক্তিসম্পন্ন, ততক্ষণ তাহারা আমাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং সেগুলি যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, সে-সব যে মানবীয় জ্ঞানসৌধের ভিত্তি—এ-কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যদি কেহ মনে করে, মানুষের সমগ্র জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি—আর কিছু নয়, তবে আমরা ঐকথা অস্বীকার করিব। যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই বুঝায়—তার বেশী আর কিছু নয়, তবে আমরা বলিব, এরূপ বিজ্ঞান কোন দিন ছিল না, কোন দিন হইবেও না। উপরন্তু শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন জ্ঞান কখনও বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে না।

অবশ্য ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে, এবং উহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুসন্ধান করে, কিন্তু ঐখানেই উহাদের থামিতে হয়।

প্রথমতঃ বাহিরের তথ্যসংগ্রহ-ব্যাপারও অন্তরের কতকগুলি ভাব এবং ধারণার উপর—যথা, দেশ ও কালের উপর—নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ মানস পটভূমিকায় কিছুটা বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগুলির বর্গীকরণ বা সামান্যীকরণ অসম্ভব। সামান্যীকরণ যত উচ্চধরনের হইবে, বিমূর্ত পটভূমিকাও তত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে থাকিবে। সেইখানেই অসংলগ্ন তথ্যগুলি সাজান হয়। এখন জড়বস্তু, শক্তি, মন, নিয়ম, কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি ভাবগুলি অতি উচ্চ বিমূর্তনের ফল; কেহই কোনদিন এগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে নাই; অথবা বলা যায়, এগুলি একেবারে অতিপ্রাকৃতিক বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। অথচ এগুলি ছাড়া কোন প্রাকৃতিক তথ্য বোঝা যায় না। একটি গতিকে বোঝা যায়—একটি শক্তির সাহায্যে। কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয় জড়বস্তুর মাধ্যমে। বাহ্য পরিবর্তনগুলি বোঝা যায় প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতর দিয়া, মানসিক পরিবর্তনগুলি ধরা পড়ে চিন্তায় বা মনে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি শুধু কার্য-কারণের শৃঙ্খল দ্বারাই বোঝা যায়। অথচ কেহই কখনও জড় বা শক্তি, নিয়ম বা কারণ, দেশ বা কাল—কিছুই দেখে নাই, এমন কি কল্পনাও করে নাই।

তর্কচ্ছলে বলা যাইতে পারে—বিমূর্তভাবরূপে এগুলির অস্তিত্ব নাই, এগুলি বর্গ বা শ্রেণী হইতে পৃথক্ কিছু নয়, উহা হইতে এগুলি পৃথক্ করা যায় না। ইহাদিগকে কেবল গুণ বলা যাইতে পারে।

এই বিমূর্তন (abstraction) সম্ভব কিনা বা সামান্যীকৃত বর্গ ব্যতীত উহাদের আর কিছু অস্তিত্ব আছে কিনা—এই প্রশ্ন ছাড়াও ইহা স্পষ্ট যে, জড় বা শক্তির ধারণা, কাল বা দেশের ধারণা, নিমিত্ত নিয়ম বা মনের ধারণা—এগুলির প্রত্যেকটিই স্ব স্ব বর্গমধ্যে নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, এগুলিকে যখন শুধু এইভাবে—বিমূর্ত নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা যায়, তখনই ইহারা ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ তথ্যগুলির ব্যাখ্যারূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এই ভাব ও ধারণাগুলি শুধু যে সত্য তাহা নয়, উহা ব্যতীত ইহাদের বিষয়ে দুইটি তথ্য পাওয়া যায়ঃ প্রথমতঃ এগুলি অতিপ্রাকৃতিক, দ্বিতীয়তঃ অতিপ্রাকৃতিকরূপেই এগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে, অন্যরূপে নয়।

* * *

বাহ্যজগৎ অন্তর্জগতের অনুরূপ বা অন্তর্জগৎ বাহ্যজগতের অনুরূপ, জড়বস্তু মনেরই প্রতিকৃতি বা মন জড়জগতের প্রতিকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে অথবা মনই পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা অতি পুরাতন প্রাচীন প্রশ্ন, তবুও ইহা এখনও পূর্ববৎ নূতন ও সতেজ, ইহাদের কোন্‌টি পূর্বে বা কোন্‌টি পরে, কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি কার্য—মনই জড়বস্তুর কারণ বা জড়বস্তুই মনের কারণ—এ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিলেও ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহ্যজগৎ অন্তর্জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও উহা অন্তর্জগতের অনুরূপ হইতে বাধ্য, না হইলে উহাকে জানিবার আমাদের অন্য উপায় নাই। যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, বাহ্যজগৎই আমাদের অন্তর্জগতের কারণ, তবুও বলিতে হইবে, এই বাহ্যজগৎ যাহাকে আমরা আমাদের মনের কারণ বলিতেছি, উহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কেন-না আমাদের মন উহার ততটুকু বা সেই ভাবটুকুই জানিতে পারে, যাহা উহার সহিত উহার প্রতিবিম্বরূপে মেলে। প্রতিবিম্ব কখনও বস্তুটির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং বাহ্যজগতের যে অংশটুকু—আমরা উহার সমগ্র হইতে যেন কাটিয়া লইয়া আমাদের মনের দ্বারা জানিতে পারিতেছি, তাহা কখনও আমাদের মনের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহার অস্তিত্ব আমাদের মনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ (মনের দ্বারাই উহাকে জানা যায়)।

এইজন্যই মনকে জড়বস্তু হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে না। উহা বলাও অসঙ্গত, কেন-না আমরা জানি যে, এই বিশ্ব-অস্তিত্বের যে অংশটুকুতে চিন্তা বা জীবনীশক্তি নাই ও যাহাতে বাহ্য অস্তিত্ব আছে, তাহাকেই আমরা জড়বস্তু বলি, এবং যেখানে এই বাহ্য অস্তিত্ব নাই এবং যাহাতে চিন্তা বা জীবনীশক্তি রহিয়াছে, তাহাকেই আমরা মন বলি। সুতরাং এখন যদি আমরা জড় হইতে মন বা মন হইতে জড় প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলে যে-সকল গুণ দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করা হইয়াছিল, তাহাই অস্বীকার করিতে হইবে। অতএব মন হইতে জড় বা জড় হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে, বলা শুধু কথার কথা মাত্র।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এই বিতর্কটি মন ও জড়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা-ব্যবহার-রূপ ভ্রান্তির উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। আমরা মনকে কখনও-বা জড়ের বিপরীত ও জড় হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিতেছি, আবার কখনও বলিতেছি মন ও জড় উভয়ই মনের অন্তর্গত, অর্থাৎ জড়জগতের দৃষ্টিতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ দুই-ই মনের অংশ-বিশেষ। জড়কেও সেরূপ কখনও-বা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎরূপে আবার কখনও বা বাহ্য বা আন্তর উভয় জগতের কারণরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। জড়বাদিগণ ভাববাদিগণকে আতঙ্কিত করিয়া যখন বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরীক্ষাগারের মূল তত্ত্বগুলি হইতে মন প্রস্তুত করিবেন, তখন তাঁহারা কিন্তু এমন এক বস্তুকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, যাহা তাঁহাদের সকল মূলতত্ত্বের ঊর্ধ্বে—বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাকে তিনি জড় প্রকৃতিরূপে আখ্যা দিতেছেন। ভাববাদীও সেইরূপ যখন জড়বাদীর মূলতত্ত্বগুলি তাঁহারই চিন্তাতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, তখন কিন্তু তিনি এমন এক বস্তুর ইঙ্গিত পাইতেছেন, যাহা হইতে জড় ও চেতন উভয় বস্তুই উৎপন্ন হইতেছে; তাঁহাকেই তিনি বহু সময়ে ‘ঈশ্বর’ আখ্যাও দিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, একদল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অংশ মাত্র জানিয়া উহাকে ‘বাহ্য’ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন এবং অন্যদল উহার অপর অংশ জানিয়া উহাকেই ‘আন্তর’ আখ্যা দিতেছেন। এই উভয় প্রয়াসই নিষ্ফল। মন বা জড় কোনটিই অপরটিকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এমন আর একটি বস্তুর আবশ্যক, যাহা ইহাদের উভয়কেই ব্যাখ্যা করিতে পারে।

এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, চিন্তাও কখনও মন ব্যতীত থাকিতে পারে না। কারণ যদি এমন এক সময় কল্পনা করা যায়, যখন চিন্তার অস্তিত্ব ছিল না, তখন জড়—যেরূপে উহাকে আমরা জানি—কি করিয়া থাকিবে? অপর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয় এবং যখন ঐ অনুভূতি বাহ্যজগতের উপর নির্ভর করে, তখন আমাদের মনের অস্তিত্বও বাহ্যজগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে।

ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, ইহাদের (জড় ও মনের) একটি আরম্ভকাল (beginning) রহিয়াছে। সামান্যীকরণ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। সামান্যীকরণও আবার কতকগুলি সদৃশ বস্তুর পূর্বাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। পূর্ব অনুভূতি ব্যতীত একটির সহিত আর একটির তুলনাও সম্ভব নয়। জ্ঞান সেইজন্য পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইজন্যই উহা চিন্তা ও জড়ের পূর্বাস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহাদের আরম্ভকাল সেইজন্য সম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান যাহার উপর নির্ভর করে, সেই সামান্যীকরণের পশ্চাতেও আবার এমন একটি বস্তু থাকা আবশ্যক, যাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি একত্র হইতে পারে, চিত্রাঙ্কনের জন্য যেমন চিত্রের পশ্চাতে একটি পটের একান্ত আবশ্যক, আমাদের বাহ্যানুভূতির জন্যও সেইরূপ একটি কিছুর একান্ত প্রয়োজন, যাহার উপর ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি একত্র হইতে পারে, যদি চিন্তা বা মনকে ঐ বস্তু বলা যায়, তবে উহার একত্রীকরণের জন্য আবার আর একটি বস্তুর প্রয়োজন হইবে। মন একটি অনুভূতির প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, সুতরাং উহাদের একত্রীকরণের জন্য ঐরূপ একটি পটভূমিকার একান্ত প্রয়োজন হইবে। এই পটভূমিকা পাইলেই আমাদের সকল বিশ্লেষণ থামিয়া যায়। এই অবিভাজ্য একত্বে না পৌঁছান পর্যন্ত আমরা থামিতে পারি না। ঐ একত্বই আমাদের জড় ও চিন্তার একমাত্র-পটভূমি।

* * *

যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কোন অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তা পাওয়া যায়। যে সত্তা আমাদের নিকট ‘জড়বস্তু’ ও ‘চিন্তা’ এই উভয়ের এই প্রকার একত্ব উপস্থাপিত করে উহাই সেই সঠিক অখণ্ড ভিত্তি, যাহার উপর নিখিল প্রপঞ্চও অধিষ্ঠিত; কারণ ইহার পরে আমরা আর কোন বিশ্লেষণের কথা চিন্তা করিতে পারি না। অধিকন্তু ইহার অধিক বিশ্লেষণের আর প্রয়োজনও থাকে না, কারণ বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষের সকল প্রকার বিশ্লেষণ ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

এ পর্যন্ত আমরা এইটুকু দেখিতে পাইলাম যে, ‘মন’ ও জড়প্রপঞ্চ এবং তাহাদেরও ঊর্ধ্বে সেই অদ্বিতীয় বস্তু, যাহার উপর এই দুই-ই আপন আপন ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে—এই সমস্তই আমাদের অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত।

এই যে ঊর্ধ্বে অবস্থিত বস্তুটি, ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; যুক্তির অবর্জনীয় অঙ্গরূপে ইহা আসিয়া পড়ে, এবং এক ভাষাতীত অনুভব-স্বরূপে ইহা আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, যুক্তির সততা রক্ষা করিতে হইলে এবং আমাদের সামান্যীকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করিতে হইলে আমরা বাধ্য হইয়াই এই অনির্বচনীয় বস্তুতে উপনীত হই।

এমন যুক্তিও উঠিতে পারে যে, মানসিক ও জড়-প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে অপর কোন সারবস্তু বা চেতন সত্তা আছে। ইহা মানিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতে পারি বা জানি শুধু এই নিখিল প্রপঞ্চকে; এবং এই প্রপঞ্চের ব্যাখ্যার জন্য প্রপঞ্চাতীত কোন অপর বস্তুর প্রয়োজন হয় না। বিশ্লেষণের ধারা ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। পরন্তু সর্ব বস্তুর সমন্বয়-ক্ষেত্ররূপে কোন সারবস্তু আছে, এইরূপ যে বোধ হইয়া থাকে, ইহা মানসিক ভ্রান্তি মাত্র।

আমরা দেখিতে পাই, অতি পুরাকাল হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী বিরাজমান। এক পক্ষের মতে মানুষের মনে বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যয় রচনা করিবার এবং বস্তুনিরপেক্ষ সূক্ষ্ম ধারণায় উপস্থিত হইবার যে অনিবার্য প্রয়োজন রহিয়াছে, উহাই জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক পথ-নির্দেশক, এবং যতক্ষণ না আমরা সমস্ত প্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া এমন এক বিশুদ্ধ প্রত্যয়ে উপস্থিত হইতেছি, যাহা সর্বপ্রকারে স্বতন্ত্র এবং দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার বিরাম নাই। এক্ষণে যদি আমরা স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উহাকে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতরে বিলীন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলি, যতক্ষণ না এমন কিছুতে উপনীত হই যেখানে অপর সব কিছুর সমাধান পাই, এবং এই প্রণালী অবলম্বনে চিন্তা ও পদার্থের দ্বারা বিরচিত নিখিল প্রপঞ্চের বিশ্লেষণপূর্বক পূর্বোক্ত চরম ধারণায় উপস্থিত হই, তবে ইহা স্বতই প্রতিভাত হইবে যে, এই চরম ফল ব্যতীত যাহা কিছু আছে, সে সবই ইহার বিবিধ বিকাশমাত্র। কাজেই এই চরম ফলটিই একমাত্র সত্য বস্তু; অপর যাহা কিছু আছে, তাহা উহার ছায়ামাত্র। অতএব ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যে সত্য নাই; সত্য উহার অতীত।

অপর দিকে অপর পক্ষ বলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের নিকট যাহা উপস্থিত করে, জগতে কেবলমাত্র তাহাই সত্য এবং যদিও ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির সহিত তাহারও ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন একটা বস্তুর আভাস অনুস্যূত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তথাপি উহা মনের ছলনামাত্র, এবং তাই উহা মিথ্যা।

অপরিবর্তনীয় কোন কিছুর ধারণা না থাকিলে পরিবর্তনশীল কোন কিছুর ধারণা হয় না। এখন যদি বলা হয় যে, যে অপরিবর্তনীয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল বস্তুটিকে দেখা হয়, তাহাও একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিবর্তনশীল ঘটনামাত্র এবং উহার অপরিবর্তনীয়তা শুধু আপেক্ষিক এবং এইজন্য উহাকে বুঝিতে হইলে উহাকেও আর একটা কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে হইবে, এবং পর পর এইরূপই চলিতে থাকিবে, তাহা হইলে আমরা বলি, এই শৃঙ্খলা-পরম্পরাকে অনন্ত ধারায় যত দীর্ঘই করা হউক না কেন, পরিশেষে দেখা যাইবে, আমরা যেহেতু অপরিবর্তনীয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত পরিবর্তনশীল বস্তুর ধারণা করিতে পারি না, অতএব বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে এমন একটি সত্তার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হইতেছে, যাহা সকল পরিবর্তনশীল বস্তুর পশ্চাতে রহিয়াছে। বিভিন্ন অংশের মিলনে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার একাংশ গ্রহণ করিবার এবং অপরাংশ পরিত্যাগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। কেহ যদি মুদ্রার প্রধান-নামাঙ্কিত দিকটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উহার উল্টা দিকটাও গ্রহণ করিতে হয়, তা যতই তিনি উহা অপছন্দ করুন না কেন।

অধিকন্তু মানুষের প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে ইহাই বিঘোষিত হয় যে, সে স্বাধীন। সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী হইতে সর্বাপেক্ষা অশিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই জানে, সে স্বাধীন। অথচ প্রত্যেক মানুষ সেই সঙ্গে সামান্য চিন্তা করিলেই দেখিতে পায় যে, তাহার প্রতিটি কর্মের পশ্চাতে কতকগুলি অভিপ্রায় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা রহিয়াছে। এবং সেই অবস্থা ও অভিপ্রায়গুলি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত জাগতিক যে-কোন ঘটনাকে যেভাবে কার্য-কারণের নিয়মানুসারে নির্ণয় করা চলে, যে-কোন মানুষের জীবনের যে-কোন ঘটনাকেও তেমনি ঐ অভিপ্রায় ও অবস্থাগুলি হইতেই কার্য-কারণের সুনিশ্চিত ধারা অবলম্বনে নির্ণয় করা চলে।

এখানে আবার ঠিক পূর্বের অসুবিধারই সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের ইচ্ছা একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের বৃদ্ধি কিংবা একটি প্রস্তরখণ্ডের পতনের মতই কার্যকারণের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, এবং তথাপি এই-সকল বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির অবিনশ্বর ধারণা অনুস্যূত রহিয়াছে। এস্থলেও যাঁহারা সম্পূর্ণ ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা ঘোষণা করিবেন যে, মুক্তির ধারণা ভ্রান্তিমাত্র, কারণ মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

এক্ষণে একদিকে ভ্রান্তি বলিয়া মুক্তিকে উড়াইয়া দিলে কোন ব্যাখ্যাই হইল না। অপরদিকে এরূপও তো বলা যাইতে পারে যে, প্রয়োজনের ধারণা বা বন্ধন বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের ধারণা অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তি। কোন মতবাদ যখন ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হয়, তখন সে ঘটনাগুলির কোন-একটি ঐ মতবাদের অনুরূপ হইতেছে না দেখিয়া যদি ঐগুলিকে বাদ দিয়া বাকীগুলির সহিত নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করে, তবে সে মতটি গোড়াতেই ভ্রমাত্মক। এইটুকু পথ উন্মুক্ত রহিল যে আমাদিগকে প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হইবে শরীর মুক্ত নহে, ইচ্ছাও মুক্ত নহে। কিন্তু শরীর মনের ঊর্ধ্বে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা এবং (অসমাপ্ত)

বেদান্ত দর্শন-প্রসঙ্গে

বেদান্তবাদী বলেন যে, মানুষ জন্মায় না বা মরে না বা স্বর্গেও যায় না এবং আত্মার পক্ষে পুনর্জন্ম একটা নিছক কাহিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায় যে, যেন একটি পুস্তকের পাতা উল্টানো হইতেছে; ফলে পুস্তকটির পাতার পর পাতা শেষ হইতেছে, কিন্তু পাঠকের উহাতে কিছুই হইতেছে না। প্রত্যেক আত্মা সর্বব্যাপী; সুতরাং উহা কোথায় যাইবে বা কোথা হইতে আসিবে? এই-সব জন্ম-মৃত্যুতে প্রকৃতিরই পরিবর্তন হয় এবং আমরা ভুলক্রমে উহাকে আমাদের পরিবর্তন বলিয়া মনে করি। পুনর্জন্ম প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং অন্তরে স্থিত ভগবানের বিকাশ।

বেদান্ত-মতে প্রত্যেক জীবন অতীতের উপর গঠিত এবং যখন আমরা আমাদের সমগ্র অতীতটাকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। মুক্ত হইবার ইচ্ছা শৈশবেই ধর্মপ্রবণতার রূপ লয়। সমগ্র সত্যটি মুমুক্ষুর নিকট পরিস্ফুট হইতে কয়েক বৎসর যেন লাগে। এই জন্ম পরিত্যাগ করিবার পর পরবর্তী জন্মের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তখনও মানুষ মায়ার ভিতর থাকে।

আমরা আত্মাকে এইভাবে বর্ণনা করিঃ শস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না, বর্শা বা কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উহাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি উহাকে দহন করিতে পারে না, জল উহাকে দ্রব করিতে পারে না; উহা অবিনাশী, সর্বব্যাপী; সুতরাং ইহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

যদি আমাদের অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ হইয়া থাকে, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, অনাগত ভবিষ্যতে উহা ভাল হইবেই। সকলের জন্য শাশ্বত মুক্তি—ইহাই হইল আমাদের মূল নীতি। প্রত্যেককেই ইহা লাভ করিতে হইবে। মুক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত বাসনাই ভ্রমপ্রসূত। বেদান্তী বলেন, প্রত্যেক সৎ কর্ম সেই মুক্তিরই প্রকাশ।

আমি বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগৎ হইতে সমস্ত অশুভ অন্তর্হিত হইবে। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? এই প্রবাহ চলিতেছে। এক প্রান্ত দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতেছে, আবার অন্য প্রান্ত দিয়া উহা পুনরায় প্রবেশ করিতেছে। বেদান্ত বলেন, তুমি শুদ্ধ ও পূর্ণ; এবং এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা শুভ ও অশুভের ঊর্ধ্বে। উহাই হইল তোমার স্বরূপ। আমরা যাহাকে শুভ বলি, তাহা অপেক্ষাও উহা উচ্চতর। অশুভ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মাত্র। অশুভ (পাপ) বলিয়া আমাদের কোন তত্ত্ব নাই। আমরা ইহাকে 'অজ্ঞান' বলি।

আমাদের নীতিশাস্ত্র, আমাদের লোক-ব্যবহার—উহা যতদূর পর্যন্ত যাক না কেন, সবই মায়ার জগতের ভিতরে। সত্যের পরিপূর্ণ বিবৃতি হিসাবে অজ্ঞানাদি বিশেষণ ঈশ্বরে প্রয়োগ করিবার চিন্তাও আমরা করিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা শুধু বলি, তিনি সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। চিন্তা ও বাক্যের প্রত্যেক প্রয়াস দ্রষ্টাকে দৃশ্যে পরিণত করিবে এবং উহার স্বরূপের হানি ঘটাইবে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবেঃ আমি ব্রহ্ম—এই কথা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যদি তুমি বল—আমিই ব্রহ্ম, তাহা হইলে অন্যায় কর্ম করিতে কে তোমাকে বাধা দিবে? সুতরাং তোমার ঈশ্বরত্ব শুধু মায়ার জগতের ঊর্ধ্বেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি আমি যথার্থই ব্রহ্ম হই, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আক্রমণের ঊর্ধ্বে আমি অবশ্যই থাকিব এবং কোন অসৎ কর্ম করিতে পারিব না। নৈতিকতা অবশ্য মানুষের লক্ষ্য নয়, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্তির ইহা একটি উপায়। বেদান্ত বলেন, যোগও একটি পথ, যে পথে মানুষ এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। বেদান্ত বলেন, অন্তরে যে মুক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মানুভূতি হয়। নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্র ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র, ঐ-সবকে যথাযথ স্থানে বসাইতে হয়।

অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা হয় তাহার সারমর্ম হইল এই যে, অদ্বৈত বেদান্ত ইন্দ্রিয়ভোগে উৎসাহ দেয় না। আমরা আনন্দের সহিতই উহা স্বীকার করি। বেদান্তের আরম্ভ নিতান্ত দুঃখবাদে এবং শেষ হয় যথার্থ আশাবাদে। ইন্দ্রিয়জ আশাবাদ আমরা অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দ্রিয় আশাবাদ আমরা জোরের সহিত ঘোষণা করি। প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়ভোগে নাই—উহা ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে এবং উহা প্রতি মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে। জগতে আমরা যে আশাবাদের নিদর্শন দেখি, উহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দর্শনে ত্যাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ত্যাগ বা নেতিভাব আত্মার যথার্থ অস্তিত্বই সূচিত করে। বেদান্ত ইন্দ্রিয়জগৎকে অস্বীকার করে—এই অর্থে বেদান্ত নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু প্রকৃত জগতের কথা ঘোষণা করে বলিয়া আশাবাদী।

বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয়, যদিও ইহাতে বুদ্ধির অতীত আর একটি সত্তা রহিয়াছে, কিন্তু উহারও উপলব্ধির পথ বুদ্ধির ভিতর দিয়া। সমস্ত পুরাতন কুসংস্কার দূর করিবার জন্য যুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তারপর যাহা থাকিবে, তাহাই বেদান্ত। একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে, যেখানে ঋষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে সখা, কেন তুমি ক্রন্দন করিতেছ? তোমার জন্ম-মরণ-ভীতি নাই। তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমার কোন দুঃখ নাই, কারণ তুমি অসীম নীল আকাশ-সদৃশ, অবিকারী তোমার স্বভাব। আকাশের উপর নানা বর্ণের মেঘ আসে, মুহূর্তের জন্য খেলা করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আকাশ সেই একই থাকে। তোমাকে কেবল মেঘগুলি সরাইয়া দিতে হইবে।'
১

আমাদের কেবল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে এবং পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। জল আপন বেগে ধাবিত হইবে এবং নিজের স্বভাবেই ক্ষেত্রটিকে আপ্লুত করিয়া ফেলিবে, কেন-না জল তো পূর্বেই সেখানে ছিল।

মানুষ অনেকটা চেতন, কিছুটা অচেতন আবার চেতনের ঊর্ধ্বে যাইবারও সম্ভাবনা তাহার আছে। কেবল আমরা যখন যথার্থ মানুষ হইতে পারিব, তখনই আমরা বিচারের উপরে উঠিতে পারিব। 'উচ্চতর' বা 'নিম্নতর' শব্দগুলি কেবল মায়ার জগতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সত্যের জগতে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ সেখানে কোন ভেদ নাই। মায়ার জগতে মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বেদান্তী বলেন, মানুষ দেবতা অপেক্ষা বড়। দেবতাদেরও মরিতে হইবে এবং পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র নরদেহে তাহারা পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে।

ইহা সত্য যে, আমরা একটা মতবাদ সৃষ্টি করিতেছি। আমরা স্বীকার করি যে, ইহা ক্রটিহীন নয়, কারণ সত্য অবশ্যই সমস্ত মতবাদের ঊর্ধ্বে। কিন্তু অন্য মতবাদগুলির সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিব যে, বেদান্তই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মতবাদ। তবুও ইহা সম্পূর্ণ নয়, কারণ যুক্তি ও বিচার সম্পূর্ণ নয়। ইহাই একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ, যাহা মানব-মন ধারণা করিতে পারে।

ইহা অবশ্য সত্য যে, একটি মতবাদকে শক্তিশালী হইতে হইলে তাহাকে প্রচারশীল হইতে হইবে। বেদান্তের ন্যায় কোন মতবাদ এত প্রচারশীল হয় নাই। আজও পর্যন্ত ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বহু অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। যাঁহারা যথার্থ মানুষ ছিলেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই ঐরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু কালে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি তোমরা বিশ্বাস করিতে পার না যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হইয়া যাইব। আমরা বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন একমাত্র সুখই থাকিবে এবং কোন দুঃখই থাকিবে না।

মধ্যে মধ্যে আমাদের জীবনে পরম আনন্দের মুহূর্ত আসে, যখন আনন্দ ছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না, আর কিছুই দিই না বা জানি না। তারপর সেই ক্ষণটি চলিয়া যায় এবং আমাদের সম্মুখে জগৎপ্রপঞ্চ অবস্থিত দেখি। আমরা জানি, ঈশ্বরের উপর একটি পর্দা চাপান হইয়াছে মাত্র এবং ঈশ্বরই সমস্ত বস্তুর পটভূমিকারূপে অবস্থান করিতেছেন।

বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, নির্বাণ এই জীবনেই পাওয়া যাইতে পারে, উহা পাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মানুভূতিই নির্বাণ এবং এক মুহূর্তের জন্যও উহা একবার সাক্ষাৎ করিলে আর কখনও কেহ ব্যক্তিত্বের মরীচিকায় মোহগ্রস্ত হয় না। আমাদের চক্ষু আছে সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমরা অবশ্যই দেখিব, কিন্তু সর্বদা আমরা জানিব, উহা কি। আমরা ইহার প্রকৃত স্বভাব জানিয়া ফেলিয়াছি। আবরণই আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, আত্মা কিন্তু অপরিবর্তনীয়। আবরণ খুলিয়া যায় এবং আত্মাকে ইহার পশ্চাতে দেখিতে পাই। সব পরিবর্তনই এই আবরণে। মহাপুরুষে আবরণটি সূক্ষ্ম এবং আত্মা তাঁহার ভিতর দিয়া প্রায়ই প্রকাশিত হয়। পাপীতে আবরণটি ঘন, সেইজন্য তাহার আবরণের পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছেন এবং মহাপুরুষের আবরণের পশ্চাতেও যে সেই একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন—এই সত্যটি আমরা ভুলিয়া যাই। যখন আবরণটি নিঃশেষে অপসারিত হইবে, তখন আমরা দেখিব, উহা কখনই ছিল না এবং আমরা আত্মা ছাড়া আর কিছুই নই। আবরণের অস্তিত্বও আর আমাদের স্মরণে থাকিবে না।

জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের দুইটি দিক্ আছে। প্রথমতঃ জাগতিক কোন বস্তু দ্বারা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রভাবিত হন না। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র তিনিই জগতের কল্যাণ করিতে সমর্থ হন। পরোপকার করার পশ্চাতে যে যথার্থ প্রেরণা, তাহা তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন, কারণ তাঁহার কাছে এক ছাড়া আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে অহঙ্কার বলা যায় না, কারণ উহা ভেদাত্মক। ইহাই একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা। তাঁহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন, ব্যক্তি-সর্বস্ব নয়। প্রেম ও সহানুভূতির প্রত্যেক ব্যাপার এই বিশ্বজনীনতার প্রকাশ—'নাহং, তুঁহু' তাঁহার এই ভাবটিকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা যাইতে পারে, 'তুমি অপরকে সাহায্য কর, কারণ তুমি যে তাহাতে আছ এবং সেও যে তোমাতে আছে।' একমাত্র প্রকৃত বেদান্তীই তাঁহার ন্যায় মানুষকে সাহায্য করিতে পারিবেন ও বিনা দ্বিধায় তাঁহার জীবনদান করিবেন, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার মৃত্যু নাই। জগতে যতক্ষণ একটিমাত্র পোকাও জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনিও জীবিত থাকিবেন, যতক্ষণ একটিমাত্র জীবও ভক্ষণ করিবে, ততক্ষণ তিনিও ভক্ষণ করিবেন। সুতরাং তিনি পরোপকার করিয়া যান; দেহকে সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে—এই আধুনিক ধারণা তাঁহাকে কখনও বাধা দিতে পারিবে না। যখন মানুষ ত্যাগের এই শীর্ষে উপনীত হন, তখন তিনি নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও অতিশয় দূষিত স্থানকে আর ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও দূষিত স্থানরূপে দেখেন না, কিন্তু দেখেন সেই একই ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন।
২

এইরূপ সমদর্শী পুরুষই সুখী এবং তিনিই ইহজীবনে সংসার জয় করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পারে গিয়াছেন।'
৩
ঈশ্বর দ্বন্দ্বাদি-বর্জিত; সুতরাং বলা হয় যে, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন।

যীশু বলেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি ছিলাম।' ইহার অর্থ এই যে, যীশু এবং তাঁহার মত অবতার পুরুষেরা মুক্ত আত্মা। নাজারেথের যীশু তাঁহার প্রারব্ধের বশবর্তী হইয়া মানব-রূপ ধারণ করেন নাই, করিয়াছিলেন মানব-কল্যাণের জন্যই। ইহা ভাবা উচিত নয় যে, মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন সে কর্ম করিতে পারে না—একটা জড় মৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়। পরন্তু সেই মানুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমী হন, কারণ অপরে বাধ্য হইয়া কর্ম করে, আর তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম করেন।

যদি আমরা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হই, তাহা হইলে কি আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না? হাঁ, নিশ্চয়ই থাকিবে। ঈশ্বরই আমাদের স্বকীয়তা। এখন যে তোমার স্বাতন্ত্র্য আছে, উহা অবশ্য সেরূপ নয়। তুমি উহার দিকে অগ্রসর হইতেছ। স্বকীয়তার অর্থ এই যে, উহা এক অবিভাজ্য বস্তু। বর্তমান স্বাতন্ত্র্যকে কি করিয়া তুমি স্বকীয়তা বল? এখন তুমি একরকম চিন্তা করিতেছ, এক ঘণ্টা পরে আবার আর একরকম এবং দুই ঘণ্টা পরে আবার অন্যরকম চিন্তা করিবে। স্বকীয়তার পরিবর্তন নাই। উহা সর্ব বস্তুর উপরে—অপরিবর্তনীয়। আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, ঐ অবস্থায় চিরকাল থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ তাহা হইলে তস্কর তস্করই থাকিয়া যাইবে, বদমাশ বদমাশই থাকিবে, অন্য কিছু হইতে পারিবে না। প্রকৃত স্বকীয়তার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং কোন কালে হইবেও না এবং উহাই ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভিতর নিত্য বিরাজমান।

বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয় বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্তান।

সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত

[ইংলণ্ডের অন্তর্গত রিজওয়ে গার্ডেনস-এ অবস্থিত এয়ার্লি লজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ]

যাঁহাদের দৃষ্টি শুধু বস্তুর স্থূল বহিরঙ্গে আবদ্ধ, তাঁহারা ভারতীয় জাতির মধ্যে দেখিতে পান—কেবল একটি বিজিত ও নির্যাতিত জনসমাজ, কেবল এক দার্শনিক ও স্বপ্নবিলাসী মানব-গোষ্ঠী। ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী, মনে হয়—তাঁহারা ইহা অনুভব করিতে অক্ষম। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, যেমন অতিমাত্র কর্মচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা ও ধ্যানমগ্নতার সাহায্যে লাভবান্ হইতে পারে, সেইরূপ প্রাচ্যজাতিও অধিকতর কর্মোদ্যম ও শক্তি-অর্জনের দ্বারা লাভবান্ হইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন অনিবার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি একে একে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইলেও কোন্ শক্তিবলে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হিন্দু ও য়াহুদী জাতিই (যে দুইটি জাতি হইতে পৃথিবীর সব ধর্মমতের সৃষ্টি হইয়াছে) আজও বাঁচিয়া আছে? একমাত্র তাহাদের অধ্যাত্ম-শক্তিই ইহার কারণ হইতে পারে। নীরব হইলেও হিন্দুজাতি আজও বাঁচিয়া আছে, আর প্যালেষ্টাইনে বাসকালে য়াহুদীদের যে সংখ্যা ছিল, বর্তমানে তাহা বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের দর্শনচিন্তা সমগ্র সভ্যজগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া চলিয়াছে এবং তাহাতে অনুস্যূত হইয়া আছে। পুরাকালে যখন ইওরোপখণ্ডের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, তখনও ভারতের বাণিজ্য সুদূর আফ্রিকার উপকূলে উপনীত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল; ফলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়েরা কখনও তাহাদের দেশের বাহিরে পদার্পণ করে নাই—এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই।

ইহাও লক্ষণীয় যে, ভারতে কোন বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য-বিস্তার যেন সেই বিজয়ী শক্তির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ সেই সন্ধিক্ষণেই তাহার লাভ হইয়াছে—ঐশ্বর্য, অভ্যুদয়, রাজ্যবিস্তার এবং অধ্যাত্ম-সম্পদ্। পাশ্চাত্য দেশের লোক সর্বদা ইহাই নির্ণয় করিতে সচেষ্ট যে, এ জগতে কত বেশী বস্তু সে আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতে পারিবে। প্রাচ্যদেশের লোক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া চলে ও প্রমাণ করিতে চায় যে, কত অল্প ঐহিক সম্পদের দ্বারা তাহার দিন চলিতে পারে। বেদে আমরা এই সুপ্রাচীন জাতির ঈশ্বর-অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখিতে পাই। ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া তাঁহারা ধর্মের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বপুরুষদের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতা, ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা, এবং বরুণ অর্থাৎ দেবগণের দেবতার উপাসনায় উপনীত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণার ক্রমবিকাশ—এই বহু দেবতা হইতে এক পরম দেবতার ধারণায় উপনীত হওয়া আমরা সকল ধর্মমতেই দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিপালন করিতেছেন, এবং যিনি সকলের অন্তর্যামী, তিনিই সকল উপজাতীয় দেবতার অধিনায়ক। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ক্রমবিকাশের পথে চলিয়া বহুদেবতাবাদ হইতে একেশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরকে এই প্রকার মানবীয় রূপগুণে বিভূষিত ভাবিয়া হিন্দুমন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কারণ যাঁহারা ঈশ্বরানুসন্ধানে ব্যাপৃত, তাঁহাদের নিকট এই মত অত্যন্ত মানবীয় ভাবে পূর্ণ।

সুতরাং অবশেষে তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ ও জড়বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। অন্তর্জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ কি? ইহা স্বরূপতঃ আত্মা, ইহা তাঁহাদের নিজ সত্তার সহিত অভিন্ন এবং একমাত্র এই বস্তু সম্বন্ধেই মানুষ নিশ্চিত হইতে পারে। আগে নিজেকে জানিতে পারিলেই মানুষ নিজেকে জানিতে পারে, অন্যথা নয়। এই একই প্রশ্ন সৃষ্টির আদিকালে ঋগ্বেদে ভিন্নভাবে করা হইয়াছিল—'সৃষ্টির আদি হইতে কে বা কোন্ তত্ত্ব বর্তমান?' এই প্রশ্নের সমাধান ক্রমে বেদান্তদর্শনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বেদান্তদর্শন বলে, আত্মা আছেন অর্থাৎ যাহাকে আমরা পরমতত্ত্ব, সর্বাত্মা বা স্ব-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইল সেই শক্তি, যাহা দ্বারা আদিকাল হইতে সব কিছু প্রকাশমান হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

বৈদান্তিক একদিকে যেমন প্রশ্নের ঐ সমাধান করিলেন, তেমনি আবার নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিও আবিষ্কার করিয়া দিলেন। যদিও সকল প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ই 'হত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস' ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ নির্দেশ করেন নাই। 'কেন আমি আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করিব না?'—এই প্রশ্নের সন্তোষজনক বা সংশয়াতীত কোন উত্তরই ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুরা শুধু মতবাদ লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণা-সহায়ে ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। হিন্দু বলেনঃ আত্মা নির্বিশেষ ও সর্বব্যাপী, এবং সেইজন্য অনন্ত। অনন্ত বস্তু কখনও দুইটি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এক অনন্তের দ্বারা অপর অনন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। জীবাত্মা সেই অনন্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ, অতএব প্রতিবেশীকে আঘাত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা হইবে। এই স্থূল আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিই সর্বপ্রকার নীতিবাক্যের মূলে নিহিত আছে। অনেক সময়ই বিশ্বাস করা হয় যে, পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রগতির কালে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় এবং এক ধারণা হইতে অপর ধারণায় উপনীত হইতে হইলে পূর্বেরটি বর্জন করিতে হয়। কিন্তু ভ্রান্তি কখনও সত্যে লইয়া যাইতে পারে না। আত্মা যখন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সে এক সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়, এবং তাহার পক্ষে প্রত্যেক স্তরই সত্য। আত্মা ক্রমে নিম্নতর সত্য হইতে ঊর্ধ্বতর সত্যে উপনীত হয়। বিষয়টি এইভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে পারা যায়। এক ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রতি পদে সে আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রথম চিত্রটি দ্বিতীয় চিত্র হইতে কতই না পৃথক্ হইবে, এবং তৃতীয়টি হইতে

কিংবা সূর্যে উপনীত হইলে সর্বশেষটি হইতে উহা আরও কত পৃথক্ হইবে! এই চিত্রগুলি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটিই সত্য; বিশেষ শুধু এইটুকু যে, দেশকালের পরিবেশ পরিবর্তিত হওয়ায় তাহারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। এই সত্যের স্বীকৃতির ফলেই হিন্দুগণ সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ধর্মের মধ্যে নিহিত সর্বসাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এইজন্যই সকল জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুগণই ধর্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। কোন মুসলমান সাধকের স্মৃতিসৌধের কথা মুসলমানরা বিস্মৃত হইলেও হিন্দুদের দ্বারা তাহা পূজিত হয়। হিন্দুগণের এইরূপ পরধর্মসহিষ্ণুতার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য মন যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির বাঞ্ছিত লক্ষ্য—ঐক্য না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনমতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক একমাত্র অণু বা পরমাণুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেন। যখন তিনি উহা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার আর কোন কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না। আর আমরা যখন আত্মার বা স্ব-স্বরূপের ঐক্য দর্শন করি, তখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের নিকট তখন ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সেই একমাত্র সত্তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। অণুর নিজস্ব দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি না থাকিলেও অণুগুলির মিশ্রণের ফলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বিস্তৃতির উদ্ভব হয়—এইপ্রকার কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদিগকে বাধ্য হইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয়। যখনই এক অণু অপর অণুর উপর ক্রিয়া করে, তখনই একটি যোগসূত্রের প্রয়োজন হয়। এই যোগসূত্রটি কিরূপ? যদি ইহা একটি তৃতীয় অণু হয়, তাহা হইলে সেই পূর্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় অণু কিরূপে তৃতীয় অণুর উপর কার্য করিবে? এইরূপ যুক্তি যে অনবস্থাদোষদুষ্ট, তাহা অতি সুস্পষ্ট। সকল প্রকার পদার্থবিদ্যা এই এক আপাতসত্য মতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে যে, বিন্দুর নিজের কোন পরিমাণ নাই, আর বিন্দুর মিলনে গঠিত রেখার দৈর্ঘ্য আছে অথচ প্রস্থ নাই—এই স্বীকৃতিতেও পরস্পর-বিরোধ থাকিয়া যায়। এইগুলি দেখা যায় না, ধারণাও করা যায় না। কেন? কারণ এইগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, অধ্যাত্ম বা তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। সুতরাং পরিশেষে দেখা যায়, মনই সকল অনুভবের আকার দান করে। আমি যখন কোন চেয়ার দেখি, তখন আমি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বাহিরে অবস্থিত বাস্তব চেয়ারটি দেখি না, বহিঃস্থ বস্তু এবং তাহার মানস প্রতিচ্ছায়া—এই উভয়ই দেখি; অতএব শেষ পর্যন্ত জড়বাদীও ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মতত্ত্বে উপনীত হন।

বেদান্ত -দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব

[বোষ্টনের টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ]

আজ যখন সুযোগ পাইয়াছি, তখন এই অপরাহ্ণের আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে একটু ধন্যবাদ প্রকাশের অনুমতি নিশ্চয় পাইব। আমি আপনাদের মধ্যে তিন বৎসর বাস করিয়াছি এবং আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি। এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই সুযোগে এথেন্স নগরী-সদৃশ আমেরিকার এই শহরে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যাওয়া খুবই সঙ্গত। এদেশে প্রথম পদার্পণের অল্প কয়েক দিন পরেই মনে করিয়াছিলাম, এই জাতি-সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিব। কিন্তু আজ তিন বৎসর অতিবাহিত করার পরও দেখিতেছি যে, এ-সম্বন্ধে একখানি পৃষ্ঠা পূর্ণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিতেছি, বেশভূষা, আহার-বিহার বা আচার ব্যবহারের খুঁটিনাটি সম্পর্কে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, মানুষ—পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ; সেই একই আশ্চর্য মানব-প্রকৃতি সর্বত্র বিরাজিত। তথাপি প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু আছে এবং এদেশীয়গণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার সার আমি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। এই আমেরিকা মহাদেশে কেহ কোন ব্যক্তিগত বিচিত্র ব্যবহারাদি সম্বন্ধে সমালোচনা করে না। মানুষকে তাহারা নিছক মানুষরূপেই দেখে এবং মানুষরূপেই হৃদয় দিয়া বরণ করে। এই গুণটি আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখি নাই।

আমি এদেশে একটি ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম; তাহা বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শন অতি প্রাচীন। ইহা বেদ নামে খ্যাত প্রাচীন সুবিশাল আর্য-সাহিত্য হইতে উদ্ভূত। বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যে-সব উপলব্ধি, তত্ত্বালোচনা, বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা যেন তাহা হইতেই প্রস্ফুটিত একটি সুকোমল পুষ্প। এই বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক, ইহার উদ্ভবের জন্য ইহা কোন ব্যক্তি বা ধর্মগুরুর নিকট ঋণী নয়; ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। অথচ যে-সব ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার কোন বিদ্বেষ নাই। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনমত ও ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—যথা বৌদ্ধধর্ম কিংবা আধুনিক কালের কয়েকটি ধর্মমত। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরই মত এই-সকল ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রত্যেকটির একজন ধর্মনেতা আছেন এবং তাঁহারা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাদ-বিসংবাদ নাই।

বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদান্ত দাবী করে যে, উহা পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্বটি হইল এই যে, মানুষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; আমরা আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই সেই ঐশী চেতনা হইতে প্রসূত। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বীর্যবান্, যাহা কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা কিছু ঐশ্বর্যবান্, সে-সবই ঐ ব্রহ্মসত্তা হইতে উদ্ভূত; এবং যদিও তাহা অনেকের মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। যেন এক অনন্ত মহাসমুদ্র পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অনন্ত মহাসমুদ্র হইতে একটি তরঙ্গরূপে উত্থিত হইয়াছি। আমরা প্রত্যেকেই সেই অনন্তকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং সুপ্ত সম্ভাবনার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে যে সৎ-চিৎ-ও আনন্দময় মহাসাগরের সহিত আমরা স্বভাবতঃ অভিন্ন, সেই মহাসাগরে আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সেই ঐশী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিবার তারতম্যের দরুন ঘটিয়াছে। অতএব বেদান্তের অভিমত এই যে, প্রত্যেক মানুষ যতটুকু ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দিক্ হইতে বিচার না করিয়া তাহার স্বরূপের দিক্ হইতেই তাহাকে বিচার করিতে হইবে। সকল মানুষই স্বরূপত ব্রহ্ম; অতএব কোন আচার্য যখন কাহাকেও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তখন নিন্দাবাদ ছাড়িয়া দিয়া ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তিকে জাগাইবার জন্যই তাঁহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বেদান্ত ইহাও প্রচার করে যে, সমাজ-জীবনে ও প্রতি কর্মক্ষেত্রে আমরা যে বিশাল শক্তিপুঞ্জের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে অন্তর হইতে বাহিরে উৎসারিত হয়। অতএব অন্য ধর্মসম্প্রদায় যাহাকে অনুপ্রেরণা বা ঐশী শক্তির অন্তঃপ্রবেশ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, বেদান্তবাদী তাহাকেই মানবের ঐশী শক্তির বহির্বিকাশ নামে অভিহিত করিতে চান; অথচ তিনি অপর ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে চান না। যাঁহারা মানুষের এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাদের সহিত বেদান্তবাদীর কোন বিরোধ নাই। কারণ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্রহ্মশক্তিরই উন্মেষে যত্নপর।

মানুষ যেন ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ, অথচ সতত প্রসারশীল একটি অনন্ত শক্তিমান্ স্প্রীং- এর মত; পরিদৃশ্যমান সমগ্র সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা এই মুক্তি-প্রয়াসেরই ফল। আমাদের আশেপাশে যত কিছু প্রতিযোগিতা, হানাহানি এবং অশুভ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই এই মুক্তি প্রয়াসের কারণ বা পরিণাম নয়। আমাদের একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধরা যাক, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত উচ্চস্থানে কোথাও পরিপূর্ণ জলাশয় অবস্থান করিতেছে; জলপ্রবাহ কৃষিক্ষেত্র অভিমুখে ছুটিতে চায়, কিন্তু একটি রুদ্ধ দ্বারের দ্বারা প্রতিহত হয়। দ্বারটি যেই উদ্ঘাটিত হইবে, অমনি জলরাশি নিজবেগে প্রবাহিত হইবে। পথে আবর্জনা বা মলিনতা থাকিলে প্রবহমান জলধারা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই-সকল আবর্জনা ও মলিনতা মানবের এই দেবত্ব-বিকাশের পরিণামও নয়, কারণও নয়। ঐগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র। অতএব ঐগুলির প্রতিকার সম্ভব।

বেদান্তের দাবী এই যে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে কোথাও উহা পুরাণের রূপক-কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। বেদান্তের দৃঢ় অভিমত এই যে, এমন কোন ধর্ম প্রেরণা এ-যাবৎ প্রকটিত হয় নাই কিংবা এমন কোন মহান্ দেবমানবের অভ্যুদয় হয় নাই, যাঁহাকে মানবপ্রকৃতির এই স্বতঃসিদ্ধ অসীম একত্বের অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা না চলে। নৈতিকতা, সততা ও পরোপকার বলিয়া যাহা কিছু আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাও ঐ একত্বের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জীবনে এরূপ অনেক মুহূর্ত আসে, যখন প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে যে, সে বিশ্বের সহিত এক ও অভিন্ন, এবং সে জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক এই অনুভূতিই জীবনে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই ঐক্যের প্রকাশকেই আমরা প্রেম ও করুণা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশাস্ত্র ও সততার মূলভিত্তি। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকেই 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই'—এই মহাবাক্যে সূত্রাকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয়—সে এই বিশ্ব-সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন; তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্মা; যত জীবদেহ আছে, সব তোমারই দেহ; কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তোমার অন্তর হইতে ঘৃণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব—সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, তবে সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে, তখন আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটিবে। বেদান্তের অপর একটি বিশিষ্ট ভাব এই যে, ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই অসীম বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এবং সকলেরই লক্ষ্য এক বলিয়া সকলকেই একই মতে আনয়নের চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেদান্তবাদীর কবিত্বময় ভাষায় বলা যায়, 'যেমন বিভিন্ন স্রোতস্বতী বিভিন্ন পর্বত-শিখর হইতে উদ্গত হইয়া নিম্নভূমিতে অবতরণ করে এবং সরল বা বক্রগতিতে যথেচ্ছ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে আসিয়া উপনীত হয়, তেমনি হে ভগবান্, এই-সকল বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস ও পথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জন্মলাভ করিয়া সরল বা কুটিল পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে তোমাতেই আসিয়া উপনীত হয়।'

বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, এই অভিনব ভাবরাশির আধারভূত এই প্রাচীন দার্শনিক মতটি সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্মমত বৌদ্ধধর্মকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আলেকজান্দ্রিয়াবাসী, অজ্ঞেয়বাদী ও মধ্যযুগের ইওরোপীয় দার্শনিকের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইহা জার্মান-দেশীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। অথচ এই অসীম প্রভাব প্রায় অলক্ষিতভাবেই পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে। রাত্রির মৃদু শিশিরসম্পাতে যেমন শস্যক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীর গতিতে এবং অলক্ষ্যে এই অধ্যাত্মদর্শন মানবের কল্যাণার্থ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। এই ধর্মপ্রচারের জন্য সৈন্যগণের রণযাত্রার প্রয়োজন হয় নাই। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রচারশীল ধর্ম বৌদ্ধধর্মে আমরা দেখি, প্রথিতযশা সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিসমূহ সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, আণ্টিওক, পারস্য, চীন প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্য জগতের বহু দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ শিলালিপিতে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যেন অপর ধর্মকে নিন্দা না করেন। বলা হইয়াছিল, 'যেখানকারই হউক, সকল ধর্মেরই ভিত্তি এক; সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা কর, তোমার যাহা বলিবার আছে, সে-সকলই শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন কিছু করিও না—যাহাতে কাহারও ক্ষতি হয়।'

এইরূপে দেখা যায়, ভারতবর্ষে হিন্দুদের দ্বারা অপর ধর্মাবলম্বীরা কখনও নির্যাতিত হয় নাই; প্রত্যুত এখানে দেখা যায় এক অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধা, যাহা তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পোষণ করিয়াছে। নিজেদের দেশ হইতে বিতাড়িত য়াহুদীদের একাংশকে তাহারা আশ্রয় দিয়াছিল; তাহারই ফলে মালাবারে আজও য়াহুদীরা বর্তমান। অপর এক সময়ে তাহারা ধ্বংসপ্রায় পারসীক জাতির যে অংশটুকু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, আজও তাঁহারা আমাদের জাতির অংশরূপে, আমাদের একান্ত প্রিয়জনরূপে আধুনিক বোম্বাই-প্রদেশবাসী পারসীকগণের মধ্যে রহিয়াছেন। যীশুশিষ্য সেণ্ট টমাসের সহিত এদেশে আগমন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, এইরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাও এদেশে আছেন; তাঁহারা ভারতে বসবাস করিতে এবং নিজেদের ধর্মমত স্বাধীনভাবে পোষণ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন; তাঁহাদের একটি পল্লী আজও এদেশে বর্তমান। পরধর্মে বিদ্বেষহীনতার এই মনোভাব আজও ভারতে বিনষ্ট হয় নাই, কোন দিনই হইবে না এবং হইতেও পারে না।

বেদান্ত যে-সব মহতী বাণী প্রচার করে, সেগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহাই যখন স্থির হইল যে, আমরা জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন অপরের অক্ষমতায় ধৈর্যহারা হইব কেন? কেহ অপরের তুলনায় শ্লথগতি হইলেও আমাদের তো ধৈর্য হারাইয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাকে আমাদের অভিশাপ দিবার অথবা নিন্দা করিবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে দেখিতে পাইব—সর্বকার্যে সেই একই ব্রহ্মশক্তির প্রভাব বিদ্যমান, সর্বমানব-হৃদয়ে সেই একই ব্রহ্মসত্তার বিকাশ ঘটিতেছে। শুধু সেই অবস্থাতেই আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাবী করিতে পারিব।

মানুষ যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই-সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।

ইতিহাসে বেদান্ত-দর্শনের বাস্তবিক কার্যকারিতার যে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল।

বেদান্ত ও অধিকার

[লণ্ডনে প্রদত্ত]

আমরা অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বাংশ প্রায় শেষ করিয়াছি। একটা বিষয় এখনও বাকী আছে; বোধ হয় উহা সর্বাপেক্ষা দুরূহ। এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে আমাদের চারিদিকে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়—সমগ্র জগৎই সেই এক সত্তা-স্বরূপের বিবর্তন। সংস্কৃতে এই সত্তাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। ব্রহ্ম প্রপঞ্চে পরিবর্তিত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটি অসুবিধাও আছে। ব্রহ্মের পক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপায়িত হওয়া কি করিয়া সম্ভব? কেনই বা ব্রহ্ম বিপরিণত হইলেন? সংজ্ঞা হইতেই বোঝা যায় ব্রহ্ম অপরিণামী। অপরিবর্তনীয় বস্তুর পরিবর্তন একটি স্ববিরোধী উক্তি। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহাদের ঐ একই অসুবিধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করা যায়—কি প্রকারে এই সৃষ্টির উদ্ভব হইল? ইহা নিশ্চয়ই কোন সত্তাশূন্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; হইলে উহা স্ববিরোধী হইবে। সত্তাশূন্য কোন কিছু হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কার্য কারণেরই অন্যতর রূপমাত্র। বীজ হইতে মহা মহীরুহ উৎপন্ন হয়। বৃক্ষটি বায়ু ও জল-সংযুক্ত বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বৃক্ষ-শরীর গঠনের নিমিত্ত যে পরিমাণ বায়ু ও জলের প্রয়োজন, তাহা নির্ধারণ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম—কার্যরূপ বৃক্ষে যে পরিমাণ জল ও বায়ু আছে, উহার কারণরূপ জল ও বায়ুর পরিমাণও ঠিক তদ্রূপ। আধুনিক বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে, কারণই অন্য আকারে কার্যে পরিণত হইতেছে। কারণের বিভিন্ন সমন্বিত অংশ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কার্যে পরিণত হয়। জগৎ কারণহীন—এইরূপ কষ্টকল্পনা আমাদের বর্জন করিতেই হইবে। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।

কিন্তু আমরা একটি সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপর একটি সঙ্কটে পতিত হইলাম। প্রত্যেক মতবাদেই ঈশ্বরের ধারণার সহিত তাঁহার অপরিণামিত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত—একটির ভিতর দিয়াই অপরটি আসিয়া পড়ে। অত্যন্ত আদিম অস্পষ্ট ঈশ্বরানুসন্ধান-ব্যাপারেও একটিমাত্র ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা হইল মুক্তি। এই ধারণা কিভাবে আসিল, তাহার ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি আমরা দেখিয়াছি। মুক্তি ও অপরিণামিত্ব একই কথা। যাহা মুক্ত, তাহাই অপরিণামী। যাহা অপরিণামী, তাহাই মুক্ত। কোন কিছুই ভিতরে কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইলে তাহার ভিতরে বা বাহিরে এমন কিছু থাকা চাই, যাহা ঐ বস্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ঐ বস্তু অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা এইরূপ এক বা একাধিক কারণ দ্বারা বদ্ধ, যে কারণগুলি নিজেরাও ঐরূপ পরিবর্তনশীল। যদি মনে করা যায়—ঈশ্বরই জগৎ হইয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বর এখানে তাঁহার স্বরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন। আবার যদি মনে করি, অনন্ত ব্রহ্ম এই সান্ত জগৎ হইয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের অসীমত্বও তদনুপাতে হ্রাস পাইল, সুতরাং তাঁহার অসীমত্ব হইতে এই জগৎ বাদ পড়িতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরিণামী ঈশ্বর ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বরই জগৎ-রূপে পরিণত হন—এই মতবাদের দার্শনিক অসুবিধা পরিহার করিবার জন্য বেদান্তের একটি নির্ভীক মতবাদ আছে। তাহা এই যে, জগৎকে যেভাবে আমরা জানি বা উহার সম্বন্ধে যেভাবে আমরা চিন্তা করি, সেইভাবে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত বলেন, সেই অপরিণামীর কখনও পরিবর্তন হয় নাই, আর এই সমগ্র জগৎ একটি প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র, ইহার বাস্তব কোন সত্তা নাই। বেদান্ত বলেন, আমাদের এই যে অংশের ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা এবং উহাদের পারস্পরিক পৃথকত্বের ধারণা, সে-সকলই বাহ্য—এগুলির কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। ঈশ্বরের কোনই পরিবর্তন হয় নাই; তিনি জগৎ-রূপে কখনও পরিণত হন নাই। আমরা ঈশ্বরকে যে জগৎ-রূপে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ আমরা দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখি। এই দেশ, কাল ও নিমিত্তই এই আপাতপ্রতীয়মান পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু উহা পারমার্থিক নয়। ইহা সত্যসত্যই একটি দ্ব্যর্থহীন নির্ভীক মতবাদ। এখন এই মতবাদটি আমাদের আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে। ভাববাদ (Idealism) সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, ইহা সেইরূপ ভাববাদ নয়। ইহা বলে না যে, এই জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা বলে যে, ইহার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু ইহাকে আমরা যে ভাবে দেখিতেছি, ইহা ঠিক তাহা নয়। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য অদ্বৈত বেদান্ত একটি সুবিদিত উদাহরণ দেন। রাত্রির অন্ধকারে একটি গাছের গুঁড়িকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ভূত বলিয়া মনে করে; দস্যু মনে করে, উহা পুলিস; বন্ধুর জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি মনে করে, উহা তাহারই বন্ধু। এই-সকল ব্যাপারে গাছের গুঁড়িটির কিন্তু কোনই পরিবর্তন হয় নাই, কতকগুলি আপাতপ্রতীয়মান পরিবর্তন অবশ্যই ঘটিয়াছিল এবং উহা ঘটিয়াছিল ভিন্ন ভিন্ন দর্শকেরই মনে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে নিজের অনুভূতির (Subjective) দিক্ হইতে ইহা আমরা আরও বেশী বুঝিতে পারি। আমাদের বাহিরে এমন একটা কিছু আছে, যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের ভিতরেও আরও এমন একটা কিছু আছে, যাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'খ'। জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই এই 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টি; সুতরাং আমরা যে-সকল বস্তু জানি, সেগুলির প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই থাকিবে—'ক' বহির্ভাগ এবং 'খ' অন্তর্ভাগ এবং 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টিলব্ধ বস্তুকেই আমরা জানিতে সমর্থ হই। অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তু আংশিকভাবে আমাদের সৃষ্টি এবং উহার অপর অংশটি বাহ্য। এখন বেদান্ত বলেন, এই 'ক' এবং 'খ' এক অখণ্ড সত্তা।

হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও অন্য কয়েকজন আধুনিক দার্শনিকও ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যখন বলা হয়—যে-শক্তি পুষ্পের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই শক্তিই আমার চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—বৈদান্তিকও এই একই ভাব প্রচার করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, বহির্জগতের সত্যতা এবং অন্তর্জগতের সত্যতা একই। এমন কি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, উহা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরাই উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়াছি। বস্তুতঃ বাহ্যজগৎ বা অন্তর্জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা

যাইতে পারে, আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়, সমগ্র জগৎ আমাদিগের নিকট পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আমাদের মনই আমাদের অনুভূত বিষয়কে পরিবর্তিত করে। আমি যদি পরিবর্তিত হই, তবে বাহ্যজগৎও পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে—তুমি, আমি এবং বিশ্বের সর্ববস্তুই সেই নিরতিশয় ব্রহ্ম, আমরা ব্রহ্মের অংশবিশেষ নই, সমগ্রভাবেই আমরা ব্রহ্ম। তুমি সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সবটুকুই; অন্যান্য সকলেও ঠিক তাই। কারণ এই অখণ্ড সত্তার অংশবিশেষের ধারণা হইতে পারে না। এই-সকল জাগতিক বিভাগ, এই-সকল সসীমত্ব প্রতীতি মাত্র, স্বরূপতঃ অসম্ভব। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বাঙ্গসুন্দর; আমি কখনও বদ্ধ হই নাই। বেদান্ত নির্ভীকভাবে প্রচার করেনঃ তুমি যদি মনে কর—তুমি বদ্ধ, তাহা হইলে তুমি বদ্ধই থাকিয়া যাইবে; তুমি যদি বুঝিয়া থাক—তুমি মুক্ত, তবে তুমি মুক্তই থাকিবে। সুতরাং এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হইল আমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, আমরা সর্বদাই মুক্ত ছিলাম এবং চিরদিনই মুক্ত থাকিব। আমাদের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, আমাদের মৃত্যু নাই, আমরা কখনই জন্মগ্রহণ করি না। তাহা হইলে এই পরিবর্তনসমূহ কি? এই বাহ্যজগতের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? এই জগৎ একটি প্রাতিভাসিক জগৎ মাত্র—ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকে 'বিবর্তবাদ' বলা হয়, প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতেছেন। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন নাই; তাঁহার কোন পরিণামও নাই। অতিক্ষুদ্র জীবকোষেও সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মই অন্তর্নিহিত। বাহ্য আবরণের জন্যই ইহাকে 'জীবকোষ' বলা হয়; কিন্তু জীবকোষ হইতে মহামানব পর্যন্ত সকলের আভ্যন্তর সত্তার কোন পরিবর্তন নাই—ইহা এক ও অপরিবর্তনীয়; কেবল বাহিরের আবরণেরই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

ধরা যাক—এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে এবং ইহার বাহিরে রহিয়াছে সুন্দর দৃশ্য। পর্দার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহার ভিতর দিয়াই আমরা বাহিরের দৃশ্যটির খানিকটা দেখিতে পাইতেছি। মনে করুন—এই ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ইহা যতই বড় হইতে লাগিল, ততই দৃশ্যটি অধিকতরভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। পর্দাটি যখন তিরোহিত হইল, তখন আমরা সমগ্র দৃশ্যটির সম্মুখীন হইলাম। বাহিরের দৃশ্যটি হইল আত্মা; আমাদের ও দৃশ্যটির মধ্যে যে পর্দা, তাহা হইল মায়া—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত। উহার কোথাও একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, যাহার মধ্য দিয়া আমি আত্মাকে এক ঝলক মাত্র দেখিতে পাইতেছি। ছিদ্রটি বড় হইলে আমি আত্মাকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইব; আর যখন পর্দাটি একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন অনুভব করিব—আমিই আত্মস্বরূপ। সুতরাং জাগতিক পরিবর্তন নিরতিশয় ব্রহ্মে সাধিত হয় না—হয় প্রকৃতিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশিত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্তন চলিতে থাকে। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, কেবল কাহারও মধ্যে অন্যের তুলনায় তিনি অধিকতর প্রকাশিত। সমগ্র জগৎ পরমার্থতঃ এক। আত্মা-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক আত্মা অন্য আত্মা অপেক্ষা বড়—এরূপ বলার কোন অর্থ হয় না। ইতর প্রাণী হইতে বা উদ্ভিদ অপেক্ষা মানুষ বড়, এ-কথা বলাও সেজন্য নিরর্থক। সমগ্র জগৎ এক। উদ্ভিদের মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের বাধা খুব বেশী, ইতর প্রাণীর মধ্যে একটু কম; মানুষের মধ্যে আরও কম; সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতে তদপেক্ষাও কম; কিন্তু পূর্ণতম ব্যক্তিতে আত্মপ্রকাশের বাধা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের সমস্ত সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, যাহা কিছু আমরা ভাবি বা করি—সবই সেই একই লক্ষ্যের দিকে—পর্দাটিকে ছিন্ন করা, ছিদ্রটিকে বৃহত্তর করা, অভিব্যক্তি ও অন্তরালে অবস্থিত সত্যের মধ্যবর্তী আবরণকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তোলা। সুতরাং আমাদের কাজ আত্মার মুক্তিসাধন নয়, আমাদের নিজেদের বন্ধনমুক্ত করা। সূর্য মেঘস্তরের দ্বারা আবৃত, কিন্তু মেঘস্তর সূর্যের কোন পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারে না। বায়ুর কাজ মেঘগুলিকে সরাইয়া দেওয়া; আর মেঘগুলি যত সরিয়া যাইবে, সূর্যালোক তত প্রকাশ পাইবে। আত্মাতে কোন পরিবর্তন নাই—ইহা অনন্ত, নিত্য, নিরতিশয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আত্মার কোন জন্ম বা মৃত্যু হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, স্বর্গগমন—এই-সব আত্মার ধর্ম নয়। এইগুলি বিভিন্ন আপাতপ্রতীয়মান অভিব্যক্তি মাত্র—মরীচিকা বা নানাবিধ স্বপ্ন। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি জগৎসম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেছে—সে এখন দুর্ভাবনা এবং দুষ্কর্মের স্বপ্নে মশগুল, কিছু সময় পরে সেই স্বপ্নেরই ভাবনা তাহার পরবর্তী স্বপ্ন সৃষ্টি করিবে। সে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে যে, সে একটি ভয়ঙ্কর স্থানে রহিয়াছে এবং নির্যাতিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শুভ ভাবনা ও শুভকর্মের স্বপ্ন দেখিতেছে, সে এই স্বপ্নের অবসানে আবার স্বপ্ন দেখিবে যে, সে আরও ভাল জায়গায় রহিয়াছে। এইভাবে স্বপ্নের পর স্বপ্ন আসিতে থাকে। কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যখন এই সমস্ত স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইবে। আমাদের প্রত্যেকের এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন মনে হইবে সমগ্র জগৎ স্বপ্নমাত্র ছিল; তখন আমরা দেখিতে পাইব—আত্মা তাহার এই পরিবেশ হইতে অনন্ত গুণে বড়। এই পরিবেশের ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিতে পাইব—অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মার তুলনায় এই পরিবেশগুলির কোনই অর্থ নাই। অবশ্য এই প্রকার অনুভূতি কালসাপেক্ষ; আর অনন্তের তুলনায় এই কাল কিছুই নহে, ইহা সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুতুল্য। সুতরাং শান্তভাবে আমরা অপেক্ষা করিতে পারি।

এইরূপে দেখিতে পাই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চন্দ্র অন্যান্য গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে; একদিন না একদিন ইহা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু যাঁহারা সজ্ঞানে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শীঘ্রই কৃতকার্য হইবেন। কার্যতঃ এই বৈদান্তিক মতবাদের একটি সুবিধা এই যে, যথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণা কেবল এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সম্ভব। সকলেই আমাদের সহযাত্রী, সকলেই এক পথের পথিক—সকল জীবন, সকল তরু-গুল্ম, সকল প্রাণী—সকলেই সেই দিকে যাইতেছে; শুধু আমার মানুষ-ভ্রাতা নয়, জন্তু-জানোয়ার, তরু-গুল্ম, আমার সকল ভাই-ই সেই দিকে চলিয়াছে; কেবল আমার ভাল ভাইটি নয়, আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধার্মিক ভাইটি নয়, আমার দুর্বৃত্ত ভাইটিও—সকলেই একই লক্ষ্যে যাইতেছে। প্রত্যেকেই একই প্রবাহে ভাসমান, প্রত্যেকেই অনন্ত মুক্তির দিকে ছুটিতেছে। আমরা এই গতি বন্ধ করিতে পারি না; কেহই পারে না; হাজার চেষ্টা করিলেও কেহই ইহা হইতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, মানুষ সম্মুখে চালিত হইবেই এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করিবেই। সৃষ্টির অর্থ মুক্তির অবস্থায় পুনর্বার ফিরিয়া যাইবার জন্য সংগ্রাম। মুক্তিই আমাদের সত্তার কেন্দ্রস্থল; ইহা হইতে আমরা যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যে এখানে রহিয়াছি, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি এবং এই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের অভিব্যক্তিকেই আমরা বলি 'প্রেম'।

এইরূপ প্রশ্ন করা হয়—এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথায় ইহার স্থিতি? কোথায়ই বা ফিরিয়া যায়? উত্তর হইল—প্রেম হইতে ইহার উৎপত্তি, প্রেমেই ইহার স্থিতি, প্রেমেই ইহার প্রত্যাবর্তন। এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, কেহ পছন্দ করুক বা না করুক, কাহারও পক্ষে পশ্চাদপসরণ সম্ভব নহে। যতই পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করা যাক না কেন, প্রত্যেককেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইতে হইবে। তবুও আমরা যদি জ্ঞাতসারে—সজ্ঞানে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের গতিপথ মসৃণ হইবে, ঘাত-প্রতিঘাতের কর্কশত্ব অনেকটা মন্দীভূত হইবে এবং আমাদের লক্ষ্যপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হইবে। ইহা হইতে আমরা স্বভাবতঃ আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি আমাদের ভিতরে, বাহিরে নয়। যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তাহা একটি প্রতিবিম্বক কাঁচ মাত্র। আমাদের সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতর হইতে আসিয়া প্রকৃতিরূপ এই কাঁচের উপরে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এইটুকু মাত্রই প্রয়োজন; যাহাকে আমরা শক্তি বলি, প্রাকৃতিক রহস্য বলি, বেগ বলি, সে সবই আমাদের ভিতরে। বাহ্যজগতে রহিয়াছে কেবল এক পরিবর্তনের পরম্পরা। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; আত্মা হইতেই সমস্ত জ্ঞান আসে। মানুষই আপনার মধ্যে জ্ঞানকে আবিষ্কার করে, উহাকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞান অনন্তকাল ধরিয়া সেখানে রহিয়াছে। প্রত্যেকেই জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দস্বরূপ এবং অনন্ত সত্তাস্বরূপ। অন্যত্র আমরা যেমন দেখিয়াছি, সাম্যের নৈতিক ফল যেরূপ, এই প্রকার বোধেরও ফল সেইরূপ।

বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। দুইটি শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে; একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে একটি সুবিধার সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙিয়া যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে। এইরূপ সংগ্রাম আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে পাই। অবশ্য প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, তাহাদের উপর সে একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবী করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কেন-না ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক। যাহারা মনে করে 'আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা বেশী জানি', তাহারা অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবী করে। তাহারা বলে, 'হে সাধারণ ব্যক্তিগণ, এস, আমাদের পূজা কর। আমরা ঈশ্বরের দূত; তোমাদের আমাদিগকে পূজা করিতেই হইবে।' কিন্তু বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়। একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বিদ্যমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও-বা কিছু অল্প প্রকাশ। একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। অধিকারের দাবী তবে কোথায়? প্রত্যেক জীবেই পূর্ণজ্ঞান বিদ্যমান; অতি মূর্খের মধ্যেও উহা রহিয়াছে, সে এখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই; সম্ভবতঃ প্রকাশের সুযোগ পায় নাই; চতুর্দিকের পরিবেশ হয়তো তাহার অনুকূল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে, তখন তাহা প্রকাশ করিবে। একজন লোক অন্য লোক হইতে বড় হইয়া জন্মিয়াছে—বেদান্ত কখনই এই ধারণা পোষণ করে না। দুইটি জাতির মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা স্বভাবতই উন্নততর—বৈদান্তিকের নিকট এই ধারণাও একেবারে নিরর্থক। তাহাদিগকেও একই পরিবেশে ফেলিয়া দিয়া দেখ তো—একই-রূপ বুদ্ধিবৃত্তি উহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় কিনা। তৎপূর্বে এক জাতি অপর জাতি হইতে বড়—এ-কথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিষয়ে কাহারও কোন বিশেষ অধিকার দাবী করা উচিত নয়। মনুষ্যজাতির সেবা করাই একটি অধিকার; ইহাই তো ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বর এখানেই আছেন, এই সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছেন। তিনিই মানুষের অন্তরাত্মা। মানুষ আর কি অধিকার চাহিতে পারে? ঈশ্বরের বিশেষ দূত কেহ নাই, কখনও ছিল না এবং কখনও হইতে পারে না। ছোট বা বড় সমস্ত প্রাণীই সমভাবে ঈশ্বরের রূপ; পার্থক্য কেবল উহার প্রকাশের মধ্যে। চিরপ্রচারিত সেই এক শাশ্বত বাণী তাহাদের নিকট ক্রমে ক্রমে আসিতেছে। সেই শাশ্বত বাণী প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে লিখিত হইয়াছে। উহা সেখানেই বিরাজমান, এবং সকলেই উহা প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট। অনুকূল পরিবেশে কেহ কেহ অন্যের তুলনায় ইহা কিছুটা ভালভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছে, কিন্তু বাণীর বাহক হিসাবে তাহারা একই। এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কী দাবী হইতে পারে? অতীতের সকল ঈশ্বরপ্রেরিতের মত অতি মূর্খ মানব, অতি অজ্ঞান শিশুও ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা মহামানব হইবেন, তাঁহারা তাহাদেরই মত; মূর্খতম ও অজ্ঞানতম মানবগণও সমভাবে মহান্। প্রত্যেক জীবের অন্তস্তলে চিরকালের জন্য সেই অনন্ত শাশ্বত বাণী রক্ষিত আছে। জীবমাত্রেরই মধ্যে সেই 'মহতো মহীয়ান্' ব্রহ্মের অনন্ত বাণী নিহিত রহিয়াছে। ইহা তো সদা বর্তমান। সুতরাং অদ্বৈতের কাজ হইল এই-সকল অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া। ইহা কঠিনতম কাজ এবং আশ্চর্যের বিষয়—অন্য দেশের তুলনায় স্বীয় জন্মভূমিতেই কম সক্রিয়। অধিকারবাদের যদি কোন দেশ থাকে, তাহা হইলে ইহা সেই দেশই, যে-দেশ এই অদ্বৈতদর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশজাত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। সেখানে অবশ্য আর্থিক অধিকারবাদ ততটা নাই (আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক্), কিন্তু জন্মগত ও ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান।

একবার এই বৈদান্তিক নীতিপ্রচারের প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল; উহা বেশ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া সফলও হইয়াছিল। আমরা জানি, ইতিহাসে ঐ কালটি ঐ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আমি বৌদ্ধগণের অধিকারবাদ-খণ্ডনের কথা বলিতেছি। বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি অতি সুন্দর বিশেষণ আমার মনে আছে। ঐগুলি হইতেছে—'হে তথাগত, তুমি বর্ণাশ্রম-খণ্ডনকারী, তুমি সর্ব-অধিকার-বিধ্বংসী, তুমি সর্বপ্রাণীর ঐক্য-বিঘোষক।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনিই একমাত্র ঐক্যের ভাবই প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঐক্যভাবের অন্তর্নিহিত শক্তি বুদ্ধের শ্রমণসঙ্ঘ অনেকটা ধরিতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সঙ্ঘকে একটি উচ্চ ও নীচ পার্থক্য-যুক্ত যাজক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়াছে। মানুষমাত্রকে যখন বলা হয়, 'তোমরা সকলেই দেবতা', তখনই এই ধরনের সঙ্ঘ গঠন সম্ভব নয়—সঙ্ঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। বেদান্তের অন্যতম শুভফল হইল ধর্মচিন্তা-বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা দেওয়া; ভারতবর্ষ তাহার ইতিহাসে সকল যুগেই এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। ইহা যথার্থ গৌরবের বিষয় যে, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে কখনও ধর্মের জন্য উৎপীড়ন হয় নাই, যেখানে ধর্ম বিষয়ে

মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

বৈদান্তিক নীতির এই বহিরাবরণ-দিকটির পূর্বে যেরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে; বরং অতীতের তুলনায় ইহা বোধ হয় অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কারণ জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার অধিকার দাবী করাও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ও শয়তানের ধারণা অথবা অহুরা মাজ্‌দা ও অর্হিমানের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট কবিকল্পনা আছে। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য অন্য কিছুতে নয়, কেবল স্বার্থশূন্যতা বা স্বার্থপরতায়। ঈশ্বর যতটুকু জানেন, শয়তানও ততটুকুই জানে; সে ঈশ্বরের মতই শক্তিশালী, কেবল তাহার পবিত্রতা নাই—এই পবিত্রতার অভাবই তাহাকে শয়তান করিয়াছে। এই একই মাপকাঠি বর্তমান জগতের প্রতি প্রয়োগ কর; পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম-নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবী করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয় নাই। এই কারণেই বেদান্ত এই অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে চায়, মানবাত্মার উপর এই উৎপীড়ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে চায়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা গীতা অধ্যয়ন করিয়াছ, এই স্মরণীয় উক্তিগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছেঃ 'যাঁহারা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর অথবা চণ্ডালে সমদর্শী, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি', 'যাঁহাদের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা ইহজীবনেই জন্মান্তর জয় করেন; যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র এক ও গুণদোষাদি-দ্বন্দ্বহীন, সেইহেতু তাঁহারাও ব্রহ্মে অবস্থিত হন অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন।' সকলের প্রতি এই সমভাব—ইহাই বৈদান্তিক নীতির সারমর্ম। আমরা দেখিয়াছি, আমাদেরই মন বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্ব করে। বিষয়ীকে (subject) পরিবর্তন কর, বিষয়ও (object) পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। নিজেকে পবিত্র কর; তাহা হইলে জগৎ পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এই বিষয়েই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা উত্তরোত্তর আমাদের প্রতিবেশীদের ব্যাপারেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি; কিন্তু নিজেদের বিষয়ে আমাদের সমীক্ষা ক্রমশই কমিতেছে। আমরা যদি বদলাইয়া যাই, জগৎও বদলাইয়া যাইবে। আমরা যদি পবিত্র হই, জগৎও পবিত্র হইবে। কথা হইতেছে এই যে, অন্যের মধ্যে আমি মন্দ দেখিব কেন? আমি নিজে মন্দ না হইলে কখনও মন্দ দেখিতে পারি না। আমি নিজে দুর্বল না হইলে কখনও কষ্ট পাইতে পারি না। আমার শৈশবে যে-সকল বস্তু আমাকে কষ্ট দিত, এখন তাহারা আর কষ্ট দেয় না। বেদান্ত বলেন—বিষয়ীর পরিবর্তন হওয়াতে বিষয়ও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। যখন আমরা ঐ প্রকার অত্যাশ্চর্য ঐক্য ও সাম্যের অবস্থায় উপনীত হইব, তখন যে-সকল বস্তুকে আমরা দুঃখ ও মন্দের কারণ বলিতেছি, সেগুলিকে উপেক্ষা করিব, সেগুলির দিকে আমরা উপহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। বেদান্তে ইহাকেই মুক্তিলাভ বলে। মুক্তি যে ক্রমশঃ আসিতেছে, এই সমভাব ও ঐক্যবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই তাহার সূচনা। সুখ ও দুঃখে সমভাব, জয় ও পরাজয়ে তুল্যভাব—এই প্রকার মনই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে। মনকে সহজে জয় করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারে, স্বল্পতম উত্তেজনায় বা বিপদে যে-সকল মন তরঙ্গায়িত হয়, তাহাদের কিরূপ অদ্ভুত অবস্থা ভাবিয়া দেখুন! মনের উপর যখন এই পরিবর্তনগুলি আসে, তখন মহত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর মাত্র। মনের এই অস্থির অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেই হইবে। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে বাহিরের বিরুদ্ধ শক্তি আসিলে আমরা কতটুকুই বা তাহা দ্বারা প্রভাবিত হই, আর উহা সত্ত্বেও কতটুকুই বা আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারি। আমাদিগকে সাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত সকল শক্তিকে যখন আমরা বাধা দিতে পারিব, তখনই আমরা মুক্তিলাভ করিব, ইহার পূর্বে নয়। এই অব্যাহত সাম্যই মুক্তি। ইহাই মুক্তি; এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুকে 'মুক্তি' বলা যাইতে পারে না। এই ধারণা হইতেই—এই উৎস হইতেই সর্বপ্রকার সুন্দর ভাবধারা এই জগতের উপর প্রবাহিত হইয়াছে; প্রকাশভঙ্গীতে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় সাধারণতঃ এগুলি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—বহু নির্ভীক ও অদ্ভুত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি বাহ্য-জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ধ্যান-ধারণার জন্য গিরিগুহা বা অরণ্যে বাস করিতেছেন। মুক্তিলাভই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর প্রতিভাবান্ বরণীয় ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা দুর্গত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট। আপাততঃ এই দুই পন্থা পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। যে-ব্যক্তি মানবসমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া গিরিগুহায় বাস করেন, তিনি মানবজাতির অভ্যুত্থানের জন্য ব্যাপৃত ব্যক্তিদের নিতান্ত করুণা ও উপহাসের পাত্র বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, 'কি মূর্খ! জগতে করণীয় কি আছে? মায়ার জগৎ সর্বদা ঐরূপই থাকিবে। ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না।' ভারতবর্ষে আমি যদি আমাদের কোন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কি বেদান্তে বিশ্বাসী?' তিনি বলিবেন, 'তাই তো আমার ধর্ম; আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি; বেদান্তই আমার প্রাণ।' 'আচ্ছা, তবে কি আপনি সর্ববস্তুর সাম্যে, সর্বপ্রাণীর ঐক্যে বিশ্বাসী?' তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি।' পরমুহূর্তে যখন একটি নীচ জাতির লোক এই পুরোহিতের নিকটে আসিবে, তখন সেই লোকটির স্পর্শ এড়াইবার জন্য তিনি লাফ দিয়া রাস্তার একধারে চলিয়া যাইবেন। যদি প্রশ্ন করেন, 'আপনি লাফ দিতেছেন কেন?' তিনি বলিবেন, 'কারণ তাহার স্পর্শমাত্রই যে আমাকে অপবিত্র করিয়া ফেলিত।' 'কিন্তু আপনি এই মাত্র তো বলিতেছিলেন, আমরা সকলেই সমান; আপনি তো স্বীকার করেন, আত্মাতে আত্মাতে কোন পার্থক্য নাই।' উত্তরে তিনি বলিবেন, 'ঠিকই, তবে গৃহস্থদের পক্ষে ইহা একটি তত্ত্বমাত্র। যখন বনে যাইব, তখন আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিব।' তোমাদের ইংলণ্ডের বংশমর্যাদায় এবং ধনকৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা কর, একজন খ্রীষ্টান হিসাবে তিনি মানবভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী কিনা; সকলেই তো ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই'; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সাধারণ লোক সম্বন্ধে একটা কিছু অশোভন মন্তব্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানবভ্রাতৃত্ব একটি 'কথার কথা'-রূপে রহিয়া গিয়াছে; কখনই ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। সকলেই ইহা বুঝে, সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু যখনই তুমি তাহাদিগকে ইহা কার্যে পরিণত করিতে বলিবে, তখনই তাহারা বলিবে, ইহা কার্যে পরিণত করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে।

একজন রাজার বহুসংখ্যক সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বলিতেন, 'আমার প্রভুর জন্য আমি আমার জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত; আমার মত অকপট ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।' কালক্রমে একজন সন্ন্যাসী সেই রাজার নিকট

আসিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, ‘কোন দিনই কোন রাজার আমার মত এতজন অকপট বিশ্বস্ত সভাসদ্ ছিল না।’ সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, ‘আমি ইহা বিশ্বাস করি না।’ রাজা বলিলেন, ‘আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।’ ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঘোষণা করিলেন, ‘আমি একটি বিরাট যজ্ঞ করিব, যাহা দ্বারা এই রাজার রাজত্ব দীর্ঘকাল থাকিবে। অবশ্য একটা শর্ত আছে—যজ্ঞের জন্য একটি ক্ষুদ্র দুগ্ধ-পুষ্করিণী করিতে হইবে, উহাতে রাজার প্রত্যেক সভাসদকে অন্ধকার রাত্রিতে এক কলসী দুধ ঢালিতে হইবে।’ রাজা হাসিয়া বলিলেন, ‘ইহাই কি একটা পরীক্ষা?’ তিনি তাঁহার সভাসদগণকে তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন এবং কি করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে সেই প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। নিশীথ রাত্রিতে তাঁহারা আসিয়া পুষ্করিণীতে স্ব স্ব কলসী শূন্য করিলেন, কিন্তু প্রভাতে দেখা গেল পুষ্করিণীটি কেবল জলে পূর্ণ। সভাসদগণকে একত্র করাইয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, যখন এত কলসী দুধ ঢালা হইতেছে, তখন তিনি যে জল ঢালিতেছেন, তাহা কেহ ধরিতে পারিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এইরূপ ধারণা। গল্পের সভাসদগণের ন্যায় আমরাও স্ব স্ব ভাগের কাজ ঐরূপে করিয়া যাইতেছি। পুরোহিত বলেন, জগতে এত বেশী ঐক্যের বোধ রহিয়াছে যে, আমি যদি আমার ক্ষুদ্র অধিকারটুকু লইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা কেহ ধরিতে পারিবে না। আমাদের ধনীরাও অনুরূপ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক দেশের উৎপীড়করাও এইরূপ বলে। উৎপীড়কদের তুলনায় উৎপীড়িতদের জীবনে বেশী আশা আছে। উৎপীড়কদের পক্ষে মুক্তিলাভ করিতে অনেক বেশী সময় লাগিবে, অন্যের পক্ষে সময় লাগিবে কম। খেঁকশিয়ালের নিষ্ঠুরতা সিংহের নিষ্ঠুরতা হইতে ভীষণতর। সিংহ একবার আঘাত করিয়া কিছুকালের জন্য শান্ত থাকে, কিন্তু খেঁকশিয়াল বার বার তাহার শিকারের পশ্চাতে ছুটিবার চেষ্টা করে, একবারও সুযোগ হারায় না। পৌরোহিত্য-প্রথা স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ। সেই জন্যই যেখানে পৌরোহিত্য-প্রথার উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। বেদান্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে; ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আসে না।

তুমি কি খ্রীষ্টের এই কথা বিশ্বাস কর—‘তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দাও এবং ঐ অর্থ দরিদ্রগণকে দান কর?’ এইখানেই যথার্থ ঐক্য, শাস্ত্রবাক্যকে এখানে আপন ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা নাই, এখানে সত্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। শাস্ত্রবাক্যকে ইচ্ছানুরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিও না। আমি শুনিয়াছি, এইরূপ বলা হয় যে, মুষ্টিমেয় য়াহুদী—যাঁহারা যীশুর উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদিগকেই কেবল এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও একই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার অন্যান্য উপদেশও শুধু য়াহুদীদের জন্য বলা হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিও না; যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহস অবলম্বন কর। যদি বা আমরা সত্যে উপনীত হইতে না পারি, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা যেন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করি। আমরা যেন অন্তরে এই আশা পোষণ করি—কোন দিন আমরা সত্যে উপনীত হইবই; আমরা ইহার জন্য যেন সচেষ্ট থাকি। আদর্শটি এই—‘তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রগণকে ঐ অর্থ দান কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।’ এইরূপে সকল অধিকারকে এবং আমাদের মধ্যে অধিকারের পরিপোষক সবকিছুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া আমরা যেন সেই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করি, যাহা সকল মানবজাতির প্রতি সাম্যবোধ আনয়ন করিবে। তুমি মনে কর যে, তুমি একটু বেশী মার্জিত ভাষায় কথা কও বলিয়া পথচারী লোকটি অপেক্ষা তুমি উন্নততর। স্মরণ রাখিও, তুমি যখন এইরূপ ভাবিতে থাক, তখন তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর না হইয়া বরং নিজের পায়ের জন্য নূতন শৃঙ্খল নির্মাণ করিতেছ। সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার যদি তোমাতে প্রবেশ করে, তবে তোমার সর্বনাশ অনিবার্য। ইহাই সর্বাপেক্ষা নিদারুণ বন্ধন। ঐশ্বর্য বা অন্য কোন বন্ধন মানবাত্মাকে এরূপ শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। ‘আমি অন্যের অপেক্ষা পবিত্রতর’—ইহা অপেক্ষা সর্বনাশকর অন্য কোন চিন্তা মানুষ করিতে পারে না। তুমি কি অর্থে পবিত্র? তোমার অন্তঃস্থিত ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে অবস্থিত। তুমি যদি এই তত্ত্ব না জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কিছুই জান নাই। পার্থক্য কি করিয়া থাকিবে? সব বস্তুই এক। প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ ‘মহতো মহীয়ান্’ ঈশ্বরের মন্দির। তুমি যদি ইহা দেখিতে পার, তবে ভাল; যদি না পার, তবে আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে তোমার এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

অধিকার

[লণ্ডনের সিসেম ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা]

সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে হয়। একটি সর্বদাই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক্ করিতেছে এবং অপরটি প্রতি মুহূর্তে বস্তুগুলিকে সর্বদা এক সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমটি উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা সৃষ্টি করিতেছে; অন্যটি যেন সত্তাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করিতেছে এবং এই-সব পরিদৃশ্যমান পৃথকত্বের মধ্যে ঐক্য ও সাম্য আনিতেছে। মনে হয়, এই দুইটি শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিদ্যমান। বাহ্যজগতে বা ভৌতিক জগতে এই দুইটি শক্তি অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়, আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। ইহারা ব্যক্তিভাবগুলিকে পরস্পর পৃথক্ করিতেছে, অন্যগুলি হইতে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতেছে; আবার এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছে এবং অভিব্যক্তি ও আকৃতির সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে। মানুষের সামাজিক জীবনেও এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ-জীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং ইহা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কিন্তু মূল উপাদান সকলের মধ্যেই বর্তমান। একটির কাজ বস্তুগুলিকে পরস্পর পৃথক্ করা এবং অপরটির কাজ ঐগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। একটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি উহা ভাঙিতেছে; একটি শ্রেণী ও অধিকার সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি সেগুলি ধ্বংস করিতেছে। সমগ্র বিশ্ব এই দুইটি শক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। এক পক্ষ বলে, যদিও এই একীকরণশক্তি বিদ্যমান, তথাপি সর্বশক্তি দ্বারা আমাদিগকে ইহার প্রতিরোধ করিতে হইবে, কারণ ইহা মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। পূর্ণ ঐক্য ও পূর্ণ বিলয় একই কথা; জগতে এই নিত্য-ক্রিয়াশীল বৈষম্য-উৎপাদিকা শক্তি যখন বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন জগৎ লোপ পাইবে। বৈষম্য বা বৈচিত্র্যই দৃশ্যমান জগতের কারণ; একীকরণ বা ঐক্য দৃশ্যমান জগৎকে সমরূপ প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করে। মানবজাতি অবশ্যই এইরূপ অবস্থা পরিহার করিতে চায়। আমরা আমাদের আশে-পাশে যে-সকল বস্তু ও ব্যাপার দেখি, সেগুলির ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। জোরের সহিত এরূপও বলা হয় যে, জড়দেহে এবং সামাজিক শ্রেণী-বিভাগে সম্পূর্ণ সমতা স্বাভাবিক মৃত্যু আনে এবং সমাজের বিলোপ সাধন করে। চিন্তা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা মননশক্তির অপচয় ও অবনতি ঘটায়। সুতরাং সম্পূর্ণ সমতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ইহা এক পক্ষের যুক্তি, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ যখন জাতিবিভাগ সমর্থন করিতে চান, যখন সমাজের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করিতে চান, তখন কার্যতঃ তাঁহারাও এই যুক্তির উপরই জোর দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংস হইবে এবং সগর্বে এই ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপিত করেন যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণশাসিত সমাজই সর্বাধিক দীর্ঘায়ু। সুতরাং বেশ কিছু জোরের সহিতই তাঁহারা তাঁহাদের এই যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিছুটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিতই তাঁহারা বলেন, যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু করে, তাহা অপেক্ষা যে-ব্যবস্থায় সে দীর্ঘতম জীবন লাভ করিতে পারে, তাহা অবশ্যই শ্রেয়ঃ।

পক্ষান্তরে সকল সময়েই ঐক্যের সমর্থক একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য মহান্ ধর্মপ্রচারকদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত নূতন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, এবং নিপীড়িত পদদলিত ও অধিকার-বঞ্চিতদের দাবীতে এই ঐক্য ও সমতার বাণীই বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। যাঁহাদের ব্যক্তিগত সুবিধা আছে, তাঁহারা উহা রাখিতে চান, এবং ইহার পক্ষে কোন যুক্তি পাইলে ঐ যুক্তি যতই অদ্ভুত ও একদেশদর্শী হউক না কেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। এই মন্তব্য উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য।

দর্শনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আর একটি রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধগণ বলেন, পরিদৃশ্যমান ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনকারী কোন-কিছুর সন্ধান করার প্রয়োজন নাই; এই জগৎপ্রপঞ্চ লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বৈচিত্র্য যতই দুঃখজনক ও দুর্বল বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাই জীবনের সারবস্তু, ইহার চেয়ে বেশী আমরা কিছু পাইতে পারি না। বৈদান্তিক বলেন, একমাত্র একত্বই বর্তমান রহিয়াছে। বৈচিত্র্য শুধু বহির্বিষয়ক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপাতপ্রতীয়মান। বৈদান্তিক বলেন, 'বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইও না। একত্বের নিকট ফিরিয়া যাও।' বৌদ্ধ বলেন, 'ঐক্য পরিহার কর, ইহা একটি ভ্রম। বৈচিত্র্যের দিকে যাও।' ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মতের এই পার্থক্য আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের সংখ্যা খুবই অল্প। দর্শন ও দার্শনিক ভাবধারা, ধর্ম ও ধর্মবিষয়ক জ্ঞান পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছিল; আমরা বিভিন্ন ভাষায় একই প্রকার সত্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র; কখনও অভিনব উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ পর্যন্ত একই সংগ্রাম চলিতেছে। একপক্ষ চান—আমরা জগৎপ্রপঞ্চ ও উহার এই-সব বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে আঁকড়াইয়া থাকি; প্রভূত যুক্তি দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, বৈচিত্র্য থাকিবেই, উহা বন্ধ হইয়া গেলে সব-কিছুই লুপ্ত হইবে। জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য দ্বারাই সংঘটিত হয়। অপর পক্ষ আবার নিঃসঙ্কোচে একত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নীতিশাস্ত্রে ও আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক প্রচণ্ড পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সম্ভবতঃ নীতিশাস্ত্রই একমাত্র বিজ্ঞান, যাহা এই দ্বন্দ্ব হইতে দৃঢ়তার সহিত দূরে রহিয়াছে; কেন-না ঐক্যই যথার্থ নীতি, প্রেমই ইহার ভিত্তি। ইহা তো বৈচিত্র্যের দিকে—পরিবর্তনের দিকে তাকাইবে না। নৈতিক চর্যার একমাত্র লক্ষ্য এই ঐক্য—এই সমতা। বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজাতি যে মহত্তম নৈতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়াছে, সেগুলির কোন পরিবর্তন নাই; একটু অপেক্ষা করিয়া পরিবর্তনের দিকে

তাকাইবার তাহাদের সময় নাই। এই নৈতিক নিয়মগুলির একটি উদ্দেশ্য—ঐ একত্ব বা সাম্যের বোধ সুগম করা। ভারতীয় মন—বৈদান্তিক মনকেই আমি ভারতীয় মন মনে করি—অধিকতর বিশ্লেষণপ্রবণ বলিয়া ইহার সকল বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ এই ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সব-কিছুকেই এই একমাত্র ঐক্যের ধারণার উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই একই দেশে অন্য মতবাদীরা—যেমন বৌদ্ধগণ কোথাও ঐ ঐক্য দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের নিকট সকল সত্য কতকগুলি বৈচিত্র্যের সমষ্টিমাত্র; একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনই সম্পর্ক নাই।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের কোন এক পুস্তকে বর্ণিত একটি গল্পের কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইহা একটি গ্রীক গল্প—কিভাবে একজন ব্রাহ্মণ এথেন্সে সক্রেটিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'মানুষকে জানাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'কিন্তু ঈশ্বরকে না জানিয়া আপনি মানুষকে কিভাবে জানিতে পারেন?' এক পক্ষ—অর্থাৎ বর্তমান ইওরোপের প্রতিনিধি, গ্রীক পক্ষ মানুষকে জানার উপর জোর দিল। পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের প্রতিনিধি, প্রধানতঃ ভারতীয় পক্ষ ঈশ্বরকে জানার উপর জোর দিয়াছে। এক পক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, অপর পক্ষ ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতিকে দর্শন করে। বর্তমানে হয়তো এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দূরে থাকিয়া সমগ্র সমস্যার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিবার অধিকার আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বৈচিত্র্য আছে; এবং জীবনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ইহাও সত্য যে, এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ঐক্য অনুভব করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরে আশ্রিতরূপে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায়। মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং মানুষকে জানিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং ঈশ্বরকে জানিয়াই আমরা মানুষকে জানিতে পারি। এই উক্তিগুলি আপাতবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মনুষ্য-প্রকৃতি অনুযায়ী অপরিহার্য। সমগ্র বিশ্ব—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ক্রীড়াক্ষেত্র; সমগ্র জগৎ—সাম্য ও বৈষম্যের খেলা; সমগ্র বিশ্ব—অসীমের মধ্যে সসীমের ক্রীড়াভূমি। একটিকে গ্রহণ না করিয়া আমরা অপরটিকে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইহাদের দুইটিকে একই অনুভূতির—একই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি ব্যাপার সর্বদা এইভাবেই চলিবে।

আমাদের আরও বিশেষ উদ্দেশ্য—ধর্মের বিষয় (নীতির নয়) বলিতে গেলে বলিতে হয়, যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার ভেদ ও পার্থক্যের বিলয় এবং ফলস্বরূপ এক নিষ্ক্রিয় সমাবস্থা অসম্ভব। এইরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আবার এই সত্যের আর একটি দিকও আছে, অর্থাৎ এই ঐক্য তো পূর্ব হইতেই বর্তমান রহিয়াছে। অদ্ভুত দাবী এই—এই ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এই ঐক্য ছাড়া বৈচিত্র্য তোমরা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিতে না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে হইবে না, ঈশ্বর তো পূর্ব হইতেই আছেন। সকল ধর্মই এই দাবী করিয়া আসিতেছেন। যখনই কেহ সান্তকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনই তিনি অনন্তকেও উপলব্ধি করিয়াছেন। কেহ কেহ সান্তের উপর জোর দিয়া ঘোষণা করিলেন, 'আমরা বহির্জগতে সান্তকেই উপলব্ধি করিয়াছি।' কেহ কেহ অনন্তের উপর জোর দিয়া বলিলেন, 'আমরা কেবল অনন্তকেই উপলব্ধি করিয়াছি।' কিন্তু আমরা জানি, একটি ছাড়া অন্যটি উপলব্ধি করিতে পারি না—ইহা যুক্তির দিক্ দিয়া অপরিহার্য। সুতরাং দাবী করা হইতেছে—এই সমতা, এই ঐক্য, এই পূর্ণতা—যে-কোন নামেই ইহাকে অভিহিত করি না কেন—সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং এখনও রহিয়াছে। আমাদের কেবল ইহা বুঝিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা ইহা জানি বা না জানি, পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি, এই উপলব্ধি ইন্দ্রিয়ানুভূতির ন্যায় শক্তি ও স্বচ্ছতা লাভ করুক বা না করুক, ইহা বর্তমান রহিয়াছেই। আমাদের মনের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা না হইলে সসীমের উপলব্ধি সম্ভব হইত না। আমি 'দ্রব্য' ও 'গুণ'-এর পুরাতন ধারণার কথা বলিতেছি না, আমি একত্বের কথাই বলিতেছি। এই-সব জাগতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে যখনই আমরা 'তুমি' ও 'আমি' পৃথক্—এই উপলব্ধি করিতেছি, তখনই 'তোমার' ও 'আমার' অভিন্নতার উপলব্ধিও স্বতই আমাদের মনে আসিতেছে। এই ঐক্যবোধ ছাড়া জ্ঞান কখনও সম্ভব হইত না। সমতার ধারণা ব্যতীত অনুভূতি বা জ্ঞান কিছুই সম্ভব হইত না। সুতরাং উভয় ধারণাই পাশাপাশি চলিতেছে।

সুতরাং অবস্থার পূর্ণ সমতা নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হইলেও তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকল মানুষ একরূপ হউক—ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না। আবার বিভিন্ন আচার্য ঘোষিত এই-সকল আশ্চর্য নীতিবাক্য আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়ঃ 'এইরূপে মুনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না এবং সেইহেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, ইহজীবনেই তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু জয় করিয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমদর্শী। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।' ইহাই যে যথার্থ ভাব, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; তথাপি আবার মুশকিল এই যে, বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি ও অবস্থানগত সমতা কখনও লাভ করা যায় না।

কিন্তু অধিকার-বিলোপ আমরা নিশ্চয়ই ঘটাইতে পারি। সমগ্র জগতের সম্মুখে ইহাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান—ইহা আমাদের সমস্যা নয়; আমাদের সমস্যা হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ লইয়া এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকেদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কাড়িয়া লইবে কিনা। এই বৈষম্যকে ধ্বংস করিবার জন্যই সংগ্রাম। কেহ কেহ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর দৈহিক বলশালী হইবে এরূপে স্বভাবতই দুর্বল লোকদিগকে দমন বা পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, কিন্তু এই শারীরিক শক্তির জন্য তাহারা জীবনের যাহা কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়,

তাহাই নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবে—এই প্রকার অধিকার-বোধ তো নীতিসম্মত নয় এবং ইহার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। একদল লোক স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশী ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে—ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের এই সামর্থ্য-হেতু তাহারা অসমর্থ ব্যক্তিদের উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিবে—ইহা তো নীতিসম্মত নয়; এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।

এই-সকল বৈচিত্র্য পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র্য জীবনের অপরিহার্য সারবস্তু। এভাবেই আমরা অনন্তকাল খেলা করিব। তুমি হইবে ধনী এবং আমি হইব দরিদ্র; তুমি হইবে বলবান্ এবং আমি হইব দুর্বল; তুমি হইবে বিদ্বান্ এবং আমি হইব মূর্খ; তুমি হইবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প আধ্যাত্মিক। তাহাতে কি আসে যায়? আমাদিগকে এরূপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান্ বলিয়া আমা অপেক্ষা বেশী অধিকার ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাও হইতে পারে না, কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই সমতা বর্তমান।

বাহ্যজগতে পার্থক্যের বিনাশ এবং সমতার প্রতিষ্ঠা—কখনই নৈতিক আচরণের আদর্শ নয়, এবং কখনও হইবে না। ইহা অসম্ভব, ইহা মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণ হইবে। যথার্থ নৈতিক আদর্শ—এই-সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার বিভীষিকা সত্ত্বেও অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার আপাত-দুর্বলতা সত্ত্বেও সেই অনন্ত শক্তিকে প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা এবং সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ বাহ্য প্রতিভাস সত্ত্বেও আত্মার অনন্ত অসীম শুদ্ধস্বরূপতা স্বীকার করা। এই তত্ত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল একটা দিক্ গ্রহণ করিলে, সমগ্র তত্ত্বের একাংশমাত্র স্বীকার করিলে উহা বিপজ্জনকই হইবে এবং কলহের পথ প্রশস্ত করিবে। সমগ্র তত্ত্বটি আমাদিগকে যথাযথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর

যে-শ্রেণীর ধর্মচিন্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আমি অবশ্য স্বীকৃতির যোগ্য ধর্মচিন্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিম্নস্তরের চিন্তা 'ধর্ম' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথা বলিতেছি না—ঐ উচ্চতর চিন্তারাশির মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা, শাস্ত্রের অলৌকিকতা ইত্যাদি ভাব স্বীকৃত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরম্ভ হয়। এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি; ইহার স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার সৃষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের চিন্তাধারায় আত্মার ধারণা সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের এই দেহ চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান; ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এইটুকুই প্রাচীনতম। ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অত্যল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম চিন্তাসমূহ এক অনন্যসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই বর্তমান কালে একমাত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচার ও অনুমান সহায়ে আমরা কখনও কখনও বুঝিতে সমর্থ হই যে, এইরূপ এক স্তর ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমরা ভারতীয় ধর্মচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্তু পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি আদিম স্তরে সৃষ্টির ধারণা বড়ই অভিনব। তখন এই ধারণা ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব শূন্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে; একসময় এই বিশ্বের কিছুই ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাব হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী স্তরে আমরা দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় উঠিয়াছে—'অভাব হইতে কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে?' বেদান্তের প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্তু হইতে উদ্গত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইতে কোথাও কোন ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় না। মানুষ হাতে-নাতে যাহা কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-সাপেক্ষ। কোন গৃহ নির্মিত হইয়া থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল; কোন নৌকা থাকিলে তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; যদি কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহা কিছু কার্যবস্তু, তাহা এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বর্জিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ সমগ্র ধর্মচিন্তার ইতিহাস এই উপাদানের অনুসন্ধানেই পর্যবসিত।

কোন্ বস্তু হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছাড়াও, ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল—'কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন?' সকল দর্শনমত যেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত। ইহার একটি সমাধান হইল এই যে—প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা অনন্তকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিতেছে; এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, কিন্তু ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দ্রব্যকণিকা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মাও তাঁহার ইচ্ছাধীন। ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অন্যান্য স্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদান্তিক দর্শনের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তবাদীরা সকলেই একটি সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়া চলেন। দার্শনিক মতবাদ যাহার যাহাই হউক না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহা প্রাচীন সাংখ্য মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। এই মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক্ষানুভূতির ধারা এইঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, তাহা বাহিরের ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়; অন্তরিন্দ্রিয় হইতে উহা মনে এবং মন হইতে বুদ্ধিতে প্রেরিত হয়; বুদ্ধি হইতে উহা এমন এক সত্তার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা এক এবং যাহাকে তাঁহারা 'আত্মা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন সংবেদনের কেন্দ্রস্থলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির সন্ধান পাইয়াছে, তদুপরি উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলির অবস্থান আবিষ্কার করিয়াছে; এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের অন্তরিন্দ্রিয় এবং মনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের ঐক্য কোথায়, তাহা শারীরবিজ্ঞান আমাদের বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের ঐক্য কোথায় সংস্থাপিত? মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—এরূপ কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। সুতরাং ভারতীয় মনস্তত্ত্ব যতটুকু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। আমাদের এমন একটি ঐক্যস্থান চাই, যাহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহা একটি পূর্ণ অনুভব গড়িয়া তুলিবে। যতক্ষণ না সেই বস্তুটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে আমরা কোন ঐক্যবদ্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই ঐক্যস্থলটি না থাকে, তাহা হইলে আমরা কখনও হয়তো কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তো নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তারপর শুনিব, ইত্যাদি। ফলে যখন কাহারও কথা শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে পাইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন।

আমাদের এই শরীর জড়বস্তু নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র। ইহা অনুভূতিহীন ও অচেতন। বৈদান্তিকগণ যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলেন, তাহাও ঐরূপ। তাঁহাদের মতে এই সূক্ষ্মদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড়; ইহা অতি ক্ষুদ্র কণিকাদ্বারা গঠিত; এই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহায়েও সেগুলি দেখা যায় না। ঐ সূক্ষ্ম দেহ কোন্ প্রয়োজনে লাগে? ইহা অতি সূক্ষ্মশক্তির আধার। এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির আধার, সূক্ষ্মদেহও তেমনি সেই-সকল সূক্ষ্মশক্তির আধার, যাহাকে আমরা বিভিন্ন বৃত্তির আকারে উদিত 'চিন্তা' নামে অভিহিত করি। প্রথমে পাই স্থূলশক্তিসহ স্থূল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ। আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তি নিজের অবস্থানের জন্য জড় বস্তুর মুখাপেক্ষী। কাজেই স্থূলতর শক্তি আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্য করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলাকারে কার্য করিতেছে, তাহাই আবার সূক্ষ্মাকার কার্যের আকর হয় এবং চিন্তার আকারে পরিণত হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই; তাহারা একই শক্তির শুধু

স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশ। স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ নাই। সূক্ষ্মদেহও জড়বস্তু দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সূক্ষ্ম। আর এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সূক্ষ্মদেহও সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র। কোথা হইতে এই-সকল শক্তি আসে? বেদান্তদর্শনের মতে প্রকৃতিতে দুইটি বস্তু আছে, একটিকে তাঁহারা 'আকাশ' বলেন; উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা অতি সূক্ষ্ম। অপরটিকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ', উহাই হইল শক্তি। যাহা কিছু আপনারা বায়ু, মাটি বা অন্য কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথবা শুনেন, সে-সবই জড়বস্তু, সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অথবা স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যূত। আকাশকে যদি জলের সহিত তুলনা করা যায়, তবে বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ-সকলকে জল হইতে উৎপন্ন এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বলা চলে। যে শক্তি আকাশকে এই বিবিধ আকারে পরিবর্তিত করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাঁটা, বসা, কথা বলা ইত্যাদিরূপে স্থূলস্তরে প্রাণের বিকাশের জন্য আকাশ হইতে এই স্থূলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে ঐ একই প্রাণ সূক্ষ্মতর আকারে চিন্তারূপে বিকশিত হইতে পারে, তাই পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহটিও আকাশ অর্থাৎ আকাশের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সর্বাগ্রে আছে এই স্থূলদেহ, তাহার ঊর্ধ্বে আছে এই সূক্ষ্মদেহ। তাহারও ঊর্ধ্বে আছে জীব বা প্রকৃত মানুষ। নখগুলি যেমন আমাদের দেহের অংশ হইলেও ঐগুলিকে বার বার কাটিয়া ফেলা চলে, স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ইহা ঠিক নয় যে, মানবের দুইটি দেহ আছে—একটি সূক্ষ্ম এবং অপরটি স্থূল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর এবং যাহা দ্রুতবিনাশী, তাহাকে স্থূলশরীর বলে। যেমন আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বার আমি এই স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তবু সূক্ষ্মশরীরটি থাকিয়া যায়। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, 'মানুষ' বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, যাহার প্রথমতঃ আছে একটি দ্রুত ধ্বংসশীল স্থূলদেহ, তারপর আছে একটি বহুযুগস্থায়ী সূক্ষ্মদেহ, সর্বোপরি আছে একটি জীবাত্মা। বেদান্তের মতে এই জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। প্রকৃতিও নিত্য, কিন্তু পরিণামী নিত্য। প্রকৃতির যাহা উপাদান—অর্থাৎ প্রাণ এবং আকাশ—তাহাও নিত্য; কিন্তু তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে। জীব আকাশ কিংবা প্রাণের দ্বারা নির্মিত নয়; ইহা জড়সম্ভূত নয় বলিয়া নিত্য। ইহা প্রাণ ও আকাশের কোন প্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। যাহা যৌগিক পদার্থ নয়, তাহা কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ ধ্বংসের অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন। স্থূলদেহ আকাশ এবং প্রাণের মিলনে গঠিত; অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু জীব যৌগিক পদার্থ নয়; কাজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই। এই একই কারণে ইহা কখনও জন্মে নাই। কোন অযৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পারে না। এই একই যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই আরম্ভ সম্ভব। লক্ষ লক্ষ আত্মাসহ এই প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কার্য করিতেছেন। ইহার সবটুকুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি বিশ্বের চিরন্তন অধিপতি। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত। এখন প্রশ্ন এইঃ ঈশ্বরই যদি বিশ্বের নিয়ন্তা হন, তবে কেন তিনি এই পাপময় বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, কেন আমরা এত দুঃখকষ্ট পাইব? দ্বৈতবাদীদের মতেঃ ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তিনি মানুষকে সাজা দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই। মানুষ দরিদ্র বা অন্ধ হইয়া বা অন্য কোন দূরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার কারণ কি? ঐরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। জীব অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও সৃষ্টি হয় নাই। আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে। যাহা কিছু আমরা করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ করিলে আমরা সুখী হই, আর মন্দ কাজ করিলে দুঃখ পাই। ঐরূপেই জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্যও করিতে থাকে। মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদান্ত সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত সকলেই স্বীকার করেন, জীব স্বরূপতঃ পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞান জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। পাপকর্ম করিলে যেমন সে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্মের ফলে তেমনই আবার তাহার স্বরূপ-চেতনা জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেমন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ।

যখন পুণ্যকর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত পাপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব পুনর্বার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে 'দেবযান' নামে কথিত পথে ঊর্ধ্বে গমন করে। তখন ইহার বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়তা ব্যতীত কেহ চিন্তা করিতে পারে না। চিন্তা থাকিলে শব্দও অবশ্যই থাকিবে। শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয়। তখন জীব এই শরীর হইতে দ্রুত বহির্গত হয়, এবং সূর্যলোকে গমন করে। এই বিশ্বজগৎ মণ্ডলাকারে সজ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমণ্ডল, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি দেখা যায়। তাহার ঊর্ধ্বে সূর্যলোক অবস্থিত; তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্দ্রলোক বলে। তাহারও পরে আছে বিদ্যুল্লোক নামে আর একটি লোক। জীব ঐ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইলে পূর্ব হইতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নামক সর্বোত্তম স্বর্গে লইয়া যান। সেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়া বাস করে; তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের আর সর্ববিধ ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়। বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা আছেন এবং তিনি ঈশ্বর। অপর কেহই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন, তাহা হইলে দ্বৈতবাদীদের মতে তিনি ঘোর নাস্তিক। সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীবাত্মা যদি শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারেন। তিনি যদি সকল দেবদেবীকে নিজের সম্মুখে আসিতে নির্দেশ দেন, কিংবা যদি পিতৃপুরুষদের আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছানুসারে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাঁহার আর দুঃখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছা করিলে তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব—যিনি ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিয়াছেন, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাসনা ছাড়া অন্য কোন কর্ম করিতে চাহেন না।

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা এত উন্নত নন; তাঁহারা সৎকর্ম করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা বলেন—দরিদ্রকে তাঁহারা কিছু দান করিবেন, কিন্তু বিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের কিরূপ গতি হয়? তাঁহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে লয় পায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং চন্দ্রলোকে যায়। ঐ জীব সেখানে দীর্ঘকালের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সৎকর্মের ফল যতকাল থাকে, ততদিন ধরিয়া তিনি সুখভোগ করেন। যখন সেই সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাসনানুযায়ী ধরাধামে নূতন জীবন আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে এবং মুসলমান ধর্মে উল্লিখিত দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদমাত্রই বুঝিতে হইবে। যথা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্দ্রত্ব একটি উচ্চপদের নাম। বহু সহস্র মানুষ সেই পদ লাভ করিয়া থাকে। সর্বোত্তম বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকারী কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি দেবতার মধ্যে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাঁহার পুনর্বার মর্ত্যলোকে জন্মলাভের কাল আসিয়া পড়ে। ইহলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতাদেরও পরিবর্তন হয়, তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়। স্বর্গবাসী সকলেরই মৃত্যু আছে। একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হইল ব্রহ্মলোক; সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

এইরূপে জীবগণ স্বর্গে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দৈত্যদের উৎপাতের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বর্গফল তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকরই হইয়া থাকে। পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহারা মাঝে মাঝে দেবতাদের নানারূপে তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদানবের সংগ্রামের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখা যায় যে, অনেক সময় দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিত। অবশ্য অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষা দৈত্যগণের দুষ্কর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সকল পুরাণেই দেবগণকে কামপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাঁহারা মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন করিয়া কোন শস্য বা উদ্ভিদে সঞ্চারিত হন এবং ঐরূপে মানবের দ্বারা ভক্ষিত খাদ্যের মধ্য দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করেন। পিতার নিকট হইতে তাঁহারা উপযুক্ত দেহ-গঠনের উপাদান পান। যখন সেই উপাদানের উপযোগিতা শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের নূতন দেহ সৃষ্টি করিতে হয়। এখন—এরূপ অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা নানাপ্রকার দানবীয় কার্য সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তাহারা অত্যন্ত হীনকর্মা হইলে অতি নিম্নস্তরের প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে অথবা বৃক্ষলতা কিংবা প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়।

দেবজন্মে কোন কর্মফল অর্জিত হয় না; একমাত্র মানুষই কর্মফল অর্জন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। যখন মানুষ মরিয়া দেবতা হয়, তখন তাহাদের কেবল সুখ ও আরামের সময়, সেই সময় তাহারা নূতন কর্ম করে না; স্বর্গ তাহাদের অতীত সৎকর্মের পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার ফল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না।

নিম্নতর স্তরগুলি হইতে উচ্চস্তরের দিকে ক্রমবিকাশের পথে পশুত্ব একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ইতঃপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই-সকল বিলুপ্ত পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে?

বেদে নরকের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী কালের গ্রন্থ পুরাণের রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাই তাঁহারা নানা রকম নরক কল্পনা করিয়াছেন। এই-সব নরকের কতকগুলিতে মানুষকে করাত দিয়া চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম যাতনা চলিতেছে, কিন্তু তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহারা প্রতি মুহূর্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত হইতেছে। তবে দয়া করিয়া এই-সকল গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই-সব যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে। এই অবস্থায় তাহাদের অসৎ-কর্মের ক্ষয় হয়; অনন্তর তাহারা মর্ত্যে পুনরাগমন করে এবং আবার নূতন সুযোগ পায়। সুতরাং এই মানবদেহে একটি মহা সুযোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম শরীর বলে। ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমরা একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যৎ-নির্ধারক বিন্দু। সুতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। মানুষ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এই পর্যন্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এইবারে আমরা উচ্চতর বেদান্তদর্শনে আসিতেছি, যাহা পূর্বোক্ত মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ—উভয়ই। ঈশ্বরকে যদি আপনারা এক অসীম পুরুষ বলিয়া মানেন, এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে অসীম বলেন, তবে আপনারা এই অসীম বস্তুগুলির সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব কথা; এভাবে চলিলে আপনারা সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শূকর এবং হত্যাকারী ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্তু হইয়াছেন? আমরা বলিয়া থাকি, ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্তুতে পরিণত হইতে পারেন? আমাদের উত্তর এই—ইহা ঠিক যেন আমাদেরই মত। এই ধরুন আমি একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়। তথাপি আমি—প্রকৃত আমি—এই দেহ নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমি নিজেকে শিশু, তরুণ, যুবক বা বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিই; অথচ ইহাতে আমার আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। উহা সর্বদা একই আত্মারূপে অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই-সকলের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, আত্মাও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতি এবং আত্মার পরিবর্তনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে রূপের (আকৃতির) পরিবর্তন বুঝায়।

ইহা নূতন রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ হয়। অসৎ কর্মের দ্বারা ইহার সঙ্কোচন ঘটে। যে কর্মের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশুভ কর্ম বলে। আবার যে-সকল কর্মের ফলে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়, তাহাকে শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচন হইয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় এবং সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবার তাহারা সম্প্রসারিত হইবে এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করিবে। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ আছে এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্যই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ-সংসারের কখনও অবসান হইবে না, কারণ ইহা শাশ্বত। ইহাই হইল দ্বিতীয় মতবাদ। প্রথমটিকে বলা হয় 'দ্বৈতবাদ'। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনটিরই অস্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ; এই তিন মিলিয়া একটি অভিন্ন সত্তা গঠন করিয়াছে। ইহা ধর্মবিকাশের একটি উচ্চতর স্তরের নিদর্শন এবং ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলা হয়। দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মত একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়।

সর্বশেষে আসিতেছেন অদ্বৈতবাদীরা। তাঁহারাও সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ—এই উভয়ই হইতে হইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরেরা যখন বলেন, ঈশ্বর এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও ঈশ্বর কূটস্থ নিত্য, তখন অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। তাহাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া লাভ কি? উপাদান-কারণ আমরা তাহাকেই বলি, যাহা কার্যে পরিণত হয়; কার্য বলিতে কারণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা কারণেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশ্ব যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর, ঐ শরীর সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্মাকার হইয়া কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ কারণ হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব ঘটে, তবে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, ফলতঃ ভগবান্ নিজেই এই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এখানে এক অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ভগবানই যদি নিখিলবিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে—আপনারা সকলে এবং সব-কিছুই ঈশ্বর। এই গ্রন্থখানি ঈশ্বর এবং প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। আমার শরীর ঈশ্বর, মনও ঈশ্বর, আত্মাও ঈশ্বর। তাহাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? ঈশ্বর কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? সেই এক ঈশ্বরই কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? কেমন করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ও অসীম বস্তু—বিশ্বের সেই অখণ্ড সত্তা বিখণ্ডিত হইতে পারেন? অসীম বস্তুর বিভাজন সম্ভব নহে। সেই অখণ্ড অবিমিশ্র সত্তা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পারেন? যদি তিনিই এই বিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং যদি তিনি পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকৃতির অংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যদি আমাদের ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারও কোন-না-কোন দিন মৃত্যু হইবে। এই তথ্যটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আবার প্রশ্ন, এই ঈশ্বরের কি পরিমাণ অংশ এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ (বীজগণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ) হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে সেই অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেরূপ রহিলেন না, কারণ তাঁহার ঐ পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

অতএব অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, 'এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা—এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র।' জীব বলিয়া মোটেই কিছু নাই; অতএব তাহাদের অগণিত সংখ্যাই বা কিরূপে হইবে? একমাত্র সেই অনন্ত সত্তা আছেন। যেমন একই সূর্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়, কোটি কোটি জলকণিকা যেমন কোটি কোটি সূর্যকে প্রতিফলিত করে এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সূর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি ধারণ করে, অথচ সূর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র। এই-সকল বিভিন্ন অন্তঃকরণ যেন বিভিন্ন জলবিন্দুর মত সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে। ঈশ্বর এই-সকল বিভিন্ন জীবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বাদ দিয়া কোন নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে না; সেই অনন্ত সত্তাই সেই সত্য। এই শরীর-মন ও আত্মা-রূপে আপনি একটি স্বপ্ন মাত্র; কিন্তু স্বরূপতঃ আপনি সেই সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আপনাতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মত। সুতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্ম, এই-সকল আসা-যাওয়া মায়াসৃষ্ট অলীক কল্পনা মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সর্বাতীত স্বরূপের মধ্যে যেন কয়েকটি কণিকামাত্র। অতএব আপনার কিরূপে জন্ম-মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব না। আমার কোনদিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শত্রু ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। আমিই তিনি, আমিই তিনি। তাহা হইলে এই দর্শনের মতে মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাঁহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্বের সহিত অভিন্ন হইয়া যান; তাঁহাদের পক্ষে সকল স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোকও লয় পায়, সমগ্র স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহারা নিজেদের এই বিশ্বের সনাতন ঈশ্বররূপে দেখিতে পান। তাঁহারাই অনন্ত জ্ঞান ও শান্তি-মণ্ডিত প্রকৃত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পান এবং মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাদের তখন তুচ্ছবস্তুতে আনন্দের অবসান ঘটে। আমরা এই ক্ষুদ্র দেহে এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই। যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন আনন্দ আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন সুখের আকর, তখন নিখিল শরীর আমার হইয়া গেলে সুখও যে অপরিমিত হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; তখনই মুক্তিলাভ হইবে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাতীত বেদান্তদর্শন বলা হয়।

বেদান্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে; আমরা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্বের ঊর্ধ্বে গমন করা সাধ্যাতীত। কোন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে আর কোন উপায়েই একত্বকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না।

সকল মানুষের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইহা অতি দুরূহ। প্রথমতঃ ইহা বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করাই কঠিন, ইহা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্মতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অনুভব-শক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্ স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। ব্যক্তিকেও জাতিরই ন্যায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল স্তরের মাধ্যমে মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিন্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি মানবজাতির সেই জীবনেতিহাস তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্‌যাপিত করিতে পারে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনারা যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা নিজেদের জীবনের সেই সময় স্মরণ করুন, যখন আপনারা ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেকে দেহ ও মন-রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র স্বপ্ন আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার অংশমাত্রকেও স্বীকার করিলে সমগ্রটিকেও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে বলে যে, এই বিশ্ব আছে অথচ তাহার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ জগৎ থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্যক এবং সেই কারণকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া মানি। কারণের অস্তিত্ব না মানিয়া কোন কার্যকে স্বীকার করা অসম্ভব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইবেন এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইবে। যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে নিজের জন্ম-মৃত্যু মানিতেই হইবে। কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-মৃত্যুর স্বপ্নও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে। যে বস্তুকে আমরা বর্তমানে বিশ্বরূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তাঁহাকেই এইবার নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-রূপে দেখিতে পাইব।

হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর

যে-শ্রেণীর ধর্মচিন্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আমি অবশ্য স্বীকৃতির যোগ্য ধর্মচিন্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিম্নস্তরের চিন্তা 'ধর্ম' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথা বলিতেছি না—ঐ উচ্চতর চিন্তারাশির মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা, শাস্ত্রের অলৌকিকতা ইত্যাদি ভাব স্বীকৃত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরম্ভ হয়। এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি; ইহার স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার সৃষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের চিন্তাধারায় আত্মার ধারণা সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের এই দেহ চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান; ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এইটুকুই প্রাচীনতম। ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অত্যল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম চিন্তাসমূহ এক অনন্যসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই বর্তমান কালে একমাত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচার ও অনুমান সহায়ে আমরা কখনও কখনও বুঝিতে সমর্থ হই যে, এইরূপ এক স্তর ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমরা ভারতীয় ধর্মচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্তু পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি আদিম স্তরে সৃষ্টির ধারণা বড়ই অভিনব। তখন এই ধারণা ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব শূন্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে; একসময় এই বিশ্বের কিছুই ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাব হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী স্তরে আমরা দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় উঠিয়াছে—'অভাব হইতে কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে?' বেদান্তের প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্তু হইতে উদ্গত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইতে কোথাও কোন ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় না। মানুষ হাতে-নাতে যাহা কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-সাপেক্ষ। কোন গৃহ নির্মিত হইয়া থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল; কোন নৌকা থাকিলে তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; যদি কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহা কিছু কার্যবস্তু, তাহা এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বর্জিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ সমগ্র ধর্মচিন্তার ইতিহাস এই উপাদানের অনুসন্ধানেই পর্যবসিত।

কোন্ বস্তু হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছাড়াও, ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল—'কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন?' সকল দর্শনমত যেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত। ইহার একটি সমাধান হইল এই যে—প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা অনন্তকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিতেছে; এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, কিন্তু ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দ্রব্যকণিকা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মাও তাঁহার ইচ্ছাধীন। ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অন্যান্য স্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদান্তিক দর্শনের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তবাদীরা সকলেই একটি সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়া চলেন। দার্শনিক মতবাদ যাহার যাহাই হউক না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহা প্রাচীন সাংখ্য মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। এই মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক্ষানুভূতির ধারা এইঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, তাহা বাহিরের ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়; অন্তরিন্দ্রিয় হইতে উহা মনে এবং মন হইতে বুদ্ধিতে প্রেরিত হয়; বুদ্ধি হইতে উহা এমন এক সত্তার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা এক এবং যাহাকে তাঁহারা 'আত্মা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন সংবেদনের কেন্দ্রস্থলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির সন্ধান পাইয়াছে, তদুপরি উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলির অবস্থান আবিষ্কার করিয়াছে; এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের অন্তরিন্দ্রিয় এবং মনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের ঐক্য কোথায়, তাহা শারীরবিজ্ঞান আমাদের বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের ঐক্য কোথায় সংস্থাপিত? মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—এরূপ কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। সুতরাং ভারতীয় মনস্তত্ত্ব যতটুকু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। আমাদের এমন একটি ঐক্যস্থান চাই, যাহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহা একটি পূর্ণ অনুভব গড়িয়া তুলিবে। যতক্ষণ না সেই বস্তুটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে আমরা কোন ঐক্যবদ্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই ঐক্যস্থলটি না থাকে, তাহা হইলে আমরা কখনও হয়তো কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তো নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তারপর শুনিব, ইত্যাদি। ফলে যখন কাহারও কথা শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে পাইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন।

আমাদের এই শরীর জড়বস্তু নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র। ইহা অনুভূতিহীন ও অচেতন। বৈদান্তিকগণ যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলেন, তাহাও ঐরূপ। তাঁহাদের মতে এই সূক্ষ্মদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড়; ইহা অতি ক্ষুদ্র কণিকাদ্বারা গঠিত; এই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহায়েও সেগুলি দেখা যায় না। ঐ সূক্ষ্ম দেহ কোন্ প্রয়োজনে লাগে? ইহা অতি সূক্ষ্মশক্তির আধার। এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির আধার, সূক্ষ্মদেহও তেমনি সেই-সকল সূক্ষ্মশক্তির আধার, যাহাকে আমরা বিভিন্ন বৃত্তির আকারে উদিত 'চিন্তা' নামে অভিহিত করি। প্রথমে পাই স্থূলশক্তিসহ স্থূল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ। আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তি নিজের অবস্থানের জন্য জড় বস্তুর মুখাপেক্ষী। কাজেই স্থূলতর শক্তি আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্য করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলাকারে কার্য করিতেছে, তাহাই আবার সূক্ষ্মাকার কার্যের আকর হয় এবং চিন্তার আকারে পরিণত হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই; তাহারা একই শক্তির শুধু

স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশ। স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ নাই। সূক্ষ্মদেহও জড়বস্তু দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সূক্ষ্ম। আর এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সূক্ষ্মদেহও সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র। কোথা হইতে এই-সকল শক্তি আসে? বেদান্তদর্শনের মতে প্রকৃতিতে দুইটি বস্তু আছে, একটিকে তাঁহারা 'আকাশ' বলেন; উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা অতি সূক্ষ্ম। অপরটিকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ', উহাই হইল শক্তি। যাহা কিছু আপনারা বায়ু, মাটি বা অন্য কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথবা শুনেন, সে-সবই জড়বস্তু, সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অথবা স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যূত। আকাশকে যদি জলের সহিত তুলনা করা যায়, তবে বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ-সকলকে জল হইতে উৎপন্ন এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বলা চলে। যে শক্তি আকাশকে এই বিবিধ আকারে পরিবর্তিত করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাঁটা, বসা, কথা বলা ইত্যাদিরূপে স্থূলস্তরে প্রাণের বিকাশের জন্য আকাশ হইতে এই স্থূলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে ঐ একই প্রাণ সূক্ষ্মতর আকারে চিন্তারূপে বিকশিত হইতে পারে, তাই পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহটিও আকাশ অর্থাৎ আকাশের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সর্বাগ্রে আছে এই স্থূলদেহ, তাহার ঊর্ধ্বে আছে এই সূক্ষ্মদেহ। তাহারও ঊর্ধ্বে আছে জীব বা প্রকৃত মানুষ। নখগুলি যেমন আমাদের দেহের অংশ হইলেও ঐগুলিকে বার বার কাটিয়া ফেলা চলে, স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ইহা ঠিক নয় যে, মানবের দুইটি দেহ আছে—একটি সূক্ষ্ম এবং অপরটি স্থূল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর এবং যাহা দ্রুতবিনাশী, তাহাকে স্থূলশরীর বলে। যেমন আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বার আমি এই স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তবু সূক্ষ্মশরীরটি থাকিয়া যায়। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, 'মানুষ' বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, যাহার প্রথমতঃ আছে একটি দ্রুত ধ্বংসশীল স্থূলদেহ, তারপর আছে একটি বহুযুগস্থায়ী সূক্ষ্মদেহ, সর্বোপরি আছে একটি জীবাত্মা। বেদান্তের মতে এই জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। প্রকৃতিও নিত্য, কিন্তু পরিণামী নিত্য। প্রকৃতির যাহা উপাদান—অর্থাৎ প্রাণ এবং আকাশ—তাহাও নিত্য; কিন্তু তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে। জীব আকাশ কিংবা প্রাণের দ্বারা নির্মিত নয়; ইহা জড়সম্ভূত নয় বলিয়া নিত্য। ইহা প্রাণ ও আকাশের কোন প্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। যাহা যৌগিক পদার্থ নয়, তাহা কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ ধ্বংসের অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন। স্থূলদেহ আকাশ এবং প্রাণের মিলনে গঠিত; অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু জীব যৌগিক পদার্থ নয়; কাজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই। এই একই কারণে ইহা কখনও জন্মে নাই। কোন অযৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পারে না। এই একই যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই আরম্ভ সম্ভব। লক্ষ লক্ষ আত্মাসহ এই প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কার্য করিতেছেন। ইহার সবটুকুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি বিশ্বের চিরন্তন অধিপতি। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত। এখন প্রশ্ন এইঃ ঈশ্বরই যদি বিশ্বের নিয়ন্তা হন, তবে কেন তিনি এই পাপময় বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, কেন আমরা এত দুঃখকষ্ট পাইব? দ্বৈতবাদীদের মতেঃ ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তিনি মানুষকে সাজা দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই। মানুষ দরিদ্র বা অন্ধ হইয়া বা অন্য কোন দূরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার কারণ কি? ঐরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। জীব অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও সৃষ্টি হয় নাই। আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে। যাহা কিছু আমরা করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ করিলে আমরা সুখী হই, আর মন্দ কাজ করিলে দুঃখ পাই। ঐরূপেই জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্যও করিতে থাকে। মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদান্ত সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত সকলেই স্বীকার করেন, জীব স্বরূপতঃ পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞান জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। পাপকর্ম করিলে যেমন সে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্মের ফলে তেমনই আবার তাহার স্বরূপ-চেতনা জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেমন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ।

যখন পুণ্যকর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত পাপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব পুনর্বার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে 'দেবযান' নামে কথিত পথে ঊর্ধ্বে গমন করে। তখন ইহার বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়তা ব্যতীত কেহ চিন্তা করিতে পারে না। চিন্তা থাকিলে শব্দও অবশ্যই থাকিবে। শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয়। তখন জীব এই শরীর হইতে দ্রুত বহির্গত হয়, এবং সূর্যলোকে গমন করে। এই বিশ্বজগৎ মণ্ডলাকারে সজ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমণ্ডল, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি দেখা যায়। তাহার ঊর্ধ্বে সূর্যলোক অবস্থিত; তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্দ্রলোক বলে। তাহারও পরে আছে বিদ্যুল্লোক নামে আর একটি লোক। জীব ঐ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইলে পূর্ব হইতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নামক সর্বোত্তম স্বর্গে লইয়া যান। সেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়া বাস করে; তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের আর সর্ববিধ ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়। বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা আছেন এবং তিনি ঈশ্বর। অপর কেহই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন, তাহা হইলে দ্বৈতবাদীদের মতে তিনি ঘোর নাস্তিক। সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীবাত্মা যদি শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারেন। তিনি যদি সকল দেবদেবীকে নিজের সম্মুখে আসিতে নির্দেশ দেন, কিংবা যদি পিতৃপুরুষদের আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছানুসারে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাঁহার আর দুঃখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছা করিলে তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব—যিনি ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিয়াছেন, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাসনা ছাড়া অন্য কোন কর্ম করিতে চাহেন না।

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা এত উন্নত নন; তাঁহারা সৎকর্ম করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা বলেন—দরিদ্রকে তাঁহারা কিছু দান করিবেন, কিন্তু বিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের কিরূপ গতি হয়? তাঁহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে লয় পায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং চন্দ্রলোকে যায়। ঐ জীব সেখানে দীর্ঘকালের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সৎকর্মের ফল যতকাল থাকে, ততদিন ধরিয়া তিনি সুখভোগ করেন। যখন সেই সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাসনানুযায়ী ধরাধামে নূতন জীবন আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে এবং মুসলমান ধর্মে উল্লিখিত দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদমাত্রই বুঝিতে হইবে। যথা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্দ্রত্ব একটি উচ্চপদের নাম। বহু সহস্র মানুষ সেই পদ লাভ করিয়া থাকে। সর্বোত্তম বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকারী কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি দেবতার মধ্যে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাঁহার পুনর্বার মর্ত্যলোকে জন্মলাভের কাল আসিয়া পড়ে। ইহলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতাদেরও পরিবর্তন হয়, তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়। স্বর্গবাসী সকলেরই মৃত্যু আছে। একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হইল ব্রহ্মলোক; সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

এইরূপে জীবগণ স্বর্গে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দৈত্যদের উৎপাতের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বর্গফল তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকরই হইয়া থাকে। পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহারা মাঝে মাঝে দেবতাদের নানারূপে তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদানবের সংগ্রামের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখা যায় যে, অনেক সময় দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিত। অবশ্য অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষা দৈত্যগণের দুষ্কর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সকল পুরাণেই দেবগণকে কামপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাঁহারা মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন করিয়া কোন শস্য বা উদ্ভিদে সঞ্চারিত হন এবং ঐরূপে মানবের দ্বারা ভক্ষিত খাদ্যের মধ্য দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করেন। পিতার নিকট হইতে তাঁহারা উপযুক্ত দেহ-গঠনের উপাদান পান। যখন সেই উপাদানের উপযোগিতা শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের নূতন দেহ সৃষ্টি করিতে হয়। এখন—এরূপ অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা নানাপ্রকার দানবীয় কার্য সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তাহারা অত্যন্ত হীনকর্মা হইলে অতি নিম্নস্তরের প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে অথবা বৃক্ষলতা কিংবা প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়।

দেবজন্মে কোন কর্মফল অর্জিত হয় না; একমাত্র মানুষই কর্মফল অর্জন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। যখন মানুষ মরিয়া দেবতা হয়, তখন তাহাদের কেবল সুখ ও আরামের সময়, সেই সময় তাহারা নূতন কর্ম করে না; স্বর্গ তাহাদের অতীত সৎকর্মের পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার ফল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না।

নিম্নতর স্তরগুলি হইতে উচ্চস্তরের দিকে ক্রমবিকাশের পথে পশুত্ব একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ইতঃপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই-সকল বিলুপ্ত পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে?

বেদে নরকের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী কালের গ্রন্থ পুরাণের রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাই তাঁহারা নানা রকম নরক কল্পনা করিয়াছেন। এই-সব নরকের কতকগুলিতে মানুষকে করাত দিয়া চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম যাতনা চলিতেছে, কিন্তু তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহারা প্রতি মুহূর্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত হইতেছে। তবে দয়া করিয়া এই-সকল গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই-সব যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে। এই অবস্থায় তাহাদের অসৎ-কর্মের ক্ষয় হয়; অনন্তর তাহারা মর্ত্যে পুনরাগমন করে এবং আবার নূতন সুযোগ পায়। সুতরাং এই মানবদেহে একটি মহা সুযোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম শরীর বলে। ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমরা একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যৎ-নির্ধারক বিন্দু। সুতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। মানুষ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এই পর্যন্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এইবারে আমরা উচ্চতর বেদান্তদর্শনে আসিতেছি, যাহা পূর্বোক্ত মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ—উভয়ই। ঈশ্বরকে যদি আপনারা এক অসীম পুরুষ বলিয়া মানেন, এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে অসীম বলেন, তবে আপনারা এই অসীম বস্তুগুলির সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব কথা; এভাবে চলিলে আপনারা সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শূকর এবং হত্যাকারী ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্তু হইয়াছেন? আমরা বলিয়া থাকি, ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্তুতে পরিণত হইতে পারেন? আমাদের উত্তর এই—ইহা ঠিক যেন আমাদেরই মত। এই ধরুন আমি একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়। তথাপি আমি—প্রকৃত আমি—এই দেহ নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমি নিজেকে শিশু, তরুণ, যুবক বা বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিই; অথচ ইহাতে আমার আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। উহা সর্বদা একই আত্মারূপে অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই-সকলের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, আত্মাও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতি এবং আত্মার পরিবর্তনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে রূপের (আকৃতির) পরিবর্তন বুঝায়।

ইহা নূতন রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ হয়। অসৎ কর্মের দ্বারা ইহার সঙ্কোচন ঘটে। যে কর্মের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশুভ কর্ম বলে। আবার যে-সকল কর্মের ফলে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়, তাহাকে শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচন হইয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় এবং সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবার তাহারা সম্প্রসারিত হইবে এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করিবে। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ আছে এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্যই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ-সংসারের কখনও অবসান হইবে না, কারণ ইহা শাশ্বত। ইহাই হইল দ্বিতীয় মতবাদ। প্রথমটিকে বলা হয় 'দ্বৈতবাদ'। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনটিরই অস্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ; এই তিন মিলিয়া একটি অভিন্ন সত্তা গঠন করিয়াছে। ইহা ধর্মবিকাশের একটি উচ্চতর স্তরের নিদর্শন এবং ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলা হয়। দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মত একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়।

সর্বশেষে আসিতেছেন অদ্বৈতবাদীরা। তাঁহারাও সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ—এই উভয়ই হইতে হইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরেরা যখন বলেন, ঈশ্বর এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও ঈশ্বর কূটস্থ নিত্য, তখন অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। তাহাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া লাভ কি? উপাদান-কারণ আমরা তাহাকেই বলি, যাহা কার্যে পরিণত হয়; কার্য বলিতে কারণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা কারণেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশ্ব যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর, ঐ শরীর সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্মাকার হইয়া কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ কারণ হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব ঘটে, তবে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, ফলতঃ ভগবান্ নিজেই এই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এখানে এক অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ভগবানই যদি নিখিলবিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে—আপনারা সকলে এবং সব-কিছুই ঈশ্বর। এই গ্রন্থখানি ঈশ্বর এবং প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। আমার শরীর ঈশ্বর, মনও ঈশ্বর, আত্মাও ঈশ্বর। তাহাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? ঈশ্বর কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? সেই এক ঈশ্বরই কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? কেমন করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ও অসীম বস্তু—বিশ্বের সেই অখণ্ড সত্তা বিখণ্ডিত হইতে পারেন? অসীম বস্তুর বিভাজন সম্ভব নহে। সেই অখণ্ড অবিমিশ্র সত্তা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পারেন? যদি তিনিই এই বিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং যদি তিনি পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকৃতির অংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যদি আমাদের ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারও কোন-না-কোন দিন মৃত্যু হইবে। এই তথ্যটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আবার প্রশ্ন, এই ঈশ্বরের কি পরিমাণ অংশ এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ (বীজগণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ) হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে সেই অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেরূপ রহিলেন না, কারণ তাঁহার ঐ পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

অতএব অদ্বৈতবাদীগণ বলেন, 'এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা—এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র।' জীব বলিয়া মোটেই কিছু নাই; অতএব তাহাদের অগণিত সংখ্যাই বা কিরূপে হইবে? একমাত্র সেই অনন্ত সত্তা আছেন। যেমন একই সূর্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়, কোটি কোটি জলকণিকা যেমন কোটি কোটি সূর্যকে প্রতিফলিত করে এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সূর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি ধারণ করে, অথচ সূর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র। এই-সকল বিভিন্ন অন্তঃকরণ যেন বিভিন্ন জলবিন্দুর মত সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে। ঈশ্বর এই-সকল বিভিন্ন জীবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বাদ দিয়া কোন নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে না; সেই অনন্ত সত্তাই সেই সত্য। এই শরীর-মন ও আত্মা-রূপে আপনি একটি স্বপ্ন মাত্র; কিন্তু স্বরূপতঃ আপনি সেই সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আপনাতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মত। সুতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্ম, এই-সকল আসা-যাওয়া মায়াসৃষ্ট অলীক কল্পনা মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সর্বাতীত স্বরূপের মধ্যে যেন কয়েকটি কণিকামাত্র। অতএব আপনার কিরূপে জন্ম-মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব না। আমার কোনদিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শত্রু ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। আমিই তিনি, আমিই তিনি। তাহা হইলে এই দর্শনের মতে মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাঁহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্বের সহিত অভিন্ন হইয়া যান; তাঁহাদের পক্ষে সকল স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোকও লয় পায়, সমগ্র স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহারা নিজেদের এই বিশ্বের সনাতন ঈশ্বররূপে দেখিতে পান। তাঁহারাই অনন্ত জ্ঞান ও শান্তি-মণ্ডিত প্রকৃত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পান এবং মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাদের তখন তুচ্ছবস্তুতে আনন্দের অবসান ঘটে। আমরা এই ক্ষুদ্র দেহে এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই। যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন আনন্দ আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন সুখের আকর, তখন নিখিল শরীর আমার হইয়া গেলে সুখও যে অপরিমিত হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; তখনই মুক্তিলাভ হইবে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাতীত বেদান্তদর্শন বলা হয়।

বেদান্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে; আমরা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্বের ঊর্ধ্বে গমন করা সাধ্যাতীত। কোন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে আর কোন উপায়েই একত্বকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না।

সকল মানুষের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইহা অতি দুরূহ। প্রথমতঃ ইহা বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করাই কঠিন, ইহা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্মতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অনুভব-শক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্ স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। ব্যক্তিকেও জাতিরই ন্যায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল স্তরের মাধ্যমে মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিন্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি মানবজাতির সেই জীবনেতিহাস তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্‌যাপিত করিতে পারে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনারা যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা নিজেদের জীবনের সেই সময় স্মরণ করুন, যখন আপনারা ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেকে দেহ ও মন-রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র স্বপ্ন আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার অংশমাত্রকেও স্বীকার করিলে সমগ্রটিকেও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে বলে যে, এই বিশ্ব আছে অথচ তাহার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ জগৎ থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্যক এবং সেই কারণকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া মানি। কারণের অস্তিত্ব না মানিয়া কোন কার্যকে স্বীকার করা অসম্ভব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইবেন এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইবে। যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে নিজের জন্ম-মৃত্যু মানিতেই হইবে। কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-মৃত্যুর স্বপ্নও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে। যে বস্তুকে আমরা বর্তমানে বিশ্বরূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তাঁহাকেই এইবার নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-রূপে দেখিতে পাইব।

বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত

বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্যান্য সকল ধর্মমতের ভিত্তি বেদান্ত। কিন্তু যাহাকে আমরা আধুনিক কালের অদ্বৈত দর্শন বলি, উহার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন-পন্থী হিন্দুরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবে না। তাহাদের নিকট বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ড। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধগণকেও অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সমগ্র মতবাদটি প্রসারিত করার একটি সচেতন প্রয়াস রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিবাদ নাই। বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল মতের সমন্বয় করা। মহাযানী বৌদ্ধদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্তু বর্মী, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনযানীরা বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি আছে এবং জিজ্ঞাসা করেঃ এই দৃশ্যজগতের পশ্চাতে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্টি করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? বেদান্তের উত্তরঃ এই উক্তি মিথ্যা। বেদান্ত কখনও স্বীকার করে না যে, একটি দৃশ্য জগৎ ও একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে; একটি মাত্র জগৎ আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখিলে উহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সব সময়েই ইন্দ্রিয়াতীত। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রজ্জু, না হয় সর্প; কিন্তু একসঙ্গে কখনও দুইটি নয়। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে বলে, আমরা হিন্দুরা দুইটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, উহা সর্বৈব ভুল। ইচ্ছা করিলে জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিবার অধিকার তাহাদের আছে, কিন্তু ইহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলিবার কোন অধিকার অপরের নাই—এ-কথা বলিয়া বিবাদ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।

বৌদ্ধধর্ম দৃশ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করিতে চায় না। একমাত্র দৃশ্যজগতেই তৃষ্ণা আছে। তৃষ্ণাই এই সব-কিছু সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক বৈদান্তিকেরা কিন্তু এই মত আদৌ গ্রহণ করে না। আমরা বলি, একটা কিছু আছে, যাহা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বস্তু—যৌগিক পদার্থ, 'মৌলিক' নয়। একটি বাহ্যবস্তু না থাকিলে কোন ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি—এই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা আমরা সহজেই দেখিতে পাই। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? বাহিরের প্রেরণা ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে কখনও দেখিয়াছ কি? উত্তেজনা ব্যতীত, অথবা আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত বাসনা উঠিতে পারে না। ইচ্ছা মস্তিষ্কের এক-প্রকার প্রতিক্রিয়া-বিশেষ, সাংখ্যবাদীরা ইহাকে বলে 'বুদ্ধি'। এই প্রতিক্রিয়ার পূর্বে ক্রিয়া থাকিবেই, এবং ক্রিয়া থাকিলেই একটি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যখন স্থূল জগৎ থাকে না, তখন স্বভাবতই ইচ্ছাও থাকিবে না; তথাপি তোমাদের মতে ইচ্ছাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। ইচ্ছা সৃষ্টি করে কে? ইচ্ছা জগতের সহিত সহাবস্থিত। যে উত্তেজনা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাই ইচ্ছা নামক পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দর্শন নিশ্চয়ই এখানে থামিবে না। ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সুতরাং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ—বাহিরের ও ভিতরের মিশ্রণ। মনে কর একটি মানুষ কোন ইন্দ্রিয় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে লোকটির আদৌ ইচ্ছা থাকিবে না। ইচ্ছার জন্য প্রয়োজন কোন বাহ্য বিষয়ের, এবং মস্তিষ্ক ভিতর হইতে কিছু শক্তি লাভ করে। কাজেই দেওয়াল বা অন্য যে-কোন বস্তু যতখানি যৌগিক পদার্থ, ইচ্ছাও ঠিক ততখানি যৌগিক পদার্থ। জার্মান দার্শনিকদের ইচ্ছাশক্তি-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমরা মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা নিজেই জ্ঞেয় পদার্থ, কাজেই উহা পরম সত্তা হইতে পারে না। ইহা বহু অভিক্ষেপের অন্যতম। এমন কিছু আছে, যাহা ইচ্ছা নয়, কিন্তু ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হইতেছে—এ-কথা আমি বুঝিতে পারি; কিন্তু ইচ্ছা নিজেই প্রত্যেক বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছে—এ-কথা বুঝিতে পারি না; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, জগৎ হইতে স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছার কোন ধারণাই আমাদের থাকিতে পারে না। যখন সেই মুক্তিস্বরূপ সত্তা ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়, তখন দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা সেই রূপান্তর ঘটে। ক্যান্টের বিশ্লেষণ ধর। ইচ্ছা—দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। তাহা হইলে ইহা কি করিয়া পরম সত্তা হইবে? কালের মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছা না করিলে কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না।

সমস্ত চিন্তা রুদ্ধ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা চিন্তার অতীত। নেতি নেতি বিচার করিয়া যখন সব দৃশ্যজগৎকে অস্বীকার করা হয়, তখন যাহা কিছু থাকে, তাহাই এই পরম সত্তা। ইহাকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা অভিব্যক্ত হয় না; কারণ অভিব্যক্তি পুনরায় ইচ্ছায় পরিণত হইবে।

বেদান্তদর্শন এবং খ্রীষ্টধর্ম

[১৯০০ খ্রীঃ, ২৮ ফেব্রুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত ওকল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যগুলি এতই চমকপ্রদ যে, সময়ে সময়ে মনে হয় বিভিন্ন ধর্মগুলি অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে বুঝিবা একে অন্যকে অনুকরণ করিয়াছে।

এই অনুকরণের কার্যটি বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু এইরূপ একটি দোষারোপ যে ভাসা ভাসা ও বাস্তবানুগ নয়, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফুট হইবেঃ

ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ এবং জীবন-মাত্রই অন্তর্জীবনেরই বিবর্তন। ধর্ম প্রয়োজনবশতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়।

আত্মার ভাষা এক, কিন্তু বিভিন্ন জাতির ভাষা বিভিন্ন; তাহাদের রীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির মধ্যেও প্রভেদ অনেক। ধর্ম অন্তরের অভিব্যক্তি এবং ইহা বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও রীতি-নীতির মধ্য দিয়া প্রকাশমান। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রতীত হয় যে, জগতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রকাশগত, ভাবগত নয়। যেমন আত্মার ভাষা ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক বিভেদ সত্ত্বেও একই হইয়া থাকে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য এবং একত্ব আত্মারই অন্তর্গত এবং সহজাত। বিভিন্ন যন্ত্রে যেমন ঐক্যতান আছে, তেমনি ধর্মগুলির মধ্যেও সেই একই মিলনের সুর স্পন্দিত।

সব বড় বড় ধর্মের মধ্যেই একটি প্রথম সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একখানি করিয়া প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ আছে।

যে-সব ধর্মের এইরূপ কোন গ্রন্থ নাই, তাহারা কালে লোপ পায়। মিশরদেশীয় ধর্মমতগুলির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় ধর্মমতেরই প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ যেন উহার ভিত্তিপ্রস্তর, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই মতাবলম্বিগণ সমবেত হয় এবং যাহা হইতে ঐ ধর্মের শক্তি এবং জীবন বিকীর্ণ হয়। আবার প্রতিটি ধর্মই দাবী করে যে, তাহার নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থই ভগবানের একমাত্র বাণী এবং অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা ও মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার উপর বোঝা চাপান এবং অন্য ধর্ম অনুসরণ করা মূর্খতা ও ধর্মান্ধতা।

সকল ধর্মের রক্ষণশীল অংশের বৈশিষ্ট্যই হইল এইপ্রকার গোঁড়ামি। উদাহরণস্বরূপ—বেদের যাহারা গোঁড়া সমর্থক, তাহারা দাবী করে যে, পৃথিবীতে বেদই একমাত্র প্রামাণ্য ঈশ্বরের বাণী এবং ঈশ্বর বেদের মধ্য দিয়াই জগতে তাঁহার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন; শুধু তাহাই নয়, বেদের জন্যই এই জগতের অস্তিত্ব। জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব হইতেই বেদ ছিল, জগতের সব-কিছুর অস্তিত্ব বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে গরুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই গরুর অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে; অর্থাৎ যে জন্তুকে আমরা গরু বলিয়া জানি, তাহা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের ভাষাই ঈশ্বরের আদিম ভাষা; অন্যান্য সব ভাষা আঞ্চলিক বাচন মাত্র, ঈশ্বরের নয়। বেদের প্রতি শব্দ ও বাক্যাংশ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রতি উচ্চারণ-ধ্বনি যথাযথ স্পন্দিত হইবে, এবং এই সুকঠোর যাথার্থ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুতিও ঘোরতর পাপ ও ক্ষমার অযোগ্য।

ঠিক এই প্রকার গোঁড়ামি সব ধর্মের রক্ষণশীল অংশেই বর্তমান। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ লইয়া এই ধরনের মারামারি যাহারা প্রশ্রয় দেয়, তাহারা মূর্খ এবং ধর্মান্ধ। যাঁহারা যথার্থ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের বহিঃপ্রকাশ লইয়া কখনও বিবাদ করেন না। তাঁহারা জানেন, সব ধর্মের তাৎপর্য এক, সুতরাং কেহ একই ভাষায় কথা না বলিলেও তাঁহারা পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ করেন না।

বেদসমূহ বস্তুতই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কেহই জানে না, কোন্ কালে কাহার দ্বারা এগুলি লিখিত হইয়াছে। বেদসমূহ বিভিন্ন খণ্ডে সংরক্ষিত এবং আমার সন্দেহ হয়, কেহ কখনও এইগুলি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছে কিনা।

বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম এবং সব প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি; অর্থাৎ অন্যান্য প্রাচ্যধর্মগুলি বেদেরই শাখা-প্রশাখা। প্রাচ্যদেশের সব ধর্মমত বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে।

যীশুখ্রীষ্টের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাণীগুলির অধিকাংশেরই কোন প্রয়োগ বর্তমানকালে নাই—এরূপ মত পোষণ করা অযৌক্তিক। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসীদের শক্তিলাভ হইবে; খ্রীষ্টের বাণীতে যাহারা বিশ্বাসবান্, তাহাদের কেন শক্তিলাভ হয় না? যদি বল, তাহার কারণ বিশ্বাস এবং পবিত্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তবে তাহা ঠিকই। কিন্তু বর্তমানকালে ঐগুলির কোন প্রয়োগ নাই—এইরূপ বলা হাস্যোদ্দীপক।

আমি কখনও এইরূপ কোন ব্যক্তি দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। আমি সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছি, নিকৃষ্ট

লোকের—নরমাংসভোজীদের সহিতও মিশিয়াছি এবং আমি কখনও এমন একজনকেও দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। তাহারা যাহা করে, আমি যখন নির্বোধ ছিলাম, আমিও তাহা করিয়াছি। তখন আমি ইহাদের অপেক্ষা উন্নত কিছুই জানিতাম না, এখন আমি বুঝিতেছি। এখন তাহারা ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু জানে না, কিছুকাল পরে তাহারাও জানিতে পারিবে। প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। আমরা সকলেই উন্নতির পথেই চলিয়াছি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নততর নয়।

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?

[১৯০০ খ্রীঃ, ৮ এপ্রিল সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত]

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা গত এক মাস যাবৎ আমার প্রদত্ত বক্তৃতাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বেদান্ত-দর্শনে নিহিত ভাবগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছেন।

বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম, তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে—এমন কথা বলা যায় না। অতএব 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে?'—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

প্রারম্ভেই আমি বলিতে চাই যে, বেদান্ত জনগণের অধিকাংশের ধর্ম কখনও হইয়া উঠিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের ন্যায় কোন একটি জাতির সকলকে এই ধর্ম আপন কুক্ষিতে আনিতে কখনও কি সক্ষম হইবে? সম্ভবতঃ ইহা হইতে পারে। যাহাই হউক, আজ বিকালে আমরা এই প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা করিতে চাই।

প্রথমেই বলি, বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব বেদান্ত কি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর জোর দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়—যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোন আপস করে না, বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না।

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম একখানি গ্রন্থ। অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থখানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি। গ্রন্থ নাই—এমন কোন ধর্ম আজ টিকিয়া নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্ত্বেও মানুষ গ্রন্থ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

আপনাদের দেশে গ্রন্থবিহীন ধর্ম-স্থাপনের প্রতিটি চেষ্টাই অকৃতকার্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে সম্প্রদায়-সকল প্রবল সাফল্যের সহিত গড়িয়া উঠে—কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সেগুলি লোপ পায়, কারণ তাহাদের কোন গ্রন্থ নাই। অন্যান্য দেশেও এইরূপই হয়।

ইউনিটেরিয়ান ধর্মান্দোলনের উত্থান ও পতন আলোচনা করুন। এই ধর্ম আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি উপস্থাপিত করিয়াছে। মেথডিষ্ট, ব্যাপ্টিষ্ট এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মত এই সম্প্রদায় কেন এত প্রচারিত হয় নাই? কারণ উহার কোন গ্রন্থ ছিল না। অপরপক্ষে য়াহুদীদিগের কথা ভাবুন; মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা—এক দেশ হইতে অন্যদেশে বিতাড়িত হইয়াছে—তথাপি নিজেদের গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ তাহাদের গ্রন্থ আছে। পারসীদিগের কথা ভাবুন—পৃথিবীতে সংখ্যায় মাত্র একলক্ষ। ভারতে জৈনদিগের দশ লক্ষ অবশিষ্ট আছে। আর আপনারা কি জানেন যে, এই মুষ্টিমেয় পারসী ও জৈনগণ এখনও টিকিয়া আছে, কেবল তাহাদের গ্রন্থের জোরে। বর্তমান সময়ের জীবন্ত ধর্মগুলির প্রত্যেকেরই একটি গ্রন্থ আছে।

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন—একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ব্যক্তি হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান্ আচার্যরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পূজা করিবেই। তাহার চাই—একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্ নেতা। সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়।

হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের অবতার আছেন; বৌদ্ধ, মুসলমান ও য়াহুদীদের প্রেরিত পুরুষ আছেন। কিন্তু সব ধর্মের এক ব্যাপার—তাহাদের শ্রদ্ধা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করিয়া নিবিষ্ট।

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োজন—নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য এমন এক বিশ্বাস যে, সেই ধর্মই একমাত্র সত্য; নতুবা ইহা জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

উদারতা শুষ্ক বলিয়া মরিয়া যায়; ইহা মানুষের মনের ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না—সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে; মাত্র কয়েকজনের উপরই ইহার প্রভাব। কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে বলে, আমরা তাহা চাই না—কারণ তাহাতে সাক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই; স্বার্থ-দ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও মনুষ্য-স্বভাব একইভাবে কাজ করে।

নবী আসিলেন—যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিল, তাহাদিগকে তিনি কোন এক প্রকারের ফললাভের প্রতিশ্রুতি দিলেন—আর যাহারা অনুসরণ করিল না, তাহাদের জন্য রহিল অনন্ত দুর্গতি। এইভাবে তিনি তাঁহার ভাব প্রচার করেন। প্রচারশীল আধুনিক ধর্মগুলি ভয়ঙ্করভাবে গোঁড়া। যে সম্প্রদায় যত বেশী অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, তাহার তত বেশী সাফল্য এবং ততই অধিক সংখ্যক মানুষ তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর এবং বহুজাতির সহিত বসবাস করিয়া এবং বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবার পর আমার সিদ্ধান্ত—বিশ্বভ্রাতৃত্বের বহু বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিই চলিতে থাকিবে। বেদান্ত এই-সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহা কোন পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। অপর কোন গ্রন্থের উপর কোন গ্রন্থের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদান্ত স্বীকার করে না। ঈশ্বর, আত্মা ও

চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সব সত্যই একখানি মাত্র গ্রন্থেই থাকিতে পারে—বেদান্ত একথা দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করে। যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উপনিষদই বারংবার বলিতেছে, 'শুধু পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।' দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করা—বেদান্তমতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদই কোন ব্যক্তিবিশেষে আসক্ত নয়।

কোন একজন পুরুষ বা নারী কখনই বেদান্তবাদীর কাছে পূজার্হ হইয়া উঠেন নাই, তাহা হইতে পারে না। একজন মানুষ একটি পাখী বা কীট অপেক্ষা বেশী পূজার যোগ্য নয়, আমরা সকলেই ভাই, পার্থক্য কেবল মাত্রায়। আমি যাহা, নিম্নতম কীটও তো তাহা। বুঝিয়া দেখুন, কোন মানুষ আমাদিগের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিবেন, আর আমরা গিয়া তাঁহাকে পূজা করিব—তিনি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবেন—আর আমরা তাঁহার কৃপায় উদ্ধার পাইব—এই-সকল ভাবের স্থান বেদান্তে খুবই কম। বেদান্ত এরূপ শিখায় না—না গ্রন্থ, না কোন মানুষকে পূজা করিতে; না, এই-সকল কিছুই শিখায় না।

ঈশ্বরবিষয়ক সমস্যাটি আরও জটিল। আপনারা এই দেশে সাধারণতন্ত্র চান। বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে।

আপনাদের দেশে সরকার আছে—সরকার একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। আপনাদের সরকার স্বৈরাচারতন্ত্রী নয়, তথাপি পৃথিবীর যে-কোন রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। মনে হয়, কেহই এই কথাটি বুঝিতে পারে না যে, সত্যিকারের শক্তি, সত্যিকারের জীবন, সত্যিকারের ক্ষমতা অদৃশ্য, নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় নিহিত। ব্যক্তি হিসাবে—অন্য সব-কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে মানুষ নগণ্যমাত্র, কিন্তু যে জাতিটি নিজেই নিজের শাসন করিয়া থাকে, উহার অন্তর্গত নৈর্ব্যক্তিক সত্তাবিশেষ হিসাবে আপনার শক্তি অসীম। সরকারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আপনারা অভিন্ন—আপনারা এক ভীষণ শক্তি। কিন্তু বস্তুতঃ শক্তিটি কোথায় নিহিত? প্রত্যেক মানবই সেই শক্তি। রাজা তো আত্মাতে নাই। আমি সকল মানুষকে সমভাবে একই দেখি। আমাকে কাহারও নিকট টুপি খুলিতে বা মাথা নত করিতে হইবে না। তথাপি প্রতি মানুষের মধ্যেই এই ভীষণ শক্তি। বেদান্ত ঠিক এইরূপ।

বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ এক জগতে সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট্ নন! অনেকে আছে, তাহাদের ঐরূপ একজন ঈশ্বর চাই, যাঁহাকে তাহারা ভয় করিবে, যাঁহাকে তাহারা সন্তুষ্ট করিবে। তাহারা প্রদীপ জ্বালাইবে এবং তাঁহার সম্মুখে ধুলায় গড়াগড়ি যাইবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা চাই, স্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজা চাই। অন্ততঃ এই দেশ হইতে রাজা বিদায় হইয়াছেন। স্বর্গস্থ রাজা আজ কোথায়? মর্ত্যের রাজারা যেখানে, সেইখানেই। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে। এই দেশে আপনারা সকলেই রাজা। বেদান্ত ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে, জীব ব্রহ্মই। এইজন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশীমত সৃষ্টিকারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে—সর্বভূতে। এই দেশ হইতে মহিমান্বিত রাজা বিদায় লইয়াছেন, স্বর্গস্থ রাজ্যপাট বেদান্ত হইতে শত শত বৎসর পূর্বেই লোপ পাইয়াছে।

ভারত মহিমান্বিত একজন রাজাকে চায়, ঐভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—এই কারণেই বেদান্ত ভারতের ধর্ম হইতে পারে না। বেদান্ত আপনাদের দেশের ধর্ম হইতে পারে—সে সম্ভাবনা আছে, কারণ ইহা সাধারণতন্ত্র। কিন্তু তাহা হইতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যখন আপনারা পরিষ্কারভাবে বেদান্ত বুঝিয়া লইতে পারিবেন। যদি আপনারা সত্যিকারের নর-নারী হইতে পারেন—অর্ধজীর্ণ-ভাবধারা-সম্পন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ না হন, যদি আপনারা সত্যিকারের ধার্মিক হইতে চান তবেই ইহা সম্ভব, কারণ বেদান্ত কেবল আধ্যাত্মিক-ভাবের সহিতই সংশ্লিষ্ট।

স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ! ঈশ্বর নামক যে অনন্ত তত্ত্ব আমাদের সকলের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছেন, তিনিই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন! ভাবুন দেখি কী অধর্মের কথা! ইহাই জড়বাদ, জঘন্য জড়বাদ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর। এই ধারণা—জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিয়ভাব হইতে উদ্ভূত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মাম্বো ফাম্বো' ধর্ম অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত নয়। ঈশ্বর আত্মা; তিনি সত্যস্বরূপে উপাস্য। আত্মা কি শুধু স্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? আমরাই আত্মা। আমরা তাহা অনুভব করি না কেন? কিরূপে তুমি আত্মা হইতে ভিন্ন হইলে? দেহ ভিন্ন আর কিছুই ইহার কারণ নহে। দেহভাব ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুভূত হয়।

বেদান্ত এই-সব মতবাদ প্রচার করে নাই। কোন পুস্তক নয়; বেদান্তে মনুষ্যসমাজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া লইতে হয় না। 'তোমরা কীট, আর আমরা ঈশ্বর—প্রভু!'—না, এই-সব কিছুই ইহাতে নাই। যদি তুমি ঈশ্বর, তবে আমিও ঈশ্বর। সুতরাং বেদান্ত পাপ স্বীকার করে না। ভ্রম আছে, পাপ নাই; কালক্রমে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। শয়তান নাই—এই ধরনের কল্পনামূলক গল্পের কোনটির অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত কেবল একটি পাপকে—জগতের মধ্যে কেবল একটিকেই স্বীকার করে, তাহা এইঃ 'অপরকে বা নিজেকে পাপী ভাবাই পাপ।' এই ধারণা হইতে অপরাপর ভ্রম-প্রমাদ যাহাকে সাধারণতঃ পাপ বলা হয়, তাহা ঘটিয়া থাকে। আমাদের জীবনে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে, কিন্তু আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমরা ভুল যে করিতে পারিয়াছি, এজন্য আমাদের জয় হউক। দূরদৃষ্টিতে অতীতের দিকে চাহিয়া দেখুন। যদি বর্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক হইয়া থাকে, তবে তাহা অতীতের সকল বিফলতা ও সাফল্যের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। সাফল্যের জয় হউক! ব্যর্থতারও জয় হউক! যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইও না। অগ্রসর হও। দেখা যাইতেছে, বেদান্ত পাপ বা পাপী কল্পনা করে না। ভয় করিতে হইবে—এমন ঈশ্বর এখানে নাই। ঈশ্বরকে আমরা কখনও ভয় করিতে পারি না, কারণ তিনি আমাদের আত্মা-স্বরূপ। তাহা হইলে যাহার ঈশ্বরে ভয় আছে, তিনিই কি সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি নন? এমন লোকও থাকিতে পারেন, যিনি আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পান, কিন্তু তেমন ব্যক্তিও নিজেকে ভয় পান না। মানুষের নিজের আত্মাই ভগবান্। তিনিই

একমাত্র সত্তা, যাহাকে সম্ভবতঃ কখনই ভয় করা যায় না। কি বাজে কথা যে, ‘ঈশ্বরের ভয় তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভীত করিল’, ইত্যাদি, ইত্যাদি—কি পাগলামি? ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, পাগলা-গারদে যেন আমাদের সকলকেই বাস করিতে না হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের অধিকাংশই পাগল না হই, তবে ‘ভগবান্‌কে ভয় করা’ ইত্যাদি মিথ্যা বিষয় রচনা করি কেমন করিয়া? ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, কম-বেশী সমগ্র মনুষ্যজাতিই পাগল। মনে হইতেছে, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

কোন গ্রন্থ নয়, ব্যক্তি নয়, সগুণ ঈশ্বর নয়। এইগুলি দূর করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়চেতনাও দূর হইবে। আমরা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারি না। হিমবাহে তুহিন-স্পর্শে মুমূর্ষু ব্যক্তির মত এখন আমরা আবদ্ধ হইয়া আছি। শীতে অবসন্ন পথিক ঘুমাইয়া থাকার জন্য একপ্রকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে এবং তাহাদের বন্ধুগণ যখন তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান করে, তখন সে যেমন বলিয়া থাকে, ‘আমাকে মরিতে দাও, আমি ঘুমাইতে চাই’—তেমনি আমরা সকলেই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় আঁকড়াইয়া আছি, এমন কি আমরা ইহাতে বিনষ্ট হইয়া গেলেও আঁকড়াইয়া থাকি—আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ভাব আছে।

হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ একবার মর্ত্যে শূকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শূকরীর গর্ভে কালক্রমে তাঁহার অনেকগুলি ছোট ছোট শাবক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পরিবারটিতেই খুব সুখী; তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ও ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া এই পরিবারের সহিত কাদায় মহানন্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং মর্ত্যে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে তিনি শূকর-শরীর ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু ভগবান্ ঐ-সকল কিছুই করিলেন না—তিনি দেবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি খুব সুখে আছেন এবং ইহাতে যেন কোন বাধা উপস্থিত না হয়। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দেবগণ ঈশ্বরের শূকর-শরীরটি ধ্বংস করিয়া দিতেই তিনি তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ফিরিয়া পাইলেন এবং শূকর-যোনিতেও যে তিনি এত আনন্দ পাইতে পারেন—ইহা ভাবিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইলেন।

ইহাই মানুষের স্বভাব। যখনই তাহারা নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কথা শোনে, তাহারা ভাবে, ‘আমার ব্যক্তিত্বের কী হইবে?—আমার ব্যক্তিত্ব যে নষ্ট হইবে!’ আবার কখনও মনে ঐরূপ চিন্তা আসিলে শূকরটির কথা স্মরণ করিবে এবং তাহার পরে ভাবিবে, কী অসীম সুখের খনি না তোমার মধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থাতে আপনি কতই না সুখী! কিন্তু যখন মানুষ সত্যস্বরূপ জানিতে পারে, তখন সে এই ভাবিয়া অবাক হয় যে, সে এই ইন্দ্রিয়পর জীবন ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। ব্যক্তিত্বে কী আছে? ইহা কি শূকর জীবন হইতে ভাল কিছু? আর তাহাই ছাড়িতে চায় না! ভগবান্ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদান্ত শিখায় যে, সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ সব বর্তমানেই নিহিত। কোন মানুষই কখনও অতীতকে দেখে নাই। আপনাদের কেহ কি অতীতকে দেখিয়াছেন? যখন কেহ অতীতকে বোধ করিতেছি বলিয়া চিন্তা করে, তখন সে বর্তমান মুহূর্তমধ্যে অতীতের কল্পনা করে মাত্র। ভবিষ্যৎ দেখিতে গেলে বর্তমানের মধ্যেই তাহাকে আনিতে হইবে, বর্তমানই একমাত্র সত্য—বাকী সব কল্পনা। এই বর্তমান, ইহাই সব। কেবল একই বর্তমান। যাহা কিছু বর্তমানে অবস্থিত, তাহাই সত্য। অনন্তকালের মধ্যে একটি ক্ষণ—অন্যান্য প্রত্যেক ক্ষণের মতই সম্পূর্ণ ও সর্বগ্রাহী। যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে—তাহা সবই বর্তমানে অবস্থিত। যদি কেহ ইহার বাহিরে কোন কিছুর কল্পনা করিতে চান, করুন—কিন্তু কখনই সফলকাম হইবেন না।

এই পৃথিবীর সাদৃশ্য বাদ দিয়া কোন্ ধর্ম স্বর্গ-চিত্রের বর্ণনা দিতে পারিয়াছে? আর সবই তো চিত্র—কেবল এই জগৎ-চিত্রটি আমাদিগের নিকট ধীরে ধীরে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জগৎকে স্থূল, এবং বর্ণ-আকৃতি-শব্দাদি সম্পন্ন আছে বলিয়া দেখিতেছি। মনে করুন, আমার একটি বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয় হইল—তখন সব পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। মনে করুন, আমার ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মতর হইয়া গেল—তখন আপনারা সকলেই অন্যরূপে প্রতিভাত হইবেন। যদি আমি পরিবর্তিত হই, তবে আপনারা পরিবর্তিত হইয়া যান। যদি আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে চলিয়া যাই, আপনারা আত্মারূপে—ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইবেন। বস্তুগুলিকে যেমন দেখা যাইতেছে, তাহারা ঠিক তেমনটি নয়।

ক্রমে ক্রমে যখন এইগুলি আমরা বুঝিব, তখন ধারণা হইবেঃ এই সব স্বর্গাদি লোক—সব-কিছু—সব এইখানে, এইক্ষণেই অবস্থিত; আর এইগুলি সত্য সত্য ঈশ্বরাস্তিত্বের উপর আরোপিত বা অধ্যস্ত সত্তা ব্যতীত কিছুই নয়। এই অস্তিত্ব স্বর্গ-মর্ত্যাদি অপেক্ষা মহত্তর। মানুষ ভাবে, মর্ত্যলোক পাপময় এবং স্বর্গ অন্য কোথাও অবস্থিত। মর্ত্যলোক খারাপ নয়। জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, ইহাও ভগবান্ স্বয়ং। বিশ্বাস করা অপেক্ষা এই তত্ত্বকে বোঝা অনেক বেশী দুরূহ। আততায়ী, যে আগামীকাল ফাঁসিতে ঝুলিবে, সেও ভগবান্, সাক্ষাৎ ভগবান্। নিশ্চিতভাবে এই তত্ত্বকে ধারণা করা খুবই কঠিন, কিন্তু ইহাকে উপলব্ধি করা যায়।

এইজন্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বাত্মার ঐক্য। আমি অপরাপর মানুষ, জন্তু—ভাল, মন্দ—যে-কোন জিনিষের সঙ্গেই অভিন্ন। সর্বত্র এক শরীর, এক মন ও একটি আত্মা বিরাজিত। আত্মা কখনও মরে না। মৃত্যু বলিয়া কোথাও কিছু নাই—দেহের ক্ষেত্রেও মরণ নাই, মনও মরে না। শরীরেরই বা মৃত্যু কিরূপে ঘটিতে পারে? একটি পাতা খসিয়া পড়িল—ইহাতে কি গাছের মৃত্যু ঘটে? এই বিশ্ব আমার শরীর। দেখুন, কিভাবে ইহা অনন্তকাল ধরিয়া আছে। সকল মনই আমার। সকল পায়ে আমি পরিভ্রমণ করি—সকল মুখে আমিই কথা বলি—সর্বশরীরে আমিই অধিষ্ঠিত।

কেন আমি ইহা অনুভব করিতে পারি না? কারণ আমার ব্যক্তিত্ব—ঐ শূকরত্ব। মানুষ নিজেকে এই মনের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এইজন্য কেবল এইখানেই থাকিতে পারে—দূরে নয়। অমরত্ব কি? সামান্য কয়েকজন মাত্র জবাবটি এইভাবে দেয়,

‘ইহা যে আমাদেরই অস্তিত্ব!’ বেশীর ভাগ লোকই ভাবে, এই সবই মরণশীল বা মৃত—ভগবান্ এইখানে নাই, তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অমর হইবে। তাহারা কল্পনা করে যে, মৃত্যুর পর তাহারা ভগবানের দর্শন পাইবে। কিন্তু যদি তাহারা তাঁহাকে এই লোকে এইক্ষণে দেখিতে না পায়—তবে মৃত্যুর পরও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। যদিও তাহারা সকলেই অমরত্বে বিশ্বাসী, তথাপি তাহারা জানে না—মরিবার পর স্বর্গে গিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় না, পরন্তু আমাদের শূকরসুলভ ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া—একটি ক্ষুদ্র শরীরের সহিত নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করিতে পারি। নিজেকে সকলের সহিত এক বলিয়া জানা—সকল দেহের মধ্যেই আপনার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা—সকল মনের মধ্য দিয়া অনুভব করাই অমরত্ব। আমরা এই শরীর ছাড়া অপর শরীরের মধ্য দিয়াও অনুভূতি লাভ করিতে পারি; আমাদিগকে অপর শরীরের মধ্য দিয়াও অনুভূতি লাভ করিতেই হইবে। সমবেদনার অর্থ কি? এই সমবেদনার—শরীর মধ্যে এই অনুভূতির—কি কোন সীমা আছে? ইহাও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন সমগ্র বিশ্বের মধ্য দিয়া আমি অনুভব করিব।

ইহাতে লাভ কি? এই শূকর-শরীর ত্যাগ করা কঠিন; আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শূকর- শরীরের আনন্দ ত্যাগ করিতে দুঃখবোধ করিয়া থাকি। বেদান্ত ইহা ত্যাগ করিতে বলে না, বলে—‘ইহার পরে যাও।’ কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নাই—দুইটি শরীরে অনুভূত সুখলাভ অধিকতর ভাল—তিনটিতে আরও বেশী ভাল। একটির বদলে বহু শরীরে বাস! যখন আমি বিশ্বের মাধ্যমে সুখলাভ করিতে পারিব, তখন সমগ্র বিশ্বই আমার শরীর হইবে।

অনেকে আছেন, যাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব শুনিয়া ভীত হন। তাঁহারা যে পরপীড়নকারী কোন ঈশ্বরের সৃষ্ট ক্ষুদ্র শূকর দেহমাত্র নন—এই কথা শুনিতে তাঁহারা রাজী নন। আমি তাঁহাদিগকে বলি, ‘অগ্রসর হউন!’ তাঁহারা বলেন—তাঁহারা পাপের পঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কাহারও কৃপা ব্যতীত তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। আমি বলি, ‘তোমরাই ঈশ্বর!’ তাঁহারা জবাবে বলেন, ‘ওহে ঈশ্বরদ্বেষী! তুমি কোন্ সাহসে এই কথা বল? কিভাবে একটি দীন প্রাণী (জীব) ঈশ্বর হয়? আমরা পাপী!’ আপনারা জানেন, সময়ে সময়ে আমি বড় হতোদ্যম হইয়া পড়ি। শত শত পুরুষ ও মহিলা আমাকে বলিয়াছেন, ‘যদি নরকই নাই, তবে ধর্ম কিভাবে থাকে?’ যদি এই-সব মানুষ স্বেচ্ছায় নরকে যায়, তবে কে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে?

মানুষ যাহা কিছুর স্বপ্ন দেখে বা ভাবে—সবই তাহার সৃষ্টি। যদি নরকের চিন্তা করিয়া মরে, তবে নরকই দেখিবে। যদি মন্দ এবং শয়তানের চিন্তা করে, তবে শয়তানকেই পাইবে—ভূত ভাবিলে ভূত পাইবে। যাহা কিছু ভাবনা করিবেন, তাহাই হইবেন, এইজন্য সৎ ও মহৎ ভাবনা অবশ্যই ভাবিতে হইবে। ইহার দ্বারাই নিরূপিত হয় যে, মানুষ একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কীটমাত্র। আমরা দুর্বল—এই কথা উচ্চারণ করিয়াই আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, ইহা অপেক্ষা বেশী ভাল কিছু হইতে পারি না। মনে কর, আমরা নিজেরাই আলো নিবাইয়া, জানালা বন্ধ করিয়া চীৎকার করি—ঘরটি অন্ধকার। ঐ সকল আহাম্মকির কথা ভাবুন! ‘আমি পাপী’—এই কথা বলিলে আমার কী উপকার হইবে? যদি আমি অন্ধকারেই থাকি, তবে আমাকে একটি প্রদীপ জ্বালিতে দাও; তাহা হইলে সকল অন্ধকার চলিয়া যাইবে। আর মানুষের স্বভাব কী আশ্চর্যজনক। যদিও তাহারা সর্বদাই সচেতন যে, তাহাদের জীবনের পিছনে বিশ্বাত্মা বিরাজিত, তথাপি তাহারা বেশী করিয়া শয়তানের কথা—অন্ধকার ও মিথ্যার কথা ভাবিয়া থাকে। তাহাদের সত্যস্বরূপের কথা বলুন—তাহারা বুঝিতে পারিবে না; তাহারা অন্ধকারকে বেশী ভালবাসে।

ইহা হইতেই বেদান্তে একটি মহৎ প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছেঃ জীব এত ভীত কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবগণ নিজেদের অসহায় ও অপরের উপর নির্ভরশীল করিয়াছে বলিয়া। আমরা এত অলস যে, নিজেরা কিছুই করিতে চাই না। আমরা একটি ইষ্ট, একজন পরিত্রাতা, অথবা একজন প্রেরিত পুরুষ চাই, যিনি আমাদের জন্য সব-কিছু করিয়া দিবেন। অতিরিক্ত ধনী কখনও হাঁটেন না—সর্বদাই গাড়ীতে চলেন; বহু বৎসর বাদে তিনি হঠাৎ একদিন জাগিলেন, কিন্তু তখন তিনি অথর্ব হইয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বোধ করিতে আরম্ভ করেন, যে ভাবে তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছেন, তাহা মোটের উপর ভাল নয়, কোন মানুষই আমার হইয়া হাঁটিতে পারে না। আমার হইয়া যদি কেহ প্রতিটি কাজ করে, তবে সে প্রতিবারই আমাকে পঙ্গু করিবে। যদি কাহারও সব কাজই অপরে করিয়া দেয়, তবে সে অঙ্গচালনার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। যাহা কিছু আমরা স্বয়ং করি, তাহাই একমাত্র কাজ যাহা আমাদিগের নিজস্ব। যাহা কিছু আমাদের জন্য অপরের দ্বারা কৃত হয়, তাহা কখনই আমাদের হয় না। তোমরা আমার বক্তৃতা শুনিয়া আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে পার না। যদি তোমরা কিছুমাত্র শিখিয়া থাক, তবে আমি সেই স্ফুলিঙ্গ-মাত্র, যাহা তোমাদের ভিতরকার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। অবতার পুরুষ বা গুরু কেবল ইহাই করিতে পারেন। সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি মূর্খতা।

ভারতে বলদ-বাহিত শকটের কথা আপনারা জানেন। সাধারণতঃ দুইটি বলদকে গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, আর কখনও কখনও এক আঁটি খড় একটি বাঁশের মাথায় বাঁধিয়া পশুদুইটির সামনে কিঞ্চিৎ দূরে—কিন্তু উহাদের নাগালের বাহিরে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বলদ দুইটি ক্রমাগত খড় খাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। ঠিক এইভাবেই আমরা সাহায্য লাভ করি। আমরা মনে করি—আমরা নিরাপত্তা, শক্তি, জ্ঞান, শান্তি বাহির হইতে পাইব। আমরা সর্বদাই এইরূপ আশা করি, কিন্তু কখনও আশা পূর্ণ করিতে পারি না। বাহির হইতে কোন সাহায্য কখনও আসে না।

মানুষের কোন সহায়ক নাই। কেহ কোন কালে ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না। কেনই বা থাকিবে? আপনারা কি মানব বা মানবী নন? এই পৃথিবীর প্রভুগণ কি অপরের কৃত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইবে? ইহাতে কি আপনারা লজ্জিত নন? যখন আপনারা ধুলায় মিশিয়া যাইবেন, তখনই অপরের সহায়তা লাভ করিবেন। কিন্তু মানুষ আত্মস্বরূপ। নিজেদের বিপদ হইতে টানিয়া তোল! ‘উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্’। ইহা ছাড়া অন্য কোন সাহায্য নাই—কোনকালে ছিলও না। সহায়ক আছে, এরূপ ভাবনা সুমধুর ভ্রান্তিমাত্র। ইহার দ্বারা কোন মঙ্গল হইবে না। একদিন একজন খ্রীষ্টান আমার কাছে আসিয়া বলে, ‘আপনি একজন ভয়ঙ্কর পাপী।’ উত্তরে বলিলাম—‘হ্যাঁ, তাই, তারপর?’ সে একজন ধর্মপ্রচারক। লোকটি আমাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাহাকে

আসিতে দেখিলেই আমি পলায়ন করিতাম। সে বলিত, 'তোমার জন্য আমার অনেক ভাল ভাল জিনিষ আছে। তুমি একটি পাপী, আর তুমি নরকে যাবে।' আমি জবাবে বলিতাম, 'খুব ভাল—আর কিছু?' আমি প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?' সে উত্তর দিল, 'আমি স্বর্গে যাচ্ছি।' আমি বলিলাম, 'আমি তাহলে নরকেই যাব।' সেই দিন হইতে সে আমাকে নিষ্কৃতি দেয়।

এইখানে কোন খ্রীষ্টান আসিলে বলিবে, 'তোমরা সকলেই মরিতে বসিয়াছ। কিন্তু যদি তোমরা আমাদের মতবাদে বিশ্বাস কর, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের মুক্ত করিবেন।' যদি ইহা সত্য হইত—কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—তাহা হইলে খ্রীষ্টান দেশগুলিতে কোন অন্যায় থাকিত না। 'এস, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করি, বিশ্বাস করিতে কোন খরচ লাগে না।' কিন্তু কেন? ইহাতে কোন লাভও হয় না! যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এখানে এত অধিক লোক দুষ্ট কেন?' তাঁহারা বলেন, 'আমাদিগকে আরও খাটিতে হইবে।' (তার মানে) 'ভগবানে বিশ্বাস রাখ, কিন্তু তল্পী ঠিক রাখ।' ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর এবং ভগবান্ আসিয়া সাহায্য করুন। কিন্তু আমিই তো সংগ্রাম, প্রার্থনা এবং পূজা করি; আমিই তো আমার সমস্যা-সকল মিটাইয়া লই—আর ভগবান্ লন তাঁহার কৃতিত্ব। ইহা তো ভাল নয়। আমি কখনও তাহা করি না।

একবার আমি এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি অবশ্যই আপনার কল্যাণ কামনা করব, মহাশয়া।—আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানুন।' আমি যখন কাজ করি, আমি আমার প্রতিই কর্তব্য করি, যেহেতু আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, এবং বর্তমানে যাহা আমার আছে, তাহা সবই উপার্জন করিয়াছি—সেহেতু আমি ধন্য।

তুমিই তো সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, অথচ ধন্যবাদ জানাইতেছ অপরকে, কারণ তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তুমি ভীত। হাজার বছরের পুঞ্জীভূত এই-সব কুসংস্কার চিরতরে ঝাড়িয়া ফেল। ধার্মিক হওয়া একটু কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। সকল কুসংস্কারই জড়বাদ-প্রসূত, কারণ সেইগুলি কেবল দেহজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার কোন কুসংস্কার নাই—ইহা শরীরের বৃথা বাসনা হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

কিন্তু এই বৃথা বাসনাগুলি এখানে সেখানে—এমন কি অধ্যাত্ম-রাজ্যেও প্রতিভাত। আমি কতকগুলি প্রেততত্ত্বের সভায় যোগদান করিয়াছি। একটিতে নায়িকা ছিলেন একজন মহিলা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনার মা ও ঠাকুরদা আমার কাছে আসেন।' তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহিলাটিকে নমস্কার জানাইয়াছেন ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন। কিন্তু আমার মা এখনও জীবিত! মানুষ এই কথা ভাবিতে ভালবাসে যে, মৃত্যুর পরে তাহাদের আত্মীয়পরিজন এই দেহের আকারেই বর্তমান থাকে, আর প্রেততাত্ত্বিকগণ তাহাদের কুসংস্কারগুলিকে লইয়া খেলায়। এই কথা জানিলে আমি দুঃখিতই হইব যে, আমার মৃত পিতা এখনও তাঁহার নোংরা দেহটি পরিধান করিয়া অছেন। পিতৃপুরুষগণ এখনও জড়বস্তুতে আবদ্ধ আছেন, এই কথা জানিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সান্ত্বনা পায়। অপর একস্থলে যীশুকে আমার সামনে আনা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, 'ভগবান্, আপনার কুশল তো?' এই সব ব্যাপারে আমি হতাশ বোধ করি। যদি সেই মহান্ ঋষিপুরুষ অদ্যাপি ঐ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের—দীন প্রাণীদের ভাগ্যে না জানি কী আছে! প্রেততাত্ত্বিকগণ আমাকে ঐ-সকল পুরুষদের কাহাকেও স্পর্শ করিবার অনুমতি দেন নাই। যদি এই-সব সত্যও হয়—তবু আমি ঐ-সকল চাহি না। আমি ভাবিঃ সাধারণ মানুষ সত্যি নাস্তিক!—কেবল পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহা! বর্তমানে যাহা আছে, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া মৃত্যুর পরও তাহারা এই জিনিষই বেশী করিয়া চায়!

বেদান্তের ঈশ্বর কি? তিনি একটি তত্ত্বস্বরূপ, ব্যক্তি নন। তুমি, আমি সকলেই ব্যষ্টি- ঈশ্বর। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা যে পরম-ঈশ্বর, তিনি একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তুমি এবং আমি, বেড়াল, ইঁদুর, শয়তান, ভূত—এই-সবই তাঁহার ব্যষ্টি-সত্তা—সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। তুমি ব্যষ্টিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাও; উহা তোমার স্বরূপকেই পূজা করা। যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তবে কখনও কোন গীর্জায় যাইও না। বাহিরে এস, যাও নিজেকে ধৌত কর। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কার তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, যতক্ষণ না তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ বারে বারে নিজেকে ধৌত কর। অথবা সম্ভবতঃ তোমরা তাহা করিতে চাও না—কারণ এদেশে তোমরা ঘন ঘন স্নান কর না—ঘন ঘন স্নান করা ভারতীয় প্রথা, ইহা তোমাদের সমাজে প্রচলিত নয়।

আমি বহুবার জিজ্ঞাসিত হইয়াছিঃ 'তুমি এত হাস কেন ও এত ঠাট্টা বিদ্রূপ কর কেন?' মাঝে মাঝে আমি খুব গম্ভীর হই—যখন আমার খুব পেট-বেদনা হয়! ভগবান্ আনন্দময়। তিনি সকল অস্তিত্বের পিছনে। তিনিই সকল বস্তুর মঙ্গলময় সত্তাস্বরূপ। তোমরা তাঁহার অবতার। ইহাই তো গৌরবময়। যত তুমি তাঁহার সমীপবর্তী হইবে, তোমার শোক বা দুঃখজনক অবস্থা তত কম আসিবে। তাঁহার কাছ হইতে যত দূরে যাইবে ততই দুঃখে তোমার মুখ বিশুষ্ক হইবে। তাঁহাকে আমরা যত অধিক জানিতে পারি, তত ক্লেশ অন্তর্হিত হয়। যদি ঈশ্বরময় হইয়াও কেহ শোকগ্রস্ত হয়, তবে সেইরূপ পরিস্থিতির প্রয়োজন কি? এইরূপ ঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি? তাঁহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও! আমরা তাঁহাকে চাই না।

কিন্তু ভগবান্ অনাদি নিরাকার সত্তা—ত্রিকালে অবাধিত সত্য, অব্যয়, শাশ্বত অভয়; আর তোমরা তাঁহার অবতার, তাঁহার রূপায়ণ। ইহাই বেদান্তের ঈশ্বর, আর তাঁহার স্বর্গ সর্বত্র অবস্থিত। যত ব্যষ্টি দেবতা আছেন, সব এই স্বর্গে বাস করেন, আর তোমরা সবও তো তাই। মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা দূর হউক।

কিসের জন্য প্রার্থনা কর? স্বর্গে যাইবার জন্য, কোন বস্তু লাভের আশায় আর অপর কেহ বঞ্চিত থাক্—এইজন্য। 'প্রভু, আমি আরও খাদ্য চাই! অপরে ক্ষুধার্ত থাক্!' ঈশ্বর—যিনি সত্যস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, সদা আনন্দময় সত্তা, যাহাতে কোন খণ্ড নাই, চ্যুতি নাই, যিনি সদামুক্ত, সদাপূত, সদাপূর্ণ—তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা! আমরা আমাদের যত মানবীয় বৈশিষ্ট্য বৃত্তি ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহাতে আরোপিত করিয়াছি। তাঁহাকে অবশ্যই আমাদের খাদ্য ও বসন যোগাইতে হইবে। বস্তুতঃ এই-সব আমাদের নিজেদের

করিয়া লইতে হইবে আর কেহ কখনও এইগুলি আমাদের জন্য করিয়া দেয় নাই। এই তো সদা সত্য কথা।

কিন্তু তোমরা এই-বিষয়ে খুব কমই ভাব। তোমরা ভাব, এমন এক ভগবান্ আছেন তোমরা যাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র, যিনি তোমাদের প্রার্থনা মাত্রই তোমাদের জন্য কাজ করিয়া দেন; আর তোমরা তাঁহার নিকট সকল মানুষ সকল প্রাণীর জন্য করুণা প্রার্থনা কর না—কর কেবল নিজের জন্য, তোমার নিজস্ব পরিবারের জন্য, তোমাদের জাতির জন্য। যখন হিন্দুগণ খাইতে পায় না—তখন তোমরা গ্রাহ্যই কর না; সে-সময় তোমরা কল্পনাও কর না যে, খ্রীষ্টানদের যিনি ঈশ্বর, তিনি হিন্দুদেরও ঈশ্বর। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজা সবই অবিদ্যা-প্রভাবে আমাদের নিজেদের 'দেহ' ভাবনা করা-রূপ মূর্খতার দ্বারা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাদের ভাল নাও লাগিতে পারে। আজ তোমরা আমাকে অভিশাপ দিতে পার, কিন্তু কাল তোমরা আমাকে অভিনন্দিত করিবে।

আমরা অবশ্যই চিন্তাশীল হইব। প্রত্যেক জন্মই বেদনাদায়ক। আমাদিগকে অবশ্যই জড়বাদ হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। জগন্মাতা হয়তো আমাদের তাঁহার গণ্ডীর বাহিরে আসিতে দিবেন না; তাহা হউক আমরা নিশ্চিত চেষ্টা করিব। এই সংগ্রামই তো সকল প্রকারের পূজা; আর বাকী যাহা কিছু সব ছায়ামাত্র। তুমিই তো ব্যষ্টিদেবতা। এখনই আমি তোমার পূজা করিতেছি। এই তো সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা—সমগ্র জগতের পূজা করা অর্থাৎ এইভাবে জগতের সেবা করা। আমি জানি, ইহা একটি উচ্চ ভাবভূমিতে দাঁড়ান—ইহাকে ঠিক উপাসনার মত মনে হয় না; কিন্তু ইহাই সেবা, ইহাই পূজা।

অসীম জ্ঞান কর্মসাধ্য নয়। জ্ঞান সর্বকালে এইখানেই, অজর ও অজাত। তিনি, জগদীশ্বর জগতের প্রভু—সকলের মধ্যে বিরাজিত। এই শরীরই তাঁহার একমাত্র মন্দির। এই একটি মন্দিরই চিরকাল ছিল। এই আয়তনে—শরীরে তিনি অধিষ্ঠিত—তিনি আত্মারও আত্মা—রাজারও রাজা। আমরা এই কথা বুঝিতে পারি না, আমরা তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি বা প্রতিমা গড়ি এবং তাহার উপর মন্দির নির্মাণ করি। ভারতে এই বেদান্ততত্ত্ব সর্বকালে আছে, কিন্তু ভারত এই-সব মন্দিরে পরিপূর্ণ। আবার কেবল মন্দিরই নয়—অনেক গুহা আছে, যাহার মধ্যে বহু খোদিত মূর্তি রহিয়াছে। 'মূর্খ গঙ্গার তীরে বাস করিয়া জলের নিমিত্ত কূপ খনন করে!' আমরা তো এইরূপই! ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা প্রতিমা গড়ি। আমরা তাঁহাকে মূর্তিতে প্রতিফলিত দেখিতে চাই—যদিও সর্বদা তিনি আমাদের শরীরের মন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন। আমরা সকলেই উন্মাদ—আর ইহাই বিরাট ভ্রম।

সব জিনিষকে ভগবান্ বলিয়া পূজা কর—প্রত্যেকটি আকৃতিই তাঁহার মন্দির। বাদ-বাকী সব প্রতারণা—ভ্রম। সর্বদা অন্তর্মুখী হও, কখনও বহির্মুখী হইও না। এইরূপ ঈশ্বরের কথাই বেদান্ত প্রচার করে—আর এই তাঁহার পূজা। স্বভাবতই বেদান্তে কোন সম্প্রদায়, ধর্ম বা জাতিবিচার নাই। কিভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হইতে পারে?

শত শত জাতিবিভাগ! যদি কেহ অপরের খাদ্য স্পর্শ করে, তবে চীৎকার করিয়া উঠিবে—'প্রভু, আমাকে রক্ষা কর—আমি অপবিত্র হইলাম!' পাশ্চাত্য পরিদর্শন করিয়া আমি যখন ভারতে ফিরিয়া গেলাম, তখন পাশ্চাত্যদের সহিত আমার মেলামেশা ও আমি যে গোঁড়ামির নিয়মাবলী ভঙ্গ করিয়াছি, ইহা লইয়া কয়েকজন প্রাচীনপন্থী খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যে আমার বেদের তত্ত্ব প্রচার করা তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন নাই।

আমরা যদি সকলেই আত্মস্বরূপ ও এক, তবে কেমন করিয়া ধনী দরিদ্রের প্রতি, বিজ্ঞ অজ্ঞের প্রতি মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতে পারে? বেদান্তের ভাবে পরিবর্তিত না হইলে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা কি করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? অধিকসংখ্যক যথার্থ বিজ্ঞ লোক পাইতে সহস্র সহস্র বৎসর সময় লাগিবে। মানুষকে নূতন পথ দেখান—মহৎ ভাব দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। পুরানো কুসংস্কারগুলি তাড়ান আরও কঠিন—খুবই কঠিন কাজ, সেগুলি সহজে লোপ পায় না। এত শিক্ষা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ অন্ধকার দেখিতে ভয় পান—শিশুকালের গল্পগুলি তাঁহাদের মনে আসিতে থাকে এবং তাঁহারা ভূত দেখেন।

'বেদ', এই শব্দটির অর্থ জ্ঞান এবং ইহা হইতে 'বেদান্ত' শব্দটি আসিয়াছে। সব জ্ঞানই বেদ, ইহা অনন্ত ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত। জ্ঞান কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও জ্ঞানকে সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছ? ইহাকে আবিষ্কার করা যায়—যাহা আবৃত ছিল, তাহাকে অনাবৃত করা যায়। জ্ঞান সর্বদা এইখানেই অবস্থিত, কারণ জ্ঞানই স্বয়ং ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞান—সবই আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। তাহাকে আমরা আবিষ্কার করি—এই পর্যন্ত। এই-সব জ্ঞানই সাক্ষাৎ ভগবান্। 'বেদ' এক মহদায়তন সংস্কৃত গ্রন্থ। আমাদের দেশে যিনি বেদপাঠ করেন, তাঁহার সম্মুখে আমরা নতজানু হই। আর যে ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। এটা কুসংস্কার—মোটেই বেদান্ত মত নয়—এও জঘন্য জড়বাদ। ঈশ্বরের নিকট সকল জ্ঞানই পবিত্র; জ্ঞানই ঈশ্বর। অনন্ত জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে সকল মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। যদিও তোমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তোমরা সত্য সত্যই অজ্ঞ নও। তোমরা ভগবানের শরীর—তোমরা সকলেই। তোমরা সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র অবস্থিত, দিব্যসত্তার অবতার। তোমরা আমাকে উপহাস করিতে পার, কিন্তু একদিন সময় আসিবে, যখন তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে, অবশ্যই বুঝিবে—কেহই বাকী থাকিবে না।

লক্ষ্য কি? যাহা আমি বলিয়াছি—বেদান্ত; ইহা কোন নূতন ধর্ম নয়। খুব পুরাতন—ঈশ্বরের মত পুরাতন। এই ধর্ম স্থান বা কালে সীমিত নয়—ইহা সর্বত্র বিরাজিত। এই সত্য সকলেই জানে। আমরা সকলেই এই সত্য অন্বেষণ করিতেছি। সমগ্র বিশ্বেরও ঐ একই গতি। ইহা এমন কি বহিঃপ্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি পরমাণু ঐ লক্ষ্যের দিকে প্রচণ্ডগতিতে ছুটিতেছে। আর তুমি কি মনে কর যে, অনন্ত শুদ্ধ এই জীবগণের কেহ পরম সত্য লাভ না করিয়া পড়িয়া থাকিবে? সকলেই পাইবে—সকলেই একই লক্ষ্যপানে অন্তর্নিহিত দেবত্বের আবিষ্কার করিতে চলিয়াছে। পাগল, খুনী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ—যে-মানুষ বিচারের প্রহসনে এ দেশে শাস্তি পায়, সকলেই একই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবলমাত্র যাহা আমরা অজ্ঞানে করিতেছিলাম, তাহা সজ্ঞানে ও ভালভাবে করা আমাদের কর্তব্য।

সকল সত্তার ঐক্যবোধ তোমাদের সকলের মধ্যে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এ-পর্যন্ত কেহ উহা না লইয়া জন্মায় না। যতই তোমরা অস্বীকার কর না কেন, ঐ বোধ ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। মানবীয় প্রেম কি? উহা কমবেশী এই ঐক্যবোধেরই স্বীকৃতি। 'আমি তোমাদের সহিত এক—আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ও কন্যা, আমার বন্ধু।' কেবল তোমরা না জানিয়া এই ঐক্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলিতেছ, 'কেহ পতির জন্য পতিকে কখনই ভালবাসে নাই, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসিয়াছে।' পত্নী এইখানেই ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। পত্নীর মধ্যে পতি নিজেকে দেখিতে পান—স্বভাবতই দেখিতে পান, কিন্তু তাহা তিনি জ্ঞানতঃ—সচেতনভাবে পান না। সমগ্র বিশ্বই একটি অস্তিত্বে গ্রথিত। এ-ছাড়া অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। বিভিন্নতা হইতে আমরা সকলে একটি বিশ্বাস্তিত্বের দিকে চলিয়াছি। পরিবারগুলি গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠীগুলি উপজাতিতে, উপজাতিগুলি জাতিতে, জাতিগুলি মানবত্বে, কত বিভিন্ন মত—একত্বের দিকে চলিয়াছে। এই একত্বের অনুভূতিই জ্ঞান—বিজ্ঞান।

ঐক্যই জ্ঞান—নানাই অজ্ঞান। এই জ্ঞানে তোমাদের জন্মগত অধিকার। তোমাদিগকে এই তত্ত্ব শিখাইতে হইবে না। বিভিন্ন ধর্ম এই জগতে কখনই ছিল না। আমরা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি বা না করি, মুক্তি আমরা লাভ করিবই—ইহা আমাদের নিয়তি। যেহেতু তোমরা মুক্তস্বভাব, এই অবস্থা তোমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে এবং তোমরা মুক্ত হইয়া যাইবে। আমরা মুক্তই আছি, কেবল ইহা আমরা জানি না, আর আমরা এ পর্যন্ত কি করিতেছি, তাহাও আমরা জানি না। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে ও আদর্শে একই নীতিকথা বর্তমান; কেবল একটি কথাই প্রচারিত হইয়াছে—'নিঃস্বার্থ হও, অপরকে ভালবাস।' কেহ বলিতেছে, 'কারণ যিহোভা আদেশ করিয়াছেন।' 'আল্লাহ্'—মুসলিম বলিবেন। অপরে বলিবেন—'যীশু।' যদি ইহা কেবল যিহোভারই আদেশ, তবে যাহারা যিহোভাকে জানে না, তাহাদের নিকট ইহা কিভাবে আসিল? যদি যীশুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি যীশুকে কখনও জানে না, সে কি করিয়া ইহা পাইল? যদি বিষ্ণুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তবে য়াহুদীগণ, যাহারা সেই ভদ্র-লোকের সঙ্গে কখনই পরিচিত নয়, কিভাবে তাহা পাইল? এই-সব হইতে মহত্তর আর একটি উৎস আছে। কোথায় সেইটি? তাহা ভগবানের সনাতন মন্দিরে—নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল প্রাণীর অন্তরাত্মায় এই তত্ত্ব নিহিত। সেই অনন্ত নিঃস্বার্থতা, সেই অনন্ত আত্মোৎসর্গ, ঐক্যের দিকে ফিরিবার সেই অনন্ত বাধ্যবাধকতা—এই সবই সেইখানে রহিয়াছে।

অবিদ্যার অজ্ঞানের জন্য আমরা খণ্ডিত, সীমিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি, এবং আমরা তাই ক্ষুদ্র, শ্রীমতী অমুক ও শ্রীঅমুক হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতি প্রতি পলকে এই ভ্রম—এই মিথ্যা প্রতীতি জন্মাইতেছে। আমি কখনও অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পুরুষ বা ক্ষুদ্র নারী নহি, আমি এই বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব। আত্মা প্রতি মুহূর্তে আপন মহিমায় উন্নীত হইতেছে ও ইহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব ঘোষণা করিতেছে।

বেদান্ত সর্বত্রই বিদ্যমান, কেবল তোমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে। পুঞ্জীকৃত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারগুলিই আমাদের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ। যদি আমরা সক্ষম হই, তবে আইস, আমরা ঐ-সবগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলি এবং ধারণা করিতে শিখি যে, ঈশ্বর চেতনাস্বরূপ এবং তাঁহার পূজা জ্ঞান ও সত্যের মধ্য দিয়া করিতে হয়। জড়বাদী হইবার জন্য কখনও সচেষ্ট হইও না। সকল জড়কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। ঈশ্বরের কল্পনা অবশ্যই যথার্থ আধ্যাত্মিক হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাগুলি কমবেশী জড়বাদ-ঘেঁষা—এগুলিকে দূর করিতে হইবে। মানুষ যত বেশী আধ্যাত্মিক হইতে থাকে, তত সে এই সকল ভাব পরিত্যাগ করে ও এইগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যায়। বস্তুতঃ সকল দেশেই এমন কয়েকজন লোক সর্বকালে আসিয়াছেন, যাহারা এই সব জড়বাদ ছুঁড়িয়া ফেলিবার শক্তি রাখেন এবং প্রখর দিবালোকে দণ্ডায়মান হইয়া জ্ঞানস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারাই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন।

সবই এক আত্মা—বেদান্তের এই জ্ঞান যদি প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজই অধ্যাত্মভাবে ভাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি জানি না। সহস্র বৎসরেও তাহা হইবে না। পুরাতন সংস্কারগুলি সব দূরীভূত হইবে। তোমরা সকলেই পুরাতন সংস্কারগুলিকে কিভাবে চিরন্তন করা যায়, তাহাতেই উৎসাহিত। আবার পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠীগত ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত সৌভ্রাত্র—এই সকল ভাবও বিদ্যমান। এই সকলই বেদান্ত উপলব্ধির বাধাস্বরূপ। ধর্ম অতি সামান্য কয়েকজনের নিকটই ঠিক ঠিক ধর্ম।

গোটা পৃথিবীতে ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁহারা কর্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মী। ইহাই মানুষের ইতিহাস। তাঁহারা কদাচিৎ সত্যের সহিত মিলাইয়া জীবন-ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদাই সমাজ নামক ঈশ্বরের পূজক ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের বিশ্বাস—তাহাদের কুসংস্কার, তাহাদের দুর্বলতাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই, নিজদিগকে প্রকৃতির অনুকূলে করিয়াছেন—ইহার বেশী কিছু নয়। ভারতে গিয়া নূতন ধর্মমত প্রচার কর—কেহ তোমার কথা শুনিবে না। কিন্তু যদি বল যে, বেদ হইতে ঐ মত প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহারা বলিবে—'ভাল কথা।' এখানে আমি এই মতবাদ প্রচার করিতে পারি, কিন্তু তোমরা—তোমাদের কয়জন আমার কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে? কিন্তু সমগ্র সত্য এইখানেই বর্তমান এবং আমি তোমাদিগকে সত্য কথাই বলিব।

এই প্রশ্নের অপর একটি দিকও আছে। সকলেই বলেন, চরম বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধি হঠাৎ আসিতে পারে না এবং পূজা প্রার্থনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় সাধনার পথে মানুষকে ধীরে ধীরে আগাইয়া যাইতে হইবে। এইটি ঠিক পথ কিনা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। ভারতে আমি উভয় পথ ধরিয়াই কাজ করি।

কলিকাতায় আমাদের এই-সব প্রতিমা ও মন্দির রহিয়াছে—ঈশ্বরের ও বেদের নামে—বাইবেল এবং যীশু ও বুদ্ধের নামে। চেষ্টা চলুক। কিন্তু হিমালয়ের উপরে আমার একটি স্থান আছে, যেখানে বিশুদ্ধ সত্য ব্যতীত আর কিছুরই প্রবেশাধিকার থাকিবে না—এরূপ মনঃস্থ করিয়াছি। সেইখানে তোমাদিগকে আজ আমি যে-ভাবের কথা বলিলাম, তাহা কার্যে পরিণত করিতে চাই। একটি

ইংরেজ-দম্পতি ঐ স্থানের দায়িত্বে রহিয়াছেন। উদ্দেশ্য—সত্যানুসন্ধিৎসুদের শিক্ষিত করা এবং বালক-বালিকাদিগকে ভয়হীন ও কুসংস্কারহীন ভাবে গড়িয়া তোলা। তাহারা যীশু, বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু—ইত্যাদি কাহারও বিষয় শুনিবে না। তাহারা প্রথম হইতেই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে। তাহারা বাল্যকাল হইতেই শিখিবে যে, ঈশ্বরই চেতনা এবং তাঁহার পূজা সত্য ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া করিতে হয়। সকলকেই চেতনা-রূপে দেখিতে হয়—ইহাই আদর্শ। আমি জানি না, ইহাতে কি ফল হইবে। আজ আমার যেরূপ মনে হইতেছে, সেরূপ প্রচার করিতেছি। আমার মনে হইতেছে—যেন দ্বৈত সংস্কার বাদ দিয়াই আমি সম্পূর্ণ এইভাবেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম। দ্বৈতবাদে যে কিছু ভাল হইতে পারে—তাহাতে যে আমি মাঝে-মাঝে সম্মতি জানাই, তাহার কারণ ইহা দুর্বল ব্যক্তিকে সাহায্য করে। যদি তোমাকে কেহ ধ্রুবতারা দেখাইয়া দিতে বলে, তবে প্রথমে তুমি তাহাকে ধ্রুবতারার নিকটবর্তী কোন উজ্জ্বল তারকা দেখাও, তারপর একটি অনতি-উজ্জ্বল তারকা, তারপর একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা, পরিশেষে ধ্রুবতারা দেখাও। এই পদ্ধতিতে তাহার পক্ষে ধ্রুবতারা দেখা সহজ হয়। এই-সব বিভিন্ন উপাসনা ও সাধনা, বাইবেল-জাতীয় গ্রন্থ ও দেবতা সকল ধর্মের প্রাথমিক সোপান—ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন মাত্র।

কিন্তু তারপর আমি ইহার অপর দিকটির কথা ভাবি। যদি এই মন্থর ও ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ কর, তবে জগতের এই সত্যে পৌঁছাইতে কতদিন লাগিবে? কত দিন? আর ইহা যে প্রশংসনীয় রূপে সাফল্য লাভ করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এই পর্যন্ত তাহা হয় নাই। দুর্বলদের পক্ষে ক্রমিক অথবা অক্রমিক, সহজ অথবা কঠিন, যাহাই হউক না কেন—দ্বৈতবাদ-সম্মত সাধন কি মিথ্যাভিত্তিক নয়? প্রচলিত ধর্মীয় সাধনগুলি মানুষকে দুর্বল করিতেছে, সুতরাং সেগুলি কি ভুল নয়? ঐগুলি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—মানুষের ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। দুটি ভুল কি একটি সত্য সৃষ্টি করিতে পারে? মিথ্যা কি সত্য হয়? অন্ধকার কি আলোকে পরিণত হয়?

আমি একজন মহামানবের ক্রীতদাস—তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার বার্তাবহ; আমি পরীক্ষা করিতে চাই। বেদান্তের যে সত্যগুলি তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা লইয়া ইতঃপূর্বে কেহ সত্যিকারের গবেষণা করে নাই। যদিও বেদান্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন—ইহা সর্বদাই কুসংস্কার ও অন্যান্য জিনিষের সহিত মিশ্রিত হইয়া ছিল।

যীশু বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক', এবং তোমরা তাহার পুনরাবৃত্তি কর। তথাপি ইহা মানবসমাজকে সাহায্য করে নাই। উনিশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষ এই বাণী বোঝে নাই। তাহারা যীশুকে মানবের পরিত্রাতা করিয়াছে। তিনি ঈশ্বর, আর আমরা কীট! ঠিক এইরূপ ভারতবর্ষে—প্রত্যেক দেশে এই ধরনের বিশ্বাসই সম্প্রদায়বিশেষের মেরুদণ্ড।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে—জগৎপ্রভু, অবতার, পরিত্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে; শেখানো হইয়াছে—তাহারা নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন, এইগুলি মানুষকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন।

সময় আসিতেছে—যখন মহান্ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনা-রূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

যোগ ও মনোবিজ্ঞান

যোগ ও মনোবিজ্ঞান

পাশ্চাত্যে মনোবিজ্ঞানের ধারণা অতি নিম্নস্তরের। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান; কিন্তু পাশ্চাত্যে ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে—অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ইহাকেও উপযোগিতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। কার্যতঃ মানবসমাজের উপকার ইহার সাহায্যে কতটা সাধিত হইবে? আমাদের ক্রমবর্ধমান সুখ ইহার মাধ্যমে কতদূর বর্ধিত হইবে? যে-সকল দুঃখ-বেদনায় আমরা নিয়ত পীড়িত হইতেছি, সেগুলি ইহা দ্বারা কতদূর প্রশমিত হইবে? পাশ্চাত্যে সব-কিছুই এই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

মানুষ সম্ভবতঃ ভুলিয়া যায় যে, আমাদের জ্ঞানের শতকরা নব্বই ভাগ স্বভাবতই মানুষের পার্থিব সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধির উপর কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই দৈনন্দিন জীবনে কার্যতঃ প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, আমাদের চেতনমনের অতি সামান্য অংশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে এবং ঐ সামান্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই জীবন ও মনের সব-কিছু বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবচেতন মনের বিশাল সমুদ্রে উহা একটি সামান্য বিন্দুমাত্র। যদি আমাদের অস্তিত্ব শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমরা যে-সব জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলি শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা হয় না। পশুস্তর হইতে যতই আমরা উপরে উঠিতে থাকি, আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ-বাসনা ততই হ্রাস পাইতে থাকে এবং বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বোধের সহিত আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে এবং 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের অনুশীলন'—এই ভাবটি ইন্দ্রিয়সুখ-নিরপেক্ষ হইয়া মনের পরম আনন্দের বিষয় হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্যে প্রচলিত পার্থিব লাভের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের সেরা। কেন? আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়ের দাস, নিজেদের চেতন ও অবচেতন মনের দাস। কোন অপরাধী যে স্বেচ্ছায় কোন অপরাধ করে—তাহা নয়, শুধু নিজের মন তাহার আয়ত্তে না থাকাতেই সে ঐরূপ করিয়া থাকে, এবং এইজন্য সে তাহার চেতন ও অবচেতন মনের, এমন কি প্রত্যেকের মনেরও দাস হয়। সে নিজ মনের প্রবলতম সংস্কারবশেই চালিত হয়। সে নিরুপায়। সে নিজ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—বিবেকের কল্যাণকর নির্দেশ এবং নিজের সৎস্বভাবের বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। সে তাহার মনের প্রবল নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। বেচারী মানুষ নিতান্তই অসহায়।

প্রতিনিয়ত ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অন্তরের শুভনির্দেশ আমরা প্রতিনিয়ত অগ্রাহ্য করিতেছি এবং পরে ঐজন্য নিজেরাই নিজেদের ধিক্কার দিতেছি। আমরা বিস্মিত হই—কিভাবে ঐরূপ জঘন্য চিন্তা করিয়াছিলাম, এবং কিভাবেই বা ঐ প্রকার হীনকার্য আমাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। অথচ আমরা পুনঃপুনঃ ইহা করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ ইহার জন্য দুঃখ ও আত্মগ্লানি ভোগ করি। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের মনে হয় যে, ঐ কর্ম করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহা নয়, আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ইহা করিয়াছিলাম। আসলে আমরা নিরুপায়! আমরা সকলেই নিজেদের মনের ক্রীতদাস এবং অপরের মনেরও। ভালমন্দের তারতম্য এক্ষেত্রে প্রায় অর্থহীন। অসহায়ের ন্যায় আমরা ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি। আমরা মুখেই বলি, আমরা নিজেরা করিতেছি, ইত্যাদি; কিন্তু আসলে তাহা নয়।

চিন্তা করিতে এবং কাজ করিতে বাধ্য হই বলিয়া আমরা চিন্তা এবং কাজ করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের এবং অপরের দাস। আমাদের অবচেতন মনের অতি গভীরে অতীতের চিন্তা ও কর্মের যাবতীয় সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—শুধু এ-জীবনের নয়, পূর্ব পূর্ব জীবনেরও। এই অবচেতন মনের অসীম সমুদ্র অতীতের চিন্তা ও কর্মরাশিতে পরিপূর্ণ। এই-সকল চিন্তা ও কর্মের প্রত্যেকটি স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা করিতেছে, নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, একটি অপরটিকে অতিক্রম করিয়া চেতন-মানসে রূপ পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইতেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গের আকারে, উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে তাহাদের প্রবাহ। এই-সকল চিন্তা ও পুঞ্জীভূত শক্তিকেই আমরা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, প্রতিভা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করি, কারণ উহাদের যথার্থ উৎপত্তিস্থল আমরা জানি না।

অন্ধের মত বিনা প্রতিবাদে উহাদের নির্দেশ আমরা পালন করি। ফলে দাসত্ব—চরম অসহায় দাসত্ব আমাদিগকে চাপিয়া ধরে, অথচ নিজেদের 'মুক্ত' বলিয়া আমরা প্রচার করি। হায়, আমরা নিজেদের মনকে নিমেষের জন্য সংযত করিতে পারি না, বস্তু-বিশেষে উহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারি না, বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মুহূর্তের জন্য একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না! অথচ আমরাই নিজেদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখ। যেভাবে করা উচিত বলিয়া আমরা জানি, অতি অল্প সময়ের জন্যও আমরা সেভাবে করিতে পারি না। মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয়-বাসনা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে তৎক্ষণাৎ আমরা উহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ি। এরূপ দুর্বলতার জন্য আমরা বিবেক-দংশন ভোগ করি, কিন্তু পুনঃপুনঃ আমরা এইরূপই করিয়া থাকি এবং সর্বদাই ইহা করিতেছি। যত চেষ্টাই করি না কেন, একটি উচ্চমানের জীবন আমরা যাপন করিতে পারি না। অতীত জীবন এবং অতীত চিন্তাগুলির ভূত যেন আমাদিগকে দাবাইয়া রাখে। ইন্দ্রিয়গুলির এই দাসত্ব জগতের সকল দুঃখের মূল। জড়দেহের ঊর্ধ্বে উঠিবার অসামর্থ্য—পার্থিব সুখের জন্য চেষ্টা আমাদের সকল দুর্দশা ও ভয়াবহতার হেতু।

মনের এই উচ্ছৃঙ্খল নিম্নগতিকে কিভাবে দমন করা যায়, কিরূপে উহাকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনা যায়, এবং উহার দোর্দণ্ড প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, মনোবিজ্ঞান তাহারই শিক্ষা দেয়। অতএব মনোবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান; উহাকে বাদ দিলে অন্যান্য বিজ্ঞান ও জ্ঞান মূল্যহীন।

অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল মন আমাদিগকে নিয়ত নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে লইয়া যাইবে এবং চরমে আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, ধ্বংস করিবে। আর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মুক্তিদান করিবে। সুতরাং মনকে অবশ্য সংযত করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান আমাদিগকে মনঃসংযমের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়।

যে-কোন জড়বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রচুর তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। ঐ-সকল তথ্য ও উপাদানের বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষার ফলে ঐ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মনের অনুশীলন ও বিশ্লেষণে সকলের সমভাবে আয়ত্ত কোন তথ্য ও বাহির হইতে সংগৃহীত উপাদান পাওয়া যায় না—মন নিজের দ্বারাই বিশ্লেষিত হয়। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলিয়া ধরা যায়। পাশ্চাত্যে মানসিক শক্তিকে, বিশেষতঃ অসাধারণ মানসিক শক্তিকে, অনেকটা যাদুবিদ্যা ও গূঢ় যৌগিকক্রিয়ার সামিল বলিয়া গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ সেই দেশে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত মিশাইয়া ফেলিবার ফলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের অনুশীলন ব্যাহত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে সেই-সকল সাধু-ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাঁহারা সিদ্ধাই-জাতীয় ব্যাপারে অনুরক্ত।

পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্‌গণ একই ফল লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন। তাহার কারণ পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (data) সর্বজনলভ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য, এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের মতই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে এমন কোন তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারেন।

মনের অতি-গভীর প্রদেশে বিরাজ করেন আত্মা, মানুষের প্রকৃত সত্তা। মনকে অন্তর্মুখী কর, আত্মার সহিত সংযুক্ত কর; এবং স্থিতাবস্থার সেই দৃষ্টিকোণ হইতে মনের আবর্তনগুলি লক্ষ্য কর, সেগুলি প্রায় সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ঐ-সকল তথ্য বা উপাত্ত ও ঘটনা কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতিগম্য, যাঁহারা ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন। জগতের অধিকাংশ তথাকথিত অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যেই মনের গতি, প্রকৃতি, শক্তি প্রভৃতি লইয়া প্রভূত মতভেদ দেখা যায়। ইহার কারণ, তাঁহারা মনোজগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের এবং অন্যান্যের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সামান্য কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং ঐ-সকল একান্ত বাহ্য ও ভাসা ভাসা অভিব্যক্তির যথার্থ প্রকৃতি না জানিয়া ঐগুলিকেই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মেই ছিটগ্রস্ত এমন একদল লোক থাকেন, যাঁহারা ঐ-সকল উপাদান, তথ্য প্রভৃতিকে মৌলিক গবেষণার জন্য নির্ভরযোগ্য বিচারের মান বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু সেগুলি তাঁহাদের মস্তিষ্কের উদ্ভট খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদি মনের রহস্য অবগত হওয়াই অভীপ্সিত হয়, তবে তোমাকে নিয়মানুগ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তুমি একটি চেতন স্তরে উঠিতে চাও, যেখান হইতে মনকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং মনের উচ্ছৃঙ্খল আবর্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না, তবে মনকে সংযত করিতে অভ্যাস কর। নতুবা তোমার পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি নির্ভরযোগ্য হইবে না, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং মোটেই যথার্থ উপাদান ও তথ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

যে-সকল মানুষ মনের প্রকৃতি লইয়া গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, দেশ বা মত- নির্বিশেষে তাঁহাদের উপলব্ধি চিরদিন একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। বস্তুতঃ মনের গভীরতম প্রদেশে যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহাদের উপলব্ধি কখনও ভিন্ন হয় না।

অনুভূতি ও আবেগপ্রবণতা হইতেই মানুষের মন ক্রিয়াশীল হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলোক রশ্মি আমার চক্ষুতে প্রবেশ করে, এবং স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তথাপি আমি আলো দেখিতে পাই না। তারপর মস্তিষ্ক ঐ আবেগকে মনে বহন করিয়া লইয়া যায়, তথাপি আমি আলো দেখি না; মনে যখন তাহার প্রতিক্রিয়া জন্মে, তখনই মনে আলোর অনুভূতি হয়। মনের প্রতিক্রিয়াই অনুপ্রেরণা এবং তাহারই ফলে চক্ষু প্রত্যক্ষ দর্শন করে।

মনকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার অবচেতন স্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে, সেখানে যে-সকল চিন্তা ও সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে হইবে, সাজাইতে হইবে এবং সংযত করিতে হইবে। ইহাই প্রথম সোপান। অবচেতন-মনকে সংযত করিতে পারিলেই চেতন মনও বশীভূত হইবে।

মনের শক্তি

[লস এঞ্জেলেস্, ক্যালিফর্নিয়া, ৮ জানুআরী ১৯০০ খ্রীঃ]

সর্ব যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। অসাধারণ ঘটনার কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, এ-বিষয়ে আমাদের অনেকের নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। বিষয়টির প্রস্তাবনারূপে আমি বরং তোমাদের নিকট প্রথমে আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনারই উল্লেখ করিব। একবার এক ব্যক্তির কথা শুনিয়া-ছিলাম; মনে মনে কোন প্রশ্ন ভাবিয়া তাঁহার কাছে যাওয়া মাত্রই তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিতেন; আরও শুনিয়াছিলাম, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। মনে কৌতূহল জাগিল; তাই কয়েকজন বন্ধুসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যেকেই মনে মনে কোন-না-কোন প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিলাম এবং পাছে ভুল হয়, সেজন্য প্রশ্নগুলি এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া নিজ নিজ জামার পকেটে রাখিয়া দিলাম। আমাদের এক একজনের সঙ্গে তাঁহার যেমনি দেখা হইতে লাগিল, অমনি তিনি তাঁহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া উত্তর বলিয়া দিতে লাগিলেন। পরে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া কাগজটি ভাঁজ করিয়া আমার হাতে দিলেন, এবং তাহার অপর পিঠে আমাকে নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'এটি দেখিবেন না, পকেটে রাখিয়া দিন; যখন বলিব, তখন বাহির করিবেন।' আমাদের সকলের সঙ্গেই এই রকম করিলেন। তারপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটিবে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথাও বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, 'আপনাদের যে ভাষায় খুশী, কোন শব্দ বা বাক্য চিন্তা করুন।' আমি সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রকাণ্ড বাক্য মনে মনে আওড়াইলাম; সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতেন না। তিনি বলিলেন, 'পকেট হইতে কাগজটি বাহির করুন তো!' দেখি, তাহাতে সেই সংস্কৃত বাক্যটিই লেখা রহিয়াছে! এক ঘণ্টা আগে তিনি এটি লিখিয়াছিলেন, আর নীচে মন্তব্য দিয়াছিলেন, 'যাহা লিখিয়া রাখিলাম, ইনি পরে সেই বাক্যটিই ভাবিবেন'—ঠিক তাহাই হইল। আমাদের অন্য একজন বন্ধুকেও অনুরূপ একখানি কাগজ দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা স্বাক্ষর করিয়া পকেটে রাখিয়াছিলেন। এখন বন্ধুটিকেও একটি বাক্য চিন্তা করিতে বলিলে তিনি কোরানের একাংশ হইতে আরবী ভাষায় একটি বাক্য ভাবিলেন। ঐ ব্যক্তির সে ভাষা জানিবার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। বন্ধুটি দেখিলেন, সেই বাক্যটিই কাগজে লেখা আছে।

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ডাক্তার। তিনি জার্মান ভাষায় লিখিত কোন ডাক্তারি পুস্তক হইতে একটি বাক্য ভাবিলেন। তাঁহার কাগজে তাহাই পাওয়া গেল।

সেদিন হয়তো কোনরূপ প্রতারিত হইয়াছি ভাবিয়া কিছুদিন পরে আমি আবার সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম। সেদিন আমার সঙ্গে নূতন আর একদল বন্ধু ছিলেন। সেদিনও তিনি অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আর একবার—ভারতে হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় শুনিলাম যে, সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আছেন; তিনি হরেক রকমের জিনিষ বাহির করিয়া দিতে পারেন। কোথা হইতে যে আসে সেগুলি, কেহই জানে না। তিনি একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আমি তাঁহার কৌশল দেখিতে চাহিলাম। ঘটনাচক্রে তখন তাঁহার জ্বর। ভারতে একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন সাধু ব্যক্তি অসুস্থ লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া দিলে তাহার অসুখ সারিয়া যায়। ব্রাহ্মণটি সেজন্য আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, মাথায় হাত বুলাইয়া আমার জ্বর সারাইয়া দিন।' আমি বলিলাম, 'ভাল কথা, তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাইতে হইবে।' তিনি রাজী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছামত আমি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলাম; তিনিও তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বাহিরে আসিলেন। তাঁহার কটিদেশে জড়ানো একফালি কাপড় ছাড়া আমরা তাঁহার দেহ হইতে আর সব পোষাকই খুলিয়া লইলাম। বেশ শীত পড়িয়াছিল, সেজন্য আমার কম্বলখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলাম; ঘরের এক-কোণে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল, আর পঁচিশ জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাঁহার দিকে। তিনি বলিলেন, 'যিনি যাহা চান, কাগজে তাহা লিখিয়া ফেলুন।' সে অঞ্চলে কখনও জন্মে না, এমন সব ফলের নাম আমরা লিখিলাম—আঙুর, কমলালেবু, এই-সব ফল। লেখার পর কাগজগুলি তাঁহাকে দিলাম। তারপর কম্বলের ভিতর হইতে আঙুরের থোলো, কমলালেবু ইত্যাদি সবই বাহির হইল। এত ফল জমিয়া গেল যে, ওজন করিলে সব মিলিয়া তাঁহার দেহের ওজনের দ্বিগুণ হইয়া যাইত। সে-সব ফল আমাদের খাইতে বলিলেন। আমাদের ভিতর কেহ কেহ আপত্তি জানাইলেন, ভাবিলেন ইহাতে সম্মোহনের ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজেই খাইতে শুরু করিলেন দেখিয়া আমরাও সবাই উহা খাইলাম। সেগুলি আসল ফলই ছিল।

সব শেষে তিনি একরাশি গোলাপফুল বাহির করিলেন। প্রত্যেকটি ফুলই নিখুঁত—শিশিরবিন্দু পর্যন্ত রহিয়াছে পাপড়ির উপর; একটিও থেঁতলানো নয়, একটিও নষ্ট হয় নাই। আর একটি দুটি তো নয়, রাশি রাশি ফুল! কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল—জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'সবই হাত-সাফাই এর ব্যাপার।'

তা যে-ভাবেই ঘটুক, এটি বেশ বোঝা গেল যে, শুধু হাত-সাফাই এর দ্বারা এরূপ ঘটানো অসম্ভব। এত বিপুল পরিমাণ জিনিষ তিনি আনিলেন কোথা হইতে?

যাহাই হউক, এরূপ বহু ঘটনা আমি দেখিয়াছি। ভারতে ঘুরিলে বিভিন্ন স্থানে এরূপ শত শত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই এ-সব আছে। এমন কি এদেশেও এ ধরনের অদ্ভুত ঘটনা কিছু কিছু চোখে পড়ে। অবশ্য ভণ্ডামিও বেশ কিছু আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখ—ভণ্ডামি দেখিলেই এ-কথাও তো বলিতে হইবে যে, উহা কোন কিছু সত্য ঘটনার অনুকরণ। কোথাও না

কোথাও সত্য নিশ্চয়ই আছে, যাহার অনুকরণ করা হইতেছে। শূন্য- পদার্থের তো আর অনুকরণ হয় না। অনুকরণ করিতে হইলে অনুকরণ করিবার মত যথার্থ সত্য বস্তু একটি থাকা চাই-ই।

অতি প্রাচীন কালে, হাজার হাজার বছর আগে, ভারতে আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী করিয়াই এই-সব ঘটনা ঘটিত। আমার মনে হয়, যখন কোন দেশে লোকবসতি খুব বেশী ঘন হয়, তখন যেন মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পায়। আবার কোন বিস্তৃত দেশে যদি লোকবসতি খুব পাতলা হয়, তাহা হইলে সেখানে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকতর বিকাশ ঘটে।

হিন্দুদের ধাত খুব বিচারপ্রবণ বলিয়া এই-সব ঘটনার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল; ইহা লইয়া তাঁহারা গবেষণা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্তেও পৌঁছিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহা লইয়া তাঁহারা একটি বিজ্ঞানই গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এ-সব ঘটনা অসাধারণ হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হয়; অতি-প্রাকৃতিক বলিয়া কিছুই নাই। জড়জগতের অন্য যে-কোন ঘটনার মতই এগুলিও নিয়মাধীন। কেহ এইরূপ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলার কোন কারণ নাই; কেন-না এই সিদ্ধান্তগুলি লইয়া যথারীতি গবেষণা ও সাধন করা যায়, এবং এগুলি অর্জন করা যায়। তাঁহারা এই বিদ্যার নাম দিয়াছিলেন 'রাজযোগ'। ভারতে হাজার হাজার লোক এই বিদ্যার চর্চা করে; ইহা সে-জাতির নিত্য-উপাসনার একটি অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, মানুষের মনের মধ্যেই এই-সব অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে। আমাদের মন বিশ্বব্যাপী বিরাট মনেরই অংশমাত্র। প্রত্যেক মনের সঙ্গেই অপরাপর সব মনের সংযোগ রহিয়াছে। একটি মন যেখানেই থাকুক না কেন, গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাহার সত্যিকারের যোগাযোগ রহিয়াছে।

দূরদেশে চিন্তা প্রেরণ করা-রূপ যে একজাতীয় ঘটনা আছে, তাহা কখনও লক্ষ্য করিয়াছ কি? এখানে কেহ কিছু চিন্তা করিল; হয়তো ঐ চিন্তাটি অন্য কোথাও অন্য কাহারও মনে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। হঠাৎ যে এমন হয়, তাহা নয়। উপযুক্ত প্রস্তুতির পরে—কেহ হয়তো দূরবর্তী কাহারও মনে কোন চিন্তা পাঠাইবার ইচ্ছা করে; আর যাহার কাছে পাঠানো হয়, সেও টের পায় যে, চিন্তাটি আসিতেছে; এবং যেভাবে পাঠানো হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উহা গ্রহণ করে—দূরত্বে কিছু যায় আসে না। চিন্তাটি লোকটির কাছে ঠিক পৌঁছায়, এবং সে সেটি বুঝিতে পারে। তোমার মন যদি একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে এখানে থাকে, আর আমার মন অন্য একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে ওখানে থাকে এবং এ দুই-এর মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে আমার মনের চিন্তা তোমার কাছে পৌঁছায় কিরূপে? সাধারণ ক্ষেত্রে আমার চিন্তাগুলি যে তোমার কাছে সোজাসুজি পৌঁছায়, তা নয়; আমার চিন্তাগুলিকে 'ইথার'-এর তরঙ্গে পরিণত করিতে হয়, সেই ইথার-তরঙ্গগুলি তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছিলে সেগুলিকে আবার তোমার নিজের মনের চিন্তায় রূপায়িত করিতে হয়। চিন্তাকে এখন রূপান্তরিত করা হইতেছে, আর সেখানে আবার উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। প্রক্রিয়াটি এক পরোক্ষ জটিল পথে চলে। কিন্তু টেলিপ্যাথিতে (ইচ্ছাসহায়ে দূরদেশে চিন্তা প্রেরণের ব্যাপারে) তাহা করিতে হয় না; এটি প্রত্যক্ষ সোজাসুজি ব্যাপার।

ইহা হইতেই বোঝা যায়, যোগীরা যেরূপ বলিয়া থাকেন মনটি সেরূপ নিরবচ্ছিন্নই বটে। মন বিশ্বব্যাপী। তোমার মন, আমার মন, ছোট ছোট এই-সব মনই সেই এক বিরাট মনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, একই মানস-সমুদ্রের কয়েকটি ছোট ছোট তরঙ্গ; আর মনের এই নিরবচ্ছিন্নতার জন্যই আমরা একজন আর একজনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা পাঠাইতে পারি।

আমাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে—দেখ না। জগৎ জুড়িয়া যেন একটা প্রভাব-প্রসারের ব্যাপার চলিতেছে। নিজ শরীর-রক্ষার কাজে আমাদের শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়, বাকী শক্তির প্রতিটি বিন্দুই দিনরাত ব্যয়িত হইতেছে অপরকে প্রভাবান্বিত করার কাজে। আমাদের শরীর, আমাদের গুণ, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতা—এ-সবই সর্বক্ষণ অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে আবার ঠিক এইভাবেই আমরাও অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছি। আমাদের চারিদিকেই এই কাণ্ড ঘটিতেছে। একটি স্থূল উদাহরণ দিতেছি। কেহ হয়তো আসিলেন, যাঁহাকে তুমি সুপণ্ডিত বলিয়া জান এবং যাঁহার ভাষা মনোরম; ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি তোমার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিলেন না। আর একজন আসিয়া কয়েকটি মাত্র কথা বলিলেন, তাও সুসংবদ্ধ ভাষায় নয়, হয়তো বা ব্যাকরণের ভুলও রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তোমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিলেন। তোমরা অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছ। কাজেই বেশ বোঝা যাইতেছে যে, শুধু কথা সব সময় মনে দাগ কাটিতে পারে না; লোকের মনে ছাপ দিবার কাজে ভাষা—এমন কি চিন্তা পর্যন্ত কাজ করে তিনভাগের একভাগ মাত্র, বাকী দুইভাগ কাজ করে ব্যক্তিটি। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই বাহিরে গিয়া তোমাকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সব পরিবারেই একজন কর্তা আছেন; দেখা যায়—তাঁহাদের ভিতর কয়েকজন এ-কাজে সফলকাম হন, কয়েকজন হন না। কেন? আমাদের সফলতার জন্য আমরা দোষ চাপাই পরিবারের অন্য লোকদের উপর। অকৃতকার্য হইলেই বলি, এই অমুকের দোষে এইরূপ হইল। বিফলতার সময় নিজের দোষ বা দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। নিজেকে নির্দোষ দেখাইতে চায় সকলেই, আর দোষ চাপায় অপর কাহারও বা অপর কিছুর ঘাড়ে, না হয়তো দুর্ভাগ্যের ঘাড়ে। গৃহকর্তারা যখন অকৃতকার্য হন, তখন তাঁহাদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোলা উচিত যে, কেহ কেহ তো বেশ ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেহ কেহ তাহা পারে না কেন? দেখা যাইবে যে, সব নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিটির উপর; পার্থক্য সৃষ্টির কারণ হয় লোকটি নিজে, তাহার উপস্থিতি বা তাহার ব্যক্তিত্ব।

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের কথা ভাবিতে গেলে আমরা সর্বদা দেখিব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁহারা নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। অতীতের বড় বড় সব গ্রন্থকারদের, বড় বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কথা ধর। খাঁটি কথা বলিতে গেলে কয়টি

চিন্তাই বা তাঁহারা করিয়াছেন? মানবজাতির পুরাতন নেতারা যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সবটার কথাই ভাব; তাঁহাদের প্রত্যেকখানি পুস্তক লইয়া উহার মূল্য নির্ধারণ কর। জগতে আজ পর্যন্ত যে-সব যথার্থ চিন্তার, নূতন ও খাঁটি চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির পরিমাণ মুষ্টিমেয়। আমাদের জন্য যে-সব চিন্তা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়া দেখ। গ্রন্থকারেরা যে মহামানব ছিলেন, তাহা তো মনে হয় না, অথচ জীবৎকালে তাঁহারা যে মহামানবই ছিলেন, তাহা সুবিদিত। তাঁহারা এত বড় হইয়াছিলেন কিভাবে? শুধু তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের লেখা গ্রন্থ বা তাঁহাদের বক্তৃতার জন্য তাঁহারা বড় হন নাই; এ-সব ছাড়া আরও কিছু ছিল, যাহা এখন আর নাই; সেটি তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব। আগেই বলিয়াছি, এ ব্যাপারে মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিনভাগের দুইভাগ, আর তাঁহার বুদ্ধির, তাঁহার ভাষার প্রভাব তিনভাগের একভাগ। প্রত্যেকের ভিতরই আমাদের আসল মানুষটি, আসল ব্যক্তিত্বটি প্রকৃত কাজ করে; আমাদের ক্রিয়াগুলি তো শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ। মানুষটি থাকিলে কাজ হইবেই; কার্য কারণকে অনুসরণ করিতে বাধ্য।

সর্ববিধ জ্ঞানদানের, সর্ববিধ শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত ভিতরের মানুষটিকে গড়িয়া তোলা। কিন্তু তাহার বদলে আমরা সব সময় বাহিরটি মাজিয়া ঘষিয়া চাকচিক্যময় করিতেই ব্যস্ত। ভিতর বলিয়া যদি কিছু নাই রহিল, তবে শুধু বাহিরের চাকচিক্য বাড়াইয়া লাভ কি? মানুষকে উন্নত করাই সর্ববিধ শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যে-ব্যক্তি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তিনি সমজাতীয় ব্যক্তিদের উপর যেন যাদুমন্ত্র ছড়াইতে পারেন, তিনি যেন শক্তির একটা আধার-বিশেষ। ঐরূপ মানুষ তৈরী হইয়া গেলে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ হন; এরূপ ব্যক্তিত্ব যে-বিষয়ে নিয়োজিত হইবে, তাহাই সফল করিয়া তুলিবে।

এখন কথা হইতেছে, ইহা সত্য হইলেও আমাদের পরিচিত কোন প্রাকৃতিক নিয়ম সহায়ে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। রসায়নের বা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানসহায়ে ইহা বুঝানো যাইবে কিরূপে? কতখানি 'অক্সিজেন,' কতখানি 'হাইড্রোজেন,' কতখানি 'কার্বন' ইহাতে আছে, কতগুলি অণু কিভাবে সাজানো আছে, কতগুলি কোষ লইয়াই বা ইহা গঠিত হইয়াছে—ইত্যাদির খোঁজ করিয়া এই রহস্যময় ব্যক্তিত্বের কি বুঝিব আমরা? তবু দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তব সত্য; শুধু তাহাই নয়, এই ব্যক্তিত্বটিই আসল মানুষ; এই মানুষটিই বাঁচিয়া থাকে, চলাফেরা করে, কাজ করে; এই মানুষটিই সঙ্গীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের পরিচালিত করে, আর শেষে চলিয়া যায়; তাহার বুদ্ধি, তাহার গ্রন্থ, তাহার কাজ—এগুলি তাহার পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া নিদর্শন মাত্র। বিষয়টি ভাবিয়া দেখ। বড় বড় ধর্মাচার্যদের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের তুলনা করিয়া দেখ। দার্শনিকেরা ক্বচিৎ কখনও কাহারও ভিতরের মানুষটিকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছেন, অথচ লিখিয়া গিয়াছেন অতি অপূর্ব সব গ্রন্থ। অপরদিকে ধর্মাচার্যেরা জীবৎকালেই বহুদেশের লোকের মনে সাড়া জাগাইয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিত্বই এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিকদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার মত ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ। বড় বড় ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তিদের বেলা উহা অতি প্রবল। দার্শনিকদের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করে, আর ধর্মাচার্যদের ব্যক্তিত্ব স্পর্শ করে জীবনকে। একটি হইতেছে যেন শুধু রাসায়নিক পদ্ধতি—কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইয়া একটি আলোর ঝলক সৃষ্টি করিতে পারে, নাও করিতে পারে। অপরটি যেন একটি আলোকবর্তিকা—ক্ষিপ্রবেগে চারিদিকে ঘুরিয়া অপর জীবন-দীপগুলি অচিরে প্রজ্বলিত করে।

যোগ-বিজ্ঞান দাবী করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে ক্রমবর্ধিত করিবার প্রক্রিয়া সে আবিষ্কার করিয়াছে; সে-সব রীতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মানিয়া চলিলে প্রত্যেকেই নিজ ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক বিষয়গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম, এবং সর্ববিধ শিক্ষার রহস্যও ইহাই। সকলেরই পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। গৃহস্থের জীবনে, ধনী দরিদ্র ব্যবসায়ীর জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সকলেরই জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া তোলার মূল্য অনেক। প্রাকৃতিক যে-সব নিয়ম আমাদের জানা আছে, সেগুলিরও পিছনে অতি সূক্ষ্ম সব নিয়ম রহিয়াছে। অর্থাৎ স্থূলজগতের সত্তা, মনোজগতের সত্তা, অধ্যাত্মজগতের সত্তা প্রভৃতি বলিয়া আলাদা আলাদা কোন সত্তা নাই। সত্তা বলিতে যাহা আছে, তাহা একটি-ই। বলা যায়, ইহা যেন একটি ক্রমঃসূক্ষ্ম অস্তিত্ব; ইহার স্থূলতম অংশটি এখানে রহিয়াছে; (একবিন্দু অভিমুখে) এটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে; আমরা যাহাকে 'আত্মা' বলি, তাহাই সূক্ষ্মতম, আমাদের দেহ স্থূলতম। আর মনুষ্যরূপ এই ক্ষুদ্র জগতেও যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই আছে। আমাদের এই বিশ্বটিও ঠিক এইরূপই, জগৎ তাহার স্থূলতম বাহ্যপ্রকাশ, আর ক্রমশঃ একবিন্দু-অভিমুখী হইয়া চলিয়া তাহা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষে ঈশ্বরে পর্যবসিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া আমরা জানি যে, সূক্ষ্মের মধ্যেই প্রচণ্ডতম শক্তি নিহিত থাকে; স্থূলের মধ্যে নয়। কোন লোককে হয়তো বিপুল ভার উত্তোলন করিতে দেখা যায়; তখন তাহার মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠে, তাহার সারা অঙ্গে শ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। এ-সব দেখিয়া আমরা ভাবি, মাংসপেশীর কি শক্তি! কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি যোগায় সুতার মত সরু স্নায়ুগুলিই; মাংসপেশীর সঙ্গে একটিমাত্রও স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র মাংসপেশী কোন কাজই আর করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র স্নায়ুগুলি আবার শক্তি আহরণ করে আরও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি আবার শক্তি পায় চিন্তা নামক সূক্ষ্মতর বস্তুর নিকট হইতে; ক্রমে আরও সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম আসিয়া পড়ে। কাজেই সূক্ষ্মই শক্তির যথার্থ আধার। অবশ্য স্থূল স্তরের গতিগুলিই আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্তরে যে গতি হয়, তাহা দেখিতে পাই না। যখন কোন স্থূল বস্তু নড়ে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, সেজন্য স্বভাবতই গতির সঙ্গে স্থূলের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য মনে করি। কিন্তু সব শক্তিরই যথার্থ আধার সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মে কোন গতি আমরা দেখি না, সে গতি অতি তীব্র বলিয়াই বোধ হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানের সহায়তায়, কোন গবেষণার সহায়তায় যদি বাহ্যপ্রকাশের কারণ-রূপ শক্তিগুলি ধরিতে পারি, তাহা হইলে শক্তির প্রকাশগুলিও আমাদের আয়ত্তে আসিবে। কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্‌বুদ উঠিতেছে; যখন হ্রদের উপরে উঠিয়া উহা ফাটিয়া যায়, তখনই মাত্র উহা আমাদের নজরে পড়ে, তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার মধ্যে কোন সময়ই সেটিকে দেখিতে পাই না। চিন্তার বেলাও চিন্তাটি অনেকখানি পরিণতি লাভ করিবার পর বা কর্মে পরিণত হইবার পর উহা আমাদের অনুভবে আসে। আমরা ক্রমাগত অভিযোগ করি যে, আমাদের চিন্তা—আমাদের কর্ম আমাদের বশে থাকে না। কিন্তু থাকিবে কি করিয়া? যদি সূক্ষ্মগতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, চিন্তারূপে

কর্মরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই যদি চিন্তাকে আরও সূক্ষ্মাবস্থায় তাহার মূলাবস্থায় ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে সবটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখন এমন কোন প্রক্রিয়া যদি থাকে, যাহা অবলম্বনে এই-সব সূক্ষ্মশক্তি ও সূক্ষ্ম কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা, অনুসন্ধান করা, ধারণা করা এবং পরিশেষে এগুলিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শুধু তাহা হইলেই আমরা নিজেকে নিজের বশে আনিতে পারিব। আর নিজের মনকে যে বশে আনিতে পারে, অপরাপর ব্যক্তির মনও তাহার বশে আসিবে নিশ্চিত। এইজন্যই সর্বকালে পবিত্রতা ও নীতিপরায়ণতা ধর্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। পবিত্র ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারে। সব মন একই মনের বিভিন্ন অংশ মাত্র। একটি মৃৎখণ্ডের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার নিকট বিশ্বের সমুদয় মৃত্তিকাই জানা হইয়া গিয়াছে। নিজের মন সম্বন্ধে জ্ঞান যাহার হইয়াছে, নিজের মনকে যে আয়ত্তে আনিয়াছে, সব মনের রহস্যই সে জানে, সব মনের উপরই তাহার প্রভাব আছে।

এখন সূক্ষ্মাংশগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে আমরা বহু শারীরিক দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; সেইরূপ সূক্ষ্মগতিগুলি আয়ত্তে আনিতে পারিলে আমরা বহু দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি; এ-সব সূক্ষ্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতালাভ করিলে বহু বিফলতা এড়াইয়া চলা যায়। এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ইহার উপযোগিতার কথা। তারপর আরও উঁচু কথা আছে।

এখন এমন একটি মতের কথা তুলিতেছি, যাহা লইয়া সম্প্রতি কোন বিচার করিব না, শুধু সিদ্ধান্তটি বলিয়া যাইব। কোন জাতি যে-সব অবস্থার ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই জাতির প্রত্যেক মানুষকেই শৈশবে দ্রুতগতিতে ঐ-সব অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়; যে-সব অবস্থা পার হইয়া আসিতে একটা জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হইয়াছে, সে-সব পার হইতে শিশুটির প্রয়োজন হয় মাত্র কয়েক বছরের—এইটুকু যা প্রভেদ। শিশুটি প্রথমে আদিম অসভ্য মানুষেরই মত থাকে—সে পায়ের তলায় প্রজাপতি দলিয়া চলে। প্রথমাবস্থায় শিশুটি স্বজাতির পূর্বপুরুষেরই মত। যত বড় হইতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে শেষে জাতির পরিণত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। তবে সে ইহা খুব ক্ষিপ্র বেগে ও অল্প সময়ে করিয়া ফেলে। এখন সব মানুষকে একটি জাতি বলিয়া ধর, অথবা সমগ্র প্রাণিজগৎকে—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণিগণ—একটি সমগ্র সত্তা বলিয়া ভাব। এমন একটি লক্ষ্য আছে, যাহার দিকে এই জীব-সমষ্টি অগ্রসর হইতেছে। এই লক্ষ্যকে 'পূর্ণতা' বলা যাক। এমন অনেক নর-নারী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ উন্নতির পূর্বাভাস সূচিত হয়। সমগ্র মানবজাতি যতদিন না পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, যুগ যুগ ধরিয়া বারে বারে জন্ম এবং পুনর্জন্ম বরণ না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ক্ষীপ্রগতিতে সেই যুগ যুগান্তর পার হইয়া যান। আর ইহাও আমাদের জানা আছে যে, আন্তরিকতা থাকিলে প্রগতির এই প্রণালীগুলিকে খুবই ত্বরান্বিত করা সম্ভব। শুধু জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়া কয়েকটি সংস্কৃতিহীন লোককে যদি কোন দ্বীপে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহারা ধীরে ধীরে উচ্চ, উচ্চতর সভ্যতা উদ্ভাবন করিতে থাকিবে। ইহাও আমাদের অজানা নয় যে, কিছু অতিরিক্ত সাহায্য পাইলে এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। আমরা গাছপালার বৃদ্ধির সহায়তা করি; করি না কি? প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিলেও গাছগুলি বাড়িয়া উঠিত, তবে দেরী হইত; বিনা সাহায্যে যতদিনে বাড়িত, তদপেক্ষা অল্প সময়ে বাড়িবার জন্য আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করি। এ-কাজ আমরা সর্বদাই করিতেছি, আমরা কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব না কেন? জাতি হিসাবে আমরা তাহা করিতে পারি। অপর দেশে প্রচারক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির দ্রুততর কোন সীমা কি নির্দেশ করা যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কোন মানুষ এইটুকুমাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়, এ-কথা বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি? ইহাতে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, আজ হইতে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর পরে গোটা জাতিটিই যে ধরনের মানুষে ভরিয়া যাইবে, সেইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ আজই অবতীর্ণ হইতে পারেন। যোগীরা এই কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বড় বড় অবতারপুরুষ ও আচার্যেরা এই ধরনেরই মানুষ; তাঁহারা এই এক-জীবনেই পূর্ণতা-লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্বকালেই আমরা এরূপ মানবের দর্শন পাইয়াছি। সম্প্রতি—এই সেদিনকার কথা—এরূপ একজন মানব আসিয়াছিলেন, যিনি এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার এই কার্যটিকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, এগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে লাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। এই উন্নতির বেগ দ্রুততর করিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত করিয়া এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক্; এবং যে বিজ্ঞানসহায়ে মন ও তাহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ। অর্থ ও অন্যান্য জাগতিক বস্তু দান করিয়া অপরকে সাহায্য করা বা দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে চলা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া—এ-সব নিতান্তই তুচ্ছ আনুষঙ্গিক কার্য মাত্র।

তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বাহ্যপ্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে অপেক্ষা করিতে না দিয়া তাহার পূর্ণত্বকে প্রকট করিয়া দেওয়াই এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা। এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান্ উদ্দেশ্য।

জ্ঞানে, শক্তিতে, সুখ-সমৃদ্ধিতে মানুষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাতি হিসাবে আমরা ক্রমাগত উন্নত হইয়া চলিয়াছি। ইহা যে সত্য—ধ্রুব সত্য, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও কি তাহা সত্য? হাঁ, কিছুটা তো বটেই। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন জাগেঃ ইহার সীমা-নির্ধারণ হইবে কোথায়? আমার দৃষ্টিশক্তি কয়েক ফুট দূরে মাত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু এমন লোক আমি দেখিয়াছি—যে

পাশের ঘরে কি ঘটিতেছে, চোখ বন্ধ করিয়াও তাহা দেখিতে পায়। তোমার যদি ইহা বিশ্বাস না হয়, সে-লোকটি হয়তো তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাকেই শিখাইয়া দিবে কি করিয়া এভাবে দেখিতে হয়। যে-কোন লোককে ইহা শেখানো যায়। কেহ কেহ পাঁচ মিনিটের শিক্ষায় অপরের মনে কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। এই-সব হাতে হাতে দেখাইয়া দেওয়া যায়।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা সীমারেখা টানিব কোথায়? এই ঘরের এককোণে বসিয়া অপরে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে পারে, পাশের ঘরের লোকটির মনের খবরই বা সে পাইবে না কেন? যে-কোন জায়গায় লোকের চিন্তাই বা টের পাইবে না কেন? না পাইবার কোন কারণ আমরা দেখাইতে পারিব না। সাহস করিয়া বলিতে পারি না, ইহা অসম্ভব। আমরা শুধু বলিতে পারি, কিভাবে ইহা সম্ভব হয়—তাহা জানি না। এরূপ ঘটা অসম্ভব—এ-কথা বলিবার কোন অধিকার জড়বিজ্ঞানীদের নাই; তাঁহারা শুধু এইটুকু বলিতে পারেন, 'আমরা জানি না।' বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল তথ্য সংগ্রহ করা, সামান্যীকরণ করা, কতকগুলি মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া এবং সত্য প্রকাশ করা—এই পর্যন্ত। কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার করিয়া চলিতে শুরু করিলে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিবে কিরূপে?

একজন মানুষ কতখানি শক্তি অর্জন করিতে পারে, তাহার কোন সীমা নাই। ভারতীয় মনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে সে অনুরক্ত হইলে আর সব-কিছু ভুলিয়া তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যায়। ভারত যে বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা তোমরা জান। গণিতের আরম্ভ সেখানে। আজ পর্যন্ত তোমরা সংস্কৃত গণনানুযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করিতেছ। সকলেই জানে বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে। আর নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানিত।

এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভারতের ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল, যখন শুধু মানুষ ও মানুষের মন—এই একটি বিষয়ে ভারতের সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য-লাভের সহজতম উপায় মনে হওয়ায় এ-বিষয়টি তাঁহাদের নিকট এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করিলে মনের অসাধ্য কিছুই নাই—এই বিষয়ে ভারতীয় মনে এতখানি দৃঢ়বিশ্বাস আসিয়াছিল যে, মনঃশক্তির গবেষণাই তাহার মহান্ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের নিকট সম্মোহন, যাদু ও এই জাতীয় অন্যান্য শক্তিগুলির কোনটিই অলৌকিক মনে হয় নাই। ইতঃপূর্বে ভারতীয়েরা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন, তখন তেমনি যথা নিয়মে এই বিজ্ঞানটিও শিখাইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে জাতির এত বেশী দৃঢ়-প্রত্যয় আসিয়াছিল যে, তাহার ফলে জড়বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল শুধু এই একটি লক্ষ্যে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীরা বিবিধ পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেলেন। কেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আলো লইয়া; বিভিন্ন বর্ণের আলোক কিভাবে শরীরে পরিবর্তন আনে, তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটি বিশেষ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতেন, একটি বিশেষ বর্ণের ভিতর বাস করিতেন, এবং বিশেষ বর্ণের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন। এইরূপে কত রকমের পরীক্ষাই না চলিতে লাগিল। অপরে কান খুলিয়া রাখিয়া ও বন্ধ করিয়া, শব্দ লইয়া পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। তাছাড়া আরও অনেকে গন্ধ এবং অন্যান্য বিষয় লইয়াও পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন।

সব-কিছুরই লক্ষ্য ছিল মূলে উপস্থিত হওয়া, বিষয়ের সূক্ষ্মভাগগুলিতে গিয়া পৌঁছানো। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সত্যই অতি অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ও দিয়াছেন। বাতাসের ভিতর ভাসিয়া থাকিবার জন্য, বাতাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন। পাশ্চাত্যের একজন বড় পণ্ডিতের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, সেটি বলিতেছি। সিংহলের গভর্নর স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখিয়া উহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কতকগুলি কাঠি আড়াআড়িভাবে একটি টুলের মত সাজাইয়া ঐ টুলের উপর একটি বালিকাকে আসন করাইয়া বসানো হইল। বালিকাটি কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, যে-লোকটি খেলা দেখাইতেছিল সে একটি একটি করিয়া এই কাঠিগুলি সরাইয়া লইতে লাগিল; সব কাঠিগুলি সরাইয়া লইবার পর বালিকাটি শূন্যে ভাসিতে লাগিল। কিছু একটা গোপন কৌশল আছে ভাবিয়া গভর্নর তাঁহার তরবারি বাহির করিয়া বালিকাটির নীচের শূন্য স্থানে সজোরে চালাইয়া দিলেন। দেখিলেন, কিছুই নাই সেখানে। এখন ইহাকে কি বলিবে? কোনরূপ যাদু বা অলৌকিকত্ব ইহাতে ছিল না। এইটিই আশ্চর্য ব্যাপার। এ-জাতীয় ঘটনা অলীক, এমন কথা ভারতে কেহই বলিবে না। হিন্দুদের কাছে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিবার পূর্বে হিন্দুদের প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, 'আরে, আমাদের কোন যোগী আসিয়া সকলকে হটাইয়া দিবে।' এটি জাতির এক চরম বিশ্বাস। বাহুবল বা তরবারির বল আর কতটুকু? শক্তি তো সবই আত্মার। ইহা সত্য হইলে ইহাতে মনের সব শক্তি নিয়োগ করিবার প্রলোভন খুবই বেশী হইবে। তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা যেমন খুব কঠিন, এই ক্ষেত্রেও তাহাই; তাহাই বা বলি কেন, ইহা তাহার চেয়ে আরও বেশী কঠিন। তবু বেশীরভাগ লোকেরই ধারণা যে, এই-সব শক্তি অতি সহজেই অর্জন করা যায়। বিপুল সম্পদ্ গড়িয়া তুলিতে তোমার কত বছর লাগিয়াছে বল দেখি। সে-কথা ভাবিয়া দেখ একবার। প্রথমে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেই তো বহু বছর গিয়াছে। তারপর তোমাকে বাকী জীবনটাই তো পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

তাহা ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু গতিহীন, স্থির। চেয়ারটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি, চেয়ারটি আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে না। কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মন, যাহা সদা চঞ্চল। যখনই পর্যবেক্ষণ করিতে যাও দেখিবে উহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মন এখন একটি ভাবে রহিয়াছে, পরমুহূর্তে হয়তো সেই ভাব পালটাইয়া গেল; একটার পর একটা ভাবের এই পরিবর্তন সব সময় লাগিয়াই আছে। এই-সব পরিবর্তনের মধ্যেই উহার অনুশীলন চালাইতে হইবে, উহাকে বুঝিতে হইবে, ধরিতে হইবে এবং আয়ত্তে আনিতে হইবে। কাজেই কত বেশী কঠিন এই মনোবিজ্ঞান! এই বিষয়ে কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হয়। লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন কার্যকরী প্রক্রিয়া তাহাদিগকে শিখাই না কেন? ইহা তো আর তামাশা নয়! এই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনাইতেছি; বাড়ি ফিরিয়া দেখিলে—ইহাতে ফল কিছু হয় নাই;

আমিও কোন ফল দেখিতে পাইলাম না! তারপর তুমি বলিলে, 'যত সব বাজে কথা!' এই রকম যে হয়, তাহার কারণ—তুমি এইটিকে বাজে জিনিষরূপেই চাহিয়াছিলে। এই বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি; কিন্তু যেটুকু জানি, সেটুকু শিখিতেই আমাকে জীবনের ত্রিশ বছর ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে, আর তারপর যেটুকু শিখিয়াছি, ছয় বছর ধরিয়া লোকের কাছে তাহা বলিয়া বেড়াইতেছি। ইহা শিখিতেই আমার ত্রিশ বছর লাগিয়াছে—কঠোর পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বছর খাটিতে হইয়াছে। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্টা খাটিয়াছি, কখনও রাত্রে মাত্র একঘণ্টা ঘুমাইয়াছি, কখনও-বা সারারাত্রই পরিশ্রম করিয়াছি; কখনও কখনও এমন সব জায়গায় গিয়া বাস করিয়াছি, যাহাকে প্রায় শব্দহীন, বায়ুহীন বলা চলে; কখনও-বা গুহায় বাস করিতে হইয়াছে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখ। আর এই-সব সত্ত্বেও আমি অতি অল্পই জানি বা কিছুই জানি না; আমি যেন এই বিজ্ঞানের বহির্বাসের প্রান্তটুকু মাত্র স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু আমি ধারণা করিতে পারি যে, এই বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল ও অত্যাশ্চর্য।

এখন তোমাদের ভিতর কেহ যদি সত্য সত্যই এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে চাও, তাহা হইলে জীবনের যে-কোন বিষয়কার্যের জন্য যতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া উহাতে লাগিয়া পড়া প্রয়োজন হয়, ঠিক ততখানি বা তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া এ বিষয়েও অগ্রসর হইতে হইবে।

বিষয়কর্মের জন্য কত মনোযোগই না দিতে হয়, আর কি কঠোর ভাবেই না উহা আমাদিগকে পরিচালিত করে! মাতা, পিতা, স্ত্রী বা সন্তান মরিয়া গেলেও বিষয়কর্ম বন্ধ থাকিতে পারে না! বুক যদি ফাটিয়াও যায়, তথাপি কর্মক্ষেত্রে আমাদের যাইতেই হইবে, প্রতিটি ঘণ্টা দারুণ যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইলেও কাজ করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষয়কর্ম; আর আমরা ভাবি ইহা যুক্তিসঙ্গত, ইহা ন্যায়সঙ্গত।

যে-কোন বিষয়কর্মের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয় এই বিজ্ঞানের জন্য। বিষয়কর্মে অনেকেই সফলতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে সফল হন খুব কম লোক। কারণ—যিনি ইহার অনুশীলন করেন, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বিষয়কর্মের বেলা যেমন সকলেই প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করেই, এই বিজ্ঞানের বেলাও ঠিক তাই; প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আভাস পায়-ই, যাহার ফলে ইহার সত্যতায় আস্থা আসে, এবং বিশ্বাস আসে যে, বহু লোক সত্য সত্যই এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত সব-কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ইহাই হইল বিজ্ঞানটির মোটামুটি কথা। নিজের শক্তিতে এবং নিজের আলোকের উপর নির্ভর করিয়া এই বিজ্ঞান অন্য যে-কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য সগর্বে আমাদিগকে আহ্বান করে। প্রবঞ্চক, যাদুকর, শঠ—এই-সবও এক্ষেত্রে আছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা থাকে, তাহা অপেক্ষা বরং বেশীই আছে। কি কারণে? কারণ তো একই—যে কাজে যত বেশী লাভ, ঠক-প্রবঞ্চকের সংখ্যাও তাহাতে তত বেশী। কিন্তু তাহা বলিয়া কাজটি যে ভাল হইবে না, ইহা তো আর কোন যুক্তি নয়। আর একটি কথা আছে; সমস্ত যুক্তি-বিচার মন দিয়া শোনা বুদ্ধিবৃত্তির একটি ভাল ব্যায়াম হইতে পারে, মনোযোগ সহকারে অদ্ভুত বিষয়ের কথা শুনিলে বুদ্ধির পরিতৃপ্তিও ঘটিতে পারে। কিন্তু কেহ যদি তাহারও পরের কথা জানিতে চাও, তবে শুধু বক্তৃতা শুনিলে হইবে না। বক্তৃতায় ইহা শেখানো যায় না, কারণ ইহা জীবন-গঠনের কথা। আর জীবনই অপরের ভিতর জীবন সঞ্চার করিতে পারে। তোমাদের ভিতর যদি কেহ ইহা শিখিতে সত্যই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে পরম আনন্দের সহিত আমি তাহাকে সাহায্য করিব।

আত্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি

পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ বিতর্কমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একবার ঐরূপ এক আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচার্য বিষয় ছিল—'আত্ম-বস্তু কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যোগ্য?' বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি মন্তব্য শুনিয়াছিলেন, যাহা তিনি পাশ্চাত্যখণ্ডে সেই প্রথমই শ্রবণ করেন নাই; প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেনঃ

একটি প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ স্ত্রীজাতির কোন আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না—এইপ্রকার যে উক্তি এখানে আমাদের নিকট করা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বহু দিনের এবং তাঁহারা এই ভ্রমটি ধরিয়া রাখিতে পছন্দ করেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের প্রকৃতির ইহা একটি অদ্ভুত ধারা যে, সে যাহাদিগকে পছন্দ করে না, তাহাদের সম্বন্ধে এমন কিছু প্রচার করিতে চায়, যাহা খুবই খারাপ। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, আমি মুসলমান নই, কিন্তু উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল এবং আমি দেখিয়াছি, কোরানে এমন একটিও উক্তি নাই, যাহার অর্থ নারীর আত্মা নাই; বস্তুতঃ কোরান বলেন, নারীর আত্মা আছে।

আত্মা সম্বন্ধে যে-সকল বিষয় আজ আলোচিত হইল; সে-সম্পর্কে আমার এখানে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই, কারণ প্রথমেই প্রশ্ন উঠেঃ 'আত্মিক বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া চলে কিনা?' আপনারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে কি বোঝেন? প্রথমতঃ প্রত্যেক বিষয়কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় দিক্ হইতে দেখা আবশ্যক। যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের সহিত আমরা খুবই পরিচিত, এবং যেগুলি আমরা খুবই পড়িয়াছি, ঐগুলির কথাই ধরা যাক। ঐগুলি সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য যে, ঐ দুই বিদ্যার অতি সাধারণ বিষয়গুলির পরীক্ষণও জগতের যে-কোন ব্যক্তি অনুধাবন করিতে পারে? একটি মূর্খ চাষাকে ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রদর্শন করুন; সে উহার কি বুঝিবে? কিছুই না। কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বুঝিবার মত অবস্থায় উপনীত হইবার আগে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহার পূর্বে সে এই-সব কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহা এই ব্যাপারে একটি প্রচণ্ড অসুবিধা। যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ অর্থে ইহাই বুঝিতে হয় যে, কতগুলি তথ্যকে এমন সাধারণ স্তরে নামাইয়া আনা হইবে যে, ঐগুলি সকল মানুষের পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয় হইবে, ঐগুলি সকলের দ্বারা অনুভূত হইবে, তাহা হইলে কোন বিষয়ে যে এইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ সম্ভব—ইহা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। তাহাই যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের যত বিশ্ববিদ্যালয় এবং যত শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সবই বৃথা হইত। যদি শুধু মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া বৈজ্ঞানিক সকল বিষয়ই আমরা বুঝিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি কেন? এত অধ্যয়ন-অনুশীলনই বা কেন? এই-সবের তো কোন মূল্যই নাই। সুতরাং আমরা বর্তমানে যে স্তরে আছি, জটিল বিষয়সমূহ সেখানে নামাইয়া আনাকেই যদি বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়, তবে এই কথা শ্রবণমাত্র নির্বিচারে বলা চলে যে, তাহা এক অসম্ভব ব্যাপার। অতঃপর আমরা যে অর্থ ধরিতেছি, তাহাই নির্ভুল হওয়া উচিত। তাহা হইল এই যে, কতগুলি জটিলতর তত্ত্ব প্রমাণের জন্য অপর কতগুলি জটিল তত্ত্বের অবতারণা আবশ্যক। এই জগতে কতগুলি অধিকতর জটিল, দুরূহ বিষয় আছে, যেগুলি আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প জটিল বিষয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি এবং হয়তো এই উপায়ে উক্ত বিষয়সমূহের নিকটতর জ্ঞান লাভ করি; এইরূপে ক্রমে এগুলিকে আমাদের বর্তমান সাধারণ জ্ঞানের স্তরে নামাইয়া আনা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল ও যত্নসাপেক্ষ এবং ইহার জন্যও বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন, প্রভূত পরিমাণ শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এই সম্পর্কে আমি এইটুকুই বলিতে চাই যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাইতে হইলে শুধু যে বিষয়ের দিক্ হইতেই সম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন আছে, তাহা নয়; যাহারা এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দিক্ হইতেও যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন। এই-সব শর্ত পূর্ণ হইলেই কোন ঘটনাবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে যখন প্রমাণ বা অপ্রমাণ উপস্থাপিত হইবে, তখন আমরা হাঁ বা না বলিতে পারিব। কিন্তু তৎপূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অথবা যে-সকল ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে পুনঃপুনঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রমাণ করা অতি দুরূহ বলিয়াই মনে হয়।

অতঃপর স্বপ্ন হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, এই জাতীয় যে-সব ব্যাখ্যা অতি অল্প চিন্তার ফলে প্রসূত হইয়াছে, সেগুলির প্রসঙ্গে আসিতেছি। যাঁহারা এই-সব ব্যাখ্যা অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিবেন—এই ধরনের অভিমত কেবল অসার কল্পনামাত্র। ধর্ম স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত—এই মত যদিও অতি সহজভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি এইরূপ কল্পনা করার কোন হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐরূপ হইলে অতি সহজেই অজ্ঞেয়বাদীর মত গ্রহণ করা চলিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিষয়টির অত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এমন কি আধুনিককালেও নিত্য নূতন অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। এইগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেবল হইবে কেন, এ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান হইয়া আসিতেছে। অন্ধ বলে—সূর্য নাই। তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, সূর্য সত্যই নাই। বহু বৎসর পূর্বেই এই-সব ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। কত কত জাতি সমগ্রভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিজদিগকে স্নায়ুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যকলাপ আবিষ্কারের উপযুক্ত যন্ত্র করিয়া তুলিবার সাধনায় নিযুক্ত রাখিয়াছে। তাহাদের আবিষ্কৃত তথ্য-প্রমাণাদি বহু যুগ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, এই-সব বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সব দেশে এমন অনেক নর-নারী আজও বর্তমান আছেন, যাঁহারা এই ঘটনারাশির জীবন্ত প্রমাণ। অবশ্য আমি স্বীকার করি, এক্ষেত্রে প্রচুর ভণ্ডামি আছে এবং ইহার মধ্যে প্রতারণা ও মিথ্যা অনেক পরিমাণে বর্তমান। কিন্তু এই-সব কোন্ ক্ষেত্রে নাই? যে-কোন একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ই ধরা যাক না কেন; সন্দেহাতীত সত্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কিংবা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারেন—এইপ্রকার তত্ত্ব মাত্র দুই-তিনটিই আছে, অবশিষ্ট সবই শূন্যগর্ভ কল্পনা। অজ্ঞেয়বাদী নিজের অবিশ্বাস্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে চান, নিজের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখুন না। দেখিবেন—তাহার অর্ধেক ভিত্তিমূলসহ ধসিয়া পড়িবে। আমরা অনুমান-

কল্পনার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, মানবাত্মার ইহাই স্বাভাবিক প্রগতি। একদিকে অজ্ঞেয়বাদী, অপরদিকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধানী—এই উভয়বৃত্তি সম্পন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে আমাদের নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। এইজন্য আমাদের নিজ সীমার ঊর্ধ্বে যাওয়া প্রয়োজন; যাহা অজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত, তাহা জানিবার জন্য কঠিন প্রয়াস করিতে হইবে, এবং এই সংগ্রাম অপ্রতিহতভাবে চলা চাই।

অতএব—বক্তা অপেক্ষা এক পদ অগ্রসর হইয়া আমি এই মত উপস্থাপিত করিতেছি যে, প্রেতাত্মাদের নিকট হইতে শব্দ অবলম্বনে সাড়া পাওয়া, কিংবা টেবিলে আঘাতের শব্দ শোনা প্রভৃতি যে-সব ঘটনাকে ছেলেখেলা বলে, অথবা অপরের চিন্তা জানিতে পারা প্রভৃতি যে-সব শক্তি আমি বালকদের মধ্যেও দেখিয়াছি, কেবল এই-সব সামান্য সামান্য ব্যাপারই নয়, পরন্তু যে-সব ঘটনাকে পূর্ববর্তী বক্তা উচ্চতর অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—কিন্তু যাহাকে আমি মনেরই অতি-চেতন অভিজ্ঞতা বলিতে চাহিতেছি—সেই-সবের অধিকাংশই হইতেছে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার প্রথম সোপান মাত্র। প্রথমেই আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত—মন সত্যই সেই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে কিনা। আমার ব্যাখ্যা অবশ্য উক্ত বক্তার ব্যাখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইবে; তথাপি পরস্পরের ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ ঠিক করিয়া লইলে হয়তো আমরা উভয়েই একমত হইতে পারিব। আমাদের সম্মুখে যে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, তাহা সম্পূর্ণরূপে মানবানুভূতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পরেও সম্প্রতি যে প্রকার চেতনা আছে, তাহা থাকে কিনা—এই প্রশ্নের উপর খুব বেশী কিছু নির্ভর করে না। সত্তার সহিত অনুভূতি যে সব সময় থাকিবেই—এমন কোন কথা নাই। আমার নিজের এবং আমাদের সকলেরই শরীর সম্পর্কে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহার খুব অল্প অংশেরই সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং ইহার অধিকাংশ সম্পর্কেই আমরা অচেতন। তবু শরীরের অস্তিত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নিজ মস্তিষ্ক সম্পর্কে কেহই সচেতন নয়। আমি আমার মস্তিষ্ক কখনই দেখি নাই, এবং ইহার সম্পর্কে আমি কোন সময়েই সচেতন নই। তথাপি আমি জানি, মস্তিষ্ক আছে। অতএব এইরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা অনুভূতির জন্য লালায়িত; বস্তুতঃ আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্বের জন্য আগ্রহান্বিত, যাহা এই স্থূল জড়বস্তু হইতে ভিন্ন এবং ইহা অতি সত্য যে, এই জ্ঞান আমরা এই জীবনেই লাভ করিতে পারি, এই জ্ঞান ইতঃপূর্বে অনেকেই লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার সত্যতা ঠিক তেমনিভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যেভাবে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

এই-সব বিষয় আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। উপস্থিত সকলকে আমি আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথা মনে রাখা ভাল যে, আমরা প্রায়ই এই-সব ব্যাপারে প্রতারিত হই। কোন ব্যক্তি হয়তো আমাদের সম্মুখে এমন একটি ব্যাপারের প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, যাহা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ, কিন্তু আমরা তাহা এই যুক্তি অবলম্বনে অস্বীকার করিলাম যে, আমরা উহা সত্য বলিয়া অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত বিষয় সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা সেই-সব প্রমাণ অনুধাবন করিবার উপযুক্ত কিনা এবং আমরা আমাদের দেহমনকে ঐ-সব আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারের উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছি কিনা, তাহা বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যাই।

রাজযোগের লক্ষ্য

ধর্মজীবনে ধ্যান-ধারণার দিকটিই যোগের লক্ষ্য, নৈতিক দিকটি নয়, যদিও কার্যকালে নীতিবিষয়ক আলোচনা কিছুটা আসিয়াই পড়ে। ভগবানের বাণী বলিয়া যাহা পরিচিত, শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জগতের নর-নারীর মন সত্য সম্বন্ধে আরও অধিক অনুসন্ধানপরায়ণ হয়। তাহারা নিজে কিছু সত্য উপলব্ধি করিতে চায়। ধর্মের বাস্তবতা নির্ভর করে একমাত্র উপলব্ধির উপর। মনের অতিচেতন ভূমি হইতেই অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সত্য আহরণ করিতে হয়। বিশেষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহারা যে ভূমিতে উঠিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে আমাদেরও উঠিতে হইবে; সেখানে উঠিয়া আমরা যদি একই ধরনের অনুভূতি লাভ করি, তাহা হইলেই আমাদের কাছে সেগুলি সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অপরে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সবই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি; যাহা একবার ঘটিয়াছে, পুনর্বার তাহা ঘটিতে পারে; ঘটিতে পারে নয়, একই পরিবেশে আবার তাহা ঘটিতে বাধ্য। এই অতিচেতন অবস্থায় কিভাবে পৌঁছাইতে হয়, রাজযোগ তাহা শিক্ষা দেয়। সব বড় বড় ধর্মই কোন-না-কোন ভাবে এই অতিচেতন অবস্থাকে স্বীকার করে; কিন্তু ভারতে ধর্মের এই দিকটির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রথমাবস্থায় কয়েকটি বাহ্য প্রক্রিয়া এই অবস্থালাভের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে; কিন্তু শুধু এই ধরনের বাহ্য প্রক্রিয়া অবলম্বনে কখনও বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। নির্দিষ্ট আসন, নির্দিষ্ট প্রণালীতে শ্বাস-ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে মন শান্ত ও একাগ্র হয়; কিন্তু এগুলির অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং ভগবান্-লাভের বা সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই-ই। স্থির হইয়া বসিয়া একটি ভাবের উপর মন নিবিষ্ট করিবার ও মনকে সেখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গেলেই অধিকাংশ লোক অনুভব করিবে যে, উহাতে সফল হইবার জন্য বাহিরের কিছু সহায়তার প্রয়োজন আছে। মনকে ধীরে ধীরে এবং যথানিয়মে বশে আনিতে হয়। ধীর, নিরবচ্ছিন্ন এবং অধ্যবসায়যুক্ত সাধনসহায়ে ইচ্ছাশক্তিকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। ইহা ছেলেখেলা নয়, একদিন চেষ্টা করিয়া পরদিন ছাড়িয়া দিবার মত খেয়ালও নয়। সারা জীবনের কাজ এইটি; আর যে লক্ষ্য-লাভের জন্য এ প্রচেষ্টা, তাহা পাইবার জন্য যত মূল্যই আমাদিগকে দিতে হউক না কেন, সে মূল্য উহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; কারণ আমাদের লক্ষ্য হইল ভগবৎসত্তার সঙ্গে পূর্ণ একত্বানুভূতি। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, এবং ঐ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিতে পারি—এই বোধ থাকিলে তাহা লাভের জন্য কোন মূল্যকেই আর অত্যধিক বলিয়া মনে হইতে পারে না।

একাগ্রতা

১৯০০ খ্রীঃ ১৬ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কো শহরে ‘ওয়াশিংটন হল’-এ প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর কথা ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন ... দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যকার শব্দ বা বাক্যগুলি স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য অনুলেখিকা কর্তৃক নিবদ্ধ। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্ত কেন্দ্রের মুখপত্র ‘Vedanta and the West’ পত্রিকার ১১১তম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

বহির্জগতের অথবা অন্তর্জগতের যাবতীয় জ্ঞানই আমরা একটি মাত্র উপায়ে লাভ করি—উহা মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা সম্ভবপর হয় না, যদি সেই বিষয়ে আমরা মন একাগ্র করিতে না পারি। জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে মনঃসংযোগ করেন, ... এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মনের রহস্য জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মন একাগ্র করিয়া উহাকে নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে। এই জগতে এক মনের সঙ্গে অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তারতম্যেই। দুইজনের মধ্যে যাহার একাগ্রতা বেশী, সেই অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই একাগ্রতার এই বিপুল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকেই ‘প্রতিভাশালী’ বলা হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রের মতে—দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকিলে আমরা সকলেই প্রতিভাবান্ হইতে পারি। কেহ কেহ হয়তো অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তো জীবনের কর্তব্যগুলি কিছু দ্রুততগতিতেই সম্পন্ন করেন। ইহা আমরা সকলেই করিতে পারি। ঐ শক্তি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। মনকে জানিবার জন্য উহাকে কিভাবে একাগ্র করা যায়, তাহাই বর্তমান বক্তৃতার বিষয়বস্তু। যোগিগণ মনঃসংযমের যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজ রাত্রে ঐগুলির কয়েকটির কিছু পরিচয় দিতেছি।

অবশ্য—মনের একাগ্রতা নানাভাবে আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে একাগ্রতা আসিতে পারে। সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে কাহারও কাহারও মন শান্ত হইয়া যায়; কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় কোন সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া। ... এরূপ লোকও আছে, যাহারা তীক্ষ্ণ লোহার কাঁটার আসনে শুইয়া বা ধারাল নুড়িগুলির উপর বসিয়া মনের একাগ্রতা আনিয়া থাকে। এগুলি সাধারণ নিয়ম নয়, এই প্রণালী খুবই অবৈজ্ঞানিক। মনকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

কেহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া মন একমুখী করে। শারীরিক ক্লেশই তাহাকে ঈপ্সিত একাগ্রতা লাভ করাইতেছে। কিন্তু এই-সবই অস্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক এই-সম্বন্ধে কতকগুলি সর্বজনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শরীর আমাদের জন্য যে গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে, উহা অতিক্রম করিয়া মনের অতিচেতন অবস্থায় পৌঁছানোই আমাদের লক্ষ্য। চিত্তশুদ্ধির সহায়ক বলিয়াই যোগীর নিকট নীতিশাস্ত্রের মূল্য। মন যত পবিত্র হইবে, উহা সংযত করাও তত সহজ হইবে। মনে যে-কোন চিন্তা উঠুক না কেন, মন উহা ধারণ বা গ্রহণ করিয়া বাহিরের কর্মে রূপায়িত করে। যে-মন যত স্থূল, উহাকে বশ করা ততই কঠিন। কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়া মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন করা কখনও সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম হয়তো সে কিছু মনঃসংযম করিতে পারিল, কিছু সফলতাও আসিতে পারে, হয়তো বা একটু দূরশ্রবণশক্তি লাভ হইল ... কিন্তু এই শক্তিগুলিও তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। মুশকিল এই যে, অনেক ক্ষেত্রে যে-সকল অসাধারণ শক্তি তাহার আয়ত্তে আসিয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ঐগুলি কোন নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে অর্জিত হয় নাই। যাহারা যাদুবলে সর্প বশীভূত করে, তাহাদের প্রাণ যায় সর্পাঘাতেই। ... কেহ যদি কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে তো সে পরিণামে ঐ শক্তির কবলে পড়িয়াই বিনষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ উপায়ে অলৌকিক শক্তি লাভ করে। তাহাদের অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মহত্যা করে।

মনঃসংযমের অনুশীলন—বিজ্ঞানসম্মত, ধীর, শক্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভাবে শিক্ষা করা উচিত। প্রথম প্রয়োজন সুনীতিপরায়ণ হওয়া। এইরূপ ব্যক্তি দেবতাদের নামাইয়া আনিতে চান, এবং দেবতারাও মর্ত্যধামে নামিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের সারকথা হইল সম্পূর্ণভাবে সুনীতিপরায়ণ হওয়া। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি—

ইহার অর্থ কি? কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা ও কঠোরতা—এইগুলি একান্ত আবশ্যক। একবার ভাবিয়া দেখ—কাহারও মধ্যে যদি এই সব গুণের পূর্ণ সমাবেশ হয় তো ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই, বল দেখি? যদি কেহ কোন জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাবশূন্য হন ... (তাঁহার সমক্ষে) প্রাণিবর্গ হিংসা ত্যাগ করিবে। যোগমার্গের আচার্যগণ সুকঠিন নিয়মাবলী সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। ... (সেগুলি পালন না করিলে কেহই যোগী হইতে পারিবে না) যেমন দানশীল না হইলে কেহ 'দাতা' আখ্যা লাভ করিতে পারে না। ...

তোমরা বিশ্বাস করিবে কি—আমি এমন একজন যোগী পুরুষ
১
দেখিয়াছি, যিনি ছিলেন গুহাবাসী, এবং সেই গুহাতেই বিষধর সর্প ও ভেক তাঁহার সঙ্গেই একত্র বাস করিত; তিনি কখনও কখনও দিনের পর দিন মাসের পর মাস উপবাসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আসিতেন। সর্বদাই চুপচাপ থাকিতেন। একদিন একটা চোর আসিল। ... সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি-করা জিনিষের পোঁটলাটি ফেলিয়া পলাইল। সাধু পোঁটলাটি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে অনেক দূর দ্রুত দৌড়াইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন; শেষে তাহার পদপ্রান্তে পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার অনিচ্ছাকৃত ব্যাঘাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতি কাতরভাবে জিনিষগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এগুলি আমার নয়, তোমার।'

আমার বৃদ্ধ আচার্যদেব বলিতেন, 'ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই এসে জোটে।' এরূপ লোক এখনও আছেন। তাঁহাদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না। ... যখন মানুষ অন্তরের অন্তস্তলে পবিত্র হইয়া যায়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ঘৃণার ভাব থাকে না, তখন সকল প্রাণীই (তাঁহার সম্মুখে) হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করে। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। মানুষের সহিত আচরণের জন্য এগুলি আবশ্যক। ... সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। ... অপরের দোষত্রুটি দেখিয়া বেড়ান তো আমাদের কাজ নয়। উহাতে কোন উপকার হয় না। এমন কি, ঐগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন না করি। সৎ চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

হয়তো মিস অমুক আসিয়া এখানে হাজির; বলিলেন, 'আমি যোগসাধনা করব।' বিশ বার তিনি নিজের অভিপ্রায়ের কথা অপরের কাছে বলিয়া বেড়াইলেন। হয়তো ৫০ দিন ধ্যান অভ্যাস করিলেন। পরে বলিলেন, 'এই ধর্মে কিছুই নেই; আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তো কিছুই।'

(ধর্মজীবনের) ভিত্তিই সেখানে নাই। ধার্মিক হইতে হইলে এই পূর্ণ নৈতিকতার বনিয়াদ (একান্ত আবশ্যক)। ইহাই কঠিন কথা। ...

আমাদের দেশে নিরামিষভোজী সম্প্রদায়সমূহ আছে। ইহারা প্রত্যুষে পিপীলিকার জন্য সেরের পর সের চিনি মাটিতে ছড়াইয়া দেয়। একটি গল্প শোনা যায়, একবার এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি পিঁপড়াদের চিনি দিতেছিল, এমন সময় একজন আসিয়া পিঁপড়াগুলি মাড়াইয়া ফেলে। 'হতভাগা, তুই প্রাণিহত্যা করলি!' বলিয়া প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে এমন এক ঘুষি মারে যে, লোকটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

বাহ্য পবিত্রতা অত্যন্ত সহজসাধ্য, এবং সারা জগৎ (উহার) দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে। কোন বিশেষ পরিচ্ছদই যদি নৈতিকতার পরিমাপক হয়, তবে যে-কোন মূর্খই তো তাহা পরিধান করিতে পারে। কিন্তু মন লইয়াই যখন সংগ্রাম, তখন উহা কঠিন ব্যাপার। শুধু বাহিরের কৃত্রিম জিনিষ লইয়া যাহারা থাকে, তাহারা নিজে নিজেই এত ধার্মিক বনিয়া উঠে! মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আমার খুব ভক্তি ছিল। (একবার বাইবেলে বিবাহভোজের বিষয়টি পড়ি।) অমনি বই বন্ধ করিয়া বলিতে থাকি, 'অহো, তিনি মদ ও মাংস খেয়েছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধুপুরুষ হতে পারেন না।'

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সব সময়েই যেন আমাদের নজর এড়াইয়া যায়। সামান্য বেশভূষা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মূর্খেরাও তো উহা দেখিতে পারে। কিন্তু অশন-বসনের বাহিরে দৃষ্টি যায় কয়জনের? হৃদয়ের শিক্ষাই আমাদের কাম্য। ... ভারতে একশ্রেণীর লোককে কখনও কখনও দিনে বিশ-বার স্নান করিতে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে। আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পর্যন্ত তাহারা কুণ্ঠিত হয়। ... স্থূল ব্যাপার, বাহ্য আচার মাত্র! (শুধু স্নান করিয়াই যদি পবিত্র হওয়া যাইত) তবে তো মৎস্যকুলই সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রাণী।

স্নান, পোষাক, খাদ্যবিচার প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য তখনই, যখন এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপূরক হয়। ... আধ্যাত্মিকতার স্থান প্রথমে, এগুলি সহায়কমাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যদি না থাকে, তবে যতই ঘাসপাতা খাওয়া যাক না কেন, কোনই কল্যাণ নাই। ঠিকমত বুঝিলে এগুলি জীবনে অগ্রগতির পথে সাহায্য করে, নচেৎ উন্নতির পরিপন্থী হয়।

এইজন্যই এই বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলিতেছি। প্রথমতঃ সকল ধর্মেই অজ্ঞলোকদের হাতে পড়িয়া সব কিছুরই অবনতি হয়। বোতলে কর্পূর ছিল, সমস্তটাই উবিয়া গেল—এখন শূন্য বোতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি।

আর একট কথা। ... (আধ্যাত্মিকতার) লেশমাত্রও থাকে না, যখন লোকে বলিতে আরম্ভ করে, 'আমারটাই ভাল, তোমার যা-কিছু সবই মন্দ।' মতবাদ ও বাহিরের অনুষ্ঠানগুলি লইয়াই বিবাদ, আত্মায় বা শাশ্বত সত্যে কখনও বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গৌরবময় ধর্মপ্রচার চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্মিকতা উবিয়া গেল। ... (খ্রীষ্টধর্মেও এইরূপ।)

তারপর যখন কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে এবং তাঁহার স্বরূপ জানিতে চায় না, তখন কলহের সূত্রপাত হয়—এক ঈশ্বরে তিনটি ভাব, না ত্রিত্বভাবে এক ঈশ্বর! স্বয়ং ভগবানের নিকটে পৌঁছিয়া আমাদিগকে জানিতে হইবে—তিনি 'একে তিন, না তিনে এক।'

এই প্রসঙ্গের পর এখন আসনের কথা। মনঃসংযোগের চেষ্টায় কোন একটি আসনের প্রয়োজন। যিনি যেভাবে সহজে বসিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড সরল ও সহজভাবে রাখাই নিয়ম। মেরুদণ্ড শরীরের ভার বহিবার জন্য নয়। ... আসন সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণীয়—যে আসনে মেরুদণ্ডকে শরীরের ভারমুক্ত করিয়া সহজ ও সরলভাবে রাখা যায়, সে-আসনেই বস।

ইহার পর (প্রাণায়ামের) ... শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম। ইহার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। ... যাহা বলিতেছি, তাহা ভারতের কোন সম্প্রদায়বিশেষ হইতে সংগৃহীত একটা শিক্ষা নয়। ইহা সর্বজনীন সত্য। যেমন এই দেশে তোমরা ছেলেমেয়েদের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রার্থনা শিক্ষা দাও, (ভারতবর্ষে) বালকবালিকাদের সম্মুখে তেমনি কতিপয় বাস্তব তথ্য ধরা হয় ...।

দুই-একটি প্রার্থনা ব্যতীত ধর্মের কোন মতবাদ ভারতের শিশুদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় না। পরে তাহারা নিজেরাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া এমন কাহারও অন্বেষণ করে, যাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে পারা যায়। অনেকের কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের সন্ধান পাইয়া বলে, 'ইনিই আমার গুরু!' তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। আমি যদি বিবাহিত হইতাম, আমার স্ত্রী অন্য একজনকে গুরু গ্রহণ করিতে পারিত, আমার পুত্র অন্য কাহাকেও গুরু করিতে পারিত; দীক্ষার কথা কেবল আমার এবং আমার গুরুর মধ্যেই সর্বদা গুপ্ত থাকে। স্ত্রীর সাধনপ্রণালী স্বামীর জানার প্রয়োজন নাই। স্বামী তাঁহার স্ত্রীর সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না, কেন-না ইহা সুবিদিত যে, নিজের সাধনপ্রণালী কেহ কখনও বলিবে না। ইহা যে-কোন গুরু ও শিষ্যের জানা আছে, ... অনেক সময় দেখা যায়, যাহা একজনের নিকট হাস্যাস্পদ, তাহাই হয়তো অপরের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। ... প্রত্যেকেই নিজের বোঝা বহিতেছে; যাহার মনটি যেভাবে গঠিত, সেইভাবেই তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সাধক, গুরু এবং ইষ্টের সম্বন্ধটি ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যেগুলি সকল আচার্যই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাণায়াম ও ধ্যান সর্বজনীন। ইহাই হইল ভারতীয় উপাসনাপ্রণালী। গঙ্গার তীরে আমরা দেখিতে পাইব—কত নর-নারী ও বালক-বালিকা প্রাণায়াম ও পরে ধ্যান (অভ্যাস) করিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া বেশী সময় তাহারা প্রাণায়ামাদিতে দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ইহাকেই জীবনের প্রধান অনুশীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নানা প্রণালী অভ্যাস করে। চুরাশি প্রকার পৃথক্ পৃথক্ আসন আছে। যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশে চলে, তাহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে।

ইহার পরেই আসে 'ধারণা' (একাগ্রতা)। ... মনকে দেহের কতকগুলি স্থানবিশেষে ধরিয়া রাখার নাম 'ধারণা'। হিন্দু বালক-বালিকা ... দীক্ষা গ্রহণ করে। সে গুরুর নিকট হইতে একটি মন্ত্র পায়। ইহাকে বীজমন্ত্র বলে। গুরু এই মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের গুরুর নিকট হইতে। এইভাবে মন্ত্রগুলি গুরুপরম্পরায় শিষ্যের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। 'ওঁ' এইরূপ একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেক বীজেরই গভীর অর্থ আছে। এই অর্থ গোপনে রাখা হয়, লিখিয়া কেহ কখনও প্রকাশ করেন না। গুরুর কাছে কানে শুনিয়া মন্ত্র লওয়াই রীতি, লিখিয়া নয়। মন্ত্র লাভ করিয়া শিষ্য উহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিতে থাকে।

আমার জীবনের এক সময়ে আমিও ঐভাবে উপাসনা করিয়াছি। বর্ষাকালে একটানা চার মাস ধরিয়া প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের পর গঙ্গাস্নান ও আর্দ্র বস্ত্রে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জপ করিতাম। পরে কিছু খাইতাম, সামান্য ভাত বা অন্য কিছু। বর্ষাকালে এইরূপ চাতুর্মাস্য।

মানুষের সামর্থ্যে জগতে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই নাই—ভারতীয় মনের ইহাই বিশ্বাস। এই দেশে যদি কাহারও ধনাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহাকে কর্ম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখা যায়। ভারতে কিন্তু এমন লোকও আছে, যে বিশ্বাস করে—মন্ত্রশক্তির দ্বারা অর্থলাভ সম্ভব। তাই সেখানে দেখা যাইবে যে, ধনাকাঙ্ক্ষী হয়তো বৃক্ষতলে বসিয়া মন্ত্রের মাধ্যমে ধন কামনা করিতেছে। (চিন্তার) শক্তিতে সব-কিছু তাহার নিকট আসিতে বাধ্য। এখানে তোমরা যে ধন উপার্জন কর, ইহারও প্রণালী একই প্রকার। তোমরা ধনোপার্জনের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ কর। কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'হঠযোগী'। ... তাঁহারা বলেন, মৃত্যুর হাত হইতে শরীরটিকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। ... তাঁহাদের সমস্ত সাধন শরীর-সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ বৎসরের সাধন! সেইজন্য অল্প বয়স হইতে আরম্ভ না করিলে ইহা আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ... হঠযোগীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথার প্রচলন আছে; হঠযোগী যখন প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তখন তাহাকে নির্জন অরণ্যে একাকী ঠিক চল্লিশ দিন আসিয়া গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াগুলি একে একে যথারীতি অভ্যাস করিতে হয় এবং শিক্ষণীয় সমস্ত কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে হয়। ...

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ৫০০ বৎসর বাঁচিয়া আছে বলিয়া দাবী করে। সকলেই আমাকে বলিয়াছে যে, তাহাদের পিতামহেরাও এই লোকটিকে দেখিয়াছিল। ... তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কুড়ি মাইল করিয়া বেড়ান। ইহাকে ভ্রমণ না বলিয়া দৌড়ান বলাই ভাল। তারপর কোন জলাশয়ে গিয়া আপাদমস্তক কাদা মাখেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার জলে ডুব দেন, আবার কাদা মাখেন। ... এই-সবের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। (লোকে বলে সাপও দুইশত বৎসর জীবিত থাকে।) সম্ভবতঃ লোকটি খুব বৃদ্ধ, কারণ আমি ১৪ বৎসর ভারত ভ্রমণ করিয়াছি এবং যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি—প্রত্যেকে তাহার কথা জানে। লোকটি সারা জীবনই ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছে। ... (হঠযোগী) ৮০ ইঞ্চি লম্বা রবার গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে। হঠযোগীকে দৈনিক চার বার শরীরের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অঙ্গ ধুইতে হয়।

প্রাচীরগুলিও তো সহস্র সহস্র বৎসর অটুট থাকিতে পারে। ... তাহাতে হয়ই বা কি? এত দীর্ঘায়ু হওয়ার কামনা আমার নাই। 'এক দিনের বিপর্যয়রাশি মানুষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া তোলে!' সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও দোষত্রুটিতে পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শরীরই যথেষ্ট।

অন্যান্য সম্প্রদায় আছে ...। তাহারা তোমাদিগকে সঞ্জীবনী সুরা একফোঁটা দেয় এবং উহা খাইয়া তোমাদের যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে। ... কত যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—সকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর মাস লাগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই দিকে (জড়-জগতের মধ্যেই)। প্রতিদিন এক-একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ...।

ঐ-সকল সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস মন। মনকে বশীভূত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মন একাগ্র করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, দেহের ভিতর মেরুদণ্ডের কতকগুলি স্থানে বা স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে মন স্থির রাখিতে পারিলে যোগী দেহের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন। যোগীর পক্ষে শান্তিলাভের প্রধান বিঘ্ন ও উচ্চতম আদর্শের পরিপন্থী হইল এই দেহ। সেইজন্য তিনি চান দেহকে বশীভূত করিতে এবং ভৃত্যবৎ কাজে লাগাইতে।

এইবার ধ্যানের কথা। ধ্যানই সর্বোচ্চ অবস্থা। ... যখন (মনে) সংশয় থাকে, তখন উহার অবস্থা উন্নত নয়। ধ্যানই মনের উচ্চ অবস্থা। উন্নত মন বিষয়সমূহ দেখে বটে, কিন্তু কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলে না। যতক্ষণ আমার দুঃখের অনুভূতি আছে, ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সুখ বা আনন্দ বোধ করি, আমি দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছি। কিন্তু সুখ দুঃখ দুই-ই যখন সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তখনই হয় উচ্চ অবস্থা। ... ধ্যানমাত্রই সাক্ষাৎ অতিচেতন-বোধ। পূর্ণ মনঃসংযমে জীবাত্মা স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে যথার্থই মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তখন জীবাত্মা যাহা চায়, তাহাই পায়। জ্ঞান ও শক্তি তো সেখানে পূর্ব হইতেই আছে। জীবাত্মা শক্তিহীন জড়ের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া মরে, হায় হায় করে। নশ্বর বস্তুসমূহের সহিত জীবাত্মা নিজেকে মিশাইয়া ফেলে। ... কিন্তু যদি সেই মুক্ত আত্মা কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে চান, তবে তিনি তাহা পাইবেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে না চান, তাহা হইলে উহা পাইবেন না। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরই হইয়া যান। এইরূপ মুক্ত পুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁহার আর জন্মমৃত্যু নাই। তিনি চিরমুক্ত।

একাগ্রতা ও শ্বাস-ক্রিয়া

মন একাগ্র করিবার ক্ষমতার তারতম্যই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য। যে-কোন কাজে সাফল্যের মূলে আছে এই একাগ্রতা। একাগ্রতার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। ইহার ফল প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে। সঙ্গীত, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে আমাদের যে উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, তাহা এই একাগ্রতা-প্রসূত। একাগ্রতার ক্ষমতা পশুদের একরকম নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা পশুদের শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এই কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পশুকে যাহা শেখান হয়, তাহা সে ক্রমাগত ভুলিয়া যায়; কোন বিষয়ে একসঙ্গে অধিকক্ষণ মন দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই—মন একাগ্র করার ক্ষমতা পশুর চেয়ে মানুষের অনেক বেশী। মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণও আবার এই একাগ্রতার তারতম্য। সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে একাগ্রতার মাত্রার বিভিন্নতাই এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। পার্থক্য শুধু এইখানেই। সকলেরই মন সময়ে সময়ে একাগ্র হইয়া যায়। যাহা আমাদের প্রিয়, তাহারই উপর আমরা সকলে মনোনিবেশ করি; আবার যে বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তাহাই প্রিয় হইয়া উঠে। এমন মা কি কেহ আছেন, নিজের ছেলের অতিসাধারণ মুখখানিও যিনি ভালবাসেন না? মায়ের কাছে সেই মুখখানিই জগতের সুন্দরতম মুখ। মন সেখানে নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই মুখখানি তাঁহার প্রিয় হইয়াছে। সকলেই যদি ঠিক সেই মুখখানির উপর মন বসাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার উপর সকলেরই ভালবাসা জন্মিত; সকলেই ভাবিত, এমন সুন্দর মুখ আর হয় না। যাহা ভালবাসি, তাহারই উপর আমরা মনোনিবেশ করি। সুললিত সঙ্গীত-শ্রবণকালে আমাদের মন সেই সঙ্গীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা মন সরাইয়া লইতে পারি না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাতে যাহাদের মন একাগ্র হয়, সাধারণ পর্যায়ের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না। ইহার বিপরীতটিও সত্য। দ্রুত-লয়ের সঙ্গীত-শ্রবণমাত্র মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ছেলেরা হালকা সঙ্গীত পছন্দ করে, কারণ তাহাতে লয়ের দ্রুততা মনকে বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইবার কোন অবকাশই দেয় না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত জটিলতর, এবং তাহা অনুধাবন করিতে হইলে অধিকতর মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন; সেইজন্যই সাধারণ সঙ্গীত যাহারা ভালবাসে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না।

এই ধরনের একাগ্রতার সব চেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, মন আমাদের আয়ত্তে থাকে না, বরং মনই আমাদের চালিত করে। যেন সম্পূর্ণ বাহিরের কোন বস্তু আমাদের মনটিকে টানিয়া লইয়া যতক্ষণ খুশী নিজের কাছে ধরিয়া রাখে। সুমধুর সঙ্গীত-শ্রবণকালে অথবা মনোরম চিত্রদর্শনকালে আমাদের মন উহাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়া যায়; মনকে আমরা সেখান হইতে তুলিয়া আনিতে পারি না।

আমি যখন তোমাদের মনোমত কোন বিষয়ে ভাল বক্তৃতা দিই, তখন আমার কথায় তোমাদের মন একাগ্র হয়। তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের মনকে কাড়িয়া আনিয়া আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উহাকে ঐ প্রসঙ্গের মধ্যে ধরিয়া রাখি। এভাবে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইয়া একাগ্র হয়। আমরা তাহাতে বাধা দিতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, চেষ্টা করিয়া এই একাগ্রতা বাড়াইয়া তোলা ও ইচ্ছামত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা। যোগীরা বলেন, হাঁ, তাহা সম্ভব; তাঁহারা বলেন, আমরা মনকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারি। নৈতিক দিক্ হইতে একাগ্রতার ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলায় বিপদও আছে; কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিবার পর ইচ্ছামাত্র সেখান হইতে সে-মন তুলিয়া লইতে না পারিলেই বিপদ। এরূপ পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। মন তুলিয়া লইবার অক্ষমতাই আমাদের প্রায় সকল দুঃখের কারণ। কাজেই একাগ্রতার শক্তি বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মন তুলিয়া লইবার শক্তিও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। বস্তুবিশেষে মনোনিবেশ করিতে শিখিলেই চলিবে না। প্রয়োজন হইলে মুহূর্তের মধ্যে সেখান হইতে মন সরাইয়া লইয়া বিষয়ান্তরে তাহাকে নিবিষ্ট করিতে পারা চাই। এই উভয় ক্ষমতা সমভাবে অর্জন করিয়া চলিলে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ইহাই মনের প্রণালীবদ্ধ ক্রমোন্নতি। আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নতুন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত, এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম; তারপর ওভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রসহায়ে খুশীমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।

আমার সাধনা বরাবর একমুখী ছিল। ইচ্ছামত মন তুলিয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন না করিয়াই আমি একাগ্রতার শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলাম; ইহাই হইয়াছে আমার জীবনে গভীরতম দুঃখভোগের কারণ। এখন আমি খুশীমত মন তুলিয়া লইতে পারি; তবে ইহা শিখিতে হইয়াছে অনেক পরে।

কোন বিষয়ে ইচ্ছামত আমরা নিজেরাই যেন মনোনিবেশ করিতে পারি; বিষয় যেন আমাদের মনকে টানিয়া না লয়। সাধারণতঃ বাধ্য হইয়াই আমরা মনোনিবেশ করি; বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণের প্রভাবে আমাদের মন সেখানে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, আমরা তাহাকে বাধা দিতে পারি না। মনকে সংযত করিতে হইলে—যেখানে ইচ্ছা করিব ঠিক সেখানেই তাহাকে নিবিষ্ট করিতে হইলে—বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন; অন্য কোন উপায়ে তাহা হইবার নয়। ধর্মের অনুশীলনে মনঃসংযম একান্ত প্রয়োজন। এ অনুশীলনে মনকে ঘুরাইয়া মনেরই উপর নিবিষ্ট করিতে হয়।

মনের নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করিতে হয় প্রাণায়াম হইতে। নিয়মিত শ্বাস-ক্রিয়ার ফলে দেহে সমতা আসে; তখন মনকে ধরা সহজ হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমেই আসন বা দেহসংস্থানের কথা ভাবিতে হয়। যে-কোন ভঙ্গিতে অনায়াসে বসিয়া থাকা যায়, তাহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড যেন ভারমুক্ত থাকে, দেহের ভার যেন বক্ষ-পঞ্জরের উপর রাখা হয়। কোন স্বকপোলকল্পিত কৌশল অবলম্বনে মন-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিও না, একমাত্র সহজ, সরল শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াই এ-পথে যথেষ্ট। বিবিধ কঠোর সাধন-সহায়ে মনকে একাগ্র করিতে প্রয়াসী হইলে ভুল করা হইবে। সে-সব করিতে যাইও না।

মন শরীরের উপর কার্য করে, আবার শরীরও মনের উপর ক্রিয়াশীল। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থা শরীরে ফুটিয়া উঠে, আবার শরীরের প্রতিটি ক্রিয়ার অনুরূপ ফল প্রকটিত হয় মনের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনকে দুটি আলাদা বস্তু বলিয়া ভাবিলেও কোন ক্ষতি নাই, আবার দুটি মিলিয়া একটি-ই শরীর—স্থূল দেহ তাহার স্থূল অংশ, আর মন তাহার সূক্ষ্ম অংশ—এরূপ ভাবিলেও কিছু আসে যায় না। ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল। মন প্রতিনিয়ত শরীরে রূপায়িত হইতেছে। মনকে সংযত করিতে হইলে প্রথমে শরীরের দিক্ হইতে আরম্ভ করা বেশী সহজ। মন অপেক্ষা শরীরের সঙ্গে সংগ্রাম করা অনেক সহজ কাজ।

যে যন্ত্র যত বেশী সূক্ষ্ম, তাহার শক্তিও তত বেশী। মন শরীরের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। এজন্য শরীর হইতে আরম্ভ করিলে কাজ সহজ হয়।

প্রাণায়াম হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে শরীর-অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া মনের কাছে পৌঁছান চলে। এভাবে চলিতে চলিতে শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তারপর শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করি; ক্রমে সূক্ষ্মতর ও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি, অবশেষে মনের কাছে গিয়াই পৌঁছাই। শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অনুভূতিতে আসামাত্র সেগুলি আয়ত্তে আসে। কিছুকাল পরে শরীরের উপর মনের কার্যগুলিও অনুভব করিতে পারিবে। মনের একাংশ যে অপরাংশের উপর কাজ করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিবে; এবং মন যে স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগাইতেছে, তাহাও অনুভব করিবে; কারণ মনই স্নায়ুমণ্ডলীর নিয়ন্তা ও অধীশ্বর। বিভিন্ন স্নায়ুস্পন্দন অবলম্বনে মনই ক্রিয়া করিতেছে, ইহাও টের পাইবে।

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে—প্রথমে স্থূল শরীরের উপর ও পরে সূক্ষ্মশরীরের উপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে মনকে আয়ত্তে আনা যায়।

প্রাণায়ামে প্রথম ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও খুবই স্বাস্থ্যকর। ইহার অভ্যাসে আর কিছু না হউক স্বাস্থ্যলাভ ও শরীরের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হইবেই। বাকী প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে ও সাবধানে করিতে হয়।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম বলিতে কি বোঝায়, প্রথমে আমরা তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে। দার্শনিকদের মতে এই সৃষ্টি তরঙ্গাকারে চলে; তরঙ্গ উঠিল, আবার পড়িয়া মিলাইয়া গেল, যেন গলিয়া বিলীন হইল। আবার এই-সব বৈচিত্র্য লইয়া উঠিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে আবার চলিয়া গেল। এইভাবে পর পর ওঠা-নামা চলিতে থাকে। জড়পদার্থ ও শক্তির মিলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও রচিত হইয়াছে; সংস্কৃতশাস্ত্রাভিজ্ঞ দার্শনিকেরা বলেনঃ কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব বস্তুকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহারা এই মূল পদার্থের নাম দিয়াছেন 'আকাশ' (ইথার); আর প্রকৃতির যে-সব শক্তি আমরা দেখিতে পাই, সেগুলিও যে মূল শক্তির অভিব্যক্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 'প্রাণ'। আকাশের উপর এই প্রাণের কার্যের ফলেই বিশ্বসৃষ্টি হয়, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের অন্তে—অর্থাৎ কল্পান্তে—একটি সৃষ্টির বিরতি-সময় আসে। একটি সৃষ্টিপ্রবাহের পর কিছুক্ষণ বিরতি আসিয়া থাকে—সব কাজেই এই নিয়ম। যখন প্রলয়কাল আসে, তখন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকারাজি প্রভৃতির সহিত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতে হইতে আবার আকাশে পরিণত হয়; সব-কিছুই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া 'আকাশ'-এ লীন হয়। মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, গতি, চিন্তা প্রভৃতি শরীরের ও মনের যাবতীয় শক্তিও বিকীর্ণ হইতে হইতে আবার মূল 'প্রাণ'-এ লীন হইয়া যায়। ইহা হইতে আমরা প্রাণায়ামের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই আকাশ যেমন সর্বত্রই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং আমরা তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছি, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান সব-কিছুই আকাশ হইতে সৃষ্ট; হ্রদের জলে ভাসমান বরফের টুকরার মত আমরাও এই ইথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। বরফের টুকরাগুলি হ্রদের জল দিয়াই গঠিত, আবার সেই জলেই ভাসিয়া বেড়ায়। বিশ্বের সমুদয় পদার্থও তেমনি 'আকাশ' দিয়া গঠিত এবং 'আকাশ'-এর সমুদ্রেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণের অর্থাৎ বল ও শক্তির বিশাল সমুদ্রও ঠিক এই-ভাবেই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই প্রাণসহায়েই আমাদের শ্বাস-ক্রিয়া চলে, দেহে রক্তচলাচল হয়; এই প্রাণই স্নায়ুর ও মাংসপেশীর শক্তিরূপে এবং মস্তিষ্কের চিন্তারূপে প্রকাশ পায়। সব শক্তিই যেমন একই প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তেমনি সব পদার্থই একই আকাশের বিবিধ অভিব্যক্তি; স্থূলের কারণ সব সময়েই সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোন রসায়নবিদ্ যখন একখণ্ড স্থূল মিশ্রপদার্থ লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে থাকেন, তখন তিনি বস্তুতঃ এই স্থূল পদার্থটির উপাদান সূক্ষ্ম পদার্থের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হন। আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের বেলাও ঠিক একই কথা; স্থূলের ব্যাখ্যা সূক্ষ্মের মধ্যে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল তাহার কার্য। যে স্থূল বিশ্বকে আমরা দেখি, অনুভব করি, স্পর্শ করি, তাহার কারণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতে চিন্তার মধ্যে। চিন্তার কারণ ও ব্যাখ্যা আবার পাওয়া যায় আরও পরে। আমাদের এই মনুষ্যদেহেও হাত নাড়া, কথা বলা প্রভৃতি স্থূল কার্যগুলিই আগে আমাদের নজরে পড়ে; কিন্তু এই কার্যগুলির কারণ কোথায়? দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্নায়ুগুলিই তাহার কারণ; সে স্নায়ুর ক্রিয়া মোটেই আমাদের অনুভবে আসে না; তাহা এত সূক্ষ্ম যে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না; তাহা ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাহিরে। তবু আমরা জানি যে, দেহের এইসব স্থূল কার্যের কারণ এই স্নায়ুরই ক্রিয়া। এই স্নায়ুর গতিবিধি আবার সেই-সব সূক্ষ্মতর স্পন্দনের কার্য, যাহাকে আমরা চিন্তা বলিয়া থাকি। চিন্তার কারণ আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর একটি বস্তু, যাহাকে আত্মা—মানুষের চরম সত্তা অথবা জীবাত্মা বলে। নিজেকে ঠিকমত জানিতে হইলে আগে স্বীয় অনুভবশক্তিকে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কোন অণুবীক্ষণযন্ত্র বা ঐ-জাতীয় কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলিকে দেখা যায়। এই-জাতীয় উপায় অবলম্বনে কখনও সেগুলি দেখা সম্ভব নয়। তাই যোগী এমন একটি বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন, যাহা তাঁহাকে নিজের মন পর্যবেক্ষণ করিবার উপযোগী যন্ত্র গঠন করিয়া দেয়; সে যন্ত্রটি মনের মধ্যেই রহিয়াছে। সূক্ষ্ম জিনিষ ধরিবার মত এমন শক্তি মন পায়, যাহা কোন যন্ত্রের দ্বারা কোনকালে পাওয়া সম্ভব নয়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে স্থূল হইতে শুরু করিতে হইবে। শক্তি যত সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর হইয়া আসিবে, ততই আমরা নিজ প্রকৃতির গভীরতর—গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিব। প্রথমে আমরা সমস্ত স্থূল ক্রিয়াগুলি ধরিতে পারিব, তারপর চিন্তার সূক্ষ্ম গতিবিধিগুলি; চিন্তা উদিত হইবার পূর্বেই তাহার সন্ধান পাইব, উহার গতি কোন্ দিকে এবং কোথায় তাহার শেষ, সব-কিছুই ধরিতে পারিব। যেমন ধর, সাধারণ মনে একটি চিন্তা উঠিল। মন জানে না—চিন্তাটি উৎপন্ন হইল কিভাবে বা কোথায়। মন যেন সমুদ্রের মত এক তরঙ্গের উৎস। কিন্তু তরঙ্গটি দেখিতে পাইলেও মানুষ বুঝিতে পারে না—কি করিয়া উহা হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল, কোথায় তাহার জন্ম, কোথায় বা তাহার বিলয়। তরঙ্গটি দেখা ছাড়া বেশী আর কিছুর সন্ধান সে জানে না। কিন্তু অনুভব-শক্তি যখন সূক্ষ্ম হইয়া আসে, তখন উপরের স্তরে উঠিয়া আসার বহু পূর্বেই তরঙ্গটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি; আবার তরঙ্গটি অদৃশ্য হইবার পরও বহুদূর পর্যন্ত উহার গতিপথের অনুসরণ করিতে পারি। তখনই যথার্থ মনস্তত্ত্ব বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা বোধগম্য হয়। লোকে আজকাল নানা বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিতেছে; কিন্তু এ-সব গ্রন্থ মানুষকে শুধু ভুল পথে পরিচালিত করে। কারণ নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিবার মত ক্ষমতা না থাকায় গ্রন্থ-রচয়িতারা যে-সব বিষয় সম্বন্ধে কখনও স্বয়ং কোন জ্ঞানলাভ করেন নাই, অনুমানমাত্র-সহায়ে সেই-সব বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানমাত্রকেই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং সে তথ্যগুলিরও পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ অবশ্য প্রয়োজন। সামান্যীকরণ করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ তথ্য যতক্ষণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ করিবার আর থাকেই বা কি? কাজেই সাধারণ তত্ত্বে পৌঁছাইবার সব প্রচেষ্টা নির্ভর করিতেছে—যে বিষয়গুলির আমরা সামান্যীকরণ করিতে চাই, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিবার উপর। একজন একটি কল্পিত মত গড়িয়া তুলিল, তারপর সেই মতকে ভিত্তি করিয়া অনুমানের পর অনুমান চলিতে লাগিল; শেষে সমগ্র গ্রন্থটি শুধু অনুমানে ভরিয়া গেল, যাহার কোনটিরই কোন অর্থ হয় না। রাজযোগ-বিজ্ঞান বলে, সর্বপ্রথম নিজের মন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য তোমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে; নিজের মন বিশ্লেষণ করিয়া, মনের সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়া মনের ভিতর কি ঘটিতেছে, নিজে তাহা দেখিয়া এ-কাজ করা যায়; তথ্যগুলি সংগৃহীত হইবার পর সেগুলি সামান্যীকরণ কর। তাহা হইলেই যথার্থ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান আয়ত্ত হইবে। আগেই বলিয়াছি, কোন সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষে পৌঁছাইতে হইলে প্রথম তাহার স্থূল অংশের সাহায্য লইতে হইবে। বাহিরে যাহা কর্মপ্রবাহের

আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই সেই স্থূলতর অংশ। সেটিকে ধরিয়া যদি আমরা ক্রমে আরও অগ্রসর হই, তাহা হইলে ক্রমে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে অবশেষে উহা সূক্ষ্মতম হইয়া যাইবে। এইরূপে স্থির হয়, আমাদের এই শরীর বা তাহার ভিতরে যাহা কিছু আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র বস্তু নহে; বস্তুতঃ উহারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্যন্ত বিস্তৃত একই শৃঙ্খলের পরস্পর-সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রন্থি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সবগুলিকে লইয়া তুমি একটি গোটা মানুষ; এই দেহটি অন্তরের একটি বাহ্য অভিব্যক্তি বা একটি কঠিন আবরণ; বহির্ভাগটি স্থূলতর, অন্তর্ভাগটি সূক্ষ্মতর; এমনি ভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে আত্মার কাছে গিয়া পৌঁছিবে। এভাবে আত্মার সন্ধান পাইলে তখন বোঝা যায়, এই আত্মাই সব-কিছু অভিব্যক্ত করিতেছেন; এই আত্মাই মন হইয়াছেন, শরীর হইয়াছেন; আত্মা ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকী যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন স্তরে আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থূলাকারে অভিব্যক্তি মাত্র। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থূল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, আর তাহার পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম স্পন্দন, যাহাকে 'ঈশ্বরেচ্ছা' বলা যায়। তাহারও পশ্চাতে আমরা এক অখণ্ড পরমাত্মার সন্ধান পাই এবং তখনই বুঝিতে পারি, সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং ইহাও অনুভূত হয় যে, জগৎ ঈশ্বর এবং পরমাত্মা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহেন; ফলতঃ তাহারা একটি মৌলিক সত্তারই বিভিন্ন অভিব্যক্ত অবস্থা। প্রাণায়ামের ফলেই এ-সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে এই যে-সব সূক্ষ্ম স্পন্দন চলিতেছে, তাহারা শ্বাস-ক্রিয়ার সহিত জড়িত। এই শ্বাস-ক্রিয়াকে যদি আমরা আয়ত্তে আনিতে পারি, এবং তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত ও নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর গতিগুলিকেও ধরিতে পারিব, এবং এইরূপে এই শ্বাস-ক্রিয়াকে ধরিয়াই মনোরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিব।

পূর্বপাঠে তোমাদের যে প্রাথমিক শ্বাস-ক্রিয়া শিখাইয়াছিলাম, তাহা একটি সাময়িক অভ্যাস মাত্র। এই শ্বাস-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে কয়েকটি আবার খুব কঠিন; আমি অবশ্য কঠিন উপায়গুলি বাদ দিয়া বলিবার চেষ্টা করিব, কারণ কঠিনতর সাধনগুলির জন্য আহার ও অন্যান্য বিষয়ে অনেকখানি সংযমের প্রয়োজন, আর তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই তাহা সম্ভব নয়। কাজেই সহজ ও মন্থরতর সাধনগুলি সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। এই শ্বাস-ক্রিয়ার তিনটি অঙ্গ আছে। প্রথম অঙ্গ হইতেছে নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, যাহার সংস্কৃত নাম 'পূরক' বা পূর্ণকরণ; দ্বিতীয় অঙ্গের নাম 'কুম্ভক' বা ধারণ, অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র বায়ুপূর্ণ করিয়া ঐ বায়ু বাহির হইতে না দেওয়া; তৃতীয় অঙ্গের নাম 'রেচক' অর্থৎ শ্বাসত্যাগ। যে প্রথম সাধনটি আজ আমি তোমাদিগকে শিখাইতে চাই, তাহা হইতেছে সহজভাবে শ্বাস টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ দম বন্ধ রাখিয়া পরে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করা। তারপর প্রাণায়ামের আর একটি উচ্চতর ধাপ আছে, কিন্তু আজ আর সে-বিষয়ে কিছু বলিব না; কারণ তাহার সব কথা তোমরা মনে রাখিতে পারিবে না; উহা বড়ই জটিল। শ্বাস-ক্রিয়ার এই তিনটি অঙ্গ মিলিয়া একটি 'প্রাণায়াম' হয়। এই শ্বাস-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহার অভ্যাসে বিপদ আছে। সেজন্য সংখ্যার সাহায্যে ইহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়; তোমাদিগকে সর্বনিম্ন সংখ্যা লইয়াই আরম্ভ করিতে বলিব। চার সেকেণ্ড ধরিয়া শ্বাস গ্রহণ কর, তারপর আট সেকেণ্ড দম বন্ধ করিয়া রাখ; পরে আবার চার সেকেণ্ড ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা পরিত্যাগ কর। * আবার প্রথম হইতে শুরু কর; এইভাবে সকালে চারিবার ও সন্ধ্যায় চারিবার করিয়া অভ্যাস করিবে। আর একটি কথা আছে। এক-দুই-তিন বা এই ধরনের অর্থহীন সংখ্যা গণনা অপেক্ষা নিজের কাছে পবিত্র বলিয়া মনে হয়, এমন কোন শব্দ জপের সহিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ করা ভাল। যেমন আমাদের দেশে 'ওঁ' নামক একটি সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। 'ওঁ' ঈশ্বরের প্রতীক। এক, দুই, তিন, চার এই-সব সংখ্যার পরিবর্তে 'ওঁ' জপ করিলে উদ্দেশ্য ভালভাবেই সিদ্ধ হয়। আর একটি কথা। প্রথমে বাম নাক দিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া ডান নাক দিয়া উহা ছাড়িতে হইবে, পরে ডান নাক দিয়া টানিয়া বাম নাক দিয়া ছাড়িতে হইবে। তারপর আবার পদ্ধতিটি পাল্টাইয়া লও; এইভাবে পরপর চল। প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে খুশীমত শুধু ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে যে-কোন নাক দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া করিবার শক্তির অধিকারী হইতে পার। কিছুদিন পর ইহা সহজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এখনই তোমাদের সে শক্তি নাই। কাজেই এক নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ করার সময় অপর নাকটি আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কুম্ভকের সময় উভয় নাসারন্ধ্রই এইভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

পূর্বে যে দুইটি বিষয় শিখাইয়াছি, উহাও ভুলিলে চলিবে না। প্রথম কথা, দেহ সোজা রাখিবে; দ্বিতীয় কথা, ভাবিবে যে তোমার শরীর দৃঢ় এবং অটুট—সুস্থ ও সবল। তারপর চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ ছড়াইয়া দিবে, ভাবিবে সারা জগৎ আনন্দে ভরপুর। পরে—যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনা করিবে। তারপর প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে। তোমাদের অনেকেরই মধ্যে হয়তো সর্বাঙ্গে কম্পন, অযথা ভয়জনিত স্নায়বিক অস্থিরতা প্রভৃতি শারীরিক বিকার উপস্থিত হইবে। কাহারও বা কান্না পাইবে, কখনও কখনও মানসিক আবেগোচ্ছ্বাস হইবে। কিন্তু ভয় পাইও না; সাধনাবস্থায় এ-সব আসিয়াই থাকে। কারণ গোটা শরীরটিকে যেন নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। চিন্তার প্রবাহের জন্য মস্তিষ্কে নূতন প্রণালী নির্মিত হইবে, যে-সব স্নায়ু সারা জীবনে কখনও কাজে লাগে নাই, সেগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠিবে, এবং শরীরেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বহু পরিবর্তন-পরম্পরা উপস্থিত হইবে।

ধ্যান

স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খ্রীঃ ৩ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো শহরে ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা—আইডা আনসেল। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কিছু কিছু কথা ধরিতে পারেন নাই, সে-সব স্থলে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন ... দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যেকার শব্দ বা বাক্য স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের মুখপত্র Vedanta and the West পত্রিকায় ১১২তম সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৫) মুদ্রিত হইয়াছে।

সকল ধর্মই 'ধ্যান'-এর উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। যোগীরা বলেন ধ্যানমগ্ন অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন বাহিরের বস্তু অনুশীলনে রত থাকে, তখন ইহা সেই বস্তুর সহিত একীভূত হয় এবং নিজেকে হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমায় মানুষের মন যেন একখণ্ড স্ফটিকের মত—নিকটে যাহাই থাকুক, উহা তাহারই রঙ ধারণ করে। অন্তঃকরণ যাহাই স্পর্শ করে, ... তাহারই রঙে উহাকে রঞ্জিত হইতে হয়। ইহাই তো সমস্যা। ইহারই নাম বন্ধন। ঐ রঙ এত তীব্র যে, স্ফটিক নিজেকে বিস্মৃত হইয়া বাহিরের রঙের সহিত একীভূত হয়। মনে কর—একটি স্ফটিকের কাছে একটি লাল ফুল রহিয়াছে; স্ফটিকটি উহার রঙ গ্রহণ করিল এবং নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে লাল রঙের বলিয়াই ভাবিতে লাগিল। আমাদেরও অবস্থা ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরাও শরীরের রঙে রঞ্জিত হইয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। (এই ভ্রান্তির) অনুগামী সব দুঃখই সেই এক অচেতন শরীর হইতে উদ্ভূত। আমাদের সব ভয়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ সেই একমাত্র মহাভ্রান্তি —'আমরা শরীর' এই ভাব হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ছবি। সন্নিহিত পুষ্পের বর্ণানুরঞ্জিত স্ফটিকতুল্য এই জীব! কিন্তু স্ফটিক যেমন লাল ফুল নয়, আমরাও তেমনি শরীর নই। ধ্যানাভ্যাস অনুসরণ করিতে করিতে স্ফটিক নিজের স্বরূপ জানিতে পারে এবং নিজ রঙে রঞ্জিত হয়। অন্য কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদিগকে সত্যের অধিকতর নিকটে লইয়া যায়। ...

ভারতে দুই ব্যক্তির দেখা হইলে (আজকাল) তাঁহারা ইংরেজীতে বলেন, 'কেমন আছেন?' কিন্তু ভারতীয় অভিবাদন হইল, 'আপনি কি সুস্থ?' যে মুহূর্তে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে, তোমার দুঃখ আসিবার আশঙ্কা আছে। ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুঝি—আত্মার উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা। আত্মা যখন নিজের অনুধ্যানে ব্যাপৃত এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার তখনকার অবস্থাটিই নিশ্চিতরূপে সুস্থতম অবস্থা। ভাবোন্মাদনা, প্রার্থনা প্রভৃতি অপরাপর যে-সব প্রণালী আমাদের রহিয়াছে, সেগুলিরও চরম লক্ষ্য ঐ একই। গভীর আবেগের সময়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। যদিও এ আবেগটি হয়তো কোন বহির্বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মন সেখানে ধ্যানস্থ।

ধ্যানের তিনটি স্তর। প্রথমটিকে বলা হয় (ধারণা)—একটি বস্তুর উপরে, একাগ্রতা অভ্যাস। এই গ্লাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই গ্লাসটি ছাড়া অপর সকল বিষয় মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া শুধু ইহারই উপর মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু মন চঞ্চল। ... মন যখন দৃঢ় হয় এবং তত চঞ্চল নয়, তখনই ঐ অবস্থাকে 'ধ্যান' বলা হয়। আবার ইহা অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা আছে, যখন গ্লাসটি ও আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় (সমাধি বা পরিপূর্ণ তন্ময়তা)। তখন মন ও গ্লাসটি অভিন্ন হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। তখন সকল ইন্দ্রিয় কর্মবিরত হয় এবং যে-সকল শক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়া করে, সেগুলি (মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয়)। তখন গ্লাসটি পুরাপুরিভাবে মনঃশক্তির অধীনে আসিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যোগিগণের অনুষ্ঠিত ইহা একটি প্রচণ্ড শক্তির খেলা। ... ধরা যাক—বাহিরের বস্তু বলিয়া কিছু আছে। সে ক্ষেত্রে যাহা বাস্তবিকই আমাদের বাহিরে রহিয়াছে, তাহা—আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা নয়। যে গ্লাসটি আমাদের চোখে ভাসিতেছে, সেটি নিশ্চয়ই আসল বহির্বস্তু নয়। গ্লাস বলিয়া অভিহিত বাহিরের আসল বস্তুটিকে আমি জানি না এবং কখনও জানিতে পারিব না।

কোন কিছু আমার উপর একটি ছাপ রাখিল; তৎক্ষণাৎ আমি আমার প্রতিক্রিয়া জিনিষটির দিকে পাঠাইলাম এবং এই উভয়ের সংযোগের ফল হইল 'গ্লাস'। বাহিরের দিক্ হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া—'ক' এবং ভিতর হইতে উত্থিত প্রতিক্রিয়া—'খ'। গ্লাসটি হইল 'ক-খ'। যখন 'ক'-এর দিকে তাকাইতেছ, তখন উহাকে বলিতে পার 'বহির্জগৎ', আর যখন 'খ'-এর দিকে দৃষ্টি দাও,

তখন উহা 'অন্তর্জগৎ'। ... কোন্‌টি তোমার মন আর কোন্‌টি বাহিরের জগৎ—এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে দেখিবে, এরূপ কোন প্রভেদ নাই। জগৎ হইতেছে তুমি এবং আরও কিছুর সমবায় ...।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তুমি একটি হ্রদের শান্ত বুকে কতকগুলি পাথর ছুঁড়িলে। প্রতিটি প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই দেখা যায় একটি প্রতিক্রিয়া। প্রস্তরখণ্ডটিকে বেড়িয়া সরোবরের কতকগুলি ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। এইরূপেই বহির্জগতের বস্তুনিচয় যেন মন-রূপ সরোবরে উপলরাশির মত নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জিনিষ দেখি না ...; দেখি শুধু তরঙ্গ ...।

মনে উত্থিত তরঙ্গগুলি বাহিরে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। আমরা আদর্শবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) গুণ-সকল আলোচনা করিতেছি না। মানিয়া লইতেছি—বাহিরের জিনিষ রহিয়াছে, কিন্তু যাহা আমরা দেখি, তাহা বাহিরে অবস্থিত বস্তু হইতে ভিন্ন, কেন-না আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা বহিঃস্থ বস্তু ও আমাদের নিজেদের সত্তার একটি সমবায়।

মনে কর—আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহা গ্লাসটি হইতে উঠাইয়া লইলাম। কি অবশিষ্ট রহিল? প্রায় কিছুই নয়। গ্লাসটি অদৃশ্য হইবে। যদি আমি আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহা এই টেবিলটি হইতে সরাইয়া লই, টেবিলের আর কি থাকিবে? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকিবে না, কারণ ইহা উৎপন্ন হইয়াছিল বহির্বস্তু ও আমার ভিতর হইতে প্রদত্ত কিছু—এই দুই লইয়া। (প্রস্তরখণ্ড) যখনই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, হ্রদ বেচারীকে তখনই উহার চারিপাশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে। যে-কোন উত্তেজনার জন্য মনকে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেই হইবে। মনে কর ... আমরা যেন মন বশীভূত করিতে পারি। তৎক্ষণাৎ আমরা মনের প্রভু হইব। আমরা বাহিরের ঘটনাগুলিকে আমাদের যাহা কিছু দেয়, তাহা দিতে অস্বীকার করিলাম ...। আমি যদি আমার ভাগ না দিই, বাহিরের ঘটনা থামিতে বাধ্য। অনবরত তুমি এই বন্ধন সৃষ্টি করিতেছ। কিরূপে? তোমার নিজের অংশ দিয়া। আমরা সকলেই নিজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া বন্ধন রচনা করিতেছি...। যখন বহির্বস্তু ও আমার মধ্যে অভিন্ন বোধ করার ভাব চলিয়া যাইবে, তখন আমি আমার (দেয়) ভাগটি তুলিয়া লইতে পারিব এবং বস্তুও বিলুপ্ত হইবে। তখন আমি বলিব, 'এখানে এই গ্লাসটি রহিয়াছে,' আর আমি আমার মনটি উহা হইতে উঠাইয়া লইব, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটিও অদৃশ্য হইবে ...। যদি তুমি তোমার দেয় অংশ উঠাইয়া লইতে সমর্থ হও, তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাঁটিতে পারিবে। জল আর তোমাকে ডুবাইবে কেন? বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকার কষ্টও থাকিবে না। প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুতে তোমার দান অন্ততঃ অর্ধেক এবং প্রকৃতির অর্ধাংশ। যদি তোমার অর্ধভাগ সরাইয়া লওয়া যায় তো দৃশ্যমান বস্তুর বিলুপ্তি ঘটিবে।

... প্রত্যেক কাজেরই সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে ...। যদি কোন লোক আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট দেয়—ইহা সেই লোকটির কার্য এবং (বেদনা) আমার শরীরের প্রতিক্রিয়া ...। মনে কর আমার শরীরের উপর আমার এতটা ক্ষমতা আছে যে, আমি ঐ স্বয়ংচালিত প্রতিক্রিয়াটি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। ঐরূপ শক্তি কি অর্জন করা যায়? ধর্মশাস্ত্র (যোগশাস্ত্র) বলে, যায় ...। যদি তুমি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ ইহা লাভ কর, তখন বলিয়া থাক—'অলৌকিক' ঘটনা। আর যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা কর, তখন উহার নাম 'যোগ'।

মানসিক শক্তির দ্বারা লোকের রোগ সারাইতে আমি দেখিয়াছি। উহা 'অলৌকিক কর্মী'র কাজ। আমরা বলি, তিনি প্রার্থনা করিয়া লোককে নীরোগ করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন, 'না, মোটেই না, ইহা কেবল তাঁহার মনের শক্তির ফল। লোকটি বৈজ্ঞানিক। তিনি জানেন, তিনি কি করিতেছেন।'

ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে সব কিছু দিতে পারে। যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও, (ইহা ধ্যানের অনুশীলনেই সম্ভব হইবে)। আজকাল বিজ্ঞানের সকল আবিষ্ক্রিয়াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বস্তুটি তন্ময়ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন এবং সব-কিছু ভুলিয়া যান—এমন কি নিজেদের সত্তা পর্যন্ত, আর তখন মহান্ সত্যটি বিদ্যুৎপ্রভার মত আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অনুপ্রেরণা' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিঃশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তুক নয় (নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভব), সেইরূপ 'অনুপ্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুই বৃথা পাওয়া যায় নাই।

যীশুখ্রীষ্টের কার্যের মধ্যে আমরা তথাকথিত শ্রেষ্ঠ 'অনুপ্রেরণা' দেখিতে পাই। তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর কর্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অনুপ্রেরণা' তাঁহার প্রাক্তন কর্মের—কঠিন শ্রমের ফল ...। 'অনুপ্রেরণা' লইয়া ঢাক পিটান অনর্থক বাক্যব্যয়। যদি তাহাই হইত, তবে ইহা বর্ষাধারার মত পতিত হইত। যে-কোন চিন্তাধারায় প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণ শিক্ষিত (ও কৃষ্টিসম্পন্ন) জাতিসমূহের মধ্যেই আবির্ভূত হন। প্রত্যাদেশ বলিয়া কিছু নাই। ... অনুপ্রেরণা বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা আর কিছুই নয়—যে সংস্কারগুলি পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, সেগুলির কার্যপরিণত রূপ অর্থাৎ ফল। একদিন সচকিতে আসে এই ফল! তাঁহাদের অতীত কর্মই ইহার কারণ।

সেখানেও দেখিবে ধ্যানের শক্তি—চিন্তার গভীরতা। ইঁহারা নিজ নিজ আত্মাকে মন্থন করেন। মহান্ সত্যসমূহ উপরিভাগে আসিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাসই জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। ধ্যানের শক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। ধ্যানশক্তির প্রয়োগে অজ্ঞান, কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে আমরা সাময়িকভাবে মুক্ত হইতে পারি, ইহার বেশী নয়। মনে কর, এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে যে, এই বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে এবং আর এক ব্যক্তি রাত্রে আসিয়া বলিল, 'যাও, বিষ পান কর!' এবং বিষ খাইয়াও আমার মৃত্যু হইল না (যাহা ঘটিল তাহা এই)—ধ্যানের ফলে বিষ ও আমার নিজের মধ্যে একত্ববোধ হইতে সাময়িকভাবে আমার মন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অপর পক্ষে সাধারণভাবে বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

যদি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাকে ধ্যানের অবস্থায় উন্নীত করি, তবে যে-কোন লোককেই আমি বাঁচাইতে

পারি। এই কথা (যোগ)-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ইহা কতখানি নির্ভুল, তাহার বিচার তোমরাই করিও।

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেঃ তোমরা ভারতবাসীরা এ-সব জয় কর না কেন? অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তোমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা দাবী কর। তোমরা যোগাভ্যাস কর এবং অন্য কাহারও অপেক্ষা দ্রুত অভ্যাস কর। তোমরা যোগ্যতর। ইহা কার্যে পরিণত কর! তোমরা যদি মহান্ জাতি হইয়া থাক, তোমাদের যোগপদ্ধতিও মহান্ হওয়া উচিত। সব দেবতাকে বিদায় দিতে হইবে। বড় বড় দার্শনিকদের চিন্তাধারা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের ঘুমাইতে দাও। তোমরাও বিশ্বের অন্য সকলের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিশু মাত্র। তোমাদের সব কিছু দাবী নিষ্ফল। তোমাদের যদি সত্যি দাবী থাকে, সাহসের সহিত দাঁড়াও, এবং স্বর্গ বলিতে যাহা কিছু—সব তোমাদের। কস্তুরীমৃগ তাহার অন্তর্নিহিত সৌরভ লইয়া আছে, এবং সে জানে না—কোথা হইতে সৌরভ আসিতেছে। বহুদিন পর সে সেই সৌরভ নিজের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। এ-সব দেবতা ও অসুর মানুষের মধ্যে আছে। যুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিতে জান যে, তোমার মধ্যেই সব আছে। দেবতা ও কুসংস্কারের আর প্রয়োজন নাই। তোমরা যুক্তিবাদী, যোগী, যথার্থ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন হইতে চাও।

(আমার উত্তর এইঃ তোমাদের নিকট) সব-কিছুই জড়। সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বর অপেক্ষা বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মূর্তিপূজক গরীব বেচারীকে তো তোমরা ঘৃণা করিতেছ। তার চেয়ে তোমরা বড় নও। আর ধনের পূজারী তোমরাই বা কী! মূর্তিপূজক তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত কোন বিশেষ কিছুকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা তো সেটুকুও কর না। আত্মার অথবা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন কিছুর উপাসনা তোমরা কর না! তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। 'ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ!' ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপই। প্রকৃত ভাব ও বিশ্বাস লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। চৈতন্য কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে? 'আমাদের ঈশ্বর'—এই কথার অর্থ কি? তুমিই তো চৈতন্য। এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে কখনই ত্যাগ করিও না। আমি চৈতন্যস্বরূপ। যোগের সমস্ত কৌশল এবং ধ্যানপ্রণালী আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য।

এখনই কেন এই সমস্ত বলিতেছি? যে পর্যন্ত না তুমি (ঈশ্বরের) স্থান নির্দেশ করিতে পারিবে, এ-বিষয় কিছুই বলিতে পার না। (তাঁহার) প্রকৃত স্থান ব্যতীত স্বর্গে এবং মর্ত্যের সর্বত্র তুমি তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছ। আমি চেতন প্রাণী, অতএব সমস্ত চেতনার সারভূত চেতনা আমার আত্মাতে অবশ্যই থাকিবে। যাহারা ভাবে ঐ চেতনা অন্য কোথাও আছে, তাহারা মূর্খ। অতএব আমার চেতনাকে এই স্বর্গেই অন্বেষণ করিতে হইবে। অনাদিকাল হইতে যেখানে যত স্বর্গ আছে, সে-সব আমারই মধ্যে। এমন অনেক যোগী ঋষি আছেন, যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া 'আবৃত্তচক্ষু' হন এবং নিজেদের আত্মার সমস্ত চেতনার চেতনাকে দর্শন করেন। ইহাই ধ্যানের পরিধি। ঈশ্বর ও তোমার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার কর এবং এইরূপে মুক্ত হও।

সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়া চলিয়াছে, শেষে আমরা দেখি—ইহা মূর্খতামাত্র। জীবন অপেক্ষা আরও মহত্তর কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক (এই জীবন) নিকৃষ্টতর। কেন আমি বাঁচিবার আশায় ছুটিতে যাইব? জীবন অপেক্ষা আমার স্থান যে অনেক উচ্চে। বাঁচিয়া থাকাই সর্বদা দাসত্ব। আমরা সর্বদাই (অজ্ঞানের সহিত নিজেদের) মিশাইয়া ফেলিতেছি ...। সবই দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল।

তুমি যে কিছু লাভ কর, সে কেবল নিজের দ্বারাই, কেহ অপরকে শিখাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া (আমরা শিক্ষা করি) ... ঐ যে যুবকটি—উহাকে কখনও বিশ্বাস করাইতে পারিবে না যে, জীবনে বিপদ-আপদ আছে। আবার বৃদ্ধকে বুঝাইতে পারিবে না যে, জীবন বিপত্তিহীন, মসৃণ। বৃদ্ধ অনেক দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইহাই পার্থক্য।

ধ্যানের শক্তিদ্বারা এ-সবই ক্রমে ক্রমে আমাদের বশে আনিতে হইবে। আমরা দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি যে, আত্মা মন ভূত (জড় পদার্থ) প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের (বাস্তব সত্তা কিছু নাই)। ... যাহা আছে, তাহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। বহু কিছু থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অর্থ ইহাই। অজ্ঞানের জন্যই বহু দেখি। জ্ঞানে একত্বের উপলব্ধি ...। বহুকে একে পরিণত করাই বিজ্ঞান ...। সমগ্র বিশ্বের একত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের নাম বেদান্ত-বিদ্যা। সমগ্র জগৎ এক। আপাত প্রতীয়মান বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই 'এক' অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের পক্ষে এখন এই-সকল বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আমরা এগুলি দেখিতেছি—অর্থাৎ এগুলি আমরা বলি পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ (পাঁচটি মৌলিক পদার্থ)। ইহার পরে রহিয়াছে মনোময় সত্তা, আর আধ্যাত্মিক সত্তা তাহারও পরে। আত্মা এক, মন অন্য, আকাশ অন্য একটি কিছু ইত্যাদি—এরূপ কিন্তু নয়। এই-সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একই সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে; ফিরিয়া গেলে কঠিন অবশ্যই তরলে পরিণত হইবে। যেভাবে মৌলিক পদার্থগুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, সেভাবেই আবার তাহাদের ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কঠিন পদার্থগুলি তরলাকার ধারণ করিবে, তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে পরিণত হইবে। নিখিল জগতের ইহাই কল্পনা—এবং ইহা সর্বজনীন। বাহিরের এই জগৎ এবং সর্বজনীন আত্মা, মন, আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি আছে। মন সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষুদ্র জগতে বা অন্তর্জগতে 'আমি' ঠিক ঐ এক। আমিই আত্মা, আমিই মন। আমিই আকাশ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ। আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সত্তায় প্রত্যাবর্তন। একটি ক্ষুদ্র জীবনে 'মানুষকে' সমগ্র বিশ্বের জীবন যাপন করিতে হইবে। এরূপে মানুষ এ-জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। তাহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবৎকালেই সে বিশ্বজীবন অতিবাহিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

আমরা সকলেই সংগ্রাম করি। ... যদি আমরা পরম সত্যে পৌঁছিতে না পারি, তবে অন্ততঃ এমন স্থানেও উপনীত হইব, যেখানে এখানকার অপেক্ষা উন্নততর অবস্থাতেই থাকিব। এই অভ্যাসেরই নাম ধ্যান। (সব কিছুকে সেই চরম সত্য—আত্মাতে পর্যবসিত করা।) কঠিন দ্রবীভূত হইয়া তরলে, তরল বাষ্পে, বাষ্প ব্যোম্ বা আকাশে আর আকাশ মনে রূপান্তরিত হয়। তারপর মনও গলিয়া যাইবে। শুধু থাকিবে আত্মা—সবই আত্মা।

যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবী করেন যে, এই শরীর তরল বাষ্প ইত্যাদিতে পরিণত হইবে। তুমি শরীর দ্বারা যাহা খুশী করিতে পারিবে—ইহাকে ছোট করিতে পার, এমন কি বাষ্পেও পরিণত করিতে পার, এই দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাতায়াতও সম্ভব হইতে পারে—এই রকম তাঁহারা দাবী করেন। আমার অবশ্য তাহা জানা নাই। আমি কখনও কাহাকেও এরূপ করিতে দেখি নাই। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই-সব কথা আছে। যোগশাস্ত্রগুলিকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

হয়তো আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জীবনে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ইহা প্রতিভাত হয়। কে জানে এখানেই হয়তো কোন প্রাচীন যোগী রহিয়াছেন, যাঁহার মধ্যে সাধনা সম্পূর্ণ করিবার সামান্যই একটু বাকী। অভ্যাস!

একটি চিন্তাধারার মাধ্যমে ধ্যানে পৌঁছিতে হয়। ভূতপঞ্চকের শুদ্ধীকরণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়—এক-একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া স্থূল হইতে পরবর্তী সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মতরে, তাহাও আবার মনে, মনকে পরিশেষে আত্মায় মিশাইয়া দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মস্বরূপ।*

জীবাত্মা সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ। অবশ্য জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন না। এই মুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আধার, প্রায় সর্বশক্তিমান্, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান্ হইতে পারেন না। যদি কোন মুক্ত পুরুষ বলেন, 'আমি এই গ্রহটিকে কক্ষচ্যুত করিয়া ইহাকে এই পথ দিয়া পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য করিব' এবং আর একজন মুক্তাত্মা যদি বলেন, 'আমি গ্রহটিকে এই পথে নয়, ঐ পথে চালাইব' (তবে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হইবে)।

তোমরা যেন এই ভুল করিও না। আমি যে ইংরেজীতে বলি, 'আমি ঈশ্বর (God)', তাহার কারণ ইহা অপেক্ষা আর কোন যোগ্যতর শব্দ নাই। সংস্কৃতে 'ঈশ্বর' মানে সচ্চিদানন্দ, জ্ঞান—স্বয়ংপ্রকাশ অনন্ত চৈতন্য। ঈশ্বর অর্থে কোন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিবিশেষ নয়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভূমা। ...

আমি কখনও রাম নই, ঈশ্বরের (ঈশ্বরের সাকার ভাবের) সহিত কখনও এক নই, কিন্তু আমি (ব্রহ্মের সহিত—নৈর্ব্যক্তিক সর্বত্র-বিরাজমান সত্তার সহিত) এক। এখানে একতাল কাদা রহিয়াছে। এই কাদা দিয়া আমি একটি ছোট ইঁদুর তৈরী করিলাম আর তুমি একটি ক্ষুদ্রকায় হাতী প্রস্তুত করিলে। দুই-ই কাদার। দুইটিকেই ভাঙিয়া ফেল। তাহারা মূলতঃ এক—তাই একই মৃত্তিকায় পরিণত হইল। 'আমি এবং আমার পিতা এক।' (কিন্তু মাটির ইঁদুর আর মাটির হাতী কখনই এক হইতে পারে না।)

কোন জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তো আমার চেয়ে কিছু বেশী জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থামিয়া যাও। আবার এক আত্মা আছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই ঈশ্বর, যোগাধীশ (স্রষ্টারূপে সগুণ ঈশ্বর)। তখন তিনি সর্বশক্তিমান্ 'ব্যক্তি'। সকল জীবের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। তাঁহার শরীর নাই—শরীরের প্রয়োজন হয় না। ধ্যানের অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পার, যোগীন্দ্র ঈশ্বরের ধ্যান করিয়াও তাহা লভ্য। একই বস্তু আবার কোন মহাপুরুষকে, অথবা জীবনের ঐকতানকে ধ্যান করিয়াও লাভ করা যায়। এগুলিকে বিষয়গত ধ্যান বলে। সুতরাং এইভাবে কয়েকটি বাহ্য বা বিষয়গত বস্তু লইয়া ধ্যান আরম্ভ করিতে হয়। বস্তুগুলি বাহিরেও হইতে পারে, ভিতরেও হইতে পারে। যদি তুমি একটি দীর্ঘ বাক্য গ্রহণ কর, তবে তাহা মোটেই ধ্যান করিতে পারিবে না। ধ্যান মানে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া মনকে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করার চেষ্টা। মন সকল চিন্তাতরঙ্গ থামাইয়া দেয় এবং জগৎও থাকে না। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারেই ধ্যানের দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। ... আরও একটু বেশী কঠোর পরিশ্রম কর—ধ্যান গভীরতর হইবে। তখন তোমার শরীরের বা অন্য কিছুর বোধ থাকিবে না। এইভাবে একঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকার পর বাহ্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে তোমার মনে হইবে যে, ঐ সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শান্তি উপভোগ করিয়াছ। ধ্যানই তোমার শরীরযন্ত্রটিকে বিশ্রাম দিবার একমাত্র উপায়। গভীরতম নিদ্রাতেও ঐরূপ বিশ্রাম পাইতে পার না। গভীরতম নিদ্রাতেও মন লাফাইতে থাকে। কিন্তু (ধ্যানের) ঐ কয়েকটি মিনিটে তোমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হইয়া যায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে। শরীরের জ্ঞান থাকে না। তোমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে এতই আনন্দ পাইবে যে, তুমি অত্যন্ত হালকা বোধ করিবে। ধ্যানে আমরা এইরূপ পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকি।

তারপর বিভিন্ন বস্তুর উপরে ধ্যান। মেরুমজ্জার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্যানের প্রণালী আছে। (যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ বর্তমান। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহ এই দুই প্রধান পথে গমনাগমন করে।) শূন্যনালী (যাহাকে বলে সুষুম্না) মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্না-পথ সাধারণতঃ রুদ্ধ থাকে, কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহা উন্মুক্ত হয়, (স্নায়বীয়) প্রাণশক্তিপ্রবাহকে (মেরুদণ্ডের নীচে) চালাইয়া দিতে পারিলেই কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। জগৎ তখন ভিন্নরূপ ধারণ করে। ... (এইরূপে ঐশ্বরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুণ্ডলিনীর জাগরণ।)

সহস্র সহস্র দেবতা তোমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, কারণ তোমার জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে পারি; ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা সেই 'ক'-কে দেখি বা উপলব্ধি করি। বাহিরে অবস্থিত ঐ গাছটিকে ধরা যাক। একটি চোর আসিল, সে ঐ মুড়া গাছটিকে কি ভাবিবে? সে দেখিবে—একজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে। শিশু উহাকে মনে করিল—একটা প্রকাণ্ড ভূত। একটি যুবক তাহার প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে কি দেখিল? নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমাকে। কিন্তু এই স্থাণু বা মুড়া গাছটির তো কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। স্বয়ং ঈশ্বরই কেবল আছেন, আমরাই আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে মানুষ, ধূলি, বোবা, দুঃখী ইত্যাদি-রূপে দেখিয়া থাকি।

যাহারা একইভাবে গঠিত, তাহারা স্বভাবতঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং একই জগতে বাস করে। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়—তোমরা একই স্থানে বাস কর। সমস্ত স্বর্গ এবং সমস্ত নরক এখানেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কতকগুলি বড় বৃত্তের আকারে সমতল ক্ষেত্রসমূহ যেন পরস্পর কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে ... । এই সমতল ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত আমরা আর একটি সমতলের (বৃত্তকে) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিতে পারি। মন যদি কেন্দ্রে পৌঁছে, তবে সমস্ত স্তরেরই তোমার জ্ঞান হইতে থাকিবে। ধ্যানের সময় কখনও কখনও তুমি যদি অন্য ভূমি স্পর্শ কর, তখন অন্য জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্মা এবং আরও কত কিছুর সংস্পর্শে আসিতে পার।

ধ্যানের শক্তি দ্বারাই এই-সব লোকে যাইতে পার। এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে। যদি তুমি পাঁচদিন ঠিক ঠিক ধ্যান অভ্যাস কর, এই (জ্ঞান) কেন্দ্রগুলির ভিতর হইতে একপ্রকার 'সংবেদনা' অনুভব করিবে—তোমার শ্রবণশক্তি সূক্ষ্মতর হইতেছে। ... (জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যতই মার্জিত হইবে, অনুভূতিও ততই সূক্ষ্ম হইবে। তখন অধ্যাত্মজগৎ খুলিয়া যাইবে।) এইজন্য ভারতীয় দেবতাগণের তিনটি চক্ষু কল্পনা করা হইয়াছে। তৃতীয় বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে বিবিধ আধ্যাত্মিক দর্শন উপস্থিত হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে যতই উঠিতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়গুলির পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জগৎ ভিন্নরূপে প্রতীত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবী তখন স্বর্গে পরিণত হয়। তোমার কথা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর কুণ্ডলিনী অধস্তন কেন্দ্রগুলিতে নামিলে তুমি আবার মানবীয় ভূমিতে আসিয়া পড়। সমস্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া কুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে সহস্রারে পৌঁছিবে, তখন সমগ্র দৃশ্য জগৎ (তোমার অনুভূতিতে) বিলীন হয় এবং এক সত্তা ব্যতীত কিছুই অনুভব কর না। তখন তুমিই পরমাত্মা; সমুদয় স্বর্গ তাঁহা হইতেই সৃষ্টি করিতেছ; সমস্ত জগৎও তাঁহা হইতেই রচনা করিতেছ। তিনিই একমাত্র সত্তা; তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

[ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলেস-এ 'হোম্-অব্-ট্রুথ'-এ প্রদত্ত বক্তৃতা]

আজ সকালে প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তত্ত্বের আলোচনা অনেক হইয়াছে, এখন তাহার সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিলে মন্দ হইবে না। এই বিষয়টির উপর ভারতে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। এদেশের লোক যেমন জাগতিক বিষয়ে কার্যকুশল, আমাদের দেশের লোক তেমনি ঐ বিষয়ে দক্ষ বলিয়া মনে হয়। এদেশের পাঁচজন লোক একসঙ্গে ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করে, আমরা একটি যৌথ কারবার (প্রতিষ্ঠান?) আরম্ভ করিব, আর পাঁচঘণ্টার মধ্যে তাহা করিয়াও ফেলে। ভারতের লোক কিন্তু এ-সব ব্যাপারে এত অপটু যে, তাহাদের পঞ্চাশ বছরের চেষ্টাতেও এ-কাজটি হয়তো হইয়া উঠিবে না। কিন্তু একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে; সেখানে যদি কেহ কোন দার্শনিক মত প্রচার করিতে চায়, তাহা হইলে সে মতবাদ যত উদ্ভটই হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। যেমন ধর, একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, বার বছর দিনরাত একপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়; সঙ্গে সঙ্গে একপায়ে দাঁড়াইবার মত শত শত লোক জুটিয়া যাইবে। তাহারা নীরবে সব কষ্ট সহ্য করিবে। বহু লোক আছে, যাহারা ধর্মলাভের জন্য বছরের পর বছর ঊর্ধ্ববাহু হইয়া থাকে; আমি স্বচক্ষে এরূপ শত শত লোক দেখিয়াছি। আর এ-কথাও মনে করা চলিবে না যে, তাহারা নিরেট আহাম্মক; বস্তুতঃ তাহাদের জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কর্মদক্ষতা শব্দটিরও অর্থ আপেক্ষিক।

অপরের দোষ-গুণ বিচার করিবার সময় আমরা প্রায়ই এই একটি ভুল করিয়া বসি; আমাদের মনোরাজ্যে আমরা যে বিশ্ব রচনা করিতেছি, তাহার বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারে—এ কথা যেন আমরা কখনও ভাবিতেই চাই না; আমরা ভাবি—আমাদের নিজের নীতিবোধ, ঔচিত্যবোধ, কর্তব্যবোধ ও প্রয়োজনবোধ ভিন্ন ঐসব ক্ষেত্রে আর সমস্ত ধারণাই মূল্যহীন। সেদিন ইওরোপ যাত্রার পথে মার্সাই শহর হইয়া যাইতেছিলাম; তখন সেখানে ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল। উহা দেখিয়া জাহাজের ইংরেজ যাত্রীরা সকলেই ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র ব্যাপারটাকে অতি নৃশংস বলিয়া সমালোচনা ও নিন্দা করিতে লাগিল। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া শুনিলাম, বাজী রাখিয়া লড়াই করিবার জন্য প্যারিসে একদল লোক গিয়াছিল, কিন্তু ফরাসীরা তাহাদের সদ্যসদ্য ফিরাইয়া দিয়াছে। ফরাসীদের মতে ও-কাজটি পাশবিক। বিভিন্ন দেশে এই-জাতীয় মতামত শুনিতে শুনিতে আমি যীশুখ্রীষ্টের সেই অতুলনীয় বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে শুরু করিয়াছি—'অপরের বিচার করিও না, তাহা হইলেই নিজেও অপরের বিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।' যতই শিখি, ততই আমাদের অজ্ঞতা ধরা পড়ে, ততই আমরা বুঝি যে, মানুষের এই মন-নামক বস্তুটি কত বিচিত্র, কত বহুমুখী! যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, স্বদেশবাসীদের তপস্বিসুলভ কৃচ্ছ্রসাধনের সমালোচনা করা আমার অভ্যাস ছিল; আমাদের দেশের বড় বড় আচার্যেরাও উহার সমালোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মত ক্ষণজন্মা মহামানবও ঐরূপ করিয়াছেন। তবু বয়স যত বাড়িয়াছে, ততই বুঝিতেছি যে, বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। কখনও কখনও মনে হয়, বহু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই-সব তপস্বীর সাধনশক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার একাংশও যদি আমার থাকিত! প্রায়ই মনে হয়, এ-বিষয়ে আমি যে-অভিমত দিই ও সমালোচনা করি, তাহার কারণ এই নয় যে, আমি দেহ-নির্যাতন পছন্দ করি না; নিছক ভীরুতাই ইহার কারণ, কৃচ্ছ্রসাধনার শক্তি ও সাহসের অভাবই ইহার কারণ।

তাহা হইলেই দেখিতেছ যে, শক্তি, বীর্য ও সাহস—এই-সব অতি অদ্ভুত জিনিষ। 'সাহসী লোক,' 'বীর পুরুষ,' 'নির্ভীক ব্যক্তি'—প্রভৃতি কথা সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, ঐ সাহসিকতা বা বীরত্ব বা অন্য কোন গুণই ঐ লোকটির চরিত্রের চিরসাথী নয়। যে-লোক কামানের মুখে ছুটিয়া যাইতে পারে, সেই-ই আবার ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়; আবার অপর কেহ হয়তো কোন কালেই কামানের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস পায় না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্থিরভাবে অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারে। কাজেই অপরের বিচার করিবার সময় সাহসিকতা, মহত্ত্ব ইত্যাদি যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ খুলিয়া বলা প্রয়োজন। 'ভাল নয়' বলিয়া যে-লোকটির সমালোচনা আমি করিতেছি, সেই লোকটিই হয়তো আমি যে-সব বিষয়ে ভাল নই, এমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য রকমে ভাল হইতে পারে। আর একটি উদাহরণ দেখ। প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্মদক্ষতা লইয়া আলোচনাকালে আমরা সর্বদা ঠিক এই ভুলটিই করিয়া বসি। যেমন—পুরুষরা লড়াই করিতে এবং প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারে বলিয়া লোকে মনে করে যে, এই বিষয় লইয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায়; আর স্ত্রীলোকের শারীরিক দুর্বলতা ও যুদ্ধে অপারগতার সঙ্গে পুরুষের এই গুণের তুলনা করা চলে। ইহা অন্যায়। মেয়েরাও পুরুষদের মত সমান সাহসী। নিজ নিজ ভাবে প্রত্যেকেই ভাল। নারী যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ লইয়া সন্তান পালন করে, কোন্ পুরুষ সেভাবে তাহা করিতে পারে? একজন কর্মশক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, অপরজন বাড়াইয়াছে সহনশক্তি। যদি বল, মেয়েরা তো শারীরিক শ্রম করিতে পারে না, তবে বলিব, পুরুষরাও তো সহ্য করিতে পারে না। সমগ্র জগৎটি একটি নিখুঁত ভারসাম্যের ব্যাপার। এখন আমার জানা নাই, তবে একদিন হয়তো আমরা জানিতে পারিব যে, নগণ্য কীটের ভিতরেও এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের মানবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অতি দুষ্টপ্রকৃতির লোকের ভিতরেও এমন কিছু সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, যাহা আমার ভিতর মোটেই নাই। নিজ জীবনে আমি প্রতিদিন ইহা লক্ষ্য করিতেছি। অসভ্য জাতির একজন লোককে দেখ না! আমার দেহটি যদি তাহার মত অমন সুঠাম হইত! সে ভরপেট খায়-দায়, অসুখ কাহাকে বলে—তাহা বোধ হয় জানেই না; আর এদিকে আমার তো অসুখ লাগিয়াই আছে। তাহার দেহের সঙ্গে আমার মস্তিষ্ক বদলাইয়া লইতে পারিলে আমার সুখের মাত্রা কতই না বাড়িয়া যাইত। তরঙ্গের উত্থান ও পতন লইয়াই গোটা জগৎটি গড়া; কোন স্থান নীচু না হইলে অপর একটি স্থান উঁচু হইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করিতে পারে না। সর্বত্রই এই ভারসাম্য বিদ্যমান। কোন

বিষয়ে তুমি মহৎ, তোমার প্রতিবেশীর মহত্ত্ব অন্য বিষয়ে। স্ত্রী-পুরুষের বিচার করিবার সময় তাহাদের নিজ নিজ মহত্ত্বের মান ধরিয়া বিচার করিও। একজনের জুতা আর একজনের পায়ে ঢুকাইতে গেলে চলিবে কেন? একজনকে খারাপ বলিবার কোন অধিকারই অপরের নাই। এই-জাতীয় সমালোচনা দেখিলে সেই প্রাচীন কুসংস্কারেরই কথা মনে পড়ে—'এরূপ করিলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে।' কিন্তু সেরূপ করা সত্ত্বেও জগৎ এখনও ধ্বংস হইয়া যায় নাই। এদেশে বলা হইত যে, নিগ্রোদের স্বাধীনতা দিলে দেশের সর্বনাশ হইবে; কিন্তু সর্বনাশ হইয়াছে কি? আরও বলা হইত যে, গণশিক্ষার প্রসার হইলে জগতের সর্বনাশ হইবে। কিন্তু তাহাতে আসলে জগতের উন্নতিই হইয়াছে। কয়েক বছর আগে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে ইংলণ্ডের সব চেয়ে খারাপ অবস্থার সম্ভাবনার বর্ণনা ছিল। লেখক দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের মজুরী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতেছে। একটা রব উঠিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দাবী অত্যধিক—এদিকে জার্মানরা কত কম বেতনে কাজ করে! এ-বিষয়ে তদন্তের জন্য জার্মানীতে একটি কমিশন পাঠান হইল। কমিশন ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, জার্মান শ্রমিকরা উচ্চতর হারে মজুরী পায়। এইরূপ হইল কি করিয়া? জনশিক্ষাই ইহার কারণ। কাজেই জনশিক্ষার ফলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে, এ-কথাটির গতি কি হইবে? বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রাচীনপন্থীদেরই সর্বত্র আধিপত্য। তাহারা জনগণের কাছে সব কিছুই লুকাইয়া রাখিতে চায়। আমরাই জগতের মাথার মণি—এই-আত্মপ্রসাদকর সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে তাহারা। তাহাদের বিশ্বাস—এই-সব ভয়ঙ্কর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না, তাহাতে শুধু জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এখন কর্মকুশলতার কথাতেই ফিরিয়া আসা যাক। ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই মনস্তত্ত্বের ব্যাবহারিক প্রয়োগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে ভারতে একজন বড় দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার নাম পতঞ্জলি। মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত তথ্য, প্রমাণ ও গবেষণা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অতীতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতার সুযোগটুকুও লইয়াছিলেন। মনে থাকে যেন, জগৎ অতি প্রাচীন; মাত্র দুই বা তিন হাজার বছর পূর্বে ইহার জন্ম হয় নাই। এখানে—পাশ্চাত্যদেশে শেখান হয় যে, 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-এর সঙ্গে আঠারো-শ বছর আগে সমাজের জন্ম হইয়াছিল; তাহার পূর্বে সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না। পাশ্চাত্য-জগতের বেলা এ-কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র জগতের বেলা নয়। লণ্ডনে যখন বক্তৃতা দিতাম, তখন আমার একজন সুপণ্ডিত মেধাবী বন্ধু প্রায়ই আমার সঙ্গে তর্ক করিতেন; তাঁহার তূণীরে যত শর ছিল, তাহার সবগুলি একদিন আমার উপর নিক্ষেপ করিবার পর হঠাৎ তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'তাহা হইলে আপনাদের ঋষিরা ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেন নাই কেন?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'কারণ তখন ইংলণ্ড বলিয়া কিছু ছিলই না, যে সেখানে আসিবেন। তাঁহারা কি অরণ্যে গাছপালার কাছে প্রচার করিবেন?'

ইঙ্গারসোল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করিতে আসিলে আপনাকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হইত, আপনাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, অথবা ঢিল ছুঁড়িয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।'

কাজেই খ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বেও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, ইহা মনে করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। সভ্যতা সব সময়েই নিম্নতর অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় আসিয়াছে কিনা—এ-কথার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই ধারণাটিকে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সব যুক্তি-প্রমাণ দেখান হইয়াছে, ঠিক সেই-সব যুক্তি-প্রমাণ দিয়া ইহাও দেখান যায় যে, সভ্য মানুষই ক্রমে অসভ্য বর্বরে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, চীনারা কখনও বিশ্বাসই করিতে পারে না যে, আদিম বর্বর অবস্থা হইতে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে; কারণ তাহাদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তোমরা যখন আমেরিকার সভ্যতার উল্লেখ কর, তখন তোমাদের বলিবার প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, তোমাদের জাতি চিরকাল থাকিবে এবং উন্নতির পথেই চলিবে। যে হিন্দুরা সাত শত বৎসর ধরিয়া অবনতির পথে চলিতেছে, তাহারা প্রাচীনকালে সভ্যতায় অতি-উন্নত ছিল—এ-কথা বিশ্বাস করা খুবই সহজ। ইহা যে সত্য নয়—এ-কথা প্রমাণ করা যায় না।

কোন সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। অপর একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোন জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই। এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, মূল সভ্যতার অধিকারী জাতি একটি বা দুটি ছিল, তাহারাই বাহিরে যাইয়া নিজেদের ভাব ছড়াইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে; এইভাবেই সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছে।

বাস্তব জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলাই ভাল। কিন্তু একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে। ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার যেমন আছে; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ কুসংস্কার আছে। এমন অনেক পুরোহিত আছেন, যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানকে নিজ জীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করেন; তেমনি বৈজ্ঞানিক নামধেয় এমন অনেক আছেন, যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের পূজারী। ডারউইন বা হাক্সলির মত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নাম করা মাত্র আমরা অন্ধভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করি। এইটি আজকালকার চলিত প্রথা। যাহাকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলি, তাহার ভিতর শতকরা নিরানব্বই ভাগই হইতেছে নিছক মতবাদ। ইহাদের অনেকগুলি আবার প্রাচীনকালের বহু-মস্তক ও বহু-হস্তবিশিষ্ট ভূতে অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নয়; তবে পার্থক্য এইটুকু যে, কুসংস্কার হইলেও উহাতে মানুষকে গাছপাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইতে অন্ততঃ খানিকটা আলাদা বলিয়া ভাবা হইত। যথার্থ বিজ্ঞান আমাদের সাবধানে চলিতে বলে। পুরোহিতদের সঙ্গে ব্যবহারে যেমন সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও তেমনি সতর্কতা আবশ্যক। অবিশ্বাস লইয়া শুরু কর। বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, সব প্রমাণ পাইয়া তবে বিশ্বাস কর। আধুনিক বিজ্ঞানের অতিপ্রচলিত বিশ্বাস এখনও প্রমাণোত্তীর্ণ হয় নাই। অঙ্কশাস্ত্রের মত বিজ্ঞানের ভিতরেও অনেকগুলি মতবাদই শুধু কাজ চালাইয়া যাইবার উপযুক্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উচ্চতর জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাতিল হইয়া যাইবে।

খ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে একজন বড় ঋষি কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের সুবিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং সামান্যীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে তাঁহার আবিষ্কৃত জ্ঞানের অংশবিশেষ লইয়া তাহার বিশেষ চর্চা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে শুধু হিন্দুরাই জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির চর্চায় যথার্থ আন্তরিকতার সহিত ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি এখন বিষয়টি তোমাদের শিখাইতেছি—কিন্তু তোমরা কয়জনই বা ইহা অভ্যাস করিবে? অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে কয়দিন বা কয়মাস আর লাগিবে তোমাদের? এ-বিষয়ের উপযুক্ত উদ্যম তোমাদের নাই। ভারতবাসীরা কিন্তু যুগের পর যুগ ইহার অনুশীলন চালাইয়া যাইবে। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, ভারতবাসীদের কোন সাধারণ প্রার্থনা-গৃহ, কোন সাধারণ সমবেত প্রার্থনা-মন্ত্র বা ঐ-জাতীয় কোন কিছু নাই; তাহা সত্ত্বেও তাহারা প্রতিদিন শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করে, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করে; এইটিই তাহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ। এইগুলিই মূল কথা। প্রত্যেক হিন্দুকে ইহা করিতেই হয়। ইহাই সে-দেশের ধর্ম। তবে সকলে এক পদ্ধতি অবলম্বনে উহা না-ও করিতে পারে, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ, মনঃসংযম প্রভৃতি অভ্যাস করিবার জন্য এক এক জনের এক একটি বিশেষ পদ্ধতি থাকিতে পারে। কিন্তু একজনের পদ্ধতি অপরের জানিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি তাহার স্ত্রীর-ও না; পিতাও হয়তো জানেন না, পুত্র কি পদ্ধতি অবলম্বনে চলিতেছে। কিন্তু সকলকেই এ-সব অভ্যাস করিতে হয়। আর এ-সবের মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই; গোপন রহস্যের কোন ভাবই ইহার মধ্যে নাই। হাজার হাজার লোক নিত্য গঙ্গাতীরে বসিয়া চোখ বুজিয়া প্রাণায়াম ও মনের একাগ্রতা-সাধনের অভ্যাস করিতেছে—এ-দৃশ্য নিত্যই চোখে পড়ে। মানব-সাধারণের পক্ষে কতকগুলি অভ্যাস-সাধনার পথে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দুইটি অন্তরায় থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ধর্মাচার্যেরা মনে করেন যে, সাধারণ লোক এ-সব সাধনার যোগ্য নয়। এই ধারণায় হয়তো কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু গর্বের ভাবই ইহার জন্য বেশী দায়ী। দ্বিতীয় অন্তরায় নির্যাতনের ভয়। যেমন—এদেশে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে প্রকাশ্য স্থানে কেহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে চাহিবে না; এখানে এ-সবের চলন নাই। আবার ভারতে যদি কেহ, 'ভগবান্, আজ আমাকে দিনের অন্ন যোগাড় করিয়া দাও' বলিয়া প্রার্থনা করে, তবে লোকে উপহাস করিবে। হিন্দুদের দৃষ্টিতে 'হে আমার স্বর্গবাসী পিতা' ইত্যাদি বলার চেয়ে বড় আহাম্মকি থাকিতে পারে না। উপাসনাকালে হিন্দু ইহাই ভাবিয়া থাকে যে, ভগবান্ তাহার অন্তরেই রহিয়াছেন।

যোগীরা বলেন, আমাদের দেহে তিনটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ আছে; একটিকে তাঁহারা ইড়া বলেন, অপরটিকে পিঙ্গলা, আর এই দুইটির মধ্যবর্তীটিকে বলেন সুষুম্না; এগুলি সবই মেরু-নালীর মধ্যে অবস্থিত। বামদিকের ইড়া এবং দক্ষিণের পিঙ্গলা—এই দুইটির প্রত্যেকটিই স্নায়ু-গুচ্ছ; আর মধ্যবর্তী সুষুম্নাটি একটি শূন্য নালী, স্নায়ুগুচ্ছ নয়। এই সুষুম্না-পথ রুদ্ধাবস্থায় থাকে; সাধারণ মানুষ শুধু ইড়া ও পিঙ্গলার সাহায্যেই কাজ চালায় বলিয়া ঐ পথটি তাহাদের কোন প্রয়োজনেই লাগে না। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চারী অন্যান্য স্নায়ুগুলির মারফত শরীরের সর্বত্র মস্তিষ্কের আদেশ পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ সব সময়ে চলাফেরা করে। ইড়া ও পিঙ্গলাকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোবদ্ধ করাই প্রাণায়ামের মহান্ উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু শ্বাসক্রিয়াটুকুর ভিতর কিছুই নাই—ফুসফুসের ভিতর কিছুটা বাতাস ঢুকাইয়া লওয়া ছাড়া উহা আর কি? রক্তশোধন ছাড়া উহার আর কোন প্রয়োজনই নাই; বাহির হইতে আমরা যে বায়ুকে নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লই এবং উহাকে রক্তশোধনের কার্যে নিয়োগ করি, সে বায়ুর মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই; ঐ ক্রিয়াটা তো একটা স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই গতিটিকে প্রাণ-নামক একটি মাত্র স্পন্দনে পরিণত করা যায়; আর সব জায়গায় সব গতিই এই প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রাণই বিদ্যুৎ, এই প্রাণই চৌম্বক-শক্তি; মস্তিষ্ক এই প্রাণকেই চিন্তারূপে বিকীর্ণ করে। সবই প্রাণ; প্রাণই চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রগণকে চালিত করিতেছে।

আমরা বলি—বিশ্বের যাহা কিছু আছে, তাহা সবই এই প্রাণের স্পন্দনের ফলে বিকাশলাভ করিয়াছে। স্পন্দনের সর্বোচ্চ ফল চিন্তা। ইহা অপেক্ষাও বড় যদি কিছু থাকে, তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ইড়া ও পিঙ্গলা নামক নাড়ীদ্বয় প্রাণের সাহায্যে কাজ করে। প্রাণই বিভিন্ন শক্তিরূপে পরিণত হইয়া শরীরের প্রতি অঙ্গকে পরিচালিত করে। ভগবান্ জগৎরূপে কার্যের স্রষ্টা এবং সিংহাসনের উপরে বসিয়া ন্যায়বিচার করিতেছেন—ভগবান্ সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগ কর। কাজ করিতে করিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কারণ ঐ কার্যে আমাদের কিছুটা প্রাণ-শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়।

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রাণের ক্রিয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়া উঠে। প্রাণ যখন নিয়মিত ছন্দে চলে, তখন দেহের সব-কিছুই ঠিকমত কাজ করে। যোগীদের যখন নিজ শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তখন শরীরের কোন অংশ অসুস্থ হইলে তাঁহারা টের পান যে, প্রাণ সেখানে ঠিকমত ছন্দে চলিতেছে না, এবং যতক্ষণ না সহজ ছন্দ ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ তাঁহারা প্রাণকে সেদিকে সঞ্চালিত করেন।

তোমার নিজের প্রাণকে যেমন তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তেমনি যথেষ্ট শক্তিমান্ হইলে এখানে বসিয়াই ভারতে অবস্থিত অপর একজনের প্রাণকেও তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। সব প্রাণই এক, মাঝখানে কোন ছেদ নাই; একত্বই সর্বত্র বিদ্যমান। দৈহিক দিক্ দিয়া, আত্মিক মানসিক ও নৈতিক দিক্ দিয়া, আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া সবই এক। জীবন একটি স্পন্দন মাত্র। যাহা এই (বিশ্বব্যাপী জড়) 'আকাশ'-সমুদ্রকে স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই তোমার ভিতরও স্পন্দন জাগাইতেছে। কোন হ্রদে যেমন কাঠিন্যের মাত্রার তারতম্য বিশিষ্ট অনেকগুলি বরফের স্তর গড়িয়া ওঠে, অথবা কোন বাষ্পের সাগরে বাষ্পস্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে, এই বিশ্বটিও যেন সেই ধরনের জড় পদার্থের একটি সমুদ্র। ইহা একটি 'আকাশের' সমুদ্র; ইহার ভিতর ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে আমরা চন্দ্র, সূর্য, তারা ও আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব দেখিতেছি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রহিয়াছে, সব স্থান জুড়িয়া সেই একই পদার্থ বিদ্যমান।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগৎ বস্তুতঃ এক; অধ্যাত্মজগৎ, জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং প্রাণ-জগৎ—এরূপ কোন ভেদ নাই। সবই এক জিনিষ, যদিও অনুভূতির বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা হইতেছে। যখন তুমি নিজেকে দেহ বলিয়া ভাব, তখন তুমি যে মন, সে-কথা ভুলিয়া যাও; আবার নিজেকে যখন মন বলিয়া ভাব, তখন শরীরের কথা ভুলিয়া যাও। 'তুমি'-

নামধেয় একটি মাত্র সত্তাই আছে; সে বস্তুটিকে তুমি জড়পদার্থ বা শরীর বলিয়া মনে করিতে পার, অথবা সেটিকে মন বা আত্মারূপেও দেখিতে পার। জন্ম, জীবন ও মৃত্যু—এ-সব প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। কেহ কখনও জন্মায় নাই, কেহ কখনও মরিবেও না; আমরা শুধু স্থান পরিবর্তন করি—আর বেশী কিছু নয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা যে মরণকে এত বড় করিয়া ভাবে, তাহাতে আমি দুঃখিত; সব সময় তাহারা একটু আয়ুলাভের জন্য লালায়িত। 'মৃত্যুর পরেও যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি; আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও!' যদি কেহ তাহাদের শোনায় যে, মৃত্যুর পরেও তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাহারা কী খুশীই না হয়! এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আসে কি করিয়া! কি করিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, আমরা মরিয়া গিয়াছি! নিজেকে মৃত বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি, দেখিবে তোমার নিজের মৃতদেহ দেখিবার জন্য তুমি বাঁচিয়াই আছ। বাঁচিয়া থাকা এমন একটি অদ্ভুত সত্য যে, মুহূর্তের জন্যও তুমি তাহা ভুলিতে পার না। তোমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন সন্দেহ হইতে পারে না, বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। চেতনার প্রথম প্রমাণই হইল—'আমি আছি'। যে অবস্থা কোন কালে ছিল না, তাহার কল্পনা করা চলে কি? সব সত্যের মধ্যে ইহা সব চেয়ে বেশী স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই অমরত্বের ভাব মানুষের মজ্জাগত। যাহা কল্পনা করা যায় না, তাহা লইয়া কোন আলোচনা চলে কি? যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সত্যাসত্য লইয়া আমরা আলোচনা করিতে চাহিব কেন?

কাজেই যে দিক্ হইতেই দেখা যাক না কেন, গোটা বিশ্বটি একটি অখণ্ড সত্তা। এই মুহূর্তে বিশ্বটিকে প্রাণ ও আকাশের, শক্তি ও জড়পদার্থের একটি অখণ্ড সত্তা বলিয়া আমরা ভাবিতেছি। মনে থাকে যেন, অন্যান্য মূল তত্ত্বগুলির মত এ তত্ত্বটিও স্ব-বিরোধী। কারণ শক্তি মানে কি?—যাহা জড়পদার্থে গতির সঞ্চার করে, তাহাই শক্তি। আর জড়পদার্থ কি?—যাহা শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। এরূপ সংজ্ঞা অন্যোন্যাশ্রয়-দোষে দুষ্ট। জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের এত গর্ব সত্ত্বেও আমাদের যুক্তির কতকগুলি মূল উপাদান বড়ই অদ্ভুত ধরনের। আমাদের ভাষায় যাহাকে বলে—'মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা!' এই জাতীয় পরিস্থিতিকে 'মায়া' বলে। ইহার অস্তিত্ব নাই, নাস্তিত্বও নাই। ইহাকে 'সৎ' বলিতে পার না, কারণ যাহা দেশ-কালের অতীত, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই শুধু 'সৎ'। তবু অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সহিত এই জগতের অনেকটা মিল আছে বলিয়া ইহার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়।

কিন্তু যেটি আসল সদ্‌বস্তু, পারমার্থিক সত্তা, তাহা সব-কিছুরই ভিতর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে; সেই সত্তাই যেন ধরা পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। এই অসীম, অনাদি, অনন্ত, চির-আনন্দময়, চিরমুক্ত সদ্‌বস্তুটিই আমাদের স্বরূপ, আসল মানুষ। এই আসল মানুষটি জড়াইয়া পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। জগতের সব-কিছুরই এই একই অবস্থা। সব-কিছুরই সত্যস্বরূপ হইতেছে এই সীমাহীন অস্তিত্ব। (বস্তুশূন্য) বিজ্ঞানবাদের কথা নয় এ-সব; এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জগতের কোন অস্তিত্বই নাই। সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ইহার একটি আপেক্ষিক সত্তা আছে। কিন্তু ইহার অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পারমার্থিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ দাঁড়াইয়া আছে।

বিষয়বস্তু ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। এখন মূল বক্তব্যে ফিরিয়া আসা যাক। আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে (দেহের মধ্যে) যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা সবই স্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে যে-সব কাজ চলে, সেগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিলে কত ভাল হয়, বল দেখি!

ঈশ্বর কাহাকে বলে, মানুষ কাহাকে বলে, পূর্বে তাহা তোমাদের বলিয়াছি। মানুষ যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র সর্বত্র বিদ্যমান। ঈশ্বর সকলের হাত দিয়াই কাজ করেন, সব চোখ দিয়াই দেখেন, সব পা দিয়াই হাঁটেন, সকল শরীর অবলম্বনে শ্বাস-গ্রহণ করেন, সকল জীবন অবলম্বনেই জীবনধারণ করেন, প্রত্যেক মুখ দিয়া কথা বলেন এবং প্রত্যেক মস্তিষ্কের ভিতর দিয়াই চিন্তা করেন। মানুষ যদি তাহার আত্মচেতনার কেন্দ্র অনন্তগুণে বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের মত হইতে পারে, সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য অর্জন করিতে পারে। কাজেই আমাদের অনুধ্যানের প্রধান বিষয় হইল চেতনা। ধর, যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি আদি-অন্তহীন রেখা রহিয়াছে। রেখাটিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাহার উপর দিয়া একটি জ্যোতির্বিন্দু সঞ্চরণ করিতেছে। রেখাটির উপর দিয়া চলিবার সময় জ্যোতির্বিন্দুটি রেখার বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর আলোকিত করিতেছে, আর যে অংশ পিছনে পড়িতেছে, তাহা আবার অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে। আমাদের চেতনাকে এই জ্যোতির্বিন্দুটির সহিত তুলনা করা যায়। বর্তমানের অনুভূতি আসিয়া অতীতের অনুভূতিগুলিকে সরাইয়া দিতেছে, অথবা অতীত অনুভূতিগুলি অবচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা টের-ই পাই না যে, সেগুলি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; সেগুলি আছে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের দেহমনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। চেতনার সাহায্য ছাড়া আমাদের অভ্যন্তরে যে-সব কার্য এখন চলিতেছে, সেগুলি সবই একদিন আমাদের সজ্ঞানে সাধিত হইত। এখন স্বয়ংক্রিয় হইয়া চলার মত যথেষ্ট প্রেরণাশক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সব নীতিশাস্ত্রেই এই একটা বড় রকমের ভুল ধরা পড়ে যে, কি উপায়ে মানুষ খারাপ কাজ করা হইতে বিরত থাকিবে, সেই শিক্ষা ঐ নীতিশাস্ত্রগুলিতে নাই। সব নীতিপদ্ধতিই শিখায়, 'চুরি করিও না।' খুব ভাল কথা। কিন্তু মানুষ চুরি করে কেন? ইহার কারণ এই যে, সর্বক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি খারাপ কাজগুলি সবই আপনা-আপনি ঘটিয়া যায়। দাগী চোর-ডাকাতেরা, মিথ্যাবাদীরা, অন্যায়কারী নর-নারী—সকলেই নিজ নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐরূপ হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্যই মনস্তত্ত্বের একটি বড় সমস্যা। মানুষের বিচার—আমাদিগকে অতি উদার সহৃদয় দৃষ্টি লইয়াই করিতে হইবে।

ভাল হওয়া অত সোজা নয়। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত তুমি তো একটি যন্ত্রমাত্র, তার বেশী আর কি? নিজে ভাল বলিয়া তোমার গর্ব করা কি উচিত? নিশ্চয়ই না। তুমি ভাল, কারণ এরূপ না হইয়া তোমার উপায় নাই। আর একজন খারাপ, কারণ সেও ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার অবস্থায় পড়িলে তুমি যে কি হইতে, কে জানে? দুশ্চরিত্রা নারী বা জেলখানার চোর তো তোমাদেরই

হিতার্থে যীশুখ্রীষ্টের মত বলিপ্রদত্ত হইতেছে, যাহাতে তোমরা ভাল হও। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ধারাই এই। যত চোর ও খুনী আছে, যত বিচারবুদ্ধিহীন, যত দুর্বলতম ব্যক্তি, যত পাপিষ্ঠ, যত দানবপ্রকৃতির লোক আছে, আমার দৃষ্টিতে তাহারা সকলেই এক একজন যীশু। দেবরূপী খ্রীষ্ট এবং দানবরূপী খ্রীষ্ট উভয়েই আমার পূজার্হ, এই আমার মত; ইহা ছাড়া অন্য ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। সতের চরণে, সাধুর পাদপদ্মে, দুষ্টের চরণে, দানবের পদেও আমার নমস্কার। তাহারা সবাই আমার শিক্ষক, আমার ধর্মগুরু, সকলেই আমার ত্রাণকর্তা। কাহাকেও হয়তো আমি অভিশাপ দিই, কিন্তু তবু তাহার পতনের ফলে উপকৃত হই; আবার—অপরকে হয়তো আশীর্বাদ করি, আর তাহারও সৎকর্মের ফলে উপকৃত হই। আমার এখানে উপস্থিতি যতটা সত্য, আমি যাহা বলিলাম, তাহাও ততখানি সত্য। পতিতা নারীকে দেখিয়া আমাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, কারণ সমাজ তাহাই চায়, যদিও সে আমার ত্রাণকর্ত্রী, যদিও তাহার পতিতাবৃত্তির ফলে অপর স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পাইতেছে। কথাটি ভাবিয়া দেখ। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মনে মনে কথাটি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। কথাটি সত্য—নিরাবরণ, নির্ভীক সত্য। আমি যত বেশী করিয়া জগৎকে দেখিতেছি, যত বেশী সংখ্যক নর-নারীর সম্পর্কে আসিতেছি, আমার এই বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইতেছে। কার দোষ দিব? কার প্রশংসা করিব? সব-কিছুরই দুটি দিকই দেখিতে হইবে।

সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে, তাহা বিপুল; আমাদের অবচেতন স্তরে যে-সব অসংখ্য চিন্তা ডুবিয়া রহিয়াছে, আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াই যেগুলি নিজে নিজে কাজ করিয়া চলে, সেগুলিকে স্ববশে আনিতে চাওয়াই হইল আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। খারাপ কাজটি অবশ্য চেতনস্তরেই ঘটে, কিন্তু যে কারণ কাজটিকে ঘটাইল, তাহা ছিল আমাদের অগোচরে বহুদূরে—অবচেতনার রাজ্যে; সেজন্য তাহার শক্তিও বেশী।

ফলিত মনস্তত্ত্ব প্রথমেই অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে; আর ইহা জানা কথা যে, আমরা উহাকে আয়ত্তে আনিতে পারি। কেন পারি? কারণ আমরা জানি যে, চেতনই অবচেতনের কারণ; আমাদের অতীতের যে লক্ষ লক্ষ চেতন-চিন্তাগুলি মনের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই অবচেতন চিন্তা; অতীতের সজ্ঞান ক্রিয়াগুলিই নিষ্ক্রিয় ও অবচেতনরূপে থাকে; আমরা আর সেগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাই না, সেগুলিকে চিনি না; সেগুলির কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও, অবচেতন স্তরে যেমন পাপের শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তেমনি পুণ্যের শক্তিও আছে। আমাদের অন্তরে অনেক কিছু সঞ্চিত আছে, যেন একটি থলির মধ্যে সব পুরিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা সেগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সেগুলির কথা ভাবি না পর্যন্ত; আর তাহার ভিতর এমন অনেক চিন্তা আছে, যেগুলি পচিয়া যাইতেছে, পচিয়া নিশ্চিত বিপদের কারণ হইতেছে; এই-সব অবচেতন কারণই বাহিরে আসিয়া মানব-সমাজকে ধ্বংস করে। সেজন্য যথার্থ মনস্তত্ত্বের উচিত—যাহাতে এগুলিকে চেতনার আয়ত্তে লইয়া আসা যায়, তাহার চেষ্টা করা। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে গোটা মানুষটিকেই যেন জাগাইয়া তুলিবার বিশাল কর্তব্য, যাহাতে সে নিজের সর্বময় কর্তা হইতে পারে। শরীরের ভিতরে যে-সব যন্ত্রের কাজকে আমরা স্বয়ংক্রিয় বলিয়া থাকি, যেমন যকৃতের ক্রিয়া, সেগুলিকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছাধীন করা যায়।

এ-বিষয়ে চর্চার প্রথম অংশ হইল অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা। পরের অংশ—চেতনারও পারে চলিয়া যাওয়া। অবচেতনের কাজ যেমন চেতনার নিম্নস্তরে হয়, তেমনি আর এক ধরনের কাজ হয় চেতনার ঊর্ধ্বে, অতিচেতন স্তরে। এই অতিচেতন অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ মুক্ত হয় ও দেবত্ব লাভ করে; মৃত্যু অমরত্বে রূপায়িত হয়, দুর্বলতা অনন্তশক্তির রূপ নেয়, এবং লৌহশৃঙ্খল পর্যবসিত হয় মুক্তিতে। অতিচেতনার এই সীমাহীন রাজ্যই আমাদের লক্ষ্য।

কাজেই এখন পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, কাজটিকে দু-ভাগে ভাগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইড়া ও পিঙ্গলা নামে শরীরে যে দুটি সাধারণ (স্নায়বিক) প্রবাহ আছে, সেগুলিকে ঠিকমত চালাইয়া অবচেতন ক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ চেতনারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে হইবে।

শাস্ত্রে বলে, আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে যিনি এই সত্যে পৌঁছিয়াছেন, তিনিই যোগী। এই অবস্থায় সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যায়। সুষুম্নার মধ্যে তখন একটি প্রবাহ প্রবেশ করে; ইতঃপূর্বে এই নূতন পথে কোন প্রবাহ প্রবেশ করে নাই। প্রবাহটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে, এবং বিভিন্ন পদ্মগুলি (মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্না-কেন্দ্রগুলি, যোগশাস্ত্রের ভাষায় এগুলিকে 'পদ্ম' বলা হয়) অতিক্রম করিয়া অবশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছায়। যোগী তখন নিজের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করেন।

নির্বিশেষভাবে আমরা সকলেই যোগের এই চরম অবস্থা লাভ করিতে পারি। কাজটি কিন্তু দুরূহ। যদি কেহ এই সত্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে শুধু বক্তৃতা শুনিলেই বা কিছুটা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই চলিবে না। প্রস্তুতির উপরেই সব-কিছু নির্ভর করে। একটি আলো জ্বালিতে কতটুকু আর সময় লাগে? মাত্র এক সেকেণ্ড; কিন্তু বাতিটি প্রস্তুত করিতে কতখানি সময় যায়! দিনের প্রধান ভোজনটি করিতে আর কতটুকু সময় লাগে? বোধ হয় আধঘণ্টার বেশী দরকার হয় না। কিন্তু খাবারগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আলো জ্বালিতে চাই আমরা, কিন্ত ভুলিয়া যাই যে, বাতিটি প্রস্তুত করাই হইল প্রধান কাজ।

লক্ষ্যলাভ এত কঠিন হইলেও তাহার জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও কিন্তু বৃথা যায় না। আমরা জানি, কিছুই লুপ্ত হইয়া যায় না। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এজন্মে যাহারা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা কি ছিন্ন মেঘের মত বিনষ্ট হইয়া যায়?' শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, 'সখা, এ-জগতে কিছুই লুপ্ত হয় না। মানুষ যাহা কিছু করে, তাহা তাহারই থাকিয়া যায়। এজন্মে যোগের ফললাভ করিতে না পারিলেও পরজন্মে আবার সে সেই ভাবেই চলিতে শুরু করে।' এ-কথা না মানিলে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্ভুত বাল্যাবস্থার ব্যাখ্যা করিবে কিরূপে?

প্রাণায়াম, আসন—এগুলি যোগের সহায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-সবই দৈহিক। বড় প্রস্তুতি হইতেছে মনের ক্ষেত্রে। তাহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন—শান্ত সমাহিত জীবন।

যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে স্বাধীন হইতেই হইবে, এবং এমন এক পরিবেশে নিজেকে রাখিতে হইবে, যেখানে তুমি একাকী ও সর্ববিধ উদ্বেগমুক্ত। যে আরামপ্রদ সুখের জীবন চায়, আবার সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও লাভ করিতে চায়, তাহার অবস্থা সেই মূর্খেরই মত, যে কাষ্ঠখণ্ড-ভ্রমে একটি কুমীরকে আঁকাড়াইয়া নদী পার হইতে চায়। 'আগে ঈশ্বরের রাজ্যের খোঁজ কর, তাহা হইলে সব-কিছুই তোমার নিকট আসিয়া পড়িবে।' ইহাই সর্বোত্তম কর্তব্য, ইহাই বৈরাগ্য। একটি আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আর কোন কিছু যেন মনে স্থান না পায়। যাহার কোন কালে বিনাশ নাই তাহাকে অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে পাইবার জন্য যেন আমরা আমাদের সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করি। অনুভূতিলাভের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আমাদিগকে লড়িতেই হইবে; সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই আমরা উন্নত হইব। অনেক কিছু ভুলভ্রান্তি হইবে; কিন্তু তাহারাই হয়তো ভুলের ছদ্মবেশে আমাদের কল্যাণসাধনের দেবদূত।

ধ্যানই অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। ধ্যানকালে আমরা সর্ববিধ জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হই, এবং নিজ ভাগবত স্বরূপ উপলব্ধি করি। ধ্যানের সময় আমরা কোন বাহ্য সহায়তার উপর নির্ভর করি না। আত্মার স্পর্শে মলিনতম স্থানগুলিও উজ্জ্বলতম বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইতে পারে, জঘন্যতম বস্তুও সুরভিমণ্ডিত হইতে পারে, পিশাচও দেবতায় পরিণত হইতে পারে, তখন সব শত্রুভাব—সব স্বার্থ শূন্যে লীন হয়। দেহবোধ যত কম আসে ততই ভাল। কারণ দেহই আমাদের নীচে টানিয়া আনে। দেহের প্রতি আসক্তির জন্য, দেহাত্মবোধের জন্য আমাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া ওঠে। রহস্যটি এইঃ চিন্তা করিতে হয়—আমি দেহ নই, আমি আত্মা, ভাবিতে হয়—সমগ্র বিশ্ব এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাহা কিছু সবই, তাহার ভালমন্দ সব-কিছুই হইতেছে পরপর সাজান কতকগুলি ছবির মত, পটে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর মত, আমি তাহার সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা।

রাজযোগ -প্রসঙ্গে

যোগের প্রথম সোপান যম।
যম আয়ত্ত করিতে পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজনঃ

১. কায়মনোবাক্যে কাহাকেও হিংসা না করা।

২. কায়মনোবাক্যে সত্য কথা বলা।

৩. কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।

৪. কায়মনোবাক্যে পরম পবিত্রতা রক্ষা করা।

৫. কায়মনোবাক্যে অপাপবিদ্ধতা।

পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইহার সম্মুখে সব-কিছু নিস্তেজ। তারপর ‘আসন’ বা সাধকের বসিবার ভঙ্গী। আসন দৃঢ় হওয়া চাই, এবং শির পঞ্জর এবং দেহ ঋজু ও সরলরেখায় অবস্থিত হইবে। মনে মনে চিন্তা কর—তোমার আসন দৃঢ়, কোন কিছু তোমাকে টলাইতে পারিবে না। অতঃপর চিন্তা কর—মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটু একটু করিয়া তোমার সমগ্র দেহ বিশুদ্ধ হইতেছে। চিন্তা কর—শরীর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, জীবন-সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য ইহা একটি নিখুঁত শক্ত ভেলা।

ঈশ্বরের নিকট, জগতের সকল মহাপুরুষ, ত্রাণকর্তা এবং পবিত্রাত্মাদের নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহারা যেন তোমায় সাহায্য করেন। তারপর আধ ঘণ্টা প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক অভ্যাস কর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত মনে মনে ‘ওঁ’ শব্দ উচ্চারণ কর। এই আধ্যাত্মিক শব্দের অদ্ভুত শক্তি আছে।

যোগের অন্যান্য স্তরঃ (১) প্রত্যাহার অর্থাৎ সকল বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া সম্পূর্ণরূপে মানসিক ধারণার দিকে পরিচালিত করা; (২) ধারণা অর্থাৎ অবিচল একাগ্রতা; (৩) ধ্যান অর্থাৎ প্রগাঢ় চিন্তা; (৪) সমাধি অর্থাৎ (শুদ্ধ ধ্যান) রূপবিবর্জিত ধ্যান। ইহা যোগের সর্বোচ্চ এবং শেষ স্তর। পরমাত্মায় সকল চিন্তাভাবনার নিরোধের নাম ‘সমাধি’—যে অবস্থায় উপলব্ধি হয়, ‘আমি ও আমার পিতা এক।’

একবারে একটি কাজ কর, এবং উহা করিবার সময় অপর সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া উহাতেই সমগ্র মন অর্পণ কর।

রাজযোগ -শিক্ষা

[ইংলণ্ডের শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত]

প্রাণ

পদার্থ (জড়প্রকৃতি) পাঁচ প্রকার অবস্থার অধীনঃ আকাশ, আলোক, বায়বীয়, তরল ও কঠিন—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌—ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। অতি সূক্ষ্ম বায়ুর মত আদি পদার্থ হইতে ইহাদের উদ্ভব। বিশ্বের অন্তর্গত তেজ (বা শক্তি) 'প্রাণ' নামে অভিহিত—উহাই এই উপাদানগুলির (পঞ্চভূতের) মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান। প্রাণশক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত মনই মহা যন্ত্রস্বরূপ। মন জড়াত্মক। মনের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মাই প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রাণ জগতের পরিচালক-শক্তি; জীবনের প্রত্যেকটি বিকাশের মধ্যে প্রাণশক্তি দৃষ্ট হয়। দেহ নশ্বর, মনও নশ্বর; উভয়ই যৌগিক পদার্থ বলিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। এই-সকলের পশ্চাতে আছে অবিনাশী আত্মা। শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা প্রাণের নিয়ামক ও পরিচালক। কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের চতুর্দিকে দেখি, তাহা সর্বদাই অপূর্ণ। এই বোধ পূর্ণতা লাভ করিলে যীশুখ্রীষ্টাদি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধি সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এজন্য উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মন ও দেহ সৃষ্টি করিতেছে। সকল বস্তুর পশ্চাতে—যথার্থ সত্তায় সকল প্রাণীই সমান।

মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; উহা প্রাণশক্তি প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। শক্তির বহিঃপ্রকাশের নিমিত্ত পদার্থের প্রয়োজন। পরবর্তী প্রশ্ন হইল—প্রাণকে কিরূপে ব্যবহার করা যায়। আমরা সকলেই প্রাণের ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু কি শোচনীয় ভাবেই না উহার অপচয় ঘটে! প্রস্তুতির স্তরে প্রথম নীতি হইল সমুদয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-প্রসূত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাহা কিছু বিদ্যমান, আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য উহা উপলব্ধি করিতে হইবে। অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন—এই তিনটি স্তরে আমাদের মন ক্রিয়া করিয়া থাকে। যোগীই কেবল অতিচেতন মনের অধিকারী। যোগের মূলতত্ত্ব হইল, মনের ঊর্ধ্বে গমন। আলোক অথবা শব্দের স্পন্দনমাত্রা অনুযায়ী এই তিনটি স্তরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। আলোর কতগুলি স্পন্দন এত মন্থর যে, সহজে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না—স্পন্দনমাত্রা দ্রুত হইয়া আমাদের নিকট আলোকরূপে প্রতিভাত হয়; তারপর স্পন্দনের বেগ এত দ্রুত হয় যে, আর উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, শব্দ সম্বন্ধেও অনুরূপ ঘটিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না করিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয়াতীত হইতে পারা যায়, তাহাই শিখিতে হইবে। কতকগুলি যৌগিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে গিয়া পাশ্চাত্য মন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে ঐ শক্তিগুলি তাঁহাদের মধ্যে অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রায়ই ব্যাধির আকার ধারণ করে। হিন্দুগণ বিজ্ঞানের এই বিষয়টি অনুশীলনপূর্বক নির্দোষ করিয়াছেন। এখন সকলেই কোন ভয় বা বিপদের আশঙ্কা না করিয়া উহা চর্চা করিতে পারে। অতিচেতন অবস্থার একটি সুন্দর প্রমাণ হইল মনের আরোগ্য-বিধান; কারণ—যে চিন্তা আরোগ্য সম্পাদন করে, তাহা প্রাণেরই একপ্রকার স্পন্দন এবং উহাকে ঠিক চিন্তা বলা যায় না, কিন্তু চিন্তা অপেক্ষা উচ্চস্তরের এমন কিছু—যাহার নাম আমাদের জানা নাই।

প্রত্যেক চিন্তার তিনটি অবস্থা আছে। প্রথমতঃ চিন্তার উদয় অথবা আরম্ভ—যাহার বিষয়ে আমরা সচেতন নই; দ্বিতীয়তঃ যখন চিন্তা মনের উপরিভাগে আসে; তৃতীয়তঃ যখন চিন্তা আমাদের নিকট হইতে সঞ্চারিত হয়। চিন্তা জলের উপরিভাগে অবস্থিত বুদ্বুদের ন্যায়। চিন্তা ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইলে উহাকে আমরা 'শক্তি' বলি। যে স্পন্দন দ্বারা তুমি পীড়িত ব্যক্তিকে নীরোগ করিতে চাও, তাহা চিন্তা নয়—শক্তি। যে মানবাত্মা সকলের মধ্যে অনুস্যূত, সংস্কৃতে তাহাকে 'সূত্রাত্মা' বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

প্রাণের শেষ এবং সর্বোত্তম প্রকাশ হইল 'প্রেম'। যে মুহূর্তে প্রাণ হইতে প্রেম উৎপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত। এই প্রেম লাভ করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও মহৎ কাজ। অপরের দোষ দেখিও না, নিজেরই সমালোচনা করা উচিত। মাতালকে দেখিয়া নিন্দা করিও না; মনে রাখিও, মাতাল তোমারই আর একটি রূপ। যাহার নিজের মধ্যে মলিনতা নাই, সে অপরের মধ্যেও মলিনতা দেখে না। তোমার নিজের মধ্যে যাহা আছে, তাহাই তুমি অপরের মধ্যে দেখিয়া থাক। সংস্কার-সাধনের ইহাই সুনিশ্চিত পন্থা। যে-সকল সংস্কারক অন্যের দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা নিজেরাই যদি দোষাবহ কাজ বন্ধ করেন, তবে জগৎ আরও ভাল হইয়া উঠিবে। নিজের মধ্যে এই ভাব পুনঃপুনঃ ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

যোগ-সাধনা

শরীরের যথাযথ যত্ন লওয়া কর্তব্য। আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই দেহের পীড়ন করে। মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিও। বিষণ্ণভাব

আসিলে পদাঘাতে তাহা দূর করিয়া দাও। যোগী অত্যধিক আহার করিবেন না, আবার উপবাসও করিবেন না; যোগী বেশী নিদ্রা যাইবেন না, আবার বিনিদ্রও হইবেন না। সর্ব বিষয়ে যিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন।

কোন্ সময় যোগাভ্যাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ? ঊষা ও সায়ংকালের সন্ধিক্ষণে যখন সমগ্র প্রকৃতি শান্ত থাকে, তখনই যোগের সময়। প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দভাবে আসনে বসিবে। মেরুদণ্ড ঋজু রাখিয়া, সম্মুখে বা পশ্চাতে না ঝুঁকিয়া শরীরের তিনটি অংশ—শির, গ্রীবা ও পঞ্জর সরল রাখিবে। অতঃপর দেহের এক একটি অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা কর—সমগ্র দেহটি সম্পূর্ণ বা নির্দোষ। তারপর সমগ্র বিশ্বে একটি প্রেমের প্রবাহ প্রেরণ কর এবং জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা কর। সর্বশেষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মনকে যুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে মনের গতিবিধির উপর একাগ্রতা-সাধনের ক্ষমতা অর্জন কর।

ওজঃশক্তি

যাহা দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের (একজনের সহিত অপরের) পার্থক্য নির্ধারিত হয়, তাহাই ওজঃ। যাঁহার মধ্যে ওজঃশক্তির প্রাধান্য, তিনিই নেতা। ইহার প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি আছে। স্নায়ুপ্রবাহ হইতে ওজঃশক্তির সৃষ্টি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ যৌনশক্তিরূপে যাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকেই অতি সহজে ওজঃশক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। যৌনকেন্দ্রে অবস্থিত শক্তির ক্ষয় এবং অপচয় না হইলে উহাই ওজঃশক্তিতে পরিণত হইতে পারে। শরীরের দুইটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিরের পশ্চাদ্ভাগে স্নায়ুপ্রবাহ-দুইটি ৪ সংখ্যার মত আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত। এইরূপে শরীরের বাম অংশ মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্নায়ুচক্রের সর্বনিম্নপ্রান্তে যৌনকেন্দ্র—মূলাধারে (Sacral Plexus) অবস্থিত। এই দুই স্নায়ুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত শক্তির গতি নিম্নাভিমুখী এবং ইহার অধিকাংশ মূলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। মেরুদণ্ডের শেষ অস্থিখণ্ড এই মূলাধারে অবস্থিত এবং সাঙ্কেতিক ভাষায় উহাকে 'ত্রিকোণ' বলা হয়। সমস্ত শক্তি উহার পার্শ্বে সঞ্চিত হয় বলিয়া ঐ শক্তি সর্পরূপ প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত হয়। চেতন ও অবচেতন—এই দুইটি স্নায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে। কিন্তু অতিচেতন যখন এই চক্রের নিম্নভাগে উপনীত হয়, তখন স্নায়ুপ্রবাহের ক্রিয়া বন্ধ হয়, এবং ঊর্ধ্বগামী হইয়া চক্রাকার সম্পূর্ণ করিবার পরিবর্তে স্নায়ুকেন্দ্রের গতি রুদ্ধ হইয়া ওজঃশক্তিরূপে মূলাধার হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের ঐ ক্রিয়া (সুষুম্না নাড়ী) বন্ধ থাকে, কিন্তু ওজঃশক্তির গমনাগমনের নিমিত্ত উহা উন্মুক্ত হইতে পারে। এই ওজঃপ্রবাহ মেরুদণ্ডের একটি চক্র হইতে অপর চক্রে ধাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি (যোগী) জীবনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উপনীত হইতে পার। মনুষ্যদেহধারী আত্মার পক্ষে সর্বপ্রকার স্তরে উপনীত হওয়া ও সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব বলিয়াই সে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষের পক্ষে অন্য ধরনের দেহ আর প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইচ্ছা করিলে এই দেহেই তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে। ওজঃশক্তি যখন এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ধাবিত হইয়া অবশেষে সহস্রারে Pineal Gland-এ (মস্তিষ্কের যে অংশের কোন ক্রিয়া আছে কিনা শরীরবিজ্ঞান বলিতে পারে না) আসিয়া উপনীত হয়, তখন মানুষ দেহও নয়, মনও নয়; তখন সে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত।

যৌগিক শক্তির মহা বিপদ এই যে, ঐ শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া মানুষ পড়িয়া যায়, এবং উহার যথার্থ প্রয়োগ জানে না। যে-ক্ষমতা সে লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার কোন শিক্ষা এবং জ্ঞান নাই। বিপদ এই যে, এই-সকল যৌগিক শক্তির প্রয়োগের ফলে যৌনানুভূতি অস্বাভাবিকরূপে জাগ্রত হয়, কারণ বাস্তবিকপক্ষে যৌনকেন্দ্র হইতেই এই-সকল শক্তির উদ্ভব। যৌগিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ না করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও উত্তম পন্থা, কারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অধিকারীর উপর ঐ শক্তিগুলি অতি মারাত্মক রকমের ক্রিয়া করে।

প্রতীকের প্রসঙ্গে বলিতেছি। মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বে এই ওজঃশক্তির গতি পেঁচান স্ক্রু-র মত অনুভূত হয় বলিয়া উহাকে 'সর্প' বলা হয়। ঐ সর্পের অবস্থান ত্রিকোণের উপরে। যখন ঐ শক্তি জাগ্রত হয়, তখন মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া যায় এবং এক চক্র হইতে অন্য চক্রে বিচরণকালে আমাদের অন্তরে এক নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত হয়—অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম-অভ্যাস হইতেছে অতিচেতন মনের শিক্ষা। শরীরের দ্বারা যে অভ্যাস করিতে হয় (শারীরিক প্রক্রিয়া), তাহা তিন অংশে বিভক্ত এবং উহার কার্য প্রাণবায়ু লইয়া—অর্থাৎ নিঃশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ (পূরক, কুম্ভক ও রেচক)। চার সংখ্যা গণনা করিতে করিতে এক নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বায়ুগ্রহণ করিতে হইবে, ষোল সংখ্যা গণনা করিতে করিতে উহা ধারণ করিবে এবং আট সংখ্যা গণনা করিতে করিতে অপর নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বায়ু (নিঃশ্বাস) ত্যাগ করিতে হইবে। অতঃপর নিঃশ্বাস লইবার সময় অপর নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বিপরীতভাবে উহার অভ্যাস করিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক নাসারন্ধ্র বন্ধ রাখিয়া এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু যথাসময়ে প্রাণবায়ু তোমার বশে (আয়ত্তে) আসিবে। সকাল-সন্ধ্যায় চারিবার এইরূপ প্রাণায়াম করিবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পারে

‘অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য তোমার সন্নিকটে।’ ‘অনুতাপ’ শব্দটি গ্রীকভাষায় ‘Metanoctic’ (Meta শব্দের অর্থ—ঊর্ধ্বে, অতীত) এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ ‘জ্ঞানের পারে যাও’—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পারে—‘এবং স্বীয় অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, যেখানে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইবে।’

স্যর হ্যামিলটন কোন দার্শনিক আলোচনার শেষে বলিয়াছেন, ‘এখানে দর্শনের অবসান (সমাপ্তি), এখানে ধর্মের আরম্ভ।’ বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান নাই এবং কখনও থাকিতে পারে না। বুদ্ধিপ্রসূত বিচার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। অজ্ঞেয়বাদিগণ বলেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে জানিতে সমর্থ নন, এবং তাঁহারা ইহা যথার্থই বলিয়া থাকেন, কারণ ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ জ্ঞান তাঁহারা নিঃশেষ করিয়াছেন, তথাপি ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অতএব ধর্মকে প্রমাণ করিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ও তত্ত্বদর্শিগণ ‘ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন’ বলিয়া দাবী করেন, অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, এবং স্বীয় অন্তরেই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। মানুষ যখন এই বিশ্বের অন্তর্গত সেই পরম সত্য দর্শন করে, কেবল তখনই তাহার সকল সন্দেহের নিরসন হয়, এবং হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইহাই ‘ঈশ্বর-দর্শন’। আমাদের কাজ হইল—সত্যকে নিরূপণ করা, কেবল মতামত গলাধঃকরণ করিলে চলিবে না। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধর্মজগতেও সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তাহার বাহিরে যাইলেই উহা সম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মজগতের সত্যসমূহ যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর-দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য, শক্তিলাভ নয়। শুদ্ধ সৎ, চিৎ ও প্রেমই জীবনের লক্ষ্য; এবং প্রেমই ঈশ্বর-স্বরূপ।

চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান

স্বপ্নে ও চিন্তায় আমরা যে বৃত্তি অর্থাৎ কল্পনা প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাই সত্যে উপনীত হইবার উপায় হইবে। কল্পনাশক্তি অধিক প্রবল হইলে বিষয়বস্তু দৃষ্ট হয়। অতএব কল্পনা-সহায়ে আমরা শরীরকে সুস্থ অথবা পীড়িত অবস্থায় আনিতে পারি। যখন কোন বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মস্তিষ্কের অণুপরমাণুগুলির অবস্থান নলের ভিতর দিয়া নানা রঙের কাঁচখণ্ডের প্রতিফলন দ্বারা দৃষ্ট কারুকার্যের ন্যায় হইয়া থাকে (Kaleidoscopic)। মস্তিষ্কের অণুপরমাণুগুলির ঐরূপ সংস্থাপন ও সংযোগের পুনঃপ্রাপ্তিই ‘স্মৃতি’ বলিয়া অভিহিত হয়। ইচ্ছাশক্তি যত প্রবল হয়, মস্তিষ্কের পরমাণুগুলির পুনর্বিন্যাসের সফলতা তত অধিক হইয়া থাকে। দেহকে আরোগ্য করিবার একটিমাত্র শক্তিই আছে, এবং ঐ শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। ঔষধ ঐ শক্তিকে উদ্দীপিত করে মাত্র। দেহের মধ্যে যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, ঐ শক্তি দ্বারা তাহা বিতাড়িত হয়, এবং দেহের রোগ ঐ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। যদিও ঔষধের দ্বারা দেহপ্রবিষ্ট বিষ দূরীভূত করিবার শক্তি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, চিন্তাশক্তির দ্বারাই উহা অধিকতর স্থায়িভাবে উদ্দীপিত হয়। পীড়ার সময় যাহাতে আদর্শ স্বাস্থ্যের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং সুস্থ থাকাকালীন মস্তিষ্কের পরমাণুগুলি যে-অবস্থায় ছিল, পুনর্বিন্যাসের সময় আবার সেরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারে, সেজন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি-সম্বন্ধীয় চিন্তায় কল্পনার আধিপত্য প্রয়োজন। ঐ অবস্থায় শরীর মস্তিষ্কের অনুসরণ করিবার প্রবণতা লাভ করে। পরবর্তী ক্রম হইল আমাদের উপর অপরের মনের ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত প্রণালীতে উপনীত হইতে পারা। ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখা যায়। যে উপায়ে এক মনের উপর অপর মন ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা শব্দ। সৎ ও অসৎ চিন্তাগুলির প্রত্যেকটিই প্রভাবসম্পন্ন শক্তি এবং এই বিশ্ব ঐরূপ চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। অনুভূত না হইলেও কম্পন যেমন চলিতে থাকে, সেইরূপ কার্যে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা চিন্তারূপেই বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঘুঁষি না মারা পর্যন্ত হাতের মধ্যে উহার শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অবশেষে উহা কার্যে রূপান্তরিত হইয়া ঘুঁষিতে পরিণত হয়। আমরা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ চিন্তার উত্তরাধিকারী। যদি আমরা নিজেদের পবিত্র ও সৎচিন্তার যন্ত্রস্বরূপ করি, তবে সৎ চিন্তা-সকল আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। শুদ্ধাত্মা কখনও অসৎ চিন্তা গ্রহণ করিবে না। অসৎ লোকের মনই অসৎ চিন্তাগুলির উপযুক্ত ক্ষেত্র। এগুলি ঠিক জীবাণুর মত উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। চিন্তাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায়; নূতন নূতন আবেগ ঐগুলিতে কম্পন সৃষ্টি করিয়া চিন্তারাজ্যে উদিত হয়; অবশেষে এক বৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অপরগুলিকে আত্মসাৎ করে। প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর এই বিশ্বজনীন চিন্তাপ্রবাহের পুনরুত্থান ঘটে, এবং তখন ঐ বৃহৎ তরঙ্গটি অন্যান্য ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। এইরূপে একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি যে-যুগে বাস করেন, সে-যুগের চিন্তাসমূহ তিনি নিজ মনের মধ্যে ধারণ করেন এবং ঐগুলিকে বাস্তব রূপ দিয়া মানবজাতির নিকট অর্পণ করেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বৃহদাকার তরঙ্গের দৃষ্টান্তস্বরূপ; তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারস্পরিক ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসরের। যে-তরঙ্গের পশ্চাতে সর্বদা অত্যুজ্জ্বল পবিত্রতা ও মহত্তম চরিত্র বিরাজ করে, তাহাই পৃথিবীতে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর একবার আমাদের যুগে চিন্তাতরঙ্গের স্পন্দন বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব উহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং নানা আকারে ও নানা সম্প্রদায়ে উহা আবির্ভূত হইতেছে। এই-সব তরঙ্গের উদ্ভব ও বিলয় পর্যায়ক্রমে হইলেও গঠনমূলক ভাব সর্বদা ধ্বংসের অবসান ঘটায়। তখন মানুষ নিজ আধ্যাত্মিক স্বরূপ লাভের নিমিত্ত গভীরে ডুব দেয়, সে নিজেকে কখনও কুসংস্কার দ্বারা বদ্ধ বলিয়া অনুভব করে না। অধিকাংশ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং উহারা বুদ্বুদের ন্যায় ওঠে ও পড়ে, কারণ ঐ-সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাধারণতঃ চরিত্রবল নাই। পূর্ণ প্রেম ও প্রতিক্রিয়াহীন হৃদয় দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। নেতা চরিত্রহীন হইলে তাহার প্রতি আনুগত্য সম্ভব নয়। পূর্ণ পবিত্রতা দ্বারাই স্থায়ী আনুগত্য ও বিশ্বাস নিশ্চিতরূপে লাভ করা যায়।

একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং ধৈর্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাও; তোমার জীবনে সূর্যোদয় হইবেই।

কল্পনার প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসা যাক।

কুণ্ডলিনীকে এমনভাবে কল্পনা করিতে হইবে যেন তাহা বাস্তব। ত্রিকোণ-অস্থিখণ্ডে কুণ্ডলী-আকারে সর্পটি অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীক।

তারপর পূর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস কর এবং নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া বা শ্বাসবন্ধ করিয়া উহাতে ৪ সংখ্যা আকৃতির নিম্নে প্রবহমান স্রোতের মত কল্পনা কর। স্রোত যখন নিম্নতম অংশে উপনীত হয়, তখন উহা ত্রিকোণাবস্থিত সর্পটিকে আঘাত করে এবং ফলে সর্পটি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়—এইরূপ চিন্তা কর। চিন্তা দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে ত্রিকোণাভিমুখে পরিচালনা কর।

দৈহিক প্রণালী আমরা এখন শেষ করিলাম এবং এই অংশ হইতে মানসিক প্রণালীর আরম্ভ।

প্রথম প্রক্রিয়ার নাম—'প্রত্যাহার'। মনকে বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। দৈহিক প্রণালী শেষ হইলে মনকে ইচ্ছামত দৌড়াইতে দাও, বাধা দিও না। কিন্তু সাক্ষীর ন্যায় উহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখ। এইরূপে এই মন তখন দুই অংশে বিভক্ত হইবে—অভিনেতা ও দ্রষ্টা। তারপর মনের যে-অংশ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, তাহাকে শক্তিশালী কর এবং মনের গতিবিধি দমন করিবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করিও না। মন অবশ্যই চিন্তা করিবে; কিন্তু ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ সাক্ষী যখন তাহার কার্য করিয়া যাইবে, অভিনেতা—মন অধিকতর আয়ত্ত হইবে, যে-পর্যন্ত না তোমার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াঃ ধ্যান। ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা স্থূলদেহধারী এবং আমাদের মনও রূপ চিন্তা করিতে বাধ্য। ধর্ম এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং বাহ্যরূপও অনুধ্যানের সাহায্য করে। কোন রূপ ব্যতিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধ্যান) করিতে পার না। চিন্তা করিতে গেলে কোন না কোন 'রূপ' আসিবেই, কারণ চিন্তা ও প্রতীক অবিচ্ছেদ্য। সেই রূপের উপর মন স্থির করিতে চেষ্টা কর।

তৃতীয় প্রক্রিয়াঃ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় এবং ইহা যথার্থ 'একাগ্রতা' (একমুখীনতা)। মন সাধারণতঃ বৃত্তাকারে ক্রিয়া করে। কোন একটি বিন্দুতে মন নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। অবশেষে ফললাভ। মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে আরোগ্যকরণ, 'জ্যোতিঃ' দর্শন ও সর্বপ্রকার যৌগিক শক্তি লাভ হয়। মুহূর্তমধ্যে তুমি এই চিন্তা-প্রবাহ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতে পার, যেমন যীশুখ্রীষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ করিবে।

পূর্বে যথাযথ শিক্ষা না থাকায় এই-সকল শক্তিদ্বারা অনেকের পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া যোগের এই স্তরগুলি খুব ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে বলি, তারপর সমস্তই তোমাদের আয়ত্তে আসিবে। প্রেম যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কিছু পরিমাণে আরোগ্যকরণ অভ্যাস করিতে পার, কারণ প্রেম কোন অনিষ্ট সাধন করে না।

মানুষমাত্রেই অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ও ধৈর্যহীন। সকলেই শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই শক্তি অর্জন করিবার জন্য অতি অল্প লোকই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিতরণ করিতেই উৎসুক, কিছু সঞ্চয় করিবে না। অর্জন করিতেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু খরচ করিতে অল্প সময় লাগে। সুতরাং শক্তি অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অপচয় না করিয়া সঞ্চয় কর।

রিপুর প্রত্যেকটি তরঙ্গ দমন করিলে তাহা তোমার অনুকূলে সমতা রক্ষা করে। অতএব ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ প্রদর্শন না করাই উত্তম কৌশল। সকল নৈতিক বিষয়েই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না।' এই উপদেশ যে কেবল নীতিসঙ্গত, তাহা নয়; সত্যই ইহা উত্তম পন্থা। ইহা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত আমরা উহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করি না, কারণ যে-ব্যক্তি ক্রোধ প্রদর্শন করে, সে শক্তির অপচয় করিয়া থাকে। মস্তিষ্কে ঐ-সকল ক্রোধ ও ঘৃণার সমাবেশ হইতে পারে, এরূপ সুযোগ মনকে দেওয়া সঙ্গত নয়। রসায়ন-বিজ্ঞানে মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকের কার্য সমাপ্ত হইবে। একত্ব আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিজ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করে, এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই একত্ব লব্ধ হইয়াছে। মানুষ পূর্ণ ঐক্যে উপনীত হয় তখনই, যখন সে বোঝে, 'আমি ও আমার পিতা এক।'

পাদটীকা

১	নারদীয় সূক্ত, ঋগ্বেদ, ১০-১২৯
২	ভাষার ভঙ্গীতে পাঠকের মনে হইতে পারে, বুদ্ধিতত্ত্ব মহতের অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে; যাহাকে 'মহৎ' বলা যায়, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব।
৩	পূর্বে সাংখ্যমতানুযায়ী যে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বামীজীর কিঞ্চিৎ বিরোধ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্বে বুঝান হইয়াছে, অহংতত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রর উৎপত্তি হয়। এখানে আবার উহাদের মধ্যে ভূতের কথা বলিতেছেন। এটি কি কোন নূতন তত্ত্ব? বোধ হয়, অহংতত্ত্ব একটি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রর উৎপত্তি সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজী এইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের কল্পনা করিয়াছেন।
৪	বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।—গীতা, ১০।৪২
৫	তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।—ঐ, ২।৫২
৬	ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।—ঐ, ২।৪৫
৭	ইতঃপূর্বে মহত্তত্ত্বকে 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে, এখানে আবার পুরুষের সর্বজনীন ভাবকে 'ঈশ্বর' বলা হইল। এই দুইটি আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। এখানে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পুরুষ মহত্তত্ত্বরূপ উপাধি পরিগ্রহ করিলেই তাহাকে 'ঈশ্বর' বলা হয়।
৮	পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে ইহাকে বলে—**Catalytic agent**
৯	ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।—গীতা, ৯।১০
১০	এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহ. উপ., ৪।৩। ৩২
১১	কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করাকে **generalisation** বা সামান্যীকরণ বলে।
১২	কারণভাবাচ্চ।—সাংখ্যসূত্র, ১।১১৮
১৩	কঠোপনিষদ্, ২।২।১১
১৪	কুসুমবচ্চ মণিঃ।—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৫

১৫	বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি—এই লোক-প্রচলিত বিশ্বাসটির কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকীটাণুবিশেষ **(Parasite)** হইতে মুক্তার উৎপত্তি।
১৬	গীতা, ১৩।১৩
১৭	মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে। ন চ ব্যোমভূমি র্ন তেজো ন বায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ —নির্বাণষট্‌কম্, শংকরাচার্য
১৮	যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথাঽক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।—মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।১
১৯	বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫।১৫
২০	বৃহ. উপ., ৫।১৫ দ্রষ্টব্য
২১	ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ —নির্বাণষটকম্, ৫, শঙ্করাচার্য
২২	ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।—বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৫
২৩	বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট'-এ আছে—ঈশ্বর আদি নর আদম ও আদি নারী ইভকে সৃজন করিয়া তাহাদিগকে ইডেন-নামক সুরম্য উদ্যানে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে ইভকে প্রলোভিত করিয়া তৎপর তাহার দ্বারা আদমকে ঐ বৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের ভালমন্দ-জ্ঞান উপস্থিত হইয়া পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।—**O. T. Genesis. Ch. 1-3**
২৪	ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।—কেন উপ, ১।৩
২৫	কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্। নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ —বিবেকচূড়ামণি, ৪১০

২৬	কঠোপনিষদ্, ২।২।১৩
২৭	বৃহ উপ., ৫।৬
২৮	যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্॥—ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৪
২৯	নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।—মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৪
৩০	তুলনীয়ঃ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ —কঠ. উপ, ১।৩।১৪
৩১	বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ের প্রায় সমুদয়ই ঐ দুই অংশের ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যামাত্র।

১	মুণ্ডক উপ, ৩।১।১; শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪।৬
২	ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।—কঠ. উপ., ১।৩।১৪
৩	সর্বর্ধমান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৫৬
৪	**Lord's Prayer, N.T. Matt. VI, 10.**
৫	**O.T. Exodus, XX, 5**
৬	ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি … শ্বেঃ উপ., ৪।৩
৭	মুণ্ডক উপ, ৩|১|১-৩; শ্বেঃ উপ., ৪|৬-৭
৮	গীতা, ২|১২
৯	তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।—গীতা, ৯।৬
১০	অথর্ববেদ, কাণ্ড ৪, সূঃ ১৬; এখানে ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।
১১	ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥—ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬
১২	কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।—ঋগ্বেদ, ১০।৮১।২
১৩	ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১-২—নাসদীয় সূক্ত।
১৪	কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ঐ, ৪র্থ মন্ত্র
১৫	ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ঐ, ৭ম মন্ত্র
১৬	ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১-৪ মন্ত্র—হিরণ্যগর্ভসূক্তম

ধর্ম, দর্শন ও সাধনা

১	যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভরত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং ন ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি? যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেতোব সত্যম্।—ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৩-৪
২	জৈন সমেত।

বেদান্তের আলোকে

১	দ্রষ্টব্যঃ অবধূতগীতা, ৩।৩৪-৩৭
২	গীতা, ৫।১৮
৩	গীতা, ৫।১৯

যোগ ও মনোবিজ্ঞান

১	গাজীপুরের পওহারী বাবা।
*	সংখ্যা যখন দুই-আট-চার হয়, তখন এই প্রক্রিয়াই কঠিনতর হইয়া উঠে। গুরুর উপদেশ লইয়া এগুলি অভ্যাস করিতে হয়।
*	মৌলিক পদার্থগুলির শুদ্ধীকরণ ‘ভূতশুদ্ধি নামে’ পরিচিত; ইহা ক্রিয়ামূলক উপাসনার অঙ্গবিশেষ। উপাসক অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চমহাভূতকে তাহাদের তন্মাত্রপঞ্চক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত মনে মিলাইয়া দিতেছেন। মন, বুদ্ধি ও ব্যষ্টি-অহঙ্কারকে লীন করিয়া দেওয়া হয় ‘মহৎ’ অর্থাৎ বিরাট অহং-এ। প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিতে মহৎ লীন হয় এবং প্রকৃতি লীন হয় ব্রহ্ম বা চরম সত্যে। মেরুমজ্জার নিম্নদেশে মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি উপাসকের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া উচ্চতম জ্ঞানকেন্দ্র মস্তিষ্কে সহস্রারে নীত হয়। এই উচ্চতম কেন্দ্রে

উপাসক পরমাত্মার সহিত একাত্মতার ধ্যানে নিরত থাকেন—অনুলেখক।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
চতুর্থ খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’র চতুর্থ খণ্ডে প্রধানতঃ ভক্তি-বিষয়ক বক্তৃতা ও কথোপকথন সংগ্রথিত হইল। সাধারণতঃ এই ধারণাই প্রচলিত যে, স্বামীজী জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে যেভাবে যত কথা বলিয়াছেন, ভক্তি সম্বন্ধে ততটা বলেন নাই। সকল প্রচলিত ধারণার মত এই ধারণাও আংশিক সত্য। স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে বেশী কথা বলেন নাই, কিন্তু যেখানে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহা অতীব গভীর—এই সংকলনে তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর প্রচারিত ভক্তি পরাভক্তি, এবং পরাভক্তি ও পরজ্ঞান একই। স্বামীজীর এই ‘ভক্তিযোগ’ সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের ঊর্ধ্বে—সমন্বয়ই ইহার মূলতত্ত্ব। জ্ঞান ও ভক্তির যে দ্বন্দ্ব, তাহা পথের দ্বন্দ্ব—লক্ষ্যের নয়।

এই খণ্ডের প্রথমাংশে আছে ‘ভক্তিযোগ’-নামক বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, পরবর্তী অংশ ‘ভক্তি-রহস্য’-এ প্রায় একই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সবিস্তারে ও সহজভাবে। উভয়ত্র আমরা প্রকাশিত পুস্তকের বিষয়-বিন্যাস অনুসরণ করিয়াছি।

তৃতীয় অংশ ‘দেববাণী’ Inspired Talks-নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা ও পটভূমিকায় পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের আভাস পাওয়া যাইবে। গ্রন্থপাঠে বুঝা যাইবে ‘দেববাণী’তে স্বামীজীর জীবন-বাণী ঘনীভূতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির একখানি অমূল্য সঞ্চয়ন।

শেষাংশ ‘ভক্তি-প্রসঙ্গে’—নূতন সঞ্চয়ন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ভক্তি সম্বন্ধে প্রদত্ত বক্তৃতা ও কথোপকথন এখানে সংকলিত হইল। ‘নারদ-ভক্তিসূত্র’-এর নির্বাচিত অংশের অনুবাদ, এবং ভক্তি বিষয়ক গল্প-দুইটি স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভার এক অজ্ঞাত দিকের পরিচয় বহন করে।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’ প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
১৭ই জানুআরি, ১৯৬৩

ভক্তিযোগ

অকপটভবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে। নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্র'-এ বলিয়াছেন, 'ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।' 'ইহা লাভ করিলে জীব সর্বভূতে প্রেমবান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি লাভ করে।' 'এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।' 'কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও ভক্তি অধিকতরা, কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।'

১

আমাদের দেশের সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য, নারদাদি ভক্তিতত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গ-সমর্থনকারী ব্যাসসূত্রের মহান্ ভাষ্যকারও ভক্তিসম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সূত্রই শুষ্কজ্ঞানসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারের থাকিলেও সূত্রগুলির—বিশেষতঃ উপাসনা-বিষয়ক সূত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে সহজে তাহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে মনে করে, বাস্তবিক তাহা নাই। ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষ্যে মিলিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হাতে পড়িয়া রাজযোগ প্রায়ই অসাবধান ব্যক্তিদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ না হইয়া মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে রাজযোগও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট-ধর্মান্তর্গত গোঁড়ার দল—এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের মধ্যেই সর্বদা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেম জন্মে না, সেই ইষ্টনিষ্ঠাই আবার অনেক সময় অন্য সকল মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপের কারণ। সকল ধর্মের ও সকল দেশের দুর্বল অপরিণতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ একটিমাত্র উপায়েই তাহাদের নিজ আদর্শ ভালবাসিতে পারে। সেই উপায়টি—অপর সমুদয় আদর্শকে ঘৃণা করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন আদর্শের বিষয় শুনিলে বা দেখিলে কেন গোঁড়ার মত চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। এরূপ ভালবাসা যেন প্রভুর সম্পত্তিতে অপরের হস্তক্ষেপ-নিবারণের জন্য কুকুর-সুলভ সহজ প্রবৃত্তির মত। তবে প্রভেদ এই—কুকুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর; প্রভু যে বেশ ধরিয়াই আসুন না কেন, কুকুর তাঁহাকে কখনও শত্রু বলিয়া ভুল করে না। গোঁড়া কিন্তু সমুদয় বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত বিষয়ে তাহার দৃষ্টি এত অধিক যে, কোন ব্যক্তি কি বলিতেছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা শুনিবার বা বুঝিবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না: কিন্তু কে উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে-লোক স্বমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমযুক্ত, সে-ই নিজ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ব্যক্তিদের অনিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে না।

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম 'গৌণী'। উহা পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিতে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

এই জীবনেই যে আমরা সকলে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব, তাহা সম্ভব নয়; তবে আমরা জানি—যে-চরিত্রে জ্ঞান ভক্তি ও যোগ সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ। উড়িবার জন্য পাখির তিনটি জিনিষের আবশ্যক—দুইটি পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যোগ উহার পুচ্ছ। যাঁহারা এই তিনপ্রকার সাধন-প্রণালী একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের অবস্থায় আগাইয়া দেওয়া ব্যতীত এগুলির আর কোন উপযোগিতা নাই।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আচার্যগণের মধ্যে সামান্য একটু মতভেদ আছে, যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য—একাধারে দুই-ই মনে করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, এ প্রভেদ নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিকে সাধন-স্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায়, আর একটু অগ্রসর হইলে এই নিম্নস্তরের উপাসনাই উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভিন্নভাব ধারণ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধন-প্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান—প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও পূর্ণ ভক্তির সহিত আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন।

এইটি মনে রাখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক—এ বিষয়ে বেদান্তের মহান্ ভাষ্যকারেরা কি বলেন। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'—এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলেন, 'লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরুর বা রাজার নির্দেশানুবর্তী হয় এবং নির্দেশানুবর্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করে, তাহাকেই ভক্ত বলিয়া থাকে। লোকে

আরও এইরূপ বলিয়া থাকে—পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির ধ্যান করিতেছে। এখানেও একরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে।'

২

শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি।

আবার ভগবান্ রামানুজ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ

'এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন ভগবৎ-সম্বন্ধে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়।' এইরূপে শাস্ত্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এইরূপ স্মরণ আবার দর্শন করারই সামিল। কারণ 'সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্মক্ষয় হইয়া যায়।'—এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে 'স্মরণ' দর্শনের সহিত সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি সন্নিহিত, তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু যিনি দূরবর্তী, তাঁহাকে কেবল স্মরণ করা যাইতে পারে; তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দর্শন করিতে বলিতেছেন, সুতরাং ঐরূপ স্মরণ ও দর্শন এক পর্যায়ের কার্য বলিয়া সূচিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে। ... আর উপাসনা-অর্থে সর্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতে দৃষ্ট হয়। জ্ঞান—যাহা নিরন্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ-অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ... সুতরাং স্মৃতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'নানবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, কিংবা বহু বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, 'আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন'; অত্যন্ত প্রিয়কেই 'বরণ' করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসেন, এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যাহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত এবং প্রেমের সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।'

৩

অতএব কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ-অনুভবাত্মক এই স্মৃতি যাঁহার অতি প্রিয় (উহা ঐ স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাঁহাকেই সেই পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই সেই পরমাত্মা লব্ধ হন। এই নিরন্তর স্মরণ 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' সূত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন—'প্রণিধান- অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা (যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া সমুদয় কর্ম সেই পরম গুরুর উপর সমর্পিত হয়।'

৪

আবার ভগবান্ ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'প্রণিধান-অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার বাসনা সকল পূর্ণ হয়।'

৫

শাণ্ডিল্যের মতে 'ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি।'

৬

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'অজ্ঞলোকের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ তীব্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।'

৭

আসক্তি—কাহার জন্য? পরম প্রভু ঈশ্বরের জন্য। আর কাহাকেও ভালবাসা—তা তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে ভালবাসা কখনই 'ভক্তি' হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, —'ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জগদন্তর্গত সকল প্রাণী কর্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত; তাহারা অবিদ্যার অন্তর্গত ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের ধ্যানের সহায় নয়।'

৮

শাণ্ডিল্যসূত্রের 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, 'উহার অর্থঃ অনু—পশ্চাৎ, ও রক্তি—আসক্তি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমাজ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আসে।'

৯

তাহা না হইলে যে-কোন ব্যক্তির প্রতি, যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ পূজাপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর কে? 'যাঁহা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে'

১০

তিনি ঈশ্বর—'অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু।'

১১

আর সকলের উপর 'তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।'

১২

এগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটি? 'নেতি নেতি' করিয়া জ্ঞানী যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন, তিনি একটি এবং ভক্তের প্রেমময় ভগবান্ আর একটি? না, সেই একই সচ্চিদানন্দ—প্রেমময় ভগবান্, একাধারে তিনি সগুণ ও নির্গুণ। সর্বদাই বুঝিতে হইবে, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নন। সবই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'। তবে নির্গুণ পরব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার পাত্র হইতে পারেন না। এইজন্য ভক্ত ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকে উপাস্যরূপে নির্বাচন করেন। একটি উপমার দ্বারা বুঝা যাকঃ

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান—তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে ঐগুলি এক বটে, কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে তাহারা ঐ মৃত্তিকাতেই অব্যক্তভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে এক, কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেই রূপ থাকে, ততদিন সেগুলি পৃথক্ পৃথক্। মাটির ইঁদুর কখনও মাটির হাতি হইতে পারে না। কারণ আকার গ্রহণ করিলে বিশেষ আকৃতিই বস্তুর বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ কোন আকৃতিহীন মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্য উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমনের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি। বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তাত্মা যে প্রায়-অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যাস আর একটি সূত্রে বলিতেছেন, 'কিন্তু কেহই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিলাভ করিবে না, তাহা কেবল ঈশ্বরের।'

১৩

এই সূত্রব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে কোন কালে সম্ভব নয়, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মধ্বাচার্য বরাহপুরাণ হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া তাঁহার প্রিয় সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যকার রামানুজ বলেনঃ

সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়শক্তি ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত কিনা? অথবা উহার অভাবে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তাঁহাদের ঐশ্বর্য কিনা? মুক্তাত্মা জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করা যাক। কেন? কারণ শ্রুতি বলেন, 'মুক্তাত্মা পরম একত্ব লাভ করেন' (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।১।৩)। আরও উক্ত হইয়াছে, 'তাঁহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়'। এখন কথা এই, পরম একত্ব ও সকল বাসনার পরিপূরণ পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি-জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব সকল বাসনার পরিপূরণ ও পরম একত্ব লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, মুক্তাত্মা সমগ্র জগতের নিয়ন্তৃত্বও লাভ করেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি, মুক্তাত্মা কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তিলাভ করেন। 'জগন্নিয়মন' অর্থে—জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার রূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তৃত্ব। মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই জগন্নিয়মন—শক্তি নাই, যাহা কিছু ঈশ্বরের স্বরূপ আবৃত করে, তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে সে-সকল আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হয়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। ইহা কিরূপে জানিলে? নিখিল-জগন্নিয়ন্তৃত্ব কেবল পরব্রহ্মেরই গুণ বলিয়া যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্যবলেই ইহা জানিয়াছি। 'যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।'—(তৈত্তি. উপ., ৩।১)। যদি এই জগন্নিয়ন্তৃত্ব মুক্তাত্মাদেরও সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব-গুণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধরণ গুণগুলিকেই বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। অতএব নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে পরমপুরুষকেই জগন্নিয়মনের কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর ঐ ঐ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্নিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের উপর আরোপিত হইতে পারে। বেদবাক্যগুলি এইঃ 'বৎস, আদিতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন। কেবল ব্রহ্মাই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই-সকল দেবতাই ক্ষত্র।' 'আদিতে আত্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব—পরে তিনি এই জগৎ সৃজন করিলেন।' 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান, দ্যাবা-পৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম কিংবা সূর্য—কিছুই ছিল না, তিনি একাকী সুখী হইলেন না। ধ্যানের পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয় জন্মিল।' 'যিনি পৃথিবীতে বাস করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র', 'যিনি আত্মাতে বাস করিয়া' ইত্যাদি।

১৪

পরসূত্র-ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিতেছেন, ‘যদি বল ইহা সত্য নয়, কারণ বেদে ইহার বিপরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব—তাহা নিম্নদেবলোকে মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য-বর্ণনা মাত্র।’

১৫

ইহাও একরূপ সহজ মীমাংসা হইল।যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির ঐক্য স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মতে এই সমষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদসমূহ আছে। অতএব এই মতও কার্যতঃ দ্বৈত বলিয়া জীবাত্ম ও সগুণ ঈশ্বরের স্পষ্ট ভেদ রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে সহজ হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই বিষয়ে কি বলেন। আমরা দেখিব, অদ্বৈতমত কেমন দ্বৈতবাদীর সকল আশা- আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহোচ্চ দিব্যভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইঁহাদেরই কথা ভাগবত-পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ ‘হে রাজন্, হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সকল বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

১৬

সাংখ্যেরা ইঁহাদিগকে ‘প্রকৃতিলীন’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ কখনই ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, ‘সেখানে কে কাহাকে দেখে?’—এরূপ ব্যক্তি সমুদয়ের বাহিরে গিয়াছেন, যাহাকে শ্রুতি ‘নেতি, নেতি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা, এবং ঐ উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর—এই তিনরূপে বিভক্ত দেখিবেন। ভক্তির আতিশয্যে চেতনার ঊর্ধ্বতর স্তরে যখন প্রহ্লাদ নিজেকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগৎ ও তাঁহার কারণ—কিছুই তো দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাঁহার নিকট নাম-রূপ দ্বারা বিভক্ত নয়—এমন এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাঁহার বোধ হইল—তিনি প্রহ্লাদ, অমনি তাঁহার নিকট জগৎ ও অশেষকল্যাণগুণরাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত হইলেন। মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগে ও প্রেমে অহংজ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে আবার উপাস্যরূপ পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখনই ‘তাঁহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহাস্যযুত, পীতাম্বরধারী, মাল্যভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মন-মথনকারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।’

১৭

এখন আবার আমরা আমাদের আচার্য শঙ্করের কথায় আসিতেছি। শঙ্কর বলেনঃ যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন, অথচ যাঁহাদের মন লয় হয় না, অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য সসীম কি অসীম? এই সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দেখানো হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য অসীম, কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় ‘তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন’, ‘সকল দেবতা তাঁহার পূজা করেন’, ‘সমগ্র জগতে তাঁহার কামনার পূর্তি হয়।’ ইহার উত্তরে ব্যাসের উক্তি ‘জগদ্‌ব্যাপারবর্জং; মুক্তাত্মাগণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অন্যান্য অণিমাদি শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের—কারণ সৃষ্টিসম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় উক্তি আছে, সবগুলিতে তাঁহারই কথা বলা হইয়াছে। কোন প্রসঙ্গে সেখানে মুক্তাত্মাদের কোন উল্লেখ নাই। সেই পরম পুরুষ একাই জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে যত শ্রুতি আছে, সবই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর তাঁহার প্রসঙ্গে ‘নিত্যসিদ্ধ’ এই বিশেষণেও প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আরও বলেন, মুক্তাত্মাদের অণিমাদি-শক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও অন্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। অতএব সেই শক্তিগুলি অসীম নয়—সেগুলির আদি আছে ও সেগুলি সীমাবদ্ধ, সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত-বিষয়ে মুক্তাত্মাদের কোন স্থান নাই। আবার তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; একজন হয়তো সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, আর একজন নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই বিরোধ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন করা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই ‘পরম পুরুষের অধীন।’

১৮

অতএব সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতি ভক্তি প্রয়োগ সম্ভব। ‘যাহারা অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তাহাদের ক্লেশ অধিকতর।’

১৯

ভক্তি মানবপ্রকৃতির অনুকূলে সহজভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণ করিতে পারি না—ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তুর সম্বন্ধেও কি ইহা সমভাবে সত্য নয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান্ কপিল বহুযুগ পূর্বে প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান বা ধারণার মধ্যে মানবীয় চেতনা বা বুদ্ধি অন্যতম উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় বস্তুই বুদ্ধি ও তাহার সহিত অপর কোন বস্তুর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই হউক। আর যাহাকে আমরা সচরাচর ‘সত্য বস্তু’

বলিয়া মনে করি, তাহা এই অনিবার্য মিশ্রণ। বাস্তবিকই বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, তাহা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। অতএব ঈশ্বর মানবধর্মী বলিয়া তাঁহাকে অসত্য বলা নিছক বাজে কথা। এ যেন পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) মধ্যে তুচ্ছ বিবাদের মত। ঐ বিবাদ আপাততঃ ভয়াবহ বোধ হইলেও বাস্তব (real)-শব্দের অর্থ লইয়া মারপ্যাঁচের উপর স্থাপিত। 'সত্য' শব্দের দ্বারা যত প্রকার ভাব সূচিত হইয়াছে, সে-সব ভাবই 'ঈশ্বর' ভাবটির অন্তর্গত। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদূর সত্য, ঈশ্বরও ততদূর সত্য। আর বাস্তব-শব্দটি এখানে যে অর্থে প্রযুক্ত হইল, ঐ শব্দদ্বারা তদপেক্ষা অধিক আর কিছু বুঝায় না। ইহাই হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম

ভক্তের পক্ষে এই-সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়োজন—কেবল নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করার জন্য। এতদ্ব্যতীত উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই, কারণ তিনি এমন এক পথে চলিয়াছেন যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির অস্পষ্ট ও চিত্তচঞ্চলকারী রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবে; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের শুষ্ক যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বৃথান্বেষণের পরিবর্তে প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশিত হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না, তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, উপলব্ধি করেন। আর এই ভগবানকে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি তর্কবিচার হইতে উচ্চতর নয়? শুধু তাই নয়, অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও বড় বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়োজনও নয়? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক, যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা কিছু মানুষকে সুখ দিতে পারে—তাহারই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে; ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়গুলি কোন কাজের নয়, কারণ এগুলি দ্বারা টাকাকড়ি বা দৈহিক সুখ পাওয়া যায় না। এরূপ লোকের মতে যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, সেগুলির কোন প্রয়োজন নাই। যাহার যে-বিষয়ে যেমন অভাববোধ, তাহার প্রয়োজনবোধও সেই বিষয়ে তদনুরূপ। সুতরাং যাহারা পান, ভোজন, অপত্য-উৎপাদন ও তারপর মৃত্যু—ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লাভ-বোধ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা জন্মিতেও অনেক জন্ম লাগিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিকট আত্মার উন্নতি-সাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়ার মত মনে হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রেমেই মানবজীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এইরূপ মানুষ এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি পরা ও গৌণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত; 'গৌণী' অর্থাৎ সাধন ভক্তি, 'পরাভক্তি' উহারই পূর্ণ বা চরম অবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্য সহায় না লইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আর ইহাও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—যাহাদের ধর্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও অনুষ্ঠানপ্রচুর, সেই-সকল সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছিলেন। যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু ভগবৎ-পথে স্খলিতচরণে অগ্রসর সুকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বন-স্বরূপ, সেই ভাবগুলিকে যে-সকল শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মপ্রণালী একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চায়—যে-সকল ধর্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক হর্ম্যের ছাদের অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্যন্ত ভাঙিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা লইয়া যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু মানবহৃদয়ে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক জীবনরূপ চারাগাছটির গঠনোপযোগী উপাদান, সেগুলি পর্যন্ত দূর করিয়া দিতে চায়, দেখিতে পাওয়া যায়—সেই-সকল ধর্ম শীঘ্রই একটি আধারে, শব্দরাশি ও তর্কাভাসের একটি কাঠামোতে পর্যবসিত হইয়াছে। হয়তো একটু সামাজিক আবর্জনা-দূরীকরণ বা তথাকথিত সংস্কার-প্রিয়তার আভাসযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহাদের ধর্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী; তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ; উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনের সর্বস্ব। মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অভিপ্রেত রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্যই

২০

ইহাদের মতে মানব-জীবনের সর্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গোঁড়ামির অদ্ভুত মিশ্রণের অনুগামিগণ যত শীঘ্র তাহাদের স্বরূপ প্রকটিত করিয়া বাহির হয় এবং নাস্তিক জড়বাদীদের দলে যোগ দেয়—ইহাই তাহাদের করা উচিত—ততই সংসারের মঙ্গল। একবিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান ও গোঁড়ামির এই শুষ্ক ধূলিময় ক্ষেত্রে একজন—মাত্র একজন অমিততেজা ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, দেখাও তো! না পার, চুপ করিয়া থাক, হৃদয়ের দরজা-জানালা খুলিয়া দাও, সত্যের বিমল আলোক প্রবেশ করুক, তত্ত্বদর্শী সেই ভারতীয় সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া শোন, তাঁহারা কি বলিতেছেন।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

জীবাত্মামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই—শেষ পর্যন্ত সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তাশক্তির ফলস্বরূপ। আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি তাহার ফলস্বরূপ হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে বাহির হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যখন এই সহায়তা পাওয়া যায়, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই নয়। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব—আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমাদের আধ্যাত্মিক উপকার হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা যদি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব বড়জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যকালে—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়—কেন এত ভয়াবহ ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হয়, তাহার কারণ—আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে ‘গুরু’ বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে ‘শিষ্য’ বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক; আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কর্ষিত থাকা প্রয়োজন। যেখানে এই দুইটি বিদ্যমান সেখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। ‘ধর্মের প্রকৃত বক্তা অবশ্যই আশ্চর্য পুরুষ হইবেন, শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া চাই।’

২১

যখন উভয়েই আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যত্র নয়। ঐরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু সাধক। আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল, একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মচক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে, কারণ সময়ে ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা জাগিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তি-সঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার ধর্মালোক আকর্ষণ করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকশক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।

তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে, যথা—ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেক সময় এরূপ দেখা যায়ঃ হয়তো কাহাকেও খুব ভালবাসিতাম, তাহার মৃত্যু হইল, আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফসকাইয়া চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজন একটি দৃঢ়তর উচ্চতর আশ্রয়—আমাদিগকে অবশ্যই ধার্মিক হইতে হইবে। কয়েকদিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্মপিপাসা বলিয়া অনেক সময়ই ভুল করিতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্মের জন্য যথার্থ স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মিবে না, আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎ পাইব না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, সত্যলাভের জন্য আমাদের এ-সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখনই ঐরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা। এরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিব, আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নই—আমাদের প্রকৃত ধর্মপিপাসা জাগে নাই।

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরুসম্বন্ধে আরও অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছে যাহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে, শুধু তাই নয়, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। ‘অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নির্বুদ্ধি হইলেও নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় প্রতি পদবিক্ষেপেই স্খলিতপদ হইয়া পরিভ্রমণ করে।’

২২

এইরূপ মানুষেই জগৎ পরিপূর্ণ। সকলেই গুরু হইতে চায়। ভিখারীও লক্ষ টাকা দান করিতে চায়। এইরূপ লোক যেমন সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, এই গুরুগণও তেমনি।

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ

তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে; এইরূপ আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লোকগুরুর আবির্ভাব হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারে যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্যালোক-সম্পাত আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় নাই—উহা স্বপ্রকাশ; সত্য আমাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দাঁড়াইয়া বলে—'ইহাই সত্য।' যে-সকল আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমরা আমাদের গুরু বা আচার্যের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি; এই কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। আর জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহা ছাই, তাহাই পাই—ইহা একটি সনাতন নিয়ম। যে বস্তু আমরা অন্তরের সহিত চাই, তাহা ছাড়া আমরা অন্য বস্তু লাভ করিতে পারি না। ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ; আমরা সচরাচর যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। শুধু ধর্মকথা শুনিলে আর ধর্মপুস্তক পড়িলেই যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, হৃদয়ে ধর্মপিপাসা প্রবল হইয়াছে। যতদিন না প্রাণে ব্যাকুলতা জাগরিত হয় এবং যতদিন না আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে পারি, ততদিন সদাসর্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দু-এক দিনের কর্ম নয়, কয়েক বৎসর বা দু-এক জন্মেরও কর্ম নয়; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হয়, ধৈর্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গুরু সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ বাইবেল বা কোরান পাঠ করিতেছে, কিন্তু শাস্ত্রসমূহ শুধু শব্দ এবং ব্যাকরণ—ধর্মের কয়েকখানা শুষ্ক অস্থিমাত্র। যে গুরু শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্য। শাস্ত্রের শব্দজাল যেন মহারণ্য, মানুষ নিজেকে উহার ভিতর হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়া পায় না। 'শব্দজাল মহারণ্যসদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ।'

২৩

'শব্দযোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রমর্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়—পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের বিষয়মাত্র, উহা দ্বারা সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের সহায়তা হয় না।'

২৪

যাহারা ধর্মব্যাখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা—লোকে তাহাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান করুক। জগতের প্রধান ধর্মাচার্যগণ কেহই এইভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে কখনও চেষ্টা করেন নাই, শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া ক্রমাগত মারপ্যাঁচ করেন নাই। তাঁহারা শুধু জগৎকে শাস্ত্রের মহান্ ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাহাদের শিখাইবার কিছুই নাই, তাহারা হয়তো শাস্ত্র হইতে একটি শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ডে এক পুস্তক রচনা করে। সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ বিষয় লইয়াই কেহ হয়তো আলোচনা করিয়া গেলেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেনঃ এক আম-বাগানে কয়েকজন লোক বেড়াইতে গিয়াছিল; বাগানে ঢুকিয়া তাহারা গনিতে আরম্ভ করিল, কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা, আমের বর্ণ, আকার, প্রকার ইত্যাদি নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার করিতে লাগিল। আর একজন ছিল বিচক্ষণ, সে এসব গ্রাহ্য না করিয়া আম পাড়িতে লাগিল ও খাইতে লাগিল। বলো দেখি, কে বেশী বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরিবে, কেবল পাতা গনিয়া—হিসাব করিয়া লাভ কি? এই পাতা-ডালপালা গোনা ও অপরকে উহার সংখ্যা জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য এরূপ কার্যের উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্মরাজ্যে নয়। যাহারা এরূপ পাতা গনিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে কখনও একটিও ধর্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম—যাহা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জিনিষ, তাহাতে পাতা-গোনারূপ অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় কর্তব্য ও প্রেম সম্বন্ধে যে সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহা অনুসরণ করাই তোমার কাজ। উহার সম্বন্ধে বা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য। তাহারা যাহা চায় তাহা লইয়াই থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতী তর্কবিচারে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া এস আমরা আম খাইতে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, 'গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, দেখিবার

প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন তাহাই বিচার করিতে হইবে। সেইটি লইয়াই কাজ করা প্রয়োজন।' এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষক যাহাই হউন না কেন, কিছু আসে যায় না। কারণ উহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কী ধর্ম শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে শক্তি সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং ধর্মাচার্যের সম্বন্ধে প্রথমেই দেখা আবশ্যক তিনি কি চরিত্রের লোক; তারপর তিনি কি বলেন তাহাও দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক, তবেই তাঁহার কথার প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে; কারণ তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যেই যদি সেই শক্তি না থাকে, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কী? গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিকস্পন্দন-বিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহা যেন সমবেদনাবশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। গুরুর বাস্তবিক কার্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যের বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নয়। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে। সুতরাং গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক, গুরুর উদ্দেশ্য কি? গুরু যেন অর্থ, নাম-যশ বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহার কার্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, লাভ বা যশের ইচ্ছা এক মুহূর্তে এই সঞ্চারের মাধ্যম নষ্ট করিয়া ফেলে। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে ভগবদ্‌ভাব শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি দেখ—গুরুতে এইসব লক্ষণ বর্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে; যেহেতু তিনি যদি হৃদয়ে সদ্‌ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তিনি হয়তো অসদ্‌ভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। 'যিনি বিদ্বান্ নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ',

২৫
তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে যে, ধর্মে অনুরাগী হইবার, ধর্মের মর্মবোধ করিবার এবং উহা জীবনে পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায় না। 'শিলাখণ্ডের নিকট ধর্মোপদেশ-শ্রবণ, নদীর কলনাদে গ্রন্থপাঠ ও সর্বত্র শুভদর্শন'

২৬

আলঙ্কারিক বর্ণনাহিসাবে সত্য বটে, কিন্তু যাহার নিজের মধ্যে সত্য বিকশিত হয় নাই, সে কখনও এগুলি হইতে এতটুকু জ্ঞান আহরণ করিতে পারে না। পর্বত, নদী প্রভৃতি কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে?—যাহার পবিত্র হৃদয়ে ভক্তিকমল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই মানবাত্মাকে। আর যে আলোকে এই কমল সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে, তাহা ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরুরই জ্ঞানালোক। যখন এইভাবে হৃদয় উন্মুক্ত হয়, তখন সেই হৃদয়—পর্বত, নদী, তারা, সূর্য, চন্দ্র অথবা এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহার হৃদয় এখনও উন্মুক্ত হয় নাই, সে এ-সকলে পর্বতাদি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবে না। চিত্রশালায় গিয়া অন্ধের কিছু লাভ নাই। আগে তাহাকে চক্ষু দাও, তবেই সে সেখানকার দর্শনীয় বস্তুসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবে।

গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণগ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এরূপ সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই-সব দেশেই অসাধারণ ধর্মবীরগণ সকল জন্মিয়াছেন; আর যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ রক্ষা করা হয় নাই, সে-সব দেশে ধর্মের শিক্ষক কেবল বক্তামাত্র। নিজের প্রাপ্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে উভয়েই নিজ নিজ পথ দেখেন,—একে আর অপরের চিন্তা করেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রায়ই অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়; আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই। এই-সব লোকের কাছে ধর্ম যেন ব্যবসায়ে পরিণত। তাহারা মনে করে, অর্থ দ্বারা ধর্ম ক্রয় করা যায়। ঈশ্বরেচ্ছায় ধর্ম যদি এত সুলভ হইত! তাহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এরূপ হইবার নয়।

ধর্ম—সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম, তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নয়, গ্রন্থ হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পার, সমুদ্রের তলদেশে আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারিকোণ অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।

অবতার

যেখানে লোকে তাঁহার (ঈশ্বরের) নামকীর্তন করে, সেই স্থান পবিত্র; আর যে-ব্যক্তি তাঁহার নাম করেন, তিনি আরও কত পবিত্র! আর যাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হই, তাঁহার নিকট কতই না ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত! ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যের সংখ্যা খুব বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই-সকল আচার্য-বিরহিত হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী একেবারে আচার্যশূন্য হয়, সেই মুহূর্তেই উহা এক ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হয় ও বিনাশের দিকে ধাবিত হয়। আচার্যগণই মানবজাতির সুন্দরতম প্রকাশস্বরূপ এবং 'অহেতুকদয়াসিন্ধু'।

২৭

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, 'আমাকে আচার্য বলিয়া জানিও।'

২৮

অর্থাৎ সাধারণ গুরুশ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—ঈশ্বরের অবতারগণ। ইহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি—কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও মুহূর্তের মধ্যে সাধু হইয়া যায়। ইঁহারা গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। মানুষ তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না; আর বাস্তবিক এই আচার্যগণকে উপাসনা করিতে আমরা বাধ্য।

এই-সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি আর কোন রূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু গঠন করি এবং উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ীকে শিব গড়িতে বলা হয়; অনেক দিন চেষ্টা করিয়া সে একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই আমরা শোচনীয়ভাবে বিফল হই; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মানুষভাবে ছাড়া অন্যভাবে কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপবোধে সমর্থ হইব, কিন্তু যতদিন সীমাবদ্ধ মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবানকে মানব-ভাবে ছাড়া আর কোন ভাবেই চিন্তা করিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে বা জগতের অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্ক-সমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এই-সকল মনুষ্য-অবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক—এ-কথা নিজের সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পার, কিন্তু 'সহজ' বুদ্ধিতে কি বলে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাতে কি আছে? কিছুই নাই—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। তারপর যখন দেখিবে, কোন লোক এইরূপ অবতারপূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি? 'সর্বশক্তিমত্তা', 'সর্বব্যাপিতা' ও এইরূপ শব্দগুলি দ্বারা কি বোঝ? দেখিবে, ঐগুলির বানান ব্যতীত সে আর অধিক কিছু বোঝে না। এ-সকল শব্দের দ্বারা তাহার মনে কোন অর্থেরই বোধ হয় না, এমন কোন ভাব দ্বারা সে ঐগুলি ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহা তাহার মানবীয় প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটা একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত এ ব্যক্তির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, আর এই বক্তা সমাজে অশান্তি ও দুঃখ সৃষ্টি করে। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতিতেই ধর্ম, সুতরাং শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ করা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে 'সহজ' জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত দুর্লভ নয়।

আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ; ভগবানকে আমরা মনুষ্য-রূপে দেখিতে বাধ্য। মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল—তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা ভগবানকে একটি বৃহৎ মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভাবিতে হইবে, ভগবান্ একটি বৃহৎ মৎস্য। মানুষকেও ভাবিতে হইবে, ভগবান্ মানুষ; আর ঐ-সকল সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ধারণা বিকৃত-কল্পনাসম্ভূত নয়। মানুষ, মহিষ, মৎস্য—এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বরূপ, সবগুলি ভগবৎ-সমুদ্রে নিজ নিজ ধারণ-শক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেক পাত্রে সেই এক ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। নিজ মনের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা করে, আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরকে মানুষরূপেই উপাসনা করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নাই।

প্রকার লোক ভগবানকে মানুষরূপে উপাসনা করে না। প্রথম—নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়—পরমহংসগণ, যাঁহারা মনুষ্যসুলভ সমুদয় দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া মানবপ্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহাদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই কেবল ভগবানকে তাঁহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়ে যেমন, এখানেও তেমনি—দুইটি চরম বিপরীত ভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় অ-জ্ঞানী ও পরম জ্ঞানী—এ-দুয়ের কেহই উপাসনা করে না; নরপশুগণ অজ্ঞান বলিয়া উপাসনা করে না, জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সর্বদা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র উপাসনার প্রয়োজন হয় না। যে-ব্যক্তি এই দুই চূড়ান্তভাবের মধ্যবর্তী, অথচ বলে—আমি ভগবানকে

মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, বিশেষ যত্নের সহিত সেই ব্যক্তির দেখাশুনা করা আবশ্যক। কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিয়াও বলিতে হয়, সে প্রলাপ বকিতেছে, সে ভুল করিয়াছে; তাহার ধর্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণেরই উপযুক্ত।

ভগবান্ মানুষের দুর্বলতা বুঝেন, এবং মানুষের হিতের জন্যই মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

২৯

'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।'

৩০

'জগতের ঈশ্বর আমি,—আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।'

৩১

অবতার সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যখন প্রবল বন্যা আসে, তখন সব ছোট ছোট নদী ও খানা কানায় কানায় ভরিয়া যায়; সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সাধারণ মানুষও তখন হাওয়াতেই ধর্মভাব অনুভব করে।'

মন্ত্র

আমরা কিন্তু এখানে মহাপুরুষ বা অবতারগণের কথা বলিতেছি না; এখন আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদিগকে সচরাচর মন্ত্র দ্বারা শিষ্যগণের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ মনুষ্যচিত্তে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা নামরূপাত্মক নয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরও নিয়ম বলিতে হইবে। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেই জানিতে পারা যায়,'

৩২

তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডকে জানিতে পারিলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকেও জানিতে পারা যায়। রূপ বস্তুর বাহিরের আবরণ বা খোসা, আর নাম বা ভাব যেন উহার অন্তর্নিহিত শস্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড শরীরই রূপ, আর মন বা অন্তঃকরণই নাম, এবং বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সহিত উহাদের বাচকশব্দগুলি নিত্যযুক্তভাবে বর্তমান। অন্যভাষায় বলিতে গেলে ব্যক্তি-মানুষের ভিতরেই 'ব্যষ্টিমহৎ' বা চিত্তে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি উত্থিত হইয়া প্রথমে সূক্ষ্ম শব্দ বা ভাবরূপ—পরে তদপেক্ষা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা 'সমষ্টিমহৎ' প্রথমে নিজেকে নামে, পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করেন। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই 'রূপ'; ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত 'স্ফোট' রহিয়াছে। 'স্ফোট' বলিতে সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ 'শব্দব্রহ্ম'। সমুদয় নাম বা ভাবের উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটেই সেই শক্তি, যাহা দ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেন; শুধু তাই নয়, ভগবান্ প্রথমে নিজেকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে বিকশিত করেন। এই স্ফোটের একটিমাত্র বাচক শব্দ আছে—'ওঁ'। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ-বলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক্ করিতে পারি না, তখন এই ওঙ্কার ও নিত্য-স্ফোট অবিভাজ্যরূপে বর্তমান। এজন্য শ্রুতি বলেন, সমুদয় নামরূপের উৎস—ওঙ্কার-রূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে এই স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বলো—শব্দ ও ভাব নিত্যসম্বন্ধ বটে, কিন্তু একটি ভাবের বাচক বিবিধ শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ ভাবের বাচক যে এই একটি বিশেষ শব্দ ওঙ্কার, তাহা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি, ওঙ্কারই এইরূপ সর্বভাব-প্রকাশক বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ ইহার তুল্য নয়। স্ফোটই সমুদয় ভাবের উপাদান, ইহা কোন একটি বিশেষ ভাব নয়; অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবগুলির মধ্যে পরস্পর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেকটি বাচক শব্দ এক-একটি ভাব প্রকাশ করে, অতএব উহা স্ফোটের প্রতীক হইতে পারে না। কারণ স্ফোট সর্বভাবের সমষ্টি। আর কোন বাচক শব্দ দ্বারা অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর সমষ্টি-ভাব থাকে না, উহা একটি বিশেষ ভাবে পরিণত হয়। অতএব স্ফোটকে বুঝাইতে হইলে এমন একটি শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা স্ফোট খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি প্রায় যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ প্রতীক বা বাচক।

শ্রুতি বলেন, ওঙ্কার—কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ শব্দপ্রতীক। কারণ অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষর একত্রে 'অউম' এইরূপে উচ্চারিত হইলে উহাই সর্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে। সমুদয় শব্দের মধ্যে 'অ' সর্বাপেক্ষা কম বিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'অক্ষরের মধ্যে আমি অকার।'

৩৩

আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। 'অ' কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, 'ম' শেষ ওষ্ঠ্য বর্ণ। আর 'উ' জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়া যাইতেছে—এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক; অন্য কোন শব্দেরই সেই শক্তি নাই; সুতরাং এই শব্দটিই স্ফোটের যোগ্যতম বাচক, আর এই স্ফোটেই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। এবং বাচ্য হইতে বাচক পৃথক্ করা যাইতে পারে না, সুতরাং এই 'ওঁ' এবং 'স্ফোট' এক ও অভিন্ন। এই জন্য স্ফোটকে বলা হয় 'নাদব্রহ্ম', আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতর দিক্ বলিয়া ঈশ্বরের নিকটতর এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, তেমনি তাঁহার দেহরূপ এই জগৎকেও সাধনের মনোভাব-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

উপাসকের মনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে, তখন তাহার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে তদনুযায়ী ভাবই উদিত হয়। ইহার ফল এই—একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে। সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন সার্বভৌম বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তেমনি এই বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সবগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব প্রকাশ করে। ওঙ্কার যেমন অখণ্ডব্রহ্মের বাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেইরূপ সেই পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাচক। ঐ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানের ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়ক।

প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা

এইবার প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয় আলোচনা করিব। প্রতীক অর্থে যে- সকল বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? ভগবান্ রামানুজ বলিয়াছেনঃ 'ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে।'

৩৪

শঙ্করাচার্য বলিয়াছেনঃ 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে—ইহা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম—ইহা আধিদৈবিক। মন আধ্যাত্মিক প্রতীক, এবং আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ...যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়।'

৩৫

প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসন-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণ-তন্ত্রেও বহু প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এখন কথা এইঃ ঈশ্বরকে—কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না—উহা মুক্তিও দিতে পারে না। সুতরাং একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে জগৎকারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না; প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করেন, এরূপ স্থলে সেই উপাসক সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হন, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণমাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়া জগৎকারণরূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাই নয়, প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতাকে অথবা অন্য প্রাণীকে ঐ দেবতা বা প্রাণী-রূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটি আনুষ্ঠানিক কর্মমাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটি 'বিদ্যা' বলিয়া উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা বা অন্য কেহ ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাসনার সহিত তুল্য হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি—সর্বত্রই কোন দেবতা, মহাপুরুষ বা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন। ব্যাখ্যাস্বরূপে অদ্বৈতবাদী বলেন, 'নামরূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নয়?' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, 'সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নন?' শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তেমনি প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।'

৩৬

প্রতীক সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই-সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুসন্তের সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে না। কিন্তু উহা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে উহার উপাসনায় ভক্তি ও মুক্তি—উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় সাধকদের সহায়তার জন্য অবাধে পূর্বোক্তভাবে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এই সহায়তা অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধুসন্ত ও শহীদগণের কবর অনেকটা প্রতীক বা প্রতিমারূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেস্ট্যাণ্টরা ধর্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন, আর আজকাল খাঁটি প্রোটেস্ট্যাণ্টের সহিত অগস্ট কম্‌তের চেলা বা নীতিমাত্র-প্রচারক ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই। আবার খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মে প্রতিমাপূজার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুতে কেবল প্রতীক বা প্রতিমাই উপাসিত হয়, ব্রহ্মদৃষ্টিসৌকর্যার্থে নয়। সুতরাং উহা বড়জোর কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র। অতএব উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তিলাভ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রতিমাপূজাতে সাধক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্মসমর্পণ করে, সুতরাং মূর্তি বা কবর, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভের এইরূপ ব্যবহারই প্রকৃত পুতুলপূজা। কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম বা অন্যায় নয়, উহা একটি অনুষ্ঠান—একটি কর্মমাত্র; উপাসকেরা অবশ্যই উহার ফল পাইয়া থাকেন।

ইষ্টনিষ্ঠা

এইবার ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যে ভক্ত হইতে চায়, তাহার জানা উচিত, 'যত মত তত পথ'—তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র।

'হে ভগবান্‌, লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে—লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটি নামেই তোমার পূর্ণশক্তি বর্তমান। যে উপাসক যে নামে উপাসনা করিতে ভালবাসে, তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হও। তোমার প্রতি অন্তরাত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে ডাকিবার কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দৈব—তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।'

৩৭

শুধু তাই নয়, ভক্ত যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন; এমন কি তাঁহাদের সমালোচনা-বিষয়েও যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন; তাঁহাদের নিন্দা শোনাও তাঁহার উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা উদার, সহানুভূতিসম্পন্ন, অপরের গুণগ্রহণে সমর্থ, আবার গভীর ভগবৎ-প্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা যায়, উদারভাবাপন্ন সম্প্রদায়গুলি আধ্যাত্মিক গভীরতা হারাইয়া ফেলে। ধর্ম তাহাদের নিকট একপ্রকার রাজনীতিক-সামাজিক-ভাবাপন্ন সমিতির কার্যে পরিণত হয়। আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের নিজ আদর্শের প্রতি খুব ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু তাহাদের এই ভালবাসার প্রতিটি বিন্দু অপর সকল সম্প্রদায়ের—যেগুলির মতের সহিত তাহাদের এতটুকুও পার্থক্য আছে—সেগুলির উপর ঘৃণা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ যদি পরম উদার অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হইয়া যাইত, বড় ভাল হইত! কিন্তু এইরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি বিরল। তথাপি আমরা জানি, জগতের অনেককে এই আদর্শে শিক্ষিত করা সম্ভব; আর ইহার উপায় এই 'ইষ্টনিষ্ঠা'।

প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় মানুষকে শুধু নিজের আদর্শটি দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনন্ত দ্বার খুলিয়া দেন, এবং মানবের সমক্ষে প্রায় অসংখ্য আদর্শ স্থাপন করেন। সেই আদর্শগুলির প্রত্যেকটিই সেই অনন্তস্বরূপের এক-একটি বিকাশ মাত্র। অতীত ও বর্তমানের মহামহিমময় ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের অবতারগণ মনুষ্যজীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কঠিন পর্বত কাটিয়া যে-সকল বিভিন্ন পথ বাহির করিয়াছেন, পরমকরুণাপরবশ হইয়া বেদান্ত উহা মুমুক্ষু নরনারীগণকে দেখাইয়া দেন, আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে—এমন কি ভবিষ্যৎ মানবকেও সেই সত্য ও আনন্দের ধামে আহ্বান করেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দের অবস্থায় উন্নীত হয়।

ভক্তিযোগ এইরূপে ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির একটিকেও ঘৃণা বা অস্বীকার করিতে নিষেধ করেন। তথাপি গাছ যতদিন ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপরিণত অবস্থায় নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। অনেক লোক উদার ধর্মভাবের নামে অনবরত ভাবাদর্শ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের বৃথা কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে। নূতন নূতন বিষয় শোনা তাহাদের যেন একরূপ ব্যারাম—একরূপ নেশার ঝোঁকের মত। তাহারা খানিকটা সাময়িক স্নায়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটি চলিয়া গেলেই তাহারা আর একটির জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়, আর ঐ পর্যন্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেনঃ আর এক প্রকার মানুষ আছে, তাহারা মুক্তা-ঝিনুকের মত। মুক্তা-ঝিনুক সমুদ্রতল ছাড়িয়া স্বাতীনক্ষত্রে পতিত বৃষ্টি-জলের জন্য উপরে আসে। যতদিন না ঐ জলের একটি বিন্দু পায়, ততদিন সে মুখ খুলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, তারপর গভীর সমুদ্রতলে ডুব দেয় এবং যে পর্যন্ত না বৃষ্টিবিন্দুটি মুক্তায় পরিণত হয়, সে পর্যন্ত সেইখানেই বিশ্রাম করে।

এই উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা-ভাবটি যেরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিত্বের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। ভক্তিপথে প্রবর্তকের এই একনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। হনুমানের ন্যায় তাঁহার বলা উচিত, 'যদিও লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মস্বরূপে অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।'

৩৮

অথবা সাধু তুলসীদাস যেমন বলিতেন, 'সকলের সঙ্গে বসো, সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর; যে যাহাই বলুক না কেন সকলকেই হাঁ হাঁ বলো, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় রাখিও'

৩৯

, ভক্তিযোগীরও সেই প্রকার আচার অবলম্বন করা উচিত। ভক্তসাধক যদি অকপট হন, তবে গুরুদত্ত ঐ বীজমন্ত্র হইতেই আধ্যাত্মিক ভাবের সুবৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্মজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিবে। পরিশেষে প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন—যিনি সারা জীবন তাঁহার নিজের ইষ্টদেবতা, তিনিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত।

ভক্তির প্রস্তুতি—ত্যাগ

গৌণী ভক্তির কথা সংক্ষেপে শেষ করিয়া আমরা পরাভক্তির আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি। এখন এই পরাভক্তি-অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হইবার শেষ সাধনটির কথা বিবেচনা করা যাক। সর্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি—নাম-সাধন, প্রতীক ও প্রতিমাদির উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য। কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ—উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়; সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্যস্বরূপ মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, তখন সে জড়পদার্থ হইতে নিজের দৃষ্টি সরাইয়া লয়—তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়। কর্মযোগী সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনি যে-সকল কর্ম করেন, তাহার ফলে তিনি আসক্ত হন না, তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগীর মতে সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য—পুরুষ বা আত্মাকে বিচিত্র সুখদুঃখ ভোগ করানো। ইহার ফলে আত্মা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য স্বতন্ত্র বা পৃথক্। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে—তিনি চিরকাল চৈতন্যস্বরূপই ছিলেন, আর জড়ের সহিত তাঁহার সংযোগ কেবল সাময়িক, ক্ষণিকমাত্র। রাজযোগী প্রকৃতির সমুদয় সুখদুঃখ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই এই বাস্তবরূপে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলিয়া জানিতে হয়। তাঁহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তির প্রকাশ দেখিতেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নয়। তাঁহাকে প্রথম হইতেই জানিতে হয়, সর্বপ্রকার জ্ঞান—সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা আত্মাতেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, প্রকৃতিতে নাই। সুতরাং কেবল বিচারজনিত ধারণার বলে তাঁহাকে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়, তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ—চারিদিকের দৃশ্যের মতই অতি স্বাভাবিক; এই ত্যাগেরই প্রকাশ আমরা আমাদের চতুর্দিকে প্রতিদিন দেখিতে পাই—যদিও অল্প-বিস্তর বিকৃতরূপে। কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসিতে শুরু করিল; কিছুদিন বাদে সে আর একজনকে ভালবাসিল, প্রথমটিকে ছাড়িয়া দিল। ঐ প্রথম নারীটির চিন্তা ধীরে ধীরে শান্তভাবে তাহার মন হইতে চলিয়া গেল; সে আর ঐ নারীর অভাব বোধ করিল না। এবার মনে করো কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটির কথা যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়তো নিজের শহরকে ভালবাসে। ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার নিজের ক্ষুদ্র শহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতই চলিয়া গেল। আবার মনে কর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল, তখন তাহার স্বদেশানুরাগ, নিজ দেশের জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু কষ্ট হয় না। এই ভাব তাড়াইবার জন্য তাহাকে কিছু জোর করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অধিকতর সুখ পাইতে থাকে। তখন সে বিষয়ভোগে আর তত সুখ পায় না। কুকুর ও ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানা বিষয় জানিয়া ও নানা কার্য সম্পাদন করিয়া সে সুখ অনুভব করে, কুকুর কখনও তাহা অনুভব করিতে পারে না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু যখনই কোন প্রাণী জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তখনই এই নিম্নজাতীয় সুখের মূল্য তাহার কাছে কমিয়া যায়। মনুষ্যসমাজে দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ততই তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে; আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় ও এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপে মানুষ যখন বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যানুভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনাজনিত সুখ শূন্য বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যখন চন্দ্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার সূর্য উদিত হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে হয় না। যেমন কোন ক্রমবর্ধমান আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে হইতে শেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-জনিত সুখসমূহ স্বভাবতই নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে ‘পরাভক্তি’ বলে। যে সাধক ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না; প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি—এই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুই আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে না। জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়, আর তক্তাগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎকৃপা এইরূপে আত্মার বন্ধন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া দেয়, তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ এই বৈরাগ্য-সাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, কোনরূপ সংগ্রাম নাই। ভক্তকে তাঁহার হৃদয়ের কোন ভাবই দমন করিতে হয় না, চাপিয়া রাখিতে হয় না, তাঁহাকে বরং সেই-সকল ভাব প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে চালিত করিতে হয়।

ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত

প্রকৃতিতে আমরা সর্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ—সবই প্রেমপ্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাত্র। যে চিত্তবৃত্তি হইতে পতিপত্নীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম উদ্ভূত, অতি নীচ কামবৃত্তিও সেই খনি হইতে সঞ্জাত। ভাব সেই একই, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রকাশ বিভিন্ন। এই একই প্রেম কাহাকেও ভাল কাজে প্রেরণা দেয় এবং সে দরিদ্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে আবার কেহ বা ইহারই প্রভাবে নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথম ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রেম ভ্রান্ত পথে চালিত; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে উহা ঠিক পথে প্রযুক্ত। যে-অগ্নিতে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আবার একটি শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই, ব্যবহারে ও ফলে তারতম্য হয়। অতএব যে-প্রেমকে দুই ব্যক্তির প্রবল আসঙ্গস্পৃহা বলা যায়, তাহাই আবার অবশেষে উচ্চনীচ সর্বপ্রাণীর সেই এক স্বরূপে বিলীন হইবার ইচ্ছারূপে সর্বত্র প্রকাশিত।

ভক্তিযোগ প্রেমের এই উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে একটি নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ফল—আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। ভক্তিযোগ বলে না—ত্যাগ কর বা ছাড়িয়া দাও; শুধু বলে—ভালবাসো, সেই উচ্চতম আদর্শকে ভালবাসো। যাহার প্রেমের আস্পদ ঐরূপ, সর্বপ্রকার নীচভাব স্বভাবতই তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে।

'তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলিতে পারি না, শুধু বলিতে পারিঃ তুমি আমার প্রেমাস্পদ। তুমি সুন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্যস্বরূপ!'—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে—সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হইবে। প্রাণের সহিত ভালবাস। মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'তাঁহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ।'

১

ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মানুষকেই তোমার সাধারণ বা তদপেক্ষা উচ্চতর কার্যপ্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে করিও না। সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশূন্য হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেমের ভাব কিরূপে কার্য করিতেছে। কখনও কখনও হয়তো একটা ধাক্কা আসিল; উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। হয়তো কোথাও একটু দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ ঘটিল, হয়তো কাহারও পদস্খলন হইল—এ-সবই সেই প্রকৃত উচ্চতর প্রেমে আরোহণ করিবার সোপানমাত্র। সাক্ষিস্বরূপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখ, কিভাবে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মানুষকে প্রকৃত প্রেমের পথে আগাইয়া দেয়। যখন কেহ এই সংসার-প্রবাহের মধ্যে থাকে, তখন সে ঐ সংঘর্ষগুলি অনুভব করে। কিন্তু যখনই উহার বাহিরে আসিয়া কেবল সাক্ষিরূপে পর্যবেক্ষণ করিবে, তখন দেখিবে—অনন্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া ভগবান্ নিজেকে প্রেমরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।

'যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।'

২

অতি নিম্নভাবের আসক্তিতেও ভগবৎপ্রেমের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটি নাম 'হরি'। ইহার অর্থ এই—তিনি সকলকেই নিজের কাছে আ-হরণ করিতেছেন বা আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাহার দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়—সে কি কখনও চৈতন্যবান্ আত্মাকে টানিতে পারে? কখনই পারে না, কখনও পারিবেও না। একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল। গোটাকতক জড় পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল? কখনই নয়। ঐ জড়-পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা বিদ্যমান। অজ্ঞ লোকে উহা জানে না, তথাপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহা দ্বারাই—কেবল উহা দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, অতি নিম্নতম আসক্তিও ঈশ্বর হইতে শক্তি সংগ্রহ করে।—'হে প্রিয়তমে, পতির জন্য কেহ পতিকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী পতিকে ভালবাসে।' প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা জানিতে পারে, না জানিতেও পারে, তথাপি তত্ত্বটি সত্য। 'হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়।'

৩

এইরূপ কেহই নিজের সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদেরই জন্য ভালবাসে না, আত্মার জন্যই ভালবাসিয়া থাকে। ভগবান্ যেন একটি বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তর, আমরা যেন লৌহচূর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদাসর্বদা তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষ্টা—এই-সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে না, তাহারা কি করিতেছে। বাস্তবিক তাহারা জীবনের সকল চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমাগত সেই

পরমাত্মা-রূপ বৃহৎ চুম্বকের নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের লক্ষ্য—তাঁহার নিকট যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া।

ভক্তিযোগীই এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ জানেন ও উহার উদ্দেশ্য বুঝেন, তিনি এই সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তিনি জানেন, উহার লক্ষ্য কি, এই জন্য তিনি সর্বান্তঃকরণে এগুলি হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন। এ-সকল এড়াইয়া তিনি সকল আকর্ষণের মূলকারণ হরির নিকট একেবারে যাইতে চান। ইহাই ভক্তের ত্যাগ—ভগবানের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ তাঁহার আর সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়। এই অনন্ত প্রেম তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, অন্যান্য আসক্তির সেখানে স্থান হয় না। ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর-রূপ প্রেমসমুদ্রের জলে ভক্তি তখন ভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সেখানে ছোটখাটো ভালবাসার স্থান আর নেই। ইহাই ভক্তের ত্যাগ বা বৈরাগ্য। তাৎপর্য এইঃ ভগবান্ ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে ভক্তের যে বৈরাগ্য, তাহা ভগবানের প্রতি পরম অনুরাগ হইতে উৎপন্ন।

পরাভক্তি-লাভের জন্য এইভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক। এই বৈরাগ্য-লাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই বলিবার অধিকার আছে, ধর্মানুভূতির জন্য তাঁহার পক্ষে প্রতিমাপূজা বা অনুষ্ঠানাদি নিষ্প্রয়োজন। তিনিই কেবল সেই পরম প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যেখানে সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব অনুভব করা সম্ভব; অপরে কেবল ইহা লইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে। তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান না; মহান্ প্রেমসমুদ্র তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন তিনি আমাদের মত মানুষ পশু তরু লতা সূর্য চন্দ্র তারা দেখেন না, তিনি সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান। যাহার মুখের দিকে তিনি তাকান, তাহারই ভিতর তিনি হরির প্রকাশ দেখিতে পান। সূর্য বা চন্দ্রের আলোক তাঁহারই প্রকাশমাত্র। যেখানেই তিনি কোন সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব দেখিতে পান, সেখানেই তিনি অনুভব করেন—সবই সেই ভগবানের। এরূপ ভক্ত জগতে এখনও আছেন, জগৎ কখনই এরূপ ভক্ত-বিরহিত হয় না। এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে—আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আছে। তাঁহার হৃদয়ে কখনও ক্রোধ বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত। যখন প্রেমবলে অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্বদা দেখিতে পান, তখন কি করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন?

ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য

অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘যাঁহারা সর্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত নির্গুণের উপাসক, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?’ শ্রীভগবান্ বলেন, ‘যাঁহারা আমাতে মন সংলগ্ন করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্গুণ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল নিত্যস্বরূপকে উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতহিতে রত ব্যক্তিগণও আমাকে লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে; কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কার্য আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ তাঁহাদের মন সর্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত।’

৪

এখানে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এমন কি, উদ্ধৃতাংশে উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। জ্ঞানযোগ অবশ্য অতি মহান্; উহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা পরব্রহ্মকে অনুভব করিবার পথ। আর আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেকেই ভাবে—তত্ত্ববিচারের দ্বারা সে সব কিছু করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ অনুসারে জীবন-যাপন বড় কঠিন ব্যাপার, উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে।

জগতে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আসুর-প্রকৃতি—তাহারা এই শরীরটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। আর যাঁহারা দেবপ্রকৃতি, তাঁহারা এই শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন, উহা যেন আত্মার উন্নতিসাধনের যন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, শয়তান নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উদ্ধৃত করিতে পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সাধুব্যক্তির উচ্চতম আদর্শলাভের প্রবল উৎসাহদাতা, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তিরও কার্যের সমর্থক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা বিপদাশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মত অত উচ্চ স্তরে উঠেন না, সুতরাং তাঁহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সাধক যে পথেই অবলম্বন করুন না কেন, যতদিন না সমুদয় বন্ধন মোচন হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন না। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ভক্ত এই সহজ পথ বাছিয়া লইয়া কিভাবে মুক্তিলাভ করিবেন?

এই কয়েকটি শ্লোকে দেখা যায়, প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা কিরূপে জনৈকা ভাগ্যবতী গোপীর জীবাত্মার পাপপুণ্যরূপ বন্ধন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ‘ভগবানের চিন্তাজনিত পরমাহ্লাদে তাঁহার সমুদয় পুণ্যকর্মজনিত বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, আর ভগবানকে কাছে না পাওয়ার মহাদুঃখে তাঁহার সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন কোন বন্ধন না থাকায় সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ করিলেন।’

৫

এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিযোগের গুহ্য রহস্য এই যে, মনুষ্যহৃদয়ের যত প্রকার বাসনা বা ভাব আছে, উহার কোনটিই স্বরূপতঃ মন্দ নয়; উহাদিগকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখী
চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্বোচ্চ গতি ভগবান্, এবং অন্যান্য সকল গতিই নিম্নাভিমুখী। ফল অনুসারে আমাদের সমুদয় মনোভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—সুখ ও দুঃখ; শেষোক্ত মনোভাবকে কি করি
সাধক দিশেহারা হন। কিন্তু ভক্তিযোগ শিক্ষা দেয়—ইহা সত্য-সত্যই সম্ভব। দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিষয় বা ধন লাভ করিতে না পারিয়া যখন কেহ দুঃখ পায়, তখন দুঃখবৃত্তিকে ভুল পথে চালিত করা হইতে
করতে পারিলাম না? কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না?’—এই বলিয়া যদি কেহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তবে সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটি মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন বুঝিতে হই
পথে চালাইতেছ। উহাকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভক্ত বলেন, উহাদের কোনটিই মন্দ ন
করিয়া নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করেন।

ভক্তির প্রকাশভেদ

ভগবানে ভক্তি যতভাবে প্রকাশিত হয়, এখানে তাহার কয়েকটি আলোচিত হইতেছে।

৬

প্রথম—'শ্রদ্ধা'। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? এই-সকল স্থানে ঈশ্বরের পূজা হয় বলিয়া, এই-সকল স্থানে গেলে ঈশ্বরের ভাবের উদ্দীপনা হয় বলিয়া, এই-সকল স্থানের সহিত ঈশ্বরের সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্মাচার্যগণের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? তাঁহারা সকলেই সেই এক ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন; তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। যাহাকে আমরা ভালবাসি না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না।

তারপর 'প্রীতি'—ভগবচ্চিন্তায় সুখ বা আনন্দ অনুভব। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মানুষ কি তীব্র আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে মানুষ সর্বত্র ছুটিয়া যায়, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই ঠিক এই প্রকার ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে।

তারপর মধুরতম যন্ত্রণা 'বিরহ'—প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। 'ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, জীবনে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু পাইলাম না' বলিয়া মানুষ যখন অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং সেজন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তের বিরহ-অবস্থা। মনের এই অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমেও মাঝে মাঝে উন্মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ দেখা যায়। নর-নারীর পরস্পর-মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হইলে তাহারা যাহাদিগকে ভালবাসে না, তাহাদের সান্নিধ্যে স্বভাবতই একটু বিরক্তি বোধ করে। এইরূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন যে বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি সাধক ভালবাসেন না, সেগুলি সহ্য করিতে পারেন না। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা বলাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। 'তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।'

৭

যাঁহারা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাহাদিগকেই বন্ধু বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা বলেন, তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে হয়।

আরও এক উচ্চ অবস্থা আসে, যখন এই জীবনধারণও শুধু প্রেমাস্পদের জন্য। উহা ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবনধারণ করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম 'তদর্থপ্রাণস্থান'। আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখবোধ হয়। সংক্ষেপে—প্রিয়তমের চিন্তা আছে বলিয়াই জীবন তখন মধুর বলিয়া মনে হয়।

তদীয়তা—তাঁহার হইয়া যাওয়া; ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই 'তদীয়তা' আসে। যখন তিনি ভগবানের পাদ স্পর্শ করিয়া ধন্য হন, তখন তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়, বিশুদ্ধ হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি অনেক ভক্ত কেবল ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই জীবনধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সুখ—এটি তাঁহারা ছাড়িতে চান না।'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা আত্মায় পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও ভগবানকে নিষ্কামভাবে ভক্তি করিয়া থাকেন।'

৮

'এই ভগবানকে দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করিয়া থাকেন।'

৯

যখন মানুষ নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে তখনই এই 'তদীয়তা'-অবস্থা লাভ হয়। সাধারণ ভালবাসাতেও যেমন প্রেমাস্পদের সকল জিনিষই প্রেমিকের চক্ষে অমূল্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের। প্রিয়তমের এক টুকরা বস্ত্রও সে ভালবাসে; এরূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ সমুদয় জগৎই যে তাঁহার।

বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ

প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখিলে কিরূপে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায়? ঈশ্বরই সমষ্টি। সমগ্র জগৎকে যদি এক অখণ্ডস্বরূপে চিন্তা করা যায়, তাহাই ঈশ্বর; আর দৃশ্যমান জগৎ যখন পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায়, তখনই উহা ব্যষ্টি। সমষ্টিকে, সেই সর্ব-ব্যাপীকে—যে এক অখণ্ড বস্তুর ভাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড ভাবসমূহ (unities) অবস্থিত, তাঁহাকে ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ 'বিশেষ' (particular) লইয়াই ক্ষান্ত নন, তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারপরই ব্যষ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই 'সামান্য' (universal) ভাবের অন্বেষণেই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। জ্ঞানীর লক্ষ্য—যাঁহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সামান্যভাবস্বরূপ পুরুষকে জানা। ভক্ত চান—যাঁহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেই সর্বগত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে; যোগীর আকাঙ্ক্ষা—সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করা, যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ত্ব, কি দর্শন—সর্ব বিভাগেই উহা চিরকাল এই বহুর মধ্যে এক সর্বগত তত্ত্বের অপূর্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত।

ভক্ত ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাকো, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পার, কিন্তু সমগ্র জগৎকে মোটেই ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিস্বরূপ, মুক্ত মুমুক্ষু বদ্ধ—জগতের সকল জীবাত্মার সকল আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই সাধকের পক্ষে সর্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভক্ত বলেনঃ ভগবান্ সমষ্টি এবং সেই দৃশ্যমান জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব—ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র। সমষ্টিকে ভালবাসিলে সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল। তখনই জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন—সবই সহজ হইবে। প্রথমে ভগবৎপ্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা জগতের হিতসাধন করা সম্ভব হইবে না। ভক্ত বলেনঃ সবই তাঁহার, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। এইরূপ ভক্তের নিকট ক্রমশঃ সবই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁহার। সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারই প্রকাশ। তখন কিভাবে অপরকে আঘাত করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন সাধক এই পরাভক্তিলাভে সমর্থ হন, তখন ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হয়। মানুষকে তখন আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়াই বোধ হয়; অপরাপর জীবজন্তুও আর জীবজন্তু বলিয়া বোধ হয় না, ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই এক প্রকাশ বলিয়া বোধ হইবে। 'এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে অবিচলিতভাবে ভালবাসেন।'

১০

এইরূপ প্রগাঢ় সর্বব্যাপক প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও 'অপ্রতিকূল্য'; এ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহার কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নয়। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ—দুঃখ আসিলে বলতে পারেন, 'স্বাগত দুঃখ'; কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, 'এস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ।' সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে সহাস্যে অভিনন্দন করিতে পারেন। 'ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে, সকলেই স্বাগত।' ভগবান্ ও যাহা কিছু তাঁহার—সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ ও দুঃখের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন দুঃখকষ্টের জন্য আর অভিযোগ করেন না। আর প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবশ্যই মহাবীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।'

অধিকাংশ মানুষের কাছে দেহই সর্বস্ব। দেহই তাহাদের নিকট সমগ্র বিশ্ব, দেহের সুখই তাহাদের চরম লক্ষ্য। এই দেহ ও দৈহিক ভোগ্যবস্তুকে উপাসনা করা-রূপ আসুরিক ভাব আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলিতে পারি, যুক্তির স্তরে খুব উচ্চে উড়িতে পারি, তথাপি আমরা শকুনির মত; যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন, আমাদের মন ভাগাড়ে গলিত শবের মাংসখণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীরকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে কেন? ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমরা এই শরীর তাহাকে দিতে পারি না কেন? উহাতে তো ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে; এই কার্যের সহিত আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কি খুব বেশী প্রভেদ? অহংকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পার না কি? প্রেমধর্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প লোকই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই কমবেশী কিছু কালের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি এবং অল্পাধিক স্বাস্থ্যসম্ভোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি হইল? আমরা শরীরের যতই যত্ন লই না কেন, শরীর তো একদিন যাইবেই। ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'সাধু ব্যক্তি কেবল অপরের সেবার জন্য ধন, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত হইয়া

থাকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য—এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাজে না গিয়া ভাল কাজে যায়, তবে তাহা খুব ভাল বলিতে হইবে।’

১১

আমরা কোন রূপে পঞ্চাশ—জোর এক-শ বছর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তার পর?—মৃত্যু। যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন সময় আসিবে, যখন উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে। ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, জগতের বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্যরা সকলেই এই পথে গিয়াছেন।

ভক্ত বলেন—এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, সেটুকুরই সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আর বাস্তবিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার—জীবনকে সর্বভূতের সেবায় নিযুক্ত করা। ভয়ানক দেহবুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। আমাদের মহাভ্রমঃ এই শরীরটি আমি; যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা করিতে হইবে ও উহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইবে। এই ভাবই আমাদের পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দেয় না। যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে; তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এই জন্য ভক্ত বলেন, ‘আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে,’ এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক’—এই বাক্যের অর্থই ঐ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা—ভগবানের ইচ্ছাতেই আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে, ইহা নির্ভরতা নয়। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্যাদি হইতেও ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু তাহা ভগবান্ দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখনও কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না। ‘প্রভু লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে; আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।’—ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত ‘এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত’ ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ হইতে এই ‘অপ্রাতিকূল্য’-অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোনরূপ স্বার্থ থাকে না; আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তাঁহার স্বার্থহানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে? এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহা নিঃশেষে তাহার সর্ব বন্ধন মোচন করে।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক

উপনিষদ্ পরা ও অপরা নামক দুইটি বিদ্যা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিদ্যা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে, ‘ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার যোগ্য দুই প্রকার বিদ্যা—পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণ যতি ইত্যাদির বিদ্যা, কল্প অর্থাৎ যজ্ঞপদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দসমুহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়, এবং ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। আর পরাবিদ্যা তাহাই, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায়।’

১২

সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই পরাবিদ্যাই ব্রহ্মজ্ঞান। দেবীভাগবতে১৩ পরাভক্তির এই লক্ষণগুলি পাইঃ তৈল যেমন এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় অবিছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তেমনি মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এরূপ অবিরত ও নিত্য স্থিরতাই মানব-হৃদয়ে সর্বোচ্চ ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ। আর সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভক্তির—‘রাগানুগা’ ভক্তির সোপানমাত্র। যখন সাধকের হৃদয়ে পরানুরাগের উদয় হয়, তখন তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর কিছুই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। তিনি নিজ মনে তখন ভগবানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবেন না। তাঁহার আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া মনোজগতের ও জড়জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। এরূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিজ হৃদয়ে উপাসনা করিতে সক্ষম| তাঁহার নিকটে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রতীক ও প্রতিমা, শাস্ত্রাদি ও মতামত সবই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—উহাদের দ্বারা তাঁহার আর কোন উপকার হয় না। ভগবানকে এরূপভাবে ভালবাসা বড় সহজ নয়।

সাধারণ মানবীয় ভালবাসা—যেখানে প্রতিদান পায়, সেখানেই বৃদ্ধি পায়; যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীনতা আসিয়া ভালবাসার স্থান অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা অগ্নির প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত ইহার তুলনা করিতে পারি। পতঙ্গ আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পতঙ্গের স্বভাবই এইভাবে অগ্নিকে ভালবাসা। জগতে যত প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, তাহাই সর্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরাভক্তিতে লইয়া যায়।

প্রেম ত্রিকোণাত্মক

প্রেমকে আমরা একটি ত্রিকোণ-রূপে প্রকাশ করিতে পারি, উহার কোণগুলিই যেন উহার তিনটি অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। তিনটি কোণ ব্যতীত একটি ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ সম্ভব নয়, আর এই তিনটি লক্ষণ ব্যতীত প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। প্রেম-রূপ এই ত্রিকোণের একটি কোণঃ প্রেমে কোন দর-কষাকষি বা কেনা-বেচার ভাব নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়; সে- ক্ষেত্রে উহা কেবল দোকানদারিতে পরিণত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পালনের জন্য তাঁহার নিকট কোন-না-কোন অনুগ্রহ-প্রাপ্তির ভাব থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম থাকিতে পারে না। ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় যাহারা উপাসনা করে, তাহারা ঐ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন—তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের এই দিব্য ভাবাবেগের আর কোন হেতু নাই।

কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ‘আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।’ সাধু কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ও বলিলেন, ‘বনের ফল আমার প্রচুর আহার, পর্বত-নিঃসৃত পবিত্র সরিৎ আমার পর্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষত্বক্ আমার পর্যাপ্ত পরিধেয় এবং গিরিগুহা আমার যথেষ্ট বাসস্থান। কেন আমি তোমার বা অপরের নিকট কিছু লইব?’ রাজা বলিলেন, ‘আমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমার সহিত রাজধানীতে রাজপ্রসাদে চলুন এবং আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন।’ অনেক অনুনয়ের পর তিনি অবশেষে রাজার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রাসাদে গেলেন। দান করিবার পূর্বে রাজা পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেনঃ হে ভগবান্ আমাকে আরও সন্তান-সন্ততি দাও, আরও ধন দাও, আরও রাজ্য দাও, আমার শরীর নীরোগ কর, ইত্যাদি। রাজার প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্বেই সাধু নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে করিতে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘প্রভু, আমার দান গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন?’ সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ‘ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে তো একজন ভিক্ষুক; তুমি আবার কিভাবে আমাকে কিছু দিতে পার? আমি এত মূর্খ নই যে, ভিক্ষুকের নিকট দান গ্রহণ করিব। যাও আমার অনুসরণ করিও না।’

এই গল্পটিতে ধর্মরাজ্যে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্রকৃত ভক্তদের ভিতর বেশ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে। কোন বরলাভের জন্য, এমন কি মুক্তিলাভের জন্যও ভগবানের উপাসনা করা অধম উপাসনা। প্রেম কোন পুরস্কার চায় না, প্রেম সর্বদা প্রেমেরই জন্য। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, কারণ তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। দৃষ্টান্তঃ তুমি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া উহা ভালবাসিয়া ফেলিলে; তুমি ঐ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা কর না, আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না; তথাপি উহা দর্শন করিয়া তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়—উহা তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহা তোমাকে শান্ত করিয়া দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ মর্ত্য স্বভাবের ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এবং এক স্বর্গীয় আনন্দে মনকে শান্ত করিয়া দেয়। ইহাতে প্রকৃত প্রেমের ভাব, এবং এই বৈশিষ্ট্যই উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের একটি কোণ। অতএব প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না, সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ কর। ভগবানকে তোমার প্রেম নিবেদন কর, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কিছু চাহিও না।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণঃ প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা ভয়ে ভগবানকে ভালবাসে, তাহারা মনুষ্যাধম; তাহাদের মনুষ্যভাবই পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে ভগবান্ এক বিরাট পুরুষ, তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক; তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভগবানকে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা করা অতি নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনা বলিতে হয়, তবে উহা অতি অপরিণত ভাবেরই উপাসনা। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন সেখানে ভালবাসাও থাকিবে কি করিয়া? প্রেম স্বভাবতই সমুদয় ভয়কে জয় করিয়া ফেলে। কল্পনা কর, এক তরুণী জননী পথে চলিয়াছেন; একটি কুকুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটতম কোন গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু তাঁহার সঙ্গে থাকে এবং যদি একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই জননী কোথায় থাকিবেন?—সিংহের মুখে। শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য অবশ্যই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ভালবাসা সর্ববিধ ভয়কে জয় করে। আমি জগৎ হইতে পৃথক্—এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাব হইতেই ভয় জন্মে। মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আমি নিজেকে যত স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ মনে করে, সে কোন কাজের নয়, নিশ্চয়ই সে ভয়ে অভিভূত হইবে। আর নিজেকে যতই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলিয়া না ভাবিবে, ততই তোমার ভয় কমিয়া যাইবে। যতদিন তোমার একবিন্দু ভয় আছে, ততদিন তোমার মধ্যে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটি একত্র থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাকে ভয় করিবেন না। ‘ভগবানের নাম বৃথা লইও না’—এই আদেশ শুনিয়া প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক হাসিয়া উঠেন। প্রেমের ধর্মে ভগবন্নিন্দা কোথায়? যেরূপেই হউক, প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। প্রকৃত ভক্ত তাঁহাকে ভালবাসে, তাই তো তাঁহার নাম করে।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণঃ প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান নাই। প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ প্রেমেই প্রেমিকের সর্বোচ্চ আদর্শ রূপায়িত। যতদিন না ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। হইতে পারে, অনেক স্থলে মানুষের ভালবাসা ভুল পথে চালিত হয়, অপাত্রে অর্পিত হয়, কিন্তু প্রেমিকের পক্ষে তাঁহার প্রেমাস্পদ সর্বদা তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ। একজন হয়তো জঘন্যতম ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, আর একজন—মহত্তম এক

ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, তা সত্ত্বেও উভয়ত্র নিজ আদর্শকেই ভালবাসা হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ‘ঈশ্বর’ বলা হয়। অজ্ঞ বা জ্ঞানী, সাধু বা পাপী, নর বা নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত—সকলেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর। সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহ সমন্বিত করিলেই প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ভগবানের পূর্ণতম ভাব পাওয়া যায়।

এই আদর্শগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে স্বভাবতই বর্তমান। উহারা যেন আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি সবই আদর্শকে ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে সমাজে যে নানাবিধ কর্মের প্রকাশ ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র। ভিতরে যাহা আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মানবহৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবেই একমাত্র প্রেরণাশক্তি, যাহা মানবজাতির মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। হইতে পারে, শত শত জন্মের পর, সহস্র সহস্র বৎসর চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে—আমাদের অন্তরের আদর্শ আনুযায়ী বাহিরকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বা বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত ভিতরের আদর্শকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা বৃথা। এইটি বুঝিতে পারিলে সাধক বহির্জগতে নিজের আদর্শ প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেই উচ্চতম প্রেমের ভূমি হইতে আদর্শকেই আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিম্নস্তরের আদর্শগুলি এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত।

সকলেই এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, কুরূপার মধ্যেও প্রেমিক হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। বাহিরের লোক বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু প্রেমিক কুরূপা দেখেন না, তিনি তাঁহার হেলেনকেই দেখিয়া থাকেন। সুন্দর বা কুৎসিত যাহাই হউক, প্রেমের আধার প্রকৃতপক্ষে যেন একটি কেন্দ্র, তাহার চারিদিকে আমাদের আদর্শগুলি রূপায়িত হয়। সাধারণতঃ মানুষ কিসের উপাসনা করে?—অবশ্য শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রেমিকের সর্বাবগ্রাহী পূর্ণ ভাবাদর্শ নয়। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ অন্তরের আদর্শকেই উপাসনা করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শকে বাহিরে আনিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। তাই তো আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিজেরা নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু, তাহারা এক রক্তপিপাসু ঈশ্বর কল্পনা করে, কারণ তাহারা কেবল নিজ নিজ ভাবের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবাসিতে পারে। এই জন্যই সদ্‌ভাবাপন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, তাঁহার আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই

যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা, লাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্ত-ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার আদর্শ কি? মহামহিমময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন, 'আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়াছি, আমার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই, তথাপি তোমার নিকট হইতে আমি আর কিছুই চাই না। বাস্তবিক এমন কিছুই নাই, যাহা আমি 'আমার' বলিতে পারি।' সাধক যখন এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করেন, তখন তাহার আদর্শ প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। এই প্রকার সাধকের সর্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার 'বিশেষত্ব'রূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্বভৌম প্রেম, অনন্ত ও অসীম প্রেম, উহাই প্রেমস্বরূপ। প্রেমের এই মহান্ আদর্শকে তখন সেই সাধক কোনরূপ প্রতীক বা প্রতিমার সহায়তা না লইয়াই উপাসনা করেন। এই সর্বাবগাহী প্রেমকে 'ইষ্ট' বলিয়া উপাসনা করাই পরাভক্তি। অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল উহা লাভের সোপানমাত্র।

এই প্রেমধর্ম অনুসরণ করিতে করিতে আমরা যে সফলতা বা বিফলতার সম্মুখীন হই, সে-সব এই আদর্শলাভের পথেই ঘটে। অন্তরে একটির পর একটি বস্তু গৃহীত হয় এবং আমাদের আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্যবস্তুই ক্রমবিস্তারশীল সেই অভ্যন্তরীণ আদর্শকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, এবং ভক্ত স্বভাবতই একটির পর একটি আদর্শ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে সাধক বুঝিতে থাকেন, বাহ্যবস্তুতে আদর্শ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা, আদর্শের সহিত তুলনায় সকল বাহ্যবস্তুই অতি তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি সেই সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ প্রেম লাভ করেন। উহা তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ও সত্যস্বরূপে অনুভূত হয়। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন 'ভগবানকে প্রমাণ করা যায় কিনা? ভগবান্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কিনা?'—এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর ইচ্ছাই হয় না। তাঁহার নিকট ভগবান্ প্রেমময়, প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই ভাবই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। প্রেমরূপ বলিয়া ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, অন্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।শাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্যান্য ধর্মের অনেক যুক্তি আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভক্ত এরূপ ঈশ্বরের চিন্তা করেন না বা করিতে পারেন না। এখন তাঁহার নিকট ভগবান্ কেবল প্রেমস্বরূপে বর্তমান। সকলের অন্তর্যামিরূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া ভক্ত আনন্দে বলিয়া উঠেন, 'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসে। কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে।'

কেহ কেহ বলেন, স্বার্থপরতাই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মের মূল। উহাও প্রেম, তবে (কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হইয়া) 'বিশেষ'-ভাবাপন্ন হওয়ায় উহা নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে মাত্র। যখন আমি নিজেকে জগতের সকল বস্তুতে অবস্থিত ভাবি, তখন আমার প্রেম বিশ্বব্যাপী হয় এবং আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র প্রাণী মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও 'বিশেষ' ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করায় আমাদের ভ্রম দৃঢ় হইয়া যায়। এই জগতের সকল বস্তুই ঈশ্বর-প্রসূত, সুতরাং ভালবাসার যোগ্য। কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সমষ্টিকে ভালবাসিলে অংশগুলিকেও ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই—প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত ভক্তগণের ভগবান্। ঈশ্বর-বিষয়ক অন্যান্য ভাব, যথা—স্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, স্রষ্টা, নানাবিধ মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি এরূপ ভক্তের নিকট নিরর্থক; তাঁহাদের নিকট এ-সবের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ পরাভক্তির প্রভাবে তাঁহারা একেবারে এই-সকলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন।

যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তখন 'ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ'—এই ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য সর্বপ্রকার ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সে সিদ্ধ ভক্ত তাঁহার ভগবানকে মন্দিরে বা গির্জায় দর্শন করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না—যেখানে ভগাবন্ নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পান, বাহিরেও দেখিতে পান, সাধুর সাধুতায় দেখিতে পান, পাপীর পাপেও দেখিতে পান, কারণ তিনি যে পূর্বেই তাঁহাকে নিত্যদীপ্তিমান্ ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান্ অনির্বাণ প্রেমজ্যোতিঃরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা

মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই সর্বোচ্চ আদর্শ প্রকাশ করা অসম্ভব। উচ্চতম মানব-কল্পনাও উহার অনন্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য অনুভব করিতে অক্ষম। তথাপি সর্বদেশের নিম্ন ও উচ্চ ভাবের প্রেমধর্মের সাধকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ বুঝিতে বা বুঝাইতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বিভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। মানব ঐশ্বরিক বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই চিন্তা করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণ কেবল আমাদের আপেক্ষিক ভাষাতেই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট যেন সীমার ভাষায় লেখা অসীমের কথা। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান্ ও তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক ভাষা ও শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরাভক্তির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই দিব্য প্রেম বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থাকে ‘শান্ত ভক্তি’ বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, বাহ্য অনুষ্ঠানমূলক প্রতীকোপাসনা অপেক্ষা একটু উন্নত সাধারণ শান্ত ভালবাসার উদয় হইয়াছে মাত্র, উহাতে তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততা মোটেই নাই, তখন ঐ ভাবকে ‘শান্ত ভক্তি’ বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতক লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন, আর কিছু লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান। ‘শান্ত-ভক্ত’ ধীর শান্ত নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চতর ভাব—‘দাস্য’; এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

তার পর ‘সখ্য-প্রেম’—এই সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে বলিয়া থাকেন, ‘তুমি আমার প্রাণের সখা।’

১৪

এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে, যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট নিজের হৃদয় খোলে, এবং জানে—বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার করিবে না, বরং সর্বদায় সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, সেইরূপ সখ্য-প্রেমের সাধক ও তাঁহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে একটা সমভাবের আদান প্রদান চলিতে থাকে। সুতরাং ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন—সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাবগুলি তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ-অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে তাঁহার সমান মনে করেন। ভগবান্ যেন আমাদের খেলার সাথী, আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি। ছেলেরা যেমন খেলা করে, যেমন মহামহিমান্বিত রাজামহারাজাগণও যেমন নিজ নিজ খেলা খেলিয়া যান, সেইরূপ প্রেমময় ভগবান্ও নিজ জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? আমরা কার্য করি, তাহার উদ্দেশ্য কোন অভাবপূরণ, আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায়। ভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য-বিষয়ে আমরা যে-সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সেগুলি গল্প-হিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ঐগুলির অন্য কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক সবই তাঁহার লীলা বা খেলা। এই জগৎ তাঁহার খেলা—ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত একটি মজার খেলামাত্র। যদি তুমি দরিদ্র হও, তবে দারিদ্র্যকেই একটি কৌতুক বলিয়া উপভোগ কর; যদি ধনী হও, তবে ঐ অবস্থাও আর একটি তামাশারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে তো বেশ মজা, আবার সুখ আসিলে মনে করিতে হইবে, এ আরও মজা। সংসার একটি ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপ কৌতুক উপভোগ করিতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান্ আমাদের সহিত সর্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান্ আমাদের অনন্তকালের খেলার সাথী, কেমন সুন্দর খেলা খেলিতেছেন! খেলা সাঙ্গ হইল—এক যুগ শেষ হইল। তারপর অল্পাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম—তারপর আবার খেলা আরম্ভ—আবার জগতের সৃষ্টি! যখন ভুলিয়া যাও সবই খেলা, আর তুমিও এ-খেলার সহায়ক, তখনই—কেবল তখনই দুঃখকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়; তখনই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার তোমার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দু-দণ্ড জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে লীলাভূমি ও নিজদিগকে তাঁহার লীলাসহায়ক বলিয়া মনে কর, তখনই তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন। তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্যহৃদয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্সমূহের সহিত খেলা করিতেছেন। আমরা যেন তাঁহার হাতে দাবাবোড়ের ঘুঁটি, একটি ছকে বসাইয়া তিনি যেন সেগুলি চালিতেছেন। তিনি আমাদিগকে প্রথমে একদিকে, পরে অপরদিকে সাজাইতেছেন—আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই খেলার সহায়ক। কি আনন্দ! আমরা তাঁহার খেলার সহায়ক।

পরবর্তী ভাবকে ‘বাৎসল্য’ বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হইতে ঐশ্বর্যের ভাবগুলি দূর করা। ঐশ্বর্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা ঠিক নয়। চরিত্র-গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাস করা আবশ্যক বটে, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে প্রেমিক যখন শান্ত-প্রেমের একটু আস্বাদ পান, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন, তখন তাঁহার আর নীতিশাস্ত্র, বিধিনিয়ম প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। ভক্ত বলেন, আমি ভগবানকে মহামহিম, ঐশ্বর্যশালী, জগদীশ্বর দেবদেবরূপে ভাবিতে চাই না। ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্যভাব দূর করিবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজ শিশুসন্তান-রূপে ভালবাসেন। মাতাপিতা সন্তানকে ভয় করেন না, তাহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তিও হয় না।

সন্তানের কাছে তাঁহাদের প্রার্থনা করিবারও কিছু থাকে না। সন্তান সর্বদাই গ্রহীতা, সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য মাতাপিতা শত শতবার শরীর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের একটি সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্র জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এই ভাব হইতে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, ভগবান্ নরদেহে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বাৎসল্যভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে উপাসনা করা অসম্ভব, তাঁহারা ভয়ে এ-ভাব হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের মাতৃক্রোড়ে যীশু ও কৃষ্ণের শিশুমূর্তি রহিয়াছে। ভারতীয় নারীগণ অনেক সময় নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া চিন্তা করেন; খ্রীষ্টান জননীগণও নিজদিগকে খ্রীষ্টের মাতা বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন। ইহা হইতে পাশ্চাত্যের লোকেরা ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্বন্ধেও জানিতে পারিবেন; আর ইহা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ কুসংস্কার আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। এই ভয়মিশ্রিত ভক্তি, ঐশ্বর্য ও মহিমার ভাব প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে।

মানবীয় ভাবের আর একটি রূপে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার নাম 'মধুর'-ভাব, সর্বপ্রকার ভাবের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ। এ- সংসারে প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি—আর মানবীয় অভিজ্ঞতায় যত প্রকার প্রেম আছে, তাহার মধ্যে উহাই উচ্চতম ও প্রবলতম। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট-পালট করিয়া দেয়, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম মানুষের প্রতিটি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে?—তাহার নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়?—মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করিয়া ফেলে? দিব্য প্রেমের এই মধুরভাবে ভগবান্ আমাদের পতি। আমরা সকলে স্ত্রী বা প্রকৃতি, জগতে পুরুষ আর কেহ নাই। একমাত্র পুরুষ আছেন—তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।

আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্পাধিক পরিমাণে খেলাই করিতেছি, ভগবান্ই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। তবে দুঃখের বিষয়, যে অনন্ত সমুদ্রে এই প্রেমের প্রবল স্রোতস্বতী অবিরতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, মানব তাহা জানে না; সুতরাং নির্বোধের ন্যায় সে মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানব-প্রকৃতিতে সন্তানের প্রতি যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সন্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য নয়; যদি তুমি অন্ধভাবে ঐ একটিমাত্র সন্তানের উপরই উহা প্রয়োগ কর, তবে সেজন্য তোমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু ঐ কষ্টবোধ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে, তোমার ভিতর যে-প্রেম আছে, তাহা যদি কোন মনুষ্যে প্রয়োগ কর, তবে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, মনে দুঃখ ও বেদনা পাইবে। অতএব আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমকেই দিতে হইবে—যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখনও কোন পরিবর্তন নাই, যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হয়, যেন উহা ভগবানের নিকট পৌঁছায়—যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ, প্রেম যেন তাঁহারই নিকট পৌঁছায়। সকল নদীই সমুদ্রে গিয়া পড়ে, একটি জলবিন্দুও পর্বতগাত্র হইতে পতিত হইয়া নদীতে থামিতে পারে না, ঐ নদী যত বড়ই হউক না কেন! অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে যাইবার পথ করিয়া লয়। ভগবান্ই আমাদের সর্বপ্রকার ভাবাবেগের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগ করিতে চাও, ভগবানের উপর রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে তিরস্কার কর, বন্ধুকে ভর্ৎসনা কর; আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পার? মর্ত্য-জীব তোমার রাগ সহ্য করিবে না; প্রতিক্রিয়া আসিবেই। যদি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হও, আমিও অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিব, কারণ আমি তোমার ক্রোধ সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রেমাস্পদকে বলো, 'তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলিয়া রাখিয়াছ?' ভগবান্ ছাড়া আর কিসে আনন্দ আছে? ছোট ছোট মাটির টিপিতে আর কি সুখ? অনন্ত আনন্দের ঘনীভূত ভাবকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—ভগবান্ই এই আনন্দের ঘনীভূত ভাব। আমাদের সকল ভাবাবেগ যেন তাঁহারই সমীপে উন্নীত হয়। ঐগুলি তাহারই জন্য অভিপ্রেত; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে ঐগুলি নীচভাবে পরিণত হয়; সোজা লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিলে অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়। মানুষের শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি যেভাবেই প্রকাশিত হউক না কেন, ভগবান্ই উহাদের একমাত্র লক্ষ্য—'একায়ন'। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা—সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকেই যায়; তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ। এই হৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনিই পরম সুন্দর, পরম মহীয়ান—সৌন্দর্যস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর কে আছে? তিনি ব্যতীত স্বামী হইবার উপযুক্ত জগতে আর কে আছে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন।

অনেক সময় দেখা যায়, দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট উপযোগী মনে করেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়।'

১৫

প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। ভগবান্ যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হয়—তাঁহার পক্ষে সূর্য-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরম অবস্থা।

প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদক নয়। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে,

যতই উহা বাধা পায়, ততই উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ—উহাতে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন নারী তাঁহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, এবং তাঁহার পিতা, মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবল ভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সবকিছু ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের সুখদুঃখ ভুলিয়া—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার; তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না; এই দুইটি কখনও একত্র থাকে না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখনও একসঙ্গে থাকে না।'

১৬

উপসংহার

যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন ঐগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার, নির্বাণ—এ-সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়! এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে চাই? ‘ভগবান্, আমি ধন জন সৌন্দর্য বিদ্যা—এমন কি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।’

১৭

ভক্ত বলেন, ‘চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।’ তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? কে ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে? ভক্ত বলেন, ‘আমি জানি— তিনি ও আমি এক, তথাপি আমি তাঁহা হইতে নিজেকে পৃথক্ রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব।’

প্রেমের জন্য প্রেম—ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ। প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিবার জন্য কে না সহস্রবার বদ্ধ হইবে? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না; তিনি স্বয়ং ভালবাসিতে চান, আর চান ভগবান্ যেন তাঁহাকে ভালবাসেন। তাঁহার নিষ্কাম প্রেম —যেন উজান বাহিয়া যাওয়া। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে—স্রোতের বিপরীত দিকে যান। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলে। আমি একজনকে জানি, লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত! তিনি উত্তর দিতেন, ‘বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ তো একটা বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত, কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ বা স্বর্গলাভের জন্য পাগল। এই বিরাট বাতুতালয়ে আমিও পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্য পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও পাগল। আমার বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত আমার পাগলামিই সব চেয়ে ভাল।’ প্রকৃত ভক্তের প্রেম এই প্রকার তীব্র উন্মত্ততা, উহার কাছে আর সব আকর্ষণই অন্তর্হিত হয়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট কেবল প্রেমে পূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই বোধ হয়।মানুষের হৃদয়ে যখন এই প্রেম আবির্ভূত হয়, তখন তিনি অনন্তকালের জন্য সুখী— চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের সংসার-ব্যাধি চিরকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

দ্বৈতভাব লইয়াই আমাদিগকে প্রেমের ধর্ম আরম্ভ করিতে হয়। আমাদের মনে হয়, ভগবান্ আমাদের হইতে পৃথক্, আর আমরাও নিজদিগকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ করি। উভয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া মিলন সম্পাদন করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, আর ভগবান্ও ক্রমশঃ মানুষের নিকটতর হইতে থাকেন। মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ—যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতির ভাব লইয়া তাহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকে। তাহার নিকট ভগবানেই সর্বরূপে বিরাজিত। আর তখনই সাধক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্য দেবতায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া যান। প্রথম অবস্থায় আমরা সকলেই নিজেকে ভালবাসি। এই ক্ষুদ্র অহং-এর অসঙ্গত দাবী ভালবাসাকেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। অবশেষে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয়, তখন দেখা যায়—এই ক্ষুদ্র ‘অহং’ সেই অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্বে অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার যে-সকল মলিনতা ও বাসনা ছিল, তখন সেগুলি সব চলিয়া যায়। অবশেষে তিনি এই সুন্দর প্রাণস্পর্শী সত্য অনুভব করেন— প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই।

ভক্তির সাধন

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

১

বিবেকহীন ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার জন্য ব্যাকুল আমার এই হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও দূর না হয়।

প্রহ্লাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, যাহারা উচ্চতর কিছু জানে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—টাকাকড়ি, বেশভূষা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও সম্পত্তিতে—তাহাদের কি দারুণ প্রীতি, কি প্রচণ্ড আসক্তি! তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পূর্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন, 'আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবলভাবে অনুরক্ত হইব, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নয়।' এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহা 'ভক্তি' আখ্যা লাভ করে। ভক্তিতে কিছুই ধ্বংস করিতে হয় না। ভক্তিযোগে বলা হয়, আমাদের কোন প্রবৃত্তিই বৃথা নয়, বরং ঐগুলির সাহায্যেই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি। ভক্তি কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া নষ্ট করে না,—ভক্তি প্রকৃতির বিরোধী হয় না, শুধু মোড় ফিরাইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে চালিত করিয়া দেয়।

আমরা কত স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি ভালবাসি, ঐগুলিকে না ভালবাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না, কারণ ঐগুলি আমাদের নিকট পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না। যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে অবস্থিত—কোন সত্য অনুভব করে, তখনও তাহার আসক্তি থাকিতে পারে, তবে উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু—ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্বে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকেই 'ভক্তি' বলে। রামানুজাচার্যের মতে এই প্রবল অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধন-প্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথমতঃ 'বিবেক'। এই বিবেক-সাধনটি বিশেষতঃ পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট একটি অদ্ভুত জিনিষ। রামানুজের মতে ইহার অর্থ 'খাদ্যাখাদ্যের বিচার।' যে-সকল উপাদানে দেহ ও মনের বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাদ্যের মধ্যে সেইগুলি বিদ্যমান; আমি এখন যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিতেছি, তাহার সবই আমার ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে ছিল; আমার দেহমনের ভিতর উহা পরিবর্তিত, সঞ্চিত ও নূতনদিকে চালিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। বহির্জগতে জড়বস্তু ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, দেহ মন এবং খাদ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। তাই যদি হইল, অর্থাৎ যদি আমাদের খাদ্যের জড়কণাগুলি হইতে আমরা চিন্তাশক্তির যন্ত্র প্রস্তুত করি, আর ঐ কণাগুলির মধ্যবর্তী সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহ হইতে আমরা চিন্তাও উৎপন্ন করি, তবে ইহাও সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, এই চিন্তাশক্তি ও তাহার যন্ত্র উভয়ই আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবে, বিশেষ প্রকার খাদ্য মনে বিশেষ প্রকার পরিবর্তন উৎপাদন করিবে; প্রতিদিনই আমরা ইহা দেখিয়া থাকি। আরও কত প্রকার খাদ্য আছে, সেগুলি শরীরে পরিবর্তন সাধন করে, পরিণামে মনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ইহা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় তত্ত্ব; আমরা যত দুঃখভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই আমাদের আহার হইতে জাত। আপনারা দেখিয়াছেন, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযত করা বড়ই কঠিন, তখন মন অবিরত ছুটিতে থাকে! কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক—সেইগুলি খাইলে দেখিবেন, মনকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। অধিক পরিমাণে সুরা বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য পান করিলে মানুষ বুঝিতে পারে, মনকে আর সংযত রাখা যাইবে না। মন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়।

রামানুজাচার্যের মতে খাদ্যসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ 'জাতিদোষ'। জাতিদোষ-অর্থে সেই খাদ্যবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ বুঝায়। সর্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা—মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ উহা স্বভাবতই অপবিত্র। অন্যের প্রাণনাশ করিয়া তবে মাংস পাইতে পারি। মাংস খাইয়া আমরা ক্ষণিক সুখ পাই, আর আমাদের সেইটুকু সুখের জন্য একটি প্রাণীকে তাহার প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাই নয়, এজন্য আমরা মানুষেরও অবনতির কারণ হইয়া থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে সেই প্রাণীটি হত্যা করিত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা এই কাজ করাইয়া লয়, আবার সেই হত্যাকার্যের জন্য সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করে। এখানকার আইন জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডে কসাই কখনও জুরির আসন গ্রহণ করিতে পারে না—ভাবটা এই যে, কসাই স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর। তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে?—সমাজ। আমরা যদি মাংস ভক্ষণ না করিতাম, তবে কেহ কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল তাহারাই করিতে পারে, যাহাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে হয়, এবং যাহারা ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তেজক খাদ্য, যথা—পেঁয়াজ, রসুন, সাওয়ারক্রট (Sauerkraut)

২

প্রভৃতি দুর্গন্ধ খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে। আরও পূতি, পর্যুষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ খাদ্যও

বর্জন করিতে হইবে।

৩

খাদ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় দোষের নাম 'আশ্রয়দোষ'। পাশ্চাত্যগণের পক্ষে এটি বুঝা আরও কঠিন। 'আশ্রয়দোষ' অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসিতেছে, তাহার সংস্পর্শে খাদ্যে যে দোষ জন্মে। এটি হিন্দুদের একটি রহস্যপূর্ণ মতবাদ। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দিকে এক প্রকার জ্যোতি রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাতেই যেন তাহার প্রভাব, তাহার মনের—তাহার চরিত্রের বা ভাবের কিছু অংশ লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে তাহার শক্তির মত চরিত্রবৈশিষ্ট্যও যেন বহির্গত হইতেছে, আর ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাই তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব রন্ধনের সময় কে আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিল, সে-দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন দুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি যাহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ খাদ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসদ্ভাব সংক্রামিত হইবে।

তৃতীয় 'নিমিত্তদোষ'। এটি বুঝা খুব সহজ। খাদ্যে ধূলি প্রভৃতি সংস্পর্শ যেন কখনও না হয়। বাজার হইতে রাজ্যের ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর রাখা ঠিক নয়। থুতু, লালা প্রভৃতি হইতেও সাবধান হইতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিষ ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল দিয়াছেন! অতএব ঠোঁটে আঙুল ঠেকাইয়া লালা দ্বারা সব জিনিষ স্পর্শ করার মত কদর্য অভ্যাস আর কিছুই নাই। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membrane) শরীরের মধ্যে অতি কোমলাংশ, এগুলি হইতে নিঃসৃত লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রামিত হয়। কোন দ্রব্যে লালার স্পর্শ—শুধু দোষাবহ নয়, বিপজ্জনক। তারপর একজন যে জিনিষের আধখানা কামড়াইয়া খাইয়াছে, তাহা খাওয়া উচিত নয়; যথা, একজন একটা আপেল এক কামড় খাইয়া বাকীটা অপরকে খাইতে দেয়, এরূপ করা উচিত নয়। খাদ্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দোষগুলি বর্জন করিলে খাদ্য শুদ্ধ হয়। আহারশুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।'

৪

রামানুজাচার্যের উপনিষদের ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর একজন ভাষ্যকার—শঙ্করাচার্য ঐ বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। 'আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ'—যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার, সুতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আহার। তিনি কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন? 'আহারশুদ্ধি'র প্রকৃত অর্থ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত না হওয়ার জন্য আমাদের এই দোষগুলি বর্জন করিতে হইবেঃ প্রথমতঃ আসক্তিরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে; ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয়ে প্রবল আসক্তি থাকিবে না। সব দেখুন, সবকিছু করুন, সব স্পর্শ করুন, কিন্তু আসক্ত হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, নিজের উপর তাহার কোন প্রভুত্ব থাকে না, সে দাস হইয়া যায়। যদি কোন নারী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে ঐ পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে; পুরুষও তেমনি নারীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার তো কোন প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া অপেক্ষা এই জগতে অনেক বড় বড় কাজ আছে। সকলকেই ভালবাসুন, সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, কিন্তু কাহারও দাস হইবেন না। প্রথমতঃ উহা তো আমাদিগকে অধঃপতিত করিয়া দেয়; দ্বিতীয়তঃ উহাতে অপরের প্রতি ব্যবহারে আমাদিগকে ঘোর স্বার্থপর করিয়া তুলে, এই দুর্বলতার দরুন আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের ভাল করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে চাই। জগতে যত কিছু অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তিবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল সৎকর্মে আসক্তি রাখিতে হইবে, এবং সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কোন ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া যেন আমাদের দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। ঈর্ষা বা দ্বেষ সমুদয় অনিষ্টের মূল, আর উহা জয় করা বড়ই কঠিন। তৃতীয়তঃ মোহ। আমরা সর্বদাই এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছি ও তদনুসারে কার্য করিতেছি, আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিজেরাই সৃষ্টি করিতেছি। আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা কিছু ক্ষণকালের জন্য আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, তাহাকে সর্বোত্তম বস্তু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতিয়া যাইতেছি; কিছু পরেই দেখিলাম, তাহা হইতে একটা খুব আঘাত পাইয়াছি, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে পড়িতেছি, এবং অনেক সময় সারা জীবনটাই আমরা ঐ ভুল লইয়া থাকি। শঙ্করাচার্যের মতে এই পূর্বোক্ত রাগদ্বেষমোহরূপ ত্রিবিধদোষ-বর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ গ্রহণ করাকেই 'আহারশুদ্ধি' বলে। এই আহারশুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া, রাগদ্বেষমোহ-বর্জিত হইয়া চিন্তা করিতে পারে। এইরূপে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন চলিতে থাকে।

স্বভাবতই আপনারা সকলে বলিবেন যে, শঙ্করাচার্যকৃত এই ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। তাহা হইলেও বলিতেছি, রামানুজকৃত ব্যাখ্যাটিকে অবহেলা করা চলিবে না। স্থূল খাদ্য শুদ্ধ হইলে বাকীগুলিও শুদ্ধ হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, মনই সকলের মূল, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ নন। জড়পদার্থের শক্তি দ্বারা আমরা সকলেই চালিত হই, এবং যতদিন আমরা এইভাবে চালিত হইব, ততদিন আমাদিগকে জড়ের সাহায্য লইতেই হইবে; তারপর যখন আমরা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিব তখন যাহা খুশী পানাহার করিতে পারি। আমাদিগকে রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া পানাহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে 'মানসিক আহার'-এর দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।, শরীরের স্থূলখাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া তো অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহা হইলে আমাদের আত্মচেতনা ক্রমশঃ সবল হইতে থাকিবে, এবং শরীরচেতনার দাবী ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। তখন আর কোন খাদ্যই আমাদের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সকলেই এক লাফে উচ্চতম আদর্শ ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তো কিছু হইবে না! তাহাতে

পড়িয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত পা খোঁড়া হইয়া যাইবে। আমরা এই জগতে বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে ধীরে ধীরে শিকল ভাঙিতে হইবে। রামানুজের মতে এই 'বিবেক' অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্য-বিচারই ভক্তির প্রথম সাধন।

ভক্তির দ্বিতীয় সাধনের নাম 'বিমোক'। বিমোক-শব্দের অর্থ বাসনার দাসত্ব-মোচন। যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্বপ্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই কামনা করিও না। এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর জীবনে লইয়া যাইবার জন্য যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল উচ্চতর উদ্দেশ্যলাভে যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। আমরা সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে, এই জগৎ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, একটি উদ্দেশ্য লাভের উপায় মাত্র। যদি এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত, তবে আমরা এই স্থূলদেহেই অমরত্ব লাভ করিতাম, আমরা কখনই মরিতাম না। কিন্তু দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্তে আমাদের চতুর্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি মূর্খতাবশতঃ ভাবিতেছি, আমরা কখনও মরিব না।

৫

ঐ ধারণা হইতে আমরা ভাবিয়া থাকি, এই জীবন আমাদের চরম লক্ষ্য—আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের এই অবস্থা। এই ভাব এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতা লাভের উপায়স্বরূপ হয়, ততক্ষণই ভাল; আর যখন ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তখন ইহা মন্দ—মন্দ বৈ আর কিছুই নয়। এইরূপে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, টাকা-কড়ি বা বিদ্যা আমাদের ভগবৎপথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল, কিন্তু যখনই তাহা না হয়, তখন সেগুলি মন্দ বৈ আর কিছুই নয়। স্ত্রী যদি ঈশ্বরলাভের সহায়তা করে, তবেই তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়—এইরূপ পতিপুত্রাদি সম্বন্ধেও। অর্থ যদি মানুষকে অপরের কল্যান-সাধনে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। নতুবা উহা কেবল অনিষ্টের মূল, আর যত শীঘ্র আমরা অর্থের সংস্রব হইতে নিষ্কৃতি পাই, ততই মঙ্গল।

পরবর্তী সাধন 'অভ্যাস'। আমাদের কর্তব্য—মন যেন সর্বদাই ঈশ্বরাভি-মুখে গমন করে, অন্য কোন বস্তুর আমাদের মনকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। মন যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বরচিন্তা করে। ইহা বড় কঠিন কাজ, কিন্তু বারংবার অভ্যাসের দ্বারা ইহা সম্ভব। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইবে। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন। একদিকে মোড় ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে ফিরুন, এবং যত শীঘ্র পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া যান। ইন্দ্রিয়বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, আমরা এই মুহূর্তে হাসিতেছি, পরক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্য বায়ুপ্রবাহেই আমরা বিচলিত হইতেছি—সামান্য একটা বাক্যের দাস, সামান্য এক টুকরা খাদ্যের দাস হইয়াছি। ইহা অতি লজ্জার বিষয়—ইহার উপর আমরা আবার নিজদিগকে 'আত্মা' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি এবং অনেক বড় বড় বাজে কথা বলিয়া থাকি। আমরা সংসারের দাস—ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত হইয়া নিজেদের এই অবস্থায় আনিয়াছি। এখন বিপরীত দিকে চল, ঈশ্বরের চিন্তা কর—মন কোন শারীরিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন শুধু ঈশ্বরের চিন্তা করে। যখন মন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দাও, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। 'যেমন তৈল এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আসিতে থাকে, সেইরূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।' এই অভ্যাস আবার শুধু মনের দ্বারা করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাজে কথা না শুনিয়া, আমাদিগকে ঈশ্বরের কথা শুনিতে হইবে; বাজে কথা না বলিয়া ঈশ্বর-বিষয়ক কথা বলিতে হইবে; বাজে পুস্তক না পড়িয়া ঈশ্বর-বিষয়ক সদ্‌গ্রন্থ পড়িতে হইবে।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার এই 'অভ্যাস'-এর সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ—সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান্ বলিতেছেনঃ

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করে, আমি সেখানেই অবস্থান করি।

মনুষ্য-মনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব—উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়। দেখিবেন, অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিগণ—যাহারা এক মুহূর্তও মন স্থির করিতে পারে না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, একাগ্র হইয়া যায়। এমন কি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।

পরবর্তী সাধন 'ক্রিয়া'—পরের হিতসাধন। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বরচিন্তা আসিবে না। যতই আমরা পরের কল্যাণ-সাধনে চেষ্টা করিব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে, এবং সেই হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করিবেন। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া বা কর্ম পঞ্চবিধ—উহাদিগকে 'পঞ্চ-মহাযজ্ঞ' বলে। প্রথমঃ ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ স্বাধ্যায়—প্রত্যহ শুভ ও পবিত্র-ভাবোদ্দীপক কিছু কিছু পাঠ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ঃ দেবযজ্ঞ—ঈশ্বর, দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয়ঃ পিতৃযজ্ঞ—আমাদের পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য।

চতুর্থঃ নৃযজ্ঞ—মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের জন্য গৃহ নির্মাণ না করে, তবে তাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও দুঃখী, তাহারই জন্য যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে, তবেই সে যথার্থ গৃহী। যদি কেহ কেবল নিজের ও নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্মাণ করে, তবে উহা অতি ঘোর স্বার্থপর কাজ। এরূপ ব্যক্তি

কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য কিছু রন্ধন করিবার অধিকার নাই, পরের জন্যই তাহাকে রন্ধন করিতে হইবে—পরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার অধিকার।

৬

ভারতে সাধারণতঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে যে, যখন বাজারে নূতন নূতন জিনিষ, যথা—আম, কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোন ব্যক্তি কিছু কিনিয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। তারপর তিনি নিজে খাইয়া থাকেন। আর এদেশে (আমেরিকায়) অনুসরণ করিবার পক্ষে এটি একটি খুবই ভাল দৃষ্টান্ত। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ নিঃস্বার্থ হইবে, আবার স্ত্রীপুত্রাদিও ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথমজাত ফল ভগবানকে নিবেদন করিত, কিন্তু আজকাল আর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য—অবশিষ্ট অংশে আমাদের অধিকার। দরিদ্রগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি—যাহারাই কোনরূপ দুঃখকষ্ট পাইতেছে, তাহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পরকে না দিয়া যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সে পাপ ভোজন করে।

৭

পঞ্চমঃ ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ নিম্নতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য। সকল জীবজন্তুকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুশী করিবে, এইজন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে—এ-কথা বলা মহাপাপ। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নয়। শরীরের কোন অংশে স্নায়ুবিশেষ নড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য একটি প্রাণীকে কাটিয়া দেখা—কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি! এমন সময় আসিবে, যখন সকল দেশেই—যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। আমাদের দেশে বৈদেশিক সরকার এরূপ কার্যে যতই উৎসাহ দিক্ না কেন, হিন্দুরা যে এ-বিষয়ে সহানুভূতি করেন না, তাহাতে আমি খুশী। যাহা হউক, গৃহে রান্না-করা আহারের একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দিতে হইবে। এদেশের প্রত্যেক শহরে অন্ধ খঞ্জ বা আতুর, ঘোড়া, গরু, কুকুর, বিড়ালের জন্যও হাসপাতাল থাকা প্রয়োজন—তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং যত্ন করিতে হইবে।

তারপর 'কল্যাণ' অর্থাৎ পবিত্রতা। নিম্নলিখিত গুণগুলি কল্যাণ-শব্দবাচ্যঃ ১ম, সত্য; যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জব—অকপটভাব, সরলতা—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ এক করিতে হইবে; যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সহজ সরল পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া। ৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর নাই। সে-ই হীনতম ব্যক্তি, যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে; সে প্রতিগ্রহ করিতে—পরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। আর সে-ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাহার হাত পরের দিকে ফিরানো রহিয়াছে—যে পরকে দিতেই ব্যাপৃত। হস্ত নির্মিত হইয়াছে—কেবল দিবার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, রুটির শেষ টুকরাটি পর্যন্ত দান করুন; পরকে খাদ্য দিতে গিয়া যদি তোমার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তাহারা তো পূর্ব হইতেই বদ্ধ। তাহারা সব দান করিয়া দিতে পারে না। তাহারা সন্তানগুলিকে উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ভোগের মূল্য দিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলেমেয়ে নাই?স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, আমার নিজের একটি সন্তান চাই। ৬ষ্ঠ, অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।

পরবর্তী সাধন 'অনবসাদ', ইহার ঠিক অর্থ—চুপ করিয়া বসিয়া না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না হওয়া, অর্থাৎ প্রফুল্লতা; নৈরাশ্য আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। সর্বদা হাসিমুখে প্রফুল্ল থাকিলে কোন স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। যাহাদের মন সর্বদা বিষণ্ণ ও তমোভাবে আচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভালবাসিবে কি করিয়া? তাহারা যদি ভালবাসার কথা বলে, তবে জানিবেন—উহা মিথ্যা; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অপরকে আঘাত করিতে চায়। গোঁড়াদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের মুখ সর্বদা ভার হইয়াই আছে—তাহাদের সমুদয় ধর্মটাই যেন বাক্যে ও কার্যে পরের বিরোধিতা করা। অতীতে তাহারা কি করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং অবাধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলে এখনও কী করিতে পারে, তাহাও ভাবুন। ক্ষমতা করায়ত্ত হইবে জানিলে তাহারা আগামী কালই সমগ্র জগৎকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে, কারণ বিষণ্ণভাবই তাহাদের ঈশ্বর। ক্ষমতাপন্ন এক ভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া, সর্বদা বিষণ্ণ থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে আর ভালবাসার লেশমাত্র থাকে না, কাহারও প্রতি তাহাদের এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে দুঃখিত বোধ করে, সে কখনও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। 'আমি বড় দুঃখী!'—এরূপ বলা ধার্মিকের লক্ষণ নয়, ইহা শয়তানি। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। বাস্তবিকই যদি আপনার দুঃখ থাকে, সুখী হইবার চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্বল ব্যক্তি কখনই ভগবানকে লাভ করিতে পারে না—অতএব দুর্বল হইবেন না। আপানাকে শক্ত সবল হইতে হইবে—অনন্ত শক্তি আপনার ভিতর। নতুবা কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? ঈশ্বর-লাভ করিবেন কিরূপে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অনুদ্ধর্ষ' সাধন করিতে হইবে। উদ্ধর্ষ-শব্দের অর্থ অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ঐ অবস্থায় মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে, আর পরিণামে সর্বদা দুঃখই আসিয়া থাকে। কথায় বলে, 'যত হাসি, তত কান্না'। মানুষ একবার একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। মনকে প্রফুল্ল অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। মন যেন কখনও কোন কিছুর বাড়াবাড়ি না করে, কারণ বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

রামানুজের মতে এইগুলিই ভক্তির সাধন।

ভক্তির প্রথম সোপান—তীব্র ব্যাকুলতা

ভক্তিযোগের আচার্যগণ নির্ণয় করিয়াছেন—ভক্তি ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। কিন্তু 'মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তিতত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। জীবনের সম্পূর্ণ পৃথক্ দুই প্রকার আদর্শ দেখা যায়। যে-কোন দেশের মানুষ, যে কিছুটা ধর্ম মানে, সেই বোধ করিয়া থাকে—মানুষ দেহ ও আত্মা দুই-ই। কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে মানুষ সাধারণতঃ দেহের দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের আচার্যগণ কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক দিক্‌টার উপর অধিক জোর দিয়া থাকেন, আর ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে সর্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় পর্যন্ত এই ভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলে, 'অমুক তাহার আত্মা পরিত্যাগ করিল' (gave up the ghost); ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে লোকে বলিয়া থাকে, 'অমুক দেহত্যাগ করিল'; পাশ্চাত্য ভাব—মানুষ একটা দেহ, তাহার আত্মা আছে; প্রাচ্যভাব—মানুষ আত্মাস্বরূপ, তাহার দেহ আছে। এই পার্থক্য হইতে অনেক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে-আদর্শ অনুসারে মানুষ দেহ এবং তাহার একটি আত্মা আছে, সেই আদর্শে দেহের উপরে সম্পূর্ণ ঝোঁকটা পড়িয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা কর—মানুষ কি জন্য জীবনধারণ করে? ঐ আদর্শের অনুগামিগণ বলিবে, 'ইন্দ্রিয়সুখভোগের' জন্য; দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজন-পান করিব, অনেক বিষয়—ধন-দৌলতের অধিকারী হইব; বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সব থাকিবে, তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিব—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।' ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা কল্পনা করিতে পারে না। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে, এখন যে-সকল ইন্দ্রিয়সুখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই চলিতে থাকিবে। ইহলোকে সে চিরকাল এই সুখভোগ করিতে পারিবে না—এজন্য সে বড়ই দুঃখিত, তাহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সে মনে করে, যে-কোন ভাবে হউক সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে এ-সবই নূতনভাবে চলিতে থাকিবে। তাহার এই-সব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, এই-সব সুখভোগই থাকিবে—কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়িবে। সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চায়, তাহার কারণ—ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্যলাভের উপায়। তাহার জীবনের লক্ষ্য—বিষয়-সম্ভোগ। সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন—যিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই-সব সুখ দিতে পারেন, তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় ভাব এই যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে আর কিছু নাই, এই-সব ইন্দ্রিয়সুখভোগের ভিতর দিয়া আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। শুধু তাই নয়; যদি ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সুখভোগ যত অল্প, তাহার জীবন তত উন্নত। কুকুরটা যখন খায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। শূকর-শাবকটার ব্যবহার লক্ষ্য করিও—সে খাইতে খাইতে কি আনন্দসূচক ধ্বনি করে! সে যেন স্বর্গসুখ পাইতেছে, যদি কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা আসিয়া তাহার দিকে তাকান, সে তাঁহাকে লক্ষ্যই করিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র জীবন। এমন কোন মানুষ জন্মায় নাই, যে ঐভাবে খাইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, নিম্নতর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কত তীক্ষ্ণ—তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি কখনও ঐরূপ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়সুখেই পশুগণের চরম আনন্দ—তাহারা ঐ আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর যে যত অনুন্নত, ইন্দ্রিয়সুখে সে তত অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। যতই উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে থাকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে। দেখিবেন, আপনাদের বিচারশক্তি ও প্রেমের যতই বিকাশ হইবে, ততই আপনাদের ইন্দ্রিয়-সুখসম্ভোগের শক্তি কমিয়া যাইবে।

বিষয়টি আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি দেওয়া আছে, সে শক্তি—হয় দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে যদি উহাদের একটির উপর যে-পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা যায়, অন্যগুলির উপর প্রয়োগ করিবার শক্তি তবে ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য জাতি অপেক্ষা অজ্ঞ বা অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণতর। আর বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাস হইতে আমরা এই একটি শিক্ষা পাইতে পারি যে, কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার স্নায়ু সূক্ষ্মতর হইতে থাকে এবং শরীর দুর্বলতর হইয়া যায়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন—দেখিবেন, ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে জয় করিবে। দেখা যায়, বর্বর জাতিই প্রায় সর্বদা জয়লাভ করে। অতএব আমরা দেখিতেছি, যদি আমাদের সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবার বাসনা হয়, তবে বুঝিতে হইবে, আমরা অসম্ভব কিছু চাহিতেছি—কারণ তাহা হইলে আমরা পশু হইয়া যাইব। মানুষ যখন বলে, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে তার ইন্দ্রিয়সুখভোগ তীব্রতর হইবে, তখন সে জানে না, সে কি চাহিতেছে; মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়া পশুজন্ম হইলে তবেই তাহার পক্ষে এরূপ সুখভোগ সম্ভব। শূকর কখনও মনে করে না, সে অশুচি বস্তু ভোজন করিতেছে। উহাই তাহার স্বর্গ, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেও সে তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র-সত্তা নিয়োজিত।

মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। তাহারা শূকর-শাবকের ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ পঙ্কে গড়াগড়ি দিতেছে—উহার বাহিরে কি আছে উহা দেখিতে পায় না। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখভোগই চায়, আর উহা না পাইলে তাহারা যেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। 'ভক্ত' শব্দটির শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ কখনও 'ভক্ত' হইতে পারে না—তাহারা কখনও প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার ইহাও ঠিক যে, এই নিম্নতর আদর্শ অনুসরণ করিলে কালে এই ভাব পরিবর্তন হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কিছু আছে, যাহার সম্বন্ধে জানিতাম না; জানিলে জীবনের উপর এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপর প্রবল আসক্তি ধীরে ধীরে

চলিয়া যাইবে। ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন এক সহপাঠীর সঙ্গে কি একটা খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি হইয়াছিল; তাহার গায়ে আমার চেয়ে বেশী জোর ছিল, কাজে-কাজেই সে ঐ খাবারটা আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। তখন আমার যে ভাব হইয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে। আমার মনে হইল, তাহার মত দুষ্ট ছেলে জগতে আর জন্মায় নাই, আমি যখন বড় হইব, আমার গায়ে জোর হইবে, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল—সে এত দুষ্ট যে, কোন শাস্তিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা উচিত। এখন আমরা উভয়েই বড় হইয়াছি, উভয়ের মধ্যে এখন নিবিড় বন্ধুত্ব। এইরূপে এই সমগ্র জগৎ শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ—খাওয়া এবং উপাদেয় খাবারই তাহাদের সর্বস্ব, যদি এতটুকু এদিক ওদিক হয়, তবেই সর্বনাশ! তাহারা কেবল ভাল ভাল খাবারের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধারণা—সর্বদা সর্বত্র প্রচুর খাবার আছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণের ধারণা—স্বর্গ একটি বেশ ভাল মৃগয়ার স্থান। আমাদের সকলেরই স্বর্গের ধারণা নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ; কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে এবং যতই উচ্চতর বস্তু দেখিতে পাই, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই-সকলের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইতে থাকি। আধুনিক কালে সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া (ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে) এই-সব ধারণা অতিক্রম করা হয়, আমরা যেন সেভাবে এই-সকল ধারণা পরিত্যাগ না করি, তাহাতে ভাবগুলি উড়াইয়া দেওয়া হইল—নষ্ট করিয়া ফেলা হইল; যে নাস্তিক এইরূপে সব উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত; কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি উহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চায় না, কারণ তাহার মতে স্বর্গই নাই; আর ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে যাইতে চান না, কারণ তিনি উহাকে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চান কেবল ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর ব্যতীত জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ংই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য—তাঁহাকে দর্শন কর, তাঁহাকে সম্ভোগ কর। ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু আমরা ধারণাই করিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ। প্রেম অপেক্ষা কোন উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেম-শব্দ দ্বারা সংসারের সাধারণ স্বার্থপর ভালবাসা বুঝায় না—উহাকে 'প্রেম' নামে অভিহিত করা ঈশ্বরনিন্দার সমান। আমাদের পুত্রকলত্রাদির প্রতি ভালবাসা জীবজন্তুর ভালবাসার মত। যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহাই একমাত্র 'প্রেম'-শব্দবাচ্য এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের সম্বন্ধেই সম্ভব। এই প্রেমলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা পিতামাতা, পুত্রকন্যা ও অন্যান্য সকলকেই ভালবাসিতেছি—এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছি। আমরা ধীরে ধীরে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ঐ বৃত্তির পরিচালনা হইতে কিছুই শিখিতে পারি না—একটি সোপানে আরোহণ করিয়া উহাতেই আমরা আবদ্ধ হইয়া যাই, আমরা একটি ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পড়ি। কখনও কখনও মানুষ এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। মানুষ এই জগতে চিরকাল স্ত্রী-পুত্র ধন-মান— এই-সবের দিকে ছুটিতেছে, সময়ে সময়ে তাহারা বিশেষ ধাক্কা খাইয়া সংসারের যথার্থ রূপ বুঝিতে পারে। এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ঠিক ঠিক ভালবাসিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মানুষ বোঝে, মানুষের ভালবাসা সব শূন্য। মানুষ ভালবাসিতেই পারে না—শুধু কথা বলে। 'আহা! প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি' বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করিয়া পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু যেই স্বামীর মৃত্যু হয়, অমনি সন্ধান করে, ব্যাঙ্কে তাঁহার কত টাকা আছে; আর কাল তাহার কি গতি হইবে—এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিত হইলে, অথবা সামান্য দোষ করিলে তাহার দিকে আর চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাপূর্ণ।

সান্ত জীব কখনও ভালবাসিতে পারে না, অথবা সান্ত জীব ভালবাসার যোগ্যও হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই যখন ভালবাসার পাত্রের দেহের এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হইতেছে, তখন এই জগতে অনন্ত প্রেমের কি আর আশা করা যাইতে পারে? ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। তবে এ-সব ভালবাসাবাসি কেন? এগুলি কেবল ভ্রমমাত্র—প্রেমের বিভিন্ন অবস্থানমাত্র। মহাশক্তি আমাদের পিছন হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন—আমরা জানি না কোথায় সেই প্রেমাস্পদকে খুঁজিব, কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। বারংবার আমাদের ভ্রম ধরা পড়িতেছে। আমরা একটা জিনিষ ধরিলাম—উহা আমাদের হাত ফসকাইয়া গেল, তখন আমরা আর কিছুর জন্য হাত বাড়াইলাম। এইভাবে আমরা আগাইয়া চলি, শেষ পর্যন্ত আলোক আসিয়া থাকে, তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হই—একমাত্র তিনিই আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকেন, তাঁহার ভালবাসার কোন পরিবর্তন নাই, তিনি সর্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমি অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে কেই বা কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহ্য করিবেন? যাহার মনে ক্রোধ ঘৃণা বা ঈর্ষা নাই, যাহার সাম্যভাব কখনও নষ্ট হয় না, যাহার জন্ম নাই—মৃত্যু নাই, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড় কঠিন এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়—অতি অল্প লোকেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে। আমরা শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মের দোকানদারি করে, সকলেই ধর্মের কথা বলে, খুব কম লোকেই প্রকৃত ধর্ম লাভ করিয়া থাকে। এক শতাব্দীর মধ্যে অতি অল্প লোকই সেই ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন এক সূর্যের উদয়ে সমগ্র অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনি এই অল্পসংখ্যক যথার্থ ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্ত পুরুষের অভ্যুদয়েই সমগ্র দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যায়। এরূপ ঈশ্বর-পুত্রের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ ধন্য হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র জগতে এরূপ মহাপুরুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু আমাদের সকলেরই ঐরূপ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, আপনি বা আমিই যে সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে হইব না, তাহা কে বলিল? অতএব আমাদিগকে ভক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি স্ত্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসে ; স্ত্রীও ভাবে—আমি স্বামিগতপ্রাণা। কিন্তু যেই একটি সন্তান হইল, অমনি অর্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা সন্তানের প্রতি গেল। সে নিজেই টের পাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্বের মত ভালবাসা নাই। আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, অধিকতর ভালবাসার পাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে পূর্বের ভালবাসা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন কয়েকজন সহপাঠীকেই আপনারা জীবনের প্রিয়তম বন্ধু মনে করিতেন অথবা মাতাপিতাকে ঐরূপ ভালবাসিতেন, তারপর বিবাহ হইল, তখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর প্রীতির আস্পদ হইল—পূর্বের ভাব চলিয়া গেল—নূতন প্রেম প্রবলতর হইয়া উঠিল। আকাশে একটি তারা উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটি

বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর তদপেক্ষা আর একটি বৃহত্তর নক্ষত্রের উদয় হইল, অবশেষে সূর্য উঠিল—তখন সূর্যের প্রকাশে ক্ষুদ্রতর জ্যোতিগুলি ম্লান হইয়া গেল। সূর্যই সেই ঈশ্বর। এই তারাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা। আর যখন ঐ সূর্যের উদয় হয়, তখন মানুষ উন্মাদ হইয়া যায়—ঐরূপ ব্যক্তিকে এমার্সন 'ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত মানব' (a God-intoxicated man) বলিয়াছেন; তখন তাহার নিকট মানুষ জীবজন্তু সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়া ঈশ্বর-রূপে পরিণত হয়—সবই সেই এক প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রেম কেবল জৈব আকর্ষণমাত্র। তাহা না হইলে প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের কি প্রয়োজন? কোন মূর্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা ভয়ানক পৌত্তলিকতা, কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর সামনে ঐরূপে নতজানু হওয়া যাইতে পারে—তাহাতে কোন দোষ নাই!

এই-সবের ভিতর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। সংসারে আমরা ভালবাসার বহু স্তরের সম্মুখীন হই। প্রথমে আমাদের জমি পরিষ্কার করিতে হইবে। জীবনটাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, ভালবাসার সমগ্র তত্ত্ব তাহারই উপর নির্ভর করিবে। এই সংসারই জীবনের চরম লক্ষ্য—এইরূপে মনে করা পশুজনোচিত ও মানুষের ঘোর অবনতির কারণ। যে এই ধারণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, সে-ই ক্রমে হীন হইয়া যায়; সে আর কখনও উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবে না—জগতের অন্তরালে অবস্থিত তত্ত্বের চকিত আভাসও কখনও পাইবে না, সে সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে। সে কেবল টাকার চেষ্টা করিবে—যাহাতে ভাল ভাল খাবার খাইতে পায়। এরূপ জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস—ইন্দ্রিয়ের দাস মানুষ, নিজেকে জাগাও, উচ্চতর তত্ত্ব আরও কিছু আছে। আপনারা কি মনে করেন, চক্ষু-কর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির দাস হইয়া থাকিবার জন্যই এই মানুষের—এই অনন্ত আত্মার—দেহধারণ? আমাদের পিছনে অনন্ত সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সব করিতে পারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা, আর প্রেমবলেই আপনার ঐ শক্তির উদয় হইতে পারে। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত—ইহাই আমাদের আদর্শ। একদিনেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। আমরা কল্পনা করিতে পারি, আমরা ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়—ঐ অবস্থা এখনও বহু বহু দূরে। যে যে-অবস্থায় রহিয়াছে, যদি সম্ভব হয়, সেই অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। মানুষ জড়বাদের উপরই নির্ভরশীল। তুমি আমি সকলেই জড়বাদী। ঈশ্বর সম্বন্ধে—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যা কিছু বলিয়া থাকি, তা বেশ ভাল, কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেগুলি আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথা মাত্র; আমরা তোতাপাখির মত সেগুলি শিখিয়াছি এবং মাঝে মাঝে আওড়াইয়া থাকি। অতএব আমরা যে-অবস্থায় আছি অর্থাৎ আমরা এখন যে জড়বাদী—সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং আমাদিগকে জড়ের সাহায্য অবশ্যই লইতে হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রকৃত আত্মাবাদী বা চৈতন্যবাদী হইব—নিজদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, আত্মা বা চৈতন্য যে কি বস্তু, তাহা বুঝিব; তখন দেখিব—যে-জগৎকে আমরা অনন্ত বলিয়া থাকি, তাহা অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম জগতের একটি স্থূল বাহ্যরূপ মাত্র।

ইহা ছাড়া আমাদের আরও কিছু প্রয়োজন আছে। আপনারা বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount)-এ পাঠ করিয়াছেনঃ 'চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; আঘাত কর, তবেই দ্বার খুলিয়া যাইবে; খোঁজ তবেই পাইবে।' মুশকিল এই যে—চায় কে, খোঁজে কে? আমরা সকলেই বলি, আমরা ঈশ্বরকে জানি। ঈশ্বর নাই—প্রমাণ করিবার জন্য কেহ এক বৃহৎ পুস্তক লিখিলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আর একজন আরও বড় একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন ধরিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই নিজের কর্তব্য মনে করিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব খণ্ডন করাই নিজ কর্তব্য মনে করেন ও প্রচার করিয়া বেড়ান—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিবার কি প্রয়োজন? ঈশ্বর থাকুন বা না-ই থাকুন, অনেকের পক্ষেই তাহাতে কি আসে যায়? এই শহরে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতরাশ সম্পন্ন করে—ঈশ্বর আসিয়া তাহার পোষাক বা আহারের ব্যাপারে কোন সাহায্য করেন না। তারপর তাহারা কাজে যায় ও সারাদিন কাজ করিয়া টাকা রোজগার করে। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহারা বাড়ি আসে, তারপর উত্তমরূপে ভোজন করিয়া শয়ন করে—এ-সব কাজই তাহারা যন্ত্রবৎ করিয়া থাকে, ঈশ্বরের চিন্তা মোটেই করে না, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। মানুষের চারিটি নিত্যকর্তব্য আছে—আহার, পান, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি। তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া বলে, 'সময় হইয়াছে—চল।' তখন মানুষ বলিয়া থাকে—'মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আর একটু সময় চাই, আমার ছেলেটি একটু বড় হোক।' কিন্তু মৃত্যু বলে—'এখনই চল, তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।' জগৎ এইরূপেই চলিয়াছে। এইরূপেই সাধারণ মানুষের জীবন কাটিয়া যায়। সে বেচারাকে আমরা আর কি বলিব? ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবার কোন সুযোগই সে পায় নাই। হয়তো পূর্বজন্মে সে একটি শূকরছানা ছিল—মানুষ হইয়া তদপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র জগৎ তো আর ঐরূপ নয়—কতক লোক আছেন, যাঁহাদের কিছুটা চৈতন্য হইয়াছে। হয়তো কিছু দুঃখকষ্ট আসিল—যাহাকে আমরা খুব ভালবাসি, সে মরিয়া গেল। যাহার উপর মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম—যাহার জন্য সমুদয় জগৎকে, এমন কি নিজের ভাইকে পর্যন্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, যাহার জন্য ভয়ানক কার্য করিয়াছি, সে মরিয়া গেল, তখন হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল, হয়তো অন্তরাত্মার বাণী শোনা গেল—'তারপর কি?' যে ছেলের জন্য মানুষ সকলকে প্রতারণা করিল, নিজেও কখনও ভাল করিয়া খাইল না, সে হয়তো মারা গেল—সেই আঘাতে মানুষ জাগিয়া উঠে। যে-স্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য মানুষ উন্মত্ত বৃষের মত সকলের সহিত লড়াই করিয়াছিল, যাহার নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারের জন্য সে টাকা জমাইতেছিল, সেই স্ত্রী একদিন হঠাৎ মরিয়া গেল, তারপর? কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মৃত্যুতে কোন আঘাত বোধ হয় না; কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই যখন কোন জিনিষ হাত ফসকাইয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা বলিয়া থাকি—এর পর কি? ইন্দ্রিয়ের প্রতি আমাদের এমনই দারুণ আসক্তি! ইহারই জন্য আমরা কষ্ট পাই। আপনারা শুনিয়াছেন—জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতেছিল, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সে একটা খড়ের কুটা ধরিয়াছিল। সাধারণ মানুষও প্রথমে ঐরূপ সামনে যাহা পায় তাহাই ধরিয়া থাকে; আর যখন ব্যর্থ হয়, তখনই বলিয়া থাকে—কে আছ, আমায় রক্ষা কর, সাহায্য কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে মানুষকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এই ভক্তিযোগ কিন্তু একটি ধর্ম-সাধনা। আর ইহা বহুর জন্য নয়; তাহা হওয়াই অসম্ভব। নতজানু হওয়া, ওঠ-বস-করা—এ-সব

কসরৎ সর্বসাধারণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম অতি অল্প লোকের জন্য। সকল দেশেই হয়তো মাত্র কয়েক শত লোক যথার্থ ধার্মিক হইতে পারে বা হইবে। অপরে ধর্ম করিতে পারে না, কারণ তাহারা জাগরিত হইবে না—তাহারা ধর্ম চায়ই না। প্রধান কথা হইতেছে— ভগবানকে চাওয়া। আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সবকিছুই চাই; কারণ আমাদের সাধারণ অভাবগুলি বাহ্য জগৎ হইতেই পূর্ণ হইয়া যায়। কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনমতে পূর্ণ হয় না তখনই আমরা অন্তর্জগৎ হইতে—ঈশ্বর হইতে আমাদের অভাব পূরণ করিতে চাই। যতদিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন আমাদের থাকিতে পারে না। কেবল যখন আমরা এখানকার বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত, এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাই, তখনই আমরা ঐ অভাবপূরণের জন্য ইন্দ্রিয়জগতের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, কেবল তখনই উহা মিটাইবার তাগিদ হয়। যত শীঘ্র পার, এই সংসারের ছেলেখেলা শেষ করিয়া ফেলো, তবেই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ করিবে, তখনই ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইবে।

এক-রকম ধর্ম আছে—উহা ফ্যাশন বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়তো যথেষ্ট আসবাব আছে; এখানকার ফ্যাশন—একটি জাপানী পাত্র (vase) রাখা, অতএব হাজার টাকা দাম হইলেও ঐ পাত্র একটি অবশ্যই চাই। এইরূপ অল্পস্বল্প ধর্মও চাই—একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নয়। ইহাকে প্রকৃত 'ব্যাকুলতা' বলে না। তাহাকেই বলে ব্যাকুলতা, যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। বায়ু চাই, খাদ্য চাই, কাপড় চাই; এগুলি ব্যতীত আমরা জীবনধারণ করিতে পারি না। মানুষ যখন কোন নারীকে ভালবাসে, তখন সময় সময় সে এরূপ বোধ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারে না, যদিও ইহা তাহার ভ্রম। স্বামী মরিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী মনে করে—স্বামীকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু দেখা যায়—সে তো ঠিক বাঁচিয়াই থাকে। আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, আর বাঁচিব না, কিন্তু তবু তো ঠিক বাঁচিয়া আছি; প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্য—যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, তাহাকেই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায়; হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানের ঐরূপ অভাব বোধ করিব, অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, যখন আমরা এই জগতের—সমুদয় জড়শক্তির অতীত কিছুর জন্য অভাব বোধ করিব, তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব। যখন আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞানমেঘ সরিয়া যায়, আমরা সেই সর্বাতীত সত্তার একবার মাত্র চকিত দর্শন লাভ করি, সেই মুহূর্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় বোধ হয়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মূল্য কতটুকু? তখনই আত্মার বিকাশ হয়, ভগবানের অভাব অনুভূত হয়; তখন এমন বোধ হয় যে, তাঁহাকে পাইতেই হইবে।

সুতরাং ভক্ত হইবার প্রথম সোপান এই জিজ্ঞাসা—আমরা কি চাই? প্রত্যহ নিজ মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ঈশ্বরকে চাই? আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাশক্তি, উচ্চতম মেধা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা এই প্রেম লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহার নিকটই ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন।৮ ভালবাসা সর্বদাই পারস্পরিক, প্রতিবিম্বের মত; আপনি আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন এবং আমি আপনাকে ভালবাসিতে গেলে আপনি আমাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তবু যদি আমি আপনাকে ভালবাসিতে যাই, তবে এক মাসে হউক, এক বৎসরে হউক, আপনি আমাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইবেন। মনোজগতে ইহা একটি সর্বজনবিদিত ঘটনা। ভগবান্ যাহাকে ভালবাসেন, সেও ভগবানকে ভালবাসে, সে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরে। প্রেমিকা স্ত্রী যেভাবে তাহার মৃত পতির চিন্তা করে, পুত্রগণকে আমরা যেভাবে ভালবাসিয়া থাকি, ঠিক সেইভাবে আমাদিগকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করিব। এই-সব বই, এই-সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। বই পড়িয়া আমরা তোতাপাখি হই, বই পড়িয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রেমের একটি অক্ষর পাঠ করিয়াছে, সে-ই প্রকৃত পণ্ডিত। অতএব প্রথমেই আমাদের চাই—সেই আকাঙ্ক্ষা বা ব্যাকুলতা।

প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ভগবানকে চাই? যখন আমরা ধর্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করি, বিশেষতঃ যখন আমরা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন নিজ নিজ মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। অনেক সময় দেখি, আমি তো ভগবানকে চাই না, বরং তদপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যই ভালবাসি। এক টুকরো রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি; অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা একটা হীরার পিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন! ভগবানের জন্য তাঁহাদের সে ব্যাকুলতা নাই। এই বিশ্বজগতে যিনি একমাত্র সত্য বস্তু, তাঁহাকে তাঁহারা জানেন না। আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে—'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।' গরীবের খড় লুট করিয়া অথবা পিঁপড়ে মারিয়া কি হইবে? অতএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগবানকেই ভালবাসুন। সংসারের এ-সব জিনিষ ভালবাসিয়া কি হইবে? আমি স্পষ্টবাদী মানুষ—তবে আমার উদ্দেশ্য ভাল; আমি সত্য কথা বলিতে চাই, আমি আপনাদের তোষামোদ করিতে চাই না, ঐরূপ করা আমার কাজ নয়। ঐরূপ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি শহরের ভাল জায়গায় শৌখিন লোকের উপযোগী একটা চার্চ খুলিয়া বসিতাম। তোমরা আমার সন্তানের মত—আমি তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে চাইঃ এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই এই সত্য লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতীত এই সংসারের বাহিরে যাওয়ার আর অন্য উপায় নাই। তিনি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই জগৎই জীবনের চরম লক্ষ্য—এরূপ ধারণাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই জগতের—এই দেহের একটা নিজস্ব মূল্য আছে, এবং উহা গৌণ। এগুলি উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বরকে সংসারসুখ-লাভের উপায়স্বরূপ করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, লোকে উপাসনা-স্থলে গিয়া প্রার্থনা করিতেছে—ভগবান্, আমার রোগ সারাইয়া দাও; ভগবান্, আমায় ইহা দাও, উহা দাও। তাহার সুন্দর সুস্থ দেহ চায়— যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে যে, একজন কেহ কোন স্থানে বসিয়া আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ঐ কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, সেই হেতু তাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধর্মের এরূপ ধারণা অপেক্ষা নাস্তিকতা ভাল। আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বৎসর সাধনা করিয়াও আমরা এই আদর্শে উপনীত হইতে পারিব কিনা জানি না, কিন্তু এটিকেই সর্বোচ্চ আদর্শ করিতে হইবে—আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকেও উচ্চতম বস্তু লাভের চেষ্টায়

নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছানো না যায়, অন্ততঃ কিছুদূর পর্যন্ত তো যাওয়া যাইবে। ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার জন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হইবে।

ভক্তির আচার্য—সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ

সকল আত্মাই বিধাতার নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, চরমে সকল প্রাণীই সেই পূর্ণাবস্থা লাভ করিবে। অতীতে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করিয়াছি অথবা যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আমাদের বর্তমান অবস্থা তাহারই ফলস্বরূপ, আর এখন যেরূপ কার্য বা চিন্তা করিতেছি তদনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। এই কঠোর কর্মবাদ সত্য হইলেও ইহার মর্ম এই নয় যে, আত্মোন্নতি-সাধনে অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মা হইতে শক্তিসঞ্চার দ্বারাই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ বাহিরের সহায়তা একান্তই প্রয়োজন। বাহির হইতে প্রেরণা শক্তি আসিয়া যখন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর কার্য করিতে থাকে, তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয় —মানুষের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানুষ পরমশুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়।

বাহির হইতে যে-শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। এক আত্মা অপর আত্মা হইতেই শক্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কিছু হইতে নয়। আমরা সারা জীবন বই পড়িতে পারি, খুব বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণামে দেখিব—আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধি খুব উন্নত ও বিকশিত হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই; বরং আমরা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে।

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখনও কখনও ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব—উহাতে আমাদের বুদ্ধিই কিছুটা সাহায্য পাইয়াছে মাত্র, আত্মার কিছুই হয় নাই। এই জন্যই আমরা প্রায় সকলেই ধর্মসম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারি, অথচ ধর্মানুযায়ী জীবন-যাপনের সময় অনুভব করি—আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা। ইহার কারণ—আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্য বাহির হইতে যে শক্তির প্রয়োজন, পুস্তক হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি সঞ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে, এবং যাহাতে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে 'শিষ্য' বলে। এই শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যাঁহার নিকট হইতে শক্তি আসিবে, তাঁহার সঞ্চার করিবার মত শক্তি থাকা আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাহারও উহা গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সজীব হওয়া আবশ্যক, ক্ষেত্রও সুকৃষ্ট হওয়া চাই; এবং যেখানে এই দুইটি শর্ত পূর্ণ হইয়াছে, সেখানেই ধর্মের অপূর্ব বিকাশ হইয়া থাকে। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'—ধর্মের বক্তাও অলৌকিক-গুণসম্পন্ন, আর শ্রোতাও তদ্রূপ।

৯

আর যখন প্রকৃতপক্ষে উভয়েই অলৌকিক-গুণসম্পন্ন এবং অসাধারণ-প্রকৃতির হন, তখনই চমৎকার আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা যায়, নতুবা নয়। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ গুরু এবং ঐরূপ ব্যক্তিই যথার্থ শিষ্য—অপরে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে একটু জানিবার চেষ্টা—একটু সামান্য কৌতূহল হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মের বহিঃসীমায় দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে সবই হইয়া থাকে। কালে এই-সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যথার্থ ধর্মপিপাসা জাগ্রত হইতে পারে। আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্যময় নিয়ম যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বীজ আসিবেই আসিবে, জীবাত্মার যখনই ধর্মের প্রয়োজন হইবে, তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক গুরুও অবশ্যই আসিবেন। কথায় বলে—'যে পাপী পরিত্রাতাকে খুঁজিতেছে, পরিত্রাতাও খুঁজিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার করেন।' গ্রহীতা আত্মার আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ক হয়, তখন উহা যে শক্তিকে খুঁজিতেছে, তাহা অবশ্য আসিবে।

তবে পথে বড় বড় বিপদ আছে। গ্রহীতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে ভালবাসি; সে মরিয়া গেল, মুহূর্তের জন্য আঘাত পাইলাম। বোধ হইল—সমুদয় জগৎটা জলের মত আঙুল দিয়া গলিয়া যাইতেছে। তখন আমরা ভাবি, এই অনিত্য সংসার হইতে উচ্চতর বস্তুর সন্ধান করিতে হইবে; আর মনে করি—আমরা ধার্মিক হইতেছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মন হইতে সেই ভাব-তরঙ্গ চলিয়া গেল; আমরা যেখানেই ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্মপিপাসা বলিয়া ভুল করি। কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব, ততদিনই সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনবোধ আসিবে না এবং আমরা শক্তিসঞ্চারকের সাক্ষাৎ লাভও করিতে পারিব না।

অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি যে, আমরা সত্যলাভের জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহা লাভ হইতেছে না, তখন ঐরূপ বিরক্তিপ্রকাশের পরিবর্তে আমাদের প্রথম কর্তব্য—নিজ নিজ অন্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা, আমরা যথার্থই সত্যবস্তু চাই কিনা। তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিব—আমরাই ধর্মলাভের উপযুক্ত নই, আমরা উহা চাই না; অধ্যাত্মতত্ত্বলাভের জন্য এখনও আমাদের পিপাসা জাগে নাই। শক্তিসঞ্চারকের সম্বন্ধে আরও অনেক বাধাবিঘ্ন।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যদিও স্বয়ং অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, তথাপি অহঙ্কারবশতঃ নিজেদের সবজান্তা মনে করে, আর

শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে 'অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় উভয়েই খানায় গিয়া পড়ে'।

১০

পৃথিবী এইরূপ মানুষেই পূর্ণ; সকলেই গুরু হইতে চায়। এ যেন ভিখারীর লক্ষমুদ্রাদানের প্রস্তাবের ন্যায়। এই ভিক্ষুক যেমন হাস্যাস্পদ হয়, ঐ গুরুরাও তেমনি।

তবে গুরুকে চিনিব কিরূপে? প্রথমতঃ সূর্যকে দেখিবার জন্য মশালের প্রয়োজন হয় না—বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে, সূর্য উঠিয়াছে, আমাদের কল্যাণার্থে যখন কোন লোকগুরুর আবির্ভাব হয়, তখন আত্মা স্বভাবতই বুঝিতে পারে, সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। সত্য স্বতঃসিদ্ধ—উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না—উহা স্বপ্রকাশ, উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম দেশে পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

অবশ্য এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যগণের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমরাও সকলে এতটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নই যে, আমরা যাঁহার নিকট শক্তি- লাভের জন্য যাইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব—সেইজন্য কতকগুলি পরীক্ষা প্রয়োজন। শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা চাই, তেমনি গুরুরও লক্ষণ আছে।

শিষ্যের থাকা চাই—পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অপবিত্র ব্যক্তি কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। পবিত্রতাই শিষ্যের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ। সর্বপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রয়োজন—যথার্থ জ্ঞানপিপাসা। ধর্ম চায় কে? এই তো প্রশ্ন। সনাতন বিধানই এই, আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। যে চায়—সে পায়। ধর্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ; আমরা সাধারণতঃ উহাকে যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। তারপর আমরা তো সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে, ধর্মের কথা শুনিলেই বা ধর্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম হয় না; যতদিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা—নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম। এ দু-এক দিনের বা কয়েক বৎসর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়, হয়তো প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে। ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম লাভ হইতে পারে, অথবা শত শত জন্মেও লাভ না হইতে পারে, তথাপি আমাদিগকে উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে শিষ্য এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্মসাধনে অগ্রসর, সেই কৃতকার্য হয়।

গুরু সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরান ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে—কিন্তু ওগুলি তো কেবল শব্দরাশি, বাহ্য পদ্ধতি, ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব—ধর্মের শুষ্ক কাঠামো মাত্র। ধর্মাচার্য হয়তো গ্রন্থবিশেষের রচনাকাল নিরূপণ করিতে পারেন, কিন্তু শব্দ তো ভাবের বাহ্য আকৃতি বৈ আর কিছুই নয়। যাহারা শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে, এবং মনকে সর্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণ্যস্বরূপ—চিত্তভ্রমণের কারণ, মন ঐ শব্দজালের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না।

১১

বিভিন্ন প্রকারের শব্দযোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা, কথা বলিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্র বাখ্যা করিবার নানা উপায়, এ শুধু পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাহাতে কখনও মুক্তিলাভ হয় না।

১২

তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উৎসুক—যাহাতে সকলে তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। আপনারা দেখিবেন, জগতে কোন শ্রেষ্ঠ আচার্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকার্থ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টাও করেন নাই, তাঁহারা বলেন নাই, এই শব্দের এই অর্থ আর এই শব্দ এবং ঐ শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবন ও বাণী পাঠ করুন, দেখিবেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। তথাপি তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাঁহারা একটি শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন্ ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কিরূপে ঘুমাইত—এই সম্বন্ধে তিনখণ্ড এক গ্রন্থ লিখিলেন।

আমাদের গুরুদেব একটি গল্প বলিতেনঃ কয়েকজন লোক আমবাগানে গিয়াছিল; তাদের মধ্যে অধিকাংশই গনিতে লাগিল—কটা আমগাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা, পাতার কি রঙ, ডালগুলি কত বড়, কত শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি। এ-সব লিখিয়া লইয়া নানারকম আশ্চর্য আলোচনা করিতে লাগিল। আর একজন—সেই বেশী বুদ্ধিমান্—বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়া আম পাড়িয়া খাইতে লাগিল। অতএব এই ডালপালা ও পাতা গোনা ছাড়িয়া দাও। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এ-সব কর্মের উপযোগিতা আছে, কিন্তু এখানে—এই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়। ঐরূপ কার্যের দ্বারা কেহ কখনও আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। এই-সব 'পাতাগোনা' দলের ভিতর কি আপনারা কখনও একজনও ধর্মবীরকে দেখিয়াছেন? ধর্মই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ গৌরব; উহা আবার সর্বাপেক্ষা সহজ—উহাতে পাতাগোনা বা হিসাব করার মত ঝামেলার কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে চান, তবে কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম হয়—বেথলিহেমে বা

জেরুজালেমে, তিনি কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন্ তারিখে 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন, এ-সব জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ঐ উপদেশগুলি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই যথেষ্ট। কখন ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দুই হাজার শব্দের একটি প্রবন্ধ পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ-সব পণ্ডিতদের আমোদের জন্য—তাঁহারা উহা লইয়া আনন্দ করুন। তাঁহাদের কথায় 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া আসুন—আমরা 'আম খাই'।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র—তিনি কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহা বলেন তাহা লইয়া কাজ করিলেই হইল।' এ-কথা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রেরই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; সে অনায়াসে উহা শিক্ষা দিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা কেবল বুদ্ধিবিষয়ক বলিয়া বুদ্ধিজাত শক্তির উপর নির্ভর করে; এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার কিছুমাত্র বিকাশ না থাকিলেও একজনের দারুণ-বুদ্ধিশক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানে—যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, তাহার হৃদয়ে কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক আলোক প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। সে কি শিক্ষা দিবে? সে তো নিজেই কিছু জানে না। চিত্তের শুদ্ধিই আধ্যাত্মিক সত্য। 'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন'— এই একটি বাক্যের মধ্যেই ধর্মের সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত। যদি আপনি এই একটি কথা শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্মসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু কথিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে-সবই আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা ঐ একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ একটিমাত্র বাক্যই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন বা সেই সর্বাতীত তত্ত্বের চকিত দর্শন অসম্ভব। অতএব গুরুর 'পবিত্রতা'রূপ এই একটি গুণ থাকিতেই হইবে, প্রথমে দেখিতে হইবে—তিনি কি প্রকারের মানুষ; তারপর শুনিতে হইবে, তিনি কি বলেন। লৌকিক বিদ্যার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে অবশ্য এ-কথা খাটে না। তাঁহারা কি চরিত্রের লোক, ইহা জানা অপেক্ষা তাঁহারা কি বলেন, এইটি জানা আমাদের বেশী প্রয়োজন। ধর্মাচার্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে, তিনি কিরূপ চরিত্রের মানুষ, তবেই তাঁহার কথার একটা মূল্য হইবে; তিনি যে শক্তিসঞ্চারক। যদি তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কী সঞ্চার করিবেন? গুরুর মনে এক প্রকার স্পন্দন রহিয়াছে, শিষ্যের মনে তিনি উহা সঞ্চার করিয়া দেন। একটি উপমা দেওয়া যাক। যদি এই আধারে অগ্নি থাকে, তবেই উহা তাপ সঞ্চার করিতে পারে, নতুবা পারে না। ইহা একজন হইতে আর একজনের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের কথা—কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজিত করা নয়। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে—উহা প্রথমে বীজরূপে আসিয়া ক্রমশঃ বৃহৎ বৃক্ষাকারে বর্ধিত হইতে থাকে। অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে—গুরুর উদ্দেশ্য কি। দেখিতে হইবে—তিনি যেন নাম যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন; কেবল ভালবাসা—শিষ্যের প্রতি অকপট ভালবাসার জন্যই যেন তিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। গুরু হইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালবাসার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হইতে পারে। অপর কোন মাধ্যমের দ্বারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোন প্রকার লাভ বা নামযশের আকাঙ্ক্ষারূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিসঞ্চারক মাধ্যম নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সব কিছু করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

যখন দেখিবে—গুরুর এই গুণগুলি আছে, তখন আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় বিপদ আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে সময় সময় কুভাব সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব স্বভাবতই বোধ হইতেছে, যে- কোন ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পার না। নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ

১৩

অলঙ্কার-হিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ সত্যের এক কণাও প্রচার করিতে পারে না। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে?—প্রকৃত গুরুর জ্ঞানালোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হইয়াছে; হৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে নদী-প্রস্তর চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে—ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে শুধু নদী ও প্রস্তরই দেখিবে। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাওয়া বৃথা; আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন-উন্মীলনকারী। অতএব পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ এবং শিষ্য তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তান বা উত্তরাধিকারী। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে কথা বলা বেশ ভাল বটে, কিন্তু নম্রতা বিনয় আজ্ঞাবহতা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম হইতে পারে না। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ এখনও বর্তমান, কেবল সেখানেই বড় বড় ধর্মবীরের জীবন বিকশিত হয়, কিন্তু যে সমাজে এইরূপ সম্বন্ধ বিসর্জিত হইয়াছে, সেখানে ধর্ম চিত্তবিনোদনের একটি উপায়মাত্রে পরিণত হইয়াছে। যে-সকল জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর, গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, ধর্ম সেখানে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। গুরুশিষ্যের ভিতর ঐরূপ ভাব ব্যতীত ধর্ম আসিতেই পারে না। প্রথমতঃ শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই; দ্বিতীয়তঃ যাহার ভিতরে সঞ্চারিত হইবে এমনও কেহ নাই—কারণ সকলেই যে স্বাধীন! কাহার নিকট হইতে তাহারা শিখিবে? আর কেহ শিখিতে আসিলেও সে জ্ঞান ক্রয় করিতে আসে—বলেঃ আমাকে এক টাকার ধর্ম দাও। আমরা কি আর এজন্য এক টাকা খরচ করিতে পারি না?—এভাবে ধর্মলাভ করা যায় না।

১৪

; গুরুর মাধ্যমে উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। সিদ্ধ যোগী হইলে ঐ জ্ঞান আপনা-আপনি আসিয়া থাকে, গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না! যতদিন না গুরুলাভ করিতেছ, ততদিন পৃথিবীর চার কোণে মাথা খুঁড়িয়া আসিতে পার, অথবা হিমালয়, আল্পস্ বা ককেসস্ পর্বত অথবা গোবি বা সাহারা মরুভূমিতে বা সাগরের তলদেশেও যাইতে পার, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। গুরু লাভ কর; সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, সেইভাবে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর। গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে, তারপর ধ্যান যতই প্রগাঢ় হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার বাহ্যরূপ আর দেখা যায় না, তখন সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বিরাজমান। যাঁহারা এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব লইয়া সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হন, সত্যের ভগবান্ তাঁহাদের নিকট অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। 'পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।'

১৫

যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, সেই স্থানই পবিত্র! যিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কতদূর পবিত্র! আর যাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কত গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সমীপে যাওয়া উচিত! এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ গুরু একটিও থাকেন না—এমন কখনও হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরু-বিরহিত হইবে, সেই মুহূর্তেই উহা ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানবজীবনের সুন্দরতম বিকাশ—তাঁহারা আছেন বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। তাঁহাদের শক্তিতেই সমাজ-বন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—এই পৃথিবীর খ্রীষ্টতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা গুরুরও গুরু—স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ। তাঁহারা পূর্বোক্ত গুরুগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি শুধু ইচ্ছামাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহূর্তের মধ্যে সাধুতে পরিণত হয়। তাঁহারা কিরূপে ইহা করিতেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই? আমি যে-সকল গুরুর কথা বলিতেছিলাম, এই গুরুগণ তাঁহাদের মত নন, ইঁহারা ঐ-সকল গুরুরও গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপে আমরা ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারি না। তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, একমাত্র তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।

অবতারের মধ্যে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবে ব্যতীত অন্যরূপে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে তাঁহার এক ভয়ানক বিকৃত রূপই গড়িয়া থাকি। ভারতের চলিত কথায় বলে, এক মূর্খ শিব গড়িতে গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি বানর গড়িয়াছিল। যখনই ঈশ্বরের মূর্তি গড়িবার চেষ্টা করি, তখনই আমরা তাঁহাকে বিকৃত করিয়া তুলি, কারণ যতক্ষণ আমরা মানব, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে মানব অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মানবপ্রকৃতি অতিক্রম করিব এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব। কিন্তু যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মানুষরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলো না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্যরূপে দেখিতে পাইবে না। আমরা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তিতা দিতে পারি, খুব যুক্তিবাদী হইতে পারি, প্রমাণ করিত পারি যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই-সকল পৌরাণিক গল্প একেবারে অর্থহীন, কিন্তু একবার সহজ বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক—ঐ অসাধারণ বুদ্ধির পশ্চাতে কি আছে? উহা শূন্য, খানিকটা বুদ্বুদ মাত্র। অতঃপর যখনই দেখিবে, কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বর-পূজার বিরুদ্ধে খুব জোর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করঃ ঈশ্বর-সম্বন্ধে আপনার কী অনুভূতি? 'সর্বশক্তিমত্তা', 'সর্বব্যাপিতা', 'সর্বব্যাপী প্রেম' ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐগুলির বানান ছাড়া আর বেশী কি বোঝেন? সে কিছুই বোঝে না, সে ঐ শব্দগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ভাবই বোঝে না। রাস্তার যে লোকটি একখানি বইও পড়ে নাই, তাহা অপেক্ষা সে কোন অংশে উন্নত নয়। তবে রাস্তার লোকটি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি—সে সংসারের শান্তিভঙ্গ করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় সকলে ব্যতিব্যস্ত। তাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মানুভূতি নাই, উভয়ে এক ভূমিতেই অবস্থিত।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম; শুধু কথা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করিতে হইবে। আত্মাতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষানুভূতি। সর্বব্যাপী পুরুষ বলিতে কি বোঝায়? মানুষের তো নিরাকার আত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই—তাহার সম্মুখে যে-সব আকৃতিমান্ বস্তু সে দেখে, সেইগুলি দিয়াই তাহাকে আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল আকাশ বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সমুদ্র বা একটা বিরাট কিছুর চিন্তা করিতে হয়। তা-ছাড়া সে আর কিরূপে ঈশ্বরচিন্তা করিবে? তুমিই বা কি করিতেছ? তুমি সর্বব্যাপিতার কথা বলিতেছ, অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র? অতএব সংসারের এই-সব বৃথা তর্কযুক্তি কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হউক—আমরা সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। আর এই সাধারণ জ্ঞানের মত দুর্লভ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। এ পৃথিবীতে বড় বেশী কথা ও আলোচনা!

আমাদের বর্তমান গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে আমরা সীমাবদ্ধ, আমরা ভগবানকে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য। মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহদাকার মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এক বৃহৎ মৎস্যরূপেই ভগবানের ধারণা করিতে হইবে, মানুষ যদি ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে চায়, তবে তাহাকে মানুষরূপেই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে, আর এগুলি শূন্য কল্পনা নয়। তুমি, আমি, মহিষ, মৎস্য—ইহাদের প্রত্যেকে যেন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গেল; মানবরূপ

পাত্রে ঐ জল মানবাকার, মহিষপাত্রে মহিষাকার ও মৎস্যপাত্রে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেকটি পাত্রে জল ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও ঐ কথা। ঈশ্বরকে—মানুষ মানুষরূপই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দেখে। যে যার নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। কেবল এইভাবেই তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে মানুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনাই করিতে হইবে, কারণ ইহা ছাড়া আর পথ নাই।

দুই প্রকার ব্যক্তি ভগবানকে মানুষভাবে উপাসনা করে না, পশুপ্রকৃতির মানব—যাহার কোন ধর্মই নাই, আর পরমহংস—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি মানবভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ-মনের বোধ দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনও নাই, শরীরবোধও নাই—তিনিই যীশু ও বুদ্ধের মত ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপেই উপাসনা করিতে সমর্থ, তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করেন না। আর অপর প্রান্তে পশুভাবাপন্ন মানব। আপনারা জানেন, দুই বিপরীত প্রান্ত চরমে কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই দুই অবস্থায় কেহ কাহারও উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে না, মন বুদ্ধি যতটা বিকশিত হইলে উপাসনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, ততটা তাহাদের হয় নাই; জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন; তাঁহারাও উপাসনা করেন না। তাঁহারা আর কাহার উপাসনা করিবেন? ঈশ্বর কখনও ঈশ্বরের উপাসনা করেন না। এই দুই প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ বলে, সে মনুষ্যরূপে ভগবানের পূজা করিবে না, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। সে যে কী বলিতেছে, তাহার মর্ম সে নিজেই জানে না; সে ভ্রান্ত, তাহার ধর্ম অসার চিন্তা, শুধু বৃথা বুদ্ধির কারসাজি।

অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপে উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। আর যে-সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর, তাহারা ধন্য। খ্রীষ্টানদের পক্ষে খ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব তাঁহারা খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখুন—তাঁহারা যেন কখনই খ্রীষ্টকে না ছাড়েন। ভগবদ্দর্শনের স্বাভাবিক উপায়—মানুষে ঈশ্বরদর্শন। আমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সমুদয় ধারণাই এরূপ দেব-মানবে বর্তমান। খ্রীষ্টানদের এটি বিশেষ ত্রুটি যে, তাঁহারা খ্রীষ্ট ব্যতীত ভগবানের অন্যান্য অবতার মানেন না। খ্রীষ্ট ভগবানের বিকাশ ছিলেন, বুদ্ধও তাই ছিলেন, এরূপ আরও শত শত হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও 'ইতি' করিবেন না, ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন করা উচিত মনে করেন, খ্রীষ্টকেও তাহা নিবেদন করুন। তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে না, তিনি সর্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। খ্রীষ্টানরা যে প্রার্থনা করিবার সময় 'খ্রীষ্টের নামে' বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, ইহা খুব ভাল; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া কেবল খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করার প্রথা প্রচলিত হইলে আরও ভাল। ঈশ্বর মানবের দুর্বলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ ধারণ করেন। 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি।'

১৬

'জগতের সর্বশক্তিমান্ বা সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে ভগবান্ আবার কিরূপে মানব-রূপ ধরিবেন।'

১৭

তাহাদের মন আসুরিক, অজ্ঞানমেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। এই মহান্ ঈশ্বরাবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, তাঁহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং তাঁহাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। খ্রীষ্টের উপাসনা করিতে হইলে তিনি যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সেইভাবে উপাসনা করিব। তাঁহার জন্মদিনে আমি ভোজের আনন্দ না করিয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সদৃশ করিয়া লন। আমাদের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, তাঁহাদের মত হইয়া যায়।

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শূন্যে বিচরণকারী ভূত-প্রেতাদির সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। কি অন্যায়! খ্রীষ্ট ভূত-প্রেত-নামানোর দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি এই দেশে (আমেরিকায়) এ-সব বুজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের অবতারগণ এইভাবে আসেন না, তাঁহাদের স্পর্শের ফল মানুষের মধ্যে অন্যভাবে প্রকটিত হইবে। খ্রীষ্টের স্পর্শে মানুষের সমগ্র আত্মাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টভাবেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে—তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিচ্ছুরিত হইবে। রোগ-আরোগ্যকরণে বা অন্যান্য অলৌকিক কার্যে খ্রীষ্টের কতটুকু শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি নিম্নাধিকারী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলিয়া ঐ ছোটখাটো বিস্ময়ের কার্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ-সকল অদ্ভুত কার্য কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?—য়াহুদীদের মধ্যে; আর তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথাও ঐগুলি অনুষ্ঠিত হয় নাই?—ইওরোপে! ঐ-সব অদ্ভুত কার্য য়াহুদীদের ভিতর অনুষ্ঠিত হইল—আর তাহারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিল। এবং তাঁহার 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) ইওরোপে প্রচারিত হইল, সেখানে উহা গৃহীত হইল। মানুষ চিন্তাশীল—যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিল এবং যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য করায় বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্যে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব নয়—একটা মহা মূর্খও ঐ-সব করিতে পারে। তাহারাও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে, পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরের রোগ সারাইতে পারে। আমি দেখিয়াছি—অতি ভয়ানক অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য করিয়াছে, তাহারা মাটি হইতে ফল উৎপন্ন করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি অনেক মূর্খ ও পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, অনেক মূর্খ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভয়ানক রোগ সারাইয়া দিয়াছে। এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি পৈশাচিক শক্তি। খ্রীষ্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক; তাঁহার সর্বশক্তিমান্ বিরাট প্রেম ও

তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ চিরকাল রহিয়াছে, চিরকাল থাকিবে। লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহাদিগকে নীরোগ করিতেন—এ-কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন, 'পবিত্রাত্মারা ধন্য'—এ-কথা মানুষ ভুলিতে পারে না, এ-কথা আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যতদিন মানুষের মন থাকিবে, ততদিন ঐ বাক্যগুলি অফুরন্ত মহাশক্তির ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে। যতদিন মানুষ ঈশ্বরের নাম না ভুলিয়া যায়, ততদিন ঐ বাক্যগুলি থাকিবে—ঐগুলির শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিবে, কখনই থামিবে না। যীশু এই শক্তিলাভেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, এই শক্তি তাঁহার ছিল—ইহা পবিত্রতার শক্তি—আর বাস্তবিকই ইহা যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীষ্টকে উপাসনা করিবার সময়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কি চাহিতেছি। অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনের হাস্যকর ব্যাপার নয়, আত্মার অদ্ভুত শক্তি আমাদের চাহিতে হইবে—যাহা মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক দূর করে এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়।

প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা

ভক্তি দুই প্রকার—প্রথমটি বৈধী বা আনুষ্ঠানিক ভক্তি, অপরটি মুখ্যা বা পরা ভক্তি। 'ভক্তি' শব্দে অতি নিম্নতম হইতে উচ্চতম উপাসনা পর্যন্ত বুঝায়। পৃথিবীতে যে-কোন দেশে বা যে-কোন ধর্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় সকলের মূলে ভালবাসা। অবশ্য ধর্মের ভিতর অনেকটাই কেবল অনুষ্ঠান; আবার অনেক কিছু আছে, সেগুলি অনুষ্ঠানও নয়, ভালবাসাও নয়—তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। যাহা হউক, ঐ অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতিপথে সাহায্য করিবার জন্য এই বৈধী বা বাহ্য ভক্তি একান্ত আবশ্যক। মানুষ এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে—মনে করে, একেবারে লাফাইয়া সে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। শিশু যদি মনে করে, সে একদিনেই বড় হইয়া যাইবে, তবে সে ভ্রান্ত। আমি আশা করি, আপনারা সর্বদাই এই ভাবটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্মলাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি। আমরা সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর আছেন। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? কেহ বা বলিয়া থাকে, ঈশ্বর স্বর্গে আছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে ঈশ্বর দেখিয়াছে কিনা? সে যদি বলে, 'দেখিয়াছি'—আপনারা হাসিয়া উঠিবেন ও তাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের কাছেই ধর্ম একটা বুদ্ধিগত বিশ্বাস মাত্র—শুধু কতকগুলি মত মানিয়া লওয়া। ইহার বেশী তাহারা আর উঠিতে পারে না। আমি আমার জীবনে কখনও এরূপ ধর্ম প্রচার করি নাই, এবং উহাকে আমি ধর্ম নামই দিতে পারি না। ঐ প্রকার ধর্ম স্বীকার করা অপেক্ষা বরং নাস্তিক হওয়া ভাল। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম নির্ভর করে না। আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা আছেন। আত্মাকে কখনও দেখিয়াছেন কি? আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, অথচ আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না—ইহা কেমন কথা? আপনাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং আত্মদর্শনের কোন উপায় বাহির করিতে হইবে। নতুবা ধর্মসম্বন্ধে কথা বলা বৃথা। যদি কোন ধর্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ নিজ হৃদয়ে আত্মা, ঈশ্বর ও সত্য দর্শন করাইতে সমর্থ করিবে। এই-সব মতামত বা বিশ্বাসের কোন একটি লইয়া যদি আপনি ও আমি অনন্তকাল তর্ক করি, তথাপি আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। মানুষ তো যুগযুগান্ত ধরিয়া এরূপ তর্কযুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? বুদ্ধি তো সেখানে মোটেই পৌঁছিতে পারে না। আমাদিগকে বুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষানুভূতিই ধর্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা যে আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা উহা দেখিতেছি। যদি এক জায়গায় বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ঐ দেয়ালের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে থাকেন, তথাপি কোন কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখনই দেয়ালটি দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তখন যদি পৃথিবীর সব লোক আপনাকে বলে—ঐ দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের কথা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ আপনি জানেন যে, আপনার নিজের চক্ষুর সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতামত ও গ্রন্থরাশি অপেক্ষা বেশী।

আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদেরও অস্তিত্ব নাই। এরূপ কথা যাহারা বলে, আপনারা তাহাদের কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিশ্বাস করে না। তাহারা জানে যে, ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর অপেক্ষা বলবান্। ধার্মিক হইতে গেলে আপনাদিগকে প্রথমেই গ্রন্থ ফেলিয়া দিতে হইবে। বই যত কম পড়েন, ততই ভাল।

এক-একবারে একটা করিয়া কাজ করুন। বর্তমানকালে পাশ্চাত্যে অনেকের একটা ঝোঁক দেখা যায়—তাহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার ভাব লইয়া খিচুড়ি পাকাইতেছে, সর্বপ্রকার ভাবের বদহজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলোমেলো অসম্বন্ধ গোলমাল সৃষ্টি করে; সেগুলি যে স্থির হইয়া একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহারও সুযোগ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানবিধ ভাবগ্রহণ একপ্রকার রোগ হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু ইহাকে আদৌ ধর্ম বলিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ চায় খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনা। তাহাদিগকে ভূতের কথা বলুন, কিংবা উত্তরমেরু বা অন্য কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদ্বয়যুক্ত বা অন্য কোন অদ্ভুত আকারধারী মানুষের কথা বলুন, যাহারা অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা ছমছম করিয়া উঠে। এই-সব বলিলেই তাহারা খুশী হইয়া বাড়ি যাইবে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই তাহারা আবার নূতন উত্তেজনা খুঁজিবে। কেহ কেহ ইহাকেই ধর্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাতুলালয়-গমনের পথ—ধর্মলাভের নয়। এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ভাবের স্রোত চলিতে থাকিলে এই দেশ একটা বিরাট বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। দুর্বল ব্যক্তি কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, আর এই-সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। অতএব ও-সব দিকেই যাইবেন না। ওগুলি কেবল মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়, মস্তিষ্কে তালগোল পাকাইয়া দেয়, মনকে দুর্বল করিয়া অন্তরাত্মাকে নীতিভ্রষ্ট করে; ফলে মানুষ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম—মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপে বিদ্যা অর্জন করা নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়া। 'চুরি করিও না'—এই উপদেশ সকলেই জানে। কিন্তু তাহাতে কি হইল? যে ব্যক্তি চুরি করে না, সেই ইহার তত্ত্ব জানিয়াছে। 'অপরকে হিংসা করিও না'—এই উপদেশ সকলেই জানে। কিন্তু তাহার মূল্য কি? যাহারা হিংসা করে না, তাহারাই অহিংসাতত্ত্ব জানিয়াছে, এবং ঐ আদর্শের উপর নিজদের চরিত্র গঠন করিয়াছে।

অতএব আমাদিগকে ধর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে, আর এই ধর্ম উপলব্ধি করা একটি সুদীর্ঘ সাধনার ব্যাপার। জগতের প্রত্যেক পুরুষই মনে করে—তাহার মত সুন্দর, তাহার মত বিদ্বান্, তাহার মত শক্তিমান্, তাহার মত অদ্ভুত আর কেহ নাই। প্রত্যেক

নারীও তেমনি নিজেকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মনে করে। আমি তো এমন একটি শিশুও দেখি নাই, যে অসাধারণ নয়। সকল জননীই আমাকে বলিয়া থাকেন, 'আমার ছেলেটি কি অসাধারণ!' মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। মানুষ যখন কোন অতি উচ্চ অনুভূতি বা অদ্ভুত বিষয়ের কথা শোনে, তখন মনে করে, অনায়াসেই উহা লাভ করিবে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও স্থির হইয়া ভাবে না যে, অনেক কঠোর চেষ্টা করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে। সকলে এক লাফে সেখানে উঠিতে চায়। উহা সর্বাপেক্ষা ভাল, অতএব উহা আমাদের চাই-ই। আমরা কখনও স্থির হইয়া চিন্তা করি না যে, উহা লাভ করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা, ফলে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। আপনারা কোন ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠাইতে পারেন না—আমাদের সকলকেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। অতএব ধর্মের প্রথম সোপান এই বৈধী ভক্তি বা নিম্নস্তরের উপাসনা।

নিম্নস্তরের উপাসনা কি কি? এই উপাসনা কি ও কতপ্রকার তাহা বুঝাইবার পূর্বে আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু 'সর্বব্যাপী' বলিতে কি বোঝেন? একবার চোখ বুঝিয়া ভাবুন—সর্বব্যাপিতা কি প্রকার! চোখ বুজিয়া আপনি কি দেখেন? হয় সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা, অথবা একটি বিস্তৃত প্রান্তরের কথা বা নিজেদের জীবনে অন্য যে-সব জিনিষ দেখিয়াছেন, সেগুলির কথাই আপনি চিন্তা করেন। যদি তাই হয়, তবে 'সর্বব্যাপী ভগবান্'—এই কথা বলিয়া আপনি কোন ভাবই ব্যক্ত করেন না। আপানার নিকট ঐ বাক্যের কোন অর্থ নাই। ভগবানের অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধেও এইরূপ। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি সম্বন্ধেই বা আমাদের কি ধারণা?—কিছুই নয়। ধর্ম অর্থে উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি; আর যখন আপনি ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আপনাকে ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তার পূর্বে ঐ শব্দের বানানটুকুই আপনি জানেন, আর কিছুই জানেন না। অতএব শিশুরা যেমন প্রথমে স্থূল কিছু অবলম্বন করিয়া শেখে, পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণা হয়, সেইরূপ উচ্চতম অনুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও প্রথমে স্থূল অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। 'পাঁচ দুগুণে দশ' বলিলে একটি ছোট ছেলে কিছু বুঝিবে না, কিন্তু যদি পাঁচটি করিয়া জিনিষ দুইবার লইয়া দেখানো যায়—মোট দশটি জিনিষ হইয়াছে, তাহা হইলে সে বুঝিবে। এই সূক্ষ্মের ধারণা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল লাভ হইয়া থাকে। এখানে আমরা সকলেই শিশুতুল্য; বয়সে বড় হইতে পারি এবং জগতের সব বই পড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ধর্মরাজ্যে আমরা শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষানুভূতির শক্তিই ধর্ম। বিভিন্ন মতামত, দর্শন বা নৈতিক মতবাদ লইয়া মস্তিষ্ক যতই পূর্ণ কর না কেন, তাহাতে ধর্ম জীবনে বড় কিছু আসে যায় না; নিজে কি হইলে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল, এইটির উপর ধর্মজীবন নির্ভর করে। আমরা মতামত ও শাস্ত্রাদি শিখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে কিছুই উপলব্ধি করি নাই। আমাদিগকে এখন নতূন করিয়া আবার স্থূল বস্তুর মাধ্যমে সাধন আরম্ভ করিতে হইবে—আমাদিগকে মন্ত্র, স্তবস্তুতি, অনুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে হইবে; এবং এইরূপ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সহস্র প্রকারের হইতে পারে।

সকলের পক্ষে এক প্রকার উপাসনা-প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কতক লোক মূর্তিপূজায় উপকৃত হইতে পারে, কতক লোক নাও হইতে পারে। কতক লোকের ক্ষেত্রে মূর্তির বাহ্যপূজার প্রয়োজন হইতে পারে, কাহারও বা শুধু মনের মধ্যেই ঐরূপ মূর্তি-চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনের ভিতর মূর্তির উপাসনা করে, সে বলে, 'আমি মূর্তিপূজক অপেক্ষা উন্নত; মূর্তিচিন্তা যখন অন্তরে করা হয়, তখনই ঠিক ঠিক উপাসনা হয়। বাহিরে মূর্তিপূজা করাই পৌত্তলিকতা, এরূপ ধর্মের বিরোধিতা করিব।' যখন কেহ মন্দির বা গির্জারূপ একটা সাকার বস্তু খাড়া করে, সে উহাকে পবিত্র মনে করে, কিন্তু মূর্তিটি মনুষ্যাকৃতি হইলেই সে উহা অতি ভয়াবহ মনে করে। অতএব স্থূলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার নানাবিধ সাধন প্রণালী আছে, এইগুলির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষে সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিব। আবার একই প্রকার সাধনপ্রণালী সকলের জন্য নয়। এক প্রকার সাধনপ্রণালী হয়তো আপনার পক্ষে উপযোগী, অন্য আর জনের পক্ষে হয়তো অন্য প্রকার সাধনপ্রণালী প্রয়োজন। প্রত্যেকটি সাধনপ্রণালী যদিও চরমে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, তথাপি সবগুলি সকলের উপযোগী নয়। আমরা সাধারণতঃ এই আর একটি ভুল করিয়া থাকি। আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নয়, তবে আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিব? আমার মন্দির-নির্মাণপ্রণালী বা স্তব পাঠ করার রীতি আপনার ঠিক ভাল লাগে না, তবে আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার উপর চাপাইতে যাইব? পৃথিবী ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন—বহু নির্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে, তাহার সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্য প্রণালীগুলি শয়তানি, এবং জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্মিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই-সকল সাধনপ্রণালীর সবগুলিই ভাল এবং ধর্মলাভে আমাদিগকে সাহায্য করে; আর মনুষ্যপ্রকৃতি যখন নানবিধ, তখন ধর্মসাধনের বিভিন্ন প্রকার প্রণালীও প্রয়োজন। এইরূপ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যত প্রচলিত হয়, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। পৃথিবীতে যদি কুড়িটি ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে খুব ভাল; যদি চার শত ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে আরও ভাল; কারণ তাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটি ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারা যাইবে। অতএব যখন ধর্ম ও ধর্মভাবসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেকটি মানুষ ধর্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ক্রমশঃ অধিকসংখ্যাক মানুষ ধর্মপথে সাহায্য লাভ করিবে। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ধর্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাক—যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষ অপর সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নিজস্ব একটি ধর্ম লাভ করে। ভক্তিযোগের ইহাই ভাব।

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম আপনার বা আপনার ধর্ম আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, তথাপি মনের রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয়, আর যদিও পথ অনেক, তথাপি সব পথই সত্য; কারণ পথগুলি একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। একটি সত্য, অন্যগুলি মিথ্যা—তাহা হইতে পারে না। এই নিজ নিজ নির্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় 'ইষ্ট' বলে।

অতঃপর শব্দ বা মন্ত্র-শক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে—বেদ, বাইবেল, কোরানে—শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে—মানবজাতির উপর ঐগুলির আশ্চর্য প্রভাব!

তারপর আবার ভক্তিলাভের বাহ্যসহায়রূপ প্রতীক-বস্তু আছে। এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব। ধর্মের প্রধান প্রতীক-বস্তুগুলি কিন্তু ইচ্ছামত বা খেয়ালমত রচিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। আমরা সর্বদাই রূপক-সহায়ে চিন্তা করিয়া থাকি; আমাদের সকল শব্দই বস্তুতঃ চিন্তার রূপক মাত্র, বিভিন্ন জাতি প্রকৃত কারণ না জানিয়াও বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ কারণ মনের অন্তরালে, ঐ প্রতীকগুলি চিন্তার সহিত জড়িত; যেমন চিন্তা বা ভাব হইতে প্রতীক-বস্তু বাহিরে রূপ-গ্রহণ করে, তেমনি ঐ প্রতীক আবার ভিতরে ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। এইজন্য ভক্তিযোগের এই অংশে এই-সব ভাবোদ্দীপক প্রতীক-বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি, প্রার্থনা বা স্তবস্তুতির কথা আছে।

সকল ধর্মেই প্রার্থনা আছে, তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না, এগুলি পুণ্যকর্ম। স্বর্গাদি গমনের বা কোন প্রকার বাহ্য বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনা কর্মমাত্র। যিনি ভগবানকে ভালবাসিতে চান, যিনি ভক্ত হইতে চান, তাঁহাকে ঐ-সকল প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে কেনা-বেচার দোকানদারী ধর্মভাব পুঁটুলি বাঁধিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবেই তিনি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যাহা চাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর—ভিখারীর ধর্ম।—মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কূপ খনন করে! ১৮ সেই মূর্খ—যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ড অন্বেষণ করে! ভগবান্ হীরকখনিস্বরূপ, তাঁহার কাছে কাচখণ্ডবৎ স্বাস্থ্য খাদ্য বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে!—কি দুর্ভাগ্য! এই দেহ একদিন মরিবেই; তবে আর বার বার দেহের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে কি আছে? শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিও নিজ ধনের অতি অল্প অংশই নিজে ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি তো দিনে চার-পাঁচ বার ভোজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু শ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক তিনি লইতে পারেন না, তাঁহার নিজের দেহের জন্য যতটা জায়গা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা এই জগতের সকল বস্তু কখনই একা পাইতে পারি না। যদি না পাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই দেহ একদিন যাইবে—এ সব কে গ্রাহ্য করে? যদি ভাল ভাল জিনিষ আসে, আসুক; যদি সেগুলি চলিয়া যায়—যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। আমরা ভগবানকে লাভ করিতে চলিয়াছি। ভগবানের নিকট গিয়া এ-জিনিষ ও-জিনিষ চাওয়া ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, অতি নিম্নাঙ্গের কর্মমাত্র। আমরা সেই রাজরাজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা করিতেছি। আমরা সেখানে ভিক্ষুকের বেশে যাইতে পারি না। যদি ঐ বেশে আমরা কোন সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি সেখানে যাইতে দেওয়া হইবে? কখনই নয়। আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। ভগবান্ রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট্; তাঁহার নিকট আমরা জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে পারি না; দোকানদারের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কেনা-বেচা সেখানে একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলে যেমন পড়িয়াছেন যে, যীশু যিহোবার মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তথাপি কেহ কেহ প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোষাক দাও। হে ভগবান্ আজ আমার মাথাধরা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরও দু-ঘণ্টা বেশী প্রার্থনা করিব।' এইরূপ প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা নিজেদের একটু উচ্চতর মনোভাবাপন্ন মনে করিবেন। মনে করিবেন, এইরূপ ছোটখাটো জিনিষের জন্য প্রার্থনা করার ঊর্ধ্বে। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি শরীর-সুখের জন্য ঐভাবে প্রার্থনা করিয়া ব্যয় করে, তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি?

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই প্রকার সব বাসনা—এমন কি স্বর্গ-গমনের বাসনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গও এই-সব স্থানেরই মত, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কিছু দুঃখ, কিছু সুখ ভোগ করিতে হয়। স্বর্গে না হয় দুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। জ্ঞানের আলো সেখানে এতটুকু বাড়িবে না, স্বর্গে শুধু আমাদের পুণ্যকর্মের ফলভোগ হইবে। খ্রীষ্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান, যেখানে ভোগসুখ তীব্রভাবে বর্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শত বার গিয়াছেন, আবার সেখান হইতে শত শত বার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে এই-সকল বাসনা অতিক্রম করা যায়? কিসে মানুষকে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে? মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ ক্রীতদাসের মত, প্রকৃতির হাতে পুতুলের মত; প্রকৃতি খেলনার মত তাহাদিগকে কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নাড়িতেছে। অতি সামান্য আঘাতে যে দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, আমরা সর্বদা সেই দেহের যত্ন করিতেছি, এবং সেই জন্যই সর্বদা ভয়ব্যাকুলচিত্তে জীবন যাপন করিতেছি। সেদিন পড়িতেছিলাম—হরিণকে নাকি প্রাণের ভয়ে প্রত্যহ প্রায় ৬০।৭০ মাইল ছুটিতে হয়। হরিণ অনেক মাইল দৌড়াইয়া গেল, তারপর কিছু খাইল। আমাদের জানা উচিত—আমরা হরিণ অপেক্ষা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত। হরিণ তবুও খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ানো আমাদের রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেইজন্য আমরা সর্বদাই বিকৃত বস্তু খুঁজিতেছি—অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও তদনুরূপ জীবন খুঁজিতেছি। বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তবে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি! ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই—আমাদের সমগ্র জীবনটাই কতকগুলি ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি? হরিণের পক্ষে ভয় করিবার এক প্রকার জিনিষই আছে, যথা, ব্যাঘ্রাদি; আর মানুষের ভয় সমগ্র জগৎ হইতে।

এখন প্রশ্ন এই—আমরা কিরূপে এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? হিতবাদিগণ (Utilitarians) বলেন, 'ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। আমরা ও-সবের কিছু জানি না। এই জগতেই সুখে বাস করা যাক।' যদি সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে

ঐরূপ করিতাম, কিন্তু জগৎ আমাদিগকে তো তাহা করিতে দিবে না। আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাস হইয়া রহিয়াছেন, ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? যতই দুঃখ এড়াইবার চেষ্টা করিবেন, ততই আরও দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবেন। জানি না, কত বর্ষ ধরিয়া সুখী হইবার জন্য কত পরিকল্পনা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া থাকে। দুই শত বর্ষ পূর্বে 'পুরাতন পৃথিবী'তে (Old World) লোকের অভাব অতি অল্পই ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, অভাবও শতগুণ বাড়িয়া চলিল। আমরা ভাবি, অন্ততঃ যখন আমরা স্বর্গে গিয়া পরিত্রাণ পাইব, তখন আমাদের সব বাসনা পূর্ণ হইবে—তাই তো আমরা স্বর্গে যাইতে চাই। সেই অনন্ত অদম্য পিপাসা! সর্বদাই একটা কিছু চাওয়া! ভিক্ষুক অবস্থায় মানুষ চায় টাকা। টাকা হইলে আবার অন্যান্য জিনিষ চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তারপর আবার অন্য কিছু চায়। এতটুকু বিশ্রাম নাই। কিভাবে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমরা স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরও বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরও বাড়িতে থাকে, তেমনি তাহার বাসনাও বাড়িয়া যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ খুব ধনী হওয়া, এবং তাহা হইলে বাসনাও বাড়িতে থাকিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্রে পড়া যায়—স্বর্গেও দেবতারা মানুষের মত অনেক আমোদপ্রমোদ ও ছলনা করিয়া থাকে, তাহারা সবাই যে খুব ভাল, তাহা নয়; তারপর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল একটা ভোগবাসনা মাত্র। এটি ত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গে যাওয়া তো অতি ছোট কথা, এরূপ চিন্তা করা অতি অমার্জিত মনোভাবের লক্ষণ। আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব—এ ভাব যেমন, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তেমনি। এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে, কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়া গেলে ধর্ম ও ভক্তির দ্বারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না।

প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

‘প্রতীক’ ও ‘প্রতিমা’—দুইটি সংস্কৃত শব্দ। আমরা এখানে এই ‘প্রতীক’ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ‘প্রতীক’ শব্দের অর্থ—অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া। সকল দেশে সকল ধর্মেই দেখিতে পাইবেন, উপাসনার নানাবিধ স্তর রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সাধুগণের প্রতিমূর্তি পূজা করেন; এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কতকগুলি রূপ ও প্রতীকের উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর কোন সত্তার উপাসনা করেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। আমি প্রেত-উপাসকদের কথা বলিতেছি। পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি, এখানে প্রায় আশী লক্ষ প্রেতোপাসক আছেন। তারপর আবার কতক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর সত্তা অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই-সকল বিভিন্ন সোপানের কোনটিকেই নিন্দা করে না, কিন্তু এই-সকল উপাসনাকেই এক প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাসকগণ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন, এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায়ে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের মুক্তিলাভ হয় না; আমরা যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় উহাদের উপাসনা করি, উহা দ্বারা সেই সেই বিশেষ বস্তুই লাভ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি তার পরলোকগত পূর্বপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা বিশেষ বিশেষ সংবাদ লাভ করিতে পারেন। এই-সকল উপাস্য হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয়, তাহাকে ‘বিদ্যা’ অর্থাৎ ‘বিশেষ জ্ঞান’ বলে, কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। বেদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক। সগুণ ঈশ্বরকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতীক সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নয়। ঐগুলিকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব কেহ কেহ যদি মনে করে—দেবতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনা দ্বারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে তাহাদের মহাভুল। ঐগুলি দ্বারা তাহারা বড়জোর কয়েকটি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ-সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি আর উচ্চতর কিছু বুঝে না, সে এই-সকল প্রতীকোপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও সুখসম্ভোগ লাভ করিবে। তারপর দীর্ঘকাল ভোগ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর যখন সে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন সে নিজেই এই-সব প্রতীকোপাসনা ত্যাগ করিবে।

এই-সকল বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনাই সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভালবাসা, প্রিয়জনের দেহের প্রতি ভালবাসা—এই মানবপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্বদাই তাঁহাদিগের দেহ আবার দেখিতে চাই। আমরা তাঁহাদের দেহের প্রতিই আসক্ত! আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহাদের দেহ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছিল এবং মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবি, তাঁহাদের দেহ অপরিবর্তনীয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে পূর্বের মতই দেখিব। শুধু তাই নয়, আমাদের কোন বন্ধু বা পুত্র জীবদ্দশায় অতিশয় দুষ্টস্বভাব থাকিলেও মৃত্যু হইবামাত্র আমরা মনে করিতে থাকি, তাহার মত সাধু প্রকৃতির লোক আর জগতে কেহই নাই—সে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য হইয়া যায়। ভারতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার সমাধিস্থানের উপর মন্দির নির্মাণ করে, এবং সেই শিশুটিই ঐ মন্দিরের দেবতা হইয়া যায়। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম খুব প্রচলিত, এবং এমন দার্শনিকের অভাব নাই, যাঁহাদের মতে ইহাই সকল ধর্মের মূল। অবশ্য তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না।

যাহা হউক স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রতীক-পূজা আমাদিগকে কখনই মুক্তি দিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদ এই যে, প্রতীক বা সমীপকারী সোপান-পরম্পরা যতক্ষণ পর্যন্ত আর একটি অগ্রবর্তী সোপানে পৌঁছিবার সহায়তা করে, ততক্ষণ উহারা দোষাবহ নয় বরং উপকারী, কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন সারা জীবন প্রতীকোপাসনাতেই লাগিয়া থাকে। সম্প্রদায়-বিশেষের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। স্পষ্টতর করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে প্রচলিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা ভাল, ইহা দ্বারা আমাদের উচ্চতর ভাবসমূহ জাগরিত হয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন করিয়াই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাই, আমরা উহার বাহিরে আসিতে পারি না। নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে পারি না। এই-সকল প্রতীকোপাসনায় ইহাই বড় বিপদ। লোকে মুখে বলিবে যে, এগুলি সোপান মাত্র—এই-সকল সোপানের মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায়—তাহারা সেই-সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। যদি কোন যুবক চার্চে না যায়, তবে সে নিন্দার্হ, কিন্তু যদি বৃদ্ধ বয়সেও কেহ চার্চে যায়, সে-ও তেমনি নিন্দার্হ; তাহার আর এই ছেলেখেলায় কোন প্রয়োজন নাই, চার্চের সাহায্যে তাহার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার আর এই-সব প্রতীক, পদ্ধতি ও প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন?

প্রতীকোপাসনার আর একটি প্রবল, প্রবলতম ভাব—গ্রন্থ বা শাস্ত্রের উপাসনা। সকল দেশেই দেখিবেন, গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা মনে করিয়া থাকে, ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন; কিন্তু তাহাদের মতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে এবং যদি তাঁহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বুদ্ধকে পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, কিন্তু তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর না কেন?’ তাহারা বলিবে,

'যেহেতু বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে।' গ্রন্থোপাসনা বা শাস্ত্রোপাসনার তাৎপর্য এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুশী মিথ্যা বলো না কেন, তাহাতে দোষ নাই। ভারতে যদি আমি কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি এবং যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই, তাহা হইলে কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না; কিন্তু আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কারসাজি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিনষ্ট করিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে মূর্খেরা দলে দলে আসিয়া আমার অনুসরণ করিবে। তারপর আবার কিছু লোক আছে, তাহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকে; তাহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভয় পাইবে, কিন্তু ঐ প্রচারকেরা বলে, আমরা যাহা বলিতেছি, যীশুখ্রীষ্টের মতও এইরূপই ছিল। যত সব আহাম্মকেরা তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায়। বেদে বা বাইবেলে পাওয়া যায় না, এমন সব নূতন জিনিষ মানুষ লইতেই চায় না। স্নায়ুসমূহ যেভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যাইতে চায়। যখন আপনারা কোন নূতন বিষয় শোনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন—ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা ও ভাব সম্বন্ধে এ-কথা আরও বিশেষভাবে সত্য। মন প্রচলিতভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোন নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন; সুতরাং সেই ভাবটিকে প্রচলিত ভাবের খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। কৌশল হিসাবে এটি ভাল বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে মন্দ। এই সংস্কারকগণ এবং যাঁহাদিগকে আপনারা উদারমতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাঁহারা আজকাল রাশি রাশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেরূপ অর্থ হয় না; কিন্তু তাঁহারা যদি ঐভাবে প্রচার না করেন, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিবে না। ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্টিস্টদের (Christian Scientists) মতে যীশু একজন মস্ত রোগ-নিরাময়কারী, প্রেততত্ত্ববাদীদের (Spiritualists) মতে একজন মস্ত ভৌতিক (Psychic) এবং থিওজফিস্টদের মতে একজন 'মহাত্মা' ছিলেন। ধর্মগ্রন্থের একই বাক্য হইতে এই-সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'

১৯

—এই বাক্যের অন্তর্গত 'সৎ' শব্দের অর্থ বিভিন্ন মতবাদিগণ বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ ঈশ্বর। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা। সকলেই ঐ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন।

গ্রন্থোপাসনায় এই-সব দোষ আছে, তবে উহার একটি বড় গুণও আছে। উহা একটা শক্তি। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীকদের কথা শুনিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন পারস্যবাসী—এক সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি ছিল। আরবীয়েরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ

২০

লইয়া পলায়ন করিল এবং সেই ধর্মগ্রন্থের বলেই তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। য়াহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখুন। যদি তাহাদের একটি ধর্মগ্রন্থ না থাকিত, তাহারা জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাহাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচার সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তালমুড (Talmud) তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, উহা সমুদয় ভাবগুলি পরিষ্কারভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে, এবং উহা উপাস্য বস্তু। বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন—সকলেই উহা দেখিবে, একখানি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। কেহ কেহ বোধ হয় আমাকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায়, সেগুলির জন্য এই-সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর গ্রন্থগুলিই জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোঁড়ামির জন্য দায়ী। বর্তমানকালে গ্রন্থসমূহই সর্বত্র মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করিতেছে। সকল দেশেই মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

তারপর প্রতিমা বা মূর্তি ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে আপনারা কোন-না-কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কেহ কেহ মানবাকার প্রতিমা অর্চনা করিয়া থাকে, আর আমি মনে করি, উহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমা-পূজার প্রয়োজন হয়, তবে আমি পশু, গৃহ বা অন্য কোন মূর্তি অপেক্ষা বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে করে, এই প্রতিমাটিই ঠিক; অপরে মনে করে, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টানরা মনে করেনঃ ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, উহাই ঠিক, কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাত্মক। য়াহুদীরা মনে করেন দুই দিকে দুই দেবদূত-বসানো সিন্দুকের আকৃতিযুক্ত একটি মূর্তি নির্মাণ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন মূর্তি গঠিত হয়, তবে উহা অতিশয় ভয়াবহ। মুসলমানেরা মনে করেন, প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া 'কাবা' নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই উহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজার ইহাই অপূর্ণতা বা দোষ, তথাপি এগুলি সবই প্রয়োজনীয় সোপান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই দিলেই চলিবে না। গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতে পারি, গ্রন্থের উপর অন্ধবিশ্বাস যত কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অনুভব করিয়াছেন, তাহাই প্রশ্ন। ঈশা, মুশা, বুদ্ধ

কি করিয়াছেন, বলিলে কি হইবে—তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না, যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করিতেছি। আপনি যদি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চিন্তা করেন—মুশা এই এই খাইয়াছিলেন, তাহাতে তো আপনার ক্ষুধা মিটিবে না, সেইরূপ মুশার এই প্রকার মত ছিল—জানিলেই আপনার উদ্ধার হইবে না। এ-সকল বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কখনও কখনও মনে হয় এই-সব প্রাচীন আচার্যগণের সহিত যখন আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত অবশ্যই সত্য; আবার কখনও কখনও ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁহাদের মত মিলিতেছে, তখন তাঁহাদের মত ঠিক। আমি স্বাধীন চিন্তা করায় বিশ্বাস করি। এই-সব পবিত্রস্বভাব আচার্যগণের প্রভাব হইতেও একেবারে মুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করুন, কিন্তু ধর্মকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তুরূপে গ্রহণ করুন। তাঁহারা যেভাবে জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ নিজের চেষ্টায় জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে। তাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হইবে না। আপনাদিগকে 'বাইবেল' হইতে হইবে—অনুসরণ করিতে হইবে না। বাইবেলকে শুধু পথের আলোকরূপে, পথপ্রদর্শক স্তম্ভ বা নিদর্শনরূপে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

গ্রন্থের মূল্য ঐ পর্যন্ত; কিন্তু প্রতিমা প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। আপনারা মনকে স্থির করিবার সময় বা কোনরূপ চিন্তা করিবার সময় দেখিবেন, আপনারা স্বভাবতই মনে মনে মূর্তি গড়িবার প্রয়োজন অনুভব করেন, এইরূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। দুই প্রকার মানুষের রূপ-কল্পনার বা মূর্তির প্রয়োজন হয় না—নরপশুর, যে ধর্মের কোন ধার ধারে না; আর সিদ্ধপুরুষের, যিনি এই-সকল অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই দুই অবস্থার মধ্যে রহিয়াছি। ভিতরে ও বাহিরে আমাদের কোন-না-কোনরূপ আদর্শ বা মূর্তির প্রয়োজন—উহা কোন পরলোকগত মানুষের হইতে পারে, অথবা কোন জীবিত নর বা নারীর হইতে পারে। ইহা ব্যক্তিত্বের উপাসনা—শরীর-কেন্দ্রিক, তবে ইহা খুব স্বাভাবিক। সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করার দিকে আমাদের ঝোঁক। সূক্ষ্ম হইতে যদি আমরা স্থূল না হইয়া থাকি, তবে কিভাবে এখানে আসিলাম? আমরা স্থূলভাবপ্রাপ্ত আত্মা, এইভাবেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুতরাং মূর্তিভাব যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, তেমনি মূর্তির সাহায্যেই আমরা ইহার বাহিরে যাইব। ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সদৃশবিধানের

২১

মত—'বিষস্য বিষমৌধম্'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের পিছনে ছুটিয়াই আমরা মানুষভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমরা সাকার ব্যক্তিভাবের উপাসনা করিতে বাধ্য; ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলি না কেন, ব্যক্তিরূপের বা সাকারের উপর আসক্ত হইও না—ইহা বলা খুব সহজ বটে, কিন্তু যে এ-কথা বলে, সে-ই ব্যক্তিভাবের উপর অতিশয় আসক্ত, বিশেষ বিশেষ নরনারীর উপর তাহার তীব্র আসক্তি—মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি যায় না, সুতরাং মৃত্যুর পরেও সে তাহাদের অনুসরণ করিতে চায়। ইহাই পুতুলপূজা। ইহাই পুতুলপূজার বীজ—মূল কারণ; আর কারণই যদি থাকে, তবে কোন-না-কোন আকারে পৌত্তলিকতা আবার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কোন সাধারণ নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমূর্তির উপর আসক্তি বা আকর্ষণ থাকা কি ভাল নয়? পাশ্চাত্যের লোকেরা বলিয়া থাকে, মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ, কিন্তু তাহারা কোন নারীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে অনায়াসে বলিতে পারে, 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলো। তুমি আমার নয়নের মণি, তুমি আমার আত্মা'—এই-সব। তাহাদের যদি চারিটি করিয়া পা থাকিত, তবে তাহারা চার পায়ের হাঁটু গাড়িয়া বসিত! ইহা নিকৃষ্টতর পৌত্তলিকতা বা পৌত্তলিকতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশুরা ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। একটি নারীকে 'আমার প্রাণ, আমার আত্মা' বলার অর্থ কি? এ ভাব তো পাঁচ দিনের মধ্যেই উবিয়া যায়, এ কেবল ইন্দ্রিয়গত আসক্তি মাত্র। তাই যদি না হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট ঐরূপ হাঁটু গাড়িয়া বসে না কেন? এই ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ কামনা অথবা তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট—কেবল একরাশ ফুলচাপা দেওয়া মাত্র। কবিরা উহার একটি সুন্দর নামকরণ করিয়া উহার উপর আতর গোলাপজল ছড়াইয়া দেন। তাহা হইলেও উহা স্বার্থপর কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধ বা জিনের মূর্তির সমক্ষে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া 'তুমিই আমার জীবনস্বরূপ' বলা কি উহা অপেক্ষা ভাল নয়? আমি বরং শত শত বার এইরূপই করিব।

আর এক প্রকার প্রতীক আছে—পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ প্রতীকোপাসনার স্বীকৃতি নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, যে-কোন বস্তুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির এক-একটি সোপানস্বরূপ—প্রত্যেকটি আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটতর করিয়া দেয়। অরুন্ধতী একটি অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। যদি কেহ ঐ নক্ষত্র দেখিতে চায়, প্রথমে তাহাকে উহার নিকটবর্তী একটি বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র—তারপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে অতি ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে এই-সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমা মানুষকে ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা—এ-সবই প্রতীকোপাসনা। ইহা মানবকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা কাহাকেও মুক্তি দিতে পারে না, এই ভাবও অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ভিতর ঈশ্বরই প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁহারা বলেন, ইঁহারা প্রতীক নন, ইঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য। যাহা হউক, আমরা এই-সকল প্রতীক বা সোপান অবলম্বন করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি এই-সব প্রতীকোপাসনার সময় আমরা মনে করি, আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি, তাহা হইলে আমরা ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশুখ্রীষ্টের উপাসনা করে ও মনে করে, সে উহা দ্বারাই মুক্ত হইবে, সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি কেহ মনে করে যে, ভূত-প্রেতের উপাসনা করিয়া বা কোন মূর্তি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে-কোন বস্তুর ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন। মূর্তি ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে দেখুন। ঈশ্বরে অন্য কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্তু যে-কোন বস্তুতে ইচ্ছা ঈশ্বরভাব প্রবেশ করান। যে সাকার মূর্তিটি উপাসনা করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিবেন না। বরং যাহা কিছু উপাসনা করেন, সেই সব কিছু ঈশ্বরভাবে পূর্ণ করিয়া দিন। এভাবে একটা বিড়ালের মধ্যেও আপনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। বিড়ালকে ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ তাঁহা হইতেই সব কিছু আসিয়াছে। তিনিই সবকিছুতে। একখানি চিত্রকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা

যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে চিত্ররূপে উপাসনা করা ভুল। চিত্রে ঈশ্বরচিন্তা করা খুবই ঠিক, কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে করা ভুল। বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করা তো খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ঈশ্বরের প্রতিমা প্রতীকমাত্র। ইহাই ভগবানের যথার্থ উপাসনা।

তারপর ভক্তিযোগে প্রধান আলোচ্য বিষয়—শব্দশক্তি বা নামশক্তি। সমগ্র জগৎ নামরূপাত্মক। হয় জগৎ নাম ও রূপের সমষ্টি অথবা শুধু নাম, এবং উহার নাম কেবল একটি মনোময় মূর্তি। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, এমন কিছুই নাই, যাহা নামরূপাত্মক নয়। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু যখনই আমরা তাঁহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাঁহাকে নামরূপযুক্ত ভাবিতে হয়। চিত্ত যেন একটি স্থির হ্রদের তুল্য, চিন্তাসমূহ যেন ঐ চিত্তহ্রদের তরঙ্গ আর এই-সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব-প্রণালীকেই 'নাম-রূপ' বলে। 'নাম-রূপ' ব্যতীত কোন তরঙ্গই উঠিতে পারে না। যাহা কিছু সর্বদা একরূপ, তাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না। উহা অবশ্যই চিন্তার অতীত, কিন্তু যখনই উহা চিন্তা ও জড় পদার্থে পরিণত হয়, তখনই উহার নামরূপ চাই-ই চাই। আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, 'শব্দ' হইতে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণের একটা মত আছে—শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় উহারই নাম 'শব্দব্রহ্মবাদ'। উহা একটি প্রাচীন ভারতীয় মত; ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক ঐ মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হয় এবং সেখানে ঐ ভাব রোপণ করা হয়। এইরূপে সেখানে শব্দব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শব্দ হইতে ঈশ্বর সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এ-কথার গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর যখন স্বয়ং নিরাকার, তখন সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বাহিরে প্রক্ষেপ করা, বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্মাণ করিলেন, এই প্রলাপের অর্থ কি? ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হন, আর সবই তাঁহাতে ফিরিয়া আসে, আবার বাহির হয়, আবার ফিরিয়া আসে। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মন হইতে যে-কোন ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা নাম-রূপ ব্যতীত হইতে পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির—একেবারে চিন্তাহীন হইয়াছে। যখনই চিন্তা আরম্ভ হইবে, অমনি উহা নাম ও রূপকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটি নির্দিষ্ট নাম ও একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নাম-রূপের সহিত জড়িত। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মানুষের যত প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার অনুরূপ একটি নাম বা শব্দ অবশ্যই থাকিবে। তাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্মুখ বা স্থূল বিকাশ, তেমনি এই জগৎও মনেরই বিকাশ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। আর ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে একটি পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে পারিলে আপনি সমগ্র জগতের গঠনপ্রণালী জানিতে পারিবেন। আপনাদের শরীরের স্থূল ভাগ এই স্থূল দেহ, আর চিন্তা বা ভাব উহারই অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর ভাগ। এ-দুটি চিরদিন অবিচ্ছেদ্য। ইহা তো প্রতিদিনই দেখিতে পান। কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে যখন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহার চিন্তা বা ভাবসমূহও অমনি বিশৃঙ্খল হইতে থাকে। কারণ ঐ দুইটি একই বস্তু—একই বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্মভাগ মাত্র। মন ও জড়বস্তু বলিয়া দুইটি পৃথক্ পদার্থ নাই। একটি উচ্চ বায়ুস্তম্ভে যেমন একই বায়ুর ঘন ও পাতলা স্তর পর পর পাওয়া যায়—এবং বায়ুমণ্ডলের যতই ঊর্ধ্বে যাওয়া যায়, ততই উহা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে—এই দেহ সম্বন্ধেও সেইরূপ। বরাবর ইহা একই বস্তু—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। দেহটা যেন নখের মত, নখ কাটিয়া ফেলুন, আবার নখ হইবে। বস্তু যতই সূক্ষ্মতর হয়, তাহা ততই অধিকতর স্থায়ী হয়, সর্বকালেই ইহার সত্যতা দেখা যায়; আবার যতই স্থূলতর হয়, ততই অল্পকাল-স্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতেছি—রূপ স্থূলতর, নাম সূক্ষ্মতর। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটি কিন্তু একই বস্তু; একে তিন, তিনে এক; একই বস্তুর ত্রিবিধ অবস্থা—সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটি থাকিলে অপরগুলিও থাকিবেই। যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব বর্তমান। সুতরাং সহজেই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, এই দেহ যে নিয়মে নির্মিত, এই ব্রহ্মাণ্ড যদি সেই একই নিয়মে নির্মিত হয়, তবে ইহাতেও নাম রূপ ও ভাব—এই তিনটি জিনিষ অবশ্যই থাকিবে। চিন্তা বা ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, উহাই জগতের প্রকৃত প্রেরণাশক্তি এবং উহাকেই 'ঈশ্বর' বলে। আমাদের দেহের অন্তর্যামী ভাবকে 'আত্মা' এবং জগতের অন্তর্যামী ভাবকে 'ঈশ্বর' বলে। তারপর 'নাম', এবং সর্বশেষে 'রূপ'—যাহা আমরা দর্শন ও স্পর্শন করিয়া থাকি। যেমন আপনি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আপনার দেহের একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে, আবার তাহার শ্রীঅমুক বা শ্রীমতী অমুক প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে আবার ভাব—অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্মিত—তাহা রহিয়াছে; সেইরপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম এই নামকে 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়া থাকে। বাইবেলে২২ লিখিত আছে—'আদিতে শব্দ ছিল, সেই শব্দ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিল, সে শব্দই ঈশ্বর।' সেই নাম হইতেই রূপের প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন। এই সর্বব্যাপী ভাব বা চেতনাকে সাংখ্যেরা 'মহৎ' আখ্যা প্রদান করেন। এই নাম কি? আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে। সমগ্র জগৎ সমপ্রকৃতির, আর আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে, সমগ্র জগৎ যে উপাদানে নির্মিত, প্রত্যেকটি পরমাণুও সেই উপাদানে নির্মিত। আপনারা যদি এক-তাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই জানিতে পারিবেন।

২৩

সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটু মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই হইবে। যদি আপনারা একটি টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে—সব দিক্ দিয়া উহাকে জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা সমগ্র জগৎকে জানিতে পারিবেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—মানুষই স্বয়ং ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব—অর্থাৎ মননকারী পুরুষ রহিয়াছেন। অতএব এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও অবশ্যই সেই একই নিয়মে নির্মিত। প্রশ্ন—এই নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ—ওঁ। প্রাচীন মিশরবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত।

যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাধক ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব—তাহা ওঁ।

২৪

ইনিই অক্ষর অপরব্রহ্ম, ইনিই অক্ষর পরব্রহ্ম। এই অক্ষরের—ওঙ্কারের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।

২৫

ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক! ইহা বহির্জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী, উভয়েরই প্রতিভূ! এখন আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাব- গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়—যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই জগৎকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ জগৎ-রূপে দেখা যাইতে পারে, আর এইরূপ বিভিন্নভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটিই স্বয়ং এক-একটি সম্পূর্ণ জগৎ হইবে এবং প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন নাম-রূপ ও তাহাদের পশ্চাতে একটি ভাব থাকিবে। এই ভাবগুলিই প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের এক-একটি নাম আছে। এইরূপ পবিত্র নাম বা শব্দ অনেক আছে; ভক্তিযোগীর বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন।এই তো নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল—এখন উহার সাধনে কি ফল হয়, তাহাই বিচার্য। এই-সব নামের প্রায় অনন্ত শক্তি আছে। কেবল ঐ শব্দ বা মন্ত্রগুলি জপ করিয়াই আমরা সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারি, সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।'

২৬

গুরু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইবেন এবং শিষ্যও সেইরূপ হইবে। এই নাম এমন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পাইয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু হইতে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ আসিতেছে, এবং গুরুপরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং পুনঃপুনঃ জপ করিলে নাম অনন্তশক্তিসম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায় তাঁহাকে 'গুরু' বলে, আর যিনি পান তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে। যদি বিধি- পূর্বক এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে সাধক ভক্তিযোগের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া রহিল। কেবল ঐ মন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতম অবস্থা আসিবে।

'হে ভগবান্ আপনার কত নাম রহিয়াছে! আপনি জানেন, উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য! সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্তশক্তি রহিয়াছে। এই-সকল নাম উচ্চরণের কোন নির্দিষ্ট দেশকালও নাই, কারণ সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানেই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্য, আপনি এত দয়াময়! আমি অতি দুর্ভাগা যে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।'

২৭

ইষ্ট

ইষ্ট সম্বন্ধে পূর্ব বক্তৃতায় কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি—আশা করি, ঐ বিষয়টি আপনারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিবেন; কারণ ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা হইলে আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। 'ইষ্ট' শব্দটি ইষ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে; উহার অর্থ—ইচ্ছা করা, মনোনীত করা। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানুষের চরম লক্ষ্য এক—মুক্তিলাভ ও সর্বদুঃখনিবৃত্তি। যেখানেই কোন প্রকার ধর্ম বিদ্যমান, সেখানেই এই দুইটির একটি না একটি আদর্শ কাজ করিতেছে। অবশ্য ধর্মের নিম্নস্তরে ঐ ভাবগুলি তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট হউক, আর অস্পষ্টই হউক—আমরা সকলেই ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সকলেই দুঃখ এড়াইতে চাই—প্রতিদিন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা হইতে মুক্তি চাই; আমরা সকলেই মুক্তিলাভের—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিতেছি। জগতের সকল কার্যের মূলেই ঐ দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের চেষ্টা। সকলের লক্ষ্য এক, তথাপি সেখানে পৌঁছিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই-সকল বিভিন্ন পথ বা উপায় নিরূপিত হইয়াছে। কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধান, কাহারও জ্ঞানপ্রধান, কাহারও কর্মপ্রধান, কাহারও বা অন্যরূপ। এক প্রকার প্রকৃতির ভিতরেও আবার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে। এখন আমরা যে-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। একজনের প্রকৃতিতে সন্তানবাৎসল্য প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা সমধিক, কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও বা বন্ধুর প্রতি অধিক ভালবাসা, কাহারও স্বদেশপ্রীতি অতিশয় প্রবল—আবার কিছু লোক জাতিধর্মদেশ-নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতিকে ভালবাসিয়া থাকেন।

অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আর যদিও আমরা প্রত্যেকেই এমন ভাবে কথা বলি, যেন মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের প্রেরণাশক্তি, উহা দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হইতেছে, কিন্তু বর্তমান কালে সমগ্র জগতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি একশতের বেশী আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্প কয়েকজন মাত্র জ্ঞানীই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক মহাত্মাই সর্বজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন, এবং আমার মত লোক তাঁহাদের সেই ভাব লইয়া প্রচার করিয়া থাকে। জগতের সমুদয় মহৎ ভাবেরই পরিণাম এই। তবে আমরা আশা করি, জগৎ যেন কখনও একেবারে এরূপ মহাপুরুষশূন্য না হয়।

যাহা হউক, পূর্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। আমরা দেখিতে পাই, একটি নির্দিষ্ট ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় আছে। সকল খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। প্রত্যেক চার্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রেসবিটেরিয়ানের দৃষ্টি খ্রীষ্টের জীবনের সেই অংশে নিবদ্ধ, যেখানে তিনি পোদ্দারদের মুদ্রা লেনদেন করিতে দেখিয়া 'তোমরা ভগবানের মন্দির কেন অপবিত্র করিতেছ?' বলিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণকারিরূপে দেখিয়া থাকেন। কোয়েকারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিবেন, 'খ্রীষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।' কোয়েকার খ্রীষ্টের ঐ ভাবটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার যদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার খ্রীষ্ট-জীবনের কোন্ অংশ খুব ভাল লাগে, তিনি হয়তো বলিবেন, 'যখন খ্রীষ্ট পিটরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিয়াছিলেন।' প্রত্যেক সম্প্রদায়ই খ্রীষ্টকে নিজের ভাবে দেখিতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, একই বিষয়ে কত প্রকার বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ আছে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই-সব অবান্তর বিভাগের একটিকে অবলম্বন করে এবং অপর সকল ব্যক্তির নিজ নিজ ধারণানুসারে জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার অধিকার তাহারা শুধু যে অস্বীকার করে, তাহা নয়, আর সকলে একেবারে ভ্রান্ত এবং কেবল তাহারাই অভ্রান্ত, এই কথা বলিতেও তাহারা সাহস করে। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করে, অমনি তাহারা লড়াই করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা বলে, যে কেহ আমাদের মত বিশ্বাস করিবে না, তাহাকেই মারিয়া ফেলিব। ইহারাই আবার মনে করে, আমরা অকপট, আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট।

কিন্তু আমরা এই ভক্তিযোগে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিব? অপরে ভ্রান্ত নয়, শুধু এইটুকু বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতে চাই না; আমরা সকলকেই বলিতে চাই, নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই ঠিক পথে চলিতেছে। নিজ প্রকৃতির একান্ত প্রয়োজনে আপনি যে-পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আপনার পক্ষে সেই পন্থাই ঠিক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন—উহা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, নয় বলুন—পুরুষানুক্রমে আমরা ঐ প্রকৃতি পাইয়াছি। যে ভাবেই আপনারা উহা নির্দেশ করুন না কেন, এই অতীতের প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকের দেহমনের বিভিন্ন গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, বিশেষ সাধনপ্রণালীর উপযোগী, তাহাকেই 'ইষ্ট' বলে। ইহাই ইষ্টবিষয়ক মতবাদ, এবং আমাদের নিজস্ব সাধনপ্রণালীকে আমরা 'ইষ্ট' বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান্ শাসনকর্তা। যাহার ঐরূপ ধারণা তাহার স্বভাবই হয়তো ঐরূপ। হয়তো সে এক মহা অহঙ্কারী ব্যক্তি—সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বরকে এক সর্বশক্তিমান্ শাসনকর্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আর একজন হয়তো বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কঠোরপ্রকৃতি; সে ভগবানকে ন্যায়পরায়ণ, শাস্তি-বিধাতা প্রভৃতি গুণান্বিত ছাড়া আর কিছু ভাবিতে

পারে না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পনা করে, এবং আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরকে যেরূপে দেখিয়া থাকি, তাহাকেই আমাদের 'ইষ্ট' বলি। আমরা নিজদিগকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি, যেখানে ঈশ্বরকে ঐরূপেই—কেবল ঐরূপেই দেখিতে পারি, অন্য কোনরূপে দেখিতে পারি না। আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহার উপদেশকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি হয়তো আপনার এক বন্ধুকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে বলিবেন—সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট উপদেশ সে আর কখনও শুনে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই, তাহার সহিত বিবাদ বৃথা। উপদেশ নির্ভুল ছিল, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই।

এই বিষয়টিই আর একটু বিস্তার করিয়া বলিলে বুঝা যাইবে—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন তত্ত্ব সত্য হইতে পারে, আবার একই কালে সত্য না হইতেও পারে। আপাততঃ এই কথা স্ববিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধু নিরপেক্ষ সত্যই এক, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য অবশ্যই নানাবিধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই জগতের কথাই ধরুন। এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড নিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্তিত, সর্বত্র সমভাবাপন্ন, কিন্তু আপনি, আমি—প্রত্যেকেই নিজ নিজ পৃথক্ জগৎ দেখি, শুনি ও অনুভব করি। অথবা সূর্যের কথা ধরুন। সূর্য এক, কিন্তু আপনি, আমি এবং অন্যান্য শত শত ব্যক্তি উহাকে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন অবস্থায় দেখি। একটু স্থান-পরিবর্তন করিলে সূর্য সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির সমগ্র দৃষ্টি পরিবর্তন হইয়া যাইবে। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিবর্তন হইলে সূর্যকে আর এক রূপে দেখা যাইবে। সুতরাং বুঝা গেল, আপেক্ষিক সত্য সর্বদাই বিবিধরূপে প্রতীত হয়। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়। এইজন্য যখন দেখিবেন, ধর্মসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না, তখন তাহার সহিত বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে, আপাতবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যাসার্ধ এক সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে। বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বিন্দুগুলি কেন্দ্র হইতে যত দূরে, তাহাদের পরস্পর দূরত্ব তত অধিক; কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইলে তাহাদের দূরত্ব কমিয়া যায়; সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে মিলিত হয়, তখন দূরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়। এইরূপ একটি কেন্দ্রেই মানবজাতির চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরই ঐ কেন্দ্র এবং আমরা ব্যাসার্ধ। আমাদের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়াই আমরা ভগবানের দর্শন পাইতে পারি। এই স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে বাধ্য। এই কারণে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গীই সত্য, সুতরাং কাহারও সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।

বিভিন্নতারূপ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের প্রত্যেকের মত বিভিন্ন। আমরা যদি তর্কযুক্তি বা বিবাদের দ্বারা আমাদের মতবিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। ইতিহাসের ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র সমাধান—অগ্রসর হওয়া—কেন্দ্রের দিকে আগাইয়া যাওয়া; যত শীঘ্র উহা করিতে পারা যায়, তত শীঘ্র আমাদের বিরোধ বা বিভিন্নতা অন্তর্হিত হইবে।

অতএব ইষ্টনিষ্ঠার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম নির্বাচন করিতে অধিকার দেওয়া। কেহই অপরকে তাহার নিজের উপাস্য পূজা করিতে বাধ্য করিবে না। আমি যাঁহার উপাসনা করি, আপনি তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন না; অথবা আপনি যাঁহার উপাসনা করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব। সৈন্য, বলপ্রয়োগ বা যুক্তি দ্বারা মানুষকে দলবদ্ধ করিবার, বিশৃঙ্খলভাবে একই খোঁয়াড়ে পুরিবার এবং একই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বাধ্য করার সকল চেষ্টা চিরকাল বিফল হইয়াছে ও হইবে। কারণ ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা। শুধু তাই নয়, ইহাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। এমন নরনারী একটিও দেখিতে পাইবেন না, যে কোন এক প্রকার ধর্মের জন্য চেষ্টা না করিতেছে; কিন্তু কয়জন লোক তৃপ্ত হইয়াছে! অথবা খুব কম লোকই বাস্তবিক ধর্ম বলিয়া কিছু লাভ করিয়াছে। কেন?—কারণ অধিকাংশ লোক অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছে। অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে একটা ধর্মপদ্ধতি অবলম্বন করানো হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপঃ আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা তখন একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ঈশ্বর এই রকম, এই জিনিষ এই রকম। আমার মনে ঐসব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? আমি কিভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না জানিয়াই তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করেন; আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি বাধা-প্রাপ্ত হয়। আপনারা একটি গাছকে উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া কখনও বড় করিতে পারেন না। যেদিন আপনারা শূন্যের উপর বা প্রতিকূল মৃত্তিকায় গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেইদিন আপনারা একটি ছেলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া তাহাকে আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে আপনারা সাহায্য করিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া আপনারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্নগুলি দূর করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। নিজস্ব নিয়মানুসারেই জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; চারিদিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন, যেন কোন জীব-জন্তু চারাটি না খাইয়া ফেলে; এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—ব্যস, আপনার কাজ ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। বাকীটুকু অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বহির্বিকাশ। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা পায়। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন; যাহা শিখিলেন তাহা বাড়ী গিয়া নিজ মনের চিন্তা ও ভাবগুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন; দেখিবেন আপনারাও ঠিক সেইভাবে চিন্তা করিয়াছেন, আমি সেইগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোন কালে আপনাদিগকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনারা নিজেরাই নিজেদের শিখাইবেন—হয়তো আমি সেই চিন্তা, সেই ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহায্য করিতে পারি। ধর্মরাজ্যে এ-কথা আরও সত্য। নিজে নিজেই ধর্ম শিখিতে হইবে।

আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আমার পিতার আছে? শিক্ষকেরই বা এই-সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এ-সব জিনিষ আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার অধিকার কি সমাজের আছে? হয়তো ওগুলি ভাল ভাব, কিন্তু ওগুলি আমার পথ না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে ভুলপথে শিক্ষা দিয়া নষ্ট করা হইতেছে—জগতে আজ কি ভয়াবহ অমঙ্গল রাজত্ব করিতেছে, ভাবুন দেখি! কত কত সুন্দর ভাব, যেগুলি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সত্য হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি বংশগত ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলি দ্বারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! ভাবুন দেখি, এখনও আপনাদের মস্তিষ্কে আপনাদের শৈশবের ধর্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে কী কুসংস্কাররাশি রহিয়াছে! ভাবুন দেখি, ঐ-সকল কুসংস্কার আপনাদের কত অনিষ্ট করিয়াছে! আপনারা আবার সেইগুলি দিয়া আপনাদের ছেলেমেয়েকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মানুষ অপরের কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে না—তা একরূপ ভালই বলিতে হইবে; কারণ একবার যদি সে তাহা বুঝিত, তবে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কাজের পিছনে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, মানুষ তাহা জানে না। একথা অতি সত্য যে, 'দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্বোধেরা সেদিকে বেগে আগাইয়া যায়।' গোড়া হইতেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিরূপে?—এই 'ইষ্টনিষ্ঠা' দ্বারা। নানাপ্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কি আদর্শ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই—জোর করিয়া কোন আদর্শ আপনার উপর চাপাইয়া দিবার অধিকার আমার নাই। আমার কর্তব্য—আপনার সম্মুখে এই-সব আদর্শ তুলিয়া ধরা—যাহাতে আপনি বুঝিতে পারেন, কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে, কোন্‌টা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, এবং কোন্‌টা আপনার প্রকৃতিসঙ্গত। যেটি আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেটি গ্রহণ করুন, এবং সেই আদর্শ লইয়া ধৈর্যের সহিত সাধন করুন। এটিই আপনার ইষ্ট, আপনার বিশেষ আদর্শ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বাঁধিয়া কখনও ধর্ম হইতে পারে না। ধর্মের প্রকৃত সাধনা প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজ। আমর নিজের একটা ভাব আছে—পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা আমাকে গোপন রাখিতে হইবে; কারণ আমি জানি, ওটি আপনার ভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিব কেন? তাহারা আসিয়া আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। আমার ভাব তাহাদের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহারা আমার সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেড়াই, তবে তাহারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অতএব বলিয়া বেড়াইয়া ফল কি? এই ইষ্ট প্রত্যকেরই গোপন রাখা উচিত; উহা আপনি জানিবেন, এবং আপনার ভগবান্ জানিবেন। ধর্মের তাত্ত্বিক ভাব বা মতবাদগুলি সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে, সমবেত মণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চতর ধর্ম অর্থাৎ সাধন-রহস্য সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে না; কেহ বলা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আমার ধর্মভাবগুলি জাগাইয়া তুলিতে পারি না।

সমবেতভাবে উপাসনারূপ এই হাস্যকর অনুষ্ঠানের ফলে হইতেছে কি? ইহা ধর্ম লইয়া উপহাস করা—ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা। আধুনিক গির্জাগুলিতে ইহার ফল প্রত্যক্ষ। মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের 'ওঠ-বস' সহ্য করিবে? এখনকার গির্জার ধর্ম সেনানিবাসে সৈন্যগণের কসরতের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্দুক কাঁধে তোল, হাঁটু গাড়ো, বই হাতে কর—সব ধরাবাঁধা। দু-মিনিট ভাবভক্তি, দু-মিনিট জ্ঞানবিচার, দু-মিনিট প্রার্থনা—সব পূর্ব হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার—গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই-সব ধর্মের বিকৃত অনুকরণ ও হাস্যকর অনুষ্ঠান এখন আসল ধর্মকে বিতাড়িত করিয়া বসিয়া আছে; আর যদি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ চলে, তবে ধর্ম একেবারে লোপ পাইবে। গির্জাগুলি যত খুশী মতামত, দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করুক, কিন্তু উপাসনার—আসল সাধনার সময় আসিলে যীশু যেমন বলিয়াছেন, সেরূপ করিতে হইবে। 'প্রার্থনার সময় তোমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং গোপনে বিরাজমান তোমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা কর।'

২৮

ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম সাধন করিতে হয়, যদি অপরের সহিত বিবাদ এড়াইতে হয় এবং যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতি-লাভ করিতে হয়, তবে এই ইষ্টনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, আপনারা যেন আমার কথার এরূপ ভুল অর্থ বুঝিবেন না যে, আমি গুপ্তসমিতি-গঠন সমর্থন করিতেছি। যদি শয়তান কোথাও থাকে, তবে গুপ্তসমিতিগুলির ভিতরেই তাহাকে খুঁজিব। গুপ্তসমিতিগুলি পৈশাচিক পরিকল্পনা।

'ইষ্ট' একটি পবিত্র ভাব, ইহা কিছু গুপ্ত ব্যাপার নয়; কিন্তু কি অর্থে? অন্যের নিকট নিজ ইষ্টের কথা বলিব না কেন? কারণ নিজের প্রাণের বস্তু বলিয়া উহা পরম পবিত্র। উহা দ্বারা অপরের সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে না, তাহা জানিবে কি করিয়া? কোন ব্যক্তির প্রকৃতি এইরূপ হইতে পারে যে, সে ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে না, সে কেবল নির্গুণ ঈশ্বরের—নিজ উচ্চতম স্বরূপের উপাসনা করিতে পারে। মনে করুন, আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম, এবং সে বলিতে লাগিল—ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু তোমার আমার—সকলের মধ্যেই আত্মস্বরূপ একমাত্র ঈশ্বর আছেন। আপনারা ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন—চমকিয়া উঠিবেন। তাহার ঐ ভাব পরম পবিত্র বটে, কিন্তু উহা গোপন রহিল না।

কোন বড় ধর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য কখনও গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভারতে এরূপ কোন গুপ্তসমিতি নাই, এগুলি পাশ্চাত্য ভাব—এখন ঐগুলি ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমরা এ-সব গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জানিতাম না, আর ভারতে এই গুপ্তসমিতি থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইওরোপে কাহাকেও চার্চের মতের বিরোধী ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে দেওয়া হইত না। সেই কারণে গরীব বেচারারা নিজেদের মনোমত উপাসনার জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া গুপ্তসমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করার দরুন

কখনও কাহার উপর অত্যাচার করা হয় নাই। কখনও গুপ্ত ধর্মসমিতি ছিল না, সুতরাং ঐরূপ কোন ধারণা আপনারা একেবারেই ছাড়িয়া দিবেন। ঐ-সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হয়। এ পৃথিবীর যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেই আমি জানি, এইসব গুপ্তসমিতি কত অনিষ্টের মূল—কত সহজে এগুলি বাধাহীন প্রেমসমিতি ও ভুতুড়েসমিতি হইয়া দাঁড়ায়। অপর নরনারীর হাতের পুতুল হইয়া নিজেদের জীবনটা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই-সব বলিতেছি বলিয়া আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। আমার সারা জীবনে হয়তো পাঁচ-সাত জন নরনারী আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কিন্তু এই কয় জন যেন পবিত্র, অকপট ও খাঁটি হয়, আমি লোকের ভিড় চাই না। কতকগুলি লোক জড়ো হইয়া কি করিবে? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের দ্বারাই জগতের ইতিহাস রচিত হইয়াছে—অবশিষ্টগুলি তো উচ্ছৃঙ্খল জনতা। এই-সমস্ত গুপ্তসমিতি ও বুজরুকি-ভাব নরনারীকে অপবিত্র, দুর্বল ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে; দুর্বল ব্যক্তিদের ইচ্ছাশক্তি নাই, সুতরাং তাহারা কখনও কোন কাজ করিতে পারে না। অতএব গুপ্তসমিতিগুলির সংস্রবে থাকিবেন না। মনে ঐ-সব ভ্রান্ত রহস্যপ্রিয়তা উদিত হইবামাত্র একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। যে সামান্য পরিমাণেও অপবিত্র, সে কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। একরাশ ফুল দিয়া পচা ঘা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। আপনারা কি মনে করেন—ভগবানকে ঠকাইতে পারিবেন? কেহই পারে না। আমি অকপট নরনারী চাই, ঈশ্বর আমাকে এই-সব ভূত, উড়ন্ত দেবদূত ও শয়তান হইতে রক্ষা করুন। সাদাসিধা সাধারণ মানুষ হউন।

অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কারগুলি—দেহের যে-সকল ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা-আপনি হইয়া যায়, সেইগুলি ইহার উদাহরণ। ইহা অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর বৃত্তি আমাদের আছে—তাহাকে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি বলা যায়, এই বুদ্ধি নানা বিষয় গ্রহণ করিয়া সেইগুলি হইতেই একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে—তাহাকে প্রাতিভ-জ্ঞান বলে। উহাতে আর যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সহসা হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার প্রভেদ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? ইহাই মুশকিল। আজকাল প্রত্যেকেই আপনার নিকট আসিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, এবং অলৌকিক দাবী উপস্থিত করে। তাহারা বলে, 'আমি দিব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছি—আমার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করিয়া দাও, আমার কাছে আসিয়া সব জড়ো হও, আমার পূজা কর।'

দিব্য প্রেরণা ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাইবে? প্রথমতঃ দিব্যজ্ঞান কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না। বৃদ্ধাবস্থা শৈশবের বিরোধী নয়, উহার বিকাশমাত্র। এইরূপে আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান বলি, তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাশমাত্র। যুক্তিবিচারের ভিতর দিয়াই দিব্যজ্ঞানে পৌঁছিতে হয়। দিব্যজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না। যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিন। আপনার অজ্ঞাতে দেহের স্বাভাবিক সহজাত গতিগুলি তো যুক্তির বিরোধিতা করে না। রাস্তা পার হইবার সময় যাহাতে গাড়ী চাপা না পড়িতে হয়, সেজন্য অজ্ঞাতসারে আপনার দেহের গতি কিরূপ হইয়া থাকে? আপনার মন কি বলে, দেহকে এরূপে রক্ষা করা নির্বোধের কাজ হইয়াছে? কখনই বলে না। প্রকৃত প্রেরণা কখনও যুক্তির বিরোধী হয় না। যদি হয়, তবে উহা প্রেরণা নয়, বুজরুকি। দ্বিতীয়তঃ এই দিব্যপ্রেরণা সকলের কল্যাণকর হওয়া চাই। নাম যশ বা ব্যক্তিগত লাভ যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। উহা দ্বারা সর্বদাই জগতের—সমগ্র মানবের কল্যাণই হইবে। দিব্যপ্রেরণা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবে। যদি এই লক্ষণগুলি মিলে, তবে অনায়াসে উহাকে প্রেরণা বা প্রাতিভ-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্তমান অবস্থায় দশ লক্ষের মধ্যে একজনেরও এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয় কিনা সন্দেহ। আমি আশা করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে, এবং আপনারা প্রত্যেকেই এইরূপ দিব্যপ্রেরণাসম্পন্ন হইবেন। এখন তো আমরা ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি মাত্র, এই দিব্যপ্রেরণা হইলেই আমাদের যথার্থ ধর্ম আরম্ভ হইবে। সেণ্ট পল যেমন বলিয়াছিলেন, 'এখন আমরা অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, কিন্তু তখন সামনাসামনি দেখিব।' জগতের বর্তমান অবস্থায় এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কিন্তু এখন যেরূপ জগতে 'আমি দিব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছি' বলিয়া মিথ্যা দাবী শুনা যায়, এরূপ আর কখনই শুনা যায় নাই, এবং লোকে বলিয়া থাকে, মেয়েদের দিব্যপ্রেরণাশক্তি আছে এবং পুরুষেরা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উন্নত হয়। এ-সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিবেন না। দিব্যপ্রেরণাসম্পন্না নারী যত আছে, ঐরূপ পুরুষও তত আছে। যদিও মেয়েদের এইটুকু বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকার মূর্ছা ও স্নায়ুরোগ বেশী। জুয়াচোর ও ঠকের কাছে প্রতারিত হওয়া অপেক্ষা অবিশ্বাসী থাকিয়া মরাও ভাল। ব্যবহার করিবার জন্য আপনাকে বিচারশক্তি দেওয়া হইয়াছে, দেখান—আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। ঐরূপ করিলে পর উহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে হাত দিতে পারিবেন।

ঐ ভাব সমগ্র জাতিকে হীনবীর্য করে, স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করে, সর্বদা একটা ভূত বা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার পিপাসা বাড়াইয়া দেয়। এই-সব আজগুবী গল্প স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত করে। ইহাতে সমগ্র জাতি ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীনবীর্য হইয়া যায়।

আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—তিনি এ-সব অদ্ভুত ব্যাপারের ভিতর নাই। 'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ'—সে মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য একটা কূপ খুঁড়িতে যায়। সে মূর্খ, যে হীরার খনির নিকট থাকিয়া কাচদণ্ডের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরই সেই হীরক-খনি। আমরা ভূতের অথবা এইরূপ সমুদয় উড়ন্ত পরীর গল্পের প্রতি বৃথা আসক্ত হইয়া ভগবানকে ত্যাগ করিতেছি—ইহা বাস্তবিক আমাদের মূর্খতা।

ঈশ্বর, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি ছাড়িয়া এই-সব বৃথা বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া অবনতির লক্ষণ! পরের মনের ভাব

জানা! পাঁচ মিনিট করিয়া যদি আমাকে প্রত্যেকের মনের ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে তো আমি পাগল হইয়া যাইব। তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া প্রেমের ভগবানকে অন্বেষণ কর। ইহাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। পবিত্রতার শক্তি অপেক্ষা আর কোন্ শক্তি বড়? প্রেম ও পবিত্রতাই জগৎ শাসন করিতেছে। দুর্বল ব্যক্তি কখনও এই ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে পারে না; অতএব শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক—কোন দিক্ দিয়া দুর্বল হইবেন না। ঐ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড কেবল আপনাকে দুর্বল করিয়া ফেলে; অতএব ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সব অসত্য, অনিত্য। ঈশ্বরলাভের জন্য সমুদয় মিথ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। ‘অসার, অসার—সকলই অসার—শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসা ও তাঁহার সেবা করা ছাড়া আর সবই বৃথা।’

২৯

গৌণী ও পরা ভক্তি*

দুই-একটি ছাড়া প্রায় সকল ধর্মেই ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্মেই সগুণ ঈশ্বরের ধারণা আছে এবং সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও উপাসনার ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে না, কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে, বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ঠিক সেই ভাবে নিজ নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের পূজা করিয়া থাকে। কোন উচ্চতর পুরুষকে ভালবাসিতে হয়, যিনি আবার মানুষকে ভালবাসিতে পারেন; ভক্তি ও উপাসনা করিবার এই ভাব সর্বজনীন। নানাবিধ ধর্মের বিভিন্ন স্তরে এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের নিম্নতম স্তর বাহ্য অনুষ্ঠান-বহুল—ঐ অবস্থায় সূক্ষ্ম ধারণা একরূপ অসম্ভব, সুতরাং মানুষ সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে নিম্নতম স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থূল আকারে পরিণত করিতে চায়। ঐ অবস্থাতেই নানবিধ অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতীকও আসিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের বাহ্য অঙ্গ—ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঐ পর্যায়ভুক্ত। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গুলির প্রীতিপ্রদ, যাহা কিছু অমূর্তভাবকে মূর্ত করিবার সহায়তা করে, তাহাই মানুষ উপাসনার উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়।

সময়ে সময়ে সকল ধর্মেই সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ মানুষ যতদিন বর্তমান অবস্থায় থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানবই এমন কিছু স্থূল মূর্ত বস্তু ধরিয়া থাকিতে চাহিবে, যাহা তাহাদের ভাবরাশির আধার হইতে পারে—এমন কিছু চাহিবে, যাহা তাহাদের অন্তরের ভাবময়ী মূর্তিগুলির কেন্দ্র হইবে। মুসলমান ও প্রোটেস্টাণ্টরা সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানপদ্ধতি উঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের প্রভূত চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ভিতরেও অনুষ্ঠানপদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। এগুলির প্রবেশ নিবারণ করা যায় না। অনুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করিয়া জনসাধারণ একটি প্রতীকের পরিবর্তে অপর একটি গ্রহণ করে মাত্র। একজন মুসলমান অ-মুসলমানের অনুষ্ঠিত প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহৃত প্রতিটি মূর্তিকে পাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার নিজের কাবা-মন্দির সম্বন্ধে সে আর ঐরূপ মনে করে না। প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, সে কাবা-মন্দিরে রহিয়াছে; এবং সেখানে তীর্থ করিতে গেলে তাহাকে ঐ মন্দিরের দেয়ালে অবস্থিত 'কৃষ্ণপ্রস্তরটিকে' চুম্বন করিতে হয়। তাহার বিশ্বাস—ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরে মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর চুম্বনচিহ্নগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ-বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবে। তারপর আবার 'জিমজিম' কূপ রহিয়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, ঐ কূপ হইতে যে-কেহ একটু জল তুলিবে, তাহারই পাপ ক্ষমা করা হইবে এবং পুনরুত্থানের পর নূতন দেহ পাইয়া সে অমর হইয়া থাকিবে।

অন্যান্য ধর্মে দেখিতে পাই, প্রতীক একটি গৃহের রূপ ধরিয়া প্রবেশ করিতেছে। প্রোটেস্টাণ্টদের মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গির্জা অধিকতর পবিত্র। তাহাদের পক্ষে এই গির্জা একটি প্রতীকমাত্র। তারপর আছে শাস্ত্রগ্রন্থ। অনেকের ধারণা অন্যান্য প্রতীক অপেক্ষা শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক। ক্যাথলিকগণ যেমন সাধুগণের মূর্তি পূজা করে, প্রোটেস্টাণ্টরা তেমনি ক্রুশকে ভক্তি করে। প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা; এবং কেনই বা আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রচার করিব? মানুষ এই-সকল প্রতীকের উপাসনা করিতে পাইবে না, ইহার তো কোন যুক্তি নাই। প্রতীকের পিছনে উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিনিধিরূপেই মানুষ ঐগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বিশ্বই একটি প্রতীক—উহার মধ্য দিয়া, উহার সহায়তায় আমরা উহার অতীতে অবস্থিত—উহার দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। মানুষের নিম্নতর প্রকৃতিই এই—সে একেবারে জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রতীক অবলম্বনের মাধ্যমে জগদতীত বস্তুকে ধরিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, আমরা প্রতীকের লক্ষ্য বস্তুকে—জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ধরিবার জন্যই সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চরম লক্ষ্য চৈতন্য—জড় নয়। ঘণ্টা, প্রদীপ, মূর্তি, শাস্ত্র, গির্জা, মন্দির, অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতীক খুব ভাল বটে, ধর্মরূপ চারাগাছের বৃদ্ধির পক্ষে খুব সহায়ক বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত; উহার বেশী আর কোন উপযোগিতা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, চারাগাছটি আর বড় হয় না! কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া মরা ভাল নয়। এমন সমাজে বা সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত; ঐগুলি ধর্মরূপ চারাগাছটিকে বড় হইতে সাহায্য করিবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ-সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়াই মরিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, তাহার উন্নতি হয় নাই, তাহার আত্মার বিকাশ হয় নাই।

অতএব যদি কেহ বলে, এই-সকল প্রতীক ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি চিরকালের জন্য রাখিতে হইবে, তবে সে ভ্রান্ত; কিন্তু যদি সে বলে, ঐগুলি সাধকের নিম্নতর অবস্থায় আত্মার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে। এখানে আমি আর একটি কথা বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে আপনারা যেন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বুঝিবেন না। কোন ব্যক্তির প্রভূত বুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়তো শিশুমাত্র বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। আপনারা এখনই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বুদ্ধির দিক্ দিয়া আপনারা সকলেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু 'সর্বব্যাপী' বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার কোনপ্রকার ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়তো আকাশ বা একটা বিরাট সবুজ প্রান্তর অথবা সমুদ্র বা মরুভূমির ভাব মনে আনিতে পারেন, অবশ্য যদি শেষের দুইটি আপনি দেখিয়া থাকেন। এগুলি সবই জড় প্রতিমূর্তি, এবং যত দিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই-সকল জড়বস্তুর প্রতিমূর্তির সাহায্য আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড়মূর্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরই থাকুক অথবা বাহিরেই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আপনারা সকলেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক; এবং পৌত্তলিকতা ভাল, কারণ উহা মানুষের

প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিদ্ধ ও দেব-মানবেরাই পারেন। বাকী সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা এই বিভিন্ন রূপ ও আকারবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আপনারা কি জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুতুলের পূজা করিতেছেন না? যে বলে, আমি শরীর, সে তো জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। আপনারা সকলেই আত্মা—নিরাকার আত্মস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ; আপনারা কখনই জড় নন। অতএব যে-ব্যক্তি সূক্ষ্মধারণায় অসমর্থ, নিজেকে জড়বস্তু ও দেহ বলিয়া ভাবে এবং সেরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যে নিজ স্বরূপ চিন্তায় অসমর্থ, সেই পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন মানুষ পরস্পর বিবাদ করে, একজন আর একজনকে পৌত্তলিক বলিয়া গালি দেয়! অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাস্য পুতুলকে ঠিক মনে করে এবং অপরের উপাস্য পুতুলকে ভ্রান্ত মনে করে!

অতএব আমাদিগকে এই-সকল শিশুজনোচিত ধারণা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে, আমাদিগকে অজ্ঞজনোচিত বৃথা বাদানুবাদের উচ্চে উঠিতে হইবে। ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি অসার কথার সমষ্টি মাত্র—কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ মতবাদ, ইহাদের মতে ধর্ম কেবল কতকগুলি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির সম্মতি বা অসম্মতির-প্রকাশ মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম পুরোহিতগণের কতকগুলি বাক্যে বিশ্বাস মাত্র, ইহদের মতে ধর্ম পূর্বপুরুষগণের কয়েকটি বিশ্বাস-সমষ্টি, ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কারের সমষ্টি—জাতীয় ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার বলিয়াই তাহারা সেগুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই-সব ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, দেখিতে হইবে—সমগ্র মানবজাতি যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাণী, ধীরে ধীরে আলোকের অভিমুখে আবর্তিত হইতেছে; উহা যেন এক আশ্চর্য বৃক্ষশিশু, ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া এক অমূর্ত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে সত্যের নাম 'ঈশ্বর'; এবং উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি—প্রথম ঘূর্ণন সর্বদা জড়ের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এড়াইবার উপায় নাই।

এই-সকল অনুষ্ঠানের হৃদয়স্বরূপ এবং অন্যান্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নামোপাসনা। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম এবংপৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উহাদের ভিতর 'নামোপাসনা' বলিয়া একটি অপূর্ব ভাব প্রচলিত। 'নাম' অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। বাইবেলে পড়িয়াছি—হিব্রুদের নিকট ভগবানের নাম এত পবিত্র মনে করা হইত যে, যে-কেহ উহা উচ্চারণ করিতে পারিত না বা যে-কোন সময়ে উহা উচ্চারণ করা চলিত না, কিছুর সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। ভগবানের নাম পবিত্রতম এবং তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ নামই ঈশ্বর। ইহাও সত্য। বিশ্বজগৎ নামরূপ বৈ আর কি? আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন? শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যাইতে পারে না, উহারা অভিন্ন। চেষ্টা করুন, যদি কেহ এ-দুইটিকে পৃথক্ করিতে পারেন! যখনই আপনারা চিন্তা করেন তখনই শব্দ-অবলম্বনে চিন্তা করেন। শব্দগুলি সুক্ষ্ম ভিতরের অংশ এবং ভাব বাহ্য অংশ; এ-দুইটি সর্বদা একসঙ্গে আসিবে, ইহাদের পৃথক্ করা যায় না। একটি আর একটিকে লইয়া আসে। ভাব থাকিলেই শব্দ আসিবে, আবার শব্দ থাকিলেই ভাব আসিবে। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন ভগবানের বাহ্য প্রতীক-স্বরূপ, উহার পিছনে রহিয়াছে ভগবানের পুণ্য নাম। প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে আছে উহার নাম। যখনই আপনি আপনার বন্ধু-বিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার শরীরের কথা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম। তাৎপর্য এই যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মানুষের চিত্তের মধ্যে রূপ-জ্ঞান ব্যতীত নাম-জ্ঞান আসিতে পারে না, নাম-জ্ঞান ব্যতীত রূপ-জ্ঞান আসিতে পারে না। উহারা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। উহারা একই তরঙ্গের বাহিরের ও ভিতরের দিক্। এই কারণে সমগ্র জগতে ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত ঘোষিত এবং নামোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ নাম-মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল।

আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধর্মে সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের পূজা করা হয়। লোকে কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। আবার সাধুগণের পূজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধু-সন্তের পূজা হইয়া থাকে। না হইবেই বা কেন? আলোকের স্পন্দন সর্বত্র রহিয়াছে। পেচক অন্ধকারে দেখিতে পায়; তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, অন্ধকারেও আলো আছে, কিন্তু মানুষ তাহাতে আলো দেখিতে পায় না। ঐ আলোকের স্পন্দন একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে—যথা প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে, মানুষের চক্ষুস্নায়ুতে আলোক অনুভূত হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি নিজেকে সকল প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে মানুষের মধ্যে চিনিতে পারে। যখন তাঁহার আলোক, তাঁহার সত্তা, তাঁহার চৈতন্য মানুষের দিব্য মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়, তখন—কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে। এইরূপে মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে, এবং যতদিন সে মানুষ থাকিবে, ততদিন এইরূপই করিবে। মানুষ ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে বুঝিতে পারিবে ভগবানকে মানুষরূপে চিন্তা করা মানুষের প্রকৃতিগত।

অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরোপাসনার তিনটি সোপান দেখিতে পাই—প্রতীক বা মূর্তি, নাম ও দেবমানব। সকল ধর্মেই এগুলি কোন-না-কোন আকারে আছে; তথাপি দেখিতে পাইবেন, মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতে চায়। কেহ বলে, আমি যে-নাম সাধনা করিতেছি, তাহাই ঠিক নাম; আমি যে-রূপের উপাসক, তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ; আমি যে-সব দেবমানব মানি, তাঁহারাই ঠিক; তোমার গুলি পৌরাণিক গল্পমাত্র। বর্তমান কালের খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ পূর্বাপেক্ষা একটু সদয় হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা বলেন, প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রীষ্টধর্মেরই পূর্বাভাস মাত্র। অবশ্য তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন—শেষে খ্রীষ্টধর্মে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এই ভাব অন্ততঃ গোঁড়ামি অপেক্ষা অনেকটা ভাল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহারা এরূপ কথাও বলিতেন না, তাঁহাদের নিজ ধর্ম ছাড়া আর সবকিছু তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। ধর্ম জাতি বা শ্রেণী-বিশেষে এই ভাব সীমাবদ্ধ নয়। লোকে সর্বদাই ভাবে, তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে, অপরকেও তাহাই করিতে হইবে; এবং এখানেই বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় আমাদের উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে ভাবগুলিকে আমরা আমাদের নিজস্ব—সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি শত শত বর্ষ পূর্বে অন্যের ভিতর ছিল, সময়ে সময়ে বরং আমরা যেভাবে ঐগুলি ব্যক্ত করি, তাহা অপেক্ষা পরিস্ফুটভাবেই

ব্যক্ত ছিল।

ভক্তির এই-সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়; কিন্তু যদি সে অকপট হয়, যদি সে প্রকৃতপক্ষেই সত্যে পৌঁছিতে চায়, তবে সে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এক ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতির আর মূল্য থাকে না। মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক—প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। আর যদি কেহ ধর্ম চায়, তবে এই প্রাথমিক সোপানগুলি একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হইতেই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়। কে তাঁহাকে চায়? ইহাই প্রশ্ন। ধর্ম—মতমতান্তরে নাই, তর্কযুক্তিতে নাই; ধর্ম—হওয়া; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। আমরা দেখিতে পাই—সকলেই ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জগতের সর্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলে, কিন্তু যদি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছ? তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ?' কয়জন লোক সাহসের সহিত বলিতে পারে, 'করিয়াছি'? তথাপি তাহারা পরস্পর লড়াই করিতেছে!

একবার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা; আর একজন বলিল, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা। পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচার চলিতে লাগিল, কিছুতেই আর তর্কের বিরাম হয় না। সেই স্থান দিয়া এক মুনি যাইতেছিলেন, সকলে তাঁহাকে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে আহ্বান করিল। তিনি প্রথমে শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শিবকে দেখিয়াছ? তোমার সঙ্গে কি তাঁহার পরিচয় আছে? যদি না থাকে, তাহলে কিরূপে জানিলে—তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা?' তারপর তিনি বৈষ্ণবকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি বিষ্ণুকে দেখিয়াছ?' সকলকে ঐ প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না, এবং সেই জন্যই তাহারা অত বিবাদ করিতেছিল; যদি তাহারা সত্য সত্যই ঈশ্বরকে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শূন্য কলসী জলে ডুবাইলে শব্দ হইতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বিবাদ-বিসংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহারা ধর্মের কিছুই জানে না; ধর্ম তাহাদের নিকট পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কতকগুলি বাজে কথামাত্র। সকলেই তাড়াতাড়ি এক-একখানা বড় পুস্তক লিখিতে ব্যস্ত—উহার কলেবর যতদূর সম্ভব বড় করিতে হইবে, সেজন্য যেখান হইতে পারে চুরি করিয়া পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে থাকে, অথচ কাহারও নিকট ঋণ স্বীকার করে না। তারপর তাহারা উহা প্রকাশ করিয়া পৃথিবীতে যে গণ্ডগোল পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, তাহা আরও বাড়াইয়া তুলে।

সংসারের অধিকাংশ লোকই নাস্তিক। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে আর এক প্রকার নাস্তিকের—জড়বাদীদের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত। ইহারা অকপট নাস্তিক। ইহারা কপট ধর্মবাদী নাস্তিক অপেক্ষা ভাল। ধর্মবাদী নাস্তিকেরা ধর্মের কথা বলে, ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, কিন্তু কখনই ধর্ম চায় না—ধর্ম বুঝিবার বা সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করে না। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাক্যগুলি স্মরণ করুন, 'চাহিলেই তোমাকে দেওয়া হইবে, অনুসন্ধান করিলেই পাইবে, করাঘাত করিলেই দ্বার খুলিয়া যাইবে।' এই কথাগুলি উপন্যাস রূপক বা কল্পনা নয়, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। জগতে যে-সকল ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে উৎসারিত ঐ কথাগুলি কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলা নয়। ঐগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির ফল—ঐগুলি এমন একজনের কথা, যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন—ভগবানের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ভগবানের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন; আপনি আমি এই বাড়ীটাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা শতগুণ স্পষ্টভাবে তিনি ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবানকে চায় কে?—ইহাই প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, দুনিয়াসুদ্ধ লোক ভগবানকে চাহিয়াও পাইতেছে না? তাহা কখনই হইতে পারে না। মানুষের এমন কি অভাব আছে, যাহা পূরণ করিবার উপযোগী বস্তু বাহিরে নাই। মানুষ নিঃশ্বাস নিতে চায়—তাহার জন্য বায়ু আছে। মানুষ খাইতে চায়—সেজন্য খাদ্য রহিয়াছে। কোথা হইতে এই-সব বাসনার উৎপত্তি? বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব হইতে। আলোকই চক্ষু উৎপন্ন করিয়াছে, শব্দ হইতেই কর্ণ হইয়াছে। এইরূপ মানুষের মধ্যে যে-কোন বাসনা আছে, তাহাই পূর্ব হইতে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; পূর্ণত্বলাভের—সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার, প্রকৃতির পারে যাইবার ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল, যদি না কেহ উহা আমাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকে? অতএব যাঁহার ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবেন। কিন্তু কাহার এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব কিছুই চাই। আপনারা সমাজে যাহা দেখিতে পান, উহাকে 'ধর্ম' বলা যায় না। 'আমার গৃহিণীর সমগ্র পৃথিবী হইতে সংগৃহীত নানাবিধ আসবাব আছে, কিন্তু এখন ফ্যাশন—জাপানী কোন জিনিষ ঘরে রাখা, তাই তিনি একটি জাপানী ফুলদানি কিনিয়া ঘরে রাখিলেন'—অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্মও এইরূপ। ভোগের জন্য তাহাদের সর্বপ্রকার বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে না থাকায় জীবনটা যেন ঠিকভাবে চলিতেছে না। সমাজে সমালোচনা হইবে, সেই জন্যই একটু-আধটু ধর্ম চাই। আজকাল পৃথিবীতে ধর্মের এই অবস্থা।

এক শিষ্য তাহার গুরুর নিকটে গিয়া বলিল, 'গুরুদেব, আমি ধর্মলাভ করিতে চাই।' গুরু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিলেন। শিষ্য প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিত, 'আমাকে ধর্মলাভের উপায় করিয়া দিন।' গুরু অবশ্য এ-বিষয়ে শিষ্য অপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন। একদিন খুব গরমের সময় তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন। যুবকটি জলে ডুব দিবামাত্র গুরু তাহার পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে জলের নীচে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। যুবক জল হইতে উঠিবার জন্য অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করিলে গুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন জলের ভিতর ছিলে, তখন তোমার সর্বাপেক্ষা কিসের অভাব বোধ হইতেছিল?' শিষ্য উত্তর করিল, 'নিঃশ্বাসের জন্য বায়ুর অভাবে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল।' তখন গুরু বলিলেন, 'ভগবানের জন্য কি তোমার ঐরূপ অভাব বোধ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে এক মুহূর্তেই তুমি তাঁহাকে পাইবে।' যতদিন না ধর্মের জন্য আপনাদের ঐরূপ ব্যাকুলতা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, ততদিন যতই তর্ক বিচার করুন, যতই পড়ুন, যতই বাহ্য অনুষ্ঠান করুন, কিছুতেই কিছু হইবে না। যতদিন না হৃদয়ে এই ধর্মপিপাসা জাগিতেছে, ততদিন নাস্তিক অপেক্ষা আপনি কিছুমাত্র উন্নত নন। নাস্তিক বরং অকপট, আপনি তা নন।

একজন মহাপুরুষ বলিতেন, 'মনে কর, এ ঘরে একটা চোর রহিয়াছে; সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াছে যে, পাশের ঘরে একতাল সোনা আছে, এবং ঐ দুইটি ঘরের মধ্যে আছে একটি খুব পাতলা দেওয়াল। এরূপ অবস্থায় ঐ চোরের কিরূপ অবস্থা হইবে? তাহার ঘুম হইবে না, সে খাইতে পারিবে না, সে কিছুই করিতে পারিবে না—কেবল কিরূপে ঐ সোনার তাল সংগ্রহ করিবে, সেইদিকে তাহার মন পড়িয়া থাকিবে। সে কেবল ভাবিবে কিরূপে ঐ দেওয়াল ছিদ্র করিয়া সোনার তালটা লইবে। তোমরা কি বলিতে চাও, যদি মানুষ যথার্থ বিশ্বাস করিত যে, সুখ আনন্দ ও মহিমার খনি স্বয়ং ভগবান্ এখানে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণভাবে সাংসারিক কাজ করিতে সমর্থ হইত?' যখনই মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভগবান্ বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পাগল হইয়া উঠে। অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে, কিন্তু যখনই কেহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে যেভাবে জীবনযাপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এক জীবন আছে; যখনই সে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গুলিই মানুষের সর্বস্ব নয়; যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী নিত্য অক্ষয় আনন্দের তুলনায় এই সীমাবদ্ধ জড়দেহ কিছুই নয়, তখনই সে নিজে সেই আনন্দ লাভ না করা পর্যন্ত পাগলের মত উহারই অনুসন্ধান করে। এই উন্মত্ততা, এই তৃষ্ণা—এই ঝোঁককে ধর্মজীবনের 'জাগরণ' বলে; যখনই মানুষের এই অবস্থা হয়, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ হইতে অনেক দিন লাগে। এই-সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রার্থনা, তীর্থ-পর্যটন, শাস্ত্রাদি, কাঁসর-ঘণ্টা, প্রদীপ-পুরোহিত ঐ অবস্থার জন্য প্রস্তুতি। ঐগুলির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। আর যখনই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই উহা স্বভাবতই উহার মূলকারণ, সমুদয় বিশুদ্ধির আকর স্বয়ং ঈশ্বরকে লাভ করিতে চায়। শত শত যুগের ধূলি-আচ্ছাদিত লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট পড়িয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু কোন উপায়ে ঐ ধূলি অপসারিত হইলে আবার উহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে জীবাত্মাও শত শত যুগের অপবিত্রতা, দুর্বৃত্ততা ও পাপের ধূলিজাল আবৃত রহিয়াছে। এই-সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, পরের কল্যাণ সাধন করিয়া, পরকে ভালবাসিয়া অনেক জন্মের পরে যখন সে যথেষ্ট পবিত্র হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে তখন জাগরিত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে।

কিন্তু এই-সকল অনুষ্ঠান—প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি ধর্মের আরম্ভ মাত্র, এগুলিকে যথার্থ ঈশ্বরপ্রেম বলা যাইতে পারে না। প্রেমের কথা আমরা সর্বত্র শুনিয়া থাকি। সকলেই বলে, ভগবানকে ভালবাসো, কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানে না। যদি জানিত, তবে যখন তখন হালকাভাবে ভালবাসার কথা বলিত না। প্রত্যেকে বলে, সে ভালবাসিতে পারে; কিন্তু পাঁচ মিনিটেই বুঝিতে পারে, তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা নাই। প্রত্যেকটি নারীই বলিয়া থাকেন, তিনি ভালবাসিতে পারেন; কিন্তু তিন মিনিটেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভালবাসিতে পারেন না। এই সংসার ভালবাসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে, তাহা জানিবে কিরূপে? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে, উহাতে আদানপ্রদান বা লাভক্ষতির প্রশ্ন নাই। কিছু পাইবার জন্য যখন একজন অপরকে ভালবাসে, জানিবেন—উহা ভালবাসা নয়, দোকানদারি মাত্র। যেখানে কেনা-বেচার কথা, সেখানে আর ভালবাসা নাই। অতএব যখন কেহ 'ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, জানিবেন—তাহা ভালবাসা নয়। কি করিয়া হইবে? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তবস্তুতি উপহার দিলাম, তুমি তাহার পরিবর্তে আমাকে কিছু দাও—ইহা তো দোকানদারি মাত্র।

এক রাজা বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া রাজা এত খুশী হইলেন যে, তিনি সাধুকে তাঁহার নিকট হইতে কিছু উপহার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, 'না, আমি নিজের অবস্থায় খুব সন্তুষ্ট আছি। এই-সব বৃক্ষ হইতে খাইবার জন্য যথেষ্ট ফল পাই, এই-সব সুন্দর পবিত্র নদী হইতে প্রয়োজন- মত জল পাই, এই-সব গুহায় নিদ্রা যাই। যদিও তুমি রাজা, তথাপি তোমার প্রদত্ত উপহার আমি গ্রাহ্য করি না।' রাজা বলিলেন, 'শুধু আমাকে পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্বক একবার আমার রাজধানীতে আসুন।' অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে সাধু রাজার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে চতুর্দিকে সোনা, হীরা, মণিমাণিক্য, জহরত এবং আরও অনেক অদ্ভুত বস্তু ছিল। চারিদিকে ঐশ্বর্য-বৈভবের চিহ্ন। রাজা বলিলেন, 'আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি প্রার্থনা শেষ করিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া তিনি গৃহের এক কোণে গিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভো, আমাকে আরও ঐশ্বর্য দাও, আরও সন্তানসন্ততি দাও, রাজ্য দাও।' ইতোমধ্যে সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাজা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিলেন, 'দাঁড়ান, আমার উপহার গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন?' তখন সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। তুমি আর কি দিতে পার? তুমি নিজেই সর্বদা ভিক্ষা করিতেছ!' ঐরূপ প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নয়। যদি ভগবানের নিকট ইহা-উহা প্রার্থনা কর, তবে প্রেমে ও দোকানদারিতে প্রভেদ কি? সুতরাং প্রেমের প্রথম লক্ষণ এই—উহাতে কোনরূপ আদান-প্রদান নাই, প্রেম সর্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা নয়। ভগবানের প্রকৃত সন্তান বলেন, 'ভগবান্ যদি চান, তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্বস্ব দিতে পারি কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না, এই জগতের কোন জিনিষই আমি চাই না। তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভালবাসি, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। কে জানিতে চায়—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ কিনা? আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন শক্তিও চাই না এবং তাঁহার শক্তির কোন প্রকাশও দেখিতে চাই না। তিনি প্রেমের ভগবান্—এটুকু জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাই না।'

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। প্রেমে কি কোন ভয় থাকিতে পারে? মেষশিশু কি কখনও সিংহকে ভালবাসে? না—মূষিক বিড়ালকে? না—দাস প্রভুকে ভালবাসে? ক্রীতদাসগণ সময়ে সময়ে ভালবাসার ভান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা কি ভালবাসা? ভয়ের মধ্যে ভালবাসা কোথায় দেখিয়াছেন? উহা ভান মাত্র বুঝিতে হইবে। যতদিন মানুষ ভগবানকে মেঘের উপর আসীন, এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড দিতেছেন বলিয়া চিন্তা করে, ততদিন কোন ভালবাসা সম্ভব নয়।

ভালবাসার সহিত কখনও ভয়ের ভাব থাকিবে না। ভাবিয়া দেখুন—একজন তরুণী জননী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতেছে—অমনি তিনি সামনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। মনে করুন, পরদিনও তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—সঙ্গে তাঁহার শিশুসন্তান। আরও মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া শিশুটিকে আক্রমণ করিল; তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি? তখন তাঁহার শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সিংহের মুখেই যাইবেন। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে। ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ। ভগবান্ পুরস্কারদাতা না দণ্ডদাতা—ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রকৃত প্রেমিক কখনও এভাবে চিন্তা করে না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কিভাবে দেখেন? পত্নী তাঁহাকে বিচারপতি, পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা-রূপে দেখেন না—তাঁহাকে স্বামী বলিয়া, প্রেমাস্পদ বলিয়াই দেখেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহাকে কি ভাবে দেখে? স্নেহময় পিতা বলিয়াই দেখে, পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না। এইরূপে ভগবানের সন্তানরাও কখনও ভগবানকে পুরস্কারদাতা বা দণ্ডবিধাতা-রূপে দেখেন না। বাহিরের লোক—যাহারা তাঁহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পায় নাই, তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁহার ভয়ে সর্বদা কাঁপিতে থাকে। এ-সব ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করুন। ভগবান্ পুরস্কারদাতা বা দণ্ডদাতা—এ-সব ভাব ভয়াবহ; যাহারা বর্বর-প্রকৃতি, তাহাদের পক্ষে হয়তো এগুলির কিছু উপযোগিতা থাকিতে পারে। অনেক লোক—খুব বুদ্ধিমান্ লোকও ধর্মজগতে বর্বরতুল্য, সুতরাং এ ভাবগুলিতে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর, যাঁহাদের যথার্থ ধর্মভাব জাগরিত হইয়াছে, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ও-সব ভাব শুধু ছেলেমানুষি, বোকামি। এইরূপ ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ আরও উচ্চতর। প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করে, যখন সে দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়, তখন সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে, প্রেমই সর্বদা আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে কতই তো দেখিতে পাই, পরমা সুন্দরী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে! আবার অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সুন্দর পুরুষ এক অতি কুৎসিতা নারীকে ভালবাসিতেছে! সেখানে কিসের আকর্ষণ? বাহিরের লোক তাহাদের মধ্যে কুৎসিত নারী বা পুরুষকেই দেখিতে পায়—প্রেমিককে দেখিতে পায় না, কখনও তাহা দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। কিরূপে ইহা হয়? যে নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, সে তাহার নিজ মনের মধ্যে সৌন্দর্যের যে আদর্শ আছে, তাহাই লইয়া যেন ঐ কুৎসিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করে, সে যে ঐ কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নয়, সে তাহার নিজ আদর্শেরই পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটি যেন উপলক্ষ্যমাত্র, এবং সেই উপলক্ষ্যের উপর সে তাহার নিজ আদর্শ প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই ভালবাসা, সেখানেই এ-কথা খাটে। ভাবিয়া দেখুন, আমাদের অনেকেরই ভাই-ভগিনী দেখিতে খুবই সাধারণ, কিন্তু আমাদের ভাই-ভগিনী বলিয়াই তাহারা আমাদের নিকট পরম সুন্দর।

এই-সব ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেকেই নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপাসনা করে। এই বহির্জগৎ উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা আমাদেরই মন হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করি মাত্র। একটা শুক্তির খোলার ভিতর একটু বালুকণা প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভিতর একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাহার ফলে শুক্তি হইতে রস নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ বালুকণাকে আবৃত করে। এইরূপে সুন্দর মুক্তা উৎপন্ন হয়। আমরাও ঠিক তাই করিতেছি। বহির্জগতের বস্তুসকল বালুকণার মত আমাদের চিন্তার উপলক্ষ্য মাত্র—ঐগুলির উপর আমরা আমাদের নিজেদের ভাব আরোপ করিয়া বাহ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই জগৎটাকে ঘোর নরক-রূপে দেখে, ভাল লোকেরা ইহাকেই পরম স্বর্গ মনে করে। এই জগৎকে প্রেমিকেরা প্রেমপূর্ণ এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বেষপূর্ণ বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ জগতে বিবাদ-বিরোধ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ শান্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না। সুতরাং আমরা সর্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শের উপাসনা করিয়া থাকি, এবং যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসনা করিতে পারি, তখন আমাদের তর্কযুক্তি ও সন্দেহ সব চলিয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে কিনা, এ-কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? আদর্শ তো কখনও নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উহা আমার প্রকৃতির অংশস্বরূপ। যখন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করি, শুধু তখনই ঐ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করি, এবং যেহেতু আমি আমার অস্তিত্ব সন্দেহ করিতে পারি না, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারি না। আমার বাহিরে কোন স্থানে অবস্থিত, খেয়াল অনুযায়ী জগৎ-শাসনকারী, কয়েকদিন সৃষ্টি করার পর অবশিষ্ট কাল নিদ্রাগত এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব—বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে পারুক বা না পারুক, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ-দয়াময় হইতে পারেন কিনা, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ভগবান্ মানুষের পুরস্কারদাতা কিনা, এবং তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারীর চোখে অথবা দয়াশীল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রেমিক এই ভাব অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি এই-সব শাস্তির, ভয় ও সন্দেহের এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট, এবং এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশস্বরূপ—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

কোন্ শক্তিবলে অণু অণুর সহিত, পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আবর্তিত হইতেছে? কোন্ শক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীবজন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে—যেন সমুদয় জগৎকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে? ইহাকেই 'প্রেম' বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ—এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি—সকলের মধ্যেই এই ভগবৎপ্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণাতেই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহার প্রেরণাতেই মাতা সন্তানের জন্য এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে। এই প্রেমের প্রেরণাতেই মানুষ স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; আর আশ্চর্যের কথা, সেই একই প্রেমের প্রেরণায় চোর চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে; কারণ এই-সবের মূলেও ঐ

প্রেম, যদিও তাহার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। ইহাই জগতে একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। চোরের প্রেম টাকার উপর—প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা বিপথে চালিত হইয়াছে। এইরূপে সর্বপ্রকার পাপকর্ম ও সমুদয় পুণ্য—সব কিছুর পশ্চাতেই সেই অনন্ত শাশ্বত প্রেম বিদ্যমান। মনে করুন, একজন একই ঘরে বসিয়া নিউ ইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, এবং ঠিক সেই সময়েই আর একজন তাহার বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই দুই জন লিখিতেছে, কিন্তু যে যেভাবে আলো ব্যবহার করিতেছে, সেই সে-জন্য দায়ী হইবে—আলোর কোন দোষ-গুণ নাই। এই প্রেম সর্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইহাই সমগ্র জগতের প্রেরণা-শক্তি—ইহার অভাবে জগৎ মুহূর্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর।

কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পতিকে ভালবাসে; কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে; কেহই কোন বস্তুর জন্য সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তুকে ভালবাসে।

৩০

এমন কি, অতি-নিন্দিত এই স্বার্থপরতা, তাহাও সেই প্রেমেরই প্রকাশ। এই খেলা হইতে সরিয়া দাঁড়ান, ইহাতে মিশিয়া যাইবেন না, শুধু এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলী—দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত এই বিচিত্র নাটক দেখিয়া যান, এবং এই অপূর্ব ঐকতান শ্রবণ করুন—সবই সেই এক প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও আত্মা বা 'অহং'-ভাব ক্রমশঃ বাড়ীতে থাকে। সেই এক 'অহং'—একটি মানুষ বিবাহিত হইলে দুইটি হইবে, সন্তানাদি হইলে কয়েকটি হইবে; এইরূপে তাহার 'অহং'-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে; গ্রাম, নগর অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সেই আত্মা সকল নরনারী, সকল শিশু, সকল জীবজন্তু, সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে মিলিত করে, উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এক সর্বজনীন প্রেমে—অনন্ত প্রেমে পরিণত হইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর।

এইরূপে আমরা পরা ভক্তিতে উপনীত হই—এই অবস্থায় অনুষ্ঠান ও প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আর কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন? সকল গির্জা-মন্দিরাদি তো তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় গির্জা কোথায়, যাহা তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি নিজেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। যে অসীম প্রেমের সহিত তিনি এক হইয়া গিয়াছেন, তাহার কি আর সীমা আছে? যে-সকল ধর্ম এই প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সেই-সব ধর্মে প্রেমকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি—এই বিভিন্ন আসক্তি ও আকর্ষণ-পূর্ণ জগতে সবই সেই অনন্ত প্রেমের আংশিক বা অন্যভাবের প্রকাশ মাত্র, তথাপি আমরা সর্বদা উহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। বিভিন্ন দেশের সাধুমহাপুরুষগণ উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ঐ প্রেমের তাৎপর্য এতটুকু প্রকাশ করিবার জন্যও ভাষার ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন—এমন কি অতিশয় ইন্দ্রিয়ভোগ-বাচক শব্দগুলি পর্যন্ত দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহার ব্যবহার করিয়াছেন।

হিব্রু রাজর্ষি

৩১

এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও এইভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেনঃ 'হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার দ্বারা একবার চুম্বিত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়ীতে থাকে। তখন সকল দুঃখ দূর হয় এবং সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা করিতে থাকে।'

৩২

ইহাই প্রেমিকের উন্মত্ত অবস্থা—এই অবস্থায় সব বাসনা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমিক বলেন—মুক্তি কে চায়? কে মুক্ত হইতে চায়? এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্বাণপদের অভিলাষ করে?

'আমি ধন চাই না, আমি স্বাস্থ্যও প্রার্থনা করি না, আমি রূপ যৌবনও চাই না, আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিও কামনা করি না—এই সংসারে সমুদয় অশুভের মধ্যেও আমার পুনঃপুনঃ জন্ম হউক—আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না, কিন্তু তোমার প্রতি আমার যেন অহৈতুক প্রেম থাকে।'

৩৩

এই প্রেমের উন্মত্ততাই পূর্বোক্ত সঙ্গীতগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সর্বোচ্চ, স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, প্রবলতম ও অতিশয় মনোহর। এই কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবীয় প্রেমের মত্ততা সাধুমহাপুরুষগণের উন্মত্ত ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেম-মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান—তাঁহারা 'ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত' হইতে চান। সকল ধর্মের সাধুমহাপুরুষগণ যে প্রেম-মদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবদ্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চান না—প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, এবং কি অপূর্ব এই পুরস্কার! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা সকল দুঃখ দূরীভূত হয়; ইহাই একমাত্র পানপাত্র, যাহা পান করিলে ভবব্যাধি অন্তর্হিত হয়, তখন মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় যে, সে মানুষ।

শেষে আমরা দেখিতে পাই—বিভিন্ন সাধনপ্রণালী পরিণামে পূর্ণ একত্বরূপ এক কেন্দ্রের অভিমুখী। আমরা চিরকালেই দ্বৈতবাদিরূপে সাধন আরম্ভ করি—ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। এই দুয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্‌ও যেন মানুষের দিকে আসিতে থাকেন। পিতা, মাতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতির ভাব মানুষ ভগবানের উপর আরোপ করে এবং যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা লাভ করে। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়! দেখা যায় তোমাকে উপাসনা করিলে আমারই উপাসনা করা হয়, আর আমাকে উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা করি। সেই অবস্থায় পৌঁছিলেই মানুষ—যে-অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্বোচ্চ পরিণতি দেখিতে পায়। যেখান হইতে মানুষ আরম্ভ করে, সেইখানেই শেষও করিয়া থাকে। প্রথমে ছিল আত্মপ্রেম, কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র 'অহং' বলিয়া ভ্রম হওয়াতে ভালবাসাও স্বার্থপর ছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোক প্রকাশ পাইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানে অবস্থিত পুরুষবিশেষ মনে হইত, তিনিই তখন যেন অনন্তপ্রেমে পরিণত হইলেন। সাধক নিজেই তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যান, ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন, পূর্বে তাঁহার যে-সব বৃথা বাসনা ছিল, তখন তিনি সেগুলি পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, এবং প্রেমের চরমশিখরে আরোহণ করিয়া সাধক দেখিতে পান—প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ—এক ও অভিন্ন।

দেববাণী

পটভূমিকা

[ইংরেজী Inspired Talks গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মিস ওয়াল্ডো-লিখিত মূল্যবান্ ভূমিকাটির ইংরেজী শিরোনামা 'Introductory Narrative'—দেববাণী পুস্তকে ইহার বাঙলা অনুবাদ 'আমেরিকায় স্বামীজী', উক্ত প্রবন্ধের প্রথমাংশে স্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণ কাল হইতে চিকাগো ধর্ম-মহাসভা, এবং তারপর পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্যের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ। শেষাংশ 'দেববাণী'র পটভূমিকারূপে এখানে প্রদত্ত হইল।]

অবশেষে স্বামীজী অনুভব করিলেন, স্বীয় আচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্মের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করা-রূপ নিজ অভীপ্সিত মহাকার্যে তিনি বেশ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। ক্লাসটি এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, সুতরাং নীচেকার বড় বৈঠকখানা-দুটি ভাড়া লওয়া হইল। এইখানেই স্বামীজী সেই ঋতুটির শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত; প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ—ঘরভাড়া ও স্বামীজীর আহারাদি-ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অমনি স্বামীজী ঘোষণা করিলেন যে, ঐহিক বিষয়ে তিনি সাধারণের সমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। সেগুলির জন্য পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধা ছিল না, সেই অর্থে তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় ক্লাসটি চালাইতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা দিলেই ধর্মব্যাখ্যার কর্তব্য শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে তাঁহাকে এই কার্যের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইবে। পূর্বকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল যে, উপদেষ্টা শিষ্যগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।

ইতোমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্বামীজীর উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা পরবর্তী গ্রীষ্ম ঋতুতেও ঐ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, সেজন্য সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু তিনি একটি ঋতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় গ্রীষ্মের সময় ঐরূপ পরিশ্রম করা সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বৎসরের ঐ সময়ে শহরে থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটির আপনা-আপনি মীমাংসা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেন্ট লরেন্স নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম দ্বীপ 'সহস্র-দ্বীপোদ্যানে'(Thousand Island Park) একখানি ছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামীজী এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যবস্থা স্বামীজীর মনঃপূত হইল; তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর 'মেইন ক্যাম্প'(Maine Camp) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট সেখানে আসিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

যে ছাত্রীটি বাড়ীখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মিস্ ডাচার। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষ্যে একটি পৃথক্ কক্ষ নির্মাণ করা আবশ্যক—যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ করিবে, এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য-হিসাবে আসল বাড়ীখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নূতন পার্শ্ব সংযোজন করিয়া দিলেন। বাড়ীটি এক উচ্চভূমির উপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটি অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্রদ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিস্তৃত ক্যানাডা উপকূলে উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়ীখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়ীখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীখানি সত্য সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) 'একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত', আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনির্মিত সংযোজনটি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট আলোকস্তম্ভের মত দেখাইত। বাড়ীটির তিন দিকে জানালা ছিল এবং উহা পিছনের দিকে ত্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন; তাহার উপরকার ঘরটিতে বাড়ীখানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, এবং সেখানেই স্বামীজী অনেক ঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগের সুপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধু স্বামীজীরই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, সেজন্য মিস্ ডাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক্ সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারান্দায় আসিবার একটি দরজাও ছিল।

এই উপরতলার বারান্দাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ স্বামীজীর সকল সান্ধ্য কথোপকথন এই স্থানেই হইত। বারান্দাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা জায়গা ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়ীখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস্ ডাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পর্দা দিয়া সযত্নে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে-সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য অপূর্ব দৃশ্যটি দেখিবার জন্য সেখানে প্রায় আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না।

এইখানেই আমাদের অবস্থান-কালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসমুদ্রের মত আন্দোলিত হইত, কারণ সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ গ্রামটির একখানি বাড়িও সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেন্ট লরেন্স নদী; উহার বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এগুলি এত দূরে ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই মনে হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটপতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিকুলের মধুর কাকলি, অথবা পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চরমাণ বায়ুর মৃদু মর্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই অপূর্ব মায়া-রাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তাসমন্বিত অপূর্ব রচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরা জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজন-সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দায় গিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না, কারণ আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্বসৌন্দর্যময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্র অস্ত গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয়ই কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক তেমনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই-সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই; ঐগুলি শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতি লাভ করিতাম, তাহা আমাদের কেহই ভুলিতে পারিবে না। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে-সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময় স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি এই ভয়ে যেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন। এই সময়ে তিনি যেরূপ কোমলপ্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়তো অনেকটা সেইরূপ ব্যাপার—তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার ক্ষিপ্র ও সরস প্রত্যুত্তর দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও কখনও মুহূর্তের জন্য জীবনের মূলসুর হইতে বেশীদূরে যাইতেন না। প্রতি জিনিষটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামীজী পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্যগণের মত আর কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি ঐ-সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও ঐগুলি শুনিতে ভালবাসিতাম, কারণ তিনি কখনও এই-সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান্ ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিস্মৃত হইতেন না। আর কোন ভাগ্যবান্ ছাত্রমণ্ডলী এরূপ প্রতিভাবান্ আচার্য-লাভে নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

আশ্চর্য, ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 'সহস্রদ্বীপোদ্যান'-এ স্বামীজীর অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেজন্যই তিনি আমাদিগকে এরূপ দিবারূপ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বারো জনের সকলেই এক-সময়ে একত্র হয় নাই, ঊর্ধ্বসংখ্যায় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে দুইজন পরে 'সহস্রদ্বীপোদ্যা' এই সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামীজী আমাদের পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে নিউ ইয়র্ক নগরে স্বামীজীর তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সহস্যদ্বীপোদ্যান'-এ গমনকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব; প্রত্যেকেই গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামীজী একজন পাকা রাঁধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের দেহান্তের পরে যখন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সেবা করিতেন, সেই সময় তিনি রন্ধনকার্য শিখিয়াছিলেন। এই যুবকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার গুরুদেব কর্তৃক আরব্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্যগুলি শেষ হইবামাত্র (অনেক সময় তাহার পূর্বে) স্বামীজী আমাদিগকে—যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, সেখানে সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি

কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উপনিষৎ বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেদান্তসূত্রে বেদান্তের অন্তর্গত মহাসত্যগুলি যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ আছে। তাহাদের কর্তা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং সূত্রকারগণ প্রত্যেক অনাবশ্যক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—সূত্রকার বরং তাঁহার একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার সূত্রে একটি অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নন।

অত্যন্ত স্বল্পাক্ষর—প্রায় হেঁয়ালির মত বলিয়া বেদান্তসূত্রগুলিতে ভাষ্যকারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, এই তিনজন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজী প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোন একটি লইয়া, তারপর আর একটি ভাষ্য এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং দেখাইতেন —কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাঁহার নিজ মতানুযায়ী সূত্রগুলির বিকৃতার্থ করার অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা তাঁহার নিজ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিবে, নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ অর্থই সেই সূত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন! জোর করিয়া মূলের বিকৃতার্থ করা-রূপ কদভ্যাস কত পুরাতন, তাহা স্বামীজী আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়া দিতেন।

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোনদিন মধ্ববর্ণিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, আবার কোন দিন বা রামানুজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত। তবে শঙ্করের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুলচেরা বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং শেষ পর্যন্ত রামানুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাখ্যাকার রহিয়া যাইতেন।

কখনও কখনও স্বামীজী 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' লইয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই সূত্রগুলিতে ঈশ্বরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়—হিন্দুদের প্রকৃত সর্বগ্রাসী আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ! সে-প্রেম সত্য সত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া তাহাকে ভূতে-পাওয়ার মত পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যভাব লাভ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়, এ উপায় ভক্তগণের স্বভাবতই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে—কেবল তাঁহাকেই ভালবাসার নাম ভক্তি।

এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজী সর্বপ্রথম আমাদিগের নিকট তাঁহার মহান্ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সর্ববিস্তারে বর্ণনা করেন—কিরূপে স্বামীজী দিনের পর দিন তাঁহার সহিত কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝোঁক দমন করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা যে সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুদেবকে সন্তাপিত করিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়াও ফেলিত—এই সকল কথা বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিতেন, স্বামীজী একজন মুক্ত মহাপুরুষ, বিশেষভাবে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে স্বামীজীকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নয়, কিন্তু অপর দেশসমূহের জন্যও কোন একটি বিশেষ কার্য করিতে হইবে। তিনি প্রায় বলিতেন, 'বহুদূরে আমার আরও সব ভক্ত আছে; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা বলে, যাহা আমি জানি না।'

'সহস্রদ্বীপোদ্যান'-এ সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্যত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে এবং ছাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তারপর নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিক-লিখনবিৎকে (stenographer) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামীজীর উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তাঁহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্যের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামীজীকে যেন আবার জীবন্ত বোধ হয় এবং তিনি যেন তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেজন্য কৃতিত্ব একজনের—যিনি পরে স্বামীজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্য নিষ্কামপ্রেম-প্রসূত ছিল, সুতরাং ঐ কার্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল।

এস. ই. ওয়াল্ডো
(S. E. Waldo)

নিউ ইয়র্ক, ১৯০৮

দেববাণী - ১

বুধবার, ১৯ জুন, ১৮৯৫

সহস্রদ্বীপোদ্যানে এই দিন হইতে স্বামীজী নিয়মিত শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। আমাদের সকলে তখনও সমবেত হয় নাই, কিন্তু আচার্যের হৃদয় কাজ করিতে শুরু করিয়াছে; যে তিন-চারজন উপস্থিত ছিলাম, তাহাদিগকে লইয়াই তিনি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজী একখানি বাইবেল হাতে করিয়া ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহা হইতে জনের গ্রন্থখানি

১

খুলিয়া বলিলেন, তোমরা যখন সকলেই খ্রীষ্টান, তখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র দিয়া আরম্ভ করাই ভাল।

জনের গ্রন্থ-প্রারম্ভেই আছেঃ 'আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিতই ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।'

হিন্দুরা এই 'শব্দ'কে বলে থাকেন 'মায়া' বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব, কারণ এটি ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা বিশ্বজগতে প্রতিফলিত দেখি, তখন তাকে 'প্রকৃতি' বলে থাকি। 'শব্দ'-এর দুটি বিকাশ, একটি এই 'প্রকৃতি'—এইটিই সাধারণ বিকাশ; আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণ। সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞেয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুকে আমরা জানতে পারি না। আমরা পরম পিতাকে

২

জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়কে

৩

জানতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা শুধু মানবত্ব-রূপ রঙের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি।

জন-লিখিত গ্রন্থের প্রথম পাঁচ শ্লোকেই খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। এর প্রত্যেকটি শ্লোক গভীরতম দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ।

পূর্ণস্বরূপ যিনি, তিনি কখনও অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের মধ্যেও আছেন বটে, কিন্তু ঐ অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বরের দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা নেত্ররোগাক্রান্ত হয়ে সূর্যকে অন্যরূপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে সূর্য যেমন তেমনই থাকে, তার কিছু এসে যায় না। জনের ঊনত্রিংশ শ্লোকে যে লেখা আছে, 'তিনি জগতের পাপ দূর করেন'—তার মানে এই যে, খ্রীষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর খ্রীষ্ট হয়ে জন্মালেন—মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ, এইটি জানিয়ে দেবার জন্য। আমরা হচ্ছি দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ, কিন্তু দেবভাবাপন্ন মানুষ-হিসাবে খ্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নেই।

ত্রিত্ববাদীদের

৪

যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের মত সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত। একাত্ববাদীদের (Unitarians) খ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু একজন নৈতিক সাধুপুরুষ। এ দুয়ের কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হননি, সেই খ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য করতে পারেন, তাঁতে কোনরূপ অপূর্ণতা নেই। এই-সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে, তাঁরা ঈশ্বর—তাঁরা আজন্ম এটি জানেন। তাঁরা যেন সেই-সব অভিনেতাদের মত, যাঁদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু যাঁরা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মত মানুষ হয়ে আসেন, আমাদেরই মত বদ্ধ বলে ভান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কখনই বদ্ধ নন, সদাই মুক্তস্বভাব।

* * *

মঙ্গল বা কল্যাণভাব সত্যের সমীপবর্তী বটে, কিন্তু তবু পূর্ণ সত্য নয়। অমঙ্গল যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এটি শেখবার পর আমাদের শিখতে হবে, মঙ্গলও যেন আমাদের সুখী করতে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমরা মঙ্গল-অমঙ্গল দুইয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে যথাযোগ্য স্থান আছে, সেটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে ও বুঝতে হবে—একটা

থাকলেই অপরটাও থাকবেই থাকবে।

দ্বৈতবাদের ভাবটি প্রাচীন পারসীকদের৫ কাছ থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ভাল-মন্দ দুই-ই এক জিনিষ এবং উভয়েই আমাদের মনে। মন যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুভাশুভ দুয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের কেউ আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে পরমানন্দ ভোগ করবে। অশুভ যেন লোহার শিকল, আর শুভ সোনার শিকল; কিন্তু দুই-ই শিকল। মুক্ত হও এবং জন্মের মত জেনে রাখো— কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না। সোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আলগা করে নাও, তার পর দুটোই ফেলে দাও। অশুভ-রূপ কাঁটা আমাদের শরীরে রয়েছে; ঐ ঝাড়েরই আর একটি (শুভ-রূপ) কাঁটা নিয়ে পূর্বের কাঁটাটি তুলে ফেলে শেষে দুটোকেই ফেলে দাও, এবং মুক্ত হও।

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেও না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও; কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। কোন শর্ত কর না, তা হলেই তোমার ঘাড়েও কোন শর্ত চাপবে না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই তো দোকানদার মাত্র।... তাঁর সই-করা চেক যোগাড় কর, সর্বত্রই তার খাতির হবে।

ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তিনি উপলব্ধির বস্তু; কিন্তু তাঁকে কখনও 'ইতি ইতি' করে নির্দেশ করা যায় না।

* * *

আমরা যখন দুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি, তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা দুটো কুকুর-বাচ্চাকে পরস্পর খেলা করতে বা কামড়াকামড়ি করতে দেখে সেদিকে আদৌ মনোযোগ দিই না, জানি যে দুটোতে মজা করছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক-আধটা কামড় লাগলেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু—সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বৈ আর কিছু নয়। এই জগৎটা সবই কেবল খেলার জন্য—ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপন্ন করতে পারে না।

* * *

'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।
একে মন-মাঝি আনাড়ী, রিপু ছজন কুজন দাঁড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি;
ভেঙে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, উপায় কি করি?
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি।'

মা, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয়; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও আলোক অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা', নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

৬

তিনি দুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের ভিতর, মহান্ ভাবের ভিতরও রয়েছেন। যখন ভ্রমর মধু পান করে, তখন প্রভুই ভ্রমর-রূপে মধু পান করেন। ঈশ্বরই সর্বত্র রয়েছেন জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিন্দা-স্তুতি দুই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাখ যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কি করে করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কি আত্মা নও? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র-স্বরূপ।

৭

আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারাওয়ালা আমাদের ধরবার জন্য পিছু পিছু ছুটছে—তাই আমরা জগতের যা সৌন্দর্য, তার শুধু ঈষৎ আভাসমাত্রই দেখে থাকি। এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। পেছনে মন রয়েছে বলেই জড়তার সত্তা লাভ করে আমরা জগৎ বলে যা দেখছি, তা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত

ঈশ্বরই।

রবিবার, ২৩ জুন

সাহসী ও অকপট হও—তারপর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ করবে। একবার শিকলের একটা কড়া কোনমতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটা ক্রমে ক্রমে টেনে আনতে পারবে! গাছের মূলে যদি জল দাও, সমগ্র গাছটাই জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সবই পাওয়া গেল।

একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর। তোমরা নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে, ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে—কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে সম্ভোগ করতে পারবে। নিজের প্রকৃতিটা আগে ঠিক কর, তারপর সেই প্রকৃতি-অনুযায়ী পথ অবলম্বন করে তাতে নিষ্ঠাপূর্বক থাক। প্রবর্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই (একটা ভাবে দৃঢ় হওয়া) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাকে এবং যদি 'ভাবের ঘরে চুরি' না থাকে, তবে ঐ নিষ্ঠাই তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গির্জা, মন্দির, মত-মতান্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা করবার জন্য তার চারদিকে বেড়া দেওয়া। কিন্তু যদি গাছটাকে বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙে দিতে হবে। এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম, বেদ, বাইবেল, মত-মতান্তর—এ-সবও যেন চারাগাছের টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না একদিন বেরুতে হবে। নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে টবে বসিয়া রাখা—সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগলে রাখা।

* * *

সমগ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ, এক-একটি তরঙ্গের দিকে দেখ না; একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ দেখো না। প্রত্যেকটি কীট প্রভু ঈশার ভাই। একটাকে বড়, অপরটাকে ছোট বলো কি করে? নিজের নিজের স্থানে সকলেই যে বড়। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি সূর্য, চন্দ্র, তারাতেও আছি। আত্মা দেশকালের অতীত ও সর্বব্যাপী। যে-কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, তাই আমার মুখ; যে-কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখছে, তাই আমার চক্ষু। আমরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নই; আমরা দেহ নই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমাদের দেহ। আমরা যেন ঐন্দ্রজালিকের মত মায়াযষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করছি। আমরা যেন মাকড়সার মত আমাদেরই নির্মিত বৃহৎ জালের মধ্যে—মাকড়সা যখনই ইচ্ছা করে, তখনই তার জালের সুতোগুলোর যে-কোনটাতে যেতে পারে। বর্তমানে সে যেখানে রয়েছে, সেইটাই জানতে পারছে, কিন্তু কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পারবে। আমরাও এখন যেখানে আমাদের দেহটা রয়েছে, সেখানেই নিজ সত্তা অনুভব করছি, এখন একটি মস্তিষ্কমাত্র ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যখন পূর্ণজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হই, তখন আমরা সব জানতে পারি, সব মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি। এখনই আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে জ্ঞানাতীত বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ করতে থাকবে।

আমরা চেষ্টা করছি, কেবল অস্তি-মাত্র, সৎস্বরূপ হতে; তাতে 'আমি' পর্যন্ত থাকবে না—কেবল শুদ্ধ স্ফটিকের মত হবে; তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিম্ব পড়বে, কিন্তু তা যেমন তেমনই থাকবে। এই অবস্থা লাভ হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্ত্রের মত হয়ে যায়; সে সদা শুদ্ধভাবাপন্নই থাকে, তার শুদ্ধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিত্র হতেই পারে না।

নিজেকে সেই অনন্তস্বরূপ বলে জান, তা হলে ভয় একদম চলে যাবে। সর্বদাই বলো, 'আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) এক।'

৮

* * *

আঙুরগাছে যেমন থোলো থোলো আঙুর ফলে, ভবিষ্যতে তেমনই থোলো থোলো খ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তখন সংসার-খেলা শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসার চক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন একটা কেটলিতে জল চড়ানো হয়েছে; জল ফুটতে আরম্ভ করলে প্রথমে একটার পর একটা করে বুদ্বুদ উঠতে থাকে, ক্রমে এই বুদ্বুদগুলোর সংখ্যা বেশী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দুটি বুদ্বুদ। মুশা ছিলেন একটি ছোট বুদ্বুদ, তারপর ক্রমশঃ বড় বড় আরও সব বুদ্বুদ উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগৎসুদ্ধ এইরূপ বুদ্বুদ হয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সৃষ্টি তো অবিরাম প্রবাহে চলছেই, আবার নূতন জলের সৃষ্টি হয়ে ঐ পূর্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে।

সোমবার, ২৪ জুন

অদ্য স্বামীজী 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেনঃ

'ভক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেম-স্বরূপ এবং অমৃত-স্বরূপ—যা লাভ করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয়—যা পেলে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কারও প্রতি দ্বেষ করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না—যা জেনে মানব মত্ত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়।'

৯

গুরুদেব বলতেন, ‘এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা-গারদ। এখানে সবাই পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমানুষের জন্য পাগল, কেউ নামযশের জন্য পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্য জিনিষের জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্তে সোনা হয়ে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায়—মানুষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিংবা কোন অন্যায় কর্ম হতে পারে না।’

‘ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয়।’

১০

মহাপুরুষেরা ধর্মপ্রচার করে যান—কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারেরা ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। খ্রীষ্টধর্মে একেই পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) শক্তি বলেছে—এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই ‘হস্ত-স্পর্শ’-এর (The laying-on of hands) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য (খ্রীষ্ট) প্রকৃতপক্ষেই শিষ্যগণের ভিতর শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। একেই ‘গুরুপরম্পরাগত শক্তি’ বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজম্‌ই (Baptism—দীক্ষা) অনাদিকাল থেকে জগতে চলে আসছে।

‘ভক্তিকে কোন বাসনাপূরণের সহায়রূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কারণ ভক্তিই সমুদয় বাসনা-নিরোধের কারণস্বরূপ।’

১১

নারদ ভক্তির এই লক্ষণগুলি দিয়েছেন, ‘যখন সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য ও সমুদয় ক্রিয়া তাঁর প্রতি অর্পিত হয় এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে হৃদয়ে পরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়েছে, বুঝতে হবে।’

১২

‘পূর্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্বোচ্চ অবস্থা। কারণ অন্যান্য সাধারণ প্রেমে প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছ থেকে প্রতিদান চায়, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল তাঁর সুখে সুখী হয়ে থাকে।’

১৩

‘প্রকৃত ভক্তিলাভ হলে যে সবকিছু ত্যাগ হয়—বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য—ভক্তের সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।’

‘যখন অন্য সব ত্যাগ করে চিত্ত ঈশ্বরের দিকে যায়, তাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিরোধী সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হয়, তখনই বুঝতে হবে, যথার্থ ভক্তিলাভ হতে চলেছে।’

১৪

যতদিন না ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততদিন শাস্ত্রবিধি মেনে চলতে হবে।’

১৫

যতদিন না তোমার চিত্তের এতদূর দৃঢ়তা হচ্ছে যে, শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন না করলেও তোমার হৃদয়ের যথার্থ ভক্তিভাব নষ্ট হয় না, ততদিন ঐগুলি মেনে চল, কিন্তু তারপর তুমি শাস্ত্রের পারে চলে যাও। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ—প্রত্যক্ষ করা। প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি কোন ধর্মাচার্য বলেন, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা কোন কালে পারবে না, তাঁর কথায় বিশ্বাস কর না; কিন্তু যিনি বলেন, তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পার, কেবল তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে। জগতের সকল যুগের সকল দেশের সকল শাস্ত্র—সকল সত্যই বেদ। কারণ এই-সব সত্য প্রত্যক্ষ করতে হয়, আর যে-কোন মানুষই ঐ-সব সত্য আবিষ্কার করতে পারে।

যখন ভক্তিসূর্যের কিরণে দিগন্ত প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন আমরা সকল কর্ম, ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি।

ঈশ্বর ও তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি—এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর কিছু না বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অনুরাগী হও, তাঁকে ভালবাসো, জগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্য কর না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার

১৬

—প্রথম প্রকারে দাবীর ভাব, নিজে কিছু দেয় না; দ্বিতীয় প্রকারে বিনিময়ের ভাব থাকে; তৃতীয় প্রকারে প্রতিদানের কোন চিন্তা নেই; যেন আলোর প্রতি পতঙ্গের ভালবাসা—পুড়ে মরবে, তবু ভালবাসতে ছাড়বে না।

‘এই ভক্তি—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।’

১৭

কর্মের দ্বারা কর্মকর্তার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন উপকার হয় না। কর্ম দ্বারা আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। যা চিন্তা কর, তাই হয়ে যাও—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও, তা হলে তোমায় সদা সর্বদা তাঁকে চিন্তা করতে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তদ্ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, তুমি তাঁকে ভালবাসবে। এইরূপ সদা সর্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম।

'পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা এক জিনিষ।'

তবে ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেবল নানা মত-মতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না। তাঁকে ভালবাসতে হবে এবং সাধন করতে হবে। সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন 'চারাগাছ'—মন শক্ত না হয়। দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তা কর এবং যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলি সবই ঈশ্বর-ভাবিত হয়ে করা যেতে পারে।

'শয়নে প্রণাম-জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে।'

সকল কার্যে, সকল বস্তুতে তাকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বর-বিষয়ে আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে।

ভগবানের অথবা তাঁর যোগ্যতম সন্তান যে-সব মহাপুরুষ—তাঁদের কৃপালাভ কর।

১৮

এই দুইটি হচ্ছে ভগবানলাভের প্রধান উপায়।

এই-সকল মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাঁচ মিনিট কাল তাঁদের সঙ্গলাভ করলে সারাটা জীবন বদলে যায়।

১৯

আর যদি সত্য সত্য প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষ-সঙ্গ চাও, তবে তোমার কোন-না-কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে।

এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়; তাঁরা যা বলেন, তাই শাস্ত্রস্বরূপ; তাঁরা যে-কোন কার্য করেন, তাই সৎকর্ম; এমনি তাঁদের মাহাত্ম্য।

২০

তাঁরা যে-স্থানে বাস করেছেন, সেই স্থান তাঁদের দেহনিঃসৃত পবিত্র শক্তি-স্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায়; যারা সেখানে যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; তাতে তাদেরও ভিতরে পবিত্রভাবের সঞ্চার হতে থাকে।

'এইরূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন প্রভৃতির ভেদ নেই। যেহেতু তাঁরা তাঁর।'

২১

অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। 'আমি, আমার'—এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। জগতে যাঁর 'আমার' বলতে কিছুই নেই, ভগবান্ তাঁরই কাছে আসেন। সব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্য ত্যাগ কর। 'আমার কি হবে?'—এরূপ ভাবনা একেবারে ভেবো না। তুমি যে-সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও চেও না। ভগবানে সব সমর্পণ করে কর্ম করে যাও, কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে কর না।

২২

যখন সব মনপ্রাণ এক অবিছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো তো শুধু কাচের পুঁতির মত অসার জিনিষ।

প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, 'এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য নূতন ও প্রতিক্ষণ বাড়তে থাকে', এটি সূক্ষ্ম অনুভব-স্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝতে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না।

২৩

'ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বতঃপ্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই।'

২৪

কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করাকে 'যুক্তি' বলে। আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না—কোন কালেও নয়।

ভক্তি নিরপেক্ষ হওয়া চাই। এমন কি, আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখনও তা প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা। প্রেমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, শক্তি সেই একই। 'প্রেমের প্রকৃত ভাব শান্তি ও আনন্দ।'

২৫

হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে, তখন সে ভালবাসা ছাড়া আর সব ভুলে যায়। অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কাম ক্রোধ ত্যাগ কর—ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, কেবল একমাত্র তুমিই আছ। 'আমি—তুমি'। কারও নিন্দা কর না। যদি দুঃখ বিপদ আসে, জেন—ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন, আর এইটি জেনে পরম আনন্দিত হও। ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পূর্ণস্বরূপ, নিরপেক্ষ।

দেববাণী - ২

মঙ্গলবার, ২৫ জুন

যখনই কোন সুখভোগ করবে, তারপর দুঃখ আসবেই আসবে—এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে। যে আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা যা চাই, তা সুখও নয়, দুঃখও নয়। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। উভয়ই শিকল—একটা লোহার শিকল, অপরটা সোনার শিকল। এ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন—তাঁতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ-দুঃখ উভয়ই অবস্থাবিশেষ, আর অবস্থামাত্রেই সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ, অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ। আত্মাকে যে আমাদের লাভ করতে হবে, তা নয়; আত্মাকে আমরা পেয়েই আছি, কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেটি ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব। খুব উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত হও; আমি যে সেই অনন্ত আত্মস্বরূপ—এই জেনে আমাদের জগৎপ্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই জগৎটা একটি ছোট শিশুর খেলার মত; আমরা যখন তা জানি, তখন জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে পারবে না। যদি প্রশংসা পেলে মন উৎফুল্ল হয়, তবে নিন্দায় নিশ্চয় বিষণ্ণ হবে। ইন্দ্রিয়ের—এমন-কি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে-সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ঐ সুখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ, ঐ সুখ আনন্দস্বরূপ। সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম' হব, ততই আমরা আধ্যাত্মিক হব। এই আত্মানন্দকেই 'ধর্ম' বলা হয়।

অন্তর্জগৎ—যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগতের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। বহির্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় প্রক্ষেপমাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, এটা সত্যের ছায়ামাত্র। কবি বলেছেন, কল্পনা সত্যের সোনালী ছায়া।

আমরা যখন সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা আমাদের পক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। আমাদের বাদ দিলে জগৎটা অচেতন, মৃত জড়পদার্থ মাত্র। আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার মূর্খের মত ঐ কথা ভুলে গিয়ে কখনও তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ করতে যাচ্ছি।

সেই মেছুনীদের মত হয় না। কয়েকজন মেছুনী আঁষচুবড়ি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ী ফিরছিল—এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এলো। তারা বাড়ী যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। মালিনী রাত্রে তাদের যে ঘরে শুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই ফুলের বাগান। হাওয়াতে বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলের গন্ধ তাদের নাকে আসতে লাগল—সেই গন্ধ তাদের এত অসহ্য বোধ হতে লাগলো যে, তারা কোনমতে ঘুমোতে পারে না। শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, 'দেখ, আমাদের আঁষচুবড়িগুলোতে জল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক।' তাই করাতে যখন নাকের কাছে সেই আঁষচুবড়ির গন্ধ আসতে লাগলো, তখন তারা আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

এই সংসার আঁষচুবড়ির মত—আমরা যেন সুখভোগের জন্য ওর উপর নির্ভর না করি; যারা করে, তারা তামসপ্রকৃতি বা বদ্ধজীব। তারপর আবার রাজসপ্রকৃতির লোক আছে, তাদের অহংটা খুব প্রবল, তারা সদাই 'আমি, আমি' বলে থাকে। তারা কখনও কখনও সৎকার্য করে থাকে, চেষ্টা করলে তারা ধার্মিক হতে পারে। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ—তারা সদাই অন্তর্মুখ—তারা সদাই আত্মনিষ্ঠ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মানুষে এক এক গুণের প্রাধান্য হয় মাত্র।

সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্মাণ বা তৈরি করা নয়, সৃষ্টি মানে—যে সাম্য-ভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে আবার ফিরে পাবার চেষ্টা, যেমন একটা শোলার ছিপি (cork) যদি টুকরো টুকরো করে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে সেগুলো যেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন—যেখানে জগৎ, সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাকবেই থাকবে। একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ সাম্যভাব এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই জগৎ চলছে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভাল-মন্দও চলবে; কিন্তু যখন আমরা জগৎকে অতিক্রম করি, তখন ভাল-মন্দ দুয়েরই পারে চলে যাই—পরমানন্দ লাভ করি।

জগতে দুঃখবিরহিত সুখ, অশুভবিরহিত শুভ—কখনও পাবার সম্ভাবনা নেই; কারণ জীবনের অর্থই হচ্ছে বিনষ্ট সাম্যভাব। আমাদের চাই মুক্তি; জীবন সুখ বা শুভ—এ-সবের কোনটাই নয়। সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে—তার আদিও নেই, অন্তও নেই, যেন একটা অগাধ হ্রদের উপরকার সদা-গতিশীল তরঙ্গ। ঐ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি; আর কতকগুলো জায়গা আছে, যেখানে সাম্যভাব পুনঃস্থাপিত হয়েছে—কিন্তু উপরের তরঙ্গ সর্বদাই চলেছে, সেখানে অনন্তকাল ধরে ঐ সাম্যাবস্থা-লাভের চেষ্টা চলেছে| জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয়ই মায়া—এ অবস্থাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জো নেই; এক সময়ে বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মা—এ দুয়েরই পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই—যা থেকে আমরা নিজেদের পৃথক্ করে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে পৃথক্ বলে উপাসনা

করছি! কিন্তু সেই উপাস্য চিরকালই আমাদের প্রকৃত আত্মা—এক ও একমাত্র ঈশ্বর, যিনি পরমাত্মা।

সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা ফিরে পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ 'ঈশ্বরতনয়' হও, তবেই যীশুর মত পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য বুঝায়। দুর্বলতা—দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবেই তুমি কেবল আত্মামাত্র; যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত; যদি মুক্তস্বভাব হন, তবেই বলব—ঈশ্বর যথার্থ আছেন।

* * *

জগৎটা আমার জন্য, আমি কখনও জগতের জন্য নই। ভাল-মন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব—উন্নতি করা নয়, বরং যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা; মানুষের স্বভাব—মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা। আর দেবতার স্বভাব—ভাল-মন্দ কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না—সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হতে হবে। হৃদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান্ করে ফেল; সাংসারিক তুচ্ছতার পারে চলে যাও; এমন-কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যাও; জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখ; এইটি জেনে রাখ যে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না; আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য উপভোগ কর। জগতের সুখ কি রকম জান?—যেমন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে করতে কাদার মধ্য থেকে কাচের পুঁতি কুড়িয়ে পেয়েছে। জগতের সুখ-দুঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভাল-মন্দ উভয়কেই সমান বলে দেখ—দুই-ই ভগবানের খেলা; সুতরাং ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ—সবেতেই আনন্দ কর।

* * *

আমার গুরুদেব বলতেন, 'সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ-নারায়ণের কাছ থেকে সরে থাকতে হয়। সব জলই নারায়াণ বটে, তবে ময়লা জল খাওয়া যায় না।'

'গগনময় থালে রবিচন্দ্র-দীপক' জ্বলে—অন্য মন্দিরের আর কি দরকার? 'সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নেই; সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নেই।'

কিছু পাবার চেষ্টা কর না, কিছু এড়াবার চেষ্টাও কর না—যা কিছু আসে গ্রহণ কর, 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট' হও। কোন কিছুতেই বিচলিত না হওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনতা। কেবল সহ্য করে গেলে হবে না, একেবারে অনাসক্ত হও। সেই ষাঁড়ের গল্পটি মনে রেখ।

একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিঙে বসেছিল—অনেকক্ষণ বসবার পর তার বিবেক বুদ্ধি জেগে উঠল; হয়তো ষাঁড়ের শিঙে বসে থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে—এই মনে করে সে ষাঁড়কে সম্বোধন করে বলতে লাগল, 'ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ কর, এই আমি উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় বললে, 'না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙে বাস কর না—তাতে আমার কি এসে যায়?'

বুধবার, ২৬ জুন

যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করতে পারি। বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই এ-কথা জানেন। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা—তাঁর কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে যেও না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, 'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।'—হে অর্জুন, ত্রিলোকে আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তা হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে। যে-সব শক্তিতে কাজ হয়, সেগুলি তো আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেবল তাদের ফলটা দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেল, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন—এ তো তাঁরই কাজ। আমাদের আর কিছু করতে হবে না—কেবল সরে দাঁড়াতে হবে, তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে। আমরা যত সরে যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন। 'কাঁচা আমি'টাকে দূর করে দাও। কেবল 'পাকা আমি'টাই থাক্।

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিষ। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যে-কোন চিন্তা করি, তাতেই আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালাগালিতে পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে।

কিছুই কামনা কর না। ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্তু কোন ফল-কামনা কর না। যাঁরা কামনাশূন্য, তাঁদেরই কাজ ফলপ্রসূ। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন করে নিয়ে যান, কিন্তু তাঁরা মনে করেন, আমরা কিছুই করছি না। তাঁরা কোনরূপ দাবীদাওয়া করেন না, তাঁদের কাজ অজ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে। যদি তাঁরা (ঐহিক) জ্ঞান-বৃক্ষের ফল

খান, তা হলে তো তাঁদের অহংকার এসে যাবে, আর যা কিছু লোক-কল্যাণ তাঁরা করবেন—সব লোপ পেয়ে যাবে। যখনই

আমরা 'আমি' এই কথা বলি, তখনই আমরা আহাম্মক বনে যাই আর বলি, আমরা 'জ্ঞান' লাভ করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চোখ-ঢাকা বলদের মত' আমরা ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান্ বেশ ভালভাবে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও খুব ভাল। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনি সবচেয়ে বেশী কাজ করতে পারেন। নিজেকে জয় কর, তা হলেই সমুদয় জগৎ তোমার পদতলে আসবে।

সত্ত্বগুণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসলস্বরূপ দেখতে পাই, তখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অতীত দেশে চলে যাই। অহংই সেই বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, যা আমাদের বদ্ধ করে রেখেছে—সত্যের মুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না—সকল বিষয়েই, সকল কাজেই 'আমি, আমার' এই ভাব মনে এনে দেয়—আমরা ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি, ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে দূর করে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংরূপ শয়তানি ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে ফেলো। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অনুভব কর, জীবনে ঐ ভাবটাকে নিয়ে এস। যতদিন না এই অহংভাব-গঠিত জগৎটাকে ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব-না—কেউ কখনও পারেনি, আর পারবেও না। সংসার ত্যাগ করা মানে—এই 'অহং'টাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যেন দেহের না হয়ে যাই। এই দুষ্ট 'আমি'টাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে হবে। লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্বাদ কর; ভেবে দেখ, তারা তোমার কত উপকার করেছে; অনিষ্ট যদি কারও হয়, তো কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভেতর থেকে বার করে দিক্—তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে অগ্রসর হবে। বানরী যেমন তার বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে পদদলিত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ আমরাও সংসারটাকে যতদিন পারি আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু অবশেষে যখন তাকে পদদলিত করতে বাধ্য হই, তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। ন্যায়ধর্মের জন্য যদি অপরের অত্যাচার সহ্য করতে হয় তো আমরা ধন্য; যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি তো আমরা ধন্য; ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের তফাত করবার জিনিষ অনেক কমে গেল।

ভোগ হচ্ছে লক্ষফণা সাপ—তাকে আমাদের পদদলিত করতে হবে। আমরা এই ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে থাকি; কিছুই না পেয়ে হয়তো আমরা নৈরাশ্যে অবসন্ন হই। কিন্তু লেগে থাক, লেগে থাক—কখনই ছেড় না। এই সংসারটা একটা অসুরের মত। এ যেন একটা রাজ্য—আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' তার রাজা। তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। কাম-কাঞ্চন, নাম-যশ ত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, অবশেষে আমরা সুখে দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ করব। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই সুখ—এ ধারণা একেবারে জড়বাদী। ওতে এক কণাও যথার্থ সুখ নেই; যা কিছু সুখ, তা সেই প্রকৃত আনন্দের প্রতিবিম্বমাত্র।

যাঁরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। চিত্তশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর আসে।

পদ্মের মত হও। পদ্ম এক জায়গাতেই থাকে, কিন্তু যখন ফুটে ওঠে, তখন চারদিক্ থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ দেখতে পেতেন না—তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাজেই সেই মন্দ দূর করবার জন্য চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মস্ত নৈতিক সংস্কারক, নেতা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে এই শান্তপ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়ে গেছেন। এই-সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার—তাঁরা প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবন-যাপন করে ভব-রঙ্গমঞ্চ হতে সরে যান। তাঁরা কখনও 'আমি, আমার' বলেন না। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এরূপ ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ-সকলের নির্মাতা। তাঁরা সদাই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তাদাত্ম্য লাভ করেন, এই বাস্তব জগৎ থেকে বহুদূরে এক ভাব-জগতে বাস করেন। তাঁরা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতসারে কিছু করেনও না। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্বপ্রকার উচ্চভাবের প্রেরকস্বরূপ—তাঁরা জীবন্মুক্ত, একেবারে অহংশূন্য। তাঁদের ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, কোন আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, তাঁরা শুধুই তত্ত্বস্বরূপ।

বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন

(স্বামীজী অদ্য বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট লইয়া আসিলেন এবং পুনর্বার 'জনের গ্রন্থ' পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।)

যীশুখ্রীষ্ট যে শান্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ আপনাকে সেই 'শান্তিদাতা' বলে দাবী করতেন। তাঁর মতে—যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক ভাবে জন্ম হয়েছিল, এ-কথা স্বীকার করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সকল যুগে, সকল দেশেই এইরূপ দাবী দেখতে পাওয়া যায়। সকল মহামানব দাবী করেছেন, দেবতা থেকেই তাঁদের জন্ম।

জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু তাঁকে কখনই জানতে পারি না। জ্ঞান একটা নিম্নতর অবস্থামাত্র। তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 'জ্ঞান লাভ' করলেন, তখনই তাঁর পতন হল। তার পূর্বে তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ ছিলেন। আমাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক্ পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখনও আসল মুখটা দেখতে পাই না, শুধু প্রতিবিম্বটাই দেখতে পাই। আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ, কিন্তু যখন ঐ প্রেমসম্বন্ধে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি—আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, জড়বস্তু চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ।

নিবৃত্তি-অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। হিন্দুদের পুরাণে আছে, প্রথম সৃষ্ট চারজন ঋষিকে

২৭

হংসরূপী ভগবান্ শিক্ষা দিয়েছিলেন—সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাত্র; সুতরাং তাঁরা আর প্রজাসৃষ্টি করলেন না। এর তাৎপর্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি; কারণ আত্মাকে অভিব্যক্তি করতে গেলে শব্দ দ্বারা ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর 'শব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে'।

২৮

তা হলেও তত্ত্ব জড়াবরণে আবৃত না হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে অবশেষে এইরূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্যই এ-কথা বোঝেন, আর সেইজন্যই অবতারেরা পুনঃপুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিয়ে যান, আর সেইকালের উপযোগী তার একটি নূতন আকার দিয়ে যান। আমার গুরুদেব বলতেনঃ ধর্ম এক; সকল অবতারকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন। যখন আমরা নাম-রূপ থেকে—বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের ভাল-মন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি। 'অনন্ত উন্নতি' মানে অনন্তকালের জন্য বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আকৃতির ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়। সব রকম দেহ, এমন-কি দেবদেহ থেকেও আমাদের মুক্তিলাভ করতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু, সত্যবস্তু কখনও দুটি থাকতে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং 'আমিই সেই'।

মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্মের যা মূল্য; যে কাজ করে, ঐ কর্ম দ্বারা তারই কল্যাণ হয়—অপর কারও কিছু হয় না।

* * *

জ্ঞান মানে—শ্রেণীবদ্ধ করা, কতকগুলি জিনিষকে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা। আমরা একই প্রকারের অনেকগুলি জিনিষ দেখলাম—দেখে সেই সবগুলির একটা কোন নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শান্ত হল। আমরা কেবল কতকগুলি 'ঘটনা' বা 'তথ্য' আবিষ্কার করে থাকি, কিন্তু কেন সেগুলি ঘটছে, তা জানতে পারি না। অজ্ঞানের অন্ধকারেই আরও খানিকটা বেশী জায়গা এক পাক ঘুরে এসে আমরা মনে করি, কিছু জ্ঞানলাভ করলাম। এই জগতে 'কেন'র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; 'কেন'র উত্তর পেতে হলে আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে। 'জ্ঞাতা'কে কখনও প্রকাশ করা যায় না। এ যেন এক-টুকরো নুনের সমুদ্রে পড়ে যাওয়া—যেই পড়ল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল।

বৈষম্যই সৃষ্টির মূল—একরসতা বা সমতাই ঈশ্বর। এই বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও; তা হলেই জীবন ও মৃত্যু—দুই-ই জয় করবে, এবং অনন্ত সমত্বে পৌঁছবে, তখনই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হবে—ব্রহ্মস্বরূপ হবে। মুক্তিলাভ কর, সে চেষ্টায় প্রাণ যায়, তাও স্বীকার। একখানা বইয়ের সঙ্গে তার পাতাগুলির যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে জন্মান্তরের জীবনগুলিরও সেই সম্বন্ধ; আমরা কিন্তু অপরিণামী, সাক্ষিস্বরূপ, আত্মা; আর তাঁরই উপর জন্মান্তরের ছায়া পড়ছে; যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে ঘোরাতে থাকলে চোখে একটা বৃত্তের প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি; আর যেহেতু আত্মা অনন্ত, অপরিণামী ও অচঞ্চল, সেহেতু আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ—পরমাত্মা। আত্মাকে জীবন বলতে পারা যায় না, কিন্তু তাই থেকেই সুখের উৎপত্তি হয়।

* * *

আজকাল জগতের লোক ভগবানকে পরিত্যাগ করছে, কারণ তাদের ধারণা—জগতের যতদূর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত, তা তিনি করছেন না; তাই লোকে বলে থাকে, 'তাঁকে নিয়ে আমাদের লাভ কি?' ঈশ্বরকে একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা বলে ভাবতে হবে নাকি?

আমরা এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, ভেদবুদ্ধি—এইগুলিকে দূর করে দিতে পারি। 'কাঁচা আমি'কে নষ্ট করে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে হবে—একরকম মনে মনে আত্মহত্যা করা আর কি! শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখ—কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ করবার যন্ত্ররূপে; এইটুকু এদের যথার্থ প্রয়োজন। কেবল সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান কর; তার দ্বারা আনন্দলাভ হবে, এ-কথা ভেব না। আনন্দ আপনা হতে আসতে পারে, কিন্তু তার জন্যই যেন সত্যলাভে উৎসাহিত হয়ো না। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য রেখ না। সত্যলাভ করবার জন্য যদি নরকের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তাতেও পেছ-পা হয়ো না।

দেববাণী - ৩

শুক্রবার, ২৮ জুন

(অদ্য সকলেই স্বামীজীর সহিত বনভোজনে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদিও স্বামীজী যেখানেই থাকিতেন, সেখানেই অবিরাম শিক্ষা দিতেন, অদ্যকার উপদেশের কোন প্রকার 'নোট' রাখা হয় নাই; তাই তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছুই লিপিবদ্ধভাবে নাই। তবে বাহির হইবার পূর্বে প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেনঃ)

সর্বপ্রকার অন্নের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও—অন্নই ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁর সর্বব্যাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমাদের সর্বপ্রকার কার্য করতে সাহায্য করে থাকে।

শনিবার, ২৯ জুন

(অদ্য স্বামীজী গীতা হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন।)

গীতায় 'হৃষীকেশ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জীবাত্মাগণের ঈশ্বর কৃষ্ণ—'গুড়াকেশ'কে অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর (অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী) অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই সংসারই 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র। পঞ্চপাণ্ডব (অর্থাৎ ধর্ম) শত কৌরবের (আমরা যে-সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের) সঙ্গে যুদ্ধ করছেন! পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) সেনাপতি। আমাদের সবচেয়ে আসক্তির বস্তু—সমুদয় ইন্দ্রিয়সুখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের মেরে ফেলতে হবে। আমাদের নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমাদের আর সমস্ত ভাবকে এইভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তিবর্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনই সংসারের হয়ে যাননি। সকল কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর; কাজের জন্যই কাজ কর, কখনও নিজের জন্য কর না।

* * *

নামরূপাত্মক কোন কিছু কখনই মুক্তস্বভাব হতে পারে না। মৃত্তিকা-রূপ আত্মা থেকে ঘটাদির মত আমরা হয়েছি: এ অবস্থায় আত্মা সীমাবদ্ধ—আর মুক্ত নন; আপেক্ষিক সত্তাকে কখনও মুক্ত বলা যেতে পারে না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ সে কখনই বলতে পারে না, 'আমি মুক্ত'; যখনই সে নাম-রূপ ভুলে যায়, তখনই মুক্ত হয়। সমুদয় জগৎটাই আত্মস্বরূপ—বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন এক সুরের মধ্যেই নানা রঙপরং তোলা হয়েছে—তা না হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। সময়ে সময়ে বেসুরো বাজে বটে, তাতে বরং পরবর্তী সুরের ঐকতান আরও মিষ্ট লাগে। মহান্ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়—সাম্য, শক্তি ও মুক্তি।

যদি তোমার স্বাধীনতা অপরকে ক্ষুণ্ণ করে, তা হলে বুঝতে হবে—তুমি স্বাধীন নও। অপরের কোন প্রকার ক্ষতি কখনও কর না।

মিল্টন বলেছেন, 'দুর্বলতাই দুঃখ।' কর্ম ও ফলভোগ—এই দুটির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। অনেক সময়েই দেখা যায়, যে বেশী হাসে, তাকে কাঁদতেও হয় বেশী—যত হাসি তত কান্না। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।

* * *

জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে কুচিন্তাগুলিকে রোগজীবাণু বলা যেতে পারে। আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘা মারা—তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করি।

আমরা জগতের সমুদয় শুভচিন্তারাশির উত্তরাধিকারী, অবশ্য যদি সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আসতে দিই।

শাস্ত্র তো সবসময় আমাদের মধ্যেই রয়েছে। মূর্খ, শুনতে পাচ্ছ না কি, তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে—'সচ্চিনানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোঽহং সোঽহম্।'

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা—সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। প্রকৃত ধর্ম একটিই। আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে—তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি। যারা খুঁজতে জানে, তাদের কাছে সত্যযুগ তো এখনই রয়েছে। আমরা নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর মনে করছি—জগৎ সংসার গোল্লায় গেছে।

এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কার্য থাকে না। তাকে কেবল 'অস্তি' বা 'সৎ' মাত্র বলা যায়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না।

যথার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হতে পারে।

রবিবার, ৩০ জুন

একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না করে চিন্তা করবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা—এক কথা। আমরা কোন একটি বিশেষ জীবকে অবলম্বন না করে স্তন্যপায়ী কোন জীবের ধারণা করতে পারি না। ঈশ্বরের ধারণাসম্বন্ধেও ঐ কথা।

জগতে যতপ্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে সূক্ষ্ম সারনিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি।

প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে—একটি হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক 'শব্দ'; আমাদের ঐ দুটিকেই নিতে হবে। কি বিজ্ঞানবাদী (Idealist), কি জড়বাদী (Materialist), কারও মত খাঁটি সত্য নয়। ভাব ও তার প্রকাশ দুই-ই আমাদের নিতে হবে।

আমরা আরশিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই—সমুদয় জ্ঞানও সেইরকম প্রতিবিম্বিত বস্তুরই জ্ঞান। কেউ কখনও তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, কিন্তু আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর বা পরমাত্মা।

তখনই তোমার নির্বাণ-অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 'তুমিত্ব' থাকবে না। বুদ্ধ বলেছিলেনঃ যখন 'তুমি' থাকবে না, তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা—তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র বা কাঁচা আমিটা চলে যাবে।

অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে সেই অভ্যন্তরীণ দিব্য জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে; যেন একটা লোহার পিপের ভিতর একটা আলো রয়েছে, ঐ আলোর একটি রশ্মিও বাইরে আসতে পারছে না। একটু একটু করে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝের আড়ালটাকে ক্রমশঃ পাতলা করে ফেলতে পারি। অবশেষে সেটা কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণে যেন ঐ লোহার পিপে কাচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই অভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ যথার্থরূপে দেখা যাচ্ছে। আমরা সকলেই এইরূপ কাচের পিপে হবার পথে চলেছি—এমন-কি, এর চেয়েও উচ্চতর বিকাশের আধার হব। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আদৌ কোন পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা করতে হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কোন কালে সিদ্ধ হতে পারে না।

* * *

বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্ত্বের (Principle) দৃষ্টান্তস্বরূপ; কিন্তু শিষ্যেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব করে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া করতে করতে তত্ত্বটা ভুলে যায়।

বুদ্ধ সগুণ ঈশ্বর-ভাবকে ক্রমাগত আক্রমণ করেছিলেন বলেই ভারতে প্রতিমাপূজার সূত্রপাত হল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্বই ছিল না, তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে আমরা জগৎস্রষ্টা ও 'আমাদের সখা' ঈশ্বরকে হারালাম, আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমাপূজার উৎপত্তি হল। লোকে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করলে। যীশুখ্রীষ্ট-সম্বন্ধেও তাই হয়েছে। কাঠ-পাথরের পূজা থেকে যীশু-বুদ্ধের পূজা পর্যন্ত—সবই প্রতিমাপূজা, কিন্তু কোন-না-কোনরূপ মূর্তি ব্যতীত আমাদের চলতে পারে না।

* * *

জোর করে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাউকে বল না—'তুমি মন্দ', বরং তাকে বল—'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।'

পুরুতরা সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে; কারণ তারা লোককে গাল দেয় ও তাদের সমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে টান দেয়, মনে করে—সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু তার ফলে আর দু-তিনটা দড়ি স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রেমে কখনও কেউ গাল-মন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ ঐ রকম করে থাকে। 'ন্যায়সঙ্গত রাগ' বলে কোন জিনিষ নেই।

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষ তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মত; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। তা না হলে ঐ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতা-মাত্রে পরিণত হতে পারে।

* * *

আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে—যদিও সেই চরম পদার্থের ধারণা-সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। বুদ্ধ এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'ব্রহ্ম বা আত্মা বলে কিছু নেই।'

চরিত্র-হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তারপর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই-সব বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, যাঁদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের স্রোত বয়ে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মত আশ্চর্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না!

জগতে একটামাত্র শক্তিই রয়েছে—সেইটেই কখনও মন্দ, কখনও বা ভালভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর শয়তান একই নদী—কেবল স্রোতটা পরস্পরের বিপরীত-গামী।

দেববাণী - ৪

সোমবার, ১ জুলাই

(শ্রীরামকৃষ্ণদেব)
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন—এমন-কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করতেন না। জীবিকার জন্য তাঁর সাধারণের মত কোন কাজ করবার জো ছিল না। পুঁথি বিক্রি করবার বা কারও চাকরি করবার জো তো ছিলই না, এমন-কি, তাঁর কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য করবারও উপায় ছিল না। তিনি একরূপ আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে ছিলেন, যা অযাচিতভাবে উপস্থিত হত, তাতেই তাঁর খাওয়া-পরা চলত; কিন্তু তাও কোন পতিত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করতেন না। হিন্দুধর্মে দেবমন্দিরের তেমন প্রাধান্য নেই। যদি সব মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও ধর্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ী তৈরি করা স্বার্থপরতার কাজ; কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য বাড়ী তৈরি করা যেতে পারে। সেই জন্য লোকে ভগবানের নিবাস-রূপে মন্দিরাদি নির্মাণ করে থাকে।

অতিশয় পারিবারিক অসচ্ছলতা হেতু শ্রীরামকৃষ্ণ অতি অল্পবয়সে এক মন্দিরে পূজারী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। মন্দিরে জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলে থাকে। একটি নারীমূর্তি একটি পুরুষমূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তাতে এই প্রকাশ হচ্ছে যে, মায়াবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন—তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, তখন তিনি নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননীরূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষমূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন, তিনি শিব বা ব্রহ্ম, তিনি মায়াবৃত হয়ে শব হয়েছেন। অদ্বৈতবাদী বা জ্ঞানী বলেন, 'আমি জোর করে মায়া কাটিয়ে ব্রহ্মকে প্রকাশ করব।' কিন্তু দ্বৈতবাদী বা ভক্ত বলেন, 'আমরা সেই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি দ্বার ছেড়ে দেবেন, আর তখনই ব্রহ্ম প্রকাশিত হবেন, তাঁরই হাতে চাবি রয়েছে।'

প্রতিদিন মা-কালীর সেবা-পূজা করতে করতে এই তরুণ পুরোহিতের হৃদয়ে ক্রমে এমন তীব্র ব্যাকুলতা ও ভক্তির উদ্রেক হল যে, তিনি আর নিয়মিতভাবে মন্দিরে পূজার কাজ চালাতে পারলেন না। সুতরাং তিনি তা পরিত্যাগ করে মন্দিরের এলাকার ভিতরেই যেখানে একপাশে ছোটখাটো জঙ্গল ছিল, সেইখানে গিয়ে দিবারাত্র ধ্যানধারণা করতে লাগলেন। সেটি ঠিক গঙ্গার উপরেই ছিল; একদিন গঙ্গার প্রবল স্রোতে ঠিক একখানি কুটির-নির্মাণের উপযোগী সব জিনিষপত্র তাঁর কাছে ভেসে এল। সেই কুটিরে থেকে তিনি ক্রমাগত প্রার্থনা করতে লাগলেন ও কাঁদতে লাগলেন—জগজ্জননী ছাড়া আর কোন বিষয়ের চিন্তা, নিজের দেহরক্ষার চিন্তা পর্যন্ত তাঁর রইল না। তাঁর এক আত্মীয় এই সময়ে তাঁকে দিনের মধ্যে একবার করে খাইয়ে যেতেন, আর তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন। কিছুদিন পর এক সন্ন্যাসিনী এসে তাঁকে তাঁর 'মা'কে পাবার সহায়তা করতে লাগলেন। তাঁর যে-কোন প্রকার গুরুর প্রয়োজন হত, তাঁরা নিজে থেকেই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতেন। সকল সম্প্রদায়ের কোন-না-কোন সাধু এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আর তিনি আগ্রহ করে সকলেরই উপদেশ শুনতেন। তবে তিনি কেবল সেই জগন্মাতারই উপাসনা করতেন—তাঁর কাছে সবই 'মা' বলে মনে হত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কারও বিরুদ্ধে কখনও কড়া কথা বলেননি। তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, সকল সম্প্রদায়ই ভাবত—তিনি তাদেরই লোক। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য, তাঁর কাছে সকলেরই স্থান ছিল। তিনি মুক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রেমেই তাঁর মুক্ত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত, বজ্রবৎ কঠোরতায় নয়। এইরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাব সৃষ্টি করেন, আর 'হাঁক-ডেকে' থাকের লোক ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেন্ট পল এই শেষ থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দিকে বিস্তার করেছিলেন।

সেন্ট পলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদেরই এ যুগের নূতন আলোক হতে হবে। আমাদের যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন—এমন একটি সঙ্ঘ, যা আপনা হতেই নিজেকে দেশকালের উপযোগী করে নেবে। যখন তা হবে, তখন সেইটিই হবে জগতের শেষ ধর্ম। সংসার চক্র চলবে—আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা দিলে চলবে না। নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, আর সেই-সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেই যুগের অবতার বিরাজ করছেন। রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তাঁর ধর্ম গঠনমূলক, এতে ধ্বংসমূলক কিছু নেই। তাঁকে নূতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জানবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম লাভ করেছিলেন। সে-ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ করে নিতে বলে; বলে, 'আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার। আমি যে-সাধন অবলম্বন করেছি, তুমিও সেই সাধন কর, তা হলে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন করবে।' ঈশ্বর সকলের কাছেই আসবেন—সেই সামঞ্জস্য সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের সৃষ্ট কোন নূতন বস্তু নয়। আর তিনি সেগুলি তাঁর নিজস্ব বলে কখনও দাবীও করেননি; তিনি নামযশের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করতেন না। তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, সেই সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রচারের জন্য কখনও বাইরে কোথাও যাননি। যারা তাঁর কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ করবে, তাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

হিন্দুসমাজের প্রথানুযায়ী তাঁর পিতামাতা তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। বালিকা এক সুদূর পল্লীতে তাঁর নিজ পরিজনের মধ্যেই বাস করতে থাকেন—তাঁর যুবা পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে

ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু জানতেন না। যখন তিনি বড় হলেন, তখন তাঁর স্বামী ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। তিনি হেঁটে দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। স্বামীকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন—তাঁর কি অবস্থা; কারণ তিনি স্বয়ং মহা পবিত্রা বিশুদ্ধা ও উন্নতস্বভাবা ছিলেন। তিনি তাঁর কাজে কেবল সাহায্য করবার ইচ্ছাই করেছিলেন; তাঁর কখনও এ-ইচ্ছা হয়নি যে, তাঁকে গৃহস্থের পর্যায়ে টেনে নামিয়ে আনেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহান্ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন বলে পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্মদিন সেখানে ধর্মোৎসব-রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

* * *

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে পুরোহিত এসে সেই শালগ্রামশিলাকে পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করেন, ধূপকর্পূরাদির দ্বারা আরতি করেন, তারপর তাঁর শয়ন দিয়ে ঐভাবে পূজা করার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর স্বরূপতঃ রূপবিবর্জিত হলেও তিনি ঐরূপ প্রতীক বা কোনরূপ জড়বস্তুর সাহায্য ব্যতীত তাঁর উপাসনা করতে পারছেন না, এই দোষ বা দুর্বলতার জন্য পূজারী তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি শিলাটিকে স্নান করান, কাপড় পরান এবং নিজের চৈতন্যশক্তি দ্বারা তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

একটি সম্প্রদায় আছে, তারা বলে—ভগবানকে কেবল শিব ও সুন্দর-রূপে পূজা করা দুর্বলতামাত্র, আমাদের অশিব রূপকেও ভালবাসতে হবে, পূজা করতে হবে। এই সম্প্রদায় তিব্বত দেশের সর্বত্র বিদ্যমান, আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। এই সম্প্রদায়ের ভারতে প্রকাশ্যভাবে থাকবার জো নেই, সুতরাং তারা গোপনে গোপনে সম্প্রদায় করে থাকে। কোন ভদ্রলোক গুপ্তভাবে ভিন্ন এই-সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন না। তিব্বত-দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ

২৯

কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে-চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব তপস্যা করে, আর শক্তি (বিভূতি)-লাভের দিক্ দিয়ে খুব সাফল্যও লাভ করে থাকে।

'তপস্' শব্দের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হয়তো উদয়াস্ত জপ করা—সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ওঙ্কার-জপ। এই-সকল ক্রিয়ার দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মায়, যাকে—আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক—যে-কোনরূপে ইচ্ছা পরিণত করা যেতে পারে। এই তপস্যার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন-কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগৎসৃষ্টি করবার জন্য তপস্যা করতে হয়েছিল। এটা যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ—এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে—'ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপস্যা দ্বারা পাওয়া যায় না।'

যে-সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্যকলাপ বর্ণনা করে, যেগুলির সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী। যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢ়বিশ্বাসী, তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখতে পায় না।

ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আজ মাসের কোন্ তারিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'রামই আমার চিরদিনের সন তারিখ সব। আমি আর কোন তারিখ গ্রাহ্য করি না।'

মঙ্গলবার, ২ জুলাই

(জগজ্জননী)
শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পূজা করে থাকেন—কারণ মা-নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা 'দক্ষিণাচার' বা 'দক্ষিণমার্গ' বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়—এর দ্বারা কখনও ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের—রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে 'বামাচার' বা 'বামমার্গ' বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা ঐ সাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ-স্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা-নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা—ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন নিজের মাকে সর্বশক্তিময়ী মনে করে ভাবে—মা সব করতে পারে। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখনও নিজেদের জানতে পারি না।

সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া—সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে

পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা খুশী তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা—যে-কোনরূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম ও রূপ—দুই-ই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই-সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি (cells) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক-একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় 'ব্রহ্ম', আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা 'শক্তি' বা 'মা' বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্ত-স্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা—যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক অস্তিত্ব; এটিই বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

বুধবার, ৩ জুলাই

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ। কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে যে, 'পূর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দূরে যায়।' যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জ্ঞানলাভ করছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারছি—ঈশ্বর কি বস্তু, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু ভয় থাকবেই। যীশুখ্রীষ্ট মানুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন—আর তার খুব নিন্দাও করে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, সুতরাং তাঁর ক্রোধেরও কোন কারণ নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনও সর্বোচ্চ ভাব হতে পারে না। ডেভিডের হস্ত শোণিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্য তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেননি।

৩০

আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর —যা, তোমার হাতের ভিতর রয়েছে—তা হলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। এ যেন জলস্থিতিবিজ্ঞানের (Hydrostatics) সমস্যার মত—একবিন্দু জলের শক্তিতে সমগ্র জগৎকে সাম্যাবস্থায় রাখা যেতে পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও সেইরূপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোলমাল দেখে আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটিতেও কোন গোল হয়েছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি।

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না।

যথার্থ বৈদান্তিককে সকলের সহিত সহানুভূতি করতে হবে, কারণ অদ্বৈতবাদ বা সম্পূর্ণ একত্বভাবই বেদান্তের সারমর্ম। দ্বৈতবাদীরা সাধারণতঃ গোঁড়া হয়ে থাকে—তারা মনে করে, তাদের পথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, আর তারা অত্যন্ত গোঁড়া। শৈবেরা আর একটি দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া ভক্ত ছিল যে, অপর কোন দেবতার নাম কানে শুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে দু-কানে দুটি ঘণ্টা বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। সেইজন্য তিনি তার কাছে অর্ধশিব অর্ধবিষ্ণু অর্থাৎ হরিহর-মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি করছিল। কিন্তু তার এমন গোঁড়ামি যে, যখন সে দেখলে ধূপধুনার গন্ধ বিষ্ণুর নাকে যাচ্ছে, তখন বিষ্ণু যাতে সেই সুগন্ধ উপভোগ করতে না পান, সেজন্য তাঁর নাক চেপে ধরলে!

* * *

মাংসাশী প্রাণী—যেমন সিংহ—এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলেছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল 'ইয়াঙ্কি' (মার্কিন) ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।

* * *

যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে দু-ভাগ করে ফেলি—আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অনুরূপ করে সৃষ্টি করে থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু হবার জন্য সৃষ্টি করে থাকি, ঈশ্বর আমাদের তাঁর দাস করেননি। যখন আমরা জানতে পারি, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই আমাদের মুক্তি হয়। সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি আপনাকে এক চুলও তফাত করবে, ততদিন ভয় কখনও দূর হতে পারে না।

ভগবৎ-সাধনা করে—ভগবানকে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে?—বোকার মত এই প্রশ্ন কখনও কর না। চুলোয় যাক জগৎ, ভগবানকে ভালবাস—আর কিছু চেও না। ভালবাস এবং অপর কিছু প্রত্যাশা কর না। ভালবাস—আর সব মত-মতান্তর ভুলে যাও। প্রেমের পেয়ালা পান করে পাগল হয়ে যাও। বল, 'হে প্রভু, আমি তোমারই—চিরকালের জন্য তোমারই'—এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দাও। 'ঈশ্বর' বলতে যে 'প্রেম' ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। একটা বিড়াল তার বাচ্চাদের ভালবেসে আদর করছে দেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে যাও, আর ভগবানের উপাসনা কর। সেই স্থানে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা বিশ্বাস কর। সর্বদা বল, 'আমি তোমার, আমি তোমার'; কারণ আমরা সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না—তিনি তো প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে যাও। 'সেই বিশ্বাত্মা, জগজ্জ্যোতিঃ প্রভু সর্বদা তোমাদের রক্ষা করুন।'

* * *

নির্গুণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশ-বিশেষকে উপাসনা করতেই হবে। যীশু আমাদের মত মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন—তিনি 'খ্রীষ্ট' হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মত খ্রীষ্ট হতে পারি, আর আমাদের তা হতেই হবে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবস্থা-বিশেষের নাম—যা আমাদের লাভ করতে হবে। যীশু ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। জগন্মাতা বা আদ্যাশক্তিই ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—তারপর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তাঁর থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বদ্ধ করি, আবার আমরাই ঐ শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হই। আত্মা অভয়স্বরূপ। আমরা যখন আমাদের আত্মার বাইরে অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি, তবে আমরা যে কি করছি, তা জানি না। আমরা যখন আত্মার স্বরূপ জানতে পারি, তখনই ঐ রহস্য বুঝি। একত্বই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

পারসীক সুফীদিগের কবিতায় আছেঃ

'একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগল—শেষে তিনি বা আমি কেউই রইলাম না। এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাবে স্মরণ হয় যে, এক সময়ে দুজন পৃথক্ লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক করে দিলে।'

৩১

জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান—ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও ততদিন আছে। যে-ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাঁকেই 'inspired' বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ঋষি বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে 'revelation' বা অপৌরুষেয় বাণী বলে। কিন্তু এরূপ অপৌরুষেয় বাণীও অনন্ত—এমন নয় যে এ-পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতেই তা শেষ হয়ে গেছে, এবং এখন অন্ধভাবে তার অনুসরণ করতে হবে। বিজেতারা হিন্দুদের ধর্মকে এতদিন ধরে সমালোচনা করে এসেছে যে, এখন তারা (হিন্দুরা) নিজেরাই নিজেদের ধর্ম সমালোচনা করতে সাহস করে, আর এর ফলে তারা স্বাধীনচেতা হয়ে গিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্তারা অজ্ঞাতসারে হিন্দুদের পায়ের বেড়ি ভেঙে দিয়েছে। হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধার্মিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবন্নিন্দা বা ধর্মনিন্দা কাকে বলে, তা জানে না। তাদের মতে ভগবান্ বা ধর্মসম্বন্ধে যে-কোন ভাবে আলোচনা করা হোক না, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। আর তারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্মধ্বজিতার প্রতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

খ্রীষ্টের ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতানুযায়ী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বার চেষ্টা করেনি। এজন্যই খ্রীষ্ট-সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার সহায় হয়েছিল, কেবল সেগুলিকেই রাখা হয়েছিল। সুতরাং সেই গ্রন্থগুলির উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইরূপ গ্রন্থ বা শাস্ত্র-উপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা—ওটা আমাদের হাত-পা একেবারে বেঁধে রেখে দেয়। এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম, কি দর্শন—সবকিছুই ঐ শাস্ত্রের মতানুযায়ী হতে হবে। প্রটেস্টাণ্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার। খ্রীষ্টান দেশসমূহের প্রত্যেকের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড গির্জা চাপান রয়েছে, আর তার উপরে একখানা ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ?

জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা করতে পারি না; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানুষ—আবার মানুষও ঈশ্বর। যখন আমরা মনুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত উচ্চতর কোন কিছু সাক্ষাৎ করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ-মন-কল্পনা—এ-সবেরই বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ করে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা। পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। আমরা

নিজেরা যা কিছু করে থাকি অথবা অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার করে থাকি।

সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল সেটা কখনও বেশী, কখনও কম অভিব্যক্ত হয়—এই মাত্র। ঐ জ্ঞানের একমাত্র উৎস আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়।

* * *

সমুদয় কাব্য, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত কেবল ভাষা, বর্ণ ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

* *

*

ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফল ভোগ করে—তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে, তাদের মহা দুর্দৈব—তাদের বেশী বেশী ভুগতে হবে।

যাঁরা সমত্বভাব লাভ করেছেন, তাঁরাই ব্রহ্মে অবস্থিত বলে কথিত হন। সকল রকম ঘৃণার অর্থ—যেন আত্মার দ্বারা আত্মার হনন। সুতরাং প্রেমেই জীবনের যথার্থ নিয়ামক। প্রেমের অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা; কিন্তু আমরা যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ (তথাকথিত কাজ) করতে পারি। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা জানেন ও দেখেন যে, সবই ছেলেখেলামাত্র, সুতরাং তাঁরা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না।

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা, কিন্তু হাত গুটিয়ে স্থির হয়ে থেকে 'হে প্রভু, আমি তোমারই শরণাগত হলাম' বলা এবং তিনি যা হয় করুন বলে অপেক্ষা করে থাকা খুবই কঠিন।

শুক্রবার, ৫ জুলাই

যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে-কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্য-লাভ করতে পারবে না; অবশ্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে সত্যের অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে।

* * *

চার্বাকেরা ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়—তারা সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে-সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্মা—দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন বলে দেহের নাশে আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তার কোন প্রমাণ নেই। তারা কেবল ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করত—অনুমান দ্বারাও যে জ্ঞান-লাভ হতে পারে, তা স্বীকার করত না।

সমাধি-অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাব, অথবা সমত্বভাব লাভ করা।

জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা ভ্রমমাত্র। বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেটাই ভ্রম। বেদান্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ দুই-ই। ব্যাবহারিক ভূমিতে তুমি কখনই মুক্ত নও, কিন্তু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুমি নিত্যমুক্ত।

মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও।

আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে, জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করলেই ঐ শক্তি তোমাতে আসবে।

'হে মাতঃ বাগীশ্বরি, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি আমার জিহ্বায় বাক্-রূপে আবির্ভূতা হও!'

'হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ—তুমি আমার ভিতর আবির্ভূতা হও! হে কালি, তুমি অনন্ত কালরূপিণী, তুমি অমোঘ শক্তিস্বরূপিণী!'

শনিবার, ৬ জুলাই

(অদ্য স্বামীজী ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।)

ওঁ তৎ সৎ!

শঙ্করের মতে জগৎকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অস্মদ্ (আমি) ও যুস্মদ্ (তুমি)। আর আলো ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুটিও সেরূপ; সুতরাং বলা বাহুল্য, এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হতে পারে না। এই আমি বা বিষয়ীর (subject) উপর তুমি বা বিষয়ের (object) অধ্যাস হয়েছে। বিষয়ীই একমাত্র সত্য বস্তু, অপরটি অর্থাৎ বিষয় আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র। ইহার বিরুদ্ধ মত অর্থাৎ বিষয় সত্য ও বিষয়ী মিথ্যা—এ মত কখনও প্রমাণ করা যেতে পারে না। জড়পদার্থ ও বহির্জগৎ শুধু আত্মারই অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই রয়েছে।

আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন। যেমন বল-সামান্তরিকে৩২ দুই বিভিন্নমুখী বলপ্রয়োগের ফলে একটি বস্তুতে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, সেরূপ এই সংসারও আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ। এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য; কিন্তু আমরা জগৎকে সেভাবে দেখছি না; যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়েছে। একেই বলে 'অধ্যাস'। যে সত্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাকেই অধ্যস্ত সত্তা বলে। যেমন পূর্বে যে দৃশ্য দেখেছি, এখন তার স্মরণ হল। সেই সময়ের জন্য সেটা সত্য বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়; অথচ অধ্যাসের দৃষ্টান্ত অপরে এইরূপ দেন—উষ্ণতা জলের ধর্ম বা গুণ নয়, অথবা যেমন আমরা জলে উষ্ণতা কল্পনা করে থাকি। সুতরাং অধ্যাস মানে 'অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ'—যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা যখন জগৎ দেখছি, তখন আমরা সত্যকেই দর্শন করছি, কিন্তু যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে দেখছি—তার দ্বারা সত্য বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে দেখা যাচ্ছে।

তুমি নিজেকে বাইরে বিষয়রূপে প্রক্ষেপ না করে কখনও নিজেকে জানতে পার না। ভ্রান্তির অবস্থায় আমাদের সামনের বস্তুগুলোকেই আমরা সত্য বলে মনে করি, অদৃষ্ট বস্তুকে কখনও সত্য বলে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে (object) বিষয়ী (subject) বলে ভুল করে থাকি। আত্মা কিন্তু কখনও বিষয় (object) হন না। মনে হচ্ছে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়, আর বহিরিন্দ্রিয়গুলি তারই যন্ত্রস্বরূপ। বিষয়ীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি (objectifying power) আছে—তার দ্বারাই তিনি জানতে পারেন, 'আমি আছি'। কিন্তু সেই আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়—মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন। তবে আমরা একটা ভাবকে (idea) আর একটা ভাবের উপর অধ্যাস করতে পারি—যেমন আমরা যখন বলি, 'আকাশ নীল'—আকাশটা একটা ভাবমাত্র, আর নীলত্বও একটা ভাব—আমরা নীলত্ব ভাবটা আকাশের উপর আরোপ বা অধ্যাস করে থাকি।

বিদ্যা ও অবিদ্যা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুই নিয়ে জগৎ, কিন্তু আত্মা কোন কালে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয় না। আপেক্ষিক জ্ঞানও ভাল, কারণ সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোহণ করবার সোপান। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি দেব-প্রমাণজন্য জ্ঞানও কখনও পরমার্থ সত্য হতে পারে না; কারণ ঐগুলি সবই আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর। প্রথমে 'আমি দেহ' এই ভ্রম দূর করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হবে। মানবীয় জ্ঞান পশুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাত্র।

* * *

বেদের এক অংশে কর্মকাণ্ড—নানাবিধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও যথার্থ আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের বিষয় বর্ণিত আছে। বেদের এই ভাগ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আর সেইজন্যই বেদের ঐ ভাগের জ্ঞান যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানের অতি সমীপবর্তী। সেই অনন্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না; এই জ্ঞান স্বয়ংপূর্ণ-স্বরূপ। বহুশাস্ত্রপাঠেও এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান অপরোক্ষানুভূতি। আরশির উপর যে ময়লা রয়েছে, তা পরিষ্কার করে ফেল। নিজের মনটা পবিত্র কর, তা হলেই দপ্ করে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম।

শুধু ব্রহ্মই আছেন—জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই, মন্দও নেই,—সবই আমরা 'রজ্জুকে সর্প' মনে করছি—ভ্রম আমাদেরই। আমরা তখনই কেবল জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন। হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মস্বরূপ—তার উপর হত্যাকারিরূপ যে আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে হাত ধরে তাকে এই সত্য জানিয়ে দাও।

আত্মাতে কোন জাতিভেদ নেই; আছে—ভাবাটাই ভ্রম। সেই রকম আত্মার জীবন বা মরণ বা কোন প্রকার গতি বা গুণ আছে—এরূপ ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা কোথাও যানও না, আসেনও না। তিনি তাঁর নিজের সমুদয় প্রকাশগুলির অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে ঐ ঐ প্রকাশ বলে মনে করছি। এ এক অনাদি অনন্ত ভ্রম চিরকাল ধরে চলেছে। তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বলতেন, তা হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না।

স্বর্গ আমাদের বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার-মাত্র, আর বাসনা চিরকালই বন্ধন—অবনতির দ্বারস্বরূপ। ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া আর কোনভাবে কোন বস্তুকে দেখো না। তা যদি কর, তা হলে অন্যায় বা মন্দ দেখবে; কারণ আমরা যে বস্তু দেখতে পাই, তার উপর একটা ভ্রমাত্মক আবরণ প্রক্ষেপ করি, তাই মন্দ দেখতে পাই। এই-সব ভ্রম থেকে মুক্ত হও এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। সব রকম ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়াই মুক্তি।

এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে; কারণ সে জানে, 'আমি আছি'; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। আমরা সকলেই জানি যে, আমরা আছি, কিন্তু কি করে আছি, তা জানি না। অদ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্যান্য নিম্নতর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ত্ব এই যে—আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রহ্মস্বরূপ। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে যা কিছু

সব—জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমাদের অপরোক্ষানুভূতি বেদেরও অতীত; কারণ বেদেরও প্রামাণ্য ঐ অপরোক্ষানুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ বেদান্ত হচ্ছে—প্রপঞ্চাতীত সত্তার তত্ত্বজ্ঞান।

'সৃষ্টির আদি আছে' বললে সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে 'মায়া' বলে। যতক্ষণ সেই মাতৃরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়ে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।

জগৎটা আমাদের উপভোগের জন্য পড়ে রয়েছে; কিন্তু কখনও অভাববোধ করে কিছু চেও না। অভাববোধ করাটা দুর্বলতা, অভাববোধই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। আমরা ভিক্ষুক নই, আমরা রাজপুত্র!

রবিবার, ৭ জুলাই, প্রাতঃকাল

অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা যাক না কেন, তা অনন্তই থাকে, আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনন্ত।

পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম এক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক বলে জেন। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটী জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী ধ্যানে যে ঈশ্বর দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই দেখে থাকেন।

আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র। যতদিন ভোগসুখ খোঁজা যায়, ততদিন বন্ধন থেকে যায়। যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যায়, ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্তি। জীবাত্মা প্রকৃতিকে সম্ভোগ করে থাকে। প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর—এদের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁকে বাইরে প্রকাশ না করছি, ততদিন তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। যেমন ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটাকে নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কারকে উত্তরারণি বলে কল্পনা কর, আর ধ্যান যেন মন্থন।

৩৩

তা হলে আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্যা দ্বারা এইটে করতে চেষ্টা কর। দেহকে সরল ভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল বাইরে।সুতরাং তাদের জোর করে মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণা-সহায়ে মনকে ধ্যানে স্থির কর। যেমন দুধের ভিতর সর্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

৩৪

সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

* * *

জগৎটা একটা অবিরাম গতি-স্বরূপ; আর ঘর্ষণ (friction) হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন-কতক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরম্ভ হবে।

যতদিন এই 'ত্বগম্বর' মানুষকে বেষ্টন করে থাকে, অর্থাৎ যতদিন সে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।

ঐ দিন, অপরাহ্ণ

ভারতের ছটি দর্শনকে 'আস্তিক দর্শন' বলে; কারণ তারা বেদে বিশ্বাসী। ব্যাসের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সূত্রাকারে অর্থাৎ যেমন বীজগণিতশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা অক্ষরের সাহায্যে ভাব-প্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে এটা লিখেছিলেন—এতে কর্তা ক্রিয়া বড় একটা নেই। ব্যাসসূত্র এইরূপ সংক্ষেপে রচিত হওয়ায় শেষে তার অর্থ বুঝতে এত গোল হল যে, ঐ এক সূত্র থেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি হল। এই অদ্বৈতবাদই 'বেদান্ত-কেশরী'। আর এই-সব বিভিন্ন মতের বড় বড় ভাষ্যকারেরা বেদের অক্ষর-রাশিকে তাঁদের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য সময়ে সময়ে 'জেনে শুনে মিথ্যাবাদী' হয়েছেন।

উপনিষদে কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপের ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থই প্রধানতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস।

বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তত্ত্বেরই আলোচনা আছে। দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে অদ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত। তার ব্যাখ্যাতা রামানুজ। তিনি বলেন, 'বেদরূপ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে ব্যাস মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই বেদান্তদর্শন-রূপ মাখন তুলেছেন।' তিনি আরও বলেছেন 'জগৎপ্রভু ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণ-সমন্বিত পুরুষোত্তম।' মধ্ব পুরোদস্তুর দ্বৈতবাদী। ... তিনি বলেন, স্ত্রীলোকের পর্যন্ত বেদপাঠে অধিকার আছে। তিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে তাঁর মত-স্থাপনের জন্য শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম মানে বিষ্ণু—শিব নন, কারণ বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই।

দেববাণী - ৫

সোমবার, ৮ জুলাই

মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই—তিনি শাস্ত্রপ্রমাণেই সব গ্রহণ করেছেন।

রামানুজ বলেন, বেদই সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ। ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন উচ্চ বর্ণের সন্তানদের যজ্ঞোপবীত-গ্রহণের পর অষ্টম, দশম বা একাদশ বর্ষ বয়সে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিত। বেদাধ্যয়নের অর্থ গুরুগৃহে গিয়ে নিয়মিত স্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করা।

জপের অর্থ—ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃপুনঃ উচ্চারণ; এই জপ করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনন্তরূপে উপনীত হন। যাগযজ্ঞাদি যেন ভঙ্গুর নৌকা। ব্রহ্মকে জানতে হলে ঐ যাগযজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি আর কিছু নয়—অজ্ঞানের বিনাশ; ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়। বেদান্তের তাৎপর্য জানতে গেলে যে এই-সব যাগযজ্ঞ করতেই হবে, তার কোন মানে নেই; কেবল ওঙ্কার জপ করলেই যথেষ্ট।

ভেদ-দর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই ভেদ-দর্শনের কারণ। এইজন্যই যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তাতে ভেদজ্ঞান আরও বাড়িয়ে দেয়। ঐ-সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু (ভোগসুখ) লাভ করা—অথবা কোন কিছু (দুঃখ) থেকে নিস্তার পাওয়া।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মস্বরূপ—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ত্ব প্রথম শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা ধারণা করতে হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হবে। মনন অর্থে বিচার করা—বিচার দ্বারা, যুক্তিতর্কের দ্বারা ঐ জ্ঞান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যক্ষানুভূতি ও সাক্ষাৎকারের অর্থ সর্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করে ফেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র থেকে অপর পাত্রে ঢালা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ধ্যান দিবারাত্র মনকে ঐ ভাবের মধ্যে রেখে দেয় এবং তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্বদা 'সোঽহম্, সোঽহম্' চিন্তা কর—অহরহ এইরূপ চিন্তা মুক্তির প্রায় কাছাকাছি। দিবারাত্র বল—'সোঽহম্, সোঽহম্'। সর্বদা এইরূপ চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ হবে। ভগবানকে এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্বদা স্মরণের নামই 'ভক্তি'।

সব রকম শুভকর্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য করে থাকে। শুভ চিন্তা ও শুভ কার্য—অশুভ চিন্তা ও অশুভ কর্ম অপেক্ষা কম ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করে, সুতরাং গৌণভাবে এরা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম কর, কিন্তু কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। যিনি ভক্তিপূর্বক সত্য-স্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, তাঁর কাছে সেই সত্য-স্বরূপ ভগবান্ প্রকাশিত হন।

আমরা যেন প্রদীপ-স্বরূপ, আর ঐ প্রদীপের জ্বালাটাকেই আমরা 'জীবন' বলি। যখনই অম্লজান ফুরিয়ে যাবে, তখনই আলোটাও নিবে যাবে। আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিষের মিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং জীবন অবশ্যই তার উপাদান-কারণগুলিতে লীন হবে।

মঙ্গলবার, ৯ জুলাই

আত্মা-হিসাবে মানুষ বাস্তবিক মুক্ত, কিন্তু মানুষ-হিসাবে সে বদ্ধ, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক পরিবেশে সে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষ-হিসাবে তাকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে—এই পর্যন্ত। কিন্তু জগতের সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে এই মনুষ্য-শরীরই শ্রেষ্ঠ শরীর, আর মনুষ্য-মনই শ্রেষ্ঠ মন। যখন মানুষ আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্যকমত যে-কোন শরীর ধারণ করতে পারে; তখন সে সব নিয়মের পারে। এটা প্রথমতঃ একটা উক্তিমাত্র; একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যে এটা নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে; আমরা নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে পারি না। ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজযোগই প্রমাণ করে দেখানো যেতে পারে, আর আমি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে যা ঠিক বলে জেনেছি, শুধু তাই শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই প্রাতিভ জ্ঞান, কিন্তু তা কখনও যুক্তিবিরোধী হতে পারে না।

কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুতরাং কর্ম—বিদ্যা বা জ্ঞানের সহায়ক। বৌদ্ধদের মতে মানুষ ও জীবজন্তুর হিতসাধনই একমাত্র কর্ম; ব্রাহ্মণদের মতে উপাসনা ও সর্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপ কর্ম এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। শঙ্করের মতে—'শুভাশুভ সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।' যে-সকল কর্ম অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো পাপ—সাক্ষাৎসম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারণস্বরূপে, যেহেতু সেগুলির দ্বারা রজঃ ও তমঃ বেড়ে যায়। সত্ত্বের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য ও শুভকর্মের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের ঈশ্বরদর্শন হয়।

জ্ঞান কখনও উৎপন্ন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল অনাবৃত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে; যে কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাঁকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত (inspired) পুরুষ বলা হয়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন,

আমরা তাঁকে ঋষি বা অবতার বলি; আর যখন সেটা জড়জগতের কোন সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলি। যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ব্রহ্ম, তথাপি আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি।

শঙ্কর বলেনঃ ব্রহ্ম সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার—তত্ত্ব-স্বরূপ; আর জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ যে অভিব্যক্তি, তা ব্রহ্মে কাল্পনিক ভেদমাত্র। রামানুজ ব্রহ্মে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খাঁটি অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মে কোন গুণই স্বীকার করেন না—এমন-কি সত্তা পর্যন্ত নয়, সত্তা বলতে আমরা যাই কেন বুঝি না। রামানুজ বলেনঃ আমরা সচরাচর যাকে 'জ্ঞান' বলি, ব্রহ্ম তাঁরই সার-স্বরূপ। অব্যক্ত বা সাম্যভাবাপন্ন জ্ঞান—ব্যক্ত বা বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত হলেই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।

* * *

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মসমূহের অন্যতম বৌদ্ধধর্ম ভারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখ দেখি, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভুত ছিল, যাতে তারা ঐরূপ উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণা করতে পেরেছিল!

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ স্বীকার করেননি, আর এখন ভারতে তাঁর একটিও অনুগামী দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য দার্শনিকেরা সকলেই সামাজিক কুসংস্কারগুলোর অল্পবিস্তর দালাল ছিলেন; তাঁরা যতই উঁচুতে উঠে থাকুক না কেন, তাঁদের মধ্যে একটু-আধটু 'চিল-শকুনির ভাব' ছিল। আমার গুরুদেব যেমন বলতেন, 'চিল-শকুনি এত উঁচুতে ওঠে যে, তাদের দেখা যায় না; কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে—কোথায় এক টুকরো পচা মাংস পড়ে আছে!'

* * *

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁরা বলতেন, বিদ্যা যদি পুঁথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্যকাল উপস্থিত হলে সে-বিদ্যা বিদ্যা নয়, সে-ধনও ধন নয়।

৩৫

শঙ্করকে অনেকে শিবের অবতার বলে জ্ঞান করে থাকে।

বুধবার, ১০ জুলাই

ভারতে সাড়ে ছ-কোটি মুসলমান আছে—তাদের মধ্যে কতক সুফী আছে। এই সুফীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আর তাদের মাধ্যমেই ঐ ভাব ইওরোপে এসেছে। তারা বলে, 'আন্ আল্ হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্য-স্বরূপ। তবে তাদের ভিতর বহিরঙ্গ (বা প্রকাশ্য), এবং অন্তরঙ্গ (বা গুহ্য) মত আছে। যদিও মহম্মদ নিজে এ মত পোষণ করতেন না।

'হাশাশিন' শব্দ থেকে ইংরেজী assassin (হত্যাকারী) শব্দ এসেছে। মুসলমানদের একটি প্রাচীন সম্প্রদায় ধর্মমতের অঙ্গ মনে করে কাফের বা অবিশ্বাসীদের হত্যা করত।

মুসলমানদের উপাসনার সময় এক কুঁজো জল সামনে রাখতে হয়। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করে রয়েছেন, এটা তাঁরই প্রতীক-স্বরূপ।

৩৬

হিন্দুরা দশাবতারে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে নয় জন অবতার হয়ে গেছেন, দশম অবতার পরে আসবেন।

* * *

বেদের সকল বাক্য তৎপ্রচারিত দর্শনের সমর্থক—এইটি প্রমাণ করতে শঙ্করকে কখনও কখনও কূট তর্কের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বুদ্ধ অন্য সকল ধর্মাচার্যের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন। তিনি বলে গেছেন, 'কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না। বেদ

৩৭

মিথ্যা। যদি আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ মেলে, সে বেদেরই সৌভাগ্য। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনায় কোন ফল নেই।' মনুষ্যজাতির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে সর্বাঙ্গসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। মঙ্গলের জন্যই তিনি মঙ্গলময় জীবন যাপন করতেন, ভালবাসার জন্যই তিনি ভালবাসতেন; তাঁর অন্য অভিসন্ধি কিছু ছিল না।

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে, মনন করতে হবে, কারণ বেদ এইরূপ বলছেন। বিচার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহায়ক। বেদ এবং অনুভূত যুক্তি বা ব্যক্তিগত অনুভূতি উভয়ই ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁর মতে বেদ এক প্রকার অনন্ত জ্ঞানের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ। বেদের প্রমাণ এই যে, তা ব্রহ্ম হতে প্রসূত হয়েছে, আবার ব্রহ্মের প্রমাণ এই যে, বেদের মত অদ্ভুত গ্রন্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কারও প্রকাশ করবার সাধ্য নেই। বেদ সর্বপ্রকার জ্ঞানের খনিস্বরূপ; আর মানুষ যেমন নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ু

বাইরে প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তাঁর ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; সেইজন্যই আমরা জানতে পারি, তিনি সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় না; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিষ। বেদের সাহায্যেই জগৎ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জানতে পেরেছে—তাঁকে জানবার আর অন্য উপায় নেই।

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি—এটা সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, গরু হারালেও বেদে তা খুঁজে পাওয়া যায়।

শঙ্কর আরও বলেন, কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনপ্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে করছে বা অপর একজন স্থাণুজ্ঞান করছে, তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না।

বেদান্তবেদ্য জ্ঞান আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বিচার বা শাস্ত্রদ্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে পারে না। তাঁকে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদান্তই ঐ অবস্থালাভের উপায় দেখিয়ে দেয়। আমাদের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই নির্গুণ ব্রহ্মে পৌছতে হবে। সব অনুভূতির ভেতর প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্মকে অনুভব করছে

৩৮

; ব্রহ্ম ছাড়া আর অনুভব করবার দ্বিতীয় বস্তুই নেই। আমাদের ভিতর যেটা 'আমি, আমি' করছে, সেটাই ব্রহ্ম। কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত তাঁকে অনুভব করছি, তথাপি আমরা জানি না যে, তাঁকে অনুভব করছি। যে মুহূর্তে আমরা ঐ সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্তেই আমাদের সব দুঃখকষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের ঐ সত্যকে জানতেই হবে। একত্ব-অবস্থা লাভ কর, তা হলে আর দ্বৈতভাব আসবে না। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে অন্বেষণ করা, উপাসনা ও সাক্ষাৎ করা—এই-সকলের দ্বারাই সেই জ্ঞানলাভ হবে।

ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা; অপরা বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান। মুণ্ডকোপনিষৎ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষৎ এই উপদেশ দিচ্ছেন।

৩৯

দুই প্রকার বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপাসনা ও নানাবিধ যাগযজ্ঞের উপদেশ—সেই কর্মকাণ্ড এবং সর্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়, তাই পরা বিদ্যা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্যে থেকেই সমুদয় সৃষ্টি করছেন—বাইরে অপর কিছু নেই, যা জগৎকারণ হতে পারে। সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তিস্বরূপ, ব্রহ্মই যা কিছু আছে—সব। যিনি আত্মযাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্মকে জানেন। মূর্খেরাই বাহ্য পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, অজ্ঞানব্যক্তিরাই মনে করে, কর্মের দ্বারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হতে পারে। যাঁরা সুষুম্নাবর্ত্মে (যোগীদের মার্গে) গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতেও যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে; আত্মা থেকেই সব কিছু প্রসূত হয়েছে। ওঙ্কার হচ্ছে যেন ধনু, আত্মা হচ্ছে যেন তীর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে। তাঁতে মিশে এক হয়ে যেতে হবে।

৪০

সসীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই অসীমস্বরূপ। এইটি জানলে আর কারও সঙ্গে আমরা তর্ক করি না।

ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সেই দিব্যজ্ঞানলাভ করতে হবে। 'সত্যমের জয়তে নানৃতম্, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।'

৪১

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ রয়েছে; কেবল সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান।

বৃহস্পতিবার, **১১** জুলাই

মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই স্থায়ী হতে পারে না। জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নয়। জড় ও চিৎ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটা দ্বারাই অপরটার ব্যাখ্যা হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে একটা ভিত্তি আছে, এ-বিষয়ে সকল আস্তিকই একমত, কেবল সেই ভিত্তিস্থানীয় বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ-সম্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ। জড়বাদীরা জগতের ঐরূপ কোন ভিত্তি আছে বলে স্বীকারই করে না।

সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমন-কি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।

যীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তাঁর শিষ্য টমাস (Apostle Thomas) কর্তৃক জগতের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান

সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা (Anglo-Saxons) তখনও অসভ্য ছিল—গায়ে চিত্র-বিচিত্র আঁকত ও পর্বতগুহায় বাস করত। এক সময়ে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হবে।

খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রীষ্টের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যেরা এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম—জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববর্তী তিনটি ধর্ম, যথা—হিন্দু, য়াহুদী ও জরথুস্ট্রের (পারসী) ধর্ম কখনও অপরকে ধর্মান্তরিত করে দলপুষ্টি করতে চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধেরা কখনও নরহত্যা করেনি, তারা শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারাই এক সমেয় জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল।

বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই শূন্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ, এই দুয়ের মাঝখানে সত্যি কোথাও থামতে পার না। বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল—তারা তাদের মত যুক্তি দ্বারা যতদূর নিয়ে যাওয়া চলে, তা নিয়ে গিয়েছিল। অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই এক অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে পৌঁছেছিল—যা থেকে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও বহুত্ব (অভেদ ও ভেদ)-বোধ আছে। এই দুটি অনুভূতির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা হবেই। শূন্যবাদী বলেন, পৃথকত্ব বা বহুত্ববোধ সত্য; অদ্বৈতবাদী বলেন, একত্ববোধই সত্য; সমগ্র জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (tug of war) চলেছে।

অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শূন্যবাদী একত্বের কোন ভাব পান কি করে? ঘূর্ণমান আলোটা (অলাতচক্র) বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? একটা স্থিতি স্বীকার করলে তবেই গতির ব্যাখ্যা হতে পারে। সব জিনিষের পশ্চাতে একটা অখণ্ড সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে, সেটা শূন্যবাদী বলেন—ভ্রমমাত্র; কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আবার অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে, এক বহু হল কি করে। এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। অতীন্দ্রিয় শক্তি যেন ঐ অবস্থায় যাবার একটি যন্ত্রস্বরূপ, আর তার ব্যবহার অদ্বৈতবাদীরই করায়ত্ত। তিনিই ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করতে সমর্থ; মানুষ 'বিবেকানন্দ' নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। সুতরাং তার পক্ষে জগৎসমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে অপরের পক্ষেও ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে, কারণ সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ সেখানে ধর্মের আরম্ভ। আর এইরূপ উপলব্ধির দ্বারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাবে। সুতরাং জগতে ধর্মলাভই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য; আর মানব অজ্ঞাতসারে এইটি অনুভব করেছে বলেই সে আবহমান কাল ধর্মভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে।

ধর্ম যেন বহুগুণশালিনী পয়স্বিনী গাভী; সে অনেক লাথি মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? সে অনেক দুধও দেয়। যে-গরুটা দুধ দেয়, গোয়ালা তার লাথি সহ্য করে যায়।

'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'-এ আছে, মহামোহ ও বিবেক—এই দুই রাজায় লড়াই বেধেছিল। বিবেক-রাজার সম্পূর্ণ জয় আর হয় না। অবশেষে বিবেক-রাজার সঙ্গে উপনিষদ্-দেবীর পুনর্মিলন হয়, এবং তাঁদের প্রবোধ-রূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শত্রু বলে আর কেউ রইল না। তখন তাঁরা পরমসুখে বাস করতে লাগলেন। আমাদের প্রবোধ বা ধর্মসাক্ষাৎকার-রূপ মহৈশ্বর্যবান্ পুত্রলাভ করতে হবে। ঐ প্রবোধ-রূপ পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত একটা বীর হয়ে দাঁড়াবে।

ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত। ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানমার্গ কি রকম?—না—যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্বত্যনদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে অতি সত্বর বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, 'সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।' ভক্তিমার্গ বলে, 'স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।' এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

ভক্ত বলেনঃ 'প্রভো চিরকালের জন্য আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিকই তুমিই করছ—আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।'

'হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান করব; আমার বুদ্ধি নেই যে, আমি শাস্ত্র শিক্ষা করব; আমার সময় নেই যে, যোগ-অভ্যাস করব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহ-মন অর্পণ করলাম।'

যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্তধারণা আসুক, কিছুই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ যদি নাও থাকেন, তবু প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। কুকুরের মত পচা মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভাল। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিষ কিছু নেই।

৪২

ভক্তিদ্বারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়—ঐ জ্ঞানের পর পরাভক্তি আসে।

জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, 'ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন'; তাই সে সবকিছুই গ্রহণ করে।

রাবিয়া

রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহ্যমান
নিজ শয্যা 'পরে আছিলা শয়ান।
এহেন কালেতে নিকটে তাঁহার
আগমন হল দুই মহাত্মার;—
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
পূজেন যাঁদের সব মুসলমান।
কহিলা হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে,
'পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
যে শাস্তি ঈশ্বর দিন-না তাহারে,
সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।'
পবিত্র মালিক—গভীরাত্মা যিনি,
বলিলেন নিজ অনুভব-বাণী,
'প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার,
আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।'
রাবিয়া শুনিয়া দু-জনের বাণী,
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি;
কহিলা, 'হে ঈশ, কৃপার ভাজন,
দুঁহু প্রতি এক করি নিবেদন—
যে-জন দেখেছে প্রভুর বদন,
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
উঠিবে না কভু এমত বিচার—
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে;
জানিবে না কভু শাস্তি কারে বলে।'

—পারসী কবিতা

শুক্রবার, ১২ জুলাই

(অদ্য বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে পড়া হইতে লাগিল।)

চতুর্থ ব্যাসসূত্র—'তৎ তু সমন্বয়াৎ'—আত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

ঈশ্বরকে—বেদান্ত থেকে জানতে হবে। সমুদয় বেদই—জগৎকারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা ঈশ্বরের কথা বলছে। সমুদয় হিন্দু দেবদেবীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছেন। ঈশ্বর এই তিনের একীভাব।

বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমি তো সেই ব্রহ্মই রয়েছ। বেদ এইটুকু করতে পারে, যে-আবরণটা আমাদের চোখের সামনে থেকে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে, সেইটেই দূর করে দিতে সাহায্য করতে পারে। প্রথম চলে যায় অজ্ঞানাবরণ, তারপর যায় পাপ, তারপর বাসনা আর স্বার্থপরতা দূর হয়; এইভাবে সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়। এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হতে পারে, যখন আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম ও আমি এক; অর্থাৎ নিজেকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলির সঙ্গে নয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর করে দাও দেখি, তা হলেই সব দুঃখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ ভাল করে দেওয়ার এই রহস্য। এই জগৎটা একটা সম্মোহনের (hypnotism) ব্যাপার; নিজের ওপর থেকে এই সম্মোহনের আবেশটা দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার আর কষ্ট থাকবে না।

মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তারপর পুণ্য অর্জন করতে হয়, শেষে পাপ-পুণ্য দুই-ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ দ্বারা তমঃকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সত্ত্বগুণে লয় করতে হবে—সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে। এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে তোমার প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর উপাসনা-স্বরূপ হবে।

যখনই দেখ যে অপরের কথা থেকে কোন কিছু শিখছ (বা লাভ করছ), জেনো যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক।

৪৩

যতই ক্ষমতা-লাভ হবে, ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কোন কিছু বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া। আর বাসনাগুলো সোনার পাতমোড়া বিষের বড়ি—এইটে জানার নামই বৈরাগ্য।

'মন ব্রহ্ম নয়।' 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটি উপলব্ধি করে, তখন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'।

৪৪

তার সব হৃদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশয় ছিন্ন হয়। যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থালাভ হতে পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে জেতে হবে। যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ তা চিরকালই পৃথক্ থাকবে; তুমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ হও, তুমি কখনও তাঁর সঙ্গে এক হতে পারবে না; আবার বিপরীতক্রমে যদি তুমি এক হও, তা হলে কখনই পৃথক্ থাকতে পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আসবে। আসল কথা, ব্রহ্মের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে—পুণ্যকর্ম কেবল আবরণটা দূর করবার সহায়তা করে। আমরা 'আজাদ' অর্থাৎ মুক্ত, এইটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

'যমেবৈষ বৃণুতে'—যাঁকে এই আত্মা বরণ করেন

৪৫

—এর তাৎপর্য, আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি।

ব্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর করছে? —আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর করছে। আমাদের চেষ্টার দ্বারা আরশির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত হয়—আরশি যেমন তেমনি থাকে, পরিবর্তিত হয় না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। 'যিনি জানেন যে তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন। যিনি কেবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই জানেন না।'

৪৬

আমরা বদ্ধ—এই ধারণাটাই ভুল।

ধর্ম জিনিষটা জাগতিক নয়; ধর্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার; এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিষটা আত্মার স্বরূপ হতে অভিন্ন। আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদা অপরিণামী। এই আত্মাকে তুমি কখনও জানতে পার না। আমরা এই আত্মার সম্বন্ধে 'নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। শঙ্কর বলেন, 'যাকে আমরা মন বা কল্পনার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেও দূর করতে পারি না, তাই ব্রহ্ম।'

* * *

এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দরাশিমাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করতে পারি, আবার লয় করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের—কর্মী (বা কর্মানুষ্ঠানকারী)-দের মত এই যে, শব্দের পুনঃপুনঃ উচ্চরণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফল-স্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টি কর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। হিন্দু দর্শনের এক সম্প্রদায়—মীমাংসকগণ বলেন, ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি।

শনিবার, ১৩ জুলাই

আমরা যা কিছু জানি, তাই মিশ্রণ-স্বরূপ; আর আমাদের সমুদয় বিষয়ানুভূতি বিশ্লেষণ থেকেই এসে থাকে। মনকে অমিশ্র, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই দ্বৈতবাদ। শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না; বরং যত বই পড়বে, ততই মন গুলিয়ে যাবে। যে-সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তাঁরা ভাবতেন—মনটা একটা অমিশ্র বস্তু; আর তাই থেকে তাঁরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান (Psychology) মনের অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবস্তু; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্তু কোন-না-কোন বাহ্য শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেইহেতু মন বা ইচ্ছাও বহিঃস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে। এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (will) বাসনার (desire) অধীন। কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তস্বভাব—সকলেই এটা অনুভব করে থাকে।

অজ্ঞেয়বাদী বলেন, এই ধারণাটা ভ্রমমাত্র। তা হলে জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা সকলেই জগৎ দেখছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব করছি। তা হলে আমরা যে সকলেই নিজেদের মুক্তস্বভাব বলে অনুভব করছি, এ অনুভবও যথার্থ না হবে কেন? যদি সকলে অনুভব করছে বলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে সকলেই যখন নিজেদের মুক্তস্বভাব বা স্বাধীন প্রকৃতি অনুভব করছে, তখন তারও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমরা যেমন দেখছি, সেভাবে তার সম্বন্ধে 'স্বাধীন' কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। মানুষের নিজ মুক্ত স্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই

সমুদয় তর্ক যুক্তি বিচারের ভিত্তি। 'ইচ্ছা'—বদ্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ ছিল, তাই মুক্ত স্বভাব। এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা—এতেই প্রতিমুহূর্তে দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা করছে। একমাত্র বস্তু, যা প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে—তা অনন্ত, অসীম, দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে। মানুষের ভিতর এখন যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পূর্বস্মৃতিমাত্র—স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র।

জগতে সকল জিনিষ যেন ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছে—তার উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎস আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা করছে। মানুষ যে সুখের অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়—সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেইটা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। এই যে নীতিপালন, এও বদ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা, আর এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি।

* * *

কর্তব্যের ধারণাটা যেন দুঃখরূপ মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড—আত্মাকেই যেন দগ্ধ করে ফেলছে। 'হে রাজন্, এই এক বিন্দু অমৃত পান করে সুখী হও।' আত্মা অকর্তা—এই ধারণাই অমৃত।

ক্রিয়া হতে থাক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আসে; ক্রিয়া থেকে সুখই হয়ে থাকে, সমুদয় দুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু আগুনে হাত দেয়—তার সুখ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তার শরীর প্রতিক্রিয়া করে, তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্টবোধ হয়ে থাকে। ঐ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পারলে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। মস্তিষ্ককে নিজের বশে নিয়ে এস, যেন সে প্রতিক্রিয়াটার খবর না রাখতে পারে। সাক্ষিস্বরূপ হও, দেখ—যেন প্রতিক্রিয়া না আসে, কেবল তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত সেইগুলি, যখন আমরা নিজেদের একেবারে ভুলে যাই। স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাজ কর না। আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই জগৎ তো একটা খেলার আখড়া—এখানে আমরা খেলছি; আমাদের জীবন তো অনন্ত আনন্দের অবকাশ!

জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে—এ ভয় কখনও কর না, কারও উপর নির্ভর কর না। যে মুহূর্তে তুমি সকল সাহায্য প্রত্যাখান কর, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্জটা পুরো জলে শুষে নিয়েছে, সে আর জল টানতে পারে না।

* * *

আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্যায়, যদিও গায়ে পড়ে অপরকে আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উঁচু জিনিষ। 'ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ' বলে কোন জিনিষ নেই, কারণ সকল বস্তুতে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে।

রবিবার, ১৪ জুলাই

ভারতে দর্শন-শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে—যে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা দ্বারা আমরা ঈশ্বর-দর্শন করতে পারি। দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। সুতরাং কোন হিন্দু কখনও ধর্ম ও দর্শনের ভিতর সংযোগসূত্র কি, তা জানতে চায় না।

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছেঃ (১) স্থূল বস্তুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান (concrete); (২) ঐগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা বা ঐগুলির মধ্যে 'সামান্য' আবিষ্কার করা (generalised); (৩) সেই সামান্যগুলির ভিতর আবার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ঐক্য আবিষ্কার করা (abstract)। সমুদয় বস্তু যেখানে একত্ব-প্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্তু হচ্ছেন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ধর্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে, দেখা যায়; দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য; সর্বশেষে অবস্থায় দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিবৃতি। এদের মধ্যে প্রথম দুটি শুধু সাময়িক প্রয়োজনের জন্য, কিন্তু দর্শনই ঐ-সকলের মূল ভিত্তিস্বরূপ, আর অন্যগুলি সেই চরমতত্ত্বে পৌঁছবার সোপান মাত্র।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের ধারণা এই—বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট ও খ্রীষ্ট ব্যতীত ধর্মই হতে পারে না। য়াহুদীধর্মেও মুশা ও প্রফেটদের সম্বন্ধে এই রকম এক ধারণা আছে। এরূপ ধারণার হেতু এই যে, এই-সব ধর্ম কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সর্বোচ্চ ধর্ম এই-সকল পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়ে ওঠে; সে-ধর্ম কখনও শুধু এগুলির উপর নির্ভর করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই প্রকৃত ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডটা যে এক অখণ্ড বস্তু, তা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক যাকে 'সত্তা' (being) বলেন, বৈজ্ঞানিক তাকেই 'জড়' (matter) বলে থাকেন; কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ তত্ত্বতঃ দুই-ই এক জিনিষ। দেখ না—পরমাণু অদৃশ্য ও অচিন্ত্য, অথচ তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে। বেদান্তীরাও আত্মা সম্বন্ধে ঠিক এইভাবের কথাই বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সব সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বলছেন।

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণস্বরূপ এমন এক বস্তুকে নির্দেশ করছেন, যা হতে অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত-কারণ, আবার সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদান-কারণ—সবই। যেন কুম্ভকার মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্মাণ করছে—এখানে কুম্ভকার হচ্ছে নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুম্ভকারের চক্র অসমবায়ী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মাই এই তিন। আত্মা কারণও বটে, আবার অভিব্যক্তি বা কার্যও বটে। বেদান্তী বলেন, এই জগৎটা সত্য নয়, আপাতপ্রতীয়মান মাত্র। প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিদ্যাবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মমাত্র।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর—প্রকৃতি বা এই জগৎপ্রপঞ্চ হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন, ঈশ্বর এই জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি এই জগৎ নন।

আমরা অনুভূতি-বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারূপেই জানতে পারি—একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা দাগরূপে জানতে পারি। আমরা মস্তিষ্ককে সম্মুখে বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে; সুতরাং মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনন্তকালের জন্য সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে; মন সর্বব্যাপী কিনা।

'দেশ-কাল-নিমিত্ত যে চিন্তারই প্রণালীবিশেষ'—এই আবিষ্ক্রিয়াই ক্যাণ্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্বেই এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে, আর একে 'মায়া' নামে অভিহিত করেছে। শোপেনহাওয়ার শুধু যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদোক্ত তত্ত্বগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে 'আর্য' বলে গেছেন।

* * *

সকল বৃক্ষের মধ্যে যে এক বৃক্ষত্ব রয়েছে—সেইটে জানার নামই 'জ্ঞান'। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে— এই একত্বের জ্ঞান।...

সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের চরম সামান্য বা সাধারণ ভাবই সগুণ ঈশ্বর; কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত নয়।...

সেই এক তত্ত্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব হয়েছে।...

পদার্থ-বিজ্ঞানের কাজ ঘটনাবলী আবিষ্কার করা, দর্শন যেন ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলি নিয়ে তোড়া বাঁধবার সুতো। চিন্তাসহায়ে ঐক্য আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারেও এইরূপ একটা প্রণালীর সহায়তা নিতে হয়।...

ধর্মের ভিতর—স্থূল, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও চরম একত্ব—এই তিনটি ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো না। সেই চরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে—সেই একত্বে চলে যাও।

* * *

অসুরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতারা সত্ত্বপ্রধান যন্ত্র; কিন্তু দুই-ই যন্ত্র; মানুষই কেবল চেতন, জীবন্ত। যন্ত্রবৎ ভাবটাকে দূর করে দাও; ধারণা কর, তুমি যন্ত্র নিয়ে কাজ করছ—তুমি যন্ত্র নও, তবেই মুক্ত হতে পারবে। এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তিসাধন করতে পারে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এই আত্মা যাকে বরণ করেন, এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক্ থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ করছে—কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টবাদমূলক ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তো এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাঁড়ায়।

দেববাণী - ৬

সোমবার, ১৫ জুলাই

যেখানে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিব্বতে, সেখানে স্ত্রীলোকদের শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে বেশী। যখন ইংরেজরা ঐ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে।

মালাবার দেশে অবশ্য মেয়েদের বহুবিবাহ নেই, কিন্তু সেখানে সব বিষয়ে তাদের প্রাধান্য। সেখানে সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিদ্যাচর্চায় যারপরনাই উৎসাহ। ঐ দেশে দেখেছি—অনেক মেয়ে ভাল সংস্কৃত বলতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একটি মেয়েও সংস্কৃত বলতে পারে কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতার উন্নতি হয়, আর দাসত্ব থেকে অবনতিই হয়ে থাকে। পোর্তুগীজ বা মুসলমান কারও দ্বারাই মালাবার কখনও বিজিত হয়নি।

দ্রাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্যজাতি—আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে তারা ভাগ হয়ে গেল; কতকগুলি মিশরে, কতকগুলি ব্যাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট ভারতেই রইল।

মঙ্গলবার, ১৬ জুলাই

(শঙ্কর)

অদৃষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদের যাগযজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন করতে হবে।

কর্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। সর্বপ্রকার নীতি-ধর্মের মূল হচ্ছে বিধিনিষেধ—'এই কাজ কর' এবং 'এই কাজ কর না'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহমনের সঙ্গেই এগুলির সম্বন্ধ। সর্বপ্রকার সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; সুতরাং সুখদুঃখ ভোগ করতে গেলেই শরীরের প্রয়োজন। যার দেহ যত উন্নত, তার ধর্ম বা পুণ্যের আদর্শ তত উচ্চ; এই রকম ব্রহ্মা পর্যন্ত; এ পর্যন্ত সকলেরই শরীর আছে। আর যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ সুখদুঃখ থাকবেই; কেবল দেহভাবমুক্ত হলেই সুখদুঃখ অতিক্রম করা যেতে পারে। শঙ্কর বলেন, আত্মা দেহহীন।

কোন বিধি-নিষেধের দ্বারা মুক্তিলাভ হতে পারে না। তুমি সদা মুক্তই আছ। যদি তুমি পূর্ব হতেই মুক্ত না থাক, তবে কিছুই তোমায় মুক্তি দিতে পারে না। আত্মা স্বপ্রকাশ। কার্যকারণ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—এই দেহশূন্য ভাব বা বিদেহ অবস্থার নামই মুক্তি। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সবকিছুর পারে ব্রহ্ম। যদি মুক্তি কোন কর্মের ফল হত, তবে তার কোন মূল্যই থাকত না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীজ নিহিত থাকত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাব, তাকে লাভ করতে হয় না, সেটা আত্মার যথার্থ স্বরূপ।

তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার জন্য—বন্ধন ও ভ্রম দূর করবার জন্য—কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন; এরা মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে পারি না। শঙ্কর আরও বলেন, অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরব-মুকুট; কিন্তু বেদের নিম্নতর ভাগগুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ তারা আমাদের কর্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে, আর এইগুলির সাহায্যেও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই সেই অবস্থায় যাবে। অদ্বৈতবাদ যে-অবস্থায় নিয়ে যায়, কর্ম এবং উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়।

শাস্ত্র ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর করে দিতে পারে। শাস্ত্রের কার্য নাশাত্মক (negative)। শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনেছিলেন, আবার সকলের সামনে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাই বলো, তাঁকে ঐ নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে। প্রথমে মানুষকে একটা স্থূল অবলম্বন দাও, তারপর ধীরে ধীরে তাকে সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম এই চেষ্টাই করছে, আর এ থেকে বোঝা যায়—কেন ঐ-সকল ধর্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন-না-কোন অবস্থার উপযোগী। শাস্ত্র অবিদ্যা দূর করতে সাহায্য করে, কিন্তু শাস্ত্রও ঐ অবিদ্যার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তা দূর করা। 'সত্য অসত্যকে দূর করে দেবে।' তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে মুক্ত করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ করনি। 'যিনি মনে করেন—আমি জানি, তিনি জানেন না।'

৪৭

যিনি স্বয়ং জ্ঞাতাস্বরূপ, তাঁকে কে জানতে পারে?

৪৮

দুটি চিরন্তন বস্তু আছে—ব্রহ্ম ও জগৎ। প্রথমটি অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিণামী, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জগৎ পরিণামী। জগৎ অনন্তকাল ধরে রয়েছে। যেখানে পরিণাম কতখানি হচ্ছে, মন তা ধরতে পারে না, তোমরা তো তাকেই অনন্ত বলে থাক। জগৎ ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু একই সময়ে তো তোমরা দুটো দেখতে পাও না—একখানা পাথরের উপর একটা ছবি বা মূর্তি খোদাই করা রয়েছে; যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন খোদাই-এর দিকে থাকে না; আবার যখন খোদাই-এর দিকে মন দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না; অথচ দুই-ই এক।

তুমি কি এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে সম্পূর্ণ স্থির শান্ত করতে পার? সকল যোগীই বলেন, এটা করা সম্ভব।

* * *

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে—নিজেকে দুর্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। কোন বস্তুতে তুমি যে শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া।

আমরা সূর্য চন্দ্র তারা অতিক্রম করে রয়েছি, আমরা জগৎপ্রপঞ্চেরও উপরে। শিক্ষা দাও, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আছে—এটি স্বীকার কর না, যা নেই—তাকে আর নূতন করে সৃষ্টি কর না। সদর্পে বল—আমি প্রভু, আমি সকলের প্রভু। আমরাই নিজেদের শৃঙ্খল নিজেরা গড়েছি, আর আমরাই কেবল ঐ শিকল ভাঙতে পারি।

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধ্য; ইচ্ছা হল তাকে গ্রহণ করলাম, ইচ্ছা হল ত্যাগ করলাম—এরূপ হতে পারে না। যখন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য নয়, তবে মনে ঐ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে।

কর্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে-স্বরূপ ভুলে ছিলে, তা ফিরে পাও। আত্মা যে দেহ, এইটে মনে করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকতে থাকতেই মুক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, 'অসৎ'কে 'সৎ' বা সত্য বলে গ্রহণ করা।

বুধবার, ১৭ জুলাই

রামানুজ জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাত্মা বা প্রাণী), অচিৎ (জড়প্রকৃতি), এবং ঈশ্বর—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন; অথবা চেতন, অবচেতন ও অধিচেতন—এই তিন ভাগ। শঙ্কর কিন্তু বলেনঃ (জীবাত্মা) চিৎ ও (পরমাত্মা) ঈশ্বর বা ব্রহ্ম একবস্তু। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাঁর গুণ নয়। ব্রহ্মকে চিন্তা করতে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর বলা যেতে পারে 'ওঁ তৎ সৎ'—অর্থাৎ তিনি সত্তাস্বরূপ, তিনি অস্তিস্বরূপ—এই মাত্র।

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তু থেকে পৃথক্ করে দেখতে পার? দুটি বস্তুর মধ্যে 'বিশেষ' বা পার্থক্য কোন্‌খানে? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নয়, কারণ তা হলে সব জিনিষই এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়-জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে। একটা বস্তু কি, তা জানতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়, সেটা কি নয়। দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে অবস্থিত, আর চিত্তে যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা এগুলি জানতে পারি। বস্তুর স্বরূপের মধ্যে ভেদ নেই, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে। বাইরে এক অখণ্ড বস্তুই রয়েছে; ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে; সুতরাং বহুজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি।

এই 'বিশেষ'গুলিই গুণপদবাচ্য হয়—যখন তারা পৃথক্ থাকে, অথচ কোন একটি জিনিষের সঙ্গে জড়িত থাকে। এই 'বিশেষ' জিনিষটা কি, তা আমরা ঠিক করে বলতে পারি না। আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা বা একটা 'অস্তি'ভাব। আর যা কিছু সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তুর সত্তাসম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি। বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, কারণ ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে; ভুলভাবে হলেও একটা কিছু তো দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জুজ্ঞান বাধিত হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীতক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিষ দেখছ বলে প্রমাণিত হয় না যে, অন্য জিনিষটা নেই। জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু তার যে অস্তিত্ব আছে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

শঙ্কর আরও বলেন যে, অনুভূতিই (perception) অস্তিত্বের চরম প্রমাণ। অনুভূতি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও আত্মসচেতন, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বা কারণ-সাপেক্ষ নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। চেতনা (consciousness) ব্যতীত অনুভূতি হতে পারে না; অনুভব স্বপ্রকাশ, তারই নিম্নতর মাত্রার প্রকাশকে 'চেতনা' বলে। কোন প্রকার অনুভব-ক্রিয়াই চেতনারহিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে চেতনা। সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুটি পৃথক্ পৃথক্ ভাব এক সঙ্গে জোড়া নয়। যার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই, তাই অনন্ত; সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্তস্বরূপ; অনুভূতি সর্বদাই স্বসংবেদ্য। অনুভূতি নিজেই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ; এটা মনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা থেকেই মন হয়েছে; অনুভূতি নিরপেক্ষ, পূর্ণই একমাত্র জ্ঞাতা, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা। অনুভূতি স্বয়ং অনুভব করে, কিন্তু আত্মাকে 'জ্ঞাতা' বলা যেতে পারে না; কারণ 'জ্ঞাতা' বললে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায়। কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা 'অহং' নন, কারণ তাঁতে 'আমি আছি' এই ভাবটি নেই। আমরা (অহং ভাব) সেই আত্মার

প্রতিবিম্বমাত্র, আত্মা ও ব্রহ্ম এক।

যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলো বা ভাবো, তখনই আপেক্ষিকভাবে ঐ কাজগুলি করতে হয়, সুতরাং সেখানে এই-সকল যুক্তিবিচার খাটে। কিন্তু যোগাবস্থায় অনুভব ও অপরোক্ষানুভূতি এক হয়ে যায়। রামানুজ-ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আংশিকভাবে একত্ব-দর্শন, এবং অদ্বৈতাবস্থার অভিমুখে একটি সোপানস্বরূপ। 'বিশিষ্ট' মানেই ভেদ বা পৃথক্‌করণ। 'প্রকৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা পরিণাম বা পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল চিন্তারাশি—পরিবর্তনশীল শব্দরাশি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না। ঐরূপ করে আমরা শুধু এমন একটা বস্তুতে উপনীত হই, যা থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ নয়। আমরা কেবল শব্দগত একত্বে পৌঁছই, তার চেয়ে আর চরম ঐক্য বার করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের বিলোপ-সাধন হয় না।

বৃহস্পতিবার, ১৮ জুলাই

(অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ঃ প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্যের যুক্তি।)

সাংখ্যেরা বলেন, জ্ঞান একটি মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ, আর তারও পারে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আমরা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হই। এই পুরুষ—সংখ্যায় বহু; আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি পুরুষ। অদ্বৈত-বেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একটিই হতে পারেন, সেই পুরুষ চেতন; তিনি অচেতন বা কোন গুণসম্পন্ন হতে পারেন না, কারণ গুণ থাকলেই সেগুলি তাঁর বন্ধনের কারণ হবে, পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। অতএব সেই এক বস্তু অবশ্যই সর্বপ্রকারগুণরহিত, এমন কি—জ্ঞান পর্যন্ত তাতে থাকতে পারে না, এবং সেই পুরুষ জগৎ বা আর কিছুর কারণ হতে পারে না। বেদ বলেন, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'—হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।

৪৯

যেখানে সত্ত্বগুণ সেইখানেই জ্ঞান দেখা যায় বলে প্রমাণিত হয় না যে, সত্ত্বই জ্ঞানের কারণ; বরং, মানুষের ভিতর জ্ঞান পূর্ব হতেই রয়েছে, সত্ত্বের সান্নিধ্যে সেই জ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ হয় মাত্র। যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহগোলক রাখলে ঐ আগুন লৌহগোলকটার ভিতর পূর্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, তাকেই ব্যক্ত করে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে—তার ভিতরে প্রবেশ করে না, সেই রকম।

শঙ্কর বলেন—জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ জ্ঞান সেই পুরুষ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। জগৎ ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্বদাই রয়েছে, সুতরাং চিরন্তন জ্ঞেয় বস্তু একটি আছেই। জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি কোন আকারেরই প্রয়োজন নেই; যে সসীম, তার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাখবার জন্য একটা প্রতিবন্ধকের (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির) প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ঐরূপ সহায়তার আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। বাস্তবিক এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী 'সংসারী' জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র আত্মা কিছু নেই। পঞ্চ প্রাণ যাঁতে একীভূত হয়েছে—এই দেহের সেই চেতন নিয়ন্তাকেই 'জীবাত্মা' বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্যরূপ বোধ করছ, সে ভ্রান্তি তোমারই, জীবে সে ভ্রান্তি নেই। তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি নিজেকে আর যা কিছু বলে ভাবছ, তা ভুল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে পূজা কর না, কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁরই উপাসনা কর। শুধু আত্মার উপাসনাতেই মুক্তিলাভ হবে। এমন কি, সগুণ ঈশ্বর পর্যন্ত সেই আত্মার বহিঃপ্রকাশমাত্র। শঙ্কর বলেছেন, 'স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।'—নিজ স্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে।

আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকি, সে সব সত্য। যেমন ধ্রুবতারাকে দেখাতে হলে তার আশপাশের নক্ষত্রগুলির সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি।

* * *

ভগবদ্গীতা বেদান্তসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।

শুক্রবার, ১৯ জুলাই

যতদিন আমার 'আমি, তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন একজন ভগবান্ আমাদের রক্ষা করছেন, এ-কথা বলবার অধিকারও আমার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে-সকল অনিবার্য সিদ্ধান্ত আসে, সেগুলিও নিতে হবে, 'আমি, তুমি' স্বীকার করলেই আমাদের আদর্শস্থানীয় আর একটি তৃতীয় বস্তু স্বীকার করতে হবে, যা আমি-তুমির মাঝখানে আছে; সেইটিই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ। যেমন বাষ্প তুষার হয়, তুষার থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু যখন বাষ্পাবস্থা, তখন আর গঙ্গা নেই; আবার যখন জল, তখন তার মধ্যে বাষ্প চিন্তা করি না।

সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন পর্যন্ত আমরা জগৎকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রম, পদার্থবিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দেয়; আমরা কোন জিনিষকে যেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ ঘ্রাণ বা আস্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিষটা বাস্তবিক তা নয়। বিশেষ

বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপন্ন করছে, আর সেইগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করছে; আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্যই জানতে পারি।

'সত্য'-শব্দ 'সৎ' থেকে এসেছে। যা 'সৎ' অর্থাৎ 'আছে', যেটি 'অস্তিস্বরূপ' সেটিই সত্য। আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। আমাদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, তাঁর নিজের কাছে সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখা যায়, ঈশ্বরকেও তেমনি সাকারভাবে দেখা যেতে পারে। মানুষ-হিসাবে আমাদের একটি ঈশ্বরের প্রয়োজন; আত্মস্বরূপে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে না। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জগজ্জননীকে সদাসর্বদা তাঁর কাছে বর্তমান দেখতেন—তাঁর চারপাশের অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁকেই বেশী বাস্তব বলে দেখতেন; কিন্তু সমাধি-অবস্থায় তাঁর আত্মা ব্যতীত আর কিছুর অনুভব থাকত না। সেই সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, শেষে তিনি যেন গলে যান, তখন 'ঈশ্বর'ও থাকেন না, 'আমি'ও থাকে না—সব সেই আত্মায় লীন হয়ে যায়।

চেতনার বোধ একটা বন্ধন। 'সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার কল্পনা'-রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি-সৃষ্টির পূর্বে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি কিছুর কারণ হয়, তবে তা আবার অপর কিছুর কার্যস্বরূপ। একেই বলে 'মায়া'। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি—এই হল মায়া। সর্বত্র এইরূপ চক্রগতি দেখা যায়ঃ মন দেহ সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মন সৃষ্টি করছে; ডিম থেকে পাখি, আবার পাখি থেকে ডিম; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ। এই জগৎপ্রপঞ্চ একেবারে বৈষম্যে পূর্ণ নয়, আবার পুরোপুরি সমভাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীন—তাকে এই দুই ভাবের উপরে উঠতে হবে। এ দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য বটে, কিন্তু সেই যথার্থ সত্য—সেই অস্তি-স্বরূপকে লাভ করতে গেলে আমরা এখন যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, চেতনা, করা, যাওয়া, জানা বলে জানি, সে-সব অতিক্রম করতে হবে। (পৃথক্ বা স্বতন্ত্র) জীবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই—ওটা মিশ্র বস্তু হলে তো কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ। এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্য যত চেষ্টা, সবই বাস্তবিক পাপ, আর ঐ স্বাতন্ত্র্যকে নাশ করবার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম বা পুণ্য। এই জগতে সব কিছুই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙবার চেষ্টা করছে। চারিত্র্যনীতির (morality) ভিত্তি হচ্ছে—এই পার্থক্যজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙবার চেষ্টা, কারণ এইটিই সকল প্রকার পাপের মূল; চারিত্র্যনীতি আগে থেকেই রয়েছে, ধর্মশাস্ত্র ঐ নীতি পরবর্তী কালে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথা স্বভাবতই উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য পরে পুরাণের উৎপত্তি। যখন ঘটনাসমূহ ঘটে যায়, তখন সেগুলি যুক্তি-বিচারের চেয়ে উচ্চতর কোন নিয়মেই ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে—ঐগুলি বোঝবার চেষ্টায়। যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটবার শক্তি নেই, এ যেন ঘটনাগুলি ঘটে যাবার পরে সেগুলির জাবরকাটা। যুক্তিতর্ক যেন মানুষের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক (historian)।

বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন (কারণ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের একটি শাখা মাত্র), আর শঙ্করকেও কখনও কখনও 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয়। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন, শঙ্কর সেইগুলি সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করলেন। বুদ্ধ কখনও কারও কাছে মাথা নোয়াননি—বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা—কারও কাছে নয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে তিনি যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা—জগতে কেউ কখনও দেখেনি। বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিনজাতির জন্য করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

শনিবার, ২০ জুলাই

প্রত্যক্ষানুভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম। অনন্ত যুগ ধরে আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা বলে যাই, তাতে কখনই আমাদের আত্মজ্ঞান হতে পারে না। কেবল মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া ও নাস্তিকতায় কিছু তফাত নেই। মানুষ-হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে নাস্তিকই বেশী খাঁটি। সেই প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে আমি যে কয় পা অগ্রসর হব, তা থেকে কোন কিছুই আমাকে কখনও হটাতে পারবে না। কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হল। আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। গুরু কেবল আমাদের কাছে 'আধ্যাত্মিক খাবার' এনে দিতে পারেন—ঐ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করতে গেলে আমাদের তা খেতে হবে। তর্কযুক্তি কখনও ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারে না, কেবল যুক্তিসঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে।

ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিষেরই অতি অস্পষ্ট অনুকরণ-মাত্র।

আমাদের মনের শক্তিগুলির একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে সহায়তা করবার একমাত্র যন্ত্র। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ আত্মাকে) জানতে পার, তা হলে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান সকল আত্মাকেই জানতে পারবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মনের একাগ্রতা-সাধন হয়—যুক্তি, বিচার, ভক্তি, ভালবাসা, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ—এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন করে দেখা যায়।

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না। কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের মত একটার পর একটা অবলম্বন করতে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি সর্বনিম্ন সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের বাইরে দেখা, তারপর অন্তর্যামিরূপে দেখা। স্থলবিশেষে, একটার পর আর একটা—এইরূপ ক্রম আবশ্যক হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল

একটা পথই প্রয়োজন। 'জ্ঞানলাভ করতে হলে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে যেতেই হবে'—সকলকেই এ-কথা বলা চরম মূর্খতা।

যতদিন না যুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ত্বলাভ করছ, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাকো, আর ঐ অবস্থায় পৌঁছলে তুমি বুঝবে যে, সেটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিষ, কারণ ঐ অবস্থা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত এই ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্তু স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মূর্ছাবিশেষকে সমাধি বলে ভুল কর না। অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে বলে দাবী করে থাকে, স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি-অবস্থা বলে ভ্রম করে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা। বাইরের কোন লক্ষণ দেখে নির্ণয় করবার উপায় নেই—যথার্থ সমাধি হয়েছে কিনা, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। তবে যুক্তিবিচারের সাহায্য নিলে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সুতরাং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে; ধর্মলাভ মানে হচ্ছে—যুক্তিতর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্তু ঐ ধর্মলাভ করবার পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান যেন বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি যেন বাষ্প—সব চেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা। একটার পর আর একটা আসে। সব জায়গাতেই এই নিত্য পৌর্বাপর্য বা ক্রম রয়েছে—যেমন অজ্ঞান, সংজ্ঞা বা আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, দেহ মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাবটা (link) প্রথম ধরি, সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ভ হয়েছে—আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে—দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা বলে থাকে—মন থেকে দেহ হয়েছে। উভয় পক্ষেই যুক্তির সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য। আমাদের ঐ দুটোরই পারে যেতে হবে—এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে দেহ বা মন কোনটি-ই নেই। এই যে ক্রম—এও মায়া।

ধর্ম যুক্তিবিচারের পারে, ধর্ম অতি-প্রাকৃত। বিশ্বাস-অর্থে কিছু মেনে নেওয়া নয়, বিশ্বাসের অর্থ—সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা, বিশ্বাস হৃদয়-কন্দর উদ্ভাসিত করে দেয়। প্রথমে সেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর—বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর জানতে পারা যায় তা দেখ; এর উপর দিয়ে বিচারের বন্যা বয়ে যাক—তারপর বাকী যা থাকে, সেইটুকু গ্রহণ কর। যদি কিছু বাকী না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি একটা কুসংস্কারের হাত থেকে বেঁচেছ। আর যখন তুমি স্থির সিদ্ধান্ত করবে যে, কিছুই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্মা সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাক এবং সকলকে ঐ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও; সত্য কখনও পক্ষপাতী হতে পারে না, এতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে স্থিরভাবে ও শান্তচিত্তে তাঁর উপর নিদিধ্যাসন কর বা তাঁর ধ্যান কর, তোমার মনকে তাঁর উপর একাগ্র কর, ঐ আত্মার সঙ্গে নিজেকে একভাবাপন্ন করে ফেল। তখন আর বাক্যের কোন প্রয়োজন থাকবে না, তোমার ঐ মৌনভাবই অপরের ভিতর সত্য তত্ত্ব সঞ্চার করবে। বৃথা কথা বলে শক্তিক্ষয় কর না, চুপচাপ ধ্যান কর। আর বহির্জগতের গণ্ডগোল যেন তোমাকে বিক্ষুব্ধ না করে। যখন তোমার মন সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তা জানতে পার না। চুপচাপ থেকে শক্তিসঞ্চয় কর, আর আধ্যাত্মিকতার বিদ্যুদাধার (dynamo) হয়ে যাও। ভিখারী আবার কি দিতে পারে? রাজাই কেবল দিতে পারে—সেও আবার শুধু তখনই দিতে পারে, যখন সে নিজে কিছু চায় না।

* * *

তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমার নিজের মনে কর না, নিজেকে ভগবানের ভাণ্ডারী বলে মনে কর। ধনের প্রতি আসক্ত হয়ো না। নামযশ টাকাকড়ি সব যাক্, এগুলি সব ভয়ানক বন্ধন। মুক্তির অপূর্ব পরিবেশ অনুভব কর। তুমি তো মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত; অবিরত বল, আমি ধন্য, আমি আনন্দময়, আমি মুক্তস্বরূপ, আমি অনন্তস্বরূপ, আমার আত্মাতে আদি নেই, অন্ত নেই; সবই আমার আত্মস্বরূপ।

রবিবার, ২১ জুলাই

(পাতঞ্জল যোগসূত্র)

চিত্ত বা মন যাতে বৃত্তিরূপে বিভক্ত না হয়ে পড়ে, যোগশাস্ত্র তাই শিক্ষা দিয়ে থাকে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' মনটা বিষয়-সমূহের ছাপ ও অনুভূতির, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রস্বরূপ, সুতরাং তা নিত্য হতে পারে না। মনের একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, সেই শরীর দ্বারা মন স্থূল দেহের উপর কার্য করে থাকে। বেদান্ত বলেন, মনের পশ্চাতে যথার্থ আত্মা আছেন। বেদান্ত অপর দুটিকে—অর্থাৎ দেহ ও মনকে স্বীকার করে থাকেন; আর একটি তৃতীয় পদার্থ স্বীকার করেন—যা অনন্ত, চরমতত্ত্ব-স্বরূপ, বিশ্লেষণের শেষ ফলস্বরূপ, এক অখণ্ড বস্তু—যাকে আর ভাগ করা যেতে পারে না। জন্ম হচ্ছে পুনর্যোজন, মৃত্যু হচ্ছে বিয়োজন, সব কিছু বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আত্মাকে পাওয়া যায়। আত্মাকে আর ভাগ করতে পারা যায় না, সুতরাং আত্মাতে পৌঁছলে নিত্য সনাতন তত্ত্বে পৌঁছান গেল।

প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতে সমগ্র সমুদ্রটা রয়েছে—যত কিছু অভিব্যক্তি, সবই তরঙ্গ, তবে কতকগুলি খুব বড় আর কতকগুলি ছোট, এইমাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐসব তরঙ্গ স্বরূপতঃ সমুদ্র—সমগ্র সমুদ্র; কিন্তু তরঙ্গ-হিসাবে প্রত্যেকটি অংশ মাত্র। তরঙ্গসমূহ যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সব এক। পতঞ্জলি বলেন,—'দৃশ্যবিহীন দ্রষ্টা'। যখন মন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন আত্মা তার সঙ্গে মিশিয়া থাকেন। অনুভূত পুরাতন বিষয়গুলির দ্রুত পুনরাবৃত্তিকে 'স্মৃতি' বলে।

অনাসক্ত হও। জ্ঞানই শক্তি আর জ্ঞানলাভ করলেই তোমার শক্তিও আসবে। জ্ঞানের দ্বারা এমন কি এই জড় জগৎটাও তুমি উড়িয়ে দিতে পার। যখন তুমি মনে মনে কোন বস্তু থেকে এক একটা করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণই বাদ দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছে করলেই সমগ্র জিনিষটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পারবে।

যারা উত্তম অধিকারী, তারা যোগে খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করতে পারে—ছ-মাসে তারা যোগী হতে পারে। যারা তদপেক্ষা নিম্নাধিকারী, তাদের যোগে সিদ্ধিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আর যে-কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করলে, অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদা সর্বদা সাধনে রত থাকলে দ্বাদশ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এই-সব মানসিক ব্যায়াম না করে কেবল ভক্তি দ্বারাও ঐ অবস্থায় যেতে পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু বিলম্ব হয়।

মনের দ্বারা সেই আত্মাকে যেভাবে দেখা বা ধরা যেতে পারে, তাকেই 'ঈশ্বর' বলে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম 'ওঁ', সুতরাং ঐ ওঙ্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। সর্বদা ওঙ্কার জপই যথার্থ উপাসনা। ওঙ্কার সাধারণ শব্দমাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ।

ধর্ম তোমায় নূতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়। ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিঘ্ন—সুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ করবার সর্বোকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ। 'দৌর্মনস্য' বা মন খারাপ হওয়া-রূপ বিঘ্নটিকে দূর করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে জানতে পার, পরে আর তোমার মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা—এগুলিও অন্যান্য বিঘ্ন।

* * *

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সূক্ষ্ম শক্তি—দেহের সর্বপ্রকার গতির উৎস। প্রাণ সর্বসুদ্ধ দশটি—তন্মধ্যে পাঁচটি অন্তর্মুখ আর পাঁচটি বহির্মুখ। একটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে। প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মনের দ্বারা প্রাণসমূহকে নিয়মিত করা। শ্বাস যেন ইন্ধন, প্রাণ বাষ্প এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া আছেঃ পূরক—শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুম্ভক—শ্বাসকে ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক—বাইরে শ্বাস নিক্ষেপ করা।

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি তোমার কাছে পৌঁছয়। যে-কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু গুরুই শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করে থাকেন, তাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে। শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই-ভাই-সম্বন্ধ, আর ভারতের আইন এই সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকে। গুরু তাঁর পূর্ব পূর্ব আচার্যদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্দ পেয়েছেন, তাই শিষ্যে সংক্রামিত করেন—গুরু ব্যতীত সাধনভজন কিছু হতে পারে না; বরং বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই-সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না। প্রত্যেক ইষ্টদেবতার এক-একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট-অর্থে বিশেষ উপাসকের বিশেষ আদর্শ বুঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ। ঐ শব্দের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ়ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনাপ্রণালী ভারতের সকল সাধকের মধ্যে প্রচলিত।

দেববাণী - ৭

মঙ্গলবার, ২৩ জুলাই

(ভগবদ্‌গীতা—কর্মযোগ)

কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা কর না—ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার না থাকে। এইরূপ কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে—ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাভ করবার পূর্বে কর্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে। 'আত্মা'র জন্য কর্ম করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে সুখের আকাঙ্ক্ষাও কর না; আবার কর্ম করলে কষ্ট হবে—এ ভয়ও কর না। দেহ-মনই কাজ করে থাকে, আমি করি না। সদাসর্বদা নিজেকে এই কথা বলো এবং এটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর—যাতে তোমার বোধই হবে না যে, তুমি কিছু করছ।

সমুদয় কর্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাকো, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না—যেমন পদ্মপত্রের মূলগুলি পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তা যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়। যে অন্ধ, তার রঙের জ্ঞান নেই, সুতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখব কি করে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি এবং তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি। যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব না। বাইরে অপবিত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অস্তিত্ব থাকবে না। প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন কর, 'অন্তর্জ্যোতিঃ' দ্বারা তাঁকে দেখ, যদি সর্বত্র সেই ব্রহ্মদর্শন হয়, তবে আমরা আর অন্য কিছু দেখতে পাব না। এই সংসারটাকে চেও না, কারণ যে যা চায়, সে তাই পায়। ভগবানকে—কেবল ভগবানকেই অন্বেষণ কর। যত অধিক ক্ষমতা-লাভ হবে, ততই বন্ধন আসবে, ততই ভয় আসবে। একটা সামান্য পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীত ও দুঃখী। এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। স্রষ্টার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কর, সৃষ্টের তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কর না।

'আমিই কর্তা ও আমিই কার্য।' 'যিনি কামক্রোধের বেগধারণ করতে পারেন, তিনি মহাযোগী-পুরুষ।'

৫০

'অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে পারে।'

৫১

* * *

আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধীর স্থির হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করে গেছেন, ফলে আমাদেরও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার জন্য মস্তিষ্কটুকু রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা লাভের আশায় যে-রকম ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, তাতে সেটি নষ্ট হবার যোগাড় হচ্ছে।

* * *

শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি আছে—আর মানসিক অবস্থা, ঔষধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয় এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে। যতদিন আমরা প্রাকৃতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের জড়ের সহায়তা প্রয়োজন। আমরা যতদিন না স্নায়ুসমূহের দাসত্ব কাটাতে পারছি, ততদিন জড়ের সাহায্য আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে—তাকে 'অজ্ঞানভূমি' বা 'অবচেতন মন' বলা যেতে পারে; আমরা যাকে সমগ্র মানুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র। দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলি আন্দাজমাত্র। ধর্ম কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রত্যক্ষদর্শন জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু—যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে। 'আপ্ত' তাঁদের বলে, যাঁরা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রণালী অনুসরণ কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। একজন জ্যোতির্বিদ্ রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি দেখাতে পারেন না, তার জন্য দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রয়োজন। সেইরূপ ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ দেখতে হলে, যাঁরা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের প্রণালীগুলি অনুসরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা করবার উপায়ও তত নানাবিধ। আমরা সংসারে আসবার পূর্বেই ভগবান্ এ থেকে বেরুবার উপায়ও করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের চাই—শুধু সেই উপায়টাকে জানা। তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি কর না; কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর। তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে ঝগড়া করুক। খ্রীষ্টকে দর্শন কর, তবে তুমি যথার্থ খ্রীষ্টান হবে। আর সবই বাজে কথামাত্র—কথা যত কম হয়, ততই ভাল।

জগতে যার কিছু বার্তা বহন করবার বা শিক্ষা দেবার থাকে, তাকেই ‘বার্তাবহ’ বা দূত বলা যেতে পারে; দেবতা থাকলে তবেই তাকে মন্দির বলা যেতে পারে, এর বিপরীতটা সত্য নয়।

ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্যন্ত না তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের মত প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকামের হয়েছিল।

৫২

আনুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে আনুমানিক জ্ঞান নিয়ে কথা বললেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ দর্শন করেছ, তারই সম্বন্ধে কথা বল দেখি—কোন মনুষ্যহৃদয়ই তাকে স্বীকার না করে পারবে না। প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেণ্ট পল্‌কে (St. Paul) ইচ্ছার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঐদিন, অপরাহ্ণ

(মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়—সেই কথাবার্তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেনঃ)

ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করে, আবার নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে। একেই বলে ‘মায়া’। যেহেতু তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানেরই ভিত্তি মায়া, ঐ জ্ঞান ‘অন্যোন্যাশ্রয়দোষদুষ্ট’। এমন এক সময় আসে—যখন ঐ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করে। ‘ছেড়ে দাও রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।’ ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের এক করে ফেলি, তখনই মায়া আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে। মায়াকে ছেড়ে দাও, কেবল সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাক। তা হলেই অবিচলিত থেকে জগৎপ্রপঞ্চ-রূপ ছবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারবে।

বুধবার, ২৪ জুলাই

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হতে পারে, কারণ ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে ঐ-সবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে পারে। সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগসাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাদি, তপস্যা, যোগসাধন, এমন কি ঔষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে। যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁর ‘ধর্মমেঘ’ নামে সমাধিলাভ হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন, তা চারিদিকে ধর্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই সেটা ধ্যান-পদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হয়ে থাকে।

মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নয়। আত্মা কোন বস্তুর কারণ হতে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখনও প্রকৃতিতে যুক্ত হন না, অবিবেকের দরুন বোধ হয়—পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছে।

* * *

লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীন দশায় পড়ে আছে—এ-রকম মনে না করে, অপরকে সাহায্য করতে শিক্ষা কর। শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে—বুঝতে হবে।

বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে—ও তো একটা ভ্রমমাত্র। ‘যাঁর মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনিই কেবল ‘আজাদ’ বা মুক্ত।’

কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে—ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাসো, তা হলে সব বাসনা চলে যাবে।

সর্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে; অতএব পৃথিবীর উন্নতির জন্য—ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রংচঙে করবার জন্য কেন চেষ্টা কর? সবই তো শেষে চলে যাবে। সাদা ইঁদুরের মত খাঁচায় বসে কেবল ডিগবাজি খেও না; সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হোক আর মন্দই হোক, বাসনা জিনিষটাই খারাপ। এ যেন কুকুরের মত মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিনরাত লাফান, অথচ মাংসের টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষ পর্যন্ত কুকুরের মত মৃত্যু। ও-রকম হয়ো না। সমস্ত বাসনা নষ্ট করে ফেল।

* * *

পরমাত্মা যখন মায়াধীশ, তখন তিনি ঈশ্বর; পরমাত্মা যখন মায়ার অধীন, তখনই তিনি জীবাত্মা। সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে যাবে।

বৃক্ষের বৃক্ষত্বটা মায়া—গাছ দেখবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপকেই দেখছি, মায়া-আবরণে ঢাকা। কোন ঘটনা সম্বন্ধে ‘কেন’—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত। সুতরাং ‘মায়া কিরূপে এল?’—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কারণ মায়ার মধ্য থেকে ওর উত্তর কখনও দেওয়া যেতে পারে না; আর মায়ার পরে কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া অসদ্‌দৃষ্টিই ‘কেন’—এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে, কিন্তু ‘কেন’ প্রশ্ন থেকে মায়া আসে না—মায়াই ঐ ‘কেন’ জিজ্ঞাসা করে। ভ্রমই ভ্রমকে নষ্ট করে দেয়। যুক্তি-বিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এটা একটা চক্রস্বরূপ, কাজেই যুক্তি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান, আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি।

অজ্ঞানে যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়, তখনই অজ্ঞান দৃশ্য হয়।স্বতন্ত্রভাবে ধরলে সেটা শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। মেঘে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না।

* * *

চারজন লোক দেশভ্রমণ করতে করতে একটা খুব উঁচু দেওয়ালের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রথম পথিকটি অতি কষ্টে দেওয়াল বেয়ে উঠল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেওয়ালের ওপারে লাফ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় পথিকটি দেওয়ালে উঠল, ভেতরের দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি করে ভেতরে পড়ল। তারপর তৃতীয়টিও দেওয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়াছে—সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে, তারপর আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে তাদের অনুসরণ করলে। কিন্তু চতুর্থ পথিকটি দেওয়ালে উঠে তার সঙ্গীদের কি হল জেনে লোককে তা জানাবার জন্য ফিরে এল। এই সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে—যে-সকল মহাপুরুষ মায়ার দেওয়াল বেয়ে ভেতরের দিকে পড়েছেন, তাঁরা পড়বার আগে যে আনন্দে ‘হাঃ হাঃ’ করে হেসে উঠেন, সেই হাস্য।

* * *

আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক্ করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখন তাঁকেই আমরা ‘ঈশ্বর’ বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন—আমাদের মনের দ্বারা দৃষ্ট এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্তা। জগতের সমুদয় মন্দ ও দুঃখরাশিকে কুসংস্কারাছন্ন মন যেভাবে দেখে, তাকেই ‘শয়তান’ বলে।

বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই

(পাতঞ্জল যোগসূত্র)

কার্য তিন প্রকারের হতে পারে—কৃত (যা তুমি নিজে করছ), কারিত (যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ), আর অনুমোদিত (অপরে করছে—তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্যের ফল প্রায় একরূপ।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জিত হতে হবে। দেহটার যত্ন ভুলে যাও। যতটা সম্ভব, দেহচেতনা ভুলে যাও।

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায়, তাকেই ‘আসন’ বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনন্তভাবে ভাবিত করতে পারলে এটি হতে পারে।

একটা বিষয়ে সর্বদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ‘ধ্যান’। স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ফেলা যায়, তা হলে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক্ পৃথক্, অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য করছে। আমাদের মনের ভেতরেও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে; তবে আমাদের ভেতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভেতর ঐরূপ কার্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ-অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। যারা যোগী নয়, তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট স্থল-বিশেষেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

* * *

অপরকে হিংসা করলে বন্ধন হয় ও আমাদের সামনে থেকে সত্য ঢাকা পড়ে যায়। শুধু নিষেধাত্মক ধর্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। মায়াকে আমাদের জয় করতে হবে, তা হলে মায়াই আমাদের অনুসরণ করবে। যখন কোন বস্তুকে আমাদের আর বাঁধতে পারে না, তখনই আমরা সেই বস্তু পাবার যোগ্যতা লাভ করি। যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। যারা কোন কিছু চায় না, শুধু তারাই প্রকৃতিকে জয় করছে।

এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যিনি নিজের বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া—এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এটি কার্যে পরিণত করেছে—এমন লোক শতাব্দীর ভিতর বড়জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব কর না, কিছু জেনো না, কিছু কর না, নিজের বলে কিছু রেখ না—সবকিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর আর সর্বান্তঃকরণে বল, ‘তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।’

আমরা বদ্ধ—এই ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জেগে ওঠ—বন্ধন চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম করবার

এই একমাত্র উপায়।

‘ছেড়ে দাও রজ্জু, বলো হে সন্ন্যাসি, ওঁ তৎ সৎ ওঁ।’

৫৩

আমরা যে অপরের সেবা করতে পারছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য—কারণ ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের আত্মোন্নতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান করবার সময় গ্রহীতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসুন এবং তাকে ধন্যবাদ দিন, গ্রহীতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে দান করতে অনুমতি দিন। সব প্রাণীর মধ্যে সেই প্রভুকে দান করে তাঁকেই দান কর। যখন আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎপ্রপঞ্চই আর থাকবে না, কারণ প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—এই ভ্রম থেকে আমাদের মুক্ত করা। অপূর্ণতা বলে কিছু আছে—এইটে ভাবাই অপূর্ণতা সৃষ্টি করা। আমরা পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, এই চিন্তাতেই কেবল ওটা দূর হতে পারে। যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু মন্দ তাতে লেগে থাকবেই থাকবে। তবে সমুদয় কার্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তা হলে ভাল মন্দ কিছুই তোমায় অভিভূত করতে পারবে না।

কাজ করাটা ধর্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত কাজ মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ আমরা করুণা করব কাকে? তুমি ঈশ্বরকে করুণার চক্ষে দেখতে পার কি? ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগৎরূপ একটি নৈতিক ব্যায়ামশালা দিয়েছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না—তুমি এই জগৎকে সাহায্য করতে পার। তোমায় যদি কেউ অভিশাপ দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ গালাগালি বা অভিশাপ জিনিষটা কি, তা দেখবার জন্য সে যেন তোমার সম্মুখে একখানি আরশি ধরেছে, আর তোমাকে আত্মসংযম অভ্যাস করবার অবসর দিচ্ছে। সুতরাং তাকে আশীর্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আরশি সামনে না ধরলে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না।

অপবিত্র চিন্তা ও কল্পনা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামনা দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফললাভ হয়। কাম-শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন কর না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হয়। এই শক্তি যত প্রবল থাকবে, এর দ্বারা তত অধিক কাজ সম্পন্ন হতে পারবে। প্রবল জলের স্রোত পেলে তবেই জলশক্তির সাহায্যে খনির কাজ করা যেতে পারে।

আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে—দেখতে পারি। চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, ‘এই জগতের তত্ত্বাবধান তুমি কর, পরলোকের খবর ঈশ্বর নেবেন।’ কি আহাম্মকি কথা! যদি আমরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে পারি, তবে পরলোকের ভার নেবার জন্য আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার?

শুক্রবার, ২৬ জুলাই

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

সব কিছু ভালবাস, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্য।

যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, ‘আত্মার দ্বারাই আমরা সব জিনিষ জানতে পারছি।’ আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না—যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে?

৫৪

যিনি নিজেকে আত্মা বলে জানতে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জানেন—তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চ, আবার এর স্রষ্টাও বটে।

* * *

পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে কুসংস্কার উৎপত্তি হয়, আর এটা বাস্তবিকই দুর্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কখনও কিছুর আপস না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের দোহাই দিতে চেষ্টা কর না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী করবার জন্য নামিয়ে এন না।

শনিবার, ২৭ জুলাই

(কঠোপনিষৎ)

অপরোক্ষানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল কথার

কথামাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতি হলে মানুষ ধর্মাধর্ম, ভূতভবিষ্যৎ—সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়। ‘নিষ্কাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শ্বাশ্বতী শান্তি এসে থাকে।’

৫৫

শুধু কথা বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা করা, এমন-কি বেদ পর্যন্ত মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।

আমাদের ভিতর পরমাত্মা ও জীবাত্মা—দুই-ই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে যথার্থ সূর্যস্বরূপ বলে জানেন।

আমরা যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তা হলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। মনের শক্তি দ্বারাই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না, তা হলে দেহ এবং বহির্জগৎ—এই উভয়েরই হাত থেকে মুক্তি পাবে।

এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জগৎ বলে দেখছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থানুসারে একেই কেউ স্বর্গ, কেউ নরক বলে দেখে। ইহলোক পরলোক—এ দুটোই স্বপ্নমাত্র, পরেরটি আবার প্রথমটির ছাঁচে গড়া। ঐ দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জানো—সবই সর্বব্যাপী, সবই বর্তমান। প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা যাই-ও না, আসি-ও না। এই যে মানুষ ‘স্বামী বিবেকানন্দ’—এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর, সুতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা—যাঁকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে দর্শন করছি—তাঁর কখনও জন্ম হয়নি; তিনি কখনও মরবেন না—তিনি অনন্ত ও অপরিণামী সত্তা।

আমরা মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাগ করি বা একটা শক্তিরূপেই দেখি, মনঃশক্তি এক-রকমই থাকে। একজন অন্ধ বলে, ‘প্রত্যেক জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিষের প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক বলতে পারি।’ সুতরাং ঘন কুয়াশার ভিতর একজন অন্ধ একজন চক্ষুষ্মান্ লোককে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কারণ তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাত হয় না।

মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি যোগী; তারপর বাকী যা কিছু—সবই হবে। শুনতে, দেখতে, ঘ্রাণ বা স্বাদ নিতে অস্বীকার কর; বহিরিন্দ্রিয়গুলি থেকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে নাও। তুমি তো অজ্ঞাতসারে এটি সদাসর্বদাই করছ—যেমন যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন থাকে; সুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পার। মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে। দেহের সাহায্যেই যে আমাদের কাজ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি একেবারে ছেড়ে দাও। তা তো করতে হয় না। নিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্তখনিস্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা। বাহিরের শিক্ষাদ্বারা যদি হৃদয়রূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে—বলা যেতে পারে।

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই ‘ক্ষুদ্র মৃদু বাণী’; সেই যথার্থ নিয়ন্তা, যে আমাদের বলছে—এই কাজ কর, এই কাজ কর না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর সেইটেই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য হওয়া যায়। মুক্তিলাভ করবার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে, সব প্রয়োগ কর; জ্ঞানবিচার, কর্ম, উপাসনা, ধ্যান—সব পথই অবলম্বন কর, সব পাল এক সঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুরোদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পার, ততই ভাল।

* * *

খ্রীষ্টানদের ব্যাপ্টিজ্‌ম্ (baptism) সংস্কার একটা বাহ্যশুদ্ধি-স্বরূপ—এটি অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক। বৌদ্ধধর্ম থেকে এর উৎপত্তি।

খ্রীষ্টানদের ইউক্যারিস্ট নামক অনুষ্ঠান অসভ্য জাতিসমূহের একটি অতি প্রাচীন প্রথার অবশেষ। ঐ-সব অসভ্য জাতি—কখনও কখনও তাদের বড় বড় নেতারা যে-সব গুণে মহৎ হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাঁদের মেরে ফেলত এবং তাঁদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে-সকল শক্তিতে তাদের নেতা বীর্যবান্, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আসবে, আর কেবল এক ব্যক্তি ঐরূপ বীর্যবান্ ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই ঐরূপ হবে। নরবলি-প্রথা য়াহুদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাদের ঈশ্বর জিহোবা—ঐ প্রথার জন্য অনেক শাস্তি দিলেও তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ পায়নি। যীশু নিজে শান্তপ্রকৃতি ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে য়াহুদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচার করবার চেষ্টার ফলে খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই মতবাদের উৎপত্তি হল যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি-রূপে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেন। য়াহুদীদের মধ্যে পূর্বে এক প্রথা ছিল—তাঁদের পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করে ছাগলের উপর মানুষের পাপ চাপিয়ে দিয়ে তাকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন—এখানে ছাগলের বদলে মানুষ, এই তফাত। এই নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দরুন খ্রীষ্টধর্ম যীশুর যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেল এবং তার ভিতর পরের উপর অত্যাচার করবার ও অপরের রক্তপাত করবার ভাব এল।

* * *

কোন কাজ করবার সময় বল না, ‘এটা আমার কর্তব্য’; বরং বল, ‘এটা আমার স্বভাব’।

‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্’—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবানকে লাভ করবে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণজাতি নিজেদের সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা নিজেদের ‘ভূদেব’ বলে দাবী করেন। তাঁরা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, তবে তাঁদের দোষ এই যে, তাঁরা আধিপত্য বা প্রভুত্ব খোঁজেন। যাই হোক, ভারতে প্রায় ছয় কোটী ব্রাহ্মণের বাস; তাঁদের কোনপ্রকার বিষয়-আশয় নেই, তাঁরা বেশ ভাল লোক, নীতিপরায়ণ। আর এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা শিক্ষা পেয়ে আসছেন যে, তাঁরা বিধিনিষধের অতীত, তাঁদের কোনপ্রকার শাস্তির বিধান নেই। তাঁরা নিজেদের ‘দ্বিজ’ বা ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে থাকেন।

রবিবার, ২৮ জুলাই

(দত্তাত্রেয়

৫৬

-কৃত অবধূত-গীতা)

‘মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর করছে।’

‘যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, যিনি আত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে?’

আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব—নিজের স্বরূপ বলে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি।

‘আমিই তিনি, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।’

‘কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্যই আমার বন্ধন উৎপন্ন করতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দস্বরূপ।’

‘অস্তি নাস্তি’ কিছুই নেই, সবই আত্ম-স্বরূপ। সবই আপেক্ষিক ভাব। সমুদয় দ্বন্দ্ব দূর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল, জাতি কুল দেবতা—আর যা কিছু—সব চলে যাক। ব্রহ্ম হওয়া বা হয়ে যাওয়া—এ-সবের কথা কেন বল? দ্বৈত-বা অদ্বৈতবাদের কথাও ছেড়ে দাও। তুমি দুই ছিলে কবে যে, দুই ও একের কথা বলছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের দ্বারা শুদ্ধ হব—এ-কথা বল না, তুমি স্বয়ং যে শুদ্ধ-স্বভাব। কেউ তোমায় শিক্ষা দিতে পারে না।

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মত লোকই ধর্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা কোন কিছু গ্রাহ্য করেন না, শরীরের সুখদুঃখ গ্রাহ্য করেন না, শীত-উষ্ণ বা বিপদ-আপদ বা অন্য কিছু— মোটেই গ্রাহ্য করেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, গা যে পুড়ছে, তা তাঁরা টের পান না।

‘জ্ঞাতা-জ্ঞান ও জ্ঞেয়-রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।’

‘যখন বন্ধন ও মুক্তি-রূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।’

‘মনঃসংযম করে থাক তাতেই বা কি, না করে থাক তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে তাতেই বা কি, না থাকে তাতেই বা কি? তুমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা। বলোঃ আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। আমি অপরিণামী নির্মল আকাশ-স্বরূপ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শই করতে পারে না।’

‘ধর্মাধর্ম—পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে ফেল। মুক্তি ছেলেমানুষি কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞান-স্বরূপ, আমি সেই পবিত্রতা-স্বরূপ।’

‘কেউ কখনও বদ্ধ হয়নি, কেউ কখনও মুক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে আর শেখাতে এস না—আমি চিদ্‌ঘনস্বভাব, কিসে আমার এই স্বভাব বদলাতে পারে? কাকেই বা শেখান যেতে পারে? কে শেখাতে পারে?’

তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

‘বদ্ধস্বভাব লোকই অপরকে বদ্ধ দেখে, ভ্রান্ত ব্যক্তিই অপরকে ভ্রান্ত মনে করে, যে অপবিত্র সেই অপবিত্রতা দেখে থাকে।’

দেশ-কাল-নিমিত্ত—এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে করছ তুমি বদ্ধ আছ, মুক্ত হবে—এটাই তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী সত্তা। কথা বন্ধ কর, চুপ করে বসে থাক—সব জিনিষ তোমার সামনে থেকে উড়ে যাক—ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন কিছু নেই, ও-সব কুসংস্কারমাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।

'আমি আনন্দ-স্বরূপ।' যেমন আদর্শের অনুসরণ করবার দরকার নেই—তুমি ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেও না। তুমি সারসত্তা-স্বরূপ। শান্তিতে থাকো—নিজেকে ব্যতিব্যস্ত কর না। তুমি কখনও বদ্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। কাকে উপাসনা করবে? কেই বা উপাসনা করে? সবই তো আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। বার বার বল—'আমি আত্মা, আমি আত্মা।' আর সব উড়ে যাক।

দেববাণী - ৮

সোমবার, ২৯ জুলাই, প্রাতঃকাল

আমরা কখনও কখনও কোন জিনিষ নির্ণয় করতে হলে তার পরিবেশ বর্ণনা করে থাকি। এ-কে তটস্থ লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' নামে অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্বাচ্য সর্বাতীত সত্তারূপ সমুদ্রের তটের কিছু কিছু বর্ণনা করছি মাত্র। আমরা এ-কে 'অস্তি' বলতে পারি না, কারণ 'অস্তি' বলতে গেলেই তার বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও আপেক্ষিক। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা ঠিক ঠিক হতে পারে না। কেবল 'নেতি, নেতি'—এ নয়, ও নয়—এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ তাঁকে চিন্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়; সুতরাং চিন্তা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় (ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে) প্রতারিত করছে। বেদান্ত অনেককাল আগে এটি আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান সবেমাত্র ঐ তত্ত্বটি বুঝতে আরম্ভ করেছে। একখানা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানিতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণা অনুকরণ করে থাকে। দুজন লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে তুমি দেখতে পাবে, কোন বস্তুতে কোন প্রকার গতি—কোন প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিবর্তন আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া। প্রকৃতিকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর অর্থাৎ গতির তত্ত্ব আলোচনা কর। দেহ ও মন কোনটাই আমাদের যথার্থ আত্মা নয়—দুই-ই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সারসত্য—যথার্থ তত্ত্বকে জানতে পারি। তখন আমরা দেহ-মনের পারে চলে যাই, সুতরাং দেহ-মনের দ্বারা যা কিছু অনুভব হয়, তাও চলে যায়। তখন তুমি এই জগৎপ্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না বা জানতে পারবে না, তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান—উভয়ই সসীম। আমরা এখন আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছি—তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সারসত্য-স্বরূপ সেই অজ্ঞাত বস্তুর কাছে পৌঁছব।

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে একখানা ছবি দেখি, তা হলে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি; তথাপি আমরা যা দেখি, তা বাস্তবিক ছবিটাই। ফুটোটা যত বড় করতে থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেতে থাকি। আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিষটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকি। আবার যখন আমরা কার্ডবোর্ডখানা ফেলে দিই, তখনও আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি, কিন্তু এবার ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা ঐ ছবিটাতে যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, তা দ্বারা ছবিটার কিছু পরিবর্তন হয় না। এইরূপ—আত্মাই সকল বস্তুর মূল সত্যস্বরূপ; আমরা যা কিছু দেখছি, সবই আত্মা—কিন্তু আমরা যেভাবে এদের নামরূপাকারে দেখছি, সেভাবে নয়। ঐ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত—মায়ার অন্তর্গত।

ঐগুলি যেন দূরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন সূর্যের আলোকের দ্বারাই আমরা ঐ দাগগুলি দেখতে পাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তু পশ্চাতে না থাকলে আমরা মায়াটাকেও দেখতে পেতাম না। 'স্বামী বিবেকানন্দ' বলে মানুষটা ঐ দূরবীনের কাচের উপর একটা দাগমাত্র। প্রকৃত 'আমি' সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্যবস্তুটাই আমাকে—(নামরূপাত্মক) স্বামী বিবেকানন্দ দেখতে সমর্থ করছে। প্রত্যেকটি ভ্রমেরও সারসত্তা আত্মা—আর যেমন সূর্য কখনও ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে এক হয়ে যায় না, দাগগুলি আমাদের দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখনই নামরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্মসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অন্তর্যামী ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেল। তা হলেই আমরা দেখব—'আমি ও আমার পিতা এক।'

আগে আমাদের অনুভূতি হয়, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে। আমাদের এই অনুভূতি লাভ করতে হবে, আর এই প্রত্যক্ষানুভূতিই হল বাস্তবিক ধর্ম। কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, ধর্মমত বা অবতারের কথা কখনও না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু তার যদি প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে থাকে, তবে আর কিছু দরকার নেই। চিত্ত শুদ্ধ কর—এই হচ্ছে ধর্মের সার কথা; আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্বরূপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারি না। শিশু কোথাও কোন পাপ দেখতে পায় না, কারণ বাইরের পাপটার পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দূর করে ফেল—তা হলেই তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেখতে পাবে না। ছোটছেলের সামনে চুরি-ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে এর কোন অর্থই নেই, সে এর কিছুই বোঝে না। ধাঁধার ছবির ভিতর লুকানো জিনিষটা একবার যদি দেখতে পাও, তা হলে পরেও সর্বদাই দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি একবার মুক্ত ও নির্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগৎপ্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই মুহূর্তেই হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা সিধা হয়ে যায়, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়। আর ঘুম ভাঙলে ভেবে আশ্চর্য হই যে কি করে এই সব বাজে স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম।

'যাঁকে লাভ করলে পর্বতপ্রমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে না', তাঁকে লাভ করতে হবে।

জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদয়কে পৃথক্ করে ফেল, তা হলেই আত্মা মুক্তস্বরূপ হয়ে পৃথক্‌ভাবে দাঁড়াতে পারবে—যদিও পুরাতন বেগে তখনও দেহমনরূপ-চক্র খানিকক্ষণের জন্য চলবে। তবে তখন চাকাটি সোজাই চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা তখন শুভ কার্যই হবে। যদি সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য হয়, তা হলে জেনো সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নয়—যদি সে আপনাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে দাবী করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে। এটাও বুঝতে হবে যে, তখন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময় তার উপর কুঠারপ্রয়োগ সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্মই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভ্রম বা অজ্ঞানকে নষ্ট করছে। অপরকে পাপী বলাই সবচেয়ে গর্হিত কাজ। ভাল কাজ না জেনে করলেও তার ফল একই প্রকার হয়—তা বন্ধন-মোচনের সহায়তা করে।

দূরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্যকেও দাগমুক্ত মনে করাই আমাদের মৌলিক ভ্রম। সেই 'আমি'-রূপ সূর্য কোনপ্রকার বাহ্যদোষে লিপ্ত নন—এইটি জেনে রাখো, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুলতে নিযুক্ত কর। যত প্রাণী সম্ভব, তার মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তোমার যা কিছুর অভাব বোধ হয়, তাই তুমি সৃষ্টি করে থাক;—বাসনামুক্ত হও।

দেবতারা ও পরলোকগত ব্যক্তিরা সকলে এখানেই রয়েছেন—এই জগৎকেই তাঁরা স্বর্গ বলে দেখছেন। একই অজ্ঞাত বস্তুকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছে। এই পৃথিবীতেই কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হতে পারে। কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা কর না—এইটেই সব চেয়ে নিকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য, দুই-ই বন্ধন—দুই-ই আমাদের ধর্মপথ থেকে, মুক্তিপথ থেকে দূরে রাখে। তিনটি জিনিষ এ পৃথিবীতে বড় দুর্লভঃ প্রথম—মনুষ্যদেহ (মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব বিদ্যমান; বাইবেলে আছে, 'মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিস্বরূপ')। দ্বিতীয়—মুক্ত হবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয়—মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, যিনি স্বয়ং মায়ামোহ-সমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে পাওয়া

৫৮

। এই তিনটি যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই হবে!

কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞান লাভ হয়, তা একটা নূতন যুক্তিতর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব কর, তা তোমার কোন কালে যাবার নয়। ধর্ম সম্বন্ধে কেবল বচনবাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে-কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসবে—যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, কাজকর্ম—সকলের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি কর; আর এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর।

ইঙ্গারসোল

৫৯

আমায় একবার বলেন, 'এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলালেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার করে নিতে হবে, যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়; কারণ এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত নই।' আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলামঃ এই জগৎরূপ কমলালেবু নিংড়াবার যে প্রণালী আপনি জানেন, তার চেয়ে ভাল প্রণালী আমি জানি, আর আমি তা দ্বারা বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি—আমার মৃত্যু নেই; সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই; সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান্ বলে ভালবাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পান, তার চেয়ে দশহাজারগুণ রস পাবেন—একটি ফোঁটাও বাদ যাবে না। প্রত্যেকটি ফোঁটাই পাবেন।

যাকে আমাদের 'ইচ্ছা' বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ আত্মা, এবং বাস্তবিকই তা মুক্তস্বভাব।

ঐদিন, অপরাহ্ণ

যীশুখ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেননি, আর সর্বোপরি তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্য মর্যাদা দেননি। মেয়েরাই তাঁর জন্য সব করলে, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিত শিষ্য' (Apostle) পদে উন্নীত করলেন না। তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান—আবার বুদ্ধও যে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তা নয়। যাই হোক, বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমানাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধানা শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন। আমাদের কিন্তু এই-সকল মহাপুরুষের সমালোচনা করা উচিত নয়, আমাদের শুধু উচিত—তাঁদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। তা হলেও যিনি যত বড়ই হোন না কেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হতে হবে।

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়। মানুষের যে বড় বড় গুণগুলি দেখা যায়, সেগুলি তার

নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্বলতা মাত্র; সুতরাং তার চরিত্র বিচার করবার সময় সেগুলি কখনও গণনা করতে নেই।

* * *

ইংরেজী ভার্চু (virtue)-শব্দটি সংস্কৃত 'বীর' (vira) শব্দ থেকে এসেছে, কারণ প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক লোক বলে বিবেচনা করত।

মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের মত মহাপুরুষেরা কেবল বহিরবলম্বন; তাঁদের উপর আমাদের ভিতরের শক্তিগুলি আমরা আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদেরই প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মনুষ্যজাতির কখনও উদ্ধার হত না—এরূপ ভাবা ঈশ্বরনিন্দার সমান। মনুষ্য-স্বভাবের ভিতর যে ঐশ্বরিক ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে ঐ রূপ ভুলে যাওয়া বড় ভয়ানক—ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন-না-কোন সময়ে প্রকাশিত হবেই হবে। মনুষ্য-স্বভাবের মহত্ত্ব কখনও ভুলো না। ঈশ্বর অতীতে যা হয়েছেন, ভবিষ্যতে যা হবেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরাই। 'আমি'ই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র—খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই উপরে তরঙ্গ-মাত্র। তোমার নিজের অন্তরাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নত কর না। যতক্ষণ না তুমি নিজেকে সেই দেবদেব বলে জানতে পারছ, ততক্ষণ তোমার মুক্তি হতে পারে না।

আমাদের সকল অতীত কর্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ কর্মগুলিই আমাদের চরম আদর্শ লাভ করিয়ে দেয়। কার কাছে আমি ভিক্ষা করব?—আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র; তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, সেটাকে 'আমি' বল না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেন। সত্যকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য যাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে) শুনতে পেলেন—তাঁর অন্তরের বাণী তাঁকে বলছে, 'তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে।' নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শ্রবণ কর।

যে-সকল মহাপুরুষ প্রচারকার্যের জন্য প্রাণপাত করে যান, তাঁরা—যে- সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে মহাপবিত্র জীবনযাপন করেন, বড় বড় ভাব চিন্তা করে যান এবং ঐরূপে জগতের সাহায্য করেন—তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ। ঐ-সকল শান্তিপ্রিয় নির্জনবাসী মহাপুরুষ একের পর এক আবির্ভূত হন—শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই তত্ত্বগুলি চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান।

* * *

জ্ঞান স্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান—যার সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব বলে থাকেন, আর এই প্রচণ্ড দাবীও করে থাকেন।

সত্য যা, তা সাহসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বলো,—ঐ সত্য প্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না হল, সে দিকে খেয়াল কর না। দুর্বলতাকে আমল দিও না। সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান্ লোকদের পক্ষেও যদি অতিমাত্রায় প্রখর বোধ হয়, তাঁরা যদি তা সহ্য করতে না পারেন, সত্যের বন্যা যদি তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা যাক—যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল। ছেলেমানুষী ভাব—শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই শোভা পায়; কিন্তু দেখা যায়, ঐ-সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই আবদ্ধ নয়, ঐ-সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্মপ্রচারকদেরও কুক্ষিগত।

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা খারাপ। তা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।

উন্নতি যা কিছু, তা এই ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হয়ে থাকে। মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্বোচ্চ প্রাণী, কারণ এই মানবদেহে—এই জন্মেই আমরা সম্পূর্ণরূপে এই আপেক্ষিক জগতের বাইরে যেতে পারি, সত্য সত্যই মুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারি, আর ঐ মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্য সত্যই ইহজীবনে মুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং কেউ এ দেহ ত্যাগ করে যতই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না, কারণ মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ করা যেতে পারে।

দেবতারা (angels) কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন না, কাজেই তাঁরা শাস্তিও পান না; সুতরাং তাঁরা মুক্ত হতেও পারেন না। সংসারের ধাক্কাই আমাদের জাগিয়ে দেয়, এই জগৎস্বপ্ন ভাঙবার সাহায্য করে। ঐরূপ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার—মুক্তিলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

* * *

কোন বস্তু—যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা তার এক নাম দিই, আবার সেই জিনিষকেই যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্য নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উৎকৃষ্ট হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।

ঐদিন, অপরাহ্ণ

আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তার কারণ উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটি দিক্‌মাত্র, সেই জিনিষটাই দুভাগ হয়ে বাহ্য ও আন্তর হয়েছে।

ইংরেজী 'প্যারাডাইস' (Paradise)-শব্দটি সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে এসেছে, ঐ শব্দটা পারস্য ভাষায় চলে গিয়েছিল—(ফার-দৌস)-এর শব্দার্থ হচ্ছে দেশের পারে, অথবা অন্য দেশ বা অন্য লোক। প্রাচীন আর্যেরা বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মানুষকে কেবল দেহ বলে কখনও ভাবতেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক—দুই-ই অনিত্য ও সান্ত, কারণ কোন কার্যই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে পারে না, আর কোন কারণই চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য বা ফলমাত্রের নাশ হবেই। এই রূপকটিতে

৬০

সমগ্র বেদান্তদর্শনের সার রয়েছেঃ

সোনার মত পালকযুক্ত দুটি পাখি একটা গাছে বসে আছে। উপরে যে পাখিটা বসে আছে, সে স্থির শান্তভাবে নিজ মহিমায় নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পাখিটা নীচের ডালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল—ঐ গাছের ফল খাচ্ছে—কখনও মিষ্ট ফল, কখনও বা কটু ফল। একবার সে একটা অতিরিক্ত কটু ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় পাখিটার দিকে চাইলে। কিন্তু আবার সে শীঘ্রই তাকে ভুলে গিয়ে পূর্বের মত সেই গাছের ফল খেতে লাগলো। আবার একটা কটু ফল খেলে—এইবার সে টুপ টুপ করে লাফিয়ে উপরের পাখিটার দু-এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাখিটা একেবারে উপরের পাখিটার জায়গায় গিয়ে বসল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সে অমনি বুঝলে যে, দুটো পাখি কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর শান্ত—স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন—উপরের পাখিই ছিল।

বুধবার, ৩১ জুলাই

প্রটেস্টাণ্টধর্ম-সংস্থাপক লুথার ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধর্মের সর্বনাশ করে গেলেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিপরায়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বর-বিশ্বাসীরাই ধর্মলাভ করতে পারে|

সমাজ যাদের অসৎ বলে, তারা মহাপুরুষদের পবিত্রতার জন্য মূল্য দেয়—সুতরাং তাদের দেখে, ঘৃণা না করে ঐ কথাই ভাবা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা মীরাবাঈ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপন্ন করার জন্য যেন প্রকৃতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হয়েছে।

* * *

'আমিই পবিত্রাত্মাদের পবিত্রতা' 'আমিই সকলের মূল, প্রত্যেকে নিজের মত করে সেটি ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।' 'আমিই সব করছি, তুমি নিমিত্তমাত্র।'

৬১

বেশী কথা বল না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন, তাঁকে অনুভব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হল জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জানবার বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব।

* * *

সত্ত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে, রজঃ বাসনা দ্বারা বদ্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান আলস্য প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ করে।

৬২

রজঃ ও তমঃ—এই দুটি নিম্নতর গুণকে সত্ত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করে মুক্ত হও।

ভক্তিযোগের দ্বারা সাধক অতি শীঘ্র ব্রহ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের পারে চলে যান।

৬৩

ইচ্ছা, চেতনা, ইন্দ্রিয়, বাসনা, রিপু—এইগুলি মিলিত হয়ে যা হয়েছে, তাকে আমরা 'জীবাত্মা' বলে থাকি।

প্রথম হচ্ছে প্রতীয়মান আত্মা (দেহ); দ্বিতীয়, মানস আত্মা—যে ঐ দেহটাকে 'আমি' বলে মনে করে (এইটি মায়াবদ্ধ ব্রহ্ম); তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ—নিত্যমুক্ত। তাঁকে আংশিকভাবে দেখলে 'প্রকৃতি' বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখলে সমস্ত প্রকৃতি উড়ে যায়; এমন কি তাঁর স্মৃতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথম—পরিণামী ও অনিত্য (মরণধর্মী বা ধ্বংসশীল), দ্বিতীয়—সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি), তৃতীয়—কূটস্থ নিত্য (আত্মা)।

* * *

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার কি আছে? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও; যাই কর না কেন, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন কপটতা রেখ না।

ভারতে কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে 'স্বস্থ' (যা থেকে 'স্বাস্থ্য' কথাটা এসেছে) এই সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'স্বস্থ' শব্দের অর্থ—স্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কোন জিনিষ দেখেছি, এটা বুঝাতে হলে হিন্দুরা বলে থাকে, 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' 'পদার্থ' কি না পদ বা শব্দের অর্থ, অর্থাৎ শব্দপ্রতিপাদ্য ভাববিশেষ। এমন কি এই জগৎপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে একটা 'পদার্থ' (অর্থাৎ শব্দের অর্থ)।

* * *

জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষের দেহ আপনা-আপনি ন্যায় কার্যই করে থাকে (তার দ্বারা অন্যায় কার্য হয় না)। তাঁর শরীর কেবল শুভ কার্যই করতে পারে, কারণ তা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। অতীত সংস্কাররূপ যে বেগের দ্বারা তাঁদের দেহচক্র পরিচালিত হতে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হয়ে গেছে।

* * *

সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎ-প্রসঙ্গ না করি; কিন্তু যে দিন মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃতপক্ষে দুর্দিন বলা যায় না।

৬৪

সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ 'ভক্তি' বলা যায়। অন্য কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে—তিনি যত বড়ই হোন না কেন—'ভক্তি' বলা যায় না। এখানে 'পরম প্রভু' বলতে পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে, তোমরা পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ঈশ্বর (Personal God) বলতে যা বোঝ, তাকে অতিক্রম করে আছে এই ধারণা। 'যা হতে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, যাঁতে এর স্থিতি, আবার যাঁতে লয়, তিনিই ঈশ্বর—নিত্য, শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান্, সদামুক্তস্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপ।'

মানুষ নিজের মস্তিষ্ক থেকে ভগবানকে সৃষ্টি করে না; তবে তার যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর তার যত ভাল ভাল ধারণা তাঁতে আরোপ করে। এই এক-একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক-একটি গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানোই বাস্তবিক ব্যক্তি-ঈশ্বরের (Personal God) দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁর সব গুণ রয়েছে। আমরা যতক্ষণ মানবভাবাপন্ন, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব—এই তিনটি সত্তা আমাদের দেখতে হয়। তা না দেখে থাকতেই পারি না।

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই-সকল দার্শনিক পার্থক্য বাজে কথা মাত্র। সে যুক্তি-বিচার গ্রাহ্যই করে না, সে বিচার করে না—সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যাঁরা বলেন, মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যাঁরা বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি'

৬৫

—আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই।

ভক্তিযোগে বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ বহির্জগৎ থেকেই আমাদের সাধারণ সব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্য কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যখন আমরা এ জীবনে চারদিক্ থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই হতাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তুর জন্য আমাদের প্রয়োজন বোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে থাকি।

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙ্গেচুরে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সব বৃত্তিই মুক্তিলাভ করবার উপায়স্বরূপ হতে পারে। ঐসব বৃত্তিকেই ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে—সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে হবে।

তোমাদের পাশ্চাত্য ধর্মের ধারণা থেকে ভক্তির এইটুকু তফাত যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই—ভক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত করতে বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন-কি এমন সব ভক্তও আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে তাঁদের সন্তান বলে উপাসনা

করে থাকেন—এরূপ উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাসনায় ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন ভাব না থাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন পর্যন্ত এতটুকু ভয় থাকবে, ততদিন ভক্তির আরম্ভই হতে পারে না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার, আদান-প্রদানের ভাব কিছুই নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য, এমন-কি স্বর্গ পর্যন্ত কামনা করেন না।

যিনি ভগবানকে ভালবাসতে চান, ভক্ত হতে চান, তাঁকে ঐ-সব বাসনা একটি পুঁটলি করে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে আগে দোকানদারি ধর্মের পুঁটলি বাইরে ফেলে আসতে হবে। এ-কথা বলছি না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না—সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করা অতি নীচু দরের ধর্ম, ভিখারীর ধর্ম।

'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ।'

সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করে জলের জন্য আবার কুয়া খোঁড়ে।

এই-সব আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—এগুলি অতি নিম্নস্তরের কর্ম। ভক্তি এর চেয়ে উঁচু জিনিষ। আমরা রাজরাজের সামনে আসবার চেষ্টা করছি। আমরা সেখানে ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে ইচ্ছা করি, ভিখারীর মত ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেখানে কি ঢুকতে দেবে? কখনই নয়। দরোয়ান আমাদের ফটক থেকে বার করে দেবে। ভগবান্ রাজার রাজা—আমরা তাঁর সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলবে না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতা-বিক্রেতাদের মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া। এরূপ স্বর্গ এই জায়গারই—এই পৃথিবীরই মত, না হয় এর চেয়ে একটু ভাল। খ্রীষ্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা তীব্র ভোগের জায়গা। তা কি করে ভগবান্ হতে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা—এ সুখভোগেরই কামনা। এ বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—নিজের জন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হবে না।

সুখদুঃখ, লাভক্ষতি—এ-সকলের বাসনা ত্যাগ করে দিবারাত্র ঈশ্বরোপাসনা কর, এক মুহূর্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

আর সব চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্র সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা কর। এইরূপে দিবারাত্র উপাসিত হলে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁর উপাসকদের শক্তি দেন—যাতে তারা তাঁকে অনুভব করতে পারে।

বৃহস্পতিবার, ১ অগাস্ট

প্রকৃত গুরু তিনি, আমরা যাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। তিনিই সেই প্রণালী, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগসূত্র। ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দুর্বলতা ও পৌত্তলিকতা আসতে পারে; কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে সংযোগ করে দেন। যদি তোমার গুরুর ভিতরে যথার্থ সত্য থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্রতা ছিল শিশুর মত। তিনি জীবনে কখনও টাকা স্পর্শ করেননি, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ধর্মাচার্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না, তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিতর মানুষ-ভাবটা মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। বাস্তবিকই তিনি পাপ দেখতে পেতেন না—যে-চোখে মানুষ পাপ বা অন্যায় দেখে, তার চেয়ে তাঁর দৃষ্টি পবিত্রতর ছিল। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এঁদের ধারা লুপ্ত হয়ে যায়, সকলেই যদি জগৎটাকে ত্যাগ করে যান, তা হলে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ পবিত্র জীবন যাপন করে লোকের কল্যাণ-বিধান করেন, কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবনযাপন করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

* * *

আমাদের ভিতর যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত করবার উপায় বলে দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞানলাভ করি, তখনই আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি। যখন তোমার ভিতরে সেই অন্তর্জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন?—তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদয় শাস্ত্রে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও না, এ জগতে তুমি সব করতে পার। কখনও নিজেকে দুর্বল ভেব না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর্ম, চুলোয় যাক সব শাস্ত্র।

ধর্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ করবার জন্য সাহায্য ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। এমন-কি এদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ করতে পারি। তথাপি শাস্ত্র ও আচার্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কিন্তু এরা যেন তোমায় বদ্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ কর না। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের মুক্তি-সাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই একটিমাত্র ধারণা পোষণ কর যে, তিনি আমাদের চিরকালের সহায়।

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম—দুই-ই একসঙ্গে থাকা চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। আমরা ভগবানকে কিছু দিতে পারি না, তিনিই আমাদের সব দিয়ে থাকেন, তিনি সকল গুরুর গুরু। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যখন তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা, তখন আমরা যে তাঁকে ভালবাসব, এ আর আশ্চর্য কি? আর কাকে বা কোন্ বস্তুকে আমরা ভালবাসতে পারি? আমরা হতে চাই সেই স্থির অগ্নিশিখা—যার তাপ নেই, ধোঁয়া নেই! যখন তোমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখবে, তখন আর কার উপকার করতে পারবে? ভগবানের তো আর উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে যায়, সর্বত্র সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর তো নিজেরই কল্যাণ করবে। এইটি অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমার চেয়ে বড়, তুমি যে তার সেবা করছ, তার কারণ—তুমি তার চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড় আর সে ছোট। গোলাপ যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছে বলে সে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেই ভাবে দিয়ে যাও।

সেই মহান্ হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কার কার্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার জন্য গভর্নমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরেজরা কিছুই করেনি। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং বললেন, 'আমাকে ছেড়ে তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যাও।' তিনি নামযশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করতেন না।

ঐদিন, অপরাহ্ণ

জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ক্রমাগত চলেছে, যেন নাগরদোলা—আত্মা যেন ঐ নাগরদোলায় চড়ে ঘুরছে। এই ক্রম চিরন্তন। এক একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু চিরকাল সেই একরকম ঘটনাই বার বার ঘটছে, আর এই কারণেই লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে পারে; কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই তো বর্তমান। যখন আত্মা একটা শৃঙ্খলের ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ঐরূপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তারা আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যায়। ঐরূপ শ্রেণীর বা ঘটনা-পরম্পরার একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে সমুদয় ঘটনা-শৃঙ্খলটাই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাই যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে। এই শক্তি সহজেই লাভ করা যায়, কিন্তু এতে বাস্তবিক কোন লাভ নেই, আর ঐ শক্তিলাভের সাধনায় আমাদের সমপরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়। সুতরাং ও-সব বিষয়ের চেষ্টা কর না, ভগবানের উপাসনা কর।

শুক্রবার, ২ অগাস্ট

ভগবদ্-উপলব্ধির জন্য প্রথমে নিষ্ঠা দরকার।

'সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥'

সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম লও, অপরের কথায় 'হাঁ, হাঁ' করতে থাক, কিন্তু নিজের ভাব কোন মতে ছেড় না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা—অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা। যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্যতঃ সহানুভূতি করতে পারব না কেন? যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা করে একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে; কিন্তু যখন আমি সবল হব, তখন অপর সকলের মত অনুভব করতে পারব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করতে পারব।

প্রাচীনকালের লোকের ভাব ছিল—অপর সকল ভাব নষ্ট করে একটা ভাবকে প্রবল করা। আধুনিক ভাব হচ্ছে—সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি করা। একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে—মনের বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা, তারপর যেখানে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর—তাতে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আত্মোন্নতির উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে দিকে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর। এরূপ করলে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না। যে সমগ্রটাকে পায়, সে অংশটাকেও পায়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

'আমি প্রথমে তাকে দেখলাম, সেও আমায় দেখলে; আমিও তার প্রতি কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ করলে'—এইরূপ চলতে লাগলো। শেষে দুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।

* * *

সমাধির দু-টি ভাব আছেঃ এক ভাবে আমি নিজেরই ধ্যান করি, আর এক ভাবে বাইরের বস্তু ধ্যান করি। তারপর ধ্যানের ধ্যাতা ধ্যেয় অভেদ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা লাভ করে তারপর ইচ্ছা করলে নিজেকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পার। প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর। খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতভাব ভুলে দ্বৈতবাদী হবার শক্তিলাভ করতে হবে, আবার যখন খুশী যেন ঐ অদ্বৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায়।

* * *

কার্য-কারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হব, ততই বুঝব যে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প এখন যেমন আমাদের কাছে বোধ হয়, তেমনি যা কিছু আমরা দেখছি, সবই ঐরূপ অসম্বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্য-কারণ বলে কিছু নেই, আর আমরা কালে তা জানতে পারব। সুতরাং যদি পার তো যখন কোন রূপক-গল্প শুনবে, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এন, মনে মনে ঐ গল্পের পূর্বাপর সঙ্গতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলো না। হৃদয়ে রূপক-বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বের প্রতি অনুরাগের বিকাশ কর, তারপর সমুদয় পৌরাণিক বর্ণনাগুলিকে কবিত্ব মনে করে উপভোগ কর। পুরাণ-চর্চার সময় ইতিহাস ও যুক্তিবিচারের দৃষ্টি নিয়ে এস না। ঐ-সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মত ঘোরাও, কে মশালটা ধরে রয়েছে—এ প্রশ্ন কর না, তা হলেই একটা আলোক-চক্র দেখতে পাবে; এতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে।

পুরাণ-লেখকেরা সকলেই—তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রবাহকার-চিত্র এঁকে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে ফেল না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কাজ করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার কর—তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে, সেইটুকুই নাও।

তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি—যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের 'আমি' বা আত্মা।

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা যে-সকল রূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমাদের অলৌকিক দর্শনসমুহ অপেক্ষা মুশার অলৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ আমাদের অধিকতর জ্ঞান এবং মিথ্যা ভ্রম দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক কম।

যতদিন না আমাদের হৃদয়-রূপ আশ্রয় খুলছে, ততদিন শাস্ত্রপাঠ বৃথা। তখন ঐ শাস্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা। শক্তি কি, তা শক্তিমান্ ব্যক্তিই বুঝতে পারে; হাতিই সিংহকে বুঝতে পারে, ইঁদুর কখনও সিংহকে বুঝতে পারে না। আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা কেমন করে যীশুকে বুঝব? দুখানা পাঁউরুটিতে ৫০০০ লোক খাওয়ানো, অথবা ৫ খানা পাঁউরুটিতে দুজন লোক খাওয়ানো—এই দুই-ই মায়ার স্বপ্নরাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সত্য নয়, সুতরাং এই দুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্ত্বই কেবল মহত্ত্বের আদর করতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন। স্বপ্ন সেই স্বপ্নদ্রষ্টাই—তা ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। ঐ স্বপ্ন বা স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক্ বস্তু নয়। সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর 'সোঽহম্, সোঽহম্'—এই এক সুরে বাজছে, অন্যান্য সুরগুলি তারই ওলট-পালট মাত্র, সুতরাং তাতে মূল সুরের—মূল তত্ত্বের কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শাস্ত্র আমরাই, আমরা যে-সব কথা বলেছি, সেগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত। সবই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত খ্রীষ্ট—ঐভাবে সব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাব্য। জগতে এ পর্যন্ত যত বাইবেল, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হয়েছেন, সব আমাদেরই আলোকে আলোকিত। এই আলোক ব্যতীত ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবন্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার উপর দাঁড়াও।

মৃতদেহের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহারই কর না, তাতে সে ক্ষুব্ধ হয় না। আমাদের দেহকে ঐরূপ মৃতবৎ করে ফেলতে হবে, আর দেহের সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটা দূর করে ফেলতে হবে।

শনিবার, ৩ অগাস্ট

যে-সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই হাজার বছরের জীবন যাপন করতে হয়। তারা যে যুগে জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু সাধারণ লোক কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের উৎপত্তি এইরূপেই।

* * *

একদা এক হিন্দু রানী

৬৭

ছিলেন, তাঁর ছেলেরা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করুক—এ বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। তাঁদের শৈশবে যখন তিনি তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন, তখন সর্বদা তাদের কাছে এই একটি গান গাইতেন—'তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি'—তুমি সেই আত্মা, তুমি সেই ব্রহ্ম। তাদের তিনজন সন্ন্যাসী হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হতে লাগল। বিদায় দেবার সময় মা তাকে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, 'বড় হলে পড় এতে কি লেখা আছে'। সেই কাগজখানাতে লেখা ছিল—'ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্মা কখনও মরেন না, কখনও মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সৎসঙ্গে বাস কর।' যখন রাজপুত্র বড় হয়ে লেখাটি পড়লেন, তিনিও তখনই সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

ত্যাগ কর, সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন একপাল কুকুর—রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুকরো মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখছি, পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মত হও—জেনো যে, সমুদয় জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ করছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে; ততক্ষণ ঐ ভাবটি তোমার আসতেই পারে না। যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পার, মনে মনে সব ত্যাগ কর। অন্তরের অন্তর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও। এই হল যথার্থ আত্মত্যাগ—এ না হলে ধর্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার বাসনা কর না; কারণ যা বাসনা করবে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে, যেমন সেই গল্পে আছে—এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিল এবং তার ফলে তার সর্বাঙ্গে নাক

৬৮

হয়েছিল, বাসনা করলে ঠিক সেই রকম হয়। যতক্ষণ না আমরা আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ করতে পারছি না। 'আত্মই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেউ নয়।'

এইটি অনুভব করতে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্য সকলের দেহেও বর্তমান—এইটি জানবার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই এক। আর সব বাজে জিনিষ ছেড়ে দাও। ভালমন্দ কাজ যা করেছ, সেগুলি সম্বন্ধে একদম ভেব না—সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ। কুসংস্কার দূর করে দাও। সম্মুখে মৃত্যু এলেও দুর্বলতা আশ্রয় কর না।

অনুতাপ কর না—পূর্বে যে-সব কাজ করেছ, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না; এমন কি—যে-সব ভাল কাজ করেছ, তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও। আজাদ (মুক্ত) হও। দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না। তুমি কোন কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পার না—ফল আসবেই আসবে; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু সাবধান, যেন পুনর্বার সেই কাজ কর না। সকল কর্মের ভার ভগবানের উপর ফেলে দাও, ভাল-মন্দ—সব দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিও না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে, ভগবান্ তাকেই সাহায্য করেন।

* * *

বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে। 'যেমন দিবা ও রাত্রি কখনই একসঙ্গে থাকতে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান্ দুই কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না।'

৬৯

সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর।

'খাবার, খাবার' বলে চেঁচান এবং খাওয়া, 'জল, জল' বলে চেঁচান এবং জল পান করা—এই দুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাত; সুতরাং কেবল 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' বলে চেঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে।

সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই তরঙ্গ অসীমত্ব লাভ করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গরূপে নয়। তারপর সমুদ্রস্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে। নিজেকে তরঙ্গপ্রবাহ বলে মনে কর না; জেন যে তুমি মুক্ত।

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে—কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা। যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্মের আরম্ভ। সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ঐ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মত, তা দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলি করতে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ (inspiration) উজ্জ্বল আলোকের মত সমগ্র সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কিছু করবার ইচ্ছা বা প্রেরণা আসাকেই ঈশ্বরভাবাবেশ (inspiration) বলতে পারা যায় না।

মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটি বৃত্ত বলে বর্ণনা করা যেতে পারে—এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌছবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা করবার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর যখন সেখানে ফিরে আসবে, তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপাসনা, সাধু-মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম—মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার এই-সব উপায়; তবে প্রথমেই আমাদের তীব্র মুমুক্ষুত্ব থাকা চাই। যে জ্যোতিঃ দপ্ করে প্রকাশ হয়ে আমাদের হৃদয়ান্ধকার দূর করে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে—এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ (ঐ জ্ঞানকে আমাদের 'জন্মগত অধিকার' বলা যেতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই)। কেবল যে মেঘগুলো ঐ জ্ঞানসূর্যকে ঢেকে রেখেছে, সেইগুলো আমাদের দূর করে দিতে হবে।

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্বপ্রকার ভোগ করবার বাসনা ত্যাগ কর (ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ)। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত কর (দম ও শম)। সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য কর, মন যেন জানতেই না পারে যে, তোমার কোনরূপ দুঃখ এসেছে (তিতিক্ষা)। মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে দাও, গুরু ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখ। তুমি যে নিশ্চয়ই মুক্ত হতে পারবে, এটিও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা)। যাই হোক না কেন, সর্বদা বল, 'সোঽহম্, সোঽহম্'। খেতে বেড়াতে, কষ্টে পড়েও বল 'সোঽহম্, সোঽহম্'; মনকে অবিরত ভাবে বল —এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি-মাত্র আছি (সমাধান)। দেখবে—একদিন দপ্ করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে বোধ হবে—জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ব্রহ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন হও (মুমুক্ষুত্ব)।

৭০

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরানো অন্ধকূপের মত; আমরা ঐ অন্ধকূপে পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি—ঐ স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে আর ভ্রমের সৃষ্টি কর না। এ যেন বটগাছের মত ক্রমাগত ঝুরি নামিয়ে বাড়তেই থাকে। যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে চাওয়াই তোমার মূর্খতা। আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি তো স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ—তোমার আবার কর্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব—কারও প্রতি কিছু কর্তব্য নেই।

৭১

যা হচ্ছে হয়ে যাক্, চুপচাপ করে পড়ে থাক।

"রামপ্রসাদ বলে—ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা;
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা॥"

শরীর মরে মরুক—আমার যে একটা দেহ আছে, এটা তো একটা পুরানো উপকথা বৈ আর কিছুই নয়। চুপচাপ করে থাক, আর জান, আমি ব্রহ্ম।

কেবল বর্তমান কালই বিদ্যমান—আমরা চিন্তায় পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারি না; কারণ চিন্তা করতে গেলেই তাকে 'বর্তমান' করে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, তার যেখানে যাবার ভেসে যাক। এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র, এটা যেন তোমায় আর প্রতারিত করতে না পারে। জগৎটা যা নয়, তুমি তাকে তাই বলে জেনেছ, অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান করেছ, এখন এটা বাস্তবিক যা, একে তাই বলে জান। যদি দেহটা কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্য কর না। কর্তব্যের নিদারুণ ধারণা ভীষণ কালকূট-স্বরূপ, জগৎ ধ্বংস করে ফেলছে।

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে—এর জন্য অপেক্ষা কর না। এইখানেই একটা বীণা নিয়ে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করা কেন? ইহালোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল। স্বর্গে বিবাহ করা নেই, বিবাহ দেওয়াও নেই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্ব-রূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা—গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।

রবিবার, ৪ অগাস্ট

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁকে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট তাঁরই কথা প্রচার করছি।'

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল জ্ঞাত বস্তুর চেয়ে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, যাঁকে আমরা সর্বত্র দেখছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে; সকলেই—এমন-কি পশুরা পর্যন্ত জানে যে 'আমি আছি'। আমরা যা কিছু জানি সব আত্মারই বহিঃক্ষেপ—বিস্তার-স্বরূপ। ছোট ছোট ছেলেদের শেখাও, তারাও এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারে। অজ্ঞাতসারে হলেও প্রত্যেক ধর্ম এই আত্মাকেই উপাসনা করে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি এরূপ অশোভন আসক্তি সমুদয় অনিষ্টের মূল। এই থেকেই যত সব প্রতারণা ও চুরি হয়ে থাকে। এরই জন্য লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি। কোন জড়বস্তুকে মূল্যবান্ বলে মনে কর না, আর তাতে আসক্ত হয়ো না। তুমি যদি কিছুতে, এমন-কি জীবনে পর্যন্ত আসক্ত না হও, তা হলে আর কোন ভয় থাকবে না। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'

৭২

যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন, বরাবর তিনি মৃত্যুর কবলে পড়েন। আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শারীরিক মৃত্যুও থাকে না, মানসিক মৃত্যুও থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, সুতরাং আমার দেহ চিরকাল থাকবে; কারণ গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য, এমন-কি সমগ্র জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ—ঐ দেহের আর নাশ হবে কি করে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই যে আমার—তবে মৃত্যু আসবে কি করে? আত্মা কখনও জন্মানও না, মরেনও না—যখন আমরা এইটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ উড়ে যায়; 'আমি আছি', 'আমি অনুভব করি', 'আমি ভালবাসি'—'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'—এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার ক্ষুধা বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ জগতে যে-কেউ যা-কিছু খাচ্ছে, তা আমিই খাচ্ছি। যদি একগাছা চুল উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে আমরা মরে গেলাম। সেই রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, সে তো ঐ একগাছা চুল উঠে যাওয়ারই মত।

সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই ঈশ্বর—তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত। ... তিনটে অবস্থা আছে—পশুত্ব (তমঃ), মনুষ্যত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ত্ব)। যাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তাঁরা অস্তিমাত্র বা সৎস্বরূপ হয়ে থাকেন। তাঁদের পক্ষে কর্তব্য একেবারে শেষ হয়ে যায়, তাঁরা মানুষকে কেবল ভালবাসেন, আর চুম্বকের মত অপরকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন আর চেষ্টা করে কোন সৎকার্য করতে হয় না, তখন তুমি যে কাজ করবে তাই সৎকার্য হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিৎ সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীশুখ্রীষ্ট যখন মোহকে জয় করে বলেছিলেন, 'শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা', তখনই দেবতারা তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন। ব্রহ্মবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য করতে পারে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আত্মা অপরকে পবিত্র করে থাকে। অতএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর, তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর। যখন আমরা তিনটি দেবানুগ্রহ—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ করি, তখনই বুঝতে হবে—মুক্তি আমাদের করতলগত।'

৭৩

* * *

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই 'নির্বাণ'। এটা নির্বাণ-তত্ত্বের 'না'-এর দিক্, এতে বলে—আমি এটা নই, ওটা নই। বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে 'হাঁ'-এর দিকটা বলেন—ওরই নাম মুক্তি। 'আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ, সোঽহম্—আমিই সেই'; এই হল বেদান্ত—নিখুঁতভাবে তৈরী একটি খিলানের যেন শীর্ষপ্রস্তর।

বৌদ্ধধর্মের মহাযান-সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী—তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্বাণের 'বিনাশ' অর্থ গ্রহণ করে।

কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 'আমি'কে নাশ করতে পারে না। যার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং অবিশ্বাসে উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র। আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। 'আমি আমার আত্মাকে নমস্কার করি।' 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্ম।' এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোনমতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও নষ্ট করা যায় না।

বর্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননী-রূপে উপাসনা করা কর্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজায় আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে। এখানে (আমেরিকায়) কোন মন্দির (পৌরোহিত্যশক্তি) কাউকে দাবিয়ে রাখছে না, অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলির মত এখানে কেউ কষ্টভোগ করে না। নারীজাতি শত শত যুগ ধরে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে, তাই তাদের ভিতর অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা একটা ভাব আঁকড়ে ধরে থাকে, সহজে ছাড়তে চায় না। এই জন্যই সকল দেশে তারা এমন-কি কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মসমূ্হের এবং পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই পরে তাদের স্বাধীনতার কারণ হবে। বৈদান্তিক হয়ে আমাদের বেদান্তের এই মহান্ ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। জনসাধারণকেও ঐ ভাব দিতে হবে—এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকাতেই কাজে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষী ব্যক্তিরা এই-সকল ভাব প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ সেগুলিকে ধরে রাখতে পারেনি। এই নূতন যুগে জনসাধারণ বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করবে, আর মেয়েদের দ্বারাই এটা কাজে পরিণত হবে।

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন 'মা' বলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিয়ো নাকো,
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।'

যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সে-সকলের পারে। তুমি আমার জীবনের সুধাকর-স্বরূপ, আমার আত্মারও আত্মা।

ঐদিন, অপরাহ্ণ

দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের গতি। কালেই সমুদয় পরিবর্তন বা পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ; আর যদি পূর্ণস্বরূপ হন, তবে তিনি অনন্তস্বরূপ; আর অনন্তস্বরূপ হলে অবশ্যই তিনি অদ্বিতীয়; কারণ দুটি অনন্ত থাকতে পারে না, সুতরাং আত্মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই হতে পারেন। যদিও আত্মাকে বহু বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি কোন ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে চলতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে সে এক-একটা বিভিন্ন সূর্য দেখবে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সবগুলি তো সেই একই সূর্য।

'অস্তিভাব'ই হচ্ছে সর্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ, আর ঐ ভিত্তিতে যেতে পারলেই পূর্ণতা লাভ হয়। যদি সব রংকে এক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিদ্যাই লোপ পেয়ে যেত। সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়; আমরা বলে থাকি—সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর থেকে হয়েছে। তাও-বাদী

৭৪

, কংফুছ (Confucius)-মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরথুস্ত্র-শিষ্যগণ (Zoroastrians) সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায় এই মহৎ নীতি প্রচার করছেন, তুমি অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর'—কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তাঁরা এর যুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষ অপর সকলকেই অবশ্য ভালবাসবে; কারণ সেই অপর সকলে যে সে নিজে, সেই এক বস্তুই রয়েছেন কিনা।

জগতে যত বড় বড় ধর্মাচার্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল লাওৎসে, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন—'তোমার শত্রুদেরও উপকার কর, যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাসো।'

তত্ত্বসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; সেগুলি আমরা সৃষ্টি করি না, আবিষ্কার করি মাত্র। ধর্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতি। বিভিন্ন মতামত—প্রণালী মাত্র, ওগুলি ধর্ম নয়। জগতের যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী 'ধর্ম'-এরই বিভিন্ন প্রয়োগমাত্র। শুধু মতবাদ কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি হবে—তা না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। একেবারে মূলে যাও; স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর—তাঁর স্বরূপ কি? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝতে হবে—তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্মই বলে যে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।

তোমার নিজের যেন কিছু বলবার থাকে, তা না হলে অপরে কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা করতে পারবে কেন? পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেক না, সর্বদাই নূতন সত্যসমূহের জন্য প্রস্তুত হও। 'মূর্খ তারা, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোনতা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না।' আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ। মহাপুরুষেরা তাঁদের এই পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা কি করে বুঝব যে, মুশা ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন— যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই? যদি ঈশ্বর কখনও মুশার কাছে এসে থাকেন তো আমার কাছেও আসবেন। আমি একেবারে সোজাসুজি তাঁর কাছে যাব, তিনি যেন আমার সঙ্গে কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না—সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দা। যদি ঈশ্বর দু-হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলে থাকেন, আজ আমার সঙ্গেও তিনি কথা কইতে পারেন। তা না হলে কি করে জানব, তিনি মরে যাননি? যে-কোন পথে হোক, ঈশ্বরের কাছে এস—কিন্তু আসা চাই। তবে আসবার সময় যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞান ব্যক্তিদের করুণা করবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিঁপড়ের জন্য পর্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন, কারণ তিনি জানেন দেহটা কিছুই নয়।

দেববাণী - ৯

সোমবার, ৫ অগাস্ট

প্রশ্ন এইঃ সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় নিম্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে? আধুনিক মার্কিন বালক আজ যে বিষয় পঁচিশ বছরে শিখে ফেলতে পারে, তার পূর্বপুরুষদের সে-বিষয়ে শিখতে এক-শ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে-অবস্থা লাভ করতে তার পূর্বপুরুষদের আটহাজার বছর লেগেছিল। শরীরের দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায়, গর্ভে ভ্রূণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর (amoeba) অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নানা অবস্থা অতিক্রম করে শেষে মানুষরূপে ধারণ করে। এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু মানবজাতির সমগ্র অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে না, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে। যিনি প্রথমটি করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যিনি দ্বিতীয়টি করতে পারেন, তিনি 'জীবন্মুক্ত'।

কাল বা সময় কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার গতি অভাবনীয়ভাবে দ্রুত। কত দ্রুত আমরা ভাবী জীবনটা যাপন করতে পারি, তার কোন সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অনুভব করতে কতদিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারা যায় না। এক মুহূর্তে হতে পারে, কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে। এটা বাসনা বা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়া দরকার। জ্বলন্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে—তাতে জল, এমন কি বরফের চাঙ্গড় পর্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। একরাশ ছট্‌রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগবে। লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু জন্মের ফলে সংস্কার গঠিত হয়েছে, শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী তাকে উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এর মধ্যে যে-কোন একটি ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামঞ্জস্য করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বারা সামঞ্জস্য করতে হবে, আর কর্ম—তত্ত্বকে কাজে পরিণত করার সাধনা যেন সকল পথেরই অঙ্গস্বরূপ হয়। যে যেখানে আছে, তাকে সেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও, ধর্মশিক্ষা যেন ধ্বংসমূলক না হয়ে সর্বদা গঠনমূলক হয়।

মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্ম-সমষ্টির পরিচায়ক। এটি যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্ধ, যেটি ধরে মানুষকে চলতে হবে। সকল ব্যাসার্ধ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়। অপরের স্বাভাবিক প্রবণতা উলটে দেবার এতটুকু চেষ্টাও কর না, তাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই পেছিয়ে যায়। যখন তুমি 'জ্ঞান' শিক্ষা দিচ্ছ, তখন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে আর শিষ্য যে-অবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেইখানে যেতে হবে। অন্যান্য যোগেও এইরূপ। প্রত্যেকটি বৃত্তি এমন ভাবে বিকশিত করতে হবে যে, যেন সেটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নেই—এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য, অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জন কর, কিন্তু গভীরতা হারিয়ে উদারতা চেও না। আমরা অনন্তস্বরূপ; আমাদের মধ্যে কোন কিছুর 'ইতি' করা যেতে পারে না। সুতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের মত গভীর, অথচ ঘোরতর নাস্তিকের মত উদার-ভাবাপন্ন হতে পারি।

এটি কার্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা। তা হলেই তুমি তাকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। এইরূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা দুই-ই লাভ হবে। জ্ঞান এমনভাবে উপলব্ধি কর যে, যেন জ্ঞানই একমাত্র রয়েছে। তারপর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ নিয়েও ঐভাবে সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার ইচ্ছামত তরঙ্গ উৎপন্ন করতে পারবে। তোমার নিজের মন-রূপ হ্রদকে সংযত কর, তা না হলে তুমি অপরের মন-রূপ হ্রদের তত্ত্ব কখনও জানতে পারবে না।

তিনিই প্রকৃত আচার্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ যে দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী—এ ধারণা ছেড়ে দাও; কেবল পূর্ণতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্বজ্ঞান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ—তোমাদের তাদের প্রতি অনন্ত-ধৈর্যসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব রেখ না; তারা যে-রোগে আক্রান্ত হয়ে জগৎটাকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে, আগে সেই রোগ নির্ণয় কর; তারপর যাতে তাদের সেই রোগ সেরে যায়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখতে পায়, সে বিষয়ে সাহায্য কর। সর্বদা স্মরণ রেখ যে, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকী সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—সুতরাং তারা যা করছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপে প্রকাশিত, তখন তা বদ্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গলতে থাকে, তখন স্বাধীন বা উন্মুক্ত, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তটের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যায়; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, সেখানে ঐ জল আবার পূর্বের স্বাধীনতা ফিরে পায়। প্রথমটা যেন 'মানবের পতন' (Fall of Man) ও দ্বিতীয়টি যেন 'পুনরুত্থান' (Resurrection)। একটা পরমাণু পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে না—যতক্ষণ না সেটি মুক্তাবস্থা লাভ করছে।

কতকগুলি কল্পনা অন্য কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে। সমগ্র জগৎটাই কল্পনা, কিন্তু একরকমের কল্পনাসমষ্টি অপর প্রকারের কল্পনাসমষ্টিকে নষ্ট করে দেয়। যে-সব কল্পনা বলে—জগতে পাপ দুঃখ মৃত্যু রয়েছে, সে-সব কল্পনা বড় ভয়ানক; কিন্তু

আর একরকমের কল্পনা বলে—‘আমি পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে দুঃখ নাই’, এইগুলিই শুভ কল্পনা, আর এগুলিই অন্যান্য কল্পনার বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে। সগুণ ঈশ্বরই মানবের সর্বোচ্চ কল্পনা, যা আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি সব ভেঙে দিতে পারে।

‘ওঁ তৎ সৎ’ অর্থাৎ একমাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও রয়েছে; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপ, আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ; এই দুইটিই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্যই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছে—দুই-ই নিত্য সত্য। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাত ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কাল ধরে পরিবর্তনশীল—এরা মায়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম। জরাথুস্ট্রীয় ও খ্রীষ্টানেরা মায়াকে দু-ভাগে ভাগ করে ভাল অর্ধেকটাকে ‘ঈশ্বর’ ও মন্দ অর্ধেকটাকে ‘শয়তান’ নাম দিয়েছেন। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন।

মহম্মদ দেখলেন খ্রীষ্টধর্ম সেমিটিক ভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্যে থেকেই খ্রীষ্টধর্মের কিরূপ হওয়া উচিত—তার যে একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত—এইটিই তাঁর উপদেশের বিষয়। ‘আমি ও আমার পিতা এক’—এই আর্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ঐ উপদেশে তিনি ভয় পেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব থেকে নিত্য পৃথক্ জিহোবা-সম্বন্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদ (Trinity) অনেক উন্নত। যে ভাব-পরম্পরা ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তার প্রথম ভাব। লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর দেখে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়—তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন। অদ্বৈতবাদ সর্বোচ্চ অবস্থা, একেশ্বরবাদ তার চেয়ে নীচের স্তর। বিচারযুক্তির চেয়েও কল্পনা তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম জিনিষটা রক্ষা করুক। ‘আমি জনক রাজার মত নির্লিপ্ত’— একথা বলে ভান কর না। তুমি জনক বটে, কিন্তু মোহ বা অজ্ঞানের জনকমাত্র।

৭৫

অকপট হয়ে বল, ‘আদর্শ কি, তা আমি বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু এখনও তার কাছে এগোতে পারছি না।’ বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ করবার ভান কর না। যদি বাস্তবিক ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে ঐ ত্যাগকে ধরে থাক। লড়াইয়ে এক-শ লোকের পতন হোক না, তবু তুমি পতাকা তুলে নাও এবং এগিয়ে যাও; যে পড়ে পড়ুক না কেন, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর সত্য। যুদ্ধে যার পতন হবে, সে যেন অপরের হাতে পতাকাটি দিয়ে যায়—যাতে সে ঐ পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। পতাকা কখনও ভূলুণ্ঠিত হতে পারে না।

* * *

বাইবেলে আছে—প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, যখন ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার অশুচিতা আমাতে জুড়ে দেবার কি দরকার? তাই বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকী যা কিছু সব চলে যাক। তোমাতে নূতন কিছু আসুক—এ কামনা কর না, বরং সবকিছু ত্যাগ করতে পারলেই খুশী হও। ত্যাগ কর, আর জেন—তুমি দেখতে না পেলেও সফলতা লাভ তুমি করবেই। যীশু বারটি জেলে শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ অল্প ক-টি লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য উড়িয়ে দিয়েছিল।

ঈশ্বরের বেদীতে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপ অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখনও করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি অনেক ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখলেই হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ করব—কেবল তাঁকেই চাই—এই বলে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়ার যা হবার হোক; ঈশ্বর ও সংসার—এই দুই-এর মধ্যে কোন আপস করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, কেবল তা হলেই দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি ‘আজাদ’ বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যু আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনর্জন্ম হবে না।

সত্যকে সত্যের দ্বারা বিচার করতে হবে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্যকে দেখবার জন্য আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই—ঐ সত্য ধরে থাকো।

ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ—এগুলিই সাধারণকে আকর্ষণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু নেই।

‘মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে, আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন!’৭৬

মঙ্গলবার, ৬ অগাস্ট

‘আমি’ না থাকলে বাইরে ‘তুমি’ থাকতে পারে না। এই থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে ‘আমাতে’ ছাড়া বাহ্য

জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'তুমি' কেবল 'আমা'তেই রয়েছে। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, 'তুমি' না থাকলে 'আমার' অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না। তাঁদের পক্ষেও যুক্তির বল সমান। এই দুটো মতই আংশিক সত্য—খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা। দেহ যেমন জড় ও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, চিন্তাও তাই। জড় ও মন উভয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত—এক অখণ্ড বস্তু আপনাকে দু-ভাগ করে ফেলেছে। এই এক অখণ্ড বস্তুর নাম 'আত্মা'।

সেই মূল সত্তা যেন 'ক', সেটিই মন ও জড়—উভয়রূপে নিজেকে প্রকাশ করছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে হয়ে থাকে, সেগুলিকেই আমরা 'নিয়ম' বলি। এক অখণ্ড সত্তা-রূপে তা মুক্তস্বভাব, বহু-রূপে সেটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একটা মুক্তির ধারণা সদাসর্বদা বর্তমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি অর্থাৎ 'আসক্তি ত্যাগ করা'। আর বাসনাবশে যে-সব জড়ত্ববিধায়িনী শক্তি আমাদের সাংসারিক কার্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে; তাদেরই নাম প্রবৃত্তি।

সেই কাজটাকেই নীতিসঙ্গত বা সৎ কর্ম বলা যায়, যা আমাদের জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে; তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ম। এই জগৎপ্রপঞ্চকে অনন্ত বোধ হচ্ছে, কারণ এর মধ্যে সব জিনিষই চক্রগতিতে চলছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি বর্ধিত হয়ে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং এখানে—এই সংসারে—কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসার বৃত্ত থেকে আমাদের বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র গতি।

মন্দের কেবল আকার বদলায়, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। প্রাচীনকালে যার শক্তি ছিল, সেই শাসন করত, এখন ধূর্ততা শক্তির স্থান অধিকার করেছে। দুঃখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ এখানে (আমেরিকায়) গরীব লোক নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পায়।

ভাল মন্দ—এই দুটো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিমানসমষ্টি যেন একটা হ্রদের মত—ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক—সুতরাং একজনকে সুখী করা মানেই আর এক জনকে অসুখী করা। বাইরের সুখ জড়সুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। সুতরাং এককণা সুখও পেতে গেলে তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড়সুখ কেবল জড়দুঃখের রূপান্তর মাত্র।

যারা ঐ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা তার পতনাংশটা—আর তাতে কি আছে, তা দেখতে পায় না। কখনও মনে কর না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুখী করতে পার। ঘানির বলদ তার সামনে বাঁধা খড়ের গোছা পাবার জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু কোন কালে তার কাছে পৌঁছতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে সুখরূপ আলেয়ার অনুসরণ করছি—সর্বদাই সেটা আমাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টানতে টানতে আমাদের মৃত্যু হল, তারপর আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে। যদি আমরা অশুভকে দূর করে দিতে পারতাম, তা হলে আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্যন্ত পেতাম না; আমরা তা হলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতাম না। যখন মানুষ বুঝতে পারে, জড়জগতে সুখ অন্বেষণের সকল প্রচেষ্টা একেবারে নিরর্থক, তখনই ধর্মের আরম্ভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অঙ্গমাত্র।

মানবদেহে ভাল-মন্দের এমন ভারসাম্য বজায় আছে যে, তাইতেই মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুক্ত যে, সে কোনকালেই বদ্ধ হয়নি। মুক্ত কি করে বদ্ধ হল—এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে কার্যকারণ-ভাবও নেই। 'স্বপ্নে আমি একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছিল'—এখন আমি কি করে প্রশ্ন করতে পারি যে, কুকুর কেন আমায় তাড়া করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল; কিন্তু দুই-ই স্বপ্ন, বাইরে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমরা যাতে এই বন্ধনের বাইরে যেতে পারি, বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাদের সে-বিষয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করছে। তবে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে পবিত্র। এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ ধর্ম নীতি বা চরিত্রকে (morality) তার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।

'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন। যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লুপ্ত হয়ে যায়, তথাপি এই একটিমাত্র বাক্য সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করবে। অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বর-দর্শন হবে। সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই। পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে পারব—আমরা কোন কালে বদ্ধ হইনি। নানাত্ব-দর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ—সবকিছুকেই আত্মরূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাসো। ভেদভাব সব একেবারে দূর করে দাও।

* * *

পিশাচপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘায়ের মত আমার দেহের একটা অংশ। যত্ন করে তাকে ভাল করে তুলতে হবে। দুষ্ট লোককেও ক্রমাগত সাহায্য করতে থাক, যতক্ষণ না সে সম্পূণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে।

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন আমাদের বিশ্বাস করবার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের বস্তু দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই ভাবে সাহায্যও পেতে পারি। এই সাহায্য-ভাবের সূক্ষ্মতম ভাবকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপ।

যা-কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা-কিছু কল্যাণকর, যা-কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিস্বরূপ। ঈশ্বরসমন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা যখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নেই, সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম, বিষও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না'—এই কথাটাই একটা অসম্ভব বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি। নদীটাই যখন লুপ্ত হল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে? সাহায্যের জন্য কাঁদ দেখি, তা হলে সাহায্য পাবে—আর অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্য কান্নাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন; খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকী রয়েছেন কেবল আত্মা।

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুশী খেলা কর। তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না; কারণ যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না; যখন ঐ অবস্থালাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে নির্ধূম শিখা, তাপ নেই—আলো আছে।

৭৭

তখন প্রারব্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কেবল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ মুক্তিলাভ হবার পূর্বে সব মন্দ চলে গেছে। চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তন-কর্মের ফল লাভ করলে। পূর্বজন্মে সে যোগী ছিল, যোগভ্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয়; এ জন্মেও পতন হওয়াতে তাকে চোর হতে হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব জন্মে সে যে শুভকর্ম করেছিল, তার ফল ফলল। তার যখন মুক্তিলাভ হবার সময় হল, তখনই তার যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা হল, আর তাঁর এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল।

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকেও মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ করত যে, ঐ দ্বেষবশে সে সর্বদা তাঁর চিন্তা করত। ক্রমাগত বুদ্ধের এত চিন্তায় তার চিত্তশুদ্ধি-লাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ করবার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

* * *

(এই ভাবেই শেষ হইয়া গেল আমাদের প্রিয়তম গুরুদেবের 'দিব্যবাণী', পরদিন স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যান হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যান।)

ভক্তি-প্রসঙ্গে

নারদভক্তি-সূত্র

১৮৯৫ খ্রীঃ শরৎকালে মিঃ স্টার্ডির সহযোগিতায় স্বামীজী কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত।

[নারদীয় ভক্তি-সূত্র দশটি অনুবাকে বিভক্ত, ইহাতে মোট ৮৪টি সূত্র আছে। অনুবাক্ অনুসারে সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে—৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭, ১১। স্বামীজী কয়েকটি সূত্র একসঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন, কয়েকটি বাদ দিয়াছেন । এখানে পাঁচটি পরিচ্ছেদে মোট ৬২টি সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা এখানে ইংরেজী অনুবাদে ব্যক্ত ভাব ও পরিচ্ছেদ-বিভাগ অনুসরণ করিয়াছি।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি।
২। ইহা প্রেমামৃত।
৩। ইহা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হয়, অমর হয়, চিরতৃপ্তির অধিকারী হয়।
৪। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর কিছুই চায় না এবং দ্বেষ ও অভিমান-শূন্য হয়।
৫। ইহা জানিয়া মানুষ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়, শান্ত হয়, এবং একমাত্র ভগবদ্‌বিষয়েই আনন্দ পাইয়া থাকে।
৬। কোন বাসনাপূরণের জন্য ইহাকে ব্যবহার করা চলে না, কারণ ইহা সর্ববিধ বাসনার নিবৃত্তি-স্বরূপ। ৭। 'সন্ন্যাস' বলিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয়—এই উভয়বিধ উপাসনারই ত্যাগ বুঝায় ।
৮। যাহার সমগ্র সত্তা ঈশ্বরে নিবদ্ধ, সেই-ই ভক্তিপথের সন্ন্যাসী; যাহা কিছু তাহার ভগবদ্‌ভক্তির বিরোধী, তাহাই সে ত্যাগ করে।
৯। অন্য সব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়।
১০। জীবন সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে হয়।
১১। নতুবা মুক্তির নামে অসদাচরণে বিপদ আছে।
১২। ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই পরিত্যক্ত হয়।
১৩। ভক্তির অনেক সংজ্ঞা আছে; কিন্তু নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন এইগুলিঃ যখন সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়; ভগবানকে স্বল্পক্ষণ বিস্মৃত হইলেও যখন অতি গভীর দুঃখের উদয় হয়, বুঝিতে হইবে তখন প্রেম-সঞ্চার শুরু হইয়াছে।
১৪। যেমন, এই প্রেম গোপীদের ছিল।
১৫। কারণ ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করিলেও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই।
১৬। এরূপ না হইলে তাঁহারা অসতীত্ব-রূপ পাপের ভাগী হইতেন।
১৭। ইহাই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। কারণ মানুষের সব ভালবাসায় প্রতিদানে কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর। কারণ ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য।
২। খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে বা খাদ্যবস্তুর দর্শনে যেমন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান, এমন কি ভগবদ্দর্শন হইলেও মানুষ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেইজন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। যাহা হউক, সিদ্ধ ভক্তগণ ভক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেনঃ
২। যে ভক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, এমন কি মানুষের সঙ্গ পর্যন্ত অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।
৩। দিবারাত্র সে একমাত্র ভক্তির বিষয় ছাড়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।
৪। যেখানে ভগবানের কীর্তন ও আলোচনা হয়, সেখানে তাহার যাওয়া উচিত।
৫। প্রধানতঃ মুক্ত মহাপুরুষের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়।
৬। মহাপুরুষের সঙ্গলাভ দুর্লভ এবং আত্মার মুক্তি-বিধানে তাহা অমোঘ।
৭। ভগবৎকৃপায় এরূপ গুরুলাভ হয়।
৮। ভগবান্ ও ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নাই।
৯। অতএব এরূপ মহাপুরুষদের কৃপালাভের চেষ্টা কর।
১০। অসৎসঙ্গ সর্বদা বর্জনীয়।
১১। কারণ উহা কাম-ক্রোধ বাড়াইয়া দেয়, মায়ায় বদ্ধ করে, উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দেয়, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা (অধ্যবসায়) নাশ করে এবং সবকিছুই ধ্বংস করিয়া দেয়।
১২। এই বিপত্তিগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে আসিতে পারে, কিন্তু অসৎসঙ্গ এগুলিকে সমুদ্রাকারে পরিণত করে।
১৩। যে সকল আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, যে মহাপুরুষের সেবা করে, সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে একাকী বাস করে, যে গুণাতীত ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সে-ই মায়ার পারে যাইতে পারে।
১৪। যে কর্মফল ত্যাগ করে, যে সর্ব কর্ম, সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব, এমন-কি শাস্ত্রজ্ঞানও পরিত্যাগ করে, সে-ই নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়।
১৫। সে ভবনদী পার হয়, এবং অপরকেও পার হইতে সাহায্য করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনার অতীত—অনির্বচনীয়।
২। মূক যেমন যাহা আস্বাদন করে, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি মানুষ এই প্রেমের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তবে তাহার আচরণে উহা প্রকাশ পায়।
৩। বিরল কোন ব্যক্তির জীবনে এই প্রেমের প্রকাশ ঘটে।
৪। সর্বগুণাতীত, সমস্ত বাসনার অতীত, চিরবর্ধমান, চিরবিচ্ছেদহীন, সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রেম।
৫। যখন মানুষ এই প্রেম-ভক্তি লাভ করে, তখন সে সর্বত্রই এই প্রেমের রূপ দর্শন করে, উহার কথাই শ্রবণ করে, উহাই কীর্তন করে এবং চিন্তা করে।
৬। গুণ ও অবস্থানুসারে এই প্রেম বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে।
৭। তম (মূঢ়তা, আলস্য), রজ (চঞ্চলতা, কর্মপ্রবণতা), সত্ত্ব (শান্তি, পবিত্রতা)—এগুলি গুণ; আর্ত (দুঃখী), অর্থার্থী (কোন কিছুর অভিলাষী), জিজ্ঞাসু (সত্যানুসন্ধিৎসু), জ্ঞানী (জ্ঞাতা)—এগুলি বিভিন্ন অবস্থা।
৮। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তগুলি পূর্বোক্তগুলি অপেক্ষা উচ্চতর।
৯। ভক্তিই উপাসনার সহজতম পথ।

১০। ইহা স্বতঃপ্রমাণ—প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না।
১১। শান্তি ও পরমানন্দই ইহার প্রকৃতি।
১২। ভক্তি কখনও কাহারও বা কোন কিছুর অনিষ্ট করিতে চায় না, এমন কি প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিরও নয়।
১৩। ভোগ-বিষয়ক, ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ-বিষয়ক, বা নিজের শত্রু-বিষয়ক প্রসঙ্গ কদাপি শুনিতে নাই। ১৪। অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি অবশ্যই পরিহার্য।
১৫। এই-সব রিপুকে যদি দমন করিতে না পার, তবে ঈশ্বরের দিকে এগুলির মোড় ফিরাইয়া দাও, সর্বকর্ম তাঁহাতে সমর্পণ কর।
১৬। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে এক ভাবিয়া, নিজেকে ভগবানের চিরভৃত্য বা চিরবধূ ভাবিয়া ভগবানের সেবা কর; তাঁহাকে প্রেমনিবেদন এইভাবেই করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। যে প্রেম ভগবানে একাগ্র, তাহাই শ্রেষ্ঠ।
২। ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে গেলে তাঁহাদের (এরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিকদের) কথা কণ্ঠে রুদ্ধ হয়, তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলেন; তীর্থকে তাঁহারাই পবিত্র করেন; তাঁহাদের কর্ম শুভ; তাঁহারা সদ্‌গ্রন্থকে অধিকতর সদ্‌ভাবাপন্ন করিয়া তোলেন; কারণ তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে একাত্ম।
৩। কেহ যখন ভগবানকে এতখানি ভালবাসে, তখন তাহার পূর্বপুরুষগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন, আর পৃথিবী একজন গুরুলাভ করে।
৪। এরূপ প্রেমিকের নিকট বংশ, লিঙ্গ, জ্ঞান, আকার, জন্ম ও সম্পদের কোন ভেদ থাকে না।
৫। কারণ এ-সবই তো ভগবানের।
৬। তর্ক বর্জনীয়।
৭। কারণ ইহার কোন শেষ নাই, কোন সন্তোষজনক ফল-লাভও ইহাতে হয় না।
৮। এমন গ্রন্থ পাঠ কর এবং এমন কর্ম কর—প্রেমভক্তি বর্ধিত হয়।
৯। সুখ-দুঃখের, লাভ-লোকসানের সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা কর। একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করিও না।
১০। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া ও দেবভাব সর্বদা পোষণ করিবে।
১১। অন্য সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমস্ত মন দিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা করা উচিত। এভাবে রাত্রিদিন উপাসনা করিলে ভক্তের নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হন, এবং ভক্তকে উপলব্ধির সামর্থ্য দান করেন।
১২। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রেম অপেক্ষা মহত্তর কিছু নাই। জগতের সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয় পরিহার করিয়া, প্রাচীন মহাপুরুষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া আমরা এভাবে এই প্রেমভক্তির কথা প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি।

ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে

দ্বৈতবাদী বলে, সর্বদা দণ্ডহস্তে শাসন করিতে উদ্যত একজন ঈশ্বরকে না ভাবিলে তুমি নীতিমান্ হইতে পার না। ব্যাপারটা কি রকম? ধর একটি ঘোড়া আমাদের নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবে। আর ঘোড়াটি ছ্যাকরা গাড়ীর হতভাগ্য ঘোড়া, সে চাবুক ভিন্ন এক পাও অগ্রসর হয় না—এইটি তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। এই ঘোড়ার বক্তৃতার বিষয় হইল 'মানুষ', তাহার মতে মানুষমাত্রই নীতিহীন। কেন? কারণ মানুষকে নিয়মিতভাবে চাবুক মারা হয় না। কিন্তু চাবুকের ভয় মানুষকে আরও নীতিহীন করিয়া তোলে।

তোমরা সকলে বলো যে, ঈশ্বর বলিয়া একটি সত্তা আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী। চক্ষু বন্ধ কর এবং চিন্তা করিতে থাক—ঈশ্বর কিরূপ। তুমি কি দেখিবে? যখনই তোমার মনে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের ভাবটি আনিবার চেষ্টা করিবে, তখনই দেখিবে সাগর, নীল আকাশ, বিস্তৃত বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর কিংবা এরূপ কোন বস্তু—যাহা তুমি পূর্বে দেখিয়াছ—তাহারই চিন্তা মনে উঠিতেছে। যদি তাই হয়, সর্বব্যাপী ভগবান্ সম্বন্ধে তোমার কোনই ধারণা নাই। 'সর্বব্যাপিত্ব' তোমার কাছে একটা অর্থহীন শব্দ। ঈশ্বরের অন্যান্য বিশেষণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কী ধারণা আছে? কিছুই নাই। উপলব্ধিই ধর্ম; যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বর-ভাবটি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতেছ, ততক্ষণ আমি তোমাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক বলিব না। উপলব্ধির আগে ইহা শুধু কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিষ্কে যতই মত, দর্শন, ও নীতি-পুস্তকের রাশি সঞ্চিত রাখ না কেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তুমি কী উপলব্ধি করিয়াছ, জীবনে ঐগুলি কতটা পরিণত করিয়াছ, তাহাই বিচার্য।

মায়ার আবরণের ভিতর দিয়া দেখিলে নির্গুণ ব্রহ্মকেই সগুণ ঈশ্বররূপে দেখা যায়। ব্রহ্মকে যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করি, তখন তাঁহাকে একমাত্র সগুণ ভগবান্‌রূপেই দেখিতে পারি। আসল কথা পরমাত্মাকে কখনও বিষয়ীভূত করা যাইতে পারে না। জ্ঞাতা নিজেকে কি করিয়া জানিবেন? তবে তিনি যেন নিজের ছায়াকে প্রক্ষেপ করিতে পারেন এবং যদি বলিতে চাও—ইহাকে 'বিষয়ীভূত করা' বলিতে পার। সুতরাং সেই ছায়ার যে সর্বোচ্চ রূপ, নিজেকে বিষয়ীভূত করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আত্মা হইতেছেন শাশ্বত কর্তা; সেই আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে রূপান্তরিত করিবার জন্য আমরা নিরন্তর চেষ্টা করিতেছি; এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা হইতে দৃশ্যজগতের ও যাহাকে আমরা 'জড়' বলি তাহার ও অন্যান্য সবকিছুর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত দুর্বল প্রচেষ্টা এবং আমাদের কাছে আত্মার জ্ঞেয়রূপে যে সর্বোচ্চ প্রকাশ সম্ভব, তাহা সগুণ ঈশ্বর। এই জ্ঞেয়ই আমাদের স্বরূপ-উদ্ঘাটন-প্রচেষ্টার ফল। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এই-সব অভিজ্ঞতা পুরুষ বা জীবাত্মাকে দিতেছে; জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে। অদ্বৈত বেদান্তমতে জীব নিজেকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে দেখে—জ্ঞাতা সর্বদা জ্ঞাতাই থাকেন; এবং তখনই অনাসক্তি আসে এবং জীব মুক্ত হয়।

যখন কোন সাধক সেই পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করেনঃ 'আমি এবং আমার পিতা এক'। তিনি জানেন, তিনি পরব্রহ্মের সহিত; সগুণ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি নিজেকে প্রক্ষেপ করেন। তিনি খেলা করেন, যেমন অতি পরাক্রান্ত রাজাও মাঝে মাঝে পুতুল লইয়া খেলা করেন।

স্থিতির বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য কতকগুলি কল্পনা বাকী কল্পনাগুলির বন্ধন ছিন্ন করিতে সাহায্য করে। সমস্ত জগৎটাই একটা কল্পনা। এক শ্রেণীর কল্পনা আর এক শ্রেণীর কল্পনার উপশম ঘটায়। এই জগতে পাপ, দুঃখ ও মৃত্যু আছে—এই জাতীয় কল্পনাগুলি মারাত্মক। কিন্ত আর এক জাতীয় কল্পনা আছেঃ তুমি পবিত্র, ভগবান্ আছেন, দুঃখ নাই। এগুলিই ভাল এবং কল্যাণকর, বন্ধন-মোচনের সহায়ক। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সর্বোচ্চ কল্পনা, যাহা শৃঙ্খলের সব গ্রন্থি ভাঙিয়া ফেলিতে পারে।

'ভগবান্, তুমি ইহা রক্ষা কর এবং উহা আমাকে দাও; ভগবান্, আমি এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, পরিবর্তে তুমি আমার দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণ করিয়া দাও; হে ভগবান্, আমার মাথা-ধরা সারাইয়া দাও ইত্যাদি'—এইরূপ প্রার্থনা ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, কর্মের নিম্নতম রূপ। যদি কোন মানুষ দেহকে তৃপ্ত করিতে—দেহের ক্ষুধা মিটাইতেই সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সহিত পশুর কি প্রভেদ? ভক্তি উচ্চতর বস্তু, স্বর্গৈষণা অপেক্ষাও উচ্চতর। স্বর্গ বলিতে খুব বেশী মাত্রায় ভোগ করিবার স্থান বুঝায়। তাহা কি করিয়া ভগবান্ হইতে পারে?

একমাত্র মূঢ় ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়-ভোগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করা সহজ। পান-ভোজন-ক্রিয়ারূপ পুরাতন অভ্যস্ত পথে ভ্রমণ করা কঠিন নয়। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ বলিতে চান, 'এই অনায়াস-সাধ্য ভাবগুলি গ্রহণ কর এবং সেগুলির উপরই ধর্মের ছাপ দিয়া দাও।' এই ধরনের মতবাদ বিপজ্জনক। ইন্দ্রিয়-ভোগে মৃত্যু। আধ্যাত্মিক স্তরে যে জীবন, তাহাই যথার্থ জীবন। অন্য ভোগভূমির জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। আমাদের এই জাগতিক জীবনকে একটি শব্দে বর্ণনা করা যাইতে পারে, উহা 'অভ্যাসের ব্যায়ামাগার'। যথার্থ জীবন উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।

যতক্ষণ ছোঁয়াছুঁয়ি তোমার ধর্ম, এবং রান্নার হাঁড়ি তোমার ইষ্ট, ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। ধর্মে ধর্মে যে দ্বন্দ্ব—তাহা অর্থহীন, কেবল কথার সংঘর্ষ মাত্র। প্রত্যেকেই ভাবে, 'ইহা আমার মৌলিক চিন্তা'; এবং সে চায়—সবকিছুই তাহার মতানুসারে চলুক। এই ভাবেই ধর্মবিরোধের সূত্রপাত।

অপরকে সমালোচনা করিবার সময় আমরা সর্বদা নির্বোধের মত নিজের চরিত্রের একটি মাত্র বিশেষ উজ্জ্বল দিক্‌কেই সমগ্র জীবন বলিয়া ধরিয়া লই এবং উহার সহিত অপরের চরিত্রের অনুজ্জ্বল দিক্‌টি তুলনা করি। ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করিবার সময় আমরা এ-ভাবে ভুল করিয়া বসি।

গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা একটি ধর্মের অতি দ্রুত প্রচার হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ধর্মেরই প্রচার দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে-ধর্ম প্রত্যেককে তাহার মতের স্বাধীনতা দেয় এবং এইরূপে তাহাকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করে, যদিও এই প্রক্রিয়ার গতি মন্থর। সর্বপ্রথম দেশকে (ভারতবর্ষকে) আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর, তারপর অন্যান্য ভাবগুলি আসিবে। ধর্ম ও অধ্যাত্মজ্ঞান-দান শ্রেষ্ঠ দান, কারণ ইহা অসংখ্য জন্মপ্রাপ্তি-রূপ বন্ধন মোচন করে। ইহার পর পার্থিব জ্ঞান-দান, ইহার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে মানুষের চক্ষু খুলিয়া যায়। তৃতীয় দান জীবন-দান এবং চতুর্থ অন্ন-দান।

সাধন করিতে করিতে যদি শরীরের পতন হয়, তবে তাহাই হউক। তাহাতে কি আসে যায়? নিরন্তর সৎসঙ্গের দ্বারা কাল পূর্ণ হইলে ঈশ্বরানুভূতি হইবে। একটা সময় আসে, যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, মানবসেবার জন্য এক ছিলিম তামাক সাজা লক্ষ লক্ষ ধ্যান জপ অপেক্ষা বড় কাজ। যে এক ছিলিম তামাক ঠিকভাবে সাজিতে পারে, সে ধ্যানও ঠিকমত করিতে পারে।

দেবতারা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত পরলোকগত জীবাত্মা ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইতে পারি।

তিনিই আচার্য, যাঁহার ভিতর দিয়া ঐশী শক্তি ক্রিয়া করে। যে-শরীরের মাধ্যমে আচার্যত্ব লাভ হয়, তাহা অপর সাধারণ লোকের শরীর হইতে ভিন্ন। সে-শরীরকে ঠিকভাবে রাখিবার জন্য একটি বিশেষ যোগ বা বিজ্ঞান আছে। আচার্যের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কোমল ও মন অতি সংবেদনশীল, ফলে তিনি সুখ ও দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন। বস্তুতঃ তিনি অ-সাধারণ।

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হৃদয়বান্ মানুষই জয়লাভ করে এবং ব্যক্তিত্বই সকল সাফল্যের গোপন রহস্য।

নদীয়ার অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মহাভাবের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শক্তি। কখনও মনে করিও না যে, এটি বা ওটি তাঁহার মত ছিল। কিন্তু তিনি একটি শক্তি, সেই শক্তি এখনও তাঁহার শিষ্যদের ভিতর মূর্ত হইয়া আছে এবং জগতে কার্য করিতেছে। ভাবের দিক্ দিয়া তিনি এখনও বাড়িয়া চলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একই দেহে জীবন্মুক্ত ও আচার্য ছিলেন।

ভক্তিযোগের উপদেশ

রাজযোগ এবং শারীরিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কোন একটি যোগই অপরিহার্য নয়। আমি তোমাদের নিকট অনেকগুলি পদ্ধতি এবং আদর্শ উপস্থাপিত করিতে চাই, যাহাতে তোমরা নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী একটি বাছিয়া লইতে পার; একটি উপযোগ না হইলে অপরটি হয়তো হইতে পারে।

আমরা আমাদের চরিত্রের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং ব্যাবহারিক—প্রত্যেকটি দিক্ সমভাবে উন্নত করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হইতে চাই। বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তদতিরিক্ত কোন ভাব বুঝিতে পারে না। একটি ভাবেই তাহারা এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, অন্য কোনটির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি যায় না। সর্বতোমুখী হওয়াই আমাদের প্রকৃত আদর্শ। বস্তুতঃ জাগতিক দুঃখের কারণ—আমরা এতদূর একদেশদর্শী যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি না। মনে কর, কোন ব্যক্তি ভূগর্ভস্থ খনি হইতে সূর্যকে নিরীক্ষণ করিল, সে সূর্যকে একভাবে দেখিবে। এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে দেখিল, একজন কুয়াশার ভিতর দিয়া এবং একজন পর্বতের উপর হইতে নিরীক্ষণ করিল। প্রত্যেকের নিকট সূর্যের বিভিন্ন রূপ প্রতিভাত হইবে। নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্য একই। দৃষ্টি বিভিন্ন হইলেও বস্তু এক, এবং তাহা হইল সূর্য।

প্রত্যেক মানুষের স্বভাব অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে। সে ঐ প্রবণতা অনুযায়ী কোন আদর্শ এবং আদর্শে উপনীত হইবার কোন পথ গ্রহণ করে। লক্ষ্য কিন্তু সর্বদাই সকলের জন্য এক। রোম্যান ক্যাথলিকরা গভীর ও আধ্যাত্মিক, কিন্তু উদারতা হারাইয়াছে। ইউনিটেরিয়ানরা উদার, কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিকতা নাই, তাহারা ধর্মের উপর পুরোপুরি গুরুত্ব দেয় না। আমরা চাই—রোমান ক্যাথলিকদের গভীরতা এবং ইউনিটেরিয়ানদের উদারতা। আমরা আকাশের মত উদার এবং সমুদ্রের মত গভীর হইব; আমাদের মধ্যে থাকিবে অতিশয় ঐকান্তিক উৎসাহ, অতীন্দ্রিয়বাদীর গভীরতা এবং অজ্ঞেয়বাদীর উদারতা।

দাম্ভিক ব্যক্তির নিকট 'পরধর্ম-সহিষ্ণুতা' শব্দটি এক অপ্রীতিকর মনোভাবের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে নিজেকে উচ্চাসনে বসাইয়া স্বজাতীয়দের করুণার চোখে দেখিয়া থাকে। উহা মনের এক ভয়াবহ অবস্থা। আমরা সকলেই একই পথে একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেছি। আমাদের মধ্যে বহু ভাবের সমাবেশ থাকিবে। চরিত্রে আমরা অবশ্যই বিকাশশীল হইব। আমাদের কেবল অপরের মতগুলি সহ্য করিলেই চলিবে না, উহা অপেক্ষা কঠিনতর কার্য করিতে হইবে—আমাদিগকে সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইবে, অপরের অবলম্বিত পথে প্রবেশ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরান্বেষণ-প্রচেষ্টার সহিত সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মের দুইটি ভাব আছে—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন আপনারা খ্রীষ্টধর্মের অবতারবাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর মাধ্যমে মুক্তিলাভ ইত্যাদি বলেন, তখন আমি আপনাদের সহিত একমত। আমি বলিব—অতি উত্তম, আমিও উহা সত্য বলিয়া জানি। কিন্তু যখনই আপনারা বলিতে থাকিবেন, 'আর কোন প্রকৃত ধর্ম নাই, ঈশ্বরের আর কোন প্রকাশ নাই', তখন আমি বলিব—থামুন, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। প্রত্যেক ধর্মেরই প্রচার করিবার, মানুষকে শিক্ষা দিবার মত বাণী আছে। কিন্তু যখনই ধর্ম প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে, অন্যকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, তখনই উহা নেতিবাচক ও ভয়াবহ মনোভাব অবলম্বন করে এবং কোথা হইতে আরম্ভ করিবে, কোথায় বা শেষ করিবে—জানে না।

শক্তি-মাত্রই আবর্তিত হয়। যে শক্তিকে আমরা 'মানুষ' বলি, তাহা অনন্ত ঈশ্বর হইতে যাত্রা শুরু করে এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া আসিবে। ঈশ্বর-সমীপে প্রত্যাবর্তনের জন্য দুইটি পন্থার একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রকৃতির সঙ্গে মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলা, অথবা অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে গতিপথে থামিয়া যাওয়া; এই অন্তঃ-শক্তি অপ্রতিহত থাকিলে আমাদিগকে চক্র-পথে ঈশ্বর-সমীপে ফিরিয়া লইয়া যাইবে, এবং যেন প্রবলবেগে ঘুরিয়া সল্পদূরত্বের পথে ঈশ্বর-দর্শন করাইবে। যোগীরা এই পথেই গিয়া থাকেন।

আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী আদর্শ নিরূপণ করিবে। এই আদর্শকে তাহার 'ইষ্ট' বলা হয়। ইহাকে অবশ্যই পবিত্র—অতএব গোপনীয় রাখিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিলে ইষ্টভাবেই করিবে। ঐ বিশিষ্ট পন্থা নিরূপণের উপায় কি? ইহা অতীব দুরূহ, কিন্তু উপাসনায় অধ্যবসায়ী হইলে উহা আপনা হইতে প্রকাশ পাইবে। মানুষের নিকট ভগবানের তিনটি বিশেষ দান আছে—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষ-সংশ্রয়।

সগুণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আমাদের ভক্তিভাব আসিতে পারে না। প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ দুই-ই প্রয়োজন। ঈশ্বরকে অনন্তগুণসম্পন্ন মানব বলা যাইতে পারে। তিনি এরূপ হইতে বাধ্য, কারণ যতক্ষণ আমরা মনুষ্যদেহধারী, আমাদের ঈশ্বরও মনুষ্যরূপী হইবেন। সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা না করিয়া আমরা পারি না। ভাবিয়া দেখুন, জগতের কোন বস্তুকেই আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুরূপে চিন্তা করিতে পারি না। সর্বত্রই আমরা বস্তুর সঙ্গে স্বীয় মনকে সংযুক্ত করিয়া লই। বস্তুতঃ প্রকৃত চেয়ার হইতেছে—চেয়ার ও মনের উপর চেয়ার-বস্তুটির প্রতিক্রিয়ার সংযোগ। প্রতিটি বস্তুকে প্রথমে মনের দ্বারা রঞ্জিত করিতে হইবে, উদাহরণস্বরূপ—সাদা, চারকোণা, উজ্জ্বল, শক্ত বাক্সটি কেহ তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিল, কেহ চারিটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অপর একজন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিল। শেষোক্ত ব্যক্তিই বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে একটি অধিক গুণ-সমন্বিত দেখিতে পাইল। এইরূপে যদি কোন ব্যক্তি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই একই বাক্সটি দেখে, সে

উহাতে অতিরিক্ত আর একটি গুণ দেখিতে পাইবে।

আমি প্রেম ও জ্ঞান দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই জানি যে, জগৎ-কারণ সেই প্রেম ও জ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। যাহা আমার মধ্যে প্রেম সৃষ্টি করিল, তাহা কিরূপে প্রেমশূন্য হইতে পারে? জগৎ-কারণকে আমরা মনুষ্যগুণবর্জিত চিন্তা করিতে পারি না। সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে ঈশ্বরকে পৃথগ্‌ভাবে দেখার আবশ্যকতা আছে। ঈশ্বরকে তিনভাবে চিন্তা করা যায়ঃ নিম্নতম ভাব—যখন আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই মত দেহধারী দেখিতে পাই, রোমক শিল্পকলা দেখুন; উচ্চতর ভাব—যখন ঈশ্বরের মধ্যে মানবের গুণাবলী আরোপ করি এবং এইভাবে চলিতে থাকি। সর্বশেষ উচ্চতম ভাব—তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখি।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সকল ধাপেই আমরা ঈশ্বর এবং কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। সেখানে কোন মিথ্যা কল্পনা বা ভ্রান্তি নাই। যেমন সূর্য বিভিন্ন দূরত্ব হইতে দৃষ্ট হইলেও তাহা সূর্যই—চন্দ্র বা অন্য কোন পদার্থ নয়।

আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই অনুরূপ না দেখিয়া পারি না—তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা অনন্তগুণসম্পন্ন দেখিলেও আমাদেরই মত ধরিয়া লই। আমরা নিরপেক্ষ অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য আপেক্ষিক ভূমিতে নামিয়া আসি।

প্রত্যেক ধর্মেই ভগবানের প্রতি ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত; এক প্রকারের ভক্তি—মূর্তি আচার-অনুষ্ঠান ও শব্দের মাধ্যমে, অন্যরূপ ভক্তি—প্রেমের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জগতে আমরা নানা নিয়মে বদ্ধ, আর এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা মুক্ত হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছি, প্রকৃতিকে অমান্য করিতে এবং পদদলিত করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ—প্রকৃতি আমাদের বাসস্থান দেয় না, আমরা উহা নির্মাণ করিয়া লই। প্রকৃতি আমাদিগকে অনাবৃতভাবেই সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা বস্ত্রদ্বারা নিজেদের আবৃত করিয়াছি। মানুষের লক্ষ্য হইল মুক্ত হওয়া; যে পরিমাণে আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে আমাদের কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে। নিয়মের বাহিরে যাইবার জন্যই আমরা প্রথমে নিয়ম মানিয়া চলি, নিয়ম মানিয়া না চলাই হইল সমগ্র জীবনের সংগ্রাম। এই কারণেই আমি 'ক্রিশ্চান সায়াণ্টিস্ট'দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি; তাঁহারা মানবের স্বাধীনতা ও আত্মার দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মা সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে। 'এই জগৎ আমার পিতার রাজ্য, আমিই ইহার উত্তরাধিকারী'—এই ভাবটি মানুষকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'আমার নিজ আত্মা সকলকে জয় করিতে পারে।'

মুক্তি লাভ করিবার পূর্বে আমাদিগকে নিয়মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বাহিরের সাহায্য, প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান, মত, পথ প্রভৃতির নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে; যতদিন না আমরা সাধনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হই, ততদিন এগুলি আমাদের সাহায্য করিবে এবং শক্তি দিবে। পরে আর ঐগুলির প্রয়োজন থাকে না। এগুলি যেন আমাদের ধাত্রীস্থানীয়, অতএব শৈশবে অপরিহার্য। গ্রন্থাদিও ধাত্রীর কাজই করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করিয়া সেই অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, যেখানে মানুষ উপলব্ধি করিবে, সে তাহার শরীরের প্রভু। গাছ-গাছড়া, ঔষধ প্রভৃতির প্রভাব আমাদের উপর ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ আমরা ঐগুলির সাহায্য স্বীকার করি; সবল হইলে বাহিরের নিয়ম-পদ্ধতির কোন আবশ্যকতা থাকে না।

ভক্তি-পথে শব্দের কার্যকারিতা

দেহ মনেরই স্থূল রূপ মাত্র। মন কতকগুলি সূক্ষ্ম স্তর আর দেহ কতকগুলি স্থূল স্তরের দ্বারা গঠিত। মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলে মানুষ দেহও বশীভূত করিতে পারে। প্রত্যেক মনের যেমন বিশেষ দেহ থাকে, তেমনি প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ চিন্তা বা ভাব আছে। ক্রুদ্ধ হইলে আমরা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করি—'আহাম্মক', 'মূর্খ' ইত্যাদি; আবার দুঃখিত হইলে কোমল হ্রস্ব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি—'আহা!' এগুলি অবশ্য ক্ষণিক মনোভাব মাত্র; কিন্তু প্রেম, শান্তি, স্থৈর্য, আনন্দ, পবিত্রতা প্রভৃতি সকল ধর্মেই কতকগুলি চিরন্তন মনোভাব আছে। ঐ-সকল ভাব প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট শব্দরাশি আছে। মানুষের উচ্চতম ভাবরাশির একমাত্র প্রতীক হইতেছে শব্দ। শব্দ চিন্তা হইতে জাত। আবার এই শব্দগুলি হইতে চিন্তারাশি বা ভাবরাশি জাত। এখানেই শব্দের সাহায্য প্রয়োজন। এরূপ শব্দগুলির প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক-একটি প্রতীক। এ-সকল রহস্যপূর্ণ পবিত্র শব্দরাশি আমরা জানি এবং বুঝিতে পারি, কিন্তু কেবল গ্রন্থাদিতে পড়িলেই ঐগুলি আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শব্দগুলি ভাবপূর্ণ হইলে এবং সাধনা করিয়া যিনি স্বয়ং ভগবানের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন এবং এখনও ভাগবত জীবন যাপন করেন, এরূপ ব্যক্তির স্পর্শ থাকিলে ঐগুলি ফলপ্রদ হয়। একমাত্র তিনিই ঐ ভাব-প্রবাহকে গতিদান করিতে সমর্থ। খ্রীষ্ট-দ্বারা চালিত প্রবাহ-পথেই শক্তিসঞ্চারের কার্য চলিয়া আসিতেছে। যাঁহার মধ্যে এই শক্তি-সঞ্চারের ক্ষমতা আছে, তিনিই গুরু। উত্তম আচার্যদের ঐ শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, যেমন যীশুখ্রীষ্টের। সাধারণ আচার্যগণও শব্দের মাধ্যমে এই শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অপরের দোষ দেখিবে না। দোষ দেখিয়া কাহাকেও বিচার করা যায় না। এ যেন ভূমিতে পতিত পচা অপক্ক অপরিণত আপেলগুলি দেখিয়া গাছটির বিচার করা। এইভাবে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বারা তাহার চরিত্রের বিচার হইতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, দুষ্টলোক পৃথিবীর সর্বত্রই একরূপ। চোর এবং হত্যাকারী এশিয়া, আমেরিকা ও ইওরোপে সমভাবেই দেখা যায়। তাহারা নিজেদের লইয়া একটি স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। সৎ, পবিত্র ও সরল ব্যক্তিদের মধ্যেই বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। অপরের মধ্যে অসাধুতা দেখিবার চেষ্টা করিও না। অজ্ঞতা ও দুর্বলতাই হইল অসাধুতা। মানুষকে দুর্বল বলিয়া লাভ কি? সমালোচনা আর ধ্বংসমূলক আলোচনা নিষ্ফল। মানুষকে উচ্চতর কিছু দিতে হইবে। তাহাকে তাহার মহৎ স্বভাব ও জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে অবহিত কর। আরও অধিক লোক কেন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না? কারণ খুব কম লোকই পঞ্চেন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন আনন্দের সংবাদ রাখে। অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্তর্জগতের ব্যাপার—চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কর্ণ দ্বারা শুনিতে পায় না।

এখন আমরা 'প্রেমের মধ্য দিয়া উপাসনা' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা হয় যে, 'গির্জায় অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, কিন্তু সেখানে মরা ভাল নয়।' চারাগাছ চারিপার্শ্বের বেড়া হইতে সহায়তা এবং আশ্রয় লাভ করে, কিন্তু কালে সেই বেড়া তুলিয়া না লইলে বৃক্ষটি সবল হইতে বা বাড়িতে পারিবে না। বাহ্য পূজা যে একটি প্রয়োজনীয় সোপান, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সেই সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ কর। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ প্রেম হইলে তিনি যে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্—এ-সব বড় বড় বিশেষণের কথা আর চিন্তা করিও না। আমরা ঈশ্বরের নিকট কিছুই চাই না বলিয়া তাঁহার গুণাবলী লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। ভগবানের প্রতি প্রেমই আমাদের একমাত্র কাম্য, কিন্তু তখনও সগুণ ঈশ্বরের ভাব আমাদিগকে অনুসরণ করিতে থাকে, আমরা মনুষ্যভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি না, লাফ দিয়া দেহভাবের বাহিরে যাইতে পারি না; সুতরাং আমরা যেভাবে পরস্পরকে ভালবাসি, ঈশ্বরকেও সেইভাবে ভালবাসিব।

মানব-প্রেমের পাঁচটি স্তর আছেঃ

১. অতি সাধারণ এবং নিম্নতম হইল—'শান্ত' প্রেম, তখন আমরা আশ্রয়, আহার ও সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্য পিতার উপর নির্ভর করি।
২. দাস্য-প্রেমঃ যে-প্রেম আমাদিগকে সেবার প্রেরণা দেয়। ভৃত্য যেমন প্রভুকে সেবা করে—মানুষ ভগবানকে সেইভাবে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই সেবার ভাব অন্যান্য ভাবের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে; তখন প্রভু সৎ কি অসৎ, দয়ালু কি নির্দয়, সে সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হইয়া যাই।
৩. সখ্য-প্রেমঃ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, সমানে সমানে ভালবাসা, সঙ্গীর প্রতি সঙ্গীর ভালবাসা, খেলার সাথীর প্রতি খেলার সাথীর ভালবাসা। মানুষ তখন ভগবানকে নিজ সহচর বলিয়া অনুভব করে।
৪. বাৎসল্য প্রেমঃ ভগবানকে সন্তানভাবে দেখা। ভারতে এই বাৎসল্য-ভাবটি পূর্বোক্ত সখ্য এবং শান্ত প্রেম হইতে উচ্চতর গণ্য হইয়া থাকে, কারণ ইহাতে ভয়ের বিন্দুমাত্র স্থান নাই।
৫. মধুর প্রেমঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম; ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—ভগবান্ই শ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ।

এই মধুর-ভাবটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছেঃ চারিচক্ষুর মিলন হওয়ায় দুটি আত্মার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল; প্রেম দুই আত্মার মধ্যবর্তী হইয়া দুইকে এক করিয়া দিল।

যখন কোন ব্যক্তি শেষোক্ত পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হয়, তখন তাহার সমস্ত বাসনা চলিয়া যায়। পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান গির্জা—কোন কিছুরই সে অপেক্ষা রাখে না। সকল ধর্মের লক্ষ্য—মুক্তির বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু এবং অন্যান্য বন্ধন হইতে মুক্তির ভাবও ত্যাগ করিতে হয়। সেই উচ্চতম প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই, কারণ শ্রেষ্ঠ প্রেমে পরিপূর্ণ একত্ববোধ হয়; স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞানে শারীরিক ভেদবুদ্ধি থাকে। সুতরাং মিলন একমাত্র আত্মাতেই সম্ভব। আমাদের দেহবোধ যতই ক্ষীণ হইবে, প্রেম ততই পূর্ণ হইবে; অবশেষে যাবতীয় দেহজ্ঞান দূরীভূত হইয়া দুটি আত্মা এক হইয়া যাইবে। প্রেমকে আমরা চিরদিন ভালবাসি। রূপ অতিক্রম করিয়া প্রেম অরূপকে দর্শন করে। লোকে বলে—'প্রেমিক ইথিওপের ললাটে হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে।'১ ইথিওপ একটি ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিতেরই উপর মানুষ স্বীয় প্রেম অর্পণ করে। ভক্তি যখন উত্তেজক পদার্থগুলি পরিত্যাগ করে, তখন দেখিতে পায়, মধ্যে যে বস্তু রহিয়াছে, উহা উত্তেজক পদার্থগুলিকে সুন্দর মুক্তাতে পরিণত করে; মানুষও তেমনি প্রেমের

বিস্তার করে; প্রেমই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই আদর্শই চিরদিন স্বার্থশূন্য, সুতরাং মানুষ প্রেমকেই ভালবাসে। ভগবান্ প্রেম-স্বরূপ। আমরা ভগবানকে ভালবাসি অর্থাৎ প্রেমকেই ভালবাসি। প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করি মাত্র। প্রেমকে ব্যক্ত করা যায় না। মূক ব্যক্তি মাখন আস্বাদন করিলেও মাখনের গুণাগুণ ব্যক্ত করিতে পারে না। মাখন মাখনই এবং যাহারা মাখন আস্বাদ করে নাই, তাহাদের নিকট ইহার গুণাবলী প্রকাশ করা যায় না। প্রেমের জন্যই প্রেম—যাহারা প্রেম অনুভব করে নাই, তাহাদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করা যায় না।

প্রেমকে একটি ত্রিভুজের সহিত তুলনা করা যায়। উহার প্রথম কোণটি হইল—প্রেম কখনও কিছু চায় না, কোন কিছু প্রার্থনা করে না। দ্বিতীয় কোণ— প্রেমের মধ্যে ভয়ের স্থান নাই; তৃতীয় এবং চরম কোণ—প্রেমের জন্যই প্রেম। প্রেমের প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মতর এবং উন্নততর হয়। জাগতিক সম্পর্কে চরম প্রেম দুর্লভ, কারণ মানবীয় প্রেম প্রায় সর্বদাই পারস্পরিক এবং সাপেক্ষ। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম এক অবিচ্ছিন্ন ধারার মত, উহাকে কোন কিছুই ব্যাহত বা রুদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ যখন ঈশ্বরকে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে ভালবাসে—ভিক্ষুকের মত নয় অথবা কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়, তখন সেই প্রেম চরম ক্রমবিকাশের স্তরে উপনীত হইয়া জগতে এক মহাশক্তিরূপে পরিণত হয়। এই-সকল অবস্থায় পৌঁছিতে দীর্ঘ সময় লাগে। আমাদের স্বভাবগত ভাবের সাহায্যেই আমাদিগকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে। কেহ সেবার ভাব লইয়া জন্মায়, কেহ বা মাতৃ-প্রেম লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনে আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতির সুযোগ লইতে হইবে।

জগতের কল্যাণ-সাধন

আমাকে প্রশ্ন করা হয়—তোমাদের ধর্ম, সমাজের কোন্ কাজে লাগে? সমাজকে সত্য-পরীক্ষার কষ্টিপাথর করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। সমাজ আমাদের ক্রমোন্নতির একটি সোপান মাত্র—ইহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। নতুবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুণাগুণ এবং প্রয়োজনীয়তাও শিশুর প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত আসুরিক। সামাজিক অবস্থা চিরস্থায়ী হইলে উহা শিশুর চিরকাল শিশু থাকার অনুরূপ হইবে। শিশু কখনই পূর্ণ মানব হইতে পারিবে না; ব্যবহারের বা অর্থের দিক্ হইতে শব্দগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ, সুতরাং নির্দোষ সমাজও অসম্ভব। মানুষকে শৈশব অবস্থার ভিতর দিয়াই বড় হইতে হইবে। কোন একটি বিশেষ অবস্থায় সমাজ ভাল হইতে পারে, কিন্তু উহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ সমাজ অবিরত পরিবর্তনশীল প্রবাহ মাত্র। দম্ভ এবং অহমিকাপূর্ণ বর্তমান বণিক্-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এ-সবই 'লর্ড মেয়রের প্রদর্শনী'র মত।

জগৎ ব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তাশক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে চায়। আমার গুরুদেব বলিতেন—'তুমি তোমার নিজের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত করিতেছ না কেন? অলিকুল আপনা হইতে আসিবে।' জগতে এখন ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাসবান্ হও, তাহা হইলেই ভগবানে বিশ্বাস আসিবে। জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান্ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস।

আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। প্রথমে নির্জনে থাকিয়া নিজেকে উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। নিজেকে একটি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে। প্রথমে জগতের লোকের জন্য অনুভব কর। যখন সকলেই কাজের জন্য উন্মুখ, তখন হৃদয়বান্ ব্যক্তি কোথায়? কোথায় সেই হৃদয়বত্তা, যাহা ইগনেসিয়াস লয়লাকে সৃষ্টি করিয়াছিল? তোমার বিনয় এবং প্রেম পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাহার ঈর্ষা আছে, সে বিনয়ী বা প্রেমিক হইতে পারে না। ঈর্ষা এক বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর পাপ। ইহা মানুষের মধ্যে রহস্যজনকভাবে প্রবেশ করে। নিজেকে প্রশ্ন কর—ঈর্ষা এবং হিংসায় তোমার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি? হিংসা ও ঈর্ষার জন্য জগতে বার বার বহু আরব্ধ সৎকার্য বিনষ্ট হইয়াছে। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান্ হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

সৎকর্ম-সাধনের দ্বিতীয় অঙ্গ—ধারণার জন্য মস্তিষ্ক, কিন্তু ইহা শুষ্ক সাহারা-মরুতুল্য, কারণ বুদ্ধি একা কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, যদি উহার পশ্চাতে হৃদয়বত্তা না থাকে। প্রেম অবলম্বন কর, প্রেম কোন কালে ব্যর্থ হয় না। প্রেম থাকিলে মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারিবে, হস্ত সৎকর্ম করিতে পারিবে। ঋষিরা ধ্যান-ধারণা করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন। 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ঈশ্বর দর্শন করিবে।' সকল মহাপুরুষই ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছে, এবং অতীন্দ্রিয় একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আমরা এখন সেই গৌরবোজ্জ্বল চিত্রের পরিকল্পনাটি পূর্ণ করিতে পারি মাত্র।

বাহ্যপূজা

[১০ এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীঃ আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বাইবেল পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহুদি-জাতির সমগ্র ইতিহাস এবং চিন্তাধারার মূলে রহিয়াছেন দুই শ্রেণীর শিক্ষক—পুরোহিত ও ধর্মগুরুগণ। পুরোহিতগণ রক্ষণশীলতার এবং ধর্মগুরুগণ প্রগতিশীলতার প্রতীক। মোট কথা এই সমাজে ক্রমে ক্রমে গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতা প্রবেশ করে, বাহ্য আচার সবকিছুকে অধিকার করিয়া বসে। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। তারপর কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আবির্ভূত হন। তাঁহারা নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ প্রচার করেন এবং সমাজকে গতিশীল করিয়া তোলেন। কয়েক পুরুষ যাইতে না যাইতেই শিষ্যগণ নিজ নিজ গুরুর প্রচারিত ভাবসমূহের প্রতি এত বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়ে যে, ঐগুলি ছাড়া তাহারা অন্য কিছু দেখিতে পায় না। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল এবং উদার-মতাবলম্বী প্রচারকগণও কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া পুরোহিতে পরিণত হইবেন। আবার প্রগতিবাদী মনীষিগণও—কাহারও মধ্যে সামান্য প্রগতি দেখিলে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া সমাজ অগ্রসর হউক—ইহা তাঁহারা চাহিবেন না। যাহা-কিছু যেভাবে চলিতেছে, ঐভাবে চলিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্মের প্রাথমিক নীতিগুলির মধ্যে যে-শক্তি কাজ করে, তাহা ধর্মের বাহ্যরূপে প্রকাশিত হয়। ... নীতি বা গ্রন্থ, কতকগুলি নিয়ম, বিশেষ প্রকারে অঙ্গ-সঞ্চালন, দাঁড়ানো বা বসিয়া পড়া—এ-সবই উপাসনার পর্যায়ভুক্ত। অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে ধারণা করিতে পারে, সে-জন্য পূজা স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকই একটি ভাবকে কখনও ভাবরূপে পূজা করে না। ইহা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে যে কোনদিন হইবে, তাহাও মনে হয় না। এই শহরের কয় সহস্র ব্যক্তি ঈশ্বরকে একটি ভাব-রূপে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত? অতি সামান্যই। মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস করে, তাই ঐরূপ করিতে পারে না। মানুষকে আরও পূর্ব হইতে ধর্মভাব দিতে হইবে। তাহাকে স্থূলভাবে কিছু করিতে বলোঃ কুড়িবার উঠিতে এবং কুড়িবার বসিতে বল, সে উহা বুঝিবে। তাহাকে এক নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে এবং অপর রন্ধ্র দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বলো—সে উহা বুঝিবে। নিছক ভাবগত আদর্শ মানুষ মোটেই গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের দোষ নয়। ... ঈশ্বরকে ভাব-রূপে পূজা করার শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে উত্তম। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন তুমি উহা পারিতে না। ... লোকেরা যদি স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ধর্ম সম্বন্ধে ধারণাগুলি অপরিণত এবং ধর্মের বহিরঙ্গগুলি স্থূল ও অমার্জিত হইয়া পড়ে। লোকেরা যদি মার্জিত ও শিক্ষিত হয়, তাহাদের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি আরও সুন্দর হয়। বাহ্য অনুষ্ঠানাদি থাকিবে, সেগুলি শুধু কালের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হইবে।

ইহা আশ্চর্য যে, মুসলমানধর্ম যেভাবে বাহ্যপূজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম কখনও সেরূপ করে নাই। ... চিত্র, স্থাপত্য বা সঙ্গীত— মুসলমানদের থাকিতে পারিবে না, কেন-না এইগুলি বাহ্যপূজার সহায়ক। জনসাধারণের সঙ্গে পুরোহিতের কখনও যোগাযোগ হইবে না, হইলেই পার্থক্যের সৃষ্টি হইবে। এইভাবে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তবু পয়গম্বরের দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী যাইতে না যাইতেই সাধু-সন্তের পূজা প্রবর্তিত হইল। এইখানে সাধুর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ! ঐখানে তাঁহার গাত্রচর্ম!—এইভাবে চলিতে লাগিল। বাহ্যপূজা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্যতম সোপান এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

সুতরাং বাহ্যপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া উহার যেটুকু ভাল, তাহা গ্রহণ করা উচিত, এবং অন্তর্নিহিত ভাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। অবশ্য সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের পূজা বলিতে গাছ-পাথরের পূজাই বুঝায়। প্রত্যেক অমার্জিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিই যে-কোন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া উহাতে নিজস্ব ভাব যোগ করিয়া দিবে, তাহাতেই তাহার সাহায্য হইবে। সে একখণ্ড অস্থি বা পাথর পূজা করিতে পারে। বাহ্যপূজার এই সকল অপরিণত অবস্থায় মানুষ কিন্তু কখনও পাথরকে পাথর হিসাবে বা গাছকে গাছ হিসাবেই পূজা করে নাই—সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই তোমরা এটুকু জান। পণ্ডিতেরা অনেক সময় বলেন—মানুষ গাছ-পাথরের পূজা করিত। এ-সবই অর্থহীন। মানবজাতি যে-সকল নিম্নস্তরের পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, বৃক্ষ-পূজা ঐগুলির অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে কখনই মানুষ ভাব ছাড়া অন্য কিছুরই পূজা করে নাই। মানুষ ভাবস্বরূপ এবং ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারে না। দেবভাবে পূর্ণ মনুষ্য-মন সূক্ষ্মভাবকে জড়বস্তুরূপে উপাসনা করার মত এত বড় ভুল কখনও করিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে মানুষ পাথর বা গাছকে ভাবরূপেই চিন্তা করিয়াছে। সে কল্পনা করিয়াছে যে, সেই পরম সত্তার কিছুটা এই পাথর বা গাছে রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে আত্মা আছেন। বৃক্ষপূজা এবং সর্পপূজা সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জ্ঞান-বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ অবশ্যই থাকিবে এবং সর্পের সহিত ঐ বৃক্ষ কোন-না-কোন ভাবে জড়িত থাকিবে। এগুলি প্রাচীনতম পূজা-পদ্ধতি। সেখানেও দেখিবে, কোন বিশেষ প্রস্তর বা বিশেষ বৃক্ষই পূজিত হইয়াছে—পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষ এবং যাবতীয় প্রস্তরকে পূজা করা হয় নাই।

বাহ্যপূজার উন্নততর সোপানে ঈশ্বরের বা পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তিকে পূজা করা হয়। লোকে মৃত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি এবং ঈশ্বরের কাল্পনিক প্রতিমা নির্মাণ করে। পরে তাহারা ঐগুলি পূজা করে।

আরও উন্নততর পূজা—মৃত সাধু-সন্ত, সজ্জন বা সতী-সাধ্বীদের পূজা। লোকে তাঁহাদের দেহাবশেষ পূজা করে। তাহারা ঐ দেহাবশেষের মধ্যে সাধু-মহাপুরুষগণের উপস্থিতি অনুভব করে এবং মনে করে যে, তাঁহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঐ সাধু-মহাপুরুষগণের অস্থি স্পর্শ করিলে তাহাদের রোগ সারিবে। দেহাস্থিই যে তাহাদিগকে নিরাময় করিবে তাহা নয়, দেহাস্থির মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই তাহাদের রোগ আরোগ্য করিবেন।

এ-সবই নিম্নাঙ্গের পূজা, তথাপি এগুলি পূজা। আমাদিগকে ঐগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। বুদ্ধি-বিচারের দিক্ দিয়া দেখিলে শুধু ঐগুলি যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু অন্তরের দিক্ দিয়া আমরা এগুলি ছাড়িতে পারি না। যদি তুমি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সাধু-মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তিগুলি সরাইয়া লও এবং তাহাকে কোন মন্দিরে যাইতে না দাও, তাহা হইলে সে মনে মনে ঐগুলি স্মরণ করিবে। সে উহা না করিয়া পারিবে না। একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের বিষয় ভাবিতে গেলেই মেঘের উপর উপবিষ্ট দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ ছাড়া অন্য কাহারও কথা তাঁহার মনে উদিত হয় না। ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষাই তিনি পান নাই এবং মানবিক ভাব ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিতে তিনি অক্ষম।

বাহ্য উপাসনার আরও একটি উন্নততর সোপান আছে—প্রতীক-উপাসনা। বাহ্যবস্তু সেখানেও বর্তমান, কিন্তু তাহা বৃক্ষ প্রস্তর বা সাধু-মহাত্মাদের স্মৃতিচিহ্ন নয়। ঐগুলি প্রতীক। পৃথিবীতে সর্বপ্রকার প্রতীকই বর্তমান। বৃত্ত অনন্তের একটি মহৎ প্রতীক। ... ইহার পর সমচতুর্ভুজ; সুপরিচিত ক্রুশপ্রতীক এবং ইংরেজী S ও Z পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে কাটিয়াছে—এরূপ দুইটি আঙুল প্রভৃতি রহিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করে, এই প্রতীকগুলির কোন সার্থকতা নাই। ... আবার কেহ কেহ অর্থহীন কোন জাদুমন্ত্র চায়। যদি তুমি উহাদিগকে সহজ সরল সত্য কথা বলো, তবে উহারা গ্রহণ করিবে না। ... মানুষের স্বভাবই এই—তাহারা তোমাকে যত কম বুঝে, ততই তোমাকে ভাল ও বড় মনে করে। প্রত্যেক দেশে সব যুগেই এরূপ উপাসকেরা কতগুলি জ্যামিতিক চিত্র এবং প্রতীক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। একদা জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অধিকাংশ লোকই এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, জ্যামিতিবিদ্ একটি সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত করিয়া উহার চারি কোণে অর্থহীন জাদুমন্ত্রবিশেষ বলিলেই সমগ্র পৃথিবী ঘুরিতে শুরু করিবে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং ভগবান্ অবতরণ করিয়া লাফাইতে থাকিবেন ও মানুষের ক্রীতদাস হইয়া পড়িবেন। দলে দলে এইরূপ উন্মাদ দিবারাত্র এ-সকল বিষয় একাগ্রমনে পড়ে। এ-সবই ব্যাধিবিশেষ। ইহাদের চিকিৎসক প্রয়োজন। দার্শনিকদের জন্য এ-সব নয়।

আমি কৌতুক করিতেছি, কিন্তু এজন্য খুবই দুঃখিত। সমস্যাটি ভারতে অত্যন্ত গুরুতর। এইগুলি জাতির ধ্বংস, অবনতি এবং অবৈধ বলপ্রয়োগের লক্ষণ। তেজ, বীর্য, জীবনীশক্তি, আশা, স্বাস্থ্য এবং যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহার লক্ষণই হইল শক্তি। যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন দেহ, মন এবং বাহুতে বল থাকা আবশ্যক। এই-সব অর্থহীন জাদুমন্ত্রবিশেষ দ্বারা অধ্যাত্মশক্তি অর্জনের চেষ্টা বিশেষ ভয়ের কারণ—ইহাতে জীবন-নাশের ভয়ও আছে। 'প্রতীক উপাসনা' বলিতে আমি ঐগুলি বলি নাই। কিন্তু এই প্রতীকোপাসনায় কিছু সত্য নিহিত আছে। কিছু সত্য ব্যতিরেকে কোন মিথ্যাই দাঁড়াইতে পারে না। কোন বস্তুর বাস্তব সত্তা না থাকিলে উহার অনুকরণও হইতে পারে না।

বিভিন্ন ধর্মে প্রতীক-পূজা বর্তমান। এমন সব প্রতীক আছে, যেগুলি সুন্দর, শক্তিপ্রদ, বলিষ্ঠ এবং ছন্দোময়। ভাবিয়া দেখ, লক্ষ লক্ষ লোকের উপর ক্রুশের কি আশ্চর্য প্রভাব! অর্ধচন্দ্ররূপ প্রতীকের কথা ধর। এই একটি প্রতীকের যে কি আকর্ষণী শক্তি, সে-কথা চিন্তা করিয়া দেখ। পৃথিবীতে সর্বত্রই সুন্দর ও চমৎকার প্রতীকসমূহ বর্তমান। এই প্রতীকগুলি ভাব প্রকাশ করে এবং কতকগুলি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। সচরাচর প্রতীকগুলি বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি স্ফুরণ করে।

প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের তুলনা করিয়া দেখ। বিগত চারিশত বৎসরের মধ্যে এই দুইটি সম্প্রদায়ের কোনটি হইতে অধিকসংখ্যক সাধক ও শহীদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্যাথলিকদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত আলোক, ধূপধুনা, মোমবাতি, যাজকদের পোষাক প্রভৃতির একটা স্বকীয় প্রভাব রহিয়াছে। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম অতি শুষ্ক ও গদ্যময়। প্রোটেস্টাণ্টরা অনেক বিষয়ে জয়যুক্ত হইয়াছে, কয়েকটি দিকে ক্যাথলিকদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ধারণাগুলি স্পষ্টতর এবং অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক। এই পর্যন্ত ঠিক থাকিলেও তাহারা অনেক কিছু হারাইয়াছে। ... গির্জার মধ্যে চিত্রগুলির কথাই ধরা যাক। এগুলি কবিত্ব-শক্তিকে ভাষা দিবার একটি প্রচেষ্টা, কবিতার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে কেন আমরা উহা গ্রহণ করিব না? অন্তরাত্মা যাহা চাহিতেছে, তাহা অন্তরাত্মাকে দিব না কেন? আমাদিগকে সঙ্গীতও গ্রহণ করিতে হইবে। প্রেসবিটেরিয়ানরা আবার সঙ্গীতেরও বিরোধী, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে উহারা যেন মুসলমান। সমস্ত কবিতা ধ্বংস হউক! সমস্ত অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হউক! তারপর তাহারা যে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, সে সঙ্গীত ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমি দেখিয়াছি, কিরূপে তাহারা বক্তৃতামঞ্চের উপর আলোকের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে।

বহির্জগতে রূপায়িত কবিতায় ও ধর্মে অন্তঃকরণ পূর্ণ হউক। কেন না হইবে? বাহ্য উপাসনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার না—বার বার ইহা সমাজে জয় লাভ করিবে। ... ক্যাথলিকরা যাহা করে, তাহা যদি তোমার রুচিসম্মত না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আরও ভাল কিছু কর। কিন্তু আমরা আরও ভাল কিছু করিতেও পারিব না, অথচ যে কবিত্ব পূর্ব হইতে বিদ্যমান, তাহাও গ্রহণ করিব না—এটি এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। জীবনে কবিত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক। তুমি পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পার, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহা শুষ্ক অস্থি নয়, ইহা সমস্ত বস্তুর সার। যাহা নিত্য সত্তা, তাহা দ্বৈতভাবাপন্ন যে-কোন বস্তু অপেক্ষা অধিকতর কবিত্বপূর্ণ।

পাণ্ডিত্যের স্থান নাই। অধিকাংশের পক্ষেই পাণ্ডিত্য সাধন-পথে একটি বাধা। ... একজন পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক পড়িয়াও মোটেই ধার্মিক না হইতে পারে, আর একজন হয়তো নিরক্ষর হইয়াও ধর্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ। নিজের

প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত। আমি যখন 'মনুষ্যত্ব-লাভের বা মানুষ-গড়ার ধর্ম'—এই শব্দ-কয়টি ব্যবহার করি, তখন আমি ঐগুলি দ্বারা কোন পুস্তক, অনুশাসন বা মতবাদের কথা বুঝি না। যে-ব্যক্তি সেই অনন্ত সত্তার এতটুকুও তাহার অন্তরে অনুভব করিয়াছে বা ধারণা করিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলি।

আমি সারা জীবন যাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, যাঁহার কয়েকটিমাত্র ভাব শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি, তিনি কোনক্রমে তাঁহার নিজের নাম লিখিতে পারিতেন। আমি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সারা জীবনে আমি তাঁহার মত আর একজনকেও দেখিলাম না। তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিলে নিজেকে নির্বোধ বলিয়া মনে হয়, কেন-না আমি বই পড়িতে চাই, অথচ তিনি কোনদিনই বই পড়েন নাই। অন্যের উচ্ছিষ্ট তিনি কখনও গ্রহণ করিতে চাহিতেন না অর্থাৎ অন্যের চিন্তাধারাকে কোনদিন তিনি নকল করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে তিনি নিজেই নিজের বই ছিলেন। সারা জীবন জ্যাক (Jack) কি বলিল, জন (John) কি বলিয়াছে—তাহাই বলিয়া আসিতেছি; নিজে কিছুই বলিলাম না। জন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এবং জ্যাক পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছে, তাহা জানিয়া তোমার কী লাভ হইয়াছে? তোমার নিজের কি বলিবার আছে, তাই বলো।

মনে রাখিও—পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলেরই ধারণা ভুল। মনকে বলিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই জ্ঞানের একমাত্র মূল্য। আমি অবাক্ হইতেছি যে অনন্ত কাল ধরিয়া এই গলাধঃকরণের দ্বারা আমাদের বদহজম হইতেছে না কেন? আমাদের এইখানেই থাকিয়া যাবতীয় পুস্তক পুড়াইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং নিজেদের অন্তরে চিন্তা করা কর্তব্য। তোমরা অনেক বিষয়ে কথা বলো এবং তোমাদের 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য'কে হারাইবার আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া ওঠ। এই অন্তহীন গলাধঃকরণের দ্বারা প্রতি মুহূর্তেই তোমরা ব্যক্তিত্ব হারাইতেছ। আমি যাহা শিক্ষা দিতেছি, তাহা যদি তোমাদের মধ্যে কেহ শুধু বিশ্বাস করে, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব; তোমাদের মধ্যে যদি স্বাধীন চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত করিতে পারি, তবেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। ... আমার উদ্দেশ্য—নরনারীকে বলা, মেষগুলিকে নয়। 'নরনারী' বলিতে আমি 'মানুষ' বুঝি। তোমরা ক্ষুদ্র মানুষ নও যে, পথের নোংরা ন্যাকড়া টানিয়া আনিয়া খেলার পুতুল তৈরি করিবে।

এই জগৎ একটি শিক্ষার স্থান! মানুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ব্ল্যাঙ্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সে সবই জানে! কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক কিছুই বলেন নাই! খুশীমত কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমি অধ্যাপককে বলিতাম, 'বাহিরে যাও! তোমার কোন প্রয়োজন নাই!' এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধকে যে-কোন উপায়ে মনে রাখিবে! তোমার চিন্তা যদি ভুল হয় হউক, তুমি সত্য লাভ করিলে কি না করিলে তাহাতে কিছু আসে যায় না। মূল কথাটি হইল—মনকে নিয়ন্ত্রিত করা। যে-সত্য তুমি অপরের নিকট হইতে লইয়া গলাধঃকরণ করিবে, তাহা তোমার নিজস্ব হইবে না। আমার মুখে সত্য শুনিয়া তাহা শিক্ষা দিতে পার না এবং আমার মুখে শুনিয়াও কোন সত্য তুমি শিখিতে পার না। কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না। সত্য অনুভব করিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। ... নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, নিজেদের চিন্তা করিয়া, নিজেদের আত্মা উপলব্ধি করিয়া, সকলকেই শক্তিমান্ হইতে হইবে। কারাগারে আবদ্ধ সৈনিকদের মত একসঙ্গে উঠা, একসঙ্গে বসা, একই খাদ্য খাওয়া, একসঙ্গে মাথা নাড়িয়া অন্যের প্রচারিত মতবাদ গলাধঃকরণ করা প্রভৃতিতে কোন ফল নাই। বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। সমতাই (একই রকম চিন্তা করা) মৃত্যুর লক্ষণ।

একবার একটি ভারতীয় শহরে অবস্থানকালে এক বৃদ্ধ আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'স্বামীজী, আমার পথ নির্দেশ করুন।' আমি দেখিলাম যে, লোকটি আমার সম্মুখের টেবিলটির মত একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে; মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছিল। আমি বলিলাম, 'তোমাকে যাহা নির্দেশ দিব, তাহা পালন করিবে কি? তুমি কি চুরি করিতে পার? তুমি মদ খাইতে পার? মাংস খাইতে পার? লোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ আপনি আমাকে কী শিক্ষা দিতেছেন?' আমি তাহাকে বলিলাম, 'এই দেওয়ালটি কি কখনও চুরি করিয়াছে? এ কি কখনও মদ খাইয়াছে?' লোকটি উত্তর দিল, 'না, মহাশয়।' মানুষই চুরি করে, মদ খায়, আবার ঈশ্বরত্ব লাভ করে।

'বন্ধু, আমি জানি, তুমি একটি দেওয়াল মাত্র নও। কিছু একটা কর! কিছু একটা কর!' আমি অনুভব করিয়াছিলাম, লোকটি চুরি করিলে তাহার আত্মা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। তোমাদের যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব?—তোমরা তো এক সঙ্গে ওঠ, একসঙ্গে বস এবং একই কথা বল। ইহা মৃত্যুর পথ জানিবে। তোমার আত্মার জন্য কিছু কর। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অন্যায় কর, কিন্তু একটা কিছু কর! আমাকে তোমরা এখন বুঝিতে না পারিলেও ক্রমে বুঝিতে পারিবে। আত্মা যেন বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছে, উহার উপর মরিচা ধরিয়াছে। এই মরিচা ঘষিয়া মাজিয়া ছাড়াইতে হইবে, তবেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব। জগতে এত অন্যায় কেন, তাহা তোমরা এখন বুঝিতেছ। এই মরিচা হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্যই গৃহে ফিরিয়া এ-বিষয়ে চিন্তা কর।

আমরা জাগতিক বস্তুসকলের জন্য প্রার্থনা করি। কোন উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত আমরা ব্যবসায়ী বুদ্ধি লইয়া ভগবানের পূজা করি। খাওয়া-পরার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। পূজা উত্তম। কিছু না করা অপেক্ষা কিছু একটা করা ভাল। 'নাই মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।' অত্যন্ত ধনী এক যুবক রোগাক্রান্ত হইল, অমনি সে আরোগ্যলাভের জন্য গরীবদের দান করিতে আরম্ভ করিল। ইহা ভাল কাজ, কিন্তু ইহা ধর্ম নয়—আধ্যাত্মিকতা নয়, ইহা জাগতিক ব্যাপার। কোন্‌টা জাগতিক এবং কোন্‌টা জাগতিক নয়? যখন উদ্দেশ্য ইহজীবন, এবং ভগবান্ সেই উদ্দেশ্য-লাভের উপায়রূপে ব্যবহৃত হন, তখন তাহা জাগতিক। আবার যেখানে ঈশ্বর-লাভই উদ্দেশ্য এবং জাগতিক জীবন সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানেই অধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। সুতরাং যে-ব্যক্তি এই জাগতিক জীবনে প্রাচুর্য কামনা করে, তাহার নিকট এই জীবনের স্থায়িত্ব তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সে পরলোকগত ব্যক্তিদের দেখিতে চায় এবং তাহাদের সহিত আবার সুখে দিন কাটাইতে চায়।

যে-সকল মহিলা প্রেতাত্মাদের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিডিয়াম বা মাধ্যম। দেখিতে দীর্ঘাকার, তবু তিনি মাধ্যম। বেশ! এই মহিলা আমাকে খুবই পছন্দ করিতেন এবং তাহার নিকট যাইবার জন্য আমন্ত্রণ

করিয়াছিলেন। প্রেতাত্মারা সকলেই আমার প্রতি বিনম্র ছিল। আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। বুঝিতেই পারিতেছ, ইহা ছিল মধ্যরাত্রে প্রেতশক্তি-বাদীদের বৈঠক। মাধ্যম বলিল, '... আমি একজন প্রেতকে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছি। প্রেত আমাকে বলিতেছে যে, ঐ বেঞ্চের উপর একজন হিন্দু ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।' আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, 'তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য কোন প্রেতাত্মার সাহায্য প্রয়োজন হয় না।'

সেখানে একজন সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ এবং বিবাহিত যুবক উপস্থিত ছিল। সে তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। মাধ্যম বলিল, 'অমুকের মা এখানে আসিয়াছেন।' যুবকটি তাহার মায়ের বিষয় আমাকে বলিতেছিল—তাহার মা মৃত্যুকালে খুবই ক্ষীণদেহ হইয়া পড়েন। কিন্তু পর্দার অন্তরাল হইতে যে-মা বাহির হইল! তোমরা যদি তাহাকে দেখিতে! যুবকটি কি করে, তাহা দেখিতে চাহিলাম। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, যুবকটি লাফাইয়া সেই প্রেতাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'মাগো, তুমি প্রেতলোকে গিয়া অপরূপ হইয়াছ!' আমি বলিলাম, 'আমি ধন্য যে আমি এইখানে উপস্থিত আছি। এই-সব ঘটনা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে।'

বাহ্য উপাসনার প্রসঙ্গে আবার বলি, ইহজীবন এবং জাগতিক সুখের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঈশ্বরকে উপাসনা করা অতি নিম্নস্তরের পূজা। ... অধিকাংশ লোকই দেহের এই মাংসপিণ্ড এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ অপেক্ষা উচ্চতর কোন চিন্তা করিতে পারে না। এই বেচারারা এই জীবনেই যে-সুখের সন্ধান করে, সে-সুখ পাশব সুখ ... । তাহারা প্রাণিখাদক। তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের ভালবাসে। ইহাই কি মানুষের সব গৌরব? আমরা আবার সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে পূজা করি। কি জন্য? কেবল এই-সব জাগতিক বস্তু পাইবার জন্য এবং সর্বদা ঐগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য। ... ইহার অর্থ এই যে, আমরা এখনও পশুপক্ষীর জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। পশু-পক্ষী অপেক্ষা আমরা মোটেই উন্নততর নই। আমরা উন্নততর কিছু জানিও না। আমাদিগকে ধিক্! আমাদের আরও উচ্চতর শিক্ষা পাওয়া উচিত। পশুপক্ষীদের সহিত আমাদের তফাত এই যে, আমাদের মত তাহাদের ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। ... পশুদের মত আমাদেরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি আরও তীক্ষ্ণ। একটি কুকুর যেরূপ তৃপ্তি সহকারে একখণ্ড হাড় চিবায়, আমরা একগ্রাস অন্ন তেমন তৃপ্তির সহিত খাই না। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের জীবনে আনন্দ বেশী। সুতরাং আমরা পশুদের চেয়ে একটু নিকৃষ্ট।

তোমরা কেন এমন কিছু হইতে চাহিবে যাহাতে প্রকৃতির কোন শক্তি তোমাদের উপর অধিকতর কার্যকরী হইবে? ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তনীয় বিষয়। কি তোমাদের কাম্য—এই জীবন, ইন্দ্রিয়সুখ, এই শরীর অথবা অনন্তগুণে মহৎ এবং উচ্চতর কোন কিছু বস্তু, এমন একটি অবস্থা যাহার কোন চ্যুতি নাই. যেখানে কোন পরিবর্তন নাই?

অতএব ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তোমরা বল, 'হে প্রভু, অন্ন দাও, অর্থ দাও, আমার রোগ নিরাময় কর, ইহা কর, তাহা কর!' যখনই তোমরা এইরূপ প্রার্থনা কর, তখনই 'আমি জড়বস্তু, জড়জগৎই আমার লক্ষ্য'—এই ভাবে নিজেদের সম্মোহিত করিয়া থাক। প্রত্যেকবারই যখন তোমরা জাগতিক অভিলাষ পূরণের জন্য উদ্যোগী হও, ততবারই তোমরা বলিতে থাক—'আমরা জড়দেহ মাত্র, আমরা আত্মা নই।' ...

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি সব স্বপ্ন মাত্র। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সৃষ্টিতে মৃত্যু—সেই মহান্ মৃত্যু আছে, যাহা সব ভ্রান্তি, সব স্বপ্ন, এই দেহবাদিতা, এই মর্মবেদনার অবসান ঘটাইয়া দেয়। কোন স্বপ্নই চিরস্থায়ী হইতে পারে না—শীঘ্র অথবা বিলম্বে ইহা অবশ্যই শেষ হইবে। স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করিতে পারে, এমন কেহ নাই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবুও বলিব, এই প্রকারের উপাসনার সার্থকতা আছে। এভাবে চলিতে থাকো। প্রার্থনা একেবারে না করা অপেক্ষা কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা ভাল। এই সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এগুলি প্রাথমিক শিক্ষা। মন ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, দেহ, এই জাগতিক ভোগসুখের ঊর্ধ্বে কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

মানুষ কিরূপে ইহা করে? প্রথমে মানুষ চিন্তাশীল হয়। তুমি যখন কোন একটি সমস্যা চিন্তা করিতে থাক, তখন সেখানে চিন্তারই এক অপূর্ব আনন্দ আসে, ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ বলিয়া কিছু থাকে না। ... এই আনন্দই মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে লইয়া যায়। ... একটি মহৎ ভাবের বিষয় চিন্তা কর। ... চিন্তা যতই গাঢ় হইবে এবং মন সংযত হইবে, তখন তোমার দেহের বিষয় আর মনে উদিত হইবে না। তোমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন তুমি সমস্ত দেহ-জ্ঞানের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইবে। তখন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছিল, সবই ঐ একটি ভাবে কেন্দ্রীভূত হইবে। ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি পশু অপেক্ষা উন্নত। সেই সময় দেহাতীত এমন একটি অনুভূতি, এমন একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তুমি লাভ করিবে, যাহা কেহই তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ... মনের লক্ষ্য সেখানে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নয়।

এইরূপে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি অন্য অনুভূতির রাজ্যে একটু করিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তখন এই জগৎ বলিয়া তোমার নিকট আর কিছুই থাকিবে না। যখন তুমি সেই আত্মার একটু আভাস পাইবে, তখন তোমার ইন্দ্রিয়বোধ, তোমার ভোগাকাঙ্ক্ষা, তোমার দেহাসক্তি চলিয়া যাইবে। সেই ভাররাজ্যের আভাস একের পর এক তোমার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। তোমার যোগ সম্পূর্ণ হইবে এবং আত্মা তোমার নিকট আত্মারূপেই প্রতিভাত হইবে। তখনই তুমি ঈশ্বরকে আত্মারূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিবে। তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, উপাসনা কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নয়|অন্তরের অন্তরে এই পূজা ছিল ভালবাসা, যাহা অসীম হইয়াও সসীম; ঈশ্বররের পাদপদ্মে ইহা অন্তরের চিরন্তন আত্মনিবেদন—সর্বস্ব অর্পণ। সেখানে কেবল 'তুমি', 'আমি' নই। 'আমি' সেখানে মৃত—'তুমি'ই সেখানে আছ, 'আমি' নাই। সেখানে আমি ধন, সৌন্দর্য, এমন কি পাণ্ডিত্যও কামনা করি না। আমি মুক্তি চাই না। যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে বিশ হাজার বার নরক গমন করিব। আমি কেবল একটি বস্তু কামনা করিঃ হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রেমাস্পদ হও।

উপাসক ও উপাস্য

[১৯০০ খ্রীঃ ৯ এপ্রিল আমেরিকায় সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর বক্তৃতার কোন কথা বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে ... চিহ্ন দেওয়া আছে। ( ) বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ অনুলেখিকা কর্তৃক স্বামীজীর বাক্যের পরিপূরক হিসাবে বসান হইয়াছে।]

মানব-প্রকৃতির যে দিক্‌টি অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক, আমরা উহার আলোচনা করিতেছিলাম।

২

এখন আমরা আবেগ-প্রধান দিক্‌টি দেখিব। ... পূর্বেরটি মানুষকে গ্রহণ করে একটি সীমাহীন সত্তারূপে—নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হিসাবে; অপরটিতে মানুষ একটি সীমাবদ্ধ জীব; ... কয়েক ফোঁটা চোখের জল বা কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসের জন্য প্রথমটির অপেক্ষা করিবার সময় নাই; দ্বিতীয়টি কিন্তু ঐ অশ্রুবিন্দু না মুছিয়া দিয়া, ঐ বেদনার ক্ষত আরোগ্য না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমটি বৃহৎ—এত বৃহৎ ও চমৎকার যে, সময়ে সময়ে ঐ বিস্তার আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। অপরটি অতি সাধারণ, কিন্তু তবুও বড় সুন্দর এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহী। প্রথমটি আমাদিগকে এত উঁচুতে লইয়া যায় যে, আমাদের ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সেই বায়ুমণ্ডলে আমরা নিঃশ্বাস লইতে পারি না। অপরটি যেখানে আমরা আছি, আমাদিগকে সেইখানেই রাখিয়া দেয় এবং জীবনের নানা বিষয়ে (সীমায়িতভাবে) দেখিবার চেষ্টা করে। একটি কোন কিছুই গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ না উহাতে বুদ্ধির দেদীপ্যমান ছাপ দেওয়া হইতেছে; অন্যটি দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বাসের উপর; যাহা সে দেখিতে পায় না, তাহা সে মানিয়া লয়। দুইটিরই প্রয়োজন আছে। পাখি কখনও একটি মাত্র ডানায় উড়িতে পারে না।

আমরা এমন মানুষ দেখিতে চাই, যিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন ... উদারহৃদয়, উন্নতমনা (কর্মে নিপুণ)। প্রয়োজন এইরূপ ব্যক্তির, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের দুঃখ-কষ্ট তীব্রভাবে অনুভব করে। ... আর (আমরা চাই) এমন মানুষ, যিনি শুধু অনুভব করিতে পারেন তাহা নয়, পরন্তু বস্তুনিচয়ের অর্থ ধরিতে পারেন, যিনি প্রকৃতি এবং বুদ্ধির মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দেন। (আমাদের দরকার) এমন মানুষের, যিনি সেখানেও থামেন না, (কিন্তু) যিনি (সেই অনুভবকে বাস্তব কর্মে) রূপায়িত করতে ইচ্ছুক। মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং হাত—এই তিনটির এই প্রকার সমন্বয় আমাদের কাম্য। জগতে অনেক লোক-শিক্ষক আছেন, কিন্তু দেখিতে পাইবে—(তাঁহাদের অধিকাংশই) একদেশী। কাহারও দৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের উপর, অন্য কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না। অপর কেহ বা শুনেন প্রেমের সুমধুর গীতি এবং ইহা ছাড়া আর কিছুতে কান দিতে পারেন না। আবার আর একজন আছেন কাজে (ডুবিয়া), তাঁহার অনুভূতি বা চিন্তার সময় নাই। এরূপ একজন মহামানব কেন (চাও) না—যিনি যেমন কর্মী, তেমনি জ্ঞানী, আবার সমানভাবে প্রেমিক? ইহা কি সম্ভব?—নিশ্চয়ই নয়। ভবিষ্যতের মানুষ হইবেন এই প্রকৃতির। বর্তমানকালে (কেবল মাত্র) অল্প কয়েকজনই এইরূপ আছেন। (ইঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে) যতদিন না সারা পৃথিবী এই ধরনের মানুষে পূর্ণ হয়।

আমি তোমাদিগকে এতদিন মেধা (এবং) বিচারের সম্বন্ধে বলিয়াছি। সমগ্র বেদান্ত আমরা শুনিলামঃ মায়ার যবনিকা টুটিয়া যায়, ঘন মেঘ সরিয়া গিয়া সূর্যালোক আমাদের উপর দীপ্তি পায়। এ যেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গদেশ অধিরোহণের চেষ্টা, মেঘের রাজ্যের ওপারে অদৃশ্য যে শৃঙ্গগুলি রহিয়াছে—সেখানে পৌঁছিতে হইবে। এখন আমরা অন্য দিক্‌টি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই—অতি সুরম্য উপত্যকাগুলি—প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য! (আমরা আলোচনা করিব) ভালবাসা—যাহা সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা সত্ত্বেও আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, সেই প্রেম—যাহার জন্য আমরা দুঃখের শিকল গড়িয়াছি, যাহার জন্য মানুষ অনন্তকাল স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে আত্মবলিদান এবং সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করিয়া চলিয়াছে উহার কষ্ট। সেই অনন্ত অনুরাগ, যাহার জন্য মানুষ নিজের হাতে বন্ধন পরে, দুর্গতি ভোগ করে—তাহাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। অপরটি আমরা যে ভুলিয়া যাইব, তাহা নয়। হিমালয়ের হিমবাহ কাশ্মীরের ধান্যক্ষেত্রের সহিত মিতালি করুক। বজ্রের গুরুগর্জনের সহিত মিশিয়া যাক পাখির কাকলি।

যাহা কিছু অতি পরিপাটি ও মনোহর, তাহা লইয়াই আমাদের বর্তমান আলোচনা। পূজাপ্রবৃত্তি তো সর্বত্রই আছে, প্রত্যেক জীবে। প্রত্যেকেই ভগবানের আরাধনা করে। যে নামই দেওয়া যাক না কেন, তিনি সকলের পূজা পাইতেছেন। পৃথিবীর কর্দমে—যেমন সুন্দর পদ্মফুলের, যেমন জীবনের আরম্ভ, উপাসনার আদিও সেইরূপ। ... (প্রথমে) খানিকটা ভয়ের ভাব থাকে, পার্থিব লাভের দিকে আকাঙ্ক্ষা থাকে। ভিখারীর পূজা। এগুলি পূজাবৃত্তির প্রারম্ভিক। (উহার অবসান) ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া।

ভগবান্ আছেন কি? এমন একজন কেহ আছেন কি, যাঁহাকে ভালবাসা যায়, যিনি ভালবাসা গ্রহণ করিতে সমর্থ? পাথরকে ভালবাসিয়া বেশী কিছু লাভ নাই। আমরা তাহাই ভালবাসি, যাহা ভালবাসা বুঝতে পারে, যাহা আমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে। উপাসনার বেলাও এইরূপ। আমাদের এই পৃথিবীতে কেহ একখণ্ড শিলাকে (শিলা বলিয়া) পূজা করিয়াছে, এমন কথা কখনও বলিও না। সে সর্বদাই উপাসনা করিয়াছে (পাথরটির মধ্যে সর্বব্যাপী সত্তাকে)।

আমাদের ভিতর সেই বিশ্বপুরুষ রহিয়াছেন, আমরা সন্ধান পাই। (কিন্তু) তিনি যদি আমাদের হইতে পৃথক্ না হন, তাহা হইলে আমরা উপাসনা করিব কিভাবে? আমি তো শুধু 'তোমাকে' পূজা করিতে পারি, 'আমাকে' নয়। কেবল 'তোমারই' নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, 'আমার' কাছে নয়। 'তুমি' বলিয়া কেহ আছে কি?

একই বহু হন। আমরা যখন একককে দেখি, তখন মায়ার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত সঙ্কীর্ণ যাহা কিছু সব অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু বহুত্ব

যে অর্থহীন নয়, ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক। বহুকে অবলম্বন করিয়াই আমরা একে পৌছাই। ...

ব্যক্তি-ঈশ্বর কেহ আছেন কি—যে-ঈশ্বর চিন্তা করেন, বুঝিতে পারেন, আমাদিগকে চালিত করেন?—আছেন। নির্বিশেষ ঈশ্বরের এই-সব গুণের কোনটিই থাকিতে পারে না। তোমরা প্রত্যেক্যেই এক-একটি 'ব্যক্তি'। তুমি চিন্তা কর, ভালবাসো, ঘৃণা কর; (তুমি) ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হও ইত্যাদি; কিন্তু তবুও তুমি হইতেছ নৈর্ব্যক্তিক, সীমাহীন। একাধারে (তুমি) সগুণ এবং নির্গুণ। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিহীন-দুটি দিকই তোমার রহিয়াছে। ঐ (নৈর্ব্যক্তিক সত্তা) ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে না, (কিংবা) দুঃখিত (বা) ক্লিষ্ট হইতে পারে না, এমন কি দুঃখকষ্টের চিন্তাও করিতে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক সত্তা চিন্তা করিতে পারে না, জানিতে পারে না। উহা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। পক্ষান্তরে ব্যক্তিসত্তার জ্ঞান আছে, চিন্তা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। যিনি সর্বগত পরম, স্বভাবতই তাঁহার দুইটি দিক্ থাকিতে বাধ্য। একটি বস্তুসমূহের অনন্ত সত্তার (নির্ণায়ক), অপরটি তাঁহার ব্যক্তিভাব—আমাদের সকলের আত্মার আত্মা। তিনি সকল প্রভুর প্রভু। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারই নির্দেশে ইহা বর্তমান রহিয়াছে। ...

সেই অনন্ত—চিরশুদ্ধ, চির (মুক্ত) ... তিনি কিন্তু বিচারক নন। ভগবান্ কখনও (একজন) বিচারপতি হইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনের উপর বসিয়া ভাল এবং মন্দের বিচার করেন না। ... তিনি শাসক নন, সেনাপতি নন, (কিংবা) অধিনায়কও নন। অসীম করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় তিনি—সগুণ (ঈশ্বর)।

অপর একটি দিক্ হইতে দেখ। তোমার দেহের প্রতি জীবকোষে (cell) একটি আত্মা রহিয়াছে, যাহা জীবকোষটি সম্বন্ধে সচেতন। উহা একটি পৃথক্ বস্তু। উহার নিজস্ব একটি ইচ্ছা আছে, স্বকীয় একটি ছোট কর্মক্ষেত্র আছে। সমস্ত (জীবকোষ) মিলিয়া গোটা ব্যক্তিটি গঠিত। (অনুরূপভাবে) বিশ্বজগতের যিনি সগুণ ঈশ্বর, তিনি হইলেন এই-সব (বহু ব্যক্তির) সমষ্টি।

আর একদিক্ দিয়া বিচার কর। তুমি—অর্থাৎ আমি যেমন তোমায় দেখি—হইলে তোমার পরম সত্তার যেটুকু আমার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হইয়া অনুভূত, সেইটুকু। আমার চোখ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়া তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমাকে আমি খণ্ডিত করিয়া লইয়াছি। তোমার যেটুকু আমার চোখের দ্বারা দেখা সম্ভব, ততটুকুই আমি দেখি। আমার মন তোমার যতটা ধারণা করিতে পারে, ততটুকুই আমি 'তুমি' বলিয়া জানি, তাহার বেশী নয়। এইভাবেই আমি সর্বগত নৈর্ব্যক্তিককে অনুশীলন করিতে গিয়া (তাঁহাকে সগুণরূপে দেখি), যতক্ষণ আমাদের দেহ আছে, মন আছে, ততক্ষণ আমরা সর্বদা এই ত্রি-সত্তাকে দেখি—ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং আত্মা। এই তিন সর্বদাই এক অবিভাজ্য সত্তায় থাকিতে বাধ্য ... প্রকৃতি রহিয়াছে, মানবাত্মাসমূহ রহিয়াছে; আবার রহিয়াছেন তিনি—যাঁহাতে প্রকৃতি এবং মানবাত্মাসমূহ (অবস্থিত)।

বিশ্বাত্মা শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমার আত্মা হইল ঈশ্বরের একটি অংশ। ঈশ্বর আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা। ইহাই সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাযোগ্য উচ্চতম আদর্শ।

তুমি যদি দ্বৈতবাদী না হইয়া একত্ববাদী হও, তাহা হইলেও তোমার ব্যক্তি-ঈশ্বর থাকিতে পারে। ... এক অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। সেই এক নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন। সেই কারণে এক হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন (বহু)। ... বৃহৎ 'আমি'-কে—সত্য 'আমি'-কে পূজা করিতেছে ক্ষুদ্র 'আমি'। অতএব সব মতেই 'ব্যক্তি' (ঈশ্বর) রাখা চলে।

কেহ কেহ এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে, তাহারা অন্যান্য অপেক্ষা সুখী হয়। ন্যায়পরায়ণ কাহারও রাজত্বে এইরূপ কেন হইবে? পৃথিবীতে মৃত্যু রহিয়াছে কেন? এই-সকল কঠিন প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে। (এই সমস্যাসমূহের) কখনও সমাধান হয় নাই। কোন দ্বৈতভূমি হইতে উহাদের মীমাংসা হইতে পারে না। বস্তুসমূহ যথার্থই যেভাবে আছে, ঠিক সেভাবেই ঐগুলি দেখিবার জন্য আমাদিগকে দার্শনিক বিচারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম হইতেই কষ্ট ভোগ করিতেছি। এজন্য ঈশ্বর দায়ী নন। আমরা যাহা করি, তাহা আমাদেরই দোষ, অন্য কাহারও নয়। ঈশ্বরকে দোষারোপ কেন? ...

অমঙ্গল কেন রহিয়াছে? যে একটিমাত্র উপায়ে (এই সমস্যার) মীমাংসা করিতে পার, তাহা হইল—(এই কথা বলা যে, ঈশ্বর) ভাল ও মন্দ দুই-এরই কারণ। সগুণ ঈশ্বরবাদের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা এইঃ যদি বল ভগবান্ শুধু সৎ—তিনি অসৎ নন, তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার নিজের যুক্তির ফাঁদে আটকাইয়া পড়িবে। কি করিয়া জানিলে—(একজন) ভগবান্ আছেন? বলা হয় (যে, তিনি) এই বিশ্বজগতের পিতা; আরও বলা হয়—তিনি মঙ্গলময়। কিন্তু পৃথিবীতে অমঙ্গলও তো রহিয়াছে, তবে তিনি অমঙ্গলস্বরূপই বা হইবেন না কেন? ... সেই সমস্যা।

ভাল বলিয়া কিছু নাই, মন্দও নাই। আছেন শুধু ভগবান্। ... ভাল কি, তাহা তুমি কিরূপে জান? তুমি নিজে (উহা) অনুভব কর। (মন্দ কি, তাহারও জ্ঞান কি ভাবে হয়?) যদি মন্দ আসে, তুমি উহা অনুভব কর। ... ভাল এবং মন্দ আমাদেরই অনুভব দ্বারা আমরা জানিয়া থাকি। এমন কেহ নাই যে, শুধু ভালই অনুভব করে—তাহার অনুভূতি শুধু সুখকর। এমন কেহও নাই, যে শুধু অপ্রীতিকর ভাবগুলিই অনুভব করে। ...

অভাব এবং উদ্বেগই সকল দুঃখের কারণ, সুখেরও। অভাব কি বাড়িয়া চলিতেছে, না কমিতেছে? জীবন কি সহজ না জটিল হইতেছে? নিশ্চয়ই জটিল। অভাবসমূহ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। যাঁহারা তোমাদের প্রপিতামহ ছিলেন, তাঁহাদের তোমাদের মত এত পোষাক বা অর্থের দরকার ছিল না। তাঁহাদের বৈদ্যুতিক গাড়ী ছিল না, রেলরাস্তাও তাঁহারা দেখেন নাই। আর এইজন্যই তাঁহাদের পরিশ্রম করিতে হইত কম। যখন এই-সব জিনিষের প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে অভাবও আসে, খাটুনিও বাড়ে। আকাঙ্ক্ষা যত বাড়ে, প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে।

অর্থসংগ্রহ খুবই শ্রমসাধ্য। অর্থ রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ। কিছু বিত্তসঞ্চয়ের জন্য তোমাদিগকে সারা পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, (আর) উহা রক্ষা করিতে সমস্ত জীবন ধরিয়া চলিবে সংগ্রাম। (অতএব) গরীবের চেয়ে ধনীর দুশ্চিন্তা বেশী। ... এই তো ব্যাপার!—

জগতের সর্বত্রই ভাল ও মন্দ রহিয়াছে| কখনও কখনও মন্দের মধ্য দিয়া ভাল আসে সত্য, কিন্তু অন্য সময়েও আবার মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কোন-না-কোন সময়ে অমঙ্গল সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি মদ্যপান আরম্ভ করুক। (প্রথমে) কিছু খারাপ হয় না, কিন্তু সে যদি ক্রমাগত মদ্যপান করিতে থাকে, তবে তাহার অনিষ্ট হইবে। ... কেহ ধনী পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিল; বেশ ভাল। কিন্তু সে বুদ্ধিহীন হইল, কখনও তাহার শরীর বা মস্তিস্ক খাটাইল না। ইহা শুভ হইতে অশুভের উৎপত্তি। আবার জীবনের প্রতি আমাদের যে নিবিড় ভালবাসা, সেই কথা চিন্তা কর। আমরা কতই না ছুটাছুটি—লাফালাফি করি! কয়েক মুহূর্তের তো জীবন! কত কঠোর পরিশ্রম করি! একেবারে অসমর্থ শিশু হইয়া আমরা জন্মিয়াছি। জিনিষগুলি বুঝিয়া উঠিতে আমাদের বহু বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে ষাট বা সত্তর বৎসরে আমাদের চোখ খোলে এবং তখন আদেশ আসে— 'বেরিয়ে যাও!' এই তো অবস্থা!

আমরা দেখিলাম—ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক শব্দ। যাহা আমার কাছে ভাল, তাহা তোমার পক্ষে মন্দ। আমার যাহা নৈশ আহার, তুমি যদি তাহা খাও তো কাঁদিতে আরম্ভ করিবে, আর আমি হাসিয়া উঠিব। ... আমরা দুজনে (হয়তো) নাচিতেছি, কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে—আর তুমি যাতনার সহিত। ... একই বস্তু আমাদের জীবনের কোন এক সময়ে শুভ, অন্য সময়ে অশুভ। কি করিয়া বলিতে পার, ভাল ও মন্দ সবই পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে এবং এটি সর্বৈব ভাল আর ঐটি সর্বৈব মন্দ?

এখন প্রশ্ন এই, ভগবান্ যদি চিরদিন সৎই হন, তাহা হইলে এই-সব অশুভের জন্য দায়ী কে? খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ বলেন, শয়তান বলিয়া একজন ভদ্রলোক আছেন। কিন্তু কি করিয়া বল—দুইজন ভদ্রলোক কাজ করিতেছেন? একজনেরই থাকা চাই; যে-আগুনে শিশু পুড়িয়া যায়, তাহাতে খাবারও তৈরী হয়। কি করিয়া বলিবে, আগুন ভাল বা মন্দ? কি করিয়া বলিবে, উহা দুই ব্যক্তির সৃষ্টি? (তথাকথিত) সমস্ত অশুভ তবে কে সৃষ্টি করিল? অন্য কোন সমাধান নাই। তিনি পাঠাইতেছেন মৃত্যু ও জীবন, মড়ক ও মহামারী এবং সবকিছু। ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তাহা হইলে তিনিই শুভ, তিনিই অশুভ; তিনিই সুন্দর, তিনিই ভীষণ; তিনিই জীবন এবং তিনিই মৃত্যু।

এইরূপ ঈশ্বরকে কি করিয়া উপাসনা করা যাইবে? আমরা ক্রমশঃ (বুঝিতে) পারিব, মানুষ ভীষণের পূজা কীভাবে শিখিতে পারে; তখনই মানুষ শান্তি পাইবে। মনের শান্তি যদি নষ্ট হইয়া থাকে, দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি যদি না পাইয়া থাক তো সর্বপ্রথম কর্তব্য—ঘুরিয়া দাঁড়ানো এবং ভীষণের সম্মুখীন হওয়া। উহার মুখোস ছিঁড়িয়া ফেলো, দেখিতে পাইবে—সেই একই (ঈশ্বর) রহিয়াছেন। তিনিই সগুণ ঈশ্বর—যাহা কিছু ভাল (প্রতীয়মান) এবং যাহা কিছু মন্দ (আপাতপ্রতীতিতে)। আর কেহ নাই। দুই জন প্রভু যদি থাকিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতি এক মুহূর্তও টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রকৃতিতে অপর কেহ নাই| সবই একতান। ঈশ্বরের লীলা একদিকে, আর শয়তানের অপরদিকে—এরূপ হইলে সমগ্র সৃষ্টির ভিতর একটি চরম (বিশৃঙ্খলা) উপস্থিত হইত। নিয়ম ভাঙিবার সাধ্য কাহার আছে? এই গ্লাসটি যদি আমি ভাঙিয়া ফেলি, ইহা পড়িয়া যাইবে। একটি পরমাণুকে যদি কেহ স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয়, অপর প্রত্যেকটি পরমাণুর স্থিতিবৈষম্য ঘটিবে। ... নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। প্রত্যেকটি পরমাণু নিজ স্থানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটির ওজন করিয়া, মাপ করিয়া বসান আছে এবং নিজ নিজ (উদ্দেশ্য) পূর্ণ করিতেছে। ঈশ্বরের বিধানে বাতাস বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে। তাঁহার শাসনে জগৎসমূহ যথাযথ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহারই আদেশে মৃত্যু পৃথিবীতে শিকারসন্ধানে রত। একবার ভাবিয়া দেখ তো দুই বা তিন জন ঈশ্বর জগতে মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছেন। ইহা হইতেই পারে না।

আমরা এখন দেখিতে পাইলাম—আমাদের জগৎস্রষ্টা সগুণ ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি দয়াময় এবং নিষ্ঠুরও। ... তিনি মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল। তাঁহার স্মিত হাস্য দেখিতে পাই, আবার ভ্রূকুটিও দেখিতে পাই। আর তাঁহার বিধান অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি হইলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।

সৃষ্টির অর্থ কি? শূন্য হইতে কি কোন কিছুর আবির্ভাব হইতে পারে? ছয় হাজার বৎসর আগে ঈশ্বর স্বপ্নোত্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন (এবং) তাহার পূর্বে কিছুই ছিল না—ইহা কী? ঈশ্বর তখন কী করিতেছিলেন? তিনি কি আরামে ঘুমাইতেছিলেন? ভগবান্ হইলেন জগৎ-কারণ, আর কার্য দেখিয়া আমরা কারণকে জানিতে পারি। কার্য যদি না থাকে, তাহা হইলে কারণ কারণই নয়। কারণ সর্বদা কার্যের মধ্য দিয়াই পরিজ্ঞাত। ... সৃষ্টি অনন্ত। ... কাল বা দেশের মাধ্যমে সৃষ্টির আদি চিন্তা করা যায় না।

কেন তিনি এই সৃষ্টি করেন? কারণ তিনি ইহা পছন্দ করেন—কারণ তিনি মুক্ত। ... তুমি আমি নিয়মের অধীন, কেন-না আমরা (শুধু্) কতিপয় নির্দিষ্ট পথেই কাজ করিতে পারি, অন্য পথে নয়। 'হাত না থাকিলেও তিনি সবকিছু ধরিতে পারেন, পদবিহীন হইয়াও দ্রুত চলিয়া যান'।

৩

দেহ নাই, তথাপি তিনি সর্বব্যাপী।

'চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু চক্ষু যাঁহা দ্বারা দেখে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

৪

তোমরা অন্য কিছুর উপাসনা করিতে পার না। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া আছেন। যাহাকে বলা হয় ‘নিয়ম’, উহা তাঁহার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। নিয়মসমূহ দ্বারা তিনি জগৎ পরিচালনা করিতেছেন।

এ পর্যন্ত (আমরা আলোচনা করিয়াছি) ঈশ্বর ও প্রকৃতি—শাশ্বত ঈশ্বর, চিরন্তন প্রকৃতি। কোন আত্মারই (কখনও) সৃষ্টি হয় নাই। আত্মার বিনাশও নাই। কেহই তাহার নিজের মৃত্যু কল্পনা করিতে পারে না। আত্মা অসীম, নিত্য বর্তমান। উহা মরিবে কিরূপে? উহা শরীর পরিবর্তন করে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া দিয়া নূতন অব্যবহৃত পোষাক পরিধান করে, ঠিক সেইরূপ শীর্ণ শরীর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটি নূতন দেহ গ্রহণ করা হয়।

৫

আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা সর্বশক্তিধর সর্বব্যাপী। চৈতন্যের দৈর্ঘ্যও নাই বা প্রস্থ কিংবা ঘনত্বও নাই। ... উহা এখানে বা সেখানে—ইহা কি করিয়া বলা যায়? এই শরীরটি নষ্ট হইলে (আত্মা) অপর একটি দেহের (মাধ্যমে) কাজ করিবে। আত্মা যেন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু উহার কেন্দ্র হইল দেহে। ঈশ্বর এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই বটে, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। আত্মা স্বভাবতই আনন্দময়, শুদ্ধ, পূর্ণ; উহার প্রকৃতি যদি অশুচি হইত, তাহা হইলে উহা কখনও শুদ্ধ হইতে পারিত না। ... আত্মার স্বরূপই হইল নিষ্কলুষ; এই জন্যই তো মানুষের পক্ষে পবিত্র হওয়া সম্ভব। আত্মা (স্বভাবতই) আনন্দঘন; তাই বলিয়াই তো উহা আনন্দ লাভ করিতে পারে। আত্মা শান্তিস্বরূপ; (এই কারণেই উহার পক্ষে শান্তি অনুভব করা সম্ভবপর)। ...

আমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের এই দেহবুদ্ধির স্তরে দেখিতেছি, তাহাদের সকলকেই ঈর্ষা, কলহ ও কষ্টের সহিত জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, আর তারপর আসে মৃত্যু। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের যাহা হওয়া উচিত, আমরা তাহা নই। আমরা স্বাধীন নই, সম্পূর্ণ শুদ্ধ নই, ইত্যাদি। আত্মা যেন অবনত হইয়াছেন; অতএব আত্মার প্রয়োজন—বিস্তার। ...

কিভাবে ইহা করা যায়? উহা নিজে নিজেই সিদ্ধ করিতে পারিবে কি?—না। কোন ব্যক্তির মুখ যদি ধূলিধূসরিত হইয়া থাকে, উহা কি ধূলি দিয়া পরিষ্কার করা চলে? মাটিতে একটি বীজ পুঁতিলাম, উহা হইতে গাছ হইল, গাছ হইতে আবার বীজ, বীজ হইতে অন্য একটি গাছ—এইরূপ চলিতে থাকিবে। মুরগী হইতে ডিম, আবার ডিম হইতে মুরগী। যদি কিছু ভাল কাজ কর, উহার ফল তোমাকে পাইতে হইবে—পুনরায় জন্মগ্রহণ ও দুঃখভোগ। এই অন্তহীন শৃঙ্খলে যদি একবার আটকাইয়া যাও, আর থামিতে পারিবে না। ঘুরিতেই থাকিবে, ... উপরে এবং নীচে, ঊর্ধ্বলোক এবং অধোলোকের (দিকে) এবং এই-সব (দেহসমূহ)। নিষ্কৃতির পথ নাই।

তবে এই-সকল হইতে ত্রাণের উপায় কি এবং এখানে কিই বা তোমার চাই? একটি ভাব হইল—দুঃখ হইতে অব্যাহতি। আমরা প্রত্যেকেই দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছি। ... কর্মের দ্বারা ইহা হইবার নয়। কর্ম কর্মই বাড়ায়। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি নিজে মুক্ত এবং আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তবে ইহা সম্ভবপর। প্রাচীন ঋষির ঘোষণা—‘হে মর্ত্যলোকবাসী ও ঊর্ধ্বলোকনিবাসী অমৃতের সন্তানগণ তোমরা সকলে শোন— আমি রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। যিনি সকল অন্ধকারের পারে, আমি তাঁহাকে জানিয়াছি। এই সংসার-মহাসমুদ্র আমরা পার হই কেবল তাঁহারই কৃপায়।’

৬

ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা এইরূপঃ স্বর্গ আছে, নরক আছে, মর্ত্যলোক আছে; কিন্তু এইগুলি চিরন্তন নয়। যদি আমার নরকে গতি হয়, উহা নিত্যকালের জন্য নয়। যেখানেই থাকি না কেন, একই যন্ত্রণা চলিতে থাকিবে। সমস্যা হইল—এই-সব যন্ত্রণা অতিক্রম করা যায় কিরূপে? যদি আমি স্বর্গে যাই, হয়তো কিছু বিশ্রাম মিলিবে। কিন্তু হয়তো কোন অপকর্ম করিয়া বসিলাম, তখন তো শাস্তি পাইতে হইবে, স্বর্গবাস চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ... ভারতীয় আদর্শ স্বর্গে যাওয়া নয়। এই পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ কর। নরকেও পড়িও না, স্বর্গকেও তুচ্ছ কর। লক্ষ্য কি?—মুক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই মুক্ত হইতে হইবে। আত্মার মহিমা আবৃত হইয়া আছে। উহাকে পুনরায় অনাবৃত করিতে হইবে। আত্মা তো আছেনই—সর্বত্রই আছেন। কোথায় যাইবেন? ... কোথায়ই বা যাইতে পারেন? যদি এমন কোন স্থান থাকিত, যেখানে আত্মা নাই, তবেই তো সেখানে যাইবার কথা উঠিত। ইনি সদা-বর্তমান—(এইটি) যদি হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে চিরকালের জন্য পরিপূর্ণ সুখ (আসিবে)। আর জন্ম মৃত্যু নয়। ... আর রোগ নয়, দেহ নয়। দেহ (টি) নিজেই তো কঠিনতম ব্যাধি। ...

আত্মা আত্মা (-রূপে) দাঁড়াইয়া থাকিবেন। চৈতন্য চৈতন্যরূপে জীবিত থাকিবেন। ইহা কিভাবে সম্পাদন করা যাইবে? যিনি স্বভাবতই নিত্যবর্তমান, শুদ্ধ ও পূর্ণ, আত্মার (মধ্যে সেই পরমেশ্বরকে) আরাধনা করিয়া। এই জগতে সর্বশক্তিমান্ দুইজন থাকিতে পারেন না। (কল্পনা কর) দুই বা তিনজন ঈশ্বর (আছেন); একজন সংসার সৃষ্টি করিবেন, অপর জন বলিবেন, ‘আমি সংসার ধ্বংস করিব।’ ইহা কখনও ঘটিতে (পারে না)। ভগবান্ একজনই হওয়া চাই। আত্মা যখন পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্ (ও) সর্বজ্ঞ (হইয়া যান)। ইনিই উপাসক। উপাস্য কে?—সেই পরমেশ্বর স্বয়ং, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। আর সর্বোপরি তিনি প্রেম-স্বরূপ। (আত্মা) কিরূপে এই পূর্ণতা লাভ করিবে?—উপাসনা দ্বারা।

দিব্য প্রেম

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে ১০ এপ্রিল ১৯০০ খ্রীঃ প্রদত্ত]

(প্রেমকে একটি ত্রিকোণের প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রথম কোণটি এই যে,) প্রেম কোন প্রশ্ন করে না। ইহা ভিক্ষুক নয়। ... ভিখারীর ভালবাসা ভালবাসাই নয়। প্রেমের প্রথম লক্ষণ হইতেছে ইহা কিছুই চায় না, (বরং ইহা) সবই বিলাইয়া দেয়। ইহাই হইল প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনা, ভালবাসার মাধ্যমে উপাসনা! ঈশ্বর করুণাময় কিনা, এই প্রশ্ন আর উঠে না। তিনি ঈশ্বর, তিনি আমার প্রেমাস্পদ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা, তিনি সান্ত কিংবা অনন্ত, এ-সব আর জিজ্ঞাস্য নয়। যদি তিনি মঙ্গল বিতরণ করেন ভালই, যদি অমঙ্গল করেন, তাহাতেই বা কি আসে যায়? কেবল ঐ একটি—অনন্ত প্রেম ছাড়া তাঁহার অন্যান্য সবগুণই তিরোহিত হয়।

ভারতবর্ষে একজন প্রাচীন সম্রাট্ ছিলেন। তিনি একবার শিকারে বাহির হইয়া বনের মধ্যে জনৈক বড় যোগীর সাক্ষাৎ পান। সাধুর উপর তিনি এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিয়া কিছু উপহার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। (প্রথমে) সাধু রাজী হন নাই, (কিন্তু) বারংবার সম্রাটের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে স্বীকার করিলেন। তিনি (প্রাসাদে) উপস্থিত হইলে সম্রাট্কে জানানো হইল। সম্রাট্ বলিলেন, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রার্থনা শেষ করিয়া লই।' সম্রাট্ প্রার্থনা করিতেছিলেন, 'প্রভু, আমাকে আরও ধন দাও— আরও (জমি-জায়গা, স্বাস্থ্য), আরও সন্তান-সন্ততি।' সাধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, 'কই, আপনি আমার উপহার তো গ্রহণ করিলেন না?' যোগী উত্তর দিলেন, 'আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেই অধিক ভূসম্পত্তি, টাকাকড়ি, আরও কত কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, আপনি আর আমাকে কি দিবেন? আগে নিজের অভাবগুলি মিটাইয়া নিন।'

প্রেম কখনও যাচ্ঞা করে না, ইহা সব সময় দিয়াই যায়। ... যখন একটি যুবক তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে যায়, ... তাহাদের মধ্যে বেচাকেনার সম্বন্ধ থাকে না; তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে প্রেমের, আর প্রেম ভিক্ষুক নয়। (এইরূপে) আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনার অর্থ ভিক্ষা নয়। যখন আমরা সমস্ত চাওয়া—'প্রভু, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও'—শেষ করিয়াছি তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয়টি (ত্রিকোণ-স্বরূপ প্রেমের দ্বিতীয় কোণ) এই,—প্রেমে ভয় নাই। তুমি আমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পার, তবু আমি তোমাকে ভালবাসিতেই (থাকিব)। মনে কর, তোমাদের মধ্যে একজন মা—শরীর খুব দুর্বল—দেখিলে, রাস্তায় একটি বাঘ তোমার শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতেছে। বল তো, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? জানি, তুমি ঐ ব্যাঘ্রটির সম্মুখীন হইবে। অন্য সময়ে পথে একটি কুকুর পড়িলেই তোমাকে পলাইতে হয়, কিন্তু এখন তুমি বাঘের মুখে ঝাঁপ দিয়া তোমার শিশুটিকে কাড়িয়া লইবে। ভালবাসা ভয় মানে না। ইহা সমস্ত মন্দকে জয় করে। ঈশ্বরকে ভয় করা ধর্মের সূত্রপাত মাত্র, উহার পর্যবসান হইল প্রেমে। সমস্ত ভয় যেন তখন মরিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়টি (ত্রিকোণাত্মক প্রেমের তৃতীয় কোণ) এই—প্রেম নিজেই নিজের লক্ষ্য। ইহা কখনই অপর কোন কিছুর 'উপায়' হইতে পারে না। যে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি এই-সব পাইবার জন্য', সে ভালবাসে না। প্রেম কখনই কোন উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় নয়; ইহা নিশ্চিতভাবে পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের সীমা এবং আদর্শ কি? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ—ইহাই সব। কেন মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে? এই 'কেন'র, কোন উত্তর নাই, কেন-না ভালবাসা তো কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। ভালবাসা আসিলে উহাই মুক্তি, উহাই পূর্ণতা, উহাই স্বর্গ। আর কি চাই? অন্য আর কি প্রাপ্তব্য থাকিতে পারে? প্রেম অপেক্ষা মহত্তর আর কি তুমি পাইতে পার?

আমরা সকলে প্রেম অর্থে যাহা বুঝি, আমি তার কথা বলিতেছি না। একটুখানি ভাবপ্রবণ ভালবাসা দেখিতে বেশ সুন্দর। পুরুষ নারীকে ভালবাসিল, আর নারী পুরুষের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখাও তো যায় যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জন (John) জেনকে (Jane) পদাঘাত করিল এবং জেনও জনকে লাথি মারিতে ছাড়িল না। ইহা বৈষয়িক ভাব, ভালবাসাই নয়। যদি জন বাস্তবিকই জেনকে ভালবাসিত, তবে সেই মুহূর্তেই সে পূর্ণ হইয়া যাইত। (তাহার প্রকৃত) স্বরূপই প্রেম; সে স্বয়ংপূর্ণ। জন কেবলমাত্র জেনকে ভালবাসিয়া যোগের সমুদয় শক্তি পাইতে পারে, (যদিও) সে হয়তো ধর্মের, মনস্তত্ত্বের বা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মতবাদসমূ্হের একটি অক্ষরও জানে না। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোন পুরুষ ও নারী পরস্পরকে যথার্থ ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে যোগিগণ যে-সকল বিভুতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, এই দম্পতিও সেই-সকল শক্তি (অর্জন করিতে সমর্থ হইবে,) যেহেতু প্রেম যে স্বয়ং ঈশ্বর। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান্ সর্বত্র বিরাজমান এবং (সেইজন্য) তোমাদেরও মধ্যে এই ভালবাসা রহিয়াছে, তোমরা জান বা না জান।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। ... মনে করিলাম, যুবককে পরীক্ষা করিবার ইহা একটি উপযুক্ত অবসর। সে তাহার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় দর্শন ও দূর-শ্রবণের ক্ষমতা লাভ করে। ষাট কি সত্তর বার যুবকটি একবারও ভুল করে নাই, এবং তরুণী ছিল দুইশত মাইল দূরে। (সে বলিত) 'এইভাবে তরুণী সাজগোজ করিয়াছে।' (কিংবা) 'ঐ সে চলিয়া যাইতেছে।' আমি ইহা নিজের চোখে দেখিয়াছি।

ইহাই হইতেছে প্রশ্নঃ তোমার স্বামী কি ঈশ্বর নন? তোমার সন্তান কি ঈশ্বর নয়? তুমি যদি তোমার পত্নীকে ঠিক ঠিক ভালবাসিতে পার, জগতের সকল ধর্মের ভাবই তোমাতে ফুটিয়া উঠিবে। তোমার মধ্যেই তুমি লাভ করিবে ধর্মের ও যোগের সমস্ত রহস্য। কিন্তু ভালবাসিতে পার কি? প্রশ্ন তো ইহাই। তুমি বল, 'মেরী, আমি তোমায় ভালবাসি ... অহো, আমি তোমার জন্য মরিতে পারি।' (কিন্তু যদি তুমি) দেখ, মেরী অপর এক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতেছে, তুমি তাহার গলা কাটিতে চাহিবে। আবার মেরী যদি জনকে অন্য একটি মেয়ের সহিত কথা বলিতে দেখে, তবে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না এবং জনের জীবন নরকের ন্যায় দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে। ইহার নাম 'ভালবাসা' নয়। ইহা যৌন ক্রয়-বিক্রয়। ইহাকে 'প্রেম' বলা অতীব নিন্দনীয়। সংসারের মানুষ দিবা-রাত্র ঈশ্বর ও ধর্মের কথা বলিয়া থাকে—তেমনি প্রেমের কথাও। প্রত্যেক বিষয়কে একটি ভণ্ডামিতে পরিণত করা—ইহাই তো তোমরা করিতেছ! সকলেই প্রেমের কথা বলে, (তবু) সংবাদপত্রের স্তম্ভে (আমরা পড়ি), প্রত্যেক দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কাহিনী। যখন তুমি জনকে ভালবাস, তখন কি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাস, অথবা তোমার জন্য? (যদি তুমি তোমার নিজের জন্য তাহাকে ভালবাস), তাহা হইলে জনের নিকট হইতে কিছু আশা কর। (যদি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাস), তবে জনের কাছ হইতে তুমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখ না। সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যাহা খুশী করিতে পারে, (এবং) তুমি তাহাকে একইভাবে ভালবাসিবে।

এই তিনটি বিন্দু, তিনটি কোণ লইয়া (প্রেম)-ত্রিভুজ। প্রেম ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র শুষ্ক হাড়ের মত, মনস্তত্ত্ব একপ্রকার মতবাদ-বিশেষ এবং কর্ম শুধুই পণ্ডশ্রম। (প্রেম থাকিলে) দর্শন হইয়া যায় কবিতা, মনোবিজ্ঞান হয় (মরমী অনুভূতি) আর কর্ম সৃষ্টির মাঝে মধুরতম বলিয়া পরিগণিত হয়। (কেবলমাত্র) গ্রন্থ-অধ্যয়নে (লোকে) শুষ্ক হইয়া যায়। কে বিদ্বান্?—যে অন্ততঃ একবিন্দু প্রেমও অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরই প্রেম এবং প্রেমই ঈশ্বর। আর ঈশ্বর তো সব স্থানেই রহিয়াছেন। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান—এইটি যে অনুভব করে, সে বুঝিতে পারে না যে, সে মাথায় ভর করিয়া বা পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেমন যে-লোক এক বোতল মদ খাইয়াছে, সে জানে না যে—সে কোথায় রহিয়াছে। ...যদি আমরা দশ মিনিট ভগবানের জন্য কাঁদি, পরবর্তী দুই মাস আমরা কোথায় আছি—সে জ্ঞান আমাদের থাকিবে না। ... আহারের সময়ও আমরা মনে রাখিতে পারিব না, কি খাইতেছি—তাহাও জানিব না। ঈশ্বরকেও ভালবাসিবে, আবার সর্বদা বেশ ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিবে—ইহা (কি করিয়া) সম্ভবপর? ... প্রেমের সেই সর্বজয়ী সর্বব্যাপী শক্তি কিরূপে আসিতে পারে? ...

মানুষ বিচারশীল নয়। তাহারা সকলেই পাগল। শিশুরা (পাগল) খেলায়, তরুণ তরুণীকে লইয়া, বৃদ্ধেরা তাহাদের অতীতের চর্বিত-চর্বণে।

৭

কেহ বা পাগল অর্থের পিছনে। কেহ কেহ তবে ঈশ্বরের কন্য পাগল হইবে না কেন? জন (John) জেনের (Jane) জন্য যেরূপ পাগল হইয়া ছুটিতেছে, ঈশ্বরের প্রেমের জন্য সেইরূপ উন্মাদ হও। কোথায়, এমন লোক কোথায়? (অনেকে) বলে, 'আমি কি এইটি ছাড়িব? অমুকটা ত্যাগ করিব? একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বিবাহ কি করিব না?' না, কোন বিষয়ই ছাড়িতে যাইও না। বিষয়ই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে। অপেক্ষা কর, তুমি সব কিছুই ভুলিবে।

(সম্পূর্ণরূপে) ভগবৎপ্রেমে পরিণত হওয়া—এখানেই প্রকৃত উপাসনা। রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে সময় সময় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়; সেই-সব অত্যাশ্চর্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে কিরূপ আত্মহারা হইয়া বেড়াইতেছেন! এইরূপ প্রেমই লাভ করিতে হইবে। ঐশ্বরিক প্রেম এই প্রকার হওয়াই উচিত—কিছুই না চাহিয়া, কিছুই অন্বেষণ না করিয়া।

প্রশ্ন হইয়াছিল—কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে? তোমর সমস্ত বিষয়-সম্পদ, তোমার সকল পরিজন, সন্তান-সন্ততি—সবকিছু অপেক্ষা প্রিয়তর ভাবিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা কর। (তাঁহাকে উপাসনা কর) যেন তুমি স্বয়ং ভালবাসাকেই ভালবাসিতেছ। এমন একজন আছেন, যাঁহার নাম 'অনন্ত প্রেম'—ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র সংজ্ঞা। যদি এই ... বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুমাত্র ভাবিও না। যতক্ষণ অনন্তপ্রেমস্বরূপ তিনি রহিয়াছেন, ততক্ষণ আমাদের ভাবনা কিসের? উপাসনার অর্থ কি, (তোমরা) দেখিলে তো? অন্য সব চিন্তা অবশ্যই চলিয়া যায়। ঈশ্বর ছাড়া সমস্তই তিরোহিত হয়। সন্তানের প্রতি পিতা বা মাতার যে ভালবাসা, স্বামীর উপর স্ত্রীর যে প্রেম, পত্নীর প্রতি স্বামীর যে ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে আকর্ষণ—এই-সব প্রেম একত্র ঘনীভূত করিয়া ঈশ্বরকে দিতে হইবে। যদি কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসে, তবে সে অন্য-পুরুষকে ভালবাসিতে পারে না। যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোন (নারীকে) ভালবাসা সম্ভব নয়। ইহাই হইল ভালবাসার ধর্ম।

আমার গুরুদেব বলিতেন, 'মনে কর এই ঘরের মধ্যে এক থলে মোহর রহিয়াছে, আর পাশের ঘরে একটি চোর আছে—সে ঐ মোহরের থলের কথা জানে। চোরটি কি ঘুমাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই নয়। সব সময়েই সে পাগল হইয়া ভাবিতে থাকিবে, কি উপায়ে মোহরগুলি আত্মসাৎ করা যায়।' ... (এইরূপে) কোন লোক যদি ভগবানকে ভালবাসে, তবে সে কি করিয়া অন্য কিছুকে ভালবাসিবে? ঈশ্বরের বিপুল প্রেমের সম্মুখে অন্য কিছু দাঁড়াইবে কিরূপে? উহার কাছে সবকিছুই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সেই প্রেমকে লাভ করিবার জন্য—বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য, উহা অনুভব করিয়া উহাতেই অবস্থান করিবার জন্য পাগল হইয়া ছুটাছুটি না করিয়া মন থামিতে পারে কি?

আমরা এইভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিবঃ 'আমি ধন চাই না, (বন্ধুবান্ধব বা সৌন্দর্য চাই না) বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, এমন কি মুক্তিও চাই না। যদি ইহাই তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে সহস্র মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়া দাও। আমার শুধু এই প্রার্থনা যে, আমি যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি, আর যেন কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ের প্রতি যে টান, সেরূপ তীব্র ভালবাসা যেন আমার হৃদয়ে আসে, কিন্তু কেবল সেই চিরসুন্দরের জন্য। ঈশ্বরকে বন্দনা! প্রেমময় ঈশ্বরকে বন্দনা!' ঈশ্বর

ইহা ছাড়া অন্য কিছু নন। অনেক যোগী যে-সব অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারেন, তিনি সেগুলি গ্রাহ্য করেন না। ক্ষুদ্র জাদুকরেরা ক্ষুদ্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ জাদুকর; তিনি সমুদয় জাদুবিদ্যা দেখাইতে পারেন। কে জানে কত ব্রহ্মাণ্ড (আছে,) কে ভ্রূক্ষেপ করে? ...

আর একটি উপায় আছে। সবকিছু জয় করিতে, সমস্ত কিছু দমন করিতে—শরীর (এবং) মন উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে। ... কিন্তু (ভক্ত বলেন) 'সবকিছু জয় করিবার সার্থকতা কি? আমার কাজ ঈশ্বরকে লইয়া।'

একজন যোগী ছিলেন, খুব ভক্ত! গলক্ষত-রোগে তিনি যখন মুমূর্ষু তখন অপর একজন যোগী—দার্শনিক—তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। (শেষোক্ত) যোগী বলিলেন, 'দেখুন, আপনি আপনার ক্ষতের উপর মন একাগ্র করিয়া উহা সারাইয়া ফেলুন না কেন?' তৃতীয় বার যখন এইরূপ বলা হইল, তখন (সেই পরমযোগী) উত্তর দিলেন, 'তুমি কি ইহা সম্ভব মনে কর, যে-মন সম্পূর্ণরূপে আমি ভগবানকে নিবেদন করিয়াছি, (তাহা এই হাড়মাসের খাঁচায় টানিয়া আনিব)?' যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার সাহায্যের জন্য দেবসেনাদলকে আহ্বান করিতে সম্মত হন নাই। 'এই ক্ষুদ্র শরীর কি এতই মূল্যবান্ যে ইহাকে দুই বা তিন দিন বেশী বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আমি বিশ হাজার দেবদূতকে ডাকিয়া আনিব?'

(জাগতিক দিক্ হইতে) এই শরীরই আমার সর্বস্ব। ইহাই আমার জগৎ, আমার ভগবান্। আমি শরীর। দেহে চিমটি কাটিলে আমি মনে করি, আমাকেই কাটিলে। যদি মাথা ধরিল তো মুহূর্তে আমি ভগবানকে ভুলিয়া যাই। আমি দেহের সহিত এমনই জড়িত! ঈশ্বর এবং সব কিছুকেই নামাইয়া আনিতে হইবে, আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য—এই দেহের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতে যীশুখ্রীষ্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মরণ বরণ করিলেন এবং (তাঁহার সাহায্যের জন্য) দেবদূতগণকে ডাকিলেন না, তখন তিনি মূর্খের কাজই করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে নামাইয়া আনিয়া ক্রুশ হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু যিনি প্রেমিক, তাঁহার নিকট এই দেহ কিছুই নয়; তাঁহার দিক্ হইতে দেখিলে—কে এই অকিঞ্চিৎকর জিনিষের জন্য মাথা ঘামাইবে? এই শরীর থাকে কি যায়—বৃথা চিন্তায় কি লাভ? রোম্যান সৈন্যগণের ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডের চেয়ে এর দাম বেশী নয়।

(জাগতিক দৃষ্টি) ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাত। ভালবাসিয়া যাও। যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তোমাকেও যে ক্রুদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। যদি কেহ নিজেকে হীন করিয়া ফেলে, তোমাকেও যে সেই হীন স্তরে নামিতে হইবে, তার কি মানে? ... 'অন্য লোক বোকামি করিয়াছে বলিয়া আমিও রাগ করিব? অশুভকে প্রতিরোধ করিও না।' ঈশ্বরপ্রেমিকগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। জগৎ যাহাই করুক, যে ভাবেই ইহা চলুক, (তাঁহাদের উপর) ইহা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

জনৈক যোগী অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'দেখ, আমার কী শক্তি! আকাশের দিকে তাকাও; আমি ইহাকে মেঘ দিয়া ঢাকিয়া দিব।' বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (কেহ) বলিল, 'প্রভু, অদ্ভুত আপনার শক্তি! কিন্তু আমাকে তাহাই শিক্ষা দিন, যাহা পাইলে আমি আর কোন কিছু চাহিব না।' ... শক্তিরও ঊর্ধ্বে যাওয়া—কিছুই চাই না, শক্তিলাভেরও বাসনা নাই! (ইহার তাৎপর্য) শুধু বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না। ... হাজার হাজার বই পড়িয়াও তুমি জানিতে সমর্থ হইবে না ... যখন আমরা ইহা বুঝিতে আরম্ভ করি, সমুদয় জগৎ-রহস্য যেন আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়। ... একটি ছোট মেয়ে তাহার পুতুল লইয়া খেলিতেছে—সব সময় সে নূতন নূতন স্বামী পাইতেছে, কিন্তু যখন তাহার সত্যকারের স্বামী আসে, তখন (চিরদিনের জন্য) সে তাহার পুতুল-স্বামীগুলি দূরে ফেলিয়া দেয়। ... জগতের সবকিছু সম্বন্ধে ঐ একই কথা। (যখন) প্রেমসূর্য উদিত হয়, তখন এই-সব খেলার শক্তি-সূর্য—এই সমস্ত (কামনা-বাসনা) অন্তর্হিত হয়। শক্তি লইয়া আমরা কি করিব? যেটুকু শক্তি তোমার আছে, তাহা হইতেও যদি অব্যাহতি পাও তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ভালবাসিতে আরম্ভ কর। ক্ষমতার মোহ নিশ্চয়ই কাটান চাই। আমার ও ভগবানের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন খাড়া না হয়। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর কিছুই নন; আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম—অন্তেও প্রেম।

এক রানীর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তিনি রাস্তায় রাস্তায় (ভগবৎপ্রেমের বিষয়) প্রচার করিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেশের সর্বত্র অত্যন্ত নির্যাতন করিয়া তাড়া করিতেন। রানী তাঁহার ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিয়া গান গাহিতেন। তাঁহার গানগুলি সর্বত্র গীত হয়। 'চোখের জলে আমি (প্রেমের অক্ষয়লতা পুষ্ট করিয়াছি)'।

৮

ইহাই চরম, মহান্ (লক্ষ্য)। ইহা ব্যতীত আর কি আছে? (লোকে) ইহা চায়, উহা চায়। তাহারা সবাই পাইতে ও সঞ্চয় করিতে চায়। এই জন্যই এত কম লোক (প্রেম) বুঝিতে পারে, এত কম লোক ইহা লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে জাগাও এবং বল। তাহা হইলে তাহারা এ-বিষয়ে আরও কিছু সঙ্কেত পাইবে।

প্রেম স্বয়ং শাশ্বত, অন্তহীন ত্যাগ-স্বরূপ। তোমাকে সবকিছু ছাড়িতে হইবে। কিছুই তোমার অধিকারে রাখা চলিবে না। প্রেম লাভ করিলে তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। ... 'চিরকালের জন্য কেবল তুমিই আমার ভালবাসার ধন থাকিও।' প্রেম ইহাই চায়। 'আমার প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের একটি মাত্র চুম্বন! আহা, যে তোমার চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার সমস্ত দুঃখ যে চলিয়া গিয়াছে। একটি মাত্র চুম্বনে মানুষ এত সুখী হয় যে, অন্য বস্তুর উপর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে শুধু তোমারই স্তুতিতে মগ্ন থাকে, আর একমাত্র তোমাকেই দেখে।'

৯

মানবীয় ভালবাসাতেও (দিব্য প্রেমের সত্তা লুকান থাকে)। গভীর প্রেমের প্রথমক্ষণে সমস্ত জগৎ যেন এক সুরে তোমার হৃদয়-

বীণার সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিশ্বের প্রত্যেকটি পাখি যেন তোমারই প্রেমের গান গাহিয়া থাকে, প্রতিটি ফুল যেন তোমার জন্যই ফুটিয়া থাকে। চিরন্তন অসীম প্রেম হইতেই (মানবীয়) ভালবাসা উদ্ভূত।

ঈশ্বরপ্রেমিক কোন কিছুকে ভয় করিবেন কেন? দস্যু-তস্করের, দুঃখ-দুর্বিপাকের—এমন কি নিজের জীবনের ভয়ও তাঁহার নাই। ... প্রেমিক অনন্ত নরকে যাইতেও প্রস্তুত, কিন্তু উহা কি নরক থাকিবে? স্বর্গ, নরক—এই-সব ধারণা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর প্রেম আস্বাদন করিতে হইবে। ... শত শত লোক প্রেমের অনুসন্ধানে তৎপর, কিন্তু উহা আসিলে ভগবান্ ছাড়া আর সবই অদৃশ্য হইয়া যায়।

অবশেষে প্রেম, প্রেমাস্পদ এবং প্রেমিক এক হইয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য। ... আত্মা ও মানুষের মধ্যে এবং আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে কেন? ... কেবল এই প্রেম উপভোগ করিবার জন্য। ঈশ্বর নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন, সেই জন্য তিনি নিজেকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলেন। ... প্রেমিক বলেন, ‘সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্য ইহাই’। আমরা সকলেই এক। ‘আমি ও আমার পিতা এক।’ এইক্ষণে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য আমি পৃথক্ হইয়াছি। ... কোন্‌টি ভাল—চিনি হওয়া, না চিনি খাওয়া? চিনি হওয়া—তাহাতে আর কী আনন্দ? চিনি খাওয়া—ইহাই হইল প্রেমের অনন্ত উপভোগ।

প্রেমের সমগ্র আদর্শ—(ঈশ্বরকে) আমাদের পিতা, মাতা, সখা, সন্তানভাবে (ভাবিবার প্রণালী—ভক্তিকে দৃঢ় করিবার এবং গভীরতরভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য)। স্ত্রী-পুরষের মধ্যেই ভালবাসার তীব্র অভিব্যক্তি। ঈশ্বরকে এইভাবেও ভালবাসিতে হইবে। নারী তাহার পিতাকে ভালবাসে,—মাতা, সন্তান এবং বন্ধুকেও ভালবাসে; কিন্তু পিতা, মাতা, সন্তান বা বন্ধুর কাছে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল একজনের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই থাকে না। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও। ... পতি-পত্নীর সম্পর্ক সর্বাঙ্গীণ। এই সম্পর্কে অন্য সব ভালবাসা একীভূত হইয়াছে। পত্নী স্বামীর মধ্যে পিতা মাতা, সন্তান সবই পায়। স্বামীও পত্নীর মধ্যে মাতা, কন্যা প্রভৃতি সবকিছু লাভ করে। স্ত্রী-পুরুষের এই সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণ প্রেম ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে—যে-প্রেম নারী সম্পূর্ণ নির্ভয়ে লজ্জা না করিয়া, রক্তের সম্বন্ধ না মানিয়া তাহার প্রিয়তমকে নিবেদন করে। কোন অন্ধকার নাই। তাহার নিজের নিকট হইতে যেমন গোপন করিবার কিছু নাই, সেইরূপ তাহার প্রেমাস্পদের নিকটেও গোপনীয় বলিতে কিছুই থাকে না। এইরূপ প্রেম (ঈশ্বরের উপর) আসা চাই। এই বিষয়গুলি ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তোমরা ধীরে ধীরে এই-সব বুঝিতে পারিবে, তখন সমস্ত যৌন ভাবও দূরে চলিয়া যাইবে। ‘তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম’ এই জীবন ও ইহার সকল সম্পর্কগুলি।

তিনি স্রষ্টা ইত্যাদি—এই-সমস্ত ধারণা তো বালকদিগের উপযুক্ত। তিনি আমার প্রিয়, আমার জীবন—ইহাই আমার অন্তরের ধ্বনি হউক। ...

‘আমার একমাত্র আশা আছে। লোকে তোমাকে বলে জগতের প্রভু।

১০

ভালমন্দ, ছোটবড় সবই তুমি। আমিও তোমার এই জগতের অংশ এবং তুমিও আমার প্রিয়। আমার শরীর, মন, আত্মা তোমারই পূজাবেদীতলে। হে প্রিয়, আমার এই উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান করিও না।’

প্রেমের ধর্ম

[১৮৯৫ খ্রীঃ ১৬ নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি]

অনুভূতির গভীরে উপনীত হতে প্রতীক-উপাসনা এবং অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে যাবার প্রয়োজন মানুষের আছে বলেই ভারতবর্ষে আমরা বলে থাকি, 'কোন ধর্মমতের গণ্ডীর মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু সেই মত নিয়েই মরা ভাল নয়।' চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য বেড়ার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু চারা যখন বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন বেড়াই আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রাচীন পদ্ধতিগুলি সমালোচনা ও নিন্দা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ভুলে যাই যে, ধর্মের ক্রমবিকাশ অবশ্যই থাকবে।

আমরা প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা করি, এবং তাঁকে স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি বলে বিশেষিত করে থাকি। কিন্তু প্রেমের সঞ্চার হলে ঈশ্বর শুধু প্রেমস্বরূপ হয়ে যান। ঈশ্বর কী—তা নিয়ে প্রেমিক ভক্ত মাথা ঘামায় না, কারণ সে তাঁর কাছে কিছুই চায় না। জনৈক ভারতীয় সাধক বলেছেন, 'আমি তো আর ভিক্ষুক নই।' আর সে ভয়ও করে না। ভগবানকে মানুষেরই মত ভালবাস।

ভক্তিভাবাশ্রিত কয়েকটি সাধনপ্রণালীর উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে। (১) শান্তঃ সহজ শান্তিপূর্ণ অনুরাগ—পিতৃত্ব ও সাহায্যের একটা ভাব মিশ্রিত; (২) দাস্যঃ সেবাভাবের আদর্শ; ঈশ্বর প্রভু বা অধ্যক্ষ বা সম্রাট্‌রূপে দণ্ড ও পুরস্কারদানে রত; (৩) বাৎসল্যঃ ঈশ্বরে সন্তানভাব। ভারতবর্ষে মা কখনই শাস্তি দেন না। এ-সব অবস্থার প্রত্যেকটিতে উপাসক ঈশ্বরের এক-একটি আদর্শ গ্রহণ করে তদনুযায়ী সাধন করে। তারপর (৪) ভগবান্ হন সখা; সখ্যভাবে কোন ভয় নেই। এতে সমতা ও অন্তরঙ্গতার ভাবও আছে। অনেক হিন্দুসাধক ঈশ্বরকে সখা ও খেলার সাথী জ্ঞানে উপাসনা করে। তারপর (৫) মধুর-ভাবঃ মধুরতম প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম। সেণ্ট টেরেসা এবং ভাবাবিষ্ট সাধকগণ—এর দৃষ্টান্ত। পারসীকদের মধ্যে কান্তাভাবে এবং হিন্দুদের মধ্যে পতিরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করার রীতি আছে। মহীয়সী রানী মীরাবাঈ-এর কথা আমাদের মনে পড়ে; তিনি ভগবানকে পতি বলে প্রচার করতেন। অনেকের মত এত চরমে পৌঁছেছে যে, তাদের কাছে ঈশ্বরকে 'সর্বশক্তিমান্' বা 'পিতা' বলা যেন অধর্ম। এ-ভাবের উপাসনার ভাষা প্রণয়মূলক। এমন কি কেউ কেউ অবৈধ প্রণয়ের ভাষাও ব্যবহার করে থাকেন। কৃষ্ণ ও ব্রজগোপিকাদের কাহিনী এই পর্যায়ভুক্ত। তোমাদের হয়তো ধারণা যে, এই ভাবের উপাসনায় সাধকের অত্যন্ত অধোগতি হয়। তা হয়ও বটে। তথাপি অনেক বড় বড় সাধকের জীবনে উন্নতিও হয়েছে এই ভাবের মধ্য দিয়ে। এমন কোন মানবীয় বিধান নেই, যার অপব্যবহার হয়নি। ভিখারী আছে বলে কি তুমি রান্না বন্ধ রাখবে? চোরের ভয়ে তুমি কি নিঃস্ব হয়েই কাটাবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি চুম্বনের একবার মাত্র আস্বাদন আমাকে পাগল করে তুলেছে!'

১১

এই ভাবে আরাধনার ফলে কেউ বেশীদিন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকতে বা আচার-অনুষ্ঠানাদি মেনে চলতে পারে না। ভারতে ধর্ম মুক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এ মুক্তিও ত্যাগ করতে হয়, তখন শুধু প্রেমের জন্যই প্রেম।

সর্বশেষে আসে নির্বিশেষ প্রেম—আত্মা। একটি পারসী কবিতায় বর্ণিত আছে, জনৈক প্রণয়ী তার প্রণয়িনীর ঘরের দরজায় ঘা দিল। প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করল 'কে তুমি?' প্রেমিক উত্তর দিল, 'তোমারই প্রিয়তম অমুক।' প্রেমিক শুধু বলল, 'আমি তো এমন কাউকে চিনি না! তুমি চলে যাও!' ... এভাবে চতুর্থবারও যখন প্রশ্ন করল, তখন প্রেমিক বলে উঠল, 'প্রিয়তম, আমি তো তুমিই, অতএব দরজা খোল।' অবশেষে দরজা খুলে গেল।

প্রেমিকার ভাষায় অনুরাগ বর্ণনা করে জনৈক মহান্ সাধক বলেছেনঃ 'চার চোখের মিলন হল। দুটি আত্মায় যেন কি পরিবর্তন হয়ে গেল! এখন আর আমি বলতে পারি না—তিনি পুরুষ এবং আমি নারী, অথবা তিনি নারী এবং আমি পুরুষ। শুধু এটুকুই স্মৃতিতে আছে যে, আমরা দু-টি আত্মা ছিলাম। অনুরাগের আবির্ভাবে এক হয়ে গেছি।'

১২

সর্বোচ্চ প্রেমে শুধু আত্মারই মিলন। অন্য যত রকম ভালবাসা, সবই দ্রুত বিলীয়মান। শুধু আত্মিক প্রেমই স্থায়ী হয়, এবং ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

প্রেম দেখে আদর্শটি। এটি ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ। ঈশ্বর কারণ, স্রষ্টা ও পিতা। প্রেম হচ্ছে চরম পরিণতি। কুঁজো সন্তানের জন্য মা অপেক্ষা করেন, কিন্তু দিন কয়েক লালন-পালনের পরই তাকে স্নেহ করেন এবং সব চেয়ে সুন্দর মনে করেন। কৃষ্ণাঙ্গ ইথিওপের ললাটে প্রেমিক সুন্দরী হেলেনেরই রূপ দেখে। এ-সব ব্যাপার আমরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করতে পারি না। ইথিওপের ললাট উপলক্ষ মাত্র; প্রেমিক তো দেখে হেলেনকেই। উপলক্ষের উপর তার আদর্শটি প্রক্ষেপ করা হয়, এবং আদর্শ তাকে আবৃত করে—শুক্তি যেমন বালুকণাকে মুক্তায় রূপান্তরিত করে। ঈশ্বর হচ্ছেন আদর্শ, যাঁর ভিতর দিয়ে মানুষ সব কিছু দেখতে পারে।

সুতরাং আমরা প্রেমকেই ভালবাসছি। এই প্রেম মুখে প্রকাশ করা যায় না। কোন বাক্যই তা উচ্চারণ করতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা মৌন।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রেমে অতিশয় উন্নত হয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানবীয় ভালবাসা গুণ-মিশ্রিত। অন্যের মনোভাবের উপর তা নির্ভরশীলও বটে। প্রেমের এই পারস্পরিক নির্ভরতাকে ব্যক্ত করার শব্দ ভারতীয় ভাষাগুলিতে আছে। সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ভালবাসা হচ্ছে স্বার্থযুক্ত; তাতে শুধু ভালবাসা পাবার সুখই আছে। আমরা ভারতবর্ষে বলি, 'একজন গাল পেতে দিচ্ছে, আর একজন চুম্বন করছে।' পারস্পরিক প্রেম এর ঊর্ধ্বে। কিন্তু এও থাকে না। যথার্থ প্রেম সর্বস্ব-ত্যাগে। এ-অবস্থায় আমরা অন্যকে দেখতে অথবা আমাদের আবেগকে প্রকাশ করবার মত কিছু করতেও চাই না। দেওয়াটাই যথেষ্ট। এভাবে মানুষকে ভালবাসা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরকে ভালবাসা সম্ভব।

বালকেরা রাস্তায় ঝগড়া করতে করতে যদি ভগবানের নামে শপথ করে, ভারতবর্ষে তাতে কোন ঈশ্বরনিন্দা হয় না। আমরা বলি, আগুনে হাত দাও—তুমি অনুভব কর আর নাই কর, তোমার হাত পুড়বেই। তেমনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করলে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হবে না।

ঈশ্বরনিন্দার ভাবটি এসেছে য়াহুদীদের কাছ থেকে; য়াহুদীরা পারসীকদের আনুগত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ঈশ্বর বিচারকর্তা ও শাস্তা—এ-ভাবটি মন্দ না হলেও নিম্নস্তরের ও স্থূল। ত্রিভুজের তিনটি কোণঃ প্রেম কিছু চায় না; প্রেমে কোন ভয় নাই; প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শের জন্য।

'সেই প্রেমময় ভগবান্ যদি বিশ্বভুবন জুড়ে না থাকতেন, তবে কে-ই বা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারত, কে-ই বা এক মুহূর্ত ভালবাসতে পারত?'

আমরা অনেকেই দেখতে পাব যে, শুধু কর্ম করতেই আমরা জন্মেছি। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করব। ভগবানের প্রীতির জন্যই কাজ করা হয়েছে। বিফল হলেও দুঃখ করবার কিছু নাই। ভগবানের প্রীতির জন্যই তো যত কিছু কর্ম।

নারীর মধ্যে মাতৃ-ভাবটি খুব পরিস্ফুট। ঈশ্বরকে তাঁরা সন্তানভাবে উপাসনা করেন; যা কিছু করেন তার জন্য, কিছুই চান না।

ক্যাথলিক এই-সব গভীর তত্ত্বের অনেক কিছুই শেখায়, এবং একটু সংকীর্ণ হলেও অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ। আধুনিক সমাজে প্রোটেষ্টান্ট মত উদার হলেও অগভীর। সত্য কতখানি মঙ্গল করেছে, তা দ্বারা সত্যের বিচার করা—একটি শিশুকে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মতই অসঙ্গত।

সমাজ হবে প্রগতিশীল। নিয়মকে অতিক্রম করে নিয়মের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করার প্রয়োজনেই আমরা তাকে স্বীকার করি। ত্যাগের অর্থই হচ্ছে—কেউই ঈশ্বর ও ধন-দেবতার উপাসনা একসঙ্গে করতে পারে না।

তোমাদের বিচার-বুদ্ধি ও প্রেম গভীর কর। তোমাদের হৃদয়-পদ্ম ফুটিয়ে তোল—মৌমাছি আপনিই এসে জুটবে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস রাখ,—তারপর ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে। মুষ্টিমেয় শক্তিধর মানুষই পৃথিবী তোলপাড় করে দিতে পারে। চাই পরের জন্য অনুভব করার সহানুভূতিশীল হৃদয়, উদ্ভাবনকারী মস্তিষ্ক, এবং কর্ম করার উপযোগী দৈহিক শক্তি। বুদ্ধ (মনুষ্যেতর) প্রাণিবর্গের জন্যও আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র করে তোল। কিন্তু ঈশ্বরই কর্ম করেন, তুমি কর না। একজনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব রয়েছে। জড়বস্তুর একটি কণার মধ্যেই জগতের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। হৃদয় মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ কর।

পূর্বে বিধান ছিল প্রতিযোগিতা, আজকের বিধান হচ্ছে সহযোগিতা। আগামীকাল কোন বিধি-বিধানই থাকবে না। ঋষিরা তোমায় সাধুবাদ করুন, অথবা জগৎ তোমায় ধিক্কার দিক্, ভাগ্য-লক্ষ্মী তোমার প্রতি প্রসন্না হোন অথবা দারিদ্র্য ও বস্ত্রহীনতা তোমায় ভ্রূকুটি করুক, একদিন হয়তো বনের লতাপাতা আহার করবে, আবার পরদিনই পঞ্চাশ উপকরণের বিরাট ভোজে অংশ গ্রহণ করবে, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে এগিয়ে যাও!

১৩

[স্বামীজী তারপর প্রশ্নোত্তরে পওহারী বাবার কথা উল্লেখ করেন—কিভাবে সেই যোগী নিজের বাসনপত্রগুলি নিয়ে চোরের পিছনে ছুটেছিলেন এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি জানতুম না যে, তুমি এসেছিলে! দয়া করে বাসনগুলি গ্রহণ কর। এগুলি তোমার! আমি তোমার সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর।' স্বামীজী আরও বলেন, কিভাবে এক বিষধর সাপ সেই যোগীকে দংশন করে এবং সন্ধ্যার দিকে সুস্থ বোধ করে তিনি বলতে থাকেন, 'আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে দূত এসেছিল!']

বিল্বমঙ্গল

‘ভক্তমাল’ নামক একখানা ভারতীয় গ্রন্থ হইতে এই কাহিনীটি গৃহীত। এক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। অন্য গ্রামের এক দুশ্চরিত্রা নারীর প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হয়। গ্রাম দুইটির মধ্যে একটি বড় নদী ছিল। প্রত্যহ খেয়া-নৌকায় নদী পার হইয়া যুবক তাহার নিকট যাইত। একদিন যুবককে পিতৃশ্রাদ্ধাদির কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়; এজন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সেদিন সে মেয়েটির কাছে যাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজের এই অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। যুবক ছটফট করিতে থাকিলেও তাহার কোন উপায় ছিল না। অনুষ্ঠান শেষ করিতে রাত্রি হইয়া গেল।

তখন ভীষণ গর্জন করিয়া ঝড় উঠিয়াছে। বৃষ্টি নামিল, প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে নদী বিক্ষুব্ধ হইল। নদী পার হওয়া বিপজ্জনক, তথাপি যুবক নদীতীরে উপস্থিত হইল। খেয়াঘাটে নৌকা নাই; এ দুর্যোগে মাঝিরা নদী পার হইতে ভয় পায়। যুবক কিন্তু যাইবার জন্য অস্থির; মেয়েটির প্রেমে সে পাগল; তাহাকে যাইতেই হইবে। একখণ্ড কাঠ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাই ধরিয়া সে নদী পার হইল। অপর তীরে পৌঁছিয়া কাষ্ঠখণ্ডটি টানিয়া উপরে উঠাইল এবং প্রণয়িনীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহদ্বার বন্ধ; যুবক দ্বারে করাঘাত করিলেও ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দে কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। সুতরাং সে গৃহপ্রাচীরের চতুর্দিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যাহা দেখিতে পাইল, সেটিকেই প্রাচীর-লম্বিত রজ্জু বলিয়া মনে করিল।

‘অহো! প্রিয়া আমার আরোহণের জন্য রজ্জু রাখিয়া দিয়াছে!’—মনে মনে এই বলিয়া যুবক সযত্নে সেটিকে ধরিল। সেই রজ্জুর সাহায্যে সে প্রাচীরে আরোহণ করিল এবং অপর দিকে পৌঁছিয়া পা ফসকাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। একটা শব্দ শুনিয়া গৃহবাসিগণ জাগিয়া উঠিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া মেয়েটি যুবককে মূর্ছিত অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। যুবকের দেহ হইতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ব্যাপার কি? তোমার গায়ে এমন দুর্গন্ধ কেন? কি করে আঙিনার ভেতরে এলে?’ যুবক উত্তর করিল, ‘কেন, আমার প্রেমিকা কি প্রাচীরে একটা দড়ি ঝুলিয়ে রাখেনি?’ স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, ‘প্রেমিকা আবার কে? অর্থোপার্জনই আমাদের উদ্দেশ্য। তুমি কি মনে কর, তোমার জন্য আমি দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম? কি উপায়ে তুমি নদী পার হলে? ‘কেন, একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরেছিলাম।’ মেয়েটি বলিল, ‘চল, একবার দেখে আসি।’

যে রজ্জুর কথা বলা হইয়াছে, উহা ছিল একটা বিষধর গোখুরা সাপ, তাহার সামান্য স্পর্শেই মৃত্যু নিশ্চিত। সাপটার মাথা ছিল একটা গর্তের মধ্যে। সাপের গর্তে প্রবেশ করার সময় যুবক দড়ি মনে করিয়া তাহার লেজটা ধরিয়াছিল। প্রেমে পাগল হইয়াই সে এই কাজ করিয়াছিল। সাপের মুখ গর্তের মধ্যে এবং দেহ বাহিরে থাকিলে যদি কেহ তাহার লেজ ধরে, তবে সাপ তাহার মুখ গর্তের বাহিরে আনে না। এইজন্যই যুবক লেজ ধরিয়া প্রাচীর আরোহণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যুবক খুব জোরের সহিত লেজ টানিতে থাকায় সাপটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ‘কাষ্ঠখণ্ডটি কোথায় পেলে?’ উত্তর হইল, ‘কেন, নদীতে ভেসে আসছিল।’ বস্তুতঃ উহা ছিল একটি গলিত শব; নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইবার সময় কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া যুবক উহা ধরিয়াছিল। এখন বুঝা গেল, তাহার দেহে কেন ঐ দুর্গন্ধ। মেয়েটি যুবকের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘প্রেমে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না; আমরা কখনও প্রেমে বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ যদি প্রেম না হয়, তবে—ভগবান্ রক্ষা করুন! প্রেম কি তা আমরা জানি না; কিন্তু বন্ধু! আমার মত একজন নারীকে তুমি হৃদয় দান করিলে কেন? কেন তোমার হৃদয় ভগবানকে উৎসর্গ করলে না? এরূপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।’—এই কথায় যুবকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ক্ষণিকের জন্য তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। ‘ভগবান্ কি আছেন?’ ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধু, আছেন বৈ কি!’

যুবক সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং চলিতে চলিতে এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে সাশ্রুনয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, ‘প্রভু, আমি তোমাকে চাই। আমার এ প্রেম-প্রবাহ ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে ধরে না। আমি সেই প্রেমের সাগরকে ভালবাসিতে চাই, যেখানে আমার প্রেমের এই প্রবল প্রবাহিণী গিয়া মিশিতে পারে; আমার প্রেমের এই বেগবতী নদী তো আর ক্ষুদ্র জলাশয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা চায় অনন্ত সাগর। প্রভু, তুমি যেখানেই থাক, আমার কাছে এস।’

এইভাবে বহু বৎসর বনে কাটাইয়া তাহার মনে হইল, সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সে শহরে আসিল। একদিন সে নদীতীরে একটি স্নানের ঘাটে বসিয়াছিল, এমন সময় ঐ শহরের এক বণিকের সুন্দরী যুবতী পত্নী পরিচারিকা-সহ সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধের সেই পুরাতন ভাবটি আবার জাগিয়া উঠিল, সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি তাহাকে আবার আকর্ষণ করিল। যোগী নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল এবং যুবতীকে তাহার গৃহ পর্যন্ত অনুসরণ করিল। মুহূর্তমধ্যে যুবতীর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গৈরিকধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বলিল, ‘মহারাজ, ভেতরে আসুন। আমি আপনার জন্য কি করিতে পারি?’ যোগী উত্তর করিলেন, ‘আমি আপনার নিকট একটি ভয়ানক বস্তুর প্রার্থী?’ ‘মহারাজ, যে-কোন বস্তু চাইতে পারেন, আমি গৃহস্থ; যে যা চায়, আমি তাকে তাই দিতে প্রস্তুত।’ সন্ন্যাসী বলিলেন, ‘আমি আপনার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।’ গৃহস্থ বলিল, ‘হা ভগবান্ এ কি! আমি তো পবিত্র, আমার স্ত্রীও পবিত্র; প্রভু সকলের রক্ষক। মহারাজ, স্বাগতম্, ভেতরে আসুন।’ সন্ন্যাসী ভিতরে আসিতেই গৃহস্বামী স্ত্রীর নিকট তাঁহার পরিচয় দিল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?’ সন্ন্যাসী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘মা, আপনার চুল থেকে দুটো কাঁটা আমাকে দেবেন কি?’ ‘এই নিন্।’ সন্নাসী সেই কাঁটা দুটি নিজের দুই চোখে সজোরে বিঁধিয়া দিয়া বলিলেন, ‘দূর হ, দুর্বৃত্ত নয়ন-যুগল। এখন থেকে তোরা

আর সম্ভোগ করতে পারবি না। যদি দেখতেই চাস, তবে অন্তশ্চক্ষু দিয়ে দেখ্—সে ব্রজের রাখালকে। এখন অন্তশ্চক্ষুই তোর সর্বস্ব।'

এইভাবে সন্ন্যাসী পুনরায় বনে ফিরিয়া গেলেন এবং আবার দিনের পর দিন ভগবানের কাছে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে প্রেমের যে উদ্দাম প্রবাহ বহিতেছিল, তাহাই সত্যলাভের জন্য সংগ্রাম করিতে লাগিল; পরিশেষে তিনি সিদ্ধি- লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়রূপ প্রেম-প্রবাহিণীর গতি ঠিক পথে পরিচালিত হইয়া তাঁহাকে রাখালরাজের নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে, কৃষ্ণরূপে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে একবার মাত্র তাঁহার অনুতাপ আসিয়াছিল যে, তিনি চক্ষু হারাইয়া—কেবল অন্তর্দৃষ্টিই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রেমবিষয়ক কয়েকটি মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই লেখকেরা প্রথমে গুরুবন্দনা করেন। তাই বিল্বমঙ্গল সেই নারীকেই তাঁহার প্রথম গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

বাল-গোপালের কাহিনী

একদিন শীতের অপরাহ্নে—পাঠশালায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে গোপাল নামে একটি ব্রাহ্মণ-বালক তার মাকে ডেকে বলল, ‘মা, বনের পথ দিয়ে একা একা পাঠশালায় যেতে আমার বড় ভয় করে। অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হয় চাকর না-হয় আর কেউ আসে। পাঠশালায় পৌঁছে দেবার জন্যও আসে, আবার বাড়ী নিয়ে যেতেও আসে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসে না, মা?’

একটি গ্রাম্য-পাঠশালার ছাত্র গোপাল। সকালে-বিকালে তার পাঠশালা বসত। বিকালের ছুটির পর, শীতের দিনে, বাড়ি আসতে আসতে পথেই সন্ধ্যা হয়ে যেত। তাছাড়া পাঠশালার পথটিও নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে একেবেঁকে গিয়েছে। কাজেই অন্ধকারে একলাটি ঐ পথে আসতে গোপালের ভয় করত।

গোপালের মা বিধবা। শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন নিয়েই গোপালের বাবার দিন কাটত, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। আবার তাঁর মৃত্যুর পর দুঃখিনী বিধবা তার মা যেন বিষয়-ব্যাপার থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদিও সে-সবের সঙ্গে যোগাযোগ কোনদিনই তাঁর বেশী ছিল না। তখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান-উপাসনা, যম-নিয়ম প্রভৃতি পালন করে চরম-মুক্তিদাতা যে মৃত্যু, তারই জন্য ধৈর্য সহকারে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অন্তরে আশা ছিল—মৃত্যুর পরপারে, অন্তহীন জীবনের পথে, যিনি তাঁর ভাল-মন্দের সাথী, সুখ-দুঃখের অংশভাগী সেই দয়িতের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন। ...

নিজের একটি পর্ণকুটিরেই তিনি বাস করতেন। তাঁর স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে একখণ্ড ধানজমি কেউ তাঁকে দান করেছিল। সে-জমিতে যে ধান উৎপন্ন হতে—বিধবার প্রয়োজনের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। এ-ছাড়া, কুটিরটিকে ঘিরে আরও কিছু জমি ছিল। সেখানে বাঁশ-ঝাড় ছিল, কয়েকটি নারিকেল গাছ ছিল, আর ছিল দু-চারটি আম ও লিচুর চারা। গ্রামবাসীদের সাহায্যে সেগুলি থেকেও প্রচুর ফলমূল পাওয়া যেত। এরও উপর আর যা লাগত, তার জন্য প্রতিদিন অনেকটা সময় তিনি চরকায় সুতা কাটতেন। ...

প্রভাতের প্রথম স্বর্ণ-কিরণ তালগাছের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিফলিত হবার বহুপূর্বে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। তখনও প্রভাতী পাখির কল-কাকলি শুরু হতে না। একটি সামান্য মাদুর আর তার উপর বিছানো একখানা কম্বল—এই ছিল তাঁর শয্যা। সেই দীন শয্যাটিতে বসে অতি প্রত্যূষ থেকে তিনি নামগান আরম্ভ করতেন। পুণ্যশ্লোকা নারীদের পূত চরিতকথা কীর্তন করতেন, ঋষিদের প্রণাম জানাতেন, আর জপ করতেন। জপ করতেন মানুষের পরমাশ্রয় নারায়ণের নাম, করুণাময় মহাদেবের নাম, আর জগত্তারিণী তারাদেবীর নাম। সর্বোপরি অন্তরের সর্ব-আকূতি নিবেদন করতেন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দেবতা—শ্রীকৃষ্ণের কাছে, যিনি করুণায় বিগলিত হয়ে মানুষের শিক্ষার জন্য, ত্রাণের জন্য বাল-গোপালমূর্তিতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে প্রার্থনার ফলে তাঁর অন্তরে এক বিচিত্র আনন্দানুভূতি জেগে উঠত। মনে হতে তিনি যেন নিজস্বামীর সহিত একত্র হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার বাঞ্ছিত পথে আরও একটি দিন এগিয় গেলেন।

কুটিরের অনতিদূরে ছিল একটি নদী। দিবারম্ভের পূর্বেই সেই নদীতে তাঁর স্নান হয়ে যেত। স্নানকালে তাঁর প্রার্থনা ছিল—‘হে দেবতা, নদীর নির্মলজলে স্নান করে দেহটি আমার যেমন পবিত্র হল—স্নিগ্ধ হল, তোমার করুণায় আমার অন্তরটিও যেন তেমনি পবিত্র—তেমনি স্নিগ্ধ হয়ে যায়।’

তারপর সদ্যোধৌত শুদ্ধ একটি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে তিনি পুষ্প-চয়ন করতেন, সুগন্ধ চন্দন প্রস্তুত করতেন বৃত্তাকৃতি চন্দন-পাটায়, এবং তুলসীপত্র আহরণ করে পূজার উদ্দেশ্যে ছোট ঠাকুরঘরটিতে প্রবেশ করতেন। সে ঘরে তাঁর বাল-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি রেশমী চন্দ্রাতপের নীচে, সুদৃশ্য দারু-নির্মিত সিংহাসনে, ভেলভেটের কোমল গদির উপরে, প্রায় পুষ্পাবৃত অবস্থায় থাকত শ্রীকৃষ্ণের সে ধাতুনির্মিত বাল-গোপাল মূর্তিটি।

মায়ের প্রাণ শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে কল্পনা করেই শুধু তৃপ্তিলাভ করত। তাঁর স্বামী জীবিতকালে কতদিন কতবার বেদোক্ত সেই নিরাকার, নিরবয়ব, নৈর্ব্যক্তিক দেবতার বর্ণনা তাঁকে শুনিয়েছেন। সর্ব-অন্তর দিয়ে সে-সব অনবদ্য কাহিনী তিনি শ্রবণ করতেন, অকুণ্ঠচিত্তে ধ্রুব সত্য বলে সেগুলি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু হায়! শিক্ষাহীন ও শক্তিহীন এক নারীর পক্ষে সে বিরাটকে ধারণা করা কিরূপে সম্ভব? তাছাড়া শাস্ত্রে তো এ-কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে—যে যে-ভাবে আমাকে ভজনা করে, সে সে-ভাবেই আমাকে লাভ করে থাকে। মানুষ যুগে যুগে আমারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে থাকে।—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

এবং ঐ ভাবটিতেই তাঁর অন্তর ভরে যেত, অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না।

এইভাবেই কাটছিল তাঁর জীবন। হৃদয়ের সকল ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণে তিনি সমর্পণ করেছিলেন এবং সে সমর্পণটি বিশেষভাবে তাঁর ক্ষুদ্র ধাতু-বিগ্রহটিকে ঘিরেই নিয়ত লুতাতন্তুর মত আবর্তিত হত। তাছাড়া ভগবানের এ-বাণীটিও তার

শোনা ছিল—

‘রক্তমাংসের তৈরী মানুষকে তুমি যেমন সেবা কর, আমাকেও তেমনি প্রেম পবিত্রতা দিয়ে সেবা কর। আমি সেই সেবা গ্রহণ করব।’

সুতরাং সেবাই তিনি করতেন; যে-ভাবে নিজ প্রভুকে মানুষ সেবা করে, যে-ভাবে সেবা করে গুরুকে, সর্বোপরি তাঁর নয়নের নিধি পুত্রকে, একমাত্র সন্তানকে তিনি যেভাবে সেবা করতেন—শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনিভাবেই সেবা করতেন। প্রতিদিন ধাতুমূর্তিটিকে তিনি স্নান করাতেন, সাজাতেন, ধূপধুনা দিতেন তাঁর সামনে। কিন্তু ভোগ বা নৈবেদ্য? হায়, দরিদ্র বিধবার সে সামর্থ্য কোথায়? দুঃখে তাঁর চোখে জল আসত, আর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করতেন স্বামীর কাছে শোনা সেই শাস্ত্রবচন, ভগবানের সেই অভয়-উক্তি—পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে যা-কিছু দান করে, আমি তাই গ্রহণ করে থাকি।—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

সুতরাং তাঁর প্রার্থনা ছিল এই মন্ত্রেঃ হে দেবতা, এই বিপুলা পৃথিবীতে কত বিচিত্র কুসুম তোমারই প্রীতির জন্য নিয়ত ফুটে উঠেছে, তবু আমার তুচ্ছ বনফুল ক-টি গ্রহণ কর। তুমি বিশাল বিশ্বের অন্নদাতা, তথাপি আমার সামান্য ফলের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। আমি শক্তিহীন, শিক্ষাহীন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রাণের রাখাল, আমার পুত্র। তুমি কৃপা করে আমার পূজা-অর্চনা সার্থক কর, আমার প্রেম কামনাহীন কর। ...

পূজার ফল বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে ফলও তুমিই গ্রহণ কর। আমাকে দাও প্রেম, শুধু প্রেম—যে-প্রেম অন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না, প্রেম ভিন্ন আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না।

হয়তো আকস্মাৎ কোনদিন গ্রামের বাউল-বৈরাগী মায়ের ক্ষুদ্র আঙিনাটিতে এসে দাঁড়ায় এবং প্রভাতী সুরে গান ধরে—

শোনরে মানুষ ভাই,
প্রেমের কথা কয়ে যাই
(আমি) জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে—
প্রেমের ডাকে করি ভয়,
আমার আসন কাঁপে
প্রেমের ডাকে,
প্রেমাশ্রুতে হই উদয়।
নিত্যমুক্ত যেই ভগবান্
নিরবয়ব ব্রহ্ম যেই,
প্রেমের দায়ে নররূপে
তারি খেলা দেখতে পাই;
তারি লীলা জানতে পাই।
বৃন্দাবনের কুঞ্জছায়ে
জ্ঞানের কিবা প্রকাশ ছিল?
রাখাল-বালক গোপ-বালিকা
শাস্ত্র কবে পড়েছিল?
কিন্তু তারা প্রেমিক ছিল,
ছিল ভালবাসায় ভরা,
তাইতো তাদের প্রেমের পাশে
আমি চির রইনু ধরা।

এমনি করে তাঁর মাতৃহৃদয় যেন ভাগবত সত্তার মধ্যেই নিজের পুত্রটিকে লাভ করেছিল এবং দেব-গোপালের নামানুসারে পুত্রের নামও তিনি রেখেছিলেন—গোপাল। তাকে অবলম্বন করেই এ-জগতের বুকে নিজের মনটিকে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। নতুবা পার্থিব-বন্ধনহীন তাঁর মন মুহুর্মুহুঃ জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে ধাবিত হত। এ মাটির পৃথিবীতে তাঁর যে প্রাত্যহিক জীবন, তা ছিল যেন অনেকটা কলের মত, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত। বস্তুতঃ তাঁর চলাফেরা, তাঁর চিন্তা সুখ, এক কথায় তাঁর সমগ্র জীবনটুকু কি ঐ ক্ষুদ্র বালকটিকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল না? হ্যাঁ, তাই ছিল।

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তিনি তাঁর মাতৃহৃদয়ের সকল কোমলতা দিয়ে ঐ শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন। আজ সে পাঠশালায় যাবার মত বড় হয়েছে, পাঠশালায় সে যাবে। তাই ছাত্রজীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো সংগ্রহ করবার জন্য মার কত দীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম!

প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশী ছিল না। যে-দেশে মাটির প্রদীপে একছটাক তেল ঢেলে আর একটা কাপড়ের সলতে লাগিয়ে আলো জ্বেলে প্রফুল্ল চিত্তে মানুষ বিদ্যাচর্চায় দিন কাটায়, যেখানে ঘাসের তৈরী একটি মাদুর ভিন্ন আর কোন আসবাব-পত্রেরই প্রয়োজন

হয় না, সে-দেশের ছাত্রজীবনের প্রয়োজন খুব বেশী হবার কথাও নয়। তবু সামান্য যে দু-চারটি জিনিষের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করতেই দরিদ্র বিধবাকে বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

দিনের পর দিন চরকায় সূতা কেটে গোপালের জন্য একখানা পরবার কাপড় এবং একখানা গায়ে দেবার চাদর তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সংগ্রহ করতে হয়েছিল মাদুর-জাতীয় ছোট একটি আসন, যার উপর দোয়াত, খাগের কলম প্রভৃতি রেখে গোপাল লিখবে এবং পরে যেটিকে গুটিয়ে বগলদাবা করে পাঠশালায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর ফিরবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে।

তারপর যে-শুভদিনটিতে গোপালের বিদ্যারম্ভ হল, সে প্রথম অ, আ, লিখতে চেষ্টা করল—সে-দিনটি দুঃখিনী মায়ের কাছে যে কী আনন্দের দিন ছিল, তা মা ভিন্ন অন্যের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ? আজ তাঁর মনে একটি গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। বনপথ দিয়ে একা যেতে-আসতে গোপাল ভয় পাচ্ছে, কে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? এর আগে কোনদিন নিজের বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য এমন করে তিনি ভাবেননি, অনুভব করেননি। মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক্ যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল ভগবানের সেই চিরন্তন আশ্বাসবাণী—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

একান্তভাবে—অনন্যচিন্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে, আমি তার সকল ভার স্বয়ং বহন করে থাকি।

আর তাঁর বিশ্বাসী মন ঐ আশ্বাস-বাণীতেই একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। ...

তারপর চোখের জল মুছে ছেলেকে বললেন, 'ভয় কি বাবা! ঐ বনে আমার আর একটি ছেলে থাকে, তারও নাম গোপাল। সে তোমার বড় ভাই। বনভূমির অন্ধকার পথে যখন তুমি ভয় পাবে, তখন তোমার দাদাকে ডেক।'

বিশ্বাসী মায়ের পুত্র গোপাল। সেও তাই সকল অন্তর দিয়েই মার কথা বিশ্বাস করল। ...

তারপর সেদিন অপরাহ্নে—পাঠশালা থেকে ফেরার পথে অরণ্যভূমির নিবিড়তায় ভয় পেয়েই মায়ের নির্দেশ অনুসারে বালক তার বনের ভাইটিকে ডাক দিল—'গোপাল-দাদা, তুমি কি এখানে আছ? মা বলেছেন, তুমি এই বনে থাক; বলেছেন, তোমাকে ডাকতে। একলাটি আমার বড় ভয় করছে, ভাই!'

তখন দূর বনান্তরাল থেকে শব্দ ভেসে এল—'ভয় নেই ভাই, এই তো আমি রয়েছি। ভয় কিসের, তুমি বাড়ি যাও।'

সেদিন থেকে, এমনি করে দিনের পর দিন গোপাল তার বনের দাদাকে ডাকে, আর একই স্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে সে-সব কথা সে বলে, আর মা বিস্ময়ে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শোনেন সে কাহিনী। তারপর একদিন মা তাকে বললেন—'বাবা, এরপর যখন তোমার রাখাল দাদার সঙ্গে দেখা হবে, তখন তাকে বল সে যেন তোমাকে দেখা দেয়।' ...

পরদিন যথাকালে বনপথে যাবার সময় গোপাল তার ভাইকে ডাক দিল এবং পূর্বের মত উত্তরও এল বন থেকে। কিন্তু এবার মার কথামত গোপাল তার দাদাকে দেখা দেবার জন্য একান্ত অনুরোধ করল। বলল, 'গোপাল দাদা, তোমাকে তো কোনদিন আমি দেখিনি। আজ আমাকে দেখা দাও।'

তখন উত্তর শোনা গেল, 'ভাই, এখন বড় ব্যস্ত আছি। আজ আমি আসতে পারব না।' কিন্তু গোপাল ছাড়বে না, সে বার বার কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগল। তখন অকস্মাৎ বনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল বনের রাখাল। পরনে গোপালকের বেশ, মাথায় ছোট্ট মুকুট—তাতে বসানো শিখিপুচ্ছ, হাতে বাঁশের বাঁশী।

দুইটি বালকই তখন মহাখুশী। একসঙ্গে তারা খেলা করল, গাছে উঠল, ফল কুড়াল, ফুল কুড়াল—বনের গোপাল আর দুঃখিনী মায়ের গোপাল—দু-টি ভাই। খেলতে খেলতে পাঠশালার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল এবং গোপাল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠশালার পথে চলে গেল।

সেদিন তার পাঠ প্রায় ভুল হয়ে গেছে। সমগ্র অন্তর উৎসুক হয়ে রয়েছে কেবল বনে ফিরে রাখাল দাদার সঙ্গে আবার খেলা করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়। ...

এইভাবে কয়েকমাস সময় কেটে গেল। দিনের পর দিন সন্তানের বিচিত্র কাহিনী শুনতেন মা, আর ভগবানের অপার করুণার কথা চিন্তা করে নিজের দৈন্য বৈধব্য প্রভৃতি সব কিছু ভুলে যেতেন। দুঃখকে মনে মনে গ্রহণ করতেন ভগবানের অনন্ত আশীর্বাদ বলে।

এরপর পাঠশালার গুরুমশায়ের গৃহে একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন এল। সে-কালে গ্রাম্য-পাঠশালার পণ্ডিতগণ একাই অনেকগুলি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেন। নির্ধারিত বেতন হিসাবেও তাঁরা বিশেষ কিছু গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হলে ছাত্রেরা নানা উপঢৌকন দিত শিক্ষককে এবং সে-সবের উপর তাঁরা অনেকাংশে নির্ভরও করতেন।

কাজেই গোপালের গুরুমশায়ও ছাত্রদের কাছে অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপঢৌকনের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং প্রত্যেক ছাত্র সাধ্যমত সে অনুরোধ রক্ষাও করল। কেউ দিল অর্থ, কেউ দিল অন্য কোন দ্রব্য-সামগ্রী। কিন্তু দুঃখিনী বিধবার পুত্র গোপাল! হায়, উপঢৌকনের সামগ্রী সে কোথায় পাবে? তাই অন্য পড়ুয়ারা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে—কে কি দেবে, তার বিবরণ গোপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে বেড়াতে লাগল।

সে রাত্রে মনে গভীর দুঃখ নিয়ে গোপাল মাকে সব কথা বলল। বলল—'গুরুমশায়ের জন্য কিছু দিতেই হবে।' কিন্তু মায়ের তো কোন সম্বলই নেই, কি দেবেন তিনি?

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যা চিরদিন করে এসেছেন জীবনের সর্বাবস্থায়, আজও তাই করবেন, রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করবেন। তাঁর কাছেই চাইবেন, যদি কিছু প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছেলেকে বললেন, সে যেন তার বনের রাখাল-দাদার কাছে গুরুমশায়ের জন্য কিছু চেয়ে নেয়।

পরদিন বনের পথে রাখাল-দাদার সঙ্গে যথানিয়মে গোপালের দেখা হল, দুজনে কিছুক্ষণ খেলাধুলাও করল। তারপর বিদায় নেবার কালে গোপাল তার দুঃখের কথা জানাল রাখাল-দাদাকে, অনুরোধ করল গুরুমশায়কে দেবার মত কিছু উপহার সে যেন তাকে দেয়।

রাখাল বলল, 'ভাই গোপাল, আমি সামান্য বনের রাখাল। মাঠে মাঠে গোরু চরাই। আমার তো টাকা-পয়সা নেই, ভাই। তবে তোমার রাখাল-দাদার উপহারস্বরূপ এই ছোট ক্ষীরের বাটিটি তুমি নাও, এইটি তোমার গুরুমশাকে উপহার দিও।'

গোপালের তখন আনন্দ আর ধরে না। একে তো গুরুমশায়ের জন্য কিছু উপহার হাতে পেয়েই সে খুশী, তার উপর সে-উপহার এসেছে রাখাল-দাদার কাছ থেকে। অতি দ্রুত সে পাঠশালায় চলে গেল। পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রেরা তখন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে এক এক করে গুরুমশায়ের হাতে তাহাদের উপহার তুলে দিচ্ছে। গোপালও কম্পিতবক্ষে সবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাল ভাল উপহার ছিল, সুতরাং পিতৃহীন দরিদ্র বালকের তুচ্ছ উপহারের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না।

সে-তাচ্ছিল্যে গোপাল যেন দমে গেল, দুঃখে তার চোখে জল এল। অবশেষে হঠাৎ গুরুমশায়ের চোখ পড়ল তার দিকে। তিনি তখন তার হাত থেকে ক্ষীরের পাত্রটি নিয়ে অন্য একটি বৃহৎ পাত্রে ঢেলে দিলেন। কিন্তু একি! মুহূর্তে সে শূন্যপাত্র আবার ক্ষীরে পূর্ণ হয়ে গেল! আবার ঢাললেন, আবারও পূর্ণ হল! এমনি যতবার তিনি ঢালেন, ততবারই পাত্রটি মুহূর্তে ভরে ওঠে!

উপস্থিত সকলে তো একেবারে স্তম্ভিত। গুরুমশায় তখন দু-হাতে গোপালকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'এ-পাত্র তুই কোথায় পেলি, বাবা?'

গোপাল তখন পণ্ডিতমশায়ের কাছে তার বনের রাখাল-দাদার কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করল। কেমন করে সে তাঁকে প্রতিদিন ডাকে এবং সাড়া পায়; কেমন করে প্রতিদিন দু-জনে তারা খেলা করে এবং কেমন করে ঐ ক্ষীরের ছোট পাত্রটিও রাখাল-দাদার হাত থেকেই সে পেয়েছে।

সব কথা শুনে গুরুমশায় তখনই তার সঙ্গে বনে গিয়ে সেই অদ্ভুত রাখাল-বালককে দেখতে চাইলেন এবং গোপালও মহানন্দে তাঁকে নিয়ে চলল। বনস্থলীতে গিয়ে অন্যদিনের মত আজও সে তার দাদাকে ডাকল, কিন্তু সেদিন কোন উত্তর শোনা গেল না। গোপাল বার বার ডাকতে লাগল, তবু কোন জবাব এল না। তখন অতি করুণ স্বরে গোপাল বলল, 'রাখাল-দাদা, আজ তুমি আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না? তুমি উত্তর না দিলে এঁরা যে মনে করবেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি।'

তখন অতিদূরে বন-প্রদেশ থেকে একটি স্বর ভেসে এল—এক অশরীরী শব্দ, কে যেন বলছে, 'ভাই, তোমার আর তোমার মায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের এখনও অনেক দেরী, তাঁকে বল সে-কথা।'

শিষ্যের সাধনা

[১৯০০ খ্রীঃ ২৯ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।]

আমার বক্তব্য বিষয়—শিষ্যত্ব। জানি না, আমার বক্তব্য আপনারা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। আপনাদের পক্ষে এই ভাব গ্রহণ করা কিছু কঠিন হইবে—আমাদের দেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শ ও এদেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শের মধ্যে অনেক প্রভেদ। ভরতবর্ষের এক প্রাচীন প্রবাদবাক্য আমার মনে পড়িতেছেঃ গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক। এই প্রবাদবাক্যটি সত্য বলিয়াই মনে হয়। আধ্যাত্মিকতা লাভের পথে শিষ্যের মনোভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ মনোভাব থাকিলে জ্ঞানলাভ সহজেই ঘটিয়া থাকে।

সত্যলাভ করিতে হইলে শিষ্যের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? জ্ঞানী মহাপুরুষগণ বলেন, এক নিমেষেই সত্যলাভ করা যায়—ইহা তো শুধু জানার ব্যাপার। স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়—ভাঙিতে কতক্ষণ লাগে? এক মুহূর্তেই স্বপ্ন শেষ হইয়া যায়। ভ্রান্তি দূর হইতে কতক্ষণ লাগে? চক্ষের পলক মাত্র। যখন সত্যকে জানিতে পারি, তখন কেবল মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়, আর কিছুই হয় না। রজ্জুকে সর্প ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি—ইহা রজ্জু। সমগ্র ঘটনাটি আধ সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। 'তুমি সেই'—তুমিই সত্যস্বরূপ—ইহা জানিতে কতক্ষণ লাগে? যদি আমরা ব্রহ্মই এবং সর্বদাই ব্রহ্মস্বরূপ, তবে ইহা না জানাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য। ইহা জানিতে পারাই তো স্বাভাবিক। আমরা বরাবর কি ছিলাম, বর্তমানেই বা আমাদের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে নিশ্চয়ই যুগযুগান্ত লাগিবে না।

তবু এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি উপলব্ধি করা কঠিন বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি ক্ষীণ আভাস লাভ করিতেই যুগযুগান্ত কাটিয়া যায়। ঈশ্বরই জীবন; ঈশ্বরই সত্য। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থ লিখিয়া থাকি; আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা ইহা অনুভব করি যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর সবই মিথ্যা; আজ এ-কথা অনুভব করি, কাল এ-ভাব থাকিবে না, তবু সারাজীবন আমাদের অধিকাংশই পূর্বে যেমন ছিলাম সেইরূপই থাকিয়া যাই। আমরা অসত্যকে আঁকড়াইয়া থাকি এবং সত্যের প্রতি বিমুখ হই। আমরা সত্যলাভ করিতে চাই না। আমরা চাই না যে, কেহ আমাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়। তবেই দেখিতেছ, কেহ গুরুর প্রয়োজন বোধ করে না। শিখিতে চায় কে? কিন্তু যদি কেহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্য উপলব্ধি করিতে চায়, যদি কেহ গুরুর নিকট সত্যলাভ করিতে চায়, তাহাকে খাঁটি শিষ্য হইতেই হইবে।

শিষ্য হওয়া সহজ নয়; তাহার জন্য অনেক প্রস্তুতি প্রয়োজন। অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। বৈদান্তিকগণ চারিটি প্রধান সাধনের কথা বলিয়াছেন। প্রথম সাধন এই—যে-শিষ্য সত্য জানিতে চায়, তাহাকে ইহ-পরজীবনে সমস্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনের মধ্যে কোনরূপ বাসনা থাকে, ততক্ষণ যাহা দেখি তাহা সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য, জগৎ সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনে সংসারের জন্য বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সত্য লাভ হইবে না। 'আমার চারিদিকে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক—আমি ভ্রূক্ষেপ করি না'—পরলোক সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার মনোভাব পোষণ করিতে হইবে; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না। স্বর্গ কি?—এই জগতেরই অনুবৃত্তিমাত্র। যদি স্বর্গ না থাকিত—এই অসার পার্থিব জীবনের কোন অনুবৃত্তি যদি না থাকিত, আমরা আরও ভাল হইতাম; যে ক্ষণিকের মিথ্যা স্বপ্নে আমরা মগ্ন, সে-স্বপ্ন আরও শীঘ্র ভাঙিয়া যাইত। স্বর্গে যাইয়া আমরা শুধু আমাদের দুঃখজনক মোহকে দীর্ঘতর করিয়া তুলি।

স্বর্গে যাইয়া কি লাভ হইবে? দেবতা হইয়া অমৃত পান করিবেন, আর বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। পৃথিবী অপেক্ষা সেখানে দুঃখ যেমন কম, সত্যও তেমনি কম। অতিশয় দরিদ্র অপেক্ষা ধনী ব্যক্তি অনেক কম সত্য বুঝিতে পারে। 'ধনী ব্যক্তির স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাতায়াত করা বরং সহজ।'

১৫

নিজের ধন-ঐশ্বর্য ক্ষমতা সুখ-সুবিধা ও বিলাস-ব্যসন ব্যতীত ধনী ব্যক্তির অন্য কিছু চিন্তা করিবার সময় নাই। ধনী ব্যক্তিরা অতি অল্পই ধার্মিক হয়। কেন? কারণ তাহারা মনে করে, ধার্মিক হইলে তাহাদের জীবনে আর কোন আমোদ-প্রমোদ থাকিবে না। ঠিক তেমনি স্বর্গে ধার্মিক হইবার আশা খুবই কম। আরাম ও ভোগ সেখানে অত্যন্ত বেশী—স্বর্গের অধিবাসীরা তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

অনেকে বলেন, স্বর্গে আর অশ্রুপাত করিতে হইবে না। যে কখনও কাঁদে না, তাহাকে আমি বিশ্বাস করি না। দেহের যেখানে হৃদয় থাকা উচিত, তাহার সেইখানে একটি বৃহৎ কঠিন প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। ইহা তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বর্গবাসীদের বেশী সহানুভূতি নাই। স্বর্গবাসীর সংখ্যা তো অনেক, আর আমরা এই ভয়ানক পৃথিবীতে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা আমাদের টানিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তো ঐরূপ কিছুই করেন না। তাঁহারা কাঁদেন না। স্বর্গে কোন দুঃখ-কষ্ট নাই, সুতরাং তাঁহারা কাহারও দুঃখ গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা অমৃত পান করেন, নৃত্য চলিতে থাকে—সুন্দরী পত্নী লইয়া নানাবিধ সুখে তাঁহাদের দিন কাটে।

এ-সকলের উর্ধ্বে উঠিয়া শিষ্যকে বলিতে হইবে, 'ইহজীবনে আমার কোন কিছুই কাম্য নয়, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে,

সেখানেও আমি যাইতে চাই না। শরীরের সহিত তাদাত্ম্যমূলক কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-জীবন আমি চাই না। বর্তমানে আমার ধারণা—এই বিপুল মাংসস্তূপ দেহটাই আমি। আমি বিশ্বাস করিতে চাই না যে, আমি সত্যই ঐরূপ।'

পৃথিবী ও স্বর্গ ইন্দ্রিয়দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয় না থাকিলে এই পৃথিবীকে তুমি গ্রাহ্যই করিতে না। স্বর্গও একটা জগৎ। পৃথিবীতে স্বর্গে অন্তরীক্ষে যাহা কিছু আছে, সব মিলিয়া একটি নাম—পৃথিবী বা সংসার।

সুতরাং শিষ্য অতীত ও বর্তমানকে জানিয়া, ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়া উন্নতি কাহাকে বলে, সুখ কাহাকে বলে—এগুলি সব জানিয়া বুঝিয়া ত্যাগ করিবে এবং একমাত্র সত্যের সন্ধান করিবে। ইহাই প্রথম শর্ত বা সাধন।

দ্বিতীয় সাধন এই যে, শিষ্যকে অবশ্যই অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিতে সমর্থ হইতে হইবে এবং অন্যান্য অধ্যাত্ম সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত দৃশ্যমান যন্ত্রগুলি বহিরিন্দ্রিয়; অন্তরিন্দ্রিয়গুলি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। বাহিরে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি রহিয়াছে, ভিতরে অনুরূপ অন্তরিন্দ্রিয় রহিয়াছে। আমরা সর্বদা উভয়প্রকার ইন্দ্রিয়গুলির আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির যোগাযোগ রহিয়াছে। যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি কাছে আসে, ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদিগকে ঐগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। আমাদের নিজস্ব পছন্দ বা স্বাধীনতা নাই। প্রকাণ্ড একটি নাসিকা রহিয়াছে। সামান্য একটু সুগন্ধ আসিতেছে, আমাকে ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি কোন দুর্গন্ধ আসিত, তবে আমি বলিতাম, 'এই ঘ্রাণ গ্রহণ করিও না'; কিন্তু প্রকৃতি বলিবে 'গ্রহণ কর'। আমি এই ঘ্রাণ গ্রহণ করি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আমরা কি হইয়াছি। আমরা নিজেদের বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। আমার চক্ষু আছ, ভাল-মন্দ যাহা কিছু চক্ষুর সুমুখ দিয়া যাক না কেন, আমাকে দেখিতেই হইবে। শ্রবণযন্ত্রের ব্যাপারটিও এইরূপ। যদি কেহ বিরক্তির সহিত আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে শুনিতেই হইবে। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আমাকে উহা শুনিতে বাধ্য করে এবং শুনিয়া আমি মনে মনে কত কষ্টই না ভোগ করি। নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই হউক, মানুষকে শুনিতেই হইবে। এমন বধির লোক আমি অনেক দেখিয়াছি, যাহারা সাধারণতঃ শুনিতে পায় না, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে তাহারা সব শুনিতে পায়।

এই আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয় সাধক বা শিষ্যের বশে থাকিবে। যে অবস্থায় মন অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে, স্বভাবের আদেশের বিরুদ্ধে, দাঁড়াতেই পারে, কঠোর অভ্যাসের দ্বারা সাধক শিষ্য সেই অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে। সে নিজের মনকে আদেশ করিতে সমর্থ হইবে, 'তুমি আমার। আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, কোন কিছু দেখিও না বা বলিও না।' তৎক্ষণাৎ মন আর কিছু দেখিবে না বা শুনিবে না। কোন রূপ বা শব্দ মনের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে না। সে-অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির আধিপত্য হইতে মন মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন বিচ্ছিন্ন। শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ইহা আর সংযুক্ত থাকে না। বাহিরের বস্তু-সকল আর এখন মনকে আদেশ করিতে পারে না। মন ঐগুলির সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে। সম্মুখে সুন্দর গন্ধ রহিয়াছে; শিষ্য মনকে বলিল, 'ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ করিও না।' মন আর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না। যখন এই স্তরে পৌঁছিয়াছ, তখন জানিবে তুমি ঠিক ঠিক শিষ্য হইতে শুরু করিয়াছ। এইজন্যই যখন কেহ বলে, 'আমি সত্য জানিয়াছি,' তখন আমি বলি, 'যদি সত্য জানিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার আত্মসংযম হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া সংযমশক্তির পরিচয় দাও।'

তারপর মনকে শান্ত করিতে হইবে। মন চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। যে মুহূর্তে আমি ধ্যান করিতে বসি, তৎক্ষণাৎ জগতের ঘৃণ্যতম বিষয়গুলি মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি যেন মনের দাস। মন যতক্ষণ চঞ্চল এবং আয়ত্তের বাহিরে, ততক্ষণ কোনরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্ভব নয়। শিষ্যকে মনঃসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য মনের কার্যই চিন্তা করা। কিন্তু শিষ্যের অনভিপ্রেত হইলে মন নিশ্চয়ই চিন্তা করিবে না; যখনই সে আদেশ করিবে, তখনই মনকে চিন্তা বন্ধ করিতে হইবে। উপযুক্ত শিষ্য হইতে গেলে মনের এরূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সহিষ্ণুতার প্রচণ্ড শক্তিও শিষ্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যখন চারিপাশে সব কিছুই ভাল চলে, তখন জীবন বেশ আরামপ্রদ বোধ হয়, মনও ভাল থাকে। কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে মনের স্থৈর্য নষ্ট হইয়া যায়। উহা ভাল নয়। সকল দুঃখকষ্ট বিনা অভিযোগে, এতটুকু দুঃখী না হইয়া, এতটুকু প্রতিরোধ প্রতিশোধ বা প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া সহ্য কর। ইহাই যথার্থ সহিষ্ণুতা। ইহাই তোমাকে অর্জন করিতে হইবে।

পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ চিরকালই আছে। মন্দটির অস্তিত্ব অনেকে ভুলিয়া যায়—অন্ততঃ ভুলিবার চেষ্টা করে; যখন মন্দ আসে, তখন তাহারা উহা দ্বারা সহজে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিরক্তি বোধ করে। আবার কেহ কেহ কোনরূপ মন্দের অস্তিত্বই স্বীকার করে না এবং সব কিছুকেই ভাল বলিয়া মনে করে। উহাও একটি দুর্বলতা, উহাও মন্দ জিনিষের প্রতি ভীতি হইতে সঞ্জাত। যদি কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য থাকে, গোলাপ-জল ছিটাইয়া তাহাকে সুগন্ধ বলা কেন? হ্যাঁ, জগতে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। ভগবান্ মন্দ জিনিষ জগতে রাখিয়াছেন। কিন্তু তোমাকে তাহার উপর চুনকাম করিতে হইবে না। কেন মন্দ রহিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তোমার মাথা-ঘামানো প্রয়োজন নাই। ভগবানে বিশ্বাস রাখো এবং চুপ করিয়া থাক।

আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে জনৈক ব্রাহ্মণ রোগমুক্তির জন্য তাঁহাকে তাঁহার প্রবল মনঃশক্তি প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিল। তাহার মতে—আচার্যদেব যদি দেহের রোগাক্রান্ত অংশটির উপর তাঁহার মন একাগ্র করেন,—তবে অসুখ সারিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'কি! যে-মন ঈশ্বরকে দিয়াছি, সেই মন এই তুচ্ছ শরীরে নামাইয়া আনিব?' দেহ এবং রোগের কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন না। তাঁহার মন সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া থাকিত। সে-মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এই মন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে রাজী ছিলেন না।

স্বাস্থ্য, সম্পদ, দীর্ঘজীবন প্রভৃতি তথাকথিত ভাল ভাল জিনিষের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা—মায়া বা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। এগুলি পাইবার জন্য মনোনিবেশ করিলে ভ্রম দৃঢ় করা হয়। ইহজীবনে আমাদের এ-সকল স্বপ্ন ও মায়া আছে, এবং পরলোকে—স্বর্গে যাইয়া আমরা এগুলি আরও বেশী পরিমাণে পাইতে চাই। মায়া বাড়িয়া যায়। মন্দের প্রতিরোধ করিও না; তাহার সম্মুখীন হও। তুমি মন্দ বা অশুভ অপেক্ষা অনেক বড়।

জগতে এই দুঃখ আছে, একজনকে তো তাহা ভোগ করিতে হইবেই। কাহারও অনিষ্ট না করিয়া তুমি কোন কাজ করিতে পার না। আর যখন তুমি পার্থিব শুভ কামনা কর, তখন শুধু আর একটি অশুভই এড়াইয়া যাও। সেই অশুভ অপর কাহাকেও ভোগ করিতে হইবে। মন্দটি সকলেই অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে চায়। সাধক বলিবে, 'জগতের সকল দুঃখ আমার নিকটে আসিতে দাও। আমি এগুলি সহ্য করিব। অপরকে মুক্ত হইতে দাও।'

ক্রুশবিদ্ধ মহামানবকে স্মরণ কর। জয়লাভ করিবার জন্য তিনি অসংখ্য দেবদূত আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করিলেন না। যাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, তাহাদিগকে তিনি করুণা করিলেন। তিনি সকল দুঃখকষ্ট ও অপমান সহ্য করিলেন। সকলের ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। 'তোমরা যাহারা অতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার নিকটে আইস। আমি তোমাদের দুঃখ দূর করিব এবং শান্তি দিব।'

১৬

ইহাই যথার্থ সহনশীলতা। তিনি এই জীবনে কত ঊর্ধ্বে ছিলেন—এত ঊর্ধ্বে যে, আমরা ক্রীতদাসগণ তাহা ধারণাও করিতে পারি না! আমার গালে কেহ চড় মারিলেই আমার হাত সশব্দে আর একটি চড় মারিয়া দেয়! আমি কিরূপে সেই মহিমময় পুরুষের মহত্ত্ব ও চিত্তের প্রশান্তি ধারণা করিতে পারি? তাঁহার মহিমা আমি কি বুঝিব?

কিন্তু আদর্শকে আমি নীচে নামাইয়া আনিব না। আমি অনুভব করি, আমি দেহ; আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করি। আমার মাথা ধরিলে তাহা সারাইবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই, দুই হাজার শিশি ঔষধ খাই। কেমন করিয়া আমি এ-সকল অপূর্ব চরিত্র বুঝিতে পারিব? আদর্শ আমি দেখিতে পারি—কিন্তু আদর্শের কতটুকু? এই দেহের কোন চেতনা, কোন তুচ্ছ অহং-ভাব, কোন আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে না। সর্বদা শুধু চৈতন্যবিষয়ক চিন্তা করিয়া এবং মনকে জড়বস্তুর ঊর্ধ্বে রাখিয়া আমি সেই আদর্শের আভাসমাত্র পাইতে পারি। জড়বস্তুর চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়-জগতের রীতিনীতির কোন স্থান সেই আদর্শে নাই। ঐগুলি হইতে মন তুলিয়া আত্মায় সমাহিত কর। তোমার জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, নাম ও যশ সব ভুলিয়া যাও এবং অনুভব কর—তুমি শরীর বা মন নও, তুমি শুদ্ধ আত্মা।

আমি যখন 'আমি' বলি, তখন এই চৈতন্য বা আত্মাকেই বুঝি। যখন তুমি নিজের 'আমি' সম্বন্ধে চিন্তা কর, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখ—কোন্ ছবি ফুটিয়া উঠে। তোমার দেহচিত্র কি মনে জাগিতেছে? অথবা মনের প্রকৃতি? যদি তাই হয়, তবে তুমি এখনও সত্য 'আমি'কে জানিতে পার নাই। এমন সময় আসিবে, যখন 'আমি' বলিতে বলিতে সমগ্র জগৎ—সেই অনন্ত সত্তা উদ্ভাসিত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি নিজের সত্য স্বরূপকে দেখিতে পাইবে এবং নিজের অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করিবে। তুমি চৈতন্যময়, তুমি জড়পদার্থ নও—ইহাই সত্য। ভ্রম বলিয়া একটি অনুভূতি আছে—এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—জড়কে চৈতন্য এবং চৈতন্যকে জড় বলিয়া মনে হয়। ইহাই প্রচণ্ড ভ্রম। ইহা দূর করিতে হইবে।

গুরুর প্রতি শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে—ইহাই পরবর্তী সাধনা। পাশ্চাত্য গুরু শিষ্যকে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরুর সহিত শিষ্যের সম্পর্ক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। গুরু আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়, তারপর মাতা, তারপর পিতা। গুরুর প্রতিই আমার শ্রদ্ধা সর্বপ্রথমে নিবেদিত। যদি পিতা বলেন, 'ইহা কর' এবং গুরু বলেন, 'ইহা করিও না'—আমি তাহা করি না। গুরু আমার আত্মার মুক্তিসাধন করেন। পিতামাতা আমায় শরীর দিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে আত্মার মধ্যে নবজন্ম দান করিয়াছেন।

আমাদের কতকগুলি অদ্ভুত বিশ্বাস আছে। একটি এই—অতি অল্প কয়েকটি অসাধারণ আত্মা আছেন, যাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাঁহারা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা মুক্তই আছেন; নিজেদের মুক্তির জন্য তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, অপরকে সাহায্য করিতে চান। তাঁহাদের কিছু শিখিবার প্রয়োজন নাই। শৈশব হইতে তাঁহারা সব জানেন। ছয়মাসের শিশু হইয়াও তাঁহারা পরমসত্যের বাণী বলিতে পারেন।

এই মুক্তাত্মাদের উপরেই মনুষ্যজাতির উন্নতি নির্ভর করে। তাঁহারা যেন প্রথম প্রজ্বলিত দীপের ন্যায়—এই দীপটি হইতে অপর দীপগুলি জ্বলিয়া উঠে। ইহা সত্য যে, সকলের অন্তরের আলোক রহিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির অন্তরেই ইহা প্রচ্ছন্ন। মহাপুরুষগণ প্রথম হইতেই এই আলোকে ভাস্বর। যাহারা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের হৃদয়দীপও যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা প্রথম দীপটির কোন ক্ষতি হয় না, প্রথম দীপটি অপর দীপগুলিতে আলোক সঞ্চার করে। কোটি কোটি দীপ প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু প্রথম দীপটি পূর্বের মতই অনির্বাণ তেজে জ্বলিতে থাকে। প্রথম দীপটি গুরু। যে দীপটি এই প্রথম দীপের শিখা হইতে প্রজ্বলিত হয়, সে শিষ্য। ক্রমে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও গুরু হন—এই ভাবে চলিতে থাকে। যাঁহাদের আপনারা অবতারপুরুষ বলিয়া থাকেন, সেই মহাপুরুষগণ বিপুল অধ্যাত্মশক্তির আধার। তাঁহারা সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চার করেন এবং শিষ্য-পরম্পরা এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ প্রবর্তন করেন।

খ্রীষ্টান বিশপ হস্তদ্বারা কাহারও মস্তক স্পর্শ করিয়া নিজে পূর্বগ বিশপের নিকট যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। বিশপ বলেন, যীশু তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, শিষ্যগণ

আবার অপরের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করেন। এইভাবেই পরম্পরাক্রমে খ্রীষ্টের শক্তি তাঁহার নিকট আসিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, শুধু বিশপগণ নন, আমাদের প্রত্যেককেই সেই শক্তি লাভ করিতে হইবে। আপনারা প্রত্যেকেই সেই প্রচণ্ড অধ্যাত্মশক্তির আধার হইতে পারেন। কেন হইতে পারিবেন না? না হইবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু প্রথমে আপনাকে একজন গুরু—যথার্থ গুরু খুঁজিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি সামান্য মানব মাত্র নন। আপনি একজন দেহধারী গুরু লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত গুরু দেহের মধ্যে নাই। চোখে যেমন দেখিতেছেন, গুরু সেইরূপ দেহধারী মানুষ নন। গুরু আপনার নিকট মানবরূপে আসিতে পারেন এবং আপনি তাঁহার নিকট শক্তিলাভও করিতে পারেন। কখনও কখনও তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। গুরুর শক্তি আমাদের নিকট নানাভাবে আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য—মর্ত্য মানবের জন্য গুরু অবশ্যই আসিবেন। তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষণ অবধি আমাদের প্রস্তুতি চলিবে।

আমরা বক্তৃতা শুনি, পুস্তক পড়ি, ঈশ্বর আত্মা ধর্ম ও মুক্তি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করি। এগুলি আধ্যাত্মিকতা নয়, কারণ আধ্যাত্মিকতা পুস্তকে দর্শনে বা মতবাদে নাই। ইহা বিদ্যা বা বিচারে নাই, অন্তরের প্রকৃত বিকাশে নিহিত। তোতাপাখিও বুলি মনে রাখিয়া আওড়াতেই পারে। যদি আপনি বিদ্বান্ হইয়া থাকেন, তাহাতে কি আসে যায়? গর্দভেরা সমগ্র গ্রন্থাগারটি পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং যখন যথার্থ আলোক আসিবে, তখন পুঁথিগত বিদ্যার আর প্রয়োজন হইবে না। নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে অক্ষম ব্যক্তিও ধার্মিক হইতে পারেন, আবার পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারের জ্ঞানরাশি যাঁহার মস্তকে পুঞ্জীভূত আছে, তিনিও পারেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাণ্ডিত্যের উপর আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে না। গুরুর স্পর্শ—শক্তি-সঞ্চার দ্বারা আপনার হৃদয় জাগ্রত হইবে। তারপরই আধ্যাত্মিক উন্নতির আরম্ভ। উহাই যথার্থ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। আর থামিতে হইবে না, আপনি ক্রমেই অগ্রসর হইবেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক বন্ধু খ্রীষ্টান ধর্মযাজক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী?' আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, বোধ হয় একটু অধিক শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাসী?' 'তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হও না কেন?' 'কেমন করিয়া দীক্ষিত হইব? কাহার দ্বারা?' যথার্থ দীক্ষাদাতা কোথায়? দীক্ষা কি? ইহা কি কতকগুলি বাঁধা-ধরা মন্ত্র আওড়াইয়া জল ছিটান, না জোর করিয়া ধরিয়া জলে ডুবান?

দীক্ষা হইতেছে সাক্ষাৎভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ। যথার্থ দীক্ষালাভ করিলে জানিবেন—আপনি দেহ নন, আপনি আত্মা। যদি পারেন, তবে সেই দীক্ষা আমায় দিন; যদি তাহা না পারেন, তবে তো আপনারাই খ্রীষ্টান নন। তথাকথিত দীক্ষালাভের পরেও আপনারা তো পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের নামে আপনারা দীক্ষিত হইয়াছেন—এ-কথা বলার অর্থ কি? শুধু কথা আর কথা—আর জগৎকে নিজ নিজ মূর্খতার দ্বারা বিরক্ত করিয়া তোলা! 'অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও নিজেদের জ্ঞানী ও বিদ্বান্ মনে করিয়া মূর্খেরা অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায় যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।'

১৭

সুতরাং এ-কথা বলিবেন না যে, আপনারা খ্রীষ্টান; আর দীক্ষা (Baptism) প্রভৃতির মত তত্ত্ব লইয়া বাগাড়ম্বর করিবেন না।

অবশ্য যথার্থ দীক্ষা আছে, জগতে আসিয়া যীশু যখন প্রথম তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দীক্ষা ছিল। যুগে যুগে যে-সকল মুক্তাত্মা মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, আমাদের নিকট অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে। ইহাই যথার্থ দীক্ষা। আপনারা দেখিতেছেন, প্রত্যেক ধর্মের বিধি ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত হইবার পূর্বেই সর্বজনীন সত্যের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। কালক্রমে এই সত্য লোকে ভুলিয়া যায়; বাহ্য অনুষ্ঠানাদি যেন ইহার শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে। বাহিরের পদ্ধতিগুলি বজায় থাকে, কিন্তু ভিতরের ভাবটি চলিয়া যায়। শুধু বাহিরের আধারটি আমরা দেখিতে পাই। দীক্ষার বাহ্য রূপটি আছে।

কিন্তু অতি অল্প ব্যক্তিই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। বাহ্য আচারই যথেষ্ট নয়। আমরা যদি প্রত্যক্ষ সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে ঐ বিষয়ে যথার্থভাবে দীক্ষিত হইতে হইবে। ইহাই আদর্শ।

গুরু আমাকে অবশ্যই শিক্ষাদান করিয়া আলোকের পথে পরিচালিত করিবেন এবং যে গুরুশিষ্য-পরম্পরার তিনি নিজে একটি যোগসূত্র, আমাকেও তাহার যোগসূত্র করিয়া লইবেন। যে-কোন লোক নিজেকে গুরু বলিয়া দাবী করিতে পারে না। গুরু হইবেন তিনি, যিনি সেই পারমার্থিক সত্য জানিয়াছেন—প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। শুধু কথা বলিলেই কেহ গুরু হইতে পারে না। আমার মত বাক্যবাগীশ মূর্খ অনেক কথা বলিতে পারে, কিন্তু গুরু হইতে পারে না। যথার্থ গুরু শিষ্যকে বলিবেন, 'যাও, আর পাপ করিও না'—সে আর পাপ করিতেই পারে না। তাহার আর পাপ করিবার শক্তিই থাকে না।

আমি এই জীবনে এরূপ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্র আমি পড়িয়াছি। এগুলি অপূর্ব। কিন্তু পুস্তকে সেই প্রাণবন্ত শক্তির সাক্ষাৎ পাইবেন না, যে-শক্তি মু্হূর্তে জীবন পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা শুধু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; জ্ঞানের উজ্জ্বল বিগ্রহ এই মহাপুরুষগণ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁহারাই গুরু হইবার উপযুক্ত। তুমি আমি কেবল বৃথা বচনবাগীশ, গুরু বা আচার্য নই; শুধু কথার কোলাহলে জগৎকে বিব্রত করিতেছি, চিন্তাজগতে অশুভ কম্পনের সৃষ্টি করিতেছি। আশা, প্রার্থনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হই, একদিন আমরা সত্যে উপনীত হইব, তখন আর আমাদের কথা বলিতে হইবে না।

'গুরুর বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ; তিনি অশীতিপর বৃদ্ধকে শিক্ষা দিতেছেন। গুরুর শিক্ষাপদ্ধতি নীরবতা আর শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছিন্ন

হইতেছে।’

১৮

ইহাই গুরুর বর্ণনা। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ এক ব্যক্তিকে পাইলে তাঁহার প্রতি আপনার কিরূপ বিশ্বাস ও ভালবাসা হইবে। কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান্ অপেক্ষা কিছু কম নন! এ জন্যই খ্রীষ্টের শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। শিষ্য গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। যতক্ষণ না মানুষ ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ সে ভগবানের যতটুকু জানিতে পারে, তাহা এই মানবদেহধারী নরদেবতারূপেই জানিতে পারে। আর অন্য কী ভাবে সে ভগবানকে জানিতে পারে?

এখানে আমেরিকায় একজন ব্যক্তি—খ্রীষ্টজন্মের উনিশ-শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, খ্রীষ্ট যে জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, সে সেই য়াহুদীজাতিসম্ভূতও নয়, সে যীশু অথবা তাঁহার পরিবারবর্গকে দেখে নাই। সে বলে, ‘যীশু ছিলেন ভগবান্। যদি বিশ্বাস না কর, তবে নরকে যাইবে।’ আমরা বুঝিতে পারি, যীশুর শিষ্যগণ কিভাবে বিশ্বাস করিতেন, খ্রীষ্ট ভগবান্। তিনি তাঁহাদের গুরু ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যীশুকে অবশ্যই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। উনিশ-শত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত মানুষটিকে লইয়া এই আমেরিকান কি করিবে? এই যুবকটি আমায় বলিতেছে, যীশুকে আমি বিশ্বাস করি না, অতএব আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যীশু সম্বন্ধে সে কি জানে? সে পাগলা-গারদে থাকিবার উপযুক্ত। এরূপ বিশ্বাস চলিবে না। তাহাকে তাহার গুরু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

যীশু আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, আপনার নিকট আসিতে পারেন। তখন যদি আপনি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, ভাল কথা। গুরুর আবির্ভাব অবধি আমরা অবশ্যই প্রতীক্ষা করিব এবং গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করিতে হইবে। তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বর অপেক্ষা কিছু কম নন। গুরুকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, ক্রমে তিনি লীন হইয়া যাইতেছেন। পরে কি থাকে? গুরুমূর্তি ভগবানের জন্য আসন ছাড়িয়া দেন। আমাদের নিকট আসিবার জন্য ভগবান্ গুরুর জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরিয়া থাকেন। স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে এই মূর্তির আবরণ ক্রমশঃ খসিয়া যায়, ভগবান্ প্রকাশিত হন।

‘আমি গুরুকে প্রণাম করি, যিনি ব্রহ্মানন্দের মূর্ত বিগ্রহ, পরমসুখদ ও পরমজ্ঞানের প্রতিমূর্তি, যিনি পবিত্র পূর্ণ অদ্বিতীয় অনন্ত সুখ-দুঃখের অতীত অচিন্ত্য ভাবাতীত ও ত্রিগুণরহিত’।

১৯

ইনিই প্রকৃত গুরু। শিষ্য যে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, এবং সন্দেহাতীত ভাবে অনুসরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। গুরু-শিষ্যের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ।

মুক্তিলাভের জন্য শিষ্যকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে—ইহাই পরবর্তী সাধন। ইন্দ্রিয়নিচয় আমাদিগকে কেবল দগ্ধ করে, বাসনা বৃদ্ধি করে—ইহা জানিয়াও পতঙ্গের ন্যায় আমরা অগ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। ‘উপভোগের দ্বারা বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না। ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভোগের দ্বারা ভোগ বাড়িয়াই চলে।

২০

বাসনা দ্বারা বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা জানিয়াও মানুষ সর্বদাই ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। জন্ম জন্ম ধরিয়া তাহারা ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে এবং ফলে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিতেছে, তথাপি বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। যে-ধর্ম তাহাদিগকে এই ভীষণ বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে, তাহাকেও তাহারা বাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় করিয়া তুলিয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এবং বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা ক্বচিৎ কখনও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৎপরিবর্তে তাহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা করে, ‘হে ঈশ্বর! আমার মাথার বেদনা সারাইয়া দাও। আমায় কিছু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দাও।’

দৃষ্টির পরিধি এত সঙ্কীর্ণ, এত নীচু, এত পশুবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেহই এই দেহের ঊর্ধ্বে কিছু চাহিতেছে না। হায়, কি ভয়ঙ্কর অবনতি! কি ভায়ানক দুর্দশা! এই মাংসপিণ্ড, পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর উদর! শিশ্ন ও উদরের সমাবেশ ছাড়া জগৎটা আর কি? কোটি কোটি নরনারীর পানে চাহিয়া দেখ—তাহারা এইজন্যই জীবনধারণ করিয়া আছে। তাহাদের নিকট হইতে এই বস্তু-দুইটি সরাইয়া লও, তাহারা মনে করিবে জীবন শূন্য অর্থহীন ও অসহনীয়। আমরা এইরূপ, আর আমাদের মনও এইরূপ। এই মন সর্বদা ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থ করিবার পথ ও উপায় খুঁজিতেছে। সর্বদাই এইরূপ চলিতেছে। দুঃখকষ্টও তেমনি অনন্ত। দেহের এই সকল তৃষ্ণা শুধু ক্ষণিক তৃপ্তি এবং অশেষ দুঃখের কারণ হয়। এ যেন পয়োমুখ বিষকুম্ভের অবস্থা। কিন্তু তথাপি আমরা এগুলির জন্য লালায়িত হই।

কি করা যায়? ইন্দ্রিয়-দমন এবং বাসনা-ত্যাগই এই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা প্রকৃত পরীক্ষা। এই নিরর্থক ইন্দ্রিয়সর্বস্ব সংসার বর্জন কর। যথার্থ বাসনা মাত্র একটি আছেঃ সত্যোপলব্ধির বাসনা—অধ্যাত্মজীবনলাভের বাসনা। জড়বাদ বা অহংসর্বস্বতা আর নয়। আমাকে আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। দৃঢ় ও তীব্র ইচ্ছা চাই। কোন ব্যক্তির হাত-পা বাঁধিয়া তাহার শরীরে এক-টুকরা জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া দিলে সে উহা ফেলিয়া দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করে। যদি এই জ্বলন্ত সংসারকে দূরে সরাইয়া ফেলিতে আমার সেইরূপ তীব্র ইচ্ছা ও অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকে, তবেই পরম সত্যের আভাস লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইবে।

আমাকে লক্ষ্য করুন। দুই-তিনটি ডলার সহ আমার ছোট পকেট বইটি হারাইয়া গেলে ঘরের মধ্যে বিশবার খুঁজিয়া বেড়াই। কত উদ্বেগ, কত দুশ্চিন্তা, কত চেষ্টা! যদি আপনাদের কেহ আমাকে কোন বাধা দেন, তবে কুড়ি বৎসর উহা আমার মনে থাকে, সেই ঘটনাটি ক্ষমা করিতে বা ভুলিয়া যাইতে পারি না। ইন্দ্রিয়ের অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলির জন্য আমি ঐরূপ চেষ্টা করিতে পারি। ভগবানের জন্য কে এইরূপ চেষ্টা করে? 'ক্রীড়ারত শিশু সব কিছুই ভুলিয়া থাকে। যুবকগণ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত; তাহারা অন্য কিছুর চিন্তা করে না। প্রাচীনেরা তাহাদের অতীত দুষ্কর্মের চিন্তায় মগ্ন।'

২১

বৃদ্ধেরা আয় উপভোগ করিতে পারে না, তাহারা অতীতে যাহা ভোগ করিয়াছিল, তাহার কথাই ভাবিতেছে। জাবর কাটিতেই বৃদ্ধেরা খুব দক্ষ। বিষয়ভোগের জন্য মানুষ যেভাবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে, ভগবানের জন্য কেহই তেমন করে না।

সকলেই বলিয়া থাকে ঈশ্বর সত্য-স্বরূপ, একমাত্র নিত্য বস্তু, আত্মাই আছে, জড় নাই। তথাপি ভগবানের নিকট তাহারা যে-যে বিষয়ে প্রার্থনা করে, সেগুলি কদাচিৎ আত্মবিষয়ক। তাহারা সর্বদাই জড়বস্তু চায়। তাহাদের প্রার্থনায় জড়বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হয় না। ধর্মের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে! সমগ্র ব্যাপারটিই মেকী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইতেছে না। মানুষ শুধু একটি জিনিষের জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিবে—আত্মার জন্য, কারণ একমাত্র আত্মাই আছে। ইহাই আদর্শ। যদি আপনি এখনই ইহা লাভ করিতে না পারেন, তবে বলুন, 'আমি ইহা লাভ করিতে পারিতেছি না; আমি জানি ইহাই আদর্শ, কিন্তু এখনও অনুসরণ করিতে পারিতেছি না।' কিন্তু আপনি তো তাহা করেন না। ধর্মকে আপনারা নিম্নস্তরে নামাইয়া আনিয়া আত্মার নামে জড়বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আপনারা সকলেই নাস্তিক, ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। 'অমুক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছিল—ইহার মধ্যে কিছু থাকিতে পারে। এস, চেষ্টা করি আর মজা দেখি। হয়তো কোন উপকার হইবে; হয়তো আমার ভাঙা পা-খানি জোড়া লাগিয়া যাইবে।'

রুগ্নব্যক্তিরা বড় দুঃখী, তাহারা ঈশ্বরের পরম উপাসক, কারণ তাহাদের ধারণা—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। যদি এই প্রার্থনা আন্তরিক হয় এবং যদি তাহারা মনে রাখে যে, এই প্রার্থনা ধর্ম নয়, তবে এরূপ প্রার্থনা যে একেবারে মন্দ, তাহা নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'চার প্রকার লোক আমাকে ভজনা করে—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, ও জ্ঞানী।'

২২

আর্ত মানুষ দুঃখমোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। অসুস্থ হইলে তাহারা আরোগ্য-কামনায় পূজা করে; সম্পদ হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে। আবার অনেকের মন কামনায় পূর্ণ বলিয়া ভগবানের নিকট নাম, যশ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রার্থনা করে। তাহাদের প্রার্থনা এইরূপঃ 'হে মাতা মেরী! আমি যাহা চাই, তাহা পাইলে তোমার পূজা দিব। তুমি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে আমি ঈশ্বরের পূজা করিব এবং তোমাকে সব কিছুর অংশ দিব।' যাহারা অতটা জড়বাদী নয়, অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসীও নয়—এমন লোকেরা তাঁহাকে জানিতে চায়। তাহারা তত্ত্বান্বেষী। তাহারা দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে, বক্তৃতাদি শ্রবণ করে, তাহারা জিজ্ঞাসু। যাহারা ভগবানের আরাধনা করে এবং তাঁহাকে জানিতে পারে—তাহারা সর্বশেষ শ্রেণীর সাধক। এই চারি স্তরের সাধকই ভাল—কেহই মন্দ নয়। তাহারা সকলেই ঈশ্বরের আরাধনা করে।

কিন্তু আমরা শিষ্য হইবার সাধনা করিতেছি। আমাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হইবে পরমসত্যকে জানা, আমাদের লক্ষ্য উচ্চতম। 'পরিপূর্ণ উপলব্ধি' প্রভৃতি বড় বড় কথা আমরা বলিয়াছি। কথা অনুযায়ী কাজ করা চাই। আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসুন আমরা আত্মার উপাসনা করি। আমাদের সাধনার ভিত্তি, সাধনার পথ ও চরম ফল সবই হউক চৈতন্যময়। কোথাও জড়-জগৎ থাকিবে না। জগৎ চলিয়া যাক্, মহাশূন্যে ঘুরিতে থাকুক—কে ইহা গ্রাহ্য করে? আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হউন। উহাই লক্ষ্য। আমরা জানি, এখনও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারি নাই। কিছুই আসে যায় না; হতাশ হইবেন না। হতাশ হইয়া আদর্শকে নীচে নামাইয়া আনিবেন না। প্রয়োজনীয় কথা এইঃ নিজেকে আপনি কতটা কম এই প্রাণহীন জড়দেহ বলিয়া ভাবিতেছেন, আর কতটাই বা জ্যোতির্ময় অমর আত্মা বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। যতই নিজেকে জ্যোতির্ময় অমর আত্মারূপে চিন্তা করিবেন, ততই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন। ইহাই তীব্র মুমুক্ষুত্ব।

শিষ্য হইবার চতুর্থ এবং সর্বশেষ সাধন—নিত্যানিত্য-বিচার। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। সদাসর্বদা মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে, নিবেদিত থাকিবে। ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই; আর সব কিছু আসে এবং চলিয়া যায়। এই সংসারের জন্য কোনরূপ বাসনাই ভ্রম, কারণ এ সংসার অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সব কিছু অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণ একমাত্র ঈশ্বরসম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে—মনকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

যিনি শিষ্য হইতে চান, তাঁহাকে এই সকল শর্ত পূর্ণ করিতে হইবে। নচেৎ তিনি প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্যে আসিতে পারিবেন না। আর যদি সৌভাগ্যবশতঃ গুরুলাভও হয়, তথাপি গুরু যে আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁহার মধ্যে সঞ্চার করিবেন, তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন না। এ-সকল সাধনার মধ্যে কোন আপস চলিবে না। এই শর্তগুলি পূর্ণ করিলে এবং এইরূপ প্রস্তুতি থাকিলে শিষ্যের হৃদয়কমল বিকশিত হইয়া উঠিবে, তখনই মৌমাছি আসিবে। শিষ্য তখন জানিতে পারিবেন যে, গুরু তাঁহার দেহের মধ্যেই, তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলেই বিরাজিত ছিলেন। তখনই তিনি বিকশিত হইয়া উঠেন, তখনই তিনি উপলব্ধি করেন। সংসার-সমুদ্র পার হইয়া তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া যান। এ ভয়ঙ্কর সাগর তিনি পার হইয়াছেন; কোন লাভ বা প্রশংসার কথা না চিন্তা করিয়া করুণাবশতঃ তিনি তখন অপরকেও সংসার-সাগরের পারে যাইতে সাহায্য করেন।

২৩

গুরুর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর

স্বামীজী বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেনঃ ব্যবসায়িসুলভ হিসেবী মনোভাব ছাড়ো—সামান্য একটি জিনিষের প্রতি যে-আসক্তি আছে, তা ছাড়তে পারলে বুঝব, মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছ। আমি তো কোন পতিতা, পাপী বা সাধু দেখিতে পাচ্ছিনে। যাকে পতিতা বলছ, সেও তো মহামায়াই। সন্ন্যাসীরা একবার বা দুবার তাকে 'মা' বলে আহ্বান করে, তারপর আবার তাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়, তারা বলে, 'হে অসতী পতিতা নারী, দূরে সরে যাও'। একমুহূর্তেই সকল অজ্ঞানতা দূর হতে পারে—অজ্ঞানতা ধীরে ধীরে দূর হয় বলা মূর্খতামাত্র। বহু গুরু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরেও শিষ্য তাঁর প্রতি অনুগত থাকে—দেখা গিয়েছে। রাজপুতানায় দেখেছি, জনৈক ভক্তের গুরু খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও শিষ্য তাঁকে নিয়মিতভাবে পূর্বের মত সাহায্য দিত, সাহায্য বন্ধ করেনি। তোমরা পাশ্চাত্য ধারণা ছাড়। কোন বিশেষ গুরুর উপরে তোমরা যখন তোমাদের সকল বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছ, তখন সকল শক্তি দিয়ে তাঁকেই ধরে থাক।

একমাত্র বালকেরাই বলে থাকে যে, বেদান্তের মধ্যে কোন নৈতিকতা নেই। তাদের কথা ঠিকই—কারণ বেদান্ত নৈতিকতার ঊর্ধ্বে। তোমরা সন্ন্যাসী হয়েছ, উচ্চ চিন্ত ও আলোচনা কর।

তোমাদের জোর করে অন্ততঃ একটি বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি আনতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে চিন্তা করা অনেক সহজ। কিন্তু বিপদ হল এই—আমরা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আনতে পারি না। ঈশ্বর তো নিরাকার, নিত্য, সর্বত্র বিরাজিত।

তাঁকে সাকার বলে চিন্তা করা মহাপাপ, ঐরূপ চিন্তা করলে ঈশ্বর-নিন্দা করা হয়। কিন্তু সাকার উপাসনার মূলকথা এই যে, ঐ প্রকার উপাসনার মাধ্যমে উপাসক ভগবদ্বিষয়ে ধারণার উৎকর্ষ লাভ করে।

২৪

মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য

মন্ত্রবাদের সমর্থকদের বিশ্বাস—কতকগুলি শব্দ গুরু বা শিষ্যপরম্পরায় চলে এসেছে। এই-সকল শব্দের বার বার উচ্চারণে বা জপে একপ্রকার উপলব্ধি হয়। 'মন্ত্রচৈতন্য' শব্দের দু-রকম অর্ত করা হয়। এক মতে—মন্ত্র জপ করতে করতে জাপকের সামনে তার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। 'ইষ্ট' হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয় বা মন্ত্রের দেবতা। আর একটি মত এইঃ যে-গুরুর উপযুক্ত শক্তি নেই, তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে—সেই মন্ত্রে চেতনা সঞ্চার করতে হলে দীক্ষিতকে কতগুলি অনুষ্ঠান২৫ করতে হয়, তখন সেই মন্ত্রজপের ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন মন্ত্রে চেতনা সঞ্চারিত হলে তার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। একটি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে—বহুক্ষণ জপ করলেও জপকারী কোন রকম অস্বস্তি বোধ করে না এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার মনঃসংযোগ হয়। এ হচ্ছে তান্ত্রিক মন্ত্রের কথা।

বৈদিক যুগ থেকেই মন্ত্র সম্পর্কে এই দুটি মত চলে আসছে। যাস্ক ও অন্যান্যের অভিমত এই—বেদমন্ত্রের অর্থ আছে। কিন্তু প্রাচীন মন্ত্রশাস্ত্রীরা বলেনঃ এগুলির কোন অর্থই নেই। তবে কোন কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে এই সকল মন্ত্র বার বার উচ্চারিত হলে এগুলি যজ্ঞকর্তাকে বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে। উপনিষদের মন্ত্র-আবৃত্তিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয়।

ঈশ্বর-সম্পর্কে ধারণা

প্রকৃতির নিয়ম-বন্ধনের অতীত—সর্বপ্রকারে স্বাধীন স্বতন্ত্র কাহারও সন্ধান লাভ করাই মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। বেদান্তবাদীরা এরূপ নিত্য শাশ্বত পুরুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও সাংখ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন 'জন্য ঈশ্বর'-এ,—অর্থাৎ যিনি একদা মনুষ্য ছিলেন, তারপর আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। পুরাণসমূহে অবতারবাদের মাধ্যমে এই দুটি মতের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'জন্য ঈশ্বর' তো নিত্য (শাশ্বত) ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নন, মায়া দ্বারা তিনি কেবল এই প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। 'নিত্যঈশ্বর'-এর বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা যুক্তি দেনঃ 'মুক্ত আত্মা কি করে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে?' মিথ্যা ভিত্তির উপর সাংখ্যবাদীদের এই যুক্তি স্থাপিত। মুক্ত আত্মা তো কারও অধীন নয়, তাকে তো তুমি নির্দেশ দিতে পার না—এই কর বা এই কর না। সে মুক্ত, সে যা-ইচ্ছে করতে পারে। বেদান্তের মতে 'জন্য-ঈশ্বর' ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি বা লয় করতে পারেন না।

ঈশ্বরঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত

যাঁকে তোমরা ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বল, আমার ধারণা তিনি এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তা একই-কালে সাকার ও নিরাকার। আমরাও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'অব্যক্ত', আর আপেক্ষিকভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'ব্যক্তি'। তোমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-সত্তা, সকলেই সর্বব্যাপী। শুনলে প্রথমটা মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এ কথা যতখানি সত্য, ঐ কথাও ততখানি সত্য, আত্মা সর্বব্যাপী না হয়ে পারে কি করে? আত্মার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই—জড়ের কোন ধর্মই আত্মায় নেই। আমরা সবাই যদি আত্মা হই, তা হলে দেশ (space) দ্বারা পরিচ্ছন্ন হতে পারি না, দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে; আমরা যদি শরীরে আবদ্ধ থাকতাম, তাহলে আমাদের জড়বস্তুই হতে হত। শরীর, আত্মা—সব কিছুই জড় হতে। 'শরীরে বাস করা', 'আত্মাকে শরীরে আটকে রাখা' প্রভৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হত, এর অতিরিক্ত এদের কোন অর্থ থাকত না।

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে—আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি; প্রত্যেকটি আত্মা হচ্ছে এক-একটি বৃত্ত, একটি বিন্দুতে যার কেন্দ্র এবং যার পরিধি কোথাও নেই। কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, সেখানেই সব কর্মশক্তি প্রকাশিত। তোমরা সর্বব্যাপী, তবে সত্তাচেতনা একটি বিন্দুতে ঘনীভূত। সেই বিন্দুটি কিছু জড়কণা সংগ্রহ করে সেগুলিকে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে, তাকে বলে 'শরীর'।

তা হলে তুমি সর্বত্র আছ। যখন একটি শরীর বা যন্ত্র আর কাজ করতে পারে না, তখন শরীরের কেন্দ্র 'তুমি' সরে যাও, আবার নতুন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়কণা সংগ্রহ করে তাদের মাধ্যমে আবার কাজ করতে থাক। এই হল মানুষ। তা হলে ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি কোথাও নেই এবং যার কেন্দ্র সর্বত্র; এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও সক্রিয়। সীমাবদ্ধ আত্মা আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ করে চলেছে। আমাদের শুধু একটি চেতন বিন্দু, সেই বিন্দু একবার এগিয়ে চলেছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি নগণ্য। আমরা যখন বলি, ঈশ্বর কথা বলছেন, তখন তার অর্থ—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যমে বলছেন। আমরা যখন বলি—তিনি দেশ-কালের সীমার অতীত, তার অর্থ —তিনি ব্যক্তিত্বশূন্য সত্তা। এই উভয়ই এক সত্তা।

একটি দৃষ্টান্ত দিইঃ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখছি। মনে কর, তুমি সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে দেখবে আর এর সূর্য—অনেক বড়। সবশেষে দেখবে, প্রকৃত সূর্য লক্ষ মাইল জুড়ে। এখন এই যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাক, প্রত্যেক স্তর থেকে ছবি তোলা হল। প্রকৃত সূর্যেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সবগুলি তুলনা কর, মনে হবে প্রত্যেকটি পৃথক্। প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখা গেল লক্ষমাইল-ব্যাপী বিরাট প্রকৃত সূর্য। দুটি একই সূর্য।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অসীম সত্তাকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, মনের বিভিন্ন স্তর থেকে। নিম্নতম মানুষ দেখছে তাঁকে পূর্বপুরুষ-রূপে; দৃষ্টি যখন আরও বড় হল, তখন তাঁকে দেখছে একটি গ্রহের নিয়ন্তা-রূপে; দৃষ্টি আরও ব্যাপক হলে মানুষ বুঝতে পারে, তিনি বিশ্বের নিয়ামক। সর্বোচ্চ মানব অনুভব করেন, 'তিনি আমাদের স্বরূপ'। ঈশ্বর সর্বদা একই, তাঁকে যে বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তার কারণ দৃষ্টির প্রভেদ ও তারতম্য।

ভগবৎ-প্রেম

[১৮৯৪, ১৫ ফেব্রুআরী আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটারিয়ান চার্চে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।]

ভগবানকে আমরা মানি, যথার্থই তাঁকে চাই বলে নয়—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে দরকার বলে। প্রেম হচ্ছে এমন কিছু, যা সম্পূর্ণ স্বার্থহীন; এ প্রেম যাঁকে অর্পিত হয়, শুধু তাঁরই মহিমা ও স্তুতি ছাড়া তাতে অন্য কোন চিন্তার স্থান নেই। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে প্রণতি আর পূজা, প্রতিদানে প্রেম কিছু চায় না। শুধু ভালবাসাই হল বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আবেদন।

একজন হিন্দু-সাধিকা

২৬

সম্পর্কে এ-রকম শোনা যায়—বিবাহের পর তিনি তাঁর পতি রাজাকে বলেছিলেন, 'ইতিপূর্বেই আমি বিবাহিতা।' রাজা জিজ্ঞাসা করেন, 'কার সঙ্গে?' সাধিকা উত্তর দেন, 'ভগবানের সঙ্গে।' দীন-দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালবাসতে। তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত গভীর ছিল তা তাঁর প্রার্থনাগীতিগুলির একটি হতে জানা যায়ঃ 'আমি ধন মান কিছুই চাই না—এমন কি মুক্তিও চাই না; প্রভু, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে শত শত নরক-যাতনাও দিতে পার—তথাপি শুধু তোমাতেই আমার অনুরাগ দাও।' আমাদের প্রাচীন ভাষা এই সাধিকার মধুর ভজনাবলীতে পূর্ণ। তাঁর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তখন এক নদীর তীরে গিয়ে তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। এক মর্মস্পর্শী সঙ্গীতে তিনি ব্যক্ত করে যান যে, তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্যই তিনি যাত্রা করেছেন।

পুরুষেরা ধর্মের দার্শনিক বিচারে সমর্থ। নারী স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ; সে ভগবানকে ভালবাসে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। সলোমনের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি বাইবেলের চমৎকার অংশগুলির অন্যতম। এগুলির ভাবও অনেকটা ঐ হিন্দু-সাধিকার ভজনগীতের মত অনুরাগে পূর্ণ। তথাপি শুনেছি, এই অতুলনীয় সঙ্গীতগুলি খ্রীষ্টানরা নাকি বাইবেল থেকে বাদ দিতে চাচ্ছেন। এর একটা কৈফিয়তও আমি শুনেছি—সলোমন নাকি কোন যুবতীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং যুবতীর কাছ থেকে তাঁর রাজোচিত প্রেমের প্রতিদান চেয়েছিলেন। যুবতী অন্য কোন যুবককে ভালবাসত, সলোমনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইত না। এ কৈফিয়তটি কারও কারও কাছে হয়তো ভালই লাগবে, কারণ এ-সব ভজনগীতের অন্তর্নিহিত ভাব—অলৌকিক ভগবৎ-প্রেম—তারা বুঝতে অক্ষম। ভারতের ভগবদ্‌ভক্তি অন্যান্য দেশের ভগবদ্‌ভক্তি থেকে কিছু স্বতন্ত্র, কারণ যে-দেশের তাপমান-যন্ত্র শূন্যের নীচে ৪০ ডিগ্রী সূচিত করে, সে দেশের লোকের প্রকৃতিও কিছু ভিন্ন ধরনের হয়। যে-জলবায়ুতে বাইবেল রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়, সেখানকার লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা—যারা ঈশ্বরোপাসনার চেয়ে সঙ্গীতগুলিতেও ব্যক্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদ অর্থের পূজা করতেই অধিকতর অভ্যস্ত—সেই-সব আবেগশূন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি থেকে পৃথক্ ছিল। 'এতে আমার কি লাভ?'—এটাই যেন ভগবদ্‌ভক্তির ভিত্তি। প্রার্থনাদিতে তারা শুধু স্বার্থপূর্ণ বিষয়গুলিই কামনা করে।

খ্রীষ্টানরা সর্বদা চান, ভগবান্ তাঁদের কিছু না কিছু দিন। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সিংহাসন-সমীপে তাঁরা ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হন। গল্পে আছে—এক ভিক্ষুক কোন সম্রাটের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছিল। ভিক্ষুক যখন অপেক্ষা করছিল, সম্রাটের তখন প্রার্থনার সময়। সম্রাট্ প্রার্থনা করছিলেনঃ 'হে জগদীশ্বর, আমাকে তুমি আরও ঐশ্বর্য দাও, আরও শক্তি দাও, আরও বড় সাম্রাজ্য দাও।' ভিক্ষুক এই শুনে চলে যাচ্ছিল। সম্রাট্ পিছনে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, 'চলে যাচ্ছ কেন?' উত্তর হল, 'ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা চাই না।'

যে তীব্র আধ্যাত্মিক উন্মাদনা মহম্মদের হৃদয় আলোড়িত করেছিল, অনেকের পক্ষেই তা বোঝা কঠিন। তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি দিতেন এবং বিরহ-যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। যে-সব লোকোত্তর পুরুষ এরূপ তীব্র হৃদয়াবেগ অনুভব করেছেন, লোকে তাঁদের বায়ুরোগগ্রস্ত বলেছে। অহং-শূন্যতাই ঈশ্বরানুরাগের প্রধান লক্ষণ; ধর্ম আজকাল মানুষের এক-রকম শখ বা বিলাসমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে গির্জায় যায় গড্ডলিকা-প্রবাহের মত; তারা ভগবানকে স্বেচ্ছায় বরণ করে না, তারণ তাঁর সঙ্গে তো তাদের প্রয়োজন বা স্বার্থের সম্বন্ধমাত্র। অধিকাংশ লোকই একরকম প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, অথচ নিজেদের খুব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে।

মাতৃভাবে উপাসনা

[১৯০০, জুন মাসে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অনুবাদ।]

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমষ্টি পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হইয়াছে; একমাত্র কন্‌ফিউসিয়াস চিরন্তন একটি নীতির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মনুদেবতা আহ্‌রিমানে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতে পুরাণের গল্প চাপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়া গিয়াছে। ঋগ্‌বেদেই একটি মন্ত্র

২৭

পাওয়া যায়, 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্‌—'।

মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি পদক্ষেপে ইহা অনুভূত হয়। অন্তরে অনুভূত শক্তি—আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি—প্রকৃতি। এই দুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যাহা কিছু জানি বা অনুভব করি, তাহা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ—উভয়ের উপর সূর্যের আলো সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা—এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে। এই ভাবেই মাতৃভাব উদ্ভূত।

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম, আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখনও সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামনা করে না, সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ্য করে না—সে জন্য বরং আরও বেশী ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।

যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মাতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্তু ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। স্বার্থবোধ না থাকিলে দুঃখও আনন্দের অনুভূতি আনিতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনের সাক্ষিরূপে পরিণত হই। জগদ্‌-ব্যাপারের পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের সাধককে বিস্মিত করে। আমাদের ধারণা—ঈশ্বর মানুষের মত সসীম ও ব্যক্তিত্ব-যুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আসে। শক্তি বলিতেছেন, 'আমি রুদ্রের জন্য ধনু বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি ব্রহ্মদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে পারেন।'

২৮

উপনিষদে এই ভাবের চিন্তা নাই, বেদান্ত এই বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই—ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিঃ 'সদসচ্চাহমর্জুন'—আমি ব্যক্ত, আমিই অব্যক্ত; ভাল মন্দ—সবই আমার সৃষ্টি।

এই ভাব কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে আবার দেখা দেয় নূতন দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ—উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহাও আংশিক মাত্র। সহানুভূতির অভাবে এই ধারণা মানুষকে পশুভাবাপন্ন ও হিংস্র করিয়া ফেলে। এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পশুর ধর্ম।

সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাপীর বিদ্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে। এই ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া দুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়—তখন আমরা জাগিয়া উঠি এবং মায়ের সত্তা অনুভব করি।

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাস—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালবাস, কারণ তুমি সন্তান। ভালয় মন্দে—সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।

পাদটীকা

১	ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। —নারদ-সূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় সূত্র ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ। —ঐ, ২।৭ ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। —ঐ, ৪।২৫ ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ। —ঐ, ৪।৩০

২	তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে ইতি চ যস্তাৎপর্যেণ গুর্বাদীননুবর্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি বা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে। —শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১

	ধ্যানং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ‘স্মৃত্যুপলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ’ ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; ‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে’ ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি ‘আত্মা বারে দ্রষ্টব্য’ ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনপ্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা। বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্। ‘বেদনমুপাসনম্’

৩	স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি।’ সর্বাসূপনিষৎসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং ‘বেদনমুপাসনম্’ ইত্যুক্তং ‘সকৃৎপ্রত্যয়ং কুষাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রষাজাদিবৎ’ ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা ‘সিদ্ধং তূপাসনশব্দাৎ’ ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনামিতি নির্ণীতম্। ‘উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি’ তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। সেয়ং স্মৃতিদর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি—‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ষমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্’ ইতি অনেন কেবলশ্রবণমননিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা ‘ষমবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ’ ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রষতত ইতি ভগবতৈবোক্তং—‘তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপষান্তি তে’ ইতি ‘প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ’ ইতি চ। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। —রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১
৪	প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্

	পরমগুরাবর্পয়তি। —ভোজবৃত্তি, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৩
৫	‘প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহাত্যভিধ্যানমাত্রেণ’ ইত্যাদি।
৬	‘সা পরানুরক্তিরীশ্বরে’ –শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।২
৭	যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েস্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।। —বিষ্ণুপুরাণ, ১। ২০।১৯
৮	আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ। প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবর্তিনঃ।। যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ। অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ।।
৯	ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্। —স্বপ্নেশ্বরটীকা, শাণ্ডিল্যসূত্র ১। ২
	জন্মাদ্যস্য যতঃ।

	—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২

১১	পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১। ২৫।২৬

১২	স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপ। —শাণ্ডিল্যসূত্র

১৩	জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ। —ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

	কিং মুক্তস্যৈশ্বর্যং জগৎসৃষ্ট্যাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্বেশ্বরত্বমপি উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ, কিং যুক্তং, জগদীশ্বরত্বমপীতি, কুতঃ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ সত্যসংকল্পত্বশ্রুতেশ্চ, নহি পরমসাম্যসত্যসঙ্কল্পত্বে সর্বেশ্বরাসাধারণজগদ্ব্যাপাররূপজগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যেতে অতঃ সত্যসঙ্কল্পতাপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপিমুক্তৈশ্বর্যমিত্যেবং প্রাপ্তেঃ,প্রচক্ষ্মহে—জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি জগদ্ব্যাপারো নিখিলচেতনাচেতন-স্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদনিয়মনন্তদ্বর্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্যং কুতঃ প্রকরণাৎ নিখিলজগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে, ‘যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব

১৪	প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্বব্রহ্মেতি'।যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানামপি সাধারণং স্যাৎ ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে। অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বং তথা 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজতেতি' 'ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্তদেকং সন্নব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান' ইতি 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি স ইমাল্লোকানসৃজত ইতি'। 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ণ সোমো ন সূর্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদিষু যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর' ইত্যারভ্য 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে' অসন্নিহিতত্বাচ্চ, ন চৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ। —রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

১৫	'প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতিচেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।' এই সূত্রের (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮) রামানুজভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৬	আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং

	—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১
১৭	তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।। —শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩২।২
১৮	যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্যং ভবিতুমর্হতি ‘আপ্নোতি স্বারাজ্যম্’ ‘সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি’ ‘তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচরো ভবতি’ ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জয়িত্বাঽন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ? তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বর্যং শ্রুয়তে। তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যাভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং নিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধ সমর্থ্যেত, পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠন্তে। —শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭
১৯	গীতা,

১৯	গীতা, ১২।৫

২০	ইষ্টাপূর্ত

২১	‘আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা’ ইত্যাদি।—কঠ উপ., ১।২।৭

২২	অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ... ...অন্বেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ—মুণ্ডক উপ., ১।২।৮; কঠ উপ., ১।২।৫

২৩	শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।—বিবেকচূড়ামণি, ৬০

২৪	বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্। বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥—ঐ, ৫৮

২৫	শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ। —বিবেকচূড়ামণি, ৩৩

২৬	**And this our life exempt from public haunt, Finds tongues in trees, books in the running brooks,**

	good in every thing. — Shakespeare's 'As you Like It,' Act II, Sc. I

২৭	বিবেকচূড়ামণি, ৩৫

২৮	আচার্য মাং বিজানীয়াৎ....। শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।২০
২৯	স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। —শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তসূত্র, ১।১।২০
৩০	যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। পরিত্রাণায়া সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। —গীতা, ৪।৭-৮
৩১	অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্।। —গীতা, ৯।১১

৩২	'যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ইত্যাদি।—ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪
৩৩	অক্ষরাণামকারোঽস্মি।—গীতা, ১০।৩৩
৩৪	অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম্। রামানুজ ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫
৩৫	মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪। সংশয়ের উত্তর পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।
৩৬	ফলন্ত...আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্বাধ্যক্ষত্বাৎ।...ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।—শঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৫
	নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-স্তত্রর্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

৩৭	এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দৈবমীদৃশামিহাজনি নানুরাগঃ।। —শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

৩৮	শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।

৩৯	সব্‌সে বসিয়া সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম। হাঁ জী হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম।।—দোঁহা, তুলসীদাস

৪০	আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধোঃধ্রুবা স্মৃতিঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭। ২৬২

৪১	আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানামিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোহন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ল্যাং ভবতি; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি

	ধ্রুবাবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি।—শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭।২৬
৪২	অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। — গীতা, ৬।৩৫
৪৩	‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।’ —মুণ্ডক উপ., ৩।২।৪
৪৪	আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ।’ —তৈত্তি. উপ., ২।৮।১

১	তমের ভান্তমনুভাতি সর্বম্। তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।--কঠ উপ., ২।২।১৫

২	এতস্যৈবানন্দস্য...ইত্যাদি- বৃহ. উপ., ৪।৩।৬২

৩	ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। —বৃহ. উপ., ২।৪।৫

৪	গীতা, ১২।১-৭

৫	‘ তাচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা। তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা।। চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্। নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।।বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩। ২১-২২

৬	সম্মান-বহুমান প্রীতিবিরহেতর-বিচিকিৎসা-মহিমখ্যাতিতদর্থপ্রাণস্থান-তদীয়তাসর্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ।—শাণ্ডিল্যসূত্র, (২।১)৪৪

৭	তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষঃ সেতুঃ।–মুণ্ডক উপ., ২।২।৫

৮	আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপু্রুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

৯	যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।—নৃসিংহপূর্বতাপনী উপ., ২।৪

১০	এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। কর্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্।।

	ধনানি জীবিতঞ্চৈব

১১	পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।। সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।।— হিতোপদেশ
১২	দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। –মুণ্ডক উপ.,১।১।৪-৫
১৩	চেতসো বর্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা।–দেবীভাগবত, ৭।৩৭।১২
১৪	ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।— পাণ্ডবগীতা
	সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।

১৫	ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ —শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ ।৩১ । ১৪
১৬	জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহীঁ, জহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম। দুঁহু মিলত নহীঁ রব রজনী নহীঁ মিলত একঠাম।–দোঁহা, তুলসীদাস
১৭	ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্ বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।—শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

১	**Gospel according to St. John, New Testament**
২	**God the Father**
৩	**God the Son**
৪	**Trinitarians**—ইঁহাদের মতে ঈশ্বর পিতা-পুত্র ও পবিত্রাত্মা-ভেদে একেই তিন।
৫	জরথুষ্ট্রের অনুগামী প্রাচীন পারস্যবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন, অহুরমজদ ও অহ্রিমান (শুভাশুভের অধিষ্ঠাতা দেবতা)—এই দুই মূলতত্ত্ব হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।
	দেবীমাহাত্ম্য,

৬	চণ্ডী ৫।১৭
৭	শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং.......স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।– কেনোপনিষৎ, ১।২
৮	**I and my Father are one.—N. T.**
৯	নারদভক্তিসূত্র, ১।২।৬
১০	তুলনীয়ঃ ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলে কিকাঃ। নৃত্যান্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।। — শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৩।৩২
১১	ওঁ সা ন কাময়মান্য নিরোধরূপাৎ।— নারদভক্তিসূত্র, ২,৭
১২	ওঁ নারদস্ত তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।–ঐ, ৩,১৯

১৩	ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিন্ তৎসুখসুখিত্বম্ ।—ঐ, ৩, ২৪

১৪	ওঁ নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ। ওঁ তস্মিন্ অনন্যতা তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা ।—ঐ, ২ ।৮-৯

১৫	ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্ ।—ঐ ২। ১২

১৬	সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা

১৭	ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। —নারদভক্তিসূত্র, ৪ ।২৫

১৮	ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ।—ঐ, ৫ ।৩৮

১৯	ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ।—ঐ, ৫ ।৩৯

	ওঁ তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি

২০	কর্মাণি, সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি। ওঁ তন্ময়াঃ। —নারদভক্তিসূত্র, ৯।৬৯-৭০

২১	ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ। ওঁ যতস্তদীয়া।—ঐ, ১।৭২-৭৩

২২	ঐ ৬। ৪৩-৪৯

২৩	ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।— ঐ, ৭।৫৪

২৪	ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ। ওঁ প্রমাণান্তরস্যনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ।— নারদ ভক্তিসূত্র, ৫৮-৫৯

২৫	ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।— ঐ, ৮।৬০

২৬	**'Tree of Knowledge'— O.T., Genesis**

২৭	সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার

২৮	**'The letter killeth'— N.T., 2 Carinthians, III, 6.**

২৯	**Communism—** কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত নয়, সকলের সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে— এই মত।

৩০	**Bible, O.T., Samuel, XVII**

৩১	তুলনীয়—শ্রীচৈতন্যের সহিত রায় রামানন্দের কথোপকথনঃ না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৩২	**Parallelogram of forces:** একটি সামন্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন বাহুদ্বয় যদি দুইটি বলের তীব্রতা ও গতিরেখার সূচনা

৩২	করে, তাহা হইলে উহার কর্ণ দ্বারা ঐ দুইটি বলের সমবায়জনিত ফলের তীব্রতা ও গতিরেখা নিরূপিত হইবে।
৩৩	স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥—শ্বেতাশ্ব উপ, ১।১৪
৩৪	ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি চ বিজ্ঞানম্। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন।।—ব্রহ্মবিন্দু উপ., ২০
৩৫	পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্। কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।।—চাণক্যনীতি
৩৬	তুলনীয়ঃ বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে ঘটস্থাপন।
	এখানে বেদের

৩৮	প্রতিবোধবিদিতং......। কেন উপ., ২।৪

৩৯	মুণ্ডক উপ., ১।১।৪

৪০	প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ —মুণ্ডক উপ, ২।২।৪

৪১	মুণ্ডক উপ., ৩।১।৬

৪২	তুলনীয়ঃ ‘সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।’—হিতোপদেশ

৪৩	যখনই আমরা কোন ব্যক্তি স্থান বা বস্তুকে জানি, তা স্মৃতির মধ্য দিয়েই জানি, নতুবা বলি —জানি না। যার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তার সম্বন্ধেই স্মৃতি সম্ভব, অতএব অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক।

	স্মৃতি সম্ভব, অতএব অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক।

৪৪	মুণ্ডক উপ., ২।২।৮

৪৫	কঠ উপ., ১।২।২৩

৪৬	যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম।। —কেন উপ., ২।৩

৪৭	কেন উপ., ২। ৩

৪৮	'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'—বৃহ., উপ., ২।৪।১৪ ; ৪। ৫।১৫

৪৯	ছান্দ্যোগ্য উপ., ৬।২।১

৫০	'গীতা, ৫।২৩

৫১	ঐ, ৬। ৩৫

৫৩	‘সন্ন্যাসীর গীতি’ **(Song of the Sannyasin)** হইতে। কবিতাটি সহস্রদ্বীপোদ্যানে এইকালেই রচিত।

৫৪	বৃহ. উপ., ২।৪।১৪

৫৫	কঠ. উপ., ২।২।১৩

৫৬	দত্তাত্রেয় মুনি—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র, এক শরীরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবতার।

৫৭	গীতা, ৬।২২

৫৮	দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।।-- বিবেকচূড়ামণি, ৩

৫৯	**Robert Ingersoll**—আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী।

৫৯	—আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী।

৬০	মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।১-৩

৬১	গীতা, ১১।৩৩

৬২	গীতা, ১৪।৯

৬৩	গীতা, ১৪।২৬

৬৪	যদচ্যুত-কথালাপ-রস-পীযূষ-বর্জিতম্। তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্॥

৬৫	রামপ্রসাদ

৬৬	তলনীয়ঃ পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল। .... দুঁহ মন মনোভব পেশল জানি।।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

গল্পটি এইঃ একজন
গরীব লোক এক
দেবতার কাছে বর
পেয়েছিল। দেবতা
সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,
‘তুমি এই পাশা
নাও। এই পাশা
নিয়ে যে যে কামনা
করে তিনবার
ফেলবে, সেই তিনটি
কামনাই তোমার
পূর্ণ হবে।’ সে
অমনি আহ্লাদে
আটখানা হয়ে বাড়ি
গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে
পরামর্শ করতে
লাগল—কি বর
চাওয়া যায়। স্ত্রী
বললে, ‘ধনদৌলত
চাও।’ কিন্তু স্বামী
বলল ‘দেখ,
আমাদের দুইজনেই
নাক খাঁদা, তাই
দেখে লোকে
আমাদের বড় ঠাট্টা
করে, অতএব
প্রথমবার পাশা
ফেলে সুন্দর নাক
প্রার্থনা করা যাক।
টাকায় তো আর
শরীরের কুরূপ দূর
হয় না।’ স্ত্রীর মত
কিন্তু প্রথমে টাকা

৬৮	টাকায় তো আর শরীরের কুরূপ দূর হয় না।' স্ত্রীর মত কিন্তু প্রথমে টাকা হোক। শেষে দুজনে পাশা নিয়ে কাড়াকাড়ি বাধল। অবশেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে পাশা ফেলল —'আমাদের কেবল সুন্দর নাক হোক, নাক—আর কিছু চাই না।' আশ্চর্য, যেমন পাশা ফেলা অমনি তাদের সর্বাঙ্গে রাশি রাশি সুন্দর নাক হল। তখন তারা দেখলে এ কি বিপদ হল! তখন দ্বিতীয়বার পাশা ফেলে বললে, 'নাক চলে যাক'। আমনি সব নাক চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের খাঁদা নাকও চলে গেল। দুটি বর তো হয়ে গেছে, এখন বাকী আছে তৃতীয় বর। তখন তারা ভাবলে —যদি এইবার

	ভাল নাক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে—তাদের অবশ্য সব কথা বলতে হবে। তখন তারা আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাট্টা করবে; বলবে যে এরা এমন তিনটি বর পেয়েও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলে না। কাজেই তৃতীয়বার পাশা ফেলে তারা তাদের পুরাতন খাঁদা নাকই ফিরিয়ে নিলে। গল্পটিতে বোঝা গেলঃ কিছু বাসনা ক'রো না; যা চাইবে, তা পাবে; সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বন্ধনে বাঁধা পড়বে।

৬৯	'জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহীঁ, জহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম। দুহুঁ একসাথ মিলত নহীঁ, রব রজনী এক ঠাম॥'—তুলসীদাস

	মিলত নহীঁ, রব রজনী এক ঠাম॥’—তুলসীদাস

৭০	সাধন-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত।

৭১	অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর হইতে স্বামীজী এই কথা বলিতেছেন, এই অবস্থা শরীর ও অহংবোধকে অতিক্রম করিয়া। যে এত উচ্চে উঠে নাই, সাধনার জন্যই তাহার কর্তব্য প্রয়োজন। যে শরীর ও অহংকারের অধীন নয়, সেই কর্তব্যের ঊর্ধ্বে।

৭২	কঠ উপ., ২।১।১০

৭৩	তুলনীয়ঃ বিবেকচূড়ামণি, ৩

৭৪	খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওৎজে-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। ইঁহাদের মত প্রায়

৭৫	‘জনক’ শব্দটির অর্থ জন্মদাতা, মিথিলার রাজারও নাম ‘জনক’; তিনি জনগণের জন্য রাজ্যপালন করিতেন এবং মনে মনে সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন।

৭৬	মুণ্ডক উপ., ১।১।৭

৭৭	‘জ্যোতিরিব অধূমকঃ’ —কঠ উপ, ২।১।১৩, ‘দগ্ধেন্ধনমিবানলম্’—শ্বেতাশ্ব, উপ.,৬।১৯

১	**The Lunatic, the Lover and the Poet Are of imagination all compact; —The Lover all as frantic Sees Helen's beauty on an Ethiop's brow. —Shakespeare's A Mid-summer Night's Dream. Act V, Sc. I**
২	স্বামীজী এখানে পূর্বে প্রদত্ত 'একাগ্রতা' এবং 'ধর্মের রূপায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটি বক্তৃতার কথাই উল্লেখ

	করিয়াছেন।
৩	‘অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা...’—শ্বেতাশ্বতর উপ., ৩/১৯
৪	‘যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। —কেনোপনিষৎ, ১।৭
৫	বাসাংসি জীর্ণানি......। গীতা, ২।২২
৬	শ্বেতাশ্ব. উপ., ২।৫
৭	‘বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ’ ইত্যাদি, মোহমুদ্গরঃ —শঙ্করাচার্য, ১৩
	আঁসূয়ন জল সীঁচঁ সীঁচঁ

৮	প্রেমবোলী বোঈ—মীরাবাঈ

৯	তুলনীয় : শ্রীমদ্‌ভাগবত, গোপীগীতা, ১০

১০	তুহুঁ জগতনাথ, জগতে কহায়সি, নহি মুহি জগত কি বার।—বিদ্যাপতি

১১	শ্রীমদ্‌ভাগবত

১২	রায় রামানন্দ-সংবাদ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

১৩	নিন্দন্তু নীতিনিপুণা ...। নীতিশতকম—ভর্তৃহরি

	যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে স্বামী রাঘবানন্দ

১৪	কর্তৃক মিস এস্. ই. ওয়াল্ডোর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত।

১৫	**N.T. Matt., XIX.24**

১৬	**N.T. Matt., XIX, 28**

১৭	কঠ উপ., ১।২।৫

১৮	তুলনীয়ঃ চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ গুরুর্যুবা। গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়াঃ। দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্, ১২

১৯	ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্। একং নিত্যং

১৯	বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নামামি ॥— গুরুগীতা

২০	ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগনে শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবত্মের্ব ভুয় এবাভিবর্ধতে ॥— শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৯। ১৯।১৪

২১	বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুনীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥— মোহমুদগর, শঙ্করাচার্য

২২	গীতা, ৭।১৬

২৩	বিবেক চূড়ামণি, ৩৯

	ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ-

	১।৫

২৫	পুরশ্চরণ

২৬	মীরাবাঈ

২৭	দেবীসূক্ত—ঋগ্‌বেদ, ১০।১০।১২৫

২৮	দেবীসূক্ত, ৬

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
পঞ্চম খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’র পঞ্চম খণ্ডে প্রথমেই উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত ‘ভারতে বিকেকানন্দ’ গ্রন্থখানি সন্নিবেশিত হইল, তবে ঐ পুস্তকে স্বামীজীর বক্তৃতা ছাড়া আনুষাঙ্গিক যে-সকল বিষয়—যথা বিভিন্ন স্থানের অভিনন্দন পত্র, অভ্যর্থনার বর্ণনা এবং কয়েকটি সহযাত্রীর ডায়েরী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ ছিল, সেগুলি এখানে বাদ দেওয়া হইল। ঐগুলির প্রয়োজনীয় বিষয় তথ্যপঞ্জীতে কিছু কিছু লওয়া হইয়াছে। এগুলি সম্পূর্ণভাবে পাইতে গেলে মূল পুস্তকই পড়িতে হইবে। অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত ইংরেজ সংস্করণ Lectures from Colombo to Almora-র সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে আমরা উদ্বোধন-সংস্করণই অনুসরণ করিয়াছি।

দ্বিতীয় অংশ ‘ভারত-প্রসঙ্গে’ ভারত সম্বন্ধে স্বামীজী কর্তৃক লিখিত কয়েকটি গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের অনুবাদ এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমেরিকায় ভারত সম্বন্ধে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার সারমর্ম স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির অনুবাদও এই অংশে সন্নিবেশিত হইল। ‘ভারতীয় নারী’ একটি দীর্ঘ বক্তৃতা, এবং সর্বশেষ রচনাটি মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর—উহাতেও ভারতের সমস্যা, সাধনা, ইতিহাস ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। তথ্যপঞ্জীতে ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক বিষয়গুলির টীকা যথাসাধ্য দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থাবলী-প্রকাশে যে-সকল লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’-প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সে জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
জানুআরি, ১৯৬৩

প্রকাশক

ভারতে বিবেকানন্দ

কলম্বোয় স্বামীজীর বক্তৃতা

আমেরিকা ও ইওরোপে সাড়ে তিন বৎসর কাল বেদান্ত প্রচার করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ জানুআরী স্বামীজী সিংহলের রাজধানী কলম্বো বন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিনই এক অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পরদিন অপরাহ্নে 'ফ্লোরাল হল'-এ স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন, তাহাই 'কলম্বো হইতে আলমোড়া বক্তৃতাবলী'র প্রথম বক্তৃতা।

যেটুকু সামান্য কার্য আমাদ্বারা কৃত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন শক্তিবলে হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে পর্যটনকালে আমার এই পরম-পবিত্র প্রিয় মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ-ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার; কারণ পূর্বে যাহা হয়তো হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন তাহা আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্যভূমি— কর্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন; আজ আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে—যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে —যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—ভারতবর্ষ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের স্থাপয়িতাগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন, তাহা এখানেই সঞ্চিত রহিয়াছে। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন—ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।

সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; আপনাদের মধ্যেও যাঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তথ্য অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, ততটা আর কোন জাতিরই নিকট নহে। 'নিরীহ হিন্দু' কথাটি সময়ে সময়ে তীব্র নিন্দারূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন তিরস্কারবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে; তবে ইহাতেও আছে। হিন্দুগণ চিরকালই ঈশ্বরের মহিমান্বিত সন্তান। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য, প্রাচীন ও বর্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব প্রসূত হইয়াছে সত্য, অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব এক জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য, কোন কোন জাতির জীবন-তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দিকে মহাশক্তিশালী ভাবের বীজসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য,—কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিবেন—ঐ-সকল ভাব রণভেরীর নির্ঘোষে ও রণসাজে সজ্জিত গর্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত প্রচারিত হইয়াছিল, রক্তবন্যায় সিক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর রুধির-কর্দমের মধ্য দিয়াই ঐ-সকল ভাবকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক শক্তিপূর্ণ ভাব-প্রচারের পশ্চাতেই অগণিত মানুষের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছে।

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতিসকল পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়াছে, ভারত কিন্তু শান্তভাবে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে। যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষেরা জার্মানির গভীর অরণ্যে অসভ্য অবস্থায় নীলবর্ণে নিজেদের রঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার কোন সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না—সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা জয় করি নাই, সেই শুভ কর্মের ফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীকবাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রীসের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত! এমন একদিন ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল।রোম সর্বত্র যাইত এবং মানবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। রোমের নামে পৃথিবী কাঁপিত। আজ ক্যাপিটোলাইন গিরি

১

ভগ্নস্তূপমাত্রে পর্যবসিত! যেখানে সীজারগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ ঊর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে। অন্যান্য অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে, মদগর্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বল্পকালমাত্র অত্যাচার-কলঙ্কিত জাতীয় জীবন যাপন করিয়া তাহারা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এইরূপেই এই-সকল জাতি মনুষ্যসমাজে নিজেদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপনারা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইবেন না;

কোন এক অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি—এ-কথা মনে করিবেন না! সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্তমান; শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই-সকল সনাতন আচার এখানে এখনও বর্তমান। যতই দিন যাইতেছে, ততই দুঃখ-দুর্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে শুধু এই ফল হইয়াছে যে, সেইগুলি আরও দৃঢ়—আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ-সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল উৎসই বা কোথায়—ইহা যদি জানিতে চান, তবে বিশ্বাস করুন তাহা এই ধর্মভাবেই বিদ্যমান। সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আমি যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম—সংসারের অন্যান্য কাজের মত একটা কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন ও প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার চেষ্টা আছে। এই-সব নানা কার্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে—সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটু-আধটু ধর্মকর্মও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে—এই ভারতের কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য।

চীন-জাপানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন তাহা জানেন? পাশ্চাত্য সমাজে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন সেই সংবাদ রাখেন? যদি রাখেন, দুই চারিজন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট ধর্মসভা বসিয়াছিল এবং সেখানে এক হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য! দেখিতেছি—এখানকার সামান্য মুটে-মজুরও তাহা জানে! ইহাতে বুঝা যাইতেছে—হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল কোথায়। পূর্বে দেশীয়, বিশেষতঃ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোক প্রকাশ করিতে শুনিতাম, আর নিমেষে ভূপ্রদক্ষিণ- কারী পর্যটকগণের পুস্তকে ঐ বিষয় পড়িতাম! এখন বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা আংশিক সত্য, আবার আংশিকভাবে অসত্যও বটে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি বা যে-কোন দেশের একজন কৃষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন—'তুমি কোন্ রাজনীতিক দল-ভুক্ত?' সে বলিয়া দিবে—সে উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল-দলভুক্ত,

২

এবং কাহাকেই বা ভোট দিবে। আমেরিকার কৃষক জানে, সে রিপাবলিকান বা ডেমোক্রাট। এমন কি রৌপ্য-সমস্যা (Silver question) সম্বন্ধেও তাহার কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলিবে, 'বিশেষ কিছু জানি না, গির্জায় গিয়া থাকি মাত্র!' বড়জোর সে বলিবে— তাহার পিতা খ্রীষ্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, 'রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জান কি? সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিবে, 'এটা আবার কি? সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনে কখনও শোনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে—রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকুই বুঝে। কিন্তু তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'তোমার ধর্ম কি?' সে নিজের কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, 'আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত।' ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দুই-একটি কথা বাহির হইবে যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা বলিতেছি; তাই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটা-না-একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু—আমরা বলি, অনন্ত পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টিই বর্তমান আকারে প্রকাশ পায়; আর আমরা বর্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এই সংসারে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথে তাহাকে যেন চলিতেই হইবে; সেই ভাব অবলম্বন না করিলে সে বাঁচিতে পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির যেন একটি বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের যেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকেই যেন একটি বিশেষ ব্রত পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে—কখনও ছিল না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবেও না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা এইঃ সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব, বা ইংরেজরা তাহাদের অজেয় বাহিনীসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই-সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই পৃথিবীর কাছে ভারতের দান।

এইরূপে অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির মিলন ঘটাইয়াছে, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ভারতের একাকিত্ব তখনই ভাঙিয়াছে; যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে

জনৈক ফরাসী যুবক-কৃত অস্পষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, ‘উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে।’ অতঃপর সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, ‘গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিবর্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে।’ আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে।

যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন—ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন ও সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে। আমি সেই সম্বন্ধে আপনাদিগকে পূর্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখনও বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরেজী ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা-দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে—যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা-দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে—fascination (সম্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে, বরং ঠিক তাহার বিপরীত; উহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানব-মনে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু যদি মানুষ অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করে, মনোযোগের সহিত ভারতীয় আচার গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মূলীভূত মহান্ তত্ত্বসমূহের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে—শতকরা নিরানব্বই জনই ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্যে, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ, ঊষাকালীন শান্ত শিশির-সম্পাতের মত এই ধীর সহিষ্ণু ‘সর্বংসহ’ ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কার মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে পুরাতন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্মবিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত শিথিল হইয়া যাইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব-জাতিকে নিজ নিজ মতের অনুবর্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবী করিয়া থাকে, তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাত প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ভঙ্গুর কাচ-পাত্রের মত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর জ্ঞানিগণ ধর্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই যে-ভারতের অধিবাসিগণের ধর্মজীবন সর্বোচ্চ দার্শনিক সত্য-দ্বারা নিয়মিত, সেই ভারতের দর্শন—ভারতীয় মনের ধর্মবিষয়ক সর্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ এই-সকল মহান্ তত্ত্ব—অসীম জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্তত্ব ও বিভিন্ন জীবশরীরে তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা-রূপ অপূর্ব তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্ব—পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতই অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ এই পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র কাদামাটির ডোবা মনে করিত, এবং ভাবিত—কাল অতি অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্বোপরি মানবাত্মার অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেই বিদ্যমান, এবং সর্বকালেই এই মহান্ তত্ত্ব সর্বপ্রকার ধর্মতত্ত্ব- অনুসন্ধানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তির নিত্যতা (Conservation of Energy) প্রভৃতি আধুনিক বিস্ময়কর মতগুলি সর্বপ্রকার অপরিণত ধর্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে—তখন মানবাত্মার অপূর্বসৃষ্টি—ঈশ্বরের অদ্ভুত বাণীস্বরূপ এই বেদান্তের হৃদয়গ্রাহী, মনের উন্নতি-বিধায়ক ও চিত্তপ্রসারকারী তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানবজাতির শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু ইহাও বলিতে চাই, ভারতের বাহিরে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে আমি ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ—যেগুলির উপর ভারতীয় ধর্মরূপ সৌধ্য নির্মিত—সেইগুলি মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা—শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, সেইগুলি বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার; এইগুলি প্রকৃতপক্ষে ‘ধর্ম’-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে। একটি সত্য সনাতন—উহা মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব, জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে—পূর্বে অবস্থিত কোন কিছুর বিকাশমাত্র— এতদ্বিষয়ক মতবাদ, যুগপ্রবাহ-সম্বন্ধীয় আশ্চর্য নিয়মাবলী ও এইরূপ অন্যান্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সর্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক বিষয়সমূহ এই-সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তি। এগুলি ছাড়া আবার অনেকগুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সেইগুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য নিয়মিত। সেইগুলিকে ‘শ্রুতি’র অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে ‘স্মৃতি’র—পুরাণের অন্তর্গত। এইগুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্বসমূহের কোন স্থায়ী সম্পর্ক নাই। আমাদের আর্যজাতির ভিতরও এইগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে দেখা যায়। এক যুগের যে বিধান, অন্য যুগে তাহা নহে। যখন এই যুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তখন ঐগুলি আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশকালের উপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্তন করিবেন।

জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের এই-সকল অপূর্ব অনন্ত চিত্তোন্নতিবিধায়ক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিস্বরূপ মহৎ তত্ত্বসমূহ ভারতেই প্রসূত হইয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ—ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার (Tribal Gods) জন্য ‘আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা; এস, যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি’ বলিয়া প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার জন্য যুদ্ধরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখনও দেখা যায় নাই। মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মহান্ মূলতত্ত্বগুলি সহস্র বৎসর পূর্বের মত আজও মানবজাতির কল্যাণসাধনে সমর্থ। যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, যতদিন কর্মফল

থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং যতদিন স্বীয় শক্তি দ্বারা আমাদিগকে নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বিদ্যমান থাকিবে।

সর্বোপরি, ভারত জগৎকে কোন্ তত্ত্ব শিখাইবে, তাহা বলিতেছি। যদি আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী লক্ষ্য করি, তবে আমরা সর্বত্র দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই-সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিত, তবে সেই-সকল দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম হইত—যেমন বেবিলনীয় দেবতাগণ। যখন বেবিলনবাসিগণ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দেবতাগণের নাম ছিল 'বল' (Baal)। এইরূপ য়াহুদী জাতিরও বিভিন্ন দেবগণের সাধারণ নাম ছিল 'মোলক' (Moloch)। আরও দেখিতে পাইবেন, এই-সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ যখন অপরগুলি হইতে বড় হইয়া উঠিত, তখন তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বলিয়া দাবী করিত। এই ভাব হইতে আবার স্বভাবতই এইরূপ ঘটিত যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া তুলিতে চাহিত। বেবিলন- বাসিগণ বলিত, 'বল মেরোডক' দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ—অন্যান্য দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'মোলক য়াভে' অন্যান্য মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসিত হইত। ভারতেও দেবগণের মধ্যে এই সংঘর্ষ—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণ শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'৪ একমাত্র সৎস্বরূপই আছেন, জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। শিব বিষ্ণু অপেক্ষা বড় নহেন, অথবা বিষ্ণুই সব, শিব কিছু নহেন—তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। পূর্বোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যেই ভারতের সমগ্র ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বার বার উচ্চারিত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রতিটি শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—জাতীয় জীবনের উপাদানস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে-উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্মিত, তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে—সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান, অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা—পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী। তোমার হয়তো বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন হয়তো বলিতে পারে, সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে ইহা কিরূপে সম্ভবঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সৎস্বরূপ এক, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

হে আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সর্বোপরি পৃথিবীকে এই মহান্ সত্য আমাদের শিখাইতে হইবে। অন্যান্য দেশের বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা বলেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা স্থির হইয়া কখনও ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোর কুসংস্কার রাশি বর্তমান! এখনও সর্বত্র এই ভাব—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই নীচ সঙ্কীর্ণতা! তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের নিজেদের যাহা আছে, তাহাই অতি মূল্যবান্; অর্থোপার্জনই তাঁহাদের মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তাঁহাদের যাহা আছে তাহাই একমাত্র কাম্য বস্তু, আর বাকী সব কিছুই নহে। যদি তিনি মৃত্তিকা-দ্বারা কোন অসার বস্তু নির্মাণ করিতে পারেন, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, তবে সব-কিছু ফেলিয়া দিয়া ঐগুলিকেই ভাল বলিতে হইবে। শিক্ষা ও বিদ্যার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীর এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সভ্যতার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এখনও মনুষ্যজাতির শতকরা নিরানব্বই জন অল্প-বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে এই-সব কথা পড়িতে পার, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও এরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি, এখনও পৃথিবীতে এই ভাবগুলি নাই বলিলেই হয়; শতকরা নিরানব্বই জন এই-সকল বিষয় চিন্তাও করে না। পৃথিবীর যে-কোন দেশে আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি—এখনও অন্যধর্মাবলম্বীর উপর দারুণ নির্যাতন চলিতেছে; নূতন বিষয় শিক্ষা করা সম্বন্ধে পূর্বেও যে- সকল আপত্তি উঠিত, এখনও সেই পুরানো আপত্তিগুলিই উত্থাপিত হইয়া থাকে। জগতে যতটুকু পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যতঃ তাহা এইখানেই—এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্যধর্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে! তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা—শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে কথিত হইয়াছেঃ

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥'

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মত—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কেহ একটিকে শ্রেষ্ঠ, অপরটিকে হিতকর বলেন।

সমুদ্র যেমন নদীসকলের একমাত্র গম্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটিল নানাপথগামী জনগণের তুমিই একমাত্র গম্য।

ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইলেও সকলেই কিন্তু একই লক্ষ্যে চলিতেছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে; কিন্তু অবশেষে সকলেই সেই এক প্রভুর নিকট পৌঁছিবে। যখন তোমরা শুধু তাঁহাকে শিবলিঙ্গ নয়—সর্বত্র দেখিবে, তখনই তোমাদের শিব- ভক্তি এবং তোমাদের শিবদর্শন সম্পূর্ণ হইবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি শিবের যথার্থ ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিবে। যে নামে, যে রূপে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, সব তাঁহারই উপাসনা। কাবা-র৪ দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রীষ্টীয় গির্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তাঁহারই উপাসনা করিতেছে। যে-কোন নামে যে-কোন মূর্তির উদ্দেশে যে-ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায়, কারণ তিনি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মা। পৃথিবীতে কি-অভাব, তাহা তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালভাবেই জানেন। সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। পৃথিবীতে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহ থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অতএব সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবলমাত্র এখান হইতে—আমাদের মাতৃভূমি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি এ-কথা বলিতেছি? কারণ এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহা নহে; আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বত্র ইহা প্রবাহিত রহিয়াছে। এইখানে—কেবল এইখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এইখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। এইভাবে আমাদের জগৎকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে। ভারত ইহা অপেক্ষাও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে, কিন্তু সেইগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই নম্রতা, শান্তভাব, তিতিক্ষা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবের মহতী শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সর্বজাতি, সর্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে। ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।’

জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত

কলম্বো হইতে কাণ্ডি, অনুরাধাপুর ও ভাভোনিয়া হইয়া স্বামীজী জাফনা শহরে পদার্পণ করেন। সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। জাফনায় অভিনন্দনের উত্তরে ২৩ জানুআরী 'হিন্দু কলেজ' প্রাঙ্গণে তিনি 'বেদান্ত' সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি দেন।

বিষয় অতি বৃহৎ, কিন্তু সময় খুবই কম; একটি বক্তৃতায় হিন্দুদিগের ধর্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি, বর্ণনা করিব। যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিন্তু আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ—'যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত।' প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দই 'হিন্দু'রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই 'হিন্দু' বলিতেন। এইরূপেই 'হিন্দু'শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান-শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য এই শব্দ-ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার সার্থকতা নাই; কারণ তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, বর্তমানকালে সিন্ধুনদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মত এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা 'বৈদিক' শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস—এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য; সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্মের ভিত্তি। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ঐ-সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

বেদ-নামক শব্দরাশি কোন পুরুষের উক্তি নহে। উহার সন-তারিখ এখনও নির্ণীত হয় নাই, কখনও হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম—ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়। হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ; কারণ বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। 'বেদ' অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি; বিদ্ ধাতুর অর্থ—জানা। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত। ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; পূর্ব হইতেই বিদ্যমান সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন বা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব হইতে বিদ্যমান ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। ঐ ভাবরাশি অনন্ত কাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল—ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্তা।

বেদ-নামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ যাগযজ্ঞের কথা আছে; উহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমান যুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন-না-কোন আকারে বর্তমান। কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, যথা সাধারণ মানবের কর্তব্য—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্তব্য এখনও পর্যন্ত অল্প-বিস্তর অনুসৃত হইতেছে। দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ। ইহার নাম 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে-কেহ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্‌ভাগ মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতে সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে—আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্মের যত শাখাপ্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন, যিনি বেশ ভাল করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—উপনিষদ্ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই-সকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যাঁহারা হিন্দুধর্মের খুব অমার্জিত শাখা-বিশেষেরও রূপকতত্ত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব দৃষ্টান্তরূপে পরিণত হইয়া ঐ-সকল ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকগুলি সবই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে প্রতীকরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এইগুলি মুনিদের লেখা গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ মুনি এই-সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য যেরূপ, স্মৃতির প্রামাণ্যও সেইরূপ; তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই-সকল স্মৃতি যুগে যুগে ভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি—সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি

—এই-সকল যুগের প্রত্যেক যুগে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে; আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি।

বেদান্তে ধর্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তনীয়। কেন?— কারণ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অপরিবর্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, সেইগুলি ঐ মূল- তত্ত্বগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখনও পরিবর্তন হইতে পারে না। আত্মা, স্বর্গগমন প্রভৃতির ভাব কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্বে ঐ-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ভাব ছিল, এখনও তাহাই আছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে।

কিন্তু যে-সকল ধর্মকার্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সেইগুলিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং সময়-বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্য-বিশেষের বিধান রহিয়াছে, অন্য সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়-বিশেষের উপযোগী ছিল, কিন্তু ঋতু পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি তখন ঐ খাদ্য-ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতই প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্তন করিতেই হইবে; কিভাবে ঐ-সকল পরিবর্তন করিতে হইবে—ঋষিরা আসিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্মের মূল সত্যগুলি বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইবে না, ঐগুলি সমভাবে থাকিবে।

তারপর পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিত। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, নানাবিধ রূপকের দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বসকলের বিবৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে-ভাষায় লিখিত তাহা অতি প্রাচীন; অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই ঐ গ্রন্থের সময়-নিরূপণে সমর্থ। পুরাণ সমসাময়িক লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ-সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে-সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেইগুলির মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। মুনিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেকটিই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তারপর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইগুলি সবই হিন্দুদের শাস্ত্র। যে জাতির মধ্যে এত অধিকসংখ্যক ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান এবং যে-জাতি অগণিত বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্মের চিন্তায় তাহার শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে, সে-জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব অতি স্বাভাবিক। আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কোন কোন বিষয়ে এই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য বিদ্যমান। সম্প্রদায়গুলির এই-সকল খুঁটিনাটির বিভিন্নতা বুঝিবার সময় এখন আমাদের নাই। সুতরাং যে-সকল মতে—যে-সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, সম্প্রদায়সমূহের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের মত—এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তারপর তিনি ঘুমাইতেছেন—ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। *** উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ||—যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। এমন সময় কখনই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া থাকে। আমাদের 'সৃষ্টি' ইংরেজী 'Creation' নহে। 'Creation' বলিতে ইংরেজীতে 'কিছু-না হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব'—এই অপরিণত মতবাদ বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া আমি তোমাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির অবমাননা করিতে চাই না। সমগ্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, কেবল প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে যায়, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার ব্যক্ত হইয়া উহা সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন পূর্বের মতই সংযোগ, পূর্বের মতই প্রকাশ হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙিয়া যায়—ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। আবার বাহিরে আসে; অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গের মত একবার সম্মুখে আর-বার পশ্চাতে আন্দোলিত হইতেছে। দেশ, কাল এবং অন্যান্য সব-কিছুই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই 'সৃষ্টির আরম্ভ আছে' বলা সম্পূর্ণ বাতুলতা। সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। এই জন্য যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি-অন্ত বুঝিতে হইবে; উহার অন্য কোন অর্থ নাই।

কে এই সৃষ্টি করিতেছেন?—ঈশ্বর। ইংরেজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায় আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম নিত্য—নিত্যশুদ্ধ নিত্যজাগ্রত সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ দয়াময় সর্বব্যাপী নিরাকার অখণ্ড। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এখন প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের নিত্য স্রষ্টা ও বিধাতা হন, তাহা হইলে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হয়। জগতে তো যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—

এখানে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; এইরূপ বৈষম্য কেন? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বিদ্যমান। কারণ এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই উৎপাত, এই দিবা-রাত্রি গগনবিদারী দীর্ঘনিঃশ্বাস—ইহাই আমাদের এই জগতের অবস্থা! ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর! মানুষের কল্পিত নিষ্ঠুরতম দানব অপেক্ষা এই ঈশ্বর আরও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন। তবে কে ইহা করিল?—আমরা নিজেরাই করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রের উপর সমভাবেই বর্ষণ করে। কিন্তু যে-ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত, তাহাই শস্যশালী হয়; যে-ভূমি ভালভাবে কর্ষিত নয়, তাহা ঐ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারে না। ইহা মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার দয়া অনন্ত অপরিবর্তনীয়—আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করিলাম? কেহ জগতে সুখী হইয়া জন্মাইল, কেহ বা অসুখী—তাহারা তো এই বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই? করিয়াছে বৈ কি! পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে।

এখন আমরা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোচনায় আসিলাম—যাহাতে শুধু আমরা হিন্দুরা নই, বৌদ্ধ এবং জৈনগণও একমত। আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির মত জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে—তাহা হইতেই পারে না; এইরূপ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই। কালে যাহার আরম্ভ, কালেই তাহার অন্ত হইবে। গতকল্য যদি জীবনের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য উহার শেষ হইবে—পরে উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। জীবন অবশ্য পূর্বেও বর্তমান ছিল। আজকাল ইহা বেশী বুঝাই- বার আবশ্যক নাই; কারণ আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে— জড়-জগতের আবিষ্কারগুলির সাহায্যে আমাদের শাস্ত্রনিহিত তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতেছে। তোমরা সকলে পূর্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনানুযায়ী কোন শিশুকেই প্রকৃতি স্বহস্তে জগৎ-রঙ্গমঞ্চে লইয়া আসেন না, তাহার স্কন্ধে অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্মের ফল ভোগ করিতে আসে। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্মবিধান; আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের নিয়ামক। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহা-দ্বারাই 'ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ' নিরাকৃত হয়। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য, আমরাই কারণস্বরূপ; সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমরা অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে—আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। আর ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; আর বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি। সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝিতে হইবে। মানুষের ইচ্ছা কোন ঘটনার অধীন নহে। মানুষের অনন্ত ইচ্ছাশক্তি ও মুক্ত স্বভাবের সম্মুখে সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্যন্ত মাথা নত করিবে—দাস হইয়া থাকিবে।

এইবার স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে—আত্মা কি? আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও অন্যান্য দেশে বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা-দ্বারা সেই সর্বাতীত সত্তার আভাস পাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা জানি, ইহার ফলও অতি শোচনীয় হইয়াছে। সেই সত্তার আভাস পাওয়া দূরে থাক্, আমরা যতই জড়-জগতের আলোচনা করি, ততই অধিকতর জড়বাদী হইতে থাকি। যদি বা একটু-অধটু ধর্মভাব পূর্বে থাকে, জড়-জগতের আলোচনা করিতে করিতে তাহাও দূর হইয়া যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরমপুরুষের জ্ঞান বাহ্যজগৎ হইতে পাওয়া যায় না। অন্তরমধ্যে—আত্মার মধ্যে ঐ তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সেই অনন্তের কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই ঈশ্বরকে জানিতে পারি। জীবাত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মতভেদ আছে বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সকলে একমত। যথা—সকল জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক আত্মায় সর্ববিধ শক্তি আনন্দ পবিত্রতা সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে—সে যতই দুর্বল বা মন্দ হউক, সে বড় বা ছোট হউক—সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণী ও আমার মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই; সে আমার ভ্রাতা; তাহারও যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছে। অন্যত্র 'সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃভাব' প্রচারিত হইয়া থাকে, ভারতে উহা 'সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব'—এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত আমার ভাই—তাহারাও আমার দেহস্বরূপ। 'এবং তু পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্' ইত্যাদি—এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্বভূতময় জানিয়া সকল প্রাণীকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিবেন। সেই কারণেই ভারতে ইতরপ্রাণী ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই—সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মাতে সমুদয় শক্তি বর্তমান—এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

স্বভাবতই এইবার আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব-আলোচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বেই 'আত্মা' সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা চর্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় Soul ও Mind—এই দুইটি শব্দে বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত 'আত্মা' ও ইংরেজী' 'Soul' শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচক। আমরা যাহাকে 'মন' বলি, পাশ্চাত্যেরা তাহাকে 'Soul' বলেন। পাশ্চাত্য দেশে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন দিন ছিল না। প্রায় বিশ বৎসর হইল সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছে। আমাদের এই স্থূল শরীরের পশ্চাতে মন; মন কিন্তু আত্মা নহে; উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রয় নির্মিত। উহাই জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে, উহার পশ্চাতে মানুষের আত্মা রহিয়াছে। এই 'আত্মা' শব্দ Soul বা Mind শব্দের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদিগকে সংস্কৃত 'আত্মা' অথবা আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুযায়ী 'Self' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, আত্মা যে মন ও স্থূল-শরীর—উভয় হইতেই পৃথক্, এই ধারণাটি মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম-শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে; কালে যখন সর্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখন উহার আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়; ইচ্ছা করিলে

জীবাত্মা এই মন বা সূক্ষ্ম-শরীরকে রাখিতেও পারে, অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। মুক্তিই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব।

আমাদের ধর্মেও স্বর্গ-নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ-নরকের স্বরূপ বিচার করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্যলোকেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র হইবে—না হয় একটু বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ। তাহাতে বরং আরও মন্দই হইবে। এইপ্রকার স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্মবশে ইহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্র-বরুণাদি কোন দেব-বিশেষের নাম নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা স্বর্গসুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু যেমন এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধন মান ঐশ্বর্য লাভ করিলে উচ্চতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা করেন না; তাঁহাদের শুভ কর্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি। সুতরাং এই-সকল স্বর্গেও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তু লাভ করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত?—মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেনঃ 'শ্রেষ্ঠ স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে—তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশ-কাল তোমার উপর কার্য করিতেছে, ততদিন তুমি ক্রীতদাসমাত্র।' এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি—উভয়কে জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে তোমাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে, সুতরাং মৃত্যুরও পারে উপনীত হইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল, সুতরাং তুমি দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই। দেহ সম্বন্ধেই নরনারী ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আরোপ করা ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

এই আত্মা কিরূপে সংসারে বদ্ধ হইলেন? একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই অজ্ঞানের নাশ হইবে, জ্ঞানই আমাদিগকে এই অজ্ঞানের পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা এবং ভগবানের মন্দিরজ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তিবলে জ্ঞানের উদয় হইবে, অজ্ঞান দূরীভূত হইবে, সকল বন্ধন টুটিয়া যাইবে এবং আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়-কর্তা—জগতের শাশ্বত জনক- জননী। তাঁহার সহিত আমাদের ভেদ নিত্য। মুক্তির অর্থ তাঁহার সামীপ্য ও সালোক্য-প্রাপ্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় সগুণ ঈশ্বরের প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই নির্গুণ সর্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না; কারণ জ্ঞান মনের ধর্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যইতে পারে না; কারণ চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায়মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা যাইতে পারে না; কারণ বিচারও সসীমতা—দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে না; কারণ বদ্ধ ভিন্ন মুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন কার্য করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? অভাব না থাকিলে কেহ কোন কার্য করে না।—তাঁহার আবার অভাব কি? বেদে তাঁহার প্রতি 'সঃ' শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নয়, নির্গুণ ভাব বুঝাইবার জন্য 'তৎ' শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করা হইয়াছে। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হইলে ব্যক্তিবিশেষ বুঝাইত, তাহাতে জীব-জগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য সূচিত হইত। তাই নির্গুণবাচক 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'তৎ' শব্দবাচ্য নির্গুণ ব্রহ্ম প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।

এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি?—তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সকল জীবের মূল ভিত্তিস্বরূপ সেই সত্তার বিভিন্ন বিকাশমাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নির্গুণ সত্তা হইতে আমাদিগকে পৃথক্ ভাবি, তখনই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি; আর এই অনির্বচনীয় নির্গুণ সত্তার সহিত আমাদের অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তি। সংক্ষেপতঃ আমাদের শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদই সর্বপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—সকলকে নিজের মত ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণি-নির্বিশেষে সকলকেই নিজের মত প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিগণকে নিজের মত ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, তখনই বুঝিবে—অপরের ক্ষতি করিলে নিজের ক্ষতি করা হইল; তখনই আমরা বুঝিব, কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে গিয়া আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন কালের প্রয়োজন অনুসারে লোকের উপর ভক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে—সর্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জিত হইয়া 'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয় তাহা বলা যায় না! ভয়?—কাহাকে ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু। মানুষ নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত—সেই আত্মা অনাদি অনন্ত ও অবিনাশী, তাঁহাকে কোন অস্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, তিনি অনন্ত জন্মরহিত মৃত্যুহীন, তাঁহার মহিমার সম্মুখে সূর্য-চন্দ্রসমূহ—এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমাদিগকে এই মহিমময় আত্মার বিশ্বাসবান্ হইতে হইবে—তবেই বীর্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাব, তবে দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি নিজেকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; নিজেকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদের নিজেকে দুর্বল ভাবিতে শিক্ষা দেয় না, পরন্তু নিজেদের তেজস্বী সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতরে ঐ ভাব এখনও প্রকাশিত নাও হইতে পারে, কিন্তু উহা তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভাব রহিয়াছে। তবে আমি ঐ ভাবগুলি জীবনে রূপায়িত করিতে পারি না কেন? কারণ, ঐ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি উহাতে আমি বিশ্বাসী হই, তবে ইহা এখনই প্রকাশিত হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। অদ্বৈতবাদ ইহাই শিক্ষা দেয়।

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা, কোনরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক,—সাহসী সর্বজয়ী সর্বংসহ হউক। সর্বপ্রথমে তাহারা আত্মার মহিমা সম্বন্ধে জানুক। এই শিক্ষা বেদান্তে—কেবল বেদান্তেই পাইবে; অন্যান্য ধর্মের মত ভক্তি উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ বেদান্তে আছে—যথেষ্ট পরিমাণেই আছে; কিন্তু আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবনপ্রদ এবং অতি অপূর্ব। কেবল বেদান্তেই সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের প্রধান তত্ত্বগুলি বলিলাম। ঐগুলি কিভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, এখন সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে যে-সকল কারণ বর্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্যতও দেখিতেছি—এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করে না। শৈব এ-কথা বলে না যে, বৈষ্ণবমাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে ঐ-কথা বলে না। শৈব বলে, 'আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমি তোমার পথা চল; পরিণামে আমরা একই স্থানে পৌঁছিব।' ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এই কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাকেই 'ইষ্টতত্ত্ব' বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ-কথা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে-প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে-প্রণালী আমার পথ নাও হইতে পারে, হয়তো তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক পথে যাইতে হইবে—এ-কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাজ্য। যদি কখনও পৃথিবীর সব লোক একধর্মমতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে বিলুপ্ত হইবে। বৈচিত্র্যই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকিবে। বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পথ তোমার পক্ষে ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার পথ আমার পক্ষে ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে নহে। প্রত্যেকেরই ইষ্ট ভিন্ন—এ-কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের পথ ভিন্ন।

এটি মনে রাখিও, কোন ধর্মের সহিত আমাদের বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই ইষ্ট ভিন্ন। কিন্তু যখন দেখি—কেহ আসিয়া বলিতেছে, 'ইহাই একমাত্র পথ' এবং ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশে জোর করিয়া আমাদিগকে ঐ মতাবলম্বী করিতে চায়, তখন আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকি। যাহারা ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে ভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদের বিনাশ-সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে, ইহা যে সহ্য করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে! ইহাই যদি প্রেম হয়, তবে দ্বেষ বলিব কাহাকে? খ্রীষ্ট বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যে-কোন অবতারেরই উপাসনা করুক না, কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, 'এস ভাই, তোমার যে-সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি; কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না।' আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয়তো উহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন্ খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমিই বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে-সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন্ পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমিই ঠিক বুঝিতে পারি—ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে, যদি কোন মন্দিরে গিয়া অথবা কোন প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার অন্তরে অবস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পার, তবে তাহাই কর; প্রয়োজন হয় দুই শত প্রতিমা গড় না কেন? যদি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার ঈশ্বর-উপলব্ধির সাহায্য হয়, তবে শীঘ্র ঐ সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন কর। যে-কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর; যদি কোন মন্দিরে যাইলে তোমার ঈশ্বরলাভের সহায়তা হয়, সেখানে গিয়াই উপাসনা কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে-মুহূর্তে তুমি বিবাদ কর, সেই মুহূর্তে তুমি ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশ পশুস্তরে

উপনীত হইতেছ।

আমাদের ধর্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কাছে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী আপাততঃ ধর্মের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই-সকল নিয়ম আবশ্যক ছিল। যখন আর আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।

যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। একসময় আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির একটিরও বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। গতকালের শিশু—যে আগামীকালই হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিতে বলে এবং আমিও যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের বাহিরে নানাদেশে হইতে আমরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরনের। তাহাদিগকে বল—তোমরা যখন একটি স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া রাখিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও; ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী! বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় বিলয়! আগে আমাদের মত স্থায়ী সমাজ গঠন কর; প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যেগুলির শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিবে পারে—তখন তোমাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় হইবে। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র।

আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইয়াছে। এখন আমি বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারত-কার বেদব্যাসের জয় হউক! তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম।' অন্যান্য যুগে যে-সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এই যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা। 'দান' শব্দে কি বুঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান; অন্নবস্ত্রদান সর্বনিম্নে। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যা দান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি প্রাণদান পর্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান অপেক্ষা অন্যান্য সব কাজ নিম্নস্তরের। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত উৎস।

এই ত্যাগের দেশ—ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় ধর্মের অপরোক্ষানুভূতির এরূপ দৃষ্টান্ত পাইবে? পৃথিবী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর— অন্যান্য দেশে অনেক বড় বড় কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখানে—কেবল এখানেই এমন মানুষ পাওয়া যায়, যিনি ধর্মকে জীবনে পরিণত করিয়াছেন। বড় বড় কথা বলাই ধর্ম নয়; তোতাপাখিও কথা কয়, আজকাল কলেও কথা বলে; কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহার মধ্যে ত্যাগ আধ্যাত্মিকতা তিতিক্ষা ও অনন্ত প্রেম বিদ্যমান। এই-সকল গুণ থাকিলে তবে তুমি ধার্মিক পুরুষ। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং আমাদের দেশে এমন মহৎ জীবনসমূহ উদাহরণস্বরূপ রহিয়াছে, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা-রত্নগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ-সকল তত্ত্ব শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে তাহা নহে, সমগ্র জগতে ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই দেখিবে—তুমি নিজেরই কল্যাণ করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্মকে ভালবাস, যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য শাস্ত্রাদি হইতে এই রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারগণকে দিতে হইবে—এই মহাব্রত-সাধনে প্রাণ পণ করিতে হইবে।

সর্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়! শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হইতেছি—আমরা সর্বদাই পরস্পরকে হিংসা করিতেছি। অমুক কেন আমা অপেক্ষা বড় হইল, আমি কেন তাহা অপেক্ষা বড় হইলাম না—অহরহঃ আমাদের এই চিন্তা! এমন কি ধর্মকর্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে ভয়ানক কোন পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষাপরতা। সকলেই আদেশ করিতে চায়, আদেশ পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে! প্রথমে আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে। ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে-সব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন—আমরা ভক্তি ও স্পর্ধার সহিত তাঁহাদের কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এখন আমাদের কাজ করিবার সময়—আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ যেন গৌরবের সহিত আমাদের এই কার্যকলাপের আলোচনা করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত হউন না কেন, প্রভুর আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন সব কাজ করিব, যাহা দ্বারা তাঁহাদেরও গৌরব-রবি ম্লান হইয়া যাইবে।

পাম্বান-অভিনন্দনের উত্তর

জাফনা হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া স্বামীজী ২৬ জানুআরী ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পাম্বান দ্বীপে পৌঁছিলেন। জেটির নিম্নে এক চন্দ্রাতপতলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। রামনাদের রাজাও হৃদয়ের আবেগে স্বামীজীকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের পর স্বামীজী ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম পাম্বানে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ রামনাদের রাজা সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। স্বামীজী এখানে নিম্নোক্তভাবে উত্তর প্রদান করিলেনঃ

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে—কেবল এখানেই ত্যাগ-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে; এখানে—কেবল এখানেই অতিপ্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

আমি পাশ্চাত্যদেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি—অনেক দেশ পর্যটন করিয়াছি, অনেক জাতি দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়—প্রত্যেক জাতিরই এক-একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরূদণ্ড নহে; ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য; বুদ্ধিবলে বিজ্ঞানসাহায্যে যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য দেখান যায়, ইহাও সত্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে। ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কর্মকুশল। আজকাল আমাদের শেখানো হয়—হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা; যে সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাই, তাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশের লোকের নিকট ইহা একটি কিংবদন্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা। ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, এ-কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্মপরায়ণ, অন্য কোন দেশেই সেরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান্ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর তাহার মহামহিমময় জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণেএই জাতি যেন অবিনাশী অক্ষয় নবযৌবন লাভ করিতেছে। ভারতে কর্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু উহা অপরের দৃষ্টিপথে না পড়িবার কারণ—যে যে- কাজটি করে বা ভাল বোঝে, সে সেটিকেই মাপকাঠি করিয়া অপরের বিচার করে; ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি! মুচি জুতাসেলাই বোঝে, মিস্ত্রী গাঁথনিই বোঝে—পৃথিবীতে যে আর কিছু করিবার বা জানিবার আছে, ইহা তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোকের স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না; কারণ আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—সেই সীমার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাই না। যোগী কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞলোকের জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিতরের বস্তু দেখিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। ভারতকে পৃথিবীর সকল জাতির জন্য এই আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগাইতে হইবে। এখানেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এখন আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন নিবদ্ধ ভারতবাসীর সনাতন বিশেষত্বের পরিচায়ক এই আদর্শটি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে কোন প্রচারক হিন্দু আদর্শ প্রচারের জন্য ভারতের বাহিরে যান বা না যান, এখন কিন্তু যাইতেই হইবে; পৃথিবীতে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকি।’ ধর্মের ইতিহাস গবেষণা করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে-কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতিশাস্ত্র প্রচলিত, সেই-জাতিই উহার কতক অংশ আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, আর যে-সকল ধর্মে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট, সেগুলিও মুখ্য বা গৌণভাবে আমাদের নিকট হইতেই ঐ ভাব গ্রহণ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার-দস্যুতা-জুলুম প্রভৃতি হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসনা জয় না করিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখনও মুক্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর সব জাতিই এখন এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। শিষ্য যখন এই সত্য ধারণা করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়। ভগবান্ অনন্ত কাল সকল ধর্মের মানুষের প্রতি প্রভূত দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল ধর্মেরই ঈশ্বর—এই উদার ভাব কেবল ভারতেই বর্তমান। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এরূপ উদার ভাব দেখাও তো!

বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ বড় সঙ্কটময় ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিগুলি আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। ভারতসন্তানগণের এখন কর্তব্য—সমগ্র পৃথিবীকে মানব-জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য নিজেদের উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলা। ভারতবাসীরা সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম শিখাইতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এক একটি বিষয় আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি। অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ ও বড় লোকেরা পার্বত্যদুর্গনিবাসী, পথিকের সর্বলুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারনগণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ দেখাইতে পারিলে বড় আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন; আমরা হিন্দুগণ কিন্তু পর্বতগুহানিবাসী ফলমূলাহারী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ মুনিঋষির বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি। আমরা এখন অবনত ও হীন হইয়া পড়িতে পারি, কিন্তু যদি আমাদের ধর্মের জন্য আমরা প্রাণ পণ করি, তবে আবার আমরা মহৎ পদবীতে উন্নীত হইতে পারিব।

আপনারা আমাকে যে আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সেজন্য আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রামনাদের রাজা আমার প্রতি যে-ভালবাসা দেখাইয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যদি আমাদ্বারা কিছু সৎকার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহানুভব রাজার নিকট ঋণী; কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়, তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উৎসাহিত করেন। তিনি এখন আমার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরও অধিক কাজের আশা করিতেছেন। যদি তাঁহার মত আরও কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

রামেশ্বর-মন্দিরে বক্তৃতা

মহাসমারোহে পাম্বান হইতে স্বামীজীকে রামাশ্বরে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে তিনি একদিন রামেশ্বর-মন্দির দর্শন করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমবেত জনগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে বলা হইল। স্বামীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন, নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ধর্ম অনুরাগে,—বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম। যদি দেহ-মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ-মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধচিত্ত হইয়াও অপরকে ধর্মশিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গমাত্র—মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজায় কোন ফললাভ হয় না। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে—তাহারা যাহা খুশি করুক না কেন, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ অপবিত্রভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ, সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, সেখানে পবিত্রভাবোদ্দীপক অন্যান্য বস্তুও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাস করেন, অথচ সেখানে একটিও মন্দির না থাকে, তবে সেই স্থানকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি সেখানে অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার; কারণ অন্য স্থানের পাপ তীর্থে খণ্ডিত হয়, কিন্তু তীর্থে কৃত পাপ কিছুতেই দূরীভূত হয় না। সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবের উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে-ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা যে জাতি- ধর্মনির্বিশেষে একটি মাত্র দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।

কোন ধনী ব্যক্তির একটি বাগান ছিল এবং দুইটি মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজ করিত না; কিন্তু প্রভু আসিবামাত্র করজোড়ে 'প্রভুর কিবা রূপ, কিবা গুণ!' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালীটি বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাক-সবজি উৎপন্ন করিত ও সেইগুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বল দেখি, এই দুই জন মালীর মধ্যে প্রভু কাহাকে অধিকতর ভালবাসিবেন? এইরূপে শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যানস্বরূপ, আর এখানে দুই প্রকার মালী আছে। এক প্রকার মালী অলস কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপের—তাঁহার চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর এক প্রকার মালী আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র দুর্বল সন্তানগণের জন্য, তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট ভক্তের মধ্যে কে শিবের প্রিয়তর হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন। যিনি পিতার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আগে তাঁহার সন্তানগণের সেবা করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে শিবের সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে-কেহ তোমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইভাবে পরের সেবা করা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের ভিতরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়- দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও অসৎ-ভাবের মলিনতা রহিয়াছে। সবচেয়ে বড় পাপ স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে—আমি আগে খাইব, আমি অপরের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব, আমি সর্বসম্পদের অধিকারী হইব; যে মনে করে—আমি অপরের আগে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের আগে মুক্তিলাভ করিব, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমার পালা সকলের শেষে; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক—পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সে-ই অধিক ধার্মিক, সে-ই শিবের সামীপ্য লাভ করে; সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিকতর নিকটবর্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত সে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার হইতেছে—নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, যেন কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।

হে রাজন, হে রামনাদবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, সেজন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আমার প্রতি যে আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। কারণ মুখের ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে ভাববিনিময় অতি অপূর্ব—আত্মা নীরবে অথচ অভ্রান্ত ভাষায় অপর আত্মার সহিত আলাপ করেন, তাই আমি আপনাদের ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হে রামনাদাধিপ, আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য যদি এই দীন ব্যক্তি-দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে যদি কোন কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যদি নিজ গৃহেই অজ্ঞাত ও গুপ্তভাবে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাজির প্রতি আমাদের স্বদেশবাসীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহারা অজ্ঞতাবশে তৃষ্ণার তাড়নায় প্রাণত্যাগ না করিয়া বা অপর স্থানের মলিন পয়ঃপ্রণালীর জলপান না করিয়া তাহাদের গৃহের নিকটবর্তী অফুরন্ত নির্ঝরের নির্মল জল পান করিতে আহূত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্মপরায়ণ করিবার জন্য—রাজনীতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে যে ভারতও মরিয়া যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি কিছু করা হইয়া থাকে, হে রামনাদাধিপ, ভারত অথবা ভারতেতর দেশে আমাদ্বারা কৃত কার্যের জন্য প্রশংসার ভাগী আপনি। কারণ, আপনিই আমার মাথায় প্রথম এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আপনিই পুনঃপুনঃ আমাকে কার্যে উত্তেজিত করেন। আপনি যেন অন্তর্দৃষ্টিবলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া আমাকে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, কখনই উৎসাহদানে বিরত হন নাই। অতএব আপনি যে আমার সফলতায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমি যে দেশে ফিরিয়া আপনার রাজ্যেই ভারতের মৃত্তিকা প্রথম স্পর্শ করিলাম, ইহা ঠিকই হইয়াছে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের রাজা পূর্বেই বলিয়াছেন—আমাদিগকে বড় বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বলুন, অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এই সব- কিছুরই প্রসূতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান, আর পৃথিবী সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই-সব বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। গত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে অনেক গুরুতর রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্যদেশের সর্বত্রই বড় বড় সম্প্রদায় উঠিয়া বিভিন্ন দেশের প্রচলিত নিয়মপদ্ধতিগুলি একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হইতেছে; আমাদের দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এই- সকল কথা কিছু শুনিয়াছে কিনা। কিছুই শুনে নাই। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, ভারত হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া সেখানে সাদরে গৃহীত হন এবং সেই অবধি পাশ্চাত্যদেশে কার্য করিতেছিলেন—এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুকও তাহা জানে। লোকে বলিয়া থাকে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থুলবুদ্ধি, তাহারা দুনিয়ার কোন প্রকার সংবাদ রাখে না, রাখিতে চাহেও না। পূর্বে আমারও ঐ-প্রকার মতের দিকে একটা ঝোঁক ছিল; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কাল্পনিক গবেষণা অথবা ক্ষিপ্রগতিতে দেশ-দর্শক ও ভূ-পর্যটকগণের লিখিত পুস্তক-পাঠ অপেক্ষা অভিজ্ঞতা অনেক বেশী শিক্ষাপ্রদ।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্বোধও নহে বা তাহারা যে জগতের সংবাদ জানিতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যেমন সংবাদ-সংগ্রহে আগ্রহশীল, ইহারাও সেইরূপ। তবে প্রত্যেক জাতিরই জীবনের এক-একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ সুর সংযোজন করিতেছে। উহাই তাহার জীবনীশক্তি। উহাই তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র—একমাত্র ধর্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্য-বলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এই-সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহার সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি-সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক অপেক্ষা আমাদের দেশের সামান্য কৃষকের পর্যন্ত এই-সকল তত্ত্বসম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান আছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই জন্যই শত শত বর্ষের অত্যাচার এবং প্রায় সহস্র বর্ষের বৈদেশিক শাসনের পীড়নেও এই জাতি

এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা-রূপ যে নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইবে এবং রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্ধমৃত হীনদশাগ্রস্ত পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মত-মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারত-গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালে-মানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা; কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান সুর যেন ভৈরবরাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ত্যাগের ভৈরবরাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতীয় সকল শাস্ত্রেরই এই কথা, ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন তো ক্ষণিক। ইহার পশ্চাতে, দূরে—অতি দূরে সেই অনন্ত অপার রাজ্য; যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহাবীর মনীষিগণের হৃদয়জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; তাঁহারা এই তথাকথিত অনন্ত জগৎকেও একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপ-মাত্র জ্ঞান করেন; তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কালের—অনন্ত কালেরও অস্তিত্ব সেখানে নাই; তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে—অতি দূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও অস্তিত্ব নাই—তাঁহারা তাহারও পারে যাইতে চান। ইহাই ধর্মের গূঢ়তম রহস্য। প্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক—যতই ক্ষতিস্বীকার করিয়া হউক—সাহস করিয়া প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া অন্ততঃ একবারও চকিতের মত সেই দেশ-কালাতীত সত্তার দর্শনচেষ্টাই আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য। তোমরা যদি আমাদের জাতিকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিয়া উঠিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজসংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কান দিয়া শুনিবে, অপর কান দিয়া সে-সব বাহির হইয়া যাইবে। অতএব পৃথিবীকে তোমাদের ধর্মের শিক্ষাই দিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন এই—পৃথিবীর নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি? সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে; কি-রূপে সঙ্ঘ গঠন করিয়া পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও দেশের সকল লোক যতদিন না সম্পূর্ণ ত্যাগ-স্বীকারে সমর্থ হইতেছে, ততদিন সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের নিকট পূর্বোক্ত বিষয়গুলি কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগসুখকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়-জগৎকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমিতে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার- সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, এই সভায় দাঁড়াইয়া আমি তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও-সব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।

তথাপি আমাদের যে-সব ভ্রাতারা এখনও উচ্চতম সত্যের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের পক্ষে হয়তো এক প্রকার জড়বাদ কল্যাণের কারণ হইতে পারে—অবশ্য উহাকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটি বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই—যে-ভারতে পূর্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই, কিছুদিন যাবৎ সেখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। সেই ভ্রম এইঃ অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা-দান। প্রকৃতপক্ষে সকলের পথ এক নহে। তুমি যে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমার সেই একই প্রণালী নাও হইতে পারে। তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। সংসারের সুখসমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যে তাহা না করে, সে হিন্দু নহে; তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, সে শাস্ত্র অমান্য করে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার—তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ। যখন পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসার-রূপ ফলের ভিতরটা ভুয়া—আমড়ার মত উহার 'আঁটি ও চামড়া'ই সার, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে ফিরিবার চেষ্টা কর। মন যেন চক্রগতিতে সম্মুখে ইন্দ্রিয়ের দিকে ধাবমান হইতেছে—উহাকে আবার ফিরিয়া পশ্চাতে আসিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই আদর্শ। কিন্তু কিছু পরিমাণ অভিজ্ঞতা হইলে তবে এই আদর্শ ধরিতে পারা যায়। শিশুকে ত্যাগের তত্ত্ব শেখানো যায় না। সে জন্মাবধি আশার স্বপ্ন দেখিতেছে। ইন্দ্রিয়েই তাহার জীবনের অনুভূতি, তাহার জীবন কতকগুলি ইন্দ্রিয়সুখের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক সমাজে শিশুর মত অবোধ মানুষ আছে। সংসারের অসারতা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু সুখভোগের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে—তবেই তাহারা বৈরাগ্যলাভে সমর্থ হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্ন্যাসীদের নিয়মে বাঁধিবার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তিকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধা হইয়াছে; তাহার পক্ষে এইগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার কাজের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারা একটু সুখভোগ করিয়া লউক। দেখিবে—সে ক্রমশঃ উন্নত হইবে, ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ত্যাগের ভাব আপনা-আপনি আসিবে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, ভোগের ব্যাপারে কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, আজকাল আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। এখন আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দু-সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা। এই দুইটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু-সমাজকেই বাছিয়া লইব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে

দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব পাইয়াছে—সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই; সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদহজম হওয়ায় সে সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান নয়—তাহার মাথা বোঁ বোঁ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। সে যাহা কিছু করে, তাহার প্রেরণা-শক্তি কোথায়? ইংরেজ কিসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুটা 'বাহবা' দিবে, ইহাই তাহার সকল কাজের অভিসন্ধির মূলে! সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ-সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ! আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ কেন?—কারণ সাহেবেরা এইরূপ বলিয়া থাকে! এইরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মরিয়া যাও। জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর— দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পন্থাবলম্বী ব্যক্তিগণ 'মানুষ' ছিলেন—তাঁহাদের একটা দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু এই সামঞ্জস্যহীন ভারসাম্যহীন জীবগণ এখনও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে কি বলিব—পুরুষ, না স্ত্রী, না পশু? তবে তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন আদর্শ-স্থানীয় ব্যক্তি আছেন। তোমাদের রাজা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু দেখিতে পাইবে না; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বিষয়েই বিশেষ সংবাদ রাখেন, এমন রাজা ভারতে আর একটি বাহির করিতে পারিবে না। ইনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় ভাবেরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—উভয় জাতির যাহা ভাল, তাহাই ইনি গ্রহণ করিয়াছেন। মনু মহারাজ তৎকৃত সংহিতায় বলিয়াছেনঃ

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

৫

শ্রদ্ধাপূর্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম অর্থাৎ মুক্তিমার্গের উপদেশ লইবে। নীচকূল হইতেও বিবাহের জন্য উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

মনু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও; যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর। তবে একটি কথা মনে রাখিও—তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, তাহাই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ ধর্মের নিম্নে স্থান গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অতীত জন্মের কর্মফলে তাহার জীবনের এই নির্দিষ্ট গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। তোমরাও প্রত্যেকে এক বিশেষ ব্রতসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। মহামহিমময় হিন্দুজাতির অনন্ত অতীত জীবনের সমুদয় কর্মসমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দেশক। সাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতৃপুরুষ তোমাদের প্রত্যেক কার্য লক্ষ্য করিতেছেন! কি সেই ব্রত, যাহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জন্ম? মনু মহারাজ অতি স্পর্ধার সহিত ব্রাহ্মণের জন্মের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই?—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥

৬

'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'—ধর্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জন্ম। আমি বলি, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে-কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। অন্যান্য সকল বিষয়কেই আমাদের জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্যের অধীন করিতে হইবে। সঙ্গীতে যেমন একটি প্রধান সুর থাকে—অন্যান্য সুরগুলি তাহার অধীন, তাহারই অনুগত হইলে তবে সঙ্গীতে 'লয়' ঠিক হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। এমন জাতি থাকিতে পারে, যাহাদের মূলমন্ত্র রাজনীতিক প্রাধান্য; ধর্ম ও অন্যান্য সমুদয় বিষয় অবশ্যই তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নিম্নস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়াছে, যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম ও বৈরাগ্য; যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র—এই জগৎ অসার, দুদিনের ভ্রমমাত্র; ধর্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু—জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভোগ-ঐশ্বর্য নাম-যশ ধন-দৌলত—সব-কিছুরই স্থান উহার নিম্নে।

তোমাদের রাজার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব, তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যা ধনমান পদমর্যাদা সবই ধর্মের অধীন—ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন; এই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা হিন্দুজাতির—প্রত্যেক হিন্দুর জন্মগত সংস্কার। সুতরাং পূর্বোক্ত দুই প্রকার লোকের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহার মধ্যে হিন্দুজাতির জীবনের মূলশক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, যাহার মধ্যে আর কিছু নাই— আর একজন, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি নকল হীরা-জহরত লইয়া বসিয়া আছে, অথচ যাহার ভিতর সেই জীবনপ্রদ শক্তিসঞ্চারী আধ্যাত্মিকতা নাই—এই উভয় সম্প্রদায়ের যদি তুলনা করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস—সমবেত শ্রোতৃবর্গ সকলে একমত হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হইবেন। কারণ এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকটা আশা করিতে পারা যায়—তাহার একটা অবলম্বন আছে, জাতীয় মূলমন্ত্র তাহার প্রাণে জাগিতেছে, সুতরাং তাহার বাঁচিবার আশা আছে; শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; যেমন ব্যক্তিগত ভাবে বলা চলে—যদি মর্মস্থানে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, জীবনের গতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে অন্য কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক না কেন, তাহাকে সাংঘাতিক বলা হয় না, কারণ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা তাহাদের ক্রিয়া জীবন- ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে; সেইরূপ মর্মস্থানে আঘাত না লাগিলে আমাদের জাতির বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে—যে ভিত্তির উপর সুবিশাল জাতীয় সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে—সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, ইহাই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ—আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্মসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, প্রাণপণে তাহা ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশের বড় বড় রাজারা নিজদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন-দুর্গনিবাসী, পথিকদের সর্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যুব্যারনগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্তে অরণ্যবাসী অর্ধনগ্ন মুনিঋষির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন?তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, শোন—আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ। অন্যান্য দেশে বড় বড় ধর্মাচার্যগণও নিজেদের কোন প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, আর এখানে বড় বড় রাজারা নিজেদের কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিখিবার, তাহা শিখিয়া লও; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্বমহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; আমার বিশ্বাস—ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা মহত্তর ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরদের এই অপূর্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি বলিতেছি—নিশ্চয় তাঁহারা পরলোকে নিজ নিজ স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণের এরূপ মহিমা, এরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া নিজদিগকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিবেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নয়। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিত ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।

যিনি শৈবদের শিব, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, কর্মীদের কর্ম, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, জৈনদের জিন, ঈশাহী ও য়াহুদীদের য়াভে, মুসলমানদের আল্লা, বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম—যিনি সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্বব্যাপী পুরুষের সম্পূর্ণ মহিমা কেবল ভারতই জানিয়াছিল, প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল ভারতই লাভ করিয়াছিল, আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তোমরা হয়তো আমার এই কথায় আশ্চর্য হইতেছ, কিন্তু অন্য কোন ধর্মের শাস্ত্র হইতে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বাহির কর দেখি। অন্যান্য জাতির এক-একজন জাতীয় ঈশ্বর বা জাতীয় দেবতা—য়াহুদীর ঈশ্বর, আরবের ঈশ্বর ইত্যাদি; আর সেই ঈশ্বর আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা, তিনি যে পরম দয়াময়, তিনি যে আমাদের পিতা মাতা সখা, প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা—এই তত্ত্ব কেবল ভারতই জানিত। সেই দয়াময় প্রভু আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদিগকে শক্তি দিন, যাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ ॥
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁ॥

আমরা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন অন্নের মত আমাদের পুষ্টিবিধান করে, উহা আমাদের বলস্বরূপ হউক, উহা দ্বারা আমাদের এমন শক্তি উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারি। আমরা—আচার্য ও শিষ্য যেন কখনও পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ॥

পরমকুডি অভিনন্দনের উত্তর

[পরমকুডিতে স্বামীজী যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।]

আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নসহকারে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন তো বলিতে চাই—লোকে আমাকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনাই করুক বা অবজ্ঞা করিয়া এখান হইতে তাড়াইয়া দিক, তাহাতে স্বদেশের প্রতি, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু তারতম্য হইবে না; কারণ আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি যে, কর্ম নিষ্কাম- ভাবে করা উচিত; আমাদের ভালবাসাও নিষ্কাম হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যদেশে যে কাজ করিয়াছি, তাহা অতি সামান্যই; এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই, যিনি আমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কাজ করিতে না পারিতেন। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যে-দিন মহামনীষী ধর্মবীরগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতের অরণ্যরাজি হইতে সমুত্থিত ও ভারত-ভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের বাণী ভারতের বাহিরে জগতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করিবেন।

মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির মধ্যেই যেন একটা সংসার-বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে। তাহারা দেখে, তাহারা যে-কোন পরিকল্পনা করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফসকাইয়া যাইতেছে—প্রাচীন আচার-প্রথাগুলি সব যেন ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সব আশা-ভরসা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সবই যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে!

পৃথিবীতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছেঃ এক—ধর্মভিত্তির উপর; আর এক—সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি— আধ্যাত্মিকতা, অপরটির—জড়বাদ; একটির ভিত্তি—অতীন্দ্রিয়বাদ, অপরটির—প্রত্যক্ষবাদ। একটি এই ক্ষুদ্র জড়জগতের সীমার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে এবং এমন কি, অপরটির সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়াই জীবন যাপন করিতে সাহসী হয়; অপরটি নিজের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিতে পায়, তাহার উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত; সে আশা করে, ইহারই উপর সারা জীবন দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিবে।

আশ্চর্যের বিষয়, কখনও কখনও অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তারপরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে, যেন তরঙ্গের গতিতে একটির পর আর একটি আসিয়া থাকে! এক দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—দেশ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হয়; যে-শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, যাহাতে অধিক সুখলাভের উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৌভাগ্যসম্পদ হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষাদ্বেষও প্রবল আকার ধারণ করে—পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখন যুগধর্ম হইয়া পড়ে। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'—এই প্রকার স্বার্থপরতাই তখন মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর মানুষ চিন্তা করিতে থাকে—জীবনের সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ধর্ম সহায় না হইলে, জড়বাদের গভীর আবর্তে ক্রমশঃ মজ্জমান পৃথিবীর সাহায্যে ধর্ম অগ্রসর না হইলে, জড়বাদের গভীর আর্বতে ক্রমশঃ মজ্জমান পৃথিবীর সাহায্যে ধর্ম অগ্রসর না হইলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তখন মানুষ নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া নব অনুরাগে নূতনভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন ভিত্তির পত্তন করে। তখন ধর্মের আর এক বন্যা আসে। কালে আবার উহারও অবনতি হয়।

প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়, যাহার পার্থিব ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করে। ইহার অব্যবহিত ফল—পুনরায় জড়বাদের দিকে প্রতিক্রিয়া। জড়বাদের দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে শত শত বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার একচেটিয়া দাবী আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নয়, সর্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যক্তির করায়ত্ত হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়। এই সময় জড়বাদ দ্বারাও বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে।

যদি আপনারা আমাদের মাতৃভূমি ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিবেন—এখানে এখন সেইরূপ ঘটিতেছে। ইওরোপে আপনাদের জাতীয় উত্তরাধিকার ধর্ম প্রচার করিতে একজন গিয়াছিলেন; সেইজন্যই আজ আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। ইহা অসম্ভব হইত, যদি না ইওরোপীয় জড়বাদ ইহার পথ করিয়া দিত। সুতরাং এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে, উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে; অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট যে- অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল এবং যাহার ব্যবহার তাহারা নিজেরাও ভুলিয়া গিয়াছিল, জড়বাদ তাহা সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্ধভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অপরার্ধ এমন সব লোকের হাতে আছে, যাহারা গরুর জাবের পাত্রে শয়ান সেই কুকুরের মত—নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না!

অপর দিকে আবার আমরা ভারতে যে-সকল রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি ইওরোপে যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছে, শত শতাব্দী ধরিয়া ঐগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে; আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন-সাধনে অসমর্থ, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইওরোপের রাজনীতিক প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, আর এখন ইওরোপ অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছে—কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। ঐহিক ব্যাপারে অত্যাচার প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে; তাহারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ

লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে। ধর্ম ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই তাহাদের পদতলে। তাহারাই সর্বেসর্বা শাসনকর্তা। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় 'শাইলক'-এর শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেণ্ট-মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য দেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে; প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতদের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। ধনী ও পুরোহিত পরস্পরকে শাসনে রাখিবে।

মনে করিবেন না, ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে। নিরপেক্ষ ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সমান করিয়াছেন। অতি অধম অসুরপ্রকৃতি মানুষেরও এমন কিছু গুণ আছে, যাহা একজন বড় সাধুর নাই। নগণ্য কীটেরও এমন কিছু গুণ থাকিতে পারে, যাহা হয়তো মহাপুরুষের নাই।

অতি দরিদ্র শ্রমজীবী, যাহার জীবনে ভোগ করিবার কিছু নাই, যাহার তোমার মত বুদ্ধি নাই, যে বেদান্তদর্শনাদি বুঝিতে পারে না—মনে করিতেছ, তাহার শরীর কিন্তু তোমার মত কষ্টে অত কাতর হয় না। দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হইলে সে তোমা অপেক্ষা শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাহার প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়গত; সেখানেই তাহার সুখভোগ। সুতরাং তাহার জীবনে যেমন একপ্রকার সুখের অভাব, অপর দিকে তেমনি অন্যপ্রকার সুখের আধিক্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে—তাহার জীবনেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুতরাং ভগবান্ সকলকেই নিরপেক্ষভাবে ইন্দ্রিয়জ, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুখ দিয়াছেন। অতএব মনে করিও না, আমরাই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা।

আমরা—ভারতবাসীরা অপরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি বটে, অপরের নিকট আমরা অনেক বিষয় শিক্ষাও করিতে পারি। আমরা পৃথিবীকে যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, পৃথিবী তাহার জন্য এখন অপেক্ষা করিতেছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারি-বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। আপনারা দেখিবেন, যে-সকল দেশ হইতে পশুবলে জগৎশাসন করিবার নীতির উদ্ভব, সেই-সকল স্থানেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই-সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড়শক্তির লীলাভূমি ইওরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্মই ইওরোপকে রক্ষা করিবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন একটি সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা দ্বারা সমগ্র জগতের ভাবস্রোত পরিবর্তিত হইতে পারে। সেই সাধারণ ভিত্তি—জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্বত্র হিন্দু জৈন বৌদ্ধ—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, আত্মা সর্বশক্তির আধার। আর তোমরা বেশ জান, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। এগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতার আবরণে আবৃত রহিয়াছে। প্রকৃত 'তুমি' কিন্তু অনাদিকাল হইতেই পূর্ণ অচল অটল সুমেরুবৎ। আত্মসংযমের জন্য বাহিরের সাহায্য কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পূর্ব হইতেই তুমি আত্মসংযত, শুধু জানা এবং না-জানাতেই অবস্থার তারতম্য, এইজন্য শাস্ত্রে অবিদ্যাকেই সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ ও মানুষে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?—কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্বোচ্চ মানুষ এবং তোমার পদতলে অতি কষ্টে বিচরণকারী ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে?—অজ্ঞানই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ অতি কষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ব্রহ্ম রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে, কারণ ইহা আর কোথাও নাই। ইহা আধ্যাত্মিকতা—ইহাই আত্মবিজ্ঞান।

কিসের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে?—শক্তির জোরে। এই বলবীর্যই ধার্মিকতা, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞান- রাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে তাহা—'অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসে। এখন প্রশ্ন—এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে? আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার তুমি উত্তরাধিকারী—তুমি সেই ঈশ্বরের অংশ। শুধু তহাই নহে, অদ্বৈত- মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম—তুমি স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি; আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়—আমরা কেবল এই দ্বন্দ্ব করিতেছি।

'আত্মায় সকল শক্তি নিহিত'—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দিবে। এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর একভাবে প্রতিভাত হইবে এবং পূর্বে তুমি নরনারী ও প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন তাহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না; তখন আর মনে হইবে না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেই এই পৃথিবীতে নরনারীর জন্ম—এখানে বলবান্ জয়লাভ করিবে ও দুর্বল মরিবে।তখন বোধ হইবে, এই পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান্ শিশুর মত এখানে খেলিতেছেন, আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কাজের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস মনে হউক —ইহা খেলামাত্র! আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার মনে করিতেছি। আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে অতি দুর্বল অধঃপতিত হতভাগ্য পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছেন—নিরাশ হইও না; তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখনও পরিবর্তন হয় না; তুমি কখনও তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে পার না, প্রকৃতি কখনও প্রকৃতির বিনাশসাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ

অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু পরিণামে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কারণেই অদ্বৈতবাদ সকলের নিকট আশার বাণীই বহন করিয়া আনে, নৈরাশ্যের নয়। বেদান্ত কখনও ভয়ে ধর্ম আচরণ করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে, শয়তান সর্বদা তোমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে; যদি তোমার একবার পদস্খলন হয়, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে!

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই; বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে—তোমার কর্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, অপর কেহ তোমার হইয়া এই শরীর গঠন করে নাই। সেই সর্বব্যাপী ভগবান্ তোমার অজ্ঞানবশতঃ অব্যক্ত রহিয়াছেন; আর তুমি যে-সব সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ, এগুলির জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি এই ভয়াবহ জগতে আনীত হইয়াছ। তোমাকে জানিতে হইবে—তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি নিজেই আহার করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া আহার করে না। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করিয়া লও—অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে না; তুমিই ঐ খাদ্য হইতে রক্ত-মাংসের দেহ প্রস্তুত করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলের এক অংশের গঠনপ্রণালী জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটিকেই জানিতে পারা যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, বর্তমানে তুমি নিজ শরীর গঠন করিতেছ, তবে ইহাও সত্য যে, অতীতেও তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, ভবিষ্যতেও করিবে। আর ভাল-মন্দ সব-কিছুরই দায়িত্ব তোমার। ইহা বড়ই আশার কথা যে, আমি যাহা করিয়াছি, আমিই তাহা নষ্ট করিতে পারি।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কর্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধর্ম ভগবৎকৃপা অস্বীকার করেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শুভাশুভরূপ এই ঘোর সংসার- প্রবাহের পরপারে ভগবান্ রহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য নিত্যকৃপাময়, সর্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার-সাগরের পারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কৃপার সীমা নাই; আর রামানুজ বলেন, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটেই এই কৃপা আবির্ভূত হয়।

আত্মবিজ্ঞান-প্রদত্ত সমাজ-জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিই ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীতে নূতন সমাজের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম— অদ্বৈতবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইতে পাশ্চাত্যদেশ এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে। কারণ এই জড়বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ—এই-সকলের বড় একটা মূল্য নাই। তবে যদি কেহ খুব অমার্জিত অনুন্নত ধর্মপ্রণালীতেও বিশ্বাস করে, আমাদের ধর্মে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, যাহাতে পৃথিবীর সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে, যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চায়, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্যই করিবে। বলিতে কি, সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে-সকল উচ্চ উচ্চ ভাব ও তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাইবে না। আবার যদি কেহ খুব যুক্তিবাদী হইতে চায়, নিজের তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চায়, তবে আমরা তাহাকেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ-রূপ প্রবল যুক্তিসহ মতবাদ শিক্ষা দিতে পারি।

মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

আপনারা আমাকে যে—আন্তরিকতা অভিনন্দন জানাইয়াছেন, সে জন্য আপনাদের নিকট যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়াছি, তাহা ভষায় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। দুঃখের বিষয়, প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নয় যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুটি আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছে বটে, তথাপি আমার একটা স্থূল-শরীর আছে—হইতে পারে শরীরধারণ বিড়ম্বনা, কিন্তু উপায় নাই। আর স্থূল-শরীর জড়ের নিয়মানুসারেই চালিত হইয়া থাকে, তাহার ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যদেশে আমার দ্বারা যে সামান্য কাজ হইয়াছে, সেজন্য ভারতের প্রায় সর্বত্র লোকে যেরূপ অপূর্ব আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিবার জিনিষ মত। তবে আমি ঐ আনন্দ ও সহানুভুতি কেবল এইভাবে গ্রহণ করিতেছিঃ ভবিষ্যতে যে-সব মহাপুরুষ আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে ঐগুলি প্রয়োগ করিতে চাই। আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে সামান্য কার্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এত অধিক প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে-সব বড় বড় দিগ্বিজয়ী ধর্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত অধিক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন।

ভারত ধর্মভূমি। হিন্দু ধর্ম বুঝে—কেবল ধর্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ধর্মই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, ইহা সত্য। সকলেরই দোকানদার বা স্কুলমাস্টার বা যোদ্ধা হইবার কোন প্রয়োজন নাই; এই সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে।

সম্ভবতঃ আমরা বিভিন্ন জাতির এই ঐক্যতানে আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত। আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের যাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে- কোন জাতি গৌরব অনুভব করিতে পারে—তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে মহান্ তত্ত্বরাশি পাইয়াছি, সেগুলি যে আমরা এখনও হারাই নাই, ইহা দেখিয়াই আমার আনন্দ হইতেছে। ইহাতে আমাদের জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা—শুধু আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। আমার প্রতি কৃত যত্নের জন্যই আমার আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতির হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহাতেই আমার পরমানন্দ। এখনও এই জাতির হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে; কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে কর্মকুশল দেখিতে চায়, কিন্তু ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা নাই বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মনের মত কর্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে; আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সক্রিয় দেখিতে চাই, আমরাও সেইরূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক, আমরা তাহাদেরই মত কর্মশীল; দেখিয়া যাক, জাতি কিভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে, পূর্বের মতই প্রাণবন্ত রহিয়াছে। আমরা যে অধঃপতিত হইয়াছি—এই ধারণাই দূর করিয়া দাও।

আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি যে অক্ষুণ্ণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি আমাকে এখন গোটাকতক রূঢ় কথা বলিতে হইবে। আশা করি, আপনারা সেগুলি ভালভাবেই গ্রহণ করিবেন। এইমাত্র আপনারা অভিযোগ করিলেন যে, ইওরোপীয় জড়বাদ আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে। আমি বলি, দোষ শুধু ইওরোপীয়দের নয়, দোষ প্রধানতঃ আমাদের। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন আমাদিগকে সর্বদাই সকল বিষয় ভিতরের দিক হইতে—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয়ই জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।

ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, 'যখন অফুরন্ত নির্ঝর নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণই বা তৃষ্ণায় মরিবে কেন?' প্রশ্ন এইঃ ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না? আমি ইংলণ্ডেও এক সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্বে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, 'কেবল এই উপায়েই আমি লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।' আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুকে হাত রাখিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করুক দেখি—আমরা কি করিয়াছি; আর নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া উহার আলোকবিস্তারে কতটা সহায়তা করিযাছি? আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম। এজন্য অপর কাহাকেও দোষ দিও না, দোষ দাও নিজেদের কর্মকে। যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ—কিছুই কি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? পাপ, দূষিত খাদ্য ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা দেহ পূর্ব হইতেই যদি দুর্বল না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু মনুষ্যদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে। আমরা তো তাহাদিগকে পূর্বে সাহায্য করি নাই,

সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপ করিবার পূর্বে প্রথমে নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত; এখনও প্রতিকারের সময় আছে।

প্রথমেই—ঐ যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ! বড় বড় কর্তা-ব্যক্তিরা শত শত বৎসর ধরিয়া এই মহাবিচারে ব্যস্ত যে—এক ঘটি জল ডান-হাতে কি বাঁ-হাতে খাইব, হাত তিনবার ধুইব না চারবার; কুলকুচা করিব পাঁচবার কি ছয়বার! যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় দর্শন লিখিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করা যায়? আমাদের ধর্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে—এইরূপ এক আশঙ্কা রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই, আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—'আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র!' যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা-গারদে যাইতে হইবে!

মন যখন জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন ইহা মস্তিষ্কের দুর্বলতার নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিক তত্ত্বের গবেষণা করিতে মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়; নিজের সমুদয় তেজ, কার্যকরী শক্তি ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে; আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যেই তাহার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহার বাহিরে সে আর যাইতে পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্যের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও যে- ধনভাণ্ডার আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র পৃথিবী যেন এই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইবে। অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। ব্যাস বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম—তাহার মধ্যে আবার ধর্মদান শ্রেষ্ঠ; বিদ্যাদান তাহার নিম্নে; তারপর প্রাণদান; সর্বনিম্নে অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি; আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। এখানে ভিক্ষুকের নিকটও যতক্ষণ পর্যন্ত একখানা রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্ধেক দান করিবে। এইরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যথেষ্ট অন্নদান করিয়াছি, এক্ষণে আমাদিগকে অপর দুইপ্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম ও বিদ্যা-দান। যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরি না করিয়া কাজে লাগিয়া যাই, তবে আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধমতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।

এখন আমার যেটুকু বলিবার ছিল, বলিলাম। আমার সঙ্কল্পিত কার্যপ্রণালী বলিয়া বেড়াইতে আমি ভালবাসি না। কি করিতে ইচ্ছা করি বা না করি, মুখে না বলিয়া কাজে দেখানই পছন্দ করি। অবশ্য আমি একটা নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী স্থির করিয়াছি; যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে। জানি না, আমি কৃতকার্য হইব কিনা; তবে একটা মহান্ আদর্শ লইয়া তাহাতেই মনপ্রাণ নিয়োগ করা—ইহাই জীবনের এক মহান্ আদর্শ। তাহা না হইলে হীন পশুজীবন যাপন করিয়া লাভ কি? এক মহান্ আদর্শের অনুগামী হওয়াই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। ভারতে এই মহৎকার্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে ভারতের বর্তমান পুনরুজ্জীবনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি বর্তমান শুভমুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ না করি, তবে মহামূর্খের মত কাজ করিব।

মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

মনমাদুরা হইতে মাদুরায় আসিয়া স্বামীজী রামনাদের রাজার সুন্দর বাঙ্গলায় অবস্থান করেন। অপরাহ্নে, মখমলের খাপে পুরিয়া স্ব অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়—উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ

আমার খুব ইচ্ছা যে, কয়েকদিন তোমাদের নিকট থাকিয়া সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশমত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় অভিজ্ঞতা ও বিগত চারবৎসরব্যাপী প্রচারকার্যের বিবরণ দিই। দুঃখের বিষয়, সন্ন্যাসিগণকেও দেহভার বহন করিতে হয়। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিয়া এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আর সন্ধ্যাকালে দীর্ঘ বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হাইবে; আর অন্যান্য বিষয় ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে এবং আর একটু অবকাশ পাইলে আমাদের অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। আজ এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। একটি কথা বিশেষভাবে আমার মনে উদিত হইতেছে। আমি এখন মাদুরায় তোমাদের স্বদেশবাসী স্বনামখ্যাত উদারচেতা রামনাদরাজের অতিথি। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান না, উক্ত রাজাই আমার মাথায় চিকাগো-সভায় যাইবার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বরাবরই সর্বান্তঃকরণে ও সর্বশক্তি-দ্বারা আমার কার্য সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং অভিনন্দন-পত্রে আমাকে যে-সকল প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যবাসী এই মহাপুরুষের প্রাপ্য। কেবল আমার মনে হয়, তিনি রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলে আরও ভাল হইত; কারণ তিনি সন্ন্যাসেরই উপযুক্ত।

যখনই পৃথিবীর অংশবিশেষে কোন কিছুর আবশ্যক হয়, তখনই তাহা এক অংশ হইতে অপরাংশে গিয়া সেখানে নূতন জীবন প্রদান করে। কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক—উভয় ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। যদি জগতের কোন অংশে ধর্মের অভাব হয় এবং অপর কোথাও সেই ধর্ম থাকে, তবে আমরা জ্ঞাতসারে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্মের অভাব সেখানে ধর্মস্রোত আপনা-আপনি প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই—একবার নয়, দুইবার নয়, বার বার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে পৃথিবীকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই—যখনই কোন জাতির দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যে প্রাধান্য উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক জাতি অপর জাতিকে রাজনীতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহার যাহা আছে, তাহাই দিয়াছে। ভারত সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্বেই ভারত পৃথিবীকে আপন আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করিয়াছে। পারস্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা ঘটে। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে তৃতীয়বার। আবার ইংরেজের প্রাধান্যকালে এই চতুর্থবার সে বিধাতৃ-নির্দিষ্ট ব্রতপালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না-করি, পাশ্চাত্যদিগের সংঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও বাহ্যসভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমরাও পাশ্চাত্য জড়বাদপ্রধান সভ্যতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্যসভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতা আবশ্যক। তাহা হইলে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে; আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব-কিছু শিখিতে হইবে বা পাশ্চাত্যকে আমাদের নিকট সব-কিছু শিখিতে হইবে, তাহা নহে। সমগ্র পৃথিবী যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-অবস্থা কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহা রূপায়িত হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ততটুকু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে দেওয়া উচিত। এই আদর্শ-জগতের আবির্ভাব কখনও হইবে কিনা, তাহা জানি না; এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখনও আসিবে কিনা, এই সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে; কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখনও আসুক বা না আসুক, এই অবস্থা আনিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে, আর কেবল আমার কাজের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অপর সকলে নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া বসিয়া আছে—কেবল একমাত্র আমারই কাজ করার বাকী আছে; আমি যদি নিজের কাজ সম্পন্ন করি; তবেই সমাজ ও সংসারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। আমাদের নিজেদের এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে—ভারতে ধর্মের এক প্রবল পুনরুত্থান হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কারণ ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গোঁড়ামিও আসিয়া থাকে। কখনও কখনও লোকে এত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, অনেক সময় যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুনরভ্যুত্থান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাও উহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। অতএব পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ—ইওরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তিতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুই-ভাব হইতেই সাবধান থাকিতে হইবে প্রথমতঃ আমরা কখনও পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর তোমরা পাশ্চাত্য জাতির হুবহু অনুকরণ করিতে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্তে সমর্থ হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে—তোমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব আর থাকিবে না; ইহা অসম্ভব। কালের প্রারম্ভ হইতে মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; তুমি কি উহাকে উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইওরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা অসম্ভব বোধ হয়, তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা-সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচারমাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য এবং পরস্পরবিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মানিব, আর কোন্‌টি মানিব না? উদাহরণস্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এক টুকরা মাংস খাইতে দেখিলে ভয়ে দুই শত হাত পিছাইয়া যাইবে; আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত, পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগবলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধ; কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহাদের নিজ নিজ পল্লীতে প্রচলিত আচারকে ধর্মের সার বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহাদের মহাভুল।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মুশকিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যস্বরূপ-বিষয়ক—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ক; আর একপ্রকার সত্য কোন বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে; দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ! আর যদি কোন পুরাণ বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন—ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার ঐ যুগের জন্যই অন্যপ্রকার আচার সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতি আবার সত্য-ত্রেতা প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচার সমর্থন করিয়াছেন। এখন দেখ, তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ আছে, ততদিন ঐগুলির পরিবর্তন হইবে না—অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্ব অবস্থায় ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপর দিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে সেগুলির পরিবর্তন হয়। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথা বদলাইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল, মনে করিও না। মনে রাখিও, চিরকালই এই-সকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদপাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করানোর প্রথা ছিল। ক্রমশঃ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী, সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি হত্যা করিলে সমগ্র জাতি বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই গোহত্যা-প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীনশাস্ত্র-পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়তো এমন সব আচার প্রচলিত ছিল, যেগুলিকে এখন আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্তে অন্য সব বিধি প্রবর্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলি আবার পরিবর্তিত হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু কোন স্মৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ পাইবে, আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন; সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না—তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।

এইরূপে আমাদিগকে এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উদার ভাব—হৃদয়ের প্রসারতা আসিবে, অপর দিকে তেমন দৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে; তাহা হইলে তোমরা আমার কথার মর্ম বুঝিবে—বুঝিবে আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া লওয়া, কাহাকেও বর্জন করা নয়। আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু ও তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নত হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমান কালের সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে; আর হিন্দুই কেবল প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রথাগুলিকে সম্মান করিতে জানে। সহজ কথা বলি—সর্ব ব্যাপারেই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ বিষয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য তত্ত্বগুলি সর্বকালের জন্য, আর গৌণ বিষয়গুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি যথাসময়ে সেইগুলির পরিবর্তে অন্য প্রথা প্রবর্তিত না হয়, তবে সেগুলির দ্বারা নিশ্চয় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচারপদ্ধতিসমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে, অতিশয় কুৎসিত আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না; এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে প্রত্যক্ষভাবে জীবনপ্রদ ছিল। এখন যদি সেইগুলি উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময়ও সেইগুলির নিন্দা করিও না; বরং ঐগুলির দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে, সেজন্য ঐগুলির প্রশংসা কর—ঐগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আর আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি কাহারা? তিনিই ঋষি, যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগবিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নহে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোন দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন—'সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে'; আর আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাকে আমাকে—আমাদের সকলকেই ঋষি হইতে হইবে, অগাধ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে; আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করিব। কারণ সব শক্তি আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। আমাদিগকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে—উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে; তখনই ঋষিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষত্ব লাভ করিব। তখনই আমাদের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হইবে; তখনই আমাদের সম্মুখ হইতে যাহা কিছু মন্দ, তাহা আপনিই পলায়ন করিবে, আর কাহাকেও নিন্দা বা অভিসম্পাত করিতে হইবে না, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে না। এখানে আজ যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের

প্রত্যেককেই নিজের ও অপরের মুক্তির জন্য ঋষিত্ব লাভ করিতে শ্রীভগবান্ সাহায্য করুন।

কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা

মাদুরা হইতে ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর হইয়া স্বামীজী কুম্ভকোণম্ আসেন। সেখানে অভিনন্দনের উত্তরে বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি এক সু করেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

গীতাকার বলিয়াছেনঃ 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—অল্পমাত্রও এই ধর্ম পালন করিলে অতি মহৎ ফল লাভ হয়। যদি এই বাক্য সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্যক হয়, তবে আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি।

হে কুম্ভকোণম্ নিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অতি সামান্য কাজ করিয়াছি; কিন্তু কলম্বোয় নামিয়া অবধি এ পর্যন্ত যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই যেরূপ আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, তাহা আমার স্বপ্নের অতীত। সেই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, ইহা হিন্দুজাতির পূর্বাপর সংস্কার ও ভাবের উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ ধর্মই হিন্দুজাতির প্রকৃত জীবনীশক্তি, ধর্মই তাহার মূলমন্ত্র।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখিলাম—সকল জাতিরই এক-একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি; কাহারও-বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও-বা মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও-বা অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, মান্দ্রাজবাসীরা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আমেরিকায় যে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্যদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ ধর্মবিষয়ে বেশী শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি, ঐ বিষয়ে এখন আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে পৃথিবীর সংবাদ জানিবার এবং ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহের অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত। এখন আমি উহার রহস্য বুঝিয়াছি। আমাদের দেশের লোকও সংবাদ-সংগ্রহে খুব উৎসুক, তবে অবশ্য যে-বিষয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ, সেই বিষয়ের সংবাদেই তাহার আগ্রহ; এ বিষয়ে বরং অন্যান্য যে-সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্যটন করিয়াছি, সেখানকার সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের আগ্রহ আরও বেশী। আমাদের কৃষকগণকে ইওরোপের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরিবর্তনগুলির সংবাদ জিজ্ঞাসা কর, ইওরোপীয় সমাজে যে-সব গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে, সেগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সে-সব কিছুই জানে না, জানিতেও চাহেও না। কিন্তু সিংহলেও—যে সিংহল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন, ভারতের স্বার্থের সহিত যাহার বিশেষ সংস্রব নাই—দেখিলাম—সেখানকার কৃষকেরাও জানিয়াছে, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, আর তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিল, এবং কিছুটা পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—যে-বিষয়ে তাহাদের মনের আগ্রহ, সেই বিষয়ে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলির মতই সংবাদ-সংগ্রহে উৎসুক। আর ধর্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—আগ্রহের বস্তু।

জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত, না রাজনীতি—এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাই না; তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখনও ইহা পরিবর্তন করিতে পার না, একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিষ বসাইতে পার না। একটি বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অন্য স্থানে পুঁতিয়া দিলে উহা যে সেখানে জীবিত থাকিবে, তাহা কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান্ আদর্শে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—ধর্মের এই-সকল আদর্শের মধ্যেই আমরা পরিবর্ধিত হইয়াছি; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহস্র বৎসর যাবৎ যে-মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া, মহাশক্তি প্রয়োগ না করিয়া তোমরা কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কাজ করিতে পার; ধর্মই ভারতের পক্ষে সেই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথ অনুসরণ করাই ভারতীয় জীবনধারা, ভারতের উন্নতি ও কল্যাণের একমাত্র উপায়।

অন্যান্য দেশে পাঁচ রকম প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে ধর্ম একটি। একটি উদাহরণ দিই। আমি সচরাচর এই দৃষ্টান্তটি দিয়া থাকি—অমুক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে নানা জিনিষ আছে; এখানকার ফ্যাশন—একটি জাপানী পাত্র (Vase) ঘরে রাখা, না রাখিলে ভাল দেখায় না, সুতরাং তাঁহাকে একটা জাপানী পাত্র রাখিতেই হইবে। এইরূপ আমাদের কর্তার বা গিন্নীর অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধর্মও চাই—তবেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইল। এই কারণেই তাঁহাদের একটু-আধটু 'ধর্ম' করা চাই। জগতের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, এক কথায় সংসার। তাহাদের নিকট ঈশ্বর ও ধর্মের প্রয়োজন সংসারেরই একটু সুখবিধানের জন্য—তাহাদের নিকট ঈশ্বরের প্রয়োজন শুধু এইটুকু। তোমরা কি শোন নাই, গত দুই শত

বৎসর যাবৎ কতকগুলি অজ্ঞ অথচ পাণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখে ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে একমাত্র এই অভিযোগ শোনা যাইতেছে যে, এই ধর্ম দ্বারা সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-লাভের সুবিধা হয় না, 'কাঞ্চন' লাভ হয় না, উহা সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না, বলবান্‌কে গরীবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্তপান করিতে সাহায্য করে না! সত্যই, আমাদের ধর্ম এরূপ করে না। ইহাতে অন্যান্য জাতির সর্বস্ব লুণ্ঠন ও সর্বনাশ করিবার জন্য পদভরে ভূকম্পকারী সৈন্যপ্রেরণের ব্যবস্থা নাই। অতএব তাঁহারা বলেন—এ ধর্মে আছে কি? উহা চলতি কলে শস্য যোগাইয়া কাজ আদায় করিতে জানে না, অথবা উহা দ্বারা পেশীর শক্তি বর্ধিত হয় না। তবে এ ধর্মে আছে কি? তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না যে, ঐ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আমাদের ধর্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, কারণ আমাদের ধর্ম এই দু-তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে না। এই স্বল্প- বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধর্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম এই জগতের সীমার বাহিরে—দূরে, অতি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; সেই রাজ্য অতীন্দ্রিয়—সেখানে দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, অতি দূরে—সেখানে আর সংসারের সুখ-দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, সমগ্র জগৎই সেই মহিমময় ভূমা আত্মা-রূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, কারণ ইহা 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই উপদেশ দিয়া থাকে; আমাদের ধর্ম বলে—'কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য'; তোমরা যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন, সবই ক্ষণিক, এমন কি, জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র; এই জন্যই আমাদের ধর্ম সত্য। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম—কারণ সর্বোপরি ইহা ত্যাগ শিক্ষা দেয়। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সত্যধর্ম আমাদের মহাজ্ঞানী প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের তুলনায় যাহারা সেদিনের শিশুমাত্র, সেই-সকল জাতির নিকট সুদৃঢ় অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিতে থাকেঃ বালক! তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম। এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্মলাভের উপায়। ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, মুক্তির সোপান—ভোগ আমাদের লক্ষ্য নহে। এই জন্য আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। বিস্ময়ের বিষয়, এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত পরাক্রমের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে! কালসমুদ্রে তাহারা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও সৃষ্টি করিতে পারে নাই—নিজেদের কিছু চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল কাক-ভূশণ্ডীর মত বাঁচিয়া আছি—আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না।

আজকাল লোকে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest)-রূপ নূতন মতবাদ লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে—যাহার গায়ের জোর যত বেশী, সেই তত অধিক দিন জীবিত থাকিবে। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে-সকল জাতি কেবল অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটাইয়াছে, তাহারাই মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাকিত এবং এই দুর্বল হিন্দুজাতি, যাহারা কখনও অপর একটি জাতিকে জয় করে নাই, তাহারা এতদিনে বিনষ্ট হইয়া যাইত। জনৈকা ইংরেজ মহিলা আমাকে এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা কোন একটা জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই! পরন্তু এই জাতি এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী লইয়া সদর্পে জীবিত রহিয়াছে! আর ইহা সত্য নহে যে, উহার সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; ইহাও সত্য নহে যে, এই জাতির শরীর পুষ্টির অভাবে ক্ষয় পাইতেছে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যখনই উপযুক্ত সময় আসে, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহাবন্যার মত পৃথিবীকে প্লাবিত করে।

আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র পৃথিবীকে এক মহাসমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে চেষ্টা করিতেছে—কিরূপে তাহারা জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে; আমরা কিন্তু এখানে আর এক সমস্যার মীমাংসায় নিযুক্ত—কত অল্প জিনিষ লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্তমান লক্ষণসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, তবে বলা যায়, যাহারা স্বল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই পরিণামে জয়ী হইবে; আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।

মনুষ্যজীবনে, এমন কি জাতীয় জীবনেও সময়ে সময়ে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হয়। বোধ হয় সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসার-বিরক্তির ভাব আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের বড় বড় মনীষিগণ ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য-সম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—সবই বৃথা। সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রধান সভ্যতার এই প্রতিযোগিতায়, এই সংঘর্ষে, এই পাশব ভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা আশা করিতেছেন—এই অবস্থা পরিবর্তিত হইবে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা আসিতেছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের এখনও দৃঢ় ধারণা—রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই ইওরোপের সমুদয় অশুভ-প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কিন্তু ঐ দেশে বড় বড় মনীষীদের মধ্যে অন্য এক আদর্শ বিকাশ লাভ করিতেছে; তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনীতিক বা সামাজিক পরিবর্তন যতই হউক না কেন, মনুষ্যজীবনের দুঃখ-কষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করিতে পারিলেই সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে। যতই শক্তিপ্রয়োগ শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন ও আইনের কড়াকড়ি কর না কেন, তাহাতে কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তিত হয় না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে। এই কারণেই পাশ্চাত্য জাতিগুলি কিছু নূতন ভাব—কোন নূতন দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা যে-ধর্ম মানেন, সেই খ্রীষ্টধর্ম অনেক বিষয়ে মহৎ ও সুন্দর হইলেও উহার মর্ম তাঁহারা ভাল করিয়া বোঝেন নাই। আর এতদিন তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মকে যেভাবে বুঝিয়া আসিতেছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নিকট পর্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের প্রাচীন দর্শনসমূহে, বিশেষতঃ বেদান্তেই—এতদিন তাঁহারা যাহা খুঁজিতেছেন—সেই চিন্তাপ্রবাহ, সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যপানীয়ের সন্ধান পাইতেছেন। আর ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

জগতের যতপ্রকার ধর্ম আছে, সেগুলির প্রত্যেকটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেই সেই ধর্মাবলম্বিগণ নানাবিধ অপূর্ব যুক্তিজাল

বিস্তার করিয়া থাকেন। সে-সব শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্প দিনের কথা, আমার বিশেস বন্ধু ব্যারোজ সাহেব—‘খ্রীষ্টধর্মই যে একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম’ ইহা প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, আপনারা তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। এখন বাস্তবিক সার্বভৌম ধর্ম কোন্‌টি হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

আমার ধারণা, বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্মই নয়। আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরম্পরা উপস্থাপিত করিব। আমাদের ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধর্মই তাহাদের নিজ নিজ প্রবর্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই-সকল ধর্মের মত, শিক্ষা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেইগুলি সত্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মপ্রবর্তকদের ঐতিহাসিকতার উপরই যেন সেই-সকল ধর্মের সব-কিছুর ভিত্তি স্থাপিত। যদি তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিকতায় কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, যদি তাঁহাদের তথাকথিত ঐতিহাসিকতার ভিত্তি একবার ভাঙিয়া দেওয়া যায়, তবে সমুদয় ধর্ম-প্রাসাদটিই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে—পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বাস্তবিক বর্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্মপ্রবর্তকের জীবন সম্বন্ধে তাহাই ঘটিতেছে। আমরা জানি, তাঁহাদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা লোকে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে না, আর বাকী অর্ধেকও সন্দেহ করে। আমাদের ধর্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল বড় বড় ধর্মই এইরূপ ঐতিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের ধর্ম কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন পুরুষ বা নারী নিজেকে বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্তা মাত্র। স্থানে স্থানে এই ঋষিগণের নামের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি নামমাত্র। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাও আমরা জানি না। অনেক স্থলে তাঁহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহাও জানা যায় না; আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল আমাদের অজ্ঞাত। বাস্তবিক এই ঋষিগণ নামের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; তাঁহারা সনাতন তত্ত্বসমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই-সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আবার যেমন আমাদের ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের ধর্মও কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও অসংখ্য মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্মে যত অবতার, মহাপুরুষ, ঋষি আছেন, আর কোন্ ধর্মে এত আছেন? শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম বলে—বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক অবতার-মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইবে। ভাগবতে আছে—‘অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ’। সুতরাং এই ধর্মে নূতন নূতন ধর্মপ্রবর্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। এই হেতু ভারতের ধর্মেতিহাসে যে-সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক নন, তাহা হইলেও আমাদের ধর্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না; উহা পূর্বের মতই দৃঢ় থাকিবে; কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়—সনাতন সত্যসমূহের উপরই ইহা স্থাপিত। পৃথিবীর সকল লোককে জোর করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইবার চেষ্টা করা বৃথা; এমন কি সনাতন ও সার্বভৌম তত্ত্বসমূহ দ্বারাও অনেককে একমতাবলম্বী করা কঠিন। তবে যদি কখনও পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে ধর্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করা সম্ভব হয়, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে সকলে মানুক—এরূপ চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না, বরং সনাতন তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়া অনেকের একমতাবলম্বী হওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের কথার প্রামাণ্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকে—এ বিষয়ে আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

‘ইষ্টনিষ্ঠা’রূপ যে অপূর্ব মত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই অসংখ্য অবতারের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে সকলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যে- কোন অবতারকে তোমার জীবনের আদর্শরূপে ও বিশেষ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পার; এমন কি তাঁহাকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠও মনে করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু সনাতন তত্ত্বসমূহই যেন তোমার ধর্মসাধনের মূলভিত্তি হয়। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য হইবে—যে-কোন অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের মান্য। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

পৃথিবীর সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ এই যে, বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ, জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল বেদান্তের উপদেশের সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। অতি প্রাচীনকালে আকৃতি, বংশ ও ভাবের দিক হইতে সমতুল্য দুইটি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি প্রচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথা বলিতেছি। শেষোক্ত জাতি বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং প্রথমোক্ত জাতি অগ্রসর হইয়াছিল অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া। ইতিহাসে তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্থান-পতনের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই দুই ভিন্ন প্রকার চিন্তাপ্রণালী সেই সুদূর চরমলক্ষ্যের একই প্রকার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল বেদান্তীই—যাহারা নিজেদের ‘হিন্দু’ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে—তাহাদের ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিতে পারে; ইহাতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান জড়বাদ নিজের সিদ্ধান্তগুলি পরিত্যাগ না করিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের নিকট এবং যাঁহারা এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নিকট ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্বেই সেই-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল; কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়ের ভাষায় জড় বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে মাত্র।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদান্ত-আলোচনার দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা। আমাকে পাশ্চাত্যদেশের

অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার সহিত ইঁহাদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। এদিকে তাঁহার খাইবার বা গবেষণাগার হইতে বাহিরে যাইবার অবকাশ নাই, অথচ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত, বর্তমান যুগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাগুলি বেদান্ত এত সুন্দরভাবে পূরণ করিয়া থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, সেগুলির সহিত বেদান্তের এত সামঞ্জস্য যে, আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না।

ধর্মগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; সেই দুটির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথম তত্ত্বটি এইঃ সকল ধর্মই সত্য। আর দ্বিতীয়টিঃ জগতের সকল বস্তু আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও সবই এক বস্তুর বিকাশমাত্র। বেবিলনীয় ও য়াহুদীদের ধর্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই—বেবিলনীয় ও য়াহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম ছিল। বেবিলনীয় দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল 'বল'। তাহাদের মধ্যে 'বল মেরোদক' প্রধান। কালে এই একটি শাখা সেই জাতির অন্তর্গত অন্যান্য শাখাগুলিকে জয় করিয়া নিজের সহিত মিশাইয়া লয়। ইহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজেতা জাতির দেবতা অন্যান্য শাখাজাতির দেবতাগুলির উপরে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেমাইট জাতি যে তথাকথিত 'একেশ্বরবাদ' লইয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। য়াহুদী জাতির দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল 'মোলক'। ইঁহাদের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল 'মোলক-য়াভা'। এই ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য কতকগুলি জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্যান্য মোলকগণের অপেক্ষা বড় ও প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপ ধর্মযুদ্ধে যে-পরিণাম রক্তপাত ও পাশবিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। পরবর্তী কালে বেবিলনীয়েরা মোলক-য়াভার এই প্রাধান্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই।

আমার বোধ হয়, ধর্মবিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ জাতির প্রাধান্যলাভের চেষ্টা ভারতের সীমান্ত-প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও সম্ভবতঃ আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধানে ভারতীয় ইতিহাস য়াহুদীদের ইতিহাসের মত হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতকে পরধর্মে বিদ্বেষশূন্য ও ধর্মসাধনায় গরিষ্ঠ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে ঐ-সকল বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সেই প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত যুগে—কিংবদন্তীও যে-যুগের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়; জগতে এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রচার করেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—পরম সত্যবস্তু এক, ঋষিগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এইরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এইরূপ মহান্ সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রভাবিত করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনের সহিত যেন সর্বাংশে একীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটিকে সর্বতোভাবে ভালবাসি, তাই আমাদের দেশ—পরধর্মে দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিমময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানে—কেবল এইখানেই লোকে তাহাদের ধর্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর জন্যও মন্দির-গির্জাদি নির্মাণ করিয়া দেয়। পৃথিবীর লোককে আমাদের নিকট এই পরধর্মে সহিষ্ণুতা-রূপ মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্ম-বিদ্বেষ রহিয়াছে, তাহা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্ম-বিদ্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, অনেক সময় মনে হইয়াছে, আমাকে হয়তো বিদেশে হাড়-কখানা রাখিয়া যাইতে হইবে। ধর্মের জন্য একজনকে মারিয়া ফেলা এত তুচ্ছ কথা যে, আজ না হউক, কালই এই মহাদৃপ্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে কেহ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিলে তাহাকে সমাজচ্যুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যত প্রকার গুরুতর নির্যাতন সবই সহ্য করিতে হয়। আপনারাও যদি আমার মত পাশ্চাত্যদেশে গিয়া কিছুদিন বাস করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে, এখানে পাশ্চাত্যের লোকেরা খুব সহজে স্বচ্ছন্দে আমাদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু সেখানকার বড় বড় অধ্যাপকেরা পর্যন্ত—যাঁহাদের কথা আপনারা এখানে খুব শুনিতে পান, তাঁহারাও অত্যন্ত ভীরু; এবং ধর্মসম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করেন না।

এই কারণেই পৃথিবীকে এই পরধর্মসহিষ্ণুতারূপ মহান্ সত্য শিক্ষা করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে বিশেষ কল্যাণ হইবে। বাস্তবিকই এই ভাবে ভাবিত না হইলে কোন সভ্যতাই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার—যতদিন না এগুলি বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হইতে পারে না; যতদিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না; আর এই মৈত্রীভাব-বিকাশের প্রথম সোপান—পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না—পরস্পরের ধর্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক্ হউক না কেন, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা ভারতে ঠিক তাহাই করিয়া থাকি, এইমাত্র আপনাদিগকে আমি সে-কথা বলিয়াছি। এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুর হউক ও অত্যাচার করুক—তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতে বিরত হইব না, যতদিন

পর্যন্ত না প্রেমবলে উহাদিগকে জয় করিতে পারি; যতদিন পর্যন্ত না আমরা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখনও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না—ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে, কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখনও জয়লাভ করিতে পারে না, শান্ত স্বভাবই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়, সফল হয়।

পৃথিবীকে, ইওরোপ ও সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে আমাদের আর একটি মহৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক একত্বরূপ এই সনাতন মহৎ তত্ত্ব— সম্ভবতঃ উচ্চজাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অজ্ঞ জনসাধারণের, বলবান্ অপেক্ষা দুর্বলের পক্ষেই বেশী প্রয়োজনীয়।

হে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের নিকট আর বিস্তারিতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইওরোপের আধুনিক গবেষণা জড়বিজ্ঞানের প্রণালীতে কিরূপে সমগ্র জগতের একত্ব প্রমাণ করিয়াছে—পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তুমি আমি সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি সবই অনন্ত জড়সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গস্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র। আবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বেদান্তে দেখানো হইয়াছে—এই আপাত-প্রতীয়মান জগৎপ্রপঞ্চের একত্বভাবেরও পশ্চাতে যে যথার্থ আত্মা রহিয়াছেন, তিনিও 'এক'। জগদ-ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একমাত্র আত্মাই রহিয়াছেন—সবই সেই এক সত্তামাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বাস্তবিক যে এই একত্ব রহিয়াছে—এই মহান্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন! অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদকে ভয় করিয়া থাকেন!এখনও এই মতের অনুগামী অপেক্ষা বিরোধীর সংখ্যাই অধিক! তথাপি আমি বলিতেছি, যদি জগৎকে আমাদের জীবনপ্রদ একটি মহৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ, তিনিই যতই বড় বা ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি হউন না কেন, যখন কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, তখন তাঁহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা নীতিবিজ্ঞান প্রামাণিক হইতে পারে না। দর্শন বা নীতির প্রমাণের শুধু এই কারণ নির্দেশ করিলে তাহা কখনও উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না; কোন মানুষের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া তাঁহারা দেখিতে চাহেন, চিরন্তন তত্ত্বসমূহের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে, আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন; অনাদী অনন্ত আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি; তোমাতে আমাতে শুধু 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ নহে,—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন-চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থেই এই 'ভাই ভাই' ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।

আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচারে পদদলিত সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, ইওরোপের পক্ষেও তেমনি ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেভাবে রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে এখনই তাহারা এই মহান্ তত্ত্বকে সকল উন্নতির মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতেছে। আর হে বন্ধুগণ, আপনারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা—অনন্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অভিব্যক্ত, সেইখানেই ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শসমূহ পরিস্ফুট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাঁহাদের প্রচারিত ভাবসমূহের মূল উৎস সম্বন্ধে অজ্ঞ, কোন কোন স্থলে তাঁহারা নিজদিগকে মৌলিক গবেষণাশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ আবার নির্ভয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কোথা হইতে তাঁহারা ঐ-সকল তত্ত্ব পাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বেদান্তের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বন্ধুগণ, আমেরিকায় আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করিতেছি, দ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছি না—একবার এইরূপ অভিযোগ শুনিয়াছিলাম। দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি ও উপাসনায় যে কি অসীম আনন্দ লাভ হয়, তাহা আমি জানি; উহার অপূর্ব মহিমা আমি সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবারও সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমলভাব অবলম্বন করিবার সময় নাই। এইরূপে কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা রাশীকৃত তুলার মত কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মত স্নায়ু; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়—যদি-বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদি-বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক; আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন হইতে পারে।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। তোমার যদি এদেশীয় পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহাদের সবগুলির উপরই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাস-বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও এবং বীর্যবান্ হও। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক। আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহস্র বৎসর যাবৎ যে-কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি, কেন? কারণ উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল—আমাদের ছিল না।

আমি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া কি শিখিলাম? খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দেশ করে, এই-সকল বাজে কথার অন্তরালে উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম?—দেখিলাম ইওরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরেজ বালক তোমাকে বলিবে, 'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে— প্রত্যেক ইওরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ এই কথা বলিতে পারে কি? না, পারে না; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতারা পর্যন্ত পারে না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই জন্যই বেদান্তের অদ্বৈত-ভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি; আর আমি সাম্প্রদায়িকভাবে উহা প্রচার করি না—সার্বভৌম ও সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমি উহা প্রচার করিয়া থাকি।

এই অদ্বৈতবাদ এমনভাবে প্রচার করা যাইতে পারে—যাহাতে দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না; আর এই-সকল মতের সামঞ্জস্যসাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোন ধর্ম নাই যাহাতে বলা হয় নাই যে, ভগবান্ সকলের ভিতরে রহিয়াছেন। বিভিন্ন মতের বৈদান্তিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই পবিত্রতা, বীর্য ও পূর্ণত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! তবে কাহারও কাহারও মতে এই পূর্ণত্ব যেন কখনও কখনও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার অন্য সময়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব যে আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদ-মতে উহা সঙ্কুচিতও হয় না, বিকাশপ্রাপ্তও হয় না, তবে সময়ে সময়ে অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। কার্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত ইহা অনেকটা একরূপই হইল। একটি মত অপরটি অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্যতঃ প্রায় একই প্রকার। এই মূল তত্ত্বটি প্রচার করা জগতের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; আর আমাদের এই মাতৃভূমিতে ইহার যত অভাব, আর কোথাও তত নহে।

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক রূঢ় অপ্রিয় সত্য শুনাইতে চাই। সংবাদপত্রে পড়া যায়, আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন ইংরেজ খুন করিয়াছে, অথবা কাহারও প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। অমনি সমগ্র দেশে হইচই পড়িয়া গেল; সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার মনে প্রশ্ন উদিত হইল—এ-সকলের জন্য দায়ী কে? যখন আমি একজন বেদান্তবাদী, তখন আমি নিজেকে এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; সে নিজের মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করে। আমি যখনই আমার মনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি—কে ইহার জন্য দায়ী? তখন প্রত্যেকবারই আমি এই উত্তর পাইয়া থাকি যে, ইহার জন্য ইংরেজ দায়ী নয়; আমরাই আমাদের দুর্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—একমাত্র আমরাই দায়ী।

আমাদের অভিজাত পুরুষগণ দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল; অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল যে তাহারা মানুষ। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ক্রীতদাস হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া দু-একটি কথা বলিতে বলে, তবে প্রায়ই দেখিতে পাই—আধুনিক কালের শিক্ষাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ এই পদদলিত জনগণের উন্নতি-সাধনরূপ কর্তব্য কর্ম হইতে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

শুধু তাই নয়, আরও দেখিতে পাই—উহারা পাশ্চাত্যদেশের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ (hereditary transmission) ও সেই ধরনের অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মতসহায়ে এমন সব পাশব ও আসুরিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহাতে দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পশুপ্রকৃতি করিয়া ফেলিবার অধিকতর সুবিধা হয়। আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্রো যুবকও আসিয়াছিল, সে খাঁটি আফ্রিকার নিগ্রো। একটি সুন্দর বক্তৃতাও সে দিয়াছিল। ঐ যুবকটি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে কয়েকটি আমেরিকানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; তাহারা আমাকে ঐ যুবকটি সম্বন্ধে এইরূপ বলিলঃ এই যুবক মধ্য-আফ্রিকার জনৈক নিগ্রো দলপতির পুত্র; কোন কারণে অপর একজন দলপতি ইহার পিতার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। সে এই বালকটিকেও হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিল। বালকটি কোনক্রমে পলায়ন করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়, সেখান হইতে একটি আমেরিকান জাহাজে করিয়া আমেরিকায় আসিয়াছে। সেই বালকটি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিল! এইরূপ ঘটনা দেখিবার পর 'বংশানুক্রমিক সংক্রমণ' মতবাদে আর কিরূপে আস্থা থাকিতে পারে?

হে ব্রাহ্মণগণ! বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণের নিয়ম অনুসারে বিদ্যাশিক্ষায় যদি ব্রাহ্মণের অধিকতর যোগ্যতা থাকে, তবে তাহার শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্বলকে আগে সাহায্য কর; কারণ তাহারই তো সবটুকু সাহায্য প্রয়োজন। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি সেইরূপ বুদ্ধিমান না হয়, তবে কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দিতে থাক—তাহাদিগের জন্যই শিক্ষক নিযুক্ত কর। আমার তো মনে হয়, ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত।

এই দরিদ্রগণকে—ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও শিখাও—সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।

সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বল—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। উঠ, জাগ—যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ জাগ—নিজদিগকে দুর্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ, তাহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতর যে ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, এই মোহজাল ছিন্ন কর। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে ঐ শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে—যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগে, তবে তাহা এই দুইটি মহাবলপ্রদ শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপঃ

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

৭

বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন; কারণ, ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদান্ত-প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট লোকহিতকর কার্যের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্বদ্বয় প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অশুভ—যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়, আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রও বলিয়া থাকেন, যা কিছু অশুভ, ভেদবুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন এবং অভেদবুদ্ধি হইতে, অর্থাৎ সকল বিভিন্নতার মধ্যে এক সত্তা রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিলে সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহান্ আদর্শ।

তবে সকল বিষয়েই শুধু আদর্শে বিশ্বাস করা এক কথা, আর দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে সেই আদর্শ অনুযায়ী চলা আর এক কথা। একটি উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া অতি উত্তম, কিন্তু ঐ আদর্শে পৌঁছিবার কার্যকর উপায় কই? এখানে স্বভাবতঃ সেই কঠিন প্রশ্নটি আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সর্বসাধারণের মনে বিশেষভাবে জাগিতেছে; সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে—জাতিভেদ ও সমাজসংস্কার-বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা। আমি সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট খোলাখুলি বলিতে চাই যে, আমি একজন জাতিভেদলোপকারী বা সমাজসংস্কারক মাত্র নহি। জাতিভেদ বা সমাজসংস্কার-বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই। তুমি যে-কোন জাতির লোক হও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে সেজন্য অপর জাতির কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না। প্রেম—একমাত্র প্রেমই আমি প্রচার করিয়া থাকি; আর আমার এই উপদেশ বিশ্বাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের সেই মহান্ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিগত প্রায় একশত বৎসর যাবৎ আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকে ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবে প্লাবিত হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছুই বলিবার নাই। ইঁহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য খুব ভাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে স্থায়ী শুভফল কিছু হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দুসভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা শক্ত নহে। নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই ইহার কারণ। প্রথমতঃ তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি, অন্যান্য জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিবেচনাহীন অনুকরণ-মাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কাজ হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার-আন্দোলনগুলি দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণের দ্বারা কোন কাজ হয় না। আমাদের সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাহা দেখিতে পায়; আর কোন্ সমাজেই বা দোষ নাই?

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, এই অবসরে তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি পৃথিবীর যে-সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক, এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায় যে, সেগুলিই মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই জন্যই আমি কোন সংস্কার চাই না; আমার আদর্শ—জাতীয় আদর্শে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন সমগ্র পৃথিবীতে এমন আর একটি দেশ দেখিতে পাই না, যাহা মানব-মনের উন্নতির জন্য এত অধিক কাজ করিয়াছে। এই কারণেই আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা করি না বা গালি দিই না। আমি বলি—'যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।' এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কাজ করা হইয়াছে, কিন্তু আরও বড় বড় কাজ করিবার এখনও যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্থানে বসিয়া থাকি, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আমাদিগকে হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে; হয় আমাদিগকে উন্নতি সাধন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর

জীবনের বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া কিরূপে সম্ভব? তাহা হইতেই পারে না, তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে; অতএব 'অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান কর'—ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।

আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি। আমি সমাজের বিশেষ কোন অমঙ্গলের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি না; আমি বলিতেছি—তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্বপুরষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিখুঁতভাবে কার্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্ব ও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব—এই বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে, এখন আমাদিগকে যাহা করিতে ইহবে, তাহার প্রত্যেকটি আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং এখন আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, সেগুলিও তাঁহারা যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের মত নহে। তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে বুঝিতেন না যে, শহরের সব লোক মিলিয়া একত্র মদ্যমাংস আহার করুক, অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলিয়া যখন যেখানে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলা-গারদে পরিণত করুক; অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যা দ্বারা কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। এরূপ করিয়া উন্নত হইয়াছে—এমন জাতি তো আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণও—নিজেদের পূর্বপুরুষগণ যে সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিতে সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, এবং যতক্ষণ না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, পথিকের সর্বস্ব-লুণ্ঠনকারী পর্বতনিবাসী কোন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই শান্তি পান না। অপর দিকে আবার ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন—কৌপীনধারী অরণ্যবাসী ফলমূলাহারী বেদাধ্যায়ী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তাঁহাদের বংশের উৎপত্তি। এখানে যদি তুমি কোন প্রাচীন ঋষিকে তোমার পূর্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার, তবে তুমি উচ্চজাতীয় হইলে, নতুবা নহে। সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আধ্যাত্মিক-সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। 'ব্রাহ্মণ আদর্শ' বলিতে আমি কি বুঝিতেছি?—যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তাহাই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই হিন্দুজাতির আদর্শ। তোমরা কি শোন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন বিধিনিষেধ নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাঁহার মৃত্যুদণ্ড নাই? এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, অবশ্য সে-ভাবে বুঝিও না; প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিকভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন, যাঁহার জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিতে এবং উহা বিস্তার করিতেই নিযুক্ত—কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও সৎস্বভাব ধর্মপরায়ণ নরনারী দ্বারা যে-দেশ অধ্যুষিত, সে-জাতি ও সে-দেশ যে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! তাঁহাদের শাসনের জন্য আর সৈন্য- সামন্ত পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গস্বরূপ। আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণ-জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে পাঠ করিঃ প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে। তোমরা আর্য, অনার্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ, সে আদেশ এইঃ 'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র পৃথিবীকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক হয়—অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে পূর্ণ হয়, উপাসনা ও ধ্যান-পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর লাভ করিতে পারে।

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার উপায় কি? তোমাদিগকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া তো ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল-প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা যায়, ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি যাহা করিতে চাই এবং ঐ-বিষয়ে দিন দিন আমার মনে যে-সকল নূতন নূতন ভাব উদিত হইতেছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হইবে। অতএব আজ এখানেই বক্তৃতার উপসংহার করিব।

হিন্দুগণ! তোমাদিগকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই মহান্ জাতীয় অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে—হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই উচিত— এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া ঐ পোতের জীর্ণসংস্কার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। আমাদের স্বদেশবাসী সকলকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া জাগ্রত করিব, নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া কর্তব্য সাধন করিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার কথা অগ্রাহ্য করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীতকালে মহৎ কর্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য করিতে নাও পারি, তথাপি এই সান্ত্বনা লাভ করিব যে, আমরা যেন একসঙ্গে শান্তিতে ডুবিয়া মরিতে পারি।

স্বদেশহিতৈষী হও—যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসো। আমার স্বদেশবাসিগণ! যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়। তোমরা শুদ্ধ, শান্ত, সৎস্বভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই মায়ার জগতে ইহা এক মর্মান্তিক পরিহাস। তাহা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—পরিণামে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। ইত্যবসরে আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, কেবল দেশবাসীর নিন্দা করিলে চলিবে না। আমাদের এই পরম পবিত্র মাতৃভূমির কালজীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না; অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধেও একটি নিন্দাসূচক কথা বলিও না, কারণ সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই সেরূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও সেরূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা কৃষ্টি ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল।

অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুলিয়া যাক। এই দেশের এবং সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধন কর। তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে, সমুদয় ভার তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রতি গৃহে লইয়া যাও, প্রতি গৃহে বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় যে ব্রহ্মত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত কর। তাহা হইলেই—তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন—তুমি এই সন্তোষ লাভ করিবে যে, তুমি মহৎকার্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহৎকার্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহৎকার্য সাধিত হইলেই মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইবে।

মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর

মান্দ্রাজের জনসাধারণ—বিশেষভাবে যুবকগণ, স্বামীজীকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া যুবকগণ নিজে
যায়। ‘কার্নান ক্যাসল’-এ স্বামীজী কয়েকদিন অবস্থান করেন। মান্দ্রাজ অভ্যর্থনা-সমিতির এবং খেতড়ি-মহারাজার পক্ষ হইতে দু
প্রদত্ত হয়। এইগুলির উত্তরে স্বামীজী বিভিন্ন দিবসে ছয়টি বক্তৃতা দেন।

ভদ্রমহোদয়গণ,

একটা কথা আছে—মানুষ নানাবিধ সঙ্কল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়া থাকে। ব্যবস্থা হইয়াছিল, অভ্যর্থনা ইংরেজী ধরনে হইবে; কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধানে কার্য হইতেছে—গীতার ধরনে আমি রথ হইতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি। এরূপ ঘটনার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে বক্তৃতার জোর বাড়িবে, তোমাদিগকে যাহা বলিতে যাইতেছি, সেই কথাগুলির ভিতর একটা শক্তি আসিবে। জানি না, আমার কণ্ঠস্বর তোমাদের সকলের নিকট পৌঁছিবে কিনা, তবে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। ইহার পূর্বে আর কখনও আমার খোলা ময়দানে এত বড় সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ হয় নাই।

কলম্বো হইতে মান্দ্রাজ পর্যন্ত লোকে আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ব সহৃদয়তা দেখাইয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীই যেরূপ অভ্যর্থনা করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা আমি কল্পনায়ও আশা করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার আনন্দই হইতেছে; কারণ ইহা দ্বারা পূর্বে বার বার আমি যাহা বলিয়াছি, সেই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে—প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক-একটি বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জাতিই একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে, আর ধর্মই ভারতবাসীর সেই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহু কার্যের মধ্যে ধর্ম একটি; প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যথা ইংলণ্ডে, ধর্ম—জাতীয় জীবন-নীতির একটি অংশ মাত্র। ইংলিশ চার্চ ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরেজরা উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, নিজেদের চার্চ মনে করিয়া তাহারা উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্বাহ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারই ঐ চার্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক, কারণ উহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও একই কথা। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়, উহা—হয় রাজনীতি বা বিদ্যাচর্চার উপর, না হয় সমরনীতি বা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে ভাবের উপর সেই শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। সেইটিই তাহার মুখ্য ভাব; ইহা ছাড়া তাহার অনেক গৌণ পোশাকী ভাব আছে—ধর্ম ঐগুলির অন্যতম।

এখানে—এই ভারতে ধর্ম জাতীয় হৃদয়ের মর্মস্থল। এই ভিত্তির উপরই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, ক্ষমতা, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির চর্চাও এখানে গৌণমাত্র; সুতরাং ধর্মই এখানকার একমাত্র কার্য, একমাত্র চিন্তা। ভারতীয় জনসাধারণ জগতের কোন সংবাদ রাখে না, শত শতবার আমি এ কথা শুনিয়াছি—কথাটি সত্য। কলম্বোয় যখন নামিলাম, তখন দেখিলাম—ইওরোপে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, যথা মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না; তাহাদের মধ্যে একজনও সোশ্যালিজম্ (Socialism), এনার্কিজম্ (Anarchism) প্রভৃতি শব্দের অর্থ এবং ইওরোপে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেগুলির কথা কিছুই শোনে নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকার্যও হইয়াছেন, এ-কথা সিংহলের আবালবৃদ্ধবনিতা শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহের অভাব নাই, তবে সেই সংবাদ তাহাদের উপযোগী হওয়া চাই, তাহাদের জীবনযাত্রায় যে-সকল বিষয় অত্যাবশ্যক, তদনুযায়ী কিছু হওয়া চাই। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বলেই ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহারই সাহায্যে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে।

পৃথিবীর সকল জাতি দুইটি বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটির এবং অন্যান্য জাতি অপরটির মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি জয়ী হইবে? কিসে জাতিবিশেষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কিসেই বা কোন জাতি অতি শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়? প্রেমের জয় হইবে, না ঘৃণার?—ভোগের জয় হইবে না ত্যাগের?—জড় জয়ী হইবে না চৈতন্য? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাসও সেইরূপ। ঐতিহ্যও যে অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমময় পূর্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন এবং পৃথিবীর নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত—ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা যে-জাতি ত্যাগ করিয়াছে, সেই জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে,—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব, কিছুদিনের জন্য পাপের খেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতিকে অনেক দুঃখ ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অপর কোন জাতিকে করিতে হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও এই জাতি জীবিত রহিয়াছে; কারণ এ জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে; আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?

ইওরোপ এই সমস্যার অপর দিকটি মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছে—মানুষ কতদূর ভোগ করিতে পারে, ভালমন্দ যে-কোন

উপায়ে মানুষ কত অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইওরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিযোগিতা নষ্ট করে, তাহার শক্তিকে খর্ব করে, উহার নিষ্ঠুরতা হ্রাস করে; বর্ণাশ্রম দ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

এই সময় (প্রায় ১০,০০০ লোকের) জনতা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সকলে স্বামীজীর কথা শুনিতে না পাওয়ায় তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেনঃ

বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেছি; বরং তোমাদের উৎসাহ-প্রকাশে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি; ইহাই চাই—প্রবল উৎসাহ। তবে ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে—সযত্নে ইহা রক্ষা করিতে হইবে; এই উৎসাহাগ্নি যেন কখনও নিবিয়া না যায়। আমাদিগকে ভারতে বড় বড় কাজ করিতে হইবে। সেজন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই। এইরূপ উৎসাহ আবশ্যক। আর সভার কার্য চলা অসম্ভব। তোমাদর সদয় ব্যবহার ও সাগ্রহ অভ্যর্থনার জন্য আমি তোমাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অন্যসময় ধীর-স্থিরভাবে পরস্পর চিন্তা- বিনিময় করিব। বন্ধুগণ, এখন বিদায়।

তোমরা সকলে শুনিতে পাও, এইভাবে বক্তৃতা করা আর অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আজ অপরাহ্ণে আমাকে দেখিয়াই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বক্তৃতা সুবিধামত অন্য সময়ে—ভবিষ্যতে হইবে। তোমাদের উৎসাহ ও অভ্যর্থনার জন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি।

আমার সমরনীতি

[মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত]

সেদিন অত্যধিক লোকসমাগমের দরুন বক্তৃতায় বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই, সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মান্দ্রাজবাসিগণের নিকট বরাবর যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। অভিনন্দনপত্রগুলিতে আমার প্রতি যে-সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিভাবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না, তবে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ঐ বিশেষণগুলির যোগ্য করেন, আর আমি যেন সারা জীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি। প্রভু যেন আমাকে এই কার্যের যোগ্য করেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে হয়, অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমার কিছুটা সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্যদেশে বহন করিবার জন্য আমার একটি বার্তা ছিল—আমি নির্ভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরেজ জাতিকে সেই বার্তা, সেই বাণী শ্রবণ করাইয়াছি। অদ্যকার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি তোমাদের সকলের নিকট সাহসপূর্বক কয়েকটি কথা বলিতে চাই। কিছুদিন যাবৎ কতকগুলি ব্যাপার এমন দাঁড়াইতেছে যে, ঐগুলির জন্য আমার কাজে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। এমনকি সম্ভব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টাও চলিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই-সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকে। গত তিন বৎসর যাবৎ দেখিতেছি, জনকয়েক ব্যক্তির আমার ও আমার কার্য সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। যতদিন বিদেশে ছিলাম, ততদিন চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি একটি কথাও বলি নাই। কিন্তু এখন মাতৃভূমিতে দাঁড়াইয়া এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির কি ফল হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না; এ কথাগুলি বলার দরুন তোমাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইবে, তাহাও গ্রাহ্য করি না। লোকের মতামত আমি কমই গ্রাহ্য করিয়া থাকি। চার বৎসর পূর্বে দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে সন্ন্যাসিবেশে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। সারা দুনিয়া আমার সামনে এখনও পড়িয়া আছে। আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই—এখন আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করি।

প্রথমতঃ থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। বলাই বাহুল্য যে, উক্ত সোসাইটির দ্বারা ভারতে কিছু কাজ হইয়াছে। এ কারণে প্রত্যেক হিন্দুই ইহার নিকট, বিশেষতঃ মিসেস বেস্যাণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মিসেস বেস্যাণ্ট সম্বন্ধে যদিও আমার অল্পই জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষিণী, আর সাধ্যানুসারে তিনি প্রাণপণ আমাদের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য প্রত্যেক যথার্থ ভারতসন্তান তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন; তাঁহার ও তৎসম্পর্কীয় সকলের উপরেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ চিরকাল বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথা, আর থিওজফিস্টদের সোসাইটিতে যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তি-শ্রদ্ধা- ভালবাসা এক কথা, আর কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে তর্কযুক্তি না করিয়া, বিচার না করিয়া বিনা বিশ্লেষণে সবই গিলিয়া ফেলা আর এক কথা।

একটা কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে যে, আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সামান্য কাজ করিয়াছি, থিওজফিস্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, এ-কথা সর্বৈব মিথ্যা। এই জগতে উদার ভাব এবং 'মতভেদ সত্ত্বেও সহানুভূতি' সম্বন্ধে আমরা অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা, কিন্তু আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, যতক্ষণ একজন অপর ব্যক্তির সব কথায় বিশ্বাস করে, ততক্ষণই ঐ ব্যক্তি তাহার প্রতি সহানুভূতি করিয়া থাকে। যখনই কেহ কোন বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে সাহস করে, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায়।

আরও অনেক আছে, তাহাদের নিজেদের এক-একটা স্বার্থ আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে যাহাতে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তবে তাহাদের ভিতর প্রভূত ঈর্ষা ও ঘৃণার আবির্ভাব হয়; তাহারা তখন কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। হিন্দুরা নিজেদের ঘর নিজেরা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ক্ষতি কি? হিন্দুরা প্রাণপণে নিজেদের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কার-সভাগুলির কি অনিষ্ট হইবে? ইঁহারা কেন হিন্দুদের সংস্কার-চেষ্টায় বিরোধী হইবেন?ইঁহারা কেন এই-সব আন্দোলনের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন? 'কেন?'—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার বোধ হয়, তাঁহাদের ঘৃণা ও ঈর্ষার পরিমাণ এত অধিক যে, এ-বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

প্রথমে থিওজফিস্টদের কথা বলি। চার বৎসর পূর্বে যখন থিওজফিক্যাল সোসাইটির নেতার নিকট গমন করি—তখন আমি একজন দরিদ্র অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র, একজনও বন্ধু-বান্ধব নাই, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে, কিন্তু কাহারও নামে লিখিত কোনপ্রকার পরিচয়পত্র নাই। আমি স্বভাবতই ভাবিয়াছিলাম, ঐ নেতা যখন একজন মার্কিন এবং ভারতপ্রেমিক, তখন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে আমেরিকায় কাহারও নিকট পরিচয়পত্র দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নিকট গিয়া ঐরূপ পরিচয়পত্র প্রার্থনা করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমাদের সোসাইটিতে যোগ দিবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'না, আমি কিরূপে আপনাদের সোসাইটিতে যোগ দিতে পারি? আমি আপনাদের অনেক মতই যে বিশ্বাস করি না।' তিনি বলিলেন, 'তবে যাও, তোমার জন্য আমি কিছু করিতে পারিব না।' 'ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া? আমার থিওজফিষ্ট বন্ধুগণের কেহ যদি এখানে থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া?

যাহা হউক, আমি মান্দ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন, কেবল একজন অনুপস্থিত দেখিতেছি—বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার। আর আমি এই সভায় উক্ত ভদ্রমহোদয়ের উদ্দেশে আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মধ্যে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান, আর এ জীবনে তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই—তিনি ভারতমাতার একজন যথার্থ সুসন্তান। যাহা হউক, আমি আমেরিকায় পৌঁছিলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সব খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিতেছে। আমার শুধু গ্রীষ্মোপযোগী একখানি পাতলা পরিধেয় ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি রাস্তায় ভিক্ষায় বাহির হই, তবে আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মান্দ্রাজে কয়েকজন বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যপারটি জানিতে পারিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্রই মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।' ইহাই কি আমার জন্য পথ করিয়া দেওয়া?

আমি এখন এ-সব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই ছিল আমার মূলমন্ত্র, কিন্তু আজ ইহা বাহির হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে, আমি ধর্মমহাসভায় কয়েকজন থিওজফিস্টকে দেখিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে— তাঁহাদের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা প্রত্যেকেই যে-অবজ্ঞাদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাদৃষ্টিতে যেন প্রকাশ পাইতেছিল—'এ একটা ক্ষুদ্র কীট; এ আবার দেবতার মধ্যে কিরূপে আসিল?' ইহাতে কি আমার পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—বলুন, হইয়াছিল কি?

অতঃপর ধর্মমহাসভায় আমার নামযশ হইল। তখন হইতে প্রচণ্ড কার্যের সূত্রপাত হইল। যে-শহরেই আমি যাই, সেখানেই এই থিওজফিস্টরা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সদস্যগণকে আমার বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ করা হইত, আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিলেই তাহারা সোসাইটির সহানুভূতি হারাইবে। কারণ ঐ সোসাইটির এসোটেরিক (গুপ্তসাধনা) বিভাগের মত এইঃ যে-কেহ উহাতে যোগ দিবে, তাহাকে কেবলমাত্র 'কুথুমি ও মোরিয়ার'—তাঁহারা যাহাই হউন, তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা লইতে হইবে। অবশ্য ইঁহারা অপ্রত্যক্ষ, আর ইঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি—মিঃ জজ্ ও মিসেস বেস্যাণ্ট। সুতরাং এসোটেরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার অর্থ এই যে, নিজের স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে ইঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য আমি কখনই এরূপ করিতে পারিতাম না, আর যে-ব্যক্তি এরূপ করে, তাহাকে হিন্দু বলিতেও পারি না।

তারপর থিওজফিস্টদের নিজেদের ভিতরই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। পরলোকগত মিঃ জজের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। তিনি একজন গুণবান, সরল, অকপট প্রতিপক্ষ ছিলেন; আর তিনি থিওজফিস্টদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার সহিত মিসেস বেস্যাণ্টের যে বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোনরূপ রায় দিবার অধিকার নাই, কারণ উভয়েই নিজ নিজ 'মহাত্মা'র বাক্যকে সত্য বলিয়া দাবী করিতেছেন। সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে আশ্চর্য এই যে, উভয়ে একই মহাত্মাকে দাবী করিতেছেন। ঈশ্বর জানেন সত্য কী; তিনিই একমাত্র বিচারক, আর যেখানে উভয়ের পক্ষেই যুক্তিপ্রমাণ সমতুল্য, সেখানে একদিকে বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া রায় দিবার অধিকার কাহারও নাই। এইরূপে তাঁহারা দুই বৎসর ধরিয়া সমগ্র আমেরিকায় আমার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন! তারপর তাঁহারা—অপর বিরুদ্ধপক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহিত যোগ দিলেন। এই শেষোক্তেরা আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ি হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে-কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাকে তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে বলিতে লাগিল।

আর আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা। ইনি প্রতিদিনই প্রচার করিতেছেন, খ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছেন। খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? ইহাই কি ভারত সংস্কারের উপায়? আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বৎসর যাবৎ আমার সহিত এই স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু তাঁহারই নিকট আমি এই ব্যবহার পাইলাম! যেদিন ধর্ম-মহাসভায় আমি প্রশংসা পাই, যেদিন চিকাগোয় আমি সকলের প্রিয় হই, সেই দিন হইতে তাঁর সুর বদলাইয়া গেল; তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আমার অনিষ্ট করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে তাড়াইয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? জিজ্ঞাসা করি, বিশ বৎসর খ্রীষ্টের পদতলে বসিয়া তিনি কি এই শিক্ষাই পাইয়াছেন? আমাদের বড় বড় সংস্কারকগণ যে বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টশক্তি ভারতবাসিগণের উন্নতিবিধান করিবে, তাহা কি এইরূপে হইবে? অবশ্য যদি ঐ ভদ্রলোককে উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যায়, তবে বড় আশা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আর এক কথা। আমি সমাজ-সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে, তাঁহারা বলিতেছেন, আমি শূদ্র, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেনঃ শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এইঃ যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও—আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণসহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙলা দেশেই আমার জাতি হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের দেশের ইতিহাস

কতকটা জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জ্ঞান থাকা উচিত ছিল; তাঁহার জানা উচিৎ ছিল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। এ-সব কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইল বলিয়াই বলিলাম। আমি পূর্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমাকে শূদ্র বলিলে আমার বাস্তবিক কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্বপুরুষগণ দরিদ্রগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধস্বরূপ হইবে।

যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি অবশ্য ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? এই ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী, তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন—ইহাতে কি সে কখনও সম্মত হইতে পারে? সুতরাং গভীর রাত্রে অজ্ঞাতভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি পায়খানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন। দিনের পর দিন এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি নিজেকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিয়া তুলিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি।

হিন্দুরা এইরূপেই তোমাদিগকে ও সর্বসাধারণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারা ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। বিশ বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এমন চরিত্র গঠিত হইয়াছে যে, কেবল বন্ধুর কিছু মানযশ হইয়াছে বলিয়া, সে তাহার অর্থোপার্জনের বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে মনে করিয়া বিদেশে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে! আর খাঁটি পুরাতন হিন্দুধর্ম কিরূপে কাজ করে, অপরটি তাহার উদাহরণ। আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পায়খানা সাফ ও চুল দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হউন, তবেই আমি তাঁহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব, তাহার পূর্বে নহে। সামান্য এতটুকু কাজ হাজার হাজার লম্বা কথার সমতুল।

এখন আমি মান্দ্রাজের সংস্কার-সভাগুলির কথা বলিব। তাঁহারা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি অনেক সহৃদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বাঙলা ও মান্দ্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে তাঁহারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আর আমি এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি অনেকবার বলিয়াছি—মান্দ্রাজের এখন বড়ই সুন্দর অবস্থা। বাঙলায় যেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, এখানে সেরূপ হয় নাই। এখানে বরাবর ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে সর্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, এখানে সমাজের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়াছে, কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙলা দেশে পুরাতনের পুনরুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু মান্দ্রাজের উন্নতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে হইতেছে। সুতরাং এখানকার সংস্কারকগণ দুই প্রদেশের সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে যে প্রভেদ দেখান, সে-বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের এক বিষয়ে মতভেদ আছে—সেটি তাঁহারা বুঝেন না।

আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কার-সমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে-ব্যক্তি চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া অনাহারে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে-ব্যক্তি এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে, কোথায় শুইবে—তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাকে এত সহজে ভয় দেখানো যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি [বিদেশে] একরূপ বিনা পরিচ্ছদে হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রী নীচে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি খাইবে—কিছুই ঠিক ছিল না, তাহাকে ভারতে এত সহজে ভয় দেখানো যাইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই যে, তাঁহারা জানিয়া রাখুন—আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে, আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে, আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিবার আছে; আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই মঙ্গলবার্তা মানুষকে দিয়া যাইব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু-আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা, আমার পদ্ধতি—সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে এই বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না যে, 'তোমায় এদিকে চলিতে হইবে, ওদিকে নয়।' আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মত হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল—ইহাই আমার ভাব।

এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শতাব্দী যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে, এই অদ্ভুত জাতীয় জীবন-নদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে—কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, উহা ভাল কি মন্দ বা কিরূপে উহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত? সহস্র ঘটনাচক্র উহাকে বিশেষরূপে বেগবিশিষ্ট করিয়াছে, তাই কখনও উহা মৃদু—কখনও-বা দ্রুত গতি-বিশিষ্ট হইতেছে। কে উহার গতি নিয়মিত করিতে সাহস করে? গীতার উপদেশ অনুসারে আমাদিগকে কেবল কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করিয়া যাও, কিন্তু জাতীয় জীবন স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হইবে, কাহারও সাধ্য নাই—'এইরূপে বিকশিত হও' বলিয়া উপদেশ দিতে পারে।

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে; অন্যান্য সমাজেও আছে। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে সময় সময় ধরিত্রী সিক্ত হয়, সেখানে—পাশ্চাত্যদেশে অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত। এখানে জীবন দারিদ্র্যবিষে জর্জরিত, সেখানে বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃত; এখানে লোক না খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, সেখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যে লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। দোষ সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মত, পা হইতে দূর করিলে মাথায় ধরে; মাথা হইতে

তাড়াইলে উহা আবার অন্যত্র আশ্রয় লয়। কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া বেড়ানো মাত্র—এইটুকুই করা যায়।

হে বালকগণ, অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেয়—ভাল ও মন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। একটি লইলে অন্যটিকে লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে কোথাও-না-কোথাও জল খানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাই নয়, সমুদয় জীবনই দুঃখময়। কাহারও প্রাণনাশ না করিয়া নিঃশ্বাস- প্রশ্বাস গ্রহণ পর্যন্ত অসম্ভব; কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া এক টুকরা খাদ্যও গ্রহণ করা যায় না। ইহাই প্রকৃতির বিধান, ইহাই জীবন-দর্শন।

এই কারণে আমাদিগকে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা বলি না কেন, বুঝিতে হইবে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত হইতে ধর্মান্ধতা একেবারে দূর করিয়া আমাদিগকে শান্ত—উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোন সংস্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই এই মাত্র ফল দাঁড়াইয়াছে যে, যে-উদ্দেশ্যে সংস্কার-চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্যেই বিফল হইয়াছে। আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আন্দোলন কল্পনা করা যাইতে পারে না; তোমাদের সকলেরই উহা জানা আছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে। দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে দাসদের যে অবস্থা ছিল, পরে তাহাদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শতগুণ মন্দ হইয়াছে। দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে এই হতভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত—নিজ সম্পত্তিরনাশের আশঙ্কায় অধিকারিগণকে দেখিতে হইত, যাহাতে তাহারা দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া না পড়ে। কিন্তু এখন তাহারা কাহারও সম্পত্তি নয়, তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই; এখন সামান্য ছুতা করিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত পুড়াইয়া ফেলা হয়, গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়; কিন্তু হত্যাকারীর শাস্তির জন্য কোন আইন নাই, কারণ নিহত ব্যক্তি যে 'নিগার'—ইহারা মানুষ নহে, এমন কি পশু-নামেরও যোগ্য নহে। আইনের দ্বারা অথবা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোন সামাজিক দোষ প্রতিকার করিবার চেষ্টার ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

কোন কল্যাণসাধনের জন্য এইরূপ উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমি ইহা দেখিয়াছি, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এইরূপ দোষারোপকারী কোন সমিতির সহিত যোগ দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দাবাদের প্রয়োজন কি? সকল সমাজেই দোষ আছে; সকলেই তাহা জানে। আজকালকার ছোট ছেলে পর্যন্ত তাহা জানে। সেও মঞ্চে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষগুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে রীতিমত একটি বক্তৃতা শুনিয়া দিতে পারে। যে-কোন অশিক্ষিত বৈদেশিক এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিবার পথে ভারতে আসিয়া থাকেন, তিনিই তাড়াতাড়ি রেলভ্রমণের পর ভারতবর্ষের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইয়া ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর প্রথাসম্বন্ধে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু। সেই জলমগ্ন বালক ও দার্শনিকের গল্পে—দার্শনিক যখন বালককে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন বলিয়াছিল, 'আগে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনিব,' সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, অনেক সমিতি দেখিয়াছি, ঢের কাগজ পড়িয়াছি; এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদের হাত ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন?' এইরূপ লোক চাই। এইখানেই আমার এই-সকল সংস্কার-আন্দোলনের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু উহা দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কী উপকার হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, উহার উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; শেষে প্রাচীন সমাজের লোকেরা তাঁহাদের সুর ধরিয়াছেন, ঢিলটি খাইয়া পাটকেলটি মারিয়াছেন; আর তাহার ফল হইয়াছে এই যে, প্রত্যেকটি দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির—সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত! ইহাই কি সংস্কার? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ? ইহা কার দোষ?

অতঃপর আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে—ভারতে আমরা বরাবর রাজশাসনাধীনে কাটাইয়াছি—রাজারাই আমাদের জন্য চিরদিন বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই রাজারা নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইবার কেহ নাই। সরকার সাহস করেন না। সরকারকে সাধারণের মতামতের গতি দেখিয়া নিজ কার্যপ্রণালী স্থির করিতে হয়। কিন্তু নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর, প্রবল জনমত গঠিত হইতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজসংস্কার-সমস্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের নিকটই কোন বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তো অত্যাচার; ইহার মত প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের নিকট কতকগুলি বিষয় দোষযুক্ত হইলেই সেগুলি সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে-চড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনা-আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে—যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই; যে নূতন শক্তিতে—যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সে লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা

করিতেই হইবে।

গত শতাব্দীতে যে-সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশ পোশাকী ধরনের। এই সংস্কার-চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণ (জাতি)-কে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় নারীর কোন স্বার্থই নাই। আর সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে-সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য এ ধরনের সকল আন্দোলন। নিজেদের ঘর পরিষ্কার করিতে এবং বিদেশীদের চোখে সুন্দর প্রতীয়মান হইবার জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহাকে তো সংস্কার বলা যায় না। সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি 'আমূল সংস্কার' বা প্রকৃত সংস্কার বলিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকুক, [আবর্জনা পুড়িয়া যাক] এবং একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠিত হউক।

আর সমস্যা বড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্যা; সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই! এটিও জানিয়া রাখো যে, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ অবহিত ছিলেন। আজকাল বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম ও উহার অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা একটা ঢঙ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচনাকারীরা স্বপ্নেও কখনও ভাবে না যে, আমাদের সমাজে যে-সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, সেগুলি বৌদ্ধধর্ম-জাত। বৌদ্ধধর্মই আমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারস্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস কখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পড়িয়া থাক যে, গৌতমবুদ্ধ-প্রচারিত অপূর্ব নীতি ও তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-গুণে বৌদ্ধধর্ম এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ করঃ বৌদ্ধধর্মের বিস্তার উহার মতবাদের জন্য বা উক্ত মহাপুরুষের চরিত্রগুণে ততটা হয় নাই—বৌদ্ধগণ যে-সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে-সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে-সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, সেগুলির জন্য যতটা হইয়াছিল। এইরূপেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে। এই-সকল বড় বড় মন্দির ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংগ্রামে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র হোমকুণ্ডগুলি দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অধঃপতিত হইল; অনুষ্ঠানগুলি পরিশেষে এরূপ ঘৃণিত ভাব ধারণ করে যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট আমি তাহা বলিতে অক্ষম। যাঁহারা এ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার কারুকার্যপূর্ণ দক্ষিণ ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলি দেখিয়া আসিবেন। বৌদ্ধগণের নিকট হইতে দায়স্বরূপ আমরা ইহাই মাত্র পাইয়াছি। অতঃপর সেই মহান্ সংস্কারক শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুবর্তিগণের অভ্যুদয় হইল, আর তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্যন্ত কয়েক শত বর্ষ যাবৎ ভারতের সর্বসাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ধর্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই সংস্কারকগণ সমাজের দোষগুলি বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি তাঁহারা সমাজকে নিন্দা করেন নাই। তাঁহারা এ কথা বলেন নাই—তোমাদের যাহা আছে সব ভুল, তোমাদিগকে সব ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি সম্প্রতি পড়িতেছিলাম—আমার বন্ধু ব্যারোজ সাহেব বলিতেছেন, ৩০০ বৎসরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রীক ও রোমক প্রভাবকে একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছিল। যিনি ইওরোপ—গ্রীস ও রোম দেখিয়াছেন, তিনি কখনও এ-কথা বলিতে পারেন না। রোমক ও গ্রীক ধর্মের প্রভাব—এমন কি প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহে পর্যন্ত রহিয়াছে, নামটুকু বদলাইয়াছে মাত্র; প্রাচীন দেবগণই নূতন বেশে বিদ্যমান—কেবল নাম বদলানো। দেবীগণ হইয়াছেন মেরী, দেবগণ হইয়াছেন সাধুবৃন্দ (Saints) এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন উপাধি 'পন্টিফেক্স্ ম্যাক্সিমাস'৮ পর্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতেই পারে না, ইহা বড় সহজ নহে—আর শঙ্করাচার্য এ তত্ত্ব জানিতেন, রামানুজও জানিতেন, এরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। সুতরাং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্মকে ধীরে ধীরে উচ্চতম আদর্শের অভিমুখে গড়িয়া তোলা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি তাঁহারা অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা একেবারে সব উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কপট হইতে হইত; কারণ তাঁহাদের ধর্মের প্রধান মতই ক্রমোন্নতিবাদ—এই-সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দিয়া আত্মা তাঁহার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবে—ইহাই তাঁহাদের মূল মত। সুতরাং এই সোপানগুলি সবই আবশ্যক এবং আমাদের সহায়ক। কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে সাহসী হইবে?

আজকাল একটি কথা চালু হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই বিনা আপত্তিতে এটি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা অন্যায়। আমিও এক সময়ে ঐরূপ ভাবিতাম, এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন একজনের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুলপূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কি চাও?—সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সৃষ্টি করিতে পার, তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা সাফল্য লাভ কর। যে-কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহান্ চরিত্র সৃষ্টি কর। আর পুতুলপূজাকে লোকে গালি দেয়! কেন?—তাহা কেহই জানে না। কারণ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে জনৈক য়াহুদী-বংশসম্ভূত ব্যক্তি পুতুলপূজাকে নিন্দা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই য়াহুদী বলিয়াছিলেন, যদি কোন বিশেষ ভাব-প্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, মহা পাপ; কিন্তু যদি একটি সিন্দুকের দুইধারে দুইজন দেবদূত, তাহার উপরে মেঘ—এইরূপে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র। ঈশ্বর যদি ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র; কিন্তু যদি গভীর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা হিদেনদের কুসংস্কার! অতএব উহার নিন্দা কর।

দুনিয়া এইভাবেই চলিয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন, 'আমরা মর্ত্যমানব কি নির্বোধ!' পরের চক্ষে দেখা ও বিচার করা কি কঠিন ব্যাপার! আর ইহাই মনুষ্যসমাজের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। ইহাই ঈর্ষা ঘৃণা বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মূল। বালকগণ, অর্বাচীন শিশুগণ, তোমরা মান্দ্রাজের বাহিরে কখনও যাও নাই; তোমরা সহস্র সহস্র প্রাচীনসংস্কার-নিয়ন্ত্রিত ত্রিশকোটি লোকের উপর আইন চালাইতে চাও—তোমাদের লজ্জা করে না? এরূপ বিষম দোষ হইতে বিরত হও এবং আগে নিজেরা শিক্ষা লাভ কর। শ্রদ্ধাহীন

বালকগণ, তোমরা কেবল কাগজে গোটাকতক লাইন আঁচড় কাটিতে পার, আর কোন আহাম্মককে ধরিয়া উহা ছাপাইয়া দিতে পার বলিয়া নিজদিগকে জগতের শিক্ষক—ভারতের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেছ! তাই নয় কি?

এই কারণে আমি মান্দ্রাজের সংস্কারকগণকে এইটুকু বলিতে চাই যে, তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে; তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার জন্য আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। কিন্তু ভাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইভাবে আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি—তাঁহাদের কার্যপ্রণালী ঠিক নহে। শত বৎসর যাবৎ এই প্রণালীতে কার্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন আমাদিগকে অন্য কোন নূতন উপায়ে কাজ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য। ভারতে কি কখনও সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা তো ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর ? নানক? চৈতন্য? কবীর ? দাদু? এই যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মত একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন?রামানুজের হৃদয় কি নীচজাতির জন্য কাঁদে নাই? তিনি কি সারাজীবন পারিয়াদিগকে৯ পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিতে চেষ্টা করেন নাই? তিনি কি হিন্দু মুসলমানকে পর্যন্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া সমাজে নূতন অবস্থা আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই? তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কাজ এখনও চলিতাছে। তবে প্রভেদ এই—তাঁহারা আধুনিক সংস্কারকগণের মত চীৎকার ও বাহ্যাড়ম্বর করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের মত তাঁহাদের মুখ হইতে কখনও অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্বাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখনও সমাজের উপর দোষারোপ করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন, হিন্দুজাতিকে চিরকাল ধরিয়া ক্রমাগত উন্নতি করিতে হইবে। তাঁহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন—হিন্দুগণ, তোমরা এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে আরও ভাল কাজ করিতে হইবে। তাঁহারা এ-কথা বলেন নাই যে, তোমরা এতদিন মন্দ ছিলে, এখন তোমাদিগকে ভাল হইতে হইবে। তাঁহারা বলিতেন, তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদিগকে আরও ভাল হইতে হইবে। এই দুই প্রকার কথার ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙিয়া-চুরিয়া অপর জাতির মত গড়িতে পারা অসম্ভব, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। প্রথমে এইটিই শিক্ষা করিতে হইবে। এক ধরনের বিজ্ঞান, ঐতিহ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হওয়ায় তাহাদের আধুনিক সমাজব্যবস্থা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে আবার একপ্রকার ঐতিহ্য এবং সহস্র সহস্র বৎসর কর্ম রহিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কার অনুযায়ী চলিতে পারি, এবং আমাদিগকে সেইরূপ করিতে হইবে।

তবে আমি কি প্রণালীতে কাজ করিব? আমি প্রাচীন মহান্ আচার্যগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে চাই। আমি তাঁহাদের কাজ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারা কি প্রণালীতে কাজ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই মহাপুরুষগণ সমাজদেহ সংগঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাতে বিশেষভাবে বল, পবিত্রতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও ঐরূপ কার্য করিতেই হইবে। এখন অবস্থাচক্রের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, সেজন্য কার্যপ্রণালীর সামান্য পরিবর্তন করিতে হইবে, আর কিছু নয়।

আমি দেখিতেছি—ব্যক্তির পক্ষে যেমন, প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনি জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর, অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐক্যতান সৃষ্টি করিতেছে। কোন দেশের—যথা ইংলণ্ডের জীবনীশক্তি রাজনীতিক ক্ষমতায়। কলাবিদ্যার উন্নতিই হয়তো অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্মই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যেদিকে উহার নিজস্ব গতিধারা চলিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফলে তোমরা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, সেজন্য তোমাদিগকে তোমাদের প্রাণশক্তি—ধর্মের মধ্য দিয়া সব কাজ করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি তোমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বন্ধ হইয়া নিজ নিজ সুরে বাজিতে থাকুক। আমি দেখিয়াছি, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ধর্ম কিভাবে কাজ করিবে—ইহা না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। বেদান্তের দ্বারা কিরূপ অদ্ভুত রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হইবে, ইহা না দেখাইয়া আমি ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। এইভাবে ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, সেই নূতন সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা জীবন কতটা আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে, উহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি কত অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয়; প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতে হইবে। আর এই পন্থা-নির্বাচন এমন কিছু খারাপ হয় নাই। জড়ের পরিবর্তে চৈতন্য, মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বরের চিন্তাকে কি বিশেষ মন্দ পথ বলিতে পার? তোমাদের মধ্যে পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ়বিশ্বাস বিদ্যমান। কই, এই ভাব ত্যাগ কর দেখি! তোমরা কখনই ইহা ত্যাগ করিতে পার না। তোমরা জড়বাদী হইয়া কিছুদিন জড়বাদের কথা বলিয়া আমাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের স্বভাব জানি। যখনই তোমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে একটু ভুল করিয়া বুঝাইয়া দিব, অমনি তোমরা পরম আস্তিক হইবে। স্বভাব বদলাইবে কিরূপে? তোমরা যে ধর্মগতপ্রাণ।

এই জন্য ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিকভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর। প্রথমেই এইটি করা আবশ্যক। প্রথমেই আমাদিগকে এই কাজে মন দিতে হইবে যেঃ আমাদের উপনিষদে—আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে-সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সেগুলি ঐ-সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিতে হইবে, যেন ঐ-সকল শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মত উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম—হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই-সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে; কারণ শাস্ত্র বলেন—প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন কর্তব্য। প্রথমে লোকে শাস্ত্রবাক্যগুলি শুনুক, আর যে ব্যক্তি জনসাধারণকে তাহাদের ধর্মগ্রন্থের ও শাস্ত্রের অন্তর্গত মহান্ সত্যগুলি শুনাইতে সাহায্য করে, সে আজ এমন এক কাজ করিতেছে, যাহার সঙ্গে অন্য কোন কাজের তুলনা হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, 'এই কলিযুগে মানুষের একটি কাজ করিবার আছে। আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় কোন ফল হয় না। এখন দানই একমাত্র কর্ম।[১০] দানের মধ্যে ধর্মদান—আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান; দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। এই অপূর্ব দানশীল হিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টপাত কর। এই দরিদ্র—অতি দরিদ্র দেশে লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এমন অতিথিপরায়ণ যে, যে-কোন ব্যক্তি বিনাসম্বলে ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন। লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, সেইরূপ তিনি যেখানেই যাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ পর্যন্ত এক টুকরা রুটি থাকে, ততক্ষণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া মরিতে হয় না।

এই দানশীল দেশে আমাদিগকে প্রথম দুই প্রকার দানে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান। এই জ্ঞানদান আবার শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—সমগ্র বিশ্বে ইহা প্রচার করিতে হইবে। ইহাই বরাবর হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন ভারতীয় চিন্তারাশি কখনও ভারতের বাহিরে যায় নাই—যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন, ভারতের বাহিরে ধর্মপ্রচারের জন্য আমিই প্রথম সন্ন্যাসী গিয়াছি, তাঁহারা নিজেদের জাতির ইতিহাস জানেন না। এই ধর্মপ্রচারের ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত বন্যা সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। অগণিত সৈন্যদল লইয়া উচ্চরবে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রাজনীতিক শিক্ষা বিস্তার করা যাইতে পারে; লৌকিক জ্ঞান বা সামাজিক জ্ঞান বিস্তার করিতে হইলেও তরবারি বা কামানের সাহায্যে উহা হইতে পারে; শিশিরবিন্দু যেমন অশ্রুত ও অদৃশ্যভাবে পতিত হইয়াও রাশি রাশি গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান তেমনি নীরবে—সকলের অজ্ঞাতসারেই হওয়া সম্ভব।

ভারত বার বার জগৎকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপহার দিয়া আসিতেছে। যখনই কোন শক্তিশালী দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যখনই তাহারা পথঘাট নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সুগম করিয়াছে, অমনি ভারত উঠিয়া সমগ্র জগতের উন্নতিকল্পে তাহার যাহা দিবার আছে—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব জন্মিবার বহুদিন পূর্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে। চীন, এশিয়া-মাইনর ও মালয়-দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে এখনও তাহার চিহ্ন বর্তমান। যখন সেই প্রবল গ্রীক দিগ্বিজয়ী তদানীন্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিলেন, তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল—তখনও ভারতীয় ধর্মভাব সেই-সকল স্থানে ছুটিয়া গিয়াছিল। আর পাশ্চাত্য দেশ এখন যে-সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে, তাহা সেই মহাবন্যারই অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র। এখন আবার সেই সুযোগ উপস্থিত। ইংলণ্ডের শক্তি পৃথিবীর জাতিগুলিকে সংযুক্ত করিয়াছে; এরূপ আর পূর্বে কখনও হয় নাই। ইংরেজদের রাস্তা ও যাতায়াতের অন্যান্য উপায়গুলি জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, ইংরেজ-প্রতিভায় জগৎ আজ অপূর্বভাবে একসূত্রে গ্রথিত। আজকাল যেরূপ নানাস্থানে বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসে পূর্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সুতরাং এই সুযোগে ভারত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব না করিয়া জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দান করিতেছে। এখন এই-সকল পথ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাবরাশি সমগ্র জগতে ছড়াইতে থাকিবে।

আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমাদের ইচ্ছায় হয় নাই। ভারতের ভগবান্, যিনি তাহার ভাগ্যবিধাতা, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই এইরূপ শত শত ব্যক্তিকে জগতের সকল জাতির নিকট প্রেরণ করিবেন। পার্থিব কোন শক্তিই ইহাকে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও ধর্মপ্রচারে যাইতে হইবে। এই ধর্মপ্রচারের জন্য তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতেই হইবে; জগতের সকল জাতির নিকট, সকল ব্যক্তির নিকট প্রচার করিতে হইবে। প্রথমেই এই ধর্মপ্রচার আবশ্যক।

ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনি আসিবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি, এত বড় যে বৌদ্ধধর্ম, তাহাও কতকটা এই কারণেই এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

হে বন্ধুগণ, এই জন্য আমার সঙ্কল্প এই যে, ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত সত্যসমূহ প্রচার করিবার কাজে শিক্ষালাভ করিবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্য কিছু অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির কাছে আর সবই শক্তিহীন হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছার শক্তি অসীম। তোমরা কি বিশ্বাস কর

না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ প্রচার কর, প্রচার কর; জগৎ এই-সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তাহার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হইতেছে; তাহাদিগকে শেখানো হইয়াছে—তাহারা কিছুই নয়। সর্বত্র জনসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখানো হইয়াছে—ক্রমশঃ তাহারা সত্যসত্যই পশুস্তরে নামিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক; তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে—নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন; সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তরবারি তাঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; তিনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী।

অতএব আত্মবিশ্বাসী হও। ইংরেজ জাতির সঙ্গে তোমাদের এত প্রভেদ কিসে?তাহারা তাহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্তব্যজ্ঞান ইত্যাদির কথা যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিয়াছি, উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ কোথায়। প্রভেদ এই—ইংরেজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা বিশ্বাসী নও। ইংরেজ বিশ্বাস করে—সে যখন ইংরেজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। এই বিশ্বাসবলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই—কাজেই তোমরা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ। অতএব আত্মবিশ্বাসী হও।

আমাদের এখন প্রয়োজন—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই-সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়েকাণ্ড—সব আসিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কিছু মহৎ তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলি আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহের মত পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন। কোন বিষয় সত্য কি অসত্য—জানিতে হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এইঃ উহা তোমাকে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে কিনা; যদি করে তবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর—উহাতে প্রাণ নাই, উহা কখনও সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ, সত্যই পবিত্রতা-বিধায়ক, সত্যই জ্ঞানস্বরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, হৃদয়ে বল দেয়। এই-সকল রহস্যময় গুহ্য মতে কিছু সত্য থাকিলেও সাধারণতঃ উহা মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। আমাকে বিশ্বাস কর, সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বুঝিয়াছি। আমি ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, এদেশের প্রায় সকল গুহা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, হিমালয়েও বাস করিয়াছি। এমন অনেককে জানি, যাহারা সারা জীবন সেখানে বাস করিতেছে। আমি ঐ-সকল গুহ্য মত সম্বন্ধে এই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐগুলি মানুষকে কেবল দুর্বল করিয়া দেয়। আর আমি আমার স্বজাতিকে ভালবাসি; তোমরা তো এখনই যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ, তোমাদিগকে আর দুর্বলতর—হীনতর হইতে দেখিতে পারি না। অতএব তোমাদের কল্যাণের জন্য এবং সত্যের জন্য, আমার স্বজাতির যাহাতে আর অবনতি না হয় সেজন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছিঃ আর না, অবনতির পথে আর অগ্রসর হইও না—যতদূর গিয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে।

এখন বীর্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই-সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদ্রূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য অতি সহজ। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য-সমূহ অবলোকন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।

আর একটি কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে। লোকে স্বদেশহিতৈষিতার আদর্শের কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাস করি। স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিষ প্রয়োজন প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই-সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে?এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ

পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে, তাহারা অবশ্য এ-কথা জান। ধর্মমহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস-স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর কে লয়?

ইহাই স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান। মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? দেশবাসীকে গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি?—কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, 'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু—আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে একবিন্দু বিচলিত হন না।[১১] সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমার কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার?তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্বতের গুহায় গিয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়তো শত শত বৎসর যাবৎ উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তার এমনই শক্তি।

আর এক কথা—আমার আশঙ্কা হয়, তোমাদের বিলম্ব হইতেছে; হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-সমুদ্রের পারে লইয়া যাইতেছে। ইহার সহায়তায় অনেক শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানব জীবন-সমুদ্রের অপর পারে অমৃতধামে নীত হইয়াছে। আজ হয়তো তোমাদের নিজ-দোষেই উহাতে দু-একটি ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিষ অপেক্ষা যে-জিনিষ আমাদের অধিক কাজে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই ঐ ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমরা বন্ধ করিতে না পারি, তবে মরিতে হইবে। আমরা আমাদের বুদ্ধিসহায়ে ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিব, কিন্তু কখনই উহার নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না। আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ তোমরা দেবতাদের বংশধর, তোমরা মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের সন্তান। তোমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক। তোমাদিগকে কি নিন্দা করিব বা গালি দিব?—কখনই নয়। হে আমার সন্তানগণ, তোমাদের নিকট আমার সমুদয় পরিকল্পনা বলিতে আসিয়াছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি না শোন, এমন কি আমাকে ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব—আমরা সকলে ডুবিতেছি। এই জন্যই আমি তোমাদের ভিতর তোমাদেরই একজন হইয়া তোমাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ডুবিতেই হয়, তবে আমরা যেন সকলে একসঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারও প্রতি যেন কটূক্তি প্রয়োগ না করি।

ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা

[মান্দ্রাজে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা]

আমাদের জাতি ও ধর্মের অভিধা বা সংজ্ঞা-স্বরূপ একটি শব্দ খুব চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ‘হিন্দু’ শব্দটি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। ‘বেদান্তধর্ম’ বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা বুঝাইবার জন্য এই শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধু-নদকে ‘হিন্দু’ বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় যেখানে ‘স’ আছে, প্রাচীন পারসীক ভাষায় তাহাই ‘হ’-রূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সিন্ধু হইতে ‘হিন্দু’ হইল। আর তোমরা সকলেই জান, গ্রীকগণ ‘হ’ উচ্চারণ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা একেবারে ‘হ’ টিকে উড়াইয়া দিল—এইরূপে আমরা ‘ইণ্ডিয়ান’ নামে পরিচিত হইলাম।

এখন কথা এই, প্রাচীনকালে এই শব্দের অর্থ যাহাই থাকুক, উহা সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসিগণকেই বুঝাক বা যাহাই বুঝাক, বর্তমানে এই শব্দের আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ এখন আর সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসিগণ একধর্মাবলম্বী নহে। এখানে এখন আসল হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান, কিছু বৌদ্ধ ও জৈন বাস করিতেছেন। ‘হিন্দু’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইঁহাদের সকলকেই হিন্দু বলিতে হয়, কিন্তু ধর্মহিসাবে ইঁহাদের সকলকে হিন্দু বলা চলে না। আর আমাদের ধর্ম যেন নানা মত, নানা ভাব এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি—এইসব একসঙ্গে রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের একটা সাধারণ নাম নাই, একটা মণ্ডলী নাই, একটা সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই। এই কারণে আমাদের ধর্মের একটি সাধারণ বা সর্ববাদিসম্মত নাম দেওয়া বড় কঠিন। বোধ হয়, একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, আমরা সকলেই আমাদের শাস্ত্র—বেদে বিশ্বাসী। এটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে-ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে ‘হিন্দু’ বলিবার অধিকার নাই।

তোমরা সকলেই জান, এই বেদসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে নানাবিধ যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে, উহাদের মধ্যে অধিকাংশই আজকাল প্রচলিত নাই। জ্ঞানকাণ্ডে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ—উহা ‘উপনিষদ্’ বা ‘বেদান্ত’ নামে পরিচিত। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী আচার্য ও দার্শনিকগণ—সকলেই উহাকে উচ্চতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় প্রত্যেক দর্শন ও প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই দেখাইতে হয় যে, ঐ দর্শন বা সম্প্রদায় উপনিষদ্-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে সেই দর্শন বা সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং বর্তমানকালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ ‘বৈদান্তিক’ বা ‘বৈদিক’—এই দুইটির মধ্যে যেটি তোমাদের ইচ্ছা বলিলেই ঠিক বলা হইবে। আর আমি ‘বৈদান্তিক ধর্ম’ ও ‘বেদান্ত’ শব্দ দুইটি ঐ অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি।

আর একটু স্পষ্ট করিয়া এইটি বুঝাইতে চাই; কারণ ইদানীং বেদান্তদর্শনের ‘অদ্বৈত’ ব্যাখ্যাকেই ‘বেদান্ত’ শব্দের সমার্থক-রূপে প্রয়োগ করা অধিকাংশ লোকেরই একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে-সকল বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাহাদের অন্যতম মাত্র। উপনিষদের প্রতি অদ্বৈতবাদীর যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও ততটা আছে; এবং অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদের দর্শন বেদান্ত-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতটা দাবী করেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও ততটাই করিয়া থাকেন। দ্বৈতবাদী ও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিও এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের মনে ‘বৈদান্তিক’ ও ‘অদ্বৈতবাদী’ সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহার কিছু কারণও আছে।

যদিও বেদই আমাদের প্রধান শাস্ত্র, তথাপি বেদের পরবর্তী স্মৃতি-পুরাণও আমাদের শাস্ত্র; কারণ সেগুলিতে বেদেরই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এগুলি অবশ্য বেদের মত প্রামাণিক নহে। আর ইহাও শাস্ত্রবিধান যে, যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির মতই গ্রাহ্য হইবে এবং স্মৃতির মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন আমরা দেখিতে পাই—অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামী আচার্যগণের ব্যাখ্যায় প্রমাণরূপে উপনিষদ্ অধিক পরিমাণে উদ্বৃত হইয়াছে। কেবল যেখানে এমন বিষয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা শ্রুতিতে কোনরূপে পাওয়া যায় না, এমন অল্পস্থলেই কেবল স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য মতবাদিগণ কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন; যতই আমরা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের পর্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহাদের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্য শ্রুতির তুলনায় এত অধিক যে, বৈদান্তিকের নিকট তাহা আশা করা উচিত নয়। বোধ হয়, ইঁহারা স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণের উপর এত অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন যে, কালে অদ্বৈতবাদীই খাঁটি বৈদান্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ‘বেদান্ত’ শব্দ দ্বারা ভারতীয় ধর্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর বেদান্ত যখন বেদ, তখন ইহা সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক, হিন্দুরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন যে, বেদের কিছু অংশ এক সময়ে, আবার এবং কিছু অংশ অন্য সময়ে লিখিত হইয়াছে। হিন্দুরা অবশ্য এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সমগ্র বেদ এককালে উৎপন্ন হইয়াছিল, অথবা যদি আমার এরূপ ভাষা-প্রয়োগে কেহ আপত্তি না করেন—বেদ কখনই সৃষ্ট হয় নাই, চিরকালই সৃষ্টিকর্তার মনে উহা ছিল। ‘বেদান্ত’ শব্দে আমি উহাকেই—অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি; ভারতের দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ আমরা বৌদ্ধধর্ম, এমন কি জৈনধর্মের অংশবিশেষও গ্রহণ করিতে পারি—যদি উক্ত ধর্মাবলম্বিগণ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্যে আসিতে সম্মত হন। আমাদের হৃদয় তো যথেষ্ট প্রশস্ত—আমরা তো তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—তাঁহারাই আসিতে অসম্মত। আমরা

তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, বৌদ্ধধর্মের সারভাগ ঐ-সব উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত; এমন কি বৌদ্ধধর্মের নীতি—তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব—কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্তমান। এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি উপনিষদে রহিয়াছে, কেবল অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলি নাই। পরবর্তী কালে ভারতীয় ধর্মচিন্তার যে-সকল পরিণতি হইয়াছে, সেগুলিরও বীজ আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই। সময়ে সময়ে বিনা যুক্তিতে এরূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, উপনিষদে 'ভক্তি'র আদর্শ নাই। যাঁহারা উপনিষদ্ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন—এ অভিযোগ মোটেই সত্য নহে। অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক উপনিষদেই যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়, যাহা পরবর্তী কালে পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে বিশেষরূপে পরিণত হইয়া ফলপুষ্পশোভিত মহীরূহের আকার ধারণ করিয়াছে, উপনিষদে সেগুলি মাত্র বীজভাবে বর্তমান। উপনিষদে যেন ঐগুলি চিত্রের প্রথম রেখাপাত অথবা কাঠামোরূপে বর্তমান। কোন না কোন পুরাণে ঐ চিত্রগুলি পরিস্ফুট করা হইয়াছে, কঙ্কালসমূহে মাংস-শোণিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্বভাবের খনিস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। ভালভাবে উপনিষদের জ্ঞান অর্জন করেন নাই, এরূপ কয়েকজন ব্যক্তি প্রমাণ করিবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভক্তিবাদ বিদেশ হইতে আগত; কিন্তু তোমরা সকলেই জান, তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তোমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, সেটুকু সবই উপনিষদের কথা কি, সংহিতাতেই রহিয়াছে—উপাসনা প্রেম ভক্তিতত্ত্ব—যাহা কিছু আবশ্যক, সবই রহিয়াছে; কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। সংহিতা ভাগে স্থানে স্থানে ভীতি-প্রসূত ধর্মের চিহ্ন পাওয়া যায়। সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে দেখা যায়, উপাসক—বরুণ বা অন্য কোন দেবতার সম্মুখে ভয়ে কাঁপিতেছে; স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা নিজদিগকে পাপী ভাবিয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছে; কিন্তু উপনিষদে এ-সকল বর্ণনার স্থান নাই। উপনিষদে ভয়ের ধর্ম নাই; উপনিষদের ধর্ম—প্রেমের, উপনিষদের ধর্ম—জ্ঞানের।

এই উপনিষদ্‌সমূহই আমাদের শাস্ত্র। এইগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখিতে পাই, আমরা শতকরা নব্বই জন পৌরাণিক আর বাকী শতকরা দশজন বৈদিক—তাহাও হয় কিনা সন্দেহ। আরও দেখিতে পাই—আমাদের মধ্যে নানাবিধ অত্যন্ত-বিরোধী আচার বিদ্যমান; দেখিতে পাই—আমাদের সমাজে এমন সব ধর্মমত রহিয়াছে, যেগুলির কোন প্রমাণ হিন্দুদের শাস্ত্রে নাই। আর শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই এবং দেখিয়া আশ্চর্য হই যে, আমাদের দেশে অনেক স্থলে এমন সব প্রথা প্রচলিত আছে, যেগুলির প্রমাণ বেদ স্মৃতি পুরাণ কোথাও নাই—সেগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচারমাত্র। তথাপি প্রত্যেক অজ্ঞ গ্রামবাসীই মনে করে, যদি তাহার গ্রাম্য আচারটি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম ও এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও সে বুঝিতে পারে না—সে যাহা করিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই! তাহার পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠে যে, ঐ-সকল আচার পরিত্যাগ করিলে তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং সে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইবে, মানুষের মত মানুষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ আর এক অসুবিধা—আমাদের শাস্ত্র অতি বৃহৎ ও অসংখ্য। পতঞ্জলি-প্রণীত 'মহাভাষ্য' নামক শব্দশাস্ত্রে পাঠ করা যায়, সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। সেগুলি গেল কোথায়, কেহই জানে না। প্রত্যেক বেদ সম্বন্ধেই এইরূপ। এই-সকল গ্রন্থের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে, সামান্য অংশমাত্র আমাদের নিকট অবশিষ্ট আছে। এক এক ঋষি-পরিবার এক এক শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই-সকল পরিবারের মধ্যে অধিকাংশেরই হয় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বংশলোপ হইয়াছে, অথবা বৈদেশিক অত্যাচারে বা অন্য কারণে তাঁহাদের বিনাশ ঘটিয়াছে। আর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে-বেদের শাখাবিশেষ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক; কারণ যাহারা কিছু নূতন কিছু প্রচার করিতে চায় বা বেদের বিরোধী কোন বিষয় সমর্থন করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে এই যুক্তিটি চরম অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। যখনই ভারতে শ্রুতি ও দেশাচার লইয়া তর্ক উপস্থিত হয় এবং যখনই দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, এই দেশাচারটি শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তখন অপর পক্ষ এই উত্তর দিয়া থাকে, 'না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, উহা শ্রুতির সেই-সকল শাখায় ছিল, যেগুলি এখন লোপ পাইয়াছে। ঐ প্রথাটিও বেদসম্মত।' শাস্ত্রের এই-সকল নানাবিধ টীকা-টিপ্পনীর ভিতর কোন সাধারণ সূত্র বাহির করা অবশ্যই বিশেষ কঠিন। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই-সকল নানাবিধ বিভাগ ও উপবিভাগের একটি সাধারণ ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। অট্টালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নিশ্চয় একটি সাধারণ নকশা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে আমাদের 'ধর্ম' বলি, সেই আপাতবিশৃঙ্খল মতগুলির নিশ্চয় কোন সাধারণ ভিত্তি আছে; তাহা না হইলে উহা এতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

আবার আমাদের ভাষ্যকারদিগের ভাষ্য আলোচনা করিতে গেলে আর এক বাধা উপস্থিত হয়ঃ অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার সোজাসুজি অর্থ করেন; কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন উহার শব্দার্থ বিকৃত করিয়া উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন। ভাষ্যকার নিজ মনোমত অর্থ বাহির করিবার জন্য সময়ে সময়ে 'অজা' (জন্মরহিত) শব্দের অর্থ 'ছাগী' করিয়াছেন—কি অদ্ভুত পরিবর্তন! দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরাও এইরূপ, এমন কি আরও বিকৃতিভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে তাঁহারা দ্বৈতপর শ্রুতি পাইয়াছেন, সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদের কথা আসিয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সেই-সকল শ্রুতির যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাষা এত জটিল—বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র এত সুপরিণত যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের যদি খেয়াল হয়, তবে তিনি যে-কোন যে-কোন অর্থহীন উক্তিকেও যুক্তিবলে এবং শাস্ত্র ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন। উপনিষদ্ বুঝিবার পক্ষে এই-সকল বাধাবিঘ্ন আছে। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমি শুধু অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টরূপে প্রথমে উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিতে শিখিয়াছি। আমি এ-বিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-

সকল শাস্ত্রবাক্য পরস্পরবিরোধী নহে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রুতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত আর উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, ঐগুলির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। আমি এই-সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা—উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈতভাবের অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সেগুলি সমাপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং এখন এই মহাপুরুষের জীবনালোকে আমি দেখিতেছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনে উভয়েরই বিশেষ স্থান আছে। দ্বৈতবাদী থাকিবেই—অদ্বৈতবাদীর ন্যায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না, একটি অপরটির পরিণতি; একটি যেন কাঠামো, অপরটি ছাদ; একটি যেন মূল, অপরটি ফল।

আর উপনিষদের শব্দার্থ বিকৃত করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়; কারণ আমি দেখিতে পাই, উহার ভাষাই অপূর্ব। শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে উহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, মানবজাতির মুক্তিপথ-প্রদর্শক ধর্মজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান্ ভাবের যেমন অতি অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমন নাই। এখানেই মানবমনের সেই ব্যক্তিভাবাপন্ন বৈশিষ্ট্য—সেই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হিন্দুমন পরিপূর্ণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

অন্যান্য সকল জাতির ভিতরেই এই মহান্ ভাবের চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমর বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্‌মন্ত্রে বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব অতি গম্ভীরভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে-সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ—অনন্ত বিস্তার—অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাঁহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।

উপনিষদের ভাষা নূতন মূর্তি ধারণ করিল—উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, উহা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অর্ধ পথে গিয়াই ক্ষান্ত হইয়া তোমাকে কেবল এক ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস দেখাইয়া দেয়, তথাপি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকে না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে?—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

১২

সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই বিদ্যুৎও সেই স্থানকে আলোকিত করিতে পারে না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি?

পৃথিবীর সমগ্র দার্শনিক ভাবের পূর্ণতর চিত্র আর কোথায় পাইবে? হিন্দুজাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির মুক্তির সামগ্রিক কল্পনার সারাংশ যেমন অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, যেমন অপূর্ব রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, তেমন আর কোথায় পাইবে?

‘দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥’১৩

একই বৃক্ষের উপর সুন্দরপক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী রহিয়াছে—উভয়েই পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন; তন্মধ্যে একটি সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটি না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্নশাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখনও মিষ্ট কখনও-বা কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে এবং সেই কারণে কখনও সুখী, কখনও-বা দুঃখী হইতেছে; কিন্তু উপরের শাখার পক্ষীটি স্থির গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট—সে ভালমন্দ কোন ফলই খাইতেছে না, সে সুখ-দুঃখ উভয়েই উদাসীন—নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া আছে। এই পক্ষিদ্বয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মানবাত্মার ইহাই যথার্থ চিত্র। মানুষ ইহজীবনের স্বাদু ও কটুফল ভোজন করিতেছে—সে কাঞ্চনের অন্বেষণে মত্ত—সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবমান, সংসারের ক্ষণিক বৃথা সুখের জন্য মরিয়া হইয়া পাগলের মত ছুটিতেছে।

অন্য আর এক স্থলে উপনিষদ্ সারথি ও তাহার অসংযত দুষ্ট অশ্বের সহিত মানবের এই ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণের তুলনা করিয়াছেন। ১৪ মানুষ এইরূপে জীবনের বৃথা সুখানুসন্ধান-চেষ্টায় ছুটিতেছে। জীবনের ঊষাকালে মানুষ কত সোনার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারে, সেগুলি স্বপ্নমাত্র—বার্ধক্যে সে তাহার অতীত কর্মসমূহেরই রোমন্থন করিতে থাকে, পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, কিন্তু কিসে এই ঘোর সংসারজাল হইতে বাহির হইবে, তাহার কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। ইহাই মানুষের নিয়তি। কিন্তু

সকল মানুষেরই জীবনে সময়ে সময়ে এমন শুভ মুহূর্ত আসিয়া থাকে—গভীরতম শোকে, এমন কি গভীরতম আনন্দের মধ্যেও মানুষের এমন শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সেই সূর্যালোক-অবরোধকারী মেঘের খানিকটা যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া যায়। তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য সেই সর্বাতীত সত্তার চকিত দর্শন লাভ করি; দূরে, দূরে—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের বহু দূরে—এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ ও সুখদুঃখ হইতে অনেক দূরে—দূরে, দূরে—প্রকৃতির পরপারে—ইহলোকে বা পরলোকে আমরা যে সুখভোগের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হইতে বহু দূরে, বিত্তৈষণা লোকৈষণা প্রজৈষণা হইতে বহু দূরে—মানুষ ক্ষণিকের জন্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে, সে তখন বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত অপর পক্ষীটির শান্ত ও মহিমময় রূপ অবলোকন করে; সে দেখে—ঐ পক্ষীটি স্বাদু কটু কোন ফল ভক্ষণ করিতেছে না—নিজ মহিমায় নিজে বিভোর, আত্মতৃপ্ত—যেমন গীতায় উক্ত হইয়াছেঃ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ‖

যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার আর কোন কার্য অবশিষ্ট থাকে না। তিনি আর কেন বৃথা কার্য করিয়া সময় কাটাইবেন?

একবার চকিতভাবে দর্শন করিয়া মানুষ আবার ভুলিয়া যায়, আবার সংসারবৃক্ষে স্বাদু ও তিক্ত ফল ভোজন করিতে থাকে—তখন আর তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না। আবার হয়তো কিছুদিন পরে সে আর একবার পূর্বের ন্যায় চকিত দর্শন লাভ করে এবং যতই আঘাত পায়, ততই সেই নিম্নশাখাস্থিত পক্ষী উপরের পক্ষীর নিকটবর্তী হইতে থাকে। যদি সৌভাগ্যক্রমে সে ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পায়, তবে সে তাহার সঙ্গী—তাহার প্রাণ—তাহার সখা সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবর্তী হইতে থাকে। আর যতই সে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, ততই দেখে উপরের সেই পক্ষীর দেহজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুর্দিকে খেলা করিতেছে; যতই সমীপবর্তী হয়, ততই তাহার রূপান্তর হইতে থাকে। ক্রমশঃ যতই সে নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে, ততই দেখে—সে যেন মিলাইয়া যাইতেছে; অবশেষে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে—তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না, পত্ররাশির ভিতর সঞ্চরণশীল পক্ষীটি শান্ত গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট অপর পক্ষীর প্রতিবিম্বমাত্র। তখন সে জানিতে পারে—সে নিজেই ঐ উপরের পক্ষী, সে সর্বদাই শান্তভাবে অবস্থিত ছিল; ঐ মহিমা তাহারই। তখন আর কোন ভয় থাকে না, তখন সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া ধীর শান্তভাবে অবস্থান করে। এই রূপকের মাধ্যমে উপনিষদ্ তোমাদিগকে দ্বৈতভাব হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত অদ্বৈতভাবে লইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের এই অপূর্ব কবিত্ব, মহত্ত্বের চিত্র, মহোচ্চ ভাবসমূহ দেখাইবার জন্য শত শত উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বক্তৃতায় আমাদের আর সময় নাই। তবে আর একটি কথা বলিব, উপনিষদের ভাষা, ভাব—সব-কিছুরই ভিতর কোন জটিলতা নাই, উহার প্রত্যেকটি কথাই তরবারি-ফলকের মত, হাতুড়ির ঘায়ের মত সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেকটি সুরের একটা শক্তি আছে, প্রত্যেকটি তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয়। কোন ঘোরফের নাই, একটিও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটিও জটিল বাক্য নাই যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক-বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ভাবটিকে ক্রমাগত জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টি একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল, তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না—উপনিষদে এ-ধরনের চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যে-জাতি তখনও তাহার জাতীয় তেজবীর্য একবিন্দুও হারায় নাই। প্রতি পৃষ্ঠা ইহা আমাদিগকে তেজবীর্জের কথা বলিয়া থাকে।

এই বিষযটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, সমগ্র জীবনে আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপনিষদ্ বলিতেছেন—হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য হও।

আমার মনে সুদূর অতীতের সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে। আমি যেন দেখিতেছি—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন; সম্রাট্ সন্ন্যাসীর অপূর্ব জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ-মানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া গ্রীসে যাইতে অস্বীকার করিলেন; তখন সম্রাট্ নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিযা বলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ কথা বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বল নাই। আমাকে কে বধ করিতে পারে? ঐহিকজগতের সম্রাট্, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অব্যয়। আমি কখনও জন্মাই নাই, কখনও মরিবও না! আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ! তুমি শিশু, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য।

হে বন্ধুগণ, হে স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই উপনিষদ্ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের জন্য অশ্রুবিসর্জন করিয়া থাকি; কারণ উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই

আমাদের চাই। শক্তি আমাদের বিশেষ আবশ্যক। কে আমাদিগকে শক্তি দিবে? আমাদিগকে দুর্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্পও যথেষ্ট আছে। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যেগুলি পৃথিবীর গ্রন্থাগারসমূহের তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ করিতে পারে—এ-সকলই আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে দুর্বল করিতে পারে, তাহাও বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। বোধ হয় যেন বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—কিভাবে দুর্বল হইতে দুর্বলতর হওয়া যায়। অবশেষে আমরা কেঁচোর মত হইয়া পড়িয়াছি—এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগকে পদদলিত করিতেছে। বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমার শোণিতের সম্বন্ধ, তোমাদের জীবনে মরণে আমার জীবনমরণ। তাই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের প্রয়োজন—শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্‌সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। উহা সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতকে উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিকমুক্তি বা স্বাধীনতা—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহা পরিত্রাণের (salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।

আর উপনিষদ্ দেখাইয়া দেন যে, ঐ মুক্তি তোমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মতটি উপনিষদের আর এক বিশেষত্ব। তুমি দ্বৈতবাদী, তা হউক; কিন্তু তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি কাজের দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র। আধুনিক পরিণামবাদীরা (Evolutionists) যাহাকে ক্রমবিকাশ (Evolution) ও পূর্বানুকৃতি (Atavism) বলিয়া থাকেন, রামানুজের সঙ্কোচ-বিকাশের মতও ঠিক সেইরূপ। আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পূর্ণতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যেন সঙ্কোচপ্রাপ্ত হন, তাঁহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাব ধারণ করে; সৎকর্ম ও সৎচিন্তা দ্বারা উহা পুনরায় বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহার স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রভেদ এইটুকু যে, অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করেন, আত্মার নয়। মনে কর, একটি যবনিকা রহিয়াছে, আর ঐ যবনিকাটিতে একটি ছোট ছিদ্র আছে। আমি ঐ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই মহতী জনতাকে দেখিতেছি। প্রথমে কেবল কয়েকটি মুখ দেখিতে পাইব। মনে কর, ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ছিদ্রটি যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমি এই সমবেত জনতার অধিকতর অংশ দেখিতে পাইব। বড় হইতে হইতে শেষে ছিদ্রটি যবনিকার সমান হইয়া যাইবে। তখন তোমাদের ও আমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। এস্থলে তোমাদের বা আমার কোন পরিবর্তন হয় নাই; যাহা কিছু পরিবর্তন কেবল যবনিকাতেই ঘটিয়াছে। তোমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একরূপই ছিলে, কেবল যবনিকাটির পরিবর্তন হইল। পরিণাম সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর মতঃ প্রকৃতির পরিণাম ও অন্তরাত্মার প্রকাশ। আত্মা কোনরূপে সঙ্কুচিত হইতে পারে না, ইহা অপরিণামী ও অনন্ত। আত্মা যেন মায়ারূপ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছিল—যতই এই মায়ার আবরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, ততই আত্মা সহজাত স্বাভাবিক মহিমায় প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশ অধিকতর অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

ভারতের নিকট এই মহান্ তত্ত্বটি শিখিবার জন্য পৃথিবীর লোক অপেক্ষা করিতেছে; তাহারা যাহাই বলুক, যতই নিজেদের গরিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করুক, ক্রমশঃ যতই দিন যাইবে তাহারা বুঝিবে, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া কোন সমাজই টিকিতে পারে না। তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না পূর্বে সব-কিছুকে স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া মনে করিবার রীতি ছিল, কিন্তু এখন সব-কিছু ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে? কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মাদের চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্যন্ত প্রাচীন নিয়ম ছিল—সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া। আধুনিক নিয়ম কি? আধুনিক বিধান বলে—শরীর স্বভাবতই সুস্থ, নিজ প্রকৃতিবশে উহা ব্যাধির উপশম করিযা থাকে। ঔষধ বড়জোর শরীরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে, তাহা সঞ্চয় করিতে সাহায্য করে। অপরাধী সম্বন্ধে এই নববিধান কি বলে? নূতন বিধান স্বীকার করিয়া থাকে—কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তাহার মধ্যে যে-দেবত্ব আছে, তাহার কখনও পরিবর্তন হয় না; সুতরাং অপরাধিগণের প্রতি আমাদের তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত। এখন পূর্বের ভাব সব বদলাইয়া যাইতেছে। এখন কারাগারকে অনেক স্থলে ‘সংশোধনাগার’ বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব আছে—এই ভারতীয় ভাবটি ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে। আর কেবল তোমাদের শাস্ত্রেই ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে; অন্যান্য জাতিকে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্তন আসিবে, আর কেবল দোষ প্রদর্শনরূপ পুরাতন ভাবটি লোপ পাইবে। এই শতাব্দীর মধ্যেই ঐ ভাবগুলি চরম আঘাত পাইবে। এখন লোকে আমার সমালোচনা করিতে পারে। ‘জগতে পাপ নাই’—আমি নাকি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি; জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকে আমাকে এজন্য গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এখন যাহারা আমায় গালি দিতেছে, তাহাদেরই বংশধরগণ আমাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিবে যে—আমি অধর্ম প্রচার করি নাই, ধর্মই প্রচার করিয়াছি। অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার না করিয়া জ্ঞানালোকে বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।

আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর একটি মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব। অতি প্রাচীন কালে এক বস্তু ও আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য করা হইত, এখন অতি দ্রুত তাহা চলিয়া যাইতেছে। তড়িৎ ও বাষ্প-শক্তি জগতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ আমরা হিন্দুগণ এখন আর আমাদের দেশ ছাড়া অন্য সব দেশকে কেবল ভূত-প্রেত ও রাক্ষস-পিশাচে পূর্ণ বলি না, এবং খ্রীষ্টান দেশের লোকেরাও বলেন না যে, ভারতে কেবল নরমাংসভোজী ও অসভ্য মানুষের বাস।

আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন অবস্থায় প্রয়োগ করি না কেন, দেখা যায়, ঐ তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। অজ্ঞতাবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই

আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই। যখনই আমরা পরস্পরকে ঠিকমত জানিতে পারি, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, হইবেই তো—কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের একত্ব-ভাব স্বভাবতই আসিয়া থাকে।

রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বিপুলায়তন হইতেছে, বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্ব-ভাব বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

বিজ্ঞানেও জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উদার ভাব এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে—সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড় সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাক; তুমি আমি, চন্দ্র সূর্য, এমন কি আর যাহা কিছু—সবই এই মহান্ সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত আর চৈতন্যদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল অপরিণামী অখণ্ড সত্তা—অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। নৈতিক আদর্শের জন্যও জগৎ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে—তাহাও আমাদের গ্রন্থে রহিয়াছে। নীতিতত্ত্বের ভিত্তি সম্বন্ধেও জগৎ জানিতে উৎসুক, তাহাও আমাদের শাস্ত্র হইতেই পাইবে।

ভারতে—আমাদের কি প্রয়োজন? বৈদেশিকগণের যদি এই-সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের বিশগুণ প্রয়োজন আছে। কারণ আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি—শত শত শতাব্দী যাবৎ এই লইয়া বিবাদ করিতেছি—তিলক ধারণ এইভাবে করিতে হইবে কি ঐভাবে। কোন মানুষের দৃষ্টিতে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কিনা—এই ধরনের গুরুতর সমস্যার উপর বড় বড় বই লিখিতেছি। যে-জাতির মস্তিস্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, সে-জাতির নিকট হইতে বড় রকমের একটা কিছু আশা করা যায় না, এরূপ আচরণে আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখনও কখনও লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি তাহা করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক কিছু, কিন্তু কাজে পরিণত করি না। এইরূপে তোতাপাখির মত কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিস্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি—কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। অনেক সময় লোকে আমার অদ্বৈতমত-প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এখন কেবল আবশ্যকঃ আত্মার এই অপূর্ব তত্ত্ব—অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধতা ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে শুনাইতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা অবশ্যই পুরাণে রানী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। এই উপাখ্যানের মধ্যে মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। ইংরেজ 'পাপ, পাপী' ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে; বাস্তবিক যদি সকল ইংরেজ নিজেদের পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে এ-কথা বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে—সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে; সে নিজের মহত্ত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে—সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে সূর্যালোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে। যদি সে ধর্মযাজকদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিত—সে ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাপী মাত্র, অনন্ত কাল ধরিয়া তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ তাহাকে যেরূপ দেখিতেছ, সে কখনও সেরূপ হইত না। এইরূপে আমি প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতেরা যাহাই বলুক এবং তাহারা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মভাব কখনও বিলুপ্ত হয় না, উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি। তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?— আমরা ইংরেজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, হাজারগুণ কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরেজ নরনারী যখন আমাদের ধর্মতত্ত্ব একটু-আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহাতে মাতিয়া উঠে, আর যদিও তাহারা রাজার জাতি, তথাপি স্বদেশের লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ

করিতে পার? কথাটি একবার ভাবিয়া দেখ। আর কেন তোমরা ইহা করিতে পার না কেন?তোমরা কি জান না বলিয়া যে করিতে পার না—তাহা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিতে পার না। যতটা জানিলে তোমাদের পক্ষে কল্যাণ, তোমরা তাহা অপেক্ষা বেশী জান—ইহাই তোমাদের মুশকিল। তোমাদের রক্ত পাতলা, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিলতাপূর্ণ ও অসাড়, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরের এ অবস্থা পরিবর্তন করিতে হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নয়। গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাজের সময় আর তোমাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; আর 'সংস্কার' নামটা পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কমতি আছে? জ্ঞানের কমতি কোথায়? তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্বল, অতি দুর্বল—তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শতাব্দী যাবৎ অভিজাত সম্প্রদায়, রাজা ও বৈদেশিকরা অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদেরই স্বজনবর্গ তোমাদের সব শক্তি হরণ করিয়াছে। তোমরা এখন পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের মত হইয়াছ। কে আমাদিগকে এখন বল দিবে? আমি বলিতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য।

এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, আমি সর্বশক্তিমান্, আমি সর্বজ্ঞ।' অতএব এই আশাপ্রদ মুক্তিপ্রদ বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ কর; বলিও না—আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। আত্মায় বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার মত বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমার ইচ্ছা—তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক, তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ- আলোড়নকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্বপ্রকার অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও; আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তি লাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এ সবই উপনিষদে রহিয়াছে।

এ যে শুধু সন্ন্যাসীর জন্য ছিল, এ যে রহস্য-বিদ্যা! প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চা করিতেন! শঙ্কর একটু সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখনও যায় নাই যে, উপনিষদে কেবল সন্ন্যাসীদের আরণ্যক জীবনের কথাই আছে। আমি তোমাদিগকে সেদিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা—একমাত্র প্রামাণিক টীকা 'গীতা'— চিরকালের মত রচিত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকা-টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপবিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে-কাজই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎসজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যায়নাগারে—সর্বত্র এই-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—সে যে-কাজই করুক না কেন, সে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

আর ভয়ের কোন কারণ নাই। উপনিষদ্-নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালা প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; অনন্ত পথ আছে—ধর্ম অনন্ত, ধর্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহই যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি ইত্তম। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অতি সামান্য কর্মও অদ্ভুত ফল দিয়া থাকে; অতএব যে যতটুকু পারে করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র।

আর ইহার ফল হইবে এই যে, জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু! তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে। জাতবিভাগ ভাল জিনিষ। জীবনসমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। লোকে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—তুমি যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎসজীবী; কিন্তু তোমার ভিতর যে-ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতর সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এ কথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি এই নারীর বা ঐ ছেলেটির মুক্তির জন্য সাধনা করিয়া দিব, তবে সেটি অতি অন্যায়, অত্যন্ত ভুল কথা। আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'আপনি বিধবাদিগের ও

নারীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি চিন্তা করেন?' এ প্রশ্নের আমি শেষ বারের মত উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছে? আমি কি নারী যে, আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? তুমি কি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক নারীর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর? তফাত হও! তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে। কি আপদ! যথেচ্ছাচারী তোমরা ভাবিতেছ—সকলের জন্য সব করিতে পার! তফাত! ভগবান্ সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করিতেছ?

হে নাস্তিকগণ, তোমরা ঈশ্বরের উপর কর্তৃত্ব করিতে সাহস কর কিসে? কারণ তোমরা কি জান না, প্রত্যেকটি আত্মাই পরমাত্মস্বরূপ? নিজেদের চরকায় তেল দাও, তোমাদের ঘাড়ে এক বোঝা কর্ম রহিয়াছে। হে নাস্তিকগণ, সমগ্র জাতি তোমাদিগকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, সমাজ তোমাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, মূর্খেরা তোমাদের সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নন; ইহলোকে বা পরলোকে নিশ্চয়ই তোমাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইবে।

প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তোমরা কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদের, যদি সৌভাগ্য হয় তবে স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে ধন্য হইবে। নিজেদের খুব বড় কিছু ভাবিও না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনাবোধে ঐটুকু কর। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখি, নিজ মুক্তির জন্য তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের পূজা করিব—ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। কতকগুলি লোক যে দুঃখ পাইতেছে, তাহা তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে, কারণ তোমার আমার জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই-সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পার—এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়িতে থাকে, তোমরাও সেইভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক—আলোক লইয়া আইস। প্রত্যেকে যেন জ্ঞানের আলো পায়; যতদিন না সকলেই ভগবান্ লিভ করে, ততদিন যেন তোমাদের কাজ শেষ না হয়। দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরও অধিক আলোক লইয়া যাও, কারণ দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোক প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া যাও, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরও অধিক আলোক লইয়া যাও, কারণ আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল। এইভাবে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু প্রভুই করিবেন, কারণ ভগবানই বলিয়াছেনঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে; তুমি এমনভাবে কর্ম করিও না, যাহাতে তোমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়; অথচ কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে এমন মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করিবার শক্তি দান করেন।

ভারতীয় মহাপুরুষগণ

[মান্দ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা]

ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই প্রাচীনকালের কথা উদিত হইতেছে, ইতিহাস যে-কালের কোন ঘটনার উল্লেখ করে না এবং ঐতিহ্য যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার হইতে রহস্য-উদ্‌ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—বাস্তবিক হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ অসংখ্য মহাপুরুষের জন্ম দেওয়া ব্যতীত আর কি করিয়াছে? সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যুগপ্রবর্তক শ্রেষ্ঠ আচার্যের কথা অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব।

প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিদ সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমটি সনাতন সত্য; দ্বিতীয়টি প্রথমোক্তের ন্যায় ততদূর প্রামাণিক না হইলেও বিশেষ দেশকালপাত্রে প্রযোজ্য। সনাতন সত্য —জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য—স্মৃতি, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় এবং পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র-বিধান। তাৎপর্য এই যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাঁহার চরমলক্ষ্য-বিষয়ক মুখ্য তত্ত্বসমূহের বিশদ বর্ণনা আছে, কেবল গৌণ বিষয়গুলি—যেগুলি উহাদের বিস্তার, সেগুলিই বিশেষভাবে বর্ণনা করা স্মৃতি ও পুরাণের কার্য। সাধারণভাবে উপদেশ দিতে শ্রুতিই পর্যাপ্ত; ধর্মজীবন-যাপনের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিনির্দিষ্ট উপদেশের বেশী আর কিছু বলা যাইতে পারে না, আর কিছু জানিবারও নাই। এ-বিষয় যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্য যে-সকল উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে সেগুলি সবই কথিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই; স্মৃতি বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। শ্রুতির আর একটি বিশেষত্ব আছে। যে-সকল ঋষি শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী, তবে কয়েকজন নারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যথা তাঁহাদের জন্মের সন-তারিখ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা—তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া বলিলেই ভাল হয়—আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যরূপে বেদে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী ও কার্যকলাপই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঙ্গিতমাত্রে সমগ্র জগতকে নাড়া দিতে পারেন, এমন অদ্ভুত মহাশক্তিশালী মনোহরচরিত্র মহাপুরুষগণের পরিচয় পুরাণ বা স্মৃতিতেই আমরা সর্বপ্রথম পাইয়া থাকি—তাঁহাদের চরিত্র এত উন্নত যে, তাঁহাদের উপদেশাবলীও যেন উহার নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের ধর্মে যে-ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। উহাতে ব্যক্তিভাবরহিত অনন্ত সনাতন তত্ত্বসমূহের সঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তিভাবাপন্ন অবতারের কথা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধর্মের মূল—উহাতে কেবল সনাতন তত্ত্বের উপদেশ; বড় বড় অবতার, আচার্য ও মহাপুরুষগণের বিষয় সবই স্মৃতি ও পুরাণে রহিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্মই কোন বিশেষ ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের, মুসলমানধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঐ-সকল ধর্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। যদি কখনও এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ববিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্বল হয়, তবে তাঁহাদের ধর্মরূপ অট্টালিকা ধসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা এই বিপদ এড়াইয়াছি। কোন মহাপুরুষ, এমন কি, কোন অবতার বলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই যে তোমরা ধর্ম মানিয়া চল, তাহা নহে। কৃষ্ণের কথায় বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদানুগত বলিয়াই কৃষ্ণবাক্যের প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের যত প্রচারক হইয়াছেন, তাঁহাদার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা গোড়াতেই এ-কথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সবই বেদে কথিত হইয়াছে; নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে না। তোমরা কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশী অগ্রসর হইতে পার না। বেদ অনেক দিন পূর্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল; এই 'তত্ত্বমসি' বেদে রহিয়াছে। বাকী রহিল কেবল বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে সময়ে সময়ে লোকশিক্ষা। এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা—ইহাই বাকী রহিল; সেইজন্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বজনবিদিত বাণীতে এই তত্ত্বটি যেমন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, আর কোথাও তেমন হয় নাইঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত |
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ‖

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুভাব রক্ষা করিবার জন্য আমি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া থাকি; দুর্নীতি বিনষ্ট করিবার জন্য আমি সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকি, ইত্যাদি।—ইহাই ভারতীয় ধারণা।

ইহা হইতে কি পাওয়া যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, একদিকে সনাতন তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, ঐগুলি স্বতঃপ্রমাণ,—কোনরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করে না, ঋষিগণ—যত বড়ই হউন বা অবতারগণ যত মহিমাসম্পন্নই হউন—তাঁহাদের বাক্যের উপরও ঐগুলি নির্ভর করে না। আমরা এখানে এ-কথা বলিতে পারি যে, ভারতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা বেদান্তকেই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম বলিয়া দাবী করিতে পারি, বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না, উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম সমগ্র মানবজাতি কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশেই আমরা দেখিতে পাই, এখানে কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! একটা ক্ষুদ্র শহরেই দেখিতে পাই, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মহাপুরুষকে নিজেদের আদর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং মহম্মদ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট—এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিভাবে সমগ্র জগতের একমাত্র আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন? অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্যপ্রমাণেই বা সমগ্র নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ধর্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? বৈদান্তিক ধর্মে এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই ইহার প্রমাণ; ইহার নীতিতত্ত্ব মানবজাতির সনাতন আধ্যাত্মিক একত্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাভ করিবার নয়, উহা পূর্ব হইতেই লব্ধ।

অন্যদিকে আবার আমাদের ঋষিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। লোকের কোন না কোন আকারে একটি ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর চাই। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকেই 'ঈশ্বর' করিয়া তুলিল। ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। আমরা জানি, ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা অপেক্ষা—অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য—মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর অপেক্ষা—আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু অপেক্ষা অর্থাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর পূজ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ—জীবন্ত আদর্শ। সেই জন্যই সর্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আমাদের ঋষিগণ ইহা জানিতেন, সেইজন্য তাঁহারা সকল ভারতবাসীর জন্য এই মহাপুরুষ-উপাসনার—এই অবতার-পূজার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেনঃ

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা |
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ||

১৫

মানুষের মধ্যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয়, জানিও আমি সেখানে বর্তমান; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল অবতারকে উপাসনা করিবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু যে-কোন দেশের যে-কোন সাধু-মহাত্মার পূজা করিতে পারে। কার্যতও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খ্রীষ্টানদের চার্চে ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এভাবে উপাসনা করিব না? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম সার্বভৌম। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে সর্বপ্রকার আদর্শকেই উহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারে; জগতে যতপ্রকার ধর্মের আদর্শ আছে, সেগুলিকে এখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর ভবিষ্যতে যে-সকল বিভিন্ন আদর্শ আসিবে, সেগুলির জন্য আমরা ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে পারি। ঐগুলিকে ঐভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, বৈদান্তিক ধর্মই তাহার অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া সবগুলিকে আলিঙ্গন করিয়া লইবে।

ঈশ্বরাবতার-সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই। দ্বিতীয় শ্রেণীর আর এক প্রকার মহাপুরুষ আছেন; বেদে 'ঋষি' শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর আজকাল ইহা একটি চলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে,—ঋষিবাক্যের বিশেষ প্রামাণ্য। আমাদিগকে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি কোন তত্ত্ব 'দর্শন' করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলঃ ধর্মের প্রমাণ কি? বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না—ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেনঃ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

১৬

—মনের সহিত বাক্যও যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ ||

১৭

—সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে।

শত শত যুগ ধরিয়া ইহাই ঋষিদের ঘোষণা। বাহ্য প্রকৃতি আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত জীবন, মানবের চরম লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্বদা পরিণাম হইতেছে, সর্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা সসীম, উহা যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাঙিয়া চুরিয়া যায়। উহা কিরূপে সেই অনন্ত অপরিবর্তনীয় অখণ্ড অবিভাজ্য সনাতন বস্তুর

সংবাদ দিবে?—কখনই দিতে পারে না। আর যখনই মানবজাতি চৈতন্যহীন জড়বস্তু হইতে এই-সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাসই জানে—তাহার ফল কতখানি অশুভ হইয়াছে। তবে ঐ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানলাভ হয়,—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না। ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কি মানুষের সর্বস্ব? কে ইহা বলিতে সাহস করে? আমাদের জীবনে—আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে, হয়তো আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হইল বা আমরা অন্য কোনরূপে আঘাত পাইলাম, অথবা অতিশয় আনন্দের কিছু ঘটিল; এই-সব অবস্থায় সময়ে সময়ে মন যেন একেবারে স্থির হইয়া যায়। অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে, মনটা শান্ত হইয়া যায়, বহির্জগতে অনাসক্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে, ক্ষণকালের জন্য অনন্তের একটু আভাস তখন আমাদের চোখে প্রকাশিত হয়; মন বা বাক্য—কিছুই সেখানে যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে; অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থাকে প্রগাঢ়, স্থায়ী, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত করিতে হইবে। মানুষ শত শত যুগ পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছে—আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বদ্ধ বা সীমিত নহে, এমন কি চেতনা দ্বারাও নহে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, চেতনা সেই অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম মাত্র। চেতনা সত্তার সহিত অভিন্ন নহে, উহা সত্তার একটি অংশ মাত্র। ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতে সমর্থ। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে, কারণ ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটিকে আমি যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিয়া থাকি, বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত। টেবিলটিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ জীবাত্মার অতিচেতন অবস্থায় প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। এই ঋষিত্ব-লাভ দেশ-কাল-লিঙ্গ বা জাতিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছেন যে, এই ঋষিত্ব বংশধরগণের, আর্য-অনার্য—এমন কি ম্লেচ্ছদেরও সাধারণ সম্পত্তি।

বেদের ঋষিত্ব বলিতে ইহাই বুঝায়; আমাদিগকে ভারতীয় ধর্মের এই আদর্শ সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে, জগতের অন্যান্য জাতিও এই আদর্শটি স্মরণ রাখিবেন, তাহা হইলেই বিভিন্ন ধর্মে বিবাদ-বিসংবাদ কমিয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠ করিলেই ধর্ম লাভ হয় না; বা মতমতান্তর ও বচন দ্বারা, এমন কি যুক্তিতর্ক-বিচার দ্বারাও ধর্মলাভ হয় না। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে—ঋষি হইতে হইবে। বন্ধুগণ, যতদিন না তোমাদের প্রত্যেকেই ঋষি হইতেছ, যতদিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষাৎ করিতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভ হয় নাই, জানিবে। যতদিন না অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায়, ততদিন তোমাদের পক্ষে ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র, ততদিন কেবল ধর্মলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, ততদিন পরোক্ষ বিবরণ দিতেছ মাত্র।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ব্রাহ্মণের তর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা করিতে আসেন। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'না, দেখি নাই।' বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার পিতা?' 'না, তিনিও দেখেন নাই।' 'আপনার পিতামহ?' 'বোধ হয়, তিনিও দেখেন নাই।' তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধু, আপনার পিতৃ-পিতামহগণও যাঁহাকে দেখেন নাই, এমন পুরুষ সম্বন্ধে আপনি কিরূপে বিচার দ্বারা অন্যকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?' পৃথিবীর সকলে এইরূপই করিতেছে। বেদান্তের ভাষায় আমাদিগকেও বলিতে হইবেঃ 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

১৮

বাগাড়ম্বর দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয়।

পৃথিবীর সকল জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বেদের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবেঃ তোমাদের বাদ-বিসংবাদ বৃথা; তোমরা যে-ঈশ্বরকে প্রচার করিতে চাও, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বৃথাই তোমার প্রচার; তুমি কি বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না; আর যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাক, তবে তুমি আর বিবাদ করিবে না, তোমার মুখই উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে।

এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। সে যখন ফিরিল, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শিখিয়াছ?' পুত্র বলিল, সে নানা বিদ্যা শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, 'কিছুই শেখ নাই; আবার গুরুগৃহে যাও।' পুত্র আবার গুরুগৃহে গেল; ফিরিয়া আসিলে পিতা পূর্ববৎ প্রশ্ন করিলেন। পুত্রও পূর্ববৎ উত্তর দিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে যাইতে হইল। এবার যখন সে ফিরিল, তখন তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া গিয়াছে। তখন পিতা বলিলেন,

১৯

'বৎস, আজ তোমার মুখমণ্ডল ব্রহ্মবিদের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' যখন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখ, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার সমগ্র আকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি মানবজাতির নিকট মহাকল্যাণস্বরূপ হইবে, কেহই তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না। ইহাই ঋষিত্ব এবং ইহাই আমাদের ধর্মের আদর্শ। অবশিষ্ট যাহা কিছু—পরস্পর কথাবার্তা, যুক্তি-বিচার, দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি বেদ পর্যন্ত—এই ঋষিত্বলাভের প্রস্তুতি মাত্র, ও-গুলি গৌণ। ঋষিত্বলাভই মুখ্য। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি—সবই গৌণ। 'তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা আমরা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারি।' যাঁহারা এই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক ঋষি। ঋষি-অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ-অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। যথার্থ হিন্দু হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের কোন এক অবস্থায় এই ঋষিত্বলাভ করিতে হইবে, আর ঋষিত্বলাভই হিন্দুর নিকট মুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহস্র সহস্র মন্দির দর্শন বা পৃথিবীতে যত নদী আছে সবগুলিতে স্নান করিলে হিন্দুমতে মুক্তি হইবে না। ঋষি হইলে—মন্ত্রদ্রষ্টা হইলে তবেই মুক্তিলাভ হইবে।

পরবর্তী সময়ের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তখন সমগ্র জগৎ-আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ—শ্রেষ্ঠ অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবতারের সংখ্যা অনেক। ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ—সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই মহাকবি যে-ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শুদ্ধ, মধুর, অথচ সহজ সরল ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়তো কয়েকটি হইয়াছেন, কিন্তু সীতা আর হন নাই। ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শস্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

অতঃপর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী—সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

২০

—অন্যান্য অবতার সেই পুরুষের অংশ ও কলামাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন তাঁহার প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ করি না। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন—তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; যিনি সমগ্র ভারতের নেতা—যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। বাল্যকালে যিনি সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই প্রেমের অপূর্ব বিকাশের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; প্রেমমদিরা-পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কে গোপীদের প্রেম-জনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে। আমরা জানি, মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে পারে না। আমরা ইহাও জানি, দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরে—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশ, সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়—এমন বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানব-মনের সর্ব্বোচ্চ ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহাই সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা—যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেনঃ যদি একজন সগুণ, সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরককুণ্ড—সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। এই সমস্যার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না; তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান্—তাহাও তাহারা জানিতে চাহিত না। তাহারা কেবল বুঝিত—তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু সেনাবাহিনীর নেতা রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন।

'ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ‖’

২১

হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না; হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম; আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, প্রলোভনের ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; নরকের ভীতি ও স্বর্গ-সুখের প্রলোভন সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম-রূপ আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এ প্রেমের মহিমা কি আর বলিব! এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। আমি আবার বলিতেছি, আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে শুধু এইটুকু বলিতে চাই—নিজের মন আগে শুদ্ধ কর; আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সেই চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব; উহা কেবল দোকানদারি—আমি তোমাকে কিছু দিতেছি, প্রভু, তুমি আমাকে কিছু দাও। আর ভগবান্‌ও বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি মরিলে পর তোমাকে দেখিয়া লইব, চিরকাল আমি তোমাকে দগ্ধ করিয়া মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এই-সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

‘সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ | ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ‖’

২২

একবার, একবারমাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।

প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টাই করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চনযশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে চায় এবং উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণদর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মত দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা!

কৃষ্ণজীবনের ছোটখাটো খুঁটিনাটি লইয়া সময় নষ্ট করিও না; তাঁহার জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর। কৃষ্ণের জীবনচরিতে হয়তো অনেক ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য আছে, অনেক বিষয় হয়তো প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এ সবই সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে সমাজে যে-এক অপূর্ব নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার অবশ্যই ভিত্তি ছিল। অন্য যে-কোন মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র; আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার নিজ দেশে, এমন কি সেই সময়ে যে-সকল ভাব প্রচলিত ছিল, শুধু সেগুলিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কিনা, সে-সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নহে—ইহা প্রমাণ কর দেখি। যদি না পার, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ তত্ত্বগুলি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ কৃষ্ণের আবির্ভাবকালে আকাশে বাতাসে ঐ তত্ত্ব ভাসিতেছিল বলিয়া জানা যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস ঐ তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা জানিতে পারিবে প্রেম কি বস্তু! যখন তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের অন্য সব চিন্তা লুপ্ত হইবে, যখন তোমরা শুদ্ধচিত্ত হইবে, যখন তোমাদের আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি সত্যানুসন্ধানস্পৃহা পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম লাভ করিলে, তখন সব পাইলে।

এইবার আমরা একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়—সেটা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম! সাহেবেরাও ইহা বড় পছন্দ করে না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটা বড় সুবিধা

মনে করেন না। তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও! সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া? টিকিতেই পারেন না! মহাভারতে দু-একটি গুরুত্বহীন স্থানে ছাড়া অন্য কোথাও গোপীদের কোন উল্লেখই নাই! যথা—দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবন কথা আছে মাত্র!

এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত! সাহেবেরা যাহা না চায়, সব উড়াইয়া দিতে হইবে! গোপীদের কথা, এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত! যে-সকল ব্যক্তি এইরূপ ঘোরতর বণিক্‌মনোভাবাপন্ন, যাহাদের ধর্মের আদর্শ পর্যন্ত ব্যবসাদারি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মনোভাব এই যে, তাহারা ইহলোকে কিছু করিয়া স্বর্গে যাইবে। ব্যবসাদার চক্রবৃদ্ধি-হারে সুদ চাহিয়া থাকে, তাহারা এখানে এমন কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যাইতে চায়, যাহার ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিবে! ইহাদের ধর্মপ্রণালীতে অবশ্য গোপীদের স্থান নাই।

আমরা এখন সেই আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া আর একটু নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার মত বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান্ নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন—সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নহে। আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ—এমন কি গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও অনেক সময়ে ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আধুনিক ভাষ্যকারগণের লেখাতেই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; শ্রুতিতে অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া তাহা হইতে নিজের মনোমত অর্থ বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য এরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য; জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতায় এইভাবে বেদের তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে, এমন কি কর্মকাণ্ড পর্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে, আর ইহা দেখান হইয়াছে যে, কর্মকাণ্ড—সাক্ষাৎভাবে না হইলেও গৌণভাবে মুক্তির সহায়, অতএব উহাও সত্য; মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, শুধু একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় এবং আমাদিগকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এই-সব বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে সেগুলির সৃষ্টি হইল কেন? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত—বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট ও দুষ্ট লোকে চালু করিয়াছে; তাহারা কিছু অর্থ-লালসায় এই-সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এ কথা একেবারে ভুল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে; ঐগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হয় নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনেই ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্যই ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই। যে-দিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সে-দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সঙ্গে সেগুলিও লোপ পাইবে, আর যতদিন প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই ঐগুলির বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই থাকিবে। তরবারি-বন্দুকের সাহায্যে পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমাপূজা থাকিবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান অবশ্যই থাকিবে, আর আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। গীতাতেই দূরাগত ধ্বনির মত সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ-কোলাহল আমাদের কানে আসে, আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ মিটাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'—যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতেই সব ওতপ্রোত রহিয়াছে।

আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দূরশ্রুত অস্ফুটধ্বনি তখন হইতেই শুনিতে পাই। সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ কিছুকাল মন্দীভূত হইয়া সমন্বয় ও শান্তি আসিয়াছিল; কিন্তু আবার বিরোধ বাধিল। শুধু ধর্মমত লইয়া নহে, সম্ভবতঃ জাতি লইয়া এ বিবাদ চলিয়াছিল; আমাদের সমাজের দুইটি প্রবল অঙ্গ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল; এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখিতে পাই। তিনি আর কেহ নহেন—আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, পৃথিবী এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজের শিষ্যরূপে নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। আবার সেই বাণী উচ্চারিত হইল, যাহা গীতায় শিক্ষা দিয়াছিলঃ স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—এই ধর্মের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ —স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রগণ পর্যন্ত পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গীতার বাক্যসমূহ—শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর মহতী বাণী সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরমপদলাভের অধিকার ঘোষণা করে।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না, আত্মহিংসাশূন্য হইয়া পরমগতি লাভ করেন।

গীতার এই উপদেশের জীবন্ত উদাহরণরূপে—উহার এক বিন্দুও অন্ততঃ যাহাতে কার্যে পরিণত হয় এইজন্য—সেই গীতা-উপদেষ্টাই অন্যরূপে আবার মর্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেজন্য ইনি দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণলোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইনি দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় রামের মত ইনি চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

তোমরা সকলেই তাঁহার মহান্ চরিত্র ও অদ্ভুত প্রচারকার্যের বিষয় অবগত আছ। কিন্তু এই প্রচারকার্যের মধ্যে একটা বিষম ত্রুটি ছিল, তাহার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা ভুগিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধের কোন দোষ নাই, তাঁহার চরিত্র পরম পবিত্র ও মহামহিমময়। দুঃখের বিষয়—বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ফলে যে-সকল বিভিন্ন অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহারা বুদ্ধদেব-প্রচারিত উচ্চ আদর্শগুলি ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না। এই-সকল জাতি তাহাদের নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনা-পদ্ধতিগুলি সঙ্গে লইয়া দলে দলে আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য বোধ হইল তাহারা যেন সভ্য হইয়াছে, কিন্তু এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের সর্প ভূত প্রভৃতির উপাসনা সমাজে চালাইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ লীলাক্ষেত্র হইয়া অত্যন্ত অবনত হইল। প্রথমে বৌদ্ধগণ প্রাণিহিংসা নিন্দা করিতে গিয়া বৈদিক যজ্ঞসমূহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে প্রত্যেক গৃহে এই-সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, গৃহকোণে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত থাকিত, ইহাই ছিল উপাসনার যা-কিছু সাজসজ্জা। বৌদ্ধদের প্রচারে এই যজ্ঞগুলি লোপ পাইল, তৎপরিবর্তে বিরাট বিরাট মন্দির, জাঁকালো অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদল এবং বর্তমানকালে ভারতে আর যাহা কিছু দেখিতেছ, সেইগুলির আবির্ভাব হইল। বুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁহাদের আরও বেশী জ্ঞান থাকা উচিত ছিল, এমন কয়েকজন আধুনিক ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পৌত্তলিকতা ধ্বংস করেন। উহা পড়িয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তাঁহারা জানেন না যে, বৌদ্ধধর্মই ভারতে পৌরোহিত্য ও প্রতিমাপূজার সৃষ্টি করিয়াছিল।

দু-এক বৎসর পূর্বে একজন রুশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি যীশুখ্রীষ্টের একখানি অদ্ভুত জীবনচরিত পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি সেই পুস্তকখানির একস্থলে বলিতেছেন, খ্রীষ্ট ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্মশিক্ষার্থ জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ও মূর্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে তিব্বতের লামাদের নিকট ধর্মশিক্ষার্থ গমন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সিদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাঁহারা ভারতের ইতিহাস কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের নিকট পূর্বোক্ত বিবৃতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, পুস্তকখানি আগাগোড়া প্রতারণা। কারণ জগন্নাথ-মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ঐটিকে এবং অন্যান্য বৌদ্ধমন্দিরকে হিন্দুমন্দির করিয়া লইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার আমাদিগকে এখনও অনেক করিতে হইবে। ইহাই জগন্নাথ- মন্দিরের ইতিহাস, আর সে-সময়ে সেখানে একজনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তথাপি বলা হইতেছে—যীশুখ্রীষ্ট সেখানে ব্রাহ্মণদের নিকট উপদেশ লইবার জন্য আসিয়াছিলেন! আমাদের রুশীয় দিগ্‌গজ প্রত্নতাত্ত্বিক এই কথা বলিতেছেন!

পূর্বোক্ত কারণে বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রাণীতে দয়া, উহার উচ্চ নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মা আছে কি নাই—এই লইয়া চুলচেরা বিচারসত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎতা দেখা দিল, তাহা বর্ণনা করিবার সময় আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠান-পদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থরাজি—যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখনও বাহির হয় নাই বা মানবমস্তিষ্ক যাহা আর কখনও কল্পনা করে নাই; অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতিসমূহ, যেগুলি আর কখনও ধর্মের নামে চলে নাই—এ-সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি', তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। এবার তাঁহার আবির্ভাব হইল দাক্ষিণাত্যে। সেই ব্রাহ্মণযুবক, যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থের রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতের এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক! তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন পবিত্রভাবে লইয়া যাইতে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ—এই কার্য কত কঠিন ও কত বিরাট! সে-সময়ে ভারতের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু আভাস দিয়াছি। তোমরা যে-সকল বীভৎস আচারের সংস্কার করিতে অগ্রসর হইতেছ, সেগুলি সেই অধঃপতনের যুগ হইতে আসিয়াছে। তাতার বেলুচি প্রভৃতি দুর্দান্ত জাতিসকল ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং তাহাদের জাতীয় আচারগুলিও সঙ্গে লইয়া আসিল। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন অতি ভয়ানক পাশবিক আচারসমূহ দ্বারা কলুষিত হইল। উক্ত ব্রাহ্মণযুবক বৌদ্ধদের নিকট হইতে দায়স্বরূপ ইহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এই অবনত বৌদ্ধধর্ম হইতে বেদান্তের পুনর্বিজয় চলিতেছে, এখনও এ-কার্য চলিতেছে, এখনও উহা শেষ হয় নাই। মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে বুদ্ধদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরা পতিত হয় এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে—

শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন; তখন বৌদ্ধেরা সকলেই তাহাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যে-সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; সেগুলির কি হইবে—ইহাই এক মহাসমস্যা হইল।

তখন মহানুভব রামানুজের অভ্যুদয় হইল। শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার হৃদয় মস্তিষ্কের অনুরূপ ছিল না। রামানুজের হৃদয় শঙ্করের হৃদয় অপেক্ষা উদার ছিল। পতিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি তাহাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। কালে যে-সকল নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য সংস্কার করিলেন এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি, নূতন নূতন উপাসনাপ্রণালী সৃষ্টি করিয়া ঐগুলি যাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহাদিগকে সেগুলি উপদেশ দিতে লাগিলেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এইরূপে রামানুজের প্রচারকার্য চলিল। তাঁহার প্রচারের প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর্যাবর্তে ঐ তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেখানে কয়েকজন আচার্য ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা বহুদিন পরে—মুসলমান-শাসনকালে ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর্যাবর্তবাসী আচার্যগণের মধ্যে চৈতন্যই শ্রেষ্ঠ।

রামানুজের সময় হইতে ধর্মপ্রচারে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিও; তখন হইতে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। শঙ্করের পূর্ববর্তী আচার্যগণের যেমন ইহাই ছিল মূলমন্ত্র, রামানুজের পরবর্তী আচার্যগণেরও তাহাই হইল। শঙ্করকে কতকটা বর্জনশীল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাঁহার লিখিত গ্রন্থে এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী যেমন তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, তেমনি শঙ্করাচার্যের উপদেশাবলীর উপর যে সঙ্কীর্ণতার দোষ আরোপিত হয়, সম্ভবতঃ তাহাতে শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাঁহার শিষ্যদের বুঝিবার অক্ষমতার দরুনই এই দোষ শঙ্করে আরোপিত হইয়া থাকে।

আমি এখন এই উত্তরভারতের মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক অতি বিচারশীল পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনিও ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া তর্কে পণ্ডিতদের পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হন। বাল্যকাল হইতে তিনি শিখিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কোন মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল; তখন তিনি বাদানুবাদ, তর্ক-ন্যায়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীতে ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্যদের অন্যতম প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্লাবিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল। তাঁহার প্রেমের কোন সীমা ছিল না। পুণ্যবান্ পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত—সকলেই তাঁহার ভালবাসার ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন; যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, যেমন কালপ্রভাবে সকলেরই অবনতি হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত—সমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাকে সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহেই আমরা অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাই। শঙ্করমতাবলম্বী কেহই এ কথা স্বীকার করেন না যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ আছে। এদিকে কিন্তু জাতি-ব্যাপারে শঙ্কর অত্যন্ত বর্জনের ভাব পোষণ করিতেন। জাতিভেদের প্রশ্নে আমরা প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যের উপদেশে অপূর্ব উদারতা দেখিতে পাই, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মত সঙ্কীর্ণ।

শঙ্করের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, রামানুজ ও চৈতন্যের ছিল বিশাল হৃদয়। এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, যাঁহার মধ্যে একাধারে এইরূপ হৃদয় ও মস্তিষ্ক থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের মহতী মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় এক মহৎ ভাবে—ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয়সাধন করিবে এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

এইরূপ এক ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইয়াছিল—প্রয়োজন হইয়াছিল; আর অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়, যে-শহর পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল—ভারতের অন্যান্য শহর অপেক্ষা বেশী পরিমাণেই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না; মহামনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নাম পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সে অনেক কথা, আজ রাত্রে তোমাদিগের নিকট তাঁহার বিষয়ে কিছু বলিবার সময় নাই। সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামটুকু উল্লেখ করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতে হইবে—এই মহাপুরুষের উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ। ঐ ব্যক্তির ভিতর যে ঐশ্বরিক শক্তি খেলা করিত, সেটি লক্ষ্য করিও। ইনি দরিদ্রব্রাহ্মণ-সন্তান, বঙ্গদেশের অজ্ঞাত অপরিচিত কোন সুদূর পল্লীতে ইঁহার জন্ম। আজ ইওরোপ-আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সত্য-সত্যই ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে এবং পরে আরও সহস্র সহস্র লোক পূজা করিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি ইহাতে বিধাতার হাত না দেখিতে পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্ধ; যদি সময় আসে, যদি আর কখনও তোমাদের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ হয়, তবে তোমাদিগকে ইঁহার বিষয় আরও বিস্তারিতভাবে বলিব; এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, যদি আমার জীবনে একটিও যথার্থ তত্ত্ব কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার—তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যেগুলি অসত্য—ভ্রমাত্মক, যেগুলি মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, সেগুলির জন্য আমি—আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

আমাদের উপস্থিত কর্তব্য

এই বক্তৃতা ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টাতেই স্বামীজী চিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।

পৃথিবী যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই দিন দিন জীবন-সমস্যা আরও গভীর ও ব্যাপক হইতেছে। অতি প্রাচীনকালে যখন সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব-রূপ বৈদান্তিক সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতেই উন্নতির মূলমন্ত্র ও সারতত্ত্ব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে না টানিয়া জগতের একটি পরমাণু পর্যন্ত নড়িতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে একই সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর না করাইয়া পৃথিবীর কোন স্থানে কোনরূপ উন্নতি সম্ভব নহে। আর প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু জাতীয় বা কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যে-কোন বিষয়—যে-কোন ভাব হউক, উহাকে উদার হইতে উদারতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহা সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায়; যে-কোন আকাঙ্ক্ষাই হউক, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাড়াইতে হইবে, যেন উহা সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহা নয়, সমগ্র প্রাণিজগৎকে পর্যন্ত নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশ যে উচ্চাসনে আরূঢ় ছিল, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ আর তাহা নাই। যদি আমরা এই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা—আমাদের কার্যক্ষেত্রের সঙ্কোচনই ইহার অন্যতম কারণ।

জগতে দুইটি আশ্চর্য জাতির আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। একই মূল জাতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নির্দিষ্ট পন্থায় জীবন-সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত দুইটি প্রাচীন জাতি ছিল—আমি হিন্দু ও গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। উত্তরে হিমাচলের হিমশিখরসীমাবদ্ধ, পৃথিবীর প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অন্তহীন অরণ্যানী ও সমতলে প্রবহমান সমুদ্রবৎ বিশাল স্বাদুসলিলা স্রোতস্বতী-বেষ্টিত ভারতীয় আর্যের মন সহজেই অন্তর্মুখ হইল। আর্যজাতি স্বভাবতই অন্তর্মুখ, আবার চতুর্দিকে এই-সকল মহাভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবগ্রাহী মস্তিষ্ক স্বভাবতই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল, নিজের মন বিশ্লেষণ করাই ভারতীয় আর্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীকজাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিত, যেখানে গাম্ভীর্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের বেশী সমাবেশ—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দিকের নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী প্রকৃতি—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল, উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিতে চাহিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগপূর্বক বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইবার বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।

হিন্দু মন নিজ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি বিস্ময়কর ফল লাভ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্তি, ভারতীয় মস্তিষ্ক এখনও যেরূপ শক্তির আধার, তাহার সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের যুবকগণ অন্য যে-কোন দেশের যুবকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্বদাই জয়ী হইয়া থাকে; তথাপি যখন, সম্ভবতঃ মুসলমানকর্তৃক ভারতবিজয়ের দু-এক শতাব্দী পূর্বে জাতীয় প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জাতির এই বিশেষত্বটিকে—বিচারশক্তিকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করা হইল যে, উহারও অবনতি হইল। আর আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান—সকল বিষয়েই এই অবনতির কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্পের আর সেই উদার ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আর রহিল না। সকল বিষয়েই প্রচণ্ড অলঙ্কারপ্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সমগ্র জাতির মৌলিকত্ব যেন অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীতে প্রাচীন সংস্কৃতের হৃদয়-আলোড়নকারী গভীর ভাব আর রহিল না, পূর্বে যে প্রত্যেকটি সুর স্বতন্ত্র থাকিয়াও অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না; সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীতে নানাবিধ সুরের তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রে অবনতির চিহ্ন। তোমাদের ভাবরাজ্যের অন্যান্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য এবং মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইবে, আর তোমাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র—ধর্মের ঘোর ভয়াবহ অবনতি হইয়াছিল। যে-জাতি শত শত বৎসর যাবৎ এক গ্লাস জল 'ডান হাতে খাইব, কি বাঁ হাতে খাইব'—এইরূপ গুরুতর সমস্যাগুলির বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পার? যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলি শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচারে ব্যাস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, জগতে প্রচারিত ঈশ্বর ও আত্মা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মহত্তম ও গৌরবময় সিদ্ধান্তসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হইল, গভীর অরণ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসীর দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে কেবল খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত রহিল। মুসলমানগণ ভারতবিজয় করিয়া—তাহারা যাহা জানিত, এমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আমাদের জাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিতে পারে নাই।

অবশেষে আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশ-বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখনও কখনও শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরেজের এই ভারত-বিজয়ে বিশেষ শুভ ফল হইয়াছে। ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী; ইওরোপের সব-কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা বলিতেছে; উহার প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেকটি আসবাবপত্রে পর্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ; ইওরোপের বিজ্ঞান শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই-সব

বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানবজীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে। আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি, আর যদিও আমরা প্রথমে ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের ভাবগুলিকে একটু সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, চতুর্দিকে যে-সব উদার ভাব দেখা যাইতেছে, সেগুলি এবং জীবনের এই প্রশস্ততর ধারণাগুলি আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের স্বাভাবিক পরিণতি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পর ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশঃ নিজেদের সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি—বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছি।

আমাদের উন্নতির পথে যত বিঘ্ন আছে, সেগুলির মধ্যে একটি এই গোঁড়ামি যে— 'জগতে আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি।' ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সর্বদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তথাপি পৃথিবীর নিকট আমাদের যে অনেক কিছু শিখিতে হইবে—এ ধারণা আমি ত্যাগ করিতে পারি না। আমাদিগকে সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, সকলেই আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। আমাদেরই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনু বলিয়াছেনঃ

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি |
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ||

২৩

অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি।

সুতরাং যদি আমরা মনুর উপযুক্ত বংশধর হই, তবে তাঁহার আদেশ আমাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যে-কোন ব্যক্তি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই ঐহিক বা পারত্রিক বিষয়ে শিক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতের বাহিরের দেশগুলির সহিত আমাদের সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে একসময়ে অপরের সহিত সংস্রব না রাখিবার কথা ভাবিয়াছিলাম, তাহা শুধু আমাদের নির্বুদ্ধিতা, আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বৎসর যাবৎ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমরা যে অন্যান্য জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতের বাহিরে যাওয়া অনুচিত—এ-সব আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষি। এ-সব ধারণা সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত মিশিবে, ততই তোমাদের ও দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ব হইতেই—শত শত বৎসর পূর্ব হইতেই—যদি ইহা করিতে, তবে আজ এরূপ হইত না—যে-কোন জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত হইতে না। জীবনের প্রথম স্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি তোমরা বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িতে হইবে। যে-মুহূর্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই-মুহূর্ত হইতেই জানিবে মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে। আমি ইওরোপ-আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সহৃদয়ভাবে তাহা উল্লেখ করিয়াছ। আমাকে যাইতে হইয়াছিল, কারণ এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম চিহ্ন। এই পুনরভ্যুদয়শীল জাতীয় জীবন ভিতরে ভিতরে বিস্তৃত হইয়া আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদি এই জাতি আদৌ বাঁচিয়া থাকে, তবে এরূপ হইবেই হইবে। সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্বপ্রধান লক্ষণ; এই বিস্তারের সহিত মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের যাহা দিবার আছে, সমগ্র পৃথিবীর উন্নতিবিধানে আমাদের যেটুকু দেয় আছে, তাহাও ভারতের বাহিরে যাইতেছে।

ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, হিন্দুরা চিরকাল তাহাদের দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তোমরা তোমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই, তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাস যথাযথ অধ্যয়ন কর নাই। যে-কোনজাতিই হউক, বাঁচিতে হইলে তাহাকে কিছু দিতেই হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে, কিছু গ্রহণ করিলে উহার মূল্যস্বরূপ অপর সকলকে কিছু দিতেই হইবে। এত সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা যে বাঁচিয়া আছি—এ-কথা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন কিরূপে আমরা এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে—আমরা চিরকালই পৃথিবীকে কিছু না দিয়া আসিতেছি, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক না কেন।

তবে ভারতের দান—ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা; ধর্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক সত্য শ্রোণিতপ্রবাহের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদর্পে অগ্রসর হয় না, ঐগুলি শান্তি ও প্রেমের পক্ষদ্বয়ে ভর করিয়া শান্তভাবে আসিয়া থাকে, আর এইরূপই বরাবর হইয়াছে। অতএব দেখা গেল, ভারতকেও বরাবর পৃথিবীকে কিছু না কিছু দিতে হইয়াছে। লণ্ডনে জনৈকা মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমরা কখনও একটি জাতিকেও জয় কর নাই!' ইংরেজ জাতির পক্ষে—বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরেজ জাতির পক্ষে এ কথা শোভা পায়; তাহাদের পক্ষে একজন অন্যকে জয়

করিতে পারিলে তাহাই শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাদের দৃষ্টিতে উহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, 'ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি?' উত্তর পাই, 'কারণ এই যে, আমরা কখনও অপর জাতিকে জয় করি নাই।' ইহাই আমাদের গৌরব। তোমরা আজকাল সর্বদাই আমাদের ধর্মের এই নিন্দা শুনিতে পাও যে, উহা পরধর্ম-বিজয়ে সচেষ্ট নহে; আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম যে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, ইহাই তাহার একটি প্রধান কারণ; আমাদের ধর্ম কখনই অপর ধর্মকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত করে নাই, উহা সর্বদাই আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই পরধর্মসহিষ্ণুতা-বিষয়ক ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এইখানেই পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ইহা কেবল মতবাদে পর্যবসিত। এখানে—কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ নির্মাণ করিয়া দেয়। অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বুঝিতেছেন—আমাদের ভাব পৃথিবীতে বহুবার প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু অতি ধীরে, নীরবে ও অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ উহার শান্তভাব, উহার নীরবতা। আবার উহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বল-বাচক কোন শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনীশক্তি বলা যাইতে পারে। কোন বৈদেশিক যদি আমাদের সাহিত্য-অধ্যায়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহা তাহার নিকট অতিশয় বিরক্তিকর লাগে; উহাতে হয়তো তাহার দেশের সাহিত্যের মত উদ্দীপনা নাই, তীব্র গতি নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়া উঠিবে। ইওরোপের বিয়োগান্তক নাটকগুলির সহিত আমাদের নাটকগুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, ক্ষণকালের জন্য উদ্দীপিত করে; কিন্তু শেষ হইবা মাত্র মনে প্রতিক্রিয়া আসে, স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। ভারতের বিয়োগান্ত নাটকগুলি ঐন্দ্রজালিকের শক্তির মত ধীরে নিঃশব্দে কাজ করে; একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত হইতে থাকে। আর কোথায় যাইবে? তুমি বাঁধা পড়িলে। যিনিই আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছে, তিনিই উহার বন্ধন অনুভব করিয়াছেন—তিনিই উহার চিরপ্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে।

শিশিরবিন্দু যেমন নিঃশব্দে অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে ভারতের দান সেইরূপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে যুগান্তর আনিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না—কখনও এরূপ হইল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ বলিয়াছিল, 'ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার!' ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, 'ইহাই ভারতীয় ভাব।' তাঁহারা আধুনিক গ্রন্থকারগণের মত ছিলেন না। আধুনিক গ্রন্থকার অন্যান্য লেখকের গ্রন্থ হইতে শতকরা নব্বই ভাগ চুরি করে, শতকরা দশভাগমাত্র তাহার নিজস্ব, কিন্তু গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলে না, 'এই-সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।'

যে-সকল মহামনীষী মানবজাতির হৃদয়ে মহান্ ভাবরাশি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, গ্রন্থে নিজেদের নাম পর্যন্ত দেন নাই, তাঁহারা সমাজকে তাঁহাদের গ্রন্থরাশি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তাঁহারা সকলেই 'ব্যাস', 'কপিল' প্রভৃতি উপাধিমাত্র দ্বারা পরিচিত। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সন্তান। তাঁহারাই যথার্থভাবে গীতার শিক্ষা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ উপদেশ —'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে)—জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তবে ইহার জন্য একটি পরিবেশ প্রয়োজন। পণ্যদ্রব্য যেমন অপরের নির্মিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, ভাবরাশি সম্বন্ধেও সেইরূপ। এক দেশ হইতে অপর দেশে ভাবরাশি লইয়া যাইতে হইলে তৎপূর্বে পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; আর পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে, তখনই সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বৌদ্ধদের পূর্বেও ভারতীয় চিন্তারাশি পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই চীন, পারস্য ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে বেদান্ত প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহতী গ্রীকশক্তি প্রাচ্যজগতের বিভিন্ন অংশকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল, তখন আবার সেখানে ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টধর্ম যে-সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে, তাহাও ভারতীয় চিন্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম—উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও—যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম যাহার অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন অনুকরণমাত্র।

আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডের দোর্দণ্ড শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে আবার একত্র করিয়াছে। ইংরেজের পথ রোমক রাজপথগুলির মত কেবল স্থলে নহে, অতলস্পর্শ সমুদ্রের সব দিকে ছুটিয়াছে। ইংলণ্ডের পথগুলি সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। পৃথিবীর এক অংশ অন্য সকল অংশের সহিত যুক্ত হইয়াছে, আর বিদ্যুৎ নবনিযুক্ত দূতরূপে উহার অতি অদ্ভুত অংশ অভিনয় করিতেছে। এই-সকল অনুকূল অবস্থা পাইয়া ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ প্রকৃতি যেন আমাকে জোর করিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, উহার সময় আসিয়াছে। সকল দিকেই শুভচিহ্ন দেখা যাইতেছে; ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবী জয় করিবে। সুতরাং আমাদের জীবনসমস্যা ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে, ইহা তো অতি সামান্য কথা; আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি, আমার ধারণা হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে; আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী ভারতের

মহান্ সম্রাট্ অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন; আর আমি ইচ্ছা করি—যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, তাহাদের সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কাজে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কাজের বিরাম না হয়। লোকে তোমাকে প্রতিদিন বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া থাক। যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ করিয়া থাক, বিদেশী ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাববিস্তারের চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ করিতেছ, আর এই সভা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে—তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপর দেশে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিভাবে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ, আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ জয়—ইহার কম কিছুতেই নয়; আর আমাদের সকলকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে। বৈদেশিকগণ আসিয়া তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা ভারত প্লাবিত করিয়া দিক—ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় কর। এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিলঃ ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়। আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখগুলিকে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে, এবং ক্রমশঃ ঐরূপ পশুসংখ্যা বাড়িতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যজাতিগুলিকে জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, জাতিরূপে যদি বাঁচিতে হয়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা উহার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে?ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি বহন করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত—এমন মানুষ কোথায়? এই মঙ্গলবার্তা যাহাতে পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেক অলিতে-গলিতে পৌঁছায়, তাহার জন্য সর্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত—এমন মানুষ কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্য করিবে—এইরূপ বীরহৃদয় মানুষের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ-প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্মী প্রয়োজন। আজ ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, এরূপ না হইলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই; সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এখন এমন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে মনে করাইয়া দিতেছি—আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—যে জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল, তাহাকে পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগদ্‌বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে কুসংস্কাররাশিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে; ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পর্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ঐগুলি একেবারে মরিয়া যায়। ঐগুলি জাতীয় অবনতির কারণ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্বীর্যতা আসিয়া থাকে। আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, আমাদের মস্তিষ্ক যেন উচ্চ ও মহৎ চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়া না পড়ে, উহা যেন মৌলিকতা না হারায়, উহা যেন নিস্তেজ হইয়া না যায়, উহা যেন ধর্মের নামে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে নিজেকে বিষাক্ত করিয়া না ফেলে। আমাদের এখানে—এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে একদিকে ঘোর জড়বাদ, অপরদিকে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘোর কুসংস্কার—দুই-ই পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। একদিকে পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরাপানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তূপ, হিন্দুদর্শন কেবল শিশুর আধ-আধ বুলি এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কিন্তু কতকটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁহারা আবার উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। ঐ ব্যক্তি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত তাহার, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার বা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলি প্রতিপালন করার উপরই জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এই-সব হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

তোমরা প্রত্যেকে বরং ঘোর নাস্তিক হও, কিন্তু আমি তোমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে বুদ্ধিনাশ হয়, মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে; পতনের ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা চাই নির্ভীক সাহসী লোক, আমরা চাই—রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হইক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে, এমন-সব ভাবের প্রয়োজন নাই; সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্বপ্রকার রহস্যের দিকে ঝোঁক ত্যাগ কর। ধর্মে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদান্ত বা বেদে, সংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে? প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের জন্য কোথাও কি গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আবিষ্কৃত মহান্ সত্যসমূহ সমগ্র পৃথিবীকে দিবার জন্য তাঁহারা কি কোন চাতুরী বা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন—ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখিয়াছ কি? গুপ্তভাব লইয়া নাড়াচাড়া করা ও কুসংস্কার সর্বদাই দুর্বলতার চিহ্ন, উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব ঐগুলি হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও। সংসারে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যতদূর, তদনুযায়ী ঐগুলিকে অপ্রাকৃত বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটি গুপ্ত নহে। ধর্মের সত্যসমূহ গুপ্ত অথবা ঐগুলি হিমালয়ের শিখরে অবস্থিত গুপ্তসমিতিসমূহের একচেটিয়া সম্পত্তি—এ কথা ভারতভূমিতে

কখনই প্রচারিত হয় নাই। আমি হিমালয়ে গিয়াছিলাম, তোমরা যাও নাই। তোমাদের দেশ হইতে উহা শত শত মাইল দূরে। আমি একজন সন্ন্যাসী, গত চতুর্দশ বৎসর যাবৎ পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—এইরূপ গুপ্তসমিতি কোথাও নাই। এই-সকল কুসংস্কারের পিছনে ছুটিও না। তোমাদের এবং তোমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ নাস্তিক হইলে অন্ততঃ তোমাদের একটু তেজ থাকিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন হওয়া অবনতি ও মৃত্যুস্বরূপ। সতেজ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এই-সকল কুসংস্কার লইয়া তাহাদের সময় কাটায়, ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করে—ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয়। সাহসী হও, প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কালো দাগ—অনেক ক্ষত আছে, ঐগুলি একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কাটিয়া ফেলিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি তাহাতে অক্ষতই থাকিবে; বরং এই কালো দাগগুলি যতই মুছিয়া যাইবে, ততই মূলতত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে—সতেজে প্রকাশিত হইবে। ঐ তত্ত্বগুলিকে ধরিয়া থাক।

তোমরা শুনিয়াছ, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই নিজেকে সার্বভৌম ধর্ম বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই, সম্ভবতঃ কোন ধর্মই কোন কালে সার্বভৌম ধর্মরূপে পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধর্মের এই দাবী করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের ধর্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে; কারণ অন্যান্য সকল ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য সকল ধর্মই কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সহিত জড়িত। ঐ-সকল ধর্মাবলম্বীরা মনে করে, ঐতিহাসিকতাই তাহাদের ধর্মের শক্তি, কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা শক্তি মনে করিতেছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা; কারণ যদি ঐ ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাদের ধর্মরূপ প্রাসাদ একেবারে ধসিয়া পড়ে। ঐ-সকল ধর্মের স্থাপক মহাপুরুষদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পর্কে বিশেষরূপে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল তাঁহাদের কথার উপর যে-সকল সত্যের প্রামাণ্য ছিল, সেগুলি আবার শূন্যে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের ধর্মে যদিও মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ধর্মের সত্যসকল তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য নয়, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের মত তাঁহার নামও ভারতের ধর্মজগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত।

সুতরাং আমরা ব্যক্তিবিশেষের মতানুগামী নহি, আমরা চিরকালই ধর্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের বাস্তবরূপমাত্র—উদাহরণস্বরূপ। যদি ঐ তত্ত্বগুলি অবিকৃত থাকে, তবে শত সহস্র মহাপুরুষের, শত সহস্র বুদ্ধের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যদি ঐ তত্ত্বগুলি লোপ পায়, যদি মানুষ ঐগুলি ভুলিয়া যায়, আর সমগ্র জাতীয় জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মত অবলম্বন করিয়া চলিতে যায়, তবে সেই ধর্মের অবনতি অনিবার্য, সেই ধর্মের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কেবল আমাদের ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়, উহা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর দিকে আবার উহাতে লক্ষ লক্ষ অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নূতন মহপুরুষেরও আমাদের ধর্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইতে হইবে—এইটি ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ধর্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে, আর এইগুলি যাহাতে কালে মলিন হইয়া না পড়ে, সেজন্য আমাদের সকলকে সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের জাতীয় জীবনে ঘোর অবনতি ঘটিলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনই মলিন হয় নাই। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও ঐগুলি দূষিত করিতে সাহস করে নাই। আমাদের শাস্ত্রসমূহ পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা ভালভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূলের বিকৃতি অথবা ভাবের বিপর্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমে যেমন ছিল, এখনও ঠিক সেইভাবেই উহা রহিয়াছে এবং মানুষের মনকে সেই আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতেছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকার উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান্ আচার্য উহা প্রচার করিয়াছেন এবং উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। আর তোমারা দেখিবে—এই বেদগ্রন্থে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া মনে হয়; কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবদ্যোতক। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি একেবারে চাপা দিতে চান। দ্বৈতবাদী ধর্মাচার্য ও পুরোহিতগণ সকলকেই দ্বৈতভাবে উহাদের ব্যাখ্যা করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈত শ্লোকগুলিকে সেইরূপ অদ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা তো বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে—এটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মূর্খোচিত কার্য। আবার সমগ্র বেদ অদৈতভাবের সমর্থক, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টাও সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা। বেদে দ্বৈত অদ্বৈত—দুই-ই আছে। আমরা নূতন নূতন ভাবের আলোকে ইহা আজকাল আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিতেছি। এই-সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ধারণার দ্বারা পরিশেষে এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মনের ক্রমোন্নতির জন্যই এই-সব মতের প্রয়োজন, আর সেজন্যই বেদ এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপান দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পরবিরোধী, তাহা নহে; শিশুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য বেদ ঐ-সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

ঐগুলির প্রয়োজন আছে—শুধু শিশুদের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই শরীরকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থূলজগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তি-ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ মহান্ রামানুজ প্রমাণ করিয়াছেনঃ ঈশ্বর, জীব, জগৎ—এই তিনটির মধ্যে একটি স্বীকার করিলে অপর দুটিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা পরিহার করিবার উপায় নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা বাহ্যজগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর অস্বীকার করা ঘোর বাতুলতা।

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখনও কখনও এমন সময় আসিতে পারে, যখন জীবাত্মা তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির পারে চলিয়া যায়—সেই সর্বাতীত প্রদেশে চলিয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেনঃ

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'
'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।'
'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।'

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।—সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।—আমি তাঁহাকে জানি, ইহা মনে করি না; জানি না, ইহাও মনে করি না।

২৪

তখনই জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই, কেবল তখনই তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব—আমি ও সমগ্র জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক—এই ভাব উদিত হয়।

আর শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয়, তাহা নহে; প্রেমবলেও আমরা ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। ভাগবতে পড়িয়াছ, গোপীগণের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে বিলাপ করিতে করিতে গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-বোধে তাঁহারই মত বেশভূষা করিয়া তাঁহারই লীলার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং বুঝিতেছ, প্রেমবলেও এই একত্ব-অনুভূতি আসিয়া থাকে। জনৈক প্রাচীন পারস্যদেশীয় সুফীর একটি কবিতায় এই ভাবের কথা আছেঃ প্রেমাস্পদের নিকট গিয়া দেখিলাম—গৃহদ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিলাম, ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, 'কে?' উত্তর দিলাম, 'আমি।' দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম। আবার সেই প্রশ্ন 'কে?' আবার উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?' তখন বলিলাম—'হে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি।' তখন দ্বার খুলিয়া গেল।

সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন সোপান আছে; আর যদিও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে—যাঁহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত, তাঁহাদের মধ্যে—বিবাদ থাকে, তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ জ্ঞানের ইতি করা যায় না। প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে সর্বজ্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে। অতীত কালে যদি ঋষি-মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিও বর্তমানকালেও অনেক ঋষির অভ্যুদয় হইবে; যদি প্রাচীনকালে ব্যাস-বাল্মীকি-শঙ্করাচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন শঙ্করাচার্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটিও তোমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; অন্যান্য ধর্মেও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের বাক্যই শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ পুরুষের সংখ্যা এক দুই বা কয়েকজন মাত্র—তাঁহাদেরই মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সত্য প্রচারিত হইয়াছে; আর সকলকে তাঁহাদের কথা মানিতে হয়। খ্রীষ্টধর্ম বলেঃ নাজারেথের যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল; আমাদের সকলকে উহাই মানিয়া লইতে হইবে, আমরা আর বেশী কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের ধর্ম বলেঃ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন দুইজন নহে, অনেকের মধ্যে ঐ সত্য আবির্ভূত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। 'মন্ত্রদ্রষ্টা' শব্দের অর্থ মন্ত্র বা তত্ত্বসমূহ যিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন—কেবল বাক্যবাগীশ, শাস্ত্রপাঠক, পণ্ডিত বা শব্দবিৎ নহে—তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

বহু বাক্যব্যয় দ্বারা, অথবা মেধা দ্বারা, এমন কি বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।

২৫

বেদ নিজে এ-কথা বলিতেছেন। তোমরা কি অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ নির্ভীক বাণী শুনিতে পাও—'বেদপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না?' হৃদয় খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র-বিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে। বাহিরের রঙ ও আড়ম্বরাদি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধর্মজীবনের সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময় শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্মজীবনে সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্মকে এক করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়াই ধর্মজীবন হইয়া দাঁড়ায়, এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা কখনও ধর্মানুভূতি লাভ করা যায় না। যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎ করায় তাহাই ধর্ম; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য। যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ঋষি হইয়াছেন। সহস্র বৎসর পূর্বে যিনি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনিও যেমন ঋষি, সহস্র বৎসর পরেও যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিও তেমনি ঋষি। আর যতদিন না তোমরা ঋষি হইতেছে, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন শুরু হইবে না; ঋষি হইলে তোমাদের প্রকৃত ধর্ম আরম্ভ হইবে, এখন কেবল প্রস্তুত হইতেছ মাত্র; তখনই তোমাদের ভিতর ধর্মের প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—আমাদের ধর্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যে-কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। ইহাই মুক্তি।

আর ইহাই যদি আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তবে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা নিজে নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব, এবং তাহাই করিতে হইবে। আবার প্রাচীন ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে সম্মান দেখাইতে হইবে। এই প্রাচীনগণ মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরও বড় হইতে চাই। তাঁহারা অতীতকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষাও বড় বড় কাজ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে শত শত ঋষি ছিলেন, এখন লক্ষ লক্ষ ঋষি হইবেন, নিশ্চয় হইবেন। আর তোমাদের প্রত্যেকেই যত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ততই মঙ্গল। তোমরা যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই হইবে। তোমরা যদি নিজেদের নির্ভীক বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে নির্ভীক হইবে। যদি সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই তোমরা সাধুরূপে পরিগণিত হইবে; কিছুই তোমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। কারণ আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায়গুলির ভিতর যদি একটি সাধারণ মতবাদ থাকে, তবে তাহা এইঃ 'আত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিত্রতা রহিয়াছে।' কেবল রামানুজের মতে আত্মা কখনও সঙ্কুচিত হন ও কখনও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর শঙ্করের মতে ঐ সঙ্কোচ ও বিকাশ ভ্রমমাত্র। এ প্রভেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই তো স্বীকার করিতেছেন—ব্যক্তই হউক, আর অব্যক্তই হউক, যে-কোন আকারে হউক, ঐ শক্তি ভিতরেই রহিয়াছে। আর যত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করা যায়, ততই তোমাদের কল্যাণ। সব শক্তি তোমাদের ভিতরে রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পার। ইহা বিশ্বাস কর। মনে করিও না—তোমরা দুর্বল। আজকাল অনেকে যেমন নিজেদের অর্ধোন্মাদ বলিয়া মনে করে, সেরূপ মনে করিও না। অপরের সাহায্য ব্যতীতই তোমরা সব করিতে পার। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে; উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ কর।

ভারতের ভবিষ্যৎ

মান্দ্রাজে এই শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়—প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

এই সেই প্রাচীনভূমি, অন্য কোন দেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে তত্ত্বজ্ঞান যে-দেশকে নিজ বাসভূমিরূপে নির্দষ্ট করিয়াছিল। এই সেই ভারতভূমি, যে-ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—সমুদ্রে প্রবহমানা এবং 'সমুদ্রায়মানা' বিশাল স্রোতস্বতীসমূহ দ্বারা, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এইখানেই মানবমন নিজ স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল; এইখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-বিষয়ক মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শগুলি এইখানেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার মত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার সেইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও সেইরূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারতসন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি; ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য—তোমাদিগকে প্রকৃত কার্যের পথে আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, কেবল পূর্বগৌরব-স্মরণে মনের অবনতি হয়, উহাতে কোন ফল হয় না, অতএব আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। সত্য কথা; কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, আমাদিগকে প্রথমেই ইহা স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমেই জানিতে হইবে—আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে বহিতেছে। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া সেই বিশ্বাসবলে অতীত মহত্ত্বের চেতনা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও মহত্তর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্তব্যের মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সে কথা জানি; ঐ অবনতির প্রয়োজন ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল, ফলটি মাটিতে পড়িয়া পচিয়া গেল, তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয়তো প্রথম বৃক্ষ অপেক্ষা মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল। এইরূপে যে অবনতি-যুগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল; সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান্ প্রকাণ্ড 'ঊর্ধ্বমূলম্' বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আমি আজ তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ অপেক্ষা এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি একটি করিয়া জাতি লইয়া এই জাতির সহিত তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে— অন্যান্য জাতি যে-সকল উপাদানে গঠিত, সেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প। আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইওরোপীয়—পৃথিবীর সকল জাতির শোণিত যেন এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ—আর আচার-ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ, ইওরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই।

কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ—সর্বত্র সকলকে এক ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম—এ কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে-হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে-হিসাবে 'এক ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে—যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায়সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক, সকলেই সেগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই, এশিয়ায়—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতি, ভাষা, সমাজ সম্বন্ধে সমুদয় বাধা ধর্মের সমন্বয়ী শক্তির নিকট

তিরোহিত হয়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নাই; ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর ইহাও জানি—আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে পারি।

ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ—ইহা তো সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সে-কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি, ভারতের পক্ষে কাজ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়—প্রথমে ধর্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে গেলে সর্বনাশ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনাই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের প্রথম কর্মসূচি, যুগযুগান্তর ধরিয়া অবস্থিত কালজয়ী ঐ মহাচল হইতেই এই প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আর নিজেদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, এই-সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহা অননুমোদন করেন না, আর যাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবী করিয়া থাকি, যাঁহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, সেই মহাপুরুষগণ অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া তাঁহাদের সন্তানগণের এইরূপ বিবাদ অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এই-সকল দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে-দেহে কোন রোগের বীজ বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দ্রারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কারণ যদি রোগের বীজই শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইল, তখন আর সেই রক্তে অন্য কোন বাহ্য বস্তু কিভাবে প্রবেশ করিবে? আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি উপমার সাহায্যে বলা যায়, রোগোৎপত্তির দুইটি কারণ—বাহিরে কোন বিষাক্ত জীবাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যতক্ষণ না দেহ রোগের বীজকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়, যতদিন না দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগের বীজ প্রবেশের ও তাহার বৃদ্ধির অনুকূল হয়, ততদিন জগতের কোন জীবাণুর শক্তি নাই যে, শরীরে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। বাস্তবিক প্রত্যেকের শরীরের মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ বীজাণু ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন ঐগুলির অস্তিত্ব কেহ বুঝিতেই পারে না। শরীর যখন দুর্বল হয়, তখনই বীজাণুগুলি শরীর দখল করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। জাতীয় জীবনসম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ। যখনই জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনীতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার রোগবীজাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপন্ন করে। অতএব জাতীয় দুর্বলতার প্রতিকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি, তাহা দেখিতে হইবে এবং রক্তের সর্ববিধ দোষ দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্বপ্রকার বাহ্য বিষের প্রবেশ প্রতিরোধ করিতে পারে ও ভিতরের বিষ বাহির করিয়া দিতে পারে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমন কি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। আমি এখন এ বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্মে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থাপন করায় পরিণামে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে; ভালই হউক বা মন্দই হউক, ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি, তোমরা উহা ত্যাগ করিতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি, সুতরাং আমাদের ধর্মে আমার যেমন বিশ্বাস আছে, তোমাদের যদি তেমন না-ও থাকে, তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হইবে। তোমরা এই ধর্মবন্ধনে চির আবদ্ধ; যদি ধর্ম পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ধর্মই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। এই ধর্মরক্ষার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সাহসপূর্বক সব-কিছুই সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙিয়াছে—কিন্তু এই অত্যাচার-স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহা না শিখিতে পার, দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির, গুজরাটের সোমনাথের মত অনেক মন্দির দেখিয়া তোমরা তদপেক্ষা বেশী শিক্ষা পাইতে পার—তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পার। লক্ষ্য করিয়া দেখ, ঐ মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে—বার বার বিধ্বস্ত হইয়াছে, আবার সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া, নূতন জীবনলাভ করিয়া পূর্বেরই মত অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে।

ইহাই আমাদের জাতীয় চেতনা, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ। এই ভাব অনুসরণ কর, গৌরবান্বিত হইবে। এই ভাব পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবন-প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে 'বিনাশ'—আমি অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই; আমার বক্তব্য এইটুকু—আর আমার ইচ্ছা তোমরা ইহা ভুলিও না যে, ঐগুলি গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।

কিরূপে উহা সাধিত হইবে? আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় কার্যপ্রণালী বলিব। আমেরিকা যাইবার জন্য মান্দ্রাজ ছাড়িবার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পগুলি ছিল, এই ভাব প্রচার করিবার জন্যই আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম। ধর্মমহাসভা প্রভৃতির জন্য আমার বড় ভাবনা হয় নাই—উহা শুধু একটি সুযোগরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার

মনে যে সঙ্কল্প ঘুরিতেছিল, তাহাই আমাকে সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরাইয়াছে। আমার সঙ্কল্প এইঃ প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলি—যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই বাহিরে ঐগুলি বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্বসাধারণের—প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃত ভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই-সকল ভাবপ্রচারের এক মহা্ন অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে। সংস্কৃতভাষা যে কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে। যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পার। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃত-শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে তাঁহাদের জীবৎকালেই অদ্ভুত ফল-লাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার কিছু কারণ আছে; এই মহান্ আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমন কি, মহান্ বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফল-লাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; অতি দূরে দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব-বোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। মজ্জাগত হইয়া শিক্ষা কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য; কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব। তাহাদের সভ্যতা যেমন গভীর নয়, জ্ঞানও তদ্রূপ; একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।

এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে; এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছুর প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে, যে জাতি সংস্কৃত ভাষার সুবিধা লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও পূর্বের মতই প্রভুত্ব করিবে। নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের বলিতেছি—তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা, আর উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলিতেছে উহা বৃথা; উহাতে কোনরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না; উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব হইতেই নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে। জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তি কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা; তাহা যদি করিতে পার, তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য মান্দ্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটি মত আছেঃ দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তনিবাসী আর্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রাবিড়জাতির নিবাস ছিল; দাক্ষিণাত্যের এই ব্রাহ্মণগণ শুধু আর্যাবর্তনিবাসী ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি বলি, এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে; আমি তো আর কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমরা এতগুলি আর্যাবর্তের লোক এখানে রহিয়াছি, আর আমি আমার ইওরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য-বাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করি। উহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একটু ভাষার প্রভেদমাত্র। পূর্বোক্ত মতবাদীরা বলেন, দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা আর্যাবর্ত হইতে যখন আসেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃতভাষী ছিলেন, এখন এখানে আসিয়া দ্রাবিড়ভাষা বলিতে বলিতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেই বা ও-কথা খাটিবে না কেন? অন্যান্য জাতিও আর্যাবর্তনিবাসী ছিল, তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়া দ্রাবিড়ভাষা লইয়াছে—এ কথাই বা বলা যাইবে না কেন? যে-যুক্তি দ্বারা তুমি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইতেছ, সেই যুক্তিদ্বারাই আমি তাহাদিগকে আর্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। ও-সব মূর্খের কথা, ও-সব কথায় বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে, একটি দ্রাবিড় জাতি ছিল—তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা বনে-জঙ্গলে বাস করিতেছে। খুব সম্ভব ঐ দ্রাবিড় ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সকলেই আর্য—আর্যাবর্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোন জাতি নাই।

আবার আর এক মত আছে যে, শূদ্রেরা নিশ্চয় অনার্য জাতি—তাহারা আর্যগণের দাসস্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু মার্কিন, ইংরেজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান হতভাগ্যদের ধরিয়া জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করাইয়াছে এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; যেহেতু ঐ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানগণকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, যেহেতু এই ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীতে ছুটিয়া গিয়া এরূপ কল্পনা করে যে, ঐরূপ ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল—উজ্জ্বলবর্ণ আর্যগণ আসিয়া সেখানে বাস করিলেন; তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কাহারও কাহারও মতে মধ্য-তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন মধ্য-এশিয়া হইতে। অনেক স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ আছেন, যাঁহারা মনে করেন—আর্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দ-মত তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কালো হইলে তিনি আর্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্যগণ সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদগুলির তীরে বাস করিতেন—সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি এই-সব মতামতের সঙ্গে সেখানে ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না! আজকাল কেহ কেহ বলেন, আর্যগণ উত্তরমেরুনিবাসী ছিলেন। আর্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক! আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে—আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই; এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাস করাই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচ মিনিটে আর্যদের চাটনির মত খাইয়া ফেলিত। জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।

সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছেঃ উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান্ উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্যমানব, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও পূর্ণমানবের প্রয়োজন আছে; তাঁহার লোপ হইলে চলিবে না। আধুনিক জাতিভেদ-প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি—ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হইয়াছে, ইহা সত্য। অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণদের এ গৌরবটুকু প্রাপ্য। যথেষ্ট সাহস অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা—যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, সেটুকু তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দাও'—এই ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যটি মনে রাখিও।

অতএব বন্ধুগণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই। বিবাদে কি ফল হইবে? উহা আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের—একচেটিয়া দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে, ভারত হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, আর ইহা ভারতে ইংরেজ-শাসনের অন্যতম সুফল। মুসলমান শাসনকালেও এই একচেটিয়া অধিকার-লোপের যে সুফল ফলিয়াছে, সে-জন্য আমরা উহার নিকট ঋণী। তাহাদের রাজত্বে যে সবই মন্দ ছিল, তাহা নহে। জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ মন্দ নহে, সম্পূর্ণ ভালও নহে। মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। দারিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও অগ্নির বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল—এ কথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি।

আর তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে মান্দ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি অর্ধেক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খতা জগতে আর কিছু কি থাকিতে পারে? 'পারিয়া' বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে খ্রীষ্টান হইয়া পূর্বনাম বদলাইয়া একটা যা-হোক ইংরেজী নাম লইল বা মুসলমান হইয়া মুসলমানী নাম লইল, আর কোন গোল নাই, সব ঠিক। এইরূপ দেখিয়া ইহা ছাড়া আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারবাসীরা সব পাগল, তাহাদের গৃহগুলি এক-একটি উন্মাদ-আশ্রম, আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতের প্রত্যেক জাতির ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিবে। এরূপ দূষিত ও পৈশাচিক প্রথাসমূহ যে এখনও অবাধে রাজত্ব করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোরতর লজ্জার বিষয় নয়? নিজেদেরই সন্তানগণ অনাহারে মরিতেছে— আর যে মুহূর্তে তাহারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, অমনি তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায়! বিভিন্ন জাতির ভিতর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আর থাকা উচিত নয়।

উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি লোক—অবশ্য ইহাদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রাচীনদের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা কিছুই নাই—অন্যরূপ বলিয়া থাকে, তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যপ্রণালী। তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারাই ঐ কার্যের ব্যাপক উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ। তাঁহারা দূরে থাকিয়া—যুগ যুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব শোভাযাত্রা চলিয়াছে, তাহার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অনুধাবন করেন। তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক সকল গ্রন্থের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন।

কি সেই কার্যপ্রণালী? একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই তাঁহাদের কার্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র, সেগুলিতে দেখিবে নিম্নতর জাতিদের ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইতেছে। এমন শাস্ত্রও আছে, যাহাতে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে যে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার বেদ কিছু স্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্বরতা সন্দেহ নাই, আর ইহা বলাও বাহুল্যমাত্র। কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা সমাজের অংশবিশেষের প্রথাবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রাচীনদের ভিতর কখনও কখনও অসুরপ্রকৃতি লোকের জন্ম হইয়াছিল। সকল যুগে সর্বত্রই অল্পবিস্তর অসুরপ্রকৃতির লোক ছিল। পরবর্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়াছে—'শূদ্রগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না।' ক্রমশঃ আমরা আরও আধুনিক—বিশেষতঃ যেগুলি এই যুগের জন্য বিশেষভাবে উপদিষ্ট—সেই-সকল স্মৃতিতে দেখিতে পাই, 'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।' এইরূপে ক্রমশঃ যতই দিন যাইতেছে, ততই শূদ্রদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে। এইরূপে মূল কার্যপ্রণালীর এবং বিভিন্ন সময়ে উহার বিভিন্ন পরিণতির, অথবা কিরূপে বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া উহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে, তাহা দেখাইবার সময় আমার নাই; কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘটনা বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে।

এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণজাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ জাতিবিশেষ যদি নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতকগুলি জাতি আছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ হাজার লোক, উহারা যদি সকলে মিলিয়া নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে, আর যখনই তাহারা সকলে একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে? কারণ আর যাহাই হউক, এক জাতির সহিত অপর জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এক জাতি অপর জাতির কাজে হস্তক্ষেপ করে না—এমন কি, এক জাতির বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।

শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্যগণ—জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না, আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পার। ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি, আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি-মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

তোমাদিগকেও ঋষি-মুনি হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য হইবার গোপন রহস্য। অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই ঋষি হইতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ কি? বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। আগে শুদ্ধচিত্ত হও—তোমাতেই শক্তি আসিবে। কেবল 'আমি ঋষি' এ কথা বলিলেই চলিবে না; যখনই তুমি যথার্থ ঋষিত্ব লাভ করিবে, দেখিবে—অপরে তোমার কথা কোন-না-কোনভাবে শুনিতেছে। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য শক্তি আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে; তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার অনুবর্তী হইবে, বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনিবে, এমন কি তাহাদের অজ্ঞাতসারে—নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহারা তোমার সংকল্পিত কার্যের সহায়ক হইবে। ইহাই ঋষিত্বের প্রমাণ।

কি করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে—তাহার খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করিলাম না। বংশপরম্পরাক্রমে পূর্বোক্ত ভাব লইয়া কাজ করিতে করিতে কার্যপ্রণালীর খুঁটিনাটি আবিষ্কৃত হইবে। বিবাদ-বিসংবাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহা দেখাইবার জন্য আমি দু-একটি কথার আভাস-মাত্র দিলাম। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, আজকাল বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ঘোর বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। এটি বন্ধ হওয়া চাই। ইহাতে কোন পক্ষেরই কিছু লাভ নাই। উচ্চতর বর্ণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাভ নাই; কারণ একচেটিয়া অধিকারের দিন গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাহারা এই কার্য করে, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, ততই তাহারা পচিবে আর ধ্বংসও তত ভয়ানক হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকল জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা; ব্রাহ্মণ যদি ঐরূপ চেষ্টা করেন এবং যতদিন করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ; তিনি যদি শুধু টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই সাহায্য করা উচিত, তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে; কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে স্বর্গলাভ না হইয়া বীপরিত ফল হয়—আমাদের শাস্ত্র এই কথা বলে। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি বৈষয়িক কোন কর্ম করেন না। সাংসারিক কার্য অপর জাতির জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি—তাঁহারা যাহা জানেন তাহা অপর জাতিকে শিখাইয়া, বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা অপরকে দান করিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণ কাজ করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি, তাহা স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেনঃ

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥

২৬

ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ—তাঁহারই নিকট ধর্মের ভাণ্ডার রহিয়াছে। তাঁহাকে ঐ

ভাণ্ডার খুলিয়া রত্নরাজি জগতে বিতরণ করিতে হইবে। এ কথা সত্য যে, ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন, আর তিনিই সর্বাগ্রে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাগুলির রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য সব-কিছু ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন জ্ঞান লাভ করিল না, কেন তাঁহাদের মত অনুষ্ঠান করিল না? কেন তাহারা প্রথমে অলসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জয়লাভের সুযোগ দিয়াছিল?

তবে অধিকতর সুবিধা লাভ করা এক কথা, আর অসদ্ব্যবহারের জন্য ঐগুলিকে রক্ষা করা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা আসুরিক ভাব ধারণ করে; কেবল সদুদ্দেশ্যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই বহু-যুগ সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—ব্রাহ্মণ এতদিন যাহার অছি বা রক্ষক হইয়া আছেন, আজ তাহা সর্বসাধারণকে বিলাইয়া দিতে হইবে; তাঁহারা সর্বসাধারণকে উহা এতদিন দেন নাই বলিয়াই মুসলমান-আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই জন্যই সহস্র বৎসর যাবৎ যে-কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সে-ই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

আমাদের সর্বপ্রথম কার্য—আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে নিরাপদ স্থানে ধর্মরূপ অপূর্ব রত্নরাজি গোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখান হইতে সেগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য আগে করিতে হইবে। বাঙলাদেশে

২৭

একটি প্রাচীন বিশ্বাস আছে—যে-সাপ কামড়াইয়াছে, সে যদি নিজেই নিজের বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই রোগী বাঁচিবে। সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজের বিষ নিজেকেই উঠাইয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? এতদিন তোমরা কি করিতেছিলে? কেন তোমরা এতদিন উদাসীন ছিলে? আর অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর মস্তিষ্ক, বীর্য, সাহস—অধিকতর ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছে বলিয়া এখন বিরক্তি প্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই-সকল বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসংবাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত না থাকিয়া, সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে-শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত-ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলাভের ইহাই রহস্য।

ভারতে 'সংস্কৃতভাষা' ও 'মর্যাদা' সমার্থক। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমার সাহায্যে বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ নিজ আত্মসম্মোহনে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে; আর তাঁহার নিজের মন ভাবের যে স্তরে অবস্থিত, উহা অন্যের মনে ঠিক সেই স্তরের ভাব উৎপন্ন করে; এইরূপ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যখনই আমাদের মধ্যে একজন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শক্তিতে অনেকের ভিতর তদনুরূপ ভাবের উদয় হয়, তখনই আমরা শক্তিশালী হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ—চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে! সংহতিই শক্তির মূল—এ কথা বলিলে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা তো জড়শক্তি-বলেই সাধিত হয়; আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তবে কোথায় রহিল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বইকি! এই চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে, এবং উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি—শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।

আর এখনই আমার মনে অথর্ববেদ সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক প্রতিভাত হইতেছেঃ 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।

২৮

তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই তাঁহাদের যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন। একচিত্ত হওয়াই সমাজ-গঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপযোগী শক্তি-সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য। প্রত্যেকটি চীনার মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন, আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাপানী একচিত্ত—ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা তোমরা জান। জগতের ইতিহাসে চিরকালই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। দেখিবে—ক্ষুদ্র সংঘবদ্ধ জাতিগুলি চিরকালই বৃহৎ অসংবদ্ধ জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা খুবই স্বাভাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিগুলির বিভিন্ন ভাব ও ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা অতি সহজ—আর তাহাতেই

তাহারা সহজে উন্নত হইয়া থাকে। আর যে-জাতির লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার পক্ষে সমবেতভাবে কার্য পরিচালনা করা তত কঠিন। উহা যেন একটা অনিয়ন্ত্রিত জনতা, তাহারা কখনও একত্র মিলিতে পারে না। যাহা হউক, এই সব মত-বিরোধের ইতি করিতে হইবে।

আমাদের ভিতর আর একটি দোষ আছে। ভদ্রমহিলাগণ, আমায় ক্ষমা করিবেন, কিন্তু বহু শতাব্দী দাসত্বের ফলে আমরা যেন একটা স্ত্রীলোকের জাতিতে পরিণত হইয়াছি। এদেশে বা অপর যে-কোন দেশে যাও, দেখিবে—তিনজন স্ত্রীলোক যদি পাঁচ মিনিটের জন্য একত্র হইয়াছে তো বিবাদ করিয়া বসে! পাশ্চাত্য-দেশগুলিতে বড় বড় সভা করিয়া মেয়েরা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার-ঘোষণায় আকাশ ফাটাইয়া দেয়; তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতে পরস্পর বিবাদ করিয়া বসে, তখন কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখা যায়—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন! আমরাও এইরূপ স্ত্রীজাতির তুল্য হইয়াছি। যদি কোন নারী আসিয়া নারীর উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না, জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবে তাহারা মনে করে, ঠিকই হইয়াছে। তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে—ঐরূপ প্রভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে! সমগ্র জগৎই জাদুকর ও সম্মোহনকারী দ্বারা পূর্ণ—শক্তিশালী ব্যক্তি সর্বদা এইরূপে অপরকে বশীভূত করিতেছে। যদি তোমাদের দেশে একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে নামাইয়া আনিতে চেষ্টা কর, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, মনে কর—ঠিকই হইয়াছে। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছ। এই দাসত্বতিলক কপালে লইয়া তোমরা আবার বড় বড় নেতা হইতে চাও? অতএব দাস-মনোভাব ছাড়িয়া দাও।

আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে। তোমরা আধ মাইল পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের মত সমুদ্র পার হইতে চাহিতেছ! তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে—কর্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? এ কি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ, আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবেন! এ কি তামাশা? এ-সব অর্থহীন বাজে কথা! আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই-সব মানুষ ও পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পর বিবাদ না করিয়া প্রথমেই এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্মের ফলে কষ্ট পাইতেছ, এত কষ্টেও তোমরা চোখ খুলিবে না?

বিষয়টি এত বড়—কোথায় যে থামিব, তাহা জানি না। সুতরাং মান্দ্রাজে আমি যেভাবে কার্য করিতে চাই, দু-চার কথায় তাহা তোমাদের নিকট বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিব। আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এটি কি বুঝিতেছ? তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে কল্পনা করিতে হইবে—আলোচনা করিতে হইবে, ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, পরিশেষে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। যতদিন না তাহা করিতেছ, ততদিন এ জাতির মুক্তি নাই। তোমরা এখন যে-শিক্ষা পাইতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে; আর দোষগুলি এত বেশী যে, গুণভাগ নগণ্য হইয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে-কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়—মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। বালক স্কুলে গিয়া প্রথমেই শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আর্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সির ভিতরে মৌলিকচিন্তাযুক্ত একটি মানুষও পাওয়া যায় না। যিনি মৌলিকভাবপূর্ণ, তিনি অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন—এদেশে নয়; অথবা তিনি নিজেকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। মাথায় কতকগুলি তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে সেগুলি মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে-ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'—চন্দনভারবাহী গর্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না, ইত্যাদি।

যদি শিক্ষা বলিতে শুধু কতকগুলি বিষয় জানা বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানসমূহই তো ঋষি। সুতরাং আদর্শ এই হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে। অবশ্য ইহা একটি গুরুতর ব্যাপার—কঠিন সমস্যা। জানি না, ইহা কখনও কার্যে পরিণত হইবে কিনা। কিন্তু আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

কিভাবে আমাদের কাজ করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মান্দ্রাজের কথাই ধর। আমাদিগকে একটি মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে—কারণ হিন্দুগণ সকল কাজেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার, ঐ মন্দিরে কোন্ দেবতার পূজা হইবে—এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদ করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তাহার নিজেকে 'হিন্দু' বলিবার কোন অধিকার নাই। যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারে ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগী একটি মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ ঐ স্থানে আসিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাঁহাদের নিজ নিজ মতসমূহ শিক্ষা দিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কেবল একটি বিষয়ে নিষেধ—অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মতবিরোধ থাকিলে বিবাদ করিতে পারিবে না। তোমার যাহা বক্তব্য আছে—বলিয়া যাও, জগৎ উহা শুনিতে চায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি-সম্বন্ধে তোমার কি মত, তাহা শুনিবার অবকাশ জগতের নাই, সেটি তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ এই মন্দিরের সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র থাকিবে। এখান হইতে যে-সকল শিক্ষক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। আমরা এখন যেমন দ্বারে দ্বারে ধর্ম প্রচার করিতেছি, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা দুই-ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। এই-সকল আচার্য ও প্রচারকগণের চেষ্টায় যেমন কার্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, অমনি এইরূপ আচার্য ও প্রচারকের সংখ্যাও বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে—যতদিন না আমরা সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারি। ইহাই আমার প্রণালী।

ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রয়োজন। তোমরা বলিতে পার, টাকা কোথায়? টাকার প্রয়োজন নাই; টাকায় কি হইবে? গত বারো বৎসর যাবৎ কাল কি খাইব, তাহার ঠিক ছিল না, কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক, সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তো ঐগুলির দাস নহি। আমি বলিতেছি,অর্থ ও অন্য সব নিশ্চয় আসিবে। জিজ্ঞাসা করি, মানুষ কোথায়? আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি;—মানুষ কোথায়?

হে মান্দ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, বাল্যকালে যেমন আমার ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই এখন আমি এই-সকল কঠিন কার্যসাধনে সমর্থ হইতেছি। তোমরা প্রত্যেকে নিজের উপর এই বিশ্বাস রাখো যে, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। হাঁ, আমরা জগতের সকল দেশে যাইব, আর বিভিন্ন শক্তি-সহযোগে পৃথিবীতে যে-সব জাতি গঠিত হইতেছে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ভাব তাহাদের উপাদান-স্বরূপ হইবে। আমাদিগকে ভারতে বা ভারতের বাহিরে প্রত্যেকটি জাতির জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—আর এই অবস্থা আনিবার জন্য আমাদিগকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

ইহার জন্য আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'

২৯

—আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবকগণই ঈশ্বরলাভ করিবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারণ করিবার এই সময়—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে; কাজে লাগ—এই তো সময়। কারণ নবপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি তাহা গ্রহণ করেন। তবে ওঠ, ওকালতির চেষ্টা বা বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি অপেক্ষা বড় বড় কাজ রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প, সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। এই জীবনে আছে কি? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে মান্দ্রাজী যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা বলিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখনও নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, সে জড়বাদী হইয়াছে। কিন্তু তাহা দু-দিনের জন্য, এ ভাব তোমাদের মজ্জাগত নহে; তোমাদের ধাতে যাহা নাই; তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। উহা যে হইবার নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত; অতএব মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন এস, একটি মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক। সেই ভগবান্, যিনি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছেন, 'নিজ ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য আমি বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হই', সেই মহান্ কৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হউন।

দান-প্রসঙ্গে

মান্দ্রাজে অবস্থানকালে স্বামীজী ‘চেন্নাপুরী অন্নদান-সমাজম্’ নামক এক দাতব্য ভাণ্ডারের সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন। ব্রাহ্মণজাতিকে ভিক্ষাদান-প্রথা ঠিক নহে—পূর্ববর্তী বক্তা এই মর্মে বলিলে স্বামীজী বলেনঃ

এই প্রথার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তা-সম্পত্তির রক্ষক। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দান-প্রথার তুলনা করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্যদেশের আইন দরিদ্রকে ‘গরীবখানায়’ (poorhouse) যাইতে বাধ্য করে; মানুষ কিন্তু খাদ্য অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে, সুতরাং সে গরীবখানায় না গিয়া সমাজের শত্রু—চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিস ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। ‘সভ্যতা’ নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই, সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্যদানেরও আবশ্যকতা থাকিবে। এখন হয় ভারতের মত নির্বিচারে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসিগণকে—তাঁহারা সকলে অকপট না হইলেও—আহার সংগ্রহ করিবার জন্য শাস্ত্রের দু-চারটি কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে; অথবা পাশ্চাত্যজাতির মত বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে-আইন ভিক্ষুককে চোর-ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।

মান্দ্রাজ হইতে স্বামীজী স্টীমারে কলিকাতা রওনা হন। খিদিরপুর হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনে অতি প্রত্যুষে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিলেন। প্রায় বিশ সহস্র লোক ‘জয় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকী জয়’ ‘স্বামী বিবেকানন্দকী জয়’ ধ্বনিতে স্বামীজীকে সংবর্ধনা করেন। যুবকগণ স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই লইয়া যায়। পথে রিপন কলেজে অল্পক্ষণ থাকিয়া স্বামীজী বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের ভবনে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হন এবং আলমবাজার মঠে অবস্থান করেন। এক সপ্তাহ পরে কলিকাতায় বিরাট অভিনন্দন-সভা আহূত হয়; শ্রোতৃ-সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর

১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিলে স্বামীজী বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। ২৬ ফেব্রুয়ারী শোভাবাজারে রাজবাটীতে কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ

মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে—অতি দূরে পলাইয়া যায়; চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ—পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি সে নিজে যে সার্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর

৩০

অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মত সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মত সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহতি পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?' আমি বলিলাম, 'পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ।' ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার মনে আসিল না।

হে কলিকাতাবাসী আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতার কাজই করিয়াছ—অহো! হিন্দুভ্রাতারই কাজ। কারণ এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

এই চিকাগো ধর্মমহাসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্মমহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট শোন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল—নিজেদের প্রভুত্ব—প্রতিষ্ঠা করা। সেখানকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষঠা এবং অন্যান্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা। কার্যতঃ ফল তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইয়াছিল। বিধির বিধানে আর কিছু হইবার উপায়ই ছিল না। অনেকেই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা এই-আমার আমেরিকা-যাত্রা ধর্ম-মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, কাজেরও সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও উক্ত মহাসভার সভ্যগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ঠিক ঠিক বলিতে গেলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী সহৃদয় অতিথিবৎসল উন্নত মার্কিনজাতির প্রাপ্য—যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষরূপ বিকাশিত হইয়াছে। কোন মার্কিনের সহিত ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটিতে নিমন্ত্রন করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই মার্কিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-ইহাই তাঁহাদের পরিচয়। তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাঁহারা যে অপূর্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমার বহু বৎসর লাগিবে।

কিন্তু শুধু মার্কিনগণকে ধন্যবাদ দিলেই চলিবে না; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আটলাণ্টিকের অপরপারে সেই ইংরেজ জাতিকেও আমাদের সেরূপ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ইংরেজ জাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা পোষণ করিয়া কেহই কখনও ইংলণ্ডে পদার্পণ করে নাই; এই সভামঞ্চে যে-সকল ইংরেজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম—ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম—ঐ জাতির হৃৎস্পন্দন কোথায়, ততই

তাহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজ জাতিকে এখন আমা অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। তাঁহাদের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধভাবও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানজনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের জানি না, তাঁহারাও আমাদের জানেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা—এমন কি চরিত্র-নীতি পর্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোন ইংরেজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান—এখানে দুঃখ-দারিদ্র্য অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতেছে, অমনি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, এ দেশে কোন ধর্ম থাকিতে পারে না; তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই সত্য। ইওরোপের শীতপ্রধান জলবায়ুর জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে সেখানে দারিদ্র্য ও পাপ একত্র অবস্থান করে—দেখা যায়, ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমার অভিজ্ঞতা এই—ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র, সে তত বেশী সৎপ্রকৃতি; কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বিদেশী প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার লোক অল্পই আছেন। এখানে—কেবল এখানেই এমন এক জাতির বাস, যাহাদের নিকট 'দারিদ্র্য' বলিলে 'পাপ' বুঝায় না; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হয়। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগকেও পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি অতি ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার সবগুলিরই অর্থ আছে, সবগুলিরই ভাল দিক্ আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্বক ধৈর্যসহকারে ঐগুলি আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন; সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার বহু শতাব্দীর অতি মৃদুগতি ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলির গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও যেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারগুলি দেখিয়া উপহাস না করি, তাঁহারাও যেন আমাদের আচারগুলিকে বিদ্রূপ না করেন।

আমি এই সভায় আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয় দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরেজজাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়—তাঁহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের মস্তিষ্কে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়—উহা তাঁহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যায়, কখনও বাহির হয় না, আর ঐ জাতির অসীম কার্যকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে; অন্য কোন দেশে সেরূপ নহে। এই জাতির যেমন অপরিসীম কার্যকরী শক্তি, এই জাতির যেমন অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যকরী শক্তি বেশী। আর এই ইংরেজ-হৃদয়ের মূল উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীরে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? ইংরেজ বীরের জাতি, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা; ভাব কখনও না দেখানো—বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা এই শিক্ষা পাইয়াছেন। দেখিবেন, খুব কম ইংরেজ কখনও নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; পুরুষের কথা কেন, ইংরেজ নারীও কখনও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন না। আমি ইংরেজ নারীকে এমন কাজ করিতে দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে—এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হৃদয়ের ভাবধারার গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার সেখানে পৌঁছিতে পারেন, যদি ইংরেজের সহিত আপনার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি তাহার সহিত মেশেন, যদি একবার আপনার নিকট তাহাকে তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে ইংরেজ আপনার চিরবন্ধু—আপনার চিরদাস। এই জন্য আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম সুরের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত—সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্যই বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই মহামানবকে জানিতে পারে নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়া থাকি; এখন আমরা যে-আকারে সেই-সকল জীবনী পাই, সেগুলিতে বহু শতাব্দী যাবৎ শিষ্যপ্রশিষ্যগণের পরিবর্তন-পরিবর্ধনরূপ লেখনীচালনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের জীবন তেমন নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার সেই প্রসিদ্ধ বাণী জানা আছেঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি কথা তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয়টি এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপ একটি ধর্মের প্রবল বন্যা আসিবার পূর্বে সমাজের সর্বত্র ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-পরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি তরঙ্গ—প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়তো কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, যাহা কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গূঢ় শক্তিসম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, —সেটিই ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে এবং অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে বিপুল ও প্রবল হইয়া উহা মহাবন্যায় পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতিরোধ করিতে পারে না। এরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই দেখিবে; যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকে তবেই উহা গ্রহণ করিবে; যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হও, তবেই উহার সন্ধান পাইবে।

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না। দেখিতেছ না, সুদূর গ্রামে জাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্যসত্যই পূজিত হইতেছেন, যে-সকল দেশের লোকেরা বহু শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমাদের শক্তি, না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে; যে-শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি। কারণ তুমি আমি, সাধু মহাপুরুষ, এমন কি অবতারগণ সকলেই—সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশমাত্র; সেই শক্তি কোথাও বা কম, কোথাও বা বেশী ঘনীভূত, পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে; বোধ হয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি সমাজসংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই ধর্মের ভিতর দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, যে-মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, আমরা যেন তাহার পরিবর্তে অপর একটি মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম; যদি আমরা কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়, তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে যেভাবেই লও, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে যত মহাশক্তির বিকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য। অহো, জগতের কোন দেশে সার্বভৌম ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন এক ব্যক্তি বাস করিতেন, যাঁহার সমগ্র জীবনই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলকেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য-জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখনও ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শই পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি বা অপর যে-কেহ প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে স্থাপন করিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তাহা তোমাদের এখনই স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক—তোমরা যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ, অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, তন্মধ্যে ইঁহার জীবন শুদ্ধতম। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতেছ যে, এরূপ অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা তো কখনও পাঠও কর নাই, দেখিবার আশা তো দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।

এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তাঁহার বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। তাঁহার চরিত্র এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারিব না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যিনি সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন, আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন; আমরা কিছু করি বা না করি—তথাপি যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তিনি তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, সে-জন্য প্রভুর কাজ আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কাজের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কাজ করা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

এইরূপে চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকে। তোমরা বলিয়াছ, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ, আমাদিগকে তাহা করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয়তো খুব বড় হইতে পারে, তোমাদের অনেকে এ-কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিতে পার, তথাপি ইহাই আমাদের আদর্শ হইবে। আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে, নতুবা মরিতে হইবে; ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের বিস্তার করিতে হইবে; আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে; নতুবা আমরা অতি হীন অবস্থায় পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের মধ্যে একটা কর—হয় বাঁচো, না হয় মর।

সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশে কলহের কথা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু আমার কথা শোন, ইহা সব দেশেই আছে। রাজনীতি যে-সকল জাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই-সকল জাতি আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সূচনা করে, অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে, কিন্তু উহা থামাইবার কোন বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সব জাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে নিবদ্ধ সত্যসমূহের প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে একটি অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি অন্য কোন প্রমাণ চাও? তোমাদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি-ঘেঁষা, তাহাদিগকেই আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। অদ্যকার সভাই যে এ-বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ এই-সব স্বার্থের বিচার ছাড়িয়া দিলেও আমাদের পিছনে নিঃস্বার্থ মহান্ জীবন্ত দৃষ্টান্তসকল রহিয়াছে। ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মত খোলার ভিতর ঢুকিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে নাই। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহা আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। অতীত কালে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখা গিয়া থাকে, তবে জানিবেন—এখন মহা বন্যা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে, কারণ আদান-প্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া সব জিনিষ—এমন কি ধর্ম পর্যন্ত শিখিব? অবশ্য তাহাদের নিকট আমরা কলকব্জা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক বিষয় শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে; আমরা তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্য জগৎ অপেক্ষা করিতেছে। পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, তাহার দিকে জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি বহু শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যেও যে-আধ্যাত্মিকতা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকাররূপে লব্ধ সেই অপূর্ব রত্নরাজির জন্য ভারতের বাহিরে যে কতখানি আগ্রহ, তাহা তোমরা কিছুই জান না। আমরা এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি—এখন এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া একটা জাতীয় দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভারতে যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু পান করিবার জন্য ভারতের বাহিরে লক্ষ লক্ষ নরনারী কত আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতেই হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অধ্যাত্ম-জগতের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত বিষয়গুলি শিক্ষা করিব। চিরকাল শিষ্য হইয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমভাবাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না; আর যখন একদল লোক সর্বদাই আচার্যের আসন গ্রহণ করে এবং অপর দল সর্বদাই তাহাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে কখনও সমভাব আসিতে পারে না। যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে উহাদের নিকট যেমন শিখিতে হইবে, তেমনি তাহাদিগকে শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন এই কাজ করিতেই হইবে।

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি—বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিষ, কিন্তু এগুলি বেশীদূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব বাঙালীর দ্বারা—ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই ঐ কার্য সাধিত হইবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—উঠ, জাগো, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাক, ক্ষান্ত হইও না।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ'—এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ—জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমি এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমা অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পার। উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছ—টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদগুলির মধ্যে অতি মনোরম কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের অবশ্যই স্মরণ আছেঃ এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিষ দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা কঠিন; এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধা জাগিবামাত্রই নচিকেতার মনে হইল—আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, অধম আমি কখনই নহি; আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে-সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন; যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যম-সদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে—ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্যজাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধারই ফলে; তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ একবাক্যে যাহা প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার আত্মায় বিশ্বাসী হও—যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন—সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সব শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব আমি চাই—এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস; আর এই বিশ্বাস- অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।

আমি তো এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য লোপ পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং কার্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার হইবে যে, যাহা আমি কখনও কল্পনাও করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যত কিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে, জগতে যত বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায়

তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে-মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার; নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে কেবল বলিতে পারি—আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের, সর্বোপরি আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় লাগিতে পারি।

সর্বাবয়ব বেদান্ত

[কলিকাতা স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত বক্তৃতা]

দূরে—অতি দূরে—লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি ঐতিহ্যের ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্যন্ত যেখানে প্রবেশ করিতে অসমর্থ—অনন্তকাল স্থিরভাবে এই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে কখনও কিছুটা ক্ষীণ, কখনও অতি উজ্জ্বল, কিন্তু চিরকাল অনির্বাণ ও স্থির থাকিয়া শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের ভাবরাজ্যে উহার পবিত্র রশ্মি, নীরব অননুভূত, শান্ত অথচ সর্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি বিকিরণ করিতেছে; ঊষাকালীন শিশিরসম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে—ইহাই উপনিষদের ভাবরাশি, ইহাই বেদান্তদর্শন। কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল। অনুমান-বলে এ তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পরবিরুদ্ধ যে, এগুলির উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানব যাহা কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই জ্যোতির সমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে বেদান্তজ্ঞানের তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া কখনও পূর্বে কখনও পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গের প্রবাহ পশ্চিমে এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও এণ্টিওকে (Antioch) যাইয়া গ্রীকদিগের চিন্তায় গতি শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল।

সাংখ্যদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। সাংখ্য ও ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম বা দার্শনিক মত উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতেও প্রাচীন বা আধুনিক কালে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও ইহাদের সবগুলিই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অথবা অন্য কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, অথবা তুমি যে-নামেই নিজেকে অভিহিত কর না কেন, তোমার শাস্ত্র উপনিষদ্ই প্রমাণস্বরূপ তোমার পিছনে রহিয়াছে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে 'সনাতন'-মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। জৈন—বিশেষতঃ বৌদ্ধ মত উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিদূরিত হইয়াছিল; অতএব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র উৎস। আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, সেই অনন্তশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থবৃক্ষরূপ হিন্দুধর্ম বেদান্তের প্রভাব-দ্বারা সম্পূর্ণ অনুস্যূত। আমরা জানি বা নাই জানি—বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ আমরা বেদান্তের উপাসক; আর প্রত্যেক হিন্দু বেদান্তেরই সাধনা করে।

অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্ত প্রচার করা আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু যদি কিছু প্রচার করিতে হয়, তবে তাহা এই বেদান্ত। বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়া চলা উচিত বটে, কিন্তু এই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই। উপনিষদ্- সমূহের মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে, অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্যন্ত তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিগণ পর্যন্ত পরস্পর মতভেদহেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক সময়ে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা একটি চলিত বাক্য হইয়া গিয়াছিল—যাঁহার মত অপরের মত হইতে ভিন্ন নহে, তিনি মুনিই নহেন—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং না ভিন্নম্।' কিন্তু এখন ও-রূপ বিরোধে আর চলিবে না। উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমন্বয়ভাব রহিয়াছে, এখন তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা জগতের কাছে স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে।

ঈশ্বর-কৃপায় আমার এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাস্বরূপ—যাঁহার জীবন তাঁহার উপদেশ অপেক্ষা সহস্রগুণে উপনিষদ্মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ; বস্তুতঃ তিনি ছিলেন উপনিষদের ভাবগুলির মূর্ত বিগ্রহ। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছুটা আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের কাছে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কিনা; কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পস্পরবিরোধী নহে, পরস্পরসাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান-স্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত, ইহা দেখানোই আমার জীবনব্রত।

এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতে কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্চনা এখনও ঐ বেদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে; তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুশাসন অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সেই সব স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রম-সন্নিবেশ অধিকাংশস্থলে বেদানুযায়ী নহে, তন্ত্র বা পুরাণ অনুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী, এই অর্থে আমাদিগকে 'বৈদিক' নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না; কিন্তু আমরা সকলেই যে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। 'হিন্দু' নামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে 'বৈদান্তিক' আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই বৈদান্তিক-নামে অভিহিত হইতে পারে।

বর্তমান কালে ভারতে যে-সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় যে সামান্য মতভেদের উপর অধিক ঝোঁক দেন এবং সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া 'বিশুদ্ধাদ্বৈত', 'বিশিষ্টাদ্বৈত' প্রভৃতি নূতন নূতন নাম গ্রহণ করিতে চান, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কতকগুলি নূতন, কতকগুলি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের নূতন সংস্করণ। মোটের উপর উহাদিগকে হয় দ্বৈতবাদী, না হয় অদ্বৈতবাদী—এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়। রামানুজের জীবন ও তাঁহার দর্শনকে দ্বৈতবাদের এবং শঙ্করাচার্যকে অদ্বৈতবাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামানুজ পরবর্তী কালে ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক; অন্যান্য দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়গুলি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার উপদেশাবলীর সারাংশ, এমন কি—সম্প্রদায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলী পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ ও তাঁহার প্রচারকার্যের সহিত ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া আশ্চর্য হইবে—উহাদের পরস্পরের উপদেশ, সাধনপ্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কতদূর সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার্যপ্রবর মধ্বমুনি এবং তাঁহার অনুবর্তী—আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্যাচার্যের মত-ই বাঙলা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে, যথা—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অদ্বৈতবাদী; সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই অদ্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ 'বিষ্ণু' নামের পরিবর্তে 'শিব' নাম বসাইয়াছেন মাত্র, আর জীবাত্মার পরিণামবিষয়ক মতবাদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ববিষয়েই রামানুজ-মতাবলম্বী। রামানুজের মতানুবর্তিগণ আত্মাকে 'অণু' অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুবর্তিগণ তাঁহাকে 'বিভু' অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীনকালে অদ্বৈত-মতানুবর্তী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যেগুলিকে শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করিয়াছে। কোন কোন বেদান্তভাষ্যে বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে শঙ্করের উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাপি শঙ্করের মায়াবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্পষ্টই বোধ হয়, এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহারা এই মায়াবাদ স্বীকার করিত না; এমন কি তাহারা শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করানো হইয়াছে। যাহাই হউক, বর্তমান কালে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী, আর শঙ্করাচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য—উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের প্রভাব আমাদের বাঙলা দেশ, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বেশী বিস্তৃত হয় নাই; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে স্মার্তগণ সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী; আর বারাণসী অদ্বৈতবাদের একটি কেন্দ্র বলিয়া আর্যাবর্তের অনেক স্থলে তাঁহার প্রভাব খুবই বেশী।

এখন আর একটি কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামানুজ—কেহই নিজেকে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন নাই। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, তিনি বোধায়ন- ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে' ইত্যাদি কথা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাষ্য আমার কখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আমি সমগ্র ভারতে ইহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে উক্ত ভাষ্যের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোকগত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাসসূত্রের বোধায়ন-ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্য মানিতেন না; আর যদিও সুবিধা পাইলেই রামানুজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু তিনি নিজেই কখনও বোধায়ন-ভাষ্য সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। রামানুজ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাব, স্থানে স্থানে ভাষা পর্যন্ত লইয়া তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভাষ্যের কয়েক স্থলে প্রাচীনতর ভাষ্যসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন তাঁহার গুরু এবং গুরুর গুরু তাঁহার মতই অদ্বৈত-মতাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন, বরং সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষাও অদ্বৈততত্ত্ব-প্রকাশে অধিকতর অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কিছু নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। রামানুজ যেমন বোধায়ন-ভাষ্য অবলম্বনে তাঁহার ভাষ্য লিখিয়াছেন, শঙ্করও ঐরূপ কাজই করিয়াছিলেন, তবে কোন্ ভাষ্য-অবলম্বনে তিনি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় এখন নাই।

তোমরা যে-সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা যেগুলি দেখিয়াছ, উপনিষদ্‌ই সে-গুলির ভিত্তি। যখনই তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য দর্শনও উপনিষদ্ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনের ন্যায় আর কোন দর্শনই ভারতে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্যদর্শনের চরম পরিণতিমাত্র। আর সমগ্র ভারতের, এমন কি সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক্ দিয়া ভারতের ইতিহাসে কপিলেরই নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জগতে সর্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেইখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। কোন মত সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে, তথাপি তাহাতে কপিলের—সেই তেজস্বী মহামহিমময় অপূর্ব প্রতিভাসম্পন্ন কপিলের প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের অধিকাংশ—অতি সামান্য পরিবর্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বাঙলার নৈয়ায়িকগণ ভারতীয় দর্শন-জগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি তুচ্ছবিষয় এবং গুরুভার পারিভাষিক শব্দনিচয়—যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়—লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদান্তিকদের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয়া নিজেরা 'ন্যায়' লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের বিচার-প্রণালী-সম্বন্ধীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার মত মালাবার দেশেরও কোন কোন নগরে সুপরিচিত। এই তো গেল অন্যান্য দর্শনের কথা; ব্যাসপ্রণীত বেদান্তদর্শন—'ব্যাসসূত্র' কিন্তু ভারতে সর্বত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, আর উহার যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকভাবে বিবৃত করা, তাহা সাধন করিয়া ভারতে উহা

স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। এই বেদান্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে; শঙ্করাচার্যও এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার সূত্র-প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য—বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূহকে এক সূত্রে গাঁথিয়া একটি মালা প্রস্তুত করা। তাঁহার সূত্রগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু সেগুলি উপনিষদের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহার অধিক নহে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এখন এই ব্যাসসূত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। আর এদেশে যে-কোন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাসসূত্রের একটি নূতন ভাষ্য লিখিয়া সম্প্রদায় পত্তন করে। সময় সময় এই ভাষ্যকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতভেদ দেখা যায়, সময় সময় মূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক সেই ব্যাসসূত্র এখন ভারতে প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থের আসন গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাসসূত্রের উপর একটি নূতন ভাষ্য না লিখিয়া ভারতে কেহই সম্প্রদায়-স্থাপনের আশা করিতে পারে না। ব্যাসসূত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য গীতার প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার মহৎ জীবনে যে-সকল বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে গীতাপ্রচার ও গীতার সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ ভাষ্য প্রণয়ন অন্যতম। ভারতের সনাতন-পন্থাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই পরবর্তী কালে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া গীতার এক-একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন।

উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টই আধুনিক, যথা— আল্লোপনিষদ্। উহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে 'রজসুল্লা' বলা হইযাছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন-সাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। সংহিতাভাগে আল্লা বা ইল্লা অথবা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষদ্‌সমূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপে এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ 'রজসুল্লা' হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক, এই-জাতীয় আরও অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, এগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক, আর এইরূপ উপনিষদ্ রচনা বড় কঠিনও ছিল না। কারণ বেদের সংহিতাভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, ইহাতে ব্যাকরণের বড় বাঁধাবাঁধি ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত 'পাণিনি' এবং 'মহাভাষ্য' পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু পাঠে কিছুটা অগ্রসর হইবার পর দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবল ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমূহের ব্যতিক্রম-মাত্র। ব্যাকরণের একটি সাধারণ বিধি করা হইল, তারপরেই বলা হইল—বেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। সুতরাং দেখিতেছ, যে-কোন ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে। কেবল যাস্কের 'নিরুক্ত' থাকাতেই একটু রক্ষা। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি সমার্থক শব্দের সন্নিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, সেখানে তোমার যত ইচ্ছা উপনিষদ্ রচনা করিতে পার। একটু সংস্কৃতজ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গোটাকতক শব্দ রচনা করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের তো আর কোন ভয় নাই, তখন রজসুল্লাই হউক বা যে-কোন সুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে পার। এইরূপে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে; আর শুনিয়াছি—এখনও হইতেছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এইভাবে নূতন উপনিষদ্ রচিত হইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, যেগুলি স্পষ্টই খাঁটি জিনিষ বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেইগুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই উপনিষদের আর দু-একটি তত্ত্বসম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ উপনিষদ্‌সমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র, আর ঐ-সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইবে, একটি বক্তৃতায় কিছুই হইবে না। এই কারণে উপনিষদের আলোচনায় যে-সকল বিষয় আমার মনে উদিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে শুধু দু-একটি বিষয় তোমাদের নিকট বলিতে চাই। প্রথমতঃ জগতে ইহার ন্যায় অপূর্ব কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার 'নাসদীয় সূক্ত'-এর বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়াবস্থা-বর্ণনার সেই শ্লোক আছেঃ তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি। 'যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল'—এটি পড়িলে এই উপলব্ধি হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভারতের বাহিরে এবং ভারতের ভিতরেও গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতের বাহিরে এই চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাব-বর্ণনার আকার ধারণ করিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। যখনই মিল্টন বা দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইওরোপীয় কবি অনন্তের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার কবিত্বের পক্ষসহায়ে নিজের বাহিরে সুদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে। বেদসংহিতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেমন অপূর্বভাবে চিত্রিত হইয়া পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে, তেমনভাবে আর কোথাও হয় নাই। সংহিতার এই 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্' বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া তিন জন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন, 'সূচীভেদ্য অন্ধকার', মিল্টন বলিতেছেন, 'আলোক নাই, দৃশ্যমান অন্ধকার।' কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতা বলিতেছেন, 'অন্ধকার—অন্ধকারের দ্বারা আবৃত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুক্কায়িত।' গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। যখন হঠাৎ নূতন বর্ষাগম হয়, তখন সমগ্র দিগ্বলয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সঞ্চরণশীল শ্যাম মেঘপুঞ্জ ক্রমশঃ অন্য মেঘরাশি আচ্ছন্ন করিতে থাকে। যাহা হউক, সংহিতার এই কবিত্ব অতি অপূর্ব বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অন্যত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা মানবজীবনের মহান্ সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক বা আধুনিক ইওরোপীয়গণ যেমন বহির্জগৎ অনুসন্ধান করিয়া জীবনের এবং পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক সকল সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণও ঐরূপ করিয়াছিলেন, আর ইওরোপীয়গণের ন্যায় তাঁহারাও বিফল হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ এ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করিল না; যেখানে ছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল। বহির্জগতে জীবন-মরণের বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহারা আর

অগ্রসর হইল না; আমাদের পূর্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়া জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জগতের নিকট নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেন।

উপনিষদ্ নির্ভীকভাবে বলিলেনঃ

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

৩১

'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি।'

৩২

মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না। এইরূপ বহু বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য আত্মাভিমুখী হইলেন—অন্তর্মুখী হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাঁহারা কখনই সত্য লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা দেখিলেন, বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাদিগকে কোন আশার বাণী শোনায় না, সুতরাং তাঁহারা উহা হইতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে ছাড়িয়া সেই জ্যোতির্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন; সেখানে তাঁহারা উত্তর পাইলেনঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।

৩৩

একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।

তাঁহারা আত্মাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন; তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে জানিলেন এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ—সকলই অবগত হইলেন। আর এই আত্মতত্ত্বের বর্ণনার মত গাম্ভীর্যপূর্ণ কবিতা জগতে আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না; এমন কি আত্মার বর্ণনায় নির্দিষ্ট গুণবাচক শব্দ তাঁহারা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন আর অনন্তের ধারণা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা-লাভের চেষ্টা রহিল না। বাহ্য ইন্দিয়গ্রাহ্য অচেতন মৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনন্তের বর্ণনা লোপ পাইল; তৎপরিবর্তে আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে, উপনিষদের সেই শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রই যেন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অপূর্ব শ্লোকটির কথা স্মরণ করঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ‖

৩৪

সূর্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও দেয় না, এই বিদ্যুৎ তাঁহাকে আলোকিত করিতে পারে না, এই অগ্নির আর কথা কি? জগতে আর কোন্ কবিতা ইহা অপেক্ষা গম্ভীরভাবদ্যোতক?

এইরূপ কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপূর্ব কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটি কি অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর! ইহাতে কি বিস্ময়কর কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে! ইহার আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমপুরীতে যাইবার ইচ্ছা, আর সেই 'আশ্চর্য' তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে?—মৃত্যু-রহস্য।

উপনিষদ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, যে বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা এই—ঐগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। যদিও আমরা উহাতে অনেক আচার্য ও বক্তার নাম পাইয়া থাকি, তথাপি তাঁহাদের কাহারও বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণিকতা নির্ভর করে না। একটি মন্ত্রও তাঁহাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভর করে না। এই-সকল আচার্য ও বক্তা যেন ছায়ামূর্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সত্তা যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ব মহিমময় জ্যোতির্ময় তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর—ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। বিশজন যাজ্ঞবল্ক্য থাকুন বা না থাকুন—কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি তো রহিয়াছে। তথাপি উপনিষদ্ কোন ব্যক্তিভাবের বিরোধী নহে। জগতে প্রাচীনকালে যে-কোন মহাপুরুষ বা আচার্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা ভবিষ্যতে যাঁহাদের হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাঁহাদের সকলেরই স্থান হইতে পারে। উপনিষদ্ ব্যক্তি-উপাসনার, অবতার বা মহাপুরুষ-পূজার বিরোধী নহে, বরং উহার পক্ষে। অপরদিকে উপনিষদ্ আবার সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। উপনিষদের ঈশ্বর যেমন ব্যক্তিভাবের ঊর্ধ্বে, তেমনি সমগ্র উপনিষদই ব্যক্তি- নিরপেক্ষ অপূর্ব ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যতটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাব আশা করেন, জ্ঞানী চিন্তাশীল দার্শনিক ও যুক্তিবাদিগণের নিকট এই উপনিষদ্ ততটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

আর ইহাই আমাদের শাস্ত্র। তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, খ্রীষ্টানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুসলমানদের পক্ষে যেমন কোরান, বৌদ্ধদের যেমন ত্রিপিটক, পারসীদের যেমন জেন্দাবেস্তা, আমাদের পক্ষে উপনিষদও সেইরূপ। এইগুলি—একমাত্র এইগুলিই আমাদের শাস্ত্র। পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ, এমনি কি ব্যাসসূত্র পর্যন্ত প্রামাণ্য বিষয়ে গৌণমাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ উপনিষদ্। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতির যতটুকু উপনিষদের সহিত মেলে, ততটুকুই গ্রহণীয়; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ নির্দয়ভাবে পরিত্যাজ্য। আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু ভারতের দূরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমানে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। তুচ্ছ গ্রাম্য আচার এখন উপনিষদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। বাঙলার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে হয়তো কোন বিশেষ আচার ও মত প্রচলিত, সেইটি যেন বেদবাক্য, এমন কি তদপেক্ষা অধিক। আর 'সনাতন-মতাবলম্বী'—এই কথাটির কি অদ্ভুত প্রভাব!কর্মকাণ্ডের নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যে পালন করে, একজন গ্রাম্যলোকের নিকট সে-ই খাঁটি সনাতনপন্থী, আর যে নিয়মগুলি পালন না করে, সে হিন্দুই নয়। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমার মাতৃভূমিতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন তন্ত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতে চলিতে উপদেশ দেন; যে না চলে, সে তাঁহাদের মতে খাঁটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন এইটি স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ্য ও শ্রৌত-সূত্র পর্যন্ত বেদ-প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ্ আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণের বাক্য, আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যাহা খুশি তাহা বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। ঐগুলিকে 'শাস্ত্র' আখ্যা না দিয়া 'পুরাণ' বলাই উচিত, কারণ ঐগুলিতে জল-প্লাবনের কথা, রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি পুরাণের লক্ষণ, সুতরাং যতটা বেদের সহিত মিলে, ঐগুলির মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র যতটা বেদের সহিত মিলে. ততটাই গ্রাহ্য; যেখানে না মিলে, সেই অংশ মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরান সম্বন্ধেও এই কথা। এই-সকল গ্রন্থে অনেক নীতি-উপদেশ আছে; সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা ঐক্য হয়, ততটা পুরাণবৎ প্রামাণিক, অবশিষ্টাংশ পরিত্যাজ্য।

বেদ-সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক খ্রীষ্টান মিশনারী আমাকে এক সময় বলিয়াছিল, তাহাদের বাইবেল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলামঃ আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বলিয়াই উহা সত্য। তোমাদের শাস্ত্র যখন ঐতিহাসিক, তখন নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্বে উহা কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যপ্রণীত, আমাদের শাস্ত্র ঐরূপ নহে। আমাদের শাস্ত্রের অনৈতিহাসিকতাই উহার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদের সহিত আজকালকার অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের এই সম্বন্ধ।

উপনিষদে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এখন আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাতে নানাবিধ ভাবের শ্লোক দেখা যায়; কোন কোনটি পুরাপুরি দ্বৈতবাদাত্মক। দ্বৈতবাদাত্মক বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিতেছি? কতকগুলি বিষয়ে ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত। প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই 'সংসারবাদ' বা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়েরই একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূলশরীর, ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর বা মন; জীবাত্মা সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্মার মধ্যে কিছু প্রভেদ করা হয় নাই, কিন্তু এখানে তাহা নহে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের মতে মন বা অন্তঃকরণ যেন জীবাত্মার যন্ত্রস্বরূপ। ঐ যন্ত্রসহায়ে উহা শরীর ও বাহ্য জগতের উপর কাজ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেই একমত। বিভিন্ন সম্প্রদায় ইঁহাকে জীব, আত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে, জীবাত্মা অনাদি অনন্ত; যতদিন না শেষ মুক্তিলাভ হয়, ততদিন তিনি পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

আর একটি মুখ্য বিষয়ে ভারতের সকল সম্প্রদায়ই একমত এবং তাঁহারা স্বীকার করেন, জীবাত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি নিহিত আছে; আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মৌলিক প্রভেদ। 'ইন্স্পিরেশন' (inspiration)-শব্দ দ্বারা ইংরেজীতে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে বুঝায় যেন বাহির হইতে কিছু আসিতেছে; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে সকল শক্তি, সর্ববিধ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই রহিয়াছে। যোগীরা বলিবেন, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি, যাহা তিনি লাভ করিতে চান, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, ঐগুলি পূর্ব হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান, ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র। পতঞ্জলির মতে তোমার পদতলচারী অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ আধার অনুপযুক্ত বলিয়া ঐগুলি প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। উন্নততর শরীর পাইলেই সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে, কিন্তু সেগুলি পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। তিনি তাঁহার সূত্রের একস্থলে বলিয়াছেন, 'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।'

৩৫

—যেমন ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে কৃষককে কেবল তাহার ক্ষেত্রের আল ভাঙিয়া দিয়া নিকটস্থ জলাশয়ের সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জল যেমন নিজ বেগে আসিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তেমনি জীবাত্মাতে সকল শক্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতা পূর্ব হইতে বিদ্যমান, কেবল মায়াবরণের জন্য উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করেন এবং তাঁহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্যগণ এই ভয়ানক মত শিখাইয়া থাকে যে, আমরা সকলেই জন্মপাপী। আর যাহারা এইরূপ ভয়াবহ মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি তাহারা অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা কখনও ভাবিয়া দেখে না—যদি আমরা স্বভাবতঃ মন্দই হই, তবে আর আমাদের ভাল হইবার আশা নাই, কারণ স্বভাব বা প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে? 'প্রকৃতির পরিবর্তন হয়'—এই বাক্যটি স্ববিরোধী। যে বস্তুর পরিবর্তন হয়, তাহাকে আর 'প্রকৃতি' বলা যায় না। এই বিষয়টি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত।

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর একটি বিষয়ে একমত—ঈশ্বরের অস্তিত্ব। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন। দ্বৈতবাদী সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমি এই 'সগুণ' কথাটি তোমাদিগকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। এই 'সগুণ' বলিতে দেহধারী সিংহাসনে উপবিষ্ট জগৎশাসনকারী পুরুষবিশেষকে বুঝায় না। 'সগুণ' অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তারূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সগুণ ঈশ্বরের উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উহাকে 'সগুণ-নির্গুণ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। অদ্বৈতবাদী তাঁহার প্রতি 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন; কিন্তু উপনিষদসমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে একমত।

এখন দ্বৈতবৈদীদের মত একটু আলোচনা করিব। পূর্বেও বলিয়াছি, এ-যুগে রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মহান্ প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের জনসাধারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় ধর্মাচার্যগণ সম্বন্ধে অতি অল্পই সংবাদ রাখে। সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এক আমাদের শ্রীচৈতন্য ব্যতীত মহান্ ধর্মাচার্যগণ সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যবাসীর মস্তিষ্কই এখন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে। এমন কি চৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্যেরই মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

রামানুজের মতে নিত্য 'পদার্থ' তিনটি—ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। জীবাত্মাসকল নিত্য, আর চিরকালই পরমাত্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে, তাহাদের স্বতন্ত্রত্ব কখনও লোপ পাইবে না। রামানুজ বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্মা হইতে চিরকাল পৃথক্ থাকিবে। আর এই জগৎপ্রপঞ্চ—এই প্রকৃতিও চিরকালই পৃথক্‌রূপে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জগৎপ্রপঞ্চও সেইরূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, আর এই অর্থে রামানুজ কখনও কখনও পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন—জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কুচিত হয়, তখন জীবাত্মাসকলও সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন ঐভাবে অবস্থান করে। পরবর্তিকল্পের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। রামানুজের মতে যে-কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পূর্ণত্ব সঙ্কুচিত হয়, তাহাই অসৎকর্ম; আর যাহা দ্বারা আত্মা বিকশিত হয়, তাহাই সৎকার্য। যাহা আত্মার বিকাশের সহায়তা করে, তাহাই ভাল; আর যাহা উহার সঙ্কোচসাধন করে, তাহাই মন্দ। এইরূপে কর্মবশে আত্মার কখনও সঙ্কোচ, কখনও বিকাশ হইতেছে; অবশেষে ঈশ্বর-কৃপায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রামানুজ বলেন, যাহারা শুদ্ধস্বভাব এবং ঐ ঈশ্বরের কৃপালাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা সকলেই কৃপা লাভ করে।

শ্রুতিতে একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।' যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, এবং সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর-স্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটি লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই—'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি, সাংখ্যদর্শন-মতে এবং ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই এ-কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে গঠিত হইয়াছে—ত্রিবিধ গুণে নহে। সাধারণ লোকের ধারণা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণ, কিন্তু তাহা ঠিক নহে; ঐগুলি জগতের উপাদান-কারণ। আর আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব-পদার্থ নির্মল হইবে। কিভাবে সত্ত্ব শুদ্ধ হইবে, তাহাই বেদান্তের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, আর বেদান্তমতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব-পদার্থ অতিশয় প্রকাশস্বভাব এবং যেমন আলোক সহজেই কাচের ভিতর দিয়া যায়, আত্মচৈতন্যও তেমনি সহজেই সত্ত্ব-পদার্থের ভিতর দিয়া যায়। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হইয়া কেবল সত্ত্বটুকু অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধতা প্রকাশিত হইবে এবং তিনি তখন অধিক পরিমাণে ব্যক্ত হইবেন। অতএব এই সত্ত্ব লাভ করা অতি আবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্ব-লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। রামানুজ এই 'আহার' শব্দ খাদ্য-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাকে তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বন ও স্তম্ভ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার-শব্দের অর্থ কি, এইটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ 'জাতিদোষ'—খাদ্যের জাতি অর্থাৎ প্রকৃতিগত দোষ, যথা—পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি স্বভাবতই অশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ 'আশ্রয়দোষ'—যে-ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে-ব্যক্তিকে 'আশ্রয়' বলে; মন্দ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি, যাঁহারা সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের এই ক্ষমতা ছিল—তাঁহারা যে-ব্যক্তি খাদ্য আনিয়াছে, এমন কি যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন, এবং আমি নিজ জীবনে একবার নয়, শতবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ নিমিত্তদোষ—খাদ্যদ্রব্যে কেশ কীট আবর্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে খাদ্যের 'নিমিত্তদোষ' বলে। আমাদিগকে এখন এই শেষ দোষটি নিবারণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহার-ব্যাপারে এই দোষটি বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদোষমুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে।

তবে তো ধর্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম হয়, তবে সকলেই তো ইহা করিতে পারে। জগতে এমন কে দুর্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে নিজেকে এই দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য এই আহার-শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাক। তিনি বলেন, 'আহার' শব্দের অর্থ— ইন্দ্রিয়দ্বারা মনে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়। চিন্তাগুলি নির্মল হইলে সত্ত্ব নির্মল হইবে, তাহার পূর্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার। যদি শুধু পবিত্র ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কিনা! এরূপ হইলে

তো গাভী হরিণ প্রভৃতিই সকলের আগে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত।

'নিত নহ্‌নেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই,
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই,
তিরন ভখনসে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।'

৩৬

ইত্যাদি

যাহা হউক এই সমস্যার সমাধান কি?—উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য শঙ্করাচার্য আহার-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজন বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। দুই-ই চাই। তবে গোল এইটুকু দাঁড়াইয়াছে যে, বর্তমানকালে আমরা শঙ্করাচার্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া শুধু 'খাদ্য' অর্থটি লইয়াছি। এই জন্যই যখন আমি বলি—ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি মান্দ্রাজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। এ-বিষয়ে তোমরা বাঙালীরা তাহাদের চেয়ে অনেক ভাল। মান্দ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা সেই খাদ্য ফেলিয়া দিবে। তথাপি সেখানকার লোকেরা এইরূপ খাদ্যাখাদ্য-বিচারের দরুন যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এরূপ বা ওরূপ খাদ্য খাইলেই, এর-তার দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচিলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে মান্দ্রাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাহা নহে। অবশ্য আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মান্দ্রাজী বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উভয় মত একত্র করিলেই একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও 'উল্টা বুঝিলি রাম' করিও না। আজকাল এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব রব উঠিয়াছে। আর এ বিষয়টি লইয়া বাঙালীরাই সর্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেছে। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কি জান, বল দেখি। এ দেশে এখন সেই চাতুর্বর্ণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি চাতুর্বর্ণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, 'মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা', এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রচারের চেষ্টাও সেইরূপ। এখানে তো চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায়?—হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদপাঠ করিতে আদেশ করেন না? আর যদি এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রানুসারে যে-দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়। অতএব তল্পিতল্পা বাঁধিয়া এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। যাহারা ম্লেচ্ছখাদ্য আহার করে এবং ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জান? তোমরা তো বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ম্লেচ্ছখাদ্য আহার ও ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জান? ইহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। তোমরা আচার্যের আসন গ্রহণ করিতে চাও, কিন্তু কার্যে কেন কপটাচারী হও? তোমরা যদি তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাও সেই ব্রাহ্মণবরিষ্ঠের মত হও—যিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ম্লেচ্ছখাদ্য-ভোজনের জন্য নিজেকে তুষানলে দগ্ধ করেন। এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্রজাতি তোমাদের পদতলে আসিয়া পড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না—আবার অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাও! যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে ও-রূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তোমরা সমর্থ নও, তবে তোমাদের দুর্বলতা স্বীকার কর এবং অপরের দুর্বলতা ক্ষমা কর, অন্যান্য জাতির উন্নতির জন্য যতদূর পার সহায়তা কর, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দাও এবংতাহারাও আর্যদের মত হউক। আর হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি আপনাদিগকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি আপনারা প্রকৃত আর্য হউন।

যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান বিশেষভাবে দেখ নাই। তোমরা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি স্বদেশে প্রবেশ করি—যখন আমি দেখি, আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তখন এ দেশ আমার কাছে অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার-সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙলা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করে এবং অতি ভয়ানক গ্রন্থসকল তাহাদের কার্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশেই তাহারা এমন সব বীভৎস কাজ করিয়া থাকে। বাঙলা দেশের অধিবাসীগণ, তোমরা সকলেই ইহা জান। বামাচার-তন্ত্রগুলিই বাঙালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্র রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে এবং শ্রুতি-শিক্ষার পরিবর্তে এগুলি আলোচনা করিয়া তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে।

কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচারতন্ত্ররূপ ভয়ানক জিনিষ আপনাদের পুত্রকন্যাগণের হাতে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই বলিয়া তাহাদিগকে শেখানো হইতেছে—ঐ-গুলি হিন্দুর শাস্ত্র! যদি আপনারা সত্যই লজ্জিত হন, তবে তাহাদের নিকট হইতে ঐগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা পড়িতে দিন।

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মা চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ; তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত উপাদানকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—কারণ দুই-ই। তিনি শুধু জগতের সৃষ্টিকর্তা নন, তবে তিনি উপাদানভূত নিজ সত্তা হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদীর মত। কতকগুলি কিম্ভূতকিমাকার দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিশ্বাস—ঈশ্বর নিজ সত্তা হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি

করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চিরপৃথক্; আবার সকলেই সেই জগৎপতির চির-অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মত—ঈশ্বর নিজেকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশিয়া নির্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু এই-সকল সম্প্রদায় এখন লোপ পাইয়াছে। বর্তমান ভারতে যে-সব অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়াবশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে; বস্তুতঃ জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা কঠিন। এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই দুরূহ বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কান্টের (Kant) দর্শনে কতকটা এই ধরনের মত দেখিতে পাইবে। তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কাণ্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহার লেখায় একটা মস্ত ভুল আছে। অধ্যাপকের মতে দেশ-কাল-নিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কাণ্টই প্রথম আবিষ্কার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার আবিষ্কর্তা। তিনি দেশ-কাল-নিমিত্তকে মায়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে শঙ্করভাষ্যে এই ভাবের কথা দু-এক জায়গায় দেখিতে পাইয়া আমি বন্ধুবর অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, কাণ্টের পূর্বেও এই তত্ত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈতবেদান্তীদের এই মায়াবাদ-মতটি একটু অপূর্ব ধরনের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, নানাত্ব মায়াপ্রসূত।

এই একত্ব, এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই আমাদের চরম লক্ষ্য। আবার এইখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া আহ্বান করিতেছে—যাহার ক্ষমতা আছে ইহা খণ্ডন কর। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে—সবকিছুই ভ্রান্তি, সবকিছুই মায়ামাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রে ভোজন কর, মহারাজ-চক্রবর্তী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহারা উন্নতিশীল হইয়া নিজেদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে। যতদূর সাধ্য তাহারা সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছে, যতদূর সাধ্য ভোগ করিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্তে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমরা চিরকাল অক্ষত রহিয়াছি, আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।

এখানে আবার আর একটি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও জার্মান দার্শনিক হেগেল ও শোপেনহাওয়ার-এর মতের ন্যায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল; অঙ্কুরকে উদ্গত হইতে, উহাকে বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে, উহার সর্বনাশা শাখাপ্রশাখাকে আমাদের এ মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এইঃ সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা বিশৃঙ্খলামাত্র (Chaos); সাকার ব্যষ্টি উহা হইতে মহত্তর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা; সুতরাং তাঁহার মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের বিভিন্ন কর্মজালে জড়িত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে। পাশ্চাত্যেরা বলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমরা কেমন ইমারত বানাইতেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতেছি! ইহার পশ্চাতে—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ভোগের পশ্চাতে ঘোর দুঃখ-যন্ত্রণা, পৈশাচিকতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ লুকাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই!

অপরদিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতে ঘোষণা করিয়াছেন, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই—যাহাকে তোমরা ক্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার বৃথা চেষ্টামাত্র। এই জগতের সর্বশক্তিমান্ কারণ-স্বরূপ তুমি নিজেকে কর্দমাক্ত খানাডোবায় প্রতিবিম্বিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কিছুদিন ঐ চেষ্টা করিয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তখন যেখান হইতে আসিয়াছিলে, পশ্চাদপসরণ করিয়া সেইখানেই ফিরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য; এই বৈরাগ্য আসিলেই ধর্ম আরম্ভ হইল—বুঝিতে হইবে। ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম বা নীতির আরম্ভ হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। ত্যাগ কর। বেদ বলিতেছেনঃ ত্যাগ কর—ত্যাগ ব্যতীত অন্য পথ নাই।— 'ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ॥'

৩৭

—সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ইহাই সকল ভারতীয় শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য অনেকে রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহাত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছুদিনের জন্য সংসারের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার অপেক্ষা বড় ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল সকলেই 'জনক' বলিয়া পরিচিত হইতে চায়। তাহারা জনক বটে, কিন্তু কতকগুলি হতভাগা সন্তানের জনক-মাত্র—তাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও তাহারা অসমর্থ। শুধু ঐ অর্থেই তাহারা 'জনক', পূর্বকালীন জনকের মত তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এই ভাব! এখন জনক হইবার চেষ্টা একটু কম করিয়া লক্ষ্যের দিকে সোজা অগ্রসর হও দেখি। যদি ত্যাগ করিতে পার, তবেই তোমার ধর্ম হইবে। যদি না পার, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত পুস্তকালয় আছে, সেগুলির যাবতীয় গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু যদি শুধু কর্মকাণ্ড লইয়াই থাক, তবে বুঝিতে হইবে তোমার কিছুই হয় নাই, তোমার ভিতর ধর্মের বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। ত্যাগেই মহাশক্তি; যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকেও গ্রাহ্য করে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়—'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে'। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা, যাহা সে সমগ্র জগতে উড়াইতেছে। যে-সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত ঐ মৃত্যুহীন ভাবসহায়ে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছেঃ সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে।

হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকা যেন তোমাদের হাতছাড়া না হয়—সকলের সমক্ষে উহা তুলিয়া ধর। তুমি যদি দুর্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, তবু আদর্শকে খাটো করিও না। বল, আমি দুর্বল—আমি সংসারশক্তি ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটতার আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া, আপাতমধুর যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না; অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বল—আমি দুর্বল। কারণ এই ত্যাগ বড়ই মহান্ আদর্শ। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু-জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে।

যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তাহারা ধন্য; কারণ তাহাদের শোণিতমূল্যেই জয় লাভ হয়। একটি ব্যতীত ভারতের সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে প্রধান আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য সম্প্রদায় করেন নাই। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে কি দাঁড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা ঊর্ধ্ববাহু জটাজূটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। কারণ যদিও ঐগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে পৌরুষহীন বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতায় পূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য একটু কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগের আদর্শ অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ রামানুজ, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত—যেখানে অতি প্রাচীনকাল হইতে কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছে, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্বত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতেছেন, সেই দেশ কি এখন তাহার আদর্শ জলাঞ্জলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে—পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, হইতে পারে—সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহাদের নিকট ধর্ম কেবল কথার কথা থাকিবে না, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটি বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, সেটি আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়টিও বিরাট্। ধর্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে—এই ভাবটি ভারতেরই বৈশিষ্ট্য।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। শুধু তাই নয়, জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঘোষণা করেন, শাস্ত্রপাঠের দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বৃথা বাক্যব্যয় ও বক্তৃতা দ্বারাও আত্মজ্ঞান-লাভ হয় না; আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে এই অনুভব-শক্তি সংক্রামিত হয়; শিষ্যের যখন এইভাবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তখন তাহার নিকটও সব পরিষ্কার হইয়া যায়, সে-ও তখন আত্মোপলব্ধি করে।

আর একটি কথা। বাঙলা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিতা তোমার গুরু ছিলেন—সুতরাং আমিও তোমার সমগ্র পরিবারের গুরু হইব। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমি তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা করঃ গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হইবার যোগ্য নহেন; যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য জানেন, তিনিই গুরু। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'—যেমন চন্দনভারবাহী গর্দভ চন্দনের ভারই জানে, চন্দনের গুণাবলী অবগত নহে, এই পণ্ডিতেরাও সেইরূপ। ইঁহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। তাঁহারা যদি প্রত্যক্ষ অনুভব না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কি শিখাইবেন? বালক-বয়সে এই কলিকাতা শহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?' ঈশ্বর-দর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত; একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।' শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন-লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব।' প্রকৃত গুরু এইরূপই; শাস্ত্রের বিভিন্ন বিকৃত অর্থ করিতে পারিলেই গুরুপদবাচ্য হওয়া যায় না।

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

৩৮

নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।

'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন'—নিষ্পাপ, 'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থসংগ্রহের বাসনা

করেন না, তিনিই শান্ত, তিনি সাধু। বসন্তকাল আসিলে যেমন বৃক্ষে পত্রমুকুলোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই পরের হিতসাধন, তেমনি পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এই ভাব।

৩৯

তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ‖

৪০

তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকে ত্রাণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই গুরু, এবং ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

৪১

নিজেরা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চেষ্ট নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। তাহারা নানারূপ কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন পন্থার পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন আদর্শেরই আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন পন্থার অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই অধিকতর বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে; আর যতই তোমরা আধুনিক গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মত কাজ করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর; কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্যবান্ স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেকটি সুরই অমোঘ। তার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল। উহার কারণপরম্পরা বিচার করিবার সময় আমাদের নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই আমাদের এই জাতীয় ব্যাধির, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়; জাতীয় বীর্যের পরিবর্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।

আমি অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; বিষয়টি বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে এত কথা বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়া যাইতেছি। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদীর মতে—আমাদের যে ব্যক্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহা ভ্রমমাত্র। সমগ্র জগতের পক্ষেই এই কথাটি ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই কাহাকেও বল তুমি ‘ব্যক্তি’ নহ, সে ঐ কথায় এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, তাহার ‘আমিত্ব’—তাহা যাহাই হউক না কেন—বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার ‘আমিত্ব’ বলিয়া কিছুই নাই। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তোমার পরিবর্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে, তখন একভাবে চিন্তা করিয়াছ; এখন তুমি যুবক, এখন একভাবে চিন্তা করিতেছ; আবার যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন আর একভাবে চিন্তা করিবে। সকলেরই পরিণাম হইতেছে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে আর তোমার ‘আমিত্ব’ কোথায়? এই ‘আমিত্ব’ বা ‘ব্যক্তিত্ব’ তোমার দেহগত নহে, মনোগতও নহে। এই দেহমনের পারে তোমার আত্মা; আর অদ্বৈতবাদী বলেন, এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। দুইটি অনন্ত কখনও থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তিই আছেন—তিনিই অনন্তস্বরূপ।

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচারশীল প্রাণী, আমরা সব কিছুই বিচার করিয়া বুঝিতে চাই। এখন বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে? যুক্তি-বিচারের অর্থ—অল্প-বিস্তর শ্রেণীভুক্তকরণ, পদার্থনিচয়কে ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পৌঁছানো, যাহার উপর আর যাওয়া চলে না। সসীম বস্তুকে যদি অনন্তের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, তবে উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি চরমে অর্থাৎ অনন্তে পৌঁছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না। আর অদ্বৈতবাদী বলেনঃ এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে; আর সবই মায়া, আর কিছুরই সত্তা নাই। যে-কোন জড়বস্তু হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা এই ব্রহ্ম। আমরা এই ব্রহ্ম; নামরূপাদি আর যাহা কিছু, সবই মায়া; ঐ নামরূপ বাদ দাও, তাহা হইলে তোমার ও আমার মধ্যে আর কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই ‘আমি’ শব্দটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই হই, তবে আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি না কেন? কিন্তু এখানে এই ‘আমি’ শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। যখন তুমি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, তখন আর তুমি আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নও—ব্রহ্মের কোন অভাব নাই, তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ, তিনি অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত; তাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপে আমরা সকলেই এক।

সুতরাং দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই প্রশ্নে বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্যের মত বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত নিজেদের মত সমর্থন করিবার জন্য স্থানে স্থানে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার

সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও শাস্ত্রের এমন অর্থ করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আধুনিক পণ্ডিতদের ভিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি মতই সত্য হইতে পারে, আর বাকীগুলি মিথ্যা, যদিও তাঁহাদের শ্রুতিতে এই তভাব রহিয়াছে—যে অপূর্ব ভাব ভারত এখনও জগৎকে শিক্ষা দিবে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত সত্ত্বা এক, মুনিগণ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর এই মূলতত্ত্বটিকে কার্যে পরিণত করাই আমাদের জাতির সমগ্র জীবনসমস্যার সমাধান। ভারতে কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ব্যতীত আমরা সকলেই সর্বদা এই তত্ত্ব ভুলিয়া যাই—আমি 'পণ্ডিত' অর্থে প্রকৃত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছি। আমরা এই মহান্ তত্ত্বটি সর্বদাই ভুলিয়া যাই, আর তোমরা দেখিবে অধিকাংশ পণ্ডিতের—আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের মত এই যে, হয় অদ্বৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, নতুবা দ্বৈতবাদ সত্য। যদি বারাণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ঘাটে গিয়া উপবেশন কর, তবে তুমি আমার কথার প্রমাণ পাইবে; দেখিবে, এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের তো এই অবস্থা!

এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহ-দ্বন্দ্বের ভিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেই সামঞ্জস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উভয় মতই আবশ্যক; উহারা গণিতজ্যোতিষের ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) মতের ন্যায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে ঐ ভূকেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সে জ্যোতিষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ সূর্যকেন্দ্রিক মত শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তখন জ্যোতিষের তত্ত্বসমূহ পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে ভাল বুঝিতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীব স্বভাবতই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সগুণ ঈশ্বরই দর্শন করিব—সগুণ ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কোন ভাব উপলব্ধি করিতে পারি না, আমরা জগৎকে ঠিক এইরূপেই দেখিতে পাইব। রামানুজ বলেন, যতদিন তুমি নিজেকে দেহ মন বা জীব বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ততদিন তোমার প্রত্যেকটি অনুভূতি-ব্যাপারে জীব জগৎ এবং এই উভয়ের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষের জ্ঞান থাকিবে। কিন্তু মনুষ্যজীবনে কখনও কখনও এমন সময় আসে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যখন মন পর্যন্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রায় অন্তর্হিত হয়, যখন যে-সকল বস্তু আমাদের ভীতি উৎপাদন করে, আমাদিগকে দুর্বল করে এবং এই দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেগুলি চলিয়া যায়; তখন—কেবল তখনই সে সেই প্রাচীন মহান্ উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারে। সেই উপদেশ কি?

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

৪২

যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এইখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্বত্র সম, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

৪৩

ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি প্রাপ্ত হন।

গীতাতত্ত্ব - ১

স্বামীজী কলিকাতায় থাকাকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলমবাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবসী কয়েকজন যুবক, যাঁহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামীজী ইঁহাদিগকে ধ্যান-ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ কর্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতাব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়; তাহাই এখানে 'গীতাতত্ত্ব' নামে সঙ্কলিত হইল।

গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। প্রথম—গীতাটি মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ, অর্থাৎ উহা বেদব্যাস-প্রণীত কিনা? দ্বিতীয়—কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কিনা? তৃতীয়—যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কিনা? চতুর্থ—অর্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা? প্রথমতঃ সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি, দেখা যাক।

প্রথম প্রশ্ন

বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস—কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটি উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই 'ব্যাস' নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য—এই নামটিও একটি সাধারণ নাম। শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে গীতা-গ্রন্থখানি সর্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। এ-কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়ন-ভাষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, যদবলম্বনে রামানুজ 'শ্রীভাষ্য' প্রস্তুত করিয়াছেন—বলিয়াছেন, শঙ্করের ভাষ্যের মধ্যে উদ্ধৃত যে ভাষ্যের অংশবিশেষ উক্ত বোধায়ন-কৃত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায় নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়াও এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটি কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়ন-ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, তখন গীতাসম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য-প্রণীত। তাঁহাদের মতে—তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

কৃষ্ণসম্বন্ধে সন্দেহ এইঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন ঋষির নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতের কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে 'মদনোৎসব' নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটিকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। রাসলীলাদিও যে ঐরূপে চাপানো হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর পূর্বকালে লোকের নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র দধিসমুদ্রাদি রচনা করিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবনধারণ করিতেছেন; কিন্তু আবার বেদে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'। আমরা এখানে কাহাকে অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দিকে তাহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। ইহা খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক—গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতনভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীন কালে এক-একটি সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক-একখানি শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে খুব উচ্চ ভাবসকল নিবিষ্ট ছিল।

তৃতীয় প্রশ্ন

কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিকলিপি-কুশল ব্যক্তি (Short-hand Writer) উপস্থিত ছিলেন, যিনি সে-সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপকমাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—সদসৎপ্রবৃত্তির সংগ্রাম। এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে।

চতুর্থ প্রশ্ন

অর্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ এই যে—'শতপথব্রাহ্মণ' অতি প্রাচীন গ্রন্থ, উহাতে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে স্থলে অর্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিৎ জন্মেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এ দিকে মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্মসাধনা-শিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ঐগুলি যদি আজই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে; আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ-সম্বন্ধে সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটি ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে একটি মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ The end justifies the means; এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত সত্যকে ধারণা করা, সত্য বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

গীতাতত্ত্ব - ২

এক্ষণে কথা হইতেছে—গীতা জিনিষটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দরভাবে সাজান—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক্ষণে গীতা যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি-আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম—এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তো হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেয়ালগুলিও নিষ্কামকর্মী; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কাম কর্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক তো পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

গীতার একটি শ্লোক

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে! তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—এই স্থানে অর্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময়ও সেরূপ ধীর। অর্জুনের (মনে) ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন, 'আমরা সত্ত্বগুণী'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, 'আমরা পরমহংস'। কারণ, শাস্ত্রে আছে—পরমহংসেরা 'জড়োন্মত্তপিশাচবৎ' হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু তথায় বুঝিতে হইবে—ঐ তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটেই হয় নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটিতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটিতে তাহার অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণা করিয়া আসিতে বড় ভালবাসে; এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট কর, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'— তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ—এ তো তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ।' জগতে পাপতাই নাই, রোগশোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে-কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', তুমি বীর, তোমার এ (ক্লীবতা) সাজে না।

তোমরা যদি জগৎকে এ-কথা শুনাইতে পার—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ-সকল রোগ-শোক, পাপ-তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উল্টাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান্—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহার বাহির দিক্‌টিই দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর; সমগ্র জগৎকে বল—তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর

স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিঙ-এ দুই মাস অবস্থানের পর স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া হিমালয়ের আলমোড়া শহরে যান। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে হিন্দীতে একটি অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ

আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে-ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু ব্যক্তি জীবন-সন্ধ্যায় আসিয়া 'শেষ অধ্যায়' সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, গভীর গহ্বরে, দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল—যে-তত্ত্বগুলির কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতেও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং যেগুলিকে যোগ্যতম বিচারকগণ অতুলনীয় বলিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি এবং তোমরা সকলেই জান, আমি এখানে বাস করিবার জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি; আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—ঋষিগণের প্রাচীন বাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইব। বন্ধুগণ, সম্ভবতঃ পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও বিফল-মনোরথ হইব, নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয়তো আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাসও করি যে, জগতের অন্য কোথাও নয়, এইখানেই আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিবে।

এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে আমার সামান্য কার্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমার যে প্রশংসা করিয়াছ, সেই জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এখন আমার মন—কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছে না। যতই এই শৈলরাজের শিখরগুলি পর পর নয়নগোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল, এবং আমি কি কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি কাজ করিবার সঙ্কল্প আছে, ঐ-সকল বিষয়ের আলোচনায় না গিয়া এখন আমার মন—হিমালয় অনন্তকাল ধরিয়া যে এক সনাতন সত্য শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগশীল আবর্তে আমি যে এক তত্ত্বের অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছি—সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। 'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'—এই জগতে সকল জিনিষই ভয়-যুক্ত, কেবল বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

হ্যাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন আমার মনের ভাবসমূহ বিস্তারিতবাবে বলিবার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি, এই হিমালয়পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান, আর মানবজাতিকে আমরা চিরদিন এই ত্যাগের মহৎ শিক্ষা দিতে থাকিব। যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্মে ও আমার ধর্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে, একটি সনাতন ধর্মই বিদ্যমান—সেটি অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি, আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ 'সংসার মায়ামাত্র এবং ঈশ্বর—শুধু ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই বৃথা', ইহা জানিয়া এখানে আসিবেন।

বন্ধুগণ, তোমরা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটি সঙ্কল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়াছ। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটি এই সার্বভৌম ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ তোমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে যদি হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাই-ই চাই, এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারিব। আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া এ-সকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এখন তোমরা আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি, আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতিই ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না; আমি মনে করি, আমাদের ধর্মের প্রতিনিধি বলিয়াই তোমরা আমার প্রতি এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ। প্রার্থনা করি, এই ধর্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এখন আমরা যেরূপ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, সর্বদা যেন সেই ভাবে থাকিতে পারি।

স্বামীজী আলমোড়ায় আরও দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি স্থানীয় জেলা স্কুলে, অন্যটি ইংলিশ ক্লাবে। জেলা স্কুলে ওজস্বিনী হিন্দী ভাষায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হন। ইংলিশ ক্লাবে বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক। এই প্রসঙ্গে তিনি উপজাতীয় দেবতা-উপাসনা, বেদ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিয়ালকোটে বক্তৃতা—ভক্তি

নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী পঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ইংরেজী ও হিন্দীতে অনেক স্থানে বক্তৃতা দেন ও আলোচনাদি করেন; শিয়ালকোটে দুইটি বক্তৃতা দেন —একটি ইংরেজীতে এবং অপরটি হিন্দীতে। এটি হিন্দী বক্তৃতার অনুবাদ।

জগতে বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এক। কোথাও লোকে মন্দির নির্মাণ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, কোথাও বা অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত, কোথাও বা লোকে প্রতিমাপূজা করিয়া থাকে, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না। সত্য বটে—এই-সকল বিভিন্ন ভাব বিদ্যমান, কিন্তু যদি প্রত্যেক ধর্মে ব্যবহৃত যথার্থ কথাগুলি, উহাদের মূল তথ্য, উহাদের সার সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে—তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন। এমন ধর্মও আছে, যাহা ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত নয়, যে ধর্মের 'দর্শন' ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানে না, তথাপি দেখিবে ঐ ধর্মাবলম্বীরা সাধু-মহাত্মাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। বৌদ্ধধর্মই এই বিষয়ের প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

ভক্তি সকল ধর্মেই আছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে অর্পিত। সর্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি লাভ করা সহজ। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে দৃঢ় অভ্যাস, অনুকূল অবস্থা প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য এবং মন সম্পূর্ণ বিষয়াসক্তিশূন্য না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকল অবস্থার লোক অতি সহজেই ভক্তির সাধন করিতে পারে। ভক্তিমার্গের আচার্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি একদিন খাইতে না পায়, তবে তাহার মহাকষ্ট হয়। সন্তানের মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কী যন্ত্রণা হয়! যে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাহার প্রাণও ভগবানের বিরহে ঐরূপ ছটফট করিয়া থাকে। ভক্তির মহৎ গুণ এই যে, উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, আর পরমেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি হইলে কেবল উহা দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে।

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ'

৪৪

ইত্যাদিঃ

'হে ভগবান্, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। প্রত্যেক নামেরই গভীর তাৎপর্য আছে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার জন্য স্থান-কাল কিছু বিচার করিতে হয় না।' মৃত্যু যখন স্থান-কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন ঈশ্বরের নাম করিবার কি স্থান-কাল বিচার করিতে হইবে?

ঈশ্বর বিভিন্ন সাধক কর্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাতদৃষ্টিমাত্র, বাস্তব নহে। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদের সাধনপ্রণালীই অধিক কার্যকর, অপরে আবার তাঁহাদের সাধনপ্রণালীকেই আশু মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতির মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে—উভয় পদ্ধতিই এক প্রকার। শৈবগণ শিবকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করেন; বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণুতেই অনুরক্ত, আর দেবীর উপাসকগণ দেবীকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্না বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তিপথের মহান্ প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। দ্বেষভাব অবশ্য পরিত্যাজ্য, তাহা হইলেও ইষ্টনিষ্ঠা প্রয়োজন। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিয়াছেনঃ

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

আমি জানি যিনি লক্ষ্মীপতি, তিনিই সীতাপতি; পরমাত্মদৃষ্টিতে উভয়ে এক, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই-সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে। সে কখনও ঐ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। জগৎ যে কখনও একধর্মাবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বর করুন, জগৎ যেন কখনও

একধর্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসরণ করে; আর যদি সে এমন গুরু পায়, যিনি তাঁহার ভাব অনুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। তাহাকে সেই ভাবের বিকাশ-সাধন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যেটুকু আছে, তাহাও সে হারাইবে; সে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।

একজনের মুখ আর একজনের মুখের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর একজনের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। আর তাহাকে তাহার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দিতে বাধা কি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে—সেই দিকেই যদি উহাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা যায়, তবে উহার স্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বর্ধিত হয়; কিন্তু উহা স্বভাবতঃ যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিক হইতে সরাইয়া অন্যদিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে কি ফল হয়। উহার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া যাইবে, স্রোতের বেগও হ্রাস পাইবে। এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার—নিজ ভাব অনুযায়ী ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। ধর্মব্যাপারে যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনও এরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কখনও বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্মই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কার্যসাধন করিয়া গিয়াছে—সেইজন্যই এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনও জাগ্রত। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, বিভিন্ন ধর্মে বিরোধ দেখা দেয়, তাহার কারণ একজন মনে করিতেছে—সত্যের চাবি আমার কাছে, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে—ও-ব্যক্তি কপট, কারণ তাহা না হইলে সে আমার কথা শুনিত।

সকল ব্যক্তিই এক ধর্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? তোমরা কি সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পার? সকলকে এক ধর্মাবলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি, তরবারি-বলে সকলকে একধর্মাবলম্বী করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলে—সেখানেও একবাড়িতে দশটি ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে একটি ধর্ম কখনও থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানব-মনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে বলিয়াই মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না, এমন কি মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। 'মন্' ধাতু হইতে মনুষ্য-শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—মনুষ্য-শব্দের অর্থ মননশীল। মনের পরিচালনা না থাকিলে চিন্তাশক্তিও লোপ পায়, তখন সেই ব্যক্তিতে ও একটা সাধারণ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় ভারতের যেন কখনও এমন অবস্থা না হয়!

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সেজন্য এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। সকল বিষয়েই এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন; কারণ যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। অবশ্য বহুত্ব বা বৈচিত্র্য বলিলে ইহা বুঝায় না যে, উহার মধ্যে ছোট-বড় আছে। যদি সকলেই সমানও হয়, তথাপি এই বৈচিত্র্য থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল ধর্মেই ভাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই সেই-সব ধর্ম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়।

এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-ধর্ম অন্যায় কার্যের পোষকতা করিয়া থাকে, সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর 'না' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্ম যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল; কারণ উহা দ্বারা লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ব্যক্তিগত পবিত্রতা বা শুদ্ধ ভাবকে ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর মনে করা উচিত। এখানে ইহাও বলা কর্তব্য যে, 'আচার' অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বস্তুসংযোগে শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধির জন্য মিথ্যাভাষণ সুরাপান ও অন্যান্য গর্হিত কার্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। মদ্যপান চৌর্য দ্যূতক্রীড়া মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্য হইতে যদি বিরত থাক, তবে তো ভালই—উহা তো তোমার কর্তব্য। ইহার জন্য তুমি কোনরূপ প্রশংসা পাইতে পার না। অপরেরও যাহাতে কল্যাণ হয়, সেজন্য কিছু করিতে হইবে।

এখানে আমি ভোজনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সবই এখন লোপ পাইয়াছে; কেবল এই ব্যক্তির সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বৎসর পূর্বে আহার সম্বন্ধে যে-সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এখন ঐগুলির ভগ্নাবশেষরূপে এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ কথিত আছেঃ জাতিদোষ—যে-সকল আহার্য-বস্তু স্বভাবতই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি, সেগুলি খাইলে জাতিদুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। যে-ব্যক্তি ঐ-সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খায়, তাহার কাম প্রবল হয় এবং সে-ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানুষের চক্ষে ঘৃণিত অসৎ কর্মসকল করিতে থাকে। আবর্জনা-কীটাদি-পূর্ণ স্থানে আহারকে নিমিত্তদোষ বলে। এই দোষবর্জনের জন্য আহারের এমন স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে, যে-স্থান খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশ্রয়দোষ—অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্র ভাব উদিত হয়। এমন কি ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতেও খাওয়া উচিত নয়।

এখন এ-সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের প্রভাব চলিয়া গিয়াছে—এখন শুধু এইটুকু অবশিষ্ট আছে যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—ঐ ব্যক্তি যতই জ্ঞানী ও সাধু হউক না কেন। অথচ প্রকৃত নিয়ম যে কিভাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ময়রার দোকানে গেলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে মাছিগুলি চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিসে বসিতেছে—রাস্তার ধূলি উড়িয়া মিঠাই-এর উপর পড়িতেছে, আর ময়রার কাপড়খানা এমনি যে, চিমটি

কাটিলে ময়লা উঠে। কেন, ক্রেতারা সকলে মিলিয়া বলুক না—দোকানে গ্লাসকেস না বসাইলে আমরা কেহ মিঠাই কিনিব না। এইরূপ করিলে আর মাছি আসিয়া খাবারের উপর বসিতে পারিবে না এবং কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বীজ ছড়াইবে না। পূর্বকালে লোকসংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে-সব নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে; সুতরাং এই-সকল বিষয়ে আমাদের উৎকৃষ্টতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন, 'জলে থুথু ফেলিও না'; আর আমরা কি করিতেছি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। এই-সকল বিবেচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বাহ্য শৌচ বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরাও তাহা জানিতেন, কিন্তু এখন এই-সকল শুচি-অশুচি-বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—এখন শুধু উহার খোসাটা পড়িয়া আছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতিতে লইব, কিন্তু একজন সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি নিম্নবর্ণের অথচ তাহার মত সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে বসিয়া খায়, তবে তৎক্ষণাৎ সে জাতিচ্যুত হইবে—চিরদিনের জন্য পতিত হইয়া যাইবে। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটি স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে, পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে, এবং অসৎ-সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্য শৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন। অন্তঃশৌচসম্পন্ন হইতে গেলে সত্যভাষণ, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা আবশ্যক।

কিন্তু আমরা সচরাচর কি করিয়া থাকি? লোকে নিজের কাজের জন্য কোন ধনী লোকের বাড়ি গেল এবং তাঁহাকে 'গরীবের বন্ধু' প্রভৃতি উচ্চ বিশেষণে ভূষিত করিল; কিন্তু কোন গরীব ঐ ধনীর বাটীতে আসিলে তিনি হয়তো তাহার গলা কাটিতে প্রস্তুত। অতএব ঐরূপ ধনী ব্যক্তিকে 'দরিদ্রের বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করা তো স্পষ্টই মিথ্যা কথা। আর ইহাই আমাদের চিত্ত অশুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্য শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বারো বৎসর ধরিয়া সত্যভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশবর্ষকাল যদি তাঁহার মনে কখনও কুচিন্তার উদয় না হয়, তবে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে—তাঁহার মুখ দিয়া যে-কথা বাহির হইবে, তাহাই ফলিবে। সত্যভাষণের এমনই অমোঘ শক্তি, এবং যিনি নিজের অন্তর বাহির দুই-ই শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী।

তবে ভক্তিরও এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে শুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি যে-ধর্ম সম্বন্ধেই বিচার করিয়া দেখ না, দেখিবে সকল ধর্মেই ভক্তির প্রাধান্য এবং সকল ধর্মই বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও য়াহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ বাহ্য শৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারাও কোন না কোনরূপে কিছু না কিছু বাহ্য শৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে; তাহারা মনে করে, সর্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে বাহ্য শৌচ প্রয়োজন।

য়াহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি তাহাদের এক মন্দিরে 'আর্ক' নামক এক সিন্দুক এবং ঐ সিন্দুকের ভিতর 'মুশার দশটি আদেশ' (Tables of the Law) রক্ষিত থাকিত। ঐ সিন্দুকের উপর বিস্তারিত-পক্ষযুক্ত দুইটি স্বর্গীয় দূতের মূর্তি থাকিত, এবং উহাদের ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহারা ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিতেন। অনেক দিন হইল য়াহুদীদের সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরনেই নির্মিত হইয়া থাকে, আর এখন খ্রীষ্টানদের মধ্যে ঐ সিন্দুকে ধর্মপুস্তক রাখা হয়। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর এবং তাঁহার মাতার প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্ট্যান্টদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। উহাও প্রতিমাপূজার রূপান্তর মাত্র। পারসী ও ইরানীদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানেরা বড় বড় সাধু-মহাপুরুষদের পূজা করিয়া থাকেন, আর প্রর্থনার সময় 'কাবা'র দিকে মুখ ফিরান। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় যে, ধর্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥

৪৫

ব্রহ্মভাবে অবস্থিতিই সর্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম।

কিন্তু এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও ইহাতে কোন পাপ নাই। যে যেমন পারে, তাহার তেমন করা উচিত। যদি তাহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্য—নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য কোনরূপে উহা করিবে। এই জন্য যে প্রতিমাপূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়। সে উন্নতির ঐ সোপান পর্যন্ত আরোহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার বাহ্যপূজা চাই-ই চাই। যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ঐ-সকল ব্যক্তির চিত্তের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করুন—তাহাদের দ্বারা ভাল ভাল কাজ করাইয়া লউন। কিন্তু তাহাদের উপাসনা-প্রণালী লইয়া বিবাদের প্রয়োজন কি?

কেহ ধন, কেহ বা পুত্রলাভের জন্য ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে। আর উপাসনা করে বলিয়া তাহারা নিজেদের 'ভাগবত' বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে। যদি তাহারা শুনিতে পায়, অমুক স্থানে এক সাধু আসিয়াছে—সে তামাকে সোনা করিতে পারে, অমনি তাহার নিকট তাহারা দলে দলে ছুটিতে থাকে। তথাপি তাহারা নিজেদের 'ভাগবত' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, ধনী হইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি বলা যায় না, স্বর্গলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি বলা যায় না, এমন কি নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার

পাইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। ভয় বা কামনা হইতে ভক্তির উদ্ভব হয় না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলিতে পারেনঃ

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবাতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

৪৬

হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সর্বভূতকে দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে, তখনই সে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই; তখন—কেবল তখনই সে নিজেকে দীনের দীন জানিয়া প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানকে উপাসনা করে; তখন তাহার আর বাহ্য অনুষ্ঠান এবং তীর্থভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না, সে প্রত্যেক মানুষকেই যথার্থ দেবমন্দির বলিয়া মনে করে।

আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না আমাদের প্রাণে ভক্তিলাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জাগিতেছে, ততদিন আমরা উহার কোনটিরই প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের 'পিতা' বলিয়া থাকি। কেন তাঁহাকে পিতা বলিব? পিতা-শব্দে সচরাচর যাহা বুঝায়, উহা কখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মাতা বলাতেও ঐ আপত্তি। কিন্তু যদি আমরা ঐ দুইটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য আলোচনা করি, তবে দেখিব—ঐ দুইটি শব্দের যথার্থই সার্থকতা আছে। ঐ দুইটি শব্দ গভীর প্রেমসূচক—প্রকৃত ভাগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে পিতা বা মাতা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা কর। ঐ উপাখ্যানে শুদ্ধ ভক্তেরই প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—কারণ সংসারের আর কোন প্রেমই নরনারীর পরস্পরের প্রতি প্রেম অপেক্ষা অধিকতর নহে। যেখানে এইরূপ প্রবল অনুরাগ, সেখানে কোন ভয় থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, এবং কোন আসক্তি থাকে না—শুধু এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন উভয়কে তন্ময় করিয়া রাখে। পিতামাতার প্রতি সন্তানদের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা শ্রদ্ধাজনিত—ভয়-মিশ্রিত। ঈশ্বর কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকুন বা না-ই করিয়া থাকুন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা হউন বা না-ই হউন, এ-সকল জানিয়া আমাদের কি লাভ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা, সুতরাং ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার উপাসনা করা উচিত। যখন মানুষের সকল বাসনা চলিয়া যায়, তখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না; যখন সে ঈশ্বরের জন্য উন্মত্ত হয়, তখনই মানুষ ভগবানকে যথার্থভাবে ভালবাসিয়া থাকে। সংসারে প্রেমিক যেমন তাঁহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসিয়া থাকে, তেমনি আমাদের ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—রাধা তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত। যে-সকল গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান আছে, সে-সকল গ্রন্থ পাঠ কর, তখন বুঝিবে কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয়। কিন্তু এ অপূর্ব প্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে? অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত পাপে পূর্ণ, তাহারা জানে না—পবিত্রতা বা নীতি কাহাকে বলে; তাহারা কি এই-সব তত্ত্ব বুঝিবে? তাহারা কোনমতেই এ-সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। যখন লোকে মন হইতে সমুদয় অসৎ চিন্তা দূরীভূত করিয়া পবিত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাস করে, তখন তাহারা—মূর্খ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষার রহস্যও ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এরূপ লোক সংসারে কয়জন? কয়জনের এরূপ হওয়া সম্ভব?

এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা অসৎ লোক কলুষিত করিতে না পারে। জ্ঞানমার্গের দোহাই দিয়া মানুষ অনায়াসেই বলিতে পারে—আত্মা যখন দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন দেহ যাহাই করুক না কেন, আত্মা তাহাতে কখনই লিপ্ত হন না। যদি মানুষ যথার্থভাবে ধর্ম অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান—যে-কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না, সকলেই পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হইত। কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হইলে লোকে মন্দ হইয়া থাকে; আর মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিচালিত হয়—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অসাধু লোকের সংখ্যা বেশী হইলেও সকল ধর্মেই এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের নাম শুনিলেই মাতিয়া উঠেন, ঈশ্বরের গুণগান কীর্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। এরূপ লোকই যথার্থ ভক্ত।

ধর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে তাঁহার দাস মনে করে। সে কৃতজ্ঞচিত্তে বলে, 'হে প্রভু, আজ আমাকে দু-পয়সা দিয়াছ—সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।' এইভাবে কেহ বলে, 'হে ঈশ্বর, ভরণপোষণের জন্য আমাদিগকে আহার দাও।' কেহ বলে, 'হে প্রভো, এই এই কারণে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ' ইত্যাদি। এই ভাবগুলি একেবারে পরিত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একটিমাত্র আকর্ষণী শক্তি আছে—সেই আকর্ষণী শক্তির বশে সূর্য চন্দ্র এবং অন্যান্য সকলেই বিচরণ করিতেছে। সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। এই জগতে সকল বস্তু—ভালমন্দ যাহা কিছু সবই ঈশ্বরাভিমুখে চলিতেছে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতেছে—ভালই হউক, মন্দই হউক—সবই আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছে। নিজের স্বার্থের জন্য একজন আর একজনকে খুন করিল। অতএব নিজের জন্যই হউক আর অপরের জন্যই হউক, ভালবাসাই ঐ কার্যের মূলে। ভালই হউক বা মন্দই হউক, ভালবাসাই সকলকে প্রেরণা দেয়। সিংহ যখন ছাগশিশুকে হত্যা করে, তখন সে নিজে বা তাহার শাবকেরা ক্ষুধার্ত বলিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'ঈশ্বর কি?', তাহা হইলে বলিতে হইবে—ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। সর্বদা সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত—এরূপ অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে লাভ করা যাইবে না—ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকেই চলিয়াছে। পতির পরম অনুরাগিণী পত্নী জানে না যে, তাহার পতির মধ্যে যে দিব্যভাব ও শক্তি রহিয়াছে—তাহাই তাহাকে স্বামীর দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের উপাস্য কেবল এই

প্রেমের ঈশ্বর। যতদিন আমরা তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা ইত্যাদি মনে করি, ততদিন বাহ্য পূজার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু যখন ঐ-সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের মূর্ত প্রতীক বলিয়া চিন্তা করি এবং সকল বস্তুতে তাঁহাকে এবং তাঁহার মধ্যে সকল বস্তু অবলোকন করি, তখনই আমরা পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকি।

হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি

[লাহোরে ধ্যান সিং-এর হাবেলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত—যাহার বিষয় আমাদের মনু মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখানে হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত হইয়াছে, ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে বোঝা যায়—ভবিষ্যতে এই ভাব সমগ্র জগৎকে প্রবল বন্যায় প্লাবিত করিবে। এই সেই ভূমি—যেখানে ইহার বেগশালিনী স্রোতস্বিনীকুলের ন্যায় চতুর্দিকে বিভিন্ন আধারে প্রবল ধর্মানুরাগ বিভিন্নভাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়া, শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বজ্রনির্ঘোষে উহার মহীয়ষী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছে। এই সেই বীরভূমি—যাহা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। এই সেই ভূমি—এত দুঃখ-নির্যাতনেও যাহার গৌরব ও তেজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজ-প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন, এবং যাহাদের জন্য এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাই যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন মর্মাহত সিংহের ন্যায় দক্ষিণ দেশে গিয়া নির্জনবাস আশ্রয় করিলেন এবং নিজ দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া মর্ত্যধাম হইতে অপসৃত হইলেন।

হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখনে—এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান আমার অতি অল্পই আছে। দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি— আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি— তোমাদিগের নিকট কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।

সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু গড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। জগতে সময় সময় সমালোচনা—এমন কি কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। অনন্ত কালের জন্য আছে কার্য—উন্নতির চেষ্টা ও গঠন, সমালোচনা বা ভাঙাচোরা নয়। প্রায় গত এক শত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র সমালোচনার বন্যা বহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকারময় দেশগুলির উপর পড়িয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আমাদের আনাচে-কানাচে, গলিঘুঁজিতেই যেন সাধারণের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। স্বভাবতই আমাদের দেশে সর্বত্র বড় বড় মনীষিগণের—শ্রেষ্ঠ মহিমময় সত্যনিষ্ঠ ন্যায়ানুরাগী মহাত্মাগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে অপার স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। আর এই মহাপুরুষগণ স্বদেশকে এত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রাণ স্বদেশের জন্য কাঁদিত বলিয়া, তাঁহারা যাহা কিছু মন্দ বলিয়া মনে করিতেন তাহাই তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন। অতীতকালের এই মহাপুরুষগণ ধন্য—তাঁহারা দেশের অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান যুগের মনোভাব ধ্বনিত হইতেছেঃ যথেষ্ট! সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে; এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, এগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় অগ্রগতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে আগাইয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ি পরিষ্কার হইয়াছে; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। পথ পরিষ্কার হইয়াছে; আর্যসন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের কাছে আসিয়াছি, আর প্রথমেই আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আমার চক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহান্ ও মহিমময়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি, এবং সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব আজ রাত্রে

আমার প্রস্তাব এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ত্ব বলিব, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত; যদি পারি—আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব, এবং যদি ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হয়, তবে ঐ তত্ত্ব কার্যে পরিণত করিতে হইবে। আমরা হিন্দু। আমি এই 'হিন্দু' শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহাদ্বারা কেবল সিন্ধুনদের পূর্বতীরবর্তী লোকদিগকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসে যায় না। আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময়, সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, না চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত থাকিবে, না উহা দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমানকালে 'হিন্দু' শব্দে কোন মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝাক; এস, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যে-সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি কখনও আমার পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত গর্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম; কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তির জন্য আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীতের আলোচনা করি, যতই আমি পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, ততই গৌরব বোধ করি, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, ইহা আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে তুলিয়া আমাদের মহান্ পূর্বপুরুষগণের মহতী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্যদের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও হৃদয়ে সেই গর্ব আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলের মিলনভূমি ঠিক কোথায়, আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি, তাহা বাহির করিবার চেষ্টার পূর্বে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতেই হইবে। প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেক জাতিরও সেইরূপ একটি ব্যক্তিত্ব আছে। যেমন এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ অতীত কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকেই এক-একটি বিধিনির্দিষ্ট পথে চলিতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষ উদ্‌যাপন করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে জানিতে হইবে—জাতীয় ব্রত কি, জানিতে হইবে—বিধাতা এই জাতিকে কি কার্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির প্রগতিতে ইহার স্থান কোথায়, জানিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির সঙ্গীতের ঐক্যতানে তাহাকে কোন্ সুর বাজাইতে হইবে। আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে—তুমি সাপটিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ উহার মাথায় ঐ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোনমতে মারিতে পারিবে না। আমরা রাক্ষস-রাক্ষসীর অনেক গল্প শুনিয়াছি। রাক্ষসীর প্রাণ একটি ছোট পাখির ভিতর থাকিত। যতদিন ঐ পাখিটিকে মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেল, তাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দিষ্ট ভাবের মধ্যে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব, যতদিন না তাহাতে আঘাত লাগে, ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপারটি বুঝিতে পারিব। বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতিমুহূর্তে নিজের বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপই আছি, এখনও আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত; শুধু তাহাই নহে, আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত তাহা নহে, সম্প্রতি আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব দিতে প্রস্তুত—তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন। আজ আমরা দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, ঐগুলি বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থানলাভ করিতেছে, শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থলে ভারতীয় ভাবধারা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কারণ এই—মানবজাতির মন যে-সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বিষয়—দর্শন ও ধর্মই জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারে ভারতের মহৎ দান।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন—অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আমরা সকলেই এ-কথা জানি, আর ঐ বিরাট্ মস্তিষ্কসম্পন্ন অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগতের স্বপ্নের অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তুলাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন—সেই উচ্চতর বিষয়ের প্রতিধ্বনি বেদের মধ্যেই শুনা যাইতেছেঃ 'অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'

৪৭

তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়। এই পরিবর্তনশীল, অনিত্য, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু-দুঃখ-শোকপূর্ণ এই জগতের বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে, কিন্তু যিনি অপরিণামী আনন্দময়, একমাত্র যাঁহাতে শান্তি বিরাজিত, একমাত্র যাঁহাতে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁহার নিকট পৌঁছিলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের মতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে-সকল বিদ্যা বা বিজ্ঞান আমাদিগকে শুধু অন্ন-বস্ত্র দিতে পারে, স্বজনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ক্ষমতা দিতে পারে, যে-সকল বিদ্যা শুধু মানুষকে জয় ও শাসন করিবার এবং দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য করিবার

শিক্ষা দিতে পারে; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অনায়াসেই সেই-সকল বিজ্ঞান, সেই-সকল বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে অন্য পথ ধরিলেন, যাহা পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা অনন্তগুণে মহৎ, পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা যাহাতে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ। ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা এমন একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এখন উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া উহা আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে, আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। এখন ধর্ম ও হিন্দু—এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই। অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করিয়াছে, কিন্তু একজনও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখিকে মারিতে পারে নাই। অতএব এই ধর্মই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি, আর যতদিন আধ্যাত্মিকতা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতের কোন শক্তিই এই জাতিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। যতদিন আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন আমরা জগতের সর্বপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতেও প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে তাহাকে আমি 'হিন্দু' বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতি-চর্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু-আধটু ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু এখানে—এই ভারতে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য ধর্মানুষ্ঠান, তারপর যদি সময় থাকে, তবে অন্যান্য জিনিষ তাহার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই তেমনি আমাদিগকে প্রথমে আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক-শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক-শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্ব-সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নাই। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতেও অনেক হইবে। কারণ আমাদের ধর্মের ইহাই বিশেষত্ব, ইহার মূলতত্ত্বগুলি অতি উদার, যদিও ঐগুলি হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি ঐগুলি সেই মূল তত্ত্বসমূহের কার্যে পরিণত রূপ—যে-তত্ত্বগুলি আমাদের মাথার উপরের আকাশের মত উদার এবং প্রকৃতির মত নিত্য ও সনাতন। অতএব সম্প্রদায়গুলি যে স্বভাবতই চিরদিন থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা জগতের কোন উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। একদল লোক তো সব কাজ করিতে পারে না। অসীমপ্রায় শক্তিরাশি অল্প কয়েকটি লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয়টি বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায়-ভেদরূপ এই শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক-শক্তিসমূহের সুপরিচালনার জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পরের বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন, যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্রসকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান, এই-সকল আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতাসত্ত্বেও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলনের স্বর্ণসূত্র বিদ্যমান, ঐগুলির মধ্যে সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—জগতে এক বস্তুই বিদ্যমান, ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন—সেই ভারতে এখনও এই-সব সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষহিংসা থাকে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দেয়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস—কতকগুলি প্রধান প্রধান তত্ত্বে আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে। আমরা বৈষ্ণব বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বা আধুনিক বৈদান্তিক—যাঁহাদেরই পদানুসরণ করি না কেন, প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়েরই হই বা আধুনিক সংস্কারপন্থী সম্প্রদায়েরই হই, যে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, আমার ধারণায় সে-ই এ-সকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যাপ্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত; কারণ আমরা সকলকেই আমাদের ভাবে আনিতে পারি না; আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিব, সকলকেই সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে বা সকলকেই আমাদের প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে—জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্মরহস্যসমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত; প্রকৃতির যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, বেদেরও তেমনি; এবং যখনই আমরা এই পবিত্র গ্রন্থের সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান হই, তখনই আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংসাকারী—শেষ বিচারক এই বেদ। বেদ কি—এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কোন সম্প্রদায় বেদের অংশবিশেষকে অন্য অংশ অপেক্ষা পবিত্রতর জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না, যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি—বেদবিশ্বাসে আমরা সকলেই ভাই ভাই। আজ আমরা যে-সব পবিত্র মহৎ উত্তম বস্তুর অধিকারী, তাহার সে-সবই আসিয়াছে এই সনাতন পবিত্র অপূর্ব গ্রন্থ হইতে। বেশ, তাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তত্ত্বটিই ভারতভূমির সর্বত্র প্রচারিত হউক। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বেদ চিরদিনই যে প্রাধান্যের অধিকারী এবং বেদের যে প্রাধান্যে আমরাও বিশ্বাসী, তাহা বেদকে দেওয়া হউক। অতএব আমাদের মিলনের প্রথম ভূমি—বেদ।

দ্বিতীয়তঃ আমরা সকলেই ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকি। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী শক্তি—তাঁহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, আবার তাঁহা হইতেই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চ বহির্গত হয়। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে—কেহ হয়তো সম্পূর্ণ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা সগুণ অথচ ব্যক্তিভাবশূন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার

সম্পূর্ণ নির্গুণ ঈশ্বর মানিতে পারেন, আর সকলেই কিন্তু বেদ হইতে নিজ নিজ মতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এই-সব ভেদ-সত্ত্বেও আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সবকিছু উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অন্তে সবকিছুই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে 'হিন্দু' বলা যাইতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে এই তত্ত্বটিও ভারতভূমির সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে-ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই—আমরা তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিবাদ করিব না—কিন্তু যেরূপেই হউক, তোমাকে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন একটি ধারণা অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও ইহার কোনটিই মন্দ নহে। একটি উৎকৃষ্ট, অন্যটি উৎকৃষ্টতর, অপরটি উৎকৃষ্টতম হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ-নিচয়ের মধ্যে 'মন্দ' শব্দটির স্থান নাই। অতএব যিনি যেভাবে ইচ্ছা ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন, তিনিই ঈশ্বরের আশীর্বাদভাজন। তাঁহার নাম যতই প্রচারিত হইবে, ততই এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা করুক; এই ঈশ্বরের নাম সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও নীচ ব্যক্তির গৃহ হইতে সর্বাপেক্ষা ধনী ও মানী—সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ত্ব যাহা আমি আপনাদের নিকট বলিতে চাই, তাহা এইঃ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত আমরা বিশ্বাস করি না যে, জগৎ মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে, আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে; আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মা এই জগতের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিষয়েও সকল হিন্দুই একমত। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতি অনাদি অনন্ত, তবে কল্পনাতে এই স্থূল বাহ্য জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার অভিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃতি-নামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে এবং তরঙ্গাকার এই গতি অনন্তকাল ধরিয়া—যখন কালেরও আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে।

সকল হিন্দুই আরও বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি তাহার অভ্যন্তরে মন নামক সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত 'মানুষ' নহে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ এইগুলি অপেক্ষা মহত্তর। কারণ স্থূলদেহ পরিণামী, মনও তদ্রূপ, কিন্তু এতদুভয়ের অতীত আত্মা-নামধেয়—এই 'আত্মা' শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ করিতে আমি অক্ষম; যে শব্দের দ্বারাই ইহার অনুবাদ করা যাক না কেন, তাহা ভুল হইবে—সেই অনির্বচনীয় বস্তুর আদি-অন্ত কিছুই নাই, মৃত্যু নামক অবস্থাটির সহিত উহা পরিচিত নহে।

তারপর আর একটি বিশেষ বিষয়ে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ—তাহা এই যে, আত্মা এক দেহের পর আর এক দেহ ধারণ করে; এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমন এক অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে না, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, তাহার আর জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত সংসারবাদ বা পুনর্জন্মবাদ এবং 'নিত্য আত্মা' সম্বন্ধীয় মতবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, এই আর একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধবিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন হইতে পারে, কাহারও মতে আবার উহা সেই অনন্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র হইতে পারে, অন্যের মতে হয়তো উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করি না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব বিশ্বাস করি যে, আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার বিনাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে হইবে, অবশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া পূর্ণত্বলাভ করিতে হইবে—ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত।

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্যসূচক, ধর্মরাজ্যের মহত্তম ও অপূর্বতম আবিষ্কার-রূপ তত্ত্বটির কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য তত্ত্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাহারা ইতঃপূর্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা মৌলিক প্রভেদ যেন প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যকে এক কুঠারাঘাতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে; সেটি এইঃ আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস করি—আমরা শাক্তই হই, শৈবই হই, বৈষ্ণবই হই, এমন কি বৌদ্ধ বা জৈনই হই—আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ ও পূর্ণস্বভাব, অনন্তশক্তিসম্পন্ন ও আনন্দময়। কেবল দ্বৈতবাদীর মতে আত্মার এই স্বাভাবিক আনন্দ অতীত-অসৎকর্ম দ্বারা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার সঙ্কোচমুক্ত হইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণস্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। আত্মা কিছুদিনের জন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, অদ্বৈতবাদীর মতে এ ধারণাটিও আংশিকভাবে ভ্রমাত্মক—মায়াবৃত হওয়ার ফলেই আমরা ভাবি যে, আত্মা যেন তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ অবস্থাতেও তাঁহার সমুদয় শক্তি পূর্ণভাবেই থাকে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্ত্বে অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী, আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে অবস্থিত ব্যবধান দুরপনেয়। প্রাচ্য জাতি—যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু ভাল, তাহা অন্তরে অন্বেষণ করে; উপাসনার সময় আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করি, পাশ্চাত্য জাতি ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্মপুস্তকসমূহ Inspired—সুতরাং শ্বাস-গ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রসমূহ কিন্তু Expired—শ্বাসপরিত্যাগের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে—ঐগুলি ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত, ঈশ্বরই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের অন্তর্যামী, শাস্ত্র তাঁহারাই প্রকাশ করিয়াছেন।

এইটিই একটি প্রধান বুঝিবার জিনিষ; হে আমার বন্ধুগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বার বার লোককে বুঝাইতে হইবে। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিবারাত্র নিজেকে দীন দুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। যদি তুমি বল—'আমার মধ্যেও শক্তি আছে', তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে; আর যদি তুমি বল—'আমি কিছুই নই', ভাব যে তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে তুমি 'কিছুই নও', তবে তুমি 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি তোমাদের

মনে রাখা কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। আমরা কিরূপে 'কিছু না' হইতে পারি? আমরা সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব কাজ করিতেই হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাসরূপ প্রেরণাশক্তিই তাঁহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—যেদিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেইদিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। নিজের উপর বিশ্বাস হারানোর অর্থ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমরা কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া কাজ করিতেছেন? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্বব্যাপী অন্তর্যামী প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমাদের দেহে মনে আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি তোমরা নিরুৎসাহ হইতে পার? আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ, তুমি হয়তো একটি পর্বতপ্রায় তরঙ্গ। তাহাতে কি আসে যায়! সেই অনন্ত সমুদ্র যেমন তোমার আশ্রয়, আমারও সেইরূপ। সেই প্রাণ শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন অধিকার, আমারও তেমনি। আমার জন্ম হইতেই—আমারও যে জীবন আছে, তাহা হইতেই—স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পর্বতপ্রায় উচ্চ তরঙ্গস্বরূপ তোমার ন্যায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সন্তানগণকে—তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহত্ত্ববিধায়ক, উচ্চ মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে-কোন বাদ ইচ্ছা শিক্ষা দাও; আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আত্মার পূর্ণত্বরূপ এই অপূর্ব মতটি ভারতে সর্বসাধারণ—সকল সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে আত্মা কখনই পরে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ যাহা স্বভাবতই পূর্ণ নহে, তাহা কোনরূপে পূর্ণতা লাভ করিলেও ঐ পূর্ণতা আবার চলিয়া যাইবে। যদি অপবিত্রতাই মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্য সে পবিত্রতা লাভ করে, তথাপি চিরকালের জন্য তাহাকে অপবিত্রই থাকিতে হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই পবিত্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়া যাইবে এবং আবার সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। এজন্য আমাদের সকল দার্শনিক বলেন, পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নহে; পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নহে—এইটি স্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে যে মহর্ষি তাঁহার নিজ মনকে তাঁহার কৃত উৎকৃষ্ট কার্যাবলী ও উৎকৃষ্ট চিন্তারাশি স্মরণ করিতে বলিতেছেন, তাঁহার কথা স্মরণ রাখিও।

৪৯

কই, তিনি তো তাঁহার মনকে সমুদয় দোষ-দুর্বলতা স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অবশ্য মানুষের জীবনে দোষ-দুর্বলতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু সর্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ কর—ঐ দোষ-দুর্বলতার প্রতিকার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্বকথিত কয়েকটি মত ভারতের সকল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোঁড়া বা উদার, প্রাচীন বা নব্যপন্থী, সকলেই সম্মিলিত হইবেন। কিন্তু সর্বোপরি, আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময় সময় ভুলিয়া যাই—ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি, তাহা না হইলে উহা ধর্ম নামেরই যোগ্য নহে। 'এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত'—এ-কথা আমাদিগকে কেহ কখনও শিখাইতে পারিবে না; কারণ আমরা ও-কথায় বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠন করিবে, তুমি তাহাই হইবে। তুমি যাহা—তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে এবং নিজের চেষ্টায় হইয়াছ। সুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী বাণী আবির্ভূত হইয়াছে—'অনুভূতি'; আর একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।' খুব সাহসের কথা বটে, কিন্তু উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়—আগাগোড়া সত্য। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল তোতাপাখির মত কতকগুলি কথা মুখস্থ করিলেই চলিবে না, কেবল বুদ্ধির সায়—বুদ্ধিগত সম্মতি দিলেই চলিবে না; ইহাতে কিছুই হয় না, ধর্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করা চাই। প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন—ইহাই আমাদের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছে—এ-জন্যই যে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহা নহে। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তি আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা নহে; আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, বর্তমান কালেও খুঁজিলে অনন্তঃ দশজন আত্মজ্ঞ পুরুষের সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, যাঁহারা আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না মানুষ ঈশ্বর-দর্শন করিতেছে, যতদিন না সে আত্মা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসম্ভব। অতএব সর্বাগ্রে এই-বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে এবং আমরা উহা যতই ভাল করিয়া বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পাইবে। কারণ সে-ই প্রকৃত ধার্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে—তাঁহাকে লাভ করিয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

৫০

তাঁহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তাঁহারই সকল সংশয় চলিয়া যায়, তিনিই কর্মফল হইতে মুক্ত হন, যিনি কার্য ও কারণ-রূপী পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটাকে গভীর ধর্মানুভূতি মনে করি; তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ! যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি—প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—আমরা ধর্মের সত্যসমূহ উপলব্ধি করিবার পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা

হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেরাই অন্ধকারে ঘুরিতেছি এবং অপরকেও সেই অন্ধকারে ঘুরাইতেছি। আর ইহা বুঝিলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে। কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করঃ তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে তাঁহাকে প্রচার করিবার তোমার কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ, আবার আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ? অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায়

৫১

আমরা উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব! অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া-চিন্তিয়া অগ্রসর হও। সকলকেই নিজ নিজ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে দাও, সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শন করিতে চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে—ভারতের প্রত্যেক ঋষি, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী উৎসারিত হইবে; কারণ যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ—তিনি যে সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তখন—কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে এবং তখনই আমরা 'হিন্দু' শব্দটিকে এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিকে যথার্থরূপে বুঝিতে, হৃদয়ে গ্রহণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে এবং আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব।

আমার কথা বিশ্বাস কর, তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষী ব্যক্তি হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে-কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের সেই মহান্ গুরুগোবিন্দসিংহের বিষয়ে আমি এই বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি।

এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের এবং আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমন কি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল; অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে দক্ষিণদেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।

আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক এক জন গোবিন্দসিংহ হইতে হইবে। তোমরা স্বদেশবাসীদের ভিতর সহস্র দোষ দর্শন করিতে পার, তথাপি যাহাদের মধ্যে হিন্দুরক্ত আছে, যাহারা ভারতবাসী তাহাদের সকলকেই দেবতারূপে পূজা করিতে হইবে—যদিও তাহারা সর্বপ্রকারে তোমাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তথাপি তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ করিবে। যদি তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দসিংহের মত সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দুনামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

'ভারত-উদ্ধার' সম্বন্ধে, যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারা জীবন কার্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। তোমাদের আধ্যাত্মিকতার উপর শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের শিথিল বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্টালিকা পর্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ-বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। জাতির পর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল—মানুষ জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাশ্চাত্য ভাষা মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে, 'মানুষ আত্মা ত্যাগ করে।'

৫২

আমাদের ভাষা কিন্তু বলে, 'সে দেহত্যাগ করিল।' পাশ্চাত্যদেশীয় লোক নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমে দেহকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তারপর তাহার একটি আত্মা আছে বলিয়া উল্লেখ করে; কিন্তু আমরা প্রথমেই নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তরপর আমার একটা দেহ আছে—এই কথা বলি। এই দুইটি বাক্য আলোচনা করিলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। এই কারণে যে-সকল সভ্যতা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যরূপ বালির ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেগুলি অল্পদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্যান্য যে-সকল জাতি ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে—যথা চীন ও জাপান—এখনও জীবিত; এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন ফিনিক্স-পক্ষীর ন্যায়; সহস্রবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া নূতন মহিমায় প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর কখনও মাথা তুলিতে পারে না; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ধৈর্যধারণপূর্বক অপেক্ষা কর; ভবিষ্যৎ গৌরব আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ কখনও সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি নিজেকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি, তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের মত অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে—তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে— তাহার বিনাশ আসন্ন। এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির—আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর; আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাইবে। আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের অধীন হইয়া কার্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিব।

তোমাদের ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না; অথচ অপরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইলে কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, তাহা করে না। বীজ মৃত্তিকাদি হইতে প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি-অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এইরূপ কর। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেনঃ

৫৩

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে, ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না; এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি কঠিন ব্যাপার, তাহা তোমরা বেশ জান। আর ঈশ্বরই জানেন, কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় জীবনস্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; ঈশ্বর জানেন—তোমাদের শোণিতে কত সহস্র বৎসরের সংস্কার রহিয়াছে, আর তোমরা কি সাগরে মিলিতপ্রায় এই শক্তিশালিনী স্রোতস্বতীকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকটে লইয়া যাইতে চাও? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই বিনষ্ট হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনস্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে-সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগবতী নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাত সরল করিয়া দাও, তাহা হইলে উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্য আমি পূর্বকথিত উপায়গুলি নির্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে, সেগুলি সময়াভাবে আজ রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম না—দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতিভেদ-সম্বন্ধীয় অদ্ভুত সমস্যা রহিয়াছে। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমস্যার সব দিক্ বিচার করিতেছি। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি, এদেশের প্রায় সর্বস্থানে গিয়া সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি; কিন্তু যতই আমি এই সমস্যার আলোচনা করিতেছি, ততই উহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ধারণা করিতে গিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে আমার সম্মুখে যেন ক্ষীণ রশ্মিধারা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি সম্প্রতি ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

তারপর আবার ভোজনপানাদি-সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ যতটা মনে করি, ব্যাপারটি ততটা অনাবশ্যক নহে। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমরা এখন এই আহারাদি সম্বন্ধে যে-বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার, উহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ আমরা ভোজনপান-বিষয়ে যথার্থ শুদ্ধতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি—আমরা শাস্ত্রানুমোদিত পানভোজন-প্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।

আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে, সেগুলি আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই। আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বা কি, কিরূপেই বা সেগুলি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও আপনাদিগকে বলিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুশৃঙ্খলভাবে সভায় কার্য আরম্ভ করিতেই বিলম্ব হইয়াছে, আর এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অধিক বিলম্ব ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে সভায় যোগদান করিতে চেষ্টা করিব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আর একটি কথা বলিলেই আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইবে। ভারতে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম নিশ্চল অবস্থায় আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই 'ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। অতীতকালে বরাবর যেরূপ হইয়া আসিয়াছে, তেমনি এখনও রাজপ্রাসাদে এবং দরিদ্রের পর্ণকুটিরে ধর্ম যেন সমভাবে প্রবেশ করে। এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার এবং জন্মগত সর্বজনীন স্বত্বরূপে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহ-দ্বারে মুক্তহস্তে লইয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াস-লভ্য, ভারতের ধর্মকেও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে। ভারতে আমাদিগকে এইভাবেই কাজ করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং মতানৈক্য লইয়া বিবাদ করিয়া নহে।

আমি তোমাদিগকে কার্যপ্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে-সকল বিষয়ে আমারা সকলেই একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক; যে-সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে। আমি যেমন বার বার বলিয়াছি, কোন ঘরে যদি বহু শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, এবং যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতে থাকি, 'উঃ কি অন্ধকার! কি অন্ধকার!' তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। মানুষের সংস্কার-সাধন করিবার ইহাই রহস্য। তাহাদিগকে উচ্চতর বিষয়সমূহের আভাস দাও—প্রথমেই মানুষের উপর অবিশ্বাস লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি মানুষের উপর—খুব খারাপ মানুষের উপরও বিশ্বাস করিয়া কখনও বিফল হই নাই। সর্বস্থলেই পরিণামে জয়লাভ হইয়াছে। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা সে পণ্ডিতই হউক বা অজ্ঞ মূর্খ বলিয়াই প্রতীয়মান হউক। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা তাহাকে দেবতা অথবা সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়াই বোধ হউক। প্রথমে মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তারপর এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়া ইহাও বুঝিতে চেষ্টা কর—যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে কিছু ভুল করে, যদি সে অতিশয় ঘৃণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে জানিও—তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে ঐগুলি প্রসূত হয় নাই, উচ্চতর আদর্শের অভাব হইতেই ঐরূপ হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যে অসত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই—সে সত্যকে ধরিতে পারিতেছে না। অতএব যাহা মিথ্যা, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায়—যাহা সত্য, তাহা মানুষকে দিতে হইবে। সত্য কি, তাহাকে জানাইয়া দাও। সত্যের সহিত সে নিজ ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে, ঐখানেই তোমার কাজ শেষ হইয়া গেল। সে এখন মনে মনে তাহার পূর্ব-ধারণার সহিত উহার তুলনা করুক। আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে; আলোক অবশ্যই অন্ধকার দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের সদ্ভাবকে প্রকাশিত করিবে। যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে চাও, তবে ইহাই পথ—ইহাই একমাত্র পথ; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ফল হইবে না; বা তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা মন্দ—এ কথা বলিলেও কিছু হইবে না। তাহাদের সম্মুখে ভালটি ধর, দেখিবে কি আগ্রহের সহিত তাহারা উহা গ্রহণ করে! মানুষের অন্তর্যামী সেই অবিনাশী ঐশীশক্তি জাগ্রত হইয়া যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহিমময়, তাহারই জন্য হস্ত প্রসারণ করে।

যিনি আমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা, যিনি আমাদের পূর্বপুরুষগণের ঈশ্বর—যাঁহাকে বিষ্ণু শিব শক্তি বা গণপতি, যে নামেই ডাকা হউক না কেন—যাঁহাকে সগুণ বা নির্গুণ যেরূপেই উপাসনা করা হউক না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাঁহাকে জানিয়া 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহান্ প্রেম লইয়া আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাঁহার শুভাশীর্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার কৃপায় আমরা যেন পরস্পরকে বুঝিতে সমর্থ হই, তাঁহার কৃপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও তীব্র সত্যানুরাগের সহিত পরস্পরের জন্য কাজ করিতে পারি, এবং ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন-রূপ মহৎ কার্যের মধ্যে যেন আমাদের ব্যক্তিগত যশ ও স্বার্থ—ব্যক্তিগত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ না করে!

ভক্তি

৯ নভেম্বর, ১৮৯৭, সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের তাঁবুতে ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতা হয়। ইহাই লাহোরে স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা। লালা বালমুকুন্দ সভাপতি ছিলেন। লাহোর হইতে প্রকাশিত ‘ট্রিবিউন’-পত্রে বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হয়।

উপনিষদসমূহের গম্ভীরনাদী প্রবাহের মধ্যে একটি শব্দ দূরাগত প্রতিধ্বনির ন্যায় আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদিও উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি সমগ্র বেদান্ত-সাহিত্যে উহা স্পষ্ট হইলেও তত প্রবল নহে। উপনিষদগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয়—যেন আমাদের সম্মুখে ভূমার ভাব ও চিত্র উপস্থিত করা। তথাপি এই অদ্ভুত ভাবগাম্ভীর্যের পশ্চাতে মধ্যে মধ্যে আমরা কবিত্বেরও আভাস পাই; যথা — ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

৫৪

সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে, এই-সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, অগ্নির তো কথাই নাই।

এই অপূর্ব পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনিতে শুনিতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে, এমন কি মনোরাজ্য হইতে দূরে অতি দূরে নীত হই—এমন এক জগতে নীত হই, যাহা কোন কালে বুঝিবার উপায় নাই; অথচ তাহা সর্বদা আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। এই মহান্ ভাবের পিছনেও ছায়ার ন্যায় অনুগামী আর একটি মহান্ ভাব আছে, যাহা মানবজাতির অধিকতর গ্রহণযোগ্য, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণের অধিকতর উপযোগী, যাহা মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রবেশ করান যাইতে পারে। এই ভক্তিবীজ ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে পূর্ণভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে—আমরা পুরাণকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি।

পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্বাবধি বর্তমান; সংহিতাতেও উহার পরিচয়, উপনিষদে কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ, কিন্তু পুরাণে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তি কী বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক। পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া ইদানীং বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে ওখান হইতে অনেক অংশ লইয়া সমালোচনা হইয়াছে, যেগুলির ঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে, ঐ অংশগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে টিকিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিয়া, পৌরাণিক উক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ভৌগোলিক ও জ্যোতিষিক সত্যাসত্য প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া একটি জিনিষ আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই; প্রায় সকল পুরাণেই আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে সর্বত্র এই ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু-মহাত্মা ও রাজর্ষিগণের চরিত্র-বর্ণনমুখে উহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্যের মহান্ আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃতি করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কাজ বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই আদর্শ সাধারণ মানবের ধারণার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা বেদান্তালোকের পূর্ণচ্ছটার মহিমা বুঝিতে ও উহার আদর করিতে পারেন—উহার তত্ত্বগুলি জীবনে পরিণত করা তো দূরের কথা। কারণ প্রকৃত বেদান্তীর প্রথম কার্য ‘অভীঃ’ বা নির্ভীক হওয়া। যদি কেহ বেদান্তী হইবার স্পর্ধা রাখে, তাহাকে হৃদয় হইতে ভয় একেবারে নির্বাসিত করিতে হইবে। আর আমরা জানি, ইহা কত কঠিন। যাঁহারা সংসারের সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের এমন বন্ধন খুব কমই আছে, যাহা তাঁহাদিগকে দুর্বল কাপুরুষ করিয়া ফেলিতে পারে, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা কত দুর্বল, কত কোমল, কত নিস্তেজ। যাহাদের চারিদিকে বন্ধন, যাহারা অন্তরে বাহিরে শত সহস্র বিষয়ের দাস হইয়া রহিয়াছে, জীবনের প্রতি মুহূর্তেই দাসত্ব যাহাদিগকে ক্রমশঃ নীচের দিকে টানিতেছে, তাহারা আরও বেশী দুর্বল। এরূপ ব্যক্তিদের নিকট পুরাণসমূহ ভক্তির অতি মনোহারিণী বার্তা বহন করিয়া আনে।

তাহাদেরই জন্য ভক্তির এই কোমল ও কবিত্বময় ভাব প্রচারিত, তাহাদেরই জন্য ধ্রুব প্রহ্লাদ ও শত সহস্র সাধুগণের এই-সকল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনী বিবৃত; এবং এই দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য—লোকে যাহাতে এই ভক্তিকে নিজ নিজ জীবনে বিকাশ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা। আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যাঁহার জীবনে প্রহ্লাদ ধ্রুব বা ঐ-সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যানের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।

আধুনিক কালে পুরাণগুলির প্রভাব শুধু স্বীকার করিলেই চলিবে না, পুরাণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ পরবর্তী

যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদিগকে যে-ধর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, পুরাণগুলি আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর ও উন্নততর এবং সর্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। ভক্তির সহজ ও সুখসাধ্য ভাব লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই হইবে না, এই ভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ আমরা পরে দেখিব—এই ভক্তির ভাবটি ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমে পরিণত হয়। যতদিন ব্যক্তিগত ও বিষয়গত প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। যতদিন সাহায্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করারূপ মানবীয় দুর্বলতা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরাণ কোন না কোন আকারে থাকিবেই থাকিবে। আপনারা ঐগুলির নাম পরিবর্তন করিতে পারেন, আপনারা এতকাল যাবৎ প্রচলিত পুরাণগুলির নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া আর একখানি নূতন পুরাণ প্রণয়ন করিতে হইবে। ধরুন, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল—তিনি এই-সকল প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার করিলেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশ বৎসর যাইতে না যাইতে দেখিবেন, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহারই জীবন অবলম্বন করিয়া একখানি পুরাণ রচনা করিয়া ফেলিবে। পুরাণ ছাড়িবার জো নাই, প্রাচীন পুরাণ ও আধুনিক পুরাণ—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। মানুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিয়া থাকে। যাঁহারা সমুদয় মানবীয় দুর্বলতার অতীত হইয়া প্রকৃত পরমহংসোচিত নির্ভীকতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা মায়ার বন্ধন, এমন কি স্বাভাবিক অভাবগুলি পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, শুধু সেই বিজয়মহিমায় মণ্ডিত দেবমানবদেরই পুরাণের প্রয়োজন নাই।

ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে সাধারণ মানুষের চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত ঈশ্বরের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী-পুত্র, পিতা-বন্ধু, আচার্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিক আবশ্যক। আলোকের স্পন্দন সর্বত্রই থাকিতে পারে, অন্ধকার স্থানেও থাকিতে পারে; বিড়াল ও অন্যান্য জন্তু যে অন্ধকারেও দেখিতে পায়, এই ঘটনা হইতেই ইহা অনুমিত হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে হইলে আমরা যে স্তরে রহিয়াছি, আলোককে তদুপযোগী স্তরের স্পন্দনবিশিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং আমরা এক নির্গুণ নিরাকার সত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি বটে, কিন্তু যতদিন আমরা সাধারণ মর্ত্যজীব, ততদিন আমাদিগকে কেবল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতই মানুষ-ভাবাপন্ন। সত্য-সত্যই এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্যই দেখিতে পাই, যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে, আর যদিও ঐ সঙ্গে স্বভাবতঃ যে-সকল বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, ঐসব বাড়াবাড়ির কতকগুলি আমরা নিন্দা বা সমালোচনা করিতে পারি, তথাপি আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই, তত্ত্বটির মর্মদেশ অটুট রহিয়াছে; এই-সব বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও, এই-সকল চরমে উঠা সত্ত্বেও এই প্রচারিত মতবাদে সারবস্তু আছে, উহার অন্তরতম অংশ খাঁটি ও সুদৃঢ়—উহার একটা মেরুদণ্ড আছে।

না বুঝিয়া কোন পুরাতন উপকথা বা অবিজ্ঞানিক দুর্বোধ্য শব্দরাশি আপনাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে বলিতেছি না, কতকগুলি পুরাণের ভিতর দুর্ভাগ্যবশতঃ যে-সকল বামাচারী ব্যাখ্যা প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না; কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এগুলির ভিতর একটি সারবস্তু আছে, এগুলির লোপ না পাইবার একটি কারণ আছে। ভক্তির উপদেশ দেওয়া, ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত করা, দার্শনিক উচ্চস্তরে বিচরণশীল ধর্মকে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনে কাজে পরিণত করাই পুরাণগুলির স্থায়িত্বের কারণ।

মানুষ এখন যেরূপ অবস্থায় আছে, ঈশ্বরেচ্ছায় সেরূপ না হইলে বড় ভাল হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনার প্রতিবাদ করা বৃথা। চৈতন্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, এখনও সে জড়ভাবাপন্ন। সেই জড়ভাবাপন্ন মানবকে হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিতে হইবে, যতদিন না সে চৈতন্যময়, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়। আজকালকার দিনে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিকতা বুঝা কঠিন, এ বিষয়ে কিছু বলা আরও কঠিন। যে প্রেরণা-শক্তি আমাদিগকে কার্যক্ষেত্রে আগাইয়া দিতেছে এবং যে-সব ফল আমরা লাভ করিতে চাহিতেছি, সে-সবই জড়।

হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় বলি—আমরা কেবল স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিতে পারি। পুরাণকারগণের এই সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহারা লোককে এই স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিবার প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। এইভাবে উপদেশ দেওয়াতে পুরাণগুলি লোকের কল্যাণসাধনে যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব; ভক্তির আদর্শ অবশ্য আধ্যাত্মিক—উহার লক্ষ্য চৈতন্য, কিন্তু পথ জড়ের ভিতর দিয়া, এবং জড়ের সাহায্য অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব জড়জগতের যাহা-কিছু এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে সাহায্য করে, সে-সবই লইতে হইবে এবং সেগুলিকে এমনভাবে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে, যাহাতে জড়ভাবাপন্ন মানুষ ক্রমে উন্নত হইয়া আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে পারে। গোড়া হইতেই শাস্ত্র জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছে। যদি জড়বস্তু দ্বারা মন্দির নির্মাণ করিয়া মানুষ ভগবানকে বেশী ভালবাসিতে পারে, সে তো খুব ভাল কথা; যদি ভগবানের প্রতিমা গঠন করিয়া সে এই প্রেমের আদর্শে উপনীত হইবার সাহায্য লাভ করে, ভগবান্ তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন!—সে যদি চায়, তাহাকে বিশটি প্রতিমা পূজা করিতে দাও। যে-কোন বিষয় হউক, যদি ঐগুলি তাহাকে ধর্মের সেই চরম লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে সাহায়তা করে, এবং যদি তাহা নীতিবিরুদ্ধ না হয়, তবে অবাধে সে ঐগুলি অবলম্বন করুক। 'নীতিবিরুদ্ধ না হয়'—এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিবিরুদ্ধ বিষয় আমাদের ধর্মপথে সহায় না হইয়া বরং বহুল বিঘ্নই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ভারতে ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিমা-ব্যবহারের যাঁহারা বিরোধিতা করেন, কবীর তাঁহাদের অন্যতম; ভারতে এমন অনেক বড় বড় দার্শনিক ও ধর্মসংস্থাপকের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না—ভগবান্ সগুণ বা ব্যক্তিভাবাপন্ন, এবং অকুতোভয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে সেই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাও প্রতিমাপূজায় দোষারোপ করেন নাই। বড়জোর বলা যায়, তাঁহারা উহাকে খুব উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কোন পুরাণেই প্রতিমাপূজাকে উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলা হয় নাই। যে-সব য়াহুদী বিশ্বাস করিতেন, জিহোবা একটি পেটিকায় অবস্থান করেন, তাঁহারাও মূর্তিপূজক ছিলেন। শুধু অপরে মন্দ

বলে বলিয়া মূর্তিপূজায় দোষারোপ করা উচিত নহে। বরং প্রতিমা বা অপর কোন জড়বস্তু যদি মানুষকে ধর্মলাভে সাহায্য করে, তবে স্বচ্ছন্দে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আর আমাদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহাতে এ-কথা অতি পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই যে, জড়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত মূর্তিপূজা অতি নিম্নস্তরের উপাসনা।

সমগ্র ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জোর করিয়া প্রতিমাপূজা চাপাইবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার দোষ দেখাইবার উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। কাহার কি উপাসনা করা উচিত এবং কোন্ বস্তু অবলম্বন করিয়া উপাসনা করা উচিত, এ বিষয়ে হুকুম করিবার জন্য অন্যের কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল? সে কি করিয়া জানিবে, কিসের সাহায্যে আর একজনের উন্নতি হইবে—প্রতিমাপূজা দ্বারা, না অগ্নিপূজা দ্বারা, না এমন কি একটা স্তম্ভের উপাসনা দ্বারা? আমাদের নিজ নিজ গুরু এবং গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ দ্বারাই এ-সকল বিষয় নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হইবে। ভক্তিগ্রন্থে ইষ্টসম্বন্ধে যে-নিয়ম আছে, তাহা হইতেই ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক লোককেই তাহার বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার বিশেষ পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আর সেই নির্বাচিত পথই তাহার 'ইষ্ট'। অন্য উপাসনাগুলিকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ উপাসনাপদ্ধতি-অনুসারে সাধন করিতে হইবে—যতদিন না সাধক গন্তব্য স্থলে উপনীত হন, যতদিন না তিনি সেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হন, যেখানে আর জড়ের সাহায্য প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত কুলগুরুপ্রথা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য দু-চারিটি কথা বলা আবশ্যক—ঐ প্রথা এক প্রকার বংশপরম্পরাগত গুরুগিরিমাত্র। শাস্ত্রে আমরা পড়িয়া থাকি, যিনি বেদের সারমর্ম বুঝেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অর্থলোভে বা অপর কোন উদ্দেশ্যে লোককে শিক্ষা দেন না, যাঁহার কৃপা অহৈতুকী, বসন্ত ঋতু যেমন বৃক্ষলতাদির নিকট কিছু প্রার্থনা করে না, কিন্তু যেমন বসন্তাগমে বৃক্ষলতাদি সতেজ হইয়া উঠে, উহাদের নূতন ফলপত্র-মুকুলাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ যাঁহার স্বভাবই লোকের কল্যাণসাধন করা, যিনি উহার পরিবর্তে কিছুই চাহেন না, যাঁহার সারাজীবনই অপরের কল্যাণের জন্য, এইরূপ লোকই গুরুপদবাচ্য, অন্যে নহে।

৫৫

অসদ্‌গুরুর নিকট তো জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাই নাই, বরং তাঁহার শিক্ষায় একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। কারণ গুরু কেবল শিক্ষক বা উপদেষ্টামাত্র নহেন, শিক্ষকতা তাঁহার কর্তব্যের অতি সামান্য অংশমাত্র। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, গুরু শিষ্যে শক্তিসঞ্চার করেন। সাধারণ জড়জগতের একটি দৃষ্টান্ত ধরুন—যদি কোন ব্যক্তি ভাল বীজের টিকা না লয়, তাহার শরীরে দূষিত অনিষ্টকর বীজ প্রবেশের ভয় আছে। সেইরূপ অসদ্‌গুরুর শিক্ষায় কিছু মন্দ শিখিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে এই কুলগুরুর ভাবটি উঠিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। গুরুর কার্য যেন ব্যবসায়ে পরিণত না হয়। ইহা নিবারণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিজেকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিবার সময় কুলগুরুপ্রথা যে-অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সমর্থন করা কাহারও উচিত নহে।

আহার সম্বন্ধে আজকাল যে কঠোর নিয়মের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, সেটির অধিকাংশ বাহ্য ব্যাপার এবং যে উদ্দেশ্যে ঐ-সকল নিয়ম প্রথম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য এখন লোপ পাইয়াছে। কে খাদ্য স্পর্শ করিতে পাইবে, এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার এক অতি গভীর দার্শনিক অর্থ আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে এই সাবধানতা রক্ষা করা কঠিন বা অসম্ভব। যে-ভাবটি পালন করা কেবল ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাধকের পক্ষেই সম্ভব, তাহা সাধারণের জন্য নির্দেশ করা ভুল হইয়াছে। কেন না, জনসাধারণের অধিকাংশই জড়সুখের আস্বাদে অতৃপ্ত; এবং তৃপ্তির পূর্বেই জোর করিয়া তাহাদের উপর ধর্ম চাপাইয়া দিবার সঙ্কল্প করা বৃথা।

ভক্তের জন্য বিহিত উপাসনাপদ্ধতিগুলির মধ্যে মানুষের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক যদি কোনরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী একটি, ছয়টি বা দ্বাদশটি দরিদ্রকে প্রত্যহ নিজ গৃহে আনিয়া নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিলে ভাল হয়। অনেক দেশে দানের প্রথা দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু উহাতে তেমন সুফল না হওয়ার কারণ এই যে, উহা যথাযথ ভাবের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। 'এই নিয়ে যা'—এ-ভাবে দান বা দয়াধর্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, পরন্তু উহা হৃদয়ের অহঙ্কারের পরিচায়ক; দানের উদ্দেশ্য—জগৎ যেন জানিতে না পারে যে, দাতা দয়াধর্ম করিতেছে। হিন্দুদের অবশ্য জানা উচিত যে, স্মৃতির মতে—দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট; গ্রহীতা সেই সময় স্বয়ং নারায়ণ, সুতরাং আমার মতে এইরূপ নূতন ধরনের পূজাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিলে ভাল হয়—কতিপয় দরিদ্র অন্ধ বা ক্ষুধার্ত নারায়ণকে প্রত্যহ প্রতিগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিমার যেরূপ পূজা হয়, অশন-বসন দ্বারা তাহাদের সেইরূপ পূজা করা। পরদিবস আবার কতকগুলি লোককে লইয়া আসিয়া ঐরূপে পূজা করা। আমি কোন উপাসনাপ্রণালীর দোষ দিতেছি না, কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এইভাবে নারায়ণপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা এবং ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

উপসংহারে আমি ভক্তিকে একটি ত্রিকোণের সহিত তুলনা করিতেছি। ইহার প্রথম কোণ—প্রকৃত ভক্তি বা প্রেম কিছুই চাহে না। প্রেমে ভয় নাই—ইহাই উহার দ্বিতীয় কোণ। পুরস্কার বা প্রতিদানের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ভিক্ষুকের ধর্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম, প্রকৃত ধর্মের সহিত উহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। কেহ যেন ভিক্ষুক না হন, কারণ ভিক্ষুকতা নাস্তিকতার চিহ্ন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করে, সে মূর্খ নয়তো কি? তেমনি জড়বস্তুর জন্য ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করে, সেও মূর্খ। ভক্তকে সর্বদাই এই কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবেঃ প্রভো, আমি তোমার নিকট কিছুই চাহি না, কিন্তু যদি তোমার কিছু প্রয়োজন থাকে, আমি দিতে প্রস্তুত। প্রেমে ভয় থাকে না। আপনারা কি দেখেন নাই যে, ক্ষীণকায় অবলা নারী পথ দিয়া যাইতে যাইতে কুকুরের চীৎকারে নিকটতম গৃহে পলাইয়া আশ্রয় লয়? পরদিন সে পথ চলিতেছে—সঙ্গে তাহার শিশুপুত্র। হঠাৎ একটা সিংহ শিশুটিকে আক্রমণ করিল—তখন কি তাহাকে পূর্বদিনের মত পলাইতে দেখিবেন? কখনই না। সে তাহার সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইতেও প্রস্তুত।

তৃতীয় বা সর্বশেষ কোণ এই যে, প্রেমই প্রেমের লক্ষ্য। ভক্ত অবশেষে এইভাবে উপনীত হন যে, শুধু প্রেমই ঈশ্বর, অন্য কিছু নয়। ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে মানুষ আর কোথায় যাইবে? সকল দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। তিনিই সেই শক্তি, যাহা চন্দ্র-সূর্য-তারকারাশি পরিচালিত করিতেছে এবং নরনারী ও ইতর প্রাণিগণের মধ্যে, সকল বস্তুতে সর্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে; জড়রাজ্যে মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি শক্তিরূপে তিনিই প্রকাশিত। তিনি সকল স্থানেই রহিয়াছেন, প্রতি পরমাণুতে রহিয়াছেন, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ। তিনিই সেই অনন্ত প্রেম, যাহা জগতের একমাত্র প্রেরণা-শক্তি এবং সর্বত্র প্রত্যক্ষ স্বয়ং ভগবান্।

বেদান্ত - (লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতা)

[লাহোরে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা, ১২ নভেম্বর, ১৮৯৭]

আমরা দুইটি জগতে বাস করিয়া থাকি—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং মানুষ প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সকল গভীর সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার মহান্ ও সুন্দরের জন্য পিপাসা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া সে যে-সকল উত্তর পাইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে-সকল অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব। বহির্জগৎ হইতে মানুষ যথার্থই মহান্ ভাবসমূহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরে তাহার নিকট অন্য এক জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্মকাণ্ডভাগে আমরা ধর্মের অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ বিবৃত দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই; আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেই অপূর্ব মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে। বোধ হয় প্রলয়াবস্থার এরূপ মহত্ত্বভাবদ্যোতক বর্ণনা দিতে এ পর্যন্ত কেহ চেষ্টা করেন নাই। তথাপি উহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবের বর্ণনা—উহা স্থূলেরই বর্ণনা, উহাতে যেন এখনও কিছু জড়ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সীমার ভাষায় অসীমের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে; উহা 'দেশে'রই অনন্তত্বের বর্ণনা, মনের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম প্রণালী ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড়জগৎ হইতেই জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা প্রথমে হইয়াছিল। 'যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা'

৫৬

—এই হিমালয় পর্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবাসীর গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে গেল, অন্তর্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ 'চৈতন্যে' আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিলঃ মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?—'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।'

৫৭

—কেহ বলে, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে; কেহ বলে, থাকে না। হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি? এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বহির্জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই, আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; শেষে উত্তর আসিল।

বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত—আরণ্যক বা রহস্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি জড়ের ভাষায় নহে, চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে-সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই-সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতালি দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত—এখন আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে কোনরূপ জোড়াতালি না দিয়া মানবজাতির নিকট মহত্তর সত্যসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; এইরূপ উচ্চতম সত্য জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই।

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ড বিশাল সাগরের মত। উহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলেও অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই বলিয়াছেন, বেদান্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃস্বরূপ,—আর সত্যই ইহা বর্তমান ভারতের বাইবেল-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া 'শ্রুতি' অর্থে উপনিষদ্—কেবল উপনিষদ্ই বুঝাইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের বড় বড় দার্শনিকগণ—ব্যাস, পতঞ্জলি, গৌতম,

এমন কি দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্যন্ত—যখন তাঁহাদের মতের সমর্থক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাঁহারা উপনিষদেই উহা পাইয়াছেন, অন্য কোথাও নহে; কারণ উপনিষদসমূহের মধ্যেই সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে।

৫৮

কতকগুলি সত্য আছে, যেগুলি কেবল বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, সেগুলিও ততদিন থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক; আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদ উপাসনাপ্রণালী এ-সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রৌত সর্বজনীন সত্যসমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিরকাল স্বমহিমায় অচল, অজেয় ও অবিনাশী।

উপনিষদের যে-সকল তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্মকাণ্ডেই পূর্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ-তত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে; এমন কি মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব—যাহা সকল ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্মাকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাগের বিষয় বলিবার পূর্বে আপনাদের সমক্ষে কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, আর বেদান্ত-শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহা প্রথমেই আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমরা প্রায়ই একটি বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি—আমরা 'বেদান্ত'-শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমান ভারতবর্ষে সকল ধর্মমত অধ্যয়ন করিতে 'প্রস্থানত্রয়' সমভাবে উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসসূত্র। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ববর্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টি ও চরম পরিণতিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে পরস্পর-বিরোধী তাহা নহে, উহাদের মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ, যেন সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসসূত্রে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ্ এবং বেদান্তের অপূর্ব সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসরূপ ব্যাসসূত্রের মাঝখানে বেদান্তের টীকাস্বরূপ ভগবানের মুখনিঃসৃত 'গীতা' বর্তমান।

এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব—ভারতের যে-কোন সম্প্রদায়ই হউন না কেন, যাঁহারাই নিজদিগকে সনাতন-মতাবলম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্, গীতা ও ব্যাসসূত্রকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, কি শঙ্করাচার্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য, কি বল্লভাচার্য, কি শ্রীচৈতন্য—যিনিই নূতন সম্প্রদায়-গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিনটি 'প্রস্থান' গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং এগুলির উপর একটি করিয়া নূতন ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছে। অতএব উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি মতে 'বেদান্ত'-শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। বেদান্ত-শব্দে প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—সবগুলি মতকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন 'বেদান্তী' বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও সেইরূপ। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'-শব্দের দ্বারা বৈদান্তিকই বুঝিয়া থাকি।

আর এই বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—এই তিনটি মত স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেকদিন পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল—শঙ্কর উহার একজন শেষ প্রতিনিধিমাত্র। রামানুজী মতও তাই—রামানুজের জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিদ্যমান ছিল, এ-কথা তাঁহার লিখিত ভাষ্য হইতেই আমরা জানি। অন্যান্য যে-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় পাশাপাশি ভারতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-সকল মত পরস্পর-বিরোধী নহে। আমাদের ষড়্‌দর্শন যেমন মহান্ তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশমাত্র, ইহা যেমন অতি মৃদুধ্বনিতে আরম্ভ করিয়া শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিণত হইয়াছে, তেমনি পূর্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই, মানব-মন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সবগুলিই অদ্বৈতবাদের সেই বিস্ময়কর একত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী নহে।

অপর দিকে আমি বলিতে বাধ্য, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, এগুলি পরস্পর-বিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী সেইগুলিকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ আছে, টানিয়া সেইগুলির অদ্বৈতবোধক অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলি টানিয়া দ্বৈতবোধক অর্থ করিতেছেন। অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ—আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'—গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোনরূপ অসাধুতার আশ্রয় লইয়া ধর্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ করিবার দরকার নাই, যে-সকল শ্লোকের দ্বারা যে-সব ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই-সকল শ্লোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্লোকের সাদাসিধা অর্থ বুঝা অতি সহজ, আর যখনই তোমরা 'অধিকারভেদে'র অপূর্ব রহস্য বুঝিবে, তখনই উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ইহা সত্য যে, উপনিষদসমূহের লক্ষ্য একটিঃ কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে

সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।'

৫৯

আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় হইল—চরম একত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা। বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ছাড়া জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় জ্ঞানের কার্য হয়, তবে এই অপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে—যাহা নামরূপে সহস্র প্রকারে বিভিন্ন, যেখানে জড় ও চৈতন্যে ভেদ, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটি হইতে ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেকটি রূপ অপরটি হইতে পৃথক্, যেখানে একটি বস্তুর সহিত অপর বস্তুর পার্থক্য বিদ্যমান—সেই জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা কি গুরুতর ব্যাপার, ভাবিয়া দেখ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত 'লোকে'র মধ্যে—এই-সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অন্য দিকে আবার 'অরুন্ধতী-ন্যায়ে'র প্রয়োগ করিতে হইবে। অরুন্ধতী-নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোন বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পর ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এভাবেই সূক্ষ্মতর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্বে অন্যান্য অনেক স্থূলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতরভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না—তোমাদিগকে কেবল উপনিষদ্ দেখাইয়া দিলেই হইবে, তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই দ্বৈতবাদ—উপাসনার উপদেশ। প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তারূপে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্য, শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা, তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, যে-আচার্য উক্ত প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে উভয় ভাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে,—যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি—কোন ভেদ নাই, 'তত্ত্বমসি শ্বতকেতো'। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান, ইহাই শেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপস নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য—নিরাবরণ সত্য—এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, এবং বর্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্য প্রচার করিতে গিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই; ঈশ্বরকৃপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এখন পূর্ব-প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলির আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় যে-বিষয়ে একমত, সেই জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আমি প্রথমে জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, যাহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমাদিগকে এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ বহুযুগ পূর্বে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্ক্রিয়ামাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই সে-দিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। বিজ্ঞান সবেমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ তড়িৎ, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই একটি শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে; সুতরাং লোকে যে-কোন নামেই অভিহিত করুক না কেন, বিজ্ঞান ঐগুলিকে একটিমাত্র নামের দ্বারাই অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু অতি প্রাচীন হইলেও সংহতিতেও সেই শক্তির এরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই বল, তড়িৎই বল, চৌম্বক-শক্তিই বল অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বল—সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র এবং সেই এক শক্তির নাম 'প্রাণ'। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয়, মনে কর? কখনই নহে। যদি বল, শক্তিরাশির একেবারে ধ্বংস হয়, তবে কোন্ বীজ হইতে আবার আগামী জগৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে? কারণ, এই গতি তো চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আর একবার পড়িতেছে; আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এমনি ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে 'সৃষ্টি' বলে। 'সৃষ্টি' আর ইংরেজী 'creation' শব্দ একার্থক নহে। ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, সংস্কৃত শব্দগুলির যথাসাধ্য অনুবাদ করিয়া বলিতে হয়। 'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া—যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—সেই প্রাথমিক অবস্থায় বিলীন হয়—কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে,—আবার ক্রমশঃ প্রকাশোন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর এই শক্তিগুলির—প্রাণশক্তির কি হয়? তাহারা আদি-প্রাণে পরিণত হয়; এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়—সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না, আর বৈদিক সূক্তের 'আনীদবাতং'

৬০

—গতিহীনভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল—এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। উদাহরণস্বরূপ এই 'বাত' শব্দটি ধর। কখনও কখনও ইহার দ্বারা 'বায়ু' বুঝায়, কখনও গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থ লইয়া গোল করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর তখন 'ভূতের' বা জড়পদার্থের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্বভূতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ হইতে প্রকাশিত হয়। এই আকাশই আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে, আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনি এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।

অন্যত্র

৬১

আছে—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।'—এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই

বাহির হয়। এখানে 'এজতি' শব্দটি লক্ষ্য করিও—'এজ্' ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া। 'নিঃসৃতম্' অর্থ বাহিরে প্রক্ষিপ্ত; 'যদিদং কিঞ্চ'—জগতে যাহা কিছু।

প্রপঞ্চ-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিভাবে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কম্পন হইতে বায়ুর উৎপত্তি কিভাবে হয় ইত্যাদি—অনেক কথা বলিতে হয়। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট যে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্থূল ভূত সর্বশেষে উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা বাহিরের বস্তু আর এই স্থূল ভূতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম ভূত রহিয়াছে। এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎ দুই তত্ত্বে পর্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও চরম একত্বে পৌঁছান যায় নাই। শক্তিবর্গ 'প্রাণ'রূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ 'আকাশ'রূপ এক বস্তুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই দুইটির মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্যবসিত করা যাইতে পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব—কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই, আর যদি ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে বিজ্ঞান যেমন প্রাচীনদের ন্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী সত্তা, যাঁহার পৌরাণিক নাম ব্রহ্মা—চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞানে যাঁহাকে 'মহৎ' বলা যায়। এখানেই উভয়ের মিলন। দার্শনিক ভাষায় যাহা 'মন' বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই 'মহৎ'-এর কিয়দংশ। মস্তিষ্কের জালে আবদ্ধ ব্যষ্টি-মনের যোগফলকে 'সমষ্টি মন' বলা যায়।

কিন্তু বিশ্লেষণ এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর সমগ্র জগৎ একটি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর ব্যষ্টিতে যাহা হইতেছে, সমষ্টিতেও তাহা ঘটিয়াছে—ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে সমষ্টি-মনে কি হইতেছে, তাহাও অনেকটা নিশ্চিতভাবে অনুমান করিতে পারিতাম। এখন প্রশ্নঃ এই মন কি? বর্তমানকালে পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্মের একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্যবাসীরা আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; কারণ আধুনিক শারীরবিজ্ঞান প্রতি পদে মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইতেছে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা এ- সব তত্ত্ব বরাবর জানি। হিন্দু-বালককে প্রথমেই শিখিতে হয়, মন জড়পদার্থ—তবে সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে; উহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; উহা আত্মা নহে।

এই 'আত্মা' শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে পারিতেছি না, কারণ ইওরোপে আত্মা-শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই নাই; অতএব এই শব্দের অনুবাদ করা যায় না। জার্মান দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা-শব্দটি Self-শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু যতদিন না এই শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন উহা ব্যবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে Self-ই বল বা আর যাহাই বল, আমাদের 'আত্মা' ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে নিজের যন্ত্র, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় অন্তঃকরণ-রূপে ব্যবহার করেন, আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কাজ করে। এই মন কি? এই সেদিন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষু প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নহে, তাহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্তমান; আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

তোমাদের দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়াই অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্তরিন্দ্রিয়ের—অভ্যন্তরবর্তী মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহের; তুমি সেগুলির যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পার, কিন্তু ইন্দ্রিয়-অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরেজীতে Mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া বলেন যে, মস্তিষ্কই মন এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা কারণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে তোমাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তাহাদিগকে অনায়াসেই বলিতে পার, 'আমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহা জানিতেন।' ইহা তোমাদের ধর্মের মূলসূত্র।

বেশ কথা, এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপাদান, ইহা 'মহৎ'-এরই অংশ—মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত একটি হ্রদকে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি কি ঘটিবে? প্রথমতঃ জলে যে আঘাত করা হইল, সেইটিই যেন একটি ক্রিয়া, তারপরই জল উত্থিত হইয়া ঐ আঘাতের প্রতিক্রিয়া করিল, আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটি যেন হ্রদ, আর বাহ্য বিষয় ও বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তর। যখনই 'চিত্ত' এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কোন বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে—বাহ্য বস্তুগুলির অনুভূতি ভিতরে বহন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন—তখনই একটি কম্পন উৎপন্ন হয়. উহাই সংশয়াত্মক 'মন'। তারপর একটি প্রতিক্রিয়া হয়—উহা নিশ্চয়াত্মিকা 'বুদ্ধি', আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'অহং' জ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদিত হয়। মনে কর, আমার হাতের উপর একটি মশা আসিয়া দংশন করিল। এই বাহ্য বস্তুজনিত বেদনা আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল—মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই 'মন'। তারপরই একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমার ভিতর এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটি মশা বসিয়াছে, সেটিকে তাড়াইতে হইবে। তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হ্রদে যে-সকল আঘাত আসে, সেগুলি সবই বহির্জগৎ হইতে; কিন্তু চিত্তহ্রদে আঘাত বহির্জগৎ হইতেও আসিতে পারে, আবার অন্তর্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। চিত্ত এবং উহার বিভিন্ন অবস্থার নাম 'অন্তঃকরণ'।

পূর্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাদিগকে আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে ইহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হইবে। তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই মুক্তা দেখিয়াছ, এবং অনেকেই জান—মুক্তা কিভাবে নির্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, ঠিক সেইভাবে আমরা আমাদের সমগ্র জগৎকে গঠন করিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমন কি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনেরই কিছুটা সেই উত্তেজনার দিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তখন আমাদের নিজ মন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকারিত হয়, আমরা সেইভাবে আকারিত মনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহাদিগকে এ-কথা মানিতে হইবে, আজকাল শারীরবিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে এ-কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জগৎকে আমরা 'ক' বলিয়া নির্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃতপক্ষে ক+মনকে জানিতে পারি, এবং এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটি এত অধিক যে, উহা ঐ 'ক'-এর সর্বাংশব্যাপী, আর ঐ 'ক'-এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অতএব যদি বহির্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা যেরূপ আকারে রূপান্তরিত হয়, উহাকে আমরা সেই ভাবেই জানিতে পারি। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা 'আত্মা+মন' ব্যতীত আর কিছু নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তবে এখানে যাহা হইয়াছে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

তারপর আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিরবচ্ছিন্ন জড়প্রবাহের নামমাত্র। প্রতিমুহূর্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতিমুহূর্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে; যেন একটি সদা-প্রবাহিত নদী—উহার রাশি রাশি জল সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে সমস্তটিকে একবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে সেই একই নদী বলিয়া থাকি। কিন্তু নদীটি প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতিমুহূর্তে নদীর তটভূমি পরিবর্তিত হইতেছে, প্রতিমুহূর্তে তীরবর্তী বৃক্ষলতা এবং পত্রপুষ্পফলাদির পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটি কি? নদী এই পরিবর্তন-সমষ্টির নামমাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা এই ক্রমাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই মহান্ 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ' মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এই মত সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ভারতে বেদান্তের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে এই মত উত্থিত হইয়াছিল। এই মতকে নিরস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল, আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে খণ্ডন করিতে সমর্থ, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদের নামে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক ইহাতেই জগতের পরিত্রাণ; কারণ এই অদ্বৈতবাদেই সব কিছুর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপাসনাপ্রণালী হিসাবে দ্বৈতবাদ প্রভৃতি খুব ভাল বটে, ঐগুলি মনের খুব তৃপ্তিকর বটে, হইতে পারে—ঐগুলি মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত একটি নদীস্বরূপ—নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে, অপরদিকে পূর্ণ হইতেছে; তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করি? আমরা দেখি, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্তনীয়—যাহার জন্য আমাদের ধারণাগুলি অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয়। যদি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আলোকরাশি আসিয়া একটি যবনিকা বা দেওয়াল বা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়ে, তখন—কেবল তখনই ঐগুলি এক অখণ্ড সমষ্টির আকার ধারণ করিতে পারে। মানুষের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া অখণ্ডত্বের ভাব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখনও সেই বস্তু হইতে পারে না, কারণ মনও পরিবর্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখনও পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক অখণ্ডভাবে পরিণত হয়,—ইহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মা। আর যখন দেখিতে, সমুদয় জড়পদার্থ—তাহাকে 'সূক্ষ্ম জড়' অথবা মন যে-নামেই অভিহিত কর না—এবং সমুদয় স্থূল, জড় বা বাহ্য জগৎ উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না; অতএব উহা চৈতন্যস্বভাব অর্থাৎ উহা জড় নয়, উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

তারপর আর একটি প্রশ্ন আসে। অবশ্য বাহ্য জগৎ দেখিয়া 'কে উহা সৃষ্টি করিল, কে জড় পদার্থ সৃষ্টি করিল?'—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ উদ্দেশ্যবাদ আনিবার যে পূর্বপ্রচলিত যুক্তি রহিয়াছে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই সত্যকে জানা হইবে—আত্মা সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেইভাবেই উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক-একটি অপরিবর্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই-সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান। নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কাজ করিবে? কী সেই মধ্যবর্তী বস্তু, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কাজ করিবে? তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে আমি যে কিছু অনুভব করিতে পারি, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? এমন কী বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটি আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে—যে-আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কাজ করিবে, যে-আত্মা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিবে, যে-আত্মার সহায়তায় অপর আত্মাসমূহ প্রাণবন্ত হইবে, পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে, পরস্পরের জন্য কাজ করিবে। এই সর্বব্যাপী আত্মাই 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু, ঈশ্বর। আবার আত্মা যখন

জড়পদার্থনির্মিত নয়—চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মানুসারে উহার বিচারও চলিতে পারে না; অতএব আত্মা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

৬২

অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কোন অস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না—এই মানবাত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, নিশ্চল ও চিরন্তন।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু, কপিলের মতেও ইহা সর্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু, কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, ব্যক্ত অবস্থায় উহা অণু।

তারপর আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটিও বিশেষভাবে ভারতীয়—আর এটিই আমাদের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণভাব। এই জন্য আমি তোমাদিগকে এই তত্ত্বটির প্রতি অবহিত হইতে এবং উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ ভারতীয় বলিতে যাহা কিছু—এই তত্ত্বটি সে-সকলেরই ভিত্তিস্বরূপ। জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত শারীর-পরিণামবাদের (doctrine of physical evolution) বিষয় তোমরা শুনিয়াছ। ঐ মতে সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন; আমরা যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক; একটি অপরটিতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে।

যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।'

৬৩

অর্থাৎ এক জাতি অপর জাতিতে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। তবে ইওরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোথায়?—'প্রকৃত্যাপূরাৎ'—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। ইওরোপীয়গণ বলেনঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন-নির্বাচন প্রভৃতিই এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই জাত্যন্তরপরিণামের যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতীয়েরা ইওরোপীয়গণ অপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপূরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত ইহয়া বুদ্ধ-রূপে পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রে কোন না কোন আকারে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ না করা যায়, তবে তাহা হইতে তদনুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; হইতে পারে—উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাই-ই চাই। অতএব যদি পরিণামের এক প্রান্ত বুদ্ধ হন, তবে অপর প্রান্তের জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। বুদ্ধ যদি ক্রমবিকশিত জীবাণু হন, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চয়ই ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তি সঙ্কুচিতভাবে থাকিবে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্য কোন ভাব সম্ভব নয়। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলসঞ্চারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশ্যের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তাহা অপেক্ষা অধিক, আবার অতঃপর একজন দেবতুল্য মানবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'।

৬৪

কৃষক যেরূপ তাহার ক্ষেত্রে জলসেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটি প্রণালী কাটিয়াছি, ঐ প্রণালীর মুখে একটি কপাট আছে; পাছে সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এই জন্য ঐ কপাট বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ কপাট খুলিয়া দিলেই জল নিজশক্তিবলেই উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলের শক্তি বাড়াইতে হইবে না, জলাশয়ের জলে পূর্ব হইতেই ঐ শক্তি রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই কপাট, দেহরূপ এই কপাট—আমাদের যথার্থ এবং পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে; এই জন্যই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি—যেমন আমাদের বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধে; যদিও এ বিষয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি

দৃষ্টান্তরূপে আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই-সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্যবিবাহ-প্রথা যে-সকল ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই-সকল ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি পুরুষ বা নারীকে অপর যে কোন নারী বা পুরুষকে পত্নী বা পতিরূপে গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ ও পাশবপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্টপ্রকৃতি অসুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই-সকল পশু-প্রকৃতি সন্তান উৎপন্ন করিতেছে, অপরদিকে তাহাদিগকে বশে রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এভাবে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিভাবে সমাজ হইতে এই-সকল দোষ, এই-সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি নিবারিত হইতে পারে, তাহাই সমস্যা। আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এ-বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিবার অধিকার সমাজের আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ-প্রথার পশ্চাতে এই-সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ 'জাতি' 'গণ' প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভূত সন্তান 'আর্য' নহে। যে-সন্তানের জন্মমৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আর্য। আজকাল সকল দেশেই এইরূপ আর্যসন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ-নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান্ আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে, আমরা এখন এই-সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারি না; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই-সকল মহান্ ভাবের কতকগুলিকে লইয়া একটা বিকৃত হাস্যকর ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। অতি দুঃখের বিষয়, আজকাল আর প্রাচীন কালের মত পিতামাতা নাই, সমাজও এখন পূর্বের মত শিক্ষিত নয়, আর পূর্বে যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্যকালে যে-রূপই গ্রহণ করুক না কেন, মূল তত্ত্বটি নির্দোষ, আর যদি ঐ তত্ত্ব ঠিকমত কাজে পরিণত না হইয়া থাকে, যদি প্রণালীবিশেষ বিফল হইয়া থাকে, তবে মূল তত্ত্বটি লইয়া যাহাতে উহা ভালভাবে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। মূল তত্ত্বটি নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর কেন?

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কাজে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই থাকিবে। তত্ত্বটি যাহাতে ভাল করিয়া কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কে আত্মা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়। শুধু দ্বৈতবাদীরা বলেন—পরে আমরা ইহা বিশেষভাবে দেখিব—অসৎকর্মের দ্বারা আত্মা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার সৎকর্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনও সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি বিদ্যমান, বাহির হইতে কোন কিছু যে আত্মাতে আসিবে তাহা নহে, কোন জিনিষ যে উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের বেদসমূ্হ inspired—বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে এরূপ নহে, expired—ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে, বেদসমূহ প্রত্যেক আত্মায় নিহিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে শুধু বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি বিদ্যমান, মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। হয় বল, শক্তি—সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, না হয় বল, মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব হইতেই উহা ভিতরে রহিয়াছে। তোমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; প্রত্যেকের ভিতরে অনন্ত শক্তি যে গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে-শক্তি রহিয়াছে, অতি নিম্নতম মানুষের মধ্যেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব।

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহা বিরোধ আরম্ভ। বৌদ্ধেরা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটি জড়-স্রোত মাত্র; সেইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এইরূপ একটি জড়প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেনঃ উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। উহার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটি দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্যসংলগ্ন গুণরাশির কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা শুধু গুণই স্বীকার করিয়া থাকি। যেখানে একটি কারণ স্বীকার করিলেই সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটি কারণ স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল, আর যে-সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সেইসব মতই খণ্ডন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে—তোমার একটি আত্মা, আমার একটি আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্ একটি একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। অবশ্য দ্বৈতবাদের মত এ পর্যন্ত ঠিক; ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছে, আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এখানে মুশকিল এইটুকু যে, এই আত্মা ও পরামাত্মা উভয়ই বস্তু, আর উহাদের উপর দেহ মন প্রভৃতি গুণরূপে লাগিয়া রহিয়াছে—স্বীকার করা হয়। এখন কথা এই—কেহই কখনও 'বস্তু' দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তাও করিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধেরা বলেন, এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বল না কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? মানসিক তরঙ্গগুলি কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে, উহারা মিলিয়া একটি বস্তু হয় নাই, সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটির পশ্চাতে আর একটি চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটি অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গপরম্পরামাত্র—একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়, যাইবার সময় আর একটির জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে; আর এই-সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই 'নির্বাণ' বলে।

তোমরা দেখিতেছ, দ্বৈতবাদ এই মতের নিকট নীরব; দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা অসম্ভব; দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারেন না। সর্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন—বৌদ্ধ বলেন, ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তবে আমি সেই ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহি। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ; ইহা যদি ঈশ্বরের কার্য হয়, বৌদ্ধ বলেন—তবে আমি এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিব। আর দ্বিতীয়তঃ এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তোমরা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। যাঁহারা জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের যুক্তিসমূহের দোষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিলেন না।

তোমরা বলিয়া থাক যে, সত্য—শুধু সত্যই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। 'সত্যমেব জয়তে নানৃত্যং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।'

৬৫

সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখনও জয়লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরিব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ—তোমার ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার; আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক; অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাক; দুর্বল মানুষ তো চিরকালই চীৎকার করিয়া থাকে; যে আমাকে পরাস্ত করিবে, সেই নাস্তিক!

যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে বরাবর যুক্তিবাদী হও। যদি না পার, তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও, অপরকে সেটুকু দাও না কেন? এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব তুমি কিভাবে প্রমাণ করিবে? অপর দিকে, প্রমাণ করা যাইতে পারে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং অনস্তিত্ব-বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে। তোমার ঈশ্বর, তাঁহার গুণ, অসংখ্য জীবাত্মা, আবার প্রত্যেক জীবাত্মাই ব্যক্তি—এই-সকল লইয়া তুমি কেমন করিয়া তাঁহার অস্বিত্ব প্রমাণ করিতে পার? তুমি ব্যক্তি কিসে? দেহরূপে তুমি ব্যক্তি নও, কারণ তোমরা আজ প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও ভালরূপে জান যে, এক সময় হয়তো যে পদার্থ সূর্যে ছিল, আজ তাহা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে, আর হয়তো এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে থাকিতে পারে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? মনের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? আজ তোমার এক রকম ভাব, আবার কাল আর এক ভাব! যখন শিশু ছিলে তখন যেরূপ চিন্তা করিতে, এখন আর সেরূপ চিন্তা কর না; যুবা-অবস্থায় মানুষ যেরূপ চিন্তা করিয়াছে, বৃদ্ধ হইয়া সেরূপ চিন্তা করে না। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই তোমার ব্যক্তিত্ব—এ-কথা বলিও না, জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা তোমার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য-অংশব্যাপী। আমি যখন তোমার সহিত কথা বলি, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে, কিন্তু আমি সে-সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়সমূহ নাই, কারণ আমি তো উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি না। তবে আর তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদগুলি কোথায় দাঁড়ায়? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিভাবে প্রমাণ করিতে পার?

আবার বৌদ্ধেরা উঠিয়া বলিলেনঃ ইহা যে শুধু অযৌক্তিক তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নীতিবিরূদ্ধও বটে, কারণ উহা মানুষকে কাপুরষ হইতে এবং বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়—কেহই কিন্ত তাহাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষই ইহা এরূপ করিয়াছে। তবে কেন বাহিরের একজন কাল্পনিক ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস কর, যাঁহাকে কেহ কখনও দেখে নাই বা অনুভব করে নাই, অথবা যাঁহার নিকট হইতে কেহ কখনও সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছ, আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিকেই বা কেন শিখাইতেছ যে, মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা কুকুরের মত হওয়া, এবং এক কাল্পনিক পুরুষের সম্মুখে নিজেকে দুর্বল, অপবিত্র ও জগতে অতি হেয় অপদার্থ মনে করিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা?

অপর দিকে বৌদ্ধগণ তোমাকে বলিবেনঃ তুমি নিজেকে এইরূপ বলিয়া শুধু যে মিথ্যাবাদী হইতেছ তাহা নহে, পরন্তু তোমার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছি। কারণ এইটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিও যে, মানুষ যেমন চিন্তা করে, তেমনই হইয়া যায়। নিজেদের সম্বন্ধে তোমরা যেমন বলিবে, ক্রমশঃ তোমাদের বিশ্বাসও তেমনি দাঁড়াইবে। ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম কথাই এইঃ তুমি যাহা ভাবিয়াছ, তাহাই হইয়াছ; আবার যাহা ভাবিবে, তাহাই হইবে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কখনও ভাবিও না যে, তুমি কিছুই নও; আর যতক্ষণ না তুমি এমন কাহারও সাহায্য পাইতেছ—যিনি এখানে থাকেন না, মেঘরাশির উপর বাস করেন—ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহাও ভাবিও না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল হইবে এই যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র, হে প্রভো, আমাদিগকে পবিত্র কর—এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহার ফলে সকল প্রকার পাপের দ্বারা সম্মোহিত হইবে।

বৌদ্ধেরা বলেনঃ প্রত্যেক সমাজে যে-সকল পাপ দেখিতে পাও, সেগুলির শতকরা নব্বই ভাগ আসিয়াছে এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতে, তাঁহার সম্মুখে কুকুরের মত হইয়া থাকার ধারণা হইতে; এই অপূর্ব মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুকুরের মত হইয়া থাকা—ইহা অতি ভয়ানক কথা! বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেনঃ যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠনামক স্থানে গিয়া অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটি এড়াইবার জন্যই নির্বাণ বা বিলুপ্তির চেষ্টা

করিতেছেন।

আমি তোমাদের নিকট ঠিক একজন বৌদ্ধের মত হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি, কারণ আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয়। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটিই তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগকে দুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা প্রমাণ করা যায় না। আজকাল কি বালকও এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারে—যেহেতু কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে কুম্ভকারও তো একজন ঈশ্বর!আর যদি কেহ তোমাকে বলে, মাথা ও হাত না থাকিলেও ঈশ্বর কাজ করেন, তবে তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে পার। তোমার জগৎ-সৃষ্টিকর্তা এই ব্যক্তিবিশেষ—যাঁহার নিকট তুমি সারাজীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ—তিনি কি কখনও তোমায় সাহায্য করিয়াছেন? যদি করিয়াই থাকেন, তবে তুমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে এই আর একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিবার জন্য আহ্বান করে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়া দিবে যে, এরূপ যাহা কিছু সাহায্য তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি নিজের চেষ্টাতেই পাইতে পার। পক্ষান্তরে, তোমার এরূপ বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও তুমি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিতে। অধিকন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেইখানেই অত্যাচার ও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে, আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবটি সমূলে বিনাশ করা হয়, বৌদ্ধগণ বলেন—ততদিন এই অত্যাচারের কখনও নিবৃত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন অলৌকিক পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে। পুরোহিতেরা কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা দাবী করিবে, যাহাতে মানুষ তাহাদের নিকট মাথা নোয়ায় তাহার চেষ্টা করিবে, আর বেচারা মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। তোমরা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, যাহারা তাহাদিগকে নির্মূল করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে, এবং তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ ব্রাহ্মণদের বরং কতকটা সহৃদয়তা ও উদারতা আছে; কিন্তু এই ভূঁইফোড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিখারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরোহিতও থাকিবে, আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চনীতির অভ্যুদয়ের আশা করা যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে।

লোকে কেন এই ঈশ্বর কল্পনা করিল? কারণ প্রাচীনকালে কয়েকজন বলবান্ ব্যক্তি সাধারণ লোককে বশীভূত করিয়া বলিয়াছিল, তোমাদিগকে আমাদের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাদের সমূলে বিনাশ করিব। এইরূপ লোকই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল—ইহার অন্য কোন কারণ নাইঃ 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'—একজন বজ্রহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করেন।

বৌদ্ধ বলিতেছেনঃ তোমরা যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্মফলে হইয়াছে; তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাত্মায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই-সকল জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। এ পর্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলেই কার্য থাকিবে; বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল; এই বর্তমান আবার ভবিষ্যতে অন্য ফল প্রসব করিবে। হিন্দু বলিতেছেনঃ কর্ম জড়, চৈতন্য নহে; সুতরাং কর্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন।

বৌদ্ধ তাহাতে বলেনঃ বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুঁতিয়া গাছে জল দেওয়া হয়, তাহার ফল পাইতে তো কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয় না। বলিতে পার, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবাত্মাগণই তো চৈতন্য, অন্য চৈতন্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদের চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন; কিন্তু জৈনেরা জীবাত্মায় বিশ্বাসী, অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।

তবে হে দ্বৈতবাদিন্, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোমার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? যখন তোমরা অদ্বৈতবাদের উপর দোষারোপ করিয়া বল যে, অদ্বৈতবাদ হইতে দুর্নীতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ; আদালতে দ্বৈতবাদীদের নীতিপরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখ। যদি অদ্বৈতবাদী কুড়ি হাজার দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও কুড়ি হাজার দেখিতে পাইবে। সাধারণভাবে দেখা যায়, দ্বৈতবাদী দুর্বৃত্তের সংখ্যাই অধিক; কারণ অদ্বৈতবাদ বুঝিতে উৎকৃষ্টতর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি যাও কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবার পথ নাই। তুমি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিতে পার, কিন্তু বৌদ্ধ তো বেদ মানে না। সে বলিবেঃ আমার 'ত্রিপিটক' এ-কথা বলে না। ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত—উহা বুদ্ধের লেখাও নহে; কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি শুধু সনাতন সত্যেরই আবৃত্তি করিতেছেন। বৌদ্ধ আরও বলেন, 'তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদের ত্রিপিটকই যথার্থ বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কল্পিত—সেগুলি দূর করিয়া দাও।' এ যুক্তি এড়াইবে কিরূপে?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। দ্রব্য ও গুণ পরস্পর পৃথক্—ইহাই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি, এবং ইহা একটি দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ না, উহারা পৃথক্ নয়; দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তোমরা 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'-এর সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত অবগত আছ। যখন তুমি সর্প দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে অন্তর্হিত। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ বলিয়া বিভক্ত করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাপার মাত্র, উহার কোন

যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক্ দুইটি পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি হও, শুধু গুণরাশিই দেখিবে; আর যদি তুমি একজন শক্তিশালী যোগী হও, কেবল দ্রব্যই দেখিবে; কিন্তু একই সময়ে কখনও দ্রব্য ও গুণ দুই-ই দেখিতে পাইবে না। অতএব হে বৌদ্ধ, তুমি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহার বাস্তবিকভিত্তিই নাই; দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটি মাত্র দ্রব্যের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পার যে, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে—উহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মায় আরোপিত, তাহা হইলে তো দুইটি আত্মারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা তুমি কিভাবে জানিতে পার?—কতকগুলি প্রভেদকারী চিহ্ন দ্বারা, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, সেখানে পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দুই আত্মা নাই, এক আত্মাই বিদ্যমান; পৃথক্ পরমাত্মা স্বীকার করাও অনাবশ্যক, তোমার এই আত্মাই সেই পরমাত্মা। সেই এক আত্মাকেই 'পরমাত্মা' বলে, তাঁহাকেই 'জীবাত্মা' এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর হে সাংখ্যবাদী ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া থাক, আত্মা সর্বব্যাপী বিভু, অথচ তোমরা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর? অনন্ত কি কখনও দুইটি হইতে পারে? অনন্ত সত্তা একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সব তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নন। দুর্বল মতবাদসমূহের ন্যায় কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নন। অদ্বৈতবাদী তখনই অন্যান্য মতাবলম্বীদের সমালোচনা করেন, যখন খুব কাছে আসিয়া তাহারা অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, এই পর্যন্তই তাঁহার অন্যান্য মতাবলম্বীদের বাদখণ্ডন। তারপর তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই শুধু পরমত খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকেন না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ—তিনি বলেনঃ তুমি বলিতেছ—জগৎ একটি অবিরাম গতিপ্রবাহমাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই টেবিলটি—ইহারও প্রতিনিয়ত গতি বা পরিবর্তন হইতেছে। গতি সর্বত্রই, তাই ইহার নাম 'সংসার'; 'সৃ' ধাতুর অর্থ গমন, তাই ইহার নাম 'জগৎ'—অবিরাম গতি। তাই যদি হইল, তাহা হইলে তো এই জগতে 'ব্যক্তিত্ব' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। 'পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব' হইতে পারে না, এই বাক্যটি স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। চিন্তা ভাব, মন শরীর, জীব জন্তু—সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটি সমষ্টিরূপে ধর। সমষ্টিরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াই গতির ধারণা সম্ভব। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। সুতরাং তখনই—কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব, যখন তুমি নিজেকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পার। এই কারণেই বেদান্তী—অদ্বৈতবাদী বলেনঃ যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই; মানুষ যখন অপর বলিয়া কিছু দেখে না, অপর বলিয়া কিছু অনুভব করে না, যখন একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই তাহার ভয় দূর হয়; তখনই মানুষ মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি নিজেকে সমগ্র জগৎ-রূপে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে। যখন নিজেকে সমগ্র জগৎ-রূপে জানিবে, তখনই তুমি ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবে, আর তখনই তোমার সহিত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্রসূর্যতারকাদি-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড-রূপে দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভাল কাজ করে এবং সেই সৎকর্মবলে অন্যপ্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদিদেবসমন্বিত স্বর্গাদিলোক-রূপে দর্শন করে। যাঁহারা আরও উন্নত, তাঁহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোক-রূপে দেখেন, এবং যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে তাহার ঠিক বিপরীত—এখানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত বর্ণনা। সংহিতায় অস্তিভাবদ্যোতক ভাষায় অনন্তকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে-ভাষায় কুলাইল না, নাস্তিভাবের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইল। এই ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না, না। তোমাদিগকে আবার এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবেঃ যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে উহাকে জানিতে পারি? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?'

৬৬

বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে, চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পায়?—পায় না, জানা-ক্রিয়াটিই একটি নিম্নতর অবস্থা।

হে আর্যসন্তানগণ, তোমাদিগকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, কারণ এই তত্ত্বটির ভিতর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তোমাদের নিকট যে-সকল পাশ্চাত্যদেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, সেগুলির একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি এই যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্য ভাব। আমাদের বেদ বলিতেছেনঃ বস্তুজ্ঞান বস্তু হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ জ্ঞান-অর্থে সর্বদাই একটা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তুকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বকথিত দৃষ্টান্তে শুক্তি হইতে যেভাবে মুক্তা হয়, সেই কথা স্মরণ কর, তাহা হইলে বুঝিবে জ্ঞান-অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটি বস্তুকে আহরণ করিয়া তোমার চেতনায় আনিলে তাহার সমগ্র ভাবটি জানিতে পারিবে না। সকল জ্ঞান-সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তাই যদি হয়, জ্ঞান-অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্তের জ্ঞান-সম্বন্ধে কি উহা কম প্রযোজ্য? যিনি সকল জ্ঞানের স্বরূপ, যাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি কোন জ্ঞান লাভ করিতে পার না, যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র

জগতের এবং আমাদের অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ, তুমি কি তাঁহাকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিতে পার? তাঁহাকে তুমি কিরূপে জানিবে? কি উপায়ে তাঁহাকে বাঁধিবে?

সব কিছু—এই জগৎপ্রপঞ্চ এইরূপ বাঁধিবার বৃথা চেষ্টা। এই অনন্ত আত্মা যেন নিজের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন, নিম্নতম প্রাণী হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সব যেন তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত করিবার দর্পণ; আরও কত আধার তিনি গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু কোনটিই পর্যাপ্ত নয়, অবশেষে মনুষ্য-দেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ-সবই সসীম—অনন্ত কখনও সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না।

তারপর শুরু হয় প্রত্যাবর্তন এবং ইহাই ত্যাগ বা বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হও, ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে যাইও না—ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র, কারণ তোমাদিগকে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে তপস্যাতেই জগতের সৃষ্টি—ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিবে, ততই তোমার সম্মুখে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ—বিভিন্ন দেহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে; এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে; অবশেষে তুমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।

এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবেঃ 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'—বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে কখনও জানিতে পারা যায় না, কারণ যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তোমার চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাকে তুমি কখনও চক্ষু বলিতে পার না; উহা অন্য কিছু, উহা প্রতিবিম্বমাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা—এই অনন্ত সর্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা তো আমাদের মত চলিতে ফিরিতে, জীবনধারণ করিতে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না; সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে-কথা বুঝিতে পারে না। 'ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ,—এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ'—এই কথাই লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই—যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দভোগ—বেশী করে কাহারা?—যাহারা কুস্তি করিতেছে তাহারা, না দর্শকেরা? এই জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ; আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে-ই স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান হইয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ সে-ই আনন্দ ভোগ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে।

অদ্বৈতবাদের নৈতিক দিক আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আর একটি বিষয় আসিয়া থাকে—উহা মায়াবাদ। অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত এক-একটি বিষয় বুঝিতেই বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে আবার আরও সময় লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটি কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, 'মায়াবাদ' প্রকৃতপক্ষে বাদ বা মত বিশেষ নহে, দেশকালনিমিত্তের নাম 'মায়া'—আরও সংক্ষেপে উহাকে 'নামরূপ' বলে। সমুদ্র হইতে সমুদ্রের তরঙ্গের প্রভেদ কেবল নামে ও রূপে, আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, নাম-রূপ তরঙ্গের সহিতই বর্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইতে পারে; তরঙ্গের অন্তর্গত নাম-রূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই তোমার আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে, আর এই মায়া নাম-রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি ঐগুলিকে পরিত্যাগ কর—নাম-রূপ দূর করিয়া দাও, তবেই এ-সব পার্থক্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃতপক্ষে যাহা আছ, তাহাই থাকিবে। ইহাই মায়া। কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলী বর্ণনামাত্র।

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব আছে। সেই বেচারারা অজ্ঞ, বালকবৎ; তাহারা যে বলে জগৎ সত্য—তাহা এই অর্থে বলে যে, এই টেবিলটি বা অন্যান্য বস্তুর নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহাদের অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি উহা বা অন্যান্য বস্তু যেমন আছে, ঠিক তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞানলাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই পরস্পরের উপর নির্ভর করে, সব-কিছুই আপেক্ষিক। আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটি সোপান আছেঃ প্রথম—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পৃথক্; দ্বিতীয় সোপান—সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান; আর শেষ সোপান—একটি মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি।

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা—তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বরধারণা খুব মানবভাবাপন্ন—মানুষ যাহা করে, তিনিও তাহাই করেন, তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী করেন। আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প কথায় কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা—একটি শক্তি রহিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃতপক্ষে সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইঁহার কথা লিখিত আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল কল্যাণকর গুণরাশির আধার নহেন। ঈশ্বর ও শয়তান—দুইটি 'দেবতা' থাকিতে পারে না, এক ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে—সাহস করিয়া ভালমন্দ দুই-ই বলিতে হইবে এবং ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

৬৭

যিনি সর্বভূতে শান্তি ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্বস্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে।

'হে গার্গী, এ জগতে যাহা কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই তাঁহার অংশমাত্র।' তুমি উহাকে যেমন ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পার। আমার সম্মুখবর্তী এই আলোকের সাহায্যে তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একশত টাকা দিতে পার, আর একজন লোক তোমার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান।

তৃতীয় সোপানঃ ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ—এইগুলি একপর্যায়ভুক্ত শব্দ। প্রকৃতপক্ষে দুইটি বস্তু নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে। তুমি কল্পনা করিতেছ, তুমি শরীর—আবার আত্মা, তুমি একই সঙ্গে এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছ। তাহা কিভাবে হইতে পারে? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাঁহার পক্ষে শরীর-বোধ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যদি তুমি সাধারণ লোক হও, তবে তুমি নিজেকে দেহ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত। কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অন্যান্য জিনিষ আছে—এই-সকল তত্ত্ববিষয়ক ধারণা থাকাতে তাহার মনে হয়, এগুলি একই সময়ে রহিয়াছে। এক-কালে একটি বস্তুরই ধারণা হয়। যখন তুমি জড়বস্তু দেখিতেছ, তখন ঈশ্বরের কথা বলিও না। তুমি কেবল কার্যই দেখিতেছ, কারণকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না। আর যে-মুহূর্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সে-মুহূর্তে কার্য অন্তর্হিত হইবে। এ জগৎ কোথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস করিল?

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
অজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যামাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥

৬৮

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় অনির্বচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমা-রহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির বিকারহীন অচিন্ত্যতত্ত্বস্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধ নাই—যিনি অপরিমেয়, যিনি বেদবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্বদা আমাদের—ব্রহ্মতত্ত্ব-অভ্যাসশীলগণের নিকট প্রসিদ্ধ—এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে কিছুই অভাব নাই, স্থিরজলরাশি-সদৃশ নামরহিত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণবিকার-রহিত, ক্ষয়হীন, শান্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।—মানবের এমন অবস্থাও আসিয়া থাকে, তখন তাহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—অবশ্য অজ্ঞেয়বাদীর অর্থে উহা 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' নহে; 'তাহাকে জানিয়াছি' বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ পূর্ব হইতেই তুমি সেই ব্রহ্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক ভাবে এই টেবিল নন, আবার অন্য ভাবে ব্রহ্ম টেবিল বটে। নাম-রূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই যে- সত্যবস্তু থাকিবে, তাহাই তিনি। তিনিই প্রকৃত বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

৬৯

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছ।

তুমি সকল বস্তুতে বিদ্যমান, আমিই তুমি, তুমিই আমি—ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। এ সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিব। এই অদ্বৈতবাদেই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য নিহিত। আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তি তর্ক ও বিজ্ঞানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি। এখানেই অবশেষ যুক্তি বিচার একটি দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখনও তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ববর্তী সোপানগুলির উপর দোষারোপ করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া পিছনের দিকে তাকান এবং ঐগুলিকে আশীর্বাদ করেন; তিনি জানেন সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুলক্রমে অনুভূত ও ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একই সত্য—কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য—সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দেশে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন,

যাঁহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্যামিরূপে দেখেন, যাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আত্মরূপে ও সমগ্র বিশ্বরূপে অনুভব করেন; এ-সকল একই বস্তু,—একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট, মায়ার ভিন্ন ভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট; আর বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট বলিয়াই এই-সব বিভিন্নতা। শুধু তাই নয়, উহাদের মধ্যে একটি আর একটিতে যাইবার সোপান। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? অন্ধকারে রাস্তায় গিয়া যদি কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিতে দেখ, একজন পথচারীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর; দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জন বলিবে, ভূতে এ ব্যাপার করিতেছি; সে সর্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ অজ্ঞানের স্বভাব কার্যের বাহিরে কারণ অনুসন্ধান করা। একটা ঢিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—মাধ্যাকর্ষণ।

সর্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্মে কী বিরোধ? প্রচলিত ধর্মগুলি বহির্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর জড়িত যে, সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এইরূপ অনন্ত দেবতার কল্পনা করে, আর ভাবে—যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই একটা না একটা দেবতা বা ভূতে করিতেছে। ইহার মোট কথাটা এই যে, ধর্ম—কোন কিছুর কারণ সেই বস্তুর বাহিরে অন্বেষণ করে, আর বিজ্ঞান তাহার কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান ধীরে ধীরে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের হাত হইতে নিজের হাতে লইতেছে। যেহেতু ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করিয়াছে, সেই হেতু অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের বহির্দেশে অবস্থিত কোন দৈত্য ইহা সৃষ্টি করে নাই, ইহা আপনা-আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা-আপনি ইহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা-আপনি ইহার প্রলয় হইতেছে, ইহা এক অনন্ত সত্তা—ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'

৭০

হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই। এইরূপে তোমরা দেখিতেছ, অন্য কোন মতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম; আর বর্তমান অর্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুক্নি চলিতেছে, প্রত্যহ যেরূপ যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমরা দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইবে, আর বুদ্ধের কথায় বলিতেছি, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদিগকে কাপুরুষ মনে করিব।

যদি তোমার এইরূপ দুর্বলতা থাকে, যদি তুমি প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পার, তবে অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দাও, বেচারা মূর্তিপূজককে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও না. তাহাকে একটা পিশাচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিও না; যাহার সহিত তোমার মত সম্পূর্ণ না মিলে, তাহার নিকট তোমার মত প্রচার করিতে যাইও না। প্রথমে এইটি বুঝ যে, তুমি নিজে দুর্বল; আর যদি সমাজের ভয় পাও, যদি তোমার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুন ভয় পাও, তবে বুঝিয়া দেখ—যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই কুসংস্কারে আরও কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরও কতদূর বদ্ধ করিবে। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। অন্যের উপর সদয় হও। ঈশ্বরেচ্ছায় কালই যদি সমগ্র জগৎ—শুধু মতে নয়, অনুভূতিতেও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে তো খুব ভালই হয়; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাই কর, সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যাও; আর জানিও, ভারতে সকল প্রকার ধর্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরও ভাল হইতেছে।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের যুবকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে যে, তাহারা কাহারও কাছে শুনিয়াছে—ঈশ্বর জানেন কাহার কাছে—অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়—আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর; অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই। এ-কথার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, এ-যুক্তি পশুপ্রকৃতি ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, কশাঘাত ব্যতীত যাহাকে দমন করিবার অন্য উপায় নাই। যদি তুমি পশুপ্রকৃতি হও, তবে শুধু কশাঘাতে শাসনযোগ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা তোমার পক্ষে বরং আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কশাঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা সকলে অসুর হইয়া দাঁড়াইবে। যদি এরূপ হয়, তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত—তোমাদের ভাল করিবার আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে তোমাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতবাদ—কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব?—কারণ কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। দেবতার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে বলুক না, আমি উহা মানিতে যাইব কেন? আর ধর, কতকগুলি লোক ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল—তাহাতেই বা কি? জগতের অধিকাংশ লোকের নীতি—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'; তাই বলিতেছি—আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অদ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

৭১

অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই জন্য তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকেই হিংসা করিতেছ—কারণ তাহারা সকলেই

যে তুমি! তুমি জান আর নাই জান, সকল হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল পা দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখভোগ করিতেছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে নিজেকে হিংসা করা হয়, সেইজন্য কখনও অপরকে হিংসা করা উচিত নহে। সেজন্যই আমি যদি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাতেও আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ আমি যখন শুকাইয়া মরিতেছি, তখন আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র 'আমি-আমার' সম্পর্কীয় বিষয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগৎই আমার, আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আমাকে ও জগৎকে—কে বিনাশ করিতে পারে? কাজেই দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্যন্ত দেখা গেল—একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ-সাধনে লাভ কি? উহাতে শক্তি তেজ ও বীর্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো'

৭২

প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে। মানুষকে দুর্বল ভাবিও না, তাহাকে দুর্বল বলিও না। জানিও, সকল পাপ ও সকল অশুভ— এক 'দুর্বলতা' শব্দ দ্বারাই নির্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্যের মূল—দুর্বলতা। যাহা করা উচিত নয়, দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহাই করিয়া থাকে; দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ যে কি, এ তত্ত্ব সকলেই জানুক। দিবারাত্র তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। 'আমিই সেই'—এই ওজস্বী ভাবধারা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা পান করুক; তারপর তাহারা উহা চিন্তা করুক; ঐ চিন্তা—ঐ মনন হইতে এমন সব কাজ হইবে, যাহা পৃথিবী কখনও দেখে নাই।

কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্যকর নয়, অর্থাৎ জড়-জগতে এখনও উহার শক্তি প্রকাশিত হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ করঃ

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

৭৩

ওঁ, ইহা মহারহস্য। ওঁ—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওঙ্কার, তাহা জান। এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও; তখনই—কেবল তখনই তোমরা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে। যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, তবে বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস কর। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, যে-সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরেজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরানী ছিলেন; পয়সা-কড়ির অভাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং যখন তিনি অকৃতকার্য হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল—তিনি কোন বড় কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; সেই ব্যক্তিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া বলিতেন, 'হে প্রভু, আমি দুর্বল, আমি হীন', তবে তাঁহার কি গতি হইত? নিশ্চয় উন্মাদাগারেই তাঁহার স্থান হইত। লোকে এই-সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র পৃথিবীতে দেখিয়াছি, দীনতা ও দুর্বলতার উপদেশ দ্বারা অতি অশুভ ফল ফলিয়াছে, ইহা মনুষ্যজাতিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়—এবং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা শেষে আধপাগল-গোছের হইয়া দাঁড়ায়?

অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায়—নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য বা গোপনীয় বিদ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটিরে, সর্বত্র—এমন কি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পরে।

গীতায় কি উক্ত হয় নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ?'—এই ধর্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি স্ত্রী হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ কল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—ওঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিত থাকিও না। এখন অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের পূর্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, আর সে-দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চ স্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর সকলের জীবনে প্রবেশ করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া প্রতি শোণিতবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হউক।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা মার্কিনেরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউ ইউর্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় বাস করিবার জন্য আসিতেছে। দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে—পদদলিত, আশাহীন। কেবল একটি কাপড়ের পুঁটলি তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, তাহারা ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাতের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখন দেখ, ছয়মাস বাদে সেই লোকগুলিই ভাল জামাকাপড় পরিয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীক-দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন অদ্ভুত পরিবর্তন কিভাবে আসিল? মনে কর, সে-ব্যক্তি আর্মেনিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—'তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস তো তোকে পিষে ফেলব।' চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই, গোলাম আছিস—যা আছিস, তাই থাক্। জন্মেছিলি যখন, তখন যে-নৈরাশ্যের অন্ধকারে জন্মেছিলি, সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্।' সেখানকার হাওয়া যেন তাহাকে গুনগুন করিয়া বলিত, 'তোর কোন আশা নাই—গোলাম হয়ে চিরজীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে পড়ে থাক।' সেখানে বলবান্ ব্যক্তি তাহাকে পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল—একজন ভাল পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাহার করমর্দন করিল। সে যে ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, আর ভদ্রলোকটি যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিতে বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল—এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল—এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয়তো সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সহিত করমর্দন করিয়া আসিল, সেখানে হয়তো সে দেখিল—দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে মলিনবস্ত্র-পরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেন্টের করমর্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল! এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—মনুষ্যপূর্ণ জগতে সেও একজন মানুষ।

আমাদের এই দেশে—বেদান্তের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে বহু শতাব্দী যাবৎ এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি! তাহাদিগকে বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।' ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ লোক ক্রমশঃ ডুবিতেছে, গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে, মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, অবশেষে ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ এমন দেশ আর কোথায় আছে, যেখানে মানুষকে গো-মহিষাদির সঙ্গে একত্র বাস করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইও না—অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, তোমরা সেই ভ্রমে পড়িও না। ফলও হাতে হাতে দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্তমান। বাস্তবিক দোষ আমাদেরই। সাহস করিয়া দাঁড়াও, নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লও। অন্যের স্কন্ধে দোষারোপ করিতে যাইও না, তোমরা যে-সকল কষ্ট ভোগ করিতেছ, সেগুলির জন্য তোমরাই দায়ী।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, তোমরা এইটি বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ—বংশপরম্পরাগত এই জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে না পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার—এ-সবে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আবির্ভূত হয়. যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় জাগ্রত হয়, যে-হৃদয় সকলের জন্য অনুভব করে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা দেখা দেয়, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্মজীবনে করা হয়, ততদিন আমাদের আশা নাই। তোমরা ইওরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছ, কিন্তু তাহাদের হৃদয়বত্তার অনুকরণ করিয়াছ কি? আমি তোমাদিগকে একটি গল্প বলিব—আমি স্বচক্ষে যে ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বলিব—তাহা হইলেই তোমরা আমার ভাব বুঝিতে পারিবে। একদল ইউরেশীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া, তাহাদের একটি প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জন করিল। টাকাকড়ি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইওরোপের এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। এই গরীব বেচারারা কোন ইওরোপীয় ভাষার একটি শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অস্ট্রিয়ার ইংরেজ কন্সাল তাহাদিগকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লণ্ডনেও কাহাকেও জানিত না, সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া এই বর্মী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া নিজের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, প্রয়োজনীয় সব দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে খবরটি পাঠাইয়া দিলেন। দেখ, তাহার ফল কী হইল! পরদিনই যেন সমগ্র জাতিটি জাগিয়া উঠিল, চারিদিক হইতে তাহাদের সাহায্যার্থে টাকা আসিতে লাগিল, শেষে তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইওরোপীয়দের রাজনীতিক ও অন্যপ্রকার সভাসমিতি যাহা কিছু আছে, সেগুলি এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অন্ততঃ তাহাদের স্বজাতিপ্রীতির দৃঢ়ভিত্তি। তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে ভালবাসে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর অনুরাগ এবং তাহাদের দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও তাহাদের খুব দয়া। পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র তাহারা কিভাবে অতিথি বলিয়া আমার যত্ন লইয়াছিল, এ-কথা যদি আমি তোমাদের নিকট বার বার না বলি, তাহা হইলে আমি অকৃতজ্ঞতাদোষে দোষী হইব। এখানে সেই হৃদয় কোথায়, যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই জাতির উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজন মিলিয়া একটি ছোটখাটো যৌথ-কারবার খুলিলাম, কিছুদিন চলিতে না চলিতে আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল। তোমরা ইংরেজদের অনুকরণ করিবে বল, আর তাহাদের মত শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাও, কিন্তু তোমাদের ভিত্তি কোথায়? আমাদের বালির ভিত্তি, তাহার উপর নির্মিত গৃহ অতি শীঘ্রই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই বিশাল অদ্বৈতভাবের পতাকা উড্ডীন কর—কারণ আর কোন ভিত্তির উপর সেই অপূর্ব প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবানকে একভাবে সর্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না; সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। ওঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না; ওঠ, আর একবার ওঠ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের 'অহং' বিসর্জন দিতে হইবে। খ্রীষ্টানদের ভাষায় বলিঃ ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা কখনও এক সঙ্গে করিতে পার না। বৈরাগ্যবান্ হও—তোমাদের পূর্বপুরুষগণ বড় বড় কাজ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও; যাও, অন্যের সাহায্য কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেছ, কিন্তু তোমাদের সম্মুখে এই কর্মপরিণতি বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি—আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনাহারে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

এই জাতি ডুবিতেছে! লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া গেলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়াছি, সম্মুখে অপর্যাপ্ত আহার্য থাকা সত্ত্বেও যাহাদিগকে আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি—যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই। 'মনে মনে রাখিলেই হইল, ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা যায় না!'—তোমাদের চরিত্রের এই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলো। ওঠ, জাগো, এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি? সকলেই মরিবে—সাধু-অসাধু, ধনী-দরিদ্র—সকলেই মরিবে। শরীর কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব ওঠ, জাগো এবং সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা ভাবকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তে হউক, তিনিই ধীর, যিনি ন্যায়পথ হইতে এক পাও বিচলিত হন না।'

৭৪

ওঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ব্যয়িত হইতেছে। ওঠ, জাগো—সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহাদের উদ্ধার কর।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দুজাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও, পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব ওঠ, জাগো—পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত কর। ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদ একটু কাজে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক জগতে ততটা প্রয়োজন নয়; প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি! মত-মতান্তরে তো আর পেট ভরে না! আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ ঘৃণা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মতবাদের কথা বলিতে পার, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশ অনুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা, ধনী-দরিদ্র, সাধু-অসাধু সকলেই সেই অনন্ত অখণ্ডরূপ—যাঁহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতেছ, ততদিন কিছুই হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অদ্বৈতবাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন ঐগুলি কাজে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—শুধু এ-দেশে নয়, সর্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহমুদ্গরাঘাতে দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মগুলির কাচনির্মিত ভিত্তি সর্বত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা টানিয়া শাস্ত্রীয় শ্লোকের অর্থ করিবার

চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে—এতদূর টানা হইতেছে যে, আর টানা চলে না, শ্লোকগুলি তো আর রবার নহে!—শুধু এদেশেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে, ইওরোপ-আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশী। আর সেখানেও ভারত হইতে এই তত্ত্বের অন্ততঃ কিছু অংশ প্রবেশ করা চাই। ইতঃপূর্বেই কিছু গিয়াছে—উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য উহা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্যদেশে সেখানকার প্রাচীন ভাবাদর্শ লোপ পাইতেছে, এক নূতন ব্যবস্থা—কাঞ্চনের পূজা চালু হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা ও কাঞ্চনপূজা অপেক্ষা সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্মপ্রণালী ছিল ভাল। কোন জাতি যতই প্রবল হউক, এরূপ ভিত্তির উপর কখনই দাঁড়াইতে পারে না। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, তাহাদের বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, সেদিকে প্রথমেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবল আঘাতেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাই নয়, অপরকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে, তোমাদের ভাবরাশি ইওরোপ-আমেরিকাকেও উদ্ধার করিবে। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কাজ রহিয়াছে, আর সেই কাজের প্রথমাংশ—দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর দারিদ্র ও অজ্ঞানতিমিরে মজ্জমান ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উন্নতিসাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহু প্রসারিত কর এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ করঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহজীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

রাজপুতানায়

স্বামীজী লাহোর হইতে দেরাদুন, সাহারানপুর, দিল্লী, রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়াড় ও জয়পুর হইয়া খেতড়ি গমন করেন। সর্বত্রই তিনি শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগী বন্ধুদের সহিত আলাপ আলোচনা ও ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন এবং ছোট ছোট বক্তৃতা দেন।
খেতড়ি জয়পুরের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। খেতড়ির রাজা অগ্রবর্তী হইয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করেন এবং ছয়ঘোড়ার গাড়িতে স্বামীজীকে তুলিয়া খেতড়িতে উপনীত হন। ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীঃ স্থানীয় স্কুলগৃহে এক সভায় স্বামীজীকে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। সভাপতিত্ব করেন খেতড়ির রাজা। উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ

ভারতের উন্নতিকল্পে আমি সামান্য যাহা করিয়াছি, রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহা আমি করিতে পারিতাম না। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শ ভোগ, এবং প্রাচ্যদেশের আদর্শ ত্যাগ। খেতড়িনিবাসী যুবকগণ, পাশ্চাত্য-আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য- আদর্শের অনুসরণ কর। শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে-দেবত্ব রহিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা। অতএব শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ-বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।

খেতড়িতে বক্তৃতা—বেদান্ত

২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীঃ খেতড়িতে ডাকবাংলোয় স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে এই বক্তৃতা দেন; সভাপতি হন খেতড়ির রাজা।

গ্রীক ও আর্য-প্রাচীন দুই জাতি বিভিন্ন অবস্থাচক্রে স্থাপিত হইয়াছিল; প্রথমোক্ত জাতি প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু লোভনীয়, তাহার পরিবেশে ও বীর্যপ্রদ আবহাওয়ায় এবং শেষোক্ত জাতি চতুষ্পার্শে সর্ববিধ মহিমময় ভাবের পরিবেষ্টনে ও অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অননুকূল আবহাওয়ায় দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সূচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ গ্রীকগণ বহিঃপ্রকৃতির ও আর্যগণ অন্তঃপ্রকৃতির আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রীক-মন বাহিরের অসীম লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, আর্য-মন ভিতরের অনন্ত অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সভ্যতায় উভয়কেই নির্দিষ্ট বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে যে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে—তাহা নহে, কেবল পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে হইবে—পরস্পরের তুলনা করিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়েই লাভবান্ হইবে। আর্যগণের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রিয়। গণিত ও ব্যাকরণ-বিদ্যায় তাঁহারা অদ্ভুত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং মনোবিশ্লেষণ-বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং ইজিপ্টের নিওপ্লেটোনিকদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু প্রভাব দেখিতে পাই।

বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা স্পেন, জার্মানি ও অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় রাজপুত্র দারাশেকো পারসীতে উপনিষদ্ অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাওয়ার নামক জার্মান দার্শনিক উপনিষদের একখানি লাটিন অনুবাদ দেখিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরই কাণ্টের দর্শনে উপনিষদের শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইওরোপে সাধারণতঃ তুলনামূলক ভাষাবিদ্যাচর্চার

৭৫

জন্যই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত আলোচনা করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ডয়সনের মত ব্যক্তিও আছেন, দর্শনচর্চার জন্যই যাঁহাদের দর্শনচর্চায় আগ্রহ আছে, অন্য কারণে নহে। আশা করি, ভবিষ্যতে ইওরোপে সংস্কৃতচর্চায় আরও অধিক যত্ন দেখা যাইবে।

পূর্বকালে 'হিন্দু' শব্দে সিন্ধুনদের অপর তীরের (পূর্বতীরের) অধিবাসিগণকে বুঝাইত—তখন ঐ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শব্দের দ্বারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ সিন্ধুনদের তীরে এখন নানাধর্মাবলম্বী নানা-জাতীয় লোক বাস করে।

বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্য নহে। বেদনিবন্ধ ভাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তার পর সেই গ্রন্থ প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক ধর্মই এইরূপ গ্রন্থে নিবন্ধ, গ্রন্থসমূহের প্রভাবও অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশিরূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহস্র সহস্র বৎসর ঐ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবে বেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করিতে হইবে, পর্বতদৃঢ় ভিত্তির উপর এই বেদবিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বেদরাশি বিপুল সাহিত্য। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটি বেদাংশের চর্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারে ধরে না। এই বেদরাশি অতি প্রাচীনতম, সরল—অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিণত যে, অনেকে মনে করেন—বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই।

বেদের দুইভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের কথা আছে। সংহিতা অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত স্তোত্রাবলী—সাধারণতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্র বা অন্য কোন দেবতার স্তুতি আছে। তারপর প্রশ্ন উঠিল—এই দেবতাগণ কাহারা? এই সম্বন্ধে যেমন এক এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য মতবাদ দ্বারা আবার এই-সকল মত খণ্ডিত হইতে লাগিল; এইরূপ অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

প্রাচীন ব্যাবিলনে আত্মা-সমন্ধে এই ধারণা ছিল যে, মানুষ মরিলে মৃতদেহ হইতে আর একটি দেহ বাহির হয়, উহার স্বাতন্ত্র্য নাই, মূল দেহের সহিত উহা সম্বন্ধ কখনই ছিন্ন করিতে পারে না। মূল শরীরের ন্যায় এই 'দ্বিতীয়' শরীরেরও ক্ষুধাতৃষ্ণ প্রভৃতি বৃত্তিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মূল দেহটিতে কোনরূপ আঘাত করিলে 'দ্বিতীয়'টিও আহত হইবে।

মূল দেহটি নষ্ট হইলে ‘দ্বিতীয়’টিও নষ্ট হইবে। এই কারণে মৃতদেহ রক্ষা করিবার প্রথার সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই মমি, সমাধিমন্দির প্রভৃতির উৎপত্তি। ইজিপ্ট ও ব্যাবিলনবাসীরা এবং য়াহুদীগণ আর বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আত্মতত্ত্বে পৌঁছিতে পারেন নাই।

এদিকে ম্যাক্সমূলার বলেন, ঋগ্বেদে পিতৃ-উপাসনার সামান্য চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। মমিগণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে—সেখানে এই বীভৎস ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায় না। দেবগণ মানবের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। বেদের কথা বলিতে বলিতে আমি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। বৈদিক ঋষিগণ হয়তো সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন হৃদয়বান্ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, আমরা তো তাঁহাদের তুলনায় পশু।

অনেক বৈদিক মন্ত্রে আছে—‘যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও—যেখানে কোন দুঃখ শোক নাই’ ইত্যাদি। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যত শীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, স্থূলদেহ ছাড়া একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে; স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কোন দুঃখ নাই—কেবল আনন্দ। সেমিটিক ধর্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর; ঐ ধর্মের ধারণা এই যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদের ভাব এই যে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাহার যথার্থ জীবন আরম্ভ হইবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিলঃ এই দেবগণ কাহারা? ইন্দ্র সময়ে সময়ে মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কখনও কখনও ইন্দ্র অতিরিক্ত সোমপানে মত্ত বলিয়াও বর্ণিত; স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি ‘সর্বশক্তিমান্’ ‘সর্বব্যাপী’ প্রভৃতি বিশেষণও প্রয়োগ করা হইয়াছে। বরুণদেব সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেবচরিত্র-বর্ণনাত্মক মন্ত্রগুলি স্থানে স্থানে অতি অপূর্ব। তারপর আর এক কথা। বেদের ভাষা অতি মহদ্ভাব-দ্যোতক। বিখ্যাত ‘নাসদীয় সূক্তে’ প্রলয়ের চমৎকার বর্ণনা আছে। যাঁহারা এই-সকল মহান্ ভাব এইরূপ কবিত্বের ভষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অসভ্য হন, তবে আমরা কি?সেই ঋষিদের অথবা তাঁহাদের দেবতা ইন্দ্রবরুণাদির সম্বন্ধে আমি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ যেন ক্রমাগত পট-পরিবর্তন হইতেছে, এবং পশ্চাতে সেই এক বস্তু রহিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।’ এই দেবগণের বর্ণনা অতি রহস্যময়, অপূর্ব, অতি সুন্দর। উহার দিকে যেন ঘেঁষিবার জো নাই, উহা এত সূক্ষ্ম যে, স্পর্শ-মাত্রেই যেন উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইবে।

একটি বিষয় আমার নিকট খুব স্পষ্ট ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীকদের ন্যায় আর্যগণও জগৎ-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—সুন্দর রমণীয় বাহ্যজগৎ তাঁহাদিগকেও প্রলুব্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব যে, এখানে কোন বস্তু মহাভাবদ্যোতক না হইলে তাহার কোন মূল্যই নাই। মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিবার ইচ্ছা সাধারণতঃ গ্রীকদের মনে উদিত হয় নাই। এখানে কিন্তু এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছেঃ আমি কি? মৃত্যুর পর আমার কি অবস্থা হইবে? গ্রীকদের মতে মানুষ মরিয়া স্বর্গে যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কি?—সব-কিছুর বাহিরে যাওয়া, ভিতরে নয়—কেবল বাহিরে; গ্রীক মনের লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাই নয়, সে নিজেও যে নিজের বাহিরে। আর যখন সে এমন এক স্থানে গমন করিতে পারিবে, যাহা অনেকটা এই জগতেরই মত, অথচ যেখানে এখানকার দুঃখগুলি নাই, তখনই সে ভাবিল, যাহা কিছু তাহার প্রার্থনীয়, সে সব পাইল, পার্থিবদুঃখবর্জিত সুখ লাভ করিল, অমনি সে তৃপ্ত হইল—তাহার ধর্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। হিন্দুমনের বিচারে স্বর্গও স্থূল জগতের অন্তর্গত।

হিন্দুরা বলেনঃ যাহা কিছু সংযোগোৎপন্ন, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিলেন, ‘তুমি জান আত্মা কি?’ উত্তর আসিল—‘না।’ ‘ঈশ্বর আছেন কি?’ প্রকৃতি উত্তর দিল—‘জানি না।’ তাঁহারা তখন প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, বুঝিলেন বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান্ হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটি বাণী উত্থিত হইল—অন্যবিধ মহান্ ভাবের ধারণা উদিত হইতে লাগিল। সেই বাণীঃ ‘নেতি, নেতি’—ইহা নহে, ইহা নহে; তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য তারা, শুধু তাই কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া গেল—তখন ধর্মের এই নূতন আদর্শের উপর উহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ‘ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্’ ইত্যাদি—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে—এই বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইলেই সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশেই এই সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সেই সীমাবদ্ধ, অপরিণত, ব্যক্তিবিশেষ, সকলের পাপ-পুণ্যের বিচারকারী ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ধারণা রহিল না, আর বাহিরে অন্বেষণ রহিল না, নিজের ভিতরে অন্বেষণ আরম্ভ হইল।—‘ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।’ এইরূপে উপনিষদ্‌সমূহ ভারতের ‘বাইবেল’ হইয়া দাঁড়াইল। এই উপনিষদ্‌ও অসংখ্য, আর ভারতে যত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই-সকল মতের প্রত্যেকটি যেন এক-একটি সোপানস্বরূপঃ একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পরবর্তী সোপানে আরোহণ করিতে হয়, সর্বশেষে অদ্বৈতবাদে স্বাভাবিক পরিণতি, এবং ইহার শেষ কথা ‘তত্ত্বমসি’। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব—সকলেই যদিও উপনিষদ্‌কেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষদ্ শুধু একটি মত শিক্ষা দিতেছেন। শঙ্কর এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে উপনিষদ্ কেবল অদ্বৈতপর, উহাতে অন্য কোন উপদেশ নাই; সুতরাং যেখানে স্পষ্ট দ্বৈতভাবাত্মক শ্লোক পাইয়াছেন, সেখানে নিজ মতের পোষকতার জন্য তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ এবং মধ্বও খাঁটি অদ্বৈতভাব-প্রতিপাদক অংশ দ্বৈতভাবে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, উপনিষদ্ এক তত্ত্বই শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব সোপানারোহণ-ন্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান ভারতে ধর্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান পড়িয়া আছে। এখানকার লোক এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে; তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাঁড়ি তাহাদের দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-ভাব দূর হওয়া চাই-ই চাই, আর যত শীঘ্র উহা চলিয়া যায়, ততই মঙ্গল। উপনিষদ্‌সমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হউক, আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যেন না থাকে।

জ্ঞান-অর্থে বহুত্বের মধ্যে একত্বের আবিষ্কার। যখনই কোন বিজ্ঞান সমুদয় বিভিন্নতার অন্তরালে অবস্থিত একত্ব আবিষ্কার করে, তখনই তাহা উচ্চতম সীমায় আরোহণ করে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ন্যায় জড়বিজ্ঞানেও ইহা সত্য।

তারপর স্বামীজী উপনিষদে বর্ণিত দুইটি পক্ষীর উদাহরণ দিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন।

৭৬

খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গীকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও সঙ্গে গেলেন। রাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামীজীর এক বক্তৃতা হইল। প্রায় ৫০০ শ্রোতা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বামীজী যোধপুর, আজমীর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ না থাকায় এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্ধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী বলিলেনঃ

ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব

১৮৯৮ খ্রীঃ ১১ মার্চ স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (মিস এম.ই.নোব্‌ল্) কলিকাতার স্টার থিয়েটারে ‘ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব’ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। স্বামীজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই উঠিয়া ‘সিস্টার’কে সর্বসাধারণের নিকট পরিচয় করিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেনঃ

সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি যখন এশিয়ার পূর্বভাগে ভ্রমণ করিতেছিলাম, একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, ঐ-সকল স্থানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ও জাপানী মন্দিরসমূহের প্রাচীরে কতকগুলি সুপরিচিত সংস্কৃত মন্ত্র লিখিত দেখিয়া আমি যে কিরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই জানিয়া সুখী হইবেন যে, ঐগুলি সবই প্রাচীন বাঙলা অক্ষরে লিখিত। আমাদের বঙ্গীয় পূর্বপুরুষগণের ধর্মপ্রচারকার্যে মহোৎসাহের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ ঐগুলি আজ পর্যন্ত বিরাজমান।

এশিয়ার অন্তর্গত এই-সকল দেশ ছাড়িয়া দিলেও ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ও স্পষ্ট যে, এমন কি পাশ্চাত্যদেশেও ঐ-সকল স্থানের আচার-ব্যবহারাদির গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া আমি সেখানেও উহার প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ভাবসকল ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে—উভয়ত্রই গমন করিয়াছিল। ইহা এখন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জগৎ ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট কতদূর ঋণী এবং ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি মানবজাতির অতীত ও বর্তমান জীবনগঠনে কিরূপ শক্তিশালী উপাদান, তাহা এখন সকলেই অবগত আছেন। এ-সব তো অতীতের ঘটনা।

আমি আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই। তাহা এই যে, সেই আশ্চর্য অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি সামাজিক উন্নতি এবং সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশরূপ অত্যদ্ভুত শক্তির বিকাশ করিয়াছে। শুধু তাই কেন, আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি, অ্যাংলো-স্যাক্সনের শক্তির প্রভাব ব্যতীত—আজ আমরা যেমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব আলোচনা করিবার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, সেরূপ হইতে পারিতাম না। আর পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যে—আমাদের স্বদেশে ফিরিয়া দেখিতে পাই, সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন শক্তি সমুদয় দোষসত্ত্বেও তাহার বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট গুণগুলি লইয়া এখানে কাজ করিতেছে। আমার বিশ্বাস, এতদিনে অবশেষে এই উভয় জাতির সম্মিলনের সুমহৎ ফল সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ জাতির বিস্তার ও উন্নতির ভাব আমাদিগকে বলপূর্বক উন্নতির পথে ধাবিত করিতেছে এবং ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীকদিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত; এবং গ্রীক সভ্যতার প্রধান ভাব—প্রকাশ বা বিস্তার। ভারতে আমরা মননশীল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ে সময়ে আমরা এত অধিক মননশীল হই যে, ভাব-প্রকাশের শক্তি আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। ক্রমে এইরূপ হইল যে, পৃথিবীর নিকট আমাদের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি আর প্রকাশিত হইল না, এবং তাহার ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, আমাদের যাহা কিছু ছিল, সবই গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ব্যক্তিবিশেষের ভাবগোপনেচ্ছায় উহা আরম্ভ হইল এবং শেষে ভাব গোপন করাটা জাতীয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমাদের ভাবপ্রকাশের শক্তির এত অভাব হইয়াছে যে, আমরা মৃত জাতি বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকি। ভাবপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা কোথায়? পাশ্চাত্য সভ্যতার মেরুদণ্ড—বিস্তার ও অভিব্যক্তি। ভারতে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির কাজগুলির মধ্যে এই যে-কাজের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম, তাহা আমাদের জাতিকে জাগাইয়া আবার নিজের ভাবপ্রকাশে প্রবর্তিত করিবে, এবং এখনই উহা সেই শক্তিশালী জাতি কর্তৃক আয়োজিত ভাব-বিনিময়ের উপযোগী উপায়গুলির সাহায্য পৃথিবীর নিকট নিজ গুপ্ত রত্নসমূহ বাহির করিয়া দিবার জন্য ভারতকে উৎসাহিত করিতেছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ভারতের ভাবী উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভাবসমূহ এখন যেরূপ ধীরে ধীরে বহু স্থানে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে সত্য ও মুক্তির মঙ্গল-বার্তা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহাদের কত সুযোগ-সুবিধা ছিল। মহান্ বুদ্ধ কিভাবে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-রূপ অতি উচ্চ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন? তখনও এই ভারতে— যে-ভারতকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি—প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল এবং আমরা সহজেই পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের ভাব প্রচার করিতে পারিতাম। এখন আমরা অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যেও আমাদের ভাব-প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এই প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে এবং আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের দেশ হইতে প্রেরিত বার্তা তাহারা শুনিতেছে, আর শুধু যে শুনিতেছে তাহা নহে, উহার উত্তরও দিতেছে। ইতোমধ্যেই ইংলণ্ড তাহার কয়েকজন মহামনীষীকে আমাদের কাজে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছে। সকলেই আমার বন্ধু মিস মূলারের কথা শুনিয়াছেন এবং বোধ হয় অনেকে তাঁহার সহিত পরিচিতও আছেন—তিনি এখন এখানে এই বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত আছেন। এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলা ভারতের প্রতি

অগাধপ্রীতিবশতঃ তাঁহার জীবন ভারতের কল্যাণে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ভারতকে তাঁহার স্বদেশ ও ভারতবাসীকে তাঁহার স্বজন বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যকেই সেই সুপ্রসিদ্ধ উদারস্বভাবা ইংরেজ মহিলার নামের সহিত পরিচিত আছেন—তিনিও ভারতের কল্যাণ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি মিসেস বেসাণ্টকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই মঞ্চে দুইজন মার্কিন মহিলা রহিয়াছেন—তাঁহারাও তাঁহাদের হৃদয়ে সেই একই উদ্দেশ্য পোষণ করিতেছেন; আর আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারাও আমাদের দরিদ্র দেশের সামান্য কল্যাণের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আমি এই সুযোগে আপনাদের নিকট আমাদের জনৈক শ্রেষ্ঠ স্বদেশবাসীর নাম স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি, তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনেকটা অগ্রসর ও মহামনীষী, দৃঢ়ভাবে অথচ নীরবে আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করিতেছেন; অন্যত্র বিশেষ কাজ না থাকিলে তিনি আজ এই সভায় নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিতেন—আমি শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি। আর এখন ইংলণ্ড আর একটি উপহার-রূপে মিস মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে প্রেরণ করিয়াছেন—ইঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু আশা করি। আর বেশী কিছু না বলিয়া আমি মিস নোব্‌ল্‌কে আপনাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম—আপনারা এখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন।

সিস্টার নিবেদিতার মনোজ্ঞ বক্তৃতার পর স্বামীজী আবার উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

আমি আর দুই-চারটি কথা বলিতে চাই। আমরা এই মাত্র এই ভাব পাইলাম যে, ভারতবাসী আমরাও কিছু করিতে পারি। আর ভারতবাসীদের মধ্যে বাঙালী আমরা এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। তোমাদের মধ্যে একটা অদম্য উৎসাহ, অদম্য চেষ্টা জাগ্রত করিয়া দেওয়াই আমার জীবনব্রত। তুমি অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। কিন্তু একটি বিষয়, যাহা আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্বদা ভুলিয়া যাই, সেদিকে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই—হে মানব, নিজের উপর বিশ্বাসী হও। এই উপায়েই কেবল আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারি। তুমি অদ্বৈতবাদী হও বা দ্বৈতবাদী হও, তুমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী হও বা শঙ্করাচার্যে বিশ্বাসী হও, তুমি ব্যাস বা বিশ্বামিত্র যাঁহারই অনুবর্তী হও না কেন, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত 'আত্মবিশ্বাস' ব্যাপারে ভারতীয় ভাব সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এক মুহূর্তের জন্য ভাবিয়া দেখ—অন্যান্য ধর্মে ও অন্যান্য দেশে আত্মার শক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া থাকে—আত্মাকে তাহারা একরূপ শক্তিহীন দুর্বল নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বিবেচনা করিয়া থাকে; আমরা কিন্তু ভারতে আত্মাকে শাশ্বত বলিয়া মনে করি, আর আমাদের ধারণা—উহা চিরকাল পূর্ণ থাকিবে। আমাদিগকে সর্বদা উপনিষদের শিক্ষা মনে রাখিতে হইবে।

তোমাদের জীবনের মহান্ ব্রত স্মরণ কর। ভারতবাসী আমরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা বহু পরিমাণে বৈদেশিক ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—উহা আমাদের জাতীয় ধর্মের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত চর্বণ করিয়া ফেলিতেছে। আমরা আজকাল এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছি কেন? আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন কেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব ও উপাদানে গঠিত হইয়া পড়িয়াছে? যদি আমরা জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাই, তবে পাশ্চাত্য অনুকরণ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে; যদি আমরা উঠিতে চাই, তবে ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদিগকে তাহাদের শিল্পবিজ্ঞান—বহিঃপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহ শিখিতে হইবে, আবার পাশ্চাত্যবাসীদিগকে আমাদের নিকট আসিয়া ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে—হিন্দুগণকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমরাই জগতের আচার্য। আমরা এখানে রাজনীতিক অধিকার ও এইরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি। বেশ কথা; কিন্তু অধিকার, সুবিধা—এ-সকল কেবল বন্ধুত্বের ফলেই লাভ করা যায়, আর বন্ধুত্বও কেবল দুইজন সমান সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে। এক পক্ষ যদি চিরকালই ভিক্ষা করিতে থাকে, তবে আর উভয়ের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হইতে পারে? ও-সব কথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু আমি বলিতেছি যে, পরস্পর সাহায্য ব্যতীত আমরা কখনও শক্তিশালী হইতে পারিব না। এইজন্য আমি তোমাদিগকে ভিক্ষুকভাবে নয়, ধর্মাচার্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। কার্যক্ষেত্রে আদান-প্রদানের নিয়ম যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি আমাদিগকে পাশ্চাত্যের নিকট ইহজীবনে সুখী হইবার উপায় ও প্রণালী শিখিতে হয়, তবে কেন তাহার বিনিময়ে আমরা তাহাদিগকে অনন্তকালে সুখী হইবার উপায় ও প্রণালী না শিখাইব?

সর্বোপরি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাক। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাক, উহা ছাড়িয়া দাও। মৃত্যু সকলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আর এই অতি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক সত্যটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিও যে, পৃথিবীর সকল জাতিকে ভারতীয় সাহিত্যে নিবদ্ধ সনাতন সত্যসমূহ শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের পদতলে ধৈর্যের সহিত বসিতে হইবে। ভারতের বিনাশ নাই, চীনের নাই, জাপানেরও নাই; অতএব আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড এবং ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আমাদের এমন একজন পথপ্রদর্শক চাই, যিনি আমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন—ঐ-পথের বিষয় এইমাত্র তোমাদিগকে বলিতেছিলাম। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যে ইহা বিশ্বাস করে না, যদি আমাদের মধ্যে এমন কোন হিন্দুবালক থাকে, যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয় যে, তাহার ধর্ম শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা, আমি তাহাকে 'হিন্দু' বলিব না। আমার মনে পড়িতেছে, কাশ্মীরের কোন পল্লীগ্রামে জনৈক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী? তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় সতেজে উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তাঁহার দয়ায় আমি মুসলমানী।' তারপর একজন হিন্দুকেও ঐ প্রশ্ন করাতে সে সাদাসিধা ভাষায় বলিয়াছিল—'আমি হিন্দু।'

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে—'শ্রদ্ধা' বা অপূর্ব বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত

দেখিতে পাওয়া যায়। এই ‘শ্রদ্ধা’ বা যথার্থ বিশ্বাস প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমগ্র মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও। জানিও, একজন ক্ষুদ্র বুদ্বুদ-মাত্র বিবেচিত হইতে পারে এবং অপরে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু উভয়েরই পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে। অতএব সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। অনন্ত আশা হইতে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উৎপত্তি হয়। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়, তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জুনের যুগ লইয়া আসিবে, যে-যুগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর উচ্চ মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল। আজকাল আমরা অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক- চিন্তায় অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছি, কিন্তু এখনও ভারতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা আছে, এত অধিক আছে যে, আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই ভারতকে জগতের বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়াছে। যদি জাতীয় ঐতিহ্য ও আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে সেই গৌরবময় দিনগুলি আমাদের আবার ফিরিয়া আসিবে, আর উহা তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের ধনী ও বড় লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে।

হে দরিদ্র বঙ্গবাসিগণ, ওঠ, তোমরা সব করিতে পার, আর তোমাদিগকে সব করিতেই হইবে। যদিও তোমরা দরিদ্র, তথাপি অনেকে তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। ইহা তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। মনে করিও না—আজ বা কালই উহা হইয়া যাইবে। আমি যেমন আমার দেহ ও আমার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে উহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেইজন্য হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকাকড়ি নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে। এ-কথাই আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম। আবার তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেছি—ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু এখানে প্রমাণ করিতে চাই, সমগ্র ভারতে ‘মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাস-রূপ প্রেমসূত্র’ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আর আমি স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি; ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক।

সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন

১৮৯৯ খ্রীঃ ২০ জুন তারিখে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। পূর্বদিন ১৯ জুন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণের একটি সভায় স্বামীজী ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। মঠের ডায়েরীতে বক্তৃতার সারাংশ রক্ষিত হয়। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ,

এখন দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার অথবা বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিবার সময় নয়। আমি তোমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। আশা—তোমরা এইগুলি কার্যে পরিণত করিবে। প্রথমতঃ আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ উহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে, কারণ সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার সময় এখন নাই, আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাইঃ মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক ব্যক্তি জীবন ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এইঃ আমাদিগকে মরিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই; তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কাজ—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সব যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখী করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ, কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বিধান করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি অপরের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পার? কারণ সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—তুমি তো ইহার নগণ্য ক্ষুদ্র অংশমাত্র; সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ, না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি মনে নাই?—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

৭৭

তোমাদিগকে ধীরে ধীরে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।

তারপর এই আদর্শটিকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে, অসম্ভব আদর্শ ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে। অপর দিকে আবার অতিমাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি তো একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শও খাটো করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি। এই দুইটি 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অপরের পূর্বে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ করিব—এ-ভাবটিও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে, যদি সে তাহার নিজ ভ্রাতার মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল আদর্শবাদের সহিত প্রবল কার্যকারিতা যুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূ্হ সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে ছোটখাটো গৃহকর্ম, এমন কি পায়খানা পর্যন্ত সাফ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও।

তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই মঠের উদ্দেশ্য—মানুষ গঠন করা। অমুক ঋষি এই কথা বলিয়াছেন—শুধু এইটি শিখিলেই চলিবে না। সেই ঋষিগণ এখন আর নাই—তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতামতও চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে ঋষি হইতে হইবে। তোমরাও তো মানুষ; মহাপুরুষ, এমন কি অবতার পর্যন্ত যেমন মানুষ, তোমরাও তো সেই মানুষ। তোমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্রপাঠে কি হয়? এমন কি ধ্যানধারণাতেই বা কতদূর হইবে? মন্ত্রতন্ত্রেই বা কি করিতে পারে?তোমাদিগকে এই নূতন প্রণালী—মানুষ গড়িবার নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ তাহাকেই বলা যায়

—যে এত বলবান্ যে, তাহাকে শক্তির অবতার বলা যাইতে পারে, আবার যাহার হৃদয়ে নারীসুলভ কোমলতা আছে, কিন্তু তাহা দুর্বলতা নয়। তোমাদের চারিদিকে যে কোটি কোটি প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে, অথচ তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। আবার এইটি বুঝিতে হইবে—স্বাধীনচিন্তা যেমন আবশ্যক, তেমনি আজ্ঞাবহতাও অবশ্য চাই। আপাততঃ এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনে হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে এই দুইটি আপাতবিরুদ্ধ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়া কুমির ধরিতে বলেন, তবে প্রথমে তোমাকে তাঁহাদের কথামত কাজ করিতে হইবে, তারপর তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি সেই আদেশ অন্যায়ও হয়, তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কথানুসারে কাজ কর, তারপর প্রতিবাদ করিও। সম্প্রদায়সমূহের—বিশেষতঃ বাঙলা দেশের সম্প্রদায়গুলির এই এক বিশেষ দোষ যে, যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও একটু ভিন্ন মত হয়, অমনি সে একটি নূতন সম্প্রদায় করিয়া বসে, তাহার আর অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা থাকে না। অতএব তোমাদিগকে নিজ সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতাশূন্য হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক কেহ যেন না থাকে। বায়ুর মত মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের মত নম্র এবং আজ্ঞাবহ হও।

আমি কি শিখিয়াছি ?

স্বামীজী দ্বিতীয়বার প্রায় দেড় বৎসর পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া পূর্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধ ও আসামে কামাখ্যা দর্শন করেন; পরে শিলং ও গৌহাটি হইয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। **১৯০১ খ্রীঃ ১৯** মার্চ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ-গৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে ইংরেজীতে এই বক্তৃতা দেনঃ

আমি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখনও নিজের জন্মভূমি বাঙলাদেশ বিশেষভাবে দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের স্থলে জলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য; কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি বাঙলার সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইভাবেই আমি প্রথমে ধর্মের জন্য নানা সম্প্রদায়ে—বৈদেশিকভাববহুল নানা সম্প্রদায়ে ঘুরিতেছিলাম, অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম, জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতীয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে।

আজকাল একদল লোক আছেন, তাঁহারা ধর্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—তাঁহারা ‘পৌত্তলিকতা’ বলিয়া একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ—কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা হাঁচি-টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন দিন ভগবানকেই তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। যাহা হউক, জগন্মাতা ইঁহাদিগকেও আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা নিজ কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহা ছাড়া আর একটি দল আছেন—প্রাচীন সম্প্রদায়; তাঁহারা বলেন, ‘অত শত বুঝি না, বুঝিতেও চাহি না, আমরা চাই ঈশ্বরকে—চাই আত্মাকে; চাই জগৎ ছাড়িয়া—সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার পারে যাইতে।’ তাঁহারা বলেন, বিশ্বাসের সহিত গঙ্গাস্নান করিলে মুক্তি হয়; তাঁহারা বলেন, শিব রাম বিষ্ণু প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে; আমি সেই বলিষ্ঠ প্রাচীন-সম্প্রদায়ভুক্ত।

আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার একসঙ্গে অনুসরণ কর। ইঁহাদের মন-মুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ এইঃ

জঁহা কাম তঁহা রাম নহিঁ, জঁহা রাম তঁহা নহিঁ কাম।
কবহুঁ ন মিলত বিলোকিয়ে রবি রজনী এক ঠাম॥

৭৮

যেখানে ভগবান্ সেখানে কখনও সংসার-বাসনা থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কখনও এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। এইজন্য ইঁহারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারটা তো অনিত্য, শূন্য—কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে তুমি দুর্বল, কিন্তু কোনমতেই আদর্শকে ছোট করিও না। গলিত শবকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এইজন্য ইঁহাদের মতে এই ধর্মলাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে প্রথমে ‘ভাবের ঘরে চুরি’ ছাড়িতে হইবে।

আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছিঃ দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।

৭৯

—প্রথমে চাই মনুষ্যত্ব—মানুষজন্ম, ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা। তারপর চাই মুমুক্ষুতা; সম্প্রদায় ও ব্যক্তি-ভেদে আমাদের সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুত্ব কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখদুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য—প্রবল আগ্রহ, এই সংসারের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। যখন ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে—তুমি ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইয়াছ। তারপর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়—গুরুলাভ; গুরূপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহারই সহিত নিজের সংযোগ-স্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না, অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব?—
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।

৮০

তিনিই শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন।

পোথি পঢ়ি তোতা ভয়ো পণ্ডিত ভয়ো ন কোয়।
ঢাই অক্ষর প্রেমসে পঢ়ে সো পণ্ডিত হোয়॥

শুধু বই-পড়া পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে-সে গুরু হইতে চায়। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। ‘অবৃজিন’—

যিনি নিষ্পাপ; 'অকামহত'—কেবল জীবের হিত ব্যতীত যাঁহার আর কোন অভিসন্ধি নাই, যিনি অহেতুক-দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নাম-যশের জন্য উপদেশ দেন না, আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন, যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে 'করতলামলকৎ' দর্শন করিয়াছেন; তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বরলাভ, ঈশ্বরদর্শন সহজ হইবে। তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টি যখন দৃঢ় হইবে, তখনই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইবেন। তাই বলি হে হিন্দুগণ, হে আর্যসন্তানগণ, তোমরা এই আদর্শ কখনও বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাহিরে যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে; মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের পারে যাইতে হইবে।

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম

১৯০১ খ্রীঃ ৩১ মার্চ ঢাকায় পগোজ স্কুলের খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সম্মুখে স্বামীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন, নিম্নে তাহার বাঙলায় গৃহীত বিবরণী প্রদত্ত হইলঃ

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাই না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণ ও কীর্তন করিয়া কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি ও মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণ করিয়া প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের মত ঋষি হইতে হইবে; শুধু তাই নয়—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও মহান্ ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল, আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করি। বর্তমানকালের অবনত অবস্থা দেখিয়া আমি দুঃখিত নই; ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি আশ্বান্বিত; কারণ আমি জানি, বীজের বীজত্ব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্মের ভিতর সাধারণ ভাব কি কি? আপাততঃ নানা বিরোধ দেখিতে পাই। মত সম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন—মূর্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধে তো নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাঠেরা মুসলমান বা খ্রীষ্টান পর্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। পাঞ্জাবে অনেক গ্রামে যে-হিন্দু শূকর ভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙলা দেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরেও বিবাহ হইবার জো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু সকল হিন্দুর মধ্যে এই একটি বিষয়ের ঐক্য দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

এইরূপ আমাদের ধর্মের ভিতরেও এক মহান্ সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। যে-সকল ধর্মের নিজস্ব এক বা বহু শাস্ত্র ছিল, সেই-সকল ধর্ম দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল এবং নানাবিধ অত্যাচার সত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীকধর্মের নানাবিধ সৌন্দর্য থাকিলেও শাস্ত্রের অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল, কিন্তু য়াহুদীধর্ম ওল্ড টেস্টামেণ্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণপ্রতাপ। হিন্দুধর্মও সেইরূপ। উহার শাস্ত্র 'বেদ' জগতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটি ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যেই হউক অথবা দুর্ভাগ্যেই হউক, কর্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আর বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রে মধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আর উহাকে পূর্বের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিলভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। তারপর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত, উহাকেই 'শ্রুতিশির' বলা হয়। আর্যগণ যেখানে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন, সেখানেই দেখা যায় যে, তাঁহারা এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্মই এখন ভারতের ধর্ম। যদি কোন সম্প্রদায় জনগণের মধ্যে নিজ মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, সকলকেই তাই করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ নিজেদের মত প্রমাণ করিতে 'গোপালতাপিনী উপনিষদ্' উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত রচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ নূতন উপনিষদ্ রচনা পর্যন্ত করিয়া লন। এখন বেদ সম্বন্ধে হিন্দুগণের মত এই যে, উহা কোন পুস্তকবিশেষ বা কাহারও রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখনও ব্যক্ত হয়, কখনও বা অব্যক্ত থাকে। সায়নাচার্য একস্থলে বলিয়াছেন, 'যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্মমে'—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা—কেহ কখনও দেখে নাই; সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ঋষিগণ কেবল ঐ-সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা—মন্ত্রদ্রষ্টা, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান বেদ তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র।

এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত ধর্ম প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্মের সাক্ষাৎকার হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন, তবে হে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আরও কত মহান্ ঋষি হইতে পার! সেই ঋষিত্বলাভের চেষ্টা কর, জগৎ তোমাদের নিকট স্বতঃই নত হইবে। এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায়॥'৮১ এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার কি যে, ইহাতে সকলের

অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ তো এ-কথা বলিতেছেন না। ভৃত্য কি কখনও প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এগুলির ততটুকুই গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে; না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়াছি। বেদের চর্চা তো বাঙলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি শীঘ্র সেইদিন দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে।

বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। তাঁহারা বেদের কাল—আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, আগামী কাল উহা বদলাইয়া সহস্র বৎসর পিছাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, পূর্বে যেমন বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য। পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যেগুলি বেদের সহিত মিলে না। যথা, পুরাণে লিখিত আছে—কেহ দশ সহস্র, কেহ বা বিশ সহস্র বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য। তাহা হইলেও পুরাণে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্মের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে, সেগুলি অবশ্য লইতে হইবে।

তারপর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শাস্ত্র', যেমন 'কাপিল তন্ত্র'। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ আমি উহার বর্তমান প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞসকল লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদের ভিতরেই সেই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি ঘৃণ্য ব্যাপার বাদ দিলে—লোকে যতটা ভাবে, উহা ততটা খারাপ নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণভাগই একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আজকালকার সমুদয় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখন ধর্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ধর্মমতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধসত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ তিনটি বিষয়—তিনটি সত্তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেনঃ ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে চিরকাল সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন; সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা—অসংখ্য জীবাত্মা কর্মফলে বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমান; ইহা 'সংসারবাদ'—সাধারণতঃ ইহাকে 'পুনর্জন্মবাদ' বলে। আর রহিয়াছে এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ একেরই বিভিন্ন অবস্থা, কেহ বা সম্পূর্ণ পৃথক্ তিনটি সত্তা বলিয়া মানিলেও সকলেই এই তিনটিতে বিশ্বাস করেন।

এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই, পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ এবং সম্ভোগ করিবার জিনিষ বলিয়া জানেন; আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ, উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ কর্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তেমনি অন্তর্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী।

যাহা হউক—এখন হিন্দুধর্মের আর দু-একটা কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বর-দর্শনই প্রকৃত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। হিন্দুগণ প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্যের মধ্যে দিয়া মনুষ্যের ঈশ্বরে গিয়া থাকেন। তারপর মূর্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্যদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক-একটি পদের নাম, কিন্তু এই পঞ্চদেবতা সেই এক ভগবানের নামমাত্র। এই মূর্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা অন্যায় কার্য নহে। এই মূর্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিত ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহার নিন্দা করি না। সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি যদি আমি না পাইতাম, তবে কোথায় থাকিতাম! যে-সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি—ভাই, তুমি যদি নিরাকার-উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর; কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন?

সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কারমাত্র। সেটুকু হইয়া গেলে সংস্কারের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু তোমরা নিজদিগকে পৃথক্ করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়তো উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এস, সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি একসঙ্গে ডুবিয়া মরি।

আর ব্রাহ্মণগণকেও বলিঃ তোমরা আর বৃথা অভিমান রাখিও না, শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই; কারণ তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিলভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধদের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া অনেকের মৃত্যুর কারণ হন এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ কর; যদি তাহা করিবার সাহস না থাকে, নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া সর্বসাধারণকে সাহায্য কর, তাহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত কর এবং পদদলিতদের আবার ন্যায্য ও প্রকৃত অধিকার দাও।

ভারত প্রসঙ্গে

জগতের কাছে ভারতের বাণী

সূচী

'India's Message to the World' নামে একটি বই লেখার উদ্দেশ্যে স্বামীজী ৪২টি চিন্তাসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বইটির ভূমিকাসহ সামান্য কয়েকটি চিন্তাসূত্রই বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছিল। দেহাবসানের পর এই অসমাপ্ত ইংরেজী রচনাটি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে খসড়া-রচনাটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

১. পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বীরত্বপূর্ণ। দেশবাসীর উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।

২. ঐশ্বর্যময় পাশ্চাত্যে চার বৎসর বাস করার ফলে ভারতবর্ষকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। অন্ধকার দিক্‌গুলি গাঢ়তর এবং আলোকিত দিক্‌গুলি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

৩. পর্যবেক্ষণের ফলঃ ভারতবাসীর অধঃপতন হইয়াছে—এ-কথা সত্য নহে।

৪. প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির একীকরণ; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এই সমস্যা অন্যত্র এত বিশালরূপে দেখা দেয় নাই।

৫. ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

৬. অন্যান্য দেশে ইহা দৈহিক বলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপরাপর সংস্কৃতির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ক্ষণস্থায়ী বিপুলপ্রাণশক্তিসম্পন্ন জাতীয়-জীবন দেখা দিয়াছে, তারপর উহার ধ্বংস হইয়াছে।

৭. অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্যা যত বিরাট, উহা সমাধানের চেষ্টাও তত শান্ত উপায়ে দেখা দিয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভিন্ন আচার-পদ্ধতি, বিশেষভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মসম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৮. যে-দেশে সমস্যা অত বিরাট ছিল না, বলপ্রয়োগ দ্বারাই ঐক্যস্থাপিত হইয়াছিল, সে-দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচিত্র উন্নতির পন্থাগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া প্রধান গোষ্ঠীটিই উন্নত হইয়াছে। একটি বিশেষ শ্রেণী জনসাধারণের অধিকাংশকে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যবহার করিয়াছে; ফলে উন্নতির বেশীর ভাগ সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে—যখন সেই প্রাধান্য প্রয়াসী গোষ্ঠীটির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তখন গ্রীস রোম বা নর্মানদের ন্যায় আপাত-অভেদ্য জাতিসৌধগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৯. একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচনা অনুসারে এ-কথাও বলা যায়, ইহা দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবে।

১০. এমন একটি মহান্ পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃত সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।

১১. দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বাস্তব ক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

১২. একটি জাতীয় পটভূমি পাওয়া গেল—আর্যজাতি।

১৩. মধ্য-এশিয়া হইতে বাল্টিক উপসাগর অবধি এলাকায় কোন পৃথক্ ও বিশিষ্ট আর্যজাতি ছিল কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

১৪. তথাকথিত জাতি-রূপ (type)। বিভিন্ন জাতি সর্বদাই মিশ্রিত ছিল।

১৫. সোনালী চুল ও কালো চুল।

১৬. তথাকথিত ঐতিহাসিক কল্পনা হইতে সহজবুদ্ধির বাস্তব জগতে অবতরণ। প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল

তুর্কীস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে।

১৭. ইহার ফলে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা দেয়।

১৮. ‘সংস্কৃত’ যেমন ভাষা-সমস্যার সমাধান, ‘আর্য’ তেমনি জাতিগত সমস্যার সমাধান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান ‘ব্রাহ্মণত্ব’।

১৯. ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ—‘ব্রাহ্মণত্ব’।

২০. স্বার্থহীন, সম্পদ্‌হীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শাসন ও অনুশাসনের ঊর্ধ্বে।

২১. জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়াছে, এবং অধিকার লাভ করিয়াছে।

২২. যাঁহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তাঁহারা কোন দাবী করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই দাবী করে।

২৩. ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র আদর্শের অবনতি। পুরাণে আছে, কলিযুগে কেবল অব্রাহ্মণেরাই থাকিবে। সে-কথা সত্য, দিনে দিনে আরও সত্য হইয়া উঠিতেছে। কিছু পরিমাণ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—একমাত্র ভারতবর্ষেই আছেন।

২৪. ব্রাহ্মণত্ব লাভের পূর্বে আমাদিগকে ক্ষাত্র-আদর্শের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কেহ হয়তো পূর্বে এই আদর্শে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে উহার পরিচয় দিতে হইবে।

২৫. কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠা প্রয়োজন।

২৬. একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীরা একটি বংশগত নামে এক ধরনের দেবতার উপাসনা করে—যেমন ব্যাবিলোনীয়দের ‘বাল’-দেবতা উপাসনা এবং হিব্রুদের ‘মোলোক’-দেবতা উপাসনা।

২৭. ব্যাবিলোনীয়দের সব ‘বাল’-দেবতাকে ‘বাল-মেরোডাক’-এ পরিণত করা এবং য়াহুদীদের সব ‘মোলোক’কে 'মোলক যিয়াবাহ্’ বা ‘ইয়াহ্’তে পরিণত করার চেষ্টা।

২৮. ব্যাবিলোনীয়েরা পারসীকদের দ্বারা ধ্বংস হয়। হিব্রুগণ ব্যাবিলোনীয়দের পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনমত গড়িয়া লয় এবং একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম গড়িতে সমর্থ হয়।

২৯. স্বৈর রাজতন্ত্রের মত একেশ্বরবাদে শক্তি কেন্দ্রীভূত,আদেশ অনুযায়ী দ্রুত কার্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু আর কোন বিকাশ ইহা দ্বারা হয় না। একেশ্বরবাদের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি—নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যে-সকল জাতি এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহারা অল্পকালের জন্য সহসা উন্নতি লাভ করিয়া অতি শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়।

৩০. ভারতবর্ষে সেই সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সমাধান মিলিল—‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।’ সর্বপ্রকার সাফল্যের পশ্চাতে ইহাই মূলমন্ত্রস্বরূপ, সমগ্র সৌধের ইহাই কেন্দ্র-শিলা।

৩১. ফলস্বরূপ—বৈদান্তিকের সেই আশ্চর্য উদার সহনশীলতা।

৩২. সুতরাং বিরাট সমস্যা হইল বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট না করিয়া উহাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি-সাধন।

৩৩. স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত কোন প্রকার ধর্মের পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব।

৩৪. এইখানেই অদ্বৈতবাদের মহিমা। অদ্বৈতবাদ কোন ‘ব্যক্তি’র নয়—‘আদর্শ’-এর প্রচারক; অথচ পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়।

৩৫. চিরকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—এই অর্থে আমরা সর্বদা অগ্রসর হইতেছি।—মুসলমান আমলের মহাপুরুষবৃন্দ।

৩৬. প্রাচীনকালে এই আদর্শ পূর্ণসচেতন ও শক্তিশালী ছিল, আধুনিককালে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; এই অর্থে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে।

৩৭. ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটিবেঃ যদি কিছুকালের জন্য একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত শ্রমের দ্বারা আশ্চর্য ফল লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বহুকাল ধরিয়া যে-সকল জাতি রক্ত ও আদর্শের মধ্য দিয়া মিলিত হইতেছে, তাহাদের সমবায়ে যে ভবিষ্যৎ মহাশক্তি গড়িয়া উঠিবে—তাহা আমি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি।
ভারতের ভবিষ্যৎ—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে তরুণতম ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত একটি জাতি, যাহা প্রাচীনতমও বটে।

৩৮. আমাদের কোন্ পন্থায় কাজ করিতে হইবে? স্মৃতি-অনুসারে নির্ধারিত কয়েকটি সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি। কিন্তু উহাদের একটিও শ্রুতি হইতে আসে নাই। সময়ের সঙ্গে স্মৃতির পরিবর্তন হইবে—ইহাই নিয়মরূপে স্বীকৃত।

৩৯. বেদান্তের আদর্শ কেবল ভারতবর্ষে নয়, বাহিরেও প্রচার করিতে হইবে। লেখার মধ্য দিয়া নয়, ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রত্যেক জাতির মানস-গঠনে আমাদের চিন্তাধারা সঞ্চার করিতে হইবে।

৪০. কলিকালে দানই একমাত্র কর্ম। কর্মের দ্বারা শুদ্ধ না হইলে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

৪১. পরা ও অপরা—দুই ধরনের বিদ্যাই দান করিতে হইবে।

৪২. জাতির আহ্বান—ত্যাগ এবং ত্যাগীর দল।

ভূমিকা

প্রতীচ্যে জনগণের উদ্দেশে আমার বাণী তেজোদীপ্ত। হে প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমাদের প্রতি আমার বাণী বলিষ্ঠতর। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী আমার সাধ্যানুযায়ী আমি প্রতীচ্য জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহা ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলদৃপ্ত কণ্ঠের মৃদু অথচ নিশ্চিত বাণী স্পন্দিত হইতেছে, দিনে দিনে সেই ধ্বনি স্পষ্টতর হইতেছে—উহা বর্তমান ভারতের নিকট ভবিষ্যৎ ভারতের বাণী।

নানা জাতির মধ্যে অনেক আশ্চর্য প্রথা ও বিধি, অনেক অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, আচার-ব্যবহারের—সংস্কৃতি ও শক্তির আপাত-বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই মনুষ্যহৃদয় একই ধরনের আনন্দ-বেদনা, সবলতা ও দুর্বলতা লইয়া স্পন্দিত হইতেছে।

ভালমন্দ সর্বত্রই আছে। উহাদের সামঞ্জস্যও আশ্চর্যভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে সর্বত্র সেই গৌরবদীপ্ত মানবাত্মা; তাহার নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে জানিলে সে কখনও কাহাকেও ভুল বুঝে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এমন নরনারী আছেন, যাঁহাদের জীবন মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁহারা সম্রাট্ অশোকের সেই বাণীর প্রমাণস্বরূপ—'প্রত্যেক দেশেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করেন।'

যে পবিত্র ভালবাসার সহিত প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃস্বার্থ হৃদয়েই সম্ভব, সে-দেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য; এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর, হে আমার বন্ধুবর্গ—তোমাদেরই সেবায় ব্যয়িত হইবে।

আমার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সম্বল—সে-সবই তো আমি এই দেশের কাছে পাইয়াছি, এবং যদি আমি কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া থাকি, সে গৌরব আমার নয়, তোমাদের। কিন্তু দুর্বলতা ও ব্যর্থতা—সেগুলি আমার ব্যক্তিগত; সে-সবই এই দেশবাসীকে যে মহতী ভাবধারা আজন্ম ধারণ করিয়া রাখে, তাহা দ্বারা সমৃদ্ধ হইবার শক্তির অভাববশতঃ।

আর কী দেশ! বিদেশী অথবা স্বদেশী, যে-কেহ এই পবিত্রভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে—যদি তাহার মন পশুস্তরে অধঃপতিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম যে-সন্তানেরা পশুসত্তাকে দিব্যসত্তায় উন্নীত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন্ত চিন্তারাশি দ্বারা নিজেদের পরিবৃত অনুভব করিবে। সমগ্র বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় স্পন্দিত হইতেছে।

দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা বজায় রাখিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই সব-কিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিল—এ সবই অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।

এইখানে এই মানবতা-সমুদ্রে সুখ-দুঃখ, সবলতা-দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোতসংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই জন্মমৃত্যুর মহাসমস্যাসমূহ—জীবন- তৃষ্ণা, এ জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান করা হয়, এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে কখনও হইবে না; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই জীবনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র। এই একটি দেশ, যেখানে ধর্ম বাস্তব সত্য, এইখানেই নরনারী সাহসের সহিত অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নরনারী জীবনের সুখ-সম্ভোগের জন্য উন্মাদের মত ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানব-হৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত সব-কিছুকে ধারণ করিয়া আরও বিশাল—অনন্তপ্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে, তাহার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।

আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি দেশের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য দেশের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখনও মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখনও প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত—বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মত পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ

করে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সত্যই মহিমময় ভবিষ্যৎ, কারণ প্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে আমরা পৃথিবীর সমক্ষে স্পর্ধাপূর্বক এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিঃ ‘ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ’—সন্তান বা ধনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। জাতির পর জাতি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং বাসনার জগতে থাকিয়া তাহারা জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীন জাতিসমূহ ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে জাত অসাধুতা ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হইয়াছে—নূতন জাতিসমূহ পতনোন্মুখ। শান্তি না যুদ্ধ, সহনশীলতা না অসহিষ্ণুতা, সততা না খলতা, বুদ্ধিবল না বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা না ঐহিকতা—শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি জয়ী হইবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকী।

বহুযুগ পূর্বে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিয়াছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া সেই সমাধান অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, শেষ অবধি ইহাই ধরিয়া রাখিতে চাই। আমাদের সমাধান—ত্যাগ ও অপার্থিবতা।

সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

ভারতের ইতিহাসে কেহ এমন একটি যুগ দেখাইয়া দিন দেখি, যে-যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন, এমন মহাপুরুষের এখানে অভাব ছিল। কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সে-কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিজস্ব শান্ত প্রকৃতির দরুন এ প্রভাব বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রয়োজন হইয়াছে, যদিও স্বদেশের গণ্ডিতে ইহা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। শিক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ইহার ফলে যখনই তাতার, পারসীক, গ্রীক বা আরব জাতি এদেশের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ-সাধন করিয়াছে, তখনই এদেশ হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বন্যাস্রোতের মত সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। সেই এক ধরনেরই ঘটনা আবার আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ইংরেজের জলপথ ও স্থলপথ এবং ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের অসাধারণ বিকাশের ফলে পুনরায় সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ সাধিত হইয়াছে, এবং সেই একই ব্যাপারের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমার কথা লক্ষ্য করুন, এ কেবল সামান্য সূচনা মাত্র, বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহ আসিতেছে। বর্তমানে ভারতের বাহিরে যে-কাজ হইতেছে, তাহার ফলাফল কি, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু নিশ্চিত জানি, লক্ষ লক্ষ লোক—আমি ইচ্ছা করিয়াই বলিতেছি, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্য দেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে-বাণী—আধুনিক যুগের অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভিমুখে মানুষকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বেদান্তের উচ্চতম ভাবধারাই তাঁহাদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে। গ্রন্থের শেষ ভাগে আমাকে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করিতে হইবে। এখন আমি অন্য একটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি—দেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম।

এই সমস্যার দুইটি দিক্—কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন নয়, যে বিভিন্ন উপাদানে এই জাতি গঠিত, সেগুলির সমীকরণ। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক আত্মীয়তাসূত্রে বিধৃত করা প্রত্যেক জাতির সাধারণ কর্তব্য।

[রচনাটি অসমাপ্ত]

আর্য ও তামিল

[‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ]

সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; য়াহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই-সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তন পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রকৃতির এই উন্মাদনার মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি নিজেদের ‘আর্য’ বলিত এবং তাহাদের পন্থা ছিল ‘বর্ণাশ্রমাচার’—তথাকথিত জাতিভেদ-প্রথা।

আর্যজাতির জনসাধারণ অবশ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকগুলি সুবিধা নিজেদের হাতে রাখিয়া দিয়াছিল। তবু জাতিভেদ-প্রথা চিরদিনই খুব নমনীয় ছিল; মাঝে মাঝে নিম্নস্তরের জাতিগুলির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত নত হইয়া পড়িত।

ধনসম্পদ বা তরবারি দ্বারা নয়—আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শোধিত বুদ্ধি দ্বারাই এই আর্যজাতি অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে চালিত করিয়াছিল। ভারতের প্রধান জাতি আর্যদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণ।

অন্যান্য দেশের সামাজিক পদ্ধতি হইতে আপাততঃ পৃথক্ মনে হইলেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে আর্যদের জাতবিভাগপ্রথা দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব পৃথক্ বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমতঃ অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা। রাইন নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় দস্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলে রোমের পোপ খুবই খুশি হইবেন। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি অতীতের কোন অরণ্যচারী সংসারবিরাগী, সর্বস্বত্যাগী, ভিক্ষান্নজীবী, ইহকাল ও পরকালের তত্ত্বালোচনায় জীবনযাপনকারী ঋষিকে পূর্বপুরুষ বলিতে পারিলে আনন্দিত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ মাত্রাগত পার্থক্য। অন্য সব দেশে জাতিনির্ধারণের একক মাত্রা হিসাবে একজন নর বা নারীই যথেষ্ট। ধন, ক্ষমতা, বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দ্বারা যে-কেহ নিজ জন্মগত জাতির ঊর্ধ্বে যে-কোন স্তরে আরোহণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে সমগ্র গোষ্ঠীটিই জাতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে একক-রূপে গৃহীত। এখানেও নিম্নজাতি হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম জাতিতে উন্নীত হইতে পারা যায়, তবে এই পরার্থবাদের জন্মভূমিতে নিজ জাতির সকলকে লইয়া একত্র উন্নত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য, ক্ষমতা বা অন্য কোন গুণের দ্বারা নিজ গোষ্ঠীর লোকেদের পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নত জাতির লোকেদের সঙ্গে স্বাজাত্যের দাবী করিতে পার না। যাহারা তোমার উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ঘৃণা করিতে পার না। যদি কেহ উচ্চতর জাতিতে উন্নত হইতে চায়, তবে তাহার স্বজাতিকেও উন্নত করিতে হইবে—তাহা হইলে আর কোন কিছু বাধা দিতে পারিবে না।

ইহাই ভারতীয় স্বাঙ্গীকরণপদ্ধতি—সুদূর অতীত হইতে এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এ-কথা আরও বেশী করিয়া খাটে যে, আর্য ও দ্রাবিড়—এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, করোটিতত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে-ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নামগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ। উহারা কেবল গোষ্ঠীর মর্যাদাসূচক, এই গোষ্ঠীও সর্বদা পরিবর্তনশীল, এমন কি পরিবর্তনের শেষ ধাপে উপনীত হইয়া যখন বিবাহনিষেধ (non-marriage) প্রভৃতির মধ্যেই অন্য সব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখনও নিম্নতর জাতি বা বিদেশ হইতে আগত লোকদিগকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এই গোষ্ঠীগুলি প্রসারিত হইতেছে।

যে-বর্ণের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাহ্মণ; ধনসম্পদ্ যাহাদের হাতে তাহারাই বৈশ্য।

যে-গোষ্ঠী আপন অভীষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই সে-গোষ্ঠী নবাগতদিগের নিকট হইতে নানা উপ-বিভাগের দ্বারা নিজেদের পৃথক্ করিয়া রাখে। কিন্তু শেষ অবধি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। আমাদের চোখের উপর ভারতের সর্বত্র এইরূপ ঘটিতেছে।

স্বাভাবিকভাবেই যে-গোষ্ঠীটি নিজেদের উন্নীত করিয়াছে, তাহারা নিজেদের জন্য সব সুবিধা সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে চায়। সুতরাং উচ্চবর্ণেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা—যখনই সম্ভব হইয়াছে, রাজার সাহায্য এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্রের দ্বারাও নিম্নবর্ণের লোকেদের উচ্চাশা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহারা কি সফল হইয়াছিল?নিজেদের পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলি যত্ন সহকারে লক্ষ্য দেখ—বিশেষতঃ বৃহৎ পুরাণগুলির স্থানীয় সংস্করণগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; দৃষ্টির সম্মুখে ও চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—উত্তর পাইবে।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ এবং নানা উপ-বিভাগের মধ্যে বর্তমান বিবাহ-প্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা (যদিচ এই রীতি সর্বত্র পালিত হয় না) সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি।

ভাষাতাত্ত্বিকদের 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমন কি বাদ ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত-পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত—রক্তগত নহে। বেদে দস্যুদের কুৎসিত আকৃতি সম্বন্ধে যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই মহান্ তামিলভাষীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। বস্তুতঃ আর্য ও তামিলদের মধ্যে কাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য বেশী—এ সম্বন্ধে যদি কোন প্রতিযোগিতা হয়, তবে উহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহসী হইবে না।

বর্ণ-বিশেষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ অসার কল্পনামাত্র। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এই মতবাদ দাক্ষিণাত্যের মত অন্য কোথাও এতটা সাফল্য-লাভ করে নাই।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আমরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি নাই, সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমরা দাক্ষিণাত্যের এই সামাজিক অত্যাচারের কথা বেশী আলোচনা করিব না। মান্দ্রাজ-প্রদেশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে যে উত্তেজনা বিদ্যমান, তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমধর্ম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের অন্যতম। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অনিবার্য ক্রটিবিচ্যুতি, বৈদেশিক অত্যাচার, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-নামের অযোগ্য কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও দম্ভের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের স্বাভাবিক সুফল-লাভ ব্যাহত হইলেও এই বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতে আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে।

ভারতের আদর্শ পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের একটি জগৎসৃষ্টি—মহাভারতের মতে পূর্বে এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের এই আদর্শ ভুলিয়া না যান—মনে রাখেন।

যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করেন, তিনি নিজের সেই পবিত্রতার দ্বারা এবং অপরকেও অনুরূপ পবিত্র করিয়া নিজের দাবী প্রমাণ করুন। ইহার বদলে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত জন্মগত গর্ব লালন করিতেই ব্যস্ত; স্বদেশী অথবা বিদেশী যে-কোন পণ্ডিত এই মিথ্যাগর্ব ও জন্মগত আলস্যকে বিরক্তিকর কুতর্কের দ্বারা লালন করেন, তিনিই ইহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া দাঁড়ান।

ব্রাহ্মণগণ, সাবধান, ইহাই মৃত্যুর চিহ্ন। তোমাদের চারিপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব—ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ কর, তবে প্রভুর ভাবে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূষিত গলিত অহঙ্কারের দ্বারা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভট সংমিশ্রণের দ্বারাও নয়—শুধু সেবাভাবের দ্বারা। যে ভালভাবে সেবা করিতে জানে, সে-ই ভালভাবে শাসন করিতে পারে।

অব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতেছেন—মূল সমস্যা-সমাধানের পক্ষে এ ধরনের কাজ নিতান্ত বিঘ্নস্বরূপ। অহিন্দুরাও এই পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তারে সহায়তা করিতেছেন মাত্র।

বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হইবে না; যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে। ইহা বৌদ্ধদের রাজনীতিক বিভ্রান্তির পুনরাবর্তন হইয়া দাঁড়াইবে।

এই ঘৃণা ও অজ্ঞতাপ্রসূত কোলাহলের মধ্যে পণ্ডিত শবরীরয়ন

১

একটিমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধির পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। মূর্খোচিত নিরর্থক কোলাহলে মহামূল্য প্রাণশক্তি নষ্ট না করিয়া তিনি 'সিদ্ধান্তদীপিকা'য় 'আর্য-তামিলগণের সংমিশ্রণ' নামক প্রবন্ধে অতিসাহসিক পাশ্চাত্য ভাষাবিদগণের সৃষ্ট মতবাদের কুয়াশাই শুধু ভেদ করেন নাই, অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যের জাতিসমস্যা-সমাধানে সহায়তা করিয়াছেন।

ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনও কিছু পায় নাই। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই লাভ করিয়া থাকি। যোগ্যতার প্রথম ধাপ পাওয়ার ইচ্ছা; আমরা—নিজেদের যাহা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া মনে করি, তাহাই লাভ করিয়া থাকি।

বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য তথাকথিত 'আর্য'-মতবাদের জাল এবং ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলি শান্ত অথচ দৃঢ় সমালোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আর্যজাতির পূর্ববর্তী মহান্ তামিল-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও যথার্থ গৌরববোধ।

নানা পাশ্চাত্য মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের শাস্ত্রসমূহে 'আর্য' শব্দটি যে-অর্থে দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা এই বিপুল জনসঙ্ঘকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়—সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ-কথা সব হিন্দুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে গঠিত। কয়েকটি স্মৃতিতে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ শূদ্রেরা এখনও নবাগত শিক্ষার্থী মাত্র, ভবিষ্যতে উহারাও আর্যজাতিতে পরিণত হইবে।

যদিও আমরা জানি যে, পণ্ডিত শবরীরয়ন কিছুটা অনিশ্চয়তার পথে বিচরণ করিতেছেন, যদিও বৈদিক নাম ও জাতিসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষিপ্র মন্তব্যসমূহের সহিত আমরা একমত নহি, তবুও আমরা এ-কথা জানিয়া আনন্দিত যে, তিনি ভারতীয় সভ্যতার মহান্ উৎস সংস্কৃতির (সংস্কৃতভাষী জাতিকে যদি সভ্যতার জনক বলা যায়) পূর্ণ পরিচয়লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

তিনি যে প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো-সুমেরীয়গণের জাতিগত ঐক্য-সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়াছেন, তাহাতেও আমরা আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে-সভ্যতাটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার সহিত তুলনায় আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাত্র—সেই সভ্যতার সহিত আমাদের রক্তসম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতেছি।

আমরা মনে করি, মিশরবাসীদের পন্ট্ই মালাবার দেশ নয়, বরং সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার-তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের বদ্বীপ-অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া তীরে তীরে উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে গিয়াছিল। এই পন্ট্কে তাহারা পবিত্রভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত।

এই প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রসমূ্হের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই আরও বিশদ ও নিখুঁত আলোচনা দেখি দিবে। তামিল-ভাষার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা মাতৃভাষার ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এ-কাজে যোগ্যতর আর কাহাকে পাওয়া যাইবে?

আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত, মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত, আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তবে আমাদের সেই জন্তুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত—কারণ তাহারা মানবজাতিরও পূর্ববর্তী। জড় অথবা চেতন—এই সমগ্র বিশ্ব-জগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি, কাজ করি, যন্ত্রণা পাই, এজন্য আমরা গর্ব বোধ করি—আবার কর্মাবসানে আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মায়াতীত জগতে প্রবেশ করি, এজন্য আরও বেশী গর্ব অনুভব করি।

ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

ওঁ তৎ সৎ।

[Historical Evolution of India—প্রবন্ধের অনবাদ]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

নাসতো সদ্ জায়েত।

অনস্তিত্ব হইতে কোন অস্তিত্বের
উদ্ভব সম্ভব নহে। যাহা 'অসৎ',
তাহা কোন সদ্বস্তুর হেতুও হইতে
পারে না। শূন্যতা হইতে কোন বস্তু
জাত হয় না।

কার্য-কারণ-নিয়ম আর্যজাতিরই মত
সুপ্রাচীন। এই নিয়ম সর্বশক্তিমান্,
কোন দেশ বা কালের সীমায় ইহা
আবদ্ধ নয়। প্রাচীন ঋষি-কবিগণ
ইহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং ইহাকেই ভিত্তিরপ্রস্তররূপে স্বীকার করিয়া আজ পর্যন্ত হিন্দুজাতি তাহার জীবন-দর্শন রচনা করিয়া চলিয়াছে। ...

যুগ-প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে এবং যদিও আদিযুগের প্রথম-প্রয়াসের মধ্যে কাঁচা-হাতের অপরিণত স্বাক্ষর ছিল—যেমন থাকে সুদক্ষ স্থপতির প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে, তথাপি নির্ভীক উদ্যম ও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়া সে এক বিস্ময়কর ফল প্রসব করিয়াছিল।

এই জিজ্ঞাসার সাহস আর্য-ঋষিদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল যজ্ঞবেদীর প্রতিটি ইষ্টকখণ্ডের স্বরূপ-অনুসন্ধানে, উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের মাত্রানির্ণয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিংবা ঐগুলির পুনর্বিন্যাসে। ইহারই প্রেরণায় পূজা-উৎসবাদির তাৎপর্য সম্পর্কে কখনও তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কখনও ঐগুলির ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কখনও বা সেগুলি একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন।

এই অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রচলিত দেবতাবর্গকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল এবং সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টারূপে যিনি কীর্তিত, যিনি পিতৃপুরুষের স্বর্গীয় পিতা—তাঁহার জন্য হয় একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, অথবা এককালে অপ্রয়োজনীয় বোধে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়াই এক সার্বভৌম ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সকল ধর্ম অপেক্ষা সেই ধর্মের অনুগামীর সংখ্যা আজও সর্বাধিক।

ইহারই অনুপ্রেরণায় যজ্ঞবেদীর ইষ্টকস্থাপন-ব্যবস্থা হইতে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। আবার পূজা-উপাসনার যথাযথ কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, যাহা সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল।

ঐ অনুসন্ধিৎসা হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহাদের দান প্রাচীন অথবা আধুনিক যে-কোন জাতির দান অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে ধাতুঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতায়, সঙ্গীতের সুরগ্রাম-নির্ধারণে, বেহালা-জাতীয় তারযন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতিতে তাঁহাদের যে-প্রতিভা, তাহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই বিচিত্র গল্প ও উপাখ্যানের সাহায্যে অপরিণত শিশুমন গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আজও পৃথিবীর সর্বদেশে শৈশবের শিক্ষায়তনে শিশুগণ ঐ-সকল গল্পই শিখিয়া থাকে, আর ঐগুলির মধ্য দিয়াই জীবনের পটে সুস্পষ্ট ছাপ গ্রহণ করে।

এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির সম্মুখে এবং পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসৃণ আচ্ছাদন ছিল এবং তাহারই মধ্যে সুরক্ষিত ছিল এই জাতির অপর একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য—যাহাকে 'কবির অন্তর্দৃষ্টি' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই যেন কবিকল্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম 'সংস্কৃত' বা 'পূর্ণাঙ্গ' ভাষা। এমন কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সেই বিশ্লেষণশক্তি এবং নির্ভীক কবিকল্পনা, যাহা ঐ শক্তিকে প্রেরণা দিত—এই দুইটি অভ্যন্তরীণ কারণই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রধান সুর, ঐ দুইটি সমন্বিত শক্তির বলেই আর্যজাতি চিরদিন ইন্দ্রিয়-স্তর হইতে অতীন্দ্রিয় স্তরের দিকে গতিশীল, এবং ইহাই এই জাতির দার্শনিক চিন্তাধারার গোপন রহস্য; ইহা দক্ষকারিগর-নির্মিত ইস্পাত-ফলকের ন্যায়, যাহা লৌহদণ্ডকে ছেদন করিতে পারে, আবার বৃত্তাকারে রূপায়িত হইবার মত নমনীয়ও বটে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে তাহারা ছন্দ-গাথা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। মণি-মাণিক্যের ঐক্যতানে, মর্মর-প্রস্তরের বহু বিচিত্র স্থাপত্যে, বর্ণ-সুষমার সঙ্গীতে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের সৃষ্টিতে—যে-সৃষ্টি এই জগতের বাহিরে অন্য এক রূপকথার জগতের বলিয়া মনে হইত, সব কিছুর পশ্চাতে এই জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সহস্রবর্ষব্যাপী সাধনা নিহিত ছিল।

কলা, বিজ্ঞান, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত—সব কিছু এমন ছন্দোময় ভাবদ্বারা মণ্ডিত ছিল যে, চরমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, স্থূল বাস্তবতা সূক্ষ্ম অবাস্তবতার রঙিন আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত।

এ-জাতির দূর-অতীত ইতিহাসের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায়, সেই আদিমযুগেই—ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করিবার যন্ত্র-হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য তাহাদের আয়ত্তে ছিল। বেদ-গ্রন্থে এই জাতির জীবনাখ্যায়িকা চিত্রিত হইবার পূর্বে চলার পথে বহু প্রকারের ধর্ম ও সমাজ পশ্চাতের পথরেখায় নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সেখানে দেখা যায়—এক সুসংবদ্ধ দেবতামণ্ডলী, উৎসবাদির বিস্তারিত ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তাগিদে গঠিত বংশানুক্রমিক একটি সমাজ। সেখানে ইতিমধ্যেই অনেক প্রয়োজনীয় ও বিলাসের সামগ্রী বর্তমান।

আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় জলবায়ু এবং ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি তখনও এই জাতির উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আরও কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল। তখন দেখা গেল এক মানবগোষ্ঠী, তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের উষ্ণতা—মধ্যে দিগন্তবিস্তীর্ণ সমতল, সীমাহীন অরণ্য-অঞ্চল, আর তাহাদেরই মধ্য দিয়া দুর্বারগতি নদীসমূহ প্রচণ্ড স্রোতে প্রবাহিত। তাতার, দ্রাবিড়, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ক্ষণিক আভাস পাওয়া যায়; শেষে দেখা যায় ইহাদেরই শোণিতধারা, ভাষা ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির নির্ধারিত অংশ-সংযোগে ধীরে ধীরে আর্যদেরই অনুরূপ আর এক মহান্ জাতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা আরও শক্তিশালী—উদার অঙ্গীভূত-করণের ফলে অধিকতর সম্বদ্ধ।

আরও দেখা যায়, এই কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী গ্রহণ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর স্বকীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়াও বিশেষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের 'আর্য'-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অপরাপর জাতিকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াও আর্যজাতির অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর মধ্যে কাহাকেও গ্রহণ করিতে সম্মত নয়।

ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তম সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিমযুগেই পূজা-অর্চনার বিস্তারিত বিধিনিয়ম-প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই দার্শনিক চিন্তা দেখা দিল, এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল।

সে এক দ্বন্দ্বের কাল। ...

একদিকে পুরোহিতকুলের অধিকাংশ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেই ক্রিয়াকর্মকেই সমর্থন করিত, যেগুলির জন্য সমাজব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য। আবার অন্যদিকে যে রাজন্যবর্গের শক্তি ও শৌর্যই জাতিকে রক্ষা করিত—পরিচালিত করিত এবং যাঁহাদের নেতৃত্ব তখন উচ্চ মননক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারা শুধু ক্রিয়ানুষ্ঠানদক্ষ পুরোহিতবর্গকে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান ছাড়িয়া দিতে আর সম্মত ছিলেন না। আরও একদল ছিল, পুরোহিতকুল ও রাজকুল—উভয় হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহারা পুরোহিত এবং দার্শনিক দুই শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করিত, অধ্যাত্মবাদকে ধাপ্পাবাজি ও বুজরুকি বলিয়া অভিহিত করিত এবং জাগতিক সম্ভোগকেই জীবনের সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলিয়া ঘোষণা করিত। ইহারাই জড়বাদী।

সাধারণত মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত; কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। শ্রেণীগত সমস্যার সূচনা তখন হইতেই, এবং ভারতভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, দার্শনিকতা ও জড়বাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

এ বিরোধের প্রথম সমাধান-প্রচেষ্টা শুরু হয় ভাব-সমীকরণের সূত্র অনুসরণ করিয়া, ইহাই স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে একই সত্য বিভিন্নভাবে দেখিতে শিখাইয়াছিল।

এই চিন্তাধারার মহান্ নেতা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁহারই উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ও বিপর্যয়ের পর অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ জীবনদর্শন-রূপে 'গীতা' স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

বর্ণাধিকারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার জন্য রাজন্যবর্গের যে দাবী এবং পুরোহিতকুলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ-জনিত যে উত্তেজনা, তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও তাহার মূলীভূত হেতু যে সামাজিক বৈষম্য, তাহা তখনও দূর হইল না, রহিয়াই গেল। শ্রীকৃষ্ণ জাতিনির্বিশেষে সকলের সম্মুখে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যা তিনি স্পর্শ করেন নাই। সকলের সামাজিক সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাই দেখা যায়, বর্তমান কালের ভারতবর্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক সমতা স্বীকৃত হইলেও সামাজিক বৈষম্য দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, সেই সামাজিক বৈষম্যের বিরোধ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নূতন শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের নেতৃত্ব প্রাচীন আচার-ব্যবস্থাদি একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় বিশেষ-অধিকারভোগী পুরোহিতবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, বৈদিক দেবতাদিগকে বৌদ্ধাচার্যগণের ভৃত্যশ্রেণীতে অবনমিত করিয়াছিল; সেইসঙ্গে এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে, 'স্রষ্টা' বা 'সর্বনিয়ন্তা' বলিয়া কিছু নাই, উহা পুরোহিতগণের আবিষ্কার অথবা কুসংস্কার মাত্র।

পূজানুষ্ঠানে পশুবলি নিবারণ করিয়া, বংশগত জাতিভেদ ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য লুপ্ত করিয়া এবং আত্মার নিত্যত্বে অবিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল বৈদিক ধর্মের সংস্কার করা। বৌদ্ধধর্ম কখনও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিতে চাহে নাই। বৌদ্ধগণ একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে সুগঠিত করিয়াছিল, কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীকে সন্ন্যাসিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর যজ্ঞবেদীর স্থানে সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই ভাবেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। ...

খুব সম্ভব এই সংস্কারকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রাচীন শক্তিসমূহ কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে নাই, তথাপি বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিক কালের মত প্রাচীনকালেও রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধি-চর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

সেইজন্য দেখা যায়, পাঞ্চাল বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ-পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

আধিপত্য লাভের জন্য কুরু-পাঞ্চাল যে-যুদ্ধে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াছিল, সে-যুদ্ধের ইতিহাস প্রাচীন মহাকাব্য 'মহাভারতের' মাধ্যমে আমরা পাইয়াছি। পূর্বাঞ্চলে মগধ ও মিথিলাকে ঘিরিয়াই আধ্যাত্মিক প্রাধ্যান্য আবর্তিত হইয়াছিল এবং কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধের অবসানে মগধের রাজশক্তি কতকটা প্রাধান্য লাভ করে।

এই পূর্বাঞ্চলই বৌদ্ধদিগের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেই তাহাদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। আবার যখন মৌর্য নরপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের ক্ষতিকর কুলকলঙ্কচিহ্ন স্খালন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐ নূতন আন্দোলনকে—শুধু সমর্থন নয়—পরিচালিতও করিয়াছিলেন, তখন নূতন পুরোহিত-শক্তি পাটলিপুত্রের রাজশক্তির সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং নূতন প্রাণশক্তি যেমন মৌর্য রাজন্যবর্গকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌রূপে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মৌর্যরাজশক্তির সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ...

এ কথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বাহিরের কোন সাহায্য গ্রহণে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। ইহারই ফলে বৈদিক ধর্ম যেমন শুচিতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তেমনি অনেক হীন প্রভাব হইতেও নিজেকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু প্রচারের অতি উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সেটি সম্ভব হয় নাই।

অত্যধিক গ্রহণ প্রবণতার জন্য বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবটুকুই হারাইয়া ফেলে, এবং জনপ্রিয়তার চরম আগ্রহে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মূল বৈদিক ধর্মের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে পশুবলি প্রভৃতি বহু অবাঞ্ছিত আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধধর্মের উদাহরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিশেষ বিবেচনার সহিত মূর্তি-উপাসনা, মন্দিরে শোভাযাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করিয়া যথাসময়ে পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে এককালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সীথিয়ানদের ভারতাক্রমণ এবং পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। এই আক্রমণকারীর দল নিজেদের বাসভূমি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ প্রচারকদের আক্রমণে ইতঃপূর্বে ক্রোধদীপ্ত হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূর্যোপাসনার সহিত নিজেদের সৌরধর্মের প্রভূত সাদৃশ্য তাহারা লক্ষ্য করিল এবং যখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বহু আচারপদ্ধতি নিজেদের ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, তখন সহজেই তাহারা ব্রাহ্মণদের পক্ষ অবলম্বন

করিল।

তারপরই এক অন্ধকারময় যুগের কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিল—যাহার দীর্ঘ ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ প্রসারিত। কখনও যুদ্ধের কোলাহল ও আর্তনাদ, কখনও ব্যাপক নরহত্যার জনশ্রুতি—এই ছিল সে-কালের পরিস্থিতি, আর তাহার অবসানে এক নূতন অবস্থায় নূতন দৃশ্যের সূচনা হইয়াছিল।

তখন আর মগধ-সাম্রাজ্য নাই। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত পরস্পর-বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ কর্তৃক শাসিত হইতেছে। পূর্বাঞ্চলে ও হিমালয়ের সন্নিহিত কোন কোন প্রদেশে এবং সুদূর দক্ষিণে ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম তখন লুপ্তপ্রায়। আর সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বংশানুক্রমিক পুরোহিত-শক্তির সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতি জাগিতেছে; জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, জাতির জীবন একদিকে বংশগত ব্রাহ্মণের, অন্যদিকে নবযুগের বর্জনশীল সন্ন্যাসীর—এই দ্বিবিধ পৌরোহিত্যের কবলে; এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বৌদ্ধসংগঠনী-শক্তির অধিকারী হইলেও বৌদ্ধদের মত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না।

ইহার পর প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুত-জাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে সে ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞানকেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নবভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্যমণ্ডিত।

নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখে দায়িত্ব ছিল গুরুতর, সমস্যা ছিল বিরাট, যে-সমস্যা পূর্বপুরুষদের সম্মুখেও কখনও উপস্থিত হয় নাই।

তুলনীয় অবস্থাটি ছিল এইরূপঃ প্রথম যুগের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সংহত জাতি; একই রক্তস্রোত যাহাদের মধ্যে প্রবাহিত, যাহাদের ভাষা এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকারবেষ্টনীর অন্তরালে নিজেদের ঐক্য-সংরক্ষণে যাহারা নিয়ত যত্নশীল—সেই জাতিই বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে বহু সংযোজন ও বিস্তারের ফলে এক বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছিল। আবার বর্ণ, ভাষা, ধর্মসংস্কার, সামাজিক উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি বিপরীত প্রভাবে সেই জাতিই বহু বিবদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এখন সেইগুলিকে একটি বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে গড়িয়া তোলাই এক প্রকৃত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৌদ্ধগণও অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহার আয়তন ও গুরুত্ব এত বিস্তৃত ছিল না। তখন পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল—আর্যজাতিভুক্ত হইবার জন্য যে-সকল মানবগোষ্ঠী আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে স্বকীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া বহুবিচিত্র উপাদান-সমন্বিত এক বিরাট আর্যদেহ গড়িয়া তোলা। ... বিশেষ সুবিধাদানের এবং আপসের মনোভাব সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মরূপে বিরাজিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহাদের ইতরজাতি-সুলভ ইন্দ্রিয়াসক্তিবহুল উপাসনার প্রলোভন আর্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে সংযোগ দীর্ঘতর কালের জন্য স্থায়ী হইলে আর্যসভ্যতা নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইত। ইহার পর স্বভাবতই আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং নিজবাসভূমিতে স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়রূপে বৌদ্ধধর্ম আর টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল ভট্ট এবং দক্ষিণ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজাপদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা তদপেক্ষা অধিক কাল ধরিয়া এই অঙ্গীভূত করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে দেখা দিত সাময়িক সংস্কার-আন্দোলন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। পরে তাহাতে ব্যর্থ হইয়া বেদের দার্শনিক ভাগ বা উপনিষদসমূহকেই ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছিল।

এই আন্দোলন ব্যাসদেবের মীমাংসা-দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গীতাকে পুরোভাগে স্থাপন করে এবং পরবর্তী কালের যাবতীয় আন্দোলন ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। শঙ্করাচার্যের আন্দোলন অতি উচ্চ জ্ঞানমার্গেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার—এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে সে-আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব-ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন। উত্তরাঞ্চলে সে প্রতিক্রিয়ার পরেই মালব সাম্রাজ্যের সাময়িক গৌরবদীপ্তি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার অবসান ঘটিলে উত্তর-ভারত যেন দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। আর সে-নিদ্রা রূঢ়ভাবে ভাঙিয়াছিল আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান অশ্বারোহিদলের বজ্রনিনাদে।

যাহা হউক, দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরই এ-দেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল। কাজেই দক্ষিণ-ভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল; আর, এক সমুদ্রতীর হইতে অন্য সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-ভারত—মধ্য-এশিয়ার বিজেতাদের পাদমূলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-অঞ্চলের কোথাও একটি

শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-বিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে, মালভূমির নানা প্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধবেশে দলে দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্‌গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।

মুসলমানযুগে উত্তর-ভারতে বিজয়ী জাতির ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত রাখাই ছিল সকল আন্দোলনের মুখ্য প্রয়াস; তাহারই ফলে সে-সময়ে ধর্মজগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সমানাধিকারের ভাব দেখা দিয়াছিল।

রামানন্দ, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ যদিও জনসাধারণকে নিজ ধর্মের আবেষ্টনীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল, এবং মুসলমানদিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিও কতকটা প্রশমিত করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থনকারী; কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।

এইকালে উত্তর-ভারতে একজন শক্তিমান্ দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী-প্রতিভাসম্পন্ন শেষ শিখগুরু—গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনীতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মালব কিংবা বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগল-দরবারেও তদানীন্তন কালে যে-প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার রাজ-দরবার কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক্ হইতে এই যুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ...

তারপর আবার এক বিশৃঙ্খলার যুগ উপস্থিত হইল। শত্রু ও মিত্র, মোগলশক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী, ইংরেজ-প্রমুখ বিদেশী বণিক্‌দল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল যুদ্ধ লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূমধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইংরেজশক্তি। সেই শক্তির শাসনাধীনেই অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া দেশে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা অব্যাহত। অবশ্য সে-শৃঙ্খলা যথার্থ উন্নতির দ্যোতক কিনা—কালের নিকষেই তাহা পরীক্ষিত হইবে।

দিল্লীর বাদশাহী আমলে উত্তর-ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি যে-ধরনের ধর্ম-আন্দোলন করিত, ইংরেজ আমলেও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সে-ধরনের কিছু কিছু আন্দোলন দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে-সব ছিল যেন মৃত বা মৃতকল্পের কণ্ঠধ্বনির মত—ভয়ার্ত এক জাতির শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারের জন্য ক্ষীণ আবেদন। বিজেতাদের রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের ধর্মগত ও সমাজগত যে-কোন পরিবর্তন সাধন করিতে তাহারা একান্ত উদ্‌গ্রীব, বিনিময়ে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকুই ছিল তাহাদের প্রার্থনা। আর ইংরেজ-শাসনে বিজেতাদিগের সহিত তাহাদের ধর্ম অপেক্ষা সামাজিক পার্থক্যই ছিল স্পষ্টতর।

মনে হয়, এ-শতকের হিন্দু-সম্প্রদায়গুলির একটি মাত্র আদর্শ ছিল—তাহাদের ইংরেজ প্রভুর সমর্থন-লাভ। কাজেই ইহাদের অস্তিত্ব যে ব্যাঙের ছাতার মত ক্ষণিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ভারতের বৃহৎ জনসমাজ অতি নিষ্ঠার সহিত এই সম্প্রদায়গুলিকে দূরে পরিহার করিয়া চলিত। জনসাধারণের কাছে ইহাদের স্বীকৃতি ছিল মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ এগুলি লোপ পাইলেই যেন তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল এইরূপ চলিবে, অন্যরূপ হইতে পারে না।

সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ

জাস্টিস রানাডে-কর্তৃক প্রদত্ত Social Conference Address-এর সমালোচনা; 'Prabuddha Bharata' ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ১৯০০ খ্রীঃ ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে লিখিত।

আমরা একবার এক ঘোর ঈশ্বরনিন্দুক ইংরেজের মুখে শুনেছিলাম, 'সাহেবদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর—কিন্তু দোআঁশলা জাতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নন, অন্য কেউ।'

আজ হঠাৎ একটা জিনিষ পড়ে আমাদের ঐ ভাবের একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা কি খুলে বলি।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সংস্কারোৎসাহের জীবন্ত বাণীস্বরূপ মিঃ জাস্টিস রানাডের প্রারম্ভিক অভিভাষণ কিছু দিন হল আমাদের কাছে এসে সমালোচনার জন্য পড়ে রয়েছে। পাঠ করে দেখা গেল, ওতে প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা তালিকা রয়েছে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের উদার ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করেও সুন্দর খাঁটি উপদেশ সব দেওয়া হয়েছে—আর এগুলি এত ভাবের সহিত এবং এমন মোলায়েম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লেই বক্তাকে—বাস্তবিকই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু বক্তৃতাটির শেষ ভাগটায় একটা প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবল নূতন সম্প্রদায়টির জন্য একদল আচার্য গঠন করবার পরামর্শ দেওয়া হযেছে; দেখা গেল—বক্তা যদিও স্পষ্টতঃ ঐ সম্প্রদায়টির নাম করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি, তিনি আর্য সমাজকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলেছেন—যে-সমাজটি, স্মরণ রাখবেন, জনৈক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশটা পাঠ করে আমাদের একটু বিস্ময় বোধ হল। আমাদের মনে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠল যে, ঈশ্বর তো দেখছি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করলে কে?

আমাদের পরিজ্ঞাত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়েই সন্ন্যাসী ছিল ও আছে—হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী; এমন কি যে-ইসলামধর্মে সন্ন্যাসকে অস্বীকার করবার একটা উৎকট ভাব আছে, তা থেকে একটু নরম সুরে নেমে ইসলামপন্থীদেরও দলকে দল ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

সন্ন্যাসী আবার হরেক রকমের—কেউ পুরা মাথা-কামান, কেউ খানিকটা কামান, দীর্ঘকেশ, হ্রস্বকেশ, জটাজুটধারী এবং অন্যান্য নানাবিধ ঢঙের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছেন।

আবার এঁদের পোশাকের তারতম্যও অনেক—কেউ দিগম্বর, কেউ চীরপরিহিত, কেউ কাষায়ধারী, কেউ পীতাম্বর—আবার কৃষ্ণাম্বর খ্রীষ্টান ও নীলাম্বর মুসলমান রয়েছেন। আবার ঐ সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে একদল নানারূপে দেহকে কষ্ট দিয়ে তপস্যার পক্ষপাতী, অপর একদল বলেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্', 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।' প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই সন্ন্যাসীর ভিতর একদল যোদ্ধা ছিল—নাগা-সন্ন্যাসীর দল চিরকালই ছিল। পুরুষজাতির ন্যায় নারীজাতির ভিতরও একই ত্যাগের ভাব এবং সদৃশ শক্তিপ্রকাশ ঠিক যেন সমান্তরাল রেখায় চলে আসছে। সন্ন্যাসীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ও বরাবর ছিল, এখনও আছে। মিঃ রানাডে শুধু যে ভারতীয় সমাজিক সম্মেলনের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেছেন তা নয়, তিনি নারীজাতির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে সদা-বদ্ধপরিকর একজন মহাশয় ব্যক্তিও দেখছি। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সন্ন্যাসিনীবৃন্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে বলে বোধ হচ্ছে। প্রাচীনকালের অবিবাহিত ব্রহ্মবাদিনীরা, যাঁরা বড় বড় দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে এক রাজসভা থেকে আর এক রাজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বংশবৃদ্ধি, তাতে বাধা দিয়েছেন বলে তাঁর আশঙ্কা নেই —এই রকমই মনে হয়; আর মিঃ রানাডের মতে—পুরুষরা সন্ন্যাসী হয়ে যেমন মানবীয় অভিজ্ঞতার পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, নারীরাও সেই একই প্রকার কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করে ঐরূপ বঞ্চিত হয়েছেন, তা বোধ হয় না।

সুতরাং আমরা প্রাচীন সন্নাসিনীকুল ও তাঁদের আধুনিক আধ্যাত্মিক বংশধরগণকে মিঃ রানাডের সমালোচনা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ছেড়ে দিলাম।

তা হলে চূড়ান্ত দোষী পুরুষকেই শুধু মিঃ রানাডের সমালোচনার সব চোটটা সহ্য করতে হচ্ছে। এখন দেখা যাক, এই চোটটা খেয়েও সে সামলে উঠতে পারে কিনা।

আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই বিষয়ে যেন একমত বলে বোধ হয় যে, এই যে জগদ্ব্যাপী সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের প্রথা, তার প্রথম উৎপত্তি আমাদের এই অদ্ভুত দেশটাতে—যে দেশটাতেই এত 'সমাজসংস্কার'-এর দরকার বলে বোধ হচ্ছে।

সন্ন্যাসী গুরু ও গৃহস্থ গুরু, কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্মাচার্য—উভয় প্রকার আচার্যই বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। 'সকল বিষয়ে চৌকস্',—সব বিষয়ের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সোমপায়ী বিবাহিত গৃহস্থ ঋষিদেরই প্রথম অভ্যুদয় হয়েছিল, অথবা মানবোচিত অভিজ্ঞতাহীন সন্ন্যাসী ঋষিই প্রথমে হয়েছিলেন—এখন অবশ্য এ সমস্যার একটা মীমাংসা করা কঠিন। সম্ভবতঃ মিঃ রানাডে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উড়ো কথার উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে আমাদের জন্য এই সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। যতদিন না এ মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন প্রাচীনকালের 'বীজ ও বৃক্ষ'-এর সমস্যার মত এই একটা সমস্যাই থেকে যাবে।

কিন্তু উৎপত্তির ক্রম যাই হোক, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত সন্ন্যাসী আচার্যগণ গৃহস্থ আচার্যগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, সেই ভিত্তি হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, তবে ব্রহ্মচর্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জীবহত্যাকারী যাজ্ঞিকগণ উপনিষদ্বক্তা হতে পারলেন না কেন?—জিজ্ঞাসা করি, কেন?

একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ ঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন—খুব কম করে বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরনের! আবার অন্যদিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ঋষিগণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন, যার অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্যন্ত প্রাণভরে পান করে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তি লাভ করেছিলেন, এবং যা পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিন-চার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজসংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শক্তি পর্যন্ত দান করছে।

বর্তমান কালে আমাদের সমাজসংস্কারকগণের বেতন ও সুবিধাগুলির তুলনায় ভিক্ষু- সন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে কি সাহায্য, কি প্রতিদান পেয়ে থাকেন? আর সন্ন্যাসীর নীরব নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কার্যের তুলনায় সমাজসংস্কারকগণ কি কাজই বা করে থাকেন?

কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো আর আধুনিকদের মত নিজের বিজ্ঞাপন নিজে প্রচার করবার, নিজের ঢাক নিজে বাজাবার উপায়টা শেখেননি।

এ জগৎটা যেন কিছুই নয়, একটা স্বপ্নমাত্র—এ ভাবটা হিন্দু মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে। এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে একমত—কিন্তু পাশ্বাত্যগণ এর পরে আর কিছু দেখে না, তাই সে চার্বাকের মত সিদ্ধান্ত করে বসে, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।' এই পৃথিবীটা একটা দুঃখপূর্ণ গহ্বর মাত্র, এখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় ভোগ করে নেওয়া যাক। হিন্দুদের দৃষ্টিতে কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—এই জগৎ যতদূর সত্য, তার চেয়েও অনন্তগুণে সত্য; সুতরাং ঈশ্বর ও আত্মার জন্য জগৎটাকে ত্যাগ করতে হিন্দু প্রস্তুত।

যতদিন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এইরূপ চলবে, আর আমরা ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিগণ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বত্যাগ করবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা করতে পারেন?

আর সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত আপত্তিটা ইওরোপে প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙালী সংস্কারকগণ তাঁদের কাছ থেকে ঐটি ধার করে নিয়েছেন, আর এখন আবার আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ সেটি আঁকড়ে ধরেছেন—অবিবাহিত থাকার দরুন সন্ন্যাসীরা জীবনের 'পূর্ণ উপভোগ ও নানা রকমের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত।' আশা করি, এইবার ঐ মড়াটা চিরদিনের জন্য আরব সাগরে ডুবে যাবে—বিশেষতঃ এই প্লেগের দিনে আর হয়তো ঐ স্থানের উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের পরম সৌরভময় শবদেহের প্রতি প্রবল ভক্তি থাকতে পারে,—তাঁদের পূর্বপুরুষের বিবরণ নির্ণয় করতে যদি পৌরাণিক কাহিনীর কিছু মূল্য আছে স্বীকার করা যায়—তা সত্ত্বেও।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়ছে বলি—ইওরোপে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরাই বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন; তাঁদের পিতামাতা বিবাহিত হলেও তাঁরা 'জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা'র রসাস্বাদ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

তারপর অবশ্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে এ-কথা তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটি বৃত্তি দিয়েছেন—কোন না কোন ব্যবহারের জন্য; সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না, তিনি অন্যায় কাজ করেছেন—তিনি পাপী। বেশ, তা হলে তো কাম ক্রোধ চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন—আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবন-রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনের সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি ঐগুলিও পুরাদমে চালাতে হবে নাকি? অবশ্য সমাজসংস্কারকদলের সঙ্গে যখন সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁরা যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তাও ভাল রকম অবগত আছেন, তখন

তাঁদের এই প্রশ্নের ‘হাঁ’-জবাবই দিতে হবে। আমাদের কি উগ্রস্বভাব বিশ্বামিত্র অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের, বিশেষতঃ নারীর সাহচার্যে ‘পুরামাত্রায় নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী’ বশিষ্ঠবংশের অনুসরণ করতে হবে?—কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থ ঋষিই বৈদিক সূক্ত পাঠ ও সোমপানের জন্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, যখন যেখানে পেরেছেন, তখন সেখানেই পুত্রোৎপাদনের বিষয়ে উদারতার জন্যও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ—এঁদের অথবা যে-সকল অবিবাহিত সন্ন্যাসী ঋষি ব্রহ্মচর্যকেই ধর্মের মূলমন্ত্র বলে প্রচার করে গেছেন, আমরা তাঁদের অনুসরণ করব?

তারপর অবশ্য ভ্রষ্টের দল তো রয়েছেই, তাদের মাথায় তো গালাগালের বোঝা পড়াই উচিত—যে-সকল সন্ন্যাসী তাঁদের আদর্শ ঠিক ধরে রাখতে পারেননি, সেই দুর্বল অসৎপ্রকৃতি সন্ন্যাসীর দল।

কিন্তু আদর্শটি যদি খাঁটি ও সরল হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে-কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ চলতি কথাতেই আছে—‘ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল।’ যে কখনও উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি, সেই কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় ভ্রষ্টসন্ন্যাসী তো বীর।

আমাদের সমাজসংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের খবর যদি ভাল করে নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা দেবতাদের ভাল করে গুনতে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাজকর্মের এ-রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর যে-দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয়-মধ্যেই।

কিন্তু এদিকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারও কিছু সাহায্য চাইছে না, জীবনে যত ঝড়-ঝাপটা আসছে সব বুক পেতে নিচ্ছে—কাজ করছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমন কি কর্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণে পরিচিত, সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। সারা জীবন কাজ চলছে—আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ চলছে—কারণ ক্রীতদাসের মত জুতোর ঠোক্কর মেরে তাকে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কার্যের মূলে নেই।

এ কেবল সন্ন্যাসীই পারে। ধর্মের কথা কি বল? তা থাকা উচিত, না একেবারে অন্তর্হিত হবে? ধর্ম যদি থাকে, তবে কর্মসাধনে বিশেষ অভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক—ধর্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ তিনি ধর্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈন্যস্বরূপ। যতদিন একদল একনিষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্ ধর্মের বিনাশাশঙ্কা?

প্রোটেষ্ট্যান্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকা ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছে কেন?

বেঁচে থাকুন রানাডে ও সমাজসংস্কারকদল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত, বৎস, ভুলো না, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছ না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা।

ভারতের মানুষ

১৯৯০ খ্রীঃ ১৯ মার্চ, সোমবার ‘ওকল্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার’-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ বক্তৃতাটির সারমর্ম প্রকাশিত।

সোমবার রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন পর্যায়ে ‘ভারতের মানুষ’ সম্পর্কে যে ভাষণ দেন, তা শুধু সে-দেশের লোকের সম্বন্ধে তথ্য-বর্ণনার জন্যই নয়, এরূপ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েও তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কার-সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তার জন্যই মনোজ্ঞ হয়েছিল। বস্তুতঃ বালবিধবা, নারী-পীড়ন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এরূপ নানা বর্বরতার অভিযোগের আলোচনা শুনে শুনে তিনি স্পষ্টতই অনেকটা বিরক্ত হয়েছেন এবং উত্তরে পাল্টা অভিযোগ করার কিছুটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

ভাষণের প্রারম্ভে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ভারতবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারতে ঐক্যের বন্ধন হল ধর্ম, ভাষা বা গোষ্ঠী (race) নয়। ইওরোপে গোষ্ঠী (race) নিয়েই জাতি (nation)। কিন্তু এশিয়ায়—যদি ধর্ম এক হয়, তবে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে।

উত্তর-ভারতের মানুষকে চারটি বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কিন্তু উত্তর-ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-ভারতের ভাষাগুলি এতই স্বতন্ত্র যে, কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর-ভারতের লোকেরা মহান্ আর্যজাতিসম্ভূত—যা থেকে পিরেনিজ পর্বতমালার (Pyrenees) বাস্‌ক্ জাতি (Basques) এবং ফিন্‌ জাতি (Finns) ভিন্ন সমগ্র ইওরোপের মানুষ উদ্ভূত বলে অনুমিত হয়। দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসিগণ প্রাচীন মিশর বা সেমিটিক জাতির সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষে পরস্পরের ভাষা-শিক্ষার অসুবিধার কথা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেন যে, যখন তাঁর দক্ষিণ-ভারতে যাবার সুযোগ হয়েছিল, তখন সংস্কৃত-জানা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদ দিয়ে তাঁকে স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলতে হত।

জাতিভেদ-প্রথার আলোচনাতেই বক্তৃতার অনেকাংশ নিয়োজিত হয়। এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে স্বামীজী বলেনঃ প্রথাটি অবশ্যই এখন খারাপ দিকে যাচ্ছে, পূর্বে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই ছিল বেশী, অপকারিতার চেয়ে উপকারিতাই ছিল বেশী। সংক্ষেপে বলা চলে, পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার বৃত্তি গ্রহণ করবে—এই রীতি থেকেই এর উৎপত্তি। কালক্রমে এই বৃত্তিগত সম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই প্রথা মানুষকে যেমন বিভক্ত করেছে, তেমনি আবার সম্মিলিতও করেছে, কারণ এক শ্রেণী বা জাতি-ভুক্ত ব্যক্তি তার স্বজাতিকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ, এবং যেহেতু কোন ব্যক্তিই তার নিজের শ্রেণী বা জাতির গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, সেজন্য অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য-বিস্তারের যে-সংগ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, হিন্দুদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

জাতিভেদের সবচেয়ে মন্দ দিক হল এই যে, এতে প্রতিযোগিতা দমিত থাকে এবং প্রতিযোগিতার অভাবই বাস্তবিক পক্ষে ভারতের রাজনীতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কারণ।

বহু-আলোচিত বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক; সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তারা মোটেই ভাল বলে মনে করে না, কারণ যে-কোন দুটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ অবশ্যই বড়। ‘আমি জেনীকে ভালবাসি এবং জেনী আমাকে ভালবাসে—অতএব আমাদের এই বিবাহ করতে হবে’—এ-যুক্তির কোন সঙ্গত কারণ নেই।

বালবিধবাদের শোচনীয় অবস্থার যে-চিত্র আঁকা হয়ে থাকে, তার সত্যতা অস্বীকার করে তিনি বলেন যে, ভারতে সাধারণভাবে বিধবাদের বিস্তর প্রতিপত্তি, কারণ সে-দেশে সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। বস্তুতঃ বিধবারা এমন একটা স্থান অধিকার করে আছে যে, মেয়েরা এবং হয়তো পুরুষরাও পরজন্মে ‘বিধবা’ হবার জন্য সম্ভবতঃ প্রার্থনাও করে থাকে!

বিবাহের পূর্বেই মারা গেছে—এমন বালকদের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা যে-সব মেয়ে, তাদের ও বালবিধবাদের প্রতি করুণা-প্রদর্শন সাজত তখনই, যদি বিবাহই জীবনের একমাত্র বা মূল উদ্দেশ্য হত। কিন্তু হিন্দু চিন্তাধারা অনুসারে বিবাহ বরং একটি কর্তব্য, কোন বিশেষ অধিকার ও সুযোগ নয়; এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার না থাকা বিশেষ একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়।

ভারতের রীতিনীতি

১৮৯৪ খ্রীঃ ১৫ ফেব্রুআরী বৃহস্পতিবার ডেট্রয়েটে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বিবরণী—‘ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস’-এর সম্পাদকীয় বক্তব্য সহ।

গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে হল-ভরতি শ্রোতৃবৃন্দ খ্যাতনামা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ করে, তিনি তাঁর দেশের রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে বলেন। তাঁর বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহারে শ্রোতারা আনন্দিত হয়; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা তাঁর বক্তৃতা শোনে, মাঝে মাঝে উচ্চ করতালি-ধ্বনি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত সুবিখ্যাত বক্তৃতার চেয়েও তাঁর এই বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু ছিল অধিকতর জনপ্রিয়। ভাষণটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল; বিশেষতঃ সেই অংশগুলি, যেখানে বক্তা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর স্বদেশবাসীদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অবস্থার সুনিপুণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও দার্শনিক (এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক) প্রসঙ্গেই এই প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী এবং যখন তিনি প্রকৃতির মহৎ ও সহজ নৈতিক নিয়মের বিবেক-সম্মত কর্তব্যের কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিয়ন্ত্রিত কোমল কণ্ঠস্বর (যা তাঁর জাতির বৈশিষ্ট্য) এবং তাঁর রোমাঞ্চকর ভঙ্গি অনেকটা একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মতই মনে হচ্ছিল। শ্রোতাদের নিকট কোন নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় ছাড়া তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় তাঁর বাগ্মিতায় চরমোৎকর্ষ দেখা যায়।

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, ভারতে নৈতিকতার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশপ নিন্‌ডে (Bishop Ninde)। সানন্দচিত্তে বিবেকানন্দের পরিচয় প্রদান করে তিনি ভারতের আশ্চর্য বস্তু সম্বন্ধে ও সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধির উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করেন। পাগড়ি-মাথায় উজ্জ্বল আলখাল্লা-পরা এবং বুদ্ধিদীপ্ত-চক্ষুবিশিষ্ট সেই শ্যামবর্ণ ভদ্রমহোদয় যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক মনোমুগ্ধকর মূর্তি। বিশপের সহৃদয় বাক্যের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁর স্বদেশের জাতিভেদ, লোকের আচার-ব্যবহার ও ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলেনঃ

মূলত উত্তর-ভারতে চারটি ভাষা এবং দক্ষিণ-ভারতে চারটি, কিন্তু ধর্ম উভয়ত্র এক। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হিন্দু এবং এই হিন্দু জাতিটি কিছুটা অদ্ভুত। ধর্মীয় রীতি অনুসারে হিন্দু সব কাজ করে; ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সে আহার করে, প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে, ধর্মের নির্দেশ অনুসারে সে সৎকর্ম করে এবং অসৎ কাজও করে ধর্মভাবে।

এই সময়ে বক্তা তাঁর ভাষণের শ্রেষ্ঠ নৈতিক সার কথাটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ তাঁর স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস—সকল স্বার্থশূন্য কাজই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। অতএব হিন্দুর মতে নিজের জন্য গৃহনির্মাণ স্বার্থপরতা; হিন্দু গৃহনির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনা এবং অতিথিসেবার জন্য। নিজের জন্য আহার্য-রন্ধন স্বার্থপরতা; তাই সে রন্ধন করে দরিদ্রসেবার জন্য; যদি কোন ক্ষুধার্ত আগন্তুক প্রার্থী আসে, তবে আগে তার সেবা করে অবশেষে সে নিজে আহার্য গ্রহণ করে—এই ভাবটি দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। যে কেউ খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রার্থী হোক না কেন, সব দরজাই তার জন্য খোলা থাকবে।

জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকের বৃত্তি বংশগত—একজন ছুতোর-মিস্ত্রীর ছেলে ছুতোর হয়েই জন্মায়; স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর এবং পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। তবে এই সামাজিক দোষত্রুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, এ প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাত্র; কালের এই পরিণাম ভারতে খুব দীর্ঘ বলে বিবেচিত হয় না, যেমন মনে করা হয় এদেশে বা অন্য সকল দেশে।

দু-রকমের দান বিশেষভাবে সমাদৃত—শিক্ষাদান এবং প্রাণদান। কিন্তু শিক্ষাদানই অগ্রাধিকার লাভ করে। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা খুব ভাল; তাকে শিক্ষাদান করা তার চেয়েও ভাল। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া গর্হিত কাজ এবং যে-ব্যক্তি ব্যবসার সামগ্রীর মত শিক্ষার বিনিময়ে কাঞ্চন গ্রহণ করে, তার উপর ধিক্কার বর্ষিত হয়। সরকার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাহায্য করে থাকেন। তার ফলে তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে যে- পরিবেশ বজায় আছে, এখানে নৈতিক ফলাফল তার চেয়ে শুভকর হয়েছে।

বক্তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বেড়িয়েছিলেন, সভ্যতার সংজ্ঞা কি? প্রশ্নটি তিনি আরও বহু দেশে জিজ্ঞাসা করেছেন। কখনও উত্তর পেয়েছেন, ‘আমরাই হলাম সভ্যতার মাপকাঠি।’ তিনি সবিনয়ে জানান—শব্দটির সংজ্ঞা

সম্বন্ধে তাঁর মত অন্য রকম। কোন জাতি হয়তো প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে পারে, জনহিতকর প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান করে ফেলতে পারে, তথাপি এ কথা তাদের বোধগম্য নাও হতে পারে যে, যে-ব্যক্তি নিজেকে জয় করার শিক্ষা লাভ করেছে, সেই ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা পরিস্ফুট। পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে এই পরিবেশটি ভারতে অধিক বর্তমান, কারণ সেখানে বস্তুগত পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশের অধীন এবং প্রত্যেকেই সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশ দেখতে সচেষ্ট এবং প্রকৃতিকেও একই ভাবে দেখে। এখানেই দেখা যায়—ভাগ্যের নির্দয় পরিহাসকে অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার মত ধীর মনোভাব; এই অবস্থায় অন্য যে-কোন জাতির চেয়ে এখানে অধিকতর আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। এই দেশ ও জাতির ভেতর থেকে একটি অফুরন্ত স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে, যা দেশ-বিদেশের বহু চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এরা সহজেই ঘাড় থেকে পার্থিব বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে যে প্রাচীন রাজা আদেশ করেছিলেন, 'আর কোন রক্তপাত বা কোন যুদ্ধ করা চলবে না' এবং যিনি সৈনিকের বদলে পাঠিয়েছিলেন একদল শিক্ষক, তিনি জ্ঞানীর মত কাজই করেছিলেন, যদিও বাস্তবতার দিক্ থেকে দেশ তার ফলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু বল-প্রয়োগকারী বর্বর জাতিগুলির অধীনতা স্বীকার করলেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা চিরকাল বেঁচে আছে; কারও সাধ্য নেই, সেটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। নিষ্ঠুর ভাগ্যের আঘাত সহ্য করার মত খ্রীষ্টসুলভ নম্রতা ভারতের মানুষের আছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের আত্মা উজ্জ্বলতর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এরূপ দেশে 'ভাবপ্রচার'-এর জন্য কোন খ্রীষ্টান মিশনারীর প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের ধর্ম মানুষকে ধীর, মধুর, বিবেচক এবং মনুষ্য-পশু-নির্বিশেষে ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তোলে। নৈতিকতার দিক্ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারত উচ্চে। মিশনারীরা যদি কেবল সেখানকার পবিত্র বারি পান করতে বা সেই মহান্ জাতির উপর বহু পবিত্র জীবনের কী অপূর্ব প্রভাব পড়েছে—তা দেখতে যান, তবেই ভাল করবেন।

তারপর বক্তা বিবাহের রীতিনীতি ও প্রাচীনকালে যখন সহশিক্ষা-প্রথার প্রচলন ছিল, তখন নারীদের যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, তার বর্ণনা করেন। ভারতের ঋষিদের লেখায় প্রত্যাদিষ্ট নারীর অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই পুরুষ, কিন্তু ভারতের পূতচরিত্র নারীগণ ধর্মগ্রন্থসমূহর উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। গৃহস্থদের উপাসনার অঙ্গ পাঁচটি, তার মধ্যে একটি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা; আর একটি হল মূক প্রাণীর সেবা, এই উপাসনাটি আমেরিকানদের পক্ষে বোঝা শক্ত। ইওরোপীয়দের পক্ষেও এই ভাবটি উপলব্ধি করা সহজ নয়। অন্যান্য জাতি পাইকারী হারে প্রাণী হত্যা করে এবং নিজেরাও পরস্পর হানাহানি করে মরে, রক্তের সমুদ্রে তারা বাস করে।

একজন ইওরোপীয় বলেছিল, ভারতবাসীরা যে প্রাণী হত্যা করে না, তার কারণ তারা মনে করে, প্রাণীদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মা আছে। পশুর স্তর থেকে যারা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, তাদের পক্ষেই এ-ধরনের যুক্তি সাজে। আসলে এটা ভারতের এক শ্রেণীর নাস্তিকের উক্তি—এ ভাবে তারা বেদের 'অহিংসা ও পুনর্জন্মবাদ'-এর দোষ দর্শন করে থাকে। এ রকম ধর্মীয় মতবাদ কোনকালে ছিল না। এটা জড়বাদী বিশ্বাস। মূক প্রাণীর উপাসনার একটি উজ্জ্বল চিত্র বক্তা তুলে ধরেন।

ভারতের অপূর্ব বিধি অতিথিপরায়ণতা একটি গল্পের মাধ্যমে তিনি চিত্রিত করেন। একদা দুর্ভিক্ষের দরুন এক ব্রাহ্মণকে—তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূসহ কিছুকাল অনাহারে কাটাতে হয়। গৃহস্বামী খাদ্যের অন্বেষণে বাইরে গিয়ে সামান্য পরিমাণ ছাতু সংগ্রহ করে আনেন; বাড়িতে এসে তিনি তা চার ভাগে ভাগ করেন এবং যখন সেই ছোট্ট পরিবারটি আহার করতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। আগন্তুক একজন ক্ষুধার্ত অতিথি। ভাগগুলি তখন অতিথির সামনে দেওয়া হল এবং সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে চলে গেল, আর এদিকে অতিথি-সেবাপরায়ণ সেই চারজন মৃত্যু বরণ করল। আতিথেয়তার পবিত্র নামে ভারতে যা আশা করা যায়, এই গল্পটি তারই আদর্শ-রূপে বলা হয়ে থাকে।

সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে বক্তা তাঁর ভাষণ শেষ করেন। তাঁর বক্তব্য আগাগোড়া সহজ সরল; কিন্তু যখনই তিনি কোন চিত্র বর্ণনায় রত হন, তখন তা অপূর্ব কাব্যের মত শোনায়, তা থেকে প্রমাণিত হয়, পূর্বদেশীয় ভ্রাতা প্রকৃতির সৌন্দর্য কত গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর অপরিমিত আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ শ্রোতাগণ অনুভব করেন, কারণ তা চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসা-রূপে এবং সমন্বয়ের ঐশী বিধান ও কল্যাণকর অভিপ্রায়ের বিচিত্র কার্যরীতির গভীরে প্রবেশ করবার প্রখর অন্তর্দৃষ্টি-রূপে স্বতঃপ্রকাশিত।

ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ?

ডেট্রয়েট শহরে একটি ভাষণের বিবরণী ১৮৯৪ খ্রীঃ ৫ এপ্রিল তারিখের 'বোষ্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছেঃ

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট শহরে আসিয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর নরনারী তাঁহার ভাষণ শুনিতে আসিত, বিশেষতঃ ধর্মযাজকগণ তাঁহার অভিমতের অকাট্য যুক্তিজাল দ্বারা অতিশয় আকৃষ্ট হইতেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, একমাত্র স্থানীয় নাট্যশালাটিতেই তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইত। তিনি অতি বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন, দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাঁহার, স্বভাবও তেমনই সুন্দর। ডেট্রয়েট শহরের সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার বিবরণী প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট স্থান দিয়াছে।

'ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ' পত্রিকা একদিনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেনঃ বেশীর ভাগ লোকই মনে করিবেন যে, গত সন্ধ্যায় নাট্যশালায় প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ এই নগরে প্রদত্ত অন্য বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যথার্থ এবং বিকৃত খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দেন, কোন্ অর্থে তিনি নিজেকে একজন খ্রীষ্টান বলিয়া মনে করেন এবং কোন্ অর্থে করেন না। তিনি যথার্থ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি নিজেকে 'হিন্দু' মনে করেন। তিনি সর্বপ্রকার সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেনঃ

আমরা যীশুর প্রকৃত বার্তাবহদের চাই। তাঁহারা দলে দলে হাজারে হাজারে ভারতে আসুন, যীশুর মহৎ জীবন আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরুন এবং আমাদের সমাজের গভীরে তাঁহার ভাব অনুস্যূত করিতে সহায়তা করুন। যীশুকে তাঁহারা ভারতের প্রত্যেক গ্রামে—প্রতি প্রান্তে প্রচার করুন।

যখন কোন ব্যক্তি মুখ্য বিষয়ে এতখানি নিশ্চয়, তখন তিনি আর যাহা বলুন না কেন, তাহা গৌণ বিষয়ের বিশদ উল্লেখমাত্র। যাঁহারা এতদিন যাবৎ গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যদেশে এবং ভারতের প্রবালাকীর্ণ সমুদ্রতটে আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আচার ও জীবন-নীতির ব্যাপারে একজন পৌত্তলিক ধর্মযাজকের এই উপদেশ-বর্ষণ এক দারুণ অপমানকর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। অধিকাংশ সংশোধনের পক্ষে অবমাননা-বোধ অপরিহার্য। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তকের মহিমান্বিত জীবন-সম্পর্কে আলোচনার পর—সুদূর বিদেশী জাতিগুলির সম্মুখে যাঁহারা খ্রীষ্ট-জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেন বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছিল; এবং তাঁহার উপদেশ অনেকাংশে সেই নাজারেথবাসী যীশুখ্রীষ্টের উক্তির মতই শোনাইতেছিলঃ

'তোমার অর্থপেটিকায় স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র সংগ্রহ করিও না, পরিধানের নিমিত্ত পোশাক ও জুতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না, এমন কি নিজের নিমিত্ত একখানি ভ্রমণ-যষ্টিও সংগ্রহ করিও না; কারণ প্রত্যেক শ্রমিকই তাহার আহার্য পাইবার অধিকারী।'

যাঁহারা বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতীচ্য-দেশীয়গণের সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে, এমন কি ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ের মনোভাব—যাহাকে বিবেকানন্দ 'দোকানদারি মনোবৃত্তি' আখ্যা দিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রাচ্য-দেশীয়গণের ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

বিষয়টি ধর্মপ্রচারকদের পক্ষে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা পৌত্তলিক প্রাচ্য জগৎকে ধর্মান্তরিত করিতে চান, পার্থিব জগতের সাম্রাজ্য এবং বৈভবকে ঘৃণাসহকারে পরিহারপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজ-প্রচারিত ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।

ভ্রাতা বিবেকানন্দ নৈতিক দিক্ হইতে ভারতকে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলিয়া মনে করেন। পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতের আধ্যাত্মিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ডেট্রয়েটে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা-সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি বিবরণীর অংশবিশেষ এখানে প্রদত্ত হইলঃ

নিরহঙ্কার-ভাবই পুণ্য এবং সকল প্রকার অহং-ভাবই পাপ—এই মর্মে ভারতীয়দের যে-বিশ্বাস বর্তমান, এইখানে তাহা উল্লেখ করিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার মূল নৈতিক সুরটি ধ্বনিত করেন। গত সন্ধায় বক্তৃতায় উক্ত ভাবেরই প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহাকেই তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম বলা যাইতে পারে।

হিন্দু বলেন, নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করা স্বার্থপরতার কাজ, সেই জন্য উহা ঈশ্বরের পূজা ও অতিথিসেবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। নিজের উদরপূর্তির জন্য আহার্য প্রস্তুত করা স্বার্থপরতার কাজ, সুতরাং দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য আহার্য প্রস্তুত করা হয়। ক্ষুধার্ত অতিথির আবেদন পূর্ণ করিবার পর হিন্দু স্বয়ং অন্নগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। এই মনোভাব দেশের সর্বত্র প্রকট। যে-কোন ব্যক্তি গৃহস্থের নিকট আসিয়া আহার ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারে এবং সকল গৃহের দ্বারই তাহার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

জাতিভেদ-প্রথার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। কোন ব্যক্তি তাহার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়—উত্তরাধিকারসূত্রে; সূত্রধর সূত্রধর-রূপেই জন্মগ্রহণ করে, স্বর্ণকার স্বর্ণকার-রূপেই, শ্রমিক শ্রমিক-রূপেই এবং পুরোহিত পুরোহিত-রূপেই।

দুই প্রকার দান বিশেষ প্রশংসার্হ, বিদ্যাদান আর প্রাণদান। বিদ্যাদানের স্থান সর্বাগ্রে। অপরের জীবন রক্ষা করা উত্তম কর্ম, বিদ্যাদান অধিকতর উত্তম কর্ম। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান পাপ, পণ্যের ন্যায় অর্থের বিনিময়ে যিনি বিদ্যা বিক্রয় করেন, তিনি নিন্দার্হ। সরকার মধ্যে মধ্যে এই-সকল শিক্ষাদাতাকে সাহায্য প্রদান করেন এবং তাহার নৈতিক ফল তথাকথিত কোন কোন সুসভ্য দেশে যে-ব্যবস্থা বর্তমান, তাহা অপেক্ষা উত্তম।

বক্তা এ-দেশের সর্বত্র সভ্যতার সংজ্ঞা-সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। এ প্রশ্ন তিনি অন্যান্য দেশেও করিয়াছেন। অনেক সময় উত্তরের মর্ম হইতঃ আমরা যাহা, তাহাই সভ্যতা। তিনি উক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

তাঁহার মতেঃ কোন জাতি জলে স্থলে এমন কি সমস্ত পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে এবং জীবনের উপযোগিতা-বিষয়ক সমস্যাগুলির আপাত-সমাধান করিতে পারে, তথাপি সভ্যতা ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব হইয়া উঠে না। যে আপন আত্মাকে জয় করিতে পারিয়াছে, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা তাহারই মধ্যে পরিস্ফুট। জগতে অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই এইরূপ অবস্থা অধিক দৃষ্ট হয়—কারণ সেখানে ঐহিক বিষয় গৌণ, আধ্যাত্মিকতার সহায়কমাত্র। ভারতীয়গণ প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত সকল বস্তুর মধ্যে আত্মার বিকাশ দর্শন করেন, এবং প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহারা এই দৃষ্টিকোণ হইতেই অর্জন করেন। সুতরাং অদম্য ধৈর্যেরস হিত কঠিনতম দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার মত ধীর প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা ভারতে রহিয়াছে। সেইজন্য সেখানে এমন একটি জাতি আছে, যাহাদের নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারা দূরদূরান্তের চিন্তানায়কদের আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদের স্কন্ধ হইতে পীড়াদায়ক সাংসারিক বোঝা লাঘব করিতে আহ্বান জানাইয়াছে।

এই বক্তৃতার মুখবন্ধে বলা হয় যে, বক্তাকে বহু প্রশ্ন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনি বক্তৃতামঞ্চ হইতেই দিলেন। এই তিনটিকে নির্বাচন করিবার কারণ ক্রমশঃ জানা যাইবে। এই তিনটি প্রশ্ন হইলঃ (১) ভারতবাসীরা কি তাহাদের সন্তানদের কুমিরের মুখে সমর্পণ করে? (২) তাহারা কি নিজেদের জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে নিক্ষেপ করে? (৩) তাহারা কি বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত একত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনি সেই সুরেই দিলেন, যে-সুরে একজন আমেরিকাবাসী বিদেশে ভ্রমণকালে—নিউ ইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় কিনা, অথবা ইওরোপে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন—এরূপ উপকথা-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন! স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উক্ত প্রথম প্রশ্নটি অত্যন্ত হাস্যকর এবং উত্তর-দানের অযোগ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে।

যখন কতিপয় সদাশয় অথচ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন, 'কি কারণে কেবল বালিকাদেরই কুমিরের মুখে সমর্পণ করা হয়?'—তখন তিনি বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দেন, 'বোধ হয় তাহারা অধিকতর নরম ও কোমল বলিয়া, এবং সেই তমসাচ্ছন্ন দেশের জলাশয়সমূহের অধিবাসিগণ দন্তদ্বারা সহজেই তাহাদের চর্বণ করিতে পারিবে বলিয়া এইরূপ করা হয়।'

জগন্নাথ-সম্পর্কিত গল্প সম্বন্ধে বক্তা পবিত্র নগরের—পুরীর প্রাচীন রথযাত্রা-উৎসব বর্ণনা করিয়া এই মন্তব্য করেন যে, সম্ভবতঃ রথের রজ্জু ধরিবার ও টানিবার আগ্রহাতিশয্যে কিছুসংখ্যক পুণ্যকামী ব্যক্তি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবে। এই ধরনের কিছু দুর্ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া এমন বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

বিধবাদের অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার কথা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন, এবং সত্য তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, হিন্দু বিধবাগণ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন স্বেচ্ছায়।

যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিতেছে, সেখানে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা, যাঁহারা সর্বকালে আত্মহত্যার বিরোধী, তাঁহারা বিধবাদের উক্ত কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন; এবং যে-সকল ক্ষেত্রে স্বাধ্বী বিধবাগণ লোকান্তরে স্বামীর সহগামী হইবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এই অগ্নিপরিক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যদি তাঁহারা হস্ত-দুইখানি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐকান্তিক বাসনা পূরণে আর কোন বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই একমাত্র দেশ নয়, যেখানে নারী প্রেমবশতঃ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার অনুগমন করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল দেশেই কিছু নারী প্রাণবিসর্জন করিয়াছে। যে-কোন দেশেই এই ধরনের আবেগ বিরল, এবং ভারতবর্ষেও ইহা অন্যান্য দেশের মতই নিত্যকার সাধারণ ব্যাপার নয়।

বক্তা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন, ভারতবাসীরা নারীগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করেন না, এবং তাঁহারা কখনও 'ডাইনী' হত্যা করেন নাই।

বক্তার শেষোক্ত শ্লেষটি অতি তীব্র। এই হিন্দু সন্ন্যাসীর দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন এখানে নাই, শুধু এইটুকু বলিলেই হইবে যে, ইহার সাধারণ ভিত্তি হইল—অনন্তের উপলব্ধির জন্য আত্মার যে-প্রয়াস তাহারই উপর। একজন পণ্ডিত হিন্দু এই বৎসর লাওয়েল ইনস্টিট্যুটের পাঠক্রমের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার যাহার সূচনা করিয়া- ছিলেন, ভ্রাতা বিবেকানন্দ যোগ্যতার সহিত তাহারই উপসংহার করিলেন।

এই নূতন পর্যটকের ব্যক্তিত্ব অধিকতর আকর্ষণীয়, যদিও হিন্দু দর্শনের মতানুয়ায়ী ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বিবেকানন্দকে কার্যসূচীর শেষের দিকে রাখিতেন, যাহাতে শ্রোতাগণ তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তা দীর্ঘ নীরস বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, এবং শ্রোতাগণ দলে দলে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, তখন সম্মেলনের সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেন, সমাপ্তিসূচক স্বস্তিবাচনের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিবেন; তখনই শ্রোতারা শান্ত হইত। চার সহস্র নরনারী অসহ্য গরমে পাখা ব্যজন করিতে করিতে স্মিতমুখে ও সাগ্রহে বিবেকানন্দের পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপর বক্তাদের বক্তৃতাকালে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সভাপতি সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুটিকে শেষে পরিবেশন করিবার পুরাতন রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।

হিন্দু ও খ্রীষ্টান

১৮৯৪ খ্রীঃ, ২১ ফেব্রুআরী ডেট্রয়েটে প্রদত্ত 'Hindus and Christians' বক্তৃতার অনুবাদ।

বিভিন্ন দর্শনের তুলনায় দেখা যায়, হিন্দুদর্শনের প্রবণতা ধ্বংস করা নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে সমন্বয় সাধন করা। যদি ভারতে নতুন কোন ভাব আসে আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ করে নিই, অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ—ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। শ্রীভগবান্ এই অবতারেই প্রথম প্রচার করে গেছেন, 'আমি ঈশ্বরের অবতার, আমিই বেদাদি গ্রন্থের প্রেরয়িতা, আমি সকল ধর্মের উৎস।' তাই আমরা কোন ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে বড়ই পার্থক্য, এটি আমাদের কেউ কোন দিন শেখায়নি। সেটি হচ্ছে যীশুর রক্ত দিয়ে মুক্তি, অথবা একজনের রক্তদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ হতে হবে। য়াহুদীদের মত বলিদান-প্রথা আমাদেরও আছে। আমাদের এই বলি বা উৎসর্গ-প্রথার সহজ অর্থঃ আমি কিছু খেতে যাচ্ছি, কিছু অংশ ঈশ্বরকে নিবেদন না করাটা ভাল নয়। তাই আমি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি; সহজে সংক্ষেপে এই হল ভাবটি। তবে য়াহুদীর ধারণা উৎসর্গীকৃত মেষটির উপর তার পাপরাশি চলে যাবে, আর সে পাপমুক্ত হবে। এই 'সুন্দর' ভাবটি আমাদের দেশে বিকাশলাভ করেনি, তার জন্যে আমি আনন্দিত। অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে আমি কখনও এই ধরনের বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ চাই না। যদি কেউ এসে আমাকে বলে, 'আমার রক্তের বিনিময়ে মুক্ত হও', তাকে বলব, 'ভাই, চলে যাও, বরং আমি নরকে যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে স্বর্গে যাব। আমি নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত।' ঐ ধরনের বিশ্বাস আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়নি। আমাদের দেশের অবতার বলেছেনঃ যখনই পৃথিবীতে অসদ্‌ভাব ও দুর্নীতি প্রবল হবে, তখনই তিনি আসবেন তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে এই কাজ করে আসছেন। পৃথিবীর যেখানেই দেখবে অসাধারণ কোন পবিত্র মানব মানুষের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, জেন—তাঁর মধ্যে ভগবানই রয়েছেন।

অতএব বুঝতে পারছ, কেন আমরা কোন ধর্মের সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা কখনও বলি না, আমাদের ধর্মই মুক্তির একমাত্র রাস্তা। যে-কোন মানুষ সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে—তার প্রমাণ? প্রত্যেক দেশেই দেখি পবিত্র সাধু পুরুষ রয়েছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন বা না করুন—সর্বত্র সদ্ভাবাপন্ন নরনারী দেখা যায়। অতএব বলা যায় না, আমার ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। 'অসংখ্য নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়ে তোমারই কাছে আসে'—এটি ভারতে ছোট ছেলেদের প্রতিদিনের একটি প্রার্থনার অংশ। যারা প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনা করে, তাদের পক্ষে ধর্মের বিভিন্নতা নিয়ে মারামারি করা একেবারেই অসম্ভব। এ তো গেল দার্শনিকদের কথা, এঁদের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা, বিশেষ করে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তার কারণ—তাঁর অপূর্ব উদারতা দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।

ঐ যে মানুষটি মূর্তির সামনে প্রণাম করছে, ও কিন্তু তোমরা যে ব্যাবিলন বা রোমের পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ, তার মত নয়। এ হিন্দুর এক বিশেষত্ব। মূর্তির সামনে মানুষটি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে, 'সোঽহম্, তিনিই আমার স্বরূপ; আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার পিতা নেই, মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সোঽহম্, সোঽহম্; আমি কোন পুস্তকের বাঁধনে বাঁধা পড়িনি! কোন তীর্থের বা কোন কিছুর বন্ধন আমার নেই! আমি সৎস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, সোঽহম্, সোঽহম্।' বার বার এই কথা উচ্চারণ করে সে বলে, 'হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, বড় হতভাগ্য আমি।'

বই-পড়া জ্ঞানের ওপর ধর্ম নির্ভর করে না। ধর্ম আত্মাই, ধর্ম ঈশ্বর, শুধু বই-পড়া জ্ঞান বা বক্তৃতা-শক্তির দ্বারা ধর্ম লাভ হয় না। সব চেয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বল—আত্মাকে আত্মা-রূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না। আত্মার সম্বন্ধে তুমি একটা কল্পনা করতে পার, তিনিও পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আত্মস্বরূপে চিন্তা অসম্ভব। ঈশ্বর-তত্ত্ব যতই শোন না কেন—তুমি একজন বড় দার্শনিক, আরও বড় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ হতে পার—তবু একটি হিন্দু বালক বলবে 'ওর সঙ্গে ধর্মের কিছু সম্বন্ধ নেই। আত্মাকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে পার?' তা হলে সকল সংশয়ের শেষ, তা হলেই মনের সব বাঁকাচোরা সোজা হয়ে যাবে। জীবাত্মা (মানুষ) যখন পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সম্মুখীন হয়, তখনই সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দিগ্ধ চিন্তা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের বিচারে কোন ব্যক্তি অদ্ভুত বিদ্বান্ হতে পারেন, তবু তিনি হয়তো ধর্ম বিষয়ে 'অ, আ, ক, খ' না জানতে পারেন। আমি তাঁকে তাই বলব। জিজ্ঞাসা করব, 'আপনি কি আত্মাকে আত্মা বলে ভাবতে পারেন? আপনি কি আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানে পারদর্শী? আপনি জড়ের ঊর্ধ্বে নিজ আত্মাকে বিকশিত করেছেন?' যদি তা না করে থাকেন, তা হলে তাঁকে বলব, 'আপনার ধর্ম লাভ হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু বই, শুধু বৃথা গর্ব!'

আর ঐ 'হতভাগ্য' হিন্দুটি মূর্তির সামনে বসে দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য চিন্তা করবার চেষ্টা করে শেষে বলে, 'হে ঈশ্বর, পারলাম না তোমায় আত্মস্বরূপে ধারণা করতে, অতএব এই সাকার মূর্তিতেই তোমায় চিন্তা করি।' তখন সে চোখ খোলে, ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে, প্রণাম করে বার বার প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে আবার বলে, 'হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা কর, তোমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্য।'

তোমরা কেবল শুনে আসছ, হিন্দুরা পাথর পূজা করে। তাদের অন্তরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমরা কি ভাব? এই দেখ, আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী, যে সমুদ্র পেরিয়ে এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে। এসে অবধি শুনছি, তোমাদের সমালোচনা, তোমাদের ঐ-সব কথা। তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 'ওরা শিশু; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওরা বড় হতে পারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিষ ওরা তৈরি করতে পারে, কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে ওরা একেবারে শিশু!' এই হল তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা।

একটি কথা তোমাদের বলব, কোন নিষ্ঠুর সমালোচনা করছি না। তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কি কাজের জন্য? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে বলে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি!' তারা কিন্তু মুসলমানদের একটিও কথা বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়া পড়বে! হিন্দু বড় নিরীহ, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় বলে যায়, 'মূর্খেরা যা বলবার বলুক।' এই হল তাদের ভাব। তোমরা, যারা গালাগাল দেবার জন্যে মানুষকে শিক্ষিত করে তোল, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চীৎকার কর, 'সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা আমেরিকান। আমরা দুনিয়া সুদ্ধ লোকের সমালোচনা করব, গাল দেব, শাপ দেব, যা খুশি বলব, কিন্তু আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা বড় স্পর্শকাতর—লজ্জাবতী লতা।'

তোমরা যা খুশি করতে পার; আমরাও যে-ভাবে আছি সে-ভাবেই সন্তুষ্ট আছি। একটা বিষয়ে আমরা তোমাদের থেকে ভাল আছি, আমরা আমাদের ছেলেদের এই অদ্ভুত তথ্য গেলাই না যে—পৃথিবীতে সব পবিত্র, শুধু মানুষই খারাপ! তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা যখন আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন মনে রাখে—সমস্ত ভারতবাসী যদি দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভারতসমুদ্রের তলায় যত মাটি আছে, সব যদি পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি ছুঁড়তে থাকে, তা হলেও তোমরা আমাদের প্রতি যা করে থাক, তার কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্যে? আমরা কি কোন দিন কোথাও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছি—কাউকে ধর্মান্তরিত করবার জন্যে? আমরা তোমাদের বলি, 'তোমার ধর্মকে স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।' তোমরা বলে থাক—তোমাদের ধর্ম প্রসারশীল, তোমরা আক্রমণধর্মী। কিন্তু কত জনকে নিতে পেরেছ তোমার মতে? পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ চীনা, তারা বৌদ্ধ; তারপর আছে জাপান, তিব্বত, রাশিয়া, সাইবেরিয়া, বর্মা, শ্যাম। শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখ—এই যে খ্রীষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ, সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কি ভাবে এটা হয়েছিল? এক ফোঁটা রক্তপাত না করে। এত ডম্ফাই তোমাদের, কিন্তু বল তো—তলোয়ার ছাড়া খ্রীষ্টান ধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো! খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস মন্থন করে আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দাও, আমি দুটি চাই না। আমি জানি—তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর-গ্রহণ, নয় মৃত্যু—এই তো! যতই গর্ব কর, মুসলমানদের থেকে তোমরা কী ভাল করতে পার? 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ!' কেন? 'কারণ আমরা অপরকে হত্যা করতে পারি।' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেদুইন! রোমানরাও ঐ কথা বলত, কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।'

২

আর ঐ-সব অহঙ্কারের নীতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। ওগুলি বালির ওপর নির্মিত। বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস হবেই। এ জিনিষ মরবেই।

ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি বাঁচতে চাও, যদি চাও তোমাদের জাতি বেঁচে থাকুক, তবে বলি শোন—খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা খ্রীষ্টান নও; জাতি-হিসাবে তোমরা খ্রীষ্টান নও। ফিরে চল খ্রীষ্টের কাছে। ফিরে চল তাঁর কাছে—যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না, 'পাখিদের বাসা আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) এমন একটি জায়গা ছিল না—যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন।'

৩

তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি দুর্দৈব! উলটে ফেলো এ নীতি, যদি বাঁচতে চাও! (ধর্ম ব্যাপারে) এ দেশে যা কিছু শুনেছি, সব কপটতা। যদি এই জাতি বাঁচতে চায়, তবে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। 'ঈশ্বর এবং ধন-দেবতা (ম্যামন)-

কে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না।'

৪

এই-সব সম্পদ্—সব খ্রীষ্ট থেকে? খ্রীষ্ট এ-সব অশাস্ত্রীয় কথা অস্বীকার করতেন। ধন-দৌলত থেকে যে সম্পদ্-উন্নতি আসে, তা অনিত্য—ক্ষণস্থায়ী! প্রকৃত নিত্যত্ব রয়েছে ঈশ্বরে! যদি পার এই দুটি—এই সম্পদের সঙ্গে খ্রীষ্টের আদর্শ—মেলাতে, তবে খুবই ভাল। যদি না পার, তবে বরং সম্পদ্ ছেড়ে দাও, খ্রীষ্টের কাছেই ফিরে চল। খ্রীষ্টশূন্য প্রাসাদে বাস করা অপেক্ষা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে বাস করার জন্যে প্রস্তুত হও।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম

১৮৯৪ খ্রীঃ, ১১ মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণী—'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস'-এ প্রকাশিতঃ গতরাত্রে ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে বিবেকানন্দ এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি খুবই আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন এবং অপূর্ব বাগ্মিতাপূর্ণ এক ভাষণ দিয়েছেন। পুরা আড়াই ঘণ্টা তিনি বলেন।

জাপান ও চীন মিশনারীদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এই দেশের লোকেরা মনে করে, ভারতবর্ষ একটা বিরাট পতিত ভূখণ্ড, সেখানে আছে অনেক জঙ্গল আর কয়েকটি সভ্য ইংরেজ।

ভারতবর্ষ আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক এবং লোকসংখ্যা ত্রিশ কোটি। সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক গল্প বলা হয়, এবং সে-গুলি অস্বীকার করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খ্রীষ্টানরা যখন কোন নূতন দেশে গিয়েছে, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের যেমন নির্মূল করার চেষ্টা করেছে, ভারতের প্রথম বিজেতা আর্যগণ ভারতের আদি অধিবাসীদের সেরূপ নির্মূল করার চেষ্টা করেননি; বরং তাঁদের প্রয়াস ছিল কি করে পশুপ্রকৃতি মানুষদের উন্নত করা যায়।

স্পেন-দেশের লোকেরা সিংহলে এসেছিল খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে। তারা ভেবেছিল—পৌত্তলিকদের নিধন করে তাদের মন্দির ভেঙে ফেলার জন্য ঈশ্বর তাদের আদেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধদের কাছে তাদের ধর্মগুরুর এক ফুট লম্বা একটি দাঁত ছিল, স্পেনের লোকেরা সেটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কয়েক হাজার লোককে হত্যা করে এবং মাত্র কয়েক কুড়ি লোককে ধর্মান্তরিত করে।

পোর্তুগীজেরা এসেছিল পশ্চিম ভারতে। হিন্দুরা ঈশ্বরের ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাসী এবং সেই পবিত্র বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে তারা একটি মন্দির গড়েছিল। আক্রমণকারীরা মন্দিরটি দেখে বললে, 'এ শয়তানের সৃষ্টি', সুতরাং এই অপূর্ব কীর্তিটি বিনাশ করার জন্য তারা একটি কামান নিয়ে এসে মন্দিরের একটা অংশ ধ্বংস করল। ক্রুদ্ধ জনসাধারণ তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিল।

প্রথম দিকে মিশনারীরা দেশ অধিকার করার চেষ্টা করেছে, এবং বলপ্রয়োগে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টায় বহু লোককে হত্যা করেছে এবং কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জীবন-রক্ষার জন্য খ্রীষ্টান হয়েছে। পোর্তুগীজদের তরবারির ভয়ে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই বাধ্য হয়েছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে, এবং তারা বলত, 'আমরা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলতে বাধ্য হয়েছি।' ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মও শীঘ্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের এক অংশ অধিকার করে বসল; সুযোগের সদ্ব্যবহারের অভিপ্রায়ে তারা মিশনারীদের দূরেই রেখেছিল। হিন্দুরাই প্রথম মিশনারীদের স্বাগত জানায়, ব্যবসায়ে ব্যস্ত ইংরেজরা নয়। পরবর্তী কালের প্রথম মিশনারীদের কয়েক জনের প্রতি খুব শ্রদ্ধা আছে। তাঁরা ছিলেন যীশুর যথার্থ সেবক; তাঁরা ভারতবাসীদের নিন্দা করেননি বা তাদের সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যা কথা রটাননি। তাঁরা ছিলেন ভদ্র ও সহৃদয়। ইংরেজরা যখন ভারতের প্রভু হয়ে বসল, তখন থেকেই মিশনারীদের উদ্যম নিস্তেজ হতে আরম্ভ করে—এই অবস্থাই ভারতে মিশনারীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দিকের একজন মিশনারী ডক্টর লঙ্‌ এই দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নীল-উৎপাদনকারীদের দ্বারা ভারতে যে-অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বর্ণনা-সম্বলিত একটি ভারতীয় নাটকের তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তার ফল হয়েছিল কি? ইংরেজরা তাঁকে জেলে পুরেছিল। এ-সব মিশনারীদের দেশের মঙ্গল সাধন করেছেন, কিন্তু তাঁদের যুগ কেটে গেছে। সুয়েজ খাল বহু অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

এখনকার মিশনারীরা বিবাহিত এবং বিবাহিত বলেই তাদের কাজ ব্যাহত হয়। জনসাধারণ সম্বন্ধে মিশনারী কিছুই জানে না, তাদের ভাষায় কথা কইতে পারে না, সেইজন্য তাকে বাস করতে হয় একটি ছোটখাটো শ্বেতকায় কলোনিতে। বিবাহিত বলেই এরূপ করতে সে বাধ্য হয়। বিবাহিত না হলে সে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস করতে পারত এবং প্রয়োজন হলে মাটিতে শুতেও পারত। সুতরাং ভারতে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গী খোঁজবার জন্যে ইংরেজী-ভাষাভাষীদের মধ্যেই সে বাস করে। মিশনারী-প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। অধিকাংশ মিশনারীই তাদের কাজের অযোগ্য। আমি একজনও মিশনারী দেখিনি, যে সংস্কৃত জানে। কোন দেশের মানুষ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশের লোকেদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে কি করে? আমি কারও ওপর দোষারোপ করছি না, তবে এ-কথা সত্য যে, খ্রীষ্টানরা এমন লোকদের মিশনারী করে পাঠায়, যাদের মোটেই যোগ্যতা নেই। এটা দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত সন্তোষজনক ফল কিছুই হচ্ছে না, অথচ কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করার জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে।

মুষ্টিমেয় যারা ধর্মান্তরিত হয়, তারা মিশনারীদের চারদিকে ঘোরে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করে। যে-সকল ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে চাকরিতে বহাল রাখা হয় না, তারা আবার খ্রীষ্টধর্মও ত্যাগ করে। সংক্ষেপে সমগ্র ব্যাপারটা হল এই। ধর্মান্তরিত করার রকমটাও একেবারে হাস্যোদ্দীপক। মিশনারীদের আনীত টাকা তারা গ্রহণ করে। শিক্ষার দিক্‌টা বিবেচনা করলে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি সন্তোষজনক; কিন্তু ধর্মের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। হিন্দুরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি; তারা বঁড়শিতে ধরা না দিয়ে টোপটা খেয়ে নেয়! তাদের আশ্চর্য সহনশীলতা! একদা কোন মিশনারী বলেছিল, 'গোটা ব্যাপারটা সবচেয়ে বড় অসুবিধে ঐখানেই; আত্মসন্তুষ্ট লোকেদের কখনও ধর্মান্তরিত করা সম্ভব নয়।'

আর মহিলা মিশনারীরা কোন কোন বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের বাইবেল সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেন এবং কি করে বুনতে হয়—তাও শেখান; এজন্যে তাঁরা মাসে চার শিলিং করে পান। ভারতের মেয়েরা কখনও ধর্মান্তরিত হবে না। স্বদেশের নাস্তিকতা ও সংশয়বাদই মিশনারীদের অন্য দেশে যেতে প্ররোচিত করেছে। এদেশে এসে আমি বহু উদার প্রকৃতির পুরুষ ও নারীকে দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু ধর্মমহাসভার পর এক বিখ্যাত প্রেসবিটেরিয়ান সংবাদপত্র একটি তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা দ্বারা আমাকে সংবর্ধনা করেছিল। সম্পাদক এটাকে বলেন—'উৎসাহ'। মিশনারীরা জাতীয়তাকে বিসর্জন দেয় না বা দিতে পারে না, তারা মোটেই উদার নয়; অতএব ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে তাদের দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না; অবশ্য নিজেদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশায় তাদের সময় বেশ ভালই কাটে। ভারতের প্রয়োজন খ্রীষ্টের কাছ থেকে সাহায্য, খ্রীষ্ট-বিরোধীর কাছ থেকে নয়; এ-সকল মিশনারী খ্রীষ্টের মত নয়। খ্রীষ্টের আদর্শ অনুযায়ী তারা আচরণ করে না; তারা বিবাহিত, ভারতে গিয়ে তারা আরামের ঘর বাঁধে এবং সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা ভারতে এসে প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন, যেমন বহু হিন্দু সাধক করে থাকেন, কিন্তু এ-সব মিশনারীর সেই চারিত্রিক পবিত্রতা নেই। হিন্দুরা সানন্দে খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টকে স্বাগত জানাবে, কারণ তাঁর জীবন ছিল পবিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু তারা অজ্ঞ, মিথ্যাচারী ও আত্মপ্রবঞ্চক ব্যক্তিদের অনুদার উক্তিগুলি গ্রহণ করতে পারে না বা করবে না।

প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষ থেকে পৃথক্। এই পার্থক্য না থাকলে মানুষের মনের অধঃপতন হত। বিভিন্ন ধর্ম না থাকলে একটি ধর্মও টিকে থাকত না। খ্রীষ্টানের প্রয়োজন তার নিজের ধর্মের, হিন্দুরও তেমনি প্রয়োজন নিজ ধর্মের। বৎসরের পর বৎসর 'ধর্মগুলি' পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে। যে-সকল ধর্ম গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-গুলি আজও বেঁচে আছে। খ্রীষ্টানরা য়াহুদীদের ধর্মান্তরিত করতে পারল না কেন? কেনই বা তারা পারসীকদের খ্রীষ্টান করতে পারল না? মুসলমানদের তারা ধর্মান্তরিত করতে পারেনি কেন? চীন ও জাপানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি কেন? বৌদ্ধ ধর্মই প্রথম প্রচারশীল ধর্ম এবং বৌদ্ধদের সংখ্যা যে-কোন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যার দ্বিগুণ। তারা তরবারির সাহায্যে প্রচার করেনি। মুসলমানেরা সবচেয়ে বেশী হিংসার পথ অবলম্বন করেছে। তিনটি বৃহৎ প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। মুসলমানদেরও একসময় প্রতিপত্তির দিন এসেছিল।

প্রতিদিনই শোনা যায়—খ্রীষ্টান-জাতি রক্তপাতের দ্বারা দেশ অধিকার করছে। কোন মিশনারী এর প্রতিবাদে একটা কথা বলেছে? অতি রক্তপিপাসু জাতিগুলি কেন এমন একটি অভিযুক্ত ধর্মের প্রসংশা করবে, যে ধর্ম খ্রীষ্টের ধর্মই নয়? য়াহুদী ও আরবেরাই ছিল খ্রীষ্টধর্মের জন্মদাতা; খ্রীষ্টানেরা তাদের কিভাবেই না নির্যাতন করেছে! ভারতে খ্রীষ্টানদের যাচাই করা হয়ে গেছে এবং ওজনে তারা কম পড়েছে। আমি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে চাই না, অপরে তাদের কি চোখে দেখে, খ্রীষ্টানদের তাই দেখাতে চাই। যে-সকল মিশনারী নরকের আগুনের কথা প্রচার করে, সকলে তাদের ভয়ের চোখে দেখে। তরবারি ঘুরিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত মুসলমানেরা ভারতে এসেছে, কিন্তু আজ তারা কোথায়?

সকল ধর্মের উপলব্ধির শেষ সীমা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি। কোন ধর্মই তার বেশী শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই সার সত্য আছে এবং এই অমূল্য সম্পদের একটি বাহ্য আধার আছে। য়াহুদীর ধর্মগ্রন্থে বা হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে শুধু বিশ্বাস করাটা গৌণ ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির পরিবর্তন ঘটে, আধার পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু মূল সত্য একই থেকে যায়। মূল সত্যগুলি অভিন্ন হওয়ার ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেগুলিই ধরে থাকেন। যদি একজন খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তার ধর্মের মূল সত্য কি, তা হলে সে উত্তর দেবে, 'প্রভু যীশুর উপদেশ।' বাকী অধিকাংশই বাজে। তবে অসার অংশটিও নিরর্থক নয়; এর দ্বারাই আধার নির্মিত হয়। ঝিনুকের খোলটি আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু এর ভিতরেই থাকে মুক্তা। হিন্দু কখনও যীশুর জীবন-চরিত্র আক্রমণ করে কিছু বলবে না; যীশুর 'শৈলোপদেশ' সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ক-জন খ্রীষ্টান হিন্দু-ঋষিদের উপদেশের কথা জানে বা শুনেছে? তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত ছিল। এই হল প্রকৃতির নিয়ম। ধর্মজগতের এই মহান্ ঐকতান থেকে একটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র কেন গ্রহণ কর? এই অপূর্ব ঐকতান চলতে থাকুক। পবিত্র হও। কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য কর। কুসংস্কারই ধর্মের ওপর আধিপত্য করে। সকল ধর্মই ভাল, কারণ মূল সত্য সর্বত্র এক। প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে হবে। কিন্তু এই ব্যষ্টিগুলি নিয়েই গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি। এই চমৎকার পরিবেশ এখনই রয়েছে; এই অপূর্ব সৌধ নির্মাণের জন্য প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই কিছু না কিছু দেবার আছে।

যীশুখ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য যে-হিন্দু দেখতে পায় না, তাকে আমি করুণার পাত্র বলে মনে করি। খ্রীষ্টসদৃশ হিন্দু ঋষিকে যে-খ্রীষ্টান শ্রদ্ধা করে না, তাকেও আমি করুণা করি। মানুষ যত বেশী নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়, প্রতিবেশীর দিকে দৃষ্টি তার তত কমে যায়। যারা অপরকে ধর্মান্তরিত করে বেড়ায় এবং অপরের আত্মাকে পরিত্রাণ করার জন্য খুব বেশী ব্যস্ত, তারা বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায়। একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ভারতীয় নারীরা আরও উন্নত নয় কেন?' বিভিন্ন যুগে বর্বর আক্রমণকারীরাই অনেক পরিমাণে এর জন্যে দায়ী এবং ভারতবাসী নিজেরাও আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী। এ দেশের বল্‌নাচ ও উপন্যাসের ভক্ত মেয়েদের চেয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা বরাবরই অনেক ভাল। যে-দেশে নিজের সভ্যতা

সম্বন্ধে এত দম্ভ, সেই দেশে আধ্যাত্মিকতা কোথায়? আমি তো দেখতে পাই না। ‘ইহকাল’ এবং ‘পরকাল’—এই কথাগুলি তো শিশুদের ভয় দেখানোর জন্যে। এইখানেই সব-কিছু। ঈশ্বর নিয়ে জীবন যাপন, তাঁর ভাব নিয়েই বিচরণ—এইখানে এই শরীরেই! সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে; সমস্ত কুসংস্কার দূর করে দিতে হবে। ভারতে এখনও এ-রকম মানুষ আছে। এদেশে সে-রকম মানুষ কোথায়? আপনাদের প্রচারকেরা ‘স্বপ্নবিলাসী’দের সমালোচনা করে; এখানে আরও কিছু বেশী ‘স্বপ্নবিলাসী’ থাকলে এদেশের মানুষ সমৃদ্ধশালী হতে পারত। এখানে যদি কেউ যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ আক্ষরিকভাবে পালন করে, তবে তাকে ধর্মোন্মত্ত বলা হবে। স্বপ্নবিলাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দাম্ভিকতা—এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। গুণগ্রাহী মধুমক্ষিকা ফুলের সন্ধান করে; হৃদয়-পদ্ম বিকশিত কর। সমগ্র জগৎ ঈশ্বরভাবে পূর্ণ, পাপে পূর্ণ নয়। আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করি। আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি। বৌদ্ধদের একটি সুন্দর প্রার্থনাঃ সকল সাধু-সন্তকে প্রণাম, সকল মহাপুরুষকে প্রণাম; জগতের সকল পবিত্র নরনারীকে প্রণাম!

ভারতে শিক্ষাচর্চা

বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথমে শাসন-যন্ত্র সব সময়েই পুরোহিতগণের অধিকারে ছিল। সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারেরও উৎস ছিল পুরোহিতশ্রেণী। অতঃপর পুরোহিতগণের নিকট হইতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া ক্ষত্রিয় অথবা রাজশক্তির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সামরিক শাসন প্রাধান্য লাভ করে। সর্বদাই এইরূপ ঘটিয়াছে। পরিশেষে ভোগবিলাসের কবলে পড়িয়া জনসাধারণ অধঃপতিত হয় এবং অধিকতর শক্তিশালী ও বর্বর জাতির অধীন হইয়া যায়।

সান ফ্রানসিস্কো শহরে অবস্থিত ওয়েণ্ড সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন—এই মর্মে শ্রোতাদের সমক্ষে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। স্বামীজীর বক্তৃতার কিছু অংশঃ

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ইতিহাসের আদিকাল হইতে ভারতবর্ষ 'জ্ঞানের দেশ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও অন্য জাতিকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে অভিযানে বাহির হয় নাই। এই দেশের অধিবাসিগণ কোনদিনই যোদ্ধা নয়। আপনাদের—পাশ্চাত্যদের মত তাহারা কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, কারণ মাংসই যোদ্ধা সৃষ্টি করে; প্রাণীর রক্ত আপনাদের চঞ্চল করিয়া তোলে এবং আপনারা কিছু একটা করিবার ইচ্ছা করেন।

এলিজাবেথের সময়কার ইংলণ্ডের সহিত ভারতের তুলনা করুন। আপনাদের জাতির পক্ষে সেটি কি অন্ধকার-যুগই ছিল, আর আমরা তখনও জ্ঞানে কত উন্নত ছিলাম! অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির কলাবিদ্যাচর্চার যোগ্যতা এ পর্যন্ত খুবই কম। তাহাদের উত্তম কাব্য আছে—দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, শেক্সপীয়রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি অপূর্ব! শুধু ছন্দের মিল ঘটানোই কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্তু নয়।

ভারতবর্ষে বহুগুণ পূর্বে সঙ্গীত পূর্ণ সপ্ত-সুরে, এমন কি অর্ধ ও চতুর্থাংশ সুরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প—এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতে সব কিছু নির্ভর করে।

ভারতের নারী

১৯০০ খ্রীঃ, ১৮ জানুআরী ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায় শেক্সপীয়র ক্লাব হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতা।

স্বামী বিবেকানন্দঃ কেহ কেহ আমার বক্তৃতার পূর্বে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে, আবার কেহ কেহ বক্তৃতার পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রশ্ন করিতে চান। কিন্তু আমার প্রধান অসুবিধা এই যে, আমি জানি না—আজ আমাকে কি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে। তবে হিন্দুদর্শন, হিন্দুজাতি, হিন্দুদের ইতিহাস বা সাহিত্য-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে ভাষণ দিতে আমি প্রস্তুত। মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা কোন একটি বিষয় প্রস্তাব করিলে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

প্রশ্নঃ স্বামীজী, আমেরিকাবাসীরা অত্যন্ত প্রয়োগকুশল জাতি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুদর্শনের কোন্ বিশেষ নীতি বা মতবাদটি আমরা জীবনে কাজে লাগাইব, আর খ্রীষ্টধর্ম আমাদের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঐ নীতি আর কতটুকু বেশী কী করিবে?

স্বামীজীঃ ইহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। ইহা আপনাদের উপর নির্ভর করে। হিন্দুদর্শনের ভিতর গ্রহণযোগ্য এবং জীবনগঠনের সহায়ক কিছু যদি পান, তবে তাহা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত। আপনারা দেখিতেছেন, আমি মিশনারী নই এবং কাহাকেও আমার ভাবানুযায়ী মত পরিবর্তন করিতে বলি না। আমার নীতি এই—সব ভাবই ভাল এবং মহান্। আপনাদের কোন কোন ভাব ভারতবর্ষের কিছু লোকের উপযোগী হইতে পারে, আবার আমাদের কতকগুলি ভাব এই দেশের কিছু লোকের উপযোগী হইতে পারে; সুতরাং ভাবগুলি সারা পৃথিবীতে অবশ্যই ছড়াইতে হইবে।

প্রশ্নঃ আপনাদের দর্শনের ফলাফল আমরা জানিতে চাই। আপনাদের ধর্ম ও দর্শন কি আপনাদের নারীজাতিকে আমাদের নারীজাতি অপেক্ষা উন্নততর করিয়াছে?

স্বামীজীঃ ইহা বড়ই ঈর্ষাসূচক প্রশ্ন। আমি আমাদের মেয়েদের ভাল মনে করি এবং এদেশের মেয়েদেরও ভাল মনে করি।

প্রশ্নঃ বেশ তো, আপনি কি আপনার দেশের মেয়েদের কথা—তাহাদের রীতিনীতি, শিক্ষা এবং পরিবারে তাহাদের স্থান সম্বন্ধে বলিবেন?

স্বামীজীঃ নিশ্চয়ই, এগুলি সম্বন্ধে আমি খুব আনন্দের সহিত বলিব। তাহা হইলে আজ আপনারা 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধেই জানিতে ইচ্ছুক, দর্শন বা অন্য বিষয় নয়, ঠিক তো?

বক্তৃতা

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, আমার অনেক কিছু অপূর্ণতা আপনাদের সহ্য করিতে হইবে, কারণ আমি এমন এক সাধকসম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা বিবাহ করে না। অতএব নারীর সহিত মাতা, জায়া, কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কে অপরের জ্ঞান যতটা পূর্ণ, আমার ততটা না হওয়াই স্বাভাবিক। তারপর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ একটি বিশাল মহাদেশ—কেবল একটি দেশ নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির তুলনায় ইওরোপের জাতিগুলি পরস্পরের নিকটতর এবং অধিকতর সাদৃশ্য-বিশিষ্ট। আপনারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন, যদি বলি যে, সমগ্র ভারতবর্ষে আটটি বিভিন্ন ভাষা আছে। ঐগুলি বিভিন্ন ভাষা—আঞ্চলিক ভাষামাত্র নয় এবং প্রত্যেকেরই স্বকীয় সাহিত্য আছে। এক হিন্দীই দশ কোটি লোকের ভাষা, বাঙলা প্রায় ছয় কোটি লোকের, ইত্যাদি।

যে-কোন দুইটি ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে যতটা প্রভেদ, তাহা অপেক্ষা চারিটি উত্তর-ভারতীয় ভাষা ও দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষারগুলির মধ্যে প্রভেদ অধিকতর। প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আপনাদের ভাষা ও জাপানী ভাষার মধ্যে যতখানি পার্থক্য, এইগুলির মধ্যেও ততখানি পার্থক্য। আপনারা জানিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, যখন আমি দক্ষিণ-ভারতে যাই, সেখানে সংস্কৃত বলিতে পারে—এমন লোকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে ইংরেজীতেই কথা বলিতে হয়।

অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার, রীতি, আহার, পরিচ্ছদ এবং চিন্তাধারাতেও অনেক পার্থক্য আছে। ইহার উপর আবার বর্ণভেদ আছে। প্রত্যেকটি বর্ণ যেন একটি স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ। যদি কেহ ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করে, তবেই সে একজনের চালচলন দেখিয়া বলিতে পারিবে, লোকটি কোন্ বর্ণভুক্ত। আবার বর্ণগুলির ভিতরও বিভিন্ন আচরণ ও প্রথা বিদ্যমান। বর্ণগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, মিশুক নয়; অর্থাৎ এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত সামাজিকভাবে মিলিবে, কিন্তু একত্র পানাহার করিবে না বা পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। এই-সব ব্যাপারে তাহারা স্বতন্ত্র। পরস্পরের সহিত আলাপ এবং বন্ধুত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু এই পর্যন্তই।

ধর্মপ্রচারক বলিয়া অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা সাধারণভাবে ভারতীয় নারীকে জানিবার সুযোগ আমাদেরই বেশী। ধর্মপ্রচারককে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয়, ফলে সমাজের সকল স্তরের সহিত তাঁহার সংযোগ। উত্তর-ভারতেও মহিলারা পুরুষদের সম্মুখে বাহির হন না, সেখানেও ধর্মের জন্য তাঁহারা বহুক্ষেত্রে এই নিয়ম ভঙ্গ করেন এবং আমাদের প্রবচন শুনিতে ও আমাদের সহিত ধর্মালোচনা করিতে কাছে আসেন। ভারতীয় নারী-সম্বন্ধে আমি সব কিছুই জানি—এরূপ বলা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং আমি আপনাদের সম্মুখে আদর্শটি উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। প্রত্যেক জাতির পুরুষ বা স্ত্রীর ভিতরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটি আদর্শের রূপায়ণ ঘটে। ব্যষ্টি একটি আদর্শের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। জাতি এই-সব ব্যষ্টির সমষ্টিমাত্র, এবং জাতিও একটি মহান্ আদর্শের প্রতীক। ঐ আদর্শের উদ্দেশ্যেই জাতি অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ইহা যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে যে, একটি জাতিকে বুঝিতে হইলে প্রথমে ঐ জাতির আদর্শকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব মাপকাঠি আছে এবং সেইটি ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা উহার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

সর্বপ্রকার উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ কিংবা অবনতি—সবই আপেক্ষিক। ইহা কোন একটি মান নির্দেশ করে; কোন মানুষকে বুঝিতে হইলে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে তাহার স্বকীয় মানের পরিপেক্ষিতে তাহাকে বুঝিতে হইবে। জাতিগত জীবনে এইটি স্পষ্টতরভাবে দেখিতে পাইবেন। এক জাতি যাহা ভাল বলিয়া মনে করে, অন্য জাতি তাহা ভাল নাও বলিতে পারে। আপনাদের দেশে জ্ঞাতি-ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ খুবই সঙ্গত, কিন্তু ভারতে ঐরূপ বিবাহ আইন-বিরুদ্ধ; শুধু তাই নয়, উহাকে অতি ভয়ানক নিষিদ্ধ যৌন-সংসর্গ মনে করা হয়। এ দেশে বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ভারতে উচ্চবর্ণের নারীর দুইবার বিবাহ চরম মর্যাদাহানিকর। অতএব দেখিতেছেন, আমরা এত বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়া কাজ করি যে, একটি জাতিকে অপর জাতির মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করা উচিত হইবে না, ইহা সম্ভবও নয়। অতএব একটি জাতি কোন্ আদর্শকে তাহার সামনে রাখিয়াছে, তাহা জানা আমাদের কর্তব্য। বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা একটা ধারণা করিয়া বসি যে, সকল জাতির নৈতিক নিয়মাবলী ও আদর্শ এক। যখন অপরকে বিচার করিতে যাই, তখন ধরিয়া লই যে, আমরা যাহা ভাল বলিয়া মনে করি, তাহা সকলের পক্ষেই ভাল হইবে। আমরা যাহা করি, তাহাই উচিত কর্ম; আমরা যাহা করি না, অপরে তাহা করিলে ঘোর নীতিবিরুদ্ধ হইবে। সমালোচনার উদ্দেশ্যে আমি এ-কথা বলিতেছি না, কেবল সত্যকে আপনাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ধরিতেছি। যখন শুনি পদতলে সঙ্কুচিত করার জন্য পাশ্চাত্য নারীগণ চীনা মেয়েদের ধিক্কার দেয়, তখন তাহারা চিন্তা করে না তাহাদের আঁটসাঁট কাঁচুলি ব্যবহার জাতির অধিকতর ক্ষতি করিতেছে। ইহা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। আপনারা অবশ্যই জানেন, কর্সেট ব্যবহারে শরীরের যতটা ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে, পদতল সঙ্কুচিত করায় তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ ক্ষতিও হয় না। কারণ প্রথমোক্ত উপায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ স্থানচ্যুত হয় এবং মেরুদণ্ডটি সাপের মত বাঁকিয়া যায়। যদি মাপ নেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বক্রতা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। দোষ দেখাইবার জন্য নয়, শুধু অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য বলিতেছি। আপনারা অন্য দেশের নারীদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং তাহারা আপনাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে না বলিয়া তাহাদের ব্যবহারে আপনারা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হন। ঠিক একই কারণে অন্যান্য জাতির নারীগণও আপনাদের কথা ভাবিয়া শিহরিত হয়।

সুতরাং দুই পক্ষের ভিতরই একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। একটা সাধারণ মিলনভূমি, একটা সর্বজনীন বোধের ক্ষেত্র ও একটা সাধারণ মানবতা আছে, যাহা আমাদের কর্মের ভিত্তি হইবে। আমাদের সেই পূর্ণ ও নির্দোষ মানবপ্রকৃতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা এখন শুধু আংশিকভাবে এখানে ওখানে কাজ করিতেছে। পূর্ণত্বের চরম বিকাশ একটি মানুষে সম্ভব নয়। আপনি

একটি অংশকে রূপ দিন, আমিও আমার সাধ্যমত সামান্যভাবে আর একটি অংশ রূপায়িত করি। এখানে একজন একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করে, অন্যত্র আর একজন আর একটি অংশ গ্রহণ করে। পূর্ণত্ব হইল এই সমস্ত অংশের সমষ্টিরূপ। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, জাতির ক্ষেত্রেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকেই একটি ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়; প্রত্যেক জাতিকে মানব স্বাভাবের একটি দিক্ বিকশিত করিতে হয়; এবং আমাদিগকে এই সমস্তই একসঙ্গে গ্রথিত করিতে হইবে। সম্ভবতঃ সুদূর ভবিষ্যতে এমন এক জাতির উদ্ভব হইবে, যে-জাতির ভিতর বিভিন্ন জাতিদ্বারা অর্জিত বিস্ময়কর উৎকর্ষগুলি প্রকাশিত হইবে এবং উহা আর একটি নূতন জাতিরূপে দেখা দিবে। এই জাতির মত একটি জাতির কথা মানুষ এখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। এইটুকু বলা ছাড়া কাহারও সমালোচনা করিয়া আমার বলিবার কিছু নাই। জীবনে ভ্রমণ বড় কম করি নাই। সর্বদা চক্ষু খুলিয়া রাখিয়াছি এবং যতই আমি ঘুরি, ততই আমার মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সমালোচনা করিতে আর পারি না।

এখন 'ভারতীয় নারী'র প্রসঙ্গ। ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই ইহার প্রথম ও শেষ কথা। 'নারী'-শব্দ হিন্দুর মনে মাতৃত্বকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতে ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। আমাদের শৈশবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে একপাত্র জল লইয়া মায়ের কাছে রাখিতে হয়। তিনি তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উহাতে ডুবাইয়া দেন এবং আমরা ঐ জল পান করি।

পাশ্চাত্যে নারী জায়া। সেখানে জায়ারূপেই নারীত্বের ভাবটি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে—নারীত্বের সমগ্র শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্যে স্ত্রীই গৃহকর্ত্রী, ভারতীয় গৃহে কর্ত্রী—জননী। পাশ্চাত্যে গৃহে যদি মা আসেন, তবে তাঁহাকে (ছেলের) স্ত্রীর অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; ঘরকরনা স্ত্রীর। মা সর্বদা আমাদের গৃহেই বাস করেন; স্ত্রীকে তাঁহার অধীনে থাকিতেই হইবে। ভাবের এই-সব প্রভেদ আপনারা লক্ষ্য করুন।

আমি কেবল তুলনার প্রস্তাব করিতেছি। প্রকৃত তথ্য উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে আমরা দুই দিকের তুলনা করিতে পারি। এই তুলনাটি করুনঃ যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, 'স্ত্রী-রূপে ভারতীয় নারীর স্থান কোথায়?' এই প্রশ্নে ভারতবাসী প্রতিপ্রশ্ন করিবে, 'জননী-রূপে মার্কিন মহিলার মার্যাদা কি?' সেই সর্বমহিমময়ী, যিনি আমায় এই শরীর দিয়াছেন তিনি কোথায়? নয় মাস যিনি আমাকে তাঁর শরীরে ধারণ করিয়াছেন, তিনি কোথায়? কোথায় তিনি, যিনি আমার প্রয়োজন হইলে বার বার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার প্রতি যাঁহার স্নেহ অফুরন্ত—তা আমি যতই দুষ্ট ও হীনপ্রকৃতি হই না কেন? কোথায় সেই জননী—আর কোথায় স্ত্রী, যে নারী স্বামীর দ্বারা সামান্য অবহেলিত হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের আশ্রয় লয়? অহো মার্কিন মহিলাবৃন্দ, আপনাদের ভিতর কোথায় সেই জননী? আপনাদের দেশে তাঁহাকে আমি খুঁজিয়া পাই না। আপনাদের দেশে আমি এমন পুত্র দেখি নাই, যাহার কাছে জননীর স্থান সর্বপ্রথম। যখন আমরা দেহত্যাগ করি, তখনও আমরা চাই না যে, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আমাদের জননীর স্থান গ্রহণ করে। ধন্য আমাদের জননী! যদি মায়ের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আবার মায়ের কোলেই মাথা রাখিয়া আমরা মরিতে চাই। কোথায় নারী? 'নারী' কি এমনই একটি শব্দ, যাহা কেবল স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত? হিন্দু-মন সেই-সব আদর্শকে ভয় করে, যেগুলি অনুসারে দেহ দেহেই আসক্ত হইবে। না, না! নারী, দেহ-সংক্রান্ত কোন কিছুর সহিত তুমি যুক্ত হইবে না। তোমার নাম চিরকালের জন্য পবিত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'মা'- নাম ছাড়া এমন কি শব্দ আছে, যাহাকে কোনপ্রকার কামভাব স্পর্শ করিতে পারে না, কোনপ্রকার পশুভাব যাহার নিকটে আসিতে পারে না? এই মাতৃত্বই ভারতবর্ষের আদর্শ।

আমি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা অনেকটা আপনাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভিক্ষুক সাধুদের মত। অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আমাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, জনসাধারণ যখন চায়, তখন ধর্মকথা শুনাইতে হয়। যেখানে আশ্রয় পাই, সেখানে ঘুমাই। আমাদিগকে এই ধরনের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। আমাদের সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নারীকে এমন কি ক্ষুদ্র বালিকাকেও 'মা' সম্বোধন করিতে হয়। ইহাই আমাদের প্রথা। পাশ্চাত্যে আসিয়াও আমার পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। মহিলাদের 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে দেখিতাম, তাঁহারা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। প্রথম প্রথম ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পরে কারণ আবিষ্কার করিলাম। বুঝিলাম 'মা' হইলে তাঁহারা যে 'বুড়ী' হইয়া যাইবেন। ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী। জায়া জননীর পশ্চাতে থাকেন—ছায়ার মত। স্ত্রীকে মায়ের জীবন অনুকরণ করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য। জননীই প্রেমের আদর্শ, তিনিই পরিবারকে শাসন করেন, সমগ্র পরিবারটির উপর তাঁহার অধিকার। ভারতে সন্তান যখন কোন অন্যায় কাজ করে, পিতা তখন তাহাকে প্রহার করেন এবং মাতা সর্বদা পিতা ও সন্তানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ান। আর এদেশে ঠিক তাহার বিপরীত। এদেশে মায়ের কাজ ছেলেকে মারধোর করা, এবং বেচারী বাবাকে মধ্যস্থ হইতে হয়। লক্ষ্য করুন—আদর্শের পার্থক্য। বিরূপ সমালোচনা হিসাবে আমি ইহা বলিতেছি না। আপনারা যাহা করেন, তাহা ভালই; কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমাদের পথ। মাতা সন্তানকে অভিশাপ দিতেছেন—ইহা আপনারা কখনও শুনিতে পাইবেন না। মা সর্বদাই ক্ষমা করেন। 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'র পরিবর্তে আমরা নিরন্তন বলি 'মা'। মাতৃ-ভাব এবং মাতৃ-শব্দ হিন্দু-মনে চিরদিন অনন্ত প্রেমের সহিত জড়িত। আমাদের এই মরজগতে মায়ের ভালবাসাই ঈশ্বর-প্রেমের নিকটতম। মহাসাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেনঃ করুণা কর, জননি, আমি দুষ্ট; কিন্তু 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

ঐ দেখ হিন্দু জননী। পুত্রবধূ আসে তাঁহার কন্যারূপে। বিবাহ হইলে কন্যা পরগৃহে চলিয়া যায়, বিবাহ করিয়া পুত্র আর একটি কন্যা ঘরে আনে এবং পুত্রবধূ কন্যার শূন্যস্থান পূরণ করে। পুত্রবধূকে সেই রাজ-রাজেশ্বরীর অর্থাৎ স্বামীর মাতার শাসন-ব্যবস্থার ভিতর মানাইয়া লইতে হইবে। আমি তো সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী কখনও বিবাহ করে না। মনে করুন, আমি যদি বিবাহ করিতাম, এবং আমার স্ত্রী যদি আমার মায়ের অসন্তোষের কারণ হইত, তাহা হইলে আমিও আমার স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইতাম। কেন? আমি কি আমার মাকে পূজা করি না? সুতরাং মায়ের পুত্রবধূও কেন তাঁহাকে পূজা করিবে না? যাঁহাকে আমি পূজা করি, আমার স্ত্রী তাঁহাকে কেন পূজা করিবে না? কে সে, যে আমার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়া আমার মাকেও শাসন করিবে? তাহাকে অপেক্ষা করিতে

হইবে, যতক্ষণ না তাহার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। এই মাতৃত্বই নারীত্বকে পূর্ণ করে; মাতৃত্বই নারীর নারীত্ব। এই মাতৃত্ব পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহার পরই সে সমান অধিকার লাভ করে। তাই হিন্দুর নিকট মাতৃত্বই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু অহো! আদর্শের কি বিস্ময়কর প্রভেদ দেখিতেছি! আমার জন্মের জন্য আমার পিতামাতা বৎসরের পর বৎসর কত পূজা ও উপবাস করিয়াছিলেন! প্রত্যেক সন্তানের জন্মের পূর্বে মাতাপিতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের মহান্ স্মৃতিকার মনু আর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'প্রার্থনার ফলে যাহার জন্ম, সে-ই আর্য।' প্রার্থনা ব্যতীত যে-শিশুর জন্ম হয়, মনুর মতে সে অবৈধ সন্তান। সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। অভিশাপ মস্তকে লইয়া যে-সব শিশু এই জগতে আসে, তাহারা যেন এক অসতর্ক মুহূর্তে আসিয়া পড়ে, কারণ তাহাদের আসা রোধ করিতে পারা যায় নাই—এইরূপ সন্তানদের নিকট কি আশা করিতে পারা যায়? মার্কিন জননীগণ, আপনারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনাদের অন্তরের অন্তস্তলে ভাবিয়া দেখুন, আপনারা কি প্রকৃত নারী হইতে প্রস্তুত? এখানে কোন জাতি বা দেশের প্রশ্ন নাই, স্বজাতি-গৌরব- বোধের মিথ্যা ভাবালুতা নাই। দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত জগতে আমাদের এই মরজীবনে গর্ববোধ করিতে কে সাহস করে? ঈশ্বরের এই অনন্ত শক্তির নিকট আমরা কতটুকু? তথাপি আপনাদের আজ আমি এই প্রশ্ন করিতে চাই, ভবিষ্যৎ সন্তানটির জন্য কি আপনারা সকলে প্রার্থনা করেন? মাতৃত্ব লাভ করিয়া কি আপনারা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ? মাতৃত্বের জন্য কি আপনারা নিজেদের শুদ্ধ পবিত্র মনে করেন? নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি আপনারা ঐরূপ না বোধ করেন, তবে আপনাদের বিবাহ মিথ্যা, মিথ্যা আপনাদের নারীত্ব; আপনাদের শিক্ষা কুসংস্কার মাত্র। আর প্রার্থনা ব্যতীত যদি আপনাদের সন্তান হইয়া থাকে, তবে তাহারা মানবজাতির অভিশাপ হইবে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ উপস্থিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করুন। মাতৃত্ব হইতে বিরাট দায়িত্ব আসে। মাতৃত্বই ভিত্তি—আরম্ভ। আচ্ছা, মাকে এইরূপ পূজা করিতে হইবে কেন? কারণ আমাদের শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, সন্তান ভাল বা মন্দ হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হয়, গর্ভবাসকালীন প্রভাবের দ্বারা। লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়ে যান, লক্ষ লক্ষ পুস্তক পড়ুন, পৃথিবীর সব পণ্ডিতের সঙ্গ করুন—এগুলির প্রভাব অপেক্ষা জন্মকালীন শুভসংস্কারের প্রভাব বেশী। শুভ বা অশুভ উদ্দেশ্য লইয়াই আপনার জন্ম। শিশু জন্মগ্রহণ করে—হয় দেবতারূপে, নয় দানবরূপে—শাস্ত্র এই কথাই ঘোষণা করে। শিক্ষা এবং আর সব কিছু পরে আসে, ঐগুলি অতি তুচ্ছ। যে-ভাব লইয়া আপনার জন্ম হইয়াছে, তাহাই আপনার ভাব। অস্বাস্থ্য লইয়া যাহার জন্ম, পাইকারী হারে গোটাকয়েক ঔষধের দোকান খাইলেও সে কি সারাজীবন সুস্থ থাকিতে পারিবে? দুর্বল রুগ্ন পিতামাতা, যাহাদের রক্ত দূষিত, তাহাদের সন্তান কয় জন সুস্থ ও সবল? একজনও নয়! প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া হয় দেবতা, নয় দানবরূপে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। শিক্ষা বা আর সব কিছু অতি তুচ্ছ।

আমাদের শাস্ত্র এইরূপ বলেঃ গর্ভকালীন প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ কর। জননীকে কেন পূজা করিতে হয়? কারণ তিনি নিজেকে পবিত্র করিয়াছেন। পবিত্রতা স্বরূপিণী হইবার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, ভারতবর্ষে কোন নারী কোন পুরুষকে দেহ দান করার কথা ভাবিতেই পারেন না, দেহ তাঁহার নিজস্ব। যাহাকে দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলে, ইংরেজরা সমাজসংস্কার হিসাবে বর্তমান ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্তন করিয়াছে; কিন্তু কোন ভারতবাসীই ঐ আইনের সুযোগ গ্রহণ করিবে না। পুরুষ যখন নারীর দেহ-সম্পর্কে আসে, তখন নারী কত না প্রার্থনা ও ব্রতদ্বারা ঐ মিলন পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে! কারণ যে-পথে শিশুর আগমন, তাহা যে স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রতম প্রতীক। ইহা স্বামী-স্ত্রীর মিলিত শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, যে-প্রার্থনা প্রচণ্ড ভাল অথবা মন্দ শক্তির সম্ভাবনাযুক্ত আর একটি জীবকে এই জগতে লইয়া আসিতেছে। ইহা কি একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার? ইহা কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি? ইহা কি দেহের পাশবিক সুখসম্ভোগ? হিন্দু বলে, 'না, না, সহস্রবার না।'

কিন্তু এইটির অনুগামী আর একটি ভাব আছে। সর্বংসহা সর্বক্ষমাশীলা জননীর প্রতি ভালবাসার আর্দশ লইয়া আমাদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। জননীকে যে পূজা করা হয়, তাহার উৎস এইখানেই। আমাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য তিনি তপস্বিনী হইয়াছিলেন। আমি জন্মাইব বলিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর তাঁহার শরীর-মন, আহার-পরিচ্ছদ, চিন্তা-কল্পনা পবিত্র রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি পূজনীয়া। তারপর আমরা কোন্ ভাবটি পাই? মাতৃত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে জায়াভাব।

আপনারা—পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। আমি এই কাজটি করিতে চাই, যেহেতু আমি এটি পচ্ছন্দ করি। আমি সকলকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিব। কেন? আমার খুশি। আমি নিজের পরিতৃপ্তি চাই, সেইজন্য আমি এই নারীটিকে বিবাহ করিব। কেন? আমি তাহাকে পছন্দ করি। এই নারী আমাকে বিবাহ করিয়াছে। কেন? সে আমাকে পছন্দ করে। এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে আর আমি—এই দুইজনেই আছি, আমি তাহাকে এবং সে আমাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, আর কাহারও কোন দায়িত্ব নাই। আপনাদের শ্রীমান্ ও শ্রীমতীরা বনে গিয়া তাহাদের রুচিমত জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের যখন সমাজে বাস করিতে হয়, তখন তাহাদের বিবাহ আমাদের শুভাশুভের সহিত জড়িত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাহাদের সন্তানগণ অগ্নিসংযোগকারী, হত্যাকারী দস্যু, পরস্বাপহারী, মদ্যপ, জঘন্যাচারী ও ক্রূরকর্মা—সাক্ষাৎ দানব হইতে পারে।

এখন ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি কি? ইহা বর্ণভিত্তিক বিধান। আমার জন্ম—বর্ণ বা জাতির জন্য, তাহার জন্যই আমার জীবন। অবশ্য আমার নিজের কথা বলিতেছি না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ফলে আমরা জাতি-বর্ণের বহির্ভূত। যাহারা সমাজে বাস করে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি। কোন এক বর্ণে জন্ম বলিয়া সেই বর্ণের ধর্মানুযায়ী আমাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতেই হইবে। অর্থাৎ আপনাদের দেশের আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশ্চাত্য মানব আজন্ম স্বাতন্ত্র্যবাদী, আর হিন্দু সমাজতান্ত্রিক, পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক। সেইজন্য শাস্ত্র বলে যে, যদি পুরুষকে তাহার মনের মত যে-কোন নারী বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং নারীকেও তাহার মনের মত যে-কোন পুরুষকে বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন কি হয়? তুমি প্রেমে পড়। মেয়েটির পিতা হয়তো উন্মাদ বা যক্ষ্মারোগী। মেয়েটি হয়তো একটি পাঁড়-মাতাল ছেলের মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সমাজবিধি কি বলে? ধর্মের অনুশাসনে এই-সব বিবাহ অবৈধ। মদ্যপায়ী, ক্ষয়রোগী, উন্মাদ প্রভৃতির সন্তানদিগকে বিবাহ

করিতে দেওয়া হইবে না। ধর্ম বলে, বিকলাঙ্গ কুব্জ বিকৃতবুদ্ধি জড়বৎ ব্যক্তিদের বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ।

কিন্তু মুসলমানরা আরব হইতে ভারতবর্ষে আসিল, তাহাদের আছে আরবী আইন, আর আরবের মরুভূমির আইন আমাদের উপর জোর করিয়া চাপানো হইল। ইংরেজেরা আসিল তাহাদের আইন লইয়া। যতদূর সাধ্য তাহাও আমাদের উপর চালু করিল। আমরা পরাজিত জাতি। ইংরেজ যদি বলে, 'কাল তোমার ভগিনীকে বিবাহ করিব', আমরা কি করিতে পারি?

আমাদের সমাজ-বিধানে বলে, পরস্পরের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের দূরত্ব যতই থাকুক না কেন, এক জ্ঞাতিগোত্রের ভিতর বিবাহ অবৈধ। কারণ ঐরূপ বিবাহের দ্বারা জাতির অধোগতি হয়, বংশ লোপ পায়। কিছুতেই এ ধরনের বিবাহ হইতে পারে না এবং এইখানেই এ প্রসঙ্গ থামিয়া যায়। সুতরাং আমার বিবাহ-ব্যাপারে আমার নিজের কোন মত নাই, আমার ভগিনীর বিবাহ-ব্যাপারে—তাহারও মতামত কিছু নাই। জাতি-বর্ণের অনুশাসনের দ্বারা সব কিছু নির্ধারিত হয়।

অনেক সময় আমাদের দেশে শৈশবেই বিবাহ দেওয়া হয়। কেন? সমাজের আদেশ। পুত্র-কন্যাদের সম্মতি ছাড়াই যদি তাহাদের বিবাহ দিতে হয়, তাহা হইলে প্রেমের উন্মেষের পূর্বে শৈশবেই বিবাহ দেওয়া উচিত। যদি তাহারা পৃথক্‌ভাবে বড় হয়, তাহা হইলে বালকের হয়তো অন্য আর একটি বালিকাকে ভাল লাগিতে পারে এবং বালিকাও হয়তো আর একটি বালককে পছন্দ করিতে পারে। ফলে একটা মন্দ কিছু ঘটিতে পারে। সেইজন্য সমাজ বলে যে, ঐখানেই উহা বন্ধ করিয়া দাও। আমার ভগিনী বিকলাঙ্গ সুশ্রী বা কুশ্রী, তাহা আমি গ্রাহ্যই করি না, সে আমার ভগিনী—ইহাই যথেষ্ট। সে আমার ভ্রাতা—এইটুকু জানিলেই আমার যথেষ্ট হইল। সুতরাং তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে। আপনারা বলিতে পারেন, 'অনেকখানি আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত। পুরুষের পক্ষে একটি নারীর প্রেমে পড়ার এবং নারীর পক্ষে একজন পুরুষের প্রেমে পড়ার কি অপূর্ব হৃদয়াবেগ, সে আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ইহা তো ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসার মত। যেন ভালবাসিতে তাহারা বাধ্য।' ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু হিন্দু বলে, 'আমরা সমাজতান্ত্রিক। একটি পুরুষ বা নারীর তীব্র সুখের জন্য আমরা শত শত লোকের মস্তকে দুঃখের বোঝা চাপাইতে চাই না।'

তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত বধূ স্বামীর ঘরে আসে—ইহাকেই বলা হয় 'দ্বিতীয় বিবাহ।' শৈশবকালীন বিবাহকে বলা হয় 'প্রথমে বিবাহ' এবং তাহারা পৃথকভাবে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে মেয়েদের সঙ্গে—পিতামাতার সঙ্গে বাস করে। যখন তাহাদের বয়স হয়, তখন 'দ্বিতীয় বিবাহ' নামক আর একটি অনুষ্ঠান করা হয়। তারপর তাহারা একসঙ্গে বাস করিতে থাকে, কিন্তু পিতামাতার সহিত একত্র একই বাড়িতে। বধূ যখন জননী হয়, তখন তাহার পরিবারটুকুর সর্বেসর্বা হইবার সময় আসে।

এখন আর একটি অদ্ভুত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলিব। আমি এইমাত্র আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, প্রথম দুই তিন বর্ণের ভিতর বিধবারা আর বিবাহ করিতে পারে না; ইচ্ছা থাকিলেও পারে না। অবশ্য অনেকের নিকট ইহা একটি কঠোরতা। অস্বীকার করা যায় না যে, বহু বিধবাই ইহা পছন্দ করে না, কারণ বিবাহ না করার অর্থ হইল ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করা; অর্থাৎ তাহারা কখনই মাছ-মাংস খাইবে না, মদ্য পান করিবে না এবং শ্বেতবস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পারিবে না, ইত্যাদি। এ জীবনে বহু বিধি-নিষেধ আছে। আমরা সন্ন্যাসীর জাতি, সর্বদাই তপস্যা করিতেছি এবং তপস্যা আমরা ভালবাসি। মেয়েরা কখনও মাংস খায় না। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের কষ্ট করিয়া পানাহারে সংযম অভ্যাস করিতে হইত, মেয়েদের পক্ষে ইহা কষ্টকর নয়। আমাদের মেয়েরা মনে করে, মাংস খাওয়ার কথা চিন্তা করিলেও মর্যাদাহানি হয়। কোন কোন বর্ণের পুরুষেরা মাংস খায়, কিন্তু মেয়েরা কখনও খায় না। তথাপি বিবাহ না করিতে পাওয়া যে অনেকের পক্ষে কষ্ট—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু আমাদিগকে আবার মূলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভারতীয়েরা গভীরভাবে সমাজতান্ত্রিক। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশের উচ্চ বর্ণের ভিতর পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অনেক বেশী। ইহার কারণ কি? কারণ উচ্চবর্ণের নারীরা বংশানুক্রমে আরামে জীবনে যাপন করেন। 'তাঁহারা পরিশ্রম করেন না, সুতাও কাটেন না, তথাপি সলোমন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদেও তাঁহাদের মত ভূষিত হন নাই।'৫ আর বেচারী পুরুষেরা, তাহারা মাছির মত মরে। ভারতবর্ষে আরও বলা হয়, মেয়েদের প্রাণ বড়ই কঠিন, সহজে যায় না। পরিসংখ্যানে দেখিবেন যে, মেয়েরা অতি দ্রুতহারে পুরুষের সংখ্যা অতিক্রম করে। অবশ্য বর্তমানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই মত কঠোর পরিশ্রম করে বলিয়া ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চবর্ণের নারী-সংখ্যা নিম্নবর্ণের অপেক্ষা অধিক। তাই নিম্নবর্ণের অবস্থা ঠিক বিপরীত। নিম্নবর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সকলে কঠিন পরিশ্রম করে। স্ত্রীলোকদের আবার একটু বেশী খাটিতে হয়, কারণ তাহাদের ঘরের কাজও করিতে হয়। এই বিষয়ে আমার কোন চিন্তাই আসিত না, কিন্তু আপনাদেরই একজন মার্কিন পর্যটক মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

'হিন্দু-আচার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যাহাই বলুক না কেন, আমি ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নাই যে, লাঙ্গল টানিবার বলদের সঙ্গে বা গাড়ি টানিবার কুকুরের সঙ্গে স্ত্রীলোক জুতিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইওরোপের কোন কোন দেশে যেমন করা হয়। ভারতবর্ষে কোন স্ত্রীলোক বা বালিকাকে জমি চাষ করিতে দেখি নাই। রেলগাড়ি ধরিয়া দুই পাশে দেখিয়াছি যে, রোদেপোড়া পুরুষ ও বালকেরা খালি গায়ে জমি চষিতেছে; কিন্তু একটি স্ত্রীলোকও চোখে পড়ে নাই। দুই ঘণ্টা রেল ভ্রমণের মধ্যে মাঠে কোন স্ত্রীলোক বা বালিকাকে কাজ করিতে দেখি নাই। ভারতবর্ষে নিম্নতম বর্ণের মেয়েরাও কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করে না। অন্যান্য জাতির সমপর্যায়ের মেয়েদের তুলনায় তাহাদের জীবন অপেক্ষাকৃত আরামের; হলকর্ষণ তাহারা কখনই করে না।'

এইবার দেখ। নিম্নবর্ণের পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিক। এখন কি আশা কর? পুরুষের সংখ্যা অধিক বলিয়া নারী বিবাহ করিবার অধিকতর সুযোগ পায়।

বিধবাদের বিবাহ না হওয়া প্রসঙ্গেঃ প্রথম দুই বর্ণের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিমাত্রায় অধিক; এইজন্যই এই উভয় সঙ্কট—

একদিকে বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়া জনিত সমস্যা ও দুঃখ, অন্যদিকে বিবাহযোগ্যা কুমারীদের স্বামী না পাওয়ার সমস্যা। কোন্ সমস্যাটির আমরা সম্মুখীন হইব—বিধবা-সমস্যা অথবা বয়স্কাকুমারী-সমস্যা? এই দুইটির মধ্যে একটি লইতেই হইবে। এখন আসুন, 'ভারতীয় মন সমাজতান্ত্রিক'—সেই মূল ভাবটিতে ফিরিয়া যাই। সমাজতান্ত্রিক ভারতবাসী বলে, 'দেখ, আমরা বিধবা-সমস্যাটিকে ছোট মনে করি। কেন? কারণ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছিল, তাহারা বিবাহিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা সুযোগ হারাইয়াছে, তথাপি একবার তো তাহাদের ভাগ্যে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এখন শান্ত হও এবং সেই ভাগ্যহীনা কুমারীদের কথা চিন্তা কর—যাহারা বিবাহ করিবার সুযোগ একবারও পায় নাই।' ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন বেলা দশটা হইবে, শত সহস্র মহিলা বাজার করিতেছেন। এই সময়ে একজন ভদ্রলোক, বোধ হয় তিনি মার্কিন, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হায় ভগবান্! ইহাদের মধ্যে কয়জন স্বামী পাইবে!' সেইজন্য ভারতীয় মন বিধবাদিগকে বলে, 'ভাল কথা, তোমাদের তো সুযোগ মিলিয়াছিল, তোমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যই আমরা খুবই দুঃখিত; কিন্তু আমরা নিরুপায়। আরও অনেকে যে (বিবাহের জন্য) অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।' অতঃপর এই সমস্যার সমাধানে ধর্মের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; হিন্দুধর্ম একটি সান্ত্বনার ভাব লইয়াই আসে। কারণ আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়, বিবাহ একটা মন্দ কাজ, ইহা শুধু দুর্বলের জন্য। আধ্যাত্মিক সংস্কারসম্পন্ন নারী বা পুরুষ আদৌ বিবাহ করেন না। সুতরাং ধর্মপরায়ণা নারী বলেন, 'ঈশ্বর আমাকে ভাল সুযোগই দিয়াছেন, সুতরাং আমার আর বিবাহের প্রয়োজন কি? ভগবানের নাম করিব, তাঁহার পূজা করিব।' মানুষকে ভালবাসিয়া কি লাভ? অবশ্য ইহা সত্য যে, সকলেই ভগবানে মন দিতে পারে না। কাহারও কাহারও পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। তাহাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাদের জন্য অপর বেচারীরা কষ্ট পাইতে পারে না। আমি সমস্যাটিকে আপনাদের বিচারের উপর ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আপনারা জানিয়া রাখুন, ইহাই হইল ভারতীয় মনের চিন্তাধারা।

অতঃপর নারীর দুহিতারূপে আসা যাক। ভারতীয় পরিবারে কন্যা একটি অতি কঠিন সমস্যা। কন্যা এবং বর্ণ-জাতি—এই দুইটি মিলিয়া হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করে, কারণ কন্যার বিবাহ একই বর্ণের ভিতর দিতেই হবে, এবং বর্ণের ভিতরও আবার ঠিক একই প্রকার বংশমর্যাদার পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। সেইজন্য বেচারী পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য অনেক সময় ভিখারী হইয়া যাইতে হয়। পাত্রের পিতা পুত্রের জন্য বিরাট পণ দাবী করেন, এবং কন্যার পিতাকে কন্যার বর সংগ্রহ করিবার জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়। সেইজন্য হিন্দুর জীবনে কন্যা যেন একটি কঠিন সমস্যা। মজার কথা ইংরেজীতে কন্যাকে বলা হয় 'ডটর', সংস্কৃতে উহার প্রতিশব্দ 'দুহিতা'। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, প্রাচীনকালের পরিবারে কন্যারা গো দোহন করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং 'দুহিতা' শব্দটি দোহন করা অর্থে 'দুহ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'দুহিতা'র প্রকৃত অর্থ হইতেছে দোহনকারিণী। পরে 'দুহিতা' শব্দটির একটি নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দোহনকারিণী—দুহিতা পরিবারের সমস্ত 'দুগ্ধ' দোহন করিয়া লইয়া যায়, ইহাই হইল দ্বিতীয় অর্থ।

ভারতীয় নারী যে-সকল বিভিন্ন সম্পর্কে সম্বন্ধ, সেগুলি বর্ণনা করিলাম। আমি আপনাদের পূর্বে বলিয়াছি যে, হিন্দুসমাজে জননীর স্থান সকলের উপরে, তাঁহার পর জায়া এবং তারপর কন্যা। এই পর্যায়ের ক্রম অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। বহু বৎসর সে-দেশে বাস করিয়াও কোন বিদেশী ইহা বুঝিতে পারেন না। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের ভাষার ব্যক্তিবাচক 'সর্বানাম'-এর তিনটি রূপ আছে। ইহারা অনেকটা 'ক্রিয়া'র মত কাজ করে। একটি খুবই সম্মানসূচক, দ্বিতীয়টি মধ্যম এবং সর্বনিম্নটি অনেকটা ইংরেজীর দাউ (thou) ও দী (thee)-এর মত। শিশু এবং ভৃত্যদের সম্পর্কে শেষেরটি প্রয়োগ করা হয়। মধ্যমটি সমান সমান লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখিতেছেন যে, আত্মীয়তার সর্বপ্রকার জটিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সর্বনামগুলি ব্যবহার করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আজীবন আমি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু তিনি কখনও আমাকে 'আপনি' বলিবেন না, তিনি আমাকে 'তুমি' বলিবেন, ভুলক্রমেও তিনি আমাকে 'আপনি' বলিবেন না; যদি বলেন, তাহাতে অমঙ্গল বুঝিতে হইবে।

গুরুজনদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইলে সেইরূপ, সর্বদা ঐ প্রকার ভাষাতেই করিতে হইবে। পিতামাতাকে তো দূরের কথা, বড় ভাই বা বোনকেও 'তু', 'তুম্' বা 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে আমার সাহসই হইবে না। আর মাতাপিতার নাম ধরিয়া আমরা কখনই ডাকি না। যখন আপনাদের দেশের প্রথা জানিতাম না, তখন একটি খুবই মার্জিত-রুচি পরিবারে পুত্রকে জননীর নাম ধরিয়া ডাকিতে দেখিয়া আমি গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। বুঝিলাম, ইহাই এই দেশের রীতি। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কখনই পিতামাতার উপস্থিতিতে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করি না। এমন কি তাঁহাদের সামনেও 'প্রথম পুরুষের বহুবচন'-এ উল্লেখ করি। এইরূপে আমরা দেখি যে, ভারতীয় নারী-পুরুষের সমাজ-জীবনে এবং সম্পর্কের তারতম্যে জটিলতম জাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে গুরুজনদের সম্মুখে কেহ স্ত্রীর সহিত কথা বলে না। একাকী যখন অপর কেহ থাকে না বা শুধু ছোটরা থাকে, তখনই স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা বলা যায়। যদি আমি বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামনে স্ত্রীর সহিত কথা বলিতাম, কিন্তু বড় বোন বা পিতামাতার সম্মুখে বলিতাম না। ভগিনীদের নিকট তাহাদের স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলিতে পারি না। ভাবটি এই যে, আমরা সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক জাতি। এই একটি ভাবের উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিবাহকে একটা অপবিত্র, একটা নিম্ন পর্যায়ের ব্যাপার বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য প্রেমের বিষয় লইয়া কোন আলোচনা কখনও করা চলিবে না। মা, ভাই, বোন বা অপর কাহারও সামনে আমি কোন উপন্যাস পড়িতে পারি না। তাঁহারা আসিলে উপন্যাসটি বন্ধ করিয়া দিই।

পান-ভোজনের ব্যাপারেও এই একই রীতি। আমরা গুরুজনদের সম্মুখে আহার করি না। শিশু বা সম্পর্কে ছোট না হইলে কোন পুরুষের সম্মুখে আমাদের মেয়েরা কখনও আহার করে না। মেয়েরা বলে, 'মরিয়া যাইব, তবু স্বামীর সম্মুখে কিছু চিবাইতে পারিব না।' মাঝে মাঝে ভাই ও বোনেরা একত্র খাইতে বসিতে পারে। ধরুন আমি এবং আমার ভগিনী একসঙ্গে খাইতেছি, এমন সময় ভগিনীর স্বামী দরজার গোড়ায় আসিয়া পড়িল— তখনই ভগিনী খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে, আর স্বামী-বেচারা সরিয়া পড়িবে।

যে-সব প্রথা আমাদের দেশের একান্ত নিজস্ব, সেইগুলি আমি বলিলাম। ইহাদের ভিতর কতকগুলি আমি অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করিয়াছি। আমি কখনও বিবাহ করি নাই। বধূসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার সম্পূর্ণ নয়। মাতা এবং ভগিনী যে কি, তাহা আমি জানি; অপরের বধূ আমি দেখিয়াছি মাত্র, তাহা হইতে যেটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আপনাদের বলিলাম।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি নির্ভর করে পুরুষের উপর; অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন, সেখানে মেয়েরাও ঐরূপ হইবে। যেখানে পুরুষদের সংস্কৃতি নাই, সেখানে মেয়েদেরও নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুপ্রথা-অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামীণ ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে সমস্ত ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। আপনাদের ভাষায় এগুলি ছিল সরকারের। জমির উপর কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার নাই। ভারতবর্ষে রাজস্ব জমি হইতে আসে, কারণ প্রত্যেকে সরকার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ করে। এই জমি একটি গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি, এবং পাঁচ দশ কুড়ি বা একশ-টি পরিবার একত্র ঐ জমি দখলে রাখিতে পারে। সমস্ত জমি তাহারাই নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তাহারা সরকারকে দেয় এবং একটি চিকিৎসক এবং শিক্ষকের ভরণপোষণ করে, ইত্যাদি।

আপনাদের ভিতর যাঁহারা হারবার্ট স্পেন্সার পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে আছে, তিনি তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিকে 'মঠপদ্ধতি' বলিয়াছেন। ইহা ইওরোপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কোথাও কোথাও সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে একজন শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহার ভার ঐ গ্রামকে লইতে হইবে। আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অতি সাধারণ। কারণ আমাদের পদ্ধতিও অত্যন্ত সরল। প্রত্যেক বালক একটি ছোট মাদুরের আসন লইয়া আসে। তালপাতাতে লেখা আরম্ভ হয়, কারণ কাগজের দাম অনেক। প্রত্যেকটি বালক তাহার আসন বিছাইয়া বসে, দোয়াত ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসে এবং লিখিতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য পাটীগণিত, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ, একটু ভাষা ও হিসাব—এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাল্যকালে এক বৃদ্ধ আমাদের নীতিবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুখস্থ করাইয়াছিলেন, উহার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে আছেঃ 'গ্রামের হিতের জন্য পরিবার, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের হিতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবে।'৬ এইরূপ অনেক শ্লোক ঐ পুস্তকে আছে। আমরা ঐগুলি মুখস্থ করি, এবং শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া দেন, পরে ছাত্রও ব্যাখ্যা করে। বালক-বালিকারা একত্র এগুলি শিক্ষা করে। ক্রমে তাহাদের শিক্ষা পৃথক্ হইয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্যই ছিল। ছাত্রীরা কদাচিৎ সেখানে যাইত; কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল।

বর্তমানকালে ইওরোপীয় ধরনে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মেয়েরাও এই উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক—এই দিকেই জনমত প্রবল হইতেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা চায় না; কিন্তু যাহারা চায়, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজও ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমেরিকায় হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য রুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ বৎসরেরও অধিক হইল, নারীদের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমার মনে আছে, যে বৎসর আমি বি.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেই বৎসর কয়েকটি ছাত্রীও ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একই মান, একই পাঠ্যসূচী ছিল এবং পরীক্ষায় ছাত্রীরা বেশ ভালই করিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না। এইরূপে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, এইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, প্রাচীন পুস্তকে আমরা আরও দেখি—ছেলে ও মেয়েরা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তী কালে সমস্ত জাতির শিক্ষাই অবহেলিত হইয়াছে। বৈদেশিক শাসনে কি আর আশা করা যায়? বিদেশী বিজেতারা আমাদের কল্যাণ করিবার জন্য তো আসে নাই। তাহারা ধন-সম্পদ্ চায়। আমি বারো বৎসর কঠোর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করিয়াছি; কিন্তু আমার দেশে আমি মাসে পাঁচ ডলারও উপার্জন করিতে পারি না। ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করিবেন? ইহাই প্রকৃত অবস্থা। বিদেশী-প্রবর্তিত শিক্ষায়তনগুলির উদ্দেশ্য—বহুসংখ্যক কেরানী, পোস্টমাস্টার, টেলিগ্রাফ অপারেটর প্রভৃতি তৈরি করিয়া অল্প অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনের উপযোগী একদল কর্মদক্ষ ক্রীতদাস পাওয়া। ইহাই হইল এই শিক্ষার স্বরূপ।

ফলে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশে করিবার অনেক কিছু আছে। যদি আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন এবং অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদেরই একটি প্রবাদ বাক্য আমি বলি, 'হংসীর যাহা খাদ্য, হংসেরও খাদ্য তাই।'

৭

বিদেশী মহিলারা হিন্দু মেয়েদের কঠোর জীবন দেখিয়া কত চীৎকার করেন—কাঁদেন, কিন্তু হিন্দু পুরুষদের কঠোর জীবনের উপর আপনাদের কোনই দৃষ্টি নাই। আপনাদের চোখের জল কৃত্রিম। ছোট ছোট বালিকাদের বিবাহ হয় কাহাদের সহিত? একজনের যখন বলা হইল যে, বৃদ্ধদের সহিত এই বালিকাদের বিবাহ হয়, তখন সে বলিয়া উঠিল, 'যুবকেরা তাহা হইলে কি করে? কি আশ্চর্য! বালিকাদের কি বৃদ্ধদের সহিত—কেবল বৃদ্ধদের সহিতই বিবাহ দেওয়া হয়?' আমরা যে বৃদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করি—বোধ হয় আমাদের দেশের সব লোকই ঐরূপ।

আত্মার মুক্তি ভারতবর্ষের আদর্শ। জগৎটা কিছুই নয়। উহা একটা দৃশ্য মাত্র, একটা স্বপ্ন। এই জীবন কোটি কোটি জীবনের মত একটি। সমস্ত প্রকৃতিই মায়া, একটা ছায়া, ছায়ার আগার। ইহাই হইল ভারতীয় জীবন-দর্শন। শিশুরা জীবনকে অভিনন্দিত করে, ইহাকে মধুর ও সুন্দর বলিয়া মনে করে। কিন্তু কয়েক বছর পরেই যেখান হইতে তাহারা শুরু করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেখানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবন শেষ হইবে। যৌবন-মত্ত জাতিরাও ভাবে যে, তাহারা যাহা খুশি তাহাই করিতে পারে। তাহারা মনে করে, আমরাই পৃথিবীর অধিপতি— দেবতা, ভগবানের চিহ্নিত

জাতি। তাহারা ভাবে—সমগ্র জগৎকে শাসন করিবার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার, তাহাদের যাহা ইচ্ছা করিবার, পৃথিবীকে ওলট-পালট করিবার আদেশপত্র সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যেন তাহাদিগকে দিয়াছেন; হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার ছাড়পত্র তাহারা পাইয়াছে। ভগবান্ তাহাদিগকে এই-সব স্বাধীনতা দিয়াছেন, শিশু বলিয়াই তাহারা এই-সব অপকর্ম করে। তাই সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের কত মহিমা ও বর্ণচ্ছটা! কিন্তু তাহারা বিস্মৃতির গর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। হয়তো ধ্বংসস্তূপেই সেগুলি বিরাট!

পদ্মপত্রে জলের ফোঁটা যেমন টলমল করিয়া মুহূর্তে পড়িয়া যায়, তেমনি এই নশ্বর জীবন। যেদিকেই আমরা তাকাই, সেদিকেই দেখি ধ্বংস। আজ যেখানে অরণ্য, এক সময়ে সেখানেই ছিল বড় বড় নগরীমণ্ডিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ভারতীয় মানুষের ইহাই হইল প্রধানতম চিন্তা ও মূল সুর। আমরা জানি, আপনাদের পাশ্চাত্য জাতির শিরায় তরুণ রক্ত প্রবাহিত। আমরা জানি, মানুষের মত জাতিরও সুদিন আসে। কোথায় গ্রীস? কোথায় রোম? সেদিনের সেই শক্তিধর স্পেন কোথায়? কে জানে এই-সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভারতের কি হইতেছে? এইরূপেই জাতির জন্ম হয় এবং কালে তাহাদের ধ্বংস হয়; এইভাবেই তাহাদের উত্থান ও পতন। যাহাদের দুর্ধর্ষ সৈন্য-বাহিনীকে জগতের কোন শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, যাহারা তোমাদের সেই ভয়াবহ 'টার্টার' শব্দটি রাখিয়া গিয়াছে, সেই মুঘল আক্রমণকারীকে হিন্দু শৈশব হইতেই জানে। হিন্দু তাহার পাঠ শিক্ষা করিয়াছে। আজিকার শিশুদের মত সে প্রলাপ বকিতে চায় না। হে পশ্চাত্য জাতি! তোমাদের যাহা বলিবার তাহা বল। এখন তো তোমাদেরই দিন। বর্তমান কাল শিশুদের প্রলাপ বকিবার কাল। আমরা যাহা শিখিবার, তাহা শিখিয়াছি। এখন আমরা মৌন। তোমাদের কিছু ধনসম্পদ্ হইয়াছে, তাই তোমরা আমাদিগকে অবজ্ঞা কর। ভাল, এখন তোমাদেরই দিন। বেশ বেশ, শিশু তোমরা, আধ-আধ কথা বল—ইহাই হইল হিন্দুর মনোভাব।

অসার ফেনায়িত বাক্যের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। এমন কি মেধাশক্তির সহায়েও তিনি লভ্য নন। বাহুবলেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। পরমেশ্বর তাঁহারই কাছে আসেন, যিনি বস্তুর গোপন উৎসটি জানেন, যিনি অপর সব কিছুই নশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন; আর কাহারও নিকট তিনি আসেন না। যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ শিক্ষা পাইয়াছে। ভারত এখন ভগবানের অভিমুখী। ভারতবর্ষ অনেক ভুল করিয়াছে। তাহার উপর অনেক জঞ্জালের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়াছে। তাহাতে কি হইয়াছে? আবর্জনা- পরিষ্কারে, নগর-পরিষ্কারে কি হয়? উহা কি জীবন দেয়? যাহাদের সুন্দর প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদেরও মৃত্যু হয়। আর প্রতিষ্ঠানের কথা না বলাই ভাল। ক্ষণভঙ্গুর এই পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলি—পাঁচদিন লাগে তাহাদের গড়িতে, আর ষষ্ঠ দিবসে সেগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। এই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি একটিও একাদিক্রমে দুই শত বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারে না। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। হিন্দু বলে, 'হ্যাঁ, আমরা প্রাচীন জাতিগুলির ধ্বংসের সাক্ষী, নূতন জাতিগুলিরও মৃত্যু দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। কারণ আমাদের আদর্শ ইহসংসারের নয়, ঊর্ধ্বলোকের। তোমার যেরূপ আদর্শ, তুমি সেইরূপই হইবে; আদর্শ যদি নশ্বর হয়, পৃথিবী-কেন্দ্রিক হয়, জীবনও সেইরূপ হইবে। আদর্শ যদি জড় হয়, তবে তোমরাও জড় হইবে। দেখ! আমাদের আদর্শ—আত্মা, আত্মাই একমাত্র সৎ-পদার্থ। আত্মা ছাড়া অন্য কিছুই নাই এবং আমরা আত্মারই মত চিরজীবী।

হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সাফল্য-সংবাদে আনন্দিত মান্দ্রাজবাসীদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে (১৮৯৪ সেপ্টেম্বরে) লিখিত।

মান্দ্রাজবাসী স্বদেশী, স্বধর্মাবলম্বী ও বন্ধুগণ—

হিন্দুধর্ম-প্রচারকার্যের জন্য আমি যতটুকু যাহা করিয়াছি, তাহা যে তোমরা আদরের সহিত অনুমোদন করিয়াছ, তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। এই আনন্দ, আমার নিজের বা সুদূর বিদেশে আমার প্রচারকার্যের ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য নয়। আমার আহ্লাদের কারণ—তোমরা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে আনন্দিত তাহাতে ইহাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যদিও হতভাগ্য ভারতের উপর দিয়া কতবার বৈদেশিক আক্রমণের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, যদিও শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের নিজেদের উপেক্ষায় এবং আমাদের বিজেতাগণের অবজ্ঞায় প্রাচীন আর্যাবর্তের মহিমা স্পষ্টই ম্লান হইয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দীব্যাপী বন্যায় হিন্দুধর্মরূপ সৌধের অনেকগুলি মহিমময় স্তম্ভ, অনেক সুন্দর সুন্দর খিলান ও অনেক অপূর্ব ভিত্তিপ্রস্তর ভাসিয়া গিয়াছে, তথাপি উহার ভিত্তি অটলভাবে এবং উহার সন্ধিপ্রস্তর অটুটভাবে বিরাজমান; যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির ঈশ্বরভক্তি ও সর্বভূতহিতৈষণারূপ অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ববৎ অটুট ও অবিচলিতভাবে বর্তমান।

ভারতে ও সমগ্র জগতে যাঁহার বাণীপ্রচারের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহার অতি অনুপযুক্ত দাস আমি। তোমরা তাঁহাকে আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছ; তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাঁহাতে এবং তাঁহার উপদেশে সেই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যার প্রথম অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াছ, যাহা নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে দুর্দমনীয় বেগে ভারতে উপনীত হইবে, অনন্ত শক্তিস্রোতে যাহা কিছু দুর্বল ও দোষযুক্ত, সব ভাসাইয়া দিবে আর হিন্দুজাতির শতশতাব্দীব্যাপী নীরব দুঃখভোগের পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর গৌরবে ভূষিত করিয়া তাহাদের বিধিনির্দিষ্ট উচ্চপদবীতে উন্নীত করিবে এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে উহার যে বিশেষ ব্রত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-প্রকৃতিসম্পন্ন মানবজাতির বিকাশসাধন, তাহাও সম্পাদন করিবে।

দাক্ষিণাত্যবাসী তোমাদের নিকট আর্যাবর্তবাসিগণ বিশেষভাবে ঋণী, কারণ ভারতে আজ যে-সকল শক্তি সক্রিয়, তাহাদের অধিকাংশেরই মূল দাক্ষিণাত্য। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্তনকারী আচার্যগণ, যথা শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব—ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। যে মহাত্মা শঙ্করের নিকট জগতের প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই ঋণী; যে মহাত্মা রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শ পদদলিত পারিয়াগণকেও আলওয়ারে পরিণত করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্যাবর্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্তিগণও যে মহাত্মা মধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য। বর্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গৌরব-স্বরূপ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীরই প্রাধান্য, তোমাদের ত্যাগই হিমালয়ের সুদূরবর্তী চূড়াস্থিত পবিত্র দেবালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অতএব মহাপুরুষগণের পূতশোণিতে পূরিতধমনী, তথাবিধ আচার্যগণের আশীর্বাদে ধন্যজীবন, তোমরা যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্বপ্রথম বুঝিবে ও আদরপূর্বক গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

দাক্ষিণাত্যই চিরদিন বেদবিদ্যার ভাণ্ডার, সুতরাং তোমরা বুঝিবে যে, হিন্দুধর্ম-আক্রমণকারী অজ্ঞ সমালোচকগণের পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

জাতিতত্ত্ববিৎ বা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের মূল্য যতই হউক, 'অগ্নিমীলে', 'ইষেত্বোর্জে ত্বা', 'শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে'

৮

প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বেদীযুক্ত বিভিন্ন যজ্ঞে নানাবিধ আহুতি দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহ যতই বাঞ্ছনীয় হউক, এই-সব কিছুরই একমাত্র উদ্দেশ্য ভোগ। এগুলি মোক্ষজনক—এ কথা বলিয়া কেহ কখনও তর্ক করে নাই। সুতরাং আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষমার্গের উপদেশক জ্ঞানকাণ্ড, যাহা আরণ্যক বা শ্রুতিশির বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ভারতে চিরকাল শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে এবং চিরকাল করিবে।

সনাতন ধর্মের নানা মতমতান্তররূপ গোলকধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত, একমাত্র যে ধর্মের সর্বজনীন উপযোগিতা তৎপ্রচারিত 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ব্রহ্মের অবিকল প্রতিবিম্ব-স্বরূপ—পূর্ব হইতেই প্রতিকূল চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকায় তাহার মর্মবোধে

অক্ষম, এবং জড়বাদসর্বস্ব জাতির নিকট ঋণসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার মনাদণ্ড অবলম্বন করিয়া অন্ধকারে অন্বেষণপরায়ণ আধুনিক হিন্দুযুবক বৃথাই তাহার পূর্বপুরুষগণের ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করে এবং হয় ঐ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়ে, অথবা স্বাভাবিক ধর্মভাবের প্রেরণায় পশুজীবন-যাপনে অসমর্থ হইয়া প্রাচ্যগন্ধী বিবিধ পাশ্চাত্য জড়বাদের নির্যাস অসাবধানে পান করে, এবং শ্রুতির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ।

৯

তাঁহারাই কেবল বাঁচিয়া যান, যাঁহাদের আত্মা সদ্‌গুরুর জীবনপ্রদ স্পর্শবলে জাগ্রত হয়।

ভগবান্ ভাষ্যকার ঠিকই বলিয়াছেনঃ

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

১০

পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব সিদ্ধান্তপ্রসূ বৈশেষিকদের সূক্ষ্ম বিচারসমূহই হউক, অথবা নৈয়ায়িকদের জাতিদ্রব্যগুণসমবায় প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধীয় অপূর্ব বিচারবলীই হউক, অথবা পরিণামবাদের জনকস্বরূপ সাংখ্যদিগের তদপেক্ষা গভীরতর চিন্তাগতিই হউক, অথবা এই বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণাবলীর সুপক্ক ফলস্বরূপ ব্যাসসূত্রই হউক, মনুষ্য-মনের এই-সকল বিবিধ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি। এমন কি বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলীতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই, আর অন্ততঃ কতকগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে এবং জৈনদের অধিকাংশ গ্রন্থে শ্রুতির প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে; তবে তাঁহারা শ্রুতির কোন কোন অংশকে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 'হিংসক' শ্রুতি আখ্যা দেন—এবং সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। বর্তমান কালেও স্বর্গীয় মহাত্মা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও এবম্বিধ মত পোষণ করিতেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ও বর্তমান সমুদয় ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্র কোথায়, যদি কেহ নানাবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড কি, জানিতে চান, তবে অবশ্য ব্যাসসূত্রকেই এই কেন্দ্র, এই মেরুদণ্ড বলিয়া দেখাইতে হইবে।

হিমাচলস্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তব্ধকারী গাম্ভীর্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়'-রূপ

১১

বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়াপীতম্' কূজনই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, অথবা নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উদ্দাম নৃত্যেই যোগদান করুন, বড়গেলে তেঙ্গেলে

১২

প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরুকি ফতে'-রূপ

১৩

সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের

১৪

উপদেশই শ্রবণ করুন, কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব

১৫

বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখীসম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন, রাজপুতানার সংস্কারক দাদুর অদ্ভুত গ্রন্থাবলী বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাঁহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া 'বিচারসাগর'-এর বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই (ভারতে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বিচারসাগর-গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক) পাঠ করুন, এমন কি আর্যাবর্তের ভাঙ্গী মেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই বলুন—তিনি দেখিবেন, এই আচার্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ সকলেই সেই ধর্মপ্রণালীর অনুবর্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্য গ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত্র বিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য

১৬

যাহার প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ হইতে লালগুরুর মেথর শিষ্যগণ পর্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহার বিভিন্ন বিকাশ।

অতএব দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত এবং আরও কতকগুলি অনতিপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাযুক্ত এই প্রস্থানত্রয়

১৭

হিন্দুধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপ, প্রাচীন নারাশংসীর

১৮

প্রতিনিধিস্বরূপ পুরাণ উহার উপাখ্যানভাগ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ তন্ত্র উাহার কর্মকাণ্ড।

পূর্বোক্ত প্রস্থানত্রয় সকল সম্প্রদায়েই প্রামাণ্য গ্রন্থ, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই একটা পরিবর্তিত আকারমাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বন্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বেই তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণভাগ, বিশেষতঃ অধ্বর্যু-ব্রাহ্মণভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই; তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। 'ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ?'— জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে, শ্রৌত বা স্মার্ত কর্ম ব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমুদয় প্রচলিত কর্মকাণ্ডই তন্ত্র হইতে গৃহীত, আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনা-প্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে।

অবশ্য আমি এ কথা বলি না যে, সকল হিন্দুই সমগ্রভাবে তাঁহাদের ধর্মের এই-সকল মূল বিষয় অবগত আছেন। অনেকে—বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে—এই-সব সম্প্রদায় ও প্রণালীর নাম পর্যন্ত শুনেন নাই; কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, পূর্বোক্ত তিন প্রস্থানের উপদেশানুসারে সকল হিন্দুই চলিয়াছেন।

অপর দিকে যেখানেই হিন্দীভাষা কথিত হয়, তথাকার অতি নীচজাতি পর্যন্ত নিম্নবঙ্গের অনেক উচ্চতম জাতি অপেক্ষা বৈদান্তিক ধর্ম সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ।

ইহার কারণ কি?

মিথিলাভূমি হইতে নবদ্বীপে আনীত শিরোমণি গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভায় সযত্নে লালিত ও পরিপুষ্ট, কোন কোন বিষয়ে সমগ্র জগতের অন্যান্য সমুদয় প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপূর্ব সুনিবদ্ধ বাক্‌শিল্পে রচিত তর্কপ্রণালীর বিশ্লেষণস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ন্যায়শাস্ত্র হিন্দুস্থানের সর্বত্র শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদের চর্চায় বঙ্গবাসীর যত্ন ছিল না, এমন কি, কয়েক বর্ষ মাত্র পূর্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য

১৯

পড়াইতে পারেন—এমন কেহ বঙ্গদেশে ছিলেন না বলিলেই হয়। একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক'

২০

জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙিয়াছিল; কিছু দিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতী

২১

ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্মপ্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন।

বোধহয় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে পুরী-সম্প্রদায় বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাসসূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়াছে, না হয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপ-সনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীবন অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান্ সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি, শীঘ্রই উহা আপন লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ পরিজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার বিষয় সাদরে চর্চা করে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিভাবে সমগ্র ভারতে সক্রিয়। কি করিয়াই বা জানিবেন? তাঁহারা গদিয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে সকলে ভগবানকে ভালবাসে।

যে অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা বিশেষভাবে বঙ্গদেশেই প্রচলিত, তাহাও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্মজীবন হইতে বঙ্গদেশ যে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, তাহার আর একটি কারণ। সর্বপ্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশ এখন পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও ভাণ্ডারস্বরূপ মহান্ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের জীবন হইতে শক্তি লাভ করে নাই।

উচ্চবর্ণেরা বাঙালীরা ত্যাগের ভাব পচ্ছন্দ করেন না, তাঁহাদের ঝোঁক ভোগের দিকে। তাঁহারা কেমন করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবেন? 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ।'

২২

অন্যপ্রকার কিরূপে সম্ভব?

অপর দিকে ক্রমান্বয়ে অনেক সুদূরবিস্তারি-প্রতিভাসম্পন্ন মহা মহা ত্যাগী আচার্যগণ সমুদয় হিন্দীভাষী ভারতের মধ্যে বেদান্তের মত প্রতি গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে ত্যাগের যে মহিমা প্রচারিত হয়, তাহাতে অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেও বেদান্তদর্শনের উচ্চতম উপদেশ পর্যন্ত শিক্ষা পাইয়াছে। যথোচিত গর্বের সহিত পঞ্জাবের কৃষকবালিকা বলিয়া থাকে, তাহার চরকা পর্যন্ত 'সোঽহম্ সোঽহম্' ধ্বনি করিতেছে। আর আমি হৃষীকেশের জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশধারী ত্যাগী মেথরদিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি। অনেক গর্বিত অভিজাত ব্যক্তিও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ পাইতে পারেন। কেনই বা না এইরূপ হইবে? 'অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং'—নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করিবে।

অতএব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাববাসীরা বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধিবাসিগণ অপেক্ষা ধর্মবিষয়ে অধিক শিক্ষিত। দশনামী, বৈরাগী, পন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ত্যাগী পরিব্রাজকগণ প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ধর্মভাব লইয়া যাইতেছেন; মূল্য এক-টুকরা রুটিমাত্র। আর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কি মহৎ ও নিঃস্বার্থচরিত্র! স্বাধীন বা কাচুপন্থী সম্প্রদায়ের (যাঁহারা নিজেদের কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না) একজন সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারই চেষ্টায় সমগ্র রাজপুতানায় শত শত বিদ্যালয় ও দাতব্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তিনি জঙ্গলের ভিতর হাসপাতাল খুলিয়াছেন, হিমালয়ের দুর্গম গিরিনদীর উপরে লৌহসেতু নির্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনও মুদ্রা স্পর্শ করেন না; তাঁহার একখানি কম্বল ছাড়া সাংসারিক সম্বল আর কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহাকে লোকে 'কম্বলী স্বামী' বলিয়া ডাকে—তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করেন। তাঁহাকে কখনও একাদিক্রমে একই বাড়িতে পুরা ভিক্ষা করিতে দেখি নাই, পাছে গৃহস্থের কোন ক্লেশ হয়। আর এরূপ সাধু—তিনি একা নহেন, এরূপ শত শত সাধু রহিয়াছেন। তোমরা কি মনে কর, যতদিন এই ভূদেবগণ ভারতে জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের দেবচরিত্ররূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিতেছেন, ততদিন এই প্রাচীন ধর্মের বিনাশ হইবে?

এই দেশে (আমেরিকায়) পাদরিগণ বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস প্রতি রবিবার দুই ঘণ্টা ধর্মপ্রচারের জন্য ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—এমন কি নব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাদের ধর্মরক্ষার জন্য কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, আর বাঙালী যুবকগণ শিক্ষা পাইয়াছেন, 'কম্বলী স্বামী'র ন্যায় দেবতুল্য সম্পূর্ণ নিঃসার্থ ব্যক্তিগণ অলস ভবঘুরে মাত্র! 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'

২৩

—আমার ভক্তদের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এই আমার মত।

একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত লও—একজন অতি অজ্ঞ বৈরাগীর কথা ধর। তিনি যখন কোন গ্রামে গমন করেন, তিনিও তুলসীদাস বা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যাহা জানেন, অথবা দাক্ষিণাত্যে হইলে আলওয়ারদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছেন, তাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন। ইহা কি কিছু উপকার করা নয়? আর এই সমুদয়ের বিনিময়ে তাঁহার প্রাপ্য এক-টুকরা রুটি ও একখণ্ড কৌপীন। ইঁহাদিগকে নির্দয়ভাবে সমালোচনা করিবার পূর্বে ভ্রাতৃগণ, চিন্তা কর— তোমরা তোমাদের স্বদেশবাসীর জন্য কি করিয়াছ, যাহাদের ব্যয়ে তোমরা শিক্ষা পাইয়াছ, যাহাদিগকে শোষণ করিয়া তোমাদের পদগৌরব রক্ষা করিতে হয়, এবং 'বাবাজীগণ ভবঘুরে মাত্র' এই শিক্ষার জন্য তোমাদের শিক্ষকগণকে বেতন দিতে হয়।

আমাদের কতকগুলি স্বদেশী বঙ্গবাসী হিন্দুধর্মের এই পুনরুত্থানকে হিন্দুধর্মের 'নূতন বিকাশ' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা উহাকে 'নূতন' আখ্যা দিতে পারেন। কারণ হিন্দুধর্ম সবেমাত্র বাঙলা দেশে প্রবেশ করিতেছে; এখানে এতদিন ধর্ম বলিতে কেবল আহার বিহার ও বিবাহ সম্বন্ধীয় কতকগুলি দেশাচারমাত্রকেই বুঝাইত।

রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ হিন্দুধর্মের যে-ভাব সমগ্র ভারতে প্রচার করিতেছেন, তাহা সৎশাস্ত্রের অনুমোদিত কিনা, এই ক্ষুদ্র পত্রে সেই গুরুতর প্রশ্ন বিচার করিবার স্থান নাই। তবে আমি আমাদের সমালোচকগণ কয়েকটি সঙ্কেত দিব, যাহাতে তাহারা আমাদের মত আরও ভালরূপে বুঝিতে পারে।

প্রথমতঃ আমি কখনও এরূপ তর্ক করি নাই যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ হইতে হিন্দুধর্মের যথার্থ ধারণা হইতে পারে, যদিও তাঁহাদের কথা 'অমৃত-সমান' এবং যাঁহারা উহা শুনেন, তাঁহারা 'পুণ্যবান্'। হিন্দুধর্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মাচার্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলী জানিতে হইবে। ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা গৌতমসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের আলোকে 'আপ্ত'

২৪

সম্বন্ধে গৌতমের মতবাদ পাঠ কর, শবর ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের সাহায্যে যদি মীমাংসকগণের মত আলোচনা কর, ‘অলৌকিক প্রত্যক্ষ’ ও ‘আপ্ত’ সম্বন্ধে এবং সকলেই ‘আপ্ত’ হইতে পারে কিনা এবং এইরূপ আপ্তদিগের বাক্য বলিয়াই যে বেদের প্রামাণ্য, এই- সকল বিষয়ে তাঁহাদের মত যদি অধ্যয়ন কর, যদি তোমাদের মহীধরকৃত যজুর্বেদভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখিবার অবকাশ থাকে, তবে তাহাতে দেখিবে—মানবের আধ্যাত্মিক জীবন ও বেদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আরও সুন্দর সুন্দর বিচার আছে। তাঁহারা তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদ অনাদি অনন্ত।

‘সৃষ্টির অনাদিত্ব’ মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই, ঐ মত কেবল হিন্দুধর্মের নয়, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেরও একটি প্রধান ভিত্তি।

এখন—ভারতীয় সমুদয় সম্প্রদায়কে মোটামুটি জ্ঞানমার্গী বা ভক্তিমার্গী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যদি তোমরা শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত শারীরিকভাষ্যের উপক্রমণিকা পাঠ কর, তবে দেখিবে—সেখানে জ্ঞানের ‘নিরপেক্ষতা’ সম্পূর্ণভাবে বিচার করা হইয়াছে, আর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মানুভূতি ও মোক্ষ কোনরূপ অনুষ্ঠান, মত, জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। যে-কোন ব্যক্তি ‘সাধনচতুষ্টয়’-সম্পন্ন, সে-ই ইহার অধিকারী। সাধনচতুষ্টয় সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধিকর কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র।

ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, বাঙালী সমালোচকগণও বেশ জানেন যে, ভক্তিমার্গের কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন, মুক্তির জন্য জাতি বা লিঙ্গে কিছু আসে যায় না, এমন কি মনুষ্যজন্ম পর্যন্ত আবশ্যক নয়; একমাত্র প্রয়োজন—ভক্তি।

জ্ঞান ওই ভক্তি সর্বত্র নিরপেক্ষ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং কোন আচার্যই এরূপ বলেন নাই যে, মুক্তিলাভে কোন বিশেষ মতাবলম্বীর, বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ জাতির অধিকার। এ বিষয়ে ‘অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ’

২৫

—এই বেদান্তসূত্রের উপর শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব-কৃত ভাষ্য পাঠ কর।

সমুদয় উপনিষদ্ অধ্যয়ন কর, এমন কি সংহিতাগুলির মধ্যে কোথাও অন্যান্য ধর্মে মোক্ষের যে সঙ্কীর্ণ ভাব আছে, তাহা পাইবে না। অপর ধর্মের প্রতি সহানুভূতির ভাব সর্বত্রই রহিয়াছে, এমন কি অধ্বর্যুবেদের সংহিতাভাগের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্লোকে আছে—(যদি আমার ঠিক স্মরণ থাকে) ‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।’

২৬

এই ভাব হিন্দুধর্মের সর্বত্র রহিয়াছে।

যতদিন কেহ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া চলিয়াছে, ততদিন ভারতে কেহ কি কখনও নিজ ইষ্টদেবতা নির্বাচনের জন্য, নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হইবার জন্য নিগৃহীত হইয়াছে? সামাজিক নিয়মভঙ্গের অপরাধে সমাজ যে-কোন ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি—এমন কি অতি নীচ পতিত পর্যন্ত কখনও হিন্দুধর্ম-মতে মুক্তির অনধিকারী নয়। এই দুইটি একসঙ্গে মিশাইয়া গোল করিও না। ইহার উদাহরণ দেখ। মালাবারে একজন চণ্ডালকে একজন উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু সে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইলে তাহাকে অবাধে সর্বত্র যাইতে দেওয়া হয়, আর এই নিয়ম একজন হিন্দু রাজার রাজ্যে কত শতাব্দী ধরিয়া রহিয়াছে! ইহা একটু অদ্ভুত রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু অতিশয় প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও অপরাপর ধর্মের প্রতি হিন্দুধর্মের সহানুভূতির ভাবও ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম একটি বিষয়ে জগতের অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক্, একটি ভাব প্রকাশ করিতে সাধুগণ সংস্কৃতভাষার সমুদয় শব্দরাশি প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন যে, মানুষকে এই জীবনেই ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং অদ্বৈতবাদ আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি’—এ কথা খুব যুক্তিসঙ্গতও বটে।

এই মতের ফলস্বরূপ প্রেরণার অতি উদার ও মহৎ ভাব আসিতেছে—ইহা শুধু বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাহা নয়; শুধু বিদুর, ধর্মব্যাধ

২৭

ও অপরাপর প্রাচীন মহাপুরুষেরা ইহা বলিয়াছেন, তাহা নয়, কিন্তু সেদিন সেই দাদূপন্থী-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্যাগী নিশ্চলদাসও নির্ভিকভাবে তাঁহার ‘বিচারসাগর’ গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেনঃ

যো ব্রহ্মবিদ্ ওই ব্রহ্ম, তাকু বাণী বেদ।
সংস্কৃত ঔর ভাষামে করত ভ্রমকি ছেদ॥

যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহার বাক্যই বেদ। সংস্কৃত অথবা দেশীয় যে-কোন ভাষায় তিনি বলুন না কেন, তাহাতেই লোকের অজ্ঞান দূর হয়।

অতএব দ্বৈতবাদ অনুসারে ঈশ্বরকে লাভ করা এবং অদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়াই বেদের সমুদয় উপদেশের লক্ষ্য, এবং অন্য যাহা কিছু শিক্ষা বেদে আছে, তাহা সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার সোপানমাত্র। ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের এই মহিমা যে, তিনি নিজ প্রতিভাবলে ব্যাসের ভাবগুলি অপূর্বভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ সত্য হিসাবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; আপেক্ষিক সত্য হিসাবে এই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতে বা ভারতের বাহিরে সকল ধর্মসম্প্রদায়ই সত্য! তবে কোন কোনটি অপরগুলি অপেক্ষা উচ্চতর, এই মাত্র। মনে কর, কোন ব্যক্তি বরাবর সূর্যাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতি পদক্ষেপে সে সূর্যের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিবে। যতদিন না সে প্রকৃত সূর্যের নিকট পৌঁছিতেছে, ততদিন তাহার কাছে সূর্যের আকার দৃশ্য ও বর্ণ প্রতিমুহূর্তে নূতন হইতে থাকিবে। প্রথম সূর্যকে সে একটি বৃহৎ গোলকের ন্যায় দেখিয়াছিল। তারপর উহার আকৃতি ক্রমশঃ বড় হইতেছিল। প্রকৃতি সূর্য বাস্তবিক কখনও তাঁহার প্রথমে দৃষ্ট গোলকের মত বা পরে দৃষ্ট সূর্যসমূহের মত নয়। তথাপি ইহা কি সত্য নয় যে, সেই যাত্রী বরাবর সূর্যই দেখিতেছিল, সূর্য ব্যতীত অন্য কিছুই দেখে নাই? এইরূপে সমুদয় সম্প্রদায়ই সত্য; কোনটি প্রকৃত সূর্যের নিকটে, কোনটি বা দূরে! সেই প্রকৃত সূর্যই আমাদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

আর যখন এই সত্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেষ্টা একমাত্র বেদ—অন্যান্য ঐশ্বরিক ধারণা যাঁহারই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ দর্শনমাত্র, যখন 'সর্বলোকহিতৈষিণী শ্রুতি' সাধকের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই নির্বিশেষ পরব্রহ্মে যাইবার সমুদয় সোপানগুলি দিয়া লইয়া যান, আর অন্যান্য ধর্ম যখন ইহাদের মধ্যে এক-একটি রুদ্ধগতি ও স্থিতিশীল সোপান মাত্র, তখন জগতের সমুদয় ধর্ম এই নামরহিত, সীমারহিত, নিত্য বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা কর, অনন্তকাল ধরিয়া তোমার অন্তরের অন্তস্তল অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তথাপি এমন কোন মহৎ ধর্মভাব আবিষ্কার করিতে পারিবে না, যাহা এই আধ্যাত্মিকতার অনন্ত খনির ভিতর পূর্ব হইতেই নিহিত নাই।

হিন্দুদের তথাকথিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রথমে গিয়া দেখ—ইহা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে; প্রথমে জান, উপাসকগণ কোথায় প্রথমে উপাসনা করেন—মন্দিরে, প্রতিমায় অথবা দেহমন্দিরে।

প্রথমে নিশ্চয় করিয়া জান—তাহারা কি করিতেছে (শতকরা নিরানব্বই জনের অধিক নিন্দুকই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ), তখন বেদান্তদর্শনের আলোকে উহা আপনিই ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। তথাপি এ কর্মগুলি অবশ্য-কর্তব্য নয়। বরং 'মনু' খুলিয়া দেখ—উহা প্রত্যেক বৃদ্ধকে চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছে, এবং তাহারা উহা গ্রহণ করুক বা না করুক, তাহাদিগকে সমুদয় কর্ম অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

সর্বত্রই ইহা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় কর্মকাণ্ডে সমাপ্ত হয়—'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।'

২৮

এই-সকল কারণে অন্যান্য দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা একজন হিন্দু-কৃষকও অধিক ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন। আমার বক্তৃতায় ইওরোপীয় দর্শন ও ধর্মের অনেক শব্দ ব্যবহারের জন্য কোন বন্ধু সমালোচনাচ্ছলে অনুযোগ করিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে আমার পরম আনন্দ হইত। উহা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত, কারণ সংস্কৃত ভাষাই ধর্মভাব প্রকাশের একমাত্র সঠিক বাহন। কিন্তু বন্ধুটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার শ্রোতা ছিলেন পাশ্চাত্য নরনারীগণ। যদিও কোন ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনারী বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহাদের সংস্কৃত গ্রন্থের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছে, মিশনারীগণই উহার অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি আমি সেই সমবেত বৃহৎ মিশনারীমণ্ডলীর মধ্যে একজনকেও দেখিতে পাইলাম না, যিনি সংকৃত ভাষায় একটি পঙ্ক্তি পর্যন্ত বুঝেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেদ, বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের যাবতীয় পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বড় বড় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

আমি কোন ধর্মের বিরোধী—এ কথা সত্য নয়। আমি ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরোধী—এ কথাও সত্য নয়। তবে আমি আমেরিকায় তাঁহাদের টাকা তুলিবার কতকগুলি উপায়ের প্রতিবাদ করি।

বালকবালিকাদের পাঠ্যপুস্তকে অঙ্কিত ঐ চিত্রগুলির অর্থ কি? চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে—হিন্দুমাতা তাহার সন্তান গঙ্গায় কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে। জননী কৃষ্ণকায়া, কিন্তু শিশুটি শ্বেতাঙ্গরূপে অঙ্কিত; ইহার উদ্দেশ্য শিশুগণের প্রতি অধিক সহানুভূতি আকর্ষণ ও অধিক চাঁদাসংগ্রহ। একটি ছবিতে একজন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে একটি কাষ্ঠস্তম্ভে বাঁধিয়া নিজ হস্তে পুড়াইতেছে; স্ত্রী যেন ভূত হইয়া তাহার স্বামীর শত্রুকে পীড়ন করিবে— ঐ-প্রকার ছবির অর্থ কি? বড় বড় রথ রাশি রাশি মানুষকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিতেছে—এ-সকল ছবির অর্থ কি? সেদিন এখানে (আমেরিকায়) ছেলেদের জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একজন পাদরী ভদ্রলোক তাঁহার কলিকাতা-দর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি দেখিয়াছেন—কলিকাতার রাস্তায় একখানি রথ কতকগুলি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তির উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

মেমফিস নগরে আমি একজন পাদরী ভদ্রলোককে প্রচারকালে বলিতে শুনিয়াছি, ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র শিশুদের কঙ্কালপূর্ণ একটি করিয়া পুষ্করিণী আছে।

হিন্দুরা খ্রীষ্টশিষ্যগণের কি ক্ষতি করিয়াছে যে, প্রত্যেক খ্রীষ্টান বালকবালিকাকেই শিক্ষা দেওয়া হয়—যেন তাহারা হিন্দুদিগকে 'দুষ্ট', 'হতভাগা' ও পৃথিবীর মধ্যে ভয়ানক 'দানব' বলিয়া অভিহিত করে? এখানে বালকবালিকাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গীভূত—খ্রীষ্টান ব্যতীত অপর সকলকে, বিশেষতঃ হিন্দুকে ঘৃণা করিতে শেখানো, যাহাতে তাহারা শৈশবকাল হইতেই খ্রীষ্টান মিশনে চাঁদা দিতে শেখে।

সত্যের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের সন্তানগণের নৈতিক জীবনের খাতিরেও খ্রীষ্টান মিশনারীগণের আর এরূপ ভাবের

প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বালকবালিকাগণ যে বড় হইয়া অতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর নরনারীতে পরিণত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কোন প্রচারক—যতই অনন্ত নরকের যন্ত্রণা এবং প্রজ্বলিত অগ্নি ও গন্ধকধূমের বর্ণনা করিতে পারেন, গোঁড়াদিগের মধ্যে তাঁহার ততই অধিক প্রতিপত্তি হয়। আমার কোন বন্ধুর একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে—'পুনরুত্থান'-সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচার শ্রবণের ফলে বাতুলালয়ে পাঠাইতে হইয়াছিল। তাহার পক্ষে জ্বলন্ত গন্ধক ও নরকাদির মাত্রাটি কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল।

আবার মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থগুলি দেখ। যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ এক পঙ্ক্তি লেখে, তাহা হইলে মিশনারীগণ প্রতিহিংসায় বিষোদ্গার করিতে থাকেন।

স্বদেশবাসিগণ, আমি এই দেশে এক বৎসরের অধিক কাল; আমি ইঁহাদের সমাজের প্রায় সকল অংশই দেখিয়াছি। এখন উভয় দেশের তুলনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, মিশনারীরা পৃথিবীর সর্বত্র বলিয়া বেড়ান, আমরা শয়তান; প্রকৃতপক্ষে আমরা শয়তান নই, আর তাঁহারাও নিজেদের দেবদূত বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারাও দেবদূত নন। মিশনারীগণ হিন্দুবিবাহপ্রণালীর দুর্নীতি, শিশুহত্যা ও অন্যান্য দোষের কথা যত কম বলেন, ততই মঙ্গল। এমন অনেক দেশ থাকিতে পারে, যেখানকার বাস্তব চিত্রের সমক্ষে মিশনারীগণের অঙ্কিত হিন্দুসমাজের সমুদয় কাল্পনিক চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। কিন্তু বেতনভুক্ নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ নির্দোষ—এ দাবী আর কেহ করে করুক, আমি কখনও করিব না। এই সমাজের যে-সকল ত্রুটি অথবা শত শতাব্দী-ব্যাপী দুর্বিপাকবশে ইহাতে যে-সকল দোষ জন্মিয়াছে, সে সম্বন্ধে আর কেহই আমা অপেক্ষা বেশী জানে না। বৈদেশিক বন্ধুগণ, যদি তোমরা যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করিতে আস, বিনাশ যদি তোমাদের উদ্দেশ্য না হয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

কিন্তু যদি এই অবসন্ন পতিত জাতির মস্তকে অনবরত—সময়ে অসময়ে ক্রমাগত গালি বর্ষণ করিয়া স্বজাতির নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দেখান তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি স্পষ্টই বলিতে পারি, যদি একটু ন্যায়পরতার সহিত এই তুলনা হয়, তবে হিন্দুগণ—নীতিপরায়ণ জাতি হিসাবে জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক উচ্চ আসন পাইবে।

ভারতে ধর্মকে কখনই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। কোন ব্যক্তিকেই তাহার ইষ্টদেবতা, সম্প্রদায় বা আচার্য মনোনয়নে কখনও বাধা দেওয়া হয় নাই; সুতরাং এখানে ধর্মের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, অন্য কোথাও সেরূপ হয় নাই।

অপরদিকে আবার ধর্মের ভিতর এই নানাভাব বিকাশের জন্য একটি স্থিরবিন্দুর আবশ্যক হইল—সমাজ এই স্থিরবিন্দুরূপে গৃহীত হইল। ইহার ফলে সমাজ কঠোরশাসনে পূর্ণ ও একরূপ অচল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক।

পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু সমাজ ছিল বিভিন্ন ভাব বিকাশের ক্ষেত্র এবং স্থিরবিন্দু ছিল ধর্ম। প্রতিষ্ঠিত চার্চের সহিত একমত হওয়াই ইওরোপীয় ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল, এমন কি এখনও আছে; আর যদি কোন সম্প্রদায় প্রচলিত মত হইতে কিছু স্বতন্ত্র হইতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে অজস্র শোণিতপাতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে একটু সুবিধা লাভ করিতে হয়। ইহার ফল একটি মহৎ সমাজ-সংহতি, কিন্তু তাহাতে যে ধর্ম প্রচলিত, তাহা অতি স্থূল জড়বাদের উপর কখনও উঠে নাই।

আজ পাশ্চাত্য দেশ নিজের অভাব বুঝিতেছে। এখন পাশ্চাত্যে উন্নত ঈশ্বরতত্ত্বান্বেষিগণের মূলমন্ত্র হইয়াছে—'মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও আত্মা।' সংস্কৃত-দর্শন-অধ্যয়নকারী মাত্রেই জানেন, এ হাওয়া কোথা হইতে বহিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ না ইহা নব জীবন সঞ্চার করিতেছে, ততক্ষণ ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

ভারতে আবার নূতন নূতন অবস্থার সংঘর্ষে সমাজ-সংহতির নূতন সামঞ্জস্যবিধান বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। গত শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ ধরিয়া ভারত সমাজসংস্কার-সভায় ও সমাজসংস্কারকে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হায়! ইহার মধ্যে সব কয়টিই বিফল হইয়াছে। ইঁহারা সমাজসংস্কারের রহস্য জানিতেন না; ইঁহারা প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় শিখেন নাই। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহারা আমাদের সমাজের যত দোষ, সব ধর্মের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। বন্ধুর গায়ে মশা বসিয়াছে দেখিয়া সেই গল্পের মানুষটি যেমন দারুণ আঘাতে মশার সঙ্গে বন্ধুকেও মারিয়া ফেলে, সেইরূপ তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে তাঁহারা অটল অচল গাত্রে আঘাত করিয়াছিলেন, শেষে উহার প্রতিঘাতবলে নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছেন। যে-সকল মহামনা নিঃস্বার্থ পুরুষ এইরূপ বিপথে চালিত চেষ্টায় অকৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য! আমাদের নিশ্চেষ্ট সমাজরূপ নিদ্রিত দৈত্যকে জাগরিত করিতে সংস্কারোন্মত্ততার এই বৈদ্যুতিক আঘাতের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

আসুন, আমরা ইঁহাদের শুভকামনা করিয়া ইঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান্ হই। তাঁহারা এটুকু শিক্ষা করে নাই, ভিতর হইতে বিকাশ আরম্ভ হয়, বাহিরে তাহারই পরিণতি হয়; তাঁহারা শিক্ষা করেন নাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ পূর্ববর্তী কোন ক্রমসঙ্কোচের পুনর্বিকাশ মাত্র। তাঁহারা জানিতেন না, বীজ উহার চারিপাশের পঞ্চভূত হইতে উপাদান সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু বৃক্ষটি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। যতদিন না হিন্দুজাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং এক নূতন জাতি তাহার স্থান অধিকার করে, ততদিন প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবিত থাকিতে ভারত কখনও ইওরোপ হইতে পারে না।

ভারত কি বিলুপ্ত হইবে, যে-ভারত সমুদয় মহত্ত্ব নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন জননী, যে-ভূমিতে সাধুগণ বিচরণ করিতেন, যে-ভূমিতে ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিগণ এখনও বাস করিতেছেন? হে ভ্রাতৃগণ, এথেন্সের সেই জ্ঞানী মহাত্মার

লণ্ঠন লইয়া তোমাদের সঙ্গে এই বিস্তৃত জগতের প্রত্যেক নগর, গ্রাম, অরণ্য অন্বেষণে যাইতে রাজী আছি, কোথাও যদি এমন লোক পাও তো দেখাও। এ কথা ঠিক যে, ফল দেখিয়াই গাছ চেনা যায়। ভারতের প্রত্যেক আমগাছের তলায় পতিত ঝুড়ি ঝুড়ি কীটদষ্ট, অপক্ক আম কুড়াও এবং তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে একশতটি করিয়া গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা কর। তথাপি তুমি একটি আমেরও সঠিক বর্ণনা লিখিতে পারিবে না। গাছ হইতে একটি সুপক্ক সরস সুমিষ্ট আম পাড়িয়া লও, তবেই তুমি আমের সকল তত্ত্ব অবগত হইবে।

এইভাবে এই ঈশ্বরকল্প মানবগণই হিন্দুধর্ম কি, তাহা প্রকাশ করেন। এই জাতি শতাব্দী দ্বারা কৃষ্টির পরিমাপ করে, যে জাতিরূপ বৃক্ষ সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও অনন্ত তারুণ্যের অক্ষয় তেজে এখনও গৌরবান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই দেবমানবদের জীবন দেখিলেই সেই জাতির স্বরূপ, শক্তি ও সম্ভাবনার বিষয় জানা যায়।

ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম দেবদেবীরূপে রাজত্ব চালাইবে; অর্থ—সে পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশব বল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি। এ অবস্থা কখনও হইতে পারে না। কর্মশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণ অধিক শক্তিমান্। যাঁহারা মনে করেন হিন্দুধর্মের বর্তমান পুনরুত্থান কেবল দেশপ্রীতিজাত আবেগের একটি বিকাশমাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ আসুন, এই অপূর্ব ব্যাপার কি, তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি। ইহা কি আশ্চর্য নয় যে, একদিকে যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবল আক্রমণে পাশ্চাত্য গোঁড়া ধর্মগুলির প্রাচীন দুর্গসমূহ ধূলিসাৎ হইতেছে, একদিকে যেমন বর্তমান বিজ্ঞানের হাতুড়ির আঘাত—শুধু বিশ্বাস বা চার্চ-সমিতির ভোটাধিক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতগুলি কাচপাত্রের মত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, একদিকে যেমন আক্রমণশীল আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্ধমান স্রোতের সহিত নিজেদের মিলাইতে গিয়া পাশ্চাত্য ধর্মমতসকল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে, একদিকে যেমন অপর সমুদয় ধর্মপুস্তকের মূলগ্রন্থগুলি হইতে আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্ধমান তাড়নায় যথাসম্ভব বিস্তৃত ও উদার অর্থ বাহির করিতে হইয়াছে, আর তাহাদের অধিকাংশই ঐ চাপে ভগ্ন হইয়া অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হইয়াছে, একদিকে যেমন অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি চার্চের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছেন, অপর দিকে তেমনি যে-সকল ধর্ম সেই বেদরূপ জ্ঞানের মূল প্রস্রবণ হইতে প্রাণপ্রদ বারি পান করিয়াছে অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মই পুনরুজ্জীবিত হইতেছে?

অশান্ত পাশ্চাত্য নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কেবল গীতা বা ধম্মপদেই স্বীয় আশ্রয় পাইতেছেন—যেখানে তাঁহাদের মন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। আর যে-হিন্দু নৈরাশ্যের অশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে তাহার প্রাচীন বাসভবন শত্রুপ্রদত্ত অগ্নিতে বেষ্টিতে দেখিতেছিল, এখন বর্তমান চিন্তার প্রখর আলোকে ধূম অপসারিত হইবার পর সে দেখিতেছে, তাহার গৃহই একমাত্র নিজ শক্তিতে দণ্ডায়মান; অপরগুলি সব—হয় ধ্বংস হইয়াছে, নয় হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইতেছে। হিন্দু এখন অশ্রুমোচন করিয়া দেখিতে পাইতেছে, যে-কুঠার সেই 'ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখা অশ্বত্থ'-এর মূলদেশ কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিক অস্ত্রচিকিৎসকের শল্যের কার্যই করিয়াছে।

সে দেখিতেছে—তাহার ধর্মরক্ষার জন্য তাহার শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার বা অন্য কোনরূপ কপটতা করিবার আবশ্যকতা নাই। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রের দুর্বল অংশগুলিকে সে দুর্বল বলিতে পারে, কারণ ঐগুলি অরুন্ধতী-দর্শনন্যায়মতে নিম্নাধিকারিগণের জন্য বিহিত। সেই প্রাচীন ঋষিগণকে ধন্যবাদ, যাঁহারা এরূপ সর্বব্যাপী সদাবিস্তারশীল ধর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, যে-পদ্ধতি জড়রাজ্যে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহা কিছু হইবে, সে-সবই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দু সেইগুলিকে নূতনভাবে বুঝিতে শিখিয়াছে এবং আবিষ্কার করিয়াছে, যে-আবিষ্কারগুলি প্রত্যেক সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এত ক্ষতিকর হইয়াছে, সেগুলি তাহার পূর্বপুরুষগণের ধ্যানলব্ধ তুরীয় ভূমি হইতে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভূমিতে পুনরাবিষ্কার মাত্র।

এই কারণেই তাহাকে কোন ভাবই ত্যাগ করিতে হইবে না, অথবা তাহাকে অন্য কোথাও কিছু খুঁজিতেও হইবে না। যে অনন্ত ভাণ্ডার সে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া নিজ কাজে লাগাইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা সে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ক্রমশঃ আরও করিবে। ইহাই কি বাস্তবিক এই পুনরুত্থানের কারণ নয়?

বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদিগকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া বলিতেছিঃ

ভ্রাতৃগণ! লজ্জার বিষয় হইলেও ইহা আমরা জানি যে, বৈদেশিকগণ যে-সকল প্রকৃত দোষের জন্য হিন্দুজাতিকে নিন্দা করেন, সেগুলির কারণ আমরা। আমরাই ভারতের অন্যান্য জাতির মস্তকে অনেক অনুচিত গালি-বর্ষণের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, আর তাঁহার আশীর্বাদে আমরা যে শুধু নিজেদেরই শুদ্ধ করিব, তাহা নয়, সমুদয় ভারতকেই সনাতনধর্ম-প্রচারিত আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করিতে সাহায্য করিতে পারিব। প্রথমে এস, ক্রীতদাসের কপালে প্রকৃতি সর্বদাই যে ঈর্ষা-তিলক অঙ্কন করেন, তাহা মুছিয়া ফেলি। কাহারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হইও না। সকল শুভকর্মব্রতীকেই সাহায্য করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক। ত্রিলোকের প্রত্যেক জীবের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।

এস, আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য, তাহারই ভিত্তিতে, দণ্ডায়মান হই। সেই কেন্দ্রীভূত সত্যঃ এই অজ অনন্ত সর্বব্যাপী অবিনাশী মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য চন্দ্র তারকা নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকামণ্ডলী বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নয়, উচ্চতম দেবতা হইতে তোমাদের পদতলে ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত।

আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে জাগতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ হয় এবং নিজেরই উপর প্রয়োগ করিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

প্রথমে এস, আমরা দেবত্ব লাভ করি, পরে অপরকে দেবতা হইতে সাহায্য করিব। 'নিজে সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না; তাহাকে বল, তুমি ব্রহ্ম। যদি বা কেহ শয়তান থাকে, তথাপি ব্রহ্মকেই স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য—শয়তানকে নয়।

ঘর যদি অন্ধকার হয়, তবে সর্বদা 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধাকার দূর হইবে না, বরং আলো আন। জানিয়া রাখ—যাহা কিছু অভাবাত্মক, যাহা কিছু পূর্ববর্তী ভাবগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিতেই নিযুক্ত, যাহা কিছু কেবল দোষদর্শনাত্মক, তাহা চলিয়া যাইবেই যাইবে; যাহা কিছু ভাবাত্মক, যাহা কিছু গঠনমূলক, যাহা কোন একটি সত্য স্থাপন করে, তাহাই অবিনাশী, তাহাই চিরকাল থাকিবে। এস, আমরা বলিতে তাকি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহম্ শিবোঽহম্'—এই বলিয়া চলো—অগ্রসর হই। জড় নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য। যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহাই নামরূপাতীত সত্তার অধীন। শ্রুতি বলেন, ইহাই সনাতন সত্য। আলো আন, অন্ধকার আপনি চলিয়া যাইবে। বেদান্তকেশরী গর্জন করুক, শৃগালগণ তাহাদের গর্তে পলায়ন করিবে। চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক; ফল যাহা হইবার, হউক। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ একত্র রাখিয়া দাও, উহাদের মিশ্রণ আপনা-আপনিই হইবে। আত্মার শক্তি বিকশিত কর; উহার শক্তি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া দাও; যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আপনিই আসিবে।

তোমার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাব বিকশিত কর, আর সব-কিছুই উহার চারিদিকে সুসমঞ্জস্যভাবে মিলিত হইবে। বেদে বর্ণিত ইন্দ্রবিরোচন- সংবাদ

৩০

স্মরণ কর। উভয়েই তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে উপদেশ পাইলেন। কিন্তু অসুর বিরোচন নিজের দেহকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু দেবতা বলিয়া ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তোমরা সেই ইন্দ্রের সন্তান; তোমরা সেই দেবগণের বংশধর। জড় কখনও তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না, দেহ কখনও তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্বল; বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান্। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা আসাম হইতে সিন্ধু, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁহার উপদেশামৃত প্রচার করিয়াছে। তাহারা পদব্রজে ২০,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছে। তাহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কত অত্যাচার তাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে—এমন কি তাহারা পুলিসের দ্বারা অনুসৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অবশেষে যখন গভর্নমেণ্ট বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহারা নির্দোষ, তখন তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

এখন তাহারা বিংশতিজন মাত্র। কালই তাহাদের সংখ্যা দুই সহস্রে পরিণতি কর। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ, তোমাদের দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, সমুদয় জগতের জন্য ইহা প্রয়োজন। তোমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি জাগাইয়া তোল; সেই শক্তি তোমাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উষ্ণতা—সব কিছু সহ্য করিতে সমর্থ করিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগে পরিবেষ্টিত থাকিয়া একটু শখের ধর্ম করা অন্যান্য দেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্তরে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রেরণা বিদ্যমান। ভারত সহজেই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে। তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। মহৎ হও। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্যই সাধিত হইতে পারে না। পুরুষ স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য স্বার্থত্যাগ করিলেন, নিজেকে বলি দিলেন। তোমরা সর্বপ্রকার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম-যশ অথবা পদ—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া মানবদেহের শৃঙ্খল দ্বারা এমন একটি সেতু নির্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

যাবতীয় কল্যাণ-শক্তিকে মিলিত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সেদিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল সবুজ বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না; সমুদয় রঙ্ মিশাইয়া প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ কর। আমাদের প্রয়োজন—কার্য করিয়া যাওয়া; ফল যাহা, তাহা আপনি হইবে। যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মত্বলাভের প্রতিকূল হয়, আত্মার শক্তির সম্মুখে তাহা টিকিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।

কর্ম ও প্রেমে চিরকাল তোমাদেরই

বিবেকানন্দ

[সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, বষ্টন]

পাদটীকা

১	**Capitoline Hill**—রোম যে সাতটি পর্বতের উপর নির্মিত ছিল, তাহার একটি।
২	**Liberal or Conservative**
৩	ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬
৪	মক্কায় অবস্থিত পবিত্র প্রস্তরখণ্ড-সমন্বিত উপাসনাস্থল।
৫	মনুসংহিতা, ২|২৩৮
৬	মনুসংহিতা, ১৯।৯
৭	গীতা, ১৩|২৮-২৯
৮	রোমকদিগের পুরোহিত-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ এই নামে অভিহিত হইতেন। ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত, পোপ এখন এই নামে অভিহিত।
৯	দক্ষিণভারতের অস্পৃশ্য জাতিবিশেষ।
১০	তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞনমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ‖ মনুসংহিতা, ১।৮৬
১১	নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু, লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্। অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা, ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ‖—নীতিশতক, ৭৪
১২	কঠোপনিষদ্, ২|২|১৫
১৩	মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩|১
১৪	কঠোপনিষদ্ ১।৩।৩-৬
১৫	গীতা, ১০|৪১
১৬	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২|৪
১৭	কেন উপনিষদ্. ১|৩
১৮	কঠোপনিষৎ, ১|২|২৩
১৯	তুলনীয়ঃ ছান্দোগ্য উপ., ৪।১।২

২০	শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।২৮
২১	শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২২	শ্রীমদ্ভাগবত, ১০|৩১|১৪
২৩	মনুসংহিতা, ২|২৩৮
২৪	তৈত্তি উপ, ২|৯; কেন উপ., ১|৩; কেন উপ., ২|২
২৫	কঠ উপ, ১|২|২৩
২৬	মনুসংহিতা, ১|৯৯
২৭	অবিভক্ত বঙ্গদেশ (পরেও ‘বাঙলাদেশ’ আছে)
২৮	তুলনীয়ঃ ঋগ্বেদ, ১০|১৯১|২
২৯	তৈত্তিরীয় উপ., ২|৮|১
৩০	কলিকাতা তখন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।
৩১	তৈত্তি উপ, ২|৯
৩২	কেন উপ, ১|৩
৩৩	মুণ্ডক উপ.২|২|৫
৩৪	মুণ্ডক উপ., ২|২|১০; কঠ, ২।২।১৫; শ্বেঃ, ৬।১৪
৩৫	যোগসূত্র, ৪|৩
৩৬	মীরার ভজন
৩৭	তুলনীয়ঃ নারায়ণ উপ., ১২।৩; কৈবল্য উপ.,২; অবধূত উপ.,৫
৩৮	বিবেকচূড়ামণি, ৬০
৩৯	শান্তাঃ মহান্তঃ নিবসন্তি সন্তঃ বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ। —বিবেকচূড়ামণি, ৩৯
৪০	ঐ, ৩৯
৪১	কঠ উপ, ১|২|৫
৪২	গীতা, ৫|১৯
৪৩	গীতা. ১৩|২৯
৪৪	শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীচৈতন্য
৪৫	মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪|১২২
৪৬	শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীচৈতন্য

৪৭	মুণ্ডক উপ., ১|১।৫
৪৮	বৃহ উপ., ২|৪|১০
৪৯	ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। ঈশ উপ., ১৭
৫০	মুণ্ডক উপ., ২|২|৮
৫১	কঠ.উপ., ১|২|৫
৫২	**A man gives up the ghost.**
৫৩	মনুসংহিতা—২।২৩৮
৫৪	কঠ উপ, ২|২|১৫
৫৫	তুলনীয়ঃ বিবেকচূড়ামণি, ৩৯
৫৬	হিরণ্যগর্ভসূক্তম্, ঋগ্বেদ, ১০।১২১।৪
৫৭	কঠ উপ., ১|১।২০
৫৮	এগুলিকে বলা হয় 'আস্তিক দর্শন'; এই গ্রন্থাবলীর ২য় খণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে 'দর্শন ও দার্শনিক' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৪৯৯।
৫৯	মুণ্ডক উপ., ১|১।৩
৬০	ঋগ্বেদ, ১০|১২৯-৩২; ৩য় খণ্ডে 'বৈদিক ধর্মাদর্শ' বক্তৃতা দ্রষ্টব্য—পৃঃ ২১৩।
৬১	কঠ উপ., ২।৩।২
৬২	গীতা, ২।২৩-২৪
৬৩	যোগসূত্র, ৪|২
৬৪	যোগসূত্র, ৪|৩
৬৫	মুণ্ডক উপ, ৩|১|৬
৬৬	বৃহদারণ্যক উপ., ২|৪|১৪
৬৭	শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫ম অধ্যায়
৬৮	বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-৪১০
৬৯	শ্বেতাশ্বতর উপ., ৪|৩
৭০	ছান্দোগ্য উপনিষদ., ৬|৮।৭
৭১	গীতা, ১৩|২৯
৭২	বৃহ উপ., ২|৪|৫
৭৩	কঠ উপ., ১|২|১৬

৭৪	নীতিশতকম্—ভর্তৃহরি
৭৫	**Comparative Philology**
৭৬	দ্বা সুপর্ণা...ইত্যাদি। শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪।৬; মুণ্ডক উপ., ৩।১।১
৭৭	শ্বেতাশ্ব. উপ., ৩|১৬
৭৮	দোঁহা, তুলসীদাস
৭৯	বিবেকচূড়ামণি, ৩
৮০	বিবেকচূড়ামণি, ৩৪
৮১	শুক্লযজুর্বেদ, মাধ্যন্দিন শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র

পাদটীকা

ভারত-প্রসঙ্গে

১	**Pandit D. Savariroyan.**
২	**Sermon on the Mount. 9**
৩	**St. Matt. Ch. 8, v, 20**
৪	**Do, Ch. 6, v. 24**
৫	**New Testament: St. Matthew—VI. 29, 30.**
৬	তুলনীয়ঃ ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥—মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব, ৩৭|১৭
৭	**What is sauce for the goose is sauce for the gander.'**
৮	এই তিনটি যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব বেদের প্রথম শ্লোকের অংশ।
৯	কঠোপনিষদ্, ১।২।৫
১০	বিবেকচূড়ামণি, ৩
১১	সৎ, চিৎ, আনন্দ
১২	রামানুজীদের দুই সম্প্রদায়
১৩	গুরুজীর জয়
১৪	নানকপন্থীদের ধর্মগ্রন্থ
১৫	পূজনীয় সাধু
১৬	শ্রীশঙ্করপ্রণীত বেদান্তভাষ্য
১৭	উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র
১৮	সংহিতা
১৯	পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্যঃ বেদার্থ শিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক।

২০	ন্যায়ে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়
২১	শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একটি
২২	পাঠান্তরঃ 'ত্যাগেনৈকেন...'—ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করা যায়।
২৩	আদিপুরাণ
২৪	প্রাপ্ত, পাইয়াছেন—যিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন।
২৫	বেদান্তসূত্র, ৩|৪|৩৬
২৬	তুলনীয়ঃ গীতা, ৩|২৬
২৭	মহাভারত, বনপর্ব
২৮	গীতা, ৪।৩৩
২৯	ডায়োজিনিষ—**Diogenes**
৩০	ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষাংশ (৮।৭-১২) দ্রষ্টব্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
ষষ্ঠ খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' ও 'বর্তমান ভারত'—নামক ইতঃপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত স্বামীজীর বাংলা মৌলিক রচনাবলী ও তৎসহিত তাঁহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্র ও বাংলা কবিতাগুলি এবং ১২৮ খানি পত্র (বাংলা, এবং ইংরেজীর অনুবাদ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'ভাববার কথা' পুস্তিকাটি 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বর্তমান সমস্যা' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ ও সমালোচনার সংগ্রহ। Thomas a Kempis-এর 'Imitation of Christ' নামক পুস্তকের অসমাপ্ত অনুবাদও ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ইতঃপূর্বে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত।

'পরিব্রাজক' পুস্তকটি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে স্বামীজীর চিন্তার একটি ডায়েরী। 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মনোরঞ্জনকারী ভ্রমণকাহিনী-রূপেই স্বামীজী উহা লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসে অগাধজ্ঞানসম্পন্ন স্বামীজীর লেখনীতে উহা মধ্যপ্রাচ্য ও ইওরোপের ইতিহাস ও সভ্যতার একটি ছোটখাটো সমালোচনায় পরিণত হইয়াছে। সর্বোপরি যে সব দরিদ্র অবহেলিতদের কায়িক পরিশ্রমের উপর ঐ সকল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, স্বামীজী এই পুস্তকে তাঁহার অনুপম ভাষায় তাহাদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং কালক্রমে 'রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন' মহাধৈর্যশীল দরিদ্র শ্রমিকগণই যে জগতে আধিপত্য বিস্তার করিবে, স্বামীজী তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' উদ্বোধন-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে তখন পরাধীন ভারতবাসীর চক্ষু ঝলসিত। স্বদেশ ও বিদেশের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। উদার দৃষ্টিসহায়ে উভয় সভ্যতার যাহা ভাল লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই তিনি এই পুস্তকে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং উভয় সভ্যতার দোষগুলি ছাড়িয়া গুণগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন।

'বর্তমান ভারত' মানবজাতির উত্থান-পতনের একটি সুচিন্তিত সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস। ইহাতে স্বামীজী দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র-শক্তি পর্যায়ক্রমে জগতে আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যুগ চলিয়া গিয়াছে, বৈশ্যশক্তি অধুনা জগতে আধিপত্য করিতেছে; কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যখন 'শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে। শূদ্রধর্মকর্মের সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে, তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...।' পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে স্বামীজী যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, বর্তমানে তাহারই সূচনা দেখা যাইতেছে।

ঐ পুস্তক-প্রণয়নকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবল ছিল। বিদেশী পাশ্চাত্য বৈশ্য- শাসনের গুণদোষ বিচার করিয়া স্বামীজী দেখাইয়াছেন যে, ইহার সংস্পর্শে আসিয়া দীর্ঘসুপ্ত ভারত ধীরে ধীরে বিনিদ্র হইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্যের অর্থকরী বিদ্যা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির আদর্শ ধীরে ধীরে ভারতীয় মনে প্রবেশ করিতেছে। ইহাতে কিছু বিপদের আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। আপন আদর্শ ভুলিয়া আমরা বিদেশের আদর্শকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে উদ্যত। তাই স্বামীজী তাঁহার দৃপ্ত ভাষায় আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

স্বামীজীর রচিত সংস্কৃত স্তোত্র, বাংলা কবিতাগুলি এবং কয়েকটি ইংরেজী কবিতা অনেকদিন হইতে 'বীরবাণী' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। সেই সংগ্রহ হইতে সংস্কৃত স্তোত্র ও বাংলা কবিতাগুলি বর্তমান খণ্ডে গৃহীত হইল; ইংরেজী কবিতার অনুবাদ পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। স্বামীজীর কবিতা তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবপ্রসূত; এগুলি শুধু ছন্দোবদ্ধ পদ নহে।

স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ 'পদাবলী' সমগ্র জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। অমোঘ শক্তি-সঞ্চারক পত্রগুলি—বিশেষভাবে আত্মবিস্মৃত ভারতের পক্ষে অশেষ কল্যাণপ্রদ ও যুগোপযোগী। পত্রাবলীতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় ৭ম খণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত হইতেছে; ৮ম খণ্ডের শেষে পত্রাবলীর তথ্যপঞ্জী ও সূচীপত্র সংযোজিত হইবে।

স্বামীজীর এই সকল মৌলিক প্রবন্ধ, কবিতা এবং পত্রাবলী পাঠ করিয়া দেশবাসী নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে যাঁহারা এই খণ্ডটি প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে অল্পবিস্তর সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পূর্ব পূর্ব খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেরও দুই হাজার সেটের অধিকাংশ ব্যয় ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

প্রকাশক

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
জানুআরি, ১৯৬৩

ভাববার কথা

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

[এই প্রবন্ধটি ‘হিন্দুধর্ম কি?’ নামে ১৩০৪ সালে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসবের সময় পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।]

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত ‘বেদ’ বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি-শব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

‘সত্য’ দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রীয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে ‘বেদ’ বলা যায়।

‘বেদ’-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি, ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম ‘বেদ’।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন ‘ধর্ম’ কেবল ‘কথার কথা’ ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশকালপাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র ‘বেদ’।

অলৌকিক জ্ঞানবেত্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস-পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ ‘বেদ’-নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত ‘বেদ’ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই ‘বেদ’।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড—দুইভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশকালপাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া-পার–নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশকালপাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়— সার্বলৌকিক, সার্বভৌম ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশকালপাত্রভেদে অধিকভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণন-মুখে ঐ-সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন, এবং অনন্তভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র-লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই-সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা- বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি-বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্তসংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এই জন্য বেদমূর্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান্ হইতেছে—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোন অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন-সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতন ধর্মের সমগ্র ভাব-সমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে নব বলে বলীয়ান্ মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান্ পরমকারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাব-সমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগধর্ম-প্রবর্তক শ্রীভগবান্ পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি

[অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার-লিখিত পুস্তকের সমালোচনা]

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদ-সংহিতা পূর্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল ব্যয়ে এবং অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে এক্ষণে তাহা অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত হস্তলিপি-পুঁথির অধিকাংশ অক্ষরগুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ; বিশেষ, মহাপণ্ডিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সেই অক্ষরের শুদ্ধ্যশুদ্ধি নির্ণয় এবং অতি স্বল্পাক্ষর জটিল ভাষ্যের বিশদ অর্থ বোধগম্য করা কি কঠিন, তাহা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জীবনে এই ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটি প্রধান কার্য। এতদ্‌ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বসবাস—জীবন-যাপন; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে অধ্যাপকের কল্পনার ভারতবর্ষ—বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত, যজ্ঞধূম-পূর্ণাকাশ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বহুল, ঘরে ঘরে গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের নিয়মাবলী-পরিচালিত, তাহা নহে। বিজাতি-বিধর্মি-পদদলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মান, আধুনিক ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদাজাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—অধ্যাপকের পদযুগল কখনও ভারত-মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর রীতিনীতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতে নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, আজীবন এদেশে বাস করিলেও অথবা এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও যে-প্রকার সঙ্গ সেই সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বিষয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। বিশেষ, জাতিবিভাগে বিভক্ত এই বিপুল সমাজে একজাতির পক্ষে অন্য জাতির আচারাদি বিশিষ্টরূপে জানাই কত দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মচারীর লিখিত 'ভারতাধিবাস' নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি—'দেশীয় পরিবার-রহস্য'। মনুষ্যহৃদয়ে রহস্যজ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধ হয় ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-দিগ্‌গজ তাঁহার মেথর, মেথরানী ও মেথরানীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতিবৃন্দের দেশীয়-জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং ঐ পুস্তকের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে সমাদর দেখিয়া লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ'—আর বলি কি? তবে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে' ইত্যাদি। যাক অপ্রাসঙ্গিক কথা; তবে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের আধুনিক ভারতবর্ষের, দেশদেশান্তরের রীতিনীতি ও সাময়িক ঘটনাজ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।

বিশেষতঃ ধর্ম সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারাও বিশেষ চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ, থিওসফি সম্প্রদায় অধ্যাপকের লেখনী-মুখে প্রশংসিত বা নিন্দিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'-নামক পত্রদ্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশের প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্তপাঠে
১
রামকৃষ্ণ-জীবন তাঁহাকে আকর্ষণ করে। ইতোমধ্যে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর লাইব্রেরিয়ান টনি মহোদয়-লিখিত 'রামকৃষ্ণচরিত'ও ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায়
২
মুদ্রিত হয়। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি'-নামক ইংরেজী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্বমনীষিগণের ও আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিদ্বদ্‌বর্গের প্রতিধ্বনিমাত্রকারী ভারতবর্ষে নূতন ভাষায় নূতন মহাশক্তি পরিপূরিত করিয়া নূতন ভাবসম্পাতকারী নূতন মহাপুরুষ সহজেই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন। পূর্বতন ঋষি-মুনি-মহাপুরুষদিগের কথা তিনি শাস্ত্রপাঠে বিলক্ষণই অবগত ছিলেন; তবে এ যুগে এ ভারতে—আবার তাহা হওয়া কি সম্ভব? রামকৃষ্ণ-জীবনী এ প্রশ্নের যেন মীমাংসা করিয়া দিল। আর ভারতগতপ্রাণ মহাত্মার ভারতের ভাবী মঙ্গলের, ভাবী উন্নতির আশালতার মূলে বারিসেচন করিয়া নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল।

পাশ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা নিশ্চিত ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের অপেক্ষা ভারতহিতৈষী ইওরোপখণ্ডে আছেন কিনা, জানি না।ম্যাক্সমূলার যে শুধু ভারতহিতৈষী, তাহা নহেন—ভারতের দর্শন-শাস্ত্রে, ভারতের ধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা; অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক সর্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ
৩
দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টিয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতিসিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন; এমন কি, বোধ হয় যে, ইতঃপূর্ব-জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা এবং পাছে ভারতে আসিলে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর সহসা-সমুপস্থিত পূর্বস্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, এই ভয়ই অধুনা ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে গৃহস্থ মানুষ, যিনিই হউন, সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যখন সর্বত্যাগী উদাসীনকে অতি বিশুদ্ধ জানিয়াও লোকনিন্দিত আচারের অনুষ্ঠানে কম্পিতকলেবর দেখা যায়, 'শূকরীবিষ্ঠা' মুখে বলিয়াও যখন 'প্রতিষ্ঠা'র লোভ, অপ্রতিষ্ঠার ভয় মহা-উগ্রতাপসেরও কার্য-প্রণালীর পরিচালক, তখন সর্বদা লোকসংগ্রহেচ্ছু বহুলোকপূজ্য গৃহস্থের যে অতি সাবধানে নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে কি বিচিত্রতা? যোগশক্তি ইত্যাদি গূঢ় বিষয় সম্বন্ধেও যে অধ্যাপক একেবারে অবিশ্বাসী, তাহাও নহেন।

'দার্শনিক-পূর্ণ ভারতভূমিতে যে-সকল ধর্ম-তরঙ্গ উঠিতেছে' তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ম্যাক্সমূলার প্রকাশ করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অনেকে 'উহার মর্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অত্যন্ত অযথা বর্ণন করিয়াছেন'। ইহা প্রতিবিধানের জন্য এবং 'এসোটেরিক বৌদ্ধমত, থিওসফি প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে ভারতবাসী সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যে-সকল উপন্যাস ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে উপস্থিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে',
৪
ইহা দেখাইবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে কেবল পক্ষিজাতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান, পদভরে জলসঞ্চরণকারী মৎস্যানুকারী জলজীবী, মন্ত্রতন্ত্র-ছিটাফোঁটা-যোগে রোগাপনয়নকারী, সিদ্ধিবলে ধনীদিগের বংশরক্ষক, সুবর্ণাদি-সৃষ্টিকারী সাধুগণের নিবাসভূমি, তাহা নহে; কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ, প্রকৃত ব্রহ্মবিৎ, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত যে ঐ দেশে একেবারে বিরল নহেন এবং সমগ্র ভারতবাসী যে এখনও এতদূর পশুভাব প্রাপ্ত হন নাই যে, শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া পূর্বোক্ত বাজীকরগণের পদলেহন করিতে আপামর-সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত—ইহাই ইওরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগষ্টসংখ্যক 'নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরি'-নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'প্রকৃত মহাত্মা'-শীর্ষক প্রবন্ধে
৫
শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতের অবতারণা করেন।

ইওরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং উহার বিষয়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান্ হইয়াছেন। আর সুফল হইয়াছে কি?—এই ভারতবর্ষ নরমাংসভোজী, নগ্নদেহ, বলপূর্বক বিধবা-দাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই ধারণার প্রধান সহায় পাদরী-সাহেবগণ—ও বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, কতকগুলি আমাদের স্বদেশী। এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে একটি অন্ধতামসের জাল পাশ্চাত্যদেশ-নিবাসীদের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। 'যে দেশে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের ন্যায় লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে-প্রকার কদাচারপূর্ণ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সেই প্রকার? অথবা কুচক্রীরা আমাদিগকে এতদিন ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল?'—এ প্রশ্ন স্বতই পাশ্চাত্য মনে সমুদিত।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত অতি ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে ইওরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে 'নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরি'তে প্রকাশ করিলেন, তখন পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

মিশনরী মহোদয়েরা হিন্দুদেবদেবীর অতি অযথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যে যে যথার্থ ধার্মিক লোক কখনও উদ্ভূত হইতে পারে না—এইটি প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল, আর পূর্বোক্ত স্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসম্প্রসারণরূপ প্রবল অগ্নি নির্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি?

অবশ্য দুই দিক্ হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর পতিত হইল। বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন; এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। এবারও হেলায় উর্ত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আততায়িগণকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিবার জন্য এবং উক্ত মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম যাহাতে সর্বসাধারণে জানিতে পারে, সেইজন্য তাঁহার অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহপূর্বক 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া উহার 'রামকৃষ্ণ' নামক অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেনঃ

'উক্ত মহাপুরুষ ইদানীং ইওরোপ ও আমেরিকার বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তথায় তাঁহার শিষ্যেরা মহোৎসাহে তাঁহার উপদেশ প্রচার করিতেছেন এবং বহু ব্যক্তিকে, এমন কি, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্য হইতেও রামকৃষ্ণ-মতে আনয়ন করিতেছেন, একথা আমাদের নিকট আশ্চর্যবৎ এবং কষ্টে বিশ্বাসযোগ্য ... তথাপি প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয়ে ধর্ম-পিপাসা বলবতী, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্মক্ষুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে চাহে। এই-সকল ক্ষুধার্ত প্রাণে রামকৃষ্ণের ধর্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে আসে না বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়। ... অতএব রামকৃষ্ণ-ধর্মানুচারীদের যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত যদ্যপি হয়, তথাপি যে ধর্ম আধুনিক সময়ে এতাদৃশী সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং যাহা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্যতার সহিত জগতের সর্বপ্রাচীন ধর্ম ও দর্শন বলিয়া ঘোষণা করে এবং যাহার নাম 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদশেষ বা বেদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মদাদির অতিযত্নের সহিত মনঃসংযোগার্হ।'
৬

এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মা পুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, সন্ন্যাসী, যোগ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর অবতারণা করা হইয়াছে।

অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে দোষ আপনা হইতেই আসে—অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া—সেই দোষ এ জীবনীতে প্রবেশ করে। তজ্জন্য ঘটনাবলী-সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ সাবধানতা। বর্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস—তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি-উদূখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্সমূলার ভুলেন নাই এবং ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরমুখে দুই চারিটি কঠোর মধুর কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপূর্ণ বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তকমধ্যে অবস্থিত। এ জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা—'প্রকৃত মহাত্মা'-নামক প্রবন্ধে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অতি যত্নে আবরিত। একদিকে মিশনরী, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল—এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। 'প্রকৃত মহাত্মা' উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে; আনন্দের বিষয়—তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, ইতরতা নাই, আর গালাগালি সভ্য ইংলণ্ডের ভদ্র লেখক কখনও করেন না; কিন্তু বর্ষীয়ান্ মহাপণ্ডিতের উপযুক্ত ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষ-শূন্য অথচ বজ্রবৎ দৃঢ় স্বরে—মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

আক্ষেপগুলিও আমাদের বিস্ময়কর বটে। ব্রাহ্ম-সমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার জন্য ঐ-সকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ!!

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক উত্তর দিতেছেন যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্যধামে ছিলেন, তাঁহার সদৃশী স্ত্রী পতিকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকুমার ব্রহ্মচারিণীরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্তা ছিলেন। আরও বলেন যে, শরীরসম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ? 'আর শরীরসম্বন্ধ না রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, এ বিষয়ে উক্ত ব্রতধারণকারী ইওরোপ-নিবাসীরা সফলকাম হয় নাই, আমরা মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।'
৭
অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্মসহায় ব্রহ্মচর্য বুঝিতে পারেন, এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন; আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীরসম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।

আবার অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না। ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

আহা! কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরত ঈশার দয়াপ্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরও অভিযোগ, মদ্যপানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! 'একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না'—এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কেন কথা কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ—আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!!

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে! যাক রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতিসহায়ে উঠিতে হয়।

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ পুস্তকের অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ উক্তিগুলি যে সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের মধ্যে অনেক ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, তাহা পুস্তকের ক্ষিপ্র বিক্রয় দেখিয়াই অনুমিত হয়। উক্তিগুলি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বলিয়া মহাশক্তিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই নিশ্চিত সর্বদেশে আপনাদের ঐশী শক্তি বিকাশ করিবে। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন—তাঁহাদের জন্ম-কর্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচারকার্যও অত্যাশ্চর্য।

আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার আমাদিগকে স্বীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম দ্বারা উন্নত এবং বাণী দ্বারা রাজজাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময়বিশেষে তথাপি বলিতে হয়—আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি আমাদের লাভ, কিন্তু ঐ স্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের অসাধ্য—যে জ্ঞান-ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গ বিসর্জন করা তো দূরের কথা। যাঁহারা বুঝিয়াছেন এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি—বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদ্গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।

যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্তসমুদ্রপার পর্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্মের জয়ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্বলোকমান্য শূরবীর মহাপণ্ডিত আপনারা—আপনারা ইচ্ছা করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা—আমরা পুষ্প-চন্দন-হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্র-জীবী ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল-প্রসূত, সর্ববিদ্যাশ্রয়—আপনারা উঠুন, অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্বত্যাগ দেখান, আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্গমন করি। আর যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে

জর্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে—হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগদিগন্তব্যাপী মহাতরঙ্গ—যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুরুষমূর্তি বিরাজ করিতেছেন—আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়মপ্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে; আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ কর?

ঈশা-অনুসরণ

সূচনা

[স্বামীজী আমেরিকা যাইবার বহুপূর্বে বাঙলা ১২৯৬ সালে, অধুনালুপ্ত ‘সাহিত্য- কল্পদ্রুম’ নামক মাসিক পত্রে ‘Imitation of Christ’ নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকের ‘ঈশা-অনুসরণ’ নাম দিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত পত্রের ১ম বর্ষের ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা অবধি অনুবাদের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদটি পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।আমরা সমুদয় (প্রকাশিত) অনুবাদটিই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। সূচনাটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা।]

‘খ্রীষ্টের অনুসরণ’ নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন ‘রোম্যান ক্যাথলিক’ সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহাপুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনীশক্তিবলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা ও সাধনবলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন? যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের সমুদয় মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরবর্তী লোকেরা অনুমান করিয়া ‘টমাস আ কেম্পিস্’ নামক একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন, কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ-নামধারী স্বদেশী বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি, যে মিশনরী মহাপুরুষেরা ‘অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না’ প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি, ‘যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই’ তাঁহার শিষ্যেরা—তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া ঈশার জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না। এ অদ্ভুত বিলাসী, অতি দাম্ভিক, মহা অত্যাচারী, বেরুস এবং ব্রুমে চড়া, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান সম্বন্ধে আমাদের যে অতি কুৎসিত ধারণা হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইবে।

‘সব্ সেয়ানকী এক মত’—সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’ উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাঁহারা অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তককে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়দর্শনের একটি সূত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইবঃ ‘আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ’—সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে ভাষ্যকর ঋষি বাৎস্যায়ন
৮
বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।

যদি ‘যবনাচার্য’ প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ পুরাকালে আর্যদিগের নিকট এতাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তসিংহের পুস্তক যে এদেশে আদর পাইবে না, তাহা বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকগণের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিব। আশা করি, রাশি রাশি অসার নভেল-নাটকে বঙ্গের সাধারণ পাঠক যে সময় নিয়োজিত করেন, তাহার শতাংশের একাংশ ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। যে-সকল বাক্য ‘বাইবেল’-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে। কিমধিকমিতি!

প্রথম পরিচ্ছেদ

খ্রীষ্টের অনুসরণ’ এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসারশূন্য পদার্থে ঘৃণা

১। প্রভু বলিতেছেন, 'যে কেহ আমার অনুগমন করে, সে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিবে না।'
৯

যদ্যপি আমরা যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি, তাহা হইলে খ্রীষ্টের এই কয়েকটি কথা স্মরণ করাইতেছে যে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের অনুকরণ আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।

অতএব ঈশার জীবন মনন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।
১০

২। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অন্য সকল মহাত্মাপ্রদত্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করে এবং যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত, তিনি ইহারই মধ্যে লুক্কায়িত 'মান্না'
১১
প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এ প্রকার অনেক সময়ে হয় যে, অনেকেই খ্রীষ্টের সুসমাচার বারংবার শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না, কারণ তাহারা খ্রীষ্টের আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। অতএব যদ্যপি তুমি আনন্দ-হৃদয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্ট-বাক্যতত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সহিত তোমার জীবনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য-স্থাপনের জন্য সমধিক যত্নশীল হও।
১২

৩। 'ত্রিত্ববাদ'
১৩
সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় তোমার কি লাভ হইবে, যদি সেই সমস্ত সময় তোমার নম্রতার অভাব সেই ঐশ্বরিক ত্রিত্বকে অসন্তুষ্ট করে?

নিশ্চয়ই উচ্চ বাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট করিতে পারে না; কিন্তু ধার্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে।
১৪

অনুতাপে হৃদয়শল্য বরং ভোগ করিব—তাহার সর্বলক্ষণাক্রান্ত বর্ণনা জানিতে চাহি না।

যদি সমগ্র বাইবেল এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপা-বিহীন হও?
১৫

'অসার হইতেও অসার, সকলেই অসার; সার একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসা, সার একমাত্র তাঁহার সেবা।'
১৬

তখনই সর্বোচ্চ জ্ঞান তোমার হইবে, যখন তুমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারকে ঘৃণা করিবে।

৪। অসারতা—অতএব ধন অন্বেষণ করা এবং সেই নশ্বর পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করা।

অসারতা—অতএব মান অন্বেষণ করা ও উচ্চ পদলাভের চেষ্টা করা।

অসারতা—অতএব শারীরিক বাসনার অনুবর্তী হওয়া এবং যাহা অন্তে কঠিন দণ্ড ভোগ করাইবে তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

অসারতা—অতএব জীবনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের ইচ্ছা করা।

অসারতা—অতএব পরকালের সম্বলের চেষ্টা না করিয়া কেবল ইহজীবনের বিষয় চিন্তা করা।

অসারতা—অতএব যথায় অবিনাশী আনন্দ বিরাজমান, দ্রুতবেগে সে স্থানে উপস্থিত হইবার চেষ্টা না করিয়া অতিশীঘ্র-বিনাশশীল বস্তুকে ভালবাসা।

৫। উপদেশকের এ বাক্য সর্বদা স্মরণ কর—'চক্ষু দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, কর্ণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হয় না।'
১৭

পরিদৃশ্যমান পার্থিব পদার্থ হইতে মনের অনুরাগকে উপরত করিয়া অদৃশ্য রাজ্যে হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা কর, যেহেতু ইন্দ্রিয়সকলের অনুগমন করিলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলঙ্কিত হইবে এবং তুমি ঈশ্বরের কৃপা হারাইবে।
১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আপনার জ্ঞান সম্বন্ধে হীনভাব

১। সকলেই স্বভাবত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, কিন্তু ঈশ্বরের ভয় না থাকিলে সে জ্ঞানে লাভ কি?

আপনার আত্মার কল্যাণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যিনি নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি পর্যালোচনা করিতে ব্যস্ত, সেই গর্বিত পণ্ডিত অপেক্ষা কি—যে দীন কৃষক বিনীতভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নহে?

যিনি আপনাকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন, তিনিই আপনার চক্ষে আপনি অতি হীন এবং তিনি মনুষ্যের প্রশংসাতে অণুমাত্রও আনন্দিত হইতে পারেন না। যদি আমি জগতের সমস্ত বিষয়ই জানি, কিন্তু আমার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে যে ঈশ্বর আমার কর্মানুসারে আমার বিচার করিবেন, তাঁহার সমক্ষে আমার জ্ঞান কোন্ উপকারে আসিবে?

২। অত্যন্ত জ্ঞান-লালসাকে পরিত্যাগ কর, কারণ তাহা হইতে অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ ও ভ্রম আগমন করে।

পণ্ডিত হইলেই বিদ্যা প্রকাশ করিতে এবং প্রতিভাশালী বলিয়া কথিত হইতে বাসনা হয়।

এ প্রকার অনেক বিষয় আছে, যদ্বিষয়ক জ্ঞান আধ্যাত্মিক কোন উপকারে আইসে না এবং তিনি অতি মূর্খ, যিনি যে-সকল বিষয় তাঁহার পরিত্রাণের সহায়তা করিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই-সকল বিষয়ে মন নিবিষ্ট করেন।

বহু বাক্যে আত্মা তৃপ্ত হয় না, পরন্তু সাধুজীবন অন্তঃকরণে শান্তি প্রদান করে এবং পবিত্র বুদ্ধি ঈশ্বরে সমধিক নির্ভর স্থাপিত করে।

৩। তোমার জ্ঞান এবং ধারণাশক্তি যে পরিমাণে অধিক, তোমার তত কঠিন বিচার হইবে, যদি সমধিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ তোমার জীবনও সমধিক পবিত্র না হয়।

অতএব, তোমার দক্ষতা এবং বিদ্যার জন্য বহুপ্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করিও না; বরং যে জ্ঞান তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে ভয়ের কারণ বলিয়া জান।

যদি এ প্রকার চিন্তা আইসে যে, তুমি বহু বিষয় জান এবং বিলক্ষণ বুঝ, স্মরণ রাখিও—যে-সকল বিষয় তুমি জান না, তাহারা সংখ্যায় অনেক অধিক।

জ্ঞানগর্বে স্ফীত হইও না, বরং আপনার অজ্ঞতা স্বীকার কর। তোমা অপেক্ষা কত পণ্ডিত রহিয়াছে, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানে তোমা অপেক্ষা কত অভিজ্ঞ লোক রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াও কেন তুমি অপরের পূর্বদান অধিকার করিতে চাও?

যদি নিজ কল্যাণপ্রদ কোন বিষয় জানিতে এবং শিখিতে চাও, জগতের নিকট অপরিচিত এবং অকিঞ্চিৎকর থাকিতে ভালবাস।

৪। আপনাকে আপনি যথার্থরূপে জানা অর্থাৎ আপনাকে অতি হীন মনে করা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা। আপনাকে নীচ মনে করা এবং অপরকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তাহার মঙ্গল কামনা করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সম্পূর্ণতার চিহ্ন।

যদি দেখ, কেহ প্রকাশ্যরূপে পাপ করিতেছে অথবা কেহ কোন অপরাধ করিতেছে, তথাপি আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিও না।

আমাদের সকলেরই পতন হইতে পারে; তথাপি তোমার দৃঢ় ধারণা থাকা উচিত যে, তোমা অপেক্ষা অধিক দুর্বল কেহই নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যের শিক্ষা

১। সুখী সেই মনুষ্য, সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং নশ্বর শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সত্য স্বয়ং ও স্ব-স্বরূপে যাহাকে শিক্ষা দেয়।

আমাদিগের মত এবং ইন্দ্রিয়সকল প্রায়শ আমাদিগকে প্রতারিত করে; কারণ বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বে আমাদের দৃষ্টির গতি অতি অল্প।

গুপ্ত এবং গূঢ় বিষয়সকল ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া লাভ কি? তাহা না জানার জন্য শেষ বিচারদিনে

আমরা নিন্দিত হইব না।

উপকারক ও আবশ্যক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া স্ব-ইচ্ছায় যাহা কেবল কৌতূহল উদ্দীপিত করে এবং অপকারক—এ প্রকার বিষয়ের অনুসন্ধান করা অতি নির্বোধের কার্য; চক্ষু থাকিতেও আমরা দেখিতেছি না!

২। ন্যায়শাস্ত্রীয় পদার্থ-বিচারে আমরা কেন ব্যাপৃত থাকি? তিনিই বহু সন্দেহপূর্ণ তর্ক হইতে মুক্ত হয়েন, সনাতন বাণী [২০]
যাঁহাকে উপদেশ করেন।

সেই অদ্বিতীয় বাণী হইতে সকল পদার্থ বিনিঃসৃত হইয়াছে, সকল পদার্থ তাঁহাকেই নির্দেশ করিতেছে; তিনিই আদি, তিনিই আমাদিগকে উপদেশ করেন।

তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ কিছু বুঝিতে পারে না অথবা কোন বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে পারে না।

তিনিই অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত—তিনিই ঈশ্বরে সংস্থিত, যাঁহার উদ্দেশ্য একটি মাত্র, যিনি সকল পদার্থ এক অদ্বিতীয় কারণে নির্দেশ করেন এবং যিনি এক জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ দর্শন করেন।

হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া লও।

বহু বিষয় পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া আমি অতি ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমার সকল অভাব, সকল বাসনা তোমাতেই নিহিত।

আচার্যসকল নির্বাক্ হউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তব্ধ হউক; প্রভো, কেবল তুমি [আমার সহিত কথা] বল।

৩। মানুষের মন যতই সংযত অন্তঃপ্রদেশ হইতে সরল হয়, ততই সে গভীর বিষয়সকলে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে; কারণ তাহার মন আলোক পায়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের জন্য সকল কার্য করে, আপনার সম্বন্ধে কার্যহীন থাকে এবং সকল প্রকার স্বার্থশূন্য হয়, সেই প্রকার পবিত্র, সরল ও অটল ব্যক্তি বহু কার্য করিতে হইলেও আকুল হইয়া পড়ে না। হৃদয়ের অনুন্মূলিত আসক্তি অপেক্ষা কোন্ পদার্থ তোমায় অধিকতর বিরক্ত করে বা বাধা দেয়?

ঈশ্বরানুরাগী সাধু ব্যক্তি অগ্রে আপনার মনে যে-সকল বাহিরের কর্তব্য করিতে হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লন; সেই-সকল কার্য করিতে তিনি কখনও বিকৃত আসক্তি-জনিত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হন না; পরন্তু সম্যক বিচার দ্বারা আপনার কার্যসকলকে নিয়মিত করেন।

আত্মজয়ের জন্য যিনি চেষ্টা করিতেছেন, তদপেক্ষা কঠিনতর সংগ্রাম কে করে?

আপনাকে আপনি জয় করা, দিন দিন আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং ধর্মে বর্ধিত হওয়া—ইহাই আমাদিগের একমাত্র কর্তব্য।

৪। এ জগতে সকল পূর্ণতার মধ্যেই অপূর্ণতা আছে এবং আমাদিগের কোন তত্ত্বানুসন্ধানই একেবারে সন্দেহরহিত হয় না।

গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা আপনাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করা ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিশ্চিত পথ।

কিন্তু বিদ্যা গুণমাত্র বলিয়া অথবা কোন বিষয়ের জ্ঞানদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলে নিন্দিত নহে; কারণ উহা কল্যাণপ্রদ ও ঈশ্বরাদিষ্ট।

কিন্তু ইহাই বলা হইতেছে যে, সদ্‌বুদ্ধি এবং সাধুজীবন বিদ্যা অপেক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেকেই সাধু হওয়া অপেক্ষা বিদ্বান হইতে অধিক যত্ন করে; তাহার ফল এই হয় যে, অনেক সময় তাহারা কুপথে বিচরণ করে এবং তাহাদের পরিশ্রম অত্যল্প ফল উৎপাদন করে অথবা নিষ্ফল হয়।

৫। অহো! সন্দেহ উত্থাপিত করিতে মানুষ যে প্রকার যত্নশীল, পাপ উন্মূলিত করিতে ও পুণ্য রোপণ করিতে যদি সেই প্রকার হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে এবম্প্রকার অমঙ্গল ও পাপকার্যের বিবরণ [আলোচনা] থাকিত না এবং ধার্মিকদিগের [ধর্মসংস্থাগুলির] মধ্যে এতাদৃশী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিত না।

নিশ্চিত শেষ-বিচারদিনে—'কি পড়িয়াছি', তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; 'কি করিয়াছি' তাহাই জিজ্ঞাসিত হইবে। কি পটুতাসহকারে বাক্যবিন্যাস করিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; ধর্মে কতদূর জীবন কাটাইয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসিত হইবে।

যাঁহাদের সহিত জীবদ্দশায় তুমি উত্তমরূপে পরিচিত ছিলে এবং যাঁহারা আপন আপন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

করিয়াছিলেন, সেই-সকল পণ্ডিত এবং অধ্যাপকেরা কোথায় বলিতে পার?

অপরে তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, তাহারা তাঁহাদের বিষয় একবার চিন্তাও করে না!

জীবদ্দশায় তাঁহারা সারবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, এক্ষণে কেহ তাঁহাদের কথাও কহেন না।

৬। অহো! সাংসারিক গরিমা কি শীঘ্রই চলিয়া যায়! আহা! তাঁহাদের জীবন যদি তাঁহাদের জ্ঞানের সদৃশ হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে তাঁহাদের পাঠ এবং চিন্তা কার্যের হইয়াছে।

ঈশ্বরের সেবাতে কোন যত্ন না করিয়া বিদ্যামদে এ সংসারে কত লোকই বিনষ্ট হয়!

জগতে তাহারা দীনহীন হইতে চাহে না, তাহারা মহৎ বলিয়া পরিচিত হইতে চায়; সেইজন্যই আপনার কল্পনা-চক্ষে আপনি অতি গর্বিত হয়।

তিনিই বাস্তবিক মহান্, যাঁহার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আছে।

তিনিই বাস্তবিক মহান্, যিনি আপনার চক্ষে আপনি অতি ক্ষুদ্র এবং উচ্চপদলাভ রূপ সম্মানকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন।

তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, যিনি খ্রীষ্টকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল পার্থিব পদার্থকে বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন।

তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হন এবং আপনার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্যে বুদ্ধিমত্তা

১। প্রত্যেক প্রবাদ অথবা মনোবেগজনিত ইচ্ছাকে বিশ্বাস করা আমাদের কখনও উচিত নহে, পরন্তু সতর্কতা এবং ধৈর্যসহকারে উক্ত বিষয়ের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিবে।

আহা! আমরা এমনি দুর্বল যে, আমরা প্রায়ই অতি সহজে অপরের সুখ্যাতি অপেক্ষা নিন্দা বিশ্বাস করি এবং রটনা করি। যাঁহারা পবিত্রতায় উন্নত, তাঁহারা সহসা সকল মন্দ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না; কারণ তাঁহারা জানেন যে, মনুষ্যের দুর্বলতা মনুষ্যকে অপরের মন্দ রটাইতে এবং মিথ্যা বলিতে অত্যন্ত প্রবণ করে।

২। যিনি কার্যে হঠকারী নহেন এবং সবিশেষ বিপরীত প্রমাণ সত্ত্বে (থাকিলে) আপন মতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেন না, যিনি যাহাই শুনেন তাহাই বিশ্বাস করেন না এবং শুনিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ রটনা করেন না, তিনি অতি বুদ্ধিমান্।

৩। বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচক লোকদিগের নিকট হইতে উপদেশ অন্বেষণ করিবে এবং নিজ বুদ্ধির অনুসরণ না করিয়া তোমা অপেক্ষা যাঁহারা অধিক জানেন, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া উত্তম বিবেচনা করিবে।

সাধুজীবন মনুষ্যকে ঈশ্বরের গণনায় বুদ্ধিমান্ করে এবং এই প্রকার ব্যক্তি যথার্থ বহুদর্শন লাভ করে। যিনি আপনাকে আপনি যত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন এবং যিনি যত পরিমাণে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, তিনি সর্বদা তত পরিমাণে বুদ্ধিমান্ এবং শান্তিপূর্ণ হইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রপাঠ

১। সত্যের অনুসন্ধান শাস্ত্রে করিতে হইবে, বাক্‌চাতুর্যে নহে। যে পরমাত্মার প্রেরণায় বাইবেল লিখিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে বাইবেল সর্বদা পড়া উচিত।
২১

শাস্ত্রপাঠকালে কূটতর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কল্যাণমাত্র অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

যে-সকল পুস্তকে পাণ্ডিত্যসহকারে এবং গভীরভাবে প্রস্তাবিত বিষয় লিখিত আছে, তাহা পড়িতে আমাদের যে-প্রকার আগ্রহ, অতি সরলভাবে লিখিত যে-কোন ভক্তির গ্রন্থে সেই প্রকার আগ্রহ থাকা উচিত।

গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধি অথবা অপ্রসিদ্ধি যেন তোমার মনকে বিচলিত না করে। কেবল সত্যের প্রতি তোমার ভালবাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তুমি পাঠ কর।
২২

'কে লিখিয়াছে' সে তত্ত্ব না লইয়া 'কি লিখিয়াছে' তাহাই যত্নপূর্বক বিচার করা উচিত।

২। মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সত্য চিরকাল থাকে।

নানারূপে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিতেছেন, তাঁহার কাছে ব্যক্তিবিশেষের আদর নাই।

অনেক সময় শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে যে-সকল কথা আমাদের কেবল দেখিয়া যাওয়া উচিত, সেই-সকল কথার মর্মভেদ ও আলোচনা করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এই প্রকারে আমাদের কৌতূহল আমাদের অনেক সময় বাধা দেয়।

যদি উপকার বাঞ্ছা কর, নম্রতা সরলতা ও বিশ্বাসের সহিত পাঠ কর এবং কখনও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা রাখিও না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত আসক্তি

১। যখন কোন মানুষ কোন বস্তুর জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তখনই তাহার আভ্যন্তরিক শান্তি নষ্ট হয়।
২৩

অভিমানী এবং লোভীরা কখনও শান্তি পায় না, কিন্তু অকিঞ্চন এবং বিনীত লোকেরা সদা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। যে মানুষ স্বার্থ সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ মৃত হয় নাই, সে শীঘ্রই প্রলোভিত হয় এবং অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়সকল তাহাকে পরাভূত করে।
২৪

যাহার আত্মা দুর্বল ও এখনও কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত এবং যে-সকল পদার্থ কালে উৎপন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবের উপর যাহাদের সত্তা বিদ্যমান, সেই-সকল বিষয়ে আসক্তিসম্পন্ন পার্থিব বাসনা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। সেই জন্যই যখন সে অনিত্য পদার্থসকল কোনরূপে পরিত্যাগ করে, তখনও সর্বদা তাহার মন বিমর্ষ থাকে এবং কেহ তাহাকে বাধা দিলে সহজেই ক্রুদ্ধ হয়।

তাহার উপর যদি সে কামনার অনুগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মন পাপের ভার অনুভব করে; কারণ যে শান্তি সে অনুসন্ধান করিতেছিল, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরাভূত হইয়া তাহার দিকে আর সে অগ্রসর হইতে পারিল না।

অতএব মনের যথার্থ শান্তি ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারাই হয়; ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিলে হয় না। অতএব যে ব্যক্তি সুখাভিলাষী, তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই; যে ব্যক্তি অনিত্য বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করে, তাহারও মনে শান্তি নাই; কেবল যিনি আত্মারাম এবং যাঁহার অনুরাগ তীব্র, তিনিই শান্তি ভোগ করেন।
২৫

বর্তমান সমস্যা

['উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা]

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা-কুচেষ্টায় সাময়িক বিচলিত সামাজিক চিত্র হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাব-পরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতেই নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি মধ্য-এশিয়া, উত্তর ইওরোপ বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃ-পদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত-দেশবিশেষনিবাসী একটি বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থান ভ্রষ্ট হইয়া ইওরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইওরোপীয় জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই-সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এ-সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির, চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র, উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।

হয়তো আমাদের ভাগে সার্বভৌম পৈতৃক সম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যাবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে 'যবন' বলিত; ইহাদের নিজ নাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইওরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইওরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমন কি, একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীক মনের সৃষ্টি।'

সুদূরস্থিত বিভিন্নপর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর-সম্প্রসারিত [হয়] এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহা-জাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দরসাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।

ইওরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গর্ব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট-বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে, বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে, অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন
২৬
সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃপ্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় একবর্ণ-মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ-সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমন কি, একই দেশে জাতি এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইওরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম-কীর্তনে—সে দেশ তমগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংসপদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে [হইবার] আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা ‘উদ্বোধন’-এর জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুসরণ করিতে যাইয়া আমরা ‘ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ’ হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে অসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষমুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান্ বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?

কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে; ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে—এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্যন্ত সকলই বহু-বাগাড়ম্বরসত্ত্বেও, নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? ‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্’—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচরণগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ‘উদ্বোধন’ সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।

বাঙ্গালা ভাষা

[১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুআরী আমেরিকা হইতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে স্বামীজী যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত।]

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোন কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃত গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

যদি বল ও-কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারী ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরেমতির সাজ-পরান ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। 'ব্রাহ্মণ'-এর সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষ আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোন কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

জ্ঞানার্জন

ব্রহ্মা—দেবতাদিগের প্রথম ও প্রধান—শিষ্যপরম্পরায় জ্ঞান প্রচার করিলেন; উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী
২৭
কালচক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ—জিনের প্রাদুর্ভাব হয়, ও তাঁহাদের হইতে মানবসমাজে জ্ঞানের পুনঃপুনঃ স্ফূর্তি হয়, সেই প্রকার বৌদ্ধমতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধনামধেয় মহাপুরুষদিগের বারংবার আবির্ভাব; পৌরাণিকদিগের অবতারের অবতরণ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষরূপে, অন্যান্য নিমিত্ত-অবলম্বনেও; মহামনা স্পিতামা জরথুষ্ট্র
২৮
জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন; হজরত মুশা, ঈশা ও মহম্মদও তদ্বৎ অলৌকিক উপায়শালী হইয়া অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানব-সমাজে প্রচার করিলেন।

কয়েকজন মাত্র জিন হন, তাহা ছাড়া আর কাহারও জিন হইবার উপায় নাই, অনেকে মুক্ত হন মাত্র; বুদ্ধনামক অবস্থা সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন; ব্রহ্মাদি পদবীমাত্র, জীবমাত্রেরই হইবার সম্ভাবনা; জরথুষ্ট্র, মুশা, ঈশা, মহম্মদ লোক-বিশেষ কার্য-বিশেষের জন্য অবতীর্ণ; তদ্বৎ পৌরাণিক অবতারগণ—সে আসনে অন্যের দৃষ্টিনিক্ষেপ বাতুলতা। 'আদম' ফল খাইয়া জ্ঞান পাইলেন, 'নু' (Noah) যিহোবাদেবের অনুগ্রহে সামাজিক শিল্প শিখিলেন। ভারতে সকল শিল্পের অধিষ্ঠাতা—দেবগণ বা সিদ্ধপুরুষ; জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সমস্তই অলৌকিক পুরুষদিগের কৃপা। 'গুরু বিন্ জ্ঞান নহি'; শিষ্য-পরম্পরায় ঐ জ্ঞানবল গুরু-মুখ হইতে না আসিলে, গুরুর কৃপা না হইলে আর উপায় নাই।

আবার দার্শনিকেরা—বৈদান্তিকেরা বলেন, জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে? কুকর্মের দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে—তাহা কাটিয়া যায় মাত্র। অথবা ঐ 'স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্ফারিত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা, ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, জ্ঞানচর্চার দ্বারা অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ—ইহাও পড়া যায়।

আধুনিকেরা অপরদিকে অনন্তস্ফূর্তির আধারস্বরূপ মানব-মন দেখিতেছেন, উপযুক্ত দেশকালপাত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়াবান হইতে পারিলেই জ্ঞানের স্ফূর্তি হইবে, ইহাই সকলের ধারণা। আবার দেশকালের বিড়ম্বনা পাত্রের তেজে অতিক্রম করা যায়। সৎপাত্র কুদেশে কুকালে পড়িলেও বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শক্তির বিকাশ করে। পাত্রের উপর—অধিকারীর উপর যে সমস্ত ভার চাপান হইয়াছিল, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। সেদিনকার বর্বর জাতিরাও যত্নগুণে সুসভ্য ও জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে—নিম্নস্তর উচ্চতম আসন অপ্রতিহত গতিতে লাভ করিতেছে। নিরামিষভোজী পিতা-মাতার সন্তানও সুবিনীত বিদ্বান হইয়াছে, সাঁওতাল-বংশধরেরাও ইংরেজের কৃপায় বাঙ্গালীর পুত্রদিগের সহিত বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে। পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা ঢের কমিয়া আসিয়াছে।

একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্বপুরুষপরম্পরাগত পথে তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে, ঐ খাজানা পূর্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য। যাঁহাদের এ প্রকার পূর্বপুরুষ নাই, তাঁহাদের উপায়?—কিছুই নাই। তবে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয়, উত্তর দিলেন—আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃতিফলে আগামী জন্মে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।—আর এই যে আধুনিকেরা বহুবিদ্যার আবির্ভাব করিতেছেন—যাহা তোমরা জান না, এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন, তাহারও প্রমাণ নাই। পূর্বপুরুষেরা জানিতেন বৈকি! তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ—।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা এ সকল কথায় আস্থা প্রকাশ করেন না।

অপরা ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে; এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ; বাস্তবিক সেই অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত।

'জ্ঞান-মাত্রেই পুরুষবিশেষের দ্বারা অধিকৃত এবং ঐ-সকল বিশেষ পুরুষ, ঈশ্বর বা প্রকৃতি বা কর্মনির্দিষ্ট হইয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করেন, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের আর কোন উপায় নাই'—এইটি স্থির সিদ্ধান্ত হইলে সমাজ হইতে উদ্যোগ-উৎসাহাদি অন্তর্হিত হয়, উদ্ভাবনী-শক্তি চর্চাভাবে ক্রমশঃ বিলীন হয়, নূতন বস্তুতে আর কাহারও আগ্রহ হয় না, হইবার উপায়ও সমাজ ক্রমে বন্ধ করিয়া দেন। যদি ইহাই স্থির হইল যে, সর্বজ্ঞ পুরুষবিশেষগণের দ্বারায় মানবের কল্যাণের পন্থা অনন্তকালের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সকল নির্দেশের রেখামাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সর্বনাশ হইবার ভয়ে সমাজ কঠোর শাসন দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐ নির্দিষ্ট পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি সমাজে এ বিষয়ে কৃতকার্য হয়, তবে মনুষ্যের পরিণাম যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক কার্যই যদি অগ্র হইতে সুনির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তবে চিন্তাশক্তির পর্যালোচনার আর ফল কি? ক্রমে ব্যবহারের অভাবে উদ্ভাবনী-শক্তির লোপ ও তমোগুণপূর্ণ জড়তা আসিয়া পড়ে; সে সমাজ ক্রমশই অধোগতিতে গমন করিতে থাকে।

অপরদিকে সর্বপ্রকারে নির্দেশবিহীন হইলেই যদি কল্যাণ হইত, তাহা হইলে চীন, হিন্দু, মিশর, বাবিল, ইরান, গ্রীস, রোম ও তাহাদের বংশধরদিগকে ছাড়িয়া সভ্যতা ও বিদ্যাশ্রী জুলু, কাফ্রি, হটেণ্টট্, সাঁওতাল, আন্দামানী ও অষ্ট্রেলিয়ান্ প্রভৃতি জাতিগণকেই আশ্রয় করিত।

অতএব মহাপুরুষদিগের দ্বারা নির্দিষ্ট পথেরও গৌরব আছে, গুরু-পরম্পরাগত জ্ঞানেরও বিশেষ বিধেয়তা আছে, জ্ঞানের সর্বান্তর্যামিত্বও একটি অনন্ত সত্য। কিন্তু বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায়—তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্য স্মরণেই কালাতিপাত করে, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সর্বপ্রকারে পূর্বপুরুষদিগের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বয়ং দুর্বল হইয়া যায় এবং পরবর্তী কালে ঐ দুর্বলতাই শক্তিহীন গর্বিত হৃদয়কে পূর্বপুরুষদিগের গৌরব-ঘোষণারূপ জীবনাধার-মাত্র অবলম্বন করিতে শিখায়।

পূর্ববর্তী মহাপুরুষেরা সমুদয়ই জানিতেন, কালবশে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই লোপ হইয়া গিয়াছে, এ কথা সত্য হইলেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ লোপের কারণ, পরবর্তীদের নিকট ঐ লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান; নূতন উদ্যোগ করিয়া, পুনর্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে বিশুদ্ধচিত্তে আপনা হইতেই স্ফুরিত হয়, তাহাও চিত্তশুদ্ধিরূপ বহু আয়াস ও পরিশ্রম-সাধ্য। আধিভৌতিক জ্ঞানে যে-সকল গুরুতর সত্য মানব-হৃদয়ে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেগুলিও সহসা উদ্ভূত দীপ্তির ন্যায় মনীষীদের মনে সমুদিত হইয়াছে, কিন্তু বন্য অসভ্য মনুষ্যের মনে তাহা হয় না। ইহাই প্রমাণ যে, আলোচনা ও বিদ্যাচর্চারূপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ।

অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক—কেবল প্রকাশের তারতম্যে।

মহাপুরুষত্ব, ঋষিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্বজীবের মধ্যে আছে, উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদিসহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একবার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায় সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।

ভাববার কথা

(১)

ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদানপ্রদান-সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থামে হেলান দিয়া চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণবর্ণ ঢুলুঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ-উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বলি বাপু হে, ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ!' ক্ষিপ্র উত্তর এল—'সুর-তানের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' চোবেজী—'হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহম্মক কি না! পাগল তুই, আমাকে ভিজুতে পারিসনি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?'

* * *

ভগবান্ অর্জুনকে বলেছেনঃ তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশী; থেকে থেকে বিকট চীৎকারঃ আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে বারংবার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার ওপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির ডোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু-চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!

* * *

ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্বসম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে মরে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান্ দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না, মারেনও না'—এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান! কোন প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলাপুরীর আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরীজীর মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্য জীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কেন মুহূর্তমাত্রও ধরণীর ভারবৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজীকে আমাদের চেয়ে আহাম্মক ঠাওরেছেন।

* * *

'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর, বল দেখি?' রামচরণ—'সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।'

রামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন?

(২)

লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারি ধুম! বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বে-সুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরানী, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ 'সিয়া'দের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতিফাটান মর্সিয়ার কাতরানি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ্গ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ

করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ্ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় তো ফটক পার হয়ে মসজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এল—ও মহাপাপী ইয়েজ্বিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজ্বিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্মের বিচিত্র গতি। উলটা সমঝ্লি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজ্বিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখ্‌ব? ভল্ বাবা অজিদ, দেবতা তো তুঁহি হ্যায় অস্ মারো শারোকো কি অভি তক্ রোবত।' (ধন্য বাবা ইয়েজ্বিদ, এমনি মেরেচ শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!)

* * *

সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীয় নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? আর বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে তো ঢের মাল আছে, যার এক-একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ—শাস্ত্রসকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবতার নাম কি? উত্তর এল—এঁর নাম 'লোকাচার'। আমার লক্ষ্ণৌ-এর ঠাকুরসাহেবের কথা মনে পড়ে গেলঃ 'ভল্ বাবা "লোকাচার" অস্ মারো' ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐ রকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ
২৯
, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠেছে, সকল জিনিষ বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুশকিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদলের আদর! 'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মারো' ইত্যাদি।

পারি প্রদর্শনী

[পারি প্রদর্শনীতে স্বামীজীর এই বক্তৃতাদির বিবরণ স্বামীজী স্বয়ং লিখিয়া ‘উদ্বোধন’-এ পাঠাইয়াছিলেন।]

এই মাসের
৩০
প্রথমাংশে কয়েক দিবস যাবৎ পারি (Paris) মহাপ্রদর্শনীতে “কংগ্রেস দ’ লিস্তোয়ার দে রিলিজিঅঁ” [Congress of the History of Religions, August 1900] অর্থাৎ ধর্মেতিহাস-নামক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় অধ্যাত্ম-বিষয়ক এবং মতামতসম্বন্ধী কোন চর্চার স্থান ছিল না, কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসকলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্মপ্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় জনকয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি-বিষয়ক চর্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন। ধর্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা—প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা-কীর্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সর্বধর্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার বিশেষ বিরোধী। ফ্রান্স ক্যাথলিক-প্রধান; অতএব যদিও কর্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক জগতের বিপক্ষতায় ধর্মসভা করা হইল না।

যে প্রকার মধ্যে মধ্যে Congress of Orientalists অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরব্যাদি ভাষাভিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, সেইরূপ উহার সহিত খ্রীষ্টধর্মের প্রত্নতত্ত্ব যোগ দিয়া পারি-তে এ ধর্মেতিহাস-সভা আহূত হয়।

জম্বুদীপ হইতে কেবল দুই-তিনজন জাপানী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন; ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ।

বৈদিক ধর্ম—অগ্নিসূর্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনা-সমুদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত।

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য ‘পারি ধর্মেতিহাস-সভা’ কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু শারীরিক প্রবল অসুস্থতানিবন্ধন তাঁহার প্রবন্ধাদি লেখা ঘটিয়া উঠে নাই; কোনমতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। উপস্থিত হইলে ইওরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; উঁহারা ইতঃপূর্বেই স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট নামক এক জার্মান পণ্ডিত শালগ্রাম-শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি ‘যোনি’ চিহ্ন বলিয়া নির্ধারিত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বৎ শালগ্রাম-শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন।শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোনিপূজার অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতদ্বয়ের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু শালগ্রাম সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক।

স্বামীজী বলেন যে, শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদসংহিতার যূপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ যে প্রকার মহাদেবের অঙ্গকান্তি, পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ, ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপ-স্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।

অথর্বসংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহ্মত্ব-মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লিঙ্গাদি পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও শ্রীশঙ্করের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে, হইতে পারে যে, বৌদ্ধাদির প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধস্তূপ-সমাকৃতি দরিদ্রার্পিত ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারক-স্তূপও সেই স্তম্ভে অর্পিত হইয়াছে। যে প্রকার অদ্যাপি ভারতখণ্ডে কাশ্যাদি তীর্থস্থলে অপারগ ব্যক্তি অতি ক্ষুদ্র মন্দিরাকৃতি উৎসর্গ করে, সেই প্রকারে বৌদ্ধেরাও ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করিত।

বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ডমধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম-শিলা উক্ত অস্থিভস্মাদি-রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অপিচ নর্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপালপ্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌনব্যাখ্যা অতি অশ্রুতপূর্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌনব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি

অর্বাচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময় সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ত্রসকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।

অন্য এক বক্তৃতা—স্বামীজী ভারতীয় ধর্মমতের বিস্তার-বিষয়ে দেন। তাহাতে বলা হয় যে, ভারতখণ্ডের বৌদ্ধাদি সমস্ত মতের উৎপত্তি বেদে। সকল মতের বীজ তন্মধ্যে প্রোথিত আছে। ঐ সকল বীজকে বিস্তৃত ও উন্মীলিত করিয়া বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি। আধুনিক হিন্দুধর্মও ঐ সকলের বিস্তার—সমাজের বিস্তার ও সঙ্কোচের সহিত কোথাও বিস্তৃত, কোথাও অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইয়া বিরাজমান আছে। তৎপরে স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধ-পূর্ববর্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বলেন যে, যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ঘাটনের সহিত প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিংবদন্তীসমস্ত সত্য। বৃথা প্রবন্ধ-কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিংবদন্তীর রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার এক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক না কেন, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণিত হইবে যে, কোন গ্রীক সংস্কৃত ভাষা জানিত, ততক্ষণ সপ্রমাণ হইল না যে, ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীক জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে—গ্রীক সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতি সাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া!!

এক, 'ম্লেচ্ছা বৈ যবনাস্তেষু এষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা। ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে'—এই শ্লোকের উপর পাশ্চাত্যেরা কতই না কল্পনা চালাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কি প্রকারে প্রমাণীকৃত হইল যে, আর্যেরা ম্লেচ্ছের নিকট শিখিয়াছেন? ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উক্ত শ্লোকে আর্যশিষ্য ম্লেচ্ছদিগকে উৎসাহবান করিবার জন্য বিদ্যার আদর প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ 'গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত, কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ?' আর্যদের প্রত্যেক বিদ্যার বেদে রহিয়াছে এবং উক্ত কোন বিদ্যার প্রত্যেক সংজ্ঞাই বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকালের গ্রন্থসকলে পর্যন্ত দেখানো যাইতে পারে। এ অপ্রাসঙ্গিক যবনাধিপত্যের আবশ্যকতাই নাই।

তৃতীয়তঃ আর্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীকসদৃশ শব্দ সংস্কৃত হইতে সহজেই ব্যুৎপন্ন হয়, উপস্থিত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া যাবনিক ব্যুৎপত্তি গ্রহণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে কি অধিকার, তাহাও বুঝি না।

ঐ প্রকার কালিদাসাদিকবি-প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্যনাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কিনা। যাঁহারা উভয় ভাষায় নাটকরচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিন্‌কালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনা-প্রণালী এক, আর্যনাটকের আর এক।

আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ তো নাই, বরং শেক্সপীয়র-প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে।

অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, শেক্সপীয়র সর্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

শেষ—পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোন হিন্দু কোন কালে গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীক প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

তদ্বৎ আর্যভাস্কর্যে গ্রীক প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।

স্বামীজী ইহাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণারাধনা বুদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন এবং গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন—নবীন কোন মতে নহে। গীতার ভাষা মহাভারতের ভাষা এক। গীতায় যে-সকল বিশেষণ অধ্যাত্মসম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই বনাদি পর্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হইলে এমন ঘটা অসম্ভব। পুনশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই এবং গীতা যখন তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্রও কেন করেন নাই?

বুদ্ধের পরবর্তী যে-কোন গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না। কথা, গল্প, ইতিহাস বা কটাক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমতের বা বুদ্ধের উল্লেখ প্রকাশ্য বা লুক্কায়িতভাবে রহিয়াছে—গীতার মধ্যে কে সে প্রকার দেখাইতে পারেন? পুনশ্চ গীতা ধর্মসমন্বয়-গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোন মতের অনাদর নাই, সে গ্রন্থকারের সাদর বচনে এক বৌদ্ধমতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ-প্রদর্শনের ভার কাহার উপর?

উপেক্ষা—গীতায় কাহাকেও নাই। ভয়?—তাহারও একান্ত অভাব। যে ভগবান্ বেদপ্রচারক হইয়াও বৈদিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার বৌদ্ধমতের আবার কি ভয়?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রকার গ্রীক ভাষার এক এক গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, সেই প্রকার এক এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের

উপর জীবন উৎসর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে। বিশেষতঃ এ মহাভারত ভারতেতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা অত্যুক্তি নহে যে, এ পর্যন্ত উক্ত সর্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই।

বক্তৃতার পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেনঃ স্বামীজী যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজীকে আমরা বলি যে, সংস্কৃত-প্রত্নতত্ত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজীর সদৃশ এবং ভারতের কিংবদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি।

অন্তে—বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় অন্য সকল বিষয় অনুমোদন করিয়া এক গীতার মহাভারত-সমসাময়িকত্বে দ্বৈত মত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন যে, অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে।

অধিবেশনের লিপিপুস্তকে উক্ত বক্তৃতার সারাংশ ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইবে।

শিবের ভূত

[স্বামীজীর দেহত্যাগের বহুকাল পরে স্বামীজীর ঘরের কাগজপত্র গুছাইবার সময় তাঁহার হাতে লেখা এই অসমাপ্ত গল্পটি পাওয়া যায়।]

জার্মানীর এক জেলায় ব্যারন 'ক'য়ের বাস। অভিজাত বংশে জাত ব্যারন 'ক' তরুণ যৌবনে উচ্চপদ, মান, ধন, বিদ্যা, এবং বিবিধ গুণের অধিকারী। যুবতী, সুন্দরী, বহুধনের অধিকারিণী, উচ্চকুল-প্রসূতা অনেক মহিলা ব্যারন 'ক'য়ের প্রণয়াভিলাষিণী। রূপে, গুণে, মানে, বংশে, বিদ্যায়, বয়সে এমন জামাই পাবার জন্য কোন্ মা-বাপের না অভিলাষ? কুলীনবংশজা এক সুন্দরী যুবতী যুবা ব্যারন 'ক'য়ের মনও আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু বিবাহের এখনও দেরী। ব্যারনের মান ধন সব থাকুক, এ জগতে আপনার জন নাই—এক ভগ্নী ছাড়া। সে ভগ্নী পরমা সুন্দরী বিদুষী। সে ভগ্নী নিজের মনোমত সুপাত্রকে মাল্যদান করবেন। ব্যারন বহুধনধান্যের সহিত ভগ্নীকে সুপাত্রে সমর্পণ করবেন—তার পর নিজে বিবাহ করবেন, এই প্রতিজ্ঞা। মা বাপ ভাই সকলের স্নেহ সে ভগ্নীতে; তাঁর বিবাহ না হলে নিজে বিবাহ করে সুখী হতে চান না। তার উপর এ পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, বিবাহের পর বর, মা, বাপ, ভগ্নী, ভাই—কারুর সঙ্গে আর বাস করেন না; তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র হন। বরং স্ত্রীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে গিয়া বাস সমাজসম্মত, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে কখনও আসতে পারেন না। কাজেই নিজের বিবাহ—ভগ্নীর বিবাহ পর্যন্ত স্থগিত রয়েছে।

আজ মাস কতক হল সে ভগ্নীর কোন খবর নাই। দাসদাসী-পরিষেবিত নানাভোগের আলয় অট্টালিকা ছেড়ে, একমাত্র ভাইয়ের অপার স্নেহবন্ধন তাচ্ছিল্য করে সে ভগ্নী অজ্ঞাতভাবে গৃহত্যাগ করে কোথায় গিয়েছে! নানা অনুসন্ধান বিফল। সে শোক ব্যারন 'ক'য়ের বুকে বিদ্ধশূলবৎ হয়ে রয়েছে। আহার-বিহারে তাঁর আস্থা নাই—সদাই বিমর্ষ, সদাই মলিনমুখ। ভগ্নীর আশা ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়জনেরা ব্যারন 'ক'য়ের মানসিক স্বাস্থ্যসাধনে বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। আত্মীয়েরা তাঁর জন্য বিশেষ চিন্তিত—প্রণয়িনী সদাই সশঙ্ক।

প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী। নানাদিগ্দেশাগত গুণিমণ্ডলীর এখন প্যারিসে সমাবেশ; নানাদেশের কারুকার্য, শিল্পরচনা প্যারিসে আজ কেন্দ্রীভূত। সে আনন্দতরঙ্গের আঘাতে শোকে জড়ীকৃতহৃদয় আবার স্বাভাবিক বেগবান স্বাস্থ্য লাভ করবে, মন দুঃখচিন্তা ছেড়ে বিবিধ আনন্দজনক চিন্তায় আকৃষ্ট হবে—এই আশায় আত্মীয়দের পরামর্শে বন্ধুবর্গ-সমভিব্যাহারে ব্যারন 'ক' প্যারিসে যাত্রা করলেন। ...

হে পাঠক। প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। তোমারও কুলগত আতিথ্য চিরপ্রথিত। অতিথি যতিকে পূর্বের ন্যায় সম্মানপূর্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে, পৃথিবীর নানাস্থান পর্যটনের অভিজ্ঞতা-দানে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে-সকল কথা শুনিলে বুঝিবে, তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতে বর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে—এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি—এ-সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে তাহা নহে; কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে-বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয়সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল; হে স্বদেশী! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহুশ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে? ইতি—

বিনীত
সারদানন্দ

১ মাঘ, ১৩১২

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন হইতে

পরিব্রাজকের কাগজ-পত্র অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার অস্ট্রিয়া হইতে তুর্কি হইয়া ইজিপ্ট প্রত্যাগমনাবধি ভ্রমণকাহিনী কতক সবিস্তারে এবং কতক 'ডায়েরি'র আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সবিস্তার বর্ণিতাংশটি বর্তমান সংস্করণে পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত এবং 'ডায়েরি'র নোটগুলি পরিশিষ্টের মধ্যে মুদ্রিত করা হইল। ... ইতি—

বশংবদ
পুস্তক প্রকাশক

ভূমিকা

ভূমিকা

[১৮৯৯ খ্রীঃ ২০ জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা হইতে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামীজী নিয়মিতভাবে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠাইতে সম্মত হন। পত্রাকারে লিখিত সেই নানা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনীই উদ্বোধনের ১ম ও ২য় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র'রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে 'পরিব্রাজক'রূপে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই লেখায় 'তু-ভায়া' স্বামী তুরীয়ানন্দকে বুঝাইতেছে। স্বামীজী' বলিয়া এখানে পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বোধন করিতেছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে।]

স্বামীজি! ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত করে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, খবরটা লিখব মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুড়েমি। ডায়েরী, না কি তোমরা বল, রোজ লিখব মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে কর যে, মহাবীরের মত বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে বলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাত! 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি, হল না 'ক্ব সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন—অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল করে, খোঁটাখুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সী-সিক্‌নেস্

১

হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের 'গোঁসাইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়—হয়নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেব, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বার্নিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল-তাবল বকছি! ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল। 'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত'

২

আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রামঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলিকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিম্বা পানের পিক-বিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো- মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁব-কাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলি—চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার করে একঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটাখুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনোঃ

নদীমুখ বা বন্দর হতে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না—বিশেষত কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটীর

৩

অধিকার; তিনিই কাপ্তেন, তাঁরই হুকুম; সমুদ্রে বা আসবার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়ঃ একটি বজবজের কাছে জেম্‌স্ ও মেরী নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে, দিনের বেলায় পাইলট অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান, নতুবা নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগল।

গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরোঙ্গত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ; কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি?—হবে! গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরে লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন করে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় করে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশ যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলবারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি। বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর হর হর', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর হর হর!!'

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ ভায়া। তু-ভায়া বালব্রহ্মচারী 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমো ব্রহ্মণে', হয়েছেন 'নমো নারায়ণায়' (বাপ, রক্ষা আছে!), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্নায় প্রবেশ। যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত-ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো—গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় কর, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটির, আর ঐ যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারী, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু; মা কি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বললুম—মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করছে, ওরা হচ্ছে নেড়ে—আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ করে ফিরছে, ওরা হচ্ছে আসল মেথর, লালবেগের
৪
চেলা। যদি কথা না শোন তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি! তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।

কি বর্ণনা করতে কি বকছি আবার দেখ! আগেই তো বলে রেখেছি, আমার পক্ষে ওসব একরকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর তো আবার চেষ্টা করতে পারি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাইবোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশষ্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে—রূপ কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্তানী গালচে-দুলচে কোথাও হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারী, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখনও কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মা-র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইঁটের পাঁজা, আর নাববেন ইঁট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট

ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!

বঙ্গোপসাগরে

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে 'দূরাদয়শ্চক্র' ফক্র 'তমালতালী-বনরাজি'
৫
ইত্যাদি ওসব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেননি, সমুদ্রও দেখেননি, এই আমার ধারণা।
৬

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন সর্বত্র দুর্লভ হলেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।' তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' বলে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'
৭
। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা-ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান্ আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্প গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্', মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙালী ছেলে—পড়তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটি তো এমনি ভয় পেয়েছে যে, বোধ হয় তীরে নামতে পারলে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়ায়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন ভারতবাসী—আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন' সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ করে তুলতেন! আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে!'

এত বড় পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ করে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার 'টলিজ নালা' নামক খাল ও আদিগঙ্গা হয়ে গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কণ পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে ত্রিবেণী পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীনকাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে, পোর্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আসবার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলী-নগর। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু করে উঠতে পারেনি। মা গঙ্গা ক্রমশই বুজে আসছেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদ্রী লিখছেন, সূতির কাছে ভাগীরথী- মুখ সে সময়ে বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওয়েল—মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না বলে ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী৮ নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলীর এক মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার নীচে চন্দননগর স্থাপন করলে। জার্মান অষ্টেণ্ড কোম্পানী ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের পাঁচ মাইল নীচে অপর পারে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুললে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে আট মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত করলে। তার পর ইংরেজরা কলকেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কলকেতা এখনও খোলা, তবে 'পরেই বা কি হয়' এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটির মধ্য দিয়ে চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পাড়ের জমি হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটি বসে উঁচু হয়ে উঠে, তাহলেই মুশকিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে; কলকেতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নাকি ঐরকম হয়েছিল। আর এক

রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুরবেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হত, তোমারই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।

এই তো গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—'জেমস্ আর মেরী' চড়া। পূর্বে দামোদর নদ কলকেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন কালের বিচিত্রগতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ছ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখনও এখানে, কখনও ওখানে, কখনও একটু শক্ত, কখনও বা নরম হচ্ছেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিনরাত তার মাপজোখ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই—দিনকতক মাপজোখ ভুললেই, জাহাজের সর্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উলটে ফেলা, না হয় সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন-মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধ ঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজী নন, জাহাজ-ষ্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকেতা থাকে 'কাউণ্টি অফ ষ্টারলিং' নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই 'খোঁজ খবর নাহি পাই'। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪০০ টন বোঝাই একটি ষ্টীমারের দশ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি।

তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হল? সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্চেন'। তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।

জাহাজের কথা

এ জাহাজ কি আশ্চার্য ব্যাপার! যে সমুদ্র—ডাঙা থেকে চাইলে ভয় হয়, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেছে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্যমামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ! এ জাহাজ করলে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কলকব্জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলে না, যার ওলটপালটে আর সব কলকারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়—সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাঁকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে 'জয় জগন্নাথে'র রথ পর্যন্ত, সূতো-কাটা চরকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম করলে কে? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আনছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরী হল, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে এ ভারতবর্ষ যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, যত পরিবর্তন হোক না কেন, নীচের ধাপগুলিতে ওঠবার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হল; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা হল, ক্রমে কত রূপ বদল হল, কত তার হল, তাঁত হল, ছড়ির নাম রূপ বদলাল, এসরাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়ার গাছকতক বালাঞ্চি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের চোঙ বসিয়ে ক্যাঁকো করে 'মজওয়ার কাহারের' জাল বুনবার বৃত্তান্ত৯ জাহির করে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে, এখনও নিরেট চাকা গড়গড়িয়ে যাচ্ছে! তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে, বিশেষ এ রবার-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ, অর্থাৎ সত্যযুগের যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বলে কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। পাছে স্বার্থপরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া-লুড়ির সহায়ে সর্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন; তখন জলে বিচরণ করবার জন্য তাঁরা গাছের মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা দু-চারখানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্যন্ত কটুমারন (Catamaran) দেখেছ তো? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্যন্ত চলে যায় দেখেছ তো? উনিই হলেন— 'ঊর্ধ্বমূলম্'।

আর ঐ যে বাঙ্গাল মাঝির নৌকা—যাতে চড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাকতে হয়; ঐ যে চাটগেঁয়ে-মাঝি-অধিষ্ঠিত বজরা—যা একটু হাওয়া উঠলেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন 'দ্যাব্‌তার নাম নিতে বলে; ঐ যে পশ্চিমে ভড়—যার গায়ে নানা চিত্রবিচিত্র-আঁকা পেতলের চোক দেওয়া, দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে, ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কণের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বানচাল হয়ে ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাপি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরেছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙি—উপরে সুন্দর ছাওয়া, নীচে বাঁশের পাটাতন, ভেতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা (যাতে 'মেতুয়া গঙ্গাসাগর'—থুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কনকনে উত্তরে হাওয়ার গুঁতোয় 'ডাব নারিকেল চিনির পানা' খাও না); ঐ যে পানসি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ—কোন্নগুরে মেঘ দেখেছে কি কিস্তি সামলাচ্চে, এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্চে (যাদের বুলি—'আইলা গাইলা বানে বানি', যাদের ওপর তোমাদের মহন্ত মহারাজের 'বঘাসুর' ধরে আনতে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল—'এ স্বামিনাথ! এ বঘাসুর কঁহা মিলেব? ইত হাম জানব না')। ঐ যে গাধাবোট—যিনি সোজাসুজি যেতে জানেনই না, ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল—লঙ্কা, মালদ্বীপ বা আরব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে; আর কত বলব, ওরা সব হলেন—'অধঃশাখা প্রশাখা।'

পালভরে জাহাজ চালান একটি আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যে দিকে যাক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছবেই পৌঁছবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরী। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখতে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নামছেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চলতে বড় পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চলতে হয়, তবে হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই মুশকিল—পাখা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। মহা-বিষুবরেখার নিকটবর্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়। এখন পাল-জাহাজেও কাঠ-কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা ষ্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত, এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতি পদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জায়গার জন্য হুঁশিয়ার হওয়া, ষ্টীমার অপেক্ষা এ দুটি জিনিষ পাল-জাহাজে অত্যাবশ্যক। ষ্টীমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্তমধ্যে বন্ধ করা যায়। সামনে পিছনে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরানো যায়। পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুলতে, বন্ধ করতে, হাল ফেরাতে হয়তো জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগতে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না, কুলী ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায়, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল। ছোট ছোট পাল-জাহাজ, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে টানবার জন্য ষ্টীমার ভাড়া করে হাজার হাজার টাকা টেক্‌স দিয়ে পাল-জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ-মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল-জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জল-যুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার এদিক ওদিক, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে-সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগত, আর সে আগুন নিবুতে হত। সে জাহাজের গঠনও আর একরকমের ছিল। একদিক ছিল চেপ্টা আর অনেক উঁচু, পাঁচ-তলা ছ-তলা। যেদিকটা চেপ্টা, তারই উপর তলায় একটা কাঠের বারান্দা বার করা থাকত। তারই সামনে কমাণ্ডারের ঘর—বৈঠক। আশে পাশে অফিসারদের। তারপর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু-চারটি ঘর। নীচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান, তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক

তলার দালানের দু-পাশে তোপ বসানো, সারি সারি দ্যালের গায়ে কাটা, তার মধ্যে দিয়ে তোপের মুখ—দু-পাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নীচু ছিল; মাথা হেঁট করে চলতে হত। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় করতেও অনেক কষ্ট পেতে হত। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পার ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে লোক নিয়ে যাও। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী—জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একবার জাহাজে তুলতে পারলে হয়, তারপর—বেচারা কখনও হয়তো জাহাজে চড়েনি—একেবারে হুকুম হল, মাস্তুলে ওঠ। ভয় পেয়ে হুকুম না শুনলেই চাবুক। কতক মরেও যেত। আইন করলেন আমীরেরা, দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট করবার জন্য; রাজস্ব ভোগ করবেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আসছে!! এখন ও-সব আইন নেই, এখন আর 'প্রেস গ্যাঙ্গের' নামে চাষা-ভুষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুশীর সওদা; তবে অনেকগুলি চোর-ছ্যাঁচড় ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম শেখানো হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই বদলে ফেলেছে। এখন 'পাল'—জাহাজে অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তায় উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড়-ঝাপটার ভয়ও অনেক কম। কেবল জাহাজ না পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা খায়, এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধ-জাহাজ তো একেবারে পূর্বের অবস্থার সঙ্গে বিলকুল পৃথক্। দেখে তো জাহাজ বলে মনেই হয় না। এক একটি ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলেখেলা বৈ তো নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি! সব চেয়ে ছোটগুলি 'টরপিডো' ছুঁড়বার জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল করতে, আর বড়-বড়গুলি হচ্ছেন বিরাট যুদ্ধের আয়োজন।

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌সের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐকরাজ্যপক্ষেরা
১০
একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষের গোলা তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগল, জাহাজের কিছুই বড় করতে পারলে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে জোড়া হতে লাগল, যাতে দুষমনের গোলা কাষ্ঠ ভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়তে চলল—তা-বড় তা-বড় তোপ; তোপ—যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাসতে, ছুঁড়তে হয় না, সব কলে হয়। পাঁচ-শ লোক যাকে একটুকুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ, এখন একটা ছোট ছেলে কল টিপে যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্চে, নাবাচ্চে ও ঠাসছে, ভরছে, আওয়াজ করছে—আবার তাও চকিতের ন্যায়! যেমন জাহাজের লোহার দ্যাল মোটা হতে লাগল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চলল। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের দ্যালওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন না, ফেটে চুটে চৌ-চাকলা! তবে এই 'লুয়ার বাসর ঘর', যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি; এবং যা 'সাতালি পর্বতের' ওপর না দাঁড়িয়ে সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডো'র ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্ছেন কতকটা চুরুটের চেহারা একটি নল; তাঁকে ত্যাগ করে ছেড়ে দিলে তিনি জলের মধ্যে মাছের মত ডুবে ডুবে চলে যান। তারপর যেখানে লাগবার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থসকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্তিটা হয়, তার 'পুনর্মূষিকো ভব' অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাঠকুটোত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন! মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায়, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রায় 'কিমা'তে পরিণত অবস্থায়! এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈয়ার হওয়া অবধি জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয় না। দু-একটা লড়াই আর একটা বড় জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে এই রকম জাহাজ নিয়ে লড়াই হবার পূর্বে, লোকে যেমন ভাবত যে, দু-পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম সব উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু হয় না।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে তো উভয় পক্ষের ফৌজ মরে দু- মিনিটে ধুন হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগত তো উভয় পক্ষের জাহাজের নাম-নিশানাও থাকত না। আশ্চর্য এই যে, যত তোপ-বন্দুক উৎকর্ষ লাভ করছে, বন্দুকের যত ওজন হাল্কা হচ্ছে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটি হচ্ছে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্চে, যত ভরবার ঠাসবার কলকব্জা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্ছে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্ছে! পুরানো ঢঙের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দোঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ করতে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদমী অব্যর্থসন্ধান—আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ করে খালি হাওয়া গরম করে! অল্প স্বল্প কলকব্জা ভাল। মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে—এক এক দলে এক একটা জিনিষের টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে—আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাষ্টারি, কেরানীগিরি করে ঐ জন্যই হস্তিমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ার হয়!

বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু-চারটা তোপ বসিয়ে অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়াহুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়, তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাত। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানী ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বললেই হয়। আমাদের দেশের ও ইওরোপের বাণিজ্যে পি. এণ্ড ও. কোম্পানী সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি. আই. এস্. এন্. কোম্পানী; আরও অনেক কোম্পানী আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম (Messageries Maritimes) ফরাসী, অষ্ট্রীয়ান লয়েড, জার্মান লয়েড এবং ইতালীয়ান রুবাটিনো কোম্পানী প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি. এণ্ড ও. কোম্পানী যাত্রী-জাহাজ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী—লোকের এই

ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য-ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য।

এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানীই প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, যেন কোন কালা আদমী এমিগ্রাণ্ট অফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্চি, কেউ আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলী করবার জন্য নিয়ে যাচ্চে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্র-লোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে; অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাহিরে যাচ্চে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত; সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব এক জাত—'নেটিভ'। কুলির আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভের' জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! একক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মত। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পর্দা ইত্যাদি ইত্যাদি—ও-সব ওদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েতফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মত। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মত ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! এখন এস না এগিয়ে? 'সব নেটিভ' সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম-বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, সব নেটিভ। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি-ঝাঁটার চোটটা বেশী বৈ কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজরাজ! তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষী লাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক। কপনি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু-পায়ে শুধু-মাথায় হিল্লী দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল-ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চাল-চলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক।

আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে 'ও চেহারা এখানে চলবে না!' মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরেজী কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইওরোপী পোষাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু-একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিষটা দাও'; বললে 'নেই'। 'ঐ যে রয়েছে।' 'ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগল। যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি—বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।' একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ার আছে? আমরা হচ্চি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!' কিন্তু মজাটি দেখছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে!

বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলাণ্টিক পারাপার করে, তার এক একখান আমাদের এই 'গোলকোণ্ডা'
১১
জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে করে জাপান হতে পাসিফিক্ পার হওয়া গিয়েছিল, তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মাঝখানে প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী ও 'ষ্টীয়ারেজ' এদিক ওদিকে। আর এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। ষ্টীয়ারেজ যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে খুব গরীব লোক যায়, যারা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ করতে যাচ্চে। তাদের থাকবার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাদের ষ্টীয়ারেজ নাই, তবে ডেকযাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায় তারা বসে শুয়ে যায়। তা দূর-দূরের যাত্রায় তো একটিও দেখলুম না। কেবল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে যাবার সময়, বোম্বে থেকে কতকগুলি চীনে লোক বরাবর হংকং পর্যন্ত ডেকে গিয়েছিল।

ঝড়-ঝাপট হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরে 'হরিকেন ডেক' ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীর একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলকেতা হতে সুয়েজ পর্যন্ত এবং গরমের দিনে ইওরোপেও ডেকে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাঁদের সাজান গুজান কামরার মধ্যে গরমের চোটে তরলমূর্তি ধরবার চেষ্টা করছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী—এসব জাহাজের বড়ই খারাপ।কেবল এক নূতন জার্মান লয়েড কোম্পানী হয়েছে; জার্মানীর বের্গেন নামক শহর হতে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়; তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর, এমন কি 'হরিকেন ডেকে' পর্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়া-দাওয়া প্রায় গোলকোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর

মত। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডা জাহাজে 'হরিকেন ডেকে'র উপর কেবল দুটি ঘর আছে; একটি এ পাশে, একটি ও পাশে। একটিতে থাকেন ডাক্তার, আর একটি আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটি জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হলেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের; ওপর নীচে, সে কাঠের দেয়ালে বায়ুসঞ্চারের জন্য অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। দ্যালগুলিতে 'আইভরি পেন্ট' লাগানো; এক একটি ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। একটি দ্যালের গায়ে দুটি খুরোহীন লোহার খাটিয়ার মত এঁটে দেওয়া; একটির উপর আর একটি। অপর দ্যালের ঐ রকম একখানি 'সোফা'। দরজার ঠিক উল্টা দিকে মুখ হাত ধোবার জায়গা, তার উপর একখানি আরশি, দুটো বোতল, খাবার জলের দুটো গ্লাস। ফি-বিছানার গায়ের দিকে একটি করে জালতি পেতলের ফ্রেমে লাগানো। ঐ জালতি ফ্রেম সহিত দ্যালের গায়ে লেগে যায়, আবার টানলে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র তাইতে রেখে শোয়। নীচে বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাঁটরা রাখবার জায়গা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাবও ঐ, তবে স্থান সংকীর্ণ ও জিনিষপত্র খেলো। জাহাজী কারবারটা প্রায় ইংরেজের একচেটে। সে জন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেছে, তাতেও ইংরেজযাত্রী অনেক বলে খাওয়া-দাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মত করতে হয়। সময়ও ইংরেজী-রকম করে আনতে হয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রুশিয়াতে খাওয়া-দাওয়ায় এবং সময়ে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে—বাঙলায়, হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে, মান্দ্রাজে তফাত। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজে অল্প দেখা যায়। ইংরেজীভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরাজী ঢঙে সব গড়ে যাচ্চে।

বাষ্পপোতে সর্বেসর্বা কর্তা হচ্ছেন 'কাপ্তেন'। পূর্বে 'হাই সী'তে
১২
কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব করতেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই, তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে তাঁর নীচে চারজন 'অফিসার' বা (দিশী নাম) 'মালিম', তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনীয়র। তাদের যে 'চীফ্', তার পদ অফিসারের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন 'সুকানি'—যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে, এরাও ইওরোপী। বাকী সমস্ত চাকর-বাকর, খালাসী, কয়লাওয়ালা হচ্ছে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বাইয়ের তরফে দেখেছিলুম, পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর জাহাজে। চাকররা এবং খালাসীরা কলকেতার, কয়লাওয়ালারা পূর্ববঙ্গের, রাঁধুনীরাও পূর্ববঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চান। আর আছে চারজন মেথর। কামরা হতে ময়লা জল সাফ প্রভৃতি মেথররা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পায়খানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান চাকর-খালাসীরা ক্রিশ্চানের রান্না খায় না; তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর তো আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়ে কাজ সারে। জাহাজের রান্নাঘরের তৈয়ারী রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায়, এবং যে সকল কলকেত্তাই চাকর নয়া রোশনাই পেয়েছে, তারা আড়ালে খাওয়া-দাওয়া বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা 'মেস' আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসীদের, একটা কয়লাওয়ালাদের; একজন করে ভাণ্ডারী অর্থাৎ রাঁধুনী আর একটি চাকর কোম্পানী ফি-মেসকে দেয়। ফি-মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কলকেতা থেকে কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয় যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে রেঁধে খেত। চাকরবাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি-ডেকে দ্যালের গায় দুপাশে দুটি 'পম্প'; একটি নোনা, একটি মিঠে জলের, সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, খাওয়া-দাওয়ার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা করে এই সকল জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া তাদের অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওয়া যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্যন্ত জল অন্য কোন জাতের ছোঁবার আবশ্যক নাই; চাল ডাল শাক পাত মাছ দুধ ঘি সমস্তই জাহাজে পাওয়া যায়, বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কাজ করে বলে ডাল চাল মূলো কপি আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা—'পয়সা'। পয়সা থাকলে একলাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা করে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙালী লোকজন প্রায় আজকাল সব জাহাজে—যেগুলি কলকেতা হতে ইওরোপে যায়। এদের ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্ছে; কতকগুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্ছে। কাপ্তেনকে এরা বলে—'বাড়ীওয়ালা', 'অফিসার'—'মালিম', মাস্তুল— 'ডোল', পাল—'সড়', নামাও—'আরিয়া', ওঠাও—'হাবিস' (heave) ইত্যাদি।

খালাসীদের এবং কয়লাওয়ালাদের একজন করে সর্দার আছে, তার নাম 'সারেঙ্গ', তার নীচে দুই তিন জন 'টিণ্ডাল', তারপর খালাসী বা কয়লাওয়ালা।

খানসামাদের (boy) কর্তার নাম 'বট্‌লার' (butler); তার ওপর একজন গোরা 'ষ্টুয়ার্ড'। খালাসীদের জাহাজ ধোওয়া-পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামানো ওঠানো, পাল তোলা, পাল নামানো (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয়) ইত্যাদি কাজ করে। সারেঙ্গ ও টিণ্ডালরা সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, এবং কাজ করছে। কয়লাওয়ালা ইঞ্জিন-ঘরে আগুন ঠিক রাখছে; তাদের কাজ দিনরাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর ইঞ্জিন ধুয়ে পুঁছে সাফ রাখা। সে বিরাট ইঞ্জিন, আর তার শাখা-প্রশাখা সাফ রাখা কি সোজা কাজ? 'সারেঙ্গ' এবং তার 'ভাই' আসিস্টাণ্ট সারেঙ্গ কলকেতার লোক, বাঙলা কয়, অনেকটা ভদ্রলোকের মত; লিখতে পড়তে পারে, স্কুলে পড়েছিল, ইংরেজীও কয়—কাজ চালানো। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর—দরজায় থাকে আর্দালী। এই সকল বাঙালী খালাসী, কয়লাওয়ালা, খানসামা প্রভৃতির কাজ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আসছে, কেমন সবলশরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত! সে নেটিভি পা-চাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই—কি পরিবর্তন!

দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকিখানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ—অনেক গোরার অন্ন যাচ্চে দেখে, খুশী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গামা তোলে। আর তো কিছু বলবার নেই; কাজে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝড়-ঝাপ্টা হলে, জাহাজ বিপদে পড়লে এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাজে দেখা যাচ্চে—ও অপবাদ

মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসী এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায়নি। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনারেল ষ্ট্রঙ্ নামক এক ইংরেজ বন্ধু সিপাহী-হাঙ্গামার সময় এদেশে ছিলেন। তিনি 'গদরে'র গল্প অনেক করতেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন করে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তার মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছনে থেকে 'মারো বাহাদুর'—'লড়ো বাহাদুর' করে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাজেই এই। 'শিরদার তো সরদার'; মাথা দিতে পার তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না!

ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্‌' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্‌। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে; নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ গুরু কি ফতে।'

১৩

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্চে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত। কেউ বলেন, সোঁদরবন পূর্বে গ্রাম-নগরময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও-কথা মানতে চায় না। যা হোক ঐ সোঁদরবনের মধ্যে আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে অনেক কারখানা হয়ে গেছে। এই সকল স্থানেই পোর্তুগীজ বোম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরকানরাজের এই সকল স্থান অধিকারের বহু চেষ্টা মোগল প্রতিনিধির গঞ্জালেজ প্রমুখ পোর্তুগীজ বোম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারংবার ক্রিশ্চান, মোগল, মগ, বাঙালীর যুদ্ধ।

দক্ষিণী সভ্যতা

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকালে, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেলতে দুলতে যাচ্চেন। তবে এই তো আরম্ভ, পরে বা কি আছে! যাচ্চি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশীর ভাগই এখন মান্দ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে পড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগণ্য ক্ষুদ্র মান্দ্রাজ শহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মান্দ্রাসপট্টনম্, চন্দ্রগিরির রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরেজের ব্যবসা জাভায়। বান্তাম শহর ইংরেজদিগের এশিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। মান্দ্রাজ প্রভৃতি ইংরেজী কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান বান্তামের দ্বারা পরিচালিত। সে বান্তাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল! শুধু 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' নয় হে ভায়া; পেছনে মায়ের বল। তবে উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন—এ-কথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়লে খাঁটি দক্ষিণদেশ মনে পড়ে। যদিও কলকেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণদেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামানো মাথা, ঝুটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র, শুঁড়-ওল্টানো চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের আঙুল-কটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলেপুলের সর্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজবুত) উড়ে বামুন দেখে। গুজরাতী বামুন, কালো কুচকুচে দেশস্থ বামুন, ধপধপে ফর্সা বেরালচোখো চৌকা-মাথা কোকনস্থ বামুন, সব ঐ এক প্রকার বেশ, সব দক্ষিণী বলে পরিচিত—অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢঙ মান্দ্রাজীতে। সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল—দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুন মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে, যে তিলকের শাগরেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে, 'তিলক তিলক সব কোই কহে, পর রামানন্দী তিলক দিখত গঙ্গা-পারসে যম গৌদ্বারকে খিড়ক্!' (আমাদের দেশে চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মান্দ্রাজী তিলক দেখে চিতেবাঘ গাছে চড়ে!); আর সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি—যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার যো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারী ল-কার ও ড-কারের কারখানা; আর সেই 'মুড়গ্‌তন্নির রসম্'১৪ সহিত ভাত সাপড়ানো—যার এক এক গরাসে বুক ধড়ফড় করে ওঠে (এমনি ঝাল আর তেঁতুল!); সে 'মিঠে-নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল, ফোড়ন, দধ্যোদন' ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা—এ না হলে কি দক্ষিণ মুলুক হয়?

আবার এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কত দিনের আগে থেকেও হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেলখেকো জাতে—শঙ্করাচার্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নীচে বর্তমান হিন্দুধর্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় এ মধ্বসম্প্রদায়ের শাখামাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রামসনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল করে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না, শিষ্য করতে চায় না, সেদিন পর্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মান্দ্রাজীরাই এখনও বড় বড় তীর্থস্থান দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণদেশেই—যখন উত্তরভারতবাসী 'আল্লা হু আক্‌বর, দীন্ দীন্' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর-দেবতা স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [তখন] রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে
১৫
দাক্ষিণাত্যের সুখ-সাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা, যাঁর আশ্চর্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ—সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়ণের
১৬
এই জন্মভূমি। মান্দ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের 'সুমের' নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস' তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতা-বিস্তার—অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মালাবার উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আর্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীরবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করেছে। এই যে এত বড় বৈষ্ণবধর্ম—এ-ও এই 'তামিল' নীচবংশোদ্ভূত শঠকোপ হতে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী'। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত—সমস্ত মতের যেমন চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্মের অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তেমন আর কোথাও নাই।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছাল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল; আর বাইরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্চে, আর এক বার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠছে, আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সামনে সুপরিচিত মান্দ্রাজের ষ্ট্রাণ্ড রোড। দুজন ইংরেজ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, একজন মান্দ্রাজী জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠল। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে যে, কালা আদমীর কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক না কেন, সে যেরকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা, তবে আমার জন্য মান্দ্রাজীরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে, বোধ হয় পাবে। ক্রমে দু-চারটি করে মান্দ্রাজী বন্ধুরা নৌকায় চড়ে জাহাজের কাছে আসতে লাগল। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার যো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিংহাচার্য, ডাক্তার নঞ্জুণ্ডরাও, কিডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিমকি ইত্যাদির বোঝা আসতে লাগল। ক্রমে ভীড় হতে লাগল—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো—নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতী বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিষ্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয়
১৭

বারকতক আনাগোনা করলে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাকবে—শেষে ধমকাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকায় ভীড় আরও বাড়তে লাগল। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। তখন মান্দ্রাজী বন্ধুদের কাছে বিদায় চাইলাম, কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্' ও মান্দ্রাজী কাজকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করবার অবসর পায় না; কাজেই সে কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে চলল। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লে। তখন একটা রোল উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজারখানেক মান্দ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়-সূচক রব! মান্দ্রাজীরা আনন্দ হলে বঙ্গদেশের মত হুলু দেয়।

মান্দ্রাজ হতে কলম্বো চার দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগল। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুলতে লাগল। যাত্রীরা মাথা ধরে ন্যাকার করে অস্থির। বাঙালীর ছেলে দুটিও ভারি 'সিক্'। একটি তো ঠাউরেছে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল যে কিছু ভয় নেই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড কেলাসটা আবার 'স্ক্রু' ঠিক উপরে। ছেলে-দুটিকে কালা আদমী বলে, একটা অন্ধকূপের মত ঘর ছিল, তারই মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবনদেবেরও যাবার হুকুম নাই, সূর্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলে-দুটির ঘরের মধ্যে যাবার যো নাই; আর ছাতের উপর—সে কি দোল। আবার যখন জাহাজের সামনেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বর বসে যাচ্চে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠছে, তখন স্ক্রুটা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুরছে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক ঢক ঢক ঢক করে নড়ে উঠছে। সেকেণ্ড কেলাসটা ঐ সময় যেমন বেড়ালে ইঁদুর ধরে এক একবার ঝাড়া দেয়, তেমনি করে নড়ছে।

যাই হোক এখন মন্‌সুনের সময়। যত—ভারত মহাসাগরে—জাহাজ পশ্চিমে চলবে, ততই বাড়বে এই ঝড়ঝাপট। মান্দ্রাজীরা অনেক ফলপাকড় দিয়েছিল; তার অধিকাংশ, আর গজা দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখনও কখনও জুতো পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারী চাল। ইওরোপে মেয়েদের পা দেখানো বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক বা না থাক। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার 'ব্রহ্মবাদিন্', মাইসোরী রামানুজী 'রসম্'-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে, 'তেংকলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটলি! একটায় চিঁড়ে ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তবে বেরাদারিলোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বলল তো আর কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচ-শ, কোনটায় সাত-শ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগনীকে বে করে! যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ী দেখতে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়! যাই হোক, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া! মাথা কামানো ঝুটি-বাঁধা, শুধু-পায়, ধুতি-পরা মান্দ্রাজী ফার্ষ্টক্লাসে উঠল; বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, খিদে পেলে মুড়ি-মটর চিবুচ্চে! চাকররা মাদ্রাজীমাত্রকেই ঠাওরায় 'চেট্টি', আর [বলে] 'ওদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পরবে না, আর খাবেও না'! তবে আমাদের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে—চাকররা বলছে। বাস্তবিক কথা—তোমাদের পাল্লায় পড়ে মান্দ্রাজীদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থক্‌থকিয়ে এসেছে!

সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম

আলাসিঙ্গার ‘সী-সিকনেস্’ হল না। তু-ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল করে সামলে বসে আছেন। চারদিন—কাজেই নানা বার্তালাপে ‘ইষ্ট-গোষ্ঠী’তে কাটল। সামনে কলম্বো। এই সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু তো দেখেচি—সেতুপতি মহারাজার বাড়ীতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেচি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলো তো মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই। আর নাই বললে কি হবে?—‘গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখছেন যে।’ তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বল—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনী দেওয়া মেয়েমান্‌ষী চেহারা! আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় ‘হাঁসেন-হোঁসেন’ করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্চে গা? সেদিন পুরীতে কাদের ধরাপাকড়া করতে গিয়ে হুলুস্থূল বাধালে; বলি রাজধানীতে পাকড়া করে প্যাক করবারও যে অনেক রয়েছে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে! সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে, নিজের মত আরও কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে করে ভেসে ভেসে লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে ‘বেদ্দা’ নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির করে রাখলে, মেয়ে বে দিলে। কিছুদিন ভাল মান্‌ষের মত রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি করে হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে বুনো রাজাকে সর্দারগণ সহিত কতল করে ফেললে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা, দুষ্টুমির এইখানেই বড় অন্ত হলেন না। তারপর আর তাঁর বুনোর-মেয়ে রাণী ভাল লাগল না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আরও অনেক মেয়ে আনলেন। অনুরাধা বলে এক মেয়ে তো নিজে করলেন বিয়ে, আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত করতে লাগলেন। বেচারীরা প্রায় সব মারা গেল, কিছু অংশ ঝাড়-জঙ্গলে আজও বাস করছে। এই রকম করে লঙ্কার নাম হল সিংহল, আর হল বাঙালী বদমাশের উপনিবেশ! ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে, তাঁর ছেলে মাহিন্দো আর মেয়ে সংঘমিত্তা সন্ন্যাস নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখলেন যে লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম করে, সেগুলোকে যথাসম্ভব সভ্য করলেন, উত্তম উত্তম নিয়ম করলেন; আর শাক্যমুনির সম্প্রদায়ে আনলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠল। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড শহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্, এখনও সে শহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে আক্কেল হয়রান হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙা বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদর মোড়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠল—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞানমুদ্রা করে প্রচারমূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণ মূর্তি—তার মধ্যে। আর দ্যালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙাচ্চে, কোনটাকে করাতে চিরচে, কোনটাকে পোড়াচ্চে, কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজচে, কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্চে—সে মহা বীভৎস কারখানা! এ ‘অহিংসা পরমো ধর্মে’র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে তো অহিংসা আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক ‘অহিংসা পরমো ধর্মে’র বাড়ীতে ঢুকেচে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, ‘ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।’ বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ‘তবে চোরকে কি করা যায়? ‘কর্তা আদেশ করলেন, ‘ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।’ চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, ‘আহা, কর্তার কি দয়া!’

বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি—এই তো শুনেছিলুম। বৌদ্ধ প্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে রঙ-বেরঙের গাল ঝাড়ে; অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পূজা করে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের মধ্যে নয়—তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতোমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ ‘ভিক্ষু’-গৃহস্থ, মেয়ে-মদ্দ, ঢাক- ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে সে যে বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কি বলব! লেকচার তো ‘অলমিতি’ হল; রক্তারক্তি হয় আর কি! অনেক করে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস—তখন শান্ত হয়।

ক্রমে উত্তর দিক্ থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্বত্য শহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছুদিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দুরাজা খাড়া করলে। তারপর এল ফিরিঙ্গীর দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ। শেষ ইংরেজ রাজা হয়েছেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেনশন আর মুড়গ্‌তন্নির ভাত খাচ্ছেন।

উত্তোর সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ আর রঙ-বেরঙের দোআঁশলা ফিরিঙ্গী। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান—বর্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে বে-থার সময়। খাওয়া-দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নেই; হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্মপ্রচার হচ্ছে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইওরোপী নাম ইন্দ্রম-পিন্দ্রম এখন বদলে নিচ্ছে। হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবী জাঠদের মত সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্যন্ত বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে

ত্রিপুণ্ড্র কেটে 'শিব শিব' বলে হিঁদু হয়! স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বললেই ক্রিশ্চান সদ্য হিঁদু হয়ে যায়। তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদ্রীরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বলে হিঁদু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ আর বীরশৈববাদ এখানকার ধর্ম। হিঁদু-শব্দের জায়গায় 'শৈব' বলতে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্যকীর্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য, এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি তামিল। সিলোনের ধর্ম, খাঁটি তামিল ধর্ম—সে লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্তন, শিবের স্তবগান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ আর বড় বড় কত্তালের ঝাঁজ, আর এই বিভূতি-মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পহলওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মত, তামিলদের মাতোয়ারা নাচ না দেখলে বুঝতে পারবে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙায় নেবে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা হল। স্যর কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু-পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্ প্রমুখ বন্ধু-বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গ্‌তন্নি খাওয়া হল, আর কিং-কোকোনাট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখলাম। কাউন্টেসের বাড়ীটি মিসেস্ হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউন্টেস্ ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস্ হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন। কাউন্টেস্ নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙলার শাড়ীর মত পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ খুব ধরে গেছে দেখলাম। গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখলাম, সব ঐ ঢঙের শাড়ী পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনীরা বলে, ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান করছেন! সিলোনীরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মত নয়—খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এ স্থান হতেই ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে ধর্ম গেছে। সিলোনী বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করে; নেপালী, সিকিম, ভুটানী, লাদাকী, চীনে, জাপানীদের মত শিবের পূজা করে না; আর 'হ্রীং তারা' ওসব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। বৌদ্ধেরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু-আম্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে 'মহাযান'; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে 'হীনযান'। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নামমাত্র করে; আসল পূজা তারাদেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানী, চীনে ও কোরিয়ানরা বলে ক্বানয়ন্); আর 'হ্রীং ক্লীং' তন্ত্র-মন্ত্রের বড় ধুম। টিবেটীগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ-মাংসের যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ ভূত প্রেত তাড়াচ্ছে। চীন আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে 'ওঁ হ্রীং ক্লীং'—সব বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাঙলার এত কাছাকাছি যে, বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মান্দ্রাজে ফিরে গেল। আমরাও কুমারস্বামীর (কার্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমারস্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্তিকের ভারী পূজা, ভারী মান; কার্তিক ওঁ-কারের অবতার বলে।) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দু বোতল সরবৎ ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।

মনসুনঃ এডেন

আটাশে জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়ল। এবার ভরা মনসুনের মধ্য দিয়ে গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড় ততই বাড়ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ করছে—উভশ্রান্ত বৃষ্টি, অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জে গর্জে জাহাজের উপর এসে পড়ছে; ডেকের ওপর তিষ্ঠুনো দায়। খাবার টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে চৌকো চৌকো খুবরি করে দিয়েছে, তার নাম 'ফিডল'। তার উপর দিয়ে খাবার দাবার লাফিয়ে উঠছে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে উঠছে, যেন বা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বলছেন, 'তাইতো এবারকার মনসুনটা তো ভারি বিটকেল!' কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক, আষাঢ়ে গল্প করতে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প—চীনে কুলি জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে কেমন করে জাহাজ শুদ্ধ লুটে নিয়ে পালাত—এই রকম বহুৎ গল্প করছেন। আর কি করা যায়; লেখা পড়া এ দুলুনির চোটে মুশকিল। কেবিনের ভেতর বসা দায়; জানালাটা এঁটে দিয়েছে—ঢেউয়ের ভয়ে। এক দিন তু-ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুকরো এসে জলপ্লাবন করে গেল! উপরে সে ওছল-পাছলের ধুম কি! তারি ভেতরে তোমার 'উদ্বোধনে'র কাজ অল্প স্বল্প চলছে মনে রেখো। জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটি আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; ছেলে-মেয়েতে ছটি সন্তান; চাকররা বলে, খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়। একখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলেপিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার যো নেই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকা চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রিনী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘণ্টা বসে থাকে। তোমার ইওরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি—বলে কি অসভ্য! আর জড়ামড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও! যাহোক প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মে উত্তর ইওরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি !

জাহাজের টাল-মাটালে অনেকেরই মাথা ধরে উঠেছে। টুটল্ বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্ছে; তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে। টুটল্ বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েছে। বাপ প্লাণ্টার। টুটল্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম 'টুটল্! কেমন আছ?' টুটল্ বললে, 'এ বাঙলাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।' টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙলা। বোগেশের একটি এঁড়ে লাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে করে সুরুয়া খাইয়ে যায়, আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, 'কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!'

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত, তার কি? তা হলে কি আর আমরা এডেন পৌঁছুতুম। ভাগ্যিস সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন করে দিনরাত বিষম ঝড়-বাদলের মধ্য দিয়েও শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায় ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ; সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়ল। কাপ্তেন বললেন, 'এইখানটা মনসুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পারলেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র।' তাই হল। এ দুঃস্বপ্নও কাটল।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নামতে দেবে না, কালা-গোরা মানে না। কোন জিনিষ ওঠাতে দেবে না, দেখবার জিনিষও বড় নেই। কেবল ধুধু বালি, রাজপুতানার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পল্টনের ব্যারাক। সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরেজী যুদ্ধজাহাজ, একখানি জার্মান এল; বাকীগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেল বারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশী পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায় বড় বড় গহ্বর তৈয়ারী করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প করে আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্ছে; তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেরই একটি শহর যেন—দিশী ফৌজ, দিশী লোক অনেক। পারসী দোকানদার, সিন্ধি ব্যাপারী অনেক। এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান—রোমান বাদশা কনষ্টান্সিউস (Constantius) এখানে এক দল পাদ্রী পাঠিয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচার করান। পরে আরবেরা সে ক্রিশ্চানদের মেরে ফেলে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চান হাবসি দেশের বাদশাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাবসি-রাজ ফৌজ পাঠিয়ে এডেনের আরবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরানের সামানিডি বাদশাদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের পর এডেন আরবদের হাতে যায়। কতক কাল পরে পোর্তুগীজ সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরস্কের সুলতান ঐ স্থানকে—পোর্তুগীজদের ভারত মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্য—দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

আবার উহা নিকটবর্তী আরব-মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংরেজরা ক্রয় করে বর্তমান এডেন করেছেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্চে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্ছে, তাতে সকলেই দু-কথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য রক্ষা করতে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চলবে না বলে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান করতে চায়। ভাল ভালগুলি ইংরেজ তো নিয়ে বসেছেন; তারপর ফ্রান্স, তারপর যে যেথায় পায়—কেড়ে, কিনে, খোশামোদ করে—এক একটা জায়গা করেছে এবং করছে। সুয়েজ খাল হচ্ছে এখন ইওরোপ-এশিয়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফরাসীদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেড-

সীর ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উল্টো উৎপাত হয়ে বসে। সাত-শ বৎসরের পর-পদদলিত ইতালী কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হল, হয়েই ভাবলে—কি হলুম রে! এখন দিগ্বিজয় করতে হবে। ইওরোপের এক টুকরোও কারও নেবার যো নাই; সকলে মিলে তাকে মারবে! এশিয়ার বড় বড় বাঘা-ভাল্‌কো—ইংরেজ, রুশ, ফ্রেঞ্চ, ডচ—এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন বাকী আছে দু-চার টুকরো আফ্রিকার। ইতালী সেই দিকে চলল। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড-সীর ধারে একটি জমি দান করলে। মতলব—সেই কেন্দ্র হতে ইতালী হাবসি-রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালীও সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাবসি বাদশা মেনেলিক্ এমনি গো-বেড়েন দিলে যে, এখন ইতালীর আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণবাঁচানো দায় হয়েছে। আবার রুশের ক্রিশ্চান এবং হাবসির ক্রিশ্চানি নাকি এক রকমের—তাই রুশের বাদশা ভেতরে ভেতরে হাবসিদের সহায়।

রেড-সী

জাহাজ তো রেড-সীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাদ্রী বললেন, ‘এই—এই রেড-সী, য়াহুদী নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি বাদশা ‘ফেরো’ যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা কাদায় রথচক্রে ডুবে—কর্ণের মত আটকে—জলে ডুবে মারা গেল’। পাদ্রী আরও বললেন যে, এ-কথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান—যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্মের আজগুবীগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার এক ঢেউ উঠেছে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সবগুলি হয়ে থাকে তো আর তোমার য়াভে-দেবতা মাঝখান থেকে আসেন কেন? বড়ই মুশকিল! যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয় তো ও-কেরামতগুলি আজগুবী এবং তোমার ধর্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলেও তোমার দেবতার মহিমাটি বাড়ার ভাগ, ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা-আপনি হয়েছে। পাদ্রী বোগেশ বললে, ‘আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি।’ এ-কথা মন্দ নয়—এ সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে—পরের বেলা দোষটি দেখাতে, যুক্তিটি আনতে কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে, ‘আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়’—তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি! ওঁদের আবার মন! ছটাকও নয়, আবার মণ! পরের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূত-কিমাকার কল্পনা করে কেঁদেই অস্থির!!

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এই রেড-সীর কিনারা—প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র। ঐ—ওপারে আরবের মরুভূমি; এপারে—মিশর। এই—সেই প্রাচীন মিশর; এই মিসরীরা পন্‌ট্ দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে রেড-সী পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করে উত্তরে পৌঁছেছিল। এদের আশ্চর্য শক্তিবিস্তার, রাজ্যবিস্তার, সভ্যতাবিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদশাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য সমাধিমন্দির, নারীসিংহী মূর্তি। এদের মৃতদেহগুলি পর্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাবরি-কাটা চুল, কাছাহীন ধপ্‌ধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরী লোক সব, এই দেশে বাস করত। এই—হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরানী বাদশাহী, সিকন্দর, টলেমী বংশ এবং রোমক ও আরব বীরদের রঙ্গভূমি—মিশর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে তন্ন তন্ন করে লিখে গেছে।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরীদের মতে—মানুষ মলে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃত দেহের কোন অনিষ্ট হলেই সূক্ষ্ম শরীরে আঘাত লাগে, আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ, তাই শরীর রাখবার এত যত্ন। তাই রাজা-বাদশাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল!! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে রাস্তার রহস্য ভেদ করে রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজ-শরীর চুরি করেছে। আজ নয়, প্রাচীন মিসরীরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ সাত-শ বৎসর আগে এই সকল শুকনো মরা—য়াহুদী ও আরব ডাক্তারেরা মহৌষধি-জ্ঞানে ইওরোপ-সুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হাকিমির আসল ‘মামিয়া’!!

এই মিসরে টলেমী বাদশার সময়ে সম্রাট্ ধর্মাশোক ধর্মপ্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম প্রচার করত, রোগ ভাল করত, নিরামিষ খেত, বিবাহ করত না, সন্ন্যাসী শিষ্য করত। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলে—থেরাপিউট, অসসিনী, মানিকী ইত্যাদি—যা হতে বর্তমান ক্রিশ্চানী ধর্মের সমুদ্ভব। এই মিসরই টলেমীদের রাজত্বকালে সর্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল। এই মিসরেই সে আলেকজান্দ্রিয়া নগর, যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তাকাগার, বিদ্বজ্জন জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। সে আলেকজান্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল—পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল—বিদ্যার সর্বনাশ হল! শেষ বিদুষী নারীকে
১৮
ক্রিশ্চানেরা নিহত করে, তাঁর নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার বীভৎস অপমান করে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুকরা টুকরা মাংস আলাদা করে ফেলেছিল!

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরবের মরুভূমি। কখনও আলখাল্লা-ঝোলানো—পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা—বদ্দু আরব দেখেছ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গী, সে চাউনি, আর কোন দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্ছে—সেই আরব। যখন ক্রিশ্চানদের গোঁড়ামি আর গথদের বর্বরতা প্রাচীন ইউনান
১৯

ও রোমান সভ্যতালোককে নির্বাণ করে দিলে, যখন ইরান অ
দিয়ে মোড়বার চেষ্টা করছিল, যখন ভারতে—পাটলিপুত্র ও উ
মূর্খ ক্রূর রাজগর্ব, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আ
পশুপ্রায় আরবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল

ঐ ষ্টীমার মক্কা হতে আসছে—যাত্রী ভরা; ঐ দেখ—ইওরোপী পোষাকপরা তুর্ক, আধা ইওরোপীবেশে মিসরী, ঐ সূরিয়াবাসী মুসলমান ইরানীবেশে, আর ঐ আসল আরব ধুতিপরা—কাছা নেই। মহম্মদের পূর্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হত; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মুসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর আরবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফ্রি, সিদি, হাবসি রক্ত প্রবেশ করে চেহারা উদ্যম—সব বদলে গেছে, মরুভূমির আরব পুনর্মূষিক হয়েছেন। যারা উত্তরে, তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে—চুপচাপ করে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরবকে ভালবাসে, ‘আরবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়’—তারা বলে। আর খাঁটি তুর্করা ক্রিশ্চানদের উপর বড়ই অত্যাচার করে।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও সে গরম দুর্বল করে না। তাতে কাপড়ে গা-মাথা ঢেকে রাখলেই আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি—দুর্বল তো করেই না, বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতানার, আরবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়াড়ের এক এক জেলায় মানুষ, গরু, ঘোড়া—সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরবী মানুষ ও সিদিদের দেখলে আনন্দ হয়। যেখানে জোলো গরমি, যেমন বাঙলা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্বল।

রেড-সীর নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়—ভয়ানক গরম, তায় এই গরমি কাল। ডেকে বসে যে যেমন পারছে, একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্ছে। কাপ্তেন সকলের চেয়ে উঁচিয়ে বলছেন। তিনি বললেন, 'দিন কতক আগে একখানা চীনি যুদ্ধজাহাজ এই রেড-সী দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাপ্তেন ও আট জন কয়লাওয়ালা খালাসী গরমে মরে গেছে।'

বাস্তবিক কয়লাওয়ালা—একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেড-সীর নিদারুণ গরম। কখনও কখনও খেপে ওপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও বা গরমে নীচেই মারা যায়।

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার তো যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগল—সে ভূমধ্যসাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া।

সুয়েজ খালঃ হাঙ্গর শিকার

১৪ই জুলাই রেড-সী পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সামনে—সুয়েজ খাল। জাহাজে—সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেছেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ সম্ভবতঃ—কাজেই দোতরফা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাঁতের ন্যাটার কাছে আমাদের দিশী ছুঁৎছাঁত কোথায় লাগে! মাল নাববে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসী বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে ক্রেনে করে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নীচে সুয়েজী নৌকায় ফেলছে—তারা নিয়ে ডাঙায় যাচ্চে। কোম্পানীর এজেন্ট ছোট লঞ্চে করে জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্ছে। এ তো ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমী প্লেগ আইন-ফাইন সকলের পার—এখানে ইওরোপের আরম্ভ। স্বর্গে ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ-বিষ—প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে—ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিসরী আদমীকে ছুঁলেই আবার দশ দিন আটক—তাহলে নেপল্‌সেও লোক নাবানো হবে না, মার্সাইতেও নয়; কাজেই যা কিছু কাজ হচ্ছে, সব আলগোছে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, বস্—দশ দিন কারাঁটীন্ (quarantine)। কাজেই রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে পড়ে থাকো—সুয়েজ বন্দরে।

এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়—জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। এই বন্দরে আর অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর—মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিশ মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়, ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওর বিষয় পড়া গেছল বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানী হন হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ওর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাঁচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধঘণ্টা-টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি তো দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময়ে একজন বললে—ঐ ঐ! দশ বার জনে বলে উঠল—ঐ আসছে, ঐ আসছে!! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে—আর আগে আগে দু-একটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্ছে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসছে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্ছে, তাদের নাম 'আড়কাটী মাছ—পাইলট ফিস্।' তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশী সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙ্গর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চেপ্টা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরেজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি-কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি-কাটাকাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপসে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে পিঠে চড়ে চলছে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুইপ্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায়-পারিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপসে উঠতে লাগল; ঐ রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেণ্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির যোগাড় করলে, সে 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর ফাতনা-সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে একখান পুলিশের নৌকা—আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল, পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে—কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে তো দূরে ফেললেন; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য

'সর্চাকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়্ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগল—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এল'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ' হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মসকের আকার কি একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে, 'ঐ হাঙ্গর, ঐ হাঙ্গর' রব। 'চুপ্ চুপ্—ছেলের দল! হাঙ্গর পালাবে।' 'বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়কে যাবে'—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শিসংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্যে, পালভরে নৌকার মত সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেলল—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকল, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়াল। আবার সোঁ করে আসছে—ঐ হাঁ করে বঁড়শি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়ল; হয়েছে, টোপ খেয়েছে—টান্ টান্ টান্, ৪০।৫০ জনে টান, প্রাণপণে টান। কি জোর মাছের! কি ঝটাপট—কি হাঁ। টান্ টান্। জল থেকে এই উঠল, ঐ যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্ছে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল। তাই তো হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনি কি টানতে হয়? আর—'গতস্য শোচনা নাস্তি'; হাঙ্গর তো বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটী মাছকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি, মোদ্দা—হাঙ্গর তো চোঁচা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা'—বাঘের মত কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক 'বাঘা' বঁড়শি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-'আড়কাটী'- 'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই—ঐ যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাব্ড়ামুখো' চলে আসছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই। নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড়-গোড়, ইঁট-পাথর, কাঠ-টুকরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে'—বলে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ-মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন-না-কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়?—অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাব্ড়াকে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্কে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' বলে সরে গেল।—'আমি একাই ঠকব?'

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা ... '—শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস্', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্ড়া'; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটেছে, তা 'থ্যাব্ড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়! আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে!

এবার সব চুপ—নোড়ো চোড়ো না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কর না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ, বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ চুপ—এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাব্ড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাব্ড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্টো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ্ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিস-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে—নাড়ি-ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ্! বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর পড়ল! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। —'বটে তো'। রক্ত-মাখা গায়-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্ দুম্ দিতে লাগল হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা 'আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগল, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো এক রাশ বেরুল—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফার্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে ইওরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য

সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমী পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রী প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড-সী হয়ে। সিকন্দর শা ইরান-বিজয়ের পর নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানী বোগদাদ ও ইতালীর ভিনিস্ ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস (Christophoro Columbo) আটলাণ্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যেই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও 'ইণ্ডিয়ান' নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধুনদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা তাকে 'হিন্দু', গ্রীকরা 'ইণ্ডুস' করে তুললে; তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানী ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—'নেটিভ'।

এদিকে পোর্তুগীজরা ভারতের নূতন পথ—আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ-কথা ইওরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত—নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব? ভেবে দেখ—কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।

হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমরা নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ-কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্চে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! —তোমাদের প্রণাম করি।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিষ। প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদশাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয়সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু মিসর বিজয় করে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলে এক প্রকার নূতন করে তোলেন।

তারপর বড় কেউ কিছু করেননি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসর-খেদিব ইস্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে অধিকাংশ ফরাসী অর্থে এই খাত খনন করান। এ খালের মুশকিল হচ্ছে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃপুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন একখানি জাহাজ যাচ্চে আর একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে—এই জন্যে সমস্ত খালটি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমন ভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই-তিনখানি জাহাজ একত্র থাকতে পারে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল ষ্টেশনের মত ষ্টেশন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসছে, কখানি যাচ্চে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা কে কোথায়—তা খবর যাচ্চে এবং একটি বড় নকশার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এজন্য এক ষ্টেশনের হুকুম না পেলে আর এক ষ্টেশন পর্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরেজদের, তথাপি সমস্ত কার্য ফরাসীরা করে—এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।

ভূমধ্যসাগর

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এশিয়া, আফ্রিকা—প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হল—ইওরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহুশতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে। যে ধর্ম, যে বিদ্যা, যে সভ্যতা, যে মহাবীর্য আজ ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে—ভাস্কর্যবিদ্যার আকর, বহুধনধান্যপ্রসূ অতি প্রাচীন মিশর; পূর্বে ফিনিসিয়ান, ফিলিষ্টিন, য়াহুদী, মহাবল বাবিল, আসির ও ইরানী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি—এশিয়া মাইনর; উত্তরে—সর্বাশ্চর্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

স্বামীজী! দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা তো অনেক শুনলে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়—সত্য; মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যা কিছু লোকে জানত, তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল-নামক য়াহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুরানো পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শত মুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশ-দেশান্তরের মহা মহা মণ্ডিত দিনরাত এক টুকরো শিলালেখ বা ভাঙা বাসন বা একটা বাড়ী বা একখান টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন, আর সেকালের লুপ্ত বার্তা বার করছেন।

যখন মুসলমান নেতা ওসমান কনষ্টাণ্টিনোপল দখল করলে, সমস্ত পূর্ব ইওরোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্বে উড়তে লাগল, তখন প্রাচীন গ্রীকদের যে সকল পুস্তক, বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্বীর্য বংশধরদের কাছে লুকানো ছিল, তা পশ্চিম-ইওরোপে পলায়মান গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীকেরা রোমের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যা-বুদ্ধিতে রোমকদের গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীকরা ক্রিশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক ভাষায় ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে ক্রিশ্চান ধর্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইওরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান ক্রিশ্চানদের অনেক পূর্বে। ক্রিশ্চান হয়ে পর্যন্ত তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্বপুরুষদের বিদ্যা-বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেমনি ক্রিশ্চান গ্রীকদের কাছে ছিল; সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাতেই ইংরেজ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীকভাষা, গ্রীকবিদ্যা, শেখবার একটা ধুম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়সুদ্ধ গেলা হল। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জিত হয়ে আসতে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থ-বিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগল, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চলতে লাগল। ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অ-ক্রিশ্চান গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ করতে তো আর কোন বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়ল।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখেছে যে অমুক সময় অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া করে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বললেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখত। আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল; এই সকল কারণে গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগল।

প্রথম উপায়—মনে কর, একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বৈকি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ী পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তা হলে আর কোন গোলই রইল না।

দ্বিতীয় উপায়—মনে কর, আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে একটা ঘটনা সিকন্দর বাদশার সময়ের, কিন্তু তার মধ্যে দু-একজন রোমক বাদশার উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়—তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদশার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হল।

তৃতীয় উপায় ভাষা—সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্তন হচ্ছে, আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানা প্রকারে সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ প্রয়োগ করে গ্রন্থতত্ত্ব-নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্থ উপায়—তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক্ হতে রশ্মি বিকিরণ করতে লাগল; ফল—যে পুস্তকে কোন অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ল।

সকলের উপর—মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইওরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস নদীতটে ও মিসরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুনঃপঠন; আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান। পূর্বে বলেছি যে, এ নূতন গবেষণা-বিদ্যা 'বাইবেল' বা 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মারধোর, জ্যান্ত পোড়ানো তো আর নেই, কেবল সমাজের ভয়; তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুকরো টুকরো করেন, কালে সেই প্রকার সৎ-

সাহসের সহিত য়াহুদী ও ক্রিশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই—মাসপেরো (Maspero) বলে এক মহাপণ্ডিত, মিসর প্রত্নতত্ত্বের অতিপ্রতিষ্ঠ লেখক, 'ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল'
২০
বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদের ইংরেজীতে তর্জমা পড়ি। এবার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের (British Museum) এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাসপেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জমা আছে শুনে তিনি বললেন যে ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া ক্রিশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাসপেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়তে বললেন। পড়ে দেখি তাইতো—এ যে বিষম সমস্যা। ধর্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিষ জান তো?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ও-সব গবেষণাগ্রন্থের তর্জমার ওপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্যা (ethnology), অর্থাৎ মানুষের রঙ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে শ্রেণীবদ্ধ করা।

জার্মানরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু; বর্নফ (Burnouf) প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল—মাসপেরো-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ফরাসী। ওলন্দাজেরা য়াহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের বিশ্লেষণে বিশেষপ্রতিষ্ঠ—কুনা (Kuenen) প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ। ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ করে দিয়ে তারপর সরে পড়ে।

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কর, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলী, মিসরী প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতামাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ-কথা এখন লোকে বড় মানতে চায় না।

কালো কুচকুচে, নাকহীন, ঠোঁটপুরু, গড়ানে কপাল, আর কোঁকড়াচুল কাফ্রি দেখেছ? প্রায় ঐ ঢঙের গড়ন, তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাঁওতালী আণ্ডামানী ভিল দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro)। এদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; এরা প্রাচীন কালে আরবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে, ভারতবর্ষময়, আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বাস করত। আধুনিক সময়ে কোন কোন ঝোড়-জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এরা বর্তমান।

লেপচা, ভুটিয়া, চীনি, প্রভৃতি দেখেছ?—সাদা রঙ বা হলদে, সোজা কালো চুল? কালো চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসানো, দাঁড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোখের নীচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

নেপালী, বর্মী, সায়ামী, মালাই, জাপানী দেখেছ? এরা ঐ গড়ন, তবে আকারে ছোট।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল (Mongols) আর মোগলইড্ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ এশিয়াখণ্ড দখল করে বসেছে। এরাই মোগল, কাল্‌মুখ (Kalmucks), হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু, কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে এক চীন ও তিব্বতী সওয়ায়
২১
তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ, কাল ওদেশ করে ভেড়া ছাগল গরু ঘোড়া চরিয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে দুনিয়া ওলট-পালট করে দেয়। এদেশের আর একটি নাম তুরানী। ইরান তুরান—সেই তুরান!

রঙ কালো, কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোখ—প্রাচীন মিশর, প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস করত এবং অধুনা ভারতময়—বিশেষ দক্ষিণদেশে বাস করে; ইওরোপেও এক-আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়—এ এক জাতি। এদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ী।

সাদা রঙ, সোজা চোখ, কিন্তু কান নাক—রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ানে, ঠোঁট পুরু—যেমন উত্তর আরবের লোক, বর্তমান য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলী, আসিরী, ফিনিক প্রভৃতি; এদের ভাষাও এক প্রকারের; এদের নাম সেমিটিক। আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল, এদের নাম আরিয়ান।

বর্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ওদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির ন্যায়। উষ্ণদেশ হলেই যে রঙ কালো হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, এ-কথা এখনকার অনেকেই মানেন না। কালো এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সেগুলি অনেকের মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ী-ঘর-দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে—খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্বের বাড়ী-ঘর এখনও পাওয়া যায় নাই।
২২
তবে তার বহু পূর্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোন দেশে পা

প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের 'বেদ' অন্তত খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজ

ইওরোপী সভ্যতা

এই ভূমধ্যসাগর-প্রান্ত—যে ইওরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী, তার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিশরী, বাবিলী, ফিনিক, য়াহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরানী, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্যজাতির সংমিশ্রণে বর্তমান ইওরোপী সভ্যতা।

'রোজেট্টা স্টোন'
২৩
নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিসরে পাওয়া যায়। তার উপর জীবজন্তুর লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে
২৪
লিখিত এক লেখ আছে, তার নীচে আর এক প্রকার লেখ, সকলের নিম্নে গ্রীক ভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখ-কে এক অনুমান করেন। কপ্ত (Copts) নামক যে ক্রিশ্চান জাতি এখনও মিসরে বর্তমান এবং যারা প্রাচীন মিসরীদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে তিনি এই প্রাচীন মিসরী লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলদের ইঁট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজা অশোকের সমসাময়িক লিপি বলে আবিষ্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানা প্রকার মন্দির, স্তম্ভ, শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে প্রাচীন মিসরতত্ত্ব বিশদ করে ফেলেছে।

মিসরীরা সমুদ্রপার 'পুন্‌ট্' (Punt) নামক দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ 'পুন্‌ট্'-ই বর্তমান মালাবার, এবং মিসরীরা ও দ্রাবিড়িরা এক জাতি। এদের প্রথম রাজার নাম 'মেনুস'(Menes)। এদের প্রাচীন ধর্মও কোন কোন অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। 'শিবু' (Shibu) দেবতা 'নুই'-কে (Nui) দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, পরে আর এক দেবতা 'শু' (Shu) এসে বলপূর্বক 'নুই'-কে তুলে ফেললেন। 'নুই'র শরীর আকাশ হল, দুহাত আর দুপা হল সেই আকাশের চার স্তম্ভ। আর 'শিবু' হলেন পৃথিবী। 'নুই'র পুত্র-কন্যা 'অসিরিস' আর 'ইসিস'—মিসরের প্রধান দেব-দেবী এবং তাঁদের পুত্র 'হোরস্' সর্বোপাস্য। এই তিনজন একসঙ্গে উপাসিত হতেন। 'ইসিস' আবার গো-মাতা রূপে পূজিত।

পৃথিবীতে 'নীল' নদের ন্যায়, আকাশে ঐ প্রকার নীলনদ আছেন—পৃথিবীর নীলনদ তাঁহার অংশ মাত্র। সূর্যদেব এদের মতে নৌকায় করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন; মধ্যে মধ্যে 'অহি' নামক সর্প তাঁকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড করে ফেলে, পরে পনর দিন তাঁর সরাতে লাগে। মিসরের দেবতাসকল কেউ শৃগালমুখ, কেউ বাজের মুখযুক্ত, কেউ গোমুখ ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিস-তীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'বাল', 'মোলখ', 'ইস্তারত' ও 'দমুজি'
২৫
প্রধান। ইস্তারত দমুজি-নামক মেষপালকের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেললে। পৃথিবীর নীচে পরলোকে ইস্তারত দমুজির অন্বেষণে গেলেন। সেথায় 'আলাৎ' নামক ভয়ঙ্করী দেবী তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে ইস্তারত বললেন যে, আমি দমুজিকে না পেলে মর্ত্যলোকে আর যাব না। মহা মুশকিল; উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ, জন্তু, গাছপালা আর কিছুই জন্মাবে না। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রতি বৎসর দমুজি চার মাস থাকবেন পরলোকে—পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্যলোকে। তখন ইস্তারত ফিরে এলেন—বসন্তের আগমন হল, শস্যাদি জন্মাল।

এই 'দমুজি' আবার 'আদুনোই' বা 'আদুনিস'
২৬
নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম কিঞ্চিৎ অবান্তরভেদে প্রায় এক রকমই ছিল। বাবিলী, য়াহুদী, ফিনিক ও পরবর্তী আরবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম 'মোলখ' (যে শব্দটি বাঙলা ভাষতে মালিক, মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে) অথবা 'বাল', তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারও কারও মত—এ 'আলাৎ' দেবতা পরে আরবিদিগের আল্লা হলেন। এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। মোলখ বা বালের নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ানো হত। ইস্তরতের মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে 'বাইবেল' নামক ধর্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ হতে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্যন্ত লিখিত হয়। বাইবেলের অনেক অংশ যা পূর্বের বলে প্রথিত, তা অনেক পরের। এই বাইবেলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি 'বাবিল' জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেক স্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদশারা যখন এশিয়া মাইনরের উপর রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক 'পারসী' মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব—আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের।

য়াহুদীদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ 'য়াভে' নামক 'মোলখের'
২৭
পূজা। এই নামটি কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়, কারও কারও মতে ঐটি মিসরী শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এল, কেউ জানে না। বাইবেলে বর্ণনা আছে যে, য়াহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেকদিন ছিল—সে সব এখন কেউ বড় মানে না এবং 'ইব্রাহিম',

‘ইসহাক’, ‘ইয়ুসুফ’ প্রভৃতি গোত্রপিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

য়াহুদীরা ‘য়াভে’ এ নাম উচ্চারণ করত না, তার স্থানে ‘আদুনোই’ বলত। যখন য়াহুদীরা ইস্রেল আর ইফ্রেম
২৮
দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটি প্রধান মন্দির নির্মিত হল। জেরুসালেমে ইস্রেলদের যে মন্দির নির্মিত হল, তাতে ‘য়াভে’ দেবতার একটি নরনারী সংযোগমূর্তি এক সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটি বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে ‘য়াভে’ দেবতা—সোনামোড়া বৃষের মূর্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস করত; তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি করে যা উপার্যন করত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগত।

ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হল; তাঁরা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এঁদের নাম নবী বা Prophet (ভাববাদী)। এদের মধ্যে অনেকে ইরানীদের সংসর্গে মূর্তিপূজা, পুত্রবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়লেন। ক্রমে বলির জায়গায় হল ‘সুন্নত’; বেশ্যাবৃত্তি, মূর্তি আদি ক্রমে উঠে গেল; ক্রমে ঐ নবী-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে ক্রিশ্চান ধর্মের সৃষ্টি হল।

‘ঈশা’ নামক কোন পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা, এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা। ‘নিউ টেষ্টামেণ্টের’ যে চার পুস্তক, তার মধ্যে ‘সেণ্ট-জন’ নামক পুস্তক তো একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকী তিনখানি—কোন এক প্রাচীন পুস্তক দেখ লেখা, এই সিদ্ধান্ত; তাও ‘ঈশা’- হজরতের যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে।

তার উপর যে সময় ঈশা জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুইজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন—‘জোসিফুস্’ আর ‘ফিলো’
২৯
। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের নামও নাই; অথবা রোমান জজ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এর কোন কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

রোমকরা ঐ সময়ে য়াহুদীদের উপর রাজত্ব করত, গ্রীকরা সকল বিদ্যা শেখাত। এঁরা সকলেই য়াহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের কোন কথাই নাই।

আবার মুশকিল যে, যে সকল কথা, উপদেশ বা মত নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও-সমস্তই নানা দিগ্‌দেশ হতে এসে খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই য়াহুদীদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং ‘হিলেল্’
৩০
প্রভৃতি রাব্বিগণ (উপদেশক) প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিতরা তো এইসব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে—যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম ‘হায়ার ক্রিটিসিজম্’ (Higher Criticism)।

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এই প্রকার দেশ-দেশান্তরের ধর্ম, নীতি, জাতি ইত্যাদির আলোচনা করছেন। আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি করে?—এক বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড়ভাঙা পরিশ্রম করে যদি এই রকম একখানা বই তর্জমা করে তো সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বললেই হয়। এমন দিন কি হবে যে, আমরা নানাপ্রকার বিদ্যার চর্চা করব? ‘মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, যৎ কৃপা ... !’—মা জগদম্বাই জানেন।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগল—আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী রোম! এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী—যার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ-সংস্থাপন, পরদেশ-বিজয় এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ!

নেপল্‌স ত্যাগ করে জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইওরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে—তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতিনীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি বলব! তবে ইওরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এসব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল। শরীর কাউকে ছাড়ে না ভায়া, অতএব বারান্তরে সেসব কথা বলতে চেষ্টা করব। অথবা বলে কি হবে? বকাবকি বলা-কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙালীর) মত কে বা মজবুত? যদি পার তো করে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগল, তখন থেকেই ইওরোপ উঠতে লাগল। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক

পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।

ইওরোপে

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন? — পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল; সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাকলা, তার চক্কর ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হোক—যখন কিংবদন্তী রয়েছে তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্করময়। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে করলুম যে, পারি-তে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে; পুরানো বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম—(তিনি জানেন না ইংরেজী, আমার ফরাসী—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!) বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়—(কাজে কাজেই) ফরাসী বলবার উদ্যোগ হবে, আর গড়গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে। [তা নয়] কোথায় চললুম ভিয়েনা, তুর্কী, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালেম পর্যটন করতে! ভবিতব্য কে ঘোচায় বল। তোমায় পত্র লিখছি মুসলমান-প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল হতে।

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউড, ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয় জুল বোওয়া
৩১
—ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কালভে
৩২
। ফরাসী ভাষায় 'মিষ্টর' হচ্ছেন 'মস্যিয়', আর 'মিস্' হচ্ছেন 'মাদ্‌মোয়াজেল'—'জ'টা পূর্ববাঙলার 'জ'। মাদ্‌মোয়াজেল কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হতে।

পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড৩৩, আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কালভে—দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরেজী ভাষার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় [করে] আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা—পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন—সকলেই জানে, কাজেই এদের ইংরেজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নাই।

মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা বালক, যা বল তাই—হুবহু, আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে! বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর, আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে' (tre's ancien tre's civilise')—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি'। বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মঁ র্‌যাভ (C'est mon rave) সে মঁ র্‌যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্
৩৪
তাঁকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দুলাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—'লা দিভিন সারা!!' (La divine Sarah)—দৈবী সারা, তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই!—সে ধুম বিলাস, ইওরোপের অনেক রাজারাজড়া পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদ্‌মোয়াজেল কালভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন—রাজা-বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকাসকল আছেন; জাঁ দ্য রেজকি, প্লাঁস
৩৫
প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কসকল আছেন; এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন! কিন্তু কালভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ—এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট—যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে। আবার এ দেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙালীর মেয়ের বিদ্যা শেখবার সমধিক ইচ্ছা থাকলেও উপায়াভাবে বিফল; বাঙলা ভাষায় আছে কি শেখবার? বড় জোর পচা নভেল-নাটক!! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দু-চার জনের জন্য মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্চে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ করে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করছে।

মস্যিয় জুল বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্মসকলের, কুসংস্কারসকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব-আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইওরোপে যে সকল শয়তানপূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটেফোঁটা মন্ত্রতন্ত্র ছিল এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ করে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গ্যেটে, শিলার প্রভৃতি জার্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্তভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইওরোপে—কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায়—যেমন হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি; কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না করে যায় কোথা—এ তার, রেলওয়ে, খবরকাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমান, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও অতি যত্ন করে আমায় নিজের বাসায় প্যারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি—পেয়র হিয়াসান্থ
৩৬
এবং তাঁর সহধর্মিণী। পেয়র (অর্থাৎ পিতা) হিয়াসান্থ ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক কঠোর তপস্বি-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতাগুণে এবং তপস্যার প্রভাবে ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এঁর অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা করতেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে তাকে করে ফেললেন বে—মহা হুলস্থূল পড়ে গেল; অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলে। শুধু পা, আলখাল্লা-পরা তপস্বি-বেশ ফেলে পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট কোট বুট পরে হলেন—মস্যিয় লয়জন্।
৩৭
আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্বের নামেই ডাকি। সে অনেক দিনের কথা, ইওরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম! প্রোটেষ্টাণ্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগল। পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে বললেন, ‘তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাক (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না), কিন্তু রোমান চার্চ ত্যাগ কর না।’ কিন্তু লয়জন্-গেহিনী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হল; এখন অতি স্থবির লয়জন্ জেরুসালেমে চলেছেন—ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন্ লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে বা ফেলে দেয়—ভূমধ্যসাগরে! সে সব তো কিছুই হল না; হল—ফরাসীরা বলে, ‘ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ’। কিন্তু মাদাম লয়জনের—সে নানা দিবাস্বপ্ন চলেছে!! বৃদ্ধ লয়জন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নীর ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ বৈরাগ্য সন্ন্যাসের চর্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে—সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নীর বোধ হয় গা কস্ কস্ করে। তার উপর মেয়ে-মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা যত দোষ গিন্নীর উপর ফেলে; বলে, ‘ও মাগী আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট করে দিয়েছে!!’ গিন্নীর কিছু বিপদ বৈকি—আবার বাস হচ্ছে প্যারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে-করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ-ছেলে নিয়ে ধর্মপ্রচার এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নীর আবার একটু ঝাঁজ আছে কি না। একবার গিন্নী এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, ‘তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, ‘তুমি বড় খারাপ।’ সে অভিনেত্রী ঝট জবাব দিলে, ‘আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইন-মত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিল, তা না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে করে—গৃহস্থ করে তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?’ ‘পচাকুমড়ো শরীরের’ কথা শুনে যে দেশে হাসতুম, তার আর এক দিক্ দিয়ে মানে হয়—দেখছ?

যাক, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা—বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক আর শান্ত; সে খুশী আছে তার মাগ-ছেলে নিয়ে; দেশ সুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নীটি একটু শান্ত হলেই বোধ হয় সব মিটে যায়। তবে কি জান ভায়া, আমি দেখছি যে, পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার ও বিচার করবার রাস্তা আলাদা। পুরুষ একদিক দিয়ে বুঝবে; মেয়েমানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে। পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়েমানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরেজী জানে না; ইংরেজী ভাষায় কথা একদম বন্ধ,
৩৮
কাজেই কোন রকম করে আমায় কইতে হচ্ছে ফরাসী এবং শুনতে হচ্ছে ফরাসী।

প্যারিস নগরী হতে বন্ধুবর ম্যাকসিম্ নানাস্থানে চিঠিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা হয়। ম্যাকসিম্—বিখ্যাত ম্যাকসিম্ গানের নির্মাতা; যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে—আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে—বিরাম নাই। ম্যাকসিম্ আদতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি—। ম্যাকসিম্ তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, ‘আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া?’ ম্যাকসিম্ চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বইপত্র পড়ে অনেক দিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাকসিম্ সব রাজারাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানাশুনা, কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের উপর, ধর্মানুরাগ কংফুছে মতে। চীনে নাম নিয়ে মধ্যে মধ্যে কাগজে ক্রিশ্চান পাদ্রীদের বিপক্ষে লেখা হয়—তারা চীনে কি করতে যায়, কেন বা যায়, ইত্যাদি; ম্যাকসিম্ পাদ্রীদের চীনে ধর্মপ্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না! ম্যাকসিমের গিন্নীটিও ঠিক অনুরূপ—চীন-ভক্তি, ক্রিশ্চানী-ঘৃণা! ছেলেপুলে নেই, বুড়ো মানুষ—অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হল—প্যারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তারপর কনষ্টাণ্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্যসাগরপার ইজিপ্ত, তারপর এশিয়া মাইনর, জেরুসালেম ইত্যাদি। 'ওরিআঁতাল এক্সপ্রেস ট্রেন' প্যারিস হতে স্তাম্বুল পর্যন্ত ছোটে প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার বসবার খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার মত সুসম্পন্ন না হলেও কতক বটে। সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর প্যারিস ছাড়তে হচ্ছে।

ফ্রান্স ও জার্মানী

আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!

আর মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন, তারও আজ শেষ। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিষ্টর লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত!—তারও শেষ।

সকল জিনিষেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার পুঞ্জীকৃতভাবরূপ স্থিরসৌদামিনী, এই অপূর্ব ভূস্বর্গ-সমাবেশ প্যারিস-এগজিবিশন দেখে এলুম।

আজ দু-তিন দিন ধরে প্যারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্যদেব আজ ক-দিন বিরূপ। নানাদিগ্‌দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগরঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর আশু বিনাশ ভেবে তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

আমরাও পালিয়ে বাঁচি—এগজিবিশন ভাঙা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম প্যারিসের রাস্তা এক হাঁটু কাদা চুন বালিতে পূর্ণ হবেন। দু-একটা প্রধান ছাড়া এগজিবিশনের সমস্ত বাড়ী-ঘর-দোরই, কাটকুটরো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চুনকামের খেলা বৈ তো নয়—যেমন সমস্ত সংসার! তা যখন ভাঙতে থাকে সে চুনের গুঁড়ো উড়ে দম আটকে দেয়; ন্যাতাচোতায়, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য করে তোলে; তার উপর বৃষ্টি হলেই সে বিরাট কাণ্ড!

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেন প্যারিস ছাড়ল; অন্ধকার রাত্রি—দেখবার কিছুই নাই। আমি আর মসিয়ু বোওয়া এক কামরায়—শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করলুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি, আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে জার্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জার্মানী পূর্বে বিশেষ করে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জার্মানী—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। 'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং'—এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে; আর এক দিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জার্মানী মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানীর স্থূলহস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য; জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসী বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানীর রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত—কস্তুরীর মত এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত—পারার মত ভারী, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মত, কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জার্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি—অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ী দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ বাড়ী কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী-উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী-ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস করবে!

আমেরিকা জার্মান-প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জার্মান প্রত্যেক শহরে। ভাষা ইংরেজী হলে কি হয়, আমেরিকা আস্তে আস্তে 'জার্মানীত'
৩৯
হয়ে যাচ্ছে। জার্মানীর প্রবল বংশবিস্তার; জার্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জার্মানী ইওরোপের আদেশদাতা, সকলের উপর! অন্যান্য জাতের অনেক আগে জার্মানী প্রত্যেক নরনারীকে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বিদ্যা শিখিয়েছে; আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন করছে। জার্মানীর সৈন্য প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ; জার্মানী প্রাণপণ করেছে যুদ্ধপোতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে; জার্মানীর পণ্যনির্মাণ ইংরেজকেও পরাভূত করেছে! ইংরেজের উপনিবেশেও জার্মান পণ্য, জার্মান মনুষ্য ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছে; জার্মানীর সম্রাটের

আদেশে সর্বজাতি চীনক্ষেত্রে৪০ অবনত মস্তকে জার্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করছেন!

সারাদিন ট্রেন জার্মানীর মধ্য দিয়ে চলল; বিকাল বেলা জার্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র—এখন পররাজ্য—অষ্ট্রীয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ ইওরোপে বেড়াবার কতকগুলি জিনিষের উপর বেজায় শুল্ক; অথবা কোন কোন পণ্য সরকারের একচেটে, যেমন তামাক। আবার রুশ ও তুর্কীতে তোমার রাজার ছাড়পত্র না থাকলে একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া রুশ এবং তুর্কীতে, তোমার বইপত্র কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর তারা পড়ে শুনে যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কীর বা রুশের রাজত্বের বা ধর্মের বিপক্ষে কোন বই-কাগজ নেই, তা হলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে—নতুবা সে সব বইপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্দুক, প্যাঁটরা, গাঁটরি—সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কি না। আর কনষ্টাণ্টিনোপল আসতে গেলে দুটো বড়—জার্মানী আর অষ্ট্রীয়া এবং অনেকগুলো ক্ষুদ্র দেশের মধ্য দিয়ে আসতে হয়; ক্ষুদেগুলো পূর্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন ক্রিশ্চান রাজারা একত্র হয়ে মুসলমানের হাত থেকে যতগুলো পেরেছে, ক্রিশ্চানপূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড় ডেওদের চেয়েও অনেক অধিক।

অষ্ট্রীয়া ও হুঙ্গারী

২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেন অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছুল। অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়ার রাজবংশীয় নর-নারীকে আর্ক-ড্যুক ও আর্ক-ডচেস বলে। এ ট্রেনে দুজন আর্ক-ড্যুক ভিয়েনায় নাববেন; তাঁরা না নাবলে অন্যান্য যাত্রীর আর নাববার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা করে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটা-র উর্দি-পরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর-লাগানো (feathered) টুপি মাথায় জন-কতক সৈন্য আর্ক-ড্যুকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আর্ক-ড্যুকদ্বয় নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচলুম— তাড়াতাড়ি নেমে সিন্দুকপত্র পাস করবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। যাত্রী অতি অল্প; সিন্দুকপত্র দেখিয়ে ছাড় করাতে বড় দেরী লাগল না। পূর্ব হতে এক হোটেল ঠিকানা করা ছিল; সে হোটেলের লোক গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরাও যথাসময়ে হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে—পরদিন প্রাতঃকালে শহর দেখতে বেরুলুম।

সমস্ত হোটেলেই এবং ইওরোপের ইংলণ্ড ও জার্মানী ছাড়া প্রায় সকল দেশেই ফরাসী চাল। হিঁদুদের মত দুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে দুপ্রহরের মধ্যে; সায়ংকালে ৮টার মধ্যে। প্রত্যূষে অর্থাৎ ৮।৯ টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল—ইংলণ্ড ও রুশিয়া ছাড়া অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম ‘দেজুনে’
৪১
অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরেজী ‘ব্রেকফাষ্ট’। সায়ংভোজনের নাম ‘দিনে’, ইং—‘ডিনার’। চা পানের ধুম রুশিয়াতে অত্যন্ত—বেজায় ঠাণ্ডা, আর চীন-সন্নিকট। চীনের চা খুব উত্তম চা—তার অধিকাংশ যায় রুশে। রুশের চা-পানও চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মেশানো নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায় অপকারক। আসল চা-পায়ী জাতি চীনে. জাপানী, রুশ, মধ্য এশিয়াবাসী বিনা দুগ্ধে চা পান করে; তদ্বৎ আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফিপায়ী জাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুশিয়ায় তার মধ্যে একটু পাতিনেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরীবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং একজনের পান শেষ হলে আর এক জনকে সে চিনির ডেলাটা বার করে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলাটা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ববৎ চা পান করে।

ভিয়েনা শহর—প্যারিসের নকলে ছোট শহর। তবে অষ্ট্রীয়ানরা হচ্ছে জাতিতে জার্মান। অষ্ট্রীয়ার বাদশা এতকাল প্রায় সমস্ত জার্মানীর বাদশা ছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রুশরাজ ভিলহেলমের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রিবর বিসমার্কের অপূর্ব বুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন মল্টকির যুদ্ধপ্রতিভায় প্রুশরাজ অষ্ট্রীয়া ছাড়া সমস্ত জার্মানীর একাধিপতি বাদশা। হতশ্রী হতবীর্য অষ্ট্রীয়া কোন মতে পূর্বকালের নাম-গৌরব রক্ষা করছেন। অষ্ট্রীয় রাজবংশ—হ্যাপসবর্গ বংশ, ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জার্মান রাজন্যকুল ইওরোপের প্রায় সর্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জার্মানীর ছোট ছোট করদ রাজা ইংলণ্ড ও রুশিয়াতেও মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেছে, সেই জার্মানীর বাদশা এতকাল ছিল এই অষ্ট্রীয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ অষ্ট্রীয়ার রয়েছে—নাই শক্তি। তুর্ককে ইওরোপে ‘আতুর বৃদ্ধ পুরুষ’
৪২
বলে; অষ্ট্রীয়াকে ‘আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী’ বলা উচিত।

অষ্ট্রীয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত; সেদিন পর্যন্ত অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—‘পবিত্র রোম সাম্রাজ্য’। বর্তমান জার্মানী প্রোটেষ্টাণ্ট-প্রবল; অষ্ট্রীয় সম্রাট্ চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন ইওরোপে ক্যাথলিক বাদশা কেবল এক অষ্ট্রীয় সম্রাট্; ক্যাথলিক সঙ্ঘের ‘বড় মেয়ে’ ফ্রান্স এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন পোর্তুগাল অধঃপাতিত! ইতালী পোপের সিংহাসনমাত্র স্থাপনের স্থান দিয়েছে; পোপের ঐশ্বর্য, রাজ্য, সমস্ত কেড়ে নিয়েছে; ইতালীর রাজা আর রোমের পোপে মুখ-দেখাদেখি নাই, বিশেষ শত্রুতা। পোপের রাজধানী রোম এখন ইতালীর রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল করে রাজা বাস করছেন; পোপের প্রাচীন ইতালীরাজ্য এখন পোপের ভ্যাটিকান (Vatican)-প্রাসাদের চতুঃসীমায় আবদ্ধ! কিন্তু পোপের ধর্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতার বিশেষ সহায় অষ্ট্রীয়া। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অথবা পোপ-সহায় অষ্ট্রীয়ার বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে—নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অষ্ট্রীয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হল। সে টাকা কোথায়? ঋণজালে জড়িত হয়ে ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায় পড়েছে; আবার কোথা হতে উৎপাত—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করতে গেল। হাবশী বাদশার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে বসে পড়েছে। এ দিকে প্রুশিয়া মহাযুদ্ধে হারিয়ে অষ্ট্রীয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে। অষ্ট্রীয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েছে।

অষ্ট্রীয়ার রাজবংশের এখনও ইওরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর! তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ! এ বংশের বে-থা বড় দেখে শুনে হয়। ক্যাথলিক না হলে সে বংশের সঙ্গে বে-থা হয়ই না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে মহাবীর ন্যাপোলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকল যে, বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, ‘আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?’—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, ‘আমি কারু বংশের সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক’, অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরের এ বংশমর্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হল!

রাজ্ঞী জোসেফিনকে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় করে অষ্ট্রীয়ার বাদশার কন্যা-গ্রহণ, মহা-সমারোহে অষ্ট্রীয় রাজকন্যা মেরী লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যোজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভিষিক্ত-করণ, ন্যাপোলঅঁর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপজিগ, ওয়াটারলু, সেন্ট হেলেনা, রাজ্ঞী মেরী লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্ট-সম্রাজ্ঞীর

বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের মাতামহগৃহে মৃত্যু—এ সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে—আজকাল ন্যাপোলঅঁর-সংক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ
৪৩
প্রভৃতি নাট্যকার গত ন্যাপোলঅঁর সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখছেন; মাদাম বার্নহার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ সে সব পুস্তক অভিনয় করে প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি 'লেগলঁ'
৪৪
(গরুড়-শাবক) নামক এক পুস্তক অভিনয় করে মাদাম বার্নহার্ড প্যারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।

'গরুড় শাবক' হচ্ছে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহ-গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অষ্ট্রীয় বাদশার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারনিক বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী—যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক নানা কৌশলে সানব্রান-প্রাসাদে (Schonbrunn Palace) অজ্ঞাতভাবে বালকের ভৃত্যত্বে গৃহীত হল; তাদের ইচ্ছা—কোন রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করা এবং সমবেত ইওরোপীয় রাজন্যগণ-পুনঃস্থাপিত বুর্‌বঁ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট-বংশ স্থাপন করা। শিশু মহাবীর-পুত্র; পিতার রণ-গৌরবকাহিনী শুনে সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠল। চক্রান্তকারীদের সঙ্গে বালক সানব্রান-প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন করলে; কিন্তু মেটারনিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ব হতেই টের পেয়েছিল, সে যাত্রা বন্ধ করে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সানব্রান-প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলে—বদ্ধপক্ষ 'গরুড় শিশু' ভগ্নহৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করলে!

এ সানব্রান-প্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য ঘর-দোর খুব সাজান বটে; কোন ঘরে খালি চীনের কাজ, কোন ঘরে খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোন ঘরে অন্য দেশের—এই প্রকার; প্রাসাদস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে, কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখতে যাচ্ছে, সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্য হয়েছিল—সেই সব দেখতে যাচ্ছে। অনেক আহম্মক ফরাসী-ফরাসিনী রক্ষিপুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, 'এগ্‌লঁ'র ঘর কোন্‌টা, কোন্ বিছানায় শুতেন!! মর্ আহাম্মক, এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে জুলুম করে কেড়ে নিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ; সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি—রাখতে হয়, নিরাশ্রয়—রেখেছিল। তারা 'রোমরাজ' প্রভৃতি কোন কোন উপাধিই দিত না; খালি অষ্ট্রীয়ার নাতি—কাজেই ড্যুক, বস্। তাকে এখন 'গরুড় শিশু' করে এক বই লিখেছিস, আর তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে, মাদাম বার্নহার্ডের প্রতিভায় একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে; কিন্তু এ অষ্ট্রীয় রক্ষী সে নাম কি করে জানবে বল? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে যে ন্যাপোলঅঁর-পুত্রকে অষ্ট্রীয়ার বাদশা মেটারনিক মন্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেরেই ফেললেন। রক্ষী—'এগ্‌লঁ' শুনে, মুখ হাঁড়ি করে, গজগজ করতে করতে ঘর-দোর দেখাতে লাগল; কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুশকিল। তার উপর, এসব অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বললেই হল, এক রকম পেটভাতায় থাকতে হয়; অবশ্য কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যায়। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বকশিশের দিকে চলল। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত করে, 'এগ্‌লঁ'র গল্প করতে করতে আর মেটারনিককে গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরল; রক্ষী লম্বা সেলাম করে দোর বন্ধ করলে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত-পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা শহরে দেখবার জিনিষ মিউজিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউজিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানাপ্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকারদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজী সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল—সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল, চমৎকারজনক! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান!!

ভিয়েনা শহরে জার্মান পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কী ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্তমান—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রীয়ার লোক জার্মান-ভাষী, ক্যাথলিক; হুঙ্গারির লোক তাতারবংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীকমতের ক্রিশ্চান। এ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূতকরণের শক্তি অষ্ট্রীয়ার নেই। কাজেই অষ্ট্রীয়ার অধঃপতন।

বর্তমানকালে ইওরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্তমান অষ্ট্রীয় সম্রাটের মৃত্যুর পর অবশ্যই জার্মান অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুশ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা আহবের সম্ভাবনা; বর্তমান সম্রাট্, অতি বৃদ্ধ—সে দুর্যোগ আশুসম্ভাবী। জার্মান সম্রাট্ তুর্কীর সুলতানের আজকাল সহায়; সে সময়ে যখন জার্মানী অষ্ট্রীয়া-গ্রাসে মুখ-ব্যাদান করবে, তখন রুশ-বৈরী তুর্ক, রুশকে কতক-মতক বাধা তো দেবে, কাজেই জার্মান সম্রাট্ তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্ছেন।

ভিয়েনায় তিন দিন—দিক্ করে দিলে! প্যারিসের পর ইওরোপ দেখা-চর্ব্যচুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা; সেই কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, সেই সব এক ঢঙ, দুনিয়াসুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি! তার উপর—উপরে মেঘ আর নীচে পিল পিল করছে এই কালো টুপি, কালো জামার দল; দম যেন আটকে দেয়। ইওরোপসুদ্ধ সেই এক পোষাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে! প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি; ফল—আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি! যন্ত্র 'না' বলে না, 'হ্যাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না,

'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'—(বাপ দাদা যে দিক্ দিয়ে গেছে) সে দিকে চলে যায়, তার পর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে! 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'—সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি—হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তার পর পচে মরা!!

২৮শে অক্টোবর রাত্রি ৯টার সময় সেই ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেন আবার ধরা হল। ৩০শে অক্টোবর ট্রেন পৌঁছুল কনষ্টাণ্টিনোপলে। এ দু-রাত একদিন ট্রেন চলল হুঙ্গারি, সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হুঙ্গারির অধিবাসী অষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রজা। কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাটের উপাধি 'অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ ও হুঙ্গারির রাজা'। হুঙ্গারির লোক এবং তুর্কীরা একই জাত, তিব্বতীর কাছাকাছি। হুঙ্গাররা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইওরোপে প্রবেশ করেছে, আর তুর্করা আস্তে আস্তে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে এশিয়া-মিনর
৪৫
হয়ে ইওরোপ দখল করেছে। হুঙ্গারির লোক ক্রিশ্চান, তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তে যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। হুঙ্গাররা অষ্ট্রীয়া হতে তফাত হবার জন্য বারংবার যুদ্ধ করে এখন কেবল নামমাত্র একত্র। অষ্ট্রীয়া সম্রাট্ নামে হুঙ্গারির রাজা। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিষ্কার সুন্দর শহর। হুঙ্গার জাতি আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়—প্যারিসের সর্বত্র হুঙ্গারিয়ান ব্যাণ্ড।

তুরস্ক

সর্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি তুর্কীর জেলা ছিল—রুশযুদ্ধের পর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদশা, এবং সর্বিয়া-বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন অধিকার নেই। ইওরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জার্মান, আর ইংরেজ। বাকীদের দুর্দশা আমাদেরই মত, অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এশিয়ায় এত নীচ কোন জাত নেই। সর্বিয়া-বুলগেরিয়াময় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা মানুষ, আবর্জনারাশি—মনে হয় বুঝি দেশে এলুম! আবার ক্রিশ্চান কি না—দু-চারটা শূয়োর অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য লোকে যা ময়লা করতে পারে না, একটা শোরে তা করে দেয়। মেটে ঘর, তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা-চোতা পরনে, শূকরসহায় সর্বিয়া বা বুলগার! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত—ইওরোপী ঢঙে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নেই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুশের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দুদিন জীবন অসম্ভব—ফৌজ বিনা! 'কনসক্রিপশন্' চাই।

কুক্ষণে ফ্রান্স জার্মানীর কাছে পরাজিত হল। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্সদেশযুদ্ধ লোককে সেপাই করলে। পুরুষমাত্রকেই কিছুদিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখতে হবে; কারু নিস্তার নেই। তিন বৎসর বারিকে (barrack) বাস করে—ক্রোড়পতির ছেলে হোক না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখতে হবে। গবর্ণমেণ্ট খেতে পরতে দেবে, আর বেতন রোজ এক পয়সা। তারপর তাকে দু-বৎসর সদা প্রস্তুত থাকতে হবে নিজের ঘরে; তার পর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জার্মানী সিঙ্গি খেপিয়েছে—তাকেও কাজেকাজেই তৈয়ার হতে হল; অন্যান্য দেশেও এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ—সমস্ত ইওরোপময় ঐ কনসক্রিপশন্, এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে; কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে বোধ হয় কনসক্রিপশন্ বা হয়। রুশের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাজেই রুশ সকলের চেয়ে বেশী ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ-সব তুর্কীকে ভেঙে ইওরোপীরা বানাচ্ছে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জিত ফৌজ তোপ প্রভৃতি চাই; কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর শহরে দেখবে কতকগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পরে সেপাই। ইওরোপময় সেপাই, সেপাই—সর্বত্রই সেপাই। তবু স্বাধীনতা এক জিনিষ, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় তো অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইওরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বৈকি—দু-শ করবে; করে শিখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

রেলগাড়ী হুঙ্গারী, রোমানী
৪৬
প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চলল। মৃতপ্রায় অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে যে সব জাতি বাস করে, তাদের মধ্যে হুঙ্গারীয়ানে জীবনীশক্তি এখনও বর্তমান। যাকে ইওরোপীয় মনীষিগণ ইন্দো-ইওরোপীয়ান বা আর্যজাতি বলেন, ইওরোপে দু-একটি ক্ষুদ্র জাতি ছাড়া আর সমস্ত জাতি সেই মহাজাতির অন্তর্গত। যে দু-একটি জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুঙ্গারীয়ানেরা তাদের অন্যতম। হুঙ্গারীয়ান আর তুর্কী একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই মহাপ্রবল জাতি এশিয়া ও ইওরোপ খণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিমে হিমালয় ও হিন্দুকোশ পর্বতের উপরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী জাতির আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশের তুর্কী নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগলবাদশাহ-বংশ, বর্তমান পারস্য-রাজবংশ, কনষ্টাণ্টিনোপলপতি তুর্কবংশ ও হুঙ্গারীয়ান জাতি—সকলেই সেই 'চাগওই' দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইওরোপ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেছে এবং আজও এই সকল বংশ আপনাদের 'চাগওই' বলে পরিচয় দেয় এবং এক ভাষায় কথাবার্তা কয়। এই তুর্কীরা বহুকাল পূর্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রীপুত্র ডেরা-ডাণ্ডা সমেত, যেখানে পশুপালের চরবার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানে তাঁবু গেড়ে কিছু দিন বাস করত। ঘাস-জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য-এশিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্য-এশিয়াস্থ জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য—আকৃতিগত কিছু তফাত, মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক খ্যাঁদা নয়, অপিচ সুদীর্ঘ চোখ সোজা এবং বড়, কিন্তু মোগলদের মত দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশী। অনুমান হয় যে, বহুকাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য এবং সেমিটিক রক্ত প্রবেশ লাভ করেছে; সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির সহিত সংস্কৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরানীর মিশ্রণে—আফগান, খিলিজী, হাজারা, বরকজাই, ইউসাফজাই প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয়, সদা রণোন্মত্ত, ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতিসকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীনকালে এই জাতি বারংবার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশসকল জয় করে বড় বড় রাজ্য সংস্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল করবার পর বৌদ্ধ হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্কই 'মহাযান' নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক।

বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্য-এশিয়াস্থ গান্ধার, কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্রসকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্বে এরা যখন যে দেশ জয় করত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ করত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্তমান; বিদ্যা ও সভ্যতার নামগন্ধ নেই, বরং যে দেশ জয় করে, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে

যায়। বর্তমান আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্বপুরুষদের নির্মিত অপূর্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট মূর্তিসকল বিদ্যমান। তুর্কী-মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য মূর্খ হয়ে গেছে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতাদের নির্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে।

বর্তমান পারস্য দেশের দুর্দশার প্রধান কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্ছে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্ছে অতি সুসভ্য আর্য—প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্যবংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমদিগের শেষ রঙ্গভূমি কনষ্টাণ্টিনোপল সাম্রাজ্য মহাবল বর্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেছে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদশারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল—সেটা বোধ হয় হিন্দু ভাব ও রক্ত-সংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাসগ্রন্থে ভারতবিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটি বড় ঠিক, কারণ ভারতবিজেতা মুসলমানবাহিনীচয় যে-কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ থাক না কেন, নেতৃত্ব সর্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধধর্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের নেতৃত্বে—বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্মত্যাগী তুরস্কাধীন এবং তুরস্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দুজাতির অংশবিশেষের দ্বারা পৈতৃক ধর্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারংবার বিজয়ের নাম 'ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ, জয় ও সাম্রাজ্য-সংস্থাপন'। এই তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাদের চেহারার মত বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এবার পারস্যের শা প্যারিশ প্রদর্শনী দেখে কনষ্টাণ্টিনোপল হয়ে রেলযোগে স্বদেশে গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাকলেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন করলেন। তবে সুলতানের তুর্কী—ফার্সী, আরবী ও দু-চার গ্রীক শব্দে মিশ্রিত; শা-এর তুর্কী—অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীনকালে এই চাগওই-তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম 'সাদা-ভেড়ার' দল, আর এক দলের নাম 'কালো-ভেড়ার' দল। দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পিয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইওরোপে প্রবেশ করলে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট এক টুকরা নিয়ে হুঙ্গারী নামক রাজ্য স্থাপন করলে। কালো-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিমভাগ অধিকার করে, ককেশাস পর্বত উল্লঙ্ঘন করে, ক্রমে এশিয়া-মিনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বসল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার করলে; ক্রমে পশ্চিম রোম সম্রাজ্যের যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু উদরসাৎ করলে। অতি প্রাচীনকালে এই তুরস্ক জাতি বড় সাপের পূজা করত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগ-তক্ষকাদি বংশ বলত। তারপর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়; পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্মই গ্রহণ করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে—যে দু-দলের কথা আমরা বলছি, তাদের মধ্যে সাদা ভেড়ারা ক্রিশ্চানদের জয় করে ক্রিশ্চান হয়ে গেল, কালো-ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের ক্রিশ্চানী বা মুসলমানীতে—অনুসন্ধান করলে—নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হুঙ্গারীয়ানরা জাতি এবং ভাষায় তুরস্ক হলেও ধর্মে ক্রিশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্মের গোঁড়ামি—ভাষা, রক্ত, দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মানত না। হুঙ্গারীয়ানদের সাহায্য না পেলে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি ক্রিশ্চান রাজ্য অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হত না। বর্তমানকালে বিদ্যার প্রচার, ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা রক্তগত ও ভাষাগত একত্বের উপর অধিক আকর্ষণ হচ্ছে; ধর্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এইজন্য কৃতবিদ্য হুঙ্গারীয়ান ও তুরস্কদের মধ্যে একটা স্বজাতীয়ত্ব ভাব দাঁড়াচ্ছে।

অষ্ট্রীয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও হুঙ্গারী বারংবার তা হতে পৃথক্ হবার চেষ্টা করেছে। অনেক বিপ্লব-বিদ্রোহের ফলে এই হয়েছে যে হুঙ্গারী এখন নামে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অষ্ট্রীয় সম্রাটের নাম 'অষ্ট্রীয়ার বাদশা ও হুঙ্গারীর রাজা'। হুঙ্গারীর সমস্ত আলাদা, এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অষ্ট্রীয় বাদশাকে এখানে নামমাত্র নেতা করে রাখা হয়েছে, এটুকু সম্বন্ধও বেশী দিন থাকবে বলে বোধ হয় না। তুর্কী-স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ হুঙ্গারীয়ানে প্রচুর বিদ্যমান। অপিচ মুসলমান না হওয়ায়—সঙ্গীতাদি দেবদুর্লভ শিল্পকে শয়তানের কুহক বলে না ভাবার দরুন সঙ্গীত-কলায় হুঙ্গারীয়ানরা অতি কুশলী ও ইওরোপময় প্রসিদ্ধ।

পূর্বে আমার বোধ ছিল, ঠাণ্ডা দেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না, ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হুঙ্গারীতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছল, তার কাছে বোধ হয় মান্দ্রাজীও হার মেনে যায়।

পরিব্রাজকের ডায়েরী—সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট

(১) কনষ্টাণ্টিনোপল

কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রথম দৃশ্য রেল হতে পাওয়া গেল। প্রাচীন শহর—পগার (পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়েছে), অলিগলি, ময়লা, কাঠের বাড়ী ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য আছে। ষ্টেশনে বই নিয়ে বিষম হাঙ্গামা। মাদমোয়াজেল কাল্‌ভে ও জুল বোওয়া ফরাসী ভাষায় চুঙ্গীর কর্মচারীদের ঢের বুঝালে, ক্রমে উভয় পক্ষের কলহ। কর্মচারীদের 'হেড অফিসার' তুর্ক, তার খানা হাজির—তাই ঝগড়া অল্পে অল্পে মিটে গেল, সব বই দিলে—দুখানা দিলে না। বললে, 'এই হোটেলে পাঠাচ্ছি'—সে আর পাঠানো হল না। স্তাম্বুল বা কনষ্টাণ্টিনোপলের শহর বাজার দেখা গেল। 'পোণ্ট' (Pont) বা সমুদ্রের খাড়ি-পারে 'পেরা' (Pera) বা বিদেশীদিগের কোয়ার্টার, হোটেল ইত্যাদি—সেখান হতে গাড়ী করে শহর বেড়ানো ও পরে বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর উড্‌স্ পাশার দর্শন গমন। পরদিন বোট চড়ে বাস্ফোর ভ্রমণে যাত্রা। বড্ড ঠাণ্ডা, জোর হাওয়া, প্রথম ষ্টেশনেই আমি আর মিস্ ম্যা—নেবে গেলাম। সিদ্ধান্ত হল—ওপারে স্কুটারিতে গিয়ে পেয়র হিয়াসান্থের সঙ্গে দেখা করা। ভাষা না জানায় বোটভাড়া ইঙ্গিতে করে পারে গমন ও গাড়ী ভাড়া। পথে সুফী ফকিরের 'তাকিয়া' দর্শন, এই ফকিরেরা লোকের রোগ ভাল করে। তার প্রথা এইরূপ—প্রথম কল্‌মা পড়া ঝুঁকে ঝুঁকে, তারপর নৃত্য, তারপর ভাব, তারপর রোগ আরাম—রোগীর শরীর মাড়িয়ে দিয়ে।

পেয়র হিয়াসান্থের সঙ্গে আমেরিকান কলেজ-সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা। আরবের দোকান ও বিদ্যার্থী টর্ক (Turkish student) দর্শন। স্কুটারী হতে প্রত্যাবর্তন। নৌকা খুঁজে পাওয়া—সে কিন্তু ঠিক জায়গায় যেতে না-পারক। যা হোক, যেখানে নাবালে সেইখান হতেই ট্রামে করে ঘরে (স্তাম্বুলের হোটেলে) ফেরা। মিউজিয়ম—স্তাম্বুলের যেখানে প্রাচীন অন্দরমহল ছিল গ্রীক বাদশাদের—সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত। অপূর্ব sarcophagi (শবদেহ রক্ষা করবার প্রস্তর-নির্মিত আধার) ইত্যাদি দর্শন। তোপখানার (Tophaneh) উপর হতে শহরের মনোহর দৃশ্য। অনেক দিন পরে এখানে ছোলাভাজা খেয়ে আনন্দ। তুর্কী পোলাও কাবাব ইত্যাদি এখানকার খাবার ভোজন। স্কুটারীর কবরখানা। প্রাচীন পাঁচিল দেখতে যাওয়া। পাঁচিলের মধ্যে জেল—ভয়ঙ্কর। উডস্ পাশার সহিত দেখা ও বাস্ফোর যাত্রা। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের (Chrage d' Affairs) অধীনস্থ কর্মচারীর সহিত ভোজন (dinner)—জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানী ভদ্রলোকের সহিত দেখা। পেয়র হিয়াসান্থের লেকচার পুলিশ বন্ধ করেছে, কাজেই আমার লেকচারও বন্ধ। দেবন্‌মল ও চোবেজীর (এক জন গুজরাতী বামুন) সহিত সাক্ষাৎ। এখানে হিন্দুস্থানী, মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারতবর্ষীয় লোক আছে। তুর্কী ফিললজি। নুর বের (Noor Bey) কথা—তার ঠাকুরদাদা ছিল ফরাসী। এরা বলে, কাশ্মীরীর মত সুন্দর! এখানকার স্ত্রীলোকদিগের পর্দা-হীনতা। বেশ্যাভাব মুসলমানী। খুর্দ পাশা আর্মানী (Arian?) ও আরমিনীয়ান হত্যার কথা শুনেছি। আরমিনীয়ানদের বাস্তবিক কোন দেশ নাই। যে সব স্থানে তারা বাস করে, সেথায় মুসলমানই অধিক। আরমিনীয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্তমান সুলতান খুর্দদের হামিদিয়ে রেসল্লা (Hamidian cavarly) তৈরী করছেন, তাদের কজাকদের (Cossacks) মত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তার conscription হতে খালাস হবে।

বর্তমান সুলতান, আরমিনীয়ান এবং গ্রীক পেট্রিয়ার্কদের ডেকে বলেন যে, তোমরা tax (টেক্স) না দিয়ে সেপাই হও (conscription), তোমাদের জন্মভূমি রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয় যে, ফৌজ হয়ে লড়ায়ে গিয়ে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্র মলে ক্রিশ্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বললেন যে, প্রত্যেক পল্টনে না হয় মোল্লা ও ক্রিশ্চান পাদ্রী থাকবে, এবং লড়ায়ে যখন ক্রিশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহসকল একত্র এক গাদায় কবরে পুঁততে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্মের পাদ্রীই শ্রাদ্ধমন্ত্র (funeral service) পড়ল; না হয় এক ধর্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ অন্য ধর্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। ক্রিশ্চানরা রাজী হল না—কাজেই তারা tax (টেক্স) দেয়। তাদের রাজী না হবার ভেতরের কারণ হচ্ছে, ভয় যে মুসলমানের সঙ্গে একত্র বসবাস করে পাছে সব মুসলমান হয়ে যায়। বর্তমান স্তাম্বুলের বাদশা বড়ই ক্লেশসহিষ্ণু—প্রাসাদে থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ পর্যন্ত সব কাজ নিজে বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব-সুলতান মুরাদ বাস্তবিক নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল—এ বাদশা অতি বুদ্ধিমান। যে অবস্থায় ইনি রাজ্য পেয়েছিলেন, তা থেকে এত সামলে উঠেছেন যে আশ্চর্য! পার্লামেণ্ট হেথায় চলবে না।

(২) এথেন্স, গ্রীস

বেলা দশটায় সময় কনষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden Horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপপুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীক ধর্মের মঠ দেখলুম। এখানে পুরাকালে ধর্মশিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল—কারণ একদিকে এশিয়া আর একদিকে ইওরোপ। মেডিটরেনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখতে গিয়ে প্রোফেসার লেপরের সহিত সাক্ষাৎ, পূর্বে পাচিয়াপ্পার কলেজে মান্দ্রাজে এঁর সহিত পরিচয় হয়। একটি দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখলুম—নেপচুনের মন্দির আন্দাজ, কারণ—সমুদ্রতটে। সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌঁছলুম। এক রাত্রি কারানটাইনে থেকে সকালবেলা নাববার হুকুম এল!

বন্দর পাইরিউস (Peiraeus)-টি ছোট শহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব ইওরোপের ন্যায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন ঘাগরা-পরা গ্রীক। সেথা হতে পাঁচ মাইল গাড়ী করে শহরের প্রাচীন প্রাচীর, যাহা এথেন্সকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত করত, তাই দেখতে যাওয়া গেল। তারপর শহর দর্শন—আক্রোপলিস, হোটেল, বাড়ী-ঘর-দোর অতি পরিষ্কার। রাজবাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আক্রোপলিস, বিজয়ার (Wingless Victory) মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। মন্দিরটিতে সাদা মর্মরের কয়েকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দণ্ডায়মান দেখলুম। পরদিন পুনর্বার মাদ্‌মোয়াজেল মেলকাবির সহিত ঐ সকল দেখতে গেলাম—তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয় দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের (Eleusinian Mysteries) অভিনয় এখানেই হত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি এক ধনী গ্রীক নূতন করে দিয়েছে। Olympian games-এর (অলিম্পিক খেলার) পুনরায় বর্তমানকালে প্রচলন হয়েছে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায় আমেরিকানরা অনেক বিষয়ে জেতে। গ্রীকরা কিন্তু দৌড়ে সে স্থান হতে এথেন্সের এই থিয়েটার পর্যন্ত আসায় জেতে। তুর্কের কাছে ঐ গুণের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিয়েছে। চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুশী ষ্টীমার 'জার'-আরোহণে ইজিপ্ত-যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জানলুম ষ্টীমার ছাড়বে ৪টার সময়—আমরা বোধ হয় সকাল সকাল এসেছি অথবা মাল তুলতে দেরী হবে। অগত্যা ৫৭৬ হতে ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বে আবির্ভূত এজেলাদাস (Ageladas) এবং তাঁর তিন শিষ্য ফিডিয়াস (Phidias), মিরন (Myron) ও পলিক্লেটের (Polycletus) ভাস্কর্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখুনি খুব গরম আরম্ভ। রুশিয়ান জাহাজে স্ক্রুর উপর ফার্স্ট ক্লাস। বাকী সবটা ডেক—যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ। এ জাহাজে আবার বরফও নেই।

(৩) পারি লুভার (Louvre) মিউজিয়মে

মিউজিয়ম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম 'মিসেনী' (Mycenoean), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। আচেনী রাজ্য (Achaean) সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেই সঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব। অতি-পূর্ব অজ্ঞাতকাল হতে খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ বৎসর যাবৎ 'মিসেনী' শিল্পের কাল। এই 'মিসেনী' শিল্প প্রধানতঃ এশিয়া শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। ৭৭৬ খ্রীঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত 'হেলেনিক' বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। দোরিয়ন জাতির দ্বারা আচেনী-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইওরোপখণ্ডস্থ ও দ্বীপপুঞ্জনিবাসী গ্রীকরা এশিয়াখণ্ডে বহু উপনিবেশ স্থাপন করলে। তাতে বাবিল ও ইজিপ্তের সহিত তাদের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হল, তা হতেই গ্রীক আর্টের উৎপত্তি হয়ে, ক্রমে এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছে।

খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খ্রীঃ পূঃ ৪৭৫ পর্যন্ত 'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের কাল। এখনও মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। এ বিষয়ে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু-পা সোজা করে, খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্তির গায়ের সঙ্গে জড়ানো, তালপাকানো—পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।

'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের পরেই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের কাল—৪৭৫ খ্রীঃ পূঃ হতে ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরব্ধ হয়ে সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার-কাল। পিলোপনেশাস এবং আটিকা রাজ্যেই এই সময়কার শিল্পের চরম উন্নতি-স্থান। এথেন্স আটিকা রাজ্যেরই প্রধান শহর ছিল। কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন, "(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প, চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যার সমুজ্জল সেই খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।" এই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন। আটিক সম্প্রদায়ে আবার দুই প্রকার ভাবঃ প্রথম, মহাশিল্পী ফিডিয়াসের প্রতিভাবল। "অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনকালে মানব-মনে আপন অধিকার হারাইবে না"—এই বলে যাকে জনৈক ফরাসী পণ্ডিত নির্দেশ করেছেন। স্কোপাস আর প্র্যাক্সিটেলেস (Praxiteles) আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক। এই সম্প্রদায়ের কার্য শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।

'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের পিলোপনেশিয়েন নামক দ্বিতীয় সম্পদায়ের প্রধান শিক্ষক পলিক্লেটাস এবং লিসিপাস (Lysippus)। এঁদের একজন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অন্য জন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরে গড়নপরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখবার নিয়ম প্রবর্তিত করা।

৩২৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৪৬ খ্রীঃ পূঃ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর হতে রোমানদিগের দ্বারা আর্টিকা-বিজয়কাল পর্যন্ত গ্রীক শিল্পের অবনতি-কাল! জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর রোমানদের গ্রীস অধিকার-সময়ে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকল মাত্র করেই

সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে হুবহু কোন লোকের মুখ নকল করা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

[স্বামীজীর এই মৌলিক রচনাটি প্রথমে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ২য় ও ৩য় বর্ষে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।]

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃণ্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থি-মজ্জা-চর্বণ, অনশন-অর্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী—ইওরোপী পর্যটক এই দেখে।

ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যদ্বিহীন, 'যেন তেন প্রকারেণ' বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নিত-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশা-হীনের সমুচিত কদর্য বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।

নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়-সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই তো গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা। ইওরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের 'নেটিভ' পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক—যারা সাহেবের চাকরি করে। আর দুঃখ-দারিদ্র্য তো বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই! ময়লা-আবর্জনা চারিদিকে তো পড়েই রয়েছে। ইওরোপী চক্ষে এ ময়লার, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি—শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই নাচ—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি—ওরাও 'কালো দাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু-দলেই ভেতরের আসল জিনিষ দেখেনি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাহিরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে! এই ভাব জগতের কার্য করেছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে-দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইওরোপীয়দের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নিঃশক্তি হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্বল নিষ্কর্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বছরের নানা রকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, তো আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টায় ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনি তো এসে চাষ-বাস করত, যেমন আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে?

তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইওরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে 'হাঁসেন হোঁসেন' করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, যিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে

আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন; ঐ যে মা কালী—উনি চীন, জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী করে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামী করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ,'এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে ঐ 'আমরা'র ভেতর দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্ দিশি ভদ্রতা হে বাপু?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোন গুণ নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোন জাতিতে কোন কোন গুণের আধিক্য—প্রাধান্য।

ধর্ম ও মোক্ষ

আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছার' প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মের'। আমরা চাই কি?—'মুক্তি'। ওরা চায় কি?—'ধর্ম'। ধর্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে।

ধর্ম কি?—যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি?—যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামী, পরলোকেরও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে-সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এইজন্য ঐ যে কথা শুনেছ, মুক্তপুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নেই, তা ঠিক। তবে পরে অন্যত্রও হবে। সে তো আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ)
১
সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খামকা দেশসুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল—না এদিক, না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, মুসলমান, জৈন—ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি-ব্যক্তি-প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর করে এক করতে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াসুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'। বলি, তা কখনও হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর'—এ-কথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং'
২
ইত্যাদি। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় কর না, অত্যাচার কর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন—দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তো তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ'!!

পূর্বে বলেছি যে, 'ধর্ম' হচ্ছে কার্যমূলক। ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্যশীলতা। এমন কি, অনেক-মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য করতে বলছে না, সে স্থানগুলি বেদই নয়—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাং'
৩
। 'ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি', 'হরিনামে সর্বপাপনাশ', 'শরণাগতের সর্বাপ্তি'—এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মরচে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয়, কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ, কে শরণ যথার্থ নিতে পারে—যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ যে 'ধার্মিক'।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক-একটি কেন্দ্র। পূর্বের কর্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল? ততক্ষণ ভোগ কে ঘোচায় বল? তবে কুকর্মের চেয়ে সুকর্মটা ভাল নয়? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন, 'ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল।'

এখন ভালটা কি? 'মুক্তিকামের ভাল' অন্যরূপ, 'ধর্মকামের ভাল' আর একপ্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান্ এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব' ইত্যাদি ধর্মলাভের উপায় ভগবান্ দেখিয়েছেন! অবশ্য, কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেওয়ালে চুরি করে না; তবু তারা গরুই থাকে, আর দেওয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য-অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয়

হয়, পরমাধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে—এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও? —নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি [শান্তভাব] মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধাণ ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনতমস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষকেই 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি। আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; শেষ—'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশসুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবান্‌কে ডাকছি, ভগবান্ শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইওরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হল; ওরা-ইওরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'
৪
গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না ইওরোপী। আর যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!! এ-কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ তো প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই তো যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী—'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল—কিছুই নয়। 'হয় মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও' এই দুই কথা! মোক্ষ ছাড়া যে কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে, তার কোন রাস্তা নাই, বরং প্রতিবাদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্মে এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!!! তারপর ভাগ্যফলে ইওরোপীগুলো প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant) হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশ ক্রোর লোক, দেরী হচ্ছে! ত্রিশ ক্রোর লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?

বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত তো আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল? 'কালেতে হয়' বললে কি চলে? কাল কি কার্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে?

স্বধর্ম বা জাতিধর্ম

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়—'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' যেটি বৈদিক ধর্মের—বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোশামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্যে বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোশামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠো অন্ন দেয় না; ভিক্ষে-শিক্ষে করে বাইরে থেকে এনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনাথকে যদি খাওয়াই তো তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা; যদি না পায় তো গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী! এই আমাদের দেশের লোক, তাদের আবার কি খোশামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু-দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সে-ই যথার্থ বন্ধু।

এই 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্মই' সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়—মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম বা জাতিধর্ম স্বধর্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা করছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু গুণ দু-চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়ছে, নইলে সর্বনাশ হল কেন? 'সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।'
৫
কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য উপস্থিত হল—সাদা রঙ কালো কেন হল, সত্ত্বগুণ রজোগুণপ্রধান তমোগুণে কেন উপস্থিত হল—সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বলবার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে তো দেশের অধঃপতন হবেই না। এ-কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম বলছ, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম পুরাণ পুঁথি-পাটা বেশ করে পড়গে, এখনি দেখতে পাবে যে, শাস্ত্র যাকে জাতিধর্ম বলছে, তা সর্বত্রই প্রায় লোপ পেয়েছে। তারপর কিসে সেইটি ফের আসে, তারই চেষ্টা কর; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি তাই তোমাদের বলছি; আমি তো আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হইনি যে, তোমাদের আহম্মকিগুলিকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হল। তোমাদের মুখে চুনকালি পড়লে যে আমার মুখে পড়ে, তার কি?

পূর্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবন ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে রাক্ষসীর কিছুতেই নাশ হয় না; এও তাই। আবার দেখবে যে, যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকারগুলো সব যাক না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না, কিন্তু যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তার জান—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারু উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসীচরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য-শাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার।'—এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ, হিসাবপত্রে আমি দু-কথা বলব, বুঝব, তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।

হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মার, 'কালো' বল, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ, বর্তমান কালে পাঠান বংশরা আসছিল যাচ্ছিল, কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য করতে পারছিল না; কেন না, ঐ হিঁদুর ধর্মে ক্রমাগত আঘাত করছিল। আর মোগল রাজা কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না—মোগলরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই তো মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারাসেকো

—এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরেজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর? ঐ ধর্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী-পুঙ্গবেরা একটু আধটু চেষ্টা করেই তো '৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল। ইংরেজরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের 'তকত তাজ অচল রাজধানী'। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরেজরাও এ-কথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর'
৬
নামক পুস্তক পড়ে দেখ।

এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন?—যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি তো হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম কর্ম সব মিথ্যা, তাহলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি তো এক, প্রকার বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী-কতক নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীর দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্মপ্রাণ হোক না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক না?

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দু-দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্যে দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বৈ তো নয়।

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগাপাস্তলা ভুল, মাপ কর, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

তা ছাড়া উপায় তো সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকীগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান'
৭
বৈ তো নয়। ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকীগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে, শক্তিমান্ পুরুষ কে? না—ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতিনীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি। তবে এত তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটি শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইওরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠি বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি, কস্‌বিন্ পহনে খাসা॥'
৮
যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?

মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকী আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও। 'তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হসে তুম রোয়। এয়সী করনী কর্ চলো কি তুম্ হসে জগ রোয়॥'
৯
—যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসী, সকলে হাসতে লাগলে, তুমি কাঁদতে লাগলে; এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাসতে হাসতে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। এ পার তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি?

আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট! 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিষটা আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকী জিনিষ শিখতে হবে।

বলি—খাওয়া তো সব দেশেই এক; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতীরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টানাটানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত করে—পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান্ পুরুষ যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

শরীর ও জাতিতত্ত্ব

এখন গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়ল; তবে দু-দেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল, আমরাও ভাল; 'কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারী।' তবে ভালর রকমারী আছে, এইমাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটি জিনিষ। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম শরীরের কথা দেখা যাক, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিষ।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক মুখ গড়ন, লম্বাই চৌড়াই, রঙ চুল—কত রকমের তফাত।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙের তফাত বর্ণসাঙ্কর্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে কিছু পরিবর্তন অবশ্য হয়; কিন্তু কালো-সাদার আসল কারণ পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লারঙ জাতি দেখা যাচ্ছে, এবং অতি উষ্ণ দেশেও ধপধপে ফর্সা জাতি বাস করছে। কানাডা-নিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরুসন্নিহিত দেশ-নিবাসী এস্কিমো প্রভৃতির খুব ময়লা রঙ, আর মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপও সাদারঙ আদিম জাতির বাস; বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাত এবং চীন, হূন, দরদ্, পহ্লব, যবন ও খশ্—এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি—এঁরা হচ্ছেন আর্য। শাস্ত্রোক্ত চীনজাতি—এ বর্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা তো সেকালে নিজেদের 'চীনে' বলতেই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাওর—যেখানে এখন ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে পাহাড়ী জাতসকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু-দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারংবার দরদ্‌রাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেকদিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটীরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বোধ হয় 'হিউন'। ফল—মনুক্ত হূন আধুনিক তিব্বতী তো নয়; তবে এমন হতে পারে যে, সেই আর্য হূন এবং মধ্য আশিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে বর্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি (Prjevalski) এবং ড্যুক ড অরলিআ (Due d' Orleans) নামক রুশ ও ফরাসী পর্যটকদের মতে তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য-মুখ-চোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে—যবন এই নামটা 'য়োনিয়া'(Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়, এজন্য মহারাজ অশোকের পালি লেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশী কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে 'যবন' শব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। 'যবন' শব্দই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে হিঁদুরাই গ্রীকদের যবন বলত তা নয়; প্রাচীন মিসরী ও বাবিলরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত। 'পহ্লব' শব্দে পেহলবী-ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। 'খশ্' শব্দে এখনও অর্ধসভ্য পার্বত্যদেশবাসী আর্যজাতি—এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইওরোপীরাও এই অর্থে খশ্‌দের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্যজাতি প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ্।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্যদের লালচে সাদা রঙ, কালো বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাত। যেখানে রঙ কালো, সেখানে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এঁদের মতে হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত দু-চার জাতি এখনও পুরো আর্য আছে, বাকী সমস্ত খিচুরিজাত,
১০
নইলে কালো কেন হল? কিন্তু ইওরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দু-চার বৎসরেই চুল ফের কালো হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য, বস্। কালো বলে ঘৃণা হয়, ইওরোপীরা অন্য নাম নিনগে। আমাদের তায় কি?

কিন্তু কালো হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী সুন্দর। এ-কথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না, কিন্তু এ-কথা জগৎপ্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা।

কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ-সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে—ছোঁড়া বলে; ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। অবশ্য এরা ভাল খায়, ভাল পরে, দেশ ভাল এবং সর্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে—অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের দেশেও যে দু-একটা বলবান্ জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, কত বয়সে বে করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর শাস্ত্র পড়ে দেখ ৩০, ২৫, ২০ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বে-র বয়স। আয়ু, বল, বীর্য এদের আর আমাদের অনেক ভেদ; আমাদের 'বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন পেরুলেই ফর্সা'; এরা তখন সব গা ঝেড়ে উঠছে।

আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদরোগে ফুসফুস রোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ, বৈরাগ্যবান্ হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাউঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সে জন্যেই কি ভারতের লোক সর্বদাই 'মরণ মরণ' আর 'বৈরাগ্য বৈরাগ্য' করছে? আমি তো এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে।

আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুঁড়ছি, কান ফুঁড়ছি গহনা পরবার জন্য। এরা এখন ভদ্রলোকে বড় নাক-কান ফোঁড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। 'গড়ন গড়ন' করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দী কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে।

পোষাক ও ফ্যাশন

এদের পোষাক কাজকর্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক ছাড়া [সাধারণ] মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদেরে মেয়েদের শাড়ী আর পুরুষদের চোগা-চাপকান-পাগড়ির সৌন্দর্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আঁটাসাটায় হয় না। আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজকর্মের পোষাক নেই; কাজ করতে গেলেই কাপড়-চোপড় বিসর্জন যায়। এদের ফ্যাশন কাপড়ে, আমাদের ফ্যাশন গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে।

ফ্যাশনটা কি, না—ঢঙ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ—প্যারিস শহর থেকে বেরোয়; পুরুষদের—লণ্ডন থেকে। আগে প্যারিসের নর্তকীরা এই ঢঙ ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোষাক পরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই করতে। এখন দোকানীর ঢঙ [সৃষ্টি] করে। কত ক্রোর টাকা যে এই পোষাক করতে লাগে প্রতি বৎসর, তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোষাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের চুলের রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে, কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী করতে হয়। তারপর দু-চারজন উচ্চপদস্থ মহিলা যা পরেন, বাকী সকলকে তাই পরতে হয়, না পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাশন! আবার এই ফ্যাশন ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে, বছরে চার ঋতুতে চার বার বদলাবেই তো, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে।

যারা বড় মানুষ, তারা দরজী দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক-—তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুটকো-ছাটকা মেয়ে-দরজী দিয়ে নূতন ধরনের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্তী ফ্যাশন যদি কাছাকাছি রকমের হয় তো পুরানো কাপড় বদলে-সদলে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষেরা ফি-ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর-বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইওরোপী লোকদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে—আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়—সেথায় গিয়ে হাজির হয়, এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় প্যারিস হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকীরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে! কিন্তু মেয়েদের টুপিটি আসল ফরাসী হওয়া চাই-ই চাই। যার তা নয় সে লেডি নয়।

ইংরেজের মেয়েদের আর জার্মান মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় প্যারিস ঢঙে পোষাক পরে না—দু-দশজন বড় মানুষ ছাড়া; এইজন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা খুব ভাল পোষাক পরে—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট প্যারিস বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে, তথাপি মাশুল দিয়েও মেয়েরা প্যারিস ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈরী পোষাক পরে। নানা রকমের নানা রঙের পশমিনা, বনাত, রেশমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক করছে। ঠিক ঢঙের পোষাক না হলে জেণ্টলম্যান বা লেডির রাস্তায় বেরুনই মুশকিল।

আমাদের দেশে এ ফ্যাশনের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুকছে। এ-সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতীদের নজর দিনরাত—কি বদলাচ্ছে বা না বদলাচ্ছে, লোকে কি রকম পছন্দ করছে, তার উপর; অথবা নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই সে ব্যবসাদার বড়মানুষ। যখন তৃতীয় ন্যাপলেঅঁ ফরাসী দেশের বাদশা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি (Eugenie) পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইওরোপ প্রতি বৎসর কিনত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ বদলে গেছে। শাল আর বিক্রী হয় না। আর আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু করে সময়মত বাজার দখল করতে পারলে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে, বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল।

এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দুশ হাত দিয়ে দেখছে, খাটছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে' লেখেননি—তা কখনই করব না, করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা-আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।

দেবাসুরের গল্প তো জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে—পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকেই সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মত, দেবতাগুলো অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তা হলেই দু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে।

পরিচ্ছন্নতা

দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়—উত্তম। দুনিয়ার এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের—চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে, কিছু বাঁচোয়া। স্নান নেই বললেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে-সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর, স্নানের কি কষ্ট! যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে-দিন ভেতরের কাপড় আণ্ডারওয়ার বদলায়। অবশ্য এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকানরা একটু বেশী! জার্মান—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিন্ কালেও না!!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লশুন খাওয়া, দিনরাত ঘর্মাক্ত, আর সাত জন্মে জলস্পর্শও না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত তো ছেলেমানুষ! 'স্নান' মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাহিরে দেখা যায়। আবার কি! প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ প্যারিস, বিদ্যা-শিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে—শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হল—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন 'ছেঁড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমিকাল, তাতে স্নান করবার যো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নিইগে। বারোটা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হল, স্নানের স্থান কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ী স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ী চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুশ-ফুশগুলো তো আসল ম্লেচ্ছ, তিব্বত থেকেই ও ঢঙ আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়ীতে একটা করে স্নানের-ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাত দেখ! আমরা স্নান করি কেন?—অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক! আবার দক্ষিণী ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাকে ঘষে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হোক ডুব লাগালেই হল। ওদের—সে এক বস্তা কাপড় খুলতে হবে তার বন্ধনই বা কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই, ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই, বাপ বেটার সামনে উলঙ্গ হবে—দোষ নেই। মেয়েছেলের সামনে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখনও কখনও অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইওরোপী বলে যে, শরীর-সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি তো দূরের কথা; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা! খেয়ে আঁচানো সকলের সামনে অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় বসে বমির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো—এটা অত্যাচার। ও-সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার দেশভেদে যে সকল কার্য অনিবার্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়! আমাদের গরম দেশে খেতে বসে আধ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্য দেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়ো—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই। না ছুঁলেই হল! এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে ময়লা সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না, অপেক্ষাও বড় বেশী করতে হবে না।

আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতী খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাঁধুনী স্নান করছে, কাঁপড় বদলেছে; হাঁড়িপত্র, উনুন—সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেকলে তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতী রাঁধুনীর চৌদ্দ-পুরুষে কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চামচে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে।

রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগল। কিন্তু ধপধপে কাপড় আর টুপি পরেছে। হয়তো একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রাশীকৃত ময়দার উপর নাচছে—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমি কাল—দরবিগলিত ঘাম পা বেয়ে সেই ময়দায় সেঁধুচ্ছে। তারপর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পরা কনুই পর্যন্ত সাদা দস্তানা-পরা চাকর এনে সামনে ধরলে! কোন জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্যন্ত দস্তানা।

আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর থালসুদ্ধ অন্নব্যঞ্জন ঝাড়লে; বামুনের কাপড়ে খামছে ময়লা উঠছে। হয়তো মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল কলাপাতা ছেঁড়ার দরুন একাকার হয়ে এক অপূর্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে!!

আমরা দিব্যি স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইওরোপে ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটা ধপধপে পোষাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগাগোড়ার তফাত—হিঁদুর সেই অন্তদৃষ্টি, তা আগাপাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতী—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতীর কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতীর মেজে কার্পেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল!! হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর—দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতীর পয়োনালী রাস্তার নীচে—টাইফয়েড ফিভারের বাসা!! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতী করছেন বাইরে সাফ।

চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা—সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই—'আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ।' আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া।—সব রকমে পরিষ্কার হওয়া আচার-ভ্রষ্টের কখনও ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া—কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!

আহার ও পানীয়

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধীয় অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্যের মতে
১১
'আহার' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়জ্ঞান আর রামানুজাচার্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ কার্য কি করেই বা করে? কদর্য আহারে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্যয় হয়, এ-কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ দোষে এক জিনিষকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে আধারটা নিয়েই টানা-হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ লশুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ—'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।' তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরুদের জীবনী পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমণ্ডলে আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোন দেশ নেই। নিমিত্ত-দোষ সম্বন্ধে বর্তমান কালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র দেখতেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্তদোষে দুষ্ট ময়লা আবর্জনা পচা পক্কড় সব ওতে আছেন—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার দোকানে—বাজারে খাওয়ার ফল। এই যে প্রসাবের ব্যারামের প্রকোপ, ও-ও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণদোষ, প্রস্রাবের ব্যারাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি 'বিষলড্ডকে'র অভাব। এ-কথা বিস্তার করে পরে বলছি।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীন কালে চলেছে এবং আধুনিক কালে চলছে। প্রথম—প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ—আমিষ আর নিরামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। এক পক্ষ বলছেন—কোন কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর এক পক্ষ বলছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বলছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর; আবার বলছেন, জীবঘাত কর না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে-সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে-সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়, মনু বলছেন। অপর দিকে জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক, যে যজ্ঞ করবে বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন।

আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন!
১২
বর্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে না।পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নিরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তাহলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপাট হয়ে যেত এত দিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন, হাওয়াতে তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে।ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর এক পক্ষ বলছেন—সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠশুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা বলে কি দুনিয়াসুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী

জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধুম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্যসমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন, একান্ত অন্যায়। এই তো বাদ-বিবাদ চলছে।

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদ আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈকি। যতদিন মনুষ্য-সমাজে এই ভাব থাকবে—'বলবানের জয়', ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোন রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার করতে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন! রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কোঁদল। এক পক্ষ বলছেন যে ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও-সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক (starchy) খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরুকে পর্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রোগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতা প্রভৃতি হরিৎ সব্‌জিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম।বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু, গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায় তো অপক্ক অবস্থায় যখন স্টার্চ (starch) অধিক হয়নি। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ—এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল ফলাহারী অনেক দিন পর্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে জং ধরতে দেয় না।

এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া দাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। সে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকী আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?

ভাজা জিনিষগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ী। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গরমে সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙলা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরির বর্ণনা করছেন? ও লুচি-কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি 'পাকি রসুই' খেয়ে থাকে এমন লোক তো দেখিনি! মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুকপ্রিয়; দু-চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরীবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উল্টো আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্বে লোকে কালেভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত; এখন শহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা শহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণরোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র! খিদে পেলেও কচুরি জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়ায় হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকীটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও; তবে ও পশ্চিমী নানাপ্রকার গরম মসলাগুলো বাদ দিয়ে। মসলাগুলো খাওয়া নয়—ওগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইশুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; প্যারিস রাজধানীর ঐ সূপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইশুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ ধনে জিরে মরিচ লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে তো উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু-চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকী সব বদহজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হল? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদহজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বস না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটে নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্'। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনর আনা! পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন [ধনী] হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোন খাম্বীরদার জিনিষ খাবে না, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্বপ্রকার খাম্বীরদার জিনিষের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে-

কোন জিনিষ মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম 'শুক্ত'; তা খেতে নিষেধ—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিষ। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয় তো তাকে পুনর্বার খুব আগুনে সেঁকে খাও।

অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জলশুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিলটার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিলটার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠা প্লেগের বীজ তা যেমন তেমনি থাকে; অধিকন্তু ফিলটারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিলটারকরা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই; তারপর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিলটার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিলটারের মধ্যে দিশী তেকাঠার ওপর ঐ যে তিন-কলসীর ফিলটার উনিই উত্তম, তবে দু-তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফটকিরি দেওয়া—গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফটকিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফটকিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতী ফিলটার-মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফটকিরি-থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিলটার-মিলটার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে; তারপর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পুরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায় [তার পরিবর্তে]। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি তাই।

যার দু-পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাইমণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান দেশে বাস, দিনরাত কসরত! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুকড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রসাবের ব্যামো হয়ে মরে; 'কলকেত্তা'ই হওয়ার এই ফল!! আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার- বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে তো অমনি একটু ওষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর্ ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আস্‌্গে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস। খাবার নকল কি ইংরেজের করতে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে!! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেওয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও টাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে!! নিজেরা তো উৎসন্ন গেছ, আবার দেশসুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক! তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর-মর হবে, তবু বলবে না যে, এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে!! কোন রকম করে শহুরে হবে!!

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তো এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

গরীব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্যবিশেষ; এবং শাক-তরকারি মাছ-মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরীবের প্রধান খাওয়া তাই; অন্যান্য জিনিষ আনুষঙ্গিক। যেমন বাঙলা ও উড়িষ্যায়, মান্দ্রাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডাল তরকারি, কখনও কখনও মাছ মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সর্বদেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানাপ্রকার বজরা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংস, সমস্তেরই—সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্য ব্যবহার, তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা—এমন কি রাজারাও—যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধ সের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।

পাশ্চাত্যদেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে [তাদের] এবং ধনী দেশের গরীবদের মধ্যে ঐ প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য; মাংসের চাটনি মাত্র—তাও কালেভদ্রে। স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-ওয়াইন অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপে-খানেক না খেলে তো আর নেশা হবে না এবং তা কেউ খেতে পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ-মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষারস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল—যেমন রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক-আধ টুকরো সুঁটকি মাছ ও আলু।

ইওরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম—অর্থাৎ রুটি ভাত প্রভৃতি চাটনি এবং মাছ-মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি-খাওয়া নাই বললেই হয়। মাছ মাছই এল, মাংস মাংসই এল, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত-রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদলান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিষ থাকে তো দশবার থালা বদলাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্তো এল, তারপর থালা বদলে শুধু ডাল এল, আবার থালা বদলে শুধু ঝোল এল, আবার থালা বদলে দুটি ভাত, নয় তো দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিষ অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না।

ফরাসী চাল—সকালবেলা 'কফি' এবং এক-আধ টুকরো রুটি-মাখম; দুপুরবেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালী, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম; জার্মানরা ক্রমাগতই খাচ্ছে—পাঁচ বার, ছ-বার, প্রত্যেক বারেই অল্পবিস্তর মাংস। ইংরেজরা তিনবার—সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকানদের তিনবার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর।

তবে এ সকল দেশেই 'ডিনার'টা প্রধান খাদ্য—ধনী হলে তার ফরাসী রাঁধুনী এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু আধটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোন চাটনি বা সবজি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তারপর সূপ, তারপর আজকাল ফ্যাশন—একটা ফল, তারপর মাছ, তারপর মাংসের একটা তরকারি, তারপর থান-মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সবজি; তারপর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি, তারপর মিষ্টান্ন, শেষ কুলপি—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদলাচ্ছে—শেরি, ক্ল্যারেট, শ্যামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুলপি একটু আধটু। থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ সব বদলাচ্ছে; আহারান্তে 'কফি'—বিনা-দুগ্ধ, আসবমদ্য—খুদে খুদে গ্লাসে, এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারীর সঙ্গে মদের রকমারী দেখাতে পারলে তবে 'বড়োমানুষি চাল' বলবে। একটা খাওয়ায় আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধূম এরা করে।

আর্যরা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকির উপর থালা রেখে এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙালী, উড়ে, তেলিঙ্গী, মালাবারী প্রভৃতি মাটিতেই 'সাপড়ান'। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙট পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ-যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইওরোপীরা টেবিলের ওপর হতে কেদারায় বসে—হাত দিয়ে পূর্বে খেত, এখন নানাপ্রকার কাঁটা-চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরত বটে—যেমন আমাদের পানওয়ালীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটের মত করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে একবাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠল, চাষ বাস শিখলে; আরণ্য পশুকুলের মত একদিন বেদম খাওয়া, আর দু-পাঁচ দিন অনশন—ঘুচল; আহার নিত্য জুটতে লাগল; কিন্তু পচা জিনিষ খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম জন্মায় না; নিত্য ভোজন—মাছ মাংস; ১০।৫ দিনে অরুচি বোধ হলে একটুকরো পচা মাংস খায়— অরুচি সারে।

ইওরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে—যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধ হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই সুস্বাদ!! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ-লশুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে, দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ-লশুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লশুন, গেঁয়ো শোর, গেঁয়ো মুরগী খাওয়া এক জাতের [পক্ষে] পাপ, সাজা—জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা তারা ভয়ে প্যাঁজ-লশুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিং খেতে আরম্ভ করলে! পাহাড়ী গোঁড়া হিঁদু লশুনে-ঘাস প্যাঁজ-লশুনের জায়গায় ধরলে। ও-দুটোর নিষেধ তো আর পুঁথিতে নেই!!

সকল ধর্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধি-নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিশ্চানী ধর্মে। জৈন-বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মূলো প্রভৃতি—তাও খাবে না; খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ
১৩
নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোন জিনিষ যদি হেঁশেলে ঢোকে যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, তো সে সব ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া য়াহুদী অন্য কোন জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁদুর মত য়াহুদীরা বৃথা-মাংস

খায় না। যেমন বাঙলা দেশে ও পাঞ্জাবে মাংসের নাম 'মহাপ্রসাদ'। য়াহুদীরা সেই প্রকার 'মহাপ্রসাদ' অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না। কাজেই হিঁদুর মত য়াহুদীদেরও যে-সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নেই। মুসলমানরা য়াহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ, মাছ, মাংস একসঙ্গে খায় না এইমাত্র, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই যে সর্বনাশ, অত মানে না। য়াহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য—খাওয়া সম্বন্ধে; তবে য়াহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পাঞ্জাবে মুসলমান-হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া একটা ধর্মবিশেষ। দক্ষিণ-দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁয়ো শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়, গেঁয়ো খায় না। বাঙলা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয়—এক রকম চালে চলে। মনূক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলে সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্যন্ত—বাঙালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইনের বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

এলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে—যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নেই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখতে যায় বল। তা ছাড়া রোগ—বুনো জানোয়ারের কম!

দুধ—পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখনও কখনও সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিষ, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায়, আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখনকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কদের জন্যও এক পোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচি ছেলেদের জন্য 'ফিডিং বটল্' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে—দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই যে, রোগা-পটকাগুলো আর বড় 'বড়' হচ্ছে না, তারা ঐখানেই জন্মের শোধ দুধ খাচ্ছে; আর যেগুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠছে, সেগুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ানো প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠত, সেগুলো এক রকম সুস্থ সবল আজীবন থাকত! মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেঁলে বাঁচত!! সে তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত—উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের তুলসীতলার খোকা ও মা—দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকদের হাত এড়াত বলে।

বেশভূষা

সকল দেশেই কাপড়ে চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে?' শুধু ব্যাতনে নয়, 'কাপড় না দেখলে ভদ্র অভদ্র বুঝবো ক্যামনে' সর্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরুতে পারে না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবার পাগড়ি মাথায় না দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসীরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে। এখনও ইওরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোষাক বিদ্যমান; কিন্তু ভদ্র হলেই, দুপয়সা হলেই অমনি সে পোষাক অন্তর্ধান হন, আর ফরাসী পোষাকের আবির্ভাব। কাবুলী পাজামা-পরা ওলন্দাজী চাষা, ঘাগরা-পরা গ্রীক, তিব্বতী-পোষাক-পরা রুশ যেমন 'বোদ্র' হয়, অমনি ফরাসী কোট প্যাণ্টালুনে আবৃত হয়। মেয়েদের তো কথাই নেই, তাদের পয়সা হয়েছে কি, পারি রাজধানীর পোষাক পরতে হবেই হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী এখন ধনী জাত; ও-সব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসী নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষদের পোষাক 'লণ্ডন মেড' আর মেয়েদের পারিসিয়েন নকল। যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈয়ারী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে। আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাসুল বসায়, সে মাসুল দিয়েও পারি-লণ্ডনের পোষাক পরতে হবে। এ কাজ একা আমেরিকানরা পারে—আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা!

প্রাচীন আর্যজাতিরা ধুতি-চাদর পরত; ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা—লড়ায়ের সময়। অন্য সময় সকলেরই ধুতি-চাদর। কিন্তু পাগড়িটা ছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে-মদ্দে পাগড়ি পড়ত। এখন যেমন বাঙলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপনি-মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার কাজ হল, কিন্তু পাগড়িটা চাই; প্রাচীনকালেও তাই ছিল—মেয়ে-মদ্দে। বৌদ্ধদের সময়ের যেসকল ভাস্কর্যমূর্তি পাওয়া যায়, তারা মেয়ে-মদ্দে কৌপীন-পরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনি পরে বসেছেন সিংহাসনে; তদ্বৎ মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক-পা মল ও এক-হাত বালা; কিন্তু পাগড়ি আছে!! সম্রাট্ ধর্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে একটা ডমরু-আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন! নর্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ি আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়িতে। তবে রাজসামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চোস্ত ইজার ও চোগা। সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল; রাজা ঋতুপর্ণ আদুড় গায়ে বে করতে চললেন। ধুতি-চাদর আর্যদের চিরন্তন পোষাক, এইজন্যই ক্রিয়াকর্মের বেলায় ধুতি-চাদর পরতেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের পোষাক ছিল ধুতি-চাদর; একখান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম 'তোগা', তারি অপভ্রংশ এই 'চোগা'। তবে কখনও কখনও একটা পিরানও পরা হত। যুদ্ধকালে ইজার জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বাচৌড়া চারকোণা জামা, যেমন দুখানা বিছানার চাদর লম্বালম্বি সেলাই করা, চওড়ার দিক্ খোলা। তার মধ্যে ঢুকে কোমরটা বাঁধলে দুবার—একবার বুকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তারপর উপরের খোলা দুপাট দুহাতের উপর দু জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আটকে দিলে যেমন—উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ীরা কম্বল পরে। সে পোষাক অতি সুন্দর ও সহজ। ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরানীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে শেখে। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের সুখস্বচ্ছন্দতার আদিগুরু। অনাদিকাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে যন্ত্র তন্ত্র কত খাওয়ার জন্য, এবং কাটা পোষাক নানা রকম, ইজার-জামা টুপিটাপা পরে।

সিকন্দর শা ইরান জয় করে, ধুতি-চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার-জামা চালিয়ে দিলেন।

গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকী কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা-পাজামা ইত্যাদি নানানখানা হয়। তারপর আদুড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই তো ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশন বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশন।

ঠাণ্ডা দেশমাত্রেই এজন্য সর্বদা সর্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সামনে বেরুবার যো নেই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার যো নেই। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা, কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে শাড়ী কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নেই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখানো!

পাশ্চাত্য দেশের নর্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাবার জন্য অনাচ্ছিদিত। এদের নাচের মানে, তালে তালে শরীর অনাবৃত করে দেখানো। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের; নর্তকী বেশ্যা সর্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্য দেশে মেয়ে ছেলে সর্বদাই গা ঢাকা, গা আদুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয়; আমাদের দেশে দিনরাত আদুড় গা, পোষাক পরে ঢেকেঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক। মালাবার দেশে মেয়ে-মদ্দের কৌপীনের উপর বহির্বাসমাত্র, আর বস্ত্রমাত্রই নেই। বাঙালীরও তাই, তবে কৌপীন নাই এবং পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েরা গা-টা মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে ঢাকে।

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষে পুরুষে সর্বাঙ্গ অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত। বাপ-ছেলেয় সর্বাঙ্গ উলঙ্গ করে স্নানাদি করে,

দোষ নেই। কিন্তু মেয়েদের সামনে, বা রাস্তা-ঘাটে, বা নিজের ঘর ছাড়া—সর্বাঙ্গ ঢাকা চাই।

এক চীনে ছাড়া সর্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখছি—কোন বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা নেই। চীনে মেয়ে-মদ্দে সর্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি-দুরস্ত; খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। ক্রিশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে। এখন বাইবেল-পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা-মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার পড়ে চীনে তো চটে অস্থির। বললে, ‘এই বই কিছুতেই এ দেশে চালানো হবে না, এ তো অতি অশ্লীল কেতাব’; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোষাক পরে, পর্দার বার হয়ে চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটাবুদ্ধি, বললে—‘সর্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম এসেছে।’ এই হচ্ছে চীনের ক্রিশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোন ধর্মের উপর আঘাত করে না। শুনছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।

আবার এ পাশ্চাত্য দেশে দেশবিশেষে লজ্জাঘেন্নার তারতম্য আছে। ইংরেজ ও আমেরিকানের লজ্জা-শরম একরকম; ফরাসীর আর একরকম; জার্মানের আর একরকম। রুশ আর তিব্বতী বড় কাছাকাছি; তুরস্কের আর এক ডোল; ইত্যাদি।

রীতিনীতি

আমাদের দেশের চেয়ে ইওরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটা-ভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে; তারপর পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে জল খাওয়ার চোটে। গরমিকালে আমরা বাঁশ [বাঁশের নল] বার করে দিই লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা, বল? দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি!

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি! পাশ্চাত্যদেশের আহার মাংসময়, কাজেই অল্প; আর ঠাণ্ডা দেশে জল খাওয়া নেই বললেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসীরা জলকে বলে ব্যাঙের রস, তা কি খাওয়া চলে? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশী, কারণ ওদের দেশ গরমিকালে ভয়ঙ্কর গরম, নিউ ইয়র্ক কলকেতার চেয়েও গরম। আর জার্মানরা বড্ড 'বিয়র' পান করে—কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢক ঢক জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা? এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, তো সে বেয়াদবির আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়ো, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশীই হন না; কিন্তু পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়াটা কেমন?

ইংলণ্ডে, আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার যো নেই মেয়েদের সামনে। পায়খানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোন প্রকার অসুখের কথা মেয়েদের সামনে বলবার যো নেই, অবশ্য বুড়ী-টুড়ি আলাপী আলাদা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সামনে ও-নামটিও আনবে না।

ফরাসী দেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থানের পাশেই পুরুষদের; এরা এ-দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা ও-দোর দিয়ে যাচ্ছে; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর আলাদা। রাস্তার দু ধারে মাঝে মাঝে প্রসাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র, মেয়েরা দেখছে, তায় লজ্জা নাই—আমাদের মত। অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জার্মানদের আরও কম।

ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে 'ঠ্যাঙ' বলবার পর্যন্ত যো নেই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখখোলা; জার্মান রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।

কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে—তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সে সব কথা কওয়া চলে। আমেরিকায় পরিবারের পুরুষবন্ধু‌ও আত্মীয়তা হলে বাড়ীর যুবতী মেয়েদেরও শেকহ্যাণ্ডের স্থলে চুম্বন করে। আমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের নামগন্ধটি পর্যন্ত গুরুজনের সামনে হবার যো নেই।

এদের অনেক টাকা। অতি পরিষ্কার এবং কেতাদুরস্ত কাপড় না পরলে সে ছোটলোক—তার সমাজে যাবার যো নেই। প্রত্যহ ধোপদস্ত কামিজ, কলার প্রভৃতি দুবার তিনবার বদলাতে হবে ভদ্রলোককে! গরীবরা অত শত পারে না; ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কোঁচকা থাকলেই মুশকিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাকলেই মুশকিল। গরমিতে পচেই মর আর যাই হোক, দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথু ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি!!

পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা

ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। 'বামে বামা ... দক্ষিণে পানপাত্রং ... অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং ... কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ'।১৫ প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার—মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্টাণ্ট তো ইওরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে-ধর্মে যিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান, জেগে বসছেন 'মা'! শিশু যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'! বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর (Field-marshal) সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা'। 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী'—দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

আর মেয়ের পুজো। এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপুজো কুমারী-সধবা পুজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপুজো। তবে আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে-সে স্ত্রীলোকের পুজো, চেনা-অচেনার পুজো, ভদ্রকুলের তো কথাই নাই, রূপসী যুবতীর তো কথাই নাই। এ পুজো ইওরোপে আরম্ভ করে মূরেরা—মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা—যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাদের থেকে ইওরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগল, আর সে শক্তির সঞ্চার হল ইওরোপে, 'মা' মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন ক্রিশ্চানের ঘরে।

ইওরোপের নবজন্ম

এ ইওরোপ কি? কালো, আদকালা, হলদে, লাল, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি?

এ ইওরোপ বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রাঁস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইওরোপে, ইওরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভাল-মন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে—এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি মুক্তা প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইওরোপের কর্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ—সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী, দরিদ্র তাদের ঘোর-দোর ক্ষেত-ময়দান ঘষে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবিখানি করে রাখছে। এক জাপান ছাড়া এ ভাব আর কোথাও নাই। সেই ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন—মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ—একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে। এই ফ্রাঁস প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gauls), রোমক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোমসম্রাজ্যের বিনাশের পর ইওরোপে একাধিপত্য লাভ করলে, এদের বাদশা শার্লামাঞন (Charlemagne) ইওরোপে ক্রিশ্চান ধর্ম তলওয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন এই ফ্রাঁ জাতি হতেই এশিয়াখণ্ডে ইওরোপের প্রচার, তাই আজও ইওরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গী, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গ ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীস ডুবে গেল। রাজচক্রবর্তী রোম বর্বর (Barbars) আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল। ইওরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি বর্বরজাতি এশিয়াখণ্ডে প্রাদুর্ভাব হল—আরবজাতি। মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগল। মহাবল পারস্য আরবের পদানত হল, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান ধর্ম আর এক রূপ ধারণ করলে; সে আরবী ধর্ম আর পারসিক সভ্যতা সম্মিলিত হল।

আরবের তলওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যে পারস্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতবর্ষ হতে নেওয়া। পূর্ব পশ্চিম দুদিক হতে মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ ইওরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অন্ধ ইওরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইতালীতে প্রবেশ করলে, ধরা-রাজধানী রোমের মৃত শরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগল—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে, প্রাচীন ইতালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগল, এর নাম রেনেসাঁ (Renaissance)—নবজন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম হল ইতালীর। ইওরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। সে ক্রিশ্চানী ষোড়শ শতাব্দীতে—যখন আকবর, জাহাঁগীর, শাজাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট্ ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময় ইওরোপের জন্ম হল।

ইতালী বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইওরোপে ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান্ অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে। চারিদিক হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীর্যধারণের শক্তি ছিল না, ভারতের মত সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইওরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগল, সে এক ধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগল; ইওরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়াতে লাগল, ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগল; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠল, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠল; জাপান এশিয়ার নূতন জাত।

পারি ও ফ্রাঁস

এই পারি নগরী সে ইওরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ—না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইওরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের একাডেমির নকল; এই পারি ঔপনিবেশ-সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধ-শিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল সকল ইওরোপী ভাষায়; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে শহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জার্মান ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হোক বা শিল্পে হোক, বা সমাজনীতিতেই হোক। এই ফরাসী সভ্যতা স্কটল্যাণ্ডে লাগল, স্কটরাজ ইংলণ্ডের রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুললে; স্কটরাজ স্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি।

আর এই ফ্রাঁস স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি নগরী হতে ইওরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইওরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে। সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতে'র (Egalite', Liberte, Fraternite—সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব) ধ্বনি ফ্রাঁস হতে চলে গেছে; ফ্রাঁস অন্য ভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্‌শ করছে।

একজন স্কটল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বললেন যে, পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য; কিন্তু এ-কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোন নূতন ভাব এ জগৎকে দেবার থাকে তো এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে তো ইওরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী—এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের দেশে এই পারি নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়, এ পারি মহাকদর্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ-কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে!

কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউ ইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাত এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।

ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল? নইলে দুনিয়ায় যার দু-পয়সা হয়, সে অমনি পারি-নগরী অভিমুখে ছোটে কেন? রাজা-বাদশারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।

তাও অধিকাংশ কদর্য নাচ-তামাসা বিদেশীর জন্য। ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল কাফে, যাতে একবার খেলে সর্বস্বান্ত হতে হয়, এ-সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব-কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচকে মুচকে হাসে।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিকান জার্মান ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ করে সব দেখতে শুনতে পায়। দু-চার দিনের আলাপেই আমেরিকান বাড়ীতে দশ দিন বাস করবার নিমন্ত্রণ করে; জার্মান তদ্রূপ; ইংরেজ একটু বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাত, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে আর বাস করতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জানবার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়। বলি, মেছবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি? তেমনি এ পারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বে-র পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে; বে-থা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোন বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে পুজো—সর্বত্র নর্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই। এ-কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী-সম্বন্ধী আচার পৃথিবীর সর্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ-মানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুশকিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া, তেমনি। আর ইওরোপী পুরুষসাধারণ ও-বিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও-বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও-বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে অনেক স্থলে তার মা-বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে, পাছে ছেলেটা 'মেনিমুখো' হয়। পুরুষের এক গুণ পাশ্চাত্য দেশে চাই—সাহস; এদের 'ভার্চু' (virtue) শব্দ আর আমাদের 'বীরত্ব' একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সততা বলে। মেয়েমানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উল্টা, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বল? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্যের আবশ্যক তত নাই; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলেপিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ-মানুষে দশ গণ্ডা বে করলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশবৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা একসঙ্গে চলে না—ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।'
১৬

যাক, মোদ্দা এমন শহর আর ভূমণ্ডলে নাই। পূর্বকালে এ শহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙালীটোলার মত। আঁকাবাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে দুটো বাড়ী এক-করা খিলান, দ্যালের গায়ে পাতকো, ইত্যাদি। এবারকার এগজিবিশনে একটা ছোট পুরানো পারি তৈরী করে দেখিয়েছি। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদলেছে, এক-একবার লড়াই-বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিষ্কার নূতন ফর্দা
১৭
পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় ন্যাপোলেআঁর (Napoleon III) তৈরী। তু-ন্যাপোলেআঁর মেরে কেটে জুলুম করে বাদশা হলেন। ফরাসীজাতি সেই প্রথম বিপ্লব (French Revolution) হওয়া অবধি সতত টলমল; কাজেই বাদশা প্রজাদের খুশী রাখবার জন্য, আর পারি নগরীর সতত-চঞ্চল গরীব লোকদের কাজ দিয়ে খুশী করবার জন্য ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য—পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রইল; রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরানো শহর—পগার পাঁচিল সব ভেঙে বুলভারের (boulevards) অভ্যুদয় হতে লাগল। এবং তা হতেই শহরের সর্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে (Champs Elypsees)। রাস্তা তৈরী হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া যে, মধ্যখানে এবং দুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং একস্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম 'প্লাস্ দ লা কনকর্দ' (Place de la Concorde) এই 'প্লাস্ দ লা কনকর্দে'র চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক যান্ত্রিক নারীমূর্তি। তার মধ্যে একটি মূর্তি হচ্ছে ষ্ট্রাসবুর্গ নামক জেলার। ঐ জেলা এখন ডইচ
১৮
(জার্মান)-রা ১৮৭২ সালের লড়ায়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ ফ্রাঁসের আজও যায় না, সে মূর্তি দিনরাত প্রেতোদ্দিষ্ট ফুলমালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয়-স্বজনের গোরের ওপর দিয়ে আসে, সেই রকম বৃহৎ মালা দিনরাত সে মূর্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর চাঁদনি-চৌক কতক অংশে এই 'প্লাস্ দ লা কনকর্দের' মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ, বিজয়তোরণ আর বিরাট নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্যমূর্তি। মহাবীর প্রথম ন্যাপোলেআঁর স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে ন্যাপোলেআঁর সময়ের যুদ্ধ-বিজয় অঙ্কিত। ওপরে তাঁর মূর্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন; তার নাম 'লেটর দ ক্যাশে' (Lettre de Cachet)—মানে, রাজ-মুদ্রাঙ্কিত লিপি। তারপর সে ব্যক্তি আর কি করেছে কিনা, দোষী কি নির্দোষ, তার আর জিজ্ঞাসা-পড়া নেই, একেবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে; সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারু উপর চটলে রাজার কাছ থেকে ঐ শীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশসুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠল, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা', 'সব সমান', 'ছোট বড় কিছুই নয় '—এ ধ্বনি উঠল, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজারাণীকে আক্রমণ করলে, সে সময় প্রথমেই এ মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটায় এক রাত ধরে নাচগান আমোদ করলে। তারপর রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেললে, রাজার শ্বশুর অষ্ট্রীয়ার বাদশা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে, প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারাণীকে মেরে ফেললে, দেশসুদ্ধ লোকে 'স্বাধীনতা সাম্যের' নামে মেতে উঠল, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র (republic) হল; অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধরতে পারলে তাকেই মেরে ফেললে, কেউ কেউ উপাধি-টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিশে গেল। শুধু তাই নয়, বললে 'দুনিয়াসুদ্ধ লোক, তোমরা ওঠ, রাজা-ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হোক, সকলে সমান হোক!' তখন ইওরোপসুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল—এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজেদের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায় তাই তাকে নেবাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে চারিদিক থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্তৃপক্ষেরা 'লা পাত্রি আ দাঁজে'—জন্মভূমি বিপদে—এই ঘোষণা করে দিলে; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ 'মার্সাইএ' মহাগীত (La Marseillaise) গাইতে গাইতে—উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে, জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পান্ন ফরাসী প্রজা-ফৌজ বিরাট সমগ্র ইওরোপীয় চমুর সম্মুখীন হল, বড় ছোট ধনী দরিদ্র—সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল, 'পরিত্রাণায় ... বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'
১৯
বেরুল। সমগ্র ইওরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর—তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে ধরা কাঁপতে লাগল, তিনি ন্যাপোলেআঁর।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব—বন্দুকের নালমুখে, তলওয়ারের ধারে ইওরোপের অস্থিমজ্জার প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন-রঙা ককার্ডের (Cocarde) জয় হল। তারপর ন্যাপোলেআঁ ফ্রাঁস মহারাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্য বাদশা হলেন। তারপর তাঁর কার্য শেষ হল; ছেলে হল না বলে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী ভাগ্যলক্ষী রাজ্ঞী জোসেফিনকে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রীয়ার বাদশার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরল, রুশ জয় করতে গিয়ে বরফে তাঁর ফৌজ মারা গেল। ইওরোপ বাগ পেয়ে তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরানো রাজার বংশের একজনকে তক্তে বসালে।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁসসুদ্ধ লোক আবার তাঁকে মাথায় করে নিলে, রাজা পালাল। কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙেছে, আর জুড়ল না—আবার ইওরোপসুদ্ধ পড়ে তাঁকে হারিয়ে দিলে, ন্যাপোলেঅঁ ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন; ইংরেজরা তাঁকে 'সেণ্ট হেলেনা' নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখলে—আমরণ। আবার পুরানো রাজা এল, তার ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠল, রাজা-ফাজা তাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর এক ভাইপো এ-সময়ে ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতি-পাত্র হলেন, ক্রমে একদিন ষড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদশা ঘোষণা করলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁ; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জার্মান-যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

পরিণামবাদ

যে পরিমাণবাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণামবাদ ইওরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্মে ছিল এই যে—দুনিয়াটা সব টুকরা টুকরা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, মাটি, পাথর ধাতু প্রভৃতি—সব আলাদা আলাদা! ভগবান্ ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কিনা, বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা, তফাত বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধ এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে; এরই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও-সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বললেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম' আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া', 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হল জ্ঞানের চরম সীমা।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি এ-কথাটা এখন কেউ বুঝতে না পারে তো তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি। মোদ্দা, এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে—জড় বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে 'এক' কেমন করে হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে ওখানটা বুদ্ধির অতীত, এরাও তাই করেছে। তবে সে 'এক' কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।

সমাজের ক্রমবিকাশ

কাজেই এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী—Evolutionist. যেমন ছোট জানোয়ার বদলে বদলে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখনও কখনও ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে; তেমনি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় দুম করে জন্ম পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস করছে না। বিশেষ এদের বাপ-দাদা কাল না পরশু বর্বর ছিল, তা থেকে অল্পদিনে এই কাণ্ড। কাজেই এরা বলছে যে, সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে এবং উঠছে। আদিম মানুষ কাঠ-পাথরের যন্ত্রতন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মত কুঁড়েঘরে গুজরান করত। এর নিদর্শন সর্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোন কোন স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার করতে শিখলে, সে নরম ধাতু—টিন আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র করতে শিখলে। প্রাচীন গ্রীক, বাবিল, মিসরীরাও অনেকদিন পর্যন্ত লোহার ব্যবহার জানত না—যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই পত্র পর্যন্ত লিখত, সোনা রুপো ব্যবহার করত, তখন পর্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম নিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করত, সোনা রুপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোনা-রুপোর লোভেই স্পানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন করলে)। কিন্তু সে সমস্ত কাজ চকমকি পাথরের অস্ত্রদ্বারা অনেক পরিশ্রমে করত, লোহার নাম-গন্ধও জানত না।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষবাস শিখলে, পশুপালন করতে শিখলে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কাজ করতে লাগল। অথবা সময়মত আহারেরও জন্য জানোয়ার পালতে লাগল। গরু, ঘোড়া, শূকর, হাতী, উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পশু-পক্ষী মানুষের গৃহপালিত হতে লাগল! এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

আবার চাষবাস আরম্ভ হল। যে ফল-মূল শাক-সবজি ধান-চাল মানুষে খায়, তার বুনো অবস্থা আর এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল বুনো ঘাস নানাপ্রকার সুখাদ্য বৃহৎ ও উপাদেয় ফলে পরিণত হল। প্রকৃতিতে আপনি-আপনি দিনরাত অদলবদল তো হচ্ছেই। নানাজাতের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী শরীর সংসর্গে দেশ-কাল-পরিবর্তনে নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ-সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে তরুলতা, জীবজন্তু বদলাচ্ছিলেন, মানুষ জন্মে অবধি সে হুড়মুড় করে বদলে দিতে লাগল। সাঁ সাঁ করে এক দেশের গাছপালা জীবজন্তু অন্য দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগল, তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানাপ্রকার অভিনব জীবজন্তুর, গাছপালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে লাগল।

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌনসম্বন্ধ উপস্থিত হল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্বসমাজে মায়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাকত না। মায়ের নামে ছেলেপুলের নাম হত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাকত ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন-পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বললে, 'যেমন এ ধনধান্য আমার' আমি চাষবাস করে বা লুঠতরাজ করে উপার্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায় তো আমি বিরোধ করব', তেমনি বললে, 'এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে তো বিরোধ হবে।' বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হল। মেয়েমানুষ—পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হল। প্রাচীন রীতি—একদলের পুরুষ অন্যদলে বে করত। সে বিবাহও জবরদস্তি—মেয়ে ছিনিয়ে এনে। ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদলে গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চলল; কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে। এখনও প্রায় সর্বদেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে। বাঙলাদেশে, ইওরোপে চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয় মেয়েরা বরযাত্রীদের গালিগালাজ করে, ইত্যাদি।

দেবতা ও অসুর

সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত; যারা সমতল জমিতে, তাদের—চাষবাস; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগল; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শিকার করে খেতে লাগল। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হতে লাগল। যাদের শরীর দিনরাত খোলা হাওয়ায় থাকে, মাংসপ্রধান আহার তাদের; আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্যপ্রধান আহার তাদের; অনেক পার্থক্য হতে লাগল! শিকারী বা পশুপাল বা মৎসজীবী আহারে অনটন হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুঠতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগল, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগল।

দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর উদ্যানে বাস, পরিধান—বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড় পর্বত মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস; আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল; পরিধান ছাল; আর [আহার] বুনো জিনিষ বা ভেড়া ছাগল গরু, দেবতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে যা ধান-চাল। দেবতার শরীর শ্রম সইতে পারে না, দুর্বল। অসুরের২০ শরীর উপবাস, কৃচ্ছ, কষ্ট-সহনে বিলক্ষণ পটু।

অসুরের আহারাভাব হলেই দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধনধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগল। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু; আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্রতন্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র—সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাষবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানাতে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় তো সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে পরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায়, তখন হয় তাদের সমুদ্রমধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগল লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগল। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজিতি চলতে লাগল।

এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা রকমে নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা বিদ্যার আলোচনা চলল। একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগল, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিষটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; সে পাহারা দিলে, সে জুলুম, করে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। সে জিনিষ তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান্' ডাকতে লাগল।

ক্রমে এই সকল ভাব—প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট মরে না। যেগুলো পূর্ব জন্মে
২১
ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সেগুলো সভ্য-জন্মে বোম্বেটে ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগল। বন নেই যে সে শিকার করে, কাছে পাহাড় পর্বতও নেই যে ভেড়া চড়ায়; জন্মের দরুন শিকার বা ভেড়া চড়ানো বা মাছ ধরা কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাজেই ডাকাতি করে, চুরি করে; সে যায় কোথায়? সে 'প্রাতঃস্মরণীয়া'দের কালের মেয়ে, এ জন্মে তো আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমে নানা ঢঙের, নানা ভাবের, নানা সভ্য-অসভ্য, দেবতা-অসুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান্ বিরাজ করছেন—সাধু নারায়ণ, ডাকাত-নারায়ণ ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আসুরী হতে লাগল।

জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইওরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।

বর্তমান কালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অসুরের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে পশুপাল মৃগয়াজীবী অসুরকুল সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইওরোপখণ্ডের আদিমনিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। তারা পর্বতগহ্বরে বাস করত; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান, তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুঁতে মাচান বেঁধে, সেই মাচানের উপর ঘর-দোর নির্মাণ করে বাস করত। চকমকি পাথরের তীর, বর্শার ফলা, চকমকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাজ চালাত।

দুই জাতির সংঘাত

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইওরোপের উপর পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতের অভ্যুদয় হল; রুশদেশান্তর্গত কোন জাতির ভাষা ভারতের দক্ষিণী ভাষার অনুরূপ।

কিন্তু এ-সকল জাত বর্বর, অতি বর্বর অবস্থায় রইল। এশিয়া মাইনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইওরোপের সন্নিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইওরোপীরা বলে গ্রীক।

পরে ইতালীর রোমক (Romans) নামক অন্য এক বর্বর জাতি ইট্রস্‌কান্ (Etruscans) নামক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধিবিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হল। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে; ইওরোপখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হল। কেবল উত্তরভাগে বনজঙ্গলে বর্বর-জাতিরা স্বাধীন রইল। কালবশে রোম ঐশ্বর্যবিলাসপরতায় দুর্বল হতে লাগল; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইওরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর-তাড়নায় উত্তর-ইওরোপী বর্বর রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়ল! রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায় ইওরোপের বর্বর আর ইওরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক-গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হল; এ সময় য়াহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে ইওরোপময় ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম ক্রিশ্চানীও ছড়িয়ে পড়ল। এই সকল বিভিন্ন জাত, মত, পথ নানাপ্রকারের অসুরকুল, মহামায়ার মুচিতে,
২২
দিবারাত্র যুদ্ধ মারকাটের আগুনে গলে মিশতে লাগল; তা হতেই এই ইওরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কালো রঙ থেকে, উত্তরে দুধের মত সাদা রঙ, কালো, কটা, লাল বা সাদা চুল, কালো চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মত নাক মুখ চোখ, বা জাঁতামুখো চীনেরাম—এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট এক বর্বর, অতি বর্বর ইওরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুকাল তারা আপনা আপনি মারকাট করতে লাগল; উত্তরের গুলো বোম্বেটেরূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগল। মাঝখান থেকে ক্রিশ্চান ধর্মের দুই গুরু ইতালীর পোপ (ফরাসী ও ইতালী ভাষায় বলে 'পাপ'), আর পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপলসের পাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তুপ্রায় বর্বর বাহিনীর উপর, তাদের রাজারাণী—সকলের উপর কর্তাত্তি চালাতে লাগল।

এদিকে আবার আরব মরুভূমে মুসলমানী ধর্মের উদয় হল। বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশ্চিম পূর্ব দুপ্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইওরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোতমুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যাবুদ্ধি ইওরোপে প্রবেশ করতে লাগল।

তাতার জাতি

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলজুক তাতার (Seljuk Tartars) নামক অসুর জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেললে। আরবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি; মুসলমান-অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদের একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখতে পারেনি; তারপর থেকে আর উদ্যম করেনি।

কয়েক শতাব্দীর পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুসলমান হল, তখন এই তুর্কীরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব, সকলকে দাস করে ফেললে। ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবী বা পার্শী নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানার সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক। রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, 'তুরুগণকো বঢ়ি জোর' তাই ঠিক। কুতুবউদ্দিন হতে মোগল বাদশাই পর্যন্ত ও-সব তাতার—যে জাত তিব্বতী, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পার্শী বে করে বদলেছেন চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুরবংশ। আজও কাবুল, পারস্য, আরব্য, কনষ্টান্টিনোপলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন সেই অসুর তাতার; গান্ধারী,
২৩
ফারসী আরাব সেই তুরস্কের গোলামী করছেন। বিরাট চীনসাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর (Manchurian Tartars) পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম ছাড়েনি মুসলমান হয়নি, মহালামার (Grand Lama) চেলা। এ অসুর জাত কস্মিন্‌কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে যুদ্ধবীর্য বড় হয় না। উত্তর ইওরোপ, বিশেষ রুশের প্রবল যুদ্ধবীর্য—সেই তাতার। রুশ তিন হিস্যে তাতার রক্ত। দেবাসুরের লড়াই এখনও চলবে অনেক কাল। দেবতা অসুরকন্যা বে করে, অসুর দেবকন্যা ছিনিয়ে নেয়—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ি জাতের সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবী খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, ক্রিশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুসালেম প্রভৃতি স্থান দখল করে ক্রিশ্চানদের

তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক ক্রিশ্চান মেরে ফেললে। ক্রিশ্চান ধর্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠল; ইওরোপময় তাদের সব বর্বর চেলা; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুললে—পালে পালে ইওরোপী বর্বর জিরুসালেম উদ্ধারের জন্য এশিয়া- মাইনরে চলল। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকী মুসলমানে মারতে লাগল। সে ঘোর বর্বর ক্ষেপে উঠেছে—মুসলমানেরা যত মারে, তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনার দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেললে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুশী ছিলেন, প্রসিদ্ধ আছে।

বুনো মানুষ আর সভ্য মানুষের লড়ায়ে যা হয়, তাই হল—জিরুসালেম প্রভৃতি অধিকার করা হল না। কিন্তু ইওরোপ সভ্য হতে লাগল। সে চামড়া-পরা, আম-মাংসখেকো
২৪
বুনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি এশিয়ার সভ্যতা শিখতে লাগল। ইতালী প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখতে লাগল; একদল ক্রিশ্চান নাগা (Knights-Templars) ঘোর অদ্বৈতবেদান্তী হয়ে উঠল; শেষে তারা ক্রিশ্চানীকে ঠাট্টা করতে লাগল, এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের হুকুমে, ধর্মরক্ষার ভানে ইওরোপী রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

উভয় সভ্যতার তুলনা

এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পান (Spain) দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চা করলে, ইওরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হল; ইতালী, ফ্রাঁস, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এল; রাজারাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল। বাড়ী ঘর দোর মন্দির সব নূতন ঢঙে বনতে লাগল।

কিন্তু সমগ্র ইওরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনা-নিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা একটা দেশ জয় করে, রাজা—আপনার এক বড় টুকরা রেখে বাকী সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এতগুলো সৈন্য দিতে হবে। এই রকমে সদা-প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যককালে হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায় সে ভাব কতক আছে; ওটা মুসলমানেরা এদেশে আনে। ইওরোপীরা মুসলমানের এ-ভাব নিলে। কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা, সামন্তচক্র, ফৌজ ও বাকী প্রজা। ইওরোপে রাজা আর সামন্তচক্র বাকী সব প্রজাকে করে ফেললে এক রকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোন সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধযাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইওরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হল উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্ছে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি-জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। সে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটা কি? আর্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে শান্তিতে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাবিৎও তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়—গোড়া থেকে; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন যে, সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর আর লুঠই কর, ভোগ বলে যা খুঁজছ তা আছে শান্তিতে; শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ-বিসর্জনে; ভোগ আছেন মননশীলতায়, বুদ্ধিচর্চায়; শরীরচর্চায় নেই। জঙ্গল আবাদ করা তাদের কাজ। তারপর, প্রথমে সে পরিষ্কৃত ভূমিতে নির্মিত হল যজ্ঞ বেদী, উঠল সে নির্মল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, গবাদি পশু নিঃশঙ্কে চরতে লাগল। বিদ্যা ও ধর্মের পায়ের নীচে তলওয়ার রইল। তার একমাত্র কাজ ধর্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা, বীরের নাম আপৎ-ত্রাতা ক্ষত্রিয়। লাঙ্গল, তলওয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

ঐ যে ইওরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো' দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি-সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে। এ কথা তোমাদেরও বলি—তোমরা পণ্ডিত-মনিষ্যি, পুঁথি-পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইওরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, 'হা-অন্ন হা-অন্ন' করে, কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্যরাও তাই করেছে!! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প—রামায়ণের উপর—কেন বানাচ্ছ?

রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বৈ কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?

হতে পারে দু-এক জায়গায় আর্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু-একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিলঢেলা হাড়গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ?

অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্যসভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার,
২৫
এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ।

তুমি ইওরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ. তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনিষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ—তোমাদের আফ্রিকা?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্‌কালেও করেননি। আর্যেরা অতি দয়াল ছিলেন। তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভাসম্পন্ন মাথায় ওসব আপাতরমণীয় পাশব প্রণালী কোন কালেও স্থান পায়নি। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

ইওরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইওরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণ-বিভাগ। ইওরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

পরিশিষ্ট *

ইওরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে 'সভ্যতার উন্নতি'র (Progress of Civilization) মানে কি? তার মানে এই যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি—অনুচিত উপায়কে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা এবং ফাঁসি অথবা ষ্টানলি (Stanley) দ্বারা তাঁর সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষীদের—এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুন চাবকানো, এ-সকলের ঔচিত্য বিধান করে; 'দূর হও, আমি ওথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইওরোপী নীতি, যার দৃষ্টান্ত—যেথায় ইওরোপী-আগমন, সেথাই আদিম জাতির বিনাশ—সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে! এই সভ্যতার অগ্রসরণ লণ্ডন নগরীতে ব্যভিচারকে, পারিতে স্ত্রীপুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য দৃষ্টান্ত' জ্ঞান করে—ইত্যাদি।

এখন ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে ক্রিশ্চানধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা কর। ক্রিশ্চানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতে সমর্থ হয়নি, এবং যখন কনষ্টাণ্টাইন (Constantine)-এর তলওয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতাবিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে? যে ইওরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সচলা, ক্রিশ্চানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্মের অনুমোদিত? ক্রিশ্চানী সঙ্ঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্য-কৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্যন্ত 'চর্চ' প্রোফেন (ধর্ম ভিন্ন অন্য বিষয়াবলম্বনে লিখিত) সাহিত্য-প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট ক্রিশ্চান হওয়া সম্ভব? নিউ টেষ্টামেণ্ট (Testament)-এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইওরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ—ইওরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লমারিয়ঁ, ভিক্টর হ্যুগো-কুল বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত, অপরদিকে এই সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্মসকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হোক; দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিমনিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে-সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।

ক্রিশ্চানধর্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরাব, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কোথায়? ক্রিশ্চানেরা ইওরোপী য়াহুদীদের কি দশা এখন করছে? এক দানসংক্রান্ত কার্যপ্রণালী ছাড়া ইওরোপের আর কোন কার্যপদ্ধতি, গস্‌পেলের (Gospel) অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইওরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ক্রিশ্চানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইওরোপে ক্রিশ্চানীর শক্তি থাকত, তাহলে 'পাস্তের' (Pasteur) এবং 'কক'-এর (Koch) ন্যায় বৈজ্ঞানিকসকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইওরোপে ক্রিশ্চানী আর সভ্যতা—আলাদা জিনিষ। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু ক্রিশ্চানীর বিনাশের জন্য পাদ্রীকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে ক্রিশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হত; কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই ক্রিশ্চানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু! এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান-দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।

পাশ্চাত্য দেশে লক্ষী-সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিষ সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল! এখন একে দারিদ্র, তার ওপর আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল, তাও যাচ্ছে—পাশ্চাত্য দেশেরও কিছুই পাচ্ছি না! চলা-বসা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তা তো আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, অথচ কালের উপযোগী একটা নূতন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দশায় এখন পড়ে।

ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেওয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার করে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরানো কাঠের কাজ, ইঁটের কাজ দেখে এস গে। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না! দোর কি আগড় বোঝবার যো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতী যন্ত্র কেনা!! এই অবস্থা সর্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে; অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাকী-যন্ত্রণা মাত্র!! খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ! আমাদের বাঙালী আর বিলেতে আইরিশ, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকাবকি করছে। বক্তৃতায় এ দু-জাত বেজায় পটু। কাজের—এক পয়সাও নয়, বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে মরছে!!!

পরিষ্কার সাজান-গোজান এ দেশের (পাশ্চাত্যে) এমন অভ্যাস যে, অতি গরীব পর্যন্তরও ও-বিষয়ে নজর। আর নজর কাজেই হতে হয়—পরিষ্কার কাপড়-চোপড় না হলে তাকে যে কেউ কাজ-কর্মই দেবে না। চাকর-চাকরানী, রাঁধুনী সব ধপধপে কাপড়—দিবারাত্র। ঘরদোর ঝেড়েঝুড়ে, ঘষেমেজে ফিটফাট। এদের প্রধান শায়েস্তা এই যে, যেখানে সেখানে যা তা কখনও ফেলবে না!

রান্নাঘর ঝকঝকে—কুটনো-ফুটনো যা ফেলবার তা একটা পাত্রে ফেলছে, তারপর সেখান হতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। উঠানেও ফেলে না। রাস্তায়ও ফেলে না।

যাদের ধন আছে তাদের বাড়ীঘর তো দেখবার জিনিষ—দিনরাত সব ঝকঝক! তার ওপর নানাপ্রকার দেশবিদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছে! আমাদের এখন ওদের মত শিল্প-সংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন করতে হবে, না—না? ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরী! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপুট। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম!! বড্ড জোর ওদের (ইওরোপীয়দের)। নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশী চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল। ইওরোপী ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বলবার রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিষয়।

বর্তমান ভারত

বৈদিক পুরোহিতের শক্তি

বৈদিক পুরোহিতের মন্ত্রবলে বলীয়ান্, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান-ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম
১
পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট; আহুতিগ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর; কখনও বিভীষিকা-সংকুল আদেশ, কখনও সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়-পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীর্তিমান্, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য চিরদিন অস্তমিত; কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণকারী রাজগণের নামই পুরোহিত-প্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র-শেষ; পরীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিরপরিচিত।

রাজা ও প্রজার শক্তি

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।

কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই—হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য-শূদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছেন, সীতার বনবাসের জন্য গোপন মন্ত্রণা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথা-স্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।

নিয়মের [যে] অভাব—তাহাও নহে; নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড-পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য-সাধোনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোন শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

আবার ঐ সকল নির্দেশ—পুস্তকে। পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্য-পরিণতি, এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের
২
পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব
৩
অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।

স্বায়ত্তশাসন

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্রশাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান্—সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে। শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতি-পত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, 'এ দেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে', [তাহা] যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না তাহাও নহে। যবন
৪
পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি
৫
দ্বারা অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বর্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না; এ ভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়েত ভিন্ন সমাজমধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে, বৌদ্ধ যতিগণের মঠে ঐ স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপি নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে 'পঞ্চে'র ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায়মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বৌদ্ধবিপ্লব ও তাহার ফল

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়, উদাসীন। ‘শাপেন চাপেন বা’
৬
রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিভোজী দেবকুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী; কত শত ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার।

কাজেই রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্তধৃত-দৃঢ়সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অপ্রতিহতশাসন আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানবশক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাড়্‌গ্‌ণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখনও ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইঁহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারিভাবে উদ্‌যুক্ত হইয়াছিল।

এ বিপ্লবে—বৈদিক কাল হইতে আরব্ধ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে বিরাটরূপে স্ফুটীকৃত পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এখন এ দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক, কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্যও নাই, ব্রহ্মবীর্যও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ
৭
, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্যে ক্ষয়িতবীর্য এ নূতন শক্তিসঙ্গম নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল; শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাতমাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্‌জাল-জড়িত হইয়া পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল, অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহিরকুলাদির
৮
ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্বপ্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ প্রাধান্যস্থাপনের জন্য মধ্য-এশিয়া হইতে সমাগত ক্রূরকর্মা বর্বরবাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রীতিনীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিদ্যাবিহীন বর্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্রতন্ত্র-মাত্র-আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া আর্যাবর্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস ও বর্বরাচারের আবর্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন মৃত্তিকায় পতিত হইল। পুনর্বার কখনও উঠিবে কি, কে জানে?

মুসলমান অধিকার

মুসলমান-রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্যশক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। হজরত মহম্মদ সর্বতোভাবে ঐ শক্তির বিপক্ষে ছিলেন এবং যথাসম্ভব ঐ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-রাজত্বে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত; তিনিই ধর্মগুরু; এবং সম্রাট্ হইলে [তিনি] প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন। য়াহুদী বা ঈশাহী
৯
মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের
১০
মূর্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে—পুরোহিতদিগকে—দয়া করিয়া কোন প্রকারে জীবনধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখনও কখনও; নতুবা রাজার ধর্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন!

এক দিকে রাজশক্তি ভিন্নধর্মী ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সঞ্চারিত; অপর দিকে পৌরোহিতশক্তি সমাজ-শাসনাধিকার হইতে সর্বতোভাবে বিচ্যুত। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের স্থানে কোরানোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী। সংস্কৃত ভাষা বিজিত ঘৃণিত হিন্দুদের ধর্মমাত্র-প্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতে লাগিল, আর ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিবাহাদি রীতিনীতি-পরিচালনেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল, তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া।

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকালে পৌরোহিত্যশক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফূর্তি হয় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য-স্থাপন—এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল তাহারও কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নবজীবনের চেষ্টা।

পদদলিত-পৌরোহিত্যশক্তির মুসলমান রাজা বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি
১১
সম্রাড়্বর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদিপরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, জৈনবৌদ্ধ-রুধিরাক্তকলেবর, পুনুরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকার-যুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়। এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার সঙ্গে পৌরোহিত্যশক্তির বিশেষ কার্য ছিল না; এমন কি, শিখেরা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণ-চিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া, স্বধর্মলিঙ্গে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করে।

ইংলণ্ডের ভারতাধিকার

এই প্রকারে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর, রাজশক্তির শেষ জয়—ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত-আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম-কর্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি। আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকারস্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে। বারংবার ভারতবাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বিজয়-ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন?

অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ান্, শাপাস্ত্র, সংসারস্পৃহাশূন্য তপস্বীর ভ্রূকুটি-সম্মুখে দুর্ধর্ষ রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে। সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল—সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায়, নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছে; কিন্তু যে বৈশ্যকুল—রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত—মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য, একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে
১২
নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়া পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্বিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, 'পামর, রাজসামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস',—অচিরকাল মধ্যে ঐ দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিকসম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানব-জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, [ইহা] ভারতবাসী কখনও দেখে নাই!

বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য যা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।

চীন, সুমের,
১৩
বাবিল,
১৪
মিসরী, খল্‌দে,
১৫
আর্য, ইরানী,
১৬
য়াহুদী, আরাব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজে বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ-নেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ডপ্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।

যদ্যপি প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে ভেনিসাদি বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বহু প্রতাপশালী হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশ্যের অভ্যুদয় ঘটে নাই।

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ ব্যক্তি ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায় ঐ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ করিতেন। দেশ-শাসনাদি কার্যে সেই কতিপয় পুরুষ সওয়ায়
১৭
অন্য কাহারও কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না। মিসরাদি প্রাচীন দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অল্প দিন প্রাধান্য উপভোগ করিয়া রাজন্যশক্তির অধীন ও সহায় হইয়া বাস করিয়াছিল। চীনদেশে কুংফুছের
১৮
প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সার্ধদ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্যশক্তিকে আপন ইচ্ছানুসারে পালন করিতেছে এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া সর্বগ্রাসী তিব্বতীয় লামারা রাজগুরু হইয়াও সর্বপ্রকারে সম্রাটের অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

ভারতবর্ষে রাজশক্তির জয় ও বিকাশ অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক পরে হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই চীন মিসর বাবিলাদি জাতিদিগের অনেক পরে ভারতে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান। এক য়াহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্যশক্তির উপর আধিপত্যবিস্তারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল। বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও ক্ষমতা লাভ করে নাই। সাধারণ প্রজা—পৌরোহিত্যবন্ধনযুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া অভ্যন্তরে ঈশাহী ইত্যাদি ধর্মসম্প্রদায়-সংঘর্ষে ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে উৎসন্ন হইয়া গেল।

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্যদেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সুরাব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে, আমীর ওমরা সাজিয়া নিজ নিজ গৌরববিস্তারের আস্পদ বলিয়া।

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচালের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেলপুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাড়্‌গণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা-কলের চিমনী, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারতবিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।

পুরোহিত শক্তি

পূর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।

পৌরোহিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে; এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চার আবির্ভাব! অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানবপ্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব; জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়দর্শী সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানবসমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না। সর্বভোগের অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি পুরোহিত-কুল। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্যই পুরোহিত-প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ। দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয়-সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-অজাযূথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান। সিংহের সর্বনাশেচ্ছা পুরোহিতহস্তধৃত অধ্যাত্মরূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজনমদোন্মত্ত ভূপালবৃন্দের যথেচ্ছা-চাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ জলে সে অগ্নি নির্বাপিত। পুরোহিতপ্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু। বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবল, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত; এজন্যই সর্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।

দোষও আছে; প্রাণ-স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃতবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশসাধন করে। স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ, অস্ত্রশস্ত্রের ছেদ-ভেদ, অগ্ন্যাদির দাহিকাদি শক্তি, স্থূল প্রকৃতির প্রবল সংঘর্ষ সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে; বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার-ভাঁটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখনও কখনও সন্দেহ হয়। যেথায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্যাতন-সমস্তই উপস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্থূল উপায় ছাড়িয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থূল-সূক্ষ্মের মধ্যবর্তী এই কুজ্ঝটিকাময় প্রহেলিকাময় জগতে যাঁহারা নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ঐ প্রকার ধূম্রময়ভাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয়! সে মনের সম্মুখে সরল রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্র করিয়া লয়। ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব; আর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতা। যে বলে, আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূতপ্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য, তাহা অন্যকে কেন দিব? আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্রমধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়; সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ববিদ্যার নাশ; যাহা বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও (নূতন বিদ্যার কথা তো দূরে থাকুক) চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণ হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল পৈতৃক অধিকার পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য 'যেন তেন প্রকারণে' চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সংঘর্ষ।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব প্রাণোন্মেষের প্রতি-স্থাপনের
১৯
স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়। এ সংগ্রামে জয়বিজয়ের ফলাফল পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত। উদ্দেশ্য-হারা খেই-হারা পৌরোহিত্যশক্তি ঊর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ; যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে; যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচার-জাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদমস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তির হতাশ হইয়া নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এ জাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না। যাঁহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছিঁড়িয়া অন্যান্য জাতির বৃত্তি-অবলম্বনে ধন-সঞ্চয়ে নিযুক্ত, সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পৌরোহিত্য-অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। শিখাহীন টেড়িকাটা, অর্ধ-ইওরোপীয় বেশভূষা-আচারাদি-সুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আবার—ভারতবর্ষে যেথায় এই নবাগত ইওরোপীয় রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণযুবকবৃন্দ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান্ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত-

পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে।

গুর্জরদেশের ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রত্যেক অবান্তর সম্প্রদায়েই দুইটি করিয়া ভাগ আছে—একটি পুরোহিত-ব্যবসায়ী, অপরটি অপর কোন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করে। এই পুরোহিত-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাহ্মণকুলপ্রসূত হইলেও পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত যৌন-সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। যথা 'নাগর ব্রাহ্মণ' বলিলে উক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্ত পুরোহিত, তাঁহাদিগকেই কেবল বুঝাইবে। 'নাগর' বলিলে উক্ত জাতির যাঁহারা রাজকর্মচারী বা বৈশ্যবৃত্ত, তাঁহাদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশসমূহেও এ বিভাগ আর বড় চলে না। নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরেজী পড়িয়া রাজকর্মচারী হইতেছে, অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকেরা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য-কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই প্রকার স্রোত চলে, তাহা হইলে বর্তমান পুরোহিত-জাতি আর কতদিন এদেশে থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্মণজাতির অধিকার-বিচ্যুতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ব্রাহ্মণজাতি প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্ষত্রিয়শক্তি

অপরদিকে রাজ-সিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষরাশি সমস্তই বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজি তৃণগুল্মভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড-বিদারণে মুহূর্তও কুণ্ঠিত নহে; আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল রাজ-শাদূর্লের ভোগেচ্ছার বিঘ্ন উপস্থিত করিলেই তাহাদের সর্বনাশ; বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিলেই তাহারা নিরাপদ। শুধু তাহাই নহে; সমান প্রযত্ন, সমান আকূতি,
২০
সাধারণ স্বত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ পুরাকালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোন দেশে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজরূপ কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। শক্তিসমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজশরীরে প্রসৃত। ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটীরে উন্নত মস্তক রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাঁহার তৃপ্তিসাধনে সক্ষম?

নরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, দেবত্বের যাঁহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, লাভেচ্ছার তো কথাই নাই। রাজশরীর সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না। অসূর্যম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এই ভাব হইতে সর্বতোভাবে লোকলোচনের সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুটীরের স্থানে অট্টালিকার সমুত্থান, গ্রাম্যকোলাহলের পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্যরত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র—শনৈঃ পদসঞ্চারে প্রকৃতিক কানন, জঙ্গল, স্থূল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল; নগরের আবির্ভাব হইল।

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা—উপনিষদ্, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ। কর্মকাণ্ডের বিলোপে পুরোহিতের বৃত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ সর্বকালের সর্বদেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপর দিকে 'শাপ ও চাপ'-উভয়হস্ত
২১
জনকাদি ক্ষত্রিয়কুল; সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুরোহিত যে প্রকার সর্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেই প্রকার সকল পার্থিবশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান্। উভয়েরই উপকার আছে। উভয় বস্তুই সময় বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায়। যৌবনপূর্ণদেহ সমাজকে বালোপযোগী বস্ত্রে বলপূর্বক আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্বার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয়।

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশুসন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিলেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে প্রয়োজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার
২২
। সমাজ—গৃহের সমষ্টিমাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণবিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ
২৩
। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ। অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর রসনাতৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? সমগ্র সমাজ-শরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উদ্যমবিহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদিগের ত্বঙ্‌মাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব। পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন এবং অধিকৃত
২৪
জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? কালে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্বরজাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ

টলটলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্বভাব-পুনঃস্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও ক্রিশ্চীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। ভোজ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাধাতুবিশিষ্ট শরীর ও অনন্তভাবতরঙ্গশালী চিত্তের আর কি প্রকৃষ্ট উপাদান? কিন্তু যে খাদ্য দেহরক্ষা ও মনের বলসমাধানে একান্ত আবশ্যক, তাহারই শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইতে না পারিলে সকল অনর্থের মূল হয়।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেক দিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা সহস্রবার ঠেকিয়াও এ মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী—মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল ‘সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং’। বেণ
২৫
-রাজার ন্যায় তিনি সর্ব-দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান্, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

বৈশ্যশক্তি

যে মহাশক্তির ভ্রূভঙ্গে 'থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে,' যাহার হস্তধৃত সুবর্ণভাণ্ডরূপ বকাণ্ড-প্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির বিকাশই পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ'। কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, ''উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি-ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।''

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকারে বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকার সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ-কশাহস্ত বণিক—সকলের হৃৎকম্প-উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য-সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি সঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।

'বণিক কোন্ দেশে না যায়?' নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল বণিক অন্যদেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলা-বিলাসরূপ রুধির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনী-যোগে তাহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্য-প্রাদুর্ভাব না হইলে আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্য-ভোজ্য, সভ্যতা, বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত?

শূদ্র-জাগরণ

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়দের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কি গতি?

এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজ, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়, ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারণে' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎসর্গ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা! ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালীর ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময়ে আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্
২৬
প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র-পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ
২৭
ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর
২৮
ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। সে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার

করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী
২৯
পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ
৩০
দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ড ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা—যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধানে নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত-য়াহুদীবংশসম্ভূত হইয়াও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পৌল (St. Paul) কেশরী (Caesar) সম্রাটের
৩১
সমক্ষে আপনার অপরাধ-বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য আর্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের—এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমুত্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরেজ-সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরেজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরূক বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য-বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলণ্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরেজের থাকিবে এমন ভারতরাজ্য—শত শত

লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব'-রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগুরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য-জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের
৩২
আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছেঃ 'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ!!'
৩৩

একদিকে নব্যভারত-ভারতী বলিতেছেন—পতিপত্নী-নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন—বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। [শিখিবার] আছে,—কিন্তু ভয়ও আছে।

কোন অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি, কোন ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।'

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র [বা] বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ-ভূষা অশন-বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে; মূর্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব বর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব দোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ—নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতারক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্য দেশেও দেখিয়াছি, দুর্বল জাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইওরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশমার্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!

স্বদেশমন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

(১)

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
১

ওঁ হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী অথচ নানাপ্রকার গুণের দ্বারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু তোমার মোহনিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম আমি ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা করি না, সেজন্য হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।
১

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
বক্ত্রোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ
১

তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
২

সংসার-বন্ধন-নাশকারী ভজন, ভক্তি ও বৈরাগ্যাদি ষড়ৈশ্বর্য সেই অতি মহান্ ব্রহ্মতত্ত্বপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট—এই কথা মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র প্রতিভাত হইতেছে না। অতএব হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।
২

তে-জস্তরন্তি ত্বরিতং ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
২

রা-গং কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
৩ ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
৩

হে রামকৃষ্ণ! সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যাহারা অনুরক্ত, তোমাকে পাইয়াই তাহাদের সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, সুতরাং তাহারা শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকে অমৃতস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করে। অতএব হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।
৩

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
৪

হে প্রভো! মায়াদূরকারী মঙ্গলময় অতি পবিত্র তোমার ‘ষ্ণান্ত’ (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকেও পুণ্যে পরিণত করে। হে জগতের একমাত্র লভ্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেজন্য হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।
৪

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতায় যো হি রামঃ॥
১

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং

হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥
২

যাঁহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্যন্ত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত অর্থাৎ চণ্ডালোকেও যিনি ভালবাসিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আহা! যিনি অতিমানব-স্বভাব হইয়াও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই তিনলোকেই যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার প্রাণস্বরূপ, যিনি ভক্তির সহিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কল্যাণমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন;
১

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুল্য হুহুঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং(অর্জুনের) ঘোরতর স্বাভাবিক অন্ধতম-স্বরূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শান্ত ও মধুর গীত (গীতাশাস্ত্র) যিনি সিংহনাদরূপে গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—সেই বিখ্যাত পুরুষই এক্ষণে রামকৃষ্ণরূপে জন্মিয়াছেন।
২

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-কৃত পদ্যানুবাদ)
প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে প্রবাহিত,
লোকহিতে রত সদা, হয়ে যিনি লোকাতীত,
জানকীর প্রাণবন্ধ, উপমা নাহিক যাঁর,
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু—যিনি রাম অবতার;
স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্র-প্রলয়ের হুহুঙ্কার,
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার,
সুগভীর উঠেছিল গীতসিংহনাদ যাঁর,
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার।

(৩)

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব॥
১

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব॥
২

হে নরদেব দেব! তোমার জয় হউক। যিনি শক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গস্বরূপ, যিনি প্রেমের নানা লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষস বিনাসের মহাস্ত্রস্বরূপ, সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে নরদেব দেব! তোমার জয় হউক।
১

যাঁহার চিত্ত অদ্বয় ব্রহ্মে সমাহিত, যাঁহার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ ভক্তিরূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত—অর্থাৎ যাঁহার ভিতরে জ্ঞান এবং বাহিরে ভক্তি, যিনি দেহের দ্বারা ক্রমাগত লোকহিতার্থ কর্ম করিয়াছেন, যাঁহার কার্যকলাপ অদ্ভুত, সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে নরদেব দেব! তোমার জয় হউক।
২

(৪)

সামাখ্যাদ্যৈর্গীতিসুমধুরৈর্মেঘগম্ভীরঘোষৈ-
র্যজ্ঞধ্বান-ধ্বনিতগগনৈর্ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাতবেদৈঃ।
বেদান্তাখ্যৈঃ সুবিহিত-মখোদ্ভিন্ন-মোহান্ধকারৈঃ
স্তুতো গীতো য ইহ সততং তং ভজে রামকৃষ্ণম্॥

বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেন, বিধিপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করার ফলে তাঁহাদের

শুদ্ধ হৃদয় হইতে বেদান্তবাক্যদ্বারা ভ্রম ও অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল; তাঁহারা মেঘের মত গম্ভীর সুমধুর সুরে সামবেদ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়াছেন, যাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—আমি সর্বদা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা করি।*

শ্রীরামকৃষ্ণপ্র ণামঃ
স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ধর্মের সংস্থাপক, সকলধর্মস্বরূপ, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি।

শিবস্তোত্রম্

ওঁ নমঃ শিবায়

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্।
সুবিমলগগনাভে ত্বীশসংস্থেঽপ্যনীশে
মম ভবতু ভবেঽস্মিন্ ভাসুরো ভাববন্ধঃ॥
১

যাঁহাতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের অঙ্কুরসমূহ অসংখ্য বিভূতিরূপে কল্পিত, যিনি সুনির্মল আকাশের তুল্য, যিনি জগতের ঈশ্বররূপে অবস্থিত, যাঁহার কোন নিয়ন্তা নাই—সেই মহাদেব আমার প্রেমবন্ধন দৃঢ় ও উজ্জ্বল হউক।
১

নিহতনিখিলমোহে ঽধীশতা যত্র রূঢ়া
প্রকটিতপরপ্রেম্না যো মহাদেবসংজ্ঞঃ।
অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভুত্বম্॥
২

যিনি সমুদয় মোহ নাশ করিয়াছেন, যাঁহাতে ঈশ্বরত্ব স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত, যিনি (হলাহল পান করিয়া জগতের জীবগণের প্রতি) পরম প্রেম প্রকাশ করায় 'মহাদেব' নামে অভিহিত হইয়াছেন, প্রেমস্বরূপ যাঁহার গাঢ় আলিঙ্গনে সমুদয় ঐশ্বর্যই আমাদের হৃদয়ে শুধু মায়া বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই মহাদেবে আমার প্রেমবন্ধন দৃঢ় হউক।
২

বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি
৪
বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলিত খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্॥
৩

পূর্বসংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, উহা ঘূর্ণায়মান তরঙ্গসমূহের মত বলবান্ ব্যক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে। 'তুমি-আমি'-রূপে প্রতিভাত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সেই শিবে সংস্থাপিত অতি বিকারশীল অস্থির চিত্তকে আমি বন্দনা করি।
৩

জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অবগণনবহুরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্॥
৪

কার্যকারণভাব এবং নির্মল বৃত্তিসমূহ অসংখ্য নানারূপ হইলেও যেখানে একবস্তুই সত্য, বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে যেখানে ভিতর ও বাহির থাকে না, আহা! সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি বন্দনা করি।
৪

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।
যমিজনহৃদিগম্যো নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ॥
৫

যাঁহা হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ নষ্ট হইয়াছে, শুভ্র জ্যোতির মত যাঁহার প্রকাশ, যিনি শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানরাশি যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ (যাঁহার অট্টহাসিতে জ্ঞানরাশি ছড়াইয়া পড়িতেছে), যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়ে লভ্য, যিনি অখণ্ডস্বরূপ, মনোরূপ সরোবরে অবস্থিত সেই রাজহংসরূপী শিব, আমার দ্বারা ধ্যাত হইয়া প্রণত আমাকে রক্ষা করুন।
৫

দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্।
পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং
৫

নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ॥
৬

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্যা সতী—যাঁহাকে করকমল দান করিয়াছেন, যিনি কলির দোষসমূহ নাশ করেন, যিনি সুন্দর কহ্লারপুষ্পের মত মনোহর, পরের কল্যাণের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি, প্রণত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য সর্বদা যাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে—সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি।
৬

অম্বা-স্তোত্রম্

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাং
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥
১

হে কল্যাণকারিণী মাতঃ, তোমার দুই হাতে সুখ ও দুঃখ। কে তুমি? সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তুমি কি সর্বদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিতে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নপর হইতেছ?
১

সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্মপাশা॥
২

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী সর্বদা কৃতকর্মের ফল সংযোজনা করিয়া অবস্থিতা, যাঁহাদের কর্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে যিনি মোক্ষপদে লইয়া যান, সেই ভবানী আমাকে সর্বদা বর প্রদান করুন। আমি নিশ্চয়ই জানি, তিনি কর্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন।
২

কিং বা কৃতং কিমকৃতং
৬
ক্ব কপাললেখঃ
কিং কর্ম বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ
৭
।
ইচ্ছাগুণৈর্নিয়মিতা৮ নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যাঃ সদা৯ ভবতু সা শরণং মমাদ্যা॥
৩

এ জগতে যাঁহা ব্যতীত ধর্ম বা অধর্ম অথবা কপালের লেখা বা কর্ম বা (তাহার) ফল, এ সকল কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা নিয়মসমূহ পরিচালিত, সেই আদিকারণস্বরূপা দেবী সর্বদা আমার আশ্রয়স্বরূপা হউন।
৩

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ॥
৪

এই সংসারে যাঁহার অপরিমিতশক্তিশালী বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু-জালরূপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে বিকৃত ও ভগ্ন করিতেছে, বল, তাঁহার আশ্রয় না লইয়া কাহার শরণাপন্ন হইব?
৪

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রং
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব
১০
হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
১১

মুঞ্চন্তু মাং ন
১২
পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে॥
৫

তোমার পদ্মনেত্রের দৃষ্টি—শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতিই সমভাবে পতিত হইতেছে, সুখী দুঃখী উভয়কে তুমি একই ভাবে স্পর্শ করিতেছ। হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন—উভয়ই তোমার দয়া। হে মহাদেবী, তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে।
৫

ক্কাম্বা শিবা ক্ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীম্
১৩
।
চিন্ত্যং শ্রিয়া
১৪
সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাপরৈরভিনুতং
১৫
শরণং প্রপদ্যে॥
৬

সেই মঙ্গলময়ী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্তববাক্যই বা কোথায়? আমি আমার এই ক্ষুদ্র দুই হস্ত দ্বারা জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মী যাঁহার চিন্তা করেন, যাঁহার সুন্দর পাদপদ্মে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জনগণ যাঁহার বন্দনা করেন, আমি সেই জগন্মাতার আশ্রয় লইলাম।
৬

যা মাং চিরায়
১৬
বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং১৭ সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা১৮ মম গতিঃ সফলেঽফলে বা॥
৭

সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত চিরদিন যিনি আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলাদ্বারা অতি দুঃখময় পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্বদা পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে উত্তমরূপে পরিচালিত করিতেছেন, আমি সফলই হই আর বিফলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি।
৭

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-কৃত পদ্যানুবাদ)
তুলি ঘোর ঊর্মিভঙ্গে, মহাবর্ত তার সঙ্গে
এ ভবসাগরে কে মা, খেলিতেছ বল না?
শিবময়ী মূর্তি তোর শুভঙ্করি, একি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা।
এতই কি তোর কাজ, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ,
অশান্ত ধরায় কি গো শান্তিদান বাসনা?
১

যে ছিঁড়েছে কর্মপাশ, তারে করি চিরদাস
নিত্যশান্তি সুধারাশি পিয়াতেছ, জননী,
কার্য করি ফল চায়, কৃত ফল দিতে তায়
সদাই আকুল তুমি, ওগো হরঘরণী,
জানি মা, তোমায় আমি, কর্মপাশে বাঁধো তুমি
বেঁধো না বরদে, মোরে, নাশো দুঃখরজনী!
২

কি কারণে কার্যচয়, জগতে প্রকট হয়,
সুকৃত দুষ্কৃত কিম্বা ললাট-লিখিত রে,
কেহ না দেখিয়া কূল, কহয়ে অদৃষ্ট-মূল,

ধর্মাধর্মে সুখ-দুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে,
স্বতন্ত্র বিধান যাঁর, বদ্ধ আছে এ সংসার,
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে।
৩

যাঁহার বিভূতিচয়, লোকপাল সমুদয়,
যাঁদের অমিত শক্তি কোন বাধা মানে না,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, যে সাগরে নিরবধি
সে অনন্ত জলনিধি যাঁহাদের রচনা,
প্রকৃতি-বিকৃতিকারী এই সব কর্মচারী,
যাঁর বলে বলীয়ান্, কর তাঁরি অর্চনা।
৪

মা তোমার কৃপাদৃষ্টি সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রু মিত্র সকলের উপরেই কর গো,
সমভাবে ধনী দীনে, রক্ষা কর নিশিদিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, দুয়ে তব কৃপা ঝরে গো,
যাচি পদে, নিরুপমে, ভুল না মা, এ অধমে,
শুভদৃষ্টি তব যেন সর্বতাপ হরে গো।
৫

বিশ্বপ্রসবিনী তুমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি বৃথা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে, ধরে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
অকিঞ্চন ভক্তিধন, রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই, এই মাত্র কামনা।
৬

স্বচরিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার,
সুখ দুঃখ লয়ে সদা নানা খেলা খেলিছ,
পূর্ণ জ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ,
সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর, তাই স্নেহে মাগো পালিছ।
৭

শ্রীরামকৃষ্ণ -আরাত্রিক ভজন

মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ
১৯
জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মাদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর
২০
, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন
২১
করুণাঘন, কর্মকঠোর
২২
।
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর
২৩
॥
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্ ।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতিকুলমান
২৪
॥
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায়॥

[পূর্বে এই ভজনটি নিম্নলিখিতভাবে রচিত হইয়াছিল; পরে স্বামীজী উহার পূর্বোক্তরূপে পরিবর্তন করেন।]

খণ্ডন্-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার
২৫
।
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥

শিব-সঙ্গীত

(১)
কর্ণাটি—একতালা
তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।

(২)
তাল—সুর ফাঁকতাল
হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥
ঊর্ধ্ব জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত
মুলতান—ঢিমা ত্রিতালী
মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া, যানেকো দে।
যানেকো দে রে সেঁইয়া, যানেকো দে (আজু ভালা)।
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরাই সেঁইয়া, যানেকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সেঁইয়া)
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে
২৬
কহত সেঁইয়া, যানেকো দে॥

সৃষ্টি

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়॥
২৭

সেথা হতে বহে কারণ-ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ॥
সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি, কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র—কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশ দিক জ্যোতিমগন॥
তাহে বসে
২৮
কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ; সেই সূর্য, সেই কিরণ॥
২৯

প্রলয় বা গভীর সমাধি

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বদ্ধ হল, শুন্যে মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

সখার প্রতি

আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?
কর্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায়?

যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয়?
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশানে আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়-ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন?

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী কীট-অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব'—বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে—প্রেমের প্রেরণ!!
হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখ-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে?

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।

পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও', 'দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

নাচুক তাহাতে শ্যামা

ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয়পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী ঝরে নির্ঝরিণী—তানতরঙ্গিণী—গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণতুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগপরিচয় ভাবরাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ, ভুলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলীজ্বালা।
ফেনময় গর্জি মহাকায়, ঊর্মি ধায় লঙ্ঘিতে পর্বতচূড়া॥
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥

শোভাময় মন্দির-আলয়, হ্রদে নীল পয়, তাহে কুবলয়শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে॥
বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর—নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর—বাঞ্ছাঅগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্, বব-বব-বম্ বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতী॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থরথর, লক্ষ অশ্ববরপৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলাবরিষণ গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্য-পরিচয় পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥
দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত-বিহঙ্গম সঙ্গীত-সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্নপতন-জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভাল॥
সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা?
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥

হে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।

কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্মকথা বলি কাকে?
ভাঙ্গ বীণা—প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ—দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

গাই গীত শুনাতে তোমায়

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।

ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!
তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ-তপ সাধন-ভজন,
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে;
আছে মাত্র জানাজানি-আশ,
তাও প্রভু কর পার।

চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়,
কেন বা দেখিবে?
দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব ঘটে।

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা 'পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,

চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।
সিন্ধুরোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্রসূর্যে তোমারি বচন,
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এ সকল সত্য কথা।
কিন্তু মানি—অতি স্থূল ভাব,
তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা।

সূর্যচন্দ্র চলগ্রহতারা,
কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস

ধূমকেতু বিজলি আভাস,
সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ—মন দেখে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি
ভঙ্গ যথা তরঙ্গ-লীলার
বিদ্যা-অবিদ্যার ঘর,
জন্ম জরা জীবন মরণ,
সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বভরা,
কেন্দ্র যার 'অহমহমিতি',
ভূজদ্বয়—বাহির অন্তর,
আসমুদ্র আসূর্যচন্দ্রমা,
আতারক অনন্ত আকাশ,
মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
দেব যক্ষ মানব দানব,
পশু পক্ষী কৃমি কীটগণ,
অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব—
সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।
স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,
কেশ যথা শিরঃপরে।

মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি-প্রকাশ!
উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্রকিরণ,
কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,

শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়
কোটি সূর্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ-সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত ধ্বনি—তব বাণীঃ
—শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কাজ।—

'আমি বর্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
প্রলয়ের কালে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,

সে মহানির্বাণ, নাহি কর্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে,
আমি বর্তমান।
‘আমি বর্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্বগুণভেদ,
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্তমান।

‘আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্যপথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ-ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু;
লম্ফঝম্প আবর্ত উচ্ছ্বাস
চলে কেন্দ্র প্রতি—দূর অতি দূর হতে;
চেতন-পবন তোলে ঊর্মিমালা
মহাভূত-সিন্ধু ’পরে;
পরমাণু আবর্ত বিকাশ,
আস্ফালন পতন উচ্ছ্বাস,
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি।
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত-বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলরূপে
ধায় গ্রহ-তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য-আবাস।

‘আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।
‘আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত।
মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ;
মৃদুমন্দ মলয়-পবন
আসে যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু;
তোলে মুখ শিশিরমার্জিত
ফুল্ল ফুল রবি-পানে।’

সাগর-বক্ষে

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়।
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
বহে বায়ু আপনার মনে,
প্রভঞ্জন করিছে গঠন—
ক্ষণে গড়ে, ভাঙ্গে আর ক্ষণে—
কতমত সত্য অসম্ভব—
জড়, জীব, বর্ণ, রূপ, ভাব।
ঐ আসে তূলারাশি সম,
পরক্ষণে হের মহানাগ,
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম,
আর দেখ প্রণয়িযুগল;
শেষে সব আকাশে মিলায়।
নীচে সিন্ধু গায় নানা তান;
মহীয়ান্ সে নহে, ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।

পত্রাবলী ১-১০

পত্রাবলী
১

[শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

বৃন্দাবন
১২ অগষ্ট, ১৮৮৮

মান্যবরেষু,
শ্রীঅযোধ্যা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে পৌঁছিয়াছি। কালাবাবুর কুঞ্জে আছি—শহরে মন কুঞ্চিত হইয়া আছে। শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। তাহা শহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে। হরিদ্বারে আপনার আলাপী কেহ যদি থাকেন, কৃপা করিয়া তাঁহার উপর এক পত্র দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়। আপনার এস্থানে আসিবার কি হইল? শীঘ্র উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমধিকেনেতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

২

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

বৃন্দাবন
২০ অগষ্ট, ১৮৮৮

ঈশ্বরজ্যোতি মহাশয়েষু,
আমার এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা সম্প্রতি কেদার ও বদরিকাশ্রম দেখিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গাধর দুইবার তিব্বত ও ভূটান পর্যন্ত গিয়াছিল। অতি আনন্দে আছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। শীতকালে কনখলে ছিল। আপনার প্রদত্ত করোয়া তাহার হস্তে আজিও আছে। সে ফিরিয়া আসিতেছে—এই মাসেই বৃন্দাবন আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বার গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম। আপনার সমীপচারী সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণটিকে আমার কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিবেন ও আপনি জানিবেন। অলমিতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৩

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

বরাহনগর মঠ
৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১২৯৫
(১৯ নভেম্বর, ১৮৮৬)

পূজ্যপাদ মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যুদার হৃদয়ের উপযুক্ত পরিচায়ক অদ্ভুত স্নেহরসাপ্লুত লিপি পাঠ করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়াছি। মহাশয় আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের সুকৃতিবশতঃ সন্দেহ নাই। 'বেদান্ত' প্রেরণ দ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসিশিষ্যমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ করিব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। 'লঘু' অপেক্ষা আমাদের বাল্যাধীত 'মুগ্ধবোধ' অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহা হউক, মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা, আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এ বিষয়ে 'অষ্টাধ্যায়ী' সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই 'অষ্টাধ্যায়ী' অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন—ভরসা করি। মহাশয়কে আমার গুরুমহারাজের দুইখানি ফটোগ্রাফ এবং তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় উপদেশের কিয়দংশ—কোন ব্যক্তি সঙ্কলিত করিয়া [যাহা] মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দুই খণ্ড প্রেরণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আমার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে—ভরসা দুই-তিন মাসের মধ্যে মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া সার্থক হইব। কিমধিকমিতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৪

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা

বরাহনগর, কলিকাতা
২৮ অগষ্ট, ১৮৮৮

প্রণাম নিবেদনমিদং—

মহাশয়ের প্রেরিত 'পাণিনি' পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আমি পুনরায় জ্বরে পড়িয়াছিলাম—তজ্জন্য শীঘ্র উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। মহাশয়ের শারীরিক এবং মানসিক কুশল মহামায়ীর
১
নিকট প্রার্থনা করি। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৫

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর
২৩ মাঘ
৪ ফেব্রুআরী, ১৮৮৯

নমস্য মহাশয়,
কতকগুলি কারণবশতঃ অদ্য আমার মন অতি সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এমন সময়ে আপনার (আমাকে) অপার্থিব বারাণসীপুরীতে আবাহনপত্র আসিয়া উপস্থিত। ইহা আমি বিশ্বেশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি আমার গুরুদেবের জন্মভূমিদর্শনার্থ গমন করিতেছি, তথায় কয়েক দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইব। কাশীপুরী ও কাশীনাথদর্শনে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে নিশ্চিত পাষাণে নির্মিত। আমার শরীর এক্ষণে অনেক সুস্থ। জ্ঞানানন্দকে আমার প্রণাম। যত শীঘ্র পারি মহাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব। পরে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। কিমধিকমিতি। সাক্ষাতে সমুদয় জানিবেন ।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৬*

[শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে (মাষ্টার মহাশয়) লিখিত]

আঁটপুর,
২
হুগলী জেলা
২৬ মাঘ, ১২৯৫
(৭ ফেব্রুআরী, ১৮৮৯)

প্রিয় ম—,
মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে!

আপনার
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—যে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে, কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহাই আশ্চর্য!

৭

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর
১১ ফাল্গুন
(২১ ফেব্রুআরী, ১৮৮৯)

মহাশয়,
কাশীধামে যাইবার সংকল্প ছিল এবং আমার গুরুদেবের জন্মভূমি পরিদর্শনানন্তর কাশীধামে পৌঁছিব—এইরূপ কল্পনা ছিল; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ উক্ত গ্রামে যাইবার পথে অত্যন্ত জ্বর হইল এবং তৎপরে কলেরার ন্যায় ভেদবমি হইয়াছিল।

তিন-চারি দিনের পর পুনরায় জ্বর হইয়াছে; এক্ষণে শরীর এ প্রকার দুর্বল যে, দুই কদম চলিবার সামর্থ্যও নাই। অতএব বাধ্য হইয়া এক্ষণে পূর্বোক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না, কিন্তু আমার শরীর এ পথের নিতান্ত অনুপযুক্ত। যাহা হউক, শরীর বিশেষ বড় কথা নহে। কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই মহাশয়ের চরণ দর্শন করিবার অভিলাষ আছে। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে, আপনিও আশীর্বাদ করুন। জ্ঞানানন্দ ভায়াকে আমার প্রণাম, মহাশয়ও জানিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৮

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা

২১ মার্চ, ১৮৮৯

পূজনীয় মহাশয়,
কয়েক দিবস হইল আপনার পত্র পাইয়াছি—কোন বিশেষ কারণবশতঃ উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। শরীর এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, কিন্তু প্লীহাদি কোন উপসর্গ নাই—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেছি। অধুনা কাশী যাইবার সংকল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীর-গতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন, হইবে। জ্ঞানানন্দ ভায়ার সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন—যেন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকেন। আমার যাওয়া বড়ই অনিশ্চিত। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও জ্ঞানানন্দকে দিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৯

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

বরাহনগর

২৬ জুন, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,
বহুদিন আপনাকে নানা কারণে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধুনা গঙ্গাধরজীর সংবাদ পাইয়াছি এবং আমার কোন গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন। আমাদের এ স্থান হইতে চারি জন উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন, গঙ্গাধরকে লইয়া পাঁচ জন। শিবানন্দ নামক আমার একজন গুরুভ্রাতার সহিত ৺কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গাধর এই স্থানে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম বৎসর তিব্বত প্রবেশের অনুমতি পান নাই, পরের বৎসর পাইয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিব্বতের শতকরা ৯০ জন লামা, কিন্তু তাহারা এক্ষণে তান্ত্রিক মতের উপাসনাই অধিক করে। অত্যন্ত শীতল দেশ; আহারীয় অন্য কিছু নাই—কেবল শুষ্ক মাংস। গঙ্গাধর তাহাই খাইতে খাইতে গিয়াছিল! আমার শরীর মন্দ নাই, কিন্তু মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর!

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১০

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা

৪ জুলাই, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,
কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে—গঙ্গাধরকে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কারণ তাঁহারা আমাদের পত্র দিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোন পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব অবস্থার কোন আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্যনাথের নিকট) একটি বাংলো (bungalow) ক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেস্থানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।
৺কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব—এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী, তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়, আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয় —'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।'
৩

ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।
কিন্তু এবার অন্যপ্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট।
ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখনও কখনও উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা—দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।
কখনও কখনও কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া, তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।—'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.'
৪

আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকলপ্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া হয়—For 'we have taken up the cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death, Amen.'
৫
—Imitation of Christ.
আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। আমার ঠিকানা—বলরাম বসুর বাটী, ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পত্রাবলী ১১-২০

১১

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

সিমলা, কলিকাতা
১৪ জুলাই, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। এরূপস্থলে অনেকেই সংসারের দিকে টলিতে উপদেশ দেন। মহাশয় সত্যগ্রাহী এবং বজ্রসারসদৃশ হৃদয়বান্—আপনার উৎসাহবাক্যে পরম আশ্বাসিত হইলাম। আমার এ স্থানের গোলযোগ প্রায় সমস্ত মিটিয়াছে, কেবল একটি জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল লাগাইয়াছি, অতি শীঘ্রই বিক্রয় হইবার আশা আছে। তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে ৺কাশীধামে মহাশয়ের সন্নিকট যাইতেছি।

আপনি ২০৲ টাকার এক কেতা নোট পাঠাইয়াছিলেন। আপনি অতি মহৎ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—মহাশয়ের প্রথমোদ্দেশ্য পালনে আমার মাতা ভ্রাতাদির সাংসারিক অহঙ্কার প্রতিবন্ধক হইল; কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমার কাশী যাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া চরিতার্থ হইব। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১২

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর, কলিকাতা
৭ অগষ্ট, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

প্রায় এক সপ্তাহের অধিক হইল আপনার পত্র পাইয়াছি, সেই সময়ে পুনরায় জ্বর হওয়ায় উত্তরদানে অসমর্থ ছিলাম, ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মাস দেড়েক ভাল ছিলাম, কিন্তু পুনরায় ১০|১২ দিন হইল জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে ভাল আছি। গুটিকতক প্রশ্ন আছে, মহাশয়ের বিস্তৃত সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান—উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।—

১। সত্যকাম জাবালি এবং জনশ্রুতির কোন উপাখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সওয়ায়
৬ বেদের অন্য কোন অংশে আছে কি না?

২। শঙ্করাচার্য বেদান্তভাষ্যে অধিকাংশ স্থলেই স্মৃতি উদ্ধৃত করিতে গেলেই মহাভারতের প্রমাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু বনপর্বে অজগরোপাখ্যানে এবং উমামহেশ্বর-সংবাদে, তথা ভীষ্মপর্বে, যে গুণগত জাতিত্ব অতি স্পষ্টই প্রমাণিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন পুস্তকে কোন কথা বলিয়াছেন কি না?

৩। পুরুষসূক্তের জাতি পুরুষানুগত নহে—বেদের কোন্ কোন্ অংশে ইহাকে ধারাবাহিক পুরুষানুগত করা হইয়াছে?

৪। আচার্য, ‘শূদ্র যে বেদ পড়িবে না’—এ প্রকার কোন প্রমাণ বেদ হইতে দিতে পারেন নাই। কেবল ‘যজ্ঞেঽনবক৯প্তঃ’ ইহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যখন যজ্ঞে অধিকার নাই, তখন উপনিষদাদি পাঠেও অধিকার নাই। কিন্তু ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’—এস্থলে ঐ আচার্যই বলিতেছেন যে, অথ শব্দ ‘বেদাধ্যয়নাদনন্তরম্’—এ প্রকার অর্থ নহে, কারণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ না পড়িলে যে উপনিষদ্ পড়া যায় না, ইহা অপ্রামাণ্য; এবং কর্মকাণ্ডের শ্রুতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতিতে কোন পূর্বাপর ভাব নাই। অতএব যজ্ঞাত্মক বেদ না পড়িয়াই উপনিষদ্‌পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। যদি যজ্ঞে ও জ্ঞানে পৌর্বাপর্য না থাকিল, তবে শূদ্রের বেলা কেন ‘ন্যায়পূর্বকম্’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আচার্য আপনার বাক্যকে ব্যাহত করিতেছেন? কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না?

মহাশয়কে একখানি—কোন খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত—'Imitation of Christ' নামক পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় আপনি এ পুস্তক পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকেন তো পড়িয়া আমাকে চিরকৃতার্থ করিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১৩

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর
১৭ অগষ্ট, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

মহাশয়ের শেষ পত্রে—আপনাকে উক্ত অভিধান দেওয়ায় কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছেন! কিন্তু তাহা আমার দোষ নহে, মহাশয়ের গুণের। পূর্বে এক পত্রে আপনাকে লিখিয়াছিলাম যে, মহাশয়ের গুণে আমি এত আকৃষ্ট যে, বোধ হয় আপনার সহিত জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ ছিল। আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। প্রার্থনা করি, আজিকালিকার মানভিখারী, পেটবৈরাগী এবং উভয়ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীশ্রমীদের মধ্যে লক্ষের মধ্যেও যেন আপনার ন্যায় মহাত্মা একজন হউন। আপনার গুণের কথা শুনিয়া আমার সকল ব্রাহ্মণজাতীয় গুরুভ্রাতাও আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

মহাশয় আমার প্রশ্ন-কয়েকটির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধিত হইল। মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য আমি চিরঋণবদ্ধ রহিলাম। আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, ভারতাদি পুরাণোক্ত গুণগত জাতি সম্বন্ধে আচার্য কোন মীমাংসাদি করিয়াছেন কি না? যদি করিয়া থাকেন, কোন্ পুস্তকে? এতদ্দেশীয় প্রাচীন মত যে বংশগত, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, এবং স্পার্টানরা যে প্রকার হেলট্ [দের উপর ব্যবহার করিত] অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোন পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম—গুণ এবং কর্ম-প্রসূত। যিনি নৈষ্কর্ম ও নির্গুণত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জাত্যাদি ভাব মনে আনিলেও সমূহ ক্ষতি। এই সকল বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে, কিন্তু মহাশয়ের মতামত জানিলে কোন স্থানে সেই সকলকে দৃঢ় এবং কোন স্থানে সংশোধিত করিয়া লইব। চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না—অতএব আপনাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; আমাকে বালক এবং অজ্ঞ জানিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন, রুষ্ট হইবেন না।

১। বেদান্তসূত্রে যে মুক্তির কথা কহে, তাহা এবং অবধূত-গীতাদিতে যে নির্বাণ আছে, তাহা এক কি না?

২। ‘সৃষ্টিবর্জ’—সূত্রে এই ভাবের পুরো ভগবান্ কেহই হয় না, তবে নির্বাণ কি?

৩। চৈতন্যদেব পুরীতে সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ; কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন, তাহা বুঝি না—ইহা সত্য নাকি? প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেবের সহিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এ বিষয়ে অনেক বিচার হয়, তাহাতে চৈতন্যদেব জয়ী হন। চৈতন্যের কৃত এক ভাষ্য নাকি উক্ত প্রকাশানন্দের মঠে ছিল।

৪। আচার্যকে তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছে। ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ নামক বৌদ্ধদের (মহাযান) গ্রন্থের মতের সহিত আচার্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। ‘পঞ্চদশী’কারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ [দের] শূন্য ও আমাদিগের ব্রহ্ম একই ব্যাপার—ইহার অর্থ কি?

৫। বেদান্তসূত্রে বেদের কোন প্রমাণ কেন দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ প্রামাণ্য ‘পুরুষ-নিঃশ্বসিতম্’ বলিয়া; ইহা কি পাশ্চাত্য ন্যায়ে যাহাকে argument in a circle
৭
বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে?

৬। বেদান্ত বলিলেন—বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় অথবা সংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তর্কজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে? যে যার আপনার মতস্থাপনেই পাগল; এত বড় ‘সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ’, তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না?

৭। ন্যায়-মতে ‘আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ’; ঋষিরা আপ্ত এবং সর্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্যসিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আক্ষিপ্ত কেন হইতেছেন? যাঁহারা বলেন—পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকি পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি, তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগরপারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি?

৮। ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে যদি শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি? নরেশচন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে—

‘কপালে যা আছে কালী, তাই যদি হবে, (মা)
জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে কেন ডাকা তবে॥’

৯। সত্য বটে, বহু বাক্য এক-আধটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চিরপ্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা৮ ‘অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্’ ইত্যাদি৯ দুই-একটি বাক্যের দ্বারা কেন নিহত হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে ইহা দ্বাপরের, ইহা কলির ধর্ম ইত্যাদি বচনের অর্থ এবং সাফল্য কি?

১০। যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না, আগের বিধি প্রবল?

১১। তন্ত্র বলেন—কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল; মহেশ্বরেরই বা কোন্ কথা মানিব?

১২। বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন যে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ উপাসনা ঠিক নহে—আবার সেই ব্যাসই ভাগবতাদিতে উক্ত উপাসনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন; ব্যাস কি পাগল?

আরও এই প্রকার অনেক সন্দেহ আছে, মহাশয়ের প্রসাদে ছিন্নদ্বৈধ হইব আশা করিয়া পরে সেগুলি লিখিব। এ সকল কথা সাক্ষাৎ না হইলে সমস্ত বলা যায় না এবং আশানুরূপ তৃপ্তিও হয় না। গুরুর কৃপায় শীঘ্রই ভবৎ-চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিবার বাসনা রহিল। ইতি
শুনিয়াছি, বিনা সাধনায় শুদ্ধ যুক্ত্যাদি-বলে এ সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হওয়া প্রথমেই বোধ হয় আবশ্যক। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১৪

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

বাগবাজার, কলিকাতা
২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,
মহাশয়ের দুইখানি পত্র কয়েক দিবস হইল পাইয়াছি। মহাশয়ের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সম্মিলন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যে তর্কযুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ বটে এবং প্রত্যেক জীবনেরই উদ্দেশ্য

তাহাই—‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ’ ইত্যাদি
১০
। তবে কি না আমার গুরুমহারাজ যে প্রকার বলিতেন যে, কলসী পুরিবার সময় ভকভক ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন। বোধ হয়, দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব—ঈশ্বর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১৫

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা
৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,
অনেকদিন আপনার কোন পত্রাদি পাই নাই; ভরসা করি, শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। সম্প্রতি আমার দুইটি গুরুভ্রাতা ৺কাশীধামে যাইতেছেন। একটির নাম রাখাল ও অপরটির নাম সুবোধ। প্রথমোক্ত মহাশয় আমার গুরুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। যদি সুবিধা হয়, ইঁহারা যে কয়েকদিন উক্ত ধামে অবস্থান করেন, কোন সত্রে বলিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার সকল সংবাদ ইঁহাদের নিকট পাইবেন। আমার অসংখ্য প্রণামের সহিত।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—গঙ্গাধর এক্ষণে কৈলাসাভিমুখে যাইতেছেন। পথে তিব্বতীরা তাঁহাকে ফিরিঙ্গীর চর মনে করিয়া কাটিতে আসে, পরে কোন কোন লামা অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দেয়—এ সংবাদ তিব্বতযাত্রী কোন ব্যবসায়ী হইতে পাইয়াছি। লাসা না দেখিলে আমাদের গঙ্গাধরের রক্ত শীতল হইবে না। লাভের মধ্যে শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে—একরাত্রি তিনি অনাচ্ছাদনে বরফের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিশেষ কষ্ট হয় নাই ।

ইতি
নরেন্দ্র

১৬

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর, কলিকাতা
১৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,
আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম—পরে রাখালের পত্রে তাঁহার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও জানিলাম। আপনার রচিতpamphlet (পুস্তিকা) পাইয়াছি। Theory of Conservation of Energy (শক্তির নিত্যতা—এই মতবাদ) আবিষ্কারের পর হইতে ইওরোপে এক প্রকার Scientific (বৈজ্ঞানিক) অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু তাহা

পরিণামবাদ। আপনি ইহার সহিত শঙ্করের বিবর্তবাদের যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতি উত্তম। জার্মান Transcendentalist-দের১১ উপর স্পেন্সারের যে বিদ্রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না; তিনি স্বয়ং উহাদের প্রসাদভোজী। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গাফ্ (Gough) সম্যক্‌রূপে হেগেল বুঝেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপনার উত্তর অতি pointed (তীক্ষ্ণ) এবং thrashing (সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষযুক্তি-খণ্ডনকারী)।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১৭

[শ্রীযুক্ত বলরাম বসুকে লিখিত]

রামকৃষ্ণো জয়তি

বৈদ্যনাথ
২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

নমস্কারপূর্বকম্—

বৈদ্যনাথে পূর্ণবাবুর বাসায় কয়েকদিন আছি। শীত বড় নাই, শরীরও বড় ভাল নহে—হজম হয় না, বোধ হয় জলে লৌহাধিক্যের জন্য। কিছুই ভাল লাগিল না—স্থান, কাল ও সঙ্গ। কাল কাশী চলিলাম। দেওঘরে অচ্যুতানন্দ '—'র বাসায় ছিল। সে আমাদের সংবাদ পাইয়াই বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় জিদ করে। শেষে আর একদিন দেখা হইয়াছিল—ছাড়ে নাই। সে বড় কর্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮ টা স্ত্রীলোক বুড়ী, 'জয় রাধে কৃষ্ণ'ই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা! তাহার কর্মচারীরাও আমাদের অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহারা কেহ কেহ উহার উপর বড় চটা, তাহারা তাহার নানাস্থানের দুষ্কর্মের কথা কহিতে লাগিল।

প্রসঙ্গক্রমে আমি '—'র কথা পাড়িলাম। তোমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম বা সন্দেহ আছে, তজ্জন্যই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি। তাঁহাকে এখানকার বৃদ্ধ কর্মচারীরাও বড় মান্য ও ভক্তি করে। তিনি অতি বালিকা-অবস্থায় '—'র কাছে আসিয়াছিলেন, বরাবর স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন। এমন কি, '—'র মন্ত্রগুরু ভগবানদাস বাবাজীও জানিতেন যে, তিনি উহার স্ত্রী। তাহারা বলে, উঁহার মা তাঁহাকে '—'র কাছে দিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার এক পুত্র হয় ও মরিয়া যায় এবং সেই সময়ে '—'কোথা হইতে একটা 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বামনী আনিয়া ঘরে ঢোকায়, এই সকল কারণে তিনি তাহাকে ফেলিয়া পলান। যাহা হউক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাঁহার চরিত্রে কখনও কোন দোষ ছিল না, তিনি অতি সতী বরাবর ছিলেন এবং কখনও স্ত্রী-স্বামী ভিন্ন '—'র সহিত অন্য কোন ব্যবহার বা অন্য কাহারও প্রতি কু-ভাব ছিল না। এত অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য পুরুষ-সংসর্গ সম্ভবে না। তিনি '—'র নিকট হইতে পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্মচারীরাও ইহাকে শয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, 'তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।'

এ সকল লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বাল্যকালসম্বন্ধী গল্পে আমি পূর্বে বিশ্বাস করিতাম না। এ সকল ভাব, সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে না, তাহার মধ্যে এত পবিত্রতা—আমি romance (কাল্পনিক) মনে করিতাম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সকল ঠিক। তিনি অতি পবিত্র, আবাল্য পবিত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ সকল সন্দেহের জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী। আমি তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি মিথ্যাবাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, এ কথাও শুনিলাম। এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যাভিচারিণীতে সম্ভবে না।

আপনার পীড়া এখনও আরাম হইতেছে না। এখানে খুব পয়সা খরচ না করিতে পারিলে রোগীর বিশেষ সুবিধা বুঝি না। যাহা হয় বিবেচনা করিবেন। সকল দ্রব্যই অন্যত্র হইতে আনাইয়া লইতে হইবে।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১৮

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বৈদ্যনাথ
২৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

বহু দিবস চেষ্টার পর বোধ হয় এতদিনে ভবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। দুই-এক দিনেই ৺কাশীধামে ভবৎ-চরণসমীপে উপস্থিত হইব।

এ স্থানে কলিকাতার একজন বাবুর বাসায় কয়েক দিবস আছি, কিন্তু কাশীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দ ভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন, দেখিব। এবার 'শরীরং বা পাতয়ামি, মন্ত্রং বা সাধয়ামি' প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১৯

[বলরামবাবুকে লিখিত]

রামকৃষ্ণো জয়তি

এলাহাবাদ
৩০ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

শ্রীচরণেষু,
গুপ্ত
১২
আসিবার সময় একটা শ্লিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিবসে একখানি যোগেনের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এলাহাবাদে যাত্রা করি। পরদিবস পৌঁছিয়া দেখিলাম, যোগেন
১৩
সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পানিবসন্ত (দুই-একটা 'ইচ্ছা' ও ছিল) হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু অতি সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটি সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা অতি ভক্ত ও সাধুসেবাপরায়ণ। ইঁহাদের বড় জিদ—আমি এ স্থানে মাঘ মাস থাকি, আমি কিন্তু কাশী চলিলাম। গোলাপ-মা, যোগীন-মা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জনও
১৪
বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন?

ঈশ্বরের নিকট সপরিবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুলসীরাম, চুনীবাবু প্রভৃতিকে আমার নমস্কারাদি দিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্রনাথ

২০

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

ঁপ্রয়াগধাম
১৭ পৌষ
৩০ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

দুই-এক দিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলিয়া আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যোগেন্দ্র নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন সংবাদ পাই, তাহাতে তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখানের কয়েকটি বাঙালী বাবু অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এই স্থানে মাঘ মাসে 'কল্পবাস' করি। আমার মন কিন্তু 'কাশী কাশী' করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং আপনাকে দেখিবার জন্য মন অতি চঞ্চল। দুই-চারি দিবসের মধ্যে ইঁহাদের নির্বন্ধাতিশয় এড়াইয়া যাহাতে বারাণসীপুরপতির পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি—তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। অচ্যুতানন্দ সরস্বতী নামক আমার কোন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী যদি আপনার নিকটে আমার তত্ত্ব লইতে যান, বলিবেন যে শীঘ্রই আমি কাশী যাইতেছি। তিনি অতি সজ্জন এবং পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বাঁকীপুরে ফেলিয়া আসিয়াছি। রাখাল ও সুবোধ কি এখনও কাশীতে আছেন? এ বৎসর কুম্ভের মেলা হরিদ্বারে হইবে কি না, ইহার তথ্য লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। কিমধিকমিতি।

অনেক স্থানে অনেক জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু ও পণ্ডিত দেখিলাম, অনেকেই অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ', আপনার সঙ্গে কেমন প্রাণের টান আছে—অত ভাল আর কোথাও লাগে না। দেখি কাশীনাথ কি করেন।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

ঠিকানা—ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাটী, চক, এলাহাবাদ।

পত্রাবলী ২১-৩০

২১

[বলরাম বাবুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

এলাহাবাদ
৫ জানুআরী, ১৮৯০

নমস্কার নিবেদনঞ্চ—
মহাশয়ের পত্রে আপনার পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বৈদ্যনাথ change (বায়ুপরিবর্তন) সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্বল অথচ অত্যন্ত নরম-শরীর লোকের অধিক অর্থব্যয় না করিলে উক্ত স্থানে চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্তনই আপনার পক্ষে বিধি হয় এবং যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং গয়ংগচ্ছ করিতে করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ...

বৈদ্যনাথ—হাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু জল ভাল নহে, পেট বড় খারাপ করে, আমার প্রত্যহ অম্বল হইত। ইতঃপূর্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing (বিনা মাশুলে প্রেরিত) দেখিয়া the devil take it করিয়াছেন?
১৫
আমি বলি change (বায়পরিবর্তন) করিতে হয় তো শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ঈশ্বর করুণা করুন) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান্ তাহারই সহায় হন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord (ভগবান্) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ুপরিবর্তন) করাইবেন? যদি এতই Lord-এর উপর নির্ভর করেন, ডাক্তার ডাকিবেন না। ... যদি আপনার suit না করে (সহ্য না হয়) কাশী যাইবেন—আমিও এতদিন যাইতাম, এখানকার বাবুরা ছাড়িতে চাহে না, দেখি কি হয়।...

কিন্তু পুনর্বার বলি, change-এ (বায়ুপরিবর্তনে) যদি যাওয়া হয়, কৃপণতার জন্য ইতস্ততঃ করিবেন না। তাহা হইলে তাহার নাম আত্মঘাত। আত্মঘাতীর গতি ভগবান্‌ও করিতে পারেন না। তুলসী বাবু প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কারাদি দিবেন। ইতি—

দাস
নরেন্দ্রনাথ

২২

[শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে লিখিত]

এলাহাবাদ
৫ জানুআরী, ১৮৯০

প্রিয় ফকির,
একটি কথা তোমাকে বলি, উহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে, আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে পারে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহার সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও

সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্বলতা একদম না থাকে, বাকী আপনা-আপনি আসিবে। রামকে কখনও থিয়েটার বা কোনরূপ চিত্তদৌর্বল্যকারক আমোদ-প্রমোদে লইয়া যাইও না বা যাইতে দিও না।

তোমার
নরেন্দ্রনাথ

২৩

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

এলাহাবাদ
৫ জানুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
প্রিয় রাম, কৃষ্ণময়ী ও ইন্দু, বৎসগণ, মনে রাখিও কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর। ইতি

তোমাদের
নরেন্দ্রনাথ

২৪

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী
গোরাবাজার, গাজীপুর
শুক্রবার, ২৪ জানুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
অদ্য তিন দিন যাবৎ গাজীপুরে পৌঁছিয়াছি। এস্থানে আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি; স্থানটি অতি মনোরম। অদূরে গঙ্গা আছেন, কিন্তু স্নানের বড় কষ্ট—পথ নাই, এবং বালির চড়া ভাঙ্গিতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুর পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যে মহানুভবের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম—এ স্থানে আছেন। অদ্য ইনি ৺কাশীধামে যাইতেছেন, কাশী হইয়া কলিকাতা যাইবেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইঁহার সঙ্গে পুনর্বার কাশী যাই। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি—অর্থাৎ বাবাজীকে১৬ দেখা—তাহা এখনও হয় নাই। অতএব দুই-চারি দিন বিলম্ব হইবে। এস্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় westernized (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে, আমি western idea (পাশ্চাত্যভাব) মাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত। কেবল আমার বন্ধুর ও-সকল idea (ভাব) বড়ই কম। কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে! বিশ্বনাথ এই সকল দুর্বলহৃদয়কে রক্ষা করুন। পরে বাবাজীকে দেখিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিব। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

পুঃ—ভগবান্ শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামি ও পাপ মনে করে! অহো ভাগ্য!

২৫

[বলরাম বাবুকে লিখিত]

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

গাজীপুর
৩০ জানুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আমি এক্ষণে গাজীপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে কয়েকদিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালেরিয়া! গাজীপুরের বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারী বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাঙলার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর, chimney &c. (চিমনি ইত্যাদি)। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতোমধ্যে বাবাজীর সহিত দেখা হইল তো হইল—নহিলে এই পর্যন্ত। প্রমদাবাবুর বাগান সম্বন্ধে কাশী হইতে স্থির করিয়া লিখিব। কালী ভট্টাচার্য যদি একান্ত চাহে তো আমি কাশীতে রবিবার যাইলে যেন আসে—না আসিলেই ভাল। কাশীতে দুই-চারিদিন থাকিয়া শীঘ্রই হৃষীকেশ চলিতেছি—প্রমদাবাবুর সঙ্গে যাইলেও যাইতে পারে। আপনারা এবং তুলসীরাম সকলে আমার যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন ও ফকির, রাম, কৃষ্ণময়ী প্রভৃতিকে আমার আশীর্বাদ।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

আমার মতে আপনি কিছুদিন গাজীপুরে আসিয়া থাকিলে বড় ভাল, এখানে সতীশ বাঙলা ঠিক করিয়া দিতে পারিবে ও গগনচন্দ্র রায় নামক একটি বাবু—আফিম আফিসের Head (বড়বাবু), তিনি যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social (মিশুক)। ইঁহারা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া ১৫৲।২০৲ টাকা; চাউল মহার্ঘ, দুগ্ধ ১৬।২০ সের, আর সকল অত্যন্ত সস্তা। আর ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে কোন ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কিছু expensive (বেশী খরচ)। ৪০৲।৫০৲ টাকার উপর পড়িবে। কাশী বড় damned malarious (অত্যন্ত ম্যালেরিয়াপূর্ণ)।

প্রমদাবাবুর বাগানে কখনও থাকি নাই—তিনি কাছ-ছাড়া করিতে চান না। বাগান অতি সুন্দর বটে, খুব furnished (সাজান গোজান) এবং বড় ও ফাঁকা। এবার যাইয়া থাকিয়া দেখিয়া মহাশয়কে লিখিব। ইতি

নরেন্দ্র

২৬

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর, কলিকাতা
১৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,
বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুশকিল, তিনি বাড়ীর বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান-সমন্বিত এবং চিমনীদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা নাই। লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব। রবিবার ৺কাশীধামে

যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে। অদ্যই চলিয়া যাইতাম; যাহা হউক, রবিবার যাইতেছি। আপনার হৃষীকেশ যাইবার কি হইল?

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—গুণের মধ্যে স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর।

২৭

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ওঁ বিশ্বেশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
৪ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আপনার পত্রও পাইয়াছি এবং বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এ স্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিলাম না, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—এ পত্রের বিষয় গোপন রাখিবেন। ইতি

২৮

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

বিশ্বেশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
বএইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। বাবাজী আচারী বৈষ্ণব; যোগ, ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্তি বলিলেই হয়। তাঁহার কুটীর চতুর্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন; যখন উপরে আসেন, তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহেন। কি খান, কেহই জানে না, এইজন্যই 'পওহারী বাবা' বলে। মধ্যে একবার ৫ বৎসর—একবারও গর্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে, শরীর ছাড়িয়াছেন; কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। এবার কিন্তু দেখা দেন না, তবে দ্বারের আড়াল হইতে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা আমি কখনও শুনি নাই। কোন direct (সোজাসুজি) প্রশ্নের উত্তর দেন না, বলেন 'দাস ক্যা জানে?' তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জিদাজিদি করাতে বলিলেন যে, 'আপনি কিছুদিন এ স্থানে থাকিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।' এ প্রকার কখনও কহেন না; ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পীড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, 'কিছুদিন থাকুন।' এই আশায় আছি। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্মকাণ্ডও করেন—পূর্ণিমা

হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত হোম হয়। অতএব ইহার মধ্যে গর্তে যাইবেন না নিশ্চিত। অনুমতি কি লইব, direct (স্পষ্ট) উত্তর দিবেন না। 'দাসকে ভাগ্য' ইত্যাদি ঢের বলিবেন। আপনার ইচ্ছা থাকে, পত্রপাঠ চলিয়া আসুন। ইঁহার শরীর যাইলে বড় আপসোস থাকিবে—দুদিনে দেখা অর্থাৎ আড়াল হইতে কথা কহিয়া যাইতে পারিবেন। আমার বন্ধু সতীশবাবু অতি সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করিবেন। আপনি পত্রপাঠ চলিয়া আসুন, ইতোমধ্যে আমি বাবাজীকে বলিব।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—ইঁহার সঙ্গ না হইলেও এ প্রকার মহাপুরুষের জন্য কোন কষ্টই বৃথা হইবে না নিশ্চিত। অলমতিবিস্তরেণ।

২৯

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
১৩ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আপনার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। আমারও কোমরে একপ্রকার বেদনা হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং যাতনা দিতেছে। বাবাজীকে দুই দিন দেখিতে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে আমার খবর লইতে এক ব্যক্তি আসিয়াছিল—অতএব আজ যাইব। আপনার অসংখ্য প্রণাম দিব। আগুন বাহির হয়, অর্থাৎ অতি অদ্ভুত গূঢ় ভক্তির কথা এবং নির্ভরের কথা বাহির হয়—এমন অদ্ভুত তিতিক্ষা এবং বিনয় কখনও দেখি নাই। কোন মাল যদি পাই, আপনার তাহাতে ভাগ আছে নিশ্চিত জানিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৩০

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
১৪ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
গতকল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে শরৎ-ভায়ার পত্রখানি পাঠাইতে—বলিতে ভুলিয়াছি বোধ হয়; অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গঙ্গাধর ভায়ার একখানি পত্র পাইয়াছি। তিনি এক্ষণে কাশ্মীর, রামবাগ সমাধি, শ্রীনগরে আছেন। আমি lumbagoতে (কোমরের বাতে) বড় ভুগিতেছি। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—রাখাল ও সুবোধ ওঁকার, গির্নার, আবু, বোম্বে, দ্বারকা দেখিয়া এক্ষণে বৃন্দাবনে আছে।

পত্রাবলী ৩১-৪০

৩১

[বলরাম বাবুকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোরাবাজার, গাজীপুর
১৪ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আপনার আপসোস-পত্র পাইয়াছি। আমি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতেছি না, বাবাজীর অনুরোধ এড়াইবার যো নাই।

সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss-এর (আদর্শ আনন্দ) দিকে চাহিতে গেলে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার 'কি হইল', 'কি হইল' অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ, নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। 'পাগড়ি বেঁধেই ভগবান্' যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম। আপনার সর্বদাই যে মনে পড়ে 'কি হইল', আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

গিরিশবাবুর সহিত মাতাঠাকুরাণীকে আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে, গিরিশবাবু লিখিয়াছেন—সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আপনি অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, কার্যসিদ্ধির প্রধান উপায় যে ধৈর্য—এ আপনি ঠিক বুঝেন, সে বিষয়ে চপলমতি আমরা আপনার নিকট বহু শিক্ষার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। কাশীতে আমি—যোগীন-মাতার ঘাড় না ভাঙা যায় এবিষয়ে একদিন বাদানুবাদচ্ছলে কহিয়াছিলাম। তৎসওয়ায় আর আমি কোন খবর জানি না এবং জানিতে ইচ্ছাও রাখি না। মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি? যোগীন-মাতাকে যে বারণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সদ্বিবেচক—আপনাকে কি বলিব? কান দুটো, কিন্তু মুখ একটা; বিশেষতঃ আপনার মুখ বড় কড়া এবং ফস ফস করিয়া large promises (বেশী বেশী অঙ্গীকার-বাক্য) বাহির হয় না বলিয়া আপনার উপর অনেক সময় বিরক্ত হই, কিন্তু বিচার করিয়া দেখি যে, আপনিই সদ্বিবেচনার কার্য করেন।—'Slow but sure' (ধীর, কিন্তু নিশ্চিত)।

What is lost in power, is gained in speed (শক্তি যে পরিমাণ ব্যয়িত হয়, গতিবৃদ্ধিতে তাহা পোষাইয়া যায়), যাহাই হউক, সংসারে কথা লইয়াই কাজ। কথার ছাল ছাড়াইয়া (তাতে আপনার কৃপণতার আবরণ—এত ছাড়াইয়া) অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না এবং বহু সঙ্গ না করিলে কোন ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ইহা মনে করিয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণীকে স্মরণ করিয়া—নিরঞ্জন যদি আপনাকে কিছু কটুকাটব্য বলিয়া থাকে ক্ষমা করিবেন। 'ধর্ম—দলে নহে, হুজুগে নহে', ৺গুরুদেবের এই সকল উপদেশ ভুলিয়া যান কেন? আপনার যা করিবার সাধ্য করুন, কিন্তু তাহার কি ব্যবহার হইল, কি না হইল, ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমাদের বোধ হয় নাই। ... গিরিশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে এ সময়ে মাতাঠাকুরাণীর সেবায় তাঁহার বিশেষ শান্তিলাভ হইবে। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বিচার করিব! আর ৺গুরুদেব আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। আপনার বাটী ভিন্ন কোথাও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না এবং শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—এই সকল মনে করিয়া আমাদের ন্যায় চপলমতি বালকদিগের (নিজ পুত্রের কৃত অপরাধের ন্যায়) সকল অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করিবেন—অধিক কি লিখিব।

জন্মোৎসব কবে হইবে পত্রপাঠ লিখিবেন। আমার কোমরে একটা বেদনায় বড় অসুস্থ করিয়াছে। আর দিনকয়েক বাদে এ স্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ-ক্রোশব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে। সেই সময়ে সতীশ কতকগুলো তাজাফুল ও ডাল মহোৎসব উপলক্ষে পাঠাইবে বলিতেছে। যোগেন কোথায়, কেমন আছে? বাবুরাম কেমন আছে? সারদা কি এখন তেমনি চঞ্চলচিত্ত? গুপ্ত কি করিতেছে? তারক-দাদা, গোপাল-দাদা প্রভৃতিকে আমার প্রণাম। মাষ্টারের ভাইপো কতদূর পড়িল? রাম ও ফকির ও কৃষ্ণময়ীকে আমার আশীর্বাদাদি দিবেন। তাহারা পড়াশুনা কেমন করিতেছে? ভগবান্ করুন, আপনার ছেলে যেন 'মানুষ' হয়—না-মরদ না হয়। তুলসীবাবুকে আমার লক্ষ লক্ষ সাদর সম্ভাষণ দিবেন এবং এবারে একলা সাণ্ডেলও নিজের খাটনি খাটিতে পারিবে কিনা? চুনীবাবু কেমন আছেন?

বলরামবাবু, মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিম্বা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।

(পরের পত্রখানি) গুপ্তকে দেখাইবেন।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৩২

[স্বামী সদানন্দকে লিখিত]

১৪ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

কল্যাণবরেষু,
বোধ করি শারীরিক কুশলে আছ। আপনার জপতপ সাধন ভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমিও তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে। ইঁহারা গালি দিলে বা খুন করিলেও ক্রুদ্ধ হইও না। কোন স্ত্রীসঙ্গে যাইও না—hardy (কষ্টসহিষ্ণু) হইবার অল্প অল্প চেষ্টা করিবে এবং সইয়ে সইয়ে ক্রমে ভিক্ষা দ্বারা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর কথা শুনিবে। গুরুনিষ্ঠা, অটল ধৈর্য ও অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে। Strict morality (কঠোর নীতিপরায়ণতা) চাহি—একটুকু এদিক ওদিক হইলে সর্বনাশ। ইতি

নরেন্দ্রনাথ

৩৩

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
১৯ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
গঙ্গাধর ভায়াকে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়া ও কোন স্থানে বসিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া এবং তিব্বতে কি কি সাধু দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার কি প্রকার, সবিশেষ লিখিতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অত্র পত্রের সহিত আপনার নিকট পাঠাইতেছি। কালী (অভেদানন্দ) ভায়ার হৃষীকেশে পুনঃপুনঃ জ্বর হইতেছে, তাঁহাকে এ স্থান হইতে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি; উত্তরে যদি আমার যাওয়ার আবশ্যক তিনি বিবেচনা করেন, এ স্থান হইতে একেবারেই হৃষীকেশে যাইতে বাধ্য হইব, নতুবা দুই-এক দিনের মধ্যেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। মহাশয় হয়তো এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখিয়া হাসিবেন—কথাও তাই বটে। তবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল—সোনার শিকলের অনেক উপকার আছে, তাহা [সেই উপকার] হইয়া গেলে আপনা-আপনি খসিয়া যাইবে। আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র—এই স্থানেই একটু duty (কর্তব্য)-বোধ আছে। সম্ভবতঃ কালীভায়াকে এলাহাবাদে অথবা যে স্থানে সুবিধা হয়, পাঠাইয়া দিব। আপনার চরণে আমার শত শত অপরাধ রহিল, পুত্রস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ (আমি আপনার পুত্র, শরণাগত, আমায় শাসন করুন, শিক্ষা দিন)। কিমধিকমিতি

দাস
নরেন্দ্র

৩৪

[স্বামী অখণ্ডানন্দ বা 'গঙ্গাধর'কে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
ফেব্রুআরী, ১৮৯০

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়া অতি প্রীত হইলাম। তিব্বত সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব, সংস্কৃতে তিব্বতকে 'উত্তরকুরুবর্ষ' কহে—উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমি—এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে। তিব্বতী লোকদিগের আচার-ব্যবহার তুমি তো কিছুই লিখ নাই; যদি এত আতিথেয়, তবে কেন তোমাকে যাইতে দিল না? সবিশেষ লিখিবে—সকল কথা খুলিয়া একখান বৃহৎ পত্রে। তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।

তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর (উহাতে ব্যভিচার অতি মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল), এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন (বৌদ্ধগণ) নির্বীর্য হইল, তখনই [তাহারা] কুমারিল ভট্ট দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাউলরা মহাপ্রভুকে secret (গোপনে) স্ত্রীসম্ভোগী, সুরাপায়ী ও নানাপ্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern (আধুনিক) তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতো'ক্ত তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিত ব্যাখ্যা করে; ফল এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায়; বর্মা ও সিংহলের লোক প্রায় তন্ত্র মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে, এবং উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে 'অমিতাভ বুদ্ধম্' মানে, তাঁহাকেও ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন দিয়াছে। ফল কথা এই, উত্তরের লোকেরা যে 'অমিতাভ বুদ্ধম্' ইত্যাদি মানে, তাহা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'দিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জন করিয়াছে। যে everything for others ('যাহা কিছু সব পরের জন্য'—এই মত) তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছ, ঐ phase of Buddhism (বৌদ্ধর্মের ঐ ভাব) আজকাল ইওরোপকে বড় strike করিয়াছে (ইওরোপের বড় মনে লাগিয়াছে)। যাহা হউক, ঐ phase (ভাব) সম্বন্ধে আমার বলিবার অনেক আছে, এ পত্রে তাহা হইবার নহে। যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in this unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect (বুদ্ধি) এবং heart (হৃদয়), যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্মবাদ, তাহা jew (য়াহুদী) প্রভৃতি সকল ধর্মের কর্মবাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man (প্রথম ব্যক্তি), যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢঙ সব পুরাতনের মত রহিল, সেই তাঁহার অন্তঃকর্মবাদ—সেই তাঁহার বেদের পরিবর্তে সূত্রে বিশ্বাস করিতে হুকুম। সেই জাতিও ছিল, তবে গুণগত হইল (বুদ্ধের সময় জাতিভেদ যায় নাই), সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম মানে না, তাহাদিগকে 'পাষণ্ড' বলা। 'পাষণ্ড'টা বৌদ্ধদের বড় পুরানো বোল, তবে কখনও বেচারীরা তলওয়ার চালায় নাই, এবং বড় toleration (উদারভাব) ছিল। তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্মের প্রমাণ?—বিশ্বাস কর!!—যেমন সকল ধর্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেই জন্যই তিনি অবতার হন। তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মত। কিন্তু শঙ্করের how far more grand and rational (কত মহত্তর এবং অধিকতর যুক্তিপূর্ণ)! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ দুঃখ, পালাও পালাও। সুখ কি একেবারেই নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব? কেহ যদি বলে যে সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এ দিক্ দিয়ে যান না—তিনি বলেন, 'সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি'—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব—দুঃখ আছে কি কী আছে; জুজুর ভয়ে আমি পালাই না। আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি; আমি কি পশু যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব—জানিবার জন্য জান দিব। এ জগতে জানিবার কিছুই নাই, অতএব যদি এই relative-এর (মায়িক জগতের) পার কিছু থাকে—যাকে শ্রীবুদ্ধ 'প্রজ্ঞাপারম্' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে I do not care (আমি গ্রাহ্য করি না)। কি উচ্চভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart (হৃদয়) অণুমাত্র পান নাই; কেবল dry intellect (শুষ্ক জ্ঞানবিচার)—তন্ত্রের ভয়ে, mob-এর (ইতরলোকের) ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাতসুদ্ধ কেটে ফেললেন, এ সকল সম্বন্ধে গেলে পুঁথি লিখতে হয়; আমার তত বিদ্যা ও আবশ্যক—দুইয়েরই অভাব।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ‘ইতি’ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরেরও আপনাকে limited (সীমাবদ্ধ) করিবার শক্তি নাই। তুমি যে ‘সূত্তনিপাত’ হইতে গণ্ডারসূত্ত তর্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। ঐ গ্রন্থে ঐ প্রকার আর একটি ধনীর সূত্ত আছে, তাহাতেও প্রায় ঐ ভাব। ‘ধম্মপদ’-মতেও ঐ প্রকার অনেক কথা আছে। কিন্তু সেও শেষে যখন ‘জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ’
১৭
—যাহার শরীরের উপর অণুমাত্র শারীর বোধ নাই, তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী এক জায়গায় বসিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে তখন ঐ প্রকার আচরণ করিবে—সে দূর—বড় দূর।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥
১৮

ব্রহ্মজ্ঞের ভোজন, চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখনও বনে, কখনও শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন; যেখানে বেদ শেষ হইয়াছে, সেই বেদান্তের পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর, বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত; তিনি কখনও উলঙ্গ, কখনও উত্তমবস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মত্তবৎ, কখনও পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

গুরুচরণে প্রার্থানা করি যে তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ ভ্রমণ কর। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৫

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
২৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

Lumbago (কোমরের বাতে) বড় ভোগাইতেছে, নহিলে ইতিপূর্বেই যাইবার চেষ্টা দেখিতাম। এস্থানে আর মন তিষ্ঠিতেছে না। তিন দিন বাবাজীর স্থান হইতে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া প্রায় প্রত্যহই আমার খবর লয়েন। কোমর একটু সারিলেই বাবাজীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতেছি। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্রনাথ

৩৬

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
মার্চ, ১৮৯০

প্রাণাধিকেষু,

কল্য তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে পওহারীজী নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হন না—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত আছে, তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙলা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বদখত দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা তো gymnastics (কসরত)। এইজন্য এই অদ্ভুত রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাংলা-ঘর আছে; ঐ ঘরে থাকিব এবং উক্ত বাগান বাবাজীর কুটীরের অতি নিকট। বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকে, সেই স্থানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায়, দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্বতারোহণ-সংকল্প ত্যাগ করিলাম। এবং কোমরে দুমাস ধরিয়া একটা বেদনা—বাত (lumbago)—হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে উঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজী কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক।

আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।

তুমি যদি গাজীপুরে আইস, গোরাবাজারের সতীশবাবু অথবা গগনবাবুর নিকট আসিলেই আমার সন্ধান পাইবে। অথবা পওহারী বাবা এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে, ইঁহার নামমাত্রেই সকলে বলিবে, এবং তাঁহার আশ্রমে যাইয়া পরমহংসজীর খোঁজ করিলেই সকলে বলিয়া দিবে। মোগলসরাই ছাড়াইয়া দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া Branch Railway (শাখা রেল) একটু আছে; তাহাতে তারিঘাট—গাজীপুরের আড়পারে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয়।

এক্ষণে আমি গাজীপুরে কিছুদিন রহিলাম; দেখি বাবাজী কি করেন। তুমি যদি আইস, দুইজনে উক্ত কুটীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে পাহাড়ে বা যেথায় হয়, যাওয়া যাইবে। আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহনগরে কাহাকেও লিখিও না। আমার আশীর্বাদ জানিবে।

সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
নরেন্দ্র

৩৭

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
৩ মার্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি জানেন না—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুকুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিতে হইল। আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে। শরৎকে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি, আজিও উত্তর আইসে নাই—এমন স্থান, টেলিগ্রাম আসিতেও এত দেরী! কোমরের বেদনা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, বড় যন্ত্রণা হইতেছে। পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর

নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি ‘উল্টা সমঝ্‌লি রাম!’—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধ হয়—ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি; এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন! বাবাজী ছাড়েন না, আবার গগনবাবু (ইঁহাকে আপনি বোধ হয় জানেন, অতি ধার্মিক, সাধু এবং সহৃদয় ব্যক্তি) ছাড়েন না। টেলিগ্রামে যদ্যপি আমার যাইবার আবশ্যক হয়, যাইব; যদ্যপি না হয়, দুই-চারি দিনে কাশীধামে ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। আপনাকে ছাড়িতেছি না—হৃষীকেশে লইয়া যাইবই, কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। শৌচের কথা কি বলিতেছেন? পাহাড়ে জলের অভাব—স্থানের অভাব? তীর্থ এবং সন্ন্যাসী—কলিকালের? টাকা খরচ করিলে সত্রওয়ালারা ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া দেয়, স্থানের কা কথা!! কোন গোল নাই, এতদিনে গরম আরম্ভ হইয়াছে, তবে কাশীর গরম হইবে না—সে তো ভালই। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা চিরকাল, তাহাতে নিদ্রা উত্তমরূপ হইবারই কথা।

আপনি অত ভয় পান কেন? আমি guarantee (দায়ী), আপনি নিরাপদে ঘরে ফিরিবেন এবং কোন কষ্ট হইবে না। ব্রিটিশ রাজ্যে কষ্ট ফকিরের, গৃহস্থের কোন কষ্ট নাই, ইহা আমার experience (অভিজ্ঞতা)।

সাধ করে বলি—আপনার সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ? এক চিঠিতে আমার সকল resolution (সংকল্প) ভেসে গেল, আবার সব ফেলে গুটি গুটি কাশী চলিলাম। ইতি

গঙ্গাধর ভায়াকে ফের এক চিঠি লিখিয়াছি, এবার তাঁহাকে মঠে যাইতে বলিয়াছি। যদি যান, অবশ্যই কাশী হইয়া যাইবেন ও আপনার সহিত দেখা হইবে। আজকাল কাশীর স্বাস্থ্য কেমন? এ স্থানে থাকিয়া আমার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সকল (উপসর্গ) সারিয়াছে, কেবল কোমরের বেদনায় অস্থির, দিন রাত কনকন করে এবং জ্বালাতন করিতেছে—কেমন করিয়া বা পাহাড়ে উঠিব, ভাবিতেছি। বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ! খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—

‘আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।’

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ ‘লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী’ বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত ‘মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা।’
১৯

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে ‘ভগবান্ রক্ষা কর’ বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান্, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আপনার সকল মঙ্গল —এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখিয়াছি—তিনিই করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দাস নরেন্দ্র

পুনঃ—পত্রপাঠ উত্তর দিবেন। নরেন্দ্র

৩৮

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
৮ মার্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আপনার পত্র পাইলাম, অতএব আমিও প্রয়াগ যাইতেছি। আপনি প্রয়াগে কোথায় থাকিবেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্র

পুঃ—দুই-এক দিনের মধ্যে অভেদানন্দ যদ্যপি আইসেন, তাঁহাকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

নরেন্দ্র

৩৯

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
১১ মার্চ, ১৮৯০

বলরামবাবু,
Receipt (রসিদ) পাইবামাত্র লোক পাঠাইয়া Fairlie Place (ফেয়ার্লি প্লেস) রেলওয়ে গুদাম হইতে গোলাপ ফুল আনাইয়া শশীকে পাঠাইয়া দিবেন। আনাইতে বা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

বাবুরাম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইতেছে শীঘ্র—আমি আর এক জায়গায় চলিলাম।

নরেন্দ্র

P.S. দেরী হলে সব খারাপ হইয়া যাইবে—নিশ্চিত জানিবেন।

নরেন্দ্র

৪০

[বলরামবাবুকে লিখিত]

রামকৃষ্ণো জয়তি

গাজীপুর
১৫ মার্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশবাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। 'অহং'-বুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্মের সাধনস্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন, তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে, খুঁত খুঁত কিছু মাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

‘নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভূতকো যথা॥’

যেটুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া—ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে—প্রমদাবাবু প্রয়োগে গিয়াছেন। বাবুরাম হঠাৎ এ স্থানে আসিয়াছে, তাহার জ্বর হইয়াছে—এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে২০ ১০৲ টাকা পাঠানো গিয়াছে—সে বোধ হয় গাজীপুর হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।

ফুল—বোধ হয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া লইয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয়—সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতানো বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক—ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্র

পত্রাবলী ৪১-৫০

৪১

গাজীপুর
১৫ মার্চ, ১৮৯০

অতুলবাবু,
২১

আপনার মনের অবস্থা খারাপ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম—যাহাতে আনন্দে থাকেন তাহাই করুন।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।
২২

দাস
নরেন্দ্র

পুঃ—আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।

৪২

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
মার্চ, ১৮৯০

প্রাণাধিকেষু,

এইমাত্র তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম—হিজিবিজি বহু কষ্টে বুঝিলাম। পূর্বের পত্রে সমস্ত লিখিয়াছি। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তুমি যে নেপাল হইয়া তিব্বতের পথ বলিয়াছ, তাহা আমি জানি। যে প্রকার তিব্বতে সহজে কাহাকেও যাইতে দেয় না, ঐপ্রকার নেপালেও কাটামুণ্ড রাজধানী ও দুই-এক তীর্থ ছাড়া কাহাকেও কোথাও যাইতে দেয় না। কিন্তু আমার একজন বন্ধু এক্ষণে নেপালের রাজার ও রাজার স্কুলের শিক্ষক—তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, বৎসর বৎসর যখন নেপাল হইতে চীন দেশে রাজকর যায়, সে সময় লাসা হইয়া যায়। একজন সাধু—যোগাড় করিয়া ঐ রকমে লাসা, চীন এবং মাঞ্চুরিয়ায় (উত্তর চীন)—তারাদেবীর পীঠ পর্যন্ত গিয়াছিল। উক্ত বন্ধু চেষ্টা করিলে আমরাও মান্য ও খাতিরের সহিত তিব্বত, লাসা, চীন সব দেখিতে পারিব। অতএব তুমি অবিলম্বে গাজীপুরে চলিয়া আইস। এথায় আমি বাবাজীর কাছে কিছুদিন থাকিয়া, উক্ত বন্ধুকে চিঠি পত্র লিখিয়া নেপাল হইয়া নিশ্চিত তিব্বতাদি যাইব। কিমধিকমিতি। দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া গাজীপুরে আসিতে হয়। দিলদারনগর মোগলসরাই ষ্টেশনের তিন-চার ষ্টেশনের পর। এথায় ভাড়া যোগাড় করিতে পারিলে পাঠাইতাম; অতএব তুমি যোগাড় করিয়া আইস। গগনবাবু—যাঁহার আশ্রয়ে আমি আছি—এত ভদ্র, উদার এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তি যে কি লিখিব! তিনি কালীর জ্বর শুনিয়া হৃষীকেশে তৎক্ষণাৎ ভাড়া পাঠাইলেন এবং আমার জন্য আরও অনেক ব্যয় করিয়াছেন। এ অবস্থায় আবার তাঁহাকে কাশ্মীরের ভাড়ার জন্য ভারগ্রস্ত করা সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে জানিয়া নিরস্ত হইলাম। তুমি যোগাড় করিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আইস। অমরনাথ দেখিবার বাতিক এখন থাক। ইতি

নরেন্দ্র

৪৩

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
৩১ মার্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আমি কয়েক দিবস এস্থানে ছিলাম না এবং অদ্যই পুনর্বার চলিয়া যাইব। গঙ্গাধর ভায়াকে এস্থানে আসিতে লিখিয়াছি। যদি আইসেন, তাহা হইলে তৎসহ আপনার সন্নিধানে যাইতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এস্থানের কিয়দ্দুরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব, সে স্থান হইতে পত্র লিখিবার কোন সুবিধা নাই। এইজন্যই আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। গঙ্গাধর-ভায়া বোধ করি আসিতেছেন, না হইলে আমার পত্রের উত্তর আসিত। অভেদানন্দ-ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন। আর একটি গুরুভাই আমার নিকটে ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার পৌঁছানো সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। তাঁহার সহিত আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি। কি করি, আমি বড়ই দুর্বল, বড়ই মায়াসমাচ্ছন্ন—আশীর্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল; কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাবাজী মিষ্ট মিষ্ট বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন। আপনাকে কি বলিব, আমি আপনার চরণে শত শত অপরাধ করিতেছি—অন্তর্যাতনায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তির কৃত বলিয়া সে সকল মার্জনা করিবেন। অভেদানন্দের রক্তামাশয় হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি তাঁহার তত্ত্ব লন এবং যিনি এস্থান হইতে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যদি মঠে ফিরিয়া যাইতে চান, পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার গুরু ভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে? আশীর্বাদ করুন, যেন অটল ধৈর্য ও অধ্যবসায় আমার হয়। আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন।

দাস
নরেন্দ্র

পুঃ—প্রিয়বাবু ডাক্তারের বাটী সোনারপুরাতে অভেদানন্দ আছেন। আমার কোমরের বেদনা সেই প্রকারই আছে।

দাস নরেন্দ্র

৪৪

[স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
২ এপ্রিল, ১৮৯০

ভাই কালী,

তোমার, প্রমদাবাবুর ও বাবুরামের হস্তাক্ষর পাইয়াছি। আমি এ স্থানে একরকম মন্দ নাই। তোমার আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমারও বড় ঐরূপ হয়, সেই ভয়েই যাইতে পারিতেছি না—তার উপর বাবাজী বারণ করেন। দুই-চারি দিনের বিদায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভয় এই তাহা হইলে একেবারে, হৃষীকেশী টানে পাহাড়ে টেনে তুলবে—আবার ছাড়ানো বড় কঠিন হইবে, বিশেষ আমার মত দুর্বলের পক্ষে। কোমরের বেদনাটাও কিছুতেই সারে না—cadaverous (জঘন্য)। তবে অভ্যাস পড়ে আসছে। প্রমদাবাবুকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবে, তিনি আমার শরীর ও মনের বড় উপকারী বন্ধু ও তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। যাহা হয় হইবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
নরেন্দ্র

৪৫

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

গাজীপুর
২ এপ্রিল, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
মহাশয়, বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহা কোথায় পাইব? তাহারই চেষ্টায় ভবঘুরেগিরি করিতেছি। যদি কখনও যথার্থ বৈরাগ্য হয়, মহাশয়কে বলিব; আপনিও যদি কিছু পান, আমি ভাগীদার আছি—মনে রাখিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস নরেন্দ্র

৪৬

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

রামকৃষ্ণো জয়তি

গাজীপুর
১০ মে, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
বহুবিধ গোলমালে এবং পুনরায় জ্বর হওয়ায় আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। অভেদানন্দের পত্রে আপনার কুশল অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গঙ্গাধর ভায়া বোধ হয় এতদিনে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ স্থানে এ সময়ে যমরাজ বহু বন্ধু এবং আত্মীয়কে গ্রাস করিতেছেন, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছি। নেপাল হইতে আমার কোন পত্রাদি বোধ হয় আইসে নাই। বিশ্বনাথ কখন এবং কিরূপে আমাকে rest (বিশ্রাম) দিবেন, জানি না। একটু গরম কমিলেই এ স্থান হইতে পলাইতেছি, কোথা যাই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার জন্য ৺বিশ্বনাথ-সকাশে প্রার্থনা করিবেন, শূলী যেন আমাকে বল দেন। আপনি ভক্ত, এবং 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ' ইতি ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে বিনয় করিতেছি। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্র

৪৭

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা
২৬ মে, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

বহু বিপদ্ঘটনার আবর্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তিযুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনুঁ' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদ্যপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিমান্ হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজী আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক ওদিক বেড়াইতে গেল, সে আলাদা কথা—কিন্তু সে বেড়ানো মাত্র, তাঁহার মত এই ছিল যে এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। তা যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা-আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৪। অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাটী ভাড়া দিতেন।

৫। ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে (অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান রাজার অদ্ভুত আইনের জ্বালায়) অগ্নিসমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির এবং প্রতিকৃতি যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজাদির ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা করিতেন।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদিগের বাঙালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী University men (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ) হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?

৭। পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিস্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন; এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোকে ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবু মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই। (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন।) তাঁহারা সন্ন্যাসী; তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। ১০০০৲ টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট; আমি প্রার্থনা করিতেছি যে যদি আপনার অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্মিক ধনবানদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্যনির্বাহ হওয়ানো আপনার উচিত কি না, বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুধাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান্, সৎকুলোদ্ভুত যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের ideal (আদর্শ) ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের 'অহো দুর্দৈবম্'।

১১। যদি বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?'—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজী। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এইজন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি, আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।

১২। যদি বলেন যে ঁকাশী-আদি স্থানে আসিয়া করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! এবং বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। 'ত্যাগ' কাহাকে বলে এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না, কেবল বিলাস, ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান্ এদেশে বৈরাগ্য ও অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন। এদেশের লোকের কিছুই নাই, পশ্চিম দেশের লোকের, বিশেষ ধনীদিগের, এ সকল কার্যে অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেচনায় হয়, উত্তর দিবেন। গঙ্গাধর আজিও পৌঁছান নাই, কালি হয়তো আসিতে পারেন। তাঁহাকে দেখিতে বড় উৎকণ্ঠা।ইতি—দাস

নরেন্দ্র

পুনঃ—উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

৪৮

[প্রমদাবাবুকে লিখিত]

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা
৪ জুন, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,
আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি; তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বড় ঠিক কথা। আমরাও এ স্থানে ও স্থানে দুই চারিজন করিয়া ছড়াইতেছি। গঙ্গাধর-ভায়ার পত্র দুইখানি আমিও পাইয়াছি—ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া গগনবাবুর বাটীতে আছেন এবং গগনবাবু তাঁহার বিশেষ সেবা ও যত্ন করিতেছেন। আরোগ্য হইয়াই আসিবেন। আপনি আমাদের সংখ্যাতীত দণ্ডবৎ জানিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্র

অভেদানন্দ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। ইতি

নরেন্দ্র

৪৯*

[স্বামী সারদানন্দকে লিখিত]

বাগবাজার, কলিকাতা
৬ জুলাই,১৮৯০

প্রিয় শরৎ ও কৃপানন্দ,
তোমাদের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শুনিতে পাই, আলমোড়া এই সময়েই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, তথাপি তোমার জ্বর হইয়াছে; আশা করি, ম্যালেরিয়া নহে। গঙ্গাধরের নামে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যে তিব্বতে যাহা তাহা খাইয়াছিল, তাহা সর্বৈব মিথ্যা কথা। ... আর টাকা তোলার কথা লিখিয়াছ—সে ব্যাপারটা এইঃ তাহাকে মাঝে মাঝে 'উদাসী বাবা' নামে এক ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিতে এবং তাহার রোজ বার আনা, এক টাকা করিয়া ফলাহার যোগাইতে হইত। গঙ্গাধর বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ব্যক্তি একজন পাকা মিথ্যাবাদী, কারণ সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত প্রথম যায়, তখনই সে তাহাকে বলিয়াছিল যে, হিমালয়ে কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর গঙ্গাধর এই সকল আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিষ এবং স্থান না দেখিতে পাইয়া তাহাকে পুরাদস্তুর মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল 'তা—'ইহার সাক্ষী। বাবাজীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ পাইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার এবং তার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইতেই সে উদাসীর উপর

সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই উদাসী প্রভুর এত রাগ। আর পাণ্ডারা—সে পাজীগুলো একেবারে পশু; তুমি তাহাদের এতটুকুও বিশ্বাস করিও না।

আমি দেখিতেছি যে, গঙ্গাধর এখনও সেই আগেকার মত কোমলপ্রকৃতির শিশুটিই আছে, এই সব ভ্রমণের ফলে তাহার ছটফটে ভাবটা একটু কমিয়াছে; কিন্তু আমাদের এবং আমাদের প্রভুর প্রতি তাহার ভালবাসা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। সে নির্ভীক, সাহসী, অকপট এবং দৃঢ়নিষ্ঠ। শুধু এমন একজন লোক চাই, যাহাকে সে আপনা হইতে ভক্তিভাবে মানিয়া চলিবে, তাহা হইলেই সে একজন অতি চমৎকার লোক হইয়া দাঁড়াইবে।

এবারে আমার গাজীপুর পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না, অথবা কলিকাতা আসিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কালীর পীড়ার সংবাদে আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং বলরামবাবুর আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতায় টানিয়া আনিল। সুরেশবাবু ও বলরাম বাবু দুই জনেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন! গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠের খরচ চালাইতেছেন এবং আপাততঃ ভালয় ভালয় দিন গুজরান হইয়া যাইতেছে। আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা যোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হইবার ইচ্ছা; গঙ্গাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।

আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিষটি তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটিই কর নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। আমার মতে জ্ঞান জিনিষটা এমন কিছু সহজ জিনিষ নয় যে, তাকে 'ওঠ ছুঁড়ী, তোর বে' বলে জাগিয়ে দিলেই হল। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই মুষ্টিমেয় লোকের অধিক কেহ জ্ঞান লাভ করে না; এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরানো চাল, জানই তো। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের নামে যে ঠকবাজী চলিতেছে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্যবান্ হও। রাখাল লিখিতেছে যে, দক্ষ
২৩
তাহার সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে এবং সে সোনা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা 'জ্ঞানী' হইয়া উঠিয়াছে! ভগবান্ তাহাকে আশীর্বাদ করুন এবং তোমরাও বল, শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আমার স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল, আর গাজীপুর থাকার ফলে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা কিছুকাল থাকিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। গাজীপুর হইতে যে সকল কাজ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা শেষ করিতে কিছুকাল লাগিবে। সেই আগেও যেরূপ বোধ হইত, আমি এখানে যেন কতকটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে রহিয়াছি। এক দৌড়ে আমি হিমালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি।

আলমোড়ার জল-হাওয়া কিরূপ লাগিতেছে? শীঘ্র লিখিও। সারদানন্দ, বিশেষ করিয়া তোমার আসিয়া কাজ নাই। একটা জায়গায় সকলে মিলিয়া গুলতোন করায় আর আত্মোন্নতির মাথা খাওয়ায় কি ফল? মূর্খ ভবঘুরে হইও না, কিন্তু বীরের মত অগ্রসর হও। 'নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ'
২৪
ইত্যাদি। ভাল কথা, তোমার আগুনে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইল কেন? যদি দেখ যে, হিমালয়ে সাধনা হইতেছে না, আর কোথাও যাও না।

এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহাতে—তুমি যে নামিয়া আসিবার জন্য উতলা হইয়াছ, শুধু মনের এই দুর্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। শক্তিমান্, ওঠ এবং বীর্যবান্ হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও। অলমিতি।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল, শুধু বাবুরামের একটু জ্বর হইয়াছে।

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

৫০*

[লালা গোবিন্দ সহায়কে লিখিত]

আজমীঢ়
১৪ এপ্রিল, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

... পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও—উহাতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত। ...

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৫১-৬০

৫১*

আবু পাহাড়
৩০ এপ্রিল, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,
তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ বালকটির উপনয়ন সম্পন্ন করিয়াছ? তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদূর অগ্রসর হইলে? আশা করি প্রথমভাগ নিশ্চয়ই শেষ করিয়া থাকিবে। ... তুমি শিবপূজা সযত্নে করিতেছ তো? যদি না করিয়া থাক তো করিতে চেষ্টা করিও। 'তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই সব পাইবে।' ভগবানকে অনুসরণ করিলেই তুমি যাহা কিছু চাও পাইবে। ... কম্যাণ্ডার সাহেবদ্বয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইবে; তাঁহারা উচ্চপদস্থ হইয়াও আমার ন্যায় একজন দরিদ্র ফকিরের প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। বৎসগণ, ধর্মের রহস্য শুধু মতবাদে নহে, পরন্তু সাধনার মধ্যে নিহিত। সৎ হওয়া এবং সৎ কর্ম করাতেই সমগ্র ধর্ম পর্যবসিত। "যে শুধু 'প্রভু প্রভু' বলিয়া চীৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কার্য করে, সেই ধার্মিক।" তোমরা আলোয়ারবাসী যে কয়জন যুবক আছ, তোমরা সকলেই চমৎকার লোক, এবং আশা করি যে অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—যদিই বা মাঝে মাঝে সংসারে এক-আধটু ধাক্কা খাও, তথাপি বিচলিত হইও না; নিমিষেই উহা চলিয়া যাইবে এবং পুনরায় সব ঠিকঠাক হইয়া যাইবে।

৫২*

আবু পাহাড়, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,
মন যে দিকেই যাউক না কেন, নিয়মিত জপ করিতে থাকিবে। হরবক্সকে বলিও যে, সে যেন প্রথমে বাম নাসায়, পরে দক্ষিণ নাসায়, এবং পুনরায় বাম নাসায়, এইক্রমে প্রাণায়াম করে। বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সংস্কৃত শিখিবে। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

৫৩*

[শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত]

১৮৯১

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,
২৫

আমার স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার সংবাদ লইতে আপনি যে একজন লোক পাঠাইয়াছেন, ইহা আপনার অপূর্ব সহৃদয়তা ও পিতৃসুলভ চরিত্রের একটুখানি পরিচয় মাত্র। আমি এখানে বেশ আছি। আপনার সহৃদয়তায় এখানে আর আমার কিছুরই অভাব নাই। আমি দু-চার দিনের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। এখান হইতে নামিবার সময় আমার কোন যানবাহনের প্রয়োজন নাই। অবরোহণ কষ্টসাধ্য; কিন্তু অধিরোহণ আরও কষ্টসাধ্য এবং এ কথা জগতের সব কিছু সম্বন্ধেই

সমভাবে সত্য। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। ইতি

চির বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৫৪*

বরোদা
২৬ এপ্রিল, ১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,
আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি এখানেই পেয়ে ভারী আনন্দ হল। নাড়িয়াদ ষ্টেশন থেকে আপনার বাড়ী যেতে আমার মোটেই অসুবিধা হয়নি। আপনার ভাইদের কথা কি আর বলব? আপনার ভাইদের যেমনটি হওয়া উচিত, তাঁরা ঠিক তাই! ভগবান্ আপনার পরিবারের উপর তাঁর অশেষ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। আমার সমস্ত পরিব্রাজক জীবনে এমন পরিবার তো আর দেখলাম না। আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মণিভাই আমার সব রকম সুবিধা করে দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেলামেশার এইটুকু সুযোগ হয়েছে যে, আমি তাঁকে মাত্র দুবার দেখেছি—একবার এক মিনিটের জন্য, আর একবার খুব বেশী হয়তো দশ মিনিটের জন্য। দ্বিতীয়বারে তিনি এই অঞ্চলের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করেছিলেন। তবে আমি পুস্তকালয় ও রবিবর্মার ছবি দেখেছি; আর এখানে দেখবার মত এই তো আছে! সুতরাং আজ বিকালে বোম্বে চলে যাচ্ছি। এখানকার দেওয়ানজীকে (বা আপনাকেই) তাঁর সদয় ব্যবহারের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন। বোম্বে হতে সবিশেষ লিখিব। ইতি

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—নাড়িয়াদে শ্রীযুক্ত মণিলাল নাভুভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি অতি বিদ্বান্ ও সাধুপ্রকৃতির ভদ্রলোক। তাঁর সাহচর্যে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

৫৫*

পুনা
১৫ জুন, ১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,
আপনার শেষ চিঠি পাবার পর দীর্ঘকাল কেটে গেল; আশা করি, আমি আপনার কোনরূপ বিরাগ ঘটাইনি। আমি ঠাকুরসাহেবের সহিত মহাবালেশ্বর হতে এখানে এসেছি এবং তাঁরই বাড়ীতে আছি। এখানে আরও দু-এক সপ্তাহ থাকবার ইচ্ছা আছে; তারপর হায়দরাবাদ হয়ে রামেশ্বর যাব।

ইতোমধ্যে জুনাগড়ে আপনার পথের সমস্ত বাধা হয়তো দূর হয়ে গেছে—অন্ততঃ আমার আশা তাই। আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ পেতে বিশেষ আগ্রহ হয়—বিশেষতঃ সেই মচকানোটার।

ভবনগরের রাজকুমারের শিক্ষক ও আপনার বন্ধু সেই সুরতি [সুরাটি?] ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তিনি অতি সজ্জন। তাঁর পরিচয়লাভে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করি; তিনি বড়ই অমায়িক ও উদারপ্রকৃতির লোক।

আপনার মহামনা সহোদরগণকে এবং আমাদের ওখানকার বন্ধুবর্গকে আমার অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাবেন। বাড়ীতে পত্র লেখার সময় দয়া করে শ্রীযুক্ত নাভুভাইকে আমার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। আশা করি, সত্বর উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আপনাকে ও পরিবারস্থ সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করছি। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

৫৬*

বোম্বে
১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

এই পত্রের বাহক বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু। সে কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তার পরিবারকে আমি যদিও পূর্ব হতেই জানি, তবু তাকে দেখতে পাই খাণ্ডোয়াতে এবং সেখানেই আলাপ-পরিচয় হয়।

সে খুব সৎ ও বুদ্ধিমান্ ছেলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডারগ্রাজুয়েট। আপনি জানেন যে, আজকাল বাঙলাদেশের অবস্থা কি কঠিন; তাই এই যুবকটি চাকরির অন্বেষণে বেরিয়েছে। আমি আপনার স্বভাবসুলভ সহৃদয়তার সহিত পরিচিত আছি; তাই মনে হয় যে, এ যুবকটির জন্য কিছু করতে অনুরোধ করে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে উত্ত্যক্ত করছি না। অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। আপনি দেখতে পাবেন যে, সে সৎ ও পরিশ্রমী। কোন মানুষের প্রতি একটু দয়া দেখালে তার জীবন সুখময় হয়ে উঠতে পারে, এ বালক সেই দয়ার উপযুক্ত পাত্র; আপনি মহৎ ও দয়ালু, আপনাকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি না।

আশা করি, আমার এই অনুরোধে আপনি বিব্রত বা উত্ত্যক্ত হচ্ছেন না। এই আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ এবং বিশেষ ঘটনাচক্রে এটা করতে হল। এখন আপনার দয়ালু প্রাণই আমার আশা ও ভরসা। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

৫৭*

বোম্বে
২২ অগষ্ট, ১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনার পত্র পেয়ে খুবই কৃতার্থ হলাম—বিশেষতঃ তাহাতে আমার প্রতি আপনার পূর্বের মত স্নেহের প্রমাণ পেয়ে।

আপনার ইন্দোরের বন্ধুর ... সহৃদয়তা ও সৌজন্য সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলাই ভাল। তবে অবশ্য সব দক্ষিণীই কিছু সমান নয়। আমি শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গকে যখন পত্রে জানিয়েছিলাম যে, আমি লিমডির ঠাকুরসাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন তিনি তার উত্তরে মহাবালেশ্বরে আমায় যা লিখেছিলেন, তা উদ্ধৃত করলেই আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেনঃ

'আপনি লিমডির ঠাকুরকে ওখানে পেয়েছেন জেনে বড়ই খুশী হলাম; নতুবা আপনাকে বড়ই মুশকিলে পড়তে হত; কারণ আমরা—মারাঠারা গুজরাতীদের মত তেমন অতিথিপরায়ণ নই।' ...

আপনার গাঁটের ব্যথা এখন প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে জেনে খুব সুখী হলাম। দয়া করে আপনার ভাইকে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য মাপ করতে বলবেন। আমি এখানে কিছু সংস্কৃত বই পেয়েছি এবং অধ্যায়নের সাহায্যও জুটেছে। অন্যত্র এরূপ পাবার আশা নাই; সুতরাং শেষ করে যাবার আগ্রহ হয়েছে। কাল আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনঃসুখারামের সঙ্গে দেখা হল; তিনি তাঁর এক সন্ন্যাসী বন্ধুকে বাড়ীতে রেখেছেন। তিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয়; তাঁর পুত্রও তাই।

এখানে পনর-কুড়ি দিন, থেকে রামেশ্বর যাবার বাসনা আছে। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব নিশ্চিত।

আপনার ন্যায় উচ্চমনা, মহাপ্রাণ ও দয়ালু ব্যক্তিদের দ্বারাই জগতের প্রকৃত উন্নতি হয়। অন্যেরা সংস্কৃত কবির ভাষায় 'জননীযৌবন-বনকুঠারাঃ।'

আমার প্রতি আপনার পিতৃসুলভ স্নেহ ও যত্ন আমি মোটেই ভুলতে পারি না; আবার আমার মত একজন ফকির আপনার ন্যায় একজন মহাশক্তিমান্ মন্ত্রীর উপকারের কী প্রতিদান দিতে পারে? আমি শুধু এইটুকু প্রার্থনা করতে পারি যে, সর্বমঙ্গলবিধাতা ভগবান্ আপনাকে ইহলোকে বাঞ্ছিত সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করুন; আর আপনাকে অতি দীর্ঘায়ু দান করে অবশেষে তাঁর অনন্ত মঙ্গল ও শান্তিময় পবিত্র কোলে টেনে নিন। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—একটি বিষয় অতি দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি—এ অঞ্চলে সংস্কৃত ও অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার আছে—আর এগুলিই যেন তাদের কাছে ধর্মের শেষ কথা!

হায় বেচারারা! দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃ-পিতামহগণ গত চারশ-পুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখেনি); সাধারণ লোকেরা সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান্ তাঁদের বাঁচান!

আমি আপনার কাছে একটি বাঙালী ছেলেকে পাঠিয়েছি। আশা করি, তার প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করবেন। ইতি

বি

৫৮*

ঈশ্বরো জয়তি

বোম্বাই
২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২

প্রিয় পণ্ডিতজী মহারাজ,

আমি যথাসময়ে আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি প্রশংসার উপযুক্ত না হইলেও, আমাকে কেন যে প্রশংসা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রভু যীশুর কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'ভাল একজন মাত্রই আছেন—স্বয়ং প্রভু ভগবানই একমাত্র ভাল।' অপর সকলে তাঁহারই হস্তের যন্ত্রমাত্র। 'মহতো মহীয়ান্' পরমধামে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণই মহিমামণ্ডিত হউন, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে 'ভৃত্যটি মজুরিলাভের উপযুক্তই নহে'; বিশেষতঃ ফকিরের কোনরূপ প্রশংসালাভের অধিকার নাই। আপনার ভৃত্য যদি শুধু তাহার নির্দিষ্ট কর্তব্য করে, তবে কি সেজন্য আপনি তাহাকে প্রশংসা করেন?

আশা করি, আপনি সপরিবারে সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও মদীয় অধ্যাপক
২৬
যে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এখন আপনাকে আমি অন্য এক বিষয় বলিতে চাইঃ হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই দেখিতে পাই—প্রথমে একটি সাধারণ 'প্রতিজ্ঞা' ধরিয়া লইয়া, তারপর চুলচেরা বিচার চলিতেছে; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটিই হয়তো সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই। সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ
২৭
প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটি কারণঃ প্রথমতঃ এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত আধিক্য আমাদিগকে কর্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তা-প্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা বা দূরভ্রমণ করিবার লোক ছিল বটে, তবে তাহারা প্রায় সবই ছিল বণিক; পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত না হইয়া উহার অবনতিই হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের পর্যবেক্ষণ দোষযুক্ত ছিল, এবং তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ এতই অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক হইত যে, বাস্তবের সঙ্গে তাহার মোটেই মিল থাকিত না।

সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন কি হাস্যকর অবস্থাতেই না উপনীত হইয়াছি! ভাঙ্গীরূপে যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সংক্রামক রোগের ন্যায় সকলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে; কিন্তু যখনই পাদ্রী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা জামা (যতই ছিন্ন ও জর্জরিত হউক) পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেই প্রবেশাধিকার পায়! আমি তো এমন লোক দেখি না, যে তখন তাহাকে একখানা চেয়ার আগাইয়া না দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম করমর্দন না করিতে সাহস করে! ইহার চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদ্রীরা দক্ষিণে কি করিতেছে, দেখিবেন—আসুন দেখি। উহারা লাখ লাখ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং স্ত্রীলোকেরা—এমন কি রাজবংশীয়া মহিলাগণ পর্যন্ত—ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া

থাকে, তথাকার সিকি ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাহাদের দোষও দিতে পারি না। তাহাদের আর কোন্ বিষয়ে কি অধিকার আছে বলুন? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিবে?

আপনারই
বিবেকানন্দ

৫৯

[হরিপদ মিত্রকে লিখিত]

মাড়গাঁও, ১৮৯৩

কল্যাণবরেষু,

আপনার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌঁছিয়া ও তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই—অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি। গোকর্ণ, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম। কল্য প্রাতঃকালের ট্রেনে ধারবাড় যাত্রা করিব। ষষ্টি আমি লইয়া আসিয়াছি। ডাক্তার যুগড়েকরের মিত্র আমার অতিশয় যত্ন করিয়াছেন। ভাটেসাহেব ও অন্যান্য সকল মহাশয়কে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর আপনার ও আপনার পত্নীর সকল কল্যাণ করুন। পঞ্জেম শহর বড় পরিষ্কার। এখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ। ইতি

সচ্চিদানন্দ
২৮

৬০*

C/o বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র
খার্তাবাদ, হায়দরাবাদ
২১ ফেব্রুআরী, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার বন্ধু সেই গ্রাজুয়েট যুবকটি ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন—একটি বাঙালী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। এখন আমি ঐ বাঙালী ভদ্রলোকটির কাছেই রয়েছি—কাল তোমার যুবক বন্ধুটির কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকব; তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখা হয়ে গেলে কয়েক দিনের মধ্যেই মান্দ্রাজে ফিরছি। কারণ আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতানায় ফিরে যেতে পারব না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে; জানি না রাজপুতানায় আরও কি ভয়ানক গরম হবে, আর গরম আমি আদপে সহ্য করতে পারি না। সুতরাং এরপর আমাকে বাঙ্গালোরে যেতে হবে, তারপর উতকামণ্ডে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাব। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুটতে থাকে।

তাই আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল; আর এই জন্যই আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্য আর্যাবর্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতাম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ এই গরমে আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না—তা করতে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল, আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা। কিন্তু মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুন আমার সব আশাভরসা চুরমার হয়ে গেছে; এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলাম—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হোক। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নেই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেনো যে, কয়েক দিনের মধ্যেই দু-এক দিনের জন্য মান্দ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে বাঙ্গালোরে যাব, আর সেখান থেকে উতকামণ্ডে গিয়ে দেখব, যদি ম—মহারাজ আমায় পাঠায়। 'যদি' বলছি তার কারণ, আমি '—'রাজার অঙ্গীকারবাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা তো আর রাজপুত নয়, রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু কখনও কথার খেলাপ করবে না। যাই হোক, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

'স্বর্গে যেরূপ মর্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ অনন্তকালের জন্য তোমারই মহিমা জগতে ঘোষিত হচ্ছে এবং

সবই তোমারই রাজত্ব।’
২৯

তোমরা সকলে আমার শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
সচ্চিদানন্দ

পত্রাবলী ৬১-৭০

৬১*

[ডাঃ নাঞ্জুণ্ড রাওকে লিখিত]

খেতড়ি, রাজপুতানা
২৭ এপ্রিল, ১৮৯৩

প্রিয় ডাক্তার,
এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। বালাজী বেচারার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম। 'প্রভুই দিয়া থাকেন, আবার প্রভুই গ্রহণ করেন—প্রভুর নাম ধন্য হউক।' আমরা কেবল জানি, কিছুই নষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সেনাপতি যদি তাঁহার অধীন সৈন্যকে কামানের মুখে যাইতে বলেন, তাহাতে তাহার অভিযোগ করিবার বা ঐ আদেশ পালন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবার অধিকার নাই। বালাজীকে প্রভু এই শোকে সান্ত্বনা দান করুন, আর এই শোক যেন তাহাকে সেই পরম করুণাময়ী জননীর বক্ষের নিকট হইতে নিকটে লইয়া যায়।

মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ আমি পূর্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলিবেন, রাজা৩০ অথবা আমার গুরুভাইগণ আমার সংকল্পে বাধা দিবেন, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর তো আমার প্রতি অগাধ ভালবাসা।

একটা কথা—চেটির উত্তরটি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমি বেশ ভাল আছি। দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বাই রওনা হইতেছি।

সেই সর্বশুভবিধাতা আপনাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই সচ্চিদানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।

পুঃ—আমি জগমোহনকে আপনার নমস্কার জানাইয়াছি। তিনিও আমাকে বলিতেছেন, আপনাকে তাঁহার প্রতিনমস্কার জানাইতে।

৬২*

[শ্রীযুক্ত বালাজী রাওকে লিখিত]

১৮৯৩

প্রিয় বালাজী,
'আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়; প্রভু দিয়াছিলেন, তিনিই আবার গ্রহণ করিলেন; প্রভুর নাম ধন্য হউক!' যখন সেই প্রাচীন য়াহুদী-বংশসম্ভূত মহাত্মা—মনুষ্যের অদৃষ্টচক্রে যতদূর দুঃখ-কষ্ট আসিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া ঐ বাণী নির্গত হইয়াছিল, আর তিনি মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার এই বাণীর মধ্যেই জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গমালা নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা গর্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান। 'শোকার্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে'; কারণ ঐ মহাবিপদের দিনে, যখন পিতামাতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন করাল কালের পেষণে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, যখন গভীর দুঃখ ও নিরাশায় পৃথিবী অন্ধকার বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন দুঃখ বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

যখন জীবনভার এত দুর্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই প্রতিভাবান্ বীরহৃদয় ব্যক্তি সেই অনন্ত পূর্ণ নিত্যানন্দময় সত্তামাত্রস্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত; তখনই যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখময় কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙিয়া যায়। তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া শেষে সেই প্রভুর সিংহাসনে সমীপবর্তী হয়, 'যেখানে অত্যাচারীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না, যেখানে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে।'

ভ্রাতঃ! দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

'কেন' প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার।
কাজ কর, করে মর—এই হয় সার॥

হে প্রভো! তোমার নাম—তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হে প্রভো! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে—জানি প্রভো, মায়ের হাতেই মার খাইতেছি; কিন্তু মন বুঝিলেও প্রাণ যে বুঝে না! হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি যে একান্ত আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিতেছ, হৃদয়ের জ্বালা তো তাহা করিতে দিতেছে না।

হে প্রভো! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয়স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভো, এস হে আচার্যচূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ; সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভো, এস হে পার্থসারথি! অর্জুনকে তুমি যেমন একসময় শিখাইয়াছিলে যে, তোমার শরণ লওয়াই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তেমনি, আমাকেও শিখাও—যেন প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও শরণাগতির সহিত বলিতে পারি 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'। প্রভু আপনার হৃদয়ে শান্তি দিন, ইহাই দিবারাত্র সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা ।

৬৩*

খেতড়ি
২৮ এপ্রিল, ১৮৯৩

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,
২৫

ইচ্ছা ছিল যে, এখানে আসার পথে নাড়িয়াদে আপনার ওখানে যাব, এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব। কিন্তু কয়েকটি ঘটনাতে বাধা পড়ল, তার মধ্যে প্রধান এই যে, আপনি ওখানে ছিলেন না—হ্যামলেটের ভূমিকা বাদ দিয়ে 'হ্যামলেট' অভিনয় করা হাস্যকর ব্যাপার মাত্র! আর আমার নিশ্চিত জানা আছে যে, আপনি দিন-কয়েকের মধ্যেই নাড়িয়াদে ফিরবেন। অধিকন্তু আমি দিন-বিশেকের মধ্যেই যখন বোম্বে যাচ্ছি, তখন আপনার ওখানে যাওয়াটা পেছিয়া দেওয়াই উচিত মনে করলাম।

খেতড়ির রাজাজী আমায় দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মান্দ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; সুতরাং আমাকে খেতড়ি আসতেই হল। কিন্তু গরম অসহ্য; অতএব আমি শীঘ্রই পালাচ্ছি।

ভাল কথা, আমার প্রায় সকল দক্ষিণী রাজার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, আর বহু জায়গায় বহু অদ্ভুত দৃশ্যও দেখেছি। আবার দেখা হলে সে-সব সবিশেষ বলব। আমি জানি আপনি আমায় খুবই ভালবাসেন এবং আপনার ওখানে না যাওয়ার অপরাধ নেবেন না। যা হোক, কিছুদিনের মধ্যেই আসছি।

আর এক কথা। এখন কি জুনাগড়ে আপনার কাছে সিংহের বাচ্চা আছে? রাজার জন্য একটি কি আমায় ধার দিতে পারেন? এর বদলে আপনার পছন্দ হলে তিনি রাজপুতানার কোন জানোয়ার আপনাকে দিতে পারেন।

ট্রেনে রতিলাল ভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি ঠিক সেই সুন্দর অমায়িক মানুষটিই আছেন। আর দেওয়ানজী সাহেব, আপনার জন্য কি আর প্রার্থনা করব? করুণাময় জগৎপিতার এতগুলি পুত্রকন্যার সেবায় নিরত থেকে আপনার যে পবিত্র জীবন সকলের প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করেছে, তার শেষভাগে ভগবান্ আপনার সর্বস্ব হোন। ওম্

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৬৪*

বোম্বে
২২ মে, ১৮৯৩

দেওয়ানজী সাহেব,

কয়েকদিন হয় বোম্বে পৌঁছিয়াছি। আবার দুই-চার দিনের মধ্যে এখান হইতে বাহির হইব। আপনার যে বেনিয়া বন্ধুটির নিকট আমার থাকিবার স্থানের জন্য লিখিয়াছিলেন, পত্রযোগে তিনি জানাইয়াছেন যে, পূর্ব হইতেই তাঁহার বাটী অতিথি-অভ্যাগতে ভর্তি এবং তন্মধ্যে অনেকে আবার অসুস্থ; সুতরাং আমার জন্য স্থানসঙ্কুলান হওয়া সেখানে সম্ভব নয়—সেজন্য তিনি দুঃখিত। তবে আমরা বেশ একটি সুন্দর ও খোলা জায়গা পাইয়াছি। ... খেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও আমি বর্তমানে একত্র আছি। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহৃদয়তার জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। রাজপুতানার জনসাধারণ যে শ্রেণীর লোককে 'তাজিমি সর্দার' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং যাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজাকেও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়, ইনি সেই সর্দারশ্রেণীর লোক। অথচ ইনি এত অনাড়ম্বর এবং এমনভাবে আমার সেবা করেন যে, আমি সময় সময় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। ...

এই ব্যাবহারিক জগতে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় যে, যাঁহারা খুব সৎলোক তাঁহারাও নানাপ্রকার দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে পতিত হন। ইহার রহস্য দুর্জ্ঞেয় হইতে পারে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, এ জগতের সব কিছুই মূলতঃ সৎ—উপরের তরঙ্গমালা যে-রূপই হউক, তাহার অন্তরালে, গভীরতম প্রদেশে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক অনন্ত বিস্তৃত স্তর বিরাজিত। যতক্ষণ সেই স্তরে আমরা পৌঁছিতে না পারি, ততক্ষণই অশান্তি; কিন্তু যদি একবার শান্তিমণ্ডলে পৌঁছানো যায়, তবে ঝঞ্ঝার গর্জন ও বায়ুর তর্জন যতই হউক—পাষাণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গৃহ তাহাতে কিছুমাত্র কম্পিত হয় না।

আর আমি এ কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, আপনার ন্যায় পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি, যাঁহার সমগ্র জীবন অপরের কল্যাণসাধনেই নিযুক্ত হইয়াছে, তিনি—গীতামুখে শ্রীভগবান্ যাহাকে 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—সেই দৃঢ় ভূমিতে অবশ্যই স্থিতি লাভ করিয়াছেন।

যে আঘাত আপনি পাইয়াছেন, তাহা আপনাকে তাঁহার সমীপবর্তী করুক—যিনি ইহলোকে এবং পরলোকে একমাত্র প্রেমের আস্পদ। আর তাহা হইলেই তিনি যে সর্বকালে সব কিছুর ভিতর অধিষ্ঠিত এবং যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হারাইয়া গিয়াছে, সব কিছু আপনি তাঁহাতেই উপলব্ধি করুন।

আপনার স্নেহের
বিবেকানন্দ

৬৫*

খেতড়ি
মে, ১৮৯৩

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনি পত্র লেখার পূর্বে আমার পত্র নিশ্চয়ই পৌঁছায়নি। আপনার পত্র পড়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ হল। হর্ষ এ জন্য যে, আপনার ন্যায় হৃদয়বান্ শক্তিমান্ ও পদমর্যাদাশালী একজনের স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে; আর বিষাদ এ জন্য যে, আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার আগাগোড়াই ভুল ধারণা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন যে, আমি আপনাকে পিতার ন্যায় ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি এবং আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম। সত্য কথা এইঃ আপনার হয়তো স্মরণ আছে যে, আগে থেকেই আমার চিকাগো যাবার অভিলাষ ছিল; এমন সময় মান্দ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজার সাহায্যে আমাকে পাঠাবার সব রকম আয়োজন করে ফেলল। আপনার আরও স্মরণ থাকতে পারে যে, খেতড়ির রাজা ও আমার মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম বিদ্যমান। তাই কথাচ্ছলে তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। এখন খেতড়ির রাজা মনে করলেন যে, যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবই; আরও বিশেষ কারণ এই যে, ভগবান্ তাঁকে সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকারী দিয়াছেন এবং সেজন্য এখানে খুব আমোদ আহ্লাদ চলেছে। অধিকন্তু আমার আসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে অত দূর মান্দ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আসতে আমাকে হতই। ইতোমধ্যে নাড়িয়াদে আপনার ভাইকে টেলিগ্রাম করে জানতে চাইলাম যে, আপনি সেখানে আছেন কি না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তর পেলাম না। এদিকে বেচারা প্রাইভেট সেক্রেটারীর মান্দ্রাজ যাতায়াতে খুবই কষ্ট হয়েছিল, আর তার নজর ছিল শুধু একটা জিনিসের দিকে—জলসার আগে আমরা খেতড়ি না পৌঁছালে রাজা খুব দুঃখিত হবেন; তাই সে তখনি জয়পুরের টিকেট কিনে ফেলে। পথে রতিলালের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় এবং তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার টেলিগ্রাম পৌঁছেছিল, যথাকালে উত্তরও দেওয়া হয়েছিল, আর শ্রীযুক্ত বিহারীদাস আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন আপনিই বিচার করুন; কারণ এ যাবৎ আপনি সর্বদা সুবিচার করাকেই নিজের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছেন। আমি এ বিষয়ে কী করতে পারতাম, আর কী করা উচিত ছিল? আমি পথে নেমে পড়লে খেতড়ির উৎসবে যথাসময়ে যোগ দিতে পারতাম না এবং আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হত। কিন্তু আমি আপনার ও আপনার ভায়ের ভালবাসা জানি; তা-ছাড়া আমার এও জানা ছিল যে, চিকাগো যাবার পথে আমাকে দিন কয়েকের মধ্যেই বোম্বে যেতে হবে। ভেবেছিলাম যে, আপনার ওখানে যাওয়াটা আমার ফেরার পথের জন্য মুলতবী রেখে

দেওয়াই উত্তম হবে। আপনি যে মনে করছেন আপনার ভাইরা আমার দেখাশোনা না করায় আমি অপমানিত হয়েছি—এটা আপনার একটা অভিনব আবিষ্কার বটে! আমি তো এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি; অথবা আপনি হয়তো মানুষের মনের কথা জানার বিদ্যা শিখে ফেলেছেন—ভগবান্ জানেন! ঠাট্টা ছেড়ে দিলেও দেওয়ানজী সাহেব, আমার কৌতুকপরায়ণতা ও দুষ্টামি আগের মতই আছে; কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক বলছি যে, জুনাগড়ে আমায় যেরূপ দেখেছিলেন আমি এখনও সেই সরল বালকই আছি এবং আপনার প্রতি আমার ভালবাসাও পূর্ববৎই আছে—বরং শতগুণ বর্ধিত হয়েছে; কারণ আপনার ও দক্ষিণদেশের প্রায় সকল দেওয়ানের মধ্যে মনে মনে তুলনা করার সুযোগ আমি পেয়েছি এবং ভগবান্ জানেন, আমি দক্ষিণদেশের প্রত্যেক রাজদরবারে শতমুখে আপনার কিরূপ প্রশংসা করেছি। অবশ্য আমি জানি যে, আপনার সদ্গুণরাশি ধারণা করতে আমি অতি অযোগ্য। এতেও যদি ব্যাপারটার যথেষ্ট ব্যাখ্যা না হয়ে থাকে, তবে আপনাকে অনুনয় করছি যে, আপনি আমাকে পিতার ন্যায় ক্ষমা করুন; আমি আপনার ন্যায় উপকারীর প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞ হয়েছি—এই ধারণার কবলে পড়ে আমি যেন উৎপীড়িত না হই। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

পুঃ—আপনার ভায়ের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে, তা দূর করবার ভার আপনার ওপর দিচ্ছি। আমি যদি স্বয়ং শয়তানও হই, তবু তাঁদের দয়া ও আমার প্রতি বহু প্রকার উপকারের কথা আমি ভুলতে পারি না।

অপর যে দুজন স্বামীজী গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁরা আমার গুরুভাই এবং তাঁদের একজন আমাদের নেতা। তাঁদের সঙ্গে তিন বৎসর পরে দেখা হয় এবং আমরা সকলে আবু পর্যন্ত একসঙ্গে এসে ওখানেই ওঁদের ছেড়ে এসেছি। আপনার অভিলাষ হলে বোম্বে যাবার পথে আমি তাঁদের নাড়িয়াদে নিয়ে যেতে পারি। ভগবান্ আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের মঙ্গল করুন।

বি

৬৬

[শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত]

বোম্বে
২৪ মে, ১৮৯৩

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ ৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও ইওরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র। সর্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি ইন্দুমতী 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ-মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা—ইন্দুমতী মিত্র ইত্যাদি। আর কি লিখিব মা, সর্বদা জানিবে যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তুমি শীঘ্রই পুত্রবতী হও। আমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্যবিবরণপূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে তোমায় লিখিব। এক্ষণে আমি বোম্বেতে আছি। ৩১ তারিখ পর্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি—

আশীর্বাদক
সচ্চিদানন্দ

৬৭*

ওরিয়েণ্টাল হোটেল
ইয়োকোহামা
১০ জুলাই, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা, বালাজী, জি. জি. ও অন্যান্য মান্দ্রাজী বন্ধুগণ,

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তা করিনি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। বিশেষতঃ আমার তো কখনও নানা জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যা সঙ্গে নিতে হয়েছে, তার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি খরচ হচ্ছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বম্বাই ছেড়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে ছিল। এই সুযোগ আমি নেমে শহর দেখতে গেলাম। গাড়ী করে কলম্বোর রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। সেখানকার কেবল বুদ্ধ-ভগবানের মন্দিরটির কথা আমার স্মরণ আছে; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্বাণ-মূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলে আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। ওখান থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যদেশে অবস্থিত কাণ্ডি শহর সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার সেখানে যাবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ—কি পুরুষ কি স্ত্রী—সকলেই মৎস্যমাংস-ভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মান্দ্রাজীদেরই মত। তাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; তবে উচ্চারণ শুনে বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগল; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। উহা খুব ক্ষুদ্র শহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার-ঝরিষ্কার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে এরা ছিল সওদাগরি জাহাজসমূহের বিশেষ ভীতির কারণ—বিখ্যাত জলদস্যু। কিন্তু এখনকার বুরুজওয়ালা যুদ্ধজাহাজের প্রকাণ্ড কামানের চোটে মালয়বাসিগণ অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

পিনাং থেকে সিঙ্গাপুর চললাম। পথে দূর হতে উচ্চশৈল-সমন্বিত সুমাত্রা দেখতে পেলাম; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালে জলদস্যুগণের কয়েকটি আড্ডা অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাতে লাগলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী-উপনিবেশের (Straits Settlement) রাজধানী। এখানে একটি সুন্দর উদ্ভিদ্-উদ্যান আছে, তথায় অনেক জাতীয় ভাল ভাল 'পাম' সংগৃহীত। 'ভ্রমণকারীর পাম' (Traveller's Palm) নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্যাপ্ত জন্মায়, আর 'রুটিফল' (bread fruits) বৃক্ষ তো এখানে সর্বত্র। মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্যাপ্ত, এখানে তেমন বিখ্যাত ম্যাঙ্গোষ্টিন অপর্যাপ্ত, তবে আমের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হতে পারে? এখানকার লোকে মান্দ্রাজীদের অর্ধেক কালোও হবে না, যদিও এ স্থান মান্দ্রাজ অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্তী। এখানে একটি সুন্দর যাদুঘরও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য বেশী মাত্রায় বিরাজমান, এটাই এখানকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্ধেক নাবিক নেমে এরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক সে কথা।

তারপর হংকং। সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত হলেও সেখান থেকেই মনে হয় যেন চীনে এসেছি—চীনের ভাব সেখানে এতই প্রবল। সকল মজুরের কাজ, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বোধ হয় তাদেরই হাতে। আর হংকং তো খাঁটি চীন; যাই জাহাজ কিনারায় নোঙর করে, অমনি শত শত চীনে নৌকা এসে ডাঙায় নিয়ে যাবার জন্য তোমায় ঘিরে ফেলবে। এই নৌকাগুলো একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটিতে দুটি করে হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকাতেই বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝিরা স্ত্রীই হালে বসে থাকে, একটি হাল দু হাত দিয়ে ও অপর হাল এক পা দিয়ে চালায়। আর দেখা যায় যে, শতকরা নব্বই জনের পিঠে একটি কচি ছেলে এরূপভাবে একটি থলির মত জিনিষ দিয়ে বাঁধা থাকে, যাতে সে হাত-পা অনায়াসে খেলাতে পারে। চীনে-খোকা কেমন মায়ের পিঠে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঝুলে আছে, আর ওদিকে মা—কখনও তাঁর সব শক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালাচ্ছেন, কখনও ভারী ভারী বোঝা ঠেলছেন, অথবা অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন—এ এক বড় মজার দৃশ্য! আর এত নৌকা ও ষ্টীম-লঞ্চ ভীড় করে ক্রমাগত আসছে যাচ্ছে যে, প্রতিমুহূর্তে চীনে-খোকার টিকি-সমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে; খোকার কিন্তু সে দিকে খেয়ালই নেই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু-এক খানা চালের পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার গঠনতন্ত্র (anatomy) জেনেই সন্তুষ্ট।

চীনে-খোকা একটি রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কাজ করতে যায়। সে বিশেষরূপেই প্রয়োজনীয়তার দর্শন শিখেছে। চীন ও ভারতবাসী যে 'মমিতে' পরিণতপ্রায় এক প্রাণহীন সভ্যতার স্তরে আটকে পড়েছে, অতি দারিদ্র্যই তার অন্যতম কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে, তাকে আর কিছু ভাববার অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর শহর—পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে; ইহা শহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে প্রায় খাড়াভাবে ট্রাম-লাইন গিয়েছে; তারের দড়ির সংযোগে এবং বাষ্পীয় বলে ট্রামগুলি উপরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা হংকঙে তিন দিন ছিলাম। সেখানে থেকে ক্যান্টন দেখতে গিয়েছিলাম, হংকং থেকে একটি নদী ধরে ৮০ মাইল উজিয়ে ক্যান্টনে যেতে হয়। নদীটি এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্যন্ত যেতে পারে। অনেকগুলো চীনে জাহাজ হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বিকেলে একখানি জাহাজে চড়ে পরদিন প্রাতে ক্যান্টনে পৌঁছলাম। প্রাণের স্ফূর্তি ও কর্মব্যস্ততা মিলে এখানে কি হইচই! নৌকার ভীড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলেছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়, হাজার হাজার নৌকা রয়েছে গৃহের মত বাসোপযোগী। তাদের মধ্যে অনেকগুলো অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলো

দুতলা তেতলা বাড়ীর মত, চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে, মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে; কিন্তু সব জলে ভাসছে!!

আমরা যেখানে নামলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদের বাস করবার জন্য দিয়েছেন; এর চতুর্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল জুড়ে এই বৃহৎ শহর অবস্থিত—এখানে অগণিত মানুষ বাস করছে, জীবন-সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলে ফেলে চলেছে—প্রাণপণে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টা করছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হোক, এখানকার কর্মপ্রবণতা যতই হোক, এর মত ময়লা শহর আমি দেখিনি। তবে ভারতবর্ষের কোন শহরকে যে হিসেবে আবর্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসেবে বলছি না, চীনেরা তো এতটুকু ময়লা পর্যন্ত বৃথা নষ্ট হতে দেয় না; চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই বলছি, তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখনও স্নান করবে না।

প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপরাতলায় বাস করে। রাস্তাগুলো এত সরু যে, চলতে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চলতে না চলতে মাংসের দোকান দেখতে পাবে; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর-বেড়ালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরীবেরাই কুকুর-বেড়াল খায়।

আর্যাবর্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখনও দেখতে পায় না, চীনা মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সামনে বেরোয়। এদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটি স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট খোকার পায়ের চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না. খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ করে চলছে।

আমি কতকগুলি চীনে মন্দির দেখতে গেলাম। ক্যান্টনে যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি আছে, তা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট্ এবং সর্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর স্মরণার্থে উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্তি; তাঁর নীচেই সম্রাট্ বসেছেন, আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্তি—সব মূর্তিগুলিই কাঠে সুন্দররূপে খোদিত।

ক্যান্টন হতে আমি হংকঙে ফিরলাম। সেখান থেকে জাপানে গেলাম। নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগল। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ থেকে নেমে শহরের মধ্যে গাড়ী করে বেড়ালাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাদের অন্যতম। এদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলো প্রায় সবই চওড়া সিধে ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। খাঁচার মত এদের ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলো, প্রায় প্রতি শহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত চিড়গাছে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলো, বেঁটে সুন্দরকায় অদ্ভুত-বেশধারী জাপ, তাদের প্রত্যেক চালচলন অঙ্গভঙ্গী হাবভাব—সবই ছবির মত। জাপান 'সৌন্দর্যভূমি'। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পেছনে এক-একখানি বাগান আছে—তা জাপানী ফ্যাশনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জলপ্রণালী এবং পাথরের সাঁকো দিয়ে ভালরূপে সাজান।

নাগাসাকি থেকে কোবি গেলাম। কোবি গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকোহামায় এলাম—জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ দেখবার জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটি বড় বড় শহর দেখেছি। ওসাকা—এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটা—প্রাচীন রাজধানী; টোকিও—বর্তমান রাজধানী; টোকিও কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ হবে। লোকসংখ্যাও প্রায় কলিকাতার দ্বিগুণ।

ছাড়পত্র ছাড়া বিদেশীকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করতে দেয় না।

দেখে বোধ হয়—জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন, তা বুঝেছে; তারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে। ওদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থল-সৈন্য আছে। ওদের যে কামান আছে, তা ওদেরই একজন কর্মচারী আবিষ্কার করেছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। আমি একজন জাপানী স্থপতি-নির্মিত প্রায় এক মাইল লম্বা সকটি সুড়ঙ্গ (tunnel) দেখেছি।

এদের দেশলাই-এর কারখানা একটা দেখবার জিনিষ। এদের যে-কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে। জাপানীদের নিজেদের একটি ষ্টীমার লাইনের জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে; আর এরা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাবে, মতলব করছে।

আমি এদের অনেকগুলি মন্দির দেখলাম। প্রত্যেক মন্দির কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙলা অক্ষরে লেখা আছে। মন্দিরে পুরোহিতদের মধ্যে অল্প কয়েকজন সংস্কৃত বোঝে। কিন্তু এরা বেশ বুদ্ধিমান্। বর্তমানকালে সর্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদিত হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখনও সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি করছ? সারা জীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরছে! তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কী বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক,

তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইওরোপীয় মস্তিস্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশেপাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—'বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও' করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মান্দ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মান্দ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচার যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?

... কুক কোম্পানী, চিকাগো—এই ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বি

৬৮*

ব্রিজি মেডোজ
মেটকাফ, মাসাচুসেটস
২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

কাল তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বোধ হয় এত দিনে জাপান হইতে [লেখা] আমার পত্র পাইয়াছ। জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে
৩১
(Vancouver) পৌঁছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোনরূপে বঙ্কুবরে পৌঁছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌঁছিলাম। তথায় আন্দাজ বার দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদা রাও যে মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এবার এখানে বড় দুর্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং আমি চিকাগোয় অধিক দিন রহিলাম না। চিকাগো হইতে আমি বষ্টনে আসিলাম। লালুভাই বষ্টন পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ...

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলেন। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মত টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিষের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, জগতের অপর কোন জাতি যেন কোনমতে এ দেশে ঘেঁষিতে না পারে। সাধারণ কুলি গড়ে প্রতিদিন ৯৲।১০৲ টাকা করিয়া রোজগার করে ও উহা খরচ করিয়া থাকে। এখানে আসিবার পূর্বে যে-সব সোনার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

তুমি অনুগ্রহপূর্বক থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমাকে যে সাবধান করিয়াছ, তাহা ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হয়। এ গোঁড়া খ্রীষ্টানের দেশ—এখানে কেহ উহাদের খোঁজ খবর রাখে না বলিলেই হয়। এখনও পর্যন্ত কোন থিওজফিষ্টের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, আর দু-এক বার অপরকে—কথাপ্রসঙ্গে উহাদের বিষয় অতিশয় ঘৃণার সহিত উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। আমেরিকানরা উহাদিগকে জুয়াচোর বলিয়া মনে করে।

আমি এক্ষণে বষ্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোষাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস! জানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই। আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজ আমাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিতেছেন, 'প্রকৃত হিন্দু সাধককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে সন্দেহ নাই, তবে আমি এখন বুড়া হইয়াছি। এসোটেরিক বৌদ্ধগণ আমাকে আর ঠকাইতে পারিতেছে না।' এই তো এখানে থিয়োজফির প্রভাব এবং উহার প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা! 'মো—'র এক সময় বষ্টনের একটি খুব ধনী মহিলার কাছে বিশেষ খাতির ছিল, কিন্তু 'মো-'র দরুনই বিশেষ উহাদের সব পসার মাটি হইয়াছে। এখন উক্ত মহিলা 'এসোটেরিক বৌদ্ধধর্ম' ও ঐরূপ সমুদয় ব্যাপারের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জানিয়া রাখো, এই দেশ খ্রীষ্টানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয় করি না। আমি এখানে মেরী-তনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটি জিনিষ দেখিতে পাইতেছি; ইঁহারা আমার হিন্দুধর্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারেথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা ইঁহারা আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে ও বলাবলি করিতেছে। এখানে এইরূপেই কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে দীর্ঘ সময় ও অর্থের প্রয়োজন। এখন শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে, আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। ... বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা বড় বড় কার্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম করিব, এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে। রাজারাজড়াদের দ্বারা মহৎ কার্য হইবার আশা অতি অল্প।

চিকাগোয় সম্প্রতি একটা বড় মজা হইয়া গিয়াছে। কপুরতলার রাজা এখানে আসিয়াছিলেন, আর চিকাগো সমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্ট-বিষ্টু করিয়া তুলিয়াছিল। মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড় লোক, আমার মত ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখানে একটি পাগলাটে, ধুতিপরা মারাঠী ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি; আর এই সত্যবাদী (?) সম্পাদকেরা—যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব-আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল, তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছিল। আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া তাহারা এমন সকল কথা বাহির করিল, যাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই; তারপর এই রাজার সম্বন্ধে মারাঠী ব্রাহ্মণটি যাহা যাহা বলিয়াছিল, সব আমার মুখে বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগো সমাজ একটা ধাক্কা খাইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই মিথ্যাবাদী সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার দেশের লোককে বেশ ধাক্কা দিলেন। যাহা হউক—ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁকজমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।

কাল নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস্ জন্‌সন্ মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন; এখানে কারাগার বলে না, বলে—সংশোধনাগার। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অদ্ভুত জিনিষ। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! না দেখিলে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন তোমাদিগকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে; কিন্তু তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলে না। তোমাদের পুরোহিতগণ—ভগবান্ ভ্রান্তমত-প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য

বটে, কিন্তু অসুর আমরা; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা নহে। আর যেমন য়াহুদীরা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমগ্র জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ তোমরাও যে-কোন জাতি ইচ্ছা করিতেছে, তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ! তোমরা জান না যে, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিষেরই এপিঠ ওপিঠ। দুই-ই এক কথা।

বালাজী ও জি.জি-র স্মরণ থাকিতে পারে, একদিন সায়ংকালে পণ্ডিচেরীতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিকট ভঙ্গী ও তাহার 'কদাপি ন' (কখনও না)—এই কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তাহারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, আর সমুদয় জগৎ এই ত্রিশ কোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা দেখে, এরা কীটতুল্য, ভারতের মনোরম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান্ উপদেশসমূহ অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।

হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান্ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক'
৩২
নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধো, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সারা জীবন আমার নানা দুঃখযন্ত্রণার মধ্যেই কাটিয়াছে। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। লোকে আমাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোরে বদমাশ বলিয়াছে (মান্দ্রাজের অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটু কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, তাহাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা শিশু, অতি শিশু, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিসীমার বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য—আহার, পান, অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধি—যেন গণিতের নিয়মে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু তাহারা জানে না। বেশ সুখী তাহারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না! সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, এ কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদিত হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন; যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতিকার আছে, আর প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যাঁহারা ইহার প্রতিকারে প্রস্তুত আছেন। 'ইহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত।' ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, উচ্চস্তরে অবস্থিত এই সকল মহাপুরুষের—ঐ বিষোদ্গিরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?

গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকি দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর আমার স্বদেশের লোকেরাই যখন আমায় জুয়াচোর ভাবে, তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিলে কত কী-ই না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান্ অনন্তশক্তিমান্; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেই প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শতশতযুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! সমস্যাটির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখ! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক—আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে! রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহাও জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

এই গ্রাম হইতে কাল আমি বষ্টনে যাইতেছি। সেখানে একটি বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা করিতে হইবে। ইহারা (খ্রীষ্টান) রমাবাইকে সাহায্য করিতেছে। বষ্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। সেখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোষাক চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং আমাকে কালো রঙের লম্বা জামা পড়িতে হইবে। কেবল, বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিব। কি করিব? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্বময় কর্ত্রী; তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না। এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বল দাঁড়াইবে ৬০।৭০ পাউণ্ড। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে কিছুদিন এখানে থাকা দরকার। আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের জন্য ফনোগ্রাফ দেখিতে যাইতে পারি নাই; কারণ, তাঁহার পত্র এখানে আসিয়া পাইলাম। যদি আবার চিকাগোয় যাই, তবে উহার জন্য চেষ্টা করিব। আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদা রাও যে ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার একজন কর্তা। কিন্তু আমি প্রতিনিধি হইতে অস্বীকার করি, কারণ চিকাগোয় এক মাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল ফুরাইয়া যাইত।

কানাডা ব্যতীত সমগ্র আমেরিকায় রেলগাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নাই। সুতরাং আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কারণ উহা ছাড়া আর ক্লাস নাই। আমি কিন্তু উহার পুলমান গাড়ীতে (Pullmans) চড়িতে ভরসা করি না। এগুলি খুব আরামপ্রদ; এখানে আহার, পান. নিদ্রা, এমন কি স্নানের পর্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রহিয়াছ, বোধ করিবে। কিন্তু ইহাতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ শহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাসে গিয়াছে। শীতে আবার সব শহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এত চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস! আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে-কোন চিঠি বা টাকা আসিবে, কুক কোম্পানীকে তাহা আমার নিকট পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি। 'রোম এক দিনে নির্মিত হয় নাই।' যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে অন্ততঃ ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি—সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতোমধ্যে আমিও যে-কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাই, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি, তৎক্ষণাৎ তোমায় তার করিব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব; এখানে অকৃতকার্য হইলে ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব। 'রা—'র পিতা ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহার অন্তরটা খুব ভাল, উপরটায় কেবল বেনিয়াসুলভ কর্কশতা। চিঠি পৌঁছিতে বিশ দিনের অধিক সময় লাগিবে।

এই নিউ ইংলণ্ডে এখনই এত শীত যে, প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কানাডায় আরও শীত। কানাডায় যত নীচু পাহাড়ে বরফ পড়িতে দেখিয়াছি, আর কোথাও সেরূপ দেখি নাই।

আমি আবার এই সোমবারে সেলেমে এক বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা দিতে যাইতেছি। তাহাতে আরও অনেক সভাসমিতির সঙ্গে আমার পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ পথ করিতে পারিব। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে এই ভয়ানক মহার্ঘ দেশে অনেক দিন থাকিতে হয়। ভারতে টাকার (Rupee) দর চড়িয়া যাওয়ায় লোকের মনে মহা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহায্যের চেষ্টা বৃথা। আমাকে এখন কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এইমাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম, কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০৲ টাকা বা তাহারও বেশী পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না, অমনি চলনসই গোছের হইবে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড় খুঁতখুঁতে, আর এদেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব। মিশনরীরা ইহাদের ঘাড় ভাঙিয়া যথেষ্ট অর্থ আদায় করে। ইহারা প্রতি বৎসর রমাবাইকে খুব সাহায্য করিতেছে। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতোমধ্যে যদি অনুকূল কিছু ঘটে, লিখিব বা তার করিব। 'কেব্‌ল্' (তার) করিতে

প্রতি শব্দে পড়ে ৪৲ টাকা।

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

৬৯*

[অধ্যাপক রাইটকে লিখিত]

সেলেম
৩০ অগষ্ট, '৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,
৩৩

আজ এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি। মনে হয় চিকাগো থেকে আপনি কিছু উত্তর পেয়েছেন। মিঃ স্যানবর্ন-এর কাছ থেকে পূর্ণ নির্দেশসহ আমন্ত্রণ পেয়েছি। সুতরাং সোমবার সারাটোগায় যাচ্ছি। আপনার গৃহিণীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। অষ্টিন ও অন্য শিশুদের ভালবাসা দেবেন। আপনি সত্যই মহাত্মা এবং শ্রীমতী রাইট অতুলনীয়া।

প্রীতিবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৭০*

সেলেম
শনিবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আপনার প্রদত্ত পরিচয়পত্র পেয়েই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চিকাগোর মিঃ থেলিস্ এর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি, যাতে মহাসভার কয়েকজন প্রতিনিধির নাম এবং অন্যান্য সংবাদ আছে।

মিস্ স্যানবর্ন-এর কাছ থেকে প্রেরিত চিঠিতে আপনার সংস্কৃতের অধ্যাপক আমাকে পুরুষোত্তম যোশী বলে ভুল করেছেন, এবং ঐ চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে, বষ্টনে এমন একটি সংস্কৃত গ্রন্থাগার আছে, যার তুল্য কিছু ভারতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। গ্রন্থাগারটি দেখতে পেলে আমি কতই না খুশী হব!

'মিঃ স্যানবর্ন আমাকে সোমবার সারাটোগায় আসতে বলেছেন এবং সেইমত আমি সেখানে যাচ্ছি। সেখানে আমি 'স্যানাটোরিয়াম' নামক বোর্ডিঙ হাউসে থাকব। যদি ইতোমধ্যে চিকাগো থেকে কোন সংবাদ আসে, আশা করি অনুগ্রহ করে তা সারাটোগা স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেবেন।

আপনি, আপনার মহীয়সী পত্নী এবং শিশুসন্তানগুলি আমার মনে এমন ছাপ রেখেছেন, যা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি, তখন সত্যি মনে হয়—স্বর্গের কাছাকাছি আছি। যিনি সব কিছুর দাতা, তিনি আপনার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

কয়েক লাইন লিখে পাঠাচ্ছি—কবিতার মত করে। এই অত্যাচারটুকু আপনি ভালবেসে ক্ষমা করবেন, এই আশায়।

আপনার চিরবন্ধু
বিবেকানন্দ

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়
গীর্জায়, মন্দিরে, মসজিদে—
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।

মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মত
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ,—
তুমি কোথায়—কোথায়—আমার প্রাণ, ওগো ভগবান্?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ কেটে যায়,
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,
কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।

কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে,
মুহূর্ত মনে হয় যুগ যেন,
তখন—একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমাকে আমারি নাম ধরে।

মৃদু মধু আস্বাদের মত এক স্বর—
'পুত্র! আমার পুত্র! পুত্র মোর!'
সে কণ্ঠ বাজল হৃদয়ে একটি সুরে—
আত্মার প্রতিটি তন্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে।

উঠে দাঁড়াই। কোথায় সেই স্বর
যা ডাকছে আমায়—এমন ক'রে?

খুঁজে ফিরি এখানে, ওখানে—সেখানে,
বারে বারে—পথে ও প্রান্তে।
ঐ ঐ আবার সেই দৈবী স্বর!
ঐ তো শুনছি আমি, আমারি আহ্বান!
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয়
ডুবে গেল পরমা শান্তিতে।

জ্বলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার,
আনন্দ! আনন্দ! একি অপরূপ!
প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,
তুমি এখানে, এত কাছে,—আমারি হৃদয়ে?
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরবে!

সেইদিন থেকে যখনি যেখানে যাই
বুঝেছি হৃদয়ে, তুমি আছ পাশে পাশে
পর্বতে—উপত্যকায়—শিখরে—সানুতে
— দূরে বহু দূরে, ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে।

চাঁদের কোমল আলো, তারকার দ্যুতি,
দিবসের মহান্ উদ্ভাস—
সবার অন্তর-জ্যোতিরূপে প্রকাশিত;
তাঁর শক্তি সকল আলোর প্রাণ!
মহিমার ঊষা তিনি, সন্ধ্যা বিগলিত,
অনন্ত অশান্ত তিনি সমুদ্র,
প্রকৃতির সুষমায়, পাখীর সঙ্গীতে

শুধু তিনি, একমাত্র তিনি।

ঘোর দুর্বিপাকে যখন জড়িয়ে পড়ি,
অবসন্ন প্রাণ, ক্লান্ত ও কাতর,
যখন প্রকৃতি আমাকে চূর্ণ করে
ক্ষমাহীন তার নিয়মে—

শুনেছি তোমারি স্বর তখনি হে প্রিয়!
বলেছ গোপনে মৃদুভাষে 'আমি এসেছি',
জেগেছি সেই স্বরে; তোমার সঙ্গে
সহস্র মৃত্যুর মুখে আমি যে নির্ভয়।
তুমি আছ মায়ের গানে, যা শুনে
কোলের শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে,
তুমি আছ শিশুর হাসিতে ও খেলায়,
দাঁড়িয়ে থাকো তাদের মাঝে আলো করে।

পবিত্রহৃদয় বন্ধুরা যখন মিলিত হয়
তাদেরও মাঝে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি।
সুধা ঢেলে দাও তুমি মায়ের চুমোয়,
তুমি সুর দাও শিশুর মা-মা ডাকে।
প্রাচীন ঋষির তুমি ভগবান্,
সকল মতের তুমি চিরন্তন উৎস,
বেদ, বাইবেল আর কোরান গাইছে
তোমারি নাম উচ্চকণ্ঠে—সমস্বরে।

আছ, আছ, তুমি আছ,
ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্মা,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ,[৩৪]
—আমার ঈশ্বর তুমি,
প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি।

পত্রাবলী ৭১-৮০

৭১*

চিকাগো
২ অক্টোবর, '৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আমার দীর্ঘ নীরবতার বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন জানি না। প্রথমতঃ মহাসভায় আমি শেষ মুহূর্তে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে হাজির হয়েছিলাম। কিছু সময় তার জন্য নিদারুণভাবে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ মহাসভায় প্রায় প্রতিদিন আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছে, ফলে লিখবার কোন সময়ই করে উঠতে পারিনি। শেষ কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, হে হৃদয়বান্ বন্ধু, আপনার কাছে আমি এমনই ঋণী যে, তাড়াহুড়ো করে—চিঠির উত্তর দেবার জন্যেই—কিছু একটা লিখে পাঠালে তা আপনার অহেতুক সৌহার্দ্যের অমর্যাদা হত। মহাসভার পাট এখন চুকেছে।

প্রিয় ভ্রাতা, সেই মহাসভায়, যেখানে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত, সেখানে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে এবং বক্তৃতা দিতে আমার যে কী ভয় হচ্ছিল! কিন্তু প্রভু আমাকে শক্তি দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন আমি বীরের মত (?) সভাকক্ষে শ্রোতাদের সম্মুখীন হয়েছি। যদি আমি সফল হয়ে থাকি, তিনিই শক্তিসঞ্চার করেছেন; যদি আমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে থাকি—তা যে হব আমি আগে থেকেই জানতাম—তার কারণ আমি নিতান্ত অজ্ঞান।

আপনার বন্ধু অধ্যাপক ব্রাডলি আমার প্রতি খুবই দয়া প্রকাশ করেছেন এবং সব সময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আহা! সকলে আমার প্রতি—আমার মত নগণ্যের প্রতি কী না প্রীতিপরায়ণ, ভাষায় তা প্রাকাশ করা যায় না! প্রভু ধন্য, জয় হোক তাঁর, তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ভারতের দরিদ্র অজ্ঞ এক সন্ন্যাসী এই মহাশক্তির দেশে পণ্ডিত ধর্মযাজকদের সমতুল্য গণ্য হয়েছে। প্রিয় ভ্রাতা, জীবনের প্রতিটি দিনে আমি যেভাবে প্রভুর করুণা পাচ্ছি, আমার ইচ্ছা হয়, ছিন্নবস্ত্রে ও মুষ্টিভিক্ষায় যাপিত লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী জীবন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাই—কাজের মধ্যে দিয়েই তাঁর সেবা করে যাই।

আহা, আমি কী ভাবেই না চেয়েছি, আপনি এখানে এসে ভারতের কয়েকজন মধুরচরিত্র ব্যক্তিকে দেখে যান—কোমলপ্রাণ বৌদ্ধ ধর্মপালকে, বাগ্মী মজুমদারকে; অনুভব করবেন, সেই সুদূর দরিদ্র ভারতেও এমন মানুষ আছেন, যাঁদের হৃদয় এই বিশাল শক্তিশালী দেশের মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সমতালে স্পন্দিত হয়।

আপনার পুণ্যবতী পত্নীকে আমার অসীম শ্রদ্ধা। আপনার মধুর সন্তানগুলিকে আমার অনন্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

যথার্থ উদারমনা কর্ণেল হিগিন্‌সন আমাকে বলেছেন যে, আপনার কন্যা তাঁর কন্যাকে আমার বিষয়ে কিছু লিখেছেন। কর্ণেল আমার প্রতি খুবই সহানুভূতিপরায়ণ। আমি আগামী কাল এভানষ্টনে যাচ্ছি। সেখানে অধ্যাপক ব্রাডলিকে দেখব, আশা করি।

প্রভু আমাদের সকলকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর করুন, যাতে আমরা এই পার্থিব দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগেই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারি।

বিবেকানন্দ

(পৃথক্ একটি কাগজে লিখিত পত্রের পরের অংশ)

আমি এখন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। সমস্ত জীবন সকল অবস্থাকে তাঁরই দান বলে গ্রহণ করেছি এবং শান্তভাবে চেষ্টা করেছি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। আমেরিকায় প্রথম দিকে আমার অবস্থা ছিল ডাঙায় তোলা মাছের মত। আমি প্রভুর দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি—আমার আশঙ্কা হল, সেই এতদিনের অভ্যস্ত জীবনের ধারা এবার বোধহয় ত্যাগ করতে হবে, এবার বোধহয় নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে—এই ধারণাটা কী জঘন্য অন্যায় আর অকৃতজ্ঞতা! আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, যিনি আমাকে হিমালয়ের তুষার-শৈলে কিম্বা ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন, তিনিই এখানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন। তাঁর জয় হোক, অশেষ জয় হোক। সুতরাং আমি আবার আমার পুরাতন রীতিতে শান্তভাবে গা ঢেলে দিয়েছি। কেউ এগিয়ে এসে আমাকে খেতে দেয়, হয়তো কেউ দেয় আশ্রয়, কেউ বলে—তাঁর কথা শোনাও আমাদের। আমি জানি তিনিই তাদের পাঠিয়েছেন—আমি শুধু নির্দেশ পালন করে যাব। তিনি আমাকে সব যোগাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা, ৯।২২

এমনি এশিয়াতে, এমনি ইওরোপে, এমনি আমেরিকায়, ভারতের মরুভূমির মধ্যেও একই জিনিষ। আমেরিকার বাণিজ্য-ব্যস্ততার মধ্যেও অন্য কিছু নয়। কারণ তিনি কি এখানেও নেই? আর যদি তিনি আমার পাশে সত্যি এখানে না থাকেন, তাহলে নিশ্চিত ধরে নেব, তিনি চান যে, এই তিন মিনিটের মাটির শরীর আমি যেন ছেড়ে দিই;—হ্যাঁ, তাহলে তাই তিনি চান, এবং আমি তা সানন্দে পালন করবার ভরসা রাখি।

ভ্রাতঃ, আমাদের সাক্ষাৎ আর হতেও পারে, নাও পারে, তিনিই জানেন। আপনি বিদ্বান্, মহান্ ও পুণ্যবান্। আপনাকে বা আপনার পত্নীকে কিছু শোনাবার স্পর্ধা আমি করি না। তবে আপনার সন্তানদের জন্যঃ

প্রিয় বাছারা, পিতামাতার চেয়েও তিনি তোমাদের নিকটতর। তোমরা ফুলের মত পবিত্র ও নির্মল। সেভাবেই থাকো। তাহলেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন তোমাদের কাছে। বাছা অষ্টিন, যখন তুমি খেলা কর, তখন তোমার সঙ্গে খেলে যান আর এক খেলুড়ে, যাঁর থেকে আর কেউ তোমাকে বেশী ভালবাসেন না। আহা, কি যে মজায় ভরা তিনি। খেলা বৈ তিনি নেই। কখনও মস্ত মস্ত গোলা নিয়ে তিনি খেলা করেন, যেগুলোকে আমরা বলি পৃথিবী বা সূর্য। কখনও খেলেন তোমারি মত ছোট ছেলের সঙ্গে, হেসে হেসে খেলে যান কত রকমের খেলা। তাঁকে খুঁজে নিয়ে খেলতে পারলে কেমন মজা, একবার সেটি ভেবে দেখ।

প্রিয় অধ্যাপকজী, সম্প্রতি আমি ঘোরাফেরা করছি। চিকাগোয় এলেই আমি মিঃ ও মিসেস লায়নকে দেখতে যাই। আমার দেখা মহত্তম দম্পতিদের অন্যতম এঁরা। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু লেখেন, দয়া করে তা 'মিঃ জন্ বি. লায়ন, ২৬২ মিশিগান এভিনিউ, চিকাগো,'—এই ঠিকানায় পাঠাবেন।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

নৈয়ায়িক বা দ্বৈতবাদী বিখ্যাত দার্শনিক উদয়নাচার্য এই শ্লোকটি রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কুসুমাঞ্জলি'র প্রথমেই এই আশীর্বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই শ্লোকে তিনি চেষ্টা করেছেন সৃষ্টিকর্তা ও পরমপ্রেমিক নীতিনিয়ন্তার প্রকাশনিরপেক্ষ সত্তাকে প্রতিপাদন করতে।

আপনার সদাকৃতজ্ঞ বন্ধু
বিবেকানন্দ

৭২*

চিকাগো,
১০ অক্টোবর, ১৮৯৩

প্রিয় মিসেস উডস,
গতকাল আপনার চিঠি পেয়েছি। এখন আমি চিকাগোর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি—আমার বিবেচনায় তা বেশ ভালই হচ্ছে। ৩০ থেকে ৮০ ডলারের মধ্যে প্রতি বক্তৃতায় পাওয়া যাচ্ছে; সম্প্রতি ধর্মমহাসভার দরুন চিকাগোয় আমার নাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই ক্ষেত্রটি ত্যাগ করা বর্তমানে যুক্তিযুক্ত হবে না। মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনিও নিশ্চয় একমত হবেন। যাই হোক, আমি শীঘ্রই বষ্টনে যেতে পারি; ঠিক কবে, তা অবশ্য বলতে পারি না। গতকাল ষ্ট্রীটর থেকে ফিরেছি, সেখানে একটি বক্তৃতায় ৮৭ ডলার মিলেছে। এই সপ্তাহে প্রতিদিনই আমার বক্তৃতা আছে। সপ্তাহের শেষে আরও আমন্ত্রণ আসবে বলে আমার বিশ্বাস। মিঃ উডসকে আমার প্রীতি, এবং সকল বন্ধুকে শুভেচ্ছাদি।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৭৩*

C/o J. B. Lyon
২৬২ মিশিগান এভিনিউ, চিকাগো
২৬ অক্টোবর, '৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আপনি শুনে খুশী হবেন যে, এখানে আমার কাজ ভালই চলছে এবং এখানে প্রায় সকলেই আমার প্রতি খুব সহৃদয়, অবশ্য নিতান্ত গোঁড়াদের বাদ দিয়ে। নানা দূরদেশ থেকে বহু মানুষ এখানে বহু পরিকল্পনা, ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে, এবং আমেরিকাই একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। তবে আমার পরিকল্পনার বিষয়ে একদম আর কিছু না বলাই ঠিক করেছি। সেই ভাল। ... পরিকল্পনার জন্য একাগ্রভাবে খেটে যাওয়াই আমার ইচ্ছা, পরিকল্পনাটা থাকবে আড়ালে, বাইরে কাজ করে যাব, অন্যান্য বক্তার মত।

আমাকে যিনি এখানে এনেছেন এবং এখনও পর্যন্ত যিনি আমাকে ত্যাগ করেননি, তিনি নিশ্চয় যে অবধি আমি এখানে থাকব, আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমি ভালই করছি—এবং টাকাকড়ি পাওয়ার ব্যাপার যদি বলেন, খুবই ভাল করার আশা রাখি। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে একেবারেই কাঁচা, কিন্তু শীঘ্রই এ ব্যবসার কৌশল শিখে নেব। চিকাগোয় আমি খুবই জনপ্রিয়, সুতরাং এখানে আরও কিছু সময় থাকতে ও টাকা সংগ্রহ করতে চাই।

আগামী কাল শহরের সবচেয়ে প্রভাবসম্পন্ন মহিলাদের 'ফর্টনাইটলি ক্লাব'-এ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে যাব। হৃদয়বান্ বন্ধু! আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাব জানি না; এবং জানি না কিভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানাব, যিনি আপনার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন যে আমার কাছে পরিকল্পনার সাফল্য সম্ভব বোধ হচ্ছে, সেটা আপনারই জন্য।

ইহজগতে অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপে আনন্দ ও শান্তি লাভ করুন। আপনার সন্তানদের জন্য আমার প্রীতি ও আশীর্বাদ।

সদা প্রীতিবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৭৪*

চিকাগো
২ নভেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

কাল তোমার পত্র পাইলাম। আমার এক মুহূর্তের অবিশ্বাস ও দুর্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পাইয়াছ, তাহার জন্য অতিশয় দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন নিজেকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করিলাম যে, নিরাশ হইয়া তোমাদিগকে তার করিয়াছিলাম। তারপর হইতে ভগবান্ আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়াছেন। বষ্টনের নিকটবর্তী এক গ্রামে ডক্টর রাইটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার প্রতি অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—তিনি বলিলেন, উহাতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারও আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। অবশেষে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে—ধর্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধির সহিত আমারও থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' (Art Place) নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাই-এর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধী জৈনসমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনি বেসান্ট ও চক্রবর্তী থিওসফির প্রতিনিধি রূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মজুমদারের সহিত আমার পূর্বে পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে 'শিল্পপ্রাসাদ' পর্যন্ত খুব শোভাযাত্রা করিয়া যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসানো হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, আর উপরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার সুশিক্ষিত সমাজের বাছা বাছা ৬।৭ হাজার নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জীবনে কখনও সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল, আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের

আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং'—ভগবান্ বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোলেন। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক! সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যে দিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন 'হল'-এ এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটি সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ

'মহিলা—মহিলা—কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্যন্ত ফাঁক নাই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্বে অন্য যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল, ইত্যাদি।' যদি সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য হইবে। কিন্তু তুমি তো জানই, নাম-যশকে আমি ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্মে দাঁড়াইতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী করতালি পড়িয়া যাইত। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব। আমার এক্ষণে আর কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইওরোপ যাইতে আমার যে খরচ লাগিবে, তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। একটা কথা—তোমরা কি একসঙ্গে ৮০০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলে? আমি কুক কোম্পানীর নিকট হইতে কেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াছি। যদি তুমি ও মহারাজ পৃথক্ পৃথক্ টাকা পাঠাইয়া থাকো, তাহা হইলে বোধ হয় কতকটা টাকা এখনও আমার নিকট পৌঁছায় নাই। যদি একত্র পাঠাইয়া থাকো, তবে একবার অনুসন্ধান করিও।

নরসিংহাচার্য নামে একটি বালক আমাদের নিকট আসিয়া জুটিয়াছে। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া চিকাগো শহরে অলসভাবে কাটাইতেছে। ঘুরিয়া বেড়াক বা যাহাই করুক, আমি তাহাকে ভালবাসি। কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকে, তাহা লিখিবে। সে তোমাকে জানে। যে বৎসর পারি একজিবিশন হয়, সেই বৎসর সে ইওরোপে আসে। আমার পোষাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ শত পাউণ্ড আছে। আর আমার বাড়ীভাড়া বা খাইখরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ ইচ্ছা করিলেই এই শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ীতে আমি থাকিতে পারি। আর আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিষ জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের নারীগণ সকল দেশের নারী অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান নারী আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষে অর্থের জন্য সারা জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা অবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে; ইহারা খুব সহৃদয় ও অকপট। যে-কোন ব্যক্তির মাথায় কোনরূপ খেয়াল আছে, সেই এখানে তাহা প্রচার করিতে আসে; আর আমায় লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে, এখানে এইরূপে যে সমস্ত মত প্রচার করা হয়, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসহ নয়। ইহাদের অনেক দোষও আছে। তা কোন্ জাতির নাই? আমি সংক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য ও লক্ষণ এইরূপে নির্দেশ করিতে চাইঃ এশিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল, ইওরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করিয়াছে, আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতি বিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের ও শ্রমজীবিগণের স্বর্গস্বরূপ। আমেরিকার নারী ও সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার মনে এই ভাব উদিত হইবে। আর এই দেশ দিন দিন উদারভাবাপন্ন হইতেছে। ভারতে যে 'দৃঢ়চর্ম খ্রীষ্টান' (ইহা ইহাদেরই কথা
৩৫
) দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগের বিচার করিও না। তাহারা এখানেও আছে বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আর যে আধ্যাত্মিকতা হিন্দুদের প্রধান গৌরবের বস্তু, এই মহান্ জাতি দ্রুত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

হিন্দু যেন কখনও তাহার ধর্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্মকে উহার নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে, আর সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সকল সংস্কারই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফল কি হইল?—নিষ্ফলতা! বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়। এখানে যে-কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে—সে একজন মানুষ। ভারতে যে-কেহ জন্মায়, সেই জানে—সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। এখন উহাকে নাশ করিতে হইলে কোন ধর্মের আবশ্যকতা নাই। আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, জুতাব্যবসায়ী ও শুঁড়ী খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা। বর্তমান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাহারও আর জীবিকার জন্য যে-কোন বৃত্তি আশ্রয় করিতে কোনরূপ বাধা নাই। ইহার ফল প্রবল প্রতিযোগিতা! এইরূপে সহস্র সহস্র ব্যক্তি—জড়ের মত নীচে পড়িয়া না থাকিয়া, যে উচ্চ সম্ভাবনা লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া সেই স্তরে উপনীত হইতেছে।

আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তারপর ইওরোপ যাইব। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবানই সব যোগাইয়া

দিবেন, আশা করি। সুতরাং এখন সে বিষয়ে তোমাদের কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আমার প্রতি ভালবাসার জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য।

আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এই পত্রখানি খেতড়ির মহারাজাকে পাঠাইয়া দিও, আর ইহা প্রকাশ করিও না। আমরা জগতের জন্য অনেক মহৎ কার্য করিব, আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নামযশের জন্য নহে।

“ ‘কেন’ প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার। কাজ কর, করে মর—এই হয় সার॥’ সাহস অবলম্বন কর, আমাদ্বারা ও তোমাদের দ্বারা বড় বড় কাজ হইবে, এই বিশ্বাস রাখো। ভগবান্ বড় বড় কাজ করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। নিজদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখো; অর্থাৎ পবিত্র, বিশুদ্ধস্বভাব এবং নিঃস্বার্থপ্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান্ তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও আর আর সকল বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল, তাঁহারা তাহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া আছেন, আর যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্য-নামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন; তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা-রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্যই হইব। অধিকাংশ ভারতীয় নারী যতদূর শিক্ষার উন্নতি কল্পনা করিতে পারে, প্রত্যেকটি মার্কিন নারী তদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণকেও কেন না ঐরূপ শিক্ষিতা করিব? অবশ্যই করিতে হইবে।

মনে করিও না, তোমরা দরিদ্র। অর্থই বল নহে; সাধুতাই—পবিত্রতাই বল। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত বল কি না। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুনঃ—ভাল কথা, তোমার কাকার প্রবন্ধের মত অদ্ভুত ব্যাপার আমি আর কখনও দেখি নাই। এ যেন ব্যবসাদারের জিনিষের ফর্দ; সুতরাং উহা ধর্ম মহাসভায় পাঠের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। তাই নরসিংহাচার্য একটা পাশের হলে উহা হইতে কতক কতক অংশ পাঠ করিল; কিন্তু কেহই উহার একটা কথাও বুঝিল না। তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিও না। অনেকটা ভাব খুব অল্প কথার ভিতর প্রকাশ করা একটা বিশেষ শিল্পকলা বলিতে হইবে। এমনি কি, মণিলাল দ্বিবেদীর প্রবন্ধও অনেক কাটছাঁট করিতে হইয়াছিল। প্রায় এক হাজারের অধিক প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ওরূপ আবোল-তাবোল বক্তৃতা শুনিবার সময়ই ছিল না। অন্যান্য বক্তাদিগকে সাধারণতঃ যে আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আমাকে অনেকটা অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল, কারণ শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিয়া রাখিবার জন্য সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় বক্তাদিগকে সর্বশেষে রাখা হইত। আর আমার প্রতি ইহাদের কি সহানুভূতি! এবং ইহাদের ধৈর্যই বা কত! ভগবান্ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করুন। প্রাতে বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহারা বসিয়া থাকিত, মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধ ঘণ্টা ছুটি—ইতোমধ্যে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পাঠ হইত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাজে ও অসার, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রিয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসিয়াই থাকিত। সিংহলের ধর্মপালও তাহাদের অন্যতম প্রিয় বক্তা ছিলেন। তিনি বড়ই অমায়িক, আর এই মহাসভার অধিবেশনের সময় আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

পুনা হইতে আগত মিস সোপরাবজী নাম্নী জনৈকা খ্রীষ্টান মহিলা আর জৈনধর্মের প্রতিনিধি মিঃ গান্ধী এদেশে আরও কিছুদিন থাকিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘুরিয়া অর্থোপাজনের চেষ্টা করিবেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এ দেশে বক্তৃতা করা খুব লাভজনক ব্যবসা, অনেক সময় ইহাতে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। তুমি যে পরিমাণে লোক আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার উপরই টাকা নির্ভর করিবে। মিঃ ইঙ্গারসোল প্রতি বক্তৃতায় ৫০০ হইতে ৬০০ ডলার পর্যন্ত পাইয়া থাকেন। তিনি এ দেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা। আমি খেতড়ির মহারাজাকে আমার আমেরিকার ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছি। ইতি

আশীর্বাদক
বি—

৭৫*

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
১৯ নভেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় মিসেস উডস,
চিঠির উত্তর দিতে আমার দেরীর জন্য মাফ করবেন। কবে আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করতে পারব জানি না। আগামী কাল ম্যাডিসন এবং মিনিয়াপোলিস রওনা হচ্ছি। যে ইংরেজ ভদ্রলোকটির কথা আপনি বলেছিলেন, তিনি হলেন লণ্ডনের ডাঃ

মমেরি, লণ্ডনের দরিদ্রদের মধ্যে কর্মী হিসাবে সুপরিচিত—অতি মধুর চরিত্রের লোক। আপনি বোধ হয় জানেন না, ইংলিশ চার্চই পৃথিবীতে এক মাত্র ধর্মীয় সংস্থা, যা এখানে প্রতিনিধি পাঠায়নি; এবং ক্যাণ্টারবেরীর আর্কবিশপ ধর্মমহাসভাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করা সত্ত্বেও ডাঃ মমেরি মহাসভায় এসেছিলেন।

হে সহৃদয় বন্ধু, আপনাকে ও আপনার কৃতী পুত্রকে ভালবাসা জানাচ্ছি—আমি সর্বদা আপনাদের চিঠি লিখি আর না লিখি, কিছু এসে যায় না।

আপনি কি আমার বইগুলি এবং 'কভার-অল'টিকে মিঃ হেলের ঠিকানায় এক্সপ্রেস-যোগে পাঠাতে পারেন? ওগুলি আমার দরকার। এক্সপ্রেসের দাম এখানে মিটিয়ে দেওয়া হবে। আপনাদের সকলের উপর প্রভুর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

আপনার সদাবন্ধু
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—মিস স্যানবর্ন বা পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য বন্ধুদের যদি আপনি কখনও চিঠি লেখেন, তাহলে অনুগ্রহ করে তাঁদের আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৭৬

(হরিপদ মিত্রকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

C/o G. W. Hale
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৩

কল্যাণবরেষু,

বাবাজী, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগোবৃত্তান্ত হাজির—বড় আশ্চর্যের বিষয়, কারণ আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এ দেশে আশ্চর্যের বিষয় অনেক। বিশেষ এদেশে দরিদ্র ও স্ত্রী-দরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এ দেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই! সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু'
৩৬
—যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমানা। এ কথা বড়ই সত্য। এ দেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে। স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথ চলিবার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ্ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'
৩৭
—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান্, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

এ দেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এ দেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে রোজ ৬ টাকা—খাওয়া-পরা বাদ—দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলি ৬ টাকা রোজের কম খাটে না। কিন্তু খরচও তেমনি। চার আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলে না। ২৪৲ টাকায় এক জোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজগার তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজগার করিতে, তেমনি খরচ করিতে।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত! আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিতিষত্নতঃ'—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities (সুবিধা) আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক-জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ী-ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক-গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান্ সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই, ধর্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চে। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম শিক্ষা দিব।

কবে দেশে যাব জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান্। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৭৭*

[মান্দ্রাজী ভক্তদিগকে লিখিত]

C/o G. W. Hale
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
২২ অগষ্ট, ১৮৯২

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে। 'ইন্টিরিয়র' পত্রিকার যে সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছ, তাহা সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না; এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোক 'নীলনাসিক প্রেসবিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে। এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী জনসাধারণ এবং পুরোহিতগণের অনেকেই আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাগুলির খ্যাতনামা হইবার ওই কৌশল এখানকার সকলেই জানে; সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছু গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনরিগণ যে ইহা লইয়া একটা হুজুক করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগকে বলিও—'হে য়াহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে।' তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তি পর্যন্ত এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে, আর তাহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙিবেই ভাঙিবে। মিশনরীদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে অনেক আসাতে—তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষি করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই স্নান করিব।

তাহাদের সম্মুখে আমি আমাদের ধর্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভারত হইতে কোন সাহায্যের আর আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয়-ভাষায় অনুবাদ করিয়া চারিদিকে উহার

প্রচার কর। ইহা জাতির সম্মুখে আমাদের আদর্শ জাগরূক রাখিবে। আর সেই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দিকে শাখা-বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সাহায্য-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য কর। 'রামনাথ' বা যে-কোন 'নাথ'কে পাও, তাহাকেই ধরিয়া তাহার সাহায্যে এই কার্যের জন্য ধীরে ধীরে টাকা সঞ্চয় করিতে থাকো। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইওরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতে বা ভারতের বাহিরে মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি উদ্‌ভাবন করিয়াছে, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্যন্ত প্রচার করা। তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। 'চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি এবং কল্যাণ।' ইহার অভাবে মানুষ, বর্ণ ও জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন মতবাদ প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে-কোন ব্যক্তি, শ্রেণী, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায় যদি অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার ও কার্যের শক্তিতে বাধা দেয় (অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শক্তি কাহারও অনিষ্ট না করে) তাহা অতি অন্যায়, এবং যে ঐরূপ করে—তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য জাতি জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা সকলে জানুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক—অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে, স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমরা এক সঙ্গে রাখিয়া দিব মাত্র, উহারা প্রকৃতির নিয়মে দানা বাঁধিবে। আমেরিকার মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমগ্র আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করা আমার সাধ্য নয়। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় কৃষ্টির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্যে এত ব্যস্ত যে আত্মোন্নতির সময় পায় না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় বড় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ।

ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই। তবে এডিসন
৩৮
সম্প্রতি ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন; যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো; কাজে লাগো। দুইদিন আগেই হউক বা পরেই হউক, আমি আসিতেছি। আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান।' মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পুঃ—একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাকো। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।

আমি তোমাদের নিকট সবচেয়ে উঁচুদরের কতকগুলি কাগজ হইতে স্থানে স্থানে কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইহাদের মধ্যে ডাঃ টমাসের লেখাটি বিশেষ মূল্যবান্, কারণ তিনি সর্বাগ্রণী না হইলেও আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক বটে। 'ইণ্টিরিয়র' কাগজটার অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও আমাকে গালাগালি দিয়া একটা নাম জাহির করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, আমি সর্বসাধারণের প্রিয় বক্তা ছিলাম। আমি উহা হইতেও কয়েক পঙক্তি কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইতি

বি

৭৮*

[শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত]

চিকাগো
২৯ জানুআরী, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

কয়েক দিন হয় আপনার শেষ চিঠিখানা পাইয়াছি। আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোটভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে, আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার মহান্ গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না। আর তাহা ছাড়া যে-সকল যুবক বর্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করিবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির মত দাঁড়াইয়াছে—তাহাদেরই বা কী অবস্থা হইত? ইহারা ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে। আর এই তো সবে আরম্ভ। প্রভুর কৃপায় ইহারা এমন কাজ করিয়া যাইবে, যাহার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ ইহাদিগকে আশীর্বাদ করিবে। সুতরাং একদিকে ভারতের ও বিশ্বের ভাবী ধর্মসম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা, এবং যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোময় গহ্বরে ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, যাহাদিগকে সাহায্য করিবার কিম্বা যাহাদের বিষয় চিন্তা করিবারও কেহ নাই, তাহাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা, আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহাদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতু হওয়া—এই দুইটির মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, বাকী যাহা কিছু তাহা প্রভুই সম্পন্ন করিবেন। তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি যতক্ষণ খাঁটি আছি, ততক্ষণ কেহই আমাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ তিনিই আমার সহায়। ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই। আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়া-পরার ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডিই যে কখনও অতিক্রম করিতে পারে না! কেবল আপনার ন্যায় মহৎ-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র আমার গুণগ্রাহী। ভগবান্ আপনাকে আশীর্বাদ করুন! আমার সমাদর হউক আর নাই হউক—আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর শুধু ইহারাই নহে, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে, এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিম্বা মৃত্যুকে বরণ করিব।

আমাদের দেশের লোকের না আছে ভাব, না আছে সমাদর করিবার ক্ষমতা। পরন্তু সহস্র বৎসরের পরাধীনতার ফলে উৎকট পরশ্রীকাতরতা ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির বশে ইহারা যে-কোন নূতন ভাবধারারই বিরোধী হইয়া উঠে। এতৎসত্ত্বেও প্রভু মহান্।

আরতি ও অন্যান্য বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রত্যেক মঠেই সে-সকল প্রথা প্রচলিত আছে দেখা যায় এবং 'গুরুপূজা' সাধনার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়াই বেদে উক্ত হইয়াছে। ইহার ভালমন্দ উভয় দিকই আছে সত্য, কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখিবেন—আমাদের সম্প্রদায়ের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজের মতামত বা বিশ্বাস অন্যের উপর চাপাইবার কোন অধিকার আমরা রাখি না। আমাদের মধ্যে অনেকে কোনপ্রকার মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নহে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরের সেই বিশ্বাসে বাধা দিবারও কোন অধিকার তাহাদের নাই, কারণ তাহা হইলে আমাদের ধর্মের মূলতত্ত্বই লঙ্ঘন করা হইবে। অধিকন্তু শুধু মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানকে জানা সম্ভব। যেমন আলোক-স্পন্দন সর্বত্র, এমন কি অন্ধকার কোণেও বিদ্যমান, কেবলমাত্র প্রদীপের মধ্যেই উহা লোকচক্ষুর গোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ যদিও ভগবান্ সর্বত্র বিরাজিত, তথাপি তাঁহাকে আমরা কেবল এক বিরাট মানুষরূপেই কল্পনা করিতে পারি। করুণাময়, রক্ষক, সহায়ক প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধীয় ভাবগুলি—মানবীর ভাব; মানুষ স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই ভগবানকে দেখে বলিয়া ঐ সকল ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। কোন মনুষ্যবিশেষকে আশ্রয় করিয়াই এই সকল গুণের বিকাশ হইতে বাধ্য—তাঁহাকে গুরুই বলুন, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষই বলুন আর অবতারই বলুন। নিজদেহের সীমা আপনি যেমন উল্লম্ফনে অতিক্রম করিতে পারেন না, মানুষও তেমনি নিজ প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। যে গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতারপ্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র—সেই প্রকার গুরুকে যদি কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে, তবে তাহাতে কী ক্ষতি হইতে পারে? যদি খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ কিম্বা বুদ্ধকে পূজা করিলে কোন ক্ষতি না হয়, তবে যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁহাকে পূজা করিলে কী ক্ষতি হইতে পারে? দর্শন বিজ্ঞান অপর কোন বিদ্যার সহায়তা না লইয়া এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, 'সকল ধর্মেই সত্য নিহিত আছে, শুধু ইহা বলিলেই চলিবে না, প্রত্যুত সকল ধর্মই সত্য। আর এই সত্যই জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

কিন্তু এ মতও আমরা জোর করিয়া কাহারও উপর চাপাই না; আমার গুরুভাইদের মধ্যে কেহই আপনাকে এমন কথা বলে নাই যে, সকলকে তাঁহার গুরুকেই পূজা করিতে হইবে—ইহা কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে—যদি কেহ ঐরূপ পূজা করে, তবে তাহাকে বাধা দিবার অধিকারও আমাদের নাই। কেনই বা থাকিবে? তাহা হইলে পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব অতুলনীয় এই সমাজটি—যেখানে দশজন মানুষ দশ প্রকার ভিন্ন মত ও ভাব অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণ সাম্যের মধ্যে বাস করিতেছে—বিনষ্ট হইয়া যাইবে। দেওয়ানজী, ঈশ্বর মহান্ ও করুণাময়—ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করুন, আরও বহু কিছু দেখিতে পাইবেন।

আমরা যে প্রত্যেকটি ধর্মমতকে শুধু সহ্য করি তাহা নহে, পরন্তু উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি এবং সেই তত্ত্বই প্রভুর সহায়তায় জগতে প্রচার করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি।

বড় হইতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটি বস্তুর প্রয়োজনঃ

(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(৩) যাহারা সৎ হইতে কিম্বা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।

কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ, তাহা কোন কালে কোথাও দেখা যায় নাই। যদি আপনি কখনও পাশ্চাত্য দেশে আসেন, তবে এতদ্দেশবাসীর মধ্যে এই হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে। ভারতবর্ষে তিন জন লোকও পাঁচ মিনিট কাল একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্য কলহ করিতে শুরু করে—ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই দুরবস্থায় পতিত হয়। হায় ভগবান্! কবে আমরা হিংসা না করিবার শিক্ষা লাভ করিব!

এইরূপ একটি জাতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে এমন একদল লোক সৃষ্টি করা, যাহারা মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য স্নেহ-ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা কি বিস্ময়কর নহে? এই দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে, এই অদ্ভুত উদারভাব অপ্রতিহতবেগে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে, এবং এই দাসজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উৎকট অজ্ঞতা, ঘৃণা, প্রাচীন মূর্খতা, জাতিবিদ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি সত্ত্বেও সমগ্র দেশকে বিদ্যুৎশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

সর্বব্যাপী বদ্ধতার এই মহাসমুদ্রের মধ্যে যে কয়েকটি মহাপ্রাণ মনীষী শৈলের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—আপনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান্ আপনাকে নিরন্তর আশীর্বাদ করুন। ইতি

চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৭৯*

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
৩ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

তোমার সব চিঠিই পেয়েছিলাম; কিন্তু কী জবাব দেব, ভেবে পাইনি। তোমার শেষ চিঠিখানিতে আশ্বস্ত হলাম। ... বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র বিশ্বাসই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে পারে, এই পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি একমত; কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই—পাছে উহা শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্যবসিত হয়। প্রেম ভক্তি খুব বড় ও ভাল জিনিষ, কিন্তু নিরর্থক ভাবপ্রবণতায় আসল জিনিষই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ কালেভদ্রে জগতে এসে থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ-স্বরূপ সামনে রেখে আমরা এগোতে পারি। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান এবং পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে ঐ পূর্ণতা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হল না বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হল, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হতে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, তাতে সন্দেহ নেই।

কোন ধর্মকে ফলপ্রসূ করতে হলে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার; অথচ যাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইজন্য আমরা একটি 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়' হতে চাই। সম্প্রদায়ের যে-সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদারভাবও থাকবে।

ভগবান্ যদিও সর্বত্র আছে বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই; সুতরাং তাঁকেই কেন্দ্র করে আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউ বা মহাপুরুষ—যার যা খুশী।

আমরা সামাজিক সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ কিছুই প্রচার করি না। তবে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, আর তাঁর শিষ্যদের ভেতরে যাতে—কি মতে, কি কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এইটির দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে। আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে চাই না—তা সে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হোক বা 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই মতে বিশ্বাসবান্ হোক, অদ্বৈতবাদী হোক বা বহুদেবে বিশ্বাসী হোক, অজ্ঞেয়বাদী হোক বা নাস্তিক হোক। কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তাকে কেবল এটুকু করতে হবে যে, তাকে এমন চরিত্র গঠন করতে হবে, তা যেমনি উদার তেমনি গভীর।

অপরের অনিষ্টকর না হলে আচার-ব্যবহার, চরিত্রগঠন বা পানাহার সম্বন্ধেও আমরা কোন বিশেষ নৈতিক মতের উপর জোর দিই না। এইটুকু বলে আমরা লোককে তার নিজের বিচারের উপর নির্ভর করতে বলি। 'যা উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম; আর যা উন্নত ও সমন্বয়-ভাবাপন্ন হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম।'

তারপর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোন্‌টাতে তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেছে নিয়ে সেই পথে যাক; এ বিষয়ে আমরা সকলকে স্বাধীনতা দিই। যথা একজনের হয়তো মাংস খেলে সহজে উন্নতি হতে পারে, আর একজনের হয়তো ফলমূল খেয়ে হয়। যার যা নিজের ভাব, সে তা করুক। কিন্তু একজন যা করছে তা যদি অপরে করে, তার ক্ষতি হতে পারে, কারও কোন অধিকার নেই যে, সে অপরকে গাল দেবে, তাকে নিজের মতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা তো দূরের কথা। কতকগুলি লোকের পক্ষে হয়তো দারপরিগ্রহ উন্নতির খুব সহায়ক হতে পারে, অপরের পক্ষে হয়তো তা বিশেষ ক্ষতিকর। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বলবার কোন অধিকার নেই যে, সে ভুল পথে যাচ্ছে, জোর করে তাকে নিজের মতে আনবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা।

আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মত; একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত কেবল এই—কোথাও সূর্যের উপর মেঘের আবরণ ঘন, কোথাও এই আবরণ একটু পাতলা; আমাদের বিশ্বাস—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই—এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

আমাদের বিশ্বাস—এই হল বেদের সার রহস্য।

আমাদের বিশ্বাস—প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এইভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলে চিন্তা করা উচিত ও তার সহিত তেমনভাবে ব্যবহারও করা উচিত, কাকেও ঘৃণা করা বা কোনরূপে কারও নিন্দা বা অনিষ্ট করা উচিত নয়। আর এ যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্তব্য তা নয়, সকল নর-নারীরই কর্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস—আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাঁতে অপূর্ণতা নেই।

আমাদের বিশ্বাস—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও এ কথা নাই যে, আত্মায় লিঙ্গ, ধর্ম বা জাতিভেদ আছে। এই হেতু যাঁরা বলেন, 'ধর্ম আবার সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কি বলবে?' তাঁদের সহিত আমরা একমত; কিন্তু তাঁদের আবার আমাদের এ কথা মানতে হবে যে, ধর্মের কোনরূপ সামাজিক বিধান দেবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার করবার কোন অধিকার নেই, কারণ ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।

যদি এ কথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ করব, তাতে আমাদের উত্তর এই—তাঁরা যে ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলো বলছেন, সেই ধর্মেই পুনঃপুনঃ বলেছে, 'পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না।' বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কি রকম?—না, যেন অসৎকার্য করে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সামাজিক বিধানগুলো সমাজের নানা প্রকার অবস্থা-সংঘাত হতে উৎপন্ন—ধর্মের অনুমোদনে। ধর্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে তিনি হাত দিলেন; কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করে এবং নিজেই নিজের খণ্ডন করে বলছেন, 'সমাজসংস্কার ধর্মের কাজ নয়।' ঠিক কথা! এখন দরকার—ধর্ম যেন সমাজসংস্কার করতে না যান, আমরা সেজন্যই এ কথাও বলি, ধর্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন। অপরের অধিকারে হাত দিতে যেও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১। শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।

২। ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।

সুতরাং উভয় স্থলেই শিক্ষকের কার্য কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সর্বদা বলে থাকিঃ 'অপরের অধিকারে হাত দিও না, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য, রাস্তা সাফ করে দেওয়া। বাকী সব ভগবান্ করেন।

সুতরাং তোমরা যখন বার বার ভাব যে, ধর্মের কাজ কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, তখন তোমাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত, যে-অনর্থ আগে থেকেই হয়ে গিয়েছে সে-সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণরূপে

প্রযোজ্য। এ কি রকম জান? যেন কোন লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে; এখন বঞ্চিত ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তখন প্রথম ব্যক্তি নাকী সুরে চীৎকার শুরু করলে, আর 'মানুষের অধিকার'রূপ মতবাদ যে কত পবিত্র, তা প্রচার করতে লাগল!

সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে পুরুতগুলোর অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে!

তোমরা মাংসাহারী ক্ষত্রিয়দের কথা বলছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংস খাক আর নাই খাক, তারাই হিন্দুধর্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিষ রয়েছে, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে ধর্মের অধিকার দিয়েছেন; আর যখনই ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারও কাছে শুনে নাও। গীতায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য পথ উন্মুক্ত রয়েছে; আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত মানে করছেন। ঈশ্বর কি তোমাদের মত ভীরু আহাম্মক যে, এক টুকরো মাংসে তাঁর দয়া-নদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তাই হয়, তবে তাঁর মূল্য এক কানাকড়িও নয়। যাক, ঠাট্টা থাক। কি প্রণালীতে তোমাদের চিন্তাকে নিয়মিত করতে হবে, এ চিঠিতে তার গোটাকতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা কর না। তোমাকে পূর্বেই লিখেছি ও বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস—মান্দ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার হবে। তাই বলছি, হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে গোটাকতক লোক এই নূতন ভগবান্ রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই নূতনভাবে একেবারে মেতে উঠতে পার কি? ভেবে দেখো; উপাদান সংগ্রহ করে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণ-জীবনী লেখো দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনাসমাবেশ কর না—অর্থাৎ জীবনীটি লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপ। তার মধ্যে কেবল তাঁর কথা থাকবে। খবরদার, এর মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাকবে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া, আর জীবনীটি তাঁরই উদাহরণস্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা সাধারণের জন্য নয়। আমি অযোগ্য হলেও আমার উপর একটি কর্তব্য ন্যস্ত ছিল—যে রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা মান্দ্রাজে নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তারা কখনও কিছু করতে পারে না। ঈর্ষাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। ঈর্ষা থাকলে সর্বশক্তিমান্ ভগবানও কিছু করে উঠতে পারেন না।

আমার সম্বন্ধে মনে কর, যা কিছু করবার ছিল সব শেষ করেছি; এইটি ভাব যে, সব কাজের ভার তোমাদের ঘাড়ে। হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, ভাব যে তোমরা এই কাজ করবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। তোমরা কাজে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রামকৃষ্ণকে প্রচার কর; তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বল না। জাতিভেদের স্বপক্ষে বিপক্ষে কিছু বল না, অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বলবার দরকার নেই। কেবল লোককে বল, 'গায়ে পড়ে কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যেও না,' তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আলাসিঙ্গা, জি. জি, বালাজী ও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর, তারা এটা পারবে কি না। সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক যুবকবৃন্দ, তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

৮০*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

ডেট্রয়েট
১২ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি এখন মিঃ পামারের অতিথি। ইনি বড় চমৎকার লোক। পরশু রাত্রে ভোজ দিলেন এঁর একদল প্রাচীন বন্ধুকে; তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর। দলটিকে ইনি বলেন—'পুরানো বন্ধুদের আড্ডা।' এক নাট্যশালায় বক্তৃতা দিলাম আড়াই ঘণ্টা; সকলেই খুব খুশী। এইবার বষ্টন আর নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি। এখানকার আয় দিয়েই ওখানকার খরচ কুলিয়ে যাবে। ফ্ল্যাগ ও অধ্যাপক রাইটের ঠিকানা মনে নাই। মিশিগানে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি না। মিঃ হলডেন আজ প্রাতে খুব বোঝাচ্ছিলেন আমাকে—

মিশিগানে বক্তৃতা দেবার জন্য। আমার কিন্তু এখন বষ্টন ও নিউ ইয়র্ক একটু ঘুরে দেখবার আগ্রহ। সত্য কথা বলতে কি, যতই আমি জনপ্রিয় হচ্ছি এবং আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ হচ্ছে, ততই আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। এ-যাবৎ যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছি, তার মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে ভাল। শুনে মিঃ পামার তো আনন্দে আত্মহারা; আর শ্রোতারা এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান যে, বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর আমি জানতে পারলাম—এত দীর্ঘকাল ধরে বলেছি। শ্রোতার অমনোযোগ বা চাঞ্চল্য বক্তার অগোচর থাকে না। যাক, এ সব বাজে জিনিষ থেকে ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন—আমার আর এ সব ভাল লাগে না। ঈশ্বর করেন তো বষ্টন বা নিউ ইয়র্কে বিশ্রামের অভিপ্রায়। তোমরা সকলে আমার প্রীতি জেনো। চিরসুখী হও। ইতি।

তোমাদের স্নেহের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৮১-৯০

৮১*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

ডেট্রয়েট
১৫ মার্চ, ১৮৯৪

স্নেহের খুকীরা,

বুড়ো পামারের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। বৃদ্ধ সজ্জন ও সদানন্দ। আমার বক্তৃতার জন্য মাত্র একশো সাতাশ ডলার পেয়েছি। সোমবার আবার ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দেব। তোমাদের মা আমাকে বলেছেন—লীনের (Lynn) এক মহিলাকে চিঠি দিতে। আমি তো তাঁকে কখনও দেখিওনি। বিনা পরিচয়ে লেখা ভদ্রতাসঙ্গত হবে কি? মহিলাটির নামে বরং ডাকে একটি ছোট পরিচয়পত্র আমাকে পাঠিয়ে দিও। আর লীনই বা কোথায়? হাঁ, আমার সম্বন্ধে সব চেয়ে মজার কথা লিখেছে এখানকার এক সংবাদপত্রঃ ঝঞ্ঝা-সদৃশ হিন্দুটি এখানে মিঃ পামারের অতিথি, মিঃ পামার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন; তবে তাঁর জেদ, দুইটি বিষয়ে কিছু অদল-বদল চাই—জগন্নাথদেবের রথ টানবে তাঁর লগ্ হাউস ফার্মের 'পারচেরন্' জাতীয় অশ্ব, আর তাঁর জার্সি গাভীগুলিকে হিন্দুর গোদেবী-সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিতে হবে। এই জাতীয় অশ্ব ও গাভী মিঃ পামারের লগ্ হাউস ফার্মে বহু আছে এবং এগুলি তাঁর খুব আদরের।

প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে বন্দোবস্ত ঠিক হয়নি। হলের ভাড়াই লেগেছিল একশো পঞ্চাশ ডলার। হলডেনকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্য একজন জুটেছে, দেখি এর ব্যবস্থা ভাল হয় কি না। মিঃ পামার আমায় সারাদিন হাসান। আগামী কাল ফের এক নৈশভোজ হবে। এ পর্যন্ত সব ভালই চলেছে, কিন্তু জানি না কেন, এখানে আসা অবধি আমার মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

বক্তৃতা প্রভৃতি বাজে কাজে একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। শত বিচিত্র রকমের মনুষ্যনামধারী কতকগুলি জীবের সহিত মিশে মিশে উত্যক্ত হয়ে পড়েছি। আমার বিশেষ পছন্দের বস্তুটি যে কি, তা বলছিঃ আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না; কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন বক্তৃতায় অগ্নি বর্ষণ করতে পারি; কিন্তু তা অল্প—অতি অল্পসংখ্যক বাছাই-করা লোকের মধ্যেই হওয়া উচিত। তাদের যদি ইচ্ছা হয়তো আমার ভাবগুলি জগতে প্রচার করুক—আমি কিছু করব না। কাজের এ একটা যুক্তিযুক্ত বিভাগ মাত্র। একই ব্যক্তি চিন্তা করে, তারপর সেই চিন্তালব্ধ ভাব প্রচার করে কখনও সফল হতে পারেনি। ঐরূপে প্রচারিত ভাবের মূল্য কিছুই নয়। চিন্তা করবার, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার এই দাবী, এবং মানুষ যে যন্ত্রবিশেষ নয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই যেহেতু সব ধর্মচিন্তার সার কথা, অতএব বিধিবদ্ধ যান্ত্রিক ধারা অবলম্বন করে এই চিন্তা অগ্রসর হতে পারে না। যন্ত্রের স্তরে সব কিছুকে টেনে নামাবার এই প্রবৃত্তিই আজ পাশ্চাত্যকে অপূর্ব সম্পদ্‌শালী করেছে সত্য, কিন্তু এই প্রবৃত্তিই আবার তার সব রকম ধর্মকে বিতাড়িত করেছে। যৎসামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাকেও পাশ্চাত্য পদ্ধতিমত কসরতে পর্যবসিত করেছে।

আমি বাস্তবিকই 'ঝঞ্ঝাসদৃশ' নই, বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার যা কাম্য, তা এখানে লভ্য নয় এবং এই 'ঝঞ্ঝাবর্তময়' আবহাওয়াও আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পূর্ণত্বলাভের পথ এই যে, নিজে ঐরূপ চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ যারা সচেষ্ট, তাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে। বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়ে সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কর্ম নয়—মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহামানব সৃষ্টি করাই আমার ব্রত।

এইমাত্র ফ্ল্যাগের এক পত্র পেলাম। বক্তৃতা-ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করতে অক্ষম। তিনি বলেন, 'আগে বষ্টনে যান।' যাক, বক্তৃতা দেবার সাধ্য আর আমার নেই। এই যে আমাকে দিয়ে ব্যক্তি বা শ্রোতা বিশেষকে খুশী করবার চেষ্টা—এটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। যা হোক, এ দেশ থেকে চলে যাবার আগে অন্ততঃ দু-এক দিনের জন্যও চিকাগোয় ফিরে যাব। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

আপনার সদাকৃতজ্ঞ বন্ধু
বিবেকানন্দ

৮২*

[মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

ডেট্রয়েট
১৭ মার্চ, '৯৪

প্রিয় ভগিনী,
তোমার প্যাকেটটি গতকাল পেয়েছি। সেই মোজাগুলি পাঠাতে হয়েছে বলে দুঃখিত—এখানে আমি নিজেই কিছু যোগাড় করে নিতে পারতাম। তবে ব্যাপারটি তোমার ভালবাসার পরিচায়ক বলে আমি খুশী। যা হোক আমার ঝুলি এখন ঠাসা ভর্তি। কিভাবে যে বয়ে বেড়াব জানি না!

মিঃ পামারের সঙ্গে বেশী সময় থাকার ব্যাপারে মিসেস ব্যাগলি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আজ তাঁর বাড়ীতে ফিরেছি। পামারের বাড়ীতে বেশ ভালই কেটেছে। পামার সত্যি আমুদে দিলখোলা মজলিশী লোক, 'ঝাঁঝালো স্কচ'-এর ভক্ত; নিতান্ত নির্মল আর শিশুর মত সরল।

আমি চলে আসাতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু আমার অন্য কিছু করবার ছিল না। এখানে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আমার দু-বার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। যেমন তার বুদ্ধি, তেমনি রূপ, তেমনি ধর্মভাব; সংসারের ছোঁয়ার মধ্যে একেবারে নেই। প্রভু তাকে কৃপা করুন। সে আজ সকালে মিসেস ম্যাক্‌ডুভেলের সঙ্গে এসেছিল এবং এমন চমৎকারভাবে কথাবার্তা বলল, এমন গভীর ও আধ্যাত্মিকভাবে—আহা, আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম! যোগীদের বিষয়ে তার সব-কিছু জানা আছে, আর ইতোমধ্যে যোগাভ্যাসে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে!

বিবেকানন্দ

৮৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

ডেট্রয়েট
১৮ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী মেরী,
কলিকাতার চিঠিখানা আমাকে পাঠানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে। গুরুদেব সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি আমার কাছে শুনেছ। তাঁরই জন্মতিথি অনুষ্ঠানের একটি নিমন্ত্রণপত্র কলিকাতার গুরুভায়েরা আমাকে লিখেছেন। সুতরাং পত্রটি তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি। পত্রে আরও লিখেছেন, 'ম—' কলিকাতায় ফিরে গিয়ে রটাচ্ছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করছে। ... এই তো তোমাদের আমেরিকার 'অপূর্ব আধ্যাত্মিক পুরুষ!' তাদেরই বা দোষ কি? যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী না হওয়া পর্যন্ত—অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ না করলে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সঠিক সন্ধান না পেলে মানুষ বস্তু ও অবস্তুর, বাগাড়ম্বর ও জ্ঞানগাম্ভীর্যের এবং এ জাতীয় অপরাপর বিষয়ের পার্থক্য ধরতে পারে না। 'ম—' বেচারীর এতদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ দুঃখিত। ভগবান্ ভদ্রলোককে কৃপা করুন।

পত্রে সম্বোধনাংশ ইংরেজীতে। নামটি আমার বহু আগেকার; লেখক শৈশবের এক সাথী; এখন আমার মত সন্ন্যাসী। বেশ কবিত্বপূর্ণ নাম! নামের অংশমাত্র লিখেছে, সবটা হচ্ছে 'নরেন্দ্র', অর্থাৎ 'মানুষের সেরা' ('নর' মানে মানুষ, আর 'ইন্দ্র' মানে রাজা, অধিপতি)—হাস্যাস্পদ নয় কি? আমাদের দেশে নাম, সব এই রকমের। নাচার! আমি কিন্তু নামটি যে ছাড়তে পেরেছি, তাতে খুব খুশী।

বেশ ভাল আছি। আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি তোমার ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

৮৪

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

C/o George W. Hale
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
চিকাগো, ১৯ মার্চ, ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

এদেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু হরিদাস ভাই-এর৩৯ পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghose৪০ এবং তোমরা যে হরিদাস ভাই-এর যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

এদেশে আমার কোন অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম তেমনি শীত। গরমি কলিকাতা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই! বরফ তো ছোট জিনিষ। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ দাগ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আলকোহল থার্মোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রীরও নীচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল—বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় এক রকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, শ্লেজ চক্রহীন—ঘসড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতী চলে যেতে পারে! নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! আমি কিন্তু বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল তার পর গরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা [যুক্তরাষ্ট্র] লেকচার করে বেড়াচ্ছি! গাড়ী ঘরের মত, steam pipe (নলবাহিত বাষ্প)-যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপধপে সাদা, সে অপূর্ব শোভা!

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাইরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্ছেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ীর ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কিনা, তাই। প্রত্যেক ঘরে, সিঁড়িতে steam pipe গরম রাখছে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে এরা অদ্বিতীয়, পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলীর রোজ ৬৲ টাকা, চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪৲ টাকায় মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০৲ টাকায় একটা পোষাক। যেমন রোজগার, তেমনই খরচ। একটা লেকচার ২০০।৩০০।৫০০।২০০০।৩০০০৲ পর্যন্ত। আমি ৫০০৲ টাকা৪১ পর্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য— আমার এখানে এখন পোয়াবারো। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজর লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগোসুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগল তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বলল! ... দাদা, আমি দেখেশুনে অবাক্! বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট এ দেশে। তবে আমার মত তোমাদের হল না, তা আমার কি দোষ? ... আর মজুমদার পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, 'ও কেউ নয়, ঠক জোচ্চোর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে—আমি ফকির' ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারোজ প্রেসিডেণ্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে প্যাম্ফলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা; কিন্তু গুরু সহায় বাবা! মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মত মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাদ্রীর কি কর্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপূজা করি না'—এ সব আর চলে না—পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, এরা চায় ফিলসফি, learning (বিদ্যা), ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।

ধর্মপাল ছোকরা বেশ, ... ভাল মানুষ। তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল। দাদা, মজুমদারকে দেখে আমার আক্কেল এসে গেল। বুঝতে পারলুম, 'যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে'—ভর্তৃহরি।
৪২

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হাম্ বড়া, আর কেউ বড় হবে না।

এ দেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। 'যা শ্রীঃ সুকৃতিনাং স্বয়ং ভবনেষু' (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এ দেশে, আর 'পাপাত্মনাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ' (পাপাত্মগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। 'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ' ইত্যাদি—(তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিণী)। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' (যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে

আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা!!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, ‘যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ’ (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন)—বুড়ো মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ, আকাশপাতাল ভেদ!! ‘যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ’
৪৩
(যথোপযুক্তভাবে কর্মফল বিধান করেন)। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, ‘ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী’ ইত্যাদি—(তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)।
৪৪
আর আমরা বলছি—‘দূরমপসর রে চণ্ডাল’ (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা), ‘কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী’ ইত্যাদি (কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে?)। ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম! যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের ‘ছুঁৎমার্গ’, খালি ‘আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না’। হে হরি? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক্ থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক্ থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? ‘কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ’ (সকলে নিদ্রিত হয়ে থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন)। তিনি জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা!

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি? ‘সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥ (সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটি বাক্য—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়)। সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। ‘খালি পেটে ধর্ম হয় না’—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

“ মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফলকথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain
৪৫
. গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল- পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i.e., from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion, therefore, is not to blame, but men.
৪৬

এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি ১০।১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তার পর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! Fools and dotards and Selfishness personified
৪৭
—তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.
৪৮

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

যেমন আমাদের দেশে social virtue-র (সমাজ-হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের sprituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কত দিনে সিদ্ধকাম হব জানি না, আমাদের মত এরা hypocrite (কপট) নয়, আর jealousy (ঈর্ষা) একেবারে নাই। হিন্দুস্তানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত) করব or die in the attempt (কিম্বা ঐ চেষ্টায় মরব)। ‘সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি’—(যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করাই ভাল)।

তোমরা হয়তো মনে করতে পার, কি Utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা)। You little know what is in me (আমার ভিতর কি আছে, তোমরা মোটেই জান না)। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমার সহায়তা করে in my plan (আমার পরিকল্পনা সফল করতে)—all right (খুব উত্তম); নইলে কিন্তু গুরুদেবwill show me the way out (আমাকে পথ দেখাইবেন)। ইতি।

মাকে আমার কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ দিবে। তাঁর আশীর্বাদে আমার সর্বত্র মঙ্গল। এই পত্র বাহিরের লোকের নিকট পড়বার আবশ্যক নাই। এটি সকলকে বলিও, সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিও—সকলে jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাকতে পারবে কি না। যদি না পারে, যারা হিংসুটেপনা না করে থাকতে পারে না, তাদের ঘরে যাওয়াই ভাল, আর সকলের কল্যাণের জন্য। ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতিগত পাপ)!!! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমণ্ডুক তো দুনিয়ায় নাই। কোন একটা নূতন জিনিষ কোন দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নেই, 'আর্যবংশ'!!! কোথায় বংশ তা জানি না! ... এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মত ঘোরে, আর তারা 'আর্যবংশ'!!!

কিমধিকমিতি—বিবেকানন্দ

৮৫*

[রেভারেণ্ড হিউমকে লিখিত]

ডেট্রয়েট
২৯ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভ্রাতা,
আপনার পত্র সদ্য এখানে আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি ব্যস্ত আছি, সুতরাং আপনার পত্রের মাত্র কয়েকটি বিষয় সংশোধনের সুযোগ নিচ্ছি বলে ক্ষমা করবেন।

প্রথমতঃ পৃথিবীর কোন ধর্ম অথবা ধর্মসংস্থাপকের বিরুদ্ধে আমার কোন কিছুই বলবার নেই, থাকতে পারে না; আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আপনারা যা খুশী ভাবুন না কেন। সব ধর্মই আমার কাছে অতি পবিত্র। দ্বিতীয়তঃ মিশনরীরা আমাদের মাতৃভাষাগুলি শিক্ষা করে না, এমন কথা আমি বলিনি; কিন্তু আমার এই অভিমতে আমি এখনও সুদৃঢ় যে, তাঁদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই (সত্যি যদি কেউ থাকেন) সংস্কৃতের প্রতি কোনপ্রকার মনোযোগ দেন। তাছাড়া একথাও সত্য নয় যে, আমি কোন ধর্মসংস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলেছি, যদিও এখনও আমি আমার অভিমতের উপর জোর দিচ্ছি যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে কখনও খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হবে না; খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে—এ কথাও আমি অস্বীকার করছি; এবং সেই সঙ্গে এ কথাও যোগ করে দিচ্ছি—দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় খ্রীষ্টানেরা কেবল যে ক্যাথলিক তাই নয়, তাদের নিজেদের উক্তি অনুযায়ী তারা হল 'জাতিমানা খ্রীষ্টান', অর্থাৎ তারা ঘনিষ্ঠভাবে তাদের জাতিকে আঁকড়ে থাকে, এবং আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি—যদি হিন্দুসমাজ তার বর্জননীতি পরিহার করে, তাহলে ওদের শতকরা নব্বুই ভাগ বহু ত্রুটিপূর্ণ এই হিন্দুধর্মেই অবিলম্বে ফিরে আসবে।

পরিশেষে আমাকে 'স্বদেশবাসী' বলে সম্বোধন করার জন্য আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সর্বপ্রথম কোন বিদেশী ইওরোপীয় একজন ঘৃণ্য নেটিভকে ঐ ভাষায় সম্বোধন করতে সাহসী হলেন—তিনি ভারতে জাত বা মিশনরী, যাই হোন না কেন। বন্ধুবর, ঐ একইভাবে ভারতবর্ষেও কি আমাকে সম্বোধন করতে আপনি সাহস করবেন? ভারতে জাত মিশনরীদের অনুগ্রহ করে বলুন, তাঁরা ঐভাবেই যেন আমাদের সম্বোধন করেন, এবং যাঁরা ভারতে জন্মাননি, তাঁদের বলুন তাঁরা যেন ভারতবাসীকে সমপর্যায়ের মানুষ বলে গণ্য করেন। আর বাকী সব বিষয়ে—আপনি নিজেই আমাকে আহাম্মক মনে করবেন, যদি আমি কতকগুলো পৃথিবী-পর্যটক বা অলীক কাহিনীকারের বিবরণ অনুযায়ী আমাদের ধর্ম বা সমাজের বিচার হতে পারে বলে স্বীকার করে নিই। ভ্রাতঃ, ক্ষমা করবেন, ভারতে জন্মালেও আমাদের সমাজ বা ধর্মের বিষয়ে আপনি জানেনই বা কি? কেননা সমাজের দ্বার যেভাবে বন্ধ, কিছু জানা অসম্ভব। সর্বোপরি, সকলেই তার পূর্ব ধারণার মাপকাঠিতে কোন জাতি বা ধর্মের বিচার করে থাকে—করে না কি? প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি আমাকে 'স্বদেশবাসী' বলেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে প্রেম ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক এখনও সম্ভব।

ভ্রাতৃপ্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৮৬*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

ডেট্রয়েট
৩১ মার্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,
তুমি ও মাদার চার্চ টাকা পেয়েছ জানিয়ে যে চিঠি দুখানি লিখেছ, তা এইমাত্র একসঙ্গে পেলাম। খেতড়ির পত্রটি পেয়ে সুখী হলাম; তোমাকে ওটি ফেরত পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখো—লেখক চাইছেন খবরের কাগজের কিছু কাটিং! ডেট্রয়েটের কাগজগুলি ছাড়া আর কিছু আমার কাছে নেই, তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমিও কিছু সংগ্রহ করতে পারলে পাঠিয়ে দিও—যদি অবশ্য সুবিধা হয়। ঠিকানা জান তো?—

H. H. The Maharaja of Khetri, Rajputana, India.

চিঠিখানা কিন্তু তোমাদের ধার্মিক পরিবারের মধ্যেই যেন থাকে। মিসেস ব্রীড প্রথমে আমায় এক কড়া ঝাঁঝালো চিঠি দেন। আজ টেলিগ্রামে এক সপ্তাহের জন্য তাঁর আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ পেলাম। এর আগে নিউ ইয়র্ক থেকে মিসেস স্মিথের এক পত্র পেয়েছি—তিনি, মিস হেলেন গোল্ড ও ডাক্তার—আমাকে নিউ ইয়র্কে আহ্বান করেছেন। আবার আগামী মাসে ১৭ তারিখে লীন ক্লাবের (Lynn Club) নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমে নিউ ইয়র্কে যাব, তারপর লীনে তাদের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হব।

ইতোমধ্যে যদি আমি চলে না যাই—মিসেস ব্যাগলির আগ্রহও তাই, তাহলে আগামী গ্রীষ্মে সম্ভবতঃ এনিস্কোয়ামে (Annisquam) যাব। মিসেস ব্যাগলি সেখানে এক সুন্দর বাড়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। মহিলাটি বেশ ধর্মপ্রাণা (spiritual), মিঃ পামার কিন্তু বেশ একটু পানাসক্ত (spirituous)—তাহলেও সজ্জন। অধিক আর কি? আমি শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছি। স্নেহের ভগিনীগণ! তোমরা সুখী—চিরসুখী হও। ভাল কথা, মিসেস শার্মান নানা রকমের উপহার দিয়েছেন—নখ কাটবার ও চিঠি রাখবার সরঞ্জাম, একটি ছোট ব্যাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি—যদিও ওগুলি নিতে আমার আপত্তি ছিল, বিশেষ করে ঝিনুকের হাতলওয়ালা শৌখীন নখকাটা সরঞ্জামটার বিষয়ে, তবুও তাঁর আগ্রহের জন্য নিতে হল। ঐ ব্রাশ নিয়ে কি যে করব, তা জনি না। ভগবান্ ওদের রক্ষা করুন। তিনি এক উপদেশও দিয়েছেন—আমি যেন এই আফ্রিকী পরিচ্ছদে ভদ্রসমাজে না যাই। তবে আর কি! আমিও একজন ভদ্রসমাজের সভ্য! হা ভগবান্, আরও কি দেখতে হবে! বেশী দিন বেঁচে থাকলে কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হয়!

তোমাদের ধার্মিক পরিবারের সকলকে অগাধ স্নেহ জানাচ্ছি। ইতি

তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৮৭*

[মান্দ্রাজী ভক্তদিগকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
৯ এপ্রিল, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
তোমার শেষ পত্রখানি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। দেখ, আমাকে এখানে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় আর প্রত্যহ এতগুলো চিঠি লিখতে হয় যে, তুমি আমার কাছ থেকে ঘন ঘন পত্র পাবার আশা করতে পার না। যা হোক, এখানে যা কিছু হচ্ছে, তা যাতে তুমি মোটামুটি জানতে পার, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করে থাকি। আমি ধর্মমহাসভা-সম্বন্ধীয় একখানি বই তোমায় পাঠাবার জন্য চিকাগোয় লিখব। ইতোমধ্যে তুমি নিশ্চয় আমার দুটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা পেয়েছ।

সেক্রেটারী সাহেব আমায় লিখেছেন, আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য—কারণ ভারতই আমার কর্মক্ষেত্র। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালতে হবে, যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে।

অতএব ব্যস্ত হয়ো না, ঈশ্বরেচ্ছায় সময়ে সবই হবে। আমি আমেরিকায় অনেক বড় বড় শহরে বক্তৃতা দিয়েছি এবং ওতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার অত্যধিক খরচ বহন করেও ফেরবার ভাড়া যথেষ্ট থাকবে। আমার এখানে অনেক ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কয়েকজনের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদ্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর 'ম—'বাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চয় হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদমাশ, আবার কলিকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলেছেন, আমি ঘোর পাপে মগ্ন, বিশেষতঃ আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি!!! প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য হয়। আমি তোমার ভগিনীপতির

৪৯

লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগলা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। 'যুগ' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বড় সুন্দর—তাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই তো ঠিক ব্যাখ্যা; তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

একটা জিনিষ করা আবশ্যক—যদি পার। মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পার? রামনাদের রাজা বা ঐরূপ একজন বড় লোক কাকেও সভাপতি করে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (—অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)। তারপর সেই প্রস্তাবটি 'চিকাগো হেরাল্ড', 'ইন্টার-ওশ্যান' (Inter-Ocean), 'নিউ ইয়র্ক সান' এবং ডেট্রয়েট (মিশিগান) থেকে প্রকাশিত 'কমার্শিয়াল এডভাটাইজার' কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিকাগো ইলিনয় রাষ্ট্রে। 'নিউ ইয়র্ক সান'-এর আর বিশেষ ঠিকানার কোন আবশ্যক নাই। প্রস্তাবের কয়েকটি কপি ধর্ম-মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে—আমি তাঁর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছি, রাস্তাটার নাম ইণ্ডিয়ানা এভিনিউ। এক কপি ডেট্রয়েটের মিসেস জে. জে. ব্যাগলির নামে পাঠাবে—তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন এভিনিউ। এই সভাটা যত বড় হয়, তার চেষ্টা করবে। যত বড় বড় লোককে পার, ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করবে; তাঁদের ধর্মের জন্য, দেশের জন্য তাঁদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজ ও তাঁর দেওয়ানের নিকট হতে সভা ও তার উদ্দেশ্যের সমর্থন করে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ির মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও তাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।

উঠ বৎসগণ—এই কাজে লেগে যাও। যদি তোমরা এটা করতে পার, তবে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কাজ করতে পারব নিশ্চয়।

প্রস্তাবটি এমন ধরনের হবে যে, মান্দ্রাজের হিন্দুসমাজ, যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কাজে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয়, এইটির জন্য চেষ্টা কর—এ তো আর বেশী কাজ নয়। সব জায়গা থেকে যতদূর পার আমাদের কাজে সহানুভূতি-প্রকাশক পত্রও যোগাড় কর, ঐগুলি ছাপাও, আর যত শীঘ্র পার মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে পাঠাও। বৎসগণ, এতে অনেক কাজ হবে। 'ব্রা—' সমাজের লোকেরা এখানে যা তা বলছে। যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ করব। আমার পত্রগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি, ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কাজ করতে আরম্ভ করলে খুব হুজুকে মেতে যাবে, কিন্তু আমি কাজ না করে বাঙালীর মত কেবল লম্বা লম্বা কথা কইতে চাই না।

ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয়, কলিকাতার গিরিশ ঘোষ আর মিত্র মহাশয় আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কলিকাতায় ঐরূপ সভা আহ্বান করাতে পারেন। যদি পারেন তো খুব ভালই হয়। সম্ভব হলে কলিকাতার সভায় ঐ একই রকম প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতে বলবে। কলিকাতায় হাজার হাজার লোক আছে, যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ...

আর বিশেষ কিছু লিখিবার নেই। আমাদের সকল বন্ধুকে আমার সাদর সম্ভাষণাদি জানাবে—আমি সতত তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুনঃ—সাবধান, পত্র লিখিবার সময় আমার নামের আগে 'His Holiness' লিখো না। এখানে উহা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শুনায়। ইতি

বি

৮৮*

[অধ্যাপক রাইটকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
২৫ এপ্রিল, '৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,
আপনার আমন্ত্রণের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ৭ই মে যাচ্ছি। বিছানা?—বন্ধু, আপনার ভালবাসা এবং মহৎ প্রাণ পাথরকেও পাখীর পালকের মত কোমল করতে পারে।

সেলেমে লেখকদের প্রাতরাশে যোগ দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

৭ই ফিরছি।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৮৯*

[মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
২৬ এপ্রিল

প্রিয় ভগিনী,
গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি 'ইণ্টিরিয়র'-
৫০
এর পাগলামিতে খুব মজা বোধ করছি। কিন্তু তুমি ভারতের কাগজপত্রের যে ডাক গতকাল পাঠিয়েছ, তা মাদার চার্চ যেমন বলেছেন—দীর্ঘ বিরতির পর সত্যি সুসংবাদ। ওর মধ্যে দেওয়ানজীর একটি চমৎকার পত্র আছে। বৃদ্ধ লোকটি—প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন, যথারীতি সাহায্যের প্রস্তাব করেছেন। ওর মধ্যে কলিকাতায় প্রকাশিত আমার সম্বন্ধে একটি ছোট্ট পুস্তিকা আছে, যাতে দেখা গেল—'প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি' তাঁর নিজ দেশে মর্যাদা পেলেন; আমার জীবনে অন্তত একবারের জন্য এটা দেখতে পেলাম। আমেরিকান ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত আমার বিষয়ক অংশগুলি তার মধ্যে রয়েছে। কলিকাতার পত্রাদির অংশগুলি বিশেষভাবে তৃপ্তিকর, কিন্তু প্রশংসাবাহুল্যের জন্য সেগুলি তোমাকে পাঠাব না। তারা আমার সম্বন্ধে 'অপূর্ব', 'অদ্ভুত', 'সুবিখ্যাত' এইসব নানা আজে-বাজে কথা বলেছে, কিন্তু তারা বহন করে এনেছে সমগ্র জাতির হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা। এখন আমি লোকের কথা আর গ্রাহ্য করি না, আমার নিজের দেশের লোক বললেও না—কেবল একটি কথা। আমার বুড়ী মা এখনও বেঁচে আছেন, সারা জীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সে-সব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করবার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ আশার, তাঁর সবচেয়ে ভালবাসার যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে—কলিকাতায় মজুমদার যেমন রটাচ্ছে তেমনিভাবে—জঘন্য নোংরা জীবন যাপন করছে, এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবে। কিন্তু প্রভু মহান্, তাঁর সন্তানের ক্ষতি কেউ করতে পারে না।

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে—আমি না চাইতেই। ঐ সম্পাদকটি কে জান?—আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক, যিনি আমার অত প্রশংসা করেছেন এবং আমেরিকায় আমি হিন্দুধর্মের পক্ষ-সমর্থনে এসেছি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তিনি মজুমদারের সম্পর্কিত ভাই!! হতভাগ্য মজুমদার! ঈর্ষায় জ্বলে মিথ্যা কথা বলে নিজের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করলে। প্রভু জানেন, আমি আত্মসমর্থনের কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি।

'ফোরাম'-এ মিঃ গান্ধীর রচনা এর পূর্বেই আমি পড়েছি। যদি গতমাসের 'রিভিউ অফ রিভিউজ'টা পাও, তাহলে সেটা মায়ের কাছে পাঠ কর। তাতে আফিং-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় চরিত্র সম্পর্কে বৃটিশ ভারতের জনৈক সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীর অভিমত পাবে। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের তুলনা করে হিন্দুদের আকাশে তুলেছেন। আমাদের জাতির একজন চরমতম শত্রু ঐ স্যার লেপেল্ গ্রিফিন্! তাঁর এই মত-পরিবর্তনের কারণ কি?

বষ্টনে মিসেস ব্রীড-এর বাড়ীতে আমার সময় কেটেছে চমৎকার। অধ্যাপক রাইটের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি আবার বষ্টনে যাচ্ছি। দরজীরা আমার নূতন গাউন তৈরী করছে। কেম্ব্রিজ (হার্ভার্ড) ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতে যাব। সেখানে অধ্যাপক রাইটের অতিথি হব। বষ্টনের কাগজপত্রে আমাকে বিরাট করে স্বাগত জানিয়েছে।

এই সব আজে-বাজে ব্যাপারে আমি পরিশ্রান্ত। মে মাসের শেষের দিকে চিকাগোয় যাব। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার ফিরব পূর্বদিকে।

গত রাত্রে ওয়ালডর্ফ হোটেলে বক্তৃতা দিয়েছি। মিসেস স্মিথ প্রতি টিকিট দু-ডলার করে বেচেছেন। ঘর-ভর্তি শ্রোতা পেয়েছিলাম, যদিও ঘরটি বেশী বড় ছিল না। টাকাকড়ির দর্শন এখনও পাইনি। আজকের মধ্যে পাবার আশা রাখি।

লীন-এ যে এক-শ ডলার পেয়েছি, তা পাঠালাম না, কারণ নূতন গাউন তৈরী ইত্যাদি বাজে ব্যাপারে খরচ করতে হবে।

বষ্টনে টাকার ভরসা নেই। তবু আমেরিকার মস্তিষ্কটিকে স্পর্শ করতেই হবে, তাতে নাড়া দিতেই হবে, দেখি যদি পারি।

তোমার প্রিয় ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৯০*

[মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
২ (যথার্থতঃ ১) মে, '৯৪

প্রিয় ভগিনী,

পুস্তিকাটি তোমাকে এখনই পাঠাতে পারব বলে মনে হয় না, তবে গতকাল ভারত থেকে সংবাদপত্রের যে-সব অংশ এসেছে, তা তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেগুলো পড়ে অনুগ্রহ করে মিসেস ব্যাগলির কাছে পাঠিয়ে দিও। ঐ সংবাদপত্রটির সম্পাদক হচ্ছেন মিঃ মজুমদারের আত্মীয়। বেচারা মজুমদারের জন্য এখন আমার দুঃখ হয়!!

আমার কোটের ঠিক কমলা রঙটি এখানে খুঁজে বার করতে পারলাম না। সুতরাং তার কাছাকাছি ভাল রঙ যা মিলল—পীতাভ রক্তিম—তাতেই খুশী থাকতে হল। কয়েকদিনের মধ্যেই কোটটি তৈরী হয়ে যাবে।

সেদিন ওয়ালডর্ফের বক্তৃতা থেকে ৭০ ডলার পেয়েছি। আগামীকালের বক্তৃতা থেকে আরও কিছু পাবার আশা রাখি। ৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বষ্টনে বক্তৃতাদি আছে, তবে সেখানে তারা খুব কমই পয়সা দেয়।

গতকাল ১৩ ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে কথাটি বল না যেন। কোটের খরচ পড়বে ৩০ ডলার। খাবার-দাবার ঠিকই মিলছে ... এবং যথেষ্ট টাকা। আশা হয়, আগামী বক্তৃতার পরেই অবিলম্বে ব্যাঙ্কে কিছু রাখতে পারব।

... সন্ধ্যায় এক নিরামিষ নৈশভোজে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি!

ঠিক, আমি নিরামিষাশী ... কারণ যখন নিরামিষ জোটে, তখন তাই আমার পছন্দ। লাইম্যান অ্যাবট-এর কাছে আগামী পরশু মধ্যাহ্ন-ভোজের আর একটি নিমন্ত্রণ আছে। সময় মোটের উপর চমৎকার কাটছে। বষ্টনেও তেমনি সুন্দর কাটবে আশা হয়—কেবল ঐ জঘন্য, অতি জঘন্য বিরক্তিকর বক্তৃতা বাদে। যা হোক, ১৯ তারিখ পার হলেই এক লাফে বষ্টন থেকে ... চিকাগোয়, ... তারপরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেব, আর টানা বিশ্রাম—দু-তিন সপ্তাহের। তখন গ্যাঁট হয়ে বসে শুধু গল্প করব—আর পাইপ টানব।

ভাল কথা, তোমার নিউ ইয়র্কীরা লোক খুবই ভাল, কেবল তাদের মগজের চেয়ে টাকা বেশী।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে যাব। বষ্টনে তিনটি বক্তৃতা এবং হার্ভার্ডে তিনটি—সকলেরই ব্যবস্থা করেছেন মিসেস ব্রীড। এখানেও ওরা কিছু ব্যবস্থা করছে। সুতরাং চিকাগোর পথে আমি আর একবার নিউ ইয়র্কে আসব—কিছু কড়া বাণী শুনিয়ে টাকাকড়ি পকেটস্থ করে সাঁ করে চিকাগোয় চলে যাব।

চিকাগোয় পাওয়া যায় না এমন কিছু যদি নিউ ইয়র্ক বা বষ্টন থেকে তোমার দরকার থাকে, সত্বর লিখবে। আমার এখন পকেট-ভর্তি ডলার। যা তুমি চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে—কখনও মনে কর না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাই-ই! পৃথিবীতে একটি জিনিষই আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।

তোমার স্নেহময় ভাই
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৯১-১০০

৯১*

[অধ্যাপক রাইটকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
৪ মে, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,
আপনার সহৃদয় লিপি এখনই পেলাম। আপনার কথামত কাজ করে আমি যে খুবই সুখী হব, তা বলাই বাহুল্য।

কর্ণেল হিগিন্‌সনের চিঠিও পেয়েছি। তাকে উত্তর পাঠাচ্ছি। আমি রবিবার (৬ই মে) বষ্টনে যাব। মিসেস হাউ-এর উইমেন্‌স্ ক্লাবে সোমবার বক্তৃতা দেবার কথা।

আপনার সদা বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৯২*

১৭ বীকন ষ্ট্রীট, বষ্টন
মে, ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,
ইতোমধ্যে আপনি পুস্তিকা এবং চিঠিগুলি পেয়ে গেছেন। যদি আপনি চান, তাহলে চিকাগো থেকে ভারতীয় রাজা ও রাজমন্ত্রীদের কয়েকখানি চিঠি পাঠাতে পারি। ঐ মন্ত্রীদের একজন ভারতের রাজকীয় কমিশনের অধীন বিগত 'আফিং কমিশন'-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। আমি যে প্রতারক নই, তা আপনাকে বিশ্বাস করবার জন্য তাদের আপনার কাছে লিখতে বলব, আপনি যদি এটা পছন্দ করেন। কিন্তু ভ্রাতঃ, এ সব বিষয়ে গোপনতা ও অপ্রতিকারই আমাদের জীবনের আদর্শ।

আমাদের কর্তব্য শুধু ত্যাগ—গ্রহণ নয়। যদি আমার মাথায় খেয়াল না চাপত, তাহলে আমি কখনই এখানে আসতাম না। এতে আমার কাজের সহায়তা হবে, এই আশায় আমি ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছি, যদিও আমার দেশবাসী যখন আমাকে পাঠাতে চেয়েছিল, তখন আমি সর্বদা আপত্তি করেছি। আমি তাদের বলে এসেছি, 'আমি মহাসভায় যোগদান করতে পারি বা নাও পারি, তোমাদের যদি খুশী হয়, আমাকে পাঠাতে পার।' তাঁরা আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। বাদ-বাকী আপনি করেছেন।

হে সহৃদয় বন্ধু, সর্বপ্রকারে আপনার সন্তোষ বিধান করতে ন্যায়তঃ আমি বাধ্য। আর বাকী পৃথিবীকে—তাদের বাতচিতকে আমি গ্রাহ্য করি না। আত্মসমর্থন সন্ন্যাসীর কাজ নয়। আপনার কাছে তাই আমার প্রার্থনা, আপনি ঐ পুস্তিকা ও চিঠিপত্রাদি কাউকে দেখাবেন না বা ছাপাবেন না। বুড়ো মিশনরীগুলোর আক্রমণকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি মজুমদারের ঈর্ষার জ্বালা দেখে। প্রার্থনা করি, তাঁর যেন চৈতন্য হয়। তিনি উত্তম ও মহান্ ব্যক্তি, সারা জীবন অপরের মঙ্গল করতে চেয়েছেন। অবশ্য এর দ্বারা আমার গুরুদেবের একটি কথাই আবার প্রমাণিত হল—'কাজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও না কেন, গায়ে ছিটেফোঁটা কালি লাগবেই।' সাধু পবিত্র হবার যত চেষ্টাই কেউ করুক না কেন, মানুষ যতক্ষণ এই পৃথিবীতে আছে তার স্বভাব কিছু পরিমাণে নিম্নগামী হবেই।

ভগবানের দিকে যাবার পথ সাংসারিক পথের ঠিক বিপরীত। ঈশ্বর ও ধনৈশ্বর্য একই সঙ্গে কেউ কখনও পেয়েছে?

আমি কোনদিন 'মিশনরী' ছিলাম না, কোনদিন হবও না—আমার স্বস্থান হিমালয়ে। পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অন্ততঃ এই কথা আজ আমি বলতে পারি, 'হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি—প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, প্রভু।'

তাঁর আশীর্বাদ অনন্তকাল ধরে আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।

আপনার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগোঃ

আমি আগামীকাল কিম্বা পরশু চিকাগো যাচ্ছি।

আপনাদের বি.

৯৩*

[স্বামী সারদানন্দকে লিখিত]

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
২০ মে, ১৮৯৪

প্রিয় শরৎ,
আমি তোমার পত্র পাইলাম ও শশী আরোগ্যলাভ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমি তোমাকে একটি আশ্চর্য ব্যাপার বলিতেছি, শুন। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের ব্যবধানেও এই কার্য চলিতে পারে। এইটি সর্বদা মনে রাখিয়া আর কখনও অসুস্থ হইও না।

* * *

সান্যাল তাহার কন্যাগণের বিবাহের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এত অস্থির হইয়াছে কেন, বুঝিতে পারি না। মোদ্দা কথা তো এই যে, সে নিজে যে সংসার হইতে পলায়নে ইচ্ছুক, তাহার কন্যাগণকে সেই পঙ্কিল সংসারে নিমগ্ন করিতে চাহে!!! এ বিষয়ে আমার একটি মাত্র সিদ্ধান্ত থাকিতে পারে—নিন্দা! বালক বালিকা—যাহারই হউক না কেন, আমি বিবাহের নাম পর্যন্ত ঘৃণা করি। তুমি কি বলিতে চাও, আমি একজনের বন্ধনের সহায়তা করিব? কি আহাম্মক তুমি! যদি আমার ভাই মহিন আজ বিবাহ করে, আমি তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। এ বিষয়ে আমি স্থিরসংকল্প। এখন বিদায়—

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৯৪*

[অধ্যাপক রাইটকে লিখিত]

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
২৪ মে, '৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,
এই সঙ্গে আমি আপনাকে রাজপুতানার অন্যতম শাসক মহামান্য খেতড়ির মহারাজের পত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে ভারতের অন্যতম বৃহৎ দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের প্রাক্তন মন্ত্রীর পত্রও পাঠালাম। ইনি আফিং কমিশনের একজন সদস্য এবং ‘ভারতের গ্লাডস্টোন’ নামে খ্যাত। মনে হয় এগুলি পড়লে আপনার বিশ্বাস হবে যে—আমি প্রতারক নই।

একটা জিনিষ আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কখনই মিঃ মজুমদারের 'নেতা’র
৫১

মতাবলম্বী হইনি। যদি মজুমদার তেমন কথা বলে থাকেন, তিনি সত্য বলেননি।

চিঠিগুলো পাঠের পর আশা করি অনুগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। পুস্তিকাটির কোন দরকার নেই, ওটার কোন মূল্য দিই না।

প্রিয় বন্ধু, আমি যে যথার্থই সন্ন্যাসী, এ বিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল 'আপনাকেই'। বাকী নিকৃষ্ট লোকেরা কি বলে না বলে, আমি তার পরোয়া করি না।

'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে দানব, কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের পথে চলে যাও'—এই কথা বলেছিলেন বার্ধক্যে সন্ন্যাসগ্রহণকারী রাজা ভর্তৃহরি—ভারতের একজন প্রাচীন সম্রাট্ ও মহান্ সন্ন্যাসী।

ঈশ্বরের চিরন্তন আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হোক। আপনার সকল সন্তানের জন্য আমার ভালবাসা, এবং আপনার মহীয়সী পত্নীর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা।

আপনার সদাবান্ধব
বিবেকানন্দ

পুনশ্চঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে কেবল সমাজসংস্কারের ব্যাপারে।—কে আমি সব সময় আন্তরিকতাহীন বলে মনে করেছি, এবং এখনও সে-মত পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটেনি। ধর্মীয় ব্যাপারে অবশ্য আমার বন্ধু পণ্ডিতজীর সঙ্গেও আমার বিশেষ মতপার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল—আমার কাছে সন্ন্যাস সর্বোচ্চ আদর্শ, তাঁর কাছে পাপ। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজীরা সন্ন্যাসী হওয়াকে পাপ বলে মনে তো করবেই!!

আপনার বি.

ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের দেশের 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' দলের মত কিছু সময়ের জন্য কলিকাতায় বিস্তৃতিলাভ করেছিল, তারপর গুটিয়ে গেছে। এতে আমি সুখীও নই, দুঃখিতও নই। তার কাজ সে করেছে, যেমন সমাজসংস্কার। তার ধর্মের দান এক কানাকড়িও নয়। সুতরাং এ জিনিষ লোপ পেয়ে যাবে। যদি ম— মনে করেন আমি সেই মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তিনি ভুল করেছেন। আমি এখনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারকার্যের প্রতি প্রভূত সহানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু ঐ 'অসার' ধর্ম প্রাচীন 'বেদান্ত'-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। আমি কি করব? সেটা কি আমার দোষ? ম—কে বুড়ো বয়সে ছেলেমিতে পেয়েছে, এবং তিনি যে ফন্দি নিয়েছেন, তা আপনার খ্রীষ্টান মিশনরীদের ফন্দিবাজির চেয়ে একচুল কম নয়। প্রভু তাঁকে কৃপা করুন এবং শুভপথ দেখান।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

আপনি কবে এনিস্কোয়ামে যাচ্ছেন? অষ্টিন এবং বাইমকে আমার ভালবাসা, আপনার পত্নীকে আমার শ্রদ্ধা। আপনার জন্য গভীর প্রেম ও কৃতজ্ঞতা, যা ভাষায় প্রকাশে আমি অসমর্থ।

সদাপ্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৯৫*

চিকাগো
২৮ মে, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্বে দিতে পারি নাই, কারণ আমি নিউ ইয়র্ক ও বষ্টনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম আর আমি ন—র পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্বে তোমাকে ন—র কথা কিছু বলিব। সে সকলকে নিরাশ করেছে। কতকগুলো বিটকেল দুষ্ট পুরুষ ও মেয়ের সঙ্গে মিশিয়া যে একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—এখন কেউ তাহাকে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। যাহা হউক, অধোগতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া সে আমাকে সাহায্যের জন্য লেখে। আমিও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। যাহা হউক, তুমি তাহার আত্মীয়স্বজনকে বলিবে, তাহারা যেন শীঘ্র তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ভাড়া পাঠায়। তাহারা কুক কোম্পানীর নামে টাকা পাঠাইতে পারে—তাহারা ওকে নগদ টাকা না দিয়া ভারতের একখানা টিকিট দিবে। আমার বোধ হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যাওয়াই তাহার পক্ষে ভাল—ঐ পথে কোথাও নামিয়া পড়িবার প্রলোভন কিছু নেই। বেচারা বিশেষ কষ্টে পড়িয়াছে—অবশ্য যাহাতে সে অনশনক্লেশ না পায়, সেই দিকে আমি দৃষ্টি রাখিব। ফটোগ্রাফ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, এখন আমার নিকট একখানাও নাই—খানকতক পাঠাইবার জন্য অর্ডার দিব। খেতড়ির

মহারাজকে আমি কয়েকখানি পাঠাইয়াছিলাম এবং তিনি তাহা হইতে কতকগুলি ছাপাইয়াছিলেন—ইতোমধ্যে তুমি তাহা হইতে কতকগুলি পাঠাইবার জন্য লিখিতে পার।

জানি না, কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।

আমাকে ছাড়িয়া কাজ করিবার চেষ্টা কর, মনে কর, যেন আমি কখনও ছিলাম না। কোন ব্যক্তির বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না। যাহা পার করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না। ধর্মপাল যে তোমাদের বলিয়াছিল, আমি এ দেশ হইতে যত ইচ্ছা টাকা পাইতে পারি, সে কথা ঠিক নয়। এ বছরটা এ দেশে বড়ই দুর্বৎসর—ইহারা নিজেদের দরিদ্রদেরই সব অভাব দূর করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এরূপ সময়েও আমি যে উহাদের নিজেদের বক্তাদের অপেক্ষা অনেক সুবিধা করিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য উহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

কিন্তু এখানে ভয়ানক খরচ হয়। যদিও প্রায় সর্বদাই ও সর্বত্রই আমি ভাল ভাল ও বড় বড় পরিবারের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছি, তথাপি টাকা যেন উড়িয়া যায়।

আমি বলিতে পারি না, আগামী গ্রীষ্মকালে এদেশ হইতে চলিয়া যাইব কিনা; খুব সম্ভবতঃ না। ইতোমধ্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের কাজ যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে তোমরা সব করিতে পার। জানিয়া রাখো যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল-প্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কার্য কর, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কর। বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়—তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সঙ্কল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর। মনে রাখিও—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক—আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার শক্তি তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, 'ওঠ, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরী করিলে বিষণ্ণ হইও না বা নিরাশ হইও না। লেখায়—আঁচড় কাটায় কি ফল? উৎসাহ, বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়!

সকলকে আমার আশীর্বাদ। মান্দ্রাজের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি আমাদের কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্যে শৈথিল্য না করেন। চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকো। গর্বিত হইও না। গোঁড়াদের মত জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্র রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে। সর্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্যতায় গর্বিত হইও না, বড় বড় কাজ এখনও করিতে বাকী। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী। সকলেই সম্মুখে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্! জয়! প্রভুর জয়!!

শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ভট্টাচার্য এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণকে আমার গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাইবে। তাঁহাদিগকে বলিবে, যদিও সময়াভাবে কিছু লিখিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় তাঁহাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট আছে। আমি তাঁহাদিগের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। প্রভু তাঁহাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা কর। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই সঙ্ঘ বাড়াইতে থাকো—উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না, তখন পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পরিচালন ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য—যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভট্টাচার্যের গৃহে একটি সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য। যে কোনরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে।

কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না, কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ কর। আমার যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ! প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো, বৎসগণ! প্রভুর জয়! কিডিকে আমার ভালবাসা জানাইবে। আমি সেক্রেটারী সাহেবের পত্র পাইয়াছি।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

৯৬*

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
১৮ জুন, '৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,
অন্য চিঠিগুলো পাঠাতে দেরী হল বলে ক্ষমা করবেন। আমি সেগুলো আগে খুঁজে পাইনি। সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি।

এনিস্কোয়ামে যেতে পারব কিনা, ঠিক জানি না। আমি পুনরায় না লিখিলে চিঠিগুলো আমার কাছে পাঠাবার দরকার নেই। বষ্টনের কাগজে আমার বিরুদ্ধে লেখা সেই রচনাটি দেখে মিসেস ব্যাগলি খুবই বিচলিত হয়েছেন। তিনি ডেট্রয়েট থেকে আমার কাছে তার একটা কপি পাঠিয়েছেন এবং চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন, তিনি আমার প্রতি সব সময়ই খুব সদয় ছিলেন।

ভ্রাতঃ, আপনার মত বলিষ্ঠ হৃদয় সহজে মেলে না। এটা একটা আজব জায়গা—আমাদের এই দুনিয়াটা। তবে এই দেশে যেখানে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, সামান্য 'পরিচয়পত্র'ও যেখানে আমার নেই, সেখানে এখানকার মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণে সহৃদয়তা পেয়েছি, তার জন্য সব জড়িয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত সব কিছু মঙ্গলমুখী।

সদাকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ছেলেদের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ষ্ট্যাম্প পাঠালাম, যদি তাদের কাজে লাগে।

৯৭*

[শ্রীযুত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত]

C/o. G. W. Hale
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ
চিকাগো
২০ জুন, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,
আপনার অনুগ্রহলিপি আজ পাইলাম। আপনার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে বিবেচনাহীন কঠোর মন্তব্য দ্বারা দুঃখ দিয়াছি বলিয়া আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছি। আপনার অল্প স্বল্প সংশোধন আমি নতমস্তকে মানিয়া লইলাম। 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' কিন্তু দেওয়ানজী সাহেব, এ কথা আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আপনাকে ভালবাসি বলিয়াই ঐরূপ কথা বলিয়াছিলাম। অসাক্ষাতে যাহারা আমার দুর্নাম রটাইয়াছে, তাহারা পরোক্ষভাবে আমার উপকার তো করেই নাই, পরন্তু আমাদের হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে আমেরিকার জনসাধারণের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে একটি কথাও উক্ত না হওয়াতে ঐ সকল দুর্নাম যথেষ্ট ক্ষতির কারণই হইয়াছে। আমার দেশবাসী কেহ—আমি যে তাহাদের প্রতিনিধি—এ বিষয়ে কি একটি কথাও লিখিয়াছিল? কিম্বা আমার প্রতি আমেরিকাবাসীদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক একটি বাক্যও কি তাহারা প্রেরণ করিয়াছে? পক্ষান্তরে—আমেরিকাবাসীর নিকট তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে যে, আমি একটি পাকা ভণ্ড এবং আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই আমি প্রথম গেরুয়া ধারণ করিয়াছি। অভ্যর্থনার ব্যাপারে অবশ্য এই সকল প্রচারের ফলে আমেরিকায় কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু অর্থসাহায্যের ব্যাপারে এই ভয়াবহ ফল ঘটিয়াছে যে, আমেরিকাবাসিগণ আমার কাছে একেবারে হাত গুটাইয়া

ফেলিয়াছে। এই যে এক বৎসর যাবৎ আমি এখানে আছি—এর মধ্যে ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা লোকও এ দেশবাসীকে এ কথাটি জানানো উচিত মনে করেন নাই যে, আমি প্রতারক নহি। ইহার উপর আবার মিশনরী সম্প্রদায় সর্বদা আমার ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হইয়াই আছে এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পত্রিকাগুলিতে আমার বিরুদ্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া এখানকার কাগজে ছাপা হইয়াছে। আর আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এদেশের জনসাধারণ—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ও হিন্দুতে যে কি পার্থক্য, তাহার খুব বেশী সংবাদ রাখে না।

আমার এখানে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য—নিজের একটি বিশেষ কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। আমি সমস্ত বিষয়টি পুনর্বার সবিস্তার আপনাকে বলিতেছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য দেশে জাতীয়তাবোধ আছে, আর আমাদের তাহা নাই। অর্থাৎ শিক্ষা ও সভ্যতা এখানে (পাশ্চাত্যে) সর্বজনীন—জনসাধারণে অনুপ্রবিষ্ট। ভারতবর্ষের ও আমেরিকার উচ্চবর্ণের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই সত্য, কিন্তু উভয় দেশের নিম্নবর্ণের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন? যেহেতু তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তাহা ছিলাম না। আমাদের দেশে একজন মহৎ লোক মারা গেলে বহু শতাব্দী ধরিয়া আর একজনের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, আর এদেশে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। আপনি মারা গেলে (ভগবান্ আমার দেশের সেবার জন্য আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন) আপনার স্থান পূর্ণ করিতে দেশ যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করিবে; তাহা এখনই প্রতীয়মান হইতেছে, কারণ আপনাকে অবসর গ্রহণ করিতে দেওয়া হইতেছে না। বস্তুতঃ দেশে মহৎ ব্যক্তির অভাব ঘটিয়াছে। কেন তাহা হইয়াছে? কারণ এ দেশে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, আর আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। এ দেশের শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাই ত্রিশকোটি অধিবাসীর দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা তিন চার কিম্বা ছয় কোটি নরনারী-অধ্যুষিত এ সকল দেশে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র বিস্তৃততর। আপনি সহৃদয় বন্ধু, আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা একটি বিশেষ ত্রুটি এবং ইহা দূর করিতে হইবে।

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে? আমাদের ধর্মের কোন অপরাধ নাই, কারণ মূর্তিপূজায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। মূর্তিপূজা থাকিবে কি থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্বার বিবাহ হইবে, জাতিভেদ-প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করাই আমাদের কর্তব্য—দানাবাঁধার কার্য ঐশ্বরিক বিধানে স্বতই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই—বাকীটুকু তাহারাই নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও অসুবিধা আছে। দেউলিয়া গভর্ণমেণ্ট কোন সহায়তা করিবে না, করিতে সক্ষমও নহে; সুতরাং সেদিক হইতে সহায়তার কোন আশা নাই।

ধরুন, যদি আমরা গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই, তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সে সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না; তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ—না আছে ইহাদিগকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করিবার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটি নৈরাশ্যজনক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমি ইহারই মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়াছি। তাহা এই—যদি পর্বত মহম্মদের নিকট নাই আসে তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে।৫২ দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কিরূপে তাহা সাধিত হইবে? আপনি আমার গুরুভ্রাতাগণকে দেখিয়া থাকিবেন। এক্ষণে ঐরূপ নিঃস্বার্থ, সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে আমি পাইব। ইহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নহে, পরন্তু শিক্ষার আলোকও বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগাইবার গোড়াপত্তন আমি করিয়াছি।

মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেই সময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াচিত্র কিম্বা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিম্বা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিষই না শেখানো যাইতে পারে দেওয়ানজী! চক্ষুই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র দ্বার তাহা নহে, পরন্তু কর্ণদ্বারাও শিক্ষার কার্য যথেষ্ট হইতে পারে। এইরূপে তাহারা নূতন চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে পারে, নৈতিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বলিয়া আশা করিতে পারে। ঐটুকু পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য—বাকীটুকু উহারা নিজেরাই করিবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সন্ন্যাসিগণ কিসের জন্য এ জাতীয় ত্যাগব্রত গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা এ প্রকারের কাজ করিতে অগ্রসর হইবে? উত্তরে আমি বলিব—ধর্মের প্রেরণায়! প্রত্যেক নূতন ধর্ম-তরঙ্গেরই একটি নূতন কেন্দ্র প্রয়োজন। প্রাচীন ধর্ম শুধু নূতন কেন্দ্র-সহায়েই নূতনভাবে সঞ্জীবিত হইতে পারে। গোঁড়া মতবাদ সব গোল্লায় যাউক—উহাদের দ্বারা কোন কাজই

হয় না। একটি খাঁটি চরিত্র, একটি সত্যিকার জীবন, একটি শক্তির কেন্দ্র—একজন দেবমানবই পথ দেখাইবেন। এই কেন্দ্রেই বিভিন্ন উপাদান একত্র হইবে এবং প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত অপবিত্রতা মুছিয়া দিবে। আবার দেখুন, একটি কাষ্ঠখণ্ডকে উহার আঁশের অনুকূলেই যেমন সহজে চিরিয়া ফেলা যায়, তেমনি হিন্দুধর্মের দ্বারাই প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে হইবে, নব্য সংস্কার-আন্দোলন দ্বারা নহে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারকগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশের সংস্কৃতিধারা নিজ জীবনে মিলিত করিতে হইবে। সেই মহা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় কি? ঐ তরঙ্গের আগমনসূচক মৃদু গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন কি? সেই শক্তিকেন্দ্র—সেই পথপ্রদর্শক দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি সেই মহান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যুবকদল ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহারাই এ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবে।

এ কার্যের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম দিকটায় সামান্য কিছু অর্থেরও প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে কে আমাদিগকে অর্থ দিবে? ... দেওয়ানজী সাহেব, আমি সেইজন্যই আমেরিকায় আসিয়াছি। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি সমস্ত অর্থ দরিদ্রগণের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম; ধনী-সম্প্রদায়ের দান আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ তাহারা আমার ভাব বুঝিতে পারে নাই। এ দেশে এক বৎসর ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা দিয়াও আমি বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই—অবশ্য আমার ব্যক্তিগত কোন অভাব নাই, কিন্তু আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাহার প্রথম কারণ, এবার আমেরিকায় বড় দুর্বৎসর চলিতেছে, হাজার হাজার গরীব বেকার। দ্বিতীয়তঃ মিশনরীরা এবং '—' গণ আমার মতবাদ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয়তঃ একটি বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমার দেশের কেহ এই কথাটুকু আমেরিকাবাসিগণকে বলিতে পারিল না যে, আমি সত্যই সন্ন্যাসী, প্রতারক নই এবং আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। শুধু এই কয়টি কথামাত্র, তাহাও তাহারা বলিতে পারিল না! আমার দেশবাসিগণকে সেজন্য আমি 'বাহবা' দিতেছি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেওয়ানজী সাহেব, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। মানুষের সাহায্য আমি অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করি। যিনি গিরিগুহায়, দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন—আমার বিশ্বাস, তিনি আমার সঙ্গেই থাকিবেন। আর যদি তাহা না হয়, তবে আমা অপেক্ষা শক্তিমান্ কোন পুরুষ কোন দিন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করিবেন। আজ সব কথাই আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। হে মহাপ্রাণ বন্ধু, আমার দীর্ঘ পত্রের জন্য আমাকে মার্জনা করিবেন; যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমার প্রকৃত দরদী আর আমার প্রতি সদয়, আপনি তাঁহাদেরই একজন; আপনি আমার এই দীর্ঘ পত্রের জন্য ক্ষমা করিবেন। হে বন্ধু, আপনি আমাকে স্বপ্নবিলাসী কিম্বা কল্পনাপ্রিয় বলিয়া অবশ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু এইটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করিবেন যে, আমি সম্পূর্ণ অকপট; আর আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্তভাবেই ভালবাসি।

হে মহাপ্রাণ বন্ধুবর, ভগবানের আশীর্বাদ আপনার ও আপনার আত্মীয়স্বজনের উপর নিরন্তর বর্ষিত হউক, তাঁহার অঙ্গচ্ছায়া আপনার সকল প্রিয়জনকে আবৃত করিয়া রাখুক। আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন। আপনার নিকট আমার ঋণ অপরিসীম, কারণ আপনি শুধু বন্ধু নহেন, পরন্তু আজীবন ভগবান্ ও মাতৃভূমির সেবা সমভাবে করিয়া আসিতেছেন। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—আপনার নিকট একটু অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। আমি নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যাইতেছি। এই [হেল] পরিবারটি আমায় সর্বদা আশ্রয় দিয়াছে এবং আমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়াছে। আর আমাদের স্বদেশীয়দের ও নিজেদের পুরোহিতকুলের কুৎসা সত্ত্বেও, এবং আমি তাহাদের নিকট কোন প্রকার প্রমাণলিপি পরিচয়পত্র বা ঐরূপ কোন কিছু না লইয়া আসা সত্ত্বেও তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই। আপনি যদি আগ্রা ও লাহোরে প্রস্তুত দুই-তিনখানি গালিচা আমায় পাঠাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহাদিগকে সামান্য কিছু উপহার দিবার সাধ আছে। ইহারা ঘরের মেঝেতে ভারতীয় গালিচা পাতিয়া রাখিতে খুব ভালবাসে—ইহা একটা বিশেষ বিলাসের বস্তু। ... ইহাতে যদি অত্যধিক খরচ হয়, তবে আমি চাই না। আমি নিজে বেশ আছি। খাওয়া-দাওয়া ও বাড়ীভাড়া দেওয়ার মত এবং যখন খুশী ফিরিয়া যাওয়ার মত অর্থ আমার যথেষ্ট আছে।

আপনার
বি

৯৮*

(মহীশূরের মহারাজাকে লিখিত)

চিকাগো
২৩ জুন, ১৮৯৪

মহারাজ,
শ্রীনারায়ণ আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি

এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছি। তারপর আমাকে এ দেশে সকলে বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছে। আর এ দেশের অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিগণ আমার সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য দেশ ও এক অদ্ভুত জাতি! প্রথমতঃ জগতের মধ্যে কলকারখানার উন্নতিবিষয়ে এ জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ। এ দেশের লোক নানাপ্রকার শক্তিকে যেমন কাজে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে—এখানে কেবল কল আর কল! আবার দেখুন, ইহাদের সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশ ভাগের এক ভাগ হইবে, কিন্তু ইহারা জগতের ধনরাশির পুরা এক-ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ঐশ্বর্যবিলাসের সীমা নাই, আবার সব জিনিষই এখানে অতিশয় দুর্মূল্য। এখানে শ্রমিকের মজুরী জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রমজীবী ও মূলধনীদের মধ্যে নিত্য বিবাদ চলিয়াছে।

তারপর আমেরিকান মহিলাগণের অবস্থার প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনাদের হাতে লইতেছে; আর আশ্চর্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ অপেক্ষা অধিক। অবশ্য খুব উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অধিকাংশই পুরুষ। এই পর্যন্ত ইহাদের ভাল দিক্ বলা গেল। এখন ইহাদের দোষের কথা বলি। প্রথমতঃ মিশনরিগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের দেশের লোকের ধর্মপ্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এ দেশের ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের ভিতর জোর এক কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু- আধটু ধর্ম করিয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকে কেবল পানভোজন ও টাকা-রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যেরা আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহাদের আবার আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানরা বলে 'সর্বশক্তিমান্ ডলার' এখানে সব করিতে পারে। এদিকে আবার গরীবেরা নিঃস্ব। নিগ্রোদের (যাহাদের অধিকাংশ দক্ষিণ দিকে বাস করে) উপর ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই—উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে তাহাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এদেশে যতই আইন-কানুন, অন্য কোন দেশে এত নাই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্যাদা রাখিয়া চলে, তত আর কোন দেশেই নয়।

মোটের উপর আমাদের দরিদ্র হিন্দুরা এদের চেয়ে অনেক নীতিপরায়ণ। ইহাদের ধর্ম হয় ভণ্ডামি, না হয় গোঁড়ামি। পণ্ডিতেরা নাস্তিক, আর যাঁহারা একটু স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কার ও দুর্নীতিপূর্ণ ধর্মের উপর একেবারে বিরক্ত, তাঁহারা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ইহাদের—শূন্য হইতে সৃষ্টি, সৃষ্ট আত্মা, স্বর্গনামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট অত্যাচারী ঈশ্বর, অনন্ত নরকাগ্নি প্রভৃতি মতবাদে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত হইয়াছেন; আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মার নিত্যত্ব ও আত্মায় পরমাত্মার স্থিতি সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশসকল কোন-না-কোন আকারে ইঁহারা অতি দ্রুত গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি—উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান্ হইবেন, আর ঈশ্বরকে আমাদেরই সর্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা বলিয়া বুঝিবেন। এখন হইতেই ইহাদের সকল বিদ্বান্ পুরোহিতই এইভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে সকল মিশনরী দেখিতে পান, তাহারা কোনরূপেই খ্রীষ্টধর্মের প্রতিনিধি নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই—পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, তুলনায় আমাদের দরিদ্রগণ দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। আমাদের জনগণ ও রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকী যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেক দিন হইতে আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেইজন্য এদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এইঃ মনে করুন, মহারাজ, গ্রামে গ্রামে গরীবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষি-কার্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালক যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন এক স্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটি গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। এই

ক্যামেরা ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন! তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাঁহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়িয়া তাহারা যাহা না শিখিতে পারে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক এইভাবে মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটি সঙ্ঘ গঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এইজন্য কাজ করিবার যথেষ্ট লোক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় টাকা নাই। একটি চাকা গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট; একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। মহামান্য মহারাজের সাহায্যে আমি এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকানদের সে বিষয়ে খেয়াল নাই। আর আমাদের দেশের লোকেই যখন নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তখন ইহারাই বা ভাবিবে কেন?

হে মহামনা রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায় মহামনা একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ভারতকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শ্রদ্ধার সহিত আপনার নাম স্মরণ করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতায় নিমগ্ন লক্ষ লক্ষ আর্ত ভারতবাসীর জন্য গভীরভাবে অনুভব করে। ইহাই প্রার্থনা—

বিবেকানন্দ

৯৯*

[রাও বাহাদুর নরসিংহাচারিয়াকে লিখিত]

চিকাগো
২৩ জুন, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমাকে বরাবর যে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমি আপনার নিকট একটি বিশেষ অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। মিসেস পটার পামার যুক্তরাজ্যের প্রধানা মহিলা। তিনি মহামেলার মহিলানেত্রী ছিলেন। সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহী, মেয়েদের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা। তিনি লেডি ডফরিনের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহার ধন ও পদমর্যাদাগুণে ইওরোপীয় রাজপরিবারসমূহের নিকট হইতে অনেক অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। এ দেশে তিনি আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি চীন, জাপান, শ্যাম ও ভারত সফরে বাহির হইতেছেন। অবশ্য ভারতের শাসনকর্তারা এবং বড় বড় লোকেরা তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সাহায্য ছাড়াই আমাদের সমাজ দেখিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক। আমি অনেক সময় তাঁহাকে ভারতীয় নারীদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য আপনার মহতী চেষ্টার এবং মহীশূরে আপনার চমৎকার কলেজটির কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় আসিলে ইঁহারা যেরূপ সহৃদয় ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ এইরূপ ব্যক্তিদিগকে একটু আতিথেয়তা দেখানো কর্তব্য। আমি আশা করি, আপনারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবেন ও আমাদের স্ত্রীলোকদের যথার্থ অবস্থা একটু দেখাইতে সাহায্য করিবেন। তিনি মিশনরী বা গোঁড়া খ্রীষ্টান নহেন—আপনি সে ভয় করিবেন না। ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাই করিতে চান। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে এইরূপে সহায়তা করিলে এদেশে আমাকেও অনেকটা সাহায্য করা হইবে। প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরস্নেহাস্পদ
বিবেকানন্দ

১০০*

[মিস মেরী ও হ্যারিয়েট হেলকে লিখিত]

চিকাগো
২৬ জুন, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণের মঙ্গলাচরণে বলেছেন, 'আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি; কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ—অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসা মাত্র আমাকে যাতনা দিতে থাকে, আর সাধু ব্যক্তি ছেড়ে যাবার সময় আমার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যান।'
৫৩

আমি বলি 'তথাস্তু'। আমার কাছে—ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের ও ভালবাসার জিনিষ আর কিছুই নাই; আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ মৃত্যুতুল্য। কিন্তু এ সব অনিবার্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি! তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আমি অনুগমন করছি। হে মহৎস্বভাবা মধুরপ্রকৃতি সহৃদয়া পবিত্রস্বভাবগণ! হায়, আমি যদি ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণের মত সুখদুঃখে নির্বিকার হতে পারতাম!

আশা করি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ করছ।

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥'—গীতা

... সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রি, সংযমী তাতে জাগ্রত থাকেন; আর প্রাণিগণ যাতে জাগ্রত থাকে, আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ।

এই জগতের ধূলি পর্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে; কারণ, কবিরা বলে থাকেন, জগৎটা হচ্ছে একটা পুষ্পাচ্ছাদিত শব মাত্র। তাকে স্পর্শ কর না। তোমরা হোমা পাখীর বাচ্চা—এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বলস্বরূপ জগৎ স্পর্শ করবার পূর্বেই তোমরা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

'যে আছ চেতন ঘুমায়ো না আর!'

'জগতের লোকের ভালবাসার অনেক বস্তু আছে—তারা সেগুলি ভালবাসুক; আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভু। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদের ছবি আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূতকিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুশী তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদ মাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—প্রিয়তম, আর কিছুই নন।'

'তাঁর কত শক্তি, কত গুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে, তাই বা কে জানতে চায়? আমরা চিরদিনের জন্য বলে রাখছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভালবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিতে চাই।'

'হে দার্শনিক! তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ, তাঁর ঐশ্বর্যের কথা—তাঁর গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ, তুমি জান না, তাঁর অধরের একটি মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বের হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ও-সব বাজে জিনিষ পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পার কি?'

'মূর্খ, তুমি কার সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ? আমি আমার গলার হার নিয়ে বকলসের মত তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান। ঐ হার—প্রেমের হার, ঐ সূত্র—প্রেমের জমাটবাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ, তুমি তো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ, তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জান না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে, যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন, তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুর-ধ্বনির তালে তালে নাচতেন?'

এই যে পাগলের মত যা-তা লিখলাম, তার জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার ব্যর্থপ্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জনা করবে—এ কেবল প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার জিনিষ। সদা আমার আশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ১০১-১১০

১০১*

[জনৈক মান্দ্রাজী শিষ্যকে লিখিত]

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
২৮ জুন, ১৮৯৪

প্রিয়—,

সেদিন মহীশূর থেকে জি. জি—র এক পত্র পেলাম। দুঃখের বিষয় জি. জি আমাকে সর্বজ্ঞ মনে করে; তা না হলে সে চিঠির মাথায় তার অদ্ভুত কানাড়া ঠিকানাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখত। তারপর—চিকাগো ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমাকে চিঠি পাঠানো বড্ড ভুল। অবশ্য গোড়ায় আমারই ভুল হয়েছিল—আমারই ভাবা উচিত ছিল, আমার বন্ধুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা—তাঁরা তো আমার চিঠির মাথায় একটা ঠিকানা দেখলেই যেখানে খুশী আমার নামে চিঠি পাঠাচ্ছেন। আমাদের মান্দ্রাজ-বৃহস্পতিদের বল, তারা তো বেশ ভাল করেই জানত যে, তাদের চিঠি পৌঁছবার পূর্বেই হয়তো আমি সেখান থেকে এক হাজার মাইল দূরে চলে গেছি, কারণ আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিকাগোয় আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়ী হচ্ছে আমার প্রধান আড্ডা। এখানে আমার কাজের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বললেই হয়। কারণ—যদিও প্রসারের খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে সে আশা একেবারে নির্মূল হয়েছেঃ

ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মান্দ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি করছে, কিন্তু সে তো—তুমি জেনেছ আর আমি জানছি, কারণ আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ-ইঞ্চি কাগজের টুকরো ছাড়া আমি একখানা ভারতীয় খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে, তা দেখিনি। অন্যদিকে ভারতের খ্রীষ্টানরা যা কিছু বলছে, মিশনরীরা তা খুব সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমেই সিদ্ধ হয়েছে, যেহেতু ভারত থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বলছে না। ভারতের হিন্দু পত্রিকাগুলো আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করতে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছয়নি। তার জন্য এদেশের অনেকে মনে করছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে তো মিশনরীরা আমার পিছু লেগেছে, তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মান্দ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জন্য ধর্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল, কারণ তারা তো ছোকরা বৈ আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্ত কালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা তো গুটিকতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাজের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি, আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শনপত্র থাকা দরকার, তা না হলে মিশনরী ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে—আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ করব? মনে করেছিলাম, গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। মনে করেছিলাম, মান্দ্রাজে ও কলিকাতায় কয়েকজন ভদ্রলোক জড়ো করে এক-একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করবার জন্য ধন্যবাদ সহ প্রস্তাব পাস করিয়ে, সেই প্রস্তাবটা দস্তুরমত নিয়মানুযায়ী অর্থাৎ সেই সভার সেক্রেটারীকে দিয়ে, আমেরিকায় ডাঃ ব্যারোজের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে তথাকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা। ঐরূপ বষ্টন, নিউ ইয়র্ক ও চিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠানো বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখছি, ভারতের পক্ষে এই কাজটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন, এক বছরের ভেতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলে না, আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে। তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুশী বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দু-মাসেরও উপর হল আলাসিঙ্গাকে আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্যন্ত দিলে না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সুতরাং তোমায় বলছি, আগে এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখ, তারপর মান্দ্রাজীদের এই চিঠি দেখিও। এদিকে আমার গুরুভাইরা ছেলেমানুষের মত কেশব সেন সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বলছে, আর মান্দ্রাজীরা থিওসফিষ্টদের সম্বন্ধে আমি চিঠিতে যা কিছু লিখছি, তাই তাদের বলছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্মমহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক জুটে যাবে। এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে। মোটের ওপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনদের দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কাজ করতে পারি। যাই হোক, আমাকে কর্ম করে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় করতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বলতে হয়, তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাকবে। সমগ্র আমেরিকায় বিগত আদমসুমারিতে থিওসফিষ্টদের সংখ্যা সর্বসুদ্ধ মাত্র ৬২৫ জন—তাদের সঙ্গে মিশলে আমার সাহায্য হওয়া দূরে থাক, মুহূর্তের মধ্যে আমার কাজ চুরমার হয়ে যাবে। আলাসিঙ্গা বলছে, লণ্ডনে গিয়ে মিঃ ওল্ডের সঙ্গে দেখা করতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ও কি বাজে আহাম্মকের মত বকছে! বালক—ওরা কি বলছে, তা নিজেরাই বোঝে

না। আর এই মান্দ্রাজী খোকার দল—নিজেদের ভেতর একটা বিষয়ও গোপন রাখতে পারে না!! সারাদিন বাজে বকা আর যেই কাজের সময় এল, অমনি আর কারও পাত্তা পাবার যো নেই!!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড়ো করে, কয়েকটা সভা করে আমার সাহায্যের জন্য গোটাকতক ফাঁকা কথা পাঠাতে পারলে না—তারা আবার সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেব বলে লম্বা কথা কয়!

আমি তোমাকে ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম বিশ ডলার—বড় সুন্দর চলে। এই ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কাজ হয়, তারপর যে-কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হল।

বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক—যা আসুক অবনত মস্তকে স্বীকার করছি। যাই হোক, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মান্দ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে, আমি ততটা পাবারও উপযুক্ত ছিলাম না; আর তাদের ক্ষমতায় যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী তারা করেছে। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল—ক্ষণকালের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমরা হিন্দুরা এখনও মানুষ হয়নি—ক্ষণকালের জন্য আত্মনির্ভরতা হারিয়ে হিন্দুদের উপর নির্ভর করেছিলাম—তাতেই এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্তে আমি আশা করেছিলাম, ভারত থেকে কিছু আসবে, কিন্তু কিছুই এল না। বিশেষতঃ গত দুমাস প্রতি মুহূর্তে আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত এল না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে লাগল, কিছুই এল না—একটা আওয়াজ পর্যন্ত এল না; কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল, অনেকে আমায় ত্যাগ করলে। কিন্তু এ আমার মানুষের উপর—পশুধর্মী মানুষের উপর নির্ভর করার শাস্তি, আমার স্বদেশবাসীরা এখনও মানুষ হয়নি। তারা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথামাত্র কয়ে সাহায্য করবার যখন সময় আসে, তখন তাদের আর টিকি দেখতে পাবার যো নাই। মান্দ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্তকালের জন্য ধন্যবাদ—প্রভু তাদের সদাসর্বদা আশীর্বাদ করুন। কোন ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিকাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র—তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না। কেন? এখানে খেতে পরতে পাচ্ছি, অনেকে সহৃদয় ব্যবহার করছেন, আর দু-দশটা ভাল কথা বলেই এই সব পাচ্ছি! এমন উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন অনন্ত যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগাদের দেশে কি করতে যাব? অতএব আবার বলি—বিদায়। এই পত্রখানি একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার। মান্দ্রাজীরা, এমন কি আলাসিঙ্গা পর্যন্ত, যার ওপর আমি এতটা আশা করেছিলাম—বড় সুবিবেচনার কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত'
৫৪
খানকতক চিকাগোয় পাঠাতে পার? কলিকাতায় অনেক আছে। আমার ঠিকানা ৫৪১ নং ডিয়ারবর্ন এভিনিউ (ষ্ট্রীট নহে), চিকাগো, অথবা C/o টমাস কুক, চিকাগো, ভুলো না যেন। অন্য কোন ঠিকানা দিলে অনেক দেরী ও গোলমাল হবে, কারণ আমি এখন ক্রমাগত ঘুরছি আর চিকাগোই আমার প্রধান আড্ডা; কিন্তু এই বুদ্ধিটুকুও আমার মান্দ্রাজী বন্ধুদের মাথায় ঢোকেনি। অনুগ্রহপূর্বক জি. জি., আলাসিঙ্গা, সেক্রেটারী ও আর আর সকলকে আমার অনন্তকালের জন্য আশীর্বাদ জানাবে—আমি সর্বদা তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তাদের উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি—আমি নিজেরই প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে এই একবার অপরের সাহায্যে নির্ভর করা-রূপ ভয়ানক ভুল করেছি; আর তার শাস্তিভোগও করেছি। এ আমারই দোষ, তাদের কিছু দোষ নেই। প্রভু মান্দ্রাজীদের আশীর্বাদ করুন—তাদের হৃদয়টা বাঙালীদের চেয়ে অনেক উন্নত। বাঙালীরা কেবল বাক্যসার—তাদের হৃদয় নেই, তারা অসার। বিদায়, বিদায়, আমি এখন সমুদ্রবক্ষে আমার তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক। কঠোর সমালোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। বাস্তবিক তো আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই। আমার যতটা পাবার অধিকার, তোমরা তার চেয়ে অনন্তগুণ আমার জন্য করেছ। আমার যেরূপ কর্ম, আমি তেমনই ফল পাব, আর যা ঘটুক আমাকে চুপটি করে মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—আমার বোধ হয় আলাসিঙ্গার কলেজ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি তার কোন খবর পাইনি, আর সে আমাকে তার বাড়ীর ঠিকানাও দেয়নি।

ইতি বি

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কিডি সরে পড়েছে।

১০২

[মঠের সকল গুরুভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৪ [গ্রীষ্মকাল]

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমাদের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। বলরামবাবুর স্ত্রীর শোকসংবাদে দুঃখিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা। এ কার্যক্ষেত্র—ভোগক্ষেত্র নহে, সকলেই কাজ ফুরুলে ঘরে ফিরবে—কেউ আগে কেউ পাছে। ফকির গেছে, প্রভুর ইচ্ছা।

মহোৎসব বড়ই ধুমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই ভাল। তবে একটি কথা—মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্যে নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে—এই তো পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়, আমি কোন খাতিরে আনি না, তবে তাঁর উপদেশ জীবন শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় শশীর ঐ ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all (সর্বস্ব) করে সেই পুরানো ফ্যাশনের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (ঝোঁক) শশীর ভিতর আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি শশী ও নিরঞ্জন কেন ঐ পুরানো ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit (অন্তরাত্মা) চায় work (কাজ), কোন outlet (বাহির হবার পথ) নেই, তাই ঘণ্টা নেড়ে energy (শক্তি) খরচ করে।

শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করিতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণ বাবু, তারক-দা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে—কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া?

তারক-দার কথা মান্দ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা তাঁর উপর বড়ই প্রীত। তারক-দা, তুমি যদি কিছুদিন মান্দ্রাজে গিয়ে থাক, তাহলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাজটা বরানগরে শুরু করে যাও। যোগীন-মা, গোলাপ-মা কতকগুলি বিধবা চেলা বানাতে পারে না কি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে-সাদ্যি দিতে পার না কি? তারপর তাদের ঘরে ঘরে 'রামকৃষ্ণ' ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার না কি? ...

উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গপ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য করিতে হইবেক। দেখি বাঙালীর ধর্ম কতদূর গড়ায়। নিরঞ্জন লিখছে যে লাটুর গরম কাপড় চাই। এরা গরম কাপড় ইওরোপ আর ইণ্ডিয়া থেকে আনায়। যে দামে এখানে গরম কাপড় কিনব, তার সিকি দামে সেই কাপড় কলিকাতায় মিলবে। লাটুর আক্ষেপ শীঘ্রই দূর করিব। কবে ইওরোপ যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত—এদেশে এক রকম চলছে, এই পর্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরমি, আর এখন এলাহাবাদের মাঘ মাসের শীত!! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্তন! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব! নিউ ইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত রোজ ঘরভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইওরোপেও এমন নাই—এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির মত খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি, আমি প্রায়ই এদের বড় বড় লোকের অতিথি—আমি এদের একজন নামজাদা মানুষ এখন। মুলুকসুদ্ধ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। মিঃ হেল, যাঁর বাড়ীতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তার স্ত্রীকে আমি 'মা' বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে 'দাদা' বলে; এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি তো আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের! যদি খবর পেলে যে, একজন গরীব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়েমদ্দে চলল—তাকে খাবার, কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে! আর আমরা কি করি!

এরা গরমিকালে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোন জায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল—যেমন ইংরেজদের দেখছ, তেমনি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগ্‌গি, সে দামে ৫ গুণ সেই জিনিষ কলিকাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয়—কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড়-চোপড় বানায় না—এরা যন্ত্র-আওজার আর গম, চাল, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, নেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল ক্যালিফোর্নিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই।

এক রকম শাক আছে, Spinach—যা রাঁধলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে, আর যেগুলোকে এরা Asparagus (এস্পারেগাস) বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে 'গোপালের মার চচ্চড়ি' নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোন দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাঁউরুটি আছেন, হর-রঙের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা (cream)—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখন তো আছেন, আর বরফ-জল—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দি কি জ্বর—এন্তের

৫৫

বরফ-জল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দিতে বরফ-জল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুলপি এন্তের নানা আকারের।

নায়াগারা falls (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায় ৭।৮ বার তো দেখলুম। খুব grand (উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে Aurora Borealis
৫৬
হয়েছিল। আর কিছুই লেখবার মত খুঁজে পাচ্ছি না। এ-সব চিঠি বাজার কর না।

মা-ঠাকুরাণীর খরচপত্র কেমন চলছে, তোমরা তা তো কিছুই লেখ নাই। খালি childish prattle (আবোলতাবোল)!! ও-সকল জানবার আমার এ জন্মে বড় একটা সময় নাই, next time-এ (আগামী বারে) দেখা যাবে।

যোগেন বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে। সারদার ঘুরঘুরে রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা power of organisation (সঙ্ঘ চালাবার শক্তি) চাই—বুঝেছ? তোমাদের ভিতর কারুর মাথায় ততটুকু ঘি আছে কি? যদি থাকে তো বুদ্ধি খেলাও দিকি—তারক দাদা, শরৎ, হরি—এরা পারবে। শশীর originality (মৌলিকতা) ভারী কম, তবে খুব good workman, perservering (ভাল কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, শশী খুব executive (কাজের লোক), বাদবাকী—এরা যা বলে, তাই শুনে চলো। কতকগুলো চেলা চাই—fiery young men (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে? Intelligent and brave (বুদ্ধিমান্ ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে-মদ্দ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

তোমাদের আক্কেল বুদ্ধি এক পয়সাও নাই। Indian Mirrorকে 'পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বলতেন, তেন বলতেন' কেন বলতে গেলে? আর আজগুবি ফাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought-reading (পরের মনের কথা বলতে পারা) আর nonsense (বাজে) আজগুবি! দু-পয়সার brain (মস্তিষ্ক)-গুলো! ঘৃণা হয়ে যায়! তোদের নিজের বুদ্ধি বড় একটা খেলাতে হবে না—সাদা বাঙলা কয়ে যা দিকি।

বাবুরামের লম্বা পত্র পড়লাম। বুড়ো বেঁচে আছে—বেশ কথা! তোমাদের আড্ডাটা নাকি বড় malarious (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত)—রাখাল আর হরি লিখছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ লাট্টিবৎ ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে। বাবুরাম অনেক delirium (প্রলাপ) বকেছে। সাণ্ডেল আনাগোনা করছে, বেশ বেশ। গুপ্তকে তোমরা চিঠিপত্র লেখ—আমার ভালবাসা জানিও ও যত্ন কর। সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেক্চার (বক্তৃতা) তো কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছি। বাকী সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক্ হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো, তোর পেটে এতও ছিল!!' এরা সব বলে, পুঁথি লেখ; একটা এইবার লিখতে ফিকতে হবে দেখছি। ঐ তো মুশকিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হাঙ্গাম করে বাবা!

কোন চিঠি বাজার গুজব করিসনি, খবরদার! চ্যাঙড়ামো নাকি? যা করতে বলছি পার তো কর, না পার তো মিছে ফেচাং কর না। তোমাদের বাড়ীতে কটা ঘর আছে, কেমন করে চলছে, রাঁধুনী-ফাঁধুনী আছে কিনা—সব লিখবে। মা ঠাকুরাণীকে আমার বহুত বহুত সাষ্টাঙ্গ দিবে। তারকদাদা আর শরতের বুদ্ধি নিয়ে যে কাজটা করতে বলেছি—করবার চেষ্টা করবে—দেখব কেমন বাহাদুর। এইটুকু যদি না করতে পার তাহলে তোমাদের ওপর হতে আমার সব বিশ্বাস আর ভরসা চলে যাবে। মিছামিছি কর্তাভজার দল বাঁধতে আমার ইচ্ছা নাই—I will wash my hands off you for ever (তোমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আমি আর রাখব না)।

সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাষ্টার, রামবাবু করুন গে। তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। তাই যদি পার তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার করে খাওগে। মিছে eating the begging bread of idleness is of no use (অনায়াসলব্ধ ভিক্ষান্ন খাওয়া নিরর্থক) বুঝলে বাপু? কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ্দ—বুঝলে? গৌর-মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে-কোন রকমে হোক)। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা কর। গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থুল বাঁধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মারো দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মায়ে মেয়ে-মদ্দ, যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা spriritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরক পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে, বাকী যে তা না পার—তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়।

এই চিঠি তোমরা পড়বে—যোগেন-মা, গোলাপ-মা সকলকে শুনাবে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজী, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাত হয়ে যাক, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়ে-মদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য—আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংড়ামি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—Onward, এই কথাটি খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে। চিঠি বাজার কর না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী—তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকী তিনি নিজে বলুন গে।

ইতি নরেন্দ্র

পুঃ—একটা বড় খাতা রাখবে এবং তাহাতে যখন যে স্থান হইতে কোন পত্র আসে তাহার একটা চুম্বক লিখিয়া রাখিবে। তাহা হইলে উত্তর দিবার বেলায় ভুলচুক হইবে না। Organisation (সঙ্ঘ) শব্দের অর্থ division of labour (শ্রমবিভাগ)—প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হয়। ...

বিশেষ অনুধাবন করে যা যা লিখলাম তা করিবে। আমার কবিতা
৫৭
কপি করে রেখো, পরে আরও পাঠাব।

১০৩*

[মিসেস হেলকে লিখিত]

C/o. ডাঃ ই. গার্নসি
Fishkill Landing, N. Y.
জুলাই, ১৮৯৪

মা,

কাল এখানে এসেছি। কয়েক দিন থাকব। নিউ ইয়র্কে আপনার এক পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু 'ইণ্টিরিয়র' পাইনি। তাতে খুশীই হয়েছি; কারণ আমি এখনও নিখুঁত হইনি; আর প্রেসবিটেরিয়ন ধর্মযাজকদের—বিশেষতঃ 'ইণ্টিরিয়র'দের—আমার প্রতি যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা আছে, তা জেনে পাছে এই 'প্রেমিক' খ্রীষ্টান মহোদয়গণের উপর আমার বিদ্বেষ উদ্বুদ্ধ হয়, এই জন্য তফাতেই থাকতে চাই। আমাদের ধর্মের শিক্ষা—ক্রোধ সঙ্গত (সমর্থনযোগ্য) হলেও মহাপাপ। নিজ নিজ ধর্মই অনুসরণীয়। 'সাধারণ' ও 'ধর্মসংক্রান্ত' ভেদে ক্রোধ, হত্যা, অপবাদ প্রভৃতির মধ্যে কোন তফাত করতে পারি না—শত চেষ্টা সত্ত্বেও। এই সূক্ষ্ম নৈতিক পার্থক্যবোধ যেন আমার স্বজাতীয়গণের মধ্যে কখনও প্রবেশ না করে। ঠাট্টা থাক, শুনুন মাদার চার্চ, আপনাকে বলছি—এরা যে কপট, ভণ্ড, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপ্রিয়—তা বেশ স্পষ্ট দেখে আমি এদের উন্মত্ত আস্ফালন মোটেই গ্রাহ্য করি না।

এইবার ছবির কথা বলিঃ প্রথমে মেয়েরা কয়েকটি আনে, পরে আপনি কয়েক কপি আনেন। আপনি তো জানেন মোট ৫০ কপি দেবার কথা। এ বিষয়ে ভগিনী ইসাবেল আমার চেয়ে বেশী জানেন।

আপনি ও ফাদার পোপ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি জানবেন। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—গরম কেমন উপভোগ করেছেন? এখানকার তাপ আমার বেশ সহ্য হচ্ছে। সমুদ্রতীরে সোয়াম্‌স্কটে (Swampscot) যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এক অতি ধনী মহিলা; গত শীতে নিউ ইয়র্কে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ধন্যবাদ সহ প্রত্যাখান জানিয়েছি। এ দেশে কারও আতিথ্যগ্রহণ-বিষয়ে আমি এখন খুব সতর্ক—বিশেষ করে ধনী লোকের। খুব ধনবান্‌দের আরও কয়েকটি নিমন্ত্রণ আসে, সেগুলিও প্রত্যাখ্যান করেছি। এতদিনে এদের কার্যকলাপ বেশ বুঝলাম। আন্তরিকতার জন্য ভগবান্ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন; হায়, জগতে ইহা এতই বিরল!

আপনার স্নেহের
বি

১০৪*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
৯ জুলাই, ১৮৯৪

ভগিনীগণ,

জয় জগদম্বে! আমি আশারও অধিক পেয়েছি। মা আপন প্রচারককে মর্যাদায় অভিভূত করেছেন। তাঁর দয়া দেখে আমি শিশুর মত কাঁদছি। ভগিনীগণ! তাঁর দাসকে তিনি কখনও ত্যাগ করেন না। আমি যে চিঠিখানি তোমাদের পাঠিয়েছি, তা দেখলে সবই বুঝতে পারবে। আমেরিকার লোকেরা শীঘ্রই ছাপা কাগজগুলি পাবে। পত্র যাঁদের নাম আছে, তাঁরা আমাদের দেশের সেরা লোক। সভাপতি ছিলেন কলিকাতার এক অভিজাতশ্রেষ্ঠ, অপর ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। তাঁর এই মর্যাদা গভর্ণমেণ্টেরও অনুমোদিত। ভগিনীগণ! আমি কি পাষণ্ড! তাঁর এত দয়া প্রত্যক্ষ করেও মাঝে মাঝে বিশ্বাস প্রায় হারিয়ে ফেলি। সর্বদা তিনি রক্ষা করছেন দেখেও মন কখনও কখনও বিষাদগ্রস্ত হয়। ভগিনীগণ! ভগবান্ একজন আছেন জানবে, তিনি পিতা, তিনি মাতা; তাঁর সন্তানদের তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না—না, না, না। নানা রকম বিকৃত মতবাদ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সরল শিশুর মত তাঁর শরণাগত হও। আমি আর লিখতে পারছি না, মেয়েদের মত কাঁদছি।

জয় প্রভু, জয় ভগবান্!

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

৯৫*

U. S. A
১১ জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ৫৪১ নং ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো ছাড়া আর কোন ঠিকানায় আমায় পত্র লিখো না। তোমার শেষ চিঠিখানা সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পোঁছেছে—আর পত্রটা যে শেষে পৌঁছল, মারা গেল না, তার কারণ এখানে আমার কথা সকলে বেশ ভালরকম জানে। সভার খানকতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করবে। মিশনরীরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে, আমি কারও প্রতিনিধি নই—ঐতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কি করে কাজ করতে হয়, শেখো। এইভাবে দস্তুরমত প্রণালীতে কাজ করতে পারলে আমরা খুব বড় বড় কাজ করতে নিশ্চিতই সমর্থ হব। গত বছর আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর ফসল কাটতে চাই। ইতোমধ্যে ভারতে যতটা সম্ভব আন্দোলন চালাও। কিডি নিজের ভাবে চলুক—সে ঠিক পথে দাঁড়াবে। আমি তার ভার নিয়েছি—সে নিজের মতে চলুক, এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাবে। পত্রিকাখানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাব। বষ্টনের হার্ভার্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট (Wright)-কে একখানা প্রস্তাব পাঠাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্র লিখে এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবে যে, তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকায় আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছিলেন, আর তাঁকেও ঐটি কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করবে; তা হলে মিশনরীদের (আমি যে কারু প্রতিনিধি হয়ে আসিনি) এ কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ডেট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০৲ টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০৲ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানী আমায় ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা—হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার। আসছে বছরে আবার আমায় অনেক জিনিষ ছাপাতে হবে।

আমি এইবার নিয়মিতভাবে কাজ করব মনে করছি। কলিকাতায় লেখ, তারা আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়, তোমরাও মান্দ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও। কেবল ইচ্ছাশক্তিতেই সব হবে। কাগজ ছাপানো ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা করব। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের একটা সমিতি স্থাপন করতে হবে—তার নিয়মিত অধিবেশন হওয়া চাই, আর আমাকে যত পার, সব খবরাখবর লিখবে। আমিও যাতে নিয়মিতভাবে কাজ করতে পারি, তার চেষ্টা করছি। এই বছরে অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে আমি অনেক টাকা পাব—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতোমধ্যে তোমরা এগিয়ে চল। তোমরা পল কেরসকে (Dr. Paul Carus) একখানা পত্র লিখো, আর যদিও তিনি আমার বন্ধুই আছেন, তথাপি তোমরা তাঁকে আমাদের জন্য কাজ করবার অনুরোধ কর। মোট কথা যতদূর পার আন্দোলন চালাও—কেবল সত্যের অপলাপ না হয়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখো। বৎসগণ, কাজে লাগো—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠবে। মিসেস হেল (Mrs. G. W. Hale) আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁকে 'মা' বলি এবং তাঁর কন্যাদের 'ভগিনী' বলি। তাঁকেও একখানা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিও—আর একখানা পত্র লিখে তোমাদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নাই, এটা যাতে আসে—তার চেষ্টা করতে হবে। এটি করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে—সর্বদাই যাতে মিলে মিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এটাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সমগ্র রহস্য। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর। জীবন তো ক্ষণস্থায়ী—একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনটা সমর্পণ কর।

তুমি নরসিংহ সম্বন্ধে কিছু লেখনি কেন? সে এক রকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম, তারপর সে কোথায় যে চলে গেল, কিছু জানি না; সে আমায় কিছু লেখে না। অক্ষয় ভাল ছেলে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। থিওসফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করবার আবশ্যক নেই। আমি যা কিছু লিখি, তাদের কাছে গিয়ে সব বল না। আহাম্মক! থিওসফিষ্টরা আগে এসে আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—জান তো? জজ৫৮ হচ্ছেন হিন্দু আর কর্ণেল অলকট বৌদ্ধ। জজ এখানকার একজন খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন হিন্দু থিওসফিষ্টদের বল, তারা যেন জজকে সমর্থন করে। এমন কি, যদি তোমরা তাঁকে সমধর্মাবলম্বী বলে সম্বোধন করে এবং তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্মপ্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখতে পার, তাতে তাঁর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠবে। আমরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেব না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করব ও সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করব।

এটা স্মরণ রেখো যে, আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুতরাং '৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো' হচ্ছে আমার কেন্দ্র। সর্বদা ঐ ঠিকানাতেই পত্র দেবে, আর ভারতে যা কিছু হচ্ছে—সব খুঁটিনাটি আমাকে জানাবে আর কাগজে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু বার হচ্ছে, তার একটা টুকরো পর্যন্ত পাঠাতে ভুলো না। আমি জি. জি.-র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি। প্রভু এই বীরহৃদয় ও আদর্শচরিত্র বালকদের আশীর্বাদ করুন। বালাজী, সেক্রেটারী এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে। কাজ কর, কাজ কর—সকলকে তোমার ভালবাসার দ্বারা জয় কর। আমি মহীশূরের রাজাকে একখানা পত্র লিখেছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি। তোমাদের কাছে যে ফটো পাঠিয়েছি, তা নিশ্চয়ই এতদিনে পেয়েছ। একখানা রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভেতর যতটা ভাব ঢোকাতে পার, চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্বদা পত্রব্যবহার রাখবে। বিস্তারের চেষ্টা কর। মনে রেখো, জীবনের একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে গতি ও উন্নতি। আমি তোমার চিঠি আসতে বিলম্ব দেখে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম—এখন দেখছি, তোমার আহাম্মকিতেই এত দেরী হয়েছে। বুঝতে পারছ তো, আমি ক্রমাগত ঘুরছি আর চিঠি-বেচারাকে ক্রমাগত নানাস্থান খুঁজে তবে আমাকে বার করতে হয়। আরও তোমাদের এটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, সব কাজ দস্তুরমত নিয়ম-মাফিক করতে হবে। যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাস হয়েছে, সেগুলি ধর্মমহাসভার সভাপতি, চিকাগো, ডাঃ ব্যারোজ (Dr. J. H. Barrows)-কে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ করবে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।

ডাঃ ব্যারোজকে ও ডাঃ পল কেরসকে ঐগুলি ছাপার জন্য অনুরোধ-পত্রও যেন ঐরূপ সভার প্রতিনিধিস্থানীয় কারও কাছ থেকে যায়। বিশ্ব মহামেলার (ডেট্রয়েট, মিশিগান) সভাপতি, সেনেটার পামার (Palmer)-কে পাঠাবে—তিনি আমার প্রতি বড়ই সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন। মিসেস ব্যাগ্‌লি (J. J. Bagley)-কে ওয়াশিংটন এভিনিউ, ডেট্রয়েট, এই ঠিকানায় একখানা পাঠাবে, আর তাঁকে অনুরোধ করবে যে, সেটা যেন কাগজে প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে দেওয়া গৌণ—দস্তুর মাফিক পাঠানোই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটি একটি নিদর্শনরূপে গণ্য হবে। খবরের কাগজে অমনি অমনি কিছু বেরুলে সেটি নিদর্শনরূপে গণ্য হয় না। সব চেয়ে নিয়ম অনুযায়ী উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠানো ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ করতে অনুরোধ করা। আমি এসব কথা লিখছি, তার কারণ এই যে, আমার মনে হয়, তোমরা অন্য জাতের আদব-কায়দা জান না। যদি কলিকাতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এ রকম সব আসে, তাহলে আমেরিকানরা যাকে বলে 'boom', তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজুক মেচে যাবে) আর যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার

করবে। স্থিরভাবে লেগে থাকো—এ পর্যন্ত আমরা অদ্ভুত কার্য করেছি। হে বীরগণ, এগিয়ে যাও, আমরা নিশ্চয় জয়লাভ করব। মান্দ্রাজ থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল? সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সভাসমিতি স্থাপন করতে থাকো, কাজে লেগে যাও—এই একমাত্র উপায়। কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাকো, তাতেই তার মেজাজ ঠিক থাকবে। এ সময়টা বেশী বক্তৃতা করবার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখতে হবে। অবশ্য সর্বক্ষণই আমাকে কঠিন কার্যে নিযুক্ত থাকতে হবে, তারপর শীত ঋতু এলে লোকে যখন তাদের বাড়ী ফিরবে, তখন আবার বক্তৃতাদি শুরু করে এবার সভাসমিতি স্থাপন করতে থাকব। সকলকে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা। খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জ্বলে উঠবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। আমি কাকেও কখনও ভুলি না। তবে নেহাত অলস বলে সকলকে আলাদা আলাদা লিখতে পারি না। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

বি

পুঃ—তোমার ট্রিপ্লিকেনের ঠিকানা অথবা যদি কোন সভাসমিতি স্থাপন করে থাকো, তার ঠিকানা আমায় পাঠাবে।

বি

১০৬*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

সোয়াম্‌স্কট্
২৬ জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় খুকীরা
দেখো, আমার চিঠিগুলো যেন নিজেদের বাইরে না যায়। ভগিনী মেরীর এক সুন্দর পত্র পেয়েছি। দেখছ তো সমাজে আমি কি রকম বেড়ে চলেছি। এ সব ভগিনী জিনীর (Jeany) শিক্ষার ফলে। খেলা দৌড়ঝাঁপে সে ধুরন্ধর, মিনিটে ৫০০ হিসাবে ইতরভাষা ব্যবহারে দক্ষ, কথার তোড়ে অদ্বিতীয়, ধর্মের বড় ধার ধারে না, তবে ঐ যা একটু-আধটু। সে আজ বাড়ী গেল, আমি গ্রীনএকারে যাচ্ছি। মিসেস ব্রীডের কাছে গিয়েছিলাম, মিসেস স্টোন সেখানে ছিলেন। মিসেস পুলম্যান প্রভৃতি আমার এখানকার হোমরাচোমরা বন্ধুগণ মিসেস স্টোনের কাছে আছেন। তাঁদের সৌজন্য আগের মতই। গ্রীনএকার থেকে ফেরবার পথে কয়েক দিনের জন্য এনিসস্কোয়ামে যাব মিসেস ব্যাগলির সঙ্গে দেখা করবার জন্য। দূর ছাই, সব ভুলে যাই; সমুদ্রে স্নান করছি ডুবে ডুবে মাছের মত—বেশ লাগছে। 'প্রান্তর মাঝে' ... ('dans la plaine') ইত্যাদি কি ছাইভস্ম গানটি হ্যারিয়েট আমায় শিখিয়েছিল; জাহান্নমে যাক! এক ফরাসী পণ্ডিত আমার অদ্ভুত অনুবাদ শুনে হেসে কুটিপাটি। এইরকম করে তোমরা আমায় ফরাসী শিখিয়েছিলে, বেকুফের দল। তোমরা ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছ তো? বেশ হয়েছে, গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছ। আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন ভাবি তোমরা চার জনে গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা।

নিউ ইয়র্ক প্রদেশের কোন স্থানে মিস ফিলিপ্‌সের পাহাড় হ্রদ নদী জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর একটি স্থান আছে। আর কি চাই! আমি যাচ্ছি স্থানটিকে হিমালয়ে পরিণত করে সেখানে একটি মঠ খুলতে—নিশ্চয়ই। তর্জন গর্জন, লাথি ঝগড়ায় তোলপাড় এই আমেরিকায় ধর্মের মতভেদের আবর্তে আর একটি নূতন বিরোধের সৃষ্টি না করে এদেশ থেকে যাচ্ছি না।

ভ্রাতঃ, আপনার মত বলিষ্ঠ হৃদয় সহজে মেলে না। এটা একটা আজব জায়গা—আমাদের এই দুনিয়াটা। তবে এই দেশে যেখানে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, সামান্য 'পরিচয়পত্র'ও যেখানে আমার নেই, সেখানে এখানকার মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণে সহৃদয়তা পেয়েছি, তার জন্য সব জড়িয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত সব কিছু মঙ্গলমুখী।

হ্রদটির ক্ষণিক স্মৃতি কখনও কখনও তোমাদের মনে জাগে নিশ্চয়। দুপুরের গরমে ভাববে হ্রদের একেবারে নীচে তলিয়ে যাচ্ছ, যতক্ষণ না বেশ স্নিগ্ধ বোধ কর। তারপর সেই তলদেশে স্নিগ্ধতার মাঝে চুপ করে পড়ে থাকবে—তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে, কিন্তু নিদ্রাভিভূত হবে না—স্বপ্ন-বিজড়িত অর্ধচেতন অবস্থায়। ঐ যেমন আফিমের নেশায় হয়—অনেকটা সেই রকম। ভারী চমৎকার। তার উপর খুব বরফ-ঠাণ্ডা জলও খেতে থাকো। মাংসপেশীতে এক একবার এমন খিল ধরে যাতে হাতী পর্যন্ত কাবু হয়ে পড়বে; ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন। আর আমি ঠাণ্ডা জলে নাবচি না।

স্নেহের আধুনিকারা! তোমরা সকলে সুখী হও—সর্বদা এই প্রার্থনা করি।

১০৭*

[মিস মেরী ও মিস হ্যরিয়েট হেলকে লিখিত]

গ্রীনএকার ইন, ইলিয়ট, মেন
৩১ জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি অনেকদিন তোমাদের কোন পত্রাদি লিখিনি, লিখবারও বড় কিছু ছিল না। এটা একটা বড় সরাই ও খামার বাড়ী; এখানে ক্রিশ্চান সায়েণ্টিস্টরা
৫৯
তাদের সমিতির বৈঠক বসিয়েছে। যে মহিলাটির মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথমে আসে, তিনি গত বসন্তকালে নিউ ইয়র্কে আমাকে এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই এখানে এসেছি। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই, আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এখানে রয়েছেন। মিসেস মিল্‌স্‌ ও মিস স্টকহ্যামের কথা তোমাদের স্মরণ থাকতে পারে। তাঁরা এবং আর কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করছেন। তাঁরা খুব স্ফূর্তিতে আছেন এবং কখনও কখনও তাঁরা সকলেই সারাদিন, যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোষাক বল, তাই পরে থাকেন। বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বষ্টন থেকে মিঃ কলভিল নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। লোকে বলে, তিনি প্রত্যহ ভাবাবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা করে থাকেন—'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'-এর সম্পাদিকা, যিনি 'জিমি মিল্‌স্‌' প্রাসাদের উপর তলায় থাকতেন—এখানে এসে বসবাস করছেন। তিনি উপাসনা পরিচালনা করছেন আর মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল করবার শিক্ষা দিচ্ছেন—মনে হয়, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এই ধরনের নানা কর্ম সম্পাদন করবেন! মোট কথা, এই সম্মিলনটি এক অদ্ভুত রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস মিল্‌স্‌ বেশ প্রতিভাসম্পন্না, অন্যান্য অনেক মহিলাও তদ্রূপ। ... ডেট্রয়েটবাসিনী আর একটি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্তী একটি দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস আর্থার স্মিথ এখানে রয়েছেন। মিস গার্নসি সোয়াম্‌স্কট থেকে বাড়ী গেছেন। আমি এখান থেকে এনিস্কোয়াম যেতে পারি বোধ হয়।

এ স্থানটি সুন্দর ও মনোরম—এখানে স্নান করার ভারি সুবিধা। কোরা স্টকহ্যাম আমার জন্য একটি স্নানের পোষাক করে দিয়েছেন—আমিও ঠিক হাঁসের মত জলে নেমে স্নান করে মজা করছি—এমন কি জল-কাদায় যারা বাস করে (যেমন হাঁস-ব্যাঙ) তাদের পক্ষেও বেশ উপভোগ্য।

আর বেশী কিছু লেখবার পাচ্ছি না—আমি এখন এত ব্যস্ত যে, মাদার চার্চকে পৃথক্‌ভাবে লেখবার আমার সময় নেই। মিস হাউ-কে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

বষ্টনের মিঃ উড্‌ এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে 'হোয়ার্লপুল' মহোদয়ার
৬০
সম্প্রদায়ভুক্ত হতে তাঁর বিশেষ আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক আরও কত কি বিশেষণ দিয়ে নিজেকে একজন মনঃশক্তি-প্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তমমধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এইসব বক্তৃতা চলছিল, ঐ 'চিকিৎসার' চোটে সেটির এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে, সেটি মর্ত্যলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে, আর প্রায় দুশ' চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবে গদ্‌গদ হয়ে জমির চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করেছিল। মিল্‌স্‌ কোম্পানীর মিসেস ফিগ্‌স্‌ প্রত্যহ প্রাতে একটা করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস মিল্‌স্‌ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে দেখে ভারী খুশী হয়েছি, গত শীত-ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ করলে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে ওরা যে রকম স্বাধীনভাবে রয়েছে, শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে। তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা, একটু খেয়ালী—এই যা।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্যন্ত আছি—সুতরাং তোমরা যদি পত্র পাওয়া মাত্র জবাব দাও, তবে এখান থেকে চলে যাবার পূর্বেই পেতে পারি। এখানে একটি যুবক রোজ গান করে—সে পেশাদার; তার ভাবী পত্নী ও বোনের সঙ্গে এখানে আছে; ভাবী পত্নীটি বেশ গাইতে পারে, পরমা সুন্দরী। এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির সকলে একটা পাইন গাছের তলায় শুতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় হিন্দু ধরনে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছলাম—তারকাখচিত আকাশের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমি তো এই আনন্দের সবটুকু

উপভোগ করেছি।

এক বৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমাদের কি বলব! সরাইয়ে যারা রয়েছে তারা অল্পবিস্তর অবস্থাপন্ন, আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' করতে শেখাই, আর তারা তাই আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই কি সরল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাঁবুবাসীদের দরিদ্র করেছেন। শৌখীন বাবুরা ও শৌখীন মেয়েরা রয়েছেন হোটেলে; কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা দিয়ে বাঁধানো, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরী আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উল্টে পাল্টে ফেলছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায়, সেজন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হত। আমি এদের জুড়ি দেখতে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন। আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দর পল্লীনিবাসে বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্তও ভেব না—আমাকে তিনি দেখবেনই দেখবেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জানব, আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

'হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিষ দেয়—আমি গরীব—আমার আর কিছু নেই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া করে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চলবে না।' আমি তাই আমার সর্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি। একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরনের লোক, আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব' অর্থাৎ ভগবান্ যে রসস্বরূপ, তা একেবারে বোঝে না। তারা হয় জ্ঞানচচ্চড়ি অথবা ঝাড়ফুঁক করে রোগ আরাম করা, টেবিলে ভূত নাবানো, ডাইনী-বিদ্যা ইত্যাদির পিছনে ছোটে। এ দেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শোনা যায়, আর কোথাও তত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে, তত আর কোথাও নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা—হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ-আরামকারী শক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন। এরা আবার দিনরাত তোতা পাখীর মত 'প্রেম প্রেম প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে!

এবার তোমাদের সৎ কল্পনা এবং শুভ চিন্তার সামগ্রী খানিকটা দিচ্ছি। তোমরা সুশীলা ও উন্নতহৃদয়া। এদের মত চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে—জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্যরাজ্যের—সেই অনন্ত সৌন্দর্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাবভূমিতে বাস করবার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখনও খুঁজো না, ওগুলি পায়ের আঙুল দিয়েও যেন স্পর্শ কর না। তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয়সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক, বাকী যা কিছু অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি—তাদের যা হবার হোক গে।

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়; দিবারাত্র বল, 'তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।' ধন চলে যায়, সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়, জীবন দ্রুতগতিতে চলে যায়, শক্তি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই—তুমি যে জড় নও তার একমাত্র প্রমাণ।

ঈশ্বরে লেগে থাকো—দেহে বা অন্য কোথাও কি হচ্ছে, কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে, তখন বল, 'হে আমার ভগবান্, হে আমার প্রিয়'; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হতে থাকে, তখনও বল, 'হে আমার ভগবান্, হে আমার প্রিয়'; জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আসতে পারে তা এলেও বল, 'হে ভগবান্, হে আমার প্রিয়, তুমি এইখানেই রয়েছ, তোমাকে আমি দেখছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব করছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও, প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ কর না।' হীরার খনি ছেড়ে কাঁচখণ্ডের অন্বেষণে যেও না। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ খুঁজতে যাবে? তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক, তা হলে নিশ্চয়ই সেই পরম বস্তু লাভ করবে। সর্বদা আমার আশীর্বাদ জানবে।

বিবেকানন্দ

১০৮*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

গ্রীনএকার
১১ অগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

এ যাবৎ গ্রীনএকারেই আছি। জায়গাটি বেশ লাগল। সকলেই খুব সহৃদয়। কেনিলওয়ার্থের মিসেস প্র্যাট-নাম্নী চিকাগোবাসিনী মহিলা আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পাঁচশত ডলার দিতে চান। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমায় কিন্তু কথা দিতে হয়েছে যে, অর্থের প্রয়োজন হলেই তাঁকে জানাব। আশা করি, ভগবান্ আমাকে সেরূপ অবস্থায় ফেলবেন না। একমাত্র তাঁর সহায়তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। মায়ের বা তোমাদের কোন পত্র আমি পাইনি; কলিকাতা থেকে ফনোগ্রাফটির পৌঁছানো সংবাদও আসেনি।

আমার চিঠিতে যদি পীড়াদায়ক কোন কিছু থাকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যে, সেটা স্নেহের ভাব থেকেই লেখা হয়েছিল। তোমাদের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অনাবশ্যক। ভগবান্ তোমাদিগকে সুখী করুন। তাঁহার অশেষ আশীর্বাদ তোমাদের ও তোমাদের প্রিয়জনের উপর বর্ষিত হোক। তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট আমি চিরঋণী। তোমরা তো তা জানই এবং অনুভব কর। আমি কথায় তা প্রকাশ করতে অক্ষম। রবিবার বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি প্লিমাথে কর্ণেল হিগিনসনের ‘Sympathy of Religions’-এর অধিবেশনে। কোরা স্টকহ্যাম্ গাছতলায় আমাদের দলের ছবি তুলেছিলেন, তারই একটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এটা কিন্তু কাঁচা প্রতিলিপিমাত্র, আলোতে অস্পষ্ট হয়ে যাবে। এর চেয়ে ভাল এখন কিছু পাচ্ছি না। অনুগ্রহ করে মিস হাউকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানিও। আমার প্রতি তাঁর অশেষ দয়া। বর্তমানে আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হলে সানন্দে জানাব। মনে করছি, মাত্র দু-দিনের জন্য একবার প্লিমাথ থেকে ফিশকিলে যাব। সেখান থেকে তোমাদের আবার পত্র দেব। আশা করি—আশা করি কেন, জানিই তোমরা সুখে আছ, কারণ পবিত্র সজ্জন কখনও অসুখী হয় না। অল্প যে কয় সপ্তাহ এখানে থাকব, আশা করি আনন্দেই কাটবে। আগামী শরৎকালে নিউ ইয়র্কে থাকব। নিউ ইয়র্ক চমৎকার জায়গা। সেখানকার লোকের যে অধ্যবসায়, অন্যান্য নগরবাসিগণের মধ্যে তা দেখা যায় না। মিসেস পটার পামারের এক চিঠি পেয়েছি; অগষ্ট মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য লিখেছেন। মহিলাটি বেশ সহৃদয়, উদার ইত্যাদি। অধিক আর কি? ‘নৈতিক অনুশীলন সমিতি’র (Ethical Culture Society) সভাপতি নিউ ইয়র্কনিবাসী আমার বন্ধু ডাক্তার জেন্‌স্ এখানে রয়েছেন। তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে অবশ্য যাব। তাঁর সঙ্গে আমার মতের খুবই ঐক্য আছে। তোমরা চিরসুখী হও।

তোমাদের চিরশুভার্থী ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১০৯*

[মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

এনিস্কোয়াম্
২০ অগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,

তোমার অত্যন্ত সহৃদয় লিপিখানি এনিস্‌কোয়ামে আমার কাছে যথাসময়ে এসে পৌঁছেছে। আমি পুনরায় ব্যাগলিদের সঙ্গে আছি। তাঁরা যথারীতি সহৃদয়। অধ্যাপক রাইট এখানে ছিলেন না। তবে গত পরশু তিনি এসেছেন এবং একসঙ্গে আমাদের খুব ভাল কাটছে। এভানস্টনের মিঃ ব্রাডলি, যাঁর সঙ্গে তোমার এভানস্টনে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এখানে ছিলেন। কয়েকদিন বেশ নৌকাভ্রমণ করা গেছে এবং একদিন সন্ধ্যায় নৌকা উল্টিয়ে কাপড় জামা ও সবকিছু ভিজে একশেষ।

গ্রীনএকারে আমার চমৎকার কেটেছে। তাঁরা সকলেই নিষ্ঠাপরায়ণ ও সহৃদয়। ফ্যানি হার্টলি (Fanny Hartley) ও মিসেস মিল্‌স্ (Mrs. Mills) মনে হয় এতদিনে বাড়ী ফিরে গিয়েছেন।

ভাবছি এখান থেকে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাব, অথবা বষ্টনে মিসেস ওলি বুলের কাছেও যেতে পারি। সম্ভবতঃ তুমি এ দেশের বিখ্যাত বেহালা-বাদক মিঃ ওলি বুলের কথা শুনেছ। ইনি তাঁর বিধবা পত্নী। মহিলাটি খুবই ধর্মশীলা। তিনি কেম্ব্রিজে বাস করেন এবং ভারত থেকে আনা কারুকার্যময় কাঠ দিয়ে তৈরী একখানা সুন্দর বৈঠকখানা তাঁর আছে। তিনি চান আমি যে-কোন সময়ে তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর বৈঠকখানাটি বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করি। বষ্টন অবশ্য সব-কিছুর জন্যই একটি বৃহৎ ক্ষেত্র, কিন্তু বষ্টনের লোকেরা কোনকিছু যেমন তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করে, আবার তেমনি তৎপরতার সঙ্গে ত্যাগ করে। অন্য দিকে নিউ ইয়র্কবাসীরা একটু ঢিলে হলেও যখন তারা কোন জিনিষ ধরে, তখন খুব শক্ত করেই ধরে।

আমার স্বাস্থ্য বরাবর বেশ ভাল যাচ্ছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও যাবে। আমার সঞ্চয় থেকে খরচ করবার কোন কারণ এখনও ঘটেনি, তবু আমি বেশ ভালভাবেই কাটাচ্ছি। অর্থকরী সকল পরিকল্পনা আমি ত্যাগ করেছি, এখন শুধু এক-টুকরো খাদ্য

ও মাথার উপর একটু আচ্ছাদন পেলেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকব এবং কাজ করে যাব।

আশাকরি গ্রীষ্মাবাসে আনন্দ উপভোগ করছ। দয়া করে আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মিস হাউ (Miss Howe) এবং মিঃ ফ্র্যাঙ্ক হাউকে জানিও।

সম্ভবতঃ পূর্বের চিঠিতে তোমাকে বলা হয়নি যে, আমি কেমন করে গাছের নীচে ঘুমিয়েছি, থেকেছি এবং ধর্মপ্রচার করেছি এবং অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য আর একবার স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পেয়েছি।

খুব সম্ভবতঃ আগামী শীতে নিউ ইয়র্ককেই আমার কেন্দ্র করব; এবং তা স্থির করেই তোমাকে জানাব। এ দেশে আরও থাকার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করতে পারিনি। আমি এ সকল ব্যাপার স্থির করতে পারি না। সময়ের অপেক্ষায় থাকব। প্রভু তোমাদের সকলকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, এই হল তোমাদের সদা-স্নেহশীল ভ্রাতার নিরন্তর প্রার্থনা—

বিবেকানন্দ

১১০*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

এনিস্কোয়াম্
মিসেস ব্যাগলির বাটী
৩১ অগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,

মান্দ্রাজীদের পত্রখানি কালকের ‘বষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট্’ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তোমাকে এক কপি পাঠাবার ইচ্ছা আছে। চিকাগোর কোন কাগজে হয়তো দেখে থাকবে। কুক এণ্ড সঙ্গের অফিসে আমার চিঠিপত্র থাকবে। অন্ততঃ আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এখানে আছি, ঐদিন এখানে বক্তৃতা দেব।

দয়া করে কুকের অফিসে আমার পত্রাদি এসেছে কিনা সন্ধান নিও এবং এলে পর এখানে পাঠিয়ে দিও।

কিছুদিন হল তোমাদের কোন খবর পাইনি। মাদার চার্চকে কাল দুখানি ছবি পাঠিয়েছি। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে। ভারতবর্ষের চিঠিপত্রাদির জন্য আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন। সকলকে ভালবাসা।

তোমার চিরস্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুঃ—তোমরা কোথায় আছ, না জানায় আরও যা কিছু পাঠাবার আছে, তা পাঠাতে পারছি না।

বি

পত্রাবলী ১১১-১১৪

১১১*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
৩১ অগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র আমি 'বষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট'-এ মান্দ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখলাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছুই পৌছায়নি। যদি তোমরা ইতিপূর্বেই পাঠিয়ে থাকো, তবে শীঘ্রই পৌঁছবে। প্রিয় বৎস, এ পর্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম করেছ। কখনও কখনও একটু ঘাবড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে কর না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে ১৫,০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চলতে হয়েছে—এতে কখনও কখনও একটু ঘাবড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখে কাজ করে যাও। বোধ হয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছ, জি. জি.-র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। এমন করে ঠিকানাটা লিখেছিল যে, আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। তাইতে তার কাছে সাক্ষাৎভাবে জবাব দিতে পারিনি। তবে সে যা যা চেয়েছিল, আমি সব করেছি—আমার ফটোগ্রাফগুলি পাঠিয়েছি ও মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখেছি। আমি খেতড়ির রাজাকে একটা ফনোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র এখনও পাইনি। খবরটা নিও তো। আমি কুক এণ্ড সন্স, র‍্যামপার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় তা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র লিখো। ৮ই জুন তারিখে লেখা রাজার একখানা পত্র পেয়েছি। যদি ঐ তারিখের পর কিছু লিখে থাকেন, তা এখনও পাইনি।

আমার সম্বন্ধে ভারতের কাগজে যা কিছু বেরোবে সেই কাগজখানাই আমায় পাঠাবে। আমি কাগজটাতেই তা পড়তে চাই—বুঝলে? চারুচন্দ্রবাবু, যিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখবে। তাঁকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু—(চুপি চুপি বলছি) দুঃখের বিষয় তাঁর কথা আমার কিছু মনে পড়ছে না। তুমি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানাবে কি? থিওসফিষ্টরা এখন আমায় পছন্দ করছে বটে, কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা সর্বসুদ্ধ ৬৫০ জন মাত্র। তারপর ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্টরা আছেন, তাঁরা সকলেই আমায় পছন্দ করেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হবে। আমি উভয় দলের সঙ্গেই কাজ করি বটে, কিন্তু কারও দলে যোগ দিই না, আর ভগবৎকৃপায় উভয় দলকেই ঠিক পথে গড়ে তুলব, কারণ তারা কতকগুলো আধা-উপলব্ধ সত্য কপচাচ্ছে বৈ তো নয়।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছবার পূর্বেই আশা করি নরসিংহ টাকাকড়ি ইত্যাদি সব পাবে।

আমি 'ক্যাটের' কাছ থেকে এক পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একখানা বই লিখতে হয়, সুতরাং তোমার এই পত্রের মধ্যেই তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, আর তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বলছি যে, আমাদের উভয়ের মতামত বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না—সে একটা বিষয় একভাবে দেখছে, আমি না হয় আর একভাবে দেখছি, এই এক জিনিষকে বিভিন্নভাবে দেখা স্বীকার করে নিলেই তো আমাদের উভয়ের ভাবের এক রকম সমন্বয় হল। সুতরাং বিশ্বাস সে যাই করুক, তাতে কিছু এসে যায় না—কাজ করুক।

বালাজী, জি. জি., কিডি, ডাক্তার ও আমাদের সব বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে, আর যে-সকল স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা তাঁদের দেশের জন্য মতবিভিন্নতা গ্রাহ্য না করে সাহসের ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদেরও আমার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা জানাবে।

একটি ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কমপক্ষে কত খরচা পড়ে, হিসেব করে আমায় জানাবে, আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানা জানাবে। আমি তা হলে তার জন্যে টাকা পাঠাব—শুধু তাই নয়, আমেরিকার আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা করব। কলিকাতায়ও ঐ রকম করতে বল। আমাকে ব—র ঠিকানা পাঠাবে। সে বেশ ভাল ও মহৎ লোক। সে আমাদের সঙ্গে মিশে বেশ সুন্দর কাজ করবে।

তোমাকে সমস্ত জিনিষটার ভার নিতে হবে, সর্দার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝলে? এতটুকু কর্তৃত্বের ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠবে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে। যে যা বলে, তাইতে সায় দিয়ে যাও; কেবল চেষ্টা কর—আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড়ো করে রাখতে। বুঝলে? আর আস্তে আস্তে কাজ করে তার উন্নতির চেষ্টা কর। জি.জি. ও অন্যান্য যাদের এখনই রোজগার করবার প্রয়োজন নেই, তারা এখন যেমন করছে তেমনি করে যাক অর্থাৎ চারিদিকে ভাব ছড়াক। জি.জি. মহীশূরে বেশ কাজ করছে। এই রকমই তো করতে হবে। মহীশূর কালে আমাদের একটা বড় আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন আমার ভাবগুলি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করব ভাবছি—তারপর আগামী শীতে সারা দেশটা ঘুরে সমিতি স্থাপন করব। এ একটা মস্ত কার্যক্ষেত্র, আর এখানে যত কাজ হতে থাকবে, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্যন্ত বেশ কাজ করেছ। প্রভু তোমাদের ভেতর সব শক্তি দিবেন।

আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কাজ আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বের করে দাও এবং আর আর আনুষঙ্গিক বা আবশ্যক, তার তোড়জোড় কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের ভেতর গোপন রেখো; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মান্দ্রাজে একটা মন্দির করবার জন্য মহীশূর ও অন্যান্য স্থান থেকে টাকা তোলবার চেষ্টা কর—তাতে একটা পুস্তকালয় থাকবে, অফিস ও ধর্মপ্রচারকদের অর্থাৎ যদি কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী এসে পড়ে, তাদের জন্য কয়েকটা ঘর থাকবে। এইরূপে আমরা ধীরে ধীরে কাজে অগ্রসর হব।

সদা স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুঃ—তুমি তো জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুশকিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের দিকটা এবং টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করবার জন্য তোমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে। এখানে আমার যে-সব বন্ধু আছেন, তাঁরাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে থাকেন—বুঝলে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার করতে পার, ততই তোমাদের ও আমার—উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটি শীগগির করে ফেলে আমাকে লেখো। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র+বুদ্ধ') 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে 'ভারত' জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে। যাই হোক, আমাদের সকল বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ কর—তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন।

মঠে আমার গুরুভাইদেরও এইরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজকর্ম করতে বলবে, তবে টাকাকড়ির কাজ সব তোমাকেই করতে হবে। তাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা টাকাকড়ি ঘাঁটা পছন্দ করবেন না। আলাসিঙ্গা, জেনে রেখো ভবিষ্যতে তোমায় অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড়লোককে ধরে তাদের রাজী করিয়ে সমিতির কর্মকর্তারূপে তাদের নাম প্রকাশ করবে। আসল কাজ করতে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কাজ হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাজকর্ম খুব বেশী থাকে এবং তার দরুন যদি এ-সব করবার তোমার সময় না থাকে, তবে জি. জি. সমিতির এই বৈষয়িক দিকটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাজের ওপর তোমায় নির্ভর না করতে হয়, তার চেষ্টা করব। তা হলে তুমি নিজে উপোস না করে আর পরিবারদের উপোস না করিয়ে সর্বান্তঃকরণে এই কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। কাজে লাগো, বৎস, কাজে লাগো। কাজের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কাজ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে। আর তোমরা যদি কোনরকমে কাজটা চালিয়ে যেতে পার, তাহলে আমি ভারতে ফিরে গেলে কাজের দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ কর। যখন মনে নিরাশ ভাব আসবে, তখন ভেবে দেখো, এক বছরের ভেতর কত কাজ হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশায় চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিষ আশা করছে। নির্বোধ মিশনরীরা, ম— ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না। তোমাদের কি মন মুখ এক হয়েছে? তোমরা কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার? তোমাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তো? যদি এইগুলি তোমাদের থাকে, তবে তোমাদের কোন কিছুকে—এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করবার দরকার নেই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ। সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে—ইন্দ্রজাল, মূক অভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্মকথায়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমময় উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্বিপাকের মধ্যে দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেও না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ কর।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

১১২*

[মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গকে

৬১

লিখিত]

বেল ভিউ হোটেল, বষ্টন
১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

অভিন্নহৃদয়েষু,
তুমি কিছু মনে করিও না, গুরু হিসাবে তোমাকে উপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে বলিয়াই আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, তুমি নিজের ব্যবহারের জন্য কিছু বস্ত্রাদি অবশ্য ক্রয় করিবে, কারণ এগুলির অভাব এদেশে কোন কাজ করার পক্ষে তোমার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। একবার কাজ শুরু হইয়া গেলে অবশ্য তুমি ইচ্ছামত পোষাক পরিধান করিতে পার, তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করিবে না।

আমাকে ধন্যবাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা আমার কর্তব্যমাত্র। হিন্দু আইন অনুসারে শিষ্যই সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী, যদি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাহার কোন পুত্রও জন্মিয়া থাকে, তথাপি সে উত্তরাধিকারী নহে। এ সম্বন্ধ খাঁটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ—ইয়াঙ্কির 'অভিভাবকগিরি' ব্যবসা নহে, বুঝিতেই পারিতেছ।

তোমার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করি। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

১১৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

হোটেল বেল ভিউ
বীকন ষ্ট্রীট, বষ্টন
১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,
আজ সকালে তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পেলাম। প্রায় সপ্তাহখানেক হল এই হোটেলে আছি। আরও কিছুকাল বষ্টনে থাকব। গাউন তো এতগুলো রয়েছে, সেগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। এনিস্কোয়ামে যখন খুব ভিজে যাই, তখন পরনে ছিল সেই ভাল কালো পোষাক—যেটি তোমার খুব পছন্দ। মনে হয়, এটি আর নষ্ট হচ্ছে না; আমার নির্গুণ ব্রহ্মধ্যান এর ভিতরেও প্রবিষ্ট হয়েছে! গ্রীষ্মকাল খুব আনন্দে কাটিয়েছ জেনে বিশেষ খুশী হলাম। আমি তো ভবঘুরের মত ঘুরেই বেড়াচ্ছি। এবহিউ-লিখিত তিব্বতদেশীয় ভবঘুরে লামাদের বর্ণনা সম্প্রতি পড়ে খুব আমোদ পেলাম—আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের যথার্থ চিত্র। লেখক বলেন এরা অদ্ভুত লোক, খুশীমত এসে হাজির হয়, যার সঙ্গে হোক, খায়—নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত। যেখানে খুশী থাকবে, যেখানে খুশী চলে যাবে। এমন পাহাড় নেই যা তারা আরোহণ করেনি, এমন নদী নেই যা তারা অতিক্রম করেনি। তাদের অবিদিত কোন জাতি নেই, অকথিত কোন ভাষা নাই। লেখকের অভিমত, যে শক্তিবশে গ্রহগুলি সদা ঘূর্ণায়মান তারই কিয়দংশ ভগবান্ এদের দিয়ে থাকবেন। আজ এই ভবঘুরে লামাটি লেখবার আগ্রহ দ্বারা আবিষ্ট হয়ে সোজা একটি দোকানে গিয়ে লেখবার যাবতীয় উপকরণ সহ বোতাম-লাগানো কাঠের ছোট দোয়াত সমেত একটি পোর্টফোলিও কিনে এনেছে। শুভ সঙ্কল্প। মনে হয়, গত মাসে ভারত হতে প্রচুর চিঠিপত্র এসেছে। আমার দেশবাসিগণ আমার কাজের এরূপ তারিফ করায় খুব খুশী হলাম। তারা যথেষ্ট করেছে। আর কিছু তো লেখবার দেখতে পাচ্ছি না। অধ্যাপক রাইট, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা খুব খাতির যত্ন করেছিলেন, সর্বদা যেমন করে থাকেন। ভাষায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না। এ পর্যন্ত সবই ভাল যাচ্ছে। তবে একটু বিশ্রী সর্দি হয়েছিল। এখন প্রায় নেই। অনিদ্রার জন্য ক্রিশ্চান সায়েন্স অনুসরণ করে বেশ ফল পেয়েছি। তোমরা সুখী হও। ইতি

চিরস্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুঃ—মাকে জানিও, এখন আর কোট চাই না।

বি

১১৪*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

হোটেল বেল ভিউ
বীকন ষ্ট্রীট, বষ্টন
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

মা সারা,
আমি তোমাকে মোটেই ভুলে যাইনি। তুমি কি মনে কর, আমি কখনও এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারি? তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা দাওনি, তবু মিস ফিলিপ্‌স্ ল্যাণ্ডসবার্গকে প্রেরিত সংবাদ থেকে তোমার খবর পাচ্ছি। বোধ হয় মান্দ্রাজ থেকে আমায় যে অভিনন্দন পাঠিয়েছে, তা তুমি দেখেছ। আমি তোমাকে পাঠাবার জন্য খানকতক পাঠাচ্ছি ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে।

হিন্দু সন্তান কখনও মাকে টাকা ধার দেয় না, সন্তানের ওপর মায়ের সর্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মায়ের ওপর। সেই তুচ্ছ ডলার কটি আমাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলাতে তোমার ওপর আমার বড় রাগ হয়েছে। তোমার ধার আমি কোন কালে শুধতে পারব না।

এখন আমি বষ্টনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি। এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখতে চাই। আমার বোধ হয়, তার জন্য আমাকে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস গার্ন্সি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি মনে করছি, তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বসে বই লিখব।

তোমার সদা স্নেহাস্পদ
বিবেকানন্দ

পুঃ—অনুগ্রহ করে আমায় লিখবে, গার্ন্সিরা শহরে ফিরেছে, না এখনও ফিশকিলে আছে। ইতি

বি

পাদটীকা

১	**Paramahamsa Ramakrishna —(Theistic Quarterly Review, Oct. 1879)**
২	**Asiatic Quarterly Review.**
৩	পুনর্জন্মবাদ
৪	আলোচ্য গ্রন্থ— **The Life and Sayings of Ramakrishna by Prof. Max Müller Pp. 1 and 2.**
৫	**'A Real Mahatman in Nineteenth Century, August, 1896**
	আলোচ্য গ্রন্থ

৬	**—Pp. 10 and 11**
৭	আলোচ্য গ্রন্থ—**p. 65**
৮	আপ্তঃখলু সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথাদৃষ্টস্য **...** ঋষ্যার্যম্লেচ্ছানাং সমানাং লক্ষণম্ **...**। বাৎস্যায়ন ভাষ্য। **[**১।১।৭**]**
৯	**He that followeth me &c.—** যোহন, ৮।১২ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥—গীতা, ৭।১৪ আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম; যে-সকল

	ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

১০	ধ্যাত্বৈবাত্মানমহর্নিশং মুনিঃ। তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ ॥—রামগীতা মুনি এই প্রকারে অহর্নিশ পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

১১	ইস্রায়েলরা যখন মরুভূমিতে আহারাভাবে কষ্ট পাইয়াছিল, সেই সময় ঈশ্বর তাহাদের নিমিত্ত একপ্রকার খাদ্য বর্ষণ

	করেন—তাহার নাম ‘মান্না’ **(manna)**।

১২	শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।—গীতা শ্রবণ করিয়াও অনেকে ইহাকে বুঝিতে পারে না। ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥ —বিবেকচূড়ামণি, ৬৪ ঔষধ কথাটিতেই ব্যাধি দূর হয় না, অপরোক্ষানুভব ব্যতিরেকে ‘ব্রহ্ম ব্রহ্ম’ বলিলেই মুক্তি হইবে না। শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্মমাচরেৎ।—মহাভারত যদি ধর্ম আচরণ না কর, বেদ পড়িয়া কি হইবে?

	খ্রীষ্টিয়ান মতে জনকেশ্বর (পিতা),

১৩	পবিত্র আত্মা এবং তনয়েশ্বর (পুত্র)—ইনি একে তিন, তিনে এক।

১৪	বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্‌ । বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥—বিবেকচূড়ামণি, ৬০ নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যার কেবল কৌশলমাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

১৫	কোরিন্‌থিয়ান, ১৩।২

	Vanity of vanities, all is vanity, &c.-—ইক্লিয়াজিয়াষ্টিক, ১।২ কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ।

১৬	অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥— মণিরত্নমালা, শঙ্করাচার্য যাঁহারা তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশাশূন্য হইয়া একমাত্র শিবতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, তাঁহারাই সাধু।

১৭	ইক্লিজিয়াষ্টিক্, ১।৮

১৮	ন জাতু কামঃ কামানামূপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে। ।— মহাভারত কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতদানের ন্যায় উহা অত্যন্ত বর্ধিত হয়।

	খ্রীষ্টিয় মতে— মহাপ্রলয়ের দিনে ঈশ্বর সকলের বিচার

১৯	করিবেন এবং পাপ অথবা পুণ্যানুসারে নরক অথবা স্বর্গ প্রদান করিবেন।
২০	ইনিই ঈশারূপে অবতার হন।
২১	‘নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া’—কঠ উপঃ, ১।২।৯ তর্কের দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা যায় না।
২২	আদদীত শুভাং বিদ্যাং প্রযত্নাদবরাদপি। —মনু নীচের নিকট হইতেও যত্নপূর্বক উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।
	ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে

২৩	। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ —গীতা, ২।৬৭ সঞ্চরমাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন যাহারই পশ্চাৎ গমন করে, সেইটিই—বায়ু জলে যে প্রকারে নৌকাকে মগ্ন করে তদ্রূপ—তাহার প্রজ্ঞা বিনাশ করে।

২৪	ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে । সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥—গীতা, ২।৬২-৬৩ বাহ্য বস্তুর চিন্তা করিলে তাহাদের সঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে বাসনা

	এবং অতৃপ্ত বাসনায় ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতিধ্বংস হয়। স্মৃতিধ্বংস হইলে নিত্যানিত্য-বিবেক নষ্ট হয় এবং তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ পতন উপস্থিত হয়।

২৫	যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥—গীতা, ২।৬০ যে-সকল দৃঢ় পুরুষ সংযমী হইবার জন্য যত্ন করিতেছেন, অতি বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহাদেরও মনকে হরণ করে।

২৬	বৈবাহিক

২৭	ঊর্ধ্বগামিনী ও অধোগামিনী।
২৮	**Zoroaster** বা **Zarathustra** কুলগত নাম; স্পিতামা (=শ্বেত) ইঁহার নাম, ইনি পারসীদিগের প্রাচীন গুরু।
২৯	দ্বিরাগমন
৩০	অগষ্ট, ১৯০০

১	**Sea-sickness**—জাহাজের দুলুনিতে মাথাঘোরা এবং বমনাদি হওয়া।
২	তুলসীদাসের দোঁহার মধ্যে এই বাক্যটি আছে।
৩	আড়কাটী—যিনি বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলের গভীরতাদি জানেন এবং বন্দরের নিকটে জাহাজ চালাইবার ভার লন; **pilot.**
	ঐতিহাসিক ইলিয়টের মতে লালবেগীদের (ঝাড়ুদার মেথর সম্প্রদায়বিশেষ) উপাস্য

৪	আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ ও উত্তরপশ্চিমের লালগুরু (রাক্ষস অরণ্য কিরাত) অভিন্ন। বারাণসীবাসী লালবেগীদের মতে পীর জহরই (চিস্তিয়া সাধু সৈয়দ সাহ্ জুহুর) লালবেগ।

৫	দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥—রঘুবংশ।

	কাশ্মীর ভ্রমণ এবং ঐ দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া পরে স্বামীজীর এই বিষয়ে মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস অনেক দিন পর্যন্ত কাশ্মীর দেশের

৬	শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—এ কথা ঐ দেশের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। রঘুবংশাদি-বিবৃত হিমালয়-বর্ণনা কাশ্মীরখণ্ডের হিমালয়ের দৃশ্যের সহিত অনেক স্থলে মিলে। কিন্তু কালিদাস কখনও সমুদ্র দেখিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই।

৭	শ্রীমৎশঙ্করাচার্যকৃত 'শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র'।

৮	জলাঙ্গী নদী নবদ্বীপ হইতে কিছু দূরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের পর

	হইতেই ভাগীরথীর নাম হুগলি হইয়াছে।

৯	মজওয়ার কাহারওয়া জাল বিনুরে। দিন্‌কো মারে মছলি, রাতকো বিনু জাল। এয়সা দিকদারি কিয়া জিউকা জঞ্জাল॥ —ইত্যাদি গানটি গাড়োয়ানরা প্রায়ই গাহিত।

১০	**Unionist Party.**

১১	বি. আই. এস. এন. কোম্পানীর একখানি জাহাজের নাম। ঐ জাহাজে স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা

	করেন।
১২	সমুদ্রের যেখানে কোন দিকের কুলকিনারা দেখা যায় না, অথবা যেখান হইতে নিকটবর্তী উপকূল দুই-তিন দিনের পথ।
১৩	গুরুজীর জয়, গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন। উহা পঞ্জাব প্রদেশের শিখ-সম্প্রদায়ের উৎসাহবাক্য এবং রণসঙ্কেত।
১৪	অতিরিক্ত ঝাল-তেঁতুল-সংযুক্ত অড়হর দালের ঝোল বিশেষ। উহা দক্ষিণীদের প্রিয় খাদ্য। ‘মুড়গ্’ অর্থে

	কালো মরিচ ও ‘তিন্নি’ অর্থে দাল।
১৫	নয়মার্গ—নীতিমার্গ।
১৬	কাহারও কাহারও মতে বেদভাষ্যকার সায়ণ বিদ্যারণ্যমুনির ভ্রাতা।
১৭	স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী নির্ভয়ানন্দ।
১৮	হাইপেশিয়া(**Hypatia**)
১৯	যবন, গ্রীক
২০	**Histoire Anciene Oriental**
২১	সওয়ায়—(আরবী শব্দ) ব্যতীত, ছাড়া।

২২	হরপ্পা এবং মহেঞ্জোডারো গ্রামে ভূগর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৩০০ বৎসর পূর্বেকার সভ্যতার নিদর্শনসকল পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহাকে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা বলিয়াছেন।

২৩	**Rosetta Stone**

২৪	**Hieroglyphics**

২৫	**Baal, Moloch, Istarte,Damuzi**

২৬	**Adunoi or Adonis**

২৭	**Yave-Moloch**

২৮	**Israel, Ephraim**

২৯	**Josephus, Philo**

৩০	**Hillel**

৩১	**Monsieur Jules Bois**

৩২	**Mademoiselle Calve**

৩৩	**Sarah Bernhardt**

৩৪	পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড

৩৫	**Jean de Reszke, Plancon**

৩৬	**Pere Hyacinthe**

৩৭	**Monsieur Loyson**

৩৮	পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে একটি রীতি এই—একটি দলের মধ্যে সকলেই যে ভাষা জানেন, একত্র অবস্থানকালে

	সেই ভাষায় কথা না কওয়া অসভ্যতার পরিচায়ক।

৩৯	**Germanised**

৪০	চীনের যুদ্ধক্ষেত্র

৪১	**Dejeuner**

৪২	**The sick man of Europe**

৪৩	**Sardou**

৪৪	**L'aiglon (the Young Eagle)**

৪৫	**Asia Minor**

৪৬	**Rumania**

১	গয়াসুর ও বুদ্ধদেবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মত পরে পরিবর্তিত হয়। তিনি দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্বে কাশীধাম হইতে জনৈক শিষ্যকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে একস্থানে বলিয়াছেনঃ অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব

	হইতে প্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র। ... বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব হইতেই ছিল, প্রমাণিত হইতেছে।—উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৫৮৮ পৃঃ।

২	গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ —মনু, ৮, ৩৫০ আততায়ী ছয় প্রকারঃ অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ॥—শুক্রনীতি

৩	জৈমিনিসূত্র, ১।২।১
৪	শঙ্করাচার্য-কৃত 'মোহমুদ্গার' ৫
৫	গীতা, ৩।২৪
৬	**Forty-one Years in India, Lord Roberts—Chapters 30 & 31**
৭	'গড্ডলিকা-প্রবাহ'—যেমন একটি মেষের অনুকরণে অপর মেষসমূহ তদনুরূপ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।
	দুগ্ধ গলিতে গলিতে ফেরি করিতে হয়,

৮	কিন্তু সুরা এক স্থানে বসিয়াই বিক্রয় হয়। সতী নারীর পরিধানে বস্ত্র জুটে না, অসতী সুবেশ পরিধান করে।—তুলসীদাস

৯	তুলসীদাসের দোঁহা

১০	সঙ্কর-জাতি

১১	আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ, শব্দাদির্বিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে।—শঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৬

	সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধুমৈরেয়কং শুচি। পায়য়ামাস

	কাকুৎস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথামৃতম্ ॥ মাংসানি চ সুমৃষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ। রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্ ॥ —রামায়ণ, উত্তর ৫২
১২	সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ। যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা ॥—রামায়ণ, অযোধ্যা ৫৫ উভৌ মধ্বাসবক্ষিপ্তৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ। উভৌ পর্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জুনৌ ॥—মহাভারত, আদিপর্ব

১৩	খণ্ডিত-খুর

	দেবতার উদ্দেশে

১৪	যাহা নিবেদিত নয়।

১৫	আনন্দস্তোত্রম্

১৬	গীতা, ৩।৩৩

১৭	ফাঁকা

১৮	**Deutsch**

১৯	গীতা, ৪।৮

২০	‘দেবতা’ ও ‘অসুর’ এখানে গীতার ১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত দৈবী ও আসুরী সম্পদের প্রাধান্যযুক্ত মানব (জাতি) সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

২১	সভ্য হইবার পূর্বে

২২	ধাতু গলাইবার পাত্র, **crucible**

২৩	কান্দাহারের অধিবাসী

২৪	কাঁচা বা আরাঁধা মাংসাহারী

২৫	প্রাচীন আর্য সমাজব্যবস্থায় চারি বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; চারি আশ্রম— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

*	প্রাচীন আর্য সমাজব্যবস্থায় চারি বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; চারি আশ্রম— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

পাদটীকা - বর্তমান ভারত

১	সোমলতা —বেদে উহা ‘রাজা সোম’ নামে উক্ত।
২	অগ্নিবর্ণ— সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ। ইনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিবারাত্র অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরদোষে যক্ষ্মারোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।
	ধর্মাশোক— ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্ অশোক। ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্যের দ্বারা সিংহাসন লাভ

৩	করাতে ইনিপূর্ব্বে চণ্ডাশোক নামে খ্যাত ছিলেন। কথিত আছে, সিংহাসনলাভের প্রায় নয় বৎসর পরে, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়—ভারত ও ভারতেতর দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার তাঁহার দ্বারাই সাধিত হয়। ভারত, কাবুল, পারস্য ও পালেস্তাইন প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত স্তূপ, স্তম্ভ এবং পর্ব্বতগাত্রে খোদিত শাসনাদি ঐ বিষয়ে ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই প্রকার ধর্ম্মানুরাগ এবং

	প্রজারঞ্জনের জন্যই ইনি পরে ‘দেবানাং পিয়ো পিয়োদিশি’ (দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শন) ধর্মাশোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

৪	গ্রীক

৫	প্রজা

৬	মন্ত্র বা অস্ত্র দ্বারা

৭	উৎসাদন

৮	মিহিরকুল — হূনজাতীয় রাজা

৯	খ্রীষ্টান

১০	(ইসলামে) অবিশ্বাসী

১১	আর্যাবর্ত ও গুজরাটের পারস্যদেশীর

	সম্রাড়্গণ **(Satraps)**
১২	ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য
১৩	খল্দিয়ার আদিম নিবাসী, **Sumerians**
১৪	প্রাচীন বাবিলন-নিবাসী, **Babylonians**
১৫	খল্দিয়া-নিবাসী, **Chaldeans**
১৬	প্রাচীন পারস্য-নিবাসী, **Iranians**
১৭	ব্যতীত
১৮	**Confucious**—চীনদেশীয় ধর্ম ও নীতি-সংস্কারক

১৯	পুনরায় স্থাপন

২০	অভিপ্রায়

২১	ক্ষাত্র ও মন্ত্রশক্তি সহায় যাহার

২২	প্রযোজ্য

২৩	চিহ্ন

২৪	বিশেষ অধিকারভোগী

	বেণ—ভাগবতোক্ত রাজা-বিশেষ। কথিত আছে, ইনি আপনাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-আদি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন। ঋষিগণ

২৫	তাঁহার এ অহঙ্কার দূর করিবার জন্য কোন সময়ে সদুপদেশ দিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের তিরস্কার করেন এবং আপনাকেই পূজা করিতে বলায় তাঁহাদের কোপানলে নিহত হন। ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ-রাজার বাহুমন্থনে উৎপন্ন।

২৬	সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ

	বশিষ্ঠের

২৭	জন্মবৃত্তান্ত —ঋগ্বেদ, ৭।৩৩। ১১-১৩
২৮	ধীবরজননীর পুত্র
২৯	পশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করে যে।
৩০	চিহ্ন
৩১	রোমক সম্রাট সীজার
৩২	প্রাচীন দেবগণের
৩৩	‘মোহমুদ্গর’, শঙ্করাচার্য

পাদটীকা - বীরবাণী (কবিতা)

১	পাঠান্তর— বক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
২	পাঠান্তর— তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
৩	পাঠান্তর— রাগে কৃতে ঋতপথে ইত্যাদি
*	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক আরও তিনটি স্তবক পাওয়া যায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রীঃ লিখিত পত্রে। উহা পত্রাবলী অংশে দ্রষ্টব্য।
৪	পাঠান্তর— প্রমথতি
	পাঠান্তর—

৫	প্রাণবিচ্ছেদসুৎকং
৬	পাঠান্তর—কো বা ধর্মঃ কিমকৃতং ... ।
৭	পাঠান্তর—কিম্বাদৃষ্টং ফলমিহান্তি হি যদ্বিনা ভোঃ।
৮	পাঠান্তর—ইচ্ছাপাশৈর্নিয়মিতা
৯	পাঠান্তর—যস্যা নেত্রী
১০	পাঠান্তর—স্বস্থে দুঃস্থে ত্ববিতথং তব
১১	পাঠান্তর—মৃত্যুচ্ছায়া তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
১২	পাঠান্তর—মা মাং মুঞ্চন্তু

১৩	পাঠান্তর—ধর্তুং দোর্ভ্যামিব মতির্জগদেকধাত্রীম্
১৪	পাঠান্তর—শ্রীসঞ্চিন্ত্যং ...
১৫	পাঠান্তর—সেবাসারৈরভিনুতং
১৬	পাঠান্তর—যা মামাজন্ম ...
১৭	পাঠান্তর—যা মে বুদ্ধিং ...
১৮	পাঠান্তর—সাম্বা সর্বা ...
১৯	মানুষকে দূষিত করে এমন যে সকল অঘ অর্থাৎ পাপ, তাহা যিনি মোচন করেন।
	যিনি যুগের

২০	যিনি যুগের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত

২১	যিনি দুঃখের গঞ্জনাকে দূর করিয়াছেন

২২	কর্মবীর

২৩	যিনি কলির বন্ধনকে ছেদন করিয়াছেন

২৪	জাতি-কুল-মান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয়দান করেন

২৫	অজ্ঞানদূরকারী

২৬	করজোড়ে

২৭	এক সত্তা, যাঁহার নাম রূপ বর্ণ কিছুই নাই, যিনি দেশকালের

	যেখানে ‘নেতি নেতি’ বিচার শেষ হইয়াছে।

২৮	পাঠান্তর —ওঠে

২৯	তিনি সূর্য, কিরণজাল তাঁহারই; যিনি সূর্য, তিনিই কিরণ।

১	মহামায়া, মহামাঈ

*	ইংরেজী হইতে অনূদিত পত্র তারকাচিহ্নিত

২	স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি

৩	পূর্বজন্মের প্রীতির স্মৃতিই পরজন্মে সহজ আকর্ষণরূপে দেখা দেয়।—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫, কালিদাস

৪	গীতা, ২।৭০

	—কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি; হে পিতঃ, তুমি উহা

৫	আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও—যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি। ওঁ শান্তিঃ! —ঈশা-অনুসরণ
৬	(আরবী শব্দ)—ব্যতীত
৭	'চক্রক'—যাহার বলে সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহাকেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থন করা।
৮	মধুপর্ক বৈদিক প্রথা—ইহাতে গোবধের প্রয়োজন হইত।

৯	অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥ অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংসনিবেদন এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন —কলিকালে এই পাঁচটি ক্রিয়া বর্জন করিবে।

১০	ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ — মুণ্ডকোপনিষৎ, ২, ২।৮

	যাঁহারা বলেন ইন্দ্রিয়জন্য-

১১	জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ আরও একপ্রকার জ্ঞান আছে।
১২	স্বামী সদানন্দ
১৩	স্বামী যোগানন্দ
১৪	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ
১৫	ভাবার্থঃ গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন।
১৬	গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী পওহারী বাবা।
১৭	গীতা ৬।৮
১৮	শঙ্করাচার্যকৃত ‘বিবেকচূড়ামণি’,

	৫৩৮-৪০

১৯	পাতঞ্জল যোগসূত্রে ‘বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং’ সূত্রটির তাৎপর্য এইরূপ।

২০	স্বামী অভেদানন্দ

২১	নাট্যকার গিরিশ ঘোষের ভ্রাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ

২২	শঙ্করাচার্যকৃত ‘মোহমুদগর’

২৩	স্বামী জ্ঞানানন্দ

২৪	গীতা, ১৫।৫

২৫	স্বামীজী শ্রীযুক্ত দেশাইকে ‘দেওয়ানজী সাহেব’ বলিয়া

	সম্বোধন করিতেন।
২৬	খেতড়িতে পণ্ডিত নারায়ণ দাসের নিকট স্বামীজী পতঞ্জলিকৃত ‘পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্য’ শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই স্বামীজী ‘অধ্যাপক’ বলিতেছেন।
২৭	**Generalisation**—বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।
২৮	আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্বে স্বামীজী ‘সচ্চিদানন্দ’ নামে নিজেকে পরিচিত করিতেন।
২৯	**Lord's Prayer.**—

	Bible
৩০	খেতড়ির রাজা
৩১	কানাডার সন্নিকট প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ ও বন্দর।
৩২	পারমার্থিক ও ব্যাবহারিকঃ যখন লোককে বলা যায়, ‘তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ’, লোকে তখন এই ভাব কার্যে পরিণত

	করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, ‘পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক্।’ এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা রহিয়াছে।

৩৩	বষ্টনের অধ্যাপক **J. H. Wright** স্বামীজীকে চিকাগোর ধর্মমহাসভায় পরিচিত করাইয়া দেন। স্বামীজী তাঁহাকে **Adhyapakji** বলিতেন,

	চিঠিতেও ঐরূপ লিখিতেন।
৩৪	‘তৎ সৎ’: সেই সৎস্বরূপ [স্বামীজীর টীকাঃ **'Tat Sat' means That only Real Existence]**
৩৫	**Hard-shelled Christians**
৩৬	চণ্ডী, ৪।৫
৩৭	মনুসংহিতা, ৩।৫৬
৩৮	আবিষ্কারক **Thomas Alva Edison**
৩৯	হরিদাস বিহারীদাস দেশাই

৪০	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

	বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজী একটি **Lecture Bureau-**র **(**বক্তৃতা কোম্পানী**)** সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই কোম্পানী ভাল ভাল বক্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকে এবং বক্তৃতার সমুদয় বন্দোবস্ত করে। টিকিট বিক্রয় করিয়া যে

৪১	টাকা পায়, তাহার কতকাংশ ঐ বক্তাকে দিয়া থাকে। এই সময়ে অনেকে স্বামীজীকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পয়সা না লইলে তথায় কেহ বক্তৃতা শুনে না। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখিলেন, ইহাতে স্বাধীনভাবে কার্য করা অসম্ভব, তখন ইহাদের সহিত সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতালব্ধ অর্থের অধিকাংশ ভারতের নানা

	সৎকার্যে দান করিয়া বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

৪২	যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক, তাহা বলিতে পারি না।

৪৩	ঈশ উপনিষদ্

৪৪	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

৪৫	পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবেন। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি

	স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শেখাতে হবে।

	আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার

৪৬	তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আনতে হবে —গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

৪৭	মূর্খ, ভীমরতিগ্রস্ত ও স্বার্থপরতার মূর্তি।

৪৮	আর আমার বাকী জীবন এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।

৪৯	অধ্যাপক রঙ্গাচার্য

৫০	চিকাগো ইণ্টিরিয়র—প্রেসবিটেরিয়ান সংবাদপত্র, এরা স্বামীজীর বিরোধিতা করিত।

৫১	স্পষ্টতই কেশবচন্দ্র সেন

	প্রবাদ আছে—মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, ‘আমি পর্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত হইবে।’ এই

৫২	অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহা জনতা হয়। মহম্মদ পর্বতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি পর্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পর্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্বতের নিকট যাইবে।' তদবধি উহা একটি প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৫৩	বন্দৌঁ সন্ত অসন্তন চরণা। দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরণা॥ বিছুরত

	এক প্রাণ হরি লেই। মিলত এক দারুণ দুখ দেই॥

৫৪	**Paramahamsa Ramakrishna by Protap Chandra Majumdar**

৫৫	অজস্র

৫৬	**Aurora Boorealis —(**সুমেরু-জ্যোতি**)** পৃথিবীর উত্তরভাগে রাত্রিকালে **(**তথায় ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি**)** কখনও কখনও নভোমণ্ডলে এক প্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলো দেখা যায়। উহা নানা

	আকারের এবং নানা বর্ণের। ইহাকেই অরোরা বোরিয়ালিস বলে।
৫৭	এই পত্রের সঙ্গে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির কিছু অংশ লিখিত দেখা যায়।
৫৮	ইনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।
৫৯	**Christian Scientist**—আমেরিকার একটি সম্প্রদায়। ইঁহারা যীশুখ্রীষ্টের ন্যায়

	অলৌকিক উপায়ে রোগ আরাম করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন।
৬০	ক্রিশ্চান সায়াণ্টিস্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস এডিকে স্বামীজী রঙ্গ করে **Mrs. Whirlpool** (ঘূর্ণাবর্ত) বলতেন—কারণ **Eddy** ও **Whirlpool** সমার্থক।
৬১	স্বামীজীর আমেরিকান সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী কৃপানন্দ।
৬২	কলিকাতা ডাকঘরের ছাপ ২০. ২.

	৯০
৬৩	কলিকাতা মেছুয়াবাজার কীর্তি সিনেমার সম্মুখে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
সপ্তম খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের শেষার্ধ হইতে স্বামীজীর পত্রাবলী (যথাসম্ভব সময়ানুক্রমে) প্রকাশিত হইতেছে। ঐ খণ্ডে ১২৮ খানি পত্র (১২.৮.৮৮ হইতে ১৫.৯.৯৪ পর্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে ২৩৬ খানি পত্র (নভেম্বর ১৮৯৪ হইতে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ পর্যন্ত) প্রকাশিত হইতেছে। অবশিষ্ট ১৮৮ খানি পত্র ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

স্বামীজীর পত্রাবলীর বাংলা সংস্করণ ক্রমে ক্রমে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন যেরূপ পাওয়া গিয়াছিল এবং যেমন যেমন অনূদিত হয়, সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৫৫-৫৬ সালে পরিবর্তিত সংস্করণে তারিখ অনুসারে সাজাইয়া দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর মেরী লুই বার্কের আবিষ্কারের ফলে আরও পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজী ৮ম খণ্ডে (Vol. VIII—Complete Works) প্রকাশিত সেই পত্রগুলির অনুবাদ করিয়া তারিখ অনুসারে এই সংগ্রহে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। এ কথা বোধ হয় সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই সর্বপ্রথম স্বামীজীর সমগ্র পত্রাবলী (মোট ৫৫২ পত্র) সময়ানুক্রমে সাজাইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

গবেষক পাঠকদিগের জন্য—৮ম খণ্ডের শেষে পত্রাবলীর একটি পৃথক সূচীপত্র দেওয়া হইবে। বর্তমান সংস্করণে বহু পত্র শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের উদ্যোগে বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে। তথাপি কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল, আশা করি ভবিষ্যতে তাহা দূরীভূত হইবে।

এই খণ্ডের শেষাংশে স্বামীজীর ইংরেজী কবিতাগুলির অনুবাদ সন্নিবেশিত হইল। কবিতাগুলি অধিকাংশ অতিশয় গুরুগম্ভীর ভাবের বাহক, কয়েকটি উৎসাহ-উদ্দীপনাব্যঞ্জক; অনুবাদে এ-জাতীয় কবিতার ভাব ও ছন্দ রক্ষা করা অতি কঠিন। অনেকেই—কবি, সাহিত্যিক, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী—সময় সময় স্বামীজীর কবিতার অনুবাদে হাত দিয়াছেন। কোন কোন কবিতার একাধিক অনুবাদ আমরা দেখিয়াছি। পুরাতন ও পরিচিত অনুবাদগুলি অধিকাংশই গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে নূতন অনুবাদের সংখ্যাই অধিক। সেগুলির ক্ষেত্রে ভাব ও ছন্দের সামঞ্জস্যের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিয়াছি। কয়েকটি কবিতা পত্রের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পত্রাবলীর মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কবিতাদ্বন্দ্বের (An Interesting Correspondence) অনুবাদ এই খণ্ডে দেওয়া সম্ভব হইল না।

তথ্যপঞ্জীতে প্রধানতঃ কবিতাগুলির রচনার স্থান কাল ও পরিবেশ নির্ণয় করা হইল। পত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী পরবর্তী খণ্ডে পাওয়া যাইবে। এই খণ্ডের শেষে পত্রাবলীতে উল্লিখিত 'ব্যক্তিগণের পরিচয়' সন্নিবেশিত হইল।

এই খণ্ডের জন্য যাঁহারা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাপাইবারও আংশিক ব্যয় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা ঘরে ঘরে আদৃত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকাশক

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
জানুআরি, ১৯৬৩

পত্রাবলী (পূর্বানুবৃত্তি)

পত্রাবলী ১১৫-১২৪

১১৫*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
… আমি ক্রমাগত এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সর্বদা কাজ করছি, বক্তৃতা দিচ্ছি, ক্লাস করছি এবং লোককে নানা রকমে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছি।

আমি যে বই লেখবার সঙ্কল্প করেছিলাম, এখনও তার এক পঙ্ক্তি লিখতে পারিনি। সম্ভবতঃ পরে এ কাজ হাতে নিতে পারব। এখানে উদার মতাবলম্বীদের মধ্যে আমি কতকগুলি পরম বন্ধু পেয়েছি, গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মধ্যেও কয়েক জনকে পেয়েছি, আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফিরব। এ দেশ তো যথেষ্ট ঘাঁটা হল, বিশেষতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে। সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃতা করায় এবং একস্থানে স্থিরভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুন এই দুর্বলতা এসেছে। … সুতরাং বুঝছ আমি শীঘ্রই ফিরছি। কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছি, আর তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে; তারা অবশ্যই চাইবে, আমি বরাবর এখানে থেকে যাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—খবরের কাগজে নাম বেরনো এবং সর্বসাধারণের ভেতর কাজ করার দরুন ভুয়ো লোকমান্য তো যথেষ্ট হল—আর কেন? আমার ও-সবের একদম ইচ্ছা নেই।

… কোন দেশের অধিকাংশ লোকই কখনও কেবল সহানুভূতিবশে লোকের উপকার করে না। খ্রীষ্টানদের দেশে কতকগুলি লোক যে সৎকার্যে অর্থব্যয় করে, অনেক সময়ে তার ভেতর কোন মতলব থাকে, কিম্বা নরকের ভয়ে ঐরূপ করে থাকে। আমাদের বাঙলাদেশে যেমন চলিত কথায় বলে, 'জুতো মেরে গরু দান।' এখানে সেই রকম দানই বেশী! সর্বত্র তাই। আবার আমাদের জাতের তুলনায় পাশ্চাত্ত্যেরা অধিকতর কৃপণ। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, এশিয়াবাসীরা জগতের সকল জাতের চেয়ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা যে বড় গরীব।

কয়েক মাস আমি নিউ ইয়র্কে বাস করবার জন্য যাচ্ছি। ঐ শহরটি সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের যেন মাথা, হাত ও ধনভাণ্ডারস্বরূপ; অবশ্য বোষ্টনকে 'ব্রাহ্মণের শহর' (বিদ্যাচর্চাবহুল স্থান) বলে বটে। আমেরিকায় হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার প্রতি সহানুভূতি করে থাকে। … নিউ ইয়র্কের লোকগুলির খুব খোলা মন। সেখানে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট গণ্যমান্য বন্ধু আছেন। দেখি, সেখানে কি করতে পারা যায়। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এই বক্তৃতা-ব্যবসায়ে আমি দিন দিন বিরক্ত হয়ে পড়ছি। পাশ্চাত্যদেশের লোকের পক্ষে ধর্মের উচ্চাদর্শ বুঝতে এখনও বহুদিন লাগবে। টাকাই হল এদের সর্বস্ব। যদি কোন ধর্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয়, দীর্ঘ জীবনলাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্মের দিকে ঝুঁকবে, নতুবা নয়। … বালাজী, জি. জি এবং আমাদের বন্ধুবর্গের সকলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে।

তোমাদের প্রতি চিরপ্রেমসম্পন্ন
বিবেকানন্দ

১১৬*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,
তোমার এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সংকল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়; অতএব সময়ের অপেক্ষা কর; তাড়াতাড়ি করো না। বিশেষ, কোন আহাম্মকি কাজ করে অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার কারও নেই। সবুর কর, ধৈর্য ধরে থাক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বালাজী, জি. জি. ও আমাদের অপর সকল বন্ধুকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে। তুমিও অনন্তকালের জন্য আমার ভালবাসা জানবে।

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

১১৭*

[মঠের সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের কয়েকখানা পত্র পাইলাম। শশী প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশী। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মোচে যাবে, 'বাহ গুরুকা ফতে!' আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' (ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হয়), ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড়লোক তৈরী হয়ে যায়। চারু কে, এখন বুঝতে পেরেছি; তাকে আমি ছেলেমানুষ দেখে এসেছি কিনা, তাই ঠাওরে উঠতে পারিনি। তাকে আমার অনেক আশীর্বাদ। বলি মোহন, মিশনরী-ফিশনরীর কর্ম কি এ ধাক্কা সামলায়? এখন মিশনরীর ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে। এখানকার দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাদ্রীতে ঢের চেষ্টা-বেষ্টা করলে—এ গিরিগোবর্ধন টলাবার যো কি। মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতীর কর্ম ফার্সি পড়া? ও সব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা করো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আপনার কার্য করে চলে যাও—কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।'
১
গুরুপ্রসন্নবাবুকে এক পত্র লিখিতেছি। টাকার ভাবনা নাই, মোহন। সব হবে ধীরে ধীরে।

এ দেশে গরমীর দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়—আমিও গিয়েছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে-বুড়ো যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘরে আসে, খায় দায়—নাচে কোঁদে—গান বাজনা তো দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার যো নাই।

ঐ যে G. W. Hale (হেল)-এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। এরা বলে—

'Son is son till he gets a wife
The daughter is daughter all her life.'
২

চারজনেই যুবতী—বে থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে করতে একটা 'লভ' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানষের ঝি, ইউনিভার্সিটি 'গার্ল' (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা বোধ হয় বে থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

মেরী আর হ্যারিয়েট হল মেয়ে, আর এক হ্যারিয়েট আর ইসাবেল হল ভাইঝি। মেয়ে দুইটির চুল সোনালী অর্থাৎ [তারা] ব্লণ্ড, আর ভাইঝি দুটি brunette [ব্রূনেট] অর্থাৎ কালো চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—এরা সব জানে। ভাইঝিদের তত পয়সা নেই—তারা একটা Kindergarten School (কিণ্ডারগার্টেন স্কুল) করে, মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। ক্রোড়পতির ছেলেও রোজগার করে, তবে বে করে, আর আপনার বাড়ী ভাড়া করে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়ীতে—আমি যেখানেই কেন যাই না। তারা সব ঠিকানা করে। এদেশের ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই রোজগার করতে যায়, আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে—তাইতে করে একটা সভায় দেখবে যে 90 per cent. (শতকরা ৯০ জন) মেয়ে। ছোঁড়ারা তাদের কাছে কলকেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। মিডিয়ম (Medium) হল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পর্দার আড়ালে যায়, আর পর্দার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে—বড় ছোট, হর-রঙের। আমি গোটাকতক দেখলাম বটে, কিন্তু ঠকবাজি বলেই বোধ হল। আর গোটাকতক দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত করব। ভূতুড়েরা অনেকে আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্স—এরাই হচ্চে আজকালকার বড় দল—সর্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্ছে—গোঁড়া বেটাদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্চে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে তাকে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর 'সোঽহং সোঽহং' বলে রোগ ভাল করে দেয়—মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়া বেটাদের ত্রাহি-ত্রাহি এদেশে। Devil worship
৩
আর বড় একখানা চলছে না। আমাকে বেটারা যমের মত দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে—গোঁড়ামির জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিববার

নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন। থিওসফিষ্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্তাভজা। বল 'রোগ নেই'—বস্, ভাল হয়ে গেল, আর বল্ 'সোঽহং', বস্—ছুটি, চরে খাওগে। দেশ ঘোর materialist (জড়বাদী)। এই ক্রিশ্চিয়ান দেশের লোক—ব্যামো ভাল কর, আজগুবি কর; পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম মানে—অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে। যত বেটা দুষ্টু বজ্জাত, ঠক-জোচ্চোর মিশনরীরা তাদের ঘাড় ভাঙে আর তাদের পাপ মোচন করে। ... এরা আমাতে এক নূতন ঢৌলের মানুষ দেখেছে। গোঁড়া বেটাদের পর্যন্ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে, আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি করছে—বাবা ব্রহ্মচর্যের চেয়ে কি আর বল আছে?

আমি এখন মান্দ্রাজীদের Address (অভিনন্দন), যা এখানকার সব কাগজে ছেপে ধূমক্ষেত্র মোচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখতে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় তো ছাপিয়ে পাঠাব, যদি মাগগি হয় তো type-writing (টাইপ) করে পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরও এক কপি পাঠাব—'ইণ্ডিয়ান মিররে' ছাপিয়ে দিও।

এদেশের অবিবাহিত মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয় ডর করে। ... এরা হল বিরোচনের জাত। শরীর হল এদের ধর্ম, তাই মাজা, তাই ঘষা—তাই নিয়ে আছে। নখ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাটবার দশ হাজার, আর কাপড়-পোষাক গন্ধ-মসলার ঠিক-ঠিকানা কি! ... এরা ভাল মানুষ, দয়াবান্ সত্যবাদী। সব ভাল, কিন্তু ঐ যে 'ভোগ', ঐ ওদের ভগবান্—টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥—গীতা, ৪।১২

অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ—কি জোর, কি কার্যকুশলতা, কি ওজস্বিতা! হাতীর মত ঘোড়া—বড় বড় বাড়ীর মত গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এইখান থেকেই শুরু ঐ ঢৌল সব। মহাশক্তির বিকাশ—এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক —এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্ছাটির মত ঘাটে-মাঠে দোকান-হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে—আমি তার সিকিও করতে পারিনি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা; বাবা! এদের পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরী করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিত হয়ে মরব। তবে তোদের দেশের লোক মানুষের মধ্যে হবে। তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁষবার যুগ্যি নয়—তোদের মেয়েদের কথাই বা কি! হরে হরে, আরে বাবা, কি মহাপাপী! ১০ বৎসরের মেয়ের বর যুগিয়ে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু! কিমধিকমিতি—

আমি এদের এই আশ্চর্যি মেয়ে দেখি। একি মা জগদম্বার কৃপা! একি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেলে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে। মা তোরই কৃপা। গোলাপ-মা যা করেছে, তাতে আমি বড়ই খুশী। গোলাপ-মা বা গৌর-মা তাদের মন্ত্র দিয়ে দিক্ না কেন? মেয়ে-পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়া। বলো 'অস্তি অস্তি'; 'নাস্তি নাস্তি' করে দেশটা গেল! সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে জন্ম গেল! ঐ যে ছুঁচোগিরি, 'দীনাহীনা' ভাব—ও হল ব্যারাম। ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার! ন লিঙ্গং ধর্মকারণং, সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্। অস্তি অস্তি অস্তি, সোঽহং, সোঽহং চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং। 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'
৪
। ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'
৫
। শশী, তুই কিছু মনে করিস না—আমি সময়ে সময়ে nervous (দুর্বল) হয়ে পড়ি, দু-কথা বলে দিই। আমায় জানিস তো? তুই যে গোঁড়ামিতে নাই, তাতে আমি বড়ই খুশী। Avalanche৬ এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় করে, হর হর মহাদেব। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (আপনিই আপনাকে উদ্ধার করবে)।

রামদয়ালবাবু আমাকে এক পত্র লেখেন, আর তুলসীরামের এক পত্র পাইয়াছি। পলিটিক্যাল বিষয় তোমরা কেউ ছুঁয়ো না, এবং তুলসীরামবাবু যেন পলিটিক্যাল পত্র না লেখে। এখন পাবলিক ম্যান, অনর্থক শত্রু বাড়াবার দরকার নাই। তবে যদি পুলিশ-ফুলিশ পেছনে লাগে তোদের—'দাঁড়িয়ে জান দে'। ওরে বাপ, এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান যাবে? ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু, এবমস্তু, শিবোঽহং, শিবোঽহং (এইরূপই হউক, আমিই শিব)। রামদয়ালবাবুর কথামত ১০০ ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেব। তিনি বেচতে চান। টাকা আমাকে পাঠাতে হবে না, মঠে দিতে বলো। আমার এখানে ঢের টাকা আছে, কোন অভাব নাই—ইওরোপ বেড়াবার আর পুঁথিপত্র ছাপাবার জন্য। এ চিঠি ফাঁস করিস না।

আশীর্বাদক
নরেন্দ্র

এইবার কাজ ঠিক চলবে, আমি দেখতে পাচ্ছি। Nothing succeeds as success (কৃতকার্যতা যে সাফল্য এনে দেয়, আর কিছু তা পারে না)। বলি শশী, তুমি ঘর জাগাও—এই তোমার কাজ। ... কালী হোক business manager (বিষয়কার্যের পরিচালক)। মা-ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা খাড়া করতে পারলে তখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্তি। বুঝতে পারিস? দুই তিন হাজার টাকার মত একটা জায়গা দেখ। জায়গাটা বড় চাই। আপাততঃ মেটে ঘর, কালে তার উপর অট্টালিকা খাড়া হয়ে যাবে। যত শীঘ্র পার জায়গা দেখ। আমাকে চিঠি লিখবে। কালীকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করবে, কি রকম করে টাকা পাঠাতে হয়—Cook-এর দ্বারা কি প্রকারে। যত শীঘ্র পার ঐ কাজটা হওয়া চাই। ঐটি হলে বস্, আদ্দেক হাঁপ ছাড়ি। জায়গাটা বড় চাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের জন্য চিন্তা নাই, ধীরে ধীরে সব হবে। কলিকাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একবার জায়গা হলে মা-ঠাকুরাণীকে centre (কেন্দ্র) করে গৌর-মা, গোলাপ-মা একটা বেডোল হুজুক মাচিয়ে দিক্। মান্দ্রাজে হুজুক খুব মেচেছে, ভাল কথা বটে।

তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর? সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, কাউকে চটাতে হবে না। All the powers of good against all the powers of evil৭—এই হচ্ছে কথা। বিজয়বাবুকে খাতির-যত্ন যথোচিত করবে। Do not insist upon everybody's believing in our Guru.৮

আমি গোলাপ-মাকে একটা আলাদা পত্র লিখছি, পৌঁছে দিও। এখন তলিয়ে বুঝ—শশী ঘর ছেড়ে যেতে পারবে না; কালী বিষয়কার্য দেখবে আর চিঠিপত্র লিখবে। হয় সারদা, নয় শরৎ, নয় কালী—এদের সকলে একেবারে বাইরে না যায়—একজন যেন মঠে থাকে। তারপর যারা বাইরে যাবে, তারা যে-সকল লোক আমাদের সঙ্গে sympathy (সহানুভূতি) করবে, তাদের সঙ্গে মঠের যেন যোগ করে দেয়। কালী তাদের সঙ্গে correspondence (পত্রব্যবহার) রাখবে। একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দী—পার তো আর একটা ইংরেজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber (গ্রাহক) সংগ্রহ করতে ক-দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber (গ্রাহক) যোগাড় করুক। গুপ্ত৯—হিন্দী দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দী লিখবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। যে যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা permanent (স্থায়ী) টোল পাততে হবে। তবে লোক change (পরিবর্তিত) হতে থাকবে। আমি একটা পুঁথি লিখছি—এটা শেষ হলেই এক দৌড়ে ঘর আর কি! আর আমি বড় nervous (দুর্বল) হয়ে পড়েছি—কিছুদিন চুপ করে থাকার বড় দরকার। মান্দ্রাজীদের সঙ্গে সর্বদা correspondence (পত্রব্যবহার) রাখবে ও জায়গায় জায়গায় টোল খোলবার চেষ্টা করবে। বাকী বুদ্ধি তিনি দিবেন। সর্বদা মনে রেখো যে, পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নেই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে। 'আমার গুরুজীকে মানতেই হবে' বললেই দল বাঁধবে, আর সব ফাঁস হয়ে যাবে—সাবধান! সকলকেই মিষ্টি বচন—চটলে সব কাজ পণ্ড হয়। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out
১০
—বল্, আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।' খবরদার, No 'নেই নেই' (নেই নেই নয়); বল্—'হাঁ হাঁ,' 'সোঽহং সোঽহং'।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ॥
১১

মহা হুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।
১২
ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যস্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যস্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥

পীত্বা পীত্বা পরমপীযূষং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা শ্রীগুরুচরণং সর্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ॥
প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।

পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥
১৩

ইংরেজী লেখাপড়া-জানা young men (যুবক)-দের ভিতর কার্য করতে হবে। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (ত্যাগের দ্বারাই অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন)। ত্যাগ, ত্যাগ—এইটি খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। কার্য আরম্ভ করে দাও। তোমরা যদি একবার গোঁ ভরে কার্য আরম্ভ করে দাও, তা হলে আমি বোধ হয় কিছুদিন বিরাম লাভ করতে পারি। তার জন্যই বোধ হয় কোথাও বসতে পারতুম না—এত হাঙ্গাম করতে হবে না কি? মান্দ্রাজ থেকে আজ অনেক খবর এল। মান্দ্রাজীরা তোলপাড়টা করছে ভাল। মান্দ্রাজের মিটিং-এর খবর সব 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (Indian Mirror)-এ ছাপিয়ে দিও। আর কি অধিক লিখিব? সব খবর আমাকে খুঁটি-নাটি পাঠাবে। ইতি

বাবুরাম, যোগেন অত ভুগছে কেন?—'দীনাহীনা' ভাবের জ্বালায়। ব্যামো-ফ্যামো সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বল—এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যামো-ফ্যামো সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যামো ধরে না কি? ছুট! ঘণ্টাভর বসে ভাবতে বল—'আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি?' সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাব—'আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা'; দেখ দিকি কি বল বেরোয়। 'দীনহীনা!' কিসের 'দীনহীনা'? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? 'দীনহীনা' ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি। সব মঙ্গল হবে। No negative, all positive, affirmative—I am, God is and everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want.
১৪
আরে, এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝতে লাগল, আর তোমরা বসে বসে 'দীনাহীনা' ব্যামোয় ভোগো? কার ব্যামো—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! বলে, 'আমি কি তোমার মত বোকা?' আত্মায় আত্মায় কি ভেদ আছে? গুলিখোর জল ছুঁতে বড় ভয় পায়। 'দীনহীনা' কি এইসি তেইসি—নেই মাঙ্গতা 'দীনাক্ষীণা'! 'বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি'।
১৫
রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ (আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করিবে)—ওর মানে কি? বল—আমার ভেতর সব আছে, ইচ্ছা হলে বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বল, বাবুরাম যোগেন আত্মা—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বল ঘণ্টাখানেক দুচার দিন। সব রোগ বালাই দূর হয়ে যাবে। কিমধিকমিতি—

নরেন্দ্র

১১৮*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

হোটেল বেল ভিউ, ইওরোপীয়ান প্ল্যান
বীকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,
আমি আপনার কৃপালিপি দুইখানিই পেয়েছি। আমাকে শনিবারে মেলরোজ ফিরে গিয়ে সোমবার পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। মঙ্গলবার আপনার ওখানে যাব। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাটায় আপনার বাড়ী আমি ভুলে গেছি; আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায় লেখেন। আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না—কারণ, আপনি যা দিতে চেয়েছেন, ঠিক সেই জিনিষটাই আমি খুঁজছিলাম—লেখবার জন্য একটা নির্জন জায়গা। অবশ্য আপনি দয়া করে যতটা জায়গা আমার জন্য দিতে চেয়েছেন, তার চেয়ে কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে। আমি যেখানে হয় গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আরামে থাকতে পারব।

আপনার সদা বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

১১৯*

[ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

বোষ্টন
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,

ভারতের ডাক ও তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। ভারত থেকে বেশ কিছু সংবাদপত্রের অংশ কেটে আমার কাছে পাঠান হয়েছে। তুমি সেগুলি পড়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দেবে, তাই সেগুলি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভারতের চিঠি লেখার ব্যাপারে গত কয়েকদিন ধরে ব্যস্ত আছি। আরও দিন কয়েক বোষ্টনে থাকব। প্রীতি ও আশীর্বাদ।

সদা স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

১২০*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

... কলিকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে যে-সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিক নই, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে; সেইটি যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। ... অতএব তুমি কলিকাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত করা না হয়। কি আহাম্মকি! ... শুনলাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টান মিশনরীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্বসাধারণের সমক্ষে এ কথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি কলিকাতার যে-কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় তা প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁর ঐ বাজে আহাম্মকি কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার খ্রীষ্টান মিশনরীদের একটা অপকৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে খ্রীষ্টান-পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য করে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা ঐ রকম কিছু চর্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে, অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সম্পর্ক আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে ছাপান একটা খুব জমকাল ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, 'হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।'

... আমার বন্ধুগণকে বলবে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ করছেন, তাঁদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাটকেল মারতে যাই, তবে তো আমি তাঁদের সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়লুম। তাদের বলবে—সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, আমার জন্যে তাদের কারও সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না। তাদের (আমার বন্ধুদের) এখনও ঢের শিখতে হবে, তারা তো এখনও শিশুতুল্য। তারা বালক—তারা এখনও আহাম্মকের মত সোনার স্বপন দেখছে!

... সাধারণের সহিত জড়িত এই বাজে জীবনে এবং খবরের কাগজের হুজুকে আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।

তোমার প্রতি চিরস্নেহপূর্ণ
বিবেকানন্দ

১২১*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি যে-সকল কাগজ পাঠাইয়াছিলে, তাহা যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর এত দিনে তুমিও নিশ্চয় আমেরিকার কাগজে যে-সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকিবে। এখন সব ঠিক হইয়াছে। সর্বদা কলিকাতায় চিঠিপত্র লিখিবে। বৎস, এ পর্যন্ত তুমি সাহস দেখাইয়া আপনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছ। জি. জি-ও বড়ই অদ্ভুত ও সুন্দর কার্য করিয়াছে। হে আমার সাহসী নিঃস্বার্থ সন্তানগণ, তোমরা সকলেই বড় সুন্দর কার্য করিয়াছ। আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করিতেছি। ভারত তোমাদের লইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা ছাড়িও না। খেতড়ির রাজা ও কাঠিয়াওয়াড়স্থ লিমডির ঠাকুর সাহেব—যাহাতে আমার কার্যের বিষয় সর্বদা সংবাদ পান, তাহা করিবে। আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখিতেছি। যদি সস্তায় হয়, এখান হইতেই ছাপাইয়া পাঠাইয়া দিব, নতুবা টাইপ করিয়া পাঠাইয়া দিব। ভরসায় বুক বাঁধ—নিরাশ হইও না। এরূপ সুন্দরভাবে কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর যদি আবার তোমার নৈরাশ্য আসে, তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমাদের কার্যের আরম্ভ যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, আর কোন কার্যের আরম্ভ সেরূপ দেখা যায় না; আমাদের কার্য ভারতে ও তাহার বাহিরে যেরূপ দ্রুত বিস্তৃত হইয়াছে, এ পর্যন্ত ভারতে আর

কোন আন্দোলন সেরূপ হয় নাই।

আমি ভারতের বাহিরে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ কার্য বা সভাসমিতি করিতে ইচ্ছা করি না। ঐরূপ করিবার কোন উপকারিতা বুঝি না। ভারতই আমাদের কার্যক্ষেত্র, আর বিদেশে আমাদের কার্য সমাদৃত হওয়ার এইটুকু মূল্য যে, উহাতে ভারত জাগিবে; এই পর্যন্ত। আমেরিকার ব্যাপারে ভারতে আমাদের কার্য করিবার অধিকার ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভাববিস্তারের জন্য আমাদের দৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা—এখন এই দুইটি কেন্দ্র হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ভারতে আরও শত শত কেন্দ্র হইবে।

যদি পার তবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র উভয়ই বাহির কর। আমার যে-সকল ভ্রাতা চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন; আমিও অনেক গ্রাহক যোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব। মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হইও না, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

আপনার গাঁটের ব্যথা এখন প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে জেনে খুব সুখী হলাম। দয়া করে আপনার ভাইকে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য মাপ করতে বলবেন। আমি এখানে কিছু সংস্কৃত বই পেয়েছি এবং অধ্যায়নের সাহায্যও জুটেছে। অন্যত্র এরূপ পাবার আশা নাই; সুতরাং শেষ করে যাবার আগ্রহ হয়েছে। কাল আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনঃসুখারামের সঙ্গে দেখা হল; তিনি তাঁর এক সন্ন্যাসী বন্ধুকে বাড়ীতে রেখেছেন। তিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয়; তাঁর পুত্রও তাই।

ইচ্ছাশক্তিই জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকে। হে বৎস, যুবকগণ খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমাদের নিজেদের দোষেই ইহা ঘটিতেছে।

এইমাত্র রাশীকৃত সংবাদপত্র ও পরমহংসদেবের জীবনী আসিল—আমি সমুদয় পড়িয়া তারপর আবার কলম ধরিতেছি। আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এখন যে প্রকার অযথা নিয়ম ও আচারবন্ধন রহিয়াছে, তাহাতে তাহারা ঐরূপ না হইয়াই বা করে কি? উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই (এদেশে) ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যতপ্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা, ধর্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম নিতান্ত অপরিণত এবং সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যদেশীয় সমাজের চরণ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দূর হইতেছে, পাশ্চাত্যে ধর্মেরও ঠিক তাহাই হইতেছে। তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে এবং সহিষ্ণুতার সহিত কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রত্যেকের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারতের আদর্শ ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বা বহির্মুখী। পাশ্চাত্য এতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতিও সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই জন্য আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ—তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন; আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতি'কে বুঝিবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই! ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহার প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমি ইহাই শিক্ষা দিতেছি, আর আমাদিগকে ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সময় লাগিবে—অনেক সময় ও দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর এবং কাজ করিয়া যাও। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'।

আমি তোমাদের অভিনন্দনের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইহা ছাপাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। তা যদি সম্ভবপর না হয়, খানিকটা খানিকটা করিয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও অন্যান্য কাগজে ছাপাইবে।

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

পুঃ—বর্তমান হিন্দুসমাজ কেবল আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানুষের জন্য গঠিত এবং অন্য সকলকেই নির্দয়ভাবে পিষিয়া ফেলে। কেন? যাহারা সাংসারিক অসার বিষয়—যথা রূপরসাদি—একটু আধটু সম্ভোগ করিতে চায়, তাহারা কোথা যাইবে? তোমাদের ধর্ম যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম—সকল প্রকার অধিকারীকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের সমাজেরও তেমনি উচিত উচ্চ-নীচভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। ইহার উপায়—প্রথমে তোমাদিগকে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, পরে সামাজিক বিষয়ে উহা লাগাইতে হইবে। ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই কাজ করিতে হইবে। ইতি—

বি

১২২*

[হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত]

চিকাগো
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

অনেক দিন হইল আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়াছি, কিন্তু লিখিবার মত কিছুই ছিল না বলিয়া উত্তর দিতে দেরী করিলাম। মিঃ হেল-এর নিকট লিখিত আপনার চিঠি খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে, কারণ উহাদের নিকট আমার ঐটুকুই দেনা ছিল। আমি এ সময়টা এদেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং সব কিছু দেখিতেছি, এবং তাহার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র দেশ আছে, যেখানে মানুষ ধর্ম কি বস্তু তাহা বোঝে—সে দেশ হইল ভারতবর্ষ। হিন্দুদিগের সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে; আর তাহার নিঃস্বার্থ সন্তানগণের যথাযোগ্য যত্ন চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার কিছু উপাদান হিন্দুদের শান্ত গুণাবলীর সহিত মিলিত করিলে—এ যাবৎ পৃথিবীতে যত প্রকার মানুষ দেখা গিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের মানুষ আবির্ভূত হইবে।

কবে ভারতবর্ষে ফিরিতে পারিব, বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এদেশের যথেষ্ট আমি দেখিয়াছি, সুতরাং শীঘ্রই ইওরোপ রওনা হইতেছি—তারপর ভারতবর্ষ।

আপনার ও আপনার ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রতি আমার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

১২৩*

[মঠের সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

বাল্টিমোর, আমেরিকা
২২ অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার
১৬
পত্রপাঠে সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান অক্ষয়কুমার ঘোষের এক পত্র লণ্ডন নগর হইতে অদ্য পাইলাম, তাহাতেও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইলাম।

তোমাদের Address from the Town Hall meeting (টাউন হলের সভা হইতে অভিনন্দন) এস্থানের খবরের কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে। একেবারে Telegraph (টেলিগ্রাফ) করিবার আবশ্যক ছিল না। যাহা হউক, সকল কার্য কুশলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—এই পরম মঙ্গল। এ-সকল মিটিং ও Address-এর (অভিনন্দনের) প্রধান উদ্দেশ্য এদেশের জন্য নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য। এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে—Strike the iron while it is hot.
১৭
মহাশক্তিতে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কর। কুঁড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা অহমিকাভাব গঙ্গার জলে জন্মের মত বিসর্জন দাও ও মহাবলে কাজে লাগিয়া যাও। বাকী প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন। মহা বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। মাষ্টার মহাশয় ও G. C. Ghosh (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) প্রভৃতির দুই বৃহৎ পত্র পাইলাম। তাঁহাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। But work, work, work (কিন্তু কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর)—এই মূলমন্ত্র। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। এদেশে কার্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়িবে, সেইখানেই ফল ফলিবে—অদ্য বা শতাব্দান্তে বা। কারুর সঙ্গেই বিবাদে আবশ্যক নাই। সকলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া কার্য করিতে হইবে। তবে আশু ফল হইবে।

মীরাটের যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এক পত্র লিখিয়াছেন। তোমাদের দ্বারা যদি তাঁহার কোন সহায়তা হয়, করিবে। জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে। যোগেন ও বাবুরাম বোধ হয় এত দিনে বেশ সারিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন বোধ হয় Ceylon (সিংহল) হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে Ceylon (সিংহল)-এ পালি ভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন কেন না করে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। অনর্থক ভ্রমণে কি ফল? এবারকার উৎসব এমন করিবে যে, ভারতে পূর্বে আর হয় নাই। এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ কর এবং উক্ত উৎসবের মধ্যে অনেকেই হয়তো কিছু কিছু সহায়তা করিলে

আমাদের একটা স্থান হইয়া যাইবে। সকল বড়লোকের কাছে যাতায়াত করিবে। আমি যে-সকল চিঠিপত্র লিখি বা আমার সম্বন্ধে যাহা খবরের কাগজে পাও, তাহা সমস্ত না ছাপাইয়া যাহা বিবাদশূন্য এবং রাজনীতি সম্বন্ধে নহে, তন্মাত্র ছাপাইবে।

পূর্বের পত্রে লিখিয়াছি যে, তোমরা মা-ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। যত শীঘ্র পার। Businessman (কাজের লোক) হওয়া চাই, অন্ততঃ এক জনের। গোপালের এবং সাণ্ডেলের দেনা এখনও আছে কিনা এবং কত দেনা লিখিবে।

তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পদতলে, মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই—হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহ হইতে হইবে; এইটি যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।

এবারকার জন্মোৎসবে বোধ হয় আমি যোগদান করিতে পারিব। আমি পারি বা না পারি, এখন হইতে তার সূত্রপাত করিলে তবে মহা উৎসব হইতে পারিবে। অধিক লোক একত্র হইলে খিচুড়ি প্রভৃতি বসাইয়া খাওয়ান বড়ই অসম্ভব ও খাওয়া দাওয়া করিতেই দিন যায়। এজন্য যদি অধিক লোক হয়, তাহা হইলে দাঁড়া-প্রসাদ, অর্থাৎ একটা সরাতে লুচি প্রভৃতি হাতে হাতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। যদি ২০ হাজার লোকে চারি আনা করিয়া দেয় তো ৫ হাজার টাকা উঠিয়া যায়। পরমহংসদেবের জীবন এবং তাঁহার শিক্ষা এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে উপদেশ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙলার গ্রামে গ্রামে প্রায় হরিসভা আছে। ঐগুলিকে ধীরে ধীরে লইতে হইবে—বুঝিতে পার কিনা? সর্বদা আমাকে পত্র লিখিবে। অধিক newspaper cutting (খবরের কাগজের অংশ) পাঠাইবার আবশ্যক নাই—অনেক হইয়াছে। ইতি—

বিবেকানন্দ

১২৪*

ওয়াশিংটন
২৩ অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় বিহিমিয়া চাঁদ,

আমি এদেশে বেশ ভাল আছি। এতদিনে আমি ইহাদের নিজেদের ধর্মাচার্যগণের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহারা সকলে আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করে। সম্ভবতঃ আমি আগামী শীতে ভারতে ফিরিব। আপনি বোম্বাইয়ে মিঃ গান্ধীকে জানেন কি? তিনি এখনও চিকাগোতেই আছেন। ভারতে যেমন আমার অভ্যাস ছিল, এখানেও সেইরূপ আমি সমস্ত দেশের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। প্রভেদ এইটুকু যে, এখানে উপদেশ দিয়া, প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত আমার কথা শুনিয়াছে। এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রভু সর্বত্রই যোগাড় করিয়া দিতেছেন।

ওখানে (লিমডি, রাজপুতানায়) আমার সমস্ত বন্ধুদের ও আপনাকে ভালবাসা জানাইতেছি। ইতি

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ১২৫-১৩৪

১২৫*

[মিসেস হেলকে লিখিত]

১১২৫ সেণ্ট পল ষ্ট্রীট
বাল্টিমোর
অক্টোবর, ১৮৯৪

মা,

দেখুন, আমি কোথায় এসে পড়েছি। 'চিকাগো ট্রিবিউনে' ভারতের একটি টেলিগ্রাফ লক্ষ্য করেছেন কি? এখান থেকে যাব ওয়াশিংটন; সেখান থেকে ফিলাডেলফিয়া। তারপর নিউ ইয়র্ক। ফিলাডেলফিয়ায় আমাকে মিস মেরীর ঠিকানা পাঠাবেন। নিউ ইয়র্ক যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা করে যাব। আশা করি এতদিনে আপনি নিরুদ্বেগ হয়েছেন।

আপনার স্নেহের
বিবেকানন্দ

১২৬*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১৭০৩ ফার্ষ্ট ষ্ট্রীট
ওয়াশিংটন

প্রিয় ভগিনী,

তুমি অনুগ্রহ করে যে পত্র দুখানি লিখেছিলে সেগুলি পেয়েছি। আজ এখানে, কাল বাল্টিমোরে আমার বক্তৃতা হবে; পুনরায় সোমবার বাল্টিমোরে ও মঙ্গলবার এখানে। তার দিন কয়েক পরে যাচ্ছি ফিলাডেলফিয়া। ওয়াশিংটন থেকে যাবার দিন তোমাকে পত্র দেব। অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ফিলাডেলফিয়ায় মাত্র দিনকয়েক থাকব। ওখান থেকে নিউ ইয়র্ক। বার কয়েক নিউ ইয়র্ক—বোষ্টন দৌড়াদৌড়ি করে ডেট্রয়েট হয়ে চিকাগোয় যাব। তারপর প্রবীণ (Senator) পামার যেমন বলেন—'সাঁ করে ইংলণ্ডে।'

'ধর্মে'র ইংরেজী প্রতিশব্দ 'রিলিজন্'। কলিকাতাবাসিগণ পেট্রোর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করায় আমি খুব দুঃখিত। আমি এখানে বেশ সদ্ব্যবহার পেয়েছি, কাজও চমৎকার হচ্ছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। কেবল ভারত থেকে বোঝা বোঝা সংবাদপত্র আসায় বিরক্ত হয়েছিলাম। 'মাদার চার্চ' ও মিসেস গার্নসিকে সেগুলি গাড়ী বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়ে ভারতে ওদের নিষেধ করে দিলাম, আর যেন সংবাদপত্র না পাঠায়। ভারতে খুব হইচই পড়ে গিয়েছে। আলাসিঙ্গা লিখেছে, দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে আমার নাম রটেছে। ফলে পূর্বেকার যে শান্তি আর রইল না; এর পর আর কোথাও বিশ্রাম বা অবসর পাওয়া কঠিন। ভারতের এই সংবাদপত্রগুলি আমাকে শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি। কবে কি খেয়েছি, কখন হেঁচেছি—সব কিছু ছাপাবে। অবশ্য বোকামি আমারই। প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছিলাম নিঃশব্দে কিছু অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে; কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেছি, আর এখন চুপচাপ থাকতে পাব না। সকলে আনন্দে থাক।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

১২৭*

[ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

১৭০৮ ডব্লিউ, ১ ষ্ট্রীট, ওয়াশিংটন
২৬ (?) অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,

আমার দীর্ঘ নীরবতার জন্য ক্ষমা করো। ‘মাদার চার্চ’কে কিন্তু আমি নিয়মিত চিঠি লিখে যাচ্ছি। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই সুন্দর শীতল আবহাওয়া উপভোগ করছ। আমিও বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনকে খুব উপভোগ করছি। এখান থেকে ফিলাডেলফিয়া যাব। আমার ধারণা ছিল মিস মেরী ফিলাডেলফিয়ায় আছে; সুতরাং আমি তার ঠিকানা চেয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি অন্য কোন জায়গায় আছে। তাই মাদার চার্চের কথামত সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কষ্ট স্বীকার করুক, এ আমি চাই না।

যে মহিলাটির কাছে আমি আছি, তাঁর নাম মিস টটন, মিস হাউ-এর এক ভাইঝি। এখন এক সপ্তাহ তাঁর অতিথি হয়ে থাকব। সুতরাং তুমি তাঁর ঠিকানায় চিঠি লিখতে পার।

এই শীতে জানুআরী-ফেব্রুআরীর কোন এক সময়ে আমার ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছা। লণ্ডনের এক মহিলার কাছে আমার এক বন্ধু আছেন। মহিলাটি তাঁর আতিথ্যগ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওদিকে ফিরে যাবার জন্য ভারত থেকে প্রতিদিন তাগিদ দিচ্ছে।

কার্টুনে পিটুকে কেমন লাগল? কাউকে কিন্তু দেখিও না। পিটুকে নিয়ে এইভাবে তামাশা করা কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অন্যায়। তোমার কাছ থেকে চিঠি পেতে সব সময় আমার কত না আগ্রহ; দয়া করে যদি লেখাকে আর একটু স্পষ্ট করার পরিশ্রম করো। দোহাই, এই প্রস্তাবে চটে যেও না যেন।

তোমার সদা স্নেহময় ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১২৮*

ওয়াশিংটন
২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,
আপনি অনুগ্রহ করে আমায় মিঃ ফ্রেডারিক ডগলাসের নামে যে পরিচয়পত্র দিয়েছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাল্টিমোরে এক হোটেলওয়ালার নিকট আমি যে দুর্ব্যবহার পেয়েছি, সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। যেমন সর্বত্রই হয়েছে, এখানেও তেমনি—আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন, তারপর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। এখানে মিসেস টটনের বাড়ীতে বাস করছি। ইনি আমার চিকাগোর জনৈক বন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুতরাং সব দিকেই বেশ সুবিধা হচ্ছে। ইতি

বিবেকানন্দ

১২৯*

ওয়াশিংটন
২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
আমার শুভ আশীর্বাদ জানিবে। এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার অপর পত্রখানি পাইয়াছ। আমি কখনও কখনও তোমাদিগকে কড়া চিঠি লিখি, সেজন্য কিছু মনে করিও না। তোমাদিগের সকলকে আমি কতদূর ভালবাসি, তাহা তুমি ভালরূপই জান।

তুমি অনেকবার আমি কোথায় কোথায় ঘুরিতেছি, কি করিতেছি, তাহার সমুদয় বিবরণ ও আমার বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত আভাস জানিতে চাহিয়াছ। মোটামুটি জানিয়া রাখ, ভারতেও যাহা করিতাম, এখানে ঠিক তাহাই করিতেছি। ভগবান্ যেখানে লইয়া যাইতেছেন, সেখানেই যাইতেছি—পূর্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া আমার কোন কার্য হয় না। আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিও, আমাকে অবিশ্রান্ত কার্য করিতে হয়, সুতরাং আমার চিন্তারাশি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার অবসর নাই। এত বেশী কাজ রাতদিন করিতে হইতেছে যে, আমার স্নায়ুগুলি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে—আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত হইতে যথেষ্ট কাগজপত্র আসিয়াছে, আর আবশ্যক নাই। তুমি এবং মান্দ্রাজের অন্যান্য বন্ধুগণ আমার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা জানিয়া রাখ, তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য আমার নাম বাজান নহে; তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে সজাগ করাই ইহার উদ্দেশ্য। সংগঠন-কার্যে আমি পটু নই; ধ্যানধারণা ও অধ্যয়নের উপরই আমার ঝোঁক। আমার মনে হয়, যথেষ্ট কাজ করিয়াছি—এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই। আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দিব। তোমরা এখন জানিয়াছ, তোমরা কি করিতে পার। মান্দ্রাজের যুবকগণ, তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সব করিয়াছ—আমি তো নামমাত্র নেতা! আমি সংসারত্যাগী (অনাসক্ত সন্ন্যাসী); আমি কেবল একটি জিনিষ চাই। যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদ হউক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ‘ধর্ম’

নাম দিই না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে ধর্মকে তোমরা নিজের ধর্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত কর—ঈশ্বর তোমাদিগের সাহায্য করুন।

আমার উপর নির্ভর করিও না, নিজেদের উপর নির্ভর করিতে শেখ। আমি যে সর্বসাধারণের ভিতর একটা উৎসাহ উদ্দীপিত করিবার উপলক্ষ হইয়াছি, ইহাতে আমি নিজেকে সুখী মনে করি। এই উৎসাহের সুযোগ লইয়া অগ্রসর হও—এই উৎসাহস্রোতে গা ঢালিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে? খবরের কাগজে কি বলে না বলে, আমি সে দিকে লক্ষ্য করি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো? তবেই তুমি সর্বশক্তিমান্। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম তো? তাহাই যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়। ঈশ্বরই তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করিয়া থাকেন! তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। সকলেই আমাকে ভারতে আসিতে বলিতেছে। তাহারা মনে করে, আমি গেলে তাহারা বেশী কাজ করিতে পারিবে। বন্ধু, তাহারা ভুল বুঝিয়াছে। আজকাল যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, ইহা একটু স্বদেশহিতৈষণা মাত্র—ইহাতে কোন কাজ হইবে না। যদি উহা খাঁটি হয়, তবে দেখিবে অল্পকালের মধ্যেই শত শত বীর অগ্রসর হইয়া কার্যে লাগিয়া যাইবে। অতএব জানিয়া রাখ যে, তোমরাই সব করিয়াছ, ইহা জানিয়া আরও কার্য করিতে থাক, আমার দিকে তাকাইও না।

অক্ষয় এখন লণ্ডনে আছে—সে লণ্ডনে মিস মূলারের নিকট যাইবার জন্য আমাকে একখানি সুন্দর নিমন্ত্রণপত্র লিখিয়াছে। বোধ হয়, আগামী জানুআরী বা ফেব্রুআরীতে লণ্ডন যাইব। ভট্টাচার্য আমাকে ভারতে যাইতে লিখিতেছেন। এস্থান প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বিভিন্ন মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এদেশ অপেক্ষা আর কোথায় পাইব? এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে তো শত শত জন আমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভ্রাতাদের জন্য কাঁদে, আর এখানকার মেয়েরা দেবীর মত। মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কার্যে অগ্রসর হয়। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য করিয়া চলিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে কত শত বুদ্ধ নীরবে জীবন দিয়া গিয়াছেন!

প্রিয় বৎস আলাসিঙ্গা, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যগণের কথা কি বলিব, তাহারা আমাকে খাইতে দিয়াছে, পরিতে দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা আমার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে—খুব গোঁড়া খ্রীষ্টান পর্যন্ত। তাহাদের একজন পাদ্রী যদি ভারতে যায়, আমাদের দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে? তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ পর্যন্ত কর না, তাহারা যে ম্লেচ্ছ!!! বৎস, কোন ব্যক্তি—কোন জাতিই অপরকে ঘৃণা করিলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাবপোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও। বেদান্তের কথা ফস্ ফস্ মুখে আওড়ান খুব ভাল বটে, কিন্তু উহার একটি ক্ষুদ্র উপদেশও কার্যে পরিণত করা কি কঠিন!

আমি শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং এখানে আর খবরের কাগজ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভু তোমাকে চিরদিনের জন্য আশীর্বাদ করুন।

তোমাদের চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পুঃ—দুইটি জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর। ইতি

বি

১৩০*

[শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত]

চিকাগো
১৫ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনার অনুগ্রহ লিপি পাইয়াছি। আপনি যে এখানেও আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার সৌজন্যের নিদর্শন।

আপনার বন্ধু নারায়ণ হেমচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি বর্তমানে আমেরিকায় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি এখানে বহু চমকপ্রদ এবং অপূর্ব দৃশ্যাদি দেখিয়াছি।

আপনার ইওরোপে আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে জানিয়া সুখী হইলাম। যে প্রকারেই হউক এ সুযোগ অবশ্য গ্রহণ করিবেন। জগতের অন্যান্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাই আমাদের অধঃপতনের হেতু এবং পুনর্বার সকলের সহিত একযোগে জগতের জীবনধারায় ফিরিয়া যাইতে পারিলেই সে অবস্থার প্রতিকার হইবে। গতিই তো জীবন। আমেরিকা একটি অদ্ভুত দেশ। দরিদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে এদেশ যেন স্বর্গের মত। এদেশে দরিদ্র একরূপ নাই বলিলেই চলে এবং অন্য কোথাও মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মত স্বাধীন শিক্ষিত ও উন্নত নহে। সমাজে উহারাই সব।

ইহা এক অপূর্ব শিক্ষা। সন্ন্যাসজীবনের কোন ধর্ম—এমন কি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জিনিষগুলি পর্যন্ত আমাকে পরিবর্তিত করিতে হয় নাই, অথচ এই অতিথিবৎসল দেশে প্রত্যেকটি গৃহদ্বারই আমার জন্য উন্মুক্ত। যে প্রভু ভারতবর্ষে আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি কি আর এখানে আমাকে পরিচালিত করিবেন না? তিনি তো করিতেছেনই! একজন সন্ন্যাসীর এদেশে আসিবার কী প্রয়োজন ছিল, আপনি হয়তো তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ছিল। জগতের নিকট আপনাদের পরিচয়ের একমাত্র দাবী—ধর্ম, এবং সেই ধর্মের পতাকাবাহী যথার্থ খাঁটি লোক ভারতের বাহিরে প্রেরণ করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই ভারতবর্ষ যে আজও বাঁচিয়া আছে, এ কথা জগতের অন্যান্য জাতি বুঝিতে পারিবে।

বস্তুতঃ যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু লোকের এখন ভারতের বাহিরে জগতের অন্যান্য দেশে যাইয়া ইহা প্রতিষ্ঠা করা উচিত যে, ভারতবাসীরা বর্বর কিম্বা অসভ্য নহে। ঘরে বসিয়া হয়তো আপনারা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু আপনাদের জাতীয় জীবনের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে—আমার এ-কথা বিশ্বাস করুন।

যে সন্ন্যাসীর অন্তরে অপরের কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা বর্তমান নাই, সে সন্ন্যাসীই নহে—সে তো পশুমাত্র!

আমি অলস পর্যটক নহি, কিম্বা দৃশ্য দেখিয়া বেড়ানও আমার পেশা নহে। যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে আমার কার্যকলাপ দেখিতে পাইবেন এবং আজীবন আমাকে আশীর্বাদ করিবেন।

দ্বিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধ ধর্মমহাসভার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিতে হইয়াছিল। ধর্মমহাসভায় আমি কিছু বলিয়াছিলাম এবং তাহা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমার হাতের কাছে যে দু-চারিটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়িয়া আছে, তাহা হইতেই কিছু কিছু কাটিয়া পাঠাইতেছি। নিজের ঢাক নিজে পিটান আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আপনি আমাকে স্নেহ করেন, সেই সূত্রে আপনার নিকট বিশ্বাস করিয়া আমি এ-কথা অবশ্য বলিব যে, ইতোপূর্বে কোন হিন্দু এদেশে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং আমার আমেরিকা আগমনে যদি অন্য কোন কাজ নাও হইয়া থাকে, আমেরিকাবাসিগণ অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করিয়াছে যে, আজও ভারতবর্ষে এমন মানুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহাদের পাদমূলে বসিয়া জগতের সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতিও ধর্ম এবং নীতি শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আর হিন্দুজাতি যে একজন সন্ন্যাসীকে প্রতিনিধিরূপে এদেশে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার সার্থকতা উহাতেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইয়াছে বলিয়া কি আপনার মনে হয় না? বিস্তারিত বিবরণ বীরচাঁদ গান্ধীর নিকট অবগত হইবেন।

কয়েকটি পত্রিকা হইতে অংশবিশেষ আমি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছিঃ

‘সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভার মূল নীতি ও উহার সীমাবদ্ধতা যেরূপ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অন্য কেহই তাহা করিতে পারে নাই। তাঁহার বক্তৃতার সবটুকু আমি উদ্ধৃত করিতেছি এবং শ্রোতৃবৃন্দের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি এবং তাঁহার অকপট উক্তিসমূহ যে মধুর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ করেন, তাহা তদীয় গৈরিক বসন এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়।’— (নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক)

ঐ পৃষ্ঠাতেই পুনর্বার লিখিত আছেঃ

‘তাঁহার শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে হিন্দু সভ্যতার এক নূতন ধারা উন্মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, গম্ভীর ও সুললিত কণ্ঠস্বর স্বতই মানুষকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে এবং ঐ বিধিদত্ত সম্পদসহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গীর্জায় প্রচারের ফলে আজ আমরা তাঁর মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছি। কোন প্রকার নোট প্রস্তুত করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়া অপূর্ব কৌশল ও ঐকান্তিকতা সহকারে তিনি মীমাংসায় উপনীত হন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তাঁহার বাগ্মিতাকে অপূর্বভাবে সার্থক করিয়া তোলে।’

‘ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, এই শিক্ষিত জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা কত নির্বুদ্ধিতার কাজ।’—(হের‍্যাল্ড, এখানকার শ্রেষ্ঠ কাগজ)

আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না, পাছে আমায় দাম্ভিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আপনাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় কূপমণ্ডূকের মত হইয়াছে বলিয়া এবং বহির্জগতে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার মত অবস্থা আপনাদের নাই দেখিয়া এটুকু লেখা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা বলিতেছি না—আপনাকে মহাপ্রাণ বলিয়া জানি, কিন্তু

জাতির সর্বসাধারণের পক্ষে আমার উক্তি প্রযোজ্য।

আমি ভারতবর্ষে যেমন ছিলাম এখানেও ঠিক তেমনি আছি, কেবল এই বিশেষ উন্নত ও মার্জিত দেশে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি লাভ করিতেছি—যাহা আমাদের দেশের নির্বোধগণ স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না। আমাদের দেশে সাধুকে এক টুকরা রুটি দিতেও সবাই কুণ্ঠিত হয় আর এখানে একটি বক্তৃতার জন্য এক হাজার টাকা দিতেও সকলে প্রস্তুত; এবং যে উপদেশ ইহারা লাভ করিল, তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকে।

এই অপরিচিত দেশের নরনারী আমাকে যতটুকু বুঝিতে পারিতেছে, ভারতবর্ষে কেহ কখনও ততটুকু বোঝে নাই। আমি ইচ্ছা করিলে এখন এখানে পরম আরামের মধ্যে জীবন কাটাতেই পারি, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী এবং সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে ভালবাসি। অতএব দু-চারি মাস পরেই দেশে ফিরিতেছি এবং যাহারা কৃতজ্ঞতার ধারও ধারে না, তাহাদের মধ্যে পূর্বের মত নগরে নগরে ধর্ম ও উন্নতির বীজ বপন করিতে থাকিব।

আমেরিকার জনসাধারণ ভিন্নধর্মাবলম্বী হইয়াও আমার প্রতি যে সহায়তা সহানুভূতি শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য দেখাইয়াছে, তাহার সহিত আমার নিজ দেশের স্বার্থপরতা অকৃতজ্ঞতা ও ভিক্ষুক-মনোবৃত্তির তুলনা করিয়া আমি লজ্জা অনুভব করি এবং সেই জন্যই আপনাকে বলি যে, দেশের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দেশ দেখুন এবং নিজ অবস্থার সহিত তুলনা করুন।

এখন, এই-সকল উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিবার পর, ভারতবর্ষ হইতে একজন সন্ন্যাসী এদেশে প্রেরণ করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?

অনুগ্রহপূর্বক এই চিঠি প্রকাশ করিবেন না। ভারতবর্ষে থাকিতেও যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি—অপকৌশল দ্বারা নাম করাকে আমি ঘৃণা করি।

আমি প্রভুর কার্য করিয়া যাইতেছি এবং তিনি যেথায় লইয়া যাইবেন সেখানেই যাইব। 'মূকং করোতি বাচালং' ইত্যাদি—যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, তিনিই আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি মানুষের সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তবে ভারতবর্ষে কিম্বা আমেরিকায় কিম্বা উত্তর মেরুতে সর্বত্র তিনিই আমাকে সাহায্য করিবেন। আর যদি তিনি সাহায্য না করেন, তবে অন্য কেহই করিতে পারিবে না। চিরকাল প্রভুর জয় হউক। ইতি

আশীর্বাদক
আপনাদের বিবেকানন্দ

১৩১*

৫৪১, ডিয়ারর্বন এভিনিউ, চিকাগো
নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী,
আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পরিহাস আমি ঠিকই বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র শিশুটি নই যে, উহাতেই নিরস্ত হইব।

সংগঠন ও সংযোগশক্তিই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাফল্যের হেতু; আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সহায়তা দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। ... জৈনধর্মাবলম্বী বীরচাঁদ গান্ধীর কথাই ধরুন, তাঁহাকে আপনি বোম্বাইয়ে যথেষ্ট জানিতেন। এই ভদ্রলোকটি এদেশের দুর্জয় শীতেও নিরামিষ ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না এবং নিজের দেশ ও ধর্মকে প্রাণপণ সমর্থন করেন। এদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ পছন্দ করে, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে এদেশে পাঠাইয়াছিল, তাহারা আজ কি করিতেছে?—তাহারা বীরচাঁদকে জাতিচ্যুত করিতে সচেষ্ট।

হিংসারূপ পাপ দাসজাতির মধ্যেই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং উহাই তাহাদিগকে হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। এদেশে '—'রা বক্তৃতা করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল এবং কিছু সাফল্য লাভ যে করে নাই—এমন নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য আমি লাভ করিয়াছিলাম; আমি কোনপ্রকারে তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ হই নাই। তবে কি কারণে আমার সাফল্য অধিক হইয়াছিল? কারণ উহাই ছিল ভগবানের অভিপ্রায়।

এদেশে কেহ যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আর ভারতবর্ষে কাল যদি কোন একটি পএিকায় আপনি আমার প্রশংসা করিয়া এক ছত্র লেখেন, তবে পরদিন দেশসুদ্ধ সকলে আমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে। ইহার হেতু কি? হেতু—দাসসুলভ মনোবৃত্তি। নিজেদের মধ্যে কেহ সাধারণ স্তর হইতে একটু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, ইহা তাহাদের পক্ষে অসহ্য। এদেশের মুক্তিকামী, স্বাবলম্বী ও ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ জনগণের সহিত আমাদের দেশের অপদার্থ লোকগুলির কি আপনি তুলনা করিতে চান? আমাদের সহিত যাহাদের নিকটতম সাদৃশ্য আছে, তাহারা এদেশের সদ্যোদাসত্বমুক্ত নিগ্রোগণ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে প্রায় দুই কোটি নিগ্রো আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্বেত আমেরিকান বাস করে; অথচ এই শ্বেতকায় কয়েকজনই নিগ্রোদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছে।

আইন অনুসারে সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই দাসজাতির মুক্তির জন্য আমেরিকানরা ভাইয়ে ভাইয়ে এক নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। সেই একই দোষ—হিংসা এখানেও রহিয়াছে। একজন নিগ্রো আর একজনের প্রশংসা কিম্বা উন্নতি সহ্য করিতে পারে না; অবিলম্বে তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য আমেরিকানদিগের সহিত যোগ দেয়। ভারত- বর্ষের বাহিরে না আসিলে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব নহে।

যাহাদের প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাহাদের পক্ষে জগৎকে এইভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক বটে; কিন্তু যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি।

কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে?—তাহাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি ইহাদের নিষ্পেষণ হইতেই উদ্ভূত!

কিন্তু প্রভু মহান্। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, এ অন্যায়ের সমুচিত ফলও ফলিয়াছে। যাহারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এমন কি, যাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নির্মিত—কালচক্রের আবর্তনে তাহাদেরই হাজার হাজার লোক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছে; তাহাদের স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-সম্পত্তি সবই লুণ্ঠিত হইয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ইহাই চলিয়া আসিতেছে। আর ইহার পশ্চাতে কি কোন কারণ নাই বলিয়া আপনি মনে করেন?

ভারতবর্ষে দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন? এ-কথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। ... বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাঙলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।

এই নির্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী নাই—এ-কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা এিশ কোটি নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষেও যথেষ্ট।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে?—এ-সকল বাবুর দল কিম্বা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি?

এ-সকল সত্ত্বেও আমি বলি যে, ভগবান্ অবশ্যই একজন আছেন এবং এ-কথা পরিহাসের বিষয় নহে। তিনিই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; এবং যদিও আমি জানি যে, দাসজাতি তাহার স্বভাবদোষে যথার্থ হিতকারীকেই দংশন করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদেরই জন্য আমি প্রার্থনা করি এবং আমার সহিত আপনিও প্রার্থনা করুন। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ, তাহার প্রতি আপনি যথার্থ সহানুভূতিসম্পন্ন। আপনাকে জানিয়া অন্ততঃ এমন একজনকে জানিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি, যাঁহার মধ্যে সারবস্তু আছে, যাঁহার প্রকৃতি উদার এবং যিনি অন্তরে বাহিরে অকপট। তাই আমার সহিত 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আমি আপনাকে আহ্বান করি।

লোকে কি বলিল—সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি; তাহাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। মানুষের স্তুতি-নিন্দায় আমি দৃকপাতও করি না, তাহাদের অধিকাংশকেই অজ্ঞ কলরবকারী শিশুর মত মনে করি। সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঠিক মর্মকথাটি ইহারা কখনও বুঝিতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আমার সে অন্তর্দৃষ্টি আছে।

মুষ্টিমেয় সহকর্মীদের লইয়া এখন আমি কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি, আর উহাদের প্রত্যেকে আমারই মত দরিদ্র ভিক্ষুক। তাহাদিগকে আপনি দেখিয়াছেন। প্রভুর কাজ চিরদিন দীন-দরিদ্রগণই সম্পন্ন করিয়াছে। আশীর্বাদ করিবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট থাকে।

প্রেম এবং সহানুভূতিই একমাত্র পন্থা। ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।

প্রভু আপনাদের নিরন্তর সহায়তা করুন। আমার আশীর্বাদাদি জানিবেন।

১৩২*

[রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

১৮

নিউ ইয়র্ক
১৮ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,
সম্প্রতি কলিকাতা টাউন
হলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত
হইয়াছে এবং আমার সহ-
নাগরিকগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া
যে সহৃদয়তাপূর্ণ কথাগুলি
পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি।

মহাশয়, আমার ক্ষুদ্র কার্যও যে
আপনারা সাদরে অনুমোদন
করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের গভীরতম কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (policy)-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, যেখানেই কোন জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, সেখানেই তাহার পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে । ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ—ইহার অনিবার্য ফল এই হইল যে, যাহারা একদিন প্রাচীন জাতিসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে সমুদয় জাতির উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছি।

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে অপর জাতিসকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হইল; আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হইতেছি, ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যের কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাইবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু, যিনি বিদেশে ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জাতি বা ও-জাতির বিরুদ্ধে বিরক্তিপ্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আসুন, আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিতভাবে কার্যে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কেহ কিছু পাইবার ঠিক ঠিক উপযুক্ত হইলে জগতের কোন শক্তিই তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন।

ভবদীয় বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

১৩৩*

[মান্দ্রাজী ভক্তগণের উদ্দেশে শ্রীআলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
১৯ নভেম্বর, ১৮৯৪

হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ,

তোমাদের গত ১১ অক্টোবর তারিখের পত্র কাল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্যন্ত কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং আমাদের কার্যে উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে-কোনরূপেই হউক, সঙ্ঘের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে; আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব—নিশ্চয়ই। 'না' বলিলে চলিবে না। আর কিছুরই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ-কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বৈ আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি—এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে—অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—স্বাধীনতা ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই সম্ভব নহে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপরদিকে তাহাদের ধর্ম কিরূপ, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোষাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।

আমরা নির্বোধের মত জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? হাত বাড়াইয়া না পাইলে 'আঙুর টক' বলিব না তো কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? বাহ্য সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতাই ইহার কারণ। বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন। আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজেরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইওরোপের সমাজের মত একটি সমাজ গড়িতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন। যাহারা তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, কেবল তাহাদের সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্ত এ টাকা আসিবে। ইতোমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার শাখা স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর; কোনরূপ সামাজিক সংস্কারের কথা এখন প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোকদিগের কুসংস্কার যেন প্রশ্রয় না পায়। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ-সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসঙ্কীর্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটি মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরসঙ্কীর্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি

প্রজ্বলিত কর, আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগ। নেতৃত্ব করিবার সময় সেবকভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও; আর একজন গোপনে অপরের নিন্দা করিতেছে, তাহা শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ আর পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। এইটুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কাজ করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কাজ কর। কাজ কর, কাজ কর; পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক্ কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দন-পত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেঃ আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া—অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট—তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্বোধ হইতেই পার না। তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সম্প্রদায় ভাঙিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া যেন মরিতে না হয় যে, আমি নামের জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, বদ মতলবের একবিন্দু দাগ পর্যন্ত যেন না থাকে।

গুপ্ত বদমাশি, লুকোন জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন নিজেকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না; গুরুগিরি চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা না থাক, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার তো প্রেম আছে? ভগবান্ তো তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

ভারত হইতে প্রকাশিত থিওসফিষ্টদের একখানি কাগজে লিখিতেছে, তাঁহারা আমার সাফল্যের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন! বটেই তো!!! নিছক বাজে কথা—থিওসফিষ্টরা আমার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে!

সাবধান! আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত কৃতকার্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশ শতাব্দী তোমাদের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কাজ করিয়া যাও।

ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছি। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এখানে প্রচারের যেমন সুবিধা, সাহায্যপ্রাপ্তিরও সেইরূপ আশা। ভারতে লোকেরা বড় জোর আমার প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু কেহ একটি পয়সা দিতে রাজী নয়। পাইবেই বা কোথায়? নিজেরা যে ভিক্ষুক! তারপর ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (Nation), সর্বসাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা এই নূতন ভাব পাইতেছে। সুতরাং তাহাদিগের উপর আমার দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরে আরও বিস্তারিত লিখিতেছি। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্বাদ । ইতি—

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ফোনগ্রাফ সম্বন্ধে তোমাদের আর খবর লইবার প্রয়োজন নাই। আমি এইমাত্র খেতড়ি হইতে খবর পাইলাম যে, উহা নিরাপদে তথায় পৌঁছিয়াছে। ইতি

বি

১৩৪*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ফোনগ্রাফ ও পত্রখানি তোমার কাছে নিরাপদে পৌঁছেছে জেনে আনন্দিত হইলাম। আমাকে খবরের কাগজের অংশ কেটে আর পাঠাবার দরকার নেই, কাগজের বন্যা আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে—এখন যথেষ্ট হয়েছে, আর আবশ্যক নেই। এখন সঙ্ঘের জন্য খাট। আমি ইতোমধ্যেই নিউ ইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি, তার সহকারী সভাপতি শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখবেন—তুমিও যত শীঘ্র পার তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে আরম্ভ কর। আশা করি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হব।

আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সংহত করতে হবে—একটা সম্প্রদায় গড়বার জন্যও নয়, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের জন্যও নয়, কিন্তু বৈষয়িক দিকটার জন্য। জোরের সহিত প্রচারকার্য চালাতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো একত্র কর ও সঙ্ঘবদ্ধ হও।

রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা জীবন দেখছি—গরু-তাড়ানো ঘুচল না।

মস্তিষ্কহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে 'ডি. গুপ্তের ঔষধে' পরিণত করা ছাড়া কি রামকৃষ্ণের জগতে আর কোন কাজ ছিল না? প্রভু আমাকে এই কলিকাতার লোকদের হাত থেকে রক্ষা করুন! কি সব লোক নিয়ে কাজ করতে হবে! যদি এরা শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবনচরিত লিখতে পারে—তিনি কি জন্য এসেছিলেন, কি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক্ লক্ষ্য রেখে লিখতে পারে, তবে লিখুক। নতুবা এইসব আবোল-তাবোল লিখে তাঁর জীবনী ও উপদেশকে যেন বিকৃত করা না হয়। এ-সব লোক ভগবানকে জানতে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভেতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এ-রকম আহাম্মকি দেখলে আমার রক্ত টগবগ ফুটতে থাকে।

কিডি তাঁর ভক্তি, জ্ঞান ও ধর্মসমন্বয়ের কথা এবং অন্যান্য উপদেশ তর্জমা করুন না? এই লিখতে হবে যে, তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক্ বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে। শাস্ত্রে যে-সব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি তার মূর্ত দৃষ্টান্ত। ঋষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়া গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তি তাঁর একান্ন-বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র, পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদিগকে ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি—তাঁর এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হতে পারে। এসব ভাব নিয়ে তাঁর একখানি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীবনচরিত লেখা যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। কুরুচিপূর্ণ অসংলগ্ন ভাষা পরিহার করবে। ... অন্যান্য জাতিরা এগুলিকে চূড়ান্ত অশ্লীলতা মনে করে। তাঁর ইংরেজী জীবনচরিত সমগ্র জগৎ পড়বে, সুতরাং সাবধান, ঐপ্রকার শব্দ ও ভাব যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমার নিকট প্রেরিত একখানা জীবনচরিত পড়লাম, তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। ... সুতরাং খুব সাবধান—খুব সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে।

কলিকাতায় বন্ধুদের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই, অথচ হামবড়াইটা খুব আছে—তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে, অপরের পরামর্শ শুনতে একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভদ্রলোকদের নিয়ে যে কি করব তা বুঝি না—তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করি না। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তারা যে বাঙলা বইখানি পাঠিয়েছে, তার জন্য লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। লেখক হয়তো ভেবেছেন যে, তিনি খোলাখুলিভাবে সত্য লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, পরমহংসদেবের ভাষা পর্যন্ত বজায় রাখছেন; কিন্তু তিনি এটা ভাবেননি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের সামনে কখনও এ-রকম ভাষা ব্যবহার করতেন না। এই লেখক আশা করেন, তাঁর বই স্ত্রীপুরুষ সমভাবে পড়বে। প্রভু আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন! তারা আবার নিজের খেয়ালে চলে মনে করে, তারা সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছে! দূর ছাই এরূপ মস্তিষ্কহীনদের ভেতর দিয়ে যা কিছু বেরোয়, তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজেরা ভিখারী—রাজার মত চালচলন দেখাতে চায়। নিজেরা আহাম্মক, মনে করে—আমরা মস্ত জ্ঞানী! নগণ্য দাস সব, মনে করছে—আমরা প্রভু! এই তো তাদের অবস্থা! কি যে করব, কিছু বুঝতে পারি না। প্রভু আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আশা-ভরসা তোমাদের উপর। কাজ করে যাও, কলিকাতার লোকদের মতানুসারে চলো না, কেবল তাদের না চটিয়ে খুশী রেখে যাও এই আশায় যে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ ভাল দাঁড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাজে অগ্রসর হও। ভাত রান্না হলে অনেকেই পাত পেতে বসে যায়। সাবধান—কাজ করে যাও। সতত আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ১৩৫-১৪৪

১৩৫*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার মন যে এদিক ওদিক করছে, তা সব পড়লাম। সুখী হলাম যে, তুমি রামকৃষ্ণকে ত্যাগ করনি। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি—তাঁর সম্বন্ধে যে-সব অদ্ভুত গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি থেকে আর যে-সব অহাম্মক ওগুলি লিখছে তাদের থেকে তুমি তফাত থাকবে। সেগুলি সত্য বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝছি, আহাম্মকেরা সব তালগোল পাকিয়ে খিচুড়ি করে ফেলবে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার ছিল! তবে সিদ্ধাইরূপ বাজে জিনিষগুলোর ওপর অত ঝোঁক দাও কেন? অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারলেই তো আর ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না—জড়ের দ্বারা তো আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ? তুমি ঐ-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না, তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাক আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক যে, আমি তোমার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এটা ওটা নিয়ে মনকে চঞ্চল করো না। রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পানীয় পান করে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে, তা অপরকে পান করতে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিও না, অথবা তোমার গোঁড়ামি দ্বারা অপরকেও বিরক্ত করো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। এই কাজের জন্য তোমায় আশীর্বাদ করছি—কাজ করে যাও। এখন প্রভুর নাম প্রচার করগে।

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

১৩৬*

[ডাঃ নাঞ্জুণ্ড রাওকে লিখিত]

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম। তুমি যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বুঝতে পেরেছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই তো হল ভগবানলাভের অন্যতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রাজবাসীর উপর চিরকাল অনেক আশা পোষণ করে এসেছি। এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মান্দ্রাজ থেকেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উঠে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। আমি কেবল এই প্রার্থনা করতে পারি যে, তোমার শুভ সঙ্কল্প শীঘ্র সিদ্ধ হোক। তবে বৎস, তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বিঘ্নগুলির কথাও আমার বলা উচিত। প্রথমতঃ এটি দেখতে হবে যে, হঠাৎ কিছু করে ফেলা কারও পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ তোমার মা এবং স্ত্রীর জন্যও একটু ভাবা উচিত। অবশ্য তুমি বলতে পার, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা সংসার ত্যাগ করবার সময় তাঁদের মা-বাপের মতামতে কি সব সময় চলেছিলেন? আমি জানি, নিশ্চিত জানি যে, বড় বড় কাজ খুব স্বার্থত্যাগ ব্যতীত হতে পারে না। আমি নিশ্চিত জানি, ভারতমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবন বলি চান, আর আমার অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর কৃপায় তাঁদেরই অন্যতম হবার সৌভাগ্য লাভ করবে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাবে, মহাপুরুষগণ চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর সাধারণ লোক তার সুফল ভোগ করেছে। তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিকামনা পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ এ কথাটা ভেবে দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দিই যে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য স্ত্রীর সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়ে তোমার পিতার গৃহেই বাস কর—ইহাই 'কুটীচক' অবস্থা। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ করতে যাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও সম্মত করবার চেষ্টা কর। আর তোমার যদি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সর্বজয়ী প্রেম ও সর্বশক্তির চিত্তশুদ্ধি থাকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেশ্যসাধনে শীঘ্রই সফলতা লাভ করবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-প্রচারকার্যে লেগে যাও দেখি—কারণ, সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে কর্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন আর খুব সাধনভজনের অভ্যাস কর। তোমাকে মানব-জাতির একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য হতে হবে, আর আমার গুরু মহারাজ বলতেন, 'নিজেকে মারতে হলে একটি নরুন দিয়ে হয়, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তরবারের দরকার।' তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয় ও অনেক তর্ক-যুক্তি করে বোঝাতে হয়, কিন্তু নিজের ধর্মলাভ কেবল একটি কথায় বিশ্বাস করলেই হয়। আর যখন ঠিক সময় হবে, তখন তুমি সমগ্র জগতে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার করবার

অধিকারী হবে। তোমার সঙ্কল্প অতি শুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই—ভগবান্ শীঘ্র তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায় হোন, কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু করে ফেল না। প্রথমে কর্ম ও সাধন-ভজনের দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর।

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারিদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? কে নাম, যশ, ঐশ্বর্যভোগ—এমন কি ইহলোক-পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগোবে? কয়েকটি যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে—তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা খুব অল্পসংখ্যক; এইরূপ কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন। তারা নিশ্চয়ই আসবে।আমি আনন্দিত যে, আমাদের প্রভু তোমার মনে তাঁদের অন্যতম হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রভু যাকে মনোনীত করবেন, সে-ই ধন্য—সে-ই মহাগৌরবের অধিকারী। তমোহ্রদে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে প্রভুর জ্যোতির্ময় রাজ্যে আনবার জন্য তোমার সঙ্কল্প উত্তম, আশা উচ্চ এবং লক্ষ্য অতি মহৎ।

কিন্তু হে বৎস, এতে অন্তরায় আছে। হঠাৎ কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সামনে তো অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মত শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে। ভগবান্ শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

১৩৭**

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১৬৮, ব্র্যাট্‌ল্‌ স্ট্রীট, কেম্ব্রিজ
৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,
এখানে তিন দিন আছি। লেডী হেনরী সমারসেটের একটি সুন্দর বক্তৃতা হল। এখানে রোজ সকালে বেদান্ত বা অপরাপর বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য একখানি 'বেদান্তধর্ম' (Vedantism) 'মাদার টেম্পলের' নিকট দিয়েছিলাম। সে-খানি বোধ করি পেয়েছ। আর একদিন স্প্যাল্ডিংদের ওখানে খেতে গিয়েছিলাম। আমার আপত্তি সত্ত্বেও সেদিন তারা ধরে বসল মার্কিনদের সমালোচনা করতে হবে। আলোচনা তাদের অপ্রিয় হয়ে থাকবে; হওয়া স্বাভাবিক বটে—সর্বদা, সর্বত্র। চিকাগোয় 'মাদার চার্চ' ও পরিবারস্থ সকলের খবর কি? অনেকদিন হল তাঁদের কোন পত্র পাইনি। সময় পেলে এর পূর্বেই চট করে শহরে গিয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসতাম। সারাদিনই বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর ভয়, গিয়েও যদি দেখা না হয়।

তোমার যদি অবসর থাকে লিখো; আমি সুযোগ পাওয়া মাত্রই তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব। অপরাহ্ণের দিকে আমার অবকাশ। সকাল থেকে বেলা ১২টা ১টা পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। এইভাবে চলবে—যে পর্যন্ত এখানে আছি অর্থাৎ এই মাসের ২৭ বা ২৮ তারিখ পর্যন্ত। সকলে আমার প্রীতি জানবে। ইতি

তোমার চিরস্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১৩৮*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

কেম্ব্রিজ
ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,
এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। তোমাদের সামাজিক প্রথায় যদি না বাধে তা হলে মিসেস ওলি বুল, মিস ফার্মার, এবং মিসেস

এডামস্ নামক চিকাগো হতে আগত ব্যায়ামবিশারদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাও না কেন?

যে-কোন দিন তাদের সেখানে পাবে।

তোমাদের চিরস্নেহশীল
বিবেকানন্দ

১৩৯*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

কেম্ব্রিজ
২১ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,
এর পর তোমার আর কোন পত্র পাইনি। আগামী মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে চলে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে তুমি মিসেস বুলের পত্র অবশ্য পেয়ে থাকবে। আমি যে-কোন দিন সানন্দে তোমার কাছে যাব; বক্তৃতা শেষ হওয়ায় আমার এখন অবকাশ আছে—আগামী রবিবার ছাড়া।

চিরস্নেহশীল
বিবেকানন্দ

১৪০*

[আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত]

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয়বরেষু,
শুভাশীর্বাদ। তোমার পত্র এই মাত্র পেলাম। নরসিংহ ভারতে পৌঁছেছে শুনে সুখী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তকখানি তোমায় পাঠাতে পারিনি, সেইজন্য আমি দুঃখিত। পাঠাতে চেষ্টা করব। কথাটা হচ্ছে এই যে, ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরানো হয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কিনা জানি না, আর তুমি যে কাগজখানির কথা উল্লেখ করেছ, তার সম্বন্ধেও কখনও কিছু জানিনি। এখন ডাঃ ব্যারোজ, ধর্মমহাসভা, তৎসংক্রান্ত এই পত্র ও অন্য যা কিছু সব প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং তোমরাও ঐগুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাবতে পার।

এখন আমার সম্বন্ধে প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিশনরী কাগজে আমাকে আক্রমণ করে লিখে থাকে। তার কোনটা আমার দেখবার ইচ্ছাও হয় না। যদি ভারতের ঐ-রকম মিশনরীদের আক্রমণ-সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাজের জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিপক্ষে ভালমন্দ কি বলছে, সেদিকে আর লক্ষ্য করো না। তুমি তোমার কাজ করে যাও, আর মনে রেখো—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিত দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে, আর তোমাকে আলাদা বলছি, তুমি যতটা ভাবছ তার চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়েছে। সব জিনিষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

বাল্টিমোরের ঘটনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে লোকে নিগ্রোদের সঙ্গে অন্য কৃষ্ণকায় জাতির প্রভেদ জানে না। যখন জানতে পারবে, তখন দেখবে—তারা খুব অতিথিবৎসল। 'টমাস আ কেম্পিসে'র কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নূতন সংবাদ বটে! আমি তোমায় পূর্বেও লিখেছি, এখনও লিখছি, আমি খবরের কাগজের সুখ্যাতি বা নিন্দায় মোটেই কান দিই না, ঐরূপ কিছু আমার কাছে এলে আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি, তোমরাও তাই করো। খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে মন দিও না। মন মুখ এক করে নিজের কর্তব্য করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে! দোহাই, আমাকে খবরের কাগজ, সাময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। আমি সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুতরাং ঐ সব জিনিষের বোঝা বইতে গেলে আমার কি কষ্ট, তা বুঝতেই পারছ।

মিশনরীদের মিথ্যা উক্তিগুলি গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না—এখানে কোন ভদ্রলোকই তাদের আমল দেয় না। ভারতে তারা হাত-পা চাপড়াক, ডাঃ ব্যারোজও যে এখানে খুব বড় লোক, তা নয়। সম্পূর্ণ নীরবতাই হচ্ছে তাদের উক্তিগুলির প্রতিবাদ, আমার

ইচ্ছা—তোমরা তাই কর। সর্বোপরি, আমাকে ভারতীয় খবরের কাগজের বন্যায় ভাসিয়ে দিও না, ওর থেকে আমার যা দরকার ছিল তা হয়ে গেছে, আর না। এখন কাজে মন দাও। সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি করো। আমি তাঁর মত অকপট ও মহানুভব লোক আর দেখিনি। তাঁর ভেতর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির খুব সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। তাঁকে সভাপতি করে কাজে অগ্রসর হও। আমার ওপর বেশী নির্ভর করো না—নিজেদের ওপর নির্ভর করে যাও। এখনও আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি, মান্দ্রাজ থেকেই শক্তিতরঙ্গ উঠবে। আমার সম্বন্ধে কথা এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি—জানি না। আমি এখানে এবং ভারতে দু-জায়গাতেই কাজ করছি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারব, এই পর্যন্ত সাহায্য করতে পারি। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে।

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

১৪১*

[লালা গোবিন্দ সহায়কে লিখিত]

C/o. জি. ডবলিউ. হেল, এস্কোয়ার
চিকাগো
১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,
আমার কলিকাতার গুরুভ্রাতাগণের সহিত তোমার পত্রব্যবহার আছে কি? তুমি চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায় এবং সাংসারিক ব্যাপারে বেশ উন্নতি করিতেছ তো? হয়তো শুনিয়া থাকিবে—কিভাবে প্রায় বৎসরাধিক কাল আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচার করিতেছি। এখানে বেশ ভালই আছি। যত শীঘ্র পার এবং যতবার ইচ্ছা আমাকে চিঠি লিখিও।

সস্নেহ
বিবেকানন্দ

১৪২*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,
… সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং পরিণামে ধার্মিক লোকের জয় হইবেই। … বৎস, সর্বদা মনে রাখিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথবা যত উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গেই থাকি না কেন, আমি সর্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের, সর্বাপেক্ষা সামান্যপদস্থ ব্যক্তির জন্যও প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহাকে স্মরণ রাখিতেছি। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

১৪৩

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,
তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মজুমদারের লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করতে গেলে ঐ-রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই। মজুমদার দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল—বড় খাতির ও সম্মান; এবার আমার পোয়াবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া মজুমদারের ছেলেমানষি। যাক, উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধিরপোষিতাঃ? 'অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং' ইত্যাদয়ঃ সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ মজুমদারাখ্যঃ।
১৯
প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রবোধিত হয়। মজুমদার-ফজুমদারের কর্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের

আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form.
২০
হরমোহন প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা, কে বান্যে হরমোহনাদয়ঃ? তথাপি মম হৃদয়কৃতজ্ঞতা তান্ প্রতি। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—নৈষ প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়মিতি।
২১
প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই; বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ প্রীতি ও ভক্তি করে, আর শত শত পাদ্রী ও গোঁড়া ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্,
২২
আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য! যে শহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়েছে—Cyclonic Hindu.
২৩
তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও— I am a voice without a form (আমি অমূর্ত বাণী)।

ইংলণ্ডে যাব কি যমল্যাণ্ডে, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। এদেশে একটা চুরুটের দাম এক টাকা, একবার ঠিকাগাড়ী চড়লে ৩৲ টাকা, একটা জামার দাম ১০০৲ টাকা। ৯৲ টাকা রোজ হোটেল—প্রভু সব যুগিয়ে দেন। এদেশের সব বড় বড় লোকের বাড়ীতে যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম খাওয়া-পরা সব আসছে—জয় প্রভু, আমি কিছু জানি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।'
২৪
'বিগতভীঃ' হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। কেহ যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই ও রাজপুতানার। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে! সব খবর পাচ্ছি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—এ কথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাদা, কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনি সাধারণ মানুষের ঈর্ষা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোন ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দা হঠছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। পর্দা উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে, slow but sure (ধীরে কিন্তু নিশ্চিত), কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা।' দাদা, এ সব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। আমার পত্র অন্য কেউ যেন না পড়ে, তোমরা ছাড়া। হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, leader (নেতা) কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কিনা? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগান। Jealousy, selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে leader. প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader. সব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক জাল গুটাচ্ছেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ, প্রীতিঃ পরমসাধনম্
২৫
বুঝলে কিনা? Love conquers in the long run,
২৬
দিক্ হলে চলবে না—wait, wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর); সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। যোগেনের কথা কিছুই লেখ নাই। রাখাল-রাজা ঘুরে ফিরে পুনর্বৃন্দাবনং গচ্ছেদিতি। ...

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দাও; তবে দেখো কোন form (বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একান্ত আবশ্যক) না হয়, unity in variety (বহুত্বে একত্ব)—সর্বজনীন ভাবের যেন কোনমতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment universality.
২৭
আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখবে যে, সর্বজনীনতা—perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others.
২৮
ঐ দিয়ে বড় বড় জাহাজডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে, মনে রেখো। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে। মঠ কেমন চলছে, উৎসব কেমন হল, গোপাল—বুড়ো ও হুটকো কোথায় কেমন, গুপ্ত কোথায় কেমন—সব লিখবে। মাষ্টার কি বলে? ঘোষজা কি বলে? রামদাদা ঠাণ্ডা ভাব পেয়েছে কি না? দাদা, সকলের ইচ্ছা যে leader (নেতা) হয়, কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটি বুঝতে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। প্রভুর কৃপায় রামদাদা শীঘ্রই ঠাণ্ডা হবে ও বুঝতে পারবে। তাঁর কৃপা কাউকে ছাড়বে না। জি. সি. ঘোষ কি করছে?

আমাদের মাতৃকাগণ বেঁচে বর্তে আছে তো? গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহান্ ও উদ্দীপনাময় ভাব)। যোগেন-মা প্রভৃতি সকলে ভাল আছে বোধ হয়। ভায়া, আমার পেটটা এমন ফুলছে যে, কালে বোধ হয় দরজা টরজা কাটতে হবে। মহিম চক্রবর্তী কি করছে? তার ওখানে যাওয়া-আসা করিবে। লোকটা ভাল। আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil.
২৯
মহেন্দ্র মাষ্টারকে request from me (আমার তরফ থেকে অনুরোধ কর)। He can do it (তিনি এটা করতে পারবেন)। আমাদের একটা বড় দোষ—সন্ন্যাসের গরিমা। ওটা প্রথম প্রথম দরকার ছিল, এখন আমরা পেকে গেছি, ওটার আবশ্যক

একেবারেই নাই। বুঝতে পেরেছ? সন্ন্যাসী আর গৃহস্থে কোন ভেদ থাকবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। সকলকে ডেকে বুঝিয়ে দেবে—মাষ্টার, জি. সি. ঘোষ, রামদা, অতুল আর আর সকলকে নিমন্ত্রণ করে যে, ৫|৭টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্ধমান) গতিতে বাড়তে চলল—এ হুজুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি jealousy (ঈর্ষা) পরিত্যাগ করে united action (সমবেতভাবে কার্য) কর। Shameful (লজ্জার কথা), আমরা universal religion (সর্বজনীন ধর্ম) করছি দলাদলি করে। যদি গিরিশ ঘোষ, মাষ্টার আর রামবাবু ঐটি করতে পারে, তবে বলি বাহাদুর আর বিশ্বাসী, নইলে মিছে nonsense (বাজে)।

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বললেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তাহলে সকল ন্যাটা চুকে যায়। কিন্ত ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়াবার শক্তি নাই, কিন্ত কাউকে উঠতে দেব না—বললে কি চলে? ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত। ঐ terrible jealousy characteristic (ভয়ানক চারিত্রিক বিশেষত্ব ঈর্ষা), আমাদের, বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, we are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus.
৩০
পাঁচটা দেশ দেখলে ঐটি বেশ করে বুঝতে পারবে। আমাদের সমাত্মা এই গুণে এদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ)-দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক ঐ রকম। গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে ।

At any cost, any price, any sacrifice (ওর জন্য যতই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হোক) ঐটি আমাদের ভিতরে না ঢোকে—আমরা দশ-জন হই, দুজন হই do not care (কুছ পরোয়া নেই), কিন্তু ঐ কয়টা perfect characters (সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ চরিত্র) হওয়া চাই। আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া—বুঝতে পারছ কি? হাত ব্যথা হয়ে এল … আর লিখতে পারি না। 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব্‌ রঘুবীর রাখে টেক্‌'। রঘুবীর টেক্ রাখবেন দাদা—সে বিষয় তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো। বাঙলাদেশে তাঁর নাম প্রচার হল বা না হল, তাতে আমার অণুমাত্র চেষ্টা নাই—ওগুলো কি মানুষ! রাজপুতানা, পাঞ্জাব, N.W. (উত্তর-পশ্চিম) প্রদেশ,
৩১
মান্দ্রাজ—ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে। রাজপুতানায় যেখানে 'রঘুকুলরীতি সদা চলি আঈ। প্রাণ জাঈ বরু বচন ন জাঈ॥'—এখনও বাস করে।

পাখী উড়তে উড়তে এক জায়গায় পৌছায়, যেখান থেকে অত্যন্ত শান্তভাবে নীচের দিকে দেখে। সে জায়গায় পৌঁছেছে কি? যিনি সেখানে পৌছান নাই, তাঁর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্ছেন—শীতকাল কাটিয়ে দেওয়া গেল। শীতকালে এদেশে সর্বাঙ্গে electricity (তড়িৎ) ভরে যায়। Shake-hand (করমর্দন) করতে গেলে shock (ধাক্কা) লাগে আর আওয়াজ হয়—আঙুল দিয়ে গ্যাস জ্বালান যায়। আর শীতের কথা তো লিখেছি। সারা দেশটা দাবড়ে বেড়াচ্ছি, কিন্ত চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরে ফিরে আবার চিকাগোয় আসি। এখন পূর্বদিকে যাচ্ছি, কোথায় যে বেড়া পায়ে লাগবে, তিনি জানেন। মা-ঠাকরুন দেশে গেছেন; তাঁর শরীর বোধ হয় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করেছে।

তোমাদের কি করে চলছে, কে চালাচ্ছে? রামকৃষ্ণ,
৩২
তার মা, তুলসীরাম প্রভৃতি বোধ হয় উড়িষ্যায়?

দমদম মাষ্টার কেমন আছে? দাশুর তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কিনা? সে ঘন ঘন আসে কিনা? ভবনাথ কেমন আছে, কি করছে? তোমরা তার কাছে যাও কিনা—তোমরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কিনা? হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী মিছে কথা—মূকং করোতি, ইত্যাদি। বাবা, কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের পূজ্য। এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, ধিক তোমাদের! ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কিনা? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালবাসা দিও। কালীকৃষ্ণবাবুকে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি উন্নতচিত্ত ব্যক্তি। রামলাল কেমন আছে? তার একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে কিনা? তাকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ দিও। সাণ্ডেল ঘানিতে ঠিক ঘুরছে বোধ হয়; ধৈর্য ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক যাবে। সকলকে আমার হৃদয়ের প্রীতি।

অনুরাগৈকহৃদয়ঃ
নরেন্দ্র

পুঃ—মা-ঠাকুরাণীকে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃপুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্বাদ আমার সর্বতোমঙ্গল। ইতি

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

(মার্চ বা এপ্রিল), ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি খেতড়িতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

তারক দাদা মান্দ্রাজে অনেক কার্য করিয়াছেন—বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিলাম মান্দ্রাজবাসীদের নিকট। রাখাল ও হরি লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারীরিক কুশল। মঠের সকল সংবাদ অবগত হইলাম শশীর পত্রে।

রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য হয় না! মালসিসর আলসিসর আর যত 'সর' ওখানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাক; আর সংস্কৃত, ইংরেজী সযত্নে অভ্যাস করিবে। গুণনিধি পাঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেতড়িতে আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরেজী শিখাইবে। যে প্রকারে পার, তাহার ঠিকানা আমায় দিবে। গুণনিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। গুণনিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে। কিমধিকমিতি—

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ১৪৫-১৫৪

১৪৫

[অনাগারিক ধর্মপালকে লিখিত]

আমেরিকা
১৮৯৪

প্রিয় ধর্মপাল,
আমি তোমার কলিকাতার ঠিকানা ভুলে গিয়েছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠালাম। আমি তোমার কলিকাতার বক্তৃতার কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য ফল হয়েছিল—সে সব শুনেছি।

… এখানকার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনরী আমাকে ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করে একখানি পত্র লেখেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটি ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জান, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভেবে থাকে। আবার সেই মিশনরীটিই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, সেই চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে নিছক ঘৃণাই পেয়েছেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। একজন ধর্মপ্রচারকের এরূপ কপট ব্যবহার! দুঃখের বিষয়—প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ধর্মেই এরূপ ভাব!

গত শীতকালে আমি এদেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয়নি। মনে করেছিলাম—ভয়ানক শীত ভোগ করতে হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় কেটে গেছে। ‘ফ্রি রিলিজিয়স সোসাইটি’র (Free Religious Society) সভাপতি কর্ণেল নেগিনসনকে তোমার অবশ্য স্মরণ আছে—তিনি খুব যত্নের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন অক্সফোর্ডের ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি প্লীমাথে (plymouth) বৌদ্ধধর্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটি বৌদ্ধধর্মের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তোমার এবং তোমার কাগজের সম্বন্ধে খোঁজ করলেন। আশা করি, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

অবসরমত দয়া করে আমার সম্বন্ধে সব কথা লিখবে। তোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। ‘ইণ্ডিয়ান মিররের’ মহানুভব সম্পাদক মহাশয় আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করে আসছেন—সেজন্য তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক আমার পরম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়ব জানি না। তোমাদের থিওসফিক্যাল সোসাইটির মিঃ জজ (Mr. Judge) ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই খুব ভদ্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জজ খুব কঠোর পরিশ্রমী—তিনি থিওসফি প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চানরা তাঁদের পছন্দ করে না। সে তো তাদেরই ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক কেবল খ্রীষ্টধর্মের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ক্রিশ্চানগণ বাকী লোকদের কোনরকম ধর্মই দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম নেই, থিওসফিষ্টরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম দিতে কৃতকার্য হন, তাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, তা তো বুঝতে পারি না। কিন্তু খাঁটি গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম এদেশ হতে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খ্রীষ্টধর্মের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা ভারতের খ্রীষ্টধর্ম হতে এত তফাত যে, বলবার নয়। ধর্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, এদেশে এপিস্কোপ্যাল
৩৩
এমন কি, প্রেসবিটেরিয়ান
৩৪
চার্চের ধর্মাচার্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ধার্মিক লোক সর্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। অন্তরের প্রেমই তাঁকে উদার হতে বাধ্য করে। কেবল যাদের কাছে ধর্ম একটা ব্যবসামাত্র, তারাই ধর্মের ভিতর সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদ ও স্বার্থপরতা এনে ব্যবসার খাতিরে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও অনিষ্টকারী হতে বাধ্য হয়।

তোমার চিরভ্রাতৃপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

১৪৬*

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

একটা পুরানো গল্প শোন। একটা লোক রাস্তা চলতে চলতে একটা বুড়োকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—'ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কতদূর?' বুড়োটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ করে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চলবার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বললে, 'আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—সেটা এই মাইল-খানেক হবে।' তখন পথিক তাকে বললে, 'তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তো তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে বলছ, ব্যাপারখানা কি?' তখন বুড়ো বললে, 'ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার যে যাবার ইচ্ছে আছে, ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁটতে আরম্ভ করেছেন, তাই আপনাকে বললাম।'

হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ করে দাও, বাকী সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা, ৯।২২)

অর্থাৎ যারা আর কারও ওপর নির্ভর না করে কেবল আমার ওপর নির্ভর করে থাকে, তাদের যা কিছু দরকার, সব আমি যুগিয়ে দিই।

ভগবানের এ কথাটা তো আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়।

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প স্বল্প করে টাকা পাঠাব। কারণ, প্রথম কলিকাতাতেও আমাকে ঐরকম কিছু কিছু টাকা—বরং মান্দ্রাজের চেয়ে কিছু বেশীই—পাঠাতে হবে। সেখানে আন্দোলন আমার ওপর নির্ভর করে শুধু যে শুরু হয়েছে তা নয়, উদ্দাম বেগে চলেছে। তাদের আগে দেখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতা অপেক্ষা মান্দ্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী আছে। আমার ইচ্ছা—এই দুটো কেন্দ্রই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। এখন কিছু পূজা পাঠ প্রচার—এই ভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। সকলের মেলবার একটা জায়গা কর, সেখানে প্রতিসপ্তাহে কোনরকম একটু পূজা-আর্চা করে সভাষ্য উপনিষদ্ পাঠ হোক—এইরূপে আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করে দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি—চাকাটি ঠিক ঘুরে যাবে।

'মিররে' অভিনন্দনটা ছাপা হয়েছে, দেখলাম—ওরা যে এটা ভালভাবে নিয়েছে, তা ভালই। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

এখন কাজে লাগ দেখি। জি. জি-র প্রকৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথা ঠাণ্ডা—দুজনে এক সঙ্গে মিলে কাজ কর। ঝাঁপ দাও—এই তো সবে আরম্ভ। আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের আশা অসম্ভব—প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হবে। মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর আর কয়েকজনকে এই কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করবার চেষ্টা কর। ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ আরম্ভ করে দাও। মান্দ্রাজে একটা জায়গা নেবার চেষ্টা কর—একটা কেন্দ্র যদি করতে পারা যায়, সেইটে একটা মস্ত জিনিষ হল, তারপর সেখান থেকে ছড়াতে থাক। ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ কর—প্রথমটা কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ আরম্ভ কর, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে, যারা এই কাজের জন্য সারা জীবন দেবে। কারও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সেই যথার্থ সর্দার হতে পারে। যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপটভাবে কাজে লেগে থাক। আমার কাজ চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছু চাই না। কাজের আরম্ভটা যখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না করতে পার, তবে তোমাদের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশ্বাস থাকবে না। আমাদের আরম্ভটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ভরসায় বুক বাঁধ। জি.জি-কে তো তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু করতে হয় না—সে কেন মান্দ্রাজে একটা জায়গার জন্য যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয়, সেই উদ্দেশ্যে লোককে একটু তাতায় না? মান্দ্রাজে একটা কেন্দ্র হয়ে গেলে তারপর চারিদিকে কার্যক্ষেত্র বিস্তার করতে থাক। এখন সপ্তাহে একত্র হওয়া; একটু স্তব হল, কিছু শাস্ত্রপাঠ হল—তাহলেই যথেষ্ট। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও—তাহলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

নিজেদের কাজে স্বাধীনতা না হারিয়ে কলিকাতার ভ্রাতৃবর্গের ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে—কারণ, তারা যে সন্ন্যাসী।

কার্যসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ—বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদূর করলে মিলিয়ে তুলনা করে দেখা যাবে। ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

... এখন আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখছি না—এখন কেবল নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র—জানি না কবে সেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করে প্রকাশ করব।

বইএ আছে কি? জগৎ তো ইতোমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জনাস্তূপে ভরে গেছে। কাগজটা বার করবার চেষ্টা করো, তাতে কারও সমালোচনার দরকার নেই। তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে তা শিক্ষা দাও, তার ওপর আর এগিও না। তোমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও, বাকী প্রভু জানেন। মিশনরীদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন থেমেছে।

আমি তাদের নিন্দাবাদ লক্ষ্যই করি না, আর তাতে আমার ওপর সাধারণের ধারণা ভালই হয়েছে। আমাকে আর খবরের কাগজ পাঠিও না—যথেষ্ট এসেছে। কাজটা যাতে চলে, তার জন্য একটু চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল—খুব হয়ে গেছে। দেখ না অন্যান্য দলেরা কেমন এক রকম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে। আর তোমাদের এমন সুন্দর আরম্ভ হয়েও তোমরা যদি কিছু করতে না পার, তবে আমি বড়ই নিরাশ হব। তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না—বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি, করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। আসল কথা হচ্ছে গুরুভক্তি, মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর ওপর বিশ্বাস। তা কি তোমার আছে? যদি থাকে, আর আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি আছে—তাহলে তুমি জেনে রাখ যে, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। অতএব কাজে লেগে যাও—তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। প্রতি পদক্ষেপেই আমার শুভ ইচ্ছা এবং আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। মিলেমিশে কাজ কর, সকলের সঙ্গে ব্যবহারে অত্যন্ত সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে; আমি সর্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছি। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এই তো সবে আরম্ভ। এখানে একটু হইচই হলে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়। বুঝলে? সুতরাং তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নেই। আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু করে যেতে হবে—সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাতিটা খুব বেড়ে যাক। সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটে ভাষ্য অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত হয়ে থাক। আমার অনেক রকম কাজ করবার মতলব আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাতে করতে পার, তার চেষ্টা কর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমার সব শক্তি আসবে। কিডিকে এবং ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কথা বলো। তারা সকলেই বড় বড় কাজ করবে—দুনিয়া তা দেখে তাক লেগে যাবে। বুকে ভরসা বেঁধে কাজে লেগে যাও। তোমরা কিছু করে আমায় দেখাও; একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, থাকবার জন্য একখানা বাড়ী করে আমায় দেখাও। যদি মান্দ্রাজে আমার জন্য একখানা বাড়ী করতে না পার তো কোথায় গিয়ে থাকব? লোকের ভেতর বিদ্যুৎবেগে শক্তি সঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক যোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত করেছ, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাক। এ পর্যন্ত যা করেছ, খুব ভালই হয়েছে। আরও ভাল কর, তার চেয়ে ভাল কর—এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই পত্রের উত্তরে তুমি লিখবে যে, তোমরা কিছু করেছ। কারও সঙ্গে বিবাদ করো না, কারও বিরুদ্ধে লেগো না। রামা শ্যামা খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুশী তাই হোক না। কেন বিবাদ-বিসংবাদের ভেতর মিশবে? যার যা ভাবই হোক না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে সহ্য কর। ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের জয় হবে। ইতি—

তোমাদের
বিবেকানন্দ

১৪৭*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

আমেরিকা
১৮৯৪

… জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়, ইহা কত সত্য! যে গৃহছাদ তোমায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে উহা যে স্তম্ভগুলির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে চলিবে না—হউক না সেগুলি অতি মনোহর কারুকার্যময় 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ। উহার বিচার করিতে হইবে গৃহের কেন্দ্রস্থানীয় সেই চৈতন্যময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা, যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের যে-কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি সেখানে নাকি নারীগণের চালচলন নারীর মত নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐপ্রকার মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকার নারীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা—

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতুরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং—'
৩৫

'যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল লিখিতে থাকেন,' তথাপি তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই 'বিপজ্জনক বিধর্মী'কে
৩৬
ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই 'অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর, হয়তো বা সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির' সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্তমান ছিলেন। এই মহামনা নিঃস্বার্থ পবিত্র নারীগণই—চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর নিপুণা, কারণ নির্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে ।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখিয়াছি; কত শত জননী দেখিয়াছি, যাঁহাদের নির্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নেই। কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি, যাহারা 'ডায়না দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্মল'—আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্বাধিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে, ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাদের আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই দুর্বল মানুষগুলির দ্বারা সে সম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ উহারা তো আগাছার মত পড়িয়াই থাকে। যাহা সৎ উদার ও পবিত্র, তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হয়।

একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে কি যে-সকল অপক্ব অপরিণত কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহাদের সাহায্য লও যদিও কখনও কখনও তাহারাই সংখ্যায় অধিক? যদি একটি সুপক্ব ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায়, তবে সেই একটির দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়, যে শত শত ফল অপরিণত রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা নহে।

তারপর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদার মনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদারমনা পুরুষও দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবাপন্য সম্প্রদায়ের। তবে একটি প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশঙ্কা এই যে, তাঁহারা উদার হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন, কিন্তু নারীগণ যেখানে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহার প্রতি সহানুভূতিহেতু উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ নিজেদের ধর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে স্বতই অনুভব করেন যে, ধর্ম একটি ইতিবাচক (positive) ব্যাপার, নেতিবাচক (negative) নহে; যোগের ব্যাপার, বিয়োগের নহে। তাঁহারা প্রতিদিন এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিষের হাঁ-এর দিকটাই, ইতিবাচক দিকটাই সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই অস্তিবাচক—এবং এই হেতু গঠনমূলক শক্তিসমূহের একীকরণ দ্বারাই পৃথিবীর নাস্তিবাচক ভাবগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিকাগোর এই বিশ্ব-মহামেলা কী অদ্ভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্মমহামেলা, যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া নিজ নিজ ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাও কী অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারোজ ও মিঃ বনির অনুগ্রহে আমিও আমার ভাবগুলি সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মিঃ বনি কী অদ্ভুত লোক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট অনুষ্ঠানটির কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্যে পরিণত করিতেও প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না; তিনি নিজে একজন উকিল হইয়াও যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতা ছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন—তাঁহার হৃদয়ের গভীর মর্মস্পর্শী ভাবসমূহ তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে ব্যক্ত হইত। ... ইতি

বিবেকানন্দ

১৪৮

[স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত]

আমেরিকা
(নভেম্বর), ১৮৯৪

প্রিয় কালী,

তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। 'ট্রিবিউন' পত্রে উক্ত টেলিগ্রাফ বাহির হওয়ার কোন সংবাদ পাই নাই। চিকাগো নগর ছয়মাস যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখনও যাইবার সাবকাশ নাই; এজন্য বিশেষ খবর লইতে পারি নাই। তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই? অদ্ভুত কার্যক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের সকলের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে। শশী সাণ্ডেলের বিষয় পূর্বেই লিখিয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় কিছু চাপা থাকে না। তবে তিনি সম্প্রদায়স্থাপনাদি করুন, হানি কি? 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ'
৩৭
। দ্বিতীয়তঃ তোমার পত্রের মর্ম বুঝিলাম না।আমি অর্থসংগ্রহ করিয়া আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে নিন্দা করে

তো আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কূটস্থ বুদ্ধি তোমাদের আছে, কোন হানি হইবে না। তোমাদের পরস্পরের উপর নিরতিশয় প্রেম থাকুক, ইতর-সাধারণের উপর উপেক্ষাবুদ্ধি ধারণ করিলেই যথেষ্ট। কালীকৃষ্ণবাবু অনুরাগী ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার বিশেষ প্রণয় কহিও। যতদিন তোমরা পরস্পরের উপর ভেদবুদ্ধি না করিবে, ততদিন প্রভুর কৃপায় 'রণে বনে পর্বতমস্তকে বা' তোমাদের কোন ভয় নাই। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি',
৩৮
ইহা তো হইবেই। অতি গম্ভীর বুদ্ধি ধারণ কর। বালবুদ্ধি জীবে কে বা কি বলিতেছে, তাহার খবরমাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা ইতি।

শশীকে পূর্বে লিখিয়াছি সবিশেষ। খবরের কাগজ, পুস্তকাদি পাঠাইও না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—দেশেও ঘুরে মরা, এদেশেও তাই, বাড়ার ভাগ বোঝা বওয়া। এদেশে আমি কেমন করে লোকের পুস্তকের খদ্দের জোটাই বল? আমি একটা সাধারণ মানুষ বৈ নয়। এদেশের খবরের কাগজ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আমার বিষয় লেখে, আমি তাহা অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাহাই কর। তাহাই ব্যবস্থা।

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে, বেশ কথা; এক্ষণে ইতরগুলো কি বকে না বকে, তাতে কোন রকমে তোমরা কর্ণপাত করিবে না। আমি টাকা রোজগার করি বা যা করি, হেঁজিপেঁজি লোকের কথায় কি তাঁর কাজ আটকাবে? ভায়া, তুমি এখন ছেলেমানুষ। আমার চুলে পাক ধরেছে। হেঁজিপেঁজি লোকদের কথায় আর মতামতের উপর আমার শ্রদ্ধা আঁচে বুঝে লও। তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এককাট্টা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোন ভয় নাই। ফলে এই পর্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিব না। ইতি।

বলি, গুণনিধি কোথায় আছে, খোঁজ করে তাকে মঠে যত্ন করে আনবার চেষ্টা করিবে। সে লোকটা অতি sincere (অকপট) ও বড়ই পণ্ডিত। তোমরা দুটো জায়গার ঠিকানা করবেই করবে, যে যা বলে, বলে যাক। খবরের কাগজে আমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কে কি লেখে, লিখুক; গ্রাহ্যমধ্যেই আনবে না। আর দাদা, বার বার ব্যাগত্তা করি,
৩৯
আর ঝুড়ি ঝুড়ি খবরের কাগজাদি পাঠাইও না। বিশ্রাম এখন কোথায়? আমরা যখন শরীর ছেড়ে দিব, তখন কিছুদিন বিশ্রাম করিব। ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর! সাবাস! নিধে পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাবে।তোমরা হলে হাতী, পিঁপড়ের কামড়ে কি তোমাদের ভয়?

তোমার প্রেরিত Address (অভিনন্দন) অনেক দিন হল এসেছে এবং তার জবাবও চলে গেছে প্যারীবাবুর নিকট।

এই কথা মনে রেখো—দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'
৪০
ভয় কার? কাদের ভয় রে ভাই? এখানে মিশনরী-ফিশনরী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেছে—অমনি সকল জগৎ হবে।

'নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু শতান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥'
৪১

কিমধিকমিতি। হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটাবেন। ভয় কি রে ভাই? সকল বড় কাজ মহা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। হে বীর 'স্মর পৌরুষমাত্মনঃ উপেক্ষিতব্যাঃ জনাঃ সুকৃপণাঃ কামকাঞ্চনবশগাঃ।'
৪২
এক্ষণে আমি এদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অতএব আমার সহায়তার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার সহায়তা করিতে যাইয়া ভ্রাতৃস্নেহাৎ তোমাদের মধ্যে যে পৌরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা প্রভুর কার্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা। মনের ভাব বিশেষ উপকার বোধ না হইলে প্রকাশ করিবে না। প্রিয় হিতবচন মহাশত্রুরও প্রতি প্রয়োগ করিবে।

হে ভাই, নামযশের ধনের ভোগের ইচ্ছা জীবের স্বতই আছে। তাহাতে যদি দুদিক চলে তো সকলেই আগ্রহ করিতে থাকে। 'পরগুণ-পরমাণুং পর্বতীকৃত্য' অপিচ, ত্রিভুবনের উপকারমাত্র ইচ্ছা মহাপুরুষেরই হয়। অতএব বিমূঢ়মতি অনাত্মদর্শী তমসাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেকলেই আপনি পালিয়ে যাবে! চাঁদে থুথু ফেলবার চেষ্টা করুক; 'শুভং ভবতু তেষাম্' (তাদের মঙ্গল হউক)। যদি তাদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধি কে বারণ করতে পারে? যদি ঈর্ষাপরবশ হয়ে আস্ফালন মাত্র করে তো সব বৃথা হবে।

হরমোহন মালা পাঠিয়েছেন। বেশ কথা। বলি, এদেশে আমাদের দেশের মত ধর্ম চলে না। তবে এদের দেশের মত করে দিতে হয়। এদের হিন্দু হতে বললে এরা সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘৃণা করবে, যেমন আমরা খ্রীষ্ট-মিশনরীদের ঘৃণা করি। তবে হিঁদুশাস্ত্রের কতক ভাব এরা ভালবাসে, এই পর্যন্ত। অধিক কিছুই নয় জানিবে। পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্ম-টর্ম নিয়ে মাথা বকায়

না, মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু, এইমাত্র—বাড়াবাড়ি কিছুই নাই। ২/৪ হাজার লোক অদ্বৈতমতের উপর শ্রদ্ধাবান। তবে পুঁথি, জাতি, মেয়েমানুষ নষ্টের গোড়া—ইত্যাদি বললে দূরে পালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব হয়। Patience, purity, perseverance (ধৈর্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়)। ইতি—

নরেন্দ্র

১৪৯

[স্বামী শিবানন্দকে লিখিত]
৪৩

আমেরিকা
১৮৯৪

প্রিয় শিবানন্দ,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। সম্ভবতঃ ইতোমধ্যে তুমি আমার অন্য চিঠিগুলি পেয়েছ এবং জেনেছ যে, আর আমেরিকায় কিছু পাঠাবার দরকার নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই যে খবরের কাগজগুলো আমায় বাড়িয়ে তুলছে, তাতে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ফল এখানকার চেয়ে ভারতে বেশী। এখানে বরং রাতদিন খবরের কাগজে নাম বাজতে থাকলে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মনে বিরক্তি জন্মায়; অতএব যথেষ্ট হয়েছে। এখন এই সকল সভার অনুসরণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা কর। আর এদেশে কিছু পাঠাবার দরকার নাই। প্রথমে মাতাঠাকুরাণীর জন্য একটি জায়গা করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি, কারণ মেয়েদের জায়গাই প্রথম দারকার। … যদি মায়ের বাড়ীটি প্রথমে ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবি না। … আমি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে চলে যেতাম, কিন্তু ভারতবর্ষে টাকা নাই। হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেউ একটি পয়সা দেবে না—এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখানে লোকের টাকা আছে, আর তারা দেয়। আসছে শীতে আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ততদিন তোমরা মিলেমিশে থাক।

জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়; তারা চায় ব্যক্তি (person)। তারা যাকে পছন্দ করে, তার কথা ধৈর্যের সহিত শুনবে, তা যতই অসার হোক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না, তার কথা শুনবেই না। এইটি মনে রেখো এবং লোকের সহিত সেইমত ব্যবহার করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য। কথাগুলি রুক্ষ হলেও ভালবাসায় ফল হবেই। যে-কোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন, ভালবাসা মানুষ আপনা হতেই বুঝতে পারে।

ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই; তবে তিনি কি বলতেন, লোককে দেখতে দাও; তুমি জোর করে কি দেখাতে পার?—এইমাত্র আমার objection (আপত্তি)।

লোকে বলুক, আমরা কি বলব? দাদা, বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India.88

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র)—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তাঁর জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?

ভায়া, যীশুখ্রীষ্টকে জেলে-মালায় ভগবান্ বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে; বুদ্ধকে বেনে-রাখালে তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরির (ঊনবিংশ শতাব্দীর) শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে। … হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতির) দু-দশটি কথা পুঁথিতে আছে মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করিনি, সেই বড় ঘরনী'—এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও তাঁদের চেয়ে ঢের বড় বলে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝতে পার ভায়া?

মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইওরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?

সকলে ভাল, সকলকে আশীর্বাদ কর। দাদা, দুনিয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি! দাদা, রাগ করো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ... ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে পগার পার, এই বুঝ। দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।

বাবুরামের মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়া দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁফ ছাড়ে বাঁচি; তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।

নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়। নিরঞ্জন এমন কার্য করছে যে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি খবর রাখছি। তুমিও যে মান্দ্রাজীদের সঙ্গে যোগদান করে কার্য করছ, সে বড়ই ভাল। দাদা, তোমার উপর আমার ঢের ভরসা, সকলকে মিলেমিশে চালাও ভায়া। মায়ের জমিটা যেমন করেছ, অমনি আমি হুপ্ করে আসছি আর কি। জমিটা বড় চাই, building (বাড়ী) আপাততঃ মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building (পাকা) তুলব, চিন্তা নাই।

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। দুটো তিনটে ফিলটার তৈয়ার কর না কেন? জল সিদ্ধ করে ফিলটার করলে কোন ভয় থাকে না।

হরিশের কথা তো কিছুই শুনতে পাই না। আর দক্ষরাজা কেমন আছে? সকলের বিশেষ খবর চাই। আমাদের মঠের চিন্তা নাই, আমি দেশে গিয়ে সব ঠিকঠাক করব।

দুটো বড় Pasteur's bacteria-proof (পাস্তুরের জীবাণু-প্রতিষেধক) ফিলটার কিনবে; সেই জলে রান্না, সেই জলে খাওয়া—ম্যালেরিয়ার বাপ পালিয়ে যাবে। ... On and on; work, work, work; this is only the beginning. (এগিয়ে চল; কাজ, কাজ, কাজ; এই তো সবে আরম্ভ)।

কিমধিকমিতি—
বিবেকানন্দ

১৫০

[মঠে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৪

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, ইতঃপূর্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াভাবে তাহা অসম্পূর্ণ। রাখাল ও হরি লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লেখেন। তাঁহারা—হিন্দু খবরের কাগজরা আমার সুখ্যাতি করিতেছে, এই কথা লেখেন ও তাঁহারা বড় আনন্দিত যে, ২০ হাজার লোক খিচুড়ি খেয়েছে। যদি কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজের হিন্দুরা সভা করে রিজলিউশন পাস করিত যে, ইনি আমাদের প্রতিনিধি এবং আমেরিকার লোকেদের অভিনন্দন করিত—আমাকে যত্ন করিয়াছে বলিয়া, তাহলে অনেক কাজ এগিয়ে যেত। কিন্তু এক বৎসর হয়ে গেল, কই কিছুই হল না! অবশ্য বাঙালীদের উপর আমার কিছুই ভরসা ছিল না; তবে মান্দ্রাজবাসীরাও কিছু করতে পারলে না। ...

আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার ওপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধান হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হল—চক্রগদা- পদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবন বিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফন্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ-কথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।

যাক, তোমাদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। Idea (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। ... Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্ ... অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ... যদি কাজ করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু-চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস, তবে বুঝি। তবেই তোদের উপর আমার ভরসা হবে, নইলে ইতি।

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে তারকদার সঙ্গে রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য! না দেখা, না শোনা—একি চ্যাংড়াম নাকি? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোন কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি? সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুরমত পথে না চলে, দূর করে দেবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে, আবার তাঁর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা—আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য, একি ছেলেখেলা নাকি? আমাকে জগমোহন বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, সেই ছোকরা। গুরুভাই কি রে? হাঁ, চেলা বলতে লজ্জা করে! একদম গুরু বন্‌বে! দূর করে দিও যদি দস্তুরমত পথে না চলে।

ঐ যে তুলসী ও খোকার মনের অশান্তি, তার মানে কোন কাজ নাই। ঐ যে নিরঞ্জনেরও—তার মানে কোন কাজ নাই। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনই ভাববে তুলসী, তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোন চিন্তা রেখো না; নরক স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব don't care (গ্রাহ্য করো না), আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর। গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আনবে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা। গুপ্ত কোথা? সে আসতে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আনো। এই ক-টি কথা মনে রেখো—

১| আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি—সব ত্যাগ।
২| জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।
৩| রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।
৪| যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় করো না—ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা তো কিছু চাও না—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ; এখন organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুপ্তকেও এই কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখো, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার। 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি'—যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন সৎ বিষয়ের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়। ইতি

পুঃ—পূর্বের চিঠি মনে রেখো—মেয়ে-মদ্দ দু-ই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নাই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না—শক্তির

বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সঙ্ঘ) চাই—কুঁড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মত যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও। ইতি

নরেন্দ্র

১৫১

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৪

প্রাণাধিকেষু,

তারকদাদা ও হরির আগের লিখিত এক পত্র শেষে পাই। তাহাতে অবগত হইলাম যে, তাঁহারা কলিকাতায় আসিতেছেন। পূর্বের পত্রে সমস্ত জানিয়াছ। রামদয়ালবাবুর পত্র পাই। তথামত ছবি পাঠান হইবে। মা-ঠাকুরাণীর জন্য জমি খরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে—অর্থাৎ বিল্ডিং আপাতত মাটির হউক, পরে দেখা যাইবে। কিন্তু জমিটা প্রশস্ত চাই। কি প্রকারে কাহাকে টাকা পাঠাইব, সমস্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে। তোমাদের মধ্যে একজন বৈষয়িক কার্যের ভার লইবে।

সাণ্ডেলকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার সন্ধান করিয়া এক পত্র লিখিতে বলিবে। সাণ্ডেল চাকরি-বাকরি করিতেছে কেমন? যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, শীঘ্রই অনেক কাজ করিতে পারিব। হরমোহন কেদারবাবুর টাকার কথা কি লিখিয়াছে। আমি টাকা পত্রপাঠ পাঠাইব; কিন্তু কাহার নামে ও কাহাকে পাঠাইব, জানি না। একজন সেখানে এজেন্ট না হইলে কোন কাজ চলিতে পারে না।

বিমলা—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা—এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হিন্দুধর্মে এখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার গুরু শশীবাবুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা লিখিতেছেন। শিব, শিব! যাঁহার বড় মানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিন কালে শ্বশুর মোটেই নাই!! শশীবাবুর প্রণীত এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকে সূক্ষ্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিমলার ইচ্ছা যে, এতদ্দেশ হইতে উক্ত পুস্তক ছাপাইবার সাহায্য হয়; তাহার তো কোন উপায় দেখি না, কারণ ইহারা বাঙলা ভাষা তো মোটেই জানে না। তাহার উপর হিন্দুধর্মের সহায়তা ক্রিশ্চানরা কেন করিবে? বিমলা এক্ষণে সহজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণমধ্যে শশী ও বিমলা—এই দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কাহারও ধর্ম হইতে পারেই না; কারণ তাহাদের 'ঊর্ধ্বস্রোতস্বিনীবৃত্তি' নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং উক্ত দুইজনের কেবল উচ্চদিকে … । এই প্রকারে বিমলা এক্ষণে সনাতন ধর্মের যাহা আসল সার, তাহা খিঁচিয়া লইয়াছেন!

ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান্! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে …। পূর্বে মহতের লক্ষণ ছিল 'ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ',
৪৫
এখন হচ্ছে, আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া, ধরো হামারা পায়েরকা নীচে।

হরমোহন মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন। তাতে প্রধান খবর প্রায়ই এই রকম, যথা—'অমুক ময়রার দোকানে অমুক ছেলে আপনার নিন্দা করিল; তাহাতে অসহ্য হওয়ায় আমি লড়াই করি' ইত্যাদি। কে তাকে লড়াই করিতে বলে, প্রভু জানেন। ....যাক, তাহার ভালবাসাকে বলিহারি যাই এবং তাহার perseverance (অধ্যবসায়)-কে। মধ্যে যদি পার immediately (অবিলম্বে) হাওলাত করে কেদারবাবুর টাকা সুদসমেত দিও, আমি পত্রপাঠ পাঠাইয়া দিব। কাকে টাকা পাঠাই, কোথায় পাঠাই। তোমাদের যে হরিঘোষের গোয়াল। আমার টাকার কিছুই অভাব নাই, … কেদারবাবুর টাকা twice over দিব (দ্বিগুণ পরিশোধ করিব), তাহাকে ক্ষুণ্ণ হইতে মানা করিবে। আমি জানিতাম, উপেন তাহা পরিশোধ করিয়াছে এতদিনে। যাক, উপেনকে কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। আমি পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিব।

যে মহাপুরুষ—হুজুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখছেন, তাঁকে বলো কুকুরের মত কারুর পা চাটা আমার স্বভাব নহে। যদি সে মরদ হয় তো একটা মঠ বানিয়ে আমায় ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে ফিরে যাব? এ দেশে আমার more (অধিক) ঘর—হিন্দুস্থানে কি আছে? কে ধর্মের আদর করে? কে বিদ্যের আদর করে? ঘরে ফিরে এস!!! ঘর কোথা?

এবারকার মহোৎসব এমনি করবে যে, আর কখনও তেমন হয় নাই। আমি একটা 'পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত' লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রী করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, কিছু দাম লইবে। হুজুকের শেষ !!! … এই তো কলির সন্ধ্যে। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না; আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ' (বসন্তের ন্যায় লোকের

কল্যাণ আচরণ করে)—এই আমার ধর্ম। আমি কুঁড়ে, নিষ্ঠুর, নির্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। যাহার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্যে সহায়তা করিতে পারে। ... সাবধান, সাবধান! এ-সকল কি ছেলেখেলা, স্বপন-দেখা নাকি? মধো, সাবধান! সুরেশ দত্তর 'রামকৃষ্ণচরিত' পড়িলাম, মন্দ হয় নাই। শশী সাণ্ডেলের কোন উপকার যদি তোমাদের দ্বারা হয়, করিবে। বেচারা ভক্ত মানুষ, বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। আমি তো দাদা এখানে বসে কোন উপায় দেখি না। কিমধিকমিতি।

দাদা, একবার গর্জে গর্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি—মাষ্টার, জি. সি. ঘোষ, অতুল, রামদা, নৃত্যগোপাল, শাঁকচুন্নি! বলি, শাঁকচুন্নির কোন কথাই তো তোমরা লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি কিনা? নৃত্যগোপাল-দাদার শরীর বেশ ভাল হয়েছে কি না, বাবুরাম যোগেন সেরেছে কিনা—ইত্যাদি আমি সকলের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চাই। শরৎকে কি সাণ্ডেলকে একটি বিশেষ পত্রে সব খুলে লিখতে বলবে। কালীকৃষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, সাতু, হরি চাটুয্যে সকলকে তোমরা ভালবাস কিনা—সব লিখবে। ... তোরা এক একটা মানুষ হ দিকি রে বাবা! গঙ্গাধর খেতড়ি থেকে তো পালায় নাই?

বলি, আর খবরের কাগজ পাঠাবার আবশ্যক নাই। তার ঢের মেরে গেছে। তোদের কারও organising power (সংগঠন-শক্তি) নাই দেখিতেছি; বড়ই দুঃখের বিষয়। সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help (সাহায্য) আমি চাই; কারুর সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ খবরদার যাতে না হয়। Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning; it is character that can cleave through adamantine walls of difficulties,
৪৬
—মনে রেখো। লোকের সঙ্গে যাওয়া-আসা, বিশেষ করিয়া মতামত pooh pooh (দুঃ ছাই) করিবে না, তাতে লোক বড়ই চটে। জায়গায় জায়গায় এক একটা সেণ্টার করিতে হইবে—এ তো বড় সহজ! যেমন তোমরা জায়গায় জায়গায় ফের, অমনি একটি সেণ্টার করবে সেখানে। এই রকম করে কার্য হবে। যেখানে পাঁচজন লোক তাঁকে মানে, সেখানেই এক ডেরা—এমনি করে চল এবং সর্বদা সকল জায়গার সঙ্গে communication (যোগাযোগ) রাখিতে হইবে। ইতি

চিরস্নেহাস্পদ
বিবেকানন্দ

১৫২*

ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক ষ্টেশন
২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,

আমি নিরাপদে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছি; ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে—আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়মত সেখানে পৌঁছলাম।

সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—এথিক্যাল কালচার সোসাইটির (Ethical Culture Society) কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আসছে রবিবার একটা বক্তৃতা হবে। ডাঃ জেন্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন, আর মিঃ হিগিন্সকে পূর্বেরই মত দেখলাম—খুব কাজের লোক। বলতে পারি না কেন, অন্যান্য শহরের চেয়ে এই নিউ ইয়র্ক শহরেই দেখছি—মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের ধর্মালোচনায় আগ্রহ বেশী।

আমার ক্ষুরখানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্বক সেটা ল্যাণ্ডস্‌বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে মিঃ হিগিন্স আমার সম্বন্ধে যে পুস্তিকাটি ছাপিয়েছেন, তার এক কপি পাঠালাম—আশা করি, ভবিষ্যতে আরও পাঠাতে পারব।

মিস ফার্মারকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

সদা বশংবদ
বিবেকানন্দ

১৫৩*

C/o G. W. Hale
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্যের মাতার দেহত্যাগ-সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হলাম। তিনি একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রভু তাঁর কল্যাণ করুন।

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলে আমি ভুল করেছি। এ আমার একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য দুর্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে।

এ দেশে দু-তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কতকটা চেষ্টা করেছি, আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সহিত আমার কথা নিচ্ছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না, বরং ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইওরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাব—স্থির করেছি; এতে যা খরচ হবে, তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে। তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হোক।

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়লাম। তারা যে এ-রকম লিখবে, এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাসজাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষা। আবার এই ঈর্ষাদ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের মর্ম বুঝবে না। পাশ্চাত্য জাতিদের কার্যসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে—এই সহযোগিতা। এদের শক্তি অদ্ভুত, আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর পরস্পরের কার্যের গুণগ্রাহিতা। আর জাতটা যত দুর্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভেতর এই [কাপুরুষতা] পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠতে পারে না, আর এখানে আসবার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝতে পারছি। এরা সর্বপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্ষাপরায়ণ ও পরনিন্দাপ্রবণ। হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বলছি—তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পার, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মারছে এবং ঔষধ খাব না বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলছে?

'—' সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম-মধ্যম তাড়া খেয়ে অবধি সে আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইওরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশবাসীর পক্ষ সর্বদাই নিয়ে থাকে, কিন্তু হিন্দু—বিশেষ বাঙালী স্বদেশবাসীকে অপমানিত দেখলে খুশী হয়। যাই হোক, ওসব নিন্দা-কুৎসার দিকে একদম খেয়াল করো না। ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাক। সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণের সন্তানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাকতে এর কোন ফল দেখে যেতে না পারি; কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, সেইরূপ নিঃসন্দেহে শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—তার জাতীয় ধমনীর ভিতর নূতন বিদ্যুদগ্নি-সঞ্চার। এরূপ কাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে; এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুশী থাক; সর্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—ভাবের ঘরে যেন এতটুকু চুরি না থাকে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কারও ভেতর কোন জিনিষ লক্ষ্য করে থাক, সেটি এই—তারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই রকম এক-শ জন লোক রেখে যেতে পারি, তাহলে সন্তুষ্ট চিত্তে মরতে পারব—আমি বুঝব, আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা বকুক না কেন, তিনিই জানেন—সেই প্রভুই, জানেন কি হবে। আমার লোকের সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, অথবা সাহায্য এসে পড়লে ছেড়েও দিই না—আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও। শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হয়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটি কথা পর্যন্ত নষ্ট হবে না—হয়তো শত শত যুগ ধরে আবর্জনাস্তূপে চাপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাকতে পারে, কিন্তু শীঘ্র হোক, বিলম্বে হোক—তা আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর। আমাকে একটা খাঁটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাক—কোন লোক তোমাকে এসে সাহায্য করবে, এ ভরসা রেখো না—সকল মানুষের সাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনন্ত গুণে শক্তিমান্ নন? পবিত্র হও, প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখ, সর্বদাই তাঁর ওপর নির্ভর কর, তাহলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে, কেউ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী পত্রে আরও বিস্তারিত খবর দেব।

এদেশে যাদের গরীব বলা হয়, তাদের দেখছি; আমাদের দেশের গরীবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতসারে মরতে পারি—কেউ হয়তো আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়তো আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না, কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই

ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মত থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্চে অথচ তাদের জন্য কিচ্ছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরীব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরীবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। সকলে আমার বিশেষ ভালবাসা জানবে। ইতি

পুঃ—যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাক তো ছাপা বন্ধ কর—নাম হুজুকের আর দরকার নেই। ইতি—

বিবেকানন্দ

১৫৪*

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
৩ জানুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

গত রবিবার ব্রুকলিনে বক্তৃতা দিয়েছি। সন্ধ্যায় পৌঁছলে মিসেস হিগিন্স আমায় একটু সম্বর্ধনা করেন, এবং ডক্টর জেন্‌স্ (Janes) প্রভৃতি এথিক্যাল সোসাইটি (Ethical Society)-র কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন মনে করেন যে, এরূপ প্রাচ্যদেশীয় ধর্মপ্রসঙ্গ ব্রুকলিনের জনসাধারণের উপভোগ্য হবে না।

কিন্তু প্রভুর কৃপায় বক্তৃতা খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ব্রুকলিনের প্রায় আটশত গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন! যাঁরা মনে করেছিলেন বক্তৃতা সফল হবে না, তাঁরাই ব্রুকলিনে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। আমার নিউ ইয়র্কের বক্তৃতামালা প্রায় প্রস্তুত, কিন্তু মিস থার্সবি নিউ ইর্য়কে না আসা পর্যন্ত তারিখ ঠিক করতে চাই না। এভাবে মিস ফিলিপ্‌স্—যিনি মিস থার্সবির বন্ধু, এবং যিনি আমার নিউ ইর্য়কের বক্তৃতামালার আয়োজন করছেন—মিস থার্সবির সহযোগিতায় প্রয়োজনবোধে সেখানে কিছু বন্দোবস্ত করতে চান।

হেল পরিবারের কাছে আমি বিশেষরূপে ঋণী এবং নববর্ষের প্রথম দিনে তাদের কাছে হঠাৎ এসে হাজির হব, ভেবেছিলাম। এখানে একটি নতুন পাগড়ি যোগাড় করবার চেষ্টাতে আছি। পুরানো পাগড়িটি এখানে আছে। কিন্তু বারবার কাচার ফলে সেটা এত ঢিলে হয়ে গিয়েছে যে, সেটা পরে লোকের কাছে যাওয়া যায় না। চিকাগোর ঠিক তেমনি একটা পাগড়ি পাব বলে মনে হয়।

আশা করি আপনার পিতা ইতোমধ্যে ভাল হয়েছেন। মিস ফার্মার, মিঃ ও মিসেস গিবন্স এবং ধার্মিক পরিবারটির সকলকে আমার প্রীতি জানাবেন।

সতত স্নেহের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—ব্রুকলিনে মিস কুরিং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি বরাবরই সদয়। তাঁকে শীঘ্র চিঠি লিখলে আমার প্রীতি জানাবেন।

পত্রাবলী ১৫৫-১৬৪

১৫৫*

[স্যার এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখিত]

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
৩ জানুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় মহাশয়,

প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আপনাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখি—আমার জীবনে এমন অল্প কয়েকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় ভাব ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে পূর্ণ, সর্বোপরি যাঁহারা মনের ভাবসমূহ কার্যে পরিণত করিবার শক্তি রাখেন, আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট, তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটি মনের ভাব বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভারতের কার্য বেশ আরম্ভ হইয়াছে, আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নহে, মহা উদ্যমের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তারসাধন করিতে হইবে। এই সময়। এখন আলস্য করিলে পরে আর কার্যের সুযোগ থাকিবে না। কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা সীমাবদ্ধ করিয়াছিঃ প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে; আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে; উহার সহিত অন্যান্য ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরেজী ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।

প্রথমেই এটি করিতে হইবে; আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই বড় বড় বিষয় দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েকটি কারণে মান্দ্রাজই এক্ষণে এই কার্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোম্বাইয়ে সেই চিরদিনের জড়ত্ব; বাঙলায় ভয়—এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, তেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। মান্দ্রাজই এক্ষণে এই প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জীবন-প্রণালীর যথার্থ গুণ গ্রহণ করিয়া মধ্যপথ অনুসরণ করিতেছে।

সমাজের যে সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক—এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি? সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। আমার প্রণালী এইঃ আমি এখনও এটা মনে করি না যে, আমার জাতি এতদিন ধরিয়া কেবল অন্যায় করিয়া আসিতেছে; কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই—আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে উচ্চতর সত্যে যাইতে হইবে, মন্দ হইতে ভালয় নয়; সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়—আরও ভালয় যাইতে হইবে। আমি আমার স্বদেশবাসীকে বলি—এতদিন তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা বেশ হইয়াছে; এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে। এই জাতিবিভাগের কথাই ধরুন—সংস্কৃতে 'জাতি' শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলেই ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা অর্থাৎ জাতির অর্থই সৃষ্টি। 'একোঽহং বহু স্যাম্' (আমি এক—বহু হইব)—বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্বে এক থাকে—বহুত্ব বা বিচিত্রতাই সৃষ্টি। যদি এই বিচিত্রতাই না থাকে, তবে সৃষ্টিই লোপ পাইবে।

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে, ততদিন তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখনই উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই উহা মরিয়া যায়। মূলে 'জাতির' অর্থ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থই প্রচলিত ছিল—এমন কি, খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট হইবে। ইহা কি সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎও নষ্ট হইয়া যাইবে? বর্তমান বর্ণবিভাগ (caste) প্রকৃত 'জাতি' নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। উহা যথার্থই জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতি রোধ করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের জন্য বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃত 'জাতি'কে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে দেয় না, যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে ইহাই বলিতে চাই যে, 'জাতি' উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রাণহীন অভিজাত অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণীমাত্রই 'জাতি'র প্রতিবন্ধক—উহা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন আছে, সব ভাঙিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব। এক্ষণে ইওরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যখনই উহা জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে সমর্থ হইল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ 'জাতি' গঠন করিতে যে-সকল বাধা আছে, সেই সকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া দিল—তখনই ইওরোপ উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত 'জাতি'র বিকাশের সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা—সেইজন্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে,

জ্যোতিষীরা বালকবালিকার জন্মমাত্র জাতি নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত 'জাতি'—প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব; আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়া লইয়াছে। ইহা যদি পুনরায় পুরাপুরিভাবে চালু হয়, তবেই আমরা উঠিতে পারিব। এই বৈচিত্র্যের অর্থ বৈষম্য বা কোন বিশেষ অধিকার নয়।

আমার কার্যপ্রণালীঃ হিন্দুদের দেখান যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই 'জড়ত্ব' দূর করিতে হইবে। অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল; তাহার কারণ তখন ছিল জীবনমরণের সমস্যা, উন্নতির সময় ছিল না। এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই; এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে—স্বধর্মত্যাগী ও মিশনরীগণের উপদিষ্ট ধ্বংসের পথে নয়—আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। বহু শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্মাণ-কার্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাস্থানে সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্যপ্রণালী। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ধর্মই ভারতের মূল স্রোত; উহাকে শক্তিশালী করা হউক, তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। ইহা আমার ভাবধারার একটা দিক্। আশা করি, যথাসময়ে আমার সমুদয় চিন্তারাশি প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু বর্তমানে দেখিতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কাজ রহিয়াছে। অধিকন্তু কেবল এখান হইতেই সাহায্যের প্রত্যাশা করি। কিন্তু এ পর্যন্ত কেবল আমার ভাবপ্রচার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। এখন আমার ইচ্ছা—ভারতেও একটা চেষ্টা করা হউক। মান্দ্রাজেই সফলতার সম্ভাবনা আছে। আ—ও অন্যান্য যুবকগণ খুব খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা 'উৎসাহী যুবক' মাত্র। এই কারণে আমি তাহাদিগকে আপনার নিকট সমর্পণ করিতেছি। যদি আপনি তাহাদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চিত ধারণা—উহারা কৃতকার্য হইবে। জানি না—কবে ভারতে যাইব। তিনি যেমন চালাইতেছেন, আমি সেইরূপ চলিতেছি; আমি তাঁহার হাতে।

'এই জগতে ধনের সন্ধান করিতে গিয়া তোমাকেই শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে পাইয়াছি; হে প্রভো, তোমারই নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।'

'ভালবাসার পাত্র খুঁজিতে গিয়া একমাত্র তোমাকেই ভালবাসার পাত্র পাইয়াছি। তোমারই নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।'
৪৭

প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

১৫৬

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

১৮৯৫

প্রিয়তমেষু,
তোমার পত্রে টাকা-পঁহুছান ইত্যাদি সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ... দেশে আসিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহা ঠিক বটে; কিন্তু এদেশে একটি বীজ বপন করা হইয়াছে, সহসা চলিয়া গেলে উহা অঙ্কুরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। খেতড়ির রাজা, জুনাগড়ের দেওয়ান প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে; কিন্তু ভায়া, পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য। সকলই হইবে ধীরে ধীরে; আপাততঃ একটা জায়গা দেখার কথাটা বিস্মৃত হইও না। একটা বিরাট জায়গা চাই—১০ হাজার থেকে ২০ হাজার [টাকা] পর্যন্ত—একদম গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে পুঁজি অল্প, তথাপি ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখবে। একটা নিউ ইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা মান্দ্রাজে; এখন এই তিনটা আড্ডা চালাতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে যেমন প্রভু যোগান।

যে যা করে, করতে দিও (উৎপাত ছাড়া)। টাকাখরচ বিলকুল তোমার হাতে রেখো। ... অধিক কি বলিব? তুমি ইদিক ওদিক যাওয়াটা বড় একটা ত্যাগ কর। ঘর জাগিয়ে বসে থাক। ... স্বাস্থ্যটার উপর বেজায় নজর রাখা চাই—পরে অন্য কথা। তারকদাদা দেশপর্যটনে উৎসুক—বেশ কথা, তবে এ সব দেশে বড়ই মাগগি, ১০০০ টাকার কমে মাসে চলে না (ধর্মপ্রচারকের)। ... এদের দেশের বাঘভাল্লুকে পাদ্রী-পণ্ডিতদের মুখ হতে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে—এই বুঝ। অর্থাৎ বিদ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য; বোঝে বিদ্যের তোড়, বক্তৃতার ধুম আর মহা উদ্যোগ। আমার মতে কিন্তু যদি তারকদাদা পাঞ্জাব বা মান্দ্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন করে বেড়ান ও তোমরা একত্রিত হয়ে organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হও তো বড়ই ভাল হয়। নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কাজ বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার করা ও প্রশস্ত সুন্দর করাও কঠিন কাজ। আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন

করে এসেছি; তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পার, তাহা হইলেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ তোমরা করবে। উপস্থিত যারা রক্ষা করতে পারে না, তারা অনুপস্থিতে কি করিবে? তৈয়ারী রান্নায় একটু নুন-তেল যদি দিতে না পার, তাহলে কেমন করে বিশ্বাস হয় যে, সকল যোগাড় করবে? না হয় তারকদাদা আলমোড়ায় একটা হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন, এবং সেথায় একটা লাইব্রেরী করুন; আমরা দু-দণ্ড ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করি এবং সাধনভজন করি। যা হোক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার তাতে আপত্তি কি? অপিচ Godspeed—শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ। তারকদাদার হৃদয়ে মহা উৎসাহ আছে; এজন্য তাঁহা হতে আমি অনেক আশা করি। তারকদাদার সহিত এক থিওসফিষ্টের মূলাকাত হয়। সে লণ্ডন হতে আমাকে এক চিঠি লেখে। তারপর আর তো তার খবরাখবর নাই। সে ব্যক্তি ধনী বটে, সে তারকদাদার উপর শ্রদ্ধাবানও বটে। তার নামটা ভুলে গেছি। সে তাঁকে লণ্ডনাদি ভ্রমণ করাইতে পারে; এবং আমি যে কার্য করিতে চাই, তাহা সমাধানের জন্য তোমাদের কয়েকজনকে ইওরোপ ও আমেরিকা দেখাইয়া লওয়া অবশ্য কর্তব্য। একচক্র ভ্রমণের পর হৃদয় উদার হবে, তখন আমার idea (ভাব) বুঝতে পারবে ও কাজ করতে পারবে। তবে আমার হাতে টাকা নাই, কি করি? শীঘ্রই প্রভু রাস্তা খুলে দেবেন—এমন ভরসা আছে। এ সকল খবর ও আমার হৃদয়ের ভালবাসা তারকদাদাকে দিও, ও আলমোড়ায় একটা কিছু আড্ডা স্থাপনে বিশেষ যোগাড় দেখতে বলবে।

রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে গরীব ছোঁড়াগুলো মনে করে; কেবল বলরাম, সুরেশ, মাষ্টার ও চুনীবাবু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না। মাভৈঃ! খুব আনন্দ করতে বল—তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম?

ইতি সদৈকহৃদয়ঃ
নরেন

১৫৭*

চিকাগো
১১ জানুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় জি. জি.,

তোমার ৩রা ডিসেম্বরের পত্র এইমাত্র পেলাম। ঐ সঙ্গেই আলাসিঙ্গার ও মহীশূরের মহারাজার পত্র পেলাম। নরসিংহ যে আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে সেখান থেকে মিসেস হেগকে একখানা পত্র লিখেছে—তাতে হিন্দুদের বর্বর আখ্যা দিয়েছে, আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখেনি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। যাতে সে আরোগ্যলাভ করে, তার চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না।

ডঃ ব্যারোজ তোমার পত্রের জবাব কেন দিলেন না, জানি না; কলিকাতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, তাও দেখিনি।

এখানকার ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্শনিক হিন্দুধর্ম আপন মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। ডঃ ব্যারোজ ও ঐ ধাঁজের লোকেরা বেজায় গোঁড়া—তাদের সাহায্য আমি চাই না, প্রভুই আমার সহায়। প্রভু এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু দিচ্ছেন, আর তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যারা আমার অনিষ্ট করবার জন্য চেষ্টা করেছে, তারা এখন হয়রান হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রভু ওদের মঙ্গল করুন।

ডঃ ব্যারোজ ও ঐ ধরনের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে আমার কোনপ্রকার সংস্রব নাই। বাল্টিমোরের ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব রটেছিল, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সেখানে এখন আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু রয়েছেন, এবং বরাবরই সেখানে আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আমি এক মুহূর্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না, এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র—বন ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এর মধ্যে বোষ্টনকে 'মস্তিষ্ক' ও নিউ ইয়র্ককে 'টাকার থলি' বলা যেতে পারে। এই উভয় স্থানেই আমার কাজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। যদি সংবাদপ্রেরকগণ তোমাদের নিকট ও-সম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। যা হোক, বৎসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি, আর যে আমি তোমাদের নিকট ওগুলো পাঠাব, সে আশা করো না। কাজ আরম্ভ করবার জন্য একটু হুজুগ দরকার ছিল, এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে।

মণি আয়ারকে চিঠি লিখেছি এবং তোমাকে আমার নির্দেশ পূর্বেই জানিয়েছি। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি করতে পার। আহাম্মকের মত বাজে বকলে চলবে না, এখন আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। কিভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে, তা তোমাদের আগেই জানিয়েছি; আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যদি না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। ব্যস্, এই কথা।তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিতে চাচ্ছে না। কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি যথার্থ সত্য শিক্ষা দিতে চাই; তা এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক—আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।

আমার বা তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে আর কান দিও না। সিংহবিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন। যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে, অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করে যাব; আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব। অসত্যের চেয়ে সত্যের প্রভাব অনন্তগুণে বেশী; সাধুতারও তাই। তোমাদের যদি ঐ গুণগুলি থাকে, তবে

ওরা নিজেদের শক্তিতেই পথ করে নেবে।

থিওসফিষ্টের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। বলছ তারা আমায় সাহায্য করবে। দূর! তোমরা যেমন আহাম্মক! তোমরা কি মনে কর, এখানে লোকে তাদের সঙ্গে আমাকে একদরের মনে করে? এখানে কেউ তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, আর হাজার হাজার ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এইটি জেনে রাখ, এবং প্রভুর প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও।

খবরের কাগজে হুজুগ আমাকে যতটা না বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমি লোকের ওপর ধীরে ধীরে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করছি। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে, তারা কোনমতে এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না; তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না—প্রভু এ-কথা বলছেন।

এটা হচ্ছে চরিত্রের ও পবিত্রতার প্রভাব, ও ব্যক্তিত্বের শক্তি। যতদিন এগুলি আমার থাকবে, ততদিন নিশ্চিন্ত থেকো, কেউ আমার মাথার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। প্রভু বলেছেন, যদি কেউ চেষ্টা করে, সে ব্যর্থ হবে।

বইপত্র—বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জীবন চাই, সেইটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়; ব্যক্তির ভেতর দিয়ে ভাবের আকর্ষণ অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা তো এখনও ছেলেমানুষ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর।

ওসব বাজে বুকনি ছেড়ে দাও, প্রভুর কথা কও। ভণ্ড ও মাথাপাগলা লোকদের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমাদের নেই—জীবন যে ক্ষণস্থায়ী।

সদাসর্বদা তোমাদের এটি মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। সুতরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারি—এই পর্যন্ত। যদি তার ওপর ভরসা করে তোমাদের থাকতে হয়, তবে বরং কাজকর্ম বন্ধ করে দাও। আরও জেনে রাখ যে, আমার ভাব বিস্তার করবার এটি বিশেষ উপযুক্ত জায়গা; আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রীষ্টানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদেরই সেবা করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, জানবে।

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না, ও দেখলেই আমার গা আঁতকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাও—প্রভু আমার সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন। যদি ইচ্ছা হয় তো সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সর্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ কর। আমার আশীর্বাদ তোমাদের ওপর রয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা-বিনিময় করবার সময় আমাদের নেই। যখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে কতদূর কি করলাম, তুলনা করব ও পরস্পরের সুখ্যাতি করব। এখন কথা বন্ধ কর; কেবল কাজ—কাজ—কাজ। ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু করেছ, তা তো দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন কেন্দ্র স্থাপন করেছ, তাও দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছ—তাও তো দেখছি না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তাও কিছু দেখছি না। কেবল কথা কথা কথা—'আমরা খুব বড়, আমরা খুব বড়'—পাগল! আমরা ক্লীব—তা ছাড়া আমরা আর কি?

এই জঘন্য নাম-যশ ও অন্যান্য বাজে ব্যাপার—ওগুলিতে আমার কি হবে? ওগুলি কি আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি? আমি দেখতে চাই—শত শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে। কোথায় তারা? আমি তাদের চাই—তাদের দেখতে চাই। তোমরা তো এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে পারনি—তোমরা আমায় কেবল নাম-যশ দিয়েছ। নাম-যশ চুলোয় যাক। কাজে লাগ, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগ। আমার ভেতরে যে কি আগুন জ্বলছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি। তোমরা এখন পর্যন্ত আমায় বুঝতে পারনি। তোমরা এখনও আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তাতেই চলেছ। দূর করে দাও যত আলস্য, দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।

ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মরতে পার—ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

পুঃ—আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার বালাজী এবং আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং বলবে—রাম শ্যাম যদু আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কি বলছে, এই নিয়ে তারা যেন দিনরাত মাথা না ঘামায়, তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকলকে আশীর্বাদ কর, তারা তো শিশু মাত্র, আর তোমরা কাজে লেগে যাও। ইতি—

বি

পুঃ—সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ করতে হবে। কারণ যদি কোন রিপোর্টারকে

দেখা সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া হয়, তবে সে গিয়ে যা তা কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়। সেইজন্যই তো তোমরা বাল্টিমোর-সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো পেয়েছ। লোকগুলি কি করে ঐসব লেখবার উপাদান পেলে, আমি তো নিজেই তা জানি না। আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুশী তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টারেরা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিষ পূরণ করে দেয়। আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপবার সময় খুব সাবধান। ইতি—

বি

১৫৮*

আমেরিকা
১২ জানুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
আমি গতকল্য জি. জি-কে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার হচ্ছে—তাই তোমায় লিখছিঃ

প্রথমতঃ আমি পূর্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, বই-টই বা খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না, কিন্তু তবু তোমরা পাঠাচ্ছ—এতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কারণ আমার ঐগুলি পড়বার এবং ঐগুলি সম্বন্ধে খেয়াল করবার মোটেই সময় নেই। অনুগ্রহ করে ওগুলি আর পাঠিও না। আমি মিশনরী থিওসফিষ্ট বা ঐ ধরনের লোকদের মোটেই আমল দিই না—তারা সবাই যা পারে তা করুক। তাদের কথা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই তাদের দর বাড়ান হবে। মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরটা মিসেস—কে পাঠিয়ে ঠিক করনি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান, সুতরাং গোঁড়াদের সম্বন্ধে ওতে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা তাঁর ভাল লাগবে না। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

এখন তোমরা চিরদিনের জন্য জেনে রাখ যে, আমি নাম-যশ বা ঐরূপ বাজে জিনিষ একদম গ্রাহ্য করি না। আমি জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছ বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হয়েছে, তাতে শুধু আমার নাম-যশই হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্যই জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐসব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই, জানবে। তোমরা ভারতের ভাবগুলি প্রচারের জন্য ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছ?—কই, কিছুই না।

একটি সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন—যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে ও ভাল ভাবগুলি আদর করতে শেখাবে। আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কলিকাতার সভায় ৫০০০ লোক জড়ো হয়েছিল—অন্যান্য স্থানেও শত শত লোক সভায় মিলিত হয়েছে—বেশ কথা, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে চারটি করে পয়সা সাহায্য করতে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। বালসুলভ নির্ভরতাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত; কারও কারও আবার সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের কিছু টাকা-কড়ি পাঠাতে পারবে না—কেনই বা পারবে? যদি তোমরা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে না পার, তবে তো তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও। তুমি যে জানতে চেয়েছ—আমেরিকার কাছ থেকে বছরে কয়েক হাজার টাকা পাবার নিশ্চিন্ত ভরসা করা যেতে পারে কিনা, তাই পড়ে আমি একেবারে হতাশ হয়ে গেছি। এক পয়সাও পাবে না। সব টাকা কড়ি নিজেদেরই যোগাড় করে নিতে হবে—কেমন, পারবে?

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে পরিকল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি; ও ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই—একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেবার জন্য মান্দ্রাজে একটি কলেজ করতেই হবে। ওর মুখপত্রস্বরূপ ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পত্রিকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা কিছু কর—তাহলে জানব, তোমরা কিছু করেছ—কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

তোমাদের জাতটা দেখাক যে তারা কিছু করতে প্রস্তুত। তোমরা ভারতে যদি এরূপ কিছু করতে না পার, তবে আমাকে একলা কাজ করতে দাও। জগৎকে দেবার জন্য আমার কাছে একটা বাণী আছে, যারা তা আদরপূর্বক নেবে ও কাজে পরিণত করবে, তাদের কাছে সেটি দিয়ে যেতে চাই। কে বা কারা সেটি নেয়, আমি গ্রাহ্য করি না। 'যারা আমার পিতার কার্য করবে',৪৮ তারাই আমার আপনার জন।

যাই হোক, আবার বলছি, এইজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করো—একেবারে ছেড়ে দিও না। আমার নাম খুব বড় করতে হবে না। আমি দেখতে চাই আমার ভাবগুলি যেন কাজে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল উপদেশগুলির সঙ্গে গুরুকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলে, এবং অবশেষে ব্যক্তির জন্য তাঁর ভাবগুলি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ যেন এই প্রকার না করেন। এ বিষয়ে তাঁদের সর্বদাই সাবধান থাকতে হবে। তোমরা ভাবগুলির জন্য কাজ কর, ব্যক্তির জন্য নয়। প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

সদা আশীর্বাদক

১৫৯

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৫

প্রাণাধিকেষু,
এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজুগ এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। বোধ করি, তোমরা এতদিনে কলিকাতায় আসিয়া থাকিবে। তারকদার পত্র শেষ, তারপর আর কোন সংবাদ নাই।

কালী কলিকাতায় থাকিয়া কাগজপত্র ছাপাইতেছে—সে বড় ভাল কথা, কিন্তু এখানে আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। … কিন্তু এই যে দেশময় একটা হুজুগ উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch (শাখা) স্থাপন করিবার প্রযত্ন কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মান্দ্রাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল? খবরের কাগজ চালাইবার তোমার ভাবনা কি আমরা জানি না; এখন লোক যে অল্প। চিঠি লিখে, ইত্যাদি করে সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও; তারপর গড় গড় করে চলে যাবে। বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হল, দু-চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ-কথা কি মিথ্যে?—

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণপরমাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥
৪৯

নাই বা হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম রাম! আবার 'নেই নেই' বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কিনা? ও কোন্ দিশী বিনয়—'আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই'—ও কোন্ দিশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও রকম 'দীনাহীনা' ভাবকে দূর করে দিতে হবে! আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জান না তো এতকাল করলে কি? ও-সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব; যার ভাগ্যে আছে, সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের মত কোণে বসে মেউ মেউ করবে।

এক মহাপুরুষ লিখছেন, 'আর কেন? হুজুগ খুব হল, ঘরে ফিরে এস।' বেকুব; তোকে মরদ বলতুম, যদি একটা ঘর করে আমায় ডাকতে পারতিস। ও-সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক; বাকী কাউকে আমি চাই না, মার কৃপায় আমি এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে দেবে—মা-ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকাকড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো। জমির জন্য ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর-দ্বার এক্ষণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে। যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক দিন চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শে করিবে। আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ-নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কাজ করে, আর আমাদের সকল কাজ বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুঁড়েমি), হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

হরমোহন, মধ্যে মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন—তা আমি অর্ধেক পড়তে পারি না, ইহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ অধিকাংশ খবরই এই ঢৌলের যথা—'অমুক ময়রার দোকানে বসে অমুক ছেলেরা আপনার বিরুদ্ধে এই-সকল কথা বলিতেছিল, আর তাহাতে আমি অসহ্য বোধে তাহাদের সহিত কলহ করিলাম ইতি।' আমার পক্ষসমর্থনের জন্য তাহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু জেলে-মালা আমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, ইহা সবিশেষ শুনিবার বিশেষ বাধা এই যে—'স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ' (সময় অল্প, বিঘ্ন অনেক)।

একটা Organized Society (সঙ্ঘবদ্ধ সমিতি) চাই। শশী ঘরকন্না দেখুক, সান্যাল টাকাকড়ি বাজারপত্রের ভার নিক, শরৎ সেক্রেটারী হোক অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা কর, মিছে হাঙ্গাম কি করছ—বুঝতে পারলে কিনা? খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বানাতে পার, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম। মান্দ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কাজ করবে। তাদের কাজ করবার অনেক শক্তি আছে। এবারকার মহোৎসব এমনি হুজুগ করে করবে যে, এমন আর কখনও হয় নাই। খাওয়াদাওয়ার হুজুগ যত কম হয়, ততই ভাল। দাঁড়া-প্রসাদ, মালসা ভোগ যথেষ্ট। সুরেশ দত্ত-র 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' পাঠ করলাম। খুব ভাল; তবে … প্রভৃতি উদাহরণগুলি

ছাপিয়েছেন কেন? কি মহাপাপ, ছি ছি!

আমি একটা ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন very short (অতি সংক্ষিপ্ত) লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রী করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই। খুব ধূমধামের সঙ্গে মহোৎসব করিবে। কিছু collection (চাঁদা) নেবে। তাতে দু এক হাজার টাকা হতে পারবে। তাহলে মা-ঠাকুরাণীর জমির উপর দস্তুরমত ঘর-দ্বার হয়ে যাবে। ইতি

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে বা শহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, সেইখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি? হরিসভা প্রভৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে 'স্বাহা' করতে হবে। কি বলব তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মত পেতুম! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। ... শক্তি থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে। ... মুক্তি-ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদিগের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যই তা উৎসর্গ করবেন)। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। 'হে ভগবান্, হে ভগবান্!' আরে ভগবান্ হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে বসে কি করবে? ... তুই ভগবান্, আমি ভগবান্, মানুষ ভগবান্ দুনিয়াতে সব করছে; আবার ভগবান্ কি গাছের উপর বসে আছেন? এই তো বুদ্ধির দৌড়, তারপর— ... যদি কল্যাণ চাস, ওসব হিংসে ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগে যা। যারা তা করতে পারবে না, তাদের বিদায় করে দে।

বিমলা ... শশী সাণ্ডেলের লিখিত এক পুস্তক পাঠিয়েছেন এবং লিখেছেন যে, শশীবাবুর সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—তাই জন্য তাঁর পুস্তকের যদি এ দেশে কেহ কেহ সহায়তা করে। দাদা, সে পুঁথি হল বাঙলা ভাষায়—এদেশের লোক কি সাহায্য করবে?—পুঁথি পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম হবার যো-টি নাই, কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁদের ধর্ম হতে পারবে। আবার তাঁদের মধ্যে শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলাচরণ—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্রসূর্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্মের জোর রে বাপ! বিশেষ বাঙলাদেশে ঐ ধর্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর নাই। তপ-জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র! পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম! যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য-গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, আমায় কেউ কিছু দেয় না। বিমলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারতসুদ্ধ লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশীবাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বিমলা তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি, শশী- বাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্য চূষ্য খানা, আবার নগদ। ... ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান; কেন না ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণ বদমাশ দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি-বদমাশি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাতে-মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?'—এই-সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ দু হাজার বৎসর ধরে। এদিকে 1/4 of the people are starving (সিকি ভাগ লোক না খেতে পেয়ে মরছে)। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ আহ্লাদে আটখানা। ... আবার ও কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন দেশী ধর্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি, 'হস্তাৎ যোনিং ন গূহতি' যতদিন, ততদিন কন্যা, এর পূর্বেই তার বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহ্যসূত্রেরই এই আদেশ।

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর—'তদনন্তরং মহিষীং অশ্ব-সন্নিধৌ পাতয়েৎ' ইত্যাদি! আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্গাতা প্রভৃতিরা বেড়োল মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারী করত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ করলেন—শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা!

এ-কথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করেছেন। না করবার যো-টি কি!

এ সকল কথা বলবার মানে এই—প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিষ ছিল, খারাপ জিনিষও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—Future India—Ancient India-র (ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বলো, রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরই বল, আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি, liar (মিথ্যাবাদী), চোর, ঝুঠ বিলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। ... তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভেতর ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তি বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—'দয়া দীন উপকার'—মানুষ ভগবান্, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্মক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত নারায়ণ। কীট less manifested (অল্প অভিব্যক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত)। Every action that helps a being manifest its divine nature more and more is good; every action that retards it, is evil.

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do the same.

If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger.
৫০

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God.
৫১

মহা দঁক সামনে—সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে—হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। [এখনকার] হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু', কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান! All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake, because it is only law of life, just you breathe to live.
৫২
This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম, &c. (ইহাই নিষ্কাম প্রেম, কর্ম প্রভৃতির রহস্য)।

শশীর (সাণ্ডেল) যদি কিছু উপকার করিতে পার চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখকাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিসনি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ আত্মার বিষয় শুনিয়াও ইঁহাকে জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations.
৫৩
ক্রমশঃ লোকে বুঝবে—আমার পুরানো বোল—struggle, struggle up to light. Onward, (প্রাণপণ সংগ্রাম করে আলোর দিকে অগ্রসর হও)। অলমিতি—দাস

নরেন্দ্র

১৬০*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

ব্রুকলিন
২০ জানুআরী, ১৮৯৫

… আপনার পিতা যে তাঁর জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবেন, আমি পূর্বেই তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন এরূপ সঙ্গতিহীন মায়ার তরঙ্গ কাউকে আঘাত করবার উপক্রম করে, তখন তাকে সে বিষয় লেখাটা আমার অভ্যাস নয়। তবে এই সময়গুলি জীবনের এক একটা অধ্যায় পাল্টানোর মত—আর আমি জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত আছেন। সমুদ্রের উপরিভাগটা পর্যায়ক্রমে উঠে নামে বটে, কিন্তু যে আত্মা ধীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন ওর ভেতর দিকটা এবং নিম্নদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবালসমূহকে বেশী বেশী করে প্রকাশিত করে। আসা যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্মা কখনও আসেনও না, যানও না। যখন সমুদয় দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে, তখন সে স্থানই বা কোথায়, আত্মা যেখানে যাবেন? যখন সমুদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে, তখন ওর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার ও ছাড়বার সময়ই বা কোথায়?

পৃথিবী ঘুরছে, ঐ ঘোরাতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে সূর্য ঘুরছে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সূর্য ঘুরছে না। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে, পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করছে, এই মহান্ গ্রন্থের পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে—এদিকে সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী জ্ঞানসুধাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা পূর্বে ছিল বা বর্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে, সকলেই বর্তমান কালে রয়েছে, আর জড় জগতের একটি উপমা ব্যবহার করে বলা যায় যে, তারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের ভাব থাকতে পারে না, সেইহেতু যাঁরা সকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের রয়েছেন এবং আমাদের হবেন, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, সর্বদাই ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন। আমরা তাঁদের মধ্যে রয়েছি এবং তাঁরাও আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

এই কোষগুলির কথা ধরুন। যদিও এরা প্রত্যেকটি পৃথক্, তথাপি সকলেই ক ও খ (দেহ ও প্রাণ)—এই দুই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে। সেখানে তারা এক। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সকলেই ঐ ক-খ নামক অক্ষে (axis) সম্মিলিত। কোনটাই সেই অক্ষকে ছেড়ে থাকতে পারে না, আর ঐসকল কোষের পরিধি যতই ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, ঐ অক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা এর মধ্যে যে-কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অক্ষটিই ঈশ্বর (ব্রহ্ম ও শক্তি)। এইখানেই আমরা তাঁর সঙ্গে এক; এতেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগ, আর সকলেই সেই ভগবানে সম্মিলিত।

একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে, চাঁদটাই চলেছে। তেমনি প্রকৃতি, দেহ, জড়বস্তু—এইগুলি সচল, গতিশীল; এদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সহজাত জ্ঞান (অথবা প্রেরণা?) দ্বারা সর্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক, মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্মল নীল আকাশে এই নক্ষত্ররাজি বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা—যাঁরা আমাদের দিগন্তের বাইরে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিষটার আরম্ভ; আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হল—যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম। সুতরাং ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে, আপনার পিতা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন, তা ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকাল যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন। তিনি কি এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আর একটি ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিধান করবেন? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করছি, যে পর্যন্ত না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তিনি তা না করতে পারছেন, তাঁকে যেন আর তা না করতে হয়। প্রার্থনা করি, কাউকে যেন তার নিজকৃত পূর্ব কর্মের অদৃশ্য শক্তিতে পরিচালিত হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যেতে হয়। প্রার্থনা করি, সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে, আমরা মুক্ত। আর যদি বা আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের সে স্বপ্ন যেন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়। ইতি

বিবেকানন্দ

১৬১*

নিউ ইয়র্ক
২৪ জানুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
মনে হয়—এ বৎসর আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, কারণ অবসাদ অনুভব করছি। এক দফা বিশ্রামের খুব বেশী দরকার। সুতরাং মার্চ মাসের শেষভাগে বোষ্টনের কাজে হাত দেওয়ার সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাবটি সমীচীন বটে। এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ড যাত্রা করব।

ক্যাট্‌স্‌কিল অঞ্চলে অতি অল্পমূল্যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পাওয়া যেতে পারে। একশত-এক একর পরিমাণ একটি জমি আছে; মূল্য মাত্র দু-শ ডলার। অর্থ মজুত রয়েছে। কিন্তু জমি আমার নামে তো আর কিনতে পারি না। এ দেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু। আপনি সম্মত হলে ঐ জমিটি আপনার নামে ক্রয় করি। গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থীরা ওখানে গিয়ে ইচ্ছামত কুটীর নির্মাণ বা শিবির রচনা করে ধ্যানাভ্যাস করতে পারবে। পরে অর্থসংগ্রহে সক্ষম হলে তারা সেখানে পাকা ঘর নির্মাণ করতে পারবে।

কাল এ-মাসের শেষ রবিবাসরীয় বক্তৃতা। আগামী মাসের প্রথম রবিবারে বক্তৃতা হবে ব্রুকলিন শহরে, অবশিষ্ট তিনটি নিউ ইয়র্কে। এ-বৎসরের মত নিউ ইয়র্ক-বক্তৃতাবলী এখানেই শেষ করব।

প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে, কালে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব আমি নিশ্চিন্ত—সকল বিষয়েই। বক্তৃতা এবং অধ্যাপনায় আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে কয়েক মাস কাজ করার পর ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে বৎসর-কয়েকের জন্য অথবা চিরতরে গা-ঢাকা দেব। আমি যে ‘নিষ্কর্মা সাধু’ হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অন্তর থেকে আমি নিঃসন্দেহ। একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছেঃ এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু তাহলে কি হয়, এই সব কর্মভোগ বাকী ছিল! আমার বিশ্বাস, এবার কর্মক্ষয় হয়েছে, এবং ভগবান্ আমাকে প্রচারকার্য তথা শুভকর্মের বন্ধন থেকেও অব্যাহতি দেবেন।

আত্মাই এক এবং অখণ্ড সত্তাস্বরূপ আর সব অসৎ—এই জ্ঞান হয়ে গেলে কি আর কোন ব্যক্তি বা বাসনা মানসিক উদ্বেগের হেতু হতে পারে? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাচ্ছে। চিত্তশুদ্ধি

অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্মের যে আর কোন সার্থকতা নেই—এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে।

দুনিয়া তার ভাল মন্দ নিয়ে নানা রূপে চলতে থাকবে। ভাল মন্দ শুধু নূতন নামে ও নূতন স্থানে দেখা দেবে। নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। 'একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই ছিন্ন বস্ত্র (কৌপীন), মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন-ভোজন—হায়! এগুলিই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়! শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান, যেখানে আত্মা তার মুক্তির সন্ধান পায়—ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের এ-সব আড়ম্বর সর্বথা অন্তঃসারশূন্য ও আত্মার বন্ধন। জীবনে আর কখনও এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা অনুভব করিনি। ভগবান্ সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দিন—সকলেই মায়া-মুক্ত হোক, ইহাই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা।

১৬২*

[মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

528, 5th Avenue, নিউ ইয়র্ক
২৪ জানুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় মিস বেল,
আশা করি ভাল আছ ...

আমার শেষ বক্তৃতাটা পুরুষদের দ্বারা খুব বেশী সমাদৃত হয়নি, কিন্তু দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে মেয়েদের দ্বারা। তুমি জান যে, ব্রুকলিন জায়গাটা নারী-অধিকার আন্দোলনের বিরোধিতা কেন্দ্র, তাই যখন আমি বললাম, মেয়েরা সর্ববিষয়ে অধিকার পাবার যোগ্য এবং তাদের তা পাওয়া উচিত, তখন বলাই বাহুল্য, পুরুষেরা সেটা পছন্দ করল না। তার জন্যে কোন চিন্তা নাই, মেয়েরা খুশীতে আত্মহারা।

আমার আবার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি গার্নসিদের কাছে যাচ্ছি। শহরতলীতেও একটা ঘর পেয়েছি; সেখানে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে কয়েক ঘণ্টা কাটাব। মাদার চার্চ নিশ্চয়ই এতদিনে সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন এবং তোমরা সকলে আজকালকার সুন্দর আবহাওয়া উপভোগ করছ। মিসেস এডামস্‌কে আমার পর্বতপ্রমাণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিও, যখন তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। আমার চিঠিগুলি যথারীতি গার্নসিদের কাছে পাঠিয়ে দিও।

সকলের জন্য আমার ভালবাসা।

তোমাদের সদা স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১৬৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

54W. 33rd Street, N.Y
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো
১ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

স্নেহের ভগিনী,
এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইলাম। মাদার চার্চ কনসার্টে যাইতে পারেন নাই শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নিষ্কামভাবে কাজ করিতে বাধ্য হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন—যদিও তাহাতে নিজকৃত কর্মের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

ভগিনী জোসেফাইন লক্‌ও একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। তোমার সমালোচনাগুলি পড়িয়া আমি মোটেই দুঃখিত হই নাই, বরং বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সেদিন মিস থার্সবির বাড়ীতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সহিত আমার তুমুল তর্ক হইয়াছিল। যেমন হইয়া থাকে, ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, মিসেস বুল আমাকে এজন্য পরে খুব ভর্ৎসনা করিয়াছেন, কারণ এগুলি আমার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমারও মত ঐ প্রকার বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি যে এ সম্বন্ধে ঠিক এই সময়েই লিখিয়াছ, ইহা আনন্দের বিষয়, কারণ আমি ঐ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিতেছি। প্রথমতঃ আমি এই সকল ব্যাপারের জন্য আদৌ দুঃখিত নই; হয়তো তুমি ইহাতে বিরক্ত হইবে—হইবার কথা বটে। সাংসারিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়া যে কত ভাল, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মিষ্টভাষী হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যখন অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা ভয়ঙ্কর আপস করিতে হয়, তখনই আমি থামিয়া যাই। আমি বিনম্র দীনতায় বিশ্বাসী নহি—সমদর্শিত্বের ভক্ত!

সাধারণ মানবের কর্তব্য—তাহার 'ঈশ্বর'—সমাজের সকল আদেশ পালন করা; কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহা একটি চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া সর্বকল্যাণপ্রদ সমাজের নিকট হইতে সর্ববিধ সুখসম্পদ পায়; অপর ব্যক্তি একাকী থাকিয়া সমাজকে তাঁহার দিকে টানিয়া লন।

সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর যে তাহা করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্তশক্তিসম্পন্ন জারক (corrosive) পদার্থের সহিত তুলনা করি; উহা যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়—নরম জিনিষে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরে বিলম্বে; কিন্তু পথ করিয়া লইবেই। যল্লিখিতং তল্লিখিতম্। ভগিনী, আমি যে প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টবাক্যে আপস করিতে পারি না, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমি তাহা পারি না। সারাজীবন এজন্য ভুগিয়াছি, তবু তাহা করিতে পারি না। আমি বারবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে মিথ্যাচারী হইতে দিবেন না। অবশেষে উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহা ভিতরে আছে, তাহাই ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন পথ পাই নাই, যাহা সকলকে খুশী করিবে; সুতরাং আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই আমাকে থাকিতে হইবে—আমায় নিজ অন্তরাত্মার নিকট খাঁটি থাকিতে হইবে। 'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম-যশও নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়; বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী।' হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক হও। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, এখন আর মিষ্ট মধু হওয়া চলে না। আমি যেমন আছি, যেন তেমনই থাকি। 'হে সন্ন্যাসী, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করিয়া, শত্রু-মিত্র কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাক।' এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী হইলাম—'ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ কর।' হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের কামনা নাই, নাম-যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনী, এ সকল আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলাম। কিরূপে সহজে অর্থোপার্জন হয়, সে কৌশল আমার জানা নাই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার হৃদয়স্থিত সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? ভগিনী, আমার মন এখনও দুর্বল, বাহ্য জগতের সাহায্য আসিলে সময়ে সময়ে অভ্যাসবশতঃ উহা আঁকড়াইয়া ধরি। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজকমহাশয়ের সহিত আমার যে শেষ বাগ্‌যুদ্ধ এবং তৎপরে মিসেস বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক হয়, তাহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, মনু কেন সন্ন্যাসিগণকে উপদেশ দিয়াছেনঃ একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে। বন্ধুত্ব বা ভালবাসামাত্রই সীমাবদ্ধতা; বন্ধুত্বে—বিশেষতঃ মেয়েদের বন্ধুত্বে চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা হইলেই অনুভব করিবে—প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। জীবন কিছুই নহে, মৃত্যুও ভ্রমমাত্র! এইসব কিছুই নয়, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনী, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরিতে হইবে। আদবকায়দার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সময় আমার নাই। আমি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি, তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি সৎস্বভাবা, পরম দয়াবতী। আমি তোমার জন্য সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের সকলকে শিশুর মত দেখি।

আর স্বপ্ন দেখিও না। হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় জগৎকে আমার নূতন কিছু দিবার আছে। মানুষের মন যোগানর সময় আমার নাই, উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। বরং সহস্রবার মৃত্যু বরণ করিব, তবুও [মেরুদণ্ডহীন] জেলি মাছের মত জীপনযাপন করিয়া নির্বোধ মানুষের চাহিদা মিটাইতে পারিব না—তা আমার স্বদেশেই হোক অথবা বিদেশেই হউক। তুমিও যদি মিসেস বুলের মত ভাবিয়া থাক, আমার কোন বিশেষ কার্য আছে, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, উহা আমি নিজের ভাবে বলিব, হিন্দুভাবেও নয়, খ্রীষ্টানভাবেও নয়, বা অন্য কোনভাবেও নয়; আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ভাবে রূপ দিব—এইমাত্র। মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম, আর যাহা কিছু উহাকে বাধা দিতে চাহে, তাহা আমি পরিহার করিয়া চলিব—তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক বা তাহা হইতে পলায়ন করিয়াই হউক। কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব!! ভগিনী, আমার এ-কথা ভুল বুঝিয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসবের আস্বাদ পাও নাই, যাহা 'যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পর্যবসিত করে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে।' শক্তি থাকে তো লোকে যাহাকে 'এই জগৎ' নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার জাল হইতে বাহির হইয়া আইস। তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলিব। যাহারা এই আভিজাত্যরূপ মিথ্যা ঈশ্বরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহার চরম কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, তাহাদিগকে যদি তুমি উৎসাহ দিতে না পার, তবে চুপ করিয়া থাক; কিন্তু আপস ও মনস্তুষ্টিকরারূপ মিথ্যা মূর্খতা দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিও না।

আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে, এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তাহার গীর্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমাশিগুলিকে, তাহার সুন্দর মুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে—সর্বোপরি ধর্মের নামে তাহার দোকানদারিকে আমি ঘৃণা করি। কী! সংসারের ক্রীতদাসেরা কি বলিতেছে, তাহা দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিবে! ছিঃ! ভগিনী, তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না। বেদ বলেন, সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ, কারণ তিনি গীর্জা, ধর্মমত, ঋষি (prophet), শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না। মিশনরীই হউক বা আপর কেহই হউক, তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না। ভর্তৃহরির ভাষায়ঃ৫৪ ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর?—এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করিতে থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না; তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান। তুলসীদাসও বলিয়াছেনঃ

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার

সাধুওঁকা দুর্ভাব নহী জব্ নিন্দে সংসার।

যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজার কুকুর পিছু পিছু চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী ফিরিয়াও চাহে না। সেরূপ যখন সংসারী লোকেরা নিন্দা করিতে থাকে, তখন সাধুগণ তাহাতে বিচলিত হন না।

আমি ল্যাণ্ডসবার্গের (Landsberg) বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ইনি সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি। প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন। কখনও কখনও আমি গার্নসিদের (Guernseys) ওখানে শয়ন করিতে যাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে চিরকালের জন্য কৃপা করুন। তিনি তোমাদিগকে শীঘ্র এই জগৎ নামক বিরাট ধাপ্পাবাজি হইতে উদ্ধার করুন। তোমরা যেন কদাপি এই জগৎরূপ জরাজীর্ণ ডাইনীর কুহকে না পড়! শঙ্কর তোমাদিগের সহায় হউন! উমা তোমাদিগের সমক্ষে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিন এবং তোমাদের সকল মোহ অপসারিত করুন! স্নেহাশীর্বাদসহ

তোমাদের
বিবেকানন্দ

১৬৪

[শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে লিখিত]

54W. 33rd St., নিউ ইয়র্ক
৯ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় সান্যাল,

তোমার এক পত্র পাইলাম, তাহাতে টাকা পৌঁছিবার সংবাদ লিখিয়াছ; কিন্তু বোষ্টন হইতে কয়েকটি বন্ধু যে টাকা পাঠান, তাহার সংবাদ এখনও পাই নাই—বোধ হয় দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে পাইব। গোপালদাদা কাশী হইতে এক পত্র লেখে। জমির বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তাহা কিছুই নহে। পরঞ্চ রাখাল এক পত্রে জমির বিষয় লিখিতেছেন, তাহাও কিছু বিশেষ নহে। দুটো ঘরওয়ালা যে জমির বিষয় লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি আছে—অর্থাৎ ঘরের জন্য জমিটার কমি না হয়। জমিটা যাহাতে বড় হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। তোমাদের ঐ যে গোঁড়ামি, তাহাতে তোমাদের নিয়ে যে কিছু করা—তা আমার দ্বারা হবে না। পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন; আমি তাঁকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন? গুরুপূজার ভাব বাঙলাদেশ ছাড়া অন্যত্র আর নাই—তথাপি অন্য লোকে সে ভাব লইবার জন্য প্রস্তুত নহে। তোমাদের ভেতর একটা মস্ত মূর্খতা আছে যে, তোমরা একটা কি! বলি কলিকাতার দশ ক্রোশ তফাতে—না তোমাদের কেউ জানে, না তোমাদের গুরুকে কেউ জানে। আর তোমরা সেই ‘পরমহংসদেব অবতার’ নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি। ফল—আমি শশী প্রভৃতিকে কিঞ্চিৎ বোঝাবার চেষ্টা করে দেখলাম যে, সে চেষ্টা নিষ্ফল। অতএব তাদের দিল্লীর লাড়ু দিয়ে সরে পড়াই ভাল।

মা-ঠাকুরাণীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করব। তারপর আমি আর কিছু বুঝিসুঝি না। তোমরা তো আমার নামটি টেনে নেবার বেলা খুব তৈয়ার—যে আমি তোমাদেরই একজন। কিন্তু আমি একটা কাজ করতে বললে অমনি পেছিয়ে পড়, ‘মতলবকী গরজী জগ্ সারো’—এ জগৎ মতলবের গরজী।

আমি বাঙলাদেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার একজন, কাজের বেলায়—০ (শূন্য)।

আমি এখানে জমিদারীও কিনি নাই, বা ব্যাঙ্কে লাখ টাকাও জমা নাই। এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে—এই ঘোর শীতে রাত্তির দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার করে দু-চার হাজার টাকা করেছি—মা-ঠাকুরাণীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত। গুঁতোগুঁতির আডডা করে দেবার শক্তি আমার নাই। অবতারের বাচ্চারা কোথায়—ছোট ছোট অবতারেরা—ওহে অবতারের পিলেগণ?

অলমিতি। তোমাদের হতে আমার কোন আশা নাই। তোমরাও আমার কোন আশা করো না। যে যার আপনার পথে চলে

যাও। শুভমস্তু। এ দুনিয়া এই রকম মতলব-ভরা!

চিঠিপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় লিখবে এখন হতে। এই ঠিকানা এখন হতে—আমার নিজের আড্ডা। যদি পার একখানা 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'—English translation (ইংরেজী অনুবাদ) পাঠাবে। মহিনকে দাম দিতে বলবে। ইতি

পূর্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি অর্থাৎ সংস্কৃত নারদ-ও শাণ্ডিল্য-সূত্র, তাহা ভুলো না। ইতি

'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।' ইতি

নরেন্দ্র

পত্রাবলী ১৬৫-১৭৪

১৬৫*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

228W. 39th st., নিউ ইয়র্ক
১০ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,
এখনও আমার পত্র পাওনি জেনে বিস্মিত হলাম। তোমার পত্র পাবার ঠিক পরেই আমি তোমাকে লিখি এবং নিউ ইয়র্কে দেওয়া আমার তিনটি বক্তৃতা-সংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তিকা পাঠাই। রবিবাসরীয় ও সাধারণে প্রদত্ত এই ভাষণগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিত হয়ে পরে মুদ্রিত হয়েছে। এইরূপ তিনটি বক্তৃতা দুখানি পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়, তারই কয়েকখানি তোমাকে পাঠাই। নিউ ইয়র্কে আরও দুই সপ্তাহ আছি। অতঃপর ডেট্রয়েট। তারপরে বোষ্টনে সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ দুই।

এ বৎসর অবিরাম কাজের ফলে আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। স্নায়ুই বিশেষভাবে আক্রান্ত। সারা শীতে এক রাত্রিও সুনিদ্রা হয়নি। দেখছি—অতিরিক্ত খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। আবার সামনে ইংলণ্ডে মস্ত কাজ।

কাজগুলো করতে হবে। তারপর ভারতে ফিরে গিয়ে বাকী জীবন বিশ্রাম! ভগবানের উদ্দেশে কর্মের ফল সমর্পণ করে আমি জগতের কল্যাণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এখন বিশ্রামই আমার অভীপ্সিত। আশা করি কিছু অবসর পাব ও ভারতীয়গণ আমাকে নিষ্কৃতি দেবে।

হায়! যদি কয় বছরের জন্য আমি নির্বাক হতে পারতাম এবং আমাকে মোটেই কথা বলতে না হত! বস্তুতঃ এ-সব পার্থিব দ্বন্দ্বের জন্য আমি জন্মাইনি। আমি স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদী হয়েই আমি জন্মেছি এবং স্বপ্নরাজ্যেই আমি বাস করতে পারি। জাগতিক বিষয়সমূহ আমাকে উত্ত্যক্ত করে তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

তোমরা ভগিনী চারজন আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছ। এ দেশে আমার যা কিছু, তার মূলে তোমরা। তোমরা চিরসুখী ও সৌভাগ্যশালিনী হও। যেখানেই থাকি, গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাসা সহ সর্বদাই তোমাদের মনে রাখব। সারা জীবন স্বপ্নের ধারার মত। স্বপ্নের মধ্যে দ্রষ্টার মত থাকাই আমার আকাঙ্ক্ষা। ব্যস্। সকলের প্রতি—ভগিনী জোসেফাইনের প্রতি আমার শুভেচ্ছা। ইতি

তোমার চিরস্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১৬৬*

54 W 33rd St., নিউ ইয়র্ক
১৪ ফেব্রুআরী,১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
... জননীর ন্যায় আপনার সৎপরামর্শের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আশা করি জীবনে তদনুযায়ী কাজ করতে পারব।

আমি যে বইগুলির কথা আপনাকে লিখেছিলাম, সেগুলি আপনার বিভিন্ন ধর্মের পুস্তক-সম্বলিত গ্রন্থাগারের জন্য। আর আপনারই যখন কোথায় থাকা হবে-না-হবে ঠিক নেই, তখন ওগুলির আর এখন প্রয়োজন নেই। আমার গুরুভাইদেরও প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁরা ভারতে ওগুলি পেতে পারেন; আর আমাকেও যখন সর্বদা ঘুরতে হচ্ছে, তখন আমার পক্ষেও সেগুলি সর্বত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার এই দানের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

আপনি আমার ও আমার কাজের জন্য ইতোমধ্যেই যা করেছেন, সেজন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে কি করে করব, তা বলতে পারি না। এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন।

তবে আমার অকপট বিশ্বাস এই যে, এ বৎসর আপনার সমুদয় সাহায্য মিস ফার্মারের গ্রীনএকারের কার্যে দেওয়া উচিত। ভারত এখন অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে—শত শতাব্দী ধরে তো অপেক্ষা করছেই। আর হাতের কাছে করবার যে কাজটা রয়েছে, সেটার দিকে সর্বদাই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা, মনুর মতে—সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্যের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, প্রাচীন ঋষিরা যা বলে গেছেন, তা অতি ঠিক কথাঃ 'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'—আশাই পরম দুঃখ এবং ত্যাগ করাতেই পরম সুখ। এই যে আমার 'এ করব, ও করব', এ রকম ছেলেমানুষি ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐ-সকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে। 'সব বাসনা ত্যাগ করে সুখী হও। কেউ যেন তোমার শত্রু বা মিত্র না থাকে, তুমি একাকী বাস কর। এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে, সুখদুঃখের অতীত হয়ে, বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে কোন প্রাণীকে হিংসা না করে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বা উদ্বেগের কারণ না হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।'

'ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেও না—কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করো না। এই যে সব দৃশ্য একের পর এক দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরূপে দেখ—সেগুলি সব চলে যাক।'

হয়তো এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য ঐসব ভাবোন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

এখন বেশ সুখে আছি। আমি আর মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা যব রাঁধি—চুপচাপ খাই, তারপর হয়তো কিছু লিখলাম বা পড়লাম, উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আর এইভাবে থেকে বোধ হচ্ছে, আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন এ রকম অনুভব করিনি।

'ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয়, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, যশে নিন্দুকের ভয়, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয়, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।'
৫৫

আমি সেদিন মিস কর্বিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—মিস ফার্মার ও মিস থার্সবিও তথায় ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে আমাদের বেশ আনন্দে কাটল। মিস কর্বিনের ইচ্ছা—আগামী রবিবার থেকে তাঁর বাড়ীতে কোন রকম ক্লাস খুলি। আমি আর এখন এ-সবের জন্য ব্যস্ত নই। আপনা-আপনি যদি এসে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়কার। আর যদি না আসে, তাহলে প্রভুর আরও জয়জয়কার।

পুনরায় আমার চিরকৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার অনুগত সন্তান
বিবেকানন্দ

১৬৭*

[ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

54 West 33rd St., নিউ ইয়র্ক
২৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,

তোমার অসুখ হয়েছিল জেনে আমি দুঃখিত। তোমাকে একটি চিকিৎসা
৬৫
বলে দিচ্ছি, যদিও তোমার স্বীকৃতি আমার মনের অর্ধেক বল হরণ করে নিয়েছে। তুমি যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ, তা ভালই হয়েছে। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

বইগুলি বেশ ভাল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং সেগুলির জন্য অনেক ধন্যবাদ।

তোমার সদা স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১৬৮*

19 W. 38 St., নিউ ইয়র্ক

১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

… তথাকথিত সমাজসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামিও না, কারণ গোড়ায় আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে কোনপ্রকার সংস্কারই হতে পারে না। … তাঁর কথা প্রচার করে যাও, সামাজিক কুসংস্কার এবং গলদ সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু বলো না। হতাশ হয়ো না, গুরুর উপর বিশ্বাস হারিও না, ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিও না—হে বৎস, যতক্ষণ তোমার এই তিনটি জিনিষ আছে, কিছুই তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি দিন দিন সবল হয়ে উঠছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।

সাশীর্বাদ
বিবেকানন্দ

১৬৯*

আমেরিকা
৬ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুন তুমি হয়তো কত কি ভাবছ। কিন্তু হে বৎস! আমার বিশেষ কিছু লেখবার ছিল না; খবরের মধ্যে সেই পুরাতন কথা—কেবল কাজ, কাজ, কাজ।

তুমি ল্যাণ্ডসবার্গ ও ডাঃ ডের নিকট যে পত্র লিখেছ, তার দুখানাই আমি দেখেছি—সুন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরূপে এখনি ভারতে ফিরে যেতে পারব, তা তো বোধ হয় না। এক মুহূর্তের জন্যও ভেবো না যে, ইয়াঙ্কিরা ধর্মকে কাজে পরিণত করবার এতটুকু মাত্র চেষ্টা করে। এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই—কথা ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। ইয়াঙ্কিরা টাকা রোজগারে খুব কৃতকর্মা। আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্মভাব জেগেছে, সবটাই উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাবার আগে কাজের ভিত্তিটা পাকা করে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না করে সম্পূর্ণ করা উচিত।

'—' আয়ারকে একখানা পত্র লিখেছিলাম; তাতে যা লিখেছি, তোমরা সেইসব বিষয়ে কি করছ?

রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করবার জন্য জেদ করো না। আগে তাঁর ভাব প্রচার কর—যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটিকে মানে, তারপর তার ভাবটি নেয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে; বেশ তো, সে একবার সবদিক চেখে চেখে দেখুক, যা খুশী তাই প্রচার করুক না, কেবল গোঁড়ামি করে যেন অপরের ভাবের ওপর আক্রমণ না করে। তুমি ওখানে তোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পার, করবার চেষ্টা কর, আমিও এখানে একটু আধটু সামান্য কাজ করবার চেষ্টা করছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি পাঠিয়ে দিতে পার? গোড়াতেই একেবারে বড় বড় পরিকল্পনা খাড়া করো না, ধীরে ধীরে আরম্ভ কর। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেটা কত শক্ত, তা বুঝে অগ্রসর হও, ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর।

হে সাহসী বালকগণ! কাজ করে যাও—একদিন না একদিন আমরা আলো দেখতে পাবই পাব।

জি.জি., কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহৃদয় মান্দ্রাজী যুবকদের আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে।

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—যদি সুবিধা হয়, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে।

পুঃ—যদি লোকে পছন্দ না করে, তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা বদলে আর যা খুশী করে দাও না কেন?

সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হবে—ল্যাণ্ডসবার্গের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান কর। এইরূপে কাজটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোমনগর একদিনে নির্মিত হয়নি। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল; তিনি আমাদের বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক, প্রভুই মহান্—তিনিই অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের মহৎ কার্যে সাহায্য করবার জন্য পাঠাবেন।

ইতি—
বি

১৭০*

54 W. 33rd St., নিউ ইয়র্ক
২১ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

আমি যথাসময়ে আপনার কৃপালিপি পেলাম এবং তাতে আপনার এবং মিস থার্সবি ও মিসেস এডামস্ সম্বন্ধে খবরাখবর পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম।

আপনার সঙ্গে মিসেস ও মিস হেলের দেখা হয়েছে শুনে খুব সুখী হলাম, চিকাগোয় আমার যে কয়জন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন, তন্মধ্যে তাঁরা অন্যতম।

রমাবাঈ-এর দল আমার বিরুদ্ধে যে-সকল নিন্দা প্রচার করছে, তা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। মিসেস বুল! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, মানুষ যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাকবে যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা রচনা করে প্রচার করবেই। চিকাগোতে তো আমার বিরুদ্ধে এরূপ কিছু না কিছু লেগে থাকত।

আমাদের বাড়ীটার নীচ তলায় অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার সঙ্কল্প করছি। ঐ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে, এতেই খরচা উঠে যাবে। ভারতবর্ষে টাকা পাঠাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, সেজন্য অপেক্ষা করব।

মিস ফার্মার কি আপনার সঙ্গে আছেন? মিসেস পিক কি চিকাগোয় আছেন? আপনার সঙ্গে কি জোসেফাইন লকের দেখা হয়েছে?

মিস হ্যামলিন আমার প্রতি খুব দয়া প্রকাশ করছেন, আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করছেন।

আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম—মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে আমাদিগকে ঐগুলি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। এগুলি পরের মঙ্গল করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এখন কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। এগুলির কুৎসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরাও অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন। এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙবার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব।

তাই তো একটা কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য আমার এতটা আগ্রহ। সঙ্ঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছাড়া কিছু হবারও যো নেই। এখানেই ভয়, আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হবে। সেই বিষয়টি এই যে, কেউ সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কাজ করবে—তা হতে পারে না।

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে, সেভাবে কাজ করা উচিত, আর যদি সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল হয়, তবে হয়তো মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে সমাজকে নিশ্চয়ই তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে। একটা ভাবের জন্য যতদিন পর্যন্ত না আমরা আর যা কিছু সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোন কালে আলো দেখতে পাব না।

যাঁরা মানবজাতির কোনপ্রকার সাহায্য করতে চান, তাঁদের এ-সকল সুখ-দুঃখ, নাম- যশ, আর যত প্রকার স্বার্থ আছে, সেগুলি একটা পোঁটলা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আসতে হবে। সকল আচার্যই এই কথা বলে গেছেন ও করে গেছেন।

আমি গত শনিবার মিস কর্বিনের কাছে গিয়েছিলাম, আর তাঁকে বলে এসেছি যে, আর ওখানে ক্লাস করতে যেতে পারব না। জগতের ইতিহাসে কি কখনও এরূপ দেখা গেছে যে, ধনীদের দ্বারা কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে—টাকার দ্বারা নয়। আমার ভাব ও জীবন সবই উৎসর্গ করেছি; ভগবান্ আমার সহায়, আর কারও সাহায্য চাই না। ইহাই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য—এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে একমত।

আপনারই চিরকৃতজ্ঞ ও স্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস ফার্মার ও মিসেস এডামস্‌কে আমার ভালবাসা জানাবেন।

বি

১৭১*

[ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত]

54 W. 33 St. N.Y.
২৭ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,

তোমার চিঠিখানা পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে যে, তা প্রকাশ করা যায় না। আমিও অনায়াসে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়তে পেরেছি। অবশেষে কমলারঙ ঠাওরিয়ে সেই রঙের একটা জামা পেয়েছি, কিন্তু গরমের দিনে ব্যবহারের উপযোগী কোন জামা এ-পর্যন্ত পাইনি। যদি পাও, আমাকে অনুগ্রহ করে জানিও। এখানে নিউ ইয়র্কে তৈরী করে নেব। তোমার সেই অদ্ভুত ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ-এর অযোগ্য দর্জি সাধু-সন্ন্যাসীর জামাও প্রস্তুত করতে জানে না।

ভগিনী লক্ এক লম্বা চিঠি লিখেছে এবং হয়তো উত্তরের দেরী দেখে আশ্চর্য হয়েছে। উৎসাহে সে অভিভূত হয়ে যায়; তাই আমি অপেক্ষা করছি এবং কি লিখব, জানি না। অনুগ্রহ করে তাকে বলবে—এই মুহূর্তে কোন স্থান নির্ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মিসেস পীক সদাশয়া মহীয়সী ও অত্যন্ত ধর্মশীলা হলেও বৈষয়িক ব্যাপারে আমার মতই বুদ্ধিমান, তবে আমি দিনদিন বুদ্ধিমান হচ্ছি। ওয়াশিংটনে মিসেস পীকের জানা কে একজন তাকে গ্রীষ্মাবাসের জন্য একটি জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

কে জানে, সে প্রতারিত হবে কিনা? প্রতারণার এ এক অদ্ভুত দেশ; অন্যের ওপর সুবিধা নেওয়ার কোন-না-কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে শতকরা নিরানব্বই জনের। যদি কেউ মুহূর্তের জন্য কেবল একটু চোখ বন্ধ করে, তবেই তার সর্বনাশ! ভগিনী জোসেফাইন অগ্নিশর্মা। মিসেস পীক সাদাসিধে ভাল মহিলা। এখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যে, কিছু করবার আগে কয়েক ঘণ্টা আমাকে চারিদিকে তাকাতে হয়। সবই ঠিক হয়ে যাবে। ভগিনী জোসেফাইনকে একটু ধৈর্য ধরতে বলো। একজন বৃদ্ধার সংসার চালানর চেয়ে প্রতিদিন কিণ্ডারগার্টেন তোমার নিশ্চই আরও ভাল লাগছে। মিসেস বুলকে দেখেছ; তাঁকে এত নিরীহ ও শান্ত দেখে তুমি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছ। মিসেস এডামসের সঙ্গে মাঝে মাঝে তোমার দেখা হয় কি? তার উপদেশে মিসেস বুল খুব উপকৃত হয়েছে। আমিও কিছু উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু কোন কাজে লাগল না; মিসেস এডামস্ যেমন চাইছে, তাতে সামনের ক্রমবর্ধমান বোঝা নোয়ান যায় না। হাঁটবার সময় যদি সামনে ঝুঁকবার চেষ্টা করি, তাহলে ভারকেন্দ্র পাকস্থলীর উপরিভাগে আসে; কাজেই পুরোভাগে ডিগবাজি খেয়ে চলি।

ক্রোরপতি কেউ আসছে না, ‘কয়েক-সহস্র’পতিও নয়! দুঃখিত, খুব দুঃখিত!!! কি করতে পারি—যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার ক্লাসগুলি যে মহিলাতেই ভর্তি। … বেশ, ধৈর্য ধর। আমি চোখ মেলে রাখব, কখনও সুযোগ হারাব না। তুমি যদি কাকেও না পাও, অন্ততঃ আমার কুঁড়েমির জন্য তা নয়, জেনো।

সেই পুরাতন পথেই জীবন চলেছে। ক্রমাগত বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গ করে অনেক সময় বিরক্তি আসে, দিনের পর দিন চুপ করে থাকতে ইচ্ছা হয়।

তোমার স্বপ্ন শুভ হোক, কারণ সুখী হবার এটাই একমাত্র পথ।

সতত তোমার স্নেহের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১৭২*

আমেরিকা
৪ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করলে তুমি তাতে ভয় পেও না। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন, ততদিন আমি অপরাজেয়। আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বড় অস্পষ্ট। মিসেস হেল ছাড়া গোঁড়া খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তবে এখানে উদারভাব এবং চিন্তাও যথেষ্ট আছে। মিঃ লাণ্ড বা ঐ ধাঁজের গোঁড়ারা পালপার্বণে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ লোকই ধর্মের ধার ধারে না। শতকরা ৯৯.৯ জন লোক ঐ ধরনের। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন করে, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় বৎস! সাহস হারিও না। আমি আয়ারকে একখানি পত্র লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে তার কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, তোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জান না; আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি বই চেয়েছিলাম, সে সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখনি। যদি সব সম্প্রদায়ের ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র আমায় পাঠাতে পার তো ভাল হয়। সম্ভবতঃ সামান্না তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। আমার জন্য একটুও ভয় পেও না। তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন। ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? ভারত তো আমার ভাবরাশি-বিস্তারের সাহায্য করতে পারবে না। এই দেশ আমার ভাবে খুব আকৃষ্ট হচ্ছে। আমি যখন আদেশ পাব, তখন ফিরে যাব। ইতোমধ্যে তোমরা সকলে ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে কাজ করে যাও। যদি কেউ আমায় আক্রমণ করে কথা বলে, তাহলে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যাও। যদি কেউ ভালমন্দ বলে, পার তো তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিও, আর কাজ করে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ান যেতে পারে। উপস্থিত এইভাবে কাজ করে যাও। তাহলেই বোধ হয়, এক্ষণে মান্দ্রাজীদের কাছে খুব বেশী সহানুভূতি পাবে। এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি সাহস হারাও, তখনই তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট করছ তা নয়, কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়।

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—জি. জি., ডাক্তার, কিডি, বালাজী এবং আর সবাইকে আনন্দ করতে বলো—তারা যেন কারও বাজে কথা শুনে মনকে চঞ্চল না করে। তোমরা সকলে নিজেদের আদর্শ ধরে থাক, আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল করো না—সত্যের জয় হবেই হবে। সর্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের শাসন করতে, অথবা ইয়াঙ্কিরা যেমন বলে অপরের উপর 'boss' (মাতব্বরি) করতে যেও না; সকলের দাস হও।

—বি

১৭৩*

[মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে লিখিত]

১০ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজাচার্যের ভাষ্যের প্রথম ভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম। মণি আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আপনার (রিজলি) পল্লীগৃহে সহৃদয় আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি এখন একটু ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি এবং দেখছি আগামীকাল আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। আগামীকাল (40 W. 9th Street-এ) মিস এণ্ড্রুজ-এর গৃহে আমার একটা ক্লাস আছে। মিস ম্যাকলাউড আমাকে বলেছিলেন যে, ঐ ক্লাসটা স্থগিত রাখা সম্ভব, সেজন্য আমি কাল সানন্দে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি যে, মিস ম্যাকলাউড ভুল করেছেন। মিস এণ্ড্রুজ আমাকে বলে গিয়েছেন যে, কোন উপায়ে কাল তিনি ক্লাস বন্ধ করতে পারেন না বা প্রায় ৫০/৬০ জন সভ্যকে বিজ্ঞপ্তিও দিতে পারেন না।

এই অবস্থায় আমি আমার অক্ষমতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আশা করি মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস স্টার্জিস (Mrs. Sturgis) বুঝবেন যে, আমার অনিচ্ছা নয়, এই অনিবার্য পরিস্থিতিই আপনার সহৃদয় আমন্ত্রণ গ্রহণ না করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগামী পরশু অথবা এ সপ্তাহে আপনার সুবিধামত যে-কোন দিন যেতে পারলে খুব আনন্দিত হব।

আপনার চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

১৭৪

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
১১ এপ্রিল, ১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,
... তুমি লিখিয়াছ যে তোমার অসুখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে এখন হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তি পড়া বা অস্বাস্থ্যকর আহার বা পুতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা দুষ্কর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০।৪০ টাকার মধ্যে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ খাবার এবং রান্নার জল যেন ফিল্টার করা হয়। বাঁশের ফিল্টার বড় রকম হইলেই যথেষ্ট। জলেতেই যত রোগ—পরিষ্কার অপরিষ্কার নহে, রোগবীজপূর্ণ, তাই রোগের কারণ। জল উত্তপ্ত করে ফিল্টার করা হউক। সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নজর দিতে হইবে। একজন রাঁধুনী, একটা চাকর, পরিষ্কার বিছানা, সময়ে খাওয়া—এ-সকল অত্যাবশ্যক। যে প্রকার বলছি সমস্তই যেন করা হয়, ইহাতে অন্যথা না হয়। ... টাকাকড়ি খরচের সমস্ত ভার রাখাল যেন লয়, অন্য কেহ তাহাতে উচ্চবাচ্য না করে। নিরঞ্জন, ঘরদ্বার, বিছানা, ফিল্টার যাতে দস্তুরমত ঠিক সাফ থাকে, তাহার ভার লইবে। ... সমস্ত কার্যের সফলতা তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বেষ, ঈর্ষা, অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন কোন কল্যাণ নাই। ... কালীর Pamphlet (পুস্তিকা)

খুব উত্তম হয়েছে, তাতে কোন অতিপ্রসঙ্গ নাই।

ঐ যে কানে কানে গুজোগুজি করা—তাহা মহাপাপ বলে জানবে; ঐটা ভায়া, একেবারে ত্যাগ দিও [করিও]। মনে অনেক জিনিষ আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়।

মহোৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসছে বারে এক লাখ লোক যাতে হয়, তারই চেষ্টা করতে হবে বৈকি। মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পার, তার চেষ্টা দেখ দিকি। ... অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত উদ্যোগ যাহার সহায়, সে-ই কার্যে সিদ্ধি হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মুখ্যু-ফুখ্যু জড়ো করিসনি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত—এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি। তোমরা মহোৎসবে তো লুচিসন্দেশ বাঁটলে, আর কতকগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে, ... তোমরা কী **spiritual food** (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে, তা তো শুনলাম না? তোদের যে পুরানো ভাব **nil admirari**—কেউ কিছুই জানে না ভাব—যতদিন না দূর হবে, ততদিন তোরা কিছুই করতে পারবিনি, ততদিন তোদের সাহস হবে না। **Bullies are always cowards.** (যারা লোককে তর্জন করে বেড়ায়, তারা চিরকাল কাপুরুষ)।

সকলকে **sympathy**-র (সহানুভূতির) সহিত গ্রহণ করিবে, রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুক বা নাই মানুক। বৃথা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সহিত নিজে নিরস্ত হবে। মাষ্টার মহাশয় কতদিন মুখে বোজলা দিয়ে থাকবেন? বোজলাতেই যে জন্ম গেল দেখছি! সকল মতের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। এই সকল মহৎ গুণ যখন তোমাদের মধ্যে আসবে, তখন তোমরা মহাতেজে কাজ করতে পারবে, অন্যথা 'জয় গুরু-ফুরু' কিছুই চলবে না। যাহা হউক, এবারকার মহোৎসব অতি উত্তমই হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং তার জন্য তোমরা বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু **you must push forward. Do you see?** (তোমাদের এগিয়ে পড়তে হবে, বুঝলে কিনা?) শরৎ কি করছে? 'আমি কি জানি!আমি কি জানি!'—ওরকম বুদ্ধিতে তিন কালেও কিছু জানতে পারবে না। ঠাকুরদাদার কথা—শাঁকচুন্নীর নাকি সুর ভাল বটে, কিন্তু কিছু উঁচুদরের চাই, **that will appeal to the intellect of the learned**

(যা লেখাপড়াজানা লোকেরা পড়ে আনন্দ পাবে)। খালি খোলবাজান হাঙ্গামার কী কাজ? **Not only this** মহোৎসব **will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines.**

৫৭

তোকে কি বলব? তোরা এখনও বালক। সব ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে **I fret and stamp like a leashed hound.**

৫৮

Onward and forward (এগিয়ে পড়, এগিয়ে যাও)—আমার পুরানো বুলি। এখন এই পর্যন্ত। আমি আছি ভাল। দেশে তাড়াতাড়ি যেয়ে ফল নাই। তোরা উঠে পড়ে লেগে যা দিকি—সাবাস বাহাদুর! ইতি

নরেন্দ্র

পত্রাবলী ১৭৫-১৮৪

১৭৫*

54 W. 33rd St., নিউ ইয়র্ক
১১ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
আপনার পত্র পেলাম—ঐ সঙ্গে মনিঅর্ডার ও 'ট্রান্সক্রিপ্ট'
৫৯
কাগজটাও পেলাম। আজ ব্যাঙ্কে যাব—ডলারগুলি ভাঙিয়ে পাউণ্ড করে আনতে। কাল মিঃ লেগেটের কাছে চলে যাচ্ছি কয়েকদিন পল্লীতে বাস করবার জন্য। আশা করি, একটু বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে ভালই হবে।

এ বাড়ী এখনই ছেড়ে দেবার কল্পনা ত্যাগ করেছি, কারণ তাতে অত্যন্ত বেশী খরচা পড়বে। অধিকন্তু এখনই বদলান যুক্তিযুক্ত নহে; আমি ধীরে ধীরে সেটি করবার চেষ্টা করছি।

মিস হ্যামলিন আমায় যথেষ্ট সাহায্য করছেন—আমি সেজন্য তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করছেন—আশা করি, তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—আমার ভয় হয়, পূর্বে যেমন একবার শেখান হয়েছিল, 'নিজেকে সামলে রেখো, যার তার সঙ্গে মিশো না'—এ ব্যাপার তারই দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাঁদের পাঠান, তাঁরাই খাঁটি লোক; আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই তো আমি বুঝেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই আমাকে সাহায্য করবেন। আর অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভু তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্রপল্লীতে এভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস হ্যামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিম্বা তাঁর মতে যারা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিদ্রোচিত কুটীরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ 'ঠিক ঠিক লোক' ঐ স্থানে দিনরাত আসতে লাগল, তিনিও আসতে লাগলেন। হে প্রভো, মানুষের পক্ষে তোমার ও তোমার দয়ার উপর বিশ্বাস-স্থাপন—কি কঠিন ব্যাপার!! শিব, শিব! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বেঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়? সবই যে তিনি!! হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর ভেতরও তিনি; পাপীর ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরও তিনি—সবই যে তিনি!! সর্বপ্রকারে আমি তাঁর শরণাগত, সারা জীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন কি তিনি আমায় পরিত্যাগ করবেন? ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যদি না থাকে, তবে সমুদ্রে এক ফোঁটা জলও থাকে না, গভীর জঙ্গলে একটা ছোট ডালও পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারে একমুঠো অন্ন মেলে না; আর তাঁর ইচ্ছা হলে মরুভূমিতে ঝরণা বয়ে যায়, এবং ভিক্ষুকেরও সকল অভাব ঘুচে যায়। একটি চড়ুই পাখী কোথায় উড়ে পড়ছে—তাও তিনি দেখতে পান।
৬০
মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা—না অক্ষরে অক্ষরে সত্য ঘটনা?

এই 'ঠিক ঠিক লোকদের' কথা এখন থাক। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা হিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশে, পর্বতচূড়ায় বা মহাসমুদ্রের অতল তলে—যেখানেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, তুমিই আমার স্বরূপ। তুমি কখনই আমায় ত্যাগ করবে না—কখনই না, এ আমি ঠিক জানি। হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনও কখনও একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্য ওসব দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর, যেন আমি তোমা ছাড়া আর কারও কাছে কখনও সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কেউ কোন ভাল লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রভু, তুমি সকল ভালর সৃষ্টিকর্তা—তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জান, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে—যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা আমি মন্দের দিকে ঢলে পড়ব?

মা, তিনি কখনই আমায় ত্যাগ করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আপনার চির আজ্ঞাবহ সন্তান
বিবেকানন্দ

১৭৬*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

54 W 33rd St., নিউ ইয়র্ক
২৪ এপ্রিল, ১৮৯৫

… জননীর ন্যায় আপনার সৎপরামর্শের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আশা করি জীবনে তদনুযায়ী কাজ করতে পারব।… যে রহস্যময় চিন্তারাশি সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার মূলে যদিও কিছু সত্য আছে, তথাপি আমি সম্যক অবগত আছি, ইহাদের অধিকাংশই বাজে ও কাণ্ডজ্ঞানহীন মতলবে পরিপূর্ণ। আর এইজন্যই ভারতে কিম্বা অন্য কোথাও ধর্মের এই দিকটার সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি নাই এবং রহস্যবাদী সম্প্রদায়গুলিও আমার প্রতি বিশেষ অনুকূল নহে।

প্রাচ্যে কিম্বা পাশ্চাত্যে—সর্বত্র একমাত্র অদ্বৈতদর্শনই যে মানবজাতিকে ‘ভূতপূজা’ এবং ঐ জাতীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারে এবং কেবল উহাই যে মানবকে তাহার স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে সমর্থ, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। পাশ্চাত্য দেশেরই ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক ভারতের নিজেরও এই অদ্বৈতবাদের প্রয়োজন আছে। অথচ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ; কারণ প্রথমতঃ আমাদিগকে সকলের মনে রুচি সৃষ্টি করিতে হইবে, তারপর চাই শিক্ষা; সর্বশেষে সমগ্র সৌধটি নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই সকল গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপালট হইয়া যায়। গত বৎসর এদেশে আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়াছিলাম, বাহবাও অনেক পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম, সে-সব কাজ যেন আমি নিছক নিজের জন্যই করিয়াছি। চরিত্রগঠনের জন্য ধীর ও অবিচলিত যত্ন, এবং সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র প্রচেষ্টাই কেবল মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাই এ বৎসর আমি সেই ভাবেই আমার কার্যপ্রণালী নিয়মিত করিব, স্থির করিয়াছি। কয়েকজন বাছা বাছা স্ত্রী-পুরুষকে অদ্বৈত- বেদান্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিব—কতদূর সফল হইব, জানি না। কেহ যদি শুধু নিজের সম্প্রদায় বা দেশের জন্য না খাটিয়া সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্রতী হইতে চায়, তবে পাশ্চাত্য দেশই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

পত্রিকা বাহির করা বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু এ-সব করিবার মত ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নাই; আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করিতে পারি, মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে পারি। সত্যের উপর আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করিবেন এবং তিনিই প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাইবেন, আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট হইতে পারি।

‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ॥’ বৃহত্তর জগতের কল্যাণার্থ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে, সমগ্র জগৎ তাহার আপনার হইয়া যায়। … আমার ইংলণ্ডে যাওয়া এখনও অনিশ্চিত। সেখানে আমার পরিচিত কেহই নাই; অথচ এখানে কিছু কিছু কাজ হইতেছে। প্রভুই যথাসময়ে আমাকে পথ দেখাইবেন।

১৭৭*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

19 W. 38th Street, নিউ ইয়র্ক

প্রিয় বন্ধু,
আপনার শেষ পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। এই অগষ্ট মাসের শেষভাগে ইওরোপে যাইবার একটা ব্যবস্থা পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়া আপনার আমন্ত্রণ ভগবানের আহ্বান বলিয়া মনে করি।

‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।’ মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলে সত্যপ্রচার সহজ হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কালে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বিষ—এক ফোঁটা মিশ্রিত হইলেও সমস্ত খাদ্য দূষিত করিয়া ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী, সে-ই জগতে সব কাজ করিতে পারে।

প্রভু আপনাকে সর্বদা মায়ামোহ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার সহিত কাজ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি। যদি আমরা নিজেরা খাঁটি থাকি, তবে প্রভুও আমাদিগকে শত শত বন্ধু প্রেরণ করিবেন। ‘আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ …।’

চিরকালই ইওরোপ হইতে সামাজিক এবং এশিয়া হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই দুই শক্তির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণেই জগতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাসের একটি নূতন পৃষ্ঠা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে এবং সর্বত্র তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে। শত শত নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত—সত্য ও শিব অপেক্ষা যোগ্যতম আর কি হইতে পারে?

ভবদীয়

১৭৮*

54 W. 33rd Street, নিউ ইয়র্ক
২৫ এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

গত পরশু মিস ফার্মারের একখানি হৃদ্যতাপূর্ণ পত্র পেলাম—তার সঙ্গে বার্বার হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির জন্য একশত ডলারের একখানি চেকও এল। আগামী শনিবার তিনি নিউ ইয়র্কে আসছেন। অবশ্য আমি মিস ফার্মারকে তাঁর বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে মানা করব। বর্তমানে গ্রীনএকারে যেতে পারছি না, সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাবার বন্দোবস্ত করেছি—ঐ স্থান যেখানেই হোক। সেখানে আমার জনৈকা ছাত্রী মিস ডাচারের এক কুটীর আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে নির্জন বাস করে বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটাব, মনে করেছি। আমার ক্লাসে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে 'যোগী' করতে চাই। গ্রীনএকারের মত কর্মচঞ্চল হাট এ কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অপর জায়গাটি আবার লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে বলে যারা শুধু মজা চায়, তারা কেউ সেখানে যেতে সাহস করবে না।

জ্ঞানযোগের ক্লাসে যাঁরা আসতেন, তাঁদের ১৩০ জনের নাম মিস হ্যামলিন টুকে রেখেছিলেন—এতে আমি খুব খুশী আছি। আরও ৫০ জন বুধবারে যোগ-ক্লাসে আসতেন—আর সোমবারের ক্লাসে আরও ৫০ জন। মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গ সব নামগুলি লিখে রেখেছিলেন—আর নাম লেখা থাক বা নাই থাক, এঁরা সকলেই আসবেন। মিঃ ল্যাণ্ডসবার্গ আমার সংস্রব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি সব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। তারা সকলেই আসবে—আর তারা যদি না আসে তো অপরে আসবে। এইরূপেই চলবে— প্রভু, তোমারই মহিমা!!!

নাম টুকে রাখা এবং বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা মস্ত কাজ সন্দেহ নেই; আমার জন্য এই কাজ করেছেন বলে তাঁদের উভয়ের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, অপরের ওপর নির্ভর করা আমার নিজেরই আলস্য, সুতরাং উহা অধর্ম—আর আলস্য থেকে সর্বদা অনিষ্টই হয়ে থাকে। সুতরাং এখন থেকে ঐ-সব কাজ আমিই করছি এবং পরেও নিজেই সব করব। তাতে আর ভবিষ্যতে কারও কোন উদ্বেগের কারণ থাকবে না।

যাই হোক, আমি মিস হ্যামলিনের 'ঠিক ঠিক লোকদের' মধ্যে যাকে হোক নিতে পারলে ভারি সুখী হব; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে তেমন একজনও তো এখনও এল না। আচার্যের চিরন্তন কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 'বেঠিক' লোকদের ভিতর থেকে 'ঠিক ঠিক লোক' তৈরী করে নেওয়া।

মোদ্দা কথাটা এই, মিস হ্যামলিন নামে সম্ভ্রান্ত মহিলাটি আমাকে নিউ ইয়র্কের 'ঠিক ঠিক লোকগুলির' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং কার্যতঃ তিনি আমায় যেরূপ সাহায্য করেছিলেন, তার জন্য যদিও আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ, তবু মনে করছি আমার যা অল্পস্বল্প কাজ আছে, তা আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অন্যের সাহায্য নেবার সময় হয়নি—কাজ অতি অল্প। আপনার যে উক্ত মিস হ্যামলিন সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, তাতে আমি খুব খুশী। আপনি যে তাঁকে সাহায্য করবেন, এ জেনে অন্যে যা হোক, আমি তো বিশেষ খুশী; কারণ তাঁর সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মানুষের মুখ দেখলেই আমি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবলে তার ভিতর কি আছে, তা প্রায় অভ্রান্তভাবে জানতে পারি; আর এর ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুশী করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্যন্ত প্রকাশ করব না। আমি মিস ফার্মারের পরামর্শও খুব আনন্দের সঙ্গেই নেব—তিনি যতই ভূত-প্রেতের কথা বলুন না কেন। এ-সব ভূত-প্রেতের অন্তরালে আমি একটি অগাধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাচ্ছি, কেবল এর ওপর একটা প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম আবরণ রয়েছে—তাও কয়েক বৎসরে নিশ্চয় অন্তর্হিত হবে। এমন কি—ল্যাণ্ডস্‌বার্গও মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন আপত্তি করব না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এঁদের ছাড়া অন্য কোন লোক আমায় সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই—এই পর্যন্ত আমি বলতে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুন নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতই (অথবা যাকে আমি আমার গুরুমহারাজের প্রেরণা বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়ের মত দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে-কোন উপদেশ দেবেন, তা আমি সর্বদাই মেনে চলব—কিন্তু ঐ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে আসা চাই। আপনি যদি আর কাকেও মাঝখানে খাড়া করেন, তাহলে আমি নিজে বেছে নেওয়ার দাবী প্রার্থনা করি। এই কথা আর কি!

আপনার চিরানুগত সন্তান
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস হ্যামলিন এখনও এসে পৌঁছননি। তিনি এলে আমি সংস্কৃত বইগুলি পাঠাব। তিনি কি আপনার কাছে মিঃ নওরোজী-কৃত ভারত সম্বন্ধে একখানি বই পাঠিয়েছেন? আপনি যদি আপনার ভাইকে বইখানি একবার আগাগোড়া দেখতে বলেন, তবে আমি খুব খুশী হব। গান্ধী এখন কোথায়?

বি

১৭৯*

54 W. 33rd St. New York
মে, ১৮৯৫

প্রিয়,
তোমাকে চিঠি লেখবার পর আমার ছাত্রেরা আবার এসেছে আমায় সাহায্য করবার জন্য; ক্লাসগুলি এখন খুবই সুন্দরভাবে চলবে, সন্দেহ নেই।

এতে আমি খুব খুশী হয়েছি, কারণ শেখান ব্যাপারটা আমার জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য ও বিশ্রাম যেমন প্রয়োজন, আমার জীবনে এও তেমনি প্রয়োজন।

তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমি ইংরেজী পত্রিকা 'The Borderland'-এ—এর বিষয়ে অনেক কিছু পড়েছি— ভারতে খুব ভাল কাজ করছে এবং হিন্দুরা যাতে তাদের ধর্ম বুঝতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা করছে। আমি —র লেখায় কোনপ্রকার পাণ্ডিত্য দেখতে পাইনি, ... অথবা কোন আধ্যাত্মিকতাও নয়। যাই হোক, যে জগতের ভাল করতে চায়, তার উদ্দেশ্য সফল হোক।

কত সহজেই এ সংসার ধাপ্পাবাজিতে ভুলে যায়! এবং সভ্যতার সূচনা থেকেই কত যে জুয়াচুরি বেচারা মানুষের মাথার ওপর জমছে!

১৮০*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

৬১

U. S. A.
মে (?), ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি ধর্মের গৌরব পুনঃস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই'—হে মহারাজ, ইহা পবিত্র গীতামুখে উচ্চারিত সেই সনাতন ভগবানের বাক্য, এই কথাগুলি জগতে আধ্যাত্মিক শক্তি-তরঙ্গের উত্থান-পতনের মূল সুর।

ধর্মজগতে এই পরিবর্তন বারংবার তাহার নূতন নূতন বিশিষ্ট ছন্দে প্রকাশিত হইতেছে; যদিও অন্যান্য বিরাট পরিবর্তনের ন্যায় নিজস্ব এলাকার মধ্যগত প্রত্যেকটি বস্তুর উপর এই পরিবর্তনগুলিও প্রভাব বিস্তার করে, তথাপি শক্তি-ধারণে সমর্থ বস্তুর উপরেই তাহাদের কার্যকারিতা সমধিক প্রকাশ পায়।

বিশ্বগতভাবে যেমন জগতের আদিম অবস্থা ত্রিগুণের সাম্যভাব, এই সাম্যভাবের চ্যুতি ও তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সমুদয় চেষ্টা লইয়াই এই প্রকৃতির বিকাশ বা বিশ্বজগৎ; যতদিন না এই সাম্যাবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসে, ততদিন এইভাবেই চলিতে থাকে। সীমাবদ্ধভাবে তেমনি আমাদের এই পৃথিবীতে যতদিন মনুষ্যজাতি এইভাবেই থাকিবে, ততদিন এই বৈষম্য ও তাহার অপরিহার্য পরিপূরক এই সাম্যলাভের চেষ্টা—দুই-ই পাশাপাশি বিরাজ করিবে। তাহাতে পৃথিবীর সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর, উপজাতিগুলির ভিতর, এমন কি প্রত্যেকটি ব্যক্তিতে সুস্পষ্ট বিশেষত্ব থাকিবে।

অতএব নিরপেক্ষভাবে এবং সাম্য রক্ষা করিয়া সকলকে শক্তি প্রদত্ত হইলেও প্রত্যেক জাতিই যেন একটি বিশেষ প্রকার শক্তিসংগ্রহ ও বিতরণের উপযোগী এক-একটি অদ্ভুত যন্ত্র- স্বরূপ; ঐ জাতির অন্যান্য অনেক শক্তি থাকিলেও সেই শক্তিটিই তাহার বিশেষ লক্ষণরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। মনুষ্যপ্রকৃতিতে একটি ভাবের তরঙ্গ উঠিলে, তাহার প্রভাব অল্প-বিস্তর সকলেই অনুভব করিলেও ঐ ভাব যে-জাতির বিশেষ লক্ষণ এবং সাধারণতঃ যে-জাতিকে কেন্দ্র করিয়া ঐ ভাবের আরম্ভ, সেই জাতির অন্তস্তল পর্যন্ত উহা দ্বারা আলোড়িত হয়। এই কারণেই ধর্মজগতে কোন আলোড়ন উপস্থিত হইলে তাহার ফলে ভারতে অবশ্যই নানাপ্রকার গুরুতর পরিবর্তন হইতে থাকিবে, ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই বহুবিস্তৃত ধর্মতরঙ্গসমূহ বারংবার উত্থিত হইয়াছে, কারণ সর্বোপরি ভারত ধর্মের দেশ।

যাহা দ্বারা আদর্শলাভের সহায়তা হয়, মানুষ কেবল সেটিকেই বাস্তব বলে। সাংসারিক মানুষের নিকট যাহা কিছুর বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়, তাহাই বাস্তব; যাহার বিনিময়ে টাকা হয় না, তাহা অবাস্তব। প্রভুত্ব যাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার নিকট যাহাদ্বারা সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা চরিতার্থ হয়, তাহাই বাস্তব, বাকী সব কিছুই নয়। যাহা জীবনে বিশেষ প্রীতির প্রতিধ্বনি করে না, তাহার মধ্যে মানুষ কিছুই দেখিতে পায়

যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের সমুদয় শক্তির বিনিময়ে কাঞ্চন, নাম বা অপর কোনরূপ ভোগসুখ অর্জন করা, যাহাদের নিকট সমরসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রাই শক্তি-বিকাশের একমাত্র লক্ষণ, যাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র সুখ, তাহাদের নিকট ভারত সর্বদাই একটা বিশাল মরুভূমির মত প্রতীয়মান হইবে; তাহাদের কাছে জীবনের বিকাশ বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহার পক্ষে ঐ মরুভূমির প্রতিটি দমকা বাতাস মারাত্মক।

কিন্তু যাঁহাদের জীবনতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়জগতের অতি দূরে অবস্থিত অমৃতনদীর সলিলপানে একেবারে মিটিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আত্মা সর্পের জীর্ণত্বকমোচনের ন্যায় কাম, কাঞ্চন ও যশঃস্পৃহারূপ ত্রিবিধ বন্ধনকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, যাঁহারা চিত্তস্থৈর্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে—ইন্দ্রিয়-বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের 'ভোগ' বলিয়া কথিত আপাতমনোহর বস্তুর জন্য নীচজনোচিত কলহ, বিবাদ, দ্বেষহিংসার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্নতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সঞ্চিত সৎকর্মের ফলে চক্ষু হইতে অজ্ঞানের আবরণ খসিয়া পড়ায় যাঁহারা অসার নামরূপের পারে প্রকৃত সত্যদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি ও অফুরন্ত খনি ভারতবর্ষ তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়; শূন্যে বিলীয়মান ছায়ার মত এই জগতে যিনি একমাত্র প্রকৃত সত্তা, তাঁহার সন্ধানরত প্রত্যেকটি সাধকের নিকট ভারত আশার আলোকরূপে প্রতীত হয়।

অধিকাংশ মানব তখনই শক্তিকে শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারে, যখন অনুভবের উপযোগী করিয়া স্থূল আকারে উহা তাহাদের সম্মুখে ধরা হয়, তাহাদের নিকট যুদ্ধের উত্তেজনা শক্তির প্রত্যক্ষ বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়; আর যাহা কিছু ঝড়ের মত আসিয়া সম্মুখের সব কিছু উড়াইয়া লইয়া যায় না, উহা তাহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যুস্বরূপ। সুতরাং শত শত শতাব্দীব্যাপী যে ভারতবর্ষ কোনরূপ বাধাদানে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিদেশী বিজেতৃগণের পদতলে পতিত, জনতা সেখানে একতাহীন, স্বদেশপ্রেমের ভাবও যেখানে এতটুকু নাই—সেই ভারত তাহাদের নিকট বিকৃত অস্থিপূর্ণ দেশ, প্রাণহীন পচনশীল পদার্থের স্তূপ বলিয়া প্রতীত হইবে।

বলা হয়, যোগ্যতমই কেবল জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া থাকে। তবে সাধারণ ধারণানুসারে যে-জাতি সর্বাপেক্ষা অযোগ্য, সে-জাতি দারুণ দুর্ভাগ্য সহ্য করিয়াও কেন বিনাশের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে না? তথাকথিত বীর্যবান্ ও কর্মপরায়ণ জাতিসমূহের শক্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, আর এদিকে 'দুর্নীতিপরায়ণ (?)' হিন্দুর শক্তি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা কিরূপে হইতেছে? এক মুহূর্তের মধ্যে যাহারা জগৎকে শোণিতসাগরে প্লাবিত করিয়া দিতে পারে, তাহারা খুব প্রশংসা পাইবার যোগ্য। যাহারা জগতের কয়েক লক্ষ লোককে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য পৃথিবীর অর্ধেক লোককে অনাহারে রাখিতে পারে, তাহারাও মহৎ গৌরবের অধিকারী! কিন্তু যাহারা অপর কাহারও মুখ হইতে অন্ন কাড়িয়া না লইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুখে রাখিতে পারে, তাহারা কি কোনরূপ সম্মান পাইবার যোগ্য নয়? শত শত শতাব্দী ধরিয়া অপরের উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার না করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য পরিচালনা করাতে কি কোনরূপ শক্তি প্রদর্শিত হয় না?

সকল প্রাচীন জাতির পুরাণেই দেখা যায়, বীরপুরুষদের প্রাণ তাঁহাদের শরীরের কোন বিশেষ ক্ষুদ্র অংশে ঘনীভূত ছিল। যতদিন সেখানে হাত পড়িত না, ততদিন তাঁহারা দুর্ভেদ্য থাকিতেন। বোধ হয় যেন প্রত্যেক জাতিরও এইরূপ একটি বিশেষ কেন্দ্রে জীবনীশক্তি সঞ্চিত আছে; তাহাতে হাত না পড়া পর্যন্ত কোন দুঃখবিপদই সেই জাতিকে বিনষ্ট করিতে পারে না।

ধর্মেই ভারতের এই জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুরা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বিস্মিত না হইতেছে, ততদিন জগতে কোন শক্তি তাহাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না।

যে ব্যক্তি সর্বদাই স্বজাতির অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, আজকাল সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতের আলোচনাই হিন্দুজাতির নানারূপ দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহার বিপরীতটিই সত্য; যতদিন হিন্দুরা তাহাদের অতীত ভুলিয়া ছিল, ততদিন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া অসাড় অবস্থায় পড়িয়াছিল। যতই তাহারা অতীতের আলোচনা করিতেছে, ততই চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎকে গড়িতে হইবে, এই অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।

অতএব হিন্দুগণ যতই তাঁহাদের অতীত আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ততই গৌরবময় হইবে; আর যে-কেহ এই অতীতকে প্রত্যেকের কাছে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই স্বজাতির পরম হিতকারী। আমাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই।

প্রত্যেক বিচারশীল পাঠকই জানেন, ভারতের সামাজিক বিধানগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই নিয়মগুলি এক বিরাট পরিকল্পনার প্রতিফলনের চেষ্টাস্বরূপ ছিল, কালক্রমে ধীরে ধীরে এগুলি বিকশিত হইবার কথা। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ এত দূরদর্শী ছিলেন যে, তাঁহাদের জ্ঞানের মহত্ত্ব বুঝিতে জগৎকে এখনও অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে। আর তাঁহাদের বংশধরগণের এই মহান্ উদ্দেশ্যের পূর্ণভাব ধারণা করিবার অক্ষমতাই ভারতের একমাত্র কারণ।

শত শত শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন ভারত তাহার প্রধান দুই জাতির—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উচ্চাভিলাষপূর্ণ অভিসন্ধি-সাধনের

যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

একদিকে পুরোহিতগণ সাধারণ প্রজাদের উপর রাজাদের অবৈধ সামাজিক অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই প্রজাগণকে ক্ষত্রিয়গণ আপনাদের ‘ন্যায়সঙ্গতভক্ষ্য’রূপে ঘোষণা করিতেন। অপর দিকে ক্ষত্রিয়গণই ভারতে একমাত্র শক্তিসম্পন্ন জাতি ছিলেন, যাঁহারা পুরোহিতগণের আধ্যাত্মিক অত্যাচার ও সাধারণ মানুষকে বন্ধন করিবার জন্য তাঁহারা যে ক্রমবর্ধমান নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড প্রবর্তন করিতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই উভয় জাতির এই সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। সমগ্র শ্রুতির ভিতরেই ইহা অতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সাময়িকভাবে এই বিরোধ মন্দীভূত হইল, যখন ক্ষত্রিয়দের এবং জ্ঞানকাণ্ডের নেতা শ্রীকৃষ্ণ সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়া দিলেন। তাহার ফল গীতার শিক্ষা, যাহা ধর্ম দর্শন ও উদারতার সারস্বরূপ। কিন্তু বিরোধের কারণ তখনও বর্তমান ছিল, সুতরাং তার ফলও অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণ দরিদ্র মূর্খ প্রজার উপর প্রভুত্ব করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্বোক্ত দুই জাতির মধ্যেই বর্তমান ছিল, সুতরাং বিরোধ আবার প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল। আমরা সেই সময়কার যে সামান্য সাহিত্য পাই, তাহা সেই প্রাচীনকালের প্রবল বিরোধের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র, কিন্তু অবশেষে ক্ষত্রিয়ের জয় হইল, জ্ঞানের জয় হইল, স্বাধীনতার জয় হইল আর কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য রইল না, ইহার অধিকাংশই চিরকালের জন্য চলিয়া গেল।

এই উত্থানের নাম বৌদ্ধ সংস্কার। ধর্মের দিকে উহা কর্মকাণ্ড হইতে মুক্তি সূচনা করিতেছে, আর রাজনীতির দিকে ক্ষত্রিয় দ্বারা পুরোহিত-প্রাধান্যের বিনাশ সূচিত হইতেছে।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহা আরও বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই দুই দেবমানবই স্ত্রী-পুরষ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্যই জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

অদ্ভুত নৈতিক বল সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন মত ধ্বংস করিতে অত্যধিক সমুৎসুক ছিল। উহার অধিকাংশ শক্তিই নেতিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াতে বৌদ্ধধর্মকে উহার জন্মভূমি হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতে হইল; আর যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বৌদ্ধধর্ম যে-সকল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যদিও উহা আংশিকভাবে বৈদিক পশুবলি নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিল, কিন্তু উহা সমুদয় দেশ, মন্দির, প্রতিমা, প্রতীক, যন্ত্র ও সাধুসন্তের অস্থিতে ভরিয়া ফেলিল।

সর্বোপরি বৌদ্ধধর্মের জন্য আর্য মঙ্গোলীয় ও আদিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির জাতির যে মিশ্রণ হইল, তাহাতে অজ্ঞাতসারে কতকগুলি বীভৎস বামাচারের সৃষ্টি হইল। প্রধানতঃ এই কারণেই সেই মহান্ আচার্যের উপদেশাবলীর এই বিকৃত পরিণতিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে মনুষ্যদেহধারিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত জীবন-প্রবাহও পূতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইল; ভারতকে কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইল, যতদিন না ভগবান্ শঙ্করের আবির্ভাব এবং কিছু পরে-পরেই রামানুজ ও মধ্বাচার্যের অভ্যুদয় হইল।

ইতোমধ্যে ভারতেতিহাসের এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি অন্তর্হিত হইয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্তী আর্যভূমি, যেখানে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা মহামান্য রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের শৈশবের লীলাভূমি ছিল, তাহা এখন নীরব; আর ভারত উপদ্বীপের সর্বশেষ প্রান্ত হইতে, ভাষায় ও আকারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক জাতি হইতে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বংশধর বলিয়া গৌরবকারী বংশসমূহ হইতে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

আর্যাবর্তের সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কোথায় গেলেন? তাঁহারা একেবারে বিলুপ্ত, কেবল এখানে ওখানে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব-অভিমানী কতকগুলি মিশ্র জাতি বাস করিতেছে। আর তাঁহাদের ‘এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশদগ্রজন্মনঃ’ পৃথিবীর সকল মানুষ আপন আপন চরিত্র শিক্ষা করিবে,
৬২
এইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাময় উক্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অতি বিনয়ের সহিত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যবাসীদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে ভারতে পুনরায় বেদের অভ্যুদয় হইল—বেদান্তের পুনরুত্থান হইল; এইরূপ বেদান্তের চর্চা আর কখনও হয় নাই, গৃহস্থেরা পর্যন্ত আরণ্যকপাঠে নিযুক্ত হইলেন।

বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে ক্ষত্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন এবং দলে দলে তাঁহারাই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কার ও ধর্মান্তরকরণের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষা উপেক্ষিত হইয়া লোকপ্রচলিত ভাষাসমূহের চর্চা প্রবল হইয়াছিল। আর অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্য হইতে যে এই সংস্কার-তরঙ্গ আসিল, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই উপকার হইল। কিন্তু উহা ভারতের অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে অধিকতর ও নূতনতর বন্ধনের কারণ হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সুতরাং তাঁহারাই বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক। দেশ হইতে কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য বারংবার তাঁহাদের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে, আর ভারতেতিহাসে প্রথম হইতে তাঁহারাই পুরোহিতকুলের অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার অভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান।

যখন তাঁহাদের অধিকাংশ ঘোর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইলেন, এবং অপরাংশ মধ্য এশিয়ার বর্বর জাতিগুলির সহিত শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভারতে পুরোহিতগণের প্রাধান্য-স্থাপনে তরবারি নিয়োজিত করিল, তখনই ভারতে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়া আসিল, আর ভারতভূমি একেবারে ডুবিয়া গেল। যতদিন না ক্ষত্রিয়-শক্তি জাগরিত হইয়া নিজেকে মুক্ত করে এবং অবশিষ্ট জাতির চরণ-শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেয়, ততদিন আর ভারত উঠিবে না। পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। নিজ ভ্রাতাকে অবনমিত করিয়া মানুষ স্বয়ং কি অবনত না হইয়া থাকিতে পারে?

জানিবেন, রাজাজী, আপনার পূর্বপুরুষগণের দ্বারা আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যঃ বিশ্বজগতের একত্ব। কোন ব্যক্তি নিজের কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া কি অপরের অনিষ্ট করিতে পারে? এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচার-সমষ্টি চক্রবৃদ্ধিহারে তাঁহাদেরই উপর ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্ব ও অপমানে তাহারা অনিবার্য কর্মফলই ভোগ করিতেছে।

আপনাদেরই একজন পূর্বপুরুষ বলিয়াছিলেন, ‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।’
৬৩
—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সংসার জয় করিয়াছেন। তাঁহাকে লোকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, আমরা সকলেই ইহা বিশ্বাস করি। তবে তাঁহার এই বাক্য কি অর্থহীন প্রলাপমাত্র? যদি তাহা না হয়, আর আমরা জানি তাঁহার বাক্য প্রলাপ নয়, তবে জাতি লিঙ্গ—এমন কি গুণ পর্যন্ত বিচার না করিয়া সমুদয় সৃষ্ট জগতের এই পূর্ণ সাম্যের বিরুদ্ধে যে-কোন চেষ্টা ভয়ানক ভ্রমাত্মক; আর যতদিন না এই সাম্যভাব আয়ত্ত হইতেছে, ততদিন কেহ কখনই মুক্ত হইতে পারে না।

অতএব হে রাজন, আপনি বেদান্তের উপদেশাবলী পালন করুন—অমুক ভাষ্যকারের বা টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে নহে, আপনার অন্তর্যামী আপনাকে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, সেইভাবে। সর্বোপরি এই সর্বভূতে সর্ববস্তুতে সমজ্ঞানরূপ মহান্ উপদেশ পালন করুন—সর্বভূতে সেই এক ভগবানকে দর্শন করুন।

ইহাই মুক্তির পথ; বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বাহিরের একত্ব-জ্ঞান ব্যতীত বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, আর সকলের মানসিক একত্ব-জ্ঞান ব্যতীত মানসিক স্বাধীনতাও লাভ করিতে পারে না।

অজ্ঞান অসাম্য ও বাসনা—এই তিনটি মানবজাতির দুঃখের কারণ, আর উহাদের মধ্যে একটির সহিত অপরটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষ নিজেকে অপর কোন মানুষ হইতে, এমন কি পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবে কেন? বাস্তবিক সর্বত্রই তো এক বস্তু বিরাজিত। ‘ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী’
৬৪
—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।

অনেকে বলিবেন, ‘এরূপ ভাবা সন্ন্যাসীর পক্ষে ঠিক বটে, কিন্তু আমরা যে গৃহস্থ!’ অবশ্য গৃহস্থকে অন্যান্য অনেক কর্তব্য করিতে হয় বলিয়া সে পূর্ণভাবে এই সাম্য-অবস্থা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ইহা তাহাদেরও আদর্শ হওয়া উচিত। এই সমত্বভাব লাভ করাই সমগ্র সমাজের, সমুদয় জীবের ও সমগ্র প্রকৃতির আদর্শ। কিন্তু হায়, লোকে মনে করেঃ বৈষম্যই এই সমজ্ঞান-লাভের উপায়; অন্যায় কাজ করিয়া তাহারা যেন ন্যায়ের লক্ষ্যে—সত্যে পৌঁছিতে পারে!

ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতিতে বিষবৎ কার্য করে; মনুষ্যজাতির উপর অভিশাপস্বরূপ, সকল দুঃখের মূল কারণ—এই বৈষম্য। ইহাই শরীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ বন্ধনের মূল।

‘সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥’
৬৫

ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি লাভ করেন। এই একটি শ্লোকে অল্প কথার মধ্যে সকলের উপযোগী মুক্তির উপায় বলা হইয়াছে।

রাজপুত আপনারা প্রাচীন ভারতের গৌরবস্বরূপ। আপনাদের অবনতি হইতেই জাতীয় অবনতি আরম্ভ হইল। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইবার জন্য নহে, জ্ঞানহীনগণকে জ্ঞানদানের জন্য ও পূর্বপুরুষদের পবিত্র বাসভূমির প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যদি ক্ষত্রিয়দের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের সহিত সমবেত চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হন, তবেই ভারতের উন্নতি সম্ভব।

আর কে বলিতে পারে, ইহা শুভ মুহূর্ত নহে? কালচক্র আবার ঘুরিয়া আসিতেছে, পুনর্বার ভারত হইতে সেই শক্তিপ্রবাহ বাহির হইয়াছে, যাহা অনতিদূরকালমধ্যে নিশ্চয়ই জগতের দূরতম প্রান্তে পৌঁছিবে। এক মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছে, যাহার প্রতিধ্বনি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, প্রতিদিনই যাহা অধিক হইতে অধিকতর শক্তিসংগ্রহ করিতেছে, আর এই বাণী পূর্ববর্তী

সকল বাণী হইতেই অধিকতর শক্তিশালী, কারণ ইহা পূর্ববর্তী বাণীগুলির সমষ্টিস্বরূপ। যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ বুদ্ধ ও চৈতন্যের ভিতর দিয়া সমতল প্রদেশে নামিয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহাই আবার উচ্চারিত হইয়াছে। আবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে!

আর হে প্রিয় মহারাজ, আপনি সেই (ক্ষত্রিয়) জাতির বংশধর, যাঁহারা সনাতন ধর্মের জীবন্ত স্তম্ভস্বরূপ, অঙ্গীকারবদ্ধ রক্ষক ও সাহায্যকারী; আপনি রাম ও কৃষ্ণের বংশধর। আপনি কি এই কর্তব্য পালন না করিয়া দূরে থাকিবেন? আমি জানি, তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার নিশ্চয় ধারণা, পুনরায় ধর্মের সাহায্যে আপনারই হস্ত প্রথমে প্রসারিত হইবে। হে রাজা অজিত সিং, যখনই আমি আপনার কথা ভাবি—যাঁহার মধ্যে আপনাদের বংশের সর্বজনবিদিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত এমন পবিত্র চরিত্র (যাহা থাকিলে একজন সাধুও গৌরবান্বিত হইতে পারেন) এবং সকল মানবের জন্য অসীম প্রেম যুক্ত হইয়াছে—যখন এইরূপ ব্যক্তিগণ সনাতন ধর্মের পুনর্গঠনে ইচ্ছুক, তখন আমি ইহার মহাগৌরবময় পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী না হইয়া থাকিতে পারি না।

চিরকালের জন্য আপনার উপর ও আপনার স্বজনগণের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, আর আপনি পরের হিতের জন্য ও সত্যপ্রচারের জন্য দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন, ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

১৮১*

[কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত]

আমেরিকা
২ মে, ১৮৯৫

প্রিয়,

তোমার সহৃদয় সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য সাদরে অনুমোদন করিয়াছ, সেজন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। নাগমহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই জীবের সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ',
৬৬

তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই ৬৭
পাইয়াছ জানিবে।

প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্যে ম্লেচ্ছে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, এমন কি—পুরুষে নারীতে পর্যন্ত ভেদ করে না। প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করিয়া লয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। যে-সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর, তাহাদিগকে জাগাও—সঙ্ঘবদ্ধ কর এবং এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এ-কাজ ভারতের যুবকগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনই শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না। কলিকাতার মঠটি প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য সকল শাখার সভ্যদের উচিত এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে ও নিয়মানুসারে কার্য করা।

ঈর্ষা ও অহংভাব তাড়াইয়া দাও—সঙ্ঘবদ্ধভাবে অপরের জন্য কাজ করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটির বিশেষ অভাব।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পুঃ—নাগমহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।

বি

১৮২

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
৫ মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। যদিও অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁর হিন্দুধর্মবিষয়ক রচনাসমূহের শেষভাগে ক্ষতিকর একটি মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত হন না, আমার তবু সর্বদাই মনে হত, কালে সমগ্র তত্ত্বই তিনি বুঝতে পারবেন। যত শীঘ্র পার, 'বেদান্তবাদ' (Vedantism) নামে তাঁর শেষ বইখানা সংগ্রহ কর। বইখানিতে দেখবে তিনি সবই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন—মায় জন্মান্তরবাদ।

আমি তোমাদের এ যাবৎ যা বলেছি, তারই কিছু অংশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ; বইখানি তোমার মোটেই দুরূহ বলে মনে হবে না।

অনেক বিষয়ে দেখবে চিকাগোয় আমি যা সব বলেছি, তারই আভাস।

বৃদ্ধ যে সত্য বস্তু ধরতে পেরেছেন—এতে আমি এখন আনন্দিত। কারণ আধুনিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার মুখে ধর্ম অনুভব করবার এই হল একমাত্র পথ।

আশা করি, টড্-এর 'রাজস্থান' ভাল লাগছে। আন্তরিক ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমাদের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুঃ—মেরী কবে বোষ্টনে আসছে?

—বি

১৮৩*

[মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে লিখিত]

আমেরিকা
৬ মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজাচার্যের ভাষ্যের প্রথম ভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম। মণি আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আমি ভাল আছি—কাজকর্ম আগের মতই চলছে। তুমি লাণ্ড বলে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ; তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার কিছুই জানি না। হতে পারে তিনি কোন গীর্জার বক্তা। কারণ তিনি যদি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতেন, তাহলে আমরা নিশ্চয় তাঁর কথা শুনতে পেতাম। হতে পারে তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট বার করে ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর মিশনরীরা তাঁর সাহায্যে নিজেদের ব্যবসা জমাবার চেষ্টা করছে। তোমার চিঠি থেকে তো আমি এই পর্যন্ত অনুমান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভেতর এমন কিছু সাড়া পড়েনি, যাতে আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ তাহলে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম, এবং ডাঃ ব্যারোজ ও অন্যান্য গোঁড়ারা সবাই মিলে এই আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বিরুদ্ধে গোঁড়াদের এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। … সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে কি সেগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্মসমর্থন করে যেতে হবে? এখানে আমার কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, তাঁরাই মাঝে মাঝে জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়ে দেন। আর হিন্দুরা সবাই যদি নিশ্চিন্তে ঘুমায়, তবে হিন্দুধর্ম সমর্থন করবার জন্য আমার এত শক্তি অপচয় করার দরকার কি বল? এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম, এবং ডাঃ ব্যারোজ ও অন্যান্য গোঁড়ারা সবাই মিলে এই আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বিরুদ্ধে গোঁড়াদের এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। … সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে কি সেগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্মসমর্থন করে যেতে হবে? এখানে আমার কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, তাঁরাই মাঝে মাঝে জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়ে দেন। আর হিন্দুরা সবাই যদি নিশ্চিন্তে ঘুমায়, তবে হিন্দুধর্ম সমর্থন করবার জন্য আমার এত শক্তি অপচয় করার দরকার কি বল?

তোমরা ত্রিশ কোটি মানুষ—বিশেষ যারা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে এত গর্বিত, তারা—কি করছ বল দেখি? লড়াই করবার ভারটা তোমরা নিয়ে আমাকে কেবল প্রচার ও শিক্ষার জন্য ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত অচেনা বিদেশীদের ভেতরে থেকে প্রাণপণ সংগ্রাম করছি, প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ—যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করে আমার ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্য। ভারত কি সাহায্য পাঠাচ্ছে বল? ভারতবাসীর মত দেশপ্রেমহীন আর কোন জাতি পৃথিবীতে আছে কি? যদি তোমরা বার জন সুশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইওরোপ-আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বৎসর তাদের এখানে থাকবার খরচ যোগাতে পারতে, তাহলে তোমরা ভারতের নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার প্রভূত উপকার করতে পারতে। ভারতের প্রতি নৈতিক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয়েও ভারতের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্যের অনেকে তোমাদিগকে অর্ধনগ্ন বর্বর জাতি মনে করে, সুতরাং ভাবে—খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সভ্য করে তুলতে হবে। তোমরা এর বিপরীতটা প্রমাণ কর না কেন? তোমরা কুকুর-বিড়ালের মত কেবল বংশবৃদ্ধি করতে পার। ... যদি তোমরা ত্রিশ কোটি লোক ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাক, একটি কথা বলবারও সাহস না পাও, তবে এই সুদূর দেশে একটা মানুষ আর কত করবে বল? আমি তোমাদের জন্য যতটুকু করেছি, তোমরা ততটুকুরও উপযুক্ত নও। তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখে পাঠাও না কেন? কে তোমাদের বেঁধে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত—তোমরা যেমন পশুতুল্য, তেমন ব্যবহার পাচ্ছ। কেবল দুটো জিনিষ তোমাদের লক্ষ্য—কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াতে চাও, আর তোমরা নিজেরা—সাহেবদের, এমন কি মিশনরীদের ভয়ে ভীত! তোমরা আবার বড় বড় কাজ করবে—ফুঃ! কেন তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম সমর্থন করে বোষ্টনের এরেনা পাবলিশিং কোম্পানীর কাছে লেখা পাঠাও না? ‘এরেনা’ (Arena) একখানি সাময়িক পত্র—ওরা খুব আনন্দের সঙ্গে তা ছাপাবে, আবার হয়তো পারিশ্রমিকস্বরূপ তোমাদের যথেষ্ট টাকাও দেবে। তাহলেই তো চুকে গেল।

এইটি মনে রেখো যে, এ পর্যন্ত যে-সব হতভাগা হিন্দু এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে, তারা অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের দেশ ও ধর্মের কেবল বিরুদ্ধ সমালোচনাই করেছে। তোমরা জান, আমি এখানে নাম-যশের জন্য আসিনি—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব এসে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি করব? কে আমায় সাহায্য করবে? ভারতের কি দাসসুলভ স্বভাব বদলেছে? তোমরা ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষের মত কথা বলছ—কিসে কি হয়, তোমরা তা জান না। মান্দ্রাজে তেমন লোক কোথায়, যারা ধর্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ করবে? দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি—একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে না। আমিই একা সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করছি; হিন্দুদের কাছ থেকে এরা যা আশাই করেনি, তাই আমি এদের দিয়েছি ... । অনেকেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মত কাপুরুষ হব না। আমি কাজ করতে করতেই মরব—পালাব না। কিন্তু এই দেশে হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার বন্ধু এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত আমার অনুসরণ করবে; প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে। আর যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আমার ধর্মের আদর্শ—জীবনের আদর্শ সফল হবে, বুঝলে?

আমেরিকায় যে সর্বজনীন মন্দির (Temple Universal) স্থাপিত হবার কথা উঠেছিল, সে সম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুনতে পাই না। তবে মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউ ইয়র্কে আমার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়েছে, এখানে আমার কাজ চলতে থাকবে। আমি আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্য একটি গ্রীষ্মাবাসে নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছি—যাতে তারা কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

যা হোক, বৎস, আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। তোমাদের তিরস্কার করা দরকার ছিল। এখন কাজে লাগ—কাগজখানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগ। আমি কলিকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি; মাসখানেকের ভেতর কাগজটার জন্য তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারব। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, পরে নিয়মিতরূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারব। এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেও না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং সবল দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব করব। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ দু-জায়গায় কাজের জন্য যা টাকা দরকার, তা আমি নিজেই রোজগার করব। ... রামকৃষ্ণকে অবতার বলে মানবার জন্য লোককে বেশী পীড়াপীড়ি করো না।

এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হল ধর্মের সারকথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ—ইওরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম, আর সেমেটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম; অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন ‘ধর্ম’ বলতে বুঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।

তোমরা দেখতে পাবে যে, মূল দার্শনিক তত্ত্ব যদিও এক, তবু শাক্ত শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির ভেতর তাকে রূপায়িত করে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন ‘বাদ’ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে ওদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে, এইভাবে সামঞ্জস্য দেখাও—আর আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকটাই প্রচার কর; লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিক। আমি এ বিষয়ে একখানি বই লিখতে চাই—সেজন্য সব ভাষ্যগুলি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাছে এ পর্যন্ত কেবল রামানুজ-ভাষ্যের একখণ্ড মাত্র এসেছে।

আমেরিকান থিওসফিষ্টরা অন্য থিওসফিষ্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে ...। ইংলণ্ডের স্টার্ডি সাহেব সম্প্রতি ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার গুরুভ্রাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল; তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন, কবে আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁকে একখানি সুন্দর পত্র লিখেছি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কি? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কোন খবর পাইনি। মিশনরীগণকে ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য, দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর—ভারতে বর্তমানে ধর্মের নবজাগরণ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ওজস্বী অথচ সুরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর সেটি আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও। আমার ঐরকম দু-একখানা কাগজের সঙ্গে জানাশোনা আছে। তোমরা তো জান, আমি বিশেষ লিখিয়ে নই; আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানর অভ্যাসও আমার নেই। আমি চুপচাপ বসে থাকি, আর যা কিছু আসবার আমার কাছে আসে—তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করি না। নিউ ইয়র্ক থেকে Metaphysical Magazine বলে একখানা নূতন দার্শনিক পত্রিকা বের হয়েছে—ওখানা বেশ ভাল কাগজ। পল কেরসের কাগজটা মন্দ নয়, তবে ওর গ্রাহকসংখ্যা বড় কম। বৎসগণ! আমি যদি কপট বিষয়ী হতাম, তবে এখানকার কাজ সংগঠিত করে খুব সাফল্য অর্জন করতে পারতাম। হায়, এখানে ধর্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না। টাকার সঙ্গে নাম- যশ—এই হল ধর্মযাজক; আর টাকার সঙ্গে কাম যোগ দিলে হল সাধারণ গৃহস্থ।

আমাকে এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না। অবশ্য এটি হবে ধীরে—অতি ধীরে। ইতোমধ্যে তোমরা কাজ করে চল, আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনরীরা যা পাবার উপযুক্ত, তাদের তাই দাও। যদি আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাই, [এখানে] আমার শিষ্যেরা চমকে যাবে। মিশনরীরা তো আর তর্ক করে না, তারা কেবল গালাগাল করে; সুতরাং ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে আমার চলবে না। সেদিন রমাবাঈ নামক খ্রীষ্টান মহিলাটি আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেমসের কাছ থেকে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছেন—কাগজের সেই অংশটা তোমাকে পাঠালাম। সুতরাং তোমরা দেখছ, তারা আমার এখানকার বন্ধুবর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাক্কা খাবে, আর তোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে তাদের ঐরূপ দু-চার ঘা দিতে থাক—ঐ দুটোর মধ্যে আমি আমার নৌকো সিধে চালিয়ে নিয়ে যাই।

এখন কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে আমার। এই পত্রিকায় গুরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে আলোচিত না হয়, এর সুর—ধীর গম্ভীর উচ্চ গ্রামে বাঁধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাব ... কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় করে দেব, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখক ধর। তোমার ভগিনীপতি তো একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাসভাই, খেতড়ির রাজা, লিমডির ঠাকুরসাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেব, তাঁরা কাগজটার গ্রাহক হবেন—তাহলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ করে যাও। আমরা বড় বড় কাজ করব—ভয় পেও না। এই একটি নিয়ম কর যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের মধ্যে কোন না কোন একটির খানিকটা অনুবাদ থাকবে। আর এক কথা—তুমি সকলের সেবক হও, অপরের উপর এতটুকু প্রভুত্ব করতেও চেষ্টা করো না। তাতে ঈর্ষার উদ্রেক হবে ও সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ কর। তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত-ভাষ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাকবে, আর চারধারে খুব ভাল প্রবন্ধগুলির ও ওদের লেখকদের নাম থাকবে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাচ্ছি। কাজ করে চল। তুমি এ যাবৎ চমৎকার কাজ করেছ। আমরা সাহায্যের জন্য বসে থাকব না। হে বৎস! আমরাই এটা কাজে পরিণত করব—আত্মনির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হও, ধৈর্য ধরে থাক। আশা করি, সামান্না তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারে। আমার অপর বন্ধুদের বিরোধিতা করো না—সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চল। সকলকে আমার অনন্ত ভালবাসা জানিও।

সদা আশীর্বাদক
তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ—'—' আয়ার এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চলবে। যদি তুমি নিজেকে নেতারূপে সামনে দাঁড় করাও, তাহলে কেউ তোমায় সাহায্য করতে আসবে না, বোধ হয় এই হচ্ছে তোমার বিফলতার কারণ।—আয়ারের নামটাই যথেষ্ট; তাঁকে যদি না পাও, অন্য কোন বড়লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে ফেল। ইতি

—বি

১৮৪*

54 W. 33rd Street, নিউ ইয়র্ক
৭ মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

মিস ফার্মারের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেলবার দরুন আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম, তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠান হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিস থার্সবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন।

গতকাল মান্দ্রাজ অভিনন্দন-সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম—তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মান্দ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটি মান্দ্রাজ শহরের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, মান্দ্রাজের প্রধান ধর্মাধিকরণের (High Court) একজন বিচারপতি—ভারতে এ একটি অতি উচ্চপদ।

আমি নিউ ইয়র্কে জনসভায় আর দুটি বক্তৃতা দেব; 'মট্ স্মৃতি-মন্দিরের' ওপর- তলায় এই দুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার, বিষয়—'ধর্মবিজ্ঞান'; দ্বিতীয়টির বিষয়—'যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা'।

মিস থার্সবি প্রায় ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্লন এক্ষণে আমার কার্যের ওপর বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও প্রসারের জন্য যত্ন নিচ্ছেন। ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আসে না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে। মিস হ্যামলিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা, আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বোঝেন—ভারতে ইংরেজ শাসন বলতে কি বুঝায়।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ সন্তান
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ১৮৫-১৯৪

১৮৫*

নিউ ইয়র্ক
১৪ মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
বইগুলি সব নিরাপদে পৌঁছেছে। সেজন্য বহু ধন্যবাদ। শীঘ্রই তোমায় কিছু টাকা পাঠাতে পারব—খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র; তবে যদি বেঁচে থাকি সময়ে সময়ে কিছু পাঠাব।

এখন নিউ ইয়র্কের ওপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে; আশা করছি, একদল স্থায়ী কর্মী পাব, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে তারা কাজ চালাবে। বৎস, দেখছ এইসব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই নয়। যখন আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কাজের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত; আর প্রভুর আশীর্বাদে তা শীঘ্রই হবে। অবশ্য টাকাকড়ির দিক দিয়ে ধরলে সফলতা হয়নি, বলতে হবে। কিন্তু জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান।

মিস হ্যামলিন আমায় যথেষ্ট সাহায্য করছেন—আমি সেজন্য তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করছেন—আশা করি, তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—আমার ভয় হয়, পূর্বে যেমন একবার শেখান হয়েছিল, 'নিজেকে সামলে রেখো, যার তার সঙ্গে মিশো না'—এ ব্যাপার তারই দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাঁদের পাঠান, তাঁরাই খাঁটি লোক; আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই তো আমি বুঝেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই আমাকে সাহায্য করবেন। আর অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভু তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

তুমি আমার জন্য ভেবো না—প্রভু আমায় রক্ষা করছেন। আমার এদেশে আসা, আর এত পরিশ্রম ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না। প্রভু দয়াময়—যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা—যে-কোনরূপে হোক—আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছে; আবার এমন লোকও অনেক আছে, যারা শেষ পর্যন্ত আমার সহায়তা করবে। অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটি জিনিষ থাকলে যে-কোন সৎ আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়; এই হল সিদ্ধিলাভের রহস্য।

এই 'ঠিক ঠিক লোকদের' কথা এখন থাক। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা হিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশে, পর্বতচূড়ায় বা মহাসমুদ্রের অতল তলে—যেখানেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, তুমিই আমার স্বরূপ। তুমি কখনই আমায় ত্যাগ করবে না—কখনই না, এ আমি ঠিক জানি। হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনও কখনও একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্য ওসব দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর, যেন আমি তোমা ছাড়া আর কারও কাছে কখনও সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কেউ কোন ভাল লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রভু, তুমি সকল ভালর সৃষ্টিকর্তা—তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জান, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে—যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা আমি মন্দের দিকে ঢলে পড়ব?

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

১৮৬*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

C/o Miss Mary Philips
19 W. 38th St., নিউ ইয়র্ক
২৮ মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
এই সঙ্গে আমি একশ' ডলার অথবা ইংরেজী মুদ্রা হিসাবে ২০ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম। আশা করি, এতে তোমাদের কাগজটা বার করবার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহায্য করতে পারব।

সদা আশীর্বাদক

পুঃ—পত্রপাঠ নিউ ইয়র্কে উপরের ঠিকানায় প্রাপ্তিস্বীকার করবে। এখন থেকে নিউ ইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানা। অবশেষে আমি এদেশে কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম।

—বি

১৮৭*

54 W. 33rd St, নিউ ইয়র্ক
মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

আমি গতকাল মিস থার্সবিকে ২৫ পাউণ্ড দিয়েছি। ক্লাসগুলি চলছে বটে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা যা দেয়, তাতে ঘরভাড়াটাও ওঠে না। এই সপ্তাহটা চেষ্টা করে দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।

আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) আমার ক্লাসের জনৈকা ছাত্রী মিস ডাচারের কাছে যাচ্ছি। ভারতবর্ষ থেকে বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য আমার নিকট শীঘ্র পাঠান হচ্ছে। এই গ্রীষ্মে ওখানে থাকাকালে আমি 'বেদান্তদর্শনের তিনটি বিভিন্ন সোপান' সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি বই লিখব মনে করছি; তারপর গ্রীনএকারে যেতে পারি।

মিস ফার্মার আমার কাছে জানতে চান, এই গ্রীষ্মে গ্রীনএকারে কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা করব, আর কোন্ সময়েই বা সেখানে যাব। আমি এর উত্তরে কি লিখব বুঝতে পাচ্ছি না। আশা করি, আপনি কৌশলে ঐ অনুরোধ কাটিয়ে দেবেন—এ বিষয়ে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম।

আমি বেশ ভাল আছি—মুদ্রাকর সমিতির (Press Association) জন্য 'অমরত্ব' (Immortality) বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুত একটি প্রবন্ধ লিখতে বিশেষ ব্যস্ত আছি।

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ

১৮৮*

21 W. 34th St, নিউ ইয়র্ক
জুন, ১৮৯৫

প্রিয় জো,
৬৮

নানা ঝড়-ঝাপটা তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, দেখছি। ফলে নিশ্চয়ই আরও বহু আবরণ অপসৃত হবে।

মিঃ লেগেট তোমার ফনোগ্রাফের কথা বলছিলেন। তাঁকে কয়েকটি চোঙ (cylinders) সংগ্রহ করতে বলেছি। 'কারও একটি ফনোগ্রাফে ঐগুলি দিয়ে কথা বলি, পরে ঐগুলি জো-কে পাঠিয়ে দি'—আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন, 'আমি তো একটি ফনোগ্রাফ কিনে দিতে পারি। জো যা বলে আমি তাই করি।' তাঁর অন্তরে একটা কবিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে দেখে সুখী হলাম।

আজ গার্নসিদের ওখানে থাকতে যাচ্ছি। ডাক্তার নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে আমাকে রোগমুক্ত করতে চান। অন্য সব পরীক্ষার পর ডাঃ গার্নসি আমার নাড়ী দেখছিলেন; এমন সময় সহসা ল্যাণ্ডস্‌বার্গ এসে হাজির, আমাকে দেখামাত্র সরে পড়ল। ডাক্তার গার্নসি খুব হেসে উঠে বললেন যে, ঠিক ঐ সময়ে আসার জন্য তিনি লোকটিকে পুরস্কৃত করতে ইচ্ছুক, কারণ সে আসাতে রোগটা ঠিক ঠিক নির্ণয় করা গেল। তার আসবার পূর্ব পর্যন্ত নাড়ীর স্পন্দন ঠিক ছিল, কিন্তু তাকে দেখামাত্র মানসিক উত্তেজনার ফলে স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। নিশ্চয় হল—রোগটি স্নায়ুসংক্রান্ত। তিনিও আমাকে ডাক্তার হেল্‌মারের চিকিৎসাই চালাতে বললেন—জোর করে। তাঁর বিশ্বাস হেল্‌মার আমাকে রোগমুক্ত করবেন। লোকটি বেশ উদার।

আজই শহরে 'পবিত্র গাভী' (the sacred cow) দেখতে যাবার ইচ্ছা। নিউ ইয়র্কে আর দিন-কয়েক আছি। হেল্‌মার বলেছেন, সপ্তাহে তিনবার করে চার সপ্তাহ, তার পর দু-বার করে আর চার সপ্তাহ চিকিৎসা করালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হব। যদি ইতোমধ্যে বোষ্টনে যাই, তিনি ওখানকার এক ওস্তাদ চিকিৎসককে আবশ্যকমত নির্দেশ দেবেন।

ল্যাণ্ডস্‌বার্গের সঙ্গে সামান্য মিষ্টালাপের পর বেচারীকে অব্যাহতি দেবার জন্য— উপরতলায় মাদার গার্নসির নিকট চলে গেলাম। ইতি

সতত প্রভুপদে তোমাদের
বিবেকানন্দ

১৮৯

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা
১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের এক পত্রে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের বিশেষ সমাচার লিখ নাই। নিরঞ্জনের এক পত্র মধ্যে পাই—সে সিলোন যাইতেছে সংবাদ পাই। সারদা যাহা করিতেছে, তাহাই আমার অভিমত; তবে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার' ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম ঘোষণা করিতে নহে। চেলারা গুরুর নাম করে; গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন, তাতে জলাঞ্জলি দেয়, আর দলাদলি ইত্যাদি তার ফল।

আলাসিঙ্গা লিখেছে চারুবাবুর বিষয়। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি না। চারুবাবুর বিষয় সবিশেষ লিখিবে ও তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ দিবে। সকলের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবে—বৃথা বার্তা করিবার সময় কুলায় না। আমার জীবনে বোধ হয় কারুর সহিত ঠাট্টা-বটকেরা করার অপেক্ষা অনেক কার্য আছে।

কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে; ঘণ্টা নাড়া সন্ন্যাসীর নহে এবং যাবৎ জ্ঞান না হয়, তাবৎ কর্ম। আমিই ঐ অনর্থের মূল। এক্ষণে দেখিতেছি যে, ঐ ঘণ্টা-পত্র লইয়া রামকৃষ্ণ-অবতারের দল বাঁধিবে এবং তাঁহার শিক্ষায় ধূলি নিক্ষেপ হইবে। তোমরা ঘণ্টা ত্যাগ করিতে পার ভালই, নচেৎ আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিব না। দলাদলি, দলবাঁধা, কূপমণ্ডুকের মধ্যে আমি নাই, আর যেথায় আমি থাকি। ইতি

'—' থিওসফিষ্ট হইয়াছেন, ভালই, রুচীনাং বৈচিত্র্যং! মঙ্গলমস্তু তেষাং, কিমহংব্রবীমি (রুচির বৈচিত্র্য! তাদের মঙ্গল হউক, আমি আর কি বলিব)? Universal brotherhood (সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব), বেশ কথা—শিবাঃ বঃ সন্তু পন্থানঃ। তার চেয়ে সুখের বিষয় কি আছে? ... রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদারভাব প্রচার করে আবার দলবাঁধা কেমন করে হয়? দলের বীজ হচ্ছে ঐ ঘণ্টা-পত্র। আমি হাজারবার ঠুকেছি, এবারও ঠুকলাম—ফলে কিছু হয় না। আমার নামে যদি তোমাদের দলবাঁধার সহায়তা হয়, তাহলেই আমি লীডার (নেতা) বটি, নইলে আমি কেউ নই! এই সত্য বটে! আমি ওতে নাই। আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবং তোমরাও যে তাই, এইটি বই লিখে ছাপাতে যত্ন তো যথেষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমি যে আজ ৬ বৎসর ঘণ্টা-পত্র ত্যাগ করার জন্য বলছি, তাতে কারুর কান পাতা নাই। ... আমি একমাত্র কর্ম বুঝি—পরোপকার, বাকী সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। বুঝতে পারছ? ... ফল কথা—আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্ রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না। অবতার মানে—যাঁহারা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। অবতারবিশেষত্ব আমি দেখিতে পাইতেছি না। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকী অধর্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম, বাকী কুকর্ম; আর আমি কিছুই দেখছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্মে ফল থাকিতে পারে, কিন্তু তদবলম্বন কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ কর্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্মের ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। অতএব সন্ন্যাস অবলম্বন করে, জীবকে উচ্চগতি শিক্ষা না দিয়ে পুনঃ- পুনঃ অনর্থকর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা আমার মতে দূষণীয়। মূর্খ গৃহস্থ কর্মপর হউক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ত্যাগী!! ... সমস্তই প্রত্যেকের আত্মার বর্তমান। যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।
৬৯
'অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যসি, নাস্তি ব্রহ্ম বদসি চেৎ নাস্ত্যেব ভবিষ্যসি'।
৭০
যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে কোন কালে বলবান্ হইবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'।
৭১
দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ He was the embodiment of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras.
৭২

মিশনরী-ফিশনরী এদেশে বড় চলল না। এরা ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় খুব ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার ideas (ভাব) যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না, এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়। অর্থাৎ ঐ jealousy (ঈর্ষা) আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাজের বেলা দূর করে দেয়, তখন সকলে মিলে একজন কাজের লোকের কথামত চলে। তাতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্ছে টাকা-দেবতার জাত, সকল কথায় পয়সা; আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয়ে বড় উদার, এরা তত

নয়। কৃপণ ঘরে ঘরে। ওটি ধর্মের মধ্যে। তবে দুষ্কর্ম করলে পর পাদ্রীদের হাতে পড়ে। তখন টাকা দিয়ে স্বর্গে যায়! এগুলো সব দেশেই সমান—priestcraft (পুরোহিতদের তুকতাক)।

আমি কবে দেশে যাব, কি না যাব, কিছুই বলতে পারি না। এখানে ঘুরে বেড়ান, সেখানেও তাই। তবে এখানে হাজারো লোক আমার কথা শোনে, বোঝে—হাজারো লোকের উপকার হয়; সেখানে কি?

রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয় মজুমদার যা লিখেছিল, আমি খালি তাই চাহিয়াছিলাম। তা না হয়ে কতকগুলো জার্মান ছেঁড়া পুঁথি পাঠিয়ে দিয়েছ, আর তার মধ্যে দুখানা আমার লেকচার; কি আপদ!!

সারদা যা করছে, তা আমার সম্পূর্ণ অভিমত। তাকে আমার শত শত ধন্যবাদ। বলি, তোমরা যা কিছু করছ, আমি বুঝতে পারি না। ... যা হোক, মান্দ্রাজ ও বোম্বেতে আমার মনের মত লোক আছে। তারা বিদ্বান্ এবং সকল কথা বোঝে এবং তারা দয়াল; অতএব পরহিতচিকীর্ষা বুঝিতে পারে। কিমধিকমিতি।

মা-ঠাকুরাণীকে আমার শত শত দণ্ডবৎ দিবে এবং সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ দিবে। আমি বই-টই কিছু ছাপাই নাই। এখানে লেকচার করে বেড়াই মাত্র। গুপ্ত, তুলসী প্রভৃতির বিষয় কিছুই লেখ নাই কেন? কালী কি করছে? শরৎ, যোগেন সেরে গেছে কিনা? আমার জীবনের প্রতি দেখে [তাকালে] আমার আপসোস হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছি, তার বদলে রুটির টুকরো খেয়েছি। যদি দেখতুম যে, কোন কাজ করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তাহলে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

সারদাকে আমায় একটা চিঠি লিখতে বলবে। তার সঙ্গে আমার মত মিলবে বোধ হয়। ... আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই ইতি; আমি সারদার চেলা। যারা আমার মনের মত কার্য করবে, আমি তাদের চেলা। যারা তা না করবে, তাদের কোন খবর আমি চাই না, আমার কোন খবর তাদের জন্য নাই। ইতি

নরেন্দ্র

১৯০*

পার্সি, নিউ হ্যাম্পসায়ার
৭ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌঁছেছি। আমি জীবনে যে-সকল সুন্দরতম স্থান দেখেছি, এটি তাদের অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! শহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এখানে এসে আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাব। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান করব এবং একলা নির্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উঁচু করে দেয়।

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

১৯১*

[ভূর্জপত্রে মিস মেরী হেলকে লিখিত]

পার্সি, N.H.
১৭ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,
আগামীকাল৭৩ যাচ্ছি সহস্রদ্বীপোদ্যানে। ঠিকানা—C/o Miss Dutcher, Thousand Island Park, N.Y. তুমি এখন কোথায় আছ? গ্রীষ্মের সময় তোমরা সব কোথায় থাকবে? অগষ্ট মাসে আমার ইওরোপে যাবার সম্ভাবনা আছে। যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। সুতরাং পত্র দিও। তাছাড়া ভারত হতে কতকগুলি বই ও চিঠি আসবার কথা। অনুগ্রহ করে সেগুলো মিস ফিলিপসের ঠিকানায়—নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দিও। ভারতবর্ষে যাবতীয় পবিত্র লিপি এই ভূর্জপত্রে লেখা হয়। আমিও সংস্কৃতে লিখলামঃ উমাপতি (শিব) সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।

তোমরা সকলে অনন্তকাল সুখে থাক।

বিবেকানন্দ

১৯২*

[মিঃ লেগেটকে লিখিত]

Thousand Island Park, N.Y.
C/o Miss Dutcher ১৮ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
রওনা হবার পূর্বদিন মিসেস স্টার্জিস্-এর এক চিঠি পেয়েছি, ৫০ ডলারের একখানা চেকও সঙ্গে আছে। পরদিনই তাঁর কাছে প্রাপ্তিস্বীকার পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি এর পর যখন তাঁকে চিঠি লিখবে, তখন আমার ধন্যবাদ ও প্রাপ্তিস্বীকারটা তাঁকে জানিয়ে দিও।

প্রাচীন হিন্দু প্রবচন 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'-ছাড়া এখানে বেশ সময় কাটছে। একই কথা, আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অগষ্টের প্রথম ভাগে চিকাগো যাচ্ছি। তুমি কখন রওনা হচ্ছ?

এখানকার বন্ধুরা সকলেই তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। তোমার সর্বাঙ্গীণ সুখ শান্তি ও স্বাস্থ্য কামনা করি।

তোমার স্নেহের
বিবেকানন্দ

১৯৩*

54 W. 33rd St., নিউ ইয়র্ক
জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
আমি এইমাত্র এখানে পৌঁছলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার হয়েছে। সেখানকার পল্লী ও পাহাড়গুলি—বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউ ইয়র্ক প্রদেশের পল্লীভবনটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

ল্যাণ্ডস্‌বার্গ বেচারী এই থেকে চলে গিয়েছে। সে তার ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে যায়নি। সে যেখানেই যাক, ভগবান্ তার মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন।

যা কিছু ঘটে, সবই ভালর জন্য। সকল প্রকার মিলনের পরেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, আমি একাই সুন্দর কাজ করতে পারব। মানুষের কাছ থেকে যত কম সাহায্য নেওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে তত বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে। এইমাত্র আমি লণ্ডনস্থ জনৈক ইংরেজের একখানি পত্র পেলাম—তিনি আমার দুইজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে বাস করেছিলেন। তিনি আমায় লণ্ডনে যেতে বলছেন। আপনাকে চিঠি লেখার পর, আমার ছাত্রেরা খুব সাহায্য করছে এবং এখন যে ক্লাসগুলি খুব ভালভাবে চলবে, তাতে সন্দেহ নাই। আমি এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ খাওয়া-দাওয়ার বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মত শিক্ষাদান করাটা আমার জীবনে একটা অত্যাবশ্যক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুঃ—'—' সম্বন্ধে 'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে অনেক বিষয় পড়লাম। তিনি হিন্দুদিগকে তাদের নিজ ধর্মের গুণগুলি গ্রহণ করতে শিখিয়ে ভারতবর্ষে যথার্থই সৎকার্য করেছেন। ... উক্ত মহিলার লেখা পড়ে তার মধ্যে কোনরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলাম না, ... কিম্বা কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবও পেলাম না। যা হোক, যে-কেউ জগতের উপকার করতে চায়, ভগবান্ তারই সহায় হউন।

এই জগৎ কত সহজেই না বুজরুকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে! আর সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় থেকে বেচারা মানুষকে নিরীহ পেয়ে তার উপর কত প্রবঞ্চনাই না চলেছে!

আপনার স্নেহের
তোমাদের বিবেকানন্দ

১৯৪*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

54 W. 33rd Street, নিউ ইয়র্ক
২২ [?] জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,

ভারত থেকে প্রেরিত পত্রগুলি ও বই-এর পার্সেল নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে। মিঃ স্যামের আগমন-সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত। একদিন রাস্তায় মিঃ স্যামের এক বন্ধুর সহিত দেখা হয়। ভদ্রলোক ইংরেজ; বেশ লোক। বললেন, ওহিওর কোন স্থানে মিঃ স্যামের সঙ্গে এক বাড়ীতে আছেন।

আমার দিনগুলো আগের মতই প্রায় একভাবে চলেছে। অবসরমত হয় অনর্গল বকছি, নয়তো একদম চুপচাপ। এ গ্রীষ্মে গ্রীনএকার যাওয়া হয়ে উঠবে কিনা জানি না। সেদিন মিস ফার্মারের সহিত দেখা করি; তখন তিনি স্থানান্তরে যেতে খুব ব্যস্ত, সুতরাং বাক্যালাপ অতি অল্পই হয়। তিনি একজন মহীয়সী নারী।

ক্রিশ্চান সায়ান্সের চর্চা কেমন চলছে? আশা করি তুমি গ্রীনএকার যাচ্ছ। সেখানে ওই দলের ও ভূতুড়েদের (spiritualists) অনেককে দেখবে, তাছাড়া দেখবে হস্তরেখাবিচারক, জ্যোতিষী, আরও কত কি! মিস ফার্মারের নেতৃত্বে সেখানে মিলবে রোগের যাবতীয় প্রতিকার ও ধর্মবিষয়ক যাবতীয় মতবাদ।

ল্যাণ্ডস্‌বার্গ অন্যত্র চলে গেছে। আমি একাই আছি। আজকাল দুধ, ফল, বাদাম—এইসব আমার আহার। ভাল লাগে, আছিও বেশ। এই গ্রীষ্মের মধ্যেই মনে হয় শরীরের ওজন ৩০/৪০ পাউণ্ড কমবে। শরীরের আকার অনুসারে ওজন ঠিকই হবে। ঐ যাঃ! বেড়ান বিষয়ে মিসেস এডাম্‌সের উপদেশের কথা একেবারে ভুলে গেছি। তাঁর নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার সেগুলি অভ্যাস করতে হবে।

গান্ধী সম্ভবতঃ বোষ্টন হতে ভারত রওনা হয়েছিলেন। পথে ইংলণ্ড হয়ে যাবেন। তাঁর অভিভাবিকা মিসেস হাওয়ার্ড শোকগ্রস্ত হয়ে কেমন আছেন? কম্বলগুলো যে আটলাণ্টিকগর্ভে মগ্ন হয়নি, সত্যসত্যই এসে পৌঁছেছে—এটা সুখবর বলতে হবে।

বক্তৃতা না দিলেও এ বৎসর মাথা তোলবার সময় পাইনি। ভারত থেকে বেদান্তের উপর দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের ভাষ্য পাঠিয়েছে। আশা করি নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছবে। চর্চা করে খুব আনন্দ হবে। এই গ্রীষ্মে বেদান্তদর্শন-বিষয়ক এক পুস্তক রচনার সঙ্কল্প। ভালমন্দ, সুখদুঃখের সংমিশ্রণই জগৎ। চক্র চিরকালই উঠবে ও নামবে; ভাঙা গড়া বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। যাঁরা এ সবের পারে যাবার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই ধন্য।

মেয়েরা সব ভাল আছে জেনে সুখী হলাম। পরিতাপের বিষয়, এবারকার শীতেও কেউ ধরা পড়ল না। এদিকে শীতের পর শীত চলে যাচ্ছে। আশাও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার বাসার কাছে অবস্থিত ওয়ালডর্ফ হোটেল। আমেরিকান ধনী-কন্যারা ক্রয় করবেন বলে বহু খেতাবধারী কিন্তু কপর্দকহীন ইওরোপীয় পুরুষের প্রদর্শনী ও আড্ডা এটি। আমদানী এত প্রচুর ও বিবিধ যে, ইচ্ছানুরূপ নির্বাচন বাস্তবিকই সুলভ। কেউ আছেন একেবারেই ইংরেজী বলতে পারেন না, আবার আছেন জনকয়েক যাঁরা আধ আধ ইংরেজী বলেন, যা অন্যের বোধগম্য নয়। ভাল ইংরেজী বলতে পারেন, এমন সব লোকও আছেন। কিন্তু নির্বাকদের তুলনায় তাঁদের আশা বড় কম। কারণ যাঁরা ইংরেজী ভাল বলতে পারেন, মেয়েরা তাঁদের ঠিক 'বিদেশী' বলে মনে করে না।

এক মজার বইয়ে পড়লাম, সমুদ্রে এক আমেরিকান জাহাজ ডুবু ডুবু। লোকেরা হতাশ হয়ে অন্তিম সান্ত্বনার জন্য কোনরূপ ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করল। প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের এক বিশিষ্ট ধর্মযাজক জাহাজে ছিলেন—জস্ খুড়ো। সকলে তাঁকেই ধরে বসল, 'আর তো মরতে বসেছি, এখন কিছু ধর্মানুষ্ঠান করুন, দোহাই জস্ খুড়ো।' খুড়ো মাথার টুপি হাতে উল্টে ধরে তখনই দান সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।

ধর্ম বলতে তিনি এর বেশী বুঝতেন না। এই জাতীয় লোকের অধিকাংশেরই এই অবস্থা। এদের বুদ্ধিতে ধর্মের তাৎপর্য দানসংগ্রহ। ভগবান্ এদের মঙ্গল করুন। এখনকার মত আসি। কিছু খেতে যাচ্ছি। বড় খিদে পেয়েছে। ইতি—

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ১৯৫-২০৪

১৯৫*

19 W. 38th St., নিউ ইয়র্ক
২২ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় কিডি,
তোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখছি।

তুমি দিন দিন উন্নতি করছ জেনে খুব সুখী হলাম। তুমি যে ভাবছ, আমি আর ভারতে ফিরব না, এটা তোমার ভুল ধারণা। আমি শীঘ্রই ভারতে ফিরব, তবে কোন বিষয়ে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। এখানে আমি একটি বীজ পুঁতেছি, শীঘ্রই সেটি বৃক্ষে পরিণত হবে—হবেই হবে। তবে আমার আশঙ্কা, যদি আমি তাড়াহুড়ো করে যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, গাছটির বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজটা বার করে ফেল। তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ করে দিয়ে আমি ভারতে যাচ্ছি আর কি।

বৎস, কাজ করে যাও, রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। আমি প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে। চিরদিনের জন্য আমার ভালবাসা জানবে।

তোমার
বিবেকানন্দ

১৯৬*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

C/o Miss Dutcher
Thousand Island Park, N.Y.
২৬ জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,
ভারতীয় পত্রগুলির (mail) জন্য ধন্যবাদ। এবার অনেক সু-খবর এল। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের ‘আত্মার অমরত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাদার চার্চকে পাঠিয়েছি। আশা করি, এখন সেগুলি পড়ে তুমি আনন্দ পাচ্ছ। বেদান্তের কোন অংশই বৃদ্ধ উপেক্ষা করেননি। সাবাস তাঁর নির্ভীক কৃতিত্ব! ঔষধগুলি এসে পৌঁছেছে শুনে সমধিক সুখী হলাম। শুল্ক কিছু লাগল নাকি? যদি লেগে থাকে, আমি দিয়ে দেব; আপত্তি করো না। খেতড়িরাজের প্রেরিত শাল, কিংখাব আর ছোটখাট কয়েক রকম সুন্দর জিনিসের একটা বড় প্যাকেট আসছে। এগুলি বন্ধুদের উপহার দিতে চাই। তবে এসে পৌঁছতে এখনও অন্ততঃ মাস-কয়েক লাগবে

ভারতের চিঠিগুলোতে দেখবে, আমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করছে। ওরা অস্থির হয়ে পড়েছে। ইওরোপে যদি যাই তো নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের অতিথি হয়ে যাব। তিনি ছয় সপ্তাহ ধরে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও সুইজরলণ্ডের সর্বত্র ঘুরবেন। ওখান থেকে ভারতে ফিরব। চাই কি এখানেও ফিরতে পারি। এদেশে যে বীজ বপন করলাম, তার পরিণতি কামনা করি। এইবারের শীতে চমৎকার কাজ হয়েছে নিউ ইয়র্কে। সহসা ভারতে চলে গেলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই যাওয়া সম্বন্ধে এখনও মন করিনি।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে লক্ষ্য করার মত তেমন কিছু ঘটেনি। দৃশ্য রমণীয় বটে। কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রসঙ্গ হয়। ফল দুধ প্রভৃতি আহার করি, আর বেদান্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ি, এগুলি ওরা ভারত থেকে অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছে।

চিকাগোয় যদি ফিরি তো ছয় সপ্তাহের পূর্বে নয়, চাই কি আরও দেরী হতে পারে। বেবী যেন আমার জন্য তার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না করে। ফিরে যাবার আগে যে-কোন উপায়ে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করব—নিশ্চয় জেনো।

মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর পড়ে তুমি খুবই বিচলিত হয়েছিলে; সেখানে কিন্তু তার খুব ফল হয়েছে। সেদিন মান্দ্রাজ ‘খ্রীষ্টান কলেজে’র অধ্যক্ষ (President) মিঃ মিলার তাঁর এক ভাষণে আমার চিন্তাগুলি অনেকাংশে সন্নিবিষ্ট করে বলেছেন যে, ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে ভারতের তত্ত্বগুলি প্রতীচ্যের খুব উপযোগী, আর যুবকদের সেখানে (পাশ্চাত্যে) গিয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হতে আহ্বান করেছেন। এতে ধর্মযাজক মহলে বেশ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। ‘এরেনা’ পত্রে প্রকাশিত যে প্রবন্ধের কথা তুমি লিখেছ,

আমি তার কিছুই দেখিনি। নিউ ইয়র্কের মহিলারা আমার সম্পর্কে কোনরূপ হইচই করেননি। তোমার বন্ধুটির বিবরণ কল্পনাপ্রসূত। প্রভুত্ব করা তাদের স্বভাব নয়। আশা করি, ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ ইওরোপে যাচ্ছেন। দেশভ্রমণ জীবনে খুবই আনন্দদায়ক। আমাকে এক জায়গায় বেশী দিন আটকে রাখলে সম্ভবতঃ মারা পড়ব। পরিব্রাজক-জীবনের তুলনা হয় না।

চতুর্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, ততই জীবনের প্রকৃত অর্থ—জীবন যে স্বপ্ন, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; কেন যে মানুষ এটা বুঝতে পারে না তাও বোঝা যায়। সে যে একান্ত অর্থহীনের মধ্যে অর্থসঙ্গতি খুঁজতে চেষ্টা করেছিল! স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের সন্ধান শিশুসুলভ উদ্যম বৈ আর কি! 'সবই ক্ষণিক, সবই পরিবর্তনশীল'—এইটুকু নিশ্চয় জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখদুঃখ ত্যাগ করে জগদ্‌বৈচিত্র্যের সাক্ষিমাত্ররূপে অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসক্ত হন না।

'যাঁদের চিত্ত সাম্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা ইহজীবনেই জন্মমৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করেছেন। ভগবান্ নির্দোষ ও সমদর্শী এবং সকলের প্রতি সমবুদ্ধি; সুতরাং তাঁরা ভগবানেই অবস্থিত।'
৭৪
বাসনা, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি—এই তিনটিই বন্ধন। জীবনে অনাসক্তি, জ্ঞান ও সমদর্শিতা—এই তিনটি মুক্তি। মুক্তিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ্য।

না আসক্তি, না বিদ্বেষ; না সুখ, না দুঃখ; না মৃত্যু, না জীবন; না ধর্ম, না অধর্ম; নেতি, নেতি নেতি।

চিরতরে তোমার
বিবেকানন্দ

১৯৭*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

C/o Miss Dutcher
Thousand Island Park, N.Y.

প্রিয় ভগিনী,
ভারতীয় পত্রাদির জন্য বহু ধন্যবাদ। ভাষার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। মাদার চার্চকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার-লিখিত 'অমরত্ব' নামক যে প্রবন্ধটি পাঠাই, সেটি পড়ে দেখে থাকবে—তাঁর মতে, ইহজীবনে যারা আমাদের প্রীতিভাজন, অতীত জন্মেও তারা নিশ্চয় তেমনি ছিল। তাই মনে হয়, কোন পূর্বজন্মে আমি এই ভক্ত পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ভারত থেকে কয়েকখানি বই আসবার কথা, হয়তো এসে গেছে। যদি এসে থাকে, তবে অনুগ্রহ করে এখানে পাঠিয়ে দিও। ডাকমাশুল বাবদ যদি কিছু দেয় থাকে, সংবাদ পাবামাত্র পাঠাব, জানবে। কম্বলগুলির জন্য শুল্কের কথা তুমি তো কিছু লেখনি। খেতড়ি থেকে আর একটি বড় প্যাকেট আসবে—কার্পেট, শাল, কিংখাব ও অন্যান্য ছোট ছোট জিনিষের। বোম্বাইয়ে আমেরিকান কনসালের মারফৎ শুল্ক ওখানেই দিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে ওখানেই দিয়ে দিতে লিখেছি। নয়তো আমাকেই এখানে দিতে হবে। মনে হয় মাসকয়েকের পূর্বে আসছে না। বইগুলির জন্য উদ্‌গ্রীব রইলাম। এলেই অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিও।

মাকে, ফাদার পোপ ও ভগিনীদের সকলকে আমার ভালবাসা। এ স্থানটি বড় ভাল লাগছে। আহার যৎসামান্য, অধ্যয়ন আলোচনা ধ্যানাদি কিন্তু খুব চলছে। অপূর্ব এক শান্তির আবেগে প্রাণ ভরে উঠছে। প্রতিদিনই মনে হচ্ছে—আমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্য! কাম, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ বন্ধন যেন আমা থেকে সাময়িক ভাবে খসে পড়েছে। ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার যেমন উপলব্ধি হত, এখানেও আবার তেমনি হচ্ছে—'আমার ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ বোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্ বিধিবিশেষ মানব? কোন্‌টাই বা লঙ্ঘন করব?' সে উচ্চ ভাবভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা ডোবা। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ; একমাত্র তিনিই আছেন আর কিছু নাই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। হে প্রভো! তুমি আমার চির আশ্রয় হও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। সতত প্রীতিশুভেচ্ছাযুক্ত—

তোমাদের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

১৯৮*

আমেরিকা
১ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
তোমাদের প্রেরিত মিশনরীদের বইখানা ও রামনাদের রাজার ফটো পেলাম। রাজা ও মহীশূরের দেওয়ান—দুজনকেই পত্র

লিখেছি। রমাবাঈয়ের দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জেনসের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরীদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্বে পৌঁছেছে। ঐ পুস্তিকাতে একটা অসত্য কথা আছে। আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে কখনও খাইনি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোন কালা আদমিকে স্থান দেয় না। সেইজন্য ডাঃ ভ্রম্যান্‌কে—আমি যাঁর অতিথি ছিলাম—ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল; কারণ তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে।

আলাসিঙ্গা, তোমায় বলছি শোন, তোমাদের নিজেদেরই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার করছ কেন? যদি কেউ তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই তার সমর্থন করতে এবং আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিতে পার না কেন? আমার সম্বন্ধে বলছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। এখানে আমার শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীষ্টান; আর শিক্ষিতদের ভেতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরীদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে। মিশনরীরা কোন কিছুর বিরুদ্ধে লাগলে শিক্ষিতেরা আবার সে বিষয়টি পছন্দ করে। এখন মিশনরীদের শক্তি এখানে অনেক কমে গেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। তারা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে যদি তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে কেন আস? তোমরা কি লিখতে পার না এবং তাদের ধর্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না? কাপুরুষতা তো আর ধর্ম নয়!

এখানে ইতোমধ্যেই ভদ্রসমাজের ভেতর একদল লোক আমার ভাব নিয়েছে। আগামী বৎসর তাদের এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করব, যাতে তারা কার্যক্ষম হতে পারে; তখন কাজটা চলতে থাকবে। তারপর আমি ভারতে চলে গেলেও এখানে এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা এখানকার কাজের পৃষ্ঠপোষক হবে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য করবে। সুতরাং তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তবে তোমরা যতদিন মিশনরীদের আক্রমণে কেবল চীৎকার করবে এবং কিছু করতে না পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি তোমাদের দিকে চেয়ে হাসব। তোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট পুতুলের মত, তা ছাড়া আর কি? 'স্বামীজী, মিশনরীরা আমাদের কামড়াচ্ছে—উঃ জলে মলুম! উঃ-উঃ।' স্বামীজী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি করতে পারে?

বৎস! আমি বুঝছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মানুষ তৈরী করতে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও ক্লীবের বাস। সুতরাং বিরক্ত হয়ো না। ভারতে কাজ করার জন্য উপায় উদ্‌ভাবন আমাকেই করতে হবে। কতকগুলো মস্তিষ্কহীন ক্লীবের হাতে গিয়ে আমি পড়ছি না।

তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, তোমরা যতটুকু পার করে যাও, তা যত অল্পই হোক না কেন, একলাই আগাগোড়া সব করে যেতে হবে। কলিকাতার লোকদের এত সঙ্কীর্ণভাব! আর তোমরা মান্দ্রাজীরা কুকুরের ডাকে মূর্ছা যাও! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'—দুর্বল কখনও এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। আমার জন্য তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল আত্মরক্ষা করে যাও; আমাকে দেখাও যে, তোমরা ঐটুকু করতে পার, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট। কে আমার সম্বন্ধে কি বলছে, তাই নিয়ে আর আমাকে বিরক্ত করো না। আমার সম্বন্ধে কোন আহাম্মকের সমালোচনা শোনবার জন্য আমি বসে নেই। তোমরা শিশু, [জেনে রাখ] কেবল প্রভূত ধৈর্য, অসীম সাহস ও মহতী চেষ্টা দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, কিডির মন মাঝে মাঝে যেমন ডিগবাজি খায়, সেইরকম ডিগবাজি খাচ্ছে। কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধরুক না। 'স্বামী, স্বামী' বলে না চেঁচিয়ে ঐ দুষ্টুদের বিরুদ্ধে কি মান্দ্রাজীরা এখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না, যাতে তারা 'ত্রাহি ত্রাহি' চীৎকার করতে থাকে?

তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ করতে পারে—কাপুরুষেরা পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, চিরকালের জন্য জেনে রাখ যে, প্রভু আমায় হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। যতদিন আমি পবিত্র থাকব, তাঁর দাস হয়ে থাকব, ততদিন কেউ আমার একটি কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

তোমাদের কাগজখানা বার করে ফেল। যে-কোন রকমে হোক, আমি খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে থাকব। তোমরা কাজ করে চল। দেশবাসীর জন্য কিছু কর—তাহলে তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমার পিছনে থাকবে। সাহসী হও, সাহসী হও! মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোনমতে কাপুরুষ না হয়।

সদা প্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

১৯৯*

[মিঃ লেগেটকে লিখিত]

C/o Miss Dutcher
Thousand Island Park, N.Y.
৭ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
দেখতে পাচ্ছি—আপনি নিউ ইয়র্ক খুব উপভোগ করছেন, সুতরাং একটি চিঠির দ্বারা আপনার মধুর স্বপ্ন ভাঙবার জন্য ক্ষমা করবেন।

মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস স্টার্জিস-এর কাছ থেকে আমি দুটি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাঁরা বার্চগাছের ছালের দুটি সুন্দর খাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি সংস্কৃত মূল শ্লোক এবং অনুবাদে সে দুটি ভরিয়ে ফেলে আজকের ডাকে পাঠিয়ে দিলাম।

শুনছি, মিসেস ডোরা
৭৫
গূঢ় রহস্যাদিতে বিশ্বাসী 'মহাত্মা'-পদ্ধতিতে চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

পার্সি
৭৬
ছাড়ার পর থেকে আমি লণ্ডনে যাবার জন্য অপ্রত্যাশিত অনেক জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছি এবং আমি বহু আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি। লণ্ডনে কাজ করার এই সুযোগ হারাতে চাই না। তাই লণ্ডনের আমন্ত্রণের সঙ্গে আপনার আমন্ত্রণকে আরও কাজ করার দৈব আহ্বান বলেই মনে করি।

আমি পুরো এ মাসটা এখানেই থাকব এবং অগষ্ট মাসের কোন সময়ে কয়েকদিনের জন্য মাত্র চিকাগোয় যেতে হবে।

উদ্বিগ্ন হবেন না, ফাদার লেগেট, এই হল আশান্বিত হবার সর্বোৎকৃষ্ট সময়—যখন ভালবাসায় এত নিশ্চয়তা।

প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, চিরদিনের জন্য সকল শান্তি লাভ করুন, কারণ আপনি তা লাভ করার খুবই উপযুক্ত।

ভালবাসা এবং স্নেহে চিরদিন আপনার
বিবেকানন্দ

১৯০*

19W, 38th St., নিউ ইয়র্ক
৮ জুলাই, ১৮৯৫

স্নেহের অ্যালবার্টা,
৭৭

আমি নিশ্চিত যে, তুমি এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার সঙ্গীতশিক্ষায় নিমগ্ন। আশা করি ইতোমধ্যে তুমি স্বরগ্রামের সব কিছুই শিখে নিয়েছ। পরের বারে দেখা হলে তোমার কাছ থেকে স্বরগ্রাম সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করা আমার খুব আনন্দের বিষয় হবে।

পার্সিতে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটেছে—তিনি ঋষিকল্প নন কি?

আমি নিশ্চিত যে, হলিস্টারও (Hollister) জার্মান দেশটা খুব উপভোগ করছে এবং আশা করি তোমরা কেউই জার্মান শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে জিভ জখম করনি—বিশেষ করে সেই সকল শব্দ, যেগুলির আরম্ভ sch, tz, tsz, এবং অন্য সব মধুর জিনিষ দিয়ে।

জাহাজ থেকে লেখা তোমার চিঠিখানি তোমার মায়ের কাছে পড়েছি। আগামী সেপ্টেম্বরে আমি খুব সম্ভবতঃ ইওরোপ যাচ্ছি। আজ পর্যন্ত ইওরোপে যাইনি। মোটের উপর, সেটা যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব বেশী ভিন্নরকম হবে না, ইতোমধ্যেই আমি এদেশের আচার-ব্যবহার বেশ রপ্ত করে ফেলেছি।

পার্সিতে নৌকায় বেড়াবার সময় আমি দাঁড় চালানর দু-একটি বিষয় শিখে নিয়েছি। মাসীমা 'জো জো'-কে তাঁর 'মধুরতা'র জন্য খেসারত দিতে হয়েছে, কারণ মাছি এবং মশাগুলি মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। পরন্তু আমাকে তারা অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল; আমার মনে হয় এর কারণ মাছিগুলি ছিল গোঁড়া; তাই একজন পৌত্তলিককে তারা স্পর্শ করেনি। আবার আমার মনে হয়, পার্সিতে আমি খুব গান গাইতাম, সেই ভয়েই তারা পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের ভারি সুন্দর সুন্দর বার্চ (birch) বৃক্ষ ছিল। তার ছাল থেকে বই তৈরী করার চিন্তা আমার মনে উদিত হল—যেমন প্রাচীনকালে আমাদের দেশে করা হত; তোমার মা ও মাসীমার জন্য আমি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক লিখেছি।

অ্যালবার্টা, আমি নিশ্চয়ই জানি—তুমি অচিরেই একজন বিস্ময়কর বিদুষী হতে চলেছ। তোমাদের দুজনের জন্য ভালবাসা এবং আশীর্বাদ।

সতত স্নেহবদ্ধ তোমাদের
বিবেকানন্দ

২০১*

[মিসেস স্টার্জিসকে লিখিত]

C/o Miss Dutcher
Thousand Island Park, N.Y.
জুলাই, ১৮৯৫

মা,
আপনি নিশ্চয় ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কে এসে গিয়েছেন এবং সেখানে এখন গরম মোটেই প্রচণ্ড নয়।

এখানে আমাদের বেশ কাটছে। মেরী লুই (Marie Louise) গতকাল এসে পৌঁছেছেন। সুতরাং এখন পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন, সবাইকে মিলিয়ে আমরা ঠিক সাতজন।

পৃথিবীর সব ঘুম যেন আমাতে নেমে এসেছে। আমি দিনে অন্ততঃ দু-ঘণ্টা ঘুমাই এবং সমস্ত রাত্রি জড়পিণ্ডের মত অসাড়ে নিদ্রা যাই। মনে হয়, নিউ ইয়র্কের অনিদ্রার এটি একটি প্রতিক্রিয়া। আমি কিছু কিছু লিখছি ও পড়ছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃরাশের পর একটি করে ক্লাস নিচ্ছি। কঠোর নিরামিষবিধিতে আহার প্রস্তুত হচ্ছে, এবং আমি খুব উপোস করছি।

এ স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে আমার চর্বি থেকে বেশ কয়েক পাউণ্ড উবে যাবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। এটা মেথডিষ্টদের জায়গা এবং অগষ্ট মাসে তাদের শিবির-সভা হবে। এটা অত্যন্ত সুন্দর স্থান; শুধু ভয়, জায়গাটা এই ঋতুতে অত্যন্ত জনবহুল হয়ে পড়ে।

মিস 'জো জো'র মাছির ক্ষত নিশ্চয়ই এতদিনে সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে।—মা কোথায়? পরের বারে আপনি যখন তাঁকে চিঠি লিখবেন, দয়া করে তাঁকে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাবেন।

পার্সিতে যে-আনন্দে দিনগুলি কেটেছে, তার দিকে আমি সর্বদাই ফিরে ফিরে তাকাব এবং এই ব্যবস্থার জন্য মিঃ লেগেটকে সর্বদাই ধন্যবাদ জানাব। আমি তাঁর সঙ্গে ইওরোপে যেতে পারব। যখন তাঁর সঙ্গে পরের বারে দেখা হবে, দয়া করে তাঁকে আমার চিরন্তন ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তাঁর মত মানুষদের ভালবাসা দ্বারাই জগৎ সর্বদা আরও ভাল হবার দিকে যাচ্ছে।

আপনি কি আপনার বন্ধু মিসেস ডোরার (লম্বা জার্মান নাম) সঙ্গে আছেন? তিনি একজন মহাপ্রাণ, খাঁটি 'মহাত্মা'। দয়া করে তাঁকে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাবেন।

আমি এখন একপ্রকার তন্দ্রাচ্ছন্ন—অলস, আনন্দের ভাব নিয়ে আছি, মন্দ লাগছে না।মেরী লুই নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁর পোষা একটি কচ্ছপ নিয়ে এসেছেন। এখন এখানে এসে পোষা প্রাণীটি তার স্বাভাবিক পরিবেশ পেয়েছে। সুতরাং বিপুল অধ্যবসায়ে গড়াতে গড়াতে এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে সে মেরী লুই-র ভালবাসা ও আদরকে পেছনে—অনেক পেছনে ফেলে চলে গিয়েছে। প্রথমটায় তিনি কিছুটা দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এত জোরের সঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করতে লাগলাম যে, তাঁকে অবিলম্বে ফিরে আসতে হল।

ঈশ্বর আপনাকে এবং আপনাদের সকলকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, এই সতত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

পুনঃ—'জো জো' বার্চগাছের ছালের তৈরী বইটি পাঠায়নি। মিসেস বুলকে আমি যেটি পাঠিয়েছি, সেটি পেয়ে তিনি ভারি আনন্দিত।

ভারত থেকে আমি অনেকগুলি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। সেখানে সব ঠিক চলছে। সাগরপারে বিদেশে অবস্থিত শিশুদের আমাদের ভালবাসা পাঠিয়ে দেবেন।

—বি

২০২*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

আমেরিকা.
৯ জুলাই, ১৮৯৫

… আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইঃ মহারাজ তো বেশ ভালই জানেন, আমি হচ্ছি দৃঢ় অধ্যবসায়ের মানুষ। আমি এ দেশে একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতোমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি খুব শীঘ্রই এটা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েকশত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; কতকগুলিকে সন্ন্যাসী করব, তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা … তাদের বিদ্যাবুদ্ধি, কলাকৌশল যতই খাটাক না কেন, প্রতিদিনই বুঝছে, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ। ইতোমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি অগষ্টের শেষে সেখানে যাব মনে করেছি—দেখি, ওদিকে পাদ্রীদের কতটা ঘাঁটাতে পারা যায়। যাই হোক, আগামী শীতের কিছুটা লণ্ডনে ও কিছুটা নিউ ইয়র্কে কাটাতে হবে—তারপরই আমার ভারতে ফেরবার বাধা থাকবে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে এই শীতের পর এখানকার কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক কাজকেই তিনটি অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে-কোন ব্যক্তি তার সময়ে প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চয়ই লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং বাধা ও অত্যাচার আসুক, স্বাগতম। কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে এবং ভগবানে গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই এ-সব উড়ে যাবে। ইতি

বিবেকানন্দ

২০৩*

[মিসেস স্টার্জিসকে লিখিত]

Thousand Island Park
২৯ জুলাই, ১৮৯৫

মা,

আপনার গৌরবময় সময় এসেছে। আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ আছেন।

এখানে বেশ ভালভাবে সময় কাটছে। দু-একজন মহিলা সরাসরি ডেট্রয়েট থেকে এখানে এসেছেন আমাদের সঙ্গে থাকতে। তাঁরা বেশ পবিত্র ও ভাল। আমি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড থেকে ডেট্রয়েটে এবং সেখান থেকে চিকাগোয় যাচ্ছি।

নিউ ইয়র্কে আমার ক্লাস চলছে। আমার অনুপস্থিতিতেও তারা বেশ সাহসের সঙ্গে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। ভাল কথা, ডেট্রয়েট থেকে যে দু-জন মহিলা এসেছেন, তাঁরা ক্লাসে যোগদান করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের ভূতের ভয়। তাঁদের কে শিখিয়েছে, জ্বলন্ত এলকোহলের শিখায় একটু নুন দিলে কাল তলানি পড়ে, তাহলে সেটা হবে ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ। যা হোক, মহিলা দুটি বেশ ভূতের ভয় পেয়েছিলেন। লোকে বলে, এই রকম ভূত বিশ্বজগতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পিতা লেগেট আপনার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই খুব নিরুৎসাহ হয়েছেন। কারণ আজ পর্যন্ত তাঁর কোন চিঠি পাইনি। বেশ, দুঃখ আসে আসুক, বিচলিত না হওয়াই শ্রেয়। কাজেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।

জো জো-র সমুদ্রযাত্রা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকবে। শেষ রক্ষাই রক্ষা।

শিশুরা
৭৮
জার্মানীতে বেশ আনন্দে আছে, নিশ্চয়। তাদের জাহাজ-ভর্তি ভালবাসা জানাবেন।

এখানকার সকলের ভালবাসা জানবেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট আপনার জীবন আলোক-বর্তিকার মত হোক—এই কামনা করি।

আপনার পুত্র
তোমাদের বিবেকানন্দ

২০৪*

19W, 38th St., নিউ ইয়র্ক

৩০ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ঠিক করেছ। নাম আর ‘মটো’ (motto)
৭৯
ঠিকই হয়েছে। বাজে সমাজসংস্কার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে সমাজসংস্কার হতে পারে না। কে তোমায় বললে, আমি সমাজসংস্কার চাই? আমি তো তা চাই না! ভগবানের নাম প্রচার কর, কুসংস্কার ও সমাজের আবর্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলো না।

‘সন্ন্যাসীর গীতি’
৮০
এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিষ থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না। আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২০৫-২১৪

২০৫*

[মিঃ লেগেটকে লিখিত]

C/o Miss Dutcher
Thousand Island Park, N.Y.
৩১ জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
এর পূর্বে আমি আপনাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম; মনে হচ্ছে, সেটি সাবধানে ডাকে দেওয়া হয়নি, তাই আর একখানা লিখছি।

১৪ তারিখের পূর্বে আমি যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছব। ১১ তারিখের পূর্বে যে করেই হোক আমাকে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। সুতরাং প্রস্তুত হবার যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যাবে।

আমি আপনার সঙ্গে পারি-তে যাব, সঙ্গে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য আপনাদের বিবাহ দেখা। আপনারা যখন ভ্রমণে বাহির হবেন, তখন আমি লণ্ডন চলে যাব। ব্যস্।

আপনার এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমার চিরস্থায়ী ভালবাসা ও আশীর্বাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সতত আপনার পুত্র
বিবেকানন্দ

২০৬*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

19W. 38th St., নিউ ইয়র্ক
২ অগষ্ট, ১৮৯৫

সুহৃদ্বরেষু,
আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি আজ পাইলাম। আমি জনৈক বন্ধুর সহিত প্রথমে পারি-তে যাইতেছি—১৭ অগষ্ট ইওরোপ যাত্রা করিতেছি। পারি-তে আমার বন্ধুর বিবাহ হওয়া পর্যন্ত (মাত্র এক সপ্তাহ) থাকিব, তারপর লণ্ডনে চলিয়া যাইব।

একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে আপনার পরামর্শটি চমৎকার, এবং আমি ঐভাবেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি।

এখানে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং কাজও মন্থরগতিতে চলিতে বাধ্য। অধিকন্তু নিউ ইয়র্কে উল্লেখযোগ্য কিছু গড়িয়া তোলার আগে আরও কয়েক মাস খাটিতে হইবে। কাজেই এই শীতের গোড়ায় আমাকে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিতে হইবে, এবং গ্রীষ্মে পুনরায় লণ্ডনে যাইব। এখন যতদূর মনে হইতেছে, তাহাতে এবারে সপ্তাহ-কয়েক মাত্র লণ্ডনে থাকিতে পারিব। কিন্তু ভগবানের কৃপায় হয়তো ঐ অল্প সময়েই গুরুতর বিষয়ের সূচনা হইতে পারে। কবে লণ্ডনে পৌঁছিব, তাহা আপনাকে তার করিয়া জানাইব।

থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের জনকয়েক আমার নিউ ইয়র্কের ক্লাসে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ যখনই বেদান্তের মহিমা বুঝিতে পারে, তখনই তাহাদের হিজি-বিজি ধারণাগুলি দূর হইয়া যায়।

আমার বরাবরের অভিজ্ঞতা, যখন মানুষ বেদান্তের মহান্ গৌরব উপলব্ধি করিতে পারে, তখন মন্ত্রতন্ত্রাদি আপনা হইতে দূর হইয়া যায়। যে মুহূর্তে মানুষ একটি উচ্চতর সত্যের আভাস পায়, সেই মুহূর্তে নিম্নতর সত্যটি স্বতই অন্তর্হিত হয়। সংখ্যাধিক্যে কিছুই যায় আসে না। বিশৃঙ্খলা জনতা শত বৎসরেও যাহা করিতে পারে না, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরল সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে। এক বস্তুর উত্তাপ নিকটবর্তী অন্যান্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং যে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সেই জ্বলন্ত অনুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম ও সরলতা সঞ্জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। ‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।’—এই সনাতন সত্য আমার

বৈচিত্র্যময় জীবনে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। যিনি সৎস্বরূপে আপনার অন্তরে বিরাজিত, তিনিই সর্বক্ষণ আপনার অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক হউন; অচিরে মুক্তির আলোকে আপনি স্বয়ং উদ্ভাসিত হইয়া অন্যকে মুক্ত হইতে সাহায্য করুন।

বিবেকানন্দ

২০৭

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

19W, 38th St., নিউ ইয়র্ক
১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

… মা-ঠাকুরাণীকে আমার বহুত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে।

শিব শিব !

এখন আমি নিউ ইয়র্ক শহরে। এ শহর গরমিকালে ঠিক কলকেতার মত গরম, অজস্র ঘাম বয়ে পড়ছে, হাওয়ার লেশ নাই। দুই মাস উত্তর দিকে গিয়েছিলাম, সেথায় বেশ ঠাণ্ডা। এ পত্রপাঠ জবাব লিখিবে। এ পত্র পৌঁছিবার পূর্বে আমি ইংলণ্ডে চলিলাম। ইতি

ঠিকানা: C/o Akshoy C. Ghosh
Muller, Juan Duff House, Regent St.,
Cambridge, England

২০৮*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

19W. 38th St., নিউ ইয়র্ক
৯ অগষ্ট, ১৮৯৫

সুহৃদ্বরেষু

… আমার ব্যক্তিগত মতামতের একটু আভাস দেওয়া দরকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানব সমাজে ধর্মের অপূর্ব উচ্ছ্বাস মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া থাকে এবং তেমনি এক উচ্ছ্বাস বর্তমানেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক উচ্ছ্বাসবেগ আবার বহু ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত বলিয়া বোধ হইলেও মূলতঃ তাহারা যে একই তত্ত্ব বা তত্ত্বসমষ্টি হইতে উদ্ভূত, তাহাও তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান সময়ে যে ধর্মভাব দিন দিন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদ উহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাহারা সকলেই সেই এক অদ্বৈত-তত্ত্বের অনুভূতি ও অনুসন্ধানেই সচেষ্ট। জাগতিক, নৈতিক এবং আত্মিক সকল ক্ষেত্রেই এই একটি ভাব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মতবাদসমূহ ক্রমেই উদার হইতে উদারতর হইয়া সেই শাশ্বত অদ্বৈত-তত্ত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেগুলি এক অপূর্ব ঐক্যমূলক দর্শন—অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিরূপ; আর মানব আজ পর্যন্ত যত প্রকার একত্ববাদের দর্শন আবিষ্কার করিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম। আবার ইহাও সর্বদা দেখা যায় যে, প্রতিযুগে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র মতবাদই টিকিয়া যায় এবং অন্য তরঙ্গগুলি উঠে শুধু উহারই অঙ্গে মিশিয়ে গিয়া উহাকে একটি বিপুল ভাবতরঙ্গে পরিণত করিবার জন্য। তখন সেই প্রবল ভাবস্রোত সমাজের উপর দিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যায়।

ভারতবর্ষে, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে অর্থাৎ যাহাদের ইতিহাস আমি অবগত আছি, সেই সব দেশে বর্তমান সময়ে এইরূপ শত শত মতবাদের সংঘর্ষ চলিতেছে। ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদ এখন ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে, কেবল অদ্বৈতবাদই সর্বক্ষেত্রে প্রতাপবান। আমেরিকাতেও বহু মতবাদের মধ্যে প্রাধান্যলাভের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই অল্পবিস্তর অদ্বৈতভাবের প্রতিরূপ, আর যে ভাবপরম্পরা যত দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে, সেইগুলি অদ্বৈত বেদান্তের তত বেশী অনুরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আর আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, অন্য সবগুলিকে গ্রাস করিয়া ভবিষ্যতে একটি মতবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেই। কিন্তু সেটি কোন্‌টি? ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যে অংশটি যোগ্যতম তাহাই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। আর নিষ্কলুষ চরিত্রের মত অন্য কোন্ শক্তি মানুষকে যথার্থ যোগ্যতা-দানে সমর্থ? অনাগত ভবিষ্যতে অদ্বৈত বেদান্তই যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই জয়লাভ করিবে,

যাহার জীবন চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে; সে সম্প্রদায় কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে যে আসিবে, তাহা বিবেচ্য নহে।

আমার নিজ জীবনের একটু অভিজ্ঞতা জানাইতেছি। যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশ জন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক মাত্র ছিলাম। আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদিগকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছি, কেবল বাক্-সর্বস্ব না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পায়ে মাথা নত করে। তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ আজ দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসবে এক শত ব্যক্তিকে একত্র করিতে পারি নাই, আর গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল।

কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিম্বা বাক্‌চাতুরী-ইহাদের কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ-বারটি মাত্র সিংহবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহারা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্রহীন—তবে এই কয়েকজন ব্যক্তিই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইহাই নিগূঢ় রহস্য। যোগপ্রবর্তক পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'মানুষ যখন সমুদয় অলৌকিক যোগবিভূতির লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার ধর্মমেঘ নামক সমাধি লাভ হয়।'
৮১
সে অবস্থায়ই তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয়, তিনি ভগবৎস্বরূপে স্থিত হন, এবং অপরকে তদ্রূপ হইতে সাহায্য করেন। শুধু এই বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে চাই। জগতে বহু মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পুস্তকও লিখিত হইয়াছে; কিন্তু হায়, সামান্যমাত্রও যদি কেহ অনুষ্ঠান করিত!

সমাজ ও সঙ্ঘের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উহারা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিবে। যেখানে হিংসার কোন বিষয় নাই, সেখানে হিংসা থাকিবে কিরূপে? আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে চায়, এইরূপ অসংখ্য লোক মিলিবে। কিন্তু ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় না যে, সত্য আমাদেরই পক্ষে? আমি জীবনে যত বাধা পাইয়াছি, ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। এক টুকরা রুটির জন্য আমি গৃহ হইতে গৃহান্তরে বিতাড়িত হইয়াছি; আবার রাজা-মহারাজগণ কর্তৃকও আমি বহুভাবে পূজিত এবং বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বিষয়ী লোক এবং পুরোহিতকুল সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কি আসে যায়? ভগবান্ তাহাদের কল্যাণ করুন, তাহারাও আমার আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহারা সকলে আমাকে স্প্রিং বোর্ডেরই (spring board) মত সাহায্য করিয়াছে—ইহাদের প্রতিঘাতে আমার শক্তি উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বাক্‌সর্বস্ব ধর্মপ্রচারক দেখিয়া যে আমার ভয় পাইবার কিছুই নাই, তাহা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ কখনও কাহারও শত্রুতা করিতে পারেন না। 'বচনবাগীশ'রা বক্তৃতা করিতে থাকুক! তদপেক্ষা ভাল কিছু তাহারা জানে না। নাম, যশ ও কামিনী-কাঞ্চন লইয়া তাহারা বিভোর ও মত্ত থাকুক। আর আমরা যেন ধর্মোপলব্ধির, ব্রহ্মলাভের ও ব্রহ্ম হওয়ার জন্যই দৃঢ়ব্রত হই। আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত এবং জীবনের পর জীবন ব্যাপিয়া সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি। অন্যের কথায় আমরা যেন মোটেই কর্ণপাত না করি। সমগ্র জীবনের সাধনার ফলে যদি আমাদের মধ্যে একজনও জগতের কঠিন বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারে, তবেই আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। হরিঃ ওঁ।

আর একটি কথা। ভারতকে আমি সত্য-সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিম্বা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, সেটি—এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক।' সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই এ কথা সমভাবে সত্য। আমি বলিতে চাই, প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যই এ তত্ত্ব আরও শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে। কারণ এই চিন্তাসূত্রটির প্রণয়নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়াই প্রাচ্যের সমুদয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত।

আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব-স্পৃহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হই। আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব।

ভগবৎপদাশ্রিত
আপনার বিবেকানন্দ

২০৯*

[মিঃ লেগেটকে লিখিত]

Thousand Island Park, N.Y.
অগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

... মিঃ স্টার্ডির (যাঁর কথা সেদিন আপনাকে লিখেছি) কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম। এখানি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, সমস্ত কেমন আগে থেকে তৈরী হয়ে আসছে! এখানি ও মিঃ লেগেটের নিমন্ত্রণপত্র একসঙ্গে দেখলে, আপনার কি এটি দৈব আহ্বান বলে মনে হয় না? আমি ঐরূপ মনে করি। সুতরাং ঐ আহ্বান অনুসরণ করছি। অগষ্টের শেষাশেষি মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমি পারি যাব এবং সেখানে থেকে লণ্ডন। ... হেল-পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য চিকাগো যেতে হবে। সুতরাং গ্রীনএকার সম্মিলনীতে যোগ দিতে পারলাম না।

আমার গুরুভাইদের ও আমার কাজের জন্য আপনি যতটুকু সাহায্য করতে পারেন, কেবল সেইটুকু সাহায্যই আমি এখন চাই। আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্তব্য কতকটা করেছি। এখন জগতের জন্য—যার কাজ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য—যে দেশ আমাকে ভাব দিয়েছে, মনুষ্যজাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি, কিছু করব। যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পাচ্ছি। মুসলমানেরাও তাই বলেন। আল্লা দেবদূতগণকে (Angels) বলেছিলেন আদমকে প্রণাম করতে। ইবলিস্ করেনি, তাই সে শয়তান (Satan) হল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ—ইহাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। আর মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর—তারা যখন আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করতে পারে না। তথাকথিত উচ্চপ্রাণিগণ পরলোকগত অপর এক দেহধারী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়; ঐ দেহ সূক্ষ্ম হলেও বস্তুতঃ হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানবদেহই। তারা এই পৃথিবীতে অপর কোন লোকে বাস করে, একেবারে অদৃশ্যও নয়। তারা চিন্তা করে, আমাদের ন্যায় তাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সব কিছুই আছে—সুতরাং তারাও মানুষ। দেবগণ—এঞ্জেলগণও তাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয় এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করে তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে। ম্যাক্সমূলারের শেষ প্রবন্ধটি আপনার কেমন লাগল? ইতি

বিবেকানন্দ

২১০*

আমেরিকা
অগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌছবার পূর্বেই আমি পারিতে উপস্থিত হব। সুতরাং কলিকাতা ও খেতড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় চিঠি না লেখে। তবে আগামী শীতেই আবার নিউ ইয়র্কে ফিরছি। সুতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউ ইয়র্কে 19 W. 38th St. ঠিকানায় পাঠাবে। এ বছর আমি অনেক কাজ করেছি, আসছে বছর আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি। মিশনরীদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না। তারা চেঁচাবে, এ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দুই বৎসর মিশনরী ফণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে, আর সে-ফাঁকটা বেড়েই চলেছে। যাই হোক, আমি মিশনরীদের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর ওপর অনুরাগ থাকবে, আর সত্যের ওপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন হে বৎস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটি গেলেই বিপদ। তুমি বেশ বলেছ, আমার ভাবগুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বেশী পরিমাণে কার্যে পরিণত হতে চলেছে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারত আমার জন্য যা করেছে, আমি ভারতের জন্য তার চেয়ে বেশী করেছি। এক টুকরো রুটি ও তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গালাগাল—এই তো সেখানে পেয়েছি। আমি সত্যে বিশ্বাসী; আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্মী প্রেরণ করেন। আর তারা ভারতীয় শিষ্যদের মত নয়, তারা গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি 'কর্তব্যে' বিশ্বাসী নই, 'কর্তব্য' হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিশাপ, সন্ন্যাসীর জন্য নয়। 'কর্তব্য' একটা বাজে কথামাত্র। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোথায় যায় বা না যায়, আমি কি তা গ্রাহ্য করি? তোমরা আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য করে এসেছ—প্রভু তোমাদের তার পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা থেকে কখনও প্রশংসা চাইনি, আর এখনও ঐরূপ ফাঁকা জিনিষ খুঁজছি না। আমি ভগবানের সন্তান, আমার কাছে একটা সত্য আছে—জগৎকে শেখাবার জন্য। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আমাকে সহকর্মী সব প্রেরণ করবেন। তোমরা—হিন্দুরা কয়েক বছরের ভেতরই দেখবে, প্রভু পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড করেন! তোমরা সেই প্রাচীনকালের য়াহুদী জাতির মত—জাব পাত্রে শোয়া কুকুরের মত—নিজেরাও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্মভাব মোটেই নেই; রান্নাঘর হচ্ছে তোমাদের ঈশ্বর, শাস্ত্র—ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয়—রাশি রাশি সন্তান-উৎপাদনে। তোমরা কয়েকটি ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু কখনও কখনও আমার মনে হয়, তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বদা তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কি কখনও সহজে নিষ্পন্ন হয়? সময়, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন অনেক কথা বলতে পারতাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু তা আমি বলব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাক। প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

২১১*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

ওঁ তৎ সৎ

Hotel Continental
3 Rue Castiglione, Paris
২৬ অগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
গত পরশু এখানে এসে পৌঁছেছি। একজন আমেরিকান বন্ধুর অতিথি হয়ে এদেশে এসেছি; আগামী সপ্তাহে এখানে তাঁর বিবাহ হবে।

সে সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমাকে এখানে থাকতে হবে তারপরে লণ্ডন যাবার কোন বাধা থাকবে না ।

আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছি।

সদা সৎস্বরূপে আপনার
বিবেকানন্দ

২১২*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

C/o Miss MacLeod, Hollande
রু দ্য লা প্যায়্, পারি
৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

সুহৃদবর,
আপনার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাবশ্যক; কারণ ভাষায় তা ব্যক্ত হবার নয়।

মিস মূলারের এক প্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণ পেয়েছি। আর তাঁর বাসস্থানও আপনার বাড়ীর কাছে। সুতরাং প্রথমে দু-এক দিন তাঁর ওখানে উঠে তারপর আপনার বাড়ী গেলে বেশ হবে, মনে করছি।

আমার শরীর কয়েকদিন যাবৎ বিশেষ অসুস্থ থাকায় পত্র দিতে বিলম্ব হল। অচিরে মনে প্রাণে আপনার সহিত মিলিত হবার সুযোগের অপেক্ষায় আছি। প্রেম ও ঈশ্বরপ্রীতি সূত্রে আপনার সহিত চির আবদ্ধ—

বিবেকানন্দ

২১৩*

পারি
৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
এইমাত্র তোমার ও জি.জি-র পত্র আমেরিকা ঘুরে আমার কাছে পৌঁছল।

তোমরা যে মিশনরীদের বাজে কথাগুলোর ওপর এতটা গুরত্ব আরোপ কর, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কলিকাতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দুখাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বলো, তারা যেন আমায় একজন রাঁধুনী ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কানাকড়ি সাহায্য করবার মুরদ নেই, এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া —এতে আমার হাসিই পায়।

অপরদিকে যদি মিশনরীরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-রূপ প্রথম দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী। মিশনরী হিউমকে পরিষ্কাররূপে লিখে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি যেন তোমায় লেখেন—তিনি আমার কি কি অসদাচরণ দেখেছিলেন, অথবা তিনি যাদের কাছে শুনেছেন, তাদের নাম যেন তোমায় দেন এবং জানতে চাইবে

—তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কিনা। এইরূপ করলেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে, আর তাদের দুষ্টামি ধরা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্‌স্‌ ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চলব না। আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের ওপর আমার তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—এখন তোমরা নিজেদের সামলাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস না কি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে বকো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কলিকাতা ও মান্দ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চলতে হবে! তোমরা কি লজ্জিত হচ্ছ না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু তোয়াক্কা রাখি, না—তাদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্যন্ত এখনও আমায় বুঝতে পারলে না। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও; তা যদি না পার তো চুপ করে থাক। আমাকে দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করাবার চেষ্টা করো না। আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়। কারও সাহায্য চাই না। আমিই তো সারাজীবন অপরকে সাহায্য করে আসছি। আমাকে সাহায্য করেছে, এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাইনি। বাঙালীরা—তাদের দেশে যত মানুষ জন্মেছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে; আর যার জন্যে তারা কিছুই করেনি, বরং যে তাদের জন্য যথাসাধ্য করেছে, তারই ওপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!! তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।

কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। উপস্থিত সেখানে আমার ঠিকানা হবেঃ
C/o ই.টি.স্টার্ডি; হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড

সদা আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার করব, মনে করছি। সুতরাং কাগজের জন্য তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার ওপর নির্ভর কর, তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিষ আছে দেখবার।

বি

২১৪

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy
হাইভিউ, কেভার্শ্যাম,
রিডিং, ইংলণ্ড ১৮৯৫

প্রেমাস্পদেষু,
ইতঃপূর্বে পত্র পাইয়া থাকিবে। এক্ষণে ইংলণ্ডে আমার যাবতীয় পত্রাদি উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবে। মিঃ স্টার্ডি তারকদাদার পরিচিত। তিনি আমাকে এখানে আনাইয়াছেন এবং আমরা উভয়ে একত্রে ইংলণ্ডে হাঙ্গাম করিবার চেষ্টায় আছি। এবার আমি নভেম্বর মাসে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করিব, অতএব এখানে একজন উত্তম সংস্কৃত ও ইংরেজী, বিশেষতঃ ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্যক—শরৎ বা তুমি বা সারদা। তাহার মধ্যে তোমার শরীর যদি একদম আরোগ্য হইয়া থাকে তো বড়ই ভাল। তুমি আসিবে, নতুবা শরৎকে পাঠাইবে। কাজ এই যে, আমি যে-সকল চেলা-পত্র এখানে রাখিয়া যাইব, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ও বেদান্তাদি পড়ান এবং একটু-আধটু ইংরেজীতে তর্জমা করা, মধ্যে মধ্যে লেকচার-পত্র দেওয়া। 'কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।'—র আসিবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু গোড়া শক্ত করে না গাঁথিলে ফাঁস হইয়া যাইবে। এই পত্রে এক চেক পাঠাইলাম, তাহাতে কাপড়-চোপড় কিনিবে (অর্থাৎ যে আসিবে)। চেক মহেন্দ্রবাবু—মাষ্টার মহাশয়ের নামে পাঠাইলাম। গঙ্গাধরের টিবেটি চোগা মঠে আছে; ঐ ঢঙের এক চোগা গেরুয়া রঙের বানাইয়া লইবে। Collar (কলার)-টা যেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ... সকলের আগে একটা খুব গরম ওভারকোট; শীত বড়ই প্রবল। জাহাজের উপর ওভারকোট খুব গরম ...। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট পাঠাইতেছি; অর্থাৎ ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে বড় বিশেষ পার্থক্য নাই। ... যদি শশীর আসা স্থির হয়, তাহা হইলে পূর্ব হইতে নিরামিষ খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।

বোম্বে যাইয়া মেসার্স কিং কিং এণ্ড কোং, ফোর্ট, বোম্বে অফিসে যাইয়া বলিবে যে, 'আমি স্টার্ডি সাহেবের লোক'—তাহা

হইলে তাহারা তোমাকে এক টিকেট দিবে ইংলণ্ড পর্যন্ত। এখান হইতে এক চিঠি উক্ত কোম্পানীর উপর যাইতেছে। খেতড়ির রাজাকে এক চিঠি লিখিতেছি যে, তাঁহার বোম্বের এজেণ্ট যেন তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া book (বুক) করিয়া দেয়। যদি এই ১৫০ টাকায় কাপড়-চোপড় না হয়, রাখাল যেন তোমায় বাকী টাকা দেয়; আমি পরে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাছাড়া ৫০ টাকা হাত খরচের জন্য রাখিবে—রাখালকে দিতে বলিবে। তারপর আমি পাঠাইয়া দিব। চুনীবাবুর জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহার খবর আজও পাই নাই। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। মহেন্দ্রবাবুকে বলিবে, তিনি আমার কলিকাতার এজেণ্ট। তিনি যেন পত্রপাঠ মিঃ স্টার্ডিকে এক চিঠি লিখেন যে, যা কিছু কলিকাতা সম্বন্ধে লেখা পড়া business (বৈষয়িক কার্য) ইত্যাদি আমাদের করিতে হইবে, তাহা তিনি করিতে রাজী আছেন। অর্থাৎ মিঃ স্টার্ডি আমার ইংলণ্ডের সেক্রেটারী, মহেন্দ্র- বাবু কলিকাতার, আলাসিঙ্গা মান্দ্রাজের ইত্যাদি ইত্যাদি। মান্দ্রাজে এ খবর পাঠাইবে। সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কি কাজ হয়? 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' (উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মী লাভ হয়) ইত্যাদি। পেছু দেখিতে হইবে না—forward (এগিয়ে চল)। অনন্ত বীর্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য চাই, তবে মহাকার্য সাধন হইবে। দুনিয়ায় আগুন লাগাইয়ে দিতে হইবে।

আর যে দিন ষ্টীমার ঠিক হইবে, তৎক্ষণাৎ মিঃ স্টার্ডিকে এক পত্র লিখিবে যে, 'অমুক ষ্টীমারে আমি আসিতেছি।' নতুবা লণ্ডনে পৌঁছিয়া গোলমাল হইয়া না যাও। যে ষ্টীমার একদম লণ্ডন যায়, তাহাই লইবে; কারণ তাহাতে যদিও দু-চারি দিন অধিক লাগে, পরন্তু ভাড়া কম লাগে। এক্ষণে আমাদের অধিক পয়সা তো নাই। কালে দলে দলে চতুর্দিকে পাঠাইব। কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ

পুঃ—পত্রপাঠ খেতড়ির রাজাকে লিখিবে যে, তুমি বোম্বে যাইতেছ ইত্যাদি, এবং তাঁহার লোক যেন তোমায় জাহাজে চড়াইয়া দেয়।

বি

এই ঠিকানা একটা পকেট বুকে লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে—গোল না হয়।

পত্রাবলী ২১৫-২২৪

২১৫

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy
রিডিং, ইংলণ্ড
১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সঙ্কল্প বড়ই উত্তম। কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। Organization—এর (সঙ্ঘজীবনের) প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience (আজ্ঞাবহতা), যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম, তারপর ঘোড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না—plodding industry and perseverance (স্থির ধীর ভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই। Regular correspondence (নিয়মিত পত্রব্যবহার) অর্থাৎ কি কাজ করছ—কি ফল হল, প্রতিমাসে বা মাসে দুইবার রীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে। একজন উত্তম ইংরেজী ও সংস্কৃত-জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলণ্ডে) আবশ্যক। আমি এখান হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকা যাইব, আমার অবর্তমানে সে এখানে কার্য করিবে। শরৎ ও শশী এই দুইজন ছাড়া আমি তো আর কাকেও দেখছি না। শরৎকে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছি। রাজাজীকে
৮২
লিখেছি যে, তাঁর বোম্বের agent (ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) যেন শরৎকে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখতে ভুলে গেছি, তুমি যদি মনে করে পার—শরতের সঙ্গে এক বস্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে।
৮৩
পণ্ডিত নারায়ণ দাস, শ্রীশঙ্করলাল, ওঝাজী, ডাক্তার ও সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চোখের ওষুধ এখানে কি আছে? পেটেণ্ট ওষুধ সব জুয়াচুরি সর্বত্র। তাকে আমার আশীর্বাদ দেবে ও আর আর সব চেলাগুলোকে। যজ্ঞেশ্বরবাবু মীরাটে একটা কি সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কালীকে সেখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে মীরাটে একটা centre (কেন্দ্র) করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কালী মীরাট গিয়ে আমাকে যথাযথ রিপোর্ট করলে আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। আজমীরে একটা centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। … সাহারানপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence (পত্রব্যবহার) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা etc., work, work (কাজ কাজ)। এই রকম centre (কেন্দ্র) করতে থাক। কলিকাতায়—মান্দ্রাজে already (পূর্ব হইতেই) আছে, যদি মীরাটে ও আজমীরে পার তো বড়ই ভাল হয়। ঐপ্রকার ধীরে ধীরে জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) করতে থাক। এখানে আমার সকল চিঠিপত্র C/o মিঃ ই. টি. স্টার্ডি, হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড। আমেরিকায় C/o মিস ফিলিপ্‌স্ 19 W. 38th St., নিউ ইয়র্ক। ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে ফেলতে হবে। Obedience (আজ্ঞাবহতা) প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কাজ হয়। … ঐ-রকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc. কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

২১৬*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy, রিডিং,
ইংলণ্ড
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

মিঃ স্টার্ডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্য অন্ততঃ দুই-চার জন সেরা দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই, অতএব আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে—যাহাতে কতকগুলি 'খেয়ালী' লোকের পাল্লায় না পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমেরিকাতেও আমার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। মিঃ স্টার্ডি কিছুদিন ভারতবর্ষে আমাদের সন্ন্যাসীদের সহিত তাহাদের রীতিনীতি মানিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উদ্যমশীল লোক। এ পর্যন্ত উত্তম।

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম—এই তিনটি গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এইরূপ ছয়জন লোক এখানে পাই, আমার কাজ চলিতে থাকিবে। এইরূপ দুই-চারজন লোক পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইতি—

বিবেকানন্দ

২১৭*

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলণ্ড
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

তোমাকে শীঘ্র চিঠি না দেওয়ার জন্য সহস্র ক্ষমা চাইছি। লণ্ডনে নির্বিঘ্নে পৌঁছেছি। বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি, তাঁর বাড়ীতে বেশ আছি। চমৎকার পরিবার। স্ত্রীটি তাঁর বাস্তবিকই দেবীতুল্য, আর তিনি নিজে যথার্থ ভারতপ্রেমিক। সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাঁদেরই মত খেয়ে-দেয়ে তিনি ভারতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি। এর মধ্যেই ভারত থেকে ফেরা অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিককে দেখলাম; তাঁরা আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেন। 'শ্যামবর্ণ ব্যক্তিমাত্রই নিগ্রো'—আমেরিকানদের এই অদ্ভুত ধারণা এখানে মোটেই দেখা যায় না। রাস্তায় কেউ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েও থাকে না। ভারতের বাহিরে আর কোথাও এরূপ সুস্থির বোধ করিনি। ইংরেজরা আমাদের বোঝে, আমরাও তাদের বুঝি। এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা বেশ উচ্চ স্তরের; সেজন্য এবং বহুদিনের শিক্ষার ফলে এতটা পার্থক্য।

টার্টল-ডাভেরা ফিরেছেন কি? তাঁদের ও তাঁদের স্বজনের উপর ভগবানের কৃপা সদা বর্ষিত হোক। 'বেবী'রা কেমন আছে? আর এলবার্টা ও হলিস্টার? তাদের আমার অজস্র ভালবাসা জানাবে এবং তুমি নিজে জানবে।

বন্ধুটি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। সুতরাং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যদের ভাষ্যপাঠে আমরা সর্বদা নিযুক্ত আছি। এখানে এখন কেবল ধর্ম ও দর্শন চলেছে, জো জো! অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ক্লাস নেবার চেষ্টায় আছি।

চির প্রীতি-স্নেহ-শুভেচ্ছা
সহ বিবেকানন্দ

২১৮*

রিডিং, ইংলণ্ড
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

মিঃ স্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করিনি। ভারতবর্ষ থেকে আমার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে আনবার জন্য তিনি আমায় বলেছেন। আমি আমেরিকায় চলে গেলে সেই সন্ন্যাসী তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, আমি ভারতবর্ষে লিখেছি একজনের জন্য। এ পর্যন্ত সব ভালভাবেই চলছে। এখন পরবর্তী ঢেউয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। 'এড়িয়ে যেও না, খুঁজেও বেড়িও না; ভগবান্ যা পাঠান, তার জন্য অপেক্ষা কর'—এই আমার মূলমন্ত্র। আমি চিঠি খুব কম লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। ইতি—

বিবেকানন্দ

২১৯*

রিডিং, ইংলণ্ড
৪ অক্টোবর, ১৮৯৫

স্নেহের মার্গারেট,
৮৪

... পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। ... আমার ভালবাসা জানবে। ইতি—

বিবেকানন্দ

২২০

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy
রিডিং
৪ অক্টোবর, ১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় এক মাস যাবৎ এস্থানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীষ্মকালে পুনঃ ইংলণ্ডে আসিব। এক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্বশক্তিমান্। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

ইতঃপূর্বে শরৎকে আসিবার টাকা পাঠাইয়াছি ও পত্র লিখিয়াছি। শরৎ বা শশী দুইজনের একজন যাহাতে আইসে তাহা করিবে। শশীর রোগ যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইবে। চর্মরোগ শীতপ্রধান দেশে বড় প্রবল হইতে পারে না—উহা এই দারুণ শীতে একদম সারিয়া যাইতে পারে। নতুবা শরৎকে। ... Sturdy (স্টার্ডি) সাহেবের টাকা, সে যে-প্রকার লোক চায়, সেই প্রকার আনাইতে হইবে। উক্ত মিঃ স্টার্ডি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন। থিওসফির হাঙ্গামায় পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বড়ই আপসোস।

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাহার ইংরেজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ। '—' শীঘ্র ইংরেজী শিখিতে পারিবেন এস্থানে আসিলে, সত্য বটে, কিন্তু এদেশে শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি না; যাহারা শিখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পদে বিপদে আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহাদের আমি বিশ্বাস করি। ... অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই।

... দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না হয় বাজেই গেল; মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বল বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বললুম দাদা, রাগ করো না। আমি তোমাদের গোলাম, যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—এক চুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। ... সমাজ-ফমাজ যত দেখছ দেশ-বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—'ময়ৈবৈত নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' আজ বা কাল ও-সব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর কৃপায় 'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে।' নিমকহারাম হয়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ সুকাজ—যজ্জুহোসি যত্তপস্যাসি যদশ্নাসি &c. (ইত্যাদি) সব তাঁর পায়ে সঁপে দাও। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিনরাত দেখলে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি!!! তোর বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বৈ তো নয়, ... অমন ঠাকুরের দয়া ভোল! ... কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কিনা, তার কোনই প্রমাণ নাই; আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!! আর আমি কি বলিব? দেশে দেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে, আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে!!! তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা পেয়েছিস। আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁড়া হতে হচ্ছে। আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখতে পাই না। সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি, কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—-এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন? তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একটা টাকা, একটা মেয়ে মানুষের কাছে বিশ্বাস করিনে। যার তাঁকে বিশ্বাস নাই আর মা-ঠাকুরাণীতে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙলা বললুম, মনে রেখো।

... হরমোহন দুরবস্থা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থান-ছাড়া হতে হবে বলছেন। লেকচার চেয়েছেন—লেকচার-ফেকচার এখন কিছু নাই, তবে কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাঁকে পাঠিয়ে দেব, ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে, আমার টাকা মারা গেছে—সেজন্যই পাঠাই নাই। দ্বিতীয়তঃ কোন্ ঠিকানায় পাঠাব, তা তো জানি না। মান্দ্রাজীরা দেখছি, কাগজ বার করতে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই। যে সময়ে যে কাজ প্রতিশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়। টাকাকড়ির কথা পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। ... মাষ্টার মশায় যদি রাজী হন, তাহলে তাঁকে কলকেতার এজেন্ট হতে বলবে, কারণ তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এই সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমানুষি হুড়দঙ্গুলের কাজ নয়। একটা Centre (কেন্দ্র)—ঠিকানা তাঁকে করতে বলবে, যে ঠিকানা—ঘড়ি-ঘড়ি বদলাবে না

ও যে ঠিকানায় আমি কলকেতার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেব। ...

কিমধিকমিতি
নরেন্দ্র

২২১*

রিডিং, ইংলণ্ড
অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,
তোমার পত্র পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। মনে হয়েছিল, বুঝি বা আমায় ভুলে গেলে। লণ্ডনে ও লণ্ডনের কাছেপিঠে কয়েকটি বক্তৃতা দেব; ২২ তারিখে সাড়ে আটটার সময় প্রিন্সেস হলে দেব সাধারণের জন্য একটি।

এখানে চলে এসে একটা ক্লাস গড়ে ফেল না। বলতে গেলে এখানে এখনও কিছুই করে উঠতে পারিনি। কাজ ঠিকমত চালু করতে বেশ সময় লাগে। আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে সামান্য যা হয়েছে তাতেই আমার দুই বৎসর লেগে গেল। সকলকে ভালবাসা জানাচ্ছি।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

২২২*

রিডিং
৬ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,,
... আমি মিঃ স্টার্ডির সহিত 'ভক্তি' সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি, প্রচুর টীকা সমেত উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই মাসে আমাকে লণ্ডনে দুইটি এবং মেডেন-হেডে একটি বক্তৃতা দিতে হইবে। ইহাতে কতকগুলি ক্লাস খুলিবার ও পারিবারিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবার সুবিধা হইবে। কতকগুলি হইচই না করিয়া চুপচাপ কাজ করিতে চাই। ... আমার শুভেচ্ছাদি জানিবেন।

আপনার
বিবেকানন্দ

২২৩*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy, Esq.
হাই ভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং ইংলণ্ড
অক্টোবর, ১৮৯৫

মা,
ছেলেকে ভোলেননি তো? আপনি এখন কোথায়? মাসীমা ও শিশুরা? আপনার মন্দিরের ঋষিতুল্য পূজারীর খবর কি? 'জো জো' এত শীঘ্র 'নির্বাণ' লাভ করছে না, কিন্তু তার গভীর নীরবতা দেখে মনে হয় গভীর 'সমাধি'।

আপনি কি ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আমি ইংলণ্ডকে খুব উপভোগ করছি। আমার বন্ধুর সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করে কাটাচ্ছি—খাবার ও ধূমপান করার জন্য অল্প একটু সময় রেখে। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ছাড়া আমাদের আর কিছু আলোচ্য নেই।

মনে হয় লম্বা ট্রাউজার পরে হলিস্টার অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে; এবং এলবার্টা জার্মান শিখছে।

এখানে ইংরেজরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। কতিপয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতিরেকে কেউ কালা আদমীদের ঘৃণা করে না। এমন কি রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য করে কেউ কোন ব্যঙ্গরব করে না। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, তাহলে কি আমার মুখের রঙ সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আরশিতে সত্য ধরা পড়ে; তবু এখানে সবাই খুব বন্ধুভাবাপন্ন।

আবার যে-সকল ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ষকে ভালবাসে, তারা হিন্দুদের চেয়েও বেশী 'হিন্দু'। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে, এখানে আমি নিখুঁত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রচুর তরিতরকারী পাচ্ছি। যখন একজন ইংরেজ একটি জিনিষ ধরে, সে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ করে। গতকাল জনৈক অধ্যাপক মিঃ ফ্রেজারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে—তিনি এখানে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী। তিনি তাঁর অর্ধেক জীবন ভারতে কাটিয়েছেন; প্রাচীন চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে তিনি এতখানি পুষ্ট হয়েছেন যে, ভারতের বাইরের কোন কিছুর জন্য তিনি মোটেই পরোয়া করেন না। শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অনেক চিন্তাশীল ইংরেজ নরনারী মনে করে যে, হিন্দুদের জাতিবিভাগই সামাজিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। আপনি হয়তো কল্পনা করতে পারবেন, সেই ধারণা মাথায় নিয়ে তারা সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের কতখানি ঘৃণা করে!! আবার এখানে পুরুষেরা—অতি উচ্চশিক্ষিতেরা—ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীর আগ্রহশীল, সে তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। আমেরিকার চেয়ে এখানে মেয়েদের জীবনের পরিধিও সংকীর্ণতর। এ পর্যন্ত আমার সব কিছুই ভালয় ভালয় হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী ঘটনাবলী জানাব। গৃহস্বামী, রাণীমাতা, জো জো এবং শিশুদের ভালবাসা।

আপনাদের চিরদিনের
বিবেকানন্দ

২২৪*

রিডিং, ইংলণ্ড
২০ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

এই পত্রে লেগেটদিগকে লণ্ডনে স্বাগত জানাচ্ছি। এক হিসাবে এদেশ আমার মাতৃভূমি, সুতরাং পূর্বেই তোমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। পরে আগামী মঙ্গলবার ২২ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় প্রিন্সেস হলে আমি তোমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করব।

মঙ্গলবার পর্যন্ত আমি এত ব্যস্ত থাকব যে, এর মধ্যে কোনক্রমেই তোমার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারব না। তারপর যে-কোন দিন দেখা করব। চাই কি মঙ্গলবার দিনও গিয়ে পড়তে পারি।

চিরদিনের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২২৫-২৩৪

২২৫*

C/o E. T. Sturdy,রিডিং, ইংলণ্ড
২৪ অক্টোবর,১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিনের' দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চল। কাগজের প্রচ্ছদপট একটু ভাল করবার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার করবার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও। মিঃ স্টার্ডি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখবেন। আমি তোমাকে কয়েকখানা কাগজও পাঠাচ্ছি—তার মধ্যে দুখানা যথাক্রমে ধর্মমহাসভা ও মিশনরীগণ সম্বন্ধে। কাগজখানা ইংলিশ চার্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র। আমার অনুমান—সম্পাদকপত্নী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন, কারণ তাঁর বৈঠকখানায় আমি শীঘ্র বক্তৃতা দেব। সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস—তিনি ইংলিশ চার্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত।

ইতোমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে, আর 'স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবে, লোকে তা কেমন ভালভাবে নিয়েছে। 'স্ট্যাণ্ডার্ড' রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার লণ্ডনে গিয়ে ৮০ ওকলি ষ্ট্রীট, (Chelsea, London, S.W.) ঠিকানায় একমাস থাকব। তারপর আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে আসব। এ পর্যন্ত দেখছ, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ স্টাডি—আমার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা, যিনি শীঘ্রই এখানে আসছেন, তাঁর সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন।

সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাও—এই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌঁছেছে। ঐ টাকার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় করবে, কারণ এই পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছবার পূর্বেই আমি আমেরিকায় ফিরব। তোমাদের অবশ্য আমার 19W. 38th Street, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা—এই ঠিকানাটা মনে আছে। তোমরা অবশ্য কেভার্শ্যাম ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ স্টার্ডিকে পত্র লিখবে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার করবে। মান্দ্রাজের সঙ্গে পত্রব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কলিকাতায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকায় মিস মেরী ফিলিপ্‌স্‌, নিউ ইয়র্ক—এইরূপ চলতে থাকুক। এখন কাগজটার দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তার চেষ্টা কর। মিঃ স্টার্ডি সময়ে সময়ে লিখবেন—আমিও লিখব। এখন আমি আর টাকা পাঠাতে পারব না—ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাকে এখানে সব টাকা খরচ করতে হয়েছে, এক পয়সাও লাভ হয়নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সাময়িক পত্র প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ করবে। কাজ করে চল—ধৈর্য, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাও—এই ক-টি বিষয় মনে রেখো। লণ্ডনে মেননের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজখানাকে দাঁড় করবার জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন পর্যন্ত তুমি সরল ও পবিত্র থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কখনও বিফল হবে না; মা তোমায় ত্যাগ করবেন না, তোমার ওপর তাঁর সর্বপ্রকার শুভাশিস বর্ষিত হবে। ইতি

তোমার
বিবেকানন্দ

২২৬

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy, রিডিং,
ইংলণ্ড
১৮৯৫

প্রিয় শশী,

তোমার চিঠি, চুনীবাবুর চিঠি, সাণ্ডেলের চিঠি পূর্বে পাইয়াছি। রাখালের চিঠি আজ পাইলাম। রাখাল gravel-এ (পাথরিতে) ভুগিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, বদহজমের কারণ হইয়া থাকিবে। … মঠের business (কাজকর্ম) মাষ্টার মহাশয় যদি রাজী হন, তাঁকে দিয়ে করাবে, অথবা হুটকোকে দিয়ে। সাণ্ডেলকে তার সংসার দেখতে বলবে, মঠের কাজে-টাজে বৃথা সময় সে ব্যয় না করে। হুটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে; এখন মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে। … আমি আধা জলে-স্থলে লোক চাই না।

হরমোহনকে বলবে, লেকচার-ফেকচার এখন আমার কিছুই নাই। সুরেশ দত্তের এক 'নারদসূত্র' তোমরা পাঠিয়েছিলে। কেন, দুনিয়ায় কি আর নারদসংহিতা ছাপা ছিল না? … হরমোহন কি-একটা Lord (লর্ড) রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে? Lordটা

আবার কি—English Lord না Duke?

রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। ‘লোক না পোক’। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitism-এর (কপটতার) দিক্ মাড়াবে না। Orthodox (আনুষ্ঠানিক) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু কোন্ কালে? I do not pose as one৮৫ বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে—অহ হ!!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়! যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাঙলাদেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে। ... মঠ করতে হয় পশ্চিমে রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে even (এমন কি) বোম্বায়ে। বাঙালী! ... লণ্ডনে কতকগুলো কাফ্রির মত—আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না—এই আদর! ঝি-চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাঁকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দেখ্।

শরৎ ভাষ্য-মাষ্যগুলো Dictionary (অভিধান) দেখে একরকম এদের পড়িয়ে দিতে পারবে তো, গীতা উপনিষদ্?—না শুধুই বৈরাগ্যি? শুধু বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে? নিধে পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই! শরৎ বোধ হয় এতদিনে রওনা হয়েছে। একখানা ‘পঞ্চদশী’, একখানা ‘গীতা’ (যতগুলো পার ভাষ্য-সহিত), একখানা কাশীর ছাপা নারদ ও শাণ্ডিল্য-সূত্র (সুরেশ দত্তর ছাপা এক ছত্রে আঠারটা ভুল, মানে হয় না), পঞ্চদশীর যদি তর্জমা (ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শাঙ্কর ভাষ্যের কালীবর বেদান্তবাগীশের তর্জমা ও পাণিনিসূত্রের বা কাশিকাবৃত্তি বা ফণিভাষ্যের যদি কোন বাঙলা বা ইংরেজী (এলাহাবাদের শ্রীশ বসুর) তর্জমা থাকে তো পাঠাবে।

—গুলোকে টাকাকড়ির কাজে একদম বিশ্বাস করবে না; অত কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে না। নিজেরা কড়িপাতির খরচ-আদায় সমস্ত করবে। মধো—যা বলি করে যা, ওস্তাদি চালাস না আর আমার ওপর। এখন তোদের বাঙালীদের বল দিকি, আমাকে একখানা 'বাচস্পত্য' অভিধান পাঠিয়ে দিতে—দেখি বচনবাগীশের দল! ইংরেজের দেশে ধর্মকর্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে। এরা হয় গোঁড়া, না হয় নাস্তিক। গোঁড়াগুলো আবার অমনি ‘নমো নমো’ ধর্ম করে, ‘Patriotism (স্বদেশপ্রীতি) আমাদের ধর্ম,’ —এই মাত্র।

বই আমেরিকায় পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19W. 38th Street, New York U.S. America—ঐ হল আমার আমেরিকার address (ঠিকানা)। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব বইপত্র ঐখানে পাঠাবে। শরৎ যদি পত্রপাঠ ছেড়ে থাকে তাহলেই আমার সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business
৮৬
—ছেলেখেলা নয়। Sturdy (স্টার্ডি) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখবে ইত্যাদি। আমি এবার ইংলণ্ডে খালি একটু খবর নিতে এসেছি; আসছে গরমিকালে কিছু বেশী রকম হুজুগ করবার চেষ্টা করা যাবে। তারপর next winter India (পরবর্তী শীতে ভারতে)।

তোমার উপর আমার এখনও বিশ্বাস আছে। খেতড়ির রাজা যা কিছু খবর চান, তুমি নিজে লিখবে, অন্য কাউকেই জানতে পর্যন্ত দেবে না। যে সকল লোক আমাদের সহিত interested (আগ্রহান্বিত) তাদের regularly (নিয়মিতভাবে) চিঠিপত্র লিখবে। Interest (আগ্রহ) জাগিয়ে রাখবে। বাঙলাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। তোমরা তো কোন কিছু এ পর্যন্ত করে উঠতে পারলে না দেখছি; খালি বচন ঝাড়ছ! তোমারই যেন শরীর খারাপ, বাকীগুলো করছে কি? খালি আমরা লর্ড রামকৃষ্ণের শিষ্য! বলি, ও লর্ড রামকৃষ্ণ ব্যাপারটা কি হে? হরমোহনটা তো আধপাগলা বৈ নয়—ও একটা কি লর্ড রামকৃষ্ণ লেখে বল তো? লর্ড, ডিউক আবার কি হে? খেপাগুলোর জ্বালায় অস্থির! এখন এই পর্যন্ত। পরের চিঠিতে হালচাল লিখব। Sturdy (স্টার্ডি) সাহেবটি বড়ই ভাল, ভারি গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু বোঝে। বহুৎ পরিশ্রম করলে তবে একটু আধটু কাজ হয় এ-সব দেশে—বড়ই শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে। তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। ইংরেজরা লেকচার-ফেকচার শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। যদি শুনতে আসে তো তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে। তার ওপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তার ওপর ভগবান্-টগবান্ বললে ওরা পালিয়ে যায়, বলে—ঐ রে পাদ্রী বুঝি! তুমি বসে বসে একটা কাজ কর—ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সামান্য পুরাণ তন্ত্র পর্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ নরক আত্মা মন বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয় মুক্তি সংসার (পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে কে কি বলে, একত্র করতে থাক। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material (উপাদান) যোগাড় হচ্ছে আসল কাজ। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

নরেন্দ্র

২২৭*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

৮০ ওকলি ষ্ট্রীট, লণ্ডন
৩১ অক্টোবর, ১৮৯৫, বৈকাল ৫টা

প্রিয় বন্ধু,
এইমাত্র দুইজন যুবক ভদ্রলোক, মিঃ সিলভারলক এবং তাঁহার বন্ধু চলে গেলেন। মিস মূলার তো আজ বিকালে এসেছিলেন এবং এঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে চলে যান।

এঁদের একজন ইঞ্জিনীয়র, আর একজন শস্যের ব্যবসা করেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ এঁরা পড়েছেন এবং উভয়ে শাস্ত্রের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাচীন চিন্তাধারার অপূর্ব মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। দুজনেই চমৎকার লোক—বেশ বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। একজন গীর্জার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন, আর একজন করবেন কিনা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন।

এঁদের সঙ্গে আলাপ হবার পর দুটি জিনিষ আমার মনে জাগছে। প্রথমতঃ ঐ বইখানি আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এর ভেতর দিয়ে আমরা এমন একদল লোকের সংস্পর্শে আসতে পারব, যাঁরা দার্শনিক ভিত্তিতে ধর্মকে গ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতা একদম পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ এঁরা দুজনেই আমার ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা জানতে চান। এতে আমার চোখ খুলেছে। জগতের সাধারণ লোক চায়—কোন প্রকার অবলম্বন। বস্তুতঃ সাধারণভাবে বলতে গেলে অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন দর্শন (Philosophy) রূপপরিগ্রহ করে, তখনই তাকে 'ধর্ম' বলা হয়। তাই ধর্মমন্দির ও কিছু ক্রিয়াকলাপ থাকা নিতান্তই আবশ্যক অর্থাৎ আমাদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কিছু ক্রিয়াকলাপ ঠিক করে ফেলতে হবে।

যদি আপনি শনিবার সকালে বা তার পূর্বে আসতে পারেন, তবে আমরা 'এসিয়াটিক সোসাইটিতে' যাব, কিম্বা আপনিই আমার জন্য 'হেমাদ্রিকোষ' নামক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করতে পারেন; ঐ পুস্তকে আমরা যা চাই, তা পাব। উপনিষদগুলিও নিয়ে আসবেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুকালের মধ্যে আমরা একটা কিছু অপূর্ব সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করে ধরতে পারব; অসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদ মানবজীবনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আমরা যদি আমাদের ক্লাসগুলি শেষ হবার আগেই বইটি শেষ করে ফেলতে পারি এবং দু-একটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সেটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে পারি, তবে বইখানি চালু হয়ে যাবে। এরা চায় সঙ্ঘবদ্ধ হতে, আর চায় ক্রিয়াকলাপ। আর ঠিক এটিই একটি কারণ, যার জন্য '—'রা পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপর কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

'নৈতিক সমিতি'র প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তারা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর একখানা পত্র লিখেছে এবং তাদের একখানা ফরমও পাঠিয়েছে। তাদের ইচ্ছা যে, আমি একখানা বই সঙ্গে নিয়ে যাই এবং তা থেকে দশ মিনিট পাঠ করি। আপনি দয়া করে গীতার অনুবাদ এবং বৌদ্ধ জাতকের অনুবাদটি নিয়ে আসবেন কি? আপনার সঙ্গে দেখা না করে আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

২২৮*

৮০ ওকলি ষ্ট্রীট, লণ্ডন
৩১ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,
শুক্রবার সানন্দে তোমার ওখানে মধ্যাহ্নভোজন এবং এলবেমার্লে মিঃ কয়েটের সহিত আলাপ করব।

মিসেস ও মিস নেটার নামে দু-জন আমেরিকান মহিলা—মাতা ও কন্যা—গত রাত্রের ক্লাসে যোগদান করেন। তাঁরা যথার্থ অনুরক্ত বলে মনে হয়। মিস চেমিয়ার্সের ওখানে যে ক্লাস হত তা শেষ হল। আগামী শনিবার রাত্রি থেকে আমার বাসাতেই হবে। আমার ক্লাসের জন্য দু-একখানা চলনসই বড় ঘর পাব, আশা করি। মন্‌কিওর কন্‌ওয়ের নৈতিক সমিতির (Moncure Conway's Ethical Society) নিমন্ত্রণে ১০ তারিখে তাদের ওখানে বক্তৃতা দেব। আগামী মঙ্গলবার ব্যাল্‌বোয়া সমিতিতে (Balboa Society) বক্তৃতা। প্রভু সাহায্য করবেন। শনিবার তোমার সঙ্গে বেরুতে পারব কিনা ঠিক নেই। তবুও শহরের বাইরে তোমার খুবই ভাল লাগবে, তা ছাড়া মিঃ ও মিসেস স্টার্ডি অতি চমৎকার লোক।

ভালবাসা, আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—আমার জন্য কিছু নিরামিষ তরকারির ব্যবস্থা রেখ। ভাতের তেমন পক্ষপাতী নই, রুটি হলেও বেশ চলবে। আজকাল যা নিরামিষাশী হয়েছি, বলবার নয়।

২২৯

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy
কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড
১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার ও সান্যালের পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার চিঠি লেখার দুইটি দোষ—বিশেষ তোমার। প্রথম—যে-সকল কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রায় তার কোনটিরই জবাব থাকে না; দ্বিতীয়—জবাব লেখায় অত্যন্ত বিলম্ব। তোমরা তো ঘরে বসে আছ ভায়া! আমাকে এ বিদেশে পেটের চেষ্টা করতে হয়, আবার দিনরাত খাটতে হয়; তার উপর লাটিমের মত ঘুরে বেড়ান। ... আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, আমায় একা কাজ করতে হবে।

শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তোমরা খালি শশীর আসা সম্ভব কিনা তাই বিচার করছ। ... এ সকল হল মহাবিলাসী বাবুর দেশ; নখের কোণে একটু ময়লা থাকলে তাকে স্পর্শ করে না। শরৎ আসতে না চায় সারদাকে পাঠাবে। অথবা মান্দ্রাজে লিখে কোন লোক পাঠাবে। প্রায় দু-মাস পূর্বে আমি এ-বিষয়ে লিখেছি। তারকদা শেষ পত্রে লিখেন যে, পর মেলে (ডাকে) এ-বিষয়ে সবিশেষ জানাবে। কিন্তু এখনও দেখছি তার কিছুই ঠিকানা হয় নাই। আশা ছিল—আমি থাকতে থাকতেই কেউ আসবে; কিন্তু এখনও তো কিছুই ঠিকানা নাই, এবং দু-বছরে এক-একটা সংবাদ আসে। Business is business—অর্থাৎ কাজকর্ম তৎপর করতে হয়, গড়িমসির কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব। অতএব যে আসবে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন আশা নাই।

গিরিশবাবু আমার কাজে সহায়তা করতে পারবেন—কেমন করে? আমি চাই সংস্কৃত-জানা লোক, অর্থাৎ বই-টই তর্জমা করতে সহায়তা করে স্টার্ডিকে, আমার অনুপস্থিতিতে স্টার্ডির সঙ্গে বইপত্র তর্জমা করে—এই মাত্র। অধিক আমি আশা করি না। ... কেবল এই দরকার, আমার অনুপস্থিতিকালে একটু আধটু সংস্কৃত পড়ায় বা তর্জমা করে—এই বস্, আবার কি করবে? গিরিশবাবু এদেশে বেড়িয়ে যান না, বেশ কথা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে যেতে ৩০০০ টাকা মাত্র পড়বে। যত লোক এ-সব দেশে আসে, ততই ভাল। তবে ঐ টুপিপরা হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে। ভূত কালো—আবার সাহেব! ভদ্রলোকের মত দেশী কাপড়-চোপড় পর বাবা, তা না হয়ে ঐ জানোয়ারী রূপ!

আর কেন, হরি বল! এখানে সমস্তই ব্যয়, আয় এক পয়সাও নাই। স্টার্ডি আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে। এখানে লেকচারে আমাদের দেশের মত উল্টে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়। টাকাকড়ি সেই যা প্রথম বৎসর আমেরিকায় করি (তারপর হাতে এক পয়সাও নিই না), তা প্রায় ফুরিয়ে গেল; আমেরিকায় পঁহুছিবার মত মাত্র আছে। আমার এই ঘুরে ঘুরে লেকচার করে শরীর অত্যন্ত nervous (স্নায়ুপ্রধান) হয়ে পড়েছে—প্রায় ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা কি বল? কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এ-পর্যন্ত সহায়তা করেছে, না একজন সাহায্য করতে এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত কর ততই চায়। তারপর যদি আর না পার তো তুমি চোর!

... যা লিখতে হয় স্টার্ডিকে লিখবে—লোক পাঠাবার মতামত—যখন আসছে যুগে তোমরা সিদ্ধান্তয় উপস্থিত হবে। ... শশীকে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there (ওখানে সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)। তার ব্যামো-ফ্যামো সব প্রভুর কৃপায় ভাল হয়ে যাবে। তার সব ভার আমার। ... ইতি

বিবেকানন্দ

২৩০*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

৮০ ওকলি ষ্ট্রীট, চেলসী
১ নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

ব্যালেরেন (Balleren) সোসাইটির টিকিটের সংখ্যা ৩৫। বিষয় হল—ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ, সভাপতির স্থান শূন্য।

আপনি সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেননি, তাই পাঠালাম না।

আপনার চিঠিগুলি ঠিকভাবেই পেয়েছি।

বিবেকানন্দ

২৩১*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

২ নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
আমার মনে হয়, আপনিই ঠিক; আমরা আমাদের নিজেদের পথে কাজ করে যাব আর যা ঘটে ঘটুক।

আপনাকে বক্তৃতাটির সারাংশ পাঠাচ্ছি।

রবিবার আসব, যদি বিশেষ কিছু বাধা না ঘটে।

প্রীতির সঙ্গে আপনার
বিবেকানন্দ

২৩২

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

লণ্ডন
১৩ নভেম্বর, ১৮৯৫

কল্যাণবরেষু—
তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ প্রীত হইলাম। যেরূপ কার্য করিতেছ, তাহা অতি উত্তম। রা—অতি উদার ও মুক্তহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান্—এর অর্থসংগ্রহ উত্তম সঙ্কল্প বটে, কিন্তু ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম-কাঞ্চনের হাত এড়ান ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকা-কড়ির সম্বন্ধ মাত্রেই গোলমালের সম্ভাবনা। অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা—ছাড়া ভারতবর্ষের কোন গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহে মিত্র বলিয়া জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোন গৃহস্থকে মঠ বা কোন উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে ...। বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পূরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভান করে। অতএব যদি কখনও কোন ধনী বিশ্বাসী ভক্ত ও হৃদয়বান গৃহস্থ মঠাদি নির্মাণের জন্য উদ্যোগ করেন, অথবা সংগৃহীত অর্থ কোন ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয়—উত্তম কল্প, নতুবা হস্তক্ষেপ করিবে না—(জড়িত হইও না), উপরন্তু অন্যকে এ কার্যে বিরত করিবে। তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসরক্রমে মহানীতিপরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা—কে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না।

পাঁচজন মিলে কোন কাজ করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এই জন্যই আমাদের দুর্দশা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience first. (যিনি হুকুম তামিল করতে জানেন, তিনিই হুকুম করতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।) এই সকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে Obedience-এর (আজ্ঞাবহতার) ভাব সেই প্রকার বলবান্। আমরা সকলেই হম্‌বড়া, তাতে কখনও কাজ হয় না। মহা উদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।

তুমি যে প্রকার কার্য করছ করে যাও—তবে পড়াশুনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—ইতি। য—বাবু একখানি পত্রিকা হিন্দী ভাষায়—প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো স্পীচের অনুবাদ আলোয়ারের রা— পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবে।

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি, রাজপুতানায় একটি center (কেন্দ্র) করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। জয়পুর বা আজমীর প্রভৃতি কোন central (মধ্যবর্তী) স্থানে হওয়া উচিত—তদনন্তর আলোয়াড়, খেতড়ি প্রভৃতি শহরে branch (শাখা) স্থাপন করিবে। সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্যক নাই। পণ্ডিত না—জীকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে, ঐ লোকটি খুব উদ্যমী—কালে বিশেষ কার্যক্ষম হইবে। মাঃ— সাহেব ও —জীকেও আমার যথাযোগ্য প্রেমসম্ভাষণ দিও। ঐ 'ধর্মমণ্ডলী' বলে কি একটা আজমীরে হয়েছে—সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে।—বাবু লিখেন যে, তাঁহারা আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্যন্ত পাই নাই। ... মঠ মড়ি কলকেতায় কি করবে? কাশীতে আড্ডা করিতে হইবে। সে-সকল অনেক মতলব আছে, পরন্তু

অর্থসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে, খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে, ইংলণ্ডে হুজ্জুক ধীরে ধীরে মাচছে। এদেশে সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজবাচ্ছা কোন কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চটপটে, কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে না। আলোয়াড়ে আমার কতকগুলো চেলাপত্র আছে, সেগুলোকে নিয়ে তদারক করবে, ... মহাশক্তি তোমাতে আসবে, ভয় নাই—Be pure, have faith be obedient, (পবিত্র হও, বিশ্বাসী হও, আজ্ঞাবহ হও)।

ছেলের বে-র বিপক্ষে শিক্ষা দিবে! বালকের বে কোন শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বে-র বিপক্ষে এখন কিছু বলো না। ছেলের বে বন্ধ করতে পারলেই মেয়ের বে আপনা হতে বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েকে তো আর মেয়ে বে করবে না। লাহোর আর্য-সমাজের সেক্রেটারীকে লিখবে যে, অ-বলে যে একজন সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে থাকতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? সে লোকটির বিশেষ সন্ধান করিবে। ... ভয় কি?

বিবেকানন্দ

২৩৩*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

লণ্ডন
১৮ নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে আমার গোটাকতক প্রস্তাব আছে। আমি ইতোমধ্যেই খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় ওর অনেকগুলি গ্রাহক হয়েছে। ইংলণ্ডেও তোমায় কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় করে দেব। ইংলণ্ডে আমার কাজ বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে; আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। ইংরেজরা খবরের কাগজে বেশী বকে না; কিন্তু নীরবে কাজ করে। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। দলে দলে লোক আসছে, কিন্তু এত লোকের জন্য তো আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও অন্যান্য সকলেই মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি যে, তারা যেন ভারতীয় আকাশের তলে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত একটি বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে—তারা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দই করে। আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, তাই এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাবছে, যদি এত শীঘ্র চলে যাই, তাহলে এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোন লোক বা জিনিষের উপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন।

'ব্রহ্মবাদিনে'র প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুন দরকার। দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে—একটু যাতে স্বচ্ছ, সরস ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুশী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাক; আর এখন যেরূপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। আরও কিছু বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি তোমার জন্য 'ভক্তি' সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লিখব; কিন্তু এটি মনে রেখো, বাঙালীদের ভাষায়—'আমার মরবার পর্যন্ত সময় নেই'। দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ। নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য করতে হচ্ছে—সব একলাই; আর তার দরুন শত্রুমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি! যাই হোক, তোমরা তো শিশুমাত্র; আমাকে সব সহ্য করতে হবে।

কলিকাতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি, তাকে লণ্ডনে কাজের জন্য রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আর একজন আবশ্যক। তোমরা কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পার না? অবশ্য তার খরচপত্র সব আমি দেব। তার ইংরেজী ও সংস্কৃত দুই-ই ভাল জানা চাই—ইংরেজীটি একটু বেশী। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়। অধিকন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হতে হবে। তোমার কি চলনসই সংস্কৃত জানা আছে? জি.জি. কিছু কিছু জানে। আমি আমার নিজের লোক চাই। গুরুভক্তিই সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আসতে পারবে না। জি.জি. কি আসতে পারে? আমি দুজন লোককে এই দুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তারপর ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর দেবার জন্য নূতন নূতন লোক পাঠাব। বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিন রক্তবমি করে মরে যেত। মেনন পূর্বের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। আমাকে C/o Miss Mary Philips, 19W. 38th Street, New York—ঠিকানায় পত্র লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে (আমেরিকা) যাচ্ছি এব আগামী গ্রীষ্মে (এখানে) আবার ফিরব। ইতোমধ্যে কাকে পাঠাবে ভাবতে থাক। আমি দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই। কিডি, ডাক্তার, সেক্রেটারী সাহেব, বালাজী এবং বাকী সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। সদা আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—‘ব্রহ্মবাদিনে’ বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত। একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।

২৩৪*

লণ্ডন
২১ নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

‘ব্রিটানিয়া’ জাহাজে আগামী ২৭ বুধবার (আমেরিকা) রওনা হচ্ছি। এখানে এ পর্যন্ত আমার যতটা কাজ হয়েছে, তা বেশ সন্তোষজনক; আমার বিশ্বাস আগামী গ্রীষ্মে চমৎকার কাজ করতে পারব। ... ভালবাসাদি জানবে। ইতি

তোমাদের প্রীতিবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২৩৫-২৪৪

২৩৫*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

R. M. S. 'Britannic'
৮৭

আশীর্বাদভাজন ও প্রিয়,

এ পর্যন্ত ভ্রমণ খুবই মনোরম হয়েছে। জাহাজের খাজাঞ্চী আমার প্রতি খুব সদয় এবং একখানা কেবিন আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। একমাত্র অসুবিধা হল খাদ্য—মাংস, মাংস, মাংস। আজ তারা আমাকে কিছু তরকারি দেবে বলেছে।

আমরা এখন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছি। কুয়াশা এত ঘন যে, জাহাজ এগোতে পারছে না। তাই এই সুযোগে কয়েকটি চিঠি লিখছি।

এ এক অদ্ভুত কুয়াশা, প্রায় অভেদ্য, যদিও সূর্য উজ্জ্বলভাবে ও সহাস্য কিরণ দিচ্ছে। আমার হয়ে শিশুকে চুম্বন দেবেন এবং আপনার ও মিসেস স্টার্ডির জন্য ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

বিবেকানন্দ

পুনঃ—দয়া করে মিসেস মূলারকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আমি এভিনিউ রোডে রাত্রিকালীন কামিজটা (Night Shirt) ফেলে এসেছি। অতএব ট্রাঙ্কটি না আসা পর্যন্ত আমাকে বিনা কামিজেই চালাতে হবে।

২৩৬*

R. M. S. 'Britannic'
বৃহস্পতিবার প্রভাত
৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় এলবার্টা,

কাল সন্ধ্যায় তোমার সুন্দর চিঠিখানা পেয়েছি। আমাকে যে মনে রেখেছ, এটা তোমার সহৃদয়তা। আমি শীঘ্রই ধর্মনিষ্ঠ দম্পতিকে দেখতে যাচ্ছি। মিঃ লেগেট একজন ঋষি, এ-কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এবং তোমার মা হলেন একজন আজন্ম সম্রাজ্ঞী, তাঁরও ভেতরে ঋষির হৃদয়।

তুমি আলপস্ পর্বত খুব উপভোগ করছ জেনে আমিও আনন্দিত। আলপস্ নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। এরকম জায়গাতেই মানুষের আত্মা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে। কোন জাতি আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে দীন হলেও বাহ্য স্বাধীনতা কামনা করে। লণ্ডনে একজন সুইস যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে আমার ক্লাসে আসত। লণ্ডনে আমি খুবই কৃতকার্য হয়েছিলাম, এবং যদিও কোলাহলপূর্ণ নগরটা আমার ভাল লাগত না, আমি মানুষদের পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এলবার্টা, তোমাদের দেশে বৈদান্তিক চিন্তাধারা প্রথমে অজ্ঞ 'বাতিকগ্রস্ত' ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাজের পথ তৈরী করে নিতে হয়। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় আমার ক্লাসগুলিতে উচ্চশ্রেণীর নরনারী—কখনও কখনও যোগ দিয়েছেন, তাও মুষ্টিমেয়। আবার আমেরিকায় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ধনী হবার ফলে তাঁদের সমস্ত ঐশ্বর্য সম্ভোগ করিতে ও ইওরোপীয়দের অনুকরণ (বোকার মত?) করতে করতে কাটে। অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে বৈদান্তিক মতবাদ দেশের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহু লোক আছেন, যাঁরা বিশেষ চিন্তাশীল। তুমি শুনে অবাক হবে, এখানে আমি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেয়েছিলাম, এবং বিশ্বাস করি যে, আমার কাজ আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী সফল হবে। এর সঙ্গে ইংরেজ চরিত্রের প্রচণ্ড একগুঁয়েমি যোগ দাও এবং নিজেই বিচার কর। এই থেকে তুমি দেখতে পাবে যে, ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমার মত অনেকখানি পাল্টে গিয়েছে, এবং আমি সানন্দে তা স্বীকার করি। আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত যে, আমরা জার্মানীতে আরও ভাল করব। পরবর্তী গ্রীষ্মে ইংলণ্ডে ফিরে আসছি। ইতোমধ্যে আমার কাজ খুবই উপযুক্ত লোকের হাতে আছে। জো জো আমেরিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি আমার সদয় মহৎ পবিত্র বন্ধু আছেন এবং তোমাদের পরিবারের কাছে আমার ঋণ অশেষ। হলিস্টার ও তোমাকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

ষ্টীমারটি কুয়াশার জন্য নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের খাজাঞ্চী খুব সদয় হয়ে আমার একার জন্য একটা গোটা কেবিন দিয়েছে। এরা মনে করে, প্রত্যেক হিন্দুই একজন রাজা এবং খুব নম্র—অবশ্য এই মোহ ভেঙে যাবে যখন তারা জানবে যে, 'রাজা' কপর্দকশূন্য!! ভালবাসা ও আশীর্বাদ জেনো।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

২৩৭*

228, West 39th St. N.Y.
৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,
আপনার পত্রে আমায় যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। দশ দিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌঁছেছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষুব্ধ ছিল এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম আমি 'সমুদ্রপীড়ায়' (sea-sickness) অতিশয় কষ্ট পেয়েছি। আপনি একটি পৌত্র লাভ করেছেন জেনে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; শিশুটির মঙ্গল হোক। দয়া করে মিসেস এ্যাডামসন ও মিস থার্সবিকে আমার ঐকান্তিক ভালবাসা জানাবেন।

ইংলণ্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু রেখে এসেছি। আগামী গ্রীষ্মে ফিরে যাব, এই আশায় তাঁরা আমার অনুপস্থিতিকালে কাজ করবেন। এখানে আমি কি প্রণালীতে কাজ করব, তা এখনও স্থির করিনি। ইতোমধ্যে একবার ডেট্রয়েট ও চিকাগো ঘুরে আসবার ইচ্ছা আছে—তারপর নিউ ইয়র্কে ফিরব। সাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি একেবারে ছেড়ে দেব স্থির করেছি; কারণ আমি দেখছি, আমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে—প্রকাশ্য বক্তৃতায় কিম্বা ঘরোয়া ক্লাসে একদম টাকাকড়ির সংস্রব না রাখা। পরিণামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং খারাপ দৃষ্টান্ত দেখান হবে।

বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী গোষ্ঠীর আমি পক্ষপাতী। তারা নিজেদের কাজ নিজেদের মত করুক, তারা যা খুশী করুক। নিজের সম্বন্ধে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়াতে চাই না। আশা করি, আপনার শরীর মন ভাল আছে। ইতি

সদা প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

২৩৮*

228, West 39th St., New York
৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,
এ-যাবৎ যত সমুদ্রযাত্রা করেছি, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দশদিনব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পরে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছি। একাদিক্রমে দিনকয়েক বড়ই পীড়িত ছিলাম।

ইওরোপের তকতকে ঝকঝকে শহরগুলির পরে নিউ ইয়র্কটাকে বড়ই নোংরা ও হতচ্ছাড়া মনে হয়। আগামী সোমবার কাজ আরম্ভ করব। এলবার্টা যাঁদের 'স্বর্গীয় দম্পতি' বলে, তাঁদের কাছে তোমার বাণ্ডিলগুলি ঠিক ঠিক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বরাবরই তাঁরা বড় সহৃদয়। মিঃ ও মিসেস স্যালমন্ ও অপরাপর বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ঘটনাক্রমে মিসেস গার্নসির ওখানে মিসেস পিকের সঙ্গে দেখা হয়; কিন্তু এ-যাবৎ মিসেস রথিনবার্গারের কোন খবর নেই। 'স্বর্গের পাখী'দের সঙ্গে এই বড়দিনের সময় রিজলিতে যাচ্ছি; তুমিও ওখানে থাকলে কতই না আনন্দ হত।

লেডী ইসাবেলের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে বোধ হয়। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং নিজেও সাগর-প্রমাণ ভালবাসা জানবে। চিঠি ছোট হল বলে কিছু মনে করো না; আগামী বার থেকে বড় বড় সব লিখব।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের বিবেকানন্দ

২৩৯*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

228, West 39th St. নিউ ইয়র্ক
৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
দশ দিনের অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রার পর আমি নিরাপদে নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছেছি। আমার বন্ধুরা

ইতোমধ্যেই উপরের ঠিকানায় কয়েকটি ঘর ঠিক করে রেখেছেন। সেখানেই আমি এখন বাস করছি এবং শীঘ্র ক্লাস নেবার ইচ্ছা আছে। ইতোমধ্যে —রা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং আমাকে আঘাত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

মিসেস লেগেট ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তারা বরাবরের মতই সদয় ও অনুরক্ত।

যে সন্ন্যাসীটি আসছেন, তাঁর সম্বন্ধে ভারত থেকে কোন সংবাদ পেয়েছেন কি? আমি এখানকার কাজের পূর্ণ বিবরণ পরে লিখব।

দয়া করে মিস মূলারকে, মিসেস স্টার্ডিকে এবং অন্য বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানাবেন এবং শিশুকে আমার হয়ে চুম্বন দেবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

২৪০*

228, West 39th St. নিউ ইয়র্ক
১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—,
সেক্রেটারীর পত্র পেয়েছি, তাঁর অনুরোধ মত Harvard Philosophical Club (হার্ভার্ড)-এ আনন্দের সহিত বক্তৃতা দেব। তবে অসুবিধা এই যে, আমি এখন এক মনে লিখতে আরম্ভ করেছি; কারণ আমি এমন কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলতে চাই, যেগুলি আমি চলে গেলে আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ হবে। তার পূর্বে আমাকে চারখানি ছোট ছোট বই তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

এই মাসে চারটি রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুআরীর প্রথম সপ্তাহে ব্রুকলিনে যে বক্তৃতাগুলি দিতে হবে, ডাক্তার জেন্‌স্ প্রভৃতি তার বন্দোবস্ত করছেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

তোমাদের শুভার্থী
বিবেকানন্দ

২৪১*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

228, West 39th St., নিউ ইয়র্ক
১৬ (?) ডিসেম্বর, ১৮৯৫

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,
তোমার সব ক-খানি চিঠি একই ডাকে আজ এসেছে, মিস মূলারও একটি লিখেছেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় পড়েছেন যে, স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলণ্ডে আসছেন। যদি তাই হয়, যাদের আমি পেতে পারি, তাদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

এখানে আমার সপ্তাহে ছ-টি করে ক্লাস হচ্ছে; তা ছাড়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসও একটি আছে। শ্রোতার সংখ্যা ৭০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি রবিবারে আমি সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিই। গত মাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০০ জন বসতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ৯০০ জন আসত—৩০০ জন দাঁড়িয়ে থাকত, আর ৩০০ জন জায়গা না পেয়ে ফিরে যেত। সুতরাং এ সপ্তাহে একটা বৃহত্তর হল নিয়েছি, যাতে ১২০০ জন বসতে পারবে।

এই বক্তৃতাগুলিতে যোগ দেবার জন্য কোন অর্থাদি চাওয়া হয় না; কিন্তু সভায় যে চাঁদা ওঠে, তাতে বাড়ী-ভাড়াটা পুষিয়ে যায়। এ সপ্তাহে খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে এবং এ বৎসর আমি নিউ ইয়র্ককে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছি। যদি এই গ্রীষ্মে এখানে থেকে একটি গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান করতে পারতাম, তবে এখানকার কাজটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে চলতে পারত। কিন্তু মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার সঙ্কল্প করেছি বলে এটা অসম্পূর্ণ রেখেই যেতে হবে। অবশ্য কৃষ্ণানন্দ যদি ইংলণ্ডে আসেন এবং তাঁকে তোমার সুদক্ষ ও সুযোগ্য বলে মনে হয় এবং তুমি যদি বুঝতে পার যে, এই গ্রীষ্মে আমার অনুপস্থিতিতে কাজটার ক্ষতি হবে না, তবে গ্রীষ্মটা বরং এখানেই থেকে যাব।

অধিকন্তু ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে। কিছু বিশ্রাম আবশ্যক। এইসব পাশ্চাত্য রীতিতে আমরা অনভ্যস্ত—বিশেষতঃ ঘড়ি-ধরে চলাতে। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাখানি এখানে সুন্দর চলছে। আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ

লিখতে শুরু করেছি; তা ছাড়া মাসিক কাজের একটা বিবরণও তাদের পাঠাচ্ছি। মিস মূলার আমেরিকায় আসতে চান; আসবেন কিনা জানি না। এখানে জনকয়েক বন্ধু আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক কপি তোমায় পাঠিয়েছি। আগামী ডাকে পরবর্তী দুটি বক্তৃতার কয়েক কপি পাঠাব, তোমার যদি পছন্দ হয় তবে অনেকগুলি পাঠিয়ে দেব। ইংলণ্ডে কয়েক শত কপি বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পার কি?—তাতে ওরা পরবর্তী বক্তৃতাগুলি ছাপতে উৎসাহিত হবে।

আগামী মাসে ডেট্রয়েট যাব, তারপর বোষ্টনে ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর ইংলণ্ডে যাব কিছুদিন বিশ্রাম করে—যদি না তুমি মনে কর যে, আমাকে বাদ দিয়েও কৃষ্ণানন্দের সাহায্যে কাজ চলে যাবে। ইতি

সতত স্নেহাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

২৪২*

228, West 39th St. নিউ ইয়র্ক
২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব থেকেই পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে 'কর্ম' সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সঙ্কেতলিপিকর নিযুক্ত করেছে এবং আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেগুলি টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চল। স্টার্ডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বের করবে মনে করছে, 'ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য তাই বেশী কিছু করতে পারিনি। কাগজটার বাইরে একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বল দেখি? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর; কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক—আমি এটা দেখতে দৃঢ়সঙ্কল্প। ধৈর্য ধরে থাক এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা-কড়ির লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না—ও-সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ করব, জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠান হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস, সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে, ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী ডাকে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখবে।

বৈদিক সূক্তগুলির অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো; প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের কথায় এতটুকু মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না। নীরস ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধর্ম বা দর্শন বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদের 'আনীদবাতম্' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে—'তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন।' প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং 'অবাতম্' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ—অবিচলিতভাবে অর্থাৎ অস্পন্দভাবে। কল্পারম্ভের পূর্বে প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তি যে অবস্থায় থাকে, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (ভাষ্যকারগণ দ্রষ্টব্য)। আমাদের ঋষিদের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা কর, তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতানুসারে নয়। তারা কি জানে?

'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে; কিন্তু ক্লাসে যে-সব বলা হয়েছে, সেগুলি অমনি এলোপাতাড়ি—সুতরাং সেগুলি একটু দেখে-শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলির ওপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'ভক্তিযোগ'টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাপিও। ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বইটি খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো, থিওসফিষ্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার এবং ধৈর্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমরা আরও খুব বড় বড় কাজ করতে পারব! হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়; মনে রেখো, ইতিহাসের এই একমাত্র সাক্ষ্য যে, গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি জি.জি.-র চিঠি পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি। বিশ্বাসই মানুষকে সিংহতুল্য বীর্যবান্ করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখনও কখনও দিনে দু-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। এইভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে পথ করে নিচ্ছি—কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম প্রকৃতির লোক হলে এতেই মরে যেত। স্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মিঃ কৃষ্ণমেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখবে; কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লেখেনি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি; এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, সে দেশে ফিরছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক। সত্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও, আর নিজেদের ভেতর বিবাদ করো না। ঈর্ষাই আমাদের জাতির ধ্বংসের কারণ।

ডাক চলে যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি চিঠিখানা শেষ করতে হচ্ছে। তোমাকে ও আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

বিবেকানন্দ

২৪৩*

[স্বামী সারদানন্দকে লিখিত]

228, W. 39th St. নিউ ইয়র্ক
২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় শরৎ,

তোমার পত্রপাঠে আমি অত্যন্ত দুঃখিতই হয়েছি। দেখছি, তুমি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছ। আমি তোমাদের সকলকে—তোমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে জানি। তুমি কোন কাজে অপারগ হলে সেই কাজের জন্য তোমায় ডাকতুম না, তোমাকে শুধু সংস্কৃতের প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখাতে বলতুম এবং অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে অনুবাদ ও অধ্যাপনার কাজে স্টার্ডির সহায়তা করতে বলতুম। তোমাকে ঐ কাজের জন্য গড়ে নিতুম। বস্তুতঃ যে-কেহ ঐ কাজ চালাতে পারত—একান্ত প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতের শুধু একটু চলনসই জ্ঞানের। যাক, যা হয় সব ভালর জন্যই। এটা যদি ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক জায়গার জন্য ঠিক লোক যথাসময়ে এসে যাবে। তোমাদের কারও নিজেকে উত্যক্ত মনে করার প্রয়োজন নাই। হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড—এই ঠিকানায় স্টার্ডির নিকট টাকা পাঠিয়ে দিও।

‘সা—’র বিষয়ে বক্তব্য এইঃ টাকা কে নিচ্ছে বা না নিচ্ছে, আমি তা গ্রাহ্য করি না, কিন্তু বাল্যবিবাহ আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। এজন্য ভয়ানক ভুগেছি, আর এই মহাপাপে আমাদের জাতকে ভুগতে হচ্ছে। অতএব এরূপ পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করি, তবে নিজেই নিজের কাছে ঘৃণ্য হব। আমি তোমাকে এ বিষয়ে স্পষ্টই লিখেছিলাম; … বাল্যবিবাহরূপ এই আসুরিক প্রথার উপর আমাকে যথাশক্তি দৃঢ়ভাবে পদাঘাত করতে হবে, সেজন্য তোমার কোন দোষ হবে না। তোমার ভয় হয় তো তুমি দূর হতে নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাও। আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে—এটা অস্বীকার করলেই হল; আর আমিও তা দাবী করার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত নই। আমি দুঃখিত—অতি দুঃখিত যে ছোট ছোট মেয়েদের বর যোগাড়ের ব্যাপারে আমি মোটেই নিজেকে জড়াতে পারব না; ভগবান্ আমার সহায় হোন! আমি এতে কোনদিন ছিলাম না এবং কোনদিন থাকবও না। ‘ম—’বাবুর কথা ভাবো দেখি! এর চেয়ে বেশী কাপুরুষ বা পশুপ্রকৃতির লোক কখনও দেখেছ কি? মোদ্দা কথা এই—আমার সাহায্যের জন্য এরূপ লোক চাই, যারা সাহসী, নির্ভীক ও বিপদে অপরাঙ্মুখ। আমি খোকাদের ও ভীরুদের চাই না। প্রত্যুত আমি একাই কাজ করব। একটা ব্রত আমায় উদ্‌যাপন করতে হবে। আমি একাই তা সম্পন্ন করব। কে আসে বা কে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। ‘সা—’ ইতোমধ্যেই সংসারে ডুবেছে, আর তোমাতেও দেখছি তার ছোঁয়াচ লাগছে! সাবধান! এখনও সময় আছে। তোমায় এইটুকু মাত্র উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করেছিলাম। অবশ্য এখন তোমরাই মস্ত লোক—আমার কথা তোমাদের কাছে মোটেই বিকোবে না। কিন্তু আমি আশা করি—এমন সময় আসবে, যখন তোমরা আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাবে, জানতে পারবে এবং সম্প্রতি যেরূপ ভাবছ তা থেকে অন্যরূপ ভাববে।

আমি যোগেনের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমার মনে হয় না যে, কলিকাতা তার পক্ষে অনুকূল। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে হজমের অপূর্ব উপকার হয়।

এবার আসি। আর তোমাদের বিরক্ত করব না; তোমাদের সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক! আমি অতি আনন্দিত যে, কখনও তোমাদের কাজে লেগেছি—অবশ্য তোমরাও যদি তাই মনে কর। অন্ততঃ গুরুমহারাজ আমার উপর যে কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এইভাবে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি; ঐ কাজ সুসম্পন্ন হোক আর নাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি জেনেই খুশী আছি। সুতরাং তোমাদের নিকট বিদায়! তোমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে; আর আমার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব, তোমরা তার চেয়েও উঁচু; সুতরাং তোমরা নিজেদের পথে চল। ‘সা—’কে বলবে যে, আমি তার উপর মোটেই রাগ করিনি—তবে আমি দুঃখিত, খুব দুঃখিত হয়েছি। এটা টাকার জন্য নয়—টাকাতে আর কি যায় আসে! কিন্তু সে একটা নীতি লঙ্ঘন করেছে এবং আমার উপর ধাপ্পাবাজি করেছে বলেই আমি ব্যথিত হয়েছি। তার কাছে বিদায় নিচ্ছি, আর তোমাদেরও সকলের কাছে। আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল। অপরেরা তাদের পালা অনুযায়ী আসুক—তারা আমায় প্রস্তুত দেখতে পাবে। তুমি আমার জন্য মোটেই ব্যস্ত হয়ো না। আমি কোন দেশের কোন মানুষের তোয়াক্কা রাখি না। সুতরাং বিদায়। ঠাকুর তোমাদিগকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন! ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

২৪৪*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
ডিসেম্বর, ১৮৯৫

এখানকার কাজ চমৎকার চলিতেছে। এখানে আসার পর হইতেই আমি দৈনিক দুইটি ক্লাসের জন্য অবিরাম খাটিতেছি।

আগামীকাল হইতে এক সপ্তাহের অবকাশ লইয়া মিঃ লেগেটের সহিত শহরের বাহিরে যাইতেছি। আপনাদের দেশের জনৈকা প্রসিদ্ধা গায়িকা মাদাম স্টার্লিংকে আপনি জানেন কি? তিনি আমার কাজে বিশেষ আগ্রহান্বিতা।

আমি আমার কাজের বৈষয়িক দিকটা সম্পূর্ণভাবে একটি কমিটির হাতে দিয়া ঐ-সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়াছি। বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিবার ক্ষমতা আমার নাই—ঐ-জাতীয় কাজ আমাকে যেন শতধা ভাঙিয়া ফেলে।

নারদসূত্রের কি হইল? আমার বিশ্বাস ঐ বইখানি এখানে প্রচুর বিক্রয় হইবে। আমি এখন 'যোগসূত্র' ধরিয়াছি এবং এক একটি সূত্র লইয়া উহার সহিত সকল ভাষ্যকারের মত আলোচনা করিতেছি। এই সমস্তই লিখিয়া রাখিতেছি এবং এই লেখার কাজ শেষ হইলে উহাই ইংরেজীতে পতঞ্জলির পূর্ণাঙ্গ সঠিক অনুবাদ হইবে। অবশ্য গ্রন্থখানি অনেকটা বড় হইয়া যাইবে।

আমার বোধ হয় ট্রুব্‌নারের দোকানে 'কূর্মপুরাণের' একটি সংস্করণ আছে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পুনঃ পুনঃ ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি গ্রন্থখানি নিজে কখনও দেখি নাই। আপনি কি একবার একটু সময় করিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন যে, ঐ গ্রন্থে যোগ সম্বন্ধে গোটা কয়েক পরিচ্ছেদ আছে কিনা? যদি থাকে তবে দয়া করিয়া আমায় একখানি বই পাঠাইয়া দিবেন কি? 'হঠযোগপ্রদীপিকা', 'শিবসংহিতা' এবং যোগের উপর অন্য কোন গ্রন্থ থাকিলে তাহাও একখানি করিয়া চাই। অবশ্য মূল গ্রন্থগুলিই আবশ্যক। পুস্তকগুলি আসিলেই আমি আপনাকে মূল্য পাঠাইয়া দিব। জন ডেভিসের সম্পাদিত ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সংখ্যাকারিকা'ও একখানি পাঠাইবেন।

এইমাত্র ভারতীয় চিঠিগুলির সহিত আপনার চিঠিও পাইলাম। আসিবার জন্য যে প্রস্তুত, সে অসুস্থ। অন্যেরা বলে যে, তাহারা মুহূর্তের আহ্বানে আসিতে পারে না। এই পর্যন্ত সবই দুরদৃষ্ট মনে হয়। তাহারা না আসিতে পারায় আমি দুঃখিত। কি আর করিব? ভারতে সবই মন্থরগতি।

'বদ্ধ আত্মায় বা জীবে তাঁহার পূর্ণত্ব অব্যক্ত বা সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত; আর যখনই সেই পূর্ণত্বের বিকাশ সাধিত হয়, তখনই জীব মুক্ত হয়'—ইহাই রামানুজের মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনটাই প্রকৃত অবস্থা নহে, ঐরূপ প্রতীত হয় মাত্র। উভয় প্রণালীই মায়া—পরিদৃশ্যমান অবস্থা মাত্র।

প্রথমতঃ আত্মা স্বভাবতঃ জ্ঞাতা নহেন। 'সচ্চিদানন্দ' সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, 'নেতি নেতি' সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে। শোপেনহাওয়ার তাঁহার 'ইচ্ছাবাদ' বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাসনা, তৃষ্ণা বা তঞ্‌হা (পালি) প্রভৃতি শব্দেও ঐ ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি যে, বাসনাই সর্ববিধ অভিব্যক্তির কারণ এবং ইহাই কার্যরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যাহাই 'হেতু' বা 'কারণ', তাহাই সেই (সগুণ) ব্রহ্ম এবং মায়া—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এমন কি 'জ্ঞান'ও একটি যৌগিক পদার্থ বলিয়া অদ্বৈতবস্তু হইতে একটু স্বতন্ত্র। তবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সর্বপ্রকার বাসনা হইতেই উহা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়ের নিকটতম বস্তু। সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রথমে জ্ঞান এবং তারপর ইচ্ছার সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন।

উদ্ভিদমাত্রই 'অচেতন' অথবা বড়জোর 'চৈতন্য-বিবর্জিত ক্রিয়াশক্তি মাত্র' বলিয়া যদি আপত্তি উত্থাপিত হয়, তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই অচেতন উদ্ভিদশক্তিও সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিশক্তি, যাহাকে সাংখ্যকার 'মহৎ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—সেই এক চেতন ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

বস্তু জগতের সব কিছুই সেই 'এষণা' বা 'সঙ্কল্প'রূপ আদি বস্তু হইতে উদ্ভূত—বৌদ্ধদিগের এই মতবাদ অসম্পূর্ণ; কারণ প্রথমতঃ 'ইচ্ছা' একটি যৌগিক পদার্থ এবং দ্বিতীয়ঃ জ্ঞান বা চেতনারূপ যে প্রাথমিক যৌগিক পদার্থ, উহা ইচ্ছারও পূর্বে বিরাজ করে। জ্ঞানই ক্রিয়াতে পরিণত হয়। প্রথমে ক্রিয়া, তারপর প্রতিক্রিয়া। মন প্রথমে অনুভব করে এবং তৎপর প্রতিক্রিয়ারূপে উহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়। মনেই সঙ্কল্পের স্থিতি, সুতরাং সঙ্কল্পকে মূল বস্তু বলা ভুল।

ডয়সন্ ডারুইন-মতাবলম্বিগণের হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। বস্তুতঃ ক্রমবিকাশবাদকে উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 'ব্যক্ত' এবং 'অব্যক্ত' ভাব যে পরস্পরকে নিত্য অনুবর্তন করিয়া থাকে—এ তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানই প্রমাণ করিতে পারে। কাজেই 'বাসনা' বা 'সঙ্কল্পের' যে অভিব্যক্তি, তাহার পূর্বাবস্থায় 'মহৎ' বা 'বিশ্বচেতনা' গুপ্ত অথবা সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে। জ্ঞান ভিন্ন সঙ্কল্প অসম্ভব। কারণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান না থাকে, তবে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে কিরূপে?

বিশ্ব-চেতনা বা মহৎ (Universal Consciousness)

| | |

অবচেতন

(Sub-conscious)	(Conscious)	(Superconscious)
|	|	|
চৈতন্য-বিবর্জিত সঙ্কল্প বা ক্রিয়া (Unconsious Will)	যথার্থ সজ্ঞান সঙ্কল্প (Conscious Will Proper)	অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সঙ্কল্প (Superconscious Will)

এ তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে যতটা দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, জ্ঞানকে 'চেতন' ও 'অবচেতন' এই দুই অবস্থায় বিভক্ত করিলে ঐ দুর্বোধ্যতা অন্তর্হিত হয়। এবং তাহা না হইবার বা হেতু কি? যদি 'সঙ্কল্প' বস্তুটিকেই আমরা ঐরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, তবে উহার জনক বস্তুটিকেই বা বিশ্লেষণ করা যাইবে না কেন?

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২৪৫-২৫৪

২৪৫*

[মিস ফার্মারকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
২৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনী,
এই জগৎ—যেখানে কিছুই নষ্ট হয় না, যেখানে আমরা জীবনেই মৃত্যুর মধ্যে বাস করি, সেখানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, জনাকীর্ণ নগরীর পথে বা আদিম যুগের নিবিড় নিভৃত অরণ্যে, যা-কিছু চিন্তা করা হয়েছে, তা-ই থেকে যায়। তারা ক্রমাগত রূপপরিগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, এবং যতদিন না প্রকাশ পাচ্ছে, ততদিন অভিব্যক্ত হবার জন্য চেষ্টা করবেই এবং তাদের যতই চাপবার চেষ্টা করা হোক না কেন, তারা কিছুতেই নষ্ট হবে না। কিছুরই বিনাশ নাই—যে-সকল চিন্তা অতীতে অনিষ্টসাধন করেছিল, তারাও রূপপরিগ্রহের চেষ্টা করছে, তারাও পুনঃ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ সৎ চিন্তায় রূপায়িত হবার চেষ্টা করছে।

সুতরাং বর্তমান কালেও এমন কতকগুলি ভাবরাশি বিদ্যমান, যেগুলি আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট। এই অভিনব ভাবরাশি আমাদের বলছে যে, আমাদের অন্তরে যে দ্বৈতবাদের কল্পনা আছে, কোন বস্তু স্বরূপতঃ ভাল বা মন্দ এবংবিধ যে কল্পনা আছে ও তাদের দাবানর জন্য যে ততোধিক উৎকট বৃথা আশা রয়েছে—এ সমস্তকেই পরিহার করতে হবে। ঐ ভাবরাশি আমাদের শেখাচ্ছে, জগতে উন্নতির রহস্য প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নহে, পরন্তু উচ্চতর দিকে তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। ঐ ভাবরাশি শেখাচ্ছে, এই জগৎ ভাল ও মন্দ দিয়ে প্রস্তুত নয়; প্রত্যুত এর উপাদান হচ্ছে ভাল, তার চেয়ে ভাল এবং তার চেয়ে আরও ভাল। সকলে গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঐ ভাব শান্ত হয় না। ঐ ভাব শিক্ষা দেয় যে, কোন অবস্থাতেই একেবারে হাল ছেড়ে দেবার দরকার নেই; সুতরাং যে-কোন মনোবৃত্তি, নীতি বা ধর্মকে ঐ ভাব যে-অবস্থায় পায়, সে-অবস্থাতেই সাদরে গ্রহণ করে, এবং সেগুলির উপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করে বলে, ‘এ পর্যন্ত ভালই করেছ, এখন আরও ভাল করার সময় এসেছে।’ প্রাচীন- কালে চিন্তা করা হত—মন্দকে বর্জন করতে হবে, এই নতুন শিক্ষানুসারে বলা হয়, মন্দ রূপান্তরিত হবে—ভাল থেকে আরও ভাল করবার চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি এই ভাব শিক্ষা দেয়, যদি পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে দেখবে যে, স্বর্গরাজ্য আগে থেকেই বিদ্যমান; মানুষের যদি দেখবার সাধ থাকে, তবে সে দেখবে, সে পূর্ব থেকেই পূর্ণ।

বিগত গ্রীষ্মঋতুতে গ্রীনএকারে যে সভাগুলি হয়েছিল, সেগুলি যে এত চমৎকার হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, তুমি পূর্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ হয়ে অন্তরে ঐ ভাব যাতে অবাধে প্রবেশ করে, তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখেছিলে, স্বর্গরাজ্য যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান—নতুন চিন্তাপ্রণালীর এই সর্বোচ্চ শিক্ষারূপ ভিত্তির উপর তুমি দণ্ডায়মান ছিলে।

তুমি এই ভাব জীবনে পরিণত করে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাবার উপযুক্ত আধাররূপে প্রভু কর্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছ, এবং যে তোমাকে এই অদ্ভুত কার্যে সহায়তা করবে, সে প্রভুরই সেবা করবে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—‘মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।’ অর্থাৎ যারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা; সুতরাং আমি যেখানেই থাকি না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় তুমি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিত হয়েছ, তার উদ্‌যাপনে যে-কোন প্রকারে সহায়তা করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী আমি তৎসাধনে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করব ও তা সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা বলে মনে করব। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

২৪৬*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

রিজলী ম্যানর
২৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
বক্তৃতার নকলগুলি ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আশা করি সেগুলি কোন কাজে আসতে পারে।

আমার মনে হয়, প্রথমতঃ অনেক অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেদের কোন কাজেরই উপযুক্ত মনে করে না—এই হল ও-দেশের জাতীয় ব্যাধি; তৃতীয়তঃ তারা এখনই শীতের সম্মুখীন হতে সাহস করছে না; তিব্বতের লোকটিকে ইংলণ্ডে কাজ করার মত খুব শক্তসমর্থ বলে তারা মনে করে না। শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, কেউ না কেউ আসবে।

বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমাদের বন্ধুদের আমার বড়দিনের অভিনন্দন জানাবেন—মিসেস ও মিঃ জনসন, লেডী মারগেসন (Lady Margesson), মিসেস ক্লার্ক, মিস হয়েস (Miss Hawes), মিস মূলার, মিস স্টীল (Miss Steel) এবং বাকী সকলকে।

শিশুকে আমার হয়ে চুম্বন ও আশীর্বাদ দিবেন। মিসেস স্টার্ডিকে আমার নমস্কার। আমরা কাজ করবই। 'ওয়া গুরুজী কি ফতে।'

—বি

২৪৭

[মঠে সকলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত]

১৮৯৫

প্রিয়বরেষু,
সাণ্ডেল যে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিল, তাহা পৌঁছিয়াছে—এ-কথা লিখিতে ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে। তোমাদের জন্য লিখি—

১| পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যদ্যপি তুমি কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ অন্যাপেক্ষা দেখাও, তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল পত্তন হইবে।

২| কেহ তোমার নিকট অপর কোন ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বিলকুল শুনিবে না—শুনাও মহাপাপ, ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত তাহাতে।

৩| অধিকন্তু সকলের দোষ সহ্য করিবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, এ-কথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই সকলে ঈর্ষা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা—আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐ ভাব আনতে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে তো বড় ছোট দেখিতে পাই না, কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে; তার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ। কালী ও যোগেন টাউন-হল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল—কত গুরুতর কার্য! নিরঞ্জন সিলোন (সিংহল) প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে। সারদা কত দেশ পর্যটন করিয়া বড় বড় কার্যের বীজ বপন করিয়াছে। হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি, তখনই নূতন বল পাই। তুলসী, গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে। তিনি যে জহুরী ছিলেন, তাতে এখনও যদি সন্দেহ হয়, তাহলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাত কি? দেখ এদেশে শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিতেছে। ধীরে ধীরে—মহাকার্য ধীরে ধীরে হয়। ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পুঁতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি—আর সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে!

তিনি কাণ্ডারী; ভয় কি? তোমরা অনন্তশক্তিমান্—সামান্য ঈর্ষাবুদ্ধি ও অহংপূর্ণবুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের ক-দিন লাগে? যখনই ঐ বুদ্ধি আসিবে, প্রভুর কাছে শরণ লও। শরীর মন তাঁর কাছে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গাম মিটে যাবে একদম।

যে বাড়ীতে তোমরা আপাততঃ আছ, তাহাতে স্থান পূর্ণ হইবে না, দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশস্ত বাটীর দরকার, অর্থাৎ সকলে গুঁতোগুঁতি করে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে দুই জনের অধিক থাকা উচিত নহে। একটা বড় হল, সেখানে পুঁথি-পাটা রাখিবে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কালী, হরি, তুলসী, শশী প্রভৃতি অদল-বদল করে, যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রপাঠ করে, ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান-ধারণা একটু ও সঙ্কীর্তনাদি হয়। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এইমত একটা routine (পাঠের ক্রম) করিয়া লইলেই বড়ই মঙ্গলের বিষয়—সন্ধ্যাকালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকেরা যাহাতে আসিতে পারে; এবং প্রতি রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ-কীর্তনাদি হওয়া উচিত, সেটা public-এর (সাধারণের) জন্য। এই নিয়মাদি করে কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে দিলেই পরে আপনা হতে গড় গড় করে চলে যাবে। উক্ত হলে যেন তামাক খাওয়া না হয়। তামাক খাবার একটা যেন আলাহিদা জায়গা থাকে। এই ভাবটা তুমি

যদি পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে আনতে পার, তা হলে বুঝতাম অনেক কাজ এগলো। কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

পুনঃ—হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় করছিল, তার কি হল? কালী, শরৎ, হরি, মাষ্টার, G. C. Ghose (গিরিশবাবু) যোগাড় করে একটা যদি পার তো ভালই বটে।

—ন

২৪৮

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভারতবর্ষে কার্য হোক না হোক, কার্য এদেশে। কাহারও এক্ষণে আসিবার দরকার নাই। আমি দেশে গিয়ে কয়েকজনকে তৈয়ার করে তুলব, তারপর পাশ্চাত্য দেশে কোন ভয় থাকিবে না। গুণনিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। হরি সিং প্রভৃতি সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্বাদ দিবে। ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকিবে না। কার সাধ্য খেতড়ির রাজাকে দাবায়? মা জগদম্বা তার শিয়রে। কালীরও চিঠি পেয়েছি—কাশ্মীরে যদি centre (কেন্দ্র) করতে পার তো বড়ই ভাল হয়। যেখানে পার একটা সেণ্টার কর। এখন এদেশে আর বিলেতে আমার গোড়া বেঁধে গেছে; কারু সাধ্যি কি তা টলায়? নিউ ইয়র্ক এবার তোলপাড়! আসছে গরমিতে লণ্ডন তোলপাড়! বড় বড় হাতী দিগ্‌গজ ভেসে যাবে। পুঁটি-পাঁটার কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই তো সবে সন্ধ্যা রে ভাই!

দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower classদের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পার, তা হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পার? বড়-মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে করে খরচ হয়ে গেছে।

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করে মিলেমিশে চলে যাও—এ দুনিয়া বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই। ভয় নাই, মা আমার সহায়—এমন কাজ এবার হবে যে, তোরা অবাক হয়ে যাবি।

ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—সারদা কি বাঙলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটা ভাল না বোধ হয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise (বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা) করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।

২৪৯

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই। সবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎসর প্রচণ্ড শীত প্রভুর কৃপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দণ্ড শীত! তবে এদের বিদ্যের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা মাটির ভেতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—সেখানে হতে গরম হাওয়া বা ষ্টীম ঘরে ঘরে রাতদিন ছুটছে।

তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভেতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর (শূন্যের) নীচে ৩০|৪০ ডিগ্রী! এদেশের বড় মানুষেরা অনেকেই শীতকালে ইওরোপ পালায়—ইওরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ।

যাক, এক্ষণে তোমাকে গোটা-দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই রকম কাজ করবে। সারদার চিঠি পাইয়াছি—সে উত্তম কার্য করিতেছে—কিন্তু এক্ষণে organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করা) চাই। তাহাকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন, আশীর্বাদ—তারকদাদা প্রভৃতি সকলকে দিবে। তোমাকে আমার এই ক-টি উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে organization power (সঙ্ঘগঠন ও পরিচালন-শক্তি) আছে—এ-কথা ঠাকুর আমায় বললেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্বাদে ফুটবে। তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র) ছাড়িতে চাও না, ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে intensive and extensive (গভীর ও উদার) দুই হওয়া চাই।

১| এ জগতে যে ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (natural) নহে, অতএব অপনেয়।

২| বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ 'জাতি', অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী-পুং-বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে-প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত হয় না, সে-প্রকার ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৩| কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ 'অবিদ্যা'। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; কিন্তু 'কিং কর্ম কিমকর্মেতি' ইত্যাদি (কোন্‌টি কর্ম, কোন্‌টি অকর্ম—এই বিষয়ে জ্ঞানীরাও মোহিত হন)।

৪| যে কর্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম।

৫| অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কালগত কর্মাকর্মের সাধন।

৬| যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম; আধুনিক সময়ের জন্য তাহা নহে।

৭| রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে।

৮| রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারের রজোগুণ অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই, অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।

৯| প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িকেরা ভুল করে নাই। They have done well, but they must do better (তাহারা ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাল করিতে হইবে)। কল্যাণ—তর—তম।

১০| অতএব সকলকে—যেখানে তাহারা আছে, সেইখানেই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থামধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম, কিন্তু উৎকৃষ্ট-তর-তম করিতে হইবে।

১১| জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

১২| সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।

১৩| সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।

১৪| চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর)।

১৫| কাহারও সহিত বিবাদ-বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও—অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your message, leave others to their own thoughts (তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক)। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—তদা কিং বিবাদেন? (সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় কখনও হয় না; তবে বিবাদের প্রয়োজন কি?)

এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিষয়কার্য শিখাই। প্রথমতঃ যখন আমাকে বা অন্য কাহাকেও পত্র লিখিবে, তখন পূর্বপত্র পাঠ করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে। বাজে খবর দিবে না। গম্ভীর ভাব রাখিতে হইবে। বাল্যগাম্ভীর্যভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়-বুদ্ধিবিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ।

ম্যাক্সমূলার তোমাদের এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে বিনয়পূর্ণ উত্তর দিয়াছ কিনা, এ-কথা লেখ নাই। আমি কাহাকে টাকা পাঠাইব, তাহা লেখ নাই। কেমন করিয়া পাঠাইব? … প্রায় দেড় মাসে একখানা পত্র আসে, একটা ভুল শোধরাইতে তিন

মাস লাগে। এই কথা সদা মনে রাখিবে। সারদার পত্রে অবগত হইলাম N. Ghose (ঘোষ) আমাকে যীশুখ্রীষ্টাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ও-সকল আমাদের দেশে ভাল বটে; কিন্তু এদেশে ছাপাইয়া পাঠাইলে আমার অবমানের সম্ভাবনা। আমি কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না, আমি কি মিশনরী? যদি কালী ঐ-সকল কাগজ এতদ্দেশে না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইতে নিষেধ করিবে। কেবল Address (অভিনন্দন) পাঠাইলেই যথেষ্ট, proceedings-এ (কার্য বিবরণীতে) কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে এতদ্দেশের অনেক মান্যগণ্য নরনারী আমায় শ্রদ্ধা করেন। মিশনরী প্রভৃতিরা বহু চেষ্টা করিয়া এক্ষণে হার মানিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছে। সকল কার্যই নানা বিঘ্নের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করিলেই সত্যের জয় হয়। হাড্‌সন (Hudson) নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রথমতঃ অনাবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে আমি হাড্‌সন প্রভৃতি ফেরুপুঞ্জের সমদেশবর্তী হইব। তুমি উন্মাদ নাকি? আমি এখান হইতে কে এক হাড্‌সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় হাড্‌সন বাড্‌সনের গুরুর গুরুরা আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। তুমি কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ও-সকল দেশে চলুক, হানি নাই। ও-সকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর কার্যের জন্য। যখন তাহা সমাহিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। আমার প্রত্যেক পত্রাদি গোপন করিবে, ঝট করিয়া কাগজে ছাপাইবে না। নামযশের ঐ দায়—কিছু গোপন রাখা যায় না। আমার চিঠি পূর্বের ভাবের মত হাটের মাঝে পড়িবে না। কথা কানে হাঁটে, মনে রাখিবে। মা-ঠাকুরাণীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা অনুসন্ধান করিবে।

ঠাকুরের কাছে সকল কার্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎ পন্থা দেখাইবেন। একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তার পর বাড়ী ঘর সব হবে। আমাদের মঠ ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই। যখন আমাকে চিঠি লিখিবে, বিশেষ চিন্তা করে আবশ্যক সমাচার বিস্তারিতভাবে দিবে—অনাবশ্যক অর্থাৎ ঝগড়াঝাঁটি আমার শুনিবার সময় নাই।

কালী প্রভৃতি সকলেই উত্তম কার্য করিতেছে। সকলকেই আমার প্রেমালিঙ্গন দিও। মান্দ্রাজীদের সহিত মিলে মিশে কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে একজন তথায় যাইও। নামযশ কর্তৃত্বের বাসনা জন্মের মত ত্যাগ করিবে। আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য করিতেছেন—ইহাতে তোমাদের যতদিন বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শাঁকচুন্নী যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় edition (সংস্করণ)-এ শুদ্ধ করিতে বলিবে। এই কথা মনে সদা রাখিবে যে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান। আমাদের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক কথা লোকে দেখিতেছে, শুনিতেছে—এই ভাব মনে রাখিয়া সকল কার্য করিবে।

যদি তুমি—কাহাকে টাকা পাঠাইব অর্থাৎ—কাহার নামে লিখিতে, তাহা হইলে আজই আমি টাকা পাঠাইতাম। টাকা পাইবামাত্রই জমি খরিদ করিবে। আপাততঃ আমার নামে খরিদ করিবে। পরে আমাদের মঠের জন্য একটা জমি দেখিতে থাক। কাছাকাছি হওয়া চাই, অর্থাৎ দুইটা জমি যাহাতে অতি নিকটে হয়, এমত চেষ্টা করিবে। কলিকাতা হইতে কিছু দূরে হয়, চিন্তা নাই; যেখানে আমরা মঠ বসাইব, সেথাই ধুম মাচিবে।

মহিম চক্রবর্তীর কথায় আমি পরম আনন্দিত হইলাম—এণ্ডিস্ পর্বতে এক্ষণে গয়াক্ষেত্র বনিয়া গেল যে! সে কোথায়? তাহাকে, বিজয় গোস্বামীকে ও আমাদের বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ প্রণয়-সম্ভাষণ দিবে। ... পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই, অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে। কালীর ইংরেজী দিন দিন বেশ পরিষ্কার হইতেছে। সারদার ইংরেজীর অধোগতি হইতেছে; তাহাকে flowery style (ফেনান ভাষা) পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিজাতীয় ভাষায় flowery style লেখা বড়ই দুষ্কর। তাহাকে আমার লক্ষ 'সাবাস্'—ওহি মরদ্‌কা কাম; তারকদাদাকেও grammar (ব্যাকরণ)-টা একবার উল্টে নিতে বলবে। তারকদাদার ইংরেজী ক্রমশঃ দুরস্ত হয়ে আসছে। সকলেই well done, 'সাবাস্, বাহাদুরোঁ'। আরম্ভ অতি সুন্দর হয়েছে। ঐ ডৌলে চল। ঈর্ষা-সর্পিণী যদি না আসে তো কোন ভয় নাই, মাভৈঃ। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'। সকলে একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিবে।

আমি হিন্দুধর্মের উপর কোন পুস্তক এক্ষণে লিখিতেছি না। তবে আমার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতেছি। Every religion is an expression, a language to express the same truth, and we must speak to each in his own language.
৮৮
—সারদা এ কথা বুঝিয়াছে বেশ। হিন্দুধর্ম পরে দেখা যাইবে। হিন্দুধর্ম বললে কি এদেশের লোক আসে? সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নামে সকলে পালায়। আসল কথা, তাঁর ধর্ম; হিন্দুরা বলুক হিন্দুধর্ম—তদ্বৎ সর্বে (সেইরূপ সকলে)। তবে ধীরে ধীরে—শনৈঃ পন্থাঃ। নবাগন্তুক দীননাথকে আমার আশীর্বাদ দিও। লিখিবার সময় বড়ই অল্প, সর্বদাই লেকচার, লেকচার, লেকচার। Purity-patience-perseverance (পবিত্রতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়)! মহেন্দ্র মাষ্টার প্রভৃতি সকলকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিও। মা-ঠাকুরাণীকে আমার কোটি সাষ্টাঙ্গ। গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কার। অনেকে যে তাঁর কথা এক্ষণে শুনছে, তাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে বলিবে; কিছু কিছু 'পেলা' না নিলে মঠ চলবে কি প্রকারে? এ-কথা সকলকে খুলে বলতে হবে বৈকি!

বিদেশ হতে যদি কেউ কিছু আমার নামে পাঠায়, তাদের চিঠির জবাব দিবে। ওটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে। সাণ্ডেল অর্থাভাব লিখছেন, তথাহি তারকদাদা। বলি এতগুলো লোক তাঁকে মানে, আর একটা মঠ চলে না? তোমাদের কারুর কারুর মধ্যে একটা গুজোগুজি ভাব এখনও আছে; সেটা যেদিন একেবারে অপসৃত হবে, সেদিন হতেই সকলবিধ কল্যাণ হবে।

এদেশ হতে শীঘ্র দেশে যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজলে, দেশে মহাধ্বনি হয়; তারপর

এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়ালা! দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই নাই!

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকিত, তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী-পর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব আসে না। ক্রমে দেখা যাবে। প্রভুর ইচ্ছা। সকল বড় কাজ ধীরে ধীরে হয়। দুটো জমির কথা ভুলবে না এবং তোমাদের মধ্যে কে এ কার্যের ভার লইবে, তাহা লিখিবে; অপিচ গিরিশ ঘোষ ও অতুলের সহিত পরামর্শ করিবে। জমি আমার নামে খরিদ করিবে, অর্থাৎ মোট কথা এই—'অর্থমনর্থম্'; যার হাতে থাকিলে কারুর মনে ঈর্ষা হবে না, তারই হাতে থাকা ভাল। সাণ্ডেলকে—লাটুকে গরম কাপড় (তার মনের মত) কিনে দিতে বলেছি, এবং গোপালদাদাকে টাকা পাঠাতে বলেছি এবং হুটকোকে টাকা দিতে বলেছি—তার ঋণ-পরিশোধের জন্য।

দক্ষ ও হরিশের কথা কেউ লেখ নাই কেন? তাদের তোমরা খবর নাও কিনা? সাণ্ডেল দুঃখ পাচ্ছে, তার কারণ তার মন এখনও গঙ্গাজলের মতন হয় নাই, নিষ্কাম এখনও হয় নাই, ক্রমে হবে। যদি বাঁকটুকু একদম সিধে করে তো আর কোন দুঃখ থাকিবে না। রাখালকে, হরিকে আমার বিশেষ আলিঙ্গন প্রণাম জানাইবে। তাদের বিশেষ যত্ন করিবে। তোমরা রাখালকে দিন-দুই জবরদস্ত ব্রত করিয়ে দিয়েছ নাকি? কাজটা ভাল কর নাই। যাক, চর্বি মারা যাবে। রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিষ—এ কথা ভুলো না।

কিছুতেই ভয় খেও না। যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার যো আছে? ভবেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ (প্রাণ কণ্ঠাগত হউক), তথাপি ডর পাবে না। সিংহ-বিক্রমের সহিত অথচ 'কুসুমমিব' (ফুলের মত) কোমলতার সহিত কার্য করিবে। এবারকার মহোৎসবে খুব ধুম মাতাইবে। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, দাঁড়াপ্রসাদ ইতি। পরমহংসদেবের জীবনচরিত-পাঠ। বেদ বেদান্ত পুঁথি একত্র করে আরতি করবে, এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেলা আদায় করিবে। পুরানো ঢৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে। 'আমন্ত্রয়ে ভবন্তং সাশীর্বাদং ভগবতো রামকৃষ্ণস্য বহুমানপুরঃসরঞ্চ' ইত্যাকার একটা লাইন লিখে তারপর লিখবে যে, ঠাকুরের জন্মতিথি-মহোৎসব এবং মঠ চালাইবার খরচের জন্য আপনার সহায়তা প্রয়োজন। যদি আপনার অভিমত হয় তো অমুক স্থানে অমুকের নিকট টাকা পাঠাইবেন—ইত্যাদি। যদি মনে কর যে, আমার নামে সই করলে লোকে টাকা দেবে তো সই করে দিও অর্থাৎ ছাপিয়ে দিও। যদি না হয়, তো যেমন ordinarily (সাধারণতঃ) 'রামকৃষ্ণসেবকাঃ সন্ন্যাসিনঃ' অথবা ঐ প্রকার কোন রকম। আর এক পাতা ইংরেজীতে লিখিবে। 'লর্ড (প্রভু) রামকৃষ্ণ' শব্দের কোন অর্থ নাই; উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজী অক্ষরে 'ভগবান্' লিখিবে। তারপর এক আধ লাইন ইংরেজী লিখিয়া দিবে।

The Anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna

Sir,

We have great pleasure in inviting you to join us in celebrating the —th anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna Paramahamsa. For the celebrating of this great occasion and for the maintenance of the Alambazer Math, funds are absolutely necessary. If you think that the cause is worthy of your sympathy, we shall be very grateful to receive your contribution to the great work.

Yours obediently
(Name)
৮৯

(Place)
(Date)

যদি যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ হয়, কিয়দংশ খরচ করে বাকী একটা ফাণ্ড করে রাখবে এবং তোমাদের খরচ তা হতে চালাবে।

ভোগের নাম করে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড়ে ভাত খাওয়াবে না। দুটো ফিল্টার তৈয়ার করবে। সেই জলে রান্না ও খাওয়া দুই-ই। ফিল্টার করবার পূর্বে জল ফুটিয়ে নেবে, তা হলে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন। সকলের স্বাস্থ্যের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিবে। মাটিতে শোওয়া ত্যাগ করিবে, পার যদি—অর্থাৎ যদি পয়সা জোটে তো বড়ই ভাল। ময়লা কাপড় ব্যারামের প্রধান কারণ। ঐ সকল টাকার কাজ। সারদা তার বন্ধুদের পত্র লিখুক, ঐ প্রকার সকলে চেষ্টা কর। আমি এখানে চেষ্টা করছি বৈকি! কিন্তু খালি আমার উপর কোন কাজে নির্ভর করিবে না। ভোগের বিষয় তোমাকে লিখি—কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ পায়সান্ন চড়াইবে; তিনি তাহাই ভালবাসিতেন। ঠাকুরঘর অনেকের সহায়তা করে বটে, কিন্তু রাজসিক তামসিক খাওয়া-দাওয়ার কোন কাজ নাই। আঙুল-বাঁকান এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ কমি করে কিঞ্চিৎ গীতা-উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ Materialism (জড়োপাসনা) যত কম হয় এবং Spirituality (আধ্যাত্মিকতা) যতই বাড়ে, এই কথা আর কি। সাণ্ডেল লিখছেন যে, হাজার হাজার লোক খালি ঘণ্টানাড়া দেখতে আসে। যদি এ কথা সত্য হয় তো ও-প্রকার লোক না আসাই ভাল। ওরা মেঠাই খেতে আসে; এদিকে মঠের লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়, তখন হাজার হাজার লোক কোথায়? আর আমরা কি সর্বত্যাগ করে সাণ্ডেলের জন্য ঘণ্টা বাজাতে এসেছি? সাণ্ডেল কাঁসারীপাড়ায় বাস করুক গে, যদি ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লাগে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছেলেদের মুখে খাচ্ছেন—তোমার ঘণ্টানাড়ার মধ্যে নয়। তাদের একচুল কষ্ট দিয়ে তোমার ঘণ্টানাড়া সমস্তই বিফল হয়, অপিচ অমঙ্গল হয় তোমার নিজের। এ কথাটা রোজ একবার মনে রেখো। তিনি তোমার একলার জন্য বা সাণ্ডেলের জন্য এসেছিলেন, কি জগতের জন্য? যদি জগতের জন্য, তা হলে জগৎসুদ্ধ লোক যাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই ভাবে তাঁকে

present করতে (লোকের কাছে ধরতে) হবে। সেইজন্য সুরেশ দত্তের পুঁথিতে যে আবোল-তাবোলগুলো আছে, সেগুলো দূর করে দিতে হবে—বুঝতে পেরেছ কি? ওগুলো '—'বাবুর বুদ্ধিতে বোধ হয় সুরেশ দত্ত লিখেছে—হরিবোল হরি! যাক্, তার উদ্দেশ্য ভাল, কেবল সেই ছোট বুদ্ধি। দক্ষিণেশ্বরের ভট্‌চায্যির জীবনচরিত—মাষ্টার মহাশয় জানে, সুরেশ বাবু লেখে, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' তারা এখনও দেখতে পায় নাই। দুনিয়া তাদের দক্ষিণেশ্বরের কুটুরি। হে প্রভু, হে প্রভু! তবে you must not identify yourself with any life of Him written by anybody, nor give your sanction to any.
৯০
যতক্ষণ আমাদের নামের সঙ্গে না যায়, ততক্ষণ কোন ভয় নেই। এ সকল কথা তোমরা কাউকে বলো না—অর্থাৎ সুরেশ দত্তের উদ্দেশ্য ভাল, বইও বেশ লিখেছে—চলুক, কিছু কাজ হবে। তবে তারা তাঁকে কি ঘোড়ার ডিম বুঝেছে? সাণ্ডেল আমাকে তিন পাতা লেকচার দিয়েছে যে, মা-ঠাকুরাণীকে ভক্তি করতে হবে এবং তিনি আমায় কত দয়া করেন। সাণ্ডেলের এই মহা আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ! তাঁর [বিষয়ে] একটা কিছু লিখব মনে করি; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই। যাক্, তাঁর ইচ্ছা হয় তো কালে কালে হবে। মহেন্দ্রবাবু মঠ একপ্রকার চালাচ্ছেন; তাঁকে শত শত ধন্যবাদ; তিনি অতি মহৎ। সাণ্ডেলকে বলবে, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তার সাড়ে পাঁচ সিকের চাকরি আর তিন কড়ার বুদ্ধি শীঘ্রই ঘুচবে। তবে তার কর্ম বাজার-হাট ইত্যাদি করা; সেই কর্ম মন দিয়ে করলে—অর্থাৎ তাঁর ছেলেপুলের সেবা করলেই তার পরম কল্যাণ হবে। লেকচার-ফেকচার সে এ জন্মের মত সিকেয় তুলে রাখুক, আসছে বারে দেখা যাবে। তাকে নিজের বুদ্ধি খরচ করতে বারণ করো। যেমনটি বলি দাগা বুলিয়ে যাক্, নইলে উল্টো উৎপত্তি করে বসবে। 'হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিও বৈঠি আপনা ঠাম্।'

যোগেন কেমন আছে? হুটকো কি চাকরি করতে যাচ্ছে—কি করছে? হুটকোকে একটু লেখাপড়া শেখাবে—এখনও বয়স আছে। সব খবর খুলে লিখতে হয়—এ-কথা খুব মনে রেখো। গুপ্ত পড়ছে শুনছে কেমন? তুলসী, লেটোকে ঘুমুতে দিও, যা খেতে চায় দিও, তাড়া দিও না বিলকুল। বাবুরাম কি করছে; হরি, রাখাল কেমন আছে ইত্যাদি বিলকুল লিখবে। সকল কথা খোলসা করে শুনবে—আবোল-তাবোল কে কি বললে হরমোহনী ডৌলে লেখবার দরকার নাই। হরমোহনের সাংসারিক অবস্থা কেমন? তারকদাদা খুব কাজ করছে; বাঃ! বাঃ! সাবাস! ঐ-রকম চাই। এক-একটা নক্ষত্রের মত ছুটে পড় দিকি! গঙ্গা কি করছে? রাজপুতানায় কতকগুলো জমিদার তাকে মানে; তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে মঠের জন্য টাকা পাঠাতে বলো ...।

শাঁকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার লক্ষ-লক্ষাধিক প্রেমালিঙ্গন দিবে। তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী! শাঁকচুন্নী ঐ পুঁথি সকলকে শোনাক। মহোৎসবে শাঁকচুন্নীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। পুঁথি অতি বড় যদি হয় তো চুম্বক চুম্বক করে যেন পড়ে। শাঁকচুন্নী একটাও আবোল-তাবোল তো লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব! শাঁকচুন্নীর পুঁথি যাতে খুব বিক্রী হয়, সকলে পড়ে (মিলে) চেষ্টা করবে। তারপর শাঁকচুন্নীকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করতে যেতে বলো। বাহবা, সাবাস, শাঁকচুন্নী! সে তাঁর কাজ করছে। গাঁয়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তাঁর কথা শোনাক—এর চেয়ে তার আর কি ভাগ্য হবে? ... শশী, শাঁকচুন্নীর পুঁথি and শাঁকচুন্নী himself (নিজে) must electrify the masses (জনসাধারণের শক্তিসঞ্চার করবে)। আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই। প্রভু তোর কণ্ঠে বসুন, দ্বারে দ্বারে তাঁর নাম শুনাও। সন্ন্যাসী হবার আবশ্যক কিছুই নাই। শশী, mass (জনসাধারণ)-এর মধ্যে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। শাঁকচুন্নী is the future apostle for the masses of Bengal (বাঙলার জনসাধারণের নিকট ভাবী বার্তাবহ)। শাঁকচুন্নীকে খুব যত্ন করবে! তার বিশ্বাস-ভক্তির ফল ফলেছে। শাঁকচুন্নীকে এই ক-টা কথা লিখতে বলো—তার তৃতীয় খণ্ডে, প্রচার খণ্ডেঃ

'বেদবেদান্ত, আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেন না, He was the explanation (তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন)। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।'

এই ভাবগুলো তার ভাষায় বিস্তার করে লিখতে বলবে। যে তাঁর পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান্ হবে—মেয়ে বা পুরুষ। আর এবারে মাতৃভাব—তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন, তিনি যেন আমাদের মা—তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখতে হবে। ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলান, আর 'জাতি জাতি' করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা। He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low.
৯১
আর শাঁকচুন্নী ঘরে ঘরে তাঁর পূজা করাক। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজায় সকলের অধিকার। যে ঘটস্থাপনা বা প্রতিমা করে তাঁর পূজা করবে—মন্ত্র হোক বা না হোক—যেমন করে যে-ভাষায় যার হাত দিয়ে হোক—খালি ভক্তি করে যে পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে।—এই ডৌলে লিখতে বলো। কুছ পরোয়া নাই; প্রভু তার সহায় হবেন। কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

পুঃ—ম্যাক্সমূলারকে—তিনি ভারতের পরম সহায়—এইভাবে পত্র লিখিবে। বোধ হয় লিখিয়াছ। ... সে বই আমি অনেক দিন দেখেছি, তাতে আমার ভাবের আভাসও আছে।

যে অভিধানের বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা দু-চার জন বন্ধুকে পাঠিয়েছি—কি ফল হবে, তা জানি না। তুমি একখানা নারদ-আর শাণ্ডিল্যসূত্র এবং একখানা 'যোগবাশিষ্ঠ'—যা কলকেতায় তর্জমা হয়েছে—তা পাঠিয়ে দিতে সাণ্ডেলকে বলবে।

‘যোগবাশিষ্ঠে’র ইংরেজী তর্জমা, বাঙলা নয়। ইতি

শাঁকচুন্নী যেন আমার opinion (মত) in his book (তাঁর পুঁথিতে) না ছাপে। তাঁকে মুখে তুমি বলবে—অথবা পড়ে শুনাবে। যাকে তাকে আমার correspondence (চিঠিপত্র) পড়তে দিবে না। এ-সমস্ত private (ব্যক্তিগত)। কথা কানে হাঁটে। ইতি

নরেন্দ্র

২৫০*

আমেরিকা
১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
আমাদের কোন সঙ্ঘ নেই—আমরা কোন সঙ্ঘ গড়তেও চাই না। স্ত্রী বা পুরুষ যে-কেহ যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায়, সে-বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যদি তোমার ভিতরে শক্তি থাকে, তবে তুমি কখনই অপর পাঁচজনকে আকর্ষণ করতে অসমর্থ হবে না। আমরা কখনই থিওসফিষ্টদের কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে পারি না—তার সোজা কারণ এই যে, তারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আর আমরা তা নই।

আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক-একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি অতি অল্পই জানি—সেই অল্পস্বল্প যা জানি, তার কিছু চেপে না রেখেই শিক্ষা দিয়ে যাই। যে বিষয়টা জানি না, স্পষ্টই স্বীকার করি যে, সেটা আমার জানা নেই। আর থিওসফিষ্ট, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, লোক কিছু সাহায্য পাচ্ছে জানলে আমার এত আনন্দ হয়, তা কি বলব। আমি তো সন্ন্যাসী—সুতরাং এ জগতে আমি কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি নিজেকে সকলের দাস মনে করি। … যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাসুক, তাদের খুশী; ঘৃণা করে করুক—তাদের খুশী।

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকে করতে হবে—প্রক্যেককেই নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে। আমি কোন সাহায্য খুঁজি না, পেলে তা ত্যাগও করি না; আর জগতে কোন সাহায্য দাবী করবার অধিকারও আমার নেই। কেউ যে আমায় সাহায্য করেছে বা করবে, আমার প্রতি সে তার দয়া, তাতে আমার দাবীদাওয়া কিছু নেই; এ জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

যখন সন্ন্যাসী হই, তখন বুঝেসুঝেই এ পথ বেছে নিয়েছিলাম; বুঝেছিলাম, অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো ভিখারী; আমার বন্ধুরা সব গরীব; গরীবদের আমি ভালবাসি; দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি। কখনও কখনও যে আমায় উপবাস করে কাটাতে হয়, তাতে আমি খুশী। আমি কারও সাহায্য চাই না—তার প্রয়োজন কি? সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার সাহায্যের অভাবে নষ্ট হয়ে যাবে না। ‘সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব’—সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, সব সমান মনে করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও (গীতা)।

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাকলে এবং ঈর্ষা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কাজ হবে। তাতেই কেবল কাজ হবে, আর কিছুতেই নয়। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

২৫১

[স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত]

জানুআরী, ১৮৯৬

প্রিয় সারদা,
… তোর কাগজের idea (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব, ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার করে নে। এই চিঠির জবাব—চিঠির উত্তরে আমি ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেব। ৫০০ টাকায় কিছু আসে যায় কি? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন করে ওঠ দিকি। তবে কোন আরবী জানা মুসলমান-ভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারে, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে

পার, একটা বেশ regular item (নিয়মিত বিষয়) হবে। লেখক অনেক চাই। তার পর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গতিয়ে দিবি। ... চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব (মহোৎসব) এমনি মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা তো 'খোঁজ খবর নহি পাওয়ে।' লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় (ভারত) এসে তোলপাড় করে তুলব। ভয় কি? 'নাই নাই বললে সাপের বিষ উড়ে যায়।'—নাই নাই বলে যে নাই হয়ে যেতে হবে!

গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে। সাবাস! কালী তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস! একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বোম্বে যা। তোলপাড় কর—তোলপাড় কর দুনিয়া। কি বলব আপসোস—যদি আমার মত দুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। তোলপাড় কর—তোলপাড় কর। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। গৃহস্থদের কাজ নয়। ... সন্ন্যাসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবেঃ 'হ—র্, হ—র্, শ—ম্ভো!' ইতি—

বিবেকানন্দ

২৫২*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
৬ জানুআরী, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনী,

নববর্ষে তোমার প্রীতিসম্ভাষণের জন্য বহু ধন্যবাদ। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়টির ওখানে ছয় সপ্তাহ তোমার বেশ আনন্দে কেটেছে জেনে সুখী হলাম, যদিও তারা কেবল গল্‌ফ্‌ই খেলত। ইংলণ্ডে দেখলাম—আমি যথার্থ শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইংরেজরা আন্তরিক অভ্যর্থনা করেছে; এই ইংরেজ জাত সম্বন্ধে আমার ধারণাও অনেকখানি বদলেছে। প্রথমেই দেখলাম লাণ্ড্ (Lund) প্রভৃতি যারা আমার সঙ্গে বিরোধের জন্য ইংলণ্ড থেকে এখানে এসেছিল, ওখানে তাদের কোন পাত্তাই নেই। ইংরেজরা তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত উপেক্ষা করে। যারা ইংলিশ চার্চের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের ভদ্র বলে মনে করা হয় না। ঐ চার্চভুক্ত কয়েকজন যথার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদায় অগ্রণীদের কেউ কেউ আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছেন। আমার ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা আমেরিকার তুলনায় একেবারে অন্য রকমের।

এখানে প্রেসবিটেরিয়ান প্রভৃতি গোঁড়াদের সঙ্গে হোটেলগুলিতে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে ইংরেজরা তো হেসেই অস্থির। উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও আচার-ব্যবহার প্রভেদ লক্ষ্য করতে দেরী হল না। বুঝলাম কেন আমেরিকার মেয়েরা দলে দলে ইওরোপীয় বিবাহ করতে যায়। সকলের কাছে সদয় ব্যবহার পেয়েছি। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে অনেক উদারহৃদয় বন্ধু এখন সেখানে বসন্তকালে আমার ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে।

সেখানকার কাজ সম্বন্ধে বলি, বেদান্তের ভাব ইংরেজ সমাজের উচ্চ স্তরে প্রবেশ করেছে। বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে ধর্মযাজকের সংখ্যাও কম নয়, আমাকে বলেন যে, এ যেন গ্রীস কর্তৃক রোম-বিজয়ের পুনরভিনয় হচ্ছে ইংলণ্ডে।

ভারতে বাস করেছে এমন ইংরেজদের মধ্যে দুটি শ্রেণীঃ এক শ্রেণীর চোখে ভারতীয় যা কিছু সবই হেয়; এরা কিন্তু অশিক্ষিত। অপর শ্রেণীর নিকট ভারত পুণ্যভূমি, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র; এদের হিন্দুয়ানী হিন্দুদেরও হার মানায়, এরা ঘোর নিরামিষাশী, এমন কি স্বদেশে জাতিভেদ-প্রবর্তনেও উদ্যত। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই জাতিভেদের দারুণ পক্ষপাতী। সাধারণ বক্তৃতা ছাড়া সপ্তাহে আরও আটটি করে ক্লাস নিতাম; এত লোকসমাগম হত যে, অনেকে—এমন কি অভিজাত মহিলাগণও নিঃসঙ্কোচে মেজের উপরই বসতেন। ইংলণ্ডে দৃঢ়সঙ্কল্প নরনারী দেখতে পেলাম, তারা দায়িত্ব নিয়ে তাদের জাতি-সুলভ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ চালাতে থাকবে। এ বৎসর নিউ ইয়র্কে আমার কাজ চমৎকার চলেছে। মিঃ লেগেট নিউ ইয়র্কের একজন সেরা ধনী, তিনি আমার একান্ত অনুরাগী। এদেশে নিউ ইয়র্কবাসীরা অধিকতর দৃঢ়চিত্ত, এবং তাই এখানেই আমার কেন্দ্রস্থাপনের সঙ্কল্প করেছি। এখানকার মেথডিষ্ট ও প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আমার উপদেশাদি অসঙ্গত মনে করেন। ইংলণ্ডের ধার্মিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে এগুলি উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বরূপে পরিগণিত।

তা ছাড়া মার্কিন নারীর স্বভাবসুলভ পরচর্চা ইংলণ্ডে অজ্ঞাত। ইংরেজ মেয়েরা দেরীতে ভাব গ্রহণ করে, তবে একবার ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে তা আয়ত্ত করে নেবেই। ওখানে ওরা যথারীতি কাজ চালাচ্ছে ও প্রতি সপ্তাহে আমাকে কাজের বিবরণ পাঠাচ্ছে। বুঝে দেখ! আর এখানে সপ্তাহখানেকের জন্য যদি অনুপস্থিত থাকি তো কাজের দফা রফা। সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও—স্যাম এবং তুমি জেনো। ভগবান্ তোমাকে চিরসুখী করুন। ইতি

তোমাদের স্নেহশীল ভ্রাতা

২৫৩*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

228, W. 39th St. নিউ ইয়র্ক
১৬ জানুআরী, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

বই-কয়খানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। 'সাংখ্যকারিকা' অতি সুন্দর গ্রন্থ, এবং 'কূর্মপুরাণে' আশানুরূপ সব না পেলেও ওতে যোগ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক আছে। আমার পূর্বের চিঠিতে 'যোগসূত্র' এই শব্দটি বাদ পড়েছিল। বহু প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে পাদটীকা সংযুক্ত করে আমি ঐ গ্রন্থখানি অনুবাদ করছি। 'কূর্মপুরাণে'র পরিচ্ছেদটি আমার টীকার মধ্যে দিতে চাই। আমি মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তোমার ক্লাসগুলির খুব উৎসাহপূর্ণ বিবরণ পেয়েছি। মিঃ গলস্‌ওয়ার্দি এখন খুব আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়।

এখানে আমার ক্লাসগুলি ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আরম্ভ করেছি। দুটি কাজই খুব উৎসাহ জাগিয়েছে। এই দুই কাজের জন্য আমি টাকা নিই না; তবে হলের খরচ চালাবার জন্য (সভাদিতে) কিছু চাঁদা ওঠাই। গত রবিবারের বক্তৃতাটি খুব প্রশংসা অর্জন করেছে, এবং সেটি খবরের কাগজে বেরিয়েছে। আগামী সপ্তাহে আমি তোমায় কয়েক সংখ্যা পাঠিয়ে দেব। ওতে আমাদের কাজের একটা সাধারণ পরিকল্পনা ছিল।

আমার বন্ধুরা একজন সাঙ্কেতিক লেখক (গুডউইনকে) নিযুক্ত করায় এই সমস্ত ক্লাসের পাঠগুলি ও বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকটির এক এক কপি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে। ঐসব থেকে তুমি হয়তো কিছু চিন্তার খোরাক পেতে পার। এখানে আমি তোমার মত এমন একজন শক্তিশালী লোক চাই—যার বুদ্ধি, কর্মে দক্ষতা ও অনুরাগ আছে। এই সর্বজনীন শিক্ষার দেশে সকলকেই যেন একটা সাধারণ মাঝারি স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে; যে কয়জন যোগ্য ব্যক্তি আছে, তারা যেন গতানুগতিক অর্থ-উপার্জনের গুরুভারে পীড়িত।

এবার পল্লী অঞ্চলে আমার একটি জমি পাবার সম্ভাবনা আছে; তাতে কয়েকটি বাড়ী, বহু গাছ ও একটি নদী আছে। গ্রীষ্মকালে ওটিকে ধ্যানের স্থানরূপে ব্যবহার করা চলবে। অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে ওটার দেখাশুনার জন্য এবং টাকাকড়ি লেনদেন, ছাপা ও অন্যান্য কাজের জন্য একটি কমিটির প্রয়োজন হবে।

আমি নিজেকে টাকাকড়ির ব্যাপার থেকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছি, অথচ টাকাকড়ি না হলে কোন আন্দোলন চলতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হয়ে কার্যপরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব একটি কমিটির হাতে দিতে হয়েছে; তারা আমার অনুপস্থিতিতে এই সব চালিয়ে যাবে। স্থিরভাবে কাজ করে যাওয়া আমেরিকানদের ধাতে নেই; তারা কেবল দলবেঁধেই কাজ করে। সুতরাং তাদের তাই করতে দিতে হবে। প্রচারের দিকটার ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এদেশের জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াবে; এবং তারা স্বতন্ত্র দল গঠন করতে পারবে। ঐ হচ্ছে বিস্তারের সব চেয়ে সহজ উপায়। অতঃপর যখন আমরা যথেষ্ট বলশালী হব, তখন আমাদের শক্তিরাশিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য আমরা বাৎসরিক সম্মেলন করব।

কমিটি নিছক কাজ চালানর জন্য এবং তা নিউ ইয়র্কেই সীমাবদ্ধ।

সতত স্নেহপরায়ণ ও আশীর্বাদক
তোমাদের বিবেকানন্দ

২৫৪

[মঠে লিখিত, শেষাংশ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে]

228 W. 39th St., নিউ ইয়র্ক
১৭ জানুআরী, ১৮৯৬

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমার দুইখানি পত্র আসিয়াছে ও রামদয়ালবাবুর দুইখানি পত্র পাইয়াছি। Bill of Lading (বিল) পৌঁছিয়াছে, পরন্তু মাল আসিবার অনেক দেরী। শীঘ্র পৌঁছিবার বন্দোবস্ত না করিয়া পাঠাইলে মাল আসিতে ছয় মাস লাগিয়া যায়। হরমোহন চার মাস পূর্বে লিখেন যে, রুদ্রাক্ষ ও কুশাসন পাঠান হইয়াছে; তাহার খোঁজ-খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ মাল ইংলণ্ডে পৌঁছিলে এখানকার Agent of the Company (কোম্পানীর এজেন্ট) আমাকে notice (খবর) দেয়, তারপর মাসখানেক পরে মাল

পৌছায়। তোমাদের Bill of Lading (বিল) প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছে, এখনও notic-এর (খবরের) দেখা নাই! কেবল খেতড়ির রাজার মাল শীঘ্রই পৌঁছায়, বোধ হয় তিনি অনেক খরচ করে পাঠান। যাহা হউক, এ দুনিয়ার অপরদিকে, পাতালপুরে যে মাল নির্ঘাত পৌঁছে যায়, এই পরম ভাগ্য। মাল পৌঁছলেই তোমাদের খবর দেব। এখন তিন মাস অন্ততঃ চুপ করে থাক।

তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও। রামদয়ালবাবুকে বলিবে যে, তিনি যে-ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত হইলেও আমেরিকায় এক্ষণে কাহাকেও আনিবার আমার সাধ্য নাই। L'argent, mon ami, l'argent—টাকা, ইয়ার, টাকা কোথায়?

… তোর টিবেটের (তিব্বতের) কি খবর? 'মিররে' ছাপা হলে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিস। … হুটোপাটিতে কি কাজ হয়? … লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মত হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। তুই শশী আর গঙ্গাধর—এই তিনজন দেখছি faithful. … তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান্ বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে। তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা 'হরি'—এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম 'অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঞ্জন, অশেষ-নিঃশেষকল্যাণকর' প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় নাকি? এখন বোধ হয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানে নামই করেছ! কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

পুঃ—বাঙলাদেশটা আর ভারতবর্ষটা চেলে ফেল দেখি। জায়গায় জায়গায় Centre (কেন্দ্র) কর।

ভাগবত এসে পৌঁছেছে—Edition (সংস্করণ) বড়ই সুন্দর—কিন্তু এ-দেশের লোকের সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আদৌ নাই। এজন্য বিক্রী হবার আশা বড়ই কম। ইংলণ্ডে হতে পারে, কারণ সেখানে অনেক লোকে সংস্কৃত চর্চা করে। প্রণেতাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ দিবে। আশা করি তাঁহার মহৎ উদ্যম সুসম্পন্ন হবে। আমরা যথাসাধ্য যত্ন করব, তাঁর বই যাতে এখানে বিক্রী হয়। তাঁর Prospectus (গ্রন্থাভাস) সমস্ত জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দয়ালবাবুকে বলবে যে, মুগের দাল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে। দাল-soup will have a go if properly introduced. (ঠিকমত শুরু করাতে পারলে দালের যূষের বেশ কদর হবে)। যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গায়ে রাঁধবার direction (প্রণালী) দিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠান যায়—আর একটা ডিপো করে কতকগুলো মাল পাঠান যায় তো খুব চলতে পারে। ঐ প্রকার বড়িও খুব চলবে। উদ্যম চাই—ঘরে বসে ঘোড়ার ডিম হয়। যদি কেউ একটা Company form (কোম্পানী গঠন) করে, ভারতের মালপত্র এদেশে ও ইংলণ্ডে আনে তো খুব একটা ব্যবসা হয়। নিরুদ্যম হতভাগার দল—দশবৎসরের মেয়ের গর্ভাধান করতে কেবল জানে, আর জানে কি?

পত্রাবলী ২৫৫-২৬৪

২৫৫*

আমেরিকা
২৩ জানুআরী, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এতদিনে তুমি আমার প্রেরিত 'ভক্তিযোগের' কপি (ছাপাবার মত) যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চয় পেয়েছ। আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের ২১ ডিসেম্বর তারিখের শেষ সংখ্যা পেয়েছি।

'ব্রহ্মবাদিন্'-এর গত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ জাগছিল, তোমরা থিওসফিষ্টদের দলে যোগ দেবে নাকি? এবারে তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছ। তোমাদের মন্তব্যের স্তম্ভে থিওসফিষ্টদের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন? থিওসফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোনরকম যোগ আছে, সন্দেহ করলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্র আমার কাজের ক্ষতি হবে, আর তা হতেই পারে। সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা সকলেই তাদের ভ্রান্ত মনে করে; আর তারা যে এরূপ মনে করে, তা ঠিকই। তোমরা তা ভালরূপেই জান। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা করছ। তোমরা মনে করছ, থিওসফিষ্টদের নামে বিজ্ঞাপন দিলে ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাবে। তোমরাও যেমন আহাম্মক!

আমি থিওসফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না; কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া। তারা কি বিজ্ঞাপনের জন্য তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমরা আগ-বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি আবার যখন ইংলণ্ডে যাব, তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় করব।

আমি বিশ্বাসঘাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট বলে রাখছি, কোন ধূর্তের পাল্লায় আমি পড়ছি না। আমার সঙ্গে কপটতা চলবে না। ... আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বলছি। একজন—মাত্র একজন যদি আমায় অনুসরণ করে, সেও ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকে। সফলতা বা বিফলতা আমি গ্রাহ্যই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্যের বৃথা কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি তাদের কেউ আমায় সাহায্য করতে এসেছিল? পাগল আর কি! আমি হয় আমার আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণ খাঁটি রাখব, তা না হয় মোটেই আন্দোলন চালাব না। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

আমাদের শাস্ত্রে আছে—'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' অর্থাৎ যারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা; সুতরাং আমি যেখানেই থাকি না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় তুমি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিত হয়েছ, তার উদ্‌যাপনে যে-কোন প্রকারে সহায়তা করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী আমি তৎসাধনে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করব ও তা সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা বলে মনে করব। ইতি

তোমার
বিবেকানন্দ

পুঃ—তোমরা কি ঠিক করলে, তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বার নয়। ইতি

—বি

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিন্' বেদান্ত প্রচারের জন্য, থিওসফি প্রচারের জন্য নয়। তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা উচিত ছিল। স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্যকালে অন্যরূপ করতে দেখলে আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি।

—বি

পুঃ—এই হচ্ছে জগৎ! যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ঘৃণিত সংসার!!!

—বি

২৫৬

[স্বামী যোগানন্দকে লিখিত]

228W. 39th St., নিউ ইয়র্ক
২৪ জানুআরী, ১৮৯৬

যোগেন ভায়া,

অড়হর দাল, মুগের দাল, আমসত্ত্ব, আমসি, আমতেল, আমের মোরব্বা, বড়ি, মসলা সমস্ত ঠিক ঠিকানায় পৌঁছিয়াছে। Bill of Lading-এতে (মাল-চালানের বিলে) নাম সহি করিবার ভুল হইয়াছিল ও invoice (চালান) ছিল না; তজ্জন্য কিঞ্চিৎ গোল হয়। পরে যাহা হউক ভালয় ভালয় সমস্ত দ্রব্য পৌঁছিয়াছে। বহু ধন্যবাদ! এক্ষণে যদি ইংলণ্ডে স্টার্ডির ঠিকানায়—High View, Caversham, Reading-এতে—ঐ প্রকার দাল ও কিঞ্চিৎ আমতেল পাঠাও তো আমি ইংলণ্ডে পৌঁছিলেই পাইব! ভাজা মুগদাল পাঠাইবার আবশ্যক নাই। ভাজা দাল কিছু অধিক দিন থাকিলে বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়। কিঞ্চিৎ ছোলার দাল পাঠাইবে। ইংলণ্ডে duty (শুল্ক) নাই—মাল পৌঁছিবার কোন গোল নাই। স্টার্ডিকে চিঠি লিখিয়া দিলেই সে মাল লইবে।

তোমার শরীর এখনও সারে নাই, বড়ই দঃখের বিষয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে যেতে পার, শীতকালে যেখানে বরফ বিস্তর পড়ে—যথা দার্জিলিঙ? শীতের গুঁতোয় পেটভায়া দুরস্ত হয়ে যাবে, যেমন আমার হয়েছে। আর ঘি ও মসলা খাওয়া একদম ছেড়ে দিতে পার? মাখন ঘির চেয়ে শীঘ্র হজম হয়। অভিধান পৌঁছিলেই খবর দিব। আমার বিশেষ ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। নিরঞ্জনের খবর এখনও ঠিকানা করিতে পার নাই? গোলাপ-মা, যোগীন-মা, রামকৃষ্ণের মা, বাবুরামের মা, গৌর-মা প্রভৃতি সকলকে আমার প্রণামাদি জানাইবে। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে আমার প্রণাম দিবে।

তিনমাস বাদে আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি, পুনরায় হজুগের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য। তারপর আসছে শীতে ভারতবর্ষে আগমন। পরে বিধাতার ইচ্ছা। সারদা যে কাগজ বার করতে চায়, তার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। শশীকে যত্ন করিতে বলিবে ও কালী প্রভৃতিকে। কাহারও এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিবার আবশ্যক নাই। আমি ভারতে যাইয়া তাদের তৈয়ার করিব। তারপর যেথায় ইচ্ছা যাইবে। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

পুঃ—নিজেরা কিছু করে না এবং অপরের কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়—এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দঃখের কারণ। অতএব ঐ দুটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে Opportunity (সুযোগ) দাও। পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না। ইতি

—বি

২৫৭*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

228W. 39th St., নিউ ইয়র্ক
১০ ফেব্রুআরী, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনী,

তুমি এখন পর্যন্ত আমার চিঠি পাওনি জেনে অবাক হলাম। তোমার চিঠি পাবার ঠিক পরেই আমি চিঠি লিখেছিলাম এবং নিউ ইয়র্কে আমার তিনটি বক্তৃতাসংক্রান্ত কিছু পুস্তিকা পাঠিয়েছিলাম। এই সভায় প্রদত্ত রবিবারের বক্তৃতাগুলি আজকাল সাঙ্কেতিক লিপিতে নেওয়া হচ্ছে, পরে ছাপা হবে। তিনটি বক্তৃতা নিয়ে দুটি পুস্তিকা হয়েছে, যার অনেকগুলির অনুলিপি আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। নিউ ইয়র্কে আরও দু সপ্তাহ থাকব, তারপর ডেট্রয়েট যাব, সেখানে থেকে দু-এক সপ্তাহের জন্য আবার বোস্টন ফিরে আসব।

নিরন্তর কার্য করার ফলে এ বৎসর আমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গেছে। স্নায়ুগুলি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই শীতে আমি একরাত্রিও ভালভাবে ঘুমাইনি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমার খাটুনি খুব বেশী হচ্ছে, এখনও ইংলণ্ডে এক বৃহৎ কার্য বাকী আছে।

আমাকে তা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তারপর আশা করি ভারতে ফিরে বাকী জীবনটা বিশ্রাম করে কাটাতে পারব।

এখন আমি বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা করছি। আশা করি, তা কিছুটা পাব এবং ভারতের লোকেরা আমাকে রেহাই দেবে। খুব ইচ্ছা হয়, কয়েক বছরের জন্য বোবা হয়ে যাই এবং একেবারে কথা না বলি!

এই সকল পার্থিব সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের জন্য আমি জন্মাইনি। স্বভাবতঃ আমি স্বপ্নচারী এবং শান্তিপ্রিয়। আমি আজন্ম আদর্শবাদী, স্বপ্নজগতেই আমার বাস, বাস্তবের সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিঘ্ন ঘটায় এবং আমাকে অসুখী করে তোলে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!

তোমাদের চার বোনের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ; এ দেশে আমি যা কিছু পেয়েছি তার জন্য তোমাদের কাছে ঋণী। তোমরা নিরন্তর পবিত্র ও সুখী হও। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাদের সর্বদা গভীরতম কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করব। আমার সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ। সচেতন স্বপ্নচারী হওয়া আমার উচ্চাভিলাষ, বস্। সকলকে আমার ভালবাসা—ভগিনী জোসেফিনকে।

সতত তোমার স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

২৫৮*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

228W.39th St., নিউ ইয়র্ক
১৩ ফেব্রুআরী, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,
ভারতবর্ষ থেকে যে সন্ন্যাসী আসবেন, তিনি তোমাকে অনুবাদের কাজে এবং অন্য কাজেও সাহায্য করবেন নিশ্চয়। অতঃপর আমি যখন (ওখানে) যাব, তখন তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। আজ আর একজন সন্ন্যাসীকে তালিকাভুক্ত করা হল। এবারের আগন্তুকটি একজন পুরুষ; সে খাঁটি আমেরিকান এবং ধর্মপ্রচারক হিসাবে এদেশে তার কিছু খ্যাতি আছে। তার নাম ছিল ডাঃ ষ্ট্রীট; এখন সে যোগানন্দ, কারণ যোগের দিকেই তার সব ঝোঁক।

আমি এখান থেকে ‘ব্রহ্মবাদিন্’-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে কার্যবিবরণ পাঠাচ্ছি। সে-সব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভারতে কিছু পৌঁছাতে কি দীর্ঘ সময়ই না লাগে! আমেরিকায় কাজ সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে। শুরু থেকেই কোন ভোজবাজি না থাকায় আমেরিকার সমাজের সেরা লোকদের দৃষ্টি বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে ‘ইৎশীল’ (lziel) অভিনয় করেছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবন। এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুম-মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল! মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

আমি এই বুদ্ধ-ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেস্‌লা ছিলেন। মাদাম (বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। মোরেল ঔৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন; কিন্তু মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যপী মহৎ, সমষ্টি মন বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; তাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি।
৯২
উহার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে সৃষ্টিতত্ত্ব—তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখান হবে।

ব্রহ্ম=নিরপেক্ষ পূর্ণসত্তা
|
মহৎ বা ঈশ্বর=আদ্যা সৃষ্টিশক্তি

পরলোকতত্ত্ব কেবল অদ্বৈতবাদের দিক্ থেকে দেখান হবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন—মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও সেখান থেকে বিদ্যুল্লোকে যান; সেখানে একজন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। (অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন।)

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া-আসা নাই, আর এই যে-সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এগুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপন্ন মাত্র। অর্থাৎ সর্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্ছে আদিত্যলোক বা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক—তা আদিত্যলোককে ঘিরে আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরও ওপর বিদ্যুল্লোক—অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যেখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বললেই হয় আর তখন বলা কঠিন যে, বিদ্যুৎ জিনিষটা জড় না শক্তি। তারপর ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নেই, আকাশও নেই; সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আদ্যাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। আর এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় (ব্যষ্টি) জীব সমস্ত বিশ্বকে সমষ্টিরূপে অথবা মহতের বা বুদ্ধির সংহতিরূপে কল্পনা করে। এঁকেই পুরুষ বলে বোধ হয়—ইনি সমষ্টি আত্মাস্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যস্বরূপ একত্বকে অনুভব করে। অদ্বৈতমতে জীবের আসা-যাওয়া নেই। এই দৃশ্যগুলি ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবির্ভূত হতে থাকে; আর এই যে বর্তমান দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাও এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই হয়ে থাকে—তবে প্রলয় মানে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া, আর সৃষ্টি মানে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে আসা।

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের জগৎ মাত্র দেখতে পায়, তখন ঐ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়, এবং তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়—যদিও অন্যান্য বদ্ধ জীবের পক্ষে ঐ জগৎ থেকে যায়। নাম-রূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে ততক্ষণই তরঙ্গ বলি, যতক্ষণ তা নাম-রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গ শান্ত হলে তা সমুদ্রই হয়ে যায়, আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়। সুতরাং যে জলটা নাম-রূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নাম-রূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অথচ নাম-রূপকেও তরঙ্গ বলা চলে না। তরঙ্গ জলে পরিণত হলেই নাম-রূপ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে অন্যান্য তরঙ্গগুলির অন্যান্য নাম-রূপ থাকে বটে। এই নাম-রূপকেই বলে মায়া, আর জলই ব্রহ্ম। তরঙ্গ জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না; অথচ তরঙ্গরূপে তার নাম-রূপ ছিল। আবার এই নাম-রূপ এক মুহূর্তের জন্য তরঙ্গ থেকে পৃথক্ ভাবে থাকতে পারে না, যদিও জলস্বরূপে সেই তরঙ্গটি চিরকালই নাম-রূপ থেকে পৃথক্ থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নাম-রূপকে কখনই পৃথক্ করা চলে না, সেইহেতু তারা যে 'আছে' তা বলা যেতে পারে না। কিন্তু তারা একেবারে যে শূন্য, তাও নয়—একেই বলে মায়া।

আমি এই সকল ভাবকে সাবধানে রূপ দিতে চাই; তুমি নিশ্চয় এক নিমেষেই বুঝে নেবে, আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন চিত্ত বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্ব আরও ভাল করে দেখাতে গেলে শারীর-বিজ্ঞান (Physiology) আরও বেশী করে আলোচনা করতে হবে। উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। তবে আমি এখন এ বিষয়ে এমন স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি, যা সমস্ত ভোজবাজি থেকে মুক্ত। আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে তীব্র কর্মের মসলাতে সুস্বাদু করে এবং যোগের পাকশালায় রান্না করে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

২৫৯*

১৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্পে দৃঢ়ব্রত আছ জেনে খুব খুশী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; সেজন্য তুমি কিছু মনে করো না, কারণ তুমি জানই তো মাঝে মাঝে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর যতই তা বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম।

ধৈর্য ধরে থাক, বৎস! কাজ এত বাড়বে যে, তুমি ভাবতেও পার না। আমরা আশা করছি, এখানে শীঘ্রই বহু সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানেও অনেক পাব। স্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর জন্য তোড়জোড় করছে। সবই সুন্দর, খুব সুন্দর চলছে। তুমি পত্রিকাখানিকে একটা কমিটির হাতে দেবার যে সঙ্কল্প করেছ, আমি তা মোটেই অনুমোদন করি

না। ও-রকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত পরিচালনা নিজ হাতে রাখ এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাক। পরে কি করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ করব। কমিটি করা মানে—নানা রুচির লোক আসবে তাদের বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে সবটা পণ্ড করবে। তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন, তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে। সকল কাজেই কৃতকার্য হবার পূর্বে শত শত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাবে।

১| এ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখছি, এরই সঙ্গে সঙ্গে গত রবিবারের বক্তৃতার ফলে আমার সব কয়খানি হাড়ে ব্যথা চলেছে। আমি এক্ষণে মার্কিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউ ইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি; কিন্তু এর জন্য আমাকে ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছে। গত দু-বৎসর এক পয়সাও আসেনি। হাতে যা-কিছু ছিল, তা প্রায় সবই এই নিউ ইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাবে।

তারপর ভাব দেখিঃ হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আবার শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করা, যা একদিকে সহজ সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হবে! এ যারা চেষ্টা করেছে, তারাই বলতে পারে—কি কঠিন ব্যাপার! সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য থেকে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্তসকল বের করতে হবে; আর বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে, আবার এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত। প্রভুই জানেন, আমি কত দূর কৃতকার্য হব। কর্মে আমাদের অধিকার, ফলে নয়। বড়ই কঠিন কাজ, বৎস, বড়ই কঠিন। যতদিন না অপরোক্ষানুভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা করবার উপযুক্ত একদল শিষ্য তৈরী হচ্ছে, ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির রেখে নিজ আদর্শ ধরে থাকা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এরই মধ্যে অনেকটা কৃতকার্য হওয়া গেছে। আমাকে না বুঝবার জন্য আমি মিশনরীদের বা অন্যদের আর দোষ দিই না; তারা এ ছাড়া আর কি করতে পারত? তারা তো জীবনে পূর্বে কখনও এমন লোক দেখেনি, যে কামিনীকাঞ্চনের মোটেই ধার ধার না। প্রথমে যখন তারা দেখলে, তারা বিশ্বাস করতে পারলে না—পারবেই বা কিরূপে? তুমি যদি কখনও ভেবে থাক যে, ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যজাতিদের ধারণা ভারতীয়দেরই অনুরূপ, তাহলে তুমি নিতান্তই ভ্রান্ত। তাদের অনুরূপ শব্দ হচ্ছে বীর্য ও সাহস (virtue and courage)। তাদের সাধুত্বের আদর্শ ঐ পর্যন্ত। তাদের মতে বিবাহাদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম—এর অভাবে মানুষ অসাধু; আর যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্মান না করে সে তো অসৎ। … এখন লোকেরা দলে দলে আমার কছে আসছে। এখন শত শত লোক বুঝেছে যে, এমন লোক আছে, যারা নিজেদের কামবৃত্তিকে সত্যই সংযত করতে পারে; আর সাধুতা ও সংযমের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও বাড়ছে। যারা ধৈর্য ধরে থাকে, তাদের সব কিছুই জুটে যায়। তুমি আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমার
বিবেকানন্দ

২৬০*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

228W., 39th St., নিউ ইয়র্ক
২৯ ফেব্রুআরী, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

সম্ভব হলে মে মাসের আগেই আমি যাচ্ছি। এর জন্য তোমায় উদ্বিগ্ন হতে হবে না। পুস্তকাটি সুন্দর হয়েছে। খবরের কাগজের অংশগুলি পেলে পাঠিয়ে দেব।

পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এখানে এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। নিউ ইয়র্কে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। তারাই সাঙ্কেতিক লেখার ও ছাপার যাবতীয় খরচা দিয়েছে, এই শর্তে যে বইগুলির স্বত্বাধিকার তাদের থাকবে। সুতরাং এই পুস্তিকা ও পুস্তকগুলি তাদের। একখানা বই—'কর্মযোগ' ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে; তার চেয়ে অনেক বড় 'রাজযোগ' ছাপা চলছে; 'জ্ঞানযোগ' পরে প্রকাশিত হতে পারে। কথা-বলার ভাষা হবার ফলে বইগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করবে, পূর্বেই তা লক্ষ্য করেছ। আপত্তিকর যা কিছু ছিল—সব ছেঁটে দিয়েছি, এবং এঁরা বইগুলি বার করতে সাহায্য করেছে। বইগুলি সমিতির সম্পদ, মিসেস ওলি বুল এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মিসেস লেগেটও আছেন।

এখন বইগুলি যে তাঁদের হবে, এটা তো ন্যায়সঙ্গত। তাঁরাই প্রকাশক বলে অন্য প্রকাশকদের হস্তক্ষেপের কোন ভয় নেই।

যদি ভারত থেকে বই আসে, তবে সেগুলি রেখে দেবে।

সাঙ্কেতিক লেখক গুডউইন একজন ইংরেজ; সে আমার কাজে এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছে যে, আমি তাকে ব্রহ্মচারী

করে নিয়েছি, সে আমার সঙ্গে ঘুরছে, আমরা একসঙ্গে ইংলণ্ডে যাব। সে বরাবরের মত আমার খুব কাজে লাগবে।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

২৬১

বোষ্টন
(১ম সপ্তাহ) মার্চ, ১৮৯৬

Dear Sarada (প্রিয় সারদা),
৯৩

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। মহোৎসব উপলক্ষে আমি এক cable (তার) পাঠাই, তাহার কোন সংবাদ তো লিখ নাই দেখিতেছি। কয়েক মাস পূর্বে শশী যে সংস্কৃত অভিধান পাঠাইয়াছিল, তাহা তো আজিও পৌঁছে নাই। ... আমি শীঘ্রই ইংলণ্ড যাইতেছি। শরতের এখন আসিবার কোনই আবশ্যক নাই; কারণ আমি নিজেই ইংলণ্ড যাইতেছি। যাদের মনের ঠিকানা করতে ছ-মাস লাগে, তাদের আমার দরকার নাই। তাকে ইওরোপ বেড়াবার জন্য আমি ডাকিও নাই এবং টাকাও আমার নাই। অতএব তাকে আসতে বারণ করবে, কাউকেই আসতে হবে না।

টিবেটের (তিব্বতের) সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ করে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হল। প্রথম—নোটোভিচ-এর বই সত্য—nonsence (বাজে কথা)! তুমি কি original (মূল গ্রন্থ) দেখেছ বা India-য় (ভারতে) এনেছ? দ্বিতীয়—Jesus এবং Samaritan Woman-এর (যীশু ও সামারিয়া-দেশীয় নারীর) ছবি কৈলাসের মঠে দেখেছ। কি করে জানলে সে যীশুর ছবি, ঘিষুর নয়? যদি তাও হয়, কি করে জানলে যে, কোন ক্রিশ্চান লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই? টিবেটিয়ানদের (তিব্বতীদের) সম্বন্ধে তোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Tibet (তিব্বতের ভিতরটা) তো দেখ নাই—only a fringe of the traderoute (শুধু বাণিজ্য-পথের ধারে ধারে একটুখানি দেখিয়াছ)। ঐসকল স্থানে কেবল dregs of nation (জাতের নিকৃষ্ট ভাগটাই) দেখতে পাওয়া যায়। কলকেতার চীনেবাজার আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়?

শশীর সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করে article (প্রবন্ধ) প্রভৃতি লিখবে ... । ইতি

নরেন্দ্র

২৬২*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
১৭ মার্চ, ১৮৯৬

প্রেমাস্পদেষু—,
এইমাত্র তোমার শেষ চিঠিখানা পেলাম, খুব ভয় পেয়ে গেছি।

বক্তৃতাগুলি হয়েছিল কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে, তাঁরা সাঙ্কেতিক লিপির এবং অন্য সব কিছুর খরচ দেন—এই শর্তে যে একমাত্র তাঁদেরই সেগুলি প্রকাশ করার অধিকার থাকবে। সেইমত তাঁরা ইতোমধ্যেই রবিবারের বক্তৃতাগুলি এবং রাজযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বিষয়ে তিনটি বই ছাপিয়েছেন। বিশেষতঃ 'রাজযোগে'র অনেকখানি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র অনুবাদসহ ঢেলে সাজান হয়েছে। রাজযোগ লংম্যানদের হাতে। বইগুলি ইংলণ্ডে ছাপানর কথায় এখানকার বন্ধুরা খুব চটে গিয়েছেন; যেহেতু আইনতঃ আমি সেগুলি তাঁদের দিয়ে দিয়েছি। এখন কি করা যায়—বুঝতে পারছি না। পুস্তিকাগুলি প্রকাশের ব্যাপারটা গুরুতর নয়, কিন্তু পুস্তকগুলির এত পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন করা হয়েছে যে, আমেরিকান সংস্করণ দেখে ইংরেজী সংস্করণ চেনাই যাবে না। এখন অনুরোধ করছি—এই বইগুলি প্রকাশ করো না, অন্যথা আমি বড় অপ্রস্তত হয়ে যাব এবং অফুরন্ত ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে আমার আমেরিকার কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

ভারতের শেষ চিঠিতে জেনেছি যে, একজন সন্ন্যাসী ভারত থেকে রওনা হয়েছেন। আমি মিস মূলারের কাছ থেকে একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি, মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকেও একখানা; লেগেট পরিবার আমার প্রতি খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েছে।

আমি মিঃ চ্যাটার্জি সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্য সূত্র থেকে শুনতে পেলাম যে, তাঁর হল অর্থকষ্ট—থিওসফিষ্টরা তাঁকে টাকা দিতে পারছে না। তাছাড়া ভারত থেকে একজন অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ লোক আসছে, তার তুলনায় তিনি আমাকে যেটুকু

সাহায্য করতে পারবেন, তা যৎসামান্য। তাঁর সঙ্গে ঐ পর্যন্তই। আমাদের তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।

তোমাকে আবার অনুরোধ করছি, এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারটা ভেবে দেখো, এবং মিসেস বুলকে কয়েকটি চিঠি লেখো ও তাঁর মাধ্যমে আমেরিকার বেদান্তের বন্ধুদের মতামত জিজ্ঞেস কর। মনে রেখো আমাদের প্রচারিত নীতি 'সকল প্রাণীর একত্ব'; আর জাতীয়তামূলক সমস্ত ভাবই দুষ্ট কুসংস্কার মাত্র। অধিকন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা যে, যিনি অপরের মতে সায় দিতে প্রস্তুত, শেষে তিনি তাঁর নিজ মতেরই জয় প্রত্যক্ষ করেন। সর্বদা নতিস্বীকারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। আমাদের সকল বন্ধুকে ভালবাসা।

ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমি মার্চ মাসেই যত তাড়াতাড়ি পারি নিশ্চয় যাচ্ছি।

২৬৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

প্রিয় ভগিনী,

আমার ভয় হচ্ছে—তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ, তাই আমার একটি চিঠিরও জাবাব দাওনি। তা এখন হাজার ক্ষমা চাইছি। সৌভাগ্যক্রমে কমলা রঙের কাপড় পেয়ে গেছি এবং যত শীঘ্র পারি একটি কোট তৈরী করে নিচ্ছি। শুনে আনন্দিত হলাম যে, মিসেস বুলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। তিনি সত্যি মহীয়সী নারী এবং সহৃদয় বন্ধু। একটি কথা ভগিনী, ঘরে দুটি খুব পাতলা সংস্কৃত পুস্তিকা আছে। যদি অসুবিধা না হয়, সেগুলি দয়া করে পাঠিয়ে দিও। ভারত থেকে বইগুলি নিরাপদে এসে পৌঁছেছে এবং তার জন্য আমাকে কোন শুল্ক দিতে হয়নি। কম্বলগুলি ও গালিচা এখনও এসে পৌঁছয়নি জেনে আমি অবাক হয়েছি। মাদার টেম্পলের সঙ্গে আর দেখা করতে যেতে পারিনি; সময় পাইনি। যখনই একটু সময় পাই গ্রন্থাগারে কাটাই।

তোমাদের সকলকে আমার চিরদিনের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

তোমাদের সতত স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিঃ হাউ বরাবরই ক্লাসে আসছেন, এই শেষ ক-দিন আসেননি। মিস হাউকে আমার ভালবাসা জানাবে।

—বি

২৬৪*

বোষ্টন
২৩ মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার চিঠির উত্তর আগে দিতে পারিনি; আর এখন আমায় বেজায় তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। সম্প্রতি যাদের আমি সন্ন্যাস দিয়েছি, তাদের মধ্যে সত্যই একজন স্ত্রীলোক, ইনি মজুরদের নেত্রী ছিলেন; বাকী সব পুরুষ। ইংলণ্ডে আমি আরও কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেব, তারপর তাদের আমার সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। হিন্দুদের চেয়ে এইসব 'সাদা মুখ' সেখানে বেশী প্রভাব বিস্তার করবে; তা ছাড়া তাদের কাজ করবার শক্তিও বেশী, হিন্দুরা তো মরে গেছে। ভারতের একমাত্র ভরসার স্থল জনসাধারণ—অভিজাত সম্প্রদায় তো শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে মরে গেছে।

হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই তাকে আমার বক্তৃতাগুলি ছাপাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, কারণ সে আমার পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরীব।

'ব্রহ্মবাদিন্'-এ লম্বা লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইওরোপ ও আমেরিকায় উহা চলার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। তুমি এটাকে সংস্কৃতে ছাপালেই তো পার? সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং অফুরন্ত সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়তো বেশ সাহায্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসী তো আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধার ধারে না! একান্ত যদি রাখতে চাও তো না হয় একটা প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর—বাকীগুলিতে সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উচিত এবং লেখা হালকা হওয়া উচিত। আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ আমার সহজ ভাষা। আচার্যের মহত্ত্ব হচ্ছে—তাঁর ভাষার সরলতা। তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পার, তবে 'ব্রহ্মবাদিন্' এখানে জনপ্রিয় হবে—নতুবা নয়। যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তারা শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে।

শ্রীগুরু মহারাজের জন্মতিথিতে আমি ভারতে যে তার পাঠিয়েছিলাম, সেটি তারা পেয়েছে কিনা একটু খোঁজ নিয়ে দেখো তো।

আগামী মাসে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। আমার ভয় হয়—আমার খাটুনি অত্যধিক হয়ে পড়ছে; এই দীর্ঘ একটানা পরিশ্রমে আমার স্নায়ুমণ্ডলী যেন ছিঁড়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকে সহানুভূতি আমি কিছুমাত্র চাই না; শুধু এইজন্য লিখছি যে, তোমরা আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করো না। যতদূর ভালভাবে সম্ভব কাজ করে যাও। আমার দ্বারা সম্প্রতি কোন বড় কাজ হবে, এমন আশা নেই বলেই মনে হয়। যা হোক সাঙ্কেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিখে নেবার ফলে অনেকটা সাহিত্য গড়ে উঠেছে দেখে আমি খুশী। চারিখানি বই তৈরী হয়ে গেছে। একখানি বেরিয়ে গেছে, 'পাতঞ্জলসূত্রে'র অনুবাদ সহ 'রাজযোগে'র বইখানি ছাপা হচ্ছে, 'ভক্তিযোগে'র বইটা তোমার কাছে আছে, আর 'জ্ঞানযোগে'রটা গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্য তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া রবিবারের বক্তৃতাগুলিও ছাপা হয়ে গেছে। স্টার্ডি বিরাট কর্মী, সে সব কাজই খুব এগিয়ে দিতে পারে। যা হোক, লোককল্যাণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই মনে করেই আমি সন্তুষ্ট; আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন গিরিগুহায় ধ্যানে মগ্ন হব, তখন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে।

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২৬৫-২৭৪

২৬৫*

আমেরিকা
মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম। আমি আমার শিষ্যদের বলেছি, যাতে তারা তোমার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে। জনকয়েক ইতোমধ্যেই পাওয়া গেছে। কাজ চালিয়ে যাও। কিন্তু তুমি মনে রেখো যে, আমাকে লণ্ডন নিউ ইয়র্ক কলিকাতা ও মান্দ্রাজে কাজ চালাতে হচ্ছে। এখন আমি লণ্ডনের কাজে যাচ্ছি। প্রভুর ইচ্ছে হলে এখানে ও ইংলণ্ডে গৈরিক-পরিহিত সন্ন্যাসীতে ছেয়ে যাবে। বৎসগণ, কাজ করে যাও।

মনে রেখো, যতদিন তোমাদের গুরুর উপর শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবে না। ভাষ্য তিনখানির ঐ অনুবাদটি পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টিতে একটা মস্ত বড় কাজ হবে।

ঐ ‘সর্বজনীন ভাবের মন্দির’টি (Temple of the Universal Spirit) আমি ছেড়ে দিয়েছি—এখন একটা নূতন নাম দিয়েছি … । ইতোমধ্যেই আমার দুইজন সন্ন্যাসী শিষ্য ও কয়েক শত গৃহস্থ শিষ্য হয়েছে; কিন্তু বৎস, জনকয়েক ছাড়া তাদের অধিকাংশই গরীব; তবে জনকয়েক খুব ধনীও আছে। এ সংবাদটি এখনই প্রকাশ করে দিও না যেন। যথাসময়ে আমি জনসাধারণের সামনে আবার আত্মপ্রকাশ করব। স্থির হয়ে থাক, বৎস! স্থির হও, আর কাজ করে যাও। ধৈর্য, ধৈর্য! আগামী বৎসর আমি নিউ ইয়র্কে একটি মন্দির করবার আশা রাখি; তারপর প্রভু জানেন।

এখানে একখানি পত্রিকা চালাব; লণ্ডনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে ওখানেও তাই করব। আমার ভালাবাসাদি জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

২৬৬*

আমেরিকা
১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

গত সপ্তাহে আমি তোমাকে ‘ব্রহ্মবাদিন্’ সম্বন্ধে লিখেছিলাম। তাতে ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। ঐগুলি সব একসঙ্গে পুস্তিকাকারে বের করা উচিত। কয়েক শত আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে গুডইয়ারের নামে পাঠাতে পার। আমি বিশ দিনের মধ্যে জাহাজে ইংলণ্ড রওনা হচ্ছি। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে আমার আরও বড় বড় বই আছে। ‘কর্মযোগ’ ইতোমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। ‘রাজযোগ’খানা খুব বড় হবে—তাও যন্ত্রস্থ হয়েছে। ‘জ্ঞানযোগ’খানা বোধ হয় ইংলণ্ড থেকে ছাপাতে হবে।

তোমরা ‘ব্রহ্মবাদিন্’-এ কৃ—র একখানা পত্র ছেপেছ, কাজটা ভাল হয়নি। … ‘ব্রহ্মবাদিন্’-এর সুরের সঙ্গে ওটি খাপ খায় না। … কোন সম্প্রদায়—ভালই হোক, আর মন্দই হোক, তাদের বিরুদ্ধে ‘ব্রহ্মবাদিন্’-এ কিছু ছাপান যেন না হয়। অবশ্য বুজরুকদের প্রতি গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাবারও কোন আবশ্যক নেই। আবার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাগজটা এতই পারিভাষিক হয়ে পড়েছে যে, এখানে এর গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্যদেশবাসী ঐ সব দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত কথা বা পরিভাষা জানেও না, জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে। কোন একটা মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে। আর সর্বদা মনে রেখো যে, তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন করে কথা বলছ; আর তোমরা যা বলতে চাইছ, জগৎ তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক অনূদিত সংস্কৃত শব্দ খুব সাবধানে ব্যবহার করো; আর ভাষা যতটা সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করো।

তোমরা এই পত্র পাবার আগেই আমি ইংলণ্ড পৌঁছে যাব। সুতরাং আমাকে স্টার্ডির ঠিকানায়—হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, ইংলণ্ড—পত্র লিখবে। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

২৬৭*

চিকাগো
৬ এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,
আপনার হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পেয়েছি। বন্ধুগণের সঙ্গে আমি ইতোমধ্যে অনেক সুন্দর স্থান দেখেছি এবং অনেকগুলি ক্লাস করেছি। আরও কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, তারপর আগামী বৃহস্পতিবার রওনা হব।

মিস এডামসের অনুগ্রহে এখানকার সব ব্যবস্থাই সুন্দর হয়েছে; তিনি এত ভাল এবং দরদী! গত দুইদিন যাবৎ সামান্য একটু জ্বরে ভুগছি বলে দীর্ঘ পত্র লিখতে পারলাম না।বোষ্টনের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

২৬৮*

125, East, 44th St, নিউ ইয়র্ক
১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয়—,
… এই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোকটি বোম্বে থেকে একখানি চিঠি নিয়ে এখানে আমার কাছে এসেছেন। ভদ্রলোক যন্ত্রশিল্পে দক্ষ (practical mechanic), এবং তাঁর একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহ নির্মিত দ্রব্যগুলির কারখানা দেখে বেড়ান। … আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না; তিনি যদি মন্দ লোকও হন, তা হলেও আমার স্বদেশবাসীদের ভেতর এরকম বেপরোয়া সাহসের ভাব দেখলে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি। তাঁর নিজের খরচ চালাবার মত যথেষ্ট টাকা আছে।

লোকটি কতদূর সাচ্চা—এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তা হলে তাঁকে সুবিধা দেবেন; তিনি ঐ কারখানাগুলি দেখবার একটা সুযোগ চান মাত্র। আশা করি, তিনি খাঁটি লোক, আর আপনি তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাদি জানবেন। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

২৬৯*

[ডাঃ নাঞ্জুণ্ড রাওকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় ডাক্তার,
আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। আগামী কাল আমি ইংলণ্ডে রওনা হচ্ছি, তাই আপনাকে দু-চারটি মাত্র আন্তরিক কথা লিখতে পারব। ছেলেদের প্রস্তাবিত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতিটি আছে এবং তা চালিয়ে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও করব। আপনার উচিত, 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর ধারা অবলম্বন করে কাগজটাকে স্বাধীনমতাবলম্বী করা; কেবল ভাষা ও লেখাগুলো যাতে আরও সহজবোধ্য হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব অপূর্ব গল্প ছড়ান আছে, তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় করা দরকার; এই একটা মস্ত সুযোগ রয়েছে, যা হয়তো আপনারা স্বপ্নেও ভাবেননি। এই জিনিষটাই আপনাদের কাগজের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন সময় পাব, তেমন আপনাদের জন্য আমি যত বেশী পারি—গল্প লিখব। কাগজটাকে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তার জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' রয়েছে। এভাবে চললে কাগজটা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। ভাষাটা যতদূর সম্ভব সহজ করবেন, তা হলেই আপনারা সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্ববহুল মোটেই করবেন না। লেনদেনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাখবেন—অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ভারতে একটা জিনিষের বড়ই অভাব—একতা বা সংহতিশক্তি, তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তিতা।

কলিকাতায় বাঙলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই—প্রথম দু-বছরই মাত্র বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি; গত দু-বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলিকাতার লোকদের পাঠাবার মত টাকা আমার মোটেই নেই। তথাপি আপনাকে সাহায্য করতে পারে,

এমন লোক আমি শীঘ্রই জুটিয়ে দেব। বীরের মত এগিয়ে চলুন। একদিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হউন, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চিরবিশ্বস্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। মনে রাখবেন—ব্যক্তিগত ‘চরিত্র’ এবং ‘জীবন’ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নহে। এই চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই উদ্বেগ ও ঈর্ষার ভাব মনে উঠবে, তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন। ঈর্ষাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের কারণ। এ থেকেই আমাদের জাতির সর্বনাশ। এটি সর্বদা পরিত্যাজ্য। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক; আপনার সাফল্য কামনা করি। ইতি

আপনার স্নেহপরায়ণ
বিবেকানন্দ

২৭০*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

6 West, 43rd St., নিউ ইয়র্ক
১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬

স্নেহের ভগিনীগণ,

রবিবার নিরাপদে এসে পৌঁছেছি এবং অসুস্থতার জন্য আগে চিঠি দিতে পারিনি। হোয়াইট স্টার লাইনের ‘জার্মানীক’ জাহাজে আগামী কাল বেলা বারটায় যাত্রা করছি। ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদের চিরস্থায়ী স্মৃতির সঙ্গে—

তোমাদের চির স্নেহের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

২৭১

[স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। শরৎ পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইলাম। তোমার প্রেরিত Indian Mirror (ইণ্ডিয়ান মিরর) ও পত্র পাইলাম। লেখা উত্তম হইতেছে, বরাবর লিখিয়া যাও। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম—এ-কথা ভুলিবে না। ‘মুগের ডাল তৈয়ার হয় নাই’ মানে কি? ভাজা মুগের ডাল পাঠাইতে আমি পূর্বেই নিষেধ করিয়াছি, ছোলার ডাল ও কাঁচা মুগের ডাল পাঠাইতে বলি। ভাজা মুগ এতদূর আসিতে খারাপ ও বিস্বাদ হইয়া যায়, সিদ্ধ হয় না। যদি এবারও ভাজা মুগ হয়, টেমসের জলে যাইবে ও তোমাদের পণ্ডশ্রম। আমার চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর? চিঠি হারাও বা কেন? যখন চিঠি লিখবে, পূর্বের পত্র সম্মুখে রাখিয়া লিখিবে। তোমাদের একটু business (কাজ-চালানর) বুদ্ধি আবশ্যক। যে-সকল কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর প্রায়ই পাই না—কেবল আবোল-তাবোল! … চিঠি হারায় কেন? ফাইল হয় না কেন? সকল কাজেই ছেলেমানুষি! আমার চিঠি হাটের মাঝে পড়া হয় বুঝি? আর যে আসে, সে-ই ফাইল টেনে চিঠি পড়ে বুঝি? ... You need a little business faculty. … Now what you want is organization—that requires strict obedience and division of labour. I will write out everything in every particular from England, for which I start to-morrow. I am determined to make you decent workers thoroughly organized.
৯৪
…

'Friend' (ফ্রেণ্ড—বন্ধু) শব্দ সকলের প্রতি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী ভাষায় ও-সকল cringing politeness (দীনা হীনা ভদ্রতা) নাই; ঐ সকল বাঙলা শব্দের তর্জমা হাস্যাস্পদ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বর, ভগবান্—ও-সকল এদেশে কি চলে? M—has a tendency to put that stuff down everybody's throat, but that will make our movement a little sect. You keep separate from such attempts. At the same time, if people worship him as God, no harm. Neither encourage, nor discourage. The masses will always have the person, the higher ones, the principle; we want both. But principles are universal, not persons. Therefore stick to the principles he taught; let people think whatever they like of this person. … Truce to all quarrels and jealousy and bigotry! These will spoil everything. 'The first should be last and the last first'.
৯৫

‘মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ’ (আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত)। ইতি

বিবেকানন্দ

২৭২*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

Waveney Mansions
Fairhazel Gardens, London
এপ্রিল, ১৮৯৬, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ

প্রিয় স্টার্ডি,
আমি সকালবেলা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার চিঠিতে জানিয়েছেন—যদি আমি অক্সফোর্ডে বক্তৃতা করতে যাই, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

তোমার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ কর্তৃক সম্পাদিত অথর্ববেদ-সংহিতার জন্য তুমি কি চিঠি লিখেছ?

—বি

২৭৩

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

হাইভিউ, কেভার্শ্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,
শরতের মুখে সবিশেষ অবগত … হইলাম। ‘দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল’—একথা সর্বদা মনে রাখিবে। … আমি নিজের কর্তৃত্বলাভের আশায় নয়, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও; এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। তোমাদের মধ্যে দ্বেষভাব ও অহমিকা প্রবল হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। যারা দশজনে দশদিন প্রীতির সহিত বাস করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের দ্বারা জগতে প্রীতিস্থাপন কি সম্ভব? নিয়মবদ্ধ হওয়া ভাল নয় বটে, কিন্তু অপক্ক অবস্থায় নিয়মের বশে চলা আবশ্যক—অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ অলস মনে অনেক পরচর্চা, দলাদলি প্রভৃতি ভাব সহজেই আসে। সেইজন্য নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি লিখিতেছি। তদনুযায়ী কাজ যদি কর, পরম মঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। না যদি কর, শীঘ্রই সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবার সম্ভাবনা।

প্রথমতঃ মঠ চালাইবার সম্বন্ধে লিখিঃ

১। মঠের জন্য একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভাড়া লইবে অথবা বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। একটা বড় হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য, এবং একটি ছোট ঘর—সেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয়—আরও একটা বড় হল ঐ বাটীতে থাকার আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা সাধারণের জন্য হইবে।

২। কোন লোক মঠে আসিলে সে যার সহিত দেখা করিতে চায়, তারই সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে দিক্ না করে।

৩। এক একজন পরিবর্তন করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে সর্বসাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে—যাহাতে সাধারণ লোক যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তাহার সদুত্তর পায়।

৪। যে যার আপনার ঘরে বাস করিবে—বিশেষ কার্য না পড়িলে আর একজনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে যাহার পড়িবার ইচ্ছা হইবে, যাইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া বা অপরের সহিত কথাবার্তা একেবারেই নিষেধ

করিবে। নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে।

৫। সারাদিন সকলে পড়ে (মিলে) একটা বাজে কথা কওয়া ও বাহিরের লোক যে-সে আসছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, তাহা একেবারেই নিষেধ।

৬। কেবল যাহারা ধর্মজিজ্ঞাসু, তাহারা শান্তভাবে আসিয়া সাধারণ হলে বসিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে। অথবা কোন সাধারণ জিজ্ঞাস্য থাকে, সেদিনকার জন্য যিনি সেই কার্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবে।

৭। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি, পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করিবে।

৮। একটা ছোট ঘর অফিস হইবে। যিনি সেক্রেটারী, তিনি সেই ঘরে থাকিবেন ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্ত থাকিবে। তিনি সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন ও যে-সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি আসে, তাহা তাঁহার নিকট আসিবে ও তিনি পত্রাদি না খুলিয়া যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাঁটিয়া দিবেন। পুস্তক ও পত্রিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে।

৯। একটা ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য। তদ্ভিন্ন অপর কোন স্থানে তামাক খাইবার আবশ্যক নাই।

১০। যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাঁহাকে ঐ সকল কার্য মঠের বাহিরে যাইয়া করিতে হইবে। ইহার অন্যথা তিলমাত্র না হয়।

শাসন সমিতি

১। একজন মহান্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক লোকের মত লইয়া। দ্বিতীয় বৎসর আর একজন ইত্যাদি।

২। এ বৎসর রাখালকে মহান্ত কর, তদ্বৎ আর একজনকে সেক্রেটারী কর; তদ্বৎ আর একজন পূজাপত্র ও রান্নাবান্নার তদারক করিবার জন্য নির্বাচন কর।

৩। সেক্রেটারীর আর এক কাজ—তিনি সকলের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখিবেন। এই বিষয়ে তিনটি উপদেশ আছে—

১ম—প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটি নেয়ারের খাটিয়া ও তোষক ইত্যাদি (থাকিবে)। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

২য়—রান্না ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোষহীন হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; কারণ দুষ্ট বা অপরিষ্কৃত জলে ভোগ রাঁধিলে মহাপাপ হয়।

৩য়—শরৎকে যে প্রকার কোট করিয়া দিয়াছ, ঐ প্রকার গেরুয়া আলখাল্লা প্রত্যেককে দুটি করিয়া দিবে এবং কাপড়-চোপড় যাহাতে পরিষ্কার থাকে (তাহা দেখিবে); … বাটী অত্যন্ত পরিষ্কার যাহাতে হয়—নীচের উপরের সমস্ত ঘর—(সেদিকে নজর রাখিবে)।

৪। যে কেউ সন্ন্যাসী হতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে—এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে—তার পর সন্ন্যাসী করিয়া দিবে।

৫। ঠাকুরপূজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে।

বিভাগ

মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথাঃ (১) বিদ্যা-বিভাগ, (২) প্রচার-বিভাগ, (৩) সাধন-বিভাগ।

বিদ্যা-বিভাগঃ যাহারা পড়িতে চায়, তাহাদের জন্য পুস্তকাদি ও অধ্যাপক সংগ্রহ—এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে তাহাদের জন্য অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে।

প্রচার-বিভাগঃ মঠবাসী ও প্রবাসী। মঠবাসী প্রচারকেরা প্রত্যহ শাস্ত্রাদিপাঠ ও প্রশ্নোত্তরাদি দ্বারা জিজ্ঞাসুদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবে।

সাধন-বিভাগঃ যাঁহারা সাধন-ভজন করিতে চান, তাঁহাদের আপন আপন ঘরে সাধন-ভজনের যাহা আবশ্যক—তাহার সহায়তা করা ইত্যাদি। কিন্ত একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাউকেও যে পড়িতে দিবেন না, অথবা প্রচার করিতে দিবেন না—এ প্রকার না হয়। যিনি উৎপাত করিবেন, তাঁহাকে অন্তর (তফাৎ) হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে—ইহাতে অন্যথা না হয়।

মঠবাসী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি জ্ঞান যোগ ও কর্মসম্বন্ধে উপদেশ করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া দিবেন—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিজিজ্ঞাসু জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি। বামাচার সাধনে উপযুক্ত তোমরা কেহই নহ; অতএব বামমার্গের নামগন্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি এ-কথা না শুনিবেন, তাঁহার স্থান বাহিরে। ওঁ-সাধনের নাম পর্যন্ত যেন মঠে না হয়। 'তাঁর' ঘরে যে- দুর্বৃত্ত বিকট বামাচার ঢোকায়, তার ইহ-পরকাল উৎসন্ন হইবে।

কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ

১। কোন স্ত্রীলোক যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে আইসে, তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্তা কহিবে। কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ঠাকুরঘর ছাড়া।

২। কোন সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে যাইয়া বাস করিতে পাইবে না। যদি না শুনে, মঠ হইতে দূর করিবে। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল (ভাল)। ...

৩। দুশ্চরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোন অছিলায় তাদের ছায়া যেন আমাদের ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দুশ্চরিত্র হয়, যে-কেহ হউক—তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকার নাই। প্রভু অনেক ভাল ভাল লোক আনিবেন।

৪। শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে, এবং প্রচারের গৃহে ও সময়ে যে-কোন স্ত্রীলোক আসিতে পারেন; কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রেই চলিয়া যাইতে হইবে।

৫। কোন ক্রোধ বা ঈর্ষা প্রকাশ, বা গোপনে একজনের নিন্দা আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না। ... একজন আর একজনের দোষ দেখিতে খুব মজবুত—আপনার দোষগুলি কেউ সারাইবেন না!

৬। আহারের নির্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একটা আসন ও খাইবার জন্য একটা ছোট চৌকি (থাকিবে)—আসনে বসে চৌকির উপর থালা রেখে খাবে—যে প্রকার রাজপুতানায়।

কর্মচারী - সভা **(office-bearers)**

সমস্ত অফিসার—তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারায়, যে প্রকার 'বুদ্ধ মহারাজে'র আজ্ঞা—অর্থাৎ একজন প্রপোজ (প্রস্তাব) করিল, 'অমুক এক বৎসরের জন্য মহান্ত হউক।' সকলে 'হ্যাঁ' কি 'না' কাগজে লিখিয়া একটা কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। যদি 'হ্যাঁ' অধিক হয়, তিনি মহান্ত (হইবেন) ইত্যাদি।

যদিও তোমরা উক্ত প্রকারে অফিসার বাছিয়া লইবে, তথাপি আমি suggest (প্রস্তাব) করি যে, এ বৎসর রাখাল মহান্ত, তুলসী সেক্রেটারী ও ট্রেজারার, গুপ্ত লাইব্রেরিয়ান, শশী কালী হরি ও সারদা পর্যায়ক্রমে পড়াবার ও উপদেশ করবার ভার লউক—ইত্যাদি। সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমার সম্মতি আছে।

মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্রসম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং Progressive (প্রগতিশীল) অর্থাৎ পুরানোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারী করতে হবে। ... পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি দান—আবালবৃদ্ধবনিতা। ও-সকল কেষ্ট বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক—অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে, অন্য সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয় না। আর ও-সব পুরানো ঠাকুরদেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরানোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ! গোঁড়ামি না হলে কল্যাণ দেখছি কই? তবে অপরের দ্বেষ ত্যাগ করতে হবে।

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তাহলে আমি মঠভাড়ার এবং সমস্ত খরচ-পত্র পাঠিয়ে দেব। নতুবা তোমাদের সঙ্গত্যাগ—একদম। অপিচ গৌর-মা, যোগীন-মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁহাদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর-মাকে এক বৎসর মহান্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও সমস্ত খরচ-পত্র আমি পাঠিয়ে দেব।

প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দিন! দু-জন জগন্নাথ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁই গাছ!!! বাপু হে, তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়া গাছ হবে, তখনই মনে করো যে, থাকলে কি হয় তাঁর সঙ্গে?—দেখেছ কেবলই পুঁই গাছ! যদি তা না হত তো এত দিনে প্রকাশ হত। তিনি নিজেই বলতেন, নাচিয়ে গাহিয়ে তারা নরকে যাইবে—ঐ নরকের মূল 'অহঙ্কার'। 'আমিও যে, ও-ও সে'—বটে রে মধো? 'আমাকেও তিনি ভালবাসতেন'—হায় মধুরাম, তাহলে কি তোমার এ দুর্গতি হয়? … এখনও উপায় আছে—সাবধান! মনে রেখ যে, তাঁর কৃপায় বড় বড় দেবতার মত মানুষ তৈয়ারী হয়ে যাবে, যেখানে তাঁর দয়া পড়বে। … এখনও সময় আছে, সাবধান! Obedience is the first duty (আজ্ঞাবহতাই প্রথম কর্তব্য)—যা বলি, করে ফেল দেখি! এই কটা ছোট্ট ছোট্ট কাজ প্রথমে কর দেখি—তারপর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে। অলমিতিL

নরেন্দ্র

পুঃ—এই চিঠি সকলকে পড়াবে এবং তদনুযায়ী কাজ করা যদি উচিত বোধ হয়, আমাকে লিখবে। রাখালকে বলবে—যে সকলের দাস, সে-ই সকলের প্রভু। যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে, সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।

নরেন্দ্র

২৭৪

High View, Caversham, Reading
C/o E. T. Sturdy, Esq.,
১৮৯৬

প্রিয়—,

… প্রত্যেকে পূর্ণ উদ্যম প্রকাশ না করলে কি কোন কাজ সম্পন্ন হয়? 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—সিংহহৃদয় কাজের মানুষের কাছেই লক্ষ্মীদেবী এসে থাকেন।

পেছন ফিরে তাকানর প্রয়োজন নেই। আগে চল! আমাদের চাই অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড় কাজ করতে পারব। ... ইতি

তোমাদের স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২৭৫-২৮৪

২৭৫*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

হাই ভিউ, রিডিং
২০ এপ্রিল, ১৮৯৬

স্নেহের ভগিনীগণ,
সমুদ্রের অপর পার থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। এবার সমুদ্রযাত্রা আনন্দদায়ক হয়েছে এবং কোন পীড়া হয়নি। সমুদ্রপীড়া এড়াবার জন্য আমি নিজেই কিছু চিকিৎসা করেছিলাম। আয়ার্লণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং ইংলণ্ডের কয়েকটি পুরানো শহর দেখে এক দৌড়ে ঘুরে এলাম, এখন আবার রিডিং-এ 'ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জীবাত্মা ও পরমাত্মা' প্রভৃতি নিয়ে আছি। অপর সন্ন্যাসীটি এখানে রয়েছে; আমি যত লোক দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি একজন চমৎকার লোক, বেশ পণ্ডিতও। আমরা এখনও গ্রন্থগুলি সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি—নিতান্তই নীরস, একটানা এবং গদ্যময়, আমার জীবনেরই মত। আমি যখন আমেরিকার বাইরে যাই, তখনই আমেরিকাকে বেশী ভালবাসি। যাই হোক, এ পর্যন্ত যা দেখছি, তার মধ্যে ওখানকার কয়েকটি বছরই সর্বোৎকৃষ্ট।

তোমরা কি 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করছ? মিসেস এডামস্ (Mrs. Adams) ও মিসেস কংগারকে (Mrs. Conger) আমার ভালবাসা জানাবে। যত শীঘ্র পার তোমাদের সকলের কথা আমাকে লিখবে—আর তোমরা কি করছ, তোমাদের পান, ভোজন ও ঘুরে বেড়ানর একঘেয়েমি কি দিয়ে ভাঙছ? এখন একটু তাড়াতাড়ি, পরে এর চেয়ে বড় চিঠি লিখব; সুতরাং বিদায় এবং তোমরা সর্বদা সুখী হও।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমি সময় পেলেই মাদার চার্চের কাছে লিখব। স্যাম এবং ভগিনী লককে আমার ভালবাসা।

বি

২৭৬*

৬৩, সেন্ট জর্জেস্ রোড, লণ্ডন
মে, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনী,
আবার লণ্ডনে। এখন ইংলণ্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাণ্ডা; ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন রাখতে হয়। তুমি জেন, আমাদের ব্যবহারের জন্য এবার একটা গোটা বাড়ী পাওয়া গেছে। বাড়ীটি ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক। লণ্ডনে বাড়ীভাড়া আমেরিকার মত তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি জান। এই তোমার মার কথাই ভাবছিলাম। এইমাত্র তাঁকে একখানা চিঠি লিখে C/o Monroe & Co., 7 Rue Scribe, Paris—এই ঠিকানায় পাঠিয়েছি। এখানে জনকয়েক পুরানো বন্ধুও আছেন। মিস ম্যাকলাউড সম্প্রতি ইওরোপ ভ্রমণ করে লণ্ডনে ফিরেছেন। তাঁর স্বভাবটি সোনার মত খাঁটি এবং তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়টির কোন পরিবর্তন হয়নি। আমরা এই বাড়ীতে বেশ ছোটখাট একটি পরিবার হয়েছি; আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন সন্ন্যাসী। 'বেচারা হিন্দু' বলতে যা বুঝায়, তা এঁকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে। সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন, অতি নম্র ও মধুরস্বভাব। আমার যেমন একটা অদম্য সাহস এবং ঘোর কর্মতৎপরতা আছে, তাঁতে তার কিছুই নেই। ওতে চলবে না। আমি তাঁর ভেতর একটু কর্মশীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এখনই আমার দুটি করে ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস ঐরূপ চলবে—তারপর ভারতে যাচ্ছি; কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে—আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি সব নূতন দেখতে চাই। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে হা-হুতাশ করে আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে রাজী নই। আমার রক্তের যা জোর আছে, তাতে ঐরূপ করা চলে না। সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও সুযোগ কেবল আমেরিকাতেই আছে। আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থসথসে জেলি মাছের মত ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কিনা দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মত নবীন ও সতেজ। যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নন—তত্ত্বমাত্র। তুমি আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে; এরূপে এখনও যদিও সকলেই

স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে। ধর্ম এ ছাড়া আর কিছুই নয়; এই একত্ব অনুভব বা প্রেমই এর সাধন; সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পাশেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্তদের নর্দমার জল খাওয়ান কেন? এটা মানুষের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরাতন সংস্কারগুলোকে সমর্থন করে করে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। ... জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থান ও পাত্রে ভাবরাশি সহজে কার্যে পরিণত হতে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। হায়! যদি মাত্র বার জন সাহসী, উদার, মহৎ, সরলহৃদয় লোক পেতাম!

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব উপভোগ করছি। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

২৭৭*

লণ্ডন
৩০ মে, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,
... গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আমার বেশ দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তাঁর বয়স ৭০ বৎসর হলেও তাঁকে যুবা দেখায়; এমন কি তাঁর মুখে একটি বার্ধক্যের রেখা নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যেরূপ ভালবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত! তার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ করেন এবং তাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না।

সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরী'তে (Nineteenth Century) তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করবার জন্য কি করছেন?' রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বৎসর যাবৎ মুগ্ধ করেছেন। এটা কি সুসংবাদ নয়?

এখানে কাজকর্ম ধীরে ধীরে—কিন্তু দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী রবিবার থেকে জনসাধারণের জন্য আমার বক্তৃতা আরম্ভ হবে, ঠিক হয়েছে। ইতি—

আপনার চিরকৃতজ্ঞ ও স্নেহের
বিবেকানন্দ

২৭৮*

৬৩, সেণ্ট জর্জেস্ রোড, লণ্ডন
৩০ মে, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী,
তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। তুমি অবশ্যই ঈর্ষাপরায়ণ হওনি, কিন্তু দীন-দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি সহসা যেন তোমার করুণা উথলে উঠেছিল। যা হোক, ভয় পাওয়ার কারণ নেই। ... সপ্তাহ কয়েক আগে মাদার চার্চের (Mother Church) কাছে পত্র লিখেছিলাম; আজ পর্যন্ত একছত্র জবাব আদায় করতে পারিনি। ভয় হয়, তিনি দলবলসহ সন্ন্যাস গ্রহণ করে কোন ক্যাথলিক মঠে ঢুকে পড়েছেন; ঘরে চার-চারটি আইবুড়ো মেয়ে থাকলে বুড়ী মায়ের পক্ষে সন্ন্যাস না নিয়ে আর উপায় কি?

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে বেশ দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি ঋষিকল্প লোক—বেদান্তের ভাবে ভরপুর। তোমার কি মনে হয়? অনেক বছর যাবৎ তিনি আমার গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 'নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরী'তে গুরুদেবের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—তা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভারতসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হল। হায়! ভারতের প্রতি তাঁর প্রেমের অর্ধেকও যদি আমার থাকত!

এখানে আমরা আর একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা বার করব। 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর খবর কি? তার প্রচার বাড়াচ্ছ তো? যদি চার জন উৎসাহী আইবুড়ী মিলে একখানা পত্রিকা ভাল রকম চালু করতে না পার তো আমার সকল আশায় জলাঞ্জলি! তুমি মাঝে মাঝে আমার চিঠি পাবে। আমি তো ছুঁচটি নই যে, যেখানে সেখানে হারিয়ে যাব! এখন এখানে ক্লাস খুলেছি। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি রবিবার বক্তৃতা আরম্ভ করব। ক্লাসগুলি খুব বড় হয়; যে বাড়ীটি সারা মরশুমের জন্য ভাড়া করেছি, সেই বাড়ীতেই ক্লাস হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল—এগুলি মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নতুবা তার খানিকটা মিশালে গিলিবার পক্ষে সুবিধা হত।

কাল হালফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মিস মূলার নাম্নী জনৈকা ধনী মহিলা একটি হিন্দু ছেলেকে দত্তক

গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি যে বাড়ীতে আছি সেই বাড়ীতেই ঘর ভাড়া করেছেন। তিনিই বিয়ে দেখিবার জন্য আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান যেন আর শেষ হয় না—কি আপদ! তুমি যে বিয়েতে নারাজ, এতে আমি খুশী। এখন বিদায়। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানিবে। আর লেখার সময় নাই; এখনি মিস ম্যাকলাউডের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে যাচ্ছি। ইতি

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

২৭৯

ওঁ তৎ সৎ

England
মে (?) ১৮৯৬

প্রিয় শশী,

পূর্বপত্রে যদি ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পত্রে লিখি যে, কালী যে দিবস start (যাত্রা) করিবে, সেদিন কিম্বা তাহার আগে যেন E. T. Sturdy (স্টার্ডি)-কে চিঠি লেখে, যাহাতে সে যাইয়া তাহাকে জাহাজ হইতে লইয়া আসে। এ লণ্ডন শহর মানুষের জঙ্গল—দশ পনরটা কলিকাতা একত্রে—অতএব ঐ প্রকার না করিলে গোলমাল হয়ে যাবে। আসতে দেরী যেন না হয়, পত্রপাঠ চলে আসতে বলবে। শরতের বেলার মত যেন না হয়। বাকী বুঝে-সুঝে ঠিক করে নেবে।

কালীকে যাই হোক সত্বর পাঠাবে। যদি শরতের বেলার মত দেরী হয় তো কাহাকেও আসতে হবে না; ও-রকম গড়িমসির কাজ নয়। মহা রজোগুণের কাজ, আমাদের দেশময় খালি তমস্, আমাদের দেশে রজস্ চাই—তারপর সত্ত্ব, সে ঢের দূরের কথা। ইতি

নরেন্দ্র

২৮০*

সেন্ট জর্জেস্ রোড, লণ্ডন
৫ জুন, ১৮৯৬

প্রিয়—,

‘রাজযোগ’ বইখানার খুব কাটতি হচ্ছে। সারদানন্দ শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে যাবে।

আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন, তবু আমি ইচ্ছা করি না, আমাদের বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব এর বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলি উকিল আছে, সে পরিবারকে নিশ্চয়ই দুর্দশায় পড়তে হবে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শত শত উকিল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন দরকার সাহস ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। সুতরাং আমার ইচ্ছা ম—তড়িত্তত্ত্ববিৎ হয়। সফল হতে না পারলেও সে যে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে আসবার চেষ্টা করেছিল—এইটুকু ভেবেই আমি সন্তুষ্ট হব। শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে, সেখানকার প্রত্যেকের ভেতর যা কিছু ভাল সমস্তই ফুটিয়ে তোলে। আমি চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী হোক এবং তার নিজের ও স্বজাতির জন্য একটা নূতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়র ভারতে অনায়াসে করে খেতে পারে।

পুঃ—গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিক পত্র বার করা সম্বন্ধে তোমাকে এই ডাকে একখানা চিঠি লিখেছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখতে হলে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর সে যেভাবে কাজ করবার প্রস্তাব করছে, তাকে সেইভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। … আমার মনে হয়, সে খুব সম্ভব সারদানন্দের সঙ্গে যাবে।

তোমাদের প্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

২৭১

[স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক

১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬

কল্যাণীয়া মিস নোব্‌ল্‌,

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এইঃ মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত—সে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়নকারী, সে আমার আরও বেশী করুণার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে তুলবে।

এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগ! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে? এর চেয়ে মহত্তর কোন্‌ কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ জাগ।

তুমি চিরকাল অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে। ইতি

শুভাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

২৮২

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

৬৩, সেণ্ট জর্জেস্‌ রোড, লণ্ডন
২৪ জুন, ১৮৯৬

প্রিয় শশী,

শ্রীজীর
৯৬
সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে প্রকাশিত হবে। তিনি তাঁর একখানি জীবনী লিখতে রাজী হয়েছেন। তিনি শ্রীজীর সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্মসম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে। তোমাকে এ কাজ এখনই শুরু করতে হবে। শুধু যে সব কথা ইংরেজীতে অচল, সেগুলি বাদ দিও।* বুদ্ধি করে সে-সকল জায়গায় যথাসম্ভব অন্য কথা দিবে। 'কামিনী-কাঞ্চন'কে 'কাম-কাঞ্চন' করবে—lust and gold etc.—অর্থাৎ তাঁর উপদেশে সর্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা চাই। এই চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্যক নাই। তুমি উক্ত কার্য সমাধা করে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তর্জমা ও classify (শ্রেণীবিভাগ) করে 'প্রফেসর ম্যাক্সমূলার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংলণ্ড'—ঠিকানায় পাঠাবে।

শরৎ কাল আমেরিকায় চলল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। লণ্ডনে একটি centre-এর (কেন্দ্রের) জন্য টাকা already (এর আগেই) উঠে গেছে। আমি next (আগামী) মাসে Switzerland (সুইজরলণ্ড) গিয়ে এক দুই মাস থাকব। তারপর আবার লণ্ডনে। আমার শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? এই লণ্ডন হল—দুনিয়ার centre (কেন্দ্র)। India-র heart (ভারতের হৃৎপিণ্ড) এখানে। এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে কি যাওয়া হয়? তোরা পাগল নাকি? সম্প্রতি কালীকে আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো। পত্রপাঠ যেন চলে আসে। দুই চারি দিনের মধ্যে তার জন্য টাকা পাঠাব ও কাপড়-চোপড় প্রভৃতি যা যা দরকার সমস্তই লিখে দেব। সেইমত সমস্ত ঠিক করা হয় যেন।

মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি সকলকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিবে। মান্দ্রাজে তারকদাদা যাচ্ছেন—উত্তম কথা।

মহাতেজ, মহাবীর্য, মহা উৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ? যে রকম লিখে- ছিলাম পূর্বপত্রে, সেই রকম ঠিক চলতে

চেষ্টা করবে। Organization (সঙ্ঘ) চাই।

Organization is power and the secret of that is obedience (সঙ্ঘই শক্তি, আর আজ্ঞাবহতাই হল তার গূঢ় রহস্য)। কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

২৮৩

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy
কেভার্শ্যাম রিডিং,
৩ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় শশী,
এই পত্রপাঠ কালীকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। পূর্বের পত্রে সংবাদ পাইয়াছ। কলিকাতার মেসার্স গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর নিকট তাহার 2nd class passage (দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথেয় খরচ) গিয়াছে ও কাপড়-চোপড় কিনিতে যাহা কিছু লাগে তাহাও গিয়াছে। কাপড়-চোপড় অধিক কিছু আবশ্যক নাই।

কালীকে কতকগুলি বই আনতে হবে। আমার কাছে কেবল ঋগ্বেদ-সংহিতা আছে। কালী যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব-সংহিতা ও শতপথাদি যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় এবং কতকগুলি সূত্র ও যাস্কর নিরুক্ত যদি পায়, সঙ্গে করেই যেন আনে। অর্থাৎ ঐ বইগুলি আমার চাই। ... ঐ বই একটা কাঠের বাক্সয় পুরে আনলেই হবে।

গড়িমসি যেমন শরতের বেলায় হয়েছিল, তা যেন না হয়; পত্রপাঠ চলে আসবে। শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে। আর এখানে কোন কাজ ছিল না—অর্থাৎ ছ-মাস বাদে এল, তখন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় যেন। চিঠি হারিয়ে যেন না যায়—শরতের বেলার মত। তৎপর পাঠিয়ে দিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

২৮৪*

৬৩, সেণ্ট জর্জেস্ রোড, লণ্ডন
৬ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় ফ্র্যাঙ্কিন্‌সেন্স,
৯৭

... আটলাণ্টিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার কাজকর্ম খুব ভালভাবেই চলছে।

আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, ক্লাসগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাজের মরসুম শেষ হয়ে গেছে—আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন মিস মূলারের সঙ্গে সুইজরলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছি। গলস্‌ওয়ার্দিরা আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো বড় অদ্ভুতভাবে তাঁদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য-প্রণালীর প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তিনি একজন মহিলা রাজনীতিবিদ্, একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের ভেতর এমন তীক্ষ্ণ অথচ কল্যাণকর সহজ বুদ্ধি খুব অল্পই দেখেছি।

গত পরশু সন্ধ্যায় আমি মিসেস মার্টিনের বাড়ীতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিলা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যেই জো-র পত্রে অনেক খবর পেয়েছ।

যা হোক ইংলণ্ডে কাজ খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিতভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, এটি যে চারিদিকে ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি প্রচার করব—তাহলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাজই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে। বিশেষ আমাদের হিন্দুদের—বিজিত জাতি বলে কাজের বাধাবিঘ্নও অনেক। কিন্তু এও বলি, যেহেতু আমরা বিজিত, সেইহেতু আমাদের ভাব চারিদিকে ছড়াতে বাধ্য! কারণ দেখা যায়, আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দেখ না, য়াহুদীরা তাদের আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল-প্রতাপশালী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান্ রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পারব।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলাম যে, কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধে হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলিকাতার যে ফুটপাতে থিয়েটার, সেই ফুটপাতের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যন্ত। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না!, এ কি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আবার লোকে বলে, শুনতে পাই, যে ব্যক্তি চারদিকে মন্দ ও অমঙ্গল দেখতে পায় না, সে ভাল কাজ করতে পারে না—এক রকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়! আমি তো তা দেখছি না; বরং আমার কর্মশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কাজের সফলতাও খুব হচ্ছে। কখনও কখনও আমার এক ধরনের ভাবাবেশ হয়—মনে হয়, জগতের সবাইকে—সব জিনিষকে আশীর্বাদ করি, সব জিনিষকে ভালবাসি, আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র! প্রিয় ফ্র্যান্সিস, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিসেস লেগেট আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্যসত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছি। আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিনটিকে ধন্যবাদ! আমি এখানে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি! আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ থেকে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ('মন্দ' কথাটিতে ভয় পেও না) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য করে আসছেন। কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বৈ আর কি—কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কি ছিলাম? তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, আমার প্রিয়জনদের ত্যাগ করেছি, সব সুখের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদালীলাময় আদরের ধন, আমি তাঁর খেলার সাথী। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। কোন্ কারণে তিনি আবার যুক্তির দ্বারা চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎ-নাট্যের সব অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করছেন। জো যেমন বলে—ভারি মজা, ভারি মজা!

এ তো বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু! সব জগৎটা খুব মজা নয় কি? আমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃভাবই বল আর খেলার সাথীর ভাবই বল, এ যেন জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সকলে চেঁচামেচি করে খেলা করছে! তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি করব, কাকে নিন্দা করব? এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়, কিন্তু তাঁকে ব্যাখ্যা করবে কেমন করে? তাঁর তো মাথা-মুণ্ডু কিছু নেই—বিচারের কোন ধার ধারেন না। তিনি ছোটখাট মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বোকা সাজিয়েছেন; কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পারছেন না, আমি এবার খুব হুঁশিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি—ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ সব যুক্তিবিচার বিদ্যা-বুদ্ধি ও বাক্যাড়ম্বরের বাইরে, ও-সব থেকে অনেক দূরে। 'সাকি',
৯৮
পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই। ইতি

তোমারই
সদাপাগল বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২৮৫-২৯৪

২৮৫*

[হেল ভগিনীগণকে লিখিত]

লণ্ডন
৭ জুলাই, ১৮৯৬

স্নেহের খুকীরা,
এখানকার কাজ আশ্চর্যভাবে এগিয়ে চলেছে। এখানে ভারত থেকে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছি এবং ভারত থেকে আর একজনকে পাঠাতে বলেছি। এখানকার মরসুম শেষ হয়েছে; সুতরাং ক্লাস ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আগামী ১৬ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। আর সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে শান্তি ও বিশ্রামের জন্য ১৯ তারিখে আমি যাচ্ছি—মাসখানেকের জন্য। আবার শরৎকালে লণ্ডনে ফিরে কাজ আরম্ভ করা যাবে। এখানে কাজ খুবই আশাজনক হয়েছে। এখানে আগ্রহ জাগিয়ে—আমি প্রকৃতপক্ষে ভারতে থেকে যা করতে পারতাম, তার চেয়ে বেশী ভারতের জন্যই করছি। মা (মিসেস হেল) আমাকে লিখেছেন যে, তোমরা যদি ফ্ল্যাট-বাড়ীটা ভাড়া দিতে পার, তাহলে তিনি সানন্দে তোমাদের মিশর দর্শনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে যাচ্ছি। পরে শীতের শেষে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে ভারতে যাবার আশা করি। তাঁরাও আমার মঠে থাকতে যাচ্ছেন, মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে মাত্র। হিমালয়ের কোথাও সেটা বাস্তবে রূপ নেবার চেষ্টা করছে।

তোমরা কোথায় আছ? এখন তো পুরাদস্তুর গরমিকাল—এমন কি লণ্ডনও খুবই তেতে উঠেছে। দয়া করে মিসেস এডামস্, মিসেস কংগার এবং চিকাগোতে অন্য বন্ধুদের আমার গভীর ভালবাসা জানিও।

তোমাদের স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

২৮৬*

৬৩, সেণ্ট জর্জেস্ রোড, লণ্ডন
৮ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—,
ইংরেজ জাতটা খুব উদার। সেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরৎকালের কাজের নূতন বাড়ীর জন্য ১৫০ পাউণ্ড (প্রায় ২২৫০ টাকা) চাঁদা উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা সেই মুহূর্তেই ৫০০ পাউণ্ড দিত। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কাজ করতে চাই—হঠাৎ কতকগুলো খরচপত্র করতে চাই না। এখানে এই কাজটা চালাতে অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে—ইংরেজ-চরিত্রের গভীরতা এখানেই (যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে, সেটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না)। ইতি

বিবেকানন্দ

২৮৭*

ইংলণ্ড
১৪ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় নাঞ্জুণ্ড রাও,
'প্রবুদ্ধ ভারত'গুলি পৌঁছেছে এবং ক্লাসে বিলি করাও হয়েছে। পত্রিকা খুব সন্তোষজনক হয়েছে; ভারতে এর যথেষ্ট প্রচলন হবে নিশ্চয়। আমেরিকাতেও এর কিছু গ্রাহক হতে পারে। ইতোমধ্যেই আমি আমেরিকায় এই কাগজটার বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং গুডইয়ার ইতোমধ্যেই তা করে ফেলেছে। কিন্তু এখানে (ইংলণ্ডে) কাজ অপেক্ষাকৃত ধীরে অগ্রসর হবে। এখানে মুশকিল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত; কারণ সত্যি বলতে গেলে কোন বিদেশীই খাঁটি ইংরেজের মত তেমন ভাল ইংরেজী লিখতে পারে না, এবং খাঁটি ইংরেজীতে লিখলে ভাবের যা বিস্তার হবে, হিন্দু-ইংরেজীতে তা হতে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চেয়ে গল্প লেখা আরও শক্ত।

আমি এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; কিন্তু বিদেশী সাহায্যের উপর একদমই একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মত জাতিকেও নিজেকে নিজে সাহায্য করতে হবে। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বদেশপ্রেম। যদি কোন জাতি তা করতে না পারে, তবে বলতে হবে—তার এখনও সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। মান্দ্রাজ থেকেই এই নূতন আলোক ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া চাই—এই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। একটি বিষয়ে কিন্তু আমার একটু মন্তব্য করতে হল—মলাটটা একেবারে রুচিহীন—অতি বিশ্রী ও কদর্য। সম্ভব হলে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন—আর এতে মানুষের মূর্তি মোটেই রাখবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই প্রবুদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিরাও নন, ইওরোপীয় দম্পতিও নন। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি—বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি বনের ছবি আঁকুন দেখি। কত ভাবই তো রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। লণ্ডনের গ্রীনম্যান কোম্পানী যে 'রাজযোগ' ছেপেছে, তাতে আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন—আপনি বোম্বেতে তা পাবেন। আমি নিউ ইয়র্কে রাজযোগ সম্বন্ধে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সেগুলি এই পুস্তকে আছে।

আমি আগামী রবিবার সুইজরলণ্ডে যাচ্ছি, এবং শরৎকালে ইংলণ্ডে ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করব। সম্ভব হলে আমি সুইজরলণ্ড থেকে আপনাকে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠাব। আপনি জানেন, আমার পক্ষে বিশ্রাম খুব দরকার হয়ে পড়েছে।

একান্ত আশীর্বাদক ও শুভানুধ্যায়ী
বিবেকানন্দ

২৮৮*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

স্যান্স গ্রাণ্ড, সুইজরলণ্ড
২৫ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—,
আমি জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আসছে দু-মাসের জন্য; একটু কঠোর সাধনা করতে চাই। ওই আমার বিশ্রাম। ... পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব শান্তির ভাব আসে। এখন আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে, এমন অনেক দিন হয়নি।

বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানাবেন।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

২৮৯*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

ওঁ তৎ সৎ

গ্র্যাণ্ড হোটেল, ভ্যালে
সুইজরলণ্ড

আমি অল্পস্বল্প পড়াশুনা করছি—উপোস করছি অনেক এবং সাধনা করছি তার চেয়েও বেশী। বনে বনে বেরিয়ে বেড়ানটা অতি আরামপ্রদ। আমাদের বাসস্থানটি তিনটি বিরাট তুষার-প্রবাহের নীচে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

ভাল কথা, সুইজরলণ্ডের হ্রদে আর্যদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে আমার মনে যা-ও একটু সন্দেহের ভাব ছিল, তা একেবারে চলে গেছে; তাতারদের মাথা থেকে লম্বা টিকিটা সরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, সুইজরলণ্ডের অধিবাসীরা হচ্ছে তাই।

স্নেহাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

২৯০*

[লালা বদ্রী শাহকে লিখিত]

C/o E. T. Sturdy
রিডিং, লণ্ডন
৯৯

৫অগষ্ট, ১৮৯৬

আপনার সহৃদয় অভিনন্দনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার কাছে একটি বিষয় জানবার আছে। দয়া করে সংবাদটি জানালে বিশেষ বাধিত হব। আমি একটা মঠ স্থাপন করতে চাই—আলমোড়ায় বা আলমোড়ার কাছে হলেই ভাল। আমি শুনেছি, মিঃ র‍্যামজে নামে জনৈক ভদ্রলোক আলমোড়ার কাছে একটি বাংলোতে বাস করতেন, ঐ বাংলোর চারিদিকে একটি বাগান আছে। ঐ বাংলোটি কেনা সম্ভব হবে কি? দাম কত? যদি কেনা সম্ভব না হয়, তবে ভাড়া পাওয়া যাবে কি?

আলমোড়ার কাছে কোন সুবিধামত জায়গা আপনার জানা আছে কি, যেখানে বাগবাগিচা সহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সঙ্গে বাগান প্রভৃতি অবশ্যই থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।

আশা করি, শীঘ্র আপনার উত্তর পাব। আপনি এবং আলমোড়ার অন্যান্য সব বন্ধুরা আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানবেন। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

২৯১*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

সুইজরলণ্ড
৫ অগষ্ট, ১৮৯৬

আজ সকালে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের একখানি পত্র এসেছে; তাতে খবর পেলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকার অগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।তুমি কি তা পড়েছ? তিনি ঐ বিষয়ে আমার মত চেয়েছেন। এখনও তা দেখিনি বলে তাঁকে কিছু লিখতে পারছি না। তুমি যদি তা পেয়ে থাক তো দয়া করে আমায় পাঠিয়ে দিও। 'ব্রহ্মবাদিনে'র কোন সংখ্যা এসে থাকলে তাও পাঠিও। ম্যাক্সমূলার আমাদের কার্যধারা জানতে চান, ... এবং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও খবর চান। তিনি যথেষ্ট সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আছেন।

আমার মনে হয়, পত্রিকাদি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে তোমার সরাসরি পত্রালাপ করাই উচিত। 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী' পড়ার পরে তাঁর পত্রের উত্তর দিতে যখন আমি তোমাকে তাঁর চিঠিখানি পাঠিয়ে দেব, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, আমাদের প্রচেষ্টায় তিনি কত খুশী হয়েছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছেন।

পুনশ্চ—আশা করি, বড় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ভাল করে ভেবে দেখবে। আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পারা যাবে এবং কাগজখানি নিজেদের হাতেই রাখা যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলার কি প্রকার কার্যধারা ঠিক কর, তা জেনে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি।

যে গাছের ফল ও ছায়া আছে, তারই আশ্রয় নিতে হয়; ফল যদি নাই বা পাওয়া যায়, ছায়া থেকে তো কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না?
১০০
সুতরাং শিক্ষণীয় এই যে, বড় বড় কাজ এভাবেই করা উচিত।

২৯২*

সুইজরলণ্ড
৬ অগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

‘ব্রহ্মবাদিন্’ কতটা আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। লণ্ডনে যখন ফিরে যাব, তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা করব। তুমি সুর নামিও না যেন—কাগজখানি চালিয়ে যাও; অতি শীঘ্রই তোমায় এমন সাহায্য করতে পারব যে, বাজে শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও না; বড় বড় সব কাজ হবে, বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ‘ব্রহ্মবাদিন্’ একটি রত্নবিশেষ, একে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। অবশ্য এ-জাতীয় পত্রিকাকে সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা তাই করব। আরও মাস-কয়েক আঁকড়ে পড়ে থাক।

ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি ‘নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে’ বেরিয়েছে। সেটি পেলেই আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব। তিনি আমাকে চমৎকার সব চিঠি লেখেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বড় জীবনী লেখবার উপাদান চান।

কলিকাতায় লিখে দাও, যেন তারা যতটা সম্ভব উপাদান যোগাড় করে তাঁকে পাঠায়।

আমেরিকার কাগজে প্রেরিত সংবাদটি আমি আগেই পেয়েছি। ওটি ভারতবর্ষে প্রকাশ করবে না। সংবাদপত্রে এই সব হইচই ঢের হয়ে গেছে; আমার অন্ততঃ এ সবে বিরক্তি এসে গেছে। মূর্খেরা যাই বলুক না কেন, আমরা আমাদের কাজ করে যাব। সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পারবে না।

Organization is power and the secret of that is obedience দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন সুইজরলণ্ডে রয়েছি, আর ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। পড়া বা কোন লেখার কাজ আমি করতে পারছি না—করাও উচিত নয়। লণ্ডনে আমার এক মস্ত কাজ পড়ে আছে, আগামী মাস থেকে তা শুরু করতে হবে। আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরব এবং সেখানকার কাজটাকে দাঁড় করাব।

সকলে আমার ভালবাসা জানবে। সাহসে বুক বেঁধে কাজ করে যাও, পিছু হটো না—‘না’ বলো না। কাজ কর—প্রভু পেছনে আছেন। মহাশক্তি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ভয় পেও না; টাকা ও আর সব শীঘ্রই আসবে।

২৯৩*

[পাশ্চাত্য শিষ্য স্বামী কৃপানন্দকে লিখিত]

সুইজরলণ্ড
অগষ্ট, ১৮৯৬

পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও; মুহূর্তের জন্যও ভগবানে বিশ্বাস হারিও না—তাহলেই আলো দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী; কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বর্তমান ক্ষিপ্র অনুসন্ধিৎসার যুগে জন্মগ্রহণ করে আমরা অনেকটা সুবিধা পেয়েছি। অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নীতি ও ভগবৎপ্রেমের উচ্চ আদর্শ খর্ব করো না। সর্বোপরি সব রকম গুপ্ত সমিতির বিষয়ে সতর্ক থেক। ভগবৎ-প্রেমিকের পক্ষে চালাকিতে ভীত হবার কিছুই নেই। স্বর্গে ও মর্ত্যে পবিত্রতাই সবচেয়ে মহৎ ও দিব্য শক্তি। ‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।’—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়; সত্যের মধ্য দিয়েই দেবযান মার্গ চলেছে। কে তোমার সহগামী হল বা না হল, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না; শুধু প্রভুর হাত ধরে থাকতে যেন কখনও ভুল না হয়; তাহলেই যথেষ্ট।

গতকাল আমি ‘মণ্টি রোজা’র তুষারপ্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং সেই চিরতুষারের প্রায় মাঝখানে জাত কয়েকটি শক্ত পাপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে এনেছিলাম। তারই একটি চিঠির মধ্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি—আশা করি, জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বাধা-বিপর্যয়রূপ হিমরাশি ও তুষারপাতের মধ্যে তুমিও ঐ রকম আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করবে।

তোমার স্বপ্নটি খুবই সুন্দর। স্বপ্নে আমরা আমাদের মনের এমন একটা স্তরের পরিচয় পাই, যা জাগ্রত অবস্থায় কখনও পাই না, এবং কল্পনা যতই অবাস্তব হোক না কেন, অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ তার পশ্চাতেই অবস্থান করে। সাহস অবলম্বন কর। মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব—বাকী সব প্রভুই জানেন।

অধীর হয়ো না, তাড়াহুড়ো করো না। ধীর, একনিষ্ঠ এবং নীরব কর্মই সফল হয়। প্রভু অতি মহান্। বৎস, আমরা সফল হবই—সফল হতেই হবে। তাঁর নাম ধন্য হোক।

এখানে ... কোন আশ্রম নেই। একটি থাকলে কী সুন্দরই না হত! আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতাম এবং তাতে এদেশের কতই না কল্যাণ হত!

২৯৪*

সুইজরলণ্ড
৮ অগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

কয়েকদিন পূর্বে তোমায় একখানি পত্র লিখেছি। সম্প্রতি আমার পক্ষে তোমায় জানান সম্ভবপর হয়েছে, ‘ব্রহ্মবাদিন্’-এর জন্য আমি এইটুকু করতে পারবঃ তোমায় দু-এক বছরের জন্য মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে অর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউণ্ড হিসাবে, যাতে মাসে ১০০ পুরা হয়; এমন সাহায্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে ‘ব্রহ্মবাদিন্’-এর কাজ করতে পারবে ও সেটিকে ভাল করে দাঁড় করাতে পারবে। মণি আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলে পত্রিকার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা খরচ করে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? ‘ব্রহ্মবাদিনে’ যা কিছু বেরুবে, তার সবটাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোন মানে নাই; কিন্তু দেশপ্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের এ-পত্রিকার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।

[তোমাদের] কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজনঃ

প্রথমতঃ হিসাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ সততা অবলম্বনীয়। এই কথা বলতে গিয়ে আমি এমন কোন আভাস দিচ্ছি না যে, তোমাদের মধ্যে কারও পদস্খলন হবে, পরন্তু কাজকর্মে হিন্দুদের একটা অদ্ভুত অগোছালো ভাব আছে—হিসাবপত্র রাখার বিষয়ে তাদের তেমন সুশৃঙ্খলা বা আঁট নাই; হয়তো কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের কাজে লাগিয়ে ফেলে এবং ভাবে শীঘ্রই তা ফিরিয়ে দেব—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ ‘ব্রহ্মবাদিন্’টিকে ভালভাবে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা প্রয়োজন। এই পত্রিকাই তোমার ইষ্টদেবতাস্বরূপ হোক; তাহলেই দেখবে সাফল্য কেমন করে আসে। এর আগেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ থেকে ডেকে পাঠিয়েছি। আশা করি, পূর্বের ‘স্বামী’ (সন্ন্যাসী)-কে পাঠাবার সময় যেমন দেরী হয়েছিল, এবারে তেমন হবে না। এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় ‘ব্‌রক্ষবাদিন্’-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব পাঠিও—যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো—অখণ্ড পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থশূন্য একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল।

দু-বৎসরের মধ্যে আমরা ‘ব্রহ্মবাদিন্’কে এরূপ দাঁড় করাব যে, পত্রিকার আয় থেকে শুধু যে খরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্ম-পত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি এখনও কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে, তবে এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।

ভাল কথা, এনি বেসাণ্ট (Annie Besant) একদিন আমাকে তাঁদের সমিতিতে ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি এক সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিই—কর্ণেল অল্‌কট্ (Col. Olcott)-ও উপস্থিত ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই আমার সহানুভূতি আছে, এটি দেখাবার জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম; কিন্তু আমি কোন আজগুবিতে যোগ দেব না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলো, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই জগতে শিক্ষক—বিদেশীরা নয়। ইহলোকের বিষয়ে অবশ্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়েছি। ছয় মাস আগে যখন তিনি ওটি লেখেন, তখন তাঁর কাছে প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া লেখবার আর কোন উপাদান ছিল না; সুতরাং সে হিসাবে তাঁর প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে, বলতে হবে। সম্প্রতি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বড় বই লেখবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র লিখেছেন। আমি এর মধ্যেই তাঁকে অনেক উপাদান দিয়েছি; ভারত থেকে আরও উপাদান পাঠাতে হবে। কাজ করে যাও। লেগে থাক, সাহসী হও, ভরসা করে সব বিষয়ে লাগ। ব্রহ্মচর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে; তোমার তো ছেলেপুলে যথেষ্ট হয়েছে—আর কেন? এই সংসারটা কেবল দুঃখময়। কি বল? আমার স্নেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ২৯৫-৩০৪

২৯৫*

[মিঃ গুডউইনকে লিখিত]

সুইজরলণ্ড
৮ অগষ্ট, ১৮৯৬

আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি। বিভিন্ন চিঠিতে কৃপানন্দের
১০১
সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছি। আমি তার জন্য দুঃখিত। ... তার ভাবে তাকে চলতে দাও; তার জন্য তোমাদের কারও উদ্বেগ অনাবশ্যক।

আমায় ব্যথা দেওয়ার কথা বলছ?—তা দেব বা দানবের সাধ্যাতীত। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাক। অটল ভালবাসা ও একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবই সর্বত্র জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় বেদান্তীর উচিত নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা, 'আমি এরূপ দেখি কেন? আমি কেন ভালবাসা দিয়ে এর প্রতিকার করতে পারি না?'

স্বামী সারদানন্দ যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন, এবং তিনি যে ভাল কাজ করেছেন, আমি তাতে খুশী হয়েছি। বড় কাজ করতে হলে দীর্ঘকাল ধরে লেগে পড়ে থাকতে হয়। জনকয়েক বিফল হলেও আমাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জগতের ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে, বহু বাধা আসবে, দুর্লঙ্ঘ্য বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আগুনে ভস্মীভূত হবার সময়েও মানুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই করে। 'ভাল'র দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। এটাই আশ্চর্যের কথা যে, এত লোক সফল হয়; অনেকে যে পড়ে যায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সহস্র পদস্খলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।

এখন আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক সামনেই বিরাট তুষার প্রবাহগুলি দেখি আর অনুভব করি, যেন হিমালয়ে আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ শান্ত। আমার স্নায়ুগুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে, এবং তুমি যে-জাতীয় বিরক্তিকর ব্যাপারের কথা লিখেছ, তা আমাকে একেবারেই স্পর্শ করে না। এই ছেলেখেলা আমাকে উদ্বিগ্ন করবে কি করে? সারা দুনিয়াটা একটা নিছক ছেলেখেলা—প্রচার, শিক্ষাদান, সবই। 'যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁকেই সন্ন্যাসী বলে জেনো।'
১০২
আর রোগ শোক ও মৃত্যুর চির লীলাভূমি এই সংসাররূপ পঙ্কিল ডোবাতে কি কাম্য বস্তু থাকতে পারে?—'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করেছেন, তিনিই সুখী।'

সেই শান্তি, সেই অনন্ত অনাবিল শান্তির কিছু আভাস আমি এখন এই মনোরম স্থানে পাচ্ছি। 'একবার যদি মানুষ জানে যে, আত্মাই আছেন—আর কিছু নেই, তাহলে কিসের কামনায় কার জন্য এই শরীরের দুঃখতাপে দগ্ধ হতে হবে?'
১০৩

আমার মনে হয়, লোকে যাকে 'কাজ' বলে, তা দ্বারা যতটুকু অভিজ্ঞতা হবার তা আমার হয়ে গেছে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমি বেরিয়ে যাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি। 'সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে; যত্নপরায়ণ বহুর মধ্যেও ক্বচিৎ কেউ আমাকে যথাযথভাবে জানে।'
১০৪
কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বলবান্, তারা সাধকের মনকে জোর করে নাবিয়ে দেয়।

'মনোরম জগৎ', 'সুখের সংসার', 'সামাজিক উন্নতি'—এসব কথা 'তপ্ত বরফ', 'অন্ধকার আলো' প্রভৃতি কথার মতই। ভালই যদি হত, তবে এটা আর সংসারই হত না। অজ্ঞানবশতঃ জীব অসীমকে সসীম বিষয়ের মধ্যে, অখণ্ড চৈতন্যকে জড় অণুর মধ্যে প্রকাশ করবার কথা চিন্তা করে, কিন্তু শেষে নিজের ভুল ধরতে পেরে পালাতে চায়। এই প্রত্যাবর্তন—এই হল ধর্মের আরম্ভ; আর এর সাধনা হচ্ছে অহং-এর নাশ অর্থাৎ প্রেম। স্ত্রী, পুত্র বা আর কারও জন্য ভালবাসা নয়, পরন্তু নিজের ক্ষুদ্র 'অহং'কে ছাড়া অপর সকলের জন্য ভালবাসা। আমেরিকায় 'মানবজাতির উন্নতি' ইত্যাদি যে-সব বড় বড় বুলি অহরহ শুনতে পাবে, সে-সব বাজে কথা ভুলো না। এক দিকে অবনতি না হলে অন্যদিকে উন্নতি হতে পারে না। এক সমাজে এক রকমের ত্রুটি আছে, অন্য সমাজে অন্য রকমের। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। মধ্যযুগে ডাকাতের প্রাধান্য ছিল, এখন জোচ্চোরের দল বেশী। কোন যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা কম থাকে, অন্য যুগে বেশ্যাবৃত্তির আধিক্য দেখা যায়। কোন সময় শারীরিক দুঃখের আধিক্য, আবার অন্য সময় মানসিক দুঃখ সহস্রগুণ। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। আবিষ্কার ও নামকরণের

পূর্বেও কি মাধ্যাকর্ষণ প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই, তবে তার অস্তিত্ব জানাতে তফাতটা কি হল? আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের চেয়ে তোমরা কি বেশী সুখী?

একমাত্র মূল্যবান জ্ঞান হচ্ছেঃ এইটি জানা যে, সবই প্রতারণা—ভান মাত্র। কিন্তু কম লোকই কদাচিৎ তা জানতে পারে। 'সেই একমাত্র আত্মাকেই জান, আর অন্য সব বাক্য ত্যাগ কর।'
১০৫
জগতের দিকে দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত আমাদের এইটুকু শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে এই বলে ডাকা—'ওঠ' জাগো, যে পর্যন্ত না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছচ্ছ, ততক্ষণ থেমো না।' ধর্ম মানে ত্যাগ—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর; মানবদেহের প্রত্যেক কোষ (cell)-এর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও দেহ যেমন একটি অখণ্ড বস্তু, ঈশ্বরও ঠিক তেমন একজন ব্যক্তি। সমষ্টিই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে, দেহ যেমন কোষের ওপর নির্ভর করে; বিপরীতও সত্য। জীব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরস্পরসাপেক্ষ; একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্যকেও থাকতে হবে। আবার, এই পৃথিবী ছাড়া সব উচ্চতর লোকেই যেহেতু মন্দ অপেক্ষা ভালর ভাগ অনেকগুণ বেশী, সমষ্টি পুরুষ বা ঈশ্বরকে সর্বগুণশালী সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ বলা চলে। ঈশ্বরের পূর্ণত্ব মানলেই এই সব গুণ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়; সেজন্য আর বিচারের প্রয়োজন হয় না।

ব্রহ্ম এই উভয়ের অতীত, কিন্তু কোন অবস্থাবিশেষ নহেন। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বৈত বস্তু; বহুবস্তুসম্ভূত নন। এই সর্বব্যাপী তত্ত্বই দেহ-কোষ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সর্বত্র অনুস্যূত, এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। যা কিছু সত্য, তা এই ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। যখন ভাবি—'আমি ব্রহ্ম', তখন শুধু 'আমিই' থাকি। তুমি যখন এই চিন্তা কর, তখন তোমার পক্ষেও তাই; এইরূপ সর্বত্র। প্রত্যেকেই ঐ পূর্ণ তত্ত্ব।

দিন কয়েক আগে হঠাৎ কৃপানন্দকে চিঠি লেখবার একটা অদম্য ইচ্ছা হয়েছিল। হয়তো সে আনন্দ পাচ্ছিল না এবং আমাকে স্মরণ করছিল। সুতরাং আমি তাকে খুব স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখেছিলাম। আজ আমেরিকার সংবাদ পেয়ে তার কারণ বুঝতে পারলাম। আমি তুষার প্রবাহের কাছ থেকে তোলা গোটাকয়েক ফুল তাকে পাঠিয়েছি। মিস ওয়াল্ডোকে বলবে, তাকে যেন যথেষ্ট স্নেহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। প্রেম কখনও মরে না। সন্তানেরা যাই করুক বা যেমনই হোক না কেন, পিতৃস্নেহের মরণ নেই। সে আমার সন্তান—সে আজ দুঃখে পড়ায় আমার স্নেহ ও সাহায্যের উপর তার দাবী ঠিক তেমনি বা আরও বেশী। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

২৯৬*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

Grand Hotel, Saas Fee
Valais, Switzerland ৮ অগষ্ট,১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,
তোমার চিঠির সঙ্গে একটি চিঠির তাড়া এসেছে। এইসঙ্গে ম্যাক্সমূলারের লেখা চিঠিখানা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা তাঁর সহৃদয়তা ও সৌজন্য।

মিস মূলার খুব শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। সেক্ষেত্রে পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত সেই 'পিওরিটি কংগ্রেস' (Purity Congress) উপলক্ষে বার্নে যেতে পারব না। যদি সেভিয়ার-রা আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী হন, তবেই আমি কিয়েল (Kiel) যাব এবং যাবার আগে তোমাকে লিখব। সেভিয়ার-রা মহৎ এবং সহৃদয়, কিন্তু তাঁদের বদান্যতার অযথা সুযোগ নেবার কোন অধিকার আমার নেই। মিস মূলারের ওপরও সে-দাবী করতে পারি না, কারণ সেখানকার খরচের বহর ভয়াবহ। অতএব বার্ন কংগ্রেসের আশা ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলাম, কারণ সেটা শুরু হতে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি, তার এখনও অনেক দেরী।

তাই ভাবছি জার্মানীর দিকেই যাব, যাত্রা শেষ করব কিয়েল-এ, এবং সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরব।

তাঁর নাম হচ্ছে বালগঙ্গাধর তিলক (মিঃ তিলক) এবং বইয়ের নাম 'ওরায়ন' (Orion)।

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনঃ—জেকবীর (Jacobi) লেখাও একখানা আছে—সম্ভবতঃ একই ধারায় ও একই সিদ্ধান্ত সহ অনূদিত।

পুনঃ—আশা করি থাকবার বাড়ী ও হলঘরটি সম্বন্ধে তুমি মিস মূলারের অভিমত জিজ্ঞেস করবে, তাঁর সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করা না হলে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হবেন।

—বি

গত রাত্রে মিস মূলার অধ্যাপক ডয়সনকে তার করেছিলেন, আজ ৯ অগষ্ট সকালে উত্তর এসেছে—আমাকে 'স্বাগত' জানিয়ে; ১০ সেপ্টেম্বর আমি কিয়েল-এ ডয়সনের বাড়ীতে উঠব। তাহলে তুমি আমার সঙ্গে কোথায় দেখা করবে? কিয়েল-এ? মিস মূলার সুইজরলণ্ড থেকে ইংলণ্ডে যাচ্ছেন। আমি সেভিয়ারদের সঙ্গে কিয়েল যাচ্ছি। আমি ১০ সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছব।

পুনঃ—বক্তৃতার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করিনি। আমার পড়াশুনো করার সময় একেবারে নেই। সেলেম সোসাইটি (Salem Society) খুব সম্ভবতঃ একটি হিন্দু সম্প্রদায়—কোন খেয়ালী দল নয়।

—বি

২৯৭*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

সুইজরলণ্ড
১২ অগষ্ট, ১৮৯৬

প্রেমাস্পদেষু,
আজ আমেরিকা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এককেন্দ্রীকরণ—বর্তমান কার্যারম্ভে তো বটেই। আমি তাদের এ পরামর্শ দিয়েছি যে, অনেকগুলি কাগজ ছাপাবার বদলে তারা 'ব্রহ্মবাদিনে'র সঙ্গে আমেরিকার লেখা কয়েক পাতা জুড়ে শুরু করুক এবং কিছু চাঁদা তুলে আমেরিকার খরচটা পুষিয়ে নিক। জানি না, তারা কি করবে।

আগামী সপ্তাহে আমরা এখান থেকে জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওনা হব। আমরা সীমান্ত পার হয়ে জার্মানীতে পা দিতে না দিতে মিস মূলার ইংলণ্ডে চলে যাবেন। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং আমি তোমাকে কিয়েল-এ আশা করব।

আমি এখন পর্যন্ত কিছু লিখিওনি, পড়িওনি। বস্তুতঃ আমি নিছক বিশ্রাম নিচ্ছি। ভাবনার কারণ নেই, তুমি শীঘ্রই প্রবন্ধটি প্রস্তুত পাবে। আমি মঠ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে জানলাম যে, অপর স্বামীটি১০৬ রওনা হবার জন্য তৈরী। আমি নিশ্চিত যে, তোমরা যে ধরনের লোক চাও, তিনি সেই ধরনের উপযুক্ত হবেন। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার আছে, তিনি তাদের অন্যতম … এবং শুনলাম তাঁর ইংরেজী বেশ দুরস্ত হয়েছে। আমেরিকা থেকে সারদানন্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি খবরের কাগজের অংশ পেয়েছি—তা থেকে জানলাম যে, তিনি সেখানে খুব সাফল্য অর্জন করেছেন। মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ফুটিয়ে তোলার পক্ষে আমেরিকা একটি সুন্দর শিক্ষাকেন্দ্র। ওখানকার হাওয়া কি সহানুভূতিতে পূর্ণ! গুডউইন এবং সারদানন্দের কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি।

চিরন্তন ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

২৯৮*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

লুসার্ন
২৩ অগষ্ট, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,
আজ ভারত থেকে লেখা অভেদানন্দের একখানা চিঠি পেলাম, খুব সম্ভবতঃ তিনি ১১ অগষ্ট B. I. S. N-এর 'S. S. Mombassa'তে রওনা হয়েছেন। এর পূর্বে তিনি কোন জাহাজ পাননি, তা না হলে আরও আগে রওনা হতে পারতেন। খুব সম্ভব তিনি 'মোম্বাসা' জাহাজে স্থান পেয়ে যাবেন। 'মোম্বাসা' লণ্ডনে পৌঁছবে ১৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ। তুমি জেনেছ যে, আমার ডয়সনের কাছে যাবার দিন—মিস মূলার পরিবর্তিত করে ১৯ সেপ্টেম্বর করেছেন। অভেদানন্দকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমি লণ্ডনে থাকতে পারব না। তিনি কোন গরম পোষাক ছাড়াই আসছেন; মনে হচ্ছে সে সময়ে ইংলণ্ডে ঠাণ্ডা পড়ে যাবে এবং তাঁর অন্ততঃ কয়েকটি অন্তর্বাস ও একটি ওভারকোট দরকার হবে। এ সব ব্যাপার আমার চেয়ে তুমি অনেক ভাল জান। সুতরাং দয়া

করে এই 'মোম্বাসা'র দিকে একটু নজর রেখো। আমি তার কাছ থেকে আর একটি চিঠি আশা করছি।

বস্তুতঃ আমি বিশ্রী-রকম সর্দিতে ভুগছি। আশা করি রাজার নিকট হতে মহিনের টাকা ইতোমধ্যেই তোমার জিম্মায় এসেছে। এসে থাকলে আমি তাকে যে টাকা দিয়েছিলাম ফেরত চাই না। তুমি তার সবটাই ওকে দিতে পার।

গুডউইন ও সারদানন্দের কাছ থেকে আমি কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। তারা ভাল আছে। মিসেস বুলের কাছ থেকেও একখানা চিঠি পেয়েছি; তিনি কেম্ব্রিজে যে সমিতিটি গঠন করেছেন, আমি ও তুমি ডাক মাধ্যমে তার সভ্য হইনি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমার বেশ মনে আছে যে, আমি তাঁকে লিখেছিলাম, তোমার ও আমার পক্ষে তার সভ্যপদ গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। আমি এখন পর্যন্ত একটি লাইনও লিখে উঠতে পারিনি। এমন কি পড়বার জন্যও একমুহূর্ত সময় পাইনি, পাহাড়ের উপত্যকায় চড়াই উতরাই করতে করতে সবটা সময় কাটছে। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবে। মহিন ও ফক্সের সঙ্গে এর পর যখন দেখা হবে, দয়া করে তাদের আমার ভালবাসা জানিও।

আমাদের সকল বন্ধুকে ভালবাসা।

তোমার চিরন্তন
বিবেকানন্দ

২৯৯*

লুসার্ন
২৩ অগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার শেষ চিঠিখানি আজ পেয়েছি; ইতোমধ্যে আপনার প্রেরিত ৫ পাউণ্ডের রসিদ পেয়ে থাকবেন। আপনি সভ্য হওয়ার কথা, কি লিখেছেন, তা বুঝতে পারলাম না; তবে কোন সমিতির তালিকায় আমার নাম যুক্ত করা বিষয়ে আমার আপত্তি নাই। স্টার্ডির নিজের এ বিষয়ে কি মতামত, তা কিন্তু আমি জানি না। আমি এখন সুইজরলণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখান থেকে জার্মানীতে যাব, তারপর ইংলণ্ডে এবং পরের শীতে ভারতে যাব। সারদানন্দ ও গুডউইন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকার্য সুন্দররূপে করছে শুনে খুব খুশী হলাম। আমার নিজের কথা এই যে, আমি কোন কাজের প্রতিদানে ঐ ৫০০ পাউণ্ডের ওপর কোন দাবী রাখি না। আমার বোধ হয়, আমি যথেষ্ট খেটেছি। এখন আমি অবসর নেব। আমি ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি; তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি, এখন অন্যে এটাকে চালাক। দেখতেই তো পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে দেবার জন্য কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার যতটুকু করবার তো শেষ হয়েছে; এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন এমন কি ঐ কাজটার ওপরও কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না। এমন কি, এই কাজের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকটার ওপরও আমার অরুচি হয়ে আসছে। মা শীঘ্রই আমাকে তার কাছে টেনে নিন! আর যেন কখনও ফিরে আসতে না হয়।

এই সব কাজ করা, উপকার ইত্যাদি শুধু চিত্তশুদ্ধির সাধনা মাত্র। তা আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকাল অনন্তকাল ধরে জগৎই থাকবে। আমরা যে যেমন সে তেমন ভাবেই জগৎটা দেখি। কে কাজ করে, আর কার কাজ? জগৎ বলে কিছু নেই —এ সবই তো স্বয়ং ভগবান্। ভ্রমে আমরা একে জগৎ বলি। এখানে আমি নেই, তুমি নেই, আপনি নেই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

সুতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। এ আপনাদের টাকা, আপনারা ইচ্ছামত খরচ করবেন।

শুভানুধ্যায়ী

সদাপ্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ডাক্তার জেনসের কাজে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমি তাঁকে তা জানিয়েছি। গুডউইন ও সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের প্রসার করতে পারে তো ভগবৎকৃপায় তারা তাই করতে থাকুক। স্টার্ডি, আমার বা অন্য কারও কাছে তো আর তারা নিজেদের বাঁধা দেয়নি! গ্রীনএকারের প্রোগ্রামে একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে—ওতে ছাপা হয়েছে, স্টার্ডি কৃপা করে অনুমতি দেওয়ায় সারদানন্দ সেখানে রয়েছে। স্টার্ডি বা অপর কেহ—একজন সন্ন্যাসীকে অনুমতি দেবার কে? স্টার্ডি এটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এজন্য দুঃখও করেছে। ... এতে স্টার্ডিকে অপমানিত করা হয়েছে; আর এটা যদি ভারতে পৌঁছাত, তবে আমার কাজের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হত। ভাগ্যক্রমে আমি বিজ্ঞাপনগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছি। ... আমি জগতের কোন সন্ন্যাসী বা প্রভুর চালক নই। যে কাজটা তাঁদের ভাল লাগে, সেইটে তাঁরা করেন এবং আমি যদি তাঁদের সাহায্য করতে পারি—বস্, এইমাত্র তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙেছি—আর ধর্মসঙ্ঘের সোনার শেকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদা মুক্ত থাকব। আমার ইচ্ছা সকলেই মুক্ত হয়ে যাক—বাতাসের মত মুক্ত। যদি নিউ ইয়র্ক, বোষ্টন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন স্থান বেদান্তের আচার্য চায়, তবে তাদের উচিত এই আচার্যদের সাদরে

গ্রহণ করা, তাঁদের বাসস্থান ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। আর আমার কথা—আমি তো অবসর গ্রহণ করছি বললেই চলে। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আমার যেটুকু অভিনয় করবার ছিল, তা আমি শেষ করেছি। ইতি

আপনাদের
—বি

৩০০

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

Lake Lucerne, সুইজরলণ্ড
২৩ অগষ্ট, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,

অদ্য রামদয়ালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ—তাঁহার মতে পুরুষদিগের একদিন এবং মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এইঃ

আলমোড়ার কাছে কোন সুবিধামত জায়গা আপনার জানা আছে কি, যেখানে বাগবাগিচা সহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সঙ্গে বাগান প্রভৃতি অবশ্যই থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসবে, সে-ই ভেসে যাক।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তার পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক তাঁর অবারিত দ্বার। 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.'
১০৭
এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসীভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কি প্রকারে করিতে হইবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসবস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার বা কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভালমানুষের মত ব্যবহার করে, ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক বা পুরুষই হউক, গৃহস্থ হউক বা অসতী হউক।

আমি এক্ষণে সুইজরলণ্ডে ভ্রমণ করিতেছি—শীঘ্র জার্মানীতে যাইব অধ্যাপক ডয়সনের সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাত এবং আগামী শীতে দেশে প্রত্যাবর্তন।

আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩০১*

সুইজরলণ্ড
২৬ অগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় নাঞ্জুণ্ড রাও,
এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্পস্‌ পর্বতে খুব চড়াই করছি আর তুষারপ্রবাহ পার হচ্ছি। এখন যাচ্ছি জার্মানীতে। অধ্যাপক ডয়সন কিয়েলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরব। সম্ভবতঃ এই শীতে ভারতে ফিরব।

মলাটের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, ওটি বড্ড রঙচঙে, চটকদার (tawdry); আর তাতে অনাবশ্যক এক গাদা মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। নক্‌সা হওয়া চাই সাদাসিধে, ভাবদ্যোতক অথচ সংক্ষিপ্ত (condensed)।

আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে, কাজ সুন্দর চলছে। ... যা হোক, একটা পরামর্শ দিচ্ছি—ভারতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব একটা দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। কাজকে ঠিক ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতর বন্ধুত্বের অথবা চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। যার ওপর ভার থাকবে, সে সব টাকাকড়ির অতি পরিষ্কার হিসেব রাখবে; এমন কি যদি কাউকে পরমুহূর্তে না খেয়ে মরতে হয়, তবুও 'শাকের কড়ি মাছে' দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা। তারপর চাই—অদম্য উৎসাহ। যখন যা কর, তখনকার মত তাই হবে ভগবৎ-সেবা। এই পত্রিকাটি১০৮ এখনকার মত আপনার আরাধ্য দেবতা হোক, তাহলেই সফল হবেন।

যখন এই পত্রিকাটি দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলুগু, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের কাগজ বের করুন। মান্দ্রাজীরা খুব সৎ, উৎসাহী ইত্যাদি; তবে আমার মনে হয়, শঙ্করের জন্মভূমি ত্যাগের ভাব হারিয়ে ফেলেছে। নানা বাধা বিপদের মাঝে আমার ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, সংসার ত্যাগ করবে; তবেই তো ভিত্তি শক্ত হবে!

বীরের মত কাজ করে চলুন; (মলাটের) নক্‌সা-টক্‌সার চিন্তা এখন থাক, ঘোড়া হলে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে যান—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের সঙ্গে কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সত্য প্রচার করে মরা ভাল—ঢের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

৩০২*

[মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত]

Kiel
১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
... অবশেষে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ... অধ্যাপকের সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ও বেদান্ত আলোচনা করে কালকের দিনটা খুব চমৎকার কাটান গেছে।

আমার মতে তিনি যেন একজন 'যুধ্যমান (warring) অদ্বৈতবাদী'। অপর কিছুর সঙ্গে তিনি আপস করতে নারাজ। 'ঈশ্বর' শব্দে তিনি আঁতকে উঠেন। ক্ষমতায় কুলালে তিনি এ- সব কিছুই রাখতেন না। তোমার মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনায় তিনি খুব আনন্দিত এবং এ- সব বিষয়ে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আলোচলা করতে চান; শীঘ্রই তিনি সেখানে যাচ্ছেন।

৩০৩*

[মিস হ্যারিয়েট হেলকে লিখিত]

উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনী,

সুইজরলণ্ড থেকে ফিরে এসে এইমাত্র তোমার অতি মনোজ্ঞ খবরটি পেলাম। 'Old Maids Home' (আইবুড়োদের আশ্রম)-এ লভ্য আরাম সম্বন্ধে তুমি যে অবশেষে মত পরিবর্তন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তুমি এখন ঠিক পথ ধরেছ, শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের পক্ষে বিবাহই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য। আর যে মুহূর্তে এই চিরন্তন সত্যটি মানুষ শিখে নেবে এবং মেনে চলতে প্রস্তুত হবে যে, পরস্পরের দোষত্রুটি সহ্য করা অবশ্য কর্তব্য এবং জীবনে আপস করে চলাই রীতি, তখনই তারা সবচেয়ে সুখের জীবন যাপন করতে পারবে।

স্নেহের হ্যারিয়েট, তুমি ঠিক জেনো 'সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন'—একটা স্ববিরোধী কথা; সুতরাং সংসারের কোন কিছু আমাদের উচ্চতম আদর্শের কাছাকাছি নয়—এটা দেখবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং এটা জেনে সব জিনিষের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের একখানি পুস্তক থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করাই আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল বলে মনে হচ্ছেঃ

'স্বামীকে ইহজীবনে সমস্ত কাম্যলাভে সহায়তা করে তুমি সর্বদা তাঁহার ঐকান্তিক প্রেমের অধিকারিণী হও; অতঃপর পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতির মুখদর্শনের পরে যখন জীবন-নাট্য শেষ হয়ে আসবে, তখন যে সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলস্পর্শে সর্বপ্রকার বিভেদ দূর হয়ে যায় এবং আমরা এক হয়ে যাই, সেই সচ্চিদানন্দ-লাভে যেন তোমরা পরস্পরের সহায় হও।'
১০৯

আমি তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়, তোমার মধ্যে এমন প্রভূত ও সুসংযত শক্তি রয়েছে, যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় পূর্ণ। সুতরাং আমি নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, তোমার দাম্পত্য-জীবন খুব সুখের হবে।

তোমাকে ও তোমার ভাবী বরকে আমার অনন্ত আশীর্বাদ। ভগবান্ যেন তাকে সর্বদা এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমার মত পবিত্র, সুচরিত্রা, বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও সুন্দরী সহধর্মিণী লাভ করে সে কৃতার্থ হয়েছে।

আমি এত শীঘ্র আটলাণ্টিক পাড়ি দেবার ভরসা রাখি না, যদিও তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে আমার খুবই সাধ।

তুমি সারাজীবন উমার মত পবিত্র ও নিষ্কলুষ হও, আর তোমার স্বামীর জীবন যেন উমাগতপ্রাণ শিবের মতই হয়। ইতি

তোমার স্নেহের ভাই
বিবেকানন্দ

৩০৪*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

Airlie Lodge
Wimbledon, England
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

স্নেহের ভগিনী,

সুইজরলণ্ডে দু-মাস পাহাড় চড়ে, পর্যটন করে ও হিমবাহ দেখে আজ লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি। এতে আমার একটা উপকার হয়েছে—কয়েক পাউণ্ড অপ্রয়োজনীয় মেদ বাষ্পীয় অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। তথাপি তাতেও কোন নিরাপত্তা নেই, কারণ এ জন্মের স্থূল দেহটির খেয়াল হয়েছে মনকে অতিক্রম করে অনন্তে প্রসারিত হবে। এ ভাবে চলতে থাকলে আমাকে অচিরেই সমস্ত ব্যক্তিগত সত্তা হারাতে হবে—এই রক্তমাংসের দেহে থেকেও—অন্ততঃ বাইরের জগৎটার কাছে।

হ্যারিয়েটের চিঠিতে যে শুভ সংবাদটি এসেছে, তাতে যা আনন্দ হল—তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আজ তাকে চিঠি দিলাম। দুঃখ এই যে, তার বিবাহের সময় যেতে পারছি না, তবে সর্বাধিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে আমি 'সূক্ষ্ম দেহে' উপস্থিত থাকব। ভাল কথা, আমার আনন্দ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আমি তোমার এবং অপর ভগিনীদের নিকট হতেও অনুরূপ সংবাদ আশা করছি। এবার স্নেহের মেরী, আমি জীবনে যে এক মহৎ শিক্ষা লাভ করেছি, তার কথা তোমাকে বলব। সেটা হল এইঃ 'তোমার আদর্শ যত উচ্চ হবে, তুমি তত দুঃখী', কারণ 'আদর্শ' বলে বস্তুটিতে পৌঁছান এ সংসারে সম্ভব নয়—অথবা এ জীবনেও নয়। যে এ জগতে পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা করে, সে উন্মাদ বৈ নয়, কারণ তা হবার যো নেই।

সসীম জগতে তুমি কি করে অনন্তের সন্ধান পাবে? সুতরাং আমি তোমাকে বলছি— হ্যারিয়েট বেশ সুখের ও শান্তির জীবন লাভ করবে, কারণ কল্পনাবিলাস ও ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে চলার মত বোকা সে মোটেই নয়। যেটুকু ভাবাবেগ থাকলে জীবন মধুর হয় এবং যেটুকু সাধারণ বুদ্ধি ও কোমলতা থাকলে জীবনের অবশ্যম্ভাবী কাঠিন্যগুলি নরম হয়ে যায়—সেটুকু তার আছে। হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলিরও ঐ গুণটি আরও বেশী পরিমাণেই আছে। একজন সেরা গৃহিণী হবার মত মেয়ে সে, শুধু এ জগৎটা আহাম্মকদের দ্বারা এতই পরিপূর্ণ যে, খুব কম লোক রক্তমাংসের দেহকে অতিক্রম করে আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তোমার ও ইসাবেল-এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি তোমাকে সত্য কথাটি বলব এবং আমার 'ভাষা সোজা—স্পষ্ট'।

মেরী, তুমি হলে একটি তেজী আরবী ঘোড়ার মত—মহীয়সী ও দীপ্তিময়ী। তোমাকে রাণী হিসেবে চমৎকার মানাবে—দেহে ও মেজাজে। তুমি একজন তেজস্বী, বীর, দুঃসাহসী, নির্ভীক স্বামীর পাশে উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাবে; কিন্তু স্নেহের ভগিনী, গৃহিণী হিসেবে তুমি হবে একেবারেই নিকৃষ্ট। তুমি আমাদের দৈনন্দিন জগতের স্বচ্ছন্দচারী, সাংসারিক, পরিশ্রমী অথচ ঢিলেঢালা স্বামী বেচারাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে। ভগিনী, মনে রেখো, যদিও এ-কথা সত্যি যে বাস্তব জীবন উপন্যাসের চেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর, কিন্তু সে-রকম ঘটে ক্বচিৎ কখনও। তাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ, যতদিন না তোমার আদর্শকে বাস্তব ভূমিতে নামিয়ে আনতে পারছ, ততদিন তোমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। যদি কর, তবে তা তোমাদের উভয়ের অশান্তি ডেকে আনবে। কয়েক মাসের মধ্যেই তুমি একজন সাধারণ ভালমানুষ মার্জিত রুচি যুবা পুরুষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে, তখন তোমার কাছে জীবন নীরস বলে বোধ হবে। ভগিনী ইসাবেল-এর মেজাজটাও তোমারই মতন, শুধু কিণ্ডারগার্টেনটি তাকে বেশ কিছুটা ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে। সম্ভবতঃ সে ভাল গৃহিণীই হতে পারবে।

জগতে দু-রকমের লোক আছে। একরকম হল—বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতিস্বীকার করে, বেশী কল্পনার ধার ধারে না, কিন্তু সৎ সহৃদয় মধুরস্বভাব ইত্যাদি। তাদেরই জন্য এই পৃথিবী; তারাই সুখী হতে জন্মেছে। আবার অন্য রকমের লোক আছে, যাদের স্নায়ুগুলি উত্তেজনাপ্রবণ, যারা ভয়ানক রকম কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং সর্বদা এই মুহূর্তে উঁচুতে উঠছে এবং পরের মুহূর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের বরাতে সুখ নেই। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা মাঝামাঝি একটা সুখের সুরে ভেসে যায়। শেষোক্তেরা আনন্দ ও বেদনার মধ্যে ছুটোছুটি করে। কিন্তু এরাই হল প্রতিভার উপাদান। 'প্রতিভা এক রকমের পাগলামি'—আধুনিক এই মতবাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু সত্য নিহিত আছে।

এখন এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বড় হতে চায়, তবে তাদের তা চরিতার্থ করবার জন্য লড়াই করতে হবে—লড়াই-এর জন্যেই, আর বাইরে বেরিয়ে এসে। তাদের কোন দায় থাকবে না—বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোন অনাবশ্যক আসক্তি নয়; সেই আদর্শের জন্যই জীবনধারণ এবং সেই আদর্শের জন্যই মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মানুষ। আমার একমাত্র ভাবাদর্শ হল 'বেদান্ত', এবং আমি 'লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত'। তুমি ও ইসাবেল এই ধাতুতে গড়া; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদিও কথাটা রূঢ়, তোমরা তোমাদের জীবনের বৃথাই অপচয় করছ। হয় একটা আদর্শকে ধর, বাইরে ঝাঁপিয়ে পড় এবং তার জন্য জীবন উৎসর্গ কর; কিম্বা অল্পে সন্তুষ্ট থাক ও বাস্তববাদী হও; আদর্শকে খাটো করে বিয়ে কর ও সুখের জীবন যাপন কর। হয় 'ভোগ' নয় 'যোগ'—হয় এই জীবনটাকে উপভোগ কর, অথবা সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে যোগী হও; দুটি একসঙ্গে লাভ করার সাধ্য কারও নেই। এইবেলা না হলে কোনকালেই হবে না, ঝটপট একটাকে বেছে নাও। কথায় বলে, 'যে খুব বাছবিচার করে, তার বরাতে কিছুই জোটে না'। তাই আন্তরিকভাবে, খাঁটিভাবে আমরণ সংকল্প নিয়ে 'লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হও'; দর্শন বা বিজ্ঞান, ধর্ম বা সাহিত্য—যে-কোন একটিকে অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট জীবনে সেইটিই তোমার উপাস্য দেবতা হোক। হয় সুখী হও, নয়তো মহৎ হও। তোমার ও ইসাবেলের প্রতি আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই; তোমরা না এটায়, না ওটায়। তোমরাও হ্যারিয়েটের মত ঠিক পথটি বেছে নিয়ে সুখী হও, কিম্বা মহীয়সী হও—এই আমি দেখতে চাই। পান ভোজন সজ্জা ও যত বাজে সামাজিক চালচলনের ছেলেমানুষীর জন্য একটা জীবন দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ মেরী, তোমার। অদ্ভুত মস্তিষ্ক ও কর্মকুশলতাকে তুমি মরচে পড়তে দিয়ে নষ্ট করে ফেলছ, যার কোন অজুহাত নেই। বড় হবার উচ্চাশা তোমাকে রাখতে হবে। আমি জানি, আমার এই রূঢ় মন্তব্যগুলো তুমি ঠিকভাবে নেবে, কারণ তুমি জান, আমি তোমাদের যে 'বোন' বলে ডাকি—তার চেয়েও বেশীই আমি তোমাদের মনে করি। আমার অনেকদিন থেকেই এই কথাটি তোমাকে বলার ইচ্ছা ছিল, এবং অভিজ্ঞতা জমছে, তাই বলার আবেগে বলে ফেললাম। হ্যারিয়েটের আনন্দসংবাদ আমাকে এ-কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। আমি শুনতে পেলে খুবই আনন্দিত হব যে, তুমিও বিয়ে করেছ এবং সংসারে যতটা সুখী হওয়া যায় ততটা সুখী হয়েছ, অথবা এ-কথা শুনতে চাই যে তুমি বড় বড় কাজ করছ।

জার্মানীতে অধ্যাপক ডয়সনের কাছে গিয়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই এই শ্রেষ্ঠ জার্মান দার্শনিকের নাম শুনেছ। তিনি ও আমি একসঙ্গে ইংলণ্ড ভ্রমণ করেছি ও আজ উভয়ে এখানে আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি—আমার ইংলণ্ড বাসের অবশিষ্ট দিনগুলি তাঁর কাছেই কাটাব। ডয়সন সংস্কৃত বলতে খুব ভালবাসেন এবং পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি সেটা অভ্যাস করতে চান বলে আমার সঙ্গে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলেন না।

আমি এখানে বন্ধুদের মধ্যে এসে জুটেছি, কয়েক সপ্তাহ এখানে কাজ করব এবং তারপর শীতকালে ভারতবর্ষে ফিরে যাব।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩০৫-৩১৪

৩০৫*

[মিঃ গুডউইনকে লিখিত]

C/o Miss Muller
Airlie Lodge, Ridgeway
Gardens
উইম্বলডন, ইংলণ্ড
২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
ম্যাক্সমূলারের লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম, তা তুমি পাওনি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি ঐ প্রবন্ধে আমার নাম উল্লেখ না করায় তুমি দুঃখিত হয়ো না; কারণ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার ছ-মাস আগে তিনি ঐ প্রবন্ধটি লিখেছেন। তা ছাড়া মূল বিষয়ে যদি তিনি ঠিক থাকেন, তবে কার নাম করলেন বা না করলেন, এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

জার্মানীতে প্রফেসর ডয়সনের সঙ্গে আমার কিছুদিন খুব সুন্দর কেটেছে। তারপর দুজনে লণ্ডনে আসি। ইতোমধ্যেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য জন্মেছে। আমি শীঘ্রই তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি। দয়া করে এইটুকু শুধু মনে রেখো—আমার প্রবন্ধের প্রারম্ভে পুরানো ঢঙের 'প্রিয় মহাশয়' যেন ছাপা না হয়। রাজযোগের বইখানি কি তোমার দেখা হয়েছে? আগামী বৎসরের জন্য তোমায় একটি নকসা পাঠাব। রাশিয়ার জারের লেখা একটি ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকের উপর 'ডেলী নিউজে' যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, তা তোমায় পাঠালাম। যে প্যারাগ্রাফে তিনি ভারতবর্ষকে 'ধর্মভূমি ও জ্ঞানভূমি' বলেছেন, সেটা তোমার কাগজে উদ্ধৃত করা উচিত; তারপর ওটি 'ইণ্ডিয়ান মিররে' পাঠিয়ে দিও।

জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পার, আর ডাক্তার নাঞ্জুণ্ড রাও সহজ বক্তৃতাগুলি 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ছাপতে পারেন। তবে ওগুলো খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ছাপাবে। আমার বিশ্বাস, পরে আমি আরও বেশী লিখবার সময় পাব। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যাও। সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—যে অংশটা ছাপতে হবে, তা দাগ দিয়ে দিয়েছি—বাকীটা অবশ্য পত্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড় করতে পারবে—এমন ভরসা যদি না থাকে, তবে এখনই ওটাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্যন্ত তো পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমরা প্রবেশও করিনি; যথা—তুলসীদাস, কবীর, নানক ও দক্ষিণ ভারতীয় সাধুদের জীবন ও বাণী। অসাবধানে ও যা তা ভাবে না লিখে সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে এ-সব লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকার আদর্শ বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, তা ছাড়া এটি ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মুখপত্র হবে—অবশ্য ঐ গবেষণাদি হবে ধর্ম সম্বন্ধে। তোমার উচিত কলিকাতা ও বোম্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আসা ও তাঁদের কাছ থেকে সযত্নে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা। পূর্ণ উদ্যমে কাজে লাগ। ইতি

বি

৩০৬*

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স্
ওয়েস্টমিনস্টার, লণ্ডন
১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হল সুইজরলণ্ড থেকে ফিরেছি; কিন্তু তোমাকে এ পর্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখতে পারিনি। আমি গত mail (ডাকে)-এ কিয়েল-নিবাসী পল ডয়সন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। স্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনও কাজে পরিণত হয়নি। তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি সেন্ট জর্জেস্ রোডের বাসা ছেড়ে এসেছি। আমাদের একটি বক্তৃতা দেবার হল হয়েছে। ৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, C/o E. T. Sturdy—এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্যন্ত পত্রাদি এলে আমার কাছে পৌঁছবে। গ্রেকোট গার্ডেনে যে ঘরগুলি আছে, তা আমার ও অপর স্বামীর (সন্ন্যাসীর) থাকবার উদ্দেশ্যে মাত্র তিন মাস ভাড়া নেওয়া

হয়েছে। লণ্ডনের কাজ দিন দিন বেড়ে চলেছে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্লাসে বেশী করে লোক সমাগম হচ্ছে। শ্রোতৃ-সংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি চলে গেলে যতটা গাঁথনি হয়েছে, তার অধিকাংশই পড়ে যাবে। কিন্তু তারপর হয়তো কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে, হয়তো কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এসে এই কার্যের ভার গ্রহণ করবে—প্রভুই জানেন, কিসে ভাল হবে।

আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দেবার জন্য বিশ জন প্রচারকের স্থান হতে পারে; কিন্তু কোথা থেকেই বা প্রচারক পাওয়া যাবে, আর তাদের আনবার জন্য টাকাই বা কোথায়? যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় করে ফেলা যেতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা সবাই যে আহম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ; মুখে স্বদেশপ্রেমের কতকগুলি বাজে বুলি আওরাই, আর 'আমরা খুব ধার্মিক' এই অভিমানে ফুলে আছি! মান্দ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চটপটে ও একনিষ্ঠ; কিন্তু হতভাগাগুলো সকলেই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়েই জন্মেছে! ... এ আমি বড় শক্ত কথা বললাম; কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে—কেবল যদি এই রকম লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুত্বের যূপকাষ্ঠে হত্যা না করা হত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্দ্রাজ তখনই জাগবে, যখন তার হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে এবং দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে সেই এক ঘা ভারতের ভিতরের লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়। যা হোক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবেই হবে।

আমি তোমাদের যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম, মিস মূলার সেই টাকা দেবেন বলেছিলেন। আমি তাঁকে তোমার নূতন প্রস্তাবের বিষয় বলেছি, তিনি তা ভেবে দেখেছেন। ইতোমধ্যে আমার বিবেচনায় তাঁকে কিছু কাজ দেওয়া ভাল। তিনি 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এজেন্ট হতে স্বীকৃত হয়েছেন। তুমি তাঁকে ঐ সম্বন্ধে লিখো যেন। তাঁর ঠিকানা—Airlie Lodge, Ridgeway Gardens, Wimbledon, England. গত কয়েক সপ্তাহ তাঁরই বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু আমি লণ্ডনে না থাকলে লণ্ডনের কাজ চলতে পারে না; সুতরাং বাসা বদলেছি। মিস মূলার এতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, আমিও দুঃখিত। কিন্তু কি করব! এঁর পুরা নাম—মিস হেনরিয়েটা মূলার। ম্যাক্সমূলার দিন দিন আরও বেশী করে বন্ধুভাবাপন্ন হচ্ছেন। শীঘ্রই আমাকে অক্সফোর্ডে দুটি বক্তৃতা দিতে হবে।

মহীশূরে তামিল লিপিতে সমগ্র
১০৮
উপনিষদ্-সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডয়সনের পুস্তকাগারে সেটি দেখলাম। ও বইয়ের কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? যদি থাকে তো আমায় একখানি পাঠাবে। যদি না থাকে তো তামিল সংস্করণটিই পাঠাবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষরসহ) পাশে পাশে নাগরীতে লিখে পাঠাবে—যাতে আমি তামিল অক্ষর শিখে নিতে পারি।

সেদিন আমার সঙ্গে সত্যনাথন মহাশয়ের সাক্ষাৎ হল লণ্ডনে। তিনি আমাকে তাঁর বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা এবং তাঁর মৃতা সহধর্মিণীকৃত একখানি উপন্যাস উপহার দিলেন। তিনি বললেন, মান্দ্রাজের প্রধান এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র 'মান্দ্রাজ মেলে' রাজযোগ-পুস্তকখানির একটি অনুকূল সমালোচনা বেরিয়েছে। আরও শুনলাম, আমেরিকার প্রধান শারীরতত্ত্ববিৎ উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও ধারণাসমূহ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছেন। এই সময়ে আবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি নিয়ে উপহাস করেছেন। ভাল কথা! আমার আলোচনা অতি নির্ভীক, আর এগুলির বেশীরভাগই লোকের নিকট চিরকাল অর্থহীন থেকে যাবে। কিন্তু ওতে এমন সব বিষয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে, শারীরতত্ত্ববিদ্‌রা আরও আগেই গ্রহণ করলে ভাল করতেন। যা হোক, যেটুকু ফল হয়েছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমার ভাব এই—লোকে আমার বিরুদ্ধে বলুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কিছু বলুক।

অবশ্য ইংলণ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র, আমেরিকার সমালোচকদের মত বাজে বকে না। তারপর ইংলণ্ডের যে-সব মিশনরী ওদেশে দেখতে পাও, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই dissenters (প্রতিষ্ঠিত চার্চের বিরোধী)। ... এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যাঁরা ধার্মিক, তাঁরা সকলেই 'চার্চ অব ইংলণ্ডে'র। ইংলণ্ডে ঐ বিরোধীদের অতি অল্পই প্রতিপত্তি, আর তাদের শিক্ষাও নেই। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাদের বিষয়ে সাবধান করে দাও, তাদের কথা আমি এখানে শুনতেই পাই না। তারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তারা এখানে বাজে বকতে সাহসও পায় না। আশা করি, রামকৃষ্ণ নাইডু এতদিনে মান্দ্রাজে পৌঁছেছেন এবং তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল।

হে বীরহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায় কর। আমাদের কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। কখনও নিরাশ হয়ো না, কখনও বলো না, 'আর না, যথেষ্ট হয়েছে।' আমি একটু সময় পেলেই 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য কয়েকটি গল্প লিখব। অভেদানন্দ মারফৎ মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার দয়া করে যে সমাচার পাঠিয়েছেন, সেজন্য তাঁকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবে।

তোমার চিরপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—পাশ্চাত্য দেশে যখনই কেউ আসে এবং বিভিন্ন জাতিদের দেখে, তখনই তার চোখ খুলে যায়। কেবল অনর্থক বকে নয়,

পরন্তু ভারতে আমাদের কি আছে আর কি নেই, তা তাদের স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে—এভাবেই আমি দৃঢ়চেতা কর্মবীরদের যোগাড় করে থাকি। আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক। ইতি

বি

পুনঃ—তোমার ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য লোহার ব্লক সমেত নক্সা পাঠাব। ইতি

বি

৩০৭*

C/o Miss Muller
উইম্বল্ডন, ইংলণ্ড
৭ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় জো,

আবার সেই লণ্ডনে! আর ক্লাসগুলিও যথারীতি শুরু হয়েছে। সংস্কারবশেই আমার মন চারিদিকে সেই চেনা মুখখানি খুঁজে ফিরছিল, যে মুখে কখনও নিরুৎসাহের রেখা পড়ত না, যা কখনও পরিবর্তিত হত না আর যা ছিল সর্বদা সহায়ক, আনন্দময় ও শক্তিপ্রদ। আজ কয়েক সহস্র মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও সেই মুখখানিই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল; অতীন্দ্রিয় রাজ্যে দূরত্ব আবার কি? যাক্, তুমি তো তোমার বিশ্রাম ও শান্তিপূর্ণ ঘরে ফিরে গেছ—আর আমার ভাগ্যে আছে নিত্যবর্ধমান কর্মের তাণ্ডব! তবু তোমার শুভেচ্ছা সর্বদাই আমার সঙ্গে ফিরছে—নয় কি?

কোন নির্জন পর্বতগুহায় গিয়ে চুপ করে থাকাই হচ্ছে আমার স্বাভাবিক প্রবণতা; কিন্তু পেছন থেকে নিয়তি আমাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, আর আমি এগিয়ে চলেছি! অদৃষ্টের গতি কে রোধ করবে?

যীশুখ্রীষ্ট তাঁর Sermon on the Mount (শৈলোপদেশ)-এ এরূপ কোন উক্তি কেন করেননি—'যারা সদা আনন্দময় ও সদা আশাবাদী তারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যলাভ তো তাদের হয়েই আছে?' আমার বিশ্বাস তিনি নিশ্চয়ই ঐরূপ বলেছিলেন, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ হয়নি; তিনি বিশাল বিশ্বের অনন্ত দুঃখ অন্তরে বহন করে বলেছিলেন, সাধুর হৃদয় শিশুর মত। তাঁর সহস্র বাণীর মধ্যে হয়তো একটি বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ মনে করে রাখা হয়েছে।

বর্তমানে ফল বাদাম প্রভৃতিই আমার প্রধান আহার; এবং ওতেই যেন আমি ভাল আছি। যদি কখনও সেই 'উঁচু দেশে'র পুরাতন চিকিৎসকটির সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তবে সেই রহস্যটি তাঁকে বলো। আমার চর্বি অনেকটা কমে গেছে; তবে যেদিন বক্তৃতা থাকে, সেদিন কিছু পেট ভরা খাবার খেতে হয়। হলিস্টার কেমন আছে? তার চেয়ে মধুর প্রকৃতির বালক আমি দেখিনি। তার সারাটি জীবন সর্বপ্রকার মঙ্গলে পূর্ণ হোক!

তোমার বন্ধু কোলা নাকি জরথুষ্ট্রীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন? অদৃষ্ট নিশ্চয়ই তাঁর খুব অনুকূল নয়। তোমাদের মিস— এবং আমাদের—এর খবর কি? … আর আমাদের মিস (নাম ভুলে গেছি!) কেমন? শুনলাম, সম্প্রতি আধজাহাজ বোঝাই হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং অন্যান্য আরও কত কি সম্প্রদায়ের লোক আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে; আর একদল লোক গিয়ে ভারতবর্ষে জুটেছে, যারা মহাত্মা খুঁজে বেড়ায়, ধর্মপ্রচার করে ইত্যাদি। চমৎকার! ভারতবর্ষ ও আমেরিকা—এই দুটি দেশই যেন ধর্মবিষয়ক উৎসাহ-উদ্দীপনার লীলাভূমি বলে মনে হয়। কিন্তু জো, সাবধান, এই বিধর্মীদের পাপ অতি ভীষণ! আজ পথে মাদাম-এর সহিত সাক্ষাৎ হল। তিনি আর আজকাল আমার বক্তৃতায় আসেন না। সেটা তাঁর পক্ষে ভালই; অত্যধিক দার্শনিক চিন্তা ভাল নয়।

সেই মহিলাটির কথা কি তোমার মনে আছে—যিনি আমার প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে এমন সময় এসে উপস্থিত হতেন, যখন কিছুই শুনতে পেতেন না, কিন্তু বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে আমাকে ধরে রাখতেন এবং বকাতেন যে, ক্ষুধার জ্বালায় আমার পাকস্থলীতে ওয়াটারলুর মহাসমর উপস্থিত হত? তিনি এসেছিলেন, অপর সকলেও আসছে এবং আরও আসবে। এ সবই আনন্দের বিষয়। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই এসেছিলেন এবং গলস্ওয়ার্দি পরিবারের বিবাহিতা কন্যাদেরও একজন এসেছিলেন। মিসেস গলস্ওয়ার্দি আজ আসতে পারেননি, কারণ যথেষ্ট আগে খবর পাননি। এখন আমরা একটি 'হল'—বেশ বড় 'হল' পেয়েছি; তাতে দু-শ বা তার চেয়েও বেশী লোকের স্থান হতে পারে। একটা বড় কোণ আছে, সেখানে লাইব্রেরী বসান যাবে। সম্প্রতি আমাকে সাহায্য করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে আর একজন এসেছেন।

সুইজরলণ্ড এবং জার্মানী দুটি জায়গায়ই আমার খুব ভাল লেগেছিল। অধ্যাপক ডয়সন খুব সদয় ব্যবহার করেছিলেন। আমরা উভয়েই লণ্ডনে এসে খুব আনন্দ করেছি। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। মোটের উপর ইংলণ্ডের কাজ বেশ পাকা হচ্ছে, এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আনুকূল্য দেখে মনে হয় যে, আমাদের কাজ শ্রদ্ধাও অর্জন করেছে। সম্ভবতঃ এই শীতে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু সহ আমি ভারতবর্ষে যাব। আমার নিজের সম্বন্ধে আজ এই পর্যন্ত।

সেই নৈষ্ঠিক পরিবারটির সংবাদ কি? সব বেশ চমৎকার ভাবেই চলছে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এতদিনে ফক্সের সংবাদ

তুমি পেয়ে থাকবে। যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে শুরু না করলে সে ম্যাবেলকে বিয়ে করতে পারে না, এ-কথা তাকে যাত্রার আগের দিনে বলে ফেলে আমি হয়তো তাকে খুব মন-মরা করে দিয়েছি। ম্যাবেল কি এখন তোমার ওখানে আছে? তাকে আমার স্নেহ জানিও; আমাকে তোমার বর্তমান ঠিকানাও দিও। মা কেমন আছেন? ফ্র্যাঙ্কিন্‌সেন্স বরাবরের মত ঠিক সেই খাঁটি অমূল্য সোনাটিই আছে নিশ্চয়! এলবার্টা বোধ হয় ঠিক তার নিয়মমত গান-বাজনা, ভাষাশিক্ষা, হাসিঠাট্টা নিয়ে আছে এবং খুব করে আগের মত আপেল খাচ্ছে?

রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে; সুতরাং জো, আজকের মত বিদায় (নিউ ইয়র্কেও কি আদবকায়দা ঠিক ঠিক পালন করা দরকার?)। প্রভু নিরন্তর তোমার কল্যাণ করুন। ... আমার চিরস্নেহ ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—সেভিয়ার-দম্পতি তোমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তাঁদের ঘর (ফ্ল্যাট) থেকেই এই চিঠি লিখছি। ইতি

বি

৩০৮*

[মিস ওয়াল্ডোকে লিখিত]

উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড
৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় ওয়াল্ডো,
... সুইজরলণ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছি এবং অধ্যাপক পল ডয়সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছে। বাস্তবিক, অন্যান্য স্থানের চেয়ে ইওরোপে আমার কাজ বেশী সন্তোষজনক হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে এর একটা খুব প্রতিধ্বনি উঠছে। লণ্ডনের ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে—আজ তার প্রথম বক্তৃতা। এখন আমার নিজের একটা 'হল' হয়েছে—তাতে দুইশত বা ততোধিক লোক ধরে। ... তুমি অবশ্য জান, ইংরেজরা একটা জিনিষ কেমন কামড়ে ধরে থাকতে পারে, এবং সকল জাতির মধ্যে তারা পরস্পরের প্রতি সবচেয়ে কম ঈর্ষাপরায়ণ—এই কারণেই তারা জগতের উপর প্রভুত্ব করেছে। দাসসুলভ খোশামুদির ভাব একদম না রেখে কিভাবে আজ্ঞানুবর্তী হওয়া যায়—অপরিসীম স্বাধীনতার সঙ্গে কেমন করে কঠোর নিয়ম মেনে চলা যায়—এ রহস্য তারা বুঝেছে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এখন আমার বন্ধু। আমি লণ্ডনে ছাপমারা হয়ে গেছি। র—নামক যুবকটি সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। সে বাঙালী এবং অল্পস্বল্প সংস্কৃত পড়াতে পারবে। তুমি আমার দৃঢ় ধারণা তো জান—কামকাঞ্চন যে জয় করতে পারেনি, তাকে আমি বিশ্বাসই করি না। তুমি তাকে তত্ত্বমূলক (theoretical) বিষয় শেখাতে দিয়ে দেখতে পার; কিন্তু সে যেন রাজযোগ শেখাতে না যায়—যারা রীতিমত শিক্ষা না করেছে, তাদের ওটা নিয়ে খেলা করা মহা বিপজ্জনক। সারদানন্দের সম্বন্ধে কোন ভয় নেই—বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তার উপর আশীর্বাণী বর্ষণ করেছেন। তুমি শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন? ... এই র—বালকটির চেয়ে তোমার হাজার গুণ বেশী দর্শনের জ্ঞান আছে। ক্লাসের নোটিস বার কর এবং নিয়মিতভাবে ধর্মবিষয়ক আলোচনা কর ও বক্তৃতা দিতে থাক। এক-শ হিন্দু, এমন কি, আমার একজন গুরুভাই আমেরিকায় খুব সাফল্য লাভ করেছে শুনলে যে আনন্দ হয়, তোমাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখলে আমি তার সহস্রগুণ আনন্দলাভ করব। 'মানুষ দুনিয়া জয় করতে চায়; কিন্তু নিজ সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে।' জ্বালাও, জ্বালাও—চারিদিকে জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩০৯*

[মিসেস বুলকে লিখিত]

উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড
৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়—,
জার্মানীতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিয়েল-এ (Kiel) তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। দু-জনে

একসঙ্গে লণ্ডনে এসেছি এবং এখানেও কয়েকবার দেখাশুনা হয়েছে, খুব আনন্দলাভ করেছি। ... ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কাজের প্রতি যদিও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তবু দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাজের বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকা খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কাজ—বেদান্তপ্রচার। অন্যান্য কাজে সাহায্যও এই এক আদর্শের অনুকূল হওয়া চাই। আশা করি, আপনি এটা সারদানন্দের মনে বদ্ধমূল করে দেবেন।

আপনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন কি? ... এখানে ইংলণ্ডে সবই যেন আমাদের অনুকূল হয়ে উঠেছে। কাজ যে শুধু জনপ্রিয় হচ্ছে তা নয়, পরন্তু তার সমাদরও বাড়ছে।

আপনাদের স্নেহাধীন
বিবেকানন্দ

৩১০*

[‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকার জন্য লিখিত]

১১০

লণ্ডন
২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

চিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ
ধর্মমহাসভার স্বীয় বিরাট কল্পনা
সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি.
বনি ডাঃ ব্যারোজকে সহকারী নিযুক্ত
করায় দক্ষতম ব্যক্তির হস্তেই
কার্যভার অর্পিত হয়েছিল; আর ডাঃ
ব্যারোজের নেতৃত্বে ঐ
মহাসভাগুলির অন্যতম ধর্মমহাসভা
কিরূপ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল,
তা আজ ইতিহাসের বিষয়।

ডাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল সহনশীলতা ও ঐকান্তিক ভদ্রতাই এই মহাসভাকে অপূর্ব সাফল্যে মণ্ডিত করেছিল।

বিস্ময়কর চিকাগো মহাসভাকে অবলম্বন করেই ভারত, ভারতবাসী ও ভারতীয় চিন্তা জগৎসমক্ষে আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় যা কিছু কল্যাণ হয়েছে, তার জন্য সেই সভার অন্যান্য সকলের তুলনায় ডাঃ ব্যারোজের কাছেই আমরা বেশী ঋণী।

তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধর্মের পবিত্র নাম, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যের নাম নিয়ে আসছেন এবং আমার বিশ্বাস—ন্যাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্মের সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা অতিশয় উদার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত করবে। ঈশার শক্তির যে পরিচয় ইনি ভারতকে দিতে চান, তা পরমত-অসহিষ্ণু প্রভুভাবাপন্ন ও অপরের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ মনোবৃত্তিপ্রসূত নয়। পরন্তু ভ্রাতৃরূপে—ভারতে উন্নতিকামী বিভিন্ন দলের সহকর্মী ভ্রাতৃবর্গের অন্যতমরূপে গণ্য হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি যাচ্ছেন। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কৃতজ্ঞতা ও আতিথেয়তাই ভারতীয় জীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য; তাই আমার দেশবাসীর কাছে এই বিনীত অনুরোধ—পৃথিবীর অপর দিক্ থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রতি তাঁরা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি দেখতে পান যে, এই দুঃখ দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতরেও আমাদের হৃদয় সেই অতীতেরই ন্যায় বন্ধুত্বপূর্ণ আছে, যখন ভারত আর্যভূমি বলে পরিচিত ছিল এবং যখন তার ঐশ্বর্যের কথা জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফিরত।

৩১১*

C/o E. T. Sturdy
৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন
২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার ‘ভক্তিযোগ’ ও ‘সর্বজনীন ধর্ম’ পেয়েছি। আমেরিকায় ‘ভক্তিযোগে’র নিশ্চয়ই খুব কাটতি হবে। কিন্তু ইংলণ্ডে স্টার্ডির সংস্করণ আগেই বেরিয়ে যাওয়ায় তোমার বিক্রীর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভয় হয়।

আমি ‘ব্রহ্মবাদিন্’ ও ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ সম্বন্ধে তোমায় পূর্বেই সবিশেষ লিখেছি। ‘প্রবুদ্ধ ভারতে’র জন্য একটি গল্প আরম্ভ

করেছি; শেষ হলেই তোমায় পাঠিয়ে দেব।

কোন্ মাসে ভারতে পৌঁছব, তার এখনও ঠিক নেই। পরে এ সম্বন্ধে লিখব। গতকাল এক বন্ধুভাবাপন্ন সমিতির সভায় নূতন স্বামী১১১ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বেশ হয়েছিল এবং আমার ভাল লেগেছিল। তাঁর ভেতর ভাল বক্তা হবার শক্তি রয়েছে—এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

'ভক্তিযোগ'টা 'সর্বজনীন ধর্ম'-এর মত তেমন সুন্দরভাবে ছাপান হয়নি। মলাটে বোর্ড দিলে বইখানি দেখতে বেশ মোটা হত; আর ক্রেতাদের খুশী করবার জন্য অক্ষরগুলি মোটা করা যেত।

ভাল কথা, আমার 'কর্মোযোগ'খানি যে প্রকাশ করনি, এটা একটা লজ্জার কথা—অথচ আমার পরামর্শ না নিয়ে বইখানির এক অধ্যায় ছেপে নিয়ে আমায় বেকায়দায় ফেলেছ। আরও দেখ, ভারতে বেশী কাটতির জন্য বইগুলি সস্তা হওয়া দরকার। ইচ্ছা করলে তুমি 'রাজযোগ'খানি ছাপতে পার, আমি ইচ্ছা করেই ওখানার কপিরাইট নিইনি। যখনই ইচ্ছা হবে, তখনই ওর একটা সস্তা সংস্করণ বের করতে পার কিন্তু আমরা হিন্দুরা এত ঢিমে-তেতালা যে, আমাদের কাজ শেষ হতে না হতেই সুযোগ চলে যায়, আর তাতে আমাদের লোকসানই হয়। ছাপার কাজ ইত্যাদিতে তোমাকে চটপটে হতে হবে। তোমার 'ভক্তিযোগ' বেরুল বছরখানেক কথা চালানর পরে। তুমি কি বলতে চাও যে, পাশ্চাত্যবাসীরা মহাপ্রলয় পর্যন্ত ওটার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে? এই গড়িমসির ফলে তোমার ঐ বই-এর কাটতি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিন-চতুর্থাংশ কমে গেছে। তাহলে তো তুমি 'কর্মযোগ' ছাপছ না দেখছি; অথচ তোমার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল যে, তুমি একটা বক্তৃতা ছেপে বসে আছ? ঐ হরমোহন একটা মূর্খ; বই-ছাপান বিষয়ে সে তোমাদের— মান্দ্রাজীদের চেয়েও ঢিলে, আর তার ছাপা একেবারে বীভৎস। বইগুলো ঐভাবে প্রকাশ করার মানে কি? দুঃখের বিষয়, সে গরীব। আমার টাকা থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপান তো লোক ঠকান—এ রকম করা উচিত নয়।

খুব সম্ভব মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আর মিস মূলার ও মিঃ গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব। মিস মূলারকে তো তুমি জানই; সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার অন্ততঃ কিছুদিন আলমোড়ায় বাস করবার জন্য যাচ্ছেন; আর গুডউইন সন্ন্যাসী হবে। সে অবশ্য আমার সঙ্গেই ভ্রমণ করবে। আমাদের সব বই-এর জন্য আমরা তার কাছে ঋণী। আমার বক্তৃতাগুলি সে সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, তাই থেকে বই হয়েছে। কিছুমাত্র প্রস্তুতি ছাড়াই মু্হূর্তের প্রেরণায় এ-সকল বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। অপরেরা হোটেলে বাস করতে চলে যাবে; কিন্তু গুডউইন আমার সঙ্গে থাকবে। তোমার কি মনে হয়, দেশের লোকেরা এ বিষয়ে বড় বেশী আপত্তি করবে? সে খাঁটি নিরামিষাশী।

তুমি ইচ্ছা করলে আমার 'জ্ঞানযোগে'র বক্তৃতাগুলি ছাপাতে পার। তবে একটু ভাল করে দেখে দিও। ভাল করে দেখে ছাপান উচিত। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখানকার সকলে ভালবাসা জানাচ্ছে। ডাক্তার ব্যারোজ সম্বন্ধে ও তাঁকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত—এই বিষয়ে একটি ছোট লেখা আমি আজ 'ইণ্ডিয়ান মিররে' পাঠিয়েছি। তুমিও তাকে স্বাগত জানিয়ে 'ব্রহ্মবাদিনে' দু-চারটি মিষ্টি কথা লিখো। ইতি

—বি

৩১২*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স্
ওয়েষ্টমিনষ্টার, লণ্ডন
১ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী,
'সোনা, রূপা—এ সব কিছু আমার নেই; তবে যা আমার আছে, তা মুক্তহস্তে তোমায় দিচ্ছি'—সেটি এই জ্ঞান যে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব—এক কথায়, প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল থেকে বহির্জগতে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি; আর এই চেষ্টার ফলে আমাদের মন থেকে এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি বের হয়ে আসছে, যথা—পুরুষ, নারী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জগৎ, ভালবাসা, ঘৃণা, ধন, সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি।

আসল কথা—এই ব্রহ্ম আমাদের ভেতরেই রয়েছেন এবং আমরাই তিনি (সোঽহং), সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ 'অহম্', যিনি কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন এবং যাঁকে অন্যান্য জিনিষের মত ইন্দ্রিয়গোচর করার চেষ্টা—সময় ও ধীশক্তির অপব্যবহার মাত্র।

যখন জীবাত্মা এ-কথা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশী করে নিজের অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শারীরবিবর্তন ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে, তেমনই অপরদিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। 'মনুষ্য' কথাটি সংস্কৃত 'মন্' ধাতু থেকে সিদ্ধ—সুতরাং ওর অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণশীল প্রাণী নয়। ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ প্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক সমাজে জীবন বলতে বুঝায় ইচ্ছা তৃষ্ণা বা বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, সে-সব একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা এবং স্তরমাত্র; সেটি এই—ইচ্ছার বা কল্পিত 'আমি'র বিসর্জন, এই যে নিজের ভিতর থেকে যেন বাইরে লাফিয়ে যাবার ভাব রয়েছে, জ্ঞাতা (Subject)-কে যে জ্ঞেয় (Object)-রূপে পরিণত করবার একটা চেষ্টা রয়েছে, সেটিরও বিসর্জন। প্রেম এই আত্মসমর্পণ বা ইচ্ছাশক্তি রোধের সর্বাপেক্ষা সহজ এবং অনায়াস-সাধ্য পথ; ঘৃণা তার বিপরীত।

জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক ও আকাশের ঊর্ধ্বলোক-নিবাসী শাসনকর্তার গল্প বা কুসংস্কার দ্বারা ভুলিয়ে এই একমাত্র লক্ষ্য আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীরা কুসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে বাসনা-বর্জনের দ্বারা জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অনুবর্তন করেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে বাস্তব (Objective) স্বর্গ বা 'সুখের সহস্র বর্ষে'র (millennium) অস্তিত্ব কেবল কল্পনাতেই রয়েছে; কিন্তু অধ্যাত্ম-স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে এখনই বিদ্যমান। কস্তুরীমৃগ (নাভিস্থ) কস্তুরীর গন্ধের কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক বৃথা ছুটাছুটির পর অবশেষে আপন শরীরেই তার অস্তিত্ব জানতে পারবে।

বাস্তব জগৎ—সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করবে; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াও ততই দীর্ঘ হবে। সূর্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপর থাকে, কেবল তখনই আমাদের ছায়া পড়ে না—তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্য সবকিছুই আমাতেই রয়েছে—এই বোধ হয়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বাস্তবজগতে প্রত্যেক ঢিলটির সঙ্গে পাটকেলটি খেতে হয়—প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মত আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সমপরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তার কারণ এই যে, ভাল-মন্দ পৃথক্ বস্তু নয়, আসলে এক; পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।

আমাদের জীবন নির্ভর করে অপর উদ্ভিদ প্রাণী বা জীবাণুর মৃত্যুর উপর। আর একটি ভুল আমরা প্রতিনিয়তই করে থাকি—তা এই যে, ভাল জিনিষটাকে আমরা ক্রমবর্ধমান বলে মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিষটার পরিমাণ নির্দিষ্ট বলে ভাবি। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন এক সময় আসবে, যখন কেবল ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই অপসিদ্ধান্তটি একটি মিথ্যা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জগতে যদি ভালটি বেড়েই চলেছে, তাহলে মন্দটিও বাড়ছে। আমার স্বজাতীয় জনসাধারণের বাসনার চেয়ে আমার নিজের বাসনা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের চেয়ে আমার আনন্দ অনেক বেশী—কিন্তু আমার দুঃখও লক্ষগুণ তীব্র হয়ে গেছে। যে শরীরের সাহায্যে তুমি ভালর সামান্যমাত্র সংস্পর্শ অনুভব করতে পারছ, তাই আবার তোমাকে মন্দের অতি সামান্য অংশটুকু অনুভব করাচ্ছে। একই স্নায়ুমণ্ডলী সুখদুঃখ দু-রকম অনুভূতিই বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। জগতের উন্নতি বলতে যেমন বেশী সুখভোগ বুঝায়, তেমনি বেশী দুঃখভোগও বুঝায়। এই যে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, এই-ই মায়া বা প্রকৃতি। অনন্তকাল ধরে তুমি জগজ্জালের ভেতর সুখের অন্বেষণ করে বেড়াতে পার—তাতে সুখ পাবে অনেক, দুঃখও পাবে অনেক। শুধু ভালটি পাব, মন্দটি পাব না—এ আশা বালসুলভ মূঢ়তা মাত্র।

দুটি পথ খোলা রয়েছে। একটি—(জগতের উন্নতির) সমস্ত আশাভরসা ত্যাগ করে এ জগৎ যেমন চলছে সেভাবেই একে গ্রহণ করা, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে একটু আধটু সুখের আশায় জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে যাওয়া; অপরটি—সুখকে দুঃখেরই অপর মূর্তি জ্ঞানে একেবারে তার অন্বেষণ পরিহার করে সত্যের অনুসন্ধান করা। যারা এভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে সাহসী, তারা সেই সত্যকে সদা বিদ্যমান এবং নিজের ভেতরেই অবস্থিত বলে দেখতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা এও বুঝতে পারি যে, সেই একই সত্য কিভাবে আমাদের বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ—এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা এও বুঝি যে, সেই সত্য আনন্দস্বরূপ এবং তা ভালমন্দ দুইরূপে জগতে প্রকাশিত; আর তার সঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানি, যা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে।

এইভাবে আমরা অনুভব করব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা একটি অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ-আনন্দ সত্তার দুই বা বহু ভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র—সেটি আমার এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ। কেবল তখনই মাত্র মন্দ না করেও ভাল করা সম্ভবপর; কারণ, এইরূপ আত্মা জানতে পেরেছেন, ভালমন্দ—কি উপাদানে গঠিত; সুতরাং ওটি তখন তার আয়ত্তাধীন। এই মুক্ত আত্মা তখন ভালমন্দ যা খুশী তাই বিকাশ করতে পারেন; তবে আমরা জানি যে ইনি তখন কেবল ভালই করেন। এর নাম 'জীবন্মুক্তি' অর্থাৎ শরীর রয়েছে, অথচ মুক্ত—এটিই বেদান্ত এবং অপর সমস্ত দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। ইতি

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে (State) দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার কারও নাই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়

—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়রা এত অনুদার নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময় শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোনা অথবা রুপো—কোন্‌টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেউ জানেন বলে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, ‘আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ। রূপার দরে সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে। আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist),
১১২
তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল ‘নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল’—এই হিসাবে।

অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক্ থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভাল। জগতের ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।

এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন আরাম করে নিতে দাও—তবেই তারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয়সকল পরিহার করে ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৩১৩*

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্‌স্‌ ওয়েষ্টমিনষ্টার
১১ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

খুব সম্ভব আমি ১৬ ডিসেম্বর রওনা হব; দু-এক দিন দেরীও হতে পারে। এখান থেকে ইতালী যাব এবং সেখানে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্‌সে জাহাজ ধরব। মিস মূলার, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন নামে একজন যুবক আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়াতে বসবাস করতে যাচ্ছেন, মিস মূলারও তাই। মিঃ সেভিয়ার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ বৎসর অফিসার ছিলেন; সুতরাং তিনি ভারত সম্বন্ধে অনেকটা পরিচিত। মিস মূলার থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং অক্ষয়কে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। গুডউইন একজন ইংরেজ যুবক; এরই সাঙ্কেতিক লেখা থেকে আমার পুস্তিকাগুলি বের করা সম্ভব হয়েছে।

কলম্বো থেকে আমি প্রথমে মান্দ্রাজে পৌঁছব। অন্য সকলে স্বতন্ত্রভাবে আলমোড়া চলে যাবেন। মান্দ্রাজ থেকে আমি সোজা কলিকাতা যাব। যাত্রারম্ভে আমি তোমাকে সঠিক সংবাদ দেব। ইতি

তোমাদের স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চঃ—‘রাজযোগে’র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। ভারত ও আমেরিকাতেই সব চেয়ে

বেশী কাটতি।

৩১৪*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

গ্রেকোট গার্ডেন্‌স্‌ ওয়েষ্টমিনষ্টার
১৩ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় বুল,
… আমি অতি শীঘ্রই, খুব সম্ভব ১৬ ডিসেম্বর, ভারতবর্ষ যাত্রা করছি। পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছা আছে, এবং আমি কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি; তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

… আমি অতি শীঘ্রই, খুব সম্ভব ১৬ ডিসেম্বর, ভারতবর্ষ যাত্রা করছি। পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছা আছে, এবং আমি কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি; তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩১৫-৩২৪

৩১৫*

[মিঃ গুডউইনকে লিখিত]

৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন
২০ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,
আগামী ১৬ ডিসেম্বর আমি ইংলণ্ড থেকে যাত্রা করছি। ইতালীতে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্‌সে জার্মান লয়েড লাইনের 'S. S. Prinz Regent Leopold' নামক জাহাজ ধরব। আগামী ১৪ জানুআরী ষ্টীমার কলম্বো গিয়ে লাগবার কথা। সিংহলে অল্পস্বল্প দেখবার ইচ্ছা আছে, তারপর মান্দ্রাজ যাব।

আমার সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর সহধর্মিণী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রয় স্থাপন করতে যাচ্ছেন। ঐ হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্য শিষ্যেরা সেখানে এসে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরূপে বাস করতে পারবে। গুডউইন একজন অবিবাহিত যুবক, সে আমার সঙ্গে থাকবে এবং ভ্রমণ করবে। সে ঠিক সন্ন্যাসীরই মত।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের সময় আমার কলিকাতায় থাকার ভারি ইচ্ছা। সুতরাং খবর নিয়ে উৎসবের তারিখটি জেনে রেখো, যাতে আমায় মান্দ্রাজে বলতে পার।কলিকাতা আর মান্দ্রাজে দুটি কেন্দ্র খুলব—এই হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা; সেখানে যুবক প্রচারক তৈরী করা হবে। কলিকাতায় কেন্দ্র খোলবার মত অর্থ আমার হাতে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন সেখানেই কাজ করে গেছেন, সুতরাং কলিকাতার উপরেই আমাকে প্রথম নজর দিতে হবে। মান্দ্রাজে কেন্দ্র খোলবার মত টাকাপয়সা, আশা করি ভারতবর্ষ থেকেই উঠবে।

এই তিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব; পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হলে এ-সকল কেন্দ্র হতে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ করব তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব। প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাব। মনে রেখো, আমাদিগকে এক সময় একটিমাত্র কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কিছুদিনের জন্য ৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট আমার প্রধান ঠিকানা, কারণ ওখান থেকেই কাজ চালান হবে। স্টার্ডি প্রকাণ্ড এক বাক্স 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা পেয়েছে। আমি আগে জানতাম না, সে এখন ঐ জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করছে।

এখন তো আমাদের ইংরেজী পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কয়েকখানি আরম্ভ করতে পারি। উইম্বল্‌ডনের মিস নোব্‌ল্ একজন ভাল কর্মী। তিনিও মান্দ্রাজের দুইটি পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এই সব কাজ ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। অল্পসংখ্যক অনুগামীরাই এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই—এরূপ আশা করা চলে না যে, তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাঁদা দিতে হবে! এতটা করা চলে না। এরূপ করলে তা ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যবসার মতই দেখাবে। সুতরাং তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই ভারতের কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোন কাগজ প্রকাশ করতে হলে সব জাতিরই লেখক সংগ্রহ করতে হবে; আর তার মানে হচ্ছে—বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমার অনুপস্থিতিতে এখানকার লোকদের কাজ থাকা চাই; তা না হলে সব ভেঙেচুরে যাবে। অতএব এখানে একখানি পত্রিকা চাই; ক্রমে আমেরিকাতেও চাই।

এ-কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়। আমার শরীর ভাল আছে, অভেদানন্দেরও তাই। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩০৬*

[শ্রীযুক্ত লালা বদ্রী শাহকে লিখিত]

৩৯, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লণ্ডন
২১ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় লালাজী,
৭ জানুআরী নাগাদ আমি মান্দ্রাজে পৌঁছব; কয়েক দিন সমতলে থেকে আমার আলমোড়া যাবার ইচ্ছা।

আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন; তাঁদের মধ্যে দুজন—সেভিয়ার-দম্পতি—আলমোড়ায় বসবাস করবেন। আপনি হয়তো জানেন, তাঁরা আমার শিষ্য এবং আমার জন্য হিমালয়ে আশ্রম তৈরী করবেন। এই কারণেই একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে আপনাকে বলেছিলাম। একটি সমগ্র পাহাড় আমাদের নিজেদের জন্য চাই, যেখান থেকে হিমালয়ের তুষারশ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে আশ্রম প্রস্তুত করতে সময় লাগবে। ইতোমধ্যে অনুগ্রহপূর্বক আমার বন্ধুদের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করবেন। বাংলোটিতে তিনজনের স্থান-সঙ্কুলান হওয়া চাই। বড় বাড়ীর কোন প্রয়োজন নেই, আপাততঃ একটি ছোট বাড়ী হলেই চলবে। আমার বন্ধুগণ সেই বাড়ীতে থেকে আশ্রমের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ীর অন্বেষণ করবেন।

এই চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ উত্তর আমার হাতে আসার পূর্বেই আমি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করব। মান্দ্রাজে পৌঁছেই আপনাকে তার করে জানাব।

আপনারা সকলে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

৩১৭*

[মিস মেরী ও মিস হ্যারিয়েট হেলকে লিখিত]

৩৯, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লণ্ডন
৭ ২৮ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনীগণ,
আমার মনে হয়, যে-কোন কারণেই হোক, তোমাদের চারজনকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি এবং আমি সগর্বে বিশ্বাস করি যে, তোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তোমাদের কয়েক ছত্র লিখছি। লণ্ডনের প্রচারকার্যে খুব সাফল্য হয়েছে। ইংরেজরা আমেরিকানদের মত অত বুদ্ধিমান নয়; কিন্তু একবার যদি কেউ তাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে, তাহলে তারা চিরকালের জন্য তার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি তাদের হৃদয় অধিকার করেছি। আশ্চর্যের বিষয়, এই ছ-মাসের কাজেই জনসভায় বক্তৃতার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসে বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে। ইংরেজ কাজের লোক, সুতরাং এখানকার প্রত্যেকেই কাজে কিছু করতে চায়। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন কাজ করবার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করবেন। এখানে আরও বহুলোক ঐরূপ করতে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীপুরুষদের মাথায় একবার একটা ভাব ঢুকিয়ে দিতে পারলে, সেটা কার্যে পরিণত করবার জন্য তাঁরা যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতেও বদ্ধপরিকর। আনন্দের সংবাদ এই (আর এটা বড় কম কথা নয়) যে, ভারতের কাজ আরম্ভ করবার জন্য অর্থ-সাহায্য পাওয়া গেছে এবং পরে আরও পাওয়া যাবে। ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভু তাদের কেন অধিক কৃপা করেছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙে দিতে পারলেই হল—বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলিকাতায় একটি ও হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতার এলটি গোটা পাহাড়ের উপর এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল থাকবে, আর শীতকালে খুব ঠাণ্ডা হবে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ঐখানে থাকবেন এবং ঐটি ইওরোপীয় কর্মিগণের কেন্দ্র হবে। আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবন-প্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের উত্তপ্ত সমতলভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেলতে চাই না। আমাদের কার্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে [বেদান্ত] প্রচার করুক, আর সে-সব দেশ থেকে নরনারী পাঠাক ভারতবর্ষে কাজ করতে। এতে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা আদানপ্রদান হবে। কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা করে আমি 'জবের গ্রন্থে' বর্ণিত ভদ্রলোকটির মত১১৩ উপরে নীচে চারিদিক ঘুরে বেড়াব।

ডাক ধরতে হবে, আজ এখানেই শেষ। সব দিকেই আমার কাজের সুবিধা হয়ে আসছে—এতে আমি খুশী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুশী হবে। তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি

তোমাদের চিরস্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুঃ—ধর্মপালের খবর কি? তিনি কি করছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।

—বি

৩১৮*

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্‌স্
ওয়েষ্টমিনষ্টার, লণ্ডন
৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় এলবার্টা,
‘জো জো’কে লেখা ম্যাবেল (Mabel)-এর একটি চিঠি একসঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি এর মধ্যেকার সংবাদটি খুব উপভোগ করেছি এবং তুমিও নিশ্চয়ই করবে।

এখান থেকে ১৬ যাত্রা করে নেপল্‌স্‌-এ গিয়ে আমাকে ষ্টীমার ধরতে হবে। দিনকয়েক আমি ইতালীতে থাকব—চার পাঁচদিন রোমে। বিদায় নেবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে খুব খুশী হব।

ইংলণ্ড থেকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন, তাঁরা অবশ্য আমার সঙ্গে ইতালীতেও থাকবেন। গত গ্রীষ্মে তুমি তাঁদের দেখেছ। বছরখানেকের মধ্যে আমেরিকা, তারপর ইওরোপে ফিরে আসব, ইচ্ছা করি।

প্রীতি ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

৩১৯*

[মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত]

দি গ্রেকোট গার্ডেন্‌স্
ওয়েষ্টমিনষ্টার, লণ্ডন
৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় জো,
তোমার সহৃদয় আমন্ত্রণের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, প্রিয় জো জো কিন্তু বিধি বাম। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইনের সঙ্গে ১৬ তারিখ ভারতের দিকে যাত্রা করছি। সেভিয়ার-দম্পতি ও আমি নেপল্‌স্‌-এ জাহাজ ধরব। রোমে চারদিন সময় পাওয়া যাবে, তার মধ্যে এলবার্টার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেব।

এই মুহূর্তে ব্যাপার খুব জমজমাটি; ৩৯, নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে বড় হলঘরটি লোকে পরিপূর্ণ এবং এখনও আরও লোক আসছে।

হ্যাঁ আমার সেই পুরাতন প্রিয় দেশটি এখন আমায় ডাকছে; যেতেই হবে আমাকে। সুতরাং এই এপ্রিলে রাশিয়ায় যাবার সকল পরিকল্পনা বিদায়। ভারতে কাজকর্ম কিছুটা গোছগাছ করে দিয়েই আমি চিরসুন্দর আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে আবার ফিরে আসছি।

ম্যাবেলের চিঠিখানা পাঠিয়েছ, তোমার সহৃদয়তা—বাস্তবিকই সুসংবাদ। বেচারী ফক্সের জন্য শুধু আমার একটু দুঃখ হয়। যা হোক ম্যাবেল যে তার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে—এটা ভালই হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে কাজকর্ম কি রকম চলছে—কিছু লেখনি। আশা করি সেখানকার খবর সব ভালই। বেচারী কোলা! সে কি এখন কিছু রোজকারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

গুডউইনের আসাটা একটা সৌভাগ্য, কারণ তার ফলে এখানকার বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই খরচা পোষাবার মত যথেষ্ট গ্রাহক জুটে গিয়েছে।

আগামী সপ্তাহে তিনটি বক্তৃতা, বস্‌, তারপর এই মরসুমের মত আমার লণ্ডনের কাজ শেষ। অবশ্য এখানকার সকলেই ভাবছেন, এই সাফল্যের মুখে কাজটা ছেড়ে যাওয়া বোকামি, কিন্তু আমার প্রিয় প্রভু বলছেন, ‘প্রাচীন ভারতের অভিমুখে যাত্রা কর’। আমি তাঁর আদেশ পালন করব।

ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স, মা, হলিস্টার এবং প্রত্যেককে আমার চিরন্তন ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে এবং তোমার জন্যও তাই।

চির আন্তরিকভাবে তোমার
বিবেকানন্দ

৩২০*

৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন
৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস বুল,
আপনার অতি উদার দানের প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কার্যারম্ভেই অনেক অর্থ হাতে নিয়ে আমি নিজেকে বিব্রত করতে চাই না; তবে কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অর্থকে খাটাতে পারলেই আমি সুখী হব। খুব সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করাই আমার ইচ্ছা। এখনও আমার কোন সঠিক পরিকল্পনা নেই। ভারতবর্ষে কার্যক্ষেত্রে পৌঁছে আমার পবিত্র দায়িত্বের স্বরূপ জানতে পারব। ভারত থেকে আমার পরিকল্পনা এবং উহা কার্যে পরিণত করার উপায় আপনাকে আরও বিশদভাবে জানাব।

আমি ১৬ তারিখে রওনা হব এবং ইতালীতে কয়েকদিন কাটিয়ে নেপল্‌সে জাহাজ ধরব।

অনুগ্রহ করে মিসেস—, সারদানন্দ এবং ওখানকার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আপনার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, আপনাকে আমি সর্বদাই সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করে এসেছি এবং আজীবন তাই করব। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাদি জানবেন। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

৩২১*

[জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত]

লণ্ডন
১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মহাশয়া,
নীতির ব্যাপারেও ক্রমোন্নতির মাত্রা আছে, এই ভাবটি ধরতে পারলেই আর সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটু কম সংসারিত্ব, একটু কম প্রতিকার, একটু কম হিংসার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, অহিংসা প্রভৃতি আদর্শে উপনীত হতে হবে। এই আদর্শকে সর্বদা চোখের সামনে রেখে তার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যান। প্রতিকার ছাড়া, হিংসা ছাড়া, বাসনা ছাড়া কেউ সংসারে বাস করতে পারে না। জগৎ এখনও সে অবস্থায় আসেনি, যখন ঐ আদর্শকে সমাজে রূপায়িত করতে পারা যায়। অশুভের মধ্য দিয়ে জগতের অগ্রগতি তাকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আদর্শের উপযুক্ত করে তুলছে।অধিকাংশ লোককেই এই মন্থর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষদের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই আদর্শ লাভ করতে হলে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সময়োপযোগী কর্তব্যসাধনই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং শুধু কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত হলে ওতে বন্ধন আসে না।

সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা এবং যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাছে ওটি সবচেয়ে বড় উপাসনা।

অজ্ঞান ও অশুভ নাশ করবার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের শুধু লিখতে হবে যে, শুভ বুদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৩২২*

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স,,
তাহলে গোপাল
১১৪

মেয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে! এটা হওয়া সঙ্গতই হয়েছে—স্থান-কাল-বিবেচনায়। তার জীবন সকল আশীর্বাদে বিধৃত হোক। সে গভীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার ধন, আপনার ও আপনার গৃহিণীর জীবনের আশীর্বাদরূপে সে আপনাদের কাছে এসেছে—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'প্রাচ্যদেশের জ্ঞানী পুরুষেরা পাশ্চাত্য শিশুর জন্য প্রীতি-উপহার নিয়ে আসছেন'—সেই প্রচলিত প্রথাটি পালন করবার জন্য যদি এখন আমি আমেরিকায় যেতে পারতাম! তবে আমার অন্তরাত্মা সকল প্রার্থনা ও আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে বিরাজ করছে; দেহের চাইতে মনের শক্তি ঢের বেশী।

আমি এ-মাসের ১৬ তারিখে রওনা হব এবং নেপল্‌স্‌-এ গিয়ে জাহাজ ধরব। রোমে এলবার্টার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। পবিত্র পরিবারটির জন্য সর্ববিধ ভালবাসা। ইতি

আপনাদের সদাপ্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৩২৩*

হোটেল মিনার্ভা, ফ্লোরেন্স
২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় এলবার্টা,
আগামীকাল আমরা রোমে পৌঁছব। খুব সম্ভব আগামী পরশু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব, কারণ রোমে যখন পৌঁছব, তখন রাত হয়ে যাবে। আমরা হোটেল কন্টিনেণ্টাল-এ উঠছি।

সর্ববিধ ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

৩২৪*

হোটেল মিনার্ভা, ফ্লোরেন্স
২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় রাখাল,
এই পত্র দেখেই বুঝতে পারছ যে, আমি এখনও রাস্তায়। লণ্ডন ছাড়বার আগেই আমি তোমার পত্র ও পুস্তিকাখানি পেয়েছিলাম। মজুমদারের পাগলামির দিকে দৃক্‌পাত করো না। ঈর্ষাবশতঃ তাঁর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। তিনি যেরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা শুনলে সভ্য দেশের লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করবে। এরূপ অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে তিনি নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বিফল করেছেন।

সে যাই হোক, আমরা কখনও আমাদের নাম করে হরমোহন বা অপর কাকেও ব্রাহ্মদের সঙ্গে লড়াই করতে দিতে পারি না। জনসাধারণ জানুক যে, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। যদি কেউ কলহ সৃষ্টি করে, তার জন্য সে নিজেই দায়ী। পরস্পরের সহিত বিবাদ ও পরস্পরকে নিন্দা করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। অলস, অকর্মণ্য, মন্দভাষী, ঈর্ষাপরায়ণ, ভীরু এবং কলহপ্রিয়—এই তো আমরা বাঙালী জাতি! আমার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে গেলে এগুলি ত্যাগ করতে হবে। তা ছাড়া হরমোহনকে আমার বই ছাপতে দিও না। সে যেভাবে ছাপে তাতে লোক ঠকান হয়।

কলিকাতায় কমলানেবু থাকলে আলাসিঙ্গার ঠিকানায় মান্দ্রাজে এক-শ পাঠিয়ে দিও, যাতে আমি মান্দ্রাজে পৌঁছে পেতে পারি।

মজুমদার নাকি লিখেছেন যে, 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ খাঁটি নয়, মিথ্যা। তা যদি হয় তো সুরেশ দত্ত ও রামবাবুকে 'ইণ্ডিয়ান মিররে' এর প্রতিবাদ করতে বলবে। ঐ উপদেশ কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে, তা তো আমি জানি না; সেজন্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না। ইতি

তোমার প্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুঃ— ... বেকুবদের কথা মোটেই ভেবো না; কথায় বলে, 'বুড়ো বেকুবের মত আর বেকুব নেই।' ওরা একটু চেঁচাক না।

পত্রাবলী ৩২৫-৩৩৪

৩২৫*

ড্যাম্পিয়ার, ‘প্রিন্স-রিজেন্ট লিওপোল্ড’
৩ জানুআরী, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,
তোমার চিঠি লণ্ডন থেকে ঠিকানা বদল হয়ে রোমে আমার কাছে পৌঁছেছে। তোমার অশেষ সৌজন্য যে, অমন সুন্দর একখানি চিঠি লিখেছ, তার প্রতিটি ছত্র আমি উপভোগ করছি। ইওরোপে অর্কেষ্ট্রার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। নেপল্‌স্‌ থেকে চারদিন ভয়াবহ সমুদ্রযাত্রার পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এসে পড়েছি। জাহাজ খুব দুলছে—অতএব এই অবস্থায় লেখা আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্ষমা করো।

সুয়েজ থেকে এশিয়া। আবার এশিয়ায়! আমি কি এশিয়াবাসী, ইওরোপীয় না আমেরিকান? আমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ অনুভব করছি। ধর্মপালের গতিবিধি বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু লেখনি। গান্ধীর চেয়ে তার সম্বন্ধেই আমার অনেক বেশী আগ্রহ।

কয়েকদিন পরেই কলম্বোতে নামছি, এবং সিংহলে কিছু একটা করব ভাবছি। এক সময় সিংহলে দু-কোটি অধিবাসী ছিল—তাদের বিরাট রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় এক-শ বর্গমাইল জুড়ে পড়ে রয়েছে।

সিংহলীরা দ্রাবিড়জাতি নয়—খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাঙলাদেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে তারা তাদের পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে। এখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র, আর অনুরাধাপুর ছিল সেকালের লণ্ডন।

পাশ্চাত্যের সব কিছুর মধ্যে আমি রোমকেই সবচেয়ে বেশী উপভোগ করেছি, পম্পিয়াই দেখার পর তথাকথিত ‘আধুনিক সভ্যতা’র ওপর আমি একেবারে শ্রদ্ধা হারিয়েছি। বাষ্প আর বিদ্যুৎ বাদ দিলে ওদের আর সব কিছু ছিল—এবং আধুনিকদের চেয়ে ওদের চারুকলার ধারণা এবং রূপায়ণের শক্তিও অনন্তগুণে বেশী ছিল। মিস লককে বলো, আমি যে তাকে বলেছিলাম ‘মানবমূর্তির ভাস্কর্য গ্রীসে যতটা উন্নত হয়েছিল, ভারতে ততটা হয়নি’—এ মত আমার ভুল।

ফার্গুসন প্রভৃতির প্রামাণিক গ্রন্থে পড়েছি উড়িষ্যার অথবা জগন্নাথে—যেখানে আমার যাওয়া হয়নি, সে-সব জায়গায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে-সব মানব-মূর্তি রয়েছে, সেগুলি সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের চাতুর্যে গ্রীসের যে-কোন শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। সেখানে মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি আছে—প্রকাণ্ড একটি লোলচর্ম নারীকঙ্কাল—তার প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত সংস্থান ভয়ঙ্কর ও বীভৎস। গ্রন্থকার বলেছেন—অলিন্দে স্থিত একটি নারীমূর্তি ঠিক মেডিচির ভেনাসের মত! এমন আরও কত কি!

মনে রেখো মূর্তিবিদ্বেষী মুসলমানরা প্রায় সবই ধ্বংস করেছে, তবু যা আছে—তা সমগ্র ইওরোপীয় ধ্বংসস্তূপের চেয়ে বেশী! আট বছর ঘুরেছি, তবু শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের অনেকগুলিই দেখা হয়নি।

ভগিনী লককেও বলো—ভারতের অরণ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির রয়েছে; ফার্গুসন মনে করেন, সেটি আর গ্রীসের পার্থিনন স্থাপত্যশিল্প, যে যার নিজ আদর্শের শিখরসীমা; একটি হল ভাবের, আর একটি হল ভাব ও খুঁটিনাটির। পরবর্তী মোগল সৌধাবলী প্রভৃতি ইন্দো-সারাসেন স্থাপত্যশিল্প প্রাচীনকালের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির সামনে তুলনায় একদম দাঁড়াতে পারে না। ... স্নেহ ভালবাসা জেনো। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ফ্লোরেন্সে হঠাৎ মাদার চার্চ ও ফাদার পোপের সঙ্গে দেখা। সে তো তুমি জেনেছ।

—বি

৩২৬*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

রামনাদ
শনিবার, ৩০ জানুআরী, ১৮৯৭

স্নেহের মেরী,

চারিদিকের অবস্থা অতি আশ্চর্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আসছে। সিংহলে—কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণপ্রান্ত রামনাদে সেখানকার রাজার অতিথিরূপে রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্যন্ত আমার পর্যটন যেন একটা বিরাট শোভাযাত্রা—হাজার হাজার লোকের ভিড়, আলোকসজ্জা, অভিনন্দন ইত্যাদি! ভারতভূমির যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি, সেই স্থানে ৪০ ফুট উচ্চ একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্ছে। রামনাদের রাজা একটি সুন্দর কারুকার্যখচিত খাঁটি সোনার তৈরী বৃহৎ পেটিকায় তাঁর অভিনন্দনপত্র আমাকে দিয়েছেন; তাতে আমাকে His Most Holiness (মহাপবিত্রস্বরূপ) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা আমার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, যেন সমগ্র দেশটা আমাকে অভিনন্দন করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং তুমি দেখতে পাচ্ছ, মেরী, আমি আমার সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে উঠেছি। তবু আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, প্রশান্ত দিনগুলির দিকেই ছুটছে—কি বিশ্রাম-শান্তি ও প্রেমপূর্ণ দিনগুলি! তাই এখনি তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। আশা করি, তোমরা সকলে বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডক্টর ব্যারোজকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার স্বদেশবাসীদের নিকট চিঠি লিখেছিলাম। তারা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা করেছিল। কিন্তু তিনি লোকের মনের উপর কোন রেখাপাত করতে পারেননি, তার জন্য আমি দোষী নই। কলিকাতার লোকের ভিতর নূতন কিছু ভাব ঢোকান বড় কঠিন। ডক্টর ব্যারোজ আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি; এই তো সংসার! মা, বাবা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩২৭

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

মান্দ্রাজ
১২ ফেব্রুআরী, ১৮৯৭

প্রিয় রাখাল,

আগামী রবিবার 'মোম্বাসা' জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় পুণার এবং আরও অনেক স্থানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও গরমে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

থিওসফিষ্টরা ও অন্যান্য সকলে আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল; সুতরাং আমাকেও দু-চারটি কথা—খোলাখুলিভাবে তাদের শোনাতে হয়েছিল। তুমি জান, তাদের দলে যোগ দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাকে আমেরিকায় বরাবর নির্যাতিত করেছে। এখানেও তারা তাই শুরু করতে চেয়েছিল। কাজেই আমার মত পরিষ্কার করে বলতে হয়েছিল। এতে আমার কলিকাতার বন্ধুদের কেউ যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তো ভগবান্ তাঁদের কৃপা করুন। তোমার ভয় পাবার কারণ নেই; আমি নিঃসঙ্গ নই—প্রভু সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। অন্য কীই বা করতে পারতুম। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—উপযুক্ত আসবাব থাকলে বাড়ীখানি নিও।

—বি

৩২৮*

আলমবাজার মঠ, (কলিকাতা)
২৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,

সারদানন্দ ভারতের দুর্ভিক্ষ-মোচনের জন্য ২০ পাউণ্ড পাঠিয়েছে। কিন্তু কথায় বলে, 'আগে নিজের ঘর সামলাও', সুতরাং প্রথমে সেই দুর্ভিক্ষ দূর করাই আমি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করলাম। অতএব ঐ অর্থ যথাযথ কাজেই লাগান হয়েছে।

লোকে যেমন বলে, 'আমার মরবারও সময় নেই', সমগ্র দেশময় শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড ও সম্বর্ধনার রকমারী আয়োজনে আমি এখন মৃতপ্রায়। জন্মোৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাব। আমি 'কেম্ব্রিজ সম্মেলন' থেকে একটি এবং 'ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশন' থেকে আর একটি মানপত্র পেয়েছি। 'নিউ ইয়র্ক বেদান্ত এসোসিয়েশনে'র যে মানপত্রের কথা ডাঃ জেন্‌স্ লিখেছেন, তা এখনও পৌঁছয়নি।

ডাঃ জেন্‌সের আর একখানি চিঠিও এসেছে, তাতে ভারতবর্ষে আপনাদের সম্মেলনের অনুরূপ কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-সব বিষয়ে মনযোগ দেওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ-মাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ!

বর্তমানে আমাকে দুটি কেন্দ্র খুলতে হবে—একটি কলিকাতায়, আর একটি মান্দ্রাজে। মান্দ্রাজীদের গাম্ভীর্য বেশী, আর তারা অনেক বেশী অকপট এবং আমার বিশ্বাস তারা মান্দ্রাজ থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। কলিকাতার লোক, বিশেষতঃ কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায় দেশপ্রেমের হুজুগের বেলায় উৎসাহী; কিন্তু তাদের সহানুভূতি কখনও বাস্তবে পরিণত হবে না। প্রত্যুত, এদেশে হিংসুক ও নির্দয় প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বড় বেশী—তারা আমার সব কাজকে লণ্ডভণ্ড করে নষ্ট করতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

তবে আপনি তো বেশ জানেন, বাধা যত বাড়ে, আমার ভেতরের দৈত্যটাও তত বেশী জেগে ওঠে। সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

আমি ইংলণ্ড থেকে ৫০০ পাউণ্ড এবং মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে ৫০০ পাউণ্ড পূর্বেই পেয়েছি। ঐ সঙ্গে আপনার দেওয়া অর্থ যোগ করলে দুটো কেন্দ্রই আরম্ভ করতে পারব নিশ্চয়। সুতরাং যথাসম্ভব সত্বর আপনার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় মনে হচ্ছে—আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে আপনার ও আমার দুজনের নামে টাকাটা জমা দেওয়া, যাতে আমাদের যে-কেউ টাকাটা তুলতে পারে। যদি টাকা তোলবার আগেই আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনি ঐ টাকার সবটা তুলে আমার অভিপ্রায় অনুসারে খরচ করতে পারবেন। তাহলে আমার মৃত্যুর পর আমার বন্ধুবান্ধবদের কেউ আর ঐ টাকা নিয়ে গোলমাল করতে পারবে না। ইংলণ্ডের টাকাও ঐভাবে আমার ও মিঃ স্টার্ডির নামে ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে।

সারদানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন এবং আপনিও আমার অসীম প্রীতি ও চিরকৃতজ্ঞতা জানবেন। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

৩২৯

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

দার্জিলিঙ
১৯ মার্চ, ১৮৯৭

শুভমস্তু। আশীর্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচলগুরোর্হিমানিমণ্ডিতশিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্বম্। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য-শ্রী১০৮রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বম আবিষ্কৃতমহাশৌর্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যগ্ যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগত মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নম্। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদম্। অগ্রগাঃ ভবত, অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপম্ অজ্ঞানাম্। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি—

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ
বিবেকানন্দঃ

(বঙ্গানুবাদ)

শুভ হউক। আশীর্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্বতরাজ হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। পথশ্রমের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক, যতদিন না সমুদয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগের দৃঢ়তা দ্বারা জানা

যাইতেছে, পরমকল্যাণকর সেই জীবন্মুক্তি অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়চার্য শ্রী১০৮রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌর্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগেরও উদ্ধারের জন্য সম্যক্ যত্ন করিতে পার। চিরতেজস্বী হও। মুক্তি বীরদিগেরই করতলগত, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে; ইহা নিশ্চিত হইলেও তাহা লাভ করিতে সমধিক যত্ন কর। দেখ, জীবগণ মোহরূপ কুম্ভীরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে! আহা! তাহাদের হৃদয়বিদারক করুণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার লঘু করিতে ও অজ্ঞজনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে—'ভয় নাই, ভয় নাই।' সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিল জগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হউক।

তোমাদের পরমশুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৩৩০

C/o M. N. Banerjee, দার্জিলিঙ
২০ মার্চ (এপ্রিল?), ১৮৯৭

প্রিয় শশী,

তোমরা অবশ্যই এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছ। বিলিগিরি অবশ্যই অতি যত্ন করিতেছে এবং সদানন্দ তোমার সেবা করিতেছে। পূজা-অর্চা পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে মান্দ্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে। আলাসিঙ্গা বোধ হয় এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছে। কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ করিবে না—সদা শান্তিভাব আশ্রয় করিবে। আপাততঃ বিলিগিরির বাটীতেই ঠাকুর স্থাপনা করিয়া পূজাদি হউক, তবে পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সে সময়টা পাঠাদি ও লেকচার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কান ফুঁকতে যত পার, ততই মঙ্গল জানিবে। কাগজ দুটোর তত্ত্বাবধান করিবে ও যাহা পার সহায়তা করিবে। বিলিগিরির দুটি বিধবা কন্যা আছেন। তাঁদের শিক্ষা দিবে এবং তাঁদের দ্বারা ঐ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে স্বধর্মে থাকিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিন্তু এ সব কার্য তফাৎ হইতে। যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার পড়িলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কিন্তু শুনিতেছি যে, ঐ কুকুর হন্যা নহে—তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক, গঙ্গাধরের প্রেরিত ঔষধ সেবন করান যেন হয়। প্রাতঃকালে পূজাদি অল্পে সারা করিয়া সপরিবার বিলিগিরিকে ডাকাইয়া কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ করিবে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হরপার্বতীতে ভক্তি শিখাইবে। এ বিষয়ে কোন ভুল না হয়। যুবক-যুবতীদের [পক্ষে] রাধাকৃষ্ণলীলা একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে। বিশেষ বিলিগিরি প্রভৃতি রামানুজীরা রামোপাসক, তাঁদের শুদ্ধ ভাব যেন কদাচ বিনষ্ট না হয়।

বৈকালে ঐ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই প্রকার ধীরে 'পর্বতমপি লঙ্ঘয়েৎ'।

পরমশুদ্ধ ভাব যেন সর্বদা রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বামাচার না আসে। বাকী প্রভু সকল বুদ্ধি দিবে ভয় নাই। বিলিগিরিকে আমার বিশেষ দণ্ডবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। ঐ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে—একেবারে সারিয়া গেলেও যাইতে পারে—প্রভুর ইচ্ছা। আমার ভালবাসা, নমস্কার, আশীর্বাদাদি জানিবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ডাক্তার নাঞ্জুণ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্বাদ দিবে ও তাঁহাকে যতদূর পার সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ চর্চা হয়, তাহা করিবে। ইতি

—বি

৩৩১

['ভারতী'-সম্পাদিকাকে১১৫ লিখিত]

ওঁ তৎ সৎ

রোজ ব্যাঙ্ক
বর্ধমান রাজবাটী, দার্জিলিঙ

৬ এপ্রিল, ১৮৯৭

মান্যবরাসু,
মহাশয়ার প্রেরিত ‘ভারতী’ পাইয়া
বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি
এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন
ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্ঘাতার সমর্থক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা তো দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উৎকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত ‘ভারতী’ পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এইঃ

পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চির ধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্মতা (practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড-শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে। কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ-ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কার; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদবিদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্বুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্বার পাশ্চাত্যদেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য। এদেশে লোকবল কোথায়, অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রী করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভুসন্নিধানে
ভবৎ-কল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ

৩৩২

[‘ভারতী’-সম্পাদিকাকে লিখিত]

C/o M. N. Banerjee, দার্জিলিঙ
২৪ এপ্রিল, ১৮৯৭

মহাশয়াসু,
আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু নানা কারণবশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে-টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলণ্ড হইতে আমার

সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে যে অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা—আমি উক্ত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায়—আপনা-আপনির মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন, শুনিতেছি।

আপনি কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদ্বিষয়ে প্রথমে বক্তব্য এই যে, 'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ'ই হওয়া উচিত; তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিস মূলারের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যাবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছিঃ আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলীন্যপ্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্যন্ত সকল বিষয় রাজাই নির্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোন বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যাবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এইজন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন পরে সকলে মিলিয়া কর্তব্যসাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না; এইজন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোন মহৎকার্য করার চেষ্টা বৃথা, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা'—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্যহীন যে, কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকী থাকে না; এইজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার পূর্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোন আশা করি না। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক সম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্যঃ 'আধুনিক সভ্যতা' পাশ্চাত্যদেশের ও 'প্রাচীন সভ্যতা' ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যেদিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন আছে? ছ-টাকার জন্য পিতা নিজের ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? সাত-শ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ছ-কোটি মুসলমান, এক-শ বৎসর ক্রিশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রিশ্চান—কেন এমন হয়? Originality (মৌলিকতা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইওরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জার্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইওরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউ ইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishma-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট(Pat),

১১৬

তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—'প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত negative (নেতিভাবপূর্ণ)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙেচুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ। 'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ—এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য

ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, এই 'জীবাত্মা'তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা',—তফাৎ কেবল প্রকাশের তারতম্যে, 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—(পাতঞ্জলযোগসূত্রম্)। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। কথা তো হল সোজা, কিন্তু কার্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ, দয়াবান, ত্যাগী পুরুষ আছেন; ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ (এক) অর্ধেক ভাগকে—যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্যটন করে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন—ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুটি কেন্দ্র হইয়াছে; আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইওরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশকিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই; কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কার্যের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে-সাপে কামড়ায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম ইওরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই! আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বিলাস—ধর্মবৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইওরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার করিবার।

পাশ্চাত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যান আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক রমাবাঈ অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়-ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোন নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন। ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড—আমরা ধর্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' এ দুর্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভাসমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করতে পারি? আমি একা, অসহায়! আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল—আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড-বিজয়, ইওরোপ বিজয় আমেরিকা-বিজয়! তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals.
১১৭
হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিষ, তায় বাঙালীর শরীর; এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল! কিন্তু আশা এই—'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।'
১১৮

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন; তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তবে যতদিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের কৃপা করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ-বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু হাজার বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে? দু-দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার [অর্থাৎ নিজের] স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং [মাংসাদি] না খান; যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্বশক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৩৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

(দার্জিলিঙ)
১১৯

২৮ এপ্রিল, ১৮৯৭

স্নেহের মেরী,

কয়েকদিন পূর্বে তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়েছি। গতকাল হ্যারিয়েটের বিবাহের সংবাদ বহন করে চিঠি এসেছে। প্রভু নবদম্পতিকে সুখে রাখুন।

এখানে সমস্ত দেশবাসী আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যেন একপ্রাণ হয়ে সমবেত হয়েছিল। শত সহস্র লোক—যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি করছিল, রাজা-রাজড়ারা আমার গাড়ী টানছিলেন, বড় বড় শহরের সদর রাস্তার উপর তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং তাতে নানা রকম মঙ্গলবাক্য (motto) জ্বলজ্বল করছিল। সমস্ত ব্যাপারটিই শীঘ্র পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও একখানা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতোপূর্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করবার পরিকল্পনা ছেড়ে নিকটতম শৈলনিবাস দার্জিলিঙে চোঁচা দৌড় দিতে হল। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আবার মাসখানেক আলমোড়ায় থাকলেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। ভাল কথা, সম্প্রতি আমার ইওরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিত সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংলণ্ড যাত্রা করছেন। তাঁরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা রাজী নন। তাঁরা চান না আমি এখন কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, সুতরাং অত্যন্ত ক্ষুণ্ণহৃদয়ে আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে; তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা করব।

আশা করি ডাঃ ব্যারোজ এতদিনে আমেরিকায় পৌঁছেছেন। আহা বেচারা! তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুনল না। অবশ্য লোকে তাঁকে খুব সাদর অভ্যর্থনা করেছিল; তাও আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি তো আর তাঁর ভিতরে বুদ্ধি ঢোকাতে পারি না! অধিকন্তু, তিনি যেন কি-এক অদ্ভুত ধরনের লোক! শুনলাম, আমি দেশে ফিরে আসলে সমগ্র জাতিটা আনন্দে যে মেতে উঠেছিল, তাতে তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। যে করেই হোক, আরও বেশী মাথাওয়ালা একজনকে পাঠান উচিত ছিল, কারণ ডাঃ ব্যারোজ যা বলে গেছেন, তাতে হিন্দুরা বুঝেছে ধর্মমহাসভা ছিল একটা তামাশার ব্যাপারে (farce)। দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হতে পারবে না।

একটা বড় মজার কথা এই যে, খ্রীষ্টান দেশ থেকে যত লোক এদেশে এসেছে, তাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলে নির্বোধ যুক্তিঃ যেহেতু খ্রীষ্টানরা শক্তিশালী ও ধনবান্ এবং হিন্দুরা তা নয়, সেই হেতুই খ্রীষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে ভাল। এরই উত্তরে হিন্দুরা ঠিক জবাব দেয় যে, সেইজন্যই তো হিন্দুধর্মই হচ্ছে ধর্ম, আর খ্রীষ্টানধর্ম ধর্মই নয়। কারণ, এই পশুভাবাপন্ন জগতে পাপেরই জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্বদা নির্যাতন! এটা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চায় যতই উন্নত হোক না কেন, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা শিশুমাত্র। জড়বিজ্ঞান শুধু ঐহিক উন্নতি বিধান করতে পারে; কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান থেকে আসে অনন্ত জীবন। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিকতর তীব্র এবং এ-চিন্তা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রসূত নির্বুদ্ধিতা থেকে আসে প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পরিণামে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মৃত্যু।

এই দার্জিলিঙ অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯,০০২ ফুট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা—তিব্বতীরা, নেপালীরা এবং সর্বোপরি সুন্দরী লেপ্‌চা মেয়েরা—যেন ছবিটির মত।

তুমি চিকাগোর কল্‌স্টন টার্নবুল নামে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষে পৌঁছবার পূর্বে কয়েক সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখছি, আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আর তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করত! জো, মিসেস অ্যাডাম্‌স্, সিষ্টার জোসেফিন এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল্‌রা (Mills) কোথায়? তারা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে 'পিষে' চলেছে
১২০
বোধ হয়? আমি হ্যারিয়েটকে তার বিবাহে কয়েকটি প্রীতি-উপহার পাঠাব মনে করেছিলাম; কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল—তাই উপস্থিত পাঠান স্থগিত রাখতে হচ্ছে। হয়তো তাদের সঙ্গে আমার শীঘ্রই ইওরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্তা চলছে লিখতে, তাহলে আমি অবশ্য আহ্লাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতাম।

আমার চুল গোছা গোছা পাকতে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে—দেহের এই মাংস কমে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ আমাকে শুধু মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে—রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন কি আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাস করছি—তারা সকলেই নিকার-বোকার পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকার-বোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পাহাড়ী হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে-রাস্তায় চড়াই উতরাই করতে দেখতে, তাহলে খুব আশ্চর্য হয়ে যেতে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ সমতলভূমিতে বাস করা আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে; সেখানে আমার রাস্তায় পা-টি বাড়াবার যো নেই—অমনি একদল লোক আমায় দেখবে বলে ভিড় করবে!! নামযশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়। আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি; আর তা পেকে সাদা হতে আরম্ভ করেছে—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকান কুৎসা-রটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিষই না ঢেকে রাখতে পার! তোমারই জয়জয়কার।

ডাক যাবার সময় হয়ে এল, তাই শেষ করলাম। তোমার স্বপ্ন সুখকর হোক, তোমার স্বাস্থ্য সুন্দর হোক এবং তোমার অশেষ কল্যাণ হোক। বাবা, মা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৩৪*

আলমবাজার মঠ, (কলিকাতা)
৫ মে, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,
ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জিলিঙে ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম-ফ্যারাম দার্জিলিঙে একেবারেই পালিয়েছে। কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলবাসে যাচ্ছি—স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য।

আমি আগেই আপনাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা একযোগে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল! কোন বিষয়ে কার্যকারিতার দিকটা ভারতবর্ষে আদৌ দেখতে পাবেন না। কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রস্বরূপ হবে—সেখান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চাই।

আমি আরও বছর-কয়েক বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।

অধ্যাপক জেম্‌সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম; তাতে তিনি অবনত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। আপনিও লিখেছেন যে, ধর্মপাল এতে খুব রেগে গেছেন। ধর্মপাল অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায় হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেটাকে নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম বলা হয়, তা হচ্ছে অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র। এটা স্পষ্ট বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে তা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্মের যেটি প্রাচীনভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা। আর আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করি। সিংহলের বৌদ্ধধর্মও তত সুবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকালে আমার ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। সিংহলে যদি প্রাণবন্ত কেউ থাকে তো এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধরা অনেকটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে—এমন কি ধর্মপাল ও তাঁর পিতার ইওরোপীয় নাম ছিল, এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন যে, যেখানে-সেখানে কষাইয়ের দোকান খোলেন! এমন কি পুরোহিতরা পর্যন্ত ঐ কার্যে উৎসাহ দেন। আমি এক সময়ে ভাবতাম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম বর্তমানকালেও অনেক উপকার করবে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

থিওসফিষ্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে থিওসফিষ্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র—নেই বললেই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ করে দুচারজন পাশ্চাত্য-দেশবাসীকে নিজেদের মত শোনাতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন দুজন বৌদ্ধ বা দশজন থিওসফিষ্ট আমি তো দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক মানুষ ছিলাম, এখানে আর এক মানুষ হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত (হিন্দু) জাতটা আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি (authority) বলে মনে করছে; আর সেখানে ছিলাম অতিনিন্দিত প্রচারক মাত্র। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে যা কিছু বলব, তাতে সমস্ত জাতটার—আমার সমস্ত স্বদেশবাসীর—মঙ্গল হওয়া আবশ্যক, তা সেগুলো দুচারজনের যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। কপটতাকে কখনই নয়, যা কিছু খাঁটি ও সৎ, সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, সেগুলির প্রতি উদারভাব পোষণ করতে হবে। থিওসফিষ্টরা আমায় খাতির ও খোসামোদ করতে চেষ্টা করেছিল, কারণ এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর সেইজন্য আমার কাজের দ্বারা যাতে তাঁদের আজগুবিগুলো সমর্থিত না হয় এই উদ্দেশ্যে দু-চারটে কড়া স্পষ্ট কথা বলতে হয়েছিল, আর ঐ কাজ হয়ে গেছে। এতে আমি খুব খুশী। আমি যতদূর যা দেখেছি, তাতে ভারতে ইংলিশ চার্চের যে সব পাদ্রী আছে, তাঁদের উপর বরং আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিওসফিষ্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি আবার তোমাকে বলছি, ভারতবর্ষ ইতোপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে, এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের জন্য এখানকার কাজ একটু সংগঠিত করে নিয়েছি। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩৩৫-৩৪৪

৩৩৫*

আলমবাজার মঠ (কলিকাতা)
৫ মে, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌,

তোমার প্রীতি ও উৎসাহপূর্ণ পত্রখানি আমার হৃদয়ে কত যে বলসঞ্চার করেছে, তা তোমার কল্পনারও অতীত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন মন একেবারে নৈরাশ্যে ডুবে যায়—বিশেষতঃ কোন আদর্শকে রূপ দেবার জন্য জীবনব্যাপী উদ্যমের পর যখন সাফল্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি আসে এক প্রচণ্ড সর্বনাশা আঘাত। দৈহিক অসুস্থতা আমি গ্রাহ্য করি না; দুঃখ হয় এইজন্য যে, আমার আদর্শগুলি কার্যে পরিণত হবার কিছুমাত্র সুযোগ পেল না। আর তুমি তো জানই, অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব।

হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরও কত কিছু করছে; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না। দুনিয়াতে আর্থিক সাহায্য বলতে আমি পেয়েছি শুধু ইংলণ্ডে মিস — এবং মিঃ —র কাছে। ... ওখানে থাকতে আমার ধারণা ছিল যে, এক হাজার পাউণ্ড পেলেই অন্ততঃ কলিকাতার প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপন করা যাবে; আমি এই অনুমান করেছিলাম দশ বার বছর আগেকার কলিকাতার অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু ইতোমধ্যে জিনিষের দাম তিন চার গুণ বেড়ে গেছে।

যাই হোক, কাজ আরম্ভ করা গেছে। একটি পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ী ছ-সাত শিলিঙ ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে এবং তাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য আমাকে এক মাস দার্জিলিঙে থাকতে হয়েছিল। তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। আর তুমি বিশ্বাস করবে কি যে, কোন ঔষধ ব্যবহার না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই এরূপ ফল পেয়েছি!! আগামী কাল আবার আর একটি শৈলনিবাসে যাচ্ছি, কারণ নীচে এখন বেজায় গরম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের 'সমিতি' এখনও টিকে আছে। এখানকার কাজের বিবরণী তোমাকে মাসে অন্ততঃ একবার করে পাঠাব। শুনতে পেলাম লণ্ডনের কাজ মোটেই ভাল চলছে না। প্রধানতঃ এই কারণেই আমি এখন লণ্ডনে যেতে চাই না, যদিও জুবিলী
১২১
উৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডযাত্রী আমাদের কয়েকজন রাজা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন; ওখানে গেলেই বেদান্ত-বিষয়ে লোকের আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বেজায় খাটতে হত, আর তার ফলে শারীরিক কষ্ট আরও বেশী হত।

যাই হোক অদূর ভবিষ্যতে আমি মাসখানেকের জন্য (ওদেশে) যাচ্ছি। শুধু যদি এখানকার কাজের গোড়াপত্তন দৃঢ় হয়ে যেত, তবে আমি কত আনন্দে ও স্বাধীনভাবেই না ঘুরে বেড়াতে পারতাম!

এ পর্যন্ত তো কেবল কাজের কথা হল। এখন তোমার নিজের কথা পাড়ছি। কল্যাণীয়া মিস নোব্‌ল্‌, তোমার যে অনুরাগ ভক্তি বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আছে, তা যদি কেউ পায়, তবে সে জীবনে যত পরিশ্রমই করুক না কেন, ওতেই তার শতগুণ প্রতিদান হয়। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক। আমার মাতৃভাষায় বলতে গেলে, তোমার কাজে সারা জীবন দিতে পারি।

তোমার এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য বন্ধুদের চিঠিপত্র আমার কাছে সর্বদাই খুব আনন্দায়ক ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা ছাড়া অন্যরূপ হবে না। মিঃ ও মিসেস হ্যামণ্ড দুখানি অতি সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। অধিকন্তু মিঃ হ্যামণ্ড 'ব্রহ্মবাদিন্‌' পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছেন—যদিও আমি মোটেই এ প্রশস্তির যোগ্য নই। আবার তোমায় হিমালয় থেকে পত্র লিখব; উত্তপ্ত সমভূমির চেয়ে সেখানে তুষারশ্রেণীর সামনে চিন্তা আরও স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং স্নায়ুগুলি আরও শান্ত হবে। মিস মূলার ইতোমধ্যেই আলমোড়ায় পৌঁছেছেন। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার সিমলা যাচ্ছেন। তাঁরা এতদিন দার্জিলিঙে ছিলেন। দেখ বন্ধু, এইভাবেই জাগতিক ব্যাপারের পরিবর্তন ঘটছে—একমাত্র প্রভুই নির্বিকার, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি তোমার হৃদয়সিংহাসনে চির-অধিষ্ঠিত হোন—ইহাই বিবেকানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৩৬*

আলমোড়া
২০ মে, ১৮৯৭

প্রিয় সুধীর,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দ হল। একটা জিনিষ বোধ হয় তোমাকে বলতে ভুলে গেছি—আমায় যে-সব চিঠি লিখবে, তার নকল রেখো। তা ছাড়া অন্যেরা মঠে যে-সব দরকারী চিঠি লেখে বা মঠ থেকে বিভিন্ন লোকের কাছে যে-সব পত্রাদি যায়, তাও নকল করে রাখা উচিত।

সব জিনিষটা সুচারুভাবে চলছে, ওখানকার কাজে ক্রমে উন্নতি হচ্ছে এবং কলিকাতারও তাই—এই জেনে আমি বড়ই খুশী হয়েছি।

আমি এখন বেশ ভাল আছি; শুধু পথশ্রমটা আছে—তাও দিনকয়েকের মধ্যেই যাবে। সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৩৭

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
২০ মে, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,
তোমার পত্রে বিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। সুধীরের এক পত্র পাইলাম এবং মাষ্টার মহাশয়েরও এক পত্র পাই। নিত্যানন্দের (যোগেন চাটুয্যের) দুই পত্র দুর্ভিক্ষ স্থল হইতে পাইয়াছি।

টাকাকড়ি এখনও যেন জলে ভাসছে … যোগাড় নিশ্চিত হবে। হল, বিল্ডিং, জমি ও ফণ্ড—সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই—এবং দু-তিন মাস এক্ষণে আমি তো আর গরম দেশে যাচ্ছি না। তারপর একবার tour (ভ্রমণ) করে টাকা যোগাড় করব নিশ্চিত। এ বিধায় যদি তুমি বোধ কর যে, ঐ আট কাঠা frontage (সামনে খোলা জমি) না হয় ..., তাহলে … দালালের বায়না জলে ফেলার মত দিলে ক্ষতি নাই। এ-সব বিষয় নিজে বুদ্ধি করে করবে, আমি অধিক আর কি লিখব? তাড়াতাড়িতে ভুল হওয়ার বিশেষ সম্ভব। … মাষ্টার মহাশয়কে বলিবে, তিনি যে বিষয়ে বলিয়াছেন, তাহা আমার খুব অভিমত।

গঙ্গাধরকে লিখিবে যে, যদি ভিক্ষাই সেখানে (দুর্ভিক্ষ স্থলে) দুষ্প্রাপ্য হয় তো গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া খাইবে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটা পত্র উপেনের কাগজে ('বসুমতী'তে) প্রকাশ করিবে। তাহাতে অন্য লোকেও সহায়তা করিতে পারে।

শশীর এক পত্রে জানিতেছি, … সে নির্ভয়ানন্দকে চায়। যদি উত্তম বিবেচনা কর, নির্ভয়ানন্দকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া গুপ্তকে আনাইবে। মঠের Rules & Regulations-এর (নিয়মাবলীর) ইংরেজী অনুবাদ বা বাঙলা কপি শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে যেন ঐ প্রকার কার্য হয়, তাহা লিখিবে।

কলিকাতায় সভা বেশ চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এক দুইজন না আইসে কিছুই দরকার নাই (কিছু আসে যায় না)। ক্রমে সকলেই আসিবে। সকলের সঙ্গে সহৃদয়তা প্রভৃতি রাখিবে। মিষ্ট কথা অনেক দূর যায়, নূতন লোক যাহাতে আসে, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ প্রয়োজন। নূতন নূতন মেম্বর চাই।

যোগেন আছে ভাল। আমি—আলমোড়াও অত্যন্ত গরম হওয়ায় ২০ মাইল দূরে এক উত্তম বাগানে আছি; অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম। গরম কলিকাতা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি?

জ্বরভাবটা সব সেরে গেছে। আরও ঠাণ্ডা দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারে গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এত শুষ্ক যে, দিনরাত্র নাক জ্বালা করছে ও জিভ যেন কাঠের চোকলা। তোমরা আর criticise (সমালোচনা) করো না; নইলে এত দিনে আমি মজা করে ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে পড়তুম। … তুমি ও-সব মুখ্যু-ফুখ্যুদের কথা কি শোন? যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না—starch (শ্বেতসার) বলে!! আবার কি খবর—না, ভাত আর রুটি ভেজে খেলে আর starch (শ্বেতসার) থাকে না!!! অদ্ভুত বিদ্যে বাবা!! আসল কথা আমার পুরানো ধাত আসছেন। ... এইটি বেশ দেখতে পাচ্ছি। এ-দেশে এখন এ-দেশী রঙচঙ ব্যামো সব। সে-দেশে সে-দেশী রঙচঙ সব! রাত্রির খাওয়াটা মনে করছি খুব light (লঘু) করব; সকালে আর দুপুরবেলা খুব খাব, রাত্রে দুধ ফল ইত্যাদি। তাই তো ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি, হে কর্তা!!

তুমি ভয় খাও কেন? ঝট করে কি দানা মরে? এই তো বাতি জ্বলল, এখনও সারা রাত্রি গাওনা আছে। আজকাল মেজাজটাও বড় খিটখিটে নাই, ও জ্বরভাবগুলো সব ঐ লিভার—আমি বেশ দেখছি। আচ্ছা ওকেও দুরস্ত বনাচ্ছি—ভয় কি? … খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কাজ কর দিকি, একবার তোলপাড় করা যাক। কিমধিকমিতি।

মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে ও next meeting (আগামী সভা)-কে আমার greeting (সাদর সম্ভাষণ) দিও ও কহিও যে, যদিও আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, তথাপি আমার আত্মা সেথায়, যেথায় প্রভুর নামকীর্তন হয়। 'যাবৎ তব কথা রাম সঞ্চরিষ্যতি মেদিনীম্' ইত্যাদি (হনুমান)—হে রাম, যেথায় তোমার কথা হয়, সেথায় আমি হাজির। আত্মা সর্বব্যাপী কিনা! ইতি

বিবেকানন্দ

৩৩৮*

আলমোড়া
২৯ মে, ১৮৯৭

প্রিয় শশী ডাক্তার,
তোমার পত্র এবং দু-বোতল ঔষধ যথাসময়ে পেয়েছি। কাল সন্ধ্যা হতে তোমার ঔষধ পরীক্ষা করে দেখছি। আশা করি, একটি ঔষধ অপেক্ষা দুটির মিশ্রণে বেশী ফল পাওয়া যাবে।

আমি সকাল-বিকালে ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি এবং তার ফলে সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করিতেছিলাম যে, ছেলেবেলায় যখন কুস্তি করতাম, তারপর তেমনটি কখনও বোধ করিনি। আমার তখন সত্যই বোধ হত যে, শরীর থাকা একটা আনন্দের বিষয়। তখন শরীরের প্রতি ক্রিয়াতে আমি শক্তির পরিচয় পেতাম এবং প্রত্যেক পেশীর নড়াচড়াই আনন্দ দিত। সে উৎফুল্ল ভাব এখন অনেকটা কমে গেছে, তবু আমি নিজেকে বেশ শক্তিমান্ বোধ করি। শক্তি-পরীক্ষায় জি. জি. এবং নিরঞ্জন দুজনকেই আমি মুহূর্তে ভূমিসাৎ করতে পারতাম। দার্জিলিঙে আমার সবসময় মনে হত, আমি যেন কে আর একজন হয়ে গেছি। আর এখানে আমার মনে হয় যেন আমার কোন ব্যাধিই নেই। কেবল একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। জীবনে কখনও শোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমুতে পারি না; অন্তত দু-ঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করতে হয়। কেবলমাত্র মান্দ্রাজ থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত (দার্জিলিঙের প্রথম মাস পর্যন্ত) বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত। সেই সুলভ নিদ্রার ভাব এখন একেবারে চলে গেছে। আর আমার সেই পুরানো এপাশ-ওপাশ করার ধাত এবং রাত্রির আহারের পর গরম বোধ করার ভাব আবার ফিরে এসেছে। দিনের আহারের পর অবশ্য গরম বোধ করি না।

এখানে একটি ফলের বাগান থাকায় এখানে এসেই বরাবরের চেয়েও আমি বেশী ফল খেতে শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এখন খোবানি ছাড়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায় না। নৈনীতাল থেকে অন্যান্য ফল আনবার চেষ্টা করছি। এখানকার দিনগুলি যদিও তীব্র গরম, তবু তৃষ্ণা বোধ করি না। ... মোটের উপর, এখানে আমার শক্তি স্ফূর্তি এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আবার ফিরে আসছে বলে অনুভব করছি। তবে খুব বেশী দুগ্ধপানের ফলে বোধ হয় অত্যন্ত চর্বি জমতে শুরু করেছে। যোগেন কি লিখছে, তা ভ্রূক্ষেপ করবে না। সে নিজেও যেমন ভয়-তরাসে, অন্যকেও তাই করতে চায়। আমি লখনৌ-এ একটি বরফির ষোল ভাগের এক ভাগ খেয়েছিলাম; আর যোগেনের মতে ঐ হচ্ছে আমার আলমোড়ার অসুখের কারণ! যোগেন বোধ হয় দু-চারদিনের মধ্যেই এখানে আসবে। আমি তার ভার নেব। ভাল কথা, আমি সহজেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ি—আলমোড়ায় এসে প্রথম সপ্তাহ যে অসুস্থ ছিলাম, তা হয় তো তরাই অঞ্চল দিয়ে আসার ফলেই হয়ে থাকবে! যা হোক, বর্তমানে আমি নিজেকে খুবই বলবান্ বোধ করছি। ডাক্তার, আমি যখন আজকাল তুষারবৃত পর্বতশৃঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসে আবৃত্তি করি—'ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।'
১২২
—সেই সময় যদি তুমি আমায় একবার দেখতে!

রামকৃষ্ণ মিশনের কলিকাতার সভাগুলি বেশ সাফল্য লাভ করছে জেনে খুব সুখী হয়েছি। এই মহৎ কার্যের সহায়ক যাঁরা, তাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক। ... অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৩৯

[শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

আলমোড়া
৩০ মে, ১৮৯৭

সুহৃদ্বরেষু,
শুনিতেছি, অপরিহার্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি

ব্যাবহারিকে বন্ধু-জন-কর্তব্যবোধে এ কথার উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্যসূর্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে; মন যেন অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা—মতামত অপেক্ষা অন্তর্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ঢাকে, এই তো মায়া! যদিও বহু দিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলণ্ডে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে একছত্র ভবৎ-হস্তলিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাহার উত্তরপত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে—আপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজী-গীতার মলাটে ঐ একছত্র মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই, তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে?

দ্বিতীয়ত শুনিলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা খাই, যার-তার সঙ্গে খাই—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ-সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম 'ঈশ্বর' যদি হয় তো বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার 'ঈশ্বর' জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা—ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ; রামানুজ-শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পাণ্ডিত্যই—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব!! তা কি হয়, মহাশয়? কখনও হয়েছে, না হবে? 'আমি'র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা [হইতেছে] এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহাভেদকারী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে, ব্যাবহারিকে, জাতি-আদি রাখিতে হইবে বৈকি। ... মনে মনে অভেদবুদ্ধি ('পেটে পেটে' যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন—গরীবের যম; আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্মের রক্ষক!!!

তাতে আমি পড়ে-শুনে দেখছি যে, ধর্মকর্ম শূদ্রের জন্য নহে; সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে তো তাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র ও ম্লেচ্ছ—আমার আর ও-সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার ম্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অন্নে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা—যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি তাহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকী যাগযজ্ঞ সব পাগলাম—নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সে-ই মুক্ত হয়, আর যারা 'আমার মুক্তি, আমার মুক্তি' করে দিনরাত মাথা ভাবায়, তাহারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই পাঁচ রকম ভেবে মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই।

এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি

দাস
বিবেকানন্দঃ

৩৪০*

আলমোড়া
১ জুন, ১৮৯৭

প্রিয়—,

তুমি বেদ সম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করেছ, সেগুলি যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারা যেত, যদি 'বেদ' শব্দে কেবল সংহিতা বোঝাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ববাদিসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটির সমষ্টিই বেদ! এদের মধ্যে প্রথম দুটিকে কর্মকাণ্ড বলে এখন একরকম তুলে দেওয়া হয়েছে। কেবল উপনিষদকেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা গ্রহণ করেছেন।

কেবল সংহিতা-অংশটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক! প্রাচীন হিন্দুসমাজের ভেতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয়নি।

স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করবার কারণ এই যে, তিনি, ভেবেছিলেন, সংহিতার নূতন ধরনের ব্যাখ্যা করে তিনি একটি পূর্বাপরসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করবেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল সমভাবেই থেকে গেল; শুধু এইটুকু হল যে, তিনি সংহিতার ভেতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা করলেন, সেই অসামঞ্জস্য—সেই গোলযোগ 'ব্রাহ্মণে'র উপর গিয়ে পড়ল। আর তাঁর প্রক্ষিপ্তবাদ ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-প্রণালী সত্ত্বেও এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতর গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি রয়েছে।

যদি সংহিতার উপর ভিত্তি করে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ধর্মপ্রণালী গঠন করা সম্ভব হয়, তবে উপনিষদকে ভিত্তি করে যে আরও অনেক বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম স্থাপন করা যেতে পারে, এ-কথা সহস্রগুণে বেশী নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যেতে হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্যই তোমার পক্ষে থাকবেন, আর নূতন নূতন পথে অগ্রগতিরও যথেষ্ট অবকাশ থাকবে।

গীতা নিশ্চয়ই এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মূল চরিত্র বর্তমানে এতটা কুয়াশায় ঢেকে আছে যে, তা থেকে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে নূতন নূতন চিন্তাপ্রণালী ও নূতন ভাবে জীবনযাত্রা-নির্বাহের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় আমার প্রদর্শিত পথে চিন্তার সাহায্য করবে। আমার শুভাশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমারই
বিবেকানন্দ

৩৪১

[[স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত]]

ওঁ তৎ সৎ

আলমোড়া
১ জুন, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,
অবগমং কুশলং তত্রাত্যানাং বার্তাঞ্চ সবিশেষাং মঠস্য তব পত্রিকায়াম্। মমাপি বিশেষোঽস্তি শরীরস্য; সবিশেষঃ জ্ঞাতব্যঃ ভিষক্প্রবরস্য শশিভূষণস্য সকাশাৎ। ব্রহ্মানন্দেন সংস্কৃতয়া এব রীত্যা চলত্বধুনা শিক্ষা; যদি পশ্চাৎ পরিবর্তনমর্হে তদপি কারয়েৎ। সর্বেষাং সম্মতিং গৃহীত্বা তু করণীয়মিতি ন বিস্মর্তব্যম্।

অহমধুনা আলমোড়ানগরস্য কিঞ্চিদুত্তরং কস্যচিদ্ বণিজ উপবনোপদেশে নিবসামি। সম্মুখে হিমশিখরাণি হিমালয়স্য প্রতিফলিতদিবাকরকরৈঃ পিণ্ডীকৃতরজতানীব ভান্তি প্রীণয়ন্তি চ। অব্যাহতবায়ুসেবনেন মিতেন ভোজনেন সমধিকব্যায়ামসেবয়া চ সুদৃঢ়ং সুদৃশ্যং চ সঞ্জাতং মে শরীরম্। যোগানন্দঃ খলু সমধিকমস্বস্থ ইতি শৃণোমি আমন্ত্রয়ামি তমাগন্তুমত্রৈব। বিভেত্যসৌ পুনঃ পার্বত্যাৎ জলাৎ বায়োশ্চ। 'উষিত্বা কতিপয়ানি দিবসানি অত্রোপবনে যদি ন তাবদ্ বিশেষঃ ব্যাধেঃ গচ্ছ ত্বং কলিকাতায়াম্' ইত্যহমদ্য তমলিখম্। যথাভিরুচি করিষ্যতি। অচ্যুতানন্দঃ প্রতিদিনং সায়াহ্নে আলমোড়ানগর্যাং গীতাদিশাস্ত্রপাঠং জনানাহূয় করোতি। বহূনাং নগরবাসিনাং স্কন্ধাবারস্থানাং সৈন্যানাঞ্চ সমাগমোঽস্তি তত্র প্রত্যহম্। সর্বানসৌ প্রীণাতি চেতি শৃণোমি।

'যাবানর্থঃ ইত্যাদি শ্লোকস্য যো বঙ্গার্থঃ ত্বয়া লিখিতঃ নাসৌ মন্মতে সমীচীনঃ। সতি জলে প্লাবিতে উদপানে নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনম্' ইতি অস্যার্থঃ—বিষমোঽয়ম্ উপন্যাসঃ, কিং সংপ্লুতোদকে সতি জীবানাং তৃষ্ণা বিলুপ্তা ভবতি? যদ্যেবং ভবেৎ প্রাকৃতিকো নিয়মঃ জলপ্লাবিতায়াং ভূমৌ জলপানং নিরর্থকং—ক্বচিদপি বায়ুমার্গেণ অথবা অন্যেন কেনাপি গূঢ়েনোপায়েন জীবানাং তৃষ্ণানিবারণং স্যাৎ, তদাঽসৌ অপূর্বং অর্থঃ সার্থকঃ ভবিতুমর্হেৎ। নান্যথা। শাঙ্কর এবাবলম্বনীয়ঃ।

ইয়মপি [ব্যাখ্যা] ভবিতুমর্হতি—সর্বতঃ সংপ্লুতোদকায়ামপি ভূমৌ যাবানুদপানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাম্ (অল্পজলমলং ভবেদিত্যর্থঃ) 'আস্তাং তাবদ্ জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনং স্বল্পেঽপি জলে সিধ্যতি' এবং বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু অর্থঃ প্রয়োজনম্। যথা সংপ্লুতোদকে পানমাত্রং প্রয়োজনম্ তথা সর্বেষু বেদেষু জ্ঞানমাত্রং প্রয়োজনম্।

ইয়মপি ব্যাখ্যা অধিকতরা সন্নিধিমাপন্না গ্রন্থকারাভিপ্রেতা চ। উপপ্লাবিতায়ামপি ভূমৌ পানায় উপাদেয়ং পানায় হিতং জলমেব অন্বিষ্যন্তি লোকাঃ নানাৎ। নানাবিধানি জলানি সন্তি ভিন্নগুণ-ধর্মাণি উপপ্লাবিতায়া অপি ভূমেস্তারতম্যাৎ। এবং বিজানন্ ব্রাহ্মণোঽপি বিবিধজ্ঞানোপপ্লাবিতে বেদাখ্যে শব্দসমুদ্রে সংসারতৃষ্ণানিবারণার্থং তদেব গৃহ্ণীয়াৎ যদলং ভবতি নিঃশ্রেয়সায়। ব্রহ্মজ্ঞানং হি তৎ।

ইতি শং সাশীর্বাদং বিবেকানন্দস্য

[বঙ্গানুবাদ]

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠিতে মঠের সবিশেষ বার্তা ও তত্রত্য সকলের কুশল অবগত হলাম। আমারও শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। ভিষক্‌প্রবর শশিভূষণের কাছে সবিশেষ জানবে। ব্রহ্মানন্দ এখন সংশোধিত প্রস্তাবমতই শিক্ষাকার্য চালিয়ে যাক, পরে পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তাও যেন করে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, সকলের সম্মতি নিয়েই তা করতে হবে।

আমি বর্তমানে আলমোড়া থেকে কিঞ্চিৎ উত্তরে একজন ব্যবসায়ীর একটি বাগান- বাড়ীতে বাস করছি। আমার সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের চূড়াগুলি প্রতিফলিত সূর্যালোকে রজতস্তূপের মত দেখাচ্ছে এবং আনন্দ প্রদান করছে। মুক্তবায়ু-সেবন, মিতাহার এবং যথেষ্ট ব্যায়ামের ফলে আমার শরীর বিশেষ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু শুনতে পেলাম যে, যোগানন্দ খুব অসুস্থ। তাকে এখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করছি। সে অবশ্য পাহাড়ে জলহাওয়ায় ভয় পায়। আজ তাকে লিখলাম, 'এই বাগানে কিছুদিন থেকে দেখ—যদি অসুখের কোন উপশম বোধ না কর, তবে কলিকাতা ফিরে যেও।'—এখন সে যেমন ভাল মনে করে, তাই করবে। আলমোড়া শহরে অচ্যুতানন্দ প্রতি সন্ধ্যায় বহুলোক একত্র করে তাদের সম্মুখে গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে। শহরের অনেক অধিবাসী, এমন কি সৈন্যাবাস থেকে সৈন্যেরা পর্যন্ত প্রতিদিন আসে; আর শুনছি, তারা আলোচনা বিশেষ উপভোগ করে।

'যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ স্বংপ্লুতোদকে' (গীতা, ২।৪৬)—ইত্যাদি শ্লোকের তুমি যে বঙ্গার্থ লিখেছ, তা আমার মতে সমীচীন নয়। তুমি এই অর্থ দিয়েছ—'যখন দেশ জলপ্লাবিত হয়, তখন পানের জন্য পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রয়োজন নাই'—এটা অদ্ভুত কল্পনা। জলপ্লাবন হলে লোকের তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়ে যায় নাকি? প্রাকৃতিক নিয়ম যদি এরূপ হয় যে, কোন স্থান জলপ্লাবিত হবার পর জল পান নিরর্থক হয়ে যায়, আর বায়ু অথবা কোন অদৃশ্য উপায়ে স্বতই তৃষ্ণা দূরীভূত হয়ে যায়—তবেই ঐ অদ্ভুত ব্যাখ্যা সমীচীন হতে পারে, নতুবা নয়। শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণীয়।

অথবা এ ভাবেও শ্লোকটির ব্যাখ্যা হতে পারেঃ সমস্ত দেশ বন্যাপ্লাবিত হলে তৃষ্ণাতুরের নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার্তের পক্ষে যথেষ্ট)—সে যেমন বলে, 'বিরাট জলরাশি থাকুক বা না থাকুক, সামান্য একটু পানীয় জলই আমার পক্ষে যথেষ্ট'—জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদগ্রন্থেও ততটুকুই প্রয়োজন। সর্বব্যাপী বন্যার প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণ মাত্র, তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান।

এই ব্যাখ্যাটিও অধিকতর স্পষ্ট ও গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ানুরূপ—সমস্ত স্থান জলপ্লাবিত হলে মানুষ কেবল পানের জন্য আহরণীয়, পানের যোগ্য জলেরই অনুসন্ধান করে, অন্য জলের নয়। (কারণ) জলপ্লাবন হলেও মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন ধর্মের জল দেখতে পাওয়া যায়। কৌশলী ব্রাহ্মণও সেরূপ জ্ঞানের শতধারাপ্লাবিত 'বেদ' নামে খ্যাত বিরাট শব্দসমুদ্র হতে সেই অংশটুকু আহরণ করবেন, যাতে সংসারের দারুণ তৃষ্ণা দূর হয় এবং যা মুক্তি দান করবার শক্তি ধারণ করে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই তা করতে সক্ষম। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৪২*

[মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত]

আলমোড়া
২ জুন, ১৮৯৭

স্নেহের মেরী,

আমার প্রতিশ্রুত খোশগল্পভরা বড় চিঠিখানি শুরু করছি—আকারে তা সত্যি বড় হয়ে উঠুক, এই সদিচ্ছা নিয়ে। তা যদি না হয়ে ওঠে, সে তোমার কর্মফল। তোমার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খুব ভাল যাচ্ছে। আমার শরীর খুবই খারাপ; আজকাল কিছুটা উন্নতি বোধ করছি—আশা করি খুব শীঘ্রই সেরে উঠব।

লণ্ডনের কাজকর্ম কি রকম চলছে? আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি বা সেটা একেবারে ভেঙেচুরে যায়। তুমি মাঝে মাঝে লণ্ডন যাও তো? স্টার্ডির একটি শিশুসন্তান হয়েছে, নয় কি?

ভারতে সমতলভূমিতে এখন দাবদাহ। তা সহ্য করতে না পেরে এখানে এই পাহাড়ে এসেছি—জায়গাটা সমতলের চেয়ে কিছু ঠাণ্ডা।

আলমোড়ার কোন ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার বাগানে আছি—এর চারিদিকে বহু ক্রোশ পর্যন্ত পর্বত ও অরণ্য। পরশু রাত্রে

একটি চিতাবাঘ এই বাগানে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। চাকরদের প্রাণপণ চেঁচামেচি ও পাহারাদার তিব্বতী কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ শব্দ মিলে ভয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হবার মত অবস্থা ঘটেছিল। আমি এখানে আসা অবধি রোজ রাত্রে এই কুকুরগুলিকে বেশ কিছুটা দূরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে, যাতে তাদের চেঁচামেচিতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। চিতাবাঘটি তাই সুযোগ বুঝে একটি বেশ ভাল আহার্য জুটিয়ে নিল, সম্ভবতঃ অনেক সপ্তাহ এ-রকম জোটেনি। এতে তার প্রভূত কল্যাণ হোক!

মিস মূলারকে তোমার মনে পড়ে কি? কয়েকদিন থাকবার জন্য তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু চিতাবাঘের বৃত্তান্তটি শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, লণ্ডনে পাকা চামড়ার চাহিদা খুব বেশী, আর অন্য কিছুর চেয়ে এই চাহিদাই আমাদের চিতা ও বাঘগুলির মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস নিয়ে এসেছে।

তোমাকে লিখতে লিখতে আমার সামনে সারি সারি দিগন্তবিস্তৃত বরফের চূড়াগুলির উপর অপরাহ্নের রক্তিমাভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেগুলি এখান থেকে সোজাসুজি কুড়ি মাইল—আর আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথে চল্লিশ মাইল।

আশা করি কাউণ্টেস-এর কাগজে তোমার তর্জমাগুলি সমাদরে গৃহীত হয়েছে। এই জুবিলী-উৎসবের মরসুমে আমাদের দেশীয় কয়েকজন রাজার সঙ্গে আমার ইংলণ্ড যাবার খুব ইচ্ছা ছিল এবং সুযোগও ঘটেছিল, কিন্তু আমার চিকিৎসকেরা এত শীঘ্র আমাকে কাজে নামতে দিতে নারাজ। কারণ ইওরোপ যাওয়া মানে কাজে লাগা। তাই নয় কি? সেখানে ছুটি মেলে রুটি মেলে না। এখানে গেরুয়া-কাপড়খানাই যথেষ্ট, অঢেল খাবার মিলবে। যা হোক, আমি এখন বহুপ্রত্যাশিত বিশ্রাম উপভোগ করছি, আশা করি—এতে আমার পক্ষে ভালই হবে।

তোমার কাজ কিরকম চলছে? আনন্দে না দুঃখে? তোমার কি ইচ্ছা হয় না বেশ কয়েক বছর কোন কাজকর্ম না করে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে? নিদ্রা আহার ব্যায়াম এবং ব্যায়াম আহার নিদ্রা—আরও কয়েক মাস শুধু এই করে আমি কাটাতে যাচ্ছি। মিঃ গুডউইন আমার সঙ্গে আছেন। ভারতীয় পোষাকে তুমি যদি তাকে দেখতে! খুব শীঘ্রই মস্তক মুণ্ডন করিয়ে তাকে একটি পূর্ণ-বিকশিত সন্ন্যাসীতে পরিণত করতে যাচ্ছি।

তুমি এখনও কিছু কিছু যোগাভ্যাস করছ নাকি? তাতে কিছু উপকার পেয়েছ কি? খবর পেলাম—মিঃ মার্টিন মারা গিয়েছেন। মিসেস মার্টিন কেমন আছেন—তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে যাও তো?

মিস নোব্‌ল্‌কে তুমি চেন কি? তাঁকে তুমি কখনও দেখেছ? এখানেই আমার চিঠি শেষ করতে হচ্ছে, কারণ বিরাট এক ধূলির ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, লেখা আর সম্ভব হচ্ছে না। এ-সবই তোমার কর্মফল, স্নেহের মেরী, কারণ আমার তো ইচ্ছা ছিল—তোমাকে কত না অদ্ভুত ঘটনা লিখব ও মজার গল্প বলব; এখন সেগুলি আমাকে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখতে হবে, আর তোমাকেও অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ইতি

সতত প্রভুসমীপে তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৪৩*

আলমোড়া
৩ জুন, ১৮৯৭

কল্যাণীয়া মিস নোব্‌ল্‌,

... আমি নিজে তো বেশ সন্তুষ্ট আছি। আমি আমার স্বদেশবাসীদের অনেককে জাগিয়েছি; আর আমি চেয়েছিলাম তাই। জগৎ আপন ধারায় চলুক এবং কর্মের গতি অপ্রতিরুদ্ধ হোক। এ জগতে আমার আর কোন বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে, এর সবখানিই স্বার্থপ্রণোদিত—স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য মান, সবই স্বার্থের জন্য। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্য—এমন কি আমার কোন অপকর্মও স্বার্থপ্রণোদিত নয়; সুতরাং আমি সন্তুষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাজ করেছি; কিন্তু জগৎটা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি অবাক হই, মনে মনে হাসি যে, যুক্তিপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেমন করে এই স্বার্থের—এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পেছনে ছুটতে পারে।

এই হল খাঁটি কথা। আমরা একটা বেড়াজালে পড়ে গেছি এবং যত শীঘ্র কেউ বেরিয়ে যেতে পারে, ততই মঙ্গল। আমি সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি; এখন দেহটা জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলুক—কে মাথা ঘামায়?

আমি এখন যেখানে আছি, সেটি পাহাড়ের উপর এক সুন্দর বাগান। উত্তরে প্রায় সমস্ত দিক্‌চক্রবাল জুড়ে স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গাবলী আর নিবিড় বনরাজি। এখানে তেমন শীত নেই, গরমও বেশী নয়। সকাল ও সন্ধ্যাগুলি বড়ই মনোরম। সারা গ্রীষ্মটা আমার এখানে থাকা উচিত; বর্ষা শুরু হলে সমতলে নেমে গিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা।

লোকালয় থেকে দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা

অন্যরূপ; তবু সংস্কারের অনুবৃত্তি চলেছে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৪৪*

[জনৈক আমেরিকান ভক্তকে লিখিত]

আলমোড়া
৩ জুন, ১৮৯৭

আমার জন্য তোমাদের এত চিন্তিত হবার কিছুই নেই। আমার দেহ নানাপ্রকার রোগে বার বার আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই কাল্পনিক পক্ষীবিশেষের (Phoenix) মত আমি আবার বার বার আরোগ্য লাভও করছি। আমার শরীর দৃঢ়বদ্ধ বলে আমি যেমন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ নিয়ে আসে। সব বিষয়েই আমি চরমপন্থী—এমন কি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই; হয় আমি লৌহদৃঢ় বৃষের মত অদম্য বলশালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ … ।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই এই রোগের সৃষ্টি হয়েছিল—বিশ্রাম নেওয়ার ফলে সে রোগ প্রায় দূর হয়েছে। দার্জিলিঙে থাকতে আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছিলাম; কিন্তু এখন আলমোড়াতে এসে আর সব বিষয়ে সুস্থ বোধ করলেও অজীর্ণরোগে মাঝে মাঝে ভুগছি, এবং তা সারাবার জন্য 'Christian Science' (নিজের বিশ্বাসবলে রোগ সারানর) মত অনুযায়ী বিশেষ চেষ্টাও করছি। দার্জিলিঙে শুধু মানসিক চিকিৎসা-সহায়েই আমি নীরোগ হয়েছিলাম। আর এখানে আমার নিত্যকর্ম হচ্ছে—যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড় চড়াই করা, বহুদূর পর্যন্ত ঘোড়ায় দৌড়ান এবং তারপর আহার ও বিশ্রাম। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছি এবং শক্তিও বেশ পাচ্ছি। এর পর যখন দেখা হবে, তখন দেখতে পাবে—আমার চেহারা কুস্তিগিরের মত।

তুমি কেমন আছ এবং কি করছ, মিসেস-এর সময় কেমন কাটছে জানিও। ব্যাঙ্কের জমা কিছু কিছু বাড়াচ্ছ তো? আমার জন্য হলেও তা তোমাকে করতে হবে। যদি শেষ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙেই পড়ে, তাহলে এখানে কাজ একদম বন্ধ করে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তখন আমাকে আহার ও আশ্রয় দিতে হবে—কেমন পারবে তো? ইতি

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩৪৫-৩৫৪

৩৪৫

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
১৪ জুন, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,
চারুর যে পত্র তুমি পাঠাইয়াছ, তাহার বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। মহারাণীকে যে Address (মানপত্র) দেওয়া হইবে, তাহাতে এই কথাগুলি থাকা উচিতঃ

১| অতিরঞ্জিত না হয় অর্থাৎ 'তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি' ইত্যাদি nonsense (বাজে কথা), যাহা আমাদের native (নেটিভ)-এর স্বভাব।

২| তাঁহার রাজত্বকালে সকল ধর্মের প্রতিপালন হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বেদান্ত মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি।

৩| তাঁহার দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি দয়া, যথা—দুর্ভিক্ষে স্বয়ং দান দ্বারা ইংরেজদিগকে অপূর্ব দানে উৎসাহিত করা।

৪| তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ও তাঁহার রাজ্যে উত্তরোত্তর প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি প্রার্থনা।

শুদ্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া আমায় আলমোড়ার ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি সই করিয়া সিমলায় পাঠাইব। কাহাকে পাঠাইতে হইবে সিমলায়—লিখিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—মঠ হইতে শুদ্ধানন্দ আমায় সাপ্তাহিক পত্র লিখে, তাহার একটা নকল যেন মঠে রাখে। ইতি

—বি

৩৪৬

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
১৫ জুন, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,
তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death (মৃত্যু পর্যন্ত)। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা, যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক্, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্য-মহোভাগ্যম্। … ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart, that conquers, not the brain (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো আরম্ভ ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবী ছেয়ে ফেলব না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা! এরই নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি'—স্বার্থ চলে গেছে।

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি পার তো কলিকাতায় এসে আরও কতকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফণ্ড তুলে তাদের দু-একজনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক জায়গায়—আবার এক জায়গায় যাও! ঐ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্ত্বাবধান) করে বেড়াও—ক্রমে দেখবে যে, ঐ কার্যটা permanent (স্থায়ী) হবে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও বিদ্যাপ্রচার আপনা-আপনিই হবে। আমিই কলিকাতাতে বিশেষ লিখেছি। ঐ রকম কাজ করলেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর! ক্রমে দেখবে এক-একটা ডিষ্ট্রিক্ট (জেলা) এক-একটা centre (কেন্দ্র) হবে—permanent (স্থায়ী)। আমি শীঘ্রই plain-এ (সমতলে) নাবছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে? ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৪৭*

আলমোড়া
২০ জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌,

... তোমাকে সরলভাবে জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার কাছে মূল্যবান, তোমার প্রত্যেকখানি চিঠি আমাকে খুবই আনন্দ দেয়। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ হবে, তখনই তুমি নিঃসঙ্কোচে লিখো এবং জেনো যে, তোমার একটি কথাও আমি ভুল বুঝব না, একটি কথাও উপেক্ষা করব না। অনেক কাল কাজের কোন খবর পাইনি। তুমি আমায় কিছু জানাতে পার কি? ভারতে আমাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন, আমি এখানে কোন সাহায্যের আশা রাখি না। এরা এত দরিদ্র!

তবে আমি নিজেও যেভাবে শিক্ষালাভ করেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই গাছের তলা আশ্রয় করে এবং কোনরকমে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কাজের ধারাও অনেকটা বদলেছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আর আমার চিরকালের ধারণাও ছিল তাই যে, হৃদয়—শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যায়। সুতরাং বর্তমান পরিকল্পনা এই যে, বহু যুবককে গড়ে তুলতে হবে—(উচ্চশ্রেণীকে নিয়েই আরম্ভ করব, নিম্নশ্রেণীকে নিয়ে নয়; ওদের জন্য আমায় একটু অপেক্ষা করতে হবে)—এবং কোন একটি জেলায় তাদের জনকয়েককে পাঠিয়ে দিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুরু করব। ধর্মরাজ্যের এই অগ্রগামী কর্মিগণ যখন পথ পরিষ্কার করে ফেলবে, তখন তত্ত্ব ও দর্শন বলার সময় আসবে।

জনকয়েক ছেলে ইতোমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি
১২৩
আমরা পেয়েছিলাম, গত ভূমিকম্পে তা ভেঙে গেছে; তবে বাঁচোয়া একটু যে, এটা ভাড়া-বাড়ী ছিল। যাক, ভাববার কিছু নেই; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ পর্যন্ত আমাদের সম্বল শুধু মুণ্ডিত মস্তক, ছেঁড়া কাপড় ও অনিশ্চিত আহার। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবেও নিশ্চয়; কারণ আমরা মনে-প্রাণে এই কাজে লেগেছি।

এক হিসাবে এটা সত্য যে, এদেশের লোকের ত্যাগ করবার কিছু নেই বললেই চলে, তবু ত্যাগ আমাদের মজ্জাগত। যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (Executive Engineer) ছিল। ভারতে এটি একটি উচ্চ পদ। সে খড়কুটোর মত ঐ পদ ত্যাগ করেছে। ... আমার অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের সত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৪৮

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
২০ জুন, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। যোগেন ভায়ার কথাবার্তা? তিনি সঠিকে কন না, এজন্য সে-সকল শুনে কোন চিন্তা করিও না। আমি সেরেসুরে গেছি। শরীরে জোরও খুব; তৃষ্ণা নাই, আর রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব বন্ধ। ... কোমরে বেদনা-ফেদনা নাই; লিভারও ভাল। শশীর ঔষধে কি ফল হল বুঝতে পারলাম না—কাজেই বন্ধ। আম খুব খাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়াচড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে—কুড়ি-ত্রিশ মাইল একনাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছুমাত্র বেদনা বা exhaustion (অবসাদ) হয় না। দুধ একদম বন্ধ করেছি—পেট মোটার ভয়ে। কাল আলমোড়ায় এসেছি। আর বাগানে যাব না। ... বাড়ী ভাড়া-টাড়া যা করতে হয় করবে; এতে আর অত জিজ্ঞাস-পড়া কি করবে!

শুদ্ধানন্দ লিখছে—কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ও-সব কি nonsense (বাজে জিনিষ) ক্লাসে পড়ান? একসেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistry-র (রসায়নের) সাধারণ যন্ত্র ও একটা সাধারণ telescope (দূরবীক্ষণ) ও একটা microscope (অণুবীক্ষণ) ১৫০|২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শশীবাবু সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry Practical (ফলিত রসায়ন)-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন Physics ইত্যাদির ওপর। আর বাঙলা ভাষায় যে-সকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে, তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

৩৪৯

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া
৩ জুলাই, ১৮৯৭

যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

‘প্রভবতি ভগবান্ বিধি’-রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয়প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্।

যদুক্তং ‘তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি’ উচ্যেত তদপি শতশঃ; ‘তৎ ত্বমসি’ তত্ত্বাধিকারে। ইদমের তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দিশামি পদং প্রাচীনং—‘কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্’ ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং—‘তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।’ ‘ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ’ ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কে বিনা; যদ্যপরং তদেদম্ আপততি—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনম্ অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নার্হতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ম্। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে, পরন্তু সর্বগঃ সর্বান্তর্যামী সর্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্বেশ্বর এব লক্ষীকৃতঃ। স তু সমষ্টীরূপেণ সর্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবাপ্রেমরূপকর্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম; যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্ যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ, ‘প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে’ ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্বস্মিন্।

সৈব সর্ববৈষম্যসাম্যকারী ভবব্যাধি-নীরুজকরী প্রপঞ্চাবশ্যম্ভাব্যত্রিতাপহরণকরী সর্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্মণে শর্মন্।

ইতানুদিবসং প্রার্থয়তি
ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধ বিবেকানন্দঃ

(বঙ্গানুবাদ)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে-সকল শাস্ত্রকার উদ্যোগশীল নহেন, তাঁহারা বলেন ভগবদ্-বিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়; আর যাঁহারা উদ্যোগী ও কর্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ-প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন কর।

‘বিপদই তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ’—নীতিশাস্ত্রে এই যে বাক্য কথিত হইয়াছে, ‘তত্ত্বমসি’-জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা যাইতে পারে। ইহাই (অর্থাৎ বিপদে অবিচলিত ভাবই) বৈরাগ্যের লক্ষণ।

ধন্য তিনি, যাঁহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, ‘কিছু সময় অপেক্ষা কর।’ দাঁড় চালাইতে তোমার শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে দাঁড়ের উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, ‘যোগে সিদ্ধ হইলে কালে আত্মায় আপনা-আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।’ আর এই যে কথিত হইয়াছে, ‘ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়’, এখানে ‘ত্যাগ’ শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে—হয় বস্তুশূন্য বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাহা লাভ করিতে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে ত্যাগের অর্থ অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংলগ্ন করা। সর্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী—সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বর প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ—সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এইজন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। দ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত—যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে—তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত ‘দয়া’ শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই; তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্মন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দ্বারা—এই জগৎপ্রপঞ্চে (মানবজীবনে) অবশ্যম্ভাবী ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

৩৫০*

আলমোড়া
৪ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌,

আশ্চর্যের কথা, আজকাল ইংলণ্ড থেকে আমার উপর ভাল ও মন্দ দুই প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়া চলছে; প্রত্যুত তোমার চিঠিগুলি উৎসাহ ও আশার আলোকে পূর্ণ এবং আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করে—আর আমার এখন এগুলি বড়ই প্রয়োজন। প্রভুই জানেন।

আমি যদিও এখনও হিমালয়ে আছি এবং আরও অন্ততঃ এক মাস থাকব, আমি আসার আগেই কলিকাতায় কাজ শুরু করে দিয়ে এসেছি এবং প্রতি সপ্তাহে কাজের বিবরণ পাচ্ছি।

এখন আমি দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি, এবং জনকয়েক যুবককে ভাবী কাজের জন্য গড়ে তোলা ছাড়া শিক্ষাকার্যে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারিনি। অন্নসংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যদিও এ পর্যন্ত অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পেরেছি, তবু অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।

ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশী কাজ হবে না। প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলতে গেলে ‘খোদার মর্জি হলে’—আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর। … তোমাদের সমিতির কার্য-প্রণালীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত; এবং ভবিষ্যতে তুমি যা-ই কর না কেন, তুমি ধরে নিতে পার, তাতে আমার সম্মতি থাকবে। তোমার ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এর মধ্যেই আমি তোমার কাছে প্রভূত ঋণে ঋণী, এবং প্রতিদিন আরও অশেষভাবে বাধিত করছ। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা যে, এই সমস্তই পরের জন্য। নতুবা উইম্বলডনের বন্ধুরা আমার প্রতি যে অপূর্ব অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। তোমরা ইংরেজরা বড় ভাল, বড় স্থির, বড় খাঁটি—ভগবান্ তোমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করুন। আমি দূর থেকে প্রতিদিন তোমার আরও বেশী গুণগ্রাহী হচ্ছি। দয়া করে—কে আমার চির স্নেহ জানাবে এবং সেখানকার সব বন্ধুদের জানাবে। আমার অসীম ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমাদের চিরসত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৫১*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

ওঁ তৎ সৎ

আলমোড়া
৯ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় ভগিনী,

তোমার পত্রখানি পড়ে ও ভিতরে একটি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাব ফল্গুনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হলাম, আর তার কারণটা কি তাও আমি বুঝতে পারছি। তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছ, তাঁর জন্য প্রথমেই তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ; তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘটল না। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে জানতে পারলে আমি খুব খুশী হব। তিনিও তোমাদের যার সঙ্গেই হোক না কেন, দেখা হলে খুব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের টুকরো অংশ (cuttings) পেয়েছি; তাতে দেখলাম মার্কিন মেয়েদের সম্বন্ধে আমার উক্তিসমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—তাতে আরও এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার ভয়—আমি যে সন্ন্যাসী!

জাত তো কোনরকম যায়ইনি, বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুন তা বহুল পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয়, তাহলে ভারতের অর্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে হবে। তা তো হয়ইনি, বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্বে আমার যে জাতি ছিল, সেই জাতিভুক্ত এক প্রধান রাজা আমাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্য একটি সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন; তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। অন্য দিক্ থেকে ধরলে আমরা সন্ন্যাসীরা তো নারায়ণ—দেবতারা সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্র খেলে তাঁদের মর্যাদাহানি হয়। আর প্রিয় মেরী, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পুজো করেছে—আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এ রকমটি কারও হয়নি।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হত—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী-ভায়াদের প্রভাব বেশ ক্ষয় করে দিয়েছে। আর তারা এখানে কে? কেউ না। তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমাদের খেয়াল নেই!

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী-ভায়াদের সম্বন্ধে—ইংলিশ চার্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীর দল কোন্ শ্রেণীর লোক থেকে সংগৃহীত, সে সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার চার্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাদের কুৎসা সৃষ্টি করবার শক্তি সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল। মিশনরী-ভায়ারা আমার আমেরিকার কাজটা নষ্ট করবার জন্য এইটিকেই সমগ্র মার্কিন নারীর উপর আক্রমণ বলে ঢাক পেটাচ্ছে—কারণ তারা বেশ জানে, শুধু তাদের (মিশনরীদের) বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা খুশীই হবে। প্রিয় মেরী, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি—তারা আমাদের মা-বোনদের বিরুদ্ধে যে-সব কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাসী 'হিদেন'দের (বিধর্মী) উপর খ্রীষ্টান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করে, তা ধুয়ে ফেলতে বরুণ-দেবতার সব জলেও কুলোবে না। আমরা তাদের কি অনিষ্ট করেছি? অন্যে সমালোচনা করলে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্যের সঙ্গে তা সহ্য করতে শিখুক, তারপর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটি একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত সর্বজনবিদিত সত্য যে, যারা সর্বদা অপরকে গালিগালাজ করতে উদ্যত, তারা অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘা সহ্য করতে পারে না। আর তারপর তাদের আমি কি ধার ধারি? তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেটরা এবং আর কয়েকজন সমুদয় ব্যক্তি ছাড়া আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? কে আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত করবার সাহায্য করতে এসেছিল? আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মার্কিনরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্মপ্রাণ হয় তার জন্য আমেরিকায় আমার সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত।

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছ-মাস কাজ করেছি, একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব ওঠেনি—সে নিন্দা-রটনাও একজন মার্কিন মহিলার কাজ, এই কথা জানতে পেরে আমার ইংরেজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ তো কোন রকম হয়ইনি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিশ চার্চের পাদ্রী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই আরও পাব। ওখানকার একটা সমিতি আমার কাজের প্রসার লক্ষ্য করে আসছে এবং সেজন্য সাহায্যের যোগাড় করছে। ওখানকার চারজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার কাজে সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আসবার জন্য প্রস্তুত ছিল; এর পর যখন যাব, আরও শত শত লোক প্রস্তুত হবে।

প্রিয় মেরী, আমার জন্য কিছু ভয় করো না। মার্কিনরা বড়—কেবল ইওরোপের হোটেলওয়ালা ও কোটিপতিদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। পৃথিবীতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—ইয়াঙ্কিরা চটলেও আমার জায়গার অভাব হবে না। যাই হোক না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করিনি। আপনা-আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে, আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের

উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন ভারতের রাস্তায় যখন ঘুরে বেড়াতাম—কেউ আমায় চিনত না—তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে, তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা তো ছেলেমানুষ! ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব?—আমাকে দেখে কি তেমনি মনে হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হল—কারণ তোমাদের কাছে না বললে যেন আমার কর্তব্য শেষ হত না। আমি বুঝতে পারছি—আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন-চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের প্রার্থনা কখনও করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমাব। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান্ বিদ্যমান—একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।

'যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞেয় সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'যাতে পূর্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁরই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'হে মূর্খগণ, যে-সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর—সেই প্রত্যক্ষ-দেবতারই—উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।'

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে, কিছু না চেপে বলে যেতে হবে; ওতে কারও হৃদয় আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে—এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরী, আমার মুখ থেকে যাই বের হোক না কেন, কিছুতেই ভয় পেও না। কারণ যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়—তা স্বয়ং প্রভু; কিসে ভাল হয়, তিনিই বেশী বোঝেন। যদি আমায়—জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তাহলে তাতে জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, জগৎ শাসন করছে তারাই, অথচ জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়। যে-কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে, তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগবে; সভ্য যাঁরা, তাঁরা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাসি হাসবেন; আর যারা সভ্য নয়, তারা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ চীৎকার করবে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে।

সংসারের এ-সব কীটদেরও একদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—জ্ঞানহীন বালকদেরও একদিন জ্ঞানালোক পেতে হবে। মার্কিনরা অভ্যুদয়ের নূতন সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের শত শত বন্যা আমাদের দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি, যা কোন বালকস্বভাব জাতি এখনও বুঝতে অসমর্থ। আমরা জেনেছিঃ এ সবই মিছে; এই বীভৎস জগৎটা মায়ামাত্র। ত্যাগ কর এবং সুখী হও। কামকাঞ্চন ত্যাগ কর। এ ছাড়া অন্য কোন বন্ধন নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ, টাকাকড়ি—এগুলি মূর্তিমান পিশাচস্বরূপ। পার্থিব ভালবাসা দেহ থেকেই প্রসূত—কামকাঞ্চন সম্বন্ধে সব ছেড়ে দাও—ঐগুলি যেমন চলে যাবে, অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে—তখন আত্মা তাঁর অনন্ত শক্তি ফিরে পাবেন।

আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ইংলণ্ডে যাই।—আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর আগে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি

তোমাদের চিরস্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৫২

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া
১০ জুলাই, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে proof (প্রুফ) পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules and regulations (নিয়মাবলী)-টুকু—যেটুকু আমাদের meeting hall-এ (সভায়) মশায়রা পড়িয়াছিলেন—ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবে, নইলে লোক হাসিবে।

বহরমপুরে যে প্রকার কার্য
১২৪
হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য কার্য—জীবন জীবন—মতে-ফতে এসে যায় কি? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলা মূলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম; পরোপকারই সর্বজনীন মহাব্রত—আবালবৃদ্ধবনিতা, আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative (নিষেধাত্মক) ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—'মধু, তা কার কি?' ঐ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ ভগবান্' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? ঐ রকম যদি দশটা district (জেলায়) পারতে, তাহলে দশটাই কেনা হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান, এখন ঐ কর্মবিভাগটার উপরই খুব ঝোঁক, আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুলো ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাও—আলখ জাগিয়ে টাকাপয়সা, ছেঁড়া কাপড়, চালডাল, যা পায় নিয়ে আসুক, তারপর সেগুলো ডিষ্ট্রীবিউট (বিতরণ) করবে। ঐ কাজ, ঐ কাজ। তারপর লোকের বিশ্বাস হবে, তারপর যা বলবে শুনবে।

কলিকাতায় মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে, ঐ famine-এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল্-ফল্—ঘোড়ার ডিম থাক্, প্রভু যা করবার তা করবেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।

মেটিরিয়াল (মালমসলা) যোগাড় করছ না কেন? আমি এসে নিজেই কাগজ start (আরম্ভ) করব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়; লেকচার, বই, ফিলসফি—সব তার নীচে। শশীকে ঐ রকম একটা কর্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্য করতে লিখবে। আর ঠাকুরপুজো-ফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশী ব্যয় না করে। ... তুমি মঠের ঠাকুরপুজোর খরচ দু-এক টাকা মাসে করে ফেলবে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। ... শুধু জল-তুলসীর পুজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল—কলিকাতায়। আমি কাল পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৫৩*

[মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত]

আলমোড়া
১০ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় জো জো,

তোমার চিঠিগুলি পড়ার ফুরসত আমার আছে, এটা যে তুমি আবিষ্কার করে ফেলেছ, তাতে আমি খুশী।

বক্তৃতা ও বাগ্মিতা করে করে হয়রান হয়ে পড়ায় আমি হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছি। ডাক্তাররা আমায় খেতড়ির রাজার সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে না দেওয়ার আমি বড়ই দুঃখিত; আর স্টার্ডি এতে ক্ষেপে গেছে।

সেভিয়ার-দম্পতি সিমলাতে আছেন, আর মিস মূলার এখানে আলমোড়ায়। প্লেগ কমেছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ এখনও চলছে, তার উপর এ যাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় এ দুর্ভিক্ষ আরও করালরূপ ধারণ করবে বলে মনে হচ্ছে।

আমাদের কর্মীরা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় যে কাজে নেমেছে, এখান থেকে তার পরিচালনায় আমি খুবই ব্যস্ত।

যেমন করেই হোক তুমি এসে পড়; শুধু এইটুকু মনে রেখো—ইওরোপীয়দের ও হিন্দুদের (অর্থাৎ ইওরোপীয়েরা যাদের 'নেটিভ' বলেন তাদের) বসবাসের ব্যবস্থা যেন তেল-জলের মত; নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করা ইওরোপীয়দের পক্ষে সর্বনেশে ব্যাপার। (প্রাদেশিক) রাজধানীগুলোতে পর্যন্ত বলবার মত কোন হোটেল নেই। তোমাকে অনেক চাকর-বাকর সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা করতে হবে (খরচ হোটেলের চেয়ে কম)। কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত লোকের ছবি তোমায় সয়ে যেতে হবে; আমাকেও

তুমি ঐ রূপেই দেখতে পাবে। সর্বত্রই ময়লা ও নোংরা, আর সব 'কালা আদমী'। কিন্তু তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করবার মত লোক ঢের পাবে। এখানে যদি ইংরেজদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা কর, তবে তুমি আরাম পাবে বেশী; কিন্তু হিন্দুদের ঠিক ঠিক পরিচয় পাবে না। হয়তো আমি তোমার সঙ্গে বসে খেতে পাব না; কিন্তু তোমায় কথা দিচ্ছি যে, আমি তোমার সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করব এবং তোমার ভ্রমণকে সুখময় করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এই সবই তোমার ভাগ্যে জুটবে—যদি কিছু ভাল জুটে যায় তো সে বাড়তির ভাগ। হয়তো মেরী হেল তোমার সঙ্গে এসে পড়তে পারে। অর্চার্ড লেক্, অর্চার্ড দ্বীপ, মিসিগান—এই ঠিকানায় মিস ক্যাম্পবেল নাম্নী একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারী বাস করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ভক্ত, উপবাস ও প্রার্থনাদি অবলম্বন করে এই দ্বীপে নির্জনে বাস করেন, ভারতবর্ষ দর্শন করার জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি বড়ই গরীব। তুমি যদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আস, তবে যেমন করেই হোক, আমি তাঁর খরচ দেব। মিসেস বুল যদি বুড়ো ল্যাণ্ডস্‌বার্গকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, তবে সে বেঁচে যায়!

খুব সম্ভব আমি তোমার সঙ্গে আমেরিকায় ফিরব। হলিস্টার ও শিশুটিকে আমার চুমো দিও। এলবার্টা, লেগেট-দম্পতি ও ম্যাবেলকে আমার ভালবাসা জানিও। ফক্স কি করছে? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার ভালবাসা জানিও। মিসেস বুল ও সারদানন্দকে ভালবাসা জানাচ্ছি। আমি আগেকার মতই সবল আছি; কিন্তু কেমন থাকব, তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে সব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার উপর। আর দৌড়ঝাঁপ করা চলবে না।

এ বছর তিব্বতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরা যেতে দিল না; কারণ ঐ পথে চলা ভয়ানক শ্রমসাপেক্ষ। যা হোক আমি খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়েই সন্তুষ্ট আছি। তোমার বাই-সাইকেলের চেয়ে এটা আরও বেশী উন্মাদনাপূর্ণ; অবশ্য উইম্বল্‌ডনে আমার সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল উতরাই—রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খাদ!

সদা প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

পুঃ—ভারতে আসার সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে—অক্টোবরের মধ্যে বা নভেম্বরের প্রথমে; ডিসেম্বর, জানুআরী ও ফেব্রুআরী তুমি সব দেখবে এবং ফেব্রুআরীর শেষাশেষি ফিরে যাবে। মার্চ থেকে গরম পড়তে শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত সব সময়েই গরম।

মান্দ্রাজে শীঘ্রই একখানি পত্রিকা আরম্ভ করা হবে; গুডউইন তারই কাজে সেখানে গেছে।

বি

৩৫৪*

[স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
১১ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,
তুমি সম্প্রতি মঠের যে কার্য-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে ভারি খুশী হলাম। তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার বড় কিছু নেই—কেবল বলতে চাই, আর একটু পরিষ্কার করে লিখো।

যতদূর পর্যন্ত কাজ হয়েছে, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট; কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে হবে। আগে আমি একবার লিখেছিলাম, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি যন্ত্র যোগাড় করলে ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষতঃ শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাদাসিদে ও হাতেকলমে শিক্ষা দিলে ভাল হয়; কই, সে-সম্বন্ধে তো কোন উচ্চবাচ্য এ পর্যন্ত শুনিনি।

আর একটা কথা লিখেছিলাম—যে-সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, সেইগুলি কিনে ফেলা উচিত; তার সম্বন্ধেই বা কি হল?

এখন মনে হচ্ছে—মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিন জন করে মহান্ত নির্বাচন করলে ভাল হয়; একজন বৈষয়িক ব্যাপার চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক দিক্ দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াই দেখছি কঠিন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনায়াসে অপর দুটি বিভাগের ভার নিতে পারেন। মঠ দর্শন করতে কেবল কলিকাতার বাবুর দল আসছেন জেনে বড় দুঃখিত হলাম। তাঁদের দ্বারা কিছু হবে না। আমরা চাই সাহসী যুবকের দল—যারা কাজ করবে; আহাম্মকের দলকে দিয়ে কি হবে?

ব্রহ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে—মঠে তাদের সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন; যেন তা পাঠাতে ত্রুটি না হয়, আর যে বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান যেন তারা পাঠায়।

গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ করে যাও ও প্রস্তুত থাক।

অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্য-প্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। মনে হয়, তারা একটা ছোট গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণের কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে—কই, এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখান না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।

আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে-সম্বন্ধে তো কোন কথা শুনছি না—কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে! ব্রহ্মানন্দকে বলো, বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরও মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত ঐ কার্যে ফল কিছু হয়নি; কারণ তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা দেশের লোকের শিক্ষার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং এইভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিন্তু সেই দ্বার দিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সবচেয়ে সহজ উপায় এইঃ একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু-মহারাজের মন্দির কর। গরীবরা সেখানে আসুক, তাদের সাহায্যও করা হোক, তারা সেখানে পূজা-অর্চাও করুক। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে 'কথা' হোক। ঐ কথার সাহায্যেই তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিজেদেরই ঐ বিষয়ে একটা আস্থা ও আগ্রহ বাড়তে থাকবে—তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে, আর হতে পারে, কয়েক বৎসরের ভেতর ঐ ছোট মন্দিরটিই একটি প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হবে। যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন-কার্যে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রথমে প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রস্থলে একটা জায়গা নির্বাচন করুন—এইরূপ একটি কুঁড়ে নিয়ে সেখানে ঠাকুরঘর স্থাপন করুন—যেখান থেকে আমাদের অল্প-স্বল্প কাজ আরম্ভ হতে পারে।

মনের মত কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মত করে নিতে পারে, সে-ই বুদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মত, সর্ষপের মত ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ কাজকেই মহৎ করে তোলে।
১২৫

যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন করছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জুয়াচোরেরা যেন গরীবের প্রাপ্য নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ষ এমন অলস জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য হবে, তারা কখনও না খেয়ে মরে না—কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্রহ্মানন্দকে বলো, যাঁরা দুর্ভিক্ষে কাজ করছেন, তাঁদের সকলকে এই কথা লিখতেঃ যাতে কোন ফল নেই, এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে তাঁদের কখনই দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্যের প্রতিষ্ঠা।

এখন তোমরা বুঝতে পারছ, তোমাদের নূতন নূতন মৌলিক চিন্তার চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই গোটা কাজটা চুরমার হয়ে যাবে। এই রকম করতে পারঃ তোমরা সকলে মিলে একটা সভায় এই বিষয় আলোচনা কর, আমাদের হাতে যে অল্পস্বল্প সম্বল আছে, তা থেকে কি করে সবচেয়ে ভাল স্থায়ী কাজ হতে পারে। কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হোক, সকলেই নিজের মতামত—বক্তব্য বলুক, সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক, বাদপ্রতিবাদ হোক, তারপর আমাকে তার একটা বিবরণ পাঠাও।

উপসংহারে বলি, তোমরা মনে রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট বেশী আশা করি—আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পারতাম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' হতেই হবে—আমি বলছি—অবশ্যই হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা—এই তিনটি যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের হটাতে পারবে না। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

স্নেহাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩৫৫-৩৬৪

৩৫৫

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

দেউলধার, আলমোড়া
১৩ জুলাই, ১৮৯৭

প্রেমাস্পদেষু,

এখান হইতে আলমোড়ায় যাইয়া যোগেন-ভায়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন। সুভালা-ভ্যালি পৌঁছে সংবাদ দিবেন।... ডাণ্ডি আদি পাওয়া অসম্ভব বিধায় লাটুর যাওয়া হইল না। আমি ও অচ্যুত পুনরায় এ স্থানে আসিয়াছি। আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রৌদ্রে ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের দরুন একটু আজ খারাপ আছে। শশীবাবুর ঔষধ প্রায় দুই সপ্তাহ খাইলাম—বিশেষ কিছুই দেখি না।—লিভারের বেদনাটা গিয়াছে ও খুব কসরত করার দরুন হাত-পা বিশেষ muscular (পেশীবহুল) হইয়াছে, কিন্তু পেটটা বিষম ফুলিতেছেঃ উঠতে বসতে হাঁপ ধরে। বোধ হয় দুধ খাওয়াই তার কারণ। শশীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, দুগ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা। পূর্বে আমার দুইবার sun-stroke (সর্দি-গরমি) হয়। সেই অবধি রৌদ্র লাগিলেই চোখ লাল হয়, দুই-তিন দিন শরীর খারাপ যায়।

মঠের খবর শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম ও দুর্ভিক্ষের কার্য উত্তমরূপে হইতেছে শুনিলাম। দুর্ভিক্ষের জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' আফিস হইতে টাকা আসিয়াছে কিনা লিখিবে এবং এখান হইতেও শীঘ্র টাকা যাইবে। দুর্ভিক্ষ আরও অনেক স্থানে তো আছে। একটি গ্রামে এতদিন থাকিবার আবশ্যক নাই। উহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিবে এবং এক এক জনকে এক এক জায়গায় যাইতে লিখিবে। ঐ সকল কাজই আসল কাজ; ঐরূপ ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে পর ধর্মের বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। ঐ যে গোঁড়ারা আমাদের গালি করিতেছে, ঐ রকম (সেবা) কার্যই তাহার একমাত্র উত্তর—এইটি সদা মনে রাখিবে। শশী ও সারদা যে প্রকার বলিতেছে, সেই প্রকার ছাপাইতে আমার কোন আপত্তি নাই।

মঠের নাম কি হইবে এইটা স্থির তোমরাই কর। ... টাকা সাত সপ্তাহের মধ্যেই পৌঁছিবে; জমির তো কোন খবর নাই। এ বিষয়ে কাশীপুরের কেষ্টগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না? পরে বড় কার্য ক্রমে হবে। যদি মত হয়, এ বিষয় কাহাকেও—মঠস্থ বা বাহিরের—না বলিয়া চুপি চুপি অনুসন্ধান করিও। দুই-কান হইলেই কাজ খারাপ হয়। যদি ১৫|১৬ হাজারের ভিতর হয় তো তৎক্ষণাৎ কিনিবে (যদি ভাল বোঝ)। যদি কিছু বেশী হয় তো বায়না করিয়া ঐ সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করিও। আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল। বাকী ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি জড়িত)। বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। অতি গোপনে—'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সাংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব'।
১২৬

কাশীপুরের বাগানের অবশ্য জমির দাম বেড়ে গেছে; কিন্তু কড়ি তেমনি কমে গেছে। যা হয় একটা করো ও শীঘ্র করো। গয়ংগচ্ছ করতে করতে যত কাজ মাটি হয়। ওটাও তো নিতেই হবে, আজ না হয় কাল—আর যত বড়ই গঙ্গাতীরে মঠ হউক না। অন্য লোক দিয়ে কথা পাড়লে আরও ভাল হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লম্বা দর হাঁকবে। চেপে কাজ করে চল। অভীঃ, ঠাকুর সহায়। ভয় কি? সকলকে আমার ভালবাসা দিবে।

বিবেকানন্দ

(খামের উপরে লিখিত)

... কাশীপুরের বিশেষ চেষ্টা দেখ। ... বেলুড়ের জমি ছেড়ে দাও।

হুজুরদের নামের জ্বালায় কি গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে? সব নাম 'মহাবোধি' নেয় তো নিক। গরীবদের উপকার হোক। কাজ বেশ চলছে—উত্তম কথা। আরও লেগে যাও। আমি প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করছি। Saccharine & lime (স্যাকারিন ও নেবু) এসেছে।

বি

৩৫৬*

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
২৩ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌,
আমার সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্য কিছু মনে করো না। আমি এখন পাহাড় থেকে সমতলের দিকে চলেছি, কোন একটা জায়গা পৌঁছে তোমাকে বিস্তারিত চিঠি দেব।

ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সরলতা থাকতে পারে—তোমার এ কথার যে কি অর্থ, তা তো আমি বুঝি না। আমার দিক্ থেকে আমি বলতে পারি যে, প্রাচ্য লৌকিকতার সামান্য যা এখনও আমার আছে, তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে দিয়ে শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে কথা বলার জন্য আমি প্রস্তুত। আহা, যদি একটি দিনের জন্যও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে বাস করা যায়, এবং সরলতার মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়! তাই কি শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা নয়?

এ সংসারে অন্যের ভয়ে আমরা কাজ করি, ভয়ে কথা বলি, ভয়ে, চিন্তা করি। হায়, শত্রুপরিবেষ্টিত জগতে আমাদের জন্ম! 'শত্রুর গুপ্তচর বিশেষভাবে আমাকেই লক্ষ্য করে ফিরছে'—এমনি একটা ভীতির হাত থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যে জীবনে এগিয়ে যেতে চায়, তার ভাগ্যে আছে দুর্গতি! এ সংসার কখনও কি আপনার জনে পূর্ণ হবে? কে জানে? আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি।

কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমানে দুর্ভিক্ষনিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে—দুর্ভিক্ষসেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান। এখন পর্যন্ত অবশ্য খুব সামান্য ভাবেই চলছে, যে-সব ছেলেরা শিক্ষাধীন, তাদের সুবিধামত কাজে লাগান হচ্ছে।

বর্তমানে মান্দ্রাজ ও কলিকাতাই আমাদের কাজের জায়গা। গুডউইন মান্দ্রাজে কাজ করছে। কলম্বোতেও একজন গেছে। যদি ইতোমধ্যেই পাঠান না হয়ে থাকে, তবে আগামী সপ্তাহ থেকে তোমাকে সমস্ত কাজের একটি করে মাসিক বিবৃতি পাঠান হবে। আমি বর্তমানে কর্মকেন্দ্র থেকে দূরে আছি; তাই সবই একটু ঢিলে চলছে, তা দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু মোটের উপর কাজ সন্তোষজনক।

তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান্ তোমাকে আশীর্বাদ করুন!

আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানকার কাজ অনেকটা জেঁকে উঠবে, তোমার মত আমিও তা বিশ্বাস করি। তথাপি এখানকার কর্মচক্র খানিক ঘুরতে আরম্ভ না করলে এবং আমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালাবার মত অনেকে আছে, এটি না জেনে আমার পক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। মুসলমানরা যেমন বলে, 'খোদার মর্জিতে'—তা কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী খেতড়ির রাজা এখন ইংলণ্ডে আছেন। তিনি শীঘ্র ভারতে আসবেন, এবং তিনি অবশ্যই আমার বিশেষ সহায়ক হবেন।

আমার অনন্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৫৭

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া
২৪ জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,
তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। Orphanage (অনাথাশ্রম) সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রী-মহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী centre (কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। … টাকার চিন্তা নাই—কল্য আমি আলমোড়া হইতে plain-এতে (সমতল প্রদেশে) নামিব, যেখানে হাঙ্গাম হইবে সেইখানে একটা চাঁদা করিব—famine-এর (দুর্ভিক্ষের) জন্য—ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাতার মঠ, ঐ নমুনায় প্রত্যেক জেলায় যখন এক-একটি মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য; গ্রামের লোকদের lecture (বক্তৃতা) আদি দ্বারা ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস। ইংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্যের সহায়তার জন্য একটি সভা আছে; ঐ সভার কার্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়া থাকি। এই প্রকার চতুর্দিক হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে। ভয় কি? যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য

করব, তাদের দ্বারা কোন কার্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করে।

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকী থাকবে না। আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও ব্রহ্মচারীকে জানাইবে। তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কার্য করে। ওয়া গুরুকী ফতে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

৩৫৮*

[মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত]

আলমোড়া
২৫ জুলাই, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

এবার আমার প্রতিশ্রুতি পালনের সময়, ইচ্ছা ও সুযোগ হয়েছে। তাই এ চিঠি লিখতে বসেছি। কিছুকাল আমার শরীরটা খুব দুর্বল ছিল, এবং নানা কারণে এই (জুবিলী) উৎসবের মরসুমে আমার ইংলণ্ড যাওয়া স্থগিত রাখতে হল।

আমার অকপট ও প্রেমাস্পদ বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পারলাম না বলে প্রথমটায় মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেখলাম কর্মফল এড়াবার যো নেই, তাই আমার এই হিমালয়কে নিয়েই পরিতুষ্ট থাকতে হল। তবে এ বিনিময়ে মোটেই খুশী হতে পারিনি, কারণ মানুষের মুখচ্ছবিতে জীবন্ত আত্মার প্রতিফলনে যে সৌন্দর্য, জড় জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যের চেয়ে তা অনেক বেশী আনন্দদায়ক।

আত্মাই কি জগতের আলোকস্বরূপ নয়?

নানা কারণে লণ্ডনের কাজ একটু ঢিমে-তেতালায় চলেছে; তার একটি মুখ্য কারণ হল—কাঞ্চন, বুঝলে? আমি সেখানে থাকলে টাকাকড়ি যে-কোন উপায়ে জুটে যায়, এবং কাজ এগিয়ে যায়। এখন কেউই কাঁধ পাতছে না। আমাকে আবার যেতেই হবে, এবং কাজটাকে আবার গড়ে তোলার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করতে হবে।

আজকাল বেশ খানিকটা ব্যায়াম করছি ও ঘোড়ায় চড়ছি, কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সর-তোলা দুধ খেতে হয়েছিল আর তারই ফলে আমি পিছনের চেয়ে সামনের দিকে বেশী এগিয়ে গিয়েছি। যদিও আমি সবসময়ই আগুয়ান কিন্তু এখনই এতটা অগ্রগতি চাই না, তাই দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

জেনে খুশী হলাম খাবার সময় তোমার বেশ ক্ষুধা হয়।

উইম্বল্‌ডনের মিস মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে তুমি জান কি? সে আমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি পার তো তার সঙ্গে ডাকে যোগাযোগ করো, তা হলে সেখানে তুমি আমার কাজে অনেকটা সহায়তা করতে পারবে। তার ঠিকানা—Brantwood, Worple Road, Wimbledon.

তাহলে আমার ছোট বন্ধু মিস অর্চার্ড (Miss Orchard)-কে তুমি দেখেছ এবং তাকে তোমার বেশ ভালও লেগেছে—বেশ কথা। তার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা। যখন আমি খুব বুড়ো হয়ে যাব, তখন তোমার বা মিস অর্চার্ডের মত আমার বিশেষ প্রিয় ছোট ছোট বন্ধুদের জয়বার্তা পৃথিবীর বুকে ঘোষিত হচ্ছে দেখে কতই না আনন্দের সঙ্গে জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম থেকে চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করব!

কথায় কথায় বলে রাখি, আমার চুল পাকতে শুরু করেছে—এত তাড়াতাড়ি যে বুড়ো হতে চলেছি, তাতে আনন্দই হচ্ছে। সোনালীর মধ্যে—অর্থাৎ কালোর মধ্যে—রূপালী কেশ অতি দ্রত এসে যাচ্ছে।

ধর্মপ্রচারকের অল্পবয়সী হওয়া ভাল নয়, তোমার তাই মনে হয় না কি? আমি কিন্তু তাই মনে করি, সারা জীবন ধরেই মনে করেছি। একজন বৃদ্ধের প্রতি মানুষ অনেক বেশী আস্থা এবং তাঁকে দেখে অনেক বেশী শ্রদ্ধা জাগে। তথাপি এ জগতে বুড়ো বদমাসগুলিই সবচেয়ে মারাত্মক, তাই নয় কি? এই দুনিয়ার বিচারের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে, এবং হায়, সত্য থেকে তা কতই না স্বতন্ত্র!

তাহলে তোমার 'বিশ্বজনীন ধর্ম' (প্রবন্ধ) রিভিউ দ্য দ্যো মোঁদে (Revue de deux Mondes) পত্রিকা নাকচ করে দিয়েছে। মুষড়ে পড়ো না, আবার অন্য কোন কাগজে চেষ্টা কর। আমি নিশ্চিত যে একবার গৃহীত হলে তুমি খুব দ্রুত প্রবেশাধিকার পাবে। আমি খুবই আনন্দিত যে, কাজটিকে তুমি খুব ভালবাস; কাজ তার নিজের পথ তৈরী করে নেবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র

সন্দেহ নেই। স্নেহের মেরী, আমাদের ভাবাদর্শের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এবং অদূর ভবিষ্যতেই তার সার্থক রূপায়ণ হবে।

মনে হয় এ চিঠিখানা পারি-তে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে—তোমার সৌন্দর্যময় পারি—এবং আশা করি ফরাসী দেশের সাংবাদিকতা ও সেখানকার আসন্ন 'বিশ্ব মেলা' সম্পর্কে তুমি আমাকে অনেক কিছু লিখবে।

বেদান্ত ও যোগের সাহায্যে তুমি উপকৃত হয়েছ, এ-কথা জেনে আমি খুবই খুশী। দুর্ভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে সার্কাস-দলের ক্লাউনের মত মনে হয়, সে কেবল অন্যকে হাসায়, কিন্তু তার নিজের দশা সকরুণ।

স্বভাবতই তোমার বেশ হাসিখুশী মেজাজ। তোমার মনে কোন কিছুরই যেন প্রভাব পড়ে না। তা ছাড়া তুমি খুবই পরিণামদর্শী, কারণ খুব সাবধানে তুমি 'প্রেম' বা প্রেমঘটিত যাবতীয় বাজে জিনিষ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছ। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, তুমি শুভকর্ম করেছ এবং তোমার জীবনব্যাপী কল্যাণের বীজ বপন করেছ। আমাদের জীবনের ত্রুটি হল এই যে, আমরা বর্তমানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হই—ভবিষ্যতের দ্বারা নয়। যা এই মুহূর্তে আমাদের ক্ষণিক আনন্দ দেয়, তারই পিছনে আমরা ছুটি; ফলে দেখা যায়, বর্তমানের ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে আমরা ভবিষ্যতের বিপুল দুঃখ সঞ্চার করে বসি।

যদি ভালবাসবার মত কেউ আমার না থাকত! যদি আমি শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হতাম! আমার আপনার লোকেরাই আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশী দুঃখের কারণ হয়েছে—আমার ভ্রাতা, ভগ্নী, জননী ও অন্য সব আপন জন। আত্মীয়স্বজনরাই মানুষের উন্নতির পথে কঠিন বাধাস্বরূপ। আর এটা খুব আশ্চর্য নয় কি যে, মানুষ তৎসত্ত্বেও বিবাহ করবে ও নূতন মানুষের জন্ম দিতে থাকবে!!!

যে মানুষ একাকী, সে-ই সুখী। সকলের কল্যাণ কর, সকলকে তোমার ভাল লাগুক, কিন্তু কাউকে ভালবাসতে যেও না। এটা একটা বন্ধন, আর বন্ধন শুধুই দুঃখ ডেকে আনে। তোমার অন্তরে তুমি একাকী বাস কর—তাতে সুখী হবে। যার দেখাশুনো করবার কেউ নেই এবং কারও তত্ত্বাবধান নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, সেই মুক্তির পথে এগিয়ে যায়।

তোমার মনের গঠন দেখে আমার ঈর্ষা হয়—শান্ত, নম্র, হাসিখুশী অথচ গভীর ও বন্ধনহীন। তুমি মুক্ত হয়ে গেছ, মেরী, তুমি মুক্ত হয়ে আছ; তুমি তো জীবন্মুক্ত। আমার প্রকৃতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের গুণ বেশী, আর তোমার মধ্যে মেয়েদের চাইতে পুরুষের গুণ বেশী। আমি সব সময়ই অন্যের দুঃখ-বেদনা শুধু-শুধুই নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছি, অথচ কারও কোন কল্যাণ করতেও পারছি না—ঠিক যেমন মেয়েদের সন্তান না হলে একটি বেড়াল পুষে তার প্রতি সকল ভালবাসা ঢেলে দেয়।

তোমার কি মনে হয়, তার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা আছে? একদম না, এগুলি হল জড় স্নায়বিক বন্ধন—হ্যাঁ, ঠিক তাই। হায়, পঞ্চভূতে গড়া এই দেহের দাসত্ব ঘোচান—সে কি সহজ কথা!

তোমার বন্ধু মিসেস মার্টিন প্রতি মাসে অনুগ্রহ করে তাঁর পত্রিকাটি আমাকে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে, স্টার্ডির থার্মোমিটার এখন শূন্য ডিগ্রীর নীচে। এই গ্রীষ্মে আমার ইংলণ্ডে যাওয়া হল না বলে তিনি খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছেন। আমার কি-ই বা করার ছিল?

আমরা এখানে দুটি মঠের পত্তন করেছি—একটি কলিকাতায়, অপরটি মান্দ্রাজে। কলিকাতার মঠটি (একটি জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ী) সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ভয়ানক আন্দোলিত হয়েছে।

আমরা বেশ কয়েকটি যুবককে পেয়েছি, তাদের এখন শিক্ষানবিশী চলছে। তা ছাড়া আমরা বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য সেবাকেন্দ্র খুলেছি, এবং কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমরা ঐরকম কেন্দ্র স্থাপন করার চেষ্টা করব।

কয়েকদিন বাদেই আমি সমতলে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে যাব—এই পর্বতের পশ্চিম খণ্ডে। সমভূমিতে যখন একটু ঠাণ্ডা পড়বে, তখন দেশময় একবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াব—দেখব কি পরিমাণ কাজ করা যায়।

এখন আর লিখবার সময় নেই, অনেক লোক অপেক্ষা করছে—তাই স্নেহের মেরী, তোমার জন্য সর্ববিধ আনন্দ ও সুখ কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। হাড়মাসের দেহ কখনও যেন তোমাকে প্রলুব্ধ করতে না পারে, সতত এই প্রার্থনা।

সর্বদা প্রভুসমীপে তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৫৯*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া
২৮ জুলাই, ১৮৯৭

মা,

আপনার সুন্দর ও সহৃদয় লিপিখানির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার কতই না ইচ্ছা ছিল খেতড়ির রাজার সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে সেখানকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার। গত মরসুমে লণ্ডনে আমার অনেকগুলি ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু কপালে তা নেই; আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই রাজার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হল না।

এলবার্টা তাহলে আবার আমেরিকায় স্বগৃহে ফিরে এসেছে। রোমে আমার জন্য সে যা করেছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। হলি (Hollister) কেমন আছে? তাদের উভয়কে আমার ভালবাসা জানাবেন এবং আমার সর্বকনিষ্ঠ নবজাত ভগিনীটিকে আমার হয়ে চুম্বন দেবেন।

ন-মাস হল আমি হিমালয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়েছি। এবার আবার কাজের লাগাম ধরতে সমতলে ফিরে যাচ্ছি।

ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স, জো জো ও ম্যাবেলকে আমার ভালবাসা এবং আপনাকেও চিরন্তনভাবে।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৩৬০*

আলমোড়া
২৯ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌,

স্টার্ডির একখানি চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে, তুমি ভারতে আসতে এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কাল তার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু মিস মূলারের কাছ থেকে তোমার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে যা জানতে পারলাম, তাতে এ পত্রখানিও আবশ্যক হয়ে পড়েছে; মনে হচ্ছে, সরাসরি তোমাকে লেখা ভাল।

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।

কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পার না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।

ভারতে তা ছাড়া, জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত; আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদাই আগুনের হল্‌কা চলছে।

শহরের বাইরে কোথাও ইওরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি আমি কেউ নই; তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই তোমায় সাহায্য করব।

কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিম্বা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক্ থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক। 'মরদ্‌কী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার তোমাকে একটু সাবধান করা দরকার—তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস মূলার কিম্বা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তাঁর নিজের ভাবে মিস মূলার চমৎকার মহিলা; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধারণা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মাথায় ঢুকেছে যে, তিনি আজন্ম নেত্রী আর দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিতে টাকা ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এই মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই বারবার মাথা তুলছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে যে, তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব। তাঁর বর্তমান সঙ্কল্প এই যে, তিনি কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া নেবেন—তোমার ও নিজের জন্য, এবং ইওরোপ ও আমেরিকা থেকে যে-সব বন্ধুদের আসার সম্ভাবনা আছে তাঁদেরও জন্য। এটা অবশ্য তাঁর সহৃদয়তা ও অমায়িকতার পরিচায়ক; কিন্তু তাঁর মঠাধ্যক্ষাসুলভ সঙ্কল্পটি দুটি কারণে সফল হবে না—তাঁর

রুক্ষ মেজাজ এবং অদ্ভুত অস্থিরচিত্ততা। কারও কারও সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাল; যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মিসেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ; এত ভাল, এত স্নেহময়ী তিনি! সেভিয়ার-দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না; এমন কি স্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি। কিন্তু তাঁদের এখনও কোন নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী নেই। তুমি এলে তোমার সহকর্মীরূপে তাঁদের পেতে পার এবং তাতে তোমার ও তাঁদের—উভয়েরই সুবিধা হবে। কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

আমেরিকার সংবাদে জানলাম যে, আমার দুজন বন্ধু—মিস ম্যাকলাউড ও বোষ্টনের মিসেস বুল এই শরৎকালেই ভারত-পরিভ্রমণে আসছেন। মিস ম্যাকলাউডকে তুমি লণ্ডনেই দেখছ—সেই পারি-ফ্যাশনের পোষাক-পরিহিতা মহিলাটি! মিসেস বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁরা ইওরোপের হয়ে এদেশে আসছেন; সুতরাং আমার পরামর্শ এই যে, তাঁদের সঙ্গে এলে তোমার পথের একঘেয়েমি দূর হতে পারে।

মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। কিন্তু চিঠিটি বড় শুষ্ক এবং প্রাণহীন। লণ্ডনের কাজ পণ্ড হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন বলে মনে হয়।

অনন্ত ভালবাসা জানবে। ইতি

সদা ভগবৎ-পদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৩৬১

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
২৯ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শশী,

তোমার কাজকর্ম বেশ চলছে, খবর পাইলাম। তিনটি ভাষ্য বেশ করে পড়ে রাখবে, আর ইওরোপীয় দর্শনাদিও বেশ করে পড়বে, ইহাতে অন্যথা না হয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল-তলওয়ার চাই, এ কথা যেন ভুল একদম না হয়। সুকুল এক্ষণে পৌঁছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। সদানন্দ যদি সেখানে থাকিতে না চায়, কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে, এবং প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট—আয়-ব্যয় প্রভৃতি সব সমেত মঠে পাঠাইতে ভুল যেন না হয়। আলাসিঙ্গার বোনাই এখানে বদ্রী শা-র নিকট হতে চারিশত টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে; পৌঁছিবামাত্র পাঠাইবার কথা, এখনও কেন পাঠাইল না। আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসিবে এবং সত্বর পাঠাইতে কহিবে; কারণ আমি পরশুদিন এখান হতে যাচ্ছি—মসূরী পাহাড় বা অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক করব। কাল এখানে ইংরেজ-মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে বড়ই খুশী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দীতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুশী—হিন্দীতে যে oratory (বাগ্মিতা) করতে পারব তা তো আগে জানতাম না। মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় তো কলিকাতায় যেভাবে কার্য হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে করে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন বেশী খরচ করবে না, পাছে ফুরিয়ে যায়—কিছুদিন পরে করো।

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে—তবে বিশেষ আতুপুতুতে শরীর উল্টা আরও খারাপ হয়ে যায়। বিদ্যের জোর না থাকলে কেউ ঘণ্টা-ফণ্টা মানবে না—এ-কথাটা নিশ্চিত, এবং এইটি মনে স্থির রেখে কার্য করবে।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও গুডউইন প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৬২

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া
৩০ জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,
তোমার কথামত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ বিবৃত করিয়া শশী-ডাক্তারকে দিয়া দেখাইয়া ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’-এ একটি লম্বাচওড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্খগুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।

Orphan (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি করছ? মঠ হতে চারি-পাঁচজনকে না হয় ডাকিয়া লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre (স্থায়ী কেন্দ্র) করিতে হইবে বৈকি। আর—দেবকৃপা না হলে এদেশে কি কাজ হয়? রাজনীতি ইত্যাদিতে কোন যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাদের সহিত কোন বিবাদাদিতেও কাজ নাই। একটা কার্যে তন্ মন ধন। এখানে একটি—সাহেবমহলে-ইংরেজী বক্তৃতা হইয়াছিল, ও একটি—দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে। হিন্দীতে আমার এই প্রথম, কিন্তু সকলের তো খুব ভাল লাগল। সাহেবরা অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, ‘কালো মানুষ!’ ‘তাই তো কি আশ্চর্য’ ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইংরেজীতে, দেশী লোকের জন্য। এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য হয় দেখা যাক। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরেলি-যাত্রা, তারপর সাহারানপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মসূরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও ‘ফের লেগে যা’ আরম্ভ করেছি। শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out. (মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—‘এর কমে হবেই না।’ তাল ঠুকে লেগে যাও—‘ওয়া গুরুকী ফতে!’ টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল। … এই—তো ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই—কি কাজ করলে বল? কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ

৩৬৩*

[মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত]

আলমোড়া
১১ অগষ্ট, ১৮৯৭

প্রিয় জো,
… হ্যাঁ, জগন্মাতার কার্য পড়ে থাকবে না, কারণ তা সত্য, আন্তরিকতা ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এখনও তা থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি। ঐকান্তিক অকপটতাই হল এর মূলনীতি।

ভালবাসা সহ তোমার
বিবেকানন্দ

৩৬৪

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

আম্বালা
১৯ অগষ্ট, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,
মান্দ্রাজের কাজ অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আলাসিঙ্গা ও তাহার ভগিনীপতির টাকা আলমোড়ায় পৌঁছিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। গুডউইন লিখিতেছে, যে টাকা বাকী আছে লেকচার-এর দরুন—তাহা হইতে কিছু লইবার জন্য, Reception Committee (অভ্যর্থনা সমিতি)-কে চিঠি লিখিতে বলিতেছে। … উক্ত লেকচার-এর টাকা Reception-এ (অভ্যর্থনায়) খরচ করা অতি নীচ কার্য—তাহার বিষয়ে আমি কোন কথা কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি না। টাকা

সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোক যে কিরূপ, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। … তুমি নিজে বন্ধুদের—আমার তরফ হইতে এ-কথা বুঝাইয়া বলিবে এবং তাঁহারা যদি খরচ চালান ভাল, নতুবা তোমরা কলিকাতার মঠে চলিয়া আসিবে, অথবা রামনাদে মঠ উঠাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি এক্ষণে ধর্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি। নিরঞ্জন, দীনু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে। সদানন্দকে এতদিন মঠে কেন পাঠাও নাই? যদি সেখানে এখনও থাকে, পরে অমৃতসর হইতে নিরঞ্জন পত্র লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া পাঞ্জাবে কার্য আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাজপুতানাই কার্যের ক্ষেত্র। কার্য আরম্ভ করিয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিনকতক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আলাসিঙ্গা, জি. জি, গুডউইন, গুপ্ত, সুকুল প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিও, তুমিও জানিও। ইতি

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩৬৫-৩৭৪

৩৬৫*

মঠ, (বেলুড়?)
১২৭

১৩ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,
আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না; যদিও খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি, তবু আগামী শীতের আগে পূর্ব শক্তি ফিরে পাব বলে বোধ হয় না। জো-র একখানি পত্রে জানলাম যে, আপনারা দুজন ভারতবর্ষে আসছেন। বলাই বাহুল্য আপনাদের এখানে দেখতে পেলে আমি আনন্দিত হব; কিন্তু গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। বড় নগরাদি ছাড়া অন্যত্র ইওরোপীয় জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধা নেই বললেই চলে।

ইংলণ্ড থেকে সংবাদ পেলাম যে, মিঃ স্টার্ডি অভেদানন্দকে নিউ ইয়র্কে পাঠাচ্ছেন। আমাকে বাদ দিয়ে ইংলণ্ডের কাজ চলা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। এক্ষণে একটি মাত্র পত্রিকা মিঃ স্টার্ডি চালাবেন। এই মরসুমেই আমি ইংলণ্ডে যাবার আগেই ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারদের বোকামিতে বাধা পেলাম। ভারতবর্ষের কাজ চলছে।

ইওরোপ কিম্বা আমেরিকার কেউ ঠিক এখনই এদেশের কোন কাজে আসবে বলে আমার তো মনে হয় না। তা ছাড়া কোন পাশ্চাত্য দেশবাসীর পক্ষে এদেশের জলবায়ু সহ্য করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এনি বেস্যান্টের অসাধারণ শক্তি থাকলেও তিনি কেবল থিওসফিষ্টদের মধ্যে কাজ করেন; ফলে এদেশে ম্লেচ্ছদের যে-রকম সমাজবর্জিত হয়ে থাকা প্রভৃতি নানা অসম্মান ভোগ করতে হয়, তাঁকেও তাই করতে হচ্ছে। এমন কি গুডউইন পর্যন্ত মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাকে ঠিক করে দিতে হয়। গুডউইন বেশ কাজ করছে, সে পুরুষ বলে লোকের সঙ্গে মিশতে বাধা নেই। কিন্তু এদেশে পুরুষদের সমাজে মেয়েদের কোন স্থান নেই, মেয়েরা শুধু নিজেদের মধ্যেই কাজ করতে পারে। যে-সব ইংরেজ বন্ধু এদেশে এসেছেন, তাঁরা এ যাবৎ কোন কাজেই লাগেননি; ভবিষ্যতেও তাঁদের দ্বারা কিছু হবে কিনা, জানি না। এ সকল জেনেও যদি কেউ চেষ্টা করতে রাজী থাকে, তবে তাকে সাদরে আহ্বান করি।

সারদানন্দ যদি আসতে চায় তো চলে আসুক, আমার স্বাস্থ্য এখন ভেঙে গেছে; সুতরাং সে এলে সব কাজ গুছোতে বিশেষ সাহায্য হবে, সন্দেহ নেই।

দেশে ফিরে গিয়ে যাতে এদেশের জন্য কাজ করতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে মিস মার্গারেট নোব্‌ল্ নামে একটি ইংরেজ মেয়ে ভারতে এসে এখানকার অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের জন্য খুব উৎসুক হয়েছে। আপনারা যদি লণ্ডন হয়ে আসেন, তবে আপনার সঙ্গে আসার জন্য তাকে লিখেছি। বড় অসুবিধা এই যে, দূর থেকে কখনও আপনারা এখানকার অবস্থা পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না। দুটি দেশের ধরন এতই স্বতন্ত্র যে, আমেরিকা কিম্বা ইংলণ্ড থেকে তার কোন ধারণা করা অসম্ভব।

ভাববেন যে, আপনারা যেন আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাবার জন্য বেরিয়েছেন, তারপর যদি দৈবাৎ উৎকৃষ্ট কিছু পান তো সেটা আশাতিরিক্ত। ইতি

আপনাদের
বিবেকানন্দ

৩৬৬

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

অমৃতসর
২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,
যোগেন এক পত্রে ... বাগবাজারে ... বাটী ২০,০০০ টাকায় ... কিনিতে বলেন। ... ঐ বাড়ী কিনিলেও বেশ হাঙ্গাম আছে, যথা—ভেঙেচুরে বৈঠকখানাটিকে একটি হল করা এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করা। আবার ঐ বাটী অতি প্রাচীন ও জীর্ণ। যাহা হউক গিরিশবাবু ও অতুলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। আমি সদলে অদ্য কাশ্মীরে চলিলাম দুইটার গাড়ীতে। মধ্যে ধর্মশালা পাহাড়ে যাইয়া শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং টনসিল, জ্বর প্রভৃতি একেবারে আরাম হইয়া গিয়েছে। ...

তোমার এক পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। নিরঞ্জন, লাটু, কৃষ্ণলাল, দীননাথ, গুপ্ত ও অচ্যুত আমার সঙ্গে কাশ্মীর যাইতেছে।

মান্দ্রাজ হইতে যে ব্যক্তি famine work-এ (দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে) ১৫০০ টাকা দিয়াছে, সে চায় যে তাহার বিশেষ টাকা কি কি খরচে গেল—তাহার একটি তালিকা। উহা তাহাকে পাঠাইবে। আমরা এক রকম আছি ভাল। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে।

৩৬৭

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়
প্রধান বিচারপতি, শ্রীনগর, কাশ্মীর
১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

এক্ষণে কাশ্মীর। এদেশ সম্বন্ধে যে প্রশংসা শুনিয়াছ, তাহা সত্য। এমন সুন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয় না। কিন্তু এমন নরককুণ্ডের মত ময়লা গ্রাম ও শহর আর কোথাও নাই। শ্রীনগরে ঋষিবরবাবুর বাড়ীতে ওঠা গেছে। তিনি বিশেষ যত্নও করছেন। আমার চিঠিপত্র তাঁর ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি দু-এক দিনের মধ্যে অন্যত্র বেড়াইতে যাইব; কিন্তু আসিবার সময় পুনরায় শ্রীনগর হইয়া আসিব এবং চিঠিপত্রও পাইব। গঙ্গাধর সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠাইয়াছ, তা দেখিলাম। তাহাকে লিখিবে যে মধ্যপ্রদেশে অনেক orphan (অনাথ) রহিয়াছে ও গোরখপুরে। সেখান হইতে পাঞ্জাবীরা অনেক ছেলেপুলে আনাইতেছে। মহেন্দ্রবাবুকে বলিয়া কহিয়া একটা এ-বিষয়ে agitation (আন্দোলন) করা উচিত—যাহাতে কলিকাতার লোকে ঐ-সকল orphan-এর charge (ভার) নেয়, সে বিষয়ে একটা আন্দোলন হওয়া উচিত—বিশেষতঃ যাহাতে মিশনরীরা যে-সকল orphan (অনাথ) লইয়াছে, তাহাদের যেন ফিরাইয়া দেয়—সে-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে Memorial (স্মারকলিপি) দেওয়া উচিত। গঙ্গাধরকে আসিতে বল এবং রামকৃষ্ণ-সভার তরফ হইতে এ-বিষয়ে একটা বিষম হুজ্জুক করা উচিত। কোমর বেঁধে বাড়ী বাড়ী গিয়ে হুজ্জুক কর। Mass meeting (জনসভা) করাও ইত্যাদি। সিদ্ধি হউক না হউক—একটা বিষম গোলমাল কর। Central Province (মধ্যপ্রদেশ) এবং গোরখপুর ইত্যাদিতে যে-সব প্রধান বাঙালী আছে, তাদের পত্র লিখে সব facts (বিবরণ) জানাও এবং তুমুল আন্দোলন কর। রামকৃষ্ণ-সভা একদম জেঁকে যাক। হুজুকের উপর হুজ্জুক—বিরাম না যেন হয়, এই হল secret (রহস্য)। সারদার কার্যের পরিপাটি দেখে খুব খুশী হলাম। গঙ্গাধর এবং সারদা যেখানে যেখানে গেছে, সেই সেই জেলায় এক একটা centre (কেন্দ্র) না করে আর যেন বিরত না হয়।

এইমাত্র গঙ্গাধরের পত্র পাইলাম। সে ঐ জেলায় centre (কেন্দ্র) করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—বেশ কথা। তাহাকে লিখিও যে, তাহার বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পত্রের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে নামিয়াই লাটু, নিরঞ্জন, দীনু ও খোকাকে পাঠাইয়া দিব; কারণ উহাদের এখানে আর কোন কার্য সম্ভব নয়, এবং কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে শুদ্ধানন্দ, সুশীল ও আর একজনকে পাঠাইবে। তাহাদের আম্বালায় ক্যাণ্টনমেণ্ট মেডিকেল হল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবে। আমি সেখান হতে লাহোরে যাইব। দুটো করে গেরুয়া রঙের মোটা গেঞ্জি, পাতবার আর মুড়ি দেবার দুই দুই কম্বল, আর গায়ে দেবার একটা করে গরম কাপড় ইত্যাদি লাহোরে কিনিয়া দিব। যদি 'রাজযোগ' বইয়ের অনুবাদ হইয়া গিয়া থাকে তো তাহা ছাপাইবে ঘরের পয়সায়। … ভাষা যেখানে দুরূহ আছে, তাহা অতি সরল করিবে এবং যদি পারে—তুলসী তাহার একটা হিন্দী তর্জমা করুক। ঐ বইগুলি বাহির হইলে মঠের অনেক সাহায্য হয়।

তোমার শরীর—বোধ হয় এক্ষণে বেশ আছে। আমার শরীর ধর্মশালা … যাওয়া অবধি এখনও বেশ আছে। ঠাণ্ডাটিই বেশ লাগে এবং শরীর ভাল থাকে। কাশ্মীরের দু-একটা জায়গা দেখিয়া একটা উত্তম স্থানে চুপ করিয়া বসিব—এই প্রকার ইচ্ছা, অথবা জলে জলে ঘুরিব। যাহা ডাক্তারবাবু বলেন, তাহাই করিব। এখানে রাজা এখন নাই। তাঁহার মেজভাই সেনাপতি আছেন। তাঁহার সম্পাদকতায় একটা বক্তৃতা হইবার উদ্যোগ হইতেছে। যাহা হয় পরে লিখিব। দু-এক দিনের মধ্যে যদি হয় তো থাকিব; নহিলে আমি বেড়াইতে চলিলাম। সেভিয়ার মরীতেই রহিল। তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ—টাঙ্গার ঝটকায়। মরীর বাঙালী বাবুরা বড়ই ভাল এবং ভদ্র।

জি. সি. ঘোষ, অতুল, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সকলকে আমার সাষ্টাঙ্গ দিবে ও সকলকে তাতাইয়া রাখিবে। যোগেন যে বাটী কিনিবার কথা বলিয়াছিল, তাহার খবর কি? আমি এখান হইতে অক্টোবর মাসে নামিয়া পাঞ্জাবে দু-চারটি লেকচার দিব। তাহার পর সিন্ধু হইয়া কচ্ছ, ভুজ ও কাথিয়াওয়াড়—সুবিধা হইলে পুণা পর্যন্ত, নহিলে বরোদা হইয়া রাজপুতানা। রাজপুতানা হইয়া N. W. P (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) ও নেপাল, তারপর কলিকাতা—এই তো প্রোগ্রাম এখন; পরে প্রভু জানেন। সকলকে আমার প্রণাম

আশীর্বাদ ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ

৩৬৮*

[মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত]

C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়
প্রধান বিচারপতি, শ্রীনগর, কাশ্মীর
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

অবশেষে আমরা কাশ্মীরে এসে পড়েছি। এ জায়গার সব সৌন্দর্যের কথা তোমায় লিখে আর কি হবে? আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা যোগীদের অনুকূল। কিন্তু এদেশের যারা বর্তমান অধিবাসী, তাদের অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেও তারা অত্যন্ত অপরিষ্কার! এদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য এবং শারীরিক শক্তিলাভের জন্য আমি এক মাস জলে জলে ঘুরে বেড়াব। কিন্তু নগরটিতে এখন ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং সদানন্দ ও কৃষ্ণলালের জ্বর হয়েছে। সদানন্দ আজ ভাল আছে, কিন্তু কৃষ্ণলালের এখনও জ্বর আছে। ডাক্তার আজ এসে তার জোলাপের ব্যবস্থা করে গেছেন। আমরা আশা করি, সে কালকের মধ্যে সেরে উঠবে এবং আমরা যাত্রাও করব কাল। কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট আমাকে তাঁদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন, বজরাটি বেশ সুন্দর, আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদের উপরও আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্য দল বেঁধে আসছে; আমাদের সুখে রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই করছে।

আমেরিকায় কোন কাগজে প্রকাশিত ডাক্তার ব্যারোজের একটি প্রবন্ধ 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ উদ্ধৃত হয়েছে; কে একজন নিজের নাম না দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর ঐ অংশ আমায় পাঠিয়েছে এবং এর কি উত্তর হবে জানতে চেয়েছে। আমি অংশটুকু ব্রহ্মানন্দকে পাঠাচ্ছি এবং যে অংশগুলি নিছক মিথ্যা, তার উত্তরও লিখে দিচ্ছি।

তুমি ওখানে ভাল আছ এবং তোমার দৈনন্দিন কার্য চালিয়ে যাচ্ছ জেনে সুখী হলাম। আমি শিবানন্দের কাছ থেকেও একখানি পত্র পেয়েছি; তাতে ওখানকার কাজের সবিশেষ খবর আছে।

একমাস পরে পাঞ্জাব যাচ্ছি; তোমাদের তিনজনকে আমি আম্বালাতে পাব আশা করি। যদি কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় তো তোমাদের একজনকে কার্যভার দিয়ে যাব। নিরঞ্জন, কৃষ্ণলাল ও লাটুকে ফেরত পাঠিয়ে দেব।

আমার ইচ্ছা আছে, একবার চট করে পাঞ্জাব ও সিন্ধু হয়ে কাথিয়াওয়াড় ও বরোদার ভেতর দিয়ে রাজপুতানায় ফিরব, সেখান থেকে নেপাল যাব, সর্বশেষ কলিকাতায়।

আমাকে শ্রীনগরে ঋষিবরবাবুর বাড়ীর ঠিকানায় পত্র দিও। আমি ফিরিবার পথে পত্র পাব। সকলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৬৯

[শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত]

শ্রীনগর
কাশ্মীর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

আজ ৯ মাস যাবৎ শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় এবং গ্রীষ্মাধিক্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতেছি। এক্ষণে কাশ্মীরে। আমি অনেক পর্যটন করিয়াছি; কিন্তু এমন দেশ তো কখনও দেখি নাই। এক্ষণে শীঘ্রই পাঞ্জাবে যাইব এবং পুনরায় কার্য আরম্ভ করিব। সদানন্দের মুখে তোমাদের সমস্ত সমাচার পাইলাম এবং [মধ্যে মধ্যে] পাইয়া থাকি। আমি নিশ্চিত পাঞ্জাব হইয়া করাচিতে আসিতেছি, সেথায় সাক্ষাৎ হইবে। ইতি

সাশীর্বাদং
বিবেকানন্দস্য

৩৭০

[শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত]

কল্যাণবরেষু,

মা, আমি (পত্র) লিখিতে পারি নাই এবং বেলগাঁও আসিতে পারি নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। আমি রোগে অত্যন্ত ভুগিতেছিলাম, এবং তখন আমার যাওয়া অসম্ভব ছিল। এখন হিমালয়ে ভ্রমণ করিয়া সমধিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি। কার্য শীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব। দুই সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে যাইব এবং লাহোর অমৃতসরে দুই-একটি লেকচার দিয়াই করাচি, গুজরাট, কচ্ছ ইত্যাদি। করাচিতে নিশ্চিত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এ কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূস্বর্গ—এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি স্ত্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হয়। তুমি কেমন আছ—শারীরিক ও মানসিক, বিশেষ খবর লিখিও। আমার বিশেষ আশীর্বাদ জানিবে, এবং সর্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি, নিশ্চিত জানিও। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৭১

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

১২৮

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীনগর, কাশ্মীর
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

এক্ষণে কাশ্মীর দেখিয়া ফিরিতেছি। দু-এক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব যাত্রা করিব। এবার শরীর অনেক সুস্থ হওয়ায় পূর্‍্বের (পূর্বের) ভাবে পুনরায় ভ্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। Lecture (লেকচার)-ফেকচার বড় বেশী নয় —যদি একটা-আদটা পাঞ্জাবে হয় তো হইবে, নহিলে নয়। এদেশের লোক তো এখনও এক পয়সা গাড়ীভাড়া পর্যন্ত দিলে না—তাহাতে মণ্ডলী লইয়া চলা যে কি কষ্টকর বুঝিতেই পার। কেবল ঐ ইংরেজ শিষ্যদের নিকট হাত পাতাও লজ্জাকর কথা। অতএব পূর্‍্বের (পূর্বের) ভাব 'কম্বলবন্ত' হইয়া চলিলাম। এ হালে Goodwin (গুডউইন) প্রভৃতি কাহারও প্রয়োজন নাই বুঝিতেই পারিতেছ।

Ceylone (সিলোন) হইতে একটি সাধু P. C. Jinavara Vamer (পি. সি. জিনবর বমার) নামক—আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন; তিনি ভারতবর্ষে আসিতে চান ইত্যাদি। বোধ হয় ইনিই সেই Siamese (শ্যামদেশীয়) রাজকুমার সাধু। ইঁহার ঠিকানা Wallawatta, Ceylone. যদি সুবিধা হয় ইঁহাকে Madras-এ (মান্দ্রাজ) নিমন্ত্রণ কর। ইঁহার বেদান্তে বিশ্বাস আছে। মান্দ্রাজ থেকে ইঁহাকে অন্যান্য স্থানে পাঠান তত কঠিন কার্য নহে। আর অমন একটা লোক সম্প্রদায়ে থাকাও ভাল। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সকলকে জানাইবে ও জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—খেতড়ির রাজা 10th Oct. (১০ অক্টোবর) বোম্বে পৌঁছিবে—Address (অভিনন্দন) দিতে ভুলিও না।

V.

৩৭২

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

শ্রীনগর, কাশ্মীর
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

গোপাল-দাদার এক পত্রে অবগত হইলাম যে, তোমরা কোন্নগরে জমি দেখিয়া আসিয়াছ। জমি নাকি ষোল বিঘা নিষ্কর এবং দাম আট-দশ হাজারের কম। স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল বিবেচনা করিয়া যেমন ভাল হয় করিবে। আমি দু-এক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব চলিলাম। অতএব এ স্থানে চিঠিপত্র আর লিখিও না। Next (পরবর্তী) ঠিকানা আমি 'তার' করিব। হরিপ্রসন্নকে পাঠাইবার কথা যেন ভুলো না। গোপাল-দাদাকে বলিবে যে, 'তাঁহার শরীর শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে—শীত আসছে, ভয় কি?—খুব খাও দাও, মৌজ উড়াও।' যোগেনের শরীর কেমন থাকে তদ্বিষয়ে মিসেস সি. সেভিয়ার, স্প্রিং ডেল, মরী, ঠিকানায় এক চিঠি লিখিবে এবং তাহার উপর To wait arrival (না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে) লিখিয়া দিও। সকলকে ভালবাসা আশীর্বাদ ইত্যাদি দিও। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—খেতড়ির রাজা ১০ অক্টোবর বোম্বাই আসিবে, Address (অভিনন্দন)-টা ভুলিও না।

৩৭৩*

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

শ্রীনগর, কাশ্মীর
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেয়েছি, মঠের চিঠিও পেয়েছি। দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি পাঞ্জাব রওনা হচ্ছি। বিলাতী ডাক এসেছে। মিস নোব্‌ল্ তার পত্রে যে-সব প্রশ্ন করেছে সেগুলি সম্বন্ধে আমার উত্তর এইঃ

(১) প্রায় সব শাখা-কেন্দ্রই খোলা হয়েছে, তবে এখনও আন্দোলনের আরম্ভ মাত্র।

(২) সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই শিক্ষিত, যারা তা নয় তারাও লৌকিক শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু অকপট নিঃস্বার্থপরতাই সৎকার্যের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে অন্য সব শিক্ষার চেয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকেই সমধিক মনোযোগ দেওয়া হয়।

(৩) লৌকিক বিদ্যার শিক্ষকবৃন্দঃ আমরা যাদের কর্মিরূপে পাচ্ছি তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। এক্ষণে আবশ্যক—শুধু তাহাদিগকে আমাদের কার্য-প্রণালী শেখান এবং চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য—তাহাদিগকে আজ্ঞানুবর্তী ও নির্ভীক করা; আর তার প্রণালী হচ্ছে—প্রথমতঃ গরীবদের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা এবং ক্রমে মানসিক উচ্চতর স্তরগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শিল্প ও কলাঃ অর্থাভাবহেতু আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্গত এই অংশ এখনও আরম্ভ করতে পারছি না। বর্তমানে যে সোজা কাজটুকু করা চলে, তা হচ্ছে—ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয়, তার জন্য বাজার সৃষ্টি করা। যারা নিজেরা দালাল নয়, পরন্তু এই শাখার সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদের দ্বারাই এ কাজ করান উচিত।

(৪) জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ান ততদিনই প্রয়োজন হবে, যতদিন না জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অন্য সব কিছু অপেক্ষা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের ধর্মভাব ও ধর্মজীবন সমধিক কার্যকর হবে।

(৫) সকল জাতির মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। এ পর্যন্ত উচ্চ স্তরের মধ্যেই কেবল কাজ হয়েছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ-সাহায্যকেন্দ্রগুলিতে আমাদের কর্মবিভাগের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নিম্নতর জাতিগুলিকেও আমরা প্রভাবিত করতে পারছি।

(৬) প্রায় সকল হিন্দুই আমাদের কাজ সমর্থন করেন; কিন্তু এই জাতীয় কার্যে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে তাঁরা অভ্যস্ত নহেন।

(৭) হাঁ, আমরা গোড়া থেকেই আমাদের দান ও অন্যান্য সৎকার্যে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ইতরবিশেষ করি না।
১২৯

এই সূত্র আনুসারে মিস নোব্‌ল্‌কে চিঠি লিখলেই হবে। যোগেনের চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়—আসল ভেঙেও টাকা খরচ করবে। ভবনাথের স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলে কি?

ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন যদি আসতে পারে তো বড় ভাল হয়। মিঃ সেভিয়ার একটা স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—যা হয় একটা শীঘ্র করে ফেলতে পারলে হয়। হরিপ্রসন্ন ইঞ্জিনীয়ার মানুষ, ঝট করে কিছু করতে পারবে। আর জায়গা-টায়গা সে ব্যক্তি বোঝেও ভাল। দেরাদুন মসূরীর নিকট একটা জায়গা হওয়া তাদের পছন্দ—অর্থাৎ যেখানে বেশী শীত না হয় এবং বার মাস থাকা চলে। হরিপ্রসন্নকে অতএব একদম আম্বালায় শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, মেডিকেল হল, আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট-এ পাঠাবে পত্রপাঠ। আমি পাঞ্জাবে নেমেই সেভিয়ারকে তার সঙ্গে দিয়ে পাঠাব। আমি ঝাঁ করে পাঞ্জাবটা হয়ে করাচি দিয়ে কাথিয়াওয়াড় গুজরাট না হয়ে রাজপুতানার ভিতর দিয়ে নেপাল হয়ে চট করে চলে আসছি। তুলসী যে মধ্যভারতে গেছে—সে কি দুর্ভিক্ষকার্যের জন্য? এখানে আমরা সব ভাল আছি ...। সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল ও ডায়েবেটিস অনেকদিন ভাগলওয়া হয়েছেন—আর কোন ভয় করব না। সকলকে আমার আশীর্বাদ, প্রণাম ও ভালবাসা দিও। কালী নিউ ইয়র্কে পৌঁছিয়াছে, খবর পাইয়াছি; কিন্তু সে কোন চিঠিপত্র লিখে নাই। স্টার্ডি লিখছে, তার Work (কাজ) এত বেড়ে উঠেছিল যে, লোকে অবাক হয়ে যায়—আবার দু-চারজন তার খুব প্রশংসা করে চিঠিও লিখেছে। যা হোক, আমেরিকাতে অত গোল নাই—এক রকম চলে যাবে। শুদ্ধানন্দ এবং তার ভাইকেও হরিপ্রসন্নর সঙ্গে পাঠাবে—এ দলের মধ্যে খালি গুপ্ত আর অচ্যুত আমার সঙ্গে থাকবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৭৪*

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

শ্রীনগর, কাশ্মীর
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় মিস ম্যাকলাউড,

তোমার আসার যদি ইচ্ছাই থাকে, তবে তাড়াতাড়ি চলে এস। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুআরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ঠাণ্ডা, তারপরে গরম। তুমি যা দেখতে চাও, তা ঐ সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে; কিন্তু সব কিছু দেখতে গেলে অবশ্য বছর-কয়েক লাগবে।

সময় বড় অল্প; তাই তাড়াতাড়ি এই কার্ড লেখার জন্য মনে কিছু করো না। অনুগ্রহ করে মিসেস বুলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে এবং গুডউইন যেন শীঘ্র সেরে ওঠে, সেজন্য আমার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি। মা, এলবার্টা, ছোট্ট শিশুটি ও হলিস্টারকে আমার ভালবাসা জানাবে; এবং সর্বশেষে, কিন্তু তাই বলে সব চেয়ে কম নয়, ফ্র্যাঙ্কিকেও আমার অনুরূপ ভালবাসাই জানাবে। ইতি

সতত ভগবদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

কবিতা (অনুবাদ)

সন্ন্যাসীর গীতি

সন্ন্যাসীর গীতি ১

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে,
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি;
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
—সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি,
উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ১
ভেঙে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল—
সোনার নির্মিত হলে কি দুর্বল,
হে ধীমান্, তারা তোমার বন্ধনে?
ভাঙ শীঘ্র তাই ভাঙ প্রাণপণে।
ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দ-দ্বন্দ্ব,
ত্যজহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ।
আদর' দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব-তিলক ভালের উপর;
স্বাধীনতা-বস্তু কখনও জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু তো বুঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
দূর কর দুয়ে অতীব সত্বর;
কর কর গান, কর নিরন্তর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ২
যাক অন্ধকার, যাক সেই তমঃ,
আলেয়ার মত বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে আঁধার হইতে আঁধারে
লয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।
জীবনের এই তৃষা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।
এই তম-রজ্জু জীবাত্মা-পশুরে
জন্মমৃত্যু-মাঝে আকর্ষণ করে।
সে-ই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
ফাঁদে পা দিও না—জেনে তত্ত্ব এই।
বলহ সন্ন্যাসি, বল বীর্যবান্—
করহ আনন্দে কর এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৩
'কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে'
বলে লোকে, 'হেতু কার্য প্রসবিবে,
শুভ কর্মে—শুভ, মন্দে—মন্দ ফল,
এ নিয়ম রোধে নাহি কারও বল।
এ মর-জগতে সাকার যে জন,
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ।'
সত্য সব, কিন্তু নামরূপ-পারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জান 'তত্ত্বমসি', করো না ভাবনা,

করহ সন্ন্যাসি, সদাই ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৪
সত্য কিবা তারা জানে না কখনও,
সবাই যাহারা দেখয়ে স্বপন—
পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব—
আত্মা তো কখনও নহে এই সব;
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গভেদ,
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।
কার পিতা তবে, কাহার সন্তান?
কার বন্ধু শত্রু কাহার ধীমান?
একমাত্র যেবা—যেবা সর্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়,
'তত্ত্বমসি' ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
উচ্চরবে তাই এই তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৫
একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়;
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া;
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি-জীবাত্মারূপে প্রকাশিত;
'তত্ত্বমসি' ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর, উচ্চ তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৬
অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর?
পাবে না তো হেথা, কিম্বা এর পর;
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ;
নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসি—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৭
দাও দাও দাও সবারে অভয়,
বল—'প্রাণিজাত, করো নাকো ভয়;
ত্রিদিব পাতাল থাক যে যেখান,
সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান;
স্বরগ নরক, ইহামুত্রফল
আশা ভয় আমি ত্যজিনু সকল।'
এইরূপে কাটো মায়ার বন্ধন,
গাও গাও গাও করে প্রাণপণ—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৮
ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি;
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে;
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না কখনও,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন;
কোথা অপযশ—কোথা বা সুখ্যাতি?
স্তাবক-স্তাব্যে একত্ব-প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি।
জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে,
গাও হে সন্ন্যাসি, নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ৯
পশিতে পারে না কভু তথা সত্য,
কাম-লোভ-বশে যেই হৃদি মত্ত;

কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন;
কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার,
হউক সামান্য—বন্ধন অপার;
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভু মায়া পার।
ত্যজ অতএব এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ১০
সুখ তরে গৃহ করো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও;
হউক কুৎসিত, কিম্বা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে?
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ১১
তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়,
অ-তত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয়;
হে মহান্, তোমা করিবেক ঘৃণা,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখো না।
স্বাধীন উন্মুক্ত—যাও স্থানে স্থানে,
অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো অজ্ঞানে—
মায়া-আবরণে ঘোর অন্ধকারে,
নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে।
বিপদের ভয় করো না গণনা,
সুখ অন্বেষণে যেন হে মেতো না;
যাও এ উভয় দ্বন্দ্ব-ভূমিপারে,
গাও গাও গাও, গাও উচ্চস্বরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ১২
এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ;
আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে;
'আমি' বা 'আমার' কোথায় তখন?
ঈশ্বর—মানব—তুমি—পরিজন—
সকলেতে 'আমি', আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।
সে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ১৩

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি ২

জাগো আরও
একবার!

মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরও উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম পঙ্কজ-আঁখি-যুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন। ১

হও পুনঃ অগ্রসর,

তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার,
নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
দীন হীন ধূলি-কণিকার;
শক্তিমান্ তবু, মতি স্থির,
আনন্দ-মগন, মুক্ত, বীর;
হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি!
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী। ২

লুপ্ত সে জনম-গৃহ,

যেথা বহু স্নেহসিক্ত হিয়া
পালিলা শৈশবে, হর্ষভরে
নিরখিলা যৌবন-উন্মেষ;
কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে অমোঘ প্রভাব—সৃষ্ট যাহা
প্রকৃতি-নিয়মে সবে-ফিরে
যেথা স্থান উদ্ভব-কারণ
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ। ৩

উরহ আবার তবে,

সেই তব জন্মস্থান হতে,
হিম-স্তূপ অভ্রকটিহার
আশীষিবে যেথায় সতত,
শক্তি দিবে করিয়া সঞ্চার
নব নব অসাধ্য সাধনে;
যেথা সুরনদী তব স্বর
বাঁধিবে অমর গীতি-সুরে;
দেবদারু ছায়া বিধানিবে
নিত্য শান্তি যেথা তব শিরে। ৪

সর্বোপরি, যিনি উমা

শান্তপূতা হিমগিরিসুতা
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর

জননী যে সর্বভূতে স্থিতা,
কার্য যাহা সবি কার্য যাঁর,
এক ব্রহ্ম করে প্রপঞ্চিত,
কৃপা যাঁর সত্যের দুয়ার
খুলি এক বহুতে দেখায়,
দিবে শক্তি সে জননী তোমা
ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাঁহার
অসীম, সে প্রেম পারাবার। ৫

আশীষিবে তোমা তাঁরা,

পরমর্ষি সবে, যাঁহাদের
কোন দেশ, কোন কাল নারে
শুধু আপনার বলিবারে,
—এ জাতির জনয়িতৃগণ—
সত্যের মরম যাঁরা সবে,
একই রূপ করি অনুভব,
নিঃসঙ্কোচে প্রচারিল ভবে ভাল মন্দ যেমন ভাষায়,
তুমি দাস তাঁহাদের, তায়
লভিয়াছ রহস্য সে মূল।
—বস্তু এক, ইথে নাহি ভুল। ৬

হে প্রেম! কহ সে তব

শান্ত স্নিগ্ধবাণী, মায়া-সৃষ্টি
যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তরে স্তরে ছায়াস্বপ্ন আর
হের সব শূন্যেতে মিলায়,
অবশেষে সত্য নিরমল
'স্বে মহিম্নি' বিরাজে কেবল। ৭

কহ আর বিশ্বজনে …

উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর।
স্বপন-রচনা শুধু ভবে—
কর্ম হেথা গাঁথে মালা যার
নাহি সূত্র বৃন্তমূলহীন
ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার,
জন্ম লভে, গর্ভে অসতের,
সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধায়
আদিতে যে শূন্য ছিল তায়!
অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে,
মিশি সত্যে যাও এক হয়ে,
মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক—
কিম্বা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক প্রেম নিরবধি। ৮

মৃত্যুরূপা মাতা

মৃত্যুরূপা মাতা ৩

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ
এসে আবরিছে মেঘে,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে
ঘূর্ণ-বায়ুবেগে!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ, বহির্গত
বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে
উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ
গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা
হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!

করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

খেলা মোর হল শেষ

খেলা মোর হল শেষ [৪]

কভু উঠি, কখনও বা পড়ি
কালের তরঙ্গ
সনে
গড়াইয়া চলিয়াছি হায়,
ক্ষণস্থায়ী এক দৃশ্য হতে
স্বল্পস্থায়ী
দৃশ্যান্তরে
জীবনের জোয়ার-ভাঁটায়।
অন্তহীন এই প্রহসনে
তিক্ত আজি প্রাণ
মোর;

আর ইহা নাহি লাগে ভাল,
মিছে ছোটা, পাব নাতো কভু, দেখা নাহি যায় দূরে,
সাগরের পারে তীর কালো!
জন্ম হতে জন্মান্তরাবধি দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি,
কভু দ্বার খুলিল না হায়,
আঁখি মম ক্ষীণ হল তবু, বৃথা আশা ধরিবারে
সে আলোর একটি ছটায়।
অতি ক্ষুদ্র এই জীবনের সমুচ্চ সঙ্কীর্ণ সেই
সেতু 'পরে দাঁড়াইয়া চাহি—
অগণিত জনগণ নীচে যুঝিছে, কাঁদিছে কেহ
হাসিতেছে—কেন জানি নাহি,
সম্মুখেতে ভীষণ কপাট ভ্রূভঙ্গে চাহিয়া বলে,
'আর নাহি হও অগ্রসর,
এই সীমা অদৃষ্টের তব; প্রলুব্ধ করো না আর,
যত পার সব সহ্য কর।
মিশে যাও ইহাদের সাথে পান কর হলাহল
নাচো গাও উহাদের সনে
জানিবারে বাসনা যাহার, দুঃখ আছে তার ভালে,
অতএব রহ এই স্থানে।'
আমি কিন্তু থাকিতে না চাই, জলবুদ্বুদের সম
ভাসমান এই পৃথ্বীতল,
শূন্যগর্ভ গঠন ইহার, শূন্যগর্ভ নাম তার,
জন্মমৃত্যু-শূন্য সে সকল।
মোর কাছে মিছা এই সব, আমি চাই ভেদিবারে
নামরূপ মিথ্যা অবয়বে,
খুলিবারে চাহি আমি ওই সম্মুখের প্রশস্ত কপাট—
মোর লাগি খুলিতেই হবে।
দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোক-ছটায়
খেলা মোর হইয়াছে শেষ—
অতি শ্রান্ত পুত্র তব মা গো, আকুল আকাঙ্ক্ষা হৃদে
গৃহে আজি করিবে প্রবেশ।
ঘন ঘোর অন্ধকার মাঝে খেলিতে ছাড়িয়া দিয়ে
বিভীষিকা দেখাও আমারে,
আশা মোর হল আজি শেষ, ভয় আসি দেখা দিল
খেলার আনন্দ গেল দূরে।
তপ্ত স্ফীত সাগর সমান গভীর দুঃখের মাঝে
রিপুদল প্রবল তাড়নে,
তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হেথা সেথা কত কষ্ট পাই মা গো

ভবিষ্যৎ সুখের ছলনে।
জীবনের অর্থ হেথা হায় জীবন্ত মরণ, আর
মরণ যে কেবা বলো জানে—
সুখদুঃখ নিয়ত-চক্রের পুনঃ সেই প্রবর্তন
নব আবর্তন নাহি আনে।
শিশু দেখে মধুর স্বপন— স্বর্ণসম সমুজ্জ্বল,
ধূলিতে তা হয় পরিণত,
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে হায়— ভগ্ন তার শত আশা,
পুঞ্জীভূত মরিচার মত।
জীবনের শেষপ্রান্তে যবে বিলম্বে লভিয়া জ্ঞান
চক্র ছাড়ি যাই মোরা চলি,
অন্যজন নবতেজ লয়ে সে চক্র ঘুরাতে আসে
দিন যায় বর্ষ পড়ে ঢলি।
ঘোরে চক্র অবিরত বেগে মায়া-ক্রীড়নক মাত্র
কামনা ইহার কেন্দ্রস্থল,
বৃথা আশা দেয় গতিবেগ এ চক্রের দণ্ড যত
সুখ দুঃখ অনিত্য কেবল।
ভাসিয়া চলেছি আজ আমি, কোথা তাহা নাহি জানি,
এ অনলে বাঁচাও গো আসি,
করুণা-আধার তুমি মা গো, রক্ষা কর মোরে, যেন
কামনা-সাগরে নাহি ভাসি।
ফিরায়ো না দেখায়ো না মোরে, ভয়ঙ্কর মুখ তব
সহিতে পারি না আমি এত,
ক্ষমা কর দেহ মা অভয় সদয়া হও গো আজি
দোষ মম নাহি ধর মাতঃ!
নিয়ে যাও জননি গো মোরে সেই দূরে পরপারে,
যেথায় সকল দ্বন্দ্ব শেষ,
সকল দুঃখের পারে, অশ্রু যেথা নাহি দেখা দেয়
পার্থিব সুখেরও নাহি লেশ।
যাহার গরিমা রবি শশী, অনন্ত তারকারাজি
উজলিত আকাশের পটে,
ক্ষণপ্রভা রূপের ছটায় প্রকাশিতে নাহি পারে
মাত্র তার প্রতিবিম্ব রটে।
দেখো যেন মিছা স্বপ্নে মা গো তোমার মু'খানি হতে
আমারে আড়াল নাহি করে,
খেলা মোর হল আজি শেষ, শৃঙ্খল ভাঙিয়া দাও,
মুক্ত আজি কর মা আমারে।

দোষ কারও নয়

দোষ কারও নয় ৫

দিনমণি ডুবে অস্তাচলে,
রেখে যায় রক্তরাঙা কর,
আলোকিত ক্ষীণ দিনমানে
এই যেন শেষ অবসর!
রাখি আঁখি দেখি সচকিতে
বিজয়ের রাশি পিছে রয়,
জয়ে গণি হীন লজ্জা বলে
আমি ছাড়া দোষী কেহ
নয়।
জীবনেরে গড়ি দিন দিন
কিম্বা উহা করে চলি ক্ষয়,
যথাকর্ম সেইরূপ ফল—
শুভে শুভ, মন্দে মন্দ হয়।
স্রোত যদি একবার ধায়
রোধ কিম্বা নিয়ন্ত্রণ তার
সাধ্য নহে কভু আর কারও,
আমা ছাড়া দোষ তবে কার?
আমি হই রূপধারী সেই,
ছিল যাহা অতীত আমার,
সৃষ্টিবীজ সুপ্ত সেখানেই
বিকশিতে ভুবনে আবার।
ইচ্ছা, চিন্তা—যে অতীত ধরি
মনোমাঝে সদা ব্যক্ত হয়,
বাহিরের আকৃতিও তাই,
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

প্রেমরূপে ফিরে আসে প্রেম
ঘৃণা আনে ঘৃণা তীব্রতর,
পরিমাপ নিজে তারা করে
রেখে যায় ছাপ মোর ’পর।
জীবনের শেষে মরণেও
তাহাদের দাবী জমা রয়,
এই ভোগ—দায় আমারি তো
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

ত্যজিলাম মিছে ভয়রাশি
বৃথা যত পরিতাপ আর
বুঝিয়াছি গূঢ় অনুভবে
স্বকর্মের কিবা অধিকার।
হর্ষ-ব্যথা অপমান যশ—
মোর কর্মে জাত প্রেতচয়,
ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ানু
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

ভাল মন্দ প্রেম আর ঘৃণা
সুখ তথা দুঃখ যাহা বলি
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে,
যুগ্মভাবে বাঁধা তো সকলি।
দুঃখ ছাড়া সুখস্বপ্ন দেখি

ভ্রান্তি শুধু! সত্য নাহি হয়,
আসিল না, আসিবে না কভু
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

অতএব ত্যজিলাম ঘৃণা
ত্যজিলাম তুচ্ছ ভালবাসা,
দূর করি দ্বন্দ্বের সংঘাত
মিটিয়াছে জীবনের তৃষা।
চিরমৃত্যু—ইহাই তো চাই
—নির্বাণ এ জীবন-শিখার,
ঘুচে-যাওয়া কর্মের আশ্রয়
রহিবে না দোষী কেহ আর।

একমাত্র নরবর, এক সেই প্রভু
একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি
কুহেলী-সন্দেহঘেরা যত পথ ছিল
ঘৃণাভরে ত্যজিলেন তিনি,
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন,
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান—
'মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনেও তাই
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ।'

ওঁ নমো ভগবতে সম্বুদ্ধায়
ওঁ নতি মোর ভগবান্ বুদ্ধ যিনি তাঁয়।

ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়

ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়

৬

সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ
যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়,
জয় তব জেনো সুনিশ্চয়।
শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে তার পাছে
পাছে,
ঢেউ পড়ে, ওঠে পুন তারি সাথে
সাথে,
আলো ছায়া আগাইয়া দেয়
পরস্পরে;
হও তবে ধীর, স্থির, বীর।
জীবনকর্তব্য-ধর্ম বড় তিক্ত জানি,
জীবনের সুখচয় বৃথা ও চঞ্চল,
লক্ষ্য আজ বহুদূরে ছায়ায় মলিন;
তবু চল অন্ধকারে হে বীর হৃদয়,
সবটুকু শক্তি সাথে লয়ে।
কর্ম নষ্ট নাহি হবে, কোন চেষ্টা হবে না বিফল,
আশা হোক উন্মূলিত, শক্তি অস্তমিত,
কটিদেশ হতে তব জনমিবে উত্তরপুরুষ,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়
কল্যাণের নাহিক বিলয়।
জ্ঞানী গুণী মুষ্টিমেয় জীবনের পথে—
তবুও তাঁরাই হেথা হন কর্ণধার,
জনগণ তাঁহাদের বোঝে বহু পরে;
চাহিও না কারও পানে, ধীরে লয়ে চল।
সাথে তব ক্রান্তদর্শী দূরদর্শী যাঁরা,
সাথে তব ভগবান্ সর্বশক্তিমান্,
আশিস ঝরিয়া পড়ে তব শিরে—তুমি মহাপ্রাণ—
সত্য হোক, শিব হোক সকলি তোমার।

অজানা দেবতা

অজানা দেবতা ৭

১

অন্ধকার নিরাশার বিসর্পিল পথে
ক্লান্ত পদে
এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভারনত
চলেছে পথিক।
হৃদয়ের মননের কোন প্রান্ত হতে
কোথাও মেলে না প্রাণে
নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন।
অবশেষে একদা যখন
লুপ্তপ্রায় সীমারেখা
ভালমন্দ সুখদুঃখ জন্মমরণের—
অকস্মাৎ উদ্ভাসিল পুণ্যরজনীতে
অপরূপ জ্যোতিরেখা হৃদয়েতে তার।
কোন্ উৎস হতে এল অচেনা এ আলো—
কিছুই তো জানে না সে।
তবুও জানাল
আলোক-ঈশ্বরে তার প্রাণের প্রণাম।
অজানা আশার বাণী
ব্যাপ্ত হল সমগ্র সত্তায়,
স্বপ্নাতীত মহিমায়
পূর্ণ করে দিল তার সমস্ত ভুবন,
সে ভুবন পার হয়ে আভাসিল আর এক জগৎ।
বলিলেন মৃদু হেসে পণ্ডিতের দল—
'অন্ধ এ বিশ্বাস।'
সে আলোর দীপ্ত শান্তি অনুভব করি'
বলিল সে নম্র প্রত্যুত্তরে,
'ধন্য মানি এ অন্ধবিশ্বাস।'

২

স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদের সুরামত্ত
আর এক পথিক,
জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ছুটে চলে
উন্মাদের মত,
অবশেষে একদা যখন
এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন
খেলার পুতুল যত কীটসম মানুষের দল,
নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্ছুরিত আলো
দৃষ্টিরে আচ্ছন্ন করে, ইন্দ্রিয় অবশ,
সুখদুঃখ একাকার, অনুভূতিহীন;
প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা
শবসম লগ্ন হয়ে থাকে তার দুই বাহুপাশে,
যত সে ছাড়াতে চায়,
তত তার বক্ষ জুড়ে আসে;
উন্মাদ-কল্পনা-ভরে বহুরূপে মৃত্যুরে সে চায়,
ফিরে আসে আরবার মুগ্ধ আকর্ষণে।
তারপর একদিন
দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে—

হৃতশক্তি, সম্পদবিহীন,
বেদনায়, অশ্রুধারে, মর্মযন্ত্রণায়—
আত্মীয়তা ফিরে পেল সারা নিখিলের।
বন্ধুজন করে পরিহাস।
কৃতজ্ঞ হৃদয় তার করে উচ্চারণঃ
'ধন্য দুঃখ; ধন্য এ বেদনা।'

৩

সুন্দর সুঠাম দেহ,
শুধু মন তার শক্তিহীন
দুর্বার গভীর কোন আবেগ-সংযমে,
অমোঘ-প্রবৃত্তি-স্রোত
রুদ্ধ করা অসাধ্য তাহার।
সংসারে সবাই তারে—
সদাশয়, ভাল—বলে জানে।
পরম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে।
দূর হতে দেখেছে সে চেয়ে—
সংসার-তরঙ্গসাথে বৃথা যুদ্ধে রত
নরনারী যত।
দেখিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মত
কেবলি ক্লেদাক্ত দেখে সকল সংসার,
সব গ্লানিময়।
তারপর একদা কখন,
সহসা সৌভাগ্যসূর্য দেখা দিল হেসে,
তারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন।
সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন।
বুঝিল সেঃ নিয়ম ভাঙে না কভু
তরু ও প্রস্তর,
তবু তারা প্রস্তর ও তরু হয়ে থাকে।
নিয়মবন্ধন হতে ঊর্ধ্বে এসে
সংগ্রামসাধনা দিয়ে
ভাগ্যেরে সে করে নেবে জয়—
এ পরম অধিকার মানুষেরই তরে।
চিত্তের জড়তা ঘুচি নবীন জীবন
হল মুক্ত, প্রসারিত—
সংগ্রাম-সমুদ্রপারে যে অনন্ত শান্তি বিরাজিত
তাহারি আলোক-রশ্মি
উদ্ভাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায়।
পশ্চাতে রয়েছে পড়ি'
অতীতের
অকৃতার্থ নিষ্ফল জীবন,
তরু ও প্রস্তর সম চেতনাবিহীন,
আর একদিকে তার স্খলনপতন,
যার লাগি' বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার।
সানন্দ-অন্তরে তবু
ধন্য মানি এ অধঃপতন
ঘোষিল সেঃ 'ধন্য এই পাপ।'

হে স্বপন!

হে স্বপন! ৮

ভাল মন্দ যাই হয় হোক,
সুখের সুস্মিত হাসি দেখা দেয় যদি,
অথবা উদ্বেল হয় দুঃখ-পারাবার,
সবারি আপন অংশ আছে অভিনয়ে,
কারও হাসি কারও কান্না, যখন
যেমন,
রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের তরে
—
রৌদ্র জলে আবর্তিয়া চলে দৃশ্যান্তর।

হে স্বপন! সার্থক স্বপন!

কাছে দূরে প্রসারিত কর মায়াজাল,
পেলব কোমল কর তীব্র রেখা যত,
সব রুক্ষতারে তুমি নম্র করে তোলো।

তোমারি মাঝারে আছে সব ইন্দ্রজাল।
তোমারি পরশে
প্রাণপুষ্পে হিল্লোলিত
জাগে মরুভূমি,
মধুর সঙ্গীতে ভরে
ঘনঘোর অশনি-গর্জন,
মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আস্বাদ।

অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি

অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি

৯

তুষার-কঠিন মাটিই না হয় হোক না
তোমার শয্যা,
আবরণ তব শীতার্ত ঝঞ্ঝার,
জীবনের পথে নাই বা জুটিল
বন্ধুজনার হর্ষ,
ব্যর্থ তোমার সৌরভ-বিস্তার;

প্রেম যদি হয় নিজেই ব্যর্থ তবু কী-
বা আসে যায়
না হয় ব্যর্থ সৌরভসঞ্চার—
অকল্যাণের জয় যদি হয়, কল্যাণ
পরাজিত,
পুণ্যের ’পরে পাপের অত্যাচার;

তবু প্রশান্ত বিকশিত থাক, পবিত্র মধুময়
থাক অবিচল আপনার মহিমায়,
দাও, ঢেলে দাও স্নিগ্ধ উদার মধু সৌরভ তব
চির-প্রসন্ন অযাচিত করুণায়।

কে জানে মায়ের খেলা!

কে জানে মায়ের খেলা! ১০

কে জানে—হয়তো তুমি ক্রান্তদর্শী
ঋষি!
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল
গভীর গহন,
যেখানে লুকান রয় মা'র হাতে
অমোঘ অশনি!

হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক
করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে,
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার
সঙ্কেত,

মুহূর্তে যা হতে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে!

হয়তো বা জ্ঞানদীপ্ত মহান্ তাপস,
বলেছেন যতটুকু,
তারও বেশী পেয়েছেন প্রাণে।
কে জানে কখন,
কার হৃদি-সিংহাসনে
মা আমার পাতেন আসন।

মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে,
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্যবলে,
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—খেয়াল তাঁহার
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।

হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে,
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হৃদয়,
হয়তো সহস্র শক্তি কন্যার অন্তরে
রেখেছেন বিশ্বমাতা সযত্ন সঞ্চয়।

পানপাত্র

পানপাত্র ১১

এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশে
সৃষ্টির উন্মেষ হতে এ পাত্র-রচনা।
জানি জানি এ পানীয় কালকূট ঘোর,
তোমারি মন্থিত সুরা—দূর অতীতের
বাসনা বেদনা ভ্রান্তি যুগযুগান্তের।

দুর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ,
প্রতি পদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ পত্রখানি সানন্দযাত্রার।
তোমারি মতন সেও পাবে মোর বক্ষে
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধরে—এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—আর কারও তরে নয়,
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্বরচনায়
আছে তারও স্থান। লও এই পানপাত্র—
বুঝিতে বলিনি আমি, কি অর্থ ইহার,
শুধু চোখ বুঝে দেখ স্বরূপ আমার।

জাগ্রত দেবতা

জাগ্রত দেবতা ১২

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে,
সব হাতে তাঁরি কাজ,
সব পায়ে তাঁরি চলা,
তাঁরি দেহ তোমরা সবাই,

কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল
প্রতিমা।

মহামহীয়ান যিনি, দীন হতে দীন,
একাধারে কীট ও দেবতা যিনি,
পাপী পুণ্যবান,
দৃশ্যমান, জ্ঞানগম্য, সর্ব্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান্,
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা।

অতীত জীবনধারা নাই তাঁর মাঝে,
অথবা আগামী কোন জনম মরণ,
নিয়ত ছিলাম মোরা তাঁহাতে বিলীন,
চিরকাল এক হয়ে রব তাঁরি বুকে।
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা।

ওরে মূর্খদল!
জীবন্ত দেবতা ঠেলি',
অবহেলা করি'
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়,
চলেছিস ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা।

আলোক

আলোক ১৩

সম্মুখে পশ্চাতে চেয়ে দেখি—
সব ঠিক, সকলি সার্থক।
বেদনার গভীর আমার
জ্বলে এক চিন্ময় আলোক।

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম

১৪

চল আত্মা, শীঘ্রগতি, তারকা-খচিত
তব পথে,
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাঁধে
মনোরথে;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে
আবরণ!
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে
তোমারে বরণ!

সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব
আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক
তব স্থান;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে!

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ-সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তাঁর সাথে হলে একপ্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়

আশীর্বাদ

আশীর্বাদ ১৫

বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদুমধুময়,
আর্যবেদী ’পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য
বিরাজে—
সকলই তোমার হোক, আরও,
আরও কিছু
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা অতীতের
কেহ।

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।

মুক্তি

মুক্তি ১৬

ওই দেখ মিলাইয়া যায় কালো
মেঘপুঞ্জ যত
রাত্রির আঁধারে আরও ঘন করি,
ধরণীর ’পরে
তাহারা থমকি ছিল, অবসন্ন বিষাদ
কালিমা!
তোমার মোহন-স্পর্শে জগৎ জাগিয়া
উঠে ওই!
পাখীরা তুলিছে তান—ফুলদল তুলে
ধরে তার
শিশির-খচিত শত তারার মুকুট;
সুস্বাগত
জানায় তোমায় তারা দুলিয়া দুলিয়া। সরোবর
প্রেমভরে মেলিয়াছে শত শত আঁখিশতদল—
তোমারে বরিয়া নিতে, তার সারা গভীরতা দিয়া।
এস, এস, এস তুমি, আলোকের ওগো অধিরাজ!
তোমারি লাগিয়া আজ অন্তরের স্বাগত আহ্বান!
ওগো সূর্য, আজ তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে!

ভাব দেখি, কেমন পৃথিবী আছিল প্রতীক্ষারত
কত কাল; তোমারি সন্ধানে প্রতি দেশে প্রতি যুগে
কত না ছাড়িল গৃহ, কত প্রিয় পরিজন প্রীতি
তোমারি লাগিয়া তারা চলিয়াছে আত্ম-নির্বাসিত
ভয়ঙ্কর সাগর চিরিয়া—আদিম বনানী মাঝে;
প্রতি পদক্ষেপে তার দেয় তাল জীবন মরণ।
তারপর এল দিন—সফলিয়া উঠিল যখন
সকল সাধনা কর্ম পূজা প্রেম আত্মবলিদান—
গ্রহণ করিলে আসি—সব হল—সম্পূর্ণ সার্থক!
তখন উঠিলে তুমি—হে প্রসন্ন, ছড়াবার তরে
মুক্তির আলোক শুভ্র—সারা বিশ্ব-মানবের ’পরে!

চল প্রভু, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
তুলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।

শান্তি

শান্তি ১৭

ওই দেখ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়-—
অন্ধকারে আলোকস্বরূপ
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস

আনন্দ যা হয়নি প্রকাশ,
অবেদিত দুঃখ সুগভীর,
অযাপিত অমৃত জীবন—
অশোচিত মৃত্যু সনাতন।

দুঃখ নয়, আনন্দও নয়
মাঝে তার তারে বোধ হয়,
রাত্রি নয়, ঊষাও সে নয়—
উভয়ের মাঝে জুড়ে রয়।
সঙ্গীতের মাঝে মধু সম—
সুপবিত্র ছন্দ মাঝে যতি,
নীরবতা কথার অন্তরে,
মাঝে দুই রিপু তাড়নার
হৃদয়ের শান্ত ভাব সে যে!
অদেখা সে সৌন্দর্যসম্ভার,
সে যে প্রেম একাকী অদ্বয়,
অগাহিত জাগে মহাগান—
অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান!

মৃত্যু দুই জীবনের মাঝে,
স্তব্ধতা সে ঝঞ্ঝাদ্বয় মাঝে,
শুদ্ধতা সে ঝঞ্ঝাদ্বয় মাঝে,
মহাশূন্য—যা হতে সৃজন—
যাহে পুনঃ আসিছে ফিরিয়া।

এরি লাগি ঝরে আঁখিজল
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে,
এ যে শান্তি—লক্ষ্য জীবনের —
একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।

জীবন্মুক্তের গীতি

জীবন্মুক্তের গীতি ১৮

বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিনী;
প্রজ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোম-পথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জনে।

প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহা ঘন,
দামিনী ঝলকে তার হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহাপ্রাণ উচ্চ তত্ত্ব দেয় প্রকাশিয়া।

স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মূর্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেম প্রতারণা হোক,
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ হোক।

রোষ-দীপ্ত মূর্তি ধরি আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।

নহি স্বর্গবাসী আমি—নর পশু নয়,
পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ মন,
স্তম্ভিত নির্বাক যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়,
স্বরূপ বর্ণিতে মোর—আমি সেই, 'সোঽহম্'।

সূর্য সোম বসুন্ধরা জন্মে নাই যবে,
তারাদল ধূমকেতু জন্মেনি যখন,
কালের-ও উদ্ভব যবে হয়নি এ ভবে,
ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তখন।

মেদিনী সুষমাময়ী, ভাস্বর তপন,
এই শান্ত সুধাকর, উজ্জ্বল আকাশ
নিমিত্ত-অধীনে করে গমনাগমন,
জীবন তাদের-ও বদ্ধ, বন্ধনে বিনাশ।

বিশ্ব-মন বিস্তারিয়া অনিত্যের জাল
ধরিয়া তাদের রাখে দৃঢ়বদ্ধ করে,
পৃথিবী নরক স্বর্গ—মন্দ আর ভাল
সে চিন্তা-তন্তুর মাঝে উঠে আর পড়ে।

দেশ আর কাল, আর কার্য ও কারণ,
এ সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ!
ইন্দ্রিয়-মনের পারে মোর অবস্থান।
আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের—সাক্ষী সে মহান্!

নহে দ্বৈত, নহে বহু—অদ্বৈতের ভূমি,
একত্বে মিলিত তাই সকলি আমায়।
ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্ন মাত্র প্রেমের চিন্তায়।

ভাঙ মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম!
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো স্থির—আমি সেই, 'সোঽহং, সোঽহং'।

আমারই আত্মাকে

আমারই আত্মাকে ১৯

ধরে থাক আরও কিছুকাল, অটল
হৃদয়,
ছিন্ন করো নাকো এই আজন্ম বন্ধন,
যদিও অস্পষ্ট ক্ষীণ এই বর্তমান—
ভবিষ্যৎ ঘনতমোময়!

কেটে গেছে যেন এক যুগ—
তোমাতে আমাতে মিলে
যাত্রা শুরু করিলাম—জীবনের উঁচু-
নীচু পথে,
অপূর্ব সমুদ্রে কভু ভেসে যাই শান্ত
ধীর পালে,
আমি মোর তব কাছে, তার চেয়ে তুমি আরও কাছে, মাঝে মাঝে,
মনের তরঙ্গগুলি উঠিবার আগে প্রকাশিত করেছ তুমিও!

অবিকল প্রতিভাস! তোমার স্পন্দন মেলান আমার সাথে,
সূক্ষ্মতম চিন্তা, তবু পূর্ণরূপে ধ্বনিত তোমাতে।
হে সংস্কার-লিপিকার! এখন কি আমাদের বিদায়ের পালা?

তোমাতেই রহিয়াছে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস,
অশুভ বাসনা যবে ফেনাইয়া ওঠে, সতর্ক করেছ তুমি,
সাবধান-বাণী তব হেলায় দিয়েছি ফেলে,
তবু তুমি সত্য শুভ শক্তি মোর—পূর্বের মতন!

আমন্ত্রণ

আমন্ত্রণ ২০

রোদন কি হেতু সখা? সর্বশক্তি
তোমারি তো অন্তরে নিহিত!
জ্ঞান-বীর্য-প্রদ সেই নিজ দিব্য
স্বরূপেরে কর উদ্বোধিত—
ত্রিলোকে যা কিছু আছে সবই তব
পাদমূলে আসিবে তখন!
আত্মার শক্তিই হয় চিরজয়ী—
জড়শক্তি নহে কদাচন।

ত্রিভুবন উপাড়িব, তারকা চিবায়ে
খাব [করি অট্টহাস]!
জান না কি কেবা মোরা? বীর গতভয় মোরা রামকৃষ্ণ দাস।

দেহকেই 'আমি' ভাবে—নাস্তিক্য ইহারি নাম—যারা অনিক্ষণ
'ক্ষীণ মোরা, দীন মোরা' বলি করে তাহারাই করুণ ক্রন্দন।
রামকৃষ্ণ-দাস মোরা—[দেহাতীত অবিকারী অমৃত অভয়
সত্তাকেই 'আমি' জানি] অভয়-পদেতে স্থিত হয়েছি যখন—
আস্তিক্য ইহারি নাম—হইয়াছি মোরা সবে বীর, গতভয়।
সংসার-আসক্তি ত্যজি, ত্যজি সর্ব-দ্বন্দ্ব-মূল স্বার্থপরতায়,
পরামৃত পান করি, ধ্যান করি সর্ববিধ কল্যাণ-নিলয়
শ্রীগুরু-চরণাম্বুজ, ধরাবাসী সবাকারে করি নমস্কার
অমৃতের পূর্ণপাত্রে পান তরে আমন্ত্রণ করি বারংবার—
পূর্ণ যেই পাত্রখানি অনাদি-অনন্ত-বেদ-
পয়োধি-মন্থন-লব্ধ অতুলন ধনে,
যাহে শক্তি প্রদানিলা প্রজাপতি-নারায়ণ-
মহেশাদি শক্তিমান্ সর্ব দেবগণে,
পরিপূর্ণ যাহা সর্ব-অবতার-প্রাণসারে—
পূর্ণ যহা সবাকার মিলিত সত্তায়—
সে অমৃত-পূর্ণপাত্র ধরিয়া মানবদেহ
রামকৃষ্ণ-রূপ লয়ে এসেছে ধরায়।

পত্রাবলী-পরিশিষ্ট

২০৫ক*

[মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে লিখিত]

সহস্রদ্বীপোদ্যান (যুক্তরাষ্ট্র)
অগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,
আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি।

আমার ইচ্ছামত আপনি আমায় লণ্ডনে যেতে বলেছেন—এ আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ও মহত্ত্বের পরিচায়ক। সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আমার লণ্ডনে যাবার কোন তাড়া নেই। তাছাড়া, আমি আপনাকে প্যারিসে বিবাহিত দেখতে চাই; তারপর আমি লণ্ডনে যাব।

আমি ঠিক সময়ে হাতের কাছে প্রস্তুত ... থাকব, ভয় নেই।

ইতি
আপনার চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

২৬০ক*

[গিরিধারীদাস মঙ্গলদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত]

২২৮ ওয়েষ্ট ৩৯ ষ্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
২ মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় বন্ধু,
আপনার সুন্দর পত্রখানির উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন।

আপনার পিতৃব্য মহাত্মা ছিলেন, তাঁর সমগ্র জীবন দেশের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। আশা করি আপনারা সবাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

এই শীতে ভারতে ফিরছি—হরিদাস ভাইকে আর দেখতে পাব না ভেবে কী যে দুঃখ হচ্ছে, তা প্রকাশ করতে আমি অপারগ।

তিনি একজন দৃঢ়নিষ্ঠ উন্নতচরিত্র বন্ধু ছিলেন, তাঁকে হারিয়ে ভারতের খুবই ক্ষতি হল।

শিগ্‌গির ইংলণ্ডে যাচ্ছি—গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাবার ইচ্ছা, আর পরের শীতকালে ভারতে যাব।

আপনার পিতৃব্য ও বন্ধুদের আমার কথা জানাবেন।

আপনার পরিবারবর্গের চির শুভানুধ্যায়ী
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার ইংলণ্ডের ঠিকানাঃ কেয়ার অব ই.টি.স্টার্ডি এস্কোয়ার, হাই ভিউ, কেভার্শ্যাম, রীডিং, ইংলণ্ড।

৩২৪ক*

[‘লাইট অব দ্য-ইষ্ট’ পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত]*

প্রিয় মহাশয়,
'লাইট অব দ্য-ইষ্ট' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠানর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পত্রিকাটির সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

যেহেতু পত্রিকাটির উন্নতিকল্পে আপনি আমার পরামর্শ চেয়েছেন আমি খোলাখুলি বলি, একাজে আমার আজীবন অভিজ্ঞতায় আমি সব সময়ে দেখেছি যে অলৌকিকের চর্চা ক্ষতিকর, তা মানুষকে দুর্বল করে। আমাদের যা চাই তা হল শক্তি। অন্যান্য জাতির চেয়ে ভারতবাসী—আমাদের বেশী দরকার বলিষ্ঠ তেজস্বী চিন্তার। সর্ববিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের অনুশীলন আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। যুগ যুগ ধরে আমাদের ভেতরে রহস্যময় বস্তু ঠেসে পোরা হয়েছে। তার ফলে, আমাদের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক পরিপাকশক্তি এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যা প্রায় চিকিৎসার অসাধ্য এবং জাতিটাকে অকর্মণ্য মানসিক জড়তার এমন এক নিম্নস্তরে টেনে নামান হয়েছে যার অভিজ্ঞতা এর আগে বা পরে অন্য কোন সভ্য সমাজকে লাভ করতে হয়নি। একটা বলশালী জাতি গড়ে তুলতে হলে তার পেছনে তরতাজা ও বলিষ্ঠ চিন্তা থাকা দরকার।[তা] আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপনিষদের মধ্যে, যা সারা পৃথিবীকে শক্তিশালী করতে পারে। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে শক্তির শাশ্বত আকর। কিন্তু তাকে কাজে লাগান দরকার। প্রথমে বেদান্তকে পণ্ডিতীর কঠিন আবরণ থেকে মুক্ত করতে হবে; তারপরে তার সমস্ত সরলতা সৌন্দর্য ও ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েও তা প্রয়োগ করে দেশের সর্বত্র শিক্ষা দিতে হবে। 'এটা একটা বিরাট কাজের ফরমাশ', কিন্তু তাহলেও, যেন আগামী কালই একাজ নিষ্পন্ন হবে এভাবে এই উদ্দেশ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।' একটা বিষয়ে আমি সুনিশ্চিতঃ যে কেউ অকপট ভালবাসা দিয়ে, নিঃস্বার্থপর হয়ে মানুষের সেবা করতে চায় সে অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৩৩০ক*

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

(দার্জিলিঙ থেকে লেখা)
আলমবাজার মঠ, কলকাতা
২৬ মার্চ, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,
আমাকে নিয়ে জাতীয় উল্লাস-উদ্দীপনা প্রদর্শন শেষ হয়েছে; অন্ততঃ আমাকে সে সব সংক্ষেপে সারতে হয়েছে, যেহেতু আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। পশ্চিমে একটানা খাটুনি ও ভারতে এক মাস প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরিণাম বাঙালীর ধাতে —বহুমূত্র রোগ। এ একটি বংশগত শত্রু এবং বড়জোর কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগে আমার দেহাবসান পূর্বনির্দিষ্ট। শুধু মাংস খাওয়া, জল একেবারে না খাওয়া এবং সর্বোপরি, মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিশ্রামই, বোধ হয়, জীবনের মেয়াদ বাড়াবার একমাত্র উপায়। মগজটাকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম আমি দিচ্ছি, দার্জিলিঙে যেখান থেকে এখন আপনাকে চিঠি লিখছি।

সারদানন্দের সাফল্যের খবর পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবেন এবং তাকে অত্যধিক কাজ করতে দেবেন না। বাঙালীর শরীর মার্কিনদের মত নয়।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় (মোহিনী) কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন। আপনার প্রেরিত বার্তা তাঁকে দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কাজ করতে বেশ আগ্রহী। আর বেশী কিছু লেখবার নেই, আমি শুধু আমার মঠটি চালু করতে দৃঢ়সংকল্প এবং সে কাজ সারা হওয়া মাত্র আমি আবার আমেরিকায় আসব।

প্রসঙ্গতঃ গার্টুড অর্চাড (Gertrude Orchard) নামে ইংলণ্ডের এক মহিলাকে আপনার কাছে পাঠাব। তিনি গৃহশিক্ষিকার কাজ করেছেন, কিন্তু ললিতকলাদিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে এবং আমার ইচ্ছে, তিনি আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখুন। আপনার ও মিসেস (ফ্লোরেন্স) এ্যাডাম্স-এর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি তাঁকে দেব।

মিসেস এ্যাডাম্স, মিস থার্সবী, মিস ফার্মার (মহীয়সী ভগিনী) এবং অন্যান্য সুহৃদ্গণকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

আপনি আমার অসীম প্রীতি ও চিরকৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহের
বিবেকানন্দ

৩৩১ক*

[লালা বদ্রী শাহকে লিখিত]

দার্জিলিঙ
৭ এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রিয় লালাজী,
এইমাত্র তারযোগে আপনার সহৃদয় আমন্ত্রণ পেলাম। বোধহয় আপনি ইতোমধ্যে শুনেছেন যে আমি মারাত্মক বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েছি।

তাতে আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল এবং আমাকে ছুটতে হল দার্জিলিঙে—এ জায়গায় খুব ঠাণ্ডা এবং এই রোগের পক্ষে হিতকর বলে।

সেই থেকে আমি অনেক ভাল বোধ করছি এবং ডাক্তাররা চান না যে আমি ঘোরাফেরা করি, কেন না তাতে রোগ আবার বাড়বে। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা যদি মাস দুয়েক চলে তাহলে মনে হয় আমি সমতল ভূমিতে নেমে আসতে সমর্থ হব এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে আলমোড়ায় যেতে পারব। আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি বলে আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু আপনি বুঝছেন, এছাড়া গত্যন্তর ছিল না; শরীরটা আমার আয়ত্বে ছিল না।

আপনি ও আলমোড়ার অন্যান্য সব বন্ধুরা আমার ভালবাসা জানবেন।

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দঃ

৩৪৮ক*

[কলম্বোর মিঃ টি.শোকনাথনকে লিখিত]*

আলমোড়া
৩০ জুন, ১৮৯৭

প্রিয় বন্ধু,
সিংহলে (অধুনা শ্রীলঙ্কা) থাকার সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে অনুসারে পত্রবাহক স্বামী শিবানন্দকে সেখানে পাঠান হল। যে কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত হবে তিনি তার বিশেষ উপযুক্ত, অবশ্য আপনার সহৃদয় সহায়তা পেলে।

আশা করি আপনি তাঁকে সিংহলের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবেন। ইতি

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

তথ্যপঞ্জী

ব্যক্তি-পরিচয়

[পত্রাবলীতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়]

অক্ষয়	অক্ষয়কুমার ঘোষ, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক। খাণ্ডোয়ায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। পরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে মিস মূলারের তত্ত্বাবধানে যখন তিনি ছিলেন, স্বামীজী তাঁহাদের বাটীতে অতিথি হন।
অক্ষয়কুমার সেন	শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি’-প্রণেতা। স্বামীজী তাঁহাকে ‘শাঁকচুন্নী মাষ্টার’ বলিতেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলেনঃ এই গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচার করিবে।
অখণ্ডানন্দ স্বামী (গঙ্গাধর, গঙ্গা)	শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ (১৯৩৪-৩৭)। তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় উত্তরাখণ্ডের দুর্গম তীর্থরাজি দর্শন করিতে করিতে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে যান। সেখানে বৌদ্ধমঠে কিছুকাল কাটাইয়া কাশ্মীর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর স্বামীজী তাঁহাকে হিমালয় ভ্রমণে সাথী করেন। স্বামীজী-পরিকল্পিত সেবার আদর্শকে তিনিই প্রথম কার্যে রূপায়িত করেন—প্রথমে খেতড়িতে, পরে মুর্শিদাবাদে।
অচ্যুতানন্দ সরস্বতী (অচু, অচ্যুত, গুণনিধি)	দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের প্রচারক। পূর্বনাম গুণনিধি ভট্টাচার্য। স্বামীজীর সহিত কাশ্মীর ভ্রমণকালে তিনি যে ডায়েরী লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্বামীজীর জীবনের সেই সময়কার অনেক ঘটনা জানা যায়।
অজয় (অজয়হরি)	স্বরূপানন্দ দ্রষ্টব্য।
অজিত সিং	রাজপুতানায় খেতড়ি রাজ্যের রাজা, স্বামীজীর শিষ্য। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেন। স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রাকালে তিনি তাঁহার আলখাল্লা পাগড়ি প্রভৃতি কিনিয়া দেন এবং যথেষ্ট অর্থাদি সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজীর প্রেরণায় উভয়ে খেতড়ি রাজ্যে বহু জনহিতকর কার্যের প্রবর্তন করেন। নিজ ব্যয়ে মোগলযুগের একটি প্রাচীন কীর্তির সংস্কারকার্য পরিদর্শনকালে মিনারের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে তাঁহারই অনুরোধে স্বামীজী ‘বিবেকানন্দ’ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
অতুলবাবু	অতুলচন্দ্র ঘোষ, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল।
অদ্বৈতানন্দ, স্বামী (গোপালদাদা, বুড়োগোপাল)	শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রদত্ত কয়েকখানি গেরুয়াবস্ত্র নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ত্যাগী যুবক ভক্তদের দিয়াছিলেন।
অদ্ভুতানন্দ, স্বামী (লাটু)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য। তাঁহার অক্ষর-পরিচয় ছিল না; শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তিনি জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন।
অভয়ানন্দ	মেরী লুই দ্রষ্টব্য
অভেদানন্দ, স্বামী (কালী)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি প্রথমে লণ্ডনে ও পরে নিউ ইয়র্কে বেদান্ত প্রচার করিতে যান; এবং ২৫ বৎসর কাল ঐ কার্যে আমেরিকায় কাটান।
অলকট, কর্ণেল	বিখ্যাত থিওসফিষ্ট নেতা, কলিকাতায় থিওসফিক্যাল সোসাইটির স্থাপয়িতা।
অসীম	শ্রীরামকৃষ্ণের বাগবাজারনিবাসী ভক্ত, চুনীলালবাবুর পুত্র।

আত্মানন্দ, স্বামী (সুকুল)	স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য। পূর্বনাম গোবিন্দপ্রসাদ সুকুল। ছাত্রজীবনে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ বেলুড়ে সন্ন্যাসদীক্ষা হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারীতে স্বামী সদানন্দের সহিত সেবাকার্যে যোগ দেন। কিছুকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকা-পরিচালনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারী ছিলেন; মান্দ্রাজে প্রচারকার্যেও তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহকারী ছিলেন; বাঙ্গালোর, ঢাকা প্রভৃতি মঠে অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ কাশীধামে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

আলাসিঙ্গা, পেরুমল	স্বামীজীর বিশেষ অনুগত শিষ্য। ইঁহারই নেতৃত্বে মান্দ্রাজী যুবকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। ইনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, পরে মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

ইঙ্গারসোল (১৮৩৩-৯৯)	রবার্ট ইঙ্গারসোল, আমেরিকাবাসী বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী লেখক ও বক্তা। বক্তৃতা- কোম্পানীর কার্যোপলক্ষে ইঁহার সহিত স্বামীজীর পরিচয় এবং ধর্মদর্শনাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ইঁহার স্পষ্টবাদিতা ও আন্তরিকতার জন্য স্বামীজী ইঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীঃ The gods and other Lectures; Some mistakes of Moses.

ইন্দু	শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য বলরামবাবুর দৌহিত্রী।

ইন্দুমতী মিত্র	হরিপদ মিত্রের স্ত্রী, স্বামীজীর শিষ্যা।

ঈশান মুখোপাধ্যায়	স্বামীজীর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের পিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাদের বাড়ীতে কয়েকবার গিয়াছেন।

উডস্, মিসেস ট্যানাট	চিকাগো বক্তৃতার পূর্বে ১৮৯৩ খ্রীঃ অগষ্ট মাসে মিসেস ট্যানাট উডস্ সেলেমে তাঁহার বাড়ীতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী সেখানে এক সপ্তাহ কাটান এবং বক্তৃতা দেন; ধর্মযাজকগণ তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। মিসেস উডস্ ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন, রচনার জন্যও তাঁহার সুনাম ছিল।

উপেন	'বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত।

ঋষিবর মুখোপাধ্যায়	কাশ্মীরের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি, কাশ্মীর ভ্রমণকালে শ্রীনগরে স্বামীজী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

এবট, লীম্যান	ব্রুকলিনের প্লীমাথ কংগ্রিগেশন্যাল চার্চ-এর ধর্মযাজক এবং সাময়িক পত্র 'Outlook'-এর সম্পাদক। সমাজ ও শিল্পসংস্কারে এবং ধর্ম-আন্দোলনে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন, সেখানেই স্বামীজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

এলবার্টা	মিস এলবার্ট স্টার্জিস, মিসেস লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা; পরে কাউন্টেস অব স্যাণ্ডউইচ।

এস্পিনেল, মিসেস এমিলি	স্বামীজী যখন ১৯০০ খ্রীঃ সানফ্রান্সিস্কো টার্ক ষ্ট্রীট ফ্ল্যাটে বাস করিতেছিলেন, তখন এই ভদ্রমহিলা সেই ঘরের কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন।

ওকাকুরা মিঃ	কাকাজু ওকাকুরা, বিখ্যাত জাপানী প্রাচ্যশিল্প-বিশেষজ্ঞ; স্বামীজীকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন; স্বামীজীর সহিত বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেন।

ওয়াইকফ	(মিসেস কেরী মিড্ ওয়াইকফ)—স্বামীজী তাঁহার গৃহে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি 'ভগিনী ললিতা' নামে পরিচিতা হন। তাঁহার লস্ এঞ্জেলেস-এর বাড়ী 'বিবেকানন্দ হোম' নামে খ্যাত। ভগিনী ললিতার ঐ বাটীতেই হলিউড বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত।

ওয়াল্ডো, মিস এস্. ই.	স্বামীজীর ব্রুকলিন-বাসিনী শিষ্যা, 'ভগিনী হরিদাসী' নামে পরিচিতা। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর সহিত কথোপকথনগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেন। পরে ঐগুলি 'Inspired Talks' (বাঙলায়

	‘দেববাণী’) নামে প্রকাশিত। তিনি কিছুকাল নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির পরিচালনা করেন এবং স্বামীজীকে প্রচারকার্যে ও গ্রন্থ-সম্পাদনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

কর্বিন, মিস	মিস থার্সবির বন্ধু। নিউ ইর্য়ক বেদান্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কানাই	নির্ভয়ানন্দ দ্রষ্টব্য।

কংগার, মিসেস	চিকাগো জন বি লায়নের বিধবা কন্যা। ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে স্বামীজীকে লায়ন পরিবারের গৃহে স্থান দেওয়া হয়। উক্ত কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিতেন এবং স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনে সান্ত্বনা লাভে সমর্থ হন।

কালভে, মাদাম	ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত গায়িকা। জীবনের এক সঙ্কট মুহূর্তে স্বামীজীর সহিত দেখা হয়, স্বামীজী তাঁহার মনের অশান্তি দূর করেন; পশ্চিম ইওরোপ, তুর্কীস্থান, মিসর প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণে তাঁহার সাথী হন। বহুদিন পরে মাদাম কালভে বেলুড় মঠ দর্শন করিতে আসেন। আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

কালী (কালী তপস্বী)	অভেদানন্দ দ্রষ্টব্য।

কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, রেভাঃ	খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক। একসময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ	বিরজানন্দ দ্রষ্টব্য।

কালীকৃষ্ণ বাবু	কালীকৃষ্ণ দত্ত, একটি ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার।

কিডি	স্বামীজীর শিষ্য সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র, মান্দ্রাজে ক্রিশ্চান কলেজের বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক। স্বামীজী তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি পাখীর মত স্বল্পাহারী ছিলেন বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে ‘কিডি’ বলিয়া ডাকিতেন। তামিল ভাষায় ‘কিডি’ শব্দের অর্থ পাখী। মান্দ্রাজ হইতে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকা যখন প্রকাশিত হইত, তখন তিনি উহার অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

কৃপানন্দ, স্বামী	ল্যাণ্ডসবার্গ দ্রষ্টব্য।

কৃপানন্দ, স্বামী	বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণময়ী	ভক্ত বলরাম বসুর কনিষ্ঠা কন্যা।

কৃষ্ণলাল (কেষ্টলাল ব্রহ্মচারী)	পরে স্বামী ধীরানন্দ; শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, মঠে প্রথম দুর্গাপূজার পূজারী ছিলেন।

কৃষ্ণনন্দ, স্বামী	পূর্বনাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বিখ্যাত বক্তা ও হিন্দুধর্ম-প্রচারক। ভগবদ্গীতার টীকা-লেখক।

কৃষ্টিন ভগিনী(ক্রিশ্চিন)	ডেট্রয়েটের মিস কৃষ্টিন গ্রীনষ্টিডেল, স্বামীজীর শিষ্যা। ভারতীয় নারীশিক্ষা-কার্যে ভগিনী নিবেদিতার সহকর্মিণী; স্বামীজী তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

খগেন	বিমলানন্দ দ্রষ্টব্য।

খোকা (সুবোধ)	সুবোধানন্দ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাধর (গঙ্গা, গ্যাঞ্জেস)	অখণ্ডানন্দ দ্রষ্টব্য।

গগনবাবু	গাজীপুরনিবাসী গগনচন্দ্র রায়। স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনিই পওহারী বাবার সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দেন।

গার্নসি, মিসেস	নিউ ইয়র্ক-বাসিনী শিষ্যা, স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীঃ কিছুদিনের জন্য গার্নসি-পরিবারে বাস করিয়াছিলেন।

গিরিশবাবু	গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত নট ও নাট্যকার, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাকে 'জি. সি.' (G. C.) বলিয়া ডাকিতেন।

গুডইয়ার	নিউ ইয়র্কের মিঃ ও মিসেস ওয়াল্টার গুডইয়ার; আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্যে স্বামীজীকে সাহায্য করেন।

গুডউইন, মিঃ জে. জে	স্বামীজীর একজন প্রিয় অনুগত ইংরেজ শিষ্য। স্বামীজীর বহু বক্তৃতা ইনি সাঙ্কেতিকলিপিতে লিখিয়া রাখেন, সেইজন্যই ঐগুলি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। স্বামীজী বলিতেন— Faithful Goodwin (বিশ্বস্ত গুডউইন)। স্বামীজীর সহিত তিনি আমেরিকা, ইওরোপ ও ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ ভারতে উতকামণ্ডে তাঁহার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া স্বামীজী 'Requiescat in Pace' কবিতাটি লেখেন।

গুণনিধি	অচ্যুতানন্দ দ্রষ্টব্য।

গুপ্ত (শরৎচন্দ্র গুপ্ত)	সদানন্দ দ্রষ্টব্য।

গুরুমহারাজ	শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

গেডিস, অধ্যাপক	স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস; কিছুকাল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, পরে ফ্রান্সে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

গোপালদাদা (বুড়োগোপাল)	অদ্বৈতানন্দ দ্রষ্টব্য।

গোপালের মা	কামারহাটি-নিবাসিনী অঘোরমণি দেবী, উচ্চ-অনুভূতিসম্পন্না বাৎসল্যভাবে সিদ্ধা সাধিকা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপালভাবে দেখিতেন এবং সেইভাবের অদ্ভুত দর্শনাদি তাঁহার হইত। স্বামীজী তাঁহার অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র বসু, ডাঃ	এলাহাবাদের ডাক্তার; তীর্থপর্যটনকালে (১৮৮৮ খ্রীঃ) স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দলাল শা	স্বামীজীর আলমোড়া-নিবাসী ভক্ত।

গোবিন্দ সহায়	আলোয়ার-নিবাসী স্বামীজীর শিষ্য।

গোলাপ-মা (গোলাপমণি দেবী)	শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা; তিনি বহু বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছিলেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' এই নামেই 'কথামৃতে' তাঁহার পরিচয় দেওয়া আছে।

গৌর-মা (গৌরীমা, গৌরদাসী)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা; সন্ন্যাসিনী।

গ্রিফিন, লেপেল	স্যর লেপেল গ্রিফিন ভারতীয়দের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'সমূহ'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ	এলাহাবাদে অধ্যাপক ছিলেন; পরবর্তী কালে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলার হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন।

চারু	চারুচন্দ্র বসু, পালিভাষায় পণ্ডিত; প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থ 'ধম্মপদে'র বাঙলা অনুবাদক ও 'অশোক- অনুশাসন' প্রভৃতি পুস্তকের লেখক।

চুনীবাবু	বাগবাজার-নিবাসী চুনীলাল বসু; শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত।

ছবিল দাস	বোম্বাই-এর বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস ছবিল দাস। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন।

জগমোহন	মুন্সী জগমোহন লাল, খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, স্বামীজীর অনুগত ভক্ত, আমেরিকা যাত্রার সময় তিনিই স্বামীজীকে

	জাহাজে তুলিয়া দেন।
জজ	থিওসফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।
জনসন, মিসেস	ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারকার্যে স্বামীজীকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।
জনষ্টন, মিঃ (জনসন)	চার্লস জনসন; ব্রহ্মচর্যব্রত-গ্রহণের পর 'ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ' নামে পরিচিত হন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।
জিনি, ভগিনী	স্বামীজী যখন মিঃ হিউ এল. বিঙ্কলির অতিথি হইয়া মেমফিসের একটি বোর্ডিং হাউসে গিয়াছিলেন, উহার মালিক ছিলেন মিস ভার্জিনিয়া মুন, সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া 'ভগিনী জিনি' বলিয়া ডাকিতেন। মিস মুন উক্ত বোর্ডিং হাউসে স্বামীজীর জন্য একটি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
জি. জি	বাঙ্গালোরের জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার স্বামীজীর অনুগত ভক্ত। মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন।
জুল, বোয়া	ফরাসী দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ও সাংবাদিক। স্বামীজী প্যারিসে কিছুদিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ইওরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করেন।
জেমস্, ডক্টর লুই জি.	প্রসিদ্ধ বক্তা ও পণ্ডিত; তিনি ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং 'স্কুল অব কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে'র প্রধান পরিচালক; এসোসিয়েশনে হিন্দুধর্ম-প্রসঙ্গে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার জন্য স্বামীজীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। >
জেমস্, ডক্টর উইলিয়ম	হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত; 'Varieties of Religious Experience' প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থের লেখক। স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপের ফলে ইনি স্বামীজীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন।
জো	মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড দ্রষ্টব্য।
টাটা, স্যর জামসেদজী	বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের। জামসেদপুরে বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, বাঙ্গালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাতা।
টার্নবুল, ডাঃ	১৮৯৬ খ্রীঃ শেষভাগে চিকাগোর ডাঃ টার্নবুল নামক স্বামীজীর এক আমেরিকান ভক্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি আলমবাজার মঠে আসিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতেন, জ্যোতিষ জানিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলেন, 'ইনি জীবের উদ্ধারকর্তা ও অজ্ঞানান্ধকার-নাশক।'
টেসলা	মিঃ নিকোলা টেসলা; আমেরিকার একজন বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ত্ববিদ। স্বামীজীর মুখে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হন; উহাতে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।
ঠাকুর সাহেব	গুজরাটের অন্তর্গত লিমডির মহারাজা এবং স্বামীজীর শিষ্য। স্বামীজী তাঁহার প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।
ডয়সন, অধ্যাপক	পল ডয়সন জার্মানীর প্রসিদ্ধ প্রাচ্যদর্শনবিদ; কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি শাঙ্করভাষ্য-সমেত বেদান্ত-সূত্র, ৬০ খানি উপনিষদ্ ও মহাভারতের কতকাংশ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি স্বামীজীকে স্বীয় বাসভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন।
ডাক্তার	নাঞ্জুণ্ড রাও দ্রষ্টব্য।
ডাচার, মিস	স্বামীজীর শিষ্যা; সেন্ট লরেন্স নদীবক্ষে সহস্রদ্বীপোদ্যানে ইঁহারই নির্জন আবাসে স্বামীজী কিছুদিন অবস্থান করিয়া দ্বাদশজন শিষ্যশিষ্যাকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।
ডে, ডাক্তার	স্বামীজীর ভক্ত ডাঃ এলেন ডে।

তারক (তারকদাদা)	শিবানন্দ দ্রষ্টব্য।

তুরীয়ানন্দ, স্বামী (হরিনাথ)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য; আবাল্য বৈদান্তিক; স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। আমেরিকার 'শান্তি আশ্রম' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রগুলি সাধনজীবনের পথনির্দেশক। স্বামীজী তাঁহাকে 'হরি-ভাই' বলিতেন।

তুলসী	নির্মলানন্দ দ্রষ্টব্য।

তুলসীবাবু	তুলসীরাম ঘোষ, স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী (সারদা)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। আমেরিকাতেও তিনি 'Voice of Freedom' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সানফ্রান্সিস্কোর বেদান্তমন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বেদান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব অনেকখানি তাঁহারই। আমেরিকাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

থার্সবি, মিস এম্মা	বিখ্যাত গায়িকা, পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারকার্যে তিনি নানা প্রকারে স্বামীজীকে সাহায্য করেন। তিনি মিসেস বুলের বন্ধু এবং মিস ফিলিপস্ ও মিস স্মিথের সহিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন।

দক্ষ (দক্ষরাজা)	স্বামী জ্ঞানানন্দ; কিছুকালের জন্য বরাহনগর মঠে ছিলেন।

দমদম মাষ্টার	যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র ঘোষ; দমদমের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে 'দমদম মাষ্টার' বলা হইত। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যাতায়াত করিতেন।

দয়ানন্দ, স্বামী	আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সন্ন্যাসী—বেদকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে একবার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দেখা হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ বোম্বাই-এ আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

দাশু	দাশরথি সান্যাল, স্বামীজীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল হইয়াছিলেন।

দীননাথ (দীনু)	সচ্চিদানন্দ দ্রষ্টব্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি	কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা; ঊনবিংশ শতকের অন্যতম চিন্তানায়ক এবং রামমোহনের ভাবাদর্শে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারই উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ধর্মপাল	অনাগারিক ধর্মপাল; কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি এবং সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেলুড় মঠে আসেন।

ধীরামাতা (স্থিরামাতা)	বুল (মিসেস ওলি) দ্রষ্টব্য।

ন-ঘোষ	নগেন্দ্রনাথ ঘোষ; মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক।

নগরকার, বি. বি.	বোম্বাই হইতে প্রার্থনা সমাজের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাসভার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া কাশ্মীর ও পাঞ্জাব ভ্রমণকালে স্বামীজী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন।

নাঞ্জুণ্ড রাও, ডাক্তার	মান্দ্রাজের (ময়লাপুর) অধিবাসী তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক; স্বামীজীর অনুগত ভক্ত। ইনিই মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
নরসিংহাচারিয়ারর, জি. জি.	জি. জি. দ্রষ্টব্য।
নরসিংহাচারিয়ারর, রাও বাহাদুর	মহীশূর সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর।
নরসিংহাচার্য (নরসিমা)	ইনি বৈষ্ণব ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন। আমেরিকায় স্বামীজীর সহিত পরিচয় হয়।
ন্যাদা (নাদু)	স্বামীজীর ভাগিনেয়। মঠের ব্রহ্মচারী।
নাগমহাশয়	পূর্ববঙ্গের দুর্গাচরণ নাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান গৃহী ভক্ত। ইনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেন এবং অত্যন্ত ভক্তিমান সাধক ও দীনতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিলে নাগমহাশয় স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসেন। স্বামীজীও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে নাগমহাশয়ের দেওভোগ গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন।
নারায়ণ দাস	সংস্কৃত বৈয়াকরণ ও খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সভাপণ্ডিত; স্বামীজী তাঁহার নিকট পতঞ্জলি-কৃত পাণিনিসূত্রের টীকা 'মহাভাষ্য' অধ্যয়ন করেন এবং পত্রাবলীতে 'মদীয় অধ্যাপক' বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।
নিত্যগোপাল	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত; পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত।
নিত্যানন্দ স্বামী (যোগেন চাটুজ্যে)	স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য। বরাহনগরের অধিবাসী, মঠের সূচনা হইতেই যাতায়াত করিতেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ আলমবাজার মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্যে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দের অন্যতম সহকারী ছিলেন।
নিবেদিতা, ভগিনী	মিস মার্গারেট ই. নোব্‌ল্‌; স্বামীজীর শিষ্যা। স্বামীজী কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সহিতও জড়িত ছিলেন। The Master as I saw Him, Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda, Web of Indian Life, Cradle Tales of Hinduism প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী। ১৯১১ খ্রীঃ দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় বাগবাজার অঞ্চলে ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষাদানের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; ঐ বিদ্যালয় বর্তমানে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত।
নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী (নিরঞ্জন)	পূর্বনাম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য। নির্ভীক ও সরল-প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।
নির্ভয়, নির্ভয়ানন্দ	পূর্বাশ্রমের নাম কানাই সেন। স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য।
নির্মলানন্দ, স্বামী (তুলসী)	কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরে বাঙ্গালোরে ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করেন।
নীলাম্বরবাবু	নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বেলুড়ে গঙ্গাতীরস্থ তাঁহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং পরে ১৮৯৮ খ্রীঃ আলমবাজার হইতে মঠ সেখানে স্থানান্তরিত হয়।
নোব্‌ল্‌, মিস	ভগিনী নিবেদিতা দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতজী মহারাজ	শঙ্করলাল দ্রষ্টব্য।
পল কেরস্, ডাঃ	প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; বুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রন্থাদির রচয়িতা।
পওহারী বাবা	গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী; স্বামীজী তাঁহার নিকট হইতে হঠযোগ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। স্বামীজীর লেখা 'পওহারী বাবা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৮ম খণ্ড।
পামার, টমাস	বিশ্ব মহামেলার (World's Fair Commission) সভাপতি মিঃ টমাস পামারের ডেট্রয়েটের বাড়ীতে অতিথিরূপে স্বামীজী এক পক্ষকাল বাস করেন। ইনি পূর্বে স্পেনদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত ছিলেন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটার হইয়াছিলেন।
পুরুষোত্তম যোশী	চিকাগো ধর্মসভায় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত। বাল্যকালেই 'কথামৃত'-কার শ্রীম-র সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। পরে সরকারী অর্থবিভাগে চাকরি করিতেন।
প্যারীবাবু	উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজীকে সমর্থন করার জন্য কলিকাতা টাউন হলে ১৮৯৫ খ্রীঃ যে সভা হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন।
প্রকাশানন্দ (সুশীল)	স্বামী শুদ্ধানন্দের ভ্রাতা; স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য। ১৮৯৬ খ্রীঃ আলমবাজার মঠে যোগদান ও ১৮৯৭ খ্রীঃ স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা। পরে 'সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি'র অধ্যক্ষ। ১৯২৭ খ্রীঃ সেখানেই দেহত্যাগ।
প্রতাপ মজুমদার	কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে 'Hindu Saint' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। 'Oriental Christ' লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার লিখিত 'Paramahamsa Ramakrishna' পুস্তিকা উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত।
প্রমদাদাস মিত্র	কাশীর জমিদার; পাণ্ডিত্য, ধর্মানুরাগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বিশ্বাস এবং ভক্তির জন্য স্বামীজী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ও অপর গুরুভ্রাতারা কাশীতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত একটি স্তবে বেদান্তজ্ঞানের সহিত তাঁহার অপূর্ব ভক্তি ও বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে।
প্রেমানন্দ, স্বামী (বাবুরাম)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য। তাঁহার ভক্তিমতী মাতার আমন্ত্রণে স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ আঁটপুরে গিয়াছিলেন। বলরামবাবু এই ভক্তপরিবারেরই জামাতা।
ফকির	যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর গৃহশিক্ষক। স্বামীজী তাঁহাকে 'ফকিরুদ্দীন হালদার' বলিতেন।
ফার্মার, মিস	মিস সারা ফার্মার বিখ্যাত তরিৎতত্ত্ববিদ্ গেরিস ফার্মারের কন্যা। নিউ ইয়র্কে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানান। ইনিই 'গ্রীনএকার রিলিজিয়াস কনফারেন্সে'র প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামীজী তাঁহারই বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন।
বদ্রীসা, লালা	আলমোড়া-নিবাসী ব্যবসায়ী, স্বামীজীর ভক্ত।
বনি, মিঃ চার্লস ক্যারল	আমেরিকার বিখ্যাত আইনজ্ঞ; ১৮৯০ খ্রীঃ হইতে 'International Law and Order League'-এর সভাপতি; ১৮৯০ খ্রীঃ ৩০ অক্টোবর গঠিত World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition-এর সভাপতি হন। বিভিন্ন মানবিক বিষয় আলোচনার জন্য কতকগুলি সম্মেলন-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন।
বলরামবাবু	বলরাম বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত ও রসদদার। শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে তাঁহার বাড়ীতে বহুবার গিয়াছেন এবং শ্রীমা ও

	স্বামীজী প্রমুখ গুরুভ্রাতৃগণ তথায় মাঝে মাঝে বাস করিয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ এই বাড়ীতেই একটি সভায় ‘শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে’র সূত্রপাত হয়।

বসু, ডাক্তার	বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু। প্যারিসে ধর্মেতিহাস সম্মেলনে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বাবুরাম	প্রেমানন্দ দ্রষ্টব্য।

বার্বার, মিসেস	একজন সমাজনেত্রী; ১৮৯৫ খ্রীঃ ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামীজী কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেগুলি ‘বার্বার্স্ লেকচার’ নামে প্রসিদ্ধ।

বালগঙ্গাধর তিলক	মহারাষ্ট্রদেশীয় বিখ্যাত মনীষী ও রাজনীতিক নেতা। একদা ট্রেনে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির (Indian Nationnal Congress) অধিবেশন উপলক্ষে যখন তিনি কলিকাতায় আসেন, তখন বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

বালাজী	ডি. আর. বালাজী রাও; ইনি পরে মান্দ্রাজ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

বিজয় গোস্বামী	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; স্বামীজীর সমসাময়িক বাঙলাদেশের একজন ধর্মনেতা। শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ও ভক্ত আছেন।

বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী (হরিপ্রসন্ন)	শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ (১৯৩৭-৩৮)। প্রথম জীবনে ইনি ইঞ্জিনীয়র ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামীজীর আদেশে তাঁহারই পরিকল্পনা লইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নকশা করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী বেলুড় মঠে মন্দির নির্মিত হয়। মঠে স্বামীজীর মন্দির তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়।

বিনয়কৃষ্ণ, রাজা	কলিকাতা শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামীজীকে কলিকাতায় যে সভায় অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় (ফেব্রুআরী ১৮৯৭ খ্রীঃ), ইনি সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিমলা	কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা।

বিমলানন্দ (খগেন)	স্বামীজীর শিষ্য। ১৮৯৯ খ্রীঃ ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার পরিচালকরূপে স্বামীজী কর্তৃক মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ মায়াবতীতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

বিরজানন্দ (কালীকৃষ্ণ)	স্বামীজীর সেবক ও সন্ন্যাসী-শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ (১৯৩৮- ৫১)। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী ও রচনাসংগ্রহের সম্পাদনা ও প্রকাশনায় তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়।

বিলিগিরি	বিলিগিরি আয়েঙ্গার; আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী মান্দ্রাজে সমুদ্রতীরস্থ ‘ক্যাসল কার্নান বা আইস হাউস’ নামক বিলিগিরির প্রাসাদোপম গৃহে ছিলেন। পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অধ্যক্ষতায় এখানে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (মান্দ্রাজ কেন্দ্র) স্থাপিত হয়।

বিহিমিয়া চাঁদ	লিমডির (কাথিয়াওয়াড়) অধিবাসী।

বীরচাঁদ গান্ধী	বোম্বাই-এর ব্যারিষ্টার বীরচাঁদ গান্ধী। ইনি জৈনধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন; সেইখানেই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

বুল, মিসেস ওলি	স্বামীজীর শিষ্যা, নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের স্ত্রী। তাঁহার নিজ নাম সারা (Sarah)। বহু পত্রে স্বামীজী তাঁহাকে ‘মা’ বা ‘ধীরামাতা’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেলুড় মঠ স্থাপনের সময় তিনি স্বামীজীকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন এবং অন্যভাবেও ভারতে ও পাশ্চাত্যে তাঁহার কাজে সহায়তা করেন।

বেল, মিস লিভিয়া	সানফ্রান্সিস্কো ক্যালিফোর্নিয়া ষ্ট্রীটে হোম অব ট্রুথের নেত্রী ছিলেন। ওকল্যাণ্ড ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া প্রভাবান্বিত হন এবং ক্যাম্প আইর্ভিং-এর ব্যবস্থা ইঁহারই চেষ্টায় হয়।
বেসান্ত, ডঃ মিসেস এনি	থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী ও বক্তা; কাশী হিন্দু কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার ভাষায় স্বামীজী একজন 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী' (warrior monk)। ইংলণ্ডে তাঁহার বাসভবনে স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে আলমোড়াতে দু-একবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয়।
বৈকুণ্ঠনাথ, সান্যাল	'স্বামী কৃপানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরিব্রাজকরূপে উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে 'সাণ্ডেল' বলিতেন।
বোয়া, জুল	জুল বোয়া দ্রষ্টব্য।
ব্যারোজ, ডক্টর	চিকাগোর প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জে, এইচ ব্যারোজ। চিকাগো ধর্মসম্মেলনের জেনারেল কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।
ব্যাগলি, মিসেস	মিশিগানের গভর্ণর ব্যাগলির পত্নী। ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো বিশ্বমেলাতে (World's Fair) মিসেস ব্যাগলি একজন মহিলা-কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ডেলিগেটদের সম্বর্ধনাসভায় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ ফেব্রুআরী মাসে স্বামীজী ডেট্রয়েটে মিসেস ব্যাগলির গ্র্যাণ্ড সার্কাস পার্কের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মিসেস ব্যাগলি ডেট্রয়েটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্ণধারগণের উপস্থিতিতে স্বামীজীর জন্য এক সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন।
ব্রহ্মানন্দ, স্বামী (রাখাল)	শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও সন্ন্যাসী-শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'রাজা মহারাজা' নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ (১৮৯৯-১৯২২); ইনিই স্বামীজীর পরিকল্পিত সঙ্ঘকে গড়িয়া তোলেন।
ব্রীড, মিসেস	লীনের (আমেরিকা) একজন সমাজনেত্রী এবং 'নর্থ শোর ক্লাবে'র একজন চার্টার সভ্যা। স্বামীজী তাঁহার বাড়ীতে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং উক্ত ক্লাব ও অক্সফোর্ড হলে জনসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। মিসেস ব্রীড হার্ভার্ডেও স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন।
ব্র্যাডলি, অধ্যাপক	ডঃ রাইটের বন্ধু অধ্যাপক ব্র্যাডলির সঙ্গে এভানষ্টনে স্বামীজীর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৯৪ খ্রীঃ অগষ্টে এনিস্কোয়ামে মিসেস ব্যাগলির অতিথি থাকাকালে উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।
ব্লজেট, মিসেস এস কে	স্বামীজী ১৯০০ খ্রীঃ লস এঞ্জেলেসে এই বৃদ্ধার গৃহে প্রায় মাসাবধি কাল বাস করেন। ধর্মমহাসভায় এই বৃদ্ধা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিতা হইয়াছিলেন।
ভগবানদাস বাবাজী	কালনার বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া কথিত।
ভট্টাচার্য	মান্দ্রাজের এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র ও স্বামীজীর কলেজ-বন্ধু।
ভট্টাচার্য, রঘুনাথ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। টিহিরী রাজ্যে স্বামীজী ১৮৯০ খ্রীঃ রঘুনাথবাবুর অতিথি হইয়াছিলেন।
ভবনাথ	বরাহনগর-নিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত। স্বামীজীর (নরেন্দ্রনাথের) বিশেষ বন্ধু।
ভাটে সাহেব	পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী বেলগাঁও-এ উপস্থিত হইয়া একজন বিশিষ্ট মারাঠী ভদ্রলোকের অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অধ্যাপক জি. এম. ভাটে তাঁহাদের অভিনব অতিথি সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন।
ভাস্কর	রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি, স্বামীজীর শিষ্য; তিনি স্বামীজীকে

সেতুপতি	আমেরিকা প্রেরণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ভারতের মাটিতে যেখানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেখানে ইনি একটি ৪০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।

ভ্রম্যান, ডাঃ	স্বামীজী বাল্টিমোরে রেভাঃ ওয়াল্টার ভ্রম্যান এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের অতিথি ছিলেন। বাল্টিমোরে তাঁহার ভ্রাতাদের আয়োজনে স্বামীজী কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ওয়াল্টার, হিরাম ও কার্ল এই তিন ভাই স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন।

মজুমদার	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দ্রষ্টব্য।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	হায়দরাবাদের ষ্টেট ইঞ্জিনীয়র। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী মান্দ্রাজ হইতে হায়দরাবাদে গিয়াছিলেন এবং আমেরিকা যাইবার প্রাক্কালে একটি বক্তৃতাও দেন।

মণি আয়ার	সুব্রহ্মণ্য আয়ার দ্রষ্টব্য।

মণিভাই	বরোদা রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মণিলাল নাড়ুভাই। হরিদাস বিহারীদাসের বন্ধু। স্বামীজী ইঁহার বাড়ীতে তিন সপ্তাহ অতিথি ছিলেন।

মণিলাল দ্বিবেদী	উত্তর প্রদেশের এই ব্রাহ্মণ বৈদিক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন।

মতি	সচ্চিদানন্দ দ্রষ্টব্য।

মহিম (মহিন)	মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামীজীর মধ্যম সহোদর।

মহিম, মহিমাচরণ চক্রবর্তী	শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন।

মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (M. N. Banerji)	ইনি দার্জিলিঙের সরকারী উকিল। স্বামীজী দার্জিলিঙে তাঁহার বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন।

মাতাঠাকুরাণী	শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী।

মাদার চার্চ	মিসেস হেল দ্রষ্টব্য।

মার্গট, মার্গারেট, মার্গো, মার্গোরাইট	ভগিনী নিবেদিতা দ্রষ্টব্য।

মাষ্টারমহাশয়	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্তদের অন্যতম। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রণেতা। 'কথামৃতে' তিনি মাষ্টার, মণি, শ্রীম প্রভৃতি ছদ্মনামে পরিচিত। বিদ্যাসাগর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং ছাত্রদের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে লইয়া আসিতেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'ছেলে-ধরা মাষ্টার' বলিতেন।

মিত্র, ডাক্তার	আশুতোষ মিত্র, কাশ্মীরের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন।

মূলার, মিস হেনরিয়েটা	স্বামীজীর ভক্ত ইংরেজ মহিলা। ১৮৯৬ খ্রীঃ স্বামীজী কিছুদিন তাঁহার অতিথি ছিলেন। বেলুড়ে মঠস্থাপনকার্যেও তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

মৃণালিনী বসু	স্বামীজীর শিষ্যা, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া; নিবাস বড় জাগুলিয়া।

ম্যাককিণ্ডলি , মিস (ইসাবেল)	মিস হেল-দের সম্পর্কিত ভগিনী। অন্য ভগিনীর নাম হ্যারিয়েট।

ম্যাকলাউড , মিস, জোসেফাইন	স্বামীজীর পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রধান অনুরাগী ভক্তদিগের অন্যতমা। তিনি স্বামীজীকে তাঁহার কার্যে সর্বদা সহায়তা করিতেন। তাঁহার জীবন স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে 'জো' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিস ম্যাকলাউড বেলুড় মঠে আসিয়া অনেকবার অতিথিরূপে বাস করিয়াছেন। ১৯৪৯ খ্রীঃ আমেরিকায় হলিউড শহরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ম্যাক্সমূলার,	অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শন ও সংস্কৃতভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ

এফ	জার্মান অধ্যাপক। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থসাহায্যে ঋগ্বেদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত Sacred Books of the East (পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত Ramakrishna: His Life and Sayings ১৮৯৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।

ম্যাক্সিম, হিরাম	স্বামীজীর বন্ধু। স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের কারখানার মালিক।

যজ্ঞেশ্বরবাবু	মীরাটে যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অতিথিরূপে স্বামীজী প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ কিছুকাল কাটান। পরে ইনি 'জ্ঞানানন্দ' নাম লইয়া (ভারতধর্ম মহামণ্ডলে) সন্ন্যাসী হন।

যোগানন্দ, স্বামী (যোগেন, যোগীন্দ্রনাথ)	শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা। ১৮৯৫ খ্রীঃ কলিকাতা টাউন হলে স্বামীজীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

যোগীন-মা	যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা, শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সেবিকা।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য	টিহিরী রাজ্যের দেওয়ান, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অগ্রজ।

রঙ্গাচার্য, অধ্যাপক	আলাসিঙ্গা পেরুমলের ভগিনীপতী, ত্রিবান্দ্রম কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; দক্ষিণ ভারতে বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

রবি বর্মা	কেরলদেশীয় চিত্রশিল্পী, পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অনুকরণ করিয়া সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে রবি-বর্মা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

রমা বাঈ	মহারাষ্ট্রদেশীয় বিদুষী হিন্দু বিধবা; খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন; স্বামীজীর আমেরিকা-গমনের কিছু পূর্বে তিনি সে দেশে ভারতীয় বালবিধবাদের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে সমিতি গঠন করেন; এবং ভারতীয় নারীদের দুর্দশার কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করেন। স্বামীজী 'ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্ক্‌ল্'-এর মহিলাদের নিকট 'ভারত ও ভারতীয় নারীদের যথার্থ অবস্থা' বিবৃত করেন।

রাইট, জন হেনরী	ডক্টর রাইট ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। স্বামীজীর সহিত আলাপ হইবার পর তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য স্বামীজীকে প্রদত্ত পরিচয়পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'ইনি এমন একজন মানুষ, যাঁহার পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।' স্বামীজী কয়েকবার তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাখাল (রাজা)	ব্রহ্মানন্দ দ্রষ্টব্য।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার	প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

রাম	রামকৃষ্ণ বসু, বলরাম বসুর পুত্র।

রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী (শশী)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য। কাশীপুরে গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেন; শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজায় তাঁহার নিষ্ঠা অতুলনীয়। স্বামীজীর আদেশে মান্দ্রাজে যাইয়া দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রের সূত্রপাত করেন।

রামদয়াল, রামদয়ালবাবু	আঁটপুর-নিবাসী রামদয়াল চক্রবর্তী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত; বলরাম বসুর পুরোহিতবংশীয়; কলিকাতা হোর মিলার কোম্পানীতে কাজ করিতেন।

রামবাবু	রামচন্দ্র দত্ত; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান গৃহী-ভক্ত; কাঁকুড়গাছি 'যোগোদ্যান'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

রামলাল	রামলাল চট্টোপাধ্যায়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

লগান, ডাক্তার	স্বামীজীর শিষ্য, সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি।

লাটু	অদ্ভুতানন্দ দ্রষ্টব্য।

লালাজী	বদ্রী শা দ্রষ্টব্য।

লালা হংসরাজ	আর্যসমাজভুক্ত লালা হংসরাজ সাহানী, লাহোরের একটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মবিষয়ে স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

লুই, মিস মেরী	ফরাসী মহিলা, স্বামীজীর শিষ্যা; 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া নাম দেন 'স্বামী অভয়ানন্দ'।

লেগেট, মিঃ	ফ্রান্সিস এইচ. লেগেট, নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে তাঁহার সহায়তা করেন। কখনও কখনও স্বামীজী আদর করিয়া মিঃ লেগেটকে 'ফ্র্যাঙ্কিসেন্স' নামে ডাকিতেন।

লেগেট, মিসেস	মিস ম্যাকলাউডের বিধবা ভগিনী মিসেস স্টার্জিস, মিঃ লেগেটের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই দম্পতিকে স্বামীজী বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সর্বতোভাবে স্বামীজীকে সাহায্য করিতেন। প্রথম বিবাহের পুত্র হলিস্টার ও কন্যা এলবার্টা।

লেভিঞ্জ সাহেব	মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ই. ভি. লেভিঞ্জ স্বামী অখণ্ডানন্দকে দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যে ও অনাথ আশ্রম-স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে স্বামীজীর সহিত তাঁহার পত্রালাপ হয়।

ল্যাণ্ডসবার্গ	হের লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ ছিলেন আমেরিকান নাগরিক, জন্মগতভাবে রাশিয়ান য়াহুদী। ল্যাণ্ডসবার্গ স্বামীজীর প্রচারকার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তবে কিছুদিনের জন্য স্বামীজীকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' আবার আসেন এবং সেখানে স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দিয়া নাম দেন 'স্বামী কৃপানন্দ'।

শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ	পোরবন্দরের বেদজ্ঞ পণ্ডিত। লিমডির রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে স্বামীজী তাঁহার নিকট বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন করেন।

শঙ্করলাল, পণ্ডিত	স্বামীজীর খেতড়ি-নিবাসী ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাকে 'পণ্ডিতজী মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শরৎ	সারদানন্দ দ্রষ্টব্য।

শরৎচন্দ্র গুপ্ত	সদানন্দ দ্রষ্টব্য।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী	স্বামীজীর গৃহী-শিষ্য; 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ', 'সাধু নাগ মহাশয়' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া স্বামীজী কখনও কখনও তাঁহাকে সস্নেহে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ডাকিতেন।

শশী	রামকৃষ্ণানন্দ দ্রষ্টব্য।

শশী ডাক্তার	কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহার একখানি বাঙলা জীবনী লেখেন। তিনি বলরাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সভার 'আণ্ডার সেক্রেটারী' ছিলেন।

শশী, সান্ন্যাল	কাশীনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ; তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।

শার্মান, মিসেস ফ্লোরেন্স	ডেট্রয়েটের মিসেস ব্যাগলির বিবাহিতা কন্যা।

শাঁকচুন্নী	অক্ষয়কুমার সেন দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দ, স্বামী (তারক,	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ (১৯২২-৩৪)। স্বামীজী তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বলিতেন, সেইজন্য মঠে তিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে

তারকদা)	পরিচিত।

শিবনাথ শাস্ত্রী	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়।

শিবু	শিবরাম চট্টোপাধ্যায়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

শুদ্ধানন্দ, স্বামী (সুধীর)	স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় সম্পাদক (১৯২৭-৩৪) এবং পঞ্চম অধ্যক্ষ (১৯৩৮)। স্বামীজীর বহু লেখা ও বক্তৃতা তিনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সূচনা হইতেই তাঁহার পরিচালনায় তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের প্রধান সহকারী ছিলেন, পরে উদ্বোধনের সম্পাদক হন। স্বামীজীর রচিত 'মঠের নিয়মাবলী'র তিনি ছিলেন লিপিকার।

শ্রীম	মাষ্টার দ্রষ্টব্য।

শ্রীশবাবু	এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীশচন্দ্র বসু। ইনি তাঁহার ভ্রাতা মেজর বি. ডি. বসুর সহিত এলাহাবাদে পাণিনি প্রেস স্থাপন করেন ও অনেক বহুমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সচ্চিদানন্দ (১), স্বামী	স্বামী সারদানন্দের শিষ্য; মঠে 'বুড়ো বাবা' বলিয়া পরিচিত।

সচ্চিদানন্দ (২), স্বামী	পূর্বনাম মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য। ১৮৯৮ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামীজীর আদেশে আমেরিকায় কয়েক বৎসর বেদান্ত প্রচার করেন।

সতীশচন্দ্র	ডন সোসাইটির বিখ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামীজীর বাল্যবন্ধু; হাইকোর্টে ওকালতি করেন এবং 'Dawn' পত্রিকা প্রকাশ করেন। আলমবাজার মঠের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল।

সদানন্দ, স্বামী (গুপ্ত, শরৎচন্দ্র গুপ্ত)	স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য। হাতরাস রেল ষ্টেশনে সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ পরিব্রাজক স্বামীজীকে দর্শন করার পর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল একসঙ্গে ভ্রমণান্তে বরাহনগর মঠে আসেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ কলিকাতায় প্লেগ-মহামারীতে তাঁহার সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন।

(মঃ) সরফরাজ হোসেন	নৈনীতালের মুসলমান ভদ্রলোক, স্বামীজীর ভক্ত।

সরলা ঘোষাল	পরে সরলাদেবী চৌধুরাণী নামে পরিচিতা হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী। 'জীবনের ঝারাপাতা'য় (আত্মচরিতে) স্বামীজীর কথা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সান্যাল (সাণ্ডেল)	বৈকুণ্ঠনাথ দ্রষ্টব্য।

সারদা	ত্রিগুণাতীতানন্দ দ্রষ্টব্য।

সারদানন্দ, স্বামী (শরৎ)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্পাদক (১৮৯৯- ১৯২৭)। স্বামীজীর আদেশে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-রচনা তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। স্বামী যোগানন্দের পর তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভার গ্রহণ করেন।

সারা বার্নহার্ড	ফরাসীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী। ১৮৯৫ খ্রীঃ নিউ ইয়র্কে এবং ১৯০০ খ্রীঃ প্যারিসে স্বামীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

সারা সি. বুল	(মিসেস ওলি) বুল দ্রষ্টব্য।

সুকুল	আত্মানন্দ দ্রষ্টব্য।

সুধীর	শুদ্ধানন্দ দ্রষ্টব্য।

সুবোধানন্দ,	(খোকা, সুবোধ)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য। তিনি

স্বামী	অত্যন্ত সরল ছিলেন; মঠে তিনি ‘খোকা মহারাজ’ নামে পরিচিত।
সুব্রহ্মণ্য আয়ার	মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ বিচারপতি স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার। স্বামীজীর অনুগামী; মান্দ্রাজ অভিনন্দন-সভার সভাপতি ছিলেন।
সুরেন	সুরেশ্বরানন্দ দ্রষ্টব্য।
সুরেন্দ্র ঠাকুর	কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।
সুরেশবাবু	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী-ভক্ত। ঠাকুর তাঁহাকে ‘সুরেশ’ বলিয়া বা ‘সুরেন্দর’ বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানকালে এবং পরে বরাহনগর মঠের ব্যয়নির্বাহে সাহায্য করিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চারজন রসদদারের অন্যতম।
সুরেশ দত্ত	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী-ভক্ত। তিনি ‘পরমহংসদেবের উক্তি’ নামে একটি উপদেশ-পুস্তক প্রকাশ করেন। হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশের সন্তান, প্রথমে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।
সুরেশ্বরানন্দ	স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য। ১৮৯৮ খ্রীঃ সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের মহুলাতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য ১৮৯৭ খ্রীঃ যে সেবাকার্য হয়, সেখানে স্বামীজীর নির্দেশে তিনি সহকারিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।
সুশীল	প্রকাশানন্দ দ্রষ্টব্য।
সেভিয়ার, মিঃ (ক্যাপ্টেন জে. এইচ.) ও মিসেস	স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যা; বেদান্তপ্রচারকার্যে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে ‘মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ১৯০০ খ্রীঃ মায়াবতীতে দেহত্যাগ করেন। মিসেস সেভিয়ার বহু বৎসর মায়াবতীতে এবং শ্যামলাতালে বাস করিয়া পরে ১৯৩১ খ্রীঃ ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনি ‘মাদার’ (Mother) বলিয়া পরিচিতা।
সোরাবাজী, মিস	মিস জিনি সোরাবজী নাম্নী পার্শী মহিলা পুণা হইতে পার্শী ধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো সম্মেলনে যোগদান করেন।
স্টার্ডি, মিঃ ই. টি.	একজন ইংরেজ ভক্ত; প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং আলমোড়ায় তপস্যা করেন। ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারকার্যে তিনি স্বামীজীকে সাহায্য করেন।
স্মিথ, মিসেস	স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীঃ ২৪ এপ্রিল Woldorf Hotel-এ মিসেস আর্থার স্মিথের আলোচনা-চক্রে ‘ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম’ প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতাকালেই মিঃ ও মিসেস গার্নসির সঙ্গে স্বামীজীর বন্ধুত্ব হয়। মিস ফিলিপস্ ও মিসেস এমা থার্সবির সঙ্গে মিসেস আর্থার স্মিথও পরে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সভ্য হন।
স্যানবর্ন, (মিস) কেট	এই বর্ষীয়সী বাগ্মী লেখিকা আমেরিকায় স্বামীজীর সাহায্যার্থে প্রথম অগ্রণী হন। বোষ্টনের পথে ট্রেনে প্রথম পরিচয়ের পর তিনি স্বামীজীকে ম্যাসাচুসেটস্-এ তাঁহার ‘ব্রীজি মেডোজ’ নামক ফার্মে (গোলাবাড়ীতে) লইয়া যান।
স্যানবর্ন, মিঃ ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন	মিসেস কেট স্যানবর্নের সম্পর্কিত ভ্রাতা, ইনি ‘হিন্দু সন্ন্যাসী’র বিরুদ্ধে প্রথমে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন। পরে ব্রীজি মেডোজ-এ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের পরই তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। নিউ ইয়র্কের সারাটোগা স্প্রিং-এ আমেরিকান সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশনের এক সম্মিলনীতে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন।
স্বরূপানন্দ, স্বামী (অজয়হরি)	স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া মঠবাড়ীতে সন্ন্যাস-দীক্ষা (১৮৯৮ খ্রীঃ) গ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে বহু সদনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন ও সুবিখ্যাত 'Dawn' পত্রিকার সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের তিনি প্রথম অধ্যক্ষ এবং ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক। স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলী সংগ্রহে এবং তাহার কিয়দংশের মুদ্রণে তাঁহার অক্লান্ত শ্রম চিরস্মরণীয়। ১৯০৬ খ্রীঃ

	২৭ জুন নৈনীতালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

হরমোহন	হরমোহন মিত্র; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত এবং স্বামীজীর বন্ধু। ইনি স্বামীজীর কয়েকখানি বই ভারতে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন।

হরি	তুরীয়ানন্দ দ্রষ্টব্য।

হরিদাস বিহারীদাস দেশাই	জুনাগড়ের দেওয়ান; স্বামীজী তাঁহাকে 'দেওয়ানজী সাহেব' এবং কখনও কখনও 'হরিদাস ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার সাহায্যে ভারতের বহু রাজার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়।

হরিদাসী, ভগিনী	ওয়াল্ডো দ্রষ্টব্য।

হরিপদ মিত্র	বেলগাঁয়ের ফরেষ্ট অফিসার, স্বামীজীর শিষ্য; পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী কয়েকদিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার ভৈটা গ্রামে। স্বামীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন 'স্বামীজীর কথা'য় দ্রষ্টব্য।

হরিপ্রসন্ন (হরিপদ ব্রহ্মচারী)	বিজ্ঞানানন্দ দ্রষ্টব্য।

হরি সিং	ঠাকুর হরি সিং লাডকানি। তিনি একসময়ে জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি স্বামীজীর ভক্ত ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণকালে স্বামীজী কিছুদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিশ	হরিশচন্দ্র মুস্তফী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত।

হাউ, মিসেস	Battle Hymn of the Republic গ্রন্থের লেখিকা বিখ্যাত জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ। মিসেস হাউ- এর 'Women's Club'-এ স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৭ মে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

হলিস্টার	মিসেস বেটি স্টার্জিসের পুত্র। এলবার্টার ভ্রাতা।

হাউইস, মিঃ	চিকাগো মেলাতে অ্যাংলিক্যান চার্চের অন্যতম নেতা মিঃ ক্যানন হাউইস-এর সঙ্গে স্বামীজী পরিচিত হন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। The Dead Pulpit নামক প্রবন্ধে তিনি Vivekanandaism-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন।

হিউম, রেভাঃ	ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতের খ্রীষ্টান মিশনের ডিরেক্টার ছিলেন। স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীঃ ১১ মার্চ ডেট্রয়েটের অপেরা হাউসে ভারতের খ্রীষ্টান মিশনরীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। রেভাঃ হিউম তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্বামীজীকে কয়েকটি পত্র লেখেন এবং একটি আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন।

হিগিন্‌স্‌, মিঃ চার্লস্	ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের একজন কর্মচারী। ১৮৯৪ খ্রীঃ নভেম্বরে তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছাপাইয়া প্রাচ্যধর্ম-অধ্যয়নে উৎসাহীদের মধ্যে বিতরণ করেন। মিঃ হিগিন্‌স্‌ নিজের বাড়ীতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন। আমেরিকান ও ভারতীয় উভয় দেশের সংবাদপত্রগুলি হইতে স্বামীজী সম্বন্ধে তথ্য অবলম্বনে পুস্তিকাটি লিখিত।

হিগিন্‌সন, কর্ণেল ওয়েন্টওয়ার্থ	ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি এবং সেই যুগের একজন উদারমতাবলম্বী লেখক। ১৮৯৪ খ্রীঃ অগষ্ট প্লীমাথে অনুষ্ঠিত ফ্রি রিলিজিয়স এসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতার জন্য স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

হুটকো (হুটকো গোপাল)	গোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসিতেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছিল।

হেল, মিঃ ও মিসেস	তাঁহারা উভয়েই স্বামীজীকে বিশেষ ভালবাসিতেন। চিকাগো ধর্মমহাসভা আরম্ভ হইবার পূর্বদিন স্বামীজী যখন দেখিলেন, এই অপরিচিত দেশে তিনি নিতান্তই অসহায়, ঠিক সেই সময় মিসেস হেলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁহার দেখা হয়। তিনি বিশেষ যত্নসহকারে স্বামীজীকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে বলেন এবং ধর্মমহাসভায় যাহাতে স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্বামীজী মিসেস হেলকে 'মা' এবং তাঁহার কন্যাদের

	‘ভগিনী’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন; কখনও কখনও মিসেস হেলকে ‘মাদার চার্চ’ এবং মিঃ হেলকে ‘ফাদার পোপ’ বলিতেন। হেল-পরিবারের সকলের সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। প্রথম দিকে এই বাড়ীই ছিল স্বামীজীর আমেরিকার ঠিকানা। স্যাম ইঁহাদের একমাত্র পুত্র।
হেলবয়স্টার (Marie Halboister)	ফরাসী ক্যানেডিয়ান মহিলা। ইওরোপে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর নিকট যোগ ও বেদান্তের শিক্ষা লাভ করেন। রাজযোগ গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন।
হেল, মিস মেরী	হেল পরিবারের কন্যা। স্বামীজী তাঁহাকে ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন।
হেল, মিস , হ্যারিয়েট	ঐ
হেলেন, মিস	স্বামীজীর লস্ এঞ্জেলেস-নিবাসিনী শিষ্যা; ভগিনী ললিতার (ওয়াইকফ্) ভগিনী।
হ্যানস্‌বরো, এলিস (মিসেস হ্যানস্‌বরো, হ্যানস্‌বার্গ)	স্বামীজীর লস্ এঞ্জেলেস-নিবাসিনী শিষ্যা; ভগিনী ললিতার আর এক ভগিনী। ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণকালে তিনি কিছুকাল স্বামীজীর সেক্রেটারী-রূপে কাজ করিয়াছিলেন।
হ্যাম্‌লিন, মিস	স্বামীজীর ভক্ত; নিউ ইয়র্কে ক্লাস চালাইবার কাজে স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।
হ্যামণ্ড, মিঃ ও মিসেস	ইংলণ্ডের মিঃ এরিক হ্যামণ্ড ও তাঁহার পত্নী উভয়েই স্বামীজীর অনুগত ভক্ত ছিলেন। মিঃ হ্যামণ্ড স্বামীজীর সম্বন্ধে কবিতা, স্মৃতিকথা প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি ‘ব্রহ্মবাদিন্’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
হ্যারি	সেভিয়ার দ্রষ্টব্য।

পাদটীকা - পত্রাবলী

১	সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গে গতি হয়।
২	পুত্রের যতদিন না বিবাহ হয় ততদিনই সে পুত্র, কিন্তু কন্যা চিরদিনই কন্যা থাকে।
৩	ভূতোপাসনা—গোঁড়া খ্রীষ্টানরা হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে 'ভূতোপাসক' বলিয়া ঘৃণ্য করিয়া থাকে।
৪	বাহ্যচিহ্ন ধর্মের কারণ নহে, সর্বভূতে সমভাব—ইহাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। [বলো]—অস্তি অস্তি (তিনি আছেন, তিনি আছেন); আমিই সেই, আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব। সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তিনি জগজ্জাল হইতে বহির্গত হন।
৫	বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।
৬	পর্বতগাত্রস্খলিত বিপুল তুষারস্তূপ।
৭	সমুদয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমুদয় শুভ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
৮	সকলকে জোর করে আমাদের গুরুর ওপর বিশ্বাস করতে বলো না।
৯	স্বামী সদানন্দ।
১০	নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে—এইটি জান এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর।
১১	হে সখে, কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই তো সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্‌, তোমার ঐশ্বর্যশালী স্বরূপ জাগ্রত কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নাই—আত্মার শক্তিই প্রবল।
১২	তারকা চর্বণ করিব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।
১৩	দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে—আমরা ক্ষীণ ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব। ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস। সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া, সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃত পান করিতে করিতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি। অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহধারণ করিয়াছেন।
১৪	নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাকিবে না, সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই—যথাঃ আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয় আমার মধ্যে আছে। আমার যা কিছু প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সবই আমি আমার ভিতর অভিব্যক্ত করব।
১৫	তুমি বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান্ কর; তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান্ কর; তুমি ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর, তুমি সহ্যশক্তি, আমায় সহনশীল কর।
১৬	স্বামী ব্রহ্মানন্দের।
১৭	গরম থাকিতে থাকিতে লোহার উপর ঘা মার অর্থাৎ যথাসময়ে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত কর।

১৮	চিকাগোর ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্য জাতিসমূহের নিকট হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ টাউন হলে সভা করিয়া স্বামীজী ও আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐ সভায় কতকগুলি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রখানি তাহার উত্তরস্বরূপ উক্ত সভার সভাপতি রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়কে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন।
১৯	তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? 'মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে।' (কুমারসম্ভব)—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া এই মজুমদার নামক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা উচিত।
২০	আমি অমূর্ত (বা অশরীরী) বাণী হইতে চাই।
২১	তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে? হরমোহন প্রভৃতিই বা কে? তথাপি তাহাদের প্রতি আমাদের হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'যে অবস্থা লাভ হইলে লোক গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না' (গীতা)—সেই অবস্থা এ ব্যক্তি এখনও লাভ করে নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়া উচিত।
২২	বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে।
২৩	ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দু।
২৪	সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয়—(মুণ্ডকোপনিষদ্)। বেদান্তমতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।
২৫	আমরা কেবল তাঁহার অনুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।
২৬	আখেরে প্রেম জয়ী হইয়া থাকে।
২৭	প্রয়োজন হয়, তবে সেটি একটি ভাব—'সর্বজনীনতা' রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে।
২৮	সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, কেবল পরধর্মসহিষ্ণুতা নহে—ইহাই আমরা প্রচার করি এবং কার্যেও পরিণত করি। বিশেষ সাবধান, যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারও পদদলিত করিও না।
২৯	আমাদের মত সকলেরই যে ঠাকুরের উপর সমান বিশ্বাস থাকিবে, এমন কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র শুভ শক্তি সমবেত করিতে চাই।
৩০	হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সবচেয়ে অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।
৩১	বর্তমান U.P. (উত্তর প্রদেশ)।
৩২	বলরাম বসুর পুত্র।
৩৩	এপিস্কোপ্যাল চার্চে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এঁদের অধীনে আর দুই শ্রেণীর যাজক থাকেন।
৩৪	প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে শাসনভার সমানপদস্থ যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।
৩৫	শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্ ৩২।
৩৬	Dangerous heathen.
৩৭	তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক।—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
৩৮	ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হইয়া থাকে।

৩৯	ব্যাকুলভাবে বলি।

৪০	কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।—গীতা

৪১	নীতিনিপুণগণ নিন্দাই করুক আর স্তুতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা যান, আজই মরণ হউক বা শত বৎসর পরেই হউক, ধীরব্যক্তিগণ ন্যায়পথ হইতে কখনও বিচলিত হন না।—ভর্তৃহরি।

৪২	হে বীর, স্বীয় পৌরুষ স্মরণ কর, হীনবুদ্ধি কামকাঞ্চনাসক্ত লোকদের উপেক্ষা করাই উচিত।

৪৩	এই পত্রখানির প্রথম দুই প্যারা ও চতুর্থ প্যারার শেষার্ধ ইংরেজীতে লিখিত।

৪৪	তাঁহার জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো; ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন।

৪৫	ত্রিভুবনের হিত করিতে যিনি ভালবাসেন।

৪৬	টাকায় কিছু হয় না, নামযশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।

৪৭	যজুর্বেদ সংহিতা।

৪৮	He who doeth the will of my Father etc.—N. T., Bible.

৪৯	কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যরূপ অমৃতে পূর্ণ হইয়া, নানাপ্রকার উপকার করিয়া, ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মত বাড়াইয়া নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন।

৫০	যে-কোন কাজ জীবের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করবার সহায়তা করে, তাই ভাল। যে-কোন কাজ তার বাধা হয়, তাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান্ অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে।

৫১	দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

৫২	সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত, যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাস, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি, বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

৫৩	সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত ভাষ্য।

৫৪	চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽয়ং কিং তাপসঃ কিম্বা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্। ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্যমাণা জনৈ- র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগীনঃ॥—বৈরাগ্যশতকম্, ৯৬

৫৫	ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ংবিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্। শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥—বৈরাগ্যশতকম্

৫৬	স্বামীজী হেল ভগিনীগণকে তাদের ‘ক্রিশ্চান সায়ান্স’ পাঠ ও অভ্যাস নিয়ে মৃদু কটাক্ষ করে মজা করতেন; ক্রিশ্চান সায়েণ্টিষ্টরা রোগকে আদপেই স্বীকার না করার অভ্যাসই করে থাকে।

৫৭	এই মহোৎসব যে শুধু তাঁর স্মারকই হবে তা নয়, কিন্তু তাঁর ধর্মমতসমূহের বহুল প্রচারের এক মূল কেন্দ্রস্বরূপ হবে।

৫৮	একটা শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে, তেমনি ছটফট করি।

৫৯	Boston Evening Transcript.

৬০	'He seeth the sparrow's fall'.—N. T. Bible.

৬১	রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়ির মহারাজার ৪ মার্চ, ১৮৯৫ তারিখে লিখিত অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

৬২	এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।—মনু —এই আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর সকলে শিক্ষা করিবে।

৬৩	গীতা, ৫।১৯

৬৪	শ্বেতাশ্বতর উপ., ৪।৩

৬৫	গীতা, ১৩।২৯

৬৬	আমার ভক্তদের যে ভক্ত, সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

৬৭	শ্রীরামকৃষ্ণের।

৬৮	স্বামীজী তাঁহার মার্কিন ভক্ত মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে এই নামে ডাকিতেন।

৬৯	দুর্বল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

৭০	যদি বল ব্রহ্ম আত্মা আছেন তো অস্তিই হইবে, আর যদি বল ব্রহ্ম আত্মা নাই তো নাস্তিই হইয়া যাইবে।

৭১	পিঞ্জর হইতে সিংহের ন্যায় জগজ্জাল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যায়।

৭২	তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য, তাহারা কি প্রণালীতে—কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

৭৩	সহস্রদ্বীপোদ্যানে প্রদত্ত স্বামীজীর উপদেশগুলি 'Inspired Talks' (দেববাণী) নামে লিপিবদ্ধ; সেগুলির তারিখ ১৯ জুন থেকে ৫ অগষ্ট। ১৮ জুন থেকে ৬ অগষ্ট পর্যন্ত স্বামীজী এখানে ছিলেন, কিন্তু এই কালে লেখা অনেকগুলি চিঠিতে নিউ ইয়র্কের স্থায়ী ঠিকানাই আছে।

৭৪	গীতা, ৫।১৯

৭৫	Mrs. Dora Rosthlesberger স্বামীজীর সঙ্গে দুই ভগিনী মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস স্টার্জিস-এর পরিচয় করিয়ে দেন।

৭৬	নিউ হ্যাম্পশায়ারে মিঃ লেগেটের ক্যাম্প। সেখান থেকে স্বামীজী Thousand Island Park-এ যান।

৭৭	Miss Alberta Sturgis—মিসেস স্টার্জিসের কন্যা।

৭৮	মিসেস স্টার্জিসের পুত্র হলিস্টার ও কন্যা অ্যালবার্টা তখন জার্মানীতে পড়াশুনা করিতেছিল।

৭৯	স্বামীজীর উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে এই সময়ে (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) পাক্ষিক (পরে মাসিক) ইংরেজী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম ‘ব্রহ্মবাদিন্’, ইহার মটো— ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’।

৮০	এইকালে রচিত স্বামীজীর 'Song of the Sannyasin' নামক বিখ্যাত কবিতা ‘ব্রহ্মবাদিন্’, পত্রের ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫)

	প্রকাশিত হয়।
৮১	প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।
৮২	খেতড়ির মহারাজা।
৮৩	এই সময়ে স্বামীজী একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন।
৮৪	Miss Margaret Noble (পরে ভগিনী নিবেদিতা)
৮৫	এরূপ একজন লোক বলে তো নিজেকে জাহির করি না।
৮৬	কাজকর্ম তৎপরতার সহিত করিতে হয়।
৮৭	Britannia?
৮৮	প্রত্যেক ধর্ম সত্যের এক-একটি প্রকাশ, সেই একই সত্যকে প্রকাশ করিবার এক-একটি ভাষা, এবং আমাদিগকে প্রত্যেক নরনারীর সহিত তাহার নিজ ভাষায় কথা কহিতে হইবে।
৮৯	ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব মহাশয়, আমরা আপনাকে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের —তম জন্মোৎসবে আমাদের সহিত যোগদানের জন্য সানন্দে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই পুণ্যদিনের অনুষ্ঠানের জন্য এবং আলমবাজারের মঠ পরিচালনার জন্য অর্থের একান্ত আবশ্যক। আপনি যদি মনে করেন যে, এই উদ্দেশ্যটি আপনার সহানুভূতির যোগ্য; তবে এই মহৎ কার্যে আপনার সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইব। (স্থান) (তারিখ) ভবদীয় বিনয়াবনত (নাম)
৯০	তাঁর জীবনচরিত যে-কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না, বা তা অনুমোদন করো না।
৯১	তিনি নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা।
৯২	ঠিক এইভাবে লেখা স্বামীজীর কোন পুস্তক নাই, তবে এই সময়ের অনেক বক্তৃতায় (বিশেষতঃ ১৮৯৬ খ্রীঃ লণ্ডন-বক্তৃতামালায়) এই তত্ত্বগুলির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।
৯৩	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।
৯৪	তোমাদের একটু কাজ-চালানর বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। এখন তোমাদের চাই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। সেজন্য সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতা এবং শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন। আমি প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিনাটিভাবে ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠাব, কাল ইংলণ্ড যাত্রা করছি। তোমাদের আমি সঙ্ঘবদ্ধ সুন্দর কর্মীতে পরিণত করবই।
৯৫	সকলকে জোর করে ঐ ভাবটা গেলাবার চেষ্টা ম-এর আছে। কিন্তু তাতে আমরা একটা ছোট সম্প্রদায়ে পরিণত হব। তোমরা এ-সকল প্রয়াস থেকে পৃথক্ থাকবে। অথচ যদি লোকে তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করে, ক্ষতি নাই। তাদের উৎসাহও দিও না, নিরুৎসাহও করো না। সাধারণ মানুষ চিরকাল ব্যক্তিই চাইবে, উচ্চশ্রেণীরা তত্ত্বটি গ্রহণ করবে। আমরা দুই-ই চাই, কিন্তু তত্ত্ব সার্বভৌম, ব্যক্তি নহে। সুতরাং তাঁর প্রচারিত তত্ত্বগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক; এখন লোকে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যা খুশী ভাবুক না কেন। সর্বপ্রকার বিবাদ, ঈর্ষা ও গোঁড়ামির বিরাম হোক; এগুলি থাকলে সব পণ্ড হবে। 'যে প্রথম আছে, সে শেষে যাবে; যে শেষে আছে, সে প্রথম হবে।'
৯৬	শ্রীরামকৃষ্ণের।
*	পত্রটির এই পর্যন্ত ইংরেজীর অনুবাদ।

৯৭	Frankincense—ধূপধুনাজাতীয় সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে স্বামীজী কখনও কখনও সস্নেহে এই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।
৯৮	প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া দিত, তাহাকে 'সাকি' বলা হইত। হাফেজ, ওমর খৈয়ম প্রভৃতির কবিতায় এই শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।
৯৯	স্বামীজী তখন সুইজরলণ্ডে থাকিলেও ইহা তাঁহার ইংলণ্ডের স্থায়ী ঠিকানা।
১০০	সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥
১০১	Mr. Landsberg.
১০২	জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। গীতা—৫।৩
১০৩	আত্মানং চেদ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৪।১২
১০৪	মনুষ্যাণাংসহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ গীতা—৭।৩
১০৫	তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। —মুণ্ডক উপ., ২।২।৫
১০৬	সন্ন্যাসী।
১০৭	ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটি উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্রের মধ্যে (খুব সরু পথে) প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ।—বাইবেল
১০৮	Prabuddha Bharata.
১০৯	কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে কণ্ব মুনির আশীর্বাদের ভাবার্থ।
১১০	১৮৯৬ খ্রীঃ ডাঃ ব্যারোজ ভারতে বক্তৃতা দিতে আসিলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট অনুরোধ করিয়া স্বামীজী যে পত্র দেন, ইহা তাহারই কিয়দংশ।
১১১	স্বামী অভেদানন্দ।
১১২	Socialist—সোশ্যালিজম্-মতবাদী। এই মতাবলম্বীরা রাষ্ট্রের হস্তে ভূমি ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্ব অর্পণ করে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিষম বৈষম্য আছে, তা যথাসম্ভব দূর করে সমাজের আমূল পুনর্গঠনের পক্ষপাতী।
১১৩	'Book of Job'—Old Testament: শয়তান একবার ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথা হইতে আসিতেছ?' শয়তান বলিয়াছিল, 'এই পৃথিবীর এধার ওধার ঘুরিয়া এবং ইহার উপরে নীচে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি।'
১১৪	প্রত্যাশিত পুত্রের পরিবর্তে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই স্বামীজী এ কথা উল্লেখ করেছেন।
১১৫	শ্রীমতী সরলা ঘোষাল।
১১৬	Patrick, প্যাট্রিক—আইরিশম্যান (চলিত ভাষায়)।
১১৭	বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ লইয়া আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে হইবে।
১১৮	আমার সমানধর্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন; কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুল—'মালতী-মাধব', ভবভূতি।
১১৯	মূল পত্রে স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে 'মঠ, আলমবাজার' লিখিত আছে।

১২০	স্বামীজী Mill কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'পেষা'র উপুর কৌতুক করে ইংরেজীতে এই কথা বলেছেন, অর্থাৎ তারা ধীরে সুস্থে আপন কাজ সমাধা করছে।
১২১	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের হীরক-জয়ন্তী—ষাট বর্ষপূর্তি।
১২২	যে যোগাগ্নিময় দেহ লাভ করেছে, তার রোগ জরা মৃত্যু কিছুই নেই।—শ্বে. উপ., (২।১২)
১২৩	আলমবাজার মঠ।
১২৪	স্বামী অখণ্ডানন্দের উদ্যমে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য।
১২৫	এই অনুচ্ছেদটি বাঙলায় লিখিত।
১২৬	ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়; যেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়।
১২৭	চিঠিখানি আম্বালা হইতে লিখিত; কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে 'বেলুড়' লিখিত আছে, তখন আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে স্থানান্তরিত হইবার কথা চলিতেছে।
১২৮	প্রতিলিপি দ্রষ্টব্যঃ বানান চিঠির মত রাখা হইল।
১২৯	পত্রের এই পর্যন্ত ইংরেজীতে, পরবর্তী অংশ বাঙলায় লিখিত।

পাদটীকা - কবিতা (অনুবাদ)

১	The Song of the Sannyasin: ১৮৯৫, জুলাই Thousand Island Park-এ রচিত। অনুবাদঃ স্বামী শুদ্ধানন্দ।
২	To the Awakened India: ১৮৯৮, অগষ্ট 'Prabuddha Bharata' পত্রিকা মান্দ্রাজ হইতে আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে রচিত। অনুবাদঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।
৩	Kali the Mother: কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী দর্শনের পর ১৮৯৮, সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে লিখিত। অনুবাদঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪	My Play is Done: ১৮৯৫, বসন্তকালে নিউ ইয়র্কে লিখিত। অনুবাদঃ প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫	No One to Blame: ১৮৯৫, ১৬ মে নিউ ইয়র্কে লিখিত। অনুবাদঃ স্বামী জীবানন্দ।
৬	Hold on Yet a While, Brave Heart: খেতড়ি-মহারাজকে লিখিত। অনুবাদঃ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য।
৭	Angels Unawares: ১৮৯৮, নভেম্বর কলিকাতায় লিখিত। অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
৮	Thou Blessed Dreams: ১৯০০, ১৭ অগষ্ট প্যারিস হইতে ভগিনী ক্রিষ্টিনকে লিখিত। অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
৯	To An Early Violet: ১৮৯৬, ৬ জানুআরী নিউ ইয়র্ক হইতে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যাকে লিখিত। অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
১০	Who Knows How Mother Play: অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ
১১	The Cup: অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ
১২	The Living God: ১৮৯৭, ৯ জুলাই আলমোড়া হইতে মেরী হেলকে লিখিত পত্রের অংশ। অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
১৩	Light: ১৯০০, ২৬ ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত। অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
১৪	'Requiescat in Pace': ১৮৯৮, অগষ্ট স্বামীজীর শিষ্য গুডউইনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত ও শোকার্ত জননীর নিকট প্রেরিত। অনুবাদঃ কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৫	A Benediction: ১৯০০, ২২ সেপ্টেম্বর ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত। অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
১৬	To the Fourth of July: আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৮৯৮, ৪ জুলাই কাশ্মীরে রচিত। অনুবাদঃ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য।
১৭	Peace: ১৮৯৯, রিজলী ম্যানর, নিউ ইয়র্কে রচিত। অনুবাদঃ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য।
১৮	Song of the Free: ১৮৯৫, ১৫ ফেব্রুআরী নিউ ইয়র্কে মেরী হেলকে লিখিত। অনুবাদঃ কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৯	To My own Soul: রচনার স্থান ও কাল অজ্ঞাত
২০	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ২৫. ৯. ১৮৯৪ তারিখে লেখা পত্রের মধ্যে স্বামীজীর সংস্কৃত রচনা। অনুবাদকঃ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
অষ্টম খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

এই খণ্ডে ‘পত্রাবলী’ শেষ হইল (১৮৯৭ সেপ্টেম্বর—১৯০২ জুলাই)। যথাসম্ভব সময়ানুক্রমে সাজাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ১২ খানি পত্র পরিশিষ্টে দিতে হইল, সেগুলি বিভিন্ন বৎসরের।

পত্রাবলীর পর এই খণ্ডে ‘মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ’ সন্নিবেশিত হইয়াছে; ‘উদ্বোধন’ হইতে প্রকাশিত ঐ নামের পুস্তকে যে বক্তৃতাগুলির অনুবাদ গ্রথিত, সেগুলির সঙ্গে ‘কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা’ বক্তৃতার অনুবাদ, ‘বুদ্ধের বাণী’ ‘মহম্মদ’-বিষয়ক বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, ‘পওহারী বাবা’ প্রবন্ধের অনুবাদ, এবং বিখ্যাত 'My Master' বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ ‘মদীয় আচার্যদেব’ সংযোজিত হইল। তদুপরি এই গ্রন্থে আলোচিত মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। ‘গীতা’ বিষয়ক বক্তৃতা-তিনটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত শিক্ষা, সেগুলি ‘গীতা-প্রসঙ্গ’ নামে এই খণ্ডের শেষে যুক্ত হইল।

তথ্যপঞ্জীতে প্রথমে মহাপুরুষ-প্রসঙ্গের পরে সমগ্র পত্রাবলীর অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জী প্রদত্ত হইল। পত্রাবলীর সূচীপত্রে (বর্তমান গ্রন্থাবলীর তিন খণ্ডে প্রকাশিত) ক্রমিক সংখ্যানুসারে যথাসম্ভব সকল পত্রের তারিখ, কোথা হইতে, কাহাকে ও কি ভাষায় লিখিত—সকল তথ্য তালিকাকারে সজ্জিত হইয়াছে। আশা করি, অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই খণ্ড প্রকাশযোগ্য করিবার জন্য যাঁহারা আমাদের সামান্যভাবেও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। মেরী লুই বার্ক লিখিত 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' হইতে আমরা বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক ব্যয় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই খণ্ডের জন্য যাঁহারা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা ছোট বড় সকলের নিকট সমাদৃত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকাশক

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
জানুআরি, ১৯৬৩

পত্রাবলী (পূর্বানুবৃত্তি)

পত্রাবলী ৩৭৫-৩৮৪

৩৭৫*

শ্রীনগর, কাশ্মীর
১ অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়া মার্গ, ১

অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মত অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও, সে-ই সমগ্র বাড়ীর রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, এই হল নেতৃত্বের মূল রহস্য। ... অনুভব করে সত্য, কিন্তু জনকয়েকেই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যের প্রতি অন্তরের প্রেম, প্রশংসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, তাই একজনকে অপরের অপেক্ষা ভাব প্রচারে অধিক সাফল্য দান করে।

তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও করব না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভূস্বর্গ ছাড়া অন্য কোন দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনও মন খারাপ হয়নি। সম্ভব হলে, রাজাকে রাজী করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখানে অনেক কিছু করবার আছে—আর উপকরণও এত আশাপ্রদ!

বড় অসুবিধা এইঃ আমি দেখতে পাই—অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমাকে অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তাহলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। নিজের গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত নয়—এমন লোকও আছে, যারা এরূপ প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশী সম্ভব লোকের উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে গণ্ডীর বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন ব্যক্তির গণ্ডীর বাইরে। আমার বিশ্বাস তুমি একথা বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, অপরের শ্রদ্ধাকে তিনি পশুর মত নিজের কাজে লাগাবেন, আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিষ, আবার প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'—তেমনি আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয় উৎপাটিত করতে পারি। এ প্রেমে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু কোন বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্তু চেতনে পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ এই হল আমাদের বেদান্তের সার কথা। একই সদ্বস্তু অজ্ঞানীর চক্ষে 'জড়' এবং জ্ঞানীর চক্ষে 'ভগবান্' বলে প্রতিভাত হন এবং জড়ের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয় লাভ—তাই হল সভ্যতার ইতিহাস। অজ্ঞানীরা নিরাকারকেও সাকাররূপে দেখে, জ্ঞানী সাকারেও নিরাকার এর দর্শন পান। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যে আমরা শুধু এই শিক্ষাই পাচ্ছি। ... অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। 'বজ্রের মত দৃঢ় অথচ কুসুমের মত কোমল'—এটিই হচ্ছে সার নীতি।

চিরস্নেহশীল সত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৭৬

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

মরী
১০ অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হইতে গত পরশু সন্ধ্যাকালে মরীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল। কেবল কেষ্টলাল ও গুপ্তের মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়াছিল—তাহাও সামান্য। এই Address (অভিনন্দনটি) খেতড়ির রাজার জন্য পাঠাতে হইবে—সোনালি রঙে ছাপাইয়া ইত্যাদি। রাজা ২১।২২ অক্টোবর নাগাদ বোম্বে পৌঁছিবেন। বোম্বেতে আমাদের কেহই এক্ষণে নাই। যদি কেহ থাকে, তাহাকে এক কপি পাঠাইয়া দিবে—যাহাতে সেই ব্যক্তি রাজাকে জাহাজেই ঐ Address প্রদান করে বা বোম্বে শহরেতে কোথাও। উত্তম কপিটি খেতড়িতে পাঠাইবে। একটি মিটিং-এ (সভাতে) ঐটি পাস করিয়া লইবে। যদি কিছু বদলাইতে ইচ্ছা হয়, হানি নাই। তাহার পর সকলেই সহি করিবে; কেবল আমার নামের জায়গাটা খালি রাখিবে—আমি খেতড়ি যাইয়া সহি করিব। এ বিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়। যোগেন কেমন আছে পত্রপাঠ লিখিবে—লালা হংসরাজ সাহানি, উকিল, রাওলপিণ্ডির ঠিকানায়। রাজা বিনয়কৃষ্ণের তরফের Address (অভিনন্দন)-টা দুদিন নয় দেরী হবে— আমাদেরটা যেন পৌঁছায়।

এইমাত্র তোমার ৫ তারিখের পত্র পাইলাম। যোগেনের সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং আমার এই চিঠি পাইবার পূর্বেই হরিপ্রসন্ন বোধ হয় আম্বালায় পৌঁছিবে। আমি তাহাদিগকে ঠিক ঠিক advice (নির্দেশ) সেখানে পাঠাইব। মা-ঠাকুরাণীর জন্য ২০০ টাকা পাঠাইলাম—প্রাপ্তিস্বীকার করিবে। ... ভবনাথের স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই কেন লিখ নাই। তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে কি?

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসূরীর নিকট বা অন্য কোন central (কেন্দ্রস্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হতে দু-তিন জন এসে জায়গা select (পছন্দ) করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাবেন। আমার selection (পছন্দ) তো এক আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। বাকী আর যে যে এ বিষয়ে বোঝে—পাঠাবে। ভাব এই যে, খুব ঠাণ্ডাস্থানেও কাজ নাই, আবার গরমও হয় না। দেরাদুন গরমিকালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসূরী itself (খাস মসূরী) শীতকালে বোধহয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গাড়োয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গার বারমাস জল চাই নাইবার-খাবার জন্য। এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়ার তোমার খরচ চেয়ে পাঠিয়ে চিঠি লিখছেন। তাঁর সঙ্গে সমস্ত ঠিকানা করবে।

আমার plan (পরিকল্পনা) এক্ষণে এই—নিরঞ্জন, লাটু, দীনু এবং কৃষ্ণলালকে জয়পুর পাঠাই; আমার সঙ্গে কেবল অচু আর গুপ্ত। মরী থেকে রাওলপিণ্ডি, তথা হতে জম্মু, সেখান হতে লাহোর, তারপর একেবারে করাচি তথা হতে। আমি এখান হইতেই মঠের জন্য collection (অর্থসংগ্রহ) আরম্ভ করিলাম। যেখান হতে তোমার নামে টাকা আসুক না, তুমি মঠের ফণ্ডে জমা করিবে ও দুরস্ত হিসাব রাখিবে। দুটো ফণ্ড আলাদা—একটা কলিকাতার মঠের জন্য, আর একটা famine work etc. (দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য ইত্যাদি)। আজ সারদা ও গঙ্গার দুইটি চিঠি পাইলাম। কাল তাদের চিঠি লিখব। আমার বোধহয় সারদাকে ওখানে না পাঠিয়ে Central Province (মধ্যপ্রদেশ)-এ পাঠান ভাল ছিল। সেখানে সাগরে ও নাগপুরে আমার অনেক লোক আছে—ধনী ও পয়সা-দেনেওয়ালা ইত্যাদি। যাহা হউক, আসছে নভেম্বরে সব হবে। আজ বড় তাড়া। এখানেই শেষ।

শশীবাবুকে আমার বিশেষ আশীর্বাদ ও প্রণয় দিও। মাষ্টার মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে নেমেছেন দেখছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি জেগেছেন দেখে আমার বুক দশহাত হয়ে উঠল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখছি। অলমিতি —ওয়া গুরুকী ফতে—To work! To work! (কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও)। তোমার সব চিঠিপত্র পেয়েছি। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৭৭

[স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত]

মরী
১০ অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। Unpopular (অপ্রিয়) লোককে যদি popular (লোকপ্রিয়) করতে পার, তবেই বলি বাহাদুর। পরে ওখানে কোন কার্য হইবার আশা নাই। তদপেক্ষা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, নভেম্বরে যে work close (কাজ বন্ধ) হইবে, সেই মঙ্গল। শরীর যদি খারাপ বেশী হয় তো চলিয়া আসিবে। Central Province-এ (মধ্যপ্রদেশে) অনেক field (কার্যক্ষেত্র) আছে এবং famine (দুর্ভিক্ষ) ছাড়াও

আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি? যেখানে হউক একটা ভবিষ্যৎ বুঝে বসতে পারলেই কাজ হয়। যাহা হউক, দুঃখিত হইও না।

যাহা করা যায়, তাহার নাশ নাই—কখনও নহে; কে জানে ঐখানেই পরে সোনা ফলিতে পারে।

আমি শীঘ্রই দেশে কার্য আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় বেড়াবার আবশ্যক নাই। শরীর সাবধানে রাখিবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

৩৭৮

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

মরী
১০ অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লম্বা প্ল্যানে এখনও কাজ নাই, যাহা under existing circumstances possible (বর্তমান অবস্থায় সম্ভব) হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে ক্রমে the way will open to you (তোমার পথ খুলিয়া যাইবে)। Orphanage (অনাথাশ্রম) অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মেয়েটিকেও ছাড়া হবে না। তবে মেয়ে Orphanage-এর (অনাথাশ্রমের জন্য) মেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাই, আমার বিশ্বাস '—' মা এই বিষয়ে কাজ করতে বেশ পারবেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোন বৃদ্ধা বিধবাকে এ কার্যে ব্রতী করাও, যাঁর ছেলেপুলে নাই। তবে ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। সেভিয়ার সাহেব এ কার্যের জন্য তোমায় টাকা পাঠাইতে রাজী। তাঁহার ঠিকানা Nedon's Hotel, লাহোর। যদি তাঁকে চিঠি লেখ, উপরে লিখিবে 'To wait arrival' (আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে)। আমি শীঘ্রই কাল বা পরশু রাওলপিণ্ডি যাইতেছি, পরে জম্মু হইয়া লাহোর ইত্যাদি দেখিয়া করাচি প্রভৃতি হইয়া রাজপুতানায় আসিব।

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন মাথায় তুলে রাখ।

বি

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া। 'স ঈশঃ অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ'—তবে 'প্রকাশ্যতে কাপ্পি পাত্রে'২—এই স্থলে এই বলা উচিত, 'সঃ প্রত্যক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপঃ'—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু! বেদ, কোরান, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান্ দয়া-প্রেমের পুজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেও না। অভীঃ, অভীঃ। লোক না পোক! হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৭৯

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

মরী
১১ অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হতে আজ দশ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ যেন একটা ঝোঁকে করেছি বলে মনে হচ্ছে। সেটা শরীরের রোগ হোক বা মনেরই হোক। এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই। ... তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি, বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেউ নেই যে সব সইবে। তোমার উপর অধিক অধিক কটু ব্যবহার করেছি; যা হবার তা হয়েছে—কর্ম! আমি অনুতাপ কি করব, ওতে বিশ্বাস নাই—কর্ম! মায়ের কাজ আমার দ্বারা যতটুকু হবার ছিল ততটুকু করিয়ে শেষ শরীর মন চুর করে ছেড়ে দিলেন 'মা'। মায়ের ইচ্ছা!

এক্ষণে আমি এ সমস্ত কাজ হতে অবসর নিলাম। দু-এক দিনের মধ্যে আমি সব ছেড়ে দিয়ে একলা একলা চলে যাব; কোথাও চুপ করে বাকী জীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে হয় কর, যা ইচ্ছে হয় কর। মিসেস বুল বেশী টাকা দিয়েছেন। শরতের ওপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ কর, যা হয় কর। তবে আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র, আর বজ্রের মত অটল চাই। আমি ঐ রকম মরব। সেইজন্য আমার কাজটি করে দিও—হারা-জিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছপাও হইনি; এখন কি ... হব? হার-জিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাষ যে কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে? আমার চোখে এ সংসার খেলামাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান-অপমান দু-টাকা লাভ-লোকসান নিয়ে কি ছমাস ভাবতে হবে? ... আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে—ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন তো উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়-ডর করে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা, আমি—সব অত সিদ্ধি নিশ্চিত করে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয়তো গুরুদেব যা বলতেন যে, 'কাক বড় স্যায়না—' তার তাই হয়। আর যাই হোক, এ-সব টাকা-কড়ি, মঠ-মড়ি, প্রচার-ফ্রচার কি জন্য? সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য—শিক্ষা। তাছাড়া ধন-বাড়ী স্ত্রী-পুরুষ প্রয়োজন কি?

এজন্য টাকা গেল, কি হার হল—আমি অত বুঝতে পারি না বা পারব না। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে, 'কুছ পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি' ... তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যেগুলো খালি 'বাপ রে এগিও না, ওই ভয়'—ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কখনও আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষদের আর কি বলব, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনও কোন কাজ থেকে হঠেননি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেননি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে ভিন্‌ভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ, আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দু-ই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে ,'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে না মরতে হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই! ... 'উৎপৎস্যতেঽস্মি মম কোঽপি সনামধর্ম'—এই ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বুঝবে।

'জাগো বীর ঘুচিয়ে স্বপন; শিয়রে শমন, ... তাহা না ডরাক তোমা'—যা কখনও করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি ... তাই হবে? ... হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ; কিন্তু না লড়েই হারব?

'জাগো বীর ঘুচিয়ে স্বপন; শিয়রে শমন, ... তাহা না ডরাক তোমা'—যা কখনও করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি ... তাই হবে? ... হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ; কিন্তু না লড়েই হারব?

তারা! মা! ... একটা তাল ধরবার মানুষ নেই; আবার মনে মনে খুব অহঙ্কার, 'আমি সব বুঝি'। ... আমি এখন চললাম; সব তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন—যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত। ... আমার এখন 'ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে' আমি চাই তড়িঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।

সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব? আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে। … আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article (প্রবন্ধ) লিখেছি। সব ... ভাল নইলে বৈরাগ্য হইবে কেন? ... শেষটা কি মা আর আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার অনেক অপরাধ—যা হয় কর।

আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—মা যেন মহাশক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, 'অভয়প্রতিষ্ঠং' অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই দেখলাম, যে সদা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অপমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে সর্বদা খোয়ায়। ... তোমাদের সব কল্যাণ হোক। অলমিতি।

বিবেকানন্দ

৩৮০*

মরী

১১ অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় জগমোহনলাল,

... আমি জয়পুরে যে তিন জন সন্ন্যাসীকে পাঠাচ্ছি, তাদের দেখাশোনা করবার জন্য—আপনি বোম্বে যাবার পূর্বে—কাউকে বলে যাবেন। তাদের খাবার ও থাকার একটি ভাল জায়গার ব্যবস্থা করবেন। আমি সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে। তারা সরল মানুষ—পণ্ডিত নয়। তারা আমারই লোক, একজন আমার গুরুভ্রাতা। যদি তারা চায়, তাদের খেতড়িতে নিয়ে যেতে পারেন, আমি শিঘ্রই সেখানে যাব। এখন চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই বছর বেশী বক্তৃতাও করব না। এই সমস্ত হট্টগোলে আমার আর কোন আস্থা নেই, এতে কার্যক্ষেত্রে কোন কল্যাণই সাধিত হয় না। কলিকাতায় আমার প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য আমাকে নীরবে চেষ্টা করতে হবে; আমি তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে চুপচাপ ঘুড়ে বেড়াচ্ছি।

আশীর্বাদ সহ আপনার
বিবেকানন্দ

৩৮১

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

মরী
১২ অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কল্যকার পত্রে সবিশেষ লিখিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে বিশেষ বিশেষ direction (নির্দেশ) আবশ্যক বোধ করিতেছি। ... (১) যে যে ব্যক্তি টাকা যোগাড় করিয়া পাঠাইবে … তাহারা acknowledgement (প্রাপ্তিস্বীকার) মঠ হইতে পাইবে। (২) Acknowledgement দুইখানা—একখানা তার, অপরখানা মঠে থাকিবে। (৩) একখানা বড় খাতায় তাদের সকলের নাম ও ঠিকানা entered (লিপিবদ্ধ) থাকিবে। (৪) মঠের ফণ্ডে যে টাকা আসিবে, তাহার যেন কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব থাকে এবং সারদা প্রভৃতি যাহাকে যাহা দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাছ হতে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব লওয়া চাই। হিসাবের অভাবে ... আমি যেন জোচ্চোর না বনি। ঐ হিসাব পরে publish (ছাপিয়া বাহির) করিতে হইবে। (৫) পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজেষ্ট্রী করে নিয়ে এস যে, in case (যদি) আমি তুমি মরে যাই তো হরি এবং শরৎ আমাদের মঠের যা কিছু আছে, সব পাবে।

আম্বালা হইতে এখনও কোন সংবাদ পাই নাই—হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি পৌছিয়াছে কিনা। অপরার্ধ মাষ্টার মহাশয়কে দিও। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৮২*

[‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’কার ‘শ্রীম’কে লিখিত]

C/o লালা হংসরাজ
রাওলপিণ্ডি
১২ অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—

C'est bon mon ami (বেশ হচ্ছে, বন্ধু)—এখন আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। হে বীর, আত্মপ্রকাশ করুন। জীবন কি নিদ্রাতেই অতিবাহিত হবে? সময় বয়ে যায়। সাবাস্, এই তো পথ।

আপনার পুস্তিকা প্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ; শুধু এই পুস্তিকার আকারে খরচ পোষাবে কিনা তাই ভাবছি। ... লাভ হোক বা নাই হোক গ্রাহ্য করবেন না, তা দিনের আলোতে বেরিয়ে আসুক! এজন্য আপনার উপর যেমন অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হবে, তেমনি ততোধিক অভিশাপও আসবে—চিরন্তন ধারাই এই।

এই তো সময়!

ভগবদাশ্রিত

৩৮৩*

জম্মু
৩ নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবেল্,
… অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে; 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি'—এই হবে মূল মন্ত্র।

আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে, বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি একটুকরা রুটি পাই নিশ্চয় জেন তুমি তার সবটুকুই পাবে। আমি কাল লাহোরে যাচ্ছি; সেখানে পৌঁছে স্টার্ডিকে চিঠি লিখব। কাশ্মীরের মহারাজের কাছ থেকে কিছু জমি পাবার আশায় গত পনর দিন আমি এখানে আছি। যদি এদেশে থাকি তো আগামী গ্রীষ্মে আবার কাশ্মীর যাব এবং সেখানে কিছু কাজ শুরু করব ভাবছি।

আমার অফুরন্ত স্নেহ জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৮৪

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

লাহোর
১১ নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,
লাহোরে লেকচার একরকম হইয়া গেল। দু-এক দিনের মধ্যেই দেরাদুন যাত্রা করিব। তোমাদের সকলের অমত এবং অন্যান্য অনেক বাধাবশতঃ সিন্ধুযাত্রা এখন স্থগিত রহিল। আমার দুইখানি বিলাতী চিঠি কে রাস্তায় খুলিয়াছে। অতএব আমার চিঠিপত্র এক্ষণে আর পাঠাইবে না। খেতড়ি হইতে লিখিলে পাঠাইবে। যদি উড়িষ্যায় যাও তো এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাও যে, কোন ব্যক্তি তোমার প্রতিনিধি হইয়া সমস্ত কার্য করে—যথা হরি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমি প্রতিদিন আমেরিকা হইতে টাকার অপেক্ষা করিতেছি।

হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার জন্য বলিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় হইয়া গিয়াছে।

এখানে সম্ভবতঃ সদানন্দ ও সুধীরকে ছাড়িয়া যাইব একটি সভা স্থাপন করিয়া। এবারে লেকচারাদি আর নয়—একেবারে হুড়মুড় রাজপুতানায় যাচ্ছি। মঠ না করে আর কথা নয়। শরীর regular exercise (নিয়মিত ব্যায়ম) না করিলে কখনও ভাল থাকে না, বকে-বকেই যত ব্যারাম ধরে, ইহাই নিশ্চিত জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৮৫

[শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত]

লাহোর
১৫ নভেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,,
মা, বড় দুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ যাত্রায় সিন্ধুদেশে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিল না। প্রথমতঃ ক্যাপ্টেন এবং মিসেস সেভিয়ার যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত প্রায় আজ নয় মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা দেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটি অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া ঐ কার্য আরম্ভ করিয়া দিই, তজ্জন্য দেরাদুন না যাইলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়—তাহার কিছু করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোক বরং পূর্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি!! তাহার ওপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব; কারণ রাসমণির বাগানের মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দেবেন না!! অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দু-চারটি বন্ধুবান্ধব আছে, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই সকল কারণের জন্য আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ যাত্রা স্থগিত রাখিলাম। রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়াড় হইয়া আসিবার বিশেষ চেষ্টা করিব।তুমি দুঃখিত হইও না। আমি একদিনও তোমাদের ভুলি না, তবে কর্তব্যটা প্রথমেই করা উচিত। কলিকাতায় একটি মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখে-কষ্টে কাজ করিলাম সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়। আজই দেরাদুনে চলিলাম—সেথায় দিন সাত থাকিয়া রাজপুতানায়, তথা হইতে কাথিয়াওয়াড় ইত্যাদি।

সাশীর্বাদং
বিবেকানন্দ

৩৮৬

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

লাহোর
১৫ নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,
বোধ হয় তোমার ও হরির শরীর এক্ষণে বেশ আছে। লাহোরে খুব ধুমধামের সহিত কার্য হইয়া গেল। এক্ষণে ডেরাদুনে চলিলাম। সিন্ধুযাত্রা স্থগিত রহিল। দীনু, লাটু ও কৃষ্ণলাল জয়পুরে পৌঁছিয়াছে কিনা, এখনও কোন সংবাদ নাই। এখান হইতে মঠের খরচের জন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় চাঁদা আদায় করিয়া পাঠাইবেন। রীতিমত রসিদ তাহাকে দিও। মরী, রাওলপিণ্ডি ও শিয়ালকোট হইতে কিছু পাইয়াছ কিনা লিখিবে।

এ পত্রের জবাব C/o Post Master, Dehra Dun লিখিও। অন্য চিঠি আমি দেরাদুন হইতে পত্র লিখিলে পর পাঠাইবে। আমার শরীর বেশ আছে। তবে রাত্রে দু-একবার উঠিতে হয়। নিদ্রা উত্তম হইতেছে। খুব লেকচার করিলেও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, আর exercise (ব্যায়াম) রোজ আছে। ভাত তো আজ ৩ মাস রোজ খাই, কিন্তু কোন গোল নাই। এইবার উঠে-পড়ে লাগ। সেই বড় জায়গাটার উপর চুপিসাড়ে চোখ রাখ। এবার মহোৎসব যাতে সেথায় হয়, তার বিধিমত চেষ্টা করা যাচ্ছে। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি ৩

বিবেকানন্দ

পুঃ—মাষ্টার মহাশয় যদি আমাদের work (কাজকর্ম) সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ‘ট্রিবিউন’-এ লেখেন তো বড়ই ভাল হয়। তা হলে লাহোরটা আর জুড়ায় না। এখন তো খুব তেতেছে। টাকা-কড়ি একটু হিসাব করে খরচ কর; তীর্থযাত্রাটা নিজের নিজের উপর, প্রচারাদি মঠের ভার।

৩৮৭

[শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত]

দেরাদুন
২৪ নভেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র যথাকালে পাইলাম। অবশ্যই তোমাদের দুঃখিত হইবার কারণ অনেক হইয়াছে। কি করি বল? এক্ষণে দেরাদুনে যে কার্যে আসিয়াছিলাম, তাহাও নিষ্ফল হইল—সিন্ধুদেশেও যাওয়া হইল না। প্রভুর ইচ্ছা। এক্ষণে রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়াড় দেশ হইয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া কলিকাতায় যাইব, ইচ্ছা আছে। পথে কিন্তু আর একটি বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তা যদি না হয়, নিশ্চিত সিন্ধুদেশে আসিতেছি। ছুটি লইয়া হায়দ্রাবাদে বৃথা আসা ইত্যাদিতে তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা হইয়া থাকিবে—সকলই প্রভুর ইচ্ছা। কষ্ট করিলে তার সুফল আছে নিশ্চিত। আমি আগামী শুক্রবারে এ স্থান হইতে যাইব—সাহারানপুর হইয়া একেবারে রাজপুতানায় যাইবার ইচ্ছা। আমার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ভরসা করি, তোমরাও নীরোগ শরীরে স্বচ্ছন্দে আছ। এস্থানে ও দেরাদুনের নিকট প্লেগ হওয়ায় অনেক হাঙ্গাম করিতেছে এবং আমাদের অনেকটা ব্যাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে ও হইবে। মঠের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমি যে-স্থানেই থাকি না কেন পাইব। তুমি ও হরিপদ বাবাজী আমার বিশেষ আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

সাশীর্বাদাং
বিবেকানন্দ

৩৮৮

[স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিত]

দেরাদুন
২৪ নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয়বরেষু,

তোমার সকল সমাচার হরিপ্রসন্ন ভায়ার মুখে শুনিলাম। রাখাল ও হরির শরীর এক্ষণে সারিয়াছে শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম।

এবার টিহিরীর শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ঘাড়ে একটা বেদনার জন্য অত্যন্ত ভুগিতেছেন; আমিও নিজের ঘাড়ের একটা বেদনায় অনেকদিন যাবৎ ভুগিতেছি। যদি তোমাদের সন্ধানে পুরাতন ঘৃত থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ দেরাদুনে উক্ত বাবুকে এবং খেতড়ির ঠিকানায় কিঞ্চিৎ আমাকে পাঠাইবে। হাবু, শরৎ (উকিল)-এর নিকট নিশ্চিত পাইবে। ‘দেরাদুন—N. W. P রঘুনাথ ভট্টাচার্য’ বলিলেই উক্ত বাবু পাইবেন।

আমি পরশ্ব দিবস সাহারানপুরে চলিলাম। সেথা হইতে রাজপুতানা।

ইতি বিবেকানন্দ

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা।

৩৮৯*

দেরাদুন
২৪ নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—, ৪

আপনার দ্বিতীয় পুস্তকখানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বইটি সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতঃপূর্বে আর কোন জীবনচরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক এই ভাবে নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অনুরঞ্জিত না করে প্রকাশ করেনি। ভাষাও অনবদ্য—যেমন সরস ও সতেজ, তেমনি সরল ও সহজ।

আমি যে বইটি কতটা উপভোগ করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। ঐ সব পাঠ করবার সময় আমি যেন সত্যই অন্য জগতে চলে যাই। এ বড় আশ্চর্য, নয় কি? আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক; সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও মৌলিক হতে হবে, নয় তো কিছুই না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, কেন আমাদের মধ্যে আর কেউ এর আগে তাঁর জীবনী লিখতে চেষ্টা করেনি। এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়ে ছিল। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আছেন।

অসীম ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—সক্রেটিসের কথোপকথনগুলিতে যেন প্লেটোর কথাই সর্বদা চোখে পড়ে; আপনার এই পুস্তিকায় আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন। নাটকীয় অংশগুলি সত্যই অপূর্ব। এদেশে এবং পাশ্চাত্যে প্রত্যেকেই এই বইটি পছন্দ করছে।

৩৯০

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

দিল্লী
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

মিসেস মূলার যে টাকা দিবেন বলিয়াছেন, তাহার কতক কলিকাতায় হাজির। বাকী পরে আসিবে শীঘ্রই। আমাদেরও কিছু আছে। মিসেস মূলার তোমার ও আমার নামে গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর ওখানে টাকা রাখবেন। তাতে তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র) থাকার দরুন তুমি একাই সমস্ত draw করতে (তুলতে) পারবে। ঐটি যেমন রাখা, অমনি তুমি নিজে ও হরি পাটনায় সেই লোকটিকে ধর গিয়া—যেমন করে পার influence কর (রাজী করাও); আর জমিতে যদি ন্যায্য দাম হয় তো কিনে লও। নইলে অন্য জায়গার চেষ্টা দেখ। আমি এদিকেও টাকার যোগাড় দেখছি। নিজের জমিতে মহোৎসব করে তবে কাজ—তাতে বুড়ো মরে আর চেকড়াই ছেঁড়ে। এটি তোমার মনে থাকে যেন।

এই ৮।৯ মাস তুমি যে কাজ করেছ, খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ। এইবার ধড়াধড় দেখ না—একটি মঠ ও কলিকাতায় একটি জায়গা না বানিয়ে দিয়ে তবে কাজ। কাজকর্ম, তবে খুব গোপনে। কাশীপুরের বাগানটারও তল্লাস রেখ। আমি কাল আলোয়ার হয়ে খেতড়ি যাচ্ছি। শরীর বেশ আছে ... সর্দি করেছে বটে। চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাবে। সকলকে ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—তোমাকে যে উইল করতে বলেছিলাম শরৎ ও হরির নামে তার কি হল? অথবা তুমি জায়গা ফায়গা আমার নামে কিনবে—আমি উইল ঠিক all ready (সম্পূর্ণ তৈরী) করে রাখব। ইতি

বি

৩৯১

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

খেতড়ি ৫
৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,
আমরা কাল খেতড়ি যাত্রা করিব। দেখিতে দেখিতে লটবহর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। খেতড়ি হইয়া সকলকেই মঠে পাইবার সঙ্কল্প আছে। যে-সকল কাজ এদের দ্বারা হইবে বলে মনে করেছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কেহই যে কিছু করতে পারিবে না—তাহা নিশ্চিত। স্বাধীনভাবে না ঘুরিলে ইহাদের দ্বারা কিছুই হইবে না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে থাকিলে কে ইহাদের পুঁছিবে—কেবল সময় নষ্ট। এইজন্য ইহাদের পাঠাইতেছি মঠে।

Famine (দুর্ভিক্ষ) ফণ্ডে যে টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা একটা permanent work (স্থায়ী কার্যের) ফণ্ড করিয়া রাখিয়া দিবে। অন্য কোন বিষয়ে তাহা খরচ করিবে না এবং সমস্ত famine work (দুর্ভিক্ষ-কার্য)-এর হিসাব দেখাইয়া লিখিবে যে, বাকী এত আছে অন্য good work (ভাল কাজের)-এর জন্য। ...

কাজ আমি চাই—don't want any humbug (কোন প্রতারক চাই না)। যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নেই—'যাদু, এই বেলা পথ দেখ' তারা। খেতড়ি পৌঁছিয়াই তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র)-তে সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব—যদি পৌঁছাইয়া থাকে। আমেরিকান বষ্টন ছাপওয়ালা চিঠিমাত্রই খুলিবে, অন্য কোন চিঠি খুলিবে না। আমার চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাইবে। টাকা আমি রাজপুতানাতেই পাইব, তাহার কোন চিন্তা নাই। তোমরা প্রাণপণে জায়গাটা ঠিক কর—এবার নিজের জমির উপর মহোৎসব করিতেই হইবে।

টাকাটা কি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আছে অথবা তুমি অন্য কোথাও রাখিয়া দিয়াছ? টাকাকড়ি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। হিসাব তন্ন তন্ন রাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাপকেও বিশ্বাস নাই জানিবে। ইতি

সকলকে ভালবাসা জানাইও। হরি কেমন আছে লিখিবে। মধ্যে দেরাদুনে উদাসী সাধু কল্যাণদেব ও আরও দু এক জনের সহিত সাক্ষাৎ। হৃষীকেশওয়ালারা আমাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক—'নারায়ণ হরি'র কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ

৩৯২

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

খেতড়ি

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র)-তে আজ সহি করিয়া পাঠাইলাম। ... টাকাটা যত শীঘ্র পার draw করিবে (তুলিবে) এবং করিয়াই আমাকে তার করিবে। ছত্রপুর নামে কি একটি জায়গার বুন্দেলখণ্ডী রাজা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার ওখানে হইয়া যাইব। লিমডির রাজাও ডাকিতেছেন আগ্রহ করিয়া, সেখানেও না গেলে নহে। একবার পোঁ করে কাথিয়াওয়াড় ঘুড়িয়া চলিলাম আর কি! কলিকাতায় যেতে পারিলেই বাঁচি। বষ্টনের খবর তো এখনও নাই; তবে হয়তো শরৎ টাকাটা নিজে নিয়ে আসছে। ... যাহা হউক, যেখান থেকে যা খবর আসবে, তৎক্ষণাৎ আমাকে পত্র লিখিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চঃ—কানাই কেমন আছে? শুনিতে পাই তাহার শরীর ভাল নহে। তাহার বিশেষ খবর লইবে এবং কাহারও ওপর হুকুম যেন না হয় দেখিবে। হরির ও তোমার সুস্থ সংবাদ লিখিবে।

৩৯৩*

[স্বামী শিবানন্দকে লিখিত]

জয়পুর
২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় শিবানন্দজী,

মান্দ্রাজে থাকিতেই বোম্বে গিরগাঁওয়ের যে মিঃ শেতলুরের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তিনি আফ্রিকাতে যে সকল ভারতীয় বাসিন্দা রয়েছে, তাদের আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের জন্য কাহাকেও পাঠাইতে লিখিয়াছেন। অবশ্য তিনিই মনোনীত ব্যক্তিকে আফ্রিকায় পাঠাইবেন এবং আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন।

কাজটি আপাততঃ খুব সহজ কিম্বা নির্ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ কাজে প্রত্যেক সৎলোকেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত। আপনি বোধহয় জানেন, ওখানের শ্বেতকায়েরা ভারতীয়দিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। তাই সেখানকার কাজ হচ্ছে—ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান করতে হবে, অথচ এমন ধীরভাবে, যাতে আর বিবাদের সৃষ্টি না হয়। হাতে হাতে অবশ্য একাজের ফল পাবার আশা করা যায় না; পরিণামে দেখবেন যে, আজ পর্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ করা হয়েছে, সে-সবের চেয়েও এতে বেশী উপকার হবে। আমার ইচ্ছা, আপনি একবার এতে আপনার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখুন। যদি রাজী থাকেন তবে এই পত্রের উল্লেখ করে শেতলুরকে আপনার সম্মতি জানাবেন এবং আরও খবর চেয়ে পাঠাবেন। 'শিবা বঃ সনন্ত পন্থানঃ'। আমি শারীরিক খুব ভাল নই; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতা যাচ্ছি, সেখানে শরীর সুস্থ হবে আশা করি। ইতি

ভগবৎপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৩৯৪

[শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত]

ওঁ নমঃ ভগবতে রামকৃষ্ণায়

দেওঘর, বৈদ্যনাথ
৩ জানুআরী, ১৮৯৮

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান হইয়াছি। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐসকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তৎকালীন

আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা- আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী-অতি-অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা, আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছে। পুরুষজাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায় অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক-একটির এক-একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক-এক জনের দুই তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ একপক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। যে সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা কম, তাহাদের পূর্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ-বিষয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্যদেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোন আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেটিই প্রথম অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যাবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এইঃ সমাজ এই যে-সকল নিয়ম করে, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ; আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে কৌশলে স্ব-কামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাঁহারা বলেন, অজ্ঞ বা গরীবদের স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি—'ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরি কে করিবে?'

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত!!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

৩। এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃগ্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তি-বিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্বজন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর এবং ঐটিই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছারও বিনাশ হইল; কারণ বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নামমাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধর্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত, সত্যের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে

পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপরদিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল, তাহার নাশই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মশা মারিতে মানুষ মারার মত বৌদ্ধাদি মতে দুঃখ নাশ করিতে নিজেকেও নাশ করিয়া ফেলিলাম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্ন পরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্ন পরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐরূপ (অবস্থা) মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়, যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কামভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

৫। গুরুমূর্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্তি বসাইতে হয়। এ-স্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য।

মনুষ্যে ঈশ্বর আরোপ বড়ই মুশকিল; কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক; তোমার ভক্তিতে সে ঈশ্বরত্ব-উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৩৯৫-৪০৪

৩৯৫*

[শ্রী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

মান্দ্রাজের মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা সকলেই তোমায় অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি, লোকসমাগম ভালই হইয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক খোরাকেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

তোমার অতি প্রিয় মুদ্রাদি এবং 'ক্লীফটে'র পরিবর্তে তুমি যে মান্দ্রাজের লোকদের আত্মবিদ্যা শিখাইবার জন্য অধিকতর কোমর বাধিয়া লাগিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমরা খুব খুশী হইয়াছি। শ্রীজি৬ সম্বন্ধে তোমার বক্তৃতা সত্যই চমৎকার হইয়াছিল—যদিও আমি খাণ্ডোয়ার থাকা-কালে 'মান্দ্রাজ মেল' পত্রে ছাপা উহার একটা বিবরণ একটু দেখিয়াছিলাম মাত্র, এবং মঠে তো উহার কিছুই পাই নাই। তুমি আমাদিগকে একখানি কপি পাঠাইয়া দাও না?

শুনিতে পাইলাম, আমার পত্রাদি না পাইয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছ; সত্য কি? প্রকৃতপক্ষে তুমি আমায় যত চিঠি লিখিয়াছ, আমি ইওরোপ ও আমেরিকা হইতে তোমায় তদপেক্ষা অধিক লিখিয়াছি। তোমার উচিত মান্দ্রাজ হইতে প্রতি সপ্তাহে যতটা সম্ভব খবর আমাদিগকে পাঠান। সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, প্রতিদিন একখানি কাগজে কয়েক পঙ্ক্তি ও কয়েকটি সংবাদ টুকিয়া রাখা।

কিছুকাল যাবৎ আমার শরীর ভাল যাইতেছিল না। সম্প্রতি অনেক ভাল। এখন কলিকাতায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু বেশী শীত পড়িয়াছে এবং আমেরিকা হইতে যেসব বন্ধুরা আসিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে খুব আনন্দেই আছেন। যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।

গঙ্গা এখানে আছে এবং তোমায় জানাইয়া দিতে বলিতেছি, সে যদিও 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের জনকয়েক গ্রাহক যোগাড় করিয়াছে, তথাপি কাগজ এত অনিয়মিতভাবে পৌঁছায় যে, তাহার ভয় হয়—তাহাদের সকলকে শীঘ্রই না হারাইতে হয়। তুমি জনৈক যুবকের সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছ, উহা পাইয়াছি এবং উহার সঙ্গে আছে সেই চিরন্তন কাহিনী, 'মহাশয় আমার জীবনধারণের কোনই উপায় নাই।' অধিকন্তু এই কাহিনীর মান্দ্রাজী সংস্করণে এইটুকু বেশী আছে—'আমার অনেকগুলি সন্তানও আছে।' ... আমি তাহাকে সাহায্য করিতে পারিলে খুশী হইতাম, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার হাতে টাকা নাই—আমার যাহা ছিল, তাহার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত রাজার হাতে দিয়াছি। ... যাহা হউক আমি পত্রখানি রাখালকে পাঠাইয়াছি—সে যদি কোন প্রকারে তোমার বন্ধু যুবকটিকে সাহায্য করিতে পারে। সে লিখিয়াছে যে, সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টানরা তাকে সাহায্য করিবে, কিন্তু সে তাহা করিবে না। তাহার হয়তো ভয় হইতেছে, পাছে তাহার ধর্মান্তর গ্রহণে হিন্দুভারত একটি উজ্জ্বলতম রত্নকে হারায়! ...

*

নূতন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকটা হয়রান হইয়া পড়িতেছে। সারদা দিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছে। ... হরিরও একটু হইয়াছিল। আমার মনে হয় ইহাতে তাহাদের অনেকটা মাংস ঝরিবে। ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি; হরি,

সারদা ও স্বয়ং আমাকে ওয়াল্‌ট্‌জ (waltz) নৃত্য করিতে দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে। আমি নিজেই অবাক হইয়া যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলাইয়া রাখি।

শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাসমত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে—ভাব দেখি সেই পুরানো মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড় উন্নতি! আমার পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 'ক্লীফট্', ঝাঁজ ও ঘণ্টার যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে তুমি মূর্ছা যাইবে। জন্মতিথি পূজা শুধু দিনের বেলা হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে। তুলসী ও খোকা কেমন আছে? তুমি তুলসীকে কাজের ভার দিয়া একবার কলিকাতায় আস না? কিন্তু উহা ভয়ানক খরচাসাপেক্ষ—আর তোমাকে তো ফিরিয়াও যাইতে হইবে; কারণ মান্দ্রাজের কাজটা পুরাপুরি গড়িয়া তোলা দরকার। আমি মাসকয়েক পরেই মিসেস বুলের সঙ্গে আবার আমেরিকায় যাইতেছি। গুডউইনকে আমার ভালবাসা জানাইও এবং তাহাকে বলিও, আমরা অন্ততঃ জাপানে যাইবার পথে তাহার সাথে দেখা করিব। শিবানন্দ এখানে আছেন এবং আমি তাহার হিমালয়ে চিরপ্রস্থানের প্রবল আগ্রহ কতকটা দমাইয়াছি। তুলসীও তাহাই ভাবিতেছে নাকি? আমার মনে হয়, ওখানকার বড় বড় ইঁদুরের গর্তেই তাহার গুহার সাধ মিটিতে পারে—কি বল?

এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি আরও সাহায্যের জন্য বিদেশ যাইতেছি। … শ্রীমহারাজের আশীর্বাদে ভারত বাঁচিয়া উঠিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৯৬*

[রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

মঠ, বেলুড়
২৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯৮

প্রিয় রাজাজী,

বক্তৃতার জন্য আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দিনকয়েক আগে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিল এবং তার ফলে আপনাদের সমিতির জন্য একটু সময় ঠিক করতে আমি বিশেষ চেষ্টা করছি। আমি এও বলেছিলাম যে, রবিবারে তাদের সঠিক জানাব।

একজন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমি অনেকটা ঋণী; তিনি সম্ভবতঃ দার্জিলিঙ নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছেন। জনকয়েক আমেরিকান বন্ধুও এখানে এসেছেন এবং আমি যা কিছু সময় পাই, তার সবটাই নতুন মঠ এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে নিয়োজিত হচ্ছে। তা ছাড়া আমার আশা এই যে, আগামী মাসে আমেরিকা যাত্রা করব।

আপনাকে সত্যই বলছি—আপনার এই নিমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং ফলাফল শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের মারফত রবিবারে আপনাকে জানাব।

আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৯৭*

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
মার্চ, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

আমি তোমায় দুইটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। (১) তুলসীর উচিত গুডউইনের নিকট হইতে সাঙ্কেতিক লিখন—

অন্ততঃ উহার গোড়ার জিনিষ—শিখিয়া লওয়া। (২) ভারতের বাইরে থাকা-কালে আমাকে প্রায় প্রতি ডাকে মান্দ্রাজে একখানি চিঠি লিখিতে হইত। আমি ঐ সব চিঠির নকলের জন্য লিখিয়া বিফল হইয়াছি। আমাকে ঐ সব চিঠি পাঠাইয়া দিও। আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখিতে চাই। ইহাকে অন্যথা করিও না। কাজ হইয়া গেলেই আমি ঐগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিব! 'ডন্' (Dawn) কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০ টাকা খরচ হইবে এবং দুইশত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে—ইহা একটা মস্ত খবর। 'প্রবুদ্ধ ভারত' অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; উহার সুশৃঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়া 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত না হয়। তাহার কথা আমাদের সর্বদাই মনে আছে। তাহার ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব না।

আমি ভাবিতেছি, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আবার কাশ্মীর যাইব।তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া সেখান হইতে আমেরিকা যাত্রা করিব।

মিস নোব্‌লের মতে মেয়ে সত্যি দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস বেস্যান্টকে ছাড়াইয়া যাইবে।

আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার মনে হয় সে যেন কাজে ডুবিয়া গিয়া নিজের শরীরপাত করিতেছে। তাহাকে বলিও শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এই ভাবেই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হইতে পারে। তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইও। কলিকাতায় জনসাধারণের জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল—একটি মিস নোবলের এবং অপরটি আমাদের শরতের। তাহারা দুজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। উহাতে মনে হয়, কলিকাতার জনসাধারণ আমাদিগকে ভুলিয়া যায় নাই। মঠের কাহারও কাহারও একটু সর্দিজ্বর হইয়াছিল। তাহারা সকলেই এখন ভাল। কাজ সুন্দর চলিয়া যাইতেছে। শ্রীমা এখন আছেন। ইওরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন! ... ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? প্রভু আমার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন ভয় নাই—সাহস হারাইও না, স্বাস্থ্য ঠিক রাখিও এবং কোন বিষয়ে অতি ব্যস্ত হইও না। খানিকক্ষণ জোরে দাঁড় টানিয়া তার পর দম লওয়া—ইহাই চিরন্তন পন্থা। রাখাল নূতন জমি-বাড়ি লইয়া আছে। এই বৎসরের মহোৎসবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই। ... প্রত্যেক মহোৎসব হওয়া চাই—এখানকার সকল ভাবধারার একটি অপূর্ব সমাবেশ। আমরা আগামী বৎসর এ বিষয়ে চেষ্টা করিব এবং আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৯৮*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২ মার্চ, ১৮৯৮

স্নেহের মেরী,

মাদার চার্চের কাছে লেখা চিঠিতে আশা করি আমার খবর আগেই জানতে পেরেছ। তোমরা সকলে—সমস্ত পরিবারটিই—আমার প্রতি এত সদয় যে, মনে হয় পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরই একজন ছিলাম, আমরা হিন্দুরা তো এই রকমই বলে থাকি। আমার একমাত্র আক্ষেপ যে, কোটিপতি আর জুটছে না; এই মুহূর্তে তাদের আমার খুবই প্রয়োজন; আমি সংগঠনের কাজ করতে করতে জরাজীর্ণ ও উগ্র স্বভাব হয়ে উঠছি। হ্যারিয়েট যদিও কোটিগুণসম্পন্ন একজনকে লাভ করেছে, তার সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার অর্থ-গুণ থাকলে নিশ্চয় মানাত ভাল; সুতরাং তুমি আবার যেন সেই ভুলটি করে বসো না।

কোন এক তরুণযুগলের স্বামী-স্ত্রী হবার পক্ষে সব কিছুই অনুকূল ছিল, কিন্তু কনের পিতার দৃঢ় সংকল্প যে, কোটিপতি ছাড়া কাউকে তিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন না। তরুণযুগল হতাশ হয়ে পড়ল, এমন সময় এক চতুর ঘটক এসে কার্যোদ্ধার করলে। সে বরকে জিজ্ঞেস করলে, দশ লক্ষ মুদ্রার পরিবর্তে সে তার নাসিকা দিতে প্রস্তুত কিনা। সে বললে, না। ঘটকটি তারপর কন্যার পিতার সামনে শপথ করে বললে যে, বরের বহু লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সঞ্চিত আছে। বিয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, তোমারও কোটিপতি জুটছে না, আর আমারও তাই টাকা মিলছে না; সেজন্য আমাকে অনেক দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছে এবং নিষ্ফল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাই রোগে আক্রান্ত। হ্যাঁ, আসল কারণটি খুঁজে বার করা আমার মত মাথারই কাজ—নিজেকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই!

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে যখন আমি দক্ষিণ ভারতে, এবং যখন লোকেরা আমাকে উৎসবে ভোজে আপ্যায়িত করছে ও আমার কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করে নিচ্ছে, এমন সময় একটি বংশগত পুরানো রোগ এসে দেখা দিল। রোগের প্রবণতা (সম্ভাবনা) সব সময়ই ছিল, এখন অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তা আত্মপ্রকাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ। আমাকে তৎক্ষণাৎ মান্দ্রাজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরাঞ্চলে আসতে হল; একদিন দেরী করা মানে অন্য

জাহাজ ধরবার জন্য সেই প্রচণ্ড গরমে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা। কথায় কথায় বলছি—আমি পরে জানতে পেরেছি যে, মিঃ ব্যারোজ পরদিন মান্দ্রাজ এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা-মত আমাকে সেখানে না পেয়ে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন— যদিও আমি তাঁর থাকবার জায়গার ও সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে এসেছিলাম। বেচারী জানে না আমি তখন মরণাপন্ন।

গত গ্রীষ্মকালটা হিমালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি; দেখলাম ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে আসতে না আসতেই সুস্থ বোধ করি, কিন্তু সমতলে গরমে যেতে না যেতে আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আজ থেকে কলিকাতায় বেজায় গরম পড়েছে, তাই আবার আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। এবার সুশীতল আমেরিকায়, কারণ মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এখন এখানে। কলিকাতার কাছে গঙ্গাতীরে আমি সঙ্ঘের জন্য একখণ্ড জমি কিনেছি। এখানে একটি ছোট বাড়ীতে তাঁরা এখন বাস করছেন; খুব কাছেই যেখানে এখন মঠ স্থাপিত হয়েছে, সে বাড়ীতে আমরা রয়েছি।

প্রত্যহ তাঁদের সঙ্গে দেখা করি, এতে তাঁরাও খুব আনন্দিত। এক মাস পরে তাঁদের একবার কাশ্মীর ভ্রমণে বেরোবার ইচ্ছা; যদি তাঁরা চান, আমি তাঁদের সঙ্গে যাব— পরামর্শদাতা, বন্ধু ও সম্ভবতঃ দার্শনিক হিসাবে। তারপর আমরা সবাই সমুদ্রপথে স্বাধীনতা ও কুৎসার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হব।

তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ রোগটা আর দুই-তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। বড় জোড় নির্দোষ সঙ্গীর মত থেকে যেতে পারে। আমার কোন খেদ নেই।কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি—শুধু এইজন্য যে, আমি এখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাব, তখনও যেন যন্ত্রটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জন দিয়েছি, সেইদিনই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা হল ‘কাজ’, এমন কি তাও প্রভুকে সমর্পণ করে দিচ্ছি, তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৩৯৯*

[মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত]

দার্জিলিঙ
১৮ এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয় জো জো,

আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। সম্ভবতঃ অত্যধিক পর্বতারোহণ এবং ঐ স্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য এরূপ হইয়া থাকবে। আজ আমি আগের চেয়ে ভাল আছি, দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা। কলিকাতায় খুব গরম হলেও সেখানে আমার বেশ ঘুম হত এবং ক্ষুধাও মন্দ হত না। এখানে দুই-ই হারিয়েছি—এই যা লাভ!

মার্গারাইটের সম্বন্ধে এখনও মিস মূলারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারিনি; কিন্তু আজ তাঁকে পত্র লেখার ইচ্ছা আছে। মার্গারাইট এখানে আসবে বলে তিনি সব আয়োজন করেছেন। তাঁদের বাঙলা শেখাবার জন্য মিঃ গুপ্তকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। মিস মূলার বোধ হয় এখন মার্গারাইটের জন্য কিছু করবেন; তবু আমি তাঁকে লিখব।

এ দেশে থাকাকালে মার্গারাইট যে-কোন সময়ে কাশ্মীর দেখতে যেতে পারে; কিন্তু মিস—যদি রাজী না হন, তাহলেই আবার একটা প্রকাণ্ড গোলযোগ বাধবে, আর তাতে তাঁর ও মার্গারাইট দু-জনেরই ক্ষতি হবে।

আবার আলমোড়া যাব কিনা, তার নিশ্চয়তা নেই। মনে হয়, অধিক অশ্বারোহণের ফলে আবার রোগে পড়তে হবে নিশ্চিত। আমি তোমার জন্য সিমলায় অপেক্ষা করব। ইতোমধ্যে তুমি সেভিয়ারদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে নাও। কাজ শুরু করে তবে এ-বিষয়ে ভেবে দেখব। মিস নোব্‌ল্ রামকৃষ্ণ মিশনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমাদের ত্রিমূর্তিকে আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

সতত ভগবদাশ্রিত
তোমার বিবেকানন্দ

৪০০

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

দার্জিলিঙ
২৩ এপ্রিল, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

সন্দুকফু (Sandukphu, 11, 924 ft.) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া অবধি শরীর উত্তম ছিল, কিন্তু পুনর্বার দার্জিলিঙ আসিয়া অবধি প্রথম জ্বর, তাহা সারিয়া সর্দি-কাশিতে ভুগিতেছি। রোজ পালাইবার চেষ্টা করি; ইহারা আজ কাল করিয়া দেরী করিয়া দিল। যাহা হউক কাল রবিবার এ-স্থান হইতে যাত্রাপথে খর্সানেতে একদিন থাকিয়া সোমবার কলিকাতায় যাত্রা। ছাড়িয়াই 'তার' পাঠাইব। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি anniversary meeting (বাৎসরিক সভা) করা উচিত এবং মঠেরও একটি হওয়া উচিত। তাহাতে দুই জায়াগায় famine relief (দুর্ভিক্ষে সাহায্য)-এর হিসাব submit (পেশ) করিতে হইবে এবং famine relief-টা publish (প্রকাশ) করিতে হইবে। এই সমস্ত তৈয়ার রাখিবে।

নৃত্যগোপাল বলে, ইংরেজী কাগজটার খরচ অল্প; অতএব প্রথম উহা বাহির করিয়া পরে বাঙলাটা দেখা যাবে। এ-সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজী আছে? শশী লিখছে—শরৎ যদি একবার মান্দ্রাজে যায়, তারা হইলে তারা লেকচার tour (বক্তৃতা সফর) করে। বাবা, যে গরম এখন! শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে—জি. সি., সারদা, শশীবাবু প্রভৃতি articles (প্রবন্ধ) তৈয়ার রেখেছেন কিনা। মিসেস বুল, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে আমার love (ভালবাসা) ও blessings (শুভেচ্ছা) দিবে। আন্তরিক ভালবাসা জানিবে।

বিবেকানন্দ

৪০১*

দার্জিলিঙ
২৯ এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয় জো জো,

আমার অনেক বার জ্বর হয়ে গেল—সর্বশেষ হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখন তা সেরে গেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছি। হাঁটবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করলেই আমি কলিকাতায় নেমে আসছি।

রবিবারে দার্জিলিঙ ছাড়ব; পথে হয়তো দু-এক দিন কার্সিয়াং-এ কাটাব; তারপর সোজা কলিকাতায়। কলিকাতায় এখন নিশ্চয় ভয়ানক গরম। তুমি সে জন্য ভেবো না—ইনফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে তা ভালই হবে। কলিকাতায় যদি প্লেগ শুরু হয়, তবে আমার কোথাও যাওয়া হবে না; তুমি তাহলে সদানন্দের সঙ্গে কাশ্মীর চলে যেও। বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তোমার কিরূপ মনে হল? চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতা সমেত 'হন্‌স্ বাবা' যেমন ফিটফাট হয়ে থাকেন, ইনি অবশ্য সেরূপ নন। অন্ধকার রাত্রে যদি অগ্নিদেবতা, সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবতা ও তারকাদেবীরা ঘুমিয়ে পড়েন, তখন কে তোমার অন্তর আলোকিত করে? আমি তো এইটুকু আবিষ্কার করেছি যে, ক্ষুধাই আমার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে। আহা, 'আলোকের ঐক্য'-রূপ (Correspondence of light) মহান্ মতবাদটি কি অপূর্ব! ভাব দেখি, এই মতবাদের অভাবে জগৎ বহু যুগ ধরে কি অন্ধকারেই না ছিল! এ সব জ্ঞান, ভালবাসা ও কর্ম এবং যত বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট—সবই বৃথা। তাঁদের জীবন ও কার্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কারণ রাত্রে যখন সূর্য ও চন্দ্র তিমিরলোকে ডুবে যায়, তখন কে যে অন্তরের আলো জাগিয়া রাখে, এ তত্ত্ব তো তারা আবিষ্কার করতে পারেননি!! বড়ই মুখরোচক— কি বল?

আমি যে শহরে জন্মেছি, সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি; আর জগতে যত জ্যোতিষ্ক আজ পর্যন্ত আলো দিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার চেয়ে এ উপায়টা আমার নির্বাণলাভের প্রকৃষ্টতর উপায়!

মান্দ্রাজের সঙ্গে বহু চিঠি আদান-প্রদানের ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, এখনই আমাকে তাদের জন্য কোন সাহায্য পাঠাতে হবে না। প্রত্যুত আমি কলিকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য কর, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব। চিরকালের জন্য আমার অফুরন্ত ভালবাসা জানবে।

সদা প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৪০২*

আলমোড়া
২০ মে, ১৮৯৮

প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌
… কর্তব্যের শেষ নাই; আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর।

তুমি দুঃখ কর না; ‘ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি’—(কল্যাণকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না)। ইতি

সতত তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪০৩

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

আলমোড়া
২০ মে, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,
তোমার পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম ও তোমার ‘তারে’র জবাব পূর্বেই দিয়েছি। নিরঞ্জন গোবিন্দলাল সা কাঠগুদামে যোগীন-মার অপেক্ষা করিবে। আমি নৈনিতালে পৌঁছিলে এখান হইতে বাবুরাম ঘোড়া চড়িয়া নৈনিতালে যায় কাহারও কথা না শুনিয়া এবং আসিবার দিনও ঘোড়া চড়িয়া আমাদের সঙ্গে আসে। আমি ডাণ্ডি চড়িয়া অনেক পিছে পড়িয়াছিলাম। রাত্রে যখন ডাকবাংলায় পৌঁছি, শুনিলাম বাবুরাম আবার পড়িয়া গিয়াছে ও হাতে চোট লাগিয়াছে—ভাঙে-চুরে নাই, এবং ধমকানি খাইবার ভয়ে দেশী ডাকবাংলায় আছে; কারণ পড়িবার দরুন মিস ম্যাকলাউড তাহাকে ডাণ্ডি দিয়া নিজে তাহার ঘোড়ায় আসিয়াছে। সে-রাত্রে আমার সহিত দেখা হয় নাই। পরদিন ডাণ্ডির যোগাড় করিতেছি—ইতোমধ্যে শুনিলাম সে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি তাহার আর কোন খবর নাই। দু-এক জায়গায় তার করিয়াছি; কিন্তু খবর নাই। বোধ হয় কোন গ্রামে … বসিয়া আছে।

যোগীন-মার জন্য ডাণ্ডি হইবে; কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে হাঁটিতে হইবে।

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল, কিন্তু ডিস্পেপসিয়া (অজীর্ণতা) যায় নাই এবং পুনর্বার অনিদ্রা আসিয়াছে। তুমি যদি কবিরাজী একটা ভাল ডিস্পেপসিয়ার ঔষধ শীঘ্র পাঠাও তো ভাল হয়।

ওখানে যে দুই-একটি case (রোগের আক্রমণ) এক্ষণে হইতেছে, তাহার জন্য সরকারী প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং ward-এ ward-এ (মহল্লায় মহল্লায়) ও হাসপাতাল হইবার কথা হইতেছে। এসকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। তবে বাগবাজারের কে কি বলছে, তাহা public opinion (জনসাধারণের মত) নহে জানিবে। … আবশ্যক-কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়—এই সকল দেখিয়া কাজ করিবে।

রামলালের জন্য বিশেষ বুঝিয়া উপস্থিত মত জায়গা কিনিয়া দিবে রঘুবীরের নামে। তাহাতে উপস্থিত মা-ঠাকুরাণী ও তাঁহার অবর্তমানে রামলাল, শিবু তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সেবায়েত থাকে, অথবা যেমন ভাল হয় করিবে। বাড়ী তুমি যেমন ভাল বুঝ, এখনই আরম্ভ করিয়া দিবে; কারণ নূতন বাড়িতে ২।১ মাস বাস করা ঠিক নহে, damp (স্যাঁৎসেঁতে) হয়। … পরে পোস্তা হইবে। কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০ টাকা তোমায় কাজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।

আর আর সকলে ভাল আছে। সদানন্দ কাল পা মুচড়াইয়া বলিতেছে, সন্ধ্যা নাগাদ আরাম হইবে। এবারে আলমোড়ায় জলহাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে সেভিয়ার যে বাংলা লইয়াছে, তাহা আলমোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওপারে এনি বেস্যাণ্ট চক্রবর্তীর সহিত একটি ছোট বাংলায় আছে। চক্রবর্তী এখন গগনের (গাজিপুরের) জামাই। আমি একদিন দেখা করিতে গিয়াছিলাম। এনি বেস্যাণ্ট আমায় অনুনয় করে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে ইত্যাদি। আজও বেস্যাণ্ট চা খাইতে এখানে আসিবে। আমাদের মেয়েরা নিকটে একটি ছোট বাংলায় আছে এবং বেশ আছে। কেবল আজ মিস ম্যাকলাউড একটু অসুস্থ। হ্যারি সেভেয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে। … হরি ভাই-এর নমস্কার এবং সদানন্দ, অজয় ও সুরেনের প্রণাম জানিবে। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—সুশীলকে আমার ভালবাসা দিও এবং কানাই প্রভৃতি সকলকে। ইতি

৪০৪*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

আলমোড়া
৯ জুন, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

আপনার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভাল নেই জেনে খুব দুঃখিত হলাম। কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।

আগামী শনিবার আমি কাশ্মীর রওনা হচ্ছি। রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে লেখা আপনার পরিচয়-পত্রখানা পেয়েছি, কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করে রেসিডেন্টকে এক লাইন লিখে পাঠান যে, আপনি আমাকে একটি পরিচয়-পত্র দিয়েছেন, তা হলে আরও ভাল হয়।

আপনি দয়া করে জগমোহনকে বলবেন, সে যেন কিষণগড়ের দেওয়ানকে একথা স্মরণ করিয়ে চিঠি লেখে যে, তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন—তাঁর পণ্ডিতদের কাছ থেকে তিনি আমাকে ব্যাস-সূত্রের নিবার্ক ভাষ্য ও অন্যান্য ভাষ্যের নকল সংগ্রহ করে দেবেন।

ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ
আপনার বিবেকানন্দ

পুনঃ—বেচারা গুডউইন মারা গেছে। জগমোহন তাকে ভাল করে জানে। আমার গোটা দুই ব্যাঘ্রচর্ম চাই, যদি পারি মঠে দুজন ইওরোপীয় বন্ধুকে উপহাররূপে পাঠাব। এ-রকম জিনিষ উপহার পেলে পাশ্চাত্যবাসীরা সবচেয়ে বেশী খুশী হয়।

পত্রাবলী ৪০৫-৪১৪

৪০৫*

[নৈনিতালের মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত]

আলমোড়া
১০ জুন, ১৮৯৮

প্রীতিভাজনেষু,
আপনার পত্রের মর্ম বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম, ইহা জানিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছি যে, ভগবান্ সকলের অগোচরে আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব আয়োজন করিতেছেন।

ইহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতবাদ হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে, কারণ তাহারা হিব্রু কিম্বা আরব-জাতিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর; কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও যদি কোন ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলামধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে; এইরূপ আচরণ যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পরিষ্কার, এবং ইসলামপন্থিগণ সে-বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নয়।

এইজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই এক ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেটিকেই বাছিয়া লইতে পারে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।

ভগবান্ আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করিয়া আমাদের অতি হতভাগ্য জন্মভূমির সাহায্যের জন্য একটি মহান্ যন্ত্র-রূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা। ইতি

ভবদীয়া স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৪০৬*

[মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে লিখিত]

কাশ্মীর
৩ জুলাই, ১৮৯৮

প্রিয় স্টার্ডি,

উভয় সংস্করণেই আমার সম্মতি ছিল, কারণ আমাদের মধ্যে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, আমার বইগুলি যে-কেউ প্রকাশ করতে চাইলে আমরা আপত্তি করব না। মিসেস বুল এ সম্বন্ধে সব জানেন; তিনি তোমাকে লিখছেন।

মিস সুটার (Miss Souter)-এর কাছ থেকে সেদিন একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তিনি আগের মতই বন্ধুভাবাপন্ন।

শিশুদের, মিসেস স্টার্ডিকে ও তোমাকে ভালবাসা।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪০৭

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

শ্রীনগর
১৭ জুলাই, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। ... সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে, বাঙলা ভাষায় magazine (পত্রিকা) paying (লাভজনক) করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া subscriber (গ্রাহক) যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে প্রকার মত হয়, করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় তো ক্ষতি কি? 'রাজযোগ' ছাপা হইবার কি হইল? উপেনকেই না হয় দাও on certain shares (কিছু লাভে)। টাকাকড়ি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে, তাহাই করিবে। ... আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, আমার policy (কার্যধারা) ভুল, তোমারটা ঠিক—about helping others (অপরকে সাহায্য করা সম্বন্ধে), অর্থাৎ একেবারে বেশী দিলে লোকে grateful (কৃতজ্ঞ) না হইয়া উল্টা ঠাওরায় যে, একটা বোকা বেশ পাওয়া গেছে। I always lost sight of the demoralising influence of charity on the receiver. (দানের ফলে গ্রহীতার যে নৈতিক অবনতি হয়, সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকে না)। দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষের পয়সা যে উদ্দেশ্যে লোকে দেয়, তাহা হইতে একটুও এদিক-ওদিক করিবার আমাদের অধিকার নাই। কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই মিসেস বুল মালা পাইবেন। মিত্র মহাশয় এবং জজ সাহেব ইহাদের অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন। কাশ্মীরের জমি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, শীঘ্রই হইবার সম্ভবনা। এখানে তুমি একটা শীত কাটাইতে পারিলেই শরীর নিশ্চিত শুধরাইয়া যাইবে। যদি উত্তম ঘর হয় এবং যথেষ্ট কাঠ থাকে এবং গরম কাপড় থাকে, বরফের দেশে আনন্দ বৈ নিরানন্দ নাই। এবং পেটের রোগের পক্ষে শীতপ্রধান দেশ ব্রহ্মৌষধ। যোগেন-ভায়াকেও সঙ্গে আনিও; কারণ এদেশ পাহাড় নয়, এঁটেলমাটি বাঙলা দেশের মত।

আলমোড়ায় কাগজটা বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়; কারণ সেভিয়ার বেচারা একটা কাজ পায় এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়। সকলকে একটা একটা মনের মত কাজ দেওয়াই বড় ওস্তাদি। কলিকাতায় নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টি যেমন করে হোক খাড়া করে দিতে হবে। মাষ্টার মহাশয়কে কাশ্মীরে আনা এখনও অনেক দূরের কথা; কারণ এখানে কলেজ হতে এখনও ঢের দেরী। তবে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাকে প্রিন্সিপাল করে কলিকাতায় একটা কলেজ করা। হাজার টাকা initial expense (প্রারম্ভিক ব্যয়) হলেই চলবে। সে বিষয়ে নাকি তোমাদেরও বিশেষ মত। তাহাতে যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, তাহাই করিও। আমার শরীর বেশ আছে। রাত্রে প্রায় আর উঠিতে হয় না, অথচ দু-বেলা ভাত আলু চিনি—যা পাই তাই খাই। ওষুধটা কিছু কাজের নয়—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ঔষধ ধরে না। ও হজম হয়ে যাবে—কিছু ভয় নাই।

মেয়েরা সকলে আছে ভাল ও তোমাদের ভালবাসা জানাইতেছে। শিবানন্দজীর দুইটি চিঠি আসিয়াছে। তাঁহার অষ্ট্রেলিয়ান শিষ্যেরও এক পত্র পাইয়াছি। কলিকাতায় শুনিতেছি নাকি প্লেগ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইতি বিবেকানন্দ

৪০৮

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

শ্রীনগর
১ অগষ্ট, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার বরাবর একটি বুঝিবার ভ্রম হয় এবং '—' এর প্রবল বুদ্ধির দোষে বা গুণে সেটি যায় না। সেটি এই যে, যখন আমি হিসাব-কিতাবের কথা বলি, তোমার মনে হয় যে, আমি তোমাদের অবিশ্বাস করছি। ... আমার কেবল ভয় এই যে, এখন তো একরকম খাড়া করা গেল। অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায়, তাহাই দিনরাত্র আমার চিন্তা। হাজারও theoretical knowledge (তাত্ত্বিক জ্ঞান) থাকুক—হাতে-হেতড়ে না করলে কোন বিষয় শেখা যায় না। Election (নির্বাচন) এবং টাকাকড়ির হিসাব discussion (আলোচনা) এর জন্য বারংবার আমি বলি, যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে। একজন মরে গেলে অমনি একজন (দশজন if necessary—প্রয়োজন হলে) should be ready to take it up (কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত)। দ্বিতীয় কথা—মানুষের interest (আগ্রহ) না থাকিলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখান উচিত যে, everyone has a share in the work and property, and a voice in the management (প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে)—এই বেলা থেকে। Alternately (পর্যায়ক্রমে) প্রত্যেককেই responsible position (দায়িত্বপূর্ণ কাজ) দেবে with an eye to watch and control (নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি রেখে), তবে লোক তৈয়ার হয় for business (কাজের জন্য)। এমন machine (যন্ত্র)-টি খাড়া কর যে, আপনা- আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইণ্ডিয়ার ঐটি great defect (প্রধান দোষ), we cannot make a permanent organisation (আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না), and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone. (আর তার কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না, এবং আমাদের পরে কি হবে, তা কখনও ভাবি না)।

প্লেগ সম্বন্ধে সব লিখেছি। মিসেস বুল ও মূলার প্রভৃতির মত যে, যখন পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল হয়ে গেল, তখন মিছে কতকগুলো টাকা খরচ কেন? We will lend our services as nurses etc. Those that pay the piper must command the tune (আমরা শুধু সেবক হিসাবে কাজ করব। যারা টাকা দেয় তাদের কথা শুনতে হয়)।

কাশ্মীরের রাজা জমি দিতে রাজী। জমি দেখেও এসেছি। এখন দু-চার দিনের মধ্যে হয়ে যাবে—প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়। এখানে একটি ছোট বাড়ি করে যাব এইবারেই। যাবার সময় leave it in the charge of Justice Mukherjee (বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে যাব)। আর তুমি না হয় এসে এখানে শীত কাটিয়ে যাও with somebody else (অপর কাকেও সঙ্গে নিয়ে); শরীরও সেরে যাবে এবং কাজও হবে। যে টাকা press (ছাপাখানা)-এর (জন্য) রেখে এসেছি, তা হলেই হবে।—তুমি যেমন বিবেচনা কর। এবার N. W. P (উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ), রাজপুতানা প্রভৃতিতে কতকগুলি টাকা পাব—নিশ্চিত। ভাল কথা কয়েকজনকে … এই ভাবে টাকা দিও। এই টাকা আমি মঠ থেকে কর্জ নিচ্ছি এবং পরিশোধ করব to you with interest (তোমার কাছে সুদ সমেত)। ...

আমার শরীর এক রকম ভালই আছে। বাড়ী-ঘর আরম্ভ হয়েছে—বেশ কথা। সকলকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি

বিবেকানন্দ

৪০৯*

কাশ্মীর
২৫ অগষ্ট, ১৮৯৮

প্রিয় মার্গট,

গত দু-মাস যাবৎ আমি অলসের মত দিন কাটাচ্ছি। ভগবানের দুনিয়ার জমকালো সৌন্দর্যের যা পরাকাষ্ঠা হতে পারে, তারই মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক উদ্যানে মনোরম ঝিলামের বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি, এখানে পৃথিবী বায়ু ভূমি তৃণ গুল্মরাজি পাদপশ্রেণী পর্বতমালা তুষার-রাশি ও মানবদেহ—সবকিছুর অন্ততঃ বাহিরের দিকটায় ভগবানেরই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নৌকাটিই আমার ঘরবাড়ী; আর আমি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত— এমন কি দোয়াত-কলমও নেই বলা চলে; যখন যেমন জুটছে, খেয়ে নিচ্ছি—ঠিক যেন একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল্-এর ছাঁচে ঢালা তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবন!

কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলো না যেন। ওতে কোন লাভ নেই; সর্বদা মনে রাখবে, 'কর্তব্য হচ্ছে যেন মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত—তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে।' সাধনার দিক্ দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে, তার বেশী করতে গেলে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। আমরা জগতের কাজে অংশগ্রহণ করি আর নাই করি, জগৎ নিজের ভাবে চলে যাবেই। মোহের ঘোরে আমরা নিজেকে ধ্বংস করে ফেলি মাত্র। এক-জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা চরম নিঃস্বার্থতার মুখোস পরে দেখা দেয়; কিন্তু সবরকম অন্যায়ের কাছে যা মাথা নোয়ায়, সে চরমে অপরের অনিষ্টই করে। নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আছে কি?

তোমাদের

৪১০*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

শ্রীনগর, কাশ্মীর
২৮ অগষ্ট, ১৮৯৮

স্নেহের মেরী,

তোমাকে চিঠি লেখার কোন সুযোগ ইতোমধ্যে করে উঠতে পারিনি, আর তোমারও চিঠি পাবার কোন তাগিদ ছিল না; তাই বাজে অজুহাত দেখাব না। শুনলাম মিসেস লেগেটকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠি থেকে তুমি কাশ্মীর ও আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ জানতে পারছ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।

কাশ্মীরে হাইন্‌সহোল্ড (Heinsholdt)-এর 'মাহাত্মা'-সন্ধান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; প্রথমেই প্রতিপন্ন করতে হবে যে, সমগ্র ব্যাপারটা একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আসছে, প্রচেষ্টা খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা হয়েছে। মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ কেমন আছেন? তোমরা কেমন আছ? একজন দল থেকে সরে পড়াতে৭ পুরানো খেলা আরও উৎসাহ সহকারে চলছে কি? ফ্লোরেন্সের কোন প্রতিমূর্তির মত যার চেহারা, সে কেমন আছে (নামটা ভুলে গিয়েছি)?

কয়েকদিনের জন্য আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। তারপর যাত্রিদলটি যাচ্ছে কোন পাহাড়ের পিছনে এক বনের মধ্যে একটি শান্ত সুন্দর পরিবেশ, যেখানে কুলকুল করে ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেখানে তারা দেবদারু গাছের নীচে বুদ্ধের মত আসন করে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকবে।

এ-রকম প্রায় মাসখানেক চলবে; তারপর যখন আমাদের সৎকর্মের ফলভোগ শেষ হবে, তখন আবার স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতন হবে। তারপর কয়েক মাস কর্মফল সঞ্চয় করব ও দুষ্কর্মের জন্য আবার নরকে যেতে হবে—চীনে, এবং আমাদের কুকর্ম ক্যান্টন ও অন্যান্য নগরের দুর্গন্ধের মধ্যে আমাদের নিমজ্জিত করবে। তারপর জাপানের নরকে। তারপর আবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গলোকে।

কত না সুন্দর সুন্দর জিনিষ তোমাকে পাঠাতে আমার ইচ্ছা, কিন্তু হায়! শুল্ক-তালিকার কথা ভাবলে আমার আকাঙ্ক্ষা 'মেয়েদের যৌবন ও ভিখারীদের স্বপ্নের মত' মিলিয়ে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে বলছি, আমি খুশী যে, দিনদিন আমার চুল পাকছে। তোমার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ-বিকশিত একটি শ্বেত পদ্মের মত হবে।

আহা! মেরী যদি তুমি কাশ্মীর দেখতে—শুধুই কাশ্মীর! পদ্ম ও হাঁসে ভরা চমৎকার হ্রদগুলি (হাঁস নেই, রাজহংসী আছে—এটুকু কবির স্বাধীনতা) এবং বায়ু সঞ্চালিত সেই পদ্মগুলিতে বড় বড় কালো কালো ভ্রমর বসবার চেষ্টা করছে (আমি বলতে চাই যে পদ্মগুলি মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে—ইতি কবিতা)—এই দৃশ্য যদি তুমি দেখতে, তা হলে মৃত্যু শয্যাতেও তোমার পুরোপুরি জ্ঞান থাকত। যেহেতু এটা ভূস্বর্গ এবং যেহেতু তর্কশাস্ত্র বলে—হাতের একটি পাখী বনের দুটির সমান, অতএব এই (ভূস্বর্গের) ক্ষণিক দর্শনও লাভজনক, কিন্তু অর্থনীতির দিক্ থেকে অপরটি (অর্থাৎ না-দেখাই) শ্রেয়। কোন কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই, কোন খরচপত্র নেই, ছেলেমানুষি ভাবপূর্ণ অতি সহজ জীবন এবং তারপর সেইটুকুই সব।

আমার চিঠিটা তোমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে … সুতরাং এখানে শেষ করছি (এ হল নিছক আলস্য)। বিদায়।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

আমার স্থায়ী ঠিকানাঃ
মঠ, বেলুড়
হাওড়া জেলা, বাঙলা, ভারতবর্ষ

৪১১

[শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত]

শ্রীনগর, কাশ্মীর
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র ও তার পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, নির্বিঘ্নে সিন্ধি-ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।

মধ্যে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ দেরী হইয়া পড়িল, নতুবা এই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্জাবে যাইবার কল্পনা ছিল। এক্ষণে দেশে অতিশয় গ্রীষ্ম বলিয়া ডাক্তার যাইতে নিষেধ করিতেছেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ বোধ হয় করাচি পৌঁছিব। এক্ষণে এক-রকম ভাল আছি। আমার সঙ্গে এবার কেহ নাই। দুজন আমেরিকান লেডি ফ্রেণ্ড মাত্র আছেন। তাঁহাদের সঙ্গ বোধ হয় লাহোরে ছাড়িব। তাঁহারা কলিকাতায় বা রাজপুতানায় আমার অপেক্ষা করিবেন। আমি সম্ভবতঃ কচ্ছভুজ, জুনাগড়, ভাটনগর, লিমডি ও বরোদা হইয়া কলিকাতায় যাইব। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে চীন ও জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইব—এই তো বাসনা। পরে শ্রীপ্রভুর হাত। আমার এখনকার সমস্ত খরচ উক্ত আমেরিকান বন্ধুরা দেন এবং করাচি পর্যন্ত ভাড়া প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতেই লইব। তবে যদি তোমার সুবিধা হয়, ৫০ টাকা টেলিগ্রাম করিয়া C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ জজ, কাশ্মীর স্টেট, শ্রীনগর—এঁর নামে পাঠাইলে অনেক উপকার হইবে। কারণ সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে, এবং সর্বদা বিদেশী শিষ্যদের নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে লজ্জা করে।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৪১২*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

C/o ঋষিবর মুখার্জি
প্রধান বিচারপতি, কাশ্মীর
১৭ সেপ্টেম্বর,১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

এখানে আমি দু-সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার কিছু টাকার টান পড়েছে। যদিও আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্যের জন্য তাঁদের সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন, কিন্তু সবসময়ই তাঁদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ হয়, বিশেষতঃ অসুখ করলে খরচের বহর অনেক বেড়ে যায়। এই জগতে শুধু একজনের কাছেই আমার কিছু চাইতে লজ্জা হয় না এবং তিনি হলেন আপনি। আপনি দিলেন কি না দিলেন—আমার কাছে দুই সমান। যদি সম্ভব হয়, অনুগ্রহ করে কিছু টাকা পাঠাবেন। আপনি কেমন আছেন? অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমি (এখান থেকে) নাবছি।

জগমোহনের চিঠিতে কুমার (যুবরাজ) সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে জেনে সবিশেষ আনন্দিত হলাম। আমার সব খবর ভাল, আশা করি আপনার সব কুশল।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪১৩*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

লাহোর
১৬ অক্টোবর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

আমার ‘তারে’র পরে যে চিঠিখানা গিয়েছে, তাতে আপনার অভিপ্রেত সংবাদ ছিল; সেজন্য আপনার ‘তারে’র উত্তরে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ দিয়ে আর কোন ‘তার’ করিনি।

এ বৎসর কাশ্মীরে অনেক রোগভোগের পর এখন আরোগ্যলাভ করেছি এবং আজ সোজাসুজি কলিকাতায় যাচ্ছি। গত দশ বছর বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা দেখিনি, দুর্গাপূজা সেখানকার একটি ধুমধাম ব্যাপার। আশা করি, এ বছর পূজা দেখব।

পাশ্চাত্যদেশীয় বন্ধুগণ দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই জয়পুর দেখতে যাবেন। জগমোহন যদি সেখানে থাকে, তা হলে তাকে দয়া করে নির্দেশ দেবেন, সে যেন তাঁদের একটু দেখাশোনা করে এবং শহরটি ও প্রাচীন শিল্পকীর্তিগুলি ঘুরে দেখিয়ে দেয়।

আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দকে নির্দেশ দিচ্ছি, জয়পুর রওনা হবার পূর্বে মুন্সীজীকে যেন লিখে জানায়।

আপনি ও যুবরাজ কেমন আছেন? যথারীতি আপনার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি।

আপনার প্রীতিবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাঃ
মঠ, বেলুড়, হাওড়া জেলা, বাঙলা।

৪১৪

[শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত]

লাহোর
১৬ অক্টোবর, ১৮৯৮

কল্যাণবরেষু,
কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে এবং ৯ বৎসর যাবৎ দুর্গাপূজা দেখি নাই—এ বিধায় কলিকাতা চলিলাম। আমেরিকা যাইবার সঙ্কল্প এখন পরিত্যাগ করিয়াছি এবং শীতকালের মধ্যে করাচি আসিবার অনেক সময় হইবে।

৫০ টাকা আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দ লাহোর হইতে করাচি পাঠাইবেন। দুঃখিত হইও না—সকলই প্রভুর হাত। আমি এ বৎসর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোথাও যাইব না নিশ্চিত। সকলকে আমার আশীর্বাদ।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৪১৫-৪২৪

৪১৫*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়
২৬ অক্টোবর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,
আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমার খুব ইচ্ছা ছিল নাবার পথে আপনাকে দেখে যাব, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভেঙে পড়ল যে, একটুও দেরী না করে আমাকে সমতলে ছুটে আসতে হল। ভয় হচ্ছে, আমার হৃদযন্ত্রে কিছু গোলযোগ হয়েছে।

যা হোক, আপনার শারীরিক অবস্থা জানবার জন্য আমি খুবই ব্যগ্র। যদি আপনি ইচ্ছা করেন—খেতড়িতে আপনাকে দেখতে যাব। আপনার কল্যাণের জন্য আমি দিবারাত্র প্রার্থনা করছি। বিপদ কিছু ঘটলে হতাশ হবেন না, 'মা'ই আপনাকে রক্ষা করবেন। আপনার বিস্তারিত সংবাদ আমাকে লিখবেন। ... কুমার সাহেব কেমন আছে?

সর্ববিধ ভালবাসা ও চিরন্তন আশীর্বাদ।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪১৬*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হওড়া
নভেম্বর (?), ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,
আপনার ও কুমারের স্বাস্থ্য ভাল আছে জেনে খুব আনন্দিত হলাম। এদিকে আমার হৃদ্‌যন্ত্রটা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। বায়ু-পরিবর্তনে আমার আর কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না—গত চৌদ্দ বৎসর ধরে আমি এক-নাগাড়ে কোথাও তিনমাস থেকেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হয় যদি কোন ক্রমে বেশ কয়েক মাস ধরে এক স্থানে থাকিতে পারি, তবেই আমার পক্ষে ভাল হবে। তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। যা হোক, আমি বুঝতে পারছি, এ জীবনে আমার কাজ শেষ হয়েছে। ভাল ও মন্দ, বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার জীবন-তরী বয়ে গিয়েছে। তার ফলে যে মহৎ শিক্ষাটি আমি লাভ করেছি, তা হল—জীবনটা দুঃখময়, দুঃখ বৈ আর কিছুই নেই। 'মা'ই জানেন কোন্‌টি শ্রেয়। আমরা সকলেই কর্মের অধীন; কর্ম তার নিজের পথ করে নেয়—এর কোন ব্যতিক্রম নেই। জীবনে একটিমাত্র বস্তুই আছে, যা যে-কোন উপায়ে লাভ করতে হবে, সেটি হচ্ছে ভালবাসা। বিপুল ও অনন্ত ভালবাসা, আকাশের মত উদার ও সমুদ্রের মত গভীর—সেই হল জীবনে একটি বড় লাভ। যে তা পায়, সে ধন্য।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪১৭*

৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২ নভেম্বর, ১৮৯৮

স্নেহের জো,
আগামীকাল রবিবার কয়েকজন বন্ধুকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছি। ... চায়ের সময় তোমাকে আশা করছি। তখন সব কিছুই প্রস্তুত থাকবে।

শ্রীমা আজ সকালে নূতন মঠ দেখতে যাচ্ছেন। আমি সেখানে যাচ্ছি। আজ বিকাল ৬টায় নিবেদিতা সভাপতিত্ব করবে। যদি তোমার ভাল লাগে এবং বুলও যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে চলে এস।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪১৮*

[খেতড়ির মহারাজকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,
মিঃ দুলিচাঁদের নামে ৫০০-র অর্ডার সহ আপনার সহৃদয় লিপিখানি পেলাম। আজকাল আমি কিছুটা ভাল আছি। জানি না (স্বাস্থের) এই উন্নতি স্থায়ী হবে, কি না।

শুনলাম এই শীতে আপনি কলিকাতায় আসছেন। এ কথা কি সত্যি? নূতন বড়লাটাকে সম্মান জ্ঞাপন করতে অনেক রাজা আসছেন। কাগজ দেখে জানলাম শিখরের (Sikar) মহারাজা ইতোমধ্যেই এখানে এসেছেন।

আপনার ও আপনার স্বজনদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা জানাই।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪১৯*

বেলুড়মঠ
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয়—,
... 'মা'ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, সে-সকল তাঁরই বিধানে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪২০*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর
২৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় ধীরামাতা,

আমি যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব না, তা আপনি আগেই জেনেছেন। আপনার সঙ্গে যাবার মত শারীরিক শক্তি আমি সংগ্রহ করতে পারছি না। বুকে যে সর্দি জমেছিল তা এখনও আছে, আর তারই ফলে এখন আমি ভ্রমণে অক্ষম। মোটের উপর এখানে আমি ক্রমে সেরে উঠব বলেই আশা করি।

জানলাম, আমার ভগ্নী গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ সংকল্প নিয়ে নিজের মানসিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে। বাঙলা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যা কিছু জানা সম্ভব—বিশেষ করে অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে, সে-সবই সে শিখেছে, আর তার পরিমাণও বড় কম নয়। ইতোমধ্যে সে নিজের নাম ইংরেজী ও রোমান অক্ষরে সই করতে শিখেছে। এখন তাকে অধিকতর শিক্ষাদান বিশেষ মানসিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ; সুতরাং সে কাজ থেকে আমি বিরত হয়েছি। আমি শুধু বিনা কাজে সময় কাটাতে চেষ্টা করছি এবং জোর করেই বিশ্রাম নিচ্ছি।

কয়েকদিনের জন্য আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। তারপর যাত্রিদলটি যাচ্ছে কোন পাহাড়ের পিছনে এক বনের মধ্যে একটি শান্ত সুন্দর পরিবেশ, যেখানে কুলকুল করে ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেখানে তারা দেবদারু গাছের নীচে বুদ্ধের মত আসন করে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকবে।

এ-যাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি, কিন্তু এখন ঘটনা পরম্পরায় মনে হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন; সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। এখন থেকে আমি আমার নিজের জীবন এবং কর্মপ্রণালী বিষয়ে মনে করব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত; সুতরাং সকল দায়িত্ববোধ নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়া যে নির্দেশ দেবেন, তাই মেনে চলব।

শীঘ্রই ইওরোপ কিম্বা আমেরিকায় আপনার সহিত মিলিত হতে পারব, এই আশা নিয়ে এই চিঠি শেষ করছি। ইতি

আপনার স্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

৪২১*

মঠ, বেলুড়
২ ফেব্রুআরী, ১৮৯৯

স্নেহের জো,
তুমি নিশ্চই এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছ এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে আবার স্বজনদের সঙ্গে মিলেছ। এবারকার যাত্রায় ভাগ্য প্রতি পদে তোমার অনুকূল হয়েছে— এমন কি সমুদ্র পর্যন্ত স্থির ও শান্ত ছিল এবং অবাঞ্ছিত সঙ্গীও জাহাজে বড় কেউ ছিল না। আমার বেলায় ঠিক এর উল্টো। তোমার সঙ্গে যেতে না পেরে আমি নিরাশ হয়ে পড়েছি। বৈদ্যনাথে বায়ু পরিবর্তনে কোন ফল হয়নি। সেখানে আট দিন আট রাত্রি শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে উঠবার লড়াই শুরু করেছি।

ডাঃ সরকার এখন আমার চিকিৎসা করছেন। আগের মত হতাশ ভাব আর নেই। অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। এটা আমাদের পক্ষে বড় দুর্বৎসর। যোগানন্দ, যে মায়ের বাড়ীতে থাকত, একমাস ধরে ভুগছে এবং প্রতিদিনই মৃত্যুর প্রতিক্ষা করছে। মা-ই ভাল জানেন। আবার কাজে লেগেছি, ঠিক নিজে করছি না, ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সারা ভারতে আবার একটা আলোড়ন জাগাবার জন্য। সর্বোপরি তুমি তো জানই, অর্থাভাব হচ্ছে প্রধান অসুবিধা। জো, তুমি এখন আমেরিকায়, আমাদের এখানকার কাজের জন্য কিছু টাকা তুলতে চেষ্টা কর।

মার্চ নাগাদ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এপ্রিলে ইওরোপ যাত্রা। বাকী মা-ই ভাল জানেন।

সারাটা জীবন শরীর ও মনের কষ্ট সয়েছি অনেক, কিন্তু মায়ের অপার করুণা।আমার পাওনার চেয়ে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ ও আশীর্বাদ পেয়েছি। মায়ের কাজে অবিরাম সংগ্রাম করছি, মা দেখছেন। আমি সর্বদা লড়াই করে চলেছি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি শেষনিঃশ্বাস ফেলব।

আমার অশেষ প্রীতি এবং আশীর্বাদ—তোমার জন্য চিরদিন।

সতত সত্যরূপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪২২*

[ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষকে লিখিত]

৮

বেলুড় মঠ, হাওড়া
৬ মার্চ, ১৮৯৯

প্রিয় মহাশয়,
আপনার অত্যন্ত সানুগ্রহ আমন্ত্রণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার পত্রের উত্তর দিতে এত দেরী হল বলে বিশেষ দুঃখিত।

আমি সে-সময় খুব অসুস্থ ছিলাম এবং যাঁর উপর পত্রের উত্তর দেবার ভার ছিল, তিনি তা দেননি বলেই মনে হয়। আমি এইমাত্র তা জানতে পেরেছি।

আপনাদের সানুগ্রহ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি। এই শীতকালেই আপনাদের ঐ অঞ্চল (পূর্ববঙ্গ) দেখব বলে সঙ্কল্প করেছিলাম। কিন্তু আমার কর্মের গতি অন্যরূপ। প্রাচীন বাঙলার সভ্যতার কেন্দ্র দেখবার আনন্দ পাবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আপনাদের সহৃদয়তার জন্য আবার ধন্যবাদ।

শুভার্থী
বিবেকানন্দ

৪২৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, জেলা হওড়া
১৬ মার্চ, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,
মিসেস এডাম্‌স্‌কে ধন্যবাদ; তিনি তোমাদের—দুষ্টু মেয়েদের অবশেষে চিঠি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ‘চোখের আড়াল হলেই আর মনে থাকে না’—এ-কথা ভারতে যেমনি সত্য, আমেরিকাতেও তেমনি।

আচ্ছা, আমার শরীর এক রকম ভালই যাচ্ছে; যাতে কয়েক মাস যাবৎ মনে হচ্ছে, শরীরটা আরও কিছুকাল টিকবে।

ম্যাক্সমূলারের নূতন বই ‘রামকৃষ্ণঃ তাঁর জীবনী ও বাণী’ (Ramakrishna: His Life and Sayings) পড়েছ কি? যদি পড়ে না থাক পড়ে ফেল, এবং মাকে পড়তে দাও। মা কেমন আছেন? তাঁকে কি বুড়ো দেখাচ্ছে? ফাদার পোপ কেমন আছেন?

মার্কিন ও ইংরাজ বন্ধুদের ধন্যবাদ, তাঁদের সাহায্যেই গঙ্গার তীরে আমাদের একটি মঠ হয়েছে। মাকে মন দিয়ে দেখতে বল—‘পৌত্তলিক প্রচারক’দের দ্বারা তোমাদের ইয়াঙ্কি দেশকে প্লাবিত করতে চলেছি।

এ গ্রীষ্মে জো-র সঙ্গে আমেরিকায় যাবার খুব ইচ্ছা; কিন্তু মানুষ সংকল্প করে, এবং কে বিধান করেন?—সব সময়ে নিশ্চয়ই ভগবান্ করেন না। ভাল যা হবার তা হোক। অভয়ানন্দ (মেরী লুই) ভারতে এসেছে, বোম্বে ও মান্দ্রাজে তার খুব সম্বর্ধনা হয়েছে। আগামীকাল সে কলিকাতা আসবে, এবং আমরাও তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করছি।

মিস হাউ, মিসেস এডাম্‌স্‌, মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ এবং সাত সমুদ্রের পারে অন্যান্য যে-সব বন্ধু আছে তাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি। আমরা সাত সমুদ্রে বিশ্বাস করি—দধি, দুগ্ধ, মধু, সুরা, ইক্ষুরস, লবণ, আর একটা কি—ভুলে গেছি। তোমাদের চার বোনকে মধু-সমুদ্রের উপর দিয়ে বায়ুবেগে সঞ্চালিত করছি আমার স্নেহ।

তোমাদের চিরদিনের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪২৪*

বেলুড় মঠ
১১ এপ্রিল, ১৮৯৯

প্রিয়—,

… দু-বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে। ভাল কথা, কিন্তু এতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। হয় কি? সেই আপনভোলা আত্মা একই ভাবে বিভোর হয়ে তীব্র একাগ্রতা ও আকুলতা নিয়ে ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৪২৫-৪৩৪

৪২৫

[শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে লিখিত]

বেলুড় মঠ
১৬ এপ্রিল, ১৮৯৯

মহাশয়াসু,
আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোন একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও তো দেখি নাই, সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু-এক জন আমাদের hobby-র (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন, এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোন উৎকট পাপ করিয়া খ্রীষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক-ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি, জানিবেন। তবে মানুষ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়িলঃ

‘মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তায় যায় গো জানা,
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।’

এই তো গেল আমার তরফ থেকে। এর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন।

তারপর যে-সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এ দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড়-পর্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয় দিলে! বলি, ও-রকম দেশ-হিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ও-রকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিটকানো? কে জানে কার কি মতিগতি! আমার যেন মনে হয়, ও-সব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীতি ন মানে জাত কুজাত।
ভুখ ন মানে বাসী ভাত॥

আমি তো জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় তো না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ, শোক, মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্যন্ত সময় দিয়াছেন, বিশ্বাস—এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ

৪২৬*

মঠ, আলমবাজার
১৪ জুন, ১৮৯৯

প্রিয় বন্ধু,
আমি এখানে যে ভাবে আছি, মহামান্য (Highness) আপনাকেও সেইভাবে চাই, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা আপনার এখনই সবচেয়ে প্রয়োজন।

কয়েক সপ্তাহ আগে আপনাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু আপনার কোন সংবাদ পাইনি। আশা করি, এখন আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল আছে। এ মাসের ২০ তারিখে আবার ইংলণ্ডে যাচ্ছি।

এবারকার সমুদ্রযাত্রায় কিছু উপকার হবে, আশা করছি।

ঈশ্বর আপনাকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন এবং সর্ববিধ আশীর্বাদে মণ্ডিত করুন।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪২৭*

পোর্ট সৈয়দ
১৪ জুলাই, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,
এইমাত্র তোমার চিঠিখানি ঠিক এসে গেছে। প্যারিসের মঁ নোব্‌লেরও (M. Nobel) একখানি এসেছে। মিস নোবল্ (Miss Nobel) আমেরিকার বহু চিঠি পেয়েছেন।

নোবল্ জানিয়েছেন যে, তাঁকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকতে হবে; সুতরাং আমার লণ্ডন থেকে প্যারিসে তাঁর ওখানে যাবার তারিখ যেন পেছিয়ে দিই। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, উপস্থিত লণ্ডনে আমার বন্ধুদের অনেকেই নেই; তা ছাড়া মিস ম্যাকলাউড যাবার জন্য আমায় খুবই পীড়াপীড়ি করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। অধিকন্তু আমার আয়ু ফুড়িয়ে এল—অন্ততঃ আমাকে এটা সত্য বলে ধরে নিয়েই চলতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমেরিকায় সত্যই কিছু করতে চাই, তবে এখনি আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত প্রভাবকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলেও অন্ততঃ একমুখী করতেই হবে। তারপর মাস-কয়েক পরেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে আসার অবকাশ পাব এবং ভারতবর্ষে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত একমনে কাজ করতে পারব।

আমার মনে হয়, আমেরিকার কাজকে গুছিয়ে আনার জন্য তোমার আসা একান্ত প্রয়োজন। অতএব যদি পার তো আমার সঙ্গেই তোমার চলে আসা উচিত। তুরীয়ানন্দ আমার সঙ্গে আছে। সারদানন্দের ভাই বষ্টনে আছে। … তুমি যদি আমেরিকায় নাও আসতে পার, তবু আমার যাওয়া উচিত—কি বল?

৪২৮*

The Lymes
Woodsides, Wimbledon
৩ অগষ্ট, ১৮৯৯

স্নেহের জো,
অবশেষে হাজির। তুরীয়ানন্দের ও আমার সুন্দর বাসস্থান মিলেছে। সারদানন্দের ভ্রাতা মিস্ নোবল্-এর বাসস্থানে আছে, আগামী সোমবার রওনা হবে।

সমুদ্রযাত্রায় বেশ কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে। তা ঘটেছে ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম ও মৌসুমী ঝড়ে ঢেউয়ের উপর ষ্টীমারের ওলটপালট থেকে। অদ্ভুত, নয় কি? আশা করি এটা বজায় থাকবে। আমাদের ‘মাতা’ কোথায়—ভারতের পূজনীয়া গাভীমাতা (Worshipful Brahmini Cow)? মনে হয়, তিনি নিউ ইয়র্কে তোমার সঙ্গেই আছেন।

স্টার্ডি বাইরে গেছে, মিসেস জনসন এবং অন্য সকলেও তাই। এতে কিছু উদ্বিগ্ন। আগামী মাসের আগে সে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারছে না। ইতোমধ্যেই সমুদ্রকে ভালবেসে ফেলেছি। মৎস্যাবতার আমার উপর চড়ে পড়েছেন, আশঙ্কা হয় ভালমতেই চড়েছেন, অব্যর্থভাবে—এই বাঙালীর উপর।

এলবার্টা কেমন আছে? … বুড়োরা ও বাকী সকলে? প্রিয় মিসেস র‍্যাবিটের (Mrs. Brer Rabbit) কাছ থেকে একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি; তিনি লণ্ডনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি; আমাদের পৌঁছবার আগেই তিনি রওনা হয়েছেন।

এখানে এখন সুন্দর উষ্ণ আবহাওয়া; সকলে বলছে, একটু বেশীমাত্রায় উষ্ণ। কিছুদিনের জন্য আমি শূন্যবাদী হয়ে গেছি, কোন কিছুতেই বিশ্বাস করি না। কোন কিছুর পরিকল্পনা, কোন অনুশোচনা, প্রচেষ্টা—কিছুই নেই; কাজকর্মের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করেছি। আর হ্যাঁ, জো, জাহাজে আমি যখন তোমার বা ভগবতী গাভীর সমালোচনা করেছি, তখনই তোমার পক্ষ নিয়েছে। বেচারা ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা জানে! আসল কথা হচ্ছে, জো, লণ্ডনে কোন কাজ হবে না, কারণ তুমি এখানে নেই। তুমিই দেখছি আমার নিয়তি। এককাট্টা হয়ে লেগে যাও, কর্ম থেকে কারও নিস্তার নেই। দেখ, এবারের সমুদ্রযাত্রার ফলে আমার বয়স যেন কয়েক বছর কমে গেছে। শুধু যখন বুক ধড়ফড় করে ওঠে, তখন টের পাই বয়স হয়েছে। এটা কি অস্থিচিকিৎসার কোন ব্যাপার? আমার রোগ সারাতে দু-একটা পাঁজর কেটে বাদ দেবে নাকি? উহুঁ, তা হচ্ছে না। আমার পাঁজরা দিয়ে … তৈরী করা-টরা চলবে না। ওটা যা-ই হোক, তার পক্ষে আমার হাড় পাওয়া কঠিন হবে। আমার হাড় গঙ্গায় প্রবাল সৃষ্টি করবে, আমার বরাতে এই লেখা আছে। এখন আমার ফরাসী শেখার ইচ্ছা—যদি তুমি প্রতিদিন আমাকে একটি করে পাঠ দিয়ে যাও; কিন্তু ও-সব ব্যাকরণের বালাই একদম নয়—আমি কেবল পড়ে যাব, আর তুমি ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করে যাবে। অভেদানন্দকে আমার ভালবাসা দিও, আর বল সে যেন তুরীয়ানন্দের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি। শীঘ্র চিঠি দিও। সর্ববিধ ভালবাসার সঙ্গে।

সর্ববিধ ভালবাসার সঙ্গে
বিবেকানন্দ

৪২৯*

[মিস মেরী হেলবয়েষ্টারকে লিখিত]

C/o Miss Noble
21A High Street, উইম্বলডন
অগষ্ট, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

আবার লণ্ডনে হাজির। এবারে কোন ব্যস্ততা নেই, টানাহেঁচড়া নেই, চুপটি করে এক কোণে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাবার প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় আছি। বন্ধুরা প্রায় সকলেই লণ্ডনের পল্লী অঞ্চলে কিম্বা অন্যত্র চলে গিয়েছেন আর আমার শরীর বিশেষ সবল নয়।

তাহলে কানাডাতে সরোবর, উদ্যান ও নির্জনতার মধ্যে বিশেষ আনন্দে আছ। জেনে খুশী—খুবই খুশী যে, তুমি আবার স্রোতের উপর ভেসে উঠেছ। এ অবস্থায় যেন চিরদিন থাকতে পার!

‘রাজযোগে’র অনুবাদ এখনও শেষ করতে পারনি—বেশ তো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কাজটা হবার হলে সময় ও সুযোগ আসবেই জেন, নইলে আমাদের চেষ্টা বৃথা।

ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশ কানাডা এখন নিশ্চয়ই সুন্দর এবং খুব স্বাস্থ্যকর। কয়েক সপ্তাহ পরেই নিউ ইয়র্কে পৌঁছব, আশা করি; তারপরের কথা জানি না। আগামী বসন্তে হয়তো আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসব।

আমি একান্তভাবে চাই যে কাউকেই যেন কখনও দুঃখ পেতে না হয়, কিন্তু (একথা সত্যি যে) একমাত্র দুঃখই জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয়। তাই নয় কি?

আমাদের বেদনার মুহূর্তে চিরদিনের মত বন্ধ দুয়ার আবার খুলে যায় এবং অন্তরে আলোর বন্যা প্রবেশ করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু হায়! এ জগতে লব্ধ জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। যে মুহূর্তে মনে হয় কিছু শিখেছি, তখনই রঙ্গমঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হয়। এরই নাম মায়া!

এই খেলার জগৎ কোথায় থাকত, আর খেলাই বা কেমন করে চলত, যদি এই খেলার মর্ম আমাদের আগে থেকেই জানা থাকত? চোখ বেঁধে আমাদের খেলা। এই খেলায় আমাদের মধ্যে কেউ শয়তানের অভিনয় করছে, কেউ বা বীরের—কিন্তু জেন, এ-সবই নিছক খেলা। এটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা। রঙ্গমঞ্চে সিংহ, ব্যাঘ্র, দানব এবং আরও কত জীবই না আছে, কিন্তু সকলেরই মুখে বন্ধনী আঁটা; তারা তীক্ষ্ণ শব্দ করে, কিন্তু কামড়াতে পারে না।—জগৎ আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি চাও, শরীর বিদীর্ণ হলেও বা রক্তের ধারা বইলেও অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করতে পার। আর তা পাবার উপায় হল নৈরাশ্য বা

সকল আশা বিসর্জন দেওয়া। তুমি কি তা জান? এটি অক্ষমের হতাশার মনোভাব নয়, বিজয়ীর বিজিত বস্তুর প্রতি যে অবহেলা, এ হল তাই—কোন কিছুকে পাবার জন্য সে যেমন লড়াই করে, পাবার পর তেমনি সেটা তার অযোগ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এই নৈরাশ্য, নির্বাসনা ও লক্ষ্যহীনতার সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্য আছে। প্রকৃতিতে কোন সামঞ্জস্য, যুক্তিবিচার বা পারম্পর্য নেই, যেমন বিশৃঙ্খলা আগেও ছিল, এখনও তেমনি আছে।

নিকৃষ্ট মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই মিল যে তার চিন্তা পার্থিব, শ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গেও মিল তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতায়। এরা তিনজনই লক্ষ্যশূন্য, প্রবাহ-তাড়িত, ৯
আশাহীন—তিনজনেই সুখী।

তুমি খোশগল্পভরা চিঠি চাও, তায় নয় কি? কিন্তু আমার ঝুলিতে বেশী গল্প নেই। মিঃ স্টার্ডি দুদিন আগে এসেছে। কাল ওয়েলস্-এ তার বাড়ীতে চলে যাবে। দু-এক দিনের মধ্যেই নিউ ইয়র্কের টিকিট করতে হবে।

পুরানো কোন বন্ধুর দেখা এখনও পাইনি, মিস সুটার (Miss Souter) এবং ম্যাক্স গাইসিক (Max Gysic) ছাড়া—এঁরা এখন লণ্ডনে। এঁরা যেমন বরাবর আমার প্রতি সদয় ছিলেন, এখনও তাই।

কোন খবরই তোমাকে দেবার নেই, কারণ আমি নিজেই লণ্ডনের খবর এখনও কিছু জানি না। গারট্রুড অর্চার্ড (Gertrude Orchard) কোথায় জানি না, জানলে তার কাছে চিঠি লিখতাম। মিস কেট ষ্টীলও (Miss Kate Steel) বাইরে, বৃহস্পতিবার কি শনিবার আসছে।

একজন সুশিক্ষিত ফরাসী বন্ধুর কাছ থেকে পারি-তে তাঁর অতিথি হয়ে থাকবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু এবার যাওয়া হল না। অন্য কোন সময় তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আসব।

কয়েকজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার আশা আছে, হলে শুভেচ্ছা জানাব। আমেরিকায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। হয় আমি বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আটোয়া যেয়ে হাজির হব, কিম্বা তুমি আসবে নিউ ইয়র্কে।

বিদায়, ভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হোক।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪৩০

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

লণ্ডন
১০ অগষ্ট, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু,
তোমার পত্রে অনেক সংবাদ পাইলাম। আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু ডাঙায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন ডাক্তার বললে, নিরামিষ খাও, আর দাল ছুঁয়ো না। ইনি এখানকার একজন মুরুব্বী ডাক্তার। এঁর মতে ইউরিক এসিড-গোলমালে যত ব্যারাম হয়। মাংস এবং দাল ইউরিক এসিড বানায়; অতএব 'ত্যাজ্যং ব্রহ্মপদং' ইত্যাদি। যা হোক, আমি তাকে সেলাম করে চলে এলাম। Examine (পরীক্ষা) করে বললে চিনি-ফিনি নেই—আলবুমেন আছে। যাক! নাড়ী খুব জোর, বুকটাও দুর্বল বটে। মন্দ কি, দিনকতক হবিষ্যাশী হওয়া ভাল। এখানে বড় গোলযোগ—বন্ধু-বান্ধব সব গরমির দিনে বাইরে গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয়—খাওয়া-দাওয়ায়ও গোলমাল। অতএব দু-চার দিনের মধ্যেই আমেরিকায় চললুম। মিসেস বুলের জন্য একটা হিসাব পাঠাইও—কত টাকা জমি কিনতে, কত টাকা বাড়ি, খাইখরচ কত টাকা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সারদা বলে, কাগজ চলে না। … আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড় গড় করে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভট্চায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেন যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে? সাহেবেরা১০
কি করছেন? আমার হয়ে গেছে!
তোমরা যা করবার কর। একটা
পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা
প্রচার করবার কেউ নেই, একটা
বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই।
এক লাইন লিখবার … ক্ষমতা
কারুর নাই—সব খামকা মহাপুরুষ!
…তোমাদের যখন এই দশা, তখন
ছেলেদের হাতে ছমাস ফেলে দাও
সমস্ত জিনিষ—কাগজ-পত্র, টাকা-
কড়ি, প্রচার ইত্যাদি। তারাও কিছু
না পারে তো সব বেচে-কিনে যাদের
টাকা তাদের দিয়ে ফকির হও।
মঠের খবর তো কিছুই পাই না। শরৎ কি করছে? আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এক-রকম চলছে। তুমি টাকাকড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করবে। কমিটির সই করে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায়—এই দস্তুর। প্রতি পদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়। … ঐ-রকম প্রথমে কুঁড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চোর হয়। মঠে যারা আছে, তাদের নিয়ে একটি কমিটি করবে, আর প্রতি খরচ তারা সই না দিলে হবে না—একদম! … আমি কাজ চাই, vigour (উদ্যম) চাই—যে মরে সে বাঁচে; সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি?

শরৎ যদি কলিকাতা না জাগিয়ে তুলতে পারে ... তুমি যদি এ বৎসরের মধ্যে পোস্তা না গাঁথতে পার তো দেখতে পাবে তামাসা! আমি কাজ চাই—no humbug (কোন প্রতারণা নয়)! মাতাঠাকুরাণীকে আমার সাষ্টাঙ্গ, ইত্যাদি। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৩১*

রিজলি
২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,
জীবন হচ্ছে কতকগুলো ঘাত-প্রতিঘাত ও ভুল-ভাঙার সমষ্টি মাত্র। … জীবনের রহস্য হচ্ছে ভোগ নয়, পরন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ। কিন্তু হায়, যখন সবেমাত্র আমাদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় ঠিক তখনি ডাক আসে। এইটি অনেকের নিকট পরজন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রবল যুক্তি বলে মনে হয়। … সর্বত্রই কাজের উপর দিয়ে একটা ঘূর্ণিবায়ু বয়ে যাওয়া যেন ভাল বলে মনে হয়—তাতে সব পরিষ্কার করে দেয় এবং জিনিষের আসল রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। নূতন করে সে কাজ গড়ে তোলা হয়—বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপরে। … আমার একান্ত শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৩২*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

রিজলি
৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,
… আমার সম্বন্ধে তো ঐ এক কথা—মা-ই সব জানেন।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৩৩*

রিজলি ম্যনর ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,
আমি লেগেটদের বাড়ীতে শুধু বিশ্রামই উপভোগ করছি, আর কিছুই করছি না। অভেদানন্দ এখানে আছে, খুব খাটছে। দু-এক দিনের মধ্যে সে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে চলে যাবে এক মাসের জন্য। তারপর নিউ ইয়র্কে কাজ করতে আসবে।

তোমার প্রস্তাবিত ধারা অবলম্বনে আমি কিছু করবার চেষ্টায় আছি; কিন্তু হিন্দুদের সম্বন্ধে হিন্দুরই লেখা বই পাশ্চাত্য দেশে কতটা সমাদর পাবে জানি না।

মিসেস জন্‌সনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মূলারও আমায় ছেড়ে গেছেন—ঐ রোগের জন্য। হয়তো তাঁরাই ঠিক। তুমিও জান, আমিও জানি, আমি যা, আমি তাই। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য এবং ইওরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইওরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হতে পারি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক তো আজও দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয়, তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যাণ্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করত; তারপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হল—তা না হলে আমায় ছোঁবেই না। তারা আমাকে যা খেতে দিত, তা না খেলে আমায় অদ্ভুত মনে করত। এমনি সব!

অবশ্য সবই আমার কর্মফল, আর এতে আমি খুশীই আছি। কারণ এতে যদিও সময়ের মত যন্ত্রণা হয়, তবু এতে জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা হয় এবং তা এ-জীবনেই হোক বা পরজীবনেই হোক, কাজে লাগবে।

আমি নিজে কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়েই চলেছি। আমি সর্বদা জানি এবং প্রচার করে এসেছি যে, প্রত্যেক আনন্দের পশ্চাতে আসে দুঃখ—চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত না হলেও আসলটা তো আসবেই। আমি জগতের কাছে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি, সুতরাং যথেষ্ট ঘৃণার জন্যও আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এতে আমি খুশীই আছি—কারণ আমাকে অবলম্বন করে আমার এই মতবাদই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক উত্থানের সঙ্গে থাকে তার অনুরূপ পতন।

আমার দিক্ থেকে আমি আমার স্বভাব ও নীতিকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকি— একবার যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, সে সর্বদাই আমার বন্ধু। তাছাড়া ভারতীয় রীতি অনুসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্যই অন্তরে দৃষ্টিপাত করি; আমি জানি যে আমার উপর যত বিদ্বেষ ও ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে, তার জন্য দায়ী আমি এবং শুধু আমিই। এমনটি না হয়ে অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়।

তুমি ও মিসেস জন্‌সন যে আর একবার আমাকে অন্তর্মুখী হবার জন্য অবহিত করেছ, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিরকালের মত স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৪৩৪*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

রিজলি ম্যানর
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

হ্যাঁ, এসে পৌঁছেছি। গ্রীনএকার থেকে ইসাবেল-এর একখানা চিঠি পেয়েছি। তার সঙ্গে এবং হ্যারিয়েটের সঙ্গে শীঘ্রই দেখা করব। হ্যারিয়েট আগের মতই নীরব। যাই হোক, আমি অপেক্ষা করব, মিঃ উলী (Mr. Woolley) ক্রোরপতি হলেই আমার টাকা দাবী করব। তোমার চিঠিতে মাদার চার্চ বা ফাদার পোপের খুঁটিনাটি খবর কিছুই নেই, কতকগুলি কাগজে আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে না লিখেছে, কেবল তাই আছে। কাগজের লেখার প্রতি আমার আগ্রহ অনেকদিন কেটে গিয়েছে; সেগুলি শুধু জনসাধারণের সামনে আমাদের তুলে ধরে ও তাতে আমার বইগুলি—তোমার মতে 'যা হোক করে' বিক্রী হয়ে যায়। এখন কি করবার চেষ্টা করছি, জান? 'ভারত ও ভারতবাসী' সম্বন্ধে একটি বই লিখছি—ছোট্ট সহজ খোশগল্পে-ভরা একটা কিছু। ফরাসী শিখছি আবার। এ বছর শিখতে না পারলে আগামী বছর পারি-প্রদর্শনীর ব্যাপারটা ঠিকভাবে চালাতে পারব না। হ্যাঁ, এখানে বেশ খানিকটা ফরাসী শিখে নিতে চাই, চাকরেরা পর্যন্ত ফরাসীতে কথা বলে।

মিসেস লেগেটকে তুমি কখনও দেখনি, তাই নয় কি? মহিলাটি সত্যি চমৎকার। আগামী বছর আবার তাঁদের অতিথি হয়ে পারি যাচ্ছি, যেমন প্রথমবারে গিয়েছিলাম।

বর্তমানে দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার জন্য এবং কর্মকেন্দ্ররূপে গঙ্গাতীরে একটি মঠ হয়েছে।

সারা সময়টা কি করে কাটাচ্ছ? পড়াশুনা?—লেখা-লিখি? না, কিছুই করনি। এসময়ের মধ্যে অনেক কিছুই লিখে ফেলতে পারতে। চাই কি, যদি আমাকে ফরাসীটা শেখাতে, তাহলে এতদিনে আমি বেশ ফ্রগি (ফরাসী) হয়ে যেতাম, আর তা না করে আমাকে কিনা যত বাজে বকাচ্ছ। গ্রীনএকারে তুমি কোনদিন যাওনি; আশা করি, সেখানকার ব্যাপার প্রতি বছর বাড়ছে।

তোমার চিকিৎসা (ক্রিশ্চান সায়ান্স) দিয়ে আমাকে ভাল করতে পারলে না। তোমার রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার আস্থা বেশ কিছুটা কমে যাচ্ছে। স্যাম কোথায়?

আমার চুল তাড়াতাড়ি পেকে যাচ্ছিল, এখন কোনক্রমে তা বন্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয় এখন সবেমাত্র কয়েকটি পাকা চুল আছে; অবশ্য ভাল করে সন্ধান করলে আরও অনেক বেরিয়ে পড়বে। শুভ্র কেশ আমার বেশ পছন্দ।

মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ ইওরোপের দেশগুলিতে বেশ আনন্দে কাটাচ্ছিলেন, দেশে যাবার পথে আমি তা একটুখানি দেখে গেছি। আর চিকাগোতে তুমি রূপকথার সিন্দারেলা হয়ে বসে আছ—তা তোমার পক্ষে ভালই। আগামী বছর তোমাকে নিয়ে পারি যাব, বুড়োবুড়ীকে রাজী করাও দেখি। সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত দেখবার জিনিষ আছে; সকলে বলে, ফরাসীরা ব্যবসা গুটোবার আগে শেষবারের মত একটা বড়রকম সংগ্রামে নামছে।

হ্যাঁ, সুদীর্ঘকাল তুমি আমাকে চিঠি লেখনি। এ চিঠি তোমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু দেখছ—আমি কত ভালমানুষ, কারও সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না—বিশেষ করে মৃত্যু যখন দ্বারে। ইসাবেল ও হ্যারিয়েটকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল। মনে হয়, গ্রীনএকার ইন-এ (Greenacre Inn) তারা যথেষ্ট পরিমাণ রোগনিরাময়-শক্তির সরবরাহ পাচ্ছে এবং বর্তমান স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকে তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমার কালে কিন্তু সরাইখানাটি (Inn) আধ্যাত্মিক খাদ্যেই ভর্তি থাকত, পার্থিব দ্রব্যের পরিমাণ ছিল অনেক কম। তুমি কি অস্থিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জান? নিউ ইয়র্কে একজন এসে বাস্তবিক অবাক কাণ্ড করেছে। এক সপ্তাহ পরে তাকে দিয়ে আমার হাড়গোড় দেখান হবে।

মিস হাউ কোথায়? সত্যি তিনি মহৎপ্রাণ, একজন অকৃত্রিম বন্ধু। মেরী, কথাপ্রসঙ্গে বলছি, ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে তোমাদের পরিবারটি—মাদার চার্চ ও তার ধর্মযাজক (Mr. Hale)—সন্ন্যাসী ও সংসারী দুই রূপেই আমার মনের উপর যে ছাপ রেখেছেন, পরিচিত আর কোন পরিবার তা পারেনি। প্রভুর আশীর্বাদ চিরদিন তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমি এখন বিশ্রাম নিচ্ছি। লেগেটেরা খুব সহৃদয়। এখানে আমি খুব স্বচ্ছন্দে বাস করছি। ডিউই (Dewy) শোভাযাত্রা দেখতে নিউ ইয়র্ক যাবার ইচ্ছা। সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

তোমার সমস্ত খবর লিখবে, তা জানবার জন্য আমার খুব আগ্রহ। তুমি অবশ্যই জোজো-কে জান। আমার অবিরত স্বাস্থ্যভঙ্গের ফলে তাদের ভারতভ্রমণ পণ্ড হয়েছে, কিন্তু তারা কতই না সহৃদয় ও ক্ষমতাপরায়ণ! কয়েক বছর ধরে সে ও মিসেস বুল স্বর্গীয় দূতের মত আমার তত্ত্বাবধান করেছে। আগামী সপ্তাহে মিসেস বুলের এখানে আসার সম্ভাবনা।

আগেই তিনি এখানে এসে হাজির হতেন, কিন্তু তাঁর মেয়ে (ওলিয়া) হঠাৎ অসুখে পড়ে। মেয়েটি খুব ভুগছে, তবে এখন বিপদ কেটে গেছে। এখানে লেগেটের একখানা কুটীর মিসেস বুল নিয়েছেন। অকালে শীত না পড়লে আরও মাসখানেক এখানে আমাদের চমৎকার কাটবে। জায়গাটি সত্যি সুন্দর—বনরাজিবেষ্টিত নিখুঁত তৃণাবৃত ময়দান।

সেদিন গল্‌ফ খেলার একটা প্রচেষ্টা করা গেল; খেলাটা খুব কঠিন বলে মনে হয় না—শুধু অভ্যেস চাই। তোমার গলফ্-প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে কখনও ফিলাডেলফিয়া যাওনি? তোমার মতলবটা কি? বাকী জীবনটা কি করে কাটাতে চাও বল তো? কোন কাজের পরিকল্পনা করেছ কি? একটি বড় চিঠি লিখ, লিখবে কি? নেপলস্-এর রাজপথে চলতে চলতে তিনজন মহিলার সঙ্গে আর একজনকে যেতে দেখি—নিশ্চয়ই আমেরিকান—তোমার সঙ্গে তার এত মিল যে, আমি তো প্রায় কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কাছে এসে তবে ভুল ভাঙল। এবারের মত বিদায়। শীঘ্র শীঘ্র লিখ।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৪৩৫-৪৪৪

৪৩৫*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

রিজলি ম্যানর
৩ অক্টোবর, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,
তোমার অত্যন্ত সহৃদয় কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ। এখন আমি অনেক ভাল আছি এবং দিন দিন আরও ভাল হচ্ছি। কাল বা পরশু মেয়েকে নিয়ে মিসেস বুলের আসার কথা। সুতরাং আবার কিছুকাল ভাল কাটবে বলে মনে হয়—তোমার অবশ্য সব সময়ই ভাল কাটছে। ফিলাডেলফিয়া যাচ্ছ জেনে খুশী হয়েছি, কিন্তু সে-বারের মত এবারে ততটা নই, সে-বার দিগন্তে ক্রোরপতি দেখা দিয়েছিল। সর্ববিধ ভালবাসা জেন।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪৩৬*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

রিজলি ম্যানর
৩০ অক্টোবর, ১৮৯৯

স্নেহের আশাবাদী ভগিনী,
তোমার চিঠি পেয়েছি। স্রোতে-ভাসা আশাবাদীকে কর্মে প্রবৃত্ত করবার মত কিছু একটা যে ঘটেছে, তার জন্য আনন্দিত। তোমার প্রশ্নগুলি দুঃখবাদের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে, বলতে হবে। বর্তমান ব্রিটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক্ আছে, যদিও অজান্তে ঘটেছে—তা ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে চাপিয়ে দিয়েছে জোর করে। সংশ্লিষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হত—অনুকূল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—তাহলে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে আরও কত বিস্ময়কর হতে পারত। কিন্তু রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার—কিছু স্বাধীনতা ছিল।

কয়েক-শ অর্ধশিক্ষিত, বিজাতীয় নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান ব্রিটিশ ভারতের সাজান তামাশা—আর কিছু নয়। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নীচে।

ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, (দেশীয় রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি) তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু মুসলমান শাসনের আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও সেই সংখ্যায় পৌঁছয়নি। বর্তমান জনসংখ্যার অন্ততঃ পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মত জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতে আছে—যদি সব কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়।

এই তো অবস্থা—শিক্ষাবিস্তারও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই) যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখছি, আরও কী আসে! কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকীরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না, কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। ব্রিটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট

করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান্? মেরী, তুমি আশাবাদী হতে পার, কিন্তু আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ করে দাও—ভারতের নূতন কানুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে। আর আমি জানি তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসকসম্প্রদায় ব্যাপারটা উপভোগ করবে, কারণ আমি যে 'হিদেন'। এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম নীরো (Nero)। হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা তারা সংবাদ হিসাবেও লিখবার উপযুক্ত মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেণ্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাফিক তৈরী' ঠিক উল্টো খবরটি বাজারে ছাড়বে। হিদেন-হনন খ্রীষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত অবসর-বিনোদন। তোমাদের মিশনারীরা ভারতে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে যায়, কিন্তু ইংরেজদের ভয়ে সেখানে একটি সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারে না; যদি করে, পরদিন ইংরেজরা তাদের দূর করে দেবে।

পূর্বতন শাসকেরা শিক্ষার জন্য যে-সব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে সকলই গ্রাস করে নেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে—আর সে কী শিক্ষা! মৌলিকতার সামান্য চেষ্টাও টুঁটি টিপে মারা হয়।

মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান্ থাকেন, যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন। তেমন কোন ভগবান্ আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে।

হ্যাঁ, আশা করছি—কয়েক সপ্তাহ পরে চিকাগো যেতে পারব এবং তখন সব কথা খুলে বলব।

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ সতত তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনঃ—ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে '—' এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কতকগুলি অর্থহীন সংমিশ্রণ; ইংরেজ প্রভুদের কাছে আমাদের বাঁচতে দেবার প্রার্থনা নিয়ে এরা গজিয়ে উঠেছে। আমরা এক নূতন ভারতের সূচনা করেছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি। নূতন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাসী, যখন জাতির তা প্রয়োজন এবং যা আমাদের পক্ষে যথার্থ সত্য হবে। অন্যদের সত্যের পরীক্ষা হল 'আমাদের প্রভুরা যা অনুমোদন করেন'; আর আমাদের হল, যা ভারতীয় জ্ঞানবিচারে বা অভিজ্ঞতায় অনুমোদিত, তাই। লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, '—' ও আমাদের মধ্যে নয়, … শুরু হয়েছে আরও কঠিন ও ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে। ইতি

বি

৪৩৭*

C/o F. Leggett Esq.
রিজলি ম্যানর
আলস্টার কাউন্টি নিউ ইয়র্ক

প্রিয় স্টার্ডি,
ঠিকানায় অসম্পূর্ণতার জন্য তোমার শেষ চিঠিখানা কয়েক জায়গা ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।

হতে পারে তোমার সমালোচনার অনেকখানি অংশ সঙ্গত ও সত্য, আবার এও সম্ভব যে, কোন একদিন তুমি দেখবে, এ-সকলই কতকগুলি লোকের প্রতি তোমার বিরাগ থেকে প্রসূত, আর আমি হয়েছি অপরের কৃত অপরাধের ফলভোগী (scapegoat)।

যা হোক, এ-সব নিয়ে তিক্ততার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি যা নই, তার ভান কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না। আর তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার ধূমপান, খারাপ মেজাজ ইত্যাদি ব্যাপার—আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটালে যে-কেউ সহজে জানতে পারে। 'মিলন-মাত্রেরই বিচ্ছেদ আছে'—এই হল প্রকৃতির নিয়ম। তার জন্য আমার নৈরাশ্যের ভাব আমার মধ্যে জাগে না। আশা করি, তোমার মনে কোন তিক্ততা থাকবে না। কর্মই আমাদের মিলিয়ে দেয়, আবার কর্মই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে।

জানি তুমি কেমন লাজুকস্বভাব এবং অপরের মনোভাবে আঘাত করতে কতখানি অপছন্দ কর। আমি খুবই বুঝতে পারছি, সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের লোকদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যখন তোমাকে যুঝতে হচ্ছিল, তখন মাসের পর মাস তোমাকে কি-রকম মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এমন যে হবে, তা পূর্বে অনুমান করতে পারলে তোমাকে অনেক অনাবশ্যক মানসিক অশান্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পারতাম। এও আবার সেই 'কর্ম'।

হিসেবপত্র পূর্বে পেশ করা হয়নি, কারণ কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি; সমস্ত ব্যাপারটাকে চুকে গেলে দাতার কাছে সম্পূর্ণ

হিসেব দাখিল করব, ভেবেছিলাম। টাকার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার ফলে কাজ মাত্র গত বছর শুরু হতে পেরেছে এবং আমার নীতি হল, টাকার জন্য হাত না পেতে স্বেচ্ছায় দানের জন্য অপেক্ষা করা।

আমার সমস্ত কাজে এই একই নীতি মেনে চলি, কারণ আমার স্বভাব যে অনেকের কাছেই নিতান্ত অপ্রীতিকর, সে সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন এবং যতক্ষণ না কেউ আমাকে চায়, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে থাকি। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যও প্রস্তুত থাকি। আর এই বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার কখনও মন খারাপ হয় না কিম্বা সে-সম্বন্ধে বেশি কিছু চিন্তাও করি না, কারণ আমার নিত্য ভ্রাম্যমাণ জীবনে এ জিনিষ আমাকে সব সময়ই করতে হচ্ছে। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর দ্বারা অন্যকে যে কষ্ট দিই, সেই আমার দুঃখ। তোমার ঠিকানায় আমার নামে কোন ডাক থাকলে দয়া করে পাঠিয়ে দেবে কি?

সকল শুভাশিস তোমাদের চিরসাথী হোক—বিবেকানন্দের নিরন্তর এই প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

৪৩৮*

রিজলি
১ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ,
… মনে হচ্ছে তোমার মনে যেন কি একটা বিষাদ রয়েছে। তুমি ঘাবড়িও না, কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাই কর না কেন, জীবন কিছু অনন্ত নয়! আমি তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাহাদের বিধিলিপি; যদিও বা এর প্রতিকার সম্ভব হয়, তবু তা না হওয়া অবধি, ভাবী বহু যুগ পর্যন্ত এ জগতে এ ব্যাপারটা অন্ততঃ একটা স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৩৯*

নিউ ইয়র্ক
১৫ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ,
… মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। এ-জাতীয় স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কখনও বা মহাসঙ্গীত-সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কখনও বা অন্ধকারে কেঁদে মরে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৪০*

C/o E. Guernsey, M.D.
The Madrid, 180 W. 59
১৫ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস বুল,
শেষ পর্যন্ত—এখনই কেম্ব্রিজে যাওয়া স্থির করেছি। যে-সব গল্প শুরু করেছিলাম, তা শেষ করতেই হবে। প্রথমটি আমাকে ফেরত দিয়েছে বলে মনে হয় না।

আগামী পরশু আমার পোষাক তৈরী হয়ে যাবে, তারপরই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারব; শুধু ভয় এই—সমস্ত শীতকালটা অবিরত পার্টি আর বক্তৃতার ফলে সেখানে বিশ্রাম হবে না, উপরন্তু স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে।

যা হোক, বোধ হয় আপনি কোথায়ও একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন, যেখানে ঐ-সব ব্যাপার থেকে গা-ঢাকা দিয়ে একান্তে থাকতে পারব।

যে ভাবেই হোক, এই সপ্তাহে পোষাক তৈরী হয়ে গেলেই আমি চলে আসছি। আমার জন্য আপনার নিউ ইয়র্কে আসবার প্রয়োজন নেই। যদি আপনার নিজের কাজ থাকে, তা হলে আলাদা কথা। মণ্টক্লেয়ারের মিসেস হুইলারের কাছ থেকে খুব সহৃদয় আমন্ত্রণ পেয়েছি। বষ্টনে রওনা হবার আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্ততঃ মণ্টক্লেয়ারে ঘুরে যেতে হবে।

অনেক ভাল বোধ করছি এবং সুস্থ আছি। দুর্ভাবনা ছাড়া আর কিছু বালাই নেই; এবারে তাও নিশ্চয়ই সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ভারতে লেখা আপনার চিঠিপত্রে পরোক্ষভাবেও আমার সম্বন্ধে যেন কোন সংবাদ না থাকে—আপনার কাছে শুধু এটিই চাই; কিন্তু পাব কিনা সে-বিষয়ে আমার আশঙ্কা আছে। কিছু সময়ের জন্য অথবা চিরদিনের মত আমি গা-ঢাকা দিতে চাই। অভিশপ্ত হোক আমার প্রসিদ্ধির দিনটি!

সর্ববিধ ভালবাসা সহ
বিবেকানন্দ

৪৪১*

C/o F. H. Leggett
21 West 34th St., New York
নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,

আমার আচরণ সমর্থনের জন্য এ চিঠি নয়। যদি আমি অন্যায় কিছু করে থাকি, তবে তা কথা দিয়ে মোছা যাবে না, বা কোন বিরূপ সমালোচনা করে আমাকে সৎকাজ থেকে বিরত করা যাবে না।

বিলাসিতা, বিলাসিতা—গত কয় মাস থেকে কথাটি বড্ড বেশী শুনতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্যবাসীরা নাকি তার উপকরণ যুগিয়েছে, আর সর্বক্ষণ ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে ভণ্ড আমি নাকি নিজে সেই বিলাসিতা ভোগ করে আসছি। এই বিলাস-ব্যসনই নাকি আমার কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্ততঃ ইংলণ্ডে। আমি এই বিশ্বাসের কুহকে পড়েছিলাম যে, আমার জীবনের ঊষর মরুতে অন্ততঃ ছোট্ট একটি মরুদ্যান আছে; সমগ্র জীবনের দুঃখ ও অন্ধকারের মধ্যে আলোর একটু চিহ্ন, কঠোর পরিশ্রম ও কঠোরতর অভিশাপের জীবনে এক মুহূর্তের আরাম—সেই মরুদ্যান, সেই চিহ্ন, সেই মুহূর্তটি শুধু একটু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের ব্যাপার!!

আমি খুশীই ছিলাম, সেটুকু পেতে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের দিনে শতবার আশীর্বাদ করেছি, কিন্তু এমন সময় আকস্মিকভাবে তোমার চিঠিখানা হাতে এল, আর আমার স্বপ্নও কোথায় মিলিয়ে গেল। তোমাদের সমালোচনায় আমার আর কোন আস্থা নেই—এ-সব বিলাসব্যসনের কথায় আর কান দিই না, স্মৃতিতে জেগে উঠেছে অন্য এক দৃশ্য সেই কথাই লিখছি। উপযুক্ত মনে করলে এ চিঠি বন্ধুদের কাছে একে একে পাঠিয়ে দিও এবং কোথাও ভুল লিখে থাকলে শুধরে দিও।

ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা বাদ দিলে ইংলণ্ড থেকে আমি রুমালের মত একটুকরো বস্ত্র পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ অপর পক্ষে ইংলণ্ডে আমার শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের চাপের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা — ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ অমানুষিক খাটিয়ে। এখন আবার বিলাস-ব্যসন নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছে!! তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটি কোট দিয়েছ, বলতে পার? কেউ একটা সিগার? এক-টুকরা মাছ বা মাংস? তোমাদের মধ্যে এ-কথা বলবার দুঃসাহস কার আছে যে, তোমাদের কাছে আমি খাবার, পানীয়, সিগার, পোষাক বা টাকা চেয়েছি? জিজ্ঞেস কর, ... ঈশ্বরের নামে বলছি, জিজ্ঞেস কর তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর এবং সবচেয়ে আগে জিজ্ঞেস কর তোমার নিজের 'অন্তর্যামী ভগবানকে—যিনি কখনও ঘুমান না।'

আমার কাজের জন্য তোমরা যে টাকা দিয়েছ, তার প্রতিটি পেনি সেখানেই আছে। তোমাদের চোখের সামনে আমার ভাইকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে, সম্ভবতঃ মৃত্যুর প্রতীক্ষায়; কিন্তু তাকে আমি একটি কানাকড়িও দিইনি, কারণ আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না।

আর অন্য দিকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময় তারা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমার নিজের মার চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন; এবং তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। সেই মিসেস সেভিয়ার মান-মর্যাদার পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া। তাঁর লোকান্তরের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে মনে রাখবে দরিদ্র ভারতবাসীর একজন অকৃত্রিম শুভার্থিনীরূপে। তাঁরা কখনও আমাকে বিলাসিতার জন্য নিন্দা করেননি, যদিও আমার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হলে বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে তাঁরা

প্রস্তুত।

মিসেস বুল, মিসেস ম্যাকলাউড, মিঃ ও মিসেস লেগেট সম্বন্ধে তোমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার জন্য তাঁদের ভালবাসা ও সহৃদয়তার কথা তোমার জানা আছে; মিসেস বুল ও মিসেস ম্যাকলাউড আমাদের দেশে গিয়েছেন এবং জীবনের সাধারণ সুখ-সুবিধাগুলি ত্যাগ করে আমাদের মধ্যে এমনভাবে বসবাস ও চলাফেরা করেছেন, যা কোন বিদেশী কখনও করেনি এবং তাঁরা তো আমার বিলাসিতার মুণ্ডপাত করেন না, বরং আমাকে খাওয়াতে পারলে বা আমি চাইলে দামী সিগার খাইয়ে তাঁরা আনন্দ পান। আর যখন আমি তোমাদের জন্য প্রাণপাত করছিলাম এবং নোংরা গর্তে অনাহারের মধ্যে রেখে যখন তোমরা আমার গায়ের মাংস তুলে নিচ্ছিলে ও সঞ্চয় করে রেখেছিলে বিলাসিতার এই অপবাদ, সেদিনও এই লেগেট ও বুলদের দেওয়া রুটিই আমি খেয়েছি, তাঁদের দেওয়া কাপড়ই আমি পরেছি, তাঁদের টাকাতেই আমি ধূমপান করেছি এবং বহুবার বাড়ীভাড়াটা পর্যন্ত মিটিয়েছেন তাঁরাই।

'শরতের মেঘ গরজে বিপুল, নাহি ঢালে বারিধারা,
বর্ষার মেঘ স্তব্ধ নীরব ভাসায় বসুন্ধরা।'

তবেই দেখ ..., যাঁরা সাহায্য করেছেন বা এখনও করছেন তাঁদের কাছ থেকে কোন বিরূপ সমালোচনা বা নিন্দা নেই; যারা কিছুই করে না এবং শুধুই নিজের সার্থসিদ্ধির পথ খোঁজে, তারাই কেবল নিন্দা ও সমালোচনা করে। এ রকম মূল্যহীন, হৃদয়হীন, স্বার্থযুক্ত ও নোংরা সমালোচনার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমার কাছে আর নেই। এইসব চূড়ান্ত স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাকা আমার যতটা কাম্য, জীবনে আর কিছুই তেমন নয়।

বিলাসিতার কথা বলছ! এইসব সমালোচকদের এক এক করে ধর—দেখবে প্রত্যেকেরই মন পড়ে আছে দেহে, আত্মার উপলব্ধি কারও একবিন্দু নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আগেই হোক, পড়েই হোক তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। আর এইসব হৃদয়হীন লোকের অভিপ্রায় অনুসারে তুমি আমার আচরণ ও কর্মধারা পরিবর্তন করতে উপদেশ দিচ্ছ, আর আমি তা করছি না বলে তোমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত!

আমার গুরুভ্রাতাদের উপর আমি যে কাজ চাপাই, তারা তাই করে। যদি তারা কখনও স্বার্থপরতা দেখিয়ে থাকে, তা আমাদের আদেশেই করেছে, নিজের খুশীমত করেনি।

লণ্ডনে আমাকে যেমন অন্ধকার গর্তটির ভেতরে রেখেছিলে এবং সর্বক্ষণ পরিশ্রম ও অনাহারের মধ্যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিলে, তোমার সন্তানের বেলায় তা করতে পারতে কি? মিসেস—কি তা করতে চাইবেন?

তারা সন্ন্যাসী, তার অর্থ এই—কোন সন্ন্যাসী অকারণে শরীর ত্যাগ বা অপ্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা করবে না। পাশ্চাত্যদেশে এই-সকল কঠোরতা করতে গিয়ে আমরা সন্ন্যাসের নিয়মই ভঙ্গ করেছি। তারা আমার ভাই, আমার সন্তান। আমার জন্য তারা গর্তের মধ্যে মারা যাক, এ আমি চাই না। সত্য ও মঙ্গলকর সমস্ত শক্তির বলে আমি চাই না—তারা তাদের এত কষ্টের বদলে অনাহারে বা খেটে মরুক, কিম্বা অভিশপ্ত হোক।

আরও একটি কথা। যদি তুমি দেখাতে পার—কোথা আমি দেহের উপর নির্যাতনের কথা প্রচার করেছি, তা হলে খুশী হব। শাস্ত্রের কথা তুললে আমি বলি, সন্ন্যাসী ও পরমহংসদের জীবনযাপনের যে নিয়ম সেখানে লিপিবদ্ধ আছে, তা আমরা পালন করিনি, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াতে কোন (শাস্ত্রী) পণ্ডিত যদি সাহস করেন, (তাঁর সম্মুখীন হতে) আমি খুবই খুশী হব।

হ্যাঁ ..., বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে আমার অন্তর। এর সবই আমি বুঝি। তোমার ভেতরটা কী, তা আমি জানি, কিন্তু তুমি এমন সব লোকের কবলে পড়েছ, যারা (তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তোমাকে ব্যবহার করতে চায়। তোমার স্ত্রীর কথা বলছি না। তিনি সরলপ্রাণা, অনিষ্টকর কিছু তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু বৎস, তোমার গায়ে আমিষ গন্ধ আছে—সামান্য কিছু টাকা আছে, শকুনিরা তাই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। এই হল জীবন।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছিলে। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে ..., এখনও সে মরেনি, আজও সেই জীবন্ত ভারত নির্ভীকভাবে ধনীর অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে তার নিজস্ব বাণী প্রচার করার মনোবল রাখে; কারও মতামতের পরোয়া সে করে না, এ দেশে—যেখানে তার পায়ে শিকল আঁটা কিম্বা শিকলের প্রান্তভাগ যারা ধরে আছে, সেই শাসনকর্তাদের মুখের সামনেও করে না। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে ..., অম্লান প্রেমের, চিরস্থায়ী বিশ্বস্ততার চিরন্তন ভারতবর্ষ—শুধু রীতিনীতিতেই নয়, প্রেমে বিশ্বাসে ও বন্ধুত্বে। সেই ভারতের একজন নগণ্য সন্তান হিসাবে আমি তোমাকে ভালবাসি ভারতীয় প্রেমে, এবং এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে তোমায় সাহায্য করার জন্য আমি সহস্রবার শরীরত্যাগে প্রস্তুত।

চিরদিন তোমার
বিবেকানন্দ

৪৪২*

1st East 39 St. নিউ ইয়র্ক
২০ নভেম্বর, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,
খুব সম্ভবতঃ কাল ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করছি। পথে দু-এক দিনের জন্য চিকাগোয় থাকব। যাত্রা করে তোমাকে ‘তার’ করব। কাউকে ষ্টেশনে পাঠিও, কারণ পথে ‘ভিতর’ ও ‘বাহির’ (in and out) খুঁজে বার করতে আমি কোন দিনই পারি না, এখন তো আরওই।

তোমার চিরদিনের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪৪৩

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

আমেরিকা
২০ নভেম্বর, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু ,
শরতের পত্রে খবর পেলুম। ... হার-জিতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তোমরা এইবেলা experience (অভিজ্ঞতা) করে নাও। ... আমার আর কোন রাগ নেই। আমি আবার ... ঘুরতে চললুম জায়গায় জায়গায়। কুছ পরোয়া নেই, মাভৈঃ। সব উড়ে যাবে তোমাদের সামনে, খালি (অবাধ্য) হয়ো না, সব সিদ্ধি হবে। ... জয় মা রণরঙ্গিণী! জয় মা, জয় মা, রণরঙ্গিণী! ওয়া গুরু, ওয়া গুরুকী ফতে!

... আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না, তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি? ... এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে ... তবে মানুষ। ... কাপুরুষ দয়ার আধার!! ১১

আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ার দিনে—এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আনুন! জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী! মা নাববেনই নাববেন—মহাবলে সর্বজয়—বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন। ভয় কি? কাদের ভয়? জয় কালী, জয় কালী! তোমাদের এক এক জনের দাপটে ধরা কাঁপবে। ... জয় কালী, জয় কালী! আবার onward, forward (এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও)! ওয়া গুরু, জয় মা, জয় মা; কালী, কালী, কালী! রোগ, শোক, আপদ, দুর্বলতা, সব গেছে তোমাদের! মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের! মাভৈঃ মাভৈঃ। ফাঁড়া উতরে গেছে, মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী!

বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার——মনে যেন না আসে, ভালবাসা —যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে?—মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী!

৪৪৪

21 West 34 St.
নিউ ইয়র্ক
২১ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ব্রহ্মানন্দ,

হিসাব ঠিক আছে। আমি সে-সব মিসেস বুলের হাতে সঁপে দিয়েছি এবং তিনি বিভিন্ন দাতাকে হিসাবের বিভিন্ন অংশ জানাবার ভার নিয়েছেন। আগেকার কঠোর চিঠিগুলিতে আমি যা লিখেছি, তাতে কিছু মনে কর না। প্রথমতঃ ওতে তোমার উপকার হবে—এর ফলে তুমি ভবিষ্যতে যথানিয়মে কেতাদুরস্ত হিসাব রাখতে শিখবে এবং গুরুভাইদেরও এটা শিখিয়ে নেবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব ভর্ৎসনাতেও যদি তোমরা সাহসী না হও, তাহলে তোমাদের সব আশা ছেড়ে দিতে হবে। আমি চাই তোমরা (কাজ করতে করতে) মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মত আজ্ঞাপালন করে মরে যাও এবং নির্বাণ লাভ কর, কিন্তু কোন প্রকার ভীরুতা চলবে না।

কিছুদিনের মত আমার একটু গা-ঢাকা দেবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে সময় যেন আমায় কেউ পত্র না লেখে এবং খোঁজ না করে। আমার স্বাস্থ্যের জন্য এটি একান্ত আবশ্যক। আমার স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে গেছে—এই মাত্র, আর কিছু নয়।

তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হোক। আমার রূঢ়তার জন্য মন খারাপ কর না। মুখে যা-ই থাকুক—তুমি তো আমার হৃদয় জান। তোমাদের সর্বপ্রকার শুভ হোক। বিগত প্রায় এক বৎসর আমি যেন একটা ঝোঁকে চলেছি। এর কারণ কিছু জানি না। ভাগ্যে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ ছিল—আর তা হয়ে গেছে। আমি সত্যই এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। প্রভু তোমাদের সহায় হোন! আমি চিরবিশ্রামের জন্য শীঘ্রই হিমালয়ে যাচ্ছি। আমার কাজ শেষ হয়েছে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিসেস বুল তোমাদের তাঁর ভালবাসা জানাচ্ছেন।

পত্রাবলী ৪৪৫-৪৫৪

৪৪৫*

চিকাগো
২৬ নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস লেগেট,
আপনার সকল সহৃদয়তা, বিশেষ করে সহৃদয় পত্রটির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।আগামী বৃহস্পতিবার চিকাগো থেকে রওনা হচ্ছি, সেদিনের জন্য টিকিট ও বার্থ ঠিক করা হয়েছে।

মিস নোবল্ এখানে কাজ খুব ভালই চালাচ্ছে এবং নিজের পথ সে নিজেই তৈরী করে নিচ্ছে। এলবার্টার সঙ্গে সেদিন দেখা হল। এখন অবস্থানের প্রতিটি মুহূর্তে সে উপভোগ করছে এবং সে খুব আনন্দে আছে। মিস অ্যাডাম্স্ (Jane Adams) যথাপূর্ব দেবীর মত।

যাত্রার আগে জো জো-কে 'তার' করব এবং সারারাত বই পড়ে কাটাব। আপনাকে ও মিঃ লেগেটকে ভালবাসা।

আপনার চিরস্নেহের
বিবেকানন্দ

৪৪৬

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

চিকাগো
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৯

মা,
মাদাম কাল্ভের আগমন ছাড়া নূতন কোন খবর নেই। তিনি একজন মহীয়সী মহিলা। তাঁকে যদি আরও দেখতে পেতাম! সাইক্লোনের মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল পাইন লড়াই করে যাচ্ছে—এ একটা মহান্ দৃশ্য। তাই নয় কি?
১২

আজ রাতে এস্থান ছেড়ে যাচ্ছি। এই কয়েকটি লাইন তাড়াতাড়ি লিখছি, কারণ অ—অপেক্ষা করছিল। মিসেস অ্যাডাম্স্ যথারীতি সহৃদয়। মার্গট চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আরও লিখব।

ফ্রান্কিনসেন্সকে ভালবাসা।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৪৭*

লস এঞ্জেলেস্
৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার ষষ্ঠ দফা এসে পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও আমার ভাগ্যের কোন ইতরবিশেষ ঘটেনি। স্থান-পরিবর্তনে বিশেষ কোন উপকার হবে বলে মনে কর কি? কারও কারও প্রকৃতিই এমন যে, তারা দুঃখ পেতেই ভালবাসে। বস্তুতঃ যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, যদি তাদের জন্য আমার হৃদয় উৎসর্গ না করতাম তো অন্যের জন্য করতেই হত—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই হচ্ছে কারও কারও ধাত—আমি তা ক্রমে বুঝতে পারছি। আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটছি সত্য, কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখেরই মধ্যে আনন্দ পায়—এটা খুব আশ্চর্য নয় কি? এতে ক্ষতি কিছু নেই; শুধু ভাববার বিষয় এই যে, সুখ-দুঃখ উভয়ই সংক্রামক। ইঙ্গারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবান্ হতেন তবে ব্যাধিকে সংক্রামক না করে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যে ব্যাধি অপেক্ষা অধিক না হলেও অনুরূপভাবে সংক্রামক, তা তিনি একটুও ভাবেননি। বিপদ তো ঐখানেই। আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে জগতের কিছুই যায়-আসে না—শুধু অপরে যাতে সংক্রামিত না হয়, তা দেখতে হবে। কর্মকৌশল তো ঐখানেই। যখনই মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে ব্যথিত হন, তখন তিনি নিজের মুখ ভার করেন, বুক চাপড়ান এবং সকলকে ডেকে বলেন, ‘তোমরা তেঁতুল-জল খাও, কয়লা চিবাও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদায় বসে থাক, আর শুধু চোখের জলে করুণ সুরে বিলাপ কর।’ আমি দেখছি, তাঁদের সবারই ত্রুটি ছিল—সত্যি সত্যি ছিল। যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদিগকে এমন শঙ্কিত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং ছিল ভাল। যে ব্যক্তি সত্যসত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে, তাঁর মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না, তার কারণ এ নয় যে, জগতে পাপ নেই; তার কারণ এই যে, তিনি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যিনি পরিত্রাতা তাঁকেই সানন্দে আপন পথে চলতে হবে; যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, এ কাজ তাদের নয়।

আজ প্রাতে শুধু এ তত্ত্বের আলোই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদি এ ভাব আমার মধ্যে স্থায়িভাবে এসে থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে, তবেই যথেষ্ট।

দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোনকালে ছিলাম। অনন্ত ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমার পিতা
বিবেকানন্দ

৪৪৮*

১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনি ঠিকই ধরেছেন—আমি নিষ্ঠুর, বড়ই নিষ্ঠুর। আর আমার মধ্যে কোমলতা প্রভৃতি যা কিছু আছে, তা আমার ত্রুটি। এই দুর্বলতা যদি আমার মধ্যে আরও কম—অনেক কম থাকত! হায়! কোমলভাবই হল আমার দুর্বলতা এবং এটিই আমার সব দুঃখের কারণ। ভাল কথা মিউনিসিপ্যালিটি অত্যধিক কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়। সেটা আমারই দোষ, কারণ আমি ট্রাষ্ট করে সাধারণের হাতে তুলে দিইনি। আমি যে মাঝে মাঝে আমার ছেলেদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করি, সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত; কিন্তু তারাও জানে যে, সংসারে সবার চাইতে আমি তাদের বেশী ভালবাসি।

দৈবের সহায়তা সত্যই হয়তো আমি পেয়েছি; কিন্তু উঃ! এতটুকু দৈব কৃপার জন্য আমাকে কি পরিমাণেই না রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে। ঐটি না পেলে হয়তো আমি আরও বেশী সুখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আরও ভাল হতাম। বর্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমায় প্রাণ দিতে হবে—হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না; এইজন্যই তো ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি তো তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না—আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু হায়, এখন আমি চাই যে, আমার ছেলেদের মধ্যে অন্ততঃ একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করুক।

আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষে কোন কাজ করতে হলে, আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। আমার স্বাস্থ্য এখন আগের চেয়ে অনেকটা ভাল; হয়তো সমুদ্রযাত্রায় আরও ভাল হবে। যা হোক, এবার আমেরিকায় কেবল বন্ধু-বান্ধবদের উত্ত্যক্ত করা ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ করিনি। আমার পাথেয় বাবদ অর্থ-সাহায্য জো-র কাছ থেকেই পাব, তাছাড়া মিঃ লেগেটের কাছেও আমার কিছু টাকা আছে। ভারতবর্ষে কিছু অর্থ-সংগ্রহের আশা এখনও আমি রাখি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যে-সব বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁদের কাছে এখনও যাইনি। আশা করি, প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাজার পুরোবার জন্য পনর হাজার সংগ্রহ করতে পারব এবং ট্রাষ্টের দলিল হয়ে গেলেই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমে যাবে। আর যদি এ অর্থ সংগ্রহ করতে নাও পারি, তবু আমেরিকায় নিরর্থক বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরাও শ্রেয় মনে করি। আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে;

কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ খুব বেশী ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার একটুও ভালবাসা না থাকত! ভক্তির কথা বলছেন! হায় আমি যদি নির্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম! যাক এ জীবন শেষ হয়েছে; পরজন্মে চেষ্টা করে দেখব। আমার দুঃখ এই—বিশেষতঃ আজকাল—আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের চেয়ে অপকারই বেশী পেয়েছে। যে শান্তি ও নির্জনতা চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদৃষ্টে জুটল না।

বহু বৎসর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না—এই মনে করে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা করল, সে-সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছল, আমার সেই দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সে দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি, তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তি আমি চেয়েছি; কিন্তু ভক্তির আধার সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা থেকে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম! যাক, তাই যখন আমার নিয়তি, তখন তাই হোক; আর যত শীঘ্র এর শেষ হয়, ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি ভাবপ্রবণ, কিন্তু অবস্থার কথা ভাবুন দেখি! আপনি আমাকে কতই না ভালবাসেন—আমার প্রতি কতই না সদয়! অথচ আমিই কিনা আপনার এত বেদনার কারণ হলাম! আমি এতে দুঃখিত। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—এ তো অন্যথা হবার নয়! এখন আমি গ্রন্থি ছেদন করতে চাই, অথবা সে চেষ্টায় শরীরপাত করব।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—মহামায়ার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক। সান ফ্রান্সিস্কো হয়ে ভারতবর্ষে যাবার খরচ আমি জো-র কাছে চাইব। যদি সে তা দেয়, তবে অবিলম্বে জাপান হয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করব। এতে একমাস লাগবে। ভারতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব বলে আশা রাখি—যাতে কাজ চলে যাবে বা কাজের ভিত্তি দৃঢ়তর হবে—অন্ততঃ যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় এখন রয়েছে দেখছি, তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারবে না। কাজের শেষটা যেন বড় তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে—অবশ্য এমনি প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু ভগবানের দয়ায় এ কথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেব। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান্ যদি আমায় তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বর্তমানে আপনার চিঠি পেয়ে এত আনন্দে আছি যে, এমন আনন্দ বহুকাল পাইনি। ওয়া গুরু কি ফতে, গুরুজীর জয় হোক! হ্যাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—সংসার আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনও হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেছিল। মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম তো গৌরবের বিষয়।

আপনার ও আপনার স্বজনবর্গের সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক। আমি যতটুকুর যোগ্য তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী আপনি আমার জন্য করেছেন। ক্রিষ্টিন ও তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

বিবেকানন্দ

৪৪৯*

২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ধীরামাতা,
আজ কলিকাতার এক পত্রে জানলাম যে, আপনার চেকগুলি পৌঁছেছে; ঐ সঙ্গে বহু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার বাণীও এসেছে।

লণ্ডনের মিস সুটার ছাপানো পত্রে নববর্ষের অভিবাদন জানিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি তাঁকে যে হিসাব পাঠিয়েছেন, ইতোমধ্যে তিনি তা পেয়েছেন। আপনার ঠিকানায় সারদানন্দের যে সব চিঠি এসেছে, তা দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন।

সম্প্রতি আমার আবার শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই চিকিৎসক রগড়ে রগড়ে আমার ইঞ্চি কয়েক চামড়া তুলে ফেলেছে। এখনও আমি তার যন্ত্রণা বোধ করছি। নিবেদিতার কাছ থেকে একখানি খুব আশাপ্রদ চিঠি পেয়েছি। আমি প্যাসাডেনায় খেটে চলেছি, এবং আশা করছি যে, এখানে আমার কাজের কিছু ফল হবে। এখানে কেউ কেউ খুব উৎসাহী। 'রাজযোগ' বইখানি সত্যই এই উপকূলে চমৎকার কাজ করেছে। মনের দিক্ থেকে বস্তুতই খুব ভাল আছি; সম্প্রতি আমি যেমন শান্তিতে আছি, তেমন কখনও ছিলাম না। যেমন ধরুন, বক্তৃতার ফলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। নিশ্চয়ই এটা একটা লাভ! কিছু লেখার কাজও করছি। এখানকার বক্তৃতাগুলি একজন সাঙ্কেতিক লেখক টুকে নিয়েছিল; স্থানীয় লোকেরা তা ছাপতে চায়।

জো-এর কাছে লেখা স্বামী —এর পত্রে খবর পেলাম যে, মঠের সব ভাল আছে এবং ভাল কাজ করছে। বরাবর যেমন হয়ে থাকে—পরিকল্পনাগুলি ক্রমে কাজে পরিণত হচ্ছে; কিন্তু আমি যেমন বলে থাকি, 'মা-ই সব জানেন'। তিনি যেন আমায় মুক্তি দেন এবং তাঁর কাজের জন্য অন্য লোক বেছে নেন! ভাল কথা, ফলে আসক্তি না রেখে কাজ করার যে উপদেশ গীতায় আছে, সেটি মনে মনে ঠিক ঠিক অভ্যাস করার প্রকৃত উপায় আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। ধ্যান, মনোযোগ ও একাগ্রতার সাধন সম্বন্ধে আমি এমন আলো পেয়েছি, যা অভ্যাস করলে আমি সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অতীত হয়ে যাব। মনটাকে ইচ্ছানুসারে এক জায়গায় ঘিরে রেখে দেওয়ার কৌশল ছাড়া এটা আর কিছু নয়। এখন আপনার নিজের অবস্থা কি—বেচারী

ধীরামাতা! মা হওয়ার এই দায়, এই শাস্তি! আমরা সব শুধু নিজেদের কথাই ভাবি, মায়ের কথা কখনও ভাবি না। আপনি কেমন আছেন? আপনার কেমন চলছে? আপনার মেয়ের এবং মিসেস ব্রিগ্‌স্-এর খবর কি?

আশা করি, তুরীয়ানন্দ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং কাজে লেগে গেছে। বেচারার ভাগ্যে শুধু দুর্ভোগ! কিন্তু ওতে কিছু মনে করবেন না। যন্ত্রণাভোগেও একটা আনন্দ আছে, যদি তা পরের জন্য হয়। তাই নয় কি? মিসেস লেগেট ভাল আছেন, জো-ও তাই; আর তারা বলছে, আমি ভাল আছি। হয়তো তাদেরই কথা ঠিক। যাই হোক, আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং কাজের মধ্যেই মরতে চাই—অবশ্য যদি তা মায়ের অভিপ্রেত হয়। আমি সন্তুষ্ট। ইতি

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৫০

[স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত]

লস্ এঞ্জেলেস্
ডিসেম্বর, ১৮৯৯

হরিভাই,
… তোমার ঠ্যাঙ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ করছ তাও শুনছি। … আমার শরীর ঠিক চলছে না। মোদ্দা কথা, আমার আতুপুতু করলেই রোগ হয়। রাঁধছি, যা-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমাচ্ছি!!

আমি আসছি নিউ ইয়র্কে একমাসের ভেতর। সারদার কাগজ কি উঠে গেছে না কি? ও আর তো পাই না। Awakened (‘প্রবুদ্ধ ভারত’)—ও ঘুমিয়েছে [১৩] বুঝি? আমায় তো আর পাঠায় না। যাক্, দেশে তো ‘পিলগ্ হইছন্তি’—কে আছে, কে নেই রে রাম!! ওহে, অচু-র এক চিঠি আজ এসে হাজির। সে রাজপুতানায় শিখর রাজার রামগড় শহরে লুকিয়ে ছিল। কে বলেছে যে, বিবেকানন্দ মরে গেছে। তাই এক পত্রে লিখেছে আমায়!! তাকে একখানা জবাব পাঠাচ্ছি।

আমার সকল কুশল। তোমার, তার কুশল দেবে। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

৪৫১*

921, West 21st Street, লস্ এঞ্জেলেস্
২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,
সত্যি আমি চৌম্বক চিকিৎসা-প্রণালীতে (magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোনকালেই বিগড়ায়নি—স্নায়বিক দৌর্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যা-কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি রোজ খাবারের আগে বা পরে যে-কোন সময়েই হোক মাইলের পর মাইল বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে

গেছি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাকব।

এখন চাকা ঘুরছে—মা সেই চাকা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না—এটিই হচ্ছে রহস্য।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগোচ্ছে! এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক এই 'ক্রমাগত লড়াই লড়াই লড়াই'-এর চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিষ ভাববার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধরব, প্রচুর অর্থসংগ্রহ করব এবং তারপর ভারতীয় কাজটাকেও পুরাদমে চালিয়ে দেব। চারদিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে, অতএব প্রস্তুত হও। চারটি ভগ্নী ও তুমি আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৫২*

921, West 21st Street, লস্ এঞ্জেলেস্
২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ধীরামাতা,

শুভ নববর্ষ আপনার নিকট আসুক এবং বহুবার এভাবে আসতে থাকুক—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে এবং আবার কাজ করবার মত যথেষ্ট শক্তি পেয়েছি। ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছি এবং সারদানন্দকে কিছু টাকা (১৩০০ টাকা) পাঠিয়েছি, ... দরকার হলে আরও পাঠাব। তিন সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কোন সংবাদ পাইনি; আর আজ ভোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বেচারা ছেলেরা! আমি মাঝে মাঝে তাদের প্রতি কত রূঢ় ব্যবহারই না করি! এ-সব সত্ত্বেও তারা জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু। ... আমি তিন সপ্তাহ আগে তাদের 'তার' করে জানিয়েছি যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। আমি যদি আরও অসুস্থ না হয়ে পড়ি, তবে যেটুকু স্বাস্থ্য এখন আছে, তাতেই চলে যাবে। আমার জন্য মোটেই ভাববেন না, আমি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেছি।

গল্পগুলি আর লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি এছাড়া অন্য কিছু কিছু লিখেছি এবং প্রতিদিনই কিছু লিখিবার আশা রাখি। আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শান্তিতে আছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, এই শান্তি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরকে শেখানো। কাজই হচ্ছে আমার একমাত্র সেফ্‌টি ভালভ্ (অতিরিক্ত গ্যাস বের করে দিয়ে যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার)। আমার দরকার হচ্ছে শুধু পরিষ্কার মাথাওয়ালা জনকয়েক লোকের, যারা চেপে কাজ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারের দেখাশোনা করবে। আমার আশঙ্কা এই যে, ভারতে এমন লোক পেতে অনেক কাল কেটে যাবে; আর যদি তেমন কোন লোক থাকে, তাহলেও পাশ্চাত্য কারুর কাছে তার শিক্ষা নেওয়া উচিত। আবার, আমার পক্ষে কাজ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই আমার শক্তি খোলে বেশী। মা-র যেন তাই অভিপ্রায়। জো-এর বিশ্বাস এই যে, মায়ের মনে অনেক সব বড় বড় ব্যাপারের পরিকল্পনা চলছে—তাই যেন হয়! জো ও নিবেদিতা যেন সত্যি সত্যি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হয়ে পড়েছে দেখছি! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি জীবনে যা-কিছু ঘা খেয়েছি, যা-কিছু যন্ত্রণা ভোগ করেছি—সবই একটা সানন্দ আত্মত্যাগে পরিণত হবে, যদি মা আবার ভারতের দিকে মুখ তুলে চান।

মিস গ্রিন্‌সটিডেল (Miss Greenstidel) আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন— তার অধিকাংশই আপনার সম্বন্ধে। তিনি তুরীয়ানন্দের সম্বন্ধেও খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আমার বিশ্বাস, সে চমৎকার কাজ করবে। তার সাহস ও স্থৈর্য আছে।

আমি শীঘ্রই ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করতে যাচ্ছি। ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে যাবার সময় আমি তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। আমার নিশ্চিত ধারণা এখানে একটা বড় কর্মক্ষেত্র আছে। 'রাজযোগ' বইটা এখানে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। মিস গ্রিন্‌সটিডেল আপনার বাড়ীতে খুব শান্তি পেয়েছেন এবং বেশ আনন্দে আছেন। এতে আমি বেশ খুশী আছি। দিনে দিনে তাঁর সব বিষয়ে একটু সুরাহা হোক। তাঁর চমৎকার কার্যক্ষমতা ও ব্যবসাবুদ্ধি আছে।

জো একজন মহিলা চিকিৎসককে খুঁজে বের করেছে; তিনি 'হাতঘষা' চিকিৎসা করেন। আমরা দুজনেই তার চিকিৎসায় আছি। জো-এর ধারণা তিনি আমাকে বেশ চাঙা করে তুলেছেন। আর সে নিজে দাবী করে যে, তার নিজের উপর অলৌকিক ফল ফলেছে। 'হাতঘষা' চিকিৎসার ফলেই হোক, ক্যালিফোর্নিয়ার 'ওজোন' (Ozone) বাষ্পের ফলেই হোক, অথবা বর্তমান কর্মের দশা কেটে যাবার ফলেই হোক, আমি সেরে উঠেছি। পেটভরা খাবারের পরে তিন মাইল হাঁটতে পারা একটা বিরাট ব্যাপার নিশ্চয়!

ওলিয়াকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাবেন এবং ডাক্তার জেম্‌স্ ও বষ্টনের অপরাপর বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানাবেন। ইতি

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৫৩*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

মিসেস ব্লজেট
921, West 21st লস্ এঞ্জেলেস্
২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মেরী,

আনন্দের বড়দিন, সুখের নববর্ষ, তোমার জন্মদিনের সঙ্গে জড়িত এই দিনগুলি বারে বারে ফিরে আসুক। এই শুভেচ্ছো, প্রার্থনা ও অভিনন্দন পাঠাচ্ছি এক নিঃশ্বাসে। তুমি জেনে খুশী হবে যে, আমার রোগ সেরে গিয়েছে। এটা শুধু গরহজমের ব্যাপার, হার্ট বা কিডনীর কোন রোগ নয়—চিকিৎসকরা বলছেন; না আর বেশী কিছু নয়। এখন আমি রোজ রাত্রে খাওয়ার পর তিন মাইল হাঁটছি।

আর শোন, যে আমাকে সাড়িয়ে তুলেছে, সে ধূমপান করার উপর জোর দিচ্ছে। অতএব বেশ করে পাইপ টানছি এবং তার ফল ভালই হয়েছে। সোজা কথায়, স্নায়ুদৌর্বল্য ইত্যাদি সব কিছুর কারণ হল অজীর্ণতা, তাছাড়া কিছুই না।

আমি আবার কাজেও নেবে গেছি। কাজ, কাজ—তবে কঠিন কাজ নয়; কিন্তু আমি গ্রাহ্য করি না, এবারে কিছু টাকা করতে চাই। মার্গটকে এ কথা জানিও, বিশেষ করে পাইপের ব্যাপারটা। তুমি কি জান কে আমায় সারিয়ে তুলেছে? কোন ডাক্তার নয়, ক্রিশ্চান সায়ান্সের আরোগ্যকারী'ও নয়—একজন চৌম্বক চিকিৎসক। অবাক কাণ্ড!—হাত ঘষে সে চিকিৎসা করে—ভিতরকার চিকিৎসা পর্যন্ত, তার রোগীরা আমাকে বলেছে।

রাত হয়ে যাচ্ছে। মার্গট, হ্যারিয়েট, ইসাবেল ও মাদার চার্চকে আলাদা চিঠি লেখার আশা ছাড়তে হল। ইচ্ছাই তো অর্ধেক কাজ। তারা সকলে জানে, আমি তাদের কত গভীরভাবে ভালবাসি। অতএব এখনকার মত তুমি আমার হয়ে নববর্ষের শুভবার্তা তাদের পৌঁছে দাও।

এখানে এখন ঠিক উত্তরভারতের মত শীত, কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন একটু গরম; গোলাপ ফুলও আছে এবং চমৎকার পামগুলি। ক্ষেতে বার্লি ফলেছে, গোলাপ এবং অন্যান্য জাতের ফুল ফুটেছে আমার কুটীরের চারপাশে। গৃহস্বামিনী মিসেস ব্লজেট চিকাগোর মহিলা—স্থূলাঙ্গী, বৃদ্ধা এবং খুবই রসিক ও বাক্‌চতুরা। চিকাগোতে তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন এবং খুব মাতৃস্বভাবা।

ইংরেজদের জন্য আমার বড় দুঃখ—তারা দক্ষিণ আফ্রিকায়১৪ শক্ত পাল্লায় পড়েছে। তাঁবুর বাইরে কর্তব্যরত এক সৈনিক চীৎকার করে একবার জানিয়েছিল যে, সে এক তাতারকে পাকড়েছে। তাঁবুর ভিতর থেকে আদেশ হল 'তাকে ভিতরে নিয়ে এস।' সৈন্য বললে, 'সে আসতে চাইছে না।' আবার কড়া আদেশ শোনা গেল, 'তাহলে তুমি নিজে এস।' 'সে যে আমাকেও যেতে দিচ্ছে না' তার থেকে 'তাতার পাকড়ানো'১৫ প্রবচনটি এসে গেছে। তুমি কাউকে পাকড়েছ নাকি?

ঠিক এখনই আমি সুখী এবং বাকী জীবনই সুখী থাকার আশা করছি। বেশ কিছু টাকা করতে পারলে খুব খুশী হব। কিছু কিছু করছি। মার্গটকে বল, আমি বেশ কিছু টাকা করে ফেলেছি এবং জাপান, হনলুলু, চীন ও জাভার পথে দেশ ফিরব। তাড়াতাড়ি টাকা করার পক্ষে এটা চমৎকার জায়গা; এবং শুনছি, সান ফ্রান্সিস্কো এর চেয়েও ভাল। সে কি কিছু করতে পেরেছে?

কোটিপতি তুমি আর যোগাড় করতে পারলে না। তার অর্ধেক কিম্বা তার সিকির জন্য চেষ্টা কর না কেন? আরে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমাদের টাকা চাই, সে মিশিগান হ্রদে ডুবে মরুক, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেদিন এখানে সামান্য ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভূমিকম্পটি—আশা করি চিকাগোতেও হয়েছে এবং ইসাবেল কাদাজল ঘুলিয়ে উপরে তুলেছে। রাত হয়ে যাচ্ছে। হাই উঠছে, সুতরাং ইতি।

বিদায়; প্রীতি ও আশীর্বাদ।

বিবেকানন্দ

৪৫৪*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

লস্ এঞ্জেলেস্
১৭ জানুআরী, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

সারদানন্দের জন্য প্রেরিত কাগজপত্র সহ আপনার পত্রখানি পেয়েছি; এতে কিছু সুসংবাদ আছে। সপ্তাহে আরও কিছু সুসংবাদের আশায় আছি। আপনি আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে তো কিছু লিখলেন না। মিস গ্রিন্‌সটিডেল আমায় একখানি পত্র লিখে আপনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—আর কেই বা না জানিয়ে পারে? ইতোমধ্যে তুরীয়ানন্দ বেশ চালিয়ে যাচ্ছে, আশা করি।

এখানে বা অন্য কোথাও বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ কিছু হবে বলে আশা করি না। ওতে আমার খরচই পোষায় না। শুধু তাই নয়, পয়সা খরচের সম্ভাবনা ঘটলেই কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশে বক্তৃতার ক্ষেত্রটাকে অনেক বেশী চষে ফেলা হয়েছে, আর লোকেরা বক্তৃতা শোনার মনোভাব কাটিয়ে উঠেছে। ... আমি এখানে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের জন্য এসেছিলাম; আর আমি তা পেয়েছি। ... এখন আমার মনে হচ্ছে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করার পালা আমার ফুরিয়ে গেছে; ঐ জাতীয় কাজ করে আর আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে ...। আর আমার কাছে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের আহ্বানও আসছে—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। আমার মন প্রস্তুত হয়ে আছে এবং আমায় এ-তপস্যা করতে হবে। ... আমি এখন জো ও নিবেদিতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপদান করুক—আমার কাছে ও-সব আর নাই। আমি একটা ট্রাস্ট দলিল করতে চাই, ... শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা করে ফেলব। তারপর আমি শান্ত হব। আমি চাই বিশ্রাম, একমুষ্টি অন্ন, খানকয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। মা এখন আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দেখাচ্ছেন। অবশ্য আপনাকেই তিনি এর প্রথম আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস করিনি। ... আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় বেশী বিশ্বাস করি। জো ও নিবেদিতার মন অতি মহান্; কিন্তু এখন আমাকে চালিয়ে নেবার আলোক মা আপনারই হাতে তুলে দিচ্ছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন? আপনার পরামর্শ কি?

বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না। ...এতে আমি খুশী। আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়; কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়—কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৪৫৫-৪৬৪

৪৫৫

[ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত]

লস্ এঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্নিয়া
২৪ জানুআরী, ১৯০০

প্রিয়—,
যে শান্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্ততঃ আমার স্বদেশের—কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন; আর এই উৎসর্গের ভাব-অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একটা আপস করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে; একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয়, তাদের জোর করে দাবানো হয়, এবং তাদের দুর্ভোগ হয় বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৫৬*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

C/o Miss Meade
477 Douglas Building
লস্ এঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্নিয়া
১৫ ফেব্রুআরী ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,
তোমার—তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছিল। দেখছি, জো তোমায় চিকাগোতে ধরতে পারেনি; তবে নিউ ইয়র্ক থেকে তাদের এ-পর্যন্ত কোন খবর পাইনি। ইংলণ্ড থেকে একরাশ ইংরেজী খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর লেখা এক লাইনে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও সই রয়েছে 'F. H. M'। অবশ্য সেগুলির মধ্যে দরকারী বিশেষ কিছু ছিল না। আমি মিস মূলারকে একখানা চিঠি লিখতাম; কিন্তু আমি তো ঠিকানা জানি না। আবার ভয় হল, চিঠি লিখলে তিনি পাছে ভয় পান!

আমি মিসেস সেভিয়ারের কাছে খবর পেলাম যে, নিরঞ্জন কলিকাতায় সাঙ্ঘাতিক রকমের পীড়িত হয়ে পড়েছে—জানি না, তার দেহত্যাগ হয়েছে কিনা। যাই হোক নিবেদিতা, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—আগের চেয়ে আমার দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধান হয়ে গেছে। আমি এখন সন্ন্যাস-জীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দু-সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুশী হলাম। ভাল বিবেচনা কর তো তুমি নিজে ওগুলি আবার নতুন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যদি পাও, তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও; আর যদি বিক্রী করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও। আমার নিজের দরকার নেই। আমি এখানে কিছু অর্থ পেয়েছি। আসছে সপ্তাহে সান ফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি; সেখানে সুবিধা করতে পারব—আশা করি।

ভয় কর না—তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে-দিক্ দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান। জানি না, আমি শীঘ্র পূর্ব অঞ্চলে যাচ্ছি কিনা। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ১৬
ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাব।

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার
মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার,
ওতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝ
থেকে কতকগুলি ভারতীয় নারী-
সমিতিকে এতে যোগ দেওয়াতে
পার, তবে আরও ভাল হয়।

কুছ পরোয়া নেই, আমাদের
সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা
যেমন শেষ হবে, অমনি আমরা
ইংলণ্ডে যাব ও সেখানে খুব চুটিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করব—কি বল? ধীরামাতাকে লিখব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তারপর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য্য ধরে থাক, শক্ত ও নরম—সবই ঠিক ঘুরে আসবে। এই যে তোমার নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে, এইটুকুই আমি চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাছে টাকা উড়ে আসবে। এখন আমার স্নায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে 'মা' আমার স্নায়ুগুলিকে একটু একটু করে নীরোগ করে দিচ্ছেন, আর তোমারও ভাবুকতা শান্ত করে আনছেন। তারপর আমরা—যাচ্ছি আর কি। এইবার রাশি রাশি ভাল কাজ হবে, নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীন দেশ—ইওরোপের মূল ভিত্তি পর্যন্ত তোলপাড় করে ফেলব।

আমি ক্রমশঃ ধীর স্থির, শান্তপ্রকৃতি হয়ে আসছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত।এইবার যে কাজে লাগা যাবে, প্রত্যেক আঘাতে বেশ কাজ হবে—একটিও বৃথা যাবে না— এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—তোমার বর্তমান ঠিকানা লিখবে। ইতি

বি—

৪৫৭*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

লস্ এঞ্জেলেস্
১৫ ফেব্রুআরী, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,
এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছবার আগেই আমি সান ফ্রান্সিস্কো যাত্রা করব। কাজটার সম্বন্ধে আপনার সবই জানা আছে। বেশী কাজ করিনি, কিন্তু দিন-দিনই আমার হৃদয়—(দেহ ও মন দু-দিক্ দিয়ে) আরও বেশী সবল হচ্ছে। কোন কোন দিন আমার বোধ হয় যে, আমি সবই সহ্য করতে পারি এবং সব দুঃখই বরণ করতে পারি। মিস মূলার যে কাগজের তাড়া পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। তাঁর ঠিকানা না জানায় আমি তাঁকে কিছুই লিখিনি। তাছাড়া ভয়ও ছিল।

আমি একা থাকলেই অধিকতর ভাল কাজ করতে পারি; এবং যখন সম্পূর্ণ নিঃসহায় থাকি, তখনই আমার দেহ মন সবচেয়ে ভাল থাকে। আমি যখন আমার গুরুভাইদের ছেড়ে আট বৎসর একাকী ছিলাম, তখন প্রায় এক দিনের জন্যও অসুস্থ হইনি। এখন আবার একা থাকার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি! অবাক কাণ্ড! কিন্তু মা যেন আমায় ঐভাবে রাখতে চান—জো যেমন চায় 'নিঃসঙ্গ গণ্ডারে'র মত একাকী বেড়াতে। ... বেচারা তুরীয়ানন্দ কতই না ভুগেছে, অথচ আমায় কিছুই জানায়নি—সে বড় সরলচিত্ত ও ভালমানুষ! মিসেস সেভিয়ারের পত্রে জানলাম, বেচারা নিরঞ্জনানন্দ কলিকাতায় এতই সাঙ্ঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, সে এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। ভাল কথা! সুখ-দুঃখ হাত ধরাধরি করে চলতেই ভালবাসে। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার! তারা যেন চক্রাকারে চলে! আমার বোনের একখানি পত্রে জানলাম যে, তার পালিত কন্যাটি মারা গেছে। ভারতের ভাগ্যে যেন একমাত্র দুঃখই আছে। তাই হোক! সুখ-দুঃখে আমি যেন বোধশূন্য হয়ে গেছি! হালে আমি যেন লোহার মত হয়ে গেছি! তাই হোক—মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

গত দু-বৎসর যাবৎ যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে আসছি, তাতে আমি বড়ই লজ্জিত। এর সমাপ্তিতে আমি খুশী। ইতি

আপনার চিরস্নেহবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

৪৫৮*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

প্যাসাডেনা
২০ ফেব্রুআরী, ১৯০০

প্রিয় মেরী,
মিঃ হেলের দেহত্যাগের বেদনাদায়ক সংবাদ বহন করে তোমার চিঠিখানা গতকাল পৌঁছেছে। আমি মর্মাহত হয়েছি, সন্ন্যাসের শিক্ষা সত্ত্বেও আমার হৃদয়বৃদ্ধি এখনও বেঁচে আছে। তারপর যে-সব মহাপ্রাণ মানুষ আমি দেখেছি, মিঃ হেল তাঁদের একজন।

অবশ্যই তুমি দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যথিত; মাদার চার্চ, হ্যারিয়েট—সবারই সেই এক অবস্থা, বিশেষতঃ এই ধরনের শোক তোমাদের কাছে যখন এই প্রথম। জীবনে আমি অনেক সয়েছি, অনেককে হারিয়েছি, আর সেই বিয়োগের সবচেয়ে বিচিত্র যন্ত্রণা হল—আমার মনে হয়েছে, যে চলে গেল আমি তার যোগ্য ছিলাম না। পিতার মৃত্যুর পর মাসের পর মাস এই যাতনায় কেটেছে—আমি তাঁর কতই না অবাধ্য ছিলাম!

তুমি খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলে; যদি তোমার ঐ ধরনের কিছু মনে হয়, তাহলে জেনো সেটা শোকেরই একটি রূপ।

মেরী, মনে হয়, ঠিক এখন থেকেই তোমার যথার্থ জীবন শুরু। যতই আমরা বই পড়ি বা বক্তৃতা শুনি, বা লম্বা লম্বা কথা বলি, শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক, সেই শুধু চোখ ফোটায়। অভিজ্ঞতা যে ভাবে হয়, সেই ভাবেই তা সবচেয়ে ভাল। আমরা শিখি হাসির আলোয়, শিখি চোখের জলে। জানি না কেন এমন হয়, কিন্তু তা যে হয়, তা দেখতেই পাই। সেটাই যথেষ্ট। মাদার চার্চের জন্য অবশ্য ধর্মের সান্ত্বনা আছে। আমরা সকলে যদি স্বপ্নে ডুবে থাকতে পারতাম!

জীবনে এতদিন পর্যন্ত তুমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ, আর আমাকে জ্বলতে কাঁদতে হয়েছে সারাক্ষণ। এখন ক্ষণকালের জন্য তুমি জীবনের অপর দিকটা দেখতে পেলে। এ ধরনের অবিরাম আঘাতে আঘাতে আমার জীবন তৈরী হয়েছে, এর চেয়েও শতগুণ ভয়ঙ্কর আঘাত—দারিদ্র্যের বিশ্বাসঘাতকতার আর আমার নিজের নির্বুদ্ধিতার যন্ত্রণা। এটা নৈরাশ্যবাদ? এখন তুমি বুঝবে, কেমন করে তা আসে। ঠিক, ঠিক, তোমাকে আর কি বলব মেরী, কথা তো সবই তোমার জানা। শুধু একটি কথা বলি এবং তার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই, যদি আমাদের দুঃখ বিনিময় করা সম্ভব হত, এবং তোমাকে দেবার মত আনন্দ-ভরা মন যদি আমার থাকত, তাহলে নিশ্চয় বলছি, চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে তা বিনিময় করে নিতাম। সে-কথা মা-ই জানেন।

তোমার চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪৫৯*

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

ওঁ তৎ সৎ

ক্যালিফোর্নিয়া
২১ ফেব্রুআরী, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,
তোমাদের পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করলুম। বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরের চাকচিক্য মাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। 'জ্ঞানবলক্রিয়া'শালী আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' (হৃদয়ে একশত এবং একটি নাড়ী আছে) ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট 'সিম্প্যাথেটিক্ গ্যাংলিয়ন' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যতই দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে। তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতানো—দেরী হবে; কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্যবল যদি থাকে তো নিশ্চিত সিদ্ধি, তার আর কি?

ইংরেজ রাজপুরুষদের দোষ কি? যে পরিবারটির অস্বাভাবিক নির্দয়তার কথা লিখেছ, ওটা কি ভারতবর্ষের অসাধারণ, না সাধারণ? দেশসুদ্ধই ঐ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমাদের দেশী স্বার্থপরতা, নেহাত দুষ্টামি করে হয়নি, বহু শতাব্দী যাবৎ বিফলতা আর নির্যাতনের ফলস্বরূপ এই পশুবৎ স্বার্থপরতা; ও আসল স্বার্থপরতা নয়—ও হচ্ছে গভীর নৈরাশ্য। একটু সিদ্ধি দেখলেই ওটা সেরে যাবে। ইংরেজ রাজপুরুষেরা ঐটিই দেখছে চারিদিকে, কাজেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারবে কেন? তবে যথার্থ কাজ দেখতে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি করে বল! দেশী রাজপুরুষেরা অমন করে কি?

এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি 'আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও' বললে কি চলে? কে বা শুনছে ওদের কথা? মানুষ কাজ যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় কাজ করে—ইংরেজেরা ডেকে রাজকার্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে!! 'স্বকার্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ' (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য উদ্ধার করিবেন)। ... অ-কে Centre (কেন্দ্র) খুলতে দেননি, তার বা কি? কিষণগড় দিয়েছে তো? মুখটি বুজিয়ে সে কাজ দেখিয়ে যাক—কিছু বলা-কওয়া, ঝগড়া-ঝাঁটির দরকার নাই। মহামায়ার এ কাজে যে সহায়তা করবে, সে তাঁর দয়া পাবে, যে বাধা দেবে 'অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণঃ' (বিনা হেতুতে দারুণ শত্রুতাবদ্ধ) নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে।

'শনৈঃ পন্থাঃ' ইত্যাদি, রাই কুড়িয়ে বেল।—যখন প্রধান কাজ হয়ে, ভিত্তি-স্থাপন হয়, রাস্তা তৈরী হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু-একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে, দেশসুদ্ধ বাহবা দেয়—তখন কল চলে গেছে, তখন বালকেও কাজ করতে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে। এইটি বোঝ—ঐ দু-একটি গাঁয়ের উপর ঐ ২০ টি অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম, ঐ ১০ জন ২০ জন কার্যকরী—এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে; এখন ২/১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেরাও উত্তম কাজ করতে পারবে।

অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে। নইলে ক্রিশ্চানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই তার আর কি? মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ঘোড়া হলেই চাবুক আপনি আসবে। এখন মেয়ে (ও) ছেলে একসঙ্গেই রাখ। একটা ঝি রেখে দাও মেয়েগুলিকে দেখবে, আলাদা কাছে নিয়ে শোবে; তারপর আপনিই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে এখন বাছবিচার কর না—পরে আপনিই সিধে হয়ে যাবে। সকল কাজেই প্রথমে অনেক বাধা—পরে সোজা রাস্তা হয়ে যায়।

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভয়ে কাজ করে যাও—ওয়াহ্ বাহাদুর!! সাবাস, সাবাস, সাবাস!!

ভাগলপুরে যে কেন্দ্র স্থাপনের কথা লিখেছ, সে কথা বেশ—স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারই দু-এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন start (প্রতিষ্ঠা) করবে এবং ক্রমে ওদেরই মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।

কতলগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের এক-একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves (তারা যাতে নিজেই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি)। ঐ যে চাষারা গাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তাছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া করে গরীবের কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃতপ্রায়; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক্—এই মাত্র! তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক। তবে ধনী-দরিদ্রের বিবাদ যেন বাধিয়ে বসো না। ধনীদের আদতে গাল-মন্দ দেবে না।—স্বকার্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য উদ্ধার করবে)। তাছাড়া ওরা তো মহামূর্খ, অজ্ঞ—ওরা কি করবে?

জয় গুরু জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্রকর্মবিধান আপনা হতেই আসবে! ফলাফল আমার গ্রাহ্য নাই, তোমরা যদি এতটুকু কাজ কর, তা হইলেই আমি সুখী। বাক্যি-যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত—আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সে আমার মাথার মণি—ইতি নিশ্চতম্। মিছে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে, লোকহিত একপা-ও এগোচ্ছে না। মাভৈঃ, সাবাস বাহাদুর—গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বসুন, জগদম্বা হাতে বসুন। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৬০*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১২৫১ পাইন ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
২ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

আমাকে চিকাগোয় যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছ, সেটা তোমার একান্ত সহৃদয়তা। এই মুহূর্তেই যদি আমি সেখানে চলে যেতে পারতাম! কিন্তু আমি এখন টাকা যোগাড় করতে ব্যস্ত; তবে বেশী কিছু করে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, যে কোন উপায়েই হোক; দেশে যাওয়ার খরচটা তোলার মত টাকা আমায় করতেই হবে। এখানে একটা নূতন ক্ষেত্র পেয়েছি—শত শত উৎসুক শ্রোতা আসছে, আমার বই পড়ে এরা আগে থেকেই প্রস্তুত ও উদ্‌গ্রীব ছিল।

অবশ্য টাকা যোগাড় করার ব্যাপারটা যেমন মন্থর, তেমনই বিরক্তিকর। কয়েক-শো যোগাড় করতে পারলেই আমি খুশী হব। এর মধ্যে নিশ্চই আমার আগের চিঠিখানা পেয়ে গিয়েছ। মাসখানেক কি মাস-দেড়েকর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে যাব, আশা করছি।

তোমরা সকলে কেমন আছ? মাকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিও। তাঁর মত মনোবল যদি আমার থাকত! খাঁটি খ্রীষ্টান তিনি। আমার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু পূর্বের বল এখনও ফিরে পাইনি। কিন্তু এতটুকু শক্তির জন্য অনেকখানি পরিশ্রম করতে হবে। অনন্ত কয়েকটা দিনের জন্যও যদি বিশ্রাম ও শান্তি পেতাম! নিশ্চয় চিকাগোয় ভগিনীদের কাছে তা পাব। তবে মা-ই সব জানেন, আমার সেই পুরানো কথা—তিনি ভাল জানেন। গত দু-বছর বিশেষ খারাপ গেছে। মনের দুঃখে বাস করেছি। এখন কিছুটা আবরণ সরে গেছে, এখন আমি সুদিনের—আর ভাল অবস্থার আশায় আছি। তুমি, অন্য ভগিনীরা এবং মা—সকলের উপর সর্ববিধ আশীর্বাদ। আমার ঘাত-প্রতিঘাতময় বেসুরো জীবনে মেরী, তুমি সব সময় মধুরতম সুরের মত বেজেছ। তোমার বিশেষ সুকৃতি, তুমি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে জীবন শুরু করতে পেরেছ। আর আমি মুহূর্তের জন্যও শান্তিময় জীবন পাইনি। সব সময়ে দুর্বহ ভার মনের মধ্যে। প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪৬১*

সান ফ্রান্সিস্কো
১৫০২ জোন্‌স্ ষ্ট্রীট
৪ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

এক মাস যাবৎ আপনার কাছ থেকে কোনই খবর পাইনি। আমি সান ফ্রান্সিস্কোতে আছি। আমার লেখার ভেতর দিয়ে লোকের মন আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল, আর তারা দলে দলে আসছে; কিন্তু টাকা খসাবার কথা যখন উঠবে, তখন এই উৎসাহের কতটা থাকে, সেইটুকু দ্রষ্টব্য!

রেভারেণ্ড বেঞ্জামিন ফে মিল্‌স্ আমায় ওকল্যাণ্ডে আহ্বান করেছিলেন এবং আমার বক্তব্য প্রচারের জন্য একটি শ্রোতৃমণ্ডলীর আয়োজন করেছিলেন। তিনি সস্ত্রীক আমার গ্রন্থাদি পাঠ করে থাকেন এবং বরাবরই আমার খবরাখবর রেখে আসছেন।

মিস থার্সবির দেওয়া পরিচয়পত্রখানি আমি মিসেস হার্স্টকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক সঙ্গীতবাসরে আমাকে আগামী রবিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন।

মিস থার্সবির দেওয়া পরিচয়পত্রখানি আমি মিসেস হার্স্টকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক সঙ্গীতবাসরে আমাকে আগামী রবিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন।

আমার স্বাস্থ্য প্রায় একরূপই আছে—আমি তো কোন ইতরবিশেষ দেখছি না। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে—যদিও অজ্ঞাতসারে। আমি ৩০০০ শ্রোতাকে শোনাবার মত উঁচু গলায় বক্তৃতা দিতে পারি; ওকল্যাণ্ডে আমায় দুবার তাই করতে হয়েছিল। আর দু-ঘণ্টা বক্তৃতার পরেও আমার সুনিদ্রা হয়।

খবর পেলাম, নিবেদিতা আপনার সঙ্গে আছে। আপনি ফ্রান্সে যাচ্ছেন কবে? আমি এপ্রিলে এ জায়গা ছেড়ে পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছি। সম্ভব হলে মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। আর একবার ইংলণ্ডে চেষ্টা না করে দেশে ফেরা চলবে না কিছুতেই।

ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি এসেছে। তারা সবাই ভাল আছে। তারা মিউনিসিপ্যালিটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। এতে আমি খুব খুশী। এ মায়ার সংসারে হিংসা করা ঠিক নয়; কিন্তু 'না কামড়ালেও ফোঁস করতে দোষ নেই'—এই যথেষ্ট।

সব ঠিক হয়ে আসবে নিশ্চয়—আর যদিই বা না হয়, তাও ভাল। মিসেস সুটারের কাছ থেকেও সুন্দর একখানি চিঠি পেয়েছি। তাঁরা পাহাড়ে বেশ আছেন। মিসেস—কেমন আছেন? ... তুরীয়ানন্দ কেমন আছে?

আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবেন। ইতি

সতত আপনার
বিবেকানন্দ

৪৬২*

সান ফ্রান্সিস্কো
৪ মার্চ, ১৯০০

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,
আমি আর কাজ করতে চাই না—এখন বিশ্রাম ও শান্তি চাই। স্থান ও কালের তত্ত্ব আমার জানা আছে, কিন্তু আমার বিধিলিপি বা কর্মফল আমায় নিয়ে চলেছে—শুধু কাজ, কাজ! আমরা যেন গরুর পালের মত কসাইখানার দিকে চালিত হচ্ছে; কসাইখানা অভিমুখে তাড়িত গরু যেমন পথের ধারের ঘাস এক এক খাবলা খেয়ে নেয়, আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। আর এই হচ্ছে আমাদের কর্ম বা আমাদের ভয়—ভয়ই হচ্ছে দুঃখ ব্যাধি প্রভৃতির আকর। বিভ্রান্ত ও ভয়চকিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আমরা আরও বেশী আঘাত করি। পাপকে এড়িয়ে চলতে একান্ত আগ্রহান্বিত হয়ে আমরা পাপেরই মুখে পড়ি।

আমাদের চারপাশে কত অকেজো আবর্জনা-স্তূপই না আমরা সৃষ্টি করি! এতে আমাদের কোন উপকারই হয় না; পরন্তু যাকে আমরা পরিহার করতে চাই তারই দিকে—সেই দুঃখেরই দিকে আমরা পরিচালিত হই।

আহা! যদি একেবারে নির্ভীক সাহসী ও বেপরোয়া হতে পারা যেত!

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৬৩*

১৫০২ জোন্স্ ষ্ট্রীট
সান ফ্রান্সিস্কো
৭ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় জো,
মিসেস বুলের পত্রে জানলাম যে, তুমি কেম্ব্রিজে আছ। হেলেনের পত্রে আরও খবর পেলাম যে, তোমায় যে গল্পগুলি পাঠানো হয়েছিল, তা তুমি পাওনি। বড়ই আপসোসের কথা। মার্গর কাছে এর নকল আছে, সে তোমায় দিতে পারে। আমার শরীর একরকম চলে যাচ্ছে। টাকা নেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম অথচ ফল শূন্য! লস্ এঞ্জেলেসের চেয়েও খারাপ! কিছু না দিতে হলে তারা দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে আসে—আর কিছু খরচ করতে হলে আসে না; এই তো ব্যাপার!

দিন কয়েক যাবৎ আমার শরীর খারাপ হয়েছে এবং বড় বিশ্রী বোধ হচ্ছে। আমার বোধ হয়, রোজ রাত্রে বক্তৃতা দেবার ফলেই এ-রকম হয়েছে। আমার আশা আছে যে, ওকল্যাণ্ডের কাজের ফলে অন্ততঃ নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত ফিরে যাবার টাকা সংগ্রহ করতে পারব; আর নিউ ইয়র্কে গিয়ে ভারতে ফেরবার টাকার যোগাড় দেখব। লণ্ডনে মাস কয়েক থাকবার মত টাকা এখানে সংগ্রহ করতে পারলে লণ্ডনেও যেতে পারি। তুমি আমায় আমাদের জেনারেল-এর ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিও তো। নামও দেখছি আজকাল মনে থাকে না।

তবে আসি। প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা হতেও পারে, নাও পারে। ভগবান্ তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি যতটা সাহায্যের যোগ্য, তুমি তার চেয়েও বেশী সাহায্য আমায় করেছ। আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৬৪*

১৫০২ জোন্স্ ষ্ট্রীট
সান ফ্রান্সিস্কো

৭ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

... আপনাকে আমি আমার জন্য আর কিছু করতে বলছি না—আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যা করেছেন, তাই যথেষ্ট—আমি যতটার উপযুক্ত, তার চেয়েও ঢের বেশী করেছেন। আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন; আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ওইখানেই। অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাদের ধারণাও নেই যে, তারা আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই জন্য ভালবাসে। তাঁকে বাদ দিলে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থপূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র। যাই হোক, ভবিষ্যতে কি হবে, এই দুশ্চিন্তা এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত, এই আকাঙ্ক্ষার পীড়া বড়ই ভয়ানক। আমি সে দায়িত্বের অনুপযুক্ত—আমার অযোগ্যতা আজ ধরা পরে গেছে। আমাকে একাজ ছেড়ে দিতে হবে। এ কাজে যদি কোন নিজস্ব জীবনী শক্তি না থাকে তো মরে যাক; আর যদি থাকে, তবে আমার মত অযোগ্য কর্মীর জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না। ... আমি সারা জীবন মায়ের কাজ করেছি। এখন তা হয়ে গেছে—আমি এখন তাঁর চরকায় তেল দিতে নারাজ। তিনি অন্য কর্মী বেছে নিন—আমি ইস্তফা দিলাম!

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৪৬৫-৪৭৪

৪৬৫

[স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত]

সান ফ্রান্সিস্কো
মার্চ, ১৯০০

হরিভাই,
এই মিসেস বাঁড়ুয্যের কাছ থেকে একটা bill of lading (মাল চালানের বিল) এসেছে। সে মহিলাটি কি দাল-চাল পাঠিয়েছে—এটা তোমায় পাঠাচ্ছি। মিঃ ওয়াল্ডোকে দিও; সে সব আনিয়ে রাখবে—যখন আসবে।

আমি আসছে সপ্তায় এ স্থান ছেড়ে চিকাগোয় যাব। তারপর নিউ ইয়র্কে আসছি।

এক-রকম আছি। … তুমি এখন কোথায় থাক? কি কর? ইত্যাদি। ইতি

বি

৪৬৬

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

সান ফ্রান্সিস্কো
১২ মার্চ, ১৯০০

অভিন্নহৃদয়েষু,
তোমার এক পত্র পূর্বে পাই। শরতের এক পত্র কাল পেয়েছি। তাঁর জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র দেখলাম। শরতের বাতের কথা শুনে ভয় হয়। রাম রাম! খালি [১৭] রোগ শোক যন্ত্রণা সঙ্গে আছে দু-বছর। শরৎকে বল যে, আমি বেশী খাটছি না আর। তবে পেটের খাওয়ার মত না খাটলে শুকিয়ে মরতে হবে যে! … দুর্গাপ্রসন্ন পাঁচিলের যা হয় অবশ্যই এতদিনে করে দিয়েছে। … পাঁচিল তোলা কিছু হাঙ্গামা তো নয়। … পারি তো সেই জায়গাটায় একটা ছোট বাড়ী বানিয়ে নিয়ে বুড়ো দিদিমা ও মা-র কিছুদিন সেবা করব। দুষ্কর্ম কাউকে ছাড়ে না, মা কাউকেই সাজা দিতে ছাড়েন না। আমার কর্ম ভুগে নিলুম। এখন তোমরা সাধু মহাপুরুষ লোক—মায়ের কাছে একটু বলবে ভাই, যে আর এ হাঙ্গাম আমার ঘাড়ে না থাকে। আমি এখন চাচ্ছি একটু শান্তি; আর কাজকর্মের বোঝা বইবার শক্তি যেন নাই। বিরাম এবং শান্তি—যে কটা দিন বাঁচব, সেই কটা দিন। জয় গুরু, জয় শ্রীগুরু!

লেকচার-ফেকচার কিছুই নয়। শান্তিঃ! মঠ-(এর) ট্রাষ্ট-ডীড শরৎ পাঠিয়ে দিলেই সই করে দিই। তোমরা সব দেখো। আমি সত্য সত্য বিশ্রাম চাই। এ রোগের নাম Neurosthenia—স্নায়ুরোগ। এ একবার হলে বৎসর কতক থাকে। তবে দু-চার বৎসর

একদম rest (বিশ্রাম) হলে সেরে যায়। ... এ দেশে ঐ রোগের ঘর। এইখান থেকে উনি ঘাড়ে চড়েছেন। তবে উনি মারাত্মক হওয়া দূরে থাকুক, দীর্ঘ জীবন দেন। আমার জন্য ভেবো না। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে যাব। গুরুদেবের কাজ এগোচ্ছে না—এই দুঃখে। তাঁর কাজ কিছুই আমার দ্বারা হল না—এই আপসোস! তোমাদের কত গাল দিই, কটু বলি—আমি মহা নরাধম! আজ তাঁর জন্মদিনে তোমাদের পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও—আমার মন স্থির হয়ে যাবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু,। ত্বমেব শরণং মম, ত্বমেব শরণং মম, (তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার শরণ)। এখন মন স্থির আছে বলে রাখি। এই চিরকালের মনের ভাব। এ ছাড়া যেগুলো আসে, সেগুলো রোগ জানবে। আর আমায় কাজ করতে একদম দিও না। আমি এখন চুপ করে ধ্যান জপ করব কিছুকাল—এই মাত্র। তারপর মা জানেন। জয় জগদম্বে!

বিবেকানন্দ

৪৬৭*

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট
সান ফ্রান্সিস্কো
১২ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,
কেম্ব্রিজ থেকে লেখা আপনার পত্রখানি কাল এসেছিল। এখন আপনার একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে—১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো। আশা করি এই পত্রের উত্তরে দু লাইন লেখবার সময় পাবেন।

আপনার প্রেরিত এক পাণ্ডুলিপি আমি পেয়েছি। আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমি সেটি ফেরত পাঠিয়েছি। এ ছাড়া আমার কাছে আর কোন হিসাব নেই। সব ঠিকই আছে। লণ্ডন থেকে মিস সুটার আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন। তিনি আশা করেছেন যে, মিঃ ট্রাইন তাঁর সঙ্গে নৈশ আহারে যোগ দেবেন।

নিবেদিতার অর্থ-সংগ্রহের সাফল্যের সংবাদে আমি যার-পর-নাই খুশী হয়েছি। আমি তাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি এবং নিশ্চিত জানি যে, আপনি তার দেখাশুনা করবেন। আমি এখানে আরও কয়েক সপ্তাহ আছি; তার পরেই পূর্বাঞ্চলে যাব। শুধু গরমকালের অপেক্ষায় আছি।

টাকাকড়ির দিক্ দিয়ে এখানে মোটেই সফল হইনি; কিন্তু অভাবও নেই। যা হোক, বরাবরের মত আমার দিনগুলি এক-রকম চলে যাবেই; আর যদি না চলে, তাতেই বা কি? আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি।

মঠ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। কাল তাদের উৎসব হয়ে গেল। আমি প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যেতে চাই না। কোথায় যাব বা কখন যাব—এ বিষয়ে আমি মোটেই ভাবি না। আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি—মা-ই সব জানেন। আমার ভেতরে একটা বড় রকম পরিবর্তন আসছে—আমার মন শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। আমি জানি, মা-ই সব ভার নেবেন। আমি সন্ন্যাসিরূপেই মৃত্যুবরণ করব। আপনি আমার ও আমার আত্মীয়দের জন্য মায়ের চেয়েও বেশী করেছেন। আপনি আমার অসীম ভালবাসা জানবেন আর আপনার চিরমঙ্গল হোক—বিবেকানন্দের এই সতত প্রার্থনা।

দয়া করে মিসেস লেগেটকে বলবেন যে, কয়েক সপ্তাহের জন্য আমার ঠিকানা হবে—-১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো।

৪৬৮*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
১২ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী,
কেমন আছ? মা কেমন, ভগিনীরা কেমন? চিকাগোর হালচাল কি রকম? আমি ফ্রিস্কোতে আছি, মাসখানেকের মত এখানে থাকব। এপ্রিলের প্রথম দিকে [১৮]
চিকাগোয় যাব। অবশ্য তার আগে
তোমাকে লিখে জানাব। তোমাদের
সঙ্গে কয়েকদিন কাটাতে খুবই

ইচ্ছা, এত কাজ করতে করতে ক্লান্ত
হয়ে যেতে হয়। আমার স্বাস্থ্য
একপ্রকার, কিন্তু মন খুব শান্ত,
কিছুদিন থেকে তাই আছে। যাবতীয়
দুশ্চিন্তার ভার প্রভুর কাছে সমর্পণ
করে দিতে চেষ্টা করছি। আমি শুধু
কর্মী বৈ তো নয়। আদেশমত কাজ
করে যাওয়াই আমার জীবনের
উদ্দেশ্য। বাকী তিনিই জানেন।

‘সব কাজ কর্ম কর্তব্যধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ থেকে উদ্ধার করব। দুঃখ কর না।’ (গীতা—১৮।৬৬)

সেটা উপলব্ধি করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। শীঘ্রই যেন তা করতে পারি।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪৬৯*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
১৭ মার্চ, ১৯০০

মা,

আপনার সুন্দর চিঠিখানা পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বন্ধুদের সঙ্গে আমি সংযোগ রক্ষা করে যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও বিলম্বের ক্ষেত্রে কখনও কখনও বিচলত হই।

ডাঃ হিলার ও মিসেস হিলার (Dr. and Mrs. Hiller) শহরে ফিরে এসেছেন; মিসেস মিল্টনের (Mrs. Milton) চিকিৎসায় তাঁরা উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আমার বেলায় (তাঁরা চিকিৎসায়) বুকে অনেকগুলি বড় বড় লাল লাল দাগ ফুটে উঠেছে। আরোগ্যের ব্যাপারে কতদূর কি হয়, পরে বিস্তারিত আপনাকে জানাব। অবশ্য আমার রোগটা এমনই যে আপনা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরতে অনেক সময় লাগবে।

আপনি এবং মিসেস এডাম্‌স্‌ যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। চিকাগোয় গিয়ে নিশ্চয় তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

আপনার সব ব্যাপার কিরকম চলছে? এখানে আমি চুপচাপ সহ্য করার নীতি অবলম্বন করে যাচ্ছি, এ পর্যন্ত ফল মন্দ হয়নি।

তিন বোনের মেজোটি মিসেস হ্যান্‌স্‌ব্রো (Mrs. Hansborough) এখন এখানে। সে আমাকে সাহায্য করবার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে। প্রভু তাদের হৃদয় আশীর্বাদে ভরিয়ে দিন। তিনটি বোন যেন তিনটি দেবী! আহা, তাই নয় কি? এখানে ওখানে এ-ধরনের আত্মার সংস্পর্শ পাওয়া যায় বলেই জীবনের সকল অর্থহীনতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

আপনাদের উপর চির আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা। এও বলি, আপনিও একজন স্বর্গের দেবী। মিস কেটকে (Miss Kate) আমার ভালবাসা।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—‘মায়ের সন্তানটি’ কেমন!

মিস স্পেন্সার কেমন আছেন? তাঁকে সর্ববিধ ভালবাসা। ইতোমধ্যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমি মোটেই ভাল চিঠি-লিখিয়ে নই—কিন্তু হৃদয় ঠিক আছে। মিস স্পেন্সারকে এ কথা জানাবেন।

বি

৪৭০*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
১৭ মার্চ, ১৯০০

মা,
জো-র একটি চিঠি পেলাম; সে আমাকে চার-টুকরো কাগজ স্বাক্ষর করে পাঠাতে লিখেছে, যাতে আমার হয়ে মিঃ লেগেট আমার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারেন। তার কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় বলে, কাগজগুলি আপনার কাছে পাঠালাম।

আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, কিছু কিছু টাকাপয়সাও হচ্ছে। বেশ সন্তুষ্ট আছি। আপনার আবেদনে যে আরও বেশী লোক সাড়া দেয়নি, তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। জানতাম, তারা সাড়া দেবে না। কিন্তু আপনার সহৃদয়তার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আমার শুভেচ্ছা চিরকাল আপনাদের ঘিরে থাকুক।

আমার নামে চিঠিপত্র—১২৩১ নং পাইন ষ্ট্রীটে 'হোম অব্ ট্রুথ' (Home of Truth)-এর ঠিকানায় পাঠালে ভাল হয়। আমি ঘুড়ে বেড়ালেও সেটি একটি স্থায়ী আস্তানা, এবং সেখানকার লোকেরা আমার প্রতি সদয়।

আপনি এখন এখন খুব ভাল আছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মিসেস ব্লজেট জানিয়েছেন যে, মিসেস মিল্টন লস্ এঞ্জেলেস্ ছেড়ে চলে গিয়েছেন! তিনি নিউ ইয়র্কে গিয়েছেন কি? ডক্টর হিলার ও মিসেস হিলার গত পরশু সান ফ্রান্সিস্কো ফিরে এসেছেন; তাঁরা বলেছেন, মিসেস মিল্টনের চিকিৎসায় তাঁরা খুবই উপকৃত হয়েছেন। মিসেস হিলার অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের আশা করছেন।

এখানে এবং ওকল্যাণ্ডে ইতোমধ্যে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছি। ওকল্যাণ্ডে বক্তৃতাগুলি ভাল টাকাই পাওয়া গেছে। সান ফ্রান্সিস্কোয় প্রথম সপ্তাহে কিছু পাওয়া যায়নি, এ সপ্তাহে পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহেও কিছু আশা আছে। বেদান্ত সোসাইটির জন্য মিঃ লেগেট চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সত্যি তিনি এত সহৃদয়।

আপনার
বিবেকানন্দ

পুঃ—তুরীয়ানন্দের বিষয় আপনি কিছু জানেন কি? সে কি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে?

বি

৪৭১*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
২২ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী,
তোমার সহৃদয় চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তুমি ঠিকই বলছ য়ে, ভারতবাসীদের বিষয় ছাড়া আমার আরও অনেক কিছু চিন্তা করবার আছে, কিন্তু গুরুদেবের কাজই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য, তার তুলনায় ঐ-সবই গৌণ!

এই আত্মত্যাগ যদি সুখকর হত! তা হয় না, ফলে স্বভাবতই কখনও কখনও মনে তিক্ততা আসে; কিন্তু জেনো মেরী, আমি এখনও মানুষই আছি এবং নিজের সব কিছু একেবারে ভুলে যেতে পারি না; আশা করি, একদিন তা পারব। আমার জন্য প্রার্থনা কর।

আমার বিষয়ে বা অন্য বিষয়ে মিস ম্যাকলাউড বা মিস নোবল্ বা অন্য কারও মতামতের জন্য আমি অবশ্যই দায়ী হতে পারি না। পারি কি? কেউ সমালোচনা করলে তুমি কখনই আমাকে বেদনা অনুভব করতে দেখনি।

দীর্ঘকালের জন্য তুমি ইওরোপে যাচ্ছ জেনে আনন্দিত হলাম। লম্বা পাড়ি দাও— অনেকদিন তো পোষা পায়রার মত কাটালে।

আর আমার কথা যদি বল, আমি এই অবিরাম ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই ঘরে ফিরে শান্তিতে কাটাতে চাই। আর কাজ করতে চাই না। জ্ঞানতপস্বীর মত নির্জনে জীবন যাপন করাই আমার স্বভাব। সে অবসর কখনও জুটল না! প্রার্থনা করি, এবার তা যেন পাই। এখন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য, কর্মক্লান্ত! হিমালয়ের আশ্রম থেকে যখনই মিসেস সেভিয়ারের কোন চিঠি পাই, তখনই ইচ্ছা হয়—যেন সেখানে উড়ে চলে যাই। প্রতিনিয়ত প্ল্যাটফর্মে বক্তৃতা করে, অবিরত ঘুরে বেড়িয়ে আর নিত্যনূতন মুখ দেখে দেখে আমি একেবারে ক্লান্ত।

চিকাগোতে ক্লাস করার ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ফ্রিস্কোতে টাকা পাচ্ছি এবং শীঘ্রই দেশে ফেরার টাকা যোগাড় করে উঠতে পারব।

তুমি ও অন্যান্য ভগিনীরা কেমন আছ? এপ্রিলের প্রথম দিকে কোন সময়ে চিকাগোয় যাব—আশা করি।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৭২*

সান ফ্রান্সিস্কো
২৫ মার্চ, ১৯০০

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,

আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি এবং ক্রমশঃ বল পাচ্ছি। এখানে মাঝে মাঝে মনে হয়, খুব শীঘ্রই যেন মুক্তি পাব। গত দু-বছরের যন্ত্রণারাশি আমাকে প্রভূত শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য পরিণামে আমাদের কল্যাণই সাধন করে, যদিও তখনকার জন্য মনে হয়, বুঝি আমরা একেবারে ডুবে গেলাম।

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ; মাঝে মাঝে সে আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীল আকাশই রয়েছি।

আমি এখন সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদের জন্য লালায়িত, যা আমার এবং প্রত্যেক জীবের ভিতরে চিরদিন রয়েছে। এই হাড়মাসের খাঁচা এবং সুখদুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন—এগুলি আবার কি? আমার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। ওঁ তৎ সৎ।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৭৩*

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
২৮মার্চ, ১৯০০

নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে থাকি, তবে অবস্থা ফিরবেই ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার, তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাটছি—আর যত বেশী খাটছি, ততই ভাল বোধ করছি। শরীর খুব অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার হয়েছে, নিশ্চয়। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, অনাসক্তি মানে কি; আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ করে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি; আর এই ব্যাপারেরই আর যে একটা দিক্ আছে, যেটা সমভাবে কঠিন হলেও সেটির দিকে আমরা খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকি; সেটি হচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার—নিজেকে আলগা করে নেবার শক্তি। এই আসক্তি ও অনাসক্তি— দুই-ই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন মানুষ মহৎ ও সুখী হয়।

আমি মিসেস লেগেটের ১০০০ ডলার দানের সংবাদ পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কাজ হবার,

সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জানুন আর নাই জানুন, রামকৃষ্ণের কাজে তাঁকে এক মহৎ অংশ গ্রহণ করতে হবে।

তুমি অধ্যাপক গেডিসের যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। জো-ও একজন অলৌকিকদৃষ্টিসম্পন্ন (clairvoyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এখন আমাদের অনুকূল হতে শুরু করেছে। আমি যে অর্থ সংগ্রহ করছি, তা যথেষ্ট না হলেও উপস্থিত কাজের পক্ষে মন্দ নয়।

আমার মনে হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। ইতোমধ্যে জো ও মিসেস বুল নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন। জো-এর চিঠি ও টেলিগ্রামে তাদের আসার দিন সম্বন্ধে এত গরমিল ছিল যে, তা পড়ে বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছিলাম। ১৯

মিস সুটার-এর বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স গেসিক-এর কাছ থেকে একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। মিস সুটারও আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন, আর তাঁরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁরা লিখেছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিষকেই ঘুরে আসতে হবে—বৃক্ষরূপে বিকশিত হতে হলে বীজকে কিছুদিন মাটির নীচে পড়ে পচতে হবে। গত দু-বছর চলছিল যেন এইরূপ মাটির নীচে পচা। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে আগেও যখনই আমি ছটফট করেছি, তার পরেই জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপে একবার রামকৃষ্ণের কাছে উপনীত হই, আর একবার ঐরূপ হবার পর যুক্তরাষ্ট্রে আসতে হল। শেষটিই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বৃহৎ ব্যাপার। সে-ভাব এখন চলে গেছে—এখন আমি এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল সন্ধে খুব খাটি, যখন যা পাই খাই, রাত্রি বারটায় শুতে যাই, আর কি গভীর নিদ্রা! আগে কখনও আমার এমন ঘুমোবার শক্তি ছিল না। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৭৪*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
২৮ মার্চ, ১৯০০

আশীর্বাদভাজন মেরী,

তোমাকে জানাচ্ছি আমি খুবই আনন্দে আছি। তার মানে এ নয় যে, একটা কুহেলিকাময় সুখবাদের দিকে আমি চলেছি, তবে দুঃখকে সহ্য করবার শক্তি আমার বেড়ে যাচ্ছে। এ দুনিয়ার সুখদুঃখের পূতিগন্ধময় বাষ্পের ঊর্ধ্বে আমি উঠে যাচ্ছি, এগুলি আমার কাছে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা স্বপ্নের রাজ্য, এখানে আনন্দ উপভোগই বা কি, আর কান্নাই বা কি; সে-সব স্বপ্ন বৈ তো নয়। তাই অচিরেই হোক, বিলম্বেই হোক সেগুলি ভাঙবেই। ওখানে তোমাদের সব কেমন চলছে? হ্যারিয়েট প্যারিসে খুব আনন্দে কাটাচ্ছে। তার সঙ্গে সেখানে নিশ্চয়ই দেখা করব। আমি একখানা ফরাসী অভিধান কণ্ঠস্থ করছি! কিছু টাকাও করছি; সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম চলছে, তা সত্ত্বেও আগের তুলনায় ভাল। সুনিদ্রা, সুপরিপাক ও সম্পূর্ণ অনিয়ম চলেছে।

তোমরা পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছ। এপ্রিলের শেষে চিকাগো যাব বলে মনে করছি। যদি না পারি, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের চলে যাবার আগেই পূর্বাঞ্চলে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।

ম্যাক্‌কিণ্ডলি ভগিনীরা এখন কি করছে? আঙুরের রস খেয়ে খেয়ে বুঝি মোটা হয়ে উঠছে? এগিয়ে যাও, জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া আর কি! আর তাই বলে তুমি কি খুশী নও? আর আমি! লোকে চায় চিরন্তন স্বর্গ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কিছুই শাশ্বত নয়। আমি নিশ্চিত যে, একমাত্র তিনিই চিরন্তন স্বর্গ সহ্য করতে পারেন। এইসব বাজে জিনিষের চিরস্থায়িত্ব!

আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্রই তা গর্জন শুরু করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অচঞ্চল থাকব। এখনই তোমার চারপাশে কোন গুঞ্জন নেই। খুব দুঃখিত, অর্থাৎ দুঃখিত হবার চেষ্টা করছি, কারণ কোন কিছুর জন্যই আমি দুঃখিত হতে পারি না। সকল বোধের অতীত একটা শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়ের ঊর্ধ্বে। মাকে সে-কথা বল। গত দু-বছর ধরে মৃত্যু-উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা করেছে। এখন আমি সেই শান্তির সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্বরূপে আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। 'যিনি আত্মতুষ্ট, যিনি আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম এবং স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে—আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনার বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই। 'আত্মাকে লাভ করাই হল শ্রেষ্ঠ লাভ', 'আমি মুক্ত', অতএব আমার আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। 'চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম, এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব'—এই হল বেদান্তবাদ। এতকাল আমি এই তত্ত্বটি প্রচার করছি। তবে আঃ, কী আনন্দ!—প্রিয় ভগিনী মেরী, এখন প্রতিটি দিন তা উপলব্ধি করছি। হ্যাঁ, তাই—'আমি মুক্ত'। আমি একা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্''।

সচ্চিদানন্দে মগ্ন তোমার চিরকালের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হতে চলেছি। তুমি কখনও মন্দকে উপভোগ করেছ? হাঃ! হাঃ! বোকা মেয়ে, সবই ভাল! যত সব বাজে। কিছু ভাল, কিছু মন্দ। ভাল-মন্দ দুই-ই আমার উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্ক্যারিয়ট; দুই-ই আমার খেলা, আমারই কৌতুক। 'যতদিন দুই আছে, ততদিন ভয় তোমাকে ছাড়বে না।' উটপাখীর মত বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে ভাবছ, কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না। সব কিছুই ভাল। সাহসী হও, সব কিছুর সম্মুখীন হও; ভাল আসুক, মন্দ আসুক—দুটিকেই বরণ করে নাও, দুই-ই আমার খেলা। আমার লভ্য ভাল বস্তু কিছুই নেই, ধরে থাকবার মত কোন আদর্শ নেই; পূর্ণ করবার মত উচ্চাভিলাষও নেই; আমি হীরের খনি, ভাল-মন্দের নুড়ি নিয়ে খেলা করছি। ভাল-মন্দ দুই-ই ভাল। মন্দ, তুমি এস, ভালর জন্য; ভাল, তুমিও এস। আমার সামনে দুনিয়াটা উল্টে-পাল্টে গেলেই বা আমার কি আসে যায়? আমি বুদ্ধির অতীত শান্তি; বুদ্ধি আমাদের কেবল ভাল-মন্দই দিতে পারে। আমি তার বাইরে, আমি শান্তি।

—বি

পত্রাবলী ৪৭৫-৪৮৪

৪৭৫*

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট,সান ফ্রান্সিস্কো
৩০ মার্চ, ১৯০০

প্রিয় জো,
বইগুলি শীঘ্র পাঠিয়েছ বলে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস, এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রী হয়ে যাবে। নিজের পরিকল্পনা বদলানো সম্বন্ধে তুমি দেখছি আমার চেয়েও খারাপ। এখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' এল না কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমার আশঙ্কা, আমার ডাকের চিঠিপত্র খুবই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি খুব খাটছি, কিছু টাকা সংগ্রহ করছি, আর স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটুনি; তার পর পেটভরা নৈশভোজনান্তে ১২টায় শয্যাগ্রহণ!—এবং পায়ে হেঁটে সারা শহর বেড়ান! আর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি!

মিসেস মিল্টন তাহলে ওখানেই আছেন। তাঁকে আমার ভালবাসা জানাবে। জানাবে তো? তুরীয়ানন্দের পা কি ভাল হয়নি?

মিসেস বুলের ইচ্ছা অনুসারে আমি মার্গর চিঠিগুলি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিসেস লেগেটকে কিছু দান করেছেন জেনে বড়ই আনন্দ পেলাম। যেমন করেই হোক সব জিনিষের একটা সুরাহা হতেই হবে—তা হতে বাধ্য, কারণ কোন কিছুই শাশ্বত নয়।

সুবিধা দেখলে এখানে আরও দু-এক সপ্তাহ আছি; তারপর ষ্টকটন নামে একটা কাছাকাছি জায়গায় যাব, তারপর—জানি না। যেমন করেই হোক চলে যাচ্ছে। আমি বেশ শান্তিতে ও নির্ঝঞ্ঝাটে আছি। আর কাজ-কর্ম যেমন চলে থাকে, তেমনই চলে যাচ্ছে। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চঃ—পরিবর্তনাদি সহ 'কর্মযোগ' বইখানি সম্পাদনার জন্য মিস ওয়াল্ডোই হচ্ছেন ঠিক লোক।

—বি

৪৭৬*

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,
তোমার ফ্রান্স যাত্রার আগে এক ছত্র লিখছি। ইংলণ্ড হয়ে যাচ্ছ কি? মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি।

লস্ এঞ্জেলেস্ থেকে এখানে শারীরিক ভাল নয়, কিন্তু মানসিক অনেক ভাল আছি—সবল ও শান্তিপূর্ণ। আশা করি, এ অবস্থা বজায় থাকবে।

তোমার কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর পাইনি, শীঘ্র পাব আশা করছি। আমার নামে ভারতের একখানা চিঠি ভুল করে মিসেস হুইলারের ঠিকানায় চলে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা আমার কাছে ঠিকমত এসে পৌঁছেছে। সারদানন্দের কাছ থেকে সুন্দর সব বিবরণ পেয়েছি; তারা সেখানে চমৎকার কাজ চালাচ্ছে। ছেলেরা কাজে লেগে গেছে; দেখছ তো, ধমকানির দুটি দিকই আছে, এর ফলে তারা উঠে পড়ে লেগেছে।

আমরা ভারতবাসীরা এত দীর্ঘদিনের জন্য এমনই পরনির্ভরশীল ছিলাম যে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাদের সক্রিয় করে তুলতে হলে বেশ কিছু কড়া কথার দরকার। এক জন কুঁড়ের শিরোমণি এ বছরের জন্মতিথি উৎসবের ভার নিয়েছিল, এবং সে ভালভাবেই তা সম্পন্ন করেছে। আমার সাহায্য ছাড়াই—তারা নিজেরাই দুর্ভিক্ষে সেবার পরিকল্পনা করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে। তা দেখে আমি সত্যি খুশী! দেখ জো, মা-ই কাজ করছেন।

মিস থার্সবির (Miss Thursby) চিঠি আমি মিসেস হার্স্টকে (Mrs. Hearst) পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁর গানের আসরে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি যেতে পারিনি। বিশ্রী ঠাণ্ডা লেগেছিল। এই হল ব্যাপার।

জানি না, চিকাগো যাবার ভাড়া ফ্রিস্কোতে তুলতে পারব কিনা। ওকল্যাণ্ডের কাজ সফল হয়েছে। ওখান থেকে ১০০ ডলার পাব, ব্যস। যাই হোক, আমি সন্তুষ্ট। আমি যে চেষ্টা করেছি, সেইটাই বড় কথা।

চৌম্বক চিকিৎসা আমার কিছু করতে পারল না। যাই হোক, আমার চলে যাবে। কিভাবে যাবে তা নিয়ে ব্যস্ত নই। ... খুব শান্তিতে আছি। লস্ এঞ্জেলেস্ থেকে খবর পেলাম যে, মিসেস লেগেট আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এটা কতটা সত্য, তা জানবার জন্য নিউ ইয়র্কে 'তার' করেছি। শীঘ্র উত্তর পাব, আশা করি।

আচ্ছা, যখন লেগেটরা ও-পারে (ইওরোপে) চলে যাবেন, তখন আমার চিঠিপত্রের কি ব্যবস্থা হবে? সেগুলি ঠিকমত আমার কাছে পৌঁছবে, এমন ব্যবস্থা হবে তো?

আর কিছু লেখবার নেই, তোমাদের জন্য ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা, সে তো তুমি জানই। আমি যতটুকুর উপযুক্ত, তার চেয়ে তুমি অনেক বেশী করেছ। প্যারিসে যেতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু মে মাসে ইংলণ্ডে অবশ্যই যাব। আর কয়েক সপ্তাহ ইংলণ্ডকে পরখ না করে দেশে ফিরছি না। ভালবাসা জেনো।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—মিসেস হ্যান্স্বরো (Hansborough) এবং মিসেস এপেনুল (Mrs. Appenul) ১৭১৯ নং টার্ক স্ট্রীটে এ মাসের জন্য একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আছি এবং কয়েক সপ্তাহ থাকব।

—বি

৪৭৭*

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট
সান ফ্রান্সিস্কো
১ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি আজ সকালে পেলাম। নিউ ইয়র্কের সব বন্ধুরা মিসেস মিল্টনের (হাতঘষা) চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছেন জেনে ভারি আনন্দ হল। লস্ এঞ্জেলেসে তিনি খুবই বিফল হয়েছিলেন বলে মনে হয়; কারণ আমরা যাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, তারা সবাই আমাকে তাই বলেছে। অনেকে হাত ঘষার আগে যা ছিলেন, তার চেয়েও খারাপ বোধ করছেন। মিসেস মিল্টনকে আমার ভালবাসা জানাবেন। তাঁর চিকিৎসায় আমি অন্ততঃ সাময়িক উপকার পেতাম। বেচারা ডাক্তার হিলার! আমরা তাঁকে তড়িঘড়ি লস্ এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছিলাম—তাঁর স্ত্রীকে আরাম করার জন্য। সেদিন সকালে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা ও আলাপ হলে বেশ হত। সমস্ত ডলাই-মলাইয়ের পরে মিসেস হিলারের অবস্থা মনে হচ্ছে, আগের চেয়ে বেশী খারাপ হয়ে গেছে—তার হাড় ক-খানি সার হয়েছে, তা ছাড়া ডাক্তার হিলারকে লস্ এঞ্জেলেসে ৫০০ ডলার খরচ করতে হয়েছে, আর তাতে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমি অবশ্য জো-কে এত সব লিখতে চাই না। গরীব রোগীদের যে এতখানি সাহায্য করতে পারছে, এই কল্পনায় সে মশগুল। কিন্তু হায়! সে যদি লস্ এঞ্জেলেসের লোকদের ও এই বুড়ো ডাক্তার হিলারের মত শুনতে পেত, তবে সে সেই পুরানো কথার মর্ম বুঝতে পারত যে, কারও জন্য দাওয়াই বাতলাতে নেই। ডাক্তার হিলারকে এখান থেকে লস্ এঞ্জেলেসে পাঠানোর দলে যে আমি ছিলাম না, এই ভেবে আমি খুশী। জো আমাকে লিখেছে যে, তার কাছ থেকে এই রোগ-আরামের খবর পেয়েই ডাক্তার হিলার সাগ্রহে লস্ এঞ্জেলেসে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। সে বুড়ো ভদ্রলোক আমার ঘরে সাগ্রহে যেমন লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা দেখাও জো-র উচিত ছিল। ৫০০ ডলার খরচ বুড়োর পক্ষে বড় বেশী হয়ে গেছে। তিনি জার্মান—লাফিয়ে বেড়ান, নিজের পকেট চাপড়ান আর বলেন, এই চিকিৎসার বোকামি না হলে আপনিই তো ৫০০ ডলার পেতে পারতেন? এ ছাড়া গরীব রোগীরা তো সব আছেই—যারা ডলাই-মলাইয়ের জন্য কখনও বা প্রত্যেকে ৩ ডলার খরচ করেছে, আর এখন জো-ও আমাকে বাহবা দিচ্ছে! জো-কে এ কথা বলবেন না। তার ও আপনার যে-কোন লোকের জন্য টাকা খরচ করবার যথেষ্ট সংস্থান রয়েছে। জার্মান ডাক্তারের সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। কিন্তু নিরীহ গরীব বেচারাদের পক্ষে এটা বড় কঠিন ব্যাপার। বুড়ো ডাক্তারের এখন বিশ্বাস জন্মেছে যে, সম্প্রতি কতকগুলো ভূত-প্রেত মিলে তাঁর সাংসারিক ব্যাপার সব লণ্ড-ভণ্ড করে দিচ্ছে। তিনি আমাকে অতিথিরূপে রেখে এর একটা প্রতিকারের ও তাঁর স্ত্রীর আরোগ্যের খুব আশা করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে দৌড় করতে হল লস্ এঞ্জেলেসে, আর তার ফলে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আর এখন যদিও তিনি আমাকে তাঁর অতিথিরূপে পাবার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন, আমি কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলেছি—ঠিক তাঁর কাছ থেকে নয়, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকার কাছ থেকে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, এ-সব ভূতুড়ে ব্যাপার! তিনি থিওসফি আলোচনা করে থাকেন। আমি তাঁকে পরামর্শ

দিয়েছিলাম, মিস ম্যাকলাউডকে লিখে দিতে—কোথাও থেকে তাঁর জন্য একটি ভূতের ওঝা যোগাড় করতে, যাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে ছুটে গিয়ে আবার ৫০০ ডলার খরচ করতে পারেন!

অন্যের মঙ্গল করা সব সময় নির্ঝঞ্ঝাট নয়।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, জো যতক্ষণ খরচ যোগায়, আমি ততক্ষণ মজা পেতে রাজী আছি—হাড়-মটকানো বা ডলাই-মলাইওয়ালা—যাদের কাছেই হোক না কেন! কিন্তু ডলাই-মলাই করবার জন্য এ-সব লোককে যোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া এবং সব প্রশংসার বোঝাটা আমার ঘাড়ে তুলে দেওয়া—এ কাজটা জো-র ভাল হয়নি! সে যে বাইরের কাউকে ডলাই-মলাইয়ের জন্য নিয়ে আসছে না—এতে আমি খুশী আছি। তা না হলে জো-কে প্যারিসে চলে যেতে হত, আর মিসেস লেগেটকে সব প্রশংসা কুড়াবার ভার নিতে হত। আমি জো-র ত্রুটি সংশোধনের জন্য ডাক্তার হিলারের কাছে একজন ক্রিশ্চান সায়ান্সপন্থী (অর্থাৎ মনোবলের সাহায্যে) রোগনিরাময়কারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দিলেন—এবং জানিয়ে দিলেন যে, এ সব অদ্ভুত চিকিৎসার সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখবেন না। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি ও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, এবার মিসেস লেগেট সেরে উঠুন। তাঁর কামড়টা কিসের, তা কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?

আমি আশা করি, উইলখানি তাড়াতাড়িই আসবে; ও-বিষয়ে আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমি আশা করেছিলাম, ভারত থেকে ট্রাষ্টের একখানি খসড়াও এই ডাকেই আসবে। কিন্তু কিছু আসেনি; এমন কি 'প্রবুদ্ধ ভারত'ও আসেনি—যদিও তা সান ফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছে গেছে, দেখতে পাচ্ছি।

সেদিন কাগজে পড়লাম, কলিকাতায় এক সপ্তাহে ৫০০ লোক প্লেগে মরেছে! মা-ই জানেন কিসে মঙ্গল হবে।

মিঃ লেগেট দেখছি বেদান্ত সমিতিটাকে চালু করে দিয়েছেন। চমৎকার!

ওলিয়া কেমন আছে? নিবেদিতা কোথায়? সেদিন আমি তাকে 21 W. 34 (st), N. Y.—এই ঠিকানায় একখানি পত্র লিখেছি। সে কাজে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি খুব খুশী। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবেন।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার পক্ষে যতটা কাজ করা সম্ভব, ততটা বা তার চেয়েও বেশী কাজ পাচ্ছি। যেমন করেই হোক, আমি আমার পথের খরচ যোগাড় করব। ওরা আমায় বেশী দিতে না পারলেও কিছু কিছু দেয়। অবিরাম পরিশ্রম করে কোন রকমে আমি আমার পাথেয় যোগাড় করতে পারব, বাড়তিও কয়েক শত কিছু পাব। সুতরাং আপনি আমার জন্য মোটেই চিন্তিত হবেন না।

—বি

৪৭৮*

সান ফ্রান্সিস্কো
৬ এপ্রিল, ১৯০০

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,
শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম, তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে জানি না।

মিসেস লেগেট বলেছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে—সুতরাং তুমি তাই কর।

তোমার বইখানা শেষ করে ফেল ও তারপর আমরা প্যারিসে ফরাসীদের জয় করতে যাচ্ছি। মেরী কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেরী ওখানে থাকলে আমি দিন পনরর ভেতরে চিকাগোয় যাচ্ছি; মেরী শীঘ্রই পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছে। ইতি

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

মন সর্বব্যাপী। যে কোন স্থান থেকে এর স্পন্দন শোনা যেতে পারে এবং অনুভব করা যেতে পারে।

—বি

৪৭৯*

[জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত]

সান ফ্রান্সিস্কো
৭ এপ্রিল, ১৯০০

কিন্তু এখন আমি এত স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছি, আগে কখনও এমনটি ছিলাম না। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মহানন্দে খুব খাটছি। কর্মেই আমার অধিকার, বাকী মা জানেন।

দেখ, এখানে যতদিন থাকব বলে মনে করেছিলাম, তার চেয়ে বেশী দিন থেকে কাজ করতে হবে দেখছি। সেজন্য বিচলিত হয়ো না; আমার সব সমস্যার সমাধান আমিই করব। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, আলোও দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সফলতা আমাকে বিপথগামী করত এবং আমি যে সন্ন্যাসী—এই সত্যটাই হয়তো মনে রাখতে পারতাম না। তাই 'মা' আমাকে এই অভিজ্ঞতা দিচ্ছেন।

আমার তরী ক্রমশঃ সেই শান্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যেখান থেকে সে আর বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় মা! আর আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নাই। মায়ের নাম ধন্য হউক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি যন্ত্র মাত্র—আর কিছু জানি না, জানবার আকাঙ্ক্ষাও নেই। 'ওয়া গুরুজী কী ফতে।' জয়, শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়।

৪৮০*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
৭ এপ্রিল, ১৯০০

মা,

ক্ষতের কারণ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে, এই খবর পেয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার যে আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আপনার অত্যন্ত সহৃদয় পত্রখানিতে খুব উৎসাহ পেয়েছি। আমায় সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এল কিনা এল, তা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। ধীরে ধীরে শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হয়ে উঠছি।

মিসেস মিল্টনকে দয়া করে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাবেন। শেষ পর্যন্ত আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠব। মূলতঃ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, যদিও মাঝে মাঝে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। তবে আক্রমণগুলি স্বল্পকালস্থায়ী—তীব্রতাও কম।

তুরীয়ানন্দকে ও সিরিকে (Siri) চিকিৎসা করানো আপনার পক্ষে উপযুক্তই হয়েছে। আপনার মহৎ হৃদয়ের জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন। সর্ববিধ আশীর্বাদ নিরন্তর আপনাকে ঘিরে থাকুক।

ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসীদের মধ্যে কাজ করা যে উচিত, তা খুবই সত্যি। জুলাই মাসে বা তার আগেই ফ্রান্সে পৌঁছবার আশা করছি। 'মা'-ই জানেন। সর্বকল্যাণ আপনি লাভ করুন—আপনার সন্তান বিবেকানন্দের নিরন্তর এই প্রার্থনা।

৪৮১*

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, সান ফ্রান্সিস্কো
৮ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

এই সঙ্গে অভেদানন্দের একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পাঠালাম। ... সে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। আমি তাকে বলেছি যে, সে যেন সব বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং আমি না আসা পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে থাকে।

আমার বোধ হয়, নিউ ইয়র্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে ওরা আমাকে ওখানে চায়; আপনিও কি তাই মনে করেন? তা হলে শীঘ্রই আসব। আমার পাথেয়ের জন্য যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করছি। পথে চিকাগো ও ডেট্রয়েটে নামব। অবশ্য ততদিনে আপনিও চলে যাবেন।

অভেদানন্দ এ-যাবৎ ভাল কাজ করছে; আর আপনি তো জানেন, আমি আমার কর্মীদের কাজে মোটেই হস্তক্ষেপ করি না। যে কাজের লোক, তার একটা নিজস্ব ধারা থাকে এবং তাতে কেউ হাত দিতে গেলে সে বাধা দেয়। তাই আমি আমার কর্মীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিই। অবশ্য আপনি কার্যক্ষেত্রেই রয়েছেন এবং সব জানেন। কি করা উচিত, এ বিষয়ে আমায় উপদেশ দেবেন।

কলিকাতায় প্রেরিত টাকা যথাসময়ে পৌঁছেছে।

আমি ক্রমশঃ সুস্থ হচ্ছি, এমন কি পাহাড়-চড়াইও করতে পারি। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কিন্তু অসুস্থতার স্থিতিকাল ক্রমশই কমে আসছে। মিসেস মিল্টনকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিরি গ্রানেণ্ডার একখানি ছোট্ট চিঠি লিখেছে। তাকে বিশ্বাস করেছি দেখে বালিকাটি খুব কৃতজ্ঞ—ঠিক যেন মিসেস লেগেটের মত! চমৎকার, ভাল হাতে পড়লে টাকা জিনিষটা তেমন খারাপ নয়। আমি খুবই আশা করি যে, সিরি সম্পূর্ণ সেরে উঠুক—বেচারী!

প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে এ জায়গা ছাড়ব। প্রথমে ষ্টার ক্লোন্ নামে একটা জায়গায় যাব এবং তার পরে পূর্বাঞ্চলে যাত্রা করব। হয়তো ডেনভারেও যাব।

জো-কে আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

আপনার চিরন্তন
বিবেকানন্দ

পুনঃ—শেষ পর্যন্ত আমি আমি সেরে উঠব, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই। আমি ষ্টীম ইঞ্জিনের মত কেমন কাজ করে চলেছে—রাঁধছি, যা খুশী খাচ্ছি এবং তা সত্ত্বেও বেশ ঘুমুচ্ছি এবং ভাল আছি—এ আপনার দেখা উচিত ছিল!

আমি কিছু লিখিনি এ-যাবৎ, কারণ সময় নেই। মিসেস লেগেট ভাল হয়েছেন এবং স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করছেন জেনে আনন্দ হল। তিনি শীঘ্র নিরাময় হউন—এই আমার আশা ও প্রার্থনা। ইতি

পুনঃ—মিসেস সেভিয়ারের একখানি সুন্দর পত্রে জানলাম যে তাঁরা বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কলিকাতায় ভয়ানক প্লেগ শুরু হয়েছে; কিন্তু এবার তা নিয়ে কোন হইচই নেই। ইতি

—বি

৪৮২*

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট সান ফ্রান্সিস্কো
১০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

নিউ ইয়র্কে একটা জটলা হচ্ছে দেখছি। অ ... আমায় একখানা চিঠিতে জানিয়েছে যে, সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাবে। সে ভেবেছে, মিসেস বুল ও তুমি তার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছু লিখেছ, উত্তরে আমি তাকে ধৈর্য ধরে থাকতে লিখেছি, আর জানিয়েছি যে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড আমাকে তার সম্বন্ধে শুধু ভাল কথাই লিখেন।

দেখ জো-জো, এই সব হুজ্জতের বিষয়ে আমার রীতি তো তোমার জানাই আছে—তা হচ্ছে, সমস্ত হুজ্জত এড়িয়ে চলা। 'মা'-ই এই সবের ব্যবস্থা করেন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। জো, আমি ছুটি নিয়েছি। 'মা' এখন নিজেই তাঁর কাজ চালাবেন। এই তো বুঝি!

এখন, তুমি যেমন পরামর্শ দিয়ে থাক—আমি এখানে যা কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি, সব পাঠিয়ে দেব। আজই পাঠাতে পারতাম, কিন্তু হাজার পুরাবার অপেক্ষায় আছি। এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই সান ফ্রান্সিস্কোতে এক হাজার পুরো করবার আশা রাখি। আমি নিউ ইয়র্কের নামে একখানি ড্রাফ্‌ট কিনব, কিম্বা ব্যাঙ্ককেই যথাযথ ব্যবস্থা করতে বলব।

মঠ ও হিমালয় থেকে অনেক চিঠি আসছে। আজ সকালে স্বরূপানন্দের এক চিঠি পেলাম; কাল মিসেস সেভিয়ারের একখানি এসেছে।

মিস হ্যান্‌স্‌বরোকে ফটোগ্রাফগুলির কথা বলেছি। মিঃ লেগেটকে আমার নাম করে বেদান্ত সোসাইটির ব্যাপারটার যথোচিত সমাধান করতে বল।

এইটুকু শুধু আমি বুঝেছি যে, প্রতি দেশেই সেই দেশের নিজস্ব ধারা আমাদের মেনে চলতে হবে। সুতরাং তোমার কাজ যদি আমায় করতে হত, তাহলে আমি সমস্ত সভ্য ও সমর্থকদের সভা আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করতাম তাঁরা কি করতে চান, কোন সংহতি চান কিনা, যদি চান তবে তা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি। তুমি কিন্তু কাজটি নিজের চেষ্টায় কর। আমি রেহাই চাই। একান্তই যদি মনে কর যে, আমি উপস্থিত থাকলে সাহায্য হবে, তবে আমি দিন পনরর মধ্যে আসতে পারব। আমার ওখানকার কাজ শেষ হয়েছে। তবে সান ফ্রান্সিস্কোর বাইরে স্টকটন একটি ছোট শহর—আমি সেখানে দিন কয়েক কাজ করতে চাই। তারপর পূর্বাঞ্চলে যাব। আমার মনে হয়, এখন আমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার—যদিও আমি এই শহরে বরাবরই সপ্তাহে ১০০ ডলার করে পেতে পারি। এবারে আমি নিউ ইয়র্কের উপর 'লাইট ব্রিগেডে'র আক্রমণ (Charge of the Light Brigade) চালাতে চাই। আমার আন্তরিক ২০
ভালবাসা জানবে।

তোমার চিরস্নেহশীল
বিবেকানন্দ

পুঃ—কর্মীরা সকলেই যদি সংহতির বিরোধী হয়, তবে কি তুমি মনে কর যে, ওতে কোন ফল হবে? তুমিই জান ভাল! যা ভাল মনে করবে, তাই কর। নিবেদিতা চিকাগো থেকে আমায় একখানি চিঠি লিখেছে। সে গোটাকয়েক প্রশ্ন করেছে—আমি উত্তর দেব।

—বি

৪৮৩*

[জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত]

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া
১২ এপ্রিল,১৯০০

... 'মা' আবার প্রসন্না হচ্ছেন; অবস্থা অনুকূল হয়ে আসছে—তা হতেই হবে।

কর্ম চিরকালই অশুভকে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমি নিজ স্বাস্থ্য হারিয়ে সঞ্চিত অশুভরাশির ফলভোগ করছি। এতে আমি খুশী, এতে আমার মন হালকা হয়ে গেছে—আমার জীবনে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে; যা এর আগে কখনও ছিল না। আমি এখন কেমন করে একই কালে আসক্ত ও অনাসক্ত থাকতে হয়, তাই শিখছি এবং ক্রমশঃ নিজের মনের উপর আমার প্রভুত্ব আসছে।

মায়ের কাজ মা-ই করছেন; সেজন্য এখন বেশী মাথা ঘামাই না। আমার মত পতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মরছে; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলছে। জয় মা! ... মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে একলা আজীবন চলে এসেছি। যখনই এর ব্যাতিক্রম করেছি, তখনই আঘাত পেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

আমি সুখে আছি, নিজের মনের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শান্তিতে আছি; আমার অন্তরের বৈরাগ্য আজ আগের চেয়ে অধিক সমুজ্জ্বল। আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসা দিন দিন কমে যাচ্ছে, আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষমূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সেই যে আমরা দীর্ঘ রাত্রি জেগে কাটাতাম, তারই স্মৃতি আবার মনে জাগছে। আর কর্ম? কর্ম আবার কি? কার কর্ম? আর কার জন্যই বা কর্ম করব?

আমি মুক্ত। আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, সবই মায়ের খেলা। আমি কেন মতলব আঁটতে যাব? আর কি

মতলবই বা আঁটব? আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা না রেখেই মা-র যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা-কিছু আসবার এসেছে ও চলে গেছে। মা-ই তো যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি?

৪৮৪*

১৭ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মিঃ লেগেট,

সম্পাদিত ‘উইল’খানা এই সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি। এটা তাঁর ইচ্ছানুসারেই সম্পাদন করা হয়েছে এবং যথারীতি এটার ভার গ্রহণের কষ্ট স্বীকার করতে ২১
আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রথম থেকে আপনারা আমার প্রতি সমভাবে সদয়। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আপনি তো জানেন, যেখান থেকে আনুকূল্য পাওয়া যায় (আনুকূল্য এখন পাওয়া গিয়েছে), মানুষ সেখান থেকেই আরও বেশী করে পেতে চায়, এই তার স্বভাব।

আপনার সন্তান আমিও মানুষ।

আপনি যখন এ চিঠিখানা পাবেন, তখন আমি সান ফ্রান্সিস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছি। আপনি দয়া করে আমার ভারতীয় চিঠিপত্র C/o Mrs. Hal, 10 Aster Street, Chicago (চিকাগো), এই ঠিকানায় মার্গটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন কি? মার্গটের বিদ্যালয়ের জন্য আপনার ১০০০ ডলার দানের কথা সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লিখেছে।

আমাদের প্রতি আপনাদের অবিচলিত সহৃদয়তার জন্য নিরন্তর এই প্রার্থনা জানাই যে, সকল আশীর্বাদ চিরদিন আপনাদের ঘিরে থাকুক।

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—মিসেস লেগেট ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন জেনে আমি খুব আনন্দিত।

পত্রাবলী ৪৮৫-৪৯৫

৪৮৫*

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া
১৮ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

এইমাত্র তোমার ও মিসেস বুলের সাদর আহ্বানপত্র পেলাম। এ চিঠি আমি লণ্ডনের ঠিকানায় লিখছি। মিসেস লেগেট নিঃসন্দেহে আরোগ্যের পথে চলেছেন জেনে আমি খুবই সুখী হয়েছি!

মিঃ লেগেটে সভাপতিপদ ত্যাগ করেছেন শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম।

আসল কথা—আরও বেশী গোল পাকাবার ভয়ে আমি চুপ করে আছি। তুমি তো জানই—আমার সব ভয়ানক কড়া ব্যবস্থা; একবার যদি আমার খেয়াল চাপে তো এমন চেঁচাতে শুরু করব যে, অ—র মনের শান্তিভঙ্গ হবে। আমি তাকে শুধু এইটুকু লিখে জানিয়েছি যে, মিসেস বুল সম্বন্ধে তার সব ধারণা একেবারে ভুল।

কর্ম করা সব সময়ই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

তুমি আবার লণ্ডনে পুরানো বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে খুবই সুখী হয়েছ নিশ্চয়। তাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানিও। আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই। শরীর চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ করছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বৈ আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি; আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক' (সংসারের ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক), 'তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!'—যাই, প্রভু, যাই! ২২

হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না!

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী; এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশী; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

তুমি বুঝতে পারছ, কেন আমি অভেদানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না।

আমি কে জো, যে কারও কাজে হাত দেব? অনেক দিন হল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই। এই বৎসরের গোড়া থেকেই আমি ভারতের কাজে কোন আদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি—তা তো তুমি জানই। তুমি ও মিসেস বুল অতীতে আমার জন্য যা করেছ, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমাদের চির-কল্যাণ—অনন্ত কল্যাণ হোক। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরের সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন; পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদ-শালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত!—আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! এর আগে আমার কর্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের [২৩] ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে-সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা, যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

আহা, কি স্থির প্রশান্তি!
চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা-কিছু দেখছি শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা ভালবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভাল-মন্দ ভাব পর্যন্ত জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি শান্তি! চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না।—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব! যা কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেননা নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সবচেয়ে উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি এর আগে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ!

আমি আশা করি, তোমরা সকলে লণ্ডনে ও প্যারিসে বহু নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবে—শরীর ও মনের নূতন আনন্দ, নূতন খোরাক পাবে।

তুমি ও মিসেস বুল আমার চিরন্তন ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমারই চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৪৮৬*

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া
২০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

আজ তোমার চিঠি পেলাম। গতকাল তোমাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু তুমি ইংল্যাণ্ডে থাকবে ভেবে চিঠি সেখানের ঠিকানায় পাঠিয়েছি।

মিসেস বেট্‌স্‌-কে তোমার বক্তব্য জানিয়েছি। অ—এর সঙ্গে যে ছোটখাট একটা মতান্তর হয়েছে, তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তুমি তার যে পত্রখানা পাঠিয়েছ, তাও পেয়েছি। এ পর্যন্ত সে ঠিকই বলেছে, 'স্বামীজী আমাকে লিখেছেনঃ মিঃ লেগেট বেদান্তে উৎসাহী নন এবং আর সাহায্য করবেন না। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও।' টাকাপয়সার কি করা যাবে, তার এ প্রশ্নের উত্তরে—তোমার ও মিসেস লেগেটের ইচ্ছানুসারে তাকে আমি লস এঞ্জেলেস্ থেকে নিউ ইয়র্কের সংবাদ লিখেছিলাম।

হ্যাঁ, কাজ তার নিজের রূপ নেবেই, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার ও মিসেস বুলের মনে ধারণা যে, এ ব্যাপারে আমার কিছু করা উচিত। কিন্তু প্রথমতঃ অসুবিধা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। সেটা যে কি নিয়ে সে কথা তোমরা কেউই আমাকে কিছু লেখনি। অন্যের মনের কথা জেনে নেবার বিদ্যা আমার নেই।

তুমি শুধু সাধারণভাবে লিখেছ যে, অ—নিজের হাতে সব কিছু রাখতে চায়। এ থেকে আমি কি বুঝব? অসুবিধাগুলি কি কি? প্রলয়ের সঠিক তারিখটি সম্বন্ধে আমি যেমন অন্ধকারে, তোমার মতভেদের কারণ সম্বন্ধেও আমি তেমনই অন্ধকারে। অথচ মিসেস বুলের ও তোমার চিঠিগুলিতে যথেষ্ট বিরক্তিভাব। এই সব জিনিষ আমরা না চাইলেও কখনও কখনও জটিল হয়ে পড়ে। এগুলি স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করুক।

মিসেস বুলের ইচ্ছানুসারে উইল তৈরী করে মিঃ লেগেটকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার শরীর একরূপ চলে যাচ্ছে, কখনও ভাল আছি, কখনও মন্দ। মিসেস মিল্টনের চিকিৎসায় আমি কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছি, এ-কথা ঠিক বলতে পারি না। তিনি আমায় ভাল করতে চেয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমার প্রীতি জানাচ্ছি। আশা করি, তিনি অন্য লোকের উপকার করতে পারবেন।

এই কথাগুলি মিসেস বুলকে লেখার জন্য তাঁর কাছ থেকে চার-পাতার এক চিঠি পেয়েছি; তাতে কিভাবে আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিভাবে ধন্যবাদ জানান উচিত, সেই সব সম্বন্ধে লম্বা উপদেশ।

অ—এর ব্যাপার থেকে নিশ্চয়ই এ-সবের উৎপত্তি!

স্টার্ডি ও মিসেস জনসন মার্গটের জন্য বিচলিত হয়ে আমার কঠোর সমালোচনা করেছে। এখন আবার অ—মিসেস বুলকে বিচলিত করেছে এবং তার ধাক্কাও আমাকে সামলাতে হচ্ছে। এই হল জীবন!

তুমি ও মিসেস লেগেট চেয়েছিলে আমি তাকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হতে লিখি—এ-কথা লিখি যে, মিঃ লেগেট তাকে আর সাহায্য করবেন না। আমি তাই লিখেছি। এখন আমি আর কি করতে পারি?

যদি কেউ (John and Jack) তোমার কথা না শোনে, তা হলে তার জন্য কি আমাকে ফাঁসি যেতে হবে? এই বেদান্ত সোসাইটি সম্বন্ধে আমি কি জানি? আমি কি সেটা আরম্ভ করেছিলাম? তাতে কি আমার কোন হাত ছিল? তদুপরি, ব্যাপারটা যে কি, সে সম্বন্ধে দু-কলম লেখবার মনও কারও হয়নি।

বাস্তবিক, এ দুনিয়া খুব একটা মজা!

মিসেস লেগেট দ্রত আরোগ্যলাভ করছেন জেনে আনন্দিত। তাঁর সম্পূর্ণ রোগমুক্তির জন্য আমি নিরন্তর প্রার্থনা করি। সোমবার চিকাগো যাত্রা করব। এক সহৃদয় মহিলা নিউ ইয়র্কের এমন একখানা পাস (Railway pass) আমাকে দিয়েছেন, যা তিনমাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। 'মা'-ই আমাকে দেখবেন। সারা জীবন আগলে থাকার পরে তিনি নিশ্চয়ই এখন আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেবেন না। ইতি

তোমাদের চিরকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

৪৮৭*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

২৩ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

আজই আমার যাত্রা করা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে যাত্রার পূর্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল রেড-উড বৃক্ষরাশির নীচে তাঁবুতে বাস করার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না। তাই তিন-চার দিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলাম। তা ছাড়া অবিরাম কাজের পরে এবং চারদিনের হাড়ভাঙা ভ্রমণে বেরোবার আগে ঈশ্বরের মুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন আমার ছিল।

‘মেরী-পিসী’র সঙ্গে পনর দিনের মধ্যে দেখা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রাখবার জন্য তাগিদ দিয়ে মার্গট চিঠি লিখেছে। কথা আমি রাখব, তবে পনর দিনের জায়গায় বিশ দিন হবে, এই যা। এতে চিকাগোয় এখন যে বিশ্রী তুষার-ঝড় চলছে, তার হাত এড়াতে পারব, অধিকন্তু কিছু শক্তিসঞ্চয় করে নেব।

মার্গট দেখা যাচ্ছে মেরী-পিসীর দারুণ অনুরাগী।

আগামী কাল বনের দিকে যাত্রা করছি। উফ্! চিকাগো যাবার আগে ফুসফুস ওজোন (ozone)-এ ভরে নেব। ইতোমধ্যে চিকাগোয় আমার নামে ডাক এলে রেখে দিও, লক্ষ্মী-মেয়েটির মত সেগুলি যেন আবার এখানে পাঠিয়ে দিও না।

কাজ শেষ করে ফেলেছি। রেলভ্রমণের ধকলের আগে শুধু কয়েকদিনের—তিন কি চার দিনের—বিশ্রামের জন্য বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করছেন।

এখান থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত তিন মাস মেয়াদের একটি ফ্রী পাস (Free pass) পেয়েছি; ঘুমের কামরার খরচা ছাড়া আর কিছু খরচা নেই; অতএব, বুঝতেই পারছ—মুক্ত, মুক্ত (Free, free)!

তোমাদের স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

৪৮৮*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

৩০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

আকস্মিক অসুস্থতা ও জ্বরের জন্য এখনও চিকাগো যাত্রা করতে পারিনি। দীর্ঘ ভ্রমণের ধকল সহ্য করার মত বল পেলেই রওনা হব। মার্গটের কাছ থেকে সেদিন একখানা চিঠি পেয়েছি। তাকে আমার ভালবাসা দিও। তুমি আমার চিরন্তন ভালবাসা নিও। হ্যারিয়েট কোথায়? এখনও কি চিকাগোতেই? আর ম্যাক্‌কিণ্ডলি বোনেরা? সকলকে আমার ভালবাসা।

বিবেকানন্দ

৪৮৯*

[মিসেস ব্লজেটকে লিখিত]

২৪

২ মে, ১৯০০

আপনার অত্যন্ত সহৃদয় পত্রখানি পেয়েছি। ছ-মাসের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আবার স্নায়ুরোগে ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত আছি। যা হোক, দেখলাম আমার কিডনি ও হার্ট আগের মতই ভাল আছে। কয়েকদিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, তারপরই চিকাগো রওনা হব।

মিসেস মিলওয়ার্ড এডাম্‌স্‌কে (Mrs. Milward Adams) এইমাত্র চিঠি লিখেছি এবং আমার কন্যা মিস নোবল্‌কেও একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছি, যাতে সে মিস এডাম্‌স্‌-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এবং কাজ সম্বন্ধে তাঁকে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানায়।

স্নেহময়ী মা আমার, ভগবানের আশীর্বাদ ও শান্তি আপনি লাভ করুন। আমিও একটু শান্তি চাই, খুবই চাই, আমার জন্য প্রার্থনা করুন। কেটকে ভালবাসা।

বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস স্পেন্সার প্রভৃতি বন্ধুদের ভালবাসা। ট্রিকসের মাথায় রাশি রাশি আদরের চাপড়।

বি

৪৯০*

২ মে, ১৯০০

স্নেহের নিবেদিতা,

আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম—মাসখানেক ধরে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাই হোক, এতে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমার হার্ট বা কিডনিতে কোন রোগ নাই, শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্নায়ুগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আজ কিছু দিনের জন্য পল্লী অঞ্চলে যাচ্ছি এবং শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকব; আশা করি, শীঘ্রই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে প্লেগের খবর ইত্যাদিতে ভরা কোন ভারতীয় চিঠি আমি পড়তে চাই না। আমার সব ডাক (mail) মেরীর কাছে যাচ্ছে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসছি, ততক্ষণ মেরীর অথবা মেরী চলে গেলে তোমারই কাছে ঐসব থাকুক। আমি সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাই। জয় মা!

মিসেস হাণ্টিংটন নামে একজন প্রচুর বিত্তশালিনী মহিলা আমায় কিছু সাহায্য করেছিলেন; তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে ও তোমায় সাহায্য করতে চান। তিনি ১ জুনের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে আসবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যেও না যেন। আমি যদি সময়মত উপস্থিত থাকতে না পারি, তাঁর নামে তোমাকে একখানি পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেব।

মেরীকে আমার ভালবাসা জানিও। আমি দিন-কয়েকের মধ্যেই যাচ্ছি। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ—সঙ্গের চিঠিখানি তোমাকে মিসেস এডাম্‌সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য লিখলাম। তিনি জজ এডাম্‌সের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবে। এর ফলে হয়তো অনেক কাজ হবে। তিনি খুব পরিচিতা—তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের কর। ইতি

বি

৪৯১*

সান ফ্রান্সিস্কো
২৬ মে, ১৯০০

স্নেহের নিবেদিতা,

আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়। শ্রী ওয়া গুরু।

অশুভ অদৃষ্টের আবরণ তো দুর্ভেদ্য কালো। কিন্তু আমিই সর্বময় প্রভু! যে মুহূর্তে আমি ঊর্ধ্বে হাত তুলি—সেই মুহূর্তেই ঐ তমসা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এসবই অর্থহীন, এবং ভীতিই এদের জনক। আমি ভয়েরও ভয়, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি অদৃষ্টের নিয়ামক, আমি কপালমোচন। শ্রী ওয়া গুরু। দৃঢ় হও, মা! কাঞ্চন কিম্বা অন্য কিছুর দাস হয়ো না, তবেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত।

৪৯২*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

1921 W 21 Street
লস এঞ্জেলেস্
১৭ জুন, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

সত্যি আমি অনেকটা ভাল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিনি। যাই হোক না কেন, যারা ব্যারামে ভোগে, তাদের প্রত্যেকেরই মানসিক অবস্থা এরূপ হয়।

কালী-উপাসনা ধর্মের কোন অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বই উপনিষদ্ থেকে পাওয়া যায়। কালী-উপাসনা আমার বিশেষ খেয়াল; আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোন দিন শোননি, বা ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়নি। সকল মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি তাই প্রচার করি। যদি কোন অদ্ভুত প্রণালী থাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপন রেখে দিই এবং সেখানেই তার ইতি। কালী-উপাসনা কি বস্তু, সে তোমার কাছে কোন মতেই ব্যাখ্যা করব না, কারণ কখনও কারও কাছে তা করিনি।

তুমি যদি মনে করে থাক যে হিন্দুরা 'বসু'দের পরিত্যাগ করেছে, তা হলে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের[২৫] মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোন মতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে, সে জন্য তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।

'অ্যাংগ্লিসাইজ্‌ড' (anglicised) কথাটার দ্বারা সেই সকল লোকদেরই বোঝায়, যারা তাদের স্বভাব ও আচরণের দ্বারা দেখিয়ে দেয় যে, তারা আমাদের—দরিদ্র ও সেকেলে হিন্দুদের—জন্য লজ্জিত। আমি আমার জন্ম, জাতি বা জাতীয় চরিত্রের জন্য লজ্জিত নই। এ-ধরনের লোককে যে হিন্দুরা পছন্দ করবে না, এতে আমি আশ্চর্য নই।

খাঁটি উপনিষদের তত্ত্ব ও নীতিই আমাদের ধর্ম, তাতে আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদির কোন স্থান নেই। অনেকে মনে করে, আচার-অনুষ্ঠানাদি তাদের ধর্মানুভূতির সহায়তা করে। তাতে আমার আপত্তি নেই।

শাস্ত্র, আচার্য, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ অথবা ত্রাণকর্তাদের উপর ধর্ম নির্ভর করে না। এই ধর্ম ইহজীবনে বা অন্য কোন জীবনে অপরের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে তোলে না। এই অর্থে উপনিষদের অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম। তবে শাস্ত্র, অনুষ্ঠান, প্রেরিত পুরুষ বা ত্রাণকর্তাদেরও স্থান আছে। সেগুলি অনেককে সাহায্য করতে পারে, যেমন কালী-উপাসনা আমাকে আমার 'ঐহিক কাজে' সাহায্য করে। এগুলি স্বাগত।

তবে 'গুরু' একটি স্বতন্ত্র ভাব। শক্তির সঞ্চারক ও গ্রহীতার মধ্যে যে সম্বন্ধ, এ হল তাই, এখানে তা আত্মিক শক্তি ও জ্ঞান। শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। প্রত্যেক জাতিই অন্য জাতির ভাবধারা প্রতিনিয়ত নিজের ধাঁচের মধ্যে অর্থাৎ তার জাতীয় স্বভাবের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। কোন জাতির নির্দিষ্ট আদর্শ ধ্বংস করার সময় এখনও হয়নি। শিক্ষা যে-কোন সূত্র থেকেই আসুক না কেন, যে-কোন দেশের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তার ভাবসামঞ্জস্য আছে; কেবল তাকে গ্রহণ করবার সময়ে জাতীয় ভাবাপন্ন করে নিতে হবে অর্থাৎ সে শিক্ষা যেন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়।

ত্যাগই হল প্রত্যেক জাতির চিরন্তন আদর্শ। অন্য জাতিগুলি কেবল জানে না যে, প্রকৃতি অজান্তে তাদের দ্বারা কি করিয়ে নিচ্ছে। যুগ যুগ ধরে এই একই উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে কাজ করে চলেছে। এ পৃথিবী ও সূর্যের ধ্বংসের সঙ্গেই এই উদ্দেশ্যেরও শেষ হবে! আর পৃথিবীর নিত্য প্রগতি হচ্ছে বটে, না! আর অসীম জগতের কোথাও কেউই এ যাবৎ উন্নত হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা আদানপ্রদান করছে না! বাজে কথা! তারা জন্মায়, একই বাহ্যরূপ দেখায় এবং একভাবেই মরে! ক্রমবর্ধমান উদ্দেশ্য বটে! শিশুগণ, তোমরা স্বপ্নরাজ্যে বাস কর!

এবার নিজের কথা। হ্যারিয়েট যাতে প্রতি মাসে আমাকে কয়েক ডলার করে দেয়, তুমি নিশ্চয়ই সে বিষয়ে তাকে রাজী করাবে, এবং অন্য কয়েকজন বন্ধুর দ্বারাও তাকে রাজী করাবার চেষ্টা করব, যদি সফল হই, তাহলে ভারতে চলে যাচ্ছি। জীবিকার জন্য এইসব মঞ্চ-বক্তৃতার কাজ করে করে আমি একেবারে ক্লান্ত। এ কাজ আমার আর ভাল লাগছে না। অবসর নিয়ে লেখবার ইচ্ছা, দেখি যদি কিছু গভীর চিন্তার কাজ করতে পারি।

শীঘ্রই চিকাগো যাচ্ছি, কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছব, আশা করি।

মেরী, আশাবাদে এমন মেতে উঠছি যে, যদি ডানা থাকত হিমালয়ে উড়ে যেতাম!

মেরী, সারা জীবন আমি জগতের জন্য খেটেছি, কিন্তু সে জগৎ আমার দেহের এক খাবলা মাংস কেটে না নেওয়া পর্যন্ত এক টুকরো রুটিও আমাকে ছুঁড়ে দেয়নি।

দিনে এক টুকরো রুটি জুটলেই আমি পরিপূর্ণ অবসর নিই; কিন্তু তা অসম্ভব—।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—বস্তুর অসারতা যদি কারও কাছে ধরা পড়ে থাকে, সে মানুষ এখন আমি। এইতো জগতের চেহারা—একটা কদর্য পশুর মৃতদেহ। যে মনে করে, এ জগতের উপকার করব, সে একটা আহাম্মক। তবে ভাল হোক, মন্দ হোক, কাজ আমাদের করে যেতে হবে—আমাদের বন্ধন ঘোচাবার জন্য। আশা করি, সে কাজ আমি করেছি। এখন প্রভু আমাকে অপর পারে নিয়ে চলুন। তাই হোক, প্রভু তাই হোক। ভারত বা অন্য কোন দেশের জন্য চিন্তা আমি ত্যাগ করেছি। এখন আমি স্বার্থপর, নিজের মুক্তি চাই।

‘যিনি ব্রহ্মাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর কাছে বেদসকল প্রকাশ করেছেন, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, বন্ধনমুক্তির আশা করে তাঁর কাছে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।’
২৬

৪৯৩*

নিউ ইয়র্ক
২০ জুন, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,
… মহামায়া আবার সদয় হয়েছেন
বলে বোধ হয়, আর চক্র ধীরে ধীরে
উপর দিকে উঠছে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৯৪*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

বেদান্ত সোসাইটি
146 E 55th Street, নিউ ইয়র্ক
২৩ জুন, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

তোমার সুন্দর চিঠিখানির জন্য ধন্যবাদ। খুব ভাল আছি, সুখী আছি—যেমন থাকি। জোয়ারের আগে ঢেউ আসবেই। আমার বেলায়ও তাই। তুমি যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছ, তার জন্য আনন্দিত। মেথডিষ্টদের একটা শিবির-সভা ডাক না কেন? তাতে আরও তাড়াতাড়ি ফল হবে নিশ্চয়।

সব রকম ভাবালুতা ও আবেগ দূর করতে আমি বদ্ধপরিকর, আমাকে আর কখনও আবেগ বিহ্বল হতে দেখলে আমার গলায় দড়ি দিও। আমি হলাম অদ্বৈতবাদী; জ্ঞান আমাদের লক্ষ্য—ভাবাবেগ নয়, ভালবাসা নয়, কিছু নয়—কারণ ঐসব জিনিষ ইন্দ্রিয় বা কুসংস্কার বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত। আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ।

গ্রীনএকারে তুমি নিশ্চই বিশ্রামের সুযোগ পাবে। সেখানে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাক—এই চাই। আমার জন্য মুহূর্তের দুশ্চিন্তাও কর না। 'মা' আমাকে দেখছেন। ভাবাবেগের নরক থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করে আনছেন, উত্তীর্ণ করে দিচ্ছেন বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারের আলোকে। তুমি সুখী হও, এই আমার সতত শুভেচ্ছা।

তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনঃ—মার্গট ২৬ তারিখে যাত্রা করবে। সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ-দুয়েক পরে আমিও যেতে পারি। আমার উপরে কারও কোন অধিকার নেই, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই।

বি

তোমার চিঠিটা হজম করতে পারিনি, কারণ গত কয়েকদিন অজীর্ণতা কিছু বেশী রকম ছিল।

বি

সর্ববসময়ে আমার অনাসক্তি বিদ্যমান ছিলই। এক মুহূর্তেই আবার তা এসে গিয়েছে। শীঘ্রই আমি এমন জায়গায় দাঁড়াচ্ছি, যেখানে কোন ভাবালুতা বা হৃদয়াবেগ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

বি

পত্রাবলী ৪৯৫-৫০৪

৪৯৫*

নিউ ইয়র্ক
২ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা.
… 'মা-ই সব জানেন'—এ কথা আমি প্রায়ই বলি। মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্বস্ব—এমন কি নিজের সত্তা পর্যন্ত নেতাকে বিসর্জন দিতে হয়।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৯৬*

[মিসেস মেরী হেলকে লিখিত]

102 E 58th St., নিউ ইয়র্ক
১১ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় ভগিনী,
তোমার চিঠি পেয়ে ও গ্রীনএকার যাচ্ছ জেনে আনন্দিত হয়েছি। আশা করি, তোমার অনেক উপকার হবে। লম্বা চুল কেটে ফেলার জন্য আমি সকলের কাছে তিরস্কৃত হচ্ছি। দুঃখেরই বিষয়; তুমি জোর করেছিলে বলেই আমি তা করেছিলাম।

ডেট্রয়েট গিয়েছিলাম, গতকাল ফিরে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সে যেতে চেষ্টা করছি, সেখান থেকে ভারতে। এখানকার খবর প্রায় কিছুই নেই; কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আহার ও নিদ্রা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছি—বস্, এই পর্যন্ত।

চিরবিশ্বস্ত ও স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনঃ—চিকাগোয় আমার নামে কোন চিঠিপত্র এসে থাকলে মেয়েদের লিখো পাঠিয়ে দিতে।

৪৯৭*

102 East 58th St., নিউ ইয়র্ক
১৮ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,
তোমার চিঠি ঠিকানা-বদল হয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। ডেট্রয়েটে মাত্র তিন দিন ছিলাম। নিউ ইয়র্কে এখন ভয়ঙ্কর গরম। গত সপ্তাহে তোমার নামে ভারতের কোন ডাক ছিল না। নিবেদিতার কাছ থেকে এখনও কোন চিঠি পাইনি।

আমাদের সব ব্যাপার একই-ভাবে চলছে। উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। অগষ্ট মাসে মিস মূলার আসতে পারবেন না। তাঁর জন্য আমি অপেক্ষা করব না। পরের ট্রেনটি ধরব। সেটা যাওয়া পর্যন্ত যাওয়া অপেক্ষা কর। মিস বুককে (Miss Boocke) ভালবাসা।

প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে কালী পাহাড়ে চলে গেছে। সেপ্টেম্বরের আগে ফিরতে পারবে না। আমি একেবারে একা ... আমি তাই ভালবাসি। আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছ কি? তাদের আমার ভালবাসা।

বি

৪৯৮*

102 East 58th St., নিউ ইয়র্ক
২০ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবার আগেই—যে-রকম ষ্টীমার মিলবে সেইমত আমি হয়তো ইওরোপে—লণ্ডনে বা প্যারিসে—পৌঁছে যাব।

এখানে আমার কাজটা সহজ করে নিয়েছি। মিঃ হুইটমার্শের পরামর্শে মিস ওয়াল্ডোর হাতে কাজগুলি দেওয়া হয়েছে।

পাথেয় এবং জাহাজ—দুয়েরই ব্যবস্থা করতে হবে। বাকী 'মা' জানেন।

আমার 'অন্তরঙ্গ' বন্ধু এখনও অবতীর্ণ হননি। তিনি লিখেছেন, অগষ্টের কোন এক সময়ে তিনি আসবেন; একজন হিন্দুকে দেখবার জন্য তাঁর প্রাণ কণ্ঠায় এসে ঠেকেছে এবং ভারতমাতার জন্য তাঁর আত্মা নিরন্তর পুড়ে খাক হচ্ছে।

তাঁকে লিখেছি, লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। তাও মা জানেন। মিসেস হাণ্টিংটন মার্গটকে ভালবাসা জানিয়েছেন এবং তার কাছ থেকে সংবাদ আশা করেছেন, অবশ্য সে যদি তার বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী নিয়ে খুব ব্যস্ত না থাকে।

ভারতের 'পবিত্র গাভী'কে, তোমাকে, লেগেটদের, মিস অমুককে (কি যেন তাঁর নাম?), আমেরিকান রবার গাছকে—সকলকে ভালবাসা।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪৯৯*

102 East 58th St., নিউ ইয়র্ক
২৪ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

সূর্য=জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল=কর্ম; পদ্ম=প্রেম; সর্প=যোগ; হংস=আত্মা; উক্তিটি=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন। এটি হৃৎ-সরোবর। কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে? যা হোক, হংস যেন তোমায় এ সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন।

২৭

আগামী বৃহস্পতিবারের ফরাসী জাহাজ 'লা শ্যাম্পেন'-এ আমার যাত্রা করার কথা আছে।

Waldo and Whitmarsh কোম্পানীর বইগুলি কাছে আছে এবং ছাপার মত প্রায় প্রস্তুত হয়েছে।

২৮

আমি ভাল আছি, ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করছি—আগামী সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত

ঠিকই থাকব। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের বিবেকানন্দ

৫০০

102 East 58th St., নিউ ইয়র্ক
২৫ জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

মিসেস হ্যান্‌স্‌বার্গের একখানি চিঠিতে জানলাম যে, তুমি তাঁদের ওখানে গিয়েছিলে। তাঁরা তোমাকে খুব পছন্দ করেন এবং আমার বিশ্বাস, তুমিও বুঝতে পেরেছ তাঁদের বন্ধুত্ব কত অকৃত্রিম, পবিত্র ও স্বার্থলেশশূন্য। আমি কাল পারি (Paris) যাত্রা করছি, যোগাযোগ সব ঠিক হয়ে এসেছে। কালী এখানে নেই। আমি চলে যাচ্ছি বলে সে একটু ভাবিত হয়ে পড়েছে—কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি?

6 Place Des Etats Unis, Paris, France—মিঃ লেগেটের এই ঠিকানায় অতঃপর আমায় পত্র লিখবে। মিসেস ওয়াইকফ্, হ্যান্‌স্‌বার্গ ও হেলেনকে আমার ভালবাসা জানাবে। সমিতিগুলির কাজ আবার একটু শুরু করে দাও এবং মিসেস হ্যান্‌স্‌বার্গকে বল, তিনি যেন সময়মত সব চাঁদা আদায় করেন, আর টাকা তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেন; কারণ সারদা জানিয়েছে, তাদের বড় টানাটানি চলছে। মিস বুলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবে। আমার অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনঃ—বলি হাঁস কেমন? ‘তারা পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।’
২৯

৫০১

[মায়াবতী ‘অদ্বৈত আশ্রমে’র জনৈক সাধুকে লিখিত]

নিউ ইয়র্ক
অগষ্ট, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। এতদিন জবাব দিতে পারি নাই। তোমার সুখ্যাতি মিঃ সেভিয়ার তাঁর পত্রে করেছেন। তাতে আমি বিশেষ খুশী হলাম।

তোমরা কে কি কর ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে আমায় পত্র লিখবে। তোমার মাকে পত্র লিখ না কেন? ও কি কথা? মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কারণ। তোমার ভাই কলিকাতায় পড়ছে-শুনছে কেমন?

তোদের সব আনন্দ-দের নাম মনেও থাকে না—কোন্‌টাকে কি বলি! সবগুলোকে এক সাঁটে আমার ভালবাসা দিবি। খগেনের শরীর বেশ সেরে গেছে খবর পেয়েছি—বড়ই সুখের কথা। তোদের—সেভিয়াররা যত্ন করে কিনা সব লিখবি। দীনুর শরীরও ভাল আছে—বড় সুখের বিষয়। কালী-ছোকরার একটু মোটা হবার tendency (প্রবণতা) আছে; তার পাহাড় চড়াই-উৎরাইতে সে-সব সেরে যাবে নিশ্চিত। স্বরূপকে বলবি, আমি তার কাগজ চালানোতে বিশেষ খুশী। He is doing splendid work (সে চমৎকার কাজ করছে)।

আর সকলকে আমার আশীর্বাদ ভালবাসা দিবি। আমার শরীর সেরে গেছে—সকলকে বলিস। আমি এখান থেকে ইংলণ্ড হয়ে শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাচ্ছি।

সাশীর্বাদং
বিবেকানন্দস্য

৫০২

৬ প্লাস দে-জেতাৎ ইনি
প্যারিস
১৩ অগষ্ট, ১৯০০

হরি ভাই,
তোমার ক্যালিফোর্নিয়া হতে পত্র পেলুম। তিনজনের ভাব হতে লাগল, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাজ হয়। শ্রী—মহারাজ জানেন। যা হয় হতে দাও। তাঁর কাজ তিনি জানেন, তুমি আমি চাকর বৈ তো নই!

এ চিঠি সান ফ্রান্সিস্কোতে পাঠাই—মিসেস পানেলের কেয়ারে।

নিউ ইয়র্কের সামান্য সংবাদ পেয়েছি এইমাত্র। তারা আছে ভাল। কালী প্রবাসে। তুমি সান ফ্রান্সিস্কোতে 'কিমাসীত, প্রভাষেত, ব্রজেত, কিম্' লিখ। আর ৩০ মঠে টাকা পাঠাবার কথাটায় গাফিলা হয়ো না। লস্ এঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিস্কো হতে যেন অবশ্য অবশ্য টাকা মাসে মাসে যায়।

আমি এক রকম বেশ আছি। শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাত্রা। শরতের সংবাদ পাচ্ছি। তার মধ্যে আমাশা হয়েছে। আর সকলে আছে ভাল। ম্যালেরিয়া এবার কাউকে ধরেনি। গঙ্গার উপর বড় ধরেও না। এবার বর্ষা কম হওয়ায় বাঙলাদেশেও আকালের ভয়।

কাজ করে যাও, ভায়া, মায়ের কৃপায়; মা জানেন, তুমি জান—আমি। খালাস! আমি এখন জিরেন নিতে চললুম। ইতি

স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫০৩*

[জন ফক্সকে লিখিত]

ব্যুলেভার হ্যান্স সুয়ান্
প্যারিস
১৪ অগষ্ট, ১৯০০

অনুগ্রহপূর্বক মহিমকে লিখে জানাবেন যে, সে যা-ই করুক না কেন, আমার আশীর্বাদ সে সর্বদাই পাবে। বর্তমানে সে যা করছে, তা নিশ্চয়ই ওকালতি ইত্যাদির চেয়ে ঢের ভাল।আমি বীরত্ব ও সাহসিকতা পছন্দ করি, আর আমার জাতির পক্ষে ঐরূপ তেজস্বিতার বিশেষ প্রয়োজন। তবে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে এবং আমি বেশী দিন বাঁচবার আশা রাখি না; সুতরাং সে যেন মা ও সমস্ত পরিবারের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। যে কোন মুহূর্তে আমি চোখ বুজতে পারি। আমি তার জন্য এখন খুব গর্ব অনুভব করছি।

ইতি
আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫০৪

৬ প্লাস দে-জেতাৎ ইনি
প্যারিস
অগষ্ট, ১৯০০

হরিভাই,

এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সমুদ্রতটে অবস্থান করছি। Congress of History of Religions (ধর্মেতিহাস সম্মেলন) হয়ে গেছে। সে কিছুই নয়, জন কুড়ি পণ্ডিতে পড়ে শালগ্রামের উৎপত্তি, যিহোবার উৎপত্তি ইত্যাদি বক্‌বাদ করেছে। আমিও খানিক বক্‌বাদ তায় করেছি।

আমার শরীর-মন ভেঙে গেছে। বিশ্রাম অত্যাবশ্যক। তার উপর একে নির্ভর করবার লোক কেউ নেই, তায় আমি যতক্ষণ থাকব, আমার উপর ভরসা করে সকলে অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে যাবে।

... লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট। কাজেই ... সব লিখে-পড়ে আলাদা হয়ে গেছি। এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে, কারও একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majority-র (অধিকাংশের) হুকুমে হবে ... সেই মত ট্রাষ্ট ডীড্‌ করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি।

এ বৃত্তান্ত ঐ পর্যন্ত। এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি বস্‌। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি। সে কথা তোমায় কি বলব? ... দলিল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কত্তাত্তির! কত্তাত্তি ছাড়া বাকী সব সই করে দিয়েছি!

গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কত্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন। এ তাঁর কাজ। ... প্রাণ ধরে সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব, সে আমার কাজ।

আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম। গুরুমহারাজের ঋণ৩১ প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবী-দাওয়া নেই।

তোমরা যা করছ, ও গুরুমহারাজের কাজ, করে যাও। আমার যা করবার করে দিয়েছি, বস্‌। ও-সব সম্বন্ধে আমায় আর কিছু লিখো না, বল না, ওতে আমার মতামত একদম নেই। ... এখন থেকে অন্য রকম। ... ইতি

নরেন্দ্র

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা।

পত্রাবলী ৫০৫-৫১৪

৫০৫*

৬ প্লাস দে-জেতাৎ ইনি
প্যারিস
২৫ অগষ্ট, ১৯০০

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম; সহৃদয় কথাগুলির জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি মিসেস বুলকে মঠ থেকে টাকা তুলে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ও-বিষয়ে কিছু বললেন না, আর এদিকে ট্রাষ্টের দলিলগুলি দস্তাখতের জন্য পড়েছিল; সুতরাং আমি ব্রিটিশ কনসালের আফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ করছি।

কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম—তা ভুলের ভিতর দিয়েই হোক বা সাফল্যের ভিতর দিয়েই হোক—এখন আমি কাজ থেকে অবসর নিলাম। বাকী জীবন আপনভাবে কাটাব।

আমি এখন আর কারও প্রতিনিধি নই বা কারও কাছে দায়ী নই। বন্ধুদের কাছে আমার একটা অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা-বোধ ছিল। এখন আমি বেশ করে ভেবেচিন্তে দেখলাম—আমি কারও কিছু ধার ধারি না। আমি তো দেখছি, প্রাণ পর্যন্ত পণ করে আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেছি, পরিবর্তে পেয়েছি (বন্ধুদের) তর্জন-গর্জন, অনিষ্ট-চেষ্টা ও বিরক্তিকর ঝামেলা।

তোমার চিঠি পড়ে মনে হল, তুমি মনে করেছ, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমি ঈর্ষান্বিত। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখছি—আমার অন্য যে-কোন দোষ থাক না কেন, জন্ম থেকেই আমরা ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই।

আমি আগেও কখনও তোমাকে কোন আদেশ করিনি, এখন তো কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—এখন আর কি আদেশ দেব? আমি কেবল এই পর্যন্ত জানি যে, যতদিন তুমি সর্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, তাদের সম্বন্ধে আমার কখনও কোন ঈর্ষা নেই। কোন কিছুতে মেলামেশা করার জন্য আমি কখনও আমার ভাইদের সমালোচনা করিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—পাশ্চাত্যদেশীয় লোকদের এই একটা বিশেষত্ব আছে যে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অন্যের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে, তারা ভুলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অন্যের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয়, তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকবে, তুমি অন্যের উপর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনও কখনও কোন বিশেষ প্রভাব থেকে তোমায় দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি তো স্বাধীন, তোমার পছন্দমত নিজের কাজ বেছে নাও।

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়দের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর আগে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, আনন্দের সঙ্গে আবার তা ঘাড়ে নিলাম। বন্ধু শত্রু—সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্মক্ষয় করার সাহায্য করছে। সুতরাং 'মা' তাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫০৬*

প্যারিস
২৮ অগষ্ট, ১৯০০

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,
এই তো জীবন—শুধু কঠোর পরিশ্রম! আর তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? কঠোর পরিশ্রম কর! একটা কিছু ঘটবে, একটা পথ খুলে যাবে। আর যদি তা না হয়—হয়তো কখনও হবে না,—তাহলে তারপর কী? আমাদের যা কিছু উদ্যম সবই হচ্ছে সাময়িক ভাবে সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা! অহো, মহান্ সর্বদুঃখহর মৃত্যু! তুমি না থাকলে জগতের কী অবস্থাই না হত!

ডেট্রয়েট গিয়েছিলাম, গতকাল ফিরে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সে যেতে চেষ্টা করছি, সেখান থেকে ভারতে। এখানকার খবর প্রায় কিছুই নেই; কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আহার ও নিদ্রা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছি—বস্, এই পর্যন্ত।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বর্তমানে প্রতীয়মান এই জগৎ সত্য নয়, নিত্যও নয়। এর ভবিষ্যৎই বা আরও ভাল হবে কি করে? সেও তো বর্তমানেরই ফলস্বরূপ; সুতরাং আরও খারাপ না হলেও ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই অনুরূপ হবে!

স্বপ্ন, অহো! কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু, আবার ওর মধ্যেই এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত রয়েছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙ।

আমি ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করছি এবং এখানে—র সঙ্গে কথা বলছি। অনেকে ইতোমধ্যেই প্রশংসা করছেন। সারা দুনিয়ার সঙ্গে এই অন্তহীন গোলাকধাঁধার কথা, অদৃষ্টের এই সীমাহীন নাটাই-এর (spool) কথা—যার সুতার শেষ কেউ পায় না, অথচ প্রত্যেকে অন্ততঃ তখনকার মত মনে করে যে, সে তা বের করে ফেলেছে আর তাতে অন্ততঃ তার নিজের তৃপ্তি হয় এবং কিছুকালের মত সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে—এই তো ব্যাপার?

ভাল কথা, এখন বড় বড় কাজ করতে হবে। কিন্তু বড় কাজের জন্য মাথা ঘামায় কে? ছোট কাজই বা কিছু করা হবে না কেন? একটার চেয়ে অন্যটা তো হীন নয়। গীতা তো ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে শেখায়। ধন্য সেই প্রাচীন গ্রন্থ!

শরীরের বিষয় চিন্তা করবার খুব বেশী সময় আমার ছিল না। কাজেই শরীর ভাল আছে—ধরে নিতে হবে। এ সংসারে কিছুই চিরদিন ভাল নয়। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই—ভাল হচ্ছে শুধু ভাল হওয়া ও ভাল করা।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এ সব বিষয়ে আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব। এই কথাটুকু আমি নিশ্চয় বুঝেছি। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫০৭

[স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত]

প্যারিস
১ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রেমাস্পদেষু,
তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হলুম। পূর্বে সান ফ্রান্সিস্কো হতে পুরো বেদান্তী ও 'হোম্ অব্ ট্রুথ' (Home of Truth)-দের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলমালের আভাস পেয়েছি, একজন লিখেছিল ও-রকম হয়েই থাকে, বুদ্ধি করে সকলকে সন্তুষ্ট রেখে কাজ চালিয়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা।

আমি এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করছি। ফরাসীদের সঙ্গে থাকব তাদের ভাষা শিখবার জন্য। এক-রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, অর্থাৎ ট্রাষ্ট ডীড্-ফিড্ সই করে কলিকাতায় পাঠিয়েছি; আমার আর কোন স্বত্ব বা অধিকার রাখি নাই। তোমরা এখন সকল বিষয়ে মালিক, প্রভুর কৃপায় সকল কাজ করে নেবে।

আমার আর ঘুরে ঘুরে মরতে ইচ্ছা বড় নাই। এখন কোথাও বসে পুঁথিপাটা নিয়ে কালক্ষেপ করাই যেন উদ্দেশ্য। ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু-একমাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে।

এ ভাষাটা আর জার্মান—এ দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে এক-রকম ইওরোপী বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশ লাভ হয়। এ ফরাসীর লোক কেবল মস্তিষ্ক-চর্চা, ইহলোক-বাঞ্ছা; ঈশ্বর বা জীব—কুসংস্কার বলে দৃঢ় ধারণা, ও-সব কথা কইতে চায় না!!! আসল চার্বাকের দেশ! দেখি, প্রভু কি করেন! তবে এদেশ হচ্ছে প্রাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ। পারি নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজধানী।

প্রচার-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ হতে আমায় বিরাম দাও, ভায়া। আমি ও-সব থেকে এখন তফাত, তোমরা করে-কর্মে নাও। আমার দৃঢ় ধারণা 'মা' এখন আমা অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা শতগুণ কাজ করাবেন।

কালীর এক পত্র অনেক দিন হল পেয়েছিলাম। সে এতদিন বোধ হয় নিউ ইয়র্কে এসেছে। মিস ওয়াল্ডো মধ্যে মধ্যে খবর নেয়।

আমার শরীর কখনও ভাল, কখনও মন্দ। মধ্যে আবার সেই মিসেস মিল্টনের হাতঘষা চিকিৎসা হচ্ছে। সে বলে তুমি ভাল হয়ে গেছ already (ইতোমধ্যেই)! এই তো দেখছি যে—এখন পেটে বায়ু হাজার হোক—চলতে হাঁটতে চড়াই করতেও কোন কষ্ট হয় না। প্রাতঃকালে খুব ডন-বৈঠক করি। তারপর কালা জলে এক ডুব!!

কাল যার কাছে থাকব, তার বাড়ী দেখে এসেছি। সে গরীব মানুষ—scholar (পণ্ডিত); তার ঘরে একঘর বই, একটা ছ-তলার ফ্ল্যাটে থাকে। তায় এদেশে আমেরিকার মত লিফ্‌ট নেই—চড়াই-ওতরাই। ওতে কিন্তু আমার আর কষ্ট হয় না।

সে বাড়ীটির চারিধারে একটি সুন্দর সাধারণ পার্ক আছে। সে লোকটি ইংরেজী কইতে পারে না, সেই জন্য আরও যাচ্ছি। কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায়। এখন মায়ের ইচ্ছা। বাকী তাঁর কাজ, তিনিই জানেন। ফুটে তো বলেন না, 'গুম্ হোকে রহতী হ্যায়', তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপটা তো খুব হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

মিস বুক, মিস বেল, মিসেস এস্পিনেল, মিস বেকহাম, মিঃ জর্জ, ডাক্তার লোগান প্রভৃতি সকল বন্ধুদের আমার ভালবাসা দিও ও তুমি নিজে জেনো।

তথা লস্ এঞ্জেলেসের সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

৫০৮

প্যারিস
সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,
Just now received your letter (এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম)। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত কাজ চলে যাবে, ভয় খেও না। আমি শীঘ্রই এখান হতে অন্যত্র যাব। বোধ হয় কনস্তান্তিনোপল্ প্রভৃতি দেশসকল দেখে বেড়াব কিছুদিন। তারপর 'মা' জানেন। মিসেস উইলমটের এক পত্র পেলুম। তাতে তো তার খুব উৎসাহ বলেই বোধ হল। নিশ্চিন্ত হয়ে গট হয়ে বস। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি নাদশ্রবণাদি দ্বারা কারও হানি হয় তো ধ্যান ত্যাগ করে দিন কতক মাছ-মাংস খেলেই ও পালিয়ে যাবে। শরীর যদি দুর্বল না হতে থাকে তো কোন ভয়ের কারণ নাই। ধীরে ধীরে অভ্যাস।

তোমার পত্রের জবাব আসবার আগেই আমি এস্থান ত্যাগ করব। অতএব এর জবাব এস্থানে আর পাঠিও না। সারদার কাগজপত্র সব পেয়েছি, এবং তাকে ৩২
কয়েক সপ্তাহ হল বহুত লিখে
পাঠানো গেছে। আরও পরে পাঠাবার
উদ্দেশ্য রইল। আমার যাত্রা এখন
কোথা, তার নিশ্চিত নাই। এইমাত্র
যে, নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছি।

কালীরও এক পত্র আজ
পেলাম। তার জবাব কাল লিখব।
শরীর এক-রকম গড়মড় করে
চলছে। খাটলেই খারাপ, না
খাটলেই ভাল, আর কি? মা জানেন

। নির্বেদিতা ইংলণ্ড গেছে, মিসেস
বুল আর তাতে টাকা যোগাড় করছে। কিষেনগড়ের বালিকাগুলিকে নিয়ে সেইখানেই স্কুল করবে তার ইচ্ছা। যা পারে করুক। আমি কোন বিষয়ে আর কিছু বলি না—এই মাত্র। আমার ভালবাসা জানিবে। কিন্তু কার্য সম্বন্ধে কোন বিষয়ে আর আমার কোন উপদেশ নাই। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

৫০৯*

[মিসেস লেগেটকে লিখিত]

প্যারিস
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

মা,
এ বাড়িতে আমাদের একটা খেয়ালীদের কংগ্রেস হয়ে গেল। নানা দেশের প্রতিনিধি এসেছিল—দক্ষিণে ভারত থেকে উত্তরে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত, ইংলণ্ড ও আমেরিকাও তার মধ্যে ছিল।

সভাপতি-নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল, কারণ ডক্টর জেমস্ (Prof. William James) যদিও উপস্থিত ছিলেন, তবু তিনি বিশ্বসমস্যা সমাধানের চেয়ে মিসেস মিল্টন (চৌম্বক আরোগ্যকারী) কর্তৃক তাঁর অঙ্গে উৎপাদিত স্ফোটকগুলি সম্বন্ধে বেশী সচেতন ছিলেন।

আমি জো-র নাম প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তিনি তাঁর নূতন গাউন যথাসময়ে এসে না পৌঁছানোর দরুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সুবিধাজনক জায়গা থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এক কোণে প্রস্থান করলেন।

মিসেস বুল তৈরীই ছিলেন, কিন্তু মার্গট প্রতিবাদ করে বললেন, সে ক্ষেত্রে সভাটি তুলনামূলক দর্শনের ক্লাসে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

আমরা যখন এ-রকম সঙ্কটাবস্থায় আছি, তখন তড়াক করে এক কোণ থেকে বেঁটেখাট গোলমত একটি মূর্তি লাফিয়ে উঠল এবং বিনা ভূমিকায় ঘোষণা করল—কেবল সভাপতির সমস্যা নয়, জীবনসমস্যা পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যদি আমরা শুধু সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতার অর্চনা করি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন, কিন্তু সেটাকে অনুবাদ করতে তাঁর শিষ্যের ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল। ইতোমধ্যে উক্ত শিষ্যের গুরুদেব আপনাদের বৈঠকখানায় কম্বলাদি টেনে স্তূপাকার করে ফেলেছিলেন এই শুভবাসনায় (যে বাসনার কথা তিনি নিজ মুখেই উচ্চারণ করেছিলেন) যে, তিনি তখনই সেখানে 'অগ্নিদেবতার' মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে চান।

সেই সন্ধিক্ষণে জো বাধা দিলেন এবং একগুঁয়েমির সঙ্গে বললেন, তাঁদের বৈঠকখানায় অগ্নি-যজ্ঞ তাঁর অভিপ্রেত নয়; ফলে উক্ত ভারতীয় ঋষি জো-র দিকে অতি ভয়াবহ চোখে তাকালেন, তাকে তিনি অগ্নি-উপাসনায় সম্পূর্ণ দীক্ষিত বলে সুনিশ্চিত বিশ্বাস করেছিলেন, তার এই এরূপ ব্যবহারে ঋষির বিরক্তির সীমা ছিল না।

তখন ডক্টর জেম্স্ তাঁর স্ফোটকের পরিচর্যা থেকে মাত্র এক মিনিট সময় বাঁচিয়ে সেই অবসরে ঘোষণা করলেন যে, অগ্নিদেবতা এবং তাঁর ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে তাঁর একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্য আছে। তা তিনি উপস্থিত করতেন, যদি স্বদেহে মিল্টনীয় স্ফোটকের ব্যাপারে তাঁকে নিতান্ত কর্মব্যস্ত না থাকতে হত। তদুপরি তাঁর মহান্ আচার্য হার্বার্ট স্পেন্সার বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে গবেষণা করেননি বলে ডঃ জেম্স্ জানালেন, তিনি মহামূল্য নীরবতাকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করবেন।

'চাটনিই সেই বস্তু'—দরজার কাছ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমরা সকলে পিছনে তাকালাম। দেখি মার্গট। 'তা হল চাটনি'—মার্গট বললেন, 'চাটনি এবং কালীই জীবনের সর্বদুঃখ নিবারণ করবে, তা সকল মন্দকে গিলতে এবং সকল ভালকে চেখে উপভোগ করতে সাহায্য করবে।' বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, সজোরে জানালেন, তিনি আর একটা কথাও মুখ থেকে বার করবেন না, কারণ বক্তৃতাকালে সমবেত শ্রোতাদের মধ্য থেকে জনৈক পুরুষজীবের দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ছিল এবং মহিলার প্রাপ্য মনোযোগ মহিলাকে দিচ্ছিল না, এবং মার্গট যদিও ব্যক্তিগতভাবে স্ত্রী—পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, তথাপি তিনি ঐ বিরক্তিকর লোকটির নারীজাতির প্রতি যথাবিহিত সৌজন্যের অভাবের কারণ জানতে চান। তখন সকলে জানালেন, তাঁরা মার্গটকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন, সর্বোপরি দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, এই ভয়াবহ জনতার সঙ্গে মার্গটের আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না—মার্গট বসে পড়লেন।

তখন উঠলেন বোষ্টনের মিসেস বুল; তিনি বোঝাতে শুরু করলেন, নরনারীর সত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে বোধের অভাব থেকে কিভাবে জগতের সকল সমস্যার উৎপত্তি হয়। তিনি বললেন, 'সঠিক মানুষের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া—নরনারীর দাম্পত্য-সম্পর্কের আদর্শকে উন্নত রেখে প্রেমের মধ্যে মুক্তি এবং ঐ মুক্তির মধ্যে মাতৃত্ব ভাতৃত্ব পিতৃত্ব ঈশ্বরত্ব ও স্বাধীনতার সন্ধান—স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম এবং প্রেমের মধ্যে স্বাধীনতা দর্শন—এগুলির মধ্যেই আছে সর্বব্যাধির একমাত্র ঔষধ।'

এই কথায় স্কচ প্রতিনিধি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন, যেহেতু শিকারী ছাগপালককে তাড়া করেছে, ছাগপালক তাড়া করেছে মেষপালককে, মেষপালক তাড়া করেছে কৃষককে, এবং কৃষক তাড়া করেছে জেলেকে, তাড়া করে তাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, এখন আমরা গভীর সমুদ্র থেকে জেলেকে উঠিয়ে এনে কৃষকের উপর ফলতে চাই, কৃষককে চাই মেষপালকের উপর ফেলতে ইত্যাদি; এমনি করলেই জীবনের জাল সম্পূর্ণ বোনা হবে এবং আমরা সুখী হব—তাঁকে তাঁর এই তাড়া-করা ব্যাপারে আর বেশীক্ষণ এগোতে দেওয়া হল না। মুহূর্তের মধ্যে সকলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল এবং আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি বিমিশ্র বিশৃঙ্খল চীৎকার শুনতে পেলাম—'সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতা', 'চাটনি ও কালী', 'দাম্পত্য-সম্পর্কে মাতৃত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক বোঝাপড়ার স্বাধীনতা', 'কখনও নয়, জেলেকে তীরে ফিরে যেতেই হবে' ইত্যাদি। এই অবস্থায় জো ঘোষণা করলেন, কিছু সময়ের জন্য শিকারী হতে হবে, এবং পাগলামী না থামলে বাড়ীর বাইরে সকলকে তাড়া করে বার করে দিতে তাঁর বড়ই বাসনা হচ্ছে। তখন শান্তি ও নীরবতা ফিরে এল এবং আমি অবিলম্বে আপনাকে লিখতে বসলাম।

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫১০*

প্যারিস, ফ্রান্স
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

স্নেহের এলবার্টা,

আজ সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই যাচ্ছি; রাজকুমারী ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই খুব আনন্দিত হব। যদি বেশী রাত হয়ে যায় এবং এখানে ফিরে আসার অসুবিধা ৩৩
বুঝি, তাহলে তোমাদের বাড়ীতে
আমার শোবার একটা জায়গা করে
দিতে হবে।

প্রীতি ও আশীর্বাদসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫১১*

[মিস এলবার্টা স্টার্জিসকে লিখিত]

Perros Guiree, Bretagne
২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০

মায়ের হৃদয়-বৃত্তি, সংকল্প বীরের,
মধুর পরশখানি কোমল ফুলের,
বেদীতলে লীলাময় পুণ্য হোমানলে
সৌন্দর্যের সাথে শক্তি নিত্য যেথা দোলে;
যে শক্তি চালিত করে, প্রেমে বশ হয়.
সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন—পথ ধৈর্যময়;
আত্মায় বিশ্বাস নিত্য—সকলে তেমন,

ছোট বড় সকলেতে দেবতা দর্শন,
—এই সব আরও যাহা দেখা নাহি যায়,
জগৎ-জননী আজ দিবেন তোমায়। ৩৪

সদা প্রীতি ও আশীর্বাদ সহ
তোমার বিবেকানন্দ

প্রিয় এলবার্টা,
তোমার জন্মদিনের উপহার এই ছোট্ট কবিতাটি। লেখাটা ভাল হয়নি, কিন্তু আমার সকল ভালবাসা এতে ঢেলে দিয়েছি। তাই আমি নিশ্চিত যে, তোমার এটা ভাল লাগবে।

দয়া করে প্রত্যেকটি পুস্তিকার এক কপি মাদাম বেসনার্ড (Madame Besnard, Clairoix, Bres Compiegnfs, Oise)-কে পাঠিয়ে আমায় বাধিত করবে কি?

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দস্য

৫১২*

6 Place Des Etats Unis, Paris ৩৫
অক্টোবর, ১৯০০

প্রিয় মাদমোয়াজেল,
এখানে আমি খুব সুখী ও পরিতৃপ্ত আছি। অনেক বছর পরে ভাল সময় কাটাচ্ছি। মঁ বোয়ার (Bois) সঙ্গে আমার এখনকার জীবনযাত্রা বেশ তৃপ্ত—রাশি রাশি বই, চারিদিকে শান্তি—আমাকে পীড়িত করে এমন জিনিষ এখানে নেই।

কিন্তু জানি না কোন্ নিয়তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার (ফরাসী ভাষার) চিঠিটা ভারি মজার, তাই নয় কি? তবে এটা আমার প্রয়াস।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৫১৩

[সিষ্টার ক্রিষ্টিনিকে লিখিত]

প্যারিস ৩৬
১৪ অক্টোবর, ১৯০০

ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি পদে তোমার
উপর বর্ষিত হোক, প্রিয় ক্রিষ্টিন, এই
আমার নিরন্তর প্রার্থনা।

তোমার পরম সুন্দর শান্তিময়
চিঠিখানি আমাকে নূতন শক্তি
দিয়েছে, যে শক্তি আমি অনেক
সময় হারিয়ে ফেলি।

আমি সুখী, হ্যাঁ, সুখী, কিন্তু এখনও মনের মেঘ কাটেনি একেবারে। সে মেঘ দুর্ভাগ্যবশতঃ ফিরে আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু পূর্বের মত গ্লানিকর প্রভাব নেই তার।

মঁ জুল বোয়া (M. Jules Bois) নামে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সঙ্গে আছি। আমি তাঁর অতিথি। লেখা থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাঁকে, তাই তিনি ধনী নন, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক উচ্চ উচ্চ চিন্তার ঐক্য আছে এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে আছি।

বছর কয়েক আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার করেন, এবং আমার কয়েকটি পুস্তিকা ইতোমধ্যেই ফরাসীতে অনুবাদ করে ফেলেছেন। আমরা দু-জনেই অবশেষে একদিন আমাদের সন্ধানের বস্তুকে পেয়ে যাব, কি বল?

এমনি ভাবেই মাদাম কালভে, মিস ম্যাকলাউড ও মঁ জুল বোয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। খ্যাতনামা গায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হব।

কনস্তান্তিনোপল্, নিকট প্রাচ্য, গ্রীস এবং মিশরে যাব আমরা। ফেরার পথে ভেনাস দেখে আসব।

ফিরে আসার পর প্যারিসে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু সেগুলি দেব ইংরেজীতে, সঙ্গে দোভাষী থাকবে।

এ বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখার মত সময় বা শক্তি আর নেই। আমি এখন বুড়ো মানুষ, কি বল?

মিসেস ফাঙ্কে (Mrs. Funke) অসুস্থ। তিনি বেজায় খাটেন। আগে থেকেই তাঁর স্নায়ু পীড়া ছিল। আশা করি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আমেরিকায় উপার্জিত সব টাকা ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মুক্ত, পূর্বের মত ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মঠের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মুক্ত! এ ধরনের দায়িত্ব আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না। এমনই স্নায়ুপ্রবণ হয়ে উঠেছি, আর এতই দুর্বল।

'গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখী রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে' আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।

জীবনে অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছি, বিরাট সাফল্যও পেয়েছি কখনও কখনও, কিন্তু এই সব বাধা ও বেদনা মূল্যহীন হয়ে গেছে আমার শেষ প্রাপ্তির কাছে—আমি পেয়ে গিয়েছি আমার লক্ষ্যকে; আমি যে মুক্তার সন্ধানে জীবনসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তা তুলে আনতে পেরেছি; আমার পুরস্কার আমি পেয়েছি; আমি আনন্দিত।

তাই মনে হচ্ছে, আমার জীবনের একটা নূতন অধ্যায় খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে; 'মা' আমাকে সন্তর্পণে সস্নেহে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। বিঘ্নসঙ্কুল পথে হাঁটবার চেষ্টা আর নয়, এখন পাখীর পালকের বিছানা। বুঝলে কি? বিশ্বাস কর, তা হবেই; আমি নিশ্চিন্ত।

আমার এ-যাবৎ লব্ধ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ঐকান্তিকভাবে আমি যা চেয়েছি সর্বদা তা পেয়েছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কখনও অনেক দুঃখের পরে তা পেয়েছি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! পুরস্কারের মধুর স্পর্শ সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। বন্ধু, তুমিও দুঃখের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছ, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। কিন্তু হায়! এখন তুমি যা পাচ্ছ তা পুরস্কার নয়, অতিরিক্ত দুঃখের বোঝা।

আমার বেলায় দেখছি, মেঘ হালকা হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—আমার দুষ্কৃতির মেঘ; আর সুকৃতির জ্যোতির্ময় সূর্য উঠছে। বন্ধু, তোমার বেলায়ও তাই হবে। এই ভাষায় (ফরাসী ভাষায়) ভাবাবেগ প্রকাশ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আবেগকে কোন ভাষাই বা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে?

সুতরাং এইখানেই ছেড়ে দিচ্ছি, আমার ভাবনাকে কোমল মধুর উজ্জ্বল হৃদয়ের ভাষায় তুমি মণ্ডিত করবে, এই আশায়। বিদায়।

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু
বিবেকানন্দ

পুনঃ—২৯শে অক্টোবর আমরা ভিয়েনার পথে প্যারিস ছেরে যাব। আগামী সপ্তাহের মধ্যে মিঃ লেগেট যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন। পোষ্ট অফিসকে আমরা জানিয়ে যাব, তারা যেন আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দেয়।

বিবেকানন্দ

৫১৪*

পোর্ট টাউফিক
২৬ নভেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

জাহাজখানির আসতে দেরী হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ জাহাজ পোর্ট সৈয়দে খালের মধ্যে ঢুকেছে। তার মানে, সব ঠিক ঠিক চললে সন্ধ্যায় জাহাজ এখানে (পোর্টে) পৌঁছবে। অবশ্য এ দুদিন যেন নির্জন কারাবাস চলেছে; আর আমি কোনরকমে ধৈর্য ধরে আছি। কিন্তু এরা বলে পরিবর্তনের মূল্য তিনগুণ বেশী। মিঃ গেজের এজেণ্ট আমায় সব ভুল নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ আমায় স্বাগত জানান তো দূরের কথা, কিছু বুঝিয়ে দেবার মত কেউই এখানে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমায় কেউ বলেনি যে, অন্য জাহাজের জন্য আমাকে এজেণ্টের অফিসে গিয়ে গেজের টিকিটখানি পাল্টে নিতে হবে—আর তা করবার জায়গা সুয়েজ, এখানে নয়। সুতরাং জাহাজখানির দেরী হওয়ায় এক হিসাবে ভালই হয়েছিল। এই সুযোগে আমি জাহাজের এজেণ্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; আর তিনি আমায় নির্দেশ দিলেন, আমি যেন গেজের পাসখানি পাল্টিয়ে যথারীতি টিকিট করে নিই।

আজ রাত্রে কোন এক সময়ে জাহাজে উঠব, আশা করি। আমি ভাল আছি ও সুখে আছি, আর এ মজাটা উপভোগ করছি খুব।

মাদমোয়াজেল কেমন আছেন? বোয়া (Bois) কোথায়? মাদাম কালভেকে আমার চিরকৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাবে। তিনি বড় চমৎকার মহিলা। আশা করি, তোমার ভ্রমণটি উপভোগ্য হবে।

তোমাদের সতত স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৫১৫-৫২৪

৫১৫*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১১ ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,
পরশু রাত্রে আমি এখানে পৌঁছেছি। কিন্তু হায়! এত তাড়াহুড়া করে এসেও কোন লাভ হল না। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বেচারা কয়েক দিন পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য আত্মদান করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো—এঁরাই। মিসেস সেভিয়ারকে এইমাত্র পত্র লিখলাম—তাঁর ভাবী কার্যক্রম জানবার জন্য।

আমি ভাল আছি। এখানকার সবই সবদিক দিয়ে ভালভাবেই চলছে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখলাম—কিছু মনে কর না। শীঘ্র দীর্ঘ পত্র দেব। ইতি

সর্বদা সত্যাশ্রয়ী
তোমাদেরই বিবেকানন্দ

৫১৬*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৫ ডিসেম্বর, ১৯০০

মা,
কয়েক দিন আগে এখানে পৌঁছেছি। আমার আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল, সকলে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আমার অনুপস্থিতি-কালে আমি যতটা আশা করেছিলাম, কাজ তার চেয়েও ভালভাবে চলেছে; শুধু মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। এটা সত্যই একটা প্রচণ্ড আঘাত—হিমালয়ে কাজের ভবিষ্যৎ যে কি হবে জানি না। মিসেস সেভিয়ার এখানও সেখানে আছেন এবং আমি রোজই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আশা করছি।

সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আগের থেকে ভাল আছে; এ বছর এখানে ম্যালেরিয়া নাই। গঙ্গার ধারের এই ফালি জমিটা সব সময়েই ম্যালেরিয়া-মুক্ত। শুধু প্রচুর বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা হলেই অবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৫১৭*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৯ ডিসেম্বর, ১৯০০

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,
মহাদেশসমূহের আর একপ্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমায় প্রশ্ন করছেঃ 'কেমন আছ?' এতে তুমি অবাক হচ্ছ না কি? বস্তুতঃ আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গম।

আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কনস্তান্তিনোপল্, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত কায়রো—সবই পেছনে ফেলে এসেছি; আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচছে; শুধু ক্বচিৎ দু-একখানা মালবাহী নৌকার দাঁড়ের শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে।

এখানে এখন শীতকাল চলেছে; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ উষ্ণ ও উজ্জ্বল। এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতেরই মত। সর্বত্র সবুজ ও সোনালী রঙের ছড়াছড়ি, আর কচিঘাসগুলি যেন মখমলের মত। অথচ বাতাস শীতল, পরিষ্কার ও আরামপ্রদ। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫১৮

[শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত]

দেওঘর, বৈদ্যনাথ
বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী
২৩ ডিসেম্বর, ১৯০০

মা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। 'স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ'—সেই ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, নারদোক্ত লক্ষণটি যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তির একত্র নাম 'সমষ্টি', এক-একটির নাম 'ব্যষ্টি', তুমি আমি 'ব্যষ্টি', সমাজ 'সমষ্টি'। তুমি আমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটি 'ব্যষ্টি', আর এই জগৎটি 'সমষ্টি'—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কিনা এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কিনা—এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইণ্ডিভিজুয়ালিজম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্বক আত্মবিসর্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকম লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনী যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতরে পা, এই সরঞ্জামে ২০ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদাবোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়! এই তো গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই; উদ্ভাবনা-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিষের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে না, প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কিনা, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান্ রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন—তাহারাও জড়; চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশীল কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তি যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—না, নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ কি হয়?' ধরে-বেঁধে প্রীত কি হয়?' চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানোই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্মের চেয়ে আর কি ধর্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন-ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি এদেশের—নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বারা উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ করিতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর এক হাতে দান করছে, তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখনও তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখনও আলোকের মানে হয়?

সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা-আপনি বড় আসবে।

মা, চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে ইত্যাদি।৩৭ যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ-যাত্রায় আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছে? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখের জল সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন—

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥'

সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি), তখনই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৫১৯

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

মঠ, বেলুড়
২৬ ডিসেম্বর, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হলুম। শরীর যদি খারাপ হয়, অবশ্য এখানে তোমার আসা উচিত নয়—এবং আমিও কল্য মায়াবতী যাচ্ছি। সেখানে আমার একবার যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

আলাসিঙ্গা যদি আসে, আমার প্রত্যাগমন-অপেক্ষা তাকে করতে হবে। কানাই সম্বন্ধে এরা কি করছে—তা জানি না। আমি আলমোড়া হতে শীঘ্র ফিরব, তারপর মান্দ্রাজ যাওয়া হতে পারে। ওয়ানিয়ামবড়ি (Vaniyambadi) হতে এক পত্র পেয়েছি—তাদের আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিয়ে এক পত্র লিখো এবং আমি মান্দ্রাজ আসবার সময় অবশ্য সে-স্থান হয়ে আসব, একথা জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে না। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি

বিবেকানন্দ

৫২০*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৬ ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

আজকের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম। সেই সঙ্গে মা এবং এলবার্টার চিঠিও পেলাম। এলবার্টার পণ্ডিত বন্ধুবর রাশিয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা প্রায় আমার ধারণারই মত। তাঁর চিন্তার একটা জায়গায় শুধু মুশকিল দেখছি—সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষে এককালে রাশিয়ার ভাবে ভাবিত হওয়া সম্ভব কি?

আমাদের প্রিয় বন্ধু মিঃ সেভিয়ার—আমি পৌঁছবার আগেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সৎকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁর পুষ্পমাল্য-শোভিত দেহ বহন করে নিয়েছিল এবং ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করেছিল।

আমাদের আদর্শের জন্য ইতোমধ্যে দু-জন ইংরেজের আত্মদান হয়ে গেল। এর ফলে প্রিয় প্রাচীন ইংলণ্ড ও তার বীর সন্তানগণ আমার আরও প্রিয় হয়ে [৩৮] উঠেছে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চারাগাছটি মহামায়া যেন বারিসিঞ্চিত করেছেন—মহামায়ারই জয় হউক।

মিসেস সেভিয়ার অবিচলিত আছেন। প্যারিসের ঠিকানায় তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই ডাকে ফিরে এল। আগামী কাল আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাহাড়ে যাব। ভগবান্ তাকে আশীর্বাদ করুন—এই নির্ভয়প্রাণাকে।

আমি নিজে দৃঢ় এবং শান্ত আছি। আজ পর্যন্ত কোন ঘটনা কখনও আমাকে বিচলিত করতে পারেনি; আজও মহামায়া আমাকে অবসন্ন হতে দেবেন না।

শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে। অনাচ্ছাদিত তুষারাবরণে হিমালয় আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মিঃ জনস্টন নামক যে যুবকটি নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়ে এসেছিল, সে ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করেছে এবং মায়াবতীতে আছে।

টাকাটা সারদানন্দের নামে মঠে পাঠিয়ে দিও, কারণ আমি পাহাড়ে চলে যাচ্ছি। তারা তাদের সাধ্যমত ভাল কাজই করেছে।

আমি খুশী এবং স্নায়বিক বিরক্তির জন্য নিজেকেই বেকুব মনে করছি। তারা বরাবরের মত সৎ ও বিশ্বাসী আছে এবং তাদের শরীরও সুস্থ।

মিসেস বুলকে এ-সকল সংবাদ লিখো এবং বল যে, তিনিই বরাবর ঠিক বলেছেন, আর আমারই ভুল হয়েছে। সে-জন্য আমি সহস্রবার তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছি। তাঁকে ও—কে আমার অগাধ ভালবাসা দিও।

সমুখে পিছনে তাকাই যখন
দেখি সবকিছু ঠিকই আছে।
আত্মার জ্যোতি জ্বল জ্বল করে
আমার গভীর দুঃখের মাঝে। ৩৯

—কে, মিসেস—কে, প্রিয় জুল
বোয়াকে আমার ভালবাসা জানাবে।
প্রিয় জো, তুমি আমার প্রণাম
জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৫২১*

প্রবুদ্ধ ভারত আপিস
মায়াবতী, হিমালয়
৬ জানুআরী, ১৯০১

প্রিয় ধীরামাতা,

ডাক্তার বসু আপনার মারফত যে 'নাসদীয় সূক্ত' পাঠিয়েছিলেন, আমি এখনই তার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। আমি অনুবাদটিকে যতটা সম্ভব আক্ষরিক করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি, ডাক্তার বসু ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মিসেস সেভিয়ার খুব দৃঢ়চিত্ত মহিলা এবং খুব শান্ত ও সবলভাবে শোক সহ্য করে নিয়েছেন। তিনি এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে যাচ্ছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

এ স্থানটি অতি সুন্দর এবং তারা (আশ্রমবাসীরা) একে খুব মনোরম করে তুলেছে। কয়েক একর পরিমিত বিশাল স্থানটি সযত্নে রাখা হয়েছে। আশা করি মিসেস সেভিয়ার ভবিষ্যতে ইহা রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য তিনি বরাবরই এরূপ আশা করছেন।

জো-র কাছ থেকে শেষ চিঠিতে জানতে পেলাম, সে মাদাম কালভের সঙ্গে ... যাচ্ছে।

জেনে সুখী হলাম, মার্গট ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য তার বিদ্যা রেখে দিচ্ছে। তার বইখানা এখানে খুব সমাদর লাভ করেছে, কিন্তু মনে হয় প্রকাশকেরা বিক্রীর জন্য তেমন চেষ্টা করছে না।

কলিকাতার প্রথম দিনের ছোঁয়াচেই আমার হাঁপানি আবার দেখা দিয়েছিল। সেখানে যে দু-সপ্তাহ ছিলাম, প্রতি রাত্রেই রোগের আক্রমণ হত। হিমালয়ে বেশ ভাল আছি। এখানে খুব বরফ পড়ছে, পথে প্রবল হিমঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছিলাম; কিন্তু ঠাণ্ডা তত বেশী নয়। এখানে আসার পথে দুদিন ঠাণ্ডা লাগায় খুব উপকার হয়েছে বলে মনে হয়।

আজ মিসেস সেভিয়ারের জমিগুলি দেখতে দেখতে বরফের উপর দিয়ে মাইলখানেক চড়াই করেছি। সেভিয়ার সব জায়গায় সুন্দর রাস্তা তৈরী করেছেন। প্রচুর বাগান মাঠ ফলগাছ এবং দীর্ঘ বন তাঁর দখলে। থাকবার কুটীরগুলি কি সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন সুন্দর, এবং সর্বোপরি কাজের উপযোগী!

আপনি কি শীঘ্র আমেরিকা যাচ্ছেন? যদি না যান, তাহলে তিনমাসের মধ্যে লণ্ডনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আশা করি।

অনুগ্রহ করে মিস ওলককে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। এর পরে যখন মূলারের সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তাকে ও স্টার্ডিকে আমার গভীর ভালবাসা জানাবেন। কলিকাতায় আমার মা, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করেছি।

এখানকার সকলকেই আপনাকে ভালবাসা জানাচ্ছে।

আপনার চিরস্নেহাবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—কালী দুটি বলি গ্রহণ করেছেন; মহৎ উদ্দেশ্যে দু-জন ইওরোপীয় শহীদ আত্মত্যাগ করেছেন, এখন কাজ অতি সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে।

বি

এলবার্ট ও—কে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি।

চারিদিকে ছ-ইঞ্চি গভীর বরফ পড়ে আছে, সূর্য উজ্জ্বল ও মহীয়ান্‌, আর মধ্যাহ্নে বাহিরে বসে আমরা বই পড়ছি। আমাদের চারধারেই বরফ! বরফ থাকা সত্ত্বেও শীতকাল এখানে বেশ মৃদু। বায়ু শুষ্ক ও স্নিগ্ধকর, এবং জল প্রশংসার অতীত।

বি

৫২২*

মায়াবতী, হিমালয়
১৫ জানুআরী, ১৯০১

প্রিয় স্টার্ডি,
সারদানন্দের কাছে খবর পেলাম যে, ইংলণ্ডের কাজের জন্য যে ১,৫২৯।/৫ পাই হাতে ছিল, তা তুমি মঠে পাঠিয়ে দিয়েছ। এ টাকা ভাল কাজেই লাগবে নিশ্চিত।

প্রায় তিন মাস আগে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। তাঁরা এই পাহাড়ের উপর একটা সুন্দর আশ্রম স্থাপন করেছেন; আর মিসেস সেভিয়ারের ইচ্ছা যে, তিনি আশ্রমটি সংরক্ষণ করেন । আমি এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এবং হয়তো তাঁরই সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে পারি।

আমি প্যারিস থেকে তোমায় একখানি চিঠি লিখেছিলাম, তুমি বোধ হয় তা পাওনি।

মিসেস স্টার্ডির দেহত্যাগের খবরে বড়ই দুঃখিত হলাম। তিনি সাধ্বী স্ত্রী ও স্নেহময়ী মাতা ছিলেন; জীবনে এরূপ মহিলা বড় একটা চোখে পড়ে না। এ জীবন আঘাতপূর্ণ; কিন্তু সে আঘাতের ব্যথা যেমন করেই হোক চলে যায়—এই যা আশা!

আগের চিঠিতে খোলাখুলিভাবে তোমার মনভাব প্রকাশ করেছ বলে যে আমি চিঠি লেখা বন্ধ করেছি—তা নয়। আমি শুধু ঢেউটা চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম, এই হচ্ছে আমার রীতি। চিঠি লিখলে তিলকে তাল করে তোলা হত।

মিসেস জনসন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিও। ইতি

চিরসত্যবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫২৩*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৬ জানুআরী, ১৯০১

মা,
আপনার উৎসাহপূর্ণ কথাগুলির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এখনই আমার ঐরূপ উৎসাহবাক্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। নূতন

শতাব্দী এসেছে, কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, বরং স্পষ্টই তা ঘন হয়ে উঠছে। মিসেস সেভিয়ারকে দেখতে মায়াবতী গিয়েছিলাম। পথে খেতড়ির রাজার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেলাম। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তিনি নিজব্যয়ে আগ্রায় কোন পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির সংস্কার করছিলেন, কাজ পরিদর্শনের জন্য কোন গোম্বুজে উঠেছিলেন, গম্বুজটির অংশবিশেষ ভেঙে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জো এখানে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি।

বাঙলাদেশে, বিশেষতঃ মঠে যে মুহূর্তে পদার্পণ করি, তখনই আমার হাঁপানির কষ্টটা ফিরে আসে, এ স্থান ছাড়লেই আবার সুস্থ।

আগামী সপ্তাহে আমার মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি। তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস লাগবে। তীর্থদর্শন হল হিন্দু বিধবার প্রাণের সাধ; সারা জীবন আত্মীয়স্বজনদের কেবল দুঃখ দিয়েছি। তাঁদের এই একটি ইচ্ছা অন্তত পূর্ণ করতে চেষ্টা করছি।

মার্গট সম্বন্ধে সব কিছু জেনে আনন্দিত হলাম। এদেশে ফিরে আসছে জেনে সকলে তাকে স্বাগত জানাতে উৎসুক।

আশা করি, ডক্টর বসু ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

মিসেস হ্যামন্ডের কাছ থেকেও একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তিনি মহীয়সী নারী।

যা হোক, আমি এখন অত্যন্ত শান্ত ও আত্মস্থ; সব কিছুকে অনেক ভাল দেখছি, যা কখনও দেখবার আশা করিনি।

আপনার স্নেহের চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৫২৪*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২ ফেব্রুআরী, ১৯০১

মা,

কিছুদিন আগে আপনার একখানা চিঠি ও তার মধ্যে একখানা ১৫০ টাকার চেক পেয়েছিলাম। এটা আমি ছিঁড়ে ফেলব, কারণ আগের তিনটি চেক আমার এক ভগিনীকে (cousin) দিয়ে দিয়েছি।

জো এখানে; দুবার তার দেখা পেয়েছি, সে দেখাসাক্ষাৎ নিয়ে ব্যস্ত। ইংলণ্ডে যাবার পথে মিসেস সেভিয়ারের শীঘ্রই এখানে আসার কথা। তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মাকে নিয়ে দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় আমাকে যেতেই হচ্ছে।

বাঙলাদেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়; যা হোক, তার জন্য আজকাল বিশেষ ভাবি না, আমি ভালই আছি, আর আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভাল।

মার্গটের সাফল্যের সংবাদ জেনে আনন্দিত, জো কিন্তু বলছে, টাকা পয়সা জুটছে না; ঐখানেই গোলমাল। কেবল মাত্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মূল্য সামান্যই এবং লণ্ডন থেকে কলিকাতা অনেক দূর। মা-ই জানেন। মার্গটের ‘কালী দি মাদার’ (Kali the Mother) বইয়ের প্রশংসা সকলেই করছে। কিন্তু হায়! কেনার জন্য কেউ একটা বই পাচ্ছে না; পুস্তক-বিক্রেতারা বিক্রয় বাড়ানোর ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন।

এই নূতন শতাব্দী আপনাদের আরও মহত্তর ভবিষ্যতের জন্য অপূর্ব স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য দিক্—এই আপনার সন্তান বিবেকানন্দের সতত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৫২৫-৫৩৪

৫২৫*

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৪ ফেব্রুআরী, ১৯০১

প্রিয় জো,

বোয়া কলিকাতায় আসছেন জেনে আমি এত আনন্দিত হয়েছি যে, কি বলব। তাঁকে অবিলম্বে মঠে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখানেই থাকব। সম্ভব হলে তাঁকে এখানে কয়েক দিন রাখব, তারপর আবার নেপাল যাবার জন্য ছেড়ে দেব।

তোমার ইত্যাদি
বিবেকানন্দ

৫২৬*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৭ ফেব্রুআরী, ১৯০১

প্রিয় জো,

এইমাত্র সুন্দর ও সুদীর্ঘ চিঠিখানা পেলাম। মিস কর্নেলিয়া সোরাবজীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ও তুমি তাঁকে পছন্দ কর জেনে আমি খুব প্রীত হয়েছি। তাঁর বাবার সঙ্গে আমার পুনাতে পরিচয় হয়; তা ছাড়া তাঁর একটি ছোট বোন আমেরিকায় ছিল, তাকেও আমি জানতাম। লিমডির ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে যে সন্ন্যাসী পুনাতে বাস করতেন, তাঁর কথা মনে করিয়ে দিলে হয়তো কর্নেলিয়ার মা-ও আমাকে চিনবেন।

আশা করি, তুমি বরোদায় গিয়ে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করবে।

আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি এবং কিছুকাল এভাবে থাকব বলেই বিশ্বাস। আমি এইমাত্র মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে একখানি চমৎকার চিঠি পেয়েছি; তিনি তাতে তোমার সম্বন্ধে কত ভাল কথাই না লিখেছেন।

মিঃ টাটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এবং তাঁকে খুব দৃঢ়চেতা ও সজ্জন বলে তোমার মনে হয়েছে জেনে বিশেষ খুশী হয়েছি।

বোম্বে যাবার মত শক্তি যদি পাই, তবে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ আমি অবশ্যই গ্রহণ করব।

তুমি যে জাহাজে কলম্বো যাবে, সেটির নাম অবশ্যই 'তার' করে জানিও। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

৫২৭*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

ঢাকা
২৯ মার্চ, ১৯০১

মা,
ঢাকা থেকে লেখা আমার অপর চিঠিখানা এর মধ্যে নিশ্চয়ই পেয়েছেন। সারদানন্দ কলিকাতায় জ্বরে দারুণ ভুগছিল। কলিকাতা এ বছর সত্যি নরকে পরিণত হয়েছে। সারদানন্দ আরোগ্যলাভ করেছে এবং এখন মঠে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মঠ বাঙলাদেশের অন্যতম সেরা স্বাস্থ্যকর স্থান।

জানি না, আপনার সঙ্গে আমার মায়ের কি কথাবার্তা হয়েছিল; আমি তো উপস্থিত ছিলাম না। মনে হয়, তিনি মার্গটকে দেখার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। আর কিছু নয়—বোধ হয়।

মার্গটকে পরামর্শ দিয়েছি, সে যেন ইংলণ্ডে তার পরিকল্পনাগুলি পাকা করে নেয় এবং ফিরে আসার আগে সেগুলির কার্যকারিতা বেশ কিছুটা পরীক্ষা করে আসে। স্থায়ী ভাল কাজ করতে হলে সময় লাগে।

সারদানন্দ উপযুক্ত বল পেলে দার্জিলিঙে মিসেস ব্যানার্জীর কাছে যেতে পারে। মিসেস ব্যানার্জী কয়েকদিন কলিকাতায় আছেন।

জাপান থেকে জো-র এখনও কোন খবর পাইনি। মিসেস সেভিয়ারের শীঘ্রই জাহাজে ওঠার কথা। আমার মা ও তাঁর সঙ্গিনীরা পাঁচদিন আগে ঢাকা এসেছেন, ব্রহ্মপুত্রে পবিত্র স্নানের যোগ। যখনই কয়েকটি গ্রহের বিশেষ সংযোগ ঘটে, যা খুবই দুর্লভ, তখনই কোন নির্দিষ্ট স্থানে নদীতীরে বিপুল লোকসমাগম হয়। এ বৎসর এক লক্ষেরও বেশী লোক হয়ে ছিল; মাইলের পর মাইল নদী নৌকাতে ঢাকা ছিল।

যদিও নদী সেখানে এক মাইল চওড়া, তবু কর্দমাক্ত। কিন্তু (নদীগর্ভ) শক্ত থাকায় আমরা স্নান পূজা ইত্যাদি করতে পেরেছি।

ঢাকা তো বেশ ভালই লাগছে। আমার মা ও আর সব মেয়েদের নিয়ে চন্দ্রনাথ যাচ্ছি; সেটা পূর্ববাঙলার শেষ প্রান্তে একটি তীর্থস্থান।

আমি ভালই আছি, আশা করি, আপনার, আপনার কন্যার এবং মার্গটের স্বাস্থ্য খুব ভাল যাচ্ছে।

আপনার চিরস্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার এক ভগিনী এবং মা আপনাকে ও মার্গটকে তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন।

—বি

৫২৮*

মঠ, বেলুড়
১৫ মে, ১৯০১

প্রিয় স্বরূপ, ৪০

নৈনিতাল হতে লিখিত তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ। আমি সবেমাত্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করে ফিরেছি। অন্যান্য বারের মত এবারেও আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ভেঙে পড়েছি।

যদি বরোদার মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে সত্যিই কোন কাজ হয়, তবে আমি রাজী আছি; নতুবা ভ্রমণের পরিশ্রম এবং খরচের মধ্যে যেতে চাই না। সুতরাং মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে আমাদের কাজের সাহায্য হবে কিনা, সে বিষয়ে তোমার অভিমত—বিশেষ চিন্তা করে এবং সংবাদাদি নিয়ে আমাকে জানাবে। আমি এইমাত্র মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি পেলাম। অমরনাথ ও নৈনিতালের আর সব বন্ধুদের ভালবাসা জানাবে।

তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জেনো। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫২৯*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

মঠ, বেলুড়
২৬ ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় মেরী,
কোন বিখ্যাত নামের সঙ্গে বাঁধা পড়া কখনও কখনও বেশ হয়রানির ব্যপার। আমার চিঠিখানার অদৃষ্টে ঠিক তাই ঘটেছে। ২২ জানুআরী, ১৯০১ চিঠিখানা লিখেছ এবং একটি বিখ্যাত নাম—মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিয়েছ। তার ফলে চিঠিখানা সারা পৃথিবী তাকে অনুসরণ করে ঘুরেছে। গতকাল জাপান থেকে—মিস ম্যাকলাউড এখন জাপানে—সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছেছে; তবেই হল গ্রীক পুরাণের সেই স্ফিংক্‌স্‌ (Sphinx)-এর হেঁয়ালির সমাধানঃ ‘একটি মহৎ নামের সঙ্গে কোন ছোট নামকে যুক্ত করবে না।’

মেরী, তাহলে তোমরা ফ্লোরেন্স ও ইতালীকে উপভোগ করছ। জানি না, এখন তোমরা কোথায়। সুতরাং স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা ‘লেইডী’ (laidy), মনরো এণ্ড কোম্পানীর (Monroe & Co., 7 Rue Scribe) অনুগ্রহের উপর এ চিঠিখানা ছেড়ে দিচ্ছি।

তাহলে বৃদ্ধা মহিলা, তুমি ফ্লোরেন্স ও ইতালীর হ্রদে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কাটাচ্ছ। ভাল, যদিও তোমার কবি একে শূন্য বলে আপত্তি জানাচ্ছে।

হ্যাঁ, অনুরক্ত ভগিনী, আমার নিজের খবর কেমন? গত শরতে ভারতে ফিরেছি, সারা শীতকালটা ভুগেছি এবং এই গ্রীষ্মে বড় বড় নদী ও পাহাড় এবং ম্যালেরিয়ার দেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছি এবং দু-মাস কঠোর পরিশ্রমের পর আবার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙেছে। এখন আবার কলিকাতায় ফিরে এসেছি এবং ধীরে ধীরে এর প্রকোপ কাটিয়ে উঠছি।

কয়েক মাস আগে খেতড়ির রাজা পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন। তাহলেই দেখছ, এখন আমার চারিদিকে সব কিছু বিষণ্ণতায় ভরা এবং আমার নিজেরও স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। তথাপি শীঘ্রই তা নিশ্চয় ঝেড়ে ফেলছি এবং দেখছি এর পরে কি আসে।

ইচ্ছা হয় ইওরোপ গিয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পসল্প করে আবার হুট করে ভারতে ফিরে আসি; কারণ মোটের উপর, আজকাল আমি একপ্রকার প্রশান্তি অনুভব করছি এবং আমার অস্থিরতার বার আনা বিদায় দিয়েছি।

হ্যারিয়েট উলী, ইসাবেল এবং হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে আমার ভালবাসা এবং মাকে আমার চিরন্তন ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। মাকে বল যে ‘দুর্বোধ্য হিন্দু’র কৃতজ্ঞতা বহু পুরুষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে।

সতত প্রভুসন্নিধানে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—যখন ভাল লাগবে, এক ছত্র লিখ।

—বি

৫৩০

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৩ জুন, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,
তোমার পত্র পেয়ে হাসিও পেল, কিঞ্চিৎ দুঃখও হল। হাসির কারণ এই যে, পেটগরমের কি স্বপ্ন দেখে তুমি একটা সত্য ঠাউরে নিজেকে দুঃখিত করেছ। দুঃখের কারণ এই যে, এতে বোঝা যায় তোমার শরীর ভাল নয়—তোমার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক।

আমি তোমাকে কস্মিন্‌কালেও শাপ দিই নাই, আজ কেন দেব? আজন্ম আমার ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হল? অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই হয়—কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে, সে ভালবাসা যাবার নয়।

আমার শরীর আজকাল আবার একটু ভাল হচ্ছে। মান্দ্রাজে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কি? দক্ষিণে একটু বৃষ্টি আরম্ভ হলেই আমি বোধ হয় বোম্বে, পুনা হয়ে মান্দ্রাজ যাব। বর্ষা আরম্ভ হলেই বোধ হয় দক্ষিণের প্রচণ্ড গরম থেমে যাবে।

সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা দিও, তুমিও জানিও।

কাল শরৎ দার্জিলিঙ হতে মঠে এসেছে—শরীর অনেক সুস্থ, পূর্বাপেক্ষা। আমি ব্রহ্মদেশ আর আসাম ভ্রমণ করে এস্থানে পৌঁছেছি। সকল কাজেই নরম গরম আছে—কখনও চড়াই, কখনও উতরাই। আবার উঠবে। ভয় কি?

যা হোক, আমি বলি যে তুমি কাজকর্ম কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে একদম মঠে চলে এস—এখানে মাসখানেক বিশ্রামের পর তুমি আমি একসঙ্গে will make a grand tour (বিরাট ভ্রমণে বেরুব) in Gujrat, Bombay, Poona, Hyderabad, Mysore to Madras (গুজরাট, বোম্বে, পুনা, হায়দরাবাদ ও মহীশূর হয়ে মান্দ্রাজ পর্যন্ত)। Would not that be grand (ওটা কি খুব চমৎকার হবে না)? তা না যদি পার একান্ত, মান্দ্রাজের লেকচার এখন একমাস স্থগিত থাক—তুমি দুটি দুটি খাও, আর খুব ঘুমাও। আমি দুই-তিন মাসের মধ্যে সেথা আসছি। যা হোক, পত্রপাট একটা বিচার করে লিখবে। ইতি

সাশীর্বাদং
বিবেকানন্দ

৫৩১*

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া

প্রিয় শশী,
আমি আমার মায়ের সঙ্গে রামেশ্বরে যাচ্ছি—এই তো কথা! আমি আদৌ মান্দ্রাজে যাব কিনা জানি না। একান্তই যদি যাই, উহা সম্পূর্ণ গোপনে। আমার দেহ মন একেবারে অবসন্ন, একজন লোকের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি কারও সাথী হচ্ছি না; কাউকে সঙ্গে নেবার মতো শক্তি, অর্থ বা ইচ্ছা আমার নাই—তারা গুরুমহারাজের ভক্ত হোক আর না হোক, আসে-যায় না।

তোমায় আবার বলছি—আমি এখন মরে আছি বললেই চলে এবং কারও সহিত সাক্ষাৎ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এরূপ ব্যবস্থা যদি তুমি না করতে পার, আমি মান্দ্রাজে যাব না।

শরীর বাঁচাবার জন্য আমায় একটু স্বার্থপর হতে হচ্ছে। যোগীন-মা প্রভৃতি নিজেদের ব্যবস্থা করুন। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আমি কাউকে সঙ্গে নিতে পারব না। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫৩২*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৪ জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

জাপান—বিশেষতঃ জাপানী শিল্প তুমি উপভোগ করছ, এতে আমি খুব আনন্দিত। জাপানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে, এ-কথা তুমি ঠিকই বলেছ। জাপান আমাদের যে সাহায্য করবে, তার মধ্যে থাকবে সহানুভূতি ও মর্যাদা, আর অন্যদিকে পশ্চিমের সাহায্য সহানুভূতিশূন্য ও গঠনবিরোধী। ভারত ও জাপানের মধ্যে একটি যোগসূত্র-স্থাপন সত্যই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

আসামে একটু অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম। মঠের আবহাওয়া আমাকে কিছুটা চাঙ্গা করে তুলেছে। আসামের পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস শিলং-এ আমার জ্বর, হাঁপানি ও এলবুমেন বেড়েছিল এবং শরীর দ্বিগুণ ফুলে গিয়েছিল। যা হোক, মঠে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রোগের লক্ষণগুলি হ্রাস পেয়েছে। এ বছর ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে; তবে একটুখানি বৃষ্টি নেমেছে এবং আশা হয়, শীঘ্রই পূর্ণবেগে মৌসুমী এসে যাবে। এখানই আমার কোন পরিকল্পনা নেই, শুধু বোম্বে প্রদেশেআমাকে দারুণ ভাবে চাইছে এবং শীঘ্রই সেখানে যাবার কথা ভাবছি, এই যা; প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমরা বোম্বে অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করবার কথা চিন্তা করছি।

লেডী বেটী (Lady Betty) যে ৩০০ ডলার পাঠিয়েছেন বলছ, তা এখনও আমার কাছে এসে পৌছয়নি; জেনারেল প্যাটারসনের কাছ থেকে তার কোন সংবাদও আমি পাইনি।

স্ত্রী ও ছেলেপিলে জাহাজে ইওরোপ যাত্রা করার পর থেকে বেচারার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে; আমাকে বলেছে—তার সঙ্গে দেখা করার জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এত অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং শহরে যেতে আমার এত ভয় যে, বর্ষা আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

এখন প্রিয় জো, যদি আমাকে জাপান যেতে হয়, তবে এবার কাজটা চালাবার জন্য সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া লি হুয়াং চাং-এর (Li Huang Chang) নিকট মিঃ ম্যাক্সিমের অঙ্গীকৃত পত্রখানাও আমার অবশ্যই পাওয়া চাই। বাকী 'মা' জানেন। এখনও কিছু স্থির নেই।

ভবিষ্যদ্‌বক্তাকে দেখতে তাহলে তুমি অ্যালানকুইনান (Alanquinan) গিয়েছিলে? সে কি তার শক্তি-টক্তি সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিল? কি বললে সে? এ-বিষয়ে সবিশেষ জানাবে।

নেপাল-প্রবেশে বাধা পেয়ে জুল বোয়া লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কাগজে দেখলাম, তিনি গরম সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন; তারপর জাহাজে নিরাপদ সমুদ্রযাত্রা। মঠে দেখা হবার পর তিনি আমাকে একছত্রও লেখেননি। তুমিও নরওয়ে থেকে জাপান পর্যন্ত সারা পথ মিসেস বুলকে টেনে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর—হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল, তুমিও নিঃসন্দেহে একজন পাকা জাদুকর। জো, শরীর ও আত্মাকে চাঙ্গা রাখ; অ্যালানকুইনানের লোকটির অধিকাংশ কথাই সত্যে পরিণত হবে; গৌরব এবং সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—এবং মুক্তি। বিবাহের মাধ্যমে পুরুষকে অবলম্বন করে ওপরে ওঠাই মেয়েদের স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সেদিন অতীত হয়ে গিয়েছে। কোন পুরুষের সাহায্য ছাড়াই তুমি বড় হবে, যেমনি তুমি বড় আছ, আমাদের প্রিয় অনাড়ম্বর চিরন্তন জো!

জীবনকে আমরা যথেষ্টই দেখেছি, তাই নয়কি, জো? জীবনের কোন অনিত্য বস্তুকেই তাই আমরা আর গ্রাহ্য করি না। মাসের পর মাস আমি সমস্ত ভাবপ্রবণতা ঝেড়ে ফেলার অভ্যাস করছি; অতএব এখানেই বিরত হলাম। এখন বিদায়। আমরা একসঙ্গে কাজ করব—এ 'মায়ের' আদেশ; এতে ইতোমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে; আরও অনেক লোকের কল্যাণ সাধিত হবে; তাই হোক। মতলব আঁটা, উঁচুতে ওঠা, সবই বৃথা; 'মা' তাঁর নিজের পথ করে নাবেন; … তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সতত প্রীতি ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—এইমাত্র মিঃ ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০্ টাকার একটি চেক ও আমন্ত্রণ এল। এ খুবই লোভনীয়, কিন্তু তথাপি 'মা'-ই জানেন।

—বি

৫৩৩*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৮ জুন, ১৯০০

প্রিয় জো,

তোমার চিঠির সঙ্গে মিঃ ওকাকুরার টাকার রসিদ পাঠালাম। তোমার সব রকম চাতুরীর জন্যই আমি প্রস্তুত।

যা হোক, আমি যাবার জন্য সত্যিই চেষ্টা করছি। কিন্তু জানই তো—যেতে এক মাস, ফিরতে এক মাস, আর থাকতে হবে দিন কয়েক! তা হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; তবে আমার দুর্বল স্বাস্থ্য এবং কিছু আইনঘটিত ব্যাপার প্রভৃতির জন্য একটু দেরী হতে পারে। ইতি

সতত স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

৫৩৪*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৯০১

প্রিয় জো,

তোমার কাছে আমি যে বিপুল কৃতজ্ঞতা-ঋণে ঋণী, কল্পনাতেও তা পরিশোধ করতে পারি না। তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমার মঙ্গলকামনা করতে কখনও ভুলো না। আর তুমি হচ্ছ একমাত্র ব্যক্তি, যে এসব শুভেচ্ছার উপরেও আমার সব ভার বহন কর এবং আমার সব রকম আবেগজনিত বিস্ফোরণ সহ্য কর।

তোমার জাপানী বন্ধু বড়ই সহৃদয়তা দেখিয়েছেন; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে, আশঙ্কা হয়—আমি হয়তো জাপানের জন্য সময় করতে পারব না। আর কিছু না হোক, শুধু সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবদের খবর নেবার জন্যও নিজেকে একমাত্র বোম্বে প্রেসিডেন্সির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

তা ছাড়া (জাপান) যেতে-আসতেই দু-মাস কেটে যাবে, আর থাকতে পারব মাত্র এক মাস; এ তো আর কাজ করবার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয়—কি বল? সুতরাং তোমার জাপানী বন্ধু আমার পাথেয় বাবদ যে টাকা পাঠিয়েছেন, তাঁকে তুমি দিয়ে দাও; তুমি যখন নভেম্বরে ভারতে আসবে, তখন আমি তা শোধ করব।

আসামে আমার রোগ আবার ভীষণভাবে দেখা দেয়; ক্রমে সেরে উঠছি। বোম্বের লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে গেছে; এবার তাদের দেখতে যাব।

এ-সব সত্ত্বেও যদি তুমি চাও যে, আমার যাওয়া উচিত, তবে তোমার পত্র পেলেই আমি যাত্রা করব।

মিসেস লেগেল লণ্ডন থেকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন যে, তাঁদের প্রেরিত ৩০০ পাউণ্ড আমি পেয়েছি কিনা। ঐ টাকা এসেছে এবং পূর্ব নির্দেশানুযায়ী আমি এক সপ্তাহ আগে বা তারও আগে 'মনরো এণ্ড কোং, প্যারিস'—এই ঠিকানায় তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছি।

তাঁর শেষ যে চিঠিখানা এসেছে, তার খামটা কে নির্লজ্জভাবে ছিঁড়ে দিয়েছে। ভারতের ডাক-বিভাগ আমার চিঠিগুলো একটু ভদ্রভাবে খুলবারও চেষ্টা করে না!

তোমাদের চিরস্নেহশীল
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৫৩৫-৫৪৪

৫৩৫*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৫ জুলাই, ১৯০১

প্রিয় মেরী,
তোমার সুদীর্ঘ সুন্দর চিঠিখানির জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; বিশেষতঃ আমার মনের প্রফুল্লতার জন্য এখনই এ-রকম একটি চিঠির প্রয়োজন ছিল। আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাচ্ছে। কিছুদিনের জন্য আরোগ্যলাভ করি, তারপরেই আসে অবশ্যম্ভাবী ভাঙন। যাই হোক এই হল রোগটার প্রকৃতি।

সম্প্রতি আমি পূর্ববাঙলা ও আসাম পরিভ্রমণ করছিলাম। কাশ্মীরের পরেই আসাম ভারতের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, কিন্তু খুবই অস্বাস্থ্যকর। দ্বীপময় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে, এ দৃশ্য দেখবার মত।

তুমি জান, আমার এই দেশকে বলা হয় জলের দেশ। কিন্তু তার তাৎপর্য পূর্বে কখনও এমন ভাবে উপলব্ধি করিনি। পূর্ববাঙলার নদীগুলি যেন তরঙ্গসঙ্কুল স্বচ্ছ জলের সমুদ্র, নদী মোটেই নয়, এবং সেগুলি এত দীর্ঘ যে ষ্টীমার—সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।

মিস ম্যাকলাউড এখন জাপানে। দেশটি দেখে সে একান্ত মুগ্ধ। আমাকে যেতে লিখেছে, কিন্তু এরূপ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আমার শরীর সইতে পারবে না বলে বিরত হয়েছি। জাপান আমার পূর্বেই দেখা আছে।

তাহলে তুমি ভিনিসে আনন্দ উপভোগ করছ। বৃদ্ধটি নিশ্চয়ই খুব আমোদপ্রিয়; তবে বৃদ্ধ শাইলকের বাড়ীও ছিল ভিনিসে, তাই নয় কি?

স্যাম এ বছর তোমার সঙ্গে আছে—তাতে আমি খুবই আনন্দিত। উত্তরাঞ্চলের নিরানন্দ অভিজ্ঞতার পর সে নিশ্চয়ই ইওরোপের ভাল জিনিষগুলি উপভোগ করবে। বর্তমানে কোন নূতন চিত্তাকর্ষক বন্ধু আমার জোটেনি, পুরানো যাদের কথা তুমি জান, তাঁরা প্রায় সকলেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, এমন কি খেতড়ির রাজা পর্যন্ত। সেকেন্দ্রায় সম্রাট্ আকবরের সমাধির একটি উঁচু চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা গিয়েছেন। আগ্রার এই পুরাতন রমণীয় স্থাপত্যকীর্তিটি তিনি নিজব্যয়ে সংস্কার করছিলেন, কাজটা পরিদর্শন করতে গিয়ে একদিন পা পিছলে গিয়ে একেবারে কয়েক-শ ফুট নীচে পড়ে যান। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের ফলে এভাবে মাঝে মাঝে আমাদের দুঃখ পেতে হয়। সাবধান মেরী, তুমি ভারতীয় ধ্বংসাবশেষটির সম্বন্ধে খুব বেশী আগ্রহান্বিত হয়ো না।

মিশনের সীলমোহরে সাপটি হল রহস্যবিদ্যার (mysticism) প্রতীক; সূর্য জ্ঞানের; তরঙ্গায়িত জল কর্মের; পদ্ম প্রেমের; সকলের মাঝখানে হংসটি হল আত্মার প্রতীক।

স্যাম এবং মাকে ভালবাসা।

সদা প্রীতিবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার চিঠি সংক্ষিপ্ত করতে হল; আমি সর্বদাই অসুস্থ; এই হল শরীর!

৫৩৬*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৬ জুলাই, ১৯০১

প্রিয় ক্রিষ্টিন,

এক-একবার এক-একটি কাজের ঝোঁক যেন আমায় পেয়ে বসে। আজ লেখার নেশায় আছি। তাই সর্বাগ্রে তোমাকেই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখছি। দুর্নাম আছে, আমার ধাত স্নায়ু-প্রধান—আমি অল্পেতেই ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রিয় ক্রিষ্টিন, এ বিষয়ে তুমিও তো আমার চেয়ে নেহাৎ কম বলে মনে হয় না। আমাদের জনৈক কবি লিখেছেন, 'হয়তো পর্বত নিশ্চিহ্ন হবে, অগ্নিও শীতল হবে, কিন্তু মহতের হৃদয় কখনও মহত্ত্ব হারাবে না।' আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে আমার সর্বদা আস্থা আছে। অন্য সকলের বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই।

জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। এ কথা নিশ্চয় জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোন বাধাবিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না। ইতি

ভগবদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৫৩৭*

[মিস মেরী হেলকে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৭ অগষ্ট, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

তুমি যেমন চেয়েছিলে, আমার শরীরের অবস্থা যদি তেমন থাকত—অন্ততঃ তোমাকে একটি বড় চিঠি লেখার মত! বস্তুতঃ, দিন দিন শরীর আরও খারাপের দিকে চলেছে এবং সে ছাড়াও কত সব জটিল ও বিরক্তিকর উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। সে সব লক্ষ্য করা আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

সুইজারল্যাণ্ডের রমণীয় কাঠের কুটীরে তোমাদের সর্ববিধ আনন্দলাভ হোক, এই আমার শুভাকাঙ্ক্ষা—চমৎকার স্বাস্থ্য, উত্তম ক্ষুধা, এবং চাঙ্গা হবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের বা অন্যান্য প্রাচীন কীর্তির একটু আধটু চর্চা। তুমি পর্বতের মুক্ত বায়ু সেবন করছ জেনে খুব আনন্দিত, কিন্তু স্যামের শরীর সুস্থ নেই জেনে দুঃখিত। তবে তার জন্য কোন উদ্বেগের কারণ নেই, তার শরীরের গঠন এতই সুন্দর!

'নারীর মনোভাব ও পুরুষের ভাগ্য—দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্ ছার?' আমার সহজাত প্রকৃতি অনেকটা নারীসুলভ হতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি [৪১] যা নিয়ে চিন্তিত, তা হল—তোমার মধ্যে কিছুটা পৌরুষ সঞ্চারিত হোক। অহো মেরী, তোমার মেধা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সবই শুধু একটি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তা হল ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। তোমার ঔদ্ধত্য, উৎসাহ ইত্যাদি সব কিছুই অর্থহীন ও কৃত্রিম, তুমি বড়জোর একটি বোর্ডিঙ-স্কুলের মেয়ে—মেরুদণ্ডহীন, মেরুদণ্ডবিহীন!

হায়! জীবনভোর এই শিশু-হাঁটানোর প্রচেষ্টা! কথাটা খুবই রূঢ়, খুবই নির্দয়, কিন্তু উপায় নেই। মেরী, তোমাকে আন্তরিক ও অকপট স্নেহ করি; ভাবপ্রবণ বাক্যের মিছরি দিয়ে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না। সে সব আমার কখনও আসে না।

তারপর আবার, আমি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। ভাঁড়ামি করবার সময় আমার নেই। জাগো, বালিকা। তোমার কাছ থেকে এখন আমি কঠোর সমালোচনাপূর্ণ চিঠি আশা করছি; সোজাসুজি আঘাত কর, বেশ খানিকটা জাগানো চাই আমাকে।

ম্যাকভী-রা (Mac Veaghs) যখন এখানে ছিলেন, তখন আমি তাদের কোন খবর পাইনি। নিবেদিতা বা মিসেস বুলের কাছ থেকে সোজাসুজি কোন সংবাদ পাইনি, কিন্তু মিসেস সেভিয়ারের পত্র নিয়মিত পাই। তাঁরা সকলে এখন নরওয়েতে মিসেস বুলের অতিথি।

নিবেদিতা কবে ভারতে আসবে, কিম্বা আদৌ আসবে কিনা, জানি না।

এক অর্থে আমি এখন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি; 'আন্দোলন' কি রকম চলছে, তার অনেক কিছুরই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখি না; তবে 'আন্দোলন' জোরাল হচ্ছে—একজন লোকের পক্ষে সবকিছু খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়।

আহার ও নিদ্রার চেষ্টা ছাড়া এখন আর কিছুই করছি না, বাকী সময়টা শরীরের শুশ্রূষা করে কাটাই। প্রিয় মেরী, বিদায়; আশা করি এ জীবনে আমরা আবার কোথাও মিলিত হব; তবে দেখা হোক বা নাই হোক, আমি সতত তোমার স্নেহের ভ্রাতা।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৫৩৮*

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৯ অগষ্ট, ১৯০১

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

আমার শরীর ক্রমেই সুস্থ হচ্ছে, যদিও এখনও আমি খুবই দুর্বল। ... সুগার বা এলবুমেন নেই দেখে সকলেই অবাক। বর্তমান অস্বস্তি শুধু স্নায়বিক। যাই হোক, আমি ক্রমে সেরে উঠছি।

মা-ঠাকরুণ দয়া করে যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে আমি বিশেষ কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু মঠের সবাই বলছে যে, নীলাম্বরবাবুর বাড়ী, এমন কি গোটা বেলুড় গ্রামই এ মাসে ও পরের মাসে ম্যালেরিয়ায় ছেয়ে যায়। তারপর ভাড়াও অত্যধিক। সুতরাং মা-ঠাকরুণ যদি আসতে চান, তবে আমি তাঁকে এই পরামর্শ দিই যে, তিনি কলিকাতায় একটি ছোট বাড়ী ঠিক করুন। আমিও সম্ভবতঃ কলিকাতায় গিয়েই থাকব; কারণ বর্তমান শারীরিক দুর্বলতার উপর আবার ম্যালেরিয়া হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এখন সারদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের মত লই নাই। তারা দুজনেই কলিকাতায় আছে। এ দু-মাস কলিকাতায় স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল এবং খরচও অনেক কম।

ফল কথা, প্রভু তাঁকে যেরূপ চালান, তিনি সেরূপই চলবেন। আমরা শুধু প্রস্তাব করতে পারি; আমরা যা বলব, তা একেবারে ভুলও হতে পারে। তিনি যদি থাকার জন্য নীলাম্বরবাবুর বাড়ীই পছন্দ করেন, তবে ভাড়া ইত্যাদি আগে থেকেই ঠিক করে রেখ। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি তো এইটুকুই বুঝি।

আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জেনো। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৫৩৯*

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

ব্রহ্মানন্দ ও অপর সকলের মতামত জানা আবশ্যক হওয়ায়, এবং তারা সকলেই কলিকাতায় থাকায় তোমার শেষ পত্রের উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল।

সারা বছরের জন্য বাড়ী নেওয়ার সিদ্ধান্তটা ভেবে-চিন্তে করতে হবে। একদিকে যেমন এ মাসে বেলুড়ে ম্যালেরিয়া হবার ভয় আছে, অন্যদিকে তেমনি কলিকাতায় প্লেগের ভয়। তা ছাড়া কেউ যদি গাঁয়ের ভিতরে যাওয়া সম্বন্ধে সাবধান থাকে, তবে ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে যেতে পারে; কারণ নদীর ধারে ম্যালেরিয়া মোটেই নেই। প্লেগ এখনও নদীর ধারে আসেনি; আর প্লেগের এই প্রকোপ-কালে এ গাঁয়ে যে-কটা বাড়ী ছিল, সবই মাড়োয়ারীদের দ্বারা ভর্তি।

তা ছাড়া, সবচেয়ে বেশী তুমি কত ভাড়া দিতে পার তা জানাও, আমরা তদনুযায়ী বাড়ী দেখব। আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে, বাড়ীটি কলিকাতায় নেওয়া। আমি নিজে এখন কলিকাতায় বিদেশী বললেই হয়, তোমার পছন্দমত অন্যেরা দেখে দেবে। যত শীঘ্র সম্ভব এ দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পার ততই ভালঃ (১) মা বেলুড়ে থাকবেন, না কলিকাতায়? (২) যদি কলিকাতায় থাকেন, তবে ভাড়া কত এবং কোন্ পাড়ায় থাকা তাঁর পক্ষে ভাল? তোমাদের উত্তর পেলে এ কাজটা ঝট করে হয়ে যাবে।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখানে আমরা সবাই ভাল আছি। এক সপ্তাহ কলিকাতায় থেকে মতি ফিরে এসেছে। গত তিন দিন এখানে দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দুটি গরুর বাচ্চা হয়েছে।

—বি

৫৪০*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১

কল্যাণীয়া নিবেদিতা,

আমরা সকলেই সাময়িক আবেগে চলি—অন্ততঃ এ-কাজটার বেলায় তাই। আমি স্প্রিংটি (কাজের ঝোঁকটি) চেপে রাখতে চাই; কিন্তু এমন একটা কিছু ঘটে যায়, যার ফলে স্প্রিং অবিরত শব্দ করতে থাকে; আর তা তো দেখতেই পাচ্ছ—এই চিন্তা চলছে, স্মরণ হচ্ছে, লেখা হচ্ছে, আঁচড় কাটা হচ্ছে—আরও কত কিছু!

বর্ষার কথা বলতে গেলে বলতে হয় পূর্ণবেগে তা এসে গেছে, আর দিনরাত চলেছে মুষলধারে বর্ষণ, কেবল বৃষ্টি—বৃষ্টি—আর বৃষ্টি। নদী সব ফুলে উঠে দু-কূল ভাসিয়ে চলেছে, দীঘি-পুকুর সব ভরপুর।

মঠের জমিতে যে বর্ষার জল দাঁড়ায়, তার নিষ্কাশনের জন্য একটি গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এইমাত্র ফিরলাম। কোন কোন জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালাকার সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতে আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার (হরিণ)-টি মঠ থেকে পালিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের দিন-কয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন হাস্যরসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলছিলেন, 'মশায় এই কলিযুগে যখন জল-বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।'

একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোন প্রতিকার জানা না থাকায় একটি টবে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু কার্বলিক অ্যাসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল যে, হয় সেরে উঠবে, না হয় মরে যাবে; তা হংসীটা এখন ভাল আছে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫৪১*

প্রিয় নিবেদিতা,
… জীবনের স্রোতে উঠছি, পড়ছি। আজ যেন কতটা অবতরণের পথে …।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫৪২*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০১

প্রিয় জো,
Abatement—কথাটার ব্যাখ্যাসমেত যে চিঠিখানা গেছে, তা তুমি ইতোমধ্যেই পেয়েছ নিশ্চয়। আমি নিজে সে চিঠি লিখিনি, আর টেলিগ্রামও পাঠাইনি। আমি তখন এত অসুস্থ ছিলাম যে, দুটোর একটাও করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর থেকে শয্যাগত আছি বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস—এই আর একটি উপসর্গ জোটায় এখন আমি আগের চেয়েও খারাপ। এ-সব বিষয়ে আমি লিখতুম না' কিন্তু কেউ কেউ দেখছি সব খুঁটিনাটি চায়।

যা হোক, তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ জেনে বেশ আনন্দিত হলাম। আমার ক্ষমতায় যতটা কুলায়, আমি তাঁদের খাতির-যত্ন করব। খুব সম্ভব আমি তখন মান্দ্রাজে থাকব। আমি ভাবছি যে, আগামী সপ্তাহে কলিকাতা ছাড়ব এবং ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাব।

তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখা সম্ভব হবে কিনা, জানি না। আমি ম্লেচ্ছদের খাবার খেয়েছি বলে আমাকেই ঢুকতে দেবে কিনা, জানি না। লর্ড কার্জনকে ভেতরে যেতে দেয়নি।

যা হোক, আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা আমি তোমার বন্ধুদের জন্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। মিস মূলার কলিকাতায় আছেন, অবশ্য তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি।

সতত স্নেহশীল
তোমাদের বিবেকানন্দ

৫৪৩*

গোপাললাল ভিলা
বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট
৯ ফেব্রুআরী, ১৯০২

প্রিয় স্বরূপ,
মিসেস বুলের কণ্ঠাস্থি (Collar-bone)-র অবস্থা জেনে বড় কষ্ট হল। আশা করি চলে-ফিরে বেড়াবার মত শক্তি তিনি পাবেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে। চারুর চিঠি সম্বন্ধে উত্তর এই, তাকে বলবে সে যেন 'ব্রহ্মসূত্র' নিজে নিজে পড়ে। 'ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ আছে'—চারুর এ-কথার অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগুলিকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলেছে, আর সেগুলিকে লক্ষ্য করেই বলা উচিত; ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর তো শুধু শেষ ভাষ্যকার। বৌদ্ধসাহিত্যে অবশ্য বেদান্তের উল্লেখ আছে, আর বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা তো অদ্বৈতপন্থী। বৌদ্ধ অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটি নাম 'অদ্বয়বাদী' বলে উল্লেখ করলেন কেন? চারু লিখেছে, উপনিষদে 'ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই!! কি আহাম্মকি!

আমার মতে বৌদ্ধধর্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর। মায়াবাদ ঋক্‌সংহিতার মতই প্রাচীন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে 'মায়া' শব্দ আছে, সেটি 'প্রকৃতি'র ভাব থেকে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে। আমার মতে ঐ উপনিষদ্ অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন আলো পেয়েছি। আর আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছিঃ

(১) নানা আকারের শিবপূজা বৌদ্ধদের আগেই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধগণ শৈবদের স্থানগুলি দখল করবার চেষ্টা করেছিল,

কিন্তু তাতে অকৃতকার্য হয়ে সেই আবেষ্টনীরই মধ্যে নিজেদের নূতন নূতন স্থান করে নিয়েছিল—যেমন বুদ্ধগয়ায় ও সারনাথে।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাতে (যেমন ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে মোটেই লক্ষ্য করা হয়নি, ওটা কেবল পূর্বপ্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাস করতে গিয়েছিলেন, তাতেই ঐ স্থানের পূর্বাস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

(৪) আগে থেকেই গয়াতে পিতৃপুরুষের উপাসনা প্রচলিত ছিল, আর বৌদ্ধেরা হিন্দুদের কাছ থেকে পদচিহ্ন-উপাসনার অনুকরণ করেছিল।

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য এইঃ এটি শিবোপাসনার একটি প্রধান স্থান ছিল, ইত্যাদি কথা প্রাচীনতম লিপি প্রভৃতি থেকে প্রমাণিত হয়।

আমি বুদ্ধগয়া ও সাহিত্য থেকে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছি। চারুকে বল, সে নিজে নিজে পড়ুক, মূর্খদের মত দ্বারা যেন প্রভাবিত না হয়।

আমি এখন বারাণসীতে বেশ ভালই আছি। যদি ধীরে ধীরে এ ভাবেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। তবে বেশ লাভই হবে।

বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। আমি এ বিষয়ে একটু-আধটু আলো দেখতে পেয়েছি, তা বিশেষ ভাবে বুঝবার আগেই আমার শরীর যেতে পারে; কিন্তু কি ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে, তা আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব; তোমাকে ও তোমাদের গুরুভাইদের তা কার্য পরিণত করতে হবে। তুমি আমার বিশেষ ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫৪৪*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

গোপাললাল ভিলা, বেনারস ক্যান্টনমেন্ট
১০ ফেব্রুআরী ১৯০২

মাতা ও কন্যাকে ভারতে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। জো-র সৌজন্যে মান্দ্রাজের একখানি সংবাদপত্র পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি; নিবেদিতা মান্দ্রাজে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে, তা নিবেদিতা ও মান্দ্রাজ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। তার ভাষণ যথার্থই সুন্দর হয়েছিল।

সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে—আশা করি, আপনি এখন ভালভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এবং নিবেদিতা বিশ্রাম নিচ্ছে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাঙলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়ারের মত ঘরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়।

প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সেই শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম! তবে এখনও যে ক-টি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও। ব্রহ্মানন্দ তার ব্যবস্থাদি করবেন; আপনাদের কাজ শুধু কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণ।

ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখবার অভিপ্রায় নিয়ে। বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব ছিল—গতকাল এই শহরে এসেছে। শিল্প সম্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ; লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করেছে। মিঃ ওকাকুরার চলে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে শিল্পময় ভারত (অর্থাৎ যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার সে-ই উপযুক্ত লোক এবং শিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরার নির্দেশে সে নিশ্চয়ই

বিশেষ উপকৃত হবে। ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও খোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী, তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেরূপ আর একটি তৈরী করাতে। কি করা যায় ভেবে ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি আসে, সে সেটা করে দিতে রাজী তো হয়েছেই, আবার বলেছে, ওকাকুরার পছন্দ ওই জিনিষটির চেয়ে বহুগুণ ভাল খোদিত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েক-শ টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে।

সেই অপূর্ব পুরাতন শৈলীতে প্রাচীন চিত্রাবলীতে ও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন রীতিতে আঁকতে পারে, এরূপ একটি মাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি মটর-দানার উপর শিকারের একটি সম্পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন—খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ একেবারে নিখুঁত কাজ। পর্যটন শেষ করে ওকাকুরা আবার আশা করি এই শহরে ফিরে আসবেন, তখন এই ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি কিছু কিছু দেখে যাবেন।

মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে নিরঞ্জন গিয়েছে। তিনি জাপানী বলে কোন মন্দিরে তাঁর প্রবেশ করা নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্যান্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন।

তারা তাঁকে শিবের প্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে দিয়েছে। মিসেস এনি বেস্যাণ্ট একবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেচারী যদিও খালি পায়ে শাড়ী পরে পুরোহিতদের সামনে দীনহীনভাবে ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন, তথাপি তাঁকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আমাদের বড় বড় মন্দিরগুলিরকোনটাতেই বৌদ্ধদের অহিন্দু বলে মনে করা হয় না।

আমার এখনও কিছু স্থির হয়নি; শীঘ্রই এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারি। শিবানন্দ ও ছেলেরা (শিষ্যরা) আপনাকে তাদের স্বাগত, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাচ্ছে।

আপনার চিরদিনের
অশেষ স্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

পত্রাবলী ৫৪৫-৫৫২

৫৪৫

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

গোপাললাল ভিলা, বেনারস ক্যান্টনমেন্ট
১২ ফেব্রুআরী, ১৯০২

কল্যাণবরেষু,
তোমার পত্রে সবিশেষ জানিয়া আনন্দিত হলাম। নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে যা আমার বলবার ছিল, তাকে লিখেছি। বলবার এই যে, তার যা ভাল বিচার হয়, করবে।

আর কোন বিষয়ের মতামত আমায় জিজ্ঞেস কর না। তাতে আমার মাথা খারাপ হয়। তুমি কেবল ঐ কাজটা করে দিও—এই পর্যন্ত। টাকা পাঠিয়ে দিও; কারণ উপস্থিত দু-চার টাকা মাত্র আছে।

কানাই মাধুকরী খায়, ঘাটে জপ করে, রাত্রে এসে শোয়; ন্যাদা poor man's work (গরীদের সেবা) করে; রাত্রে এসে শোয়। খুড়ো (Okakura) আর নিরঞ্জন আগ্রায় গেছে; আজ তাদের পত্র আসতে পারে।

যেমন প্রভু করাবেন করে যেও। এদের-ওদের মতামত কি? সকলকে আমার ভালবাসা জানিও এবং ছেলেদের। ইতি

বিবেকানন্দ

৫৪৬*

[ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত]

বেনারস
১২ ফেব্রুআরী, ১৯০২

সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা ...।

যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে কিম্বা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্টভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

বিবেকানন্দ

৫৪৭

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

গোপাললাল ভিলা, বেনারস ছাউনী

১৮ ফেব্রুআরী, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাল তোমায় যে পত্র লিখেছি টাকার প্রাপ্তিস্বীকার সহিত, তাহা এতক্ষণে নিশ্চিত পেয়েছ। আজ এ পত্র লেখবার প্রধান উদ্দেশ্য ... সম্বন্ধে। তুমি পত্রপাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে। ... তারপর রোগ কি, গয়ায় কেমন ছিল ইত্যাদি; ... সুযোগ্য ডাক্তার ডাকিয়ে রোগটি বেশ নির্ণয় করে নেবে। তারপর রামবাবুর বড় মেয়ে বিষ্টুমোহিনী এখন কোথায়?—সে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে ...।

রোগের চেয়ে ভাবনা বড়! দু-দশ টাকা যা দরকার হয় দেবে। যদি একজনের মনে—এ সংসার নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি—বাকী সব ঘোড়ার ডিম।

অতি শীঘ্র জবাব দেবে। খুড়ো (Okakuraবা অক্রূর খুড়ো) আর নিরঞ্জন গোয়ালিয়র হতে পত্র লিখেছে। ... এখন এথায় ক্রমে গরম পড়ে আসছে। বোধগয়া অপেক্ষা এথায় শীত অধিক ছিল। ... নিবেদিতার সরস্বতীপূজার ধুমধাম শুনে বড়ই খুশী হলাম। নিবেদিতা শীঘ্রই স্কুল খোলে খুলুক। ... পাঠ, পুজো, পড়াশুনা সকলের যাতে হয়, সে-চেষ্টা করবে। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে।

বিবেকানন্দ

৫৪৮

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

গোপাললাল ভিলা, বেনারস
২১ ফেব্রুআরী, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম। ... মা, দিদিমা যদি আসতে চান পাঠিয়ে দিও। এই প্লেগ আসবার সময়টা কলিকাতা হতে সরে এলেই ভাল। এলাহাবাদে বড় প্লেগ চলেছে। এবার কাশীতে আসবে কিনা জানি না। তবে প্লেগ গেল বৎসর এই সময়ে কাশীতে এসেছিল। ... মিসেস বুলকে আমার নাম করে বল যে, ইলোরা-ফিলোরা মহা কষ্টের পথ এবং ভারী গরম। তাঁর এত tired (ক্লান্ত) শরীর যে, ভ্রমণে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। খুড়োর (Okakura) ক-দিন হল চিঠিপত্র পাইনি। অজন্তা গেছে—এই খবর। মহান্তও কোন খবর দেয় নাই। তবে রাজা প্যারীমোহনের পত্রের জবাবে যদি দেয় ...।

নেপালের minister (মন্ত্রী)-এর ব্যাপারটা সবিশেষ লিখবে। মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা, আশীর্বাদাদি দিবে; আর তুমি, বাবুরাম প্রভৃতি সকলে আমার নমস্কার ও ভালবাসা ইত্যাদি জানবে। গোপালদাদা চিঠি পেয়েছেন কিনা? ছাগলটাকে একটু দেখো। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ছেলেরা সকলে সাষ্টাঙ্গ জানাচ্ছে।

৫৪৯

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

গোপাললাল ভিলা, বেনারস
২৪ ফেব্রুআরী, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার প্রেরিত একটি আমেরিকান ছোট পার্শেল আজ প্রাতঃকালে পেলুম। রেজেষ্ট্রি-করা যে পত্রের কথা লিখেছ, তা কেন, কোন পত্রই পাইনি। নেপালওয়ালা এল কিনা, কি বৃত্তান্ত, এ-সব তো কিছুই জানতে পারলুম না। ... একখানা চিঠি লিখতে হলেই এত হাঙ্গাম আর দেরী!! ... এখন হিসাবটা পেলেই যে বাঁচি! তাও আবার ক-মাসে পাই!

বিবেকানন্দ

৫৫০*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২১ এপ্রিল, ১৯০২

প্রিয় জো,

মনে হচ্ছে যেন জাপান যাবার সঙ্কল্পটা ফেঁসে গেল। মিসেস বুল চলে গেলেন; তুমিও যাচ্ছ। আমার সঙ্গে জাপানীদের তেমন পরিচয় নেই।

সদানন্দ নেপালীদের সঙ্গে নেপালে গেছে। কানাইও গেছে; মার্গট এই মাস শেষ হওয়ার আগে যেতে পারলে না বলে ক্রিষ্টিন আগে যাত্রা করতে পারলে না।

লোকে বলে, আমি বেশ আছি; কিন্তু এখনও বড় দুর্বল, আর জল-পান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু রয়েছে যে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে অনেকটা উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের ফোলা একেবারে গেছে।

লেডি বেটি, মিঃ লেগেট, এলবার্টা ও হলিকে আমার অসীম ভালবাসা জানাবে। খুকুর উপর আমার আশীর্বাদ তো তার জন্মের আগে থেকেই আছে, আর চিরকাল থাকবে।

মায়াবতী তোমার কেমন লাগল? এ-বিষয়ে আমার এক ছত্র লিখো।

চিরস্নেহাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৫৫১*

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৫ মে, ১৯০২

প্রিয় জো,

মাদাম কালভেকে লিখিত পত্রখানি পাঠালাম।

আমি অনেকটা ভালই আছি; অবশ্য যতটা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় কিছুই নয়। নিরিবিলি থাকার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে—আমি চিরকালের মত অবসর নেব, আর কোন কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করব।

জো, তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক—তুমি দেবতার মত আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করছ।

চিরস্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫৫২*

[মিসেস ওলি বুলকে লিখিত]

মঠ
১৪ জুন, ১৯০২

মা,
আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানির উত্তর আরও আগে দিতে পারলে ভাল হত।

ডাক্তার জেন্‌সের সম্বন্ধে একখানি বই আমার কাছে এসেছে, কিন্তু কিছু লিখবার নির্দেশসহ কোন পত্র সঙ্গে না থাকায় আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করতে সাহস হল না। যা হোক, আপনার বর্তমান অভিপ্রায় অনুসারে আমি মিঃ ফক্সকে যথাসম্ভব সত্বর লিখব।

আমি এক রকম আছি; আর সব ভাল। নিবেদিতা পাহাড়ে আছে। ওকাকুরা শহরে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের অতিথি হয়েছেন, একদিন মঠে এসেছিলেন; কিন্তু আমি বাইরে গিয়েছিলাম। আশা করি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় জানতে পারব।

(জাপানী) যুবক হেরির এখানে জ্বর হয়েছিল; সে দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে উঠে কিছু দিনের জন্য ওকাকুরার সঙ্গে গেছে। তার ধর্মভাব দেখেই সবাই তাকে ভালবাসে। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি খুব উচ্চ এবং তার অভিলাষ এই যে, জাপানে সে খাঁটি ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপন করবে। কিন্তু আমার মনে হয় কোন জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সর্বপ্রথম বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জন করতে হবে। রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুগণ বিবাহবন্ধকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য মনে করেন, তাই তাঁরা ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তিমান্ পবিত্র বহু নরনারী জন্ম দিতে পেরেছেন। আরবগণের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি অথবা বলপূর্বক অধিকারের ব্যাপার মাত্র; ইচ্ছামাত্র সেই বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে। ফলে কুমারী কিম্বা ব্রহ্মচারীর কোন আদর্শ তাদের মধ্যে বিকশিত হতে পারেনি।

আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এমন সব জাতের হাতে গিয়ে পড়েছে, যাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় তারা সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার করে তুলেছে। সুতরাং যতদিন না জাপানীদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালবাসা ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়ে উঠছে, ততদিন তাদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উদ্ভব কেমন করে সম্ভব হবে, তা আমি বলতে পারি না। আপনি যেমন বুঝতে পেরেছেন যে, সতীত্বই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনি আমার দৃষ্টিও এ বিষয়ে খুলে গেছে যে, আমরণ সাধুচরিত্র জনকয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হলে জনসাধারণের একটা বৃহত্তম অংশকেও এই সুমহান্ পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক।

অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম; কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। মেরী লুই এখানে শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে এসেছে এবং শুনতে পাচ্ছি যে, জনকয়েক ধনী তাকে লুফে নিয়েছে। সে যেন এবারে প্রচুর অর্থ পায়—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। 'আমাকে যে যেভাবে উপাসনা করে, আমি সে-ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি।'—সে টাকা চেয়েছিল; ভগবান্ তাকে প্রচুর টাকা দিন।
৪২

আপনার চিরস্নেহাবদ্ধ সন্তান
তোমাদের বিবেকানন্দ

… পাশ্চাত্যের এই সমস্ত জাঁকজমক নিতান্ত নিষ্ফল, শুধু আত্মার বন্ধনস্বরূপ। আমার জীবন এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাবে জগতের নিষ্ফলতা কখনও অনুভব করিনি। ভগবান্ সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—এই আমার চিরপ্রার্থনা। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

রামায়ণ

[১৯০০ খ্রীঃ ৩১ জানুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায় ‘সেক্সপীয়র ক্লাবে’ প্রদত্ত বক্তৃতা]

সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য আছে; অবশ্য আরও শত শত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য বিদ্যমান। যদিও প্রায় দুই সহস্র বর্ষের উপর হইল সংস্কৃত আর কথোপকথনের ভাষা নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আমি আপনাদের সমক্ষে সেই রামায়ণ ও মহাভারত নামক অতি প্রাচীন কাব্যদ্বয়ের বিষয় বলিতে যাইতেছি। ঐ দুইটিতেই প্রাচীন ভারতবাসিগণের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের মধ্যে আবার রামায়ণ প্রাচীনতর, উহাকে রামের জীবনচরিত বলা যায়। রামায়ণের পূর্বেও ভারতে পদ্য-সাহিত্য ছিল। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ ভাগ একপ্রকার ছন্দে রচিত; কিন্তু ভারতে সর্বসম্মতিক্রমে এই রামায়ণই আদিকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

রামায়ণের কবির নাম মহর্ষি বাল্মীকি। পরবর্তী কালে অপরের রচিত অনেক আখ্যানমূলক কবিতা, ঐ প্রাচীন কবি বাল্মীকির পরিচিত নামের সহিত জড়িত হইয়াছে। শেষে এমন দেখা যায় যে, অনেক শ্লোক বা কবিতা তাঁহার রচিত না হইলেও সেগুলি তাঁহারই বলিয়া মনে করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকিলেও আমরা এখন উহা যে আকারে পাইতেছি, তাহাও অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত, জগতের সাহিত্যে উহার তুলনা নাই।

* * *

অতি প্রাচীন কালে এক স্থানে জনৈক যুবক বাস করিত। সে কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না। তাহার শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং ঐ দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির ভরণপোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন যায়—দৈবক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; দস্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবর্ষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কেন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জান না দস্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কি জন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ?’ দস্যু উত্তরে বলিল, ‘আমি এই দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি।’ দেবর্ষি বলিলেন, ‘আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তুমি যাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ, তাহারা তোমার এই পাপের ভাগ লইবে।’ দস্যু বলিল, ‘নিশ্চয়ই, তাহারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে।’ তখন দেবর্ষি বলিলেন, ‘আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও, তাহা হইলে আমি আর পলাইতে পারিব না। তার পর তুমি বাড়ি গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইসঃ তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ করে, তেমনি তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিনা?’ দেবর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া দস্যু তাঁহাকে সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পৌঁছিয়াই প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞেসা করিল, ‘পিতা, আমি কিরূপে আপনাকে ভরণপোষণ করি, তাহা কি আপনি জানেন?’ পিতা উত্তর দিলেন, ‘না আমি জানি না।’ তখন পুত্র বলিল, ‘আমি দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করি।’ পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘কি! তুই এইরূপে ঘোরতর পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস্, এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তুই পতিত, তোকে আজ হইতে ত্যাজ্য পুত্র করিলাম।’ তখন দস্যু তাহার মাতার নিকট গিয়া তাঁহাকেও ঐ প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, তৎসম্বন্ধে মাতাও পিতার ন্যায় নিজ অজ্ঞতা জানাইলে দস্যু তাঁহাকে নিজের দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা ঐ কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘উঃ, কি ভয়ানক কথা!’ দস্যু তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, ‘শোন মা, স্থির হও। ভয়ানকই হউক আর যাহাই হউক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে—তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে?’ মাতা তখন দশ হাত পিছাইয়া অম্লান বদনে বলিলেন, ‘কেন, আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন? আমি তো কখনও দস্যুবৃত্তি করি নাই।’ তখন সে তাহার পত্নীর নিকট গমন করিয়া তাহাকেও পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; বলিল, ‘শোন প্রিয়ে, আমি একজন দস্যু; অনেক কাল ধরিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছি, আর সেই দস্যুবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারাই তোমাদের সকলের ভরণপোষণ করিতেছি; এখন আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি কি আমার পাপের অংশ লইতে প্রস্তুত?’ পত্নী মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল, ‘কখনই নহে। তুমি আমার ভর্তা, তোমার কর্তব্য আমার ভরণপোষণ করা। তুমি যেরূপেই আমার ভরণপোষণ কর না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব?’

দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিলঃ এই তো দেখিতেছি সংসারের নিয়ম! যাহারা আমার পরম আত্মীয়, যাহাদের জন্য আমি এই দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা পর্যন্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে দেবর্ষিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সকল কথা তাহার নিকট বর্ণনা করিল। পরে সে কাতরভাবে তাঁহার নিকট বলিল, ‘প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন, বলে দিন—আমি কি করিব।’ তখন দেবর্ষি তাহাকে বলিলেন, ‘বৎস, তুমি এই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর। তুমি তো দেখিলে পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে না, অতএব ঐ পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে; আর যে-দিন তুমি কপর্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। একমাত্র যিনি সুখদুঃখ,

পাপপুণ্য সকল অবস্থাতেই আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তুমি তাঁহারই উপাসনা কর। তিনি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ যথার্থ ভালবাসায় বেচাকেনা নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুক।'

এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি তাহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দস্যু তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দিবারাত্র প্রার্থনায় ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্যুর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহ বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে দস্যু শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, 'মহর্ষি ওঠ।' দস্যু চমকিত হইয়া বলিল, 'মহর্ষি কে? আমি তো দস্যুমাত্র।' গম্ভীরকণ্ঠে আবার উচ্চারিত হইলঃ তুমি এখন আর দস্যু নহ। তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। এখন তুমি 'বাল্মীকি' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলে যে, তোমার দেহের চারিদিকে যে বল্মীকস্তূপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তুমি লক্ষ্য কর নাই।—এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।

এই মহর্ষি বাল্মীকি কিরূপে কবি হইলেন এখন সেই কথা বলিতেছি। একদিন মহর্ষি পবিত্র ভাগীরথীসলিলে অবগাহনের জন্য যাইতেছেন, দেখিলেন এক ক্রৌঞ্চমিথুন পরস্পরকে চুম্বন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহর্ষি ক্রৌঞ্চমিথুনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই এই আনন্দের দৃশ্যটি শোকদৃশ্যে পরিণত হইল, কোথা হইতে একটা তীর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। সেই তীরে বিদ্ধ হইয়া পুংক্রৌঞ্চটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ক্রৌঞ্চী কাতরভাবে তাহার সঙ্গীর মৃতদেহের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। মহর্ষির অন্তর এই শোকদৃশ্য দেখিয়া পরম করুণার্দ্র হইল। কে এই নিষ্ঠুর কর্ম করিল, তাহা জানিবার জন্য তিনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন।

তখন তাঁহার মুখ হইতে যে শ্লোক নির্গত হইল তাহার ভাবার্থঃ

ওরে ব্যাধ, তুই কি পাষণ্ড, তোর একবিন্দুও দয়ামায়া নাই! ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্তের জন্যও হত্যাকার্যে বিরত নহে!

শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই মহর্ষির মনে উদিত হইল, 'এ, কি? এ আমি কি উচ্চারণ করিতেছি! আমি তো কখনও এমন ভাবে কিছু বলি নাই।' তখন তিনি এক বাণী শুনিতে পাইলেনঃ বৎস ভীত হইও না, তোমার মুখ হইতে এইমাত্র যাহা বাহির হইল, ইহার নাম 'শ্লোক'। তুমি জগতের হিতের জন্য এইরূপ শ্লোকে রামের চরিত বর্ণনা কর।—এইরূপে কবিতার প্রথম আরম্ভ হইল। আদিকবি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক করুণাবশে স্বতই নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরম মনোহর কাব্য রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন।

* * *

ভারতে অযোধ্যা নামে এক প্রাচীন নগরী ছিল, উহা এখনও বর্তমান। এখনও ভারতের যে প্রদেশে ঐ নগরীর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা প্রদেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে ভারতের মানচিত্রে ঐ প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহাই সেই প্রাচীন অযোধ্যা। অতি প্রাচীন কালে সেখানে দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তিন রাণী ছিলেন, কিন্তু কোন রাণীরই সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তাই ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু আচারের অনুবর্তী হইয়া রাজা ও রাণীগণ সন্তানকামনায় ব্রতোপবাস, দেবারাধনা প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের চারটি পুত্র জন্মিল, সর্বজ্যেষ্ঠ রাম। ক্রমে এই রাজপুত্রগণ মনোহর কাব্য 'রামায়ণ' অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন।

জনক নামে আর একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার সীতা নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সীতাকে একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল, অতএব সীতা পৃথিবীর কন্যা ছিলেন, জনক-জননী ছাড়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। প্রাচীন সংস্কৃতে 'সীতা' শব্দের অর্থ হলকৃষ্ট ভূমিখণ্ড। তাঁহাকে ঐরূপ স্থানে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এরূপ অলৌকিক জন্মের কথা অনেক পাঠ করা যায়। কাহারও পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না; কাহারও মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না। কাহারও বা পিতামাতা কেহই ছিলেন না, কাহারও জন্ম যজ্ঞকুণ্ড হইতে, কাহারও বা শস্যক্ষেত্রে ইত্যাদি ইত্যাদি—ভারতের পুরাণে এ-সকল কথা আছে।

পৃথিবীর দুহিতা সীতা নিষ্কলঙ্কা ও পরম শুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। রাজর্ষি জনকের দ্বারা তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে রাজর্ষি তাঁহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভারতে প্রাচীনকালে স্বয়ম্বর নামক এক প্রকার বিবাহপ্রথা ছিল—তাহাতে রাজকন্যাগণ নিজ নিজ পতি নির্বাচন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সকলে সমবেত হইলে রাজকন্যা বহুমূল্য বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া বরমাল্যহস্তে সেই রাজপুত্রগণের মধ্য দিয়া গমন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভাট যাইত। সে পাণিগ্রহণার্থী প্রত্যেক রাজকুমারের গুণাগুণ বংশমর্যাদাদি কীর্তন করিত। রাজকন্যা যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এই সকল স্বয়ম্বরস্থলে কখনও কখনও ভাবী বরের বিদ্যা-বুদ্ধি-বল পরীক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ পণ নির্দিষ্ট থাকিত।

অনেক রাজপুত্র সীতাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। 'হরধনু' নামক এক প্রকাণ্ড ধনু যে ভাঙিতে পারিবে, সীতা তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, এ স্বয়ংবরে ইহাই ছিল পণ। সকল রাজপুত্রই এই বীর্যপরিচায়ক কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। অবশেষে রাম ঐ দৃঢ় ধনু হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। হরধনু ভগ্ন হইলে সীতা রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মহামহোৎসবে রাম-সীতার পরিণয় সম্পন্ন হইল। রাম বধূকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন।

কোন রাজার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাজার দেহান্তে যাহাতে সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, সেজন্য প্রাচীন ভারতে রাজার জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রের বিবাহের পর রাজা দশরথ ভাবিলেনঃ আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, রামও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমগ্র অযোধ্যা এই অভিষেক-সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে দশরথের প্রিয়তমা মহিষী কৈকেয়ীর জনৈকা পরিচারিকা—বহুকালপূর্বে রাজা রাণীকে যে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। এক সময়ে কৈকেয়ী রাজা দশরথকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যে-কোন দুইটি বর প্রার্থনা কর, যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ উহা দান করিব!' কিন্তু কৈকেয়ী তখন রাজার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ঐ বরের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুষ্টস্বভাবা দাসী তাঁহাকে এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, রাম সিংহাসনে বসিলে তাঁহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না; বরং তাঁহার পুত্র ভরত রাজা হইলে তঁহার সুখের অন্ত থাকিবে না। এইরূপে সে কৈকেয়ীর হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিল। দাসীরা পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণায় রাণীর হৃদয়ে প্রবল ঈর্ষার উদ্রেক হইল, তিনি অবশেষে ঈর্ষাবশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তখন সেই দুষ্টা দাসী রাজার বরদান-অঙ্গীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল, 'সেই অঙ্গীকৃত বর-প্রার্থনার ইহাই উপযুক্ত সময়। তুমি এক বরে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা কর।'

বৃদ্ধ রাজা রামচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এদিকে কৈকেয়ী যখন রাজার নিকট ঐ দুইটি অনিষ্টকর বর প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বুঝিলেন, তিনি কখনও নিজ সত্য ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাম আসিয়া তাঁহাকে এই উভয়সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। রাম পিতৃসত্য রক্ষার জন্য স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্বক রাজ্যত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে রাম চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিলেন, সঙ্গে চলিলেন প্রিয়তমা পত্নী সীতা ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ। ইঁহারা কিছুতেই রামের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না।

আর্যগণ সে-সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিদিগকে 'বানর' নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 'বানর' অর্থাৎ বন্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান্ ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্যগণ কর্তৃক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ-অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলেন। যখন সীতা রামের সহিত যাইতে চাহিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাজকন্যা হইয়া কিরূপে এই সকল কষ্ট সহ্য করিবে? অরণ্যে কখন কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই। তুমি কিরূপে সেখানে আমার সঙ্গে যাইবে?' সীতা তাহাতে উত্তর দেনঃ আর্যপুত্র যেখানে যাইবেন, সীতাও সেখানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আপনি আমাকে 'রাজকন্যা', 'রাজবংশে জন্ম' এ-সব কথা কি বলিতেছেন! আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।—অগত্যা সীতা সঙ্গে চলিলেন। আর রামগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের মুহূর্তমাত্র বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং তিনিও কিছুতেই রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাঁহারা চিত্রকূট পর্বতে কিছুদিন বাস করিলেন। পরে গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে গমন করিয়া গোদাবরীতীরবর্তী পরম রমণীয় পঞ্চবটী প্রদেশে কুটীর বাঁধিয়া তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগয়া করিতেন ও ফলমূল আহার করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। এইরূপ কিছুকাল বাস করিবার পর একদিন সেখানে এক রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল, সে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী। যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে রামের দর্শন পাইল এবং তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। কিন্তু রাম মনুষ্যমধ্যে পরম শুদ্ধস্বভাব ছিলেন, তা-ছাড়া তিনি বিবাহিত; সুতরাং রাক্ষসীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। রাক্ষসী প্রতিহিংসাবশতঃ তাহার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়া রামভার্যা পরমাসুন্দরী সীতার বিষয় তাহাকে সবিস্তারে জানাইল।

মনুষ্যমধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা বীর্যবান্ ছিলেন। রাক্ষস, দৈত্য, দানব, কাহারও এত শক্তি ছিল না যে, বাহুবলে রামকে পরাস্ত করে। সুতরাং সীতাহরণের জন্য রাবণকে মায়া অবলম্বন করিতে হইল। সে অপর এক রাক্ষসের সহায়তা গ্রহণ করিল। সেই রাক্ষস পরম মায়াবী ছিল। রাবণের অনুরোধে সে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট মনোহর নৃত্য অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা ঐ মায়ামৃগের রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য ঐ মৃগটিকে ধরিয়া আনিতে রামকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মৃগটিকে ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন কুটীরের চতুর্দিকে একটি মন্ত্রপূত গণ্ডী কাটিয়া সীতাকে বলিলেন, 'দেবী, আমার বোধ হইতেছে—আজ আপনার কিছু অশুভ ঘটিতে পারে। অতএব আপনাকে বলিতেছি, আপনি আজ কোনক্রমে এই মন্ত্রপূত গণ্ডীর বাহিরে যাইবেন না।' ইতোমধ্যে রাম সেই মায়ামৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন, সেই মৃগও তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে কুটীরে এক গভীর আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল—যেন রাম চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'লক্ষ্মণ ভাই, এস,

আমায় রক্ষা কর।' সীতা শুনিয়া অমনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ তুমি অবিলম্বে বনমধ্যে গমন করিয়া আর্যপুত্রকে সাহায্য কর।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'এ তো রামচন্দ্রের স্বর নহে।' কিন্তু সীতার বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে রামের অন্বেষণে যাইতে হইল। লক্ষ্মণ যেমন বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি রাক্ষসরাজ রাবণ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া কুটীরের সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সীতা বলিলেন, 'আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার স্বামী এখনই ফিরিবেন; তিনি আসিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিব।' সন্ন্যাসী বলিল, 'শুভে, আমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, অতএব কুটীরে যাহা কিছু আছে, এখনই আমাকে তাহা প্রদান কর।' এই কথায় সীতা আশ্রমে যে ফলমূল ছিল সেগুলি আনিয়া ভিক্ষুককে গণ্ডীর ভিতরে আসিয়াই তাহাকে লইতে বলিলেন। কিন্তু কপট ভিক্ষুক তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—ভিক্ষাজীবীর নিকট তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই, অতএব গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট আসিয়া অনায়াসে ভিক্ষা দিতে পারেন। ভিক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় সীতা যেমনি গণ্ডীর বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই কপট সন্ন্যাসী নিজ রাক্ষসদেহ পরিগ্রহণ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বারা বলপূর্বক ধারণ করিল এবং নিজ মায়ারথ আহ্বান করিয়া তাহাতে রোরুদ্যমানা সীতাকে বলপর্বক বসাইয়া তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। আহা! সীতা তখন নিতান্ত নিঃসহায়া, এমন কেহ সেখানে ছিল না, যে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে। যাহা হউক, রাবণের রথে যাইতে যাইতে সীতা নিজ অঙ্গ হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতাকে তাহার নিজ রাজ্য লঙ্কায় লইয়া গেল, সীতাকে তাহার মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাঁহাকে সম্মত করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সীতা সতীত্ব-ধর্মের সাকার বিগ্রহ ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিলেন না। রাবণ সীতাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছায়, যতদিন না তিনি তাহার পত্নী হইতে স্বীকৃত হন, ততদিন তাহাকে দিবারাত্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, সেখানে সীতা নাই, তখন তাহাদের শোকের আর সীমা রইল না। সীতার কি দশা হইল, তাঁহারা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন দুই ভ্রাতা মিলিয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনই সন্ধান পাইলেন না। অনেক দিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর একদল 'বানরের' সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের মধ্যে দেবাংশসম্ভূত হনুমানও ছিলেন। আমরা পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রামের পরম বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া সীতা-উদ্ধারে রামকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত গভীর ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও তাঁহাকে প্রভুর আদর্শ সেবকরূপে পূজা করিয়া থাকেন। আপনারা দেখিতেছেন, 'বানর' ও 'রাক্ষস' শব্দে দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইরূপে অবশেষে 'বানর'গণের সহিত রামের মিলন হইল। তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, আকাশ দিয়া একখানি রথ যাইতে তাহারা দেখিয়াছিল, তাহাতে একজন 'রাক্ষস' বসিয়াছিল, সে এক রোরুদ্যমানা পরমাসুন্দরী রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল; আর যখন রথখানি তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া যায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজগাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিকট ফেলিয়া দেন। এই বলিয়া তাহারা রামকে সেই অলঙ্কার দেখাইল। প্রথমে লক্ষ্মণই সেই অলঙ্কার লইয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহার হস্ত হইতে অলঙ্কারটি লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা সীতার বলিয়া চিনিলেন। ভারতে অগ্রজের পত্নীকে এতদূর ভক্তি করা হইত যে, লক্ষ্মণ সীতার বাহু বা গলদেশের দিকে কখনও চাহিয়া দেখেন নাই, সুতরাং বানরগণ-প্রদর্শিত অলঙ্কারটি সীতার কণ্ঠহার ছিল বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। এই আখ্যানটিতে ভারতের প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়।

সেই সময় বানর-রাজ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের বিবাদ চলিতেছিল। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। রাম সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে সুগ্রীবের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন। সুগ্রীব এই উপকারের কৃতজ্ঞতা- স্বরূপ রামকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব সর্বত্র বানর সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে হনুমান এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াও সীতার কোন সন্ধান পাইলেন না।

রাক্ষসরাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জয় করিয়াছিল। সে জগতের বহু সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়া বলপূর্বক তাহার উপপত্নী করিয়াছিল। হনুমান ভাবিতে লাগিলেন, 'সীতা কখনও তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারেন না। ওরূপ স্থানে বাস অপেক্ষা তিনি নিশ্চয় মৃত্যুকেও শ্রেয় জ্ঞান করিবেন।' এই ভাবিয়া হনুমান অন্যত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষ তিনি দেখিতে পাইলেন—সীতা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা; তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন দ্বিতীয়ার শশিকলা আকাশে সবেমাত্র উদিত হইতেছে। হনুমান তখন একটি ক্ষুদ্র বানরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের উপর বসিলেন; সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন, রাবণপ্রেরিতা রাক্ষসীগণ আসিয়া সীতাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সীতা রাবণের নাম পর্যন্ত শুনিতেছেন না।

চেড়ীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান নিজরূপ ধারণ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেবী, রামচন্দ্র আপনার অন্বেষণের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।' এই বলিয়া তিনি সীতার প্রত্যয়-উৎপাদনের জন্য চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছে জানিতে পারিলেই রামচন্দ্রের স্বসৈন্য লঙ্কায় আসিয়া রাক্ষসরাজকে জয় করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদন করিয়া হনুমান অবশেষে করজোড়ে বলিলেন, 'দেবীর যদি ইচ্ছা হয় তো দাস আপনাকে স্কন্ধে লইয়া এক লম্ফে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে পারে।' কিন্তু সীতা মূর্তিমতী পবিত্রতা; সুতরাং হনুমানের অভিপ্রায় মত কার্য

করিতে গেলে পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ হইবে বলিয়া তিনি হনুমানের সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হনুমান যথার্থই সীতার সন্ধান পাইয়াছেন, রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি শুধু তাঁহাকে নিজ মস্তক হইতে চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান ঐ চূড়ামণি লইয়া রামচন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন।

হনুমানের নিকট হইতে সীতার সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র একদল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। সেখানে রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিল। উহার নাম 'সেতুবন্ধ'—ঐ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাঁটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকাস্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ-সকল দুষ্কর কর্ম কিরূপে সম্প্রদান করিলেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

বানরগণ সেতুবন্ধনের সময় এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় উৎপাটন করিয়া আনিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিল এবং তাহার উপর রাশীকৃত শিলাখণ্ড ও মহীরূহ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা দেখিল, একটা কাঠবিড়াল বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, তারপর সেতুর উপর আসিয়া এদিক ওদিক করিতেছে এবং নিজের গা ঝাড়া দিতেছে। এইরূপে সে নিজের সামর্থ্যানুসারে বালুকা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতু-নির্মাণকার্যে সাহায্য করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কার্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। তাহারা এক-একজন একবারেই এক-একটি পাহাড়, এক-একটি জঙ্গল ও রাশীকৃত বালুকা লইয়া আসিতেছিল, সুতরাং কাঠবিড়ালটির ঐরূপ বালুকার উপর গড়াগড়ি ও গা ঝাড়া দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। রামচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়া বানরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কাঠবিড়ালটির মঙ্গল হইক, সে তার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার কার্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রমাণ।' এই বলিয়া তিনি আদর করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইলেন। এখনও কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে যে লম্বালম্বি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে উহা রামচন্দ্রের অঙ্গুলির দাগ।

সেতুনির্মাণকার্য শেষ হইলে রাম ও তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমুদয় বানরসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তারপর কয়েক মাস ধরিয়া রামচন্দ্রের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল; অবশেষে রাক্ষসাধিপ রাবণ পরাজিত ও নিহত হইল। তখন সুবর্ণময় প্রাসাদভূষিত রাবণের রাজধানী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। ভারতের সুদূর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে সেখানকার লোকদিগকে 'আমি লঙ্কায় গিয়াছি' বলিলে তাহারা বলিত, 'আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, সেখানকার সমুদয় গৃহ সুবর্ণ-নির্মিত।' যাহা হউক, এই স্বর্ণময়ী লঙ্কা রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধকালে রামের পক্ষ লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ রামচন্দ্র বিভীষণকে এই সুবর্ণময়ী লঙ্কা প্রদান করিলেন এবং রাবণের স্থানে তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন। বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে সীতা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে রাম লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন।

রাম যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তখন রামের অনুজ কৈকেয়ীতনয় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তিনি রামের বনগমনের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না; অযোধ্যায় আসিয়া যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, শোকের সীমা রইল না। বৃদ্ধ রাজা দশরথও এই সময়ে রামের শোকে অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভরত ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অরণ্যে রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার পিতার স্বর্গগমনবার্তা নিবেদন করিলেন এবং ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাহাতে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস না করিলে পিতৃসত্য কোনরূপে রক্ষিত হইবে না।' চতুর্দশ বর্ষ পরে তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামের আজ্ঞা পালন করিতে হইল। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরম অনুরাগ ও ভক্তিবশতঃ স্বয়ং সিংহাসনে বসিতে কোনমতে সম্মত হইলেন না; সিংহাসনের উপর রামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সীতা-উদ্ধারের পরই রামচন্দ্রের চতুর্দশ বর্ষ বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং ভরত তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন আরোহণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলের অনুরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাচীনকালে সিংহাসন আরোহণের সময় প্রজাগণের কল্যাণার্থে রাজাকে যে-সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে সেগুলি গ্রহণ করিলেন। তখনকার রাজগণ প্রজাবর্গের সেবকস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চলিতে হইত। আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তুকে কেমন মমতাশূন্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং সীতার সহিত পরম সুখে কাটাইলেন।

এইরূপ কিছুকাল অবগত হইলে একদিন রামচন্দ্র চরমুখে অবগত হইলেন যে, রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা সমুদ্রপারনীতা সীতাকে তিনি গ্রহণ করায় প্রজাবর্গ অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। রাবণবিজয়ের পরই রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্বে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাবা জানিয়াও সমবেত বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। সীতা যখন অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন রামচন্দ্র এই ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন—বুঝি সীতাকে হারাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, অগ্নিদেব স্বয়ং সেই অগ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছেন। তাঁহার মস্তকে এক হিরণ্ময় সিংহাসন, তদুপরি সীতাদেবী উপবিষ্ট। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রের এবং সমবেত সকলের আনন্দের সীমা রইল না। রাম পরম সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যার প্রজাবর্গ এই অগ্নিপরীক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা দেখে

নাই, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, সীতা রাবণগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনি যে সেখানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? রাজা এইরূপ অবস্থায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া ধর্মবিগর্হিত কার্য করিতেছেন; হয় সর্বসমক্ষে আবার পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে বিসর্জন করাই রাজার পক্ষে শ্রেয়।

প্রজাগণের সন্তোষের জন্য সীতা অরণ্যে নির্বাসিতা হইলেন। যে স্থানে সীতা পরিত্যক্তা হইলেন, তাহার অতি নিকটেই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। মহর্ষি তাঁহাকে একাকিনী রোরুদ্যমানা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দিলেন। সীতা তখন আসন্নপ্রসবা ছিলেন; ঐ আশ্রমেই তিনি দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে মহর্ষি তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করাইয়া যথাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি রামায়ণ নামক কাব্য রচনা করিয়া উহাতে সুর-তাল সংযোজন করেন।

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এগুলিকে লোকে ধর্মসাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের ধারণা—প্রেমসঙ্গীতই হউক বা যাহাই হউক, সঙ্গীতমাত্রেই যদি কেহ তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, বাল্মীকি রামায়ণে সুর-তাল সংযোগ করিয়া রামের পুত্রদ্বয়কে উহা গাহিতে শিখাইলেন।

ভারতে প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ করিতেন, রামচন্দ্রও তদনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার ছিল না, ধর্মকার্যের সময়ে পত্নী অবশ্যই সঙ্গে থাকিবে। সেইজন্য পত্নীর অপর একটি নাম সহধর্মিণী—যাঁহার সহিত একত্রে মিলিত হইয়া ধর্মকার্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানকালে পত্নী সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কর্তব্যটুকু না করিলে কোন ধর্মকার্যই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।

যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসর্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে বিধিপূর্বক সস্ত্রীক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, এখন এই প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, 'তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।' সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার এক সুবর্ণময়ী মূর্তি নির্মিত হইল। এই যজ্ঞমহোৎসবে সর্বসাধারণের ধর্মভাব ও আনন্দবর্ধনের জন্য সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল; কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি নিজ শিষ্য দুইটিকেকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, উহারা রামের অজ্ঞাত তাঁহারই পুত্র লব ও কুশ। সভাস্থলে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল এবং বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ-গানের জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল।

সভাস্থলে রাম ও তদীয় অমাত্যবর্গ এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ শ্রোতৃমণ্ডলীরূপে আসন গ্রহণ করিলেন। বিপুল জনতার সমাবেশ হইল। বাল্মীকির শিক্ষামত লব ও কুশ রামায়ণের গান করিতে লাগিল; তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য-দর্শনে ও মধুস্বর-শ্রবণে সমগ্র সভামণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইল। সীতার প্রসঙ্গ বার বার শ্রবণ করিয়া রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার বিসর্জন-প্রসঙ্গ আসিল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি রামকে বলিলেন, 'আপনি শোকার্ত হইবেন না, আমি সীতাকে আপনার সমক্ষে লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া বাল্মীকি সভাস্থলে সীতাকে আনিলেন। সীতাকে দেখিয়া অতিশয় বিহ্বল হইলেও প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য রামকে সভাসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনরায় পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে হইল। বারংবার তাঁহার উপর এরূপ নিষ্ঠুর অবহেলা হতভাগিনী সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিবার জন্য দেবগণের নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল। সীতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন. 'এই আমার পরীক্ষা।' এই কথা বলিয়া তিনি পৃথিবীর বক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রজাবর্গ এই অদ্ভুত ও শোচনীয় ব্যাপার-দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। রাম শোকে মুহ্যমান হইলেন।

সীতা অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে দেবগণের নিকট হইতে জনৈক দূত আসিয়া রামকে বলিলেন, 'পৃথিবীতে আপনার কার্য শেষ হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে স্বধাম বৈকুণ্ঠে চলুন।' এই বাক্যে রামের স্বরূপ-স্মৃতি জাগরিত হইল। তিনি অযোধ্যার নিকট সরিদ্বরা সরযূর জলে দেহ বিসর্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্য রামায়ণের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রাম ও সীতা ভারতবাসীদের আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীগণের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মত হওয়া। এই সকল চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর ভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ- রূপে আজও বর্তমান। পাশ্চাত্য দেশের বক্তব্য, 'কর্ম কর, কর্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' ভারতের বক্তব্য 'দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, ভারত এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কিনা, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি—সীতাচরিত্রে যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্তমান। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতে অনুস্যূত হইয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে—সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য

কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত আদর্শ তেমন হয় নাই। ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য, 'সীতা' নামটি তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে-ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, 'সীতা' বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন নারীকে আশীর্বাদ করেন, তিনি তাহাকে বলিয়া থাকেন, 'সীতার মত হও'; বালিকাকে আশীর্বাদ করিবার সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় নারীগণ সকলেই সীতার সন্তান। তাঁহারা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বংসহা, সদা-পতিপরায়ণা, নিত্য-পবিত্র সীতার মত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশ্যে একটি কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও নির্গত হয় নাই। এ-সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করাকে তিনি নিজ কর্তব্য বলিয়া ভাবিয়াছেন এবং স্থির শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। অরণ্যে সীতার নির্বাসন-ব্যাপার তাঁহার প্রতি কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন, কিন্তু সেজন্য তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, 'আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না, উহাতে কেবল জগতের একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।' ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল, তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করিবার চিন্তা পর্যন্ত কখনও করেন নাই।

কে জানে, এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—পাশ্চাত্য-মতানুযায়ী এই আপাতপ্রতীয়মান শক্তি ও তেজ, অথবা প্রাচ্যদেশীয় কষ্টসহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা?

পাশ্চাত্যবাসীরা বলেন, 'দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করিয়া, উহা নিবারণ করিয়া আমরা দুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।' ভারতবাসী বলেন, 'দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া আমরা উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে আমাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া আর কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদের পরমসুখ হইয়া দাঁড়াইবে।' যাহাই হউক, এই দুইটি আদর্শের জয় কোনটিই হেয় নহে। কে জানে—পরিণামে কোন্ আদর্শের জয় হইবে? কে জানে—কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়া মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে? কে জানে, কোন্ ভাব অবলম্বন করিলে পশুভাবকে বশীভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করা সম্ভব হইবে? সহিষ্ণুতা বা ক্রীয়াশীলতা, অপ্রতিকার বা প্রতিকার?

পরিণামে যাহাই হউক, ইতোমধ্যে যেন আমরা পরস্পরের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী—সেই ব্রত সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কার্য করিয়া যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোন আদর্শকে, কোন প্রণালীকে, কোন পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমি পাশ্চাত্যগণকে এ কথা কখনও বলি না, 'আপনারা আমাদের প্রণালী অবলম্বন করুন'; কখনই নহে। লক্ষ্য একই, কিন্তু উপায় কখনও এক হইতে পারে না। অতএব আমি আশা করি—আপনারা ভারতের আদর্শ, ভারতের সাধন-প্রণালীর কথা শুনিয়াই ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, 'আমরা জানি, আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং আমাদের উভয়ের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে দুইটি উপায়, তাহাও আমাদের পরস্পরের ঠিক উপযোগী। আপনারা আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণালী অনুসরণ করুন, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক।' আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি, বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিবাদ করিও না, যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হউক, তোমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন-চেষ্টাই আমার জীবনব্রত। জীবনের উপত্যকার আঁকাবাঁকা পথে চলিবার সময় আমরা যেন পরস্পরকে বলিতে পারি, 'তোমার যাত্রা সফল হউক।'

মহাভারত

[১৯০০ খ্রীঃ ১ ফেব্রুআরী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনা 'সেক্সপীয়র ক্লাবে' প্রদত্ত বক্তৃতা]

গতকাল আমি রামায়ণ মহাকাব্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইয়াছি। অদ্যকার সান্ধ্যসভায় অপর মহাকাব্য ‘মহাভারত’ সম্বন্ধে কিছু বলিব। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ভরত হইতে যে বংশ প্রবর্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় রাজাদের উপাখ্যান আছে। উক্ত ভরত রাজা হইতেই ভারতবর্ষের নাম হইয়াছে, এবং তাঁহার নাম হইতেই এই মহাকাব্যের নাম ‘মহাভারত’ হইয়াছে। মহাভারত শব্দের অর্থ—মহান্ অর্থাৎ গৌরবসম্পন্ন, ভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষ; অথবা মহান্ ভারতবংশীয়গণের উপাখ্যান। কুরুদিগের প্রাচীন রাজ্যই এই মহাকাব্যের রঙ্গক্ষেত্র, আর এই উপাখ্যানের ভিত্তি—কুরুপাঞ্চাল মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নহে। এই মহাকাব্য ভারতে সর্বসাধারণের বড়ই আদরের সামগ্রী। হোমারের কাব্য গ্রীকদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কালক্রমে মূল মহাভারতের সহিত অনেক অবান্তর বিষয় সংযোজিত হইতে লাগিল, শেষে উহা প্রায় লক্ষশ্লোকাত্মক এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হইল। কালে কালে মূল মহাভারতে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, পুরাণ, দার্শনিক নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ বিচার প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, পরিশেষে উহা এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় অবান্তর প্রসঙ্গ থাকিলেও সমুদয় গ্রন্থের ভিতর মূল উপাখ্যানটি অনুস্যূত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য কৌরব ও পাণ্ডব নামক একবংশজাত জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ।

আর্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভারতে আসেন। ক্রমে আর্যগণের এই সকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে আর্যগণই ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একই বংশের দুই বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রভুত্বলাভের চেষ্টা হইতেই এই যুদ্ধের উৎপত্তি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি সৈন্যদলের অধিকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাই মহাভারতের যুদ্ধ।

কুরুবংশীয় মহারাজ বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে—অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ এবং ক্ষয়রোগ এবং অন্য কোন প্রকার জন্মগত ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি পৈতৃক কোন ধরনের অধিকারী হইতে পারে না, সে কেবল নিজ ভরণপোষণের ব্যয় মাত্র পাইতে পারে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলেন না, পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র ছিল এবং পাণ্ডুর মাত্র পাঁচটি। অল্প বয়সে পাণ্ডুর দেহত্যাগ হইলে ধৃতরাষ্ট্রের উপরই রাজ্যভার পড়িল, তিনি পাণ্ডুর পুত্রগণকে নিজের পুত্রগণের সহিত লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাধনুর্ধর বিপ্র দ্রোণাচার্যের উপর তাঁহাদের শিক্ষার ভার অর্পিত হইল; দ্রোণাচার্যের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। রাজপুত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরায়ণতা ও বহুবিধ গুণগ্রাম এবং তাঁহারা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শৌর্যবীর্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তিদর্শনে অন্ধ রাজার পুত্রগণের হৃদয়ে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের চাতুরীতে এক ধর্মমহোৎসব-দর্শনের ছলে পঞ্চপাণ্ডব বারণাবত নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় দুর্যোধনের উপদেশানুসারে তাঁহাদের জন্য শণ, জতু, লাক্ষা, ঘৃত, তৈল ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দ্বারা এক প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। সেই জতুগৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। সেখানে তাঁহারা কিছুকাল বাস করিলে পর সেই গৃহে এক রাত্রে গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধর্মাত্মা বিদুর—দুর্যোধন ও তাঁহার অনুচরবর্গের এই দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্বেই অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলের অজ্ঞাতসারে প্রজ্বলিত জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারা পরম আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন, এত দিনে আমরা নিষ্কণ্টক হইলাম, এখন আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। গভীর অরণ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক দুঃখকষ্ট, দৈবদুর্বিপাক সহ্য করিতে হইল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্যবীর্য ও সহিষ্ণুতাবলে সর্ববিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে শুনিতে পাইলেন, শীঘ্র নিকটবর্তী পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যার স্বয়ম্বর হইবে।

আমি গত রাত্রে এই স্বয়ম্বরপ্রথার বিষয়ে একবার উল্লেখ করিয়াছি। কোন রাজকন্যার স্বয়ম্বরের সময় চতুর্দিক হইতে নানা দেশের রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বর-সভায় ১
আহূত হইতেন। এই সকল সমবেত
রাজকুমারদের মধ্য হইতে
রাজকুমারীকে ইচ্ছামত বর
মনোনীত করিতে হইত। ভাট
রাজপরিচারকগণ মাল্যহস্তে

রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া
প্রত্যেক রাজকুমারের সিংহাসনের
নিকট গিয়া তাঁহার নাম ধাম
বংশমর্যাদা শৌর্যবীর্যের বিষয় উল্লেখ
করিত। রাজকন্যা এইসব
রাজপুত্রদের মধ্যে যাঁহাকে পতিরূপে
মনোনীত করিতেন, তাঁহারই
গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ একজন প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীর রূপগুণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাণ্ডবেরা শুনিলেন, সেই দ্রৌপদীই স্বয়ম্বরা হইবেন।

স্বয়ম্বরে প্রায়ই রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার শৌর্যবীর্যের পরিচয়, অস্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাইতে হইত। দ্রুপদরাজ স্বয়ম্বর-সভায় তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণার্থিগণের বলপরীক্ষার এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেনঃ অতি ঊর্ধ্বদেশে আকাশে এক কৃত্রিম মৎস লক্ষ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নদেশে সতত ঘূর্ণমান মধ্যভাগে ছিদ্রযুক্ত একটি চক্র স্থাপিত ছিল, আর নিম্নে একটি জলপাত্র। জলপাত্রে মৎসের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চক্রছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণদ্বারা মৎস্যের চক্ষু যিনি বিঁধিতে পারিবেন, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। এই স্বয়ম্বর-সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য সমুৎসুক, সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

আপনারা সকলেই ভারতের বর্ণচতুষ্টয়ের বিষয়ে অবগত আছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ— ব্রাহ্মণ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পৌরোহিত্য বা যাজনাদি তাঁহাদের কার্য; ব্রাহ্মণের নীচে ক্ষত্রিয়—রাজা ও যোদ্ধাগণ এই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত; তৃতীয়—বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী; চতুর্থ—শূদ্র বা সেবক। অবশ্য এই রাজকুমারী ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্তা ছিলেন।

যখন রাজপুত্রগণ একের পর এক চেষ্টা করিয়া কেহ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন দ্রুপদ রাজপুত্র সভামধ্যে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়েরা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অকৃতকার্য হইয়াছেন, এক্ষণে অন্য ত্রিবর্ণের মধ্যে যে কেহ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; ব্রাহ্মণই হউন, বৈশ্যই হউন, এমন কি শূদ্রই হউন, যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।'

ব্রাহ্মণগণমধ্যে পঞ্চপাণ্ডব সমাসীন ছিলেন, তন্মধ্যে অর্জুনই পরম ধনুর্ধর। দ্রুপদপুত্রের পূর্বোক্ত আহ্বান-শ্রবণে তিনি উঠিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অতি শান্তপ্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ নম্রস্বভাব। শাস্ত্রবিধানানুসারে তাঁহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করা বা সাহসের কর্ম করা নিষিদ্ধ। ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় ও আত্মসংযমে সতত নিযুক্ত থাকাই তাঁহাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম। অতএব তাঁহারা কিরূপ শান্তপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়, ভাবিয়া দেখুন। ব্রাহ্মণেরা যখন দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আচরণে ক্ষত্রিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সকলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা ছদ্মবেশী অর্জুনকে তাঁহার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, অতএব তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অবলীলাক্রমে ধনু তুলিয়া উহাতে জ্যা রোপণ করিলেন। পরে ধনু আকর্ষণ করিয়া অনায়াসে চক্রছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণ ক্ষেপণ করিয়া লক্ষ্যবস্তু—মৎসটির চক্ষু বিদ্ধ করিলেন।

তখন সভাস্থলে তুমুল আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমারী দ্রৌপদী অর্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া তদীয় গলদেশে মনোহর বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু এদিকে রাজগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। এই মহতী সভায় সমবেত রাজা ও রাজকুমারগণকে অতিক্রম করিয়া একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা পরমাসুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন, স্থির করিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত রাজাদের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পাণ্ডবরা কোনমতেই পরাভূত হইলেন না, অবশেষে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদীকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে জননী কুন্তী সমীপে ফিরিয়া আসিলেন। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের উপজীবিকা, সুতরাং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করাতে তাঁহাদিগকেও বাহিরে গিয়া ভিক্ষাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু গৃহে আসিলে কুন্তী উহা তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। পঞ্চভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে লইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কৌতুকবশে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ মা, আজ কেমন মনোহর ভিক্ষা আনিয়াছি।' কুন্তী না দেখিয়াই বলিলেন, 'যাহা আনিয়াছ, পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ কর।' এই কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'একি! এ আমি কি কথা বলিলাম, এ যে এক কন্যা!' কিন্তু এখন আর কি হইবে? মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করা তো যায় না, মাতৃ-আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের জননী জীবনে কখনও মিথ্যা কথা উচ্চারণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্য কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। এইরূপে দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতার সাধারণ সহধর্মিণী হইলেন।

আপনারা জানেন, সমাজের সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপান আছে। এই মহাকাব্যের ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু আশ্চর্য আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মহাভারত-প্রণেতা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ সামাজিক প্রথা বলিয়া নির্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণ দেখাইবার

চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ-আজ্ঞা—তাঁহাদের জননী এই অদ্ভুত পরিণয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন—ইত্যাদি নানা যুক্তি দিয়া মহাভারতকার এই ঘটনাটির উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জানা আছে, সকল সমাজেই এমন এক অবস্থা ছিল, যখন বহুপতিত্ব অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক নারীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্তী আভাসমাত্র।

যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহার ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'যে পঞ্চ ব্যক্তি আমার ভগিনীকে লইয়া গেল, ইহারা কাহারা! আমার ভগিনী যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিল, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সে-ই বা কে! ইহাদের তো অশ্বরথ বা অন্য কোনরূপ ঐশ্বর্যের চিহ্ন দেখিতেছি না। ইহারা তো পদব্রজেই চলিয়া গেল দেখিলাম'' মনে মনে এই সকল বিতর্ক করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গোপনে রাত্রে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহারা যে যথার্থ ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। তখন দ্রুপদরাজ তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

অনেকে প্রথমে এইরূপ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ দোষাবহ হইতে পারে না। সুতরাং দ্রুপদরাজকেও এইরূপ বিবাহে সম্মত হইতে হইল; রাজকুমারী পঞ্চপাণ্ডবদের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইল।

পরিণয়ের পর পাণ্ডবগণ দ্রুপদগৃহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহাদের বলবীর্য বর্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা জীবিত আছেন, দগ্ধ হন নাই—ক্রমে এই সংবাদ কৌরবগণের নিকট পৌঁছিল। দুর্যোধন ও তাঁহার অনুচরবর্গ পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বর্ষীয়ান্ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন। বহুদিনের পর প্রজাবর্গ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে মহোৎসব করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নামক মনোহর নগর নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের রাজ্য ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে বশীভূত করিয়া কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারতের তদানীন্তন সমস্ত রাজগণের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই যজ্ঞে পরাজিত রাজগণকে কর সহ আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও প্রত্যেককে যজ্ঞোৎসবের এক একটি কার্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞকার্যে সাহায্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে একটি বিষম বিঘ্ন ছিল। জরাসন্ধ নামক জনৈক রাজা একশত রাজাকে বলি দিয়া নরমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ছিয়াশি জন রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধও সম্মত হইলেন। চতুর্দশ দিবস ক্রমাগত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে পরাভূত করিলেন। তখন বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতা সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রত্যেকে এক এক দিকে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন ও সমস্ত রাজন্যবর্গকে যুধিষ্ঠিরের বশে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়লব্ধ অগাধ ধনসম্পত্তি ঐ বিরাট যজ্ঞের ব্যয় নির্বাহের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্পণ করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং জরাসন্ধের কারাগার হইতে মুক্ত রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপুত্রগণও এই যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির সম্রাটের মুকুট পরিধান করিলেন এবং 'রাজচক্রবর্তী' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই সময় হইতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্য নূতন বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাণ্ডবগণের রাজ্য ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি দুর্যোধনের অসহ্য মনে হইল, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রবল ঈর্ষার ভাব লইয়া রাজসূয় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। এইরূপে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তিনি মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন কিরূপে ছলে ও কৌশলে পাণ্ডবগণের সর্বনাশ সাধন করিতে পারেন। কারণ, তিনি জানিতেন বলপূর্বক পাণ্ডবগণকে পরাভূত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। অতি অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবিদ্ ও দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাদাতা শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে আহূত হইলেন।

প্রাচীন ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধের জন্য আহূত হইলে সর্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজ মানরক্ষার জন্য তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত; এইরূপে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহূত হইয়া ক্রীড়া করিলেই মানরক্ষা হইত; আর ক্রীড়ায় অসম্মত হইলে তাহা অতি অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারত বলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ববিধ ধর্মের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইতে হইয়াছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কপট পাশা প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতেই যুধিষ্ঠির যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন ততবারই হারিতে লাগিলেন। বার বার এইরূপ পরাজিত হওয়াতে তিনি অন্তরে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া জয়লাভের আশায় একে একে তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমুদয় পণ রাখিতে লাগিলেন এবং একে একে সকলই হারাইলেন। তাঁহার রাজ্য, ঐশ্বর্য সর্বস্ব এইরূপে নষ্ট হইল। অবশেষে যখন তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য কৌরবগণ কর্তৃক বিজিত হইল, অথচ তিনি বার বার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহূত হইতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন নিজ ভাতৃগণ, নিজে স্বয়ং এবং সুন্দরী দ্রৌপদী ব্যতীত পণ রাখিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। এইগুলিও তিনি একে একে পণ রাখিলেন এবং একে একে সমস্তই হারাইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণরূপে কৌরবগণের বশীভূত হইলেন। কৌরবগণ তাঁহাদিগকে অবমাননা করিতে আর

কিছুই বাকী রাখিলেন না; বিশেষতঃ তাহারা দ্রৌপদীকে যেরূপ অবমানিতা করিল, মানুষের প্রতি মানুষ কখনও সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। অবশেষে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় পাণ্ডবগণ কৌরবদের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ্যশাসনের অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন দেখিল বড় বিপদ, তাহার সব কৌশল বুঝি ব্যর্থ হয়; সুতরাং সে পিতাকে আর একবার মাত্র অক্ষক্রীড়ার অনুমতি দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হইলেন। এবার পণ রহিল—যে-পক্ষ হারিবে, সে পক্ষকে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি এই অজ্ঞাতবাসের সময় জয়ী পক্ষ অজ্ঞাতবাসকারীদের কোন সন্ধান পায়, তবে পুনরায় ঐরূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু বিজিত পক্ষ যদি অজ্ঞাতবাসের সম্পূর্ণ কাল অজ্ঞাতভাবে যাপন করিতে পারে, তবে তারা আবার রাজ্য পাইবে।

এই শেষ খেলাতেও যুধিষ্ঠিরের হার হইল; তখন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত নির্বাসিত গৃহহীনদের বনে গমন করিলেন। তাঁহারা অরণ্যে কোনরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিলেন। এই সময় তাঁহারা ধার্মিক ও বীরপুরুষোচিত অনেক কঠিন কঠিন কার্য অনুষ্ঠিত করেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানসমূহ দর্শন করেন। মহাভারতের এই বনপর্বটি বড়ই মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ, ইহা নানাবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকায় পূর্ণ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক মনোহর অপূর্ব উপাখ্যান আছে। এই নির্বাসনের সময় মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহারা যাহাতে নির্বাসন-দুঃখ অক্লেশে সহিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রাচীন ভারতের অনেক মনোহর উপাখ্যান শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি উপাখ্যান আমি আপনাদিগকে বলিব।

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, সাবিত্রী নামে তাঁহার এক পরমাসুন্দরী গুণবতী কন্যা ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র মন্ত্রের নাম 'সাবিত্রী'। এই কন্যার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, তাঁহারও সাবিত্রী নাম রাখা হইয়াছিল। সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পিতা তাঁহাকে স্বামী মনোনীত করিতে বলিলেন। আপনারা দেখিতেছেন, ভারতে প্রাচীন রাজকন্যাগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। অনেক সময়েই তাঁহারা পাণিগ্রহণার্থী রাজকুমারগণের মধ্য হইতে নিজেরাই পতি নির্বাচন করিতেন।

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্মতা হইয়া সুবর্ণ-রথে আরোহণ করিয়া পিতৃরাজ্য হইতে অতি দূরবর্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পিতা কয়েকজন রক্ষী ও বৃদ্ধসভাসদকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে অনেক রাজসভায় যাইয়া রাজকুমারগণকে দেখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার চিত্ত জয় করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি বনের মধ্যে এক পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এইসকল অরণ্যে পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিত। সেখানে কোন জীবকে হত্যা করিতে দেখা যাইত না; এইজন্য সেখানে পশুগণ মানুষকে ভয় করিত না। এমন কি—সরোবরের মৎসকুল পর্যন্ত মানুষের হাত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য লইয়া যাইত। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যে কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই। মুনি ও বৃদ্ধগণ সেখানে মৃগ ও পক্ষীদের মধ্যে আনন্দে বাস করিতেন। এমন কি—এই নির্বাসনের সময় কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে তাহার উপর কোন অত্যাচার করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। গার্হস্থ্যজীবনে যখন আর সুখ পাইত না, তখন লোক এই সকল অরণ্যে গিয়া বাস করিত; সেখানে মুনিগণের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত।

দ্যুমৎসেন নামক জনৈক রাজা পূর্বোক্ত তপোবনে বাস করিতেন। তিনি জরাগ্রস্থ ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণপূর্বক তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ রাজা তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের সহিত এই তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে অতি কঠোর তপস্যায় তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যবান।

সাবিত্রী অনেক রাজসভা দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই তপোবনবাসী ঋষি-তপস্বিগণের উপর সকলেই এত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পোষণ করিতেন যে, সম্রাটও এই সমস্ত তপোবন বা আশ্রমের নিকট দিয়া যাইবার সময় ঋষি-মুনিগণকে পূজা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখনও ভারতে এই ঋষি-মুনিগণের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধার ভাব আছে যে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটও অরণ্যবাসী ফলমূলভোজী চীরপরিহিত কোন ঋষির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বরং পরম গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। আমরা সকলেই সেই ঋষির বংশধর। এইরূপেই ভারতে ধর্মের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে; অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই তপোবনবাসী ঋষিগণকে পূজা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! যদি তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। আর যদি তাঁহারা রথারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে রথ ও বর্মাদি বাহিরে রাখিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত শমগুণসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় না যাইলে কোন যোদ্ধারই আশ্রমে প্রবেশাধিকার ছিল না।

এইরূপে সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাজতপস্বী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দর্শন করিলেন। সত্যবানকে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী কত রাজপ্রাসাদে, কত রাজসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কোন রাজকুমার তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারেন নাই। এখানে অরণ্যাবাসে রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান তাঁহার হৃদয় হরণ করিলেন।

সাবিত্রী পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 'বৎসে সাবিত্রী, তুমি তো নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিলে; বল দেখি, তুমি কোথাও এমন কাহাকেও দেখিয়াছ কি, যাহার সহিত তুমি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর? বল মা, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া হৃদয়ের কথা খুলিয়া বল।' তখন সাবিত্রী লজ্জানম্রবদনে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, পিতা, দেখিয়াছি।' পিতা

কহিলেন, 'বৎসে, যে রাজকুমার তোমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, তাহার নাম কি?' তখন সাবিত্রী বলিলেন, 'তাঁহাকে ঠিক রাজকুমার বলিতে পারা যায় না, কারণ তাঁর পিতা দ্যুমৎসেন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। অতএব তিনি রাজকুমার হইলেও রাজ্যের অধিকারী নহেন, তিনি তপস্বিভাবে জীবনযাপন করিতেছেন, বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কুটীরবাসী বৃদ্ধ জনক-জননীর সেবায় নিরত রহিয়াছেন।'

সেই সময় দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে সাবিত্রীর পতি-নির্বাচন-বৃত্তান্ত বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, 'এই নির্বাচন বড়ই অশুভ হইয়াছে।' কথাগুলি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে এইরূপ বলিবার কারণ স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'অদ্য হইতে দ্বাদশ মাস পরে সত্যবান নিজ কর্মানুসারে দেহত্যাগ করিবে।' নারদের এই কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে রাজা কন্যাকে বলিলেন, 'সাবিত্রী, শুনিলে তো, অদ্য হইতে দ্বাদশ মাস পরে সত্যবান দেহত্যাগ করিবে; অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে, একবার এই কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। বৎসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না, এরূপ অল্পায়ু আসন্নমৃত্যু বরের সহিত তোমার কোনমতে বিবাহ হইতে পারে না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'পিতঃ, সত্যবান অল্পায়ুই হউক বা আসন্নমৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতি অনুরাগী, আমি মনে মনে সেই সাধুচরিত্র বীর সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব আপনি অন্য ব্যক্তিকে পতিরূপে বরণ করিতে আমাকে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি দ্বিচারিণী হইব। কুমারীর পতিনির্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে। একবারে সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহার মনে কখনও স্থান দেওয়া উচিত নহে।' রাজা যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়, তখন তিনি এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের সহিত যথাবিধানে বিবাহিতা হইয়া তাঁহার মনোনীত পতির সহিত বাস করিবার জন্য ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার জন্য পিতার রাজপ্রাসাদ হইতে অরণ্যমধ্যে তাঁহাদের আশ্রমে গমন করিলেন।

নারদের মুখ হইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্ দিন দেহত্যাগ হইবে তাহা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহা সত্যবানের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। সত্যবান প্রতিদিন গভীর অরণ্যে গিয়া কাষ্ঠ এবং ফলমূল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন। সাবিত্রী রন্ধনাদি গৃহকার্য করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের জীবন সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল, অবশেষে সত্যবানের দেহত্যাগের দিন নিকটবর্তী হইল। তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী এক কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন। উপবাসে থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া তিনি ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই তিন রাত্রি তিনি পতির আসন্ন মৃত্যুচিন্তা করিয়া কত গভীর দুঃখে কাটাইয়াছিলেন, অপরের অজ্ঞাতসারে কত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন, দেবতার নিকট পতির শুভকামনায় কাতরভাবে কত প্রার্থনা করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

অবশেষে সেই কালদিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সেদিন আর সাবিত্রীর—পতিকে এক মুহূর্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে সাহস হইল না। অতএব সত্যবানের অরণ্যে কাষ্ঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করিতে যাইবার সময় সাবিত্রী সেদিন পতির সঙ্গে যাইতে শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনুমতি লাভ করিয়া সত্যবানের সঙ্গে অরণ্যে গেলেন। হঠাৎ সত্যবান বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পত্নীকে বলিলেন, 'প্রিয়া সাবিত্রী, আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল অবসন্নবোধ হইতেছে, আমার সর্বশরীর যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত হইতেছে, আমি কিছুকাল তোমার পার্শ্বে বিশ্রাম করিব।' সাবিত্রী ভয়বিজড়িত ও কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, 'প্রভো, আপনি আমার অঙ্কদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করুন।' তখন সত্যবান নিজ উত্তপ্ত মস্তক সাবিত্রীর অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার শ্বাস উপস্থিত হইল, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সাবিত্রী গলদশ্রুলোচনে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যমদূতগণ সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সাবিত্রী যেখানে পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিতে পারিল না। তাহারা দেখিল সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নির গণ্ডী রহিয়াছে, যমদূতগণের মধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না, সাবিত্রীর সান্নিধ্য হইতে পলাইয়া গিয়া তাহারা যমরাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং সত্যবানের আত্মাকে আনিতে না পারার কারণ নিবেদন করিল।

তখন মৃত ব্যক্তিগণের বিচারক মৃত্যুদেবতা যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকের বিশ্বাস—পৃথিবীতে প্রথম মানুষ যিনি মরেন, তিনিই মৃত্যুদেবতা অর্থাৎ তৎপরবর্তী মৃত ব্যক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। মৃত্যুর পর কাহাকে পুরস্কার অথবা কাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, তিনি তাহা বিচার করেন। সেই যমরাজ এখন স্বয়ং আসিলেন। অবশ্য যমরাজ দেবতা, অতএব সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই অগ্নির ভিতরে অনায়াসে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল। তিনি সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মা, তুমি এই শব দেহ পরিত্যাগ কর। কারণ, জানিও মর্ত্যমাত্রকেই দেহত্যাগ করিতে হয়, ইহাই বিধির বিধান। মর্ত্যগণের মধ্যে আমিই প্রথম মরিয়াছি, তারপর হইতে সকলকেই মরিতে হয়। মৃত্যুই মানবের নিয়তি।' যমরাজ এই কথা বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন, তখন যম সত্যবানের দেহ হইতে তাঁহার জীবাত্মাকে বাহির করিয়া লইলেন। যম এইরূপে সেই যুবকের জীবাত্মাকে লইয়া স্বীয় পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিনি শুনিলেন তাঁহার পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর কাহার পদশব্দ হইতেছে। শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দেখেন—সাবিত্রী। তখন তিনি সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মা সাবিত্রী, বৃথা কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? সকল মর্ত্যজনেরই অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।' সাবিত্রী বলিলেন, 'পিতঃ, আমি আপনাকে অনুসরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেমন বলিলেন, মর্ত্যগণের পক্ষে মৃত্যুই বিধির বিধান, সেইরূপ বিধির বিধানেই নারীও তাহার প্রিয় পতির অনুসরণ করিয়া থাকে, আর বিধির সনাতন বিধানেই পতিব্রতা ভার্যাকে কখনও তাহার পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না।' তখন যমরাজ বলিলেন, 'বৎসে, তোমার বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি তোমার পতির পুনর্জীবন ব্যতীত আমার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।' তখন সাবিত্রী বলিলেন, 'হে প্রভু যমরাজ, যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন

যে, আমার শ্বশুর যেন পুনরায় তাঁহার চক্ষু লাভ করেন ও সুখী হইতে পারেন।' যম বলিলেন, 'প্রিয় বৎসে, আমি ধর্মজ্ঞ, তোমার এই ধর্মসঙ্গত বাসনা পূর্ণ হউক।' এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের জীবাত্মাকে লইয়া আবার নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি পূর্ববৎ আবার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আবার সাবিত্রীকে দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎসে সাবিত্রী, তুমি এখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসিতেছ?' সাবিত্রী উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, পিতা, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসিতেছি বটে। আমি যে না আসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি ফিরিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ যে আমার স্বামীর নিকট পড়িয়া আছে, সুতরাং যেখানে আমার স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন, সেখানে আমার দেহও যাইতেছে। আমার আত্মা তো পূর্বেই গিয়াছে—কারণ, আমার আত্মা আমার স্বামীর আত্মাতেই অবস্থিত। সুতরাং আপনি যখন আমার আত্মাকে লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা না গিয়া কি করিয়া থাকিবে?' যম কহিলেন, 'সাবিত্রী, আমি তোমার বাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইলাম। আমার নিকট হইতে তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত আর একটি বর প্রার্থনা কর।' সাবিত্রী কহিলেন, 'দেব, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করি যে, আমার শ্বশুর যেন তাঁহার নষ্ট রাজ্য ও ঐশ্বর্য ফিরিয়া পান।' যম কহিলেন, 'প্রিয় বৎসে, তোমায় এই বরও দান করিলাম। কিন্তু এখন তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, কারণ জীবিত মানুষ কখন যমরাজের সহিত যাইতে পারে না।' এই বলিয়া যম আবার চলিতে লাগিলেন। যম যদিও বারংবার সাবিত্রীকে ফিরিতে বলিলেন, তথাপি সেই নম্রস্বভাবা পতিপরায়ণা সাবিত্রী তাঁহার মৃত স্বামীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যম আবার ফিরিয়া সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'হে সাবিত্রী, হে মহানুভবে, তুমি এরূপ তীব্র শোক বিহ্বল হইয়া পাগলের মত স্বামীর অনুসরণ করিও না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'আমার মনের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, আপনি আমার প্রিয়তম স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমি সেখানেই তাঁহার অনুসরণ করিব।' যম বলিলেন, 'আচ্ছা সাবিত্রী, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে অনেক পাপ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে; তাহা হইলেও কি তুমি তোমার পতির সহিত যাইতে প্রস্তুত?' পতির প্রতি পরম অনুরাগিণী সাবিত্রী কহিলেন, 'আমার পতি যেখানে যাইবেন—জীবন হউক, মৃত্যু হউক, স্বর্গ হউক, নরকই হউক—আমি পরমানন্দে সেখানে যাইব।' যম কহিলেন, 'বৎসে তোমার কথাগুলি অতি মনোহর ও ধর্মসঙ্গত, আমি তোমার উপর পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি আর একটি বর প্রার্থণা কর, কিন্তু জানিও মৃত ব্যক্তি কখনও আবার জীবিত হয় না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'যদি আমার উপর আপনি এতদূর প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমায় এই বর দান করুন, যেন আমার শ্বশুরের রাজবংশের লোপ না হয়, যেন সত্যবানের পুত্রগণ তাঁহার রাজ্য লাভ করে।' তখন যমরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'বৎসে, তোমার মনস্কামনা সফল হউক, এই তোমার পতির জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিলাম। তোমার পতি আবার জীবিত হইবে। সত্যবানের ঔরসে তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, কালে তাহারা রাজপদ লাভ করিবে। এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও। প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল। পূর্বে কোন নারী পতিকে এমন ভালবাসে নাই, আর আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবতাও অকপট অব্যভিচারী প্রেমের শক্তির নিকট পরাজিত হইলাম।'

সাবিত্রী-উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। ভারতে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়—মৃত্যুও যে সাবিত্রীর প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল, যে সাবিত্রী ঐকান্তিক প্রেমবলে যমরাজের নিকট হইতেও স্বীয় স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মত শত শত মনোহর উপাখ্যানে পূর্ণ। আমি আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের মধ্যে মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং প্রায় লক্ষশ্লোকে পূর্ণ।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল আখ্যানের সূত্র আবার ধরা যাউক। পাণ্ডবগণ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন, এই অবস্থায় আমরা পাণ্ডবদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি। সেখানেও তাঁহারা দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাপ্রসূত নানাবিধ অত্যাচার হইতে একেবারে মুক্ত হন নাই, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও দুর্যোধন কখনই তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য হয় নাই।

অরণ্যে বাসকালে পাণ্ডবগণের একদিনের ঘটনা আমি আপনাদের নিকট বলিব। একদিন তাঁহারা বড়ই তৃষ্ণার্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি দ্রুতপদে যাইয়া অনেক অন্বেষণের পর একস্থানে একটি অতি নির্মলসলিল সরোবর দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন জলপানের জন্য সরোবরে অবতরণ করিবেন, শুনিলেন—কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, 'বৎস, জল পান করিও না। অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পরে যত ইচ্ছা জল পান করিও।' কিন্তু সহদেব অতিশয় তৃষ্ণার্ত থাকাতে এই বাক্য গ্রহণ না করিয়া ইচ্ছামত জলপান করিলেন, জলপান করিবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সহদেবকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে তাহার সন্ধানে ও জল আনয়নের জন্য পাঠাইলেন।

নকুল ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে উক্ত সরোবরের সমীপে যাইয়া ভ্রাতা সহদেবকে মৃত অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। নকুল তৃষ্ণার্ত থাকায় জলের দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনি তিনিও সহদেবের মত শুনিলেন, 'বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পশ্চাতে জল পান করিও।' তিনিও ঐ বাক্য অমান্য করিয়া জল পান করিলেন ও জল পান করিয়াই সহদেবের মত মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পরে অর্জুন ও ভীম ঐরূপে ভাতৃগণের অন্বেষণে ও জল আনিবার জন্য প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহ ফিরিলেন না। তাঁহাদেরও নকুল সহদেবের মত অবস্থা হইল। তাঁহারাও জল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং উঠিয়া ভাতৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর পরিশেষে সেই মনোহর সরোবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি ভাতৃচতুষ্টয়কে মৃত অবস্থায় ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ শোকভারাক্রান্ত হইল, তিনি ভাতৃগণের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন; সেই সময় হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'বৎস, দুঃসাহস করিও না। আমি একজন যক্ষ—বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস খাইয়া জীবনধারণ করি এবং এই সরোবরে বাস করি; এই সরোবর আমার অধিকৃত। আমার দ্বারাই তোমার ভ্রাতারা প্রেতলোকে নীত হইয়াছে। হে রাজন্, যদি

তুমিও তোমার ভ্রাতাদের মত আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান কর, তবে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পার্শ্বে পঞ্চম শবরূপে তোমাকেও শয়ন করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া স্বয়ং যথেচ্ছা জল পান কর ও অন্যত্র লইয়া যাও।' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি আপনার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন।' তখন যক্ষ তাহাকে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠিরও প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত উত্তর আপনাদের নিকট বলিতেছি। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিমাশ্চর্যম্?'—জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার কি? যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেনঃ

প্রতিমুহূর্তে আমরা দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা এখনও মরে নাই, তাহারা ভাবিতেছে যে, তাহারা কখনও মরিবে না। জগতের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার—মৃত্যু অহরহঃ সম্মুখে থাকিলেও কেহ বিশ্বাস করে না যে, সে মরিবে। ২

যক্ষের আর এক প্রশ্ন ছিল, 'কঃ পন্থাঃ?'—কোন্ পথ অনুসরণ করিলে মানবের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়? যুধিষ্ঠির ঐ প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করিলেনঃ

তর্কের দ্বারা কিছুই নিশ্চয় হইতে পারে না। কারণ, জগতে নানা মত-মতান্তর রহিয়াছে। বেদও নানাবিধ—উহার এক ভাগ যাহা বলিতেছে, অপর ভাগ তাহারই প্রতিবাদ করিতেছে। এমন দুই জন মুনি বাহির করিতে পারা যায় না, যাঁহাদের পরস্পরের মতভেদ নাই। ধর্মের রহস্য যেন গুহায় নিহিত রহিয়াছে। অতএব মহাপুরুষগণ যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথই অনুসরণীয়। ৩

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'হে রাজন্, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বকরূপী ধর্ম। আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহই মরে নাই। আমার মায়াবলেই তাহারা মৃত প্রতীয়মান হইতেছে। হে ভরতর্ষভ, তুমি যখন ধনলাভ ও সম্ভোগ অপেক্ষা অনৃশংসতাকে মহত্তর বিবেচনা করিয়াছ, তখন তোমার ভ্রাতৃবর্গ জীবিত হউক।' এই কথা বলিবামাত্র ভীমাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় জীবিত হইয়া উঠিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যক্ষের প্রশ্নগুলির উত্তর হইতে আমরা দেখিতে পাই, রাজার ভাব অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগীর ভাবই তাঁহার মধ্যে অধিক ছিল।

এদিকে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের কাল শেষ হইয়া অজ্ঞাতবাস করিবার ত্রয়োদশ বর্ষ নিকটবর্তী হইতেছিল। এই কারণে যক্ষ তাঁহাদিগকে বিরাটের রাজ্যে গমন করিয়া তথায় যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেই রূপ ছদ্মবেশে থাকিবার উপদেশ দিলেন।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর তাঁহারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাটাইলেন এবং বিরাটরাজ্যে গমন করিয়া সেখানে রাজার অধীনে সামান্য সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার দ্যূতজ্ঞ সভাসদ্ হইলেন। ভীম পাচকের কাজে নিযুক্ত হইলেন। অর্জুন নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীতশিক্ষার শিক্ষক হইয়া রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। নকুল রাজার অশ্বশালার অধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব গোশালার তত্ত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে পরিচারিকারূপে গৃহীতা হইলেন। এইরূপ ছদ্মবেশে পাণ্ডবভ্রাতৃগণ এক বৎসর নিরাপদে অজ্ঞাতবাসের কাল অতিবাহিত করিলেন। দুর্যোধন তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হইতে পারিল না। বর্ষ পূর্ণ হইবার ঠিক পরেই কৌরবগণ তাঁহাদের সন্ধান পাইল।

এইবার যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। দূত ধৃতরাষ্ট্রসমীপে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ অর্ধরাজ্যের অধিকারী; অতএব তাঁহাদিগকে যেন এক্ষণে অর্ধরাজ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু

দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ পোষণ করিত, সুতরাং সে কিছুতেই পাণ্ডবগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হইল না। পাণ্ডবেরা রাজ্যের অতি অল্পাংশ একটি প্রদেশ, এমন কি পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন, বলিলেন। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব দুর্যোধন বলিল যে, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে দেওয়া হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিবার জন্য দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কৃষ্ণও কৌরবসভায় গিয়া এই আসন্ন যুদ্ধ ও জ্ঞাতিক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি কৌরবরাজসভার বৃদ্ধগণ দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষত্রিয়ই এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিল। এক দিকে যুধিষ্ঠির, অপর দিকে দুর্যোধন—উভয়ই নিজ নিজ পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, যাঁহার অনুরোধ প্রথম পৌঁছিবে, ধার্মিক ক্ষত্রিয়কে তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন রাজা ও যোদ্ধৃবর্গ অনুরোধের পৌর্বাপর্য অনুসারে পাণ্ডব ও কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। পিতা এক পক্ষে, পুত্র হয়তো অপর পক্ষে যোগ দিলেন। এক ভ্রাতা এক পক্ষে, অপর ভ্রাতা হয়তো অপর পক্ষে যোগ দিলেন। তখনকার সমরনীতি বড়ই অদ্ভুত ছিল। সারাদিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যা হইলে যখন যুদ্ধ শেষ হইত, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর শত্রুভাব থাকিত না, এমন কি এক পক্ষ অপর পক্ষের শিবিরে পর্যন্ত যাতায়াত করিত। প্রাতঃকাল হইলেই কিন্তু তাহারা আবার পরস্পর যুদ্ধ করিত। মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণের সময় পর্যন্ত হিন্দুগণ নিজেদের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। আবার প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অশ্বারোহী পদাতিককে আঘাত করিতে পারিবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা কেহ কখনও যুদ্ধ করিতে পারিবে না, নিজের যে সুবিধাগুলি আছে, শত্রুরও ঠিক সেইগুলি না থাকিলে তাহাকে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না, কোন প্রকার ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। মোট কথা কোন প্রকারে শত্রুর কোন ছিদ্র থাকিলে তাহার অবৈধ সুযোগ লইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। যদি কেহ এই সকল যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করিতেন, তবে তিনি ঘোর অপযশের ভাগী হইতেন, তাঁহার সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইবার যো থাকিত না। তখনকার ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ শিক্ষা পাইতেন। যখন মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আসিল, তখনও হিন্দুরা তাঁহাদের আক্রমণকারীদের প্রতি সেই শিক্ষানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বারবার পরাজিত করিয়াছিলেন এবং প্রতিবারই পরাজয়ের পর উপহারাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধিই ছিল যে, অপরের দেশে কখনও বলপূর্বক অধিকার করিবে না, আর কেহ পরাস্ত হইলে তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুসলমানবিজেতৃগণ কিন্তু হিন্দুরাজগণের উপর অন্য প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহাদিগকে হাতে পাইলে বিনা বিচারে তাঁহাদের প্রাণনাশ করিতেন।

এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মহাভারত বলিতেছেন, যে সময়ে এই যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হয়, তখন সে কেবল সাধারণ ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে; তখন দৈবাস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। এই দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রশক্তি, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন হইত। এইরূপ দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তি দশলক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণবৃষ্টি হইবে—এই মন্ত্রশক্তিবলে, দৈবশক্তিবলে চারিদিকে বজ্রপাত হইবে, যে কোন জিনিষ দগ্ধ করিতে পারা যাইবে, নানা অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত—উভয় মহাকাব্যের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, এইসব অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই। কামান খুব প্রাচীন জিনিষ। চীনা ও হিন্দুরা উভয়েই উহার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের নগরসমূহের প্রাচীরে লৌহনির্মিত শূন্যগর্ভ নলনির্মিত শত শত অদ্ভুত অস্ত্র থাকিত। লোকে বিশ্বাস করিত, চীনারা ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা শয়তানকে এক শূন্যগর্ভ লৌহনালীর ভিতর প্রবেশ করাইত, আর একটি গর্তে একটু অগ্নি সংযোগ করিলেই শয়তান ভয়ঙ্কর শব্দে উহা হইতে বাহির হইয়া অসংখ্য লোকের বিনাশ সাধন করিত।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া একজনের যেমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার কথা পাঠ করা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের যুদ্ধের জন্য নানাবিধ কৌশল-অবলম্বন, ব্যূহ-রচনা, বিভিন্ন প্রকার সৈন্যবিভাগ প্রভৃতির বিষয়ও পাঠ করা যায়। চারিপ্রকার যোদ্ধার কথা মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে—পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ। ইহার মধ্যে আধুনিক যুদ্ধে শেষ দুইটির ব্যবহার নাই। কিন্তু সে সময় উহাদের বিশেষ প্রচলন ছিল। শত সহস্র হস্তী, তাহাদের আরোহীর সহিত লৌহবর্মাদিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীরূপে গঠিত হইত—এই হস্তীসৈন্যকে শত্রুসৈন্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তারপর অবশ্য রথের খুব প্রচলন ছিল। আপনারা সকলেই প্রাচীন রথের ছবি দেখিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীনকালে এই রথের ব্যবহার ছিল।

কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষই, কৃষ্ণ যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে আসিয়া যোগ দেন, তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত কৃষ্ণ স্বয়ং এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। তবে তিনি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধকালে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিতে রাজী হইলেন, আর দুর্যোধনকে নিজ অজেয় নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন।

এইবার কুরুক্ষেত্রের সুবৃহৎ ভূভাগে অষ্টাদশ-দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের ভ্রাতৃগণ, উভয় পক্ষেরই আত্মীয়স্বজনগণ এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র বীর নিহত হইলেন। এমন কি উভয় পক্ষের মিলিত যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর যুদ্ধের অবসান হইল; পাণ্ডবরা জয়লাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী এবং অন্যান্য নারীগণ পতিপুত্রাদির শোকে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে সকলে কিছু পরিমাণে শান্ত হইলে মৃত বীরগণের যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ, যাহা 'ভগবদ্‌গীতা' অপূর্ব ও অমর কাব্যরূপে জগতে পরিচিত। ভারতে ইহাই সর্বজনপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় শাস্ত্র, আর ইহাতে যা উপদেশ আছে, তাহা শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণার্জুনের যে কথোপকথন হয়, তাহাই 'ভগবদ্‌গীতা' নামে পরিচিত। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে আমি উহা পড়িতে পরামর্শ দিই। ঐ গ্রন্থ আপনাদের দেশের উপরও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি আপনারা জানিতেন, তবে এতদিন উহা না পড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমার্সন যে উচ্চ তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল যদি জানিতে চান, তবে শুনুন—তাহা এই গীতা। তিনি একবার ইংলণ্ডে কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কার্লাইল তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দেন—কংকর্ডে যে উদার দার্শনিক তত্ত্বের আন্দোলন আরম্ভ হয়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাহার মূল। আমেরিকায় উদার ভাবের যত প্রকার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোনরূপে সেগুলি ঐ কংকর্ড-আন্দোলনের নিকট ঋণী। ৪

গীতার মূল বক্তা কৃষ্ণ। আপনারা যেমন ন্যাজারেথবাসী যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ঈশ্বরের অনেক অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের বিনাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ বহু অবতারে তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায় এক এক অবতারের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসক একটি সম্প্রদায়ও আছে। অন্যান্য অবতারের উপাসক অপাক্ষা বোধ হয় ভারতে কৃষ্ণোপাসকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণভক্তগণ বলেন, কৃষ্ণই অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভাবিয়া দেখঃ তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং গৃহীদের সুখে দুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল না; কি করিয়াই বা থাকিবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখঃ তিনি কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজারূপে সর্ব অবস্থাতেই আদর্শ চরিত্র দেখাইয়াছেন, আর তিনি যে অপূর্ব উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জীবনে নিজে তাহা আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে থাকিয়াও মধুর শান্তি লাভ করেন, আবার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেও মহাকর্মশীল, তিনিই জীবনের যথার্থ রহস্য বুঝিয়াছেন। ৫

ইহা কিরূপে কার্যে পরিণত হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহার উপায় অনাসক্তি। সব কাজ কর, কিন্তু কোন কিছুর সহিত নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিও না। তুমি সর্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থের কথা ধরুন, ধনবান্ হওয়া খুব ভাল কথা। কৃষ্ণের উপদেশ এই—অর্থ উপার্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, কিন্তু উহার প্রতি আসক্ত হইও না। পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, মানযশ সকল সম্বন্ধেই এই কথা। ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন যে, ইহাদের প্রতি যেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং প্রভু ভগবান্, আর কেহ নহে। আত্মীয়স্বজনের জন্য কার্য করুন, তাহাদিগকে ভালবাসুন, তাহাদের ভাল করুন, যদি প্রয়োজন হয় তাহাদের জন্য শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবন উক্ত উপদেশের যথার্থ উদাহরণস্বরূপ ছিল।

স্মরণ রাখিবেন—যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তাহা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন, আর তাঁহার জীবনের কতক অংশ প্রায় ন্যাজারেথবাসী যীশুর মত। কৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংস নামক এক অত্যাচারী রাজা ছিল। আর কংস দৈববাণী-শ্রবণে অবগত হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তাহার নিধনকর্তা জন্মগ্রহণ করিবেন। উহা শুনিয়া সে নিজ অনুচরবর্গকে সকল পুরুষ-শিশু হত্যা করিবার আদেশ দিল। কৃষ্ণের পিতামাতাও কংসকর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—সেই কারাগারেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণমাত্র সমুদয় কারাগার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নবজাত শিশু বলিয়া উঠিল, 'আমিই সমস্ত জীব-জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' আবার কৃষ্ণকে রূপকচ্ছলে ব্রজগোপাল বলা হইয়াছে, তাঁহার একটি নাম 'রাখালরাজ'। সাক্ষাৎ ভগবান্ নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে জানিতে পারিয়া ঋষিরা তাঁহার পূজার

জন্য উপস্থিত হইলেন। উভয়ের জীবনলীলার অন্যান্য অংশে আর কোন সাদৃশ্য নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণই এই অত্যাচারী কংসকে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও স্বয়ং সিংহাসন আরোহণ করিবার কল্পনাও করেন নাই। তিনি কর্তব্য বলিয়াই ঐ কার্য সম্পদান করিয়াছিলেন; উহার ফলাফল লইয়া বা উহাতে নিজের কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে—এই বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা উঠে নাই।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে মহারথী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম—যিনি আঠার দিনের মধ্যে দু-দশ দিন যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় শরশয্যায় শয়ান ছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, দানধর্ম, বিবাহবিধি প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সাংখ্য ও যোগতত্ত্ব এবং ঋষি দেবতা ও প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা ও কিংবদন্তী বিবৃত করিলেন। মহাভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভীষ্মের এই উপদেশে পূর্ণ; ইহা হিন্দুগণের ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বিধান, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ। ইতোমধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজপদে অভিষেক-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রক্তপাতে এবং আত্মীয়স্বজন ও কুলবৃদ্ধগণের নিধনে তাঁহার হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। এক্ষণে ব্যাসের উপদেশানুসারে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

যুদ্ধাবসানে পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সসম্মানে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন। পরে সেই বৃদ্ধ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া নিজ পতিব্রতা মহিষী ও পাণ্ডবগণের মাতা কুন্তীর সহিত শেষ জীবনে তপস্যার জন্য অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর ছত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইলে একদিন সংবাদ আসিল—পাণ্ডবদের পরম সুহৃৎ, পরম আত্মীয়, আচার্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জুন অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বশ্রুত শোকসংবাদই সমর্থন করিলেন। শুধু কৃষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই জীবিত ছিলেন না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন—আমাদেরও যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসাইয়া মহাপ্রস্থানের জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন। মহাপ্রস্থান এক প্রকার সন্ন্যাসবিশেষ। প্রাচীনকালে ভারতে রাজগণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হইতেন। জীবনের সকল মায়া কাটাইয়া পানাহারবর্জিত অবস্থায় যে পর্যন্ত না দেহপাত হয়, সে পর্যন্ত কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ের দিকে চলিতে হয়; এইরূপে চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে।

তারপর দেবগণ ও ঋষিগণ আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াসমূহ পার হইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের পরপারে সুমেরু পর্বত। সুমেরু পর্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক। সেখানে দেবগণ বাস করেন। কেহ কখনও সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্মিণী দ্রৌপদী স্বর্গগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বল্কল পরিধান করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে একটি কুকুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয়ে উপনীত হইলেন ও ক্লান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে করিতে অবশেষে সম্মুখে সুবিশাল সুমেরু গিরি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে বরফের উপর দিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। সকলের অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, 'রাজন্, দেখুন, রাজ্ঞী দ্রৌপদী ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন।' যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়া শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল বলিলেন, 'আমরা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, অগ্রসর হও।' কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, 'দেখুন, দেখুন আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।' রাজার শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি থামিলেন না। কেবল বলিলেন, 'চল, চল, অগ্রসর হও।'

সহদেবের পতনের পর এই অতিরিক্ত শীত ও হিমানীতে নকুল, অর্জুন ও ভীম একে একে পড়িলেন, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির তখন একাকী হইলেও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে কুকুরটি তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে তখনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐ কুকুরের সহিত হিমানীস্তূপের মধ্য দিয়া অনেক পর্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে অবশেষে সুমেরু পর্বতে উপনীত হইলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, দেবগণ এই ধার্মিক রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার ইন্দ্র দেবরথে আরোহণ করিয়া সেখানে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্, তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র তোমাকেই সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।' কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলিলেন, 'আমি আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে না লইয়া স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত নহি।' তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'তাঁহারা পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন।'

এখন যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণকারী সেই কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, এস, রথে আরোহণ কর।' ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, 'রাজন্, আপনি এ কি বলিতেছেন! কুকুর রথে আরোহণ করিবে! এই অশুচি কুকুরটাকে আপনি ত্যাগ করুন। কুকুর কখনও স্বর্গে যায় না। আপনার মনের ভাব কি? আপনি কি পাগল হইয়াছেন? মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল সশরীরে স্বর্গগমনের অধিকারী।' তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য; কিন্তু এই কুকুরটি হিমানীস্তূপ-লঙ্ঘনের সময় প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত বারবার আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আমার ভ্রাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষীরও

প্রাণ গেল—সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করিল, কেবল এই কুকুরটিই আমায় ত্যাগ করে নাই। আমি এখন উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?' ইন্দ্র বলিলেন, 'কুকুর-সঙ্গী মানুষের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুকুরটি পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে আপনার কোন অধর্ম হইবে না।' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কুকুরটি আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি শরণাগতকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি জীবন থাকিতে স্বর্গসুখ-সম্ভোগের জন্য অথবা দেবতার অনুরোধেও ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ করিব না।' তখন ইন্দ্র বলিলেন, 'রাজন্, আপনার শরণাগত কুকুরটি স্বর্গে গমন করে, ইহাই যদি আপনার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি এক কাজ করুন। আপনি মর্ত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, আর ওই কুকুর অশুচি—প্রাণিহত্যাকারী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরায়ণ; কুকুরটা পাপী, আপনি পুণ্যাত্মা। আপনি পুণ্যবলে যে স্বর্গলোক অর্জন করিয়াছেন, তাহা এই কুকুরের সহিত বিনিময় করিতে পারেন।' রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুকুর আমার সমুদয় পুণ্য লইয়া স্বর্গে গমন করুক।'

যুধিষ্ঠির এই বাক্য বলিবামাত্র পট-পরিবর্তন হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, সেখানে কুকুর নাই, তাহার স্থানে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যম বর্তমান। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, আমি সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, আপনার ধর্ম পরীক্ষার জন্য কুকুররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একটা সামান্য কুকুরকে নিজের পুণ্যার্জিত স্বর্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার জন্য নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আপনার মত নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ, আপনার জন্ম দ্বারা পৃথিবী ধন্য হইয়াছে। সর্বপ্রাণীর প্রতি আপনার গভীর অনুকম্পা—এইমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষয় সুখকর লোকসমূহ লাভ করুন। হে রাজন্, আপনি নিজধর্মবলে ঐ সকল লোক অর্জন করিয়াছেন, আপনার দিব্য পরমপদ লাভ হইবে।'

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র ধর্ম ও অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে আবার প্রথমে তাঁহার আরও কিছু পরীক্ষা হইল, পরে স্বর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর দেবদেহপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সকল দুঃখের অবসান হইল, তাঁহারা সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

এইরূপে মহাভারত উচ্চভাবদ্যোতক কবিতায় 'ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়' বর্ণনা করিয়া এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভারতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র দিলাম। কিন্তু মহাপ্রতিভাবান্ ও মনীষাসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস ইহাতে যে অসংখ্য মহাপুরুষের উন্নত ও মহিমময় চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে পারিলাম না। ধর্মভীরু অথচ দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম ও ন্যায়, অপরদিকে পুত্রবাৎসল্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পিতামহ ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহান্ ধর্মভাব, অপর চারি পাণ্ডবের উন্নত চরিত্র, যাহাতে একদিকে মহাশৌর্যবীর্য—অপর দিকে সর্বাবস্থায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ; মানবীয় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র, এবং তপস্বিনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের স্নেহময়ী জননী কুন্তী, সদা ভক্তিপরায়ণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীদের চরিত্র—যাহা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় কোন অংশে কম উজ্জ্বল নহে—এই কাব্যের এই সকল এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজগতের সযত্নে রক্ষিত জাতীয় সম্পত্তি, এবং তাঁহাদের ভাবধারা ও চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে বর্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

জড়ভরতের উপাখ্যান

[ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

প্রাচীনকালে ভরত নামে এক প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বৈদেশিকগণ যাহাকে 'ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত করেন, তাহা ঐ দেশের অধিবাসিগণের নিকট 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে বৃদ্ধ হইলে সকল আর্য-সন্তানকেই সে-যুগে সংসার ছাড়িয়া, নিজ পুত্রের উপর সংসারের সমস্ত ভার ঐশ্বর্য ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। সেখানে তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ—আত্মার চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে হইত; এইরূপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, পুরোহিতই হউন, কৃষকই হউন, ভৃত্যই হউন, পুরুষই হউন বা নারীই হউন, এই কর্তব্য হইতে কেহই অব্যাহতি পাইত না। কারণ—পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি রূপে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্তব্যগুলি সেই এক চরম অবস্থায় পৌঁছিবার সোপান মাত্র, যে অবস্থায় মানুষের জড়বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গমন করিলেন। এক সময় যিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, যিনি সুবর্ণরজতখচিত মর্মরপ্রাসাদে বাস করিতেন, যাঁহার পানপাত্র নানাবিধ রত্নমণ্ডিত ছিল, তিনি হিমারণ্যের এক স্রোতস্বিনীতীরে কুশ ও তৃণদ্বারা সহস্তে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া বন্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। মানবাত্মায় যিনি অন্তর্যামিরূপে নিত্যবর্তমান, সেই পরমাত্মার অহরহঃ স্মরণ-মননই তাঁহার একমাত্র কার্য হইল।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। একদিন রাজর্ষি নদীতীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় এক হরিণী জল পান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়েই কিছুদূরে একটি সিংহ প্রবল গর্জন করিয়া উঠিল। হরিণী এত ভীত হইল যে, পিপাসা দূর না করিয়াই নদী পার হইবার জন্য এক উচ্চ লম্ফ প্রদান করিল। আসন্নপ্রসবা হরিণী এইরূপে হঠাৎ ভয় পাওয়ায় এবং লম্ফপ্রদানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎক্ষণাৎ একটি শাবক প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। হরিণশাবকটি জন্মিয়াই জলে পড়িয়া গেল; নদীর খরস্রোত তাহাকে দ্রুত একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রাজার দৃষ্টি সেইদিকে নিপতিত হইল। রাজা নিজ আসন হইতে উঠিয়া হরিণশাবকটিকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজ কুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেকাদি শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। করুণাহৃদয় রাজর্ষি অতঃপর হরিণশিশুটির লালনপালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, প্রত্যহ তাহার জন্য সুকোমল তৃণ ও ফলমূলাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সংসারত্যাগী রাজর্ষির পিতৃসুলভ যত্নে হরিণশিশুটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সে একটি সুন্দরকায় হরিণ হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজা নিজের মনের বলে পরিবার রাজ্যসম্পদ অতুল বৈভব ও ঐশ্বর্যের উপর চিরজীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনি এখন নদী হইতে বাঁচান মৃগশিশুর উপর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিণের উপর তাঁহার স্নেহ যতই বর্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে অসমর্থ হইলেন। বনে চরিতে গিয়া যদি হরিণটির ফিরতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রাজর্ষির মন তাহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইত। তিনি ভাবিতেন—আহা, বুঝি আমার প্রিয় হরিণটিকে বাঘে আক্রমণ করিয়াছে, হয়তো বা তাহার অন্য কোনপ্রকার বিপদ হইয়াছে, তাহা না হইলে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে কালচক্রের পরিবর্তনে রাজর্ষির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার মন মৃত্যুকালেও আত্মতত্ত্বধ্যানে নিবিষ্ট না হইয়া হরিণটির চিন্তা করিতেছিল। নিজ প্রিয়তম মৃগটির কাতর নয়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জীবাত্মা দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে হরিণ-ভাবনার ফলে পরজন্মে তাঁহার হরিণ-দেহ হইল। কিন্তু কোন কর্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। সুতরাং রাজর্ষি ভরত গৃহস্থাশ্রমে রাজারূপে এবং বানপ্রস্থাশ্রমে ঋষিরূপে যে-সকল মহৎ ও শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহারও ফল ফলিল। যদিও তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পশু-শরীরে বাস করিতেছিলেন, তথাপি তিনি জাতিস্মর হইলেন অর্থাৎ পূর্বজন্মের সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত রহিল। তিনি নিজ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্বসংস্কারবশে ঋষিগণের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে যাইতেন; সেখানে প্রত্যহ যোগ, হোম ও উপনিষদ্ আলোচনা হইত।

মৃগরূপী ভরত যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পরজন্মে কোন ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মেও তিনি জাতিস্মর হইলেন, সুতরাং পূর্ববৃত্তান্ত সর্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই দৃঢ়সঙ্কল্প হইল যে, তিনি আর সংসারের ভালমন্দে জড়িত হইবেন না। শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ করিতেন না; পাছে সংসারজালে জড়িত হইয়া পড়েন—এই ভয়ে তিনি জড় ও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মন সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্বদা নিমগ্ন থাকিত, প্রারব্ধ কর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবনযাপন করিতেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতৃ-সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। তাঁহারা ঐ সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জড়প্রকৃতি ও অকর্মণ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার প্রতি এইটুকুমাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে দেহধারণের উপযোগী আহারমাত্র দিতেন। ভ্রাতৃজায়াগণ সর্বদাই তাঁহার প্রতি অতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত করিতেন; আর যদি তিনি তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহারা তাঁহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ভয় হইত না, তিনি একটি কথাও বলিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যাইত, তখন তিনি গৃহ হইতে

নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেন, ও তাঁদের ক্রোধের উপশম না হওয়া পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শান্তভবে গৃহে ফিরিতেন।

একদিন জড়ভরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহাকে অতিরিক্ত তাড়না করিলে তিনি গৃহের বাইরে গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই দেশের রাজা শিবিকারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন শিবিকা-বাহক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন রাজার অনুচরবর্গ তাহার স্থানে শিবিকাবাহন-কার্যের জন্য আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল; অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ভরতকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। তাহাকে সবল যুবাপুরুষ দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া হইয়াছে; তুমি তাহার পরিবর্তে রাজার শিবিকা বহন করিতে রাজী আছ?' ভরত তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। রাজার অনুচরগণ দেখিল এ ব্যক্তি বেশ হৃষ্টপুষ্ট; অতএব তাহারা তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিল। ভরতও নীরবে শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষমভাবে চলিতেছে। শিবিকার বহির্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নূতন বাহককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মূর্খ, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনাবোধ হইয়া থাকে, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনাবোধ হইয়া থাকে, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্।' তখন ভরত স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া জীবনে এই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেনঃ হে রাজন্, কাহাকে আপনি মূর্খ বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্লান্ত হইয়াছে, বলিতেছেন? কাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন্, 'তুই' শব্দের দ্বারা যদি আপনি এই মাংসপিণ্ড— দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহ যেমন পঞ্চভূতনির্মিত, এই দেহও তেমনি। আর দেহটা তো অচেতন, জড়; ইহার কি কোন প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে? যদি 'মন' আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনার মন যেরূপ, আমারও তো তাহাই—উহা তো সর্বব্যাপী। আর যদি 'তুই' শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো ইহা সেই আত্মা—আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা আপনাতে যেমন, আমাতেও তেমনি; জগতের মধ্যে ইহা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব। রাজন্ আপনি কি বলিতে চাহেন, আত্মা কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আপনি কি বলিতে চাহেন, আত্মা কখনও আহত হইতে পারেন? হে রাজন্, অসহায় পথসঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা আমার এই দেহটার ছিল না, তাই যাহাতে তাহারা পদদলিত না হয়, সেজন্য এইভাবে সাবধান হইয়া চলতেই শিবিকার গতি বিষম হইয়াছিল। কিন্তু আত্মা তো কখনও ক্লান্তি অনুভব করে না, দুর্বলতা বোধ করে না; কারণ আত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। এইরূপে তিনি আত্মার স্বরূপ, পরাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন।

রাজা পূর্বে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য গর্বিত ছিলেন, তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকাবাহন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেজন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।' ভরত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পূর্ববৎ নিজের ভাবে নীরবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ-চরিত্র

[ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। দেব ও দৈত্য উভয়েই এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও সর্বদাই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। সচরাচর মানব-প্রদত্ত যজ্ঞভাগে অথবা পৃথিবীর শাসন ও পরিচালন-ব্যাপারে দৈত্যগণের অধিকার ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও তাঁহারা প্রবল হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সিংহাসন অধিকার করিতেন এবং কিছুকালের জন্য পৃথিবী শাসন করিতেন। তখন দেবগণ সমগ্র জগতের প্রভু সর্বব্যাপী বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিতেন, তিনিও তাহাদিগকে উক্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। দৈত্যগণ পরাস্ত ও বিতাড়িত হইলে দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেন।

পূর্বোক্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে তাঁহার জ্ঞাতি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুগণের বাসস্থান মর্ত্যলোক, দেব ও দেবতুল্য ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত স্বর্গলোক এবং দৈত্যগণের বাসস্থান পাতাল শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু নিজেকে সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ঈশ্বর নাই, আর চারিদিকে আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোন স্থানে কেহ যেন বিষ্ণুর উপাসনা না করে, এখন হইতে সমুদয় পূজা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য।

হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র ছিল। তিনি শৈশবাবস্থা হইতে স্বভাবতই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত। অতি শৈশবেই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, আমি সমগ্র জগৎ হইতে বিষ্ণুর উপাসনা যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার নিজগৃহে যদি সেই উপাসনা প্রবেশ করে, তবে তো সর্বনাশ, অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুইজন কঠোরশাসনক্ষম শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন যে, প্রহ্লাদ যেন বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত কখনও শুনিতে না পায়। শিক্ষকদ্বয় সেই রাজপুত্রকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণের সহিত রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু প্রহ্লাদ তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী না হইয়া সর্বদা অপর বালকগণকে বিষ্ণুর উপাসনাপ্রনালী শিখাইতে নিযুক্ত রহিলেন। শিক্ষকগণ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। কারণ, তাঁহারা প্রবলপ্রতাপ রাজা হিরণ্যকশিপুকে অতিশয় ভয় করিতেন; অতএব তাঁহারা প্রহ্লাদকে এরূপ শিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসনা ও তদ্বিষয়ক উপদেশ-দান প্রহ্লাদের নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন নিজেদের দোষ-স্খালনের জন্য রাজার নিকট গিয়া এই ভয়ঙ্কর সমাচার নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পুত্র যে কেবল নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছে তাহা নহে, অপর বালকগণকেও বিষ্ণুর উপাসনা শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

রাজা ষণ্ড ও অমর্কের নিকট পুত্র সম্বন্ধে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে নিজসমীপে আহ্বান করিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রহ্লাদকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, 'আমি দৈত্যরাজ, আমিই এখন ত্রিভুবনের অধীশ্বর, অতএব আমিই একমাত্র উপাস্য', কিন্তু এই উপদেশে কোন ফল হইল না। বালক বারবার বলিতে লাগিলেন, 'সমগ্র জগতের অধীশ্বর সর্বব্যাপী বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; আপনার রাজ্যপ্রাপ্তিও বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন; আর যতদিন বিষ্ণুর ইচ্ছা থাকিবে, ততদিনই আপনার রাজত্ব।' প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বধ করিবার জন্য নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়াই দৈত্যগণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুতে এতদূর নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি শস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না।

প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন যে, শস্ত্রাঘাতেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না, তখন তিনি ভীত হইলেন। কিন্তু আবার দৈত্যজনোচিত অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বালককে বিনাশ করিবার নানাবিধ পৈশাচিক উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাহাকে হস্তীপদতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। উদ্দেশ্য— হস্তী তাহাকে পদতলে পিষিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যেমন লৌহপিণ্ডকে পিষিয়া ফেলা হস্তীর অসাধ্য, প্রহ্লাদের দেহও হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইল না। সুতরাং প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার এই উপায় বিফল হইল না।

পরে রাজা প্রহ্লাদকে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, তাঁহার এই আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে তৃণের উপর পতিত হয়, প্রহ্লাদও তদ্রূপ অক্ষতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য অতঃপর বিষপ্রয়োগ, অগ্নিসংযোগ, অনশনে রাখা, কূপে ফেলিয়া দেওয়া, অভিচার ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়— একটির পর একটি অবলম্বিত হইল; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং কিছুই তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

অবশেষে রাজা আদেশ করিলেন, পাতাল হইতে নাগগণকে আহ্বান করিয়া সেই নাগপাশে প্রহ্লাদকে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া দেওয়া হউক। তাহার উপর বড় বড় পাহাড় স্তূপাকার করিয়া দেওয়া হউক। এই অবস্থায় তাহাকে রাখা হউক, তাহা হইলে এখনই না হয় কিছুকাল পরে সে মরিয়া যাইবে। কিন্তু পিতার আদেশে এই অবস্থায় পতিত হইয়াও প্রহ্লাদ 'হে বিষ্ণু, হে

জগৎপতে, হে সৌন্দর্যনিধে’ ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর চিন্তা ও তাঁর ধ্যান করিতে করিতে তিনি ক্রমে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অতি নিকটে রহিয়াছেন; আরও চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অন্তর্যামী। অবশেষে তাঁহার অনুভব হইল যে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সকল বস্তু এবং তিনিই সর্বত্র।

যেমন প্রহ্লাদের এইরূপ অনুভূতি হইল, অমনি তাঁহার নাগপাশ খুলিয়া গেল, তাঁহার উপর যে পর্বতরাশি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা গুড়াইয়া গেল, তখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিল ও তিনি ধীরে ধীরে তরঙ্গরাজির উপর উত্থিত হইয়া নিরাপদে সমুদ্রকূলে নীত হইলেন। তিনি যে একজন দৈত্য, তাঁহার যে একটি মর্ত্যদেহ আছে, প্রহ্লাদ তখন এ-কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ— ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইতেছে। জগতে এমন কিছু নাই—যাহা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে, তিনিই সমগ্র জগতের—সমগ্র প্রকৃতির শাস্তাস্বরূপ। এই উপলব্ধি-বলে প্রহ্লাদ সমাধিজনিত অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দে নিমগ্ন রহিলেন। বহুকাল পরে তাঁহার দেহজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, তিনি নিজেকে প্রহ্লাদ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। দেহ সম্বন্ধে আবার সচেতন হইয়াই তিনি দেখিতে লাগিলেন, ভগবান্ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র রহিয়াছে। তখন জগতের সকল বস্তুই তাঁহার বিষ্ণু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, তাঁহার শত্রু ভগবান্ বিষ্ণুর পরমভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য অবলম্বিত সকল উপায়ই বিফল হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন দৈত্যরাজ পুনরায় পুত্রকে নিজ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য বলিয়া তাঁহাকে আবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ পূর্বে পিতার নিকট যেরূপ উত্তর দিতেন, এখনও সেই একই উত্তর তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, শিক্ষা ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার শিশুজনোচিত এসব খেয়াল চলিয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্কের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলেন। ষণ্ড ও অমর্ক তদনুসারে প্রহ্লাদকে রাজধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উপদেশ প্রহ্লাদের ভাল লাগিত না, তিনি সুযোগ পাইলেই সহপাঠী বালকগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপুর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, প্রহ্লাদ নিজ সহপাঠী দৈত্যবালকগণকেও বিষ্ণুভক্তি শিখাইতেছেন, তখন তিনি আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইলেন এবং বিষ্ণুকে অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, ‘বিষ্ণু সমগ্র জগতের অধীশ্বর, তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।’ এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে তর্জন গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘রে দুষ্ট, যদি তোর বিষ্ণু সর্বব্যাপী হন, তবে তিনি এই স্তম্ভে নাই কেন?’ প্রাহ্লাদ বিনীতভাবে বলিলেন, ‘হাঁ, অবশ্যই তিনি এই স্তম্ভে আছেন।’ তখন হিরণ্যকশিপু বলিলেন, ‘আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমি তোকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিতেছি, তোর বিষ্ণু তোকে রক্ষা করুক।’ এই বলিয়া দৈত্যরাজ তরবারিহস্তে প্রহ্লাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং স্তম্ভের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে বজ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইল, নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভমধ্য হইতে বিষ্ণু নির্গত হইলেন। সহসা এই ভীষণ মূর্তি দর্শনে চকিত ও ভীত হইয়া দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগবান্ নৃসিংহ কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন।

তখন স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদও ভগবান্ নৃসিংহদেবের চরণে পতিত হইয়া পরম মনোহর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন, ‘বৎস প্রহ্লাদ, তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।’ প্রহ্লাদ ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন, ‘প্রভো, আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, এক্ষণে আমার আর কি প্রার্থনা থাকিতে পারে? আপনি আর আমাকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাইবেন না।’ ভগবান্ পুনরায় বলিলেন, ‘প্রহ্লাদ, তোমার নিষ্কাম ভক্তি দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। তথাপি আমার দর্শন বৃথা হয় না। অতএব আমার নিকট যে কোন একটি বর প্রার্থনা কর।’ তখন প্রহ্লাদ বলিলেনঃ

অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ্য বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি থাকে, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় যেন সেইরূপ গভীর অনুরাগ আমার হৃদয়ে থাকে, হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়।

৬

তখন ভগবান্ বলিলেন, ‘বৎস প্রহ্লাদ, যদিও আমার পরম ভক্তগণ ইহলোক বা পরলোকের কোনরূপ কাম্যবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি তুমি আমার আদেশ সর্বদা আমাতে মন রাখিয়া কল্পান্ত পর্যন্ত পৃথিবী ভোগ কর ও পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান কর। যথাসময়ে কল্পান্তে দেহপাত হইলে আমাকে লাভ করিবে।’ এইরূপে প্রহ্লাদকে বর দিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ প্রহ্লাদকে

দৈত্যদের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া স্ব-স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন।

জগতের মহত্তম আচার্যগণ

[১৯০০ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুআরী প্যাসাডেনা সেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা]

হিন্দুদের মতানুসারে এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিল, তারপর পড়িল, কিছুকালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল, আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্য সমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গগতিতে চলিতে থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতিসমূহ উঠিতেছে আবার পড়িতেছে, উত্থানের পর পতন হইতেছে; ঐ পতনের পর আবার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিতে পুনরুত্থান হইয়া থাকে। এইরূপ তরঙ্গগতি সর্বদা চলিতেছে। ধর্মজগতেও এইরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে এইরূপ উত্থান পতন ঘটিয়া থাকে। জাতিবিশেষের অধঃপতন হইল, বোধ হইল যেন উহার জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু ঐ অবস্থায় ঐ জাতি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে, ক্রমে নববলে বলীয়ান্ হইয়া আবার প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে, তখন এক মহাতরঙ্গের আবির্ভাব হয়। সময়ে সময়ে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করিয়া আসে, আর সর্বদাই দেখা যায়—ঐ তরঙ্গের শীর্ষে ঈশ্বরের একজন বার্তাবহ স্বীয় জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। একদিকে তাঁহারই শক্তিতে সেই তরঙ্গের—সেই জাতির অভ্যুত্থান, অপরদিকে আবার যে-সকল শক্তি হইতে ঐ তরঙ্গের উদ্ভব, তিনি সেগুলিরই ফলস্বরূপ; উভয়েই যেন পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং তাঁহাকে এক হিসাবে স্রষ্টা বা জনক, অন্য হিসাবে সৃষ্ট বা জন্য বলা যাইতে পারে। তিনি সমাজের উপর তাঁহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেন, আবার তাঁহার ঐরূপ হওয়ার কারণই হইল সমাজ। ইঁহারাই জগতের চিন্তানায়ক, প্রেরিতপুরুষ, জীবনের বার্তাবহ, ঈশ্বরাবতার।

মানুষের ধারণা, জগতে ধর্ম একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব, ধর্মাচার্য বা ঈশ্বরবতার একজন মাত্রই হইতে পারেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকেই যেন একটি—কেবল একটি ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট; সুরগুলির সমন্বয়েই ঐকতানের সৃষ্টি—কেবল একটি সুরে নহে। বিভিন্ন জাতির জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন জাতিই কখনও সমগ্র জগৎ ভোগ করিবার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন জাতিই সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে, আমরাই কেবল সমগ্র জগতের—সমগ্র ভোগের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বিধাতানির্দিষ্ট এই জাতিসমূহের ঐকতানে প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেক জাতিকেই তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়, কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই সমুদয়ের সমষ্টিই মহাসমন্বয়—মহা ঐকতানস্বরূপ।

জাতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এই সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ইঁহাদের মধ্যে কেহই চিরকালের জন্য সমগ্র জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আসেন নাই। এপর্যন্ত কেহই কৃতকার্য হন নাই, ভবিষ্যতেও হইবেন না। মানবজাতির সমগ্র শিক্ষায় প্রত্যেকেরই দান একটি অংশ মাত্র। সুতরাং ইহা সত্য যে, কালে প্রত্যেক মহাপুরুষ জগতের ভাগ্যবিধাতা হইবেন।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই আজন্ম ব্যক্তিনির্ভর ধর্মে (personal religion) বিশ্বাসী। আমরা সূক্ষ্ম আত্মা ও নানা মতামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক আচরণ, প্রত্যেক কার্যই দেখাইয়া দেয় যে, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে প্রকটিত হইলেই আমরা তত্ত্ববিশেষ ধারণা করিতে সমর্থ হই। আমরা তখনই ভাববিশেষের ধারণায় সমর্থ হই, যখন উহা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে প্রতিভাত আদর্শ পুরুষবিশেষের চরিত্রের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয়। আমরা কেবল দৃষ্টান্তসহায়েই উপদেশ বুঝিতে পারি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা সকলে এতদূর উন্নত হইতাম যে, তত্ত্ববিশেষের ধারণা করিতে আমাদের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন হইত না, তবে অবশ্য খুবই ভাল হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তবিক আমরা ততদূর উন্নত নহি। সুতরাং স্বভাবতই অধিকাংশ মানব এই অসাধারণ পুরুষগণের, এই ঈশ্বরাবতারগণের—খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ দ্বারা পূজিত এই অবতারগণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। মুসলমানরা গোড়া হইতেই এইরূপ উপাসনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রফেট বা ঈশ্বরদূত বা অবতারের উপাসনার বা তাঁহাকে কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের একেবারে বিরোধী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন প্রফেট বা অবতারের পরিবর্তে তাঁহারা সহস্র সহস্র সাধু-মহাপুরুষের পূজা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ ঘটনা অস্বীকার করিয়া তো আর কাজ করা চলে না। প্রকৃত কথা এই, আমরা ব্যক্তিবিশেষকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর এরূপ উপাসনা আমাদের পক্ষে হিতকর। তোমাদের অবতার যীশুখ্রীষ্টকে যখন লোকে বলিয়াছিল, 'প্রভু, আমাদিগকে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে দেখান', তিনি তখন উত্তর দিয়াছিলেন, 'যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে।' তাঁহার এই কথাটি তোমরা স্মরণ করিও। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁহাকে মানব ব্যতীত অন্যভাবে কল্পনা করিতে পারে? আমরা তাঁকে কেবল মানবীয় ভাবের মধ্য দিয়াই দেখিতে সমর্থ। এই গৃহের সর্বত্রই তো আলোকতরঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে, তবে আমরা উহা দেখিতেছি না কেন? কেবল প্রদীপেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ঈশ্বর সর্বব্যাপী, নির্গুণ, নিরাকার, তত্ত্ববিশেষ হইলেও আমাদের মনের বর্তমান গঠন এরূপ যে, কেবল নররূপধারী অবতারের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে—দর্শন করিতে পারি। যখনই মহাজ্যোতিষ্কগণের আবির্ভাব হয়, তখনই মানব ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমরা জগতে যেভাবে আসিয়া থাকি, তাঁহারা সেভাবে আসেন না। আমরা আসি ভিখারীর মত, তাঁহারা আসেন সম্রাটের মত। আমরা এই জগতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের মত আসিয়া থাকি, যেন আমরা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি—কোনমতে পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা এখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘুরিতেছি; আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা উপলব্ধি করিতে আমরা জানি না, বুঝিতে পারি না। আমরা আজ এইরূপ কাজ করিতেছি, কাল আবার অন্যরূপ করিতেছি। আমরা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি, বাত্যামুখে ছোট ছোট পালকের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি।

কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়—এই সকল বার্তাবহ আসিয়া থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের জীবনব্রত যেন আজন্ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, জন্ম হইতেই তাঁহারা যেন বুঝিয়াছেন ও স্থির করিয়াছেন, জীবনে কি করিতে হইতে হইবে। তাঁহাদের জীবনে কি কি করিতে হইবে, তাহা যেন তাঁহাদের সম্মুখে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে; আর লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তাঁহারা সেই নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী হইতে কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন না। ইহার কারণ এই, তাঁহারা নির্দিষ্ট কোন কার্য করিবার জন্যই আসিয়া থাকেন, তাঁহারা জগৎকে কিছু দিবার জন্য—জগতের নিকট কোন এক বিশেষ বার্তা বহন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও যুক্তি বা তর্ক করেন না। তোমরা কি কখনও এইসকল মহাপুরুষ বা শ্রেষ্ঠ আচার্যকে তাঁহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্ক করিতে শুনিয়াছ বা এইরূপ পড়িয়াছ? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও যুক্তি তর্ক করেন নাই। যাহা সত্য, তাহাই তাঁহারা সোজাসুজি বলিয়াছেন। কেন তাঁহারা তর্ক করিতে যাইবেন? তাঁহারা যে সত্য দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা কেবল নিজেরাই দর্শন করেন না, অপরকেও দেখাইয়া থাকেন। যদি তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর আছেন কিনা, আর আমি যদি উত্তরে বলি—'হ্যাঁ', তবে তখনই তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'আপনার ঐরূপ বলিবার কি যুক্তি আছে?'—আর তোমাদিগকে উহার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দিবার জন্য বেচারা আমাকে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তোমরা যীশুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে, 'ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি?' তিনিও উত্তর দিতেন, 'হ্যাঁ, আছেন বৈকি!' তারপর 'তাঁহার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ আছে কি?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন, 'এই যে প্রভু সম্মুখেই রহিয়াছেন—তাঁহাকে দর্শন কর।' অতএব তোমরা দেখিতেছ, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই সকল মহাপুরুষের যে ধারণা, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফল, উহা যুক্তিবিচারলব্ধ নহে। তাঁহারা আর অন্ধকারে পথ হাতড়ান না, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শনজনিত বলে বলীয়ান্। আমি সম্মুখস্থ এই টেবিলটি দেখিতেছি, তুমি শত শত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর যে, টেবিলটি নাই, তুমি কখনই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ আমি উহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমার এই বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ় অচল, অটল, তাঁহাদের বিশ্বাসও—তাঁহাদের আদর্শের উপর, তাঁহাদের নিজ জীবনব্রতের উপর, সর্বোপরি তাঁহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাসও তদ্রূপ দৃঢ় ও অচল। এই মহাপুরুষগণ যেরূপ প্রবল আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন, অপর কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? তুমি কি পরলোক মানো? তুমি কি এই মত অথবা ঐ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস কর? কিন্তু মূলভিত্তিস্বরূপ সেই আত্মবিশ্বাসীই যে নাই। যে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে পারে না, সে আবার অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিবে, লোকে ইহা আশা করে কিরূপে? আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় নহি। এই একবার ভাবিতেছি—আমি নিত্যস্বরূপ, কিছুতে আমাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, আবার পরক্ষণেই আমি মৃত্যুভয়ে কাঁপিতেছি। এই ভাবিতেছি আমি অজর অমর, পরক্ষণেই হয়তো একটা ভূত দেখিয়া ভয়ে এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম যে, আমি কে, কোথায় রহিয়াছি, আমি মৃত কি জীবিত—সব ভুলিয়া গেলাম। এই ভাবিতেছি—আমি খুব ধার্মিক, আমি খুব চরিত্রবান; পরমুহূর্তেই এমন এক ধাক্কা খাইলাম যে, একেবারে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইহার কারণ কি?—কারণ আর কিছুই নহে, আমি নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, আমার চরিত্রবলরূপ মেরুদণ্ড ভগ্ন।

কিন্তু এই সকল মহত্তম আচার্যের চরিত্র আলোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের সকলের ভিতর এই একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাইবে যে, তাঁহারা সকলেই নিজের উপর অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন; এরূপ বিশ্বাস অসাধারণ, সুতরাং আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আর সেই কারণেই এই মহাপুরুষগণ নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, আর তাঁহারা নিজেদের অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশ সহস্র বিভিন্ন মতবাদ কল্পনা করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতে পারি না, কাজে কাজেই আমরা যে তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারি না, ইহা স্বাভাবিক।

আবার তাঁহাদের এরূপ শক্তি যে, যখন তাঁহাদের মুখ হইতে কোন বাণী উচ্চারিত হয়, তখন জগৎ উহা শুনিতে বাধ্য হয়। যখন তাঁহারা কিছু বলেন, প্রত্যেক শব্দটি সোজা সরল ভাবে গিয়া লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, বোমার মত ফাটিয়া সম্মুখে যাহা কিছু থাকে, তাহারই উপর নিজের অসীম প্রভাব বিস্তার করে। যদি কথার পশ্চাতে শক্তি না থাকে, শুধু কথায় কি আছে? তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলিতেছ, কিরূপেই বা তোমার ভাষার শব্দবিন্যাস করিতেছ, তাহাতে কি আসে যায়? কিন্তু ব্যাকরণশুদ্ধ বা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভাষা বলিতেছ কিনা, তাহাতেই বা কি আসে যায়? তোমার ভাষা আলঙ্কারিক কিনা, তাহাতেই বা কি আসে যায়? প্রশ্ন এই—মানুষকে তোমার দিবার কিছু আছে কি? ইহা কেবল কথা শোনা নয়, ইহা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। প্রথম প্রশ্ন এই—তোমার কিছু দিবার আছে কি? যদি থাকে তবে দাও। শব্দগুলি তো শুধু ঐ দেওয়ার কাজ করে মাত্র, ইহারা শুধু কিছু দিবার বিবিধ উপায়গুলির অন্যতম। অনেক সময় কোন প্রকার কথাবার্তা না কহিয়াই এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রে আছেঃ

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

কি আশ্চর্য! দেখ ঐ বটবৃক্ষের মূলে বৃদ্ধ শিষ্যগণসহ যুবা গুরু বসিয়া রহিয়াছেন। মৌনই গুরুর শাস্ত্রব্যাখ্যান এবং তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে!

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কখনও কখনও এমনও হয় যে, তাঁহারা আদৌ বাক্য উচ্চারণই করেন না, তথাপি তাঁহারা অপরের মনে সত্য সঞ্চারিত করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিপ্রাপ্ত—তাঁহারা চাপরাস পাইয়াছেন, তাঁহারা দূত হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা অপরকে অনায়াসে হুকুম করিয়া থাকেন; তোমাদিগকে সেই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

তোমাদের শাস্ত্রে যীশুখ্রীষ্ট যেরূপ জোরের সহিত অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, তাহা কি তোমাদের স্মরণ হইতেছে না? তিনি বলিতেছেন—'অতএব তোমরা যাও—গিয়া জগতের সকল জাতিকে শিক্ষা দাও, আমি তোমাদিগকে যে-সকল বিষয় আদেশ করিতেছি, তাহাদিগকে সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দাও।' তাঁহার সকল উক্তির ভিতরই তাঁহার নিজের যে জগৎকে শিক্ষা দিবার বিশেষ কিছু আছে, তাহার উপর প্রবল বিশ্বাস দেখা যায়। জগতের লোক যাঁহাদিগকে প্রফেট বা অবতার বলিয়া উপাসনা করে, সেই সকল মহাপুরুষদের মধ্যেই এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মহত্তম আচার্যগণ এই পৃথিবীতে জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ। আমরা অপর আর কাহার উপাসনা করিব? আমি মনে মনে ঈশ্বরের ধারণা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখিলাম—কি এক মিথ্যা ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা করিয়া বসিয়াছি। এরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে তো পাপই হইবে। কিন্তু চক্ষু মেলিলে দেখিতে পাই এই মহাপুরুষগণের বাস্তব জীবন ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে-কোন ধারণা অপেক্ষা উচ্চতর। আমার মত লোক দয়ার ধারণা আর কতদূর করিবে? কোন লোক যদি আমার নিকট হইতে কোন বস্তু চুরি করে, আমি তো অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে জেলে দিবার জন্য প্রস্তুত হই। আমার আর ক্ষমার উচ্চতম ধারণা কতদূর হইবে? আমার নিজের যতটুকু গুণ আছে, তাহার চেয়ে অধিক গুণের ধারণা আমার হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে নিজে দেহের বাহিরে লাফাইয়া পড়িতে পার? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে নিজ মনের বাহিরে লাফাইয়া যাইতে পার? কেহই নাই। তোমার ভগবৎ-প্রেমের ধারণা আর কি করিবে? বাস্তব জীবনে তোমরা নিজেরা যেরূপ পরস্পরকে ভালবাসিয়া থাক, তদপেক্ষা ভালবাসার উচ্চতর ধারণা কিরূপে করিবে? নিজেরা যাহা কখনও উপলব্ধি করি নাই, সে-সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমার সকল ধারণাই প্রতি পদে বিফল হইবে। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের জীবনরূপ প্রত্যক্ষ ব্যাপার আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কল্পনা করিয়া আমাদের ধারণা করিতে হয় না। তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিয়া আমরা প্রেম, দয়া, পবিত্রতা এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহা আমরা কখনই কল্পনা করিতেও পারিতাম না। অতএব আমরা এই সকল নরদেবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আর মানুষ ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারে? আমি এমন লোক দেখিতে চাই, যে মুখে নিরাকার-তত্ত্বের কথা যতই বলুক না কেন, কার্যতঃ পূর্বোক্তভাবে সাকার উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে সমর্থ। মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। নিরাকার ঈশ্বর, নির্গুণতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মুখে আলোচনা কর—বেশ কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল নরদেবই হইলেন সকল জাতির উপাস্য যথার্থ ঈশ্বর। এই সকল দেবমানবই চিরদিন জগতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন, আর যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, ততদিন তাঁহারা পূজিত হইবেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই আমাদের বিশ্বাস হয়, যথার্থ ঈশ্বর আছেন, যথার্থ ধর্মজীবন আছে; আমাদের আশা হয় আমরাও ঈশ্বরলাভ—ধর্মজীবনলাভ করিতে পারিব। কেবল অস্পষ্ট গূঢ় তত্ত্ব লইয়া কি ফল হয়?

তোমাদের নিকট আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহার সার মর্ম এই যে, আমার জীবন উক্ত সকল অবতারকেই পূজা করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে-সকল অবতার আসিবেন, তাঁহাদিগকেও পূজা করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। সন্তান যে কোন বেশে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হউক না, মাতা তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারেন। যদি না পারেন আমি নিশ্চই বলিতে পারি, তিনি কখনই তাহার মাতা নহেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, কোন একটি বিশেষ অবতারেই যথার্থ সত্য ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখিতেছ, অপরের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইতেছ না, তোমাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃ এই সিদ্ধান্তই মনে উদিত হয় যে, তোমরা কাহারও দেবত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পার নাই, কেবল কতকগুলি শব্দ গলাধঃকরণ করিয়াছ মাত্র। যেমন লোকে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া সেই দলের যে মত, তাহাই নিজের মত বলিয়া প্রচার করে, তোমরাও তেমনি ধর্মসম্প্রদায়বিশেষে যোগদান করিয়া সেই সম্প্রদায়ের মতগুলি নিজেদের বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ইহা তো প্রকৃত ধর্ম নহে। জগতে এমন নির্বোধও অনেক আছে, যাহারা নিকটে উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট জল থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষগণের খনিত বলিয়া লবণাক্ত কূপের জল পান করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইতে এই শিখিয়াছি যে, লোকে যে-সকল শয়তানির জন্য ধর্মকে নিন্দা করে, ধর্ম সে দোষে মোটেই দোষী নয়। কোন ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করে নাই, কোন ধর্মই ডাইনী অপবাদ দিয়া নারীকে পুড়াইয়া মারে নাই, কোন ধর্মই কখনও এই ধরনের অন্যায় কার্যের সমর্থন করে নাই। তবে মানুষকে এ-সকল কার্যে উত্তেজিত করিল কিসে? রাজনীতিই মানুষকে এই সকল অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করিয়াছে, ধর্ম নয়। আর যদি এরূপ রাজনীতি ধর্মের নাম ধারণ করে, তবে তাহাতে কাহার দোষ?

এইরূপ যখনই কোন ব্যক্তি উঠিয়া বলে, আমার ধর্মই সত্য ধর্ম, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথা কখনই ঠিক নহে, সে ধর্মের গোড়ার কথা জানে না। ধর্ম কেবল কথার কথা বা মতামত নহে, অথবা অপরের সিদ্ধান্তে কেবল নিজের বুদ্ধির সায় দেওয়া নহে। ধর্মের অর্থ—প্রাণে প্রাণে সত্য-উপলব্ধি করা; ধর্মের অর্থ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করা, প্রাণে অনুভব করা, উপলব্ধি করা যে, আমি আত্মস্বরূপ আর সেই অনন্ত পরমাত্মা এবং তাঁহার সকল অবতারের সহিত আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি তুমি বাস্তবিকই সেই পরমপিতা গৃহে প্রবেশ করিয়া থাক, তুমি অবশ্যই তাঁহার সন্তানগণকেও দেখিয়াছ, তবে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না কেন? যদি চিনিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই তুমি সেই পরমপিতার গৃহে প্রবেশ কর নাই। সন্তান যে-কোন বেশে মাতার সম্মুখে আসুক, মাতা তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারেন; সন্তানের যতই ছদ্মবেশ থাকুক, মাতার নিকট সন্তান কখনও আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। তোমরা সকল দেশের, সকল যুগের ধর্মপ্রাণ মহান্ নরনারীগণকে চিনিতে শেখ এবং লক্ষ্য করিও, বাস্তবিক তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেখানেই প্রকৃত ধর্মের বিকাশ হইয়াছে, যেখানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্পর্শ ঘটিয়াছে, ঈশ্বরের দর্শন হইয়াছে, আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছে, সেখানেই মনের ঔদার্য ও প্রসারবশতঃ মানুষ সর্বত্র ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এমন সময় ছিল, যখন মুসলমানগণ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্রঃ আল্লাহ

এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল। যাহা কিছু তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতির বহির্ভূত, সে-সমস্তই ধ্বংস করিতে হইবে এবং যে-কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তথাপি সেই যুগেও যে সকল মুসলমান দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা এরূপ ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, তাঁহারা সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং চিত্তের উদারতা লাভ করিয়াছিলেন।

আজকাল ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনা যায়, পাশাপাশি আর একটি মতবাদ মনুষ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, উহার নাম ক্রমাবনতি বা পূর্বাবস্থায় পুনরাবর্তন (Atavism)। ধর্ম বিষয়েও দেখা যায়, আমরা অনেক সময় উদারতার ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার প্রাচীন সঙ্কীর্ণ মতের দিকে ফিরিয়া আসি। কিন্তু প্রাচীন একঘেয়ে ভাব আশ্রয় না করিয়া আমাদের নূতন কিছু চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে ভুল থাকে থাকুক। নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় থাকা অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল। লক্ষ্যভেদের চেষ্টা তোমরা কেন করিবে না? বিফলতার মধ্য দিয়াই তো আমরা জ্ঞানের সোপান আরোহণ করিয়া থাকি। অনন্ত সময় পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এই দেওয়ালটিকে দেখ দেখি। ইহাকে কি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ? কিন্তু উহা যে দেওয়াল সেই দেওয়ালই রহিয়াছে, কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। মানুষ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, আবার সেই মানুষই দেবতা হইয়া থাকে। কিছু করা চাই—হউক উহা অন্যায়, কিছু না করা অপেক্ষা তো উহা ভাল। গরুতে কখনও মিথ্যা বলে না, কিন্তু চিরকাল সেই গরু রহিয়াছে। যাহাই হউক কিছু একটা কর। মাথা খাটাইয়া কিছু ভাবিতে শেখ; ভুল হউক, ঠিক হউক—ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কিছু চিন্তা কর দেখি। আমার পূর্বপুরুষেরা এইভাবে চিন্তা করেন নাই বলিয়া কি আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অনুভবশক্তি ও চিন্তাশক্তি সমুদয় হারাইয়া ফেলিতে হইবে? তাহা অপেক্ষা তো মরাই ভাল! আর যদি ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা জীবন্ত ধারণা, একটা নিজের ভাব কিছু না থাকে, তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি? নাস্তিকদের বরং কিছু হইবার আশা আছে, কারণ যদিও তাহারা অন্য সকল মানুষ হইতে ভিন্নমতাবলম্বী, তথাপি তাহারা নিজে চিন্তা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি নিজে কখনও চিন্তা করে না, তাহারা এখনও ধর্মরাজ্যে পদার্পণ করে নাই। তাহারা তো শুধু মেরুদণ্ডহীন জেলী-মাছের (Jellyfish) মত কোনরূপে নামমাত্র জীবনধারণ করিতেছে। তাহারা কখনও চিন্তা করিবে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ধর্মের জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী নাস্তিক, সে ধর্মের জন্য ব্যস্ত, সে উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অতএব ভাবিতে শেখ, প্রাণপণ ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হও। বিফলতায় কি আসে যায়? স্বরূপ চিন্তা করিতে গিয়া যদি কোন অদ্ভুত মত আশ্রয় করিতে হয়, তাহাতেই বা কি? লোকে তোমায় কিম্ভূতকিমাকার বলিবে বলিয়া যদি তোমার ভয় হয়, তবে উক্ত মতামত নিজ মনের ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখ, অপরের নিকট উহা প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাই হউক একটা কিছু কর। ভগবানের দিকে প্রাণপণ অগ্রসর হও, অবশ্যই আলোক আসিবে। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন আমার মুখে গ্রাস তুলিয়া দেয়, কালে আমি নিজের হাতের ব্যবহার ভুলিয়া যাইব। গড্ডলিকা-প্রবাহের মত একজন যেদিকে যাইতেছে, সকলে সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে তো আধ্যাত্মিক মৃত্যু। নিশ্চেষ্টতার ফল তো মৃত্যু। ক্রিয়াশীল হও। আর যেখানে ক্রিয়াশীলতা, সেখানে বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকিবে। বিভিন্নতা আছে বলিয়াই তো জীবন এত উপভোগ্য, বিভিন্নতাই জগতে সব কিছুর সৌন্দর্য ও কলাকৌশল; বিভিন্নতাই জগতে সমুদয় বস্তুকে সুন্দর করিয়াছে। এই বৈচিত্র্যই জীবনের মূল, জীবনের চিহ্ন; সুতরাং আমরা উহাতে ভয় পাইব কেন?

এইবার আমরা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণকে (Prophet) কতকটা বুঝিবার পথে অগ্রসর হইতেছি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, পূর্বোক্তভাবে ধর্ম আশ্রয় করিয়াও যাঁহারা নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের মত না হইয়া যেখানেই লোকে ধর্মতত্ত্ব লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, যেখানেই ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রেমের উদয় হইয়াছে, সেখানেই আত্মা ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে—জীবনে অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও, একবারও—সেই পরম বস্তুর আভাসমাত্র পাইয়াছে, সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের বন্ধন কাটিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মের ক্ষয় হয়; কারণ তিনি তখন সেই পরমপুরুষকে দেখিয়াছেন, যিনি দূর হইতেও অতি দূরে এবং নিকট হইতেই অতি নিকটে। ইহাই ধর্ম, ইহাই ধর্মের সার। আর বাদবাকী কেবল মতমতান্তর এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অবস্থায় পৌঁছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র। আমরা এখন ঝুড়িটা লইয়া টানাটানি করিতেছি মাত্র, ফল সব নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে।[৭]

যদি দুই ব্যক্তি ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, তাহাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞসা করঃ তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ, তোমরা কি অতীন্দ্রিয় বস্তু অনুভব করিয়াছ? একজন বলিতেছে, যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র অবতার; আচ্ছা, সে কি যীশুখ্রীষ্টকে দেখিয়াছে? সে অবশ্য বলিবে, 'আমি দেখি নাই।' 'আচ্ছা বাপু, তোমার পিতা কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?'—'না, মহাশয়।' 'তোমার পিতামহ কি দেখিয়াছেন?'—'না, মহাশয়।' 'তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?'—'না, মহাশয়।' 'তবে কি লইয়া বৃথা বিবাদ করিতেছ? ফলগুলি সব নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে, এখন ঝুড়ি লইয়া টানাটানি করিতেছ!' যাঁহাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, এমন নরনারীর এইরূপে বিবাদ করিতে লজ্জাবোধ করা উচিত।

এই মহাপুরুষ ও অবতারগণ সকলেই মহান্ ও সকলেই সত্য। কেন? কারণ, প্রত্যেকেই এক একটি মহান্ ভাব প্রচার করিতে

আসিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় অবতারগণের কথা ধর। তাঁহারাই প্রাচীনতম ধর্মসংস্থাপক। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কথা ধরা যাউক। তোমরা সকলেই গীতা পড়িয়াছ, সুতরাং তোমরা দেখিবে সমগ্র গ্রন্থের মূল কথা—অনাসক্তি। সর্বদা অনাসক্ত হও। হৃদয়ের ভালবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার?—তাঁহারই অধিকার, যাহার কখনও কোন পরিণাম নাই। কে তিনি?—ঈশ্বর। ভ্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না; কারণ তাহা হইতেই দুঃখের উদ্ভব। তুমি একজনকে হৃদয় দিতে পার, কিন্তু যদি সে মরিয়া যায়, তবে তোমার দুঃখ হইবে। তুমি বন্ধুবিশেষকে ঐরূপে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু আগামীকালই সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তুমি তোমার স্বামীকে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু কাল তিনি হয়তো তোমার সহিত বিবাদ করিয়া বসিবেন। তুমি স্ত্রীকে হৃদয় সমর্পণ করিতে পার, কিন্তু সে হয়তো কাল বাদ পরশু মরিয়া যাইবে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। তাঁহার ভালবাসার কখনও অভাব হয় না। আমরা যেখানেই থাকি এবং যাহাই করি না কেন, তিনি সর্বদাই আমাদের প্রতি সমভাবে দয়াময়, তাঁহার হৃদয় সর্বদাই আমাদের প্রতি সমভাবে প্রেমপূর্ণ। তাঁহার কখনই কোনরূপ পরিণাম নাই। আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তিনি কখনই রাগ করেন না। ঈশ্বর আমাদের উপর রাগ করিবেন কিরূপে? তোমার শিশুসন্তান নানা প্রকার দুষ্টামি করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি কি তাহার উপর রাগ কর? আমরা ভবিষ্যতে কি হইব তাহা কি ঈশ্বর জানেন না? তিনি নিশ্চয় জানেন, শীঘ্র বা বিলম্বে আমরা সকলেই পূর্ণত্ব লাভ করিব। সুতরাং আমাদের শত দোষ থাকিলেও তিনি ধৈর্য ধরিয়া থাকেন, তাঁহার ধৈর্য অসীম। আমাদের তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, আর জগতের যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে কেবল তাঁহার প্রকাশ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। ইহাই মূলমন্ত্র করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্ত্রীকে অবশ্যই ভালবাসিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রী বলিয়া নহে। উপনিষদ্ বলেন, স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, তাহা স্বামী বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেই আত্মা আছেন বলিয়া, ভগবান্ আছেন বলিয়া পতি প্রিয় হইয়া থাকেন।

৮

বেদান্তদর্শন বলেনঃ দাম্পত্য প্রেমে যদিও পত্নী ভাবেন, তিনি স্বামীকেই ভালবাসিতেছেন, অথবা পুত্রবাৎসল্যে জননী মনে করেন, তিনি পুত্রকেই ভালবাসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ঐ পতির ভিতর বা পুত্রের ভিতর অবস্থান করিয়া পত্নীকে ও জননীকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র আকর্ষণের বস্তু, তিনি ব্যতীত আকর্ষণের অন্য কিছু নাই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্নী ইহা জানেন না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনিও ঠিক পথে চলিতেছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকেই ভালবাসিতেছেন। তবে অজ্ঞাতসারে কাজ অনুষ্ঠিত হইলে, উহা হইতে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হয়, জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি হয়। আমাদের শাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন। যেখানে প্রেম—যেখানেই একবিন্দু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে ঈশ্বর রহিয়াছেন; কারণ ঈশ্বর রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। যেখানে তিনি নাই, সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলি এই ভাবের। তিনি সমগ্র ভারতে সমগ্র হিন্দুজাতির ভিতর এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুরা কাজ করিবার সময়, এমন কি জল পান করিবার সময়ও বলে, যদি কার্যের কোন শুভ ফল থাকে, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম। বৌদ্ধগণ কোন সৎকর্ম করিবার সময় বলিয়া থাকে, এই সৎকর্মের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হউক, আর জগতের সমুদয় দুঃখকষ্ট আমাতে আসুক। হিন্দুরা বলে, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্, সকল আত্মার অন্তরাত্মা, সুতরাং যদি আমরা সকল সৎকর্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ, আর ঐ ফল নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎ পাইবে।

ইহা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার একটি দিক্। তাঁহার অন্য শিক্ষা কি? সংসারের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কর্ম করেন, অথচ সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি কখনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিও তেমনি পাপে লিপ্ত হন না।

প্রবল কর্মশীলতা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের আর একটি দিক্। গীতা বলিতেছেন, দিবারাত্র কর্ম কর, কর্ম কর, কর্ম কর। তোমরা বলিতে পার—তবে শান্তি কোথায়? যদি সারাজীবন ছেকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত কাজ করিয়া যাইতে হয়, ঐরূপে গাড়ী জোতা অবস্থায় মরিতে হয়, তবে আমার জীবনে শান্তিলাভ হইল কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হ্যাঁ তুমি শান্তিলাভ করিবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্র হইতে পালায়ন শান্তির পথ নহে।' যদি পার সকল কর্তব্য কর্ম ছাড়িয়া পর্বতচূড়ায় বসিয়া থাক দেখি। সেখানে গিয়াও দেখিবে, মন সুস্থির নহে, ক্রমাগত এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। জনৈক ব্যক্তি একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কি একান্ত নিরুপদ্রব মনোরম স্থান পাইয়াছেন? আপনি হিমালয়ে কত বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছেন?' সন্ন্যাসী উত্তরে বলিলেন, 'চল্লিশ বৎসর।' তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, হিমালয়ে তো অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে, আপনি উহাদের মধ্যে একটি নির্বাচন করিয়া অনায়াসে থাকিতে পারিতেন। আপনি তাহা করিলেন না কেন?' সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার মন আমাকে উহা করিতে দেয় নাই।' আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বটে যে, আমরা শান্তিতে

থাকিব, কিন্তু আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

তোমরা সকলেই সেই 'তাতার-ধরা'[৯] সৈনিক পুরুষের গল্প শুনিয়াছ। জনৈক সৈনিক পুরুষ নগরের বহির্দেশে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া সেনাবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি একজন তাতারকে ধরে ফেলেছি।' ভিতর হইতে একজন বলিল, 'তাকে ভিতরে নিয়ে এস।' সৈনিক বলিলেন, 'সে আসছে না, মশায়।' 'তবে তুমি একাই ভিতরে চলে এস।'—'সে যেতে দিচ্ছে না, মশায়।' আমাদের মনের ভিতরেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমরা সকলেই 'তাতার ধরিয়াছি'। আমরাও উহাকে থামাইতে পারিতেছি না, উহাও আমাদিগকে শান্ত হইতে দিতেছে না। আমরা সকলেই যে পূর্বোক্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায় 'তাতার ধরিয়াছি'! আমরা সকলেই বলিয়া থাকি—শান্ত ভাব অবলম্বন কর, স্থির শান্ত হইয়া থাক, ইত্যাদি। এ কথা তো প্রত্যেক শিশুই বলিতে পারে, আর মনে করে, সে ইহা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা করা কঠিন। আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছি। আমি সব কর্তব্য ফেলিয়া দিয়া পর্বতশিখরে পলাইয়াছিলাম, গভীর অরণ্যে ও পর্বতগুহায় বাস করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই; কারণ আমিও 'তাতার ধরিয়াছিলাম', সংসার আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছিল। আমার মনের মধ্যে ঐ 'তাতার' রহিয়াছে, অতএব বাহিরে কাহারও উপর দোষ চাপানো ঠিক নহে। আমরা বলিয়া থাকি, বাইরের এই অবস্থাচক্র আমার অনুকূল; ঐ অবস্থাচক্র আমার প্রতিকূল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল গোলযোগের মূল ঐ 'তাতার' আমার ভিতরেই রহিয়াছে। উহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেনঃ 'কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না, মানুষের মত উহাদের সাধনে অগ্রসর হও; উহাদের ফলাফল কি হইবে, তাহা ভাবিও না।' ভৃত্যের প্রশ্ন করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, সৈনিক পুরুষের বিচার করিবার অধিকার নাই। কর্তব্য পালন করিয়া অগ্রসর হইতে থাক, তোমাকে যে কাজ করিতে হইতেছে, তাহা বড় কি ছোট, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিও না। কেবল মনকে জিজ্ঞাসা কর, মন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতেছে কিনা। যদি তুমি নিঃস্বার্থ হও, তবে কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না, কিছুই তোমার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। কাজে ডুবিয়া যাও, হাতের সামনে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহাই করিয়া যাও। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমে ক্রমে সত্য উপলব্ধি করিবে; 'যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করেন, আবার পরম নিস্তব্ধতা ও শান্তভাবের ভিতর প্রবল কর্মশীলতা দেখেন, তিনিই যোগী, তিনিই মহাপুরুষ তিনিই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সিদ্ধ হইয়াছেন।'[১০]

এক্ষণে তোমরা দেখিতেছ যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত উপদেশের ফলে জগতের সমুদয় কর্তব্যই পবিত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। জগতের এমন কোন কর্তব্য নাই, যাহাকে 'ছোট কাজ' বলিয়া ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের আছে। সুতরাং সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাধিরাজের রাজ্যশাসনরূপ কর্তব্যের সহিত সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্যের কোন প্রভেদ নাই।

এক্ষণে তোমরা বুদ্ধদেবের উপদেশ মনোযোগের সহিত শোন। তিনি জগতে যে মহতী বার্তা ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাণীও আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিয়া থাকে। বুদ্ধ বলিতেছেন, স্বার্থপরতা এবং যাহা কিছু তোমাকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে, তাহাই একেবারে উন্মূলিত কর। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া (স্বার্থপর) সংসারী হইও না, সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হও। সংসারী লোক মনে করে, আমি নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু যখনই সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়, অমনি সে স্বার্থপর হইয়া পড়ে। মা মনে করেন, আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু শিশুর মুখের দিকে তাকাইলেই তাঁহার স্বার্থপরতা আসিয়া পড়ে। এই জগতের সকল বিষয় সম্বন্ধেই এইরূপ। যখনই হৃদয়ে স্বার্থপর বাসনার উদয় হয়, যখনই লোকে কোন স্বার্থপর কার্য করে, তখনই তাহার মনুষ্যত্ব—যাহা লইয়া সে মানুষ—তাহা চলিয়া যায়, সে তখন পশুতুল্য হইয়া যায়, দাসবৎ হইয়া যায়, সে নিজে প্রতিবেশিগণকে, তাহার ভাতৃস্বরূপ মানবজাতিকে ভুলিয়া যায়। তখন সে আর বলে না, 'আগে তোমার হউক, পরে আমার হইবে', বরং বলে, 'আগে আমার হউক, তারপর বাকী সকলে নিজে নিজে দেখিয়া লইবে।' আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের জন্য আমাদের হৃদয়ের একদেশ উন্মুক্ত রাখিতে

হইবে। তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ না করিলে আমরা কখনই শান্ত ও অকপটভাবে এবং সানন্দে কোন কর্তব্য কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে কর্ম তোমাকে করিতে হইতেছে, তাহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তবুও ভয় পাইও না; কারণ, এমন কোন কাজই নাই, যাহাতে কিছু না কিছু দোষ নাই। 'সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, আর উহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।' ১১

অপরদিকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিতেছে। সেই বাণী বলিতেছেঃ সময় চলিয়া যায়, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভিভূত নরনারীগণ, তোমরা পরম মনোহর হর্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম উপাদেয় চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ; এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে; তাহাদের কথা কি কখনও ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদিত হয়? ভাবিয়া দেখ, জগতের মধ্যে মহাসত্য এইঃ সর্বং দুঃখমনিত্যমধ্রুবম্—দুঃখ আর দুঃখ—অনিত্য জগৎ দুঃখপূর্ণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াই কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন—ইহাই মহা সত্য ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাঁদিবারই স্থান। সুতরাং আমরা যদি ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ে স্থান দিই, আমাদের কখনও স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়।

আবার, সেই ঈশদূত ন্যাজারেথবাসী ঈশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার উপদেশঃ 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটবর্তী।' আমি শ্রীকৃষ্ণের বাণী মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া অনাসক্ত হইয়া কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ি। আমি হঠাৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ের ভিতর শুনিতে পাই —'সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন সততই দুঃখময়।' ঐ বাণী শুনিবামাত্র মন এই সংশয় দোলায় দুলিতে থাকে—কাহার কথা শুনিব, শ্রীকৃষ্ণের কথা না শ্রীবুদ্ধের কথা? তখনই বজ্রবেগে ভগবান্ ঈশার বাণী আসিয়া উপস্থিত হয়, 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।' এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না, কল্য হইবে বলিয়া কিছু ফেলিয়া রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাক, উহা তোমার নিকট এখনই উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং ভগবান্ ঈশার উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান রহিয়াছে, আমরা সাদরে তাঁহার ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা এই ঈশদূতকে—সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি।

তারপর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্য ভাবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারঃ 'মহম্মদের ধর্মে আবার ভাল কি থাকিতে পারে?' তাঁহার ধর্মে নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছে—যদি না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে কিরূপে? যাহা ভাল, তাহাই স্থায়ী হয়, অন্য সমুদয়ের বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। যাহা কিছু ভাল, তাহাই সবল ও দৃঢ়, সুতরাং তাহা স্থায়ী হয়। এই পৃথিবীতেই বা অপবিত্র ব্যক্তির জীবন কতদিন? পবিত্রচিত্ত সাধুর প্রভাব কি তাহা অপেক্ষা বেশী নয়? নিশ্চয়ই; কারণ পবিত্রতাই বল, সাধুতাই বল। সুতরাং মহম্মদের ধর্মে যদি কিছুই ভাল না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া আছে কিরূপে? মুসলমান-ধর্মে যথেষ্ট ভাল জিনিষ আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য; তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, জগতের প্রত্যেক অবতার, প্রত্যেক ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, প্রত্যেক ঈশদূতই জগতে বিশেষ বিশেষ সত্যের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। যদি তোমরা প্রথমে সেই বাণী শ্রবণ কর এবং পরে আচার্যের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সত্যের আলোকে তাঁহার সমগ্র জীবনটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। অজ্ঞ মূর্খেরা নানাবিধ মতমতান্তর কল্পনা করিয়া থাকে, আর নিজ নিজ মানসিক উন্নতি অনুযায়ী, নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া এই সকল মহাপুরুষে তাহা আরোপ করিয়া থাকে। তাঁহাদের উপদেশসমূহ লইয়া তাহারা নিজেদের মতানুযায়ী ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেক মহান্ আচার্যের জীবনই তাঁহার বাণীর একমাত্র ভাষ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, তিনি নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপদেশের সহিত ঠিক মিলিবে। গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার বাণীর কি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

মহম্মদ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভাতৃভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ কিছু থাকিবে না। তুরস্কের মুসলমান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়, আর তাহার যদি উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানদের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায়) নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা করিয়া দেখ। আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের একজন মিশনরী হঠাৎ কোন গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দেবে। আমাদের এত উচ্চ দর্শনশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কার্যের সময়, আচরণের সময় আমরা কিরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায়

এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা।

পূর্বে যে-সকল মহাপুরুষ ও অবতারের বিষয় কথিত হইল, তাঁহারা ছাড়া অন্য মহত্তর অবতার কি জগতে আসিবেন? অবশ্যই আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা আসিবেন বলিয়া বসিয়া থাকাও যায় না। আমি বরং চাই, তোমাদের প্রত্যেকেই সমুদয় প্রাচীন সংহিতার সমষ্টিস্বরূপ এই যথার্থ নব সংহিতার আচার্য হও, প্রবক্তা হও। প্রাচীনকালে বিভিন্ন আচার্যগণ যে-সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেগুলি গ্রহণ কর, নিজ নিজ অনুভূতির সহিত মিলাইয়া উহাদের সম্পূর্ণ কর এবং দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়া অপরের নিকট ঐ সত্য ঘোষণা কর। পূর্ববর্তী সকল আচার্যই মহান্ ছিলেন, প্রত্যেকেই আমাদের জন্য কিছু সত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ। আমরা তাহাদিগকে নমস্কার করি, আমরা তাঁহাদের দাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদেরও নমস্কার করিব; কারণ তাঁহারা যেমন প্রফেট, ঈশ্বরতনয় বা অবতার, আমরাও তাহাই। তাঁহারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমরাও এখনই ... ইহজীবনেই সিদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হইব। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—'স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।' এখনই, এই মুহূর্তেই, এস আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি—'আমি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হইব, আমি সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের বার্তাবহ হইব, আমি ঈশ্বরতনয়—শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ হইব।'

কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা

[এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খ্রীঃ ১ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে প্রদত্ত। আইডা আনসেল (Ida Ansell) নাম্নী জনৈক শ্রোত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুধ্যানের জন্য ইহার সাঙ্কেতিক লিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৫৬ খ্রীঃ Vedanta and the West পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি ইহার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করেন। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর ভাষণের কথাগুলি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই, সেখানে ... চিহ্ন দেওয়া আছে। প্রথম বন্ধনীর () মধ্যকার অংশ স্বামীজীর ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার কর্তৃক সন্নিবেশিত।]

যে কারণ পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, প্রায় সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, সে-যুগের অনুরূপ ঘটনাবলী আমরা এযুগেও ঘটিতে দেখি।

নির্দিষ্ট আদর্শ একটি আছে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারে না, ধারণাতেও তাহা আনিতে পারে না। ... যাঁহারা শক্তিমান্ তাঁহারা ঐ আদর্শ অনুযায়ী চলেন, অনেক সময়েই অসমর্থদের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি থাকে না। শক্তিমানের নিকট দুর্বল তো শুধু কৃপারই পাত্র! শক্তিমানরাই আগাইয়া যান। ... অবশ্য ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাদের সাহায্য করাই উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকগণ আমাদের হৃদয়বান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ান। এ পৃথিবীতে কয়েক বৎসরের জীবন দ্বারা এখনই সমগ্র অনন্ত জীবন নিরূপিত করিয়া ফেলিতে হইবে—এই মত যদি অনুসরণ করিতে হয়, ... তবে ইহা আমাদের নিকট অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকই হইবে। ... যাহারা দুর্বল, তাহাদের কথা ভাবিবার অবসর আমাদের থাকিবে না।

যদি এই জগৎ আমাদের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষালয় হয়, যদি অনন্ত জীবন শাশ্বত নিয়ম অনুসারেই গঠিত, রূপায়িত এবং পরিচালিত করিতে হয়, আর শাশ্বত নিয়মে সুযোগ যদি প্রত্যেকেই লাভ করে, তাহা হইলে তো আমাদের তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমবেদনা জানাইবার, চারিদিকে চাহিবার এবং দুর্বলের সাহায্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার প্রচুর সময় আমাদের আছে।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সংস্কৃতে আমরা দুইটি শব্দ পাইঃ একটি—'ধর্ম' অপরটির 'সঙ্ঘ'। ইহা খুবই বিস্ময়কর যে, শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বংশধরগণের অবলম্বিত ধর্মের কোন নাম নাই, (যদিও) বিদেশীরা ইহাকে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলিয়া অভিহিত করেন। 'ধর্ম' এক, তবে 'সম্প্রদায়' অনেক। যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক্ করিয়া ফেল, তখনই ইহা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তখন আর উহা 'ধর্ম' থাকে না। সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে), ঘোষণা করিতে ছাড়ে না যে, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে 'ধর্ম' বিশ্বাস করে যে, জগতে একটিমাত্র ধর্মই চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও আছে। দুইটি ধর্ম কখনও ছিল না। একই ধর্ম বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন দিক্ (উপস্থাপিত করিতেছে)। মানবজাতির লক্ষ্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয়ই সর্ব প্রথম সকলের মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।

এই কৃষ্ণ বুদ্ধের কয়েক হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী। এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, কৃষ্ণ কখনও ছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস—প্রাচীন সূর্যোপাসনা হইতে কৃষ্ণের পূজা উদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ নামে বহু ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, এক কৃষ্ণ ছিলেন রাজা, আর একজন ছিলেন সেনাপতি। সবগুলি এক কৃষ্ণে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ব্যাপার এই যে, যখন আধ্যাত্মিকতায় অনুপম এমন একজন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া নানাপ্রকার পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়। কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি যে-সকল ধর্মগ্রন্থ এবং উপাখ্যান এইরূপ এক ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়, সেগুলিকে তাঁহার চরিত্রের (ছাঁচে) নূতন করিয়া ঢালা প্রয়োজন। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টের গল্পগুলি খ্রীষ্টের সর্বজনগ্রাহ্য জীবন (এবং) চরিত্রের আলোকেই রূপায়িত করা উচিত। বুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় সমস্ত কাহিনীতেই 'পরার্থে আত্মত্যাগ'রূপ তাঁহার সমগ্র জীবনের প্রধান সুরটি বজায় রাখা হইয়াছে।

কৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই ... তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাবঃ প্রথম—বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য—পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাচীন পুরোহিতকুলের ঢংঢাং, আড়ম্বর ও ক্রিয়াকলাপাদির অসারতা কৃষ্ণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, তথাপি এই সমস্তের মধ্যে তিনি কিছু ভালও দেখিয়াছিলেন।

যদি তুমি শক্তিধর হও, উত্তম। কিন্তু তাই বলিয়া যে তোমার মত বলবান্ নয়, তাহাকে অভিশাপ দিও না। ... প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে, 'হতভাগ্য তোমরা!' কে আর বলে, 'আহা, আমি কী হতভাগ্য যে, তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি না!' মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জ্ঞান অনুযায়ী যতদূর করিবার করিতেছে, কিন্তু কী দুঃখের কথা, আমি তো তাহাদিগকে আমার পর্যায়ে

টানিয়া তুলিতে পারিতেছি না!

তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন, আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনা, পুরাণকথা সবই ঠিক। ... কেন? কারণ এগুলি একই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয়। ক্রিয়াকলাপ, শাস্ত্র, প্রতীক—এ সবই এক শৃঙ্খলের এক-একটি শিকলি। শক্ত করিয়া ধর। ইহাই একমাত্র কর্তব্য। যদি তুমি অকপট হও, আর যদি দীর্ঘ শৃঙ্খলের একটি শিকলিও ধরিতে পারিয়া থাক, তবে ছাড়িয়া দিও না, বাকী অংশটুকু তোমার কাছে আসিতে বাধ্য। (কিন্তু মানুষ) ধরিতে চায় না। তাহারা কেবল ঝগড়া-বিবাদে এবং কোন্‌টি ধরিব এই বিচারেই সময় কাটায়, ফলে কোন কিছুই ধরিয়া থাকে না। ... আমরা সর্বদা সত্যকে খুঁজিয়াই' বেড়াই, কিন্তু উহা 'লাভ' করিতে কখনও চাই না। আমরা চাই শুধু ঘুরিয়া বেড়ান ও (চাওয়ার) মজা। আমাদের প্রচুর শক্তি এইভাবেই ব্যয়িত হইতেছে। সেইজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেনঃ মূল কেন্দ্র হইতে প্রসারিত শৃঙ্খলগুলির যে-কোন একটি ধরিয়া ফেল। কোন একটি সোপান অপরটি হইতে বড় নয়। ... যতক্ষণ আন্তরিকতা থাকে, ততক্ষণ কোন ধর্মমতকে নিন্দা করিও না। যে-কোন একটি শিকলি জোর করিয়া ধর, তাহা হইলে ইহা তোমাকে কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া যাইবে। ... বাকী যাহা কিছু সব তোমার হৃদয়ই শিখাইয়া দিবে। ভিতরে গুরুই সকল মত, সমস্ত দর্শন শিক্ষা দিবেন।

খ্রীষ্টের মত কৃষ্ণও নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন। নিজের মধ্যে তিনি দেবতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'একদিনের জন্যও আমার পথের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। সকলকেই আমার কাছে আসিতে হইবে। যে আমাকে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, আমি তাহাকে সে ভাবেই অর্থাৎ সেই ফলপ্রদানের দ্বারাই অনুগৃহীত করি এবং ঐ ভাবের মধ্য দিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হই। ...' কৃষ্ণের হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

১২

কৃষ্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নির্ভীক ব্যক্তিত্বে আমরা ভয় পাই। আমরা তো সব কিছুর উপর নির্ভর করি ... কয়েকটি মিষ্টি কথার উপর, অবস্থার উপর। যখন আত্মা কিছুরই উপর নির্ভর করেন না, এমন কি জীবনের উপরও নয়—তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত। উপাসনাও এই একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। উপাসনার উপর কৃষ্ণ খুব জোর দিয়াছেন। (ঈশ্বরের উপাসনা কর।)

আমরা জগতে নানাপ্রকার উপাসনা দেখিতে পাই। আর্ত ভগবানকে খুব ডাকে। ... যাহার ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সেও ধনলাভের আশায় খুব প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের জন্যই যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। (প্রশ্ন হইতে পারেঃ) 'যদি ঈশ্বর আছেন, তবে এত দুঃখ কষ্ট কেন?' ভক্ত বলেন, '... জগতে দুঃখ আছে; (কিন্তু) তাই বলিয়া আমি ভগবানকে ভালবাসিতে ছাড়িব না। আমার (দুঃখ) দূর করিবার জন্য আমি তাঁহার উপাসনা করি না। তাঁহাকে আমি ভালবাসি, কেন না তিনি প্রেমস্বরূপ।' অন্য (প্রকারের) উপাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের; কিন্ত কৃষ্ণ কোন উপাসনারই নিন্দা করেন নাই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ক্রমে উন্নত হইবে এবং তাঁহাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে পারিবে।

এই জীবন-যাপন করিয়া কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিবে? আমাদের সকলকে কি অরণ্য গুহায় যাইতে হইবে? ... না, তাহাতে লাভ কিছুই নাই। মন যদি বশীভূত না হয়, তবে গুহায় বাস করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ এই একই মন সেখানেও নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। আমরা গুহাতেও বিশটি শয়তান (দেখিতে পাইব), কেননা যত সব শয়তান তো মনেই। মন বশে থাকিলে আমরা যেখানে বাস করি না কেন, উহা গুহার সমান।

আমরা যে-জগৎ দেখিতেছি, আমাদের নিজেদের মানসিক সংস্কারই তাহা সৃষ্টি করে। আমাদেরই চিন্তাধারা বস্তুনিচয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে। সমস্ত সংসারটাই আমাদের মনের মধ্যে। ঠিক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে শেখ। প্রথমতঃ এইটি বিশ্বাস কর যে, জগতে প্রত্যেক জিনিষেরই একটি অর্থ আছে। জগতের প্রতিটি দ্রব্যই সৎ, পবিত্র ও সুন্দর। যদি তোমাদের চোখে কিছু মন্দ ঠেকে, তবে মনে করিও যে যথার্থভাবে তাহা বুঝিতেছ না। সব বোঝা নিজের উপর লও। ... যখনই আমরা বলিতে প্রলুব্ধ হই যে, জগৎ অধঃপাতে যাইতেছে, তখনই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত; তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সংসারের সব কিছু ঠিকভাবে দেখিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি।

দিবারাত্র কাজ কর। 'দেখ, আমি জগতের ঈশ্বর, আমার কোন কর্তব্য নাই। প্রত্যেক কর্তব্যই বন্ধন। কিন্তু আমি কর্মের জন্যই কর্ম করি। যদি ক্ষণমাত্রও আমি কর্ম হইতে বিরত হই, (সব কিছু বিশৃঙ্খল হইবে)।' অতএব কেবল কাজ করিয়া যাও, কিন্তু কর্তব্যবোধে নয়।

১৩

এই সংসার যেন একটি খেলা।

তোমরা তাঁহার (ভগবানের) খেলার সাথী। কোন দুঃখ, কোন দুর্গতির কথা না ভাবিয়া কাজ করিয়া যাও। কদর্য বস্তিতে এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ভগবানেরই লীলা দেখ। লোককে উন্নত করিবার জন্য কাজ কর! (তাহারা যে পাপী বা হীন, তাহা নয়; কৃষ্ণ এরূপ বলেন না।)

সৎকাজ এত কম হয় কেন জান? কোন ভদ্রমহিলা একটি বস্তিতে গেলেন। ... তিনি কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'আহা, গরীব বেচারীরা! ইহা লইয়া সুখী হও।' ... আবার কোন সুন্দরী হয়তো রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একজন দরিদ্রকে দেখিলেন এবং কয়েকটি পয়সা তাহার সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভাব দেখি, ইহা কিরূপ নিন্দনীয়! আমরা ধন্য যে, এই বিষয়ে তোমাদের বাইবেলে ভগবান্ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যীশু বলিতেছেন, 'তোমরা আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে দীনতম ব্যক্তির জন্য ইহা করিয়াছ বলিয়া ইহা আমারই জন্য করা হইয়াছে।' তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার, এইরূপ চিন্তা করাও অধর্ম। প্রথমতঃ সাহায্য করার ভাবটি মন হইতে উৎপাটিত কর, তারপর উপাসনা করিতে যাও। ঈশ্বরের সন্তানসন্ততি যে তোমার প্রভুরই সন্তান। (আর সন্তান তো পিতারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।) তুমি তো তাঁহার সেবক। ... জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর! ঈশ্বর তোমার নিকট অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার জন্য উপাসনার কী চমৎকার সুযোগ! যে মুহূর্তে চিন্তা কর যে, তুমি 'সাহায্য' করিতেছ, তখনই সমস্ত আদর্শটি নষ্ট করিয়া নিজেকে অবনত করিয়া ফেলিয়াছ। এইটি জানিয়া কাজ কর। প্রশ্ন করিবে, 'তার পর?' তোমাকে আর হৃদয়ভেদী ভয়ানক দুঃখে পড়িতে হইবে না। ... তখন কর্ম আর বন্ধন হইবে না। কর্ম খেলা হইয়া যাইবে, আনন্দে পরিণত হইবে। কর্ম কর। অনাসক্ত হও। ইহাই সম্পূর্ণ কর্মরহস্য। যদি আসক্ত হও, দুঃখ আসিবে।

জীবনে আমরা যাহাই করিতে যাই, তাহার সঙ্গে নিজেদের এক করিয়া ফেলি। এই লোকটি কটু কথা বলিল, আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ক্রোধের সঙ্গে আমি এক হইয়া গেলাম—তারপরই আসে দুঃখ। নিজেকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত কর, আর কিছুর সঙ্গে নয়; কারণ আর সব কিছুই অসত্য। অনিত্য অসত্যের প্রতি আসক্তিই দুঃখ আনে। একমাত্র সৎস্বরূপই সত্য; তিনিই একমাত্র জীবন, তাঁহাতে বিষয়-বিষয়ী (object and subject) বোধ নাই।

কিন্তু নিষ্কাম ভালবাসায় তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না। যাহা কিছু কর, ক্ষতি নাই। বিবাহ করিতে পার, সন্তানের জনক হইতে পার ... তোমার যাহা খুশী তাহা করিতে পার—কিছুই তোমাকে দুঃখ দিবে না; 'অহং'—বুদ্ধিতে কিছু করিও না। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর; কর্মের জন্যই কর্ম কর। তাহাতে তোমার কি? তুমি নির্লিপ্তভাবে পাশে দাঁড়াইয়া থাক।

যখন আমরা ঐরূপ অনাসক্তি লাভ করি, তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। তখনই বুঝিতে পারি—একই সঙ্গে কি তীব্র কর্মচাঞ্চল্য ও শান্তি! প্রতিক্ষণে কি কর্ম, আবার কি বিশ্রাম! ইহাই সংসারের রহস্য—একই সত্তায় অকর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব, একই আধারে অনন্ত এবং সান্ত। তখনই আমরা রহস্যটি আবিষ্কার করিব। 'যিনি তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে অপার শান্তি এবং অসীম শান্তির মধ্যে চরম কর্মচাঞ্চল্য লাভ করেন, তিনিই যোগী হইয়াছেন।' কেবল তিনিই প্রকৃত কর্মী, আর কেহই নন। আমরা একটু কাজ করিয়াই ভাঙিয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? যেহেতু আমরা কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলি। যদি আমরা আসক্ত না হই, তাহা হইলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারি। ১৪

এইরূপ অনাসক্তিতে পৌঁছান কত কঠিন! সেইজন্য কৃষ্ণ আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ ও উপায়গুলির নির্দেশ দিতেছেন। (পুরুষ বা নারী) প্রত্যেকের পক্ষে সহজতম রাস্তা হইতেছে ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন না হইয়া কর্ম করা। বাসনাই বন্ধন সৃষ্টি করে। আমরা যদি কর্মের ফল চাই, তবে শুভই হউক, আর অশুভই হউক, উহার ফল ভোগ করিতে হইবেই। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের মহিমার জন্যই করি, তাহা হইলে ফল নিজের ভাবনা নিজেই ভাবিবে। 'কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।' সৈনিক ফলের আশা না করিয়াই যুদ্ধ করে। সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। যদি পরাজয় হয়, তাহা সেনাপতির—সৈনিকের ১৫

নয়। প্রীতির জন্যই আমরা কর্তব্য করিব—সেনাপতির প্রীতির জন্য, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য।

যদি শক্তি থাকে, বেদান্তদর্শনের ভাব গ্রহণ কর এবং স্বাধীন হও। যদি তাহা না পার তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাহাও যদি না পার, কোন প্রতীকের উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও যদি না পার, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সৎ কাজ কর। তোমার যাহা কিছু আছে, ভগবানের সেবায় উৎসর্গ কর। যুদ্ধ করিতে থাক। 'যে-কেহ ভক্তিভরে আমার উদ্দেশ্যে পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।' যদি তুমি কিছুই করিতে না পার, একটি সৎ কাজও যদি তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না[১৬] হয়, তবে প্রভুর শরণ লও। 'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের মত চালাইতেছেন। তুমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও ...।'

কৃষ্ণ (গীতায়) ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন, এগুলি তাহারই কয়েকটি। বুদ্ধ ও যীশুর ভক্তিবিষয়ক উপদেশ আরও অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থে আছে।

[১৭]

কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি। যীশু এবং কৃষ্ণের জীবনের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোন্ চরিত্রটিকে অপরটি হইতে ধার করা হইয়াছে—এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই একজন অত্যাচারী রাজা ছিল। উভয়েরই জন্ম হইয়াছিল অনেকটা এক অবস্থায়। দুইজনেরই মাতাপিতাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। দুইজনকেই দেবদূতেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহাদের জন্মবৎসরে যে শিশুগুলি ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। শৈশবাবস্থাও একই প্রকার। ... আবার পরিণামে উভয়েই নিহত হন। কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়; তিনি তাঁহার হত্যাকারীকে স্বর্গে লইয়া যান। খ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়; তিনি দস্যুর মঙ্গল কামনা করেন এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

নিউ টেষ্টামেণ্ট এবং গীতার উপদেশগুলিতেও অনেক মিল আছে। মানুষের চিন্তাধারা একই পথে অগ্রসর হয়। ... কৃষ্ণের নিজের কথায় আমি তোমাদিগকে ইহার উত্তর দিতেছিঃ 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। অতএব যখনই দেখিবে কোন মহাত্মা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট, জানিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহার পূজা করিবে। ...'[১৮]

তিনিই যদি বুদ্ধ বা যীশুরূপে অবতীর্ণ হন, তবে ধর্মে ধর্মে কেন এত মতভেদ? তাঁহাদের উপদেশ অবশ্য পালনীয়। হিন্দু ভক্ত বলিবেনঃ স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য আচার্য (লোকগুরু)-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক বলিবেনঃ ইঁহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইঁহারা মুক্ত হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার তাঁহারা আসেন, নরশরীর ধারণ করেন এবং মানবজাতির হিতসাধন করেন, আশৈশব জানেন—তাঁহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ...। আমাদের মত বন্ধনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেহ ধারণ করিতে হয় না। ... নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসেন। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি স্বতই তাঁহাদিগের ভিতর সঞ্চিত থাকে। আমরা ঐ শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারি না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘূর্ণাবর্ত অগণিত নরনারীকে টানিয়া আনে এবং ইহার গতি চলিতেই থাকে, কেননা এই মহাপুরুষদেরই একজন না একজন পিছন হইতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাই যতদিন সমগ্র মানবজাতির মুক্তি না হয় এবং এই পৃথিবীর

খেলা পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন ইহা চলিতে থাকে।

যাঁহাদের জীবন আমরা অনুধ্যান করিতেছি, সেই মহাপুরুষগণের নাম মহিমান্বিত হউক। তাঁহারাই তো জগতের জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁহারাই তো আমাদের উপাস্য। ভগবান্ যদি মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হন, কেবল তখনই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি? মানবদেহে সীমাবদ্ধ হইলেই আমাদের পক্ষে তাঁহাকে দেখা সম্ভব। ... যদি মানুষ ও ... জীবসকলকে ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মানি, তবে এই আচার্যগণই মানবজাতির নেতা এবং গুরু। অতএব, হে দেববন্দিতচরণ মহাপুরুষগণ, তোমাদিগকে প্রণাম! হে মনুষ্যজাতির পথপ্রদর্শকগণ, তোমাদিগকে প্রণাম! হে মহান্ আচার্যগণ, তোমাদের প্রণাম! হে পৃথিকৃৎগণ, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের চির প্রণতি।

ভগবান্ বুদ্ধ

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এক এক ধর্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভুল বুঝিবেন না, এদেশে অনেকেই ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, বৌদ্ধধর্ম সনাতনধর্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা আমাদের সনাতনধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের উপর তিনি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি; যাহার এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ।' ভগবান্ বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরোহিত-ব্যবসায়ীদের অপকৌশলেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ আলোচনা করিতে চাহিতেন না; ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেক অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন, 'ও-সব আমি কিছু জানি না।' মানবের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'নিজে ভাল কাজ কর এবং ভাল হও।' একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, 'ভগবান্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।' অপরে বলিলেন, 'না, না, ও-কথা ভুল; কারণ আমার শাস্ত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।' এইরূপ অপরেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি এ কথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?'

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, 'না, ভগবান্, সকল শাস্ত্রেই বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণময়।' ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ, পবিত্র ও কল্যাণকারী হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন?'

অবশ্য আমি তাঁহার সকল মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য দেখিব না, ইহার কি কোন অর্থ আছে? জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না।অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে।' কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তিসাধন কর।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ-শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি; তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।' তিনি সর্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গগমনের বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ববিধ সুখ জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতেন এবং সমুদ্রের মত বিশাল হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা-নিবারণের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি যজ্ঞে ছাগশিশু হত্যা করিলে আপনার স্বর্গগমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে তো আরও অধিক উপকার হইবে, অতএব যজ্ঞস্থলে আমায় বধ করুন।' রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরষ সর্ববিধ অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন। তিনি কর্মযোগীর আদর্শ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোন দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতেও না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহার মতামত বা কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগের অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। হইতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস করিতেন না, তাহা আমার চিন্তনীয় বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে। নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ইহয়া থাকে।

বুদ্ধের বাণী

[১৯০০ খ্রীঃ ১৮ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত ভাষণ]

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম—দার্শনিক দৃষ্টিতে নয়; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাধিক প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল, মানবসমাজের ওপর এই আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ফেটে পড়েছিল। এমন কোন সভ্যতা নেই, যার উপর কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব অনুভূত হয়নি।

বুদ্ধের অনুগামীরা খুব উদ্যমী ও প্রচারশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন; পারস্য, এশিয়া-মাইনরে তাঁরা গিয়েছিলেন; রুশ, পোল্যাণ্ড এবং এমন আরও অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গেছেন। চীন, কোরিয়া, জাপানে তাঁরা গিয়েছিলেন; ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সামরিক জয়যাত্রার ফলে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সমগ্র ভূমধ্য-অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, ভারতের মনীষাও তখন এশিয়া ও ইওরোপের বিশাল দেশগুলির মধ্যে বিস্তৃত পথ খুঁজে পেয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশে দেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন, আর তাঁদের শিক্ষার ফলে সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত কুসংস্কার এবং পুরোহিতদের অপকৌশলগুলি বিদূরিত হতে লাগল।

এই আন্দোলনকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে, বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে ভারতে যে অবস্থা ছিল, তা জানা দরকার—যেমন খ্রীষ্টধর্মকে বুঝতে হলে খ্রীষ্টের সমকালীন য়াহুদী সমাজের অবস্থাটি উপলব্ধি করা আবশ্যক। খ্রীষ্ট-জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল, সেই ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেকবারই তার পতন ও অভ্যুদয় হয়েছে—এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বহু জাতিরই একবার উত্থানের পর পতন হয় চিরতরে। দু-রকম জাতি আছেঃ এক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান, আর এক আছে যাদের উন্নতির অবসান হয়েছে। শান্তিপ্রিয় ভারত ও চীনের পতন হয়, কিন্তু আবার উত্থানও হয়; কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি একেবার তলিয়ে গেলে আর ওঠে না—তাদের হয় মৃত্যু। শান্তিকামীরাই ধন্য, কারণ শেষ পর্যন্ত তারাই পৃথিবী ভোগ করে।

যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম, সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান্ ধর্মনেতার—আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোহিতকুল ইতোমধ্যেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। য়াহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাদের দু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন—পুরোহিত ও ধর্মগুরু; পুরোহিতরা ১৯ জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র। সমগ্র 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে' (Old Testament) দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারগুলির বিরোধিতা করেছেন। আর এই বিরোধের পরিণতি হল ধর্মগুরুদের জয় এবং পুরোহিতদের পতন।

পুরোহিতরা বিশ্বাস করত—ঈশ্বর একজন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে। পুরোহিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই মানুষ পবিত্র বেদীর কাছে যেতে পারবে! পুরোহিতদের প্রণামী দিতে হবে, পূজা করতে হবে এবং তাদেরই হাতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এই পুরোহিত-প্রাধান্যের অভ্যুত্থান হয়েছে; এই মারাত্মক ক্ষমতালিপ্সা, এই ব্যাঘ্র-সুলভ তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মানুষের আদিম বৃত্তি। পুরোহিতরাই সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, সহস্র রকম বিধিনিষেধ জারী করবে, সরল সত্যকে নানা জটিল আকারে ব্যাখ্যা করবে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অনেক কাহিনীও শোনাবে। যদি এই জন্মেই প্রতিষ্ঠা চাও অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে চাও তো তাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যত রকম আচার-অনুষ্ঠান আছে, সব করতে হবে। এগুলি জীবনকে এতই জটিল এবং বুদ্ধিকে এতই ভ্রান্ত করে যে, আমি সোজাসুজিভাবে কোন কথা বললেও আপনারা অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন। ধর্মাচার্যেরা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের কুসংস্কার ও মতলব সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ এখনও সে-সব সতর্কবাণী শুনতে শেখেনি—এখনও তাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে।

মানুষকে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে। আজকাল গণতন্ত্র এবং সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের সমান, এ-কথা সে জানবে কি করে? এজন্য তার থাকা চাই—সবল মস্তিষ্ক এবং নিরর্থক ভাবমুক্ত পরিষ্কার মন; সমস্ত অসার সংস্কাররাশিকে ভেদ করে অন্তরের গভীরে যে শুদ্ধ সত্য আছে, তাতেই তার মনকে ভরিয়ে দিতে হবে। তখনই সে জানবে যে, পূর্ণতা ও সমগ্র শক্তি তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে—অপর কেউ এগুলি তাকে দিতে পারে না। যখনই সে এইটি বোধ করে,

সেই মুহূর্তেই সে মুক্ত হয়ে যায়, সে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তখন অনুভব করে, প্রত্যেকেই তারই মত পূর্ণ এবং অন্য ভাইয়ের উপর কোন রকম দৈহিক মানসিক বা নৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার তার আর কিছুই থাকে না। তার চেয়ে ছোট কেউ থাকতে পারে—এই ভাবটি সে একেবারে ত্যাগ করে। তখনই সে সাম্যের কথা বলতে পারে, তার পূর্বে নয়।

যাক, যা বলছিলাম, য়াহুদীদের মধ্যে পুরোহিত আর ধর্মগুরুদের বিরোধ অবিরাম চলছিল, এবং সব রকম শক্তি ও বিদ্যাকে পুরোহিতরা একচেটিয়া অধিকারে রাখতে সচেষ্ট ছিল, যতদিন না তারা নিজেরাই সেই শান্তি ও বিদ্যা হারাতে আরম্ভ করেছিল। যে শৃঙ্খল তারা সাধারণ মানুষের পায়ে পরিয়ে দেয়, তা তাদের নিজেদেরই পায়ে পরতে হয়েছিল। প্রভুরাই শেষ পর্যন্ত দাস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের পরিণতিই হল ন্যাজারেথবাসী যীশুর বিজয়—এই জয়লাভই হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস। খ্রীষ্ট অবশেষে রাশীকৃত শয়তানি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্যরূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার করে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন, যাতে যে-কেউ সেই সত্য লাভ করতে চায়, স্বাধীনভাবেই সে তা পেতে পারে। এ জন্য কোন পুরোহিতের মর্জির অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে না।

য়াহুদীরা কোনকালেই তেমন দার্শনিক জাতি নয়; ভারতীয়দের মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের ছিল না বা ভারতীয় মননশীলতাও তারা লাভ করেনি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবর্তক তো তাঁরাই, আর সত্যিই তাঁরা বিস্ময়কর সব কাজও করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সেই উদার মনোভাবটি লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করলেন। কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে খুনও করতেন, তবুও তাঁর কোন শাস্তি হত না। ব্রাহ্মণ তাঁর জন্মগত অধিকারবলেই অধীশ্বর। এমন কি অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও সম্মান দেখাতে হবে।

কিন্তু পুরোহিতেরা যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছেন, তখন 'সন্ন্যাসী' নামে তত্ত্বজ্ঞ ধর্মাচার্যেরাও ছিলেন। প্রত্যেক হিন্দু, তা তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য সব কর্ম পরিত্যাগ করে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সংসার যাঁদের কোনমতেই ভাল লাগে না, তাঁরা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এরূপ দু-হাজার আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সন্ন্যাসীরা মোটেই মাথা ঘামান না; যথাঃ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ কর—দশ অক্ষর, দ্বাদশ অক্ষর ইত্যাদি; এগুলি বাজে জিনিষ।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন। কিন্তু দুই পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যেরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পথের অনুবর্তন করতে লাগলেন—ক্রমে তাঁরাও পুরোহিত হয়ে দাঁড়ালেন ও বললেন, 'আমাদের সাহায্যেই সত্যকে জানতে পারবে।' এইভাবে সত্য বস্তু আবার কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ করল; সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিগণই বার বার এসেছেন। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি—দুই-ই সর্বদা থাকবে, নতুবা মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা অবাক হচ্ছ যে, পুরোহিতদের এত সব জটিল নিয়ম-কানুন কেন? তোমরা সোজাসুজি সত্যের কাছে আসতে পার না কেন? তোমরা কি সত্যকে প্রচার করতে লজ্জিত হচ্ছ, নতুবা এত সব দুর্বোধ্য আচার-বিচারের আড়ালে সত্যকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কেন? জগতের সম্মুখে সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না বলে তোমরা কি ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত নও? এই তো তোমাদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা? পুরোহিতরাই সত্য প্রচারের যোগ্য পুরুষ! সাধারণ মানুষ সত্যের যোগ্য নয়? সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে, কিছুটা তরল করতে হবে।

যীশুর শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) এবং গীতাই ধরা যাক—অতি সহজ সরল সে-সব কথা। একজন রাস্তার লোকও বুঝতে পারে। কী চমৎকার! সত্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরলভাবেই এখানে প্রকাশিত। কিন্তু না, ঐ পুরোহিতরা এত এত সহজেই সত্যকে ধরে ফেলাটা পছন্দ করবে না। তারা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার নরকের কথা শোনাবেই। লোকে যদি তাদের বিধান মেনে চলে, তবে স্বর্গে গতি হবে; আর তাদের অনুশাসন না মানলে লোকে নরকে যাবে।

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে। কেউ কেউ ভয় পান যে, যদি পূর্ণ-সত্য সাধারণকে বলে ফেলা হয়, তবে তাদের অনিষ্টই হবে। এঁরা বলেন—নির্বিশেষ সত্য লোককে জানান উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপসের ভাবে চলেও জগতের এমন কিছু একটা মঙ্গল হয়নি। এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? সত্যকেই ব্যক্ত কর। যদি তা যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যদি তাতে প্রতিবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে আসে, তাহলে শয়তানির পক্ষই সমর্থন করা হবে।

বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ এই-সব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জনসাধারণকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বেদের একটিমাত্র শব্দও কোন বেচারার কানে প্রবেশ করলে তাকে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হত। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত সত্যরাশি বেদকে পুরোহিতরা গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল!

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়—উন্মুক্ত আকাশের মত অনন্ত হৃদয়। তিনি দেখলেন জনসাধারণ কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কিভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার করতে তিনি চাননি। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ও ছিল বিশাল। প্রশস্ত হৃদয়—আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমত্তা নেই; কি উপায়ে

কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ—তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি। সব কিছুর সমাধান করেছিলেন তিনি। তিনি নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে বোধিলব্ধ শান্তি উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ।

তোমরা আর্নল্ড-এর 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia) কাব্যে পড়েছঃ বুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং জগতের দুঃখ তাঁকে কত গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল; ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হলেও নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তা তাঁকে মোটেই শান্তি দিতে পারেনি; পত্নী এবং নবজাত শিশুসন্তানকে রেখে কিভাবে তিনি সংসার ত্যাগ করেন; সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারে দ্বারে তিনি কতই ঘুরেছিলেন এবং অবশেষে কেমন করে বোধিলাভ করলেন। তাঁর বিশাল ধর্মান্দোলন, শিষ্যমণ্ডলী এবং ধর্মসঙ্ঘের কথাও তোমরা জান। এ-সবই জানা কথা। [২০]

ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয় রূপে দেখা দিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরোহিতদের সম্পর্কে একটি কথা কিন্তু বলে রাখা দরকার—তাঁরা কোনদিনই ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন না; ধর্মদ্রোহিতাও তাঁরা করেননি কখনও। যে-কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে অবাধে প্রচার করতে পারত। তাঁদের ধর্মবুদ্ধি এ-রকম ছিল যে, কোন ধর্মমতের জন্য তাঁরা কোনকালে কাউকে নির্যাতিত করেননি। কিন্তু পুরোহিতকুলের অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁদের পেয়ে বসেছিল; তাঁরাও ক্ষমতালোভী হলেন, নানা আইন-কানুন বিধি-বিধান তৈরী করে ধর্মকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করে তুলছিলেন, আর এইভাবেই তাঁদের ধর্মের যারা অনুগামী, তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন।

ধর্মের এইসব বাড়াবাড়ির মূলোচ্ছেদ করলেন বুদ্ধ। অতিশয় স্পষ্ট সত্যকে তিনি প্রচার করেছিলেন। নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি বেদের সারমর্ম প্রচার করেছিলেন; বৃহত্তর জগৎকে তিনি এই শিক্ষা দেন, কারণ তাঁর সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের আচার্য। প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। পুরোহিত ও অপরাপর বর্ণের মধ্যে ভেদ তিনি দূর করেন। নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের যোগ্য হতে পেরেছিল; নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত দেশেও তাঁর বাণী সত্যই খুব বলিষ্ঠ। যতপ্রকার ধর্মই প্রচার করা হোক, কোন ভারতীয়ই তাতে ব্যথিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ হজম করতে ভারতকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। আপনাদের কাছে তা আরও কত কঠিন লাগবে!

তাঁরা বাণী ছিল এইঃ আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদের জন্য সব কিছু বাসনা করি—তাই তো এত দুঃখ। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কী? আত্মবিসর্জন। 'অহং' বলে কিছু নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ক্রিয়াশীল জগৎ মাত্র আছে। জীবন-মৃত্যুর গতাগতির মূলে 'আত্মা' বলে কিছুই নেই। আছে শুধু চিন্তাপ্রবাহ, একটির পর আর একটি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের একটি ফুট উঠল, আবার বিলীন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই—এইমাত্র। এই চিন্তা বা সঙ্কল্পের কর্তা কেউ নেই—কোন জ্ঞাতাও নেই। দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে—মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'—মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই। যদি জানি যে 'আমি' বলে কিছু নেই, তাহলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।

এই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি; জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পশুবলি যদি কল্যাণের হয়, তবে তো মনুষ্যবলি অধিকতর কল্যাণের'—এবং নিজেকেই তিনি যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'পশুবলি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা—এ দুটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহিতদের উদ্ভাবিত একটি কুসংস্কার মাত্র। পুরোহিতদের কথামত যদি সত্যই কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো দেখছি আমারই মতন কার্য-কারণের অধীন। যদি তিনি কার্য-কারণের অতীত, তাহলে সৃষ্টি করেন কিসের জন্য? এ-রকম ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন মর্জি অনুযায়ী দুনিয়াকে শাসন করছেন, এবং আমাদের এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন শুধু জ্বলে-পুড়ে মরবার জন্য—আমাদের দিকে করুণায় ফিরে তাকাবার মত এক মুহূর্ত অবসরও তাঁর নেই! সমগ্র জীবনটাই নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের; কিন্তু তাও যথেষ্ট শাস্তি নয়—মৃত্যুর পরেও আবার নানা স্থানে ঘুরতে হবে এবং আরও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। তথাপি এই বিশ্বস্রষ্টাকে খুশী করবার জন্য আমরা কতই না যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড করে চলেছি!'

বুদ্ধ বলছেনঃ এ-সব আচার-অনুষ্ঠান—সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটিই। সব মোহকে বিনষ্ট কর; যা সত্য তাই শুধু

থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যালোক ফুটে উঠবে। ‘অহং’-এর বিনাশ কিভাবে হবে? সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও; একটি সামান্য পিপীলিকার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাক। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করবে না, কোন ভগবানকে খুশী করবার জন্যও নয় বা কোন পুরস্কারের লোভেও নয়—কারণ শুধু ‘অহং’কে বিনাশ করে তুমি নিজের নির্বাণ চাইছ! পূজা-উপাসনা এ-সব নিতান্ত অর্থহীন। তোমরা সবাই বল ‘ভগবানকে ধন্যবাদ’—কিন্তু কোথায় তিনি? কেউই জান না, অথচ ‘ভগবান্’, ‘ভগবান্’ করে সবাই মেতে উঠেছ।

হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর ছাড়া আর সব-কিছুই ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার মানে ভক্তির মূল উৎপাটন করা। ভক্তি ও ঈশ্বরকে হিন্দুরা আঁকড়ে থাকবেই। তারা কখনই এ-দুটি পরিত্যাগ করতে পারে না। আর বুদ্ধের শিক্ষায় দেখ—ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আত্মা কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের জন্য? ‘অহং’-এর জন্য নয়, কেন না তাও এক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই আমরা আমাদের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যারা এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্মের জন্যই কর্ম করে।

তথাপি এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এর একমাত্র কারণ বিস্ময়কর ভালবাসা যা মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল—শুধু মানুষের সেবায় নয়, সর্ব প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত হয়েছিল, যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখমোচন ভিন্ন অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে, আবার ঘুড়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের অবস্থা। ভগবানের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন করত, সহস্র সহস্র জীবহত্যা করত, এই ধরিত্রীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করত ভগবানেরই জয় দিয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ফিরে তাকাল ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। এই হল সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।

সত্য যেন সত্যেরই মত ভাস্বর থাকে, এটিই ছিল এই আচার্যের ইচ্ছা। কোন রকম নতি বা আপসের বালাই নেই; কোন পুরোহিত, কোন ক্ষমতাপন্ন লোক, কোন রাজার তোষামোদ করবারও আবশ্যক নেই। কোন কুসংস্কারমূলক আচারের কাছে—তা যত প্রাচীনই হোক না কেন, কারও মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই; সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলেই কোন অনুষ্ঠান বা পুঁথিকে মেনে নিলে চলবে না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র তিনি অস্বীকার করেছেন। এমন কি যে সংস্কৃত ভাষায় বরাবর ভারতবর্ষে ধর্ম শিক্ষা চলে আসছিল, তাও তিনি বর্জন করেছিলেন, যাতে তাঁর অনুগামীরা ঐ ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত সংস্কারগুলি কোনরূপ গ্রহণ করতে না পারে।

যে-তত্ত্বটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম, তাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা যায়—হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। আমরা বলি, বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে আমাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বের কথা আছে। আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা-কিছু সবই আত্মা—একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। মায়াতে আমরা আত্মাকে বহু দেখি। আত্মা কিন্তু এক, বহু নয়। সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেনঃ মানুষ শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত করে আমি নিজেকেই আঘাত করি। আমিই বিশ্বজগৎ। আমি যে ভাবি, আমি অমুক—ইহাই মায়া। প্রকৃত স্বরূপের দিকে যতই অগ্রসর হবে, এই মায়াও তত দূরে যাবে। বিভিন্নত্ব ভেদবুদ্ধি যতই লোপ পাবে, ততই বোধ করবে যে সবই এক পরমাত্মা। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু দূর আকাশে অবস্থান করছেন—এমন একজন কেউ নন তিনি। তিনি শুদ্ধ আত্মা। কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান? তোমার মনের অন্তরের অন্তস্তলেই তিনি রয়েছেন; তিনিই হচ্ছেন অন্তরাত্মা। তোমার নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করে কিভাবে ধারণ করবে? যখন তুমি তাঁকে তোমা থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবছ, তখন তাঁকে জানতে পার না; ‘তুমিই তিনি’—এটিই ভারতীয় ঋষিদের বাণী।

তুমি অমুককে দেখছ—এবং জগতের সব তোমা থেকে পৃথক্, এ-রকম ভাব নিছক স্বার্থপরতা। তুমি মনে কর, তুমি আর আমি ভিন্ন। আমার কথা তুমি একটুও ভাব না। তুমি ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে। আমি মরে গেলেও তোমার ভোজন পান ও আনন্দ ঠিকই থাকে। কিন্তু সংসারের বাকী লোক যখন কষ্ট পায়, তখন তুমি সুখ ভোগ করতে পার না। আমরা সকলেই এক। বৈষম্য ভ্রমই যত দুঃখের মূল। আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই—কিছুই নেই।

বুদ্ধের শিক্ষা হল—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রচলিত যাবতীয় মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছান্ন করে! সব-কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তাহলে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে, বল? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদেরই কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান্ তাদেরই সাহায্য করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য ধারণা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল ও পেশীগুলোকে দুর্বল করে দেয়, আর আমাদের পরনির্ভশীল করে তোলে। যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি; যখনই পরাধীনতা, তখনই দুঃখ। মানুষের নিজের মধ্যে অনন্ত শক্তি, এবং সে তা বোধ করতে পারে—সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে-ও অনন্ত আত্মা। নিশ্চয়ই তা সম্ভব, কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস কর না। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছ, আবার সর্বদা নিজেদের বারুদও তাজা রাখছ।

বুদ্ধের শিক্ষা ঠিক বিপরীত। মানুষকে আর কাঁদতে দিও না। পূজা-প্রার্থনার কোন দরকার নেই। ভগবান্ তো আর দোকান খুলে বসেননি? প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা; আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা। তোমাদের কি এমন কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া আছে, যার দ্বারা তোমরা সেই অনন্ত শক্তিমান্

ঈশ্বরের ভজনা করছ না? সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা। যদি ভেবে থাক, কতকগুলি শব্দই হচ্ছে পূজা, তাহলে সে পূজা নিতান্তই বাহ্য। এমন পূজা-প্রার্থনা মোটেই ভাল নয়, তাতে কখনও কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা মানে কি কোন যাদুমন্ত্র, কোন রকম পরিশ্রম না করে শুধু তা উচ্চারণ করলেই তুমি আশ্চর্য ফল লাভ করবে? কখনই না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে; অনন্ত শক্তির গভীরে সকলকেই ডুব দিতে হবে। ধনী-দরিদ্র সবারই ভিতরে সেই এক অনন্ত শক্তি। একজন কঠোর শ্রম করবে, আর একজন কয়েকটি কথা বার বার বলে ফল লাভ করবে—এ মোটেই সত্য নয়। এ বিশ্বজগৎও একটি নিরন্তর প্রার্থনা। যদি এই অর্থে প্রার্থনাকে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কথার প্রয়োজন নেই; নীরব পূজা বরং ভাল।

এই মতবাদের যথার্থ মর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বোঝে না। ভারতবর্ষে আত্মা সম্বন্ধে কোন-রকম আপসের অর্থ পুরোহিতমণ্ডলীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া, এবং আচার্যদের সমস্ত শিক্ষা ভুলে যাওয়া। বুদ্ধ এ-কথা জানতেন; তাই তিনি পুরোহিত-অনুশাসিত সর্বপ্রকার আচার অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। জনসাধারণের অভ্যস্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল; অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁকে আনতে হয়েছিল। ফলে এই যাগ-যজ্ঞমূলক ধর্ম ভারত থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়, কোনকালেই তার পুনরভ্যুদয় হল না।

বৌদ্ধধর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটি বিপদের বীজ ছিল—বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্ম যদি নাস্তি-ভাবের দিকেই বেশী জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকবে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না—সংগঠনী উপাদানই হচ্ছে যথার্থ প্রেরণা—যা তার মূল প্রেরণা। সংস্কারের কাজগুলি সম্পন্ন হবার পরই অস্তি-ভাবমূলক কাজের দিকে জোর দেওয়া উচিত; বাড়ী তৈরী হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়।

ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তি-ভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, ফলে তাদের ধর্মের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। নাস্তি-ভাবের প্রকোপে সত্যের অস্তি-ভাবমূলক দিকটা চাপা পড়ে যায় এবং এই কারণেই বুদ্ধের নামে যে সব বিনাশমূলক মনোভাব আবির্ভাব হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় ভাবধারার অনুশাসনই এই।

ঈশ্বর বলে কেউ নেই এবং আত্মাও নেই—বৌদ্ধধর্মের এই সব নাস্তি-ভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি বলি—একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; এটাই সন্দেহাতীত দৃঢ় উক্তি। তিনিই একমাত্র সদ্‌বস্তু। বুদ্ধ যেমন বলেন, আত্মা বলে কিছু নেই, আমিও বলি, ‘মানুষ তুমি বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হয়ে আছ; তুমিই সব।’ কত বাস্তব! সংস্কারের উপাদান মরে গেছে, কিন্তু সংগঠনী বীজ চিরকালের জন্য সজীব আছে। বুদ্ধ নিম্নজাতীয় প্রাণীদের প্রতিও করুণা শিখিয়ে গেছেন, তার পর থেকে ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যারা সর্বজীবে, এমন কি পশুপক্ষীদের প্রতিও করুণা করতে শেখায়নি। এই দয়া, ক্ষমা, করুণাই হল বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধ-জীবনের একটা বিশেষ অবদান আছে। আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, তবে তাঁর মতবাদের নই। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি। এত বড় মহৎ জীবনের ধারণা আমাদের মত অজ্ঞ স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণ চিত্ত মানুষ কি করে করতে পারে?

তারপর তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধির কথা ভেবে দেখ। কোনরকম ভাবাবেগ নেই। সেই বিশাল মস্তিষ্কে কুসংস্কারের লেশও ছিল না। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে, পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে, অথবা বন্ধুরা বিশ্বাস করতে বলছে—এই সব কারণেই বিশ্বাস কর না; তুমি নিজেই বিচার করে দেখ, নিজেই সত্যানুসন্ধান কর; নিজেই অনুভব কর। তারপর যদি তুমি তা অন্যের বা বহুর পক্ষে কল্যাণপদ মনে কর, তখন তা মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। কোমলমস্তিষ্ক ক্ষীণমতি দুর্বলচিত্ত কাপুরুষেরা কখনও সত্যকে জানতে পারে না। আকাশের মত উদার ও মুক্ত হওয়া চাই। চিত্ত হবে নির্মল স্বচ্ছ, তবেই তাতে সত্য প্রতিভাত হবে। কী কুসংস্কাররাশিতে পরিপূর্ণ আমরা সবাই! তোমাদের দেশেও, যেখানে তোমরা নিজেদের খুবই শিক্ষিত বলে ভাব, কী সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তোমরা! ভেবে দেখ তোমাদের এত সভ্যতার গর্ব সত্ত্বেও আমি নিতান্ত হিন্দু বলেই কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ-শ বছর আগে, বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, ভারতবাসীরা অবশ্যই আশ্চর্য রকম শিক্ষিত ছিল; নিশ্চই তারা অত্যন্ত উদার ছিল। বিশাল জনতা বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিল, নৃপতিরা সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, রাণীরা সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। এত বিপ্লবাত্মক এবং যুগ যুগ ধরে প্রচারিত পুরোহিতদের শিক্ষার চেয়ে এত ভিন্ন তাঁর শিক্ষা ও উপদেশগুলিকে জনসাধারণ সহজেই সমাদর ও গ্রহণ করতে পেরেছিল। অবশ্য তাদের মনও ছিল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এইবার তাঁর পরিনির্বাণের কথা চিন্তা কর। তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও ছিল তেমনি মহৎ। তোমাদের আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মতই কোন জাতের একটি লোকের দেওয়া খাদ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তারা নির্বিচারে সব কিছু খায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, ‘তোমরা এ-খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। লোকটির কাছে গিয়ে বল, আমার জীবনে এক মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে—সে আমাকে দেহ-মুক্ত করে

দিয়েছে।' এক বৃদ্ধ বুদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসে কাছে বসেছিল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে, তিনি তিরস্কার করে বললেন, 'এ কী? আমরা এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার ওপর কিছুমাত্র নির্ভর কর না, এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনিকিংবা উপলব্ধির স্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর।'

এমন কি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠা দাবী করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হচ্ছেন উপলব্ধির এক একটি অবস্থার নামমাত্র। লোকশিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশী করে শিক্ষা দিয়েছেন, শুধু মিথ্যা 'অহং'—এর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করেননি, অদৃশ্য ঈশ্বর বা দেবতাদের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্ত করেছেন। মুক্তির সেই অবস্থা—যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন, তা লাভ করবার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছিলেন। একদিন সে-অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে; সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

ভগবান্ বুদ্ধ

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এক এক ধর্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভুল বুঝিবেন না, এদেশে অনেকেই ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, বৌদ্ধধর্ম সনাতনধর্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা আমাদের সনাতনধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের উপর তিনি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি; যাহার এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ।' ভগবান্ বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরোহিত-ব্যবসায়ীদের অপকৌশলেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ আলোচনা করিতে চাহিতেন না; ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেক অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন, 'ও-সব আমি কিছু জানি না।' মানবের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'নিজে ভাল কাজ কর এবং ভাল হও।' একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, 'ভগবান্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।' অপরে বলিলেন, 'না, না, ও-কথা ভুল; কারণ আমার শাস্ত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।' এইরূপ অপরেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি এ কথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?'

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, 'না, ভগবান্, সকল শাস্ত্রেই বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণময়।' ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ, পবিত্র ও কল্যাণকারী হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন?'

অবশ্য আমি তাঁহার সকল মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য দেখিব না, ইহার কি কোন অর্থ আছে? জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না।অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে।' কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তিসাধন কর।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ-শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি; তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।' তিনি সর্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গগমনের বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ববিধ সুখ জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতেন এবং সমুদ্রের মত বিশাল হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা-নিবারণের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি যজ্ঞে ছাগশিশু হত্যা করিলে আপনার স্বর্গগমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে তো আরও অধিক উপকার হইবে, অতএব যজ্ঞস্থলে আমায় বধ করুন।' রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরষ সর্ববিধ অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন। তিনি কর্মযোগীর আদর্শ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোন দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতেও না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহার মতামত বা কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগের অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। হইতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস করিতেন না, তাহা আমার চিন্তনীয় বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে। নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ইহয়া থাকে।

বুদ্ধের বাণী

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম—দার্শনিক দৃষ্টিতে নয়; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাধিক প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল, মানবসমাজের ওপর এই আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ফেটে পড়েছিল। এমন কোন সভ্যতা নেই, যার উপর কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব অনুভূত হয়নি।

[১৯০০ খ্রীঃ ১৮ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত ভাষণ]

বুদ্ধের অনুগামীরা খুব উদ্যমী ও প্রচারশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন; পারস্য, এশিয়া-মাইনরে তাঁরা গিয়েছিলেন; রুশ, পোল্যাণ্ড এবং এমন আরও অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গেছেন। চীন, কোরিয়া, জাপানে তাঁরা গিয়েছিলেন; ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সামরিক জয়যাত্রার ফলে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সমগ্র ভূমধ্য-অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, ভারতের মনীষাও তখন এশিয়া ও ইওরোপের বিশাল দেশগুলির মধ্যে বিস্তৃত পথ খুঁজে পেয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশে দেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন, আর তাঁদের শিক্ষার ফলে সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত কুসংস্কার এবং পুরোহিতদের অপকৌশলগুলি বিদূরিত হতে লাগল।

এই আন্দোলনকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে, বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে ভারতে যে অবস্থা ছিল, তা জানা দরকার—যেমন খ্রীষ্টধর্মকে বুঝতে হলে খ্রীষ্টের সমকালীন য়াহুদী সমাজের অবস্থাটি উপলব্ধি করা আবশ্যক। খ্রীষ্ট-জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল, সেই ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেকবারই তার পতন ও অভ্যুদয় হয়েছে—এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বহু জাতিরই একবার উত্থানের পর পতন হয় চিরতরে। দু-রকম জাতি আছেঃ এক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান, আর এক আছে যাদের উন্নতির অবসান হয়েছে। শান্তিপ্রিয় ভারত ও চীনের পতন হয়, কিন্তু আবার উত্থানও হয়; কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি একেবার তলিয়ে গেলে আর ওঠে না—তাদের হয় মৃত্যু। শান্তিকামীরাই ধন্য, কারণ শেষ পর্যন্ত তারাই পৃথিবী ভোগ করে।

যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম, সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান্ ধর্মনেতার—আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোহিতকুল ইতোমধ্যেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। য়াহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাদের দু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন—পুরোহিত ও ধর্মগুরু; পুরোহিতরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র। সমগ্র 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে' (Old Testament) দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারগুলির বিরোধিতা করেছেন। আর এই বিরোধের পরিণতি হল ধর্মগুরুদের জয় এবং পুরোহিতদের পতন।

১৯

পুরোহিতরা বিশ্বাস করত—ঈশ্বর একজন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে। পুরোহিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই মানুষ পবিত্র বেদীর কাছে যেতে পারবে! পুরোহিতদের প্রণামী দিতে হবে, পূজা করতে হবে এবং তাদেরই হাতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এই পুরোহিত-প্রাধান্যের অভ্যুত্থান হয়েছে; এই মারাত্মক ক্ষমতালিপ্সা, এই ব্যাঘ্র-সুলভ তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মানুষের আদিম বৃত্তি। পুরোহিতরাই সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, সহস্র রকম বিধিনিষেধ জারী করবে, সরল সত্যকে নানা জটিল আকারে ব্যাখ্যা করবে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অনেক কাহিনীও শোনাবে। যদি এই জন্মেই প্রতিষ্ঠা চাও অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে চাও তো তাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যত রকম আচার-অনুষ্ঠান আছে, সব করতে হবে। এগুলি জীবনকে এতই জটিল এবং বুদ্ধিকে এতই ভ্রান্ত করে যে, আমি সোজাসুজিভাবে কোন কথা বললেও আপনারা অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন। ধর্মাচার্যেরা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের কুসংস্কার ও মতলব সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ এখনও সে-সব সতর্কবাণী শুনতে শেখেনি—এখনও তাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে।

মানুষকে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে। আজকাল গণতন্ত্র এবং সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের সমান, এ-কথা সে জানবে কি করে? এজন্য তার থাকা চাই—সবল মস্তিষ্ক এবং নিরর্থক ভাবমুক্ত পরিষ্কার মন; সমস্ত অসার সংস্কাররাশিকে ভেদ করে অন্তরের গভীরে যে শুদ্ধ সত্য আছে, তাতেই তার মনকে ভরিয়ে দিতে হবে। তখনই সে জানবে যে, পূর্ণতা ও সমগ্র শক্তি তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে—অপর কেউ এগুলি তাকে দিতে পারে না। যখনই সে এইটি বোধ করে,

সেই মুহূর্তেই সে মুক্ত হয়ে যায়, সে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তখন অনুভব করে, প্রত্যেকেই তারই মত পূর্ণ এবং অন্য ভাইয়ের উপর কোন রকম দৈহিক মানসিক বা নৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার তার আর কিছুই থাকে না। তার চেয়ে ছোট কেউ থাকতে পারে—এই ভাবটি সে একেবারে ত্যাগ করে। তখনই সে সাম্যের কথা বলতে পারে, তার পূর্বে নয়।

যাক, যা বলছিলাম, য়াহুদীদের মধ্যে পুরোহিত আর ধর্মগুরুদের বিরোধ অবিরাম চলছিল, এবং সব রকম শক্তি ও বিদ্যাকে পুরোহিতরা একচেটিয়া অধিকারে রাখতে সচেষ্ট ছিল, যতদিন না তারা নিজেরাই সেই শান্তি ও বিদ্যা হারাতে আরম্ভ করেছিল। যে শৃঙ্খল তারা সাধারণ মানুষের পায়ে পরিয়ে দেয়, তা তাদের নিজেদেরই পায়ে পরতে হয়েছিল। প্রভুরাই শেষ পর্যন্ত দাস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের পরিণতিই হল ন্যাজারেথবাসী যীশুর বিজয়—এই জয়লাভই হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস। খ্রীষ্ট অবশেষে রাশীকৃত শয়তানি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্যরূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার করে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন, যাতে যে-কেউ সেই সত্য লাভ করতে চায়, স্বাধীনভাবেই সে তা পেতে পারে। এ জন্য কোন পুরোহিতের মর্জির অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে না।

য়াহুদীরা কোনকালেই তেমন দার্শনিক জাতি নয়; ভারতীয়দের মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের ছিল না বা ভারতীয় মননশীলতাও তারা লাভ করেনি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবর্তক তো তাঁরাই, আর সত্যই তাঁরা বিস্ময়কর সব কাজও করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সেই উদার মনোভাবটি লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করলেন। কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে খুনও করতেন, তবুও তাঁর কোন শাস্তি হত না। ব্রাহ্মণ তাঁর জন্মগত অধিকারবলেই অধীশ্বর। এমন কি অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও সম্মান দেখাতে হবে।

কিন্তু পুরোহিতেরা যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছেন, তখন 'সন্ন্যাসী' নামে তত্ত্বজ্ঞ ধর্মাচার্যেরাও ছিলেন। প্রত্যেক হিন্দু, তা তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য সব কর্ম পরিত্যাগ করে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সংসার যাঁদের কোনমতেই ভাল লাগে না, তাঁরা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এরূপ দু-হাজার আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সন্ন্যাসীরা মোটেই মাথা ঘামান না; যথাঃ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ কর—দশ অক্ষর, দ্বাদশ অক্ষর ইত্যাদি; এগুলি বাজে জিনিষ।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন। কিন্তু দুই পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যেরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পথের অনুবর্তন করতে লাগলেন—ক্রমে তাঁরাও পুরোহিত হয়ে দাঁড়ালেন ও বললেন, 'আমাদের সাহায্যেই সত্যকে জানতে পারবে।' এইভাবে সত্য বস্তু আবার কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ করল; সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিগণই বার বার এসেছেন। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি—দুই-ই সর্বদা থাকবে, নতুবা মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা অবাক হচ্ছ যে, পুরোহিতদের এত সব জটিল নিয়ম-কানুন কেন? তোমরা সোজাসুজি সত্যের কাছে আসতে পার না কেন? তোমরা কি সত্যকে প্রচার করতে লজ্জিত হচ্ছ, নতুবা এত সব দুর্বোধ্য আচার-বিচারের আড়ালে সত্যকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কেন? জগতের সম্মুখে সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না বলে তোমরা কি ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত নও? এই তো তোমাদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা? পুরোহিতরাই সত্য প্রচারের যোগ্য পুরুষ! সাধারণ মানুষ সত্যের যোগ্য নয়? সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে, কিছুটা তরল করতে হবে।

যীশুর শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) এবং গীতাই ধরা যাক—অতি সহজ সরল সে-সব কথা। একজন রাস্তার লোকও বুঝতে পারে। কী চমৎকার! সত্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরলভাবেই এখানে প্রকাশিত। কিন্তু না, ঐ পুরোহিতরা এত এত সহজেই সত্যকে ধরে ফেলাটা পছন্দ করবে না। তারা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার নরকের কথা শোনাবেই। লোকে যদি তাদের বিধান মেনে চলে, তবে স্বর্গে গতি হবে; আর তাদের অনুশাসন না মানলে লোকে নরকে যাবে।

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে। কেউ কেউ ভয় পান যে, যদি পূর্ণ-সত্য সাধারণকে বলে ফেলা হয়, তবে তাদের অনিষ্টই হবে। এঁরা বলেন—নির্বিশেষ সত্য লোককে জানান উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপসের ভাবে চলেও জগতের এমন কিছু একটা মঙ্গল হয়নি। এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? সত্যকেই ব্যক্ত কর। যদি তা যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যদি তাতে প্রতিবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে আসে, তাহলে শয়তানির পক্ষই সমর্থন করা হবে।

বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ এই-সব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জনসাধারণকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বেদের একটিমাত্র শব্দও কোন বেচারার কানে প্রবেশ করলে তাকে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হত। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত সত্যরাশি বেদকে পুরোহিতরা গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল!

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়—উন্মুক্ত আকাশের মত অনন্ত হৃদয়। তিনি দেখলেন জনসাধারণ কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কিভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার করতে তিনি চাননি। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ও ছিল বিশাল। প্রশস্ত হৃদয়—আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমত্তা নেই; কি উপায়ে

কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ—তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি। সব কিছুর সমাধান করেছিলেন তিনি। তিনি নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে বোধিলব্ধ শান্তি উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ।

তোমরা আর্নল্ড-এর 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia) কাব্যে পড়েছঃ বুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং জগতের দুঃখ তাঁকে কত গভীরভাবে ব্যথিত ২০ করেছিল; ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হলেও নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তা তাঁকে মোটেই শান্তি দিতে পারেনি; পত্নী এবং নবজাত শিশুসন্তানকে রেখে কিভাবে তিনি সংসার ত্যাগ করেন; সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারে দ্বারে তিনি কতই ঘুরেছিলেন এবং অবশেষে কেমন করে বোধিলাভ করলেন। তাঁর বিশাল ধর্মান্দোলন, শিষ্যমণ্ডলী এবং ধর্মসঙ্ঘের কথাও তোমরা জান। এ-সবই জানা কথা।

ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয় রূপে দেখা দিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরোহিতদের সম্পর্কে একটি কথা কিন্তু বলে রাখা দরকার—তাঁরা কোনদিনই ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন না; ধর্মদ্রোহিতাও তাঁরা করেননি কখনও। যে-কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে অবাধে প্রচার করতে পারত। তাঁদের ধর্মবুদ্ধি এ-রকম ছিল যে, কোন ধর্মমতের জন্য তাঁরা কোনকালে কাউকে নির্যাতিত করেননি। কিন্তু পুরোহিতকুলের অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁদের পেয়ে বসেছিল; তাঁরাও ক্ষমতালোভী হলেন, নানা আইন-কানুন বিধি-বিধান তৈরী করে ধর্মকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করে তুলছিলেন, আর এইভাবেই তাঁদের ধর্মের যারা অনুগামী, তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন।

ধর্মের এইসব বাড়াবাড়ির মূলোচ্ছেদ করলেন বুদ্ধ। অতিশয় স্পষ্ট সত্যকে তিনি প্রচার করেছিলেন। নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি বেদের সারমর্ম প্রচার করেছিলেন; বৃহত্তর জগৎকে তিনি এই শিক্ষা দেন, কারণ তাঁর সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের আচার্য। প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। পুরোহিত ও অপরাপর বর্ণের মধ্যে ভেদ তিনি দূর করেন। নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের যোগ্য হতে পেরেছিল; নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত দেশেও তাঁর বাণী সত্যই খুব বলিষ্ঠ। যতপ্রকার ধর্মই প্রচার করা হোক, কোন ভারতীয়ই তাতে ব্যথিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ হজম করতে ভারতকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। আপনাদের কাছে তা আরও কত কঠিন লাগবে!

তাঁরা বাণী ছিল এইঃ আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদের জন্য সব কিছু বাসনা করি—তাই তো এত দুঃখ। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কী? আত্মবিসর্জন। 'অহং' বলে কিছু নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ক্রিয়াশীল জগৎ মাত্র আছে। জীবন-মৃত্যুর গতাগতির মূলে 'আত্মা' বলে কিছুই নেই। আছে শুধু চিন্তাপ্রবাহ, একটির পর আর একটি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের একটি ফুট উঠল, আবার বিলীন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই—এইমাত্র। এই চিন্তা বা সঙ্কল্পের কর্তা কেউ নেই—কোন জ্ঞাতাও নেই। দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে—মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'—মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই। যদি জানি যে 'আমি' বলে কিছু নেই, তাহলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।

এই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি; জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পশুবলি যদি কল্যাণের হয়, তবে তো মনুষ্যবলি অধিকতর কল্যাণের'—এবং নিজেকেই তিনি যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'পশুবলি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা—এ দুটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহিতদের উদ্ভাবিত একটি কুসংস্কার মাত্র। পুরোহিতদের কথামত যদি সত্যই কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো দেখছি আমারই মতন কার্য-কারণের অধীন। যদি তিনি কার্য-কারণের অতীত, তাহলে সৃষ্টি করেন কিসের জন্য? এ-রকম ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন মর্জি অনুযায়ী দুনিয়াকে শাসন করছেন, এবং আমাদের এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন শুধু জ্বলে-পুড়ে মরবার জন্য—আমাদের দিকে করুণায় ফিরে তাকাবার মত এক মুহূর্ত অবসরও তাঁর নেই! সমগ্র জীবনটাই নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের; কিন্তু তাও যথেষ্ট শাস্তি নয়—মৃত্যুর পরেও আবার নানা স্থানে ঘুরতে হবে এবং আরও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। তথাপি এই বিশ্বস্রষ্টাকে খুশী করবার জন্য আমরা কতই না যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড করে চলেছি!'

বুদ্ধ বলছেনঃ এ-সব আচার-অনুষ্ঠান—সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটিই। সব মোহকে বিনষ্ট কর; যা সত্য তাই শুধু

থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যালোক ফুটে উঠবে। 'অহং'-এর বিনাশ কিভাবে হবে? সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও; একটি সামান্য পিপীলিকার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাক। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করবে না, কোন ভগবানকে খুশী করবার জন্যও নয় বা কোন পুরস্কারের লোভেও নয়—কারণ শুধু 'অহং'কে বিনাশ করে তুমি নিজের নির্বাণ চাইছ! পূজা-উপাসনা এ-সব নিতান্ত অর্থহীন। তোমরা সবাই বল 'ভগবানকে ধন্যবাদ'—কিন্তু কোথায় তিনি? কেউই জান না, অথচ 'ভগবান্', 'ভগবান্' করে সবাই মেতে উঠেছ।

হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর ছাড়া আর সব-কিছুই ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার মানে ভক্তির মূল উৎপাটন করা। ভক্তি ও ঈশ্বরকে হিন্দুরা আঁকড়ে থাকবেই। তারা কখনই এ-দুটি পরিত্যাগ করতে পারে না। আর বুদ্ধের শিক্ষায় দেখ—ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আত্মা কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের জন্য? 'অহং'-এর জন্য নয়, কেন না তাও এক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই আমরা আমাদের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যারা এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্মের জন্যই কর্ম করে।

তথাপি এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এর একমাত্র কারণ বিস্ময়কর ভালবাসা যা মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল—শুধু মানুষের সেবায় নয়, সর্ব প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত হয়েছিল, যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখমোচন ভিন্ন অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে, আবার ঘুড়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের অবস্থা। ভগবানের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন করত, সহস্র সহস্র জীবহত্যা করত, এই ধরিত্রীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করত ভগবানেরই জয় দিয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ফিরে তাকাল ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। এই হল সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।

সত্য যেন সত্যেরই মত ভাস্বর থাকে, এটিই ছিল এই আচার্যের ইচ্ছা। কোন রকম নতি বা আপসের বালাই নেই; কোন পুরোহিত, কোন ক্ষমতাপন্ন লোক, কোন রাজার তোষামোদ করবারও আবশ্যক নেই। কোন কুসংস্কারমূলক আচারের কাছে—তা যত প্রাচীনই হোক না কেন, কারও মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই; সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলেই কোন অনুষ্ঠান বা পুঁথিকে মেনে নিলে চলবে না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র তিনি অস্বীকার করেছেন। এমন কি যে সংস্কৃত ভাষায় বরাবর ভারতবর্ষে ধর্ম শিক্ষা চলে আসছিল, তাও তিনি বর্জন করেছিলেন, যাতে তাঁর অনুগামীরা ঐ ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত সংস্কারগুলি কোনরূপ গ্রহণ করতে না পারে।

যে-তত্ত্বটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম, তাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা যায়—হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। আমরা বলি, বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে আমাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বের কথা আছে। আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা-কিছু সবই আত্মা—একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। মায়াতে আমরা আত্মাকে বহু দেখি। আত্মা কিন্তু এক, বহু নয়। সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেনঃ মানুষ শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত করে আমি নিজেকেই আঘাত করি। আমিই বিশ্বজগৎ। আমি যে ভাবি, আমি অমুক—ইহাই মায়া। প্রকৃত স্বরূপের দিকে যতই অগ্রসর হবে, এই মায়াও তত দূরে যাবে। বিভিন্নত্ব ভেদবুদ্ধি যতই লোপ পাবে, ততই বোধ করবে যে সবই এক পরমাত্মা। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু দূর আকাশে অবস্থান করছেন—এমন একজন কেউ নন তিনি। তিনি শুদ্ধ আত্মা। কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান? তোমার মনের অন্তরের অন্তস্তলেই তিনি রয়েছেন; তিনিই হচ্ছেন অন্তরাত্মা। তোমার নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করে কিভাবে ধারণ করবে? যখন তুমি তাঁকে তোমা থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবছ, তখন তাঁকে জানতে পার না; 'তুমিই তিনি'—এটিই ভারতীয় ঋষিদের বাণী।

তুমি অমুককে দেখছ—এবং জগতের সব তোমা থেকে পৃথক্, এ-রকম ভাব নিছক স্বার্থপরতা। তুমি মনে কর, তুমি আর আমি ভিন্ন। আমার কথা তুমি একটুও ভাব না। তুমি ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে। আমি মরে গেলেও তোমার ভোজন পান ও আনন্দ ঠিকই থাকে। কিন্তু সংসারের বাকী লোক যখন কষ্ট পায়, তখন তুমি সুখ ভোগ করতে পার না। আমরা সকলেই এক। বৈষম্য ভ্রমই যত দুঃখের মূল। আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই—কিছুই নেই।

বুদ্ধের শিক্ষা হল—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রচলিত যাবতীয় মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে! সব-কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তাহলে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে, বল? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদেরই কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান্ তাদেরই সাহায্য করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য ধারণা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল ও পেশীগুলোকে দুর্বল করে দেয়, আর আমাদের পরনির্ভশীল করে তোলে। যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি; যখনই পরাধীনতা, তখনই দুঃখ। মানুষের নিজের মধ্যে অনন্ত শক্তি, এবং সে তা বোধ করতে পারে—সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে-ও অনন্ত আত্মা। নিশ্চয়ই তা সম্ভব, কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস কর না। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছ, আবার সর্বদা নিজেদের বারুদও তাজা রাখছ।

বুদ্ধের শিক্ষা ঠিক বিপরীত। মানুষকে আর কাঁদতে দিও না। পূজা-প্রার্থনার কোন দরকার নেই। ভগবান্ তো আর দোকান খুলে বসেননি? প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা; আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা। তোমাদের কি এমন কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া আছে, যার দ্বারা তোমরা সেই অনন্ত শক্তিমান্

ঈশ্বরের ভজনা করছ না? সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা। যদি ভেবে থাক, কতকগুলি শব্দই হচ্ছে পূজা, তাহলে সে পূজা নিতান্তই বাহ্য। এমন পূজা-প্রার্থনা মোটেই ভাল নয়, তাতে কখনও কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা মানে কি কোন যাদুমন্ত্র, কোন রকম পরিশ্রম না করে শুধু তা উচ্চারণ করলেই তুমি আশ্চর্য ফল লাভ করবে? কখনই না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে; অনন্ত শক্তির গভীরে সকলকেই ডুব দিতে হবে। ধনী-দরিদ্র সবারই ভিতরে সেই এক অনন্ত শক্তি। একজন কঠোর শ্রম করবে, আর একজন কয়েকটি কথা বার বার বলে ফল লাভ করবে—এ মোটেই সত্য নয়। এ বিশ্বজগৎও একটি নিরন্তর প্রার্থনা। যদি এই অর্থে প্রার্থনাকে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কথার প্রয়োজন নেই; নীরব পূজা বরং ভাল।

এই মতবাদের যথার্থ মর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বোঝে না। ভারতবর্ষে আত্মা সম্বন্ধে কোন-রকম আপসের অর্থ পুরোহিতমণ্ডলীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া, এবং আচার্যদের সমস্ত শিক্ষা ভুলে যাওয়া। বুদ্ধ এ-কথা জানতেন; তাই তিনি পুরোহিত-অনুশাসিত সর্বপ্রকার আচার অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। জনসাধারণের অভ্যস্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল; অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁকে আনতে হয়েছিল। ফলে এই যাগ-যজ্ঞমূলক ধর্ম ভারত থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়, কোনকালেই তার পুনরভ্যুদয় হল না।

বৌদ্ধধর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটি বিপদের বীজ ছিল—বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্ম যদি নাস্তি-ভাবের দিকেই বেশী জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকবে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না—সংগঠনী উপাদানই হচ্ছে যথার্থ প্রেরণা—যা তার মূল প্রেরণা। সংস্কারের কাজগুলি সম্পন্ন হবার পরই অস্তি-ভাবমূলক কাজের দিকে জোর দেওয়া উচিত; বাড়ী তৈরী হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়।

ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তি-ভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, ফলে তাদের ধর্মের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। নাস্তি-ভাবের প্রকোপে সত্যের অস্তি-ভাবমূলক দিকটা চাপা পড়ে যায় এবং এই কারণেই বুদ্ধের নামে যে সব বিনাশমূলক মনোভাব আবির্ভাব হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় ভাবধারার অনুশাসনই এই।

ঈশ্বর বলে কেউ নেই এবং আত্মাও নেই—বৌদ্ধধর্মের এই সব নাস্তি-ভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি বলি—একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; এটাই সন্দেহাতীত দৃঢ় উক্তি। তিনিই একমাত্র সদ্‌বস্তু। বুদ্ধ যেমন বলেন, আত্মা বলে কিছু নেই, আমিও বলি, 'মানুষ তুমি বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হয়ে আছ; তুমিই সব।' কত বাস্তব! সংস্কারের উপাদান মরে গেছে, কিন্তু সংগঠনী বীজ চিরকালের জন্য সজীব আছে। বুদ্ধ নিম্নজাতীয় প্রাণীদের প্রতিও করুণা শিখিয়ে গেছেন, তার পর থেকে ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যারা সর্বজীবে, এমন কি পশুপক্ষীদের প্রতিও করুণা করতে শেখায়নি। এই দয়া, ক্ষমা, করুণাই হল বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধ-জীবনের একটা বিশেষ অবদান আছে। আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, তবে তাঁর মতবাদের নই। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি। এত বড় মহৎ জীবনের ধারণা আমাদের মত অজ্ঞ স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণ চিত্ত মানুষ কি করে করতে পারে?

তারপর তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধির কথা ভেবে দেখ। কোনরকম ভাবাবেগ নেই। সেই বিশাল মস্তিষ্কে কুসংস্কারের লেশও ছিল না। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে, পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে, অথবা বন্ধুরা বিশ্বাস করতে বলছে—এই সব কারণেই বিশ্বাস কর না; তুমি নিজেই বিচার করে দেখ, নিজেই সত্যানুসন্ধান কর; নিজেই অনুভব কর। তারপর যদি তুমি তা অন্যের বা বহুর পক্ষে কল্যাণপদ মনে কর, তখন তা মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। কোমলমস্তিষ্ক ক্ষীণমতি দুর্বলচিত্ত কাপুরুষেরা কখনও সত্যকে জানতে পারে না। আকাশের মত উদার ও মুক্ত হওয়া চাই। চিত্ত হবে নির্মল স্বচ্ছ, তবেই তাতে সত্য প্রতিভাত হবে। কী কুসংস্কাররাশিতে পরিপূর্ণ আমরা সবাই! তোমাদের দেশেও, যেখানে তোমরা নিজেদের খুবই শিক্ষিত বলে ভাব, কী সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তোমরা! ভেবে দেখ তোমাদের এত সভ্যতার গর্ব সত্ত্বেও আমি নিতান্ত হিন্দু বলেই কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ-শ বছর আগে, বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, ভারতবাসীরা অবশ্যই আশ্চর্য রকম শিক্ষিত ছিল; নিশ্চই তারা অত্যন্ত উদার ছিল। বিশাল জনতা বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিল, নৃপতিরা সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, রাণীরা সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। এত বিপ্লবাত্মক এবং যুগ যুগ ধরে প্রচারিত পুরোহিতদের শিক্ষার চেয়ে এত ভিন্ন তাঁর শিক্ষা ও উপদেশগুলিকে জনসাধারণ সহজেই সমাদর ও গ্রহণ করতে পেরেছিল। অবশ্য তাদের মনও ছিল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এইবার তাঁর পরিনির্বাণের কথা চিন্তা কর। তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও ছিল তেমনি মহৎ। তোমাদের আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মতই কোন জাতের একটি লোকের দেওয়া খাদ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তারা নির্বিচারে সব কিছু খায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা এ-খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। লোকটির কাছে গিয়ে বল, আমার জীবনে এক মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে—সে আমাকে দেহ-মুক্ত করে

দিয়েছে।' এক বৃদ্ধ বুদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসে কাছে বসেছিল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে, তিনি তিরস্কার করে বললেন, 'এ কী? আমরা এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার ওপর কিছুমাত্র নির্ভর কর না, এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনিকিংবা উপলব্ধির স্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর।'

এমন কি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠা দাবী করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হচ্ছেন উপলব্ধির এক একটি অবস্থার নামমাত্র। লোকশিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশী করে শিক্ষা দিয়েছেন, শুধু মিথ্যা 'অহং'—এর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করেননি, অদৃশ্য ঈশ্বর বা দেবতাদের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্ত করেছেন। মুক্তির সেই অবস্থা—যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন, তা লাভ করবার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছিলেন। একদিন সে-অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে; সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

[১৯০০ খ্রীঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেসে প্রদত্ত বক্তৃতা]

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল এবং একটি শূন্য গহ্বর সৃষ্ট হইল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয়তো উহা পূর্বেপেক্ষা বৃহত্তর; উহারও পতন হইল, আবার একটি উঠিল। এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনা প্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান- পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ উত্থানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, পতনের দিকে নয়। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই স্বার্থকতা আছে, কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বজগতের ইহাই প্রকৃতি। কি চিন্তাজগতে, কি পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্বত্র এই ক্রমিক গতি, সর্বত্রই উত্থান-পতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রধান ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ—সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপর অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য কিছুকালের মত ইহা অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার বল সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল ইহা কোথায় ডুবিয়া যায়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ উত্থান-পতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাত্মার—যে ঈশদূতের জীবনচরিত আমরা আজ অপরাহ্নে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চয়ই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্যকলাপের যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে অল্পমাত্র আভাস পাই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে তাহা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিত। আর তাঁহার তিনবর্ষব্যাপী ধর্ম প্রচারের মধ্যে যেন কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সংঘটিত হইয়াছে, সেগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করিতে এই উনিশ শত বৎসর লাগিয়াছে। কে জানে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আরও কতদিন লাগিবে? আপনারা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার। কয়েক মুহূর্তে, কয়েক ঘণ্টা, বড়জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তি-বিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর আর কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিধর এই পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন, এখনও তাহার প্রচার কার্যের বিরাম নাই, এখনও তাহা নিঃশেষিত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই তাহাও নব বলে বলীয়ান হইতেছে।

যীশুখ্রীষ্টের জীবনে আপনারা যাহা দেখিতে পান, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টিস্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন—সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাবসমূহের ফলস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ আসিয়া থাকে বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার হইতে। সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। বর্তমানের আমরা সেই অনন্ত অতীতে কৃত কার্যের ফল ব্যতীত আর কি? অনন্ত ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান, অনিবার্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও স্থির থাকিতে অসমর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আমরা আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ। কিন্তু জাগতিক ঘটনা প্রবাহরূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকিবেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান্ পুরুষ আছেন, যাঁহারা প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের দিকেও তাঁদের হস্ত প্রসারিত। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইঁহারা যেন সেই পথের নির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। বাস্তবিক ইঁহারা এত বড় যে, ইঁহাদের ছায়া যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, আর ইঁহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনশ্বর থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর-তনয়ের ভিতর দিয়া দেখা ব্যতীত অন্য উপায়ে কেহ কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই'—এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বর-তনয়ের মধ্য দিয়া না দেখিলে ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে আমাতে—আমাদের মধ্যে অতি দীনহীন ব্যক্তিতে পর্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্বব্যাপী, সর্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও ইহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ জগতের বিরাট আলোকস্বরূপ এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে, এই সকল দেবমানবে, ঈশ্বরের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ; এইসকল অবতারে প্রতিবিম্বিত না হইলে সমগ্র জগতে সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না।

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানলোকের এই মহান্ বার্তাবহগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন। দেখিবেন, আপনার কল্পিত ঈশ্বর এই আদর্শ হইতে নিম্নে পড়িয়া আছে এবং অবতারের— ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা না হইতে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আদর্শের প্রতিমূর্তিস্বরূপ এইসকল মহাপুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের মহৎ জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর ধারণা করিতে আপনারা কখনই সমর্থ হইবেন না। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এইসকল মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অন্যায়? এই দেবমানবগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে এ পৃথিবীতে একমাত্র দেবতারূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সর্ববিধ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই তাহা নহে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনা কেবল এইভাবেই সম্ভব।

আপনারা যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন, বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা মানবজগতে মানবদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই মানবভাবাপন্ন, আপনাদের ধর্মও মানবভাবে ভাবিত এবং আপনাদের ঈশ্বরও মানবভাবাপন্ন হইবেন। অবশ্যই এরূপ হইবে। এমন লোক কে আছে, যে সাক্ষাৎ উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করিবে না, এবং যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাববিশেষ, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুরূহ, তাহাকে ত্যাগ করিবে না? সেইজন্য এই ঈশ্বরাবতারগণ সকল যুগে সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এখন য়াহুদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আধটু আলোচনা করিব। একটি তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গের উত্থানের পূর্বে তরঙ্গের যে পতনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে য়াহুদীগণ সেই অবস্থায় ছিল। ইহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা যায়। এ অবস্থায় মানুষের মন যেন সম্মুখে চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং এতদিন ধরিয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যত্নবান্ হয়। এ অবস্থায় জীবনের সার্বভৌম ও মহান্ সমস্যাসমূহের দিকে নিবিষ্ট না হইয়া মন খুঁটিনাটির দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় তরণী যেন অগ্রসর না হইয়া নিশ্চল থাকে, ইহাতে নিজস্ব চেষ্টা অপেক্ষা অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সহ্য করিবার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটি লক্ষ্য করিবেন, আমি এ অবস্থার নিন্দা করিতেছি না, ইহার সমালোচনা করিবার কিছুমাত্র অধিকার আমাদের নাই। কারণ যদি পতন না হইত, তবে ন্যাজারেথবাসী যীশুতে যে পরবর্তী উত্থান মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইত না। ফারিসি ও সাদিউসিগণ হয়তো কপট ছিলেন; হয়তো ২১ তাঁহারা এমন সব কাজ করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না; হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুক না কেন, ঈশদূত যীশুর আবির্ভাবরূপ কার্য বা ফলের বীজ বা কারণ তাঁহারাই। যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী ন্যাজারেথবাসী যীশুরূপে আবির্ভূত হয়।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদির উপর—ধর্মের অত খুঁটিনাটির উপর অনুরাগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্মজীবনের শক্তি নিহিত। অনেক সময় আমরা অত্যধিক অগ্রসর হইতে গিয়া ধর্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গোঁড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোঁড়াদের ভিতরও একটা মহৎ গুণ আছে, তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। জাতির ভিতরেও ঐরূপ শক্তি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। চতুর্দিকে বাহ্যশত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত, রোমক-শাসনে তাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ, চিন্তা-জগতে গ্রীক প্রবণতা দ্বারা এবং পারস্য ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাবতরঙ্গরাজি দ্বারা এক নির্দিষ্ট গণ্ডীতে কেন্দ্রীভূত হইয়া চতুর্দিকে দৈহিক মানসিক নৈতিক সর্ববিধ শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই য়াহুদীজাতি এক সহজাত রক্ষণশীল প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান ছিল; ইহাদের বংশধরগণ আজও সে শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরুজালেম ও য়াহুদীধর্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর যেমন—সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিতে পারে না, চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া নিজেকে নিঃশেষিত করে, য়াহুদীদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহাতে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবে বলিয়া ইহাকে দীর্ঘকাল এক স্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না।

য়াহুদী জাতির ভিতরে এই কেন্দ্রীভূত শক্তি পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়া একটি স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে এক উদ্বেল তরঙ্গসঙ্কুল নদী উৎপন্ন হইল। তাহার শীর্ষদেশে ন্যাজারেথবাসী যীশু সমাসীন। এইরূপে প্রত্যেক মহাপুরুষই তাঁহার সমসাময়িক অবস্থার ও তাঁহার নিজ জাতির অতীতের ফলস্বরূপ; তিনি আবার স্বয়ং ভবিষ্যতের স্রষ্টা। অতীত কারণসমষ্টির ফলস্বরূপ কার্যাবলী আবার ভাবী কার্যের কারণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই তাঁদের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের জন্য মহাশক্তির আধারস্বরূপ; শুধু তাঁহার নিজ জাতির জন্য নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির জন্যও তাঁহার জীবন মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ ন্যাজারেথবাসী মহাপুরুষদের বর্ণনা আমি প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ হইতেই করিব। আপনারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, তিনি একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। আপনারা তাঁহাকে নীল নয়ন ও পীত কেশ দ্বারা চিত্রিত করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, তিনি একজন খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। বাইবেল গ্রন্থে যে সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে-সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণণা আছে, তাহার কবিত্ব, তাহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গী ও সন্নিবেশ এবং তাহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি—এ-সকল প্রাচ্যভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে। তাহাতে উজ্জ্বল আকাশ, প্রখর

সূর্য, তৃষ্ণার্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা, মেষপাল কৃষককুল ও কৃষিকার্যের বর্ণনা, পনচাক্কি ঘটাযন্ত্র তৎসংলগ্ন জলাধার ও ঘরট্টের (পিষিবার জাঁতা) বর্ণনা প্রভৃতি—এ সকলই এখনও এশিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ার বাণী চিরদিনই ধর্মের বাণী, আর ইওরোপের বাণী রাজনীতির। নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইওরোপের বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্বস্ব ছিল। তদতিরিক্ত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্বর, তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে বাস করিবার অধিকার নাই, গ্রীকরা যাহা করে তাহাই ঠিক; জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটিই ঠিক নহে, সুতরাং সেগুলি জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। গ্রীক মনের সহানুভূতি একান্তই মানবিক, অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কলাকৌশলময়। গ্রীক মন সম্পূর্ণরূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত; এই জগতের বাহিরে কোন বিষয় সে স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, তাহার কবিতা পর্যন্ত এই ব্যাবহারিক জগৎকে লইয়া। তাহার দেবদেবীগণের কার্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা মানুষ, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট; সাধারণ মানুষ যেমন সুখে-দুঃখে হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তাঁহারাও প্রায় সেইরূপ। গ্রীক সৌন্দর্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, তাহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুতেই নহে, যথা—শৈলমালা, হিমানী ও কুসুমরাজির সৌন্দর্য, বাহ্য অবয়ব ও আকৃতির সৌন্দর্য, নরনারীর মুখের, বিশেষতঃ আকৃতির সৌন্দর্যেই গ্রীক মন আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণ পরবর্তী যুগের ইওরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইওরোপ গ্রীসের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এশিয়ায় আবার অন্য প্রকৃতির লোকের বাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন, কোথাও শৈলমালার চূড়াগুলি অভ্রভেদী হইয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ করিতেছে, কোথাও ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপ্ত বিশাল মরুভূমি—যেখানে একবিন্দু জলও পাইবার সম্ভাবনা নাই, একটি তৃণও যেন উৎপন্ন হয় না, কোথাও নিবিড় অরণ্য ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে, যেন শেষ হইবার নাম নাই! আবার কোথাও বা বিপুলকায় স্রোতস্বতী প্রবল বেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান। চতুর্দিকে প্রকৃতির এইসকল মহিমময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতি অনুরাগ সম্পূর্ণ এক বিপরীত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের তীব্র পিপাসা বিদ্যমান, সেখানেও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান; গ্রীকেরা যেমন অপর জাতিগুলিকে বর্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, সেখানেও সেই ভেদবুদ্ধি সেই ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু সেখানে জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এশিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ, বা ভাষা লইয়া জাতি গঠিত হয় না; সেখানে একধর্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সকল খ্রীষ্টান মিলিয়া এক জাতি, সকল মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সকল বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সকল হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। একজন বৌদ্ধ চীনদেশবাসী, অপর একজন পারস্যদেশবাসীই হউন না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্মাবলম্বী, সেইজন্য তাহারা পরস্পরকে ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেখানে ধর্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধন, মিলনভূমি। আর ঐ পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ কল্পনাপ্রবণ, তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জলপ্রপাতের কলধ্বনি, বিহগকুলের কাকলী, সূর্য চন্দ্র তারা—এমন কি সমগ্র জগতের সৌন্দর্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্য মনের পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত নহে, সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। প্রাচ্যবাসী বর্তমানের—ইহজগতের গণ্ডী ভেদ করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে চায়। বর্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নহে। প্রাচ্যদেশ যুগযুগান্ত ধরিয়া যেন সমগ্র মানবজাতির শৈশবের শিশু-শয্যা; সেখানে ভাগ্যচক্রের সর্ববিধ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্যের, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অন্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য বৈভব গৌরব শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে; বিদ্যা ঐশ্বর্য বৈভব ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি—ইহাই যেন প্রাচ্যের পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সকল পদার্থকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতই এমন কোন বস্তু দর্শন করিতে চান, যাহা অপরিণামী অবিনাশী এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য আনন্দময় ও অমর—ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখনও ক্লান্তিবোধ করেন না। আর আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, জগতের অবতার ও মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য কোন দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই শুনিতে পাইঃ এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে উচ্চতর আরও কিছু আছে। আর ঐ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্যদেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আপনারা পাশ্চাত্যেরা নিজেদের কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ পরিচালনায় এবং সেইরূপ অন্যান্য কর্মে দক্ষ। হয়তো প্রাচ্যদেশীয়গণ ও-সকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে সফল, তাঁহারা ধর্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্যে পরিণত করিয়াছেন। যদি কেহ কোন দার্শনিক মত প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন যে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাঁচশত লোক পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত। আপনারা ইহাকে হাস্যাস্পদ বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন—ইহার পশ্চাতে তাহাদের দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান; তাহারা যে ধর্মকে কেবল বিচারের বস্তু না ভাবিয়া জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তির যে-সকল বিবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেগুলি বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়ামমাত্র, তাহাদিগকে কোনকালে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ এই ন্যাজারেথবাসী যীশু যথার্থই প্রাচ্য ভাবে ভাবিত ছিলেন। এই নশ্বর জগৎ ও ইহার ঐশ্বর্যে তাঁহার আদৌ আস্থা ছিল না। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্য বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। এত প্রবলভাবে মোচড়ান হয় যে, আর টানিয়া বাড়ান চলে না; শাস্ত্রবাক্যগুলি তো আর রবার

নহে যে, যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর তাহারও একটা সীমা আছে। ধর্মকে বর্তমান যুগের ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার সহায়ক করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। এটি ভাল করিয়া বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন কখনও খাটো না করি, কেহ যেন আদর্শটিকেই একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্যজাতিগণ খ্রীষ্ট-জীবনের যে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, সেগুলি শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। তিনি যে কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না, কিছুই বোঝা যায় না। কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি, কেহ তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, কেহ বা তাঁহাকে অনুরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল-গ্রন্থে কি এমন কোন কথা লেখা আছে, যাহাতে ঐরূপ অনুমানগুলির কোন প্রমাণ আছে? একজন মহান্ ধর্মাচার্যের জীবনই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শুনুনঃ 'শৃগালেরও একটা গর্ত থাকে, আকাশচারী পাখীদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।' যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দন্তে তৃণ লইয়া দীনভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগ বৈরাগ্যের শক্তি নাই, আমাদের এখনও 'আমি ও আমার' প্রতি ঘোর আসক্তি বর্তমান। আমারা ধন ঐশ্বর্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু যীশুকে অন্যরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন না করি। তাঁহার কোন পারিবারিক বন্ধন ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন দেহভাব ছিল? আপনারা কি মনে করেন, জ্ঞানজ্যোতির পরম আধার এই অতিমানব স্বয়ং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন পশুগণের সহধর্মী হইবার জন্য? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া যা খুশী প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ—এই ভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি নিজেকে আত্মা বলিয়াই জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মা, কেবল মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে পরিচালন করিতেছেন—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐটুকু সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। পাশব ভাবের সহিত বিদেহ আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখনও বহুদূরে থাকিতে পারি, থাকিলামই বা, কিন্তু আদর্শটিকে আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পৌঁছিতে এখনও অক্ষম।

তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ—এই তত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নর-নারী, সে য়াহুদীই হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনি-দরিদ্র, সাধু-অসাধু—সকলেই তাঁহার মত সেই এক অবিনশী আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানব জাতিকে তাহাদের নিজ নিজ যথার্থ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'তোমরা এই দীন হীন কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত এবং উৎপীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে, যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোনমতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারা যায় না।' আপনারা সকলেই ঈশ্বর-তনয়, সকলেই অমর আত্মাস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেনঃ জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরেই অবস্থিত। আমি ও আমার পিতা অভেদ। ন্যাজারেথবাসী যীশু এই সব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা ইহজীবনের বিষয় কখনও কিছু বলেন নাই। এই জগতের ব্যাপারে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না, শুধু মানবজাতি যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থা হইতে তাহাকে তিনি সম্মুখে খানিকটা আগাইয়া দিবেন, আর ক্রমাগত ইহাকে চালাইতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেক নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হইতেছে।

তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে-সকল পরস্পরবিরোধী আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি। খ্রীষ্টের জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলী এবং 'উচ্চতর সমালোচনা' নামক সাহিত্যরাশির সহিত আমরা পরিচিত। আর নানা গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট-অংশ কতটা সত্য, অথবা উহাতে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে—এ সকল বিষয় বিচার করিবার জন্য আজ আমরা এখানে উপস্থিত হই নাই। যীশুখ্রীষ্টের জন্মিবার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্ট লিখিত হইয়াছিল কিনা, অথবা যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা অংশ সত্য, এ সকল প্রশ্নেও কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐ জীবনের পশ্চাতে এমন কিছু আছে, যাহা অবশ্য সত্য—এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। মিথ্যা বলিতে হইলে সত্যেরই নকল করিতে হয় এবং ঐ সত্যটির বাস্তবিক সত্তা আছে। যাহা কোনকালে ছিল না, তাহার নকল করা চলে না। যাহা কেহ কোনকালেই উপলব্ধি করে নাই, তাহা কখনই অনুকরণ করা যায় না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমান

২২

করা যাইতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল, নিশ্চয়ই সেই সময়ে জগতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—আধ্যাত্মিক শক্তির এক অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই আজ আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ঐ মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই, তখন আমাদের পণ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যদি প্রাচ্যদেশীয়দের মত আমাকে এই ন্যাজারেথবাসী যীশুর উপাসনা করিতে হয়, তবে একটিমাত্র ভাবেই আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, অর্থাৎ আমায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, অন্য কোনরূপে উপাসনা করিবার উপায় নাই। আপনারা কি বলিতে চান, আমাদের ঐরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের সমান স্তরে টানিয়া আনিয়া একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের শাস্ত্র বলেন, 'যাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা স্বয়ং সেই জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই জ্যোতির তনয়গণ উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাই।'

কারণ, আপনারা এটি লক্ষ্য করিবেন যে, মানব ত্রিবিধভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় অশিক্ষিত মানবের অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদূরে—ঊর্ধ্বে স্বর্গ নামক স্থানবিশেষে পাপপুণ্যের মহাবিচারকরূপে সিংহাসনে সমাসীন। লোকে তাঁহাকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'রূপে দর্শন করে। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এরূপ ধারণাও ভাল, ইহাতে মন্দ কিছুই নাই। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানব মিথ্যা বা ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন তো বলিতে পারেন, মানুষ নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ভ্রম বা মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে, এ-কথা কখনই বলিতে পারা যায় না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে সূর্যাভিমুখে সরলরেখায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এখান হইতে সূর্যকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইলেন, সেখানে গিয়া সূর্যকে এখানকার অপেক্ষা বৃহৎ দেখিবেন। যতই অগ্রসর হইবেন, ততই বৃহত্তররূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্যের বিশ সহস্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল, ইহাদের প্রত্যেকটি যে অপরটি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের সকলগুলিই যে সেই এক সূর্যেরই আলোকচিত্র, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন? এইরূপ উচ্চতর বা নিম্নতর সর্ববিধ ধর্মপ্রণালীই সেই অনন্ত জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপান মাত্র। কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্মে উচ্চতর—এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতে গভীর চিন্তায় অসমর্থ জনসাধারণের ধর্মে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্বর্গ নামক স্থানবিশেষে অবস্থানকারী জগৎ-শাসক, পুণ্যবানের পুরস্কারদাতা ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এরূপ অন্যান্য গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। মানব অধ্যাত্মরাজ্যে যতই অগ্রসর হয়, ততই সে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, যে-ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গ নামক স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিদ্যমান; তিনি দূরে অবস্থিত নহেন, তাহার হৃদয়-মধ্যেই রহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টতই সকল আত্মার অন্তরাত্মা। আমার আত্মা যেমন আমার দেহকে পরিচালনা করিতেছে, তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক ও নিয়ন্তা; আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মা। আবার কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর শুদ্ধচিত্ত ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইলেন যে, তাঁহারা পূর্বোক্ত ধারণা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকে লাভ করিলেন। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে আছে, 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন।' অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা ও পিতা ঈশ্বর অভিন্ন।

আপনারা দেখিবেন, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশে এই মহান্ ধর্মাচার্য যীশু উক্ত ত্রিবিধ সোপানের উপযোগী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সাধারণ প্রার্থনা (Common Prayer) শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করুনঃ 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক' ইত্যাদি। ইহা সরল ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা 'সাধারণ প্রার্থনা'; কারণ, ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য—যাঁহারা পূর্বোক্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তিনি উন্নততর সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেনঃ 'আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগের মধ্যেই বর্তমান। স্মরণ হইতেছে তো? আর যখন য়াহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আপনি কে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' য়াহুদীরা মনে করিয়াছিল, তিনি ঈশ্বরের সহিত নিজেকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের অমর্যাদা করিতেছেন। কিন্তু তিনি এই বাক্য কি উদ্দেশ্য বলিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের প্রাচীন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই দেবতা বা ঈশ্বর—তোমরা সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সন্তান।' অতএব দেখুন, বাইবেলেও ধর্মের এই ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; আর আপনারা ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শেষ সোপানে পৌঁছানই অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই ঈশ্বরের দূত বার্তাবহ যীশু সত্যলাভের পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানারূপ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা সেই যথার্থ তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না, নানাবিধ কূট জটিল দার্শনিক বিচারের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আপনার যদি কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে, সে বরং আরও ভাল; আপনি সারা জীবনে যদি একখানি পুস্তকও না পড়িয়া থাকেন, সে আরও ভাল কথা। এগুলি আপনার মুক্তির জন্য একেবারেই আবশ্যক নয়; মুক্তিলাভের জন্য ঐশ্বর্য বৈভব উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমন কি, পাণ্ডিত্যেরও কিছু প্রয়োজন নাই; কেবল একটি জিনিষের প্রয়োজন পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি। 'পবিত্রাত্মা যা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য', কারণ আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ অশুদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? আত্মা ঈশ্বরপ্রসূত, ঈশ্বর হইতে তাহার আবির্ভাব। বাইবেলের ভাষায় আত্মা 'ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ''; কোরানের ভাষায় তাহা 'ঈশ্বরেরও আত্মাস্বরূপ'। আপনারা কি বলিতে চান—এই ঈশ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পারেন? কিন্তু হায়, আমাদেরই শুভাশুভ কর্মের দ্বারা তাহা যেন শত শত শতাব্দীর ধূলি ও মলিনতায় আবৃত হইয়াছে। নানাবিধ অন্যায় কর্ম, অশুভ কর্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ ধূলি ও মলিনতায় সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কেবল ওই ধূলি ও মলিনতা দূর করা আবশ্যক, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা নিজের প্রভায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইবে। 'শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন

করিবে।' 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে।' ন্যাজারেথবাসী যীশু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'যখন স্বর্গরাজ্য এখানেই—তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহার অন্বেষণের জন্য কোথায় যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেল, স্বর্গরাজ্য এখানেই বর্তমান, দেখিতে পাইবে। ইহা পূর্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি কি করিয়া পাইবে? ইহা তো তোমার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার। তোমরা অমৃতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয়।'

ইহাই সেই সুসমাচার-বাহী যীশুখ্রীষ্টের মহতী শিক্ষা। তাঁহার অপর শিক্ষা—ত্যাগ; ত্যাগই সকল ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে কি করিয়া বিশুদ্ধ করিবে? ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'প্রভো, অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?' যীশু তাহাকে বলিলেন, 'তোমার এখনও একটি জিনিষের অভাব আছে। যাও, বাড়ী যাও; তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর, ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর, তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ্ সঞ্চয় করিবে। তারপর নিজের দুঃখভার (Cross) বহন করিয়া আমায় অনুসরণ কর।' ধনী যুবকটি যীশুর এই উপদেশে দুঃখিত হইল এবং বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার অগাধ সম্পত্তি ছিল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ঐ ধনী যুবকের মত। দিবারাত্র আমাদের কর্ণে সেই মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয়-ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, আমরা জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরাম আসিল, সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিলঃ 'তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।' 'যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষার দিকে মনোযোগ দিবে, সে তাহা হারাইবে; আর যে আমার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিবে, সে তাহা পাইবে।' কারণ, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য এই জীবন উৎসর্গ করিবে, সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। আমাদের সর্ববিধ দুর্বলতার মধ্যে, সর্ববিধ কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কখনও কখনও যেন একটু বিরাম আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ঘোষণা করিতে থাকেঃ 'তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।' তিনি ঐ এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণও ঐ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—তাহা এই ত্যাগ। এই ত্যাগের তাৎপর্য কি? সু-নীতির ডান গালে চড় মারিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিতে হইবে। যদি কেহ তোমার জামা কাড়িয়া লয়, তাহাকে বহিরাবরণটিও খুলিয়া দিতে হইবে।

আদর্শকে ছোট না করিয়া যতদূর পারা যায় উত্তমরূপে কার্য করিয়া যাইতে হইবে। আর সেই আদর্শ অবস্থা এইঃ যে অবস্থায় মানুষের 'অহং'ভাব কিছুই থাকে না, যখন কোন বস্তুতে তাহার কোন অধিকারবোধ থাকে না, যখন 'আমি, আমার' বলিবার কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করে, সে নিজেকে যেন মারিয়া ফেলে—এরূপ ব্যক্তির ভিতর স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান। কারণ, তাহার ভিতর হইতে 'অহং'বোধ একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদিগকে ঐ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে ঐ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যদিও আমাদিগকে ইতস্ততঃ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হয়। কল্যই হউক, আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ঐ আদর্শ অবস্থায় পৌঁছিতেই হইবে। কারণ, ইহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, ইহা উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থপরতা—সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ; কারণ 'অহং'ভাব-ত্যাগ হইলে ভিতরের মানুষ-ভাব মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতির সকল ধর্মাচার্যই সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। মনে করুন, ন্যাজারেথবাসী যীশু উপদেশ দিতেছেন, কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর; আমি বিশ্বাস করি, ইহাই পূর্ণতা লাভের উপায়, আর আমি ইহা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না।' ন্যাজারেথবাসী যীশু এ-কথায় কি উত্তর দিবেন? তিনি নিশ্চয় উত্তর দিবেন, 'বেশ ভাই, তুমি আদর্শ অনুসরণ কর এবং নিজের ভাবে ইহার দিকে অগ্রসর হও। তুমি ঐ উপদেশের জন্য আমাকে প্রশংসা কর আর নাই কর, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি তো দোকানদার নই, ধর্ম লইয়া ব্যবসা করিতেছি না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিয়া থাকি, আর সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার অধিকার কাহারও নই। সত্য স্বয়ং ঈশ্বর। আগাইয়া চল।' কিন্তু তাঁহার অনুগামীরা আজকাল কি বলেন? তাঁহারা বলেন, 'তোমরা তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর বা নাই কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, উপদেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দিতেছ কি? যদি উপদেষ্টার—আচার্যের সম্মান কর, তবেই তোমার উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।' এইরূপে এই আচার্যবরের সমুদয় উপদেশই বিকৃত হইয়াছে। এখন কেবল উপদেষ্টার ব্যক্তিত্ব লইয়া বিবাদ। তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশ অনুসরণ না করিয়া উপদেষ্টার নাম লইয়া টানাটানি করাতে ব্যক্তিকে সম্মান না করিয়া একভাবে তাঁহাকে অপমানিতই করিতেছে। ঐরূপে তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া শুধু তাঁহাকে সম্মান করিতে গেলে তিনি নিজেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতেন। জগতের কোন ব্যক্তি বা তাঁহাকে মনে রাখিল বা না রাখিল, তাহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? জগতের নিকট তাঁহার একটি বার্তা ছিল, এবং তিনি তাহা প্রচার করিয়াছেন। বিশ সহস্র জীবন পাইলেও তিনি জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য তাহা উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ ঘৃণিত সামারিয়াবাসীর জন্য লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, এবং তাঁহার জীবনবলিই যদি প্রত্যেকের মুক্তির একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার নিজ জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইতেন। এ সমস্ত কাজই তিনি করিতেন, ইহাতে এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা তাঁহার হইত না। স্বয়ং ভগবান্ যেভাবে কার্য করেন, তিনিও তেমনি ধীরস্থিরভাবে, নীরবে অজ্ঞাতভাবে কার্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার অনুগামীরা এক্ষণে কি বলেন? তাঁহারা বলেন, 'তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নির্দোষ হইতে পার, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আচার্যকে—আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না দাও, তবে তাহাতে কোন ফল হইবে না।' কেন? এই কুসংস্কার—এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভ্রমের একমাত্র কারণ এই যে, যীশুখ্রীষ্টের অনুগামিগণ মনে করেন, ভগবান্ কেবল একবার মাত্র দেহে আবির্ভূত হইতে পারেন।

ঈশ্বর তোমাদের নিকট মানবরূপেই আবির্ভূত হন। সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চই অতীতে বহুবার ঘটিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই ঘটিবে। প্রকৃতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাধীন নহে; আর নিয়মাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে।

ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতে মহান্ অবতারগণের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার 'ভগবদগীতা'রূপ অপূর্ব বাণী আপনারা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন; তিনি বলিতেছেনঃ

যদিও আমি জন্মরহিত, অক্ষয় এবং প্রাণিজগতের ঈশ্বর, তথাপি নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।
২৩

যখনই জগতের অবনতি হয়, তহনই ভগবান্ ইহার উন্নতির জন্য আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। গীতায় আর একস্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছেনঃ যখনই দেখিবে কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, জানিও তিনি আমারই তেজসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছি।
২৪

অতএব আসুন, আমরা শুধু ন্যাজারেথবাসী যীশুর ভিতর ভগবানকে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্বে যে-সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার পরে যাঁহারা আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের সকলের ভিতরই ঈশ্বর দর্শন করি। আমাদের উপাসনা যেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনন্ত ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁহারা সকলেই পবিত্রাত্মা ও স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা সকলেই এই দুর্বল মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের সকলের, এমন কি ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সমস্ত পাপ নিজেরা গ্রহণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে আপনারা সকলেই অবতার—সকলেই নিজ নিজ স্কন্ধে জগতের ভার বহন করিতেছেন। আপনারা কি কখনও এমন নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শান্তভাবে সহিষ্ণুতার সহিত নিজ জীবনভার বহন করিতে না হয়? বড় বড় অবতারগণ অবশ্য আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের স্কন্ধে প্রকাণ্ড জগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও সেই একই কর্ম করিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরা আমাদের সুখদুঃখরাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মন্দপ্রকৃতি, এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভার কিছু না কিছু বহন করিতে হয়। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্মের পরিণাম যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোন স্থানে এমন এক উজ্জ্বল অংশ আছে, কোন না কোন স্থানে এমন এক স্বর্ণসূত্র আছে, যাহা দ্বারা আমরা সর্বদা সেই ভগবানের সহিত সংযুক্ত। কারণ নিশ্চয়ই জানিবেন, যে মুহূর্তে ভগবানের সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হইবে, সেই মুহূর্তেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে না, সেহেতু আমরা যতই হীন ও অবনত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলের কোন না কোন নিভৃত প্রদেশে এমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোর্তিময় বৃত্ত রহিয়াছে, যাহার সহিত ভগবানের নিত্যযোগ।

বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন মতাবলম্বী যে-সকল অবতারের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্ন জাতীয় যে-সকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম; জীবন্ত-ঈশ্বরস্বরূপ যাঁহারা আমাদের বংশধরগণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম।

ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার

The Divine Incarnation or Avatara

[খ্রীষ্ট-বিষয়ক বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ]

যীশুখ্রীষ্ট ভগবান্ ছিলেন—মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বর। বহু রূপে বহু বার ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তোমরা শুধু তাঁর সেই রূপগুলিরই উপাসনা করিতে পার। পরমব্রহ্ম উপাসনার বস্তু নন। ঈশ্বরের নির্গুণ ভাবকে উপাসনা করা অর্থহীন। নরদেহে অবতীর্ণ যীশুখ্রীষ্টকেই আমাদের ঈশ্বর বলে পূজা করতে হবে। ঈশ্বরের এরূপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর কোন কিছুর পূজা কেউ করতে পারে না। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক্ কোন ভগবানের উপাসনা যত শীঘ্র ত্যাগ করিবে ততই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের কল্পনানির্মিত যিহোবার কথা ধর, আবার সুন্দর মহান্ খ্রীষ্টের কথা ভেবে দেখ। যখনই খ্রীষ্টের ঊর্ধ্বে কোন ভগবান্ সৃষ্টি কর, তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসনা করিতে পারে, মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের ঊর্ধ্বে তাঁকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস মানুষের পক্ষে বিপজ্জনকই হবে। যদি কেউ মুক্তি চাও তো খ্রীষ্টের সমীপবর্তী হও; তোমাদের কল্পিত যে কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। যদি মনে কর খ্রীষ্ট একজন মানুষ ছিলেন তবে তাঁর উপাসনা কর না। কিন্তু যখনই ধারণা করতে পারবে—তিনি ঈশ্বর, তখনই তাঁর উপাসনা কর। যারা বলে—তিনি মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে পূজাও করে, তারা নিতান্ত অশাস্ত্রীয়, অধর্মের কাজই করে। এখানে মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে। 'যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে', আর পুত্রকে না দেখে কেউ পিতার দর্শন পাবে না। শুধু বড় বড় কথা, অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পনা! যদি আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে ধরে থাক।

দার্শনিক দিক্ দিয়ে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ বলে কোন মানুষ ছিলেন না, তাঁদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম। কোরানে মহম্মদ বার বার বলেছেন, খ্রীষ্ট কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি—ও একটা রূপকমাত্র; খ্রীষ্টকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না।

যুক্তিমূলক ধর্মের সর্বনিম্ন স্তর দ্বৈতভাব, আর একের মধ্যে তিনের অবস্থিতিই উচ্চতম। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অনুস্যূত; ঈশ্বর, জগৎ এবং জীব—এই 'একের মধ্যে তিন'-কেই আমরা দেখেছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই দেহটি যেমন জীবাত্মার আবরণ, তেমনি এই জীবাত্মা যেন পরমাত্মার আবরণ বা দেহ। 'আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্র—যার মধ্যে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তারই মধ্যে তুমি রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা—নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, তথাপি একইকালে এগুলি আবার পৃথকও বটে।

আবার আর এক প্রকার 'ত্রিত্ব' (তিনে এক) আছে, অনেকটা খ্রীষ্টানদের 'ট্রিনিটি'-র মত। ঈশ্বরই পরমব্রহ্ম, এই নির্বিশেষ সত্তায় আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি না; শুধু নেতি নেতি বলতে পারি মাত্র। তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্নিধ্যসূচক কয়েকটি গুণ কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব, দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়তঃ আনন্দ—অনেকটা যেন তোমাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার অনুরূপ। পিতা হচ্ছেন সৎস্বরূপ, যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি; পুত্র হচ্ছেন চিৎ-স্বরূপ, খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। খ্রীষ্টের পূর্বে ঈশ্বর সর্বত্র ছিলেন, সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবেই আমরা তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হতে পেরেছি, ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আনন্দ, পবিত্র আত্মার আবেশ। পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আনন্দের অধিকারী হয়। যে-মুহূর্তে তুমি খ্রীষ্টকে তোমার হৃদয়ে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানন্দ; আর তাতেই হবে তিনের একত্ব-সাধন।

মহম্মদ

[সান ফ্রান্সিস্কোর বে-অঞ্চলে ১৯০০ খ্রীঃ ২৫ মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ]

কৃষ্ণের প্রাচীন বাণী—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ—এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। এই তিন জনের প্রত্যেকেই এক একটি মত প্রবর্তন করিয়া তাহা চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহাপুরুষগণের পূর্ববর্তী। তবুও আমরা বলিতে পারি, কৃষ্ণের পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, যদিও তাঁহার বাণী প্রাচীনতম। বৌদ্ধধর্মের প্রগতি-তরঙ্গে তাঁহার বাণী সাময়িক ভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আজ সায়াহ্নে আরবের মহাপুরুষ মহম্মদের বিশেষ কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মহম্মদ যৌবনে ধর্মবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন বলিয়া মনে হয় না; অর্থোপার্জনেই তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি সৎস্বভাব ও অতিশয় প্রিয়দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এক ধনী বিধবা এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর যখন মহম্মদ আধিপত্য লাভ করেন, তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিলেন। পত্নীদিগের মধ্যে কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি প্রথমা পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'তিনিই আমাকে প্রথম বিশ্বাস করেন। মেয়েদের মন বিশ্বাসপ্রবণ। ... স্বাধীনতা লাভ কর, সব কিছু লাভ কর, কিন্তু নারী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি যেন হারাইও না!'

পাপাচরণ, পৌত্তলিকতা, উপাসনার নামে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, নরবলি প্রভৃতি দেখিয়া মহম্মদের হৃদয় ব্যথিত হইল। খ্রীষ্টানদের দ্বারা য়াহুদীরা অবনমিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানেরা মহম্মদের স্বদেশীয়গণ অপেক্ষা আরও অধঃপতিত হইয়াছিল।

আমরা সর্বদা তাড়াহুড়া করি। কিন্তু মহৎ কাজ করিতে গেলে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। ... দিবারাত্র প্রার্থনার পর মহম্মদ স্বপ্নে অনেক কিছু দর্শন করিতে থাকেন। জিব্রাইল (Gabriel) স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া মহম্মদকে বলেন যে, তিনি সত্যের বার্তাবহ। দেবদূত তাঁহাকে আরও বলেন—যীশু, মুশা ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের বাণী লুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি মহম্মদকে ধর্ম প্রচারের আদেশ করেন। খ্রীষ্টানেরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসীকরা দ্বৈতভাবে প্রচার করিতেছিলেন দেখিয়া মহম্মদ বলিলেন, 'আমাদের ঈশ্বর এক, সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কাহারও তুলনা হয় না।'

'ঈশ্বর ঈশ্বরই; এখানে কোন দার্শনিক বা নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নাই। আমাদের আল্লা এক অদ্বিতীয়, এবং মহম্মদই তাঁহার রসুল'—মক্কার রাস্তায় রাস্তায় মহম্মদ ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন। ... মক্কার লোকেরা তাঁহাকে নির্যাতন করিতে থাকে, তখন তিনি মদিনা শহরে পলাইয়া গেলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সমগ্র আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ হইল। আল্লার নামে মহম্মদের ধর্মজগৎ প্লাবিত করিল। কী প্রচণ্ড বিজয়ী শক্তি!

আপনাদের ভাবসমূহ খুব কঠোর, আর আপনারা খুবই কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বশবর্তী! এই বার্তাবহগণ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসেন, নতুবা তাঁহারা কিভাবে এত মহান্ হইতে পারিয়াছিলেন? আপনারা প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আপনাদের প্রত্যেকেরই দোষ-ত্রুটি আছে। কাহার না আছে? য়াহুদীদের অনেক দোষ আমি দেখাইয়া দিতে পারি। দুর্জনেরা সর্বদাই দোষ-ত্রুটি খোঁজে। ... মাছি ক্ষত অন্বেষণ করে, আর মধুমক্ষিকা শুধু ফুলের মধুর জন্য আসে। মক্ষিকা-বৃত্তি অনুসরণ করিবেন না, মধুমক্ষিকার পথ ধরুন।

পরবর্তী জীবনে মহম্মদ অনেক পত্নী গ্রহণ করেন। মহাপুরুষেরা প্রত্যেকে দুই শত পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। আপনাদের মত 'দৈত্য'কে এক পত্নী গ্রহণ করিতেও আমি অনুমতি দিব না। মহাপুরুষদের চরিত্র রহস্যাবৃত। তাঁহাদের কার্যধারা দুর্জ্ঞেয়। তাঁহাদিগকে বিচার করিতে যাওয়া আমাদের অনুচিত। খ্রীষ্ট বিচার করিতে পারেন মহম্মদকে। আপনি আমি কে?—শিশুমাত্র। এইসকল মহাপুরুষকে আমরা কি বুঝিব?

মহম্মদের ধর্ম আবির্ভূত হয় জনসাধারণের জন্য বার্তারূপে। ... তাঁহার প্রথম বাণী ছিল—'সাম্য'। ... একমাত্র ধর্ম আছে—তাহা প্রেম। জাতি বর্ণ বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও! সেই কার্যে পরিণত সাম্যই জয়যুক্ত হইল। ... সেই মহতী বাণী ছিল খুব সহজ সরলঃ স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। শূন্য হইতে তিনি কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

মসজিদগুলি প্রোটেষ্টাণ্ট গীর্জার মত, ... সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতিকৃতি এখানে নিষিদ্ধ। এককোণে একটি বেদী; তাহার উপর কোরান রক্ষিত হয়। সব লোক সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। কোন পুরোহিত, যাজক বা বিশপ নাই। ... যে নমাজ পড়ে, সেও শ্রোতৃমণ্ডলীর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে। এই ব্যবস্থার কতকাংশ সুন্দর।

এই প্রাচীন মহাপুরুষেরা সকলেই ছিলেন ঈশ্বরের দূত। আমি নতজানু হইয়া তাঁহাদের পূজা করি, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি। কিন্তু তাঁহারা মৃত! ... আর আমরা জীবিত। আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে! ... যীশু অথবা মহম্মদের অনুকরণ করাই ধর্ম নহে। অনুকরণ ভাল হইলেও তাহা কখনও খাঁটি নহে। যীশুর অনুকরণকারী হইবেন না, কিন্তু যীশু হউন। আপনারা যীশু বুদ্ধ অথবা অন্য কোন মহাপুরুষের মতই মহান্। আমরা যদি তাঁহার মত না হই, তবে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে সেরূপ হইতে হইবে।

আমি ঠিক ঠিক যীশুর মত নাও হইতে পারি। য়াহুদী হইয়া জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজনও আমার নাই।

নিজ নিজ প্রকৃতির নিকট খাঁটি হওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। যদি আপনাদের নিজের অস্তিত্ব না থাকে, তবে ঈশ্বর অথবা অন্য কাহারও অস্তিত্বই বা কিরূপে থাকিবে? যেখানেই থাকুন, এই মনই অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে পর্যন্ত অনুভব করে। ঈশ্বরকে আমি অনুভব করি, তাই তিনি আছেন। আমি যদি ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে না পারি, তবে আমার কাছে তাঁহার অস্তিত্ব নাই। ইহাই মানব-প্রকৃতির বিরাট জয়যাত্রা।

এই মহাপুরুষগণ পথনির্দেশক চিহ্ন। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র পরিচয়। তাঁহারা বলেন, 'ভাতৃগণ, আগাইয়া যাও।' আর আমরা তাঁহাদিগকে আঁকড়াইয়া থাকি; নড়িতে চাহি না; আমরা চিন্তা করিতে চাহি না, আমরা চাই অন্যে আমাদের জন্য চিন্তা করুক। ঈশদূতগণ তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপন করেন। পূর্ণোদ্যমে কর্মপথে চলিবার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দেন। শত বৎসর পরে তাঁহাদের বাণী আমরা আঁকড়াইয়া ধরি এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই।

ধর্ম, বিশ্বাস ও মতবাদ সম্বন্ধে কথা বলা সহজ, কিন্তু চরিত্রগঠন ও ইন্দ্রিয়সংযম খুব কঠিন। এ বিষয়ে আমরা পরাভূত হই, কপট হইয়া পড়ি।

ধর্ম কোন মতবাদ নহে, কতকগুলি নিয়মও নহে। ধর্ম একটি প্রক্রিয়া। মতবাদ ও নিয়মগুলি অনুশীলনের জন্যই আবশ্যক। সেই অনুশীলনের দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করি এবং অবশেষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হই। মতবাদ ব্যায়ামবিশেষ—ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন উপকারিতা নাই। … অনুশীলনের দ্বারা আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। যখন আপনি বলিতে পারেন, 'আমি বিশ্বাস করি'—তখনই সেই অনুশীলনের পরিসমাপ্তি।

'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মনুষ্য-দেহ ধারণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'[২৫]

জ্ঞানালোকের মহান্ বার্তাবহগণের
ইহাই পরিচয়। তাঁহারা আমাদের
মহান্ আচার্য, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা;
কিন্তু আমাদিগকে নিজ নিজ পথে
চালিত হইবে।

পাওহারী বাবা

[মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার জন্য লিখিত—১৮৯৯]

১

ভগবান্ বুদ্ধ ধর্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকে সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া 'তাপিত জগৎকে সাহায্য করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম'—এই ভাবটিকেই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাকেও অনেক বৎসর ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তিও বুদ্ধদেব অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্মীর ধারণা করিতে অক্ষম; তথাপি সমুদয় বিষয়ের রহস্য বুঝিতে তাঁর অপেক্ষা আর কাহাকে কঠোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল? এ-কথা সকল সময়েই সত্য যে, কার্য যে পরিমাণে মহৎ, তাহার পশ্চাতে সেই পরিমাণে উপলব্ধির শক্তি নিহিত। পূর্ব হইতেই প্রস্তুত একটি সুচিন্তিত কার্য-প্রণালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য অধিক একাগ্র চিন্তাশক্তির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রবল শক্তি গভীর মনঃসংযোগেরই পরিণাম মাত্র। সামান্য প্রচেষ্টার জন্য হয়তো মতবাদমাত্র পর্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুদ্র বেগের দ্বারা ক্ষুদ্র লহরীর উৎপত্তি হয়, প্রবল উর্মির জনক তীব্র বেগ হইতে তাহা নিশ্চয় খুবই পৃথক্। তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র লহরীটি প্রবল উর্মি-উৎপাদনকারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশেরই বিকাশমাত্র।

মন নিম্নতর কর্মভূমিতে প্রবল কর্মতরঙ্গ তুলিতে সক্ষম হইবার পূর্বে তাহাকে তথ্যসমূহের—নগ্ন সত্যসমূহের নিকট পৌঁছিতে হইবে, সেগুলি যতই কঠোর ও ভীষণ হউক; সত্যকে—খাঁটি সত্যকে (যদিও উহার তীব্র স্পন্দনে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী ছিন্ন হইতে পারে) লাভ করিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ও অকপট প্রেরণা (যদিও উহা লাভ করিতে একটির পর আর একটি করিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়) অর্জন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্তু কালচক্রে প্রবাহিত হইতে হইতে ব্যক্তভাব ধারণা করিবার জন্য উহার চতুর্দিকে স্থূলবস্তুসমূহ একত্র করিতে থাকে; অদৃশ্য—দৃশ্যের আকার ধারণ করে; সম্ভব—বাস্তবে, কারণ—কার্যে এবং চিন্তা—প্রত্যক্ষ কর্মে পরিণত হয়।

সহস্র সহস্র ঘটনা যে কারণকে এখন কার্যে রূপায়িত হইতে দিতেছে না, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে কার্যরূপে প্রকাশিত হইবে; বর্তমানে যতই নিস্তেজ হউক না কেন, জড়জগতে শক্তিশালী চিন্তার গৌরবের দিন আসিবে। আর যে আদর্শ ইন্দ্রিয়সুখ-প্রদানের সামর্থ্য দ্বারাই সকল বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে, তাহা যথার্থ আদর্শ নহে।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, সে ইন্দ্রিয়ে তত অধিক সুখ অনুভব করে, সে তত অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করে। ইন্দ্রিয়-সুখের পরিবর্তে উচ্চতর স্তরের দৃশ্য দেখাইয়া ও সেখানকার সুখ আস্বাদ করাইয়া পশুভাবাপন্ন মানুষকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার শক্তিকেই যথার্থ সভ্যতা বলিয়া বুঝা উচিত।

মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইহা জানে। সকল অবস্থায় সে নিজে ইহা স্পষ্টরূপে না-ও বুঝিতে পারে। ভাবময় জীবন সম্বন্ধে তাহার হয়তো ভিন্ন মত থাকিতে পারে, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহার প্রাণের এই স্বাভাবিক ভাব লুপ্ত হয় না, উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে—তাই সে বাজিকর, চিকিৎসক, ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত অথবা বিজ্ঞানের অধ্যাপককে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ যে-পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াইয়া উচ্চ ভূমিতে বাস করিবার শক্তি লাভ করে, তাহার ফুসফুস যে-পরিমাণ বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিতে পারে এবং যতটা সময় সে এই উচ্চাবস্থায় থাকিতে পারে, তাহা দ্বারাই তাহার উন্নতির পরিমাপ হয়।

সংসারে ইহা দেখা যায় এবং স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উন্নত মানবগণ জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু ব্যতীত তথাকথিত আরামের জন্য সময় ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক; আর যতই তাঁহারা উন্নত হইতে থাকেন, ততই নিতান্ত আবশ্যক কাজগুলিতে তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া যায়।

ভাব ও আদর্শ অনুসারে মানুষের বিলাসের ধারণা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে থাকে। মানুষ চেষ্টা করে, সে যে-চিন্তাজগতে বিচরণ করিতেছে, তাহার বিলাসের বস্তুগুলিও যেন যথাসম্ভব তদনুযায়ী হয়—আর ইহাই কলা বা কৌশল।

'যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষাও ইহা অনেক বেশী' —ঠিক কথা, অনন্তগুণে অধিক। ২৬
এক কণা—সেই অনন্ত জ্ঞানের এক কণা-মাত্র আমাদের সুখবিধানের জন্য জড়-জগতে অবতরণ করিতে পারে, ইহার অবশিষ্ট ভাগকে জড়ের ভিতর টানিয়া আনিয়া এইভাবে স্থূল কঠিন হস্তে নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে না। সেই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সর্বদাই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে

পলাইয়া যাইতেছে এবং ইহাকে আমাদের স্তরে আনিবার চেষ্টা দেখিয়া উপহাস করিতেছে। এক্ষেত্রে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে—'না' বলিবার উপায় নাই। মানুষ যদি সেই উচ্চস্তরের সৌন্দর্যরাশি ভোগ করিতে চায়, যদি সে ইহার বিমল আলোকে অবগাহন করিতে চায়, যদি সে দেখিতে চায় যে, তাহার নিজের জীবন সেই জগৎকারণের সহিত এক ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে, তবে তাহাকে সেই স্তরে উঠিতে হইবে।

জ্ঞানই বিস্ময়-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়, জ্ঞানই পশুকে দেবতা করে; যে জ্ঞান আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট লইয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে আর সকলই জানা হয়, ২৭
যাহা সকল জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ, যাহার স্পন্দনে সকল বিজ্ঞান জীবন্ত হইয়া উঠে—সেই ধর্মবিজ্ঞান নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, কারণ উহাই কেবল মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্যানময় জীবনযাপনে সমর্থ করে। ধন্য সেই দেশ যে দেশ ইহাকে 'পরাবিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছে!

কর্মজীবনে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে প্রায় দেখা যায় না, তথাপি আদর্শটি এখনও নষ্ট হয় নাই। একদিকে আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা আমাদের আদর্শের দিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপেই অগ্রসর হই বা অতি ধীরে ধীরে অননুভবনীয় গতিতে অগ্রসর হই, আমরা যেন কখনও ইহা ভুলিয়া না যাই। আবার অপর দিকে দেখা যায়, যদিও আমরা আমাদের চোখে হাত দিয়া সত্যের জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি সে আদর্শ সর্বদাই আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আদর্শই কর্মজীবনের প্রাণ। আমরা দার্শনিক বিচারই করি বা প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর কর্তব্য সম্পন্ন করি, আদর্শই আমাদের সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। আদর্শের রশ্মি সরল বা বক্র নানা রেখায় প্রতিবিম্বিত ও পরাবর্তিত (refracted) হইয়া আমাদের জীবনগৃহের প্রতিটি গবাক্ষপথে আসিতেছে, আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহার আলোক আমাদিগকে প্রত্যেক কার্যই করিতে হয়, প্রত্যেক বস্তুকেই ইহা দ্বারা পরিবর্তিত সুন্দর বা বিকৃতরূপে দেখা যায়। আমরা বর্তমানে যাহা হইয়াছি, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিয়াছে; আর ভবিষ্যতে যাহা হইব, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিবে। আদর্শের শক্তি আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে; আমাদের সুখে দুঃখে, বড় বা ছোট কাজে, আমাদের ধর্মাধর্মে ইহার শক্তির পরিচয় অনুভূত হইয়া থাকে।

যদি কর্মজীবনের উপর আদর্শের এইরূপ প্রভাব হয়, কর্মজীবনও আদর্শ গঠনে কম শক্তিমান্ নহে। আদর্শের সত্য কর্মজীবনেই প্রমাণিত। আদর্শের পরিণতি কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবে। আদর্শ থাকিলেই প্রমাণিত হয় যে, কোন না কোন স্থানে, কোন না কোনরূপে ইহা কর্মজীবনেও পরিণত হইয়াছে। আদর্শ বৃহত্তর হইতে পারে, কিন্তু ইহা কর্মজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিস্তৃত ভাবমাত্র। আদর্শ অনেক স্থলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্ঠি ও সাধারণ ভাবমাত্র।

কর্মজীবনেই আদর্শের শক্তিপ্রকাশ। কর্মজীবনের মধ্য দিয়াই ইহা আমাদের উপর কার্য করিতে পারে। কর্মজীবনের মাধ্যমে আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণোপযোগী আকারে পরিবর্তিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে অবতরণ করে। কর্মজীবনকে সোপান করিয়াই আমরা আদর্শে আরোহণ করি। উহারই উপর আমাদের আশা-ভরসা নির্ভর করে; উহা আমাদিগকে কার্যে উৎসাহ দেয়।

যাহাদের বাক্যবিন্যাস আদর্শকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে—এরূপ একজন মানুষ অধিক শক্তিশালী।

ধর্মের সহিত সংযুক্ত না হইলে, এবং অল্পবিস্তর সফলতার সহিত কর্মজীবনে ধর্ম পরিণত করিতে যত্নবান্ একদল অনুবর্তী না পাইলে মানবজাতির নিকট দর্শনশাস্ত্রসমূহ নিরর্থক প্রতীয়মান হয়, বড়জোর উহা কেবল মানসিক ব্যায়ামমাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-সকল মতবাদ একটা কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু পাইবার আশা জাগ্রত করে না, কতক লোক সেই সকল মতবাদ গ্রহণ করিয়াও কিছুটা কার্যে পরিণত করিতে পারে, এগুলিও স্থায়িত্বের জন্য বহু লোক প্রয়োজন, কারণ তাহার অভাবে অনেক নিশ্চিত মতবাদও লোপ পাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবময় জীবনের সহিত কর্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। কোন কোন মহাত্মা পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, গভীরভাবে চিন্তা করিলে কার্যশক্তি হারাইয়া ফেলে, আবার বেশী কাজ করিলে গভীর চিন্তাশক্তি হারাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক মহামনস্বী যে-সকল উচ্চ উচ্চ আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করেন, সেইগুলিকে জগতে কার্যে পরিণত

করিবার ভার তাঁহাদিগকে কালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতে হয়। যতদিন না অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক আসিয়া আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করিয়া প্রচার করিতেছে, ততদিন তাঁহাদের চিন্তারাশিকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা লিখিবার সময়েই আমরা দিব্যচক্ষে সেই পার্থসারথীকে দেখিতেছি, তিনি যেন উভয় বিরোধী সৈন্যদলের মধ্যে রথে দাঁড়াইয়া বামহস্তে দৃপ্ত অশ্বগণকে সংযত করিতেছেন—বর্মপরিহিত যোদ্ধবেশে প্রখর দৃষ্টি দ্বারা সমবেত সৈন্যদলকে দর্শন করিতেছেন এবং স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জার প্রত্যেক খুঁটিনাটিও বিচার করিয়া দেখিতেছেন; আবার অপর দিকে আমরা যেন শুনিতেছি—ভীত অর্জুনকে চমকিত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে কর্মের অত্যদ্ভুত রহস্য বাহির হইতেছেঃ

যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম অর্থাৎ বিশ্রাম বা শান্তি এবং অকর্মের অর্থাৎ বিশ্রামের ভিতর কর্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্‌, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম করিয়া থাকেন।
২৮
ইহাই পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু খুব কম লোকেই এই আদর্শে পৌঁছিয়া থাকে। সুতরাং যেমনটি আছে, আমাদিগকে তেমনিই লইতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

ধার্মিক লোকেদের ভিতর আমরা তীব্র চিন্তাশীল (জ্ঞানযোগী), লোকহিতের জন্য প্রবল কর্মানুষ্ঠানকারী (কর্মযোগী), সাহসের সহিত আত্মসাক্ষাৎকারে অগ্রসর (রাজযোগ) এবং শান্ত ও বিনয়ী (ভক্তিযোগী)—এই চারি প্রকারের সাধক দেখিতে পাই।

২

বর্তমান প্রবন্ধে যাঁহার চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে, তিনি একজন অদ্ভুত বিনয়ী ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

পওহারী বাবা (শেষ জীবনে ইনি এই নামে অভিহিত হইতেন) বারাণসী জেলার গুজী নামক স্থানের নিকটবর্তী এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ অতি বাল্যকালেই গাজিপুরে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য আসিলেন।

বর্তমানকালে হিন্দু সাধুরা—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী—প্রধানতঃ এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী। যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাঁহারা বিভিন্নপ্রকার যোগপ্রণালীর সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত করা হয়। বৈরাগীরা রামানুজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্যগণের অনুবর্তী। মুসলমান রাজত্বের সময় যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'পন্থী' বলে; ইহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার পিতৃব্য রামানুজ বা শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন—অর্থাৎ তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন, এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাজিপুরের দুই মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে তাঁহার একখণ্ড জমি ছিল, সেইখানেই তিনি বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল বলিয়া তিনি পওহারী বাবাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন, আর তাঁহাকেই তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও সামাজিক পদমর্যাদার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার এই সময়কার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে-সকল বিশেষত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এরূপ

সুপরিচিত হইয়াছিলেন, সেগুলির কোন লক্ষণ তখন তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না। লোকের এইটুকুই স্মরণ আছে যে—তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থসমূহ অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন; এদিকে খুব চটপটে ও আমুদে ছিলেন। সময় সময় আমোদের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তার ফলে সহপাঠী ছাত্রগণকে বিলক্ষণ ভুগিতে হইত।

এইরূপে প্রাচীন ধরনের ভারতীয় ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন কার্যের ভিতর দিয়া ভাবী মহাত্মার বাল্যজীবন কাটিতে লাগিল; তাঁহার অধ্যয়নে অসাধারণ অনুরাগ ও ভাষাশিক্ষায় অপূর্ব দক্ষতা ব্যতীত সেই সরল সদানন্দ ক্রীড়াশীল ছাত্রজীবনে এমন কিছু দেখা যায় নাই, যাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই প্রবল গাম্ভীর্যের পূর্বাভাস দেয়—যাহার চূড়ান্ত পরিণতি হইয়াছিল এক অদ্ভুত ও ভয়ানক আত্মাহুতিতে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই অধ্যয়নশীল যুবক—সম্ভবতঃ এই প্রথম—জীবনের গভীর মর্ম প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন; এতদিন তাঁহার যে দৃষ্টি পুস্তকে নিবদ্ধ ছিল, এখন সেখান হইতে উঠাইয়া তাহা দ্বারা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজ মনোজগৎ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া ধর্মে যথার্থ সত্য কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। এই সময় তাঁহার পিতৃব্যের দেহত্যাগ হইল। যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন, যাঁহার উপর এই যুবক-হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা নিষিদ্ধ ছিল, তিনি চলিয়া গেলেন; তখন সেই উদ্দাম যুবক হৃদয়ের অন্তস্তলে শোকাহত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, যাহা অপরিবর্তনীয়।

ভারতে সকল বিষয়ের জন্যই একজন গুরুর প্রয়োজন হয়। আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি, পুস্তকে তত্ত্ববিশেষের ভাসা-ভাসা বর্ণনামাত্র থাকে। সকল শিল্পের, সকল বিদ্যার, সর্বোপরি ধর্মের জীবন্ত রহস্যসমূহ গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্তর্জীবনের রহস্য নির্বিঘ্নে মনন করিবার জন্য সর্বদাই লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি নিভৃত স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন; আর এখনও এমন একটি বন, পর্বত বা পবিত্রস্থান নাই, কিংবদন্তী যাহাকে কোন না কোন মহাত্মার বাসস্থান বলিয়া মহিমান্বিত করে নাই।

তাহার পর এই উক্তিটিও সর্বজনপ্রসিদ্ধ যে, 'রমতা সাধু, বহতা পানি। যহ কাভি না মৈল লখানি॥'

অর্থাৎ যে জল প্রবাহিত হয় তাহা যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তেমনি যে সাধু ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তিনিও তেমনি পবিত্র থাকেন।

ভারতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ধর্মজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়া থাকেন—কোন জিনিষ যেমন সর্বদা নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে মরিচা ধরে না, তাঁহারা বলেন, এরূপ ভ্রমণ করিলে তাঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ মলিনতা প্রবেশ করিবে না। ইহাতে আর এক উপকার হয় এই যে, তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন করিয়া লইয়া যান। যাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ভারতের চারি কোণে অবস্থিত চারিটি প্রধান তীর্থ দর্শন করা একরূপ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩০

এইসব চিন্তাই বোধ হয় আমাদের
যুবক ব্রহ্মচারীকে প্রভাবিত
করিয়াছিল, তবে আমরা নিশ্চয়
করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞানতৃষ্ণাই
তাঁহার ভ্রমণের সর্বপ্রধান কারণ।
আমরা তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে খুব
অল্পই জানি, তবে তাঁহার
সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায়
লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে
তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য-
সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন
বাঙলা ভাষার সহিত তাঁহার ব্যাপক
পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি,
দাক্ষিণাত্যে ও বাঙলাদেশে তাঁহার স্থিতি বড় অল্পদিন হয় নাই।

কিন্তু একটি স্থানে গমনের সম্বন্ধে তাঁহার যৌবনকালের বন্ধুগণ বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কাথিয়াওয়াড়ে গিরনার পর্বতের শীর্ষদেশে যোগসাধনার রহস্যে প্রথম দীক্ষিত হন।

এই পর্বত বৌদ্ধদের চক্ষে অতি পবিত্র ছিল। এই পর্বতের পাদদেশে সেই সুবৃহৎ শিলা বিদ্যমান, যাহার উপর সম্রাটকুলের মধ্যে ধার্মিকচূড়ামণি ধর্মাশোকের সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অনুশাসন খোদিত আছে। উহার নিম্নদেশে শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্ধকারে অরণ্যাবৃত বিরাট স্তূপরাজি লীন হইয়াছিল—ঐগুলিকে অনেকদিন ধরিয়াই গিরনার পর্বতশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা বলিয়াই লোকে মনে করিত। বৌদ্ধধর্ম এক্ষণে যে সম্প্রদায়ের সংশোধিত সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হয়—সেই ধর্মসম্প্রদায় এখনও উহাকে বড় কম পবিত্র মনে করেন না; আর আশ্চর্যের বিষয়, ঐ ধর্মের জগজ্জয়ী উত্তরাধিকারী আধুনিক হিন্দুধর্মে মিশিয়া যাইবার

পূর্ব পর্যন্ত ঐ ধর্ম সাহসপূর্বক স্থাপত্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই।

৩

মহাযোগী অবধূতগুরু দত্তাত্রেয়ের পবিত্র নিবাসভূমি বলিয়া গিরনার হিন্দুদের মধ্যে বিখ্যাত; আর কিংবদন্তী আছে যে, এই পর্বতচূড়ায় ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ এখনও বড় বড় সিদ্ধযোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন।

তারপর আমরা দেখিতে পাই, এই যুবক ব্রহ্মচারী বারাণসীর নিকটে গঙ্গাতীরে জনৈক যোগসাধক সন্ন্যাসীরা শিষ্যরূপে বাস করিতেছেন। এই সন্ন্যাসী নদীর উচ্চতটভূমির উপর খনিত একটি গর্তে বাস করিতেন। আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মাও পরবর্তী জীবন গাজিপুরের নিকট নদীর উচ্চতটভূমিতে একটি গভীর গহ্বর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন; ইহা তিনি ওই গুরুর নিকটে শিখিয়াছিলেন, বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যোগীরা যোগাভ্যাসের সুবিধার জন্য সর্বদাই গুহা অথবা যেখানকার আবহাওয়ার কোন রূপ পরিবর্তন নাই, এবং যেখানে কোন শব্দ মনকে বিচলিত করিতে পারে না, এমন স্থানে বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি প্রায় এই সময়ে বারাণসীতে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিতেছিলেন।

অনেক বর্ষ ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও সাধনার পর এই ব্রহ্মচারী যুবক, যেস্থানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যদি তখন জীবিত থাকিতেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ এই বালকের মুখমণ্ডলে সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন, যাহা প্রাচীনকালে জনৈক শ্রেষ্ঠ ঋষি তাঁহার শিষ্যের মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—সৌম্য ব্রহ্মজ্যোতিতে আজ তোমার মুখ উদ্ভাসিত দেখিতেছি। ৩১

কিন্তু এক্ষেত্রে বাল্যকালের সঙ্গীরাই তাঁহার গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহাদের অনেকেই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সংসার চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, যে সংসারে চিন্তার অবসর নাই, কিন্তু কর্ম অনন্ত।

তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সহপাঠী বন্ধু ও খেলার সাথীর (যাঁহার ভাব বুঝিতে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন) সমুদয় আচার-আচরণে এক পরিবর্তন—রহস্যময় পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। ঐ পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার মত হইবার ইচ্ছা, অথবা তাঁহার ন্যায় তত্ত্বান্বেষণ-স্পৃহা জাগরিত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, এ এক অদ্ভুত মানব—এই যন্ত্রণা ও জড়বাদপূর্ণ সংসার একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই পর্যন্ত। তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ইতোমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বারাণসীর নিকটে তাঁহার গুরু যেমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ ভূমিতে একটি গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশকরতঃ অনেকক্ষণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আহার সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ভ করিলেন। সারাদিন তিনি নিজের ছোট আশ্রমটিতে কাজ করিতেন, তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করিতেন, উত্তম খাদ্য রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু ছিলেন) ঠাকুরের ভোগ দিতেন, তার পর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে যাইতেন। সেখানে সারা রাত সাধনভজনে কাটাইয়া ঊষার পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং আবার নিত্যকর্ম আরম্ভ করিতেন, আমরা ভারতে এরূপ কাজকে 'অপরের সেবা বা পূজা' বলিয়া থাকি।

ইতোমধ্যে তাঁহার নিজের খাওয়াও কমিয়া আসিতে লাগিল; অবশেষে আমরা শুনিয়াছি, উহা প্রত্যহ এক মুঠ তেতো নিমপাতা বা কয়েকটা লঙ্কা মাত্রে দাঁড়াইল। তারপর গঙ্গাতীরস্থ জঙ্গলে প্রত্যহ রাত্রে সাধনার জন্য গমন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল—তিনি নিজহাতে নির্মিত গুহাতে আরও বেশী সময় বাস করিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই গুহায় তিনি দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তারপর বাহির হইতেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই জানিত না; এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'পওহারী' অর্থাৎ বায়ুভক্ষণকারী বাবা বলিতে আরম্ভ করিল।

তিনি তাঁহার জীবনে আর কখনও এই স্থান ত্যাগ করেন নাই। একবার তিনি এত অধিক দিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে,

লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেক দিন পরে বাবা আবার বাহির হইয়া বহুসংখ্যক সাধুকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

যখন ধ্যানমগ্ন না থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার গুহার মুখের উপরিভাগে অবস্থিত একটি গৃহে বাস করিতেন, আর এই সময়ে যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। গাজিপুরের অহিফেন বিভাগের রায় গগনচন্দ্র বাহাদুর—যিনি স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও ধর্মপ্রাণতার জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন—আমাদিগকে এই মহাত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দেন।

ভারতের আরও অনেক মহাত্মার জীবনের ন্যায়, এই জীবনেও বাহ্য কর্মমুখরতা বিশেষ কিছু ছিল না। 'বাক্যের দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে; আর যাহারা সত্য ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের জীবনে সত্য প্রতিফলিত হয়'—এই মহাপুরুষের জীবন ঐ ভারতীয় আদর্শেরই অন্যতম উদাহরণ। এই ধরনের ব্যক্তিগণ যাহা জানেন, তাহা প্রচার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কারণ তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাক্যের দ্বারা নয়, ভিতরের সাধনার দ্বারাই সত্যলাভ হয়। ধর্ম তাঁহাদের নিকট সামাজিক কর্তব্যের প্ররোচক শক্তিবিশেষ নয়, ধর্ম সত্যের ঐকান্তিক অনুসন্ধান এবং এই জীবনে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

কালের একটি মুহূর্ত অপেক্ষা অপর একটি মুহূর্তের অধিকতর শক্তি আছে, এ-কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন। অতএব অনন্তকালের প্রতিটি মুহূর্তই অন্যান্য মুহূর্তের সমান বলিয়া তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখানেই এবং এখনই ধর্মের সত্যসমূহের সাক্ষাৎ দর্শন করিবার উপর জোর দিয়া থাকেন।

বর্তমান লেখক এক সময়ে এই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, জগতের কল্যাণের জন্য কেন তিনি গুহা হইতে বাহিরে আসিবেন না। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও রসিকতার সহিত নিম্নলিখিত দৃঢ় উত্তর প্রদান করেনঃ

কোন দুষ্ট লোক কোন অন্যায় কার্য করিতেছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং শাস্তি-স্বরূপ তাহার নাক কাটিয়া দেয়। নিজের নাক কাটা রূপ জগৎকে কেমন করিয়া দেখাইবে, ইহা ভাবিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইল ও নিজের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক জঙ্গলে পলাইয়া গেল। সেখানে একটি ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া বসিয়া থাকিত, আর এদিক ওদিক কেহ আসিতেছে—মনে হইলে অমনি গভীর ধ্যানের ভান করিত। তাহার এইরূপ ব্যবহারে সরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দলে দলে লোক এই অদ্ভুত সাধু দেখিতে এবং পূজা করিতে আসিতে লাগিল। তখন সে দেখিল, এইরূপ অরণ্যবাসে আবার তাহার সহজে জীবিকানির্বাহের উপায় হইল। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে সেই স্থানের অধিবাসীরা মৌনব্রতধারী ধ্যানপরায়ণ সাধুর নিকট হইতে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল, বিশেষতঃ জনৈক যুবক তাহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইল। শেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, আর বিলম্ব করিলে সাধুর প্রতিষ্ঠা একেবারে লোপ হয়। তখন সে একদিন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ঐ উৎসাহী যুবককে বলিল, 'আগামী কাল একখানি ধারাল ক্ষুর লইয়া এখানে আসিও।' যুবকটি তাহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইবে, এই আশায় পরম আনন্দিত হইয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে ক্ষুর লইয়া উপস্থিত হইল। নাককাটা সাধু তাহাকে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেল, তার ক্ষুরখানি হাতে লইয়া উহা খুলিল এবং এক আঘাতে তাহার নাক কাটিয়া দিয়া গম্ভীর বদনে বলিল, 'হে যুবক, আমি এইরূপে এই আশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও তৎপর হইয়া সুবিধা পাইলেই অপরকে এই দীক্ষা দিতে থাক।' যুবকটি লজ্জায় তাহার এই অদ্ভুত দীক্ষার রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না এবং সাধ্যানুসারে তাহার গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিল। এইরূপে এক নাক কাটা সাধু-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল। তুমি কি আমাকেও এইরূপ আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখিতে চাও?

ইহার অনেক পরে, যখন তিনি অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে ছিলেন, ঐ বিষয়ে আর একবার প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? একটি মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপরের মনকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বলিয়া মনে কর না?'

অপর এক সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এত বড় একজন যোগী, তথাপি তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য উপদিষ্ট শ্রীরঘুনাথজীর মূর্তিপূজা, হোমাদি কর্ম করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'সকলেই যে নিজের কল্যাণের জন্য কর্ম করে, এ কথা তুমি ধরিয়া লইতেছ কেন? একজনও কি অপরের জন্য কর্ম করিতে পারে না?'

অতঃপর সকলেই সেই চোরের কথা শুনিয়াছেন; সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চোরাই জিনিষের পোঁটলা ফেলিয়া পলাইল। সাধু সেই পোঁটলা লইয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন; শেষে পদপ্রান্তে সেই পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে সজলনয়নে নিজকৃত বাধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও অতি কাতরভাবে সেইগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এগুলি আমার নহে, তোমার।'

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়াছি, একবার তাঁহাকে গোখুরা সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েক ঘণ্টার জন্য সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিছুকাল পরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন, তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'ঐ গোখুরা সাপটি আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূতরূপে আসিয়াছিলেন (পাহন দেওতা আয়া)।'

আমরা এই কাহিনী অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারি। কারণ, আমরা জানি তাঁহার স্বভাব কী প্রগাঢ় নম্রতা, বিনয় ও প্রেমে ভূষিত ছিল। সর্বপ্রকার পীড়া তাঁহার নিকট সেই 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূতস্বরূপ' (পাহন দেওতা) ছিল; আর যদিও তিনি ঐ সকল পীড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তথাপি অপর লোক পর্যন্ত ঐ পীড়াগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই অনাড়ম্বর প্রেম ও কোমলতা চতুর্দিকের লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল; যাঁহারা চারিদিকের পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অদ্ভুত ব্যক্তির নীরব শক্তিবিস্তারের সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষের দিকে তিনি আর লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতেন না। যখন মাটির নীচের গুহা হইতে উঠিয়া আসিতেন, তখন লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেন বটে, কিন্তু মধ্যে দ্বার রুদ্ধ থাকিত। তিনি যে গুহা হইতে উঠিয়াছেন, তাহা হোমের ধূম দেখিয়া অথবা পূজার আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তাঁহার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যখন একই কার্য করিতেন, তাহা যতই তুচ্ছ হউক—তখন তাহাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যাইতেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজায় তিনি যেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটি তাম্রকুণ্ড মাজিতেও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনি যে আমাদিগকে কর্মরহস্য সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমনভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধিস্বরূপ—তিনি নিজেই এই আদর্শের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিলেন।

তাঁহার বিনয়ও কোনরূপ কষ্ট যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিপূর্ণ ছিল না। একবার তিনি আমাদিগের নিকট অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত ভাবটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেনঃ হে রাজা, ভগবান্ অকিঞ্চনের ধন; হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে, এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্যন্ত 'আমার' বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে, তিনি তাহারই।—এই ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াই স্বভাবতঃ তাঁহার এই বিনয় আসিয়াছিল।

তিনি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন না; কারণ, তাহা হইলে নিজেকেই আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে হয়, নিজেকে অপর অপেক্ষা উচ্চতর আসনে বসাইতে হয়। কিন্তু একবার তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণ খুলিয়া গেলে তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞানবারি উৎসারিত হইত, তথাপি উত্তরগুলি সর্বদা সাক্ষাৎভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে হইত।

তিনি দীর্ঘাকৃতি, মাংসল ও একচক্ষু ছিলেন এবং প্রকৃত বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখাইত। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মত মধুর স্বর আর কাহারও শুনি নাই। জীবনের শেষ দশ বৎসর বা ততোধিক কাল তিনি লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে অবস্থান করিতেন। তাঁহার গৃহদ্বারের পশ্চাতে গোটাকতক আলু ও একটু মাখন রাখিয়া দেওয়া হইত; যখন তিনি সমাধিতে না থাকিতেন, তখন রাত্রে ঐগুলি গ্রহণ করিতেন। গুহার মধ্যে থাকিলে তাহাও তাঁহার প্রয়োজন হইত না। এইরূপে যোগশাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এবং পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নীরব জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ধূম দেখিলেই তিনি সমাধি হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইত। একদিন ধূমে পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দিকের লোকে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিল এবং ধূম পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার গৃহের দ্বার ভাঙিয়া ফেলিল এবং দেখিল, সেই মহাযোগী নিজেকে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি দিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত হইল।

আমাদিগকে এখানে কালিদাসের সেই বাক্য স্মরণ করিতে হইবেঃ

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের কার্যের নিন্দা করিয়া থাকে; কারণ সেই কার্যগুলি অসাধারণ এবং তাহাদের কারণও লোক ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। ৩২

তথাপি তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া তাঁহার এই কার্যের কারণ সম্বন্ধে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইতেছি। আমাদের মনে হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত; তখন তিনি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, সেজন্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে আর্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।

বর্তমান লেখক এই পরলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী; সেজন্য তাঁহার প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত শ্রেষ্ঠ আচার্যদিগের অন্যতম মহাত্মার উদ্দেশ্যে—এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অযোগ্য হইলেও উৎসর্গীকৃত হইল।

মদীয় আচার্যদেব

[১৮৯৬, ২৪ ফেব্রুআরী নিউ ইয়র্কে নবপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে স্বামীজী বিখ্যাত My Master বক্তৃতাটি দেন; ঐ বৎসরের শেষদিকে লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে উইম্বল্‌ডনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। বর্তমান অনুবাদ উভয় বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলিয়াছিলেনঃ যখনই ধর্মের প্রভাব কমিয়া যায় ও অধর্মের প্রভাব বাড়িতে থাকে, তখনই আমি মানবজাতিকে সাহায্য করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি।

৩৩

আমাদের এই জগৎ ক্রমাগত পরিবর্তন ও নূতন নূতন পরিস্থিতির জন্য যখনই নূতন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তি-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় স্তরে ক্রিয়াশীল বলিয়া উভয়ত্র এই সমন্বয়-তরঙ্গের আবির্ভাব হয়। আধুনিক কালে ইওরোপই প্রধানতঃ জড়রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, আর সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিস্বরূপ। অধুনা আবার আধ্যাত্মিক স্তরে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। বর্তমানে জড়বাদী ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী; আজ মানুষ ক্রমাগত জড়ের উপর নির্ভর করিতে করিতে নিজের দিব্য স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইতে বসিয়াছে—এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমন্বয়ের সেই শক্তি আসিয়াছে, সেই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে—যাহা ক্রমবর্ধমান জড়বাদের মেঘ অপসারিত করিয়া দিবে। সেই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, অনতিবিলম্বেই তাহা মানবজাতিকে তাহার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর এশিয়া হইতে এই শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগের নিয়মে পরিকল্পিত। একজন মানুষই সব কিছুর অধিকারী হইবে—একথা বলা অর্থহীন। কোন একটি জাতিই যে সকল বিষয়ের অধিকারী হইবে—এরূপ ভাবা আরও ভুল। তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! অজ্ঞতাবশতঃ শিশু ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার পুতুলের মত কাম্য আর কিছুই নাই। যে-জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে জড়বস্তুই একমাত্র কাম্য, উন্নতি বা সভ্যতা বলিতে জড়শক্তির অধিকারই বুঝায়; আর যদি এমন কোন জাতি থাকে, যাহাদের ঐ শক্তি নাই বা যাহারা ঐ শক্তি চাহে না, তাহারা নগণ্য—তাহারা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিরর্থক। অন্যদিকে আর এক জাতি ভাবিতে পারে, কেবল জড়বাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হইতে উত্থিত বাণী একদা সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিলঃ যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বের সব কিছুর অধিকার করে অথচ তাহার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে তাহাতে কি সার্থকতা? ইহাই প্রাচ্য ভাব, অপরটি পাশ্চাত্য।

এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্তমান সমন্বয়ে এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয় আদর্শের মিলন হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তেমনি সত্য। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু চায় বা আশা করে, যাহা থাকিলে জীবনটাকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, আধ্যাত্মিক স্তরেই সে তাহা পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সে স্বপ্নমুগ্ধ; প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও সেইরূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—পাঁচ মিনিটও যাহা স্থায়ী নহে, এমন পুতুল লইয়া সে খেলা করিতেছে! আর যে মুষ্টিমেয় জড়বস্তুকে শীঘ্র বা বিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাকেই বয়স্ক নরনারীগণ এত বড় মনে করে—ইহা চিন্তা করিয়া প্রাচ্য হাসিতেছে। একে অন্যকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ মানবজাতির উন্নতির পক্ষে যেমন আবশ্যক, প্রাচ্য আদর্শও সেইরূপ; আর আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা উহা অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখনই মানবকে সুখী করে নাই, কখনই করিবে না। যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, যন্ত্র আমাদিগকে সুখী করিবে, সে জোর করিয়া বলে যন্ত্রেই সুখ আছে; কিন্তু সুখ চিরকাল মনেই বর্তমান। যে মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান্ বলিব কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হইয়া তাহারই উপাসনা কর না কেন? যদি সমগ্র জগতের উপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের প্রত্যেকটি পরমাণুকে বশীভূত করিতে পার, তাহা হইলেই বা কি আসিয়া যায়? যতদিন মানুষ তাহার নিজের ভিতর সুখী হইবার শক্তি অর্জন না করে, এবং নিজেকে জয় করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন সে সুখী হইতে পারিবে না। ইহা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি 'প্রকৃত' শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিই বুঝিয়া থাকে। ইহা সত্য যে, নীল-শৈল-সাগর-সমন্বিতা নানা শক্তি ও ভাবমণ্ডিতা বাহ্যপ্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মহত্তর মানবের অন্তঃপ্রকৃতি—সূর্য-চন্দ্র-তারকা, পৃথিবী তথা সমগ্র জড়জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে এই অন্তঃপ্রকৃতি আমাদের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জগতের গবেষণায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রাচ্য জাতি তেমনি এই অন্তর্জগতের গবেষণায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অতএব ইহাই সঙ্গত যে, যখন আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রাচ্য হইতেই হইয়া থাকে। এরূপ হওয়াই সঙ্গত। আবার যখন প্রাচ্য জাতি যন্ত্রনির্মিত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে যে পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসিয়া উহা শিখিতে হইবে, ইহাও সঙ্গত। পাশ্চাত্য জাতির যখন আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহস্য শিখিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তাহাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনকথা বলিতে যাইতেছি, যিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত বলিবার পূর্বে তোমাদের নিকট ভারতের ভিতরের রহস্য, ভারত বলিতে কি বুঝায়, তা বলিব। যাহাদের চক্ষু জড়বস্তুর কৃত্রিম সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হইয়াছে, যাহারা সারা জীবনটাকে পান-ভোজন ও সম্ভোগের বেদীমূলে উৎসর্গ করিয়াছে, কাঞ্চন ও ভূখণ্ডকেই যাহারা যথাসর্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইন্দ্রিয়সুখকেই যাহারা সুখের সীমা বলিয়া বুঝিয়াছে, অর্থকেই যাহারা আরাধ্য দেবতা করিয়াছে, যাহাদের চরম লক্ষ্য ইহলোকে কয়েক মুহূর্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তারপর মৃত্যু, যাহাদের মন সম্মুখে ঝাঁপ দিতে অক্ষম, যাহারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর কোন কিছুর চিন্তা কখনও করে না, এইরূপ ব্যক্তিরা ভারতে গিয়া কি দেখে?—দেখে চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য আবর্জনা কুসংস্কার অজ্ঞতা বীভৎসভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ—তাহারা সভ্যতা বলিতে পোষাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচার মাত্র বুঝে। পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের বাহ্য অবস্থার উন্নতি করিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে; ভারত কিন্তু অন্য পথে গিয়াছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল সেখানেই এমন এক জাতির বাস, যে জাতি কখনও নিজদেশের সীমা ছাড়াইয়া অপর জাতিকে জয় করিতে গিয়াছে—সমগ্র ইতিহাসে কোথাও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জাতি কখনও অপরের দ্রব্যে লোভ করে নাই, যাহাদের একমাত্র দোষ এই যে, তাহাদের মস্তিষ্ক এবং দেশের ভূমি অতিশয় উর্বর, আর তাহারা গুরুতর পরিশ্রমে ধনসঞ্চয় করিয়া যেন অপরাপর জাতিকে ডাকিয়া নিজেদের সর্বস্বান্ত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, অপর জাতি তাহাদিগকে বর্বর বলিয়াছে—ইহাতে তাহাদের দুঃখ নাই, ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট। পরিবর্তে তাহারা এই জগতের নিকট সেই পরমপুরুষের দর্শন-বার্তা প্রচার করিতে চায়, জগতের নিকট মানবপ্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চায়, যে আবরণে মানবের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত, তাহা ছিন্ন করিতে চায়; কারণ তাহারা জানে—এ সবই স্বপ্ন, তাহারা জানে—এই জড়ের পশ্চাতে মানবের প্রকৃত দিব্যভাব বিরাজমান, যাহা কোন পাপে মলিন হয় না, কাম যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না, তাপ শুষ্ক করিতে পারে না, মৃত্যু বিনষ্ট করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে জড়বস্তু যতখানি সত্য, ভারতবাসীর নিকট মানবের যথার্থ স্বরূপও ততখানি সত্য।

তোমাদের যেমন কামানের মুখে লাফাইয়া পড়িবার সাহস আছে, তোমাদের যেমন স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিবার সাহস আছে, ঈশ্বরের নামে তাহাদেরও তেমনি সাহস আছে। এই ভারতেই মানুষ যখন মনের কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস করে এবং চিন্তা করে, তাহা যে সত্য, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ, বিষয়-সম্পত্তি সকলই সে ত্যাগ করিয়া থাকে। মানব-জীবনটা দু-দিনের নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন অনাদি অনন্ত—এ কথা যখনই কেহ বুঝিতে পারে, তখন এই ভারতেই মানুষ নদীতীরে বসিয়া অনায়াসে শরীরটা পরিত্যাগ করিতে পারে, যেমন তোমরা সামান্য তৃণখণ্ড অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পার। ইহাই তাহাদের বীরত্ব—তাহারা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়, কারণ তাহারা নিশ্চয় জানে যে, তাহাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তাহাদের শক্তি নিহিত—এই শক্তিবলেই শত শত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারে তাহারা অক্ষত রহিয়াছে; এই জাতি এখনও জীবিত এবং জাতির ভিতর ভীষণতম দুঃখ-বিপদের দিনেও ধর্মবীরের অভাব হয় নাই। পাশ্চাত্যে যেমন বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এশিয়াতেও তেমনি বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ভারতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, যখন পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়ীগণ তরবারি হস্তে ঋষির বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে, তাহারা বর্বর ও স্বপ্নবিলাসী, তাহাদের ধর্মে শুধু পৌরাণিক গল্প, ঈশ্বর আত্মা ও অন্য যাহা কিছু পাইবার জন্য তাহারা এতদিন চেষ্টা করিতেছিল, তাহা শুধু অর্থশূন্য শব্দসমষ্টি; আর হাজার হাজার বৎসর যাবৎ এই জাতি ক্রমাগত যে ত্যাগ-বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, সেগুলি বৃথা; তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণকে এই প্রশ্ন চঞ্চল করিয়া তুলিলঃ তবে কি এতদিন পর্যন্ত এই জাতির জীবন যে-আদর্শে গঠিত হইয়াছে, তাহার সার্থকতা একেবারেই নাই? তবে কি আবার এই জাতিকে পাশ্চাত্য ধারায় নূতনভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে? তবে কি প্রাচীন পুঁথি-পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, দর্শনশাস্ত্রগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, ধর্মাচার্যগণকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, মন্দিরগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে?

তরবারি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজ নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ বিজেতা পাশ্চাত্য জাতিগুলি কি বলে নাই, তোমাদের পুরাতন যাহা কিছু আছে, সবই কুসংস্কারময়—সবই পৌত্তলিকতা? পাশ্চাত্য ভাবে পরিচালিত নূতন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণ অতি বাল্যকাল হইতেই এই সকল ভাবে অভ্যস্ত হইল, সুতরাং তাহাদের ভিতর যে সন্দেহের আবির্ভাব হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে সত্যানুসন্ধানে তাহার ব্রতী হইল না; তাহার পরিবর্তে পাশ্চাত্য যাহা বলে, তাহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইল—পাশ্চাত্য ভাবই সত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইল! পুরোহিতকুলের উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে, বেদরাশি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কারণ পাশ্চাত্য এ কথা বলিতেছে! এইরূপ সন্দেহ ও অস্থিরতার ভাব হইতেই ভারতে তথাকথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠিল।

যদি তুমি ঠিক ঠিক সংস্কারক হইতে চাও, তবে তোমার তিনটি জিনিষ থাকা চাই—প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভ্রাতাদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে—ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া কি তুমি যথার্থই অনুভব কর? তোমার সমগ্র সত্তাই কি এই ভাবে পূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছে? এই ভাব কি তোমার রক্তের স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে, তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? এই ভাব কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর ঝঙ্কার তুলিতেছে? তুমি কি সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তারপর ভাবিতে হইবেঃ প্রতিকারের কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছ কিনা? তোমরা যে চীৎকার করিয়া সকলকে সবই ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিতে বলিতেছ, তোমরা নিজেরা কি কোন পথ পাইয়াছ? হইতে পারে প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ-সকল কুসংস্কারের সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের সহিত স্বর্ণখণ্ডও রহিয়াছে। এমন কোন উপায় আবিষ্কার করিয়াছ কি, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোনাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি, তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিতরূপে কি বলিতে পার যে, তোমার এই কল্যাণেচ্ছার পশ্চাতে অর্থ মান যশ বা প্রভুত্বের বাসনা নাই? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার, তুমি যাহা চাও তাহা জান, আর তোমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্তব্য—সেই কর্তব্যই সাধন করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার, যতদিন জীবন থাকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না হইবে, ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়া থাকিবে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ আচার্য ও গুরু, তবেই তুমি আমাদের নমস্য। যদি তোমার এই গুণগুলি না থাকে, তবে তুমি আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য নও। কিন্তু মানুষ বড়ই দুর্বল, বড়ই সংকীর্ণদৃষ্টি। অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার নাই, প্রকৃত দর্শনের শক্তি তাহার নাই—সে এখনই ফল দেখিতে চায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, সে নিজেই ফল ভোগ করিতে চায়, প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিতে চাহে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ কর্মেই তোমাদের অধিকার আছে, ফলে কখনও নয়।

ফল কামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—ঐরূপ অসহিষ্ণুতার জন্য শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগের আকাঙ্ক্ষায় সে যে কোন একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ ভাবী সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে এই সংস্কারের ভাব আসিল। কিছুকালের জন্য বোধ হইল, যে জড়বাদ ও 'অহং'-সর্বস্বতার তরঙ্গ ভারতের উপকূলে প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে, তাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হৃদয়ের প্রভূত সরলতা, ঈশ্বরলাভের জন্য হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা প্রভৃতি সবই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। মুহূর্তের জন্য বোধ হইল, যেন সমগ্র জাতির অদৃষ্টে বিধাতা একেবারে ধ্বংস লিখিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি এরূপ সহস্র বিপ্লব-তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। সেগুলির তুলনায় এ তরঙ্গের বেগ তো অতি সামান্য। শত শত বর্ষ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া এই দেশকে বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইয়াছে তাহাই ভাঙিয়া-চুরিয়া দিয়াছে; তরবারি ঝলসিত হইয়াছে; 'আল্লার জয়'-রবে ভারত-গগন বিদীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পরে যখন বিপ্লবের বন্যা থামিল, দেখা গেল জাতীয় আদর্শ অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। মৃত্যুকে উপহাস করিয়া ভারতবাসী নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে, এবং যতদিন ভারতের জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়সুখে উন্মত্ত না হইবে, যতদিন ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহারা এরূপই থাকিবে। হয়তো তাহারা চিরকাল ভিক্ষু ও দরিদ্র থাকিবে, ধূলি ও মলিনতার মধ্যে হয়তো তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তাহারা যে ঋষির বংশধর, এ কথা যেন তাহারা ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটি মুটে-মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু-'ব্যারনে'র বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পর্যন্ত অরণ্যবাসী বল্কলপরিহিত অরণ্যফলমূলভোজী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে নিজেকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ঋষিগণেরই বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই; আর যতদিন পুণ্যচরিত্রের উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

ভারতের চারিদিকে যখন এইরূপ নানাবিধ সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরী, বঙ্গদেশের কোনও সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি শিশুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন। এরূপ ব্রাহ্মণের জীবন নিত্য ত্যাগ ও তপস্যায় পূর্ণ। জীবিকানির্বাহের জন্য তাঁহার পক্ষে অল্প কয়েকটি পথই উন্মুক্ত, তাহার উপর আবার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে যে-কোন বিষয়কর্ম নিষিদ্ধ। আবার যথেচ্ছভাবে কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবার যো নাই। কল্পনা করিয়া দেখ—এরূপ জীবন কি কঠোর! ব্রাহ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের কথা তোমরা অনেক শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছ—এই অদ্ভুত মানুষগুলি কিভাবে তাহাদের প্রতিবেশিগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল? দেশের সকল জাতির মধ্যে তাহারা দরিদ্রতম, ত্যাগই তাহাদের শক্তির রহস্য। তাহারা কখনও ধনের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। জগতের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র পুরোহিত, সেইজন্যই তাহারা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্। তাহারা নিজেরা এরূপ দরিদ্র বটে, তথাপি দেখিবে—যদি গ্রামে কোন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণপত্নী তাহাকে গ্রাম হইতে কখনও অভুক্ত চলিয়া যাইতে দিবে না। ইহাই ভারতীয় মাতার সর্বপ্রথম কর্তব্য; যেহেতু তিনি মাতা, সেইজন্য তাঁহার কর্তব্য সকলকে খাওয়াইয়া সর্বশেষে নিজে খাওয়া। প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে হইবে—সকলে খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তবেই তিনি খাইতে পাইবেন; সেই জন্যই ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলা হয়। আমরা যাঁহার জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার মাতা এইরূপ আদর্শ হিন্দু জননী ছিলেন। ভারতে যে জাতি যত উচ্চ, তাহার বিধিনিষেধও তত বেশী। খুব নীচ জাতি যাহা খুশী খাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর জাতিসমূহে আহারে বিধিনিষেধ দেখা যায়; আর উচ্চতম জাতি, ভারতের বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি, ব্রাহ্মণের জীবনে—পূর্বেই বলিয়াছি—খুব বেশী আচারনিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহারের

তুলনায় এই ব্রাহ্মণদের জীবন বিরামহীন তপস্যায় পূর্ণ, কিন্তু তাহাদের খুব স্থৈর্য আছে। তাহারা কোন একটা ভাব পাইলে তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমে সে-ভাব পোষণ করিয়া কার্যে পরিণত করে। একবার তাহাদিগকে কোন একটা ভাব দাও, সহজে তাহা অপসারিত করিতে পারিবে না; তবে তাহাদিগকে কোন নূতন ভাব দেওয়া বড় কঠিন।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা এই কারণে অতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে বাস করে। কিরূপে জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে; তাহারা সেই-সকল বিধি-নিষেধের সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকে। তাহারা বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় হইলেও তাহাদের ঐকান্তিক ও অসাধারণ নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্মভাব দেখা যায়, কারণ সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা আসিয়াছে। তাহারা এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে যে, আমরা সকলে হয়তো তাহা ঠিক বলিয়া মনে না-ও করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের মতে তাহা সত্য। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, মানুষ সর্বদা দানশীল হইবে—এমন কি চরমভাবেও। যদি কোন ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করিতে—সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, শাস্ত্র বলেন, ইহা অন্যায় নহে, বরং ইহাই মানুষের কর্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজের মৃত্যুভয় না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে দানব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা এইরূপ চূড়ান্ত দানশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি প্রাচীন সুন্দর উপাখ্যানের কথা স্মরণ করিতে পারেন। মহাভারতে লিখিত আছে, এক অতিথিকে ভোজন করাইতে গিয়া কিরূপে একটি সমগ্র পরিবার অনশনে প্রাণ দিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, কারণ এখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। মদীয় আচার্যদেবের পিতামাতার চরিত্র এই আদর্শে গঠিত ছিল। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অথিতিকে খাওয়াইতে গিয়া মাতা সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন।

এইরূপ পিতামাতার কোলে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেন—আর জন্ম হইতেই তাঁহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্মাবধিই তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইত—কি কারণে তিনি জগতে আসিয়াছেন, তাহা জানিতেন, আর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অল্প বয়েসেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

ব্রাহ্মণ সন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। লেখাপড়ার কাজ ছাড়া ব্রহ্মণের অন্য কাজে অধিকার নাই। এখনও দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সহিত সম্পর্কিত ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক প্রণালী হইতে খুবই ভিন্ন রকমের। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। প্রাচীন ধারণা ছিল—জ্ঞান এত পবিত্র বস্তু যে, ইহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মূল্য না লইয়া অবাধে জ্ঞানবিতরণ করিতে হইবে। আচার্যেরা ছাত্রগণকে বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন; আর শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে খাওয়া-পরাও দিতেন। এই সকল আচার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য ধনী পরিবারের লোকেরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে দান করিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং আচার্যদিগকেও ছাত্রদের প্রতিপালন করিতে হইত। যে বালকের কথা আমি বলিতেছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিত ছিলেন। বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন পরে বালকের দৃঢ় ধারণা হইল যে, সকল লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব উন্নতি। সুতরাং লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানন্বেষণে সম্পূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য দেখা দিল; বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার নিকট এক স্থানে একটি মন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরে পৌরোহিত্য-কর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তোমরা যে অর্থে 'চার্চ' শব্দ ব্যবহার কর, আমাদের মন্দির সেরূপ নহে। মন্দিরগুলি সাধারণ উপাসনার স্থান নহে, কারণ ভারতে সমবেত উপাসনা বলিয়া কিছু নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

বিষয় সম্পত্তি যাঁহার বেশী আছে, তিনি এইরূপ মন্দির করিয়া দেন। মন্দিরে তিনি ঈশ্বরের কোন প্রতীক বা ঈশ্বরাবতারের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভগবানের নামে পূজার জন্য তাহা উৎসর্গ করেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চে যেরূপ অর্চনা (Mass) হইয়া থাকে, এই সকল মন্দিরে কতকটা সেইভাবে পূজা হয়—শাস্ত্র হইতে মন্ত্র-শ্লোকাদি পাঠ করা হয়, প্রতিমার সম্মুখে আলো ঘুরানো হয়; মোট কথা, আমরা একজন মহৎ ব্যক্তিকে যেভাবে সম্মান করি, প্রতিমার প্রতি ঠিক সেইরকম আচরণ করা হয়। মন্দিরে এই অনুষ্ঠানগুলিই হয়। যে ব্যক্তি কখনও মন্দিরে যায় না, তাহার অপেক্ষা যে মন্দিরে যায়, মন্দিরে যাওয়ার দরুন সে মহত্তর বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং যে কখনও মন্দিরে যায় না, সে-ই অধিকতর ধার্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ভারতে ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, আর লোকে নিজগৃহে নির্জনেই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাসনাদি নির্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে মন্দিরে পৌরোহিত্য নিন্দনীয় কার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, অর্থবিনিময়ে বিদ্যাদানই যখন নিন্দার্হ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ধর্ম সম্বন্ধে যে ইহা আরও অধিক প্রযোজ্য, বলাই বাহুল্য। মন্দিরের পুরোহিত যখন বেতন লইয়া কার্য করে, তখন বলিতে হইবে, সে এই ধর্মগত বিষয় লইয়া ব্যবসায় করিতেছে। অতএব যখন দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হইয়া এই বালককে জীবিকার একমাত্র উপায়রূপে মন্দিরে পুরোহিতের কর্ম অবলম্বন করিতে হইল, তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ।

বাঙলাদেশে অনেক কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতসমূহ সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত। কলিকাতার রাস্তায় এবং পল্লীগ্রামগুলিতে সেই-সকল গান গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মসঙ্গীত এবং সেগুলির সারমর্ম এই যে, ধর্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে হইবে। এই ভাবটি সম্ভবতঃ ভারতীয় ধর্মসমূহের বিশেষত্ব। ভারতে ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাবটি নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইবে—ইহাই ধর্ম। অনেক সাধুপুরুষের ঈশ্বরদর্শন-কাহিনী ভারতে সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তি। ভারতের আবহাওয়া সাধুসন্তদের ঈশ্বরদর্শনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনরূপ যুক্তি দ্বারা ইহাদিগকে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহারা নিজেরা যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা নিজদিগকে ঐরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ঐ-সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন, ইহজীবনেই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি বিকশিত হইলেই ধর্মের আরম্ভ। ইহাই সকল ধর্মের সার কথা।

এইজন্যই দেখিতে পাই, একজনের খুব ভাল বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, তাঁহার যুক্তিসমূহ অকাট্য, এবং তিনি খুব উচ্চ উচ্চ ভাব প্রচার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কথা কেহ শুনে না; আর একজন অতি সামান্য ব্যক্তি, নিজের মাতৃভাষাই হয়তো ভাল করিয়া জানেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় দেশের অর্ধেক লোক তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। ভারতে এরূপ হয়, যখন লোকে কোনরূপে জানিতে পারে কাহারও এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, ধর্ম তাঁহার পক্ষে আর অনুমানের বিষয় নয়—ধর্ম, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তিনি আর অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন না, তখন চারিদিক হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে এবং ক্রমে তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

৩৪

পূর্বকথিত মন্দিরে আনন্দময়ী জগন্মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা করিতে হইত। পূজা করিতে করিতে এই ভাব আসিয়া তাঁহার মন অধিকার করিলঃ এই মূর্তির ভিতর সত্যই কিছু আছে কি? সত্যিই কি জগতে আনন্দময়ী মা বলিয়া কেহ আছেন? তিনি কি সত্য সত্যই চৈতন্যময়ী এবং এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রী? অথবা এ সব কি স্বপ্নবৎ মিথ্যা? ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি?

তিনি শুনিয়াছিলেন, অতীতকালে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ এইরূপে ভগবান্ লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহার উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন, ভারতের সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই জগন্মাতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। তাঁহার সমুদয় মন প্রাণ যেন সেই একভাবে তন্ময় হইয়া গেল। কিরূপে তিনি জগন্মাতাকে লাভ করিবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার এই ভাব বাড়িতে লাগিল। শেষে তিনি 'কিরূপে মায়ের দর্শন পাইব'—ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে বা শুনিতে পারিতেন না।

সকল হিন্দু বালকের মনেই এই সংশয় আসিয়া থাকে। এই সংশয়ই আমাদের দেশের বিশেষত্বঃ আমরা যাহা করিতেছি, তাহা কি সত্য? কেবল মতবাদে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। অথচ ঈশ্বর সম্বন্ধে যত মতবাদ এ পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি সবই ভারতে আছে। শাস্ত্র বা মতবাদ আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির মনে এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকেঃ এ-কথা কি সত্য যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন? যদি থাকেন, তবে আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? আমি কি সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ? পাশ্চাত্য জাতি এগুলিকে কেবল কল্পনা মনে করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই বিশেষ কাজের কথা। এই ভাব আশ্রয় করিয়া লোক নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এই ভাবের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহত্যাগ করে এবং কঠোর তপস্যা করিবার ফলে অনেকে মরিয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির মনে ইহা খুবই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইবে; তাহারা যে কেন এইরূপ মত প্রকাশ করে, তাহারও কারণ আমি অনায়াসে বুঝিতে পারি। তবু পাশ্চাত্য দেশে অনেকদিন বসবাস করা সত্ত্বেও আমি এই প্রাচ্য ভাবকেই জীবনে সর্বাপেক্ষা সত্য—বাস্তব বলিয়া মনে করি।

জীবনটা তো মুহূর্তের জন্য—তা তুমি রাস্তার মুটেই হও, আর লক্ষ লক্ষ লোকের শাসক সম্রাটই হও। জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর—তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা খুব মন্দই হউক। হিন্দু বলেন, এ জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান—ঈশ্বরলাভ। ধর্মলাভই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সত্য হয়, তবেই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভার দুর্বহ হয় না, জীবনটা উপভোগ্য হয়। তাহা না হইলে জীবন একটা বৃথা ভারমাত্র। ইহাই আমাদের ধারণা; শত শত যুক্তি দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবলে ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে, আর ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে অনুভূতি আবশ্যক। ঈশ্বর আছেন, এইটি নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বালকের হৃদয়ে যখন এই ধারণা প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার সারাদিন কেবল ঐ এক ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। দিনের পর দিন তিনি কাঁদিয়া বলিতেন—'মা, সত্যই কি তুমি আছ, না এ সব কল্পনা মাত্র? কবিগণ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই কি এই আনন্দময়ী জননীর কল্পনা করিয়াছেন অথবা সত্যই কিছু আছে?' আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা—যে অর্থে শিক্ষা-শব্দ ব্যবহার করি, সেরূপ শিক্ষা তাঁহার কিছুই ছিল না; ইহাতে বরং ভালই হইয়াছিল। অপরের ভাব—অপরের চিন্তার অনুগামী হইয়া তাঁহার

মনের স্বাভাবিকতা, মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাঁহার মনের এই প্রধান চিন্তাটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, শেষে এমন হইল যে, তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না। নিয়মিতরূপে পূজা করা, সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করা—তখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে তিনি দেবতাকে ভোগ দিতে ভুলিয়া যাইতেন, কখনও কখনও আরতি করিতে ভুলিতেন, আবার কখনও সব ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি করিতেন। লোকমুখে ও শাস্ত্রমুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, যাহারা ব্যাকুলভাবে ভগবানকে চায়, তাহারাই তাঁহাকে পাইয়া থাকে। এক্ষণে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সেই প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। অবশেষে তাঁহার পক্ষে মন্দিরের নিয়মিত পূজা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি পূজা পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পঞ্চবটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, 'কখন সূর্য উদিত হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।' তিনি নিজের দেহভাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন, আহার করিবার কথাও তাঁহার স্মরণ থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে খুব যত্নপূর্বক সেবাশুশ্রূষা করিতেন, তিনি তাঁহার মুখে জোর করিয়া খাবার দিতেন। অজ্ঞাতসারে ঐ খাদ্য কতকটা উদরস্থ হইত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেন, 'মা, মা, তুই কি সত্যি আছিস, তবে আমায় কেন অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস? সত্য কি, আমাকে তা জানতে দিচ্ছিস না কেন? আমি তোকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন? লোকের কথা, শাস্ত্রের কথা, ষড়দর্শন—এ-সব পড়ে শুনে কি হবে মা? এ সবই মিছে। সত্য—যথার্থ সত্য আমি সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করতে চাই। সত্য অনুভব করতে—স্পর্শ করতেই আমি চাই।'

এইভাবে সেই বালকের দিনরাত্রি কাটিত। দিবাবসানে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'মা, আরও এক দিন বৃথা চলে গেল, তবু তোমার দেখা পেলাম না! এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর একটা দিন চলে গেল, আমি সত্যকে জানতে পারলাম না!' হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি কখনও কখনও মাটিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়া কাঁদিতেন।

মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষ অবস্থায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বৎস, মনে কর, একটা ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার পাশের ঘরে একটা চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর সেই চোরের নিদ্রা হইবে? সে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত এই চিন্তার উদয় হইবে যে, কি করিয়া সে ঐ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের থলিটি লইবে? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যাহার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, এই সকল আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সত্য রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, একজন অবিনশ্বর অনন্ত-আনন্দস্বরূপ আছেন, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রিয়-সুখ ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়, সে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্তের জন্যও কি সে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।' এই বালকের হৃদয়ে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিল। সে-সময়ে তাঁহার কোন গুরু ছিল না, এমন কেহ ছিল না—যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান দেয়, বরং সকলেই মনে করিত, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সাধারণে তো এইরূপ বলিবেই। যদি কেহ সংসারের অসার বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, লোক তাহাকে উন্মত্ত বলে, কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিই সংসারে যথার্থ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ উন্মত্ততা হইতেই জগৎ-আলোড়নকারী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আর ভবিষ্যতেও এইরূপ উন্মত্ততা হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোড়িত করিবে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিল। তখন তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক ও অদ্ভুত দর্শন হইতে লাগিল, নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল, যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল। জগন্মাতা নিজেই গুরু হইয়া বালককে আকাঙ্ক্ষিত সত্যলাভের সাধনায় দীক্ষিত করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে এক পরমাসুন্দরী অনুপম বিদুষী আসিলেন। পরবর্তী সময়ে এই মহাত্মা বলিলেন যে, বিদুষী বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—তিনি ছিলেন মূর্তিমতী বিদ্যা, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই মহিলার বিষয় আলোচনা করিলেও তোমরা ভারতীয়দের বিশেষত্ব কোথায় বুঝিতে পারিবে। সাধারণতঃ হিন্দুনারীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকারে বাস করেন—পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে স্বাধীনতার অভাব বলে—তাঁহার মধ্যেও এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন নারীর জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—কারণ ভারতে নরনারীগণও বিবাহ না করিয়া, সংসারত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করেন। এই মন্দিরে আসিয়াই তিনি যেমন শুনিলেন যে, একটি বালক দিনরাত ঈশ্বরের নামে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে আর লোকে তাঁহাকে পাগল বলে, অমনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই মহিলার নিকটেই বালক প্রথম সাহায্য পাইলেন। মহিলা তৎক্ষণাৎ বালকের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মত উন্মত্ততা যাহার আসিয়াছে, সে ধন্য। সমগ্র বিশ্বই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য। সে-ই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ মানুষ বড়ই দুর্লভ।' এই মহিলা বালকটির নিকট অনেক বৎসর থাকিয়া তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর সাধন শিখাইতে লাগিলেন, নানা প্রকার যোগসাধনায় দীক্ষিত করিলেন এবং এই বেগবতী ধর্ম-স্রোতস্বতীর গতিকে যেন পরিচালিত ও প্রণালীবদ্ধ করিলেন।

কিছুদিন পরে সেখানে একজন পরম পণ্ডিত ও দর্শনশাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী আসিলেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত আদর্শবাদী এবং বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি গৃহে বাস করিতেন না, রৌদ্র ঝঞ্ঝা বর্ষায় বাহিরে থাকিতেন। তিনি এই সাধককে বেদান্ত-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, গুরু অপেক্ষা শিষ্য অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েক মাস তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্বোক্ত সাধিকা মহিলা ইতঃপূর্বেই দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। যখনই বালকের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল, অমনি তিনি চলিয়া গেলেন। আজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা তিনি এখনও জীবিত আছেন, তাহা কেহই জানে না। তিনি আর ফিরেন নাই।

মন্দিরে পূজারী থাকাকালে আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া লোকে স্থির করিয়াছিল, তাঁহার একটু মাথার গোল হইয়াছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়া অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল—মনে করিল, ইহাতেই তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া যাইবে, মাথার গোল আর থাকিবে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া ভগবানকে লইয়া আরও মাতিয়া গেলেন। অবশ্য তাঁহার যেরূপ বিবাহ হইল, উহাকে ঠিক বিবাহের নাম দেওয়া যায় না। যখন স্ত্রী একটু বড় হয়, তখনই প্রকৃত বিবাহ হইয়া থাকে, আর এই বিবাহের পর স্বামী শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া আসে—ইহাই সামাজিক প্রথা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী আছেন। সুদূর পল্লীতে পিত্রালয়ে বালিকাটি শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী ধর্মে মত্ত হইয়া গিয়াছেন, এমন কি অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই মনে করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, এ কথার সত্যতা জানিতে হইবে—তাই তিনি পল্লী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার স্বামী যেখানে আছেন, পদব্রজে সেখানে গেলেন। অবশেষে যখন তিনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। যদিও ভারতে নরনারী যে-কেহ ধর্মজীবন অবলম্বন করে, তাহারই আর কাহারও সহিত কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না, তথাপি ইনি স্ত্রীকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, 'আমি জানিয়াছি, সকল নারীই আমার জননী; তবু এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

এই বিশুদ্ধস্বভাবা মহীয়সী মহিলা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বলিলেন, 'জোর করিয়া আপনাকে সংসারী করিবার ইচ্ছা আমার নাই, আমি কেবল নিকটে থাকিয়া আপনার সেবা করিতে চাই, আপনার নিকট সাধনভজন শিখিতে চাই।' তিনি স্বামীর একজন প্রধান অনুগতা শিষ্যা হইলেন—তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্ত্রীর অনুমতি পাইয়া তাঁহার শেষ বাধা অপসারিত হইল এবং তিনি স্বাধীনভাবে নিজ মনোনীত পথে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

যাহা হউক, এইরূপে তিনি সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হইলেন এবং সাধনাতেও অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল—কিভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অভিমান-বিবর্জিত হইবেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, ও শূদ্র' বলিয়া নিজের যে জাত্যভিমান আছে, কিরূপে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবেন; কিভাবে তিনি অতি হীনতম জাতির সঙ্গে পর্যন্ত নিজের সমত্ব বোধ করিবেন। আমাদের দেশে যে জাতিভেদ-প্রথা আছে, তাহাতে বিভিন্ন মানবের মধ্যে পদমর্যাদার ভেদ স্থির ও চিরনির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জন্মবশেই প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে, আর যতদিন না সে কোন গুরুতর অন্যায় কর্ম করে, ততদিন সেই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয় না। জাতিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ এবং মেথর বা চণ্ডাল সর্বনিম্ন। সুতরাং যাহাতে নিজেকে কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান না থাকে, এই কারণে এই ব্রাহ্মণসন্তান মেথরের কাজ করিয়া তাহার সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেথরের কাজ রাস্তা সাফ করা, ময়লা সাফ করা—কেহই তাহাকে স্পর্শ করে না। এইভাবে মেথরের প্রতি যাহাতে তাঁহার ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া তাহাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া মন্দিরের নর্দমা, পায়খানা প্রভৃতি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন এবং পরে নিজ দীর্ঘ কেশ দ্বারা সেই স্থান মুছিয়া দিতেন। শুধু যে এইরূপেই তিনি দীনতা স্বীকার করিতেন, তাহা নহে; মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভিক্ষুককে প্রসাদ দেওয়া হইত—তাহাদের মধ্যে আবার অনেকে মুসলমান, পতিত ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও থাকিত। তিনি সেইসব কাঙালীদের খাওয়া হইলে তাহাদের পাতা উঠাইতেন, তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট জড়ো করিতেন, তাহা হইতে স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিয়া অবশেষে যেখানে এইরূপ সকল শ্রেণীর ও অবস্থার লোক বসিয়া খাইয়াছে, সেই স্থান পরিষ্কার করিতেন। আপনারা এই শেষোক্ত ব্যাপারটিতে যে কি অসাধারণত্ব আছে, ইহা দ্বারা বিশেষ কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ভারতে আমাদের নিকট বড়ই অদ্ভুত ও নিঃস্বার্থ কাজ বলিয়া বোধ হয়। এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার কাজ নীচ অস্পৃশ্য জাতিরাই করিয়া থাকে। তাহারা কোন শহরে প্রবেশ করিলে নিজের জাতির পরিচয় দিয়া লোককে সাবধান করিয়া দেয়—যাহাতে তাহারা তাহাদের স্পর্শদোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এইরূপ নীচজাতির মুখ দেখিয়া ফেলে, তবে তাহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এই সকল শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্য সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম যে-স্থানে বসিয়া নীচজাতি আহার করে, সে-স্থান পরিষ্কার করিতেন, তাহাদের ভুক্তাবশেষ ভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। শুধু কি তাই, রাত্রে গোপনে উঠিয়া ময়লা পরিষ্কার করিয়া অস্পৃশ্যদের সহিত আপনার সমত্ব বোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই ভাব ছিলঃ আমি যে যথার্থ সমগ্র মানবজাতির সেবক হইয়াছি, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাকে তোমার বাড়ীর ঝাড়ুদার হইতে হইবে!

তারপর তাঁহার অন্তরে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে, বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীতে কি সত্য আছে, তাহা জানিবেন। এ পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্ম ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। এখন তাঁহারা বাসনা হইল, অন্যান্য ধর্ম কিরূপ তাহা জানিবেন। আর তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহাই সর্বান্তঃকরণে অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তিনি অন্যান্য ধর্মের গুরু সন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরু বলিতে ভারতে আমরা কি বুঝি, এটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। গুরু বলিতে শুধু গ্রন্থকীট বুঝায় নাঃ তিনিই গুরু, যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ জানিয়াছেন—অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে। একজন মুসলমান সাধুকে পাইয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে তিনি সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি মুসলমানদিগের মত পোষাক পরিতে লাগিলেন, সেই মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুযায়ী সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, সেই সময়ের জন্য তিনি ইসলাম-ভাবাপন্ন হইয়া গেলেন। আর তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, এই সকল সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠানও তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব-উপনীত অবস্থাতেই পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি যীশুখ্রীষ্টের সত্যধর্মের অনুসরণ করিয়াও একই ফল লাভ করিলেন। তিনি যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধককে পাইতেন, তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া তাঁহার সাধনপ্রণালী সাধনা করিয়াছিলেন; আর তিনি যখন যে প্রণালীতে সাধন করিতেন, সর্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুগণ তাঁহাকে যেমন যেমন করিতে বলিতেন, তিনি যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই তিনি একই প্রকার ফল লাভ করিতেন। এইভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই সেই একই বস্তু শিক্ষা দিতেছে—প্রভেদ প্রধানতঃ সাধনপ্রণালীতে, আরও অধিক প্রভেদ ভাষায়। মূলতঃ সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক।

তারপর তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একেবারে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান-বর্জিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ আত্মার কোন লিঙ্গ নাই; আত্মা পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন। লিঙ্গভেদ কেবল দেহেই বিদ্যমান, আর যিনি সেই আত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই ভেদবুদ্ধি থাকিলে চলিবে না। তিনি পুরুষদেহধারী,, অতএব এক্ষণে তিনি সর্ব বিষয়ে স্ত্রীভাব আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি নিজেকে নারী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ধারণ করিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন, পুরুষের কাজ সব ছাড়িয়া দিলেন, নিজ পরিবারস্থ নারীদের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন—এইরূপে অনেক বর্ষ ধরিয়া সাধন করিতে করিতে তাঁহার মন পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান একেবারে দূর হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামের বীজ পর্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আমরা পাশ্চাত্য দেশে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সাধারণতঃ এই পূজা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন—মা আনন্দময়ীর পূজা। সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। আমি নিজে দেখিয়াছি, সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করে না—এরূপ স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে তিনি করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পদতলে পতিত হইয়া অর্ধবাহ্যশূন্য অবস্থায় বলিতেছেন, 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি এই জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।' ভাবিয়া দেখ, সেই ব্যক্তির জীবন কিরূপ ধন্য, যাঁহার অন্তর হইতে সর্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক নারীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে। কেবল সেই আনন্দময়ী জগন্মাতার মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তোমরা কি বলিতে চাও, নারীর মধ্যে যে দেবত্ব রহিয়াছে, তাহাকে প্রতারণা করা যায়? তাহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় প্রবঞ্চনা ও কপটতা ধরিয়া ফেলে, উহা অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতাই সর্বতোভাবে আবশ্যক।

এই ব্যক্তি এইরূপ কঠোর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা লাভ করিলেন। আমাদের জীবনে যে-সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর তাহা রহিল না। তিনি অতি কষ্টে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ সঞ্চয় করিয়া মানবজাতিকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার ঈশ্বর নির্দিষ্ট কার্য আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রচারকার্য ও উপদেশদান আশ্চর্য ধরনের। আমাদের দেশে আচার্যের খুব সম্মান, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়। গুরুকে যেরূপ সম্মান দেওয়া হয়, পিতামাতাকেও আমরা সেরূপ সম্মান করি না। পিতামাতা হইতে আমরা দেহ পাইয়াছি, কিন্তু গুরু আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন; আমরা তাঁহার সন্তান, তাঁহার মানসপুত্র। কোন অসাধারণ আচার্যের অভ্যুদয় হইলে সকল হিন্দুই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসে, দলে দলে লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু লোকে এই আচার্যবরকে সম্মান করিল কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার কোন খেয়ালই ছিল না, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। তিনি জানিতেন—মা-ই সব করিতেছেন, তিনি কিছুই নহেন। তিনি সর্বদা বলিতেন, 'যদি আমার মুখ দিয়া কোন ভাল কথা বাহির হয়, তাহা আমার মায়ের কথা, আমার তাহাতে কোন গৌরব নাই।' তিনি তাঁহার নিজের প্রচারকার্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ ধারণা ত্যাগ করেন নাই।

আমরা দেখিয়াছি, সংস্কারক ও সমালোচকদের কার্যপ্রণালী কিরূপ। তাঁহারা কেবল অপরের দোষ দেখেন, সব ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিয়া নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করিয়া গড়িতে যান। আমরা সকলেই নিজ নিজ মনোমত এক-একটা কল্পনা লইয়া বসিয়া আছি। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহে, কারণ সকলেই আমাদের মত উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁহার কিন্তু সেই ভাব ছিল না, তিনি কাহাকেও ডাকিতে যাইতেন না। তাঁহার এই মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিলঃ যখন পদ্ম ফোটে, তখন ভ্রমর নিজে নিজেই মধু খুঁজিতে আসে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।—এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা। মদীয় আচার্যদেব আমাকে শত শত বার এই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি আমি প্রায়ই ভুলিয়া যাই। খুব কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া একটিমাত্র প্রকৃত মহৎ চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে। চিন্তার এইরূপ অদ্ভুত শক্তি! অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁহার দিবার কিছু আছে; কারণ শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল কথা বলা বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান বলিতে বুঝায় ভাব-সঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটি ফুল দিতে পারি, তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্মও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কবিত্বের ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতে এই ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান, আর পাশ্চাত্য দেশে যে 'প্রেরিতগণের গুরুশিষ্যপরম্পরা' (Apostolic succession) মত প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর—এইটিই তোমার প্রথম কর্তব্য। আগে সত্য কি—তাহা নিজে জান, পরে অনেকে তোমার নিকট শিখিবে, তাহারা তোমার নিকট আসিবে। আমার গুরুদেবের মনোভাব এইরূপই ছিল, তিনি কাহারও সমালোচনা করিতেন না।

বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্র আমি এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু কখনও শুনি নাই, তাঁহার জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন। মানুষ—হয় জ্ঞানপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ, না হয় কর্মপ্রবণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধর্মসমূহে এই বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন-না-কোনটির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তথাপি একই ব্যক্তিতে এই চারটি ভাবের বিকাশই সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ মানব ইহা করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি কাহারও দোষ দেখিতেন না, সকলের মধ্যেই ভাল দেখিতেন। আমার বেশ মনে আছে, একদিন এক ব্যক্তি ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন, এই সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত। তিনি কিন্তু তাহাদেরও নিন্দা করিতে প্রস্তুত নহেন—স্থিরভাবে কেবলমাত্র বলিলেন,

'কেউ বা সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকে, কেউ বা আবার পায়খানার দোর দিয়ে ঢুকতে পারে। এদের মধ্যেও ভাল লোক থাকতে পারে। আমাদের কাকেও নিন্দা করা উচিত নয়।' তাঁহার দৃষ্টি সংস্কারশূন্য ও নির্মল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভাব, তাহাদের ভিতরের কথাটা তিনি সহজেই ধরিতে পারিতেন। তিনি নিজ অন্তরের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখিতে এবং সরল গ্রাম্য ভাষায় তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেকটি কথায় একটা শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত। কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই; যে ব্যক্তি সেই কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সত্তা—তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া থাকে, তাই কথার জোর হয়। আমরা সকলে সময়ে সময়ে ইহা অনুভব করি। আমরা খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া থাকি, অনেক সুযুক্তিপূর্ণ প্রসঙ্গ শুনিয়া থাকি, তারপর বাড়ী গিয়া সব ভুলিয়া যাই। আবার অন্য সময় হয়তো অতি সরল ভাষায় দুই-চারটি কথা শুনিলাম—সেগুলি আমাদের প্রাণে এমন লাগিল যে, সারা জীবনের জন্য সেই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, স্থায়ী ফল প্রসব করিল। যে ব্যক্তি নিজের কথাগুলিতে নিজ সত্তা, নিজ জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় ফল হয়, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদান-প্রদান—আচার্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই ব্যক্তি ভারতের রাজধানী—[৩৫] আমাদের দেশে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখান হইতে প্রতি বৎসর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদী সৃষ্টি হইতেছিল, সেই কলিকাতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেক সন্দেহবাদী, অনেক নাস্তিক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন।

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের সন্ধান করিতাম, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্মপ্রচারক বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতা শেষে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, 'এই যে-সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?' তাঁহার উত্তরে বলিলেন, 'এ-সকল আমার মত ও বিশ্বাস।' অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিতাম, 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?' কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহারা ধর্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। এখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের একটি কথা আমার মনে পড়িতেছেঃ বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি, শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল পণ্ডিতদিগের ভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না।[৩৬]

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। অতি সরল ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি কি একজন বড় ধর্মাচার্য হইতে পারেন? আমি সারা জীবন অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'হাঁ।' 'মহাশয়, আপনি কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?' 'হাঁ।' 'কি প্রমাণ?' 'আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখি।' আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথমে আমি এমন একজনকে দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, 'আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম সত্য, উহা অনুভব করা যাইতে পারে-—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।' ইহা একটা তামাসার কথা নয়, বা মানুষের তৈরী কোন গল্প নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট যাইতে লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু

বলিতে পারি—ধর্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বারবার হইতে দেখিয়াছি।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষের বিষয় পাঠ করিয়াছিলামঃ তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। দেখিলাম, ইহা সত্য; আর যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। ধর্ম দান করা সম্ভব, আর মদীয় আচার্যদেব বলিতেন, 'জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া-নেওয়া যায়, ধর্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া-নেওয়া যাইতে পারে।' অতএব আগে ধার্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জন কর, তারপর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা বিতরণ কর। ধর্ম ব্যাক্যাড়ম্বর নহে, মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতির মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। ধর্ম কিরূপে সমিতিতে পরিণত হইবে? কোন ধর্ম কি কখনও সমিতি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ করিলে ধর্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয়, আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম লোপ পায়। এশিয়াই সকল ধর্মের প্রাচীন জন্মভূমি। এমন একটি ধর্মের নাম কর, যাহা সংগঠিত দলের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটির নাম তুমি করিতে পারিবে না। ইওরোপই এই উপায়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল, আর সেইজন্যই ইওরোপ এশিয়ার মত সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক ভাবে কখনই প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ নির্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় ধর্ম হয় না; কোন গ্রন্থে, বচনে, অনুষ্ঠানে বা সমিতিতেও ধর্ম পাওয়া যায় না; ধর্মের আসল কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলেই দেখিতেছি—যতক্ষণ না সত্যকে জানা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, যতই উপদেশ শুনি না কেন, কেবল একটি জিনিষেই আমাদের তৃপ্তি হইতে পারে—সেটি আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি; আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্মকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর সাধ্য ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—দুই-ই কখনও একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। 'তোমরা ঈশ্বর ও ধনদেবতার সেবা একসঙ্গে করিতে পার না।' ৩৭

আমার গুরুদেবের নিকট আমি আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়—একটি অদ্ভুত সত্য শিক্ষা করিয়াছি; ইহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদের সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয়, তাহা নহে, ব্যক্তি হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম তীব্র কর্ম রূপে প্রকাশিত, কাহারও ভিতর গভীর ভক্তি-রূপে, কাহারও ভিতর যোগ-রূপে, কাহারও ভিতর বা জ্ঞান-রূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে—এ কথা বলা ভুল। এইটি করিতে হইবে, এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবেঃ সত্য একও বটে, বহুও বটে। বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া সকলের প্রতি আমরা অনন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে; এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে 'বহুত্বে একত্ব' বুঝায়, ব্যাবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ থাকা সত্ত্বেও যেমন সেই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত অপরিণামী নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—ক্ষুদ্রাকারে সমষ্টির পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটি আজকাল বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমার বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে ধর্মসম্প্রদায়ের অন্ত নাই, আর দুর্ভাগ্যবশতই হউক বা সৌভাগ্যবশতই হউক, যে-কোন ব্যক্তি ধর্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সে-ই একজন প্রতিনিধি সে-দেশে পাঠাইতে চায়; এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সহিত আমি পরিচিত। এমন কি, 'মর্মনেরা' (Mormons) পর্যন্ত ভারতে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে; সেই ৩৮ তো ধর্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সেখানেই ধর্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না, কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্মপ্রচার কর—উহা যতই কিম্ভূতকিমাকার ধরনের হউক

না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে; আর জীবৎকালেই সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজিত হইবার তোমার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ ভারতে আমরা এই একটি বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার কতকগুলি আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি সকলেই বলিবে, তাহারা এক ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পর্বতে উৎপন্ন হইয়া, ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।' ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্যতঃ স্বীকার করিতে ৩৯ হইবে; তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলেন, 'অপর ধর্মে কিছু সত্য আছে; হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে'—সেভাবে নহে। আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—'অন্যান্য ধর্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু আমাদের ধর্মে উহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে!' একজন বলিতেছেন, 'আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন', আবার অপর একজন তাহার ধর্ম সর্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে ও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই মানুষকে মুক্ত করিবার সমান শক্তি আছে। মন্দিরে বা চার্চে ধর্মসকলের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সারা দেন। অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মারও রক্ষা এবং উদ্ধারের জন্য তুমি, আমি বা অপর কোন মানুষ দায়ী নয়, সেই এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে নিজদিগকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র জনসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষক। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার তবে তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার তবে মানুষ যেখানে আছে, সেখান হইতে তাহাকে একটু উপরে তুলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু মানুষের যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন; কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন প্রকার উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে, তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি তিনি কাহারও সমালোচনা পর্যন্ত করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টি জগতে কোন কিছুকে মন্দ বলিয়া দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মন কোনরূপ কুচিন্তা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগূঢ় উপায়। বেদ বলেনঃ 'ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।' যীশু বলিয়াছেন, 'তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।'

সব বড় বড় আচার্য ও মহাপুরুষগণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিক লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না কেন, সকল ধর্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে; আর ত্যাগের ভাব যত কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়পরতা ততই ধর্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে, এবং ধর্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই মহাপুরুষ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ ছিলেন। আমাদের দেশে যাঁহারা সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদিগকে সমুদয় ধন-ঐশ্বর্য মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয়; আর আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতে না, তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্যন্ত এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিদ্রিতাবস্থাতেও তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহই যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল, যাহাদের নিকট হইতে তিনি কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এইসব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চন-জয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি; এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্র ছিল না, আর বর্তমান শতাব্দীর জন্য এইরূপ মানুষের অতিশয় প্রয়োজন। বর্তমানকালে লোকে

যাহাকে নিজেদের ‘প্রয়োজনীয় দ্রব্য’ বলে, তাহা ব্যতীত তাহারা এক-মাসও বাঁচিতে পারিবে না মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্তরূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে; এ সময়ে এরূপ ত্যাগের প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এমন একজন লোকের প্রয়োজন, যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন মানুষ আছেন, যিনি সংসারের সমুদয় ধন রত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহেন। বাস্তবিক এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তিনি তাহাদের সহিত কথা কহিতেন। এরূপ ঘটনা যে দু-এক দিন ঘটিয়াছিল তাহা নহে, মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এই কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গেল। মানবজাতির প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল। যাহারা তাঁহার কৃপালাভের জন্য আসিত, এইরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে তাঁহার গলায় ঘা হইল, তথাপি অনেক বুঝাইয়াও তাঁহার কথা বলা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্বদা থাকিতাম; যাহাতে তাঁহার কষ্ট না হয়, এজন্য লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত, ‘এইসব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?’ তিনি হাসিয়া একমাত্র উত্তর দিতেন, ‘কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহ পরের সেবায় যায়, তবে তো ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।’ একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, ‘মহাশয়, আপনি তো একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।’ প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিল, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, ‘তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিতাম, কিন্তু দেখিতেছি—তুমি অপরাপর সংসারী লোকেদের মতই কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?’

এইরূপে তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, তাঁহার দেহাবসান সন্নিকট, তাই পূর্বেপেক্ষা আরও অধিক লোক দলে দলে আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্মাচার্যগণের নিকট লোক আসিয়া কিরূপে চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশাতেই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্যই অপেক্ষা করে। এইরূপ ধর্মানুরাগ হইতেই মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধে ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, তাহা যত চমৎকারই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না; কিন্তু ধর্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বাক্য দ্বারা হইবে না, নিজে ধর্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট—কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে।

যখন লোক শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল। আমাদের গুরুদেব নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর-দূরান্তর হইতে আসিত, আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তি পাইতেন না। তিনি বলিতেন, ‘যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ উপদেশ দিব।’ আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র ‘ওঁ’ উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আমরা তাঁহার দেহে অগ্নিসংযোগ করিলাম।

তাঁহার ভাব ও উপদেশাবলী প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি তখন অতি অল্পই ছিল। গৃহী ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার কতকগুলি যুবক শিষ্য ছিল, তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহারা তাহাদের সম্মুখে যে মহান্ জীবনাদর্শ দেখিয়াছিল, তাহার শক্তিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বছরের পর বছর এই দিব্য জীবনের সংস্পর্শে আসাতে প্রবল উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে লাগিল, আর যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্বংশজাত, তথাপি তাহারা যে শহরে জন্মিয়াছিল, তাহারই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা দৃঢ়তর হইয়া রহিল, আর দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার করিতে লাগিল—অবশেষে সমগ্র দেশ তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নিরক্ষর বালক কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মশক্তিবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে তাহা দান করিয়া গেলেন—আর সে সত্যকে জীবন্ত রাখিবার জন্য কেবল কয়েকজন যুবককে রাখিয়া গেলেন।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হইয়াছে; যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।

এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল—এই যুগে এইরূপ ত্যাগ আবশ্যক। আধুনিক নরনারীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র অনাঘ্রাত পুষ্পের মত কেহ থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যাহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাহাদের বয়স বেশী হয় নাই, তাহারা সংসার ত্যাগ কর। ধর্মলাভের ইহাই রহস্য—ত্যাগ

কর। প্রত্যেক নারীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। ভয় কি? যেখানেই থাক না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি। এইরূপ ত্যাগের প্রয়োজন। তোমরা কি দেখিতেছ না, পাশ্চাত্যদেশে জড়বাদের কি প্রবল স্রোত বহিতেছে? কতদিন আর চোখে কাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি দেখিতেছ না, কি ভীষণভাবে কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া লইতেছে? কেবল বাক্যের দ্বারা অথবা সংস্কার-আন্দোলনের দ্বারা নয়—ত্যাগের দ্বারাই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মভাব লইয়া অটল অচল সুমেরুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিলে তবেই তোমরা এই সকল অধর্মের ভাব রোধ করিতে পারিবে। বাক্যব্যয় করিও না, তোমার দেহের প্রত্যেকটি লোমকূপ হইতে পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক। যাহারা দিবারাত্র কাঞ্চনের জন্য এই চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ শক্তি গিয়া আঘাত করুক; তাহারা কাঞ্চনের জন্য এই তীব্র আগ্রহের মধ্যে কাঞ্চনত্যাগী তোমাকে দেখিবামাত্র আশ্চর্য হউক। আর কামও ত্যাগ কর। কাম-কাঞ্চনত্যাগী হও, নিজেকে যেন বলিস্বরূপ প্রদান কর—তুমি ছাড়া আর কে ইহা সাধন করিবে? যাহারা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ, সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে—তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ও নবীনতম, সেই বলবান্ সুন্দর যুবাপুরুষেরাই ইহার অধিকারী, তাহাদিগকেই ভগবানের বেদীতে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে; আর এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া সমগ্র মানবজাতির সেবক হও—সমগ্র মানবজাতির নিকট ধর্মপ্রচার কর। ইহাকেই তো ত্যাগ বলে, শুধু বাক্যদ্বারা ইহা হয় না। উঠিয়া দাঁড়াও, এবং কাজে লাগিয়া যাও। তোমাদিগকে দেখিবামাত্র সংসারী লোকের মনে—কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। কথায় কখনও কোন কাজ হয় না—কতই তো প্রচার হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। প্রতিমুহূর্তেই অর্থ পিপাসায় রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ উহাদের পশ্চাতে কেবল ফাঁকি— ঐ-সকল গ্রন্থের ভিতরে কোন শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমায় বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহাকেই তোমার ধর্মভাব স্পর্শ করিবে।

বর্তমান জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এইঃ মতামত, সম্প্রদায়, গীর্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার ভিতর জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি আসিয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর। কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত—সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, 'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। যাহারা নিজেরা ধর্মলাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চার করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে—তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।

তাহা হইলে তোমরা এরূপ হও! কোন দেশে—এরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, সেই দেশ ততই উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নাই, সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এইঃ 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' আর তিনি সকল দেশের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে!' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমাদের মুখে কেবল 'ভাইকে ভালবাসি' না বলিয়া, তোমাদের কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও। যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান আসিয়াছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।'

ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে। জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখিতে পাইবে; বুঝিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রতঙ্গ মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মত

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে স্থূল অর্থেই অবতার বলে মনে করতেন, যদিও এর ঠিক কি অর্থ, তা আমি বুঝতে পারতাম না। আমি বলতাম, বৈদান্তিক অর্থে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। দেহত্যাগের ঠিক কয়েক দিন আগে তাঁর খুবই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল; আমি যখন মনে মনে ভাবছি—দেখি, এই কষ্টের মধ্যেও তিনি নিজেকে অবতার বলতে পারেন কিনা—তখনই তিনি আমাকে বললেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ দেহে রামকৃষ্ণ; তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন—এজন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা করত। যে-কোন লোককেই দেখামাত্র তিনি তার চরিত্র বুঝে নিতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর সে মতের আর পরিবর্তন হত না। আমরা কোন মানুষকে বিচার করি যুক্তি দিয়ে, সেজন্য আমাদের বিচারে থাকে ভুল ত্রুটি; তাঁর ছিল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। কোন কোন ব্যক্তিকে তাঁর অন্তরঙ্গ বা 'ভেতরের লোক' বলতেন—তাদের তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে গোপন তত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের রহস্য শেখাতেন। বাইরের লোক বা বহিরঙ্গদের কাছে বলতেন নানা উপদেশমূলক গল্প; এগুলিই লোক 'শ্রীরামকৃষ্ণের কথা' বলে জানে। ঐ অন্তরঙ্গ তরুণদের তিনি তাঁর কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতেন, অনেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাতে তিনি কান দিতেন না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের মধ্যে শেষোক্তদের কাজকর্ম দেখে প্রথমোক্তদের তুলনায় তাদের প্রতিই আমার অনেক বেশী ভাল ধারণা হয়েছিল। তবে অন্তরঙ্গদের প্রতি আমার ছিল অন্ধ অনুরাগ। লোকে বলে—আমাকে ভালবাসলে আমার কুকুরটিকেও ভালবেসো। আমি ঐ ব্রাহ্মণ-পূজারীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সুতরাং তিনি যা ভালবাসেন, যাঁকে তিনি মান্য করেন—আমিও তাই ভালবাসি, তাঁকে আমি মান্য করি। আমার সম্বন্ধে তাঁর ভয় ছিল, পাছে আমাকে স্বাধীনতা দিলে আমিও আবার এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বসি।

তিনি কোন একজনকে বললেন, 'এ জীবনে তোমার ধর্ম লাভ হবে না।' সকলের ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি যেন দেখতে পেতেন। বাইরে থেকে যে মনে হত—তিনি কারও কারও উপরে পক্ষপাতিত্ব করছেন, এই ছিল তার কারণ। চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-সম্পন্ন তিনিও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন রকম সাধনা নির্দেশ করতেন। তাঁর ঘরে অন্তরঙ্গদের ছাড়া আর কাউকেই শুতে দেওয়া হত না। যারা তাঁর দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না, আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ কথা সত্য নয়।

উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম জনসাধারণের নিকট তিনি 'নারদীয় ভক্তি' প্রচার করতেন।

সাধারণতঃ তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমাকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ জাতির আদর্শ

কোন জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে তার উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ হবে 'পরব্রহ্ম'। কিন্তু তোমরা সকলেই কোন বিমূর্ত আদর্শের (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবে না বলেই তোমাদের একটি ব্যক্তির আদর্শ অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রীরাকৃষ্ণের মধ্যে তোমরা সেই আদর্শ পেয়েছ। অন্য কোন ব্যক্তি এ যুগে আমাদের আদর্শ হতে পারেন না, তার কারণ তাঁদের কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। বেদান্তের ভাব যাতে এ যুগে প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য এমন মানুষের আজ আমাদের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরাকৃষ্ণের মধ্যে এই অভাব পূর্ণ হয়েছে। আজ প্রত্যেকের সামনেই এই আদর্শ তুলে ধর। সাধু বা অবতার, যেভাবেই তাঁকে গ্রহণ কর না কেন—তাতে কিছু আসে যায় না।

তিনি একবার বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের মধ্যে আবার আসবেন। আমার মনে হয়, তারপর তিনি বিদেহ-মুক্তির অবস্থায় ফিরে যাবেন। কাজ করতে হলে প্রত্যেকেরই একজন ইষ্টদেবতা থাকা প্রয়োজন—খ্রীষ্টানেরা যাকে বলে 'গার্ডিয়ান এঞ্জেল'—এ ঠিক তাই। আমি মাঝে মাঝে যেন কল্পনা করি, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ইষ্টদেবতা আছেন। আর তাঁদের প্রত্যেকেই যেন আধিপত্য লাভের জন্য চেষ্টা করছেন। এ ধরনের ইষ্টদেবতার—কোন জাতির কল্যাণ করার ক্ষমতা থাকে না।

গীতা—১

[১৯০০ খ্রীঃ ২৬ মে সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি]

গীতা বুঝিতে হইলে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি বোঝা প্রয়োজন। গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ্ ভারতের একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ—খ্রীষ্টান জগতে নিউ টেষ্টামেণ্টের মত ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক, কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ্ কোন ঋষি বা আচার্যের জীবন-কাহিনী নয়, ইহার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। উপনিষদের সূত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভায় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'উপনিষদ্' শব্দের একটি অর্থ—(আচার্যের নিকট) উপবেশন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাদিগকে কেন সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক বিবরণ বলা হয়। দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। পূর্বাপর সম্বন্ধ বা পটভূমি নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্তত দুই হাজার বৎসর আগেকার—ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ পর্যন্ত। সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। এত বিরাট যে, যদি ইহার শ্লোকগুলি একত্র করা হয়, তবে এই বক্তৃতা-গৃহটিতে স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। ইহা ছাড়া কিছু নষ্টও হইয়া গিয়াছে। বেদ বহু শাখায় বিভক্ত; এক একটি ঋষি-সম্প্রদায় ছিলেন এক একটি শাখার ধারক ও বাহক। ঋষিগণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাখাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চারণের কিছুমাত্র ভুল না করিয়া বেদের অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতে পারেন। বেদের বৃহত্তর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার হইতে পারে। বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। বৈদিক রচনাবলীর পারম্পর্য-নির্ণয়ের জন্য আধুনিক গবেষকদের একটি ঝোঁক দেখা যায়—কিন্তু এ বিষয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থীদের ধারণা অন্যরূপ, যেমন বাইবেল সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা আধুনিক গবেষকদের মত হইতে ভিন্ন। বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ একটি দার্শনিক অংশ—উপনিষদ্, অন্যটি কর্মকাণ্ড।

কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এখন একটি মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক। অনুষ্ঠান-বিধি ও স্তবস্তুতি লইয়াই কর্মকাণ্ড; বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন স্তব। কর্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিধিসমূহ পাওয়া যায়—উহাদের কতকগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বহু হোতা ও পুরোহিতের আবশ্যক। যাগযজ্ঞের বিশদ অনুষ্ঠানের জন্য হোতা, ঋত্বিক প্রভৃতির কার্য একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ক্রমশঃ এইসব স্তব ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠে। দেবতাগণ তখন অন্তর্হিত হন এবং যাগযজ্ঞই তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা এক অদ্ভুত ক্রমপরিণতি। গোঁড়া হিন্দু (মীমাংসক) দেবতায় বিশ্বাসী নন, যাঁহারা গোঁড়া নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাসী। নিষ্ঠাবান হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বেদে উল্লিখিত দেবতাগণের তাৎপর্য কি, তাহা হইলে তিনি ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না। পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুদিগকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, শব্দের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়, এই পর্যন্ত। প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই উহার মধ্যে আছে। অতএব বেদ হইল শব্দরাশি, যাহার উচ্চারণ নির্ভুল হইলে আশ্চর্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একটি শব্দও ভুল উচ্চারণ হইলে চলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ বিধিমত উচ্চারণ হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে অন্যান্য ধর্মে যাহাকে প্রার্থনা বলা হয়, তাহা অন্তর্হিত হইল এবং বেদই দেবতারূপে পরিণত হইল। কাজেই দেখা যাইতেছে, এ মতে বেদে শব্দরাশির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এগুলি হইল শাশ্বত শব্দরাশি, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিন্তারই অভিব্যক্তি এবং চিন্তা ব্যক্ত হয় কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যে। যে শব্দরাশি দ্বারা অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হয়, তাহাই বেদ। অতএব বলা যায়, প্রত্যেকটি বস্তুর বাহিরের যে অস্তিত্ব, তাহা নির্ভর করে বেদের উপর, কারণ শব্দ ছাড়া চিন্তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যদি 'অশ্ব' শব্দটি না থাকিত, তবে কেহই অশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিত না। অতএব চিন্তা শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলি কি? এগুলি বেদ। হিন্দুরা এই ভাষাকে মোটেই সংস্কৃত বলেন না; ইহা বৈদিক বা দেবভাষা। সংস্কৃত তাহার একটি বিকৃত রূপ; অন্যান্য ভাষাগুলিও তাহাই। বৈদিক ভাষা হইতে প্রাচীনতর আর কোন ভাষা নাই। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—বেদসমূহের রচয়িতা কে? এগুলি কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই। শব্দরাশিই বেদ। একটি শব্দই বেদ, যদি আমি ঠিকভাবে তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে।

এই বেদরাশি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান এবং এই শব্দরাশি হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত। কল্পান্তে এই সব শক্তির প্রকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রথমে কেবল শব্দে এবং পরে চিন্তায় লীন হইয়া যায়। পরবর্তী কল্পে চিন্তা প্রথমে শব্দরাশিতে ব্যক্ত হয় এবং পরে শব্দগুলি হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য যাহা বেদে নাই, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহু গ্রন্থ আছে। যদি আপনারা বলেন, বেদ মানুষের দ্বারা রচিত, তাহা হইলে এই সব গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকট আপনারা হাস্যাপদ হইবেন। মানুষের দ্বারা বেদ প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল—এ কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক, প্রবাদ আছে, তিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদপাঠও

করিয়াছিলেন। যদি খ্রীষ্টান বলে, 'আমার ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং সে জন্যই উহা সত্য, আর তোমার ধর্ম মিথ্যা।' মীমাংসক উত্তর দিবেন, 'তোমার ধর্মের একটা ইতিহাস আছে এবং তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, কোন মানুষ উনিশ শত বৎসর পূর্বে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে।' যাহা সত্য, তাহা অসীম ও সনাতন। ইহাই সত্যের একমাত্র লক্ষণ। সত্যের কখনও বিনাশ নাই—ইহা সর্বত্র একরূপ। তুমি স্বীকার করিতেছ, তোমার ধর্ম কোন-না-কোন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ কিন্তু সেরূপ নয়; কোন অবতার বা মহাপুরুষ দ্বারা উহা সৃষ্ট নয়। বেদ অনন্ত শব্দরাশি—স্বভাবতঃ যে শব্দগুলি শাশ্বত ও সনাতন, সেগুলি হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সেইগুলিতেই ইহার লয় হইতেছে। তত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ... সৃষ্টির আদিতে শব্দের তরঙ্গ। জীবনসৃষ্টির আদিতে জীবাণুর মত শব্দতরঙ্গেরও আদি-তরঙ্গ আছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তা সম্ভব নয়।

যেখানে কোন বোধ চেতনা বা অনুভূতি আছে, সেখানে শব্দ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যখন বলা হয়, চারখানি গ্রন্থই কেবল বেদ, তখন ভুল বলা হয়। তখন বৌদ্ধরা বলিবেন, 'আমাদের শাস্ত্রগুলিই বেদ, সেগুলি পরবর্তীকালে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।' তাহা সম্ভব নহে, প্রকৃতি এইভাবে কার্য করে না। প্রকৃতির নিয়মগুলি একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের খানিকটা আজ ও খানিকটা কাল প্রকাশিত হইবে, এরূপ হয় না। প্রত্যেকটি নিয়ম পরিপূর্ণ। নিয়মের ক্রমবিবর্তন মোটেই নাই। যাহা হইবার তাহা একেবারেই প্রকাশিত হইবে। 'নূতন ধর্ম', 'মহত্তর প্রেরণা' প্রভৃতি শব্দ নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃতির শতসহস্র নিয়ম থাকিতে পারে, মানুষ আজ পর্যন্ত তাহার অতি অল্পই হয়তো জানিয়াছে। তত্ত্বগুলি আছে, আমরা সেগুলি আবিষ্কার করি—এই মাত্র। প্রাচীন পুরোহিতকুল এই শব্দরাশির উচ্চারণ-বিধি অধিগত করিয়া দেবতাদের স্থানচ্যুত করিয়াছেন এবং তাহাদের স্থলে নিজদিগকে বসাইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেনঃ শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা তোমরা জান না! ঐগুলি কিভাবে ব্যবহার করা যায়, আমরা জানি! এই পৃথিবীতে আমরাই জীবন্ত দেবতা। আমাদের অর্থ দাও। অর্থের বিনিময়ে আমরা বেদের শব্দরাশিকে এমন কাজে লাগাইব, যাহাতে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমরা কি নিজেরা বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ করিতে পার? পার না; সাবধান, যদি একটিও ভুল কর, তবে ফল বিপরীত হইবে। তোমরা কি ধনবান্, ধীমান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে চাও এবং মনোনীত পতি বা পত্নী লাভ করিতে চাও? তাহা হইলে পুরোহিতদের অর্থ দাও এবং চুপ করিয়া থাক।

আর একটি দিক্ আছে। বেদের প্রথম অংশের আদর্শ অপর অংশ উপনিষদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথম অংশের যে আদর্শ, তাহার সহিত এক বেদান্ত ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের আদর্শের মিল আছে। ইহলোক ও পরলোকে ভোগই ইহার মূল কথা—স্বামী-স্ত্রী পুত্র কন্যা। অর্থ দাও, পুরোহিতরা তোমাকে ছাড়পত্র দিবেন—পরকালে স্বর্গে তুমি সুখে থাকিবে। সেখানেও তুমি সব আত্মীয়-স্বজনকে পাইবে এবং অনন্তকাল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবে। অশ্রু নাই, দুঃখ নাই—শুধু হাসি আর আনন্দ। পেটের বেদনা নাই—যত পার খাও। মাথা-ব্যথা নাই, যত পার ভোজসভায় যোগদান কর। পুরোহিতদের মতে ইহাই মানব-জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য।

এই জীবন-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত আর একটি বিষয়ের সহিত আধুনিক ভাবধারার অনেকখানি মিল আছে। মানুষ প্রকৃতির দাস এবং চিরকালই সে এইরূপ থাকিবে। আমরা ইহাকে 'কর্ম' বলি। কর্ম একটি নিয়ম; ইহা সর্বত্র প্রযোজ্য। পুরোহিতদের মতে সকলেই কর্মের অধীন। তবে কি কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই? তাঁহারা বলেন, 'না। অনন্তকাল প্রকৃতির কৃতদাসরূপে থাকিতে হইবে—তবে সে দাসত্ব সুখের! যদি আমাদের উপযুক্ত দক্ষিণা দাও, তবে শব্দগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিব, যাহাতে তোমরা পরকালে কেবল ভালটুকু পাইবে, মন্দটুকু নয়।'—মীমাংসকেরা এরূপ বলেন। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ আদর্শই সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া আছে। জনসাধারণ কখনও চিন্তা করে না। যদি কেহ কখনও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের উপর কুসংস্কারের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই দুর্বলতার জন্য বাইরের একটু আঘাত তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া টুকরো টুকরো হইয়া যায়। প্রলোভন ও শাস্তির ভয় দ্বারা তাহারা চলিতে পারে না। সাধারণ লোককে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে; চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া তাহারা থাকিবে। পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়া এবং তাহাদের মানিয়া চলা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নাই—বাকী যাহা করণীয়, তাহা যেন পুরোহিতরাই করিয়া দিবেন। ধর্ম এইভাবে কতখানি সহজ হইয়া যায়! কারণ আপনাদের কিছুই করিবার নাই—বাড়ী গিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকুন। নিজেদের মুক্তিসাধনার সবই অপরে করিয়া দিবে। হায়, হতভাগ্য মানুষ!

পাশাপাশি আর একটি দার্শনিক চিন্তাধারাও ছিল। উপনিষদ্ কর্মকাণ্ডের সকল সিদ্ধান্তের একেবারে বিপরীত। প্রথমতঃ উপনিষদ্ বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন—তিনি ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্বের নিয়ামক। কালে তিনি কল্যাণময় ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হন। এই ধারণা পূর্বের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরোহিতরাও এ কথা বলেন, তবে এখানে ঈশ্বরের যে ধারণা, তাহা অতি সূক্ষ্ম। বহু দেবতার স্থলে এখানে এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ উপনিষদও স্বীকার করেন, কর্মের নিয়মে সকলে আবদ্ধ; কিন্তু নিয়মের হাত হইতে মুক্তিপথের সন্ধানও তাঁহারা দিয়াছেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য নিয়মের পারে যাওয়া। ভোগ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ কেবল প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ উপনিষদ্ যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং উহাকে নিতান্ত হাস্যকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। যাগযজ্ঞের দ্বারা সকল ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহা মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না; কারণ মানুষ যতই পায় ততই চাই। ফলে মানব হাসি কান্নার অন্তহীন গোলকধাঁধায় চিরকাল ঘুরিতে থাকে—কখনও লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না, অনন্ত সুখ কোথাও কখনও সম্ভব নহে, ইহা বালকের কল্পনা মাত্র। একই শক্তি সুখ ও দুঃখরূপে পরিণত হয়।

আজ আমার মনুষত্ব খানিকটা পরিবর্তন করিয়াছি। একটি অত্যন্ত অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। অনেক সময় আমাদের মনে অনেক ভাব জাগে, যেগুলি আমরা চাই না; আমরা অন্য বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে চাই। সেই ভাবটা কি? দেখিতে পাই পনর মিনিটের মধ্যেই তাহা আবার মনে উদিত হয়। সেই ভাবটি এত প্রবল ও ভীষণভাবে আসিয়া মনে আঘাত

করে যে, নিজেকে পাগল বলিয়াই মনে হয় এবং যখন এই ভাব প্রশমিত হয়, তখন দেখা যায় যে, পূর্বের ভাবটিকে শুধু চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। মনে কী প্রকাশিত হইয়াছিল?—আমার নিজেরই যে খারাপ সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হইবার অপেক্ষায় ভিতরে সঞ্চিত ছিল, সেগুলিই। 'প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিতে পারে?' গীতায় এইরূপ ভীষণ কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই ১ আমাদের সমস্ত সংগ্রাম—সমস্ত চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। মনের মধ্যে সহস্র প্রেরণা একই সময়ে প্রতিযোগিতা করিতেছে; তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যখনই বাধা অপসারিত হয়, তখনই সমস্ত চিন্তাগুলি প্রকট হইয়া উঠে।

কিন্তু আশা আছে। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে মনঃশক্তিকে একই সঙ্গে বহু অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করিতেছি। মন ক্রমশঃ বিকশিত হয়—যোগীগণ এই কথাই বলেন। মনের একটি আবেগ আর একটি আবেগকে জাগ্রত করে, তখন প্রথমটি নষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি ক্রুদ্ধ হইবার পর মুহূর্তে সুখী হইতে পার, তবে পূর্বের ক্রোধ চলিয়া যাইবে। ক্রোধের মধ্য হইতে তোমার পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। মনের এই অবস্থাগুলি সর্বদাই পরিবর্তন-সাপেক্ষ। চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ শিশুর স্বপ্নমাত্র। উপনিষদ্ বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখ নয়, সুখও নয়; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা। একেবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে।

মতপার্থক্যের অন্য বিষয়টি এইঃ উপনিষদ্ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির—বিশেষতঃ পশুবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির নিন্দা করেন। উপনিষদ্ বলেন, এই সব নিতান্তই নিরর্থক। প্রাচীন দার্শনিকদের এক সম্প্রদায় (মীমাংসকেরা) বলেন, কোন বিশেষ ফল পাইতে হইলে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন পশুকে বলি দিতে হইবে। উত্তরে বলা যায়, 'পশুটির প্রাণ লইবার জন্য তো পাপ হইতে পারে এবং তার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' ঐ দার্শনিকরা বলেন, এসব বাজে কথা! কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য—তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার মন বলিতেছে? তোমার মন কি বলে না বলে, তাহাতে অপরের কি আসে যায়? তোমার এ সকল কথার কোন অর্থ নাই—কারণ তুমি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতেছ। যদি তোমার মন এক কথা বলে এবং বেদ অন্য কথা বলেন, তবে তোমার মন সংযত করিয়া বেদের নির্দেশ শিরোধার্য কর। যদি বেদ বলেন, নরহত্যা ঠিক, তবে তাহাই ঠিক। যদি তুমি বল, 'না, আমার বিবেক অন্যরূপ বলে'—এ কথা বলা চলিবে না।

যে মুহূর্তে কোন গ্রন্থকে বিশেষ পবিত্র ও চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন আর উহাকে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। আমি বুঝিতে পারি না, এদেশের লোকেরা বাইবেলে পরম বিশ্বাসী হইয়াও কি করিয়া বলে—'উপদেশগুলি কত সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর!' কারণ বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী—এই বিশ্বাস যদি পাকা হয়, তবে তাহার ভালমন্দ বিচারের অধিকার—আপনাদের মোটেই নাই। যখন বিচার করিতে বসেন, তখন আপনারা ভাবেন—আপনারা বাইবেল অপেক্ষা বড়। সেক্ষেত্রে বাইবেলের প্রয়োজন কি? পুরোহিতেরা বলেন, 'বাইবেল বা অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিতে আমরা নারাজ। তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, কোন্‌টি প্রামাণিক? এই শেষ কথা। যদি কোন কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে বেদের অনুশাসন অনুযায়ী তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া লও।'

উপনিষদ্ ইহা বিশ্বাস করেন, তবে সেখানে একটি উচ্চতর মানও আছে। একদিকে যেমন বেদের কর্মকাণ্ড তাহারা অস্বীকার করে না, তেমনি আবার অন্যদিকে তাহাদের দৃঢ় মত এই যে, পশুবলি এবং অপরের অর্থের প্রতি পুরোহিতকুলের লোভ অত্যন্ত অসঙ্গত। মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া উভয়ের ভিতরে অনেক মিল আছে বটে, তবে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক মতানৈক্য বিদ্যমান। আত্মার কি দেহ ও মন আছে? মন কি কতকগুলি ক্রিয়াশীল ও সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর সমষ্টি? সকলেই মানিয়া লয়, মনোবিজ্ঞান একটি নিখুঁত বিজ্ঞান; এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

পুরোহিতকুল এবং উপনিষদের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য আছে। উপনিষদ্ বলেন—ত্যাগ কর। ত্যাগই সব কিছুর কষ্টিপাথর। সব কিছু ত্যাগ কর। সৃষ্টি প্রক্রিয়া হইতেই সংসারের যাহা কিছু বন্ধন। মন সুস্থ হয় তখনই, যখন সে শান্ত। যে-মুহূর্তে মনকে শান্ত করিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই সত্যকে জানিতে পারিবে। মন যে এত চঞ্চল, তাহার কারণ কি? কল্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই ইহার কারণ। সৃষ্টি বন্ধ কর, সত্য জানিতে পারিবে। সৃষ্টির সমস্ত শক্তি বন্ধ হইলেই সত্য জানা যায়।

অন্যদিকে পুরোহিতকুল সৃষ্টির পক্ষপাতী। এমন জীবের কল্পনা কর, যাহার মধ্যে সৃষ্টির কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। এরকম অবস্থা চিন্তা করা যায় না। স্থায়ী সমাজ-বিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল। এইজন্য (বিবাহে) কঠোর নির্বাচন-প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্ধ ও খঞ্জের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা কম। মৃগীরোগী এবং পাগলের সংখ্যাও সেখানে কম। ইহার কারণ—

প্রত্যক্ষ যৌন-নির্বাচন। পুরোহিতদের বিধান হইল—বিকলাঙ্গেরা সন্ন্যাসী হউক। অপরদিকে উপনিষদ্ বলেনঃ না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে তাজা ও সুন্দর ফুলই পূজার বেদীতে অর্পণ করা কর্তব্য। আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী ও সুস্থতম ব্যক্তিরাই সত্যলাভের চেষ্টা করিবে।

এই সব মত-পার্থক্য সত্ত্বেও পুরোহিতরা নিজেদের একটি পৃথক্ জাতি-গোষ্ঠীতে (ব্রাহ্মণ) পরিণত করিয়াছে, এ কথা আমি আপনাদের আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় হইল রাজপুরুষের জাতি (ক্ষত্রিয়)। উপনিষদের দর্শন রাজাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত, পুরোহিতদের মস্তিষ্ক হইতে নয়। প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। ব্যষ্টির জীবনের উপর অন্য কিছুর প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের ভিতর যখনই কোন অভ্যুত্থান আসিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, আর্থিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষ কখনও সাড়া দেয় নাই। আপনি যে ধর্মমত প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার পশ্চাতে অর্থনৈতিক পটভূমি থাকে এবং কিছু সংখ্যক উৎসাহী সমর্থক ইহার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আপনি একটি গোটা দেশকে আপনার ধর্মমতে আনিতে পারিবেন।

যখনই কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন (বুঝিতে হইবে) অবশ্যই তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তাহার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে। ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? মস্তিষ্কের অগ্রগতির জন্য এখনও কয়েক যুগ লাগিবে। ৬০ বৎসর হইলে মানুষ সংসার হইতে বিদায় লয়। সমগ্র জীবন একটা ভ্রান্তি। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার মত বয়স হইতে না হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন পাকস্থলী সবল ছিল, ততদিন সব ঠিক ছিল। যখন বালসুলভ স্বপ্ন বিলীন হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিবার সময় আসিল, তখন মস্তিষ্কের গতি শুরু হয়; এবং যখন মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিল, তখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাই উপনিষদের ধর্মকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অর্থগত লাভ সেখানে খুব অল্প, কিন্তু পরার্থপরতা সেখানে প্রচুর।

উপনিষদের ধর্ম যদিও প্রভূত রাজশক্তির অধিকারী রাজন্যবর্গের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবু ইহার রাজ্য বিস্তৃতি ছিল না। তাই সংগ্রাম প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বছর পরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সময় ইহা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়। বৌদ্ধধর্মের বীজ ছিল এই রাজা ও পুরোহিতের সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় ধর্মের অবনতি হয়। একদল এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে চাহিল, অন্যদল বৈদিক দেবতা, যজ্ঞ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শৃঙ্খল মোচন করিল। এক মুহূর্তে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সমান হইয়া গেল। ধর্মের মহান্ তত্ত্বগুলি ভারতে এখনও বর্তমান, কিন্তু সেগুলি প্রচার করার কাজ এখনও বাকী আছে, অন্যথা সেই তত্ত্বগুলি দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

দুইটি কারণে প্রত্যেক দেশেই পুরোহিতগণ গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হয়। একটি কারণ—তাহাদের জীবিকা, অন্যটি—তাহাদিগকে জনসাধারণের সঙ্গে চলিতে হয়। তাহা ছাড়া পুরোহিতদের মন সবল নয়। যদি জনসাধারণ বলে, 'দুই হাজার দেবতার কথা প্রচার কর', পুরোহিতরা তাহাই করিবে। যে জনমণ্ডলী তাহাদের টাকা দেয়, পুরোহিতরা তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, ভগবান্ তো টাকা দেন না; কাজেই পুরোহিতদের দোষ দেওয়ার পূর্বে নিজেদেরই দোষ দিন। আপনারা যেরূপ শাসন, ধর্ম ও পুরোহিতকুল পাইবার উপযুক্ত, সেইরূপই পাইবেন। ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু পাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সংঘর্ষ ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার একটি চূড়ান্ত অবস্থা দেখা গেল গীতাতে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি বিদ্যমান দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল—তখন এই বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি গীতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্মমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন। আপনারা যীশুখ্রীষ্টকে যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা করেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভারতবর্ষের লোক শ্রদ্ধা ও পূজা করেন। শুধু যুগের ব্যবধান মাত্র। আপনাদের দেশে ক্রীস্‌মাসের মত হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি (জন্মাষ্টমী) পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে; সেগুলির কিছু কিছু যীশুখ্রীষ্টের জীবনীর সহিত মিলিয়া যায়। কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। পিতা শিশুকে লইয়া পলায়ন করেন এবং গোপগোপীদের নিকট তাঁহার পালনের ভার অর্পণ করেন। সেই বৎসরে যত শিশু জন্মিয়াছিল, সকলকেই হত্যা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং জীবনের শেষভাগে তাঁহাকে অপরের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল—ইহাই নিয়তি।

শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আমরা তত আগ্রহ নাই। অতিরঞ্জন-দোষ হিন্দুদেরও আছে। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি বাইবেলের একটি গল্প বলে, হিন্দুরা বিশটি গল্প বলিবে। আপনারা যদি বলেন, তিমিমাছ জোনা-কে গলাধঃকরণ করিয়াছিল—হিন্দুরা বলিবেন, তাহাদের কেহ না কেহ একটি হাতীকে গিলিয়াছিল। ... বাল্যকাল হইতে আমি শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমি ধরিয়া লইতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ একজন ছিলেন এবং গীতা তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গল্প বা উপকথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। উপকথাগুলি অলঙ্কারের কাজ করে। স্বভাবতই সেগুলি যতটা সম্ভব সুশোভন করা হয় এবং আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক—ত্যাগই কেন্দ্রগত ভাব; হাজার হাজার উপকথা রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিতে ঐ ত্যাগের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লিঙ্কনের মহান্ জীবনের এক-একটি ঘটনা লইয়া বহু গল্প রচিত হইয়াছে। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই, কোন

অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। ‘কর্মের জন্যই কর্ম কর। পূজার জন্য পূজা কর। পরোপকার কর—কারণ, পরোপকার মহৎ কাজ; এর বেশী কিছু চাহিও না।’ ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। অন্যথা এই উপকথাগুলিকে সেই অনাসক্তির আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। গীতা তাঁহার একমাত্র উপদেশ নয়।

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার—সব দিক্ দিয়াই তিনি ছিলেন মহান্। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান্ ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা করুন—আপনারা তাঁহাকে জানুন বা না জানুন—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। কোন প্রকার জটিলতা, কোন প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। জগতের প্রত্যেক বস্তুর একটি নিজস্ব স্থান আছে, এবং তিনি তাহার যোগ্য মর্যাদা দিতে জানিতেন। যাহারা কেবল তর্ক করে এবং বেদের মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাহারা সত্যকে জানিতে পারে না; তাহারা ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতারও স্থান বেদে আছে। প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ স্থান নির্ণয় করাই প্রকৃত রহস্য।

তারপর হৃদয়বত্তা! বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তি এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ! বুদ্ধদেবের কর্মক্ষমতা একটি বিশেষ স্তরে পরিচালিত হইত—উহা আচার্যের স্তর। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা আচার্যের কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন! যিনি প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র ২
এই মহাপুরুষ ভ্রূক্ষেপ করেন না।
সংগ্রামের মধ্যেও তিনি ধীর
স্থিরভাবে জীবন ও মৃত্যুর
সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন।
প্রত্যেক অবতারই তাঁহার
উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ। নিউ
টেষ্টামেণ্টের উপদেশের তাৎপর্য
জানিবার জন্য আপনারা কাহারও না
কাহারও নিকট যাইয়া থাকেন।
তাহার পরিবর্তে নিজেরা উহা বার
বার পড়ুন এবং খ্রীষ্টের অপূর্ব
জীবনালোকে উহা বুঝিতে চেষ্টা
করুন।

মনীষীরা চিন্তা করেন এবং আমরাও চিন্তা করি। কিন্তু তাহার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের মন যাহা চিন্তা করে, শরীর তাহা অনুসরণ করে না। আমাদের কার্য ও চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। যে শক্তির বলে ‘শব্দ’ বেদ হয়, আমাদের কথায় সে শক্তি নাই। কিন্তু ঋষি বা মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহা অবশ্যই কর্মে পরিণত হয়। যদি তাঁহারা বলেন, ‘আমি ইহা করিব’ তবে তাঁহাদের শরীর সেই কাজ করিবেই। পরিপূর্ণ আজ্ঞাবহতা—ইহাই লক্ষ্য। আপনি এক মুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আপনি ঈশ্বর হইতে পারেন না—বিপদ এখানেই। মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহাই হন—আমাদের চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক সময় প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক যুগের কথা আলোচনা করিলাম। পরবর্তী বক্তৃতায় ‘গীতা’ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব।

গীতা—২

[১৯০০ খ্রীঃ ২৮ মে সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি]

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণ। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আধিপত্য লাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা—কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পাণ্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এতদিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতেও রাজী হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুরা—এক পক্ষে কৌরব-ভ্রাতৃগণ, অপর পক্ষে পাণ্ডবেরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে—এ-কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্রত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুতঃ এইখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

‘হে ভারত (অর্জুন), উঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।’—এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার [৩]
সূচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেনঃ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা প্রতিরোধ না করা কত ভাল, ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান্। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না।

অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্য আর মায়ার দ্বন্দ্ব। আমরা যতই পক্ষিসুলভ মমতার নিকটবর্তী হই, ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই। ইহাকে আমরা ‘ভালবাসা’ বলি। আসলে ইহা আত্ম-সম্মোহন। জীবজন্তুর মত আমরাও আবেগের অধীন। বৎসের জন্য গাভী প্রাণ দিতে পারে—প্রত্যেকটি জীবই পারে। তাহাতে কি? অন্ধ পক্ষিসুলভ ভাবাবেগ পূর্ণত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্তচৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই, সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

অর্জুন এখন আবেগের অধীন। অর্জুনের হওয়া উচিত আরও অধিক আত্ম-সংযমী, বিচারের চিরন্তন আলোকোদ্ভাসিত পথচারী একজন জ্ঞানী ঋষি, তিনি এখন তাহা নহেন। হৃদয়ের তাড়নায় মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া, নিজেকে ভ্রান্ত করিয়া, ‘মমতা’ প্রভৃতি সুন্দর আখ্যায় নিজের দুর্বলতাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি শিশুর মত হইয়াছেন, পশুর মত হইয়াছেন। কৃষ্ণ তাহা দেখিতেছেন। অর্জুন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মত কথা বলিতেছেন, বহু যুক্তির অবতারণা করিতেছেন; কিন্তু তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অজ্ঞের কথা।

‘জ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত বা মৃত কাহারও জন্যই শোক প্রকাশ করেন না।’ ‘তোমার মৃত্যু হইতে পারে না, আমারও না। এমন সময় কখনও ছিল না, যখন আমরা ছিলাম[৪]
না। এমন সময় কখনও আসিবে না, যখন আমরা থাকিব না। ইহজীবনে মানুষ যেমন শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যৌবন ও বার্ধক্য

অতিক্রম করে, তেমনি মৃত্যুতে সে দেহান্তর গ্রহণ করে মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাতে মুহ্যমান হইবে কেন?' এই যে আবেগপ্রবণতা তোমায় পাইয়া বসিয়াছে, ইহার মূল কোথায়? ইন্দ্রিয়গ্রামে। 'শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুখ—এ-সকলের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়স্পর্শ হইতেই অনুভূত হয়। তাহারা আসে এবং যায়।' এইক্ষণে মানুষ দুঃখী, আবার পরক্ষণেই সুখী। এরূপ অবস্থায় সে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। ৫

'যাহা চিরকাল আছে (সৎ), তাহা নাই—এরূপ হইতে পারে না; আবার যাহা কখনও নাই (অসৎ), তাহা আছে—এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা আদি-অন্তহীন ও অবিনাশী বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা অপরিবর্তনীয় আত্মাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন, তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর।' ৬

ইহা জানিয়া মোহ ত্যাগ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎপদ হইও না —ইহাই আদর্শ। ফল যাহাই হোক, কর্ম করিয়া যাও। নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মৃত্যু তো শুধু দেহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র! যুদ্ধ করিতে হইবে। ভীরুতা ও কাপুরুষতা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। পশ্চাদপসরণের দ্বারা কোন বিপদ দূর করা যায় না। দেবতাদের নিকট তোমরা অহরহ আকুল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে কি তোমাদের দুঃখ দূর হইয়াছে? ভারতের জনসাধারণ কোটি ছয়েক দেবতার কাছে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও কুকুর-বিড়ালের মত দলে দলে মরিতেছে। দেবতারা কোথায়? তাঁহারা তখনই আগাইয়া আসেন, যখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পার। দেবতাদের কি প্রয়োজন? ৭

কুসংস্কারের কাছে এই নতিস্বীকার করা, নিজের মনের কাছে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া তোমার শোভা পায় না। হে পার্থ! তুমি অনন্ত, অবিনশ্বর; তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। অনন্তশক্তিশালী আত্মা তুমি; ক্রীতদাসের মত ব্যবহার তোমায় শোভা পায় না। উঠ, জাগো, দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। যদি মৃত্যু হয় হউক। সাহায্য করিবার কেহ নাই। তুমিই তো জগৎ। কে তোমায় সাহায্য করিতে পারে? 'জীবগণের অস্তিত্ব শরীর উৎপত্তির পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে অব্যক্ত থাকে। শুধু মাঝখানের স্থিতিকালটুকু ব্যক্ত। কাজেই তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।' ৮

'কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে

দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, আবার অনেকে শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না।'

কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনকে বধ করা যে পাপ—এ-কথা বলার তোমার অধিকার নাই; কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম। ... 'সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।' ৯

এখানে গীতার অন্য একটি বিশেষ মতবাদের সূচনা করা হইতেছে—অনাসক্তির উপদেশ। অর্থাৎ আমরা কার্যে আসক্ত হই বলিয়া আমাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ... 'কেবল যোগযুক্ত হইয়া কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।' সমস্ত বিপদ তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে। 'এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিয়া মানব জন্মমরণরূপ সংসারের ভীষণ আবর্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।' ১০

'হে অর্জুন, কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি সফলকাম হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের মন সহস্র বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ায় শক্তির অপচয় ঘটে। অবিবেকীরা বেদোক্ত কর্মে অনুরক্ত; স্বর্গাদি ফলের জনক বেদের কর্মকাণ্ডের বাহিরে কিছু আছে, এ-কথা তাঁহারা বিশ্বাস করে না। কারণ তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে ভোগসুখ ও স্বর্গলাভ করিতে চান এবং সেজন্য যজ্ঞাদি করেন।' 'এই সকল লোক যতক্ষণ না বৈষয়িক ভোগ-সুখের প্রত্যাশা ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য আসিতে পারে না।' ১১

ইহাও গীতার আর একটি মহান্ উপদেশ। বিষয়ের ভোগসুখ যতক্ষণ না পরিত্যক্ত হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। মানুষ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকেও একজোড়া চক্ষু ও নাসিকার কামনা করে। অনেকের কল্পনা—এ-জগতে যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, স্বর্গে গিয়া তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক ইন্দ্রিয় পাওয়া যাইবে। অনন্তকাল ধরিয়া ১২

সিংহাসনে অসীম ভগবানকে—ভগবানের পার্থিব দেহকে তাঁহারা দেখিতে চান। এই সকল লোকের বাসনা—শরীরের জন্য, শরীরের ভোগসুখের জন্য, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য। স্বর্গ তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের বিস্তারমাত্র। মানুষ ইহজীবনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করিতে পারে না। এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের জীবনের সব-কিছু। 'মুক্তিপ্রদ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই শ্রেণীর মানবের নিকট একান্ত দুর্লভ।' ১৩

'বেদ সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়।' বেদ কেবল প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে যাহা দেখা যায় না, লোকে তাহা ভাবিতে পারে না। স্বর্গ লইয়া কথা বলিতে গেলে, তাহাদের মনে জাগে —সিংহাসনে একজন রাজা বসিয়া আছেন, আর লোক তাঁহার নিকট ধূপ জ্বালাইতেছে। সবই প্রকৃতি; প্রকৃতির বাহিরে কিছুই নাই। কাজেই বেদ প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না। 'এই প্রকৃতির পারে যাও; অস্তিত্বের এই দ্বৈত-ভাবের পারে যাও; তোমার ব্যক্তিগত চেতনার পারে যাও; কোন কিছুকে গ্রাহ্য করিও না, মঙ্গল বা অমঙ্গলের দিকে তাকাইও না।' ১৪

আমরা নিজদিগকে দেহের সহিত অভিন্নভাবে দেখিতেছি। আমরা দেহমাত্র, অথবা দেহটি আমাদের, আমার দেহে চিমটি কাটিলে আমি চীৎকার করি। এ-সকলই অর্থশূন্য, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। দেহকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্যই এই দুঃখ-শোক কল্পনা, প্রাণী দেবতা দানব, এই বিশ্বজগৎ—প্রত্যেকটি জিনিষ আসিয়া পড়িয়াছে। আমি চৈতন্যস্বরূপ। তুমি চিমটি কাটিলে আমি কেন লাফাইয়া উঠিব? ... এই দাসত্ব লক্ষ্য কর। লজ্জা হয় না তোমার? আমরা নাকি ধার্মিক! আমরা নাকি দার্শনিক! আমরা নাকি ঋষি! ভগবান্ মঙ্গল করুন—আমরা কী? জীবন্ত নরক বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। পাগল বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। ১৫

আমরা আমাদের শরীরের 'ধারণা' ছাড়িতে পারি না। আমরা পৃথিবীতেই বদ্ধ আছি। এই সংস্কারগুলিই আমাদের বন্ধন। এই-জাতীয় সহস্র সংস্কারের বন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় আমরা শরীর ছাড়িয়া যাই।

একেবারে আসক্তিশূন্য হইয়া কে কাজ করিতে পারে? ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন। ঐরূপ (আসক্তিশূন্য) ব্যক্তির নিকট কর্মের সফলতা ও বিফলতা সমান কথা। যদি সারা জীবনের কর্ম একমুহূর্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে বারেকের জন্যও বৃথা স্পন্দন জাগে না। 'ফলের কথা চিন্তা না করিয়া যিনি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া যান, তিনিই যোগী। এইভাবে তিনি

জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেন—এইভাবে তিনি মুক্ত হন।' তখন তিনি দেখিতে পান যে, সকল প্রকার আসক্তিই মিথ্যা মায়া। আত্মা কখনও আসক্ত হইতে ১৬
পারেন না। ... তারপর তিনি সকল শাস্ত্র ও দর্শনের পারে গমন করেন।

গ্রন্থ ও শাস্ত্রের দ্বারা যদি মন বিভ্রান্ত হয়—এক মহা আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইসব শাস্ত্রের সার্থকতা কি? কোন শাস্ত্র এই প্রকার বলে, অন্যটি আর এক প্রকার বলে। কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিবে? একাকী দণ্ডায়মান হও। নিজের আত্মার মহিমা দেখ! তোমার কর্ম করিতে হইবে, তবেই তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে?' 'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি এই জীবনও নয়, স্বাধীনতা নয়, দেবতা নয়, কর্ম নয়, কোন কিছুই নয়; যখন তিনি পরিতৃপ্ত, তখন আর অধিক কিছু চাহিবার তাঁহার নাই।' তিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ ১৭
করিয়াছেন এবং নিজের মধ্যে সংসার দেবতা স্বর্গ—সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন দেবতারা আর দেবতা থাকেন না, মৃত্যু আর মৃত্যু থাকে না, জীবন আর জীবন থাকে না। প্রত্যেকটি জিনিষই পরিবর্তিত হইয়া যায়। 'যদি কাহারও ইচ্ছা দৃঢ় হয়, তাঁহার মন যদি দুঃখে বিচলিত না হয়, যদি তিনি কোন প্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা না করেন, যদি তিনি সকল প্রকার আসক্তি, সকল প্রকার ভয়, সকল প্রকার ক্রোধ হইতে মুক্ত হন, তবে তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞা বলা হয়।' ১৮

'কচ্ছপ যেমন করিয়া তাহার পাগুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লয়, তাহাকে আঘাত করিলে একটি পা-ও বাহিরে আসে না, ঠিক তেমনি যোগী তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে পারেন।' কোন কিছুই ঐ (ইন্দ্রিয়)-গুলিকে জোর করিয়া বাহিরে আনিতে পারে না। কোন প্রলোভন বা কোনকিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারে না। সারা বিশ্ব তাঁহার চতুর্দিকে চূর্ণ হইয়া যাক, উহা তাঁহার মনে একটি তরঙ্গও সৃষ্টি ১৯
করিবে না।

অতঃপর একটি অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অনেক সময় লোকে বহুদিন ধরিয়া উপবাস করে, কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি কুড়ি দিন উপবাস করিলে বেশ শান্ত হইয়া উঠে। এই উপবাস আর আত্মপীড়ন—সারা পৃথিবীর লোক করিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণের ধারণায় এইসব অর্থশূন্য।

তিনি বলেনঃ যে মানুষ নিজের উপর
উৎপীড়ন করে, তাহার নিকট হইতে
ইন্দ্রিয়গুলি কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশগুণ অধিক শক্তি লইয়া পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন তুমি কি করিবে? ভাবখানা এই যে, স্বাভাবিক হইতে হইবে। কৃচ্ছ্রসাধন নহে। অগ্রসর হও, কর্ম কর, কেবল দৃষ্টি রাখিও যেন আসক্ত হইয়া না পড়। যে ব্যক্তি অনাসক্তির কৌশল জানে না বা তাহার সাধনা করে না, তাহার প্রজ্ঞা কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আমি বাহিরে গিয়া চোখ মেলিলাম, যদি কিছু থাকে, আমি অবশ্যই দেখিতে পাইব, না দেখিয়া পারি না। মন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এখন ইন্দ্রিয়গুলিকে যে-কোন প্রকার প্রকৃতি-জাত প্রতিক্রিয়া বর্জন করিতে হইবে।

'যাহা সংসারের নিকট অন্ধকার রাত্রি, সংযমী পুরুষ তাহাতে জাগরিত থাকেন। ইহা তাঁহার নিকট দিবালোক। আর যে বিষয়ে সারা সংসার জাগ্রত, তাহাতে সংযমী নিদ্রিত।' এই সংসার কোথায় জাগ্রত?—ইন্দ্রিয়ে। মানুষ চায় ভোজন, পান আর সন্তান; তারপর কুকুরের মত মরে। ... [২০]
কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই তাহারা
সর্বদা জাগ্রত। তাহাদের ধর্মও
ঐজন্যই। তাহারা আরও কামিনী,
আরও কাঞ্চন, আরও সন্তান লাভের
জন্য একটি ভগবান্ আবিষ্কার
করিয়াছে। অধিকতর দেবত্বলাভে
সাহায্য করিবার জন্য ভগবানকে চায়
নাই।

'যেখানে সারা জগৎ জাগ্রত,
সেখানে যোগী নিদ্রিত, যেখানে
অজ্ঞেরা নিদ্রিত, যোগী সেখানে
জাগ্রত'; সেই আলোকের রাজ্যে—
যেখানে মানুষ নিজেকে পাখীর মত, পশুর মত শরীর মাত্র বলিয়া দেখে না—দেখে অনন্ত মৃত্যুহীন অমর আত্মারূপে। এখানে অজ্ঞেরা সুপ্ত; তাহাদের বুঝিবার সময় নাই, বুদ্ধি নাই, সাধ্য নাই। সেখানে কেবল যোগীই জাগ্রত থাকেন, তাহাই তাঁহার নিকট দিবালোক।

'পৃথিবীর নদীগুলি অবিরত তাহাদের জলরাশি সমুদ্রে ঢালিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি অবিচলিত, অপরিবর্তিতই থাকে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে প্রকৃতির সকল সংবেদন আনিলেও জ্ঞানীর হৃদয় কোনপ্রকার বিক্ষেপ বা ভয়ের কথা ভাবিতে পারে না।' লক্ষ লক্ষ স্রোতে [২১]
দুঃখ আসুক, শত শত স্রোতে সুখ
আসুক! আমি দুঃখের অধীন নই—
আমি সুখের ক্রীতদাসও নই।

গীতা—৩

[১৯০০ খ্রীঃ ২৯ মে সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি]

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনি আমাকে কর্মের উপদেশ দিতেছেন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবনের উচ্চতম অবস্থা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, যদি জ্ঞানকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে কর্মের উপদেশ দিতেছেন কেন? ২২

শ্রীকৃষ্ণঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে দুইটি সাধনপথ প্রচলিত আছে। জ্ঞানানুরাগী দার্শনিকগণ জ্ঞানযোগের এবং নিষ্কামকর্মিগণ কর্মযোগের কথা বলেন। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না। এ-জীবনে কর্ম বন্ধ করিয়া থাকা মুহূর্তমাত্র সম্ভব নয়। প্রকৃতির গুণগুলিই মানুষকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম বন্ধ করিয়া মনে মনে কর্মের কথা চিন্তা করে, সে কিছুই লাভ করিতে পারে না। সে মিথ্যাচারী হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মনের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি কর্ম কর। ২৩

'যদি তুমি এ রহস্য বুঝিয়া থাক যে, তোমার কোন কর্তব্য নাই—তুমি মুক্ত, তথাপি অপরের কল্যাণের জন্য তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করে।'

পরা শান্তির অধিকারী মুক্ত মহাপুরুষ যদি কর্মত্যাগ করেন, তবে যাহারা সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে নাই, তাহারা মহাপুরুষকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে। ২৪

'হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি মুহূর্তের জন্য কর্ম না করি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেরূপ কর্ম করে, জ্ঞানিগণকে অনাসক্তভাবে এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।' ২৫

আপনি যদি জ্ঞানের অধিকারী হন, তবু অজ্ঞান ব্যক্তিদের বালসুলভ বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদের স্তরে নামিয়া আসিয়া

তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করুন। ইহা একটি অতিশয় শক্তিশালী ভাব, এবং ভারতে ইহাই আদর্শ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মন্দিরে যান, প্রতিমাপূজাও করেন —ইহা কপটতা নয়। ২৬

গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যাঁহার ভক্তিপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ আমারই পূজা করেন। এই ভাবে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবানেরই পূজা করিতেছে। ভগবানকে ভুল নামে ডাকিলে কি তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তিনি ভগবান্ নহেন। এ কথা কি বুঝিতে পার না, মানুষের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহাই ভগবান্?—যদিও ভক্ত শিলাখণ্ড ২৭ পূজা করিতেছে, তাহাতে কি আসে যায়?

ধর্ম কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি— এই ধারণা হইতে যদি আমরা একবার মুক্ত হইতে পারি, তবেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। ধর্মের একটি ধারণাঃ আদি মানব আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সৃষ্টি—আর পালাইবার পথ নাই। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন—অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে বিশ্বাস করুন! কিন্তু ভারতে ধর্মের ধারণা অন্যরূপ। সেখানে ধর্ম মানে অনুভূতি, উপলব্ধি; অন্য কিছু নয়। চার ঘোড়ার জুড়িগাড়ীতে, বৈদ্যুতিক শকটে অথবা পদব্রজে—কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্য এক। খ্রীষ্টানদের পক্ষে সমস্যা—কিভাবে এই ভীষণ ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। ভারতীয়দের সমস্যা—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং নিজেদের হারান আত্মভাবকে ফিরিয়া পাওয়া।

আপনি কি উপলব্ধি করিয়াছেন—আপনি আত্মা? যদি বলেন—‘হাঁ’, তবে ‘আত্মা’ বলিতে আপনি কি বোঝেন? আত্মা কি এই দেহ-নামক মাংসপিণ্ড, অথবা অনাদি অনন্ত চিরশান্ত জ্যোতির্ময় অমৃতত্ব? আপনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি নিজেকে এই দেহ মনে করিতেছেন, ততক্ষণ আপনি আপনার পায়ের নীচের ঐ ক্ষুদ্র কীটের সমান। এ অপরাধের মার্জনা নাই, আপনার অবস্থা আরও শোচনীয়; কারণ আপনি দর্শনশাস্ত্র সবই জানেন, অথচ দেহবোধ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিতেছেন না। শরীরই আপনার ভগবান্—ইহাই আপনার পরিচয়! ইহা কি ধর্ম?

আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম। আমরা কি করিতেছি? ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মাকে জড়বস্তুরূপে অনুভব করিতেছি! অমৃতস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আমরা মৃত্যু ও জড়বস্তু নির্মাণ করি, এবং প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে চেতন আত্মা ‘সৃষ্টি’ করি!

ঊর্ধ্ববাহু ও হেঁটমুণ্ড হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা অথবা ত্রিমুণ্ডধারী পাঁচ হাজার দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তবে সানন্দে ঐগুলিকে গ্রহণ করুন। যেভাবেই হউক, আত্মজ্ঞান লাভ করুন। এ বিষয়ে কোন সমালোচনার অধিকার কাহারও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যদি তোমার সাধন-পদ্ধতি উচ্চতর ও উন্নততর হয় এবং অপরের পদ্ধতি খুব খারাপ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি তাহার নিন্দা করিবার কোন অধিকার তোমার নাই।

ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি নয়, পরন্তু ধর্মকে ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈশ্বরদর্শন হইয়াছিল; মুশাও (Moses) দাবাগ্নির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। মুশা ঈশ্বরদর্শন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনাদের পরিত্রাণ হইয়াছে? অপরের ঈশ্বরদর্শনের কথা আপনাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়া ঈশ্বরদর্শন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারে, এতদ্ব্যতীত আর এতটুকু সাহায্য করিতে পারে না। পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্তগুলির

ইহাই মূল্য, আর বেশী কিছু নয়। সাধনার পথে এইগুলি নির্দেশক-স্তম্ভ মাত্র। একজন আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা দূর হয় না, তেমনি একজনের ঈশ্বরদর্শনে অপরের মুক্তি হয় না। নিজেকেই ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। তাঁহার একটি শরীরে তিনটি মাথা অথবা ছয়টি দেহে পাঁচটি মাথা—ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অর্থহীন কলহেই এই-সকল লোক প্রবৃত্ত হয়। আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? না। ... এবং লোকে বিশ্বাস করে না যে, তাহারা কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে। মর্ত্যের মানুষ আমরা কি নির্বোধ! নিশ্চয়ই, পাগলও বটে!

ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে—যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই আপনারও ঈশ্বর, আমারও ঈশ্বর। সূর্য কাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আপনারা বলেন, শ্যাম খুড়ো সকলেরই খুড়ো। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে নিশ্চয় আপনি তাঁহাকে দেখিতে পারেন, নতুবা সেরূপ ঈশ্বরের চিন্তাই করিবেন না।

প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভাল! কিন্তু মনে রাখিবেন—ইহা আপনার পক্ষেই ভাল হইতে পারে। একই খাদ্য যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভাল, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়—সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সবসময় জন বা মেরীর গায়ে না-ও লাগিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, যাহারা চিন্তা করে না—এরূপ নরনারীকে জোর করিয়া এই রকম একটা ধরাবাঁধা ধর্মবিশ্বাসের ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন; বরং নাস্তিক বা জড়বাদী হওয়াও ভাল, তবু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করুন! এ ব্যক্তির পদ্ধতি ভুল—এ-কথা বলিবার অধিকার আপনার আছে? আপনার নিকট ইহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিন্দা করিবার অধিকার আপনার নাই। অর্থাৎ এই মত অবলম্বন করিলে আপনার অবনতি হইবে; কিন্তু এ-কথা বলা যায় না যে, ঐ ব্যক্তিও অবনত হইবে; তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশঃ যদি তুমি জ্ঞানী হও, তবে একজনের দুর্বলতা দেখিয়া তাহাকে মন্দ বলিও না।

যদি পার তাহার স্তরে নামিয়া তাহাকে সাহায্য কর। ক্রমে ক্রমে তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি হয়তো তাহার মগজে পাঁচ ঝুড়ি তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহার কী ভাল হইবে? পূর্বাপেক্ষা হয়তো তাহার অবস্থা খারাপই হইবে।

কর্মের এই বন্ধন কোথা হইতে আসে? আমরা আত্মাকে কর্মদ্বারা শৃঙ্খলিত করি। আমাদের ভারতীয় মতে সত্তার দুইটি দিক্—একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে আত্মা। প্রকৃতি বলিতে শুধু বহির্জগতের বস্তুসমূহ বোঝায় না; আমাদের শরীর মন বুদ্ধি—এমন কি 'অহঙ্কার' পর্যন্ত এই প্রকৃতির অন্তর্গত। অনন্ত জ্যোতির্ময় শাশ্বত আত্মা এই সকলের ঊর্ধ্বে। এই মতে আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকিবেন। ... কোন সময়েই আত্মাকে মনবুদ্ধির সহিতও অভিন্নরূপে গণ্য করা যায় না ...(দেহের সঙ্গে তো দূরের কথা)।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের ভুক্ত খাদ্যই চিরকাল মন সৃষ্টি করিতেছে; মন জড়পদার্থ। আত্মার সহিত খাদ্যের কোন সম্পর্ক নাই। খাওয়া বা না খাওয়া, চিন্তা করা বা না করা ... তাহাতে আত্মার কিছু আসে যায় না। আত্মা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতি চিরকাল সমভাবে থাকে। আলোর সম্মুখে নীল বা সবুজ—যে কাঁচ দিয়াই দেখ না কেন, তাহাতে আলোর কিছু আসে যায় না; মূল আলোর রঙ অপরিবর্তনীয়। মনই বিভিন্ন পরিবর্তন আনে—নানা রঙ দেখায়। আত্মা যখন এই দেহ ত্যাগ করে, তখন এ-সবই টুকরা টুকরা হইয়া যায়।

প্রকৃতিরও প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। সৎস্বরূপ আত্মাই জীবাত্মারূপে (আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া) চলা ফেরা করে, কথা বলে এবং সব কিছু কর্ম করে। জীবাত্মার শক্তি, মন-বুদ্ধি ও প্রাণই জড়ের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হইতেছে। যদিও চেতন আত্মা আমাদের চিন্তা, শারীরিক কর্ম ও সব-কিছুর কারণ, যদিও আত্মার জ্যোতি সর্বত্র প্রতিফলিত, তথাপি ভালমন্দ সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ প্রভৃতি প্রকৃতিগত যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাব আত্মাকে স্পর্শ করে না।

'হে অর্জুন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাদের শরীর মনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার নিয়মানুসারে কাজ করিয়া চলিতেছে। আমরা প্রকৃতির সহিত নিজদিগকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছি—আমি এই সকল কর্মের কর্তা। এইভাবে আমরা ভ্রান্তির কবলে পড়ি।' ২৮

কোন না কোন কিছুর বাধ্য হইয়াই আমরা কর্ম করি। ক্ষুধা বাধ্য করে, তাই আমি খাই। দুঃখভোগ হীনতার দাসত্ব। প্রকৃত 'আমি' (আত্মা) চিরদিন মুক্ত। কে তাহাকে কর্মে বাধ্য করিতে পারে? কারণ সুখ-দুঃখের ভোক্তা তো প্রকৃতির অন্তর্গত। যখন আমরা দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া ভাবি, তখনই বলি, 'আমি অমুক, আমি এই দুঃখভোগ করিতেছি। এইরূপ যত বাজে কথা।' কিন্তু যিনি সত্যকে জানিয়াছেন, তিনি নিজেকে সব কিছু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন। তাঁহার শরীর কি করে বা মন কি ভাবে, তাহা তিনি গ্রাহ্য

করেন না। কিন্তু মানব-সমাজের এক বিরাট অংশই ভ্রান্তির বশীভূত; যখনই তাহারা কোন ভাল কাজ করে, তখন নিজেদের ইহার কর্তা বলিয়া মনে করে। তাহারা এখনও উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস বিচলিত করিও না। মন্দ ছাড়িয়া তাহারা ভাল কাজ করিতেছে; খুব ভাল, তাই করুক! ... তাহারা কল্যাণকর্মী। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা আরও গৌরব আছে। তাহারা সাক্ষিমাত্র—কাজ স্বতই হইয়া যায়, ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে। যখন অসৎকর্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া কেবল সৎকর্ম করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিবে যে, তাহারা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। তাহারা কর্তা নয়, তাহারা কর্ম হইতে পৃথক্, তাহারা সাক্ষিমাত্র। তাহারা শুধু দাঁড়াইয়া দেখে। প্রকৃতি হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতেছে। তাহারা এ-সকল হইতে উপরত। 'হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন আর কিছুই ছিল না। সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং জগতের সৃষ্টি হইল।' 'জ্ঞানীও প্রকৃতির দ্বারা ২৯
চালিত হইয়া কার্য করে। প্রত্যেকেই প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য করে। কেহ প্রকৃতিতে অতিক্রম করিতে পারে না।' অণুও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে অণুকেও নিয়ম মানিতেই হইবে। 'বাহিরের সংযমে কি হইবে?'

জীবনে কোন কিছুর মূল্য কিসের দ্বারা নির্ণীত হয়? ভোগসুখ বা ধনসম্পদের দ্বারা নয়। সব জিনিষ বিশ্লেষণ করুন। দেখিবেন আমাদের৩০
শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুরই মূল্য নাই। অনেক সময় ভোগসুখ অপেক্ষা দুঃখকষ্টই আমাদের আরও ভাল অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক সময় সুখাস্বাদ অপেক্ষা আঘাতগুলিই আমাদের জীবনে মহত্তর শিক্ষা দিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষেরও একটা মূল্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মতে আমরা একেবারে সদ্যোজাত নূতন জীব নই। আমাদের সত্তা পূর্বেও ছিল। আমাদের মনবুদ্ধিও একেবারে নূতন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেকটি শিশু কেবল অতীত মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, তাহার পূর্ববর্তী উদ্ভিদ্-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিও সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার সংস্কারে অতীত অধ্যায়গুলি সব আছে—বর্তমান অধ্যায় আছে, আর আছে সম্মুখে ভবিষ্যতের অনেকগুলি অধ্যায়। প্রত্যেকের জীবনপথ পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত, মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। এই অন্ধকার সত্ত্বেও কোন ঘটনা বা অবস্থার উদ্ভব কারণ ব্যতীত হইতে পারে না। অজ্ঞানই ইহার কারণ। কার্যকারণের অন্তহীন শৃঙ্খলে একটির পর একটি শিকলি বাঁধা রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্য ও কারণের বিশ্বব্যাপী এই শৃঙ্খলের একটি শিকলি আপনি ধরিয়াছেন, আমি আর একটি। ঐ শৃঙ্খলের সেই অংশটুকু আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ নিজের প্রকৃতিগত পথে চলিতে চলিতে মরাও ভাল। অপরের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিও না। এই আমার নিজের পথ এবং ৩১
তাহাতেই আমি চলিতেছি। আপনি উপরের পথে চলিতেছেন। নিজের পথ ছাড়িয়া আমি ঐ পথে যাইতে সর্বদা প্রলুব্ধ হইতেছি এবং ভাবিতেছি আপনার সহযাত্রী হইব। যদি আমি ওখানে যাই, তবে আমি 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইব। এই সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। এ-সবই ক্রমোন্নতির কথা। উন্নতির পথ ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করুন, সব পাইবেন। নতুবা পরের পন্থা অবলম্বন করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে বিপদ দেখা দিবে। ধর্ম শিক্ষা

দিবার এইটি মৌলিক রহস্য।

মানুষের পরিত্রাণ বলিতে আপনারা কি বোঝেন? সকলকে একই ধর্মমতে বিশ্বাস করিতে হইবে? কখনই তাহা নয়। অবশ্য এমন কতকগুলি উপদেশ বা আদর্শ আছে, যেগুলি সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। যথার্থ আচার্য আপনার প্রকৃতি এবং কোন্ পথ আপনার পক্ষে শ্রেয়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। আপনি হয়তো নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; আপনারা নিজদিগকে যে সাধনপথের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা ভুলও হইতে পারে। এ বিষয়ে এখনও আপনার চেতনা বিকশিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত আচার্যকে উহা জানিতে হইবে। আপনাকে একবার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিবেন, আপনি কোন্ পথের অধিকারী, এবং তিনিই আপনাকে সেই পথ ধরাইয়া দিবেন। অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া এধারে ওধারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও আমরা এতটুকু অগ্রসর হইতে পারি না। তারপর যথাসময়ে সদগুরুর জীবন-প্রবাহে পড়িয়া আমরা দ্রুত অগ্রসর হই। ঈশ্বর-কৃপায় নিদর্শন এই যে, অনুকূল স্রোত পাইবার শুভ মুহূর্তে আমরা ভাসিয়া থাকি। তারপর আর সংগ্রাম নাই। সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা বরং ঐ পথে (চলিতে চলিতেই) মরিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ কি হয়? আমরা একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কতকগুলি ধরাবাঁধা মত স্থাপন করি, মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া যাই। সকলকে এক প্রকৃতির মনে করিয়া, সেরূপ ব্যবহার করি। কিন্তু দুইটি মানুষের কখনও একই দেহ, একই মন হয় না; দুইটি ব্যক্তির ধর্ম বা সাধনপথ কখনও এক হইতে পারে না। যদি ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চান, তবে কোন সংগঠিত ধর্মের (organized religion) দ্বারস্থ হইবেন না। ঐগুলি দ্বারা ভাল অপেক্ষা শতগুণ মন্দই হইয়া থাকে, কারণ উহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। মনোযোগের সহিত সব কিছু দেখুন, কিন্তু নিজের পথে নিষ্ঠা রাখুন। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তবে কোন ফাঁদে পা দিবেন না। যখনই কোন সম্প্রদায় তাহাদের ফাঁস পরাইবার জন্য চেষ্টা করিবে, তখনই নিজেকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। যেমন মধুকর বহু ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, অথচ কোন ফুলে আবদ্ধ হয় না, তেমনই সংগঠিত, ধর্মে প্রবেশ করুন, কিন্তু আবদ্ধ হইবেন না। ধর্ম আপনাকে ও আপনার ঈশ্বরকে লইয়া; কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসিবে না। একবার ভাবিয়া দেখুন—এই সংগঠিত ধর্মগুলি কী করিয়াছে! কোন নেপোলিয়নের অত্যাচার এই সকল ধর্মীয় নির্যাতন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল—যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হই, অমনি অপরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। একজনকে ভালবাসার অর্থ যদি অপরকে ঘৃণা করাই বুঝায়, তার চেয়ে ভাল না বাসাই ভাল। এ ভালবাসা নয়, নরক! যদি নিজের লোকগুলিকে ভালবাসার অর্থ অপর সকলকে ঘৃণা করা, তবে তাহা নিছক স্বার্থপরতা ও পশুত্ব; ইহার ফলে পশুতে পরিণত হইতে হইবে। অতএব অপরের ধর্ম যতই বড় বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা অবলম্বন করা অপেক্ষা নিজের (গুণগত) ধর্ম পালন করিয়া মরাও শ্রেয়।

৩২

'অর্জুন, সাবধান! কাম ও ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। ইহারা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবেকও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই কামের অনল দুষ্পূরণীয়। ইন্দ্রিয়সমূহে এবং মনে কামের অধিষ্ঠান। আত্মা কিছুই কামনা করেন না।'

'পুরাকালে এই যোগ আমি সূর্যকে শিখাইয়াছিলাম। সূর্য উহা (রাজর্ষি) মনুকে শিক্ষা দেন। এইভাবে যোগের জ্ঞান এক রাজা হইতে অন্য রাজায় পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে যোগের মহৎ শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। তাই আজ আমি আবার তোমার নিকট তাহা বলিতেছি।'

৩৩

তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি তো সেদিন জন্মিয়াছিলেন, এবং (সূর্য আপনার বহু পূর্বে জন্মিয়াছেন)—আপনি সূর্যকে এই যোগ শিখাইয়েছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব?'

৩৪

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি সেগুলি

সম্বন্ধে সচেতন নও। আমি অনাদি
জন্মরহিত সর্বভূতের অধীশ্বর। নিজ
প্রকৃতি-সহায়ে আমি দেহধারণ
করি। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের
অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানুষকে
সাহায্য করিবার জন্য আবির্ভূত হই।
সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ
এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে
যুগে অবতীর্ণ হই। যে যে-ভাবে
আমাকে পাইতে চায়, সেই ভাবেই আমি তাহার কাছে যাই। কিন্তু হে পার্থ, জানিও কেহই আমার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত
হইতে পারে না। ৩৫

কেহ কখনও বিচ্যুত হয় নাই।
আমরাই বা কিরূপে হইব? কেহই
ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত হয় না।

সকল সমাজই একটা যা তা করিয়া
খাড়া করা সাধারণ নিয়মের উপর
প্রতিষ্ঠিত। ত্রুটিহীন সাধারণীকরণের
উপরই (যথার্থ) নিয়ম গঠিত হইতে
পারে। প্রাচীন প্রবাদ কি? প্রত্যেক
নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যদি উহা
সত্যই নিয়ম হয়, তবে তাহা লঙ্ঘন
করা যায় না। কেহই উহা লঙ্ঘন
করিতে পারে না। আপেল কি মাধ্যাকর্ষণের বিধি কখনও লঙ্ঘন করে? নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আর থাকে না।
এক সময় আসিবে, যখন আপনি নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, এবং সেই মুহূর্তে আপনার চেতনা মন ও দেহ বিলীন হইয়া যাইবে।

ঐ তো একজন চুরি করিতেছে। কেন সে চুরি করে? আপনারা তাহাকে শাস্তি দেন। কেন, আপনারা তাহার কর্মশক্তি কি কোন
কাজে লাগাইতে পারেন না? আপনারা বলিবেন, সে পাপী। অনেকেই বলিবেন, সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। বিশাল
মানবগোষ্ঠীকে জোর করিয়া (বৈচিত্র্যহীন) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেই জন্যই এত সব দুঃখ যন্ত্রণা পাপ ও
দুর্বলতা। পৃথিবীকে যতটা খারাপ বলিয়া মনে করা হয়, পৃথিবী কিন্তু ততটা খারাপ নয়। মূর্খ আমরা পৃথিবীকে এতটা খারাপ
করিয়াছি। আমরা নিজেরাই ভূতপ্রেত দৈত্যদানব সৃষ্টি করি, এবং পরে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাই না। আমরা
নিজেদের চোখ থাকিয়া চীৎকার করি, 'কেহ আসিয়া আমাদিগকে আলো দেখান।'—নির্বোধ! চোখ হইতে হাত সরাইয়া লও!
তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা দেবতাদের আহ্বান করি, কেহই নিজের উপর
দোষারোপ করে না। বাস্তবিক ইহাই দুঃখের বিষয়। সমাজে এত মন্দ কেন? মন্দ কাহাকে বলে?—দেহসুখ ও শয়তানি ভাব।
মন্দকে প্রাধান্য দাও কেন? মন্দগুলিকে এত বড় করিয়া দেখিতে কেহ তো বলে নাই। 'হে অর্জুন, আমার পথ হইতে কেহই
সরিয়া যাইথে পারে না।' আমরা ৩৬
নির্বোধ, আমাদের পথও নির্বোধের
পথ। এই সব মায়ার ভিতর দিয়া
আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।
ভগবান্ স্বর্গই সৃষ্টি করিয়াছেন,
মানুষ নিজের জন্য নরক সৃষ্টি
করিয়াছে।

'কোন কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে
পারে না। কর্মফলে আমার স্পৃহা
নাই। যে-কেহ আমাকে এইভাবে
জানে, সে কর্মকৌশল জানে এবং
কর্মদ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না।
প্রাচীন ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিয়া
নির্বিঘ্নে কর্মে নিযুক্ত হইতেন। হে অর্জুন, তুমি সেইভাবে কর্ম কর।'
৩৭

'যিনি প্রচণ্ড কর্মে গভীর শান্তভাব
এবং গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম
দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।'
এখন প্রশ্ন এইঃ প্রতিটি ইন্দ্রিয়

প্রতিটি স্নায়ু কর্মপরায়ণ হইলেও আপনার মনে গভীর প্রশান্তি আছে কি?—কোন কিছু আপনার মনকে চঞ্চল করে না তো? কর্মচঞ্চল বাজারের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চারিদিকে ভিড় ঘুরপাক খাইতেছে, তাহার মধ্যে আপনার মন কি ধ্যানমগ্ন ধীর ও শান্ত? অথবা গিরিগুহায় স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কি আপনার মন তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল? যদি এইরূপ হয়, তবে আপনি যোগী—মুক্ত পুরুষ, নতুবা নন। ৩৮

‘যাঁহার প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্যদ্রষ্টাগণ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।’ যতক্ষণ স্বার্থবোধ থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে না। নিজেদের অহঙ্কার দ্বারা আমরা সবকিছুকে রঞ্জিত করি। বস্তুগুলি নিজস্ব রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তাহারা যে আবৃত তাহা নয়, কিছুই আবৃত থাকে না। আমরা তাহাদিগকে আবৃত করি। আমাদের মনবুদ্ধির তুলি দিয়া ভিন্নভাবে তাহাদিগকে চিত্রিত করি। যে-সকল জিনিষ আমরা পছন্দ করি না, সেগুলি কাছে আসিলে আমরা সেগুলির উপর একটু তুলি বুলাইয়া দিই, তারপর সেগুলির দিকে তাকাইয়া থাকি। … আমরা কোন কিছু জানিতে চাই না। সব জিনিষকে আমরা নিজের রঙে রাঙাইয়া লই। স্বার্থই সকল কর্মের প্রেরণাশক্তি। বস্তুর স্বরূপ আমাদের দ্বারাই আবৃত রহিয়াছে, গুটিপোকার মত নিজেদের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হই। গুটিপোকা তাহার নিজের জালেই নিজে আবদ্ধ হয়। আমরাও ঠিক তাহাই করিতেছি। যখনই ‘আমি’ শব্দটি উচ্চারণ করি, তখনই একটি পাক খাইল। ‘আমি ও আমার’ বলামাত্র আর এক পাক খাইল। এইরূপে চলিতে থাকে। ৩৯

কাজ না করিয়া আমরা এক মুহূর্ত থাকিতে পারি না। কাজ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রতিবেশী যখন বলে, ‘এস, সাহায্য কর’, তখন মনে যে ভাব উদিত হয়, নিজেকে সাহায্য করিবার সময়ও সেই ভাব পোষণ করিবেন। ইহার বেশী নয়। অপরের শরীর অপেক্ষা আপনার শরীর বেশী মূল্যবান নয়। অপরের দেহের জন্য যতটুকু করিয়া থাকেন, নিজের শরীরের জন্য তার বেশী করিবেন না। ইহাই ধর্ম।

‘যাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা ফলতৃষ্ণা ও স্বার্থবুদ্ধি রহিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মের এই সকল বন্ধন দগ্ধ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানী।’ ৪০ শুধু পুস্তকপাঠের দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয় না।একটি গর্দভের পৃষ্টে গোটা গ্রন্থাগারটি চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সে মোটেই জ্ঞানী হইয়া উঠিবে না। কাজেই বহু পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন কি? ‘কর্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিয়া এবং কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করেন, অথচ কর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান

করেন।’

মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় এই [৪১] পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইব। অসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম, অসহায় অবস্থাতেই চলিয়া যাইব। এখনও আমি অসহায়। আমাদের গন্তব্য কোথায়, লক্ষ্য কি—এ অবস্থার কথা চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে ভয়াবহ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব আমাদের পাইয়া বসে, তাহাও আমরা জানি না। আমরা প্রেতাত্মার মিডিয়ামের কাছে যাই—ভূত-প্রেত যদি কোন সাহায্য করিতে পারে। ভাবুন কী দুর্বলতা! ভূতপ্রেত, শয়তান, দেবতা—সব এস! পুরোহিত, ভণ্ড, হাতুড়ে—যে যেখানে আছ, সকলে এস! যে মুহূর্তে আমরা দুর্বল হই ঠিক তখনই তাহারা আমাদের পাইয়া বসে এবং যত দেবতা আমদানি করে।

আমার দেশে দেখিয়াছি, কেহ হয়তো শক্তিমান্ ও শিক্ষিত হইয়া দার্শনিকভাবে বলে, ‘এই সব প্রার্থনা পুণ্যস্নানাদি অর্থহীন।’ … তারপর তাহার পিতা দেহত্যাগ করিলেন, তাহার মাতৃ-বিয়োগ হইল। হিন্দুর পক্ষে এই শোক এক প্রচণ্ড আঘাত। তখন দেখা যাইবে পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রতিটি কর্দমাক্ত কুণ্ডে স্নান করিতেছে, মন্দিরে যাইতেছে, সকলের দাসত্ব করিতেছে—যে পার, সাহায্য কর! কিন্তু আমরা অসহায়! কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে না। ইহাই সত্য।

মানুষের সংখ্যা হইতে দেবতার সংখ্যা বেশী, তবুও কোন সাহায্য আসে না। কুকুরের মত আমরা মরি, তবু কোন সাহায্য নাই। সর্বত্র পশুর মত ব্যবহার, দুর্ভিক্ষ রোগ দুঃখ অসৎভাব! সকলেই সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কোন সাহায্য নাই। কোন আশা না থাকিলেও আমরা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া চলিয়াছি। কি শোচনীয় অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করুন। আমাদের এই দঃখ-কষ্টের অর্ধেকের জন্য আমরা দোষী নই; পিতামাতাই দায়ী। আমরা এই দুর্বলতা লইয়া জন্মিয়াছি—এবং পরে আরও বেশী দুর্বলতা আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিজেকে অসহায় মনে করা—দারুণ ভুল। কাহারও কাছে সাহায্য চাহিও না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করি। যদি তাহা না পারি, তবে আমাদের সাহায্য করিবার কেহ নাই।

‘তুমি নিজেকে তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু। আত্মা বা মন ছাড়া অন্য কোন শত্রু নাই, আত্মা বা বন্ধু ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নাই।’ [৪২]

ইহাই শেষ ও শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা শিখিতে কত কালই না লাগে! অনেক সময় মনে হয়, এই আদর্শ আমরা যেন ধরিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু পরমুহূর্তে পুরাতন সংস্কার আসিয়া পড়ে। আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। দুর্বল হইয়া আবার সেই ভ্রান্ত সংস্কার ও অপরের সাহায্যকেই আঁকড়াইয়া ধরি। অপরের সাহায্য পাইব, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমাদের যে বিরাট দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন! পুরোহিত তাদের নিয়মমত পূজা বা প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করে। ষাট হাজার লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করে এবং প্রার্থনান্তে পুরোহিতের প্রাপ্য অর্থ দেয়। মাসের পর মাস লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, প্রার্থনা করে ও পুরোহিতকে টাকা দেয়; একবার ভাবিয়া দেখুন! ইহা কি পাগলামি নয়? পাগলামি ছাড়া ইহাকে আর কি বলা যায়? ইহার জন্য দায়ী কে? আপনারা ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, ইহা শুধু অপরিণত শিশুদের মন উত্তেজনা করা! ইহার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অন্তরের অন্তস্তলে আপনারা কি? যে দুর্বল চিন্তাগুলি আপনি অন্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির জন্য আপনাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ মূল্য দিতে হইবে। কর্মের নিয়ম তাহার প্রাপ্য আদায় করিবেই।

জগতে একটিমাত্র পাপ আছে, তাহা দুর্বলতা। বাল্যকালে যখন মহাকবি মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লষ্ট’ কাব্য পড়িয়াছিলাম, তখন শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি কখনও দুর্বলতার বশীভূত হন না, সর্বপ্রকার

বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করেন। ওঠ, জাগ, ঐ প্রকার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও …। পাগলের সংখ্যা আর বাড়াইও না। যে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহিত আর তোমার দুর্বলতা যুক্ত করিও না। জগতের কাছে আমি এই কথা বলিতে চাই। শক্তিমান্ হও; ভূতপ্রেত ও শয়তানের কথা তোমরা যে বল, আমরাই তো জীবন্ত শয়তান। শক্তি ও ক্রমোন্নতিই জীবনের চিহ্ন। দুর্বলতা মৃত্যুর চিহ্ন, যাহা কিছু দুর্বল, তাহাকে এড়াইয়া চল। উহাই মৃত্যু। উহা যদি শক্তি হয়, তবে তাহার জন্য নরকেও যাও এবং শক্তি লাভ কর। সাহসীরাই মুক্তির অধিকারী। 'বীরপুরুষরাই স্ত্রীরত্নলাভের যোগ্য।' আর যাহারা সর্বাপেক্ষা বীর, শুধু তাহারাই মুক্তিলাভের যোগ্য। কাহার নরক? কাহার অত্যাচার? কাহার পাপ? কাহার দুর্বলতা? কাহার মৃত্যু কাহার রোগ?

আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যদি যথার্থ বিশ্বাস করিতেই হয়, তবে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হউন। 'তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি সবল যুবকের পদবিক্ষেপে চলিতেছ, আবার জারগ্রস্ত বৃদ্ধ দণ্ডসহায়ে চলিতেছ।' তুমিই দুর্বলতা, তুমিই ভয়, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই নরক; তুমি সর্প হইয়া দংশন ৪৩
কর, রোজা হইয়া বিষমুক্ত কর—
তুমিই ভয়-মৃত্যু ও দুঃখ-রূপে
উপস্থিত হও।

সকল দুর্বলতা, সকল বন্ধনই
আমাদের কল্পনা। সজোরে একটি
কথা বল, ইহা শূন্যে মিলাইয়া
যাইবে। দুর্বল হইও না, ওঠ, বাহির
হইবার আর অন্য কোন পথ নাই।
শক্ত হইয়া দাঁড়াও, শক্তিমান্ হও ভয়
নাই। কুসংস্কার নাই। নগ্ন সত্যের
সম্মুখীন হও। দুঃখ-কষ্টের চরম—
মৃত্যু যদি আসে, আসুক। প্রাণপণ
সংগ্রামের জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প। ধর্ম বলিতে আমি ইহাই জানি, আমি ইহা লাভ করি নাই, লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি সফল হইতে না পারি, তোমরা পারিবে। অগ্রসর হও।

'যেখানে একজন অপরকে দেখে এবং একজন অপরকে শোনে, যতক্ষণ দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণ ভয় থাকিবেই, এবং ভয়ই সমস্ত দুঃখের কারণ।' ৪৪

যখন যেখানে একজন অপরকে
দেখে না, যেখানে সবাই এক—
সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই,
অসুখী হইবারও কেহ নাই। একই
আছেন, দ্বিতীয় নাই
—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কাজেই ভয়
করিও না; ওঠ, জাগ, যে পর্যন্ত
লক্ষ্যস্থলে না পঁহুছিতেছ, সে পর্যন্ত
থামিও না।

পাদটীকা

পত্রাবলী (পূর্বানুবৃত্তি)

১	মিস মার্গারেট নোল্।
২	সেই ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তবে পাত্র বিশেষে প্রকাশ পান।
৩	শ্রীরামকৃষ্ণ—জন্মোৎসব
৪	'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত'কার শ্রীম (মহেন্দ্র গুপ্ত)
৫	উত্তরপ্রাপ্তির জন্য খেতড়ির ঠিকানা।
৬	শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বামীজী কখনও কখনও 'শ্রী' বা 'শ্রীজী' বলিয়া উল্লেখ করিতেন।
*	স্বামী ব্রহ্মানন্দ
৭	হ্যারিয়েটের বিবাহ এখানে উদ্দিষ্ট।
৮	ঢাকায় শুভাগমনের জন্য নাগরিকগণের পক্ষ হইতে অনুরোধের উত্তর।
৯	নিকৃষ্ট, মাঝামাঝি (প্রাকৃতিক) ও শ্রেষ্ঠ।
১০	সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত গুরুভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলা হইয়াছে।
১১	'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—কবিতা দ্রষ্টব্য।
১২	কন্যার মৃত্যুতে মাদাম কালভের মনের অবস্থাই এখানে বর্ণনার লক্ষ্য।
১৩	'উদ্বোধন'—পত্রিকা
১৪	'বুয়র' যুদ্ধ-প্রসঙ্গে
১৫	'Catching a Tartar'
১৬	নিউ ইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন।
১৭	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
১৮	Frisco = San Francisco
১৯	পরবর্তী পত্রপাঠে মনে হয়, এ সময় তাঁহাদের যাওয়া হয় নাই।
২০	ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্যের প্রাণবিসর্জন।
২১	মিসেস বুলের।
২২	'Follow me, and let the dead bury their dead.'—Bible (Matthew, 8-22)
২৩	শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'খাদ না থাকলে গড়ন হয় না' স্বামীজী সেই ভাব হইতে এই কথাগুলি বলিতেছেন।
২৪	লস্ এঞ্জেলেসের মিসেস ব্লজেট। এই চিঠিতে স্বামীজী তাঁহাকে 'Dear Aunt Roxy' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।
২৫	বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু
২৬	শ্বেঃ উপনিষদ্, ৬।১৮
২৭	'তন্নো হংস প্রচোদয়াৎ'।
২৮	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকটির ব্যাখ্যা।
২৯	এই অংশ খামের উপরে বাংলায় লিখিত ছিল।
৩০	স্বামীজী গীতার ভাবটি লইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন; উহার অর্থ—কোথায় থাক, কি বল, কোথায় যাও, ইত্যাদি।
৩১	২৬ মে, ১৮৯০ খ্রীঃ প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।
৩২	'উদ্বোধনে'র সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
৩৩	সম্ভবতঃ Princess Demidoff.
৩৪	মিস এলবার্টা স্টার্জিসকে তাঁর ২৩তম জন্মদিনে লিখিত।
৩৫	মূলপত্র ফরাসী ভাষায় লিখিত।
৩৬	মূলপত্র ফরাসী ভাষায় লিখিত।
৩৭	তুলনীয়ঃ The wounded snake its hood unfurls, The flame stirred up doth biaze, etc. —The Song of the Free: Swami Vivekananda
৩৮	মিঃ সেভিয়ার ও মিঃ গুডউইন।
৩৯	'Light' কবিতা দ্রষ্টব্য।
৪০	স্বামী স্বরূপানন্দ।
৪১	স্ত্রিয়াচরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?
৪২	গীতা-৪।১১

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

১	'রামায়ণ'—প্রসঙ্গে সীতার স্বয়ম্বর
২	অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ । শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥
৩	তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োবিভিন্নাঃ। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্॥ ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ । মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
৪	Concord—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.) পূর্বাঞ্চলে একটি শহর। এখানেই এমার্সন তাঁহার জীবনের শেষ ৪৮ বৎসর অতিবাহিত করেন।
৫	কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ গীতা ৪।১৮
৬	যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাঽপসর্পতু॥ বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৩
৭	ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।৮
৮	'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।'— বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫
৯	তুলনীয় হিন্দী প্রবাদঃ 'হাম্ তো কম্‌লী ছোড় দিয়া, কম্‌লী হামকো ছোড়তা নহী', ভাসমান ব্যক্তি যাহাকে কম্বল মনে করিয়া ধরিতে গিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি একটি ভাল্লুক।
১০	কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥—গীতা, ৪।১৮
১১	সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥—গীতা, ১৮।৪৮
১২	গীতা, ৪।১১
১৩	গীতা, ৩।২২-২৩
১৪	গীতা, ৪।১৮
১৫	গীতা, ২।৪৭
১৬	গীতা, ৯।২৬
১৭	গীতা, ১৮।৬১
১৮	গীতা, ৪।৮ ; ১০।৪১
১৯	Priests and Prophets
২০	Light of Asia—Edwin Arnold
২১	Pharisee—যীশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক এক য়াহুদী ধর্মসম্প্রদায়; ইঁহারা ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যবিধি অনুষ্ঠানাদির পালনেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। Sadducee—ঐ সময়ের আর এক য়াহুদী সম্প্রদায়; ইঁহারা অভিজাতবংশীয় এবং সন্দেহবাদী ছিলেন।
২২	ইতিহাস ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া বাইবেলের বিভিন্নাংশের রচনা, রচনাকাল ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিচারমূলক সাহিত্যরাশি Higher or Historical Criticism নামে অভিহিত। ইহা বাইবেলের শ্লোকাবলী ও শব্দরাশি-সম্বন্ধীয় বিচার ও ব্যাখ্যা হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর।
২৩	গীতা, ৪।৬-৮
২৪	গীতা, ১০।৪১
২৫	গীতা, ৪।৭-৮
২৬	কঠোপনিষদ্, ২।২।৯
২৭	মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।১।৩
২৮	কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥—গীতা, ৪।১৮
২৯	মতান্তরে জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।
৩০	চারি ধামঃ উত্তরে বদরী-নাথ, পূর্বে পুরী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও পশ্চিমে দ্বারকা।
৩১	ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।২।৯।২
৩২	অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্। নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥—কুমারসম্ভব
৩৩	যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥—গীতা
৩৪	'উদ্বোধন' হইতে প্রকাশিত 'My Master' বক্তৃতায় এই অনুচ্ছেদটি পাদটীকায় আছে।
৩৫	তখন কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল।
৩৬	বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্। বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥—বিবেকচূড়ামণি
৩৭	বাইবেল
	১৮৩০ খ্রীঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহারা বাইবেলে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন,

	অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ বহুবিবাহপ্রথার পক্ষপাতী।
৩৯	রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥—শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

গীতা-প্রসঙ্গ

১	প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ।— গীতা, ৩/৩৩
২	গীতা, ৪।১৮
৩	গীতা, ২|৩
৪	গীতা, ২|১১
৫	গীতা, ২।১৩
৬	গীতা, ২|১৪
৭	গীতা, ২|১৬
৮	গীতা, ২|২৮
৯	ঐ—২|২৯
১০	ঐ—২|৩৮
১১	গীতা, ২|৩৯
১২	ঐ—২|৪০
১৩	ঐ—২|৪১-৪৩
১৪	গীতা, ২।৪৫
১৫	ঐ—২।৪৪
১৬	গীতা -২|৫১
১৭	ঐ—২|৫৫
১৮	ঐ—২|৫৬
১৯	গীতা—২|৫৮
২০	ঐ—২|৬৯
২১	গীতা—২।৭০
২২	গীতা, ৩|১
২৩	ঐ—৩|২-৮
২৪	ঐ—৩|২০-২১
২৫	ঐ—৩|২২-২৪
২৬	গীতা--৯|২৩
২৭	ঐ—৩|২৫
২৮	গীতা—৩।২৭
২৯	ছান্দোগ্য উপ.,-৬।২।২-৩
৩০	গীতা, ৩।৩৩
৩১	'গীতা, ৩|৩৫
৩২	গীতা, ৩।৩৫
৩৩	ঐ—৩।৩৭, ৪০
৩৪	ঐ—৪।১-৪
৩৫	ঐ—৪।৫-৮, ১১
৩৬	গীতা, ৪।১১
৩৭	গীতা, ৪।১৪-১৫
৩৮	গীতা, ৪।১৮
৩৯	ঐ—৪।১৯
৪০	গীতা, ৪।১৯
৪১	গীতা, ৪।২০
৪২	গীতা, ৬।৫
৪৩	শ্বেতাশ্বতর ৪।৩
৪৪	ছান্দোগ্য, ৭।২৩-২৪

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
নবম খণ্ড

সূচীপত্র

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র নবম খণ্ডে প্রধানতঃ কথোপকথন-মূলক বিষয়গুলি—স্বামীজীর সহিত দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের যে-সব কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা সন্নিবেশিত হইল। এগুলি তাঁহার বক্তৃতা ও লেখার মতোই জীবনপ্রদ, উপরন্তু জাতিগত ব্যক্তিগত নানা সমস্যার সমাধানের সুচিন্তিত ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

স্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি- শিষ্য-সংবাদ' (পূর্ব ও উত্তর) দুই খণ্ডে স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থ বহু দেশসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধককে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি এখানে সর্বাগ্রে ক্রমিক অধ্যায়-অনুসারে—যথাসম্ভব তারিখ ও ঘটনার অনুক্রমে সাজান হইয়াছে।কথোপকথনের পটভূমিকার জন্য যতটুক বর্ণনা প্রয়োজন, ততটুকুই রাখা হইয়াছে; মূল পুস্তকের অধ্যায়মুখে লিখিত বিষয়সূচী ও মাঝে মাঝে লিখিত লেখকের মন্তব্য বর্জিত হইয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda'—'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' নামে বাংলায় প্রকাশিত; এ পুস্তকখানির অধ্যায়-শিরোনামা সব ঠিক রাখা হইয়াছ, কিন্তু মূল পুস্তকের বর্ণনা ও সমালোচনামূলক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু স্বামীজীর মতামত ও কথাগুলিই নির্বাচিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পটভূমিকা ও ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রাখা হইয়াছে।

'স্বামীজীর কথা' অংশটি স্মৃতিকথা-মূলক। স্মৃতিকথা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে স্বামীজীর শিষ্য—যথা স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য, হরিপদ মিত্র গৃহস্থ শিষ্য, প্রিয়নাথ সিংহ একাধারে তাঁহার বাল্যবন্ধু ও শিষ্য। এই লেখাগুলিতে স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেও বর্ণনাংশ কিছু বাদ দিয়া স্বামীজীর কথাবার্তাই চয়ন করা হইয়াছে। সমগ্র রস আস্বাদনের জন্য পাঠকগণ মূল পুস্তক-পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, আশা করি।

সর্বশেষে, 'কথোপকথন' পুস্তকটি সন্নিবেশিত হইল। এটি প্রধানতঃ দেশের ও বিদেশের সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবৃতি। এখানেও বর্ণনা— বিশেষতঃ সমালোচনা সংক্ষিপ্ত করিয়া 'কথোপকথনে' স্বামীজী কর্তৃক প্রকাশিত মতামতের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। শেষের দিকে কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক ব্যয় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তথ্যপঞ্জী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই খণ্ড মুদ্রণযোগ্য করিতে যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
(জানুআরি, ১৯৬৩)

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১-৫

১

স্থান—কলিকাতা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, বাগবাজার
কাল—ফেব্রুআরী (শেষ সপ্তাহ), ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর তিন-চারি দিন হইল স্বামীজী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইতেছেন। শিষ্য লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে বেলা প্রায় ২॥ টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' পাঠ করিয়া ইতঃপূর্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ-মহাশয়ের
১
কাছে তাহার যে যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজী জানিয়াছিলেন।

শিষ্য স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—'বয়ং তত্ত্বান্বেষাদ্ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী'
২
। কথাগুলি নাগ-মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া গিয়া শিষ্যকে 'বিবেকচূড়ামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেনঃ

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥
৩

এবং তাহাকে আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, 'মিরর'
৪
- সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন, 'তাঁকে এখানে নিয়ে এস।' নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উত্তরে স্বামীজী বলিলেনঃ

আমেরিকাবাসীর মত এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসেবাপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি; আমেরিকার লোক এত সহৃদয় বলেই তাঁরা বেদান্তভাব গ্রহণ করেছেন।

ইংলণ্ডের কথায় বলিলেনঃ ইংরেজের মত conservative (প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাদের একবার কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে তারা কিছুতেই তা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অন্য কোন জাতিতে মেলে না। সেইজন্য তারা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্ত-প্রচারকার্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহা জানাইয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

আমি কেবল কাজের পত্তন মাত্র করে এসেছি। পরবর্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে।

নরেন্দ্রবাবু॥ এইরূপ ধর্মপ্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কী আশা আছে?

স্বামীজী॥ আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্বভৌম বেদান্তবাদ—যা সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্মলাভের সমান অধিকার প্রদান করে—এর প্রচারের দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য ধর্মভাবের স্ফুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চায় পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হবে—অনেকটা এখনই হয়েছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে পারলে আমরা তাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করে জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হব। পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করে পারমার্থিক কল্যাণলাভে সমর্থ হবে।

নরেন্দ্রবাবু॥ এই আদান-প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি?

স্বামীজী॥ ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের
৫
সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকার মত কাজ করছে; আপনারা যদি মনে করেন, আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রয়োগ করেই একদিন স্বাধীন হব, তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝছেন। হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেমন, ওদের ও আমাদের ঐ শক্তি- প্রয়োগকুশলতায় তেমনি প্রভেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করে, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে ধর্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকবে। ধর্ম জিনিষটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চীৎকার করে ওদের—'এ দেও, ও দেও' বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বারা যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে। আমার বিশ্বাস—এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ (secondary) উপায় বলে বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় করব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভাবে কাজ করে যান।

নরেন্দ্রবাবু স্বামীজীর কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মূর্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত—মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা, দেখিলেই বুঝা যায়—ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা-প্রচারকের আগমন-বার্তা স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতাপাইয়ার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেনঃ

স্বামীজী॥ আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক॥ আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হন।

স্বামীজী॥ এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক॥ দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য নির্বাহ হয়।

স্বামীজী॥ আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক॥ মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজী॥ মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি?

প্রচারক॥ আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী॥ যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপ নারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেননি? প্রচারক॥ না। লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; যেমন কর্ম তেমনি ফল' হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেনঃ

যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই; তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক॥ (একটু অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী॥ (হাসিতে হাসিতে) হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করিবেন?

হিন্দুস্থানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় স্বামীজীর বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না) স্বামীজীকে বলিলেন যে, সেই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজী॥ আমি তো সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাব, যাতে আপনাদের সাহায্য করব? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, আগে মানুষের সেবায় ব্যয় করব; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব করে যদি অর্থ বাকী থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেনঃ

কি কথা বললে! বলে কিনা—কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ? এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল। পরে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ

আবার আমার সঙ্গে দেখা করো। শিষ্য॥ আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়তো কোন বড় মানুষের বাড়ীতে থাকিবেন। আমাকে তথায় যাইতে দিবে তো? স্বামীজী॥ সম্প্রতি আমি কখনও আলমবাজার মঠে, কখনও কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে থাকব। তুমি সেখানে যেও। শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়। স্বামীজী॥ তাই হবে—একদিন রাত্রিতে যেও। খুব বেদান্তের কথা হবে। শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্তায় রুষ্ট হইবে না তো? স্বামীজী॥ তারাও সব মানুষ—বিশেষতঃ বেদান্তধর্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুশী হবে। শিষ্য॥ মহাশয়, বেদান্তে অধিকারীর যে-সব লক্ষণ আছে, তাহা আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যদের ভিতরে কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে বলে—অতীতবেদবেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধনসম্পন্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয় না। আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ, তাহাতে অশন-বসনে অনাচারী; তাহারা বেদান্তবাদ বুঝিল কি করিয়া?

স্বামীজী॥ তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে, তারা বেদান্ত বুঝেছে কিনা। অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দর্জিপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

২

স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে
ও গোপাললাল শীলের বাগানে
কাল—ফেব্রুআরী বা মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী আজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ
৬
মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম
করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে
আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল,
স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের
বাগানবাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্ আমার সঙ্গে।' শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; গাড়ী ছাড়িল। চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গাদর্শন হইবামাত্র স্বামীজী আপন মনে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, 'গঙ্গা-তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং'
৭
ইত্যাদি। শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত স্বরলহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর 'হাইড্রলিক ব্রিজের' দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখ দেখি কেমন সিঙ্গির মত যাচ্ছে।' শিষ্য বলিলঃ

ইহা তো জড়। ইহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তবে তো ইহা চলিতেছে। ঐরূপে চলায় ইহার নিজের বাহাদুরি আর কি আছে?

স্বামীজী॥ বল্ দেখি চেতনের লক্ষণ কি?

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই চেতন। স্বামীজী॥ যা nature-এর against-এ rebel (প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) করে, তাই চেতন; তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্ না, একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) করবে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ), সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ। শিষ্য॥ মানুষের ও মনুষ্যজাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে?

স্বামীজী॥ খাটে কিনা একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ্ না। দেখবি, তোরা ছাড়া আর সব জাতি সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস। তোদের hypnotise (বিমোহিত) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বচ্ছর হতে চলল, ভাবছিস—আমরা হীন, সব বিষয়ে অকর্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। আমি কিন্তু কখনও ওরূপ ভাবিনি। তাই দেখ্ না, তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মত খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাবতে পারিস—'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অনন্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মত হতে পারিস।

শিষ্য॥ ঐরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ঐ কথা শোনায় ও বুঝাইয়া দেয়, এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়? লেখাপড়া করা আজকাল কেবল চাকরিলাভের জন্য—এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি।

স্বামীজী॥ তাই তো আমরা এসেছি অন্যরূপ শেখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ্, বোঝ্, অনুভূতি কর্—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস কর, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।' ঐ কথা সকলকে বল্ এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার করব—প্রথমে তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, মতলব করেছি।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ করা তো অনেক অর্থসাপেক্ষ। টাকা কোথায় পাইবেন?

স্বামীজী॥ তুই কি বলছিস? মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, এ কথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মত টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং আপনি ঐরূপে সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতেই বা কি? ইতঃপূর্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। সে-সকল এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্যেরও সময়ে ঐরূপ দশা হইবে নিশ্চয়। তবে ঐরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি?

স্বামীজী॥ পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কাজই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস, তা এখনি করে ফেল্; পরে কি হবে না হবে, সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফলদাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর), যা হয় করবেন। সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগানবাড়ীতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে সেদিন বাগানে আসিয়াছেন। স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; স্বামীজীর বিলাতী শিষ্য গুডউইন সাহেব সাক্ষাৎ 'সেবা'র মত অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইতঃপূর্বে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় শিষ্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই কি কঠোপনিষদ্ কণ্ঠস্থ করেছিস?'

শিষ্য॥ না মহাশয়, শাঙ্করভাষ্যসমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী॥ উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা হয় তোরা এখানা কণ্ঠে করে রাখিস। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা সাহস বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর্। শুধু পড়লে কি হবে?

শিষ্য॥ কৃপা করুন, যাহাতে দাসের ঐ সকল অনুভূতি হয়।

স্বামীজী॥ ঠাকুরের কথা শুনেছিস তো? তিনি বলতেন, 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুল দে না।' কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে কি রে বাপ? নিজের নিয়তি নিজের হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জল ও বায়ু কেবল তার সহায়ক মাত্র।

শিষ্য॥ বাহিরের সহায়তারও কি আবশ্যক আছে, মহাশয়? স্বামীজী॥ তা আছে। তবে কি জানিস—ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলের আত্মানুভূতির একটা সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ম। উচ্চনীচ-প্রভেদ করাটা কেবল ঐ ব্রহ্মবিকাশের তারতম্য। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, 'কালেনাত্মনি বিন্দতি।'

শিষ্য॥ কবে আর ঐরূপ হইবে, মহাশয়? শাস্ত্রমুখে শুনি, কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি!

শিষ্য॥ কবে আর ঐরূপ হইবে, মহাশয়? শাস্ত্রমুখে শুনি, কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি!

স্বামীজী॥ ভয় কি? এবার যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন এবারেই হয়ে যাবে। মুক্তি, সমাধি—এ সব কেবল ব্রহ্মপ্রকাশের পথের প্রতিবন্ধগুলি দূর করে দেওয়া। নতুবা আত্মা সূর্যের মত সর্বদা জ্বলছেন। অজ্ঞানমেঘ তাঁকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘকেও সরিয়ে দেওয়া আর সূর্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি'
৮
ইত্যাদি অবস্থা হওয়া; যত পথ দেখেছিস, সবই এ পথের প্রতিবন্ধ দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যে যে-ভাবে আত্মানুভব করেছে, সে সেইভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মজ্ঞান— আত্মদর্শন। এতে সর্ব জাতি—সর্ব জীবনের সমান অধিকার। এটাই সর্ববাদিসম্মত মত। শিষ্য॥ মহাশয়, শাস্ত্রের ঐ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যেন ছটফট করে।

স্বামীজী॥ এরই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে যত বেড়ে যাবে, ততই প্রতিবন্ধরূপ মেঘ কেটে যাবে, ততই শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হবে। ক্রমে আত্মা 'করতলামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হবেন। অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে, কতকগুলি বিধি-নিষেধ সকলেই পালন করতে পারে; কিন্তু অনুভূতির জন্য ক-জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্মপ্রাণতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের যেমন উদ্দাম উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্যও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। গোপীদের মনেও একটু একটু পুরুষ-মেয়ে ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানে ঐ ভেদ একেবারেই নেই।

('গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেনঃ)

জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে jingling of words (শ্রুতিমধুর বাক্যবিন্যাসের) দিকে বেশী নজর রেখেছেন। দেখ্ দেখি গীতগোবিন্দের 'পততি পতত্রে'
৯
ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগ-ব্যাকুলতার কি culmination (পরাকাষ্ঠা) কবি দেখিয়েছেন! আত্মদর্শনের জন্য ঐরূপ অনুরাগ হওয়া চাই, প্রাণের ভেতরটা ছটফট করা চাই। আবার বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী—তাও দেখ্! অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর, শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে 'গীতা' বলছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না! যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect (সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান্ বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশী বাজান কৃষ্ণকেই কেবল দেখলেই চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী—এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্মাদ)। মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।

শিষ্য॥ পাশ্চাত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়ে আপনার কি আশা হয়, তাহারা ক্রমে সাত্ত্বিক হইবে?

স্বামীজী॥ নিশ্চয়। মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। তাদের যোগ হবে না তো কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? তাদের উৎকৃষ্ট ভোগ দেখে আমার 'মেঘদূতে'র 'বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবসনাঃ'
১০
ইত্যাদি চিত্র মনে পড়ত। আর তোদের ভোগের ভেতর হচ্ছে কিনা—স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের মত বংশবৃদ্ধি—begetting a band of famished beggars and slaves (একপাল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসের জন্ম দেওয়া)! তাই বলছি এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম—কর্ম—কর্ম। এখন 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—এ ছাড়া উদ্ধারের আর অন্য পথ নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন?

স্বামীজী॥ ছিলেন না? এই তো ইতিহাস বলছে, তাঁরা কত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন—তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, সুদূর জাপানে পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে উন্নতি হবার যো আছে কি?

কথায় কথায় রাত্রি হইল। এমন সময় মিস মূলার (Miss Muller) আসিয়া পঁহুছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ মহিলা, স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না। স্বামীজী ইঁহার সহিত শিষ্যের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিস মূলার উপরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী॥ দেখেছিস কেমন বীরের জাত এরা! কোথায় বাড়ী-ঘর, বড় মানুষের মেয়ে, তবু ধর্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে!

শিষ্য॥ হাঁ মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অদ্ভুত। কত সাহেব-মেম আপনার সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত! একালে এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা।

স্বামীজী॥ (নিজের দেহ দেখাইয়া) শরীর যদি থাকে, তবে আরও কত দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় করে দেব। মান্দ্রাজে জন-কতক আছে। কিন্তু বাঙলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তি নেই। Brain ও muscles (মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী) সমানভাবে developed (সুগঠিত, পরিপুষ্ট) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet (লোহার মত শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হয়)।

সংবাদ আসিল, স্বামীজীর খাবার প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্, আমার খাওয়া দেখবি।' আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মেলাই তেল-চর্বি খাওয়া ভাল না। লুচি হতে রুটি ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh vegetables (তাজা তরিতরকারী) খাবি, মিষ্টি কম।' বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, 'হাঁরে, ক-খানা রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে?' কত খাইয়াছেন তাহা স্বামীজীর স্মরণ নাই। ক্ষুধা আছে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না!

আরও কিছু খাইয়া স্বামীজী আহার শেষ করিলেন। শিষ্যও বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ী না পাওয়ায় পদব্রজে চলিল; চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিবে।

৩

স্থান—কাশীপুর, ৺গোপাললাল শীলের বাগান
কাল—মার্চ, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া স্বামীজী কয়েক দিন কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, শিষ্য তখন প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করিত। স্বামীজীর দর্শনমানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের সেখানে ভিড় হইত। কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্তী হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজীর জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিবার জন্য তখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিত। প্রশ্নকর্তারা স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত; স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্বদা অবস্থান করিতেন।

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। ধনী মারোয়াড়ী বণিকগণের অন্নেই ইঁহারা প্রতিপালিত। স্বামীজীর সুনাম অবগত হইয়া কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার জন্য একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল।

আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে

সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃত- ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে ঐরূপে অনর্গল কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইওরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে সংস্কৃত-আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্ত্রদর্শী এই সকল পণ্ডিতের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন ঐ সভায় রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্মলানন্দ মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাদে স্বামীজী সিদ্ধান্তপক্ষ এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী এক স্থলে ‘অস্তি’স্থলে ‘স্বস্তি’ প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, ‘পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্’। পণ্ডিতেরাও স্বামীজীর এইরূপ দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই-চারি জন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ হইল?’ তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিলেন, ‘ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।’

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলেন যে, পূর্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বামীজী উত্তরমীমাংসা-পক্ষ অবলম্বনে তাঁহাদিগকে নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটি ভুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্তা না বলায় তাঁহার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষারোপ করেন নাই। ঐ বিষয়ে স্বামীজী ইহাই কিন্তু বলিয়াছিলেনঃ

পাশ্চাত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছেড়ে ঐভাবে ভাষার সামান্য ভুল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্য। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই নেয়— ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। তোদের দেশে কিন্তু খোসা নিয়েই মারামারি চলছে—ভেতরকার শস্যের সন্ধান কেউ করে না।

পরে স্বামীজী শিষ্যের সঙ্গে সেদিন সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল, তিনি তাহাকে উৎসাহিত করবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্তা কহিত।

‘সভ্যতা’ কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেনঃ

যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা করে ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করে দিচ্ছে, পরন্ত ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করে লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করতে না পারলেও নিঃসন্দেহে অনেকটা কমাতে সমর্থ হয়েছিল। ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্মতৎপর হতে হবে, অপরদিকে তাদের তেমনি গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। এরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য-সংমিশ্রণে জগতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হবে।

এ-কথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে বলিয়াছিলেনঃ

আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে, সে বাইরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাজকেরা যেমন অবাক হয়ে যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখনও কখনও বলেও ফেলত, ‘স্বামীজী’, আপনি একজন ধর্মযাজক; সাধারণ লোকের মত এরূপ হাসি-তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ও-রকম চপলতা শোভা পায় না।’ তার উত্তরে আমি বলতাম, We are children of bliss—why should we look morose and sombre (আমরা আনন্দের সন্তান, বিরস মুখে থাকব কেন?) ঐ কথা শুনে তারা মর্ম গ্রহণ করিতে পারত কিনা সন্দেহ।

সেদিন স্বামীজী ভাবসমাধি ও নির্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেনঃ

মনে কর, একজন হনুমানের মত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হতে থাকবে, ঐ সাধকের চলন-বলন ভাবভঙ্গী এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আসবে। 'জাত্যন্তরপরিণাম'
১১
—ঐরূপেই হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে 'তদাকারাকারিত' হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাবসমাধি। আর আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই—এইরূপে 'নেতি, নেতি' করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হলে নির্বিকল্প-সমাধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌঁছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে! ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাবমুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না—এ-কথাও ঠাকুর বলতেন।

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহাশয়, ঐদেশে কিরূপ আহরাদি করিতেন?' উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ওদেশের মতই খেতাম। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় না।'

এদেশে কি প্রণালীতে কার্য করিবেন, সে সম্বন্ধে স্বামীজী ঐদিন বলেনঃ

মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্য নূতন ধরনের সাধুসন্ন্যাসী তৈরী করতে হবে। Destruction (ধ্বংস) দ্বারা বা প্রাচীন রীতিগুলি অযথা ভেঙে সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্বকালে সর্বদিকে উন্নতিলাভ constructive process-এর (গঠনমূলক প্রণালী) দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতিগুলিকে নূতনভাবে পরিবর্তিত করেই গড়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারক মাত্রেই পূর্ব পূর্ব যুগে ঐভাবে কাজ করে গেছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম destructive (ধ্বংসমূলক) ছিল। সেজন্য ঐ ধর্ম ভারত থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজী ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেনঃ

একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু—এ কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারছে না। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীর ধারণ করে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি।

স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ওদেশে সর্বদা সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?'

স্বামীজী॥ ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তিতর্ক-দর্শন-বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু করা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা বলত, 'ও আর তুমি নূতন কি বলছ? আমাদের প্রভু ঈশাই তো রয়েছেন।'

তিনি-চারি ঘণ্টা কাল ঐরূপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সেদিন অন্যান্য আগন্তুকদের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

৪

স্থান—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও আলমবাজার মঠ
কাল—মার্চ (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭

স্বামীজী যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, মঠ তখন আলমবাজারে ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে এবার

উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা-১০টা আন্দাজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করিবে, পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে ৺রাধাকান্তকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ীর চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানীর জাহাজ বার বার যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা-১০টা আন্দাজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করিবে, পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে ঁরাধাকান্তকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ীর চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানীর জাহাজ বার বার যাতায়াত করিতেছে। নহবতেপঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশবাবু
১২
পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছেন। ইত্যবসরে বহু লোকের সঙ্গে স্বামীজী গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া 'এই যে ঘোষজ!' বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবুও তাঁহাকে করজোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশবাবুকে পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঘোষজ, সেই একদিন আর এই একদিন।' গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, 'তা বটে; তবু এখনও সাধ যায়—আরও দেখি।' এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে সকল কথা হইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামীজী পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। র তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে।

স্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। শিষ্য উৎসব সম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজীও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।'

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর সর্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদগ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

বেলা তিনটের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'একখানা গাড়ী দেখ্—মঠে যেতে হবে।' অনন্তর আলমবাজার পর্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ীর একদিকে বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেনঃ

কেবল abstract idea (শুদ্ধ ভাব মাত্র) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এ-সব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে তো mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়া দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য ওগুলি ধর্মের বহিরাবরণ—প্রকৃত ধর্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

কিন্তু যারা ধর্ম কি, আত্মা কি—এ-সব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তারা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর্, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে, তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যাঁর নামে এত লোক একত্র হয়েছিল, তিনি কে, তাঁর নামেই বা এত লোক এল কেন—এ কথা তাদের মনে উদিত হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বৈ অপকার হবে না।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ঐ উৎসব-কীর্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে কি? আমাদের দেশে ষষ্ঠীপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাঁড়াইবে। মরণ পর্যন্ত লোকে ঐসব করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই এমন লোক তো দেখিলাম না, যে ঐসকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া উঠিল!

স্বামীজী॥ কেন? এই যে ভারতে এত ধর্মবীর জন্মেছিলেন, তাঁরা তো সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর ঐ-সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংগ্রহের জন্য অবতারকল্প মহা- পুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য॥ লোক-দেখান মানিতে পারেন—কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐ-সকল বাহ্য লোক ব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে?

স্বামীজী॥ কেন পারবে না? সত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাও তো relative (আপেক্ষিক)—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর যেমন বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও-কালিয়া রেঁধে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন, সেইরূপ।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য গাড়ীভাড়া দিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতর চলিল এবং স্বামীজীর পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল। স্বামীজী জল পান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা শতরঞ্চির উপর অর্ধশায়িত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এমন ভিড় উৎসবে আর কখনও হয়নি। যেন কলিকাতাটা ভেঙে এসেছিল!' স্বামীজী॥ তা হবে না? এর পর আরও কত কি হবে!

শিষ্য॥ মহাশয়, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েই দেখা যায়—কোন-না-কোন বাহ্য উৎসব-আমোদ আছেই। কিন্তু কাহার সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দেখিয়াছি শিয়া-সুন্নিতে লাঠালাঠি হয়!

স্বামীজী॥ সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্পাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি জানিস?—সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন—আবার বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দিক্ দিয়ে দেখলে ও-সকলই মিথ্যা মায়ামাত্র।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয়, আপনারও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগ-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মকেই তিনি বহুমান দিতেন।

স্বামীজী॥ তুই কি করে জানলি, আমরা সকলে ধর্মমতকে ঐরূপে বহুমান দিই না? এই বলিয়া স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ওরে, এ বাঙাল বলে কি?' শিষ্য॥ মহাশয়, কৃপা করিয়া ঐ কথা আমায় বুঝাইয়া দিন।

স্বামীজী॥ তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিস। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম তো জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য॥ তা বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান্ বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন সর্বসাধারণকে তাহা একেবারে বলিয়া দিন না।

স্বামীজী॥ আমি যা বুঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদান্তের অদ্বৈতমতটিকে ঠিক ধর্ম বলে থাকিস, তাহলে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন?

শিষ্য॥ আগে অনুভব করিব, তবে তো বুঝাইব। ঐ মত আমি পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী॥ তবে আগে অনুভূতি কর্। তারপর লোককে বুঝিয়ে দিবি। এখন লোকে প্রত্যেকে যে এক একটা মতে বিশ্বাস করে চলেছে, তাতে তোর তো বলবার কিছু অধিকার নেই। কারণ তুইও এখন তাদের মত একটা ধর্মমতে বিশ্বাস করে চলেছিস বৈ তো নয়।

শিষ্য॥ হাঁ, আমিও একটা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ—শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজী॥ শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ্ প্রমাণ হলে বাইবেল জেন্দাবেস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য॥ এই সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মত উহারা তো আর প্রাচীন গ্রন্থ নয়। আবার আত্মতত্ত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, এমন তো আর কোথাও নাই।

স্বামীজী॥ বেশ, তোর কথা না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নেই, এ কথা বলবার তোর কি অধিকার?

শিষ্য॥ বেদ ভিন্ন অন্য সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মানিয়া যাইব। আমার ইহাতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজী॥ তা কর্, তবে আর কারও যদি ঐরূপ কোন মতে খুব বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস। দেখবি—পরে তুই ও সে একই জায়গায় পৌঁছবি। মহিম্নস্তবে পড়িসনি?—'ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।'
১৩

৫

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্, আমার সঙ্গে যাবি'। বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তিনি শিষ্যের সঙ্গে উঠিলেন; গাড়ী দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য॥ মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজী॥ চল্ না, দেখবি এখন।

এইরূপে কোথায় যাইতেছেন সে বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না বলিয়া গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে—কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, 'তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস?'

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল-কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম.এ, বি.এ পাস করিতেছে।

স্বামীজী॥ ও তো বিলাতী ঢঙে হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর! গবর্ণমেণ্টের statistic-এ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষেশতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent (শতকরা একজন)-ও হবে না, তা না হলে কি দেশের এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এ-সব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? তোরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখেছিস—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভেতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার যো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে; কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐসকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) করে তুলেছিস। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হল? মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ী এইবার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের রাস্তায় চল্।' গাড়ী যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, 'মহাকালী পাঠশালা'র স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে দুই-চারিজন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 'শিবের ধ্যান' সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ পরে তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিলেন না বলিয়া স্কুলের দুই-তিনটি শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিলে মাতাজী একজন কুমারীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন এবং 'রঘুবংশে'র তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, 'আমি ভগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।'

বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজী স্কুল সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় (Visitors' Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজীও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্যের এখনও মনে আছে—'The movement is in the right direction' (স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে)।

অনন্তর মাতাজীকে অভিবাদন করিয়া স্বামীজী পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেনঃ

স্বামীজী॥ এঁর (মাতাজীর) কোথায় জন্ম! সর্বস্ব-ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হল না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বথা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, গার্গী খনা লীলাবতীর মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কই?

স্বামীজী॥ দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নেই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হতে পারে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে যেভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইতে পারিলে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত। স্বামীজী॥ ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার-তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতিসূচক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখো লোক জড়ো করে চেঁচাতে লাগল 'আমরা আইন চাই না'। অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজী॥ কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য॥ এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজী॥ অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মাবে কেমন করে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সে- মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি, কলিকাতার অনেক স্থানে শাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের বাঙাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজী॥ ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা-আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ—সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।

শিষ্য॥ মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজী॥ ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এ-সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখান উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের

জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

গাড়ী এইবার বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহার তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃতান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (এ ছাড়া অন্য পথ নেই)। শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'যেন পেহ্লাদের দলে যাসনি।' ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'শুনিসনি? ক-অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি করে হবে? অবশ্য প্রহ্লাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে। ভক্তদের ভেতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।' সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার যখন যে দিকে ঝোঁক উঠবে—তার একটা হেস্তনেস্ত না হলে তো আর শান্তি নেই। এখন যা হচ্ছে, তাই হবে।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৬-১০

৫

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্, আমার সঙ্গে যাবি'। বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তিনি শিষ্যের সঙ্গে উঠিলেন; গাড়ী দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য॥ মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজী॥ চল্ না, দেখবি এখন।

এইরূপে কোথায় যাইতেছেন সে বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না বলিয়া গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে—কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, 'তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস?'

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল-কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম.এ, বি.এ পাস করিতেছে।

স্বামীজী॥ ও তো বিলাতী ঢঙে হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর! গবর্ণমেণ্টের statistic-এ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষেশতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent (শতকরা একজন)-ও হবে না, তা না হলে কি দেশের এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এ-সব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? তোরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখেছিস—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভেতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার যো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে; কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐসকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) করে তুলেছিস। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হল? মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ী এইবার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের রাস্তায় চল্।' গাড়ী যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, 'মহাকালী পাঠশালা'র স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে দুই-চারিজন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 'শিবের ধ্যান' সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ পরে তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিলেন না বলিয়া স্কুলের দুই-তিনটি শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিলে মাতাজী একজন কুমারীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন এবং 'রঘুবংশে'র তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে

বিনীতভাবে বলিলেন, 'আমি ভগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।'

বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজী স্কুল সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় (Visitors' Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজীও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্যের এখনও মনে আছে—'The movement is in the right direction' (স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে)।

অনন্তর মাতাজীকে অভিবাদন করিয়া স্বামীজী পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেনঃ

স্বামীজী॥ এঁর (মাতাজীর) কোথায় জন্ম! সর্বস্ব-ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হল না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বথা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, গার্গী খনা লীলাবতীর মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কই?

স্বামীজী॥ দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নেই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হতে পারে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে যেভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইতে পারিলে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত। স্বামীজী॥ ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার-তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতিসূচক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখো লোক জড়ো করে চেঁচাতে লাগল 'আমরা আইন চাই না'। অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজী॥ কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য॥ এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজী॥ অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মাবে কেমন করে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সে- মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি, কলিকাতার অনেক স্থানে শাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের বাঙাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজী॥ ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা-আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ —সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং

নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।

শিষ্য॥ মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজী॥ ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এ-সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখান উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

গাড়ী এইবার বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহার তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃতান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (এ ছাড়া অন্য পথ নেই)। শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'যেন পেহ্লাদের দলে যাসনি।' ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'শুনিসনি? ক-অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি করে হবে? অবশ্য প্রহ্লাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে। ভক্তদের ভেতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।' সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার যখন যে দিকে ঝোঁক উঠবে—তার একটা হেস্তনেস্ত না হলে তো আর শান্তি নেই। এখন যা হচ্ছে, তাই হবে।'

৬

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—(মার্চ?), ১৮৯৭

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে ঋগ্বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। ম্যাক্সমূলার (Max Muller)-এর মুদ্রিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড় লোকের বাড়ী হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামীজী সস্নেহে তাহাকে কখনও কখনও 'বাঙাল' বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী ম্যাক্সমূলার-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

মনে হল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলার-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমূলারকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না! তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে! বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ—অরুন্ধতীর মত দুটিতে সংসার করছে!—আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়ছিল!

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি ম্যাক্সমূলার হইয়া থাকেন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিলেন কেন?

স্বামীজী॥ অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য, উনি ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি?—তাঁর কাছে ও-সব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি?—East India Company (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে, এ যুগে কেউ কি কখনও দেখেছে? ম্যাক্সমূলার নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript (পাণ্ডুলিপি) লিখেছেন; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

ম্যাক্সমূলার সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার 'বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির

বিকাশ হইয়াছে'—সায়নের এই মত স্বামীজী সর্বথা সমর্থন করিয়া বলিলেনঃ

'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন আমাদের মত সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরী হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও এরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' বুঝলি?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিষ না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈরী হইবে?

স্বামীজী॥ আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ্—এই ঘটটা ভেঙে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐসকল জিনিষের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিষগুলো, সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টিভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকৃতস্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা-আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূলরূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী॥ জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘট-শব্দ থাকতে যে পারে, তা তো বুঝেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিষগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙেচুরে গেলেও তত্তদ্বোধাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করিলেই তো ঘট তৈরী হয় না।

স্বামীজী॥ তুই আমি ঐরূপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন-ঘটন হতে পারে—তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা—'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' বা 'গো মানব ঘট পট' ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক-একটা করে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিষগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি—শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য॥ হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না। স্বামীজী॥ ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নির্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়—তারপর তাও শুনা যায় না। তাও আছে কি নেই—এরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্‌-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। বস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ-সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা-শুনা জিনিষ না হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি-আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে 'ওঁ'কার অনুভব করেন 'ওঁ'কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকের কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—'ক্ষীরে নীরবৎ।'

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ

বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়'
১৪
এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু Terminology-র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে।

এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—'কি জি. সি., এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।'

গিরিশবাবু॥ কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে, ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও-সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই।

এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।'

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নী, এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?' গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!'

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশবাবু॥ জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত।

শিষ্য॥ আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান্ কিনা! কিন্তু এই সব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশবাবু॥ বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথক্‌ত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দেখ্ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তিনটে একই জিনিষ? এই দেখ্ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদবেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই তো গিরিশবাবু সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি রে তোদের কি কথা হচ্ছিল?'

শিষ্য॥ এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

স্বামীজী॥ গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশবাবু) মত যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাবুকে)

imitate (অনুকরণ) করতে গেলে
অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর
কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখনও ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ আজ্ঞে হাঁ নয়। যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মত সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদ্‌যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি?

শিষ্য॥ হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, কি হবে ও-সব পড়ে? আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?

স্বামীজী॥ আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (দিক্) থেকে আমাদের দু- জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় 'মূকাস্বাদনবৎ'। আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি?

নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, শুনিলেন তো স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।'

গিরিশবাবু॥ তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?'

সদানন্দ॥ মহারাজ! যো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী॥ প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ॥ যো হুকুম মহারাজ!

স্বামীজী॥ জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায় —'মুক্তিঃ করফলায়তে।'

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব ওঠে?

গিরিশবাবু॥ তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!

এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

৭

স্থান—আলমবাজার মঠ, কলিকাতা
কাল—এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া স্বামীজী যখন কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময় স্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিষয় সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস অথবা আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে, বহুজনহিতকর,

বহুজনসুখকর কোন ঐহিক কার্যের অনুষ্ঠান এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতেন ও কৃপা করিতেন। এই সময় কতিপয় ভাগ্যবান্ যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে চারিজনকে
১৫
স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাহাদের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল।

ইহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, সেজন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হলে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ-বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।' স্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ কৃপাগুণে তাহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'তুই তো ভট্চায বামুন; আগামী কাল তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ
১৬
করিয়ে দিবি, পরদিন এদের সন্ন্যাস দিব। আজ পাঁজি-পুঁথি সব পড়ে শুনে দেখে নিস।' শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল।

শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া পিণ্ডাদি লইয়া গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ-সব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?' শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ

সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের মত অবস্থান করবে। ন ধননে ন চেজ্যয়া ... ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।
১৭

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল, শাস্ত্রজ্ঞানের আস্ফালন দূরীভূত হইল।

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেনঃ

তোমরা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম-বিষয়েই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়, 'একূল ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে।' ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' গীতাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।'
১৮

সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নইলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়। যে যতই বলুক না কেন, আমি বুঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়?

স্বামীজী॥ সিদ্ধ হয় কিনা হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস, ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য॥ মহাশয়, সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজী॥ সন্ন্যাসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে।
১৯
যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদ্ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবাকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায়—বিদ্বৎ সন্ন্যাস, বিবিদিষা সন্ন্যাস, মর্কট সন্ন্যাস এবং আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হল, তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে—এটি পূর্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে হয় না। এরই নাম 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস।' আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করতে লাগল—একে 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' বলে। সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম 'মর্কট সন্ন্যাস'। ঠাকুর যেমন বলতেন, বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেললে। আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তখন তাকে সন্ন্যাস দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী 'আতুর সন্ন্যাস' দিয়েছিলেন। সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাসগ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়ান্তর নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজী॥ সুকৃতিবশতঃ কোন-না-কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও দু-একজন মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ-মহাশয়'।

শিষ্য॥ মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী॥ পাগলের মত কি বলছিস? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস, ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে। ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজী॥ তা কে বললে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং'
২০
বলে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ-সব বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙে রাঙিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান্ বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, 'বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।'

স্বামীজী॥ মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান্ বুদ্ধ তার ঢের আগে।

রামকৃষ্ণানন্দ। তা হলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকত; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্মের আলোচনা দেখা যায় না, তখন তুমি কি করে বলবে—বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক? দু-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।

স্বামীজী॥ History (ইতিহাস) পড়ে দেখ্। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ॥ আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সজীব করে গেছেন মাত্র।

স্বামীজী॥ ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। History-কে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মানলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান্ বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। (পুনরায় সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।)

সন্ন্যাসের origin (উৎপত্তি) যখনই হোক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে এই ত্যাগব্রত অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাস-গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যারা সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য॥ মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া ইঁহারা বলেন, সন্ন্যাসীরা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক হন না।

স্বামীজী॥ লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল্ দেখি। শিষ্য॥ পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য-শিল্প পোষাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজী॥ মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এ-সব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো-তমো-ঘোর তমোগুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভেতরই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে; এরাই ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ সন্ন্যাসী—গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাদের অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিন আমেরিকার Red Indian-দের (আদিম অধিবাসীদের) মত প্রায় extinct (উজাড়) হয়ে যেত। গৃহীরা সন্ন্যাসীদের দুমুঠো খেতে দেয় বলে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শসকল তাদের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সব idea (উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাবগুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বস্ব-ত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত করে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে তারা তাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। দেশের লোকের সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাও আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদেই বর্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institution (আশ্রম)-এর নিন্দা করে। অন্য দেশে যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসারসাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

স্বামীজী॥ হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন তো ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোক চলবে। এই সন্ন্যাস institution (আশ্রম) দেশে ছিল বলেই তো তাঁর ন্যায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি? যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হস তো তোদের ধিক —শত ধিক।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মূর্তিমান্ 'সন্ন্যাস'রূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতে যেন অন্তর্মুখ হইয়া আপনা-আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেনঃ

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
২১

পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্।' পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগণভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’

৮

স্থান—আলমবাজার মঠ
কাল—মে, ১৮৯৭

দার্জিলিঙ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিষ্য স্বামীজীকে দার্জিলিঙে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজী তদুত্তরে লিখেন, নাগ-মশায়ের আপত্তি না হলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করব।

১৩০৩ সালের ১৯ বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, আজ তোকে ‘বলি’ দিতে হবে—না?

স্বামীজী শিষ্যকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়—এ-সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেনঃ ‘আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হলে তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ; নতুবা সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগোসনি।’—এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে ‘পারিব’ বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনিষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যরা ‘সমিৎপাণি’ হয়ে গুরুর আশ্রমে যেত। গুরু—অধিকারী বলে বুঝলে তাকে দীক্ষিত করে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপীন এঁটে বেঁধে রাখত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য॥ তবে কি, মহাশয়, আমাদের মত সূতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয়?

স্বামীজী॥ বেদে কোথাও সুতোর পৈতের কথা নেই। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনও লিখেছেন, ‘অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ।’ সুতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নেই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে ‘উপনয়ন’ বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই তো তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা—আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তা হলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে কতকগুলো হাড়মাসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগ-রূপ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড়মাস দান কর। শাস্ত্রে বলে—যাঁরা অধীত বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—‘নাত্র কার্যবিচারণা।’ এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস—‘অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।’
২২

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ‘বাবা, আয়’ বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘দোরে খিল দে।’ সেইরূপ করা হইলে বলিলেন, ‘স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বস।’ স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড

তখন কি এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে দুরদুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ... কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, শিষ্য তাহা বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, 'গুরুদক্ষিণা দে।' শিষ্য বলিল, 'কি দিব?' শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, 'যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।' শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেগুলি সব খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।'

দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দীক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের
২৩
আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বামীজীও তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতোমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল?'

স্বামীজী॥ বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি-তুমি' ভাব—যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম-দ্বন্দ্বভাব এসেছে, কমে যায়। 'আমা থেকে অমুক ভিন্ন'—এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না—'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।'
২৪

যত প্রকার দুর্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায়—weakness is sin. এই দুর্বলতা থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভেতরে আত্মা সর্বদা জ্বলজ্বল করছে, সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা—এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি আমি' করছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্তমান।

শিষ্য॥ তাহা হইলে এই সকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে?

স্বামীজী॥ যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই 'আমি আত্মা'—এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে 'পাপ পাপ' বলে, সেটা weakness (দুর্বলতা)-এর ফলে—'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা'—এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

শিষ্য॥ মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না! এইটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজী॥ এক ভাবে খুব কঠিন, আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। 'আমি' জিনিষটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিষটে নেই, তাকে নিয়ে আবার মারামারি কি? আমিত্ব-রূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (সম্মোহিত) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায়—এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের মধ্যে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন—এ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য নিজের প্রভায় নিজে জ্বলছে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বসংবেদ্য। যে জিনিষটে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি করে জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।'
২৫
তুই যা কিছু জানছিস, তা মন-রূপ কারণসহায়ে। মন তো জড়; তার পিছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি? তবে এইটে মাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধতার নিকট পৌঁছাতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছাতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্যন্ত। তারপর মন যখন বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনটাই তো 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'টাও তো আর থাকিবে না।

স্বামীজী॥ তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ 'আমিত্বে'র স্বরূপ। তখন যে 'আমি'টা থাকবে, সেটা সর্বভূতস্থ, সর্বগ—সর্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ—ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা গেল, তাতে যথার্থ 'আমি'

বা আত্মার কি?

যা বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হবে—‘কালেনাত্মনি বিন্দতি।’
২৬
শ্রবণ-মনন করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে, আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূম পান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেনঃ

এ সহজ বিষয়টা বুঝতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝতে পারছে না! আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানুষ-জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা!!

৯

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—মে (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েক দিন বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি একত্র হইতে আহ্বান করায় (১ মে) ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাটীতে সমবেত হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর-যত্ন করেছে! এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কাজ চালাতে পারবে। সেই জন্য এই সঙ্ঘে একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কাজ করা হবে।

আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহী-ভক্তগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নামা রাখা হইল—‘রামকৃষ্ণ-প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন।’ উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।
২৭

উদ্দেশ্যঃ মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই ‘প্রচারের’ (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রতঃ জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই ‘প্রচারের’ (মিশনের) ব্রত।

কার্যপ্রণালীঃ মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্যঃ ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগঃ ভারত-বহির্ভূত প্রদেশসমূহে ‘ব্রতধারী’ প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম-সংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার

সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারী এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার পর বলরাম বাবুর বাটীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিশন'-সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল; এখন দেখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।'

স্বামী যোগানন্দ॥ তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?

স্বামীজী॥ তুই কি করে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডীতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডী ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কখনও উপদেশ দেননি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয়নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী প্রতিবাদ না করায়
স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কপর্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর, দেখবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

স্বামী যোগানন্দ॥ তুমি যা ইচ্ছা করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ-সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কিনা; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।

স্বামীজী॥ কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন, তা আমি কি করব—বল্?

এই বলিয়া স্বামীজী কার্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, 'আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের ওর শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হত তো ধন্য হতুম।'

শিষ্য॥ মহাশয়, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন?

যোগানন্দ॥ তিনি বলতেন, 'এমন আধার এ যুগে জগতে আর আসেনি।' কখনও বলতেন, 'নরেন পুরুষ, আমি প্রকৃতি; নরেন আমার শ্বশুরঘর।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের থাক।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবীসকলও ব্রহ্ম হতে নিজের অস্তিত্ব পৃথক্ রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক্ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।' কখনও বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ-নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার।' কখনও বলতেন, 'শুকদেবের মত

তাকে মায়া স্পর্শ করতে পারেনি।'

শিষ্য॥ ঐ কথাগুলি কি সত্য, না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিতেন?

তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুত না।

শিষ্য॥ তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ॥ তুই বুঝতে পারিসনি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য।

স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'তোদের ওদেশে
২৮
ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে লোকে জানে কি?'

শিষ্য॥ মহাশয়, এক নাগ-মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে কৌতূহল হইয়াছে! কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার, এ কথা ওদেশের লোকেরা এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস করে না।

স্বামীজী॥ ও-কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে ঐ কথা বারংবার শুনলুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস করলুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা!

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, এ কথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী॥ কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন তাঁর শরীর যায় যায়, তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পার 'আমি ভগবান্', তবে বিশ্বাস করব—তুমি সত্যসত্যই ভগবান্। তখন শরীর যাবার দু-দিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' আমি শুনে আবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হল না—সন্দেহে, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—তা অপরের কথা আর কি বলব? আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে নির্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ-সব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভস্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি, মথুরবাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কি দেখিয়াছিলেন! তাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশ্বাস হইয়াছিল।

স্বামীজী॥ যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না; মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হল, দুর্যোধন ভেল্কিবাজী ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝবার যো নেই। না দেখে না শুনে কারও ষোল-আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য॥ কৃপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়?

স্বামীজী॥ হাঁও বটে, নাও বটে।

শিষ্য॥ কিরূপ?

স্বামীজী॥ যারা কায়মনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্ ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান্ প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বলতেন, 'তাঁর বালকের স্বভাব'; সেজন্য দেখা যায়—কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না; আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভেতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়—তাকে ভগবান্ অযাচিত কৃপা করে বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, এ কথা বলতে পারিস; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, 'তাঁর প্রতি নির্ভর কর—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা'; আবার কখনও বলতেন, 'তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।'

শিষ্য॥ মহাশয়, এ তো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এখানে দাঁড়ায় না।

স্বামীজী॥ যুক্তিতর্কের সীমা মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডীর মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)-ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম)-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন—আবার সে-সকলের বাইরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে সেই মূহূর্তে beyond law (নিয়মের গণ্ডীর বাইরে) চলে যায়। সেজন্য কৃপার কোন condition (বাঁধাধরা নিয়ম) নেই; কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ সৃষ্টিটাই তাঁর খেয়াল—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।'
২৯
যিনি খেয়াল করে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে পারেন, তিনি কি আর কৃপা করে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না? তবে যে কারুকে সাধন-ভজন করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য॥ মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামীজী॥ বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্। তা হলেই এই জগৎভেল্কি আপনি-আপনি ভেঙে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎ বিচার করতে হবে, 'আমি দেহ নই'—এইরূপ বিদেহ-ভাবে অবস্থান করতে হবে, 'আমি সর্বগ আত্মা'—এইটি অনুভব করতে হবে। এরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হল পরমপুরুষার্থ।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ তাঁর কৃপা তোদের প্রতি না থাকলে তোরা এখানে আসবি কেন? ঠাকুর বলতেন, 'যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আসবেই আসবে; যেখানে-সেখানে থাক বা যাই করুক না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে।' তোর কথাই ভেবে দেখ না, যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ—যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক্ বুঝেছেন, সেই নাগ-মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? 'অনেক- জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'
৩০
—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাকলে তবে অমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ-মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন',
৩১
তা একমাত্র নাগ-মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙাল দেশ ধন্য, নাগ-মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

জি.সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি—সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বল?

গিরিশবাবু॥ আমি আর কি বলব? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।

স্বামীজী॥ আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কাজ করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide (পরিচালনা) করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না!

গিরিশবাবু॥ তিনি বলেছিলেন, 'সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে?'

এইরূপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশবাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি—ঐরূপ কথা বেশী কইতে কইতে ওর সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়, সে যে কে—এ-কথা যদি জানতে পারে, তবে আর এক মুহূর্তও তার দেহ থাকবে না।' তাই দেখিয়াছি, সর্বদা ঠাকুরের কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার মনোনিবেশ করাইতেন। সে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

১০

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—জানুআরী, ১৮৯৮

কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিছুমাত্র বিরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক, কলেজের বহু ছাত্র—তিনি এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজীর প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্যগ্রহণ—সর্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্বিদগণও গ্রহণ দেখিতে নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্মপিপাসু নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর কিন্তু গ্রহণসম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্য আজ স্বামীজীকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সে বলরাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'তোদের দেশের মত রান্না করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।'

বলরাম বাবুদের বাড়ীতে মেয়েছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ী একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ীর ভিতরে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীন-মা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধন-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও বা 'দেখিস মাছের 'জুল' যেন ঠিক বাঙালদিশি ধরনে হয়' বলিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ভাত, মুগের দাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তনি রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই পাতা করিয়া খাইতে বসিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকী আছে বলিলেও শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মত বলিলেন, 'যা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়, আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।' শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের সুক্তনি ও ভাত দিয়া গেল, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজীকে অন্য সকল তরকারি আনিয়া দিবার পর যোগানন্দ প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী-মহারাজগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল না; কিন্তু স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু তিনি সেই সুক্তনি খাইয়া খুশী হইয়া বলিলেন, 'এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের 'জুল'টা যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।' টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এটা ঠিক যেন বর্ধমানী ধরনের হয়েছে।' অনন্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, 'যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।'

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, 'ওরে গেরন লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।' এই বলিয়া একটু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, 'এই পুণ্যক্ষণে গুরূপদসেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' এই ভাবিয়া শিষ্য শান্তমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্বগ্রাস
৩২
হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মত তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২০ মিনিট বাকী আছে, তখন স্বামীজী উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্যকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'লোকে বলে, গেরনের সময় যে যা করে, সে নাকি তাই কোটিগুণে পায়; তাই ভাবলুম মহামায়া এ শরীরে সুনিদ্রা দেননি, যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি তো এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হল না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।'

অনন্তর সকলে স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতঃপূর্বে কখনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক দুরদুর করিতে লাগিল; কিন্তু স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং শিষ্য উঠিয়া 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে 'গুরুভক্তি' ও 'ত্যাগে'র মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংসা করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, 'আহা! সুন্দর বলেছে।'

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) প্রভৃতি শিষ্যকে স্বামীজী কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শুদ্ধানন্দ ওজস্বিনী ভাষায়

‘ধ্যান’ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও ঐরূপ করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকী আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, ‘তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।’

শুদ্ধানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?’

স্বামীজী॥ কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে-কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

শিষ্য॥ শাস্ত্রে যে সবিষয় ও নির্বিষয়-ভেদ দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ কি?—এবং উহার মধ্যে কোন্‌টি বড়?

স্বামীজী॥ প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেত, কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে আবার কেমন art develop (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! যাক এখন সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্তন ও প্রচার করে গেছেন। তারপর কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, এ-কথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার যো নেই।

শিষ্য॥ মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

স্বামীজী॥ বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, তখন শুদ্ধ ‘অস্তি’ এই মাত্র বোধ থাকে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন?

স্বামীজী॥ ওগুলি পূর্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হতে যাচ্ছেন, তখন ‘মার’-এর অভ্যুদয় হল। ‘মার’ বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, মনের প্রাক্‌সংস্কারই ছায়ারূপে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য॥ তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্বে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তাহা কি মনঃকল্পিত?

স্বামীজী॥ তা নয় তো কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝতে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নেই। এই যে জগৎ দেখছিস, এটাও নেই। সকলই মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস দর্শন হয়, তখন ‘যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি’—সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সঙ্কল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে পারে এবং কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐ অবস্থা লাভ করে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি (সিদ্ধাই) লাভ করে পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ ‘শিব’ ‘শিব’ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, ‘ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নয়। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, এ-ই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। ‘সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।’
৩৩

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১১-১৫

১১

স্থান—শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাটী, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া
কাল—৬ ফেব্রুআরী, ১৮৯৮-(মাঘীপূর্ণিমা)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছেন। নবগোপাল বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী দ্বারা বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। স্বামীজীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। নবগোপাল বাবুর বাটীতে আজ তদুপলক্ষে উৎসব। ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায় ঐ জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাটীখানা আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাটীতে যাইবেন, সেই পথের দুই-ধারে অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী 'দুখানি ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে! কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরঘরে!' গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ-ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। লোকে যখন দেখিল, স্বামীজী অন্যান্য সাধুগণের মত সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' স্বামীজীর এই দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল; 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপাল বাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম, জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোর্সিলেনের মূর্তি। ঠাকুরপূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণীঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ। আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।'

স্বামীজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি; সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম, যেন-তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন?' সকলেই স্বামীজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের মত পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন।

পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই পূজা করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেনঃ

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। উৎসবান্তে শিষ্যও স্বামীজীর সঙ্গে গাড়ীতে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

১২

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—ফেব্রুআরী, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন।
৩৪
আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিষপত্র এখনও সব গুছান হয় নাই। ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজী নূতন বাড়ীতে আসিয়া খুব খুশী হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন গঙ্গা, কেমন বাড়ী! এমন স্থানে মঠ না হলে কি ভাল লাগে?' তখন অপরাহ্ন।

সন্ধ্যার পর শিষ্য স্বামীজীর সহিত দোতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেহই নাই; শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ 'অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নইলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে?'

ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণগান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট যেখানে রামায়ণগান হইত, স্বামীজী খেলাধূলা ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত হইতেন; বলিলেন—রামায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া তিনি বাড়ীঘর ভুলিয়া যাইতেন এবং রাত হইয়াছে বা বাড়ী যাইতে হইবে ইত্যাদি কোন বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। একদিন রামায়ণ-গানে শুনিলেন—হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল যে, সে রাত্রি রামায়ণগান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া বাড়ীর নিকটে কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত হনুমানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হনুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন এবং অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্তি রাখিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেন।

ছাত্রজীবনে দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদের সহিত কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। কখন যে তিনি পড়াশুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

শিষ্য॥ মহাশয়, স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখনও কোনরূপ vision দেখিতেন (আপনার দিব্যদর্শন হইত) কি?

স্বামীজী॥ স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ করে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করেছিলাম বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হল, তখনও বসে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসী-মূর্তি—মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন আমায় কিছু বললেন—এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পরে মনে হল, কেন এমন নির্বোধের মত ভয়ে পালালুম, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্তির কখনও দেখা পাইনি। কতদিন মনে হয়েছে—যদি ফের তাঁর দেখা পাই তো এবার আর ভয় করব না—তাঁর সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর তাঁর দেখা পাইনি।

শিষ্য॥ তারপর এ বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন কি?

স্বামীজী॥ ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাইনি। এখন বোধ হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেনঃ মন শুদ্ধ হলে, কামকাঞ্চনে বীতস্পৃহ হলে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভুত অদ্ভুত! তবে ওতে খেয়াল রাখতে নেই। ঐ-সকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। শুনিসনি, ঠাকুর বলতেন—'কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে!' আত্মাকে সাক্ষাৎ করতে হবে— ও-সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে?

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তন্ময় হইয়া কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন। পরে আবার বলিতে

লাগিলেনঃ

দেখ্, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝতে পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

যখন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা, কখনও আরও বেশী লেকচার দিতে হত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহা ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগল। ভাবতুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা বলব? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, তাইতো এখন কি উপায় করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মত এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে-সব যেন ইহজন্মে শুনিনি, ভাবিওনি! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ করে রাখলুম, আর বক্তৃতায় তাই বললুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি! কখনও বা এত জোরে জোরে তা হত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত—'স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কইছিলেন?' আমি তাদের সে-কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'মহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থূলদেহে কখনও কখনও তার প্রতিধ্বনি বাহির হইত।'

শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'তা হবে।'

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, 'সে দেশের পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিত। বিজ্ঞান-দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিত; তাই তারা আমায় অত খাতির করত। পুরুষগুলো দিনরাত খাটছে, বিশ্রামের সময় নেই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করে মহা বিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামীজী॥ হয়েছিল বৈকি। লোকে যখন আমায় খাতির করতে লাগল, তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল! কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য হয় না; তাই ঐ-সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে contradict (প্রতিবাদ) করে ক্ষমা চাইত। কখনও কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস বাবা, সংসার সবই দুনিয়াদারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এ-সব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস না?—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥
৩৫

লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা শতবর্ষ পরে তোর দেহপাত হোক, ন্যায়পথ থেকে যেন ভ্রষ্ট হসনি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যার ভীরু কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডোবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃকপাত করে রে? যা হবার হোক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে করবই করব—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবও তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে না।

শিষ্য॥ তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্বলতার চিহ্ন?

স্বামীজী॥ শাস্ত্র নির্ভরতাকে 'পঞ্চম পুরুষার্থ' বলে নির্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে 'দৈব দৈব' করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহা-কাপুরুষতার পরিণাম, কিম্ভূতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাপানর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যা-পাপের গল্প শুনেছিস তো? সেই গোহত্যা-পাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভুগে মরতে হল। আজকাল

সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলে পাপ-পুণ্য দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রে জল! সর্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে তো মুক্ত! কিন্তু ভাল-র বেলা 'আমি', আর মন্দের বেলা 'তুমি'—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতা! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের) ভেতর ইদানীং নাগ-মহাশয়।

বলিতে বলিতে নাগ-মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, 'অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটি দেখা যায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!

শিষ্য॥ তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা-ঠাকরুন (নাগ-মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।

স্বামীজী॥ ঠাকুর জনক-রাজার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথাও শোনা যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। তিনি ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য॥ মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজী॥ অমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাকলে তবে ঐরকম মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ-মহাশয় বাড়ীতে কিরূপ থাকেন?

শিষ্য॥ মহাশয়, কাজকর্ম তো কিছুই দেখি না। কেবল অতিথিসেবা লইয়াই আছেন; পালবাবুরা যে কয়েকটি টাকা দেন, তাহা ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য সম্বল নাই; কিন্তু খরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়ীতে যেমন হয় তেমনি! নিজের ভোগের জন্য সিকি পয়সাও ব্যয় নাই—অতটা ব্যয় সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা, সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি অভিন্ন-জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্য নিজের শরীরটাকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁশ। বাস্তবিক শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (অতিচেতন) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্বদা সেই অবস্থায় থাকেন।

স্বামীজী॥ তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তোদের বাঙাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

১৩

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—ফেব্রুআরী, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। সে-বার ঐ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা
৩৬
হয়। স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন।

জন্মতিথিপূজায় সে-বার বিপুল আয়োজন! স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'পৈতে এনেছিস তো?'

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী॥ দ্বি-জাতিমাত্রেরই
৩৭
উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা সব ব্রাত্য (পতিত) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই ব্রাত্য আবার উপনয়ন- সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি, সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

স্বামীজী॥ ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না, ছোঁব না' বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।' বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে

স্বামীজী॥ এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান করে আসতে বল্। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পরবে।
স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া অসিয়া, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থুল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল।

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া 'কূজন্তং রামরামেতি' স্তবটি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধ-নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা!

রামনামকীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন —'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ।' স্বামী সারদানন্দ
৩৮
'একরূপ-অরূপনাম-বরণ' গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেনঃ

পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার।' আমাদের সঙ্গে এঁর কোন প্রভেদ নেই।

গিরিশবাবু নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবাবুকে পরান হইল। গিরিশবাবু কোন আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন, 'জি. সি., তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শোনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বস্।'

গিরিশবাবুর তখনও মুখে কোন কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন, 'দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? কামকাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করুণা অনুভব করি!' কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না!

অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দী গান গাহিলেন। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজী নীচে বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত ভক্তরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন।

উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

তোরা হচ্ছিস দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ থেকে আবার দ্বি-জাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ একশত বার জপবি, বুঝলি?

গৃহস্থটি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রবাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী বারংবার বসিতে বলায় জড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন। স্বামীজী॥ মাষ্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শোনাতে হবে।

মাষ্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ ওজনের দুইটি পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পান্তুয়া দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখান হইলে স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরঘরে নিয়ে যা।'

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেনঃ

দেখছিস কেমন কর্মবীর! ভয় মৃত্যু—এ-সবের জ্ঞান নেই; এক রোখে কর্ম করে যাচ্ছে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'।

শিষ্য॥ মহাশয়, কত তপস্যার বলে তাঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে।

স্বামীজী॥ তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম করলেই তপস্যা করা হয়। কর্মযোগীরা কর্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনি আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল—চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কাজ করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন, যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে?

স্বামীজী॥ তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবান্ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্মও সেরূপ। সুতরাং যারা পরহিতে কাজ করে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, করে যা; আর একজনের কর্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস— কর্মটা আর তপস্যা নয়?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, পূর্বে 'তপস্যা' অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজী॥ যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝলি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ্ না, তপস্যার ফল লাভ হয় কিনা। পরার্থে কর্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী॥ নিজহিতের জন্য। এই দেহটা—যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এরূপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান—এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে? স্বামীজী॥ আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার—সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে ঐ কর্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে সর্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মত হয়ে বসে থাকা?

শিষ্য॥ তাহা না হইলেও সর্ববৃত্তির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন?

স্বামীজী॥ শাস্ত্রে যাকে 'সমাধি' বলা হয়েছে, সে অবস্থা তো আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল্? সে-জন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক সর্বভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য॥ তবেই তো এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশয় যে, জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী॥ শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্মযোগ' বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেনঃ

দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি,   নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি 'পরে॥
ভূতলে অতুল মণি,   কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা,   গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥
৩৯

গিরিশবাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। 'তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে'—পদটি বারবার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে' ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।

১৪

স্থান—কলিকাতা, বলরামবাবুর বাটী
কাল—মার্চ (?) ১৮৯৮

স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা—প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী ঐ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেনঃ

সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ॥

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক এক ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজির মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে কথা পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা বড় এবং উহা লাভ করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, 'মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

স্বামীজী॥ Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা) না হলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরুগোবিন্দ

common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেননি, কেবল সেটা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়ে আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিল।

স্বামীজী॥ সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমেই লাভ করা যায়। (শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া) তুই thought-reading (অপরের মনের কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখবি? চার-পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়ে দিতে পারি।

শিষ্য॥ তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজী॥ কেন? পরের মনের ভাব জানতে পারবি।

শিষ্য॥ তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজী॥ কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য॥ তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী॥ আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম—গ্রামের কোন লোকের উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। বাড়ীওয়ালার আগ্রহাতিশয্যে এবং নিজের curiosity (কৌতূহল) চরিতার্থ করবার জন্য ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, বহু লোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়াচুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, এরই উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। দেখলুম, তার কাছেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগান হচ্ছে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোন অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ইতোমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড়ে আমার কাছে এসে বলল, 'মহারাজ, আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন।' আমি তো ভেবে অস্থির! কি করি, সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হল। গিয়েই কিন্তু আগে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল। যেই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় তো অস্থির। থিওরী-মিওরী তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, এই ব্যাপারে কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না বলে চিন্তায় ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হল না দেখে কেবল মনে হতে লাগল, 'There are more things in heaven and earth ... than are dreamt of in your philosophy!'
৪০

শিষ্য॥ পরে ঐ বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী॥ না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বললুম। অনন্তর স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ

ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন; বলতেন, 'ঐ-সকল শক্তি-প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছান যায় না।' কিন্তু মানুষের এমনি দুর্বল মন, গৃহস্থের তো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকি দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায়। সিদ্ধাই-লাভটা যে একটা খারাপ জিনিষ, ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি। সে-জন্য দেখিসনি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, 'তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুড়ের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা বাঙালকে বল না।'

শিষ্য ঐ বিষয় ইতঃপূর্বে শুনে নাই, শুনিবার জন্য জেদ করিয়া বসিলে অগত্যা স্বামীজী ঐ কথা এইরূপে বলিলেনঃ

মান্দ্রাজে যখন মন্মথবাবুর
৪১
বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম—মা
৪২

মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না—তা বাড়ীতে লেখা তো দূরের কথা। মন্মথবাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলিকাতায় 'তার' করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মায়ের শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথবাবু বললেন যে, শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবনের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ সব খবর বলে দিতে পারে। মন্মথবাবুর অনুরোধেও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথবাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলে করে, পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁটকো ভূষ-কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' করে মান্দ্রাজী ভাষায় বুঝিয়ে দিলে—উনিই পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো আমাদের আমলেই আনলে না। তারপর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল; আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তারপর একটা পেন্সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়ল। তারপর প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বললে; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললে! ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে! এইরূপে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলিকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 'কাকতালীয়ে'র ন্যায়ই হোক, বা যাই হোক। যোগানন্দ॥ তুমি পূর্বে এ-সব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার ঐ-সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল!

স্বামীজী॥ আমি কি না দেখে, না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেল্কির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেল্কিই না দেখলুম। মায়া-মায়া!! রাম রাম! আজ কি ছাইভস্ম কথাই সব হল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর যে দিনরাত জানতে-অজান্তে বলে, 'আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা', সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

এই-সব ছাইভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসৎ বিচার করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ন করবি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া-ভেল্কিবাজি! এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য—এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্যই তোদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'

কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন, 'কাল আসবি তো?'

শিষ্য॥ আজ্ঞে আসিব বৈকি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে থাকে।

স্বামীজী॥ তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে।

১৫

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

হইল স্বামীজী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস।'

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, 'এসেছিস বাবা, বস্'—এই পর্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রের ভিতরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?' 'ও কিছু না' বলিয়া স্বামীজী পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরেও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, '৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন না?' পাদস্পর্শে স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙিল, যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল; বলিলেন, 'অমরনাথ-দর্শনের পর থেকে আমার

মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।' শিষ্য শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

স্বামীজী॥

অমরনাথ ও পরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম। যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেনঃ

অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ে একটা খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হল, ঐ পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।

শিষ্য॥ শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে ৺অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়; কথাটা কি সত্য?

স্বামীজী॥ হ্যাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য॥ পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন জীবজন্তুকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে।

স্বামীজী॥ হাঁ, ৩।৪টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝতে পারলুম না।

শিষ্য॥ মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি—গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া যদি কেহ সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় তাহার সত্যসত্য শিবদর্শন হইল।

স্বামীজী॥ শুনেছি পায়রা দেখলে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, আসিবার কাল তিনি সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অল্পদিন পরেই ৺ক্ষীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাতদিন তথায় অবস্থান করিয়া ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশে পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। প্রতিদিন এক মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীজীর মনে উঠিয়াছিলঃ

মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! পুরাকালে যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছু করিল না। হায়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, 'আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা—আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস? তোকে আমি রক্ষা করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।'

শিষ্য অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, 'যা কিছু দেখিস শুনিস তা তোর ভেতরে অবস্থিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছুই নেই।' শিষ্য স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, 'মহাশয়, আপনি তো বলিতেন—এই-সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনি মাত্র।'

স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'তা ভেতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মত ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস, তা হলে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—তেমনি।'

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইল; কারণ স্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না—যুক্তিতর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত!

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, 'মহাশয়, এই যে ভূতপ্রেতাদি যোনির কথা শোনা যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে? স্বামীজী॥ সত্য বৈকি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে! তুই দেখতে পাস না বলে তাদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে ঐসব ভূতুরে কাণ্ডে মন দিসনে, ভাববি ভূতপ্রেত আছে তো আছে। তোর কাজ হচ্ছে—এই শরীর-মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে

প্রত্যক্ষ করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনে হয়—উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্মাদি-বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না। স্বামীজী॥ তোরা তো মহাবীর; তোরা আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়লি—এই বিরাট বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জানলি—এতেও কি ভূতপ্রেত দেখে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কখনও দেখিয়াছেন কি?

স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সংসার-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখনও কখনও দূর-দূরের সংবাদসকলও আনিয়া দিত। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন—তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থে যাইয়া 'সে মুক্ত হয়ে যাক'—এইরূপ প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কিনা, এই প্রশ্ন করিলে স্বামীজী কহিলেন, 'উহা কিছু অসম্ভব নয়।' শিষ্য ঐ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে স্বামীজী কহিলেন, 'তোকে একদিন ঐ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য একদিন বুঝিয়ে দেব।' শিষ্য কিন্তু এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১৬-২০

১৬

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ'
৪৩
ইত্যাদি শ্লোক-দুইটি তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং ঋতং' ইত্যাদি স্তবটি রচনা করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখিস, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা।'

শিষ্য স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

স্বামীজী যে দিন ঐ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন স্বামীজীর জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু-ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও সে কখনও শোনে নাই।

শিষ্য স্তবটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'দেখ্, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে-শুনে দিতে।'

শিষ্য॥ মহাশয়, ও-সব স্খলন নয়—উহা আর্য প্রয়োগ।

স্বামীজী॥ তুই তো বললি, কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন? এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম কি?' বলে একটা বাঙলায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মত ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ্ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও করছে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি? এখন এ-সব সন্ন্যাসীদের দূরদূরান্তরে প্রচারকার্যে যেতে হবে—ছাইমাখা অর্ধ-উলঙ্গ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম তো জাহাজেই নেবে না; ঐরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে পৌঁছলেও তাকে কারাগারে থাকতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্তন) করে নিতে হয়। এরপর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verb (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি।
৪৪
ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মত দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেইজন্যই বাঙলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, অনেক কাল হইতে এ দেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্তন করা কি শীঘ্র সম্ভব?

স্বামীজী॥ তুই যদি পুরানো চালটা খারাপ বুঝে থাকিস তো যেমন বললুম নূতন ভাবে চলতে শেখ না। তোর দেখাদেখি আরও দশজনে তাই করবে; তাদের দেখে আরও ৫০ জনে শিখবে—এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভেতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠবে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কাজ না করিস, তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাজের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য॥ আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়, উৎসাহ বল ও তেজে হৃদয় ভরিয়া যায়।

স্বামীজী॥ হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা ‘মানুষ’ যদি তৈরী হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক করে idea (ভাব)-গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন ‘ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।’ সব দিকে practical (কাজের লোক) হতে হবে। থিওরীতে থিওরীতে দেশটা উৎসন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত করবার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে কাজ করে যাবে। তুলসীদাসের দোঁহায় আছে, শুনিসনি?—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক। তাদের ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পারা যায় না। ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’—শরীরে-মনে বল না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে-মুখে খুব জোর করবি। ‘আমি হীন, আমি হীন’ বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে যায়। শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

যার ‘মুক্ত’-অভিমান সর্বদা জাগরূক, সেই মুক্ত হয়ে যায়; যে ভাবে ‘আমি বদ্ধ’, জানবি জন্মে জন্মে তার বন্ধনদশা। ঐহিক পারমার্থিক উভয় পক্ষেই ঐ কথা সত্য জানবি। ইহ জীবনে যারা সর্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ করতে করতে আসে ও যায়। ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধরা’—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, এ-কথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্বদা বল্ ‘অভীঃ, অভীঃ।’ সকলকে শোনা ‘মাভৈঃ মাভৈঃ’—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্যের সূর্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডীর বাইরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন,

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

৪৫

যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ ভয়শূন্য হবেন, সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—‘অভীঃ, অভীঃ।’—বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল-নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন ‘অভীঃ’ মূর্তিমান্ হইয়া গুরুরূপে শিষ্যের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ এই দেহধারণ করে কত সুখে-দুঃখে—কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও-সব মূহূর্তকালস্থায়ী। ঐ-সকলকে গ্রাহ্যের ভেতর আনবিনি, ‘আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা’—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। ‘আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা’—এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ- কষ্টের সময় আপনা-আপনি ঐ ভাব মনে পড়বে, চেষ্টা করে আর আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুয্যের বাড়ী গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হাঁপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগল—‘সোঽহং সোঽহং’; বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম

৪৬

আর দেখছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে ‘সোঽহং সোঽহং’—কেবল শুনতে লাগলুম ‘একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন!’

শিষ্য॥ (স্তম্ভিত হইয়া) মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অনুভূতিসকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় না।

স্বামীজী॥ না রে! শাস্ত্রও পড়তে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠ একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class (ক্লাস) খুলছি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত পড়া হবে, অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।

শিষ্য॥ আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন?

স্বামীজী॥ যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘স্বামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম না! আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।’ ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভর্ৎসনা এল। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্রভাষ্যের অর্থ যেন

‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, ‘আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন করে উদ্ধার করলেন?’ তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরুও চূর্ণ করতে পারা যায়।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার সবই অদ্ভুত।

স্বামীজী॥ অদ্ভুত বলে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হলে কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, তা-ও লুকিয়ে যায়! যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান্— তাঁর কথা ভাব—সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হলে শাস্ত্রার্থ ‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা সর্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মা বিকাশ করবার চেষ্টা কর্। দেখবি— বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হলে দেখবি, দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহগর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্, জীবকে অভয় দিয়ে বল্—‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত’—Arise! Awake! And stop not till the goal is reached. (ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থামিও না।)

১৭

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—১৮৯৮

আজ দু-দিন হইল শিষ্য বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে স্বামীজীর কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ-সময় স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল নিত্য-উৎসব। কত ধর্মচর্চা, কত সাধনভজনের উদ্যম, কত দীনদুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে!

আজ স্বামীজী শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই সেবাধিকার পাইয়া শিষ্যের হৃদয়ে আজ আনন্দ আর ধরে না। প্রসাদ-গ্রহণান্তে সে স্বামীজীর পদসেবা করিতেছে, এমন সময় স্বামীজী বলিলেনঃ

এমন জায়গা ছেড়ে তুই কিনা কলিকাতায় যেতে চাস—এখানে কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার হাওয়া, কেমন সব সাধুর সমাগম! এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি?

শিষ্য॥ মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে। এখন যাহাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি, কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দিন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়।

স্বামীজী॥ আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য, দেশ কাল আকাশ—সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছলুম আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর ‘ব্রহ্মের’ ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহাসমুদ্র—জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। ‘অবাঙ্‌মনসোগোচরম্’ কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা ‘আমি ব্রহ্ম’ এ-কথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও ‘আমি’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদার্থ পৃথক্ থাকে—দ্বৈতভান থাকে। তারপর ঐরূপ অবস্থালাভের জন্য বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বললেন, ‘দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাজ হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাজ করা শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।’

শিষ্য॥ নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক নির্বিকল্প সমাধি হইলে তবে কি কেহই আর পুনরায় অহংজ্ঞান আশ্রয় করিয়া দ্বৈতভাবের রাজত্বে—সংসারে ফিরিতে পারে না?

স্বামীজী॥ ঠাকুর বলতেন, ‘একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবনের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিন মাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মত সংসাররূপ বৃক্ষ হতে খসে পড়ে যায়।’

শিষ্য॥ মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়, মনের কোন তরঙ্গই যখন আর থাকে না, তখন আবার বিক্ষেপের—আবার অহংজ্ঞান

লইয়া সংসারে ফিরিবার সম্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে কি নিমিত্তই বা সমাধি-অবস্থা ছাড়িয়া দ্বৈতরাজ্যে নামিয়া আসিবে?

স্বামীজী॥ বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' কিন্তু অবতারেরা এক-আধটা সামান্য বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার super conscious state (জ্ঞানাতীত ভূমি) থেকে conscious state-এ—'আমি তুমি'-জ্ঞানমূলক দ্বৈতভূমিতে আসেন।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি বলি কিরূপে? কারণ শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ নির্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বামীজী॥ মহাপ্রলয়ের পরে তবে সৃষ্টিই বা আবার কেমন করে হবে? মহাপ্রলয়েও তো সব ব্রহ্মে মিশে যায়? তারপরেও কিন্তু আবার শাস্ত্রমুখে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—সৃষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্তনের মত অবতার-পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুত্থানও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে?

শিষ্য॥ আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃসৃষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিন্তু সৃষ্টির বীজ ও শক্তির—আপনি যেমন বলেন potential (অব্যক্ত) আকার-ধারণ মাত্র?

স্বামীজী॥ তা হলে আমি বলব, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নেই—যা নির্লেপ ও নির্গুণ—তাঁর দ্বারা এই সৃষ্টিই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভব হয়, তার জবাব দে।

শিষ্য॥ ইহা তো seeming projection (আপাতপ্রতীয়মান বহিঃপ্রকাশ)! সে কথার উত্তরে তো শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির বিকাশটা মরুমরীচিকার মত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। ভাব-বস্তু ব্রহ্মের অভাব বা মিথ্যা মায়াশক্তিবশতঃ এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে।

স্বামীজী॥ সৃষ্টিটাই যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নির্বিকল্প-সমাধি ও সমাধি থেকে ব্যুত্থানটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস তো? জীব স্বতই ব্রহ্মস্বরূপ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে 'আমি আত্মা' এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হলে ভ্রম, কারণ শাস্ত্র বলছে, You are already that (তুমি সর্বদা ব্রহ্মই হয়ে রয়েছ)। অতএব 'অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি'—তুই যে সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিস, এটাই তোর বন্ধন।

শিষ্য॥ এ তো বড় মুশকিলের কথা; আমি যদি ব্রহ্মই, তবে ঐ বিষয়ের সর্বদা অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজী॥ Conscious plane-এ ('তুমি- আমি'র দ্বৈতভূমিতে) ঐ কথা অনুভূতি করতে হলে একটা করণ বা যা দ্বারা অনুভব করবি, তা একটা চাই। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা তো জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনটা চেতনের মত প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন, 'চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা'-চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্বের আবেশেই শক্তিকে চৈতন্যময়ী বলে মনে হয় এবং ঐ জন্যই মনকেও চেতনপদার্থ বলে বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে যে জানতে পারবি না, এ-কথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে তো আর কোন করণ নেই—এক আত্মাই আছেন; সুতরাং যাকে জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্তা কর্ম করণ—এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্য শ্রুতি বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' ফল-কথা conscious plane-এর (দ্বৈতভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্তা-কর্ম-করণাদির দ্বৈতভান নেই। মন নিরুদ্ধ হলে তা প্রত্যক্ষ হয়। অন্য ভাষা নেই বলে ঐ অবস্থাটিকে 'প্রত্যক্ষ' করা বলছি; নতুবা সে অনুভব-প্রকাশের ভাষা নেই! শঙ্করাচার্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে দ্বৈতভূমিতে তার আভাস দেন। সেজন্যই বলে, (আপ্তপুরুষের) অনুভব থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্তু 'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে যাওয়ার' মত; বুঝলি? মোট কথা হচ্ছে যে, 'তুই যে নিত্যকাল ব্রহ্ম' এই কথাটা জানতে হবে মাত্র; তুই সর্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা জড় মন (যাকে শাস্ত্রে 'মায়া' বলে) এসে সেটা বুঝতে দিচ্ছে না; সেই সূক্ষ্ম, জড়রূপ উপাদানে নির্মিত মনরূপ পদার্থটা প্রশমিত হলে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হন। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকার-স্বরূপ। পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে; তখনই অনুভূতি হবে— 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

অতঃপর স্বামীজী বলিলেন, 'তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি?—তবে শো।' শিষ্য স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চনা করিবার জন্য স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত আগ্রহে স্বামীজী সম্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুরা পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামি-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'তোর পূজা তো হল, কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কিনা ঠাকুরের পুজোর বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পুজো করলি?' কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, 'ওরে, দেখ্, আজ কি কাণ্ড করেছে! ঠাকুরের পুজোর থালা বাসন

চন্দন এনে ও আজ আমায় পুজো করেছে।' স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন?' কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।

শিষ্য গোঁড়া হিন্দু; অখাদ্য দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজী শিষ্যকে কখনও কখনও 'ভট্‌চায' বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতে জলযোগসময়ে বিলাতী বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজী সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, 'ভট্‌চাযকে ধরে নিয়ে আয় তো।' আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজী ঐ-সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদস্বরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'আজ কি খেলি তা জানিস? এগুলি ডিমের তৈরী!' উত্তরে সে বলিল, 'যাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।' শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'আজ থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপপুণ্যাদি, অভিমান জন্মের মত দূর হোক—আশীর্বাদ করছি।'

অপরাহ্নে স্বামীজীর কাছে মান্দ্রাজের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে মান্দ্রাজে স্বামীজী কয়েক দিন ইঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ঐ-সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া এবং অন্য নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, 'একদিন এখানে থেকেই যান না।' মন্মথবাবু তাহাতে রাজী হইয়া 'আর একদিন এসে থাকা যাবে' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৮

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—১৮৯৮

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, 'কি হবে আর চাকরি করে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।' শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাষ্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘারে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেনঃ

অনেক দিন মাষ্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারি করিস না।

শিষ্য॥ তবে কি করিব?

স্বামীজী॥ কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য॥ কি ব্যবসা করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজী॥ পাগলের মত কি বকছিস? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তরতর করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অন্য সব দেশে civilization (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা? ঘৃণিত কুক্কুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দশা হয়েছে! তোরা আবার তোদের বেদবেদান্তের বড়াই করিস! যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তয়ের করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস!

শিষ্য॥ কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়?

স্বামীজী॥ উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোখের বাঁধন ছিঁড়ে

ফেল, দেখবি মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইওরোপে পথে পথে ফেরি করগে। দেখবি—ভারত-জাত জিনিষের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম, হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করে করে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ্ না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরী করে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজী॥ নেবে কিনা, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি! আমার বহু বন্ধুবান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচিত) করে দিচ্ছি। তাদের ভেতর ঐগুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দেব। তারপর দেখবি—কত লোক তাঁদের follow (অনুসরণ) করবে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবিনি।

শিষ্য॥ করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজী॥ আমি যে করে হোক তোকে start (আরম্ভ) করিয়ে দেব। তারপর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফলতা) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী॥ তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই—আত্মপ্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম। হয় ঐ-প্রকার উদ্যোগ উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য মান্য সফল) হ—নয় তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর। তবে তো আমাদের মত ভিক্ষা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারুর দিকে চায় না। দেখছিস তো আমরা দুটো ধর্মকথা শোনাই, তাই গেরস্তেরা আমাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবিনি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে, parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দিষ্ট। যারা নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বসবার জন্যই front seat (সামনের আসনগুলি)। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই করে করে তোদের অন্ন পর্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের criticize (দোষগুণ-বিচার) করতে যাস—আহম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামিচি করলে কি হবে?

শিষ্য॥ মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজী॥ কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পাড়া যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণ রোগাক্রান্ত) জাত তৈরী হচ্ছিস। কেবল machine (কল)-এর মত খাটছিস, আর 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (মূলধন) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই-সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতর জাতিসকল তো আমাদের বুদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজী॥ তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মত শার্ট-কোট পরে সভ্য না-হয় নাই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলিকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মত একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, 'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।' তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শত- গুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদানপ্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও তো আবার কালে আমাদের মত উর্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে?

স্বামীজী॥ তা কেন হবে? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্ত ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভদ্র জাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভেতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল—বল্ দেখি? ঐরূপ sympathy (সহানুভূতি) ও সাহায্য পেলে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে। ভেবে দেখ্—গল-জাতের হাতে অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্য বলি, এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ ও-সব কথা এখন থাক; তুই এখন কি স্থির করলি, তা বল। যা হয় একটা কর। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ, নয় তো আমাদের মত 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিস সবই ক্ষণিক
—'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'
৪৭
। অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলম্ব করিস নে। এখুনি অগ্রসর হ। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।' পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

১৯

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী ও নূতন মঠভূমি
কাল—৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে; ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—এই বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র

ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন। তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুর-ঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।

শিষ্য॥ ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছেন?

স্বামীজী॥ (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মুখে শুনিসনি?—কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য॥ ওঃ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল?

স্বামীজী॥ 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন—তাঁদের ভেতর দল-ফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে রাঙিয়ে এক একজনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙীন কাঁচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট বলে দেখছি। অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎকালে ঐরূপ 'দল-ফল' সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোখ ঝলসে যায়; অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি সব ভেসে যায়। কাজেই 'দল-ফল' করবার তাদের অবসর হয় না; কেবল যে যার নিজের ভাবে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং সেজন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া বসে?

স্বামীজী॥ হাঁ, এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ্ না, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিনশ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু ঐ-সকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।

শিষ্য॥ তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় হইবে?

স্বামীজী॥ হবে বৈকি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

এইরূপ কথাবার্তা চলিতে চলিতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।

সকলেই করজোড়ে ঐরূপে প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নেই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে নিয়ে চল।' শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ভয় নেই, মাথায় কর, আমার আজ্ঞা।'

শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটা-মস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ

করছেন। সাবধান, আজ থেকে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিসনে।' একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন, 'দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।'

এইরূপে নির্বিঘ্নে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেনঃ

ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বার বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ী করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এরূপ হলে কেমন হয় বল দেখি?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা!

স্বামীজী॥ কল্পনা কি রে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র করে দিচ্ছি—এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব; আর তোদের ভেতর নানা idea (ভাব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বড় বড় principle (নীতি) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ (কর্মক্ষেত্রে) দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে practical religion (কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম)।

এইরূপে নানা প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাহাকে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোন মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজী॥ শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল বলে বোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটু দক্ষিণী ভট্টাচার্য গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না—এ কথা বেদান্তভাষ্যে কেমন সমর্থন করে গেছেন! বলিহারি বিচার! বিদুরের
৪৮
কথা উল্লেখ করে বলেছেন—তার পূর্বজন্মের ব্রাহ্মণ-শরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি ঐরূপ কোন শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই তার হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে কাজ কি রে বাবা? বেদ তো ত্রৈবর্ণিক-মাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হৃদয় যে, কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন—তাদের তর্কে হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কিনা তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের ঐরূপ কাজকে fanaticism (সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু দেখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজ-জীবন দান করতে সর্বদা প্রস্তুত! দেখ্ দেখি কি উদারতা —কি দয়া!

শিষ্য॥ বুদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য এক প্রকারের পাগলামি বলা যাইতে পারে না? একটা পশুর জন্য কিনা নিজের গলা দিতে গেলেন!

স্বামীজী॥ কিন্ত তাঁর ঐ fanaticism (ধর্মোন্মাদ)—এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হল—তা দেখ্! কত আশ্রম-স্কুল-কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হল, তা ভেবে দেখ্! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে এ-সব ছিল কি?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ত্ব—তাও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ (কার্যক্ষেত্রে) আনলেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্তি।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙিয়া দিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তৎ-প্রচারিত ধর্ম ভারত হইতে কালে নির্বাসিত হইয়াছে—এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ বৌদ্ধধর্মের ঐরূপ দুর্দশা তাঁর teaching-এর (শিক্ষার) দোষে হয় নাই, তাঁর follower (চেলা)-দের দোষেই হয়েছিল; বেশী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চা করে) তাদের heart (হৃদয়)-এর উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোন তন্ত্রে নেই। বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগন্নাথক্ষেত্র'—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জানতে পারবি। রামানুজ ও চৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রটা বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐ-সকল মহাপুরুষের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্তি ধারণ করেছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য?

স্বামীজী॥ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান-মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ—কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐ-সকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এইজন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে। তবে স্থির জানবি মানবদেহের চেয়ে আর কোন বড় তীর্থ নেই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নয়। ঐ যে জগন্নাথের রথ, তাও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস না—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'
৪৯
ইত্যাদি, 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে'—এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—এর মানে হচ্ছে, তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা করে তুই কিম্ভূতকিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্বদা 'আমি' বলে ধরে নিচ্ছিস, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হত, তা হলে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ! ৺জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্তি-অবলম্বনে উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়, অতএব ঐ মূর্তিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম আলাদা?

স্বামীজী॥ তাই তো, নইলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই truth (সত্য), তবে relative truth different in degrees (আপেক্ষিক সত্যে তারতম্য আছে)। মানুষ যা কিছু সত্য বলে জানে, সে সকলই ঐরূপ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান্। এই আত্মা জড়ের ভেতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, 'জীব'নামধারী মানুষের ভেতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগরিত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণে, বুদ্ধ-শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই super conscious stage-এ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—'অবাঙমনসোগোচরম্।'

শিষ্য॥ মহাশয়, কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে—'ঐ-সকল কথা ছাড়িয়া সর্বদা ভাবে থাক।'

স্বামীজী॥ তারা যা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ করতে করতে তাদের ভেতরেও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠবেন। আমরা (সন্ন্যাসীরা) যা করছি, তাও আর এক রকম ভাব। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির মত কোন একটা ভাব ভগবানে আরোপ করে সাধনা করা—আমাদের ভাব কেমন করে হবে? ও-সব আমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না বলে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্বদা বলবি, শুনবি, বিচার করবি। ঐরূপ করতে করতে কালে দেখবি—তোর ভেতরেও সিঙ্গি (সিংহ, ব্রহ্ম) জেগে উঠবেন। ঐ সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বলেছেনঃ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল।

২০

স্থান—কলিকাতা
কাল—১৮৯৮

আজ তিন দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন। আজ সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, 'তোরা আগে চলে যা আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।' ...

প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া পশুশালায় উপস্থিত হইলেন। বাগানের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্মবাবু উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীবজন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি-সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।' কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, 'তোরা না কচ্ছপ খাস? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে; তা হলে তোরা সাপই খাস!' ইহা শুনিয়া শিষ্য ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া গেলে যখন তাহার পূর্বের আকৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন?'

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্মবাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্মবাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থ রামব্রহ্মবাবুর বাসাবাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্মবাবু॥ ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

স্বামীজী॥ ডারুইনের কথা সঙ্গত হলেও evolution (ক্রমবিকাশবাদ)-এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।

রামব্রহ্মবাবু॥ এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী॥ সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলে আমার ধারণা।

রামব্রহ্মবাবু॥ সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়। স্বামীজী॥ নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্তন), natural selection (প্রাকৃতিক নির্বাচন) প্রভৃতি যে-সকল নিয়ম কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ-সকলের একটিও তার কারণ বলে সমর্থিত হয়নি। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (জাতি) থেকে আর এক species-এ (জাতিতে) পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা (প্রকৃত্যাপূরাৎ)
৫০
সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles-এর (প্রতিবন্ধক বা বাধার) সঙ্গে দিনরাত struggle (লড়াই) করে যে ওটা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তা হলে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্ত ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার পাপীর প্রাণসংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য Struggle Theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভরূপ মত)-টা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, 'ভারতবর্ষে এখন আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিকাশবাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।'

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী অদ্য পশুশালা দেখিতে গিয়া রামব্রহ্মবাবুর ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া উপস্থিত সকলে ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব স্বামীজী আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই

পাড়িল।

শিষ্য॥ মহাশয়, পশুশালার ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজী॥ কেন, কি বুঝিসনি?

শিষ্য॥ এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উল্টা কথা বলিলেন। স্বামীজী॥ উল্টো বলব কেন? তুই-ই বুঝতে পারিসনি। Animal kingdom-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে) আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্যজগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞানবুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। মনে কর, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচারবুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য Animal Kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মত rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন করে progress (উন্নতি) হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের Struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানব- জীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মত মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য॥ তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজী॥ তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality (বিচারবুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হলে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) করবি কি করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণবিকাশস্থল) 'মানুষ' পদবাচ্য আছিস? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাসনি, এই ঢের। ঠাকুর বলতেন, 'মান হুঁশ আছে যার, সেই মানুষ।' তোরা তো 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস। তোরা animal (প্রাণী), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি। থিওরী-ফিওরী রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা করে দেখ দেখি, তোরা animal and human planes-এর (মানব এবং মানবেতর স্তরের) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কিনা! Physique (দেহ)-টাকে আগে গড়ে তোল। তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু 'ব্রহ্মচর্যহীনেন' বলেছেন।

স্বামীজী॥ তা বলুনগে। আমি বলছি, the physically weak are unit for the realization of the Self (দুর্বল শরীরে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না)।

শিষ্য॥ কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়।

স্বামীজী॥ তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস, তা হলে তারা যত শীগগীর তা work out (কার্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিস না, ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শুঁটকো লোকগুলো শীগগীর রেগে যায়—শীগগীর কামমোহিত হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী॥ তা নেই কে বলছে? মনের ওপর একবার control (সংযম) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে যে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না; ঠাকুর বলতেন, 'শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।' কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, 'আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভট্চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?

শিষ্য॥ তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম; আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী॥ তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মানবে না!

শিষ্য॥ না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ২১-২৫

২১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—১৮৯৮

আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে এবং বর্তমান মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখনও জঙ্গলপূর্ণ। জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠাবাড়ী ছিল; উহারই সংস্কার করিয়া বর্তমান মঠ-বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বলিলেনঃ

এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন ও জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals (উচ্চাদর্শসকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে এরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।

মঠের দক্ষিণ ভাগে ঐ যে জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ দর্শন বিজ্ঞান কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ভক্তি শাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ 'বিদ্যামন্দির' স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস করে শাস্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন-বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এ-সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ)-এর পর ইচ্ছে হলে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে পারবে। মঠে মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছে হলে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, মঠস্বামিগণ তাদের তখনি বহিষ্কৃত করে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে অধ্যয়ন করান হবে। এতে যাদের objection (আপত্তি) থাকবে, তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে। তারা অধ্যয়ন-মাত্র সকলের সঙ্গে একত্র করবে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হলে কেউ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারবে না। ক্রমে এরূপে যখন এই মঠের কাজ আরম্ভ হবে, তখন কেমন হবে বল দেখি?

শিষ্য॥ আপনি তবে প্রাচীনকালের মত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান?

স্বামীজী॥ নয় তো কি? Modern system of education-এ (বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে) ব্রহ্মবিদ্যা-বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নেই। পূর্বের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে এখন broad basis (উদারভাব)-এর উপর তার foundation (ভিত্তিস্থাপন) করতে হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে বলব।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

মঠের দক্ষিণে ঐ যে জমিটা আছে, ঐটিও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের 'অন্নসত্র' হবে। ঐখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবার বন্দোবস্ত থাকবে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন funds (টাকা) জুটবে, সেই অনুসারে ঐ অন্নসত্র প্রথম খুলতে হবে। চাই কি প্রথমে দু-তিনটি লোক নিয়ে start (আরম্ভ) করতে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারীদের এই অন্নসত্র চালাতে train করতে (শেখাতে) হবে! তাদের যোগাড়-সোগাড় করে, চাই কি ভিক্ষা করে এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ-বিষয়ে কোন রকম অর্থসাহায্য করতে পারবে না। ব্রহ্মচারীদের ওর জন্য অর্থসংগ্রহ করে আনতে হবে। সেবাসত্রে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হলে তবে তারা 'বিদ্যামন্দির'-শাখায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে। অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর—একুনে দশ বৎসর training (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে—অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে হয় এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝে মঠাধ্যক্ষগণ তাদের সন্ন্যাসী করা অভিমত করেন। তবে কোন কোন বিশেষ সদগুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করে মঠাধ্যক্ষ তাকে যখন ইচ্ছে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্বে যেমন বললুম, সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার মাথায় এই-সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মঠে এরূপ তিনটি শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে?

স্বামীজী॥ বুঝলিনি? প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে। অন্নদান করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থকর্মতৎপরতা ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্মল হয়ে তাতে সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যালাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, জ্ঞানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানের শাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী॥ তুই এতক্ষণেও কথাটা বুঝতে পারলিনি! শোন—এই অন্ন-হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে সেবাকল্পে ভিক্ষা-শিক্ষা করে যেরূপে হোক দুমুঠো অন্ন দীনদুঃখীকে দিতে পারিস, তা হলে জীব-জগতের ও তোর মঙ্গল তো হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই এই সৎকাজের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। ঐ সৎকাজের জন্য তোকে বিশ্বাস করে কামকাঞ্চনবদ্ধ সংসারীরা তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কাজে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি, তত আর কোন কাজে পাবিনি। যথার্থ সৎকাজে মানুষ কেন, ভগবান্‌ও সহায় হন। এরূপে লোক আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্যে দিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি। তাই আগে অন্নদান।

শিষ্য॥ মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম-স্থান চাই, তারপর ঐজন্য ঘর-দ্বার নির্মাণ করা চাই, তারপর কাজ চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

স্বামীজী॥ মঠের দক্ষিণ দিক্‌টা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি দুটি অন্ধ আতুর সন্ধান করে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা করে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি—তোর এই কাজে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'
৫১

শিষ্য॥ হাঁ, তা বটে। কিন্তু ঐরূপে নিরন্তর কর্ম করিতে করিতে কালে কর্মবন্ধন তো ঘটিতে পারে?

স্বামীজী॥ কর্মের ফলে যদি তোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হলে ঐ সব সৎকাজ তোর কর্মবন্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। ঐরূপ কর্মে বন্ধন আসবে!—ও-কথা তুই কি বলছিস? এরূপ পরার্থ কর্মই কর্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

শিষ্য॥ আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী॥ গরীব-দুঃখীদের জন্য well-ventilated (বায়ু-চলাচলের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দু-জন কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের ভাল বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবেন। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। সেবাশ্রমটি অন্নসত্রের ভেতর একটা ward (বিভাগ)-এর মত থাকবে, তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল 'দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্' এই রব উঠবে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য॥ আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টি বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী গঙ্গার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেনঃ

তোদের ভেতর কার কবে সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো দুনিয়াময় অমন কত অন্নসত্র হবে। কি জানিস, জ্ঞান শক্তি ভক্তি—সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট বলে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একটা পর্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল করে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

ঈশ্বর করেন তো এ মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখতে পায়, তা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম তখন মনে হল, যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলছে! আমি তো যথাসাধ্য করছি ও করব—তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে। বেদান্ত কেবল পড়ে কি হবে? Practical life (কর্মজীবন)-এ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।

শিষ্য॥ মহাশয়, ধ্যানসহায়ে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজী॥ সেটা তো নেশা করে অচেতন হয়ে থাকার মত; শুধু ঐরূপ থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখনও বা তাণ্ডব নৃত্য করবি, কখনও বা বুঁদ হয়ে থাকবি। ভাল জিনিষ পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতি লাভ করে না-হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে! তখনই নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! 'নিরবধি গগনাভম্'—আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মত যত্ন না করে থাকতে পারবিনি। এরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta (কর্মে পরিণত বেদান্তের অনুভূতি)—বুঝলি। তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যবহারিকভাবে বহুরূপে সামনে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম-রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে পাস?—একমাত্র মাটি, যা এর প্রকৃতি সত্তা। সেরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ—সব ভাবছিস ও দেখছিস। জ্ঞান-প্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব কোন সত্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন—যা কিছু সবই নামরূপসহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল, তখনি ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য॥ এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ কোত্থেকে এল তা পরে বলব। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়ুতে লাগলি, তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল?—না, তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন করে ছুটিয়েছিল?

শিষ্য॥ অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী॥ তা হলে ভেবে দেখ—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া বলে জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্বকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কিনা? তখন নামরূপ মিথ্যা বলে বোধ হবে কি না?

শিষ্য॥ তা হবে।

স্বামীজী॥ তা যদি হয়, তবে নাম-রূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। এরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল। এই অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব-বিভাসক আত্মার সত্তা বুঝতে পারিসনে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্তাটাকে কেবল অনুভব করবি, তখনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মানুভূতি হবে—তখনি 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ৫২

শিষ্য॥ মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী॥ যে জিনিষটা পরে থাকে না—সে জিনিষটা যে মিথ্যা, তা তো বুঝতে পেরেছিস? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে সে বলবে, অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে—সাপ বলে দেখতে পায় না। যারা দড়াকে সাপ বলে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! সেজন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নেই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না—'সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো'। যে জিনিষটা এরূপে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হতে পারে না। কেন, তা শোন।—এই প্রশ্নোত্তরটাও তো সেই নাম-রূপ বা দেশকাল ধরে করা হচ্ছে। যে ব্রহ্মবস্তু নাম-রূপ-দেশ-কালের অতীত, তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বোঝান যায়? এইজন্য শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারিকভাবে সত্য—পারমার্থিকরূপে সত্য নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞানের অস্তিত্বই নেই, তা আবার বুঝবি কি? যখন ব্রহ্মের প্রকাশ হবে, তখন আর ঐরূপ প্রশ্ন করবার অবসরই থাকবে না। ঠাকুরের সেই 'মুচি-মুটের গল্প' শুনেছিস না?—ঠিক তাই। অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে?

স্বামীজী॥ যে জিনিষটাই নেই, তা আবার আসবে কি করে?—থাকলে তো আসবে?

শিষ্য॥ তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজী॥ এক ব্রহ্মসত্তাই তো রয়েছেন! তুই মিথ্যা নাম-রূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখছিস।

শিষ্য॥ এই মিথ্যা নাম-রূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহরূপে নিত্যপ্রায় বলেছে, কিন্তু ওটা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্বদা দড়ার মত স্ব-স্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। বুঝলি?

শিষ্য॥ একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী॥ কি বল্ না? শিষ্য॥ এই যে আপনি বলিলেন, এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাহাদের কোন স্বরূপ-সত্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্বে দেখে নাই, সে জিনিষের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন সর্পভ্রম হয় না; সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই, তার ব্রহ্মে সৃষ্টিভ্রম হইবে কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে, তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে! ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজী॥ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখছেন। রজ্জুই দেখছেন, সাপ দেখছেন না। তুই যদি বলিস, ‘আমি তো এই সৃষ্টি বা সাপ দেখছি’, তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। যখন তাঁর উপদেশে ও বিচার-বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান বা সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্টিভানাদি চলে এসে থাকে তো থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নেই। ব্রহ্মতত্ত্ব ‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ না হলে এ প্রশ্নের পর্যাপ্ত মীমাংসা হতে পারে না এবং হলে আর প্রশ্নও উঠে না, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন ‘মূকাস্বাদনবৎ’ হয়।

শিষ্য॥ তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজী॥ ঐ বিষয়টি বোঝাবার জন্য বিচার। সত্য বস্তু কিন্তু বিচারের পারে—‘নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।’
৫৩

এইরূপ কথা চলিতে চলিতে শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে মঠে
৫৪
আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজী মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।’

২২

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? বক্তৃতাপ্রভাবে ইওরোপ-আমেরিকা মাতাইয়া আসিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উদ্যম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশগুলি অপেক্ষা—আমাদের বিবেচনায় এখানেই ঐরূপ উদ্যমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামীজী॥ এদেশে আগে ground (জমি) তৈরী করতে হবে, তবে বীজ ফেললে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, খুব উর্বর। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণমন, রোগশোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেকচার দিয়ে কি হবে?

শিষ্য॥ কেন, আপনিই তো কখনও কখনও বলিয়াছেন এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কার্যতঃ ধর্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে তেমন নহে। তবে আপনার জ্বলন্ত বাগ্মিতায় দেশ কেন না মাতিয়া উঠিবে—কেন না ফল হইবে?

স্বামীজী॥ ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির! বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানী, সবচেয়ে তোদের পরস্পরের ভেতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তোদের দেশের অস্থিমজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিষ্য॥ তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন?

স্বামীজী॥ প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে

গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা sleeping leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোড় একজন কি দুজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল্? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা করে একটা কেরানীগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?

শিষ্য॥ তবে কি আমাদের উপায় নাই?

স্বামীজী॥ অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি—পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার-ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাই সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে?' আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকল না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মত তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম।

স্বামীজী॥ দূর মূর্খ! শক্তি-ফক্তি কেই কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামীজী॥ তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস তো ভগবান্ তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—গীতায় পড়েছিস তো?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার বলে ভাববি কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু না দিয়ে খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চুষ্য দিয়ে পূর্তি করা—সে তো পশুর কাজ।

শিষ্য॥ মহাশয়, পরার্থে কার্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়; তাহা কোথায় পাইব?

স্বামীজী॥ বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর না। পয়সার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও তো তাদের শোনাতে পারিস। না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামীজী॥ 'হাঁ পারি' কেবল মুখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস—তা কাজে আমায় দেখা, তবে তো জানব আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা। কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথরও তো হচ্ছে মরছে—ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—'তোমাদের ভেতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী করগে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্য ভাবনা নেই। এই দেখ্ না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের) ভেতর যারা আগে ভাবত তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে। আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরী করিসনি —মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি বলে আর বসে থাকিসনি—তা হলে কিছুই হবে না।

২৩

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তবে জগতে এত বিচিত্রতা দেখা যায় কেন?

স্বামীজী॥ সত্যই হন বা আর যাই হন, ব্রহ্মবস্তুকে কে জানে বল্? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি। তবে সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে বিচারপথে অগ্রসর হলে কালে একত্বমূলে পৌঁছান যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হতে পারতিস, তা হলে এই বিচিত্রতাটা দেখতে পেতিস না।

শিষ্য॥ মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্বামীজী॥ বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে 'ব্যতিরেকী বিচার' বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে বিচার করে দেখান যে, সেটা ভাব নয়—অভাব বস্তু। তুই ঐরূপে মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে সত্যে পৌঁছানর কথা বলছিস—কেমন?

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাবরাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করি।

স্বামীজী॥ আচ্ছা। এখন দেখ, বেদ বলছে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম', যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তো মিথ্যা হচ্ছে। বেদ মানিস তো?

শিষ্য॥ বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি না মানে, তাহাকেও তো নিরস্ত করিতে হইবে?

স্বামীজী॥ তা ঠিক। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ করে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না; ইন্দ্রিয়গুলিও ভুল সাক্ষ্য দেয় এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বলতে হয় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই ঋষিরা 'যোগ' বলেছেন। যোগ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই ফল পাওয়া যায়। করে দেখ—হয়, কি না হয়। আমি বাস্তবিকই দেখেছি—ঋষিরা যা বলছেন, সব সত্য। এই দেখ—তুই যাকে বিচিত্রতা বলছিস, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়—অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য॥ কখন ঐরূপ করিয়াছেন?

স্বামীজী॥ একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ী, দোর-দালান, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল। তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল—চীৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলুম, 'ওগো, তুমি আমার কি করছ গো, আমার যে বাপ-মা আছে!' ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে 'তবে এখন থাক্' বলে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ী দোর-দালান যা যেমন সব ছিল, ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার একটি lake-এর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল। শিষ্য॥ (অবাক হইয়া) আচ্ছা মহাশয়, ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও তো হইতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি?

স্বামীজী॥ যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশা করে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি করে বলবি, বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থালাভের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্ব পূর্ব আচার্য ও ঋষিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য॥ না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শত শত এরূপ একত্বানুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—'ক্ব গতং কেন বা নীতং'
৫৫
ইত্যাদি।

স্বামীজী॥ জানবি, এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতি বলে—তা হলে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয় এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরূপে সমাধিতে সুখলাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুখে ধাববান হইতেছি কেন?

স্বামীজী॥ তুই মনে করছিস, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বুঝি? একটু ভেবে দেখ—বুঝতে পারবি, যে যা করছে, সে তা ভূমা সুখের আশাতেই করছে। তবে সকলে ঐ কথা বুঝে উঠতে পারছে না। সে পরমানন্দলাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্তে—ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি করে স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতে খাটছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। সেই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপে নজর আসবে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে—সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে।

শিষ্য॥ সে চৈতন্য হওয়া—মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হইলে কখনও হইবে না।

স্বামীজী॥ ঠাকুরের কৃপা-বাতাস তো বইছেই। তুই পাল তুলে দে না। যখন যা করবি, খুব একান্তমনে করবি। দিনরাত ভাববি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয়-ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি—সবই ক্ষণিক; এর পারে যা, তাই আমি।

শিষ্য॥ ঐ ভাব ক্ষণিক আসিলেও আবার তখনই উড়িয়া যায় এবং ছাইভস্ম সংসার ভাবি।

স্বামীজী॥ ও-রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে যাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি—যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি কি কখনও অন্যায় কাজ করতে পারি? আমি কি সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মত মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর করবি; তবে তো ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাকব।

স্বামীজী॥ মনে যখন ও-সব আসবে, তখন বিচার করবি। তুই তো বেদান্ত পড়েছিস? ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। এইরূপে জোর করে বাসনা ত্যাগ করতে করতে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন দেখবি স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য॥ আচ্ছা স্বামীজী, ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না।

স্বামীজী॥ আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ও-রকম কথা আছে। বৈরাগ্য-বিষয়বিতৃষ্ণা না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে 'ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি'—ব্রহ্মার কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জানবি—নোঙর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানার মত হচ্ছে! 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।'

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল?

স্বামীজী॥ ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে-সে লোক সামলাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ-ফঠ করছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ করে সুখ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আসতে হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন, তবে আমরা আর যাই কোথায়?

স্বামীজী॥ সংসারে রয়েছিস, তাতে ভয় কি? 'অভীরভীরভীঃ'—ভয় ত্যাগ কর। নাগ-মহাশয়কে দেখেছিস তো?—সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেউ হয় তো যেন নাগ-মহাশয়ের মত হয়। নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলো করে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি—যেন তাঁর কাছে যায়, তা হলে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ-মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর, তাঁকে জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামীজী॥ তা একবার বলতে? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব। তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব। তুই তাঁকে লিখিস।

শিষ্য॥ আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'পূর্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে।'

স্বামীজী॥ জানিস তো, নাগ-মহাশয়কে ঠাকুর বলতেন, 'জ্বলন্ত আগুন।'

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, তা শুনিয়াছি।

স্বামীজী॥ অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য॥ যে আজ্ঞা।

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া শিষ্য কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলঃ স্বামীজী কি অদ্ভুত পুরুষ—যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি আচার্য শঙ্কর!

২৪

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞানমার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামীজী॥ কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস

তো?
৫৬

শিষ্য॥ আজ্ঞা

স্বামীজী॥ কিন্তু মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবান্‌কে প্রেমস্বরূপ উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভেতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস তো কার ওপর আর হিংসাদ্বেষ করবি? সেই প্রেমানুভূতি এতটুকু বাসনা—ঠাকুর যাকে বলতেন 'কামকাঞ্চনাসক্তি'—থাকতে হবার যো নেই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকতে হবার যো নেই।

শিষ্য॥ তবে আপনি যাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামীজী॥ তা বৈকি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। দেখছিস তো বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে—'সৎ' অর্থাৎ অস্তিত্ব, 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, আর 'আনন্দ'ই প্রেম। ভগবানের সৎ-ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য-সত্তাটির ওপরেই সর্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ-সত্তাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র আনন্দস্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ।

শিষ্য॥ তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামীজী॥ কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য থেকে উপায় কখনও বড় হতে পারে না। কেন না, অধিকারিভেদে একই উদ্দেশ্যলাভ নানবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস—জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি—বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বলছেন—পুবমুখো হয়ে বসে ভগবান্‌কে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর একজন বলছেন—না, পশ্চিমমুখো হয়ে বসতে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয়তো একজন বহুকাল পূর্বে পুবমুখো হয়ে বসে ধ্যানভজন করে ঈশ্বরলাভ করেছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, পুবমুখো হয়ে না বসলে ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বললে—সে কি কথা? পশ্চিমমুখো বসে অমুক ভগবান্ লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে! আমরা তোদের ঐ মত মানি না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়তো হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরী হল—'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' কেউ আবার 'আল্লা' বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত চলতে লাগল। আমাদের এখন দেখতে হবে—এই সকল জপ-পূজাদির খেই (আরম্ভ) কোথায়। সে খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষায় 'শ্রদ্ধা' কথাটি বোঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা-কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত শ্রদ্ধা-কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্রমনে যে-কোন তত্ত্ব হোক না, ভাবতে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলছে বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। যুগ-পরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ করে সেইসব মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে ঐরূপ হয়েছে তা নয়-পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর বিচারবিহীন সাধারণ জীব ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ করে মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে এখন উপায় কি?

স্বামীজী॥ পূর্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছাগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সেগুলো সাফ করে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তোদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য॥ কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামীজী॥ কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেইসব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য॥ কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামীজী॥ এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবন-লীলা কি সত্য নহে?

স্বামীজী॥ তা কে বলছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি আপনি বলতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাদি ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামীজী॥ আমার তো বোধ হয় তাই—বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা; তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকী সব জানবি ঘোর তমোভাবাপন্ন—full of morbidity (মানসিক দুর্বলতা-সমাচ্ছন্ন)! তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) তো সকলকে লইয়া সংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।

স্বামীজী॥ তার কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়? তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন—সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারিনি! এজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন; তাঁর দেহটাই কেবল

মানুষের মত ছিল. কিন্তু চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল!

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি?

স্বামীজী॥ তোর অবতার কথাটার মানেটা কি? তা আগে বল?

শিষ্য॥ কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের মত পুরুষ।

স্বামীজী॥ তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ)-কে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা তো ছোট কথা। থাক এখন সে কথা, একটুকুই এখন শুনে রাখ—সময় ও সমাজ-উপযোগী এক এক মহাপুরুষের আসেন ধর্ম উদ্ধার করতে। তাঁদের মহাপুরুষ বল বা অবতার বল, তাতে কিছুই আসে যায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবনকে নিজ জীবন গঠন করবার ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গড়ন চলতে থাকে, মানুষ তৈরী হয় এবং সম্প্রদায় চলতে থাকে। কালে ঐ-সকল সম্প্রদায় বিকৃত হলে আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার তো শক্তি—বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামীজী॥ তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি!

শিষ্য॥ আজকাল অনেকে তো তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে!

স্বামীজী॥ তা করুক। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন করছে। তোর ঐরূপ বিশ্বাস হয় তো তুইও কর।

শিষ্য॥ আমি আপনাকেই সম্যক বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে! মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব।

অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য স্বামীজীর পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে।

২৫

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী! ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্থ, তাহাদের উপায় কি? তাহাদের তো দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

স্বামীজী॥ কাম-কাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না, তা গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জানবি—ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আসবে না।

শিষ্য॥ তবে গৃহস্থদিগের উপায়?

স্বামীজী॥ উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া, আর বড় বড়গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না, 'যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ'—বেদকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং তা বললেও হবে না।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয়-ত্যাগ হয়?

স্বামী। তা কি কখনও হয়? তবে সন্ন্যাসীরা কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা করছে; আর গেরস্তরা নোঙর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখনও মেটে কি রে? 'ভূয় এবাভিবর্ধতে'—দিন দিন বাড়তেই থাকে।

শিষ্য॥ কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে তো বিতৃষ্ণা আসিতে পারে?

স্বামীজী॥ দূর ছোঁড়া, তা ক-জনের আসতে দেখেছিস? ক্রমাগত বিষয়ভোগ করতে থাকলে, মনে সেই-সব বিষয়ের ছাপ পড়ে

যায়, দাগ পড়ে যায়, মন বিষয়ের রঙে র'ঙে যায়। ত্যাগ, ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, ঋষিবাক্য তো আছে—'গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্'—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামীজী॥ গৃহে থেকে যারা কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা ক-জনের হয়?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আপনি তো ইতঃপূর্বেই বলিলেন যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ত্যাগ হয় নাই।

স্বামীজী॥ তা বলেছি; কিন্তু এ-কথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে; তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের এখনও কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই এখনও আসেনি।

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে?

স্বামীজী॥ যারা করছে, তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে; তাদেরও কামকাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস—'যাচ্ছি যাব, হচ্ছে হবে' যারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূর। 'এখনই ভগবান্ লাভ করব, এই জন্মেই করব'—এই হচ্ছে বীরের কথা। ঐরূপ লোকে এখনই সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনই বৈরাগ্য আসবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ঠাকুর তো বলিতেন—ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এইসকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়া দেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, তাঁর কৃপা হলে হয় বটে, কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই, তবেই তাঁর কৃপা হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে তো আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামীজী॥ তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিস দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (উদ্যম বা পুরুষকার) না করে বসে থাক, দেখবি কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য॥ ভাল হইব, ইহা বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহা বলিতে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হইব, ভাল হইব, ঈশ্বর লাভ করিব?

স্বামীজী॥ যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদের ভেতর জানবি Struggle (উদ্যম বা চেষ্টা) এসেছে এবং ঐ চেষ্টা করতে করতেই ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতার-জীবনে তো ইহাও দেখা যায়—যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধনভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বরলাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি?

স্বামীজী॥ জানবি—তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে ঐ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য॥ তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেই তো তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?

স্বামীজী॥ হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা ভাল নয় কি? এবং ঐ পথেও তো 'কি করে মনের এ অশান্ত দূর করি'—এইরূপ একটা বিষম হাঁকপাকানি ও চেষ্টা আছে।

শিষ্য॥ তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কাম-কাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে এদেরই 'কৃপাসিদ্ধ' বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত—এ উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য॥ তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, 'কৃপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই; যদি থাকে তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।'

স্বামীজী॥ তা নয় রে, তা নয়; ঘোষজ যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা; সেখান Law of Causation (কার্য-কারণ-সম্বন্ধে) নেই, কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা করবে? সেখানে সেব্য-সেবক, ধ্যাতা-ধ্যেয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।

শিষ্য॥ আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল।

স্বামীজীর পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ২৬-৩০

২৬

স্থান—বেলুড়মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি?

স্বামীজী॥ অল্পবিস্তার আছে বৈকি।

শিষ্য॥ মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি?

স্বামীজী॥ খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাপ হবে, তা আমার.
৫৭
। তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাহস ও উদ্যমশূন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, ভীরু ও কাপুরুষ!

শিষ্য॥ মাছ-মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মে অহিংসাকে 'পরমো ধর্মঃ' বলিয়াছে কেন?

স্বামীজী॥ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্য ভায়ের সর্বনাশ করছে! অমন 'বক-ধার্মিক' এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্যপক্ষে দেখ—বৈদিক ও মনূক্ত ধর্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারিবিশেষে হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি বলছেন—'মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি'; মনুও বলেছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।'

শিষ্য॥ কিন্তু এমন দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু ঝোঁক হইলেই লোক আগে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপ অপেক্ষাও যেন মাছ-মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ!—এ ভাবটা কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ কোত্থেকে এল, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে, তা তো দেখতে পাচ্ছিস? দেখনা—তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছমাংস খায়, কচ্ছপ খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙলার লোকের চেয়ে সুস্থশরীর। তোদের পূর্ব-বাঙলার বড় মানুষেরাও এখনও রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মত অম্বলের ব্যারামে ভোগে না। শুনেছি, পূর্ববাঙলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অম্বলের ব্যারাম কাকে বলে, তা বুঝতেই পারে না।

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ। আমাদের দেশে অম্বলের ব্যারাম বলিয়া কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আসিয়া ঐ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমরা দুবেলাই মাছ-ভাত খাইয়া থাকি।

স্বামীজী॥ তা খুব খাবি। ঘাসপাতা খেয়ে যত পেটরোগা বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও-সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়, মহা তমোগুণের ছায়া—মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, tremendous activity (প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা); আর তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা, মোহ, নিদ্রা—এই সব।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মাছ-মাংসে তো রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামীজী॥ আমি তো তাই চাই। এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে-সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের লোককে মাছ-মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্যতৎপর করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশসুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে, গাছ-পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বলছিলুম, মাছ-মাংস খুব খাবি।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনে যখন সত্ত্বগুণের অত্যন্ত স্ফূর্তি হয়, তখন মাছ-মাংসে স্পৃহা থাকে কি?

স্বামীজী॥ না, তা থাকে না। সত্ত্বগুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ-মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রকাশের এইসব লক্ষণ জানবি—পরের জন্য সর্বস্ব-পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানতা, অহংবুদ্ধিশূন্যতা। এইসব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal-food (আমিষাহার)-এর ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখবি, মনে ঐসব গুণের স্ফূর্তি নেই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে—সেখানে জানবি হয় ভণ্ডামি, না হয় লোক-দেখান ধর্ম। তোর যখন ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণের অবস্থা হবে তখন আমিষহার ছেড়ে দিস।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তো আছে 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি'—শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অতএব সত্ত্বগুণী হইবার জন্য রজঃ-ও তমোগুণোদ্দীপক পদার্থসকলের ভোজন পূর্বেই ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে? স্বামীজী॥ ঐ শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন—'আহার'-অর্থে 'ইন্দ্রিয়-বিষয়', আর শ্রীরামানুজস্বামী 'আহার'-অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করে জীবনটা কাটাতে হবে, না ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে? ইন্দ্রিয়সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরতে হবে; আর ঐ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যই ভাল-মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্পবিস্তর বিচার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়ঃ (১) জাতিদুষ্ট—যেমন পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি। (২) নিমিত্তদুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশগণ্ডা মাছি মরে পড়ে রয়েছে, রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়েছে। (৩) আশ্রয়দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কিনা, তা সকল সময়েই খুব নজর রাখতে হয়। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝতেই পারে না, তা নিয়েই যত লাঠালাঠি চলছে, 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা' করে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই; গলায় একগাছা সুতো থাকলেই হল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নেই। খাদ্যের আশ্রয়দোষ ধরতে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেননি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানতে পেরেছি—বাস্তবিকই সে-সকল লোকের ভিতর কোন-না-কোন বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান্ লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্ সত্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চলছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়াই আমাদের কর্তব্য?

স্বামীজী॥ তা কেন বলব? আমার কথা হচ্ছে তুই বামুন, অপর জাতের অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা রাঢ়ীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী, তেলেঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? কলিকাতার জাতবিচারটা আরও কিছু মজার। দেখা যায়, অনেক বামুন-কায়েতই হোটেলে ভাত মারছেন; তাঁরাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্যের জন্য জাতবিচার ও অন্ন- বিচারের আইন করছেন! বলি—ঐ-সব কপটীদের আইনমত কি সমাজকে চলতে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, কলিকাতায় অধুনাতন সমাজে ঋষিশাষন চলিতেছে না?

স্বামীজী॥ শুধু কলিকাতায় কেন? আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, পড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিষ্য॥ তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে?

স্বামীজী॥ ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। এই দেখ না ভারতের কোথাও আর চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুন এক করে একটি ব্রাহ্মণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁব না' বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনই নয়।

২৭

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, বর্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দশা হইয়াছে কেন?

স্বামীজী॥ তোরাই সে জন্য দায়ী।

শিষ্য॥ বলেন কি? কেমন করিয়া?

স্বামীজী॥ বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরা এখন জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস!

শিষ্য॥ কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম?

স্বামীজী॥ কেন? ভট্‌চাযের দল তোরাই তো বেদবেদান্তাদি যত সারবান শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতদের কখনও পড়তে দিসনি, তাদের ছুঁসনি, তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছিস, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তো চিরকাল ঐরূপ করে আসছিস। ব্রাহ্মণেরাই তো ধর্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্বক্ষণ বলিস, ‘তুই নীচ’, ‘তুই নীচ’—তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে, ‘আমি সত্যসত্যই নীচ।’ ইংরেজীতে একে বলে hypnotise (হিপনোটাইজ) বা মন্ত্রমুগ্ধ করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির একটু একটু করে চমক ভাঙছে। ব্রাহ্মণদের তন্ত্রেমন্ত্রে তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মণদের সব তুকতাক এখন ভেঙে পড়ছে, পদ্মার পাড় ধসে যাবার মত, দেখতে পাচ্চিস তো?

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামীজী॥ পড়বে না? ব্রাহ্মণেরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করেছিল! স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল! তার ফলও হাতে হাতেই পাচ্ছে।

শিষ্য॥ কি ফল পাইতেছে, মহাশয়?

স্বামীজী॥ ফলটা কি দেখতে পাচ্ছিস না? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই এখন তোদের হাজার বছরের দাসত্ব করতে হচ্ছে, তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল ও স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, এখনও তো ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণদের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই লোকে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী॥ কোথায় চলছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার—এই সব সর্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্‌চাযের দল যা-তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন! কয়জন ভট্‌চায বৈদিক কল্প-গৃহ্য ও শ্রৌত-সূত্র পড়েছেন? তারপর দেখ—বাঙলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মনুস্মৃতির শাসন চলেছে! তোরা ভাবিস—সর্বত্র বুঝি একমত চলেছে! সেইজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়া বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর?

স্বামীজী॥ বেদের সকল প্রাচীন নিয়মই চলবে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে নূতন ছাঁচে পড়ে সমাজকে দিলে চলবে না কেন?

শিষ্য॥ মহাশয়, আমার ধারণা ছিল অন্ততঃ মনুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।

স্বামীজী॥ কোথায় মানছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখ না—তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম—যা মৃত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। ঐ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব করতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, এ পঙ্কোদ্ধার এখন সম্ভব কি?

স্বামীজী॥ তুই কি বলছিস, ভীরু কাপুরুষ? অসম্ভব বলে বলে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় কিনা হয়?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায় না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

স্বামীজী॥ আরে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্যই তো তাঁরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্টা করলে আমরাই যে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড় হতে পারি! আমাদের মতই বা তখন চলবে না কেন?

শিষ্য॥ মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তো বলিলেন, প্রাচীন আচারাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মত একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কন?

স্বামীজী॥ কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই বুঝতে পারছিস না। আমি কেবল বলেছি যে, প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি সমাজ ও সময়ের উপযোগী করে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি?

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজী॥ তবে ও কি বলছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস, আমার আশা-ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে লেগে যা।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?

স্বামীজী॥ তুই যদি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিস এবং যা বলবি, তা হাতে-নাতে করে দেখাতে পারিস তো অবশ্য নেবে। আর তোতাপাখীর মত যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মত কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হলে তোর কথা কে শুনবে বল?

শিষ্য॥ মহাশয়, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই-একটি উপদেশ দিন।

স্বামীজী॥ উপদেশ তো তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়লি, আরও কত কি পড়লি, বেশ করে ভেবে দেখ—এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি। সেই ভিত্তিটা বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি ও প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর এবং সময়োপযোগী মতসকল তাতে নিবদ্ধ কর; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের—সকল সম্প্রদায়েরই ঐসকল নিয়ম পালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লেখ দেখি ঐরূপ একখানা স্মৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দেব'খন।

শিষ্য॥ মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়; কিন্তু ঐরূপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি?

স্বামীজী॥ কেন চলবে না? তুই লেখ না। 'কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—যদি ঠিক ঠিক লিখিস তো একদিন না একদিন চলবেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। তোরাই তো পূর্বে বৈদিক ঋষি ছিলি, শুধু শরীর বদলিয়ে এসেছিস বৈ তো নয়? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোদের ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ, ওঠ, লেগে পড়, কোমর বাঁধ। কি হবে দু-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ কার্যে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু তো পশ্চাতে।

স্বামীজী॥ দূর ছোঁড়া, মরতে হয় একবারই মরবি। কাপুরুষের মত অহরহঃ মৃত্যু-চিন্তা করে বারে বারে মরবি কেন?

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু চিন্তা না হয় নাই করিলাম, কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কর্ম করিয়াই বা ফল কি?

স্বামীজী॥ ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইঁট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দু-দিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে মরাটা ভাল নয় কি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।

স্বামীজী॥ ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসুর কাছে দু-রাত্রি বকলেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না, আমি আহারনিদ্রা ত্যাগ করে অনবরত বকতে পারি। ইচ্ছা করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। আর আজকাল দেখছিস তো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই, কোন-না-কোন রকম জোটেই জোটে। তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধ-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়। তোদের মঙ্গল কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব!

শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বামীজীর ঐ-সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে বিদায় গ্রহণের আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আজ তবে আসি।'

স্বামীজী॥ আসবি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দেখ—কেমন

হাওয়া, গঙ্গার তীরে, সাধুরা সাধনভজন করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কলিকাতায় গিয়েই ছাইভস্ম ভাববি।

শিষ্য সহর্ষে বলিল, ‘আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব।’

স্বামীজী॥ ‘আজ’ কেন রে? একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে?

শিষ্য স্বামীজীর ঐ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে যুগপৎ নানা চিন্তার উদয় হওয়ার কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

২৮

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

স্বামীজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়ীটি ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতঃপূর্বেই সমতল করা হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী আজ অপরাহ্নে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণমুখে ফটক পর্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন—এইরূপে বাড়ী হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ী পর্যন্ত বারংবার পদচারণা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বাঁধান হইতেছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেনঃ

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী!

গান গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেনঃ ‘হেথা আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী!’ বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হবে!—বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, ‘বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে বসে ধ্যানধারণা করলে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা বলতেন।’

শিষ্য॥ মহাশয়, যাহারা আত্মনাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি-অশুদ্ধি-বিচারের আবশ্যকতা আছে কি?

স্বামীজী॥ যাঁদের আত্মজ্ঞানে ‘নিষ্ঠা’ হয়েছে, তাঁদের ঐসব বিচার করবার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হল? কত সাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক-আধটা বাহ্য অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে যে নানা প্রকার সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সব কেবল ঐ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য। তবে অধিকারিভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম; এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নেই। আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্মপ্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর করে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্‌ভাসিত হয়। বুঝলি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বলছেন, ‘ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।’

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যখন আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামীজী॥ কার্যকারণ-পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ প্রতীয়মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই ‘কাম্য কর্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে’—এ-কথা বলা হয়েছে। নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্মের দ্বারা হবার নয়। কারণ আত্মজ্ঞান পিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাকবে। তবেই হল—ঐ-সব সাধনাদি কর্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছু নয়; কারণ ঐ সাধনাদি ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ-সব কর্মের ফল ত্যাগ করতে বলত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত ফলপ্রসূ কর্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝলি?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

স্বামীজী॥ শরীর ধারণ করে সর্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাকতে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিষ্কাম কর্মযোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বললি 'প্রবৃত্তি হবে কেন?' তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যত কিছু কর্ম করা যায় তা সবই প্রবৃত্তিমূলক; কিন্তু কর্ম করে করে যখন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেই কেবল গতি হতে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা-আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে—কর্মের অন্ত কোথায়? তখনি সে গীতামুখে ভগবান্ যা বলছেন, 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—তার মর্ম বুঝতে পারে। অতএব যখন কর্ম করে করে আর শান্তিলাভ হয় না, তখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহধারণ করে কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে—কি নিয়ে থাকবে বল? তাই দু-চারটে সৎকর্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, তখন তারা জেনেছে যে, ঐ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সেই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্বকর্মত্যাগী—লোক-দেখান দু-চারটে কর্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এঁরাই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মযোগী বলে কথিত হয়েছেন।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্যহীন কর্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায়?

স্বামীজী॥ তা কেন? নিজের জন্য, আপন শরীর-মনের সুখের জন্য কর্ম না করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না, কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখলাভের জন্য কেন কর্ম করবেন না? তাঁরা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা-কিছু কর্ম করে যান, তাতে জগতের হিত হয়—সে-সব কর্ম 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' হয়। ঠাকুর বলতেন, 'তাঁদের পা কখনও বেচালে পড়ে না।' তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িসনি—'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।'—ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তহীন-প্রায় হয়, তখনই [ঠিক ঠিক] 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ করবার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম চলতে থাকে। মন তখন প্রায়ই super conscious (অতিচেতন) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়, তাই খাওয়া-দাওয়া থাকে—দেহাদি-বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই অতিচেতন ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায়; সে-সব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না। ঈশ্বর super conscious state-এ (জ্ঞানাতীত ভূমিতে) সর্বদা অবস্থান করেই এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন; এ সৃষ্টিতে সেজন্য কোন কিছু imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্যই বলছিলুম, আত্মজ্ঞের ফলাসঙ্গরহিত কর্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য॥ আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ—মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, 'কর্ম কর্ম কর্ম—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

স্বামীজী॥ আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম, এ দেশের মত এত অধিক তামস-প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভেতরে একাবারে ইঁট-পাটকেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথায় প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে-চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা—তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্তি হতে পারবে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান্ লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? কান্না পায় না? মান্দ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব, বাঙলা—যেদিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাশ করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোড় কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম-কথায় কেউ কান দেবে না। তাই

বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব এক তেজের মিলনে স্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সেই দিব্যমূর্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামীজী পুনরায় বলিলেনঃ

ঐরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নেই); ... ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে; কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্যকরে আলোকিত হবে।

২৯

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

মঠ-বাটী নির্মাণ হইয়াছে, সামান্য একটু-আধটু যাহা বাকী আছে, স্বামীজীর অভিমতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাহা শেষ করিতেছেন। স্বামীজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজরাখানি কিছুদিনের জন্য মঠের সামনে বাঁধা রহিয়াছে। স্বামীজী ইচ্ছামত কখনও কখনও ঐ বজরায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারান্তে স্বামীজীর ঘরে বসিয়া স্বামীজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে। মঠে এই সময় স্বামীজী সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, গৃহস্থদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই ঐগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা—পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্তা হইতে লাগিল।

স্বামীজী॥ গেরস্তদের গায়ে-কাপড়ে আজকাল কেমন একটা সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, না শোয়। আগে শাস্ত্রে পড়তুম যে, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের গন্ধ সইতে পারে না। এখন দেখছি—ঠিক কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চললে বালব্রহ্মচারীদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে। সন্ন্যাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হলে পর গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে-মিশে থাকলেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গণ্ডীর ভেতর না রাখলে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে তো দূরে থাকতেই হয়, তা ছাড়া স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ করতেই হয়।

গৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্বের মত সমভাবে মিশিতে পারিবে না ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিল, ‘কিন্তু মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি যেমন সর্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোথাও আর তেমন করি না!’

স্বামীজী॥ যত শুদ্ধসত্ত্ব লোক আছে, সবারই এখানে ঐরূপ অনুভূতি হবে। যার হয় না, সে জানবি এখানকার লোক নয়। কত লোক হুজুগে মেতে এসে আবার যে পালিয়ে যায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচর্যবিহীন, দিনরাত অর্থ অর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকার ভাব কখনও বুঝতে পারবে না, কখনও মঠের লোককে আপনার বলে মনে করবে না। এখানকার সন্ন্যাসীরা সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায়-জটা, চিম্‌টে-হাতে, ঔষধ-দেওয়া সন্ন্যাসীদের মত নয়; তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব—সকলই নূতন ধরনের ছিল, তাই আমরাও সব নূতন রকমের; কখনও সেজেগুজে বক্তৃতা দিই, আবার কখনও ‘হর হর ব্যোম্ ব্যোম্’ বলে ছাই মেখে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই!

শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তরতর করে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না করে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে? এখন চাই গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্মযোগ, হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে তো দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠবে, নতুবা তুমি যে তিমিরে, তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবসান। স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্বদিকে এখন যেখানে পোস্তা গাঁথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজরাখানি ঘাটে আনা হইলে স্বামী

নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামীজী ছাতে বসিলে শিষ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কলকল শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের পশ্চিমদিক এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই, ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত যাইতে এখনও অর্ধঘণ্টা বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামীজীর মুখে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা! সে এক ভাবপূর্ণ রূপ—বুঝান অসম্ভব!

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দেখিয়া শিষ্য ও অপর সন্ন্যাসিদ্বয় প্রণাম করিল। স্বামীজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়া এলোথেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন! শিষ্য ও সন্ন্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতে লাগিল, সে-সকল কথা যেন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটির দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটিতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইতঃপূর্বে একবার মঠের জন্য ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'বাগানটি বেশ, কিন্তু কলিকাতা থেকে অনেক দূর; ঠাকুরের শিষ্য (ভক্ত)-দের যেতে আসতে কষ্ট হত; এখানে মঠ যে হয়নি, তা ভালই হয়েছে।'

এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩০

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৮৯৯ খ্রীঃ প্রারম্ভ

শিষ্য অদ্য নাগ-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।

স্বামীজী॥ (নাগ-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন তো?

নাগ-মহাশয়॥ আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হল। কথাগুলি বলিয়া নাগ-মহাশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

স্বামীজী॥ শরীর কেমন আছে?

নাগ-মহাশয়॥ ছাই হাড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম।

ঐরূপ বলিয়া নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

স্বামীজী॥ (নাগ-মহাশয়কে তুলিয়া) ও কি করছেন?

নাগ-মঃ॥ আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস, ঠিক ভক্তিতে মানুষ কেমন হয়!

নাগ-মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ-মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়।

নাগ-মঃ॥ প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে ব্রহ্মচারী-ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ-মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোদের পাঠ বন্ধ থাকল।' সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ-মহাশয়ের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। স্বামীজীও নাগ-মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন।

স্বামীজী॥ (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস! নাগ-মহাশয়কে দেখ; ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই;

সর্বদা তন্ময় হয়ে আছেন! (নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারীদেরও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথা শোনান।

নাগ-মঃ॥ ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বলব? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি; ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মরলুম।

নাগ-মঃ॥ ছিঃ! ও-কথা কি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ আর ওপিঠ; যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামীজী॥ এ-সব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?

নাগ-মঃ॥ আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ-মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন। স্বামীজী সকলকে বলিলেন, 'যাতে এঁর কষ্ট হয়, তা করো না।' শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন।

স্বামীজী॥ আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখবে।

নাগ-মঃ॥ ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামীজী॥ আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ-মঃ॥ (আনন্দে উন্মত্ত হইয়া), এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?

স্বামীজী॥ আমার তো ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ-মঃ॥ আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারেনি।

স্বামীজী॥ আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপ জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি-ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া যায়।

নাগ-মঃ॥ ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাকেও দেখি না; যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে।

স্বামীজী॥ কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ-মঃ॥ তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ কাজ করতে মজবুত শরীর চাই; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে বেশ ছিলুম

। নাগ-মঃ॥ শরীর ধারণ করলেই—ঠাকুর বলতেন—'ঘরের টেক্স দিতে হয়।' রোগশোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই। কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ মঠের এরা আমায় যত্নে রাখে।

নাগ-মঃ॥ যাঁরা করছেন তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামীজী॥ নাগ-মহাশয়! কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না।

নাগ-মঃ॥ ঠাকুর যে বলেছিলেন—'চাবি দেওয়া রইল।' তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামীজী॥ একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ-মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগ-মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামীজী একখানি কোদাল লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিতেছিলেন—নাগ-মহাশয় দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'আমরা থাকতে আপনি ও কি করেন?' স্বামীজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেনঃ

ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগ-মহাশয় চার-পাঁচ দিন উপোস করে তাঁর কলিকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি ভাই ও আর একজন মিলে তো নাগ-মহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বললুম—আপনার এখানে আজ ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ-মহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে শুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও খাব, নাগ-মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্নাবান্না করে তো আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগ-মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বসলুম। আহারের পর, ওঁকে খেতে যেই অনুরোধ করা আর তখনি ভাতের হাঁড়ি ভেঙে ফেলে কপালে আঘাত করে বলতে লাগলেন—'যে দেহে ভগবান্ লাভ হল না, সে দেহকে আবার আহার দিব?' আমরা তো দেখেই অবাক! অনেক করে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।

স্বামীজী॥ নাগ-মহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি?

শিষ্য॥ না। ওঁর কি কাজ আছে, আজই যেতে হবে।

স্বামীজী॥ তবে নৌকা দে। সন্ধ্যা হয়ে এল।

নৌকা আসিলে শিষ্য ও নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৩১-৩৫

৩১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—(৩য় সপ্তাহ) জানুআরী, ১৮৯৯

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া আসে, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের 'উদ্বোধন' নাম মনোনীত করেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহার সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেনঃ

স্বামীজী॥ (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী॥ এই পত্রের ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য॥ কিরূপ?

স্বামীজী॥ ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী॥ তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম sacrifice (স্বার্থত্যাগ)-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি! Success (কাজ হাসিল) করে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর—গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে!

স্বামীজী॥ কেন? পত্রের প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব-প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

শিষ্য॥ তাহা হইলেও সকলে এভাব লইতে পারিবে না।

স্বামীজী॥ নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা criticism (সমালোচনা) গণ্য করে কাজে অগ্রসর হইনি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী॥ তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলিকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য॥ আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজী॥ আমার ইচ্ছা হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দেব। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি তোদের এখনও হয়নি। সেটা করতে এইসব সর্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ করে করে মরে যাবে, তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (সমালোচনা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস!

শিষ্য॥ সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজী॥ আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা করে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে। কই আমায় তো পুজোর কথা কিছু বললে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন, 'তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

স্বামীজী॥ তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে 'উদ্বোধনে'র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরায় শিষ্যের সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা করিয়াছিলেনঃ

স্বামীজী॥ 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, 'এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ স্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে পারলে সাধারণের মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের felling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাক-সিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিসনি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ করে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি?

তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—'তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই।' তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এইসব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি?

শিষ্য॥ আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়!

স্বামীজী॥ আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ আমি ডামবেল কষি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে চলবে)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে

পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

৩২

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০০

এখন স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনান্তে নীচে আসিয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। এমন সময় স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, 'কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল?'

শিষ্য॥ মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, 'বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামীজী আর তুই বুঝিস। আমরা কিন্তু জানি—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

স্বামীজী॥ তুই কি বললি?

শিষ্য॥ আমি বলিলাম. এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী, বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় 'বৈষ্ণব' বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামীজী॥ তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই ঐরূপ বলে তোকে খ্যাপায়। তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, 'আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক।'

শিষ্য॥ মহাশয়, উপনিষদে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামীজী॥ সর্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ-ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্ট-স্থিতি-লয় অধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র 'ঈশ্বর' বলে নির্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদি কূটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা বলে এরূপ যেন মনে করিসনি যে, ব্রহ্ম—জীবজগৎ থেকে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেনঃ তা নয়, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র; কিন্তু বস্তুতঃ ওতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয়নি। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয় আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নাম-রূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সারমর্ম। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-ফাস্ত্র এই কথাই নানা রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য॥ তাহা হলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামীজী॥ মন-রূপ উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় ধরতে বুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এ-জন্য নিজের personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরেরpersonality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ)-কে মানুষরূপেই ভাবতে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় 'হা হতোঽস্মি' করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূন্য হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না! বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে যে-ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার Personal God (ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর)-এ বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের Goal (লক্ষ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মন-রূপ উপাধিতে অভিমান থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপলাভে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না 'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মানুষজন্ম লাভ করে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল

হলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলে—তবে মানুষের আত্মজ্ঞানস্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে বলে মনে যার সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি করে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত সমনস্ক, সে-ই আত্মজ্ঞানলাভে যত্নপর হয়। সে-ই 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন করে মায়ার গণ্ডী ভেঙে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না?

স্বামীজী॥ তা একবার বলতে? অন্তর্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের 'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'
৫৮
—এই অংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না করে তপস্যা করলে দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা-ত্যাগ না হলে কি কিছু হবার যো আছে? সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে তো ত্যাগ আসিতে পারে?

স্বামীজী॥ যার ক্রমে আসে, তার আসুক। তুই তা বলে বসে থাকবি কেন? এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, 'হচ্ছে-হবে —ও-সব মেদাটে ভাব।' পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে, না, জলের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি, তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার করছিস।

শিষ্য॥ বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্বস্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন।

স্বামীজী॥ উদ্দেশ্য ও উপায়—সবই তোর হাতে। আমি কেবল stimulate (উদ্বুদ্ধ) করে দিতে পারি। এইসব সৎশাস্ত্র পড়ছিস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ করছিস—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য॥ (অধোমুখে বিষণ্ণভাবে) মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন, আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।

স্বামীজী॥ (শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া) ভয় কি? সর্বদা বিচার করবি—এই দেহ-গেহ, জীব-জগৎ সকলই নিঃশেষ মিথ্যা, স্বপ্নের মত; সর্বদা ভাববি—এই দেহটা একটা জড় যন্ত্রমাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ স্বরূপ। মন-রূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তারপর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্কল নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তুই তোর স্ব-স্বরূপকে জানতে পারছিস না। এই রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মারতে হবে। দেহটা তো স্থূল—এটা মরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটলি —মনটা শীগগীর মরে না। বীজাকারে কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ করে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে, এইরূপে যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্য বলি, ধ্যান-ধারণা ও বিচারকালে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামীজী॥ বীরের কাছে আবার কঠিন বলে কোন জিনিষ আছে? কাপুরুষেরাই ও-কথা বলে।—বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্।
৫৯
অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর। গীতা বলছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।'
৬০
চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক। ঐ সঙ্কল্পবিকল্প থেকেই বাসনা ওঠে। তারপর ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্থূলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। আবার কর্মও যেমন অনন্ত, কর্মের ফলও তেমনি অনন্ত। সুতরাং অনন্ত অযুত কর্মফলরূপ তরঙ্গে মন সর্বদা দুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশূন্য করে দিতে হবে—পুনরায় স্বচ্ছ হ্রদে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ আর একটিও না থাকে; তবেই ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শাস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাবে দিচ্ছেন—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ'
৬১
ইত্যাদি। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই?

স্বামীজী॥ তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বগ আত্মা—এটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, স্থূল নই, সূক্ষ্ম নই—এইরূপে 'নেতি নেতি' করে প্রত্যক্চৈতন্যরূপ স্ব-স্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার

ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলবি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্ব-স্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে; জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃতি হবে। একেই শাস্ত্রে বলে—'ত্রিপুটিভেদ'। ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাঁকে আবার জানবি কি করে? আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই চৈতন্য, আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলে নির্দেশ করা যায় না, সেই অনির্বচনীয়-মায়াশক্তি-প্রভাবেই জীবরূপী ব্রহ্মের ভেতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ conscious state (চেতন বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত-সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হয়ে যায়, তাকে শাস্ত্র superconscious state (সমাধি, সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) বলে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—'স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহী নম্।'
৬২

(গভীরভাবে মগ্ন হইয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ)

এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় মগ্ন বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান—সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি partial truth (আংশিক সত্য)। ওরা সেজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশ) কখনই হতে পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক্ দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা বলে বোধ হয়—ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তখনই বোধ হয় যে, আমিই সব, আমিই সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? শাস্ত্রে যেমন বলে, 'নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধম্'—নিত্যবস্তুরূপে ইহা স্বতঃসিদ্ধ—এইভাবেই আমি সর্বদা ইহা অনুভব করি। আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভূতি করেছি। তোরাও দেখ, অনুভূতি কর আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শোনাগে। তবে তো শান্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেনঃ

এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর, আর জগতে প্রচার কর। এতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সারকথা বললাম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; আবার কখনও বা ভক্তির, কখনও কর্মের এবং কখনও যোগের প্রাধান্য কীর্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামীজী॥ কি জানিস—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না! ব্যুত্থান-কালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভেদ-বুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথায় বলেছে। কিন্তু জানবি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম দ্বারা বড়জোর চিত্তশুদ্ধি হয়। এ-জন্যই ভাষ্যকার
৬৪
জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এ কথাটা বেশ করে জেনে রাখ—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিষ্য॥ মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিতা বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামীজী॥ ঐ-সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ—slow process (মন্থর গতি), দেরীতে ফল হয়, কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন; হয়তো বিভূতিপথে মন চলে গেল, আর স্বরূপে পৌঁছুতে পারলে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক বলে সর্বকালে সর্বদেশে সমান আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্য বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goal-এ (লক্ষ্যে) ঠিক পৌঁছান যায়। আমার মতে, এই পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ।

শিষ্য॥ এইবার আমার অবতারবাদ-বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামীজী॥ তুই যে একদিনেই সব মেরে নিতে চাস!

শিষ্য॥ মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটিয়া যায় তো বারবার আর আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না।

স্বামীজী॥ যে-আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাত নেই—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' আত্মাকে তো আর জানা যায় না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে highest ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ) যা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্যন্ত। তারপর আর জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। অল্প লোকেই তাঁদের বুঝতে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—ভবসমুদ্রে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর

হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি process-এ (উপায়) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে 'অহং' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা 'আত্মপর' বলে জানবি। 'মামেকং শরণং ব্রজ' কিনা 'আত্মসংস্থ হও'। এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী। 'বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ'—রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও তো মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে পারবিনি? 'জায়স্ব ম্রিয়স্বে'র দলে যাবি? 'শ্রেয়ঃ'কে গ্রহণ কর, 'প্রেয়ঃ'কে পরিত্যাগ কর। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সবাইকে বলবি। বলতে বলতে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহমস্মি', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করবি এবং হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা হয়ে যুদ্ধ করলেন।

শিষ্য॥ মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই কি কর্ম থাকে?

স্বামীজী॥ জ্ঞানলাভের পর সাধারণের যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ম থাকে না। তখন কর্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন-বলন সবই জীবের কল্যাণসাধণ করে। ঠাকুরকে দেখেছি 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ'
৬৬
—এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।'
৬৭

৩৩

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০১

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিদ্যা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন; রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁর একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামীজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেনঃ

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মানুষ যে জিনিষটা তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেস কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরী করা উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলাম, মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা, 'Art unveiling nature' অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড় অবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু করতে চেষ্টা করবেন।

রণদাবাবু॥ আমারও ইচ্ছা আছে—সময়মত original modeling (নূতন ভাবের মূর্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামীজী॥ আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি art-এ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (সমাদর) হবে। খাঁটি জিনিষের কখনও জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও শোনা যায়—এক এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়তো তার appreciation (সমাদর) হল!

রণদাবাবু॥ তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হোক কিছু কৃতকার্য হয়েছি। আশীর্বাদ করুন যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামীজী॥ যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফল) হবেন। যে যে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) তো হয়ই, তারপর চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত লাভ হয়। যে-কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে ভগবান্ তার সহায় হন।

রণদাবাবু॥ ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাত কি দেখলেন?

স্বামীজী॥ প্রায় সবই সমান, originality (মৌলিকত্ব) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ-সব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (মৌলিকত্ব) লোপ পেয়ে যায়; নিজে idea-র expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ করতে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন; এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের এক-একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাস্কর্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরুন—ওদেশের গান-বাজনা-নাচের expression (বাহ্য বিকাশ)-গুলি সবই pointed (তীব্র, তীক্ষ্ণ); নাচছে যেন হাত পা ছুঁড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে! গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলেদুলে তরঙ্গের মত গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্চ্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement (মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্প বিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোনতি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশ-কল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃবিকাশ) দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

রণদাবাবু॥ আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখব, আপনার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করব।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। ঐ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক, একটাও চিত্রে ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেষ্টা কারুর নেই! আমি মা-কালীর ভীমা মূর্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (কালী দি মাদার) নামক ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা express (প্রকাশ) করতে পারেন কি?

রণদাবাবু॥ কি ভাব?

স্বামীজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামীজী রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেনঃ 'The stars are blotted out' &c.
৬৮

স্বামীজী ঐ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া 'বাপ' বলিয়া ভীতচকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীজী॥ কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন তো?

রণদাবাবু॥ আচ্ছা, চেষ্টা করব।
৬৯
কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজী॥ ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে যা যা দরকার, তা আপনাকে বলে দেব।

অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেনঃ

চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।'

অতঃপর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র (Drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর পরামর্শমত আঁকিয়াছিলেন; চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেনঃ

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঁকার' বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম কর্ম বিদ্যা জ্ঞান ভক্তি—সমস্তই যাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হউন।

রণদাবাবু এবং উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহৎ উদার মন সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামীজীর মহত্ত্বের কথা ভাবিয়া সকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বলিলেনঃ

আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চা হচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু॥ মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, 'ছেলেটি খুব তেজস্বী।'

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন—'পরম ধন সে পরশমণি' ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীজী মুখ ধুইয়া শিষ্যসঙ্গে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং 'Encyclopedia Britannica' পুস্তকের শিল্প-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পূর্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের ঢঙ অনুকরণ করিয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিলেন।

৩৪

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—মে (শেষ ভাগ), ১৯০১

স্বামীজী কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামীজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও স্বামীজীর সহাস্য বদন ও স্নেহমাখা দৃষ্টি সকল দুঃখ ভুলাইয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত।

শিষ্য॥ স্বামীজী, কেমন আছেন?

স্বামীজী॥ আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে-কটা দিন দেহ আছে, তোদের জন্য খাটব। খাটতে খাটতে মরব।

শিষ্য॥ আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামীজী॥ বসে থাকবার যো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী, কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের সুখের দিক্ দেখতে দেয় না!

শিষ্য॥ শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন?

স্বামীজী॥ না রে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চারদিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shock (তড়িৎ-কম্পন)-এর মত এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্য চেতনা হল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।' 'আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল, এ-সকল কথা সাধারণ লোকে কিভাবে বুঝিবে, কে জানে! অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগিল?

স্বামীজী॥ দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপত্যকার) শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চর্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য॥ ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (রক্ষণশীল); উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (ধর্মোন্মাদ) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার photo (প্রতিকৃতি) এনে আমায় দেখালে এবং বললে, 'মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কিনা?' আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'তা বাবা, আমি কি জানি?' তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'বাবা, এখন থেকে ভাল করে খেয়ো-দেয়ো, তা হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।' এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য॥ আমাদের পূর্ববাঙলায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে!

স্বামীজী॥ গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা ইচ্ছা তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে!

শিষ্য॥ ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ মেয়েরা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখলুম। 'হ—'র স্ত্রীকে খুব intelligent (বুদ্ধিমতী) বলে বোধ হল। সে খুব যত্ন করে আমায় রেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য॥ শুনিলাম, নাগ-মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?

স্বামীজী॥ হাঁ, অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন! বাড়ীখানি কি মনোরম—যেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥টা। আমার জীবনে যে-কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার।

নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও—যেমন হওয়া উচিত, তেমনটি হয়নি।

শিষ্য॥ মহাশয়, নাগ-মহাশয়কে ও-দেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামীজী॥ ও-সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝিবে? যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে, তারাই ধন্য। শিষ্য॥ কামাখ্যা (আসাম) গিয়া কি দেখিলেন?

স্বামীজী॥ শিলঙ পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন (Sir Henry Cotton) সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'স্বামীজী! ইওরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?' কটন সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য॥ সেখানকার ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক 'হঙ্কর'দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। ঐ 'হঙ্কর'দেব শঙ্করাচার্যেরই নামান্তর কিনা বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিম্বা শঙ্করাচার্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অতঃপর শিষ্য বলিল, 'মহাশয়, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ-মহাশয়ের মত আপনাকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই।'

স্বামীজী॥ আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাল-চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও-অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে Capital (রাজধানী) থেকেই ক্রমে প্রদেশসকলে চাল-চলন আদব-কায়দার বিস্তার হয়। ও-দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ-মহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তাঁর আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন। স্বামীজী॥ ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত—ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হত—আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বলছে, 'চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।
৭০
তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্যকর) করে নেবার জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি-নেওড়ান জলের কথা
৭১
শুনেছিস তো? আচার-বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহা-শক্তিস্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। 'অনুভূতি'ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হল। আর আচার-বর্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের—বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?
৭২
অতএব মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। তাই জানবি goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির test (পরীক্ষা), কষ্টিপাথর। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি, সে যে-মতের যে-পথের লোক হোক না কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি—জীবন বৃথা। এই অনুভূতিলাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র-টাস্ত্র তো ঢের পড়লি। বল দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা। শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না। স্বামীজী॥ কর্ম-ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম করে এই দেহ পেয়েছিস—এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মদ্বারা কর্ম কেটে তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জানবি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জানবি—'পরহিতায়' কর্ম করে। তারা ভাল-মন্দ ফলের দিকে চায় না, কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ 'পরহিতায়' কর্ম করা একপ্রকার অসম্ভব—জানবি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ-বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে 'জনক' হতে চাস।

শিষ্য॥ আপনি কৃপা করুন, যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামীজী॥ ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, এ জন্মেই হবে; তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? আত্মজ্ঞান লাভ করবই করব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করে একমনে নিজের goal (লক্ষ্য)-এর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার তো পশু-পক্ষীরাও করছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তো মরতে বসেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস। মহাবীরের মত অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? ক-দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা আর বল—আমি অভয়-পদ পেয়েছি। বল—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা; তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্যপ্রদ নির্ভয় বাণী শোনা—'তত্ত্বমসি', 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এটি হলে তবে জানব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙাল।

৩৫

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(জুন), ১৯০১

শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ নহে, শিলঙ পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া অল্প দিন হইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে; গুরুভ্রাতাগণ সেই জন্য বড়ই চিন্তিত। স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন ও জল বন্ধ করিয়া 'বাঁধা' ঔষধ খাইতে হইবে। আজ রবিবার।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া আপনার অসহ্য হইবে। স্বামীজী॥ তুই কি বলছিস? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে 'আর জলপান করব না' বলে দৃঢ় সংকল্প করব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই খোলস। মন যা বলবে, সেইমত তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা করতে হল, ওদের (গুরুভ্রাতাদের) অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামীজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিতেছেনঃ

মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরী হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালে মেয়েদের জন্য তো কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযোগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘোর বামাচারে দেশ পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজী॥ এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য॥ মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্তি। মানুষের অধঃপতনের জন্য যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রী জাতিই মায়া দ্বারা মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, উহাদের জ্ঞানভক্তি কখনও হইবে না। স্বামীজী॥ কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্চায-বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃ স্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এ-সব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না।

তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥'৭৩ যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এ-জন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া নিজের কথা নিজেই যে বদলাইতেছেন।

স্বামীজী॥ তন্ত্রের বামাচার-মতটা পরিবর্তিত হয়ে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করিনি। ভগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও তো তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতৃরূপিণী, স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করিনি। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'
৭৪
—এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করতে পারলে সাধ্য কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।

শিষ্য॥ আপনার উহা উত্তম সঙ্কল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথায় পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামীজী॥ কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।

শিষ্য॥ ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্যে সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজী॥ জগতের কোন মহৎ কাজই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয়নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে—কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠস্থাপন করব। পরে দেখবি, এক, আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সামনে ধর। দেখবি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। শিষ্য॥ মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী॥ গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূরে থেকে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্প-বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হলে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস। মেয়েদের ঐ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদবেদান্ত মুখস্থ করে?

শিষ্য॥ মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না? স্বামীজী॥ তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে।

বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না—এ নিয়ম রাখতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ-সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামীজী॥ কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝতে পারিসনি। এই সব বিদুষী ও কর্মতৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। 'দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ'—সে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি দেখতে পাচ্ছিসনে?

শিষ্য॥ যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে। স্বামীজী॥ তা হোক না; তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকাজে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা 'আমি-তুমি'র plane-এ (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই; আবার মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর 'এ স্ত্রী, ও পুরুষ'—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেয়ে-পুরুষে বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো মেয়েরা তা হতে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম—মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারও মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামীজী॥ এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখবি—এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা!—তাই এত করে তোদের ঐরূপ করতে বলি এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। শিষ্য॥ আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই শিখিতেছে, কিন্তু ত্যাগ-সংযম-তপস্যা-ব্রহ্মচর্যাদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

স্বামীজী॥ প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নূতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে, তাইতেই তুই যে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। সকল সৎকার্যের প্রবর্তকেরই অভীপ্সিত কার্যানুষ্ঠানের পূর্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। বুঝলি? শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল-নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ববঙ্গে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরূপ করে কি?

স্বামীজী॥ ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ করে লোকের সামনে example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) করে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (অস্বীকার) করবিনি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাকবে। 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'
৭৫
—আগুন থাকলেই ধূম উঠবে। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতটা পারিস, ভাল কাজ করে যেতে হবে।

শিষ্য॥ ভাল কাজটা কি?

স্বামীজী॥ যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ঐ আত্মজ্ঞান শীগগীর ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায় বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখনও কখনও জন্মজন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস? সে তোর সঙ্গে থাকবেই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে? স্বামীজী॥ আচার্য শঙ্কর ঐরূপ বলে আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম-বোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎ কর্ম হবে; তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম করতে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য॥ আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি সুন্দর মীমাংসা।

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামীজী শিষ্যকে প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতে বলিলেন। শিষ্যও যাইবার পূর্বে স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, 'মহাশয়, আপনার স্নেহশীর্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।' শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সন্ন্যাসী! এই এক নূতন ঢঙ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৩৬-৪০

৩৬

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(জুন?), ১৯০১

স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। আজ ৫।৭ দিন যাবৎ স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এই ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে। শিষ্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। আসিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, 'আজও মাছ আনতে হয়? একে আজ রবিবার, তার উপর স্বামীজী অসুস্থ—শুধু দুধ খেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।' শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া নীচে মাছ ফেলিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনমানসে উপরে গেল। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী সস্নেহে বলিলেন, 'এসেছিস? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুম।'

শিষ্য॥ শুনিলাম, শুধু দুধমাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ-সাত দিন আছেন?

স্বামীজী॥ হাঁ, নিরঞ্জনের একান্ত অনুরোধে কবিরাজী ঔষধ খেতে হল। ওদের কথা তো এড়াতে পারিনে।

শিষ্য॥ আপনি তো ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার জলপান করিতেন। কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন? স্বামীজী॥ যখন শুনলুম এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সঙ্কল্প করলুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।

শিষ্য॥ ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে তো?

স্বামীজী॥ উপকার অপকার—জানিনে। গুরুভাইদের আজ্ঞাপালন করে যাচ্ছি।

শিষ্য॥ দেশী কবিরাজী ঔষধ বোধ হয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

স্বামীজী॥ আমার মত কিন্তু একজন scientific (বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানবিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman (হাতুড়ে)—যারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়। এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা বড় মাছ আনিয়াছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্বামীজী বলিলেন, 'চল, কেমন মাছ দেখব।'

অনন্তর স্বামীজী একটা গরম জামা পরিলেন এবং দীর্ঘ একগাছা যষ্টি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আজই ভাল করে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে।' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।' তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ভক্তের আনীত দ্রব্য শনিবার-রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।' স্বামী প্রেমানন্দ আর আপত্তি না করিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্ত্বেও ঠাকুরকে মৎস্যভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে ঠাকুরের ভোগের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া দিয়া স্বামীজী ইংরেজী ধরনে রাঁধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মঠের সকলে তাঁহাকে রাঁধিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া দুধ ভারমিসেলি দধি প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইবার সময় স্বামীজী ঐ-সকল মাছের তরকারি আনিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'বাঙাল মৎস্যপ্রিয়। দেখ দেখি কেমন রান্না হয়েছে।' ঐ কথা বলিয়া তিনি ঐ-সকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন হয়েছে?' শিষ্য বলিল, 'এমন কখনও খাই নাই।' তাহার প্রতি স্বামীজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার প্রাণ পূর্ণ! ভারমিসেলি (vermicelli) শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই। ইহা কি পদার্থ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'ওগুলি বিলিতী কেঁচো। আমি লণ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি।' মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামীজীর এখন আহার নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিন্তু এই অনাহার-অনিদ্রাতেও স্বামীজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল মঠে নূতন Encyclopaedia Britannica (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা) ক্রয় করা হইয়াছে। নূতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামীজীকে বলিল, 'এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।' শিষ্য তখন জানে না যে, স্বামীজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া

শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামীজী॥ কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সব বলে দেব। শিষ্য॥ (অবাক হইয়া) আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?

স্বামীজী॥ না পড়লে কি বলছি?

অনন্তর স্বামীজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ-সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম তো বলিলেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! শিষ্য ঐ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই-একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামীজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, 'ইহা মানুষের শক্তি নয়!'

স্বামীজী॥ দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য॥ আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্যরক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির স্ফুরণ কখনই সম্ভব না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামীজী আর কিছুই বলিলেন না। অনন্তর স্বামীজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয়সকলের বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্যই যেন আজ তিনি ঐগুলি ঐরূপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'তুই তো বেশ! স্বামীজীর অসুস্থ শরীর—কোথায় গল্পসল্প করে স্বামীজীর মন প্রফুল্ল রাখবি, তা না তুই কিনা ঐ-সব জটিল কথা তুলে স্বামীজীকে বকাচ্ছিস!' শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিলেন, 'নে, রেখে দে তোদের কবিরাজী নিয়ম-ফিয়ম। এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় তো বয়ে গেল।'

শিষ্য কিন্তু অতঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া বাঙালদেশীয় কথা লইয়া হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। স্বামীজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল।

প্রথম হইতে স্বামীজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টাতামাসা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।' পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেনঃ

ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 'মেঘনাদবধে'র মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ—লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মত না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই 'মেঘনাদবধকাব্য'—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছুঁচোবধকাব্য' লেখা হল! তা যত পারিস লেখ না, তাতে কি?সেই 'মেঘনাদবধকাব্য' এখনও হিমাচলের মত অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে-সব critic (সমালোচক)-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে? এই যে জি.সি. কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticize (সমালোচনা) করছে—দোষ ধরছে! জি.সি. কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোকে ঐসব বই appreciate (আদর) করবে।

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, 'যা, নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য-খানা নিয়ে আয়।' শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে 'মেঘনাদবধকাব্য' লইয়া আসিলে বলিলেন, 'পড় দিকি—কেমন পড়তে জানিস?'

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামীজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য হইল দেখিয়া প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট?

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্বাক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মূহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায়

যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া স্বামীজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামীজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠনভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত—জাগরূক রহিয়াছে।

৩৭

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০১

স্বামীজীর অসুখ এখনও একটু আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

আজ দুই দিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামীজীর সেবা করিতেছে। আজ অমাবস্যা। শিষ্য নির্ভয়ানন্দ-স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, যে আত্মা সর্বগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুস্যূত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন?'

স্বামীজী॥ তোর যে চোখ আছে, তা কি তুই জানিস? যখন কেউ চোখের কথা বলে, তখন 'আমার চোখ আছে' বলে কতকটা ধারণা হয়; আবার চোখে বালি পড়ে যখন চোখ করকর্ করে, তখন চোখ যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকদুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী জীবনের দুরতিক্রমণীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। এইজন্য দুঃখ আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মত যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই, যে এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ-সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্য জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনিষটা যত নিকটে, তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হতে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং 'আমিই সেই আত্মা', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি বেদের মহাকাব্য-সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখকষ্ট-তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞানলাভের ব্যবস্থা কেন? সৃষ্টি না হইলেই তো বেশ ছিল। আমরা সকলেই তো এককালে ব্রহ্মে বর্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই
৭৬
বা কেন? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণসঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন?

স্বামীজী॥ লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝতে পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত সৃষ্টি-ফিষ্টি যা কিছু দেখছিস, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে তোর ঐ-সব প্রশ্নই থাকবে না। শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই?

স্বামীজী॥ থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 'আমি আমি' করছিস, ততক্ষণ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ আত্মরতি আত্মক্রীড়, তখন তোর পক্ষে এ-সব কিছু থাকবে না; সৃষ্টি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি আছে কিনা—এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন তোকে বলতে হবে—

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥
৭৭

শিষ্য॥ জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে 'কুত্র লীনমিদং জগৎ' কথাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? স্বামীজী॥ ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করে বোঝাতে হচ্ছে, তাই ঐরূপ বলা হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যবহারিকরূপেই বলেছেন; পারমার্থিক সত্তা জগতের নেই, সে কেবলমাত্র 'অবাঙ্ মনসোগোচরম্' ব্রহ্মের আছে। বল, তোর আর কি বলবার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত করে দেব।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরঘরে গেলিনি?'

শিষ্য॥ আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

স্বামীজী॥ তবে থাক।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে।—আজ কালীপূজার দিন।' স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!' কথা কয়টি বলিয়া সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তব-মাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামীজীর এই অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য ও গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থির ভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেনঃ

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা, মা, কালী, কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞাপালনের জন্য অবস্থান করিতেছে।

স্বামীজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন এখনও কোন এক দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল, 'মহাশয়, এইবার কথাবার্তা বলুন।'

স্বামীজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'যাঁর লীলা এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কত দূর বল দিকি?'

শিষ্য তখনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক্ অবগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'মহাশয়, ও-সব কথার এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেল!'

স্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেনঃ

'কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী,
—কালী সুধা-তরঙ্গিণী॥'
গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেনঃ

এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'—শুনিসনি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব! রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দমম্'—এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মা-র ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, 'যা, নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগগীর আসিস।'

৩৮

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০১

স্বামীজী আজকাল মঠেই আছেন। শরীর তত সুস্থ নহে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্য আজ শনিবার মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

স্বামীজী॥ এ শরীরের তো এই অবস্থা! তোরা তো কেউই আমার কাজে সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস না। আমি একা কি করব বল? বাঙলা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ-কর্ম চলতে পারে? তোরা সব এখানে আসিস—শুদ্ধ আধার, তোরা যদি আমার এইসব কাজে সহায় না হস তো আমি একা কি করব বল? শিষ্য॥ মহাশয়, এইসকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনার কার্যে ইঁহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন; তথাপি আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী॥ কি জানিস, আমি চাই a band of Young Bengal (একদল যুবক বাঙালী); এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)-গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব ‘তমো’পূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না?

স্বামীজী॥ যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে করে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান-যশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তারপর বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও তো কার্যক্ষেত্রে সে-সকল এখনও বিকাশ করতে পারছিস না। এইসব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীরধারণ করে কোন কাজই করে যেতে পারলুম না। অবশ্য এখনও একেবারে হতাশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এইসব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মবীর বেরুতে পারে—যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ করবে।

শিষ্য॥ আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ়ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চা, কি ব্রহ্মচর্য—সর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্য করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামীজী॥ আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। Fame, that last infirmity of noble mind
৭৮
(যশের আকাঙ্ক্ষাই মহৎ ব্যক্তিদের শেষ দুর্বলতা)—পড়েছিস না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল-মন্দ—লোকে দুই তো বলবেই, কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গির মত কাজ করে যেতে হবে; তাতে ‘নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবন্তু’
৭৯
(পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক)।

শিষ্য॥ আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামীজী॥ মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃকপাত নেই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান্! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞাপালন আর ব্রহ্মচর্য- রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (সফল হবার একমাত্র রহস্য); ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়’ (এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে

না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব-শিবত্ব-লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শিশু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফঝম্প করে দেশটা উৎসন্নে গেল। একে তো এই dyspeptic (অজীর্ণ) রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে-ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ-সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে,'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম' শব্দে দিগদেশ কম্পিত করতে হবে। যে-সব music-এ (গীতবাদ্য) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে-সব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ-ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস, ideal (আদর্শ) থেকে কখনও যেন এক পাও হটিসনি। কখনও সাহসহীন হবিনি। খেতে-শুতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে তো মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি।

স্বামীজী॥ তখন এইরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!' হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান্, মেধাবান্, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান্' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, 'এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।' এইরূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হলে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষতা তখনই চলে যাবে।

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অদ্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়ে বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া তিনি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেনঃ

এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়, ধিক্ তাদের!করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিসনে? —এই—এই!

এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে!'—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজী 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল, একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্যে গমন করিল। সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামীজী বেড়াইতে গেলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখলি, আজ কেমন হল? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা সব ঠাকুরের সন্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তখনই তখনই অনুভূতি হয়ে গেল।'

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের মত লোকের মনও যখন নির্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী॥ সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর। এই মহামোহগ্রস্থ জীবসমূহের কল্যাণের জন্য কোন কাজে লেগে যা। দেখবি ও-সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। শিষ্য॥ মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—সে সামর্থ্যও নাই। শাস্ত্রেও বলে 'গহনা কর্মণো গতিঃ।'

স্বামীজী॥ তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য॥ আপনার মত সর্বশাস্ত্রার্থদর্শীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ববিচার করিব, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয় যেন অন্য কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই। স্বামীজী॥ ভাল লাগে তো তাই করে যা। আর তোর সব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত লোকদেরও জানিয়ে দে, তা হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না করে তো কেউ থাকতে পারে না। সুতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিষুর উপকার হতে পারে। ঐ-সব লিপিবদ্ধ করে যা। এতে অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য॥ অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, চাপরাস না পেলে কেহ কাহারও কথা লয় না।

স্বামীজী॥ তুই যে-সব সাধনা ও বিচারের stage (অবস্থা) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস, জগতে এমন লোক অনেক থাকতে পারে, যারা ঐ stage (অবস্থা)-এ পড়ে আছে; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হতে পারছে না। তোর experience (অনুভূতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হলে তাদেরও তো উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে-সব চর্চা করিস, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখলে অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য॥ আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামীজী॥ যে সাধনভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডী থেকে মানুষকে বের হতে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, ততকাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এইজন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

শিষ্য॥ এটি তো মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও তো এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামীজী॥ এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে। তাঁরা বলেন 'ব্যষ্টিগত মুক্তি—মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নয়, সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি।' অবশ্য ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখান যেতে পারে।

শিষ্য॥ বেদান্তমতে ব্যষ্টিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কামকর্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশূন্য হইলে, নির্বিষয় হইলে প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগদাদিবোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগৎই বা কোথায়?—কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিতত্ত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামীজী॥ হাঁ, তুই যা বলছিস, তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে—আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ দেখি।

শিষ্য॥ মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্যমনে কোন বিষয় ইতঃপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল?' যেন পূর্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! শিষ্য ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামীজী বলিলেন, 'দিনরাত ব্রহ্মবিষয়ের অনুধ্যান করবি। একান্তমনে ধ্যান করবি। আর ব্যুত্থানকালে হয় কোন লোকহিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি, না হয় মনে মনে ভাববি—জীবের, জগতের উপকার হোক, সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক। ঐরূপ ধারাবাহিক চিন্তাতরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা সেটি কাজই হোক, আর চিন্তাই হোক। তোর চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয়তো আমেরিকার কোন লোকের চৈতন্য হবে।'

শিষ্য॥ মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্বিষয় হয়, সে বিষয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন—এই জন্মেই যেন তাহা হয়।

স্বামীজী॥ তা হবে বৈকি। ঐকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয় হবে।

শিষ্য॥ আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন—সে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরূপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্বামীজী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দশমীর জ্যোৎস্নার রজতধারায় মঠের উদ্যান যেন প্লাবিত হইতেছিল।

৩৯

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০১

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-

প্রত্যাগত স্বামীজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে ঐরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামীজী কখনও কখনও ঐ-সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, 'হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোঁকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার॥'
৮০
কখনও বলিতেন, 'দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার সময় তার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।' আবার কখনও বলিতেন, 'Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।' সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামীজী তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন, কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাঁহার আশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, 'ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন ওর ফল নিশ্চয়ই ফলবে।' স্বামীজীর শ্রীমুখে এ-কথাও সর্বদা শুনা যাইত, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামীজীর লীলাবসানের পূর্বে কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেনঃ ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' শীগগীর আমার জন্যে নিয়ে আসবি।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামীজী॥ কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন; প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তো তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তাঁর তৈরী হিন্দুজীবনের গর্ভাধান থেকে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে, খেতে-শুতে, অন্য সকল বিষয়ের তো কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হতে পারল না। সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আচার-প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তন হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্ত একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য॥ আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামীজী॥ এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলান হয় তো মহামায়ার পুজো করব। তাই দুর্গোৎসব-বিধি পড়বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবার যখন আসবি, তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসবি।

শিষ্য॥ যে আজ্ঞা।

পরের রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' ক্রয় করিয়া স্বামীজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল। গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। স্বামীজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া চার পাঁচ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেনঃ তোর দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি তো এবার মার পূজো করব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় তো তাও করব।

* *

স্বামীজী মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতিক্রমে স্থির হইল, তাঁহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা হইবে। কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য তন্ত্রধারক হইলেন। যে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া স্বামীজী একদিন গান গাহিয়া-ছিলেন, 'বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন'—সেইখানেই বোধনাধিবাসের সান্ধ্যপূজা সম্পন্ন হইল। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া পশুবলিদান হয় নাই। গরীব-দুঃখীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সানন্দে পূজায় যোগদান করেন এবং পূজা দর্শন করিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

মহাষ্টমীর পূর্বরাত্রে স্বামীজীর জ্বর হওয়ার পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। নবমীরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দু-একটি গান গাহিলেন। পূজা-শেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা হইল। দুর্গাপূজার পর মঠে লক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত্র নির্বাহিত হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহার গর্ভধারিণীর ইচ্ছায় বাল্যকালের এক 'মানত' পূজা সম্পন্ন করিতে কালীঘাটে গিয়া

গঙ্গাস্নানান্তে ভিজা-কাপড়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মায়ের পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। এই-সকল কথা বলিবার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি; বরং পরম সমাদরে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পুজো করতে সাহায্য করেছিলেন।'

বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও স্বামীজী আচার্য শঙ্করের মত পূজানুষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরাগী ছিলেন।

৪০

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—মার্চ, ১৯০২১

আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহামহোৎসব—এই উৎসবই স্বামীজী শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই স্বামিপাদপদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামীজী মেজেতে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিলে এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীজী শিষ্য-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, 'খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারি টাটিয়েছে।' শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল।

স্তব-পাঠান্তে স্বামীজী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'বেশ হয়েছে।'

স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতা এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্যের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ (শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া) কি ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু-কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি, তাহলেই জানব দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।

শিষ্য॥ আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে দয়া করিয়া যাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।

স্বামীজী॥ সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও উহার ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল না—ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শীঘ্র উহা প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়।

স্বামীজী॥ ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্‌জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিয়া শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামীজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দিন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।'

স্বামীজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে হইল, তিনি যেন দূরদৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'লোকের গুলতোন দেখে কী আর হবে? আজ আমার কাছে থাক। আর নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।' শিষ্য দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। তিনিও সকল কার্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

অনন্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামীজীর কাছে আসিল। মনের সাধে আজ স্বামীজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল! স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় যত মনের কথা স্বামীজীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামীজীও হাস্যমুখে তাহার প্রশ্নাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্য-ভাবে হয় তো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন হয়তো শাস্ত্রাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন Question-Class (প্রশ্নোত্তর) হল। তার পরদিন চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হল। দুর্গাপূজা যেমন চার দিন ধরে হয়, তেমনি। ঐরূপে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতোন হলেই যে ঠাকুরের ভাব খুব প্রচার হল, তা তো নয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, ইহা আপনার সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।

স্বামীজী॥ আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ও-সব করিস।

শিষ্য॥ মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে।

ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী উহা দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণিত ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শিষ্য তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ তোরা হচ্ছিস ঠাকুরের লীলার actors (অভিনেতা)। এর পরে আমাদের কথা তো ছেড়েই দে, লোকে তোদেরও নাম করবে। এই যে-সব স্তব লিখছিস, এর পর লোকে ভক্তিমুক্তি-লাভের জন্য এইসব স্তব পাঠ করবে। জানবি, আত্মজ্ঞানলাভই পরম সাধন। অবতারপুরুষরূপী জগদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি হলেই ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।

শিষ্য॥ (অবাক হইয়া) মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞান লাভ হইবে তো? স্বামীজী॥ ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না।

শিষ্য॥ (বিষণ্ণ ও চিন্তিত ভাবে) আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দাসের উপায়ান্তর নাই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন, যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।

স্বামীজী॥ ভয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে। শিষ্য॥ (স্বামীজীর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।

স্বামীজী॥ কে কার উদ্ধার করতে পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জোতিষ্মান্ হয়ে সূর্যের মত প্রকাশ পান।

শিষ্য॥ তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনিতে পাই কেন?

স্বামীজী॥ কৃপা মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে কিছুদূর পর্যন্ত radius (ব্যাসার্ধ) নিয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle-এর (বৃত্তের) ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস তো বল।

শিষ্য॥ এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি, মহাশয়?

স্বামীজী॥ তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত করে দেওয়া কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা। বুঝলি? শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যাহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি?

স্বামীজী॥ তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়, ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় এবং তাঁর কৃপা পায়।

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন কি?

স্বামীজী॥ ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বলত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হত না; জানিস তো আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবুগাছ, বিস্তর ফলত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটি ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিলত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে তাঁকে খুব ভাল লাগল। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন করব। জানিস তো আমার বাঙালের মত

রোক। যা মনে করব, তা করবই। যে দিন দীক্ষা নেব মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু করব—এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধহয় ২।৩ ঘণ্টা গত হল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন এক-রকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মত দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প স্থগিত রাখতে হল। দু-এক দিন বাদে আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হল—ঠিক আগের দিনের মত। এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করলুম। মনে হল, যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?

স্বামীজী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। খানিক বাদে শিষ্যকে বলিলেনঃ ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য! 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন তোরা এখানকার লোক। 'রামকৃষ্ণ' নাম ধরে কে যে এসেছিলেন, কেউ চিনলে না। এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ—এরাও তাঁর ঠাওর পায়নি। কেউ কেউ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝবে। এই যে রাখাল-টাখাল যারা তাঁর এসেছে—এদেরও ভুল হয়ে যায়। অন্যের কথা আর কি বলব!

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এসেছে?' তিনি বলিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতা ও অপর দু-চার জন ইংরেজ মহিলা।' শিষ্যের মুখে ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ আলখাল্লাটা দে তো।' শিষ্য উহা আনিয়া দিলে তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন এবং শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিল। ভগিনী নিবেদিতা ও অপর মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামীজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্য কথাবার্তার পরেই চলিয়া গেলেন। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখছিস—এরা কেমন সভ্য! বাঙালী হলে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।' শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

বেলা প্রায় ২॥টা; লোকের খুব ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই! স্বামীজী শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, 'একবার নয় দেখে আয়, খুব শীগগীর আসবি কিন্তু।' শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

আন্দাজ দশ মিনিট বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ কত লোক হবে?

শিষ্য॥ পঞ্চাশ হাজার।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়া বলিলেন, 'বড়জোর তিরিশ হাজার।'

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥টার সময় স্বামীজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৪১-৪৬

৪১

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০২

পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন; কখনও কখনও কোন কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন, কখনও গাছপালা ফলফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কখনও বা চাকরবাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘরদ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐসকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া বলিতেন, 'আপনি কেন!' তাহা হইলে স্বামীজী বলিতেন, 'তা হলই বা। অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!'

ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা ছাগলকে 'হংসী' বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মটরু' বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর পাইয়া স্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের মত দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। মঠদর্শনে নবাগত ব্যক্তিরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে ঐরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত দেখিয়া অবাক হইয়া বলিত, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামীজী বিষণ্ণচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ্, আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে যায়।'

মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে এবং মাটি কাটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামীজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখনও কখনও স্বামীজীকে বলিত, 'ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; পরে বুড়োবাবা এসে বকে।' কথা শুনিয়া স্বামীজীর চোখ ছলছল করিত এবং বলিতেন, 'না না, বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল।' ইহা বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখদুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন, 'ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?' কেষ্টা বলিল, 'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ।' স্বামীজী বলিলেন, 'নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবে। তা হলে তো খাবি?' কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মঠে ঐ সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, 'হাঁরে স্বামী বাপ, তোর এমন জিনিষটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনও খাইনি।' স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, 'তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।' স্বামীজী যে দরিদ্র নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি!' অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্বস্ব-অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখনও কিছু ভোগ হয়নি।। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফট সব বিক্রী করে দিই, এইসব গরীব দুঃখী দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব-চুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্ম-প্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

দেশের লোকেরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজান ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।v

আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন

কেউ নেই রে! এই দেখনা—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মান্দ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রিশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে ক্রিশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁসনে ছুঁসনে।' দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস' বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোন দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এ দেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব। ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।

স্বামীজী॥ (সক্রোধে) কোন কাজ কঠিন বলে মনে করলে হেথায় আর আসিসনি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক্ সোজা হয়ে যায়। তোর কাজ হচ্ছে দীনদুঃখীর সেবা করা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে। তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে কাজ করে যাওয়া, পরে সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে—গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, এক একজন মহাপুরুষ এক-একটা সময়ে এক-একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শতসহস্র লোক জগতের হিতসাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে, হেথায় এত দিন আসছিস। কি করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানব—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী এলোথেলোভাবে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেনঃ

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। —'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামীজী দোতলায় উঠিলেন এবং বিছানায় শুইয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'পা দুটো একটু টিপে দে।' শিষ্য অদ্যকার কথাবার্তায় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আজ যা বলেছি, সে-সব কথা মনে গেঁথে রাখবি। ভুলিসনি যেন।'

৪২

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০২

আজ শনিবার। সন্ধ্যায় প্রাক্কালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন সাধন-ভজন জপ-তপস্যার খুব ঘটা। স্বামীজী আদেশ করিয়াছেন—কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী সকলকেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান করিতে হইবে। স্বামীজীর নিদ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে; শেষরাত্রে সকলের ঘুম ভাঙাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজান হয়।

শিষ্য মঠে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেনঃ

ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন-ভজন হচ্ছে! সকলেই শেষরাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে; ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙান হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়।'

ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপ ধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ না করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না। শশী
৮১
চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ীর গিন্নীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ান-দাওয়ানর যোগাড় ওই সব করত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই

দেখেছি!

শিষ্য॥ মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত? স্বামীজী॥ কি করে চলবে কিরে? আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষাশিক্ষা করে যা আসত, তাতেই সব চলে যেত। আজ সুরেশবাবু বলরামবাবু নেই; তাঁরা দুজনে থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ করতেন! সুরেশবাবুর নাম শুনেছিস তো? তিনি এই মঠের এক- রকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরানগরের মঠের সব খরচপত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবতেন। তাঁর ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

শিষ্য॥ মহাশয়, শুনিয়াছি—মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে যাইতেন না।

স্বামীজী॥ যেতে দিলে তো যাব। যাক, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাখবি, সংসারে তুই বাঁচিস কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয়-পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয়-আশয় রেখে যেতে পারিস তো তোর মরবার আগেই দেখতে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই—স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত নয়। এরই নাম সংসার!

মঠের পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

খরচপত্রের অনটনের জন্য কখনও কখনও মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শশীকে আমাদের মঠে central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) বলে জানবি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি! আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি! এ কথা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, তোর ভেতরে যদি বস্তু থাকে তো যত circumstances against (অবস্থা প্রতিকূল) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ—আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হতে আসছে তারা পারবে? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ-কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনতুম না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা—মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং জীবহিতকল্পে জীবনপাত করতে শিখবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মঠের এ-সব খাটবিছানা দেখিয়া বাহিরের লোকে কত কি বলে! স্বামীজী॥ বলতে দে না। ঠাট্টা করেও তো এখানকার কথা একবার মনে আনবে! শত্রুভাবে শীগগীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, 'লোক না পোক'। এ কি বললে, ও কি বললে—তাই শুনে বুঝি চলতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি কখনও বলেন, 'সব নারায়ণ, দীন-দুঃখী আমার নারায়ণ' আবার কখনও বলেন, 'লোক না পোক'—ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না। স্বামীজী॥ সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সকল নারায়ণের তো criticize (সমালোচনা) করে না? কই, দীন-দুঃখীরা এসে মঠের খাট-ফাট দেখে তো criticize (সমালোচনা) করে না। সৎকার্য করে যাব, যারা criticize (সমালোচনা) করবে তাদের দিকে দৃকপাতও করব না—এই sense-এ (অর্থে) 'লোক না পোক' কথা বলা হয়েছে। যার ঐরূপ রোক আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারও কারও বা একটু দেরীতে—এই যা তফাত; কিন্তু হবেই হবে। আমাদের ঐরূপ রোক (জিদ) ছিল, তাই একটু-আধটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তবে হুঁশ হয়েছিল! অন্য এক সময়ে সারাদিন না খেয়ে কলিকাতায় একাজ সেকাজ করে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি—এমন এক দিন নয়! কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

ঠিক ঠিক সন্ন্যাস কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচাল পা পড়লে তো একেবারে পাহাড় থেকে খদে পড়ল—হাত-পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কানাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হল। লোকটাকে বললুম, 'ওরে ছিলিমটে দিবি?' সে যেন জড়সড় হয়ে বললে, 'মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।' সংস্কার কিনা!—শুনেই পেছিয়ে এসে তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল—তাইতো, সন্ন্যাস নিয়েছি; জাত কুল মান—সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। তখন প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি তখনও লোকটা সেখানে বসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।' তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। বললুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে?—অবশেষে তামাক সেজে দিল। তখন আনন্দে ধূমপান করে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কিনা—পরীক্ষা করে আপনাকে দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কঠিন! কথায় ও কাজে একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি কখনও গৃহীর আদর্শ এবং কখনও ত্যাগীর আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করেন; উহার কোন্‌টি আমাদিগের মত লোকের অবলম্বনীয়? স্বামীজী॥ সব শুনে যাবি; তারপর যেটা ভাল লাগে, সেটা ধরে থাকবি—bulldog-এর (ডালকুত্তার) মত কামড়ে ধরে পড়ে থাকবি।

বলিতে বলিতে, শিষ্যসহ স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কখনও মধ্যে মধ্যে 'শিব শিব' বলিতে বলিতে, আবার কখনও বা গুনগুন করিয়া 'কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

৪৩

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০২

শিষ্য গত রাত্রে স্বামীজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় স্বামীজী শিষ্যকে জাগাইয়া বলিলেন, 'যা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল।' আদেশমত শিষ্য প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুর-ঘরে জপধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামীজীর নির্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা-বাজানয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাঙালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হল।' শিষ্যমুখে ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বেশ করেছিস।'

অতঃপর স্বামীজীও হাতমুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামীজীর জন্য পৃথক্ আসন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া শিষ্যকে একখানি আসন দেখাইয়া বলিলেন, 'যা, ঐ আসনে বসে ধ্যান কর।' মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তারা জ্বলিতেছে।

স্বামীজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিষ্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর সেই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামীজী 'শিব শিব' বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু তখন অরুণরাগে রঞ্জিত, মুখ গম্ভীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেনঃ

দেখলি, সাধুরা আজকাল কেমন জপ-ধ্যান করে! ধ্যান গভীর হলে কত কি দেখতে পাওয়া যায়! বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সুষুম্নার দর্শন পেলে যা দেখতে চাইবি, তাই দেখতে পাওয়া যায়। দৃঢ় গুরুভক্তি থাকলে সাধন-ভজন ধ্যান-জপ সব আপনা-আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।'

অনন্তর শিষ্য তামাক সাজিয়া স্বামীজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেনঃ ভেতরে নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিঙ্গি (সিংহ) রয়েছেন, ধ্যান-ধারণা করে তাঁর দর্শন পেলেই মায়ার দুনিয়া উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই তিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধনভজন করে, তার ভেতর কুণ্ডলিনী শক্তি তত শীঘ্র জেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মস্তকে উঠলেই দৃষ্টি খুলে যায়—আত্মদর্শন লাভ হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, শাস্ত্রে ঐ-সব কথা পড়িয়াছি মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই তো এখনও হইল না। স্বামীজী॥ 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শীগগীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাকতে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে—সেগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে হয়। ঐভাবে দেখতে দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতরঙ্গ থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে মনের সঙ্কল্পবৃত্তি। ইতঃপূর্বে যে-সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস, তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কখনও কখনও কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়—তারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে, তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্যে গলে যায়, তার নামই বৃত্তিশূন্য নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা করে তাঁকে ঐ-সকল অবস্থা আনতে হত না। আপনা-আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁকে দেখেই তো এ-সব ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা-আপনি খুলে যাবে। বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জানতে পাচ্ছিস না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান করবার পূর্বে যখন নাড়ী শুদ্ধ করবি, তখন

মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, 'জাগো মা, জাগো মা।' ধীরে ধীরে এ-সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional side-টা (ভাবপ্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটেই বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ), তাদের কুণ্ডলিনী ফড়ফড় করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচেকুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির ঊর্ধ্বগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকায় বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে অনেকের ভাব হত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। অনুসন্ধানে পরে জানতে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হত। ঠিকঠিক ধ্যানধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, এ-সকল গুহ্য সাধন-রহস্য কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নূতন কথা শুনিলাম। স্বামীজী॥ সব সাধন-রহস্য কি আর শাস্ত্রে আছে? এগুলি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় চলে আসছে। খুব সাবধানে ধ্যানধারণা করবি। সামনে সুগন্ধি ফুল রাখবি, ধুনা জ্বালবি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই করবি। গুরু-ইষ্টের নাম করতে করতে বলবিঃ জীব-জগৎ সকলের মঙ্গল হোক। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অধঃ ঊর্ধ্ব—সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বসবি। এইরূপ প্রথম প্রথম করতে হয়। তারপর স্থির হয়ে বসে—যে-কোন মুখে বসলেই হল—মন্ত্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইরূপ ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝঞ্ঝাট থাকে তো অন্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি হয়রে বাপ?

এইবার স্বামীজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেনঃ

তোদের অল্পেই আত্মদৃষ্টি খুলে যাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিস, তখন মুক্তি-ফুক্তি তো তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা ছাড়া আর্তনাদ-পূর্ণ সংসারের দুঃখও কিছু দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে যা দেখি। কঠোর সাধনা করে এ দেহ পাত করে ফেলেছি। এই হাড়মাসের খাঁচায় আর যেন কিছু নেই। তোরা এখন কাজে লেগে যা, আমি একটু জিরুই। আর কিছু না পারিস, এইসব যত শাস্ত্র-ফাস্ত্র পড়লি, এর কথা জীবকে শোনাগে। এর চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

৪৪

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০২

স্বামীজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্য মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাস হইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাসে প্রধান জিজ্ঞাসু। এরূপ শাস্ত্রালোচনাকে স্বামীজী 'চর্চা' শব্দে নির্দেশ করিতেন এবং চর্চা করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্বদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন বা উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামীজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামীজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্বদা শিরোধার্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ।

আজ শনিবার। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র শিষ্য জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্যের একান্ত বাসনা—স্বামীজীর সঙ্গে যায়, কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাওয়া কর্তব্য নহে—ভাবিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আলখাল্লা ও গৈরিক বসনের কান-ঢাকা টুপী পরিয়া একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন—পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্বে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'চল যাবি?' শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী অন্যমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া কথা কহিয়া তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহসী না হইয়া প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, স্বামীজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই বলুন।' স্বামীজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ॥ কত কি বলতেন তা তোকে একদিনে কি বলব? কখনও বলিতেন, 'নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে।' কখনও বলতেন, 'ও আমার শ্বশুরঘর।' আবার কখনও বলতেন, 'এমনটি জগতে কখনও আসেনি—আসবে না।' একদিন বলেছিলেন, 'মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়!' বাস্তবিকই উনি তখন কোন ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভেতর করে ওঁকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় সব দেখে শুনে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিষ্য॥ মহাশয়, বাস্তবিকই কখনও কখনও মনে হয়, উনি মানুষ নহেন। কিন্তু আবার কথাবার্তা বলিবার এবং যুক্তি-বিচার করিবার

কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয় যেন কোন আবরণ দিয়া সে সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে দেন না!

প্রেমানন্দ॥ ঠাকুর বলতেন, 'ও যখনি জানতে পারবে—ও কে, তখনি আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে।' তাই কাজকর্মের ভেতরে নরেনের মনটা থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যানধারণা করতে দেখলে আমাদের ভয় হয়।

এইবার স্বামীজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ঐ-সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'কিরে, তোদের কি কথা হচ্ছিল?' শিষ্য বলিল, 'এই ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছিল।' উত্তর শুনিয়াই স্বামীজী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি তাঁহার বসিবার জন্য পাতা ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে মুখ ধুইয়া উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেনঃ

তোদের দেশে বেদান্তবাদ প্রচার করতে লেগে যা না কেন? ওখানে ভয়ানক তন্ত্রমন্ত্রের প্রাদুর্ভাব। অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙাল-দেশটা তোলপাড় করে তোল দেখি, তবে জানব—তুই বেদান্তবাদী। ওদেশে প্রথম একটা বেদান্তের টোল খুলে দে—তাতে উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এই সব পড়া। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দে। আর বিচার করে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের হারিয়ে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি পড়ে। ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান আর অনুমান—এই নিয়েই হয়তো নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের মাসাবধি বিচার চলেছে! আত্মজ্ঞানলাভের তাতে আর কি বিশেষ সহায়তা হয় বল? বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মতত্ত্বের পঠন-পাঠন না হলে কি আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হোক বা নাগ-মহাশয়ের বাড়ীতেই হোক একটা চতুষ্পাঠী খুলে দে। তাতে এইসব সৎশাস্ত্র-পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। ঐরূপ করলে তোর নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কল্যাণ হবে। তোর কীর্তিও থাকবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমি নামযশের আকাঙ্ক্ষা রাখি না। তবে আপনি যেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোধ হয় মনেই থাকিয়া যাইবে।

স্বামীজী॥ বে করেছিস তো কি হয়েছে? মা-বাপ ভাই-বোনকে অন্নবস্ত্র দিয়ে যেমন পালন করছিস, স্ত্রীকেও তেমনি করবি, বস্। ধর্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি বলে সম্মানের চক্ষে দেখবি। ধর্ম-উদযাপনে 'সহধর্মিণী' বলে মনে করবি। অন্য সময়ে অপর দশ জনের মত দেখবি। এইরূপ ভাবতে ভাবতে দেখবি মনের চঞ্চলতা একাবারে মরে যাবে। ভয় কি?

স্বামীজীর অভয়বাণী শুনিয়া শিষ্য আশ্বস্ত হইল।

আহারান্তে স্বামীজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন। অপর সকলের প্রসাদ পাইবার তখনও সময় হয় নাই। সেজন্য শিষ্য স্বামীজীর পদসেবা করিবার অবসর পাইল। স্বামীজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার জন্য কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, 'এই সব ঠাকুরের সন্তান দেখছিস, এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা করে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে।' পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—গীতার উক্তি শুনেছিস তো? এদের সেবা করবি, তা হলেই সব হয়ে যাবে। তোকে এরা কত স্নেহ করে, জানিস তো?'

শিষ্য॥ মহাশয়, ইঁহাদের কিন্তু বুঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এক একজনের এক এক ভাব!

স্বামীজী॥ ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সঙ্ঘরূপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে—কালে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, 'যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।' যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচকে থাকে বলে এদের সামান্য মানুষ বলে মনে করিসনি। এরাই আবার যখন বার হবে, তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ বলে এদের জানবি। আমি এদের ঐ-ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মত spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির মত ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কিনা সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্ম-শক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল; স্বামীজী আবার বলিলেন, 'তোদের দেশ থেকে নাগ-মহাশয় ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর দু-একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল, তারা তাঁকে ধরতে পারলে না।' নাগ-মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামীজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ-মহাশয়ের বাড়ীতে গঙ্গার উৎস উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'হ্যাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল দিকি।'

শিষ্য॥ আমিও ঐ ঘটনা শুনিয়াছি মাত্র, চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার মহাবারুণীযোগে পিতাকে সঙ্গে করিয়া নাগ-মহাশয় কলিকাতা আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ী না পাইয়া তিন-চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। অগত্যা নাগ-মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং পিতাকে বলেন, 'মন শুদ্ধ হলে মা গঙ্গা এখানেই আসবেন।' পরে যোগের সময় বাড়ীর উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল—এইরূপ শুনিয়াছি। যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। আমি তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার বহু পূর্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

স্বামীজী॥ তার আর আশ্চর্য কি? তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ; তাঁর জন্য ঐরূপ হওয়া আমি কিছু আশ্চর্য মনে করি না।

বলিতে বলিতে স্বামীজী পাশ ফিরিয়া
শুইয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।
শিষ্য প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

৪৫

স্থান—কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে মঠে
কাল—১৯০২

আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা; বালকের মত উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা-আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামীজী॥ একটা দরকারে এসেছিলুম। চল, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুর ভাজা খা না, বেশ নুন-ঝাল আছে।

শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল এবং মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামীজী॥ তবে একখানা নৌকা দেখ।

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে গেল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের সহিত দরদস্তুর চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীও তথায় আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌঁছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য দুই আনা বলিল। 'ওদের সঙ্গে আবার কি দরদস্তুর করছিস?' বলিয়া স্বামীজী শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং মাঝিকে 'যা, আট আনাই দেব' বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে পৌঁছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামীজীকে একা পাইয়া শিষ্য নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল।

গত জন্মোৎসবের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের মহিমা কীর্তন করিয়া শিষ্য যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই তোর রচিত স্তবে যাদের যাদের নাম করেছিস, কি করে জানলি—তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ?'

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত করিতেছি, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি—ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামীজী॥ ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে, কিন্তু সকল ভক্তই তো তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের ভেতর নয়?ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, 'মা দেখিয়ে দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তরঙ্গ লোক নয়।' স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার ভক্তদের সম্বন্ধেও ঠাকুর সেদিন ঐরূপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে যে কতদূর প্রভেদ বর্তমান, তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্বামীজী॥ কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে—এ কি কখনও হয়েছে?—না হতে পারে? ও-কথা কখনও বিশ্বাস করবিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন 'ঈশ্বরকোটী' 'অন্তরঙ্গ' ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য কিছুই নিতে পারলে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ও-সব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর 'বাদশা', তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ কখনও কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবনযাপন করতে পারে?

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন?

স্বামীজী॥ তা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে spirituality (ধর্মানুভূতি)-র দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস, সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কার্য

করেন বা জগতের ধর্মভাব প্রচার করেন।' এটা জেনে রাখবি—অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা পরার্থে সর্বত্যাগী, যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মত পরিত্যাগ করে 'জগদ্ধিতায়' 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন। ভগবান্ ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করে আসছেন। কোথায় কবে শুনেছিস—কামকাঞ্চনের দাস হয়ে থেকে মানুষ মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? আপনি মুক্ত না হলে অপরকে কি করে মুক্ত করবে? বেদ-বেদান্ত ইতিহাস-পুরাণ সর্বত্র দেখতে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্বকালে সর্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—'যথা পূর্বং তথা পরম্'—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্যের কথা ফাঁকা আওয়াজের মত শূন্যে লীন হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্মভাব-রক্ষা ও প্রচারের মহাকেন্দ্রস্বরূপ হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছে, সে-সব কি সত্য নয়?

স্বামীজী॥ একেবারে সত্য নয়—বলা যায় না; তবে তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে যেমন আধার, সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা করছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলেছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেউ বলছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেউ বলছেন—চৈতন্যদেব 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেউ বলছেন—সাধনভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনবি; ও-সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ-অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ তখনি দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝ—তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন—কোন গেরস্ত সেখানে আছে কিনা। যদি দেখতেন—কেউ নেই বা আসছে না, তবেই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ-তপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী—উদাসীন।

শিষ্য॥ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখিতেন?

স্বামীজী॥ তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখিস না। বুঝেই দেখ না কেন—তাঁর যে-সব সন্তান ঈশ্বরলাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থে-আশ্রমে তপস্যায় দেহপাত করছে, তারা বড়—না যারা তাঁর সেবা বন্দনা স্মরণ মনন করছে অথচ সংসারের মায়ামোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তারা বড়? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আকুমার ঊর্ধ্বরেতা, যারা ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্তিমান চলদ্বিগ্রহ, তারা বড়—না যারা মাছির মত একবার ফুলে বসে, পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বসছে, তারা বড়? এ-সব নিজেই বুঝে দেখ।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, যাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করুন, উভয়ই সমান—আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।

পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্য কথার অবতারণা করিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনি যে দেশবিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল?'

স্বামীজী॥ কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

শিষ্য॥ আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।

স্বামীজী॥ এই তো কত কি দিনরাত শুনছিস। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?

শিষ্য॥ মহাশয়, আমরা তো তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায়?

স্বামীজী॥ তাঁর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এইসব সাধুদের সঙ্গলাভ তো করেছিস, তবে আর তাঁকে দেখলিনি কি করে বল? তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাঁদের সেবাবন্দনা করলে কালে তিনি revealed (প্রকাশিত) হবেন। কালে সব দেখতে পাবি।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন, সে কথা তো কোন দিন কিছু বলেন না।

স্বামীজী॥ আমার কথা আর কি বলব? দেখছিস তো, আমি তাঁর দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হব। তাঁর সামনেই কখনও কখনও তাঁকে গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামীজী তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন—

‘(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।’ ইত্যাদি

গান শুনিয়া শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল। গান সমাপ্ত হইলে স্বামীজী বলিলেন, ‘তোদের বাঙালদেশে সুকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা-গঙ্গার জল পেটে না গেলে সুকণ্ঠ হয় না।’

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামীজী
নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন
এবং জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম
বারান্দায় বসিলেন। স্বামীজীর
গৌরকান্তি এবং গৈরিকবসন সন্ধ্যার
দীপালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ
করিল।

৪৬

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—জুন (শেষ সপ্তাহ), ১৯০২

আজ ১৩ আষাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মস্থান। অদ্য সে অফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্তন করিবার সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘বেশ আছি। (শিষ্যের পোষাক দেখিয়া) তুই কোটপ্যান্ট পরিস, কলার পরিসনি কেন?’ ঐ কথা বলিয়াই নিকটস্থ স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘আমার যে-সব কলার আছে, তা থেকে দুটো কলার একে কাল দিস তো।’ সারদানন্দ-স্বামীও স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া স্বামীজীর কাছে আসিল। স্বামীজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব-লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোষাকাদি না পরিলে চলে না।

স্বামীজী॥ তা কে বারণ করছে? অফিস-অঞ্চলে কার্যানুরোধে ঐরূপ পোষাক পরবি বৈকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি—সেই কোঁচা-ঝুলান কামিজ-গায়, চাদর কাঁধে। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ তোরা কেবল শার্ট (কামিজ) পরেই এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাস—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোষাক পরে লোকের বাড়ী যাওয়া ভারি অভদ্রতা—naked (নেংটো) বলে। শার্টের উপর কোট না পরলে, ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকতেই দেবে না। পোষাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ করতেই শিখেছিস্! আজকালকার ছেলে-ছোকরারা যেসব পোষাক পরে, তা না এদেশী, না ওদেশী—এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামীজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবল শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামীজীকে বলিবে কিনা, ভাবিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ কি ভাবছিস? বলেই ফেল না।

শিষ্য॥ (সলজ্জভাবে) মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া যায়, যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পারি, তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন-ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।

শিষ্যের ঐরূপ দীনতা-দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে সস্নেহে বলিলেন, 'খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাকব, তখন তুই যাস। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন।'

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। স্বামীজী 'থাক্ থাক্' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতমতের বাগবিতণ্ডায় মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, 'ওরে আস্তে আস্তে বিচার কর; অমন চীৎকার করলে স্বামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।' শিষ্য ঐ কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে স্বামীজীর কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল—স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির—যেন 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'। স্বামীজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তি দেখিয়া সে অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্য হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যবহারিক জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কখন এখানে এলি?'

শিষ্য॥ এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামীজী॥ তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামীজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীজীর কাছে বসিল।

স্বামীজী॥ আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্য॥ মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামীজী॥ তোকে সব উপায় তো পূর্বেই বলে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল দেখি তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিয়া থাকি, তথাপি আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখনও কখনও আবার মনে হয়—কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয় আমার ধ্যান হইবে না, এখন আপনার চিরসামীপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বামীজী॥ ও সব weakness-এর (দুর্বলতার) চিহ্ন। সর্বদা নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মাদর্শন একবার হলে সব হল—জন্ম-মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি।

শিষ্য॥ আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলিতে আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া দিন।

স্বামীজী॥ সময় পেলেই ধ্যান করবি। সুষুম্না-পথে মন যদি একবার চলে যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে—বেশী কিছু আর করতে হবে না।

শিষ্য॥ আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার সত্য-বস্তু প্রত্যক্ষ হইবে কি? স্বামীজী॥ হবে বৈকি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি? ও-সব weakness (দুর্বলতা) মনেও স্থান দিবিনি।

পরে বলিলেনঃ শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

অতঃপর প্রসাদের ঘণ্টা পড়ায় বলিলেন, 'যা প্রসাদের ঘণ্টা পড়েছে।'

শিষ্য স্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা করায় স্বামীজী শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন,

‘আমার আশীর্বাদে যদি তোর কোন উপকার হয় তো বলছি—ভগবান্ রামকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।’

শিষ্য এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাজকে স্বামীজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। স্বামী শিবানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘যাঃ বাঙাল, তোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের ফল জানতে পারবি।’

আহারান্তে শিষ্য আর সে-রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজী আজ সকাল-সকাল নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শিষ্যকে কার্যানুরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া সে উপরে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, ‘এখনি যাবি?’

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ আগামী রবিবার আসবি তো?

শিষ্য॥ নিশ্চয়।

স্বামীজী॥ তবে আয়; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে।

শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে এ-জন্মের মত বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও জানে না যে, তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্থূলশরীরে তাহার এই শেষ
৮২
দেখা। স্বামীজী তাহাকে প্রসন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, ‘রবিবারে আসিস।’ শিষ্যও ‘আসিব’ বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্বামী সারদানন্দ তাহাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, ‘ওরে, কলার দুটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।’ শিষ্য বলিল, ‘আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব—আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।’

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন হইতে

'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার গুরুদেবের সহিত আলমোড়া, নৈনীতাল প্রভৃতি স্থানে এবং কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণের কয়েকখানি জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে ইহা সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তের ন্যায় নহে। বর্তমান যুগের দুইজন

মহামনীষীর ভাবের সংঘর্ষের চিত্র পুস্তকখানির
*
ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। নিবেদিতার সমুদয় কথাগুলিই ভাবপূর্ণ, এবং বর্ণনাপেক্ষা ইঙ্গিতের দ্বারাই পাঠকের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাব ও চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টির চেষ্টা করে। নিবেদিতার নিজের ভাষায় তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা বলি, 'এমন সব সময় আসিয়াছে, যাহা ভুলিবার নয়; এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।'

বশংবদ
প্রকাশক

---

* বর্তমান সংগ্রহে প্রধানতঃ স্বামীজীর কথাগুলিই চয়ন করা হইয়াছে, তৎসহ প্রয়োজনীয় পটভূমিকা সন্নিবেশিত আছে।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ১-৩

পূর্বাভাষ

ব্যক্তিগণ—স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও শিষ্যমণ্ডলী। কয়েক জন পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য—ধীরামাতা, জয়া নাম্নী এক মহিলা ও নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান—ভারতের বিভিন্ন অংশ
কাল—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

এ বৎসর দিনগুলি কি সুন্দর ভাবেই না কাটিয়াছে! এই সময়েই যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটীরে, তারপর হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ-কালে—সর্বত্রই সব সময় আসিয়াছিল, যাহা কখনও ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি—এ সমস্ত দিব্য লীলার, মনে হয়, শিশু ভগবান্ যেন জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া সাক্ষিস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি!

... দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাচল-অরণ্যানীর দৃশ্যাবলী আর দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাজভোগ্য সৌন্দর্যরাশি। স্মৃতির এই সকল নিদর্শন বর্ণনা করিতে কাহার না আগ্রহ হয়! কিন্তু বর্ণনায় উহা বিবর্ণ হইয়া উঠিবে—কেন না সে যে অসম্ভব! তাই স্মৃতির আলেখ্যে নয়, স্মৃতির আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকিবে তথাকার কোমলহৃদয় শান্তপ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ।

কিরূপ মানসিক অবস্থায় নূতন নূতন ধর্ম-বিশ্বাস প্রসূত হয়, এবং কী ধরনের মহাপুরুষেরা এইরূপ ধর্ম-বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন—আমরা তাহা কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কারণ, আমরা এমন এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছি, যিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিতেন, সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

বিদেশীর উপহাসস্থল, কিন্তু দেশবাসীর পূজাস্পদ ভিক্ষুকের বেশে তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি; তাই মনে হয়—শ্রমলব্ধ জীবিকা, সামান্য কুটীরে বাস, এবং শস্যক্ষেত্রবাহী সাধারণ পথ—কেবল এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটের মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটিতে পারে।

তাঁহার স্বদেশবাসী বিদ্বান্ রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, নিরক্ষর অজ্ঞেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাঁহার নৌকার মাঝি-মাল্লারা পথ চাহিয়া থাকিত, কতক্ষণে তিনি আবার নৌকায় ফিরিয়া আসিবেন। যে গৃহে তিনি অতিথি হইতেন, সেই গৃহের পরিচারক ভৃত্যদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কে আগে তাঁহার সেবা করিবে। আর এই সকল ব্যাপার সর্বদাই যেন একটা খেলার আবরণে জড়িত থাকিত। 'তাঁহারা যে ভগবানের খেলার সঙ্গী'—এই ভাব তাহাদের মনে স্বতই জাগরূক থাকিত।

যাঁহারা এরূপ শুভমুহূর্তের আস্বাদ পাইয়াছেন, জীবন তাঁহাদের নিকট অধিকতর মূল্যবান্, অধিকতর মধুময়। দীর্ঘ নিরানন্দ রজনীর তালবন-সঞ্চারী বায়ুও উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্তে তাঁহাদের কর্ণে শান্তিময় 'শিব! শিব!' বাণী ধ্বনিত করিয়া তোলে।

১

স্থান—বেলুড় গঙ্গাতীরে একখানি বাড়ী
কাল—মার্চ হইতে ১১ মে পর্যন্ত

গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানির সম্বন্ধে স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরামাতার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ইহার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।'

বাস্তবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশার ভাব, এবং বাহিরে প্রতি জিনিষটি সমান সুন্দর; শ্যামল বিস্তৃত শষ্পরাজি, উন্নত নারিকেল বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙের গ্রামগুলি—সবই সুন্দর!

যাঁহাদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে আসিতেন, এবং আমরা স্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন-কালে তাঁহার নাম-পরিবর্তনের কথা, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধির কথা, এবং যাহা বাক্যের অতীত ও সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত, যাহা কেবল প্রেমিক হৃদয়েরই অনুভবগম্য, পরার্থে স্বামীজীর সেই পবিত্র মর্মবেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাম। আর স্বয়ং স্বামীজী তথায় আসিতেন, উমা-মহেশ্বরের ও রাধাকৃষ্ণের গল্প বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন।

বেশীর ভাগ, তিনি আজ একটি, কাল একটি—এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন; তাঁহার যখন যেমন খেয়াল হইত, যেন তদনুসারেই কোন একটিকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কেবল যে ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।

ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে, যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে আস্বাদ করা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই খুব করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে, হয়তো তিনি হরগৌরীমিলনাত্মক একটি কবিতা
১
আবৃত্তি করিতেনঃ

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, ...

শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়। চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ,

সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়।

নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়,

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

কপালমালাপরিশোভিতায়। অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ,

দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।

নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,

... ... নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্বদাই পরিণামে অদ্বয় অনন্তের কথায় পর্যবসিত হইত। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে-কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্তি হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিষই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না। বন্ধনমাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং যাহারা 'শৃঙ্খলকে পুণ্যের আররণে ঢাকিতে চাহে' তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ স্তরের রসশিল্পের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত সমালোচক যে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহা কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। একদিন আমরা কয়েক জন ইওরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। স্বামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেনঃ

'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত!'

এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, তাহার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।' তাঁহার কথাবার্তা সরস উক্তসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই দিনই অপরাহ্নে, কোন রাজনৈতিক বিষয়ের বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'দেখা যাইতেছে যে, একটি জাতিগঠনের পক্ষে

সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্যকতা আছে!'

কয়েক মাস পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাহার জগতে কোন বিশেষ কাজ করিবার আছে, তাহার কাছে আমি কখনও উমা এবং মহেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবদেবীর কথা বলি না। কারণ, মহেশ্বর এবং জগন্মাতা হইতেই কর্মবীরগণের উদ্ভব।' ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া যে কি জিনিষ, তাহার আভাস তিনি না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে এই সব গানও সুর-সংযোগে গাহিতেনঃ

'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বলচে রে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই!
ডাকচে বাঁশী—আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান করে।'
২

তিনি তাঁহার বন্ধু-রচিত
৩
গোপগোপীগণের উত্তর-প্রত্যুত্তর-সূচক ভাবগম্ভীর গীতটিও গাহিয়া শুনাইতেনঃ

'পরমাত্মক পীতবসন নবঘনশ্যামকায়।
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি, বাঁকা নয়ন গোপীর মন মজে।
পাণ্ডবসখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা বলে নয়ন ভেসে যায়।'

২৫ মার্চ। প্রাতে কুটীরে আসিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় আসা—ইহাই স্বামীজীর এই সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে—শুক্রবার ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের
৪
দিন—তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিন জনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানান্তে একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। সেই প্রভাতটি জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত! পূজাশেষে আমরা উপর তলায় গেলাম। স্বামীজী যোগী শিবের ন্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া একঘণ্টাকাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন।

তারপর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে আমাদের নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎ কার্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্জিলিঙ যাত্রা করিলেন।

৩ মে। তারপর আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনীতিক গগন তমসাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সূচনা দেখা যাইতেছিল। ইতঃপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মূর্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'মা কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, এবং মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান্ শুভের ন্যায় অশুভ রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভ রূপেও পূজা করিতে সাহস করে।'

মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা সব দিক্ আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন স্বামীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সেই সুখের দিনগুলিও অন্তর্হিত হইল। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় আসিল।

২

স্থান—হিমালয়
কাল—১১ হইতে ২৫ মে পর্যন্ত

আমরা একটি বড় দল, অথবা প্রকৃতপক্ষে দুইটি দল—বুধবার সন্ধ্যাকালে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

তিনটি ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল—খেতড়ির রাজাকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্যদেবের আহ্লাদ; দুইজন বাঈজীর আমাদিগের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া স্বামীজীর নিকট গমন এবং অন্যের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীজীর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা; আর একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তিঃ 'স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করেন, স্মরণ রাখিবেন যে, আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহাদের সকলের অগ্রণী।'

এই নৈনীতালেই স্বামীজী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, তাহাতে তিনি তিনটি বিষয় এই আচার্যের শিক্ষার মূলসূত্র বলিয়া নির্দেশ করেনঃ তাঁহার বেদান্ত গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার, এবং হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এই-সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কার্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন।

নর্তকীদ্বয়-সংক্রান্ত ঘটনাটি আমাদের নৈনী-সরোবরের উপরে অবস্থিত মন্দিরদ্বয় দর্শন উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এইস্থানে আমরা দুইজন বাঈজীকে পূজায় রত দেখিলাম। পূজান্তে তাহারা আমাদের নিকট আসিল, এবং আমরা ভাঙা ভাঙা ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। স্বামীজী তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনোমধ্যে একটা আন্দোলন চলিয়াছিল। খেতড়ির বাঈজীর যে গল্প তিনি বারংবার করিতেন, তাহা প্রথমবার সম্ভবতঃ এই নৈনীতালের বাঈজীদের প্রসঙ্গেই বলিয়াছিলেন। খেতড়ির সেই বাঈজীকে দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনেক অনুরোধে তথায় গমন করেন এবং তাহার সঙ্গীতটি শ্রবণ করেনঃ

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈ নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নেহী হোয়, দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো॥
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

অতঃপর আচার্যদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটি পর্দা উঠিয়া গেল এবং, সবই যে এক বৈ দুই নহে—এই উপলব্ধি করিয়া তিনি তারপর আর কাহাকেও মন্দ বলিয়া দেখিতেন না।

যখন আমরা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা করিলাম তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, এবং বনপথ অতিবাহন করিতে করিতেই রাত্রি হইয়া গেল। অবশেষে বৃক্ষরাজির অন্তরালে পর্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত একটি ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার বদন আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় অতিথিগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি।

প্রাতরাশের সময় আমাদের নিকট আসিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তায় কাটাইয়া দেওয়া স্বামীজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আলমোড়া পৌঁছিবার দিন হইতেই স্বামীজী এই অভ্যাস পুনরায় শুরু করিলেন। তখন (এবং সকল সময়ই) তিনি অতি অল্প সময় ঘুমাইতেন এবং মনে হয়, তিনি যে এত প্রাতে আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা অনেক সময় আরও সকালে সন্ন্যাসিগণের সহিত তাঁহার এক প্রস্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার মুখে। কখনও কখনও, কিন্তু কালেভদ্রে, বৈকালেও আমরা তাঁহার দেখা পাইতাম, হয় তিনিই বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় তো আমরা নিজেরাই, তিনি যেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম।

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথোপকথনগুলিতে একটি নূতন এবং অনুভূতপূর্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ। স্বামীজী উল্লাসের সহিত তাঁহার দীক্ষিতা এক ইংরেজ মহিলাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি এখন কোন্ জাতিভুক্তা? উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন—তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন—একজন ভারতীয় নারীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব, ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব। স্বামীজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'বাস্তবিকই, তোমার যেরূপ স্বজাতিপ্রেম, উহা তো পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় কাজ করিয়া থাকে, আমি চাই, তুমি এইটুকু বোঝ; কিন্তু তুমি ক্রমাগত ইহাকে উল্টাইয়া দিয়া বলিয়া থাক যে, একটি জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্ঞতাকে এরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা তো শয়তানি!'

সুতরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলির সহিত সংঘর্ষের আকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে ভারতীয় এবং ইওরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের তুলনা চলিত, এবং অনেক সময় অতি মূল্যবান্ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে পাইতাম। স্বামীজীর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্যে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, কিন্তু তথা হইতে চলিয়া আসিবার পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার মনে নাই, এইরূপ বোধ হইত।

৩

স্থান—আলমোড়া

প্রথন দিন সকালে কথোপকথনের বিষয় ছিল—সভ্যতার মূল আদর্শ প্রতীচ্যে সত্য, প্রাচ্যে ব্রহ্মচর্য। হিন্দু-বিবাহ-রীতিগুলিকে তিনি এই বলিয়া সমর্থন করিলেন যে, তাহার এই আদর্শের অনুসরণের ফলেই জন্মিয়াছে এবং সর্ববিধ সংহতিগঠনেই স্ত্রীলোকের রক্ষাবিধান প্রয়োজন। সমস্ত বিষয়টির অদ্বৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও তিনি বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইলেন।

আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেনঃ যেমন জগতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি মুখ্য জাতি আছে, তেমনি চারিটি মুখ্যজাতীয় কার্যও আছে—ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, যাহা হিন্দুরা নিষ্পন্ন করিতেছে; সামরিক কার্য, যাহা রোমক সাম্রাজ্যের হস্তে ছিল; বাণিজ্যবিষয়ক কার্য, যাহা আজকালকার ইংলণ্ড করিতেছে; এবং প্রজাতন্ত্রমূলক কার্য, যাহা আমেরিকা ভবিষ্যতে সম্পন্ন করিবে। এই স্থলে তিনি, কিরূপে আমেরিকা অতঃপর শূদ্রজাতির স্বাধীনতা এবং একযোগে কার্যকারণরূপ সমস্যাগুলি পূরণ করিবে, সে বিষয়ে কল্পনাসহায়ে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিনি আমেরিকাবাসী নন, এরূপ একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া মার্কিন জাতি কিরূপ বদান্যতার সহিত সেখানকার আদিম অধিবাসিগণের জন্য বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে বিষয় বর্ণনা করিলেন।

তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম-ঋতুটিতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে এইরূপ বর্ণনা করেন, 'ক্ষীণালোক, তারপর আরও ক্ষীণালোক—আর সেখানে একটি সমাধি!'—আর একবার তিনি শাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন!' অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন! আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলা-সম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি প্রতিভা!' আকবরের প্রসঙ্গ তিনি আরও বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদগদ হইয়া আসিত।

সর্ববিধ বিশ্বজননী ভাবও আচার্যদেবের হৃদয়ে উদিত হইত। একদিন তিনি চীনদেশকে জগতের কোষাগার বলিয়া বর্ণনা করিলেন; এবং বলিলেন, তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙলা-লিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি সুদূর ইটালী পর্যন্ত চলিয়া যাইতেন। ইটালী তাঁহার নিকট 'ইওরোপের সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়, ধর্ম ও শিল্পের দেশ, একাধারে সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মভূমি, এবং উচ্চভাব সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রসূতি!'

একদিন শিবাজী ও মহারাষ্ট্র-জাতি সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাজী সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় প্রত্যাবর্তন করেন, সে বিষয়ে কথা হইল। স্বামীজী বলিলেন, 'আজও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করে, পাছে তাহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে।'

অনেক সময়, 'আর্যগণ কাহারা এবং তাঁহাদের লক্ষণ কি?'—এই প্রশ্ন তাঁহার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল সমস্যা—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপে সুইজারলণ্ডে থাকিয়াও বোধ করিতেন যেন চীনদেশে রহিয়াছেন—উভয় জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্য এত বেশী, সে গল্পও আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের সম্বন্ধেও এটি সত্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তারপর দেশভেদে আকৃতিভেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হাঙ্গেরীদেশীয় পণ্ডিতের মর্মস্পর্শী গল্প (যিনি 'তিব্বতই হুনদিগের আদিস্থান' এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং দার্জিলিঙে যাঁহার সমাধি আছে)—এইরূপ নানা কথা শুনিতে পাইতাম।

কখনও কখনও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের বিরোধের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে এতদুভয়ের সংঘর্ষ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেন; এবং জাতির উন্নতিশীল, এবং শৃঙ্খল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমূহ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আধুনিক বাঙলার কায়স্থগণই যে মৌর্যরাজত্বের পূর্বতন ক্ষত্রিয়কুল, তাঁহার এই বিশ্বাসের অনুকূলে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন। তিনি এই দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতাদর্শের এইরূপ চিত্র উপস্থাপিত করিতেনঃ একটি প্রাচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি চিরবর্ধমান-শ্রদ্ধাসম্পন্ন; অপরটি স্পর্ধাশীল, আবেগপ্রবণ এবং উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান্ বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়া যে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির এক গভীর নিয়মেরই ফলস্বরূপ। এই আপাত-বিসংবাদী সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইবামাত্র মনে হইত, বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ ধ্বংস করিবার একটি সূত্র—'ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম' ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাঙ্ঘাতিক প্রতিপক্ষ।

বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামীজী যে সময় কথা কহিতেন, সেটি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামীজীর একটি কথা হইতে বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবটিই তাঁহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী! আমি জানিতাম না যে, আপনি বৌদ্ধ!' উক্ত নাম শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মত কেহ কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নাই—আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও একটি ছাগশিশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত! এত প্রেম যে, এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য স্বীয় শরীর পর্যন্ত দান

করিয়াছিলেন এবং আশ্রয়দাতা এক চণ্ডালের জন্য আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন! আর আমার বাল্যকালে একদিন তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলাম! কারণ, আমি বুঝিয়াছিলাম ভগবান্ বুদ্ধই স্বয়ং আসিয়াছেন!'

অনেক বার—কখনও বেলুড়ে অবস্থানকালে এবং কখনও তাহার পরে—তিনি এই ভাবে বুদ্ধদেবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাদিগকে—প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলেন সেই রূপসী অম্বাপালীর উপাখ্যান, যিনি মুখ্যবারাঙ্গনা হইয়াও বুদ্ধকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে এক সর্বাপেক্ষা অধিক নূতনত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল 'ভক্তি'—প্রেমাস্পদের সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য, যাহা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর রায় রামানন্দের মুখে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছেঃ

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।
৫

সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি পারস্যের বাব-পন্থিগণের (Babists) কথা বলিয়াছিলেন—সেই পরার্থে আত্মবলিদানের যুগের কথা, যখন স্ত্রীজাতিকর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া পুরুষগণ কাজ করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিত। নিশ্চিয় সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ভালবাসিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্কগণের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব; এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎ কার্যের বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে—ইহাই তাঁহার ধারণা।

আর একদিন অরুণোদয়কালে উদ্যান হইতে যখন ঊষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামীজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব; আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী!' কারণ, এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ—তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু ঈশ্বরই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।

একদিন সন্ধ্যাকালে পরমহংস শুকের আখ্যানটি আমরা শুনিয়াছিলাম।

বাস্তবিক, শুকই ছিলেন স্বামীজীর মনের মত যোগী। তাঁহার নিকট শুক সেই সর্বোচ্চ অপরোক্ষানুভূতির আদর্শরূপ, যাহার তুলনায় জীবজগৎ ছেলেখেলা মাত্র! বহুদিন পরে আমরা শুনিয়াছিলাম কিশোর স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ)-কে শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করিয়াছিলেন 'যেন আমার শুকদেব'। 'অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা'—গীতার প্রকৃত অর্থ আমি জানি এবং শুক জানে, আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন। ভগবদ্গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্ম্য-দ্যোতক এই শিববাক্য দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না; তিনি যেন আনন্দসমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

আর একদিন স্বামীজী, হিন্দু-সভ্যতার চিরন্তন উপকূলে—আধুনিক চিন্তাতরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে-সকল উদারহৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতঃপূর্বেই নৈনীতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে!' এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে একই অঞ্চলে মাত্র কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, এ কথা মনে হইলে তিনি যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেন।

স্বামীজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনকারী এবং বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) একটি প্রিয় গল্প ছিল, সেটি এইঃ

একদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভা হইতে—এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন, ঐরূপ স্থানে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত কিনা, এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, ধীরে সুস্থে এবং গুরুগম্ভীর চালে গৃহগমনরত এক স্থূলকায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, 'মহাশয়, আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে!' এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিল না; ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈষৎ বিজ্ঞজনোচিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু ক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'পাজি! খানকয়েক বাখারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই আমায় বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস!'—এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ধুতি চাদর এবং চটি জুতা কোনক্রমে ছাড়া হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে একটা জামা ও একজোড়া জুতা পর্যন্ত পরিলেন না!

'বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কিনা?'—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্নে শাস্ত্রপাঠার্থ বিদ্যাসাগরের একমাসের জন্য

নির্জনগমনের চিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জনবাসের পর তিনি শাস্ত্র এরূপ পুনর্বিবাহের প্রতিপক্ষ নহেন', এই মত প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; সুতরাং সরকার বাহাদুর এই আন্দোলনের পক্ষে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইলে ইহা কখনই আইনরূপে পরিণত হইত না। স্বামীজী আরও বলিলেন, 'আর আজকাল এই সমস্যা সামাজিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইয়া বরং একটা অর্থনীতিসংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

যে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূত আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হইয়া 'আর ভগবান্ মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তখন 'পোশাকী' মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

বাঙলার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একজনের নাম স্বামীজী ইঁহার নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ডেভিড হেয়ার; সেই বৃদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী নিরীশ্বরবাদী—মৃত্যুর পর যাঁহাকে কলিকাতার যাজকবৃন্দ ঈশাহিজনোচিত সমাধি-দানে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকারোগাক্রান্ত এক পুরাতন ছাত্রের শুশ্রূষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নিজ ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাধিস্থল করিল, এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই স্থানই আজ শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া কলেজ স্কোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, আর তাঁহার বিদ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত, এবং আজিও কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তীর্থের ন্যায় তাঁহার সমাধিস্থান দর্শনে গিয়া থাকে।

এইদিন আমরা কথাবার্তার মধ্যে কোন সুযোগে স্বামীজীকে জেরা করিয়া বসিলাম—ঈশাহিধর্ম তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা। এইরূপ সমস্যা যে কেহ সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাণ্ডবাসী হেষ্টিসাহেবের সহিত মেলামেশাতেই ঈশাদি প্রচারকগণের সহিত তাঁহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল। এই উগ্রমস্তিষ্ক বৃদ্ধ অতি সামান্য ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাঁহার ছাত্রদেরই গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি প্রথমে স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারত-প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, 'হাঁ বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!' স্বামীজী সানন্দে বলিলেন, 'আমি তাঁহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত, তিনি যে আমাকে তেমন ঈশাহিভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এ-কথা তোমরা বলিতে পার কি? আমার তো মনে হয় না।'

লঘুতর প্রসঙ্গেও আমরা চমৎকার চমৎকার গল্প শুনিতাম। তাহার একটিঃ আমেরিকার এক নগরে স্বামীজী এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত, রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী এবং এক দম্পতির সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ একটি করিয়া পেরু কাবাব করিয়া খাইত এবং সেই দম্পতি লোকের ভূত নামাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। স্বামীজী ঐ ভদ্রলোকটিকে তাঁহার লোকঠকান ব্যবসা হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য ভর্ৎসনা-সহকারে বলিতেন, 'তোমার এরূপ করা কখনও উচিত নহে।' অমনি স্ত্রীটি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে বলিত, 'হাঁ, মহাশয়! আমিও তো উঁহাকে ঠিক ঐ কথাই বলিয়া থাকি; কারণ উনিই যত ভূত সাজিয়া মরেন, আর টাকাকড়ি যা কিছু তা মিসেস উইলিয়াম্স্‌ই লইয়া যায়।'

এক ইঞ্জিনীয়র যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটি লেখাপড়া জানিত। একদিন ভূতুড়ে কাণ্ডের অভিনয়কালে স্থূলকায়া মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ পর্দার আড়াল হইতে তাহার ক্ষীণকায়া জননীরূপে আবির্ভূতা হইলে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই হইয়াছ!' স্বামীজী বলিলেন, 'এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্মাহত হইলাম; কারণ আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়াইয়াছে!' কিন্তু স্বামীজী হটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ইঞ্জিনীয়র যুবককে এক রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক কৃষকের মৃত পিতার আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আকৃতির পরিচয়স্বরূপে এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, 'তোমায় তো বাপু—কতবার বলিলাম, তাঁর নাকের উপর একটি আঁচিল ছিল!' অবশেষে চিত্রকর এক সাধারণ কৃষকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার নাসিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়া দিয়া সংবাদ দিলেন, 'ছবি প্রস্তুত' এবং কৃষকপুত্রকে উহা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে আসিয়া কিছুক্ষণ চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শোকবিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিল, 'বাবা! বাবা! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তুমি কত বদলে গেছ!' এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনীয়র যুবক আর স্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না।

যাহা হউক, এই প্রকার সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক নানা বিষয় থাকা সত্ত্বেও স্বামীজীর মনের ভিতর এই সময় একটা সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে নির্যাতনের কথা আশ্চর্যভাবে তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বিশ্রাম ও শান্তির যে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি দু-একটি কথা বলিয়াছিলেন বটে, অতি অল্প হইলেও তাহাই যথেষ্ট। তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'নির্জনবাসের জন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, আমি একাকী বনাঞ্চলে যাইয়া শান্তিলাভ করিব।'

তারপর ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি মাথার উপর তরুণ চন্দ্রের দীপ্তি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'মুসলমানগণ শুক্লপক্ষীয় শশিকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ করি!'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার মানস-কন্যাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

২৫ মে। তিনি যেদিন যাত্রা করিলেন, সেদিন বুধবার। শনিবারে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্টা করিয়া অরণ্যানীর নির্জনতার মধ্যে বাস করিতেন বটে কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে চারিদিক হইতে এত লোক সঙ্গলাভের জন্য সাগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত যে, তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইত, এবং সেইজন্যই তিনি এইরূপে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, নগ্নপদে ভ্রমণক্ষম এবং শীতাতপ ও অল্পাহার-সহিষ্ণু সন্ন্যাসীই আছেন; প্রতীচ্য-বাস তাঁহার ক্ষতি করিতে পারে নাই।

২ জুন। শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়া কাজ কর্ম করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক 'তার' আসিল। তারটি একদিন দেরীতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'কল্য রাত্রে উতকামণ্ডে গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।' সে অঞ্চল যে (typhoid) মহামারীর সূত্রপাত হইতেছিল, আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর কথা কহিয়াছিলেন।

৫ জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামীজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়াই তাঁহার রাস্তা। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমরা মুহূর্তেকের জন্য বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। তিনি দুঃসংবাদের বিষয় জানিতেন না, কিন্তু ইতঃপূর্বেই যেন এক গভীর বিষাদচ্ছায়া তাঁহাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের
৬
কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, যিনি গোখুরা সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়া এইমাত্র বলিয়াছিলেন, 'প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে,' এবং যাঁহাকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে 'পওহারী বাবা নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছে। হোমাগ্নিতে তিনি স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।' তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামীজী! এটি কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই?'

স্বামীজী গভীর আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'তাহা আমি জানি না। তিনি এত বড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকারী নই। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন।'

৬ জুন। পরদিন প্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, তিনি এক গভীরভাবে ভাবিত। পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিটা হইতেই জাগরিত এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া গুডউইন-সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে। আঘাতটি তিনি নীরবে সহিয়া লইলেন, কয়েক দিন পরে তিনি যে-স্থানে প্রথম ইহা পাইয়াছিলেন, সে-স্থানেই আর থাকিতে চাহিলেন না; বলিলেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি রাতদিন তাঁহার মনে পড়িতেছে, এবং ইহা যে দুর্বলতা, এ-কথাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহা যে দোষাবহ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিলেন যে, কাহারও স্মৃতি দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর ক্রমবিকাশের উচ্চতর সোপানে মৎস্য কিম্বা কুক্কুরসুলভ লক্ষণগুলি অবিকল বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই। মানুষকে এই ভ্রম জয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি—এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ষণেই কোন ব্যক্তিবিশেষের (সগুণ ঈশ্বরের) ইচ্ছানুসারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জন্য এরূপ ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা মানুষের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নহে কি?—গুডউইন বাঁচিয়া থাকিলে কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত!

স্বামীজীর এই উক্তিটির সহিত, এক বৎসর পরে যে আর একটি উক্তি শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা যে-সকল অলীক কল্পনা সহায়ে সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করি, তাহা দেখিয়া ঠিক এইরূপ তীব্র বিস্ময়ের সহিত তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'দেখ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শাসক এবং কর্মচারীর জন্য অবসর ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট আছে। আর চিরন্তন শাসক ঈশ্বরই বুঝি শুধু চিরকাল বিচারাসনে বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার আর কখনও ছুটি মিলিবে না!'

কিন্তু এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা স্বামীজী তাঁহার বিয়োগদুঃখে অটল রহিলেন এবং আমাদের সহিত বসিয়া ধীরভাবে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি ক্রমাগত ভক্তি যে তপস্যায় পরিণত হয়, সেই কথা বলিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেমের খরতর প্রবাহ মানুষকে ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া বহুদূর ভাসাইয়া লইয়া গেলেও আবার তাহাকে এমন একস্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছটফট করে।

সেদিন সকালের ত্যাগসম্বন্ধীয় উপদেশসমূহ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল; পুনরায় তিনি আসিলে উক্ত মহিলা তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ধারণা—অনাসক্ত হইয়া ভালবাসায় কোনরূপ দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ।'

হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামীজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই যে ত্যাগ-রহিত ভক্তির কথা বলিতেছ, এটা কি? ইহা অত্যন্ত হানিকার!' সত্যই যদি অনাসক্ত হইতে হয়, তবে কিরূপ কঠোর আত্মসংযমের অভ্যাস আবশ্যক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলির আবরণ উন্মোচন করা চাই এবং অতি কুসুম-কোমল হৃদয়েরও যে, যে-কোন মুহূর্তে সংসারের পাপ-কালিমায় কলুষিত হইবার আশঙ্কা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভারতবর্ষীয়া সন্ন্যাসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি 'মানুষ কখনও ধর্মপথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরস্বরূপ 'এক খুরি ছাই' প্রেরণ করিয়াছিলেন। রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সুদীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর, এবং যে-কোন মুহূর্তেই বিজেতার বিজিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় (ত্যাগ, সংযম, দীনতার) কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তিনি এইরূপে যে-ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছেন, উহা ইওরোপ যে দুঃখ-উপাসনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাই কিনা?

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'আর সুখের পূজাটাই বুঝি ভারি উঁচুদরের জিনিষ?' তারপর একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, 'কিন্তু আসল কথা এই যে, আমরা দুঃখেরও পূজা করি না, সুখেরও পূজা করি না; এই উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা সুখদুঃখের অতীত, তাহাই লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য।'

৯ জুন। এই বৃহস্পতিবার প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। জন্মগত হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার জন্য স্বামীজীর মনের এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি হয়তো একদিন কোন একটি ভাবে ভাবিত হইয়া সেই ভাবের গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পর দিনই হয়তো উহাকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ চিন্তাপ্রণালীর প্রথম আভাস তিনি বাল্যকালে তাঁহার গুরুদেবের নিকট পাইয়াছিলেন। কোন এক ধর্মভাবের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা-বিষয়ে সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কি! তাহা হইলে তুমি কি মনে কর না যে, যাহারা এরূপ সব ভাবের ধারণা করিতে পারিত, তাহারাই সেই সব ভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিল?'

যেমন খ্রীষ্টের অস্তিত্ব-বিষয়ে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও তিনি কখনও কখনও তাঁহার স্বভাবসুলভ সাধারণ সন্দেহের ভাবে কথাবার্তা বলিতেনঃ ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদই সৌভাগ্যক্রমে 'শত্রু-মিত্র' দুই-ই পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিক অংশে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তো সকলের চেয়ে বেশী অস্পষ্ট। কবি, রাখাল, শক্তিশালী শাসক, যোদ্ধা এবং ঋষি—হয়তো এই সব ভাবগুলি একত্র করিয়া গীতাহস্তে এক সুন্দর মূর্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল।

আজ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত হইলেন, পরবর্তী অপূর্ব চিত্রে ভগবান্ সারথিবেশে অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে ব্যূহসংস্থান লক্ষ্য করিয়া শিষ্যস্থানীয় রাজপুত্রকে গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজী একটা কথা বারংবার বলিতেন যে, ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ স্বামীজী কোথাও গিয়া একাকী বাস করিবার জন্য ছটফট করিতেছিলেন। যে-স্থানে তিনি গুডউনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, সেই স্থান তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পত্র আদান-প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নূতন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন; কিন্তু তিনি (স্বামীজী) নিজে বাহ্যতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও ভিতরে ভক্তিতে পূর্ণ, এবং সেইজন্য মাঝে মাঝে তাঁহাতে নারী-সুলভ দুর্বলতা ও কোমলতার ভাব দেখা যাইত।

একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ পঙ্‌ক্তি লইয়া গেলেন এবং উহাকে একটি ক্ষুদ্র কবিতারূপে
৭
ফিরাইয়া আনিলেন। সেটি স্বামিহীনা গুডউইন-জননীকে তাঁহার পুত্রের স্মরণে স্বামীজী-প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপ প্রেরিত হইল।

সংশোধনের পর আসল কবিতাটির কিছুই রহিল না বলিয়া এবং যাঁহার লেখা সংশোধিত হইল, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি আগ্রহ-সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, 'কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিষ!'

১০ জুন। আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহ্নে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া রোগটিকে রোহিণী নামক ব্যাধি (Cancer) বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্বে শিষ্যগণকে বহুবার বুঝাইয়া দেন—ইহা সংক্রামক রোগ। অর্ধ ঘণ্টা পরে 'নরেন্দ্র' (তখন তাঁহার ঐ নাম ছিল) আসিয়া দেখিলেন, শিষ্যেরা একত্র হইয়া ঐ-বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া, তারপর মেজের দিকে তাকাইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের গোড়ায় ভুক্তাবশিষ্ট পায়সের বাটিটি দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাদ্যবাহী নলীটির সঙ্কোচনবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিবার জন্য অনেকবার ব্যর্থচেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা তাঁহার মুখ হইতে বার বার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ঐ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ শ্লেষ্মা ও পুঁজ নিশ্চয়ই তাহার সহিত ছিল। 'নরেন্দ্র' বাটিটি উঠাইয়া লইয়া সর্বসমক্ষে উহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও শিষ্যগণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৪-৬

৪

কাঠগুদামের পথে

১১ জুন। শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়া ত্যাগ করিলাম। কাঠগুদাম পৌঁছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল।

রাস্তার এক স্থানে এক অদ্ভুত রকমের পুরানো পানচাক্কীর এবং শূন্য কামারশালের কাছে আসিয়া স্বামীজী ধীরামাতাকে বলিলেন, 'লোকে বলে, এই পার্বত্য অঞ্চলে একজাতীয় গন্ধর্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাস। আমি একটি সত্য ঘটনা জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইখানে প্রথমে ঐ সকল মূর্তির দর্শন পান এবং তাহার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় অবগত হন।'

এখন গোলাপের মরসুম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর এক প্রকার ফুল (কামিনী ফুল) ফুটিয়া রহিয়াছে, স্পর্শমাত্রেই উহা ঝরিয়া পড়ে। ভারতীয় কাব্যজগতের সহিত ইহার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া স্বামীজী উহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন।

১৩ জুন। রবিবার অপরাহ্নে আমরা সমতল ভূমির সন্নিকটে একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগে একস্থানে বিশ্রাম করিলাম। সেইখানে স্বামীজী আমাদের জন্য রুদ্র-স্তুতিটির অনুবাদ করিলেনঃ

'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।'

আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, আমাদিগকে তম হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও, আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে রুদ্র, তোমার যে করুণাপূর্ণ দক্ষিণমুখ, তদ্দ্বারা আমাদিগকে নিত্য রক্ষা কর।

'আবিরাবির্ম এধি'—এই অংশের অনুবাদে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অনুবাদ এইরূপ দিবেন কিনাঃ 'আমাদের অন্তস্তলে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও।' কিন্তু অবশেষে তিনি আমাদের নিকট তাঁহার চিন্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, 'ইহার আসল মানে এই, আমাদেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আইস।' ইহার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'হে রুদ্র, তুমি কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও আত্মপ্রকাশ কর।' এক্ষণে তাঁহার অনুবাদটিকে সমাধিকালীন অনুভূতিরই এক ক্ষিপ্র ও সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মাত্র বলিয়া মনে করি। উহা যেন সংস্কৃতের মধ্য হইতে সজীব হৃদয়টিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরেজী ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে।

বাস্তবিক সে অপরাহ্নটি যেন অনুবাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হইল, এবং তিনি হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির অন্যতম মন্ত্রটির
৮
কিছু কিছু আমাদের নিকটে অনুবাদ করিয়া দিলেনঃ

আমি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; বায়ুসকল আমার অনুকূল হউক, নদীসকল অনুকূল হউক, ওষধিসকল অনুকূল হউক, রাত্রি ও ঊষা আমাদের অনুকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অনুকূল হউক, দ্যৌরূপী পিতা আমাদের অনুকূল হউন, বনস্পতি সকল আমাদের অনুকূল হউক, সূর্য আমাদের অনুকূল হউন, গোসকলও আমাদের অনুকূল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

পরে স্বামীজী খেতড়ির নর্তকীর নিকট সুরদাসের যে গানটি শুনিয়াছিলেন, সেটি আমাদের নিকট পুনরায় গাহিলেনঃ

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তুমহারো, ইত্যাদি—।
৯

সেই দিন কি আর এক দিন, তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন, যিনি তাঁহাকে একপাল বানর কর্তৃক উত্যক্ত দেখিয়া, এবং তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া পলাইতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, 'সর্বদা জানোয়ারগুলার সম্মুখীন হইও।'

বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই চটিতে পৌঁছিয়া দুঃখ বোধ হইত। এই সময়ে রেলযোগে 'তরাই' নামক সেই ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে আমাদের একটি সারা বিকাল লাগিয়াছিল, এবং স্বামীজী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি।

৫

স্থান—বেরিলী হইতে বারামুল্লা
কাল—১৪ হইতে ২০ জুন

১৪ জুন। পরদিন আমরা পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম; এই ঘটনায় স্বামীজী অতিশয় উল্লসিত হইলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এত প্রীতি ছিল যে, উহা ঠিক যেন তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হইত। স্বামীজী বলিলেন, 'এখানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটিতে তাহার 'সোঽহং সোঽহং' ধ্বনি শুনিয়া থাকে।' বলিতে বলিতে সহসা বিষয়ান্তর আলোচনায় তিনি সুদূর অতীতে চলিয়া গেলেন এবং আমাদের সমক্ষে যবনগণের সিন্ধুনদ-তীরে অভিযান, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধসাম্রাজ্যের বিস্তার, এই-সকল মহান্ ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী একে একে উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি যেমন করিয়া হউক আটক পর্যন্ত গিয়া, যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটি স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি আমাদের নিকট গান্ধার-ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন (নিশ্চয়ই সেগুলি তিনি পূর্ব বৎসর লাহোরের যাদুঘরে দেখিয়া থাকিবেন) এবং 'কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে'—ইওরোপীয়গণের এই অর্থহীন অন্যায় দাবী নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। গোধূলির আলোকে এই সকল পার্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটি অতিক্রমকালে স্বামীজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাস-জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।'

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, 'শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা—' বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন সুদূরে নিবদ্ধ হইল—'আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মত কোন এক অলৌকিক দর্শন-লাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি ঐরূপে সেই প্রাচীন তানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিষদ্সমূহের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাঁহার সমগ্র জীবনের কাজ।'

রাওলপিণ্ডি হইতে মরী পর্যন্ত আমরা টঙ্গায় গেলাম এবং কাশ্মীর-যাত্রার পূর্বে তথায় কয়েক দিন অতিবাহিত করিলাম। এইখানে স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তিনি প্রাচীনপন্থী পরিবেশে কোন ইওরোপীয়কে শিষ্যরূপে বা স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাইতে কোন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা বাঙলা দেশে করাই ভাল। পঞ্জাবে বিদেশীয়দিগের প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল যে, সেখানে এরূপ কোন কার্যের সফলতার সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্যাটি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিত; এবং তিনি কখনও কখনও বলিতেন যে, বাঙালীরা রাজনীতি-বিষয়ে ইংরেজের বিরোধী, অথচ উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও বিশ্বাসের একটা প্রবণতা রহিয়াছে; ইহা আপাতবিরুদ্ধ হইলেও সত্য।

অপরাহ্নের অনেকটা সময় আমরা ঝড়ের জন্য ঘরের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ডুলাই-এ আমাদের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। কারণ, স্বামীজী গম্ভীর ও বিশদভাবে এই ধর্মের আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে-সকল কুরীতি বামাচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি স্বীয় আপসহীন বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করিলেন।

যিনি কাহাকেও নিরাশ করা সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'ঠাকুর বলিতেন—হাঁ, তা বটে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীরই একটা পায়খানার দুয়ারও তো আছে!' অতঃপর স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন যে, সকল দেশেই যে-সকল সম্প্রদায়ে কদাচারের ভিতর দিয়া ধর্মলাভের চেষ্টা করা হয়, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত।

আমরা স্বামীজীর সহিত পালা করিয়া টঙ্গায় যাইবার ব্যবস্থা করিলাম, এবং এই পরবর্তী দিনটি যেন অতীত স্মৃতির আলোচনাতেই

পূর্ণ ছিল।

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সত্তার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, এবং প্রেমই যে পাপের একমাত্র ঔষধ, তাহাও বলিলেন। তাঁহার স্কুলের একজন সহপাঠী বড় হইয়া ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গেল। রোগটির ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না; উহার ফলে দিন দিন তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতেছিল, এবং চিকিৎসকগণের নৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। অবশেষে 'স্বামীজী চিরকাল ধর্মাভাবাপন্ন'—ইহা জানা থাকায় এবং অন্য সব উপায় বিফল হইলে মানুষ ধর্মের আশ্রয় লয় বলিয়া তিনি স্বামীজীকে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলেন। আচার্যদেব তথায় পৌঁছিলে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিল।

'যিনি ব্রহ্মকে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন; এবং যিনি লোকসকলকে আপনা হইতে অন্যত্র ভাবেন, লোকসকল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।'—এই শ্রুতিবাক্য
১০
তাঁহার মনে পড়িল এবং রোগীও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে স্বামীজী বলিলেন, 'সুতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের মত কথা বলি না, বা রাগিয়া কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও যে, প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু প্রচার করা আদৌ আমার অন্তরের ভাব নহে। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, এইটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলেই এই সব গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে!'

সম্ভবতঃ সেই দিনই (অথবা পূর্বদিনও হইতে পারে) তিনি 'মহাদেব'-প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলিলেন, শৈশবে তাঁহার জননী পুত্রের দুষ্টামি দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, 'এত জপ, এত উপবাসের ফলে শিব কিনা একটি পুণ্যাত্মার পরিবর্তে তোকে—ভূতকে পাঠাইলেন!' অবশেষে তিনি যে সত্য-সত্যই শিবের একটি ভূত, এই ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তাঁহার মনে হইল, যেন কোন শাস্তির নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্য শিবলোক হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা হইবে—সেখানে ফিরিয়া যাওয়া।

তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রথম আচার-মর্যাদালঙ্ঘন পাঁচ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি খাইতে খাইতে ডান হাত এঁটো-মাখা থাকিলে বাঁ হাতে জলের গেলাস তুলিয়া লওয়া কেন অধিক পরিচ্ছন্নতার কাজ হইবে না, এই মর্মে তাঁহার মাতার সহিত এক তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুষ্টামি অথবা এই জাতীয় অন্য সব দুষ্টামির জন্য জননীর অমোঘ ঔষধ ছিল—বালককে জলের কলের নীচে বসাইয়া দেওয়া, এবং তাঁহার মস্তকে শীতল জলধারা পড়িতে থাকিলে 'শিব! শিব!' উচ্চারণ করা। স্বামীজী বলিলেন, এই উপায়টি কখনও বিফল হইত না। মাতার জপ তাঁহাকে তাঁহার নির্বাসনের কথা মনে পড়াইয়া দিত, এবং তিনি মনে মনে 'না, না, এবার আর নয়!' এই বলিয়া আবার শান্ত এবং বাধ্য হইতেন।

মহাদেবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ছিল, এবং একদা তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যদি তাহারা তাহাদের নূতন নূতন কর্তব্যের মধ্যে মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে শুধু 'শিব! শিব!' বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজা করা হইবে। তাঁহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্যন্ত সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্তি দ্বারা ওতপ্রোত, যে-ধ্যান সুখচিন্তার দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে; এবং তিনি বলিলেন—এই গ্রীষ্ম ঋতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বুঝিলেন, যাহাতে মহাদেবের মস্তকে এবং সমতল প্রদেশে অবতরণের পূর্বে, শিবের জটার মধ্যে সুরধুনীর ইতস্ততঃ সঞ্চারণ কল্পিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি বহুদিন ধরিয়া পর্বতমধ্যবাহিনী নদী ও জলপ্রপাতসকল কি কথা বলে, ইহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছেন, ইহা সেই অনাদি অনন্ত 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত, সুন্দর এবং মৌন! আর আমি তাঁহার পরম ভক্ত।'

আর এক সময় তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল—বিবাহ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধেরই আদর্শস্বরূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, 'এই জন্যই—যদিও মাতার স্নেহ কতকাংশে এতদপেক্ষা মহত্তর, তথাপি পৃথিবীসুদ্ধ লোক স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া থাকে। অপর কোন প্রেমেই এরূপ মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইবার অপূর্ব শক্তি নাই। প্রেমাস্পদকে যেমনটি কল্পনা করা যায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটিই হইয়া উঠে, এই প্রেমে প্রেমাস্পদকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।'

পরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথা উঠিল, এবং বিদেশপ্রত্যাগত পান্থ কিরূপ আনন্দের সহিত আবার স্বদেশের নরনারীকে স্বাগত জানায়, স্বামীজী তাহা উল্লেখ করিলেন। সারা জীবন ধরিয়া মানুষ অজ্ঞাতসারে এই শিক্ষা লাভ করিয়া আসে যে, সে স্বদেশবাসীর মুখে এবং আকৃতিতে ভাবের মৃদুতম আলোড়নটি পর্যন্ত বুঝিতে পারে।

পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পদচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাদের কৃচ্ছ্রানুরাগ দেখিয়া স্বামীজী কঠোর তপস্যাকে 'বর্বরতা' বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ তাহাদের আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, এই দৃশ্যে তাঁহার মনে কষ্টকর স্মৃতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মানব-সাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে আবার ঐ ভাব যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং তৎপরিবর্তে সমান দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্ত হইল—এই 'বর্বরতা' না থাকিলে বিলাস আসিয়া মানুষের সমুদয় মনুষ্যত্ব অপহরণ করিত।

কাশ্মীর উপত্যকা

স্থান—বিতস্তা নদী (বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর)
কাল—২০ হইতে ২২ জুন

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়'—পরম উল্লাসে এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী আমাদের ডাকবাংলার কামরায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং ছাতাটি জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন; কোন সঙ্গী না লইয়া আসায় তাঁহাকেই সাধারণ ছোটখাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে হইতেছিল, ডোঙা ভাড়া করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তিনি বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হইয়াই হঠাৎ একজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামীজীর নাম শ্রবণে কাজের সমস্ত ভার নিজের উপর লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং দিনটি আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা সামাভারে তৈরী কাশ্মীরী চা পান করিলাম, এবং ঐ দেশের মোরব্বা খাইলাম। পরে প্রায় চারিটার সময় আমরা তিনডোঙ্গা-বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নৌ-বহর অধিকার করিলাম এবং আর বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথম সন্ধ্যাটিতে আমরা স্বামীজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিয়াছিলাম।

পরদিন আমরা তুষারমণ্ডিত পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। ইহাই 'কাশ্মীর উপত্যকা' নামে পরিচিত; কিন্তু হয়তো 'শ্রীনগর উপত্যকা' বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়।

সেই প্রথম প্রভাতে ক্ষেতের উপর দিয়া লম্বা এক চোট ভ্রমণের পর আমরা এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড চেনার গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম। সত্য-সত্যই দেখিলাম, যেন এই গাছের কোটরে প্রবাদোক্ত বিশটা গরু স্থান পাইতে পারে! কিরূপে ইহাকে এক সাধু-নিবাসের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, স্বামীজী এই স্থাপত্যবিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিকই এ সজীব বৃক্ষটির কোটরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্মিত হইতে পারিত। পরে তিনি ধ্যানের কথা বলিতে লাগিলেন; ফলে দাঁড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে চেনার গাছ দেখিলেই ঐ কথার স্মৃতি উহাকে পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া দিবে!

তাঁহার সহিত আমরা নিকটস্থ গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দেখিলাম, তরুতলে বসিয়া এক পরম সুশ্রী বর্ষীয়সী রমণী। তাঁহার মাথায় কাশ্মীরীনারী-সুলভ লাল টুপী এবং শ্বেত অবগুণ্ঠন। তিনি বসিয়া পশম হইতে সূতা কাটিতেছিলেন এবং তাঁহার চারি পাশে তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং তাহাদের ছেলেপিলেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। স্বামীজী পূর্ব শরৎ ঋতুতে আর একবার এই গোলাবাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি এই বৃদ্ধাটির স্বধর্মে আস্থা এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। সে-বার তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধাও তৎক্ষণাৎ তাহাকে জল দিয়াছিলেন। বিদায় লইবার পূর্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা লরিয়াছিলেন, 'মা, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বিনী?' সগর্বে জয়ের উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী!' এক্ষণে এই মুসলমান পরিবারের সকলে মিলিয়া স্বামীজীকে পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি যে বন্ধুগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহারা সর্ববিধ সৌজন্য-প্রকাশে রত হইলেন।

শ্রীনগর পৌঁছিতে দুই-তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে আহারের পূর্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের মধ্যে একজন (যিনি কালীঘাট দেখিয়াছিলেন) আচার্যদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, কালীঘাটে ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তাঁহার বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং বলিয়া উঠিলেন, 'প্রতিমার সম্মুখে লোকে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন?' স্বামীজী একটি তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন, 'তিল আর্যগণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ', কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটি ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথা নয়?'

আচার্যদেব আমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গ্রীষ্মাবসানের পূর্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া ধ্যান শিক্ষা দিবেন। স্থির হইল যে, আমরা প্রথমে দেশটি দেখিব—তারপর নির্জনবাস করিব।

শ্রীনগরে প্রথম রজনীতে আমরা কতিপয় বাঙালী রাজকর্মচারীর গৃহে ভোজন করিয়াছিলাম, এবং নানা কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য অভ্যাগতগণের মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন, 'প্রত্যেক জাতির ইতিহাস কতকগুলি আদর্শের রূপায়ণ এবং বিকাশ-স্বরূপ; উক্ত জাতির সকল লোকেরই উচিত সেইগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা।' আমরা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম যে, উপস্থিত হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষে ইহা তো স্পষ্টই একটি বন্ধন, এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বন্ধনাত্মক অংশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহারা সমগ্র ভাবটির প্রতিই অবিচার করিলেন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে স্বামীজী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, 'তোমরা বোধ হয় স্বীকার করিবে যে, মানব প্রকৃতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শ্রেণীভাগের একক (unit) মনস্তাত্ত্বিক; ভৌগোলিক বিভাগ অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী। প্রণালী হিসাবে এই ভাবগত সাদৃশ্যগ্রহণকে একদেশবর্তিতামূলক সাদৃশ্যগ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী করা যায়।' তারপর তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত দুইজনের কথা উল্লেখ করিলেন; তন্মধ্যে একজনকে—তিনি জীবনে যত খ্রীষ্টান দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বরাবর মনে করিতেন অথচ তিনি একজন বঙ্গনারী; এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্চাত্যে, কিন্তু স্বামীজী বলিতেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহার চেয়েও ভাল হিন্দু। সব দিক্ ভাবিয়া দেখিলে এ অবস্থায় ইহাই কি সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ছিল না যে, উহাদের একে অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব প্রসার বিধান করে?

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৭-৯

৭

স্থান—শ্রীনগর
কাল—২২ জুন হইতে ১৫ জুলাই

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় আমাদের নিকট আসিয়া দীর্ঘকাল কথাবার্তা কহিতেন—কখনও কাশ্মীর যে-সকল বিভিন্ন ধর্মযুগের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্মের নীতি, কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়তো বা কণিষ্কের সময়ে শ্রীনগরের অবস্থা—এই সকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত।

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিলেন, 'আসল কথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম অশোকের সময়ে এমন একটি কার্যের জন্যই উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্য জগৎ এ যুগেই [সবেমাত্র আজকালই] উপযুক্ত হইয়াছে!'—তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা বলিতেছিলেন। কিরূপে অশোকের ধর্মবিষয়ক একচ্ছত্রত্ব বার বার ঈশাহি ও মুসলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গ দ্বারা চূর্ণ হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতদুভয়ের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবী করিত, অবশেষে কি উপায়ে এই মহাসমন্বয় স্বল্পকালমধ্যেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে—এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি এক অপূর্ব চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

আর একবার মধ্য-এশিয়ার দিগ্বিজয়ী বীর জেঙ্গিজ খাঁ অথবা চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'লোকে তাঁহাকে একজন নীচ পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে, তোমরা শুনিয়া থাক; কিন্তু তাহা সত্য নহে! এইরূপ মহামনা ব্যক্তিগণ কখনও কেবল ধনলোলুপ বা নীচ হন না! তিনি এক রকম একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার (সময়ের) জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিতেছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছাঁচে গড়া লোক ছিলেন এবং সেকেন্দারও এই শ্রেণীর আর একজন। মাত্র এই তিন জন—অথবা হয়তো একই জীবাত্মা তিনটি পৃথক্ দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।' তারপর একই অবতার-আত্মা ঐশী শক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া জীবব্রহ্মৈক্য-সংস্থাপনের নিমিত্ত বারংবার ধর্মজগতে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া তিনি যে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে 'প্রবুদ্ধ-ভারত' মান্দ্রাজ হইতে মায়াবতীতে নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমরা সকলে প্রায়ই ইহার কথা ভাবিতাম।

স্বামীজী এই পত্রিকাখানিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তৎপ্রদত্ত সুন্দর নামটিও তাহার পরিচয়। তাঁহার নিজের কয়েকখানি মুখপত্র থাকে, এজন্য তিনি সদাই উৎসুক ছিলেন। বর্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তার-কল্পে মাসিক পত্রের কি মূল্য, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, বক্তৃতা এবং লোকহিতকর কার্যের ন্যায় এই উপায় দ্বারাও তাঁহার গুরুদেবের উপদেশাবলী প্রচার করা আবশ্যক। সুতরাং দিনের পর দিন তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকহিতকর কাজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতেন, তাঁহার কাজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ করিতেন। প্রতিদিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদকত্বে আশু-প্রকাশোন্মুখ প্রথম সংখ্যাখানির বিষয়ে কথা পাড়িতেন। একদিন বৈকালে আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিয়া বলিলেনঃ একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কবিতাকারে এরূপ দাঁড়াইল—To the Awakened India.
১১

২৬ জুন। আচার্যদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা না জানিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতঃপূর্বে কখনও কোন খ্রীষ্টান বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করে নাই, পরে আমরা ইহা দর্শন করিয়া যে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত; কারণ ভগবান্ যেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এই নামটিই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া উঠিবে।

২৯ জুন। আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা আড়ম্বরে দুই তিন সহস্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারী ভারী উপকরণে গঠিত 'তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান' নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। সেখানে শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজিত, নিম্নে বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি চতুষ্পার্শ্বে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির এবং স্মৃতিসৌধাদির নির্মাণোপযোগী স্থান-নির্বাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিষয়টির অনুকূলে স্বামীজী যে তর্ক করিতেন, তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। লণ্ডনে তিনি যেমন একবার বলিয়াছিলেন যে, চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই ঋষিগণ গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটির পর একটি করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং প্রধান প্রধান স্থানগুলি পূজামন্দির নির্মাণপূর্বক পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন। সেই সময়ের অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি মনে পড়িতেছে, যথাঃ

'তুলসী জগমে আইয়ে সবসে মিলিয়ে ধায়।

ন জানৈ কোহি ভেকমে নারায়ণ মিলি যায়॥'

তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। জানি না কোন্ রূপে নারায়ণ দেখা দেন!

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥'

একমাত্র দেবতা সর্বভূতে লুকাইয়া আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মনিয়ামক, সর্বভূতের আধার, সাক্ষী, চৈতন্যবিধায়ক, নিঃসঙ্গ এবং গুণরহিত।

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'

সেখানে সূর্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র-তারকাও নহে।

কিরূপে একজন রাবণকে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, সে গল্পও আমরা শুনিলাম। রাবণ উত্তর দিয়াছিলেনঃ আমি কি এ-কথা ভাবি নাই? কিন্তু কোন লোকের রূপ ধারণা করিতে হইলে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে; আর রাম স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং যখন আমি তাঁহার ধ্যান করি, তখন ব্রহ্মপদও তুচ্ছ হইয়া যায়—তখন পরস্ত্রীর কথা কিরূপে ভাবিব?—

'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ?'

পরে স্বামীজী মন্তব্যস্বরূপে বলিলেন, 'সুতরাং দেখ, অত্যন্ত সাধারণ বা অপরাধীর জীবনেও এই-সব উচ্চ ভাবের আভাস পাওয়া যায়।' পরদোষ-সমালোচনা সম্বন্ধে বরাবর এইরূপই হইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কখনও কোন ঘোর দুষ্কার্যের বা দুষ্ট লোকের জঘন্য ও দুর্বৃত্ত ভাবটা লইয়া টানাটানি করিতেন না।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
১৩

যাহা সর্বলোকের নিকট রাত্রি, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন; যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট রাত্রি (নিদ্রা-স্বরূপ)।

একদিন টমাস আ কেম্পিসের কথা এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা ও 'ঈশানুসরণ' মাত্র সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন—তাহা বলিতে বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্য সন্ন্যাসি-প্রবরের নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটি কথা তাঁহার মনে পড়িলঃ

ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর! হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থামো! প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরের অন্তরে কথা কও।

আবার আবৃত্তি করিতেনঃ

তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥
১৪

কঠোর দেহসাধ্য তপস্যাই বা কোথায়, আজ তোমার এই সুকোমল দেহই বা কোথায়? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহিতে পারে, কিন্তু পক্ষীর ভার কদাচ সহ্য করিতে পারে না। অতএব উমা, মা আমার, তুমি তপস্যায় যাইও না। আবার গাহিতেনঃ

এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা পরাণপুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান গো জননী কি যাতনা সয়ে,

একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশো তাহে আনন্দময়ী।

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীতা সম্বন্ধে (সেই বিস্ময়কর কবিতা, যাহাতে দুর্বলতা বা কাপুরুষত্বের এতটুকু চিহ্ন মাত্র নাই!) দীর্ঘ কথোপকথন হইত। একদিন তিনি বলিলেন যে, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের জ্ঞানচর্চায় অধিকার নাই—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীতায় নিহিত। বাস্তবিকই গীতা ব্যতীত উপনিষদ্ বুঝা একপ্রকার অসম্ভব; এবং

স্ত্রীলোক ও সকল জাতিই মহাভারত-পাঠে১৫ অধিকারী ছিল।

৪ জুলাই। অতি উল্লাসের সহিত গোপনে স্বামীজী এবং তাঁহার এক শিষ্যা (শিষ্যাগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকাবাসী নহেন) ৪ জুলাই তারিখে একটি উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। 'আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই, এবং থাকিলে উহা দ্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন করা যাইতে পারিত', এই বলিয়া একজন দুঃখ করিতেছেন—ইহা তিনি শুনিতে পান। ৩ তারিখে অপরাহ্নে মহা ব্যস্ততার সহিত তিনি এক কাশ্মীরী পণ্ডিত দর্জীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটি কিরূপ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ডোরা দাগগুলি (Stars and Stripes) অত্যন্ত আনাড়ীর মত একখণ্ড বস্ত্রে আরোপিত হইল এবং উহা চিরশ্যামল গাছের (evergreen) কয়েকটি শাখার সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনতা-লাভের দিবসে (Independence Day) প্রাতঃকালীন চা পান করিবার জন্য নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আর এক জায়গায় যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি অন্যান্য অভিভাষণের সহিত নিজে একটি কবিতা
১৬
উপহার দিলেন। সেটি এক্ষণে স্বাগত-স্বরূপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইলঃ To the Fourth of July.

৫ জুলাই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন, পাশ্চাত্যসমাজে প্রচলিত মেয়েলি শাস্ত্র অনুযায়ী পরিহাসচ্ছলে কবে তাঁহার বিবাহ হইবে দেখিবার জন্য নিজ থালায় কয়টি চেরী ফলের বিচি অবশিষ্ট আছে, গনিয়া দেখেন! স্বামীজী ইহাতে দুঃখিত হন। কি জানি কেন, স্বামীজী এই খেলাটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি আসিলেন, তখন দেখিলাম, শ্রেষ্ঠ ত্যাগের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ উথলিয়া পড়িতেছে।

৬ জুলাই। অপরাধীর সহিত যেন এক চিন্তা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার যে সহৃদয় বাসনা তাঁহাতে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই সব গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার মনে পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা দেয়!' কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহারা গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান করে, তাহাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের উপর জোর দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, 'জনক হওয়া কি এত সোজা?—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া রাজ-সিংহাসনে বসা? ধনের বা যশের অথবা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কোন খেয়াল না রাখা?—পাশ্চাত্যে আমাকে বহু লোকে বলিয়াছে যে, তাহারা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম—'এমন সব মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মান না!'

তারপর তিনি অন্য দিক্‌টির কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেনঃ এ-কথা মনে মনে বলিতে এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভুলিও না যে,

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, সূর্য এবং খদ্যোতে যে প্রভেদ, সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ।

'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।'

পৃথিবীতে সকল বস্তুই ভয়যুক্ত, মানবের পক্ষে বৈরাগ্যই ভয়রহিত।

ভণ্ড সাধুরাও ধন্য, এবং যাহারা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে, তাহারাও ধন্য; কারণ তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সফলতার কারণ। আমরা যেন কখনও আমাদের আদর্শ না ভুলি—কোন মতেই না ভুলি। এই-সব মুহূর্তে তিনি প্রতিপাদ্য ভাবটির সহিত সর্বতোভাবে এক হইয়া যাইতেন। এই সব কথাবার্তা যখন হয়, তখন আমরা ডালহ্রদ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়াছি। ডালহ্রদ দর্শনই আমাদের ৪ জুলাই-এর উৎসবের প্রকৃত আনন্দ-অনুষ্ঠান।

পরবর্তী রবিবার, ১০ জুলাই রাত্রে বিভিন্ন সূত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, আচার্যদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটি পথ দিয়া ফিরিবেন। কপর্দকমাত্র না লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাসিত দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপার তাঁহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ হয় নাই।

১৫ জুলাই। শুক্রবার অপরাহ্নে পাঁচটার সময় আমরা নদীর অনুকূল স্রোতে কিয়দ্দূর যাইবার জন্য সবেমাত্র নৌকা খুলিয়াছি, এমন সময় ভৃত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল, এবং আমাদের সংবাদ দিল যে, স্বামীজীর নৌকা আমাদের অভিমুখে আসিতেছে।

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন।

এবারকার গ্রীষ্ম ঋতুতে অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটি তুষারবর্ত্ম (glacier) ধসিয়া যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটি দুর্গম হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু আমাদের কাশ্মীরবাসের কয়েক মাসে আমরা স্বামীজীর যে তিনটি মহান্ দর্শন ও ইহার ফলে বিপুল আনন্দোপলব্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার প্রথমটির সূত্রপাত এই সময় হইতেই। যেন আমরা স্বচক্ষে তাঁহার গুরুদেবের সেই উক্তির সত্যতা অনুভব করিতে পারিতেছিলামঃ

খানিকটা অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী মা-ই উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাজ হইবে বলিয়া। কিন্তু উহা ফিন-ফিনে কাগজের পর্দার মত, নিমিষের মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলা যায়।

৮

স্থান—কাশ্মীর (পাণ্ড্রেন্থানের মন্দির)
কাল—১৬ হইতে ১৯ জুলাই

১৬ জুলাই। পর দিবস জনৈকা শিষ্যার স্বামীজীর সহিত একখানি ছোট নৌকা করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের গানগুলি একটির পর একটি গাহিয়া চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করিয়া দিতেছেনঃ

‘ভূতলে আনিয়া মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,
(আমি) তবু কালী বলে ডাকি, মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।’

অথবা,

‘মন কেন রে ভাবিস এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মত’ ইত্যাদি।

তারপর শিশু কুপিত হইলে যেমন গর্ব ও অভিমানভরে বলিয়া থাকে, সেই ভাবের একটি গান গাহিলেন। তাহার শেষভাগটি এই —

‘আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।’

১৭ জুলাই। খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস তিনি ধীরামাতার নৌকায় আসিয়া ভক্তি-প্রসঙ্গ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে হরগৌরীমিলনস্বরূপ সেই অদ্ভুত হিন্দুভাবটি কথিত হইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের অভাবে কথাগুলি কিরূপ প্রাণহীন মনে হইতেছে। তাহা ছাড়া তখনকার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য কি অপরূপ ছিল!—ছবিখানির মত শ্রীনগর, লম্বার্ডি-দেশসুলভ সমুন্নতশির পপলার গাছগুলি, এবং দূরে চির-তুষাররাশি! সেই নদীগর্ভ উপত্যকায় মহান্ পর্বতরাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তিনি আবৃত্তি করিলেনঃ

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়। সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
* * *
সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাঽশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

এবং পরক্ষণেই সেই ভাবেরই আর একরূপ—অপর ভাবে মগ্ন হইয়া তিনি আবৃত্তি করিলেনঃ

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়;
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী—প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল্ রে হরি॥
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ মাতায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয়।

তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন
যে, তাঁহার প্রাতরাশ প্রস্তুত হইয়া
অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়িয়া রহিল,

এবং অবশেষে ‘যখন এই-সব ভক্তির প্রসঙ্গ চলিতেছে, তখন আর খাবারের কি দরকার?’—এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছাপূর্বক উঠিয়া গেলেন এবং অতি সত্বরই ফিরিয়া আসিয়া সেই বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু—হয় এই সময়েই, না হয় অপর কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহার নিকট হইতে তিনি বড় বড় কার্যের প্রত্যাশা রাখেন, তাহার নিকট তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। কঠোর এবং আগ্রহবান্ কর্মীর জনক শিব, এবং কর্মীর পক্ষে তাঁহারই পদে উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত।

পরদিন তিনি আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি চমৎকার উপদেশ শুনাইলেন, তাহাতে অপরের সমালোচককে মৌমাছি বা মাছির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যাহারা মধু অন্বেষণ করে, তাহারাই মৌমাছি; আর যাহারা বাছিয়া বাছিয়া ঘায়ে বসে, তাহারাই মাছি।

পরে আমরা ইসলামাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঘটনাচক্রে ইহাই বাস্তবিক অমরনাথ-যাত্রা হইয়া দাঁড়াইল।

১৯ জুলাই। প্রথম অপরাহ্ণটিতে বিতস্তা নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে আমরা চির-অন্বেষিত পাণ্ড্রেন্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম। (পাণ্ড্রেন্থান কি পাণ্ড্রেস্থান—পাণ্ডবগণের স্থান?) ...

স্বামীজীর চক্ষে স্থানটি ইতিহাসের অতি মধুর স্মৃতিবিজড়িত। ইহা বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং ইতঃপূর্বে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটি ধর্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা সেগুলিরই অন্যতম।

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুণ্ডনামগুলির প্রচলন, যথা বেরনাগ ইত্যাদি (২) বৌদ্ধধর্মের যুগ (৩) সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যুগ এবং (৪) মুসলমান-ধর্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্যই বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শিল্প, এবং সূর্যচিহ্নিত চক্র অথবা পদ্ম ইহার খুব মামুলি কারুকার্যস্থানীয়। সর্পসম্বলিত মূর্তিগুলিতে বৌদ্ধধর্মের পূর্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত সূর্যমূর্তিটি নৈপুণ্য-বর্জিত।

তখন সূর্যাস্তের সময়—কি অপরূপ সূর্যাস্ত! পশ্চিম দিকের পর্বতগুলি গাঢ় লাল রঙে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আরও উত্তরে বরফ ও মেঘে সেগুলি নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং পীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল—উজ্জ্বল অগ্নিশিখার রঙের এবং ড্যাফোডিল ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ; তাহার পিছনেই নীল এবং ওপলের মত সাদা পটভূমি। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; তারপরেই ‘সুলেমানের সিংহাসন’ (যাহা ইতোমধ্যেই আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র তখ্‌ৎ) নজরে পড়িবামাত্র আচার্যদেব বলিয়া উঠিলেন, ‘মন্দির স্থাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায়! যেখানে চমৎকার দৃশ্য, হিন্দু সেই স্থানটি বাছিয়া লয়! দেখ, এই তখ্‌ৎ হইতে সমগ্র কাশ্মীরটি দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়া একটি সিংহ অর্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে আর মার্তণ্ড-মন্দিরের পাদমূলে একটি উপত্যকা রহিয়াছে!’

আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদূরে নঙ্গর করা হইয়াছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম—আমাদিগের সদ্য-আবিষ্কৃত নিস্তব্ধ দেবালয় এবং বুদ্ধমূর্তিটি স্বামীজীর মনে গভীর ভাবের উদ্রেক করিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ধীরামাতার বজরায় একত্র হইলাম, এবং তত্রত্য কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

ঈশাহি ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই উদ্ভূত, আচার্যদেব এই মর্মে বলিতেছিলেন, কিন্তু আমাদের একজন এই মতটি আদৌ মানিতে চাহেন না।

উক্ত নারী॥ বৌদ্ধ কর্মকাণ্ডই বা কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে।

প্রশ্নকর্ত্রী॥ অথবা ইহা দক্ষিণ ইওরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে, বৌদ্ধ ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সবই এক সাধারণ ভূমি হতে উদ্ভূত?

স্বামীজী॥ না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি, জাতি-বিভাগের বিরুদ্ধে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কিছু বলে নাই! অবশ্য জাতিবিভাগ তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটিকে পুনঃস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব সাধ্যমত এইটি কার্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।

প্রশ্ন॥ কিন্তু ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক—ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পূজাপদ্ধতির যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্মে তাহার নামগন্ধও নাই!

স্বামীজী॥ নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ম্যাস (Mass) আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed Sacramentআমাদের 'প্রসাদ' স্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে।

প্রশ্ন॥ কিন্তু ঈশাহি-ধর্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?

কেহ এইভাবে আপত্তি তুলিলে স্বামীজী বরাবর তদুত্তরে কোন নির্ভীক আপাত- বিরুদ্ধ—কিন্তু অভ্রান্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে কোন অভিনব এবং অচিন্তিতপূর্ব সামান্যীকরণ নিহিত থাকিত।

স্বামীজী॥ না; আর ঈশাহি-ধর্মেও কোনকালে ছিল না। এ তো ছাঁকা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম মুসলমানের নিকট হইতে—সম্ভবতঃ মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরান-পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।

এমন কি, 'tonsure' পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাস্টিনিয়ান দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ একখানি চিত্র আমি দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। বৌদ্ধযুগের প্রাক্‌কালীন হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুই-ই বর্তমান ছিল। ইওরোপ নিজ ধর্মসম্প্রদায়গুলি 'থিবেইড'১৭ হইতে পাইয়াছে।

প্রশ্ন॥ এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডকে আর্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?

স্বামীজী॥ হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহি-ধর্মই আর্যধর্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খ্রীষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না। ক্রীট দ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন১৮ দেখা অবধি আমার বরাবর এই সন্দেহ! আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ হয়; এবং উহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহি-ধর্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জানই তো যে, 'কার্যকলাপ' এবং 'পত্রাবলী' (Acts and Epistles) 'জীবনীচতুষ্টয়' (Four Gospels) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেণ্ট জন্ একটা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই। না! ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং মহম্মদই স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্তারূপে দণ্ডায়মান; কারণ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই শত্রু-মিত্র—দুই-ই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; যোগী, গোপ এবং পরাক্রান্ত নরপতি—এই-সব একত্র হইয়া গীতাহস্তে একখানি নয়নাভিরাম মূর্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

রেনার (Rener) ঈশাজীবনী তো শুধু ফেনা। ইহা স্ট্রসের (Strauss) কাছে ঘেঁষিতে পারে না, স্ট্রসই সাচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটি জিনিষ জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার-অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপ-পার্শ্ববর্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটির ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সঙ্গতি! একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। তারপর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের গোটাকয়েক কথা বলিয়া দিলেন। ... শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে গেল, সেই অবসরে সাধুটি সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোটের উপর আমার মনে হয়, জ্ঞানবৃদ্ধ হিলেলই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলীর উদ্ভবকর্তা, আর ন্যাজারীন নামে এক বহু প্রাচীন, কিন্তু অখ্যাত য়াহুদী সম্প্রদায় ছিল, উহাই সহসা সেণ্ট পল (St. Paul) কর্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে আরাধনার কেন্দ্ররূপে জোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিষটা তো বসন্ত-দাহ (Spring cremation) প্রথারই রূপান্তর মাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহপ্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর সূর্যঘটিত নব উপাখ্যানটি সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকিবে।

কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই! সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেনঃ বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর!

তিনি ‘পতিতা’ অম্বাপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও তিনি অন্ত্যজের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে অতিথিসৎকারককে এই মহামুক্তি-দানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠান। সত্যলাভের পূর্বেই একটি ক্ষুদ্র ছাগ-শিশুর জন্য ভালবাসা ও দয়ায় কাতর! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি রাজা শুধু যে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেটিকে মুক্তি দেন; এবং কিরূপে সেই রাজা তাঁহার অনুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত ছাগশিশুটির প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহৃদয়তার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় না! নিশ্চয়ই তাঁহার মত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৯

স্থান—কাশ্মীর (বিতস্তাতীরে)
কাল—২০ হইতে ২৯ জুলাই

২০ জুলাই। সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্মল ছিল। আমাদের দুইজন স্বামীজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের উপর দিয়া প্রায় তিন মাইল বেড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথমে পাপবোধ-সম্বন্ধে আরম্ভ করিলেনঃ কিরূপে উহা মিশর, শেম-বংশাধিষ্ঠিত জনপদসমূহ এবং আর্যভূমি—এই তিনেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্য। বেদে শয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা কামের অধীশ্বর ‘মার’ নামে পরিচিত, এবং ভগবান্ বুদ্ধের একটি সর্বজনপ্রিয় নাম ‘মারজিৎ’।
১৯
কিন্তু শয়তান যেন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশাস্ত্রে ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেরূপে সৃষ্টিকে দুই ভাগ করিয়া ফেলে না। সে সর্বদাই মলিনতার (defilement) উদাহরণস্থল, কখনও দ্বৈতসত্তার নহে।

জরথুষ্ট্র কোন প্রাচীনতর ধর্মের সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার মতে অর্মাজ্দ এবং আহ্রিমান্ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবের বিকাশমাত্র। সেই প্রাচীনতর ধর্ম বৈদান্তিক না হইয়া যায় না। সুতরাং মিশরীয়গণ এবং শেম-বংশধরগণ পাপবাদ আঁকড়াইয়া থাকে, আর আর্যগণ—যথা ভারতবাসী এবং গ্রীক যবনগণ—শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করে। ভারতবর্ষে পুণ্য ও পাপ বিদ্যা ও অবিদ্যায় পরিণত হইল, উভয়কেই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। আর্যগণের মধ্যে পারসিক এবং ইওরোপীয়গণ ধর্মচিন্তায় শেম-বংশধরগণের লক্ষণাক্রান্ত হইল; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে পাপবোধ।

তারপরে এ-সকল কথা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরের—ভারতবর্ষ ও তাহার ভবিষ্যতের—প্রসঙ্গ উঠিল। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাতিতে বল সঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া উচিত? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে ‘ক’ বলা যাউক। যে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হ্রাসও করিবে, যেমন ‘খ’? ইহার ফলে এতদুভয়ের মধ্যপথবর্তী এক পরিণতি হইবে, যেমন ‘গ’। ইহা তো জ্যামিতিক পরিবর্তনমাত্র। এরূপ তো চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটিতেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ ‘ত্যাগ’ প্রচার করিলেন এবং ভারত উহা শুনিল; এবং এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস। সেবা ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী সকলের শেষে আহার করেন। বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, উহা জাতি ও বর্ণের কল্যাণের নিমিত্ত। নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমস্যা-পূরণের অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন, আর সমস্ত জাতি তাঁহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তারপরে আবার কথাবার্তার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম। এমন সময় নৌকা আসিয়া পৌঁছিল এবং সেদিনের মত কথাবার্তা শেষ হইল।

সেদিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি স্বামীজী পীড়িত হইয়া নিজ নৌকায় শুইয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন যখন আমরা—বিজবেহার মন্দিরে অবতরণ করিলাম—ইতোমধ্যেই সেখানে অমরনাথযাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—তখন তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ‘শীঘ্র সারিয়া উঠা এবং শীঘ্র অসুখে পড়া’—চিরকালই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, এ-কথা তিনিও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন। উহার পর, দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন, এবং অপরাহ্নে আমরা ইসলামাবাদ পৌঁছিলাম।

সেইদিন বৈকালে গোধূলির সময় আচার্যদেব ধীরামাতা ও জয়াকে নিজের সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। তিনি দুই টুকরা পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, ‘সুস্থ অবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে, অথবা আমার সঙ্কল্পের জোর কমিয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আসুক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর সামনা-সামনি হই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হইয়া যাই’—বলিয়া পাথর দুখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—‘কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।’

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বসিয়া আমরা নানা কথা কহিতে লাগিলাম, এবং দু-এক ঘণ্টা আধা-হাল্কা আধা-গম্ভীর কথাবার্তা চলিল। বৃন্দাবনে বানরগুলা কিরূপ দুষ্টামি করিতে পারে, তাহার অনেক বর্ণনা শুনিলাম। এবং আমরা নানা প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পরিব্রাজক-জীবনে দুইটি বিভিন্ন ঘটনায় বিপদে যে সাহায্য আসিতেছে, স্বামীজী তাহা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ-দর্শন সত্য হইয়াছিল। একবার তিনি কয়েক দিন ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই, এক রেল ষ্টেশনে ক্লান্তিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন সময় সহসা তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহাকে উঠিয়া কোন একটি রাস্তা দিয়া যাইতে

হইবে, আর সেখানে তিনি একজন লোকের দেখা পাইবেন, যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি তদনুসারে কার্য করিলেন এবং এক থালা খাবার হাতে একজন লোকের দেখা পাইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'যাঁহার নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনিই কি তিনি?'

তারপরে একটি শিশু আমাদের নিকট আনীত হইল, তাহার হাত খুব কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীজীও বৃদ্ধামহলে প্রচলিত একটি ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ক্ষতস্থানটি তিনি জল দিয়া ধুইয়া, রক্ত পড়া বন্ধ করিবার জন্য এক টুকরা কাপড় পুড়াইয়া তাহার ছাই উক্তস্থানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়া শান্ত হইল, এবং সেই রাত্রির মত আমাদের গল্পগুজব বন্ধ হইল।

২৩ জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি আমাদিগকে মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্য আপেল গাছগুলির নীচে একত্র হইয়াছিল। মার্তণ্ড মন্দির এক অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ। উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক। উহা এক অপূর্ব স্থানে অবস্থিত এবং যে-সকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ঐগুলির বিভিন্ন নির্মাণ পদ্ধতির স্পষ্ট একত্র সমাবেশ-বশতই উহা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ... সূর্যাস্তের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন অতি রমণীয় হয়। পূর্ব এবং পরদিনের এই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল, সেগুলির কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছেঃ

'কোন জাতিই, তা যবনই (Greek) হউন বা অন্য কোন জাতিই হউন, কোন কালে জাপানীদের ন্যায় স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যান নাই। তাঁহারা কথা লইয়া থাকেন না, তাঁহারা কাজে করেন—দেশের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জমিদার আছেন—যাঁহারা সাম্রাজ্যের একত্ব-বিধানকল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া দিয়া কৃষিজীবী হইয়াছেন।
২০
আর জাপানযুদ্ধে একটিও বিশ্বাসঘাতক পাওয়া যায় নাই। একবার সেটা ভাবিয়া দেখ!'

আবার কতকগুলি লোক ভাবপ্রকাশে অক্ষম—এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন, 'আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, লাজুক ও চাপা লোকেরা উত্তেজিত হইলে সবচেয়ে বেশী আসুরিক-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।'

আর একবার সন্ন্যাস-জীবনের ও ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধ-প্রসঙ্গ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ'—যে সন্ন্যাসী সকামভাবে সুবর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী ইত্যাদি।

২৪ জুলাই। অন্ধকার রাত্রি এবং অরণ্যানী, দ্রুমরাজিতলে পাইন কাষ্ঠের এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, দুই তিনটি তাঁবু অন্ধকারের মধ্যে সাদা হইয়া দণ্ডায়মান, দূরে অগ্নিকুণ্ডপার্শ্বে উপবিষ্ট ভৃত্যগণের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর এবং তিনটি শিষ্যসহ আচার্যদেব—পরবর্তী চিত্রটি এইরূপই। সহসা আচার্যদেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'কই, তুমি তো আজকাল তোমার ইস্কুলের কোন কথা বল না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার কথা ভুলিয়া যাও?' পরে বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমার ভাবিবার ঢের জিনিষ আছে। একদিন আমি মান্দ্রাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা সিংহল অথবা কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আমি তোমার ইস্কুলের কথা ভাবিতেছি।'

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একটি অস্থায়ী কার্য-প্রণালী যে অনেক চিন্তার পর স্থির হইয়াছে, উহার প্রারম্ভ যে সামান্য হইবে, শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাহী প্রসারতার ভাব বাতিল করিবার ঝোঁক এবং সমগ্র শিক্ষাদান-চেষ্টাটিকে যে ধর্মজীবনের উপর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে—এই সমস্ত কথা তিনি মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেনঃ

তুমি সেই উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তুমি একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

কতকগুলি বাধা স্পষ্টতঃ থাকিবেই থাকিবে। নানা কারণে প্রস্তাবিত আয়তনে হয়তো অনুষ্ঠানটি প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটি ঠিক ঠিক ভাবে সঙ্কল্প করা হয়, এবং কার্য-প্রণালী নির্দোষ হইলে উপায় উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে।—সব শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেনঃ

তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা আমি করিতে পারিব না। কারণ, আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ধর্মে এবং আমাদের ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ-সকল ধর্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত, আমরাও ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্তু আমিও তো তাঁহারই মত অনুপ্রাণিত আর তুমিও আমারই মত, আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা এবং তাহাদের শিষ্যগণও সেইরূপ হইবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য করিব।

তারপর ধীরামাতা এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, যে শিষ্যাটি নারীদের উন্নতি-বিধানের প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইবেন, তাঁহার উপর তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমনকালে যে কি মহান্ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন! উহা যে পুরুষগণের জন্য যে-কার্য অনুষ্ঠিত হইবে তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হইবে তাহাও বলিলেন। আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটির (worker) দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, 'হাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উৎসাহ দরকার—তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্'

হইতে হইবে। শিব! শিব!'—এই বলিয়া মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট হইতে রাত্রির মত বিদায় লইলেন এবং আমরাও অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম।

২৫ জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তাঁবুগুলির মধ্যে একটিতে সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া অচ্ছাবল পর্যন্ত চলিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—কতকগুলি পুরাতন রত্ন হারাইয়া গিয়াছিল, পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সবই উজ্জ্বল ও নূতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া এই গল্প বলা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'অমন ভাল স্বপ্নের কথা বলিতে নাই!'

অচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম। আমরা বাগানগুলির চারিধারে বেড়াইলাম এবং একটি স্থির জলাশয়ে স্নান করিলাম। পরে আমরা প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্নের পূর্বের জলযোগ সম্পন্ন করিলাম, এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আসিলাম।

উক্ত জলযোগ-কালে যখন সকলে বসিয়াছিলাম, তখন স্বামীজী তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে অমরনাথ-গুহায় যাত্রা করিবার এবং তথায় মহাদেবের চরণে নিবেদিত হওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন। ধীরামাতা সহাস্যে অনুমতি দিলেন, এবং পরবর্তী অর্ধঘণ্টা উল্লাস ও আনন্দ-জ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতঃপূর্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমরা সকলেই পহলগাম পর্যন্ত যাইব এবং সেখান স্বামীজীর তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। সুতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকায় পৌঁছিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে বওয়ান যাত্রা করিলাম।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ১০-১২

১০

স্থান—কাশ্মীর (অমরনাথ)
কাল—২৯ জুলাই হইতে ৮ অগষ্ট

২৯ জুলাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামীজীকে খুব কমই দেখিতে পাই। তিনি তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ দিন একাহারী হইয়া থাকিতেন, এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটান হইলে কখনও কখনও তিনি মালা হাতে সেখানে আসিতেন। বওয়ান জায়গাটি একটি পল্লীগ্রামের মেলার মত—সমস্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডগুলি ঐ ধর্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরামাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগামে পৌঁছিলাম; উপত্যকাটির নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা, সে-বিষয়ে স্বামীজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'স্বামীজী, ইহা সত্য যে আপনার শক্তি আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে!' বলিবামাত্র স্বামীজী চুপ করিয়া গেলেন! যাহা হউক, সেদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্যাকে আশীর্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য, ছাউনির চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষা-বিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকে শক্তিমান্ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটি ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

পরবর্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ী যাইবার রাস্তাটি কি সুন্দর! চন্দনবাড়ীর একটি গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। সমস্ত বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এবং স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আমার সহিত দেখা করিতে ও সামান্য একটু কথাবার্তা কহিতে আসিয়াছিলেন।

চন্দনবাড়ীর সন্নিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন, ইহাই আমার প্রথম তুষারবর্ত্ম, অতএব আমাকে উহা খালি পায় অতিক্রম করিতে হইবে। জ্ঞাতব্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই বহুসহস্রফুট-ব্যাপী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তারপর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস (Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। তারপরে রাস্তাটি শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফুট উচ্চ দিয়া চলিয়াছে। শেষনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮০০০ ফুট উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি বহু নিম্নে ছিল, সুতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কুলীরা চারিদিক হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসিলদারের, স্বামীজীর এবং আমার তাঁবু খুব কাছাকাছি ছিল; সন্ধ্যাবেলায় সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর আমি আর স্বামীজীকে দেখি নাই।

পাঁচটি তটিনীর মিলনস্থল 'পঞ্চতরণী' যাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল না। অধিকন্তু ইহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু এবং এখানকার ঠাণ্ডা বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপ্রদ। ছাউনির সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই—একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এ-বিষয়ক নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

এই-সকল উচ্চ স্থানে প্রায়ই দেখিতাম যে, আমরা তুষার-শৃঙ্গরাজির মহান্ পরিধির মধ্যে রহিয়াছি—এই নির্বাক্ বিপুলায়তন পর্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মানুলিপ্ত ভগবান্ শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।

২ অগষ্ট। ২ অগষ্ট মঙ্গলবার, অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌঁছিলে সূর্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে যাতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত হইল। কোনমতে ওপারের—উতারটির তলদেশে পৌঁছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল।

ক্লান্ত হইয়া স্বামীজী ইতোমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং 'স্নান করিতে যাইতেছি'—মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অর্ধ ঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় যে, সেখানে একটি গীর্জা ধরিতে পারে, এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটি প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। পরে বলিয়াছিলেন—পাছে

তিনি 'মূর্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন—তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মত বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে প্রায় সফল হইয়াছিল, 'ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে না!'

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সহৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, 'আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে, তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব। আর সেখানে কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসা ছিল না, খারাপ কোন কিছু ছিল না। [সেখানে] কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই!'

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শুভ্র তুষারস্তম্ভটির কাব্যময় রূপের বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করে। কোন এক নিদাঘ-দিবসে তাহারা নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিল এবং এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, তাহারা অদ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্বদা ইহাও বলিতেন, 'সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।' আর আমাকে তিনি বলিলেন, 'তুমি এখন বুঝিতেছ না; কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহার ফল ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।'

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্তন করিলাম, তাহা কি সুন্দর রাস্তা! সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া আমরা তাঁবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক চটীভর রাস্তা চলিয়া একটি তুষারময় গিরিসঙ্কটে রাত্রির জন্য ছাউনি ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু পরদিন মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়া যাইবার সময় নিতান্ত বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার জন্য, এবং আমরা যে খুব শীঘ্রই আসিতেছি—এই কথা জানাইবার জন্য, আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছিল। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই আমরা গাত্রোত্থান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে সূর্য উদিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে আমরা 'হাতিয়ার তলাও' (Lake of Death) নামক হ্রদের উপরিভাগের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সেই হ্রদ—যেখানে এক বৎসর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী তাহাদেরই স্তোত্র-পাঠের কম্পনে স্থানচ্যুত একটি তুষারপ্রবাহ (avalanche) কর্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিহত হইয়াছিল! একটি ক্ষুদ্র পগ্‌ডাণ্ডী পথ খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম এবং ঐ পথে চলিয়া দূরত্ব যথেষ্ট কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ঐ পথ সকলকেই পায়ে হাঁটিয়া তাড়াতাড়ি কষ্টেসৃষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তলদেশে গ্রামবাসিগণ প্রাতঃকালীন জলযোগের মতন একটা কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থনে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, চাপাটী সেঁকা হইতেছিল, এবং চা-ও প্রস্তুত ছিল, শুধু ঢালিলেই হইল। এখন হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই যাত্রিগণ দলে দলে মুখ্য দল হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে লাগিল, এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে একটি একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল পাহাড়ের উপর পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া এবং সতরঞ্চি বিছাইয়া গল্প করিতে লাগিলাম; আমাদের বন্ধু সেই নাগা সন্ন্যাসীটি আমাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং যথেষ্ট কৌতুক-পরিহাসাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর আমরা বসিয়া এই সব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম—উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তুষারশৃঙ্গগুলি মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, নদী খরবেগে প্রবাহিতা, এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্বত্য পাইন বৃক্ষ।

৮ অগস্ট। পরদিন আমরা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম, এবং সোমবার প্রভাতে প্রাতঃকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সময়ে মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া লাগাইয়া দিল।

১১

স্থান—প্রত্যাবর্তনের পথে (শ্রীনগর)
কাল—৯ হইতে ১৩ অগস্ট

৯ অগস্ট। এই সময়ে আচার্যদেব ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় লইবার কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং যখন আমি খাতায় 'রমতা সাধু বহতা পানি, ইস্‌মে ন কোই মৈল লখানি'—এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তখন আমি স্পষ্ট জানি, ইহার অর্থ কি। 'যখনই আমায় কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়, তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি!' এই সাগ্রহ কাতরোক্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পদব্রজে স্বীয় দীর্ঘ দেশভ্রমণের চিত্রাঙ্কন এবং স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ, এই সবই উহার

যে নৌকার মাঝিরা স্বামীজীর আপনার হইয়া গিয়াছিল এবং যাহাদিগকে তিনি দুইটি ঋতু ধরিয়া সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহারা আমাদিগের নিকট বিদায় লইল। সহৃদয়তা এবং সহিষ্ণুতারও যে বাড়াবাড়ি হইতে পারে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ পরে তিনি তাঁহার সহিত মাঝিদের সম্বন্ধরূপ সমগ্র ব্যাপারটি উল্লেখ করিতেন।

১০ অগষ্ট। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে একজনের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইলাম। ফিরিবার সময় তাঁহার শিষ্যা নিবেদিতাকে তাঁহার সহিত ক্ষেতগুলির উপর দিয়া বেড়াইয়া আসিবার জন্য ডাকিলেন। তাঁহার কথাবার্তা সমস্তই ছিল স্ত্রীশিক্ষা-কার্য ও সে-বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় কি, এই লইয়া। স্বদেশ এবং উহার ধর্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সমন্বয়মূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব শুধু এইটুকু যে, তিনি চাহেন—হিন্দুধর্ম নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিবার সামর্থ্য উহার থাকুক; কেবল অস্পৃশ্যতাকেই তিনি অস্বীকার করিতেন—এই-সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন। পরে তিনি গভীর ভাবের সহিত—যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী (Orthodox), তাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। বলিলেন, 'ভারতের অভাব কার্যকুশলতা (Practicality)। কিন্তু সেজন্য ভারত যেন কখনও পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার অধিকার ছাড়িয়া না দেয়।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই আদর্শ। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠার সহিত গভীর অন্তর্জীবনের কোন অপরিহার্য সম্পর্ক নাই, এই সম্বন্ধ আকস্মিক। আর যদি আমরা নিজেরা নিজেদের ঠিক করি, তাহা হইলে জগৎও ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিতরের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতেন; তথাপি বাহ্যদশায় তিনি পুরাদস্তর কর্মতৎপর ও কর্মপটু ছিলেন।'

অতঃপর তিনি গুরুপূজা-রূপ সেই জটিল প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলিলেন, 'আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা চালিত, কিন্তু এটি অপরের পক্ষে কতদূর খাটিবে, তাহা প্রত্যেকে নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল শুধু যে একজন লোকের মধ্য দিয়াই জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে।'

১১ অগষ্ট। এই দিন করকোষ্ঠী দেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে স্বামীজীর নিকট ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'এ জিনিষটাকে সকলেই চায়, তবু সমগ্র ভারত ইহাকে হেয় জ্ঞান করে, ঘৃণা করে।' একজনের একটু বিশেষ ওকালতির উত্তরে বলিলেন, 'চেহারা দেখিয়া চরিত্র বলিয়া দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আরও বেশী সত্যসন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। এই কার্যের জন্য বুদ্ধ এক ভিক্ষুকে সঙ্ঘচ্যুত করিয়াছিলেন।'

১২ ও ১৩ অগষ্ট। স্বামীজী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়াছেন। একজন মুসলমান পর্যন্ত তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতে পারে, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাথ-যাত্রী সাধুদের যুক্তিগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী ছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'অন্ততঃ শিখদের দেশে এটি করিবেন না, স্বামীজী!' এবং তিনিও অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে উমারূপে পূজা করিতেছিলেন। ভালবাসা বলিতে সে শুধু সেবা করা বুঝিত, এবং স্বামীজীর কাশ্মীর ত্যাগের দিনে সেই শিশু তাঁহার জন্য একথাল আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাঁটিয়া টঙ্গায় তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। স্বামীজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন মনে হইলেও বালিকাকে তিনি কখনও ভুলিয়া যান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি একদিনকার কথা প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। বালিকা সেদিন নৌকার গুণ টানিবার রাস্তায় একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায়, এবং সেখানে বসিয়া উহাকে একবার এধারে, একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে কুড়ি মিনিট কাল সেই ফুলটির সহিত একাকী কাটায়।

নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটি চেনার গাছ জন্মিয়াছিল। ইহাদের কথা ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম। কারণ—কাশ্মীরের মহারাজ স্বামীজীকে উহা দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবে কার্যে 'দেশের লোকের দ্বারা, দেশের লোকের জন্য, এবং সেবক ও সেব্য—উভয়েরই প্রীতিকর'—এই মহান্ ভাব রূপায়িত হইবে, উক্ত স্থানটিকে তাহারই এক কর্ম-কেন্দ্র বলিয়া আমরা সকলে এক মানসচিত্র অঙ্কিত করিলাম।

নারীগণই গৃহনির্মাণস্থানের মাঙ্গলিক কার্য বিধান করিবেন, ভারতে প্রচলিত এই ধারণা জানা থাকায় একজন বলিয়া উঠিলেন, আমরা উক্ত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ছাউনি ফেলিয়া উহাকে দখল করিয়া লইলে কিরূপ হয়? উক্ত স্থান ইওরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত ছাউনি ফেলিবার ছোটখাট স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

১২

স্থান—চেনার-তলে ছাউনি, শ্রীনগর)
কাল—১৪ অগষ্ট হইতে ২০ সেপ্টেম্বর

১৪ অগষ্ট—৩ সেপ্টেম্বর। রবিবার প্রাতঃকাল; পরবর্তী অপরাহ্নে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী আমাদের সহিত চা পান করিতে আসিতে সম্মত হন। একজন ইওরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি বেদান্তের একজন অনুরাগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ-বিষয়ে স্বামীজীর কিন্তু কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি ঐ জিজ্ঞাসুকে বুঝাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছিল। অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি তো চাই—নিয়মলঙ্ঘন করা সম্ভব হউক, কিন্তু তা হয় কই? যদি সত্য-সত্যই আমরা কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে তো আমরা মুক্ত হইয়া যাইতাম। যাহাকে আপনি নিয়ম-ভঙ্গ বলেন, উহা তো অন্য এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র।' তৎপরে তিনি তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার শুনিবার কান ছিল না।

১৬ সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার দিন তিনি আর একবার মধ্যাহ্নভোজনে আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনিতে আসিলেন। অপরাহ্নে এমন জোরে বৃষ্টি শুরু হইল যে, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। নিকটে একখানি টডের ‘রাজস্থান’ পড়িয়াছিল, তাহাই উঠাইয়া লইয়া কথায় কথায় মীরাবাঈ-এর কথা পাড়িলেন। বলিলেন, ‘বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত।’ যাহার সকল অংশই উত্তম এমন ‘টডে’র মধ্যে—যিনি রাণী হইয়াও রাণীত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমিকাগণের সঙ্গে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মীরাবাঈ-এর গল্পটি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যে শরণাগতি, প্রার্থনাপরতা ও সর্বজীবে সেবা প্রচার করিয়াছিলেন, উহা যে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ‘নামে রুচি জীবে দয়া’র ভাব হইতে ভিন্ন, তাহাও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাঈ স্বামীজীর অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাত্রী। বিখ্যাত দস্যুদ্বয়ের হঠাৎ স্বভাব-পরিবর্তন, এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বিগ্রহে লীন করিয়া ফেলিলেন—এই-সব গল্পের কথা লোকে অন্যান্য সূত্রে অবগত আছে, সেগুলিকে তিনি মীরাবাঈ-এর গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। একবার তিনি মীরাবাঈ-এর একটি গীত আবৃত্তি এবং অনুবাদ করিয়া একজন মহিলাকে শুনাইতেছেন, শুনিলাম; আহা, যদি সবটা মনে রাখিতে পারিতাম! তাঁহার অনুবাদের প্রথম কথাগুলি এই, ‘ভাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক!’ এবং শেষাংশ এই ছিল—‘সেই অঙ্কা বঙ্কা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর সুজন কসাই এবং খেলার ছলে টিয়াপাখীকে কৃষ্ণনাম করিতে শিখাইয়াছিল সেই গণিকা, তাহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে।’
২১

আবার, আমি তাঁহাকে মীরাবাঈ-এর সেই অদ্ভুত গল্পটি বলিতে শুনিয়াছি। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া জনৈক বিখ্যাত সাধুকে
২২
নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত নারীগণের সাক্ষাৎ অকর্তব্য, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন ‘বৃন্দাবনে আর কেহ যে পুরুষ আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল—এখানে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজিত!’ এই বলিয়া মীরাবাঈ স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন। যখন বিস্মিত সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন ‘নির্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর?’—এই বলিয়া তিনি স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও তাঁহাকে মাতা যেরূপে সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, সেইরূপে আশীর্বাদ করিলেন।

অদ্য স্বামীজী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, এবং উক্ত বাদশাহের সভাকবি তানসেনের রচিত তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ-বিষয়ক একটি গীত আমাদের নিকট গাহিলেন।

তারপর স্বামীজী নানা কথা কহিতে কহিতে ‘আমাদের জাতীয় বীর’ প্রতাপসিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেনঃ কেহ তাঁহাকে কখনও বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। হাঁ, একবার মুহূর্তের জন্য তিনি পরাভব স্বীকার করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন বটে। একদিন চিতোর হইতে পলায়নের পর মহারাণী স্বয়ং রাত্রের সামান্য খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধিত মার্জার ছেলেদের জন্য যে রুটীখানি নির্দিষ্ট ছিল, তাহারই উপর ঝাপট মারিয়া সেখানি লইয়া গেল। মেবার-রাজ স্বীয় শিশুসন্তানগুলিকে খাদ্যের জন্য কাঁদিতে দেখিলেন। তখন বাস্তবিকই তাঁহার বীরহৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। অদূরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তির চিত্র দেখিয়া তিনি প্রলুব্ধ হইলেন, এবং মুহূর্তের জন্য তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আকবরের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কেবল এক মুহূর্তেরই জন্য। সনাতন বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয়জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত চিত্র প্রতাপের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হইতে না হইতেই এক রাজপুত নরপতির নিকট হইতে দূত আসিয়া তাঁহাকে সেই প্রসিদ্ধ কাগজপত্রগুলি দিল। তাহাতে লেখা ছিলঃ ‘বিধর্মীর সংস্পর্শে যাঁহার শোণিত কলুষিত হয় নাই, এরূপ লোক আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন। তাঁহারও মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, এ কথা যেন কেহ কখনও বলিতে না পারে।’ পাঠ করিবামাত্র প্রতাপের হৃদয় সাহস এবং নূতন আত্মপ্রত্যয়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি বীরগর্বে দেশ হইতে শত্রুকুল নির্মূল করিয়া উদয়পুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

তারপর অনূঢ়া রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। একাধিক নরপতি একসঙ্গে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন। আর যখন তিনটি বৃহৎ বাহিনী পুরদ্বারে উপস্থিত, তাঁহার পিতা কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যাকে বিষ দিতে মনঃস্থ করিলেন। কৃষ্ণকুমারীর খুল্লতাতের উপর এই ভার অর্পিত হইল। বালিকা যখন নিদ্রিতা—সেই সময় খুল্লতাত উক্ত কার্য সম্পাদনার্থ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সৌন্দর্য ও কোমল বয়স দেখিয়া এবং শিশুকালের মুখও মনে পড়ায় তাঁহার যোদ্ধৃহৃদয় দমিয়া গেল এবং তিনি নির্দিষ্ট কার্য করিতে অক্ষম হইলেন। কোন শব্দ শুনিতে পাইয়া কৃষ্ণকুমারী জাগিয়া উঠিলেন এবং নির্ধারিত সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া হাত বাড়াইয়া বাটিটি লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি গল্প আমরা শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজপুত-বীরগণের এরূপ গল্প অসংখ্য।

২০ সেপ্টেম্বর। শনিবারে স্বামীজী দুই দিনের জন্য আমেরিকার রাজদূত ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য স্বীকার করতে ডাল হ্রদে গমন করিলেন। সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে স্বামীজী আমাদের নূতন ‘মঠে’ (আমরা ছাউনির ঐ আখ্যাই দিয়াছিলাম) আসিলেন এবং যাহাতে তিনি গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নৌকাখানিকে আমাদের নৌকার খুব নিকটে লাগাইলেন।

[সম্পাদক (স্বামী সারদানন্দ)—লিখিত পরিশিষ্ট]

গাণ্ডেরবল হইতে স্বামীজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন, এবং বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি যে কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙলা দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। স্বামীজীর ইওরোপীয় সঙ্গিগণ

ইতঃপূর্বে শীত পড়িতেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর-ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অতএব সকলেই একত্র লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে কয়জনকে উত্তর-ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে রাখিয়া স্বামীজী সদলবলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

স্বামীজীর কথা
স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

১

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরী মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ অর্থোপার্জনাদিও করি না, সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্মতলায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মান্দ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিষ্ট প্রভৃতি—যাঁহার যেরূপ ভাব তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশ- দানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরনে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহারও প্রায় কিছুই জানিতে বাকী নাই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমূর্তি-দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে, তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হইতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার লণ্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। ষ্টেশন-প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আসিবার আর কত বিলম্ব? শুনা গেল, তিনি একখানা স্পেশাল ট্রেনে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে—গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজী যে গাড়ীখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ী থামিল, দেখিলাম স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়ীতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়' 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী জয়'—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন ষ্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনাম-সংকীর্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীর সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা, পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ী আসিয়া রিপন কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ী—একটিতে স্বামীজী

এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়ীতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব), জি.জি, কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মান্দ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজী রিপন কলেজ-বাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না। গাড়ী বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

* * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। সেখান হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—'এরা আপনার খুব admirer (মুগ্ধ ভক্ত)।'

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতি বাবুর দ্বিতলস্থ একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিক-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বামীজী যোগানন্দ-স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন। আমেরিকা-ইওরোপে স্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। স্বামীজী বলিতেছিলেনঃ

দেখ্ যোগে, দেখলুম কি জানিস?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest (প্রকাশ) করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।'।

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করলেন, 'এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsia-তে (পুরানো অজীর্ণ রোগে) ভুগছে।'।

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের বাঙলা দেশটা বড় sentimental (ভাবপ্রবণ) কিনা, তাই এখানে এত dyspepsia.'।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।।

স্বামীজী এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগানবাটীর একটি ঘরে। স্বামীজী আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি তামাক খাস?'।

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে না।'

তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'হাঁ, অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয়; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

আর একদিন স্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্বামীজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দূরে রহিয়াছি, আর কেহ নাই। স্বামীজী বলিতেছেন, 'বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী—সর্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।' তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, 'যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাবের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা বল্লভাচার্য সম্প্রদায়।'।

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথাবার্তা কহিতেছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিতেছি, 'আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি—নির্ণয় করিতে পারতেছি না।'।'

স্বামীজী অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন, 'দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মত অবস্থা ছিল; তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে বল দেখি?'

যুবক বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মূর্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা-অর্চনা করতে লাগলুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সে সময়ে একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা কর দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে।' আমি দিন-কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলুম, কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে শান্তি হয়?'

স্বামীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বাপু, আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ীর কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হলে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।' ।

যুবকটি বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, ধরুন আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?'

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণ স্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন করে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।'

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল না।'

আর একদিন মাষ্টার
২
মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ—সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়া ফল কি?'

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?'

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

টমাস আ কেম্পিস-এর 'Imitation of Christ'-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানিবার জন্য—উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন, 'নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে?' স্বামীজী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়!' ।

গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া স্বামীজী সাধন-রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন!

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহার সাহায্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব-প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে 'রামলাল-দাদা' বলিয়া নির্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আপনি বসুন, আপনি বসুন।' স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।'

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার দুটা কথা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলা যায়—কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজীর মনে হইতেছিল ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আবার বুঝি

তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।'

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডীবাবু Hindu Boys School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী, সেখানে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি পূর্ব হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন।

চণ্ডীবাবু আসিয়া স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?'

স্বামীজী বলিলেন, 'যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ—সব বলে দিয়েছিলেন।'

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কাম-দমনের বিশেষ সহায়তা হয়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একটু-আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জান—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায়-অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকাতে অনেক দিন লাগে।'

চণ্ডীবাবু একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ইংরেজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust.'

স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, 'লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।'

স্বামীজী উক্ত কার্পেণ্টার সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল, বলিলেন, 'আপনার চেহারা যে বই-এ আগেই দেখেছি।' আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। উঠিবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চণ্ডীবাবু, আপনারা তো অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?' চণ্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।'

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামীজী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
৩
স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইল। প্রশ্নটি এইঃ অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমরা শরৎবাবুকে স্বামীজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরৎবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীর নিকট যাইয়া তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হল না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান—কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি স্বামীজীর উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হইল, স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন বাবু আমাদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, 'স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।' স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?'

আমি॥ আজ্ঞা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

স্বামীজী॥ কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?

আমি॥ কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।

স্বামীজী॥ আচ্ছা, কঠ-টাই বল, কঠ উপনিষদ্ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।

আমি॥ কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।

স্বামীজী॥ আচ্ছা, তাই বল।

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ 'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা' হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য 'বেশ, বেশ' বলিতে লাগিলেন। ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, 'ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ্ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ্ কিছু থাকে তো পকেটে করে নিয়ে চল। যদি কালকের মত উপনিষদের কথা পাড়েন তো তাই পড়লেই চলবে।' রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীকৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ্ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়াছিলেন; যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই—কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীক-চিত্তে যমভবনে যাইতেই সাহসী হইয়াছিলেন—বলিতে লাগিলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর—স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেইখানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেতা বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ গেলে কিছু থাকে কিনা, তারপর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এই-সব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন!

কিন্তু এই দুই দিনের উপনিষদ্-প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব সুর লয় তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণাঃ

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।'
৪
—সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হয়—বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেনঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদ বভাতি॥
৫

সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না,চন্দ্র-তারাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেনঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।
* * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
৬

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

* * *

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হইল বাড়ী ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, স্বামীজীর মান্দ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি.জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, 'এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।'

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বৈকি। ডাক সকলকে।' সকলে আসিয়া বড় ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'একজন কেউ লিখতে থাক, আমি বলি।' তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেহ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা—উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই, বরং উহা হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি থাকবে?' (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব?) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, 'হাঁ।' তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্, এই-সব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।'

তারপর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ্, একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ্—দেখিস, যদি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।'

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল—লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তাহার দোষ দেখান, তাহাকে 'তুমি অমুক করো না, তমুক করো না'—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না; কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা-আপনি চলিয়া যায়।' ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশ আমাদের মনে বরাবর ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশমত যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম, আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্যসম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল—'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না'টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল—'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াইল—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন।' যাহা হউক, এখন মনে হইতেছে—আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detail-এর (খুঁটিনাটির) ভিতর আসিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না; তবে ইহাই সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বড় ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়—এমন কি, কখনও কখনও কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতাশক্তির

কথা কেহ স্বামীজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিতেন, ‘তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—Soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বল।’ বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন—স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ-উপরোধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙিতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখনও কখনও ধর্মসম্বন্ধে বাঙলাভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আর পূর্বেই বলিয়াছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া। আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ‘আত্মা’ সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এ-সকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগলেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন। ... কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, 'I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—must, that is my word!'—আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই.টি ষ্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দু-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ‘নরেন’ বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, ‘তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙলা অনুবাদ কর না।’ তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphlet-গুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, ‘এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।’ পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।’ তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, ‘রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।’ আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? বহুদিন পূর্ব হইতেই আমি রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি জ্ঞান বা কর্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম। মনে ভাবিতাম, মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর ‘রাজযোগ’ গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু তাহা নহেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে-সকল ধারণা ছিল, সে-সকল তো তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, ‘বাঙলা দেশে রাজযোগের চর্চার একান্ত অভাব—যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বৈ আর কিছু নয়।’

যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্তি হইয়াছিলাম।

একদিন অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামীজীর খেয়াল হইল, গীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদগ্রীব হইয়া স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা ‘গীতাতত্ত্ব’ নামে প্রথমে ‘উদ্বোধনে’র দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে ‘ভারতে বিবেকানন্দে’র অঙ্গীভূত করা হয়
।৭

যখন স্বামীজী আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিয়া যায়। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে বুঝাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায় শাস্ত্রবিবৃতি ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্মের অঙ্গে

তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে এইসকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান্ হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তারপর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্বমতসমন্বয় ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা-বাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল—'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', এ তো তোমার সাজে না—তুমি সর্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি—তাহা তো তোমার সাজে না। প্রফেটের মত ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না। মহাপাপীকে ঘৃণা করো না'—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই একটি শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, 'এই একটিমাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।'

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে। কেবল আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি—তাই ঐ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্তাঁ' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ। আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি। তখন নূতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামীজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, এ-কথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝবার চেষ্টা করবি—উদাহরণস্বরূপ দেখ্—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'
[৮]
—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।'

স্বামীজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা' সূত্রটি আসিল। স্বামীজী এই সূত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোঽকাময়ত'—তিনি (সেই জগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন 'অনুমানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, যাহা কোন কালে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল না, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন?

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ'
[৯]
সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বলতেন, সে ঐ ভাবে বলতেন।' এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেনঃ যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি তো তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝতে পারিনি—ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।'

স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথম সকলে আসন করে বস্; ভাব—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হব।' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, 'ভাব—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্রের মত দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।' এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধঘণ্টা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশমত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ 'এইবার চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজী-প্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

* * *

একদিন সকালবেলা, ৯টা-১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' আমিও বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ।' ইতঃপূর্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। এক্ষণে নির্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দীক্ষা লইতেছেন—তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তারপর শরৎ বাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'এ দীক্ষা নেবে।' স্বামীজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে?' আমি বলিলাম, 'কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও বা নিরাকার ভাল লাগে।'

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই কখনও ঘটস্থাপনা করে পূজা করেছিস?' আমি বাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন্ পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে। আর ঘটস্থাপনা করে পূজা করলে তোর সুবিধা হবে।' তারপর আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরু শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন, স্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর'; নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রতী শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের ঐ পর্যন্ত 'বিট' বলিয়া মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্তব্য কার্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, 'যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরর আসে, তোমাকে সে স্থান দেখিয়া আনব—তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এন।' আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্যভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে ভাবিয়া সহজেই স্বীকৃত হইলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, 'চল, সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।' আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতোমধ্যে স্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'বেদান্তপাঠ করা যাক—আয়।' আমি অমুক কার্যে যাইতেছি—বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, 'ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি?' এ কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, 'ভাই, চিনে এলুম বটে, কিন্তু কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।'

শিষ্যগণের—বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্ররক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী কলিকাতায় বাস করে বা রাত কাটায়—ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে এখনও বাজিতেছেঃ

দেখ্ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাত থাকতে বলছি। তোরা যে আমার লেকচারে ে ছিস—'সংসারে থেকেও ধর্ম হয়' অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকুও ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।

* * *

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশ্যক, এবং এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশ্যক, তাহার প্রবল মেধাবী হৃদয়বান্ ও বাগ্মী হওয়া উচিত, আর তাহার অধোদেশের কার্য যেন বন্ধ থাকে—যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যবান্ হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে মিস নোবল্
১০
বিলাত হইতে শীঘ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, 'বিলেতের ভেতর এমন পূতচরিতা, মহানুভবা নারী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে।' স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

* *

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মান্দ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গাচার্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে বলিলেন, 'চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ্ দিকি; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।' আমি এক গ্লাস জল স্বামীজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, 'আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।' আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত বা আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীজী অভয় দিয়া বলিলেন, 'লেখ, foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।' তখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে একখানি লেখাইলেন; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাহাকে—ঠিক মনে নাই। মনে আছে রঙ্গাচার্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন—বাঙলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন 'give a rub to the people of Calcutta'—কলিকাতাবাসীকে একটু উসকাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর কী দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেন তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতাবাসিগণ ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিতবরের 'The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

* * *

একটি বয়স্ক বাঙালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তাহার চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'মঠে যে-সকল সাধু আছেন, তাঁদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।' এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে মঠে রাখতে তোমাদের কার কিরূপ মত?' তখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না।

* * *

একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্বে প্রচার-কার্যের জন্য স্বামীজী কর্তৃক মান্দ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্যভার লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্যে যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিত, তাহাদিগকেও লইয়া স্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।' তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে ঠাকুরের

আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে—নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামীজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, ‘এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—।’ এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ‘সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?’—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন! গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামীজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

* * *

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘দেখ্, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।’ স্বামীজীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

স্বামীজীর কথা

১১

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলতে পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত এবং যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে—আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ করে।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দা কথা এই যে, এতে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ—অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জানা যায়।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে—সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুললেই 'দুঃখ দুঃখ' শুনে লোক অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হতে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভেতরেই আছে। আমরা জগতে যে 'সুখবাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে—জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়—সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিষ আছে।

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর ভেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু

বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিষ নয়, প্রত্যক্ষ জিনিষ। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া পণ্ডিতের চেয়ে বড়।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, ‘কিন্তু সে আপনাকে মানে না।’ তাতে তিনি বলে উঠলেন, ‘আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল কাজ করছে, এই জন্যে সে প্রশংসার পাত্র।’

আসল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই।

তোমরা দুটো জিনিষ গোল করে ফেলছ। কর্ম মানে—এক জীব-সেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারও অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতন আরম্ভ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

]

সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই (ধর্মলাভ) হয়ে যাবে।

গুরু কাকে বলা যায়?—যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

আচার্য যে-সে হতে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান করা চাই, না

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা-আপনি প্রকাশ হবে।

জিব চললেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চলবে।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দিতে দেরী হলেও পাকা ধর্মপ্রচার হয়।

হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হল, তবে তিনি তো সাধারণ লোকের মত হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান্ আচার্যদের শরীরে ব্যাধি-আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে তাঁর মনকে পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য—যে-সে হতে পারে না।

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।

স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন

বেলগাঁ—১৮৯২ খ্রীঃ ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, 'ইনি একজন বিদ্বান্ বাঙালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।' ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে। গোঁফদাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক চুরুট—যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম।

তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিষপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।'

সে রাত্রে বড় বেশি কথাবার্তা হইল না; কিন্তু দুই-চারিটি কথা যাহা বলিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না, এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।

আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনও দেখি

পরদিন ১৯ অক্টোবর। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান্ লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্‌স্লির ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা?

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে লেখা আছে।'

স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'যে-কোন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়' এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, 'হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।'

স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces—

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের ঐ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?'

স্বামীজী উত্তর করিলেন 'অবশ্যই উত্তম ফল আছে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পার, তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ?

centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces (বিপরীত শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite (বিপরীত) হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? ALL I can say is that you have a very poor idea of your God.'

আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস — Truth is absolute (সত্য নিরপেক্ষ)। সমস্ত ধর্ম কখনও এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে-সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেনঃ

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, 'স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?'

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া আমিও ঘুমাইতে গেলাম, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০ অক্টোবর। সকালে উঠিয়া স্বামীজীকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই শহরে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, 'সন্ন্যাসীদের—নগরে তিন দিনের বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী

আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার, যখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বস, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, না—কিছু পাপ করিতেছি মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।'

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে, তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 'বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।' পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, 'আমি যাঁহার অতিথি, তাঁহার মত করিতে পারিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।' উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার একগ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে-সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল, সে-সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতঃপূর্বে 'টাইমস্' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় 'ঈশ্বর কি?' 'কোন্ ধর্ম সত্য?' প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছেন; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিলিয়া যাওয়ায় আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। 'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্, এককালে দুই-ই হইতে পারেন না'—খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না।

আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে-সকলই আপেক্ষিক সত্য (Relative truths). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা করা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph (ফটো) লইলে একই সূর্যের ছবি নানরূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)-সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্পর্কে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি ও-কথা কোনমতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই।' পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, 'এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী
Pickwick Papers
১৩
হইতে দুই-তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'দুইবার পড়িয়াছি—একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ-ছয় মাস হইল আর একবার।'

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।'

স্বামীজী বলিলেন, 'অবশ্য সর্বাবস্থায় সকল সময় মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিষ বা কার্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিষ মন্দ এবং প্রত্যেক কার্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্বলতা আসে, সে কর্ম করিবে না; উহাই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিষ কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কিনা? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে।

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'রাজা হইলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাস কি কখনও জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।' কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।'

'সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না?'—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকী কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার মনে করে তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট! বাকী—যকের মত প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো আরও টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই তো গেল তোমার হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই, তাহা খাই; কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান্?—তুমি না আমি?' আমি তো শুনিয়া অবাক। ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে তো কাহারও সাহস দেখি নাই।

তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian (উপযোগবাদী), যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যে-সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।'

তিনি বলিলেন, 'ঐ-সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়াছি।'

এই দুই-দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচো ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না; কিন্তু শহরে ঐরূপ করিলে পুলিসের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।'

স্বামীজী বলিলেন, 'উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম.এ. পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও; বরং এম.এ পাশ করা সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।'

কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ী ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।' সেও তাহা স্বীকার করে। স্বামীজীর আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি?' সেও সাগ্রহে বলিল, 'উনি কি গুরু হইবেন? হইলে তো আমরা কৃতার্থ হই।'

এই সময়ে আবার অনেক কারণবশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও একদিনের জন্য সুখী হই নাই। তাঁহাকে এ-সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কিসের জন্য চাকরি করিতেছ? বেতনের জন্য তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাঁধিয়া

'রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা ঘটিয়াছে, সে-সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে-সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেটজ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও 'এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না'—এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই-সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

আমি বলিলাম, 'আপনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন।' পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতোমধ্যে আমার মনে হইল, স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা হইবে, এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই—এ কথা জানাইলেন।

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছু হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, 'যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পূজা-পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটীটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত।'

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের—ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই, আমায় না জানাইয়া আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে তো উহা চুরি করা হয় না। তার পর পশু-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহাকেও তো চুরি বলি না।'

রাখে নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বল দেখি—যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, অফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে—আমরা দেখি। আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা—এ কথা যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

আর একদিনের কথা—কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামীজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়! কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেনঃ দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখনও শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে।

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই-চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত,

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে; বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত—ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই তো দেখিতেছিলাম, আমাদের মতই একজন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। নানা লোকে নানা ভাবেও আসিতঃ কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোশগল্প শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে জর্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এড়াইবে বলিয়া স্বামীজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।'

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে।

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?' স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।' গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক—প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং ২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ আমাদের দীক্ষাপ্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮ তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন এবং ফটো লওয়া হইল। ইতঃপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহসত্ত্বেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া দুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিবার কথা আমাকে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে স্বীকার করিলাম।

একদিন স্বামীজী বলিলেন, 'তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাইব।' আমি চাঁদার লিষ্ট করিয়া টাকা-সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্তে একজোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি

ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ-গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরও অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সেজন্য আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেনঃ ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটি পয়সা; সেজন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এ-সব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বৈ লোকসান নাই। কেন না, তোমার মত লোকেরা দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে সে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা দুই পয়সা ভিক্ষা করিয়া গাঁজা টানিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ঐ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বৈ অপকার নাই।

প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজীকে যাঁহারা প্রথম দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন না—সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মত শক্তিমান্ পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক একবার এই কথা বলায় তিনি বলেনঃ দেখ, মন বেটা বড় পাগল—ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেইজন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহাদের খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখনও একটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক

দিয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে কোলাপুরের রাণী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া অবশেসে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজীও গেরুয়া দুইখানি গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়াছিলেন, সেগুলি সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন (Jules Verna)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এর Sartor Resartus তাঁহার নিকটেই পড়িতে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, 'যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervous debility (স্নায়ুবিক দুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ-সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্বদা 'রোগ রোগ' করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মত একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।'

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বলিলেন, 'যাহা অভীষ্ট কার্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচু-নীচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই-ই এক হইয়া যাইবে। চন্দ্রে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে, কিন্তু আমরা সব এক দেখি, সেইরূপ।' স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল—যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনি স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি—মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—স্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।

তিনি বলিলেনঃ নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ‘রামকেষ্ট’ বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেনঃ ইহাই আমার Famine Insurance Fund—যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও।

স্বামীজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ‘ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস’; তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেনঃ পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ-নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেইজন্য এত লঙ্কা খাই।

রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, এ-কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কোন নির্বোধ লোক এ-জন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেনঃ হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া সৎকার্য করাইতে পারিলে যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেইদিকে আনিতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি! গরীব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেনঃ কখনও ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম করিও। কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে; কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখনও রাগ করিও না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেনঃ

এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিস ইনস্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসায় খরচ মাসে দুই-তিন শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনার তো আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে?’ তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, ‘আপনারাই

বাগবিতণ্ডায় ধর্ম নাই, ধর্ম অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেনঃ Test of pudding lies in eating, অনুভব কর; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।

আমি বলিলাম, কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্মলাভের প্রধান সহায়—আপনি যাহা বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

চালান। এই তীর্থস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা-কড়ি বাহির হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকাকড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস কিছু লই না।'

স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য;' তিনি বলিলেন, 'There can be no two infinities.' আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেনঃ আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত—এ কথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিষ অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখিবে—সময়ও যাহা, আকাশও তাহাই; আরও অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সে-সকল অনন্ত পদার্থ একটা বৈ দুইটা দশটা নয়।

এইরূপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭ তারিখে বলিলেন, 'আর থাকিব না; রামেশ্বর যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছান হইবে না।' আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭ অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মর্মাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, 'স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।'

* * *

স্বামীজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম—আমেরিকা যাইবার পূর্বে; সে-বারকার দেখার কথা অনেকটা বলিলাম। দ্বিতীয়—যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন তাহার কিছু পূর্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয় তাঁহার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মান্দ্রাজে দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশী কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে, অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও-কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করিব।

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আর একদিন কথা উঠায় বলিলেনঃ অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিম্বা উৎকট দুষ্কর্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্যন্ত তাহার ব্যবহার করার যো নাই। কেন, তাহারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই—ইহা ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোষাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।

স্বামীজী বলিতেনঃ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানসিক ভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের প্রত্যেকেই নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মত দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে তাহা ছাড়া আর কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ও-রূপ ভাব কোনমতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত-দেশে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকার প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়-ভ্রমণকালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের

একটি স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, ‘তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়—এরূপ ভাবা কি অন্যায় নহে?’ আমি তো শুনিয়া অবাক!

নাসিকা এবং পায়ের খর্বতা লইয়াই চীনের সৌন্দর্য-বিচার, এ-কথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরেজ আমাদের মত সুবাসিত চাউলের অন্ন ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজ-সাহেবের অন্যত্র বদলী হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার তাঁহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজ-সাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, 'You ought not to have given me rotten rice.'—(তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই।)

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম; সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, ‘সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।’ আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আঘ্রাণ লইয়াই বললেন, ‘এ তো অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ বল?’ এইরূপে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ-দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশুপক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এই জন্য প্রাণ ছটফট করিত। মারিতে না পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ও-রূপ প্রাণিবধ একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিষটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা যায়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেনঃ এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহাসভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনীয়র, সূত্রধর, চর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনীয়র বলিলেন, ‘শহরের চারিদিকে বেড় দিয়া এক বৃহৎ খাল খনন কর।’ সূত্রধর বলিল, ‘কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক।’ চামার বলিল, ‘চামরার মত মজবুত কিছুই নাই, চামরার বেড়া দাও।’ কামার বলিল, ‘ও-সব কাজের কথা নয়, লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসিতে পারিবে না।’ উকিল বলিলেন, ‘কিছুই করিবার দরকার নাই, আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই—এই কাথাটি তাহাদের তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হউক।’ পুরোহিত বলিলেন, ‘তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ। হোম যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না।’ এইরূপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহারা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করিল। এ রকম করাই মানুষের স্বভাব!

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল, স্বামীজীকে বলিলাম, ‘স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সহিত আলাপ করিতে বড় ভালবাসিতাম। একদিন একটি পাগল দেখিলাম বেশ বুদ্ধিমান্, ইংরেজীও একটু-আধটু জানে; তার চাই কেবল জল খাওয়া! সঙ্গে একটি ভাঙা ঘটী। যেখানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নূতন একটা জালের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান করিত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, 'Nothing like water, Sir!'—জলের মত কোন জিনিষই নেই, মশাই! তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোনমতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, ‘এটি ভাঙা ঘটী বলিয়াই এত দিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুরি করিয়া লইত।’

স্বামীজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, ‘সে তো বেশ মজার পাগল! ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে, পাগলের তাহা নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগ-শোক-অহঙ্কারে, কাম-ক্রোধ-হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্বল হইয়া

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, ‘যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?’

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, ‘সে-সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মত গর্দভ আর কে আছে? Darty linen must not be exposed in the street.’ (ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়।)

খ্রীষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে

ঐ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তখন বলি, ও লোকটা খেপেছে। এই আর কি!’

একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ‘কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। শ্রদ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ-কথা কেহ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাঁহাদের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।’

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখিলামঃ

সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত; কিন্তু খুব কম লোকই সুখী। কাজকর্মও সকলে অনবরত করিতেছে; কিন্তু তাহার অভিলাষিত ফল পাইতে প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেইজন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাস-বলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নাই, তখনই জানিবে যে, তাহার কোন একটা বিষয়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে—এই মুহূর্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞান ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করে এবং উচ্চশ্রেণীর বহুব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হয়। সম্রাট আলেকজেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। উহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে সাহায্য করে মাত্র।

কর্ম সম্বন্ধে জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না; কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আর সেজন্য কর্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত-সুখলাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করিয়া যাইতে হইবে। উহার নাম নিষ্কাম কর্ম, গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে তাহারই উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, ‘কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর।’

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন-গ্রন্থ-নিবদ্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস

হইত না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, ‘কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যাহা ভগবদ্‌গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা?’ উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর। তিনি বলিলেনঃ গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মত এত ধুমধাম ছিল না; সেজন্য তোমাদের মত লোকের কাছে ভগবদ্‌গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কিনা, সেজন্য তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেহ—শ্রীভগবান্ সারথি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদের নিকট মূর্তিমান্ হইয়া আসিলেও তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ছুট ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলি যতটা সম্ভব জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, ‘আম খা, গাছের পাতা গুণে কি হবে?’ আমার বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation (ব্যক্তিগত ব্যাপার)—অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সে-বিষয়ে দু-চারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা।

গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ (prism) কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক সাদা রঙ রামধনুর সাতটা রঙের মত পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই রঙ, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞান উপস্থিত হইলেও মানুষ সত্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না।

এইসব কথা শুনিয়া বলিলাম, ‘স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন উহারা ক্রমে এক জায়গায় মিলিয়া গিয়াছে। মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical illusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হইতেছে। Fluorspar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে double refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উডপেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন

শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, স্বামীজী একদিন তাহা অতি সুন্দরভাবে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন, ‘অনধিকার চর্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum-total of the energy which can be exhibted by an ego is a constant quantity—অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, উহা সীমাবদ্ধ; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্মের গভীর সত্যসকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেইজন্যই ধর্মপথের পথিকদিগের প্রতি—বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা শক্তিসংরক্ষণের উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।’

স্বামীজী বাঙলাদেশের পল্লীগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লীগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন।

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক একখানি পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত-সহায়ে এমনি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে ক্লান্তিবোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াও চর্চা করিতেন।

ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়া থাকে, কেন না তাহাদের চোখের লেন্স বিভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাহাই যে সত্য, তাহারও তো প্রমাণ নাই। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেনঃ মানুষ 'সত্য সত্য', করিয়া পাগল, কিন্তু প্রকৃতি সত্য (Absolute Truth) বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, কারণ ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা সে বুঝিবে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব Absolute ভগবান্ বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝিতে পারিবে না।

স্বামীজী॥ তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বল? অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া দুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।

আমি॥ স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুইটি জিনিষ থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, তাহাও তো মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলিতেছিলেন, তাহাও তো সত্য হইতে পারে?

আমি॥ স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হইলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) আসিয়া পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন আমারও হইবে।

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস—যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য?'

এই-সকল কথা শুনিয়া আমি

স্বামীজী বলিতেনঃ চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম—সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম জিনিষ দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিষ মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সমস্ত জিনিষগুলি ৯৩টা মূল দ্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

ঐ মূল দ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিষই এক জিনিষেরই অবস্থাভেদমাত্র—বোঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল যে—উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে
১৪
।

পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম্ন জমি দেখা যায়, তাহাও সতত সমতল হইয়া একভাবে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উচ্চ জমি ধুইয়া গিয়া গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উষ্ণ জিনিষ কোন জায়গায় রাখিলে উহা ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি (conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

স্বামীজী॥ ঠিক বলিয়াছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। পূর্বকালে আমাদের মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া—ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য? শুধু দুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলিকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ—বিছানায় শুইয়া আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে,

বলিলাম, ‘স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।’ স্বামীজী বলিলেন, ‘প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা যে-উপায়েই হোক, পরে সব আপনিই হইবে। আর জ্ঞান—অদ্বৈতজ্ঞান ভারি কঠিন; জানিয়া রাখো যে, উহা মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal), কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অনুভব করিবার অন্য উপায় নাই।’

তখন এক ভিন্ন দুই দেখিবে না এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এ-সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? ধর্ম অনুভবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নহে। হাতেনাতে করিতে হইবে, তবে ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। এ-কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু-বোতল Hydrogen (উদজান) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজান) লইয়া ‘জল কই?’ করিলে কি জল হইবে, না তাহাদের একত্রে একটা জায়গায় রাখিয়া, তাহাদের ভিতর electric current (তড়িৎ-প্রবাহ) চালাইয়া তাহাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে জল দেখিতে পাইবে এবং বুঝিবে যে, জল hydrogen ও oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের তো কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রহিয়াছে। একমুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হইল, আর বলিলে কিনা, ‘কই, আমি তো সব এক দেখিতেছি না!’

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দরঃ সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্ট বস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মানুষ লেজবিহীন বানরবিশেষ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী। যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বুঝিবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ‘এটা কি, ওটা কি?’ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ায় ও উর্বর ভূমিতে শরীর-রক্ষার জন্য যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন পরিয়া প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বসিয়া আদা-জল খাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন, ‘এমন জিনিষ কি আছে, যাহা জানিলে সব জানা যায়?’ তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত হইতে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হইতেছেন এবং এখন এক কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র। কাল এবং আকাশও (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, যাহার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সূর্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি! আকাশ বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশ বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মত অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক; তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকরণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ-সকল অনন্ত পদার্থই এক, এবং একই ঐ-সকলরূপে প্রকাশিত।

তিনি উত্তর করিলেন, ‘সত্য না হইবার তো কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণস্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি?’

স্বামীজীর স্মৃতি

[প্রিয়নাথ সিংহ স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন—সব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাঁহার প্রচার-সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছেন, মান্দ্রাজে তাঁহার সম্বর্ধনায় উৎসাহিত হইয়াছেন, কলিকাতায় নিজেরাই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জনে বাল্যবন্ধুকে কাছে পাইবার আশায় কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানে আসিয়াছেন।]

অবসর পেয়েই তাঁকে ধরে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতই কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দু-চারটা কথা বলতে না বলতেই ডাকের ওপর ডাক এল যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।'

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামীজী, তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুললুম, আমি ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলিকাতায় পৌঁছবার আগেই আমাদের 'তার' করবে—আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষ নিবারণী ফণ্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও। কিন্তু দেখলুম, তুমি তা করলে না; এর কারণ কি?'

স্বামীজী বললেন, 'হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হইচই হয়। কি জানিস? একটা হইচই না হলে তাঁর (ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত ovation (সম্বর্ধনা) কি আমার জন্যে করা হল, না তাঁর নামেরই জয়জয়কার হল? তাঁর বিষয় জানবার জন্যে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হল। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে! যিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরী হবে, আর মানুষ তৈরী হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ান কতক্ষণের কথা! আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট সভা করে হইচই করে তাঁকে প্রথমে মানুক—আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ী গিয়ে যে একসঙ্গে খেলতুম তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও যা ছিলুম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছিস?'

আমি মুখে বললুম, 'না, সে রকম তো কিছুই দেখছিনি।' তবে মনে হল—সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই; কারণ সে-সব দেশে 'মানুষ' আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও করব, দেখ না।'

আমি॥ আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তো? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে?

স্বামীজী॥ তুই খেপেছিস, তাঁর নাম-প্রচারের কি কিছু বাকী আছে? লেকচার করে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ারা শুনবে, 'বেশ বেশ' করবে, হাততালি দেবে; তারপর বাড়ী গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেলবে। পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি॥ আচ্ছা, স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ ক্রিশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্যে তুমি কিছু না করে, গেলে কিনা আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম বিলুতে?

স্বামীজী॥ কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা

ভারি সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে? সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তময় আসে। তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিস বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তময় ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, তারই উপায় কর, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হতে পারে। বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার ক্রিশ্চানী ধর্ম—মেয়েলী ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌঁছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বলবে, তা তোরা যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্যাকড়া-পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মানবি কি?

আমি॥ এন. ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে এসে তোদের বলবে, ‘তোমরা কি করছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমরা বড় মনে করি’—তখন দেখিস হুদো লোক সে কথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।

আমি॥ তা কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যে-রকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখনও নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজী॥ ওরা তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার ওপর তোদের মত ‘হাঘরের দল’ জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বসতে জুতো-লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন professional (পেশাদার) ভিখিরী হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে করে সকল আফিসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচ-শ বি.এ, এম.এ দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন!—‘ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে খেতে পাচ্ছে না; সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!’ চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে ‘হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন কর’ ইত্যাদি দিনরাত কেবল ‘দাও দাও’ করে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—‘ইংরেজ, আমাদের দাও!’ বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি॥ আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজী॥ আ মরি! সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে বলে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্যে কি দিস—তাই বল। তোদের দেবার এমন জিনিষ আছে, যা ওদেরও নেই। তোরা বিলেত যাবি, তাও ভিখিরী হয়ে, কিনা বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোড় তাদের ধর্মের দুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরী হল। কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐ-সব অমূল্য রত্ন দান কর। তোদের এই ভিখিরী-নাম ঘুচবার জন্যে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে করবার জন্যে বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখনও দিয়ে থাকে? কেবল কাঙালের মত হাত পেতে নেওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে-লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মত হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেকদিন থেকে তাদের ধন-রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখবি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধাভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্যে তারা অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি॥ ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন বলছ, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম বিলোবার অধিকারী আমাদেরই করছ—এ কেমন কথা?

স্বামীজী॥ তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে ‘ভাল ভাল’ বললে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে ‘মন্দ মন্দ’বললে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাব তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে—অন্ততঃ তার

কাঠামোটা আছে। তবে হুট করে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরালায় বসে ধর্ম-জীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য করতে হবে; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্যেই তো ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি॥ কিন্তু স্বামীজী, তোমার মত কে হবে?

স্বামীজী॥ তোরা ভাবিস, আমি মলে বুঝি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না! ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস, মহা অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক 'বিবেকানন্দ' হতে পারে, দরকার হলে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্ণর জেনারেল গেলে তাঁর জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি॥ যাই বল, ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মত Philosophy-তে oratory (দর্শনে বক্তৃতা) করবার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজী॥ তুই জানিসনি। ও-ক্ষমতা সকলের হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মত জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভাবে বার করতে হয় না। মনে কর, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে, পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। অতএব বুঝলি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর, তোরও হবে। অমুকের হবে, আর অমুকের হবে না—আমাদের শাস্ত্রে এ-কথা বলে না।

আমি॥ তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা একজনের বাড়ীতে বসেছিলুম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলে। কলিকালে ও-সব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে বলেছিলে, 'তুই সমাধি দেখতে চাস, না সমাধিস্থ হতে চাস? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি।' তোমরা এই কথা বলবার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়ল, আর আমদের ঐ-বিষয়ের কোন কথাই চলল না।

স্বামীজী॥ হাঁ, মনে পড়ে।

আমায় সমাধিস্থ করে দেবার জন্যে তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামীজী বললেন, 'দেখ, গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।'

এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি আসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম; স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তাঁর নিকটে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথা শুনতে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজেই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বোঝাতে লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর 'রাজযোগ' পুস্তকখানি ভাল করে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনলাম, তাতে মনে হল তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সেদিন আমরা স্বামীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সময় উপস্থিত হই। তাঁর প্রাণায়াম-বিষয়ক কথা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন করে জানতে পারলেন? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং আরও দু-একটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামীজী, সেদিন আমার সঙ্গে যে দু-জন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এ-দেশে আসবার আগেই তারা তোমার 'রাজযোগ' পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কিনা।'

স্বামীজী বললেনঃ ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করত, 'আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন

কেমন করে জানতে পারলেন?’ ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ হত।

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্বজন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পার?’

স্বামীজী॥ হাঁ, পারি।

অতুলবাবু॥ কি জানতে পার, বলবার বাধা আছে?

স্বামীজী॥ জানতে পারি—জানি-ও, কিন্তু details (খুঁটিনাটি) বলব না।

* * *

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দিক অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জন-গর্জন করে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা সেদিন মঠে। শ্রীযুক্ত ধর্মপাল এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখবেন এবং সেখানে মিসেস বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়ীটি সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। পুরানো যে দু-তিনটি কুটীর আছে, তাতে মিসেস বুল আছেন। সাধুরা ঠাকুর নিয়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভাড়া দিয়ে বাস করছেন। ধর্মপাল বৃষ্টির আগেই সেইখানে স্বামীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হল, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নূতন মঠে যেতে হবে। স্বামীজী সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বললেন; সকলে জুতো খুললেন। ছেলেবেলার মত শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, স্বামীজীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্মপাল কিন্তু জুতো খুললেন না দেখে স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, ‘বড় কাদা, জুতোর দফা রফা হবে।’ ধর্মপাল বললেন, 'Never mind, I will wade with my shoes on.' এক এক ছাতা নিয়ে সকলের যাত্রা করা হল। মধ্যে মধ্যে কাহারও পা পিছলয়, তার উপর খুব জোর ঝাপটায় সমস্ত ভিজে যায়, তার মধ্যে স্বামীজীর হাসির রোল; মনে হল যেন আবার সেই ছেলেবেলার খেলাই বুঝি করছি। যা হোক, অনেক খানা-খন্দল পার হয়ে নূতন মঠের সীমানায় আসা গেল।

সকলের পা হাত ধোয়া হলে মিসেস বুলের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে পড়লাম। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে কলিকাতা গেল, তখনও বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে।

মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হল না। পূর্বের কথাগুলিই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, এই অদ্ভুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কখনও হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কখনও বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরস্বরে গান করছে। ক্লাসে তো বরাবর first (প্রথম) হত। খেলাতেও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই, গানেতে তো কথাই নাই—গন্ধর্বরাজ!

স্বামীজীরা ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠাণ্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে স্বামীজী তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক কথা চলল। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বিলাতী সঙ্গীত কেমন?’

স্বামীজী॥ খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অগ্নি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইসলামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাবো, ঐ যে বিদ্যুতের মত গিটকিরি দিয়ে নাকী সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিষ। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না করলে music-এ (গানে) science (বিজ্ঞান) থাকে না। Painting-এ (চিত্রশিল্পে) nature (প্রকৃতি)-কে বজায় রেখে যত artistic (সুন্দর) কর না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি music-এর science বজায় রেখে যত কারদানি কর, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগরাগিণীগুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন॥ কেন science মারা গেল? টপ্পা জিনিষটা কার না ভাল লাগে?

স্বামীজী॥ ঝিঁঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উল্টে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক-একটা রাগরাগিণী হয় তো? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃষ্টি হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল! আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ করে হচ্ছে।

এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড় মূর্চ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিষ। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন॥ ওদের music-টা কেবল martial (রণবাদ্য) বলে বোধ হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজী॥ আছে, আছে। তাতে harmony-র (ঐকতানের) বড় দরকার। আমাদের hormony-র বড় অভাব, এই জন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন করে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের (পাশ্চাত্যের) music খুব উন্নত, করুণরস বীররস—দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হল না।

প্রশ্ন॥ কোন্ রাগরাগিণীগুলি martial?

স্বামীজী॥ সকল রাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজান যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।

ইতোমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হলে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলিকাতার যে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তারপর স্বামীজী নিজে শয়ন করতে গেলেন।

* * *

প্রায় দুই বৎসর নূতন মঠ হয়েছে, সাধুরা সেইখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীজী আমায় দেখে হাসতে হাসতে তন্ন তন্ন করে সমস্ত কুশল এবং কলিকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'আজ থাকবি তো?'

আমি 'নিশ্চয়' বলে অন্যান্য অনেক কথার পর স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে তোমার মত কি?'

স্বামীজী॥ গুরুগৃহে বাস।

প্রশ্ন॥ কি রকম?

স্বামীজী॥ সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।

প্রশ্ন॥ কেন, আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি দোষ?

স্বামীজী॥ প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানী-গড়া কল বৈ তো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন॥ তাতে কি এসে গেল? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে?

স্বামীজী॥ না রে; যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর না, যার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' বলে একটা বিশ্বাস ও গর্ব থাকে, সে কি কখনও মন্দ হতে পারে? কেমন করে হবে বল না? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হতে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি আমাদের history (ইতিহাস) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যারা বলে, 'আমাদের কিছুই নেই, আমরা বর্বর', তাদের মতে নেই। আমি বলি, অন্যান্য দেশের মত নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না; তাই বলে কি তারা উপোস করে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই খায়। তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনি আছে। তোরা চোখ বুজে 'নেই নেই' বলে চেঁচালে কি ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? যাদের চোখ আছে সেই জ্বলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। তবে সেই ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে। এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই বুদ্ধির মত উপযুক্ত করে ইতিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন॥ সে কেমন করে হবে?

স্বামীজী॥ সে অনেক কথা। আর সেই জন্যই 'গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি চাই। চাই Western Science-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস, ছোট ছেলেদের 'গাধা পিটে ঘোড়া করা'-গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।

প্রশ্ন॥ তার মানে?

স্বামীজী॥ ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। ‘শেখাচ্ছি’ মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো কেতাবপত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক্ দিয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিচ্ছে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ্! কি পাসের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি?—না নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরী শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে; চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।

প্রশ্ন॥ মারোয়াড়ীরা বেশ—চাকরি করে না, প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।

স্বামীজী॥ দূর, ওরা দেশটা উৎসন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভালো—manufacture-এর (শিল্পজাত দ্রব্য-নির্মাণের) দিকে নজর বেশী। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory (শিল্পশালা), workshop (কারখানা) করে, তা হলে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাবলীরা—স্বাধীনতার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা বলে দেখিস না!

প্রশ্ন॥ High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব মানুষগুলো যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাঁড়াবে যে!

স্বামীজী॥ রাম কহ! তাও কি হয় রে? সিঙ্গি কি কখনও শেয়াল হয়? তুই বলিস কি? যে-দেশ চিরকাল জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, লর্ড কার্জন high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে বলে কি দেশসুদ্ধ লোক গরু হয়ে দাঁড়াবে!

প্রশ্ন॥ যখন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? আজও কি আছে?

স্বামীজী॥ কলকব্জা তয়ের করতে শিখলেই high education হল না। Life-এর problem solve (জীবনের সমস্যার সমাধান) করা চাই—যে-কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন॥ তবে তোমারা সেই বেদান্তও তো যেতে বসেছিল?

স্বামীজী॥ হাঁ। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলো একটু নেব-নেব হয়, আর সেইজন্যই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তি সঞ্চার করে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের জন্য তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের বড়লাট high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন॥ ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি?

স্বামীজী॥ ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত soul-elevating ideas (মানবমনের উন্নয়নকারী ভাবসমূহ) বেরিয়েছে আর যত কিছু বিদ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে রয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে তো শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মহুঃ পিপাসা পেতে লাগল। অনেকবার জল পান করলেন। এবার বললেন, ‘সিংহ, একটু বরফজল খাওয়া। তোকে সব বুঝিয়ে বলছি?’

জল পান করে আবার বললেন—‘আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ান; চাই technical education (কারিগরী শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।’

প্রশ্ন॥ সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে?

স্বামীজী॥ উপনিষদের গল্পটল্প পড়েছিস? সত্যকাম
১৫
গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য করতে গেলেন। গুরু তাঁকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন। অনেকদিন পরে যখন গুরুর সংখ্যা দ্বিগুণ হল, তখন তিনি গুরুগৃহে ফেরবার উপক্রম করলেন। এই সমস্ত একটি গরু, অগ্নি এবং অন্যান্য কতকগুলি জন্তু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ী ফিরে এলেন, তখন গুরু তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই—প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

সেই-রকম করে বিদ্যা উপার্জন করতে হবে; শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়লে রূপী বাঁদরটি থাকবে। একটা জ্বলন্ত character-এর (চরিত্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না। Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হয়েছে। পণ্ডিত মশাইরা হাত বাড়িয়ে বিদ্যাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা করে বসেছেন। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন॥ এর মানে কি? আর সব দেশে তো ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিদ্যার বলে যে ভারত জুতোর তলে

স্বামীজী॥ ওরে বাপ চেল্লাসনি, যা বলি শোন। ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস, একটা নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা পূজারী ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা করে পাঁজিপুঁথি খুলে বললে, 'এ ঠাকুরের সেবা চলবে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মহা হুলস্থুল ব্যাপার। শেষে পরমহংস মশাইকে ডাকা হল। তিনি বললেন, 'স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তাহলে কি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে?' পণ্ডিত বাবাজীদের আর টীকে-টিপ্পুনী চলল না। ওরে আহাম্মক, তা যদি হবে তো পরমহংস মহাশয় আসবেন কেন? আর বিদ্যাটাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন শক্তিসঞ্চার চাই; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন॥ সে তো সহজ কথা নয়। কেমন করে হবে?

স্বামীজী॥ সহজ হলে তাঁর আসবার দরকার হত না। এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামের প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর। কলিকাতায় একটা বড় করে মঠ কর। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগ) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।

প্রশ্ন॥ সে-রকম সাধু কোথায় পাবে?

স্বামীজী॥ তয়ের করে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলি স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না।

তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে বলে উঠলেন, 'দেখ সিঙ্গি, একটা কিছু কর। দেশের জন্য করবার এত কাজ আছে যে, তোর আমার মত হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর রে। ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।'

প্রশ্ন॥ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বলবামাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেনঃ 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বৈ ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

বেলা প্রায় ১১টা; ইতঃপূর্ব পশ্চিমদিকে একখানা মেঘ দেখা দিয়েছিল। এখন সেই মেঘ স্বন্ স্বন্ শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠল। স্বামীজীর আর আনন্দের শেষ নাই; বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে 'সিঙ্গি, আয় গঙ্গার ধারে যাই' বলে আমাকে নিয়ে ভাগীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন। কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা করছিলেন—ভারতের মঙ্গল। বললেন, 'সিঙ্গি, একটা কাজ করতে পারিস? ছেলেগুলোর অল্প বয়সে বে বন্ধ করতে পারিস?'

আমি উত্তর করলাম, 'বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুরা যাতে বে সস্তা হয়, তার ফিকির করছেন।'

স্বামীজী॥ খেপেছিস, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! ঐ হইচই-ই সার। বে যত মাগগি হয়, ততই মঙ্গল। যেমন পাশের ধুম, তেমনি কি বিয়ের ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো আর রহিল না! পরের বছর আবার তেমনি।

স্বামীজী আবার খানিক চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন, 'কতকগুলি অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে কারিগরী শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা করা যায়, তা হলে বেশ হয়!'

প্রশ্ন॥ কেন? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজী॥ সহস্রগুণে! আমি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফোটে।

প্রশ্ন॥ কেন?

স্বামীজী॥ সেখানে এখানকার মত বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি॥ আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার যো নেই।

স্বামীজী॥ ঠিক। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। কোন বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন।

প্রশ্ন॥ সাহেবদেরও তো art (শিল্প) বেশ।

স্বামীজী॥ দূর মূর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যতদিন এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা করছে জীবনে art (শিল্প) ঢোকাতে।

আমি॥ এ-রকম কথা শুনলে লোকে বলবে, তোমার সব pessimistic view (নৈরাশ্যবাদী মত)

স্বামীজী॥ কাজেই তাই বৈকি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়ীগুলো দেখ সব সাদামাটা। তার কোন মানে পাস? দেখ না—এই যে এত বড় সব বাড়ী government-এর (সরকারের) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস, বলতে পারিস? তারপর তাদের প্যাণ্ট চোস্ত কোট, আমাদের হিসেবে এক প্রকার ন্যাংটো। না? আর তার কি যে বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ। কোন্ building-টার (অট্টালিকার) মানে না বুঝতে পারিস, আর তাতে কিবা শিল্প! ওদের জলখাবার গেলাস, আমাদের ঘটী—কোনটায় আর্ট আছে? ওরে, একটুকরা Indian silk (ভারতীয় রেশম) চায়না (China)-য় নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেটা Japan (জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০ টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা করে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ী দেখেছিস?

উত্তর॥ হাঁ।

স্বামীজী॥ কি দেখেছিস?

আমি॥ বেশ নিকন-চিকন পরিষ্কার।

স্বামীজী॥ তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট! মেটে ঘরগুলো কত চিত্তির-বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্যকারিতা) আর আমাদের art (শিল্প)—ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটী ফেলে এনামেলের গেলাস এনেছেন ঘরে। ওই রকমে utility এমনভাবে আমাদের ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই art এবং utility-র combination (সংযোগ)। জাপান সেটা বড় চট করে নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমার সাহেবদের শেখাবে।

প্রশ্ন॥ কোন্ দেশের কাপড় পরা ভাল?

স্বামীজী॥ আর্যদের ভাল। সাহেবরাও এ-কথা স্বীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজান পোষাক। যত দেশের রাজ-পরিচ্ছদ এক রকম আর্য-জাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাখবার চেষ্টা, আর তা জাতীয় পোষাকের ধারেও যায় না। দেখ সিঙ্গি, ঐ হতভাগা শার্টগুলো পরা ছাড়।

প্রশ্ন॥ কেন?

স্বামীজী॥ আরে ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস)। সাহেবরা ঐগুলো পরা ঘৃণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙালীর! যা হোক একটা পরলেই হল? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর ছোঁয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড়চোপড় পরলেও যদি জাত যেত তো বেশ হত। কেন, আমাদের নিজের মত কিছু করে নিতে পারিস না? কোট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়ল। ‘চল, ঘণ্টা দিয়েছে’ বলে স্বামীজী আমায় সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে করতে স্বামীজী বললেন, ‘দেখ সিঙ্গি, concentrated food (সারভূত খাদ্য) খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুঁড়েমির গোড়া।’ আবার কিছু পরেই বললেন, ‘দেখ, জাপানীরা দিনে দু-বার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশী। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের যে দু-বার আহার কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে। একগাদা ভাত হজম করতে সব energy (শক্তি) চলে যায়।’

প্রশ্ন॥ আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে সুবিধা কি?

স্বামীজী॥ কেন, কম করে খাবে। প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস?দরিদ্রতার প্রধান কারণ আলস্য। একজনের সাহেব রাগ করে মাইনে কমিয়ে দিলে; তা সে ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, একবেলা হয়তো মুড়ি খেয়ে কাটালে।

প্রশ্ন॥ তা নয়তো কি করবে?

স্বামীজী॥ কেন, আরও অধিক পরিশ্রম করে যাতে খাওয়া-দাওয়াটা বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না? পাড়ায় যে দু-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাই-ই-চাই। সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বলব!

আহারান্তে স্বামীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।

* * *

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

প্রশ্ন॥ স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি
শিষ্য করেছ?

স্বামীজী॥ অনেক।

প্রশ্ন॥ ২।৪ হাজার?

স্বামীজী॥ ঢের বেশী।

প্রশ্ন॥ কি, সব মন্ত্রশিষ্য?

স্বামীজী॥ হাঁ।

প্রশ্ন॥ কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী? সব
প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ?

স্বামীজী॥ সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন॥ লোকে বলে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ; তাদের প্রণব কেমন করে দিলে? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও উচ্চারণে অধিকার নেই?

স্বামীজী॥ যাদের মন্ত্র দিয়েছি, তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জানলি?

প্রশ্ন॥ ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়? স্বামীজী॥ আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন॥ ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

স্বামীজী॥ ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ—দুটো আলাদা জিনিষ। এখানে সব—জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব রজঃ তমঃ—তিনটি গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন॥ তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ বলছ?

স্বামীজী॥ তাই বটে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যে আছে—কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর

পরশুরাম—একজন ব্রাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন করে হল?

প্রশ্ন॥ এ কথা তো খুব ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না? স্বামীজী॥ ঐটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ। যাক। সে-দেশে যারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা করে জপ-তপ, সাধন-ভজন করে। প্রশ্ন॥ তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায় শুনতে পাই। শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চাত্য) শিষ্য মোট চার মাস সাধন-ভজন করে তার যে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, তবে বোঝ তারা ব্রাহ্মণ কিনা—তোদের দেশে যে মহা অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটাও কেমন! ঠাকুর-মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললেন, 'ওগো, একবার শিষ্যবাড়ী-টাড়ী যাও; পাশা খেললে কি আর পেট চলে?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'হাঁগো, কাল মনে করে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি।' এই তো তোদের বাঙলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এ-রকমটা হয়নি। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।

* * *

প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য হয়। বঙ্গদেশে এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই। এখানে দশ-বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সে-প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ষ্টীমার আসিয়া মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই—সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ষ্টীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই।

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংযত ভাবের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে—যদি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো। কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আধটা সভা—যা কালেভদ্রে কারও বাড়ীতে হয়, তা নয়; সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বৈকালে সভা বসত। সকালে সমস্ত রাজকার্য। আর খবরের কাগজ তো ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত তার খবর হত। এইসকল দরবার-সভাই আমাদের দেশের—কি সব সভ্য দেশের সভ্যতার centre (কেন্দ্র) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।'

প্রশ্ন॥ এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নেই বলে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?

স্বামীজী॥ এগুলো একটা অবনতি—যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপন বাঁচা', আর গানের সময় 'হামবড়া'—এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু self-sacrifice (আত্মত্যাগ) শিক্ষা করলেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সভ্যতা self- sacrifice-এর গোড়া।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্তি পায় না। 'গান গাওয়াটা বড় দোষ'—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন করে সেটি বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। 'তামাক খাওয়াটা মহাপাপ'—এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite (অনন্ত) ভাব আছে—সে-সব ভাবের কোন-রকম স্ফূর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার যো নাই। তা হতে গেলে বাপ-মাদেরও নূতন করে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! সুসভ্য নয়, তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কিনা—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয়, আর তাঁরা রাজ্যিটা চালান। দুঃখুও হয়, হাসিও পায়। আরে সে martial (সামরিক) ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব (দাস্যভাব) সাধন করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ভক্ত-লেখক—তাঁহার কোন পুস্তকে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেনঃ

তোর এমন করে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে তারা বিশ্বাস করে না, তা কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করেছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে সে আমাদের শত্রু? তুই তো তাঁকে নীচু করে ফেললি, তাঁকে ছোট করে ফেললি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান্ হন তো যে যেমন করে ডাকুক, তাঁকেই তো ডাকছে। তবে সবাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাল দিলেই তোর কথা তারা শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিস তবে মাথা নিতে পারবি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?

একটু স্থির হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ

বীর না হলে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে? বীর না হলে হিংসা দ্বেষ যায় না; তা সভ্য হবে কি? সেই

manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই, নেই। সে-ভাব ঢের খুঁজে দেখেছি, একটা বৈ দুটো দেখতে পাইনি।

প্রশ্ন॥ কার দেখেছ, স্বামীজী?

স্বামীজী॥ এক G. C-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাসভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না; নির্ভর তার কাছে শিখেছি।

এই বলিয়া স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

* * *

দ্বিতীয়বার মার্কিন যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, স্বামীজী অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছে—স্বামীজী এখনি মঠে যাইবেন। ইতোমধ্যে বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ চল, মঠে যাবি আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, ‘আজ মজা হয়েছে। একজনের বাড়ী গেছলুম—সে একটা ছবি আঁকিয়াছে—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়েছে? আমি বললুম, মন্দ কি! সে জিদ করে বললে, সব দোষগুণ বিচার করে বল—কেমন হয়েছে। কাজেই বলতে হল—কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ ‘রথটা’ আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।’

প্রশ্ন॥ কেন প্যাগোডা রথ নয়?

স্বামীজী॥ ওরে দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না! রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মত। Grecian mythology-র (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর) ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস? দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ে সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সময়ের জিনিষগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদান বাপে-তাড়ান ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করান আর একখানা perfect drama (সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন॥ কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে?

স্বামীজী॥ শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান্)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)-টি তার শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাব আঁকা কর্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেনঃ

এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মত মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি?

উত্তর॥ ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই।

স্বামীজী॥ অ্যাই!—সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea (মুখ্যভাব); দেহ, জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥
১৬

যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নৌকা আসিয়াছে। স্বামীজী যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, 'চল, মঠে যাই। বাড়ীতে বলে এসেছিস তো?'

বন্ধু॥ আজ্ঞা হাঁ।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন।

স্বামীজী॥ এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ান চাই—কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে, আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।

বন্ধু॥ এ তো কর্মযোগ!

স্বামীজী॥ হাঁ, এই কর্মযোগ। কিন্তু সাধন-ভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি?

বন্ধু॥ গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে—বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধন-ভজন; আর তা ছাড়া সব কর্ম অকর্ম।

স্বামীজী॥ খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য, তোর প্রতি কাজের জন্য দায়ী কে? তুই তো?

বন্ধু॥ তা বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝতে পারছিনি। আসল কথা তো দেখছি গীতার ভাব—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' ইত্যাদি। তা আমি তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের জন্য আমি তো একেবারেই দায়ী নই।

স্বামীজী॥ ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখতে পাবি— তিনিই সব করাচ্ছেন, তখন ওটা বলা ঠিক; নইলে সব মুখস্থ—মিছে।

বন্ধু॥ মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার করে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন।

স্বামীজী॥ বিচার করে দেখলে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ—অহঃরহঃ তুই যা-ই করিস, তুই করছিস মনে করে করিস কিনা? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ-রকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যে, 'আমি'টা চলে যাবে আর তার জায়গায় 'হৃষীকেশ' এসে বসবেন। তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'টা বুক জুড়ে বসে থাকলে তাঁর আসবার জায়গা কোথায় যে তিনি আসবেন? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই!

বন্ধু॥ কুকর্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন তো?

স্বামীজী॥ না রে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। তিনি কুকর্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না; ওটা তোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই ওঠে। জোর করে তিনি সব করাচ্ছেন বলে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি বলে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াবার যো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটার বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি—ওটা গীতা-বেদান্তের বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমি মন্দটা করছি—বল। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করেনি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধরে নিয়ে চলতে হয়; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি—এটিই হল চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভেতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

দেখ, বিটলেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে, এও ভগবান্ করাচ্ছেন, তাহলে কি আর বেশীদিন তাকে সেই নীচ কাজ করতে হয়? সব ময়লা চট করে সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝত; আর আমার মনে হয়—বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত, বাবা, দু-মাস ধরে আর যাগ করবার যো-টি নেই, একরাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পূজা শেষ করে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে—সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্মদা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদগুরুরা দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাঁদের জন্যই ঐ-সব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে পড়ল।

প্রশ্ন॥ মন্দ কাজের অনুষ্ঠান তো সে ভাল বলে করতে লাগল, এতে তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন করে যাবে?

স্বামীজী॥ ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগবান্ পাবে বলে কাজ করছে।

প্রশ্ন॥ সত্য-সত্যই কি তা হয়?

স্বামীজী॥ সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে, না হবে কেন?

প্রশ্ন। পঞ্চ 'মকার'-সাধনে কিন্তু অনেকের মন যে মদমাংসে পড়ে যায়?

স্বামীজী॥ তাই পরমহংস-মশাই এসেছিলেন। ও-ভাবে তন্ত্রসাধনের দিন গেছে। তিনিও তন্ত্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু ও-রকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাটতেন। তন্ত্রটা বড় slippery ground (পিছল পথ)। এই জন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের [বেদান্তের] চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই।

প্রশ্ন॥ চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজী॥ জ্ঞান-বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।

প্রশ্ন॥ স্ত্রীলোকের প্রতি এইভাব কি করে আসে?

স্বামীজী॥ ওরাই হল আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পুজো আরম্ভ হবে, যেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরবলি' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেনঃ স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখবি।' তা যা বলেছিলে, তাই করলে।

স্বামীজী॥ হাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস—খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই বা সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগ হয়।

তিনদিনের স্মৃতিলিপি

২২ জানুআরী, ১৮৯৮ খ্রীঃ। ১০ মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই হাতমুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজী বলিতেছেনঃ চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত—pure, pure by nature (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনও পাপ করতে পারি?অসম্ভব। এই রকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।

প্রশ্ন॥ এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?

স্বামীজী॥ ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতিমূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই—এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখনও জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখান হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। জেনেছি যে আমরা বিজিত দুর্বল, আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই দেশের যত কিছু problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই solved (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন॥ সব দোষ শুধরে যাবে, তাও কি কখনও হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পূরণ করবার জন্য কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে! এ-সব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজী॥ অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে, না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন॥ রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব?

স্বামীজী॥ ভিখিরীর অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরী কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে?

প্রশ্ন॥ মহাশয়, majority-র (অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজী॥ Majority (অধিকাংশ) তো fools (নির্বোধ), men of common intellect (সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন); মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ করে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহাম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐ রকম আর কিছু। তোমাদের দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ তো? দুই-চার জনের সংস্কার হল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হল, আর যারা মরে মরুক।

প্রশ্ন॥ তা হলে কি কোন সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

* * *

২৩ জানুআরী, ১৮৯৮; ১১ মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজী উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বারান্দাটি

স্বামীজী॥ দরকার আছে বৈকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শ করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।

লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজী সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই-এক জনকে স্বামীজীর গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজী॥ কি বলছ মাষ্টার, বল না? ফিস্ ফিস্ করছ কেন?

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' গানটি ধরিলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখনও আসিতেছিলেন, তাঁহারা সিঁড়ি হইতে মনে করিলেন—যেন গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে। গান শেষ হইলে স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হয়েছে তো? আর গান না। নেশা ধরে যাবে। আর গালটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। Voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।'

অতঃপর স্বামীজী এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে 'মুক্তির স্বরূপ' সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীনবাবু ও আর দু-একজন বক্তৃতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার একজন গৃহীভক্তকে বলিলেন, 'এর পক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।' স্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে দুই-একজনকে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইয়া দিলেন।

স্বামীজী॥ রেগে উঠিল কেন? তোরা বড় গোল করিস। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।' ভক্তিমতে ভগবানকে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি—এ কথাও বলা যায় না, তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি।এইরূপ যার যে-টান, সে সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মা ছেলেকে ভালবাসে—সব জায়গাতেই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টানছে, সেখানেও তিনি। সর্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্বস্থানে তাঁকে অনুভব হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবে যায় অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাকতে পারে না—ভক্তের সহিত ভগবানের পৃথকত্ব থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান্ লাভের জন্য পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে—ভগবানকে অভেদভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের 'অভেদবাদী ভক্ত' বলতে পারেন। মায়ার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। দেশ-কাল নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়া। যখন এই মায়ার পারে যাওয়া যায়, তখনই একত্ববোধ হয়; তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত কোথায় জানিস? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে দেখে। তবে ঠাকুর বলতেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়; মুক্তিলাভ করে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায়—মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন? এর উত্তর এই—মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হতে পারে না। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে করে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন॥ মশায়, এ তো বড় মুশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান্; তা হলে ভগবানই তো সব পাপের জন্য দায়ী হলেন।

স্বামীজী॥ ঐ-রকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা-মাত্রকেই যখন ভগবান্ বলে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐ রকম মনে হতে পারে। সেই রকম হওয়া চাই। ভাবটার realization (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন॥ তা হলে তো বলতে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজী॥ পাপ আর পুণ্য বলে আলাদা জিনিষ তো কিছু নেই। ওগুলো ব্যবহারিক কথামাত্র। আমরা কোন জিনিষের এক-রকম ব্যবহারের নাম 'পাপ' ও আর এক-রকম ব্যবহারের নাম 'পুণ্য' দিয়ে থাকি। যেমন এই আলোটা জ্বলার দরুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর এই এক-

রকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটা ঐ আলোর আর এক-রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিষটা ভাল মন্দ হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্যটাও ঐ-রকম। আমাদের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই ‘পুণ্য’ এবং কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম ‘পাপ’।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, ‘একটা জগৎ আর একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান্—এ-কথা সত্য হোক আর না হোক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিত্ব) আছে।’

স্বামীজী॥ না হে বাপু, ওটা poetry (কবিত্ব) নয়। ওটা জ্ঞান হলে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার Mill (মিল্) Hamilton (হ্যামিল্টন), Herbert Spencer (স্পেনসার) প্রভৃতির দর্শন লইয়া প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হইল।

প্রশ্ন॥ ব্যবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজী॥ নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত; সেইজন্যই প্রবৃত্তি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন॥ সবই কর্মের ফল হলেও গোড়া তো একটা আছে! সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন?

স্বামীজী॥ কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান্ যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা মায়াটা কেন এল? আর কোথা থেকে এল?

স্বামীজী॥ ভগবান্ সম্বন্ধে ‘কেন’ বলাটা ভুল। ‘কেন’ বলা যায় কার সম্বন্ধে?—যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে আবার কেন কি? ‘মায়া কোথা থেকে এল?’—এরূপ প্রশ্নও হতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই এই মায়ার ভেতর। তুমি প্রশ্ন করছ ঐ মায়ার পারের জিনিষ সম্বন্ধে। মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিষের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে?

অতঃপর অন্য দুই-চারিটা কথার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরিলাম।

* * *

২৪ জানুআরী, ১৮৯৮। ১২ মাঘ, সোমবার। গত শনিবার যে-লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি intermarriage (অন্তর্বিবাহ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, ‘ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হতে পারে?’

স্বামীজী॥ বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ তা সমাজ-

বন্ধনকে শিথিল করে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জান তো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—‘ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং’ ইত্যাদি[১৮]; সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি বলে থাকি।

প্রশ্ন॥ তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে লোকের সঙ্গে বা মান্দ্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাত। বর-কনে সম্বন্ধে তো এই গণ্ডগোল; আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

স্বামীজী॥ ও-রকম বিয়ে হতে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহস্য) হচ্ছে—to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই বাঙলা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। এইরূপে—যেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নয়।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা না হয় বিয়েই হল, তাতে ফল কি? উপকার কি?

স্বামীজী॥ দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ বছর ধরে বিয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resistকরবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ও-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা মশায়, early marriage (বাল্যবিবাহ) সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজী॥ বাঙলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে দু-এক বছর বড় করে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যেজন্যই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় করে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ীর গিন্নী থেকে আরম্ভ করে যত আত্মীয়রা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে। আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথা বলে আর কি হবে! তাদের কথা তো আর কেউ মানে না, তবুও তারা নিজেরাই মোড়ল সাজে। রাজা বললে যে, বার বছরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি দেশের সব ধর্মধ্বজীরা ‘ধর্ম গেল, ধর্ম গেল’ বলে চীৎকার আরম্ভ করল। বার-তের বছরের বালিকার গর্ভ না হলে তাদের ধর্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা রে এদের ধর্ম! এরাই আবার political agitation (রাজনীতিক আন্দোলন) করে, political right (রাষ্ট্রীয় অধিকার) চায়।

প্রশ্ন॥ তা হলে আপনার মত—মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজী॥ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে। তবে যে-রকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। খালি বই-পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরী) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন॥ মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজী॥ ঐ-রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল

কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রাণী কেমন ছিল!

প্রশ্ন॥ আপনি যা বলছেন, তা বড়ই নূতন ধরনের; আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে-শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে।

স্বামীজী॥ চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তো হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘারে করতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা তো সহজেই দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিষ, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি জিনিষ) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form (চরিত্র তৈরী) করতে হবে—যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে-রকম সময় পড়েছে, তাতে তাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুমারী করে রেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে; তা হলে তারা অতি সহজেই ঐ-সব শিখতে পারবে এবং ঐরূপ শিখতে আনন্দও পাবে। আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এই-রকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন॥ ঐরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন করে হবে?

স্বামীজী॥ তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টে যাবে। এখন—ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হল! তা ন-বছরেই হোক, দশ-বছরেই হোক! এখন এ-রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হলে গুষ্টিসুদ্ধুর আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে! এ ভাবটা উল্টে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐ-রকম ব্রহ্মচর্য করবে, তাদের তো কথাই নেই—কতটা শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর কতটা বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না!

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, ‘মাঝে মাঝে এস।’ তিনি বলিলেন, ‘ঢের উপকার পেলুম; অনেক নূতন কথা শুনলুম, এমন আর কখনও কোথাও শুনিনি।’ সকাল হইতে কথাবার্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। আসিয়া দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি-তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, ‘মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন না?’

স্বামীজী॥ কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে হবে? তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি। তাঁর কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের ভেতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না? শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন; স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখনও সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তার প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সেই উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুললে।

প্রশ্ন॥ সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

প্রশ্ন॥ মহাশয়, তিনি তো আচণ্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী॥ সাধারণের সম্পত্তি কি করে হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না? ঐ প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা ‘মেয়ে’ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িষ্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙলা দেশটায় চারশ বছর ধরে রাধাপ্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো কেবল

কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তা চারশ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বীরত্বসূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি!

স্বামীজী॥ প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে—প্রেম, প্রেম—রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিনরাত মেতে থাকতেন, তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন॥ ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হতে পারে? স্বামীজী॥ কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নীদের সঙ্গে যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ!

প্রশ্ন॥ তবে কি ঐ প্রেমের পথ দিয়ে ভজন করে—ভগবানকে স্বামী ও নিজেকে স্ত্রী ভেবে ভজন করে—তাঁকে (ভগবানকে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব?

স্বামীজী॥ দু-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, এ-কথা নিশ্চিত। আর এ-কথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি? মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আরও চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর না? প্রাণভরে তাঁর নাম কর না? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপনি হবে। তবে এ-কথা নিশ্চিত জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বলবে, তা কি করে হবে?—আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একটা জালা হতে হবে? স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখতেই হবে? আর মধুরভাবের ওপরই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে মেয়ের ভাব নেবার দরকার কি?

প্রশ্ন॥ হাঁ, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শাস্ত্রেও কীর্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

স্বামীজী॥ বেশ কথা, কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে কর না। কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জানো? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রি-রি করে, তারপর যেই সঙ্কীর্তন থামে তখন সে ভাবটা হু হু করে নাবতে থাকে। ঢেউ যত উঁচুতে ওঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাতেও ঐরূপ দেখেছি কতকগুলো লোক গীর্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে—তারপর গীর্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুকল।

প্রশ্ন॥ তা হলে মহাশয়, চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রবর্তিত ভাবগুলির ভেতর কোন্‌গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে?

স্বামীজী॥ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart (হৃদয়বত্তা), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রশ্ন॥ ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে পারিনি। (করজোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজী॥ (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান্ তো সে-সব পারবেন না।

এইবার প্রশ্নকর্তা তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। স্বামীজী দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কাহারও কথা তিনি রাখিতেন না। বলিতেন, 'তারা এত কষ্ট করে দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি না?'

ঐদিন বেলা তিন-চারিটা হইবে। স্বামীজীর সহিত উপস্থিত কয়েকজনের অন্য কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার

কথাও হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেনঃ ইংলণ্ড থেকে আসবার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখি—বুড়ো থুড়থুড়ো ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বলছে, 'তোমরা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমরা হচ্ছি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত বলে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ঐ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে।' আমি বললাম, 'কোথায় খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া যেতে পারে?' বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখ না এখানে।' একথা বলে টার্কির নিকটবর্তী একটি স্থান দেখিয়া দিল। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন জাহাজ কোন্ জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?' ক্যাপ্টেন বলল, 'ওই সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

কথোপকথন

লণ্ডনে ভারতীয় যোগী

[ওয়েষ্টমিনষ্টার গেজেট—২৩
অক্টোবর, ১৮৯৫]

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেনঃ পাশ্চাত্য জাতির নিকটে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীত বেদান্তধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্য-সত্যই একজন ভারতীয় যোগী—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সন্ন্যাসী ও যোগিগণ শিষ্যপরম্পরাক্রমে যে-শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে গত সন্ধ্যায় 'প্রিন্সেস হলে' এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, মুখের ভাব শান্ত ও প্রসন্ন—তাঁহাকে দেখলেই বোধ হয় তাঁহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ স্বামীজী, আপনার নামের কোন অর্থ আছে কি?—যদি থাকে, তাহা কি আমি জানিতে পারি?

স্বামীজী॥ আমি এখন যে (স্বামী বিবেকানন্দ) নামে পরিচিত, তাহার প্রথম শব্দটির অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধিপূর্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টি একটি উপাধি [নাম?]—সংসারত্যাগের পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্ন্যাসীই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—বিবেক অর্থাৎ সদসদ্বিচারের আনন্দ।

'আচ্ছা স্বামীজী, সংসারের সকল লোকে যে-পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহা ত্যাগ করিলেন কেন?'

তবে কি তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আপনি এখন তাহারই প্রতিনিধিস্বরূপ?'

স্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন—না না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে সর্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, এই মতই তিনি পোষণ করিতেন এবং উহার জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন খুব বড় যোগী ছিলেন।

'তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের সহিতই আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, যথা—থিওজফিক্যাল সোসাইটি, ক্রিশ্চান সায়েণ্টিষ্টস্[১] বা অপর কোন সম্প্রদায়ের সহিত?'

'স্বামীজী স্পষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিলেন—না, কিছুমাত্র না। (স্বামীজী যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদভাবপূর্ণ!) আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহা আমার গুরুর শিক্ষানুযায়ী, তাঁহার উপদেশের অনুগামী হইয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। অলৌকিক

উপায়ে লব্ধ কোনপ্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার দাবী আমি করি না। আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্মত এবং ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব।

'তিনি বলিতে লাগিলেন—সকল ধর্মেরই লক্ষ্য—কোন বিশেষ মানব-জীবনকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া স্থূলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা দেওয়া। উক্ত আদর্শগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ ভাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদান্ত তাহারই বিজ্ঞানস্বরূপ। আমি ঐ বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি, এবং ঐ বিজ্ঞানসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়রূপে অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ স্থূল আদর্শগুলি প্রত্যেকে নিজেই বুঝিয়া লউক—এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বুঝিতে হইবে, চেষ্টা করিলে সেগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আর সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজে নিজে উহা পড়িয়া লইতে পারে। সর্বোপরি, প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি দ্বারা আদেশপ্রচারকারী—সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত মহাপুরুষদের উপদেশ বলিয়া কোন কিছু প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত করি না, অথবা গোপনীয় গ্রন্থ বা হস্তলিপি হইতে কিছু শিখিয়াছি বলিয়া দাবী করি না। আমি কোন গুপ্ত সমিতির মুখপাত্র নই, অথবা ঐরূপ সমিতিসমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমার বিশ্বাস নাই। সত্য— আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, সত্য অনায়াসে দিবালোক সহ্য করিতে পারে।

তবে স্বামীজী, আপনার কোন সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প

স্বামীজী॥ না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকয়েক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও ঐ জ্ঞান-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করিয়া গেলে পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় এ যুগেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃঢ়চিত্ত মহাপুরুষ ঐভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।

'স্বামীজী, আপনি কি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন?' ।

স্বামীজী॥ না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসভা হইয়াছিল, আমি তাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিতেছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে। সেদেশে আমার কাজ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আমাকে শীঘ্র সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

'স্বামীজী, পাশ্চাত্য ধর্মসমূহের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব?'

আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহা জগতে যত প্রকার ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমুদয়েরই ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে, আর আমার সব ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমার উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধী নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, ব্যক্তিকেই তেজস্বী করিবার চেষ্টা করি। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরাংশ বা ব্রহ্ম—এ কথাই শিক্ষা দিই, আর সর্বসাধারণকে তাহাদের অন্তর্নিহিত এই ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ।'

'এদেশে আপনার কাজ কি ধরনের হইবে?'

'আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব, আর তাহাদের নিজ

নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করিব। আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। আমি অবশ্য-বিশ্বাস্য মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।'

'আমি প্রকাশ্যে যে-সব কাজ করি, তাহার ভার আমার দু-একটি বন্ধুর হাতে আছে। তাঁহারা ২২ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় পিকাডেলি প্রিন্সেস হলে ইংরেজ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে আমার এক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিকে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। বিষয়—আমার প্রচারিত দর্শনের মূলতত্ত্ব—'আত্মজ্ঞান'।
২

তার পর আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার যে-পথ দেখিতে প
প্রস্তুত; লোকের বৈঠকখানায় বা অন্য স্থলে সভায় যোগ দেও
বিচার করা—সব কিছুই করিতে আমি প্রস্তুত। এই অর্থলাল
সকলকে বলিতে চাই, আমার কোন কার্যই অর্থলা

আমি এইবার তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম—আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিকভাবপূর্ণ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতের জীবনব্রত

[সানডে টাইমস—লণ্ডন, ১৮৯৬]

ইংলণ্ডবাসীরা যে ভারতের ‘প্রবাল উপকূলে’
৩
ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে ভারতও যে ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বড় একটা জানেন না। সেণ্ট জর্জেস রোড, সাউথ ওয়েষ্ট, ৬৩নং ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ অল্পকালের জন্য বাস করিতেছেন। দৈবযোগে (যদি ‘দৈব’ এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি করেন, এবং তাঁহার ইংলণ্ডে আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি, এই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকায় ঐ স্থানে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। তিনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত ঐ ভাবে কথোপকথনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম।

তিনি বলিলেন—আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এইরূপে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমার দেশে ঐরূপ প্রথা নাই বলিয়াই যে আমি সর্বসাধারণকে যাহা জানাইতে ইচ্ছা করি, তাহা জানাইবার জন্য বিদেশে গিয়া সেখানকার প্রচারের প্রচলিত প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, তাহাতে আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটি বন্ধু আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিছুটা কৃতকার্য হইয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারি। চিকাগো ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় শহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম, এ বৎসর আসিয়াছি দেখিতেছেন; প্রায় তিন বৎসর আমেরিকায় রহিয়াছি। আমার বিবেচনায় আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ স্তরের। দেখিলাম, মার্কিনজাতির চিত্ত সহজেই নূতন নূতন ভাব ধারণা করিতে পারে। কোন জিনিষ নূতন বলিয়াই তাহারা পরিত্যাগ করে না, উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে—তারপর উহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, বিচার করে।

‘ইংলণ্ডের লোকেরা অন্যপ্রকার—ইহাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য?’

‘হাঁ, ইংলণ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নানা নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া উহার বিকাশ হইয়াছে। ঐরূপে অনেকগুলি কুসংস্কারও আসিয়া জুটিয়াছে। সেগুলি ভাঙিতে হইবে। এখন যে-কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন নূতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঐগুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।’

‘লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আপনি আমেরিকায় কোন নূতন সম্প্রদায় বা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।’

‘এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার ভাবের বিরোধী; কারণ সম্প্রদায় তো যথেষ্টই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে

গেলে উহার তত্ত্বাবধানের জন্য লোক প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা এরূপ কাজের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ কাজ যখন অপরে চালাইতেছে, তখন আবার ঐ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন।'

'আপনার শিক্ষা কি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা?'

'সকল প্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বলিলে বরং আমার প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্মসমূহের গৌণ অঙ্গগুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে যেটি মুখ্য, যেটি উহাদের মূলভিত্তি, সেইটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাজ। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য, তিনি একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ কোন ধর্মকে কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; কোন ধর্মের এই এই ভাব ঠিক নয়—এ-কথা তিনি বলিতেন না। তিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিরূপে ঐগুলি অনুষ্ঠান করিয়া উপদিষ্ট ভাবগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্মের বিরোধিতা করা বা তাহার বিপরীত পক্ষ আশ্রয় করা—তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ তাঁহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—জৈনগণ, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং ঐ বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠানে কেহ কোন দিন বাধা দেয় নাই; আজ পর্যন্ত তাহারা ভারতে রহিয়াছে। ভারতই ঐ বিষয়ে শান্তি ও মৃদুতারূপ যথার্থ বীর্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি—এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহ্ন।'

'আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের[4] মতের মত লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে; সে-বিষয়েও আমার নিজের সন্দেহ আছে, কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে কিভাবে চলা সম্ভব?'

'জাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্যকর হইবে দেখা যায়, ভারতের কর্মফল—ভারতের অদৃষ্ট—অপর জাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া, কিন্তু আবার সময়ে ঐ-সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা। ভারত তাহার মুসলমান বিজেতাগণকে ইতোমধ্যেই জয় করিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই সুফি[5]—তাঁহাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক্ করিবার উপায় নাই। হিন্দু ভাব তাঁহাদের সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করিয়াছে—তাঁহারা ভারতের নিকট শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট মহাত্মা আকবর কার্যতঃ একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলণ্ডের পালা আসিলে ভারত তাহাকেও জয় করিবে। আজ ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, কিন্তু ভাব-জগতে উহার উপযোগিতা তো নাই-ই, বরং উহাতে অপকারই হইয়া থাকে। আপনি জানেন, শোপেনহাওয়ার[6] ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেনঃ 'অন্ধকার যুগের'[7] পর গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে যেমন ইওরোপে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব ইওরোপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইবে।'

'আমায় ক্ষমা করিবেন—কিন্তু সম্প্রতি তো ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।'

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—না দেখা যাইতে পারে, কিন্তু এ-কথাও বেশ বলা যায় যে, ইওরোপের সেই 'জাগরণের'[8] সময়ও অনেকে কোন চিহ্ন পূর্বে দেখে নাই, এবং উহা আসিবার পরও উহা যে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাঁহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাঁহারা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটি মহান্ আন্দোলন আজকাল ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে ইহা পণ্ডিতদের হস্তেই রহিয়াছে এবং তাঁহারা যতদূর কার্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুষ্ক নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে লোকে উহা বুঝিবে, ক্রমে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবে।

'আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে! তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি-প্রচারের জন্য অন্যান্য দেশে অধিক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি, যত দিন না সমগ্র জগৎ আসিয়া তাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অপেক্ষা করিবে!'

'ভারত প্রাচীন যুগে ধর্মপ্রচারকার্যে একটি প্রবল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ড খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার শত শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে তাঁহার মতাবলম্বী করিবার জন্য ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এখন ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিশেষ কোনপ্রকার ধর্ম অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা খুব বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে যে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক আপনাদিগকে কোনরূপ বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্মসম্প্রদায়ই এক মূল সত্যের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। হয় সবগুলিরই উন্নতি হইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট হইবে। উহারা ঐ এক

সত্যরূপ কেন্দ্র হইতে বহু ব্যাসার্ধের মত বাহির হইয়াছে, এবং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।'

'এখন আমরা অনেকটা মূলপ্রসঙ্গের কাছে আসিতেছি—সেই কেন্দ্রীভূত সত্য কি?'

'মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই—সে যতই মন্দপ্রকৃতি হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মশক্তি আবৃত থাকে, মানুষের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে। ঐ কথায় আমার ভারতীয় সিপাহীবিদ্রোহের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সময়ে বহুবর্ষ-মৌনব্রতধারী এক সন্ন্যাসীকে জনৈক মুসলমান দারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকে ঐ আঘাতকারীকে ধরিয়া তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'স্বামিন্, আপনি একবার বলুন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি নিহত হইবে।' সন্ন্যাসী অনেক দিনের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'বৎসগণ, তোমরা বড়ই ভুল করিতেছ—ঐ ব্যক্তিও যে সাক্ষাৎ ভগবান্!' সকলের পশ্চাতে ঐ একত্ব রহিয়াছে—উহাই আমাদের জীবনের শিক্ষা করিবার প্রধান বিষয়। তাঁহাকে গড্, আল্লা, যিহোবা, প্রেম বা আত্মা যাহাই বলুন না কেন, সেই এক বস্তুই অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে মহত্তম মানব পর্যন্ত সমুদয় প্রাণীতেই প্রাণস্বরূপে বিরাজমান। এই চিত্রটি মনে মনে ভাবুন দেখি, যেন বরফে ঢাকা সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের গর্ত করা রহিয়াছে—ঐ প্রত্যেকটি গর্তই এক একটি আত্মা—এক একটি মানুষসদৃশ, নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির তারতম্য অনুসারে বন্ধন কাটাইয়া—ঐ বরফ ভাঙিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে!'

'আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির আদর্শের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নত ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ—সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজন্য আমরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ সর্বসাধারণের কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—আমরা এইরূপ বিবেচনা করি।'

স্বামীজী খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'কিন্তু সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূলভিত্তি—মানুষের সততা। পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখনও কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতির ভাল হইয়া থাকে। আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম—এক সময়ে ঐ জাতিই সর্বাপেক্ষা চমৎকার শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ সেই চীন ছত্রভঙ্গ কতকগুলি সামান্য লোকের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ—প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত ঐ-সকল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমানে ঐ জাতিতে আর জন্মাইতেছে না। ধর্ম সকল-বিষয়ের মূল পর্যন্ত গিয়া থাকে। মূলটি যদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক থাকে।'

'ভগবান্ সকলেরই ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু, তিনি আবৃত রহিয়াছেন—এ কথাটা যেন কি রকম অস্পষ্ট ও ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক দূরে বলিয়া বোধ হয়। লোকে তো আর সদা-সর্বদা ঐ ব্রহ্মের সন্ধান করিতে পারে না?'

'বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছি, আর আপনার প্রকৃত চৈতন্যের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছেন?'

'লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। এটি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইন গভর্ণমেণ্ট রাজনীতি—এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। ঐ-সকল ছাড়াইয়া উহাদের চরম লক্ষ্যস্থল এমন একটি আছে, যেখানে আইন আর প্রয়োজন হয় না। এখানে বলিয়া রাখি, সন্ন্যাসী শব্দটির অর্থ—বিধিনিয়মত্যাগী ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষী, কিম্বা 'সন্ন্যাসী' বলিতে নেতিবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীও বলিতে পারা যায়। তবে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল ধারণা আসিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ একই শিক্ষা দিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পবিত্রতা ও চরিত্রই শক্তি। আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশে লক্ষ্য আত্মার উচ্চতর বিকাশের দিকে—অবশ্য আপনি এ-কথা বিস্মৃত হন নাই বোধ হয় যে, আত্মা দুই প্রকারঃ কূটস্থ চৈতন্য, যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ; আর আভাস চৈতন্য, আপাততঃ যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।'

'তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই-সব সম্প্রদায়, যাহা আমরা—ইংরেজেরা—এত ভালবাসি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সম্প্রদায় সহস্র সহস্র, কিন্তু সার জিনিষ খুব অল্প।'

'মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্য নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে উহা স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে যাইতে থাকে। আরও দেখুন, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ধারণা মানুষে কিরূপে লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উহা সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে আবির্ভূত হয়, তখন উহাতে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ—'অপরকে বাদ দেওয়া' ভাব থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতর ভাবে—সূক্ষ্মতর ভাবে পৌঁছিয়া থাকি।'

'ইংলণ্ডে আপনার কার্যের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি?'

'ধীরে ধীরে হইতেছে, ইহার কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি। যেখানে মূল ধরিয়া কার্য, সেখানে প্রকৃত উন্নত বা বিস্তার অবশ্যই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। অবশ্য বলা বাহুল্য, যে-কোন উপায়েই হউক, এই-সব ভাব বিস্তৃত হইবেই হইবে, এবং আমাদের

অনেকের বোধ হইতেছে, ঐ-সকল ভাব-প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

'ঐ-সব সম্প্রদায় যে লোপ পাইবে, সে-সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য উহাদের মুখ্য বা সার ভাবটি থাকিয়া যাইবে এবং উহার সাহায্যে অপর নূতন গৃহ নির্মিত হইবে। অবশ্য সেই প্রাচীন উক্তি আপনার জানা আছে যে, একটা চার্চ বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু আমরণ উহার গণ্ডীর ভিতরে বদ্ধ থাকা ভাল নয়।'

ভারত ও ইংলণ্ড

['ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৮৯৬]

লণ্ডনের ইহা মরসুমের সময়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মত ও দর্শনে আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাময়িক বাসস্থান দক্ষিণ বেলগ্রেভিয়াতে গেলাম। ভারতের আবার ইংলণ্ডকে বলিবার কি আছে, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল।

স্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন—ভারতের পক্ষে এখানে ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম নবীন তেজে উঠিতেছিল—যখন ভারতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিগুলিকে তাহার কিছু শিখাইবার ছিল, তখন সম্রাট অশোক চারিদিকে ধর্মপ্রচারক পাঠাইলেন।

'আচ্ছা, এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কেন ভারত ঐরূপে ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিল, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিল?'

'বন্ধ করিবার কারণ—ক্রমশঃ স্বার্থপর হইয়া ভারত এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল যে, আদানপ্রাদান-প্রণালীক্রমেই ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েই জীবিত থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন জগতে একই বার্তা বহন করিয়াছে; ভারতের বার্তা আধ্যাত্মিক। অনন্ত যুগ ধরিয়া অন্তরের ভাবরাজ্যেই তাহার একচেটিয়া অধিকার; সূক্ষ্ম বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র—ইহাতেই ভারতের বিশেষ অধিকার। প্রকৃতপক্ষে আমার ইংলণ্ডে প্রচারকার্যে আগমন—ইংলণ্ডের ভারত-গমনেরই ফলস্বরূপ। ইংলণ্ড ভারতকে জয় করিয়া শাসন করিতেছে, তাহার পদার্থবিদ্যা নিজের ও আমাদের কাজে লাগাইতেছে। ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও কি দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়া আমার একটি সংস্কৃত ও একটি ইংরেজী বাক্য মনে পড়িতেছে।

কোন মানুষ মরিয়া গেলে আপনারা বলেন, সে আত্মা পরিত্যাগ করিল (He gave up the ghost); আর আমরা বলি, সে দেহত্যাগ করিল। আপনারা বলিয়া থাকেন, মানুষের আত্মা আছে, তাহা দ্বারা আপনারা যেন অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মানুষের প্রধান জিনিষ। কিন্তু আমরা বলি, মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার একটা দেহ আছে। এগুলি অবশ্য জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের উপরিভাগের ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র, কিন্তু ইহাই আপনাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

'আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাওয়ারের ভবিষ্যদ্বাণীটি স্মরণ করাইয়া দিই যে, অন্ধকার যুগের (Dark Ages) অবসানে গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে ইওরোপে যেরূপ গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দর্শন ইওরোপে সুপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন আসিবে। প্রাচ্যতত্ত্ব-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে। সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে নূতন ভাবস্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।

’

'তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাহার বিজেতাকে জয় করিবে?'

'হাঁ, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলণ্ডের হাতে তরবারি—সে এখন জড়জগতের প্রভু, যেমন ইংরেজের আগে আমাদের মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট আকবর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে—সুফীদের সঙ্গে—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।'

'তাহা হইলে আপনার মতে—দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের অদৃষ্টেও ঐরূপ হইবে? বর্তমান মুহূর্তে ঐ ভবিষ্যৎ কিন্তু অনেক দূরে বলিয়াই বোধ হয়।'

'না, আপনি যতদূর ভাবিতেছেন, ততদূর নয়। ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরেজের ভাব অনেক বিষয়ে সদৃশ। আর অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে হিন্দুর ঐক্য আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যদি কোন ইংরেজ শাসনকর্তার (Civil Servant) ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে, তবে দেখা যায়, উহাই তাঁহার হিন্দুর প্রতি

'সেটি কেবল দৈবঘটনা মাত্র—বিশ্বধর্ম-মহাসভা লণ্ডনে না বসিয়া চিকাগোয় বসিয়াছিল বলিয়াই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক লণ্ডনেই উহার

সহানুভূতির কারণ। ঐ সহানুভূতির ভাব দিন দিন বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সঙ্কীর্ণ—এমন কি, কখনও কখনও অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কেবল অজ্ঞানই যে তাহার কারণ, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হইবে না।’

‘হাঁ, ইহা অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। আপনি ইংলণ্ডে না আসিয়া যে আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্যে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন?’

অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশূরের রাজা এবং আর কয়েকজন বন্ধু আমাকে সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেখানে তিন বৎসর ছিলাম—কেবল গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি লণ্ডনে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিয়াছিলাম এবং এই গ্রীষ্মেও আসিয়াছি। মার্কিনেরা খুব বড় জাত—উহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহৃদয় বন্ধু পাইয়াছি। ইংরেজদের অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প, তাহারা সকল নূতন ভাবকেই ওজন করিয়া দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত—নূতনত্ব সত্ত্বেও উহার আদর করিতে প্রস্তুত। তাহারা খুব অতিথিপরায়ণ। লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। আমার মত আপনিও আমেরিকার শহরে শহরে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন—সর্বত্রই বন্ধু জুটিবে। আমি বষ্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিস এবং অন্যান্য অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।

’

‘আর প্রত্যেক জায়গায় শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন?’

‘হাঁ, শিষ্য করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা আমার কাজের অন্তর্গত নহে। সমাজ বা সমিতি তো যথেষ্টই অছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় করিলে উহা পরিচালনার জন্য আবার লোক দরকার—সম্প্রদায় গঠিত হইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বির প্রয়োজন। অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভুত্বের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, কখনও কখনও অপরের সহিত লড়াই পর্যন্ত করিয়া থাকে।’

‘তবে কি আপনার ধর্মপ্রচারকার্যের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তাহারই প্রচার করিতে চাহেন?’

‘আমি প্রচার করিতে চাই—ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির যাহা সার, তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্মেরই একটা মুখ্য ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ঐ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহাই সকল ধর্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, উহাই সকল ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্মের অন্তরালে ঐ একত্ব রহিয়াছে—আমরা উহাকে গড্, আল্লা, যিহোবা, আত্মা, প্রেম—যে কোন নাম দিতে পারি। সেই এক সত্তাই সকল প্রাণীর প্রাণরূপে বিরাজিত—প্রাণিজগতের অতি নিকৃষ্ট বিকাশ হইতে সর্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্যন্ত সর্বত্র। আমরা ঐ একত্বের দিকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে—শুধু পাশ্চাত্যে কেন, সর্বত্রই লোকে গৌণবিষয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়া থাকে। লোকে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি লইয়া অপরকে ঠিক নিজের মত কাজ করাইবার জন্যই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পর্যন্ত করে। ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতিই যখন জীবনের সার বস্তু, তখন এইসকল বাদ-বিসংবাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দেশ না করিলেও আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হয়।’

‘আমার বোধ হয়, হিন্দু কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে পারে না।’

‘এ পর্যন্ত কখনও করে নাই। জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।’

‘কিন্তু কতক ইংরেজ—আর তাঁহারা

ভারতের প্রতি কম সহানুভূতিসম্পন্ন নন, কিম্বা উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন—জাতিভেদকে মুখ্যতঃ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন।’

‘আপনি কি ভারতের জাতীয় মহাসমিতি আন্দোলনের (Indian National Congress Movement) দিকে কখনও মনোযোগ দিয়াছেন?’

‘আমি যে ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার কার্যক্ষেত্র অন্য বিভাগে। কিন্তু আমি ঐ আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং অন্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি। ভারতের বিভিন্ন জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত হইতেছে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতি ইওরোপের বিভিন্ন জাতি অপেক্ষা কম বিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের বিভিন্ন জাতি ভারতীয় বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, আর এই ভারতীয় বাণিজ্য জগতের সভ্যতা-বিস্তারের একটি প্রবল শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। এই ভারতীয় বাণিজ্যাধিকার-লাভ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে একরূপ ভাগ্যচক্র-পরিবর্তনকারী ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ ক্রমান্বয়ে উহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। ভিনিসবাসীরা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য-বিস্তারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুদূর পাশ্চাত্যে ঐ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার আবিষ্কার হইল, ইহাও বলা যাইতে পারে।’

‘ইহার পরিণতি কোথায়?’

‘ইংলণ্ডে এই অদ্বৈত মতবাদ কিরূপে প্রসার লাভ করিতেছে? এখানে তো সহস্র সহস্র সম্প্রদায়।’

স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে ঐগুলি লোপ পাইবে। উহারা গৌণবিষয় অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য স্বভাবতই চিরকাল থাকিতে পারে না। ঐ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ধারণানুযায়ী সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। এখন ঐ-সকল বিভিন্ন ব্যক্তি-সমষ্টির মধ্যে যে ভেদরূপ প্রাচীর—ব্যবধান আছে, সেগুলি ভাঙিয়া দিয়া ক্রমে আমরা সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পৌঁছিতে পারি। ইংলণ্ডে এই কাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলণ্ডও ভারতে ঐ কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি আপনার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।’

‘সত্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন না। দেহের অন্তরালে যে চিন্তা রহিয়াছে, তাহা দ্বারাই এই শরীর গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র জাতিটি জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর ভারতে উহা সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তার বিকাশ-স্বরূপ। সুতরাং ভারতকে ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্য চেষ্টা করাও নির্বোধের কাজ। ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান বিদ্যমান ছিল; যখনই শান্তিপূর্ণ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্যই জাতিভেদের বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে, উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই তাঁহারা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতিবিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাঙিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগকেই চিরকাল এ কাজ করিতে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে; যে-কোন বৈদেশিক ভাব ঐ কাজে সাহায্য করে, তাহা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখনও আমাদের হইয়া ঐ কাজ করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড কেবল ভারতকে তাহার নিজ উদ্ধার-সাধনে সাহায্য করিতে পারে—এই পর্যন্ত! আমার মতে যে-জাতি ভারতের গলা টিপিয়া রাখিয়াছে, তাহার নির্দেশে যে-উন্নতি হইবে, তাহার কোন মূল্য নাই। ক্রীতদাসেরা অতি উচ্চ কার্য করিলেও তাহা ক্রীতদাসেরই কার্য থাকিয়া যাইবে।

‘অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে ভারতের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন—বিশেষতঃ স্বাধীন ব্যক্তিগণের সমান অধিকার লাভ। জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না, উহা উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে, পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ভারতীয় সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে, উহাকে জাগাইতে হইবে।

’

‘প্রবল যুদ্ধকুশল জাতি না হইয়া কি কেহ কখনও বড় হইয়াছে?’ স্বামীজী মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ‘হাঁ, চীন হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানে ভ্রমণ করিয়াছি। আজ চীন একটা ছত্রভঙ্গ দলের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু উন্নতির দিনে উহার যেমন সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, আর কোন জাতির এ পর্যন্ত সেরূপ হয় নাই। অনেক বিষয়—যেগুলিকে আমরা আজকাল ‘আধুনিক’ বলিয়া থাকি, চীনে শত শত—এমন কি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সেগুলি প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার কথা ধরুন।’

‘চীন এমন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল কেন?’

‘কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মানুষ তৈয়ার করিতে পারিল না। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে যে, পার্লামেন্টের আইনবলে মানুষকে ধার্মিক করিতে পারা যায় না। চীনারা আপনাদের পূর্বেই ঐ কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছিল। ঐ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের আবশ্যকতা গভীরতর। কারণ ধর্ম ব্যবহারিক জীবনের মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করে।’

‘আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি সে-বিষয়ে সচেতন?’

‘সম্পূর্ণ সচেতন। সকলে সম্ভবতঃ কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রে এই জাগরণ বেশীর ভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে কাজ চলিলেও ধর্মবিষয়ে ঐ জাগরণ বাস্তবিকই হইয়াছে।’

স্বামীজী সম্মুখের সংবাদপত্রটি লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ হইতে উদ্ধৃতাংশসমূহে একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, ‘কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সহানুভূতি স্বভাবতই আমার দেশের সহিত হইবে। তথাপি ইহাতে আমার একটি সংস্কৃত প্রবাদ মনে পড়িতেছেঃ হাতী বেচিয়া এখন আর অঙ্কুশের জন্য বিবাদ কেন? ভারতই চিরকাল দিয়াই আসিতেছে। রাজনীতিকদের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে এখনও অনেক যুগ লাগিবে।’

‘পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ এতদূর বিভিন্ন। আমাদের আদর্শ—সামাজিক অবস্থার পূর্ণতা-সাধন বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এখন এই-সকল বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, আর প্রাচ্যবাসিগণ সেই সময়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ধ্যানে নিযুক্ত। সুদান-যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার কোথা হইতে নির্বাহ হইবে, এই বিষয়ের বিচারেই এখানে পার্লামেণ্ট ব্যস্ত। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্র সংবাদপত্র-মাত্রেই সরকারের অন্যায় মীমাংসার বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আপনি হয়তো ভাবিতেছেন, ও-বিষয়টা একেবারে মনোযোগেরই যোগ্য নয়।’

‘তাহা হইলেও উহার জন্য অতি শীঘ্র চেষ্টা করা তো আবশ্যক?’

‘হাঁ, জগতের মধ্যে বৃহত্তম শাসনযন্ত্র সুমহান্ লণ্ডনের হৃদয়ের কোন ভাববীজ রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে। আমি অনেক সময় ইহার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি—কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি সূক্ষ্মতম শিরায় পর্যন্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাববিস্তার—চারিদিকে শক্তিসঞ্চালনপ্রণালী কি অদ্ভুত! ইহা দেখিলে সমগ্র সাম্রাজ্যটি কত বৃহৎ ও উহার কার্য কত গুরুতর, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয়। অন্যান্য বিষয়-বিস্তারের সহিত উহার ভাবও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্ যন্ত্রের কেন্দ্রে কতকগুলি ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে অতি দূরবর্তী দেশে পর্যন্ত ঐগুলি সঞ্চারিত হইতে পারে।’

ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক

[লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ‘একো নামক সংবাদপত্র, ১৮৯৬]

* * *

... বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীজী গাছতলায়, বড়জোর কোন মন্দিরের সন্নিকটে থাকিতেন, নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত থাকিত। কিন্তু লণ্ডনে তিনি ও-সব কিছুই করেন না। সুতরাং আমি যখন স্বামীজীর সহিত দেখা করিলাম, দেখিলাম—তিনি অপরাপর লোকের মতই বাস করিতেছেন। পোষাকও অন্যান্য লোকেরই মত—তফাত কেবল এই যে, তিনি গেরুয়া রঙের একটি লম্বা জামা পরেন।

আমি প্রথমেই ঐ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান করিতে বলিলাম।

‘আপনি কি মনে করেন, আজকাল লোকের অসার ও গৌণ বিষয়েই দৃষ্টি বেশি?’

‘আমার তো তাই মনে হয়—অনুন্নত জাতিদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য দেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাদের মধ্যেও এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্য ভাব। বাস্তবিক তাই বটে। ধনী লোকেরা হয় ঐশ্বর্যভোগে মগ্ন, অথবা আরও অধিক ধন-সঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। তারা এবং সংসারকর্মে ব্যস্ত অনেক লোকে ধর্মটাকে একটা অনর্থক বাজে জিনিষ মনে করে, আর সরল ভাবেই এ-কথা মনে করে থাকে। প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে—দেশহিতৈষিতা আর লোকাচার। লোকে বিবাহের সময় বা কাকেও কবর দেবার সময়েই কেবল চার্চে যায়।’

‘আপনি যা প্রচার করছেন, তার ফলে কি লোকের চার্চে গতিবিধি বাড়বে?‘

‘আমার তো তা বোধ হয় না। কারণ বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতবাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই যে মানবজীবনের সর্বস্ব এবং সব কিছুর ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখান আমার জীবনব্রত। ... আর এখানে ইংলণ্ডে কি ভাব চলছে? ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোশ্যালিজম্ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম

যাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত
হবে। লোকে অবশ্য তাদের
সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির
আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা
চাইবে—যাতে তাদের কাজ
পূর্বাপেক্ষা কমে যায়, যাতে তারা
ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও
যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু
যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন
সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের
সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় জানবেন যে, ধর্ম সকল বিষয়ের মূল পর্যন্ত গিয়ে থাকে। যদি ঐটি ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক।'

'কিন্তু ধর্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। লোকে সচরাচর যে-সকল চিন্তা করে এবং যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার সঙ্গে তো এর অনেক ব্যবধান।'

'সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুদ্রতর সত্যকে আশ্রয় করে থাকে, পরে তা থেকেই বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; সুতরাং অসত্য ছেড়ে সত্যলাভ হল, এটি বলা ঠিক নয়। সৃষ্টির অন্তরালে এক বস্তু বিরাজমান, কিন্তু লোকের মন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য বস্তু একটিই, জ্ঞানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা করে থাকেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সঙ্কীর্ণতর সত্য থেকে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হয়ে থাকে; সুতরাং অপরিণত বা নিম্নতর ধর্মসমূহও মিথ্যা নয়, সত্য; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অনুভূতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই মাত্র। লোকের জ্ঞানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। এমন কি, ভূতোপাসনা পর্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্মেরই বিকৃত উপাসনা মাত্র। ধর্মের অন্যান্য যে-সব রূপ আছে, তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর সত্য বর্তমান; সত্য কোন ধর্মেই পূর্ণরূপে নেই।'

'আপনি ইংলণ্ডে যে ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তা আপনারই উদ্ভাবিত কিনা, এ- কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'এ ধর্ম আমার উদ্ভাবিত কখনই নয়। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদের দেশের অনেক মহাত্মার মত তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় পবিত্রাত্মা ছিলেন এবং তাঁহার জীবন ও উপদেশ বেদান্তদর্শনের ভাবে বিশেষরূপে অনুরঞ্জিত ছিল। বেদান্তদর্শন বললাম—কিন্তু এটিকে ধর্মও বলতে পারা যায়, কারণ প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত 'ধর্ম' ও 'দর্শন' দুই-ই। সম্প্রতি 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি' পত্রের একটি সংখ্যায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার আমার আচার্যদেবের যে বিবরণ লিখেছেন, তা অনুগ্রহপূর্বক পড়ে দেখবেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শরীর ও মনের সংযম অভ্যাস করে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাঁর মুখভাব সাধারণ মানুষের মত ছিল না—তাঁর মুখে বালকের মত কমনীয়তা, গভীর নম্রতা এবং অদ্ভুত প্রশান্ত ও মধুর ভাব দেখা যেত। তাঁর মুখ দেখে বিচলিত না হয়ে কেউ থাকতে পারত না।'

'তবে আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত?'

'হাঁ, বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীয় অংশ। উহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীন ভাগে যে-সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখতে পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই এখানে সুপরিণত হয়েছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম 'সংহিতা'। এগুলি অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃতে রচিত। যাস্কের 'নিরুক্ত' নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহায্যেই কেবল এগুলি বোঝা যেতে পারে।'

* * *

'আমাদের—ইংরেজদের বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে ইংরেজরা যে কিছু শিখতে পারে, এ-সম্বন্ধে সাধারণ লোক একরূপ অজ্ঞ বললেও হয়।'

'তা সত্য বটে। কিন্তু পণ্ডিতেরা ভালভাবেই জানেন, ভারত থেকে কতদূর শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে, আর ঐ শিক্ষা কতদূরই বা প্রয়োজনীয়। আপনি দেখবেন—ম্যাক্সমূলার, মোনিয়ার উইলিয়ামস্, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বা জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভারতীয় সূক্ষ্মবিজ্ঞান (abstract science)-কে অবজ্ঞা করেন না।'

স্বামীজীর সহিত মাদুরায় একঘণ্টা

['হিন্দু', মান্দ্রাজ; ফেব্রুআরী, ১৮৯৭]

প্রশ্ন॥ আমার যতদূর জানা আছে, 'জগৎ মিথ্যা'—এই মতবাদ এই কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেঃ

(১) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থায়িত্ব এত অল্প যে, তাহা বলিবার নয়। (২) দুইটি প্রলয়ের অন্তর্গত কাল অনন্তের তুলনায় ঐরূপ। (৩) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাবস্থায় সত্য, আর ঐ জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ বর্তমানে এই জগতেরও একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যতা আছে, উহারও সত্যতা-জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ (চরমে বা পরিণামে) মিথ্যা। (৪) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গ যেমন মিথ্যা, জগৎও তেমনি একটা মিথ্যা ছায়ামাত্র।

এই কয়েকটি ভাবের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে 'জগৎ মিথ্যা' এই মতটি কোন্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে?

উত্তর॥ অদ্বৈতবাদীদের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে—প্রত্যেকেই কিন্তু ঐগুলির মধ্যে কোন-না-কোন একটি ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। শঙ্কর তৃতীয় ভাবানুযায়ী শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—এই জগৎ আমাদের নিকট যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সবই বর্তমান জ্ঞানের পক্ষে ব্যবহারিক ভাবে সত্য; কিন্তু যখনই মানবের জ্ঞান উচ্চ আকার ধারণ করে, তখনই উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়; সম্মুখে একটা স্থাণু দেখিয়া আপনার ভূত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। সেই সময়ের জন্য সেই ভূতের জ্ঞানটি সত্য; কারণ, যথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কাজ করিত, যে-ফল উৎপন্ন করিত, ইহাতেও ঠিক সেই ফল হইতেছে। যখনই আপনি বুঝিবেন—উহা স্থাণুমাত্র, তখনই আপনার ভূত-জ্ঞান চলিয়া যাইবে। স্থানু ও ভূত—উভয় জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না। একটি যখন বর্তমান, অপরটি তখন থাকে না।

প্র॥ শঙ্করের কতকগুলি গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিও কি গৃহীত হয় নাই?

উ॥ না। কোন কোন ব্যক্তি শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা'—এই উপদেশটির মর্ম ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া উহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাব দুটি, কয়েক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু শঙ্কর ঐগুলি কখনও অনুমোদন করেন নাই।

প্র॥ এই আপাতপ্রতীয়মান সভ্যতার কারণ কি?

উ॥ স্থাণুতে ভূত-ভ্রান্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই একরূপ রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে।

প্র॥ 'বেদ অনাদি অনন্ত'—এ-কথার বাস্তবিক তাৎপর্য কি? উহা কি বৈদিক মন্ত্ররাজির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে? যদি বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই 'বেদ অনাদি অনন্ত' বলা হইয়া থাকে, তবে ন্যায় জ্যামিতি রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও অনাদি অনন্ত; কারণ তাহাদের মধ্যেও তো সনাতন সত্য রহিয়াছে?

উ॥ এমন এক সময় ছিল, যখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ অপরিণামী ও সনাতন, মানবের নিকট কেবল অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র—এইভাবে বেদসমূহ অনাদি অনন্ত বিবেচিত হইত। পরবর্তী কালে বোধ হয় যেন অর্থজ্ঞানের সহিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করিল এবং ঐ মন্ত্রগুলিকেই ঈশ্বরপ্রসূত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও পরবর্তী কালে মন্ত্রগুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কখনও ঈশ্বরপ্রসূত হইতে পারে না; কারণ ঐগুলি মানবজাতিকে—প্রাণিগণকে—যন্ত্রণাদান প্রভৃতি নানাবিধ পাপজনক কার্যের বিধান দিয়াছে, উহাদের মধ্যে অনেক 'আষাঢ়ে গল্প'ও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 'অনাদি অনন্ত'—এ-কথার

যথার্থ তাৎপর্য এই যে, উহা দ্বারা মানবজাতির নিকট যে বিধি বা সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিত্য ও অপরিণামী। ন্যায়, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণামী নিয়ম বা সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনন্ত। কিন্তু এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহা বেদে নাই; আর আমি আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি—উহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সত্য আছে, দেখাইয়া দিন।

প্র॥ অদ্বৈতবাদীদের মুক্তির ধারণা কিরূপ? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই—তাঁহাদের মতে কি ঐ অবস্থার জ্ঞান থাকে? অদ্বৈতবাদীদের মুক্তি ও বৌদ্ধনির্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি?

উ॥ মুক্তিতে একপ্রকার জ্ঞান থাকে, উহাকে আমরা 'তুরীয় জ্ঞান' বা অতিচেতন অবস্থা বলিয়া থাকি। উহার সহিত আপনাদের বর্তমান জ্ঞানের প্রভেদ আছে। মুক্তি-অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। আলোকের মত জ্ঞানেরও তিন অবস্থা—মৃদু জ্ঞান, মধ্যবিধ জ্ঞান ও চরম জ্ঞান। যখন আলোকের স্পন্দন অতি প্রবল হয়, তখন উহার ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হয় যে, উহা চক্ষুকে ধাঁধিয়া দেয়, আর অতি ক্ষীণতম আলোকে যেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাতেও সেইরূপ কিছুই দেখা যায় না। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। বৌদ্ধেরা যাহাই বলুন না কেন, নির্বাণেও ঐ-প্রকার জ্ঞান বিদ্যমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্তিভাবাত্মক, বৌদ্ধ নির্বাণের সংজ্ঞা নাস্তিভাবদ্যোতক।

প্র॥ তুরীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্য অবস্থাবিশেষ আশ্রয় করেন কেন?

উ॥ এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌-মনসোগোচরম্,' অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না। যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকে মানব-মনের দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না; আর দেশ-কাল-নিমিত্তের অন্তর্গত রাজ্যেই যুক্তি ও অনুসন্ধানের অধিকার। তাই যদি হয়, তবে যে-বিষয়ে মানব-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সে-সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা বৃথা চেষ্টা মাত্র।

প্র॥ দেখা যায়—অনেকে বলেন, পুরাণগ্রন্থগুলির আপাত-প্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে গুহ্য অর্থ আছে। তাঁহারা বলেন, ঐ গুহ্য ভাবগুলি পুরাণে রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই—উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ বা মহাভারতের কথা ধরুন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তবিক কি ঐগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা কিছু আছে, অথবা উহারা কেবল দার্শনিক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার জন্য উচ্চতম আদর্শসমূহেরই দৃষ্টান্ত, কিম্বা উহারা মিল্টন হোমর প্রভৃতির কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্মক কাব্যমাত্র?

উ॥ কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণের কথা ধরুন—অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে, রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; সুতরাং ইঁহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নূতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তত্ত্ব তিনি শিখাইতে চান। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত টিকিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির শিক্ষা—আর যে-সকল ঋষি ঐ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া ইচ্ছামত যত কিছু ভাল বা মন্দ গুণ উহাদের উপর আরোপ করিতেন—এইরূপে তাঁহারা মানবজাতির পরিচালনার জন্য ধর্মের বিধান দিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব—একটা দশমাথাযুক্ত রাক্ষস অবশ্যই ছিল—মানিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাকুন, বা উহা কবিকল্পনাই হউক, ঐ চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আপনি এখন কৃষ্ণকে আরও মনোহরভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, আপনার বর্ণনা আদর্শের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবদ্ধ মহোচ্চ দার্শনিক সত্যসমূহ চিরকালই একরূপ।

প্র॥ যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধ (adept) হন, তবে কি তাঁহার পক্ষে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করা সম্ভব? পূর্বজন্মের স্থূল মস্তিষ্ক—যাহার মধ্যে তাঁহার পূর্বানুভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল—এখন তাহা আর নাই, এ-জন্মে তিনি একটি মস্তিষ্ক পাইয়াছেন। তাহাই যদি হইল, তবে বর্তমান মস্তিষ্কের পক্ষে অধুনা অবর্তমান অপর যন্ত্রের দ্বারা গৃহীত

সংবাদদাতা॥ যিনি নিজের 'গুহ্য' শক্তিসমূহের 'বিকাশ' করিয়াছেন।

প্র॥ অহিন্দুকে হিন্দুধর্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্মের মূলভাবের অবিরোধী,

আর চণ্ডাল যদি দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, ব্রাহ্মণ কি তাহা শুনিতে পারেন?

উ॥ অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করে না। যে-কোন ব্যক্তি—তিনি শূদ্রই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্রাহ্মণের নিকট পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও—তিনি যে-কোন জাতি হউন বা যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউন—সত্য শিক্ষা করা যাইতে পারে।

স্বামীজী তাঁহার এই মতের পক্ষে খুব প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। এই স্থানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল, কারণ তাঁহার মন্দিরদর্শনে যাইবার সময় হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দিরদর্শনে যাত্রা করিলেন।

সংস্কারসমূহকে গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

স্বামীজী॥ আপনি সিদ্ধ (adept) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন?

স্বামীজী॥ 'গুহ্য' শক্তি কিভাবে 'বিকাশ' প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা—যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোনরূপ অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র না থাকে। যেখানে যে-শব্দটি যথার্থ উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে পারেন, 'গুহ্য' বা 'অব্যক্ত' শক্তি 'ব্যক্ত' বা 'নিরাবরণ' হয়। যাঁহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতে পারেন। কারণ মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্ম শরীর থাকে, তাহাই তাঁহাদের বর্তমান মস্তিষ্কের বীজস্বরূপ।

ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা

[‘হিন্দু’, মান্দ্রাজ; ফেব্রুআরী, ১৮৯৭]

আমাদের জনৈক প্রতিনিধি চিঙলপুট ষ্টেশনে স্বামীজীর সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত মান্দ্রাজ পর্যন্ত আসেন। গাড়ীতে উভয়ের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিলঃ

‘স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন?’

‘বড় শক্ত কথা। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। এখন আমি এর আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরছিলুম—দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে; তখন অন্য অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা হল। আমি জাপানের দিক্ দিয়ে আমেরিকায় গেছলুম।’

‘আপনি জাপানে কি দেখলেন? জাপান উন্নতির যে-পথে চলেছে, ভারতের কি তা অনুসরণ করবার কোন সম্ভাবনা আছে—মনে করেন?’

‘কোন সম্ভাবনা নেই, যতদিন না ভারতের ত্রিশ কোটি লোক মিলে একটা জাতি হয়ে দাঁড়ায়। জাপানীর মত এমন স্বদেশহিতৈষী ও শিল্পপটু জাত আর দেখা যায় না; আর তাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইওরোপ ও অন্য স্থানে একদিকে যেমন শিল্পের বাহার, অপরদিকে আবার তেমনি অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য, তেমনি আবার তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার ইচ্ছে—আমাদের যুবকেরা জীবনে অন্ততঃ একবার জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। জাপানীরা হিন্দুদের সবই খুব ভাল বলে মনে করে, আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ বলে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম ঢের তফাত। জাপানের বৌদ্ধধর্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক্যবাদে দূষিত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম আস্তিক।’

‘জাপান হঠাৎ এ-রকম বড় হল কি করে? এর রহস্যটা কি?’

‘জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাদের স্বদেশের উপর ভালবাসা। যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিয়েই তো দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি? জাপানীরা সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়ে যেমন সাচ্চা, তোমাদেরও যখন তাই হবে, তোমরাও তখন জাপানীদের মত বড় হবে। জাপানীরা তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাইতেই তারা বড় হয়েছে। তোমরা যে কাম-কাঞ্চনের জন্য সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত!’

‘আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মত হোক?’

'তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকবে। ভারত কেমন করে জাপান বা অন্য জাতের মত হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা করে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক-একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয় উন্মুক্ত হলে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তখন ধর্মতরঙ্গ খেলতে থাকবে! ভারত ভারতই। আমরা জাপানীদের মত নই, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াতেই কেমন শান্তি এনে দেয়! আমি এখানে সর্বদা কাজ করছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ করছি। ভারতে ধর্মকার্য করলে শান্তি পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য করতে গেলে শেষে মৃত্যু হয়—বহুমূত্র হয়ে।'

'যাক জাপানের কথা। আচ্ছা, স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে কি দেখলেন?' গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভালই দেখেছিলুম। কেবল মিশনরী আর 'চার্চের মেয়েরা' (church-women) ছাড়া আমেরিকানরা সকলেই বড় অতিথিবৎসল সৎস্বভাব ও সহৃদয় ব্যক্তি।'

'চার্চের মেয়েরা কি, স্বামীজী?'

'মার্কিন মেয়ে যখন বে করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তখন সব রকম সমুদ্রতীরবর্তী স্নানের জায়গায় ঘুরতে থাকে, আর একটা পুরুষ পাকড়াবার জন্য যত রকম কৌশল করবার চেষ্টা করে। সব চেষ্টা করে যখন বিফল হয়, তখন সে চার্চে যোগ দেয়, তখন তাকে ওখানে 'ওল্ড মেড' বলে। তাদের মধ্যে অনেকে চার্চের বেজায় গোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। ... এদের বাদ দিলে, আমেরিকানরা বড় ভাল লোক। তারা আমায় ভালবাসত, আমিও তাদের খুব ভালবাসি। আমি যেন তাদেরই একজন, এই-রকম বোধ করতাম।'

'চিকাগো ধর্ম-মহাসভা হয়ে কি ফল দাঁড়াল, আপনার ধারণা?'

'আমার ধারণা, চিকাগো ধর্ম-মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অ-খ্রীষ্টান ধর্মগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়াল অ-খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য। সুতরাং খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। দেখ না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্ছে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা, যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে প্যারিসে ধর্ম-মহাসভা না হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে! ওতে বেদান্তের চিন্তাধারা বিস্তার হবার সুবিধে হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। অবশ্য আমেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে বিশেষ সুখী—কেবল গোঁড়া পুরোহিত আর 'চার্চের মেয়েরা' ছাড়া।'

'ইংলণ্ডে আপনার প্রচারকার্যের কিরূপ আশা দেখছেন, স্বামীজী?'

'খুব আশা আছে। দশ বৎসরও যেতে হবে না—অধিকাংশ ইংরেজই বেদান্তী হবে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী আশা। আমেরিকানরা তো দেখছ—সব বিষয়েই একটা হুজুক করে তোলে। ইংরেজরা হুজুগে নয়। বেদান্ত না বুঝলে খ্রীষ্টানেরা তাদের নিউ টেষ্টামেণ্টও বুঝতে পারে না। বেদান্ত সব ধর্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। বেদান্তকে ছাড়লে সব ধর্মই কুসংস্কার। বেদান্তকে ধরলে সবই ধর্ম হয়ে দাঁড়াবে।'

'আপনি ইংরেজ-চরিত্রে বিশেষ কি গুণ দেখলেন?'

'ইংরেজরা কোন বিষয়ে বিশ্বাস করলেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে যায়। ওদের কাজের শক্তি অসাধারণ। ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার চেয়ে উন্নততর নরনারী সারা পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই তাদের উপর আমার বেশী বিশ্বাস। অবশ্য প্রথমে তাদের মাথায় কিছু ঢোকান বড় কঠিন; অনেক চেষ্টাচরিত্র করে উঠে পড়ে লেগে থাকলে তবে তাদের মাথায় একটা ভাব ঢোকে, কিন্তু একবার দিতে পারলে আর সহজে সেটি বেরোয় না। ইংলণ্ডে কোন মিশনরী বা অন্য কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি—একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেষ্টা করেনি। আমি দেখে আশ্চর্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই 'চার্চ অব্ ইংলণ্ডে'র অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনেছি যে-সব মিশনরী এ দেশে আসে, তারা ইংলণ্ডের খুব নিম্নশ্রেণীভুক্ত। কোন ভদ্র ইংরেজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মত ইংলণ্ডেও জাতের খুব কড়াকড়ি। আর 'চার্চে'র সদস্য ইংরেজরা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। আপনার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্যে আমি আমার স্বদেশবাসীকে এই একটি পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনরীরা কি, তা তো এখন জেনেছি; এখন এই কর্তব্য যে, এই গালাগালবাজ মিশনরীদের মোটেই আমল না দেওয়া। আমরাই তো ওদের আস্কারা দিয়েছি। এখন ওদের মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই কর্তব্য।'

‘স্বামীজী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলন কি রকম, অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?’

‘সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছে—আর সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নূতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হলে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।’

‘ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?’

‘আমরা ভয়ানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড়ই অজ্ঞ, কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ এখানে দারিদ্র্য একটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। এরা দুর্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোষাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্তু ভারতে কারও অসাধারণ পোষাকের দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এ-রকম কথা তো কখনও শুনিনি। অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ ইওরোপের জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।’

‘ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করা ভাল বলেন?’

‘তাঁদের লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-প্রণালী দেখিয়ে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান করে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্মের ভিতর দিয়ে শেখাতে হবে।’

‘কিন্তু স্বামীজী, আপনি কি মনে করেন, এ কাজ সহজে হতে পারে?’

‘অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত করতে হবে। কিন্তু যদি আমি অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, তা হলে কালই এটা হতে পারে। কেবল এই কাজে যে পরিমাণে উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ করা হবে, তারই উপর নির্ভর করছে—এ কাজ তাড়াতাড়ি হবে বা দেরীতে হবে।’

‘কিন্তু যদি বর্তমান হীনাবস্থা তাদের অতীত কর্মের ফল হইয়া থাকে, তবে আপনার বিবেচনায় কিভাবে সহজে এটি ঘুচবে আর আপনি কেমন করেই বা তাদের সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন?’

স্বামীজী মুহূর্তমাত্র চিন্তার অবসর না লইয়াই উত্তর দিলেন, ‘কর্মবাদই অনন্তকাল মানবের স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। কর্মের দ্বারা নিজেদের হীন অবস্থায় এনেছি—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধনও নিশ্চয়ই করতে পারি। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্মের দ্বারাই এই হীনাবস্থা এনেছে, তা নয়। সুতরাং তাদের উন্নতি করবার আরও সুবিধা দিতে হবে। আমি সব জাতকে একাকার করতে বলি না। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করতে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়ে ‘জাতির অতীত’ অবস্থায় গিয়ে থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের

ইতিহাস পড়, তবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্যপ্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের করতে হবে, কারণ প্রত্যেক অভিজাত সম্প্রদায়েরই কর্তব্য নিজেদের মূলোচ্ছেদ করা। আর যত শীগগীর তাঁরা এটি করেন, ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়, বিন্দুমাত্র কালপেক্ষ করা উচিত নয়। ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে, এর সবটাই ভাল। যদি জাতিবিভাগ না থাকত তবে তোমরা থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাকলে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিষ কোথায় থাকত? জাতিবিভাগ না থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জন্যে এ-সব শাস্ত্রাদি কোথায় থাকত? মুসলমানরা তো সবই নষ্ট করে ফেলত। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল। কখনও কখনও, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত। আমি আমার স্বদেশীদের এই কথাই বলি। আমি তাদের গাল দিই না। আমি অতীতের দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা বিবেচনা করলে কোন জাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, তোমরা বেশ করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর।'

'জাতিবিভাগের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ-বিষয়ে আপনার কি মত, স্বামীজী?'

'জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত বদলাচ্ছে! কেবল মূল তত্ত্ব বদলাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম কি, জানতে গেলে বেদ পড়তে হবে। বেদ ছাড়া আর সব শাস্ত্রই যুগভেদে বদলে যাবে। বেদের শাসন নিত্য। অন্যান্য শাস্ত্রের শাসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। যেমন কোন 'স্মৃতি' এক যুগের জন্য, আর একটি 'স্মৃতি' আর এক যুগের জন্য। বড় বড় মহাপুরুষ অবতারেরা সর্বদাই আসছেন, আর কিভাবে কাজ করতে হবে, দেখিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন মহাপুরুষ নিম্নজাতির উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন। কেউ কেউ— যেমন মধ্বাচার্য—নারীদের বেদ পড়বার অধিকার দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে একে নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর এমন প্রাণশক্তি আছে, যাতে দু-লক্ষ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হতে পারে। জাতিবিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। পুরাতনেরই নব বিবর্তন বা বিকাশ—এই হল নূতন কার্যপ্রণালী।'

'হিন্দুদের কি সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই?'

'খুব আছে। প্রাচীনকালে মহাপুরুষেরা উন্নতির নূতন নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন করে সেগুলি চালিয়ে দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই-রকম করেই সমাজের উন্নতি হত। বর্তমান কালে এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে গেলে এমন একটি শক্তি চাই, যার কথা লোকে নেবে। এখন হিন্দু রাজা নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কোন সংস্কারের সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্পই পাওয়া যায়, এর চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কিছু হতে পারে না। এইজন্য কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে—যা কখনও কার্যে পরিণত হবে না, তাতে বৃথা শক্তিক্ষয় না করে আমাদের উচিত একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা—এমন একদল লোক তৈরী করা, যারা নিজেদের আইন নিজেরাই করবে। অর্থাৎ এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে—তাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেবে। তা না হলে এ-সব সংস্কার আকাশকুসুমই থেকে যায়। নূতন প্রণালী হল নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতি-সাধন। এটি কাজে পরিণত করতে সময় লাগবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে; কারণ প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই রাজার অব্যাহত শাসন ছিল।'

'আপনি কি মনে করেন, হিন্দুসমাজ ইওরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ করে কৃতকার্য হতে পারে?

'

'না সম্পূর্ণরূপে নয়। আমি বলি যে, গ্রীক মন—যা ইওরোপীয় জাতির বহির্মুখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে—তার সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হলে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মিছামিছি শক্তিক্ষয়, আর দিনরাত কতকগুলো বাজে কাল্পনিক বিষয়ে বাক্যব্যয় না করে ইংরেজদের কাছ থেকে—আজ্ঞামাত্র নেতার আদেশ-পালন, ঈর্ষাহীনতা, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। কাকেও নেতা বলে স্বীকার করলে একজন ইংরেজ তাকে সব অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তালিম করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নেই; হিন্দুর পদমর্যাদা যত বাড়ে,

ঈর্ষাও তত বাড়ে। যতদিন না এই ঈর্ষা দ্বেষ দূর হয় এবং নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শেখে, ততদিন একটা সমাজ-সংহতি হতেই পারে না, ততদিন আমরা এই-রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, কিছুই করতে পারব না। ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে—অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তা হলে আর হিন্দু বা ইওরোপীয় বলে কিছু থাকবে না; উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করেছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।'

'স্বামীজী, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ?'

'ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে ধর্মের 'কিণ্ডারগার্টেন' বিদ্যালয়। জগতের এখন যে অবস্থা, তাতে ওটি এখনও পুরোপুরি আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত—এই কাজের ভার লওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি উঠিয়ে দিতে হবে, নূতন নূতন আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হবে।'

'তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন না, দেখছি।'

'না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড করতে হবে। সব বিষয়েরই অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে—এই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পেছনে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দুজাতির ইতিহাসে বরাবর—কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনেরই চেষ্টা হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিনাশের চেষ্টা করেন, তার ফলে ভারত থেকে বহির্ভূত হলেন—তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্বদা গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন, সেই হল আমাদের কার্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন—এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দুজাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে চলেছে। সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার প্রাণপণ চেষ্টাই—ভারতীয় জীবনের সমগ্র ইতিহাস। যখনই এমন কোন সংস্কারক সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে মুছে গেছে।'

'আপনার এখানকার কার্যপ্রণালী কিরূপ?'

'আমি আমার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাই—একটি মান্দ্রাজে, আর একটি কলিকাতায়। আর আমার সঙ্কল্প সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হয় যে, বেদান্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা—তা তিনি সাধুই হন, অসাধুই হন, জ্ঞানীই হন বা অজ্ঞানই হন, ব্রাহ্মণই হন আর চণ্ডালই হন।'

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেন মান্দ্রাজের এগমোর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে লাগল। এইটুকু মাত্র স্বামীজীর মুখ থেকে শোনা গেল, ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্যাগুলিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ানর তিনি ঘোর বিরোধী।

পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার

[‘মান্দ্রাজ টাইমস্’, ফেব্রুআরী,
১৮৯৭]

গত শনিবার আমাদের পত্রের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্মপ্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্য স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সাঙ্কেতিক-লেখনবিৎ মিঃ গুডউইন মহাপুরুষের সহিত আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি তখন একখানি সোফায় বসিয়া সাধারণ লোকের মত জলযোগ করিতেছিলেন। স্বামীজী আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্ববর্তী একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। স্বামীজী গৈরিকবসন-পরিহিত, তাঁহার আকৃতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন যে-কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রতিনিধি সাঙ্কেতিক-লিপি স্বারা স্বামীজীর কথাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘স্বামীজী, আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি কি?’

স্বামীজী বলিলেন (তাঁহার উচ্চারণে একটু বাঙালী ধাঁচ পাওয়া যায়)—কলিকাতায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল হইতে আমার প্রকৃতি ধর্মপ্রবণ ছিল। তখনই সকল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া লওয়া আমার স্বভাব ছিল—শুধু কথায় আমার তৃপ্তি হইত না। কিছুকাল পরেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহার নিকটেই আমি ধর্ম শিক্ষা করি। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে আমি মান্দ্রাজ আসি, এবং মহীশূরের স্বর্গীয় রাজা এবং রামনাদের রাজার নিকট সাহায্য লাভ করি।

‘আপনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গেলেন কেন?’

‘আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ—অপরাপর জাতির সহিত না মেশা। উহাই অবনতির একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখনও পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা কূপমণ্ডুক হইয়া গিয়াছিলাম।’

‘আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন?’

‘আমি ইওরোপের অনেক স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি—জার্মানী এবং ফ্রান্সেও গিয়াছি, তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই ছিল আমার প্রধান কার্যক্ষেত্র। প্রথমটা আমি মুশকিলে পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা সে-সব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক জাতি। সেজন্য হিন্দুর সহিত অন্য কোন জাতিরই ঐ বিষয়ে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণের নিকট হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য প্রথম প্রথম অনেকে আমার ভয়ানক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা গল্পও রচনা করিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমি জুয়াচোর, আমার এক-আধটি নয়—অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিন্তু ঐ-সকল ধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, ততই তাহারা ধর্মের নামে যে কতদূর অধর্ম করিতে পারে, সে-বিষয়ে আমার চোখ খুলিয়া গেল। ইংলণ্ডে ঐরূপ মিশনরী-উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। উহাদের কেহই সেখানে আমার সঙ্গে লড়াই করিতে আসে নাই। আমেরিকায় কেহ কেহ আমার নামে গোপনে নিন্দা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু লোকে তাহাদের কথা শুনিতে চাহে নাই; কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছি। যখন পুনরায় ইংলণ্ডে আসিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, জনৈক মিশনরী সেখানেও আমার বিরুদ্ধে লাগিবে, কিন্তু ‘ট্রুথ’ পত্রিকা তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। ইংলণ্ডের সমাজবন্ধন ভারতের জাতিবিভাগ অপেক্ষাও কঠোরতর। ইংলিশ চার্চের সদস্যেরা সকলেই ভদ্রবংশজাত—মিশনরীদের

অধিকাংশই কিন্তু তাহা নহে। চার্চের সদস্যেরা আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় ত্রিশ জন ইংলিশ চার্চের প্রচারক ধর্মবিষয়ক নানা বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দেখিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রচারক বা পুরোহিতেরা ঐ-সকল বিষয়ে আমার সহিত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কখনও গোপনে আমার নিন্দাবাদ করেন নাই। ইহাতে আমার আনন্দ ও বিস্ময় উভয়ই হইয়াছিল। ইহাই জাতিবিভাগ ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষার গুণ।'

'আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন?'

'আমেরিকার অনেক লোক—ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী লোক—আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নজাতীয় মিশনরীগণের নিন্দা সেখানে আমার কাজের সহায়তাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌঁছিবার কালে আমার কাছে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না। ভারতের লোকে আমার কেবল যাইবার ভাড়াটা মাত্র দিয়াছিল। অতি অল্প দিনে তাহা খরচ হইয়া যায়, সেজন্য এখানে যেমন সেখানেও তেমনি সাধারণের উপর নির্ভর করিয়াই আমাকে বাস করিতে হইয়াছিল। মার্কিনেরা বড়ই অতিথিবৎসল। আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টান। অবশিষ্টের কোন ধর্ম নাই, অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট ধার্মিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা পাকা হইয়াছে। যদি আমি কাল মরিয়া যাই এবং কাজ চালাইবার জন্য সেখানে কোন সন্ন্যাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের কাজ চলিবে। ইংরেজ খুব ভাল লোক। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে সমুদয় ভাব চাপিয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজের মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মত চট করিয়া সে কোন জিনিষ ধরিতে পারে না, কিন্তু ভারী দৃঢ়কর্মী। মার্কিন জাতির বয়স এখনও এমন হয় নাই যে, তাহারা ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ ধরিয়া বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছে—সেজন্য সেখানে অনেকেই এখন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়া যখন আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ-ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। সেখান হইতে আমার আমেরিকা চলিয়া যাওয়ার পরেও ক্লাস চলিতে থাকে। পরে পুনরায় যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা করিলেই এক সহস্র শ্রোতা পাইতাম। আমেরিকায় উহা অপেক্ষাও অনেক অধিক শ্রোতা পাইতাম, কারণ আমি আমেরিকায় তিন বৎসর ও ইংলণ্ডে মাত্র এক বৎসর কাটাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন সন্ন্যাসী রাখিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য দেশেও প্রচারকার্যের জন্য আমার সন্ন্যাসী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।'

'ইংরেজ জাতি বড় কঠোর কর্মী। তাহাদিগকে যদি একটা ভাব দিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঐ ভাবটি যদি তাহারা যথার্থ ধরিয়া থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, উহা বৃথা যাইবে না। এদেশের লোকে এখন বেদে জলাঞ্জলি দিয়াছে; সমুদয় ধর্ম ও দর্শন এখন এদেশে রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। 'ছুঁৎমার্গ'ই ভারতের বর্তমান ধর্ম—এ ধর্ম ইংরেজ কোন কালেই লইবে না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাসমূহ এবং তাঁহারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যে অপূর্ব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাতব্বররা বলিতেন, আমার চেষ্টায় বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম আমাদের প্রাচীন ধর্মের অবনত ভাবমাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে-সকল দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সেগুলির মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের কিছু-না-কিছু প্রসঙ্গ নাই। হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে পর্যন্ত ঐরূপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অদ্বৈতবাদেরই সময় আসিয়াছে। সকলেই এখন উহার কথা বলে। তবে ইওরোপের লোকেরা নিজেদের মৌলিকত্ব দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহারা অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্যগুলি লইতেও ছাড়ে না। অধ্যপক ম্যাক্সমূলার একজন পুরা বৈদান্তিক। তিনি বেদান্তের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করেন।'

'আপনি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করিতে ইচ্ছা করেন?'

'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ঐ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্য—রাজকর-রূপে পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্মলাভের জন্য—শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হইয়া আছে। ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই কাজ করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্মপ্রচারকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ স্থাপন করিতে চাই—একটি মান্দ্রাজে ও অপরটি কলিকাতায়। কলিকাতারটি স্থাপন করিবার মত টাকার যোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইংরেজরাই—বিদেশীরাই টাকা দিবে।'

'উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্তমানে অনুষ্ঠেয় আদর্শটিকে আমি একটি সুনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি। এবং উহা কার্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা কোন মহত্তর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবেন। আমি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্বসাধারণকে কেবল কতকগুলো ভুয়া জিনিষ দিয়াই আমরা চিরকাল ভুলাইয়া রাখিয়াছি। সম্মুখে অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিতেও আমরা তাহাদিগকে নালার জলমাত্র পান করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মান্দ্রাজের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ পর্যন্ত করিবে না, কিন্তু নিজেদের শিক্ষার

সহায়তাকল্পে তাহাদের নিকট হইতে রাজকর বা অন্য কোন উপায়ে টাকা লইতে প্রস্তুত। আমি প্রথমেই ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষার জন্য পূর্বোক্ত দুইটি শিক্ষালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি, এখানে সর্বসাধারণকে অধ্যাত্ম ও লৌকিক বিদ্যা—দুই-ই শেখান হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িবে—এইরূপে ক্রমে আমরা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িব। আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি—ভগবানে বিশ্বাস করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি। সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে ঐ জন্যই আমার এত আপত্তি। গোঁড়াদের ভাব অপরিণত হইলেও তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশী। সেজন্য তাহাদের মনের তেজও বেশী। কিন্তু এখানকার সংস্কারকেরা ইওরোপীয়দিগের হাতের পুতুল-মাত্র হইয়া তাহাদের অহমিকার পোষকতাই করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ দেবতাস্বরূপ। ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে দারিদ্র্য পাপ বলিয়া গণ্য নহে। নিম্নবর্ণের ভারতবাসীদেরও শরীর দেখিতে সুন্দর—তাহাদের মনেরও কমনীয়তা যথেষ্ট। কিন্তু অভিজাত আমরা তাহাদিগকে ক্রমাগত ঘৃণা করিয়া আসার দরুনই তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারা মনে করে, তাহারা দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। ন্যায্য অধিকার পাইলেই তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর করিবে এবং উঠিয়া দাঁড়াইবে। জনসাধারণকে ঐরূপে অধিকার প্রদান করাই মার্কিন সভ্যতার মহত্ত্ব। হাঁটুভাঙা, অর্ধাশনক্লিষ্ট, হাতে একটা ছোট ছড়ি ও এক পুঁটলি কাপড়-চোপড় লইয়া সবেমাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় নামিতেছে, এমন একজন আইরিশম্যানের আকৃতির সহিত কয়েক মাস আমেরিকায় বাসের পর তাহার আকৃতির তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহার সেই সভয় ভাব গিয়াছে—সে সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কারণ, সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল, যেখানে নিজেকে দাস বলিয়া জানিত; এখন এমন স্থানে আসিয়াছে, যেখানে সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত।'

'বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা অবিনাশী, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান্। আমার বিশ্বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর হইল ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ঐগুলি একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মানুষ তৈরী করিতে পারে নাই। এগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই।'

'মিসেস বেস্যাণ্ট ও থিওজফি সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

'মিসেস বেস্যাণ্ট খুব ভাল লোক। আমি তাঁহার লণ্ডনের লজে
৯
বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক ওদিক হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম আলোচনা করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। তবে তিনি যে একজন অকপট মহিলা, এ-কথা তাঁহার পরম শত্রুও স্বীকার করিবে। ইংলণ্ডে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া পরিগণিত। তিনি একজন 'সন্ন্যাসিনী'। কিন্তু 'মহাত্মা' 'কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি। তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সংস্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাহা সত্য মনে করেন, তাহা প্রচার করুন।'

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কথা পাড়িলে স্বামীজী বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত এইভাবে প্রকাশ করিলেন, 'আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার উন্নতি বা শুভাশুভ তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে।'

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক জন ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি যে সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে অনুগ্রহপূর্বক সম্মত হইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন

[‘প্রবুদ্ধ ভারত’, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮]

সম্প্রতি ‘প্রবুদ্ধ ভারতে’র জনৈক প্রতিনিধি কতকগুলি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সেই আচার্যশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন—‘স্বামীজী, আপনার মতে আপনার ধর্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি?’

স্বামীজী প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, ‘পরব্যূহভেদ (aggression); অবশ্য এই শব্দ কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। অন্যান্য সমাজ ও সম্প্রদায় ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আমরাই প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।’

‘ভারতের পক্ষে আপনার ধর্মান্দোলন কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আপনি মনে করেন?’

‘হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া। বর্তমানকালে ‘হিন্দু’ বলিতে ভারতের তিনটি সম্প্রদায় বুঝায়—প্রথম গোঁড়া বা গতানুগতিক সম্প্রদায়; দ্বিতীয় মুসলমান আমলের সংস্কারক-সম্প্রদায়সমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্কারক-সম্প্রদায়সমূহ। আজকাল দেখি, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত—গোমাংস-ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।’

‘বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নহে?’

‘মোটেই না। ঠিক এইটিই আমরা পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া প্রাচীন ভারত মুগ্ধই হইয়াছিল, নব বলে সঞ্জীবিত হয় নাই।’

‘বর্তমানকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আপনি কি কি বিষয়ে প্রতিভাত দেখিতেছেন?‘

‘বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তো সর্বত্রই জাজ্বল্যমান। আপনি দেখিবেন—ভারত কখনও কোন কিছু পাইয়া হারায় না, কেবল উহা আয়ত্ত করিতে—নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, ভারত সেই

ভাব আর ফেলিয়া দিতে পারে নাই। বুদ্ধ বলিলেন, 'গো-বধ করিও না'; এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গো-বধ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

'স্বামীজী, আপনি পূর্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমি সকল সম্প্রদায়ের। আমরাই সনাতন হিন্দু।'

এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগভরে ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কিন্তু ছুঁৎমার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার—আর চিরদিনই উহা জাতীয় অভ্যুদয়ে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।'

'তাহা হইলে আপনি আসলে চান জাতীয় অভ্যুদয়?'

'নিশ্চয়। ভারত কেন সমগ্র আর্যজাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি বুদ্ধিবৃত্তিহীন?—কলাকৌশলহীন? উহার শিল্প, উহার গণিত, উহার দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন? কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্রা হইতে—শত শত শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রা হইতে—জাগিতে হইবে এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে তাহাকে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।'

'কিন্তু ভারত চিরদিনই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য-কুশল করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহা নিজের একমাত্র সম্বল—ধর্মরূপ পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্কা হয় না কি?'

'কিছুমাত্র না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়া ভারতে আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জীবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহ্যজীবন বা কর্মকুশলতা বিকাশ পাইয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত উভয়ে বিপরীত পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এখন উভয়ের সম্মিলন-কাল উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর-অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতেও তাঁহার মত কর্মতৎপরতা আর কাহার আছে? ইহাই রহস্য। জীবন—সমুদ্রের মত গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মত বিশাল হওয়াও চাই।'

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সময় দেখা যায়, বাহিরে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকূল হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর একত্র অবস্থান আকস্মিক মাত্র, অপরিহার্য নহে। আর যদি আমরা ভারতে ইহার সমাধান করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎও ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমরা সকলেই কি এক নহি?'

'স্বামীজী, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আর একটি প্রশ্ন মনে উদিত হইতেছে। এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই মহাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমার এই ভাব কতদূর গ্রহণ করিবে, তাহা তাহারা নিজেরাই স্থির করিবে। যতই বড় হউক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনঘাত দিয়াই চিরকাল পৃথিবীতে ঐশীশক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নূতন করিয়া আবার ঐ শক্তি লাভ করিতে হইবে। আমরা কি সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ নই?'

'ধন্যবাদ। আপনাকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনি স্বজাতির জন্য আপনার প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঐরূপ সমগ্রভাবে আপনার কর্মপদ্ধতি এখন বর্ণনা করিবেন কি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের কার্যপ্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে—কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উচ্চে তুলিয়া ধরা হউক, কিছুতেই পর্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।'

ভারতীয় নারী—তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

[‘প্রবুদ্ধ ভারত’, ডিসেম্বর,
১৮৯৮]

ভারতের নারীগণের অবস্থা ও অধিকার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য হিমালয়ের একটি সুন্দর উপত্যকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। স্বামীজীর নিকট যখন আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, ‘চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা যাক।’ তখনই আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘নারীর সম্বন্ধে আর্য ও সেমিটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত! সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্মকর্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্য পক্ষী বলি দেওয়াও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্যদের মতে সহধর্মিণী ব্যতীত পুরুষ কোন ধর্মকার্য করিতে পারে না।

আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও স্পষ্ট কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলাম, ‘কিন্তু স্বামীজী, হিন্দুধর্ম কি আর্যধর্মেরই অঙ্গবিশেষ নহে?’

স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক-ভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তিকাল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া দিয়াছেনঃ গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতিদানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে সহধর্মিণী ব্যতীত হইতে পারে না, তাহারই আবার শালগ্রামশিলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই; ইহার কারণ এই যে, এই-সকল পূজা পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।’

‘তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকার-বৈষম্য দেখা যায়, তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবসম্ভূত বলিয়া মনে করেন?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘যদি কোথাও বাস্তবিকই অধিকার-বৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে আমি ঐরূপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আকস্মিক স্রোতে এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবৈষম্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের দেশে নারীদের হীন দশা অতি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শতাব্দীর বহু ঘটনা বিপর্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীজাতির হীন অবস্থা বিচার করিয়া নহে!’

‘তাহা হইলে স্বামীজী, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্তমান অবস্থায় কি আপনি সন্তুষ্ট?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘না কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মত আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।’

‘আপনি নারীজাতির অধিকার-বৈষম্যের কারণ বলিয়া বৌদ্ধধর্মের উপরে দোষারোপ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, বৌদ্ধধর্ম কিরূপে নারীজাতির অবনতির কারণ হইল?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘সেই কারণের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধের সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, আর ঐ শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর

ভেক্ পর্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠপ্রথা অর্থাৎ এক ধর্মসঙ্ঘে বাস করিবার প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হইল, যেহেতু বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ, অর্থাৎ তাঁহার ধর্মসঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়।'

'কিন্তু বেদে তো সন্ন্যাসের বিধি আছে?'

'অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-সময় ঐ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় না। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক-রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ আছে তো?
১০
তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্রী ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী। সেকালে এইরূপ মহিলাকে 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধানুষ্কের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের মতো'; এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন আরণ্য-শিক্ষাকেন্দ্রে বালকবালিকার যে সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্য আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়ুন—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়ুন, তারপর দেখুন—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' হইতে আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কিনা।'

'স্বামীজী, আপনি বড় অদ্ভুতরূপে আমাদের অতীতের মহিমা-গৌরব সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন!'

স্বামীজী শান্তভাবে বলিলেন—'হাঁ, তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের দুইটি দিকই দেখিয়াছি। আর আমি জানি, যে-জাতি সীতা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে—ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলাদের জন্য আইনের যে-সব বজ্রবাঁধন আছে, আমাদের দেশের লোক সে-সব জানেও না। আমাদের নিশ্চয়ই অনেক দোষ আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যায়ও আছে, কিন্তু এই-সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটি কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে প্রেম কোমলতা ও সাধুতা বাহিরের কার্যে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে, আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির দ্বারা যতটা সম্ভব ঐ-ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে আমি এ-কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের প্রথাসমূহ অপেক্ষা ভারতীয় প্রথাসমূহের নানাভাবে অধিকতর উপযোগিতা রহিয়াছে।'

'তবে স্বামীজী, আমাদের মেয়েদের কোনরূপ সমস্যা আদৌ আছে কি—যাহার মীমাংসা প্রয়োজন?'

'অবশ্যই আছে—অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা'—এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই।'

'তাহা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি সংজ্ঞা দিবেন?'

স্বামীজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'আমি কখনও কোন-কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির—শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এইভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ নির্ভীক মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে। তাঁহারা সঙ্ঘমিত্তা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্ক-অনুসরণে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা পবিত্র স্বার্থশূন্য বীর হইবেন। ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শে যে বীর্য লাভ হয়, তাঁহারা সেই বীর্য লাভ করিবেন, সুতরাং তাঁহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবেন।'

'তাহা হইলে স্বামীজী, শিক্ষার ভিতর ধর্মশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, আপনি মনে করেন?'

স্বামীজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিষ বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্মসম্বন্ধে মতামতকে 'ধর্ম' বলিতেছি না। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তেমনি শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।'

'কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে, ব্রহ্মচর্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধর্মিণী অপেক্ষা যাঁহারা এইসব সম্বন্ধ এড়াইয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে উচ্চাসন দেওয়া নিশ্চয়ই নারীর উন্নতিতে সোজাসুজি আঘাত করা?'

স্বামীজী বলিলেন—'আপনার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ধর্ম যদি নারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্যকে উচ্চাসন দিয়া থাকে, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই করিয়াছে। আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও যেন একটু কি গোলমাল আছে। হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি—কেবল একটি কর্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকেন—অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা। কিন্তু ইহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার একমাত্র পন্থা নির্দেশ করিতে কেহই সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য, ভাল বা মন্দ, পাণ্ডিত্য বা মূর্খতা—যে-কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়তা করে, তাহারই সার্থকতা আছে।

এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান উপদেশ—বহির্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি, আর মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ উপলব্ধি একটিমাত্র উপায়েই সাধিত হইতে পারে। মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা—আপনার কি মনে পড়ে? ইনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভস্ম করিয়া নিজ যোগবিভূতিতে স্পর্ধান্বিত হইয়াছিলেন, তারপর নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির শুশ্রূষাকারিণী এক নারীর সহিত, পরে ধর্মব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—যাঁহারা উভয়েই নিষ্ঠা ও কর্তব্যরূপ একই মার্গ অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন?'
১১

'তাহা হইলে আপনি এদেশের নারীগণকে কি বলিতে চান?'

'কেন, আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিষ সহস্রগুণ বেশী আছে।'

হিন্দুধর্মের সীমানা

[‘প্রবুদ্ধ ভারত’, এপ্রিল, ১৮৯৯]

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন, অন্যধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে আনা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য সম্পাদকের আদেশে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি। স্বামীজী মঠ হইতে নৌকায় আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতে আসিলেন। গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ মিলিল।

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম, ‘স্বামীজী, যাহারা হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণ-বিষয়ে আপনার মতামত কি জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে আবার গ্রহণ করা যাইতে পারে?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘নিশ্চয়। তাহাদের অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে, করা উচিতও।’

তিনি মুহূর্তকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

‘আর এক কথা তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ না করিলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। যখন মুসলমানেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমানের ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়!

‘আমার নিজের মত এই যে, ভারতের আদিবাসিগণ, বহিরাগত জাতিসমূহ এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের পক্ষেই ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পুরাণসমূহে যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমার মতে তাহারা অন্যধর্মী ছিল, তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে।

‘যাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল—যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেককে দেখা যায়, অথবা যাহারা কখনও হিন্দু ছিল না, এখন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা উচিত নহে।’

‘তারপর আবার হিন্দুধর্মত্যাগী মুসলমান বা খ্রীষ্টানের মধ্যে অধিকাংশই তরবারিবলে ঐ-সব ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অথবা যাহারা ইতঃপূর্বে ঐরূপ করিয়াছে, তাহাদেরই বংশধর। ইহাদিগের হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকতা করা স্পষ্টতই অন্যায়। আর যাহারা কোনকালে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধেও কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? দেখুন না, অতীতকালে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হইয়াছে, আর এখনও সেরূপ চলিতেছে।

সাহসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘স্বামীজী, কিন্তু ইহারা কোন্ জাতি হইবে? তাহাদের কোন-না-কোনরূপ জাতি থাকা আবশ্যক, নতুবা তাহারা কখনও বিশাল হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে না। হিন্দুসমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায়?’

স্বামীজী ধীরভাবে বলিলেন, ‘যাহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতি ফিরিয়া পাইবে। আর যাহারা নূতন, তাহারা নিজের জাতি নিজেরাই করিয়া লইবে।’

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, ‘স্মরণ রাখিবেন, বৈষ্ণব-সমাজে ইতঃপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষ্ণব-সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে-জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্যই ইহা করিয়াছেন।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এই নূতন যাহারা আসিবে, তাহাদের বিবাহ কোথায় হইবে?’

স্বামীজী স্থিরভাবে বলিলেন, ‘এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই।’

আমি বলিলাম, ‘তারপর নামের কথা। আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং যে-সব স্বধর্মত্যাগী অহিন্দু নাম লইয়াছিল, তাহাদের নূতন নামকরণ করা উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিসূচক নাম বা আর কোনপ্রকার নাম দেওয়া যাইবে?’

স্বামীজী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, ‘অবশ্য নামের অনেকটা শক্তি আছে বটে।’

কিন্তু তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না। কিন্তু তারপর আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম—‘স্বামীজী, এই নব আগন্তুকগণ কি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রকার শাখা হইতে নিজেদের ধর্মপ্রণালী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে, অথবা আপনি তাহাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট ধর্মপ্রণালী নির্বাচন করিয়া দিবেন?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘এ-কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহারা আপনাপন পথ নিজেরাই বাছিয়া লইবে। কারণ নিজে নির্বাচন করিয়া না লইলে হিন্দুধর্মের মূলভাবটিই নষ্ট করা হয়। আমাদের ধর্মের সার এইটুকু যে, প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট-নির্বাচনের অধিকার আছে।’

আমি এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ আমার বোধ হয়, আমার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের আলোচনায় অনেক দিন কাটাইয়াছিলাম আর ইষ্ট-নির্বাচনের স্বাধীনতারূপ তত্ত্বটি এত উদার যে, সমগ্র জগৎকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নোত্তর ১-৫

প্রশ্নোত্তর
১
[মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত]

প্র॥ ভক্তিলাভ কিরূপে হবে?

প্র॥ গুরু কাকে বলতে পারা যায়?

উ॥ ভক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ঐ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

প্র॥ আপনি বলে থাকেন, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও; এখানে নিজের বলতে কি বুঝব?

প্র॥ যদি এক বস্তুই যথার্থ সত্য হয়, তবে এই দ্বৈতবোধ—যা সদাসর্বদা সকলের হচ্ছে, তা কোথা থেকে এল?

উ॥ যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলেন।

উ॥ বিষয় যখন প্রথম অনুভূত হয়, ঠিক সে-সময় কখনও দ্বৈতবোধ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সংযোগ হবার পর যখন আমরা সেই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে আরূঢ় করাই, তখনই দ্বৈতবোধ এসে থাকে। বিষয়ানুভূতির সময় যদি দ্বৈতবোধ থাকত, তবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে এবং জ্ঞাতাও জ্ঞেয় থেকে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করতে পারত।

প্র॥ সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট উপায় কি?

উ॥ অবশ্য পরমাত্মার উপরই নির্ভর করতে বলা আমার উদ্দেশ্য। তবে এই 'কাঁচা আমি'র উপর নির্ভর করবার অভ্যাস করলেও ক্রমে তা আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যায়, কারণ জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই মায়িক প্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়।

উ॥ যাঁদের চরিত্র সেইভাবে গঠিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ করাই এর সর্বোৎকৃষ্ট উপায়

। প্র॥ বেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা রাখা কর্তব্য?

উ॥ বেদই একমাত্র প্রমাণ—অবশ্য বেদের যে অংশগুলি যুক্তিবিরোধী, সেগুলি বেদ-শব্দবাচ্য নহে। অন্যান্য শাস্ত্র যথা পুরাণাদি—ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগতের যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়া বুঝতে হবে।

প্র॥ এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চারি যুগের বিষয় শাস্ত্রে পড়া যায়, ইহা কি কোনরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনাসম্মত অথবা

কাল্পনিক মাত্র? উ॥ বেদে তো এইরূপ চতুর্যুগের কোন উল্লেখ নেই, এটা পৌরাণিক যুগের ইচ্ছামত কল্পনামাত্র।

প্র॥ শব্দ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, না যে-কোন শব্দের দ্বারা যে-কোন ভাব বোঝাতে পারা যায়? মানুষ কি ইচ্ছামত যে-কোন শব্দে যে-কোন ভাব জুড়ে দিয়েছে?

উ॥ বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠতে পারে, স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। বোধ হয় যেন, শব্দ ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে নিত্য, তাই বা কেমন করে বলা যায়? দেখ না, একটা ভাব বোঝাতে বিভিন্ন ভাষায় কত রকম বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। কোনরূপ সূক্ষ্ম সম্বন্ধ থাকতে পারে, যা আমরা এখনও ধরতে পারছি না।

প্র॥ ভারতের কার্যপ্রণালী কি ধরনের হওয়া উচিত?

উ॥ প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীরটা যাতে সবল হয়, তেমন শিক্ষা দিতে হবে। এই রকম বার জন পুরুষসিংহ জগৎ জয় করবে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালের দ্বারা তা হবে না। দ্বিতীয়তঃ যত বড়ই হোক না কেন, কোন ব্যক্তির আদর্শ অনুকরণ করতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

প্র॥ রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের পুনরুত্থানকার্যে কোন্ অংশ গ্রহণ করবে?

উ॥ এই মঠ থেকে সব চরিত্রবান্ লোক বেরিয়ে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও উন্নতি হতে থাকবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির অভ্যুদয় হবে, শূদ্রজাতি আর থাকবে না। তারা এখন যে-সব কাজ করছে, সে-সব যন্ত্রের দ্বারা হবে। ভারতের বর্তমান অভাব—ক্ষত্রিয়শক্তি।

প্র॥ মানুষের জন্মান্তরে কি পশ্বাদি নীচযোনি হওয়া সম্ভব?

উ॥ খুব সম্ভব। পুনর্জন্ম কর্মের উপর নির্ভর করে। যদি লোকে পশুর মত কাজ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে।

প্র॥ মানুষ আবার পশুযোনি প্রাপ্ত হবে কিরূপে, তা বুঝতে পারছি না। ক্রমবিকাশের নিয়মে সে যখন একবার মানবদেহ পেয়েছে, তখন সে আবার কিরূপে পশুযোনিতে জন্মাবে?

উ॥ কেন, পশু থেকে যদি মানুষ হতে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে না কেন? একটা সত্তাই তো বাস্তবিক আছে—মূলে তো সবই এক।

প্র॥ কুণ্ডলিনী বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থূলদেহের মধ্যে আছে কি?

উ॥ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, যোগীরা যাকে পদ্ম বলেন, বাস্তবিক তা মানবের দেহে নেই। যোগাভ্যাসের দ্বারা ঐগুলির উৎপত্তি হয়ে থাকে।

প্র॥ মূর্তিপূজার দ্বারা কি মুক্তিলাভ হতে পারে?

উ॥ মূর্তিপূজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হতে পারে না—তবে মূর্তি মুক্তিলাভের গৌণ কারণস্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মূর্তিপূজার নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ অনেকের পক্ষে মূর্তি অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে দেয়—ঐ অদ্বৈতজ্ঞান-লাভেই মানব মুক্ত হতে পারে।

প্র॥ আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত?

উ॥ ত্যাগ।

প্র॥ আপনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম তার দায়স্বরূপ ভারতে ঘোর অবনতি আনয়ন করেছিল—এটি কি করে হল?

উ॥ বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী করবার চেষ্টা করেছিল। সকলে তো আর তা হতে পারে না। এইভাবে যে-সে ভিক্ষু হওয়াতে তাদের ভেতরে ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কমে আসতে লাগল। আর এক কারণ—ধর্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্বর আচার-ব্যবহারের অনুকরণ। ঐ-সব জায়গায় ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাদের ভেতর ওদের দূষিত সব আচারগুলি ঢুকল। তারা শেষে ভারতে সেগুলি চালিয়ে দিলে।

প্র॥ মায়া কি অনাদি অনন্ত?

উ॥ সমষ্টিভাবে ধরলে অনাদি অনন্ত বটে, ব্যষ্টিভাবে কিন্তু সান্ত।

প্র॥ মায়া কি?

উ॥ বস্তু প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র আছে—তাকে জড় বা চৈতন্য যে নামেই অভিহিত কর না কেন; কিন্তু ওদের মধ্যে একটি ছেড়ে আর একটিকে ভাবা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। এটাই মায়া বা অজ্ঞান।

প্র॥ মুক্তি কি?

উ॥ মুক্তি অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা—ভালমন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল, সোনার শিকলও শিকল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলতে আর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়। এইরূপ সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা অসৎপ্রবৃত্তগুলিকে দমন করতে হবে, তারপর কিন্তু সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে পর্যন্ত জয় করতে হবে।

প্র॥ ভগবৎকৃপা ছাড়া কি মুক্তিলাভ হতে পারে?

উ॥ মুক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। মুক্তি আমাদের ভেতর আগে থেকেই রয়েছে।

প্র॥ আমাদের মধ্যে যাকে 'আমি' বলা যায়, তা যে দেহাদি থেকে উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি?

উ॥ অনাত্মার মত 'আমি'ও দেহমনাদি থেকেই উৎপন্ন। প্রকৃত 'আমি'র অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

উ॥ প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিদ্যমান আর যিনি সর্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ ভাবে উপলব্ধি করে অন্তরে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন হয়েছেন এবং সকলেই ভালবাসেন, সকলের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে একটির পক্ষপাতী এবং অপরটি বিরোধী, সে জ্ঞানও নয়,

ভক্তও নয়—চোর, ঠক।

উ॥ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার কর, তবে তাঁকে সেবা করবার যথেষ্ট কারণ পাবে। সকল শাস্ত্রের মত ভগবৎসেবা অর্থে 'স্মরণ'। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ করবার হেতু উপস্থিত হবে।

উ॥ না—একই। মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।

প্র॥ ঈশ্বর অনন্ত; তিনি মানুষরূপ ধরে এতটুকু হন কি করে?

প্র॥ কেহ কেহ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কার্যে অধিকার হবে; আবার কেহ কেহ বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করা উচিত। এই দুটি বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য কিরূপে হতে পারে?

উ॥ তোমরা দুটি বিভিন্ন জিনিষে গোল করে ফেলছ। কর্ম মানে মানবজাতির সেবা বা ধর্মপ্রচারকার্য। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু তা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপরের সেবা নিচ্ছি, ততক্ষণ আমরা অপরকে সেবা করতে বাধ্য।

প্র॥ আপনি বলেন, সবই মঙ্গলের জন্য; কিন্তু দেখিতে পাই, জগতে অমঙ্গল দুঃখ কষ্ট চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার ঐ মতের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের সামঞ্জস্য আপনি কিভাবে করিবেন?

উ॥ যদি প্রথমে আপনি অমঙ্গলের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন, তবেই আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু বৈদান্তিক ধর্ম অমঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সুখের সহিত অসংযুক্ত অনন্ত দুঃখ থাকিলে তাহাকে অবশ্য প্রকৃত অমঙ্গল বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি সাময়িক দুঃখকষ্ট হৃদয়ের কোমলতা ও মহত্ত্ব বিধান করিয়া মানুষকে অনন্ত সুখের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আর অমঙ্গল বলা চলে না—বরং উহাকেই পরম মঙ্গল বলিতে পারা যায়। আমরা

প্র॥ প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত ভক্তই বা কাকে বলা যায়?

প্র॥ ঈশ্বরের সেবা করবার কি দরকার?

প্র॥ মায়াবাদ কি অদ্বৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা?

উ॥ সত্য বটে ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু তোমরা যেভাবে অনন্ত মনে করছ, অনন্ত মানে তা নয়। তোমরা অনন্ত বলতে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়সত্তা মনে করে গুলিয়ে ফেলছ। ভগবান্ মানুষরূপ ধরতে পারেন না বলতে তোমরা বুঝছ—একটা খুব প্রকাণ্ড সাকার পদার্থকে এতটুকু করতে পারা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ও-হিসাবে অনন্ত নন—তাঁর অনন্তত্ব চৈতন্যের অনন্তত্ব। সুতরাং তিনি মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করলেও তাঁর স্বরূপের কোন হানি হয় না।

কোন জিনিষকে মন্দ বলিতে পারি না, যতক্ষণ না আমরা অনন্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাহার অনুসন্ধান করি।

প্র॥ জাগতিক জড় পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই কল্পনা নহে?

২

[ব্রুকলিন নৈতিক সভা, ব্রুকলিন, আমেরিকা]

উ॥ আমার মতে বাহ্য জগতের অবশ্যই একটা সত্তা আছে—আমাদের মনের চিন্তার বাহিরেও উহার একটা অস্তিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্যের ক্রমবিকাশরূপ মহান্ বিধানের বশবর্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্, জড়ের ক্রমবিকাশ চৈতন্যের বিকাশপ্রণালীর প্রতীকস্বরূপ, কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমরা বর্তমান পার্থিব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বদ্ধ থাকায় এখনও অখণ্ড ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারি নাই। যে-অবস্থায় আমাদের অন্তরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমরা উপযুক্ত যন্ত্ররূপে পরিণত হই, যতদিন না আমরা সেই উচ্চতর অবস্থা লাভ করি, ততদিন প্রকৃত ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারিব না।

ভূত বা পিশাচোপাসনা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে। মানবজাতি ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই একরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য দেখা যায়, পার্থিব জীবনে কেহ কেহ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর ও পবিত্রতর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার বর্তমান উন্নতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে নিজেকে উন্নত করিবার সুযোগ বিদ্যমান। আমরা নিজেদের নষ্ট করিতে পারি না, আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা দুর্বল করিতে পারি না, কিন্তু উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার স্বাধীনতা আমাদের আছে।

প্র॥ যীশুখ্রীষ্টের নিকট একটি জন্মান্ধ শিশুকে আনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ শিশুটি নিজের কোন পাপবশতঃ অথবা তাহার পিতামাতার পাপের জন্য অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে?—আপনি এই সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করেন?

উ॥ এ সমস্যার ভিতর পাপের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন তো দেখা যাইতেছে না; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শিশুটির এই অন্ধতা তাহার পূর্বজন্ম-কৃত কোন কার্যের ফলস্বরূপ। আমার মতে এইরূপ সমস্যাগুলি কেবল পূর্বজন্ম স্বীকার করিলেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্র॥ আমাদের আত্মা কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

উ॥ মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দেশ-কাল আত্মার মধ্যেই বর্তমান, আত্মা দেশকালের অন্তর্গত নহেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, আমরা ইহলোকে বা পরলোকে যতই আমাদের জীবনকে পবিত্রতর ও মহত্তর করিব, ততই আমরা সেই ভগবানের সমীপবর্তী হইব, যিনি সমুদয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও অনন্ত আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপ।

প্র॥ বেদান্ত কি মুসলমান ধর্মের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

প্র॥ বেদান্ত কি জাতিভেদ স্বীকার করেন?

উ॥ জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্যেরা উহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ

করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই ঐরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিভেদের নিগড় দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade Guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা ইওরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙিয়াছে।

উ॥ জীবসত্তা কতকগুলি সংস্কার বা বুদ্ধির সমষ্টিস্বরূপ, আর এই বুদ্ধিসমূহের প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হইতেছে। সুতরাং উহা কখনও অনন্তকালের জন্য সত্য হইতে পারে না। এই মায়িক জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যেই উহার সত্যতা। জীবাত্মা চিন্তা ও স্মৃতির সমষ্টি—উহা কিরূপে নিত্য সত্য হইতে পারে?

প্র॥ বৌদ্ধধর্ম ভারতে লোপ পাইল কেন?

উ॥ বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রকৃতপক্ষে লোপ পায় নাই। উহা কেবল একটি বিপুল সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্বে যজ্ঞার্থে এবং অন্যান্য কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত, আর লোকে প্রচুর মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মদ্যপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে।

৪

[আমেরিকার হার্ডফোর্ডে ‘আত্মা ঈশ্বর ও ধর্ম’ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবৃন্দ কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

উ॥ তাই যদি হয় তো না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া ধর্মকর্ম করাইতে হয়, বাস্তবিক তাহার কোন ধর্মই হয় না। লোককে তাহার আসুরী প্রকৃতির কথা না বলিয়া তাহার ভিতরে যে দেবভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল।

প্র॥ ‘স্বর্গরাজ্য এ জগতের নহে’—এ কথা সেই প্রভু (যীশুখ্রীষ্ট) কি

৩

[টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী ক্লাব, বোষ্টন, আমেরিকা]

উ॥ বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মুসলমান ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান ধর্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কেবল যখন মুসলমানেরা অপর দেশ হইতে আসিয়া তাহাদের ভারতীয় স্বধর্মীদের নিকট বলিতে থাকে যে, তাহারা কেমন করিয়া বিধর্মীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, তখনই অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমানের দল উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া থাকে।

প্র॥ বেদের বিশেষত্ব কি?

উ॥ বেদের একটি বিশেষত্ব এই যে, যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র বেদই বার বার বলিয়াছেন—বেদকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ বলেন, উহা কেবল অজ্ঞ শিশু-মনের জন্য লিখিত। পরিণত অবস্থায় বেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।

অর্থে বলিয়াছিলেন?

উ॥ তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। য়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বলিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যীশুর সে ভাব ছিল না।

প্র॥ আপনার মতে—প্রত্যেক জীবাত্মা কি নিত্য সত্য?

প্র॥ আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা পূর্বে পশু ছিলাম, এখন মানব হইয়াছি? উ॥ আমার বিশ্বাসক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উচ্চতর প্রাণিসমূহ নিম্নতর জীবসমূহ হইতে আসিয়াছে।

প্র॥ আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, যাঁহার পূর্বজন্মের কথা মনে আছে?

উ॥ আমার এমন কয়েক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। তাঁহারা এমন এক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি উদিত হইয়াছে।

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন—যদি খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেষ্টাগণ লোককে নরকাগ্নির ভয় না দেখান, তবে লোকে আর তাঁহাদের কথা মানিবে না।

প্র॥ আপনি খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন? উ॥ খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার ছিলেন—লোকে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই। তাহারা যাহা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একটা ছায়ামাত্র, মরীচিকারূপ একটা ভ্রান্তিমাত্র।

প্র॥ যদি তিনি ঐরূপ একটা ছায়াশরীর নির্মাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাই কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নহে?

উ॥ যীশু শৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এ বিষয়ে অপরাপর লোকে যেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও তাহাই করিতে হয়; আর ইহা জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। তবে ঐ শৈলোপদেশকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে যাহা লাগিবে, তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি প্রেম ও আশীর্বাদে পূর্ণ। কখনও তাঁহার মুখ হইতে কাহারও

উ॥ আমি অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্ন বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তাঁহাকে তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকারী এক ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়া খুব উচ্চস্থান হইতে একটি পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবকে সেই পাত্রটি দেখাইবামাত্র তিনি তাহা লইয়া পা দিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্ত্বসমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরীণ জ্ঞানালোকের বিষয়, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন—আর ঐ আত্মজ্যোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ পন্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের প্রতিবন্ধক মাত্র। সেগুলিকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে।

প্র॥ আপনি কি বিশ্বাস করেন, যীশু শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন?

প্রতি একটি অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হয় নাই। তাঁহার জীবনে কোন অশুভ-অনুধ্যানের কথা শুনা যায় না। জরথুষ্ট্র বা কংফুছের মুখ হইতেও কখনও অভিশাপ-বাণী নির্গত হয় নাই।

৫
[ব্রুকলিন সভার পরিশিষ্ট হইতে সংগৃহীত]

প্র॥ আত্মার পুনর্দেহধারণ-সম্বন্ধীয় হিন্দু মতবাদটি কিরূপ?

উ॥ বৈজ্ঞানিকদের ‘শক্তি বা জড়-সাতত্য’ (Conservation of Energy or Matter) মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ আমাদের দেশের জনৈক দার্শনিকই প্রথম প্রকাশ করেন। এই মতবাদের দার্শনিকরা সৃষ্টি বিশ্বাস করিতেন না। ‘সৃষ্টি’ বলিলে বুঝায়—‘কিছু না’ হইতে ‘কিছু’ হওয়া। ইহা অসম্ভব। যেমন কালের আদি নাই, তেমনি সৃষ্টিরও আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন দুইটি রেখার মত—উহাদের আদি নাই, অন্ত নাই—উহারা নিত্য পৃথক্। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মত এইঃ উহা ছিল, আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্য-দেশীয়গণকে ভারত হইতে একটি বিষয় শিখিতে হইবে—পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। কোন ধর্মই মন্দ নহে, কারণ সকল ধর্মেরই সারভাগ একই প্রকার।

প্র॥ ভারতের মেয়েরা তত উন্নত নহেন কেন?

উ॥ বিভিন্ন যুগে যে সব অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার জন্যই ভারত-মহিলা অনুন্নত। কতকটা ভারতবাসীর নিজেরও দোষ।

এক সময় আমেরিকায় স্বামীজীকে বলা হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীকে নিজধর্মে আনয়ন করে না, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেনঃ যেমন প্রাচ্যভূভাগে ঘোষণা করিবার জন্য বুদ্ধের বিশেষ একটি বাণী ছিল, আমারও তেমনি পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করিবার একটি বাণী আছে।

প্র॥ আপনি কি এদেশে (আমেরিকায়) হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন?

উ॥ আমি কেবল দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছি।

প্র॥ আপনার কি মনে হয় না, যদি নরকের ভয় লোকের মন হইতে অপসারিত করা হয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপে শাসন করা যাইবে না?

উ॥ না; বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষা হৃদয়ে প্রেম ও আশার সঞ্চার হইলে সে ঢের ভাল হইবে।

পাদটীকা - স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

১	শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ।
২	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—কালিদাস।
৩	‘হে বিদ্বন্! ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই, সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগি হইয়াছেন, সেই পথ আমি তোমায় নির্দেশ করিয়া দিতেছি।’—বিবেকচূড়ামণি, ৪৩
৪	‘Indian Mirror’ পত্রিকা।
৫	অসুর, দেহাত্মবাদী, ভোগবাদী। দ্রষ্টব্যঃ ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ, ছান্দোগ্য উপ., ৮।৭-৮
৬	বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
৭	ব্যাসকৃত ‘বিশ্বনাথস্তবঃ’।
৮	মুণ্ডক উপনিষদ্ ২।২।৮ মুণ্ডক উপনিষদ্ ২।২।৮
৯	পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্। রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
১০	বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবসনাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।—কালিদাস
১১	দ্রষ্টব্যঃ যোগসূত্র৪।—৪।২
১২	মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
১৩	ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং —শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্
১৪	ন্যায়দর্শনের গ্রন্থবিশেষ।
১৫	নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ।
১৬	শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের শ্রাদ্ধ ঐ সময়ে করিয়া লইতে হয়, কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ ব কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না।
১৭	কৈবল্য উপ., ৩
১৮	গীতা, ১৮।২
১৯	জাবাল উপ., ৪
২০	ললিতবিস্তর।

২১	কৌপীনপঞ্চকম্—শঙ্করাচার্য
২২	কঠ উপ., ১।২।৫
২৩	তখন ব্রহ্মচারী সুধীর।
২৪	ঈশোপনিষদ্, ৭
২৫	বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৫।১৫
২৬	গীতা, ৪।৩৮
২৭	১ মে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি বা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়; ৫ মে দ্বিতীয় অধিবেশনে ইহার কার্যপ্রণালী আলোচিত হইয়
২৮	পূর্ববঙ্গে।
২৯	বেদান্তসূত্র, ২।১।৩৩
৩০	গীতা, ৬।৪৫
৩১	শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৩২	১৮১৮ খ্রীঃ ২২ জানুআরী মধ্যাহ্নের পর পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল।
৩৩	বৈরাগ্যশতকম, ভর্তৃহরি
৩৪	১৩ ফেব্রুআরী
৩৫	নীতিশতকম্—ভর্তৃহরি
৩৬	২২ ফেব্রুআরী
৩৭	ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি।
৩৮	অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত।
৩৯	শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত।
৪০	Hamlet—Shakespeare. স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশাস্ত্রে যা কল্পনা করা যায় না।
৪১	মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মান্দ্রাজে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল ছিলেন।
৪২	স্বামীজীর গর্ভধারিণী।
৪৩	এই গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে ‘বীরবাণী’ অংশে দ্রষ্টব্য।
৪৪	তখন ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিতেছিল।
৪৫	কঠ উপ., ২।৩।৩

৪৬	বায়ুপরিবর্তনের জন্য বৈদ্যনাথধামে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়া স্বামীজী একবার বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন।
৪৭	মোহমুদগর, শঙ্করাচার্য
৪৮	পাণ্ডবদের পরমধার্মিক ঋষিতুল্য পিতৃব্য; শূদ্রাণীগর্ভজাত।
৪৯	কঠ উপ., ১।৩।৩
৫০	পাতঞ্জলযোগসূত্রম্ ৪।২
৫১	গীতা, ৬।৪০
৫২	মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮
৫৩	কঠোপনিষদ্, ১।২।৯
৫৪	নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থিত।
৫৫	বিবেকচূড়ামণি, ৪।৮।৩
৫৬	শিব-রামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম, সুতরাং যুদ্ধের পরে দুজনের ভাবও হইল। কিন্তু শি রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে ঝগড়া কিচিমিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত মিটিল না।
৫৭	আমিষ-নিরামিষ আহার-বিষয়ে স্বামীজী অধিকারী-বিচার করিতেন।
৫৮	মুণ্ডক উপ., ৩।২।৪ মন্ত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৫৯	মুক্তি বীরগণেরই করতলগত, কাপুরুষদের নয়।
৬০	গীতা, ৬।৩৫
৬১	মুণ্ডক উপ., ২।২।৮
৬২	বিবেকচূড়ামণি, ৪১৭
৬৩	ঐ, ৪১৬
৬৪	শঙ্করাচার্য
৬৫	মুণ্ডক উপ., ৩।২।৯
৬৬	দেহেতে থাকিয়াও দেহবুদ্ধিশূন্য।
৬৭	বেদান্তসূত্র, ২অ, ১পা, ৩।৩সূ।
৬৮	দ্রষ্টব্যঃ ‘বীরবাণী’ কবিতা পুস্তক বা Complete Works.
৬৯	শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তিনি দেখিয়াছিলেন, রণদাবাবু বাড়ী ফিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তাণ্ডবোন্ম করেন। কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ হয় নাই, এবং স্বামীজীকে দেখানও হয় নাই।

৭০	মাধুকরী ভিক্ষা ম্লেচ্ছজাতি হইতেও গ্রহণ করিবে।
৭১	পাঁজিতে লেখা থাকে—‘এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে’, কিন্তু পাঁজিখানা নেঙড়ালে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। সেইরূপ, শা এইরূপ করলে ঈশ্বরদর্শন হয়’ না করে কেবল শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কিছুই ফল পাওয়া যায় না।
৭২	গুণাতীত অবস্থায় যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহাদের কোন বিধিনিষেধ নাই।
৭৩	যেখানে নারীগণ পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন। যেখানে নারীগণ সম্মানিতা হন না, সেখানে সকল কাজই নিষ্ফল। –
৭৪	চণ্ডী, ১।৫৬
৭৫	গীতা, ১৮।৪৮
৭৬	সৃজনের ইচ্ছা
৭৭	বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৪
৭৮	Lycidas—Milton
৭৯	নীতিশতকম্, ভর্তৃহরি
৮০	তুলসীদাস
৮১	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
৮২	২০ আষাঢ়, ৪ জুলাই—পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীজী মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন।

পাদটীকা - স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

১	অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য
২	কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটক হইতে।
৩	নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
৪	The Day of Annunciation—যেদিন দেবদূত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রের জন্মকথা জ্ঞাপন করেন।
৫	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ পরিচ্ছেদ।
৬	পওহারী বাবা।
৭	দ্রষ্টব্যঃ বীরবাণী বা Complete Works: Requisite in Pace কবিতা; এই গ্রন্থাবলীর ৭ খণ্ডে উহার অনুবাদ 'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম'।
৮	মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোবধীঃ। মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। [ইংরাজী অনুবাদের বাঙলা না দিয়া একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ দেওয়া হইল।—অনুবাদক]
৯	সম্পূর্ণ গানটি এই খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
১০	'ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনোঃ ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনোঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ...।'—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৭
১১	দ্রষ্টব্যঃ Complete Works: অনুবাদ 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি', এই গ্রন্থাবলীর ৭ খণ্ডে।
১২	শ্বেতাশ্ব উপ., ৬।১১
১৩	গীতা, ২।৬৯
১৪	কুমারসম্ভবম্, ৫।৪
১৫	লক্ষণীয়ঃ গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত।
১৬	দ্রষ্টব্যঃ Complete works; অনুবাদ 'মুক্তি', গ্রন্থাবলীর ৭ খণ্ডে।
১৭	ষ্ট্যাসিউস প্রণীত থীব্স্-সম্বন্ধীয় ল্যাটিন কাব্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্স্ প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনপ্রার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধই উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু।
	১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরী মাসে ভারত-প্রত্যাগমনের পথে নেপলস্ হইতে পোর্ট সৈয়দ আসিবার সময় স্বামীজী স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'এই ক্রীট দ্বীপ' এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটি স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত স্বপ্নের মর্ম এই ছিল যে, ঈশাহি ধর্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং এই সম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটি ইওরোপীয় শব্দ শুনাইল—তাহাদের মধ্যে একটি 'থেরাপিউটি' (Therapeutae)—এবং বলিল, 'উভয়েই সংস্কৃতশব্দজ'। থেরাপিউটি শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ

১৮	ভিক্ষুগণের পুত্র (শিষ্য)-গণ (পিউটি, সংস্কৃত পুত্র-শব্দজ)। ইহা হইতে স্বামীজী যেন বুঝিয়া লইলেন যে, ঈশাহি ধর্ম বৌদ্ধধর্মের একদল প্রচারক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, ‘প্রমাণ সব এইখানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে!’ নিদ্রাভঙ্গে ইহা সামান্য স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়া স্বামীজী শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন একজন কর্মচারী তাঁহার পাহারা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কয়টা বাজিয়াছে?’ উত্তর হইল, ‘রাত্রি দ্বিপ্রহর।’ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমরা এখন কোথায়?’ তখন বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে উত্তর শুনিলেন, ‘ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দূরে।’ এই স্বপ্ন তাঁহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আচার্যদেব নিজেই নিজেকে হাস্যাস্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ইহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন নাই। শব্দদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে হারাইয়া গিয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বামীজী স্বীকার করিলেন যে, ‘এই স্বপ্ন দেখিবার পূর্বে, কখনও তাঁহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার খেয়ালই হয় নাই।’ কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিষ, তাহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নহে। স্বামীজী বাল্যকালে একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব উত্তর দেন, ‘যাঁহাদের মাথা হইতে এমন সব জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাঁহারা যে তাহাই ছিলেন, এ কথা কি তোমার মনে হয় না?’—লেখিকা।
১৯	দ্রষ্টব্য সংস্কৃত অভিধান ‘অমরকোষ’। স্বামীজী চারি বৎসর বয়সে আধ আধ ভাষায় উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন!—লেখিকা।
২০	জাপানী সামুরাইগণ তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহাদের রাজনীতিক বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন মাত্র।—নিবেদিতা।
২১	মূল গীতটি এইঃ হরিসে লাগি রহো রে ভাই তেরা বনত বনত বনি যাই। অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই। সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।
২২	শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ শিষ্য সনাতন গোস্বামী। তিনি বাঙলার নবাবের উজীর পদ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন।

পাদটীকা - স্বামীজীর কথা

১	স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত প্রবন্ধঃ ১৩২০ সালে আষাঢ় মাসের ‘উদ্বোধনে’ প্রকাশিত।
২	‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-প্রণেতা শ্রীম।
৩	‘স্বামিশিষ্য-সংবাদ’-প্রণেতা।
৪	মুণ্ডক উপ., ২।২।৫।
৫	কঠোপনিষদ্, ২।২।১৫।
৬	শ্বেতাশ্বতর উপ., ২।৫; ৩।৮
৭	এই গ্রন্থাবলীর ৫ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।
৮	ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৯
৯	ঐ, ১।১।৩০
১০	সিষ্টার নিবেদিতা।
১১	স্বামী শুদ্ধানন্দজীর চয়ন।
১২	বোম্বাই প্রদেশে বেলগাঁও-এর ফরেষ্ট অফিসার হরিপদ মিত্র-লিখিত।
১৩	Charles Dickens-লিখিত।
১৪	স্বামীজী যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু-প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনবৎ আচরণ (Response of Inorganic matter to Electric Current) এই অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই।
১৫	ছান্দোগ্য উপ., ৭।৪-৯
১৬	গীতা, ৪।১৮
১৭	সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত।
১৮	১ গীতা, ১।৩৯

পাদটীকা - কথোপকথন

কথোপকথন

১	Christian Scientists—মার্কিনদেশীয় একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম।
২	জ্ঞানযোগের বক্তৃতা।
৩	Coral-strands—ভারতের সমুদ্রতীরে যথেষ্ট প্রবাল পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যের লোকেরা ভারতের এই পরিচয়ই জানিত।
৪	Count Leo Tolstoi—রুশিয়ার প্রসিদ্ধ পরহিতব্রত চিন্তাশীল লেখক ও সংস্কারক।
৫	আবু সৈয়দ আবুলচের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের মতের সহিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদের অনেক মিল আছে।
৬	Schopenhaur—বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। ইঁহার দর্শনে বেদান্তের প্রভাব বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে।
৭	Dark Ages—৫-১৫ শতাব্দী, যে-সময় ইওরোপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ।
৮	Renaissance—পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে যখন ইওরোপে সাহিত্য-শিল্পাদি-চর্চার পুনরভ্যুদয় হয়, তৎকালই ইতিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ।
৯	Lodge—বক্তৃতাগৃহ।
১০	বৃহদারণ্যক উপ., ৩।৮
১১	মহাভারত, বনপর্ব, ধর্মব্যাধ উপাখ্যান; এই গ্রন্থাবলীর ১ খণ্ডে ‘কর্মযোগে’ গল্পটি বিবৃত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
দশম খণ্ড

সূচীপত্র

ভূমিকা

‘আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট’—এই অংশ চিকাগো মহাসভার পূর্বে ও তাহার পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত স্বামীজী যে-সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহারই আংশিক বিবরণীর অনুবাদ। এগুলি যে-সব কাগজে যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, বহু পরিশ্রমে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া ১৯৫৮ খ্রীঃ মেরী লুইস্ বার্ক তাঁহার 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তদানীন্তনকালে স্থানীয় সংবাদপত্রে স্বামীজীর সংবাদগুলি কিভাবে প্রকাশিত ও পরিবেশিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে লক্ষণীয়। বক্তৃতার বিবরণীতে বা বিষয়বস্তু ধারণায় অনেক ভুল ধরা পড়িবে। স্বামীজীর নামের বানানও ঠিক নাই, এগুলি সংশোধন করা হয় নাই, প্রয়োজনীয় পাদটীকা প্রদত্ত হইয়াছে। শিরোনামগুলি অবশ্য আমাদের দেওয়া, কোথাও কোথাও দু-চারিটি ব্যাখ্যামূলক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন—উদ্বোধনের প্রাক্তন সম্পাদক, অধুনা সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির সহকারী প্রচারক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

পুস্তক প্রকাশকের নিবেদন

এই খণ্ডটিই ‘স্বামীজীর বাণী ও রচনা’র দশম ও শেষ খণ্ড। এই দশ খণ্ডে স্বামীজীর সব বক্তৃতা ও রচনার অনুবাদ যে আমরা দিতে পারিয়াছি, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। মৌলিক বাংলা রচনা কিছু বাদ গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, অনুবাদ সামান্য কিছু বাদ গিয়াছে, অল্প কিছু অনুবাদ সম্ভব হয় নাই। তবে পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিবেন, স্বামীজী একই তত্ত্ব বহুবার বুঝাইয়াছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বুঝাইয়াছেন।

অতএব বক্তৃতা বা রচনা দু-চারিটি বাদ গেলেও স্বামীজীর প্রধান

ভাবগুলি এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে যথাসম্ভব সংগ্রথিত হইয়াছে। কালক্রমে অবশ্য আরও পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া যাইতে পারে।

এই দশম খণ্ডটিকে এই গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্ট বলা যায়। ইহার প্রথমাংশ 'আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট', প্রধানতঃ শ্রীমতী মেরী লুইস্ বার্কের মহাগ্রন্থ 'New Discoveries' হইতে সংগৃহীত এবং সানফ্রান্সিসকো আশ্রমের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

দ্বিতীয়াংশ আইডা আনসেলের সংক্ষিপ্ত নোট অবলম্বনে তাঁহার দ্বারাই লিখিত রচনার অনুবাদ।

তৃতীয়াংশ বিবিধ সংগ্রহ—ছোট বড় নানা বিষয়ের সমাবেশে স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তাধারার বিচিত্র বিকাশ ও প্রকাশ।

শেষাংশ 'উক্তি-সঞ্চয়ন' প্রধানতঃ ভগিনী নিবেদিতার অমর গ্রন্থ 'Master as I saw Him' হইতে স্বামীজীর উক্তি-চয়ন।

অতঃপর সন্নিবেশিত হইয়াছে স্বামীজীর লেখার, বক্তৃতার ও ভ্রমণের সময়সূচী। সর্বশেষে এই গ্রন্থাবলীতে স্বামীজী কর্তৃক আলোচিত বিষয়গুলির একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী (Subject Index) প্রদত্ত হইল। আশা করি গবেষণাকারীদের ইহা বিশেষ কাজে লাগিবে।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদপটও অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় তাঁহারই পরিকল্পনা।

তথ্যপঞ্জী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই খণ্ড মুদ্রণযোগ্য করিতে যাঁহারা

আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৯
১৭ জানুআরি, ১৯৬৩

আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট

ভারতের ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ

‘সেলেম ইভনিং নিউজ’, ২৯ অগষ্ট, ১৮৯৩

গতকল্য বিকালবেলায় আবহাওয়া খুব গরম থাকা সত্ত্বেও ‘থট্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব’-এর (‘চিন্তা ও কাজ সমিতি’) বেশ কিছু সভ্য-সভ্যা তাঁহাদের অতিথিগণসহ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানোন্দের
১
বক্তৃতা শুনিবার জন্য ওয়েসলি হলে জড়ো হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক এখন এই দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। বক্তৃতাটি ছিল একটি ঘরোয়া ভাষণ। প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ ‘হিন্দুগণের ধর্ম—তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ্ বেদে যেভাবে ব্যাখ্যাত।’ বক্তা জাতিপ্রথা সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জাতি একটি সামাজিক বিভাগমাত্র, উহা ধর্মের উপর নির্ভর করে না।

বক্তা ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ভারতবর্ষের আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইলেও তথাকার জনসংখ্যা হইল ২৭ কোটি আর ইহাদের মধ্যে
৩
কোটি লোক গড়ে মাসে ৫০ সেণ্টেরও কম উপায় করে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে লোককে মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একপ্রকার গাছের ফুল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবনধারণ করিতে হয়। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান মরদরাই খায় ভাত, স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে ভাতের ফেন দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। কোন বৎসর ধান না হইলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। অর্ধেক লোক একবেলা খাইয়া বাঁচে, বাকী অর্ধেক একবার কোনমতে খাইতে পাইলে পরের বারে কোথায় খাবার জুটিবে, তাহা জানে না। স্বামী বিবে কিওন্দের মতে ভারতের অধিবাসিগণের প্রয়োজন অধিক ধর্ম বা উন্নততর কোন ধর্ম নয়, প্রয়োজন করিতকর্মা হওয়া। আমেরিকাবাসিগণকে ভারতের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ এবং অনশনক্লিষ্ট

জনগণের সাহায্যে উন্মুখ করিবার আশাতেই তিনি এই দেশে আসিয়াছেন।

বক্তা একটু বিশদভাবেই তাঁহার স্বদেশবাসিগণের অবস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে বলেন। তাঁহার ভাষণের সময় মাঝে মাঝে সেণ্ট্রাল ব্যাপটিষ্ট চার্চের ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার ও রেভারেণ্ড এস. এফ. নব্‌স্ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। বক্তা উল্লেখ করেন, মিশনরীরা ভারতে অনেক দামী দামী কথা আওড়ান এবং শুরুতে অনেক হিতকর কল্পনাও তাঁহাদের ছিল, কিন্তু তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে দেশের লোকের শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত উন্নতির জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার মতে আমেরিকানদের কর্তব্য—ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য মিশনরীদের না পাঠাইয়া শ্রমশিল্পের শিক্ষা দিতে পারেন, এমন লোক পাঠান।

দুর্দৈবের সময় খ্রীষ্টান মিশনরীদের কাছে লোকে সাহায্য পায় এবং মিশনরীরা হাতেনাতে শিক্ষাদানের স্কুলও যে খোলেন, ইহা সত্য কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে বক্তা বলেন, কখনও কখনও তাঁহারা এরূপ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব নাই, কেননা ঐরূপ সময় লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া ঐ চেষ্টা স্বভাবতই তাঁহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়।

ভারতে স্ত্রীজাতির অনুন্নত অবস্থার কারণ—বক্তার মতে—হিন্দুদের নারীর প্রতি অত্যধিক সম্মান। নারীকে ঘরের বাহিরে যাইতে না দেওয়াই ঐ সম্মান রক্ষার অনুকূল মনে করা হইত। নারী সর্বসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে গৃহাভ্যন্তরে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। স্বামীর সহিত চিতায় সহমরণ-প্রথার ব্যাখ্যায় বক্তা বলেন, পত্নী পতিকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিবাহে তাঁহারা এক হইয়াছিলেন, মৃত্যুতেও তাঁহাদের এক হওয়া চাই।

বক্তাকে প্রতিমাপূজা এবং জগন্নাথের রথের সম্মুখে স্বেচ্ছায় পড়িয়া মৃত্যুবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রথের ঐ ব্যাপারে হিন্দুদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, কেননা উহা কতকগুলি ধর্মোন্মাদ এবং প্রধানতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকের কাজ।

বক্তা স্বদেশে তাঁহার কর্মপদ্ধতির বিষয়ে বলেন, তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষণের কাজে লাগাইবেন, যাহাতে জনগণ প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে।

আজ বিকালে বিবে কানোন্দ ১৬৬নং নর্থ ষ্ট্রীটে মিসেস উড্‌স-এর বাগানে ভারতবর্ষের শিশুদের সম্বন্ধে বলিবেন। যে-কোন বালক বালিকা বা তরুণরাও ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। বিবে কানোন্দের চেহারা বেশ চমৎকার, রঙ কিছু ময়লা, কিন্তু প্রিয়দর্শন। কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা পীতাভ লাল রঙের একটি আলখাল্লা তিনি পরিয়াছিলেন। মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ি। সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার কোন জাতি নাই, সকলের সঙ্গেই তিনি পানাহার করিতে পারেন।

‘ডেলি গেজেট ’, ২৯ অগষ্ট, ১৮৯৩

ভারতবর্ষ হইতে আগত রাজা
২
স্বানী বিবি রানন্দ গতকল ওয়েস্‌লি চার্চে সেলেমের ‘থট্‌ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব’-এর অতিথিরূপে বক্তৃতা দিয়াছেন। বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর সহিত আমেরিকান রীতিতে করমর্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল একটি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা, উহার কটিবন্ধটি লাল। তিনি একটি পাগড়িও পরিয়াছিলেন। পাগড়ির প্রান্ত একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। উহা তিনি রুমালের কাজে লাগাইতেছিলেন। তাঁহার পায়ে ছিল কংগ্রেস জুতা।

বক্তা অনেকক্ষণ
ধরিয়া তাঁহার
দেশবাসীর ধর্ম ও
অর্থনৈতিক অবস্থার
বিষয় বলেন।
সেণ্ট্রাল ব্যাপটিষ্ট

চার্চে ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার এবং রেভারেণ্ড এস. এফ. নব্‌স্‌ বক্তাকে ঘন ঘন খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন। বক্তা বলেন, মিশনরীরা ভারতবর্ষে সুন্দর সুন্দর মতবাদ প্রচার করেন, গোড়াতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যও ছিল ভাল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেশের লোকের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁহারা কিছুই করেন নাই। বক্তার মতে, আমেরিকানদের উচিত ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে মিশনরী না পাঠাইয়া ভারতবাসীকে শিল্পবিজ্ঞান শিখাইবার জন্য কাহাকেও পাঠান।

ভারতে স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিবার সময় বক্তা বলেন, তাঁহার দেশে পতিরা পত্নীর কাছে কখনও মিথ্যা বলে না এবং পত্নীর উপর অত্যাচারও করে না। তিনি আরও অনেক দোষের উল্লেখ করেন, যাহা হইতে ভারতের পতিরা মুক্ত।

বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ-কথা সত্য কিনা, দৈবদুর্বিপাকের সময় ভারতের জনগণ খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিকট সাহায্য পাইয়া থাকে এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য তাঁহারা স্কুলও চালান। উত্তরে বক্তা বলেন, কখনও কখনও মিশনরীরা এই ধরনের কাজ করেন বটে, তবে তাহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব নাই, কেননা এরূপ সময়ে লোককে খ্রীষ্টধর্মে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়, কারণ আইনতঃ উহা নিষিদ্ধ।

ভারতের নারীগণের দুর্দশার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বক্তা বলেন, হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে এত শ্রদ্ধা করে যে, তাঁহাদিগকে তাহারা বাড়ীর বাহিরে আনিবার পক্ষপাতী নয়। গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া নারী পরিবারের সকলের সম্মান লাভ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমৃতা হইবার প্রাচীন প্রথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, পতির উপর পত্নীর এত গভীর ভালবাসা থাকে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন-ধারণ করা পত্নীর পক্ষে অসম্ভব। একদিন উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও সেই সংযোগ তাঁহাদের ছিন্ন হইবার নয়।

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে বক্তা বলেন, তিনি খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উপাসনার সময় তাঁহারা কি চিন্তা করেন? কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা গীর্জার কথা ভাবেন, কেহ কেহ বা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। বেশ কথা। তাঁহার দেশে লোকে ভগবানের মূর্তির কথা ভাবে। দরিদ্র জনগণের জন্য মূর্তিপূজা প্রয়োজন। বক্তা বলেন, প্রাচীনকালে ভারতীয় ধর্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে নারীরা আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং মানসিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। তবে বক্তা স্বীকার করেন, আধুনিক কালে তাঁহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। খাওয়া-পরা গল্প-গুজব এবং অপরের কুৎসা-প্রচার ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা তাঁহাদের নাই।

বক্তা স্বদেশে তাঁহার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বলেন, একদল সন্ন্যাসীকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশে কারিগরী শিক্ষাপ্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিবেন। ইহা দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতি হইবে।

‘সেলেম ইভনিং নিউজ’, ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

যে পণ্ডিত সন্ন্যাসীটি এই শহরে কিছুদিন হইল আসিয়াছেন, তিনি রবিবার সন্ধ্যা ৭/৩০-এ ইষ্ট চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন। স্বামী (রেভারেণ্ড) বিবা কানন্দ গত রবিবার সন্ধ্যায় এনিস্কোয়াম শহরে এপিস্কোপাল গীর্জায় ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ গীর্জার পাদ্রী এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে তথায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অধ্যাপক রাইট এই আগন্তুক সন্ন্যাসীকে খুব সমাদর করিতেছেন।

সোমবার রাত্রে ইনি সারাটোগায় যাইবেন এবং ওখানে সমাজবিদ্যা সমিতিতে বক্তৃতা দিবেন। পরে চিকাগোর আগামী ধর্মসম্মেলনে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা। ভারতে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, তাঁহাদের মত বিবা কানন্দও প্রাঞ্জল এবং শুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারেন। গত শুক্রবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি

ভারতীয় শিশুদের খেলাধূলা, স্কুল এবং চালচলন সম্বন্ধে সরলভাবে যে মূল্যবান কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। একটি ছোট মেয়ে যখন বলিতেছিল যে, তাহার শিক্ষিকা একবার তাহার আঙুল জোরে চুষিতে থাকায় আঙুলটি প্রায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন বিবা কানন্দের দরদী হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ... স্বদেশে সকল সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহাকেও সত্য, শুচিতা ও সৌভ্রাত্রের ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া মহৎ কল্যাণকর যাহা, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় না, আবার যদি কোথাও বিষম কোন অন্যায় ঘটে, তাহাও তাহার নজরে আসে। এই সন্ন্যাসী অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি অত্যন্ত উদার, কাহারও সহিত মতে মিল না হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সদয় কথাই ইঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়।

'ডেলি গেজেট ', ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

ভারত হইতে আগত রাজা স্বানী বিবি রানন্দ রবিবার সন্ধ্যায় ইষ্ট চার্চ-এ ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দরিদ্র জনগণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। যদিও বেশ কিছু শ্রোতৃ জড়ো হইয়াছিলেন, তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং বক্তার আকর্ষণের বিবেচনায় আরও বেশী লোক হওয়া উচিত ছিল। সন্ন্যাসী তাঁহার দেশী পোষাক পরিয়াছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ মিনিট বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আজিকার ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ভারত নয়। ভারতবর্ষে গিয়া এখন মিশনরীদের ধর্মপ্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। গুরুতর প্রয়োজন এখন লোককে কারিগরী এবং সামাজিক শিক্ষাদান। ধর্ম বলিতে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা হিন্দুদের আছে। হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। সন্ন্যাসী খুব মধুরভাষী। শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ তিনি বেশ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

'ডেলি সারাটোগিয়ান ', ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

... বক্তৃতামঞ্চে তাহার পর আসিলেন হিন্দুস্থানের মান্দ্রাজ হইতে আগত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ইনি ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়া

বেড়ান। সমাজবিদ্যায় ইহার অনুরাগ আছে, এবং বক্তা হিসাবে ইনি বুদ্ধিমান্ চিত্তাকর্ষক। ভারতের মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে ইনি বলিলেন।

অদ্যকার বক্তৃতাসূচীতে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে, বিশেষতঃ হার্টফোর্ডের কর্ণেল জেকব গ্রীনের আলোচ্য ‘স্বর্ণ ও রৌপ্য—উভয় ধাতুর মুদ্রামান’। বিবে কানন্দ পুনরায় বক্তৃতা করিবেন। এইবার তাঁহার বিষয় হইবে—‘ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার’।

বিশ্বমেলায় হিন্দুগণ

‘বষ্টন ইভনিং ট্রান্‌স্‌ক্রিপ্ট’, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

চিকাগো, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ

আর্ট প্যালেসের প্রবেশদ্বারের বামদিকে একটি ঘর আছে, যাহাতে একটি চিহ্ন ঝুলিতেছে—‘নং ১—প্রবেশ নিষেধ।’ এই ঘরে ধর্ম-মহাসম্মেলনের বক্তারা সকলেই মাঝে মাঝে, পরস্পরের সহিত অথবা সভাপতি মিঃ বনীর সহিত কথাবার্তা বলিতে আসিয়া থাকেন। মিঃ বনীর খাস দফতর এই গৃহেরই সংলগ্ন। ঘরের জোড়া কবাট সতর্ক পাহারা দ্বারা জনসাধারণ হইতে দূরে সংরক্ষিত, উঁকি দিয়া দেখিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র মহাসভার প্রতিনিধিরাই এই ‘পুণ্য’ সীমানায় ঢুকিতে পারেন, তবে বিশেষ অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নহে। কেহ কেহ ঐরূপ ঢুকেন এবং খ্যাতনামা অতিথিদের একটু নিকট সংস্পর্শ উপভোগ করেন। কলম্বাস হলে বক্তৃতা-মঞ্চের উপর যখন তাঁহারা বসিয়া থাকেন, তখন তো এই সুযোগ পাওয়া যায় না।

এই সাক্ষাৎকার-কক্ষে সমধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি হইলেন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। লম্বা মজবুত চেহারা, হিন্দুস্থানীদের বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী, মুখ কামান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুসমঞ্জস, দাঁতগুলি সাদা, সুচারু ওষ্ঠদ্বয় কথোপকথনের সময় স্নিগ্ধ হাসিতে একটু ফাঁক হইয়া যায়। তাঁহার সুঠাম মাথায় পীতাভ বা লালরঙের পাগড়ি থাকে। তিনি কখনও উজ্জ্বল কমলালেবু বর্ণের, কখনও বা গাঢ় লাল আলখাল্লা পরেন। আলখাল্লাটি কোমরবন্ধ দিয়া বাঁধা এবং হাঁটুর নীচে পড়ে। বিবেকানন্দ চমৎকার ইংরাজী বলেন এবং আন্তরিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলে সানন্দে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেন।

তাঁর সহজ চালচলনের সহিত একটি ব্যক্তিগত গাম্ভীর্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন তিনি মহিলাদের সহিত কথা বলেন, তখন বোঝা যায়, ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ের নিয়ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ‘আমি যাহা খুশী তাহা করিতে পারি, আমি স্বাধীন। কখনও আমি হিমালয় পর্বতে বাস করি, কখনও বা শহরের রাস্তায়। পরের বারের খাবার কোথায় জুটিবে, তাহা আমি জানি না। আমার কাছে কোন টাকা পয়সা থাকে না। চাঁদা তুলিয়া আমাকে এখানে পাঠান হইয়াছে।’ নিকটে দুই-একজন তাঁহার স্বদেশবাসী দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলিলেন, ‘এঁরা আমার ভার লইবেন।’ ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, তাঁহার চিকাগোর খাইখরচ অপরে দিতেছে। যে পোষাক তিনি পরিয়াছিলেন, উহা তাঁহার স্বাভাবিক সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, ‘ইহা তো একটি উৎকৃষ্ট পোষাক। দেশে আমি সামান্য কাপড় ব্যবহার করি। জুতাও পরি না।’ জাতিভেদে তিনি বিশ্বাসী কিনা প্রশ্ন করিলে বলিলেন ,‘জাতি একটি সামাজিক প্রথা। ধর্মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি সব জাতির লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি।’

মিঃ বিবেকানন্দের চেহারা এবং চালচলন হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি অভিজাত বংশে জন্মিয়াছেন। বহু বৎসরের স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য এবং গৃহহীন পরিব্রজ্যা সত্ত্বেও তাঁহার জন্মগত আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার পারিবারিক নাম কেউ জানে না। ধর্মজীবন বরণ করিয়া তিনি তাঁহার ‘বিবেকানন্দ’ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘স্বামী’ কথাটি সন্ন্যাসীর প্রতি সম্মানসূচক প্রয়োগ। তাঁহার বয়স ত্রিশ হইতে খুব বেশী নয়। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন জীবনের পরিপূর্ণতা এবং পরজীবনের ধ্যানের জন্যই সৃষ্ট। তথাপি মনে অনিবার্য কৌতূহল জাগেঃ ইঁহার সংসার-বিমুখতার মূলে কি কারণ নিহিত ছিল?

সব কিছু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া সম্বন্ধে একটি মন্তব্য শুনিয়া বিবেকানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ‘প্রত্যেক নারীর মধ্যে আমি যখন শুধু জগন্মাতাকেই দেখিতে পাই, তখন আমি বিবাহ করিব কেন? এইসব ত্যাগ করিয়াছি কেন? সাংসারিক বন্ধন এবং আসক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য, যাহাতে আর পুনর্জন্ম না হয়। মৃত্যুকালে আমি দৈবী সত্তায় মিশিয়া যাইতে চাই, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে চাই। আমি তখন বুদ্ধত্ব লাভ করিব।’

এই কথা দ্বারা বিবেকানন্দ বলিতে চান না যে, তিনি বৌদ্ধ। কোন নাম বা সম্প্রদায় তাঁহাকে চিহ্নিত করিতে পারে না। তিনি উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার্থক পরিণতিস্বরূপ, বিশাল স্বপ্নময় আত্মত্যাগপ্রধান হিন্দু সংস্কৃতির সুযোগ্য সন্তান, তিনি একজন যথার্থ সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ।

বিবেকানন্দের কাছে তাঁহার গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা বিলি করিবার জন্য থাকে। রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন হিন্দু সাধক। তাঁহার উপদেশে লোকে এত আকৃষ্ট হইত যে, অনেকে তাঁহার মৃত্যুর পর সংসারত্যাগ করিয়াছেন। মজুমদারও
৩
এই মহাপুরুষকে গুরুর ন্যায় দেখিতেন। তবে মজুমদারের আদর্শ, যেমন যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিতেন, সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিয়া পৃথিবীতে দেবভাব-প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দের ভাষণ আমাদের উপরকার আকাশের ন্যায় উদার। সকল ধর্মের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই হইবে ভবিষ্যতের সর্বজনীন ধর্ম। সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর শাস্তি ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য সৎকর্ম—ইহাও তাঁহার ভাষণের অন্যতম বক্তব্য। তাঁহার চমৎকার ভাবরাশি ও চেহারার জন্য তিনি ধর্ম-মহাসভায় অত্যন্ত সমাদৃত। মঞ্চের উপর দিয়া তাঁহাকে শুধু চলিয়া যাইতে দেখিলেও

লোকে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। হাজার হাজার মানুষের এই অভিবাদন তিনি বালকসুলভ সরলতার সহিত গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র নাই। এই বিনীত তরুণ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিঃস্বতা ও আত্মবিলুপ্তি হইতে সহসা ঐশ্বর্য ও প্রখ্যাতিতে আবর্তন নিশ্চিতই একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, থিওজফিষ্টরা হিমালয়ে 'মহাত্মা'দের অবস্থান সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, ঐ-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা। বিবেকানন্দ শুধু বলিলেন, 'আমি তাঁহাদের কাহাকেও কখনও দেখি নাই।' ইহার তাৎপর্য এই যে, হিমালয়ে ঐরূপ মহাত্মা হয়তো আছেন, তবে হিমালয়ের সহিত যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও তাঁহার এখন 'মহাত্মা'দের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

ধর্ম-মহাসভায়

দি ডিউবুক, আইওয়া 'টাইম্‌স্‌', ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

বিশ্বমেলা, ২৮ সেপ্টেম্বর (বিশেষ সংবাদ):

ধর্ম-মহাসভার অধিবেশনটিতে তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা দেখা দিয়াছিল। ভদ্রতার পাতলা আবরণ অবশ্য বজায় ছিল, কিন্তু উহার পিছনে বৈরভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রেভারেণ্ড জোসেফ কুক হিন্দুদের কঠোর সমালোচনা করেন, হিন্দুরা তাঁহাকে তীব্রতরভাবে পাল্টা আক্রমণ করিলেন। রেভারেণ্ড কুক বলেন, বিশ্বসংসার অনাদি—এ-কথা বলা একপ্রকার অমার্জনীয় পাগলামি। প্রত্যুত্তরে এশিয়ার প্রতিনিধিগণ বলেন, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট জগতের অযৌক্তিকতা স্বতঃসিদ্ধ। ওহাইও নদীর তীর হইতে লম্বা-পাল্লার কামান দাগিয়া বিশপ জে. পি নিউম্যান গর্জন করিয়া ঘোষণা করিলেন, প্রাচ্য-দেশীয়েরা মিশনরীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজকে অপমানিত করিয়াছেন, আর প্রাচ্য প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের শান্ত ও গর্বিত হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, উহা শুধু বিশপের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে তিনজন সুপণ্ডিত বৌদ্ধ চমৎকার সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় ঈশ্বর, মানুষ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখ্য বিশ্বাস উপন্যস্ত করেন। (ইহার পরে ধর্মপালের 'বুদ্ধের নিকট জগতের ঋণ' সংজ্ঞক বক্তৃতাটির চুম্বক দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সূত্রে জানা যায়, ধর্মপাল ভাষণের আগে একটি সিংহলী স্বস্তিবাচন গাহিয়াছিলেন।) অতঃপর সাংবাদিক লিখিতেছেনঃ

ধর্মপালের বক্তৃতার উপসংহারভাগ এত সুন্দর হইয়াছিল যে, চিকাগোর শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্বে ঐরূপ কখনও শুনেন নাই। বোধ করি ডিমসথেনীজও উহা ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

বদমেজাজী মন্তব্য

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাগ্য কিন্তু এত ভাল ছিল না। গোড়াতেই তাঁহার মেজাজ ঠিক ছিল না, অথবা কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহ্যতঃ তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। মাথায় ছিল ফিকা হলুদ রঙের পাগড়ি। বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিদের ভীষণ আক্রমণ করিলেন ও বলিলেন, 'আমরা যাঁহারা প্রাচ্য দেশ হইতে আসিয়াছি, এখানে বসিয়া দিনের পর দিন মাতব্বরী ভাষায় শুনিতেছি যে, আমাদিগের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত, কেননা খ্রীষ্টান জাতিসমূহ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। আমাদের চারিপাশে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে খ্রীষ্টান দেশসমূহের মধ্যে ইংলণ্ড ২৫ কোটি এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা দিয়া বিত্তবিভব লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া আমরা দেখি, খ্রীষ্টান ইওরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয় স্পেনে। আর স্পেনের ঐশ্বর্যলাভ মেক্সিকো আক্রমণের পর হইতে। খ্রীষ্টানরা সম্পত্তিশালী হয় মানুষ-ভাইদের গলা কাটিয়া। এই মূল্যে হিন্দুরা বড়লোক হইতে চায় না।'

(বক্তারা এই ভাবে আক্রমণ করিয়া চলিলেন। প্রত্যেক পরবর্তী বক্তা পূর্বগামী বক্তা অপেক্ষা যেন বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন।)

'আউটলুক ', ৭ অক্টোবর , ১৮৯৩

... ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান মিশনরীদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্মযাজকের উপযোগী উজ্জ্বল কমলালেবু রঙের পোষাকে জবাব দিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় মিশনসমূহের কাজের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই; তবে তাঁহার এই উক্তিও সত্য যে, খ্রীষ্টান প্রচারকগণ হাজার হাজার বৎসরের বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং জাতিসংস্কারযুক্ত হিন্দুধর্মকে বুঝিবার কোন প্রয়াস দেখান নাই। বিবেকানন্দের মতে—মিশনরীরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন, যথা—দেশবাসীর পবিত্রতম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া।

'ক্রিটিক', ৭ অক্টোবর , ১৮৯৩

ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধিগণের

মধ্যে দুই ব্যক্তি
ছিলেন সর্বাপেক্ষা
চিত্তাকর্ষক—
সিংহলের বৌদ্ধ
ধর্মযাজক এইচ. ধর্মপাল এবং হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মপালের একটি ধারাল উক্তিঃ 'যদি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাখান ও মতবাদ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উহাদিগকে সরাইয়া রাখ। কোন পূর্ব ধারণার বশীভূত না হইয়া চিন্তা করিতে, ভালবাসার জন্যই মানুষকে ভালবাসিতে, নিজের বিশ্বাসসমূহ নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করিতে শেখ, সত্যের সূর্যালোক নিশ্চয়ই তোমাকে দীপ্ত করিবে।'

যদিও এই অধিবেশনের (ধর্ম-মহাসভার অন্তিম অধিবেশন) সংক্ষিপ্ত ভাষণসমূহের অনেকগুলিই খুব চমৎকার হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় অপর কেহই মহাসভার মূল আদর্শ, উহার কার্যগত ত্রুটি এবং উহার উৎকৃষ্ট প্রভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষণটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর এই ভাষণের কি আশ্চর্য প্রভাব হইয়াছিল, তাহার শুধু ইঙ্গিত মাত্র আমি দিতে পারি। বিবেকানন্দ যেন দেবদত্ত বাগ্মিতার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহার হলুদ ও কমলালেবু রঙের চিত্তাকর্ষী পোষাক এবং প্রতিভাদীপ্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী ও সুমিষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কম আকর্ষণ বিস্তার করে নাই।

... স্বামীজীর ধর্ম-মহাসভার শেষ ভাষণটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া সাংবাদিক মন্তব্য করিতেছেনঃ

বৈদেশিক মিশন সম্বন্ধে যে-সকল মনোবৃত্তি ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রকাশ পাইয়াছিল, উহাই বোধ হয় এই সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ফল।

বিদ্যা ও জ্ঞানে গরিষ্ঠ প্রাচ্য পণ্ডিতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত শিক্ষানবীশকে পাঠাইবার ধৃষ্টতা ইংরেজী-ভাষাভাষী শ্রোতৃবর্গের নিকট ইহার আগে এমন দৃঢ়ভাবে আর তুলিয়া ধরা হয় নাই। আমরা যদি হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, তবে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতির ভাব লইয়া উহা বলিতে হইবে। চরিত্রে এই দুইটি গুণ আছে, এমন সমালোচক খুব দুর্লভ। বৌদ্ধেরা যেমন আমাদের নিকট হইতে শিখিতে পারে, আমাদেরও যে বৌদ্ধদের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে, ইহা আজ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ প্রভাব কার্যকর হয়।

লুসি মনরো

‘চিকাগো’, ৩ অক্টোবর, ১৮৯৩

‘নিউ ইর্য়ক ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকা ১ অক্টোবর, (১৮৯৩) ধর্ম-মহাসভার প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি দ্বারা ঐ মহতী সভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী গীতা এবং ব্যাসের বচন হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় বলিয়াছিলেনঃ

‘মণিমালার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূত্রের ন্যায় আমি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে আসিয়া উহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি।’

‘প্রত্যেক ধর্মেই পবিত্র, সাধুপ্রকৃতি, পূর্ণতাসম্পন্ন মানুষ দৃষ্ট হয়। অতএব সব মতই মানুষকে একই সত্যে লইয়া যায়, কারণ বিষ হইতে অমৃতের উৎপত্তি কি সম্ভবপর?’

‘ক্রিটিক’, ৭ অক্টোবর, ১৮৯৩

ধর্ম-মহাসভার একটি পরিণাম এই যে, উহা একটি বিশেষ সত্যের প্রতি আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল। ঐ সত্যটি হইল এইঃ প্রাচীন ধর্মমতসমূহের অন্তর্নিহিত দর্শনে বর্তমান মানুষের উপযোগী অনেক চমৎকার শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। একবার যখন ইহা আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম, তখন ঐ-সকল ধর্ম-ব্যাখ্যাতাগণের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়া চলিল এবং স্বভাবসুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া আমরা তাঁহাদিগকে বুঝিতে তৎপর হইলাম। ধর্ম-মহাসভা শেষ হইলে উপযুক্ত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়াছিল সিউআমি বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং প্রসঙ্গগুলির মাধ্যমে। বিবেকানন্দ এখন এই শহরে (চিকাগো) রহিয়াছেন। তাঁহার এই দেশে আসিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহার স্বদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে নূতন নূতন শ্রমশিল্প আরম্ভ করিতে আমেরিকানগণকে প্ররোচিত করা। কিন্তু বর্তমানে সাময়িকভাবে তিনি ঐ পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন, কেননা তিনি দেখিতেছেন, আমেরিকান জাতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বদান্য বলিয়া এই দেশে বহু লোক নানা উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য আসিতেছে। আমেরিকায় এবং ভারতে দরিদ্রদের আপেক্ষিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ জবাব দিলেন, আমেরিকায় যাহাদিগকে গরীব বলা হয়, তাহারা ভারতে গেলে রাজার হালে থাকিতে পারিবে। তিনি চিকাগোর নিকৃষ্ট পাড়া ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তই পাকা হইয়াছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক মান দেখিয়া তিনি খুশী।

যদিও বিবেকানন্দ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি সন্ন্যাসিসঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য তিনি কুলমর্যাদা ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে স্বেচ্ছায় জাতির সব অভিমান বিসর্জন দিতে

হয়। বিবেকানন্দের আকৃতিতে তাঁহার আভিজাত্য সুচিহ্নিত। তাঁহার মার্জিত রুচি, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে নূতন ধারণা দিয়াছে। তাঁহার প্রতি লোকে স্বতই একটি আকর্ষণ অনুভব করে। তাঁহার মুখশ্রীতে এমন একটি কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও জীবন্তভাব আছে যে, উহা তাঁহার গৈরিক পোষাক এবং গভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিয়া মানুষের মনকে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি অনুকূল করে। এই জন্য ইহা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, অনেক সাহিত্য-সভা তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছে এবং বহু গীর্জাতেও তিনি ধর্মালোচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন এবং বিবেকানন্দের ধর্মমত আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কোন স্মারকলিপি ছাড়াই বক্তৃতা দেন, তথ্য এবং সিদ্ধান্ত এমন নিপুণভাবে ন্যস্ত করেন যে, তাঁহার আন্তরিকতায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার বলিবার উদ্দীপনা মাঝে মাঝে এত বাড়িয়া যায় যে, শ্রোতারা মাতিয়া উঠে। বিবেকানন্দ একজন যোগ্যতম জেসুইট ধর্মযাজকের মতই পণ্ডিত ও সংস্কৃতিমান্। তাঁহার মনের গঠনেও জেসুইটদের খানিকটা ধাঁচ যেন আছে। তাঁহার কথোপকথনে ছোট ছোট ব্যঙ্গোক্তিগুলি ছুরির মত ধারাল হইলেও এত সূক্ষ্ম যে, তাঁহার অনেক শ্রোতাই উহা ধরিতে পারে না। তথাপি তাঁহার সৌজন্যের কখনও অভাব হয় না। তিনি আমাদের রীতিনীতির এমন কোন সাক্ষাৎ সমালোচনা কখনও করেন না, যাহাতে উহা কটু শোনায়। বর্তমানে তিনি আমাদিগকে তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম ও দার্শনিকগণের বাণী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন। বিবেকানন্দের মতে অজ্ঞান জনগণের জন্য মূর্তিপূজার প্রয়োজন রহিয়াছে; তবে তিনি আশা করেন, এমন সময় আসিবে যখন আমরা সাকার উপাসনা এবং পূজা অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিতে ভগবানের সত্তা অনুভব করিব, মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি করিতে পারিব। বুদ্ধ দেহত্যগ করিবার আগে যেমন বলিয়াছিলেন, বিবেকানন্দও সেইরূপ বলেন—'তোমার নিজের মুক্তি তুমি নিজেই সম্পাদন কর। আমি তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারি না। কেহই পারে না। নিজেই নিজেকে সাহায্য কর।'

‘ইভানষ্টন ইনডেক্স’, ৭ অক্টোবর, ১৮৯৩

গত সপ্তাহে কংগ্রীগেশনাল চার্চ-এ অনেকটা সম্প্রতি-সমাপ্ত ধর্ম-মহাসভার ন্যায় একটি বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন দুইজনঃ সুইডেনের ডক্টর কার্ল ভন বারগেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসী সিউআমি বিবেকানন্দ। ... সিউআমি বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্ম-মহাসভায় একজন ভারতীয় প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার অপূর্ব কমলালেবু রঙের পোষাক, ওজস্বী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং হিন্দুদর্শনের আশ্চর্য ব্যাখ্যার জন্য বহু লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার চিকাগোতে অবস্থান তাঁহার প্রতি অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও সাধুবাদের হেতু হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি তিনটি সন্ধ্যায় আয়োজিত হইয়াছিল।

শনিবার এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা দিয়া সাংবাদিক বলিতেছেনঃ

বৃহস্পতিবার ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ডক্টর ভন বারগেনের আলোচ্য বিষয় ছিল—‘সুইডেনের রাজকন্যা’-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ‘হালডাইন বীমিশ’। হিন্দু সন্ন্যাসী বলেন ‘পুনর্জন্ম’ সম্বন্ধে। শেষের বক্তৃতাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, কেননা এই বিষয়টির আলোচ্য মতসমূহ পৃথিবীর এই অঞ্চলে বিশেষ শোনা যায় না। ‘আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণ’ তত্ত্বটি এই দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন এবং খুব কম লোকেই উহা বুঝিতে পারে; কিন্তু প্রাচ্যে উহা সুপরিচিত এবং ওখানে উহা প্রায় সকল ধর্মের বনিয়াদ। যাঁহারা মতবাদরূপে ইহার ব্যবহার করেন না, তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। পুনর্জন্মতত্ত্বের মীমাংসার প্রধান বিষয় হইল—আমাদের অতীত বলিয়া কিছু আছে কিনা। বর্তমান জীবন আমাদের একটি আছে, তাহা আমরা জানি। ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধেও একটা স্থির অনুভব আমাদের থাকে। তথাপি অতীতকে স্বীকার না করিয়া বর্তমানের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, জড়ের কখনও বিনাশ নাই, অবিচ্ছিন্ন উহার অস্তিত্ব। সৃষ্টি শুধু আকৃতির পরিবর্তন মাত্র। আমরা শূন্য হইতে আসি নাই। কেহ কেহ সব কিছুর সাধারণ কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন, এই স্বীকার দ্বারাই সৃষ্টির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদিগকে ঘটনাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—কোথা হইতে এবং কিভাবে বস্তুর উৎপত্তি ঘটে। যে-সব যুক্তি দিয়া ভবিষ্যৎ অবস্থান প্রমাণ করা হয়, সেই যুক্তিগুলিই অতীত অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন। বংশগতির দ্বারা ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। কেহ কেহ বলেন, 'কই, আমরা পূর্বেকার জন্ম তো স্মরণ করিতে পারি না।' কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে, যেখানে পূর্বজন্মের স্পষ্ট স্মৃতি বিদ্যমান। এখানেই জন্মান্তরবাদের বীজ নিহিত। সেহেতু হিন্দুরা মূকপ্রাণীর প্রতি দয়ালু, সেইজন্যই অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মান্তরে বিশ্বাসী। ইঁহারা নিম্ন প্রাণীর প্রতি দয়াকে কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না। জনৈক প্রাচীন হিন্দু ঋষি ধর্মের সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ যাহাই মানুষকে উন্নত করে, তাহার নাম ধর্ম। পশুত্বকে দূর করিতে হইবে, মানবত্বকে দেবত্বে লইয়া যাইতে হইবে। জন্মান্তরবাদ মানুষকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না। মানুষের আত্মা অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া মহত্তর জীবন লাভ করিতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্থলে সেখানে তাহার আটটি ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে। এইভাবে উচ্চতর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া অবশেষে সে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা—অমৃতত্ব লাভ করিবে। মহাজনদের লোকসমূহে তখন সে নির্বাণের গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে থাকিবে।

হিন্দুসভ্যতা

[যদিও ষ্টিয়াটর শহরে ৯ অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতায় প্রচুর লোক সমাগম হইয়াছিল। ‘ষ্টিয়াটর ডেইলি ফ্রী প্রেস’ **(৯ অক্টোবর)** শুধু নিম্নের নীরস বিবরণটুকু পরিবেশন করিয়াছেন।**]**

অপেরা হাউসে শনিবার রাত্রে এই খ্যাতিমান্ হিন্দুর বক্তৃতা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তুলনামূলক ভাষাবিদ্যার সাহায্যে তিনি আর্যজাতিসমূহ এবং নূতন গোলার্ধে তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে বহুপূর্বে স্বীকৃত সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ত্রি-চতুর্থ জনগণ যাহা দ্বারা অত্যন্ত হীনভাবে নিপীড়িত, সেই জাতিভেদ-প্রথার তিনি মৃদু সমর্থন করিলেন, আর গর্বের সহিত ইহাও বলিলেন যে, যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর ক্ষমতাদৃপ্ত জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন দেখিয়াছে, সেই ভারতবর্ষই এখন বাঁচিয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেশবাসীর ন্যায় অতীতকে ভালবাসেন। তাঁহার জীবন নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁহার স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি এবং পদব্রজে ভ্রমণকে খুব উৎসাহিত করা হয়, তবে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সে-কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ভারতীয় গৃহে রান্না হইবার পর প্রথম খাইতে দেওয়া হয় কোন অতিথিকে। তারপর গৃহপালিত পশু, চাকর-বাকর এবং গৃহস্বামীকে খাওয়াইয়া বাড়ীর মেয়েরা অন্ন গ্রহণ করেন। দশবৎসর বয়সে ছেলেরা গুরুগৃহে যায়। গুরু দশ হইতে বিশ বৎসর পর্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষাদান করেন। তারপর তাহারা বাড়ীতে ফিরিয়া পারিবারিক পেশা অবলম্বন করে, অথবা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়। সে ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন অনবরত ভ্রমণ, ভগবৎ-সাধনা এবং ধর্মপ্রচারে কাটে। যে অশন-বসন লোকে স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে দেয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তাহারা টাকাকড়ি কখনও স্পর্শ করে না। বিবেকানন্দ এই শেষোক্ত শ্রেণীর। বৃদ্ধ বয়সে লোকে সংসার ত্যাগ করে এবং কিছুকাল শাস্ত্রপাঠ এবং তপস্যা করিয়া যদি

আত্মশুদ্ধি অনুভব করে, তখন তাহারাও ধর্মপ্রচারে লাগিয়া যায়। বক্তা বলেন যে, মানসিক উন্নতির জন্য অবসর প্রয়োজন। এদেশের আদিবাসীদের—যাহাদিগকে কলাম্বাস বর্বর অবস্থায় দেখিয়াছিলেন—তাহাদিগকে সুশিক্ষা না দিবার জন্য তিনি আমেরিকান জাতির সমালোচনা করেন। এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুক্ত রাখিয়াছেন।

একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা

'উইসকনসিন ষ্টেট জার্নাল' ২১ নভেম্বর, ১৮৯৩

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ম্যাডিসন শহরের কংগ্রীগেশনাল চার্চ-এ গতরাত্রে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উহা গভীর দার্শনিক চিন্তা এবং মনোজ্ঞ ধর্মভাবের ব্যঞ্জক। যদিও বক্তা একজন পৌত্তলিক, তবুও তাঁহার উপদেশাবলীর অনেকগুলি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারেন। তাঁহার ধর্মমত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত উদার। সব ধর্মকেই তিনি মানেন। যেখানেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে উন্মুখ। তিনি ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় ধর্মসমূহের গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অলস ক্রিয়াকাণ্ডের কোন স্থান নাই।

‘মিনিয়াপলিস্ ষ্টার’ ২৫ নভেম্বর ১৮৯৩

গতকল্য সন্ধ্যায় ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ (মিনিয়াপলিস্ শহরে) স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখান দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম চিরন্তন সত্যসমূহের মূর্ত প্রকাশ; সেইজন্য উহা স্বকীয় যাবতীয় সূক্ষ্ম ভাবরাশি দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল নরনারী ছিলেন, কেননা বক্তাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ‘পেরিপ্যাটেটিকস্’ নামক দার্শনিক সমিতি। নানা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক, বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ছাত্রেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিবে কানন্দ একজন ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক। তিনি তাঁহার দেশীয় পোষাকে আসিয়াছিলেন—মাথায় পাগড়ি, কোমরে লাল কটিবন্ধ দিয়া বাঁধা গৈরিক আলখাল্লা এবং অধোদেশেও লাল পরিচ্ছদ।

তিনি তাঁহার ধর্মের শিক্ষাগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত ধীর এবং স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিতেছিলেন, ত্বরিত বাগ্‌বিলাস অপেক্ষা শান্ত বাচনভঙ্গী দ্বারাই যেন তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার কথাগুলি খুব সাবধানে প্রযুক্ত। উহাদের অর্থও বেশ পরিষ্কার। হিন্দুধর্মের সরলতর সত্যগুলি তিনি তুলিয়া ধরিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোন কটূক্তি না করিলেও এমনভাবে উহার প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, যাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই পুরোভাগে রাখা হইতেছিল। হিন্দুধর্মের সর্বাবগাহী চিন্তা এবং মুখ্য ভাব হইল মানবাত্মার স্বাভাবিক দেবত্ব। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের এই সহজাত পূর্ণতাকে বিকাশ করা। বর্তমান শুধু অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী সীমারেখা। মানুষের ভিতর ভাল এবং মন্দ দুই প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। সৎ সংস্কার বলবান্ হইলে মানুষ ঊর্ধ্বতর গতি লাভ করে অসৎ সংস্কারের প্রাধান্যে সে নিম্নগামী হয়।

এই দুইটি শক্তি অনবরত তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, আর অধর্ম ঘটায় তাহার অধঃপতন।

কানন্দ আগামীকল্য সকালে ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন।

'ডে ময়েন নিউজ', ২৮ নভেম্বর, ১৮৯৩

সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আগত মনীষী পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ গত রাত্রে সেণ্ট্রাল চার্চ-এ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চিকাগোর বিশ্বমেলা উপলক্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসভায় তিনি তাঁহার দেশের ও ধর্মের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড এইচ. ও. ব্রীডেন বক্তাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। বক্তা উঠিয়া সমবেত সকলকে মাথা নীচু করিয়া অভিবাদনের পর তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। বিষয় ছিল—হিন্দুধর্ম। তাঁহার বক্তৃতা একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার নিজের ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে তিনি যে-সব দার্শনিক ধারণা পোষণ করেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় ঐ বক্তৃতাতেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান হইতে গেলে সকল ধর্মের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক। এক ধর্মে যাহা নাই, অপর ধর্ম হইতে তাহা লওয়া যায়। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রকৃত খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়। বিবেকানন্দ বলেন, 'তোমরা যখন আমাদের দেশে কোন মিশনরীকে পাঠাও, তিনি 'হিন্দু খ্রীষ্টানে' পরিণত হন, পক্ষান্তরে আমি তোমাদের দেশে আসিয়া 'খ্রীষ্টান হিন্দু' হইয়াছি।' আমাকে এই দেশে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আমি এখানে লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিব কিনা। এই প্রশ্ন আমি অপমানজনক বলিয়া মনে করি। আমি ধর্ম পরিবর্তনে বিশ্বাস করি না। আজ কোন ব্যক্তি পাপকার্যে রত আছে, তোমাদের ধারণা—কাল যদি সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সে সাধুত্ব লাভ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, এই পরিবর্তন কোথা হইতে আসে? ইহার ব্যাখ্যা কি? ঐ ব্যক্তির তো নূতন

একটি আত্মা হয় নাই, কেননা পূর্বের আত্মা মরিলে তবে তো নূতন আত্মার আবির্ভাবের কথা। বলিতে পার, ভগবান্ তাহার ভিতর পরিবর্তন আনিয়াছেন। ভাল, কিন্তু ভগবান্ তো পূর্ণ, সর্বশক্তিমান্ এবং পবিত্রতার স্বরূপ। তাহা হইলে প্রসঙ্গোক্ত ব্যক্তির খ্রীষ্টান হইবার পর ভগবান্ পূর্বের সেই ভগবানই থাকেন, কেবল যে পরিমাণ সাধুতা তিনি ঐ ব্যক্তিকে দিয়াছিলেন, উহা তাঁহাতে ঘাটতি পড়িবে।

আমাদের দেশে দুটি শব্দ আছে যাহার অর্থ এদেশে সম্পূর্ণ আলাদা। শব্দ দুটি হইল 'ধর্ম' এবং 'সম্প্রদায়'। আমাদের ধারণায় ধর্ম হইল সেই সার্বজনীন সত্য, যাহা সকল ধর্মমতের মধ্যেই অনুস্যূত। আমরা পরমত-অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর সব কিছুই সহ্য করি। অপর শব্দটি —'সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমতসমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির দল, যাঁহারা নিজদিগকে ধার্মিকতার আবরণে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে থাকেন, 'আমাদের মতই ঠিক, তোমরা ভুলপথে চলিতেছ।' ইঁহাদের প্রসঙ্গে আমার দুই ব্যাঙের গল্পটি মনে পড়িল।

কোন কুয়ায় একটি ব্যাঙের জন্ম হয়, বেচারা সারাজীবন ওখানেই কাটাইতে থাকে। একদিন সমুদ্রের এক ব্যাঙ ঐ কুয়ায় পড়িয়া যায়। দুইজনের গল্প শুরু হইল সমুদ্র লইয়া। কূপমণ্ডূক ঐ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, 'সমুদ্র কত বড়?' সাদাসিধা কোন উত্তর না পাইয়া সে তখন কুয়ার এক কোণ হইতে আর এক কোণে লাফ দিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সাগর অত বড় কিনা।' আগন্তুক বলিল, 'তা তো বটেই।' তখন কুয়ার ব্যাঙ আরও একটু বেশী দূর লাফাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তবে এত বড় কি?' সাগরের ব্যাঙ তখন উত্তর দিল 'হ্যাঁ', তখন কূপমণ্ডুক মনে মনে বলিল—'এই ব্যাঙটি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। আমি ওকে আমার কুয়ায় স্থান দিব না।' সম্প্রদায়গুলিরও এই একই অবস্থা। তাহাদের নিজেদের মত যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে তাহারা দূর করিয়া দিতে এবং পদদলিত করিতে চায়।
৪

হিন্দু সন্ন্যাসী

‘অ্যাপীল–অ্যাভালান্‌শ্‌’, ১৬ জানুআরী ১৮৯৪

স্বামী বিবে কানন্দ নামে যে হিন্দু সন্ন্যাসী আজ রাত্রে এখানকার (মেমফিস্ শহরের) বক্তৃতাগৃহে ভাষণ দিবেন, তিনি এদেশে অদ্যাবধি ধর্মসভায় বা বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বক্তাদের অন্যতম। তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা, অতীন্দ্রিয় বিষয়ে গভীর উপলব্ধি, তর্কপটুতা এবং উদার আন্তরিকতা বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের প্রখর মনোযোগ এবং সহস্র সহস্র নরনারীর প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

তারপর হইতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে তিনি বক্তৃতা-সফর করিয়াছেন এবং লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

বিবে কানন্দ কথোপকথনে অতিশয় অমায়িক ভদ্রলোক। ভাষায় তিনি যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা ইংরেজী ভাষার রত্নবিশেষ। তাঁহার চালচলন অত্যন্ত সুসংস্কৃত পাশ্চাত্য শিষ্টাচার ও রীতিনীতির সমকক্ষ। মানুষ হিসাবে তাঁহার সাহচর্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং কথাবার্তায় পাশ্চাত্য জগতের যে-কোন শহরের বৈঠকখানায় তিনি বোধ করি অপরাজেয়। তিনি শুধু প্রাঞ্জলভাবে নয় অনর্গলভাবেও ইংরেজী বলিয়া যান, আর তাঁহার অভিনব দীপ্তিমান্ ভাবরাশি আলঙ্কারিক ভাষায় চমকপ্রদ প্রবাহে যেন তাঁহার জিহ্বা হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী বিবে কানন্দ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণজনোচিত শিক্ষাদীক্ষায় পালিত হন, কিন্তু পরে তিনি জাতি ও কুলমর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মযাজক বা প্রাচ্যদেশের আদর্শে যাহাকে ‘সন্ন্যাসী’ বলা হয়, তাহাই হন। তিনি বরাবরই ঈশ্বর সম্বন্ধে মহত্তম ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই ধারণার অঙ্গীভূত রহস্যময়

বিশ্বপ্রকৃতির চৈতন্যাত্মকতায় বিশ্বাসী। বিবে কানন্দ বহু বৎসর ভারতবর্ষে উচ্চতর বিদ্যার সাধনায় এবং প্রচারে কাটাইয়াছেন। ইহার ফলে তিনি এমন প্রগাঢ় জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন যে, এই যুগের মহান্ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের অন্যতম বলিয়া তাঁহার পৃথিবীময় খ্যাতি।

বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে তাঁহার আশ্চর্য প্রথম বক্তৃতাটি তৎক্ষণাৎ সমবেত বিশিষ্ট ধর্মনায়কদের মধ্যে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল। সম্মেলনের অধিবেশনসমূহে তাঁহার ধর্মের সপক্ষে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। মানুষের ও তাহার স্রষ্টার প্রতি মানুষের উচ্চতর কর্তব্য-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহার মুখ হইতে এমন কতকগুলি কথা বাহির হইয়াছিল, যাহা ইংরেজী ভাষার অতি মূল্যবান্ মনোজ্ঞ দার্শনিক সম্পদ। চিন্তায় তিনি একজন শিল্পী, বিশ্বাসে অধ্যাত্মবাদী এবং বক্তৃতামঞ্চে সুনিপুণ নাট্যকার বিশেষ।

মেমফিস্ শহরে পৌঁছিবার পর হইতে তিনি মিঃ হু. এল. ব্রিঙ্কলীর অতিথিরূপে রহিয়াছেন। ওখানে দিবারাত্র তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উৎসুক শহরের বহু ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি টেনেসী ক্লাবেরও একজন বেসরকারী অতিথি। শনিবার সন্ধ্যায় মিসেস এস. আর. শেফার্ড কর্তৃক তাঁহার জন্য একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। রবিবারে কর্ণেল আর বি. স্নোডেন তাঁহার অ্যানিসডেল-এর গৃহে এই মাননীয় অতিথিকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ওখানে বিবে কানন্দের সহিত সহকারী বিশপ টমাস এফ. গেলর, রেভারেণ্ড ডক্টর জর্জ প্যাটারসন এবং আরও অনেক ধর্মযাজকের সাক্ষাৎ হয়।

গতকল্য বিকালে র‍্যান‍্ডলফ বিল্ডিং-এ অবস্থিত নাইণ্টিন্থ্ সেঞ্চুরী ক্লাবের কার্যালয়ে ঐ ক্লাবের কেতাদুরস্ত সভ্যদের নিকট তিনি একটি বক্তৃতা দেন। আজ রাত্রে শহরের বক্তৃতাগৃহে তাঁহার ভাষণের বিষয়বস্তু হইবে—‘হিন্দুধর্ম’।

পরমত-সহিষ্ণুতার জন্য অনুনয়

'মেমফিস্ কমার্শিয়াল', ১৭ জানুআরী, ১৮৯৪

বেশ কিছু-সংখ্যক শ্রোতা গতরাত্রে প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম- বিষয়ক ভাষণ শুনিবার জন্য শহরের বক্তৃতাগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন।

বিচারপতি আর. জে. মর্গ্যান বক্তাকে পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ ভাষণে মহান্ আর্যজাতির ক্রমপ্রসারের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ইওরোপীয়গণ এবং হিন্দুরা উভয়েই আর্যজাতির শাখা, অতএব যিনি আজ তাঁহাদের কাছে বক্তৃতা দিবেন, তাঁহার আমেরিকাবাসীর সহিত জাতিগত আত্মীয়তা রহিয়াছে।

প্রাচ্যদেশের এই খ্যাতিমান্ পণ্ডিতকে বক্তৃতাকালে ঘন ঘন করতালি দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। সকলেই আগাগোড়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনেন। বক্তার শারীরিক আকৃতি বড় সুন্দর, গায়ের রঙ ব্রোঞ্জবর্ণ, দেহের অঙ্গসৌষ্ঠবও চমৎকার। তাঁহার পরিধানে ছিল কোমরে কালো কটিবন্ধ-বেষ্টিত পাটলবর্ণের আলখাল্লা, কালো পেণ্টালুন এবং মাথায় কমনীয় ভাবে জড়ান ভারতীয় রেশমের পীতবর্ণ পাগড়ি। বক্তার বলিবার ধরন খুব ভাল এবং তাঁহার ব্যবহৃত ইংরেজী ভাষা শব্দনির্বাচন, ব্যাকরণের শুদ্ধতা এবং বাক্যগঠনের দিক্ দিয়া উৎকৃষ্ট। তাঁহার উচ্চারণের ত্রুটি শুধু কখনও কখনও যৌগিক শব্দের যে অংশে জোর দিবার কথা নয়, সেখানে জোর দেওয়া। তবে সম্ভবতঃ মনোযোগী শ্রোতারা সব শব্দই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৌলিক চিন্তায় ভরা, তথ্যপূর্ণ এবং উদার জ্ঞানে অনুস্যূত বক্তৃতাটি শুনিয়া তাঁহাদের এই প্রখর মনোযোগ নিশ্চিতই সার্থক হইয়াছিল। এই ভাষণটিকে যথার্থই বিশ্বজনীন পরধর্ম-সহিষ্ণুতার সপক্ষে একটি 'অনুনয়' বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বক্তা ভারতীয় ধর্মসংক্রান্ত

নানা মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, পরমত-সহিষ্ণুতা এবং প্রেমই হইল প্রধান প্রধান ধর্মের মুখ্য উদ্দীপনা। তাঁহার মতে ইহাই যে-কোন ধর্মবিশ্বাসের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাঁহার ভাষণে হিন্দুধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবতারণা ছিল না। ঐ ধর্মের কিংবদন্তী বা আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ চিত্র উপস্থাপিত না করিয়া তিনি উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার একটি বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশেষ মতবাদ ও ক্রিয়াকর্মের তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তবে এইগুলির অতি স্পষ্ট সরল ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছিলেন। বক্তা হিন্দুধর্মের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন। জন্মান্তরবাদ—যাহা অনেক সময়ে অপব্যাখ্যাত হয়—এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হইতেই উদ্ভূত। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, কিভাবে তাঁহার ধর্ম কালের বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া সর্বকালে বর্তমান মানবাত্মার সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। সব মানুষই যেমন আত্মার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তেমনি আত্মার অতীত অবস্থাও স্বীকার করেন। বিবে কানন্দ ইহাও স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, খ্রীষ্টধর্মে যাহাকে 'আদিম পাপ' বলা হয়, হিন্দুধর্মে উহার কোন স্থান নাই। মানুষ যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে—এই বিশ্বাসের উপর হিন্দুধর্ম মানুষের সকল চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করে। বক্তার মতে উন্নতি এবং শুদ্ধি আশার উপর স্থাপিত হওয়া বিধেয়। মানুষের উন্নতির অর্থ তাহার স্বাভাবিক পূর্ণতায় ফিরিয়া যাওয়া। সাধুতা এবং প্রেমের অভ্যাস দ্বারাই এই পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরিয়া এই গুণগুলি কিভাবে অভ্যাস করিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ কিভাবে নিপীড়িত জনগণের আশ্রয়ভূমি হইয়াছে, বক্তা তাহা নির্ণয় করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, রোম সম্রাট্ টাইটাস যখন জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া য়াহুদীদের মন্দির ধ্বংস করেন, তখন হিন্দুরা য়াহুদীদের সাদরে আশ্রয় দিয়াছিল।

বক্তা খুব প্রাঞ্জল বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুরা ধর্মের বহিরঙ্গের উপর বেশী ঝোঁক দেন না। কখনও কখনও দেখা যায়, একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রত্যেকেই ঈশ্বরের যে প্রধানতম গুণ—প্রেম, উহারই মাধ্যমে উপাসনা করিয়া থাকেন। বক্তা বলেন যে, সকল ধর্মেই ভাল জিনিষ আছে; সাধুতার প্রতি মানুষের যে উদ্দীপনাবোধ, সব ধর্মই হইল তাহার অভিব্যক্তি, অতএব প্রত্যেক ধর্মই শ্রদ্ধার যোগ্য। এই বিষয়টির উদাহরণস্বরূপ তিনি বেদের (?) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। একটি ঝরনা হইতে জল আনিতে বিভিন্ন লোকে যেমন বিভিন্ন গঠনের পাত্র লইয়া যায়, ধর্মসমূহও সেইরূপ সত্যকে উপলব্ধির বিভিন্ন আধারস্বরূপ। পাত্রের আকার আলাদা হইলেও লোকে যেমন একই জল উহাতে ভরিয়া লয়, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের মাধ্যমে আমরা একই সত্য গ্রহণ করি। ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের মর্মবোদ্ধা। যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকা হউক, যে কোন রীতিতেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা হউক, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন।

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টানরা যে-ঈশ্বরের পূজা করেন, হিন্দুদেরও উপাস্য তিনিই। হিন্দুদের ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কার্যের নির্ণায়ক মাত্র। ঈশ্বরের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ঐক্যবদ্ধ না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মূর্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অবশ্যই কিছু দুর্বলতা, তবে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মনীতি এইরূপ স্থূলভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। এই একই কারণে হিন্দুরা ভগবানের দৈবী গুণসমূহ নানা দেবদেবীর স্থূল প্রতিমার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চায়।

হিন্দুদের অবতারবাদ-প্রসঙ্গে বক্তা কৃষ্ণের কাহিনী বলেন। পুরুষসংসর্গ ব্যতীত তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্টের চরিতকথার সহিত তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের অনেক সাদৃশ্য আছে। বিবে কানন্দের মতে কৃষ্ণের শিক্ষা হইল, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—এই তত্ত্ব।

ঈশ্বরকে ভয় করা যদি ধর্মের আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহার পরিণতি হইল ঈশ্বরকে ভালবাসা।

তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, কিন্তু উহা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃপ্রেম উপলব্ধির জন্য একটি চমৎকার আবেদন এবং একটি রমণীয় ধর্মবিশ্বাসের ওজস্বী সমর্থন। বিবে কানন্দের ভাষণের উপসংহার বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যখন তিনি বলিলেন যে, খ্রীষ্টকে স্বীকার করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, তবে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকেও প্রণিপাত করা চাই; আর যখন মানব-সভ্যতার বর্বরতার একটি পরিষ্কার ছবি আঁকিয়া তিনি বলিলেন, সভ্যতার এই-সকল গ্লানির জন্য যীশুখ্রীষ্টকে দায়ী করিতে তিনি রাজী নন।

'অ্যাপীল অ্যাভাল্যাঞ্চ', ২১ জানুআরী, ১৮৯৪

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ গতকল্য বিকালে লা স্যালেট একাডেমীতে (মেমফিস্ শহরে) একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন শ্রোতৃসংখ্যা খুব কম ছিল।

বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতীয় আচার ব্যবহার'। বিবে কানন্দের ধর্মবিষয়ক চিন্তাধারা এই শহরের এবং আমেরিকার অন্যান্য নগরীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিত্তে সহজেই সমাদর লাভ করিতেছে।

তাঁহার মতবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের গোঁড়া বিশ্বাসের পক্ষে মারাত্মক। খ্রীষ্টান আমেরিকা এ-যাবৎ পৌত্তলিক ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে আলোকিত করিবার প্রভূত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, কানন্দের ধর্মের প্রাচ্য বিভব আমাদের পিতৃপিতামহের উপদিষ্ট প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের সৌন্দর্যকে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং উহা আমেরিকার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মহলের অনেকের মনে একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে।

বর্তমানকাল হইল 'খেয়ালের' যুগ। মনে হইতেছে যে, কানন্দ একটি 'বহুকালের অনুভূত চাহিদা' মিটাইতে পারিতেছেন। তিনি বোধ করি, তাঁহার দেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং আশ্চর্য পরিমাণে ব্যক্তিগত আকর্ষণ-শক্তিরও অধিকারী। তাঁহার বাগ্মিতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যায়। যদিও তাঁহার মতবাদ খুব উদার, তবুও গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মে প্রশংসা করিবার মত বস্তু সামান্যই তিনি দেখিতে পান। এ পর্যন্ত মেমফিস্ শহরে যত বক্তা বা ধর্মযাজক আসিয়াছেন, মনে হয় কানন্দ তাঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা বেশী সমাদর বিশেষভাবে লাভ করিয়াছেন।

এই হিন্দু সন্ন্যাসী এখানে যেরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা পাইতেছেন,

ভারতে খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি সেরূপ পাইতেন, তাহা হইলে অ-খ্রীষ্টান দেশসমূহে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের কাজ খুব সুগম হইত। বিবেকানন্দের গতকল্য বিকালের বক্তৃতা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ দিয়া চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বদেশের প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস এবং রীতিনীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান এবং বিষয়সমূহের বর্ণনা খুব সুষ্ঠু ও সহজভাবে দিতে পারেন।

বক্তৃতার সময় মহিলা শ্রোতারা তাঁহাকে ঘন ঘন প্রশ্ন করিতেছিলেন। তিনিও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। কেবল জনৈক মহিলা যখন তাঁহাকে একটি অবান্তর ধর্মপ্রসঙ্গে টানিয়া আনিতে চাহিয়া একটি প্রশ্ন তুলিলেন, তখন কানন্দ আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া উহার উত্তর দিতে রাজী হন নাই। প্রশ্নকর্ত্রীকে বলিলেন, অন্য কোন সময়ে তিনি 'আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ' প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মত বিবৃত করিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে; আর তাঁহার পিতার আঠার বৎসর বয়সে। বক্তা নিজে বিবাহ করেন নাই। সন্ন্যাসীর বিবাহ করিতে বাধা নাই, কিন্তু বিবাহ করিলে তাঁহার স্ত্রীকেও সন্ন্যাসিনী হইতে হয়। সন্ন্যাসিনী স্ত্রীর ক্ষমতা, সুবিধা এবং সামাজিক সম্মান তাঁহার স্বামীরই মত।
৫

একটি প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলেন, ভারতে কোন কারণেই বিবাহ-বন্ধন ছেদের প্রচলন নাই, তবে বিবাহের ১৪ বৎসর পরেও সন্তান না হইলে স্ত্রীর অনুমতি লইয়া স্বামী আর একটি বিবাহ করিতে পারেন। স্ত্রী আপত্তি করিলে ইহা সম্ভব নয়। বক্তা ভারতের প্রাচীন মন্দির এবং সমাধিস্তম্ভসমূহের অতি চমৎকার বর্ণনা দেন। বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালের ভাস্কর এবং শিল্পীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

বর্তমানকালের কারিগরদের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল।

স্বামী বিবে কানন্দ আজ রাত্রে ওয়াই. এম. এইচ. হলে এই শহরে তাঁহার শেষ বক্তৃতা করিবেন। তিনি চিকাগোর 'স্লেটন লাইসিআম ব্যুরো'-র সহিত এই দেশে তিন বৎসরের জন্য বক্তৃতাদানের একটি চুক্তি করিয়াছেন। কাল তিনি চিকাগো রওনা হইবেন। ২৫ তারিখ রাত্রিতে ওখানে তাঁহার একটি বক্তৃতা দিবার কথা।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গত সন্ধ্যায় বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দের দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইউনিটি ক্লাবের উদ্যোগে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশীয় পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার কমনীয় মুখমণ্ডল এবং বলিষ্ঠ দেহ তাঁহার চেহারায় একটি সম্ভ্রান্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রখর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ঘন ঘন করতালি পড়িতেছিল। বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিল—'ভারতের আচার-ব্যবহার'। উহা তিনি উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের দেশের 'ইণ্ডিয়া' এবং দেশবাসীর 'হিন্দু' নাম ঠিক নয়। উহা বিদেশীদের উদ্ভাবিত। তাঁহাদের দেশের প্রকৃত নাম 'ভারত' এবং অধিবাসীরা 'ব্রাহ্মণ'। প্রাচীনকালে তাঁহাদের কথ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। প্রত্যেকটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত পরিষ্কার বোধগম্য অর্থ ছিল, কিন্তু এখন সে-সব চলিয়া গিয়াছে। জুপিটার শব্দের সংস্কৃত অর্থ 'স্বর্গস্থ পিতা'। বর্তমানকালে উত্তর ভারতের সব ভাষাই মোটামুটি একপ্রকার; কিন্তু উত্তর ভারতের লোক দক্ষিণ ভারতে গেলে তথাকার লোকের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে না। ফাদার মাদার, সিষ্টার ব্রাদার প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি শুনিতে অনেকটা একই রকম। বক্তা বলেন, এই কারণে এবং অন্যান্য তথ্যের প্রমাণ হইতেও তাঁহার মনে হয়, আমরা সকলেই একটি সাধারণ সূত্র—আর্যজাতি

হইতে উদ্ভূত। এই আদিম আর্যজাতির প্রায় সব শাখাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সমাজে চারটি শ্রেণীবিভাগ ছিল—পুরোহিত, রাজা ও সৈনিক, বণিক ও শিল্পী এবং শ্রমিক ও ভৃত্য। প্রথম তিন শ্রেণীর বালকগণকে যথাক্রমে দশ, এগার এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য গুরুকুলে অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে পাঠান হইত এবং তাহাদিগকে ত্রিশ, পঁচিশ ও কুড়ি বৎসর পর্যন্ত সেখানে থাকিতে হইত। প্রাচীনকালে বালক ও বালিকা উভয়ের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখন বালকদেরই সুযোগ বেশী। অবশ্য দীর্ঘকালের এই ভুলটি শুধরাইবার চেষ্টা চলিতেছে। বৈদেশিক অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষের দর্শন এবং নীতি-নিয়মাদির অনেক অংশ প্রাচীনকালে নারীদের দ্বারা প্রণীত। হিন্দুসমাজে নারীর স্বকীয় অধিকার আছে। এই অধিকার তাঁহারা বজায় রাখেন। তাঁহাদের স্বপক্ষে আইনও রহিয়াছে।

গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ছাত্রেরা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিত। সংসারের দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই এবং উভয়েরই নিজস্ব অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে কন্যা অনেক সময় নিজের পতি নিজেই মনোনয়ন করিত; কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতাই ঐ ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানকালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানটি বড় সুন্দর। বর এবং কন্যা পরস্পর পরস্পরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া ভগবান্ এবং সমবেত সকলকে সাক্ষী মানিয়া শপথ করে যে, একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে। বিবাহ না করা পর্যন্ত কেহ পুরোহিত হইতে পারে না। প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিবার সময় পুরুষের সহিত তাহার পত্নীও যায়। হিন্দুরা এই পাঁচটিকে কেন্দ্র করিয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যথা—দেবতা পিতৃপুরুষ দরিদ্র, ইতর প্রাণী এবং ঋষি বা শাস্ত্র। হিন্দুগৃহস্থের বাড়ীতে যতক্ষণ সামান্য কিছুও থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অতিথিকে ফিরিয়া যাইতে হয় না।

অতিথির পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন শেষ হইলে গৃহের শিশুরা খায়, তারপর তাহাদের পিতা এবং সর্বশেষে জননী। হিন্দুরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জাতি; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া কখনও কেহ ক্ষুধায় মারা যায় না। সভ্যতা এক বিরাট কীর্তি। তুলনাস্বরূপ বলা হয় যে, ইংলণ্ডে যদি প্রতি চারিশত ব্যক্তির মধ্যে একজন মদ্যপায়ী থাকে তো ভারতে ঐ অনুপাতে প্রতি দশ লক্ষে একজন। বক্তা মৃত ব্যক্তির শবদাহ-অনুষ্ঠানের একটি বর্ণনা দেন। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্র ছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রচার করা হয় না। পনর দিন উপবাসের পর মৃতের আত্মীয়েরা পূর্বপুরুষদের নামে দরিদ্রদিগকে অর্থাদি দান করেন অথবা জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নৈতিক আদর্শের দিক্ দিয়া হিন্দুরা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা প্রভূত উন্নততর।

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৬ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

মানরা যখন জেরুজালেম ধ্বংস করে, তখন বহু সহস্র য়াহুদী ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করে। আরবগণ কর্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু সহস্র পারসীকও ভারতে আশ্রয় পায়, কেহই নিপীড়িত হয় নাই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে—সকল ধর্মই সত্য। তবে তাহাদের ধর্ম অপর ধর্মসমূহ অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইংরেজ মিশনরীদের প্রথম দলটিকে ইংরেজ সরকার যখন জাহাজ হইতে ভারতে নামিতে বাধা দেন, তখন একজন হিন্দুই তাঁহাদের হইয়া দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে নামিতে সাহায্য করেন। যাহা সব কিছু মানিয়া লয়, তাহাই তো ধর্মবিশ্বাস। বক্তা অন্ধের হস্তী দর্শনের সহিত ধর্মমতের তুলনা করেন। এক একজন অন্ধ হাতীর দেহের এক একটি অংশ স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া হাতী কি রকম, তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া প্রত্যেকের উক্তিই সত্য হইলেও হাতীর সামগ্রিক বর্ণনা তো কোনটি হইতেই পাওয়া যায় নাই। হিন্দু দার্শনিকরা বলেন, 'সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।' সব মানুষ কোন এক সময় একই রীতিতে চিন্তা করিবে, ইহা যাঁহারা আশা করেন তাঁহারা অলস স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে ধর্মের মৃত্যু ঘটিবে। প্রত্যেক ধর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, আর প্রত্যেকটি দল দাবী করে যে, উহাই সত্য এবং অপরেরা ভ্রান্ত। বৌদ্ধধর্মে অপর মতাবলম্বীদের উপর নিপীড়ন অবিদিত। বৌদ্ধধর্মই প্রথম নানা দেশে প্রচারক পাঠায় এবং বলিতে পারে যে, লক্ষ লক্ষ লোককে এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়া স্বমতে আনিয়াছে। নানা দোষ এবং কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা কখনও অন্যের উপর অত্যাচার করে নাই। বক্তা জানিতে চান, নানা খ্রীষ্টান দেশের সর্বত্র যে-সর্ব অসাম্য রহিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা ঐগুলি অনুমোদন করেন কিভাবে?

ইভনিং নিউজ, ১৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

‘আমি আমার ধর্মের প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইব—নিউজ-পত্রিকার এই অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।’—এই কাগজের জনৈক প্রতিনিধি বিবে কানন্দকে ঐ-বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি দেখাইলে তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ আমি অলৌকিক ঘটনা লইয়া কাজ করি না, আর দ্বিতীয়তঃ আমি যে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত, উহা অলৌকিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অলৌকিক ঘটনা বলিয়া কিছু আমরা মানি না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাহিরে আশ্চর্য অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ঐগুলি কোন-না-কোন নিয়মের অধীন। আমাদের ধর্মের সহিত ঐগুলির কোন সম্পর্ক নাই। যে-সব আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ ভারতবর্ষে করা হয় বলিয়া বৈদেশিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়, ঐগুলির অধিকাংশই হইল হাতের চাল বা সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবজনিত চোখের ভ্রম। যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কখনও ঐ-সব করেন না। তাঁহারা কখনও পয়সার জন্য হাটে বাজারে এই-সব তুকতাক দেখাইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান না। যাঁহারা যথার্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং শুধু বালসুলভ কৌতূহলাক্রান্ত নয়, তাঁহারা ঐ-সকল জ্ঞানী-পুরুষের দেখা পান এবং তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন।

মানুষের দেবত্ব

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৮ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

হিন্দু দার্শনিক এবং পুরোহিত স্বামী বিবে কানন্দ গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ 'মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা বা ধর্মব্যাখ্যান-মালার উপসংহার করিয়াছেন। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্যদেশীয় এই ভ্রাতার (এই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা তিনি পছন্দ করেন) বক্তৃতামঞ্চে আসিবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই সমগ্র গীর্জাটি দরজা পর্যন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ে ভরিয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর ও বৃত্তির লোকই ছিলেন—আইনজীবী, বিচারক, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, একজন য়াহুদী ধর্মযাজক এবং মহিলাদের তো কথাই নাই। মহিলারা বার বার উপস্থিত হইয়া এবং প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁহার ভাষণ শুনিয়া এই শ্যামবর্ণ আগন্তুককে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ অর্পণ করিবার সুস্পষ্ট প্রবণতা প্রমাণ করিয়াছেন। বক্তা ভদ্রলোকদিগের বসিবার ঘরে বসিয়া আলাপ আলোচনায় যেমন সকলকে আকর্ষণ করিতে পারেন, সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়াও সেইরূপ পারেন।

গতরাত্রের বক্তৃতা পূর্বেকারগুলি হইতে কম বর্ণনামূলক ছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বিবে কানন্দ মানবীয় এবং ঐশ্বরিক ব্যাপার লইয়া তত্ত্ববিদ্যার একটি আস্তরণ বুনিয়া চলেন। তাঁহার কথাগুলি এত যুক্তিসঙ্গত যে, বিজ্ঞানকে তিনি সাধারণ বুদ্ধির মত সরল করিয়া তুলেন। ন্যায়গর্ভ ভাষণটি যেন প্রাচ্য গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত তাঁহার স্বদেশে হাতে-বোনা এবং অতি চমৎকার নানা রঙের একটি বস্ত্রের মতই সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ী। শিল্পী যেমন তাঁহার চিত্রে নিপুণভাবে নানা রঙ ব্যবহার করেন, এই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকও তাঁহার ভাষণে সেইরূপ কাব্যময় উপমা প্রয়োগ করেন। যেখানে যেটি মানায় ঠিক সেখানে সেইটি তিনি বসাইয়া যান। উহার

প্রতিক্রিয়া কিছু অদ্ভুত ঠেকিলেও উহার একটি আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। চলচ্চিত্রের মত পর পর দ্রুত তাঁহার যুক্তিপ্রতিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত হইতেছিল, আর এই কুশলী বক্তার শ্রমও মাঝে মাঝে শ্রোতৃবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ করতালি দ্বারা সার্থকতা লাভ করিতেছিল।

বক্তৃতার পূর্বে ঘোষণা হয় যে, বক্তার নিকট অনেকগুলি প্রশ্ন আনা হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আলাদা দেওয়াই ভাল মনে করেন। তবে তিনটি প্রশ্ন তিনি বাছিয়া রাখিয়াছেন, ঐগুলির প্রত্যুত্তর বক্তৃতামঞ্চ হইতেই দিবেন। প্রশ্নগুলি এইঃ

(১) ভারতের লোকেরা কি তাহাদের শিশু-সন্তানদের কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করে?

(২) জগন্নাথের রথের চাকার নীচে পড়িয়া কি তাহারা মৃত্যুবরণ করে?

(৩) মৃত স্বামীর সহিত কি তাহারা জীবিত বিধবাকেও জোর করিয়া দাহ করে?

বিদেশে একজন আমেরিকানকে নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা দৌড়াদৌড়ি করে কিনা—এই বিষয়ে, অথবা আমেরিকা সম্বন্ধে ইওরোপে এখনও পর্যন্ত প্রচলিত এই ধরনের আজগুবি খবর সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে তিনি যেভাবে ঐ-সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন, বক্তা বিবে কানন্দ প্রথম প্রশ্নটির জবাব সেই ভাবেই দিলেন। অর্থাৎ প্রশ্নটি এতই আজগুবী যে, উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন সরল কিন্তু অজ্ঞ লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হিন্দুরা শুধু স্ত্রী-শিশুই কেন কুমীরদের মুখে দেয়?—ইহার উত্তরে বিবে কানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, উহার কারণ বোধ করি এই যে, স্ত্রী-শিশুদের মাংস বেশী নরম আর ঐ আজব দেশের নদীতে যে-সব হিংস্র জলজন্তু থাকে, তাহারা ঐরূপ মাংস

সহজে হজম করিতে পারে। জগন্নাথ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্বন্ধে বক্তা ঐ তীর্থস্থানের দীর্ঘকাল প্রচলিত রথযাত্রা ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, খুব সম্ভবতঃ কখনও কোন কোন অত্যুৎসাহী ভক্ত রথসংলগ্ন দড়িটি ধরিতে এবং টানিতে গিয়া পা পিছলাইয়া চাকার নীচে পড়িয়া মারা গিয়া থাকিবে। এইরূপ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে পরে নানা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ-সব শুনিয়া অন্য দেশের সহৃদয় লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

হিন্দুরা জীবিত বিধবাদের অগ্নিসাৎ করে—বিবে কানন্দ ইহা অস্বীকার করেন। তবে ইহা সত্য যে, কখনও কখনও কোন বিধবা নিজে স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন। এরূপ যখন ঘটিয়াছে, তখন পুরোহিত এবং সাধুসন্তেরা তাঁহাদিগকে ঐ কার্য হইতে বিরত থাকিতে পীড়াপীড়ি করিয়াছেন; কেননা ইঁহারা সকলেই আত্মহত্যার বিরোধী।

সকলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও যদি পতিব্রতা বিধবা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্য জিদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি ‘অগ্নিপরীক্ষা’ দিতে হইত। তিনি অগ্নিশিখায় প্রথমে হাত ঢুকাইয়া দিতেন। যদি হাত পুড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর সহিত সহমরণের ইচ্ছায় আর বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই তো একমাত্র দেশ নয়, যেখানে প্রেমিকা নারী প্রেমাস্পদের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত অমৃতলোকে অনুগমন করিয়াছেন। এই ধরনের মৃত্যুবরণ প্রত্যেক দেশেই হইয়াছে। যে-কোন দেশে ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিক ধর্মোন্মত্ততা। অন্যত্র যেরূপ, ভারতেও উহা ঐরূপই অস্বাভাবিক। বক্তা পুনরায় বলেন, ‘না, ভারতবাসী নারীদের পুড়াইয়া মারে না। পাশ্চাত্যদেশের মত তাহারা কখনও ডাইনীদেরও দগ্ধ করে নাই।’

অতঃপর বক্তৃতার প্রকৃত বিষয়ে আসিয়া বিবে কানন্দ প্রথমে মানব-জীবনের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেন। শরীর বাহিরের খোসা মাত্র; মনও একটি ক্রিয়াশীল বস্তুবিশেষ, ইহার কাজ খুব ত্বরিত এবং রহস্যময়; একমাত্র আত্মাই সুস্পষ্ট ব্যক্তি-সত্তা। আত্মার অন্তরস্বরূপের জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয়। আমরা যাহাকে 'পরিত্রাণ' বলি হিন্দুরা উহাকে বলেন 'মুক্তি'। বেশ বলবান্ যুক্তিসহায়ে বক্তা প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক আত্মাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। আত্মা যদি কোন কিছুর অধীন হইত, তাহা হইলে উহা কখনও অমরত্ব লাভ করিতে পারিত না। কোন ব্যক্তি কিভাবে আত্মার স্বাধীনতা ও অমরত্বের প্রত্যাক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার উদাহরণস্বরূপ বক্তা তাঁহার দেশের একটি উপকথা বর্ণনা করেন।

আসন্নপ্রসবা এক সিংহী একটি মেষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় বাচ্চা প্রসব করিয়া ফেলে এবং পরে মারা যায়। সিংহশাবকটিকে তখন এক মেষী স্তন্য পান করাইয়া বাঁচায়। শাবকটি মেষের দলে বাড়িতে থাকে। নিজেকে সে মেষ বলিয়া মনে করিত এবং আচরণও ঠিক মেষের ন্যায়ই করিত। একদিন আর একটি সিংহ আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে একটি জলাশয়ের নিকট লইয়া যায়। জলে সে নিজের প্রতিবিম্ব অপর সিংহের মত দেখিয়া বুঝিল—সে মেষ নয়, সিংহ। তখন সে সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। আমাদের অনেকেরই দশা ঐ ভ্রান্ত সিংহ-মেষের ন্যায়।

নিজদিগকে 'পাপী' মনে করিয়া আমরা কোণে লুকাইয়া থাকি এবং যত প্রকারে সম্ভব হীন আচরণ করিয়া চলি। নিজেদের আত্মার পূর্ণতা ও দেবত্ব আমরা দেখিতে পাই না। নরনারীর যে 'আমি', উহাই আত্মা। আত্মা যদি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, তাহা হইলে অনন্ত পূর্ণ স্বরূপ হইতে ব্যষ্টিগত বিচ্ছিন্নতা আসিল কিরূপে?—হ্রদের জলে সূর্যের যেমন আলাদা আলাদা অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, ঠিক সেই ভাবে। সূর্য

এক, কিন্তু প্রতিবিম্ব-সূর্য বহু। মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, কিন্তু নানা দেহে প্রতিবিম্ব-আত্মা বহু। বিম্ব-স্বরূপ পরমাত্মার অব্যাহত স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ দেহেই। এই প্রসঙ্গে বক্তা সুইডনবর্গের দর্শন ও ধর্মের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেন। হিন্দু বিশ্বাসসমূহের সহিত এই আধুনিক সাধু মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সম্বন্ধ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল সুইডনবর্গ যেন প্রাচীন এক হিন্দু ঋষির ইওরোপীয় উত্তরাধিকারী—যিনি এক সনাতন সত্যকে বর্তমান কালের পোষাক পরাইয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক (বালজাক?) তাঁহার 'পূর্ণ আত্মা'র উদ্দীপনাময় প্রসঙ্গের মধ্যে এই ধরনের চিন্তাধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরিপূর্ণতা বিদ্যমান। তাহার শারীরিক সত্তার অন্ধকার গুহাগুলির ভিতর উহা যেন শুইয়া আছে। যদি বল, ভগবান্ তাঁহার পূর্ণতার কিছু অংশ মানুষকে দেন বলিয়াই মানুষ সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, পরম দেবতা ভগবানের পূর্ণতা হইতে পৃথিবীর মানুষকে প্রদত্ত ততটা অংশ বাদ গেল। বিজ্ঞানের অব্যর্থ নিয়ম হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে পূর্ণতা নিহিত, আর এই পূর্ণতাকে লাভ করার নামই মুক্তি—ব্যক্তিগত অনন্ততার উপলব্ধি। প্রকৃতি, ঈশ্বর, ধর্ম—তিনই তখন এক।

সব ধর্মই ভাল। এক গ্লাস জলের মধ্যে যে বাতাসের বুদ্বুদটি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, উহা চেষ্টা করে বাহিরের অনন্ত বায়ুর সহিত যুক্ত হইতে। বাতাসের বুদ্বুদটি যদি তেল, ভিনিগার বা এইরূপ অন্যান্য বিভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট তরল পদার্থে আটক পড়ে, তাহা হইলে উহার মুক্তির চেষ্টা তরল পদার্থটির ঘনত্ব অনুযায়ী কম বেশী ব্যাহত হয়। জীবাত্মাও সেইরূপ বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়া উহার স্বকীয় অনন্ততা লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে। আচার-ব্যবহার, পারিপার্শ্বিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ুর প্রভাব—এই-সব দিক্ বিচার করিয়া

কোন এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম হয়তো সর্বাপেক্ষা উপযোগী। অনুরূপ কারণে আর একটি ধর্ম অপর এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে প্রশস্ত। বক্তার সিদ্ধান্তগুলির চুম্বক বোধ করি এই যে, যাহা কিছু আছে, সবই উত্তম। কোন একটি জাতির ধর্মকে হঠাৎ পরিবর্তন করিতে যাওয়া যেন—আল্পস্ পর্বত হইতে প্রবহমানা একটি নদীকে দেখিয়া কেন উহা তাহার বর্তমান পথটি লইয়াছে, সেই বিষয়ে সমালোচনা করা। আর এক ব্যক্তি হয়তো অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, হিমালয় হইতে নিঃসৃতা একটি খরস্রোতা নদী হাজার হাজার বৎসর যে-পথে বহিয়া চলিয়াছে, ঐ পথ উহার পক্ষে স্বল্পতম এবং সুষ্ঠুতম পথ নয়।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ঈশ্বরকে আমাদের পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোথাও উপবিষ্ট একজন ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করেন। কাজেই যে-স্বর্গে সোনার রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে নীচের মর্ত্যলোকের দিকে তাকাইয়া স্বর্গ-মর্ত্যের পার্থক্য বুঝা যায় না, এমন স্বর্গে তিনি স্বস্তিবোধ করিতে পারেন না। যাহাকে খ্রীষ্টানরা আচরণের ‘স্বর্ণোজ্জ্বল নীতি’
৬
বলিয়া থাকেন, উহার পরিবর্তে হিন্দুরা এই নীতিতে বিশ্বাস করেন যে, যাহা কিছু ‘অহং’শূন্য তাহাই ভাল; এবং ‘আমিত্ব’-মাত্রই খারাপ, আর এই বিশ্বাস দ্বারা যথাকালে মানুষ তাহার আত্মার অনন্ত স্বরূপ ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। বিবে কানন্দ বলেন, তথাকথিত 'সোনার নীতি'টি কী ভয়ানক অমার্জিত! সর্বদাই ‘আমি, আমি’।

অন্যের নিকট হইতে তুমি নিজে যেরূপ আচরণ চাও, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ কর! ইহা এক ভীষণ বর্বরোচিত ক্রূর নীতি, কিন্তু বক্তা খ্রীষ্টধর্মের এই মতবাদের নিন্দা করিতে চান না, কেননা যাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট, তাহারা ইহার সহিত নিজদিগকে বেশ মানাইয়া লইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে বিপুল জলধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, উহাকে বহিতে দেওয়াই কর্তব্য। যিনি উহার গতিকে পরিবর্তিত

করিতে চাইবেন, তিনি নির্বোধ। প্রকৃতিই প্রয়োজনমত সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। বিবে কানন্দ বেশ জোর দিয়াই বলেন যে, প্রেততত্ত্ববাদী বা অদৃষ্টবাদী—ইঁহারা সকলেই ভাল এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণকে ধর্মান্তরিত করিবার তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা বেশ ভালই করিতেছেন। তিনি যে হিন্দু, ইহাও উত্তম। তাঁহার দেশে বিভিন্ন স্তরের মেধাবিশিষ্ট লোকের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মমত প্রচলিত আছে। সবটা মিলিয়া একটি ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম আমিত্বকে বড় করে না। ইহার আকাঙ্ক্ষাসমূহ কখনও মানুষের অহমিকাকে জড়াইয়া নয়, ইহা কখনও পুরস্কারের আশা বা শাস্তির ভয় তুলিয়া ধরে না। হিন্দুধর্ম বলে, ব্যক্তি-মানব তাহার 'অহং'কে বর্জন করিয়া অনন্তত্ব লাভ করিতে পারে।

মানুষকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রলোভিত করিবার রীতি—ভগবান্ স্বয়ং পৃথিবীর একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রকট হইয়া ইহা প্রবর্তন করিয়াছেন বলা হইয়া থাকে—বস্তুতঃ অতি নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহরূপে দুর্নীতিজনক। ধর্মান্ধগণ খ্রীষ্টীয় মতবাদ যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের নৈতিক স্বভাবের উপর একটি লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে আত্মার অনন্ততা উপলব্ধির সময় পিছাইয়া যায়।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৮ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবে কানন্দ বলেন যে, ভারতে ধর্ম বা সামাজিক নিয়মের বশে বিধবাদের কখনও জোর করিয়া জীবন্ত দাহ করা হয় নাই। এই ঘটনাগুলির সব ক্ষেত্রেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। পূর্বে ভারতের একজন সম্রাট্ সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ পরে উহা আবার প্রচলিত হয়। অবশেষে ইংরেজ সরকার উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। সকল ধর্মেই একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ধর্মোন্মাদ। ইহা

খ্রীষ্টধর্মে যেমন, হিন্দুধর্মেও তেমনি। ভারতে এমন সব ধর্মোন্মাদ দেখা যায়, যাহারা তপশ্চরণের নামে দিনের পর দিন সর্বক্ষণ মাথার উপরে হাত তুলিয়া রাখে। দীর্ঘকাল ঐরূপ করিবার ফলে হাতটি ক্রমে অসাড় হইয়া যায় এবং আজীবন ঐ অবস্থায় থাকে। কেহ কেহ ব্রত গ্রহণ করে—একভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার। ক্রমে ইহাদের শরীরের নীচের দিকে সম্পূর্ণ অবশ হইয়া যায় এবং উহারা আর হাঁটিতে পারে না।

সব ধর্মই সত্য। মানুষ নৈতিকতা অনুশীলন করে, কোন দৈবাদেশের জন্য নয়, উহা ভাল বলিয়াই করে। হিন্দুরা ধর্মান্তরিত-করণে বিশ্বাস করে না। বক্তা বলেন, উহা অপচেষ্টা। অধিকাংশ ধর্মের পিছনে কত ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা রহিয়াছে। অতএব কোন এক ধর্মপ্রচারকের পক্ষে অন্য ধর্মাবলম্বী কাহারও ধর্মবিশ্বাসসমূহকে ভুল বলিয়া ঘোষণা করা কী নির্বুদ্ধিতা! ইহা যেন কোন এশিয়াবাসীর আমেরিকায় আসিয়া মিসিসিপি নদীর গতিপথ দেখিবার পর ঐ নদীকে ডাকিয়া বলা, 'তুমি সম্পূর্ণ ভুল পথে প্রবাহিত হইতেছ। তোমাকে উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে।' আবার আমেরিকাবাসী কেহ যদি আল্পস্ পর্বতে গিয়া জার্মান সাগরে পড়িতেছে এমন কোন নদীকে বলে যে, তাহার গতিপথ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এবং ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল নূতন নির্দেশ অনুসারে প্রবাহিত হওয়া—তাহা হইলে উহাও একই প্রকার নির্বুদ্ধিতা হইবে। বক্তা বলেন যে, খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'সোনার নিয়ম' বলেন, উহা মাতা বসুন্ধরার মতই পুরাতন। নৈতিকতার যাবতীয় বিধানেরই উৎপত্তি এই নিয়মটির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মানুষ তো স্বার্থপরতার একটি পুঁটলি বিশেষ।

বক্তা বলেন যে, পাপীরা নরকাগ্নিতে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে—এই মতবাদ সম্পূর্ণ অর্থহীন। দুঃখ রহিয়াছে, ইহা যখন জানা কথা, তখন পূর্ণ সুখ কি করিয়া সম্ভব? বক্তা কোন কোন তথাকথিত ধার্মিক

ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার রীতিকে বিদ্রূপ করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দু চোখ বুজিয়া অন্তরাত্মার উপাসনা করে, কিন্তু কোন কোন খ্রীষ্টানকে প্রার্থনার সময় তিনি কোন একটি দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, যেন স্বর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট ভগবানকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন! ধর্মের ব্যাপারে দুটি চরম হইল—ধর্মান্ধ এবং নাস্তিক। যে নাস্তিক, তাহার কিছু ভাল দিক্ আছে, কিন্তু ধর্মান্ধের বাঁচিয়া থাকা শুধু তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'টার জন্যই। জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি বক্তাকে যীশুর হৃদয়ের একটি ছবি পাঠাইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে তিনি ধন্যবাদ দিতেছেন, তবে তাঁহার মতে, ইহা গোঁড়ামির অভিব্যক্তি। ধর্মান্ধকে কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। তাহারা একটি অভিনব বস্তুবিশেষ।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ২১ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গত রাত্রে বিবে কানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রথম ইউনিটেরিয়ান চার্চে খুব ভিড় হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী আসিয়াছিলেন জেফারসন এভিনিউ এবং উডওয়ার্ড এভিনিউ-এর উত্তরাংশ হইতে। তাঁহাদের অধিকাংশই মহিলা। ইঁহারা বক্তৃতাটিতে খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, মনে হইল। ব্রাহ্মণ বক্তার অনেকগুলি মন্তব্য সোৎসাহে হর্ষধ্বনি দ্বারা এই মহিলারা সমর্থন করিতেছিলেন।

বক্তা যে-প্রেমের বিষয় আলোচনা করিলেন, উহা যৌন আকর্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবাবেগ নয়। ভারতে ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরের জন্য যে নিষ্কলুষ পবিত্র অনুরাগ বোধ করেন, উহা সেই ভালবাসা। বিবে কানন্দ তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে আলোচ্য বিষয়টি এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ ‘ভারতীয় তাহার ভগবানের জন্য যে প্রীতি অনুভব করে।’ কিন্তু বলিবার সময় তিনি এই ঘোষিত বিষয়ের সীমার মধ্যে থাকেন নাই। বরং বক্তৃতার বেশীর ভাগ ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ। ভারতীয়ের ধর্ম এবং ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ছিল উহার গৌণ অংশ। বক্তৃতার অনেক বিষয় ভারতেতিহাসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কতকগুলি প্রাসঙ্গিক কাহিনীর সাহায্যে বিশদীকৃত হয়। এই কাহিনীগুলির পাত্র ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাটগণ, হিন্দুরাজগণ নয়।

বক্তা ধর্মাচার্যগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন—জ্ঞানমার্গের পথিক ও ভক্তিপথের অনুগামী। প্রথম শ্রেণীর জীবনের লক্ষ্য হইল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দ্বিতীয়ের ভগবৎপ্রেম। বক্তা বলেন, প্রেম হইল আত্মত্যাগ। প্রেম কিছু গ্রহণ করে না সর্বদাই দিয়া যায়। হিন্দু ভক্ত ভগবানের কাছে কোন কিছু চায় না, মুক্তি বা পারলৌকিক সুখের জন্য কখনও

প্রার্থনা করে না। সে তাহার সকল চেতনা অনুরাগের গাঢ় উল্লাসে প্রেমাস্পদ ভগবানের প্রতি নিযুক্ত করে। ঐ সুন্দর অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর তখনই, যখন মানুষ ভগবানের জন্য গভীর অভাব বোধ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তায় ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন।

ঈশ্বরকে আমরা তিনভাবে ধারণা করিতে পারি। একটি হইল— তাঁহাকে এক বিরাট ক্ষমতাবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করা এবং মাটিতে পড়িয়া তাঁহার মহিমার স্তুতি করা। দ্বিতীয়ঃ তাঁহাকে পিতৃদৃষ্টিতে ভক্তি করা। ভারতে পিতাই সব সময় সন্তানদের শাসন করেন। সেই জন্য পিতার উপর ভক্তিশ্রদ্ধায় খানিকটা ভয়ও মিশিয়া থাকে। আরও একটি ভাব হইল ভগবানকে 'মা' বলিয়া চিন্তা করা। ভারতে জননী সর্বদাই যথার্থ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই ঈশ্বরের প্রতি মাতৃভাব ভারতে খুব স্বাভাবিক।

কানন্দ বলেন যে, যথার্থ ভক্ত ভগবদনুরাগে এত বিভোর থাকেন যে অপর ধর্মাবলম্বীদের নিকট গিয়া তাহারা ভুল পথে ঈশ্বর সাধনা করিতেছে, ইহা বলিবার এবং তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় তাঁহার নাই।

ডেট্রয়েট জার্নাল, ২১ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

'একটি শখ মাত্র।'—

আধুনিক কালের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই বিবে কানন্দের অভিমত! ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ, যিনি এই ডেট্রয়েট শহরে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন, যদি আরও এক সপ্তাহ এখানে থাকিতে রাজী হন, তাহা হইলে শহরের বৃহত্তম হলঘরটিতেও তাঁহার আগ্রহশীল শ্রোতৃমণ্ডলীর স্থান কুলাইবে না। তিনি এখানে দস্তুরমত একটি আকর্ষণ হইয়া পড়িয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান

চার্চের প্রত্যেকটি আসন ভরিয়া যায়; বহু লোককে বাধ্য হইয়া বক্তৃতার সারা সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভগবৎপ্রেম'। প্রেমের সংজ্ঞা তিনি দিলেন—'যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, যাহাকে ভালবাসি তাহার স্তুতি ও ভজনা ব্যতীত যাহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।' বক্তা বলেন, প্রেম এমন একটি গুণ, যাহা বিনীতভাবে পূজা করিয়া যায় এবং প্রতিদানে কিছুই চায় না। ভগবৎপ্রেম জাগতিক ভালবাসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাড়া ভগবানকে আমরা চাই না। বক্তা নানা গল্প ও উদাহরণ দ্বারা দেখান, আমাদের ভগবদর্চনার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি কিভাবে নিহিত থাকে। বক্তা বলেন, খ্রীষ্টীয় বাইবেলের সর্বাপেক্ষা চমৎকার অংশ হইল 'সলোমনের গীতি'; তবে তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এই অংশকে বাইবেল হইতে বাদ দিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বক্তা শেষের দিকে যেন এক প্রকার চূড়ান্ত যুক্তিস্বরূপ বলিলেন, 'ইহা হইতে কতটা লাভ আদায় করিতে পারি'—এই নীতির উপরই আমাদের ঈশ্বর-প্রেম স্থাপিত দেখা যাইতেছে। ভগবানকে ভালবাসিবার সহিত খ্রীষ্টানদের এত স্বার্থবুদ্ধি জড়িত থাকে যে, তাহারা সর্বদাই তাঁহার নিকট কিছু না কিছু চাহিয়া থাকে। নানাপ্রকারের ভোগ-সামগ্রীও তাহার অন্তর্ভুক্ত। অতএব বর্তমানকালের ধর্ম একটা শখ ও ফ্যাশন মাত্র, আর মানুষ ভেড়ার পালের মত গীর্জায় ভিড় করে।

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ২৫ মার্চ, ১৮৯৪

কানন্দ গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে-এ 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি প্রাচীন ভারতের নারীগণের প্রসঙ্গে বলেন যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা দেখান হইয়াছে। অনেক নারী ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা তখন ছিল খুবই প্রশংসনীয়। প্রাচ্যের নারীগণকে প্রতীচ্যের আদর্শে বিচার করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে নারী হইলেন পত্নী, প্রাচ্যে তিনি জননী। হিন্দুরা মাতৃভাবের পূজারী। সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননীর সম্মুখে ভূমিতে কপাল ঠেকাইয়া সম্মান দেখাইতে হয়। ভারতে পবিত্রতার স্থান খুব উঁচুতে। কানন্দ এখানে যে-সব ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সকলে উহা খুব পছন্দ করিয়াছেন।

ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ, ২৫ মার্চ, ১৮৯৪

গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে-এ স্বামী বিবে কানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল—'প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগে ভারতীয় নারী'। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে নারীকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। নারীর সমগ্র জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁহাকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা; আদর্শ মাতা হইতে গেলে তাহাকে খুব পবিত্র থাকিতে হইবে। ভারতে কোন জননী কখনও তাহার সন্তানকে ত্যাগ করে নাই। বক্তা বলেন, ইহার বিপরীত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন। ভারতের মায়েরা যদি আমেরিকান তরুণীদের মত শরীরের অর্ধেক ভাগ যুবকদের কুদৃষ্টির সামনে খুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইত, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইত। বক্তা ইচ্ছা করেন যে, ভারতকে তাহার নিজস্ব আদর্শে বিচার করা উচিত, এই দেশের আদর্শে নয়।

স্বামী বিবে কানন্দের ডেট্রয়েটে অবস্থান কালে নানা কথোপকথনে তিনি ভারতীয় নারীগণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি যে-সব তথ্য উপস্থাপিত করেন, তাহাতে শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় এবং ঐ বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিবার অনুরোধ আসে। কিন্তু তিনি বক্তৃতার সময় কোন স্মারকলিপি না রাখায় ভারতীয় নারী সম্বন্ধে পূর্বে ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় যে-সব বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা ঐ বক্তৃতায় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ কিছুটা নিরাশ হন, কিন্তু তাঁহার মহিলা শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক তাঁহার অপরাহ্নের কথোপকথনের কিছু প্রসঙ্গ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা এখন হইতে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হইতেছেঃ

আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্যগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর খাঁটি ব্রাহ্মণ-জাতি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে স্বপ্নেও এই উন্নত মানবগোষ্ঠীর ধারণা করা অসম্ভব। চিন্তায় কাজে এবং আচরণে ইঁহারা অতিশয় শুচি। ইঁহারা এত সাধুপ্রকৃতির যে, একথলি সোনা যদি প্রকাশ্যে পড়িয়া থাকে তো তাঁহাদের কেহ উহা লইবেন না। কুড়ি বৎসর পরেও ঐ থলিটি একই জায়গায় পাওয়া যাইবে। এই ব্রাহ্মণদের শারীরিক গঠনও অতি চমৎকার। কানন্দের নিজের ভাষায়ঃ 'ক্ষেতে কর্মনিরতা ইঁহাদের একটি কন্যাকে দেখিলে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়, আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে হয়—ভগবান্ এমন অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিমা কি করিয়া গড়িলেন!' এই ব্রাহ্মণদের অবয়ব-সংস্থান সুসম্বদ্ধ, চোখ ও চুল কৃষ্ণবর্ণ এবং গায়ের রঙ—আঙুল ছুঁচবিদ্ধ করিলে উহা হইতে একটি রক্তবিন্দু যদি এক গ্লাস দুধে পড়ে, তাহা হইলে যে রঙ সৃষ্ট হয়, সেই রঙের। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের ইহাই বর্ণনা।

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারের আইন-কানুন সম্বন্ধে বক্তা বলেন, বিবাহের সময় স্ত্রী যে যৌতুক পান, উহা সম্পূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; উহাতে স্বামীর কখনও মালিকানা থাকে না। স্বামীর সম্মতি বিনা আইনতঃ তিনি উহা বিক্রয় বা দান করিতে পারেন। সেইরূপ অন্য সূত্রে, তথা স্বামীর নিকট হইতেও তিনি যে-সকল অর্থাদি পান, উহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, তাঁহার ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন।

স্ত্রীলোক বাহিরে নির্ভয়ে বেড়াইয়া থাকেন। চারি পাশের লোকদের উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। হিমালয়ে পর্দাপ্রথা নাই। ওখানে এমন অঞ্চল আছে যেখানে মিশনরীরা কখনও পৌঁছিতে পারেন না। এইসব গ্রাম খুবই দুর্গম। অনেক চড়াই করিয়া এবং পরিশ্রমে ঐ-সকল জায়গায় পৌঁছান যায়। এখানকার অধিবাসীরা কখনও মুসলমান-প্রভাবে আসে নাই। খ্রীষ্টধর্মও ইহাদের নিকট অজানা।

ভারতের অরণ্যে এখনও কিছু কিছু বনবাসী অসভ্য লোক দেখা যায়। তাহারা অত্যন্ত বর্বর, এমন কি নরমাংসভোজী। ইহারাই দেশের আদিম অধিবাসী এবং কখনও আর্য বা হিন্দু হয় নাই। আর্যগণ ভারতে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিলে এবং দেশের ভূভাগে ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ নানাপ্রকার বিকৃতি প্রবেশ করে। সূর্যতাপও ছিল প্রচণ্ড। খর রৌদ্রে অনেকের গায়ের রঙ ক্রমশঃ কালো হইয়া যায়। হিমালয়পর্বতবাসী শ্বেতকায় লোকের উজ্জ্বল বর্ণ সমতলভূমির হিন্দুদের তাম্রবর্ণে পরিবর্তিত হওয়া তো কেবলমাত্র পাঁচ পুরুষের ব্যাপার। কানন্দের একটি ভাই আছেন, তিনি খুব ফর্সা, আবার দ্বিতীয় আর একটি ভাই-এর রঙ কানন্দের চেয়ে ময়লা। তাঁহার পিতামাতা গৌরবর্ণ। মুসলমানদের অত্যাচার হইতে নারীদের রক্ষা করার জন্যই নিষ্ঠুর পর্দাপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। গৃহে আবদ্ধ থাকিবার দরুন হিন্দু রমণীদের গায়ের রঙ পুরুষদের অপেক্ষা পরিষ্কার। কানন্দের বয়স একত্রিশ বৎসর।

কানন্দ চোখের কোণে ঈষৎ কৌতুক মিশাইয়া বলেন যে, আমেরিকান পুরুষদের দেখিয়া তিনি আমোদ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়ান যে, স্ত্রীজাতি তাঁহাদের পূজার পাত্র, কিন্তু তাঁহার মতে আমেরিকানরা পূজা করেন রূপ ও যৌবনকে। তাঁহাদিগকে কখনও তো বলিরেখা বা পক্ক কেশের সহিত প্রেমে পড়িতে দেখা যায় না! বক্তা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দৃঢ় ধারণা এই যে, এক সময়ে বৃদ্ধা নারীদের পোড়াইয়া মারিবার জন্য মার্কিন পুরুষদের পুরুষানুক্রমে পাওয়া একটি কৌশল ছিল। বর্তমান ইতিহাস ইহার নাম দিয়াছে—ডাইনী-দহন। পুরুষরাই ডাইনীদের অভিযুক্ত করিত, আর সাধারণতঃ অভিযুক্তার জরাই ছিল তাহার প্রাণদণ্ডের কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, জীবন্ত নারীকে দগ্ধ করা শুধু যে একটি হিন্দুরীতি, তাহা নয়। বক্তার মতে খ্রীষ্টীয় গীর্জার তরফ হইতে এক সময়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের অগ্নিদগ্ধ করা হইত, ইহা স্মরণ রাখিলে হিন্দু বিধবাদের সহমরণ-প্রথার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য সমালোচকদের আতঙ্ক কম হইবে।

উভয় দাহের তুলনা

হিন্দু বিধবা যখন মৃত পতির সহিত স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতেন, তখন ভুরিভোজন এবং সঙ্গীতাদিসহ একটি উৎসবের পরিবেশ সৃষ্ট হইত। মহিলা নিজে তাঁহার সর্বাপেক্ষা দামী বস্ত্র পরিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, স্বামীর সহিত সহমরণে তাঁহার নিজের এবং পরিবারবর্গের স্বর্গলোকে গতি হইবে। আত্মবলিদাত্রীরূপে তাঁহাকে সকলে পূজা করিত এবং তাঁহার নাম পরিবারের বিবরণীতে গৌরবান্বিত হইয়া থাকিত।

সহমরণ-প্রথা আমাদের নিকট যত নৃশংসই মনে হউক, খ্রীষ্টীয় সমাজের ডাইনী-দহনের তুলনায় ইহার একটা উজ্জ্বল দিক্ রহিয়াছে। যে-স্ত্রীলোককে ডাইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইত, গোড়া হইতেই তাহাকে পাপী সাব্যস্ত করা হইত। তারপর একটি বদ্ধ কারাকক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া পাপ স্বীকারের জন্য চলিত নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং ঘৃণিত বিচার-প্রহসন। অবশেষে শাস্তিদাতাদের হর্ষধ্বনির মধ্যে বেচারীকে টানিয়া বধ্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। বলপূর্বক অগ্নিদাহের যন্ত্রণার মধ্যে তাহার সান্ত্বনা থাকিত শুধু দর্শকবৃন্দের আশ্বাস যে, মৃত্যুর পর অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার আত্মার ভাগ্যে ভবিষ্যতের যে ভীষণতর কষ্ট লেখা আছে, বর্তমান কষ্ট শুধু তাহার সামান্য একটি নিদর্শন।

কানন্দ বলেন যে, হিন্দুরা মাতৃ-ভাবটির পূজা করিতে শিক্ষা পায়। মায়ের স্থান পত্নীর ঊর্ধ্বে। মা হলেন আরাধনার পাত্রী। হিন্দুদের মনে ঈশ্বরের পিতৃভাব অপেক্ষা মাতৃভাবটিই বেশী স্থান পায়।

ভারতে কোন জাতির স্ত্রীলোককেই অপরাধের জন্য কঠিন শারীরিক শাস্তি দেওয়ার বিধান নাই। হত্যা-অপরাধ করিলেও নারী প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। বরং অপরাধিনীকে গাধার পিঠে লেজের দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া রাস্তায় ঘুরান হয়। একজন ঢোল পিটাইয়া তাহার অপরাধ উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া যায়; পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার এই অবমাননাকেই যথেষ্ট শাস্তি এবং ভবিষ্যতে অপরাধের পুনরাবৃত্তির প্রতিষেধক বলিয়া মনে করা হয়। অপরাধিনী প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলে নানা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গিয়া অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পায় এবং এইভাবে সে পুনরায় শুচি হইতে পারে। অথবা সে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশপূর্বক যথার্থ নিষ্পাপ জীবন লাভ করিতে পারে।

মিঃ কানন্দকে প্রশ্ন করা হয় যে, এইভাবে অপরাধিনী নারী সন্ন্যাসী-আশ্রমে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলে এবং সমাজ-শাসন এড়াইয়া গেলে পবিত্র ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ভণ্ডামির স্থান দেওয়া হয় কিনা। কানন্দ উহা স্বীকার করিলেন, তবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জনসাধারণ ও সন্ন্যাসীর মধ্যে অপর কেহ অন্তর্বর্তী নাই। সন্ন্যাসী সকল জাতির গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের কোন হিন্দুকে হয়তো স্পর্শ করিবেন না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহা হইলে অত্যন্ত অভিজাত ব্রাহ্মণও তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে সঙ্কুচিত হইবেন না।

গৃহস্থেরা সন্ন্যাসীর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে, তবে যতক্ষণ

পর্যন্ত তাহার সাধুতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস আছে। সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ধরা পড়িলে তাহাকে সকলে মিথ্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার জীবন তখন অধম ভিক্ষুকের জীবন মাত্র। কেহ তাহাকে আর শ্রদ্ধা করে না।

নারী রাজা অপেক্ষাও অধিক সম্মান ও সুবিধা ভোগ করেন। যখন গ্রীক পণ্ডিতেরা হিন্দুজাতির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, তখন সকল গৃহের দ্বারই তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন তাহাদের তরবারি এবং ইংরেজগণ তাহাদের গুলিগোলা লইয়া দেখা দিল, তখন সব দরজাই বন্ধ করা হইল। এই ধরনের অতিথিকে কেহ স্বাগত জানায় নাই। কানন্দ যেমন মিষ্ট করিয়া বলেন, 'যখন বাঘ আসে, তখন আমরা আমাদের দরজা জানালা বন্ধ রাখি, যতক্ষণ না বাঘ চলিয়া যায়।'

কানন্দ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা তাঁহাকে বহুতর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য উদ্দীপনা দিয়াছে, তবে আমাদের তথা জগতের নিয়তি আজিকার আইন-প্রণেতার উপর অপেক্ষা করিতেছে না, উহা অপেক্ষা করিতেছে নারীজাতির উপর। কানন্দের উক্তিঃ 'তোমাদের দেশের মুক্তি দেশের নারীগণের উপরই নির্ভর করে।'

ধর্মে দোকানদারি

[মিনিয়াপলিস্ শহরে ১৮৯৩ খ্রীঃ, ২৬ নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতার 'মিনিয়াপলিস্ জার্নাল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ।]

চিকাগো ধর্ম-মহাসভার খ্যাতিমান্ ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম-ব্যাখ্যান হইতে কিছু শিখিতে উদ্‌গ্রীব শ্রোতৃমণ্ডলী গতকল্য সকালে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ ভিড় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে এই শহরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন 'পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব'। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বক্তৃতা হয়। গতকল্যকার বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

প্রারম্ভিক প্রার্থনার পর ধর্মযাজক ডক্টর এইচ. এম. সিমন্‌স্‌—'বিশ্বাস, আশা এবং দান' সম্বন্ধে সেণ্ট পলের উক্তি পাঠ করেন। সেণ্ট পল যে বলিয়াছেন, 'ইহাদের ভিতর দানই হইল সর্বোত্তম'—ইহার সমর্থনে ডক্টর সিমন্‌স্‌ ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের একটি শিক্ষা, মোসলেম ধর্মমতের একটি বচন এবং হিন্দু সাহিত্য হইতে কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। এই উক্তির সহিত সেণ্ট পলের কথার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রার্থনা সঙ্গীতের পর স্বামী বিবেকান্দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি বক্তৃতামঞ্চের ধারে আসিয়া দাঁড়ান এবং গোড়াতেই একটি হিন্দু উপাখ্যান বলিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে তিনি বলেনঃ

তোমাদিগকে আমি পাঁচটি অন্ধের একটি গল্প বলিব। ভারতের কোন গ্রামে একটি শোভাযাত্রা চলিতেছে। উহা দেখিবার জন্য অনেক লোকের ভিড় হইয়াছে। বহু আড়ম্বরে সুসজ্জিত একটি হাতী ছিল সকলের বিশেষ আকর্ষণ। সকলেই খুব খুশী। পাঁচজন অন্ধও দর্শকের

সারির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা তো চোখে দেখিতে পায় না, তাই ঠিক করিল হাতীকে স্পর্শ করিয়া বুঝিয়া লইবে জানোয়ারটি কেমন। ঐ সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইল। শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে সকলের সহিত তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন হাতীর সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হইল।

একজন বলিল, 'হাতী হইতেছে ঠিক দেওয়ালের মত।' দ্বিতীয় বলিল, 'না, তা তো নয়, উহা হইল দড়ির মত।' তৃতীয় অন্ধ কহিল, 'দূর, তোমার ভুল হইয়াছে, আমি যে নিজে হাত দিয়া দেখিয়াছি, উহা ঠিক সাপের মত।' আলোচনায় উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল, তখন চতুর্থ অন্ধ বলিল যে, হাতী হইল ঠিক যেন একটি বালিশ। ক্রুদ্ধ বাদপ্রতিবাদে অবশেষে পঞ্চম অন্ধ মারামারি শুরু করিল। তখন একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধুগণ ব্যাপার কি?' ঝগড়ার কারণ বলা হইলে আগন্তুক কহিল, 'মহাশয়রা, আপনাদের সকলের কথাই ঠিক। মুশকিল এই যে, আপনারা হাতীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করিয়াছেন। হাতীর পাশ হইল দেওয়ালের মত। লেজকে তো দড়ি মনে হইবেই। উহার শুঁড় সাপের মত বলা চলে, আর যিনি পায়ের পাতা ছুঁইয়া দেখিয়াছেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, হাতী বালিশের মত। এখন আপনারা ঝগড়া থামান। বিভিন্ন দিক্ দিয়া হাতীর সম্বন্ধে আপনারা সকলেই সত্য কথা বলিয়াছেন।'

বক্তা বলেনঃ ধর্মেও এই ধরনের মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্যের লোক মনে করে, তাহারাই একমাত্র ঈশ্বরের খাঁটি ধর্মের অধিকারী; আবার প্রাচ্যদেশের লোকেরও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অনুরূপ গোঁড়ামি বিদ্যমান। উভয়েরই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মেই রহিয়াছেন।

প্রতীচীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তা অনেক স্পষ্ট সমালোচনা করেন।

তাঁহার মতে খ্রীষ্টানদের মধ্যে ‘দোকানদারী’ ধর্মের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের প্রার্থনাঃ হে ঈশ্বর আমাকে ইহা দাও, উহা দাও; হে প্রভু তুমি আমার জন্য ইহা কর, উহা করা। হিন্দু ইহা বুঝিতে পারে না। তাহার বিবেচনায় ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া ভুল। কিছু না চাহিয়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বরং উচিত দেওয়া। ঈশ্বরের নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাকে এবং মানুষকে যথাসাধ্য দান করা—ইহাতেই হিন্দুর অধিকতর বিশ্বাস। বক্তা বলেন, তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যে অনেকেই যখন সময় ভাল চলিতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বেশ সচেতন, কিন্তু দুর্দিন আসিলে তাঁহাকে আর মনে থাকে না। পক্ষান্তরে হিন্দু ঈশ্বরকে দেখেন ভালবাসার পাত্ররূপে। হিন্দুধর্মে ভগবানের পিতৃভাবের ন্যায় মাতৃত্বের স্বীকৃতি আছে, কারণ ভালবাসার সুষ্ঠুতর পরিণতি ঘটে মাতাপুত্রের সম্বন্ধের মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান সারা সপ্তাহ টাকা রোজগারের জন্য খাটিয়া চলে, ইহাতে সফল হইলে সে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলে, ‘হে প্রভু, তুমি যে এই টাকা দিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’ তারপর যাহা কিছু সে রোজগার করিয়াছে, সবটাই নিজের পকেটে ফেলে। হিন্দু কি করে? সে টাকা উপার্জন করিলে দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের সেবা করে।

বক্তা এইভাবে প্রাচী এবং প্রতীচীর ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা করেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দীর উক্তির নিষ্কর্ষঃ তোমরা পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা মনে কর ঈশ্বরকে কবলিত করিয়াছ। ইহার অর্থ কি? ভগবানকে যদি তোমরা পাইয়াই থাকিবে, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে এত অপরাধ-প্রবণতা কেন? দশজনের মধ্যে নয়জন এত কপট কেন? ভগবান্ যেখানে, সেখানে কপটাচার থাকিতে পারে না। ভগবানের উপাসনার জন্য তোমাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ রহিয়াছে, সপ্তাহে একদিন ওখানে কিছু সময় তোমরা কাটাইয়াও আস, কিন্তু কয়জন তোমরা বাস্তবিকই ভগবানকে পূজা করিতে যাও? পাশ্চাত্যে গীর্জায় যাওয়া একটা ফ্যাশন-বিশেষ এবং তোমাদের

অনেকেরই গীর্জায় যাওয়ার পিছনে অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসী তোমাদের ভগবানের উপর বিশেষ অধিকারের কোন দাবী থাকিতে পারে কি?

এই সময় বক্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। বক্তা বলিতে থাকেনঃ আমরা হিন্দুধর্মাবলম্বীরা প্রেমের জন্য ভগবানকে ডাকায় বিশ্বাস করি। তিনি আমাদিগকে কি দিলেন সেজন্য নয়, তিনি প্রেমস্বরূপ বলিয়াই তাঁহাকে ভালবাসি। কোন জাতি বা সমাজ বা ধর্ম যতক্ষণ প্রেমের জন্য ভগবানকে আরাধনা করিতে ব্যগ্র না হইতেছে, ততক্ষণ উহারা ঈশ্বরকে পাইবে না। প্রতীচ্যে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় খুব করিতকর্মা, প্রাচ্যে আমরা ক্রিয়াপটু ধর্মে। তোমাদের দক্ষতা বাণিজ্যে, আমাদের ধর্মে। তোমরা যদি ভারতে গিয়া ক্ষেতে মজুরদের সহিত আলাপ কর, দেখিবে রাজনীতিতে তাহাদের কোন মতামত নাই। ঐ সম্বন্ধে তাহারা একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কথা কও, দেখিবে উহাদের মধ্যে যে দীনতম, সেও একেশ্বরবাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি ধর্মের সব মতের বিষয় জানে। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ‘তোমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কি রকম?’ সে বলিবে, ‘অতশত বুঝি না, আমি খাজনা দিই এই পর্যন্ত, আর কিছু জানি না।’ আমি তোমাদের শ্রমিক এবং কৃষকদের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি, তাহারা রাজনীতিতে বেশ দুরস্ত। তাহারা হয় ডেমোক্রাট, নয় রিপাবলিকান এবং রৌপ্যমান বা স্বর্ণমান কোন্‌টি তাহারা পছন্দ করে, তাহাও বলিতে পারে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহারা ভারতীয় কৃষকদের মতই বলিবে—‘জানি না’। একটি নির্দিষ্ট গীর্জায় তাহারা যায়, কিন্তু ঐ গীর্জার মতবাদ কি, তাহা তাহাদের মাথায় ঢুকে না। গীর্জায় নিজেদের সংরক্ষিত আসনের জন্য তাহারা ভাড়া দেয়—এই পর্যন্তই তাহারা জানে।

ভারতবর্ষে যে নানা প্রকারের কুসংস্কার আছে, বক্তা তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুলেন, ‘কোন্ জাতি কুসংস্কার হইতে

মুক্ত?’ উপসংহারে বক্তা বলেনঃ প্রত্যেক জাতি ভগবানকে তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতিরই ঈশ্বরের উপর দাবী আাছে। সৎপ্রবৃত্তি মাত্রই ঈশ্বরের প্রকাশ। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে মানুষকে শিখিতে হইবে ‘ভগবানকে চাওয়া’। এই চাওয়াকে বক্তা, জলমগ্ন ব্যক্তি যে প্রাণপণ চেষ্টায় বাতাস চায়, তাহার সহিত তুলনা করেন। বাতাস তাহার চাই-ই, কারণ বাতাস ছাড়া সে বাঁচিতে পারিবে না। পাশ্চাত্যবাসী যখন এইভাবে ভগবানকে চাহিতে পারিবে, তখনই তাহারা ভারতে স্বাগত হইবে, কেননা প্রচারকেরা তখন আসিবেন যথার্থ ভগবদ্ভাব লইয়া, ভারত ঈশ্বরবিমুখ—এই ধারণা লইয়া নয়। তাঁহারা আসিবেন যথার্থ প্রেমের ভাব বহন করিয়া, কতকগুলি মতবাদের বোঝা লইয়া নয়।

মানুষের নিয়তি

[মেমফিস্ শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৭ জানুআরী প্রদত্ত ভাষণের চুম্বক। ১৮ জানুআরী ‘অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত।]

শ্রোতৃসমাগম মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। শহরের সেরা সাহিত্যরসিক ও সঙ্গীতামোদীরা, তথা আইন এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা কোন কোন আমেরিকান বাগ্মী হইতে একটি বিষয়ে স্বতন্ত্র। গণিতের অধ্যাপক যেমন ছাত্রদের কাছে বীজগণিতের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় ধাপে ধাপে বুঝাইয়া দেন, ইনিও তেমনি তাঁহার বিষয়বস্তু সুবিবেচনার সহিত ধীরে ধীরে উপস্থাপিত করেন। কানন্দ
৭
নিজের ক্ষমতা এবং যাবতীয় প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়কে সফলভাবে সমর্থন করিবার সামর্থ্যের উপর পূর্ণবিশ্বাস রাখিয়া কথা বলেন। এমন কোন ভাবধারা তিনি জানেন না বা এমন কোন কিছু ঘোষণা করেন না, যাহাকে শেষ পর্যন্ত তিনি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহার বক্তৃতার অনেক স্থলে ইঙ্গারসোলের
৮
দর্শনের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। তিনি মৃত্যুর পরে নরকে শাস্তিভোগে বিশ্বাস করেন না। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ঈশ্বরকে মানেন, সেইরূপ ঈশ্বরেও তাঁহার আস্থা নাই। মানুষের মনকে তিনি অমর বলেন না, কারণ উহা পরতন্ত্র। সকল প্রকার আবেষ্টন হইতে যাহা মুক্ত নয়, তাহা কখনও অমর হইতে পারে না।

কানন্দ বলেনঃ ভগবান্ একজন রাজা নন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন এক কোণে বসিয়া মর্ত্যবাসী মানুষের কর্ম অনুযায়ী দণ্ড বা পুরস্কার বিধান করিতেছেন। এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে এবং বলিবে—আমি ঈশ্বর, আমি

তাঁর প্রাণের প্রাণ। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, নিজেদের মৃত্যুহীন সত্তাই যখন ভগবান্, তখন তিনি অতি দূরে, এই শিক্ষা দিবার সার্থকতা কি?

তোমাদের ধর্মে যে আদিম পাপের কথা আছে উহা শুনিয়া বিভ্রান্ত হইও না, কেননা তোমাদের ধর্ম আদিম নিষ্পাপ অবস্থার কথাও বলে। আদমের যখন অধঃপতন ঘটিল, তখন উহা তো তাঁহার পূর্বেকার নির্মল স্বভাব হইতেই। (শ্রোতৃবৃন্দের হর্ষধ্বনি) পবিত্রতাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আর সকল ধর্মাচরণের লক্ষ্য হইল উহা ফিরিয়া পাওয়া। প্রত্যেক মানুষ শুদ্ধস্বরূপ, প্রত্যেক মানুষ সৎ। আপত্তি উঠিতে পারে, কোন কোন মানুষ পশুতুল্য কেন? উত্তরে বলি, যাহাকে তুমি পশুতুল্য বলিতেছ, সে ধূলামাটিমাখা হীরকখণ্ডের মত। ধূলা ঝাড়িয়া ফেল, যে হীরা সেই হীরা দেখিতে পাইবে—যেন কখনও ধূলিলিপ্ত হয় নাই, এমন স্বচ্ছ। আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক আত্মা একটি বৃহৎ হীরকখণ্ড।

আমাদের মানুষ-ভ্রাতাকে পাপী বলার চেয়ে নীচতা আর নাই। একবার একটি সিংহী একটি ভেড়ার পালে পড়িয়া একটি মেষকে নিহত করে। সিংহীটি ছিল আসন্নপ্রসবা। লাফ দিবার ফলে তাহার শাবকটি ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু লম্ফন-জনিত ক্লান্তিতে সিংহী মারা গেল। সিংহশিশুকে দেখিয়া একটি মেষমাতা উহাকে স্তন্য পান করাইতে থাকে। সিংহশাবক মেষের দলে ঘাস খাইয়া বাড়িতে লাগিল। একদিন একটি বৃদ্ধ সিংহ ঐ সিংহ-মেষকে দেখিতে পাইয়া ভেড়ার দল হইতে উহাকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সিংহ-মেষ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বৃদ্ধ সিংহ অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং পরে উহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন সে উহাকে একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে লইয়া গিয়া বলিল, ‘তুমি ভেড়া নও, সিংহ—এই জলের মধ্যে নিজের আকৃতি দেখ।’ সিংহ-মেষও জলে প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ‘আমি সিংহ, ভেড়া নই।’ আসুন, আমরা নিজেদের মেষ না ভাবিয়া সিংহ ভাবি। আসুন, আমরা মেষের মত ‘ব্যা ব্যা’ করা

এবং ঘাস খাওয়া পরিত্যাগ করি।

আমেরিকায় আমার চার মাস কাটিল। ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যে আমি একটি চরিত্র-সংশোধক জেল দেখিতে গিয়াছিলাম। জেলের অধ্যক্ষকে জানিতে দেওয়া হয় না—কোন্ কয়েদীর কি অপরাধ। কয়েদীদের প্রত্যেকের উপর যেন সহৃদয়তার একটি আচ্ছাদনী ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর একটি শহরের কথা জানি, যেখানে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত তিনটি সংবাদপত্রে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, অপরাধীদের কঠিন সাজা হওয়া প্রয়োজন। আবার ওখানকার অন্য একটি কাগজের মতে দণ্ড অপেক্ষা ক্ষমাই সুসঙ্গত। একটি কাগজের সম্পাদক পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে-সব কয়েদীকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়, তাহাদিগের শতকরা মাত্র পঞ্চাশ জন সৎপথে ফিরিয়া আসে; পক্ষান্তরে যাহারা মৃদুভাবে দণ্ডিত, তাহাদের ভিতর শতকরা নব্বই জন কারামুক্তির পর সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে।

ধর্মের উৎপত্তি মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতার ফলে নয়। কোন এক অত্যাচারীকে আমরা ভয় করি বলিয়া যে ধর্মের জন্ম, তাহাও নয়। ধর্ম হইল প্রেম—যে-প্রেম বিকশিত হইয়া, বিস্তারিত হইয়া, পুষ্টিলাভ করিয়া চলে। একটি ঘড়ির কথা ধর। ছোট একটি আধারের মধ্যে কল-কব্জা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে একটি স্প্রিং। দম দেওয়া হইলে স্প্রিংটি উহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়। মানুষ হইল ঘড়ির স্প্রিং-এর মত। সব ঘড়ির যে একই রকমের স্প্রিং থাকিবে তাহা নয়, সেইরূপ সকল মানুষের ধর্মমত এক হইবার প্রয়োজন নাই। আর আমরা ঝগড়াই বা করিব কেন? আমাদের সকলের চিন্তাধারা যদি একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু ঘটিত। বাহিরের গতির নাম কর্ম, ভিতরের গতি হইল মানুষের চিন্তা। ঢিলটি মাটিতে পড়িল; আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উহার কারণ। ঘোড়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ঘোড়াকে চালাইতেছেন ঈশ্বর। ইহাই গতির নিয়ম। ঘূর্ণিপাক জলস্রোতের প্রবলতা নির্ণয়

করে। স্রোত যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে নদীও মরিয়া যায়। গতিই জীবন। আমাদের একত্ব এবং বৈচিত্র্য দুই-ই চাই। গোলাপকে অন্য এক নামেও ডাকিলেও উহার মিষ্ট গন্ধ আগেকার মতই থাকিবে। অতএব তোমার ধর্ম যাহাই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

একটি গ্রামে ছয়জন অন্ধ বাস করিত। তাহারা হাতী দেখিতে গিয়াছে। চোখে তো দেখিতে পায় না, হাত দিয়া অনুভব করিল হাতী কি রকম। একজন হাতীর লেজে হাত দিয়া দেখিল, একজন হাতীর পার্শ্বদেশে। একজন শুঁড়ে এবং চতুর্থ জন কানে। তখন তাহারা হাতীর বর্ণনা শুরু করিল। প্রথম অন্ধ বলিল, হাতী হইল দড়ির মত। দ্বিতীয় জন বলিল, না, হাতী হইতেছে বিরাট দেওয়ালের মত। তৃতীয় অন্ধের মতে হাতী একটি অজগর সাপের মত; আর চতুর্থ জন—যে হাতীর কানে হাত দিয়াছিল—বলিল, হাতী একটি কুলার মত। মতভেদের জন্য অবশেষে তাহারা ঝগড়া এবং ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিল। এমন সময়ে ঘটনাস্থলে একব্যক্তি আসিয়া পড়িল এবং তাহাদিগকে কলহের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অন্ধেরা বলিল যে, তাহারা হাতীটিকে দেখিয়াছে, কিন্তু হাতী সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই মত আলাদা এবং প্রত্যেকেই অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। তখন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের কাহারও কথা পুরা সত্য নয়, তোমরা অন্ধ। হাতী বাস্তবিক কি রকম, তাহা তোমরা কেহই জান না।'

আমাদের ধর্মের ব্যাপারেও এইরূপ ঘটিতেছে। আমাদের ধর্মের জ্ঞান অন্ধের হস্তীদর্শনের তুল্য। (শ্রোতৃমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি)

ভারতে জনৈক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, মরুভুমির বালি পিষিয়া কেহ যদি তেল বাহির করিতে পারে অথবা কুমীরের কামড় না খাইয়া তাহার দাঁত কেহ উপড়াইয়া আনিতে পারে—এ কথা বরং বিশ্বাস করিব, কিন্তু ধর্মান্ধ ব্যক্তির গোঁড়ামির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি জিজ্ঞাসা কর ধর্মে ধর্মে এত

পার্থক্য কেন, তো তাহার উত্তর এই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী হাজার মাইল পর্বতগাত্র বাহিয়া অবশেষে বিশাল সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সেইরূপ নানা ধর্মও তাহাদের অনুগামিগণকে শেষ পর্যন্ত ভগবানের কাছেই লইয়া যায়। ১৯০০ বৎসর ধরিয়া তোমরা য়াহুদীগণকে দলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ। চেষ্টা সফল হইয়াছে কি? প্রতিধ্বনি উত্তর দেয়—অজ্ঞানতা এবং ধর্মান্ধতা কখনও সত্যকে বিনষ্ট করিতে পারে না।

বক্তা এই ধরনের যুক্তি-পুরঃসর প্রায় দুই ঘণ্টা বলিয়া চলেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন, 'আসুন, আমরা কাহারও ধ্বংসের চেষ্টা না করিয়া একে অপরকে সাহায্য করি।'

পুনর্জন্ম

[মেমফিস্ শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ জানুআরী প্রদত্ত; ২০ জানুআরীর 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

পীত-আলখল্লা ও পাগড়ি-পরিহিত সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ পুনরায় গতরাত্রে 'লা স্যালেট একাডেমী'তে বেশ বড় এবং সমঝদার একটি সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ'। বলিতে গেলে এই বিষয়টির আলোচনায় কানন্দের বোধ করি স্বপক্ষসর্মথনে যত সুবিধা হইয়াছিল, এমন আর অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। প্রাচ্য জাতি- সমূহের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশ্বাসগুলির মধ্যে পুনর্জন্মবাদ অন্যতম। স্বদেশে কিম্বা বিদেশে এই বিশ্বাসের পক্ষ-সমর্থন করিতে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত, কানন্দ যেমন তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেনঃ

আপনারা অনেকেই জানেন না যে, পুনর্জন্মবাদ প্রাচীন ধর্মসমূহের একটি অতি পুরাতন বিশ্বাস। য়াহুদীজাতির অন্তর্গত ফ্যারিসীদের মধ্যে এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকগণের মধ্যে ইহা সুপরিচিত ছিল। আরবদিগের ইহা একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা এখনও টিকিয়া আছে। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। বিজ্ঞান তো বিভিন্ন জড়শক্তিকে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের আপনারা মনে করেন, পুনর্জন্মবাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাহত করে। পুনর্জন্মবাদের বিচার-ধারা এবং যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক দিকগুলির পুরাপুরি আলোচনার জন্য আমদিগকে গোড়া হইতে সবটা বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বজগতের একজন ন্যায়বান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু সংসারের দিকে তাকাইয়া দেখিলে ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়ই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার সারা জীবনে অনুকূল অবস্থাগুলি যেন প্রস্তুত

হইয়া তাহার হাতের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সব কিছুই তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতির সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে আর একজন হয়তো এমন পরিবেষ্টনীতে পৃথিবীতে আসে যে, জীবনের প্রতি ধাপে তাহাকে অপর সকলের প্রতিপক্ষতা করিতে হয়। নৈতিক অধঃপাতে গিয়া, সমাজচ্যুত হইয়া সে পৃথিবী হইতে বিদায় লয়। মানুষের ভিতর সুখ-শান্তির বিধানে এত তারতম্য কেন?

জন্মান্তরবাদ আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের এই গরমিলগুলির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। এই মতবাদ আমাদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ না করিয়া ন্যায়ের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে। পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু ইহা আদৌ সদুত্তর নয়। ইহা অবৈজ্ঞানিক। প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ থাকে। একমাত্র ঈশ্বরকেই সকল কার্য কারণের বিধাতা বলিলে তিনি এক ভীষণ দুর্নীতিশীল ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু জড়বাদও পূর্বোক্ত মতবাদেরই মত অযৌক্তিক। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার এলাকার সর্বত্রই কার্য-কারণ-ভাব ওতপ্রোত। অতএব এই দিক্ দিয়া আত্মার জন্মান্তরবাদ প্রয়োজনীয়। আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ইহা কি আমাদের প্রথম জন্ম? সৃষ্টি মানে কি শূন্য হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি? ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে ইহা অসম্ভব মনে হয়। অতএব বলা উচিত, সৃষ্টি নয়—অভিব্যক্তি।

অবিদ্যমান কারণ হইতে কোন কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি যদি আগুনে আঙুল দিই, সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিবে—আঙুল পুড়াইয়া যাইবে। আমি জানি আগুনের সহিত আঙুলের সংস্পর্শ-ক্রিয়াই হইল দাহের কারণ। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল না—এমন কোন সময় থাকা অসম্ভব, কেননা প্রকৃতির কারণ সর্বদাই বর্তমান। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার কর যে, এমন এক সময় ছিল, কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে—এই-সব বিপুল জড়-সমষ্টি কোথায় ছিল? সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রচণ্ড

অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হইবে। হই◌া অসম্ভব। পুরাতন বস্তু নূতন করিয়া গড়া চলে, কি

ন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নূতন কিছু আমদানী করা চলে না।

ইহা ঠিক যে, পুনর্জন্মবাদ গণিত দিয়া প্রমাণ করা চলে না। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে অনুমান ও মতবাদের বলবত্তা প্রত্যক্ষের মত নাই সত্য, তবে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনের ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য মানুষের বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর অন্য কোন মতবাদ আর উপস্থাপিত করিতে পারে নাই।

মিনিয়াপলিস্ শহর হইতে ট্রেনে আসিবার সময় আমার একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। গাড়ীতে জনৈক গো-পালক ছিল। লোকটি একটু রুক্ষপ্রকৃতি এবং ধর্ম বিশ্বাসে গোঁড়া প্রেসবিটেরিয়ান। সে আমার কাছে আগাইয়া আসিয়া জানিতে চাহিল, আমি কোথাকার লোক। আমি বলিলাম, ভারতবর্ষের। তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমার ধর্ম কি?’ আমি বলিলাম, হিন্দু। সে বলিল, ‘তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।’ আমি তাহাকে পুনর্জন্মবাদের কথা বলিলাম। শুনিয়া সে বলিলঃ সে বরাবরই এই মতবাদে বিশ্বাসী, কেননা একদিন সে যখন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহার ছোট বোনটি তাহার (গো-পালকের) পোষাক পরিয়া তাহাকে বলে যে, সে আগে পুরুষমানুষ ছিল। এই জন্যই সে আত্মার শরীরান্তর-প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। এই মতবাদের মূল সূত্রটি এইঃ মানুষ যদি ভাল কাজ করে, তাহা হইলে তাহার উচ্চতর ঘরে জন্ম হইবে, আর মন্দ কাজ করিলে নিকৃষ্ট গতি।

এই মতবাদের আর একটি চমৎকার দিক্ আছে—ইহা শুভ প্রবৃত্তির প্ররোচক। একটি কাজ যখন করা হইয়া যায়, তখন তো আর উহাকে ফিরান যায় না। এই মত বলে, আহা যদি ঐ কাজটি আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতে! যাহা হউক, আগুনে আর হাত দিও না।

প্রত্যেক মুহূর্তে নূতন সুযোগ আসিতেছে। উহাকে কাজে লাগাও।

বিবে কানন্দ এইভাবে কিছুকাল বলিয়া চলেন। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিয়া প্রশংসাধ্বনি করেন।

স্বামী বিবে কানন্দ পুনরায় আজ বিকাল ৪টায় লা স্যালেট একাডেমীতে 'ভারতীয় আচার-ব্যবহার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।

তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব

[মেমফিস্ শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ২১ জানুআরী প্রদত্ত; ‘অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত।]

স্বামী বিবে কানন্দ গত রাত্রে ‘ইয়ং মেনস্ হিব্রু এসোসিয়েশন হল’-এ ‘তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব’ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এখানে তিনি যতগুলি ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট। এই সুপণ্ডিত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি এই শহরের অধিবাসীবৃন্দের শ্রদ্ধা এই বক্তৃতাটি দ্বারা নিঃসন্দেহে অনেক বাড়িয়াছে। এ পর্যন্ত বিবে কানন্দ কোন না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপকারের জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ-সকল প্রতিষ্ঠান যে তাঁহার নিকট আর্থিক সহায়তা পাইয়াছে তাহাও ঠিক। গত রাত্রের বক্তৃতার দর্শনী কিন্তু তাঁহার নিজের কাজের জন্য। এই বক্তৃতাটির পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা করেন বিবে কানন্দের বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্ত মিঃ হিউ এল ব্রিঙ্কলী। এই প্রাচ্যদেশীয় মনীষীর শেষ বক্তৃতা শুনিতে গত রাত্রিতে প্রায় দুইশত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথমে এই প্রশ্নটি তুলেনঃ ধর্মের নানা মতবাদ সত্ত্বেও ধর্মে ধর্মে কি বাস্তবিকই খুব পার্থক্য আছে? বক্তার মতেঃ না, বর্তমান যুগে বিশেষ পার্থক্য আর নাই। তিনি সকল ধর্মের ক্রমবিকাশ আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখান যে, আদিম মানুষ অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রকারের ধারণা পোষণ করিত, কিন্তু মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-ধারণার এই-সকল বিভিন্নতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে এবং অবশেষে উহা একেবারেই মিলাইয়া যায়। বর্তমানে শুধু একটি মত সর্বত্র প্রবল—ঈশ্বরের নির্বিশেষ অস্তিত্ব।

বক্তা বলেনঃ এমন কোন বর্বর জাতি নাই, যাহারা কোন না কোন দেবতায় বিশ্বাস না করে। উহাদের মধ্যে প্রেমের ভাব খুব বলবান্

নয়, বরং উহারা জীবন যাপন করে ভয়ের পটভূমিতে। তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কল্পনায় একটি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ ‘দেবতা’ খাড়া হয়। এই ‘দেবতা’র ভয়ে তাহারা সর্বদাই কম্পমান। তাহার নিজের যাহা ভাল লাগে, ঐ দেবতারও তাহা ভাল লাগিবে, সে ধরিয়া লয়। সে নিজে যাহা পাইয়া সুখী হয়, সে ভাবে—উহা দেবতারও ক্রোধ শান্ত করিবে। স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধতা করিয়াও সে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে।

বক্তা ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেনঃ অসভ্য মানুষ পিতৃপুরুষের পূজা হইতে হাতীদের পূজায় পৌঁছায় এবং পরে

বজ্র এবং ঝড়ের দেবতা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসনায়। এই অবস্থায় মানুষের ধর্ম ছিল বহুদেববাদ। বিবে কানন্দ বলেনঃ ‘সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য, সূর্যাস্তের চমৎকারিতা, নক্ষত্রখচিত আকাশের রহস্যময় দৃশ্য এবং বজ্র ও বিদ্যুতের অদ্ভুত অলৌকিকতা আদিম মানুষের মনে একটি গভীর আবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা সে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। ফলে চোখের সম্মুখে উপস্থিত প্রকৃতির এইসব বিশাল ঘটনার নিয়ামক একজন উচ্চতর এবং মহাশক্তি মান্ কেহ আছেন—এই ধারণাই তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল।’

ইহার পর আসিল
আর একটি পর্যায়
—একেশ্বরবাদের
কাল। বিভিন্ন
দেবতারা অদৃশ্য
হইয়া একটি মাত্র
সত্তায় মিশিয়া
গেলেন—দেবতার দেবতা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরে। ইহার পর বক্তা আর্যজাতিকে এই পর্যায় পর্যন্ত অনুসরণ করিলেন। এই পর্যায়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কথা হইল—‘আমরা ঈশ্বরের সত্তায় বাঁচিয়া আছি, তাঁহারই মধ্যে চলিতেছি ফিরিতেছি। তিনিই গতিস্বরূপ।’ ইহার পর আর একটি কাল আসিল, দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে সর্বেশ্বরবাদের কাল বলা হয়। আর্যজাতি বহুদেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ এবং বিশ্বজগৎই ঈশ্বর—সর্বেশ্বরবাদের এই মতও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, ‘আমার অন্তরাত্মাই একমাত্র সত্য। আমার প্রকৃতি হইল সত্তাস্বরূপ,

যত কিছু বিস্তৃতি, তাহা আমাতেই।’

বিবে কানন্দ অতঃপর বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে আসেন। তিনি বলেন যে, বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই, অস্বীকারও করে নাই। উপদেশ প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ শুধু বলিতেন, ‘দুঃখ তো দেখিতে পাইতেছ; বরং উহা হ্রাস করিবার চেষ্টা কর।’ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে দুঃখ সর্বদাই বিদ্যমান।

বক্তা বলেন, মুসলমানরা হিব্রুদের ‘প্রাচীন সমাচার’ এবং খ্রীষ্টানদের ‘নূতন সমাচার’ বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারা খ্রীষ্টানদের পছন্দ করেন না, কেননা তাঁহাদের ধারণা যে, খ্রীষ্টানরা প্রাচীন ধর্মমতের বিরোধিতা করেন এবং মানুষ-পূজা শিক্ষা দেন। মহম্মদ তাঁহার মতানুবর্তীদের তাঁহার নিজের কোন ছবি রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বক্তা বলেনঃ এখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের সবগুলিই কি সত্য, না কতকগুলি খাঁটি, আর বাকীগুলি ভুয়া? সব ধর্মই একটি সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—একটি চরম অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব। ধর্মের লক্ষ্য হইল একত্ব। আমরা যে চারি পাশে ঘটনারাশির বৈচিত্র্য দেখি, উহারা একত্বেরই অনন্ত অভিব্যক্তি। ধর্মসমূহকে যদি তলাইয়া বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মানুষের অভিযান—মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।

ধরুন জনৈক ব্যক্তি একটি মাত্র মাপের জামা লইয়া অনেকগুলি লোকের কাছে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, ঐ জামা তাহাদের গায়ে লাগিবে না। তখন লোকটি উত্তর করিল, তাহা হইলে তোমরা বিদায় হও,

জামা পরিয়া কাজ নাই। কোন পাদ্রীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে-সব (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায় তাঁহার মতবাদ ও বিশ্বাসগুলি মানে না, তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? তিনি উত্তর দিলেন, ‘ওঃ, উহারা খ্রীষ্টানই নয়।’ কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল উপদেশও সম্ভব। আমাদের নিজেদের প্রকৃতি, পরস্পরের প্রতি প্রেম এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ—এইগুলি হইতে আমরা প্রশস্ততর শিক্ষা পাই। নদীর বুকে যে জলস্রোতের আবর্ত, ঐগুলি যেমন নদীর প্রাণের পরিচায়ক, ঐগুলি না থাকিলে নদী যেমন মরিয়া যায়, সেইরূপ ধর্মকে বেড়িয়া

নানা বিশ্বাস ও মত ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরই ইঙ্গিত। এই মতবৈচিত্র্য যদি ঘুচিয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মচিন্তারও মরণ ঘটিবে। গতি আবশ্যক। চিন্তা হইল মনের গতি, এই গতি থামিয়া যাওয়া মৃত্যুর সূচনা।

একটি বুদ্বুদকে যদি
এক গ্লাস জলের
তলদেশে
আটকাইয়া রাখ,
উহা তৎক্ষণাৎ
উপরের অনন্ত
বায়ুমণ্ডলে যোগ
দিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিবে। জীবাত্মা সম্বন্ধে এই একই কথা। উহা ভৌতিক দেহ থেকে মুক্তি লাভ করিতে এবং নিজের শুদ্ধ স্বভাব ফিরিয়া পাইতে অনবরত চেষ্টা করিতেছে। উহার আকাঙ্ক্ষা হইল স্বকীয় বাধাহীন অনন্ত বিস্তার পুনরায় লাভ করা। আত্মার এই প্রচেষ্টা সর্বত্রই সমান। খ্রীষ্টান বল, বৌদ্ধ বল, মুসলমান বল, অথবা সংশয়বাদী কিম্বা ধর্মযাজকই বল, প্রত্যেকের মধ্যে জীবাত্মা এই মুক্তির প্রয়াসে তৎপর। মনে কর, একটি নদী হাজার মাইল আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ কত কষ্টে অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমুদ্রে পড়িয়াছে, আর একজন মানুষ ঐ সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া নদীকে আদেশ করিতেছেঃ হে নদী, তোমার উৎপত্তি স্থলে ফিরিয়া যাও এবং নূতন একটি সিধা রাস্তা ধরিয়া সাগরে এস। এই মানুষটি কি নির্বোধ নয়? য়াহুদী তুমি, তুমি হইলে জাইঅন (Zion) শৈল হইতে নিঃসৃত একটি নদী। কিন্তু আমি, আমি নামিয়া আসিতেছি উত্তুঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ হইতে। আমি তোমাকে বলিতে পারি না—যাও, তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি ভুল পথ ধরিয়াছ। আমার পথে পুনরায় বহিয়া এস। এইরূপ উক্তি বোকামী ছাড়া বিষম ভুলও। নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাক। সত্য কখনও বিলুপ্ত হয় না। পুঁথিপত্র নষ্ট হইতে পারে, জাতিসমূহও সংঘর্ষে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্য বাঁচিয়া থাকে। পরে কোন মানুষ আসিয়া উহাকে আবিষ্কার করে এবং উহা সমাজে পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, ভগবান কী চমৎকার রীতিতে তাঁহার

অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অনবরত মানুষের কাছে অভিব্যক্ত করিতেছেন!

‘এশিয়ার আলোক’—বুদ্ধদেবের ধর্ম

[ডেট্রয়েট শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ মার্চ প্রদত্ত; ‘ডেট্রয়েট ট্রিবিউন’ পত্রিকায় প্রকাশিত।]

গতরাত্রে অডিটোরিয়ামে বিবে কানন্দ ১৫০ জন শ্রোতার নিকট ‘এশিয়ার আলোক’—বুদ্ধদেবের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মাননীয় ডন এম. ডিকিনসন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেন—কে বলিতে পারে যে, এই ধর্মমতটি ঈশ্বরাদিষ্ট, আর অন্যটি নিকৃষ্ট? অতীন্দ্রিয়তার বিভাগ-রেখা কে টানিতে পারে?

বিবে কানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগুলির বিশদ পর্যালোচনা করেন। তিনি যজ্ঞ- বেদীতে বহুল প্রাণিবধের কথা বলিয়া বুদ্ধের জন্ম এবং জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেন। সৃষ্টির কারণ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুদ্ধের মনে যে দুরূহ সমস্যাগুলি উঠিয়াছিল, ঐগুলির সমাধানের জন্য তিনি যে তীব্র সাধনা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এ-সকল বিষয় বক্তা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, বুদ্ধ অপর সকল মানুষের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে কি মিত্র, কি শত্রু—কেহ কখনও বলিতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস লইয়াছেন বা এক টুকরা রুটি খাইয়াছেন।

কানন্দ বলেন, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ বুদ্ধ কখনও প্রচার করেন নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রে যেমন একটি ঢেউ উঠিয়া মিলাইয়া যাইবার সময় পরবর্তী ঢেউটিতে তাহার শক্তি সংক্রামিত করিয়া যায়, সেইরূপ একটি জীব তাহার উত্তরকালীনে নিজের শক্তি রাখিয়া যায়। বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও প্রচার করেন নাই; আবার

ঈশ্বর যে নাই, তাহাও বলেন নাই।

তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ‘আমরা সৎ হইব কেন?’ বুদ্ধ উত্তর দিলেন, ‘কারণ তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে সদ্‌ভাব পাইয়াছ। তোমাদেরও উচিত পরবর্তীদের জন্য কিছু সদ্‌ভাব রাখিয়া যাওয়া।’ সংসার সমষ্টিকৃত সাধুতার সম্প্রসারের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের সাধু আচরণ বিধেয়।

বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবী করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, ‘আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।’

মানুষে মানুষে এবং মানুষে ও ইতরপ্রাণীতে অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রাণীই সমান। তিনিই প্রথম মদ্যপান বন্ধ করার নীতি উপস্থাপিত করেন। তাঁহার শিক্ষাঃ সৎ হও, সৎ কাজ কর। যদি ঈশ্বর থাকেন, সাধুতার দ্বারা তাঁহাকে লাভ কর। যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তবুও সাধুতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের যাবতীয় দুঃখের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাহার সমুদয় সদাচরণের জন্য প্রশংসাও তাহারই প্রাপ্য।

বুদ্ধই প্রথম ধর্মপ্রচারক দলের উদ্ভাবক। ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদিগের পরিত্রাতারূপে তাঁহার আবির্ভাব। উহারা তাঁহার দার্শনিক মত বুঝিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

উপসংহারে কানন্দ বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত।

মানুষের দেবত্ব

‘এডা রেকর্ড’, ২৮ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গত শুক্রবার (২২ ফেব্রুআরী) অপেরা হাউস-এ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ‘মানুষের দেবত্ব’ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া ঘর-ভর্তি শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। বক্তা বলেন, সকল ধর্মের মূল ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাতে বিশ্বাস—যে আত্মা জড়পদার্থ ও মন দুয়েরই অতিরিক্ত কিছু। জড়বস্তুর অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে। মনও পরিবর্তনশীল বলিয়া অনিত্য। মৃত্যু তো একটি পরিবর্তন মাত্র।

আত্মা মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া শরীরকে চালিত করে। মানবাত্মা যাহাতে শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, এই চেষ্টা করা কর্তব্য। মানুষের স্বরূপ হইল নির্মল ও পবিত্র, কিন্তু অজ্ঞান আসিয়া মেঘের মত উহাকে যেন আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আত্মাই তাহার প্রকৃত শুদ্ধ স্বরূপ ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছে। অধিকাংশ ভারতবাসী আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য, ইহা আমাদের প্রচার করা নিষিদ্ধ।

বক্তা বলেন, “আমি হইলাম চৈতন্যস্বরূপ, জড় নই। প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পরও আবার স্থূল শরীরে বাস করিবার আশা পোষণ করে। আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, এইরূপ কোন অবস্থা থাকিতে পারে না। আমরা ‘পরিত্রাণে’র বদলে ‘আত্মার মুক্তি’র কথা বলি।”

মূল বক্তৃতাটিতে মাত্র ৩০ মিনিট লাগিয়াছিল, তবে বক্তৃতার ব্যবস্থাপক সমিতির অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন, বক্তৃতার শেষে কেহ প্রশ্ন করিলে বক্তা উহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যেমন

ছিলেন ধর্মযাজক, অধ্যাপক, ডাক্তার ও দার্শনিক, তেমনি ছিলেন সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, সৎলোক আবার দুষ্ট লোক। অনেকে লিখিয়া তাঁহাদের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। অনেকে আবার তাঁহাদের আসন হইতে উঠিয়া বক্তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন। বক্তা সকলকেই সৌজন্যের সহিত উত্তর দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তাকে খুব হাসাইয়া তুলেন। এক ঘণ্টা এইরূপ চলিবার পর বক্তা আলোচনা সমাপ্তির অনুরোধ জানান। তখনও বহু লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকী। বক্তা অনেকগুলির জবাব কৌশলে এড়াইয়া যান। যাহা হউক তাঁহার আলোচনা হইতে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষাসমূহ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আরও কয়েকটি কথা আমরা লিপিবদ্ধ করিলামঃ

হিন্দুরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাহদের ভগবান্ কৃষ্ণ উত্তর ভারতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এক শুদ্ধভাবা নারীর
৯
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের কাহিনী বাইবেলে কথিত খ্রীষ্টের জীবনেতিহাসের অনুরূপ, তবে কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়। হিন্দুরা মানবাত্মার প্রগতি এবং দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করেন। আমাদের আত্মা পূর্বে পাখী, মাছ বা অপর কোন ইতরপ্রাণীর দেহে আশ্রিত ছিল, মরণের পরে আবার অন্য কোন প্রাণী হইয়া জন্মাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে আসিবার আগে এই সব আত্মা কোথায় ছিল। বক্তা বলেন অন্যান্য লোকে। আত্মা সকল অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় আধার। এমন কোন কাল নাই, যখন ঈশ্বর ছিলেন না এবং সেইজন্য এমন কোন কাল নাই যখন সৃষ্টি ছিল না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ব্যক্তি-ভগবান্ স্বীকার করেন না। বক্তা বলেন, তিনি বৌদ্ধ নন। খ্রীষ্টকে যেভাবে পূজা করা হয়, মহম্মদকে সেইভাবে করা হয় না। মহম্মদ খ্রীষ্টকে মানিতেন, তবে খ্রীষ্ট যে ঈশ্বর—ইহা অস্বীকার করিতেন। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ফলে ঘটিয়াছে, বিশেষ নির্বাচন (নূতন সৃষ্টি) দ্বারা নয়। ঈশ্বর হইলেন স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টি। হিন্দুধর্মে ‘প্রার্থনা’র রীতি নাই—এক

শিশুদের জন্য ছাড়া এবং তাহাও শুধু মনের উন্নতির উদ্দেশ্যে। পাপের সাজা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘটিয়া থাকে। আমরা যে-সব কাজ করি, তাহা আত্মার নয়, অতএব কাজের ভিতর মলিনতা ঢুকিতে পারে। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ। উহার কোন বিশ্রাম-স্থানের প্রয়োজন হয় না। জড়পদার্থের কোন ধর্ম আত্মাতে নাই। মানুষ যখন নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে, তখনই সে পূর্ণাবস্থা লাভ করে। ধর্ম হইল আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি। যে যত আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের শুদ্ধসত্তার অনুভবের নামই উপাসনা। হিন্দুধর্ম বহিঃপ্রচারে বিশ্বাস করে না। উহার শিক্ষা এই যে —মানুষ যেন ভগবানকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণের সময় নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। পাশ্চাত্যের লোক অতিরিক্ত কর্মপ্রবণ। বিশ্রামও সভ্যতার একটি অঙ্গ। হিন্দুরা নিজেদের দুর্বলতাগুলি ঈশ্বরের উপর চাপায় না। সকল ধর্মের পারস্পরিক মিলনের একটি প্রবণতা এখন দেখা যাইতেছে।

‘বে সিটি টাইমস্’, ২১ মার্চ ১৮৯৪

গতকল্য সন্ধ্যায় অপেরা হাউস-এ স্বামী বিবে কানন্দ যে চিত্তাকর্ষক ভাষণটি দিয়াছেন, ঐরূপ বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ এই শহরের (বে সিটি) লোক কদাচিৎ পাইয়া থাকে। বক্তা ভদ্রলোক, ভারতবর্ষের অধিবাসী। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর সি. টি নিউকার্ক যখন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বক্তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তখন অপেরা হাউসের নীচের তলার প্রায় অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বক্তা এই দেশের লোককে সর্বশক্তিমান্ ডলারের ভজনা করিবার জন্য সমালোচনা করেন। ভারতে জাতিভেদ আছে সত্য, কিন্তু খুনী লোক কখনও সমাজের শীর্ষস্থানে যাইতে পারে না। কিন্তু এদেশে যদি সে দশলক্ষ ডলারের মালিক হয়, তাহা হইলে সে অপর যে-কোন ব্যক্তিরও সমান। ভারতে একবার যদি কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়া বসে, তাহা হইলে বারবার সে হীন থাকিয়া যায়। হিন্দুধর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল—অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি সহিষ্ণুতা। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের ধর্ম অপেক্ষা ভারতবর্ষের ধর্মের উপরই মিশনরীদের আক্রোশ বেশী, কেননা হিন্দুরা তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে বাধা দেয় না। এখানে হিন্দুরা তাহাদের ধর্মের যাহা একটি প্রধান শিক্ষা—সহিষ্ণুতা, উহাই প্রতিপালন করিতেছে, বলিতে পারা যায়। কানন্দ একজন উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। আমরা শুনিয়াছি ডেট্রয়েট-এ কানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ হিন্দুরা নদীতে তাহাদের শিশুসন্তান নিক্ষেপ করে কিনা? কানন্দ উত্তর দেনঃ না তাহারা ঐরূপ করে না, পাশ্চাত্যদেশের মত ডাইনী সন্দেহ করিয়া স্ত্রীলোকেদেরও তাহারা দাহ করে না। বক্তা আজ রাত্রে স্যাগিন শহরে বক্তৃতা করিবেন।

‘বে সিটি ডেলী ট্রিবিউন’, ২১ মার্চ, ১৮৯৪

বে সিটিতে গতকল্য একজন খ্যাতনামা অতিথি আসিয়াছেন। ইনি হইলেন সেই বহু-আলোচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ। তিনি ডেট্রয়েট হইতে এখানে দ্বিপ্রহরে পৌঁছিয়া তখনই ফ্রেজার হাউসে চলিয়া যান। ডেট্রয়েটে তিনি সেনেটর পামারের অতিথি ছিলেন। আমাদের পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি কালই ফ্রেজার হাউস-এ কানন্দের সহিত দেখা করেন। তাঁহার চেহারা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রায় ছয় ফুট উঁচু, ওজন বোধকরি ১৮০ পাউণ্ড, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনে আশ্চর্য-রকম সামঞ্জস্য। তাঁহার গায়ের রঙ উজ্জ্বল অলিভবর্ণ, কেশ ও চোখ সুন্দর কালো। মুখ পরিষ্কার কামান। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট এবং সুনিয়মিত। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলেন, বস্তুতঃ অধিকাংশ আমেরিকানদের চেয়ে ভাল বলেন। তাঁহার ভদ্রতাও বেশ উল্লেখযোগ্য।

কানন্দ তাঁহার স্বদেশের কথা—তথা তাঁহার নিজের আমেরিকার অভিজ্ঞতা কৌতুকের সহিত বর্ণনা করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া আমেরিকায় আসিলেন, ফিরিবেন অ্যাটলাণ্টিকের পথে। বক্তা বলিলেন, ‘আমেরিকা একটি বিরাট দেশ, তবে আমি এখানে বরাবর থাকিতে চাই না। আমেরিকানরা অত্যধিক অর্থচিন্তা করে, অন্য সব কিছুর আগে ইহার স্থান। আপনাদের এখনও অনেক কিছু শিখিতে হইবে। আপনাদের জাতি যখন আমাদের জাতির ন্যায় প্রাচীন হইবে, তখন আপনাদের বিজ্ঞতা বাড়িবে। চিকাগো আমার খুব ভাল লাগে। ডেট্রয়েট জায়গাটিও সুন্দর।’

আমেরিকায় কত দিন থাকিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে কানন্দ বলেন, ‘তাহা আমি জানি না। তোমাদের দেশের অধিকাংশই আমি দেখিয়া

লইবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার পর আমি পূর্বাঞ্চলে যাইব এবং বষ্টন ও নিউ ইয়র্কে কিছুকাল থাকিব। বষ্টনে আমি গিয়াছি, তবে থাকা হয় নাই। আমেরিকা দেখা হইলে ইওরোপে যাইব। ইওরোপ দেখিবার আমার খুব ইচ্ছা। ওখানে কখনও যাই নাই।'

নিজের সম্বন্ধে এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী বলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ওখানকারই একটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সন্ন্যাসী বলিয়া দেশের সর্বত্রই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। সব সময়েই তিনি সমগ্র জাতির অতিথি।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৮।। কোটি, তন্মধ্যে ৬।। কোটি হইল মুসলমান, বাকী অধিকাংশ হিন্দু। ভারতে ৬।। লক্ষ খ্রীষ্টান আছে, তাহার ভিতর অন্ততঃ ২।। লক্ষ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের দেশের লোক সচরাচর খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে না। নিজেদের ধর্মেই তাহারা পরিতৃপ্ত। তবে কেহ কেহ আর্থিক সুবিধার জন্য খ্রীষ্টান হয়। মোট কথা ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের খুব স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি, যাহার যে-ধর্মে অভিরুচি, সে তাহাই গ্রহণ করুক। আমরা চতুর জাতি। রক্তপাতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের দেশে দুষ্ট লোক আছে বৈকি, বরং তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন তোমাদের দেশে। জনসাধারণ দেবদূত হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিবে কানন্দ আজ রাত্রে স্যাগিনে বক্তৃতা করিবেন।

গত সন্ধ্যায় বক্তৃতা আরম্ভের সময় অপেরা হাউসের নীচের তলা প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল। ঠিক ৮।১৫ মিনিটে বিবে কানন্দ তাঁহার সুন্দর প্রাচ্য পরিচ্ছদে বক্তৃতা-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সি. টি নিউকার্ক কিছু বলিয়া বক্তার পরিচয় দিলেন।

আলোচনার প্রথমাংশ ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে ও জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যামূলক। দ্বিতীয় বিষয়টির প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, বিজ্ঞান-জগতে শক্তি-সাতত্যবাদের যাহা বনিয়াদ, জন্মান্তরবাদেরও তাহাই। শক্তি-সাতত্যবাদ প্রথম উপস্থাপিত করেন ভারতবর্ষেরই একজন দার্শনিক। ইঁহারা আগন্তুক সৃষ্টিতে বিশ্বাস করিতেন না। 'সৃষ্টি' বলিতে শূন্য হইতে কোন কিছু উৎপন্ন করা বুঝায়। ইহা যুক্তির দিক্ দিয়া অসম্ভব। কালের যেমন আদি নাই, সৃষ্টিরও সেইরূপ কোন আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি আদ্যন্তহীন দুইটি সমান্তরাল রেখা। এই দার্শনিক মত অনুসারে 'সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ছিল, আছে এবং থাকিবে।' হিন্দু দর্শনের মতে আমরা যাহাকে 'শাস্তি' বলি—উহা কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমরা যদি আগুনে হাত দিই, হাত পুড়িয়া যায়। উহা একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। জীবনের ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমান অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয়। হিন্দুরা ঈশ্বরকে শাস্তিদাতা বলিয়া মনে করে না। বক্তা বলেন, 'তোমরা এই দেশে—যে রাগ করে না, তাহার প্রশংসা কর এবং যে রাগ করে, তাহার নিন্দা করিয়া থাক। তবুও দেশ জুড়িয়া হাজার হাজার লোক ভগবানকে অভিযুক্ত করিতেছে—তিনি কুপিত হইয়াছেন বলিয়া। রোমনগরী যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল, তখন সম্রাট্ নীরো তাঁহার বেহালা বাজাইতেছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরের অনুরূপ আচরণের জন্য তোমাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি তাঁহাকেও দোষ দিতেছ।'

হিন্দুধর্মে খ্রীষ্টধর্মের মত 'অবতারের মাধ্যমে পরিত্রাণ'—এইরূপ মত

নাই। হিন্দুদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট শুধু মুক্তির উপায়-প্রদর্শক। প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে দিব্যসত্তা রহিয়াছে, তবে উহা যেন একটি পর্দা দিয়া ঢাকা আছে। ধর্মের কাজ হইল—ঐ আবরণকে দূর করা। এই আবরণ-অপসারণকে খ্রীষ্টানরা বলেন, 'পরিত্রাণ', হিন্দুরা বলেন, 'মুক্তি'। ঈশ্বর বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পাতা এবং সংহর্তা।

বক্তা অতঃপর তাঁহার দেশের ধর্মসমূহের সমর্থনে কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সমগ্র রীতিনীতি যে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে লওয়া হইয়াছে, ইহা সুপ্রমাণিত। পাশ্চাত্যের লোকেদের এখন ভারতের নিকট একটি জিনিষ শেখা উচিত—পরমত-সহিষ্ণুতা।

অন্যান্য যে সকল বিষয় তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তাহা হইল—খ্রীষ্টান মিশনরী, প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের প্রচার-উৎসাহ তথা অসহিষ্ণুতা, এই দেশে ডলার-পূজা এবং ধর্মযাজক-সম্প্রদায়। বক্তা বলেন, শেষোক্ত ব্যক্তিরা ডলারের জন্যই তাঁহাদের কাজে ব্রতী আছেন। যদি তাঁহাদিগকে বেতনের জন্য ভগবানের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কতদিন গীর্জার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা বলা যায় না। তারপর বক্তা ভারতের জাতিপ্রথা, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের সংস্কৃতি, মানব-মনের সাধারণ জ্ঞান এবং আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার পর তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

ধর্মের সমন্বয়

'স্যাগিন ইভনিং নিউজ', ২২ মার্চ, ১৮৯৪

গতকল্য সন্ধ্যায় সঙ্গীত একাডেমীতে বহু-আলোচিত হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ 'ধর্মের সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতার সংখ্যা বেশী না হইলেও প্রত্যেকেই প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁহার আলোচনা শুনিয়াছেন। বক্তা প্রাচ্য পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হন। মাননীয় রোল্যাণ্ড কোনর অমায়িকভাবে বক্তার পরিচয় করাইয়া দেন। ভাষণের প্রথমাংশ বক্তা নিয়োগ করেন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম এবং জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যানে। ভারতে ভূমির প্রথম বিজেতা আর্যগণ—খ্রীষ্টানরা যেমন নূতন দেশজয়ের পর করিয়া থাকে, সেইরূপ দেশের তৎকালীন অধিবাসীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন অমার্জিত সংস্কারের লোকগণকে সুসংস্কৃত করিতে। যে-সব স্বদেশবাসী স্নান করে না বা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে, হিন্দুরা তাহাদের উপর বিরক্ত। উত্তর ভারতের অধিবাসী আর্যেরা দক্ষিণাঞ্চলের অনার্যগণের উপর নিজেদের আচার ব্যবহার জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, তবে অনার্যেরা আর্যদের অনেক রীতিনীতি ধীরে ধীরে নিজেরাই গ্রহণ করে। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে বহু শতাব্দী হইতে কিছু কিছু খ্রীষ্টান আছে। স্পেনিয়ার্ডরা সিংহলে খ্রীষ্টধর্ম লইয়া যায়। তাহারা মনে করিত যে, অখ্রীষ্টানদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট।

বিভিন্ন ধর্ম যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটি ধর্মও বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। খ্রীষ্টানদের নিজস্ব ধর্ম চাই। হিন্দুদেরও প্রয়োজন স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখা। যে-সব ধর্মের মূলে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। খ্রীষ্টানরা য়াহুদীগণকে খ্রীষ্টধর্মে

আনিতে পারে নাই কেন? পারসীকদেরও খ্রীষ্টান করিতে পারে নাই কি কারণে? মুসলমানরাও খ্রীষ্টান হয় না কেন? চীন এবং জাপানে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম—যাহাকে প্রথম প্রচারশীল ধর্ম বলিতে পারা যায়—কখনও তরবারির সাহায্যে অপরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে নাই, তবুও ইহা খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা দ্বিগুণ লোককে স্বমতে আনিয়াছে। মুসলমানেরা সর্বাপেক্ষা বেশী বল প্রয়োগ করিলেও তিনটি বড় প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা কম। মুসলমানদের বিজয়ের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিরা রক্তপাত করিয়া ভূমি দখল করিতেছে, এই খবর আমরা প্রত্যহই পড়ি। কোন্ প্রচারক ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন? অত্যন্ত রক্তপিপাসু জাতিরা যে ধর্ম লইয়া এত জয়গান করে, তাহা তো খ্রীষ্টের ধর্ম নয়। য়াহুদী ও আরবগণ খ্রীষ্টধর্মের জনক, কিন্তু ইহারা খ্রীষ্টানদের দ্বারা কতই না নির্যাতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণকে বেশ যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে, খ্রীষ্টের আদর্শ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে।

বক্তা বলেন, তিনি রূঢ় হইতে চান না, তবে অপরের চোখে খ্রীষ্টানদের কিরূপ দেখায়, তাহাই তিনি উল্লেখ করিতেছেন; যে-সব মিশনরী নরকের জ্বলন্ত গহ্বরের কথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সন্ত্রাসের সহিত দেখিয়া থাকে। মুসলমানরা ভারতে তরবারি-ঝনৎকারে আক্রমণের উপর আক্রমণ-প্রবাহ চালাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? সব ধর্মই চূড়ান্ত দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পায়, তাহা হইল একটি চৈতন্যসত্তা। কোন ধর্মই ইহার পর আর কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই একটি মুখ্য সত্য আছে, আর কতকগুলি গৌণ ভাব উহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। যেন একটি মণি—একটি পেটিকার মধ্যে রাখা আছে। মুখ্য সত্যটি হইল মণি, গৌণ ভাবগুলি পেটিকা স্বরূপ। য়াহুদীর শাস্ত্রকে মানিলাম বা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থকে—ইহা গৌণ ব্যাপার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে ধর্মের মূল সত্যের আধারটিও বদলায়, কিন্তু মূল সত্যটি অপরিবর্তিত রহিয়া যায়। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহারা ধর্মের মূল সত্যকে ধরিয়া থাকেন। শুক্তির বাহিরের খোলাটি দেখিতে সুন্দর নয়, তবে ঐ খোলার ভিতর তো মুক্তা রহিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় জনসংখ্যার একটি অল্প অংশ মাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার আগেই ঐ ধর্ম বহু মতবাদে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর নানা ধর্ম লইয়া যে একটি মহান্ ঐকতান বাদ্য চলিতেছে, উহার মধ্যে শুধু একটি যন্ত্রকে স্বীকার করিতে চাও কেন? সমগ্র বাদ্যটিকেই চলিতে দাও। বক্তা বিশেষ জোড় দিয়া বলেন পবিত্র হও, কুসংস্কার ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখিবার চেষ্টা কর। কুসংস্কারই ধর্মকে ছাপাইয়া গোল বাধায়। সব ধর্মই ভাল, কেননা মূল সত্য সর্বত্রই এক। প্রত্যেক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ব্যবহার করুক, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সকল পৃথক্ ব্যক্তিকে লইয়া একটি সুসমঞ্জস সমষ্টি গঠিত হয়। এই আশ্চর্য সামঞ্জস্যের অবস্থা ইতঃপূর্বেই রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ধর্মমত সম্পূর্ণ ধর্মসৌধটির গঠনে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছে।

বক্তা তাঁহার ভাষণে বরাবর তাঁহার স্বদেশের ধর্মসমূহকে সমর্থন করিয়া যান। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাবতীয় রীতিনীতি যে বৌদ্ধদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। নৈতিকতার উচ্চমান এবং পবিত্র জীবনের যে আদর্শ বুদ্ধের উপদেশ হইতে পাওয়া যায়, বক্তা কিছুক্ষণ তাহার বর্ণনা করেন; তবে তিনি বলেন যে, ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস-সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মে অজ্ঞেয়বাদই প্রবল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রধান কথা হইল—‘সৎ হও, নীতিপরায়ণ হও, পূর্ণতা লাভ কর।’

সুদূর ভারতবর্ষ হইতে

‘স্যাগিন কুরিআর হেরাল্ড’, ২২ মার্চ, ১৮৯৪

হিন্দু প্রচারক কানন্দের স্যাগিনে আগমন ও একাডেমীতে মনোজ্ঞ বাক্যালাপ।

গত সন্ধ্যায় হোটেল ভিন্‌সেণ্ট-এর লবিতে জনৈক বলিষ্ঠ সুঠাম ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। গায়ের শ্যামবর্ণের সহিত তাঁহার মুক্তা-ধবল দাঁত খুব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। চওড়া এবং উঁচু কপালের নীচে তাঁহার চোখ দুটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। এই ভদ্রলোকই হইলেন হিন্দুধর্মের প্রচারক স্বামী বিবে কানন্দ। মিঃ কানন্দ শুদ্ধ এবং ব্যাকরণ-সম্মত ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারণে ঈষৎ বিদেশী ঢঙটি বেশ চিত্তরঞ্জক। ডেট্রয়েটের সংবাদপত্রসমূহ যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা অবগত আছেন যে,মিঃ কানন্দ ঐ শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁহার কটাক্ষের জন্য তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন। মিঃ কানন্দের কাল একাডেমীতে বক্তৃতা দিতে যাইবার পূর্বে ‘কুরিআর হেরাল্ড’-এর প্রতিনিধি তাঁহার সহিত কয়েক মিনিট কথোপকথনের সুযোগ পান। মিঃ কানন্দ বলেন, আজকাল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে কিরূপ বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছেন; তবে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতরই ভালমন্দ দুই-ই আছে। মিঃ কানন্দের একটি উক্তি নিশ্চয়ই আমেরিকান আদর্শের বিরোধী। তিনি আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ‘না, আমি একজন প্রচারক মাত্র।’ ইহা কৌতূহলের অভাব ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক এবং ধর্মতত্ত্বাভিজ্ঞ এই বৌদ্ধ প্রচারকের সহিত যেন খাপ খায় না।

হোটেল হইতে একাডেমী খুব কাছেই। ৮টার সময় রোল্যাণ্ড কোনর তাঁহাকে নাতিবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বক্তা একটি লম্বা আলখাল্লা পরিয়া গিয়াছিলেন উহার কটিবন্ধটি লাল রঙের। তাঁহার মাথায় পাগড়ি ছিল, একটি অপ্রশস্ত শাল জড়াইয়া বোধ করি উহা গঠিত।

ভাষণের প্রারম্ভেই বক্তা বলিয়া লইলেন যে, তিনি মিশনরীরূপে এখানে আসেন নাই, বৌদ্ধরা (হিন্দুরা) অপর ধর্ম-বিশ্বাসের লোককে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইল —'ধর্মসমূহের সমন্বয়'। মিঃ কানন্দ বলেন, প্রাচীনকালে এমন বহু ধর্ম ছিল—যাহাদের আজ আর কোন অস্তিত্ব নাই, ভারতবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ হইল বৌদ্ধ (হিন্দু), অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ অন্যান্য নানা ধর্মের অনুগামী। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর মানুষের নরকে শাস্তিভোগের কোন স্থান নাই। এখানে খ্রীষ্টানদের মত হইতে উহার পার্থক্য। খ্রীষ্টানরা ইহলোকে মানুষকে পাঁচ মিনিটের জন্য ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু পরলোকে তাহার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে। মানুষের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বুদ্ধই প্রথম দেন। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি প্রধান নীতি। খ্রীষ্টানরা ইহা প্রচার করেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ অভ্যাস করেন না।

উদাহরণস্বরূপ তিনি এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোগণের অবস্থার বিষয় উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে শ্বেতকায়গণের সহিত এক হোটেলে থাকিতে বা এক যানে চড়িতে দেওয়া হয় না। কোন ভদ্রলোক তাহাদিগের সহিত কথা বলে না। বক্তা বলেন, তিনি দক্ষিণে গিয়াছেন এবং নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা বলিতেছেন।

আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত একটি সন্ধ্যা

'নরদ্যাম্প্‌টন ডেলী হেরাল্ড', ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৪

স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমুদ্রের অপর পারে আমাদের যে-সব প্রতিবেশী আছেন—এমন কি যাঁহারা সুদূরতম অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁহারাও আমাদের নিকট সম্পর্কের আত্মীয়, শুধু বর্ণ ভাষা আচার-ব্যবহার ও ধর্মে সামান্য যা একটু পার্থক্য। এই বাগ্মী হিন্দু সন্ন্যাসী গত শনিবার সন্ধ্যায় সিটি হল-এ তাঁহার বক্তৃতার উপক্রমণিকাস্বরূপ ভারতীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক চিত্র তুলিয়া ধরেন। উহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, অনেকে যথেষ্ট না জানিলেও বা অস্বীকার করিলেও জাতিসমূহের পারস্পরিক মিল ও সম্পর্ক একটি সুস্পষ্ট সত্য ঘটনা।

ইহার পর বক্তা মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল কথোপকথনচ্ছলে হিন্দু জনগণের কতিপয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের এই আলোচ্য বিষয়টিতে একটি স্বাভাবিক বা অনুশীলিত অনুরাগ আছে, তাঁহারা বক্তা ও তাঁহার চিন্তাধারার প্রতি নানা কারণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বক্তা অপরদের নৈরাশ্যই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার আলোচনার গণ্ডী আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। আমেরিকার বক্তৃতা-মঞ্চের পক্ষে বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদিগের 'আচার-ব্যবহার' সম্বন্ধে সামান্যই বলা হইয়াছিল। এই প্রাচীনতম জাতির এমন একজন সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে ঐ জাতির ব্যক্তিগত, নাগরিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মসংক্রান্ত আরও অনেক কিছু তথ্য শুনিতে পাইলে সকলেই খুশী হইতেন। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহাদিগের নিকট এই বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক, যদিও এই দিকে তাঁহাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

হিন্দু-জীবনের প্রসঙ্গ বক্তা আরম্ভ করেন হিন্দু-বালকের জন্ম হইতে। তারপর বিদ্যারম্ভ ও বিবাহ। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের উল্লেখ সামান্য মাত্র করা হয়, যদিও লোকে আরও বেশী শুনিবার আশা করিয়াছিল। বক্তা ঘন ঘন সমাজ, নীতি ও ধর্মের দিক্ দিয়া ভারতীয় জাতির চিন্তা ও কার্যধারার সহিত ইংরেজীভাষী জাতিসমূহের ভাব ও আচরণের তুলনামূলক মন্তব্যে ব্যাপৃত হইতেছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারতের অনুকূলে উপস্থাপিত হইতেছিল, তবে তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অতি বিনীত, সহৃদয় ও ভদ্র। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা হিন্দু জাতির সকল শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত। বক্তার আলোচিত অনেকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে দু-একটি পাল্টা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। উদাহরণ- স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, বক্তা যখন চমৎকার বাগ্মিতার সহিত 'নারী জাতিকে দিব্য মাতৃত্বের দৃষ্টিতে দেখা' হিন্দুদের এই ভাবটি বর্ণনা করিতেছিলেন—বলিতেছিলেন, ভারতে নারী চিরদিন শ্রদ্ধার পাত্রী এবং এমন কি কখনও কখনও যে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তিনি পূজিত হন, তাহা স্ত্রীজাতির প্রতি অতিশয় সম্মানসম্পন্ন আমেরিকান পুত্র, স্বামী ও পিতারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না—তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন যে, এই সুন্দর উচ্চ আদর্শটি কার্যতঃ হিন্দুদের গৃহে স্ত্রী, জননী, কন্যা এবং ভগিনীদের প্রতি কতদূর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

বক্তা শ্বেতকায় ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিদের বিত্তলোভ, বিলাসব্যসন, স্বার্থপরতা এবং কাঞ্চন-কৌলীন্যের সমালোচনা করিয়া উহাদের বিষময় নৈতিক ও সামাজিক পরিণামের কথা বলেন। তাঁহার এই সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং তিনি উহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধীর, মৃদু, শান্ত, অনুত্তেজিত ও মধুর কণ্ঠে বক্তা তাঁহার চিন্তাগুলিকে যে বাক্যের আকার দিতেছিলেন, উহাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ভাষার শক্তি ও আগুন এবং উহা সোজাসুজি তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিতেছিল। য়াহুদীদের প্রতি যীশুখ্রীষ্টের উগ্র কটূক্তির

কথা মনে হইতেছিল। কিন্তু অভিজাতকুলোদ্ভব, চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ঐ হিন্দু মহোদয় যখন মাঝে মাঝে কতকটা যেন তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারেই মূল বক্তব্য হইতে সরিয়া গিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বজাতির ধর্ম যাহা স্পষ্টভাবে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী, প্রধানতঃ নিজেকে বাঁচাইতে ব্যস্ত, নেতিমূলক, নিশ্চেষ্ট ও কর্মবিমুখ—খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল, আত্মত্যাগী, সর্বদা পরহিতব্রতী, পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারশীল, কর্মতৎপর ধর্ম হইতে পৃথিবীতে উপযোগিতার দিক্ দিয়া উৎকৃষ্ট, তখন মনে হয়, তাঁহার এই প্রচেষ্টা একটি বড় রকমের চাল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী অবিবেচক গোঁড়ারা যতই শোচনীয় ও লজ্জাকর ভুল করিয়া থাকুক না কেন, ইহা তো সত্য যে পৃথিবীতে যত নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং লোকহিতকর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নয়-দশমাংশ এই ধর্মের নামেই সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু স্বামী বিবে কানন্দকে দেখা ও তাঁহার কথা শুনিবার সুযোগ—কোন বুদ্ধিমান্ ও পক্ষপাতশূন্য আমেরিকানেরই ত্যাগ করা উচিত নয়। যে জাতি উহার আয়ুষ্কাল আমাদের ন্যায় শতাব্দীতে মাপ না করিয়া হাজার হাজার বৎসর দিয়া গণনা করে, সেই জাতির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হইলেন স্বামী বিবে কানন্দ। তাঁহার সহিত পরিচয় প্রত্যেকেরই পক্ষে প্রচুর লাভজনক। রবিবার অপরাহ্ণে এই বিশিষ্ট হিন্দু স্মিথ-কলেজের ছাত্রদের নিকট 'ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এই ভাষণ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বক্তার সমগ্র চিন্তাধারায় উদারতম বদান্যতা এবং যথার্থ ধর্মপ্রাণতা যে পরিস্ফুট, ইহা প্রত্যেকেই বলিতেছিলেন।

'স্মিথ কলেজ মাসিক', মে, ১৮৯৪

১৫ এপ্রিল রবিবার হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁহার ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রভূত

প্রশংসাসূচক মন্তব্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—কলেজের সান্ধ্য উপাসনায় বক্তৃতা দেন। আমরা মানুষের সৌভ্রাত্র এবং ঈশ্বরের পিতৃভাব সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া থাকি, কিন্তু এই শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করে। মানবাত্মা যখন বিশ্বপিতার এত সন্নিকটে আসে যে, দ্বেষ হিংসা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষুদ্র দাবীসমূহ তিরোহিত হয় (কেননা মানুষের স্বরূপ—এগুলির অনেক ঊর্ধ্বে), তখনই যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত—আমরা যেন হিন্দুদের গল্পে বর্ণিত 'কূপমণ্ডূক' না হইয়া পড়ি। একটি ব্যাঙ বহু বৎসর ধরিয়া একটি কূপের মধ্যে বাস করিতেছিল। অবশেষে কূপের বাহিরে যে খোলা জায়গা আছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে লাগিল।

ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে

'নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন', ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৪

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ালডর্ফ হোটেলে মিসেস আর্থার স্মিথের 'কথোপকথন-চক্রের'র নিকট 'ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গায়িকা মিসেস সারা হামবার্ট ও মিস অ্যানি উইলসন অনেকগুলি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বক্তা একটি কমলালেবু রঙের কোট এবং হলদে-পাগড়ি পরিয়াছিলেন। ইহা হইল ভগবান্ এবং মানব-সেবার জন্য সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ।

বক্তা পুনর্জন্মবাদের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কলহপ্রিয়তাই বেশী, এমন অনেক ধর্মযাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পূর্বজন্ম যদি থাকে তাহা হইলে লোকের উহা স্মরণ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, স্মরণ করিতে পারা না পারার উপর কোন ঘটনার সত্যাসত্য স্থাপন করা ছেলেমানুষি! মানুষ তো তাহার জন্মের কথা মনে করিতে পারে না এবং জীবনে ঘটিয়াছে, এমন আরও অনেক কিছুই তো সে ভুলিয়া যায়।

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টধর্মের 'শেষ বিচারের দিন'-এর ন্যায় কোন বস্তু হিন্দুধর্মে নাই। হিন্দুদের ঈশ্বর শাস্তি দেন না, পুরস্কৃতও করেন না। কোন প্রকার অন্যায় করিলে তাহার শাস্তি অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবেই ঘটিবে। যতদিন না পূর্ণতা লাভ হইতেছে, ততদিন আত্মাকে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

ভারতীয় আচার-ব্যবহার

‘বষ্টন হেরাল্ড’, ১৫ মে, ১৮৯৪

গতকল্য ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ‘ভারতীয় ধর্ম’ (বস্তুতঃ—ভারতীয় আচার-ব্যবহার) সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার জন্য এসোসিয়েশন হল-এ মহিলাদের খুব ভিড় হয়। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। (বস্তুতঃ টাইলার ষ্ট্রীট ডে নার্সারী বিদ্যালয়।) এই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী গত বৎসর চিকাগোতে যেমন সকলের মনোযোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবার বষ্টনে অনুরূপ ঘটিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক সাধু মার্জিত চালচলন দ্বারা তিনি বহু অনুরাগী বন্ধু লাভ করিয়াছেন।

বক্তা বলেনঃ হিন্দুজাতির ভিতরে বিবাহকে খুব বড় করিয়া দেখা হয় না। কারণ ইহা নয় যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি। আমাদের ধর্ম নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে পূজা করিবার উপদেশ দেয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক নারী হইলেন নিজের মায়ের মত—এই শিক্ষা হিন্দুরা বাল্যকাল হইতে পায়। কেহ তো আর জননীকে বিবাহ করিতে চায় না। আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ভাবি। স্বর্গবাসী ঈশ্বরের আমরা আদৌ পরোয়া করি না। বিবাহকে আমরা একটি নিম্নতর অবস্থা বলিয়া মনে করি। যদি কেহ বিবাহ করে, তবে ধর্মপথে তাহার একজন সহায়ক সঙ্গীর প্রয়োজন বলিয়াই করে।

তোমরা বলিয়া থাক যে, আমরা হিন্দুরা আমাদের নারীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্ জাতি স্ত্রীজাতিকে পীড়া দেয় নাই? ইওরোপ বা আমেরিকায় কোন ব্যক্তি অর্থের লোভে কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করিতে পারে এবং বিবাহের পর তাঁহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে ভারতে কোন স্ত্রীলোক যদি ধনলোভে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানদের

ক্রীতদাস বলিয়া মনে করা হয়। বিত্তবান্ পুরুষ বিবাহ করিলে তাঁহার অর্থ তাঁহার পত্নীর হাতেই যায় এবং সেইজন্য টাকাকড়ির ভার যিনি লইয়াছেন, সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

তোমরা আমাদিগকে পৌত্তলিক, অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতি বলিয়া থাক, আমরা শুনিয়া এইরূপ কটুভাষী তোমাদের ভদ্রতার অভাব দেখিয়া মনে মনে হাসি। আমাদের দৃষ্টিতে সদ্‌গুণ এবং সৎকুলে জন্মই জাতি নির্ধারণ করে, টাকা নয়। ভারতে টাকা দিয়া সম্মান কেনা যায় না। জাতিপ্রথায় উচ্চতা অর্থ দ্বারা নিরূপিত হয় না। জাতির দিক্ দিয়া অতি দরিদ্র এবং অত্যন্ত ধনীর একই মর্যাদা। জাতিপ্রথার ইহা একটি চমৎকার দিক্।

বিত্তের জন্য পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে, খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরস্পরকে মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিয়াছে। ধনলিপ্সা হইতেই জন্মায় হিংসা, ঘৃণা, লোভ এবং চলে প্রচণ্ড কর্মোন্মত্ততা, ছুটাছুটি, কলরব। জাতিপ্রথা মানুষকে এই-সকল হইতে নিষ্কৃতি দেয়। উহা তাহাকে অল্প টাকায় জীবনযাপন করিতে সক্ষম করে এবং সকলকেই কাজ দেয়। জাতিপ্রথায় মানুষ আত্মার চিন্তা করিবার অবসর পায়, আর ভারতীয় সমাজে ইহাই তো আমরা চাই।

ব্রাহ্মণের জন্ম দেবার্চনার জন্য। জাতি যত উচ্চ, সামাজিক বিধি-নিষেধও তত বেশী। জাতিপ্রথা আমাদিগকে হিন্দুজাতিরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রথার অনেক ত্রুটি থাকিলেও বহু সুবিধা আছে।

মিঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া বারাণসীর (?) প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখ করেন। উহার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মোট সংখ্যা ছিল ২০,০০০।

বক্তা আরও বলেন, 'তোমরা যখন আমার ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে বস, তখন ধরিয়া লও যে, তোমাদের ধর্মটি হইল নিখুঁত আর আমারটি ভুল। ভারতের সমাজের সমালোচনা করিবার সময়েও তোমরা মনে কর, যে পরিমাণে উহা তোমাদের আদর্শের সঙ্গে মিলে না, সেই পরিমাণে উহা অমার্জিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থহীন।'

শিক্ষা সম্পর্কে বক্তা বলেন, ভারতে যাহারা অধিক শিক্ষিত, তাহারা অধ্যাপনার কাজ করে। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতেরা পুরোহিত হয়।

ভারতের ধর্মসমূহ

'বষ্টন হেরাল্ড', ১৭ মে, ১৮৯৪

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতকল্য বিকালে এসোসিয়েশন হল-এ ১৬নং ওয়ার্ড ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে 'ভারতের ধর্মসমূহ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হইয়াছিল।

বক্তা প্রথমে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলেন। ভারতের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হইল মুসলমান। ইঁহারা বাইবেলের পুরাতন এবং নূতন দুই টেষ্টামেণ্টেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে শুধু ভগবদাদিষ্ট মহাপুরুষ মাত্র বলেন। খ্রীষ্টানদের ন্যায় ইঁহাদের উপাসনাসমূহের কোন সংস্থা নাই, তবে সম্মিলিত কোরানপাঠ প্রচলিত।

ভারতবর্ষের আর একটি ধর্মসম্প্রদায় পার্শী জাতি। ইঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ্-আবেস্তা। ইঁহারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতায় বিশ্বাসী—কল্যাণের অধিষ্ঠাতা আরমুজ্দ্ এবং অশুভের জনক আহ্রিমান। পার্শীদের নৈতিক-বিধানের সারমর্ম হইলঃ সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য এবং সৎ কর্ম।

হিন্দুগণ বেদকে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় জাতির রীতিনীতি মানিতে বাধ্য, তবে ধর্মের ব্যাপারে নিজের খুশীমত চিন্তা করিয়া দেখিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ধর্মসাধনার একটি অংশ হইল কোন সাধুপুরুষ বা ধর্মাচার্যকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ ক্রিয়া করিতেছে, উহার সুযোগ লওয়া।

হিন্দুদের তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায় রহিয়াছে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। এগুলিকে কোন ব্যক্তির

আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথে স্বভাবিকভাবে উপস্থিত তিনটি ধাপ বলিয়া মনে করা হয়।

তিন সম্প্রদায়ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তবে দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর এবং মানুষ পরস্পর ভিন্ন। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সত্তা আছে—ইহা ঈশ্বর ও জীব দুয়েরই অতীত।

বক্তা বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুধর্মের প্রকৃতি কি, তাহা দেখান এবং বলেন, ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদিকে নিজেদের হৃদয় অন্বেষণ করিতে হইবে। পুঁথিপত্রের মধ্যে ধর্ম নাই। ধর্ম হইল অন্তরের অন্তরে তাকাইয়া ঈশ্বর ও অমৃতত্বের সত্যকে উপলব্ধি করা। বেদের একটি উক্তিঃ 'যাহাকে আমি পছন্দ করি, তাহাকে সত্যদ্রষ্টারূপে গড়িয়া তুলি।' সত্যদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য।

জৈনধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার উপসংহার করেন। এই ধর্মাবলম্বীরা মূক প্রাণীদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করে। তাঁহাদের নৈতিক অনুশাসন হইল সংক্ষেপেঃ কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করাই মহত্তম কল্যাণ।

ভারতের ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাস

‘হার্ভার্ড ক্রিমজন’, ১৭ মে, ১৮৯৪

হার্ভার্ড
ধর্মসম্মিলনীর
উদ্যোগে গতকল্য
সন্ধ্যায় ‘সেভার
হল’-এ হিন্দু
সন্ন্যাসী স্বামী
বিবেকানন্দ একটি
চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। বক্তার পরিষ্কার ওজস্বী কণ্ঠ এবং ধীর আন্তরিকতাপূর্ণ বাচনভঙ্গীর জন্য তাঁহার কথাগুলি বিশেষভাবে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ বলেন, ভারতে নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং ধর্মমত বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি-ঈশ্বর স্বীকার করে, অপর কতকগুলির মতে ভগবান্ এবং বিশ্বজগৎ অভিন্ন। তবে যে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, কোন হিন্দু বলে না যে, তাহার মতটিই সত্য আর অপরে ভ্রান্ত। হিন্দু বিশ্বাস করে যে, ভগবানের নিকট পৌঁছিবার পথ বহু; যিনি প্রকৃত ধার্মিক, তিনি দল বা মতের ক্ষুদ্র কলহের ঊর্ধ্বে। যদি কাহারও যথার্থ ধারণা হয় যে, সে দেহ নয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তবেই তাহাকে ভারতে ধার্মিক বলা হয়, তার পূর্বে নয়।

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হইতে গেলে দেহের চিন্তা সর্বতোভাবে বিস্মৃত হওয়া এবং অন্য মানুষকে আত্মা বলিয়া ভাবা প্রয়োজনীয়। এইজন্য সন্ন্যাসীরা কখনও বিবাহ করে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় দুইটি ব্রত লইতে হয়—দারিদ্র্য এবং ব্রহ্মচর্য। সন্ন্যাসীর টাকাকড়ি লওয়া বা থাকা নিষিদ্ধ। সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার সময় প্রথম একটি ক্রিয়া

অনুষ্ঠেয়—নিজের প্রতিমূর্তি দগ্ধ করা। ইহার দ্বারা পুরাতন শরীর নাম ও জাতি যেন চিরকালের জন্য ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ব্রতীকে একটি নূতন নাম দেওয়া হয় এবং তিনি স্বেচ্ছামত পর্যটন বা ধর্মপ্রচারের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দেন, তাহার জন্য প্রতিদানে তাঁহার কোন অর্থ লইবার অধিকার নাই।

উপদেশ কম, খাদ্য বেশী

‘বাল্টিমোর আমেরিকান’, ১৫ অক্টোবর, ১৮৯৪

ভ্রূম্যান ব্রাদার্স-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় আলোচনা-সভাগুলির প্রথমটি গতকল্য রাত্রিতে লাইসিয়াম থিয়েটারে সম্পন্ন হয়। খুব ভিড় হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল ‘প্রাণবন্ত ধর্ম।’

ভারত হইতে আগত ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শেষ বক্তা। যদিও তিনি অল্পক্ষণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা এবং বক্তৃতার ধরন অতি সুন্দর। তাঁহার উচ্চারণে বৈদেশিক ধাঁচ থাকিলেও তাঁহার কথা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। তিনি তাঁহার স্বদেশীয় পোষাক পরিয়াছিলেন, উহা বেশ জমকালো। তিনি বলেন, তাঁহার পূর্বে অনেক ওজস্বী ভাষণ হইয়া যাওয়াতে তিনি সংক্ষেপেই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে চান। পূর্ব-বক্তারা যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহা অনুমোদন করিতেছেন। তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানাশ্রেণীর লোকের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে, কি মতবাদ প্রচার করা হইল, তাহাতে অল্পই আসে যায়। আসল প্রয়োজন হইল একটি কার্যকর কর্মপন্থা। বড় বড় কথা যদি কাজে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস চলিয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র লোকের ব্যাকুল চাহিদা হইল—উপদেশ কম, খাদ্য বেশী। ভারতবর্ষে মিশনরী পাঠান ভালই, তাঁহার ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, তবে তাঁহার মতে লোক কম পাঠাইয়া বেশী টাকা পাঠান সঙ্গত। ভারতে ধর্মমতের অভাব নাই। নূতন ধর্মমত আমদানী করা অপেক্ষা ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনই অধিক প্রয়োজনীয়। ভারতবাসী এবং পৃথিবীর সর্বত্র অন্যান্য সকলেই উপাসনার রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু মুখে প্রার্থনা উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়। হৃদয়ের আন্তরিকতা দিয়া প্রার্থনা করা চাই। বক্তা বলেন, ‘বাস্তবপক্ষে

জগতে প্রকৃত কল্যাণচিকীর্ষুর সংখ্যা খুব অল্প। অপরে শুধু তাকাইয়া দেখে, বাহবা দেয় এবং ভাবে যে, তাহারা নিজেরা অনেক কিছু মহৎ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রেমই যথার্থ জীবন। মানুষ যখন অপরের হিত করিতে ক্ষান্ত হয়, তখন আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া সে মৃত।'

আগামী রবিবার সন্ধ্যায় লাইসিয়ামে স্বামী বিবেকানন্দ হইবেন প্রধান বক্তা।

বুদ্ধের ধর্ম

'মর্নিং হেরাল্ড', ২২ অক্টোবর, ১৮৯৪

গত রাত্রে ভ্রূম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত 'প্রাণবন্ত ধর্ম' পর্যায়ের দ্বিতীয় বক্তৃতায় লাইসিয়াম থিয়েটার লোকের ভিড়ে পুরাপুরি ভরিয়া গিয়াছিল। শ্রোতাদের সংখ্যা তিন হাজার হইবে ... বক্তৃতা করেন রেভারেণ্ড হিরাম ভ্রূম্যান, রেভারেণ্ড ওয়াল্টার ভ্রূম্যান এবং এই শহরে (বাল্টিমোর) সম্প্রতি আগত ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তারা সকলেই ষ্টেজের উপর বসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড বিবেকানন্দ সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন।

তিনি একটি হলুদ রঙের পাগড়ি এবং লাল রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। আলখাল্লার কটিবন্ধটিও লাল রঙের। এই পোষাক তাঁহার প্রাচ্য চেহারার মর্যাদা বাড়াইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি একটি অদ্ভুত আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বই গতরাত্রের অনুষ্ঠানটিকে যেন জমাইয়া রাখিয়াছিল। সহজভাবে একটুও বিব্রত বোধ না করিয়া তিনি ভাষণটি বলিয়া গেলেন। উহার ভাষা নিখুঁত, উচ্চারণ—ইংরেজী ভাষা-জানা কোন সুশিক্ষিত ল্যাটিন-জাতীয় ব্যক্তির ন্যায়। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ দেওয়া হইতেছেঃ

খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর আগে বুদ্ধ তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষে তখন ধর্ম প্রধানতঃ মানুষের আত্মার প্রকৃতি লইয়া অন্তহীন বাদ-বিতণ্ডায় ব্যাপৃত। ধর্মজীবনের প্রত্যবায়সমূহের অপনোদনের জন্য তদানীন্তন ধর্মের শিক্ষায় প্রাণিহত্যা যাগযজ্ঞ এবং অনুরূপ প্রণালীগুলির উপরই নির্ভর করা হইত।

বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি এইরূপ ধর্মব্যবস্থার মধ্যে একটি

অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কথা এই যে, তিনি কোন নূতন ধর্ম প্রচলিত করেন নাই, তাঁহার আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। সকলের হিত-কামনা ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। প্রথম—অশুভ আছে। দ্বিতীয়—এই অশুভের কারণ কি? বুদ্ধ বলিলেন, অশুভের কারণ মানুষের অপরের উপর প্রাধান্য-লাভের কামনা। তৃতীয়—নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা এই দোষ দূর করা যাইতে পারে। বুদ্ধের মতে—বল প্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিরোধ সম্ভবপর নয়। ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না; ঘৃণার দ্বারা ঘৃণা নিবারিত হয় না।

ইহাই হইল বুদ্ধের ধর্মের ভিত্তি। যতক্ষণ সমাজ মানুষের স্বার্থপরতা এমন সব আইন-কানুন ও সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করে, যেগুলির লক্ষ্য হইল জোর করিয়া মানুষকে প্রতিবেশীদের হিতসাধনে প্রযোজিত করা, ততক্ষণ কোন সুফল হইবার নয়। কৌশলের বিরুদ্ধে কৌশলকে, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসাকে না লাগানই হইল কার্যকর পন্থা। নিঃস্বার্থ নরনারী সৃষ্টি করাই হইল একমাত্র প্রতীকার। বর্তমানের অশুভগুলি দূর করিবার জন্য আইন চালু করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না।

বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, ভারতে ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বরূপ লইয়া অত্যধিক জল্পনা চলে, কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় অতি সামান্য। এই মুখ্য সত্যটির উপর তিনি সর্বদা জোর দিতেনঃ আমাদিগকে সৎ এবং পবিত্র হইতে হইবে এবং অপরকে পবিত্র হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষকে উদ্যমশীল হইয়া অপরের উপকার সাধনে লাগিতে হইবে, অন্যের মধ্যে নিজের আত্মাকে, অন্যের ভিতর নিজের জীবনকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে। অপরের কল্যাণ-সাধনের দ্বারাই আমরা নিজেদের মঙ্গল বিধান করি। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, জগতে সর্বদাই অত্যধিক পরিমাণে মতবাদ চলিতে থাকে, তদনুপাতে কার্যতঃ অভ্যাস দেখা যায় খুব কম। বর্তমানকালে বুদ্ধের মত ১২ জন

লোক যদি ভারতে থাকেন তো ঐ দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই দেশে একজন বুদ্ধ পাওয়া গেলে প্রভূত কল্যাণ হইবে।

ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধি পায়, পিতৃপুরুষের ধর্মে অন্ধবিশ্বাস যখন প্রবল হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তি দ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলে, তখন একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেননা ঐ-সকলের দ্বারা মানুষের অনিষ্টই বাড়িতে থাকে, উহাদের শোষণ না হইলে মানুষের কল্যাণ নাই।

মিঃ বিবেকানন্দের বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

‘বাল্টিমোর আমেরিকান’, ২২ অক্টোবর, ১৮৯৪

‘প্রাণবন্ত ধর্ম’ সম্বন্ধে ভ্রম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয়টি শুনিবার জন্য গত রাত্রে লাইসিয়াম থিয়েটার গৃহ লোকে সম্পূর্ণ ভরিয়া গিয়াছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন এবং বুদ্ধের জন্মের সময় ভারতবাসীর মধ্যে যে-সব দোষ ছিল, তাহার উল্লেখ করেন। ঐসময়ে ভারতে সামাজিক অসাম্য পৃথিবীর অন্য যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনে পুরোহিত সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধি-বিচার এবং বিদ্যাবত্তা—পেষণযন্ত্রের এই দুই পাথরের মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ নিষ্পিষ্ট হইতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম একটি নূতন ধর্মরূপে স্থাপিত হয় নাই; বরং উহার উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে। বুদ্ধই বোধ করি একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া সকল উদ্যম পরহিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্ট-রূপ ভীষণ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহ এবং

জীবনের সকল ভোগসুখ বিসর্জন দিয়াছিলেন। যে যুগে পণ্ডিত এবং পুরোহিতকুল ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথা তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত, বুদ্ধ সেই সময়ে মানুষ যাহা খেয়াল করে না, জীবনের সেই একটি বিপুল বাস্তব সত্য আবিষ্কার করিলেন—দুঃখের অস্তিত্ব। আমরা অপরকে ডিঙাইয়া যাইতে চাই এবং আমরা স্বার্থপর বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটে। যে মুহূর্তে জগতের সকলে নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে, সেই মুহূর্তে সকল অশুভ তিরোহিত হইবে। সমাজ যতদিন আইন-কানুন এবং সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অকল্যাণের প্রতীকার করিতে সচেষ্ট, ততদিন ঐ প্রতিকার অসম্ভব। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগৎ ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছে; কোন ফল হয় নাই। হিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না। নিঃস্বার্থপরতা দ্বারাই সকল অশুভ নিবারিত হয়। নূতন নূতন নিয়ম না করিয়া মানুষকে পুরাতন নিয়মগুলি পালন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তবে অপর কোন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যাণশক্তি হারাইয়া ফেলে।

সকল ধর্মই ভাল

‘ওয়াশিংটন পোষ্ট’, ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৪

‘পীপ্‌ল্‌স্‌ চার্চ’ গীর্জার ধর্মযাজক ডক্টর কেণ্ট-এর আমন্ত্রণে মিঃ কানন্দ গতকল্য সেখানে বক্তৃতা করেন। সকালের বক্তৃতাটি ছিল রীতিমত ধর্মোপদেশ। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক্‌ মাত্রই তিনি আলোচনা করেন। প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়গুলির নিকট তাঁহার কথা কিছু অভিনব মনে হইবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্মের মূলেই ভাল জিনিষ আছে। ভাষাসমূহের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মও একটি সাধারণ আকর হইতে উৎপন্ন। গোঁড়া মতবাদ এবং প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণতি—এই দুইটি হইতে যদি ধর্মকে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মই মানুষের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। বিকালের আলোচনাটি ছিল আর্যজাতি সম্বন্ধে। উহা প্রায় একটি বক্তৃতার আকারেই উপস্থাপিত হয়। বক্তা বিভিন্ন জাতির ভাষা, ধর্ম এবং রীতিনীতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি সাধারণ সংস্কৃতভাষাগোষ্ঠী হইতে উহাদের সকলের উৎপত্তি প্রমাণ করেন।

সভার পর মিঃ কানন্দ ‘পোষ্ট’-এর জনৈক সংবাদদাতাকে বলেন, আমি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করি না। আমার ভূমিকা একজন পরিদর্শকের এবং যতদূর পারি, আমি মানুষকে শিক্ষা দিবার কার্যে ব্রতী। আমার কাছে সব ধর্মই সুন্দর। জীবন ও জগতের উচ্চতর রহস্য সম্বন্ধে অন্যের মত আমিও কতকগুলি ধারণা উপস্থাপিত করার বেশী আর কিছু করিতে পারি না। আমার মনে হয়, পুনর্জন্মবাদ ধর্মবিষয়ে আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার খুব কাছাকাছি যায়। কিন্তু ইহাকে আমি একটি ধর্মতত্ত্ব বলিয়া খাড়া করিতে চাই না। বড়জোড় ইহা একটি মতবাদ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া ইহা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহার ঐ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাঁহারই পক্ষে ঐ প্রমাণ কার্যকর। তোমার অভিজ্ঞতা আমার

কাছে কিছুই নয়, আমার অভিজ্ঞতাও তোমর নিকট নিষ্ফল। আমি অলৌলিক ঘটনায় বিশ্বাসী নই। ধর্মের ব্যাপারে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আমার নিকট অপ্রীতিকর।

তিনি ইহা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন

তবে আমার বর্তমান অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য আমাকে একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। আর আমরা যদি এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাই, আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্য কোন আকার ধারণ করিতে হইবে। এই দিক্ দিয়া আমার পুনর্জন্মে বিশ্বাস আসে। তবে আমি ইহা হাতে-নাতে প্রমাণ করিতে পারি না। পুনর্জন্মবাদের বদলে অন্য সুষ্ঠুতর কিছু যদি কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি এই মত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এ পর্যন্ত আমি নিজে ঐরূপ সন্তোষজনক কিছু খুঁজিয়া পাই নাই।

মিঃ কানন্দ কলিকাতার অধিবাসী এবং ওখানকার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের মতই তিনি ইংরেজী বলিতে পারেন। ঐ ভাষার মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি ইংরেজ জাতির সহিত ভারতবাসীর সংস্পর্শ লক্ষ্য করিবার প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিলেন। কোন বৈদেশিক মিশনরী কর্মী কানন্দের কথাবার্তা শুনিলে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী করা বিষয়ে নৈরাশ্য পোষণ করিবেন। এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের ধর্মশিক্ষা প্রাচ্যের চিন্তাধারার উপর কতদূর কার্যকরী হইয়াছে। কানন্দ উত্তরে বলেন, ‘একটি দেশে নূতন কোন চিন্তাধারা গেলে উহার কিছু না কিছু ফল অবশ্যই ঘটে, তবে প্রাচ্য চিন্তাধারার উপর খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা এতই সামান্য যে, উহা নজরেই আসে না।’ প্রাচ্য চিন্তাধারা এ দেশে যেমন স্বল্পই দাগ রাখে, পাশ্চাত্য মতবাদসমূহেরও প্রাচ্যে ঐরূপ ফল, বরং অতটাও নয়। অর্থাৎ দেশের চিন্তাশীল লোকের উপর উহার কোনই প্রভাব নাই। সাধারণ লোকের ভিতর মিশনরীদের কাজের ফলও অতি সামান্য। যতগুলি ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, দেশীয় ধর্মসম্প্রদায় হইতে ততগুলি লোক অবশ্যই কমিয়া যায়, তবে দেশের সমগ্র জনসংখ্যা এত বিপুল যে,

মিশনরীদের এই ধর্মান্তরীকরণের পরিমাপ নজরে আসে না।

যোগীরা জাদুকর

যোগিগণ বা অপর পারদর্শিগণের অনুষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা ও লামাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অনুরূপ। মিঃ কানন্দ বলেন যে, অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার কোন ঝোঁক নাই। দেশে অবশ্য বহু জাদুকর দেখা যায়, তবে উহারা যাহা দেখায় তাহা হাতের কৌশল বিশেষ। মিঃ কানন্দ নিজে একবার অল্প মাত্রায় একটি মুসলমান ফকিরের নিকট 'আমের ম্যাজিক' দেখিয়াছেন। লামাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অনুরূপ। মিঃ কানন্দ বলেন, 'এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন বা পক্ষপাতশূন্য লোকের একান্তই অভাব, অতএব তাহাদের দেওয়া বিবরণের কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা বিচার করা কঠিন।'

হিন্দু জীবন-দর্শন

‘ব্রুকলিন টাইমস্’, ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

গত রাত্রে পোচ গ্যালারীতে ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশন কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দকে একটি অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। ... অভ্যর্থনার পূর্বে এই বিশিষ্ট অতিথি ‘ভারতের ধর্মসমূহ’ সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা ছাড়া তিনি বলেন, ‘আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি শিখিতে’—ইহাই হইল হিন্দুদের জীবনদর্শন। জ্ঞান সঞ্চয়েই জীবনের পূর্ণ সুখ। মানবাত্মা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-লাভের জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তোমার বাইবেলের সহিত পরিচয় থাকিলে আমি আমার শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সেইরূপ তুমিও তোমার বাইবেল সুষ্ঠুতরভাবে পড়িতে পারিবে, যদি আমার শাস্ত্রের সহিত তোমার পরিচয় থাকে। একটি ধর্ম সত্য হইলে অন্যান্য ধর্মও নিশ্চয়ই সত্য। একই সত্য বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর এই আকারগুলি নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্যের উপর।

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা যদি জড়বস্তু বা তাহার পরিণাম দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলিত, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু চিন্তাশক্তি যে জড়বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যায় না। মানুষের দেহ কতকগুলি প্রবৃত্তি বংশানুক্রমে লাভ করে—তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই প্রবৃত্তিগুলির অর্থ হইল সেই উপযুক্ত শারীরিক সংহতি, যাহার মাধ্যমে একটি বিশেষ মন নিজস্ব ধারায় কাজ করিবে। জীবাত্মা যে বিশেষ মানসিক সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহার অতীত কর্ম দ্বারা সঞ্জাত। তাহাকে এমন একটি শরীর বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা তাহার মানসিক সংস্কারগুলির বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়। সাদৃশ্যের নিয়মে ইহা ঘটে। বিজ্ঞানের সহিত ইহার

সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কেননা বিজ্ঞান ‘অভ্যাস’ দ্বারা সব কিছুর ব্যাখ্যা করিতে চায়। অভ্যাস সৃষ্ট হয় কোন কিছুর পুনঃপুনঃ ঘটনের ফলে। অতএব নবজাত আত্মার চারিত্রিক সংস্কারগুলি ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বে উহাদের পুনঃ- পুনঃ আবৃত্তি স্বীকার করা প্রয়োজন। ঐ সংস্কারগুলি তো এই জন্মে উৎপন্ন নয়, অতএব নিশ্চয়ই অতীত জন্ম হইতে উহারা আসিয়াছে।

মানবজাতির বিভিন্ন ধর্মগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মানবাত্মা যে-সব ধাপ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেকটি ধর্ম যেন এক একটি ধাপ। কোন ধাপকেই অবহেলা করা উচিত নয়। কোনটিই খারাপ বা বিপজ্জনক নয়। সবগুলিই কল্যাণপ্রসূ। শিশু যেমন যুবক হয়, যুবক আবার যেমন পরিণত বয়স্কে রূপান্তরিত হয়, মানুষও সেইরূপ একটি সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়। বিপদ আসে তখনই যখন এই বিভিন্ন অবস্থার সত্যগুলি অনমনীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং আর নড়িতে চায় না। তখন মানুষের আধ্যাত্মিক গতি রুদ্ধ হয়। শিশু যদি না বাড়ে তো বুঝিতে হইবে সে ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষ ধর্মের পথে যদি ধীরভাবে ধাপে ধাপে আগাইয়া চলে, তাহা হইলে এই ধাপগুলি ক্রমশঃ তাহাকে পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি আনিয়া দিবে। এইজন্য আমরা ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই বিশ্বাস করি, আর ঐ সঙ্গে অতীত যে-সকল ধর্ম ছিল, বর্তমানে যেগুলি বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে যেগুলি আসিবে—সবগুলিই বিশ্বাস করি। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, ধর্মসমূহকে শুধু সহ্য করা নয়, আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা কতর্ব্য।

স্থূল জড় জগতে আমরা দেখিতে পাই—বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। কোন কিছুর প্রসারণ থামিয়া গেলে উহার জীবনেরও অবসান ঘটে। নৈতিক ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে বলিতে পারা যায়—যদি কেহ বাঁচিতে চায়, তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে। ভালবাসা রুদ্ধ হইলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রেমই হইল মানব-প্রকৃতি। তুমি উহাকে

কিছুতেই এড়াইতে পার না, কেননা উহাই জীবনের একমাত্র নিয়ম। অতএব আমাদের কর্তব্য ভালবাসার জন্যই ভগবানকে ভালবাসা, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করা, কাজের জন্যই কাজ করা। অন্য কোন প্রত্যাশা যেন আমাদের না থাকে। জানিতে হইবে যে, মানুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ, মানুষই ভগবানের প্রকৃত মন্দির।

‘ব্রুকলিন ডেলী ঈগল্’, ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

মহম্মদীয়, বৌদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মতগুলির উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে, হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম বেদের আপ্তবাণী হইতে লাভ করিয়াছেন। বেদের মতে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। মানুষ দেহধারী আত্মা। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা থাকিয়া যাইবেন। আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন নাই, কেননা উৎপত্তি অর্থে কতকগুলি জিনিষের মিলন, আর যাহা কিছু সম্মিলিত, ভবিষ্যতে তাহার বিশ্লেষও সুনিশ্চিত। অতএব আত্মার উদ্ভব স্বীকার করিলে উহার লয়ও অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য বলা হয়, আত্মার উৎপত্তি নাই। যদি বল, আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি না কেন, তাহার ব্যাখ্যা সহজ। আমরা যাহাকে বিষয়ের জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের মনঃসমুদ্রের একান্তই উপরকার ব্যাপার। মনের গভীরে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রহিয়াছে।

একটা স্থায়ী কিছু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। মন, বুদ্ধি—বস্তুতঃ সারা বিশ্বপ্রকৃতিই তো পরিবর্তনশীল। এমন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, যাহা অসীম অনন্ত—এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। এক দার্শনিক সম্প্রদায়—বর্তমান বৌদ্ধগণ যাহার প্রতিনিধি—বলিতেন, যাহা কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভর করে; মানুষ একটি স্বাধীন সত্তা—এই ধারণা ভ্রম। পক্ষান্তরে ভাববাদীরা বলেন, প্রত্যেকেই এক-একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সমস্যাটির

প্রকৃত সমাধান এই যে, প্রকৃতি অন্যোন্য-নির্ভরতা ও স্বতন্ত্রতা, বাস্তবতা ও ভাব-সত্তা—এই উভয়ের সংমিশ্রণ। পারস্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ এই যে, আমাদের শরীরের গতিসমূহ আমাদের মনের অধীন, মন আবার খ্রীষ্টানরা যাহাকে ‘আত্মা’ বলে, সেই চৈতন্যসত্তা দ্বারা চালিত। মৃত্যু একটি পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর পর অন্য লোকে গিয়া যে-আত্মারা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যাঁহারা এই পৃথিবীতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্য-সত্তার দিক্ দিয়া কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ অপর লোকে নিম্নগতি-প্রাপ্ত আত্মারাও এখানকার অন্যান্য আত্মার সহিত অভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ পূর্ণ সত্তা। অন্ধকারে বসিয়া ‘অন্ধকার, অন্ধকার’ বলিয়া পরিতাপ করিলে কোন লাভ নাই। বরং দেশলাই আনিয়া আলো জ্বালিলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়। সেইরূপ ‘আমাদের শরীর সীমাবদ্ধ, আমাদের আত্মা মলিন’ বলিয়া বসিয়া বসিয়া অনুশোচনা নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে যদি আবাহন করি, সংশয়ের অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। খ্রীষ্টানরা হিন্দুদের নিকট শিখিতে পারেন, হিন্দুরাও খ্রীষ্টানদের নিকট।

বক্তা বলেনঃ তোমাদের সন্তানদের শিখাও যে, ধর্ম হইল একটি প্রত্যক্ষ বস্তু, নেতিবাচক কিছু নয়। ইহা মানুষের শিখান বুলি নয়, ইহা হইল জীবনের একটি বিস্তার। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা অনবরত বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কতকগুলি পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া আসে। আমরা আমাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার ভাব অনুভব করি, উহা হইতে বুঝা যায় যে, শরীর ও মন ছাড়া আমাদের মধ্যে অপর একটি সত্য রহিয়াছে। শরীর ও মন পরাধীন। কিন্তু আমাদের আত্মা স্বাধীন সত্তা। উহাই আমাদের ভিতরকার মুক্তির ইচ্ছা সৃষ্টি করিতেছে। আমরা যদি স্বরূপতঃ মুক্ত না হইতাম, তাহা হইলে আমরা জগৎকে সৎ ও পূর্ণ করিয়া তুলিবার আশা পোষণ করিতে পারিতাম কি? আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাই

আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ি। আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদিগকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে পারি। আমরা বিশ্বপিতা ভগবানকে বিশ্বাস করি। তিনি তাঁহার সন্তানদের জনক ও পালয়িতা—সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্, তোমরা যেমন ব্যক্তি-ঈশ্বরকে স্বীকার কর, আমরাও ঐরূপ করি। কিন্তু আমরা ব্যক্তি-ঈশ্বরের পরেও যাইতে চাই, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের নির্বিশেষ সত্তার সহিত আমরা স্বরূপতঃ এক। অতীতে যেসব ধর্ম হইয়াছে, বর্তমানে যেগুলি আছে এবং ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম উদ্ভূত হইবে সবগুলির উপরই আমাদের শ্রদ্ধা। ধর্মের প্রত্যেক অভিব্যক্তির প্রতি হিন্দু মাথা নত করেন, কেননা জগতে কল্যাণকর আদর্শ হইল গ্রহণ—বর্জন নয়। সকল সুন্দর বর্ণের ফুল দিয়া আমরা তোড়া তৈরী করিয়া বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে উপহার দিব। তিনি যে আমাদের একান্ত আপনার জন। ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁহাকে ভালবাসিব, কর্তব্যের জন্যই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য সাধিব, পূজার জন্যই আমরা তাঁহার পূজা করিব।

ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালই, তবে ঐগুলি শুধু মানচিত্রের মত। ধর একটি বই-এ লেখা আছে, বৎসরে এত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। একজন যদি আমাকে বইটি নিংড়াইতে বলেন, ঐরূপ করিয়া এক ফোঁটাও জল পাইব না। বই শুধু বৃষ্টির ধারণাটি দেয়; ঠিক সেইরূপ শাস্ত্র, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি আমাদিগকে পথের নির্দেশ দেয় মাত্র। যতক্ষণ উহারা আমাদিগকে ধর্মপথে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করে, ততক্ষণ উহারা হিতকর। বলিদান, নতজানু হওয়া, স্তোত্রপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ—এসব ধর্মের লক্ষ্য নয়। আমরা যখন যীশুখ্রীষ্টকে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব, তখনই আমাদের পূর্ণতার উপলব্ধি হইবে। পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপ যদি আমাদিগকে সেই পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে, তবেই উহারা ভাল। শাস্ত্রের কথা বা উপদেশ আমাদের উপকারে আসিতে পারে। কলম্বাস এই মহাদেশ আবিষ্কার করিবার পর দেশে ফিরিয়া গিয়া স্বদেশবাসীকে নূতন পৃথিবীর সংবাদ দিলেন।

অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজেরা গিয়া খুঁজিয়া দেখ। আমরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপদেশ পড়িবার পর যদি নিজেরা সাধনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি, তাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না।

বক্তৃতার পর বক্তাকে যে-কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার অভিমত জানিবার সুযোগ উপস্থিত সকলকে দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে এই সুযোগ কাজে লাগাইয়াছিলেন।

নারীত্বের আদর্শ

‘ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন’, ২১ জানুআরী, ১৮৯৫

‘এথিক্যাল এসোসিয়েশন’-এর সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অংশতঃ বলেনঃ

কোন জাতির বস্তিতে উৎপন্ন জিনিষ ঐ জাতিকে বিচার করিবার পরিমাপক নয়। পৃথিবীর সকল আপেল গাছের তলা হইতে কেহ পোকায় খাওয়া সমস্ত পচা আপেল সংগ্রহ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটিকে লইয়া এক একখানি বই লিখিতে পারে, তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাহার কিছুই জানা নাই, এমনও সম্ভব। জাতির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারাই জাতিকে যথার্থ বিচার করা চলে। যাহারা পতিত, তাহারা তো নিজেরাই একটি শ্রেণীবিশেষ। অতএব কোন একটি রীতিকে বিচার করিবার সময় উহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং আদর্শ দ্বারাই বিচার করা শুধু সমীচীন নয়, ন্যায্য ও নীতিসঙ্গত।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম জাতি—ভারতীয় আর্যগণের নিকট নারীত্বের আদর্শ অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর্যজাতিতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই ধর্মাচার্য হইতে পারিতেন। বেদের ভাষায় স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সহধর্মিণী
১০
অর্থাৎ ধর্মসঙ্গিনী। প্রত্যেক পরিবারে একটি যজ্ঞবেদী থাকিত। বিবাহের সময় উহাতে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উহা মৃত্যু পর্যন্ত জাগাইয়া রাখা হইত। দম্পতির একজন মারা গেলে উহার শিখা হইতে চিতাগ্নি জ্বালা হইত। স্বামী এবং স্ত্রী একত্র গৃহের যজ্ঞাগ্নিতে প্রত্যহ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন। পত্নীকে ছাড়িয়া পতির একা যজ্ঞের অধিকার ছিল না, কেননা পত্নীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গ মনে

করা হইত। অবিবাহিত ব্যক্তি যাজ্ঞিক হইতে পারিতেন না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পৃথক্ পুরোহিত-শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতির ভিতর নারীর ধর্মকৃত্যে সমানাধিকার পিছনে হটিয়া গিয়াছিল। সেমিটিক রক্তসম্ভূত অ্যাসিরীয় জাতির ঘোষণা প্রথমে শোনা গেলঃ কন্যার কোন স্বাধীন মত থাকিবে না, বিবাহের পরও তাহাকে কোন অধিকার দেওয়া হইবে না। পারসীকরা এই মত বিশেষভাবে গ্রহণ করিল, পরে তাহাদের মাধ্যমে উহা রোম ও গ্রীসে পৌঁছিল এবং সর্বত্র নারীজাতির উন্নতি ব্যাহত হইতে লাগিল।

আর একটি ব্যাপারও এই ঘটনার জন্য দায়ী—বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন। প্রথমে পারিবারিক নিয়ম ছিল জননীর কর্ত্রীত্ব অর্থাৎ মাতা ছিলেন পরিবারের কেন্দ্র। কন্যারা তাঁহার স্থান অধিকার করিত। ইহা হইতে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহরূপ আজব প্রথার উদ্ভব হয়। অনেক সময় পাঁচ বা ছয় ভ্রাতা একই স্ত্রীকে বিবাহ করিত। এমন কি বেদেও ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃসন্তান অবস্থায় কোন পুরুষ মারা গেলে তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তান না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন একজন পুরুষের সহিত বাস করিতে পারিতেন। সন্তানদের দাবী কিন্তু ঐ পুরুষের থাকিত না। বিধবার মৃত স্বামীই সন্তানের পিতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন হয়। বর্তমানকালে অবশ্য উহা নিষিদ্ধ।

কিন্তু এই-সকল অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পবিত্রতার একটি প্রগাঢ় ভাব জাতিমানসে দেখা দিতে থাকে। এতৎসম্পর্কিত বিধানগুলি খুবই কঠোর ছিল। প্রত্যেক বালক বা বালিকাকে গুরুগৃহে পাঠান হইত। বিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত উহারা সেখানে বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত থাকিত। চরিত্রে লেশমাত্র অশুচি ভাব দেখা গেলে প্রায় নিষ্ঠুরভাবেই তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত।

ভারতীয় জাতির হৃদয়ে এই ব্যক্তিগত শুচিতার ভাব এত গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, উহা যেন একটি বাতিক বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানগণের চিতো (চিতোর)-অবরোধের সময় ইহার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে পুরুষরা নগরটি অনেকক্ষণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরীর নারীগণ বাজারে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল। শত্রুপক্ষ নগর-দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিতেই ৭৪,৫০০ কুল-ললনা একসঙ্গে ঐ কুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মবিসর্জন দিল। এই মহৎ দৃষ্টান্তটি ভারতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। চিঠির খামের উপর ৭৪।।০ সংখ্যাটি লিখিয়া দেওয়ার রীতি আছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি কেহ বেআইনীভাবে ঐ চিঠিটি পড়ে, তাহা হইলে যে মহাপাপ হইতে বাঁচিবার জন্য চিতোরের মহাপ্রাণা নারীকুলকে অগ্নিতে আত্মাহূতি দিতে হইয়াছিল, ঐরূপ অপরাধে সে অপরাধী হইবে।

ইহার (বৈদিক যুগের) পর হইল সন্ন্যাসীদের যুগ, যাহা আসে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সহিত। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল—গৃহত্যাগী যতিরাই শুধু 'নির্বাণে'র অধিকারী। নির্বাণ হইল কতকটা খ্রীষ্টানদের স্বর্গরাজ্যের মত। এই শিক্ষার ফলে সারা ভারত যেন সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট মঠে পরিণত হইল। সকল মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল শুধু একটি মাত্র লক্ষ্যে—একটি মাত্র সংগ্রামে—কি করিয়া পবিত্র থাকা যায়। স্ত্রীলোকের উপর সকল দোষ চাপান হইল। এমন কি চলতি হিতবচনে পর্যন্ত নারী হইতে সতর্কতার কথা ঢুকিয়া গেল। যথাঃ নরকের দ্বার কি? এই প্রশ্নটি সাজাইয়া উত্তরে বলা হইলঃ 'নারী'। আর একটিঃ এই মাটির সহিত আমাদের বাঁধিয়া রাখে কোন্ শিকল? —'নারী'। অপর একটিঃ অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ কে?—'যে নারী দ্বারা প্রবঞ্চিত।'

পাশ্চাত্যের মঠসমূহেও অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। সন্ন্যাস-প্রথার

পরিবিস্তার সব সময়েই স্ত্রীজাতির অবনতি সূচিত করিয়াছে।

কিন্তু অবশেষে নারীত্বের আর একটি ধারণা উদ্ভূত হইল। পাশ্চাত্যে এই ধারণা রূপ নিল পত্নীর আদর্শে, ভারতে জননীর আদর্শে। এই পরিবর্তন শুধু ধর্মযাজকগণের দ্বারা আসিয়াছিল, এরূপ মনে করিও না। আমি জানি, জগতে যাহা কিছু মহৎ ঘটে, ধর্মযাজকেরা তাহার উদ্যোক্তা বলিয়া দাবী করে, কিন্তু এ-দাবী যে ন্যায্য নয়, নিজে একজন ধর্মপ্রচারক হইয়া এ-কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ নাই। জগতের সকল ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্যে নারী-প্রগতি ধর্মের মাধ্যমে আসে নাই। জন স্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ব্যক্তিরা এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরাই ইহার জনয়িতা। ধর্ম সামান্য কিছু করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সবটা নয়। বেশী কথা কি, আজিকার দিনেও এশিয়া-মাইনরে খ্রীষ্টান বিশপরা উপপত্নী-গোষ্ঠী রাখেন!

এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যে মনোভাব দেখা যায়, উহাই খ্রীষ্টধর্মের আদর্শানুগ। সামাজিক ও মানসিক উন্নতির বিচারে পাশ্চাত্যদেশীয় ভগিনীগণ হইতে মুসলমান নারীর পার্থক্য বিপুল। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না—মুসলমান নারী অসুখী, কেননা বাস্তবিকই তাহাদের কোন কষ্ট নাই। ভারতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নারী সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এদেশে কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে সম্পত্তির অধিকার নাও দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীর প্রাপ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো সম্পূর্ণভাবে, স্থাবর সম্পত্তি জীবিতকাল পর্যন্ত।

ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হইলেন মা। তিনিই আমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভগবানকে বিশ্বজননী বলি, আর গর্ভধারিণী মাতা হইলেন সেই বিশ্বজননীরই প্রতিনিধি। একজন মহিলা-ঋষিই প্রথম

ভগবানের সহিত ঐকাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন। বেদের একটি প্রধান সূক্তে তাঁহার অনুভূতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই। নির্গুণ যেন পুরুষ, সগুণ প্রকৃতি। তাই আমরা বলি 'যে হস্তদ্বয় শিশুকে দোল দেয়, তাহাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।' যে-জাতক ঈশ্বর আরাধনার ভিতর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই হইল আর্য; আর অনার্য সেই, যাহার জন্ম হইয়াছে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে।

প্রাগ্‌জন্ম-প্রভাব-সম্বন্ধীয় মতবাদ বর্তমানকালে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বলিতেছে, 'নিজেকে শুচি এবং শুদ্ধ রাখ।' ভারতবর্ষে শুচিতার ধারণা এত গভীর যে, আমরা এমন কি বিবাহকে পর্যন্ত ব্যভিচার বলিয়া থাকি, যদি না বিবাহ ধর্মসাধনায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সৎ হিন্দুর সহিত আমিও বিশ্বাস করি যে, আমার জন্মদাত্রী মাতার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক, এবং সেইজন্য আমার মধ্যে আজ যাহা কিছু প্রশংসনীয়, তাহা তাঁহারই নিকট পাওয়া। ভারতীয় জাতির জীবন-রহস্য ইহাই—এই পবিত্রতা।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম

‘ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন’, ৪ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

এথিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থাপিত করিলে তিনি তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছেঃ

বৌদ্ধধর্ম-প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যীশুখ্রীষ্ট যেমন প্রচলিত য়াহুদী ধর্মের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, বুদ্ধও সেইরূপ ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহার দেশবাসীরা অস্বীকার করিয়াছিল, বুদ্ধ কিন্তু স্বদেশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। যে-সব মন্দিরের দ্বারদেশে বুদ্ধ পৌরোহিত্য-ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই সকল মন্দিরেই আজ তাঁহার পূজা হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নামে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, উহাতে হিন্দুদের আস্থা নাই। বুদ্ধ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন হিন্দুরা তাহা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বৌদ্ধরা যাহা প্রচার করে, তাহা গ্রহণ করিতে তাহারা রাজী নয়। কারণ বুদ্ধের বাণী নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। ঐ রঞ্জিত ও বিকৃত বাণীর ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত খাপ খাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

বৌদ্ধধর্মকে পুরাপুরি বুঝিতে হইলে উহা যাহা হইতে উদ্ভূত, আমাদিগকে সেই মূল ধর্মটির দিকে অবশ্যই ফিরিয়া দেখিতে হইবে। বৈদিক গ্রন্থগুলির দুটি ভাগ। প্রথম—কর্মকাণ্ড
১১
, যাহাতে যাগযজ্ঞের কথা আছে, আর দ্বিতীয় হইল বেদান্ত—যাহা যাগযজ্ঞের নিন্দা করে, দান ও প্রেম শিক্ষা দেয়, মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখায় না। বেদবিশ্বাসী যে সম্প্রদায়ের বেদের যে অংশে প্রীতি, সেই

অংশই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। অবৈদিকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী বা ভারতীয় জড়বাদীরা বিশ্বাস করিত যে, সব কিছু হইল জড়; স্বর্গ, নরক, আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায়—জৈনগণও নাস্তিক, কিন্তু অত্যন্ত নীতিবাদী। তাহারা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করিত, কিন্তু আত্মা মানিত। আত্মা অধিকতর পূর্ণতার অভিব্যক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলা হইত। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক হইলেও ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তাহারা বলিত বিশ্বজগতের সব কিছুর জনক হইল পরমাণু বা প্রকৃতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের চিন্তা-জগৎ ছিল বিভক্ত। তাঁহার ধর্মের নির্ভুল ধারণা করিবার জন্য আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ প্রয়োজনীয়—উহা হইল সেই সময়কার জাতি-প্রথা। বেদ শিক্ষা দেয় যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি সমাজের সকলকে রক্ষা করেন, তিনি খোক্ত (ক্ষত্রিয়) আর যিনি ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া অন্নসংস্থান করেন, তিনি বিশ (বৈশ্য)। এই সামাজিক বৈচিত্র্যগুলি পরে অত্যন্ত ধরাবাঁধা কঠিন জাতিভেদের ছাঁচে পরিণতি অর্থাৎ অবনতি লাভ করে এবং ক্রমে দৃঢ়-গঠিত সুসম্বদ্ধ একটি পৌরোহিত্য-শাসন সমগ্র জাতির কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক এই সময়েই। অতএব তাঁহার ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

সেই সময়ে দেশের আকাশ-বাতাস বাদ-বিতণ্ডায় ভরিয়া আছে। বিশ হাজার অন্ধ পুরোহিত দুই কোটি পরস্পর-বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপ সঙ্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচার-কার্য অপেক্ষা জাতির পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় আর কি থাকিতে পারে? তিনি সকলকে শুনাইলেন—‘কলহ বন্ধ কর, পুঁথিপত্র তুলিয়া রাখ, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ

করিয়া তোল।' জাতি-বিভাগের মূল তথ্যটির প্রতিবাদ বুদ্ধ কখনও করেন নাই, কেননা উহা সমাজজীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতারই অভিব্যক্তি এবং সব সময়েই মূল্যবান্। কিন্তু যাহা বংশগত বিশেষ সুবিধার দাবী করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতিপ্রথার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে তিনি বলিলেন, 'প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা লোভ, ক্রোধ এবং পাপকে জয় করিয়া থাকেন। তোমরা কি ঐরূপ করিতে পারিয়াছ? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে আর ভণ্ডামি করিও না। জাতি হইল চরিত্রের একটি অবস্থা, উহা কোন কঠোর গণ্ডীবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে-কেহ ভগবানকে জানে ও ভালবাসে, সে-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ।' যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন, 'যাগ-যজ্ঞ আমাদিগকে পবিত্র করে, এমন কথা বেদে কোথায় আছে? উহা হয়তো দেবতাগণকে সুখী করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কোন উন্নতি সাধন করে না। অতএব এই-সব নিষ্ফল আড়ম্বরে ক্ষান্তি দিয়া ভগবান্‌কে ভালবাস এবং পূর্ণতা লাভ করিবার চেষ্টা কর।'

পরবর্তী কালে বুদ্ধের এই সকল শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতের বাহিরে এমন অনেক দেশে উহা প্রচারিত হয়, যেখানকার অধিবাসীদের এই মহান্ সত্যসমূহ গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না। এই-সকল জাতির বহুতর কুসংস্কার ও কদাচারের সহিত মিশিয়া বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরিয়া আসে এবং কিম্ভূতকিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে। এইভাবে উঠে শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যাহাদের মতে বিশ্বসংসার, ভগবান্ এবং আত্মার কোন মূলভিত্তি নাই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত না। ইহার ফলে এই মত পরে অতি জঘন্য কদাচারসমূহ সৃষ্টি করে। যাহা হউক, উহা তো বুদ্ধের শিক্ষা নয়, বরং তাঁহার শিক্ষার ভয়াবহ অধোগতি মাত্র। হিন্দুজাতি যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই কুশিক্ষাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, এজন্য তাহারা অভিনন্দনীয়।

বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-গ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুক্কায়িত সত্যগুলিকে যাঁহারা সকলের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধ সেই-সকল সন্ন্যাসীর একজন। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না যে, জগৎ এখনও ঐ-সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত। লোকে এখনও ধর্মের নিম্নতর অভিব্যক্তিগুলিই চায়, যেখানে ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জনগণের চিত্তকে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিব্বত ও তাতার দেশগুলি হইতে আমদানী বিকৃত আচারসমূহের প্রচলন যখন হইল, তখনই জনগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্মে ভিড়িয়াছিল। মৌলিক বৌদ্ধধর্ম আদৌ শূন্যবাদ নয়। উহা জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম প্রচেষ্টা মাত্র। বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ-সৃষ্টিকারী আভিজাত্য প্রথাকে ভাঙিয়া দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করিয়া। তাঁহার ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন 'এমন একজন মহাপুরুষ, যাঁহার মনে একটি মাত্র চিন্তাও উঠে নাই বা যাঁহার দ্বারা একটি মাত্র কাজও সাধিত হয় নাই, যাহা মানুষের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে চালিত। তাঁহার মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট—তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকুলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।' বুদ্ধ কিভাবে জনৈক রাজার যজ্ঞে বলিদানের উদ্দেশ্যে নীত একটি মেষযূথকে বাঁচাইবার জন্য নিজেকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, বক্তা প্রথমে তাহা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি চিত্রিত করেন—দুঃখসন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে ব্যথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন, পরে তাঁহার শিক্ষা ভারতে সর্বজনীনভাবে যখন গৃহীত হইল, তখন কিভাবে তিনি জনৈক নীচকুলোদ্ভব পারিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রদত্ত শূকর-মাংস

আহার করেন এবং উহার ফলে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

জগতে ভারতের দান

‘ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন’, ২৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

সোমবার রাত্রে ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পায়ারপণ্ট এবং ক্লিণ্টন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে লং আইল্যাণ্ড হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি হলে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ‘জগতে ভারতের দান’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃসংখ্যা বেশীই ছিল।

বক্তা তাঁহার স্বদেশের আশ্চর্য সৌন্দর্যের কথা বলেন—যে দেশ নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশ-ভূমি, যে-দেশের পুত্রদের চরিত্রবত্তা ও কন্যাদের ধর্মনিষ্ঠার কথা বহু বৈদেশিক পর্যটক কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর বক্তা বিশ্বজগতে ভারত কি কি দিয়াছে, তাহা দ্রুতগতিতে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের দানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারত প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশগুলির মূল উৎসের অনুসন্ধান করিলে দেখান যাইতে পারে, উহা বুদ্ধের বাণীর ভিতর রহিয়াছে।

ইওরোপীয় এবং আমেরিকান গবেষকদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তা বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের মধ্যে বহু সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগান্তে নির্জন বাস, অন্তরঙ্গ শিষ্যসংখ্যা এবং তাঁহার নৈতিক শিক্ষা তাঁহার আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বেকার বুদ্ধের জীবনের ঘটনার মতই। বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, এই মিল কি শুধু একটি আকস্মিক ব্যাপার অথবা বুদ্ধের ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের একটি পূর্বতন আভাস? মনে হয়, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মনীষী দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এমনও কোন কোন পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নির্ভীকভাবে বলেন, খ্রীষ্টধর্ম সাক্ষাৎ বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রসূত, যেমন খ্রীষ্টধর্মের প্রথম

বিরুদ্ধবাদী শাখা মনিকাই-বাদকে (Monecian heresy) এখন সর্বসম্মতভাবে বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায়ের শিক্ষা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ভারত-সম্রাট্ অশোকের সম্প্রতি আবিষ্কৃত শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক রাজাদের সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে-সব অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে, সম্রাট্ অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ সেই-সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, খ্রীষ্টধর্মে কি করিয়া ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ এবং ভারতের নীতিতত্ত্ব আসিল এবং কেনই বা আমাদের দেশের মন্দিরের পূজার্চনার সহিত তোমাদের ক্যাথলিক গীর্জার 'মাস্'
১২
আবৃত্তি এবং 'আশীর্বাদ'
১৩
প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের এত সাদৃশ্য। খ্রীষ্টধর্মের বহু আগে বৌদ্ধধর্মে এই-সকল জিনিষ প্রচলিত ছিল। এখন এই তথ্যগুলির উপর নিজেদের বিচার-বিবেচনা তোমরা প্রয়োগ করিয়া দেখ। আমরা হিন্দুরা তোমাদের ধর্ম প্রাচীনতর, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি, যদি যথেষ্ট প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করিতে পার। আমরা তো জানি যে, তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক- দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের

বিজয়গৌরবস্বরূপ মিশ্রগণিত—ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার ভিত্তি। এই ভাষাগুলি বিকৃত উচ্চারণ-বিশিষ্ট সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা-নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলিয়াছেন, উহাতে 'স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত।' 'ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্' নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান, কেননা ঈসপ্ একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার বই-এর উপাদান লইয়াছিলেন। 'এরেবিয়ান নাইটস্' নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য এমন কি 'সিণ্ডারেলা' ও 'বরবটির ডাঁটা' গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রঙ উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার-নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে

থাকে এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমেরিকা-আবিষ্কারের হেতু হয়।

এখন দেখা যাক—এই-সকলের পরিবর্তে জগৎ ভারতকে কি দিয়াছে। নিন্দা, অভিশাপ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত-সন্তানদের রুধির-স্রোতের মধ্য দিয়া অপরে তাহার সমৃদ্ধির পথ করিয়া লইয়াছে ভারতকে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করিয়া এবং ভারতের পুত্রকন্যাগণকে দাসত্বে ঠেলিয়া দিয়া। আর এখন আঘাতের উপর অপমান হানা হইতেছে ভারতে এমন একটি ধর্ম প্রচার করিয়া, যাহা পুষ্ট হইতে পারে শুধু অপর সমস্ত ধর্মের ধ্বংসের উপর। কিন্তু ভারত ভীত নয়। সে কোন জাতির কৃপাভিখারী নয়। আমাদের একমাত্র দোষ এই যে, আমরা অপরকে পদদলিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে পারি না, আমরা বিশ্বাস করি—সত্যের অনন্ত মহিমায়। বিশ্বের নিকট ভারতের বাণী হইল—প্রথমতঃ তাহার মঙ্গলেচ্ছা। অহিতের প্রতিদানে ভারত দিয়া চলে হিত। এই মহৎ আদর্শের উৎপত্তি ভারতেই। ভারত উহা কার্যে পরিণত করিতে জানে। পরিশেষে ভারতের বাণী হইলঃ প্রশান্তি সাধুতা ধৈর্য ও মৃদুতা আখেরে জয়ী হইবেই। এক সময়ে যাহাদের পৃথিবীতে ছিল বিপুল অধিকার, সেই পরাক্রান্ত গ্রীক জাতি আজ কোথায়? তাহারা বিলুপ্ত। একদা যাহাদের বিজয়ী সৈন্যদলের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইত, সেই রোমান জাতিই বা কোথায়? অতীতের গর্ভে। পঞ্চাশ বৎসরে যাহারা এক সময়ে অতলান্তিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, সেই আরবরাই বা আজ কোথায়? কোথায় সেই লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকারী স্প্যানিয়ার্ডগণ? উভয় জাতিই আজ প্রায় বিলুপ্ত, তবে তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণের ন্যায়পরতা ও দয়াধর্মের গুণে তাহারা সামূহিক বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে, পুনরায় তাহাদের অভ্যুদয়ের ক্ষণ আসিবে। বক্তৃতার শেষে স্বামী বিবেকানন্দকে করতালি দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত করা হয়। ভারতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি

প্রশ্নেরও উত্তর দেন। গতকল্যকার (২৫ ফেব্রুআরী) 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ান' পত্রিকায় ভারতবর্ষে বিধবাদের নির্যাতিত হওয়া লইয়া যে উক্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার তিনি স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করেন।

বিবাহের পূর্বে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি যদি কিছু থাকে, ভারতীয় আইন অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাতে তাঁহার অধিকার তো বজায় থাকিবেই, তা ছাড়া স্বামীর নিকট হইতে তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন এবং মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ অপর কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তিও বিধবার দখলে আসিবে। পুরুষের সংখ্যা-ন্যূনতার জন্য ভারতে বিধবারা ক্বচিৎ পুনরায় বিবাহ করেন।

বক্তা আরও উল্লেখ করেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমরণ-প্রথা এবং জগন্নাথের রথচক্রে আত্মবলিদান সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণের জন্য তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে সার উইলিয়াম হাণ্টার প্রণীত 'ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাস' নামক পুস্তিকাটি দেখিতে বলেন।

ভারতের বালবিধবাগণ

'ডেলী ঈগ্‌ল্‌', ২৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হিষ্টরিক্যাল হল-এ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোমবার রাত্রে 'জগতে ভারতবর্ষের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তা যখন মঞ্চের উপর উঠেন, তখন মঞ্চে প্রায় আড়াই শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্কেল-এর সভাপতি মিসেস জেম্‌স্‌ ম্যাক্‌কীন কয়েকদিন আগে 'ভারতবর্ষে বালবিধবাদের উপর দুর্ব্যবহার করা হয় না।'—বক্তার এই উক্তিটির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভারতে খ্রীষ্টমতানুগ সেবাকার্য করিয়া থাকে। বক্তার নিকট এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য শ্রোতৃবৃন্দের খুব আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভাষণে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে একজন শ্রোতা ঐ প্রসঙ্গটি তুলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন—ঐ সম্পর্কে তাঁহার কি বলিবার আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, বালবিধবাদের প্রতি নির্যাতন বা কঠোর ব্যবহার করা হয়—এই সংবাদ সত্য নয়। তিনি আরও বলেনঃ ইহা ঠিকই যে কোন কোন হিন্দুর বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে। অনেকে কিন্তু বেশ পরিণত বয়সেই বিবাহ করে। কেহ কেহ বা আদৌই বিবাহ করে না। আমার পিতামহের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তিনি একেবারেই বালক। আমার পিতা বিবাহ করেন চৌদ্দ বৎসর বয়সে। আমার বয়স ত্রিশ বৎসর, আমি এখনও বিবাহ করি নাই। স্বামী মারা গেলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী পান। দরিদ্রের ঘরে বিধবার কষ্ট অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও সেইরূপ। কখনও কখনও বৃদ্ধেরা বালিকা বিবাহ করে। এইরূপ স্বামী ধনী হইলে যত শীঘ্র মারা যায়, তাহার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ততই মঙ্গল। আমি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বিধবাদের প্রতি যে রূপ নির্যাতনের কথা প্রচার করা হইতেছে, ঐরূপ একটিও দেখিতে পাই নাই। এক সময়ে আমাদের

দেশে এক ধরনের ধর্মোন্মত্ততা ছিল। তখন কখনও কখনও বিধবারা মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতেন। হিন্দু জনসাধারণ যে এই রীতি পছন্দ করিত, তাহা নয়, তবে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টাও ছিল না। অবশেষে ব্রিটিশরা ভারত অধিকার করিলে ইহা নিষিদ্ধ হয়। সহমৃতা নারীকে সাধ্বী বলিয়া খুব সম্মান করা হইত। অনেক সময়ে তাঁহাদের স্মৃতিতে স্তম্ভাদি নির্মিত হইত।

‘ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন’, ৮ এপ্রিল, ১৮৯৫

গত রাত্রিতে ক্লিণ্টন এভিনিউ-স্থিত পউচ গ্যালারীতে ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের একটি বিশেষ সভায় হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাই ছিল প্রধান কর্মসূচী। আলোচ্য বিষয় ছিলঃ ‘হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি—ঐগুলির তাৎপর্য ও কদর্থ।’ প্রশস্ত গ্যালারীটি একটি বৃহৎ জনতায় ভরিয়া গিয়াছিল।

পরিধানে প্রাচ্য পোষাক, উজ্জ্বল চক্ষু এবং মুখে প্রতিভার দীপ্তি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশ, উহার অধিবাসী এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তা বলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি শুধু চান তাঁহার ও তাঁহার স্বদেশের প্রতি ন্যায়দৃষ্টি। তিনি ভাষণের প্রারম্ভে ভারত সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপিত করিবেন। ভারত একটি দেশ নয়, মহাদেশ। যে-সব পর্যটক কখনও ভারতবর্ষে যান নাই, তাঁহারা উহার সম্বন্ধে অনেক ভুল মত প্রচার করিয়াছেন। ভারতে নয়টি পৃথক্ প্রধান ভাষা আছে এবং প্রাদেশিক উপভাষার সংখ্যা একশতেরও বেশী। বক্তা তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধে যাঁহারা বই লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই-সব ব্যক্তির মস্তিষ্ক কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের একটি ধারণা যে, ইঁহাদের ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে প্রত্যেকটি লোক ভয়ানক শয়তান। হিন্দুদের দন্তধাবন-প্রণালীর অনেক সময়ে কদর্থ করা হইয়া থাকে। তাহারা মুখে পশুর লোম বা চামড়া ঢুকাইবার পক্ষপাতী নয় বলিয়া বিশেষ কয়েকটি গাছের ছোট ডাল দিয়া দাঁত পরিষ্কার করে। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এই জন্য লিখিয়াছেন, ‘হিন্দুরা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া একটি গাছ গিলিয়া ফেলে।’ বক্তা বলেন যে, হিন্দুবিধবাদের জগন্নাথের রথচক্রের নীচে আত্মব

লিদানের রীতি কখনও ছিল না। এই গল্প যে কিভাবে চালু হইল, তাহা বুঝা ভার।

জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যগুলি ছিল খুব ব্যাপক এবং চিত্তাকর্ষক। ভারতীয় জাতিপ্রথা উচ্চাবচ শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। প্রত্যেকটি জাতি নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। জাতিপ্রথা কোন ধর্মকৃত্য নয়, উহা হইল বিভিন্ন কারিগরীর বিভাগ-ব্যবস্থা। স্মরণাতীত কাল হইতে উহা মানবসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া দেখান— কীভাবে সমাজে প্রথমে কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল। পরে চলিল প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন এবং বিবাহ ও পানাহারকে সীমাবদ্ধ করা হইল নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে।

হিন্দুগৃহে খ্রীষ্টান বা মুসলমানের উপস্থিতিতে কি প্রভাব হয়, বক্তা তাহা বর্ণনা করেন। কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি হিন্দুদের ঘরে ঢুকিলে ঘর অশুচি হইয়া যায়। বিধর্মী গৃহে আসিলে গৃহস্বামী প্রায়ই পরে স্নান করিয়া থাকেন। অন্ত্যজ জাতিদের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, উহারা সমাজে মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারি প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে এবং উহারা গলিত মাংসভোজী। তিনি আরও বলেন যে, ভারত সম্বন্ধে যে-সকল পাশ্চাত্য লেখক বই লিখিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের এই-সকল নিম্নস্তরের লোকের সংস্পর্শেই আসিয়াছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটে নাই। জাতির নিয়ম-কানুন ভাঙিলে কি শাস্তি হয়, তাহা বক্তা বর্ণনা করেন। শাস্তি শুধু এই যে, নিয়মভঙ্গকারী যে-জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও পানাহার তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে অন্য যে-সব ধারণা পাশ্চাত্যে প্রচারিত, তাহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

জাতিপ্রথার দোষ দেখাইতে গিয়া বক্তা বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না দিয়া এই প্রথা জাতির কর্মজীবনে জড়তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং

তাহাতে জনগণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়াছে। এই প্রথা সমাজকে পাশবিক রেষারেষি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে উহা সামাজিক উন্নতি রুদ্ধ করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিয়া উহা প্রজাবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। জাতিপ্রথার সপক্ষে বক্তা বলেন যে, উহাই সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের একমাত্র কার্যকর আদর্শ। কাহারও আর্থিক অবস্থা জাতিতে তাহার উচ্চাবচ স্থানের পরিমাপক নয়। জাতির মধ্যে প্রত্যেকেই সমান। বড় বড় সমাজ সংস্কারকগণের সকলেরই চিন্তায় একটি মস্ত ভুল হইয়াছিল। জাতিপ্রথার যথার্থ উৎপত্তি-সূত্র যে সমাজের একটি বিশিষ্ট পরিবেশ, উহা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ধর্মের বিধিনিষেধই ঐ প্রথার জনক। বক্তা ইংরেজ ও মুসলমান শাসকগণের দেশকে বেয়নেট, গোলাবারুদ এবং তরবারির সাহায্যে সুসভ্য করিবার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহার মতে জাতিভেদ দূর করিতে হইলে সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক প্রণালীর ধ্বংস-সাধন একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইহা অপেক্ষা বরং বঙ্গোপসাগরের জলে সকলকে ডুবাইয়া মারা শ্রেয়ঃ। ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেণ্টে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে এবং বলিতেছে, 'আমরাও একটু সভ্যতা লইয়া আসি।' ইংলণ্ডের সভ্যতা বিস্তার কিন্তু চলিতেছেই।

সন্ন্যাসী বক্তা মঞ্চের উপর একদিক হইতে অপর দিকে পায়চারি করিতে করিতে হিন্দুদের প্রতি কিভাবে অবিচার করা হয়, ইহা বর্ণনা করিবার সময় খুব উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তাঁহার কথাও বেশ দ্রুত গতিতে চলে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের কটাক্ষ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা স্বদেশে ফিরিবে শ্যাম্পেন এবং বিজাতীয় নূতন ভাবে পুরাপুরি দীক্ষা লইয়া। বাল্যবিবাহকে নিন্দা করিবার এত ধুম কেন?

না—সাহেবরা বলিয়াছে, উহা খারাপ। হিন্দুগৃহে শাশুড়ী পুত্রবধূকে যদি নিপীড়ন করে তো তাহার কারণ এই যে, পুত্র প্রতিবাদ করে না। বক্তা বলেন, বিদেশীরা যে-কোন সুযোগে হিন্দুদের উপর গালিবর্ষণ করিতে উন্মুখ, কেননা তাঁহাদের নিজেদের এত বেশী দোষ আছে যে, তাঁহারা উহা ঢাকা দিতে চান। তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতিকে নিজের মুক্তিসাধন নিজেই করিতে হইবে, অন্য কেহ উহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারে না।

বিদেশী ভারত-বন্ধুদের প্রসঙ্গে বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকায় ডেভিড হেয়ারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা? ইনি ভারতে নারীদের জন্য প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় করেন। বক্তা অনেকগুলি ভারতীয় প্রবাদ-বাক্য শুনান। ঐগুলি আদৌ ইংরেজগণের প্রশংসাসূচক নয়। ভারতের জন্য একটি ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ করিয়া তিনি বক্তৃতার সমাপ্তি করেন। তিনি বলেন, ‘ভারত যতদিন তাহার নিজের প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি খাঁটি থাকিবে, ততদিন কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানহীন এই ভয়ানক পাশ্চাত্য যখন ভারতে ভণ্ডামি ও নাস্তিকতা রপ্তানি করে, তখনই ভারতের বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি গালাগালি, গাড়ী-বোঝাই তিরস্কার এবং জাহাজ-ভর্তি নিন্দা না পাঠাইয়া অন্তহীন একটি প্রীতির স্রোত লইয়া আসা হউক। আসুন, আমরা সকলে মানুষ হই।’

সংক্ষিপ্ত লিপি-অবলম্বনে

অনুবন্ধ

খ্রীঃ ১৯০০ শতকের প্রথমার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান্ ফ্রান্সিস্কো এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে ১৭টি বক্তৃতা মিস্ আইডা আনসেল নাম্নী জনৈকা মহিলা সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঐ লিপিসঙ্কেত তখন মাত্র শিখিয়াছেন, পারদর্শিতা জন্মে নাই। কাজেই স্বামীজীর কথা জায়গায় জায়গায় ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। মিস্ আনসেল নিজের অনুধ্যানের জন্যই স্বামীজীর বক্তৃতার সাঙ্কেতিক লিপি লইয়াছিলেন, লিপিগুলি বিস্তার করিয়া পূর্ণ বক্তৃতার আকারে প্রকাশ করিবার কোন সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর লিপিগুলি তাঁহার নোটখাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার পর অনেকের অনুরোধে দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে মিস্ আনসেল লিপিগুলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৭টি বক্তৃতা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। এই অংশে অনূদিত বক্তৃতাগুলি মিস্ আইডা আনসেলের ঐ নোট হইতে প্রস্তুত। স্বামীজী যেমন যেমন বলিয়াছিলেন, লেখিকা হুবহু তাহা বজায় রাখিয়াছেন, ভাষা বা ব্যাকরণ সম্পাদনা করেন নাই। যে-সব স্থানে তিনি নিজে স্বামীজীর কতকগুলি কথা ধরিতে পারেন নাই, সেই জায়গাগুলি কয়েকটি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ স্বামীজীর নিজের উক্তি নয়, তাঁহার কোন কথার সূত্র ধরিয়া দিবার জন্য লিপিকার কর্তৃক সম্বন্ধ।

অনুবাদকস্য
১

২৩ মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

মানুষকে সর্বপ্রথম যাহা তাহার নিজের অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহের বিষয় চিন্তা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, উহা ভয় অথবা কৌতূহল, তাহা আমাদিগের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবগুলি হইতে মানুষের মনে বিশেষ বিশেষ পূজার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। মানবেতিহাসে এমন কোন সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন প্রকার পূজার আদর্শ বর্তমান নাই। ইহার কারণ কি? কেন আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাহিরে কোন কিছুর উপলব্ধির জন্য এত ব্যাকুল হই? মনোরম প্রভাতের স্পর্শেই হউক অথবা মৃত আত্মার ভয়েই হউক, কেন আমরা অতীন্দ্রিয়ের আবেশ অনুভব করি? ... প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাইবার প্রয়োজন নাই, কেননা এই ব্যাপারটি দুই হাজার বৎসর আগেও যেমন ছিল, আজও সেইরূপ বর্তমান। আমরা এখানে পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাই না। যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, প্রচুর ক্ষমতা এবং ধনৈশ্বর্য সত্ত্বেও কিসের যেন একটা অতৃপ্তি আমাদিগকে চঞ্চল করে।

বাসনা অনন্ত। উহার চরিতার্থ কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ। আমাদের চাওয়ার আর শেষ নাই, কিন্তু যাহা চাই তাহা যখন পাইতে যাই, তখনই সঙ্কট উপস্থিত হয়। আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিত। তাহার আকাঙ্ক্ষা যদিও ছিল স্বল্প, তবু উহা সে মিটাইতে পারিত না। এখন আমাদের শিল্প-বিজ্ঞানের কত উন্নতি ও বৈচিত্র্য হইয়াছে, তথাপি আমাদের চাহিদা দূর হইতেছে না। একদিকে বাসনা পরিপূর্তির উপায়গুলিকে আমরা নিপুণতর করিয়া চলিয়াছি, অপরদিকে বাসনাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আদিমতম মানুষ যে-সব জিনিষ নিজে সম্পন্ন করিতে পারিত না,

তাহাদের জন্য স্বভাবতই বাহির হইতে সাহায্য চাহিত। ... কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, অথচ উহা পাওয়া যাইতেছে না। অতএব বাহিরের শক্তিসমূহের সহায়তার দিকে তাহাকে তাকাইতে হইত। সে-কালের সেই অজ্ঞ আদিম মানুষ আর বর্তমানের সুসভ্য মানুষ উভয়েই যখন ভগবানের কাছে কোন বাসনা-পরিপূর্তির জন্য মিনতি করিতেছে, তখন উভয়ে একই পর্যায়ে পড়ে। কোন পার্থক্য আছে কি? কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, না, বহু পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ অনেক সময়েই আমরা সমলক্ষণ ব্যাপারসমূহের মধ্যে মনগড়া প্রভেদ খাড়া করি। আদিম মানুষ ও সভ্য মানুষ একই শক্তির নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। ঐ শক্তিকে তুমি ভগবান্ বা আল্লা বা যিহোবা যাহা খুশী বলিতে পার। মানুষ কিছু চায়, আর নিজের ক্ষমতায় যখন উহা আয়ত্ত করিতে পারে না, তখন কোন একজনের সাহায্য খুঁজে। এই প্রবৃত্তি আদিমকালে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। ... আমরা প্রত্যেকেই আদিম বর্বররূপে পৃথিবীতে আসি, ধীরে ধীরে নিজদিগকে সংস্কৃত করি। ... নিজেদের হৃদয় অন্বেষণ করিলে এখানে আমরা প্রত্যেকেই এই সত্যটি ধরিতে পারিব। এখনও আমাদের অসহায়তার ভয় কাটে নাই। বড় বড় কথা আমরা বলিতে পারি, দার্শনিক বলিয়া খ্যাতিও লাভ করিতে পারি, কিন্তু জীবনে যখন আঘাত আসে, তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা আমরা কত দুর্বল, আমাদের সাহায্যের কত প্রয়োজন! যত কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে, আমরা সবগুলিতেই বিশ্বাস করিতে থাকি। অবশ্য এমন কোন কুসংস্কার পৃথিবীতে নাই, যাহার কিছু না কিছু সত্য ভিত্তি আছে। ধরুন আমি যদি সারা মুখ ঢাকিয়া শুধু নাকের ডগাটি দেখাই, তবুও উহা তো আমার মুখেরই একটি অংশ। কুসংস্কার সম্বন্ধেও এইরূপ। একটি বৃহৎ সত্যের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তুচ্ছ নয়। দেখুন, মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া ব্যাপারটি হইতেই ধর্মের নিম্নতম বিকাশ ঘটিয়াছিল। ... প্রথমে মৃতদেহকে কাপড়ে জড়াইয়া ঢিবির ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইত। মৃতব্যক্তির আত্মা রাত্রে আসিয়া ঢিবিতে বাস করে—ইহাই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস। ... তারপর আরম্ভ হইল

ভূমিতে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার রীতি। ... কবরস্থানের দরজায় সহস্রদন্তী এক ভীষণা দেবী দাঁড়াইয়া! ... ইহার পর আসিল মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা। ধারণা ছিল চিতাগ্নির শিখা আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়। ... মিশরবাসীরা মৃতের জন্য খাদ্য এবং জল লইয়া যাইত।

ইহার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ভাব হইল গোষ্ঠীগত দেবতাদের ধারণা। একটি গোষ্ঠীর উপাস্য হইলেন এক দেবতা, অপর গোষ্ঠীর আরাধ্য অপর একজন দেবতা। য়াহুদী জাতির ঈশ্বর যিহোবা ছিলেন তাহাদের নিজস্ব জাতীয় দেবতা। ইনি অন্যান্য গোষ্ঠীর উপাসিত দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার আশ্রিত জাতির মঙ্গলের জন্য সব কিছু করিতে পারিতেন। তাঁহার আশ্রিত নয়—এমন একটি সমগ্র জাতিকেও যদি তিনি বিনষ্ট করিতেন, তাহাতে বলিবার কিছু ছিল না, তাহা ন্যায্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। তিনি কিছু দয়াও অবশ্য দেখাইতেন, কিন্তু সে করুণা একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল।

ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শ দেখা দিল। বিজেতা জাতির যিনি অধিপতি, তাঁহাকে সকল দলপতির উপরে স্থান দেওয়া হইল। তিনি হইলেন দেবতাদেরও দেবতা। ... পারসীকরা যখন মিশর জয় করে, তখন পারস্যের সম্রাটকে এইরূপ মনে করা হইত। দেব বা মানুষ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নয়। এমন কি সম্রাটের দিকে দৃষ্টিপাত করা ছিল প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

ইহার পর দেখিতে পাই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ধারণা—যিনি সকল ক্ষমতার আধার, সর্বজ্ঞ এবং বিশ্বজগতের পালয়িতা। তাঁহার আবাসস্থান হইল স্বর্গ। মানুষের তিনিই বিশেষ আরাধ্য, সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কেননা মানুষের জন্যই তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন। সারা পৃথিবী মানুষের ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সূর্য, চন্দ্র, তারাসমূহ তাহারই

জন্য।

এই-সব ধারণা যাহাদের, তাহাদের মন আদিম স্তরে রহিয়াছে, বলিতে হইবে। তাহাদের আদৌ সভ্য ও সংস্কৃত বলা চলে না। উচ্চতর ধর্মসমূ্হের প্রসার হয় গঙ্গা ও ইউফ্রাটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ভারতবর্ষের বাহিরে স্বর্গবাসী ঈশ্বর-ধারণার অতিরিক্ত ধর্মের আর কোন গভীরতর বিকাশ আমরা দেখিতে পাই না। ভারতের বাহিরে উচ্চতম ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলিতে এ পর্যন্ত ইহাই পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া আছেন আর বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর তথায় যাইবে। ... আমার বিশ্লেষণে ইহাকে মানুষের একটি অত্যন্ত আদিম ধারণা বলা উচিত। আফ্রিকার মাম্বো-জাম্বো আর এই স্বর্গবাসী পিতা—একই কথা। তিনি জগৎকে চালিত করিতেছেন এবং অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা সর্বত্র পূর্ণ হইতেছে।

প্রাচীন হিব্রুরা স্বর্গকে গ্রাহ্য করিত না। যীশুখ্রীষ্টকে তাহাদের না মানিবার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ, কেননা তিনি মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় স্বর্গ-শব্দের অর্থ এই পৃথিবীর অতীত স্থান। অতএব পৃথিবীর যত কিছু অশুভ সংশোধনের স্থান হইল স্বর্গ। আদিম মানুষ অশুভের পরোয়া করে না। অশুভ কেন থাকিবে, ইহা লইয়া সে প্রশ্ন তুলে না।

... শয়তান শব্দটি পারসীক। ... পারসীক এবং হিন্দুরা ধর্মের ক্ষেত্রে একই আর্য জাতির বিশ্বাসসমূহের উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভাষাতেও ঐক্য ছিল—তবে এক জাতির ভাষায় 'শুভ'বাচক শব্দগুলি অপর জাতির ভাষায় 'অশুভ' বুঝাইত। 'দেব' শব্দটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, উহার অর্থ ঈশ্বর। পারসীক ভাষায় উহার অর্থ হইল শয়তান।

পরে মানুষের ধর্মবিষয়ক চিন্তা আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইলে নানা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। ঈশ্বরকে বলা হইতে লাগিল মঙ্গলময়।

পারসীকদের মতে বিশ্বসংসারের অধীশ্বর দুই জন—একজন শুভ, অন্যজন অশুভ। প্রথমে সব কিছুই ছিল সুন্দর—চিরবসন্তযুক্ত মনোরম দেশ, মৃত্যুহীন জীবন, ব্যাধিহীন শরীর। অতঃপর আবির্ভাব হইল অশুভের অধিকর্তার। ইনি ভূমি স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিল ব্যাধি, মৃত্যু আবার মশক, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ‘অনিষ্টকারী’ ও হিংস্র জন্তুসমূহ। অতঃপর আর্যগণ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রাচীন আর্যেরা উত্তর অঞ্চলে বহুকাল ছিলেন। য়াহুদীরা শয়তানের ধারণা পারসীকদের নিকট হইতে পায়। পারসীকরাও শিক্ষা দিত যে, একদিন এই অশুভ ঈশ্বর বিনষ্ট হইবেন। আমাদের কর্তব্য হইল শুভ ঈশ্বরের পক্ষে থাকিয়া অশুভের অধীশ্বরের সহিত এই চিরন্তন সংঘর্ষে ঈশ্বরের শক্তি বৃদ্ধি করা। ... সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত হইবে এবং প্রত্যেকেই একটি নূতন দেহ পাইবে।

পারসীকদের ধারণা ছিল মন্দ লোকেরাও একদিন পবিত্রতা লাভ করিবে, তখন তাহাদের আর অশুভ প্রবৃত্তি থাকিবে না। আর্যদের প্রকৃতি ছিল স্নেহমমতাময় ও কবিত্বপ্রবণ। সেজন্য তাহারা অনন্তকাল নরকাগ্নিতে দহনের কথা ভাবিতে পারিত না। মৃত্যুর পর মানুষের নূতন শরীর হইবে। আর মৃত্যু হইবে না। ভারতের বাহিরে ধর্মের ধারণায় ইহাই হইল চরম উৎকর্ষ। উহার সহিত নৈতিক উপদেশও রহিয়াছে। মানুষের কর্তব্য তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া—সচ্চিন্তা, সদ্‌বাক্য এবং সৎকার্য। এই মাত্র। ইহা একটি কার্যকর ও জ্ঞানগর্ভ ধর্ম। ইহার মধ্যে কিছু কবিত্বেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু কবিত্ব ও চিন্তাধারার উচ্চতর পরিণতি আছে।

ভারতে বেদের প্রাচীনতম অংশে এই শয়তানের ঈষৎ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহার প্রভাব থায়ী নয়, একবার দেখা দিয়াই সে যেন গা ঢাকা দিয়াছে। বেদে অশুভের জনক এই শয়তান যেন একটি প্রহার খাইয়া পলায়ন করিয়াছে। ভারত হইতে শয়তান যখন চলিয়া গেল, তখন পারসীকরা তাহাকে গ্রহণ করিল। আমরা তাহাকে পৃথিবী হইতে একেবারে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছি। পারসীকদের ধারণা লইয়া আমরা তাহাকে একটি সুসভ্য ভদ্রলোকে পরিণত করিতে চাই। তাহাকে আমরা একটি নব কলেবর দিব। ভারতের শয়তানের ইতিবৃত্ত এইখানে শেষ হইল।

কিন্তু পরমেশ্বরের

ধারণা আগাইয়া
চলিল। তবে
এখানে আর একটি
ঘটনা মনে রাখিতে
হইবে। ঈশ্বরের
ধারণার সঙ্গে সঙ্গে
মানবীয় প্রতাপের ধারণাও বাড়িয়া চলিয়া অবশেষে পারস্যসম্রাটের মহামহিমায় গিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে, তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনের উদ্ভব হইল। মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্য—আত্মার ধারণা দেখা দিল এবং উহার ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের ধারণা একটি বস্তুনিষ্ঠ আকারে গিয়া থামিয়াছিল। ভারত এই ধাপ খানিকটা অতিক্রম করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। এই দেশে (আমেরিকায়) লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের একটি দেহ আছে। ... গোটা সম্প্রদায় এইরূপ বলে। তাহাদের ধারণা, ঈশ্বর সমগ্র জগতের শাসক, কিন্তু একটি বিশেষ স্থান আছে, যেখানে তিনি সশরীরে বাস করিতেছেন। তিনি একটি সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়, সেই রাজাধিরাজের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয়—যেমন পৃথিবীর মন্দিরে আমরা করি।

ভারতে কিন্তু উপাসকদের যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান ছিল। যাহার ফলে তাহারা ঈশ্বরকে কখনও দেহধারী করিয়া তুলে নাই। ভারতে ব্রহ্মের কোন মন্দির দেখিতে পাইবে না। ইহার কারণ এই যে, আত্মার ধারণা ভারতে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। হিব্রুজাতি কখনও আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। বাইবেলের 'পুরাতন সমাচারে' আত্মার কোন কথা পাওয়া যায় না। 'নূতন সমাচরে'ই উহা প্রথম দেখি। পারসীকরা ছিল আশ্চর্যরকমে করিতকর্মা, যুদ্ধপ্রিয়, বিজেতা জাতি। তাহারা যেন বর্তমান ইংরেজদের প্রাচীন সংস্করণ—প্রতিবেশী জাতিদের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেছে। এই ধরনের

ব্যাপারে তাহারা এত ব্যস্ত থাকিত যে, আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহাদের ফুরসত ছিল না।

আত্মার প্রাচীনতম ধারণা ছিল এই যে, উহা স্থূলদেহের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম শরীর- বিশেষ। স্থূলদেহ বিনাশ পাইলে সূক্ষ্মদেহের আবির্ভাব ঘটে। মিশরদেশে বিশ্বাস ছিল যে, সূক্ষ্মদেহেরও মৃত্যু আছে। স্থূলদেহের বিকার ঘটিলে সূক্ষ্মদেহেরও বিশ্লেষ হইতে থাকে। এইজন্য মিশরের পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল—যাহাতে মৃত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, এই আশায়। পিরামিডে রক্ষিত মৃতদেহকে আরক প্রভৃতির সহায়ে সতেজ রাখিবার চেষ্টা করা হইত।

ভারতবাসীদের মৃতদেহের প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। তাহাদের ভাব এইঃ শবটিকে কোথাও লইয়া গিয়া পুড়াইয়া ফেলা যাক। পুত্রকে পিতার মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করিতে হয়।

মানুষ দুই প্রকৃতির—দৈব ও আসুর। যাহারা দৈব প্রকৃতির তাহারা নিজদিগকে চৈতন্যময় আত্মা বলিয়া ভাবে। আসুর প্রকৃতির মানুষ মনে করে তাহারা দেহ। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ শিক্ষা দিতেন, শরীরের কোন অপরিণামী সত্তা নাই। 'কোন ব্যক্তি যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মানবাত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ ছাড়িয়া দিয়া আর একটি নূতন দেহ গ্রহণ করে।' আমার ক্ষেত্রে আমার পরিবেষ্টনী ও শিক্ষাদীক্ষা আমাকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ ছিল, কেননা আমি সদাই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। উহারা দেহের প্রতি অধিক মনোযোগী।

দেহ হইতে আত্মা তো মাত্র একটি ধাপ। ভারতে আত্মার আদর্শের উপর খুব ঝোঁক দেওয়া হইত। ঈশ্বরের ধারণার সহিত আত্মার ধারণা এক হইয়া গিয়াছিল! আত্মার ধারণাকে যদি প্রসারিত করা যায়, তাহা

হইলে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, আত্মা নাম ও রূপের অতীত। ... ভারতীয় শিক্ষা হইল এই যে, আত্মা নাম নিরবয়ব। যাহা কিছুর আকৃতি আছে, তাহা কোন না কোন সময়ে বিনষ্ট হইবে। জড়ভূত ও শক্তির সমবেত কার্য বিনা কোন আকৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। আর সকল সংহত বস্তুরই তো বিশ্লেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার আত্মার যদি নাম ও রূপ স্বীকার কর, তবে আর তুমি অমর নও, তুমি মৃত্যুর অধীন। আত্মা যদি স্থূল দেহের অনুরূপ একটি সূক্ষ্মদেহমাত্র হয়, তাহা হইলে আকৃতিমান্ বলিয়া উহা প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতির জন্মমৃত্যুর নিয়মও উহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে। ... ভারতের ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছেন—আত্মা মন নয়, সূক্ষ্মদেহও নয়।

চিন্তাসমূহ নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করা যায়। ... মনঃসংযমকে কতদূর লইয়া যাওয়া যায়, ভারতীয় যোগীরা তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে সাধনা করিয়াছেন। কঠোর অভ্যাস দ্বারা চিন্তার গতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করা যায়। মনই যদি মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হইত, তাহা হইলে চিন্তার ঊর্ধ্বে মানুষের মৃত্যু ঘটিত। ধ্যানে চিন্তা বিলুপ্ত হয়, মনের উপাদানগুলিও সর্বতোভাবে স্তিমিত হইয়া যায়। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও রুদ্ধ হয়, কিন্তু সাধকের তো মৃত্যু হয় না। যদি চিন্তা সমষ্টির উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিত, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার দেহ-মন-সংঘাতটির বিনাশই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঐরূপ ঘটে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। অতএব তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, মন ও মনের চিন্তারাশি প্রকৃত মানুষ নয়। বিচার করিয়াও দেখা গেল যে, মন কখনও মানুষের আত্মা হইতে পারে না।

আমি চলি, চিন্তা করি, কথা বলি। এই-সমস্ত কাজের মধ্যে একটি একতার সূত্র রহিয়াছে। চিন্তা ও কর্মরাশির অসংখ্য বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত অপরিবর্তনীয়

একটি সত্তা বিরাজ করিতেছে। সেই সত্তা কখনও শরীর হইতে পারে না। শরীর তো প্রতি মিনিটে পরিবর্তনশীল। উহা মনও হইতে পারে না, কেননা মনেও তো অজস্র নূতন নূতন চিন্তা সর্বদাই উঠিতেছে। ঐ একত্বের ভিত্তি শরীর-মনের যুগ্ম সংহতি, ইহাও বলা চলে না। শরীর, মন ও সংহতি প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মন যদি মুক্তই হয়, তাহা হইলে সে …

অতএব যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি প্রকৃতির এলাকার মধ্যে নন। ইনি সেই অপরিবর্তনীয় চৈতন্যময় পুরুষ—যাহার দেহ ও মন অবশ্য প্রকৃতির অধীন। ইনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করিতেছেন, যেমন তোমরা এই চেয়ারটি, এই কলমটি এবং এই কালিকে ব্যবহার কর। ইনিও সেইরূপ প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও স্থূল আকৃতিকে কাজে লাগাইতেছেন। স্থূল আকৃতি হইল দেহ, সূক্ষ্ম আকৃতি মন। ইনি নিজে নিরবয়ব, সর্বপ্রকার আকৃতিহীন। আকারসমূহ প্রকৃতিতে। প্রকৃতির পারে যিনি, তাঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম—কোন আকার থাকিতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই অরূপ। তাঁহাকে সর্বব্যাপীও হইতে হইবে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। টেবিলের উপর এই গ্লাসটির কথা ধর। গ্লাস একটি আকার, টেবিলটিও একটি আকার। ইহারা যখন ভাঙিয়া যায়, তখন গ্লাসত্বের এবং টেবিলত্বের অনেকখানিই চলিয়া যায়।

আত্মার কোন রূপ নাই বলিয়া কোন নামও নাই। ইনি যেমন এই গ্লাসটির মধ্যে ঢুকিবেন না, সেইরূপ স্বর্গেও যাইবেন না, নরকেও নয়। যে আধারে ইনি বর্তমান, সেই আধারের রূপ ইনি গ্রহণ করেন। আত্মা যদি দেশে (space) না থাকেন, তাহা হইলে দুইটি বিকল্প সম্ভবপর। হয় তিনি দেশে অনুস্যূত অথবা দেশ তাঁহাতেই অবস্থিত। তোমার দেহ দেশে অবস্থান করিতেছে বলিয়া তোমার একটি আকার অবশ্যই প্রয়োজন। দেশ আমাদিগকে সীমাবদ্ধ করে, আমাদিগকে যেন বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগের উপর একটি আকৃতি চাপাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে তুমি যদি দেশে অবস্থান না কর তো দেশ তোমাতেই

বিদ্যমান। সকল স্বর্গ, সকল পৃথিবী সেই চৈতন্যময় পুরুষে অবস্থিত।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে বাধ্য। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান। ‘হস্ত না থাকিলেও তিনি সমস্ত বস্তু ধারণ করেন, পদবিহীন হইলেও তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন।’ … তিনি নিরাকার, মৃত্যুহীন, অনন্ত। ঈশ্বরের এইরূপ ধারণা বিকাশপ্রাপ্ত হইল। … তিনি সকল আত্মার অধীশ্বর, যেমন আমার আত্মা আমার এই দেহের অধিপতি। আমার আত্মা যদি দেহ ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে দেহ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্মা যদি আমার আত্মা হইতে বিযুক্ত হন, আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। তিনি বিশ্বভুবনের স্রষ্টা, আবার যাহা কিছু ধ্বংস হইতেছে, তাহারও সংহর্তা তিনিই। জীবন তাঁহার ছায়া, মৃত্যুও তাঁহার ছায়া।

প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণ মনে করিতেন, এই কলুষিত পৃথিবী মানুষের সমাদরের যোগ্য নয়। কি ভাল, কি মন্দ—কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়।

আমি পূর্বে বলিয়াছি, শয়তান ভারতে বেশী সুযোগ পায় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, ধর্মচিন্তায় ভারতবাসী খুব সাহসী ছিল। তাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে অবোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতে চায় নাই। শিশুদের বৈশিষ্ট্য তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? তাহারা সর্বদাই অপরের উপর দোষ চাপাইতে চায়। শিশুমন ভুল করিলে অন্য কাহাকেও দোষী করিতে তৎপর। একদিকে আমরা চেঁচাই—‘আমাকে ইহা দাও, উহা দাও।’ অন্যদিকে বলি—‘আমি ইহা করি নাই। শয়তান আমাকে প্রলোভিত করিয়াছিল। সে-ই ইহার জন্য দায়ী।’ ইহাই মানুষের ইতিহাস—দুর্বল মানবজাতির ইতিবৃত্ত!

মন্দ আসিল কেন? জগৎ একটি জঘন্য নোংরা গর্তের মত কেন? আমরাই ঐরূপ করিয়াছি। অন্য কেহ দোষী নয়। আমরাই আগুনে

হাত দিয়াছি বলিয়া হাত পুড়িয়া গিয়াছে। ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। মানুষ যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পায়। ভগবান্ তো করুণাময়। আমরা যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন। তিনি তো নিজেকে আমাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত।

ইহাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতবাসীর প্রকৃতি কাব্য-ঘেঁষা। কাব্যের জন্য তাহারা পাগল। তাহাদের দর্শনও কাব্য। যে দর্শনের কথা বলিতেছি, উহা একটি কবিতা। সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু উচ্চচিন্তা, সবই কবিতায় লেখা। তত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা—সবই কাব্য।

হাঁ, আমরাই দায়ী। আমরা দুঃখ পাই কেন? বলিতে পার, 'আমি জন্মিয়াছি দুঃখী দরিদ্রের ঘরে। সারা জীবন কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা বেশ জানি।' দার্শনিকেরা ইহার উত্তরে বলিবেনঃ হাঁ, এই দুঃখভোগের জন্য তুমিই দায়ী। যে দুঃখ ও দারিদ্র্যের কথা বলিলে, উহা কি অকারণ ঘটিয়াছে বলিতে চাও? তুমি তো যুক্তিবাদী। তোমার জীবনের ঘটনাসমূহের কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে। উহার কেন্দ্র তুমিই। তুমিই সর্বক্ষণ তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছ। ... স্বীয় জীবনের ছাঁচ তোমারই গড়া। তোমার জীবন-গতির জন্য তুমি নিজেই দায়ী। কাহাকেও দোষ দিও না, কোন শয়তানকে আসামী খাড়া করিও না। তাহাতে তোমারই শাস্তির মাত্রা বাড়িবে।

এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় হাজির করা হইল। ঈশ্বর তাহার শাস্তি ঠিক করিলেন—ত্রিশ ঘা বেত। অপর এক ব্যক্তি যে পৃথিবীতে নিজে কিছু উপলব্ধি না করিয়া ধর্মোপদেশ দিত, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় নীত হইলে ঈশ্বর হুকুম দিলেন—ইহার নিজের পাপের জন্য ত্রিশ ঘা বেত এবং অপরকে ভুল উপদেশ দিয়াছে বলিয়া আরও পনর ঘা বেত। ধর্মোপদেশ দেওয়ার এই বিপদ। আমার ভাগ্যে কি আছে, আমি জানি না। আমি তো পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম-

বক্তৃতা করিয়া বেড়াই। যত লোক আমার উপদেশ শুনিয়াছে, প্রত্যেকের জন্য যদি আমাকে পনর ঘা বেত খাইতে হয়, তবে তো সমূহ বিপদ!

২

আমাদিগকে এই ভাবটি বুঝিতে হইবে—ঈশ্বরের মায়া দৈবী। উহা তাঁহার ক্রিয়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'আমার এই দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাহারা আমার শরণ লয়, তাহারা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।' আমরা দেখিতে পাই যে, নিজেদের চেষ্টায় এই মায়ার মহাসমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন; একপ্রকার অসম্ভব। সেই পুরাতন মুরগী ও ডিমের প্রশ্ন—কোন্‌টি আগে? যে-কোন কর্ম কর, উহা ফল প্রসব করিবে। কর্মটি কারণ, ফলটি হইল কার্য। কিন্তু ফলটি আবার তোমাকে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত করে। এখানে ফলটি হইল কারণ, নূতন কর্মটি হইল কার্য। এইভাবে কার্য-কারণ-পরম্পরা চলিতে থাকে। একবার গতি আরম্ভ হইলে উহার আর বিরতি ঘটে না। ভাল বা মন্দ কোন কাজ করিলে উহার ক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। উহা থামাইবার উপায় নাই। অতএব এই কর্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন। কার্য-কারণের নিয়ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যদি কেহ থাকেন এবং তিনি যদি আমাদের উপর প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কর্মচক্রের বাহিরে টানিয়া আনিতে পারেন।

আমরা বলি, এইরূপ একজন আছেন। তিনি ঈশ্বর—অসীম করুণাময়। তিনি আছেন বলিয়াই আমাদের মুক্তি সম্ভব। নিজের ইচ্ছাতে কি তুমি মুক্ত হইতে পার? 'ঈশ্বর-কৃপায় মুক্তি'—এই মতবাদের অন্তর্নিহিত দর্শন বুঝিতে পারিতেছ কি? তোমরা পাশ্চাত্যবাসীরা খুব নিপুণ-বুদ্ধি—কিন্তু যখন তোমরা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে বস, তখন সবই বড় জটিল করিয়া তোল। মুক্তি অর্থে যদি প্রকৃতির বাহিরে যাওয়া বুঝায়, তাহা হইলে কর্ম দ্বারা তোমরা কি

করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? মুক্তির অর্থ ঈশ্বরে অবস্থান। ইহা তখনই সম্ভব, যখন তুমি নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পার—যে আত্মা প্রকৃতি ও তাহার যাবতীয় বিকার হইতে পৃথক্। এই আত্মাই ঈশ্বর—বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবনসমূহের মধ্যে ওতপ্রোত।

আমার ব্যষ্টি আত্মার সহিত আমার শরীরের যে সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত ব্যষ্টি আত্মাসমূহেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। আমরা ব্যষ্টিরা হইলাম পরমাত্মার দেহ। ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি—তিনই এক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, কার্য-কারণের নিয়ম প্রকৃতির প্রতিটি অংশে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতির ফাঁসে একবার আটকাইয়া পড়িলে আর বাহির হইয়া আসা যায় না। কার্য-কারণের নিয়মে একবার বদ্ধ হইলে সম্ভাব্য পরিত্রাণ তোমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দ্বারা হইবার নয়। জগতের প্রত্যেকটি মাছির জন্য তোমরা হাসপাতাল নির্মাণ করিতে পার … এরূপ সৎকর্ম কখনই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে না। এই-সব লোকহিতকর কীর্তিকলাপ গড়ে আবার ভাঙে। মুক্তিলাভ সম্ভবপর যদি এমন কেহ থাকেন যিনি কখনও প্রকৃতিতে বাঁধা পড়েন নাই, যিনি প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রকৃতি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। নিয়ম তাঁহাকে চালিত করে না, তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ম চালু হয়। … তিনি নিত্য বর্তমান, তাঁহার করুণার অন্ত নাই। যে মুহূর্তে তুমি তাঁহাকে ঠিক ঠিক খুঁজিবে, সেই মুহূর্তেই তিনি তোমাকে মুক্ত করিবেন। কেননা তিনিই যে তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

কেন পরমাত্মা আমাদিগকে উদ্ধার করেন নাই? আমরা তাঁহাকে চাই নাই বলিয়া। আমরা তাঁহাকে ছাড়া অন্য সব কিছু চাই। তাঁহার জন্য যখনই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা জাগিবে, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমরা ভগবানকে বলি, ‘প্রভু, আমাকে একটি সুন্দর বাড়ী দাও, আমাকে স্বাস্থ্য দাও, এই বিপদটি কাটাইয়া দাও’ ইত্যাদি। মানুষ যখন তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না, তখনই তিনি দেখা দেন। একটি

ভক্তের প্রার্থনাঃ

‘হে প্রভু, ধনী ব্যক্তির স্বর্ণ রৌপ্যের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপর যেমন প্রীতি, তোমার প্রতি আমার সেইরূপই ভালবাসা যেন জাগে। আমি পৃথিবী বা স্বর্গের সুখ চাই না, রূপ-যৌবন চাই না, বিদ্যা-গৌরব চাই না। মুক্তিও চাই না। বার বার যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও আমার ভয় নাই। কিন্তু আমার কাম্য শুধু একটি বস্তু—তোমাকে ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—যাহার নিকট স্বর্গ অতি তুচ্ছ।’

মানুষ যাহা চায়, তাহাই পায়। যদি সর্বদা শরীরের ধ্যান কর, পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হইবে। এই শরীরটি গেলে আবার একটি আসিবে, একটির পর একটি শরীর-পরিগ্রহ চলিতে থাকিবে। জড়ভূতকে ভালবাসিলে জড়ভূতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। প্রথমে আসে পশুজন্ম। একটি কুকুরকে যখন হাড় কামড়াইতে দেখি, তখন বলি, ‘ভগবান্, আমাদিগকে রক্ষা করুন—যেন কুকুর-জন্ম না হয়!’ অত্যন্ত দেহাসক্তির পরিণাম কুকুর বিড়াল হইয়া জন্মান। আরও যদি অবনত হও, তাহা হইলে খনিজ প্রস্তরাদি হইবে—শুধু জড়পিণ্ড, আর কিছু নয়।

অপর অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন আপস করিতে যাইবেন না। সত্যকে ধরিয়াই মুক্তিপথে যাওয়া যায়। ইহা হইল আর একটি মূলমন্ত্র। ...

মানুষ যখন শয়তানকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিল, তখনই তাহার যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হইল। সে সাহসের সহিত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং সংসারের দুঃখকষ্টের দায়িত্ব নিজেরই স্কন্ধে লইল। পক্ষান্তরে যখনই সে ভূত-ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াছে এবং কার্য-কারণের নিয়ম লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে, তখনই তাহাকে নতজানু

হইয়া কাঁদিয়া বলিতে হইয়াছে, ‘প্রভু, আমাকে বাঁচাও। তুমিই তো আমাদের স্রষ্টা ও পিতা, আমাদের পরম বন্ধু।’ ইহা কাব্য, তবে আমার মনে হয়, খুব উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। ইহা যেন অনন্তকে রূপায়িত করা। প্রত্যেক ভাষায় এইরূপ অসীমকে রূপায়িত করিবার নিদর্শন আছে। কিন্তু এই অনন্ত যথার্থ অনন্ত নন—ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট অনন্ত—আমাদের মাংসপেশী-বিধৃত অনন্ত। ...

‘তাঁহাকে সূর্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র বা তারকারাজি বা বিদ্যুৎও নয়।’
৩
ইহা অনন্তের আর একপ্রকার চিত্রণ—নিষেধাত্মক ভাষায়। ... উপনিষদের অধ্যাত্মবাদে অনন্তকে এইভাবে চরম বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্ত পৃথিবীর শুধু শ্রেষ্ঠ দর্শনই নয়, ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্যও বটে। ...

এখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও, বেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে পার্থক্য হইল এইঃ প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ। বহির্জগতের আনন্ত্য, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধিকর্তা—ইহা লইয়াই বেদের প্রথম ভাগের ধর্মকর্ম। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বেদান্তের অন্বেষ্টব্য ভিন্ন। এখানে মানব-মনীষা ঐ-সকলকে ছাড়াইয়া গিয়া অভিনব আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। দেশগত আনন্ত্যে সে তৃপ্তি পায় নাই। উপনিষদের ঘোষণাঃ ‘স্বতঃবর্তমান পরমাত্মা মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্মুখ করিয়া গড়িয়াছেন। যাহাদের দৃষ্টি বাহিরে, তাহারা আন্তর সত্যের সন্ধান পায় না। তবে এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সত্যকে জানিবার ইচ্ছায় নিজেদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরাইয়া দিয়া অন্তরের অন্তরে প্রত্যাগাত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।’৪

আত্মার আনন্ত্য দেশগত আনন্ত্য নয়, এই আনন্ত্যই যথার্থ আনন্ত্য—উহা দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে। ... পাশ্চাত্য এই দেশকালাতীত

অধ্যাত্মজগতের সন্ধান পায় নাই। ...তাহাদের মন বহিঃপ্রকৃতি এবং উহার অধীশ্বরের দিকেই নিয়োজিত। আপন অন্তরে তাকাইয়া হারান সত্যকে খুঁজিয়া বাহির কর। এই সংসার-স্বপ্ন হইতে মন কি দেবতাদের সহায়তা বিনা জাগিয়া উঠিতে পারে? একবার যদি সংসারের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কৃপাময় পরমপিতা আমাদিগকে উহা হইতে বাহির করিয়া না আনিলে আমাদের উপায় নাই।

তবে করুণাময় ভগবানের নিকট গেলেও উহা চরম মুক্তি হইবে না। দাসত্ব দাসত্বই।সোনার শিকলও লোহার শিকলের ন্যায়ই বিপজ্জনক। নিষ্কৃতির পথ আছে কি?

না, তুমি বদ্ধ নও। কেহই কোন কালে বদ্ধ ছিল না। আত্মা সংসারের অতীত। আত্মাই সব। তুমিই সেই এক। দুই নাই। ঈশ্বর হইলেন মায়ার পর্দায় তোমারই প্রতিবিম্ব। আত্মাই প্রকৃত ঈশ্বর। মানুষ যাঁহাকে অজ্ঞানবশে পূজা করে, তিনি আত্মারই প্রতিবিম্ব। স্বর্গবাসী পিতাকে ভগবান্ বলা হয়। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা কিসে? তিনি তোমার নিজেরই প্রতিবিম্ব বলিয়া সর্বদা যে তুমি ভগবানকে দেখিতেছ, ইহা বুঝিতে পারিলে কি? তোমার যত বিকাশ ঘটে, সেই প্রতিবিম্বও তত স্পষ্টতর হইতে থাকে।

‘একই বৃক্ষে দুইটি সুন্দর পাখী
৫
বসিয়া আছে। উপরের পাখীটি হইল স্থির, শান্ত, গম্ভীর। নীচেরটি কিন্তু সদা চঞ্চল—মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাইয়া কখনও সুখী, কখনও দুঃখী।—জীবাত্মারূপী নীচের পাখীটি যখন পরমাত্মারূপী উপরের পাখীটিকে নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই তাহার দুঃখের অবসান হয়।’

... ‘ঈশ্বর’ বলিও না; ‘তুমি’ বলিও না; বল ‘আমি’। দ্বৈতবাদের

ভাষা হইল—‘হে ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা।’ অদ্বৈতের ভাষা হইলঃ ‘আত্মা’ আমার নিজের অপেক্ষাও প্রিয়। অন্তরতম সত্যের কোন নাম আমি দিব না। নিকটতম শব্দ যদি কিছু থাকে, তাহা ‘আমি’। …

‘ঈশ্বরই সত্য। জগৎ স্বপ্নমাত্র। ধন্য আমি যে, আমি এই মুহূর্তে জানিতেছি—আমি চিরকালই মুক্ত ছিলাম, চিরকালই মুক্ত থাকিব। আমি যে পূজা করিতেছি, আমিই উহার লক্ষ্য। প্রকৃতি বা অজ্ঞান কোন কিছুই আমাকে অভিভূত করে নাই। প্রকৃতি আমা হইতে তিরোহিত, দেবতারা আমা হইতে তিরোহিত, পূজা … কুসংস্কার সবই আমা হইতে তিরোহিত। আমি আমাকে জানিতেছি। আমিই সেই অনন্ত। ইনি অমুক ভদ্রলোক, ইনি অমুক মহিলা; দায়িত্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সব বুদ্ধিই লয় পাইয়াছে। আমিই সেই ভূমা। আমার মৃত্যু কি সম্ভবপর, অথবা জন্ম? কাহাকে আমি ভয় করিব? আমিই সেই এক। আমি কি নিজেকে ভয় করিব? অপর কে আছে, যাহা হইতে ত্রাস জন্মিবে? একমাত্র সত্তা আমিই। অপর কিছু নাই। আমিই সব।’

চাই শুধু নিজের চিরমুক্ত স্বরূপের স্মৃতি। কর্ম-সম্পাদ্য মুক্তি খুঁজিও না। ঐ মুক্তি কখনও পাওয়া যায় না। তুমি যে বরাবরই মুক্ত রহিয়াছ।

আবৃত্তি করিয়া চল—‘মুক্তোঽহম্’। যদি পরমুহূর্তে মোহ আসে এবং বলিতে হয় ‘আমি বদ্ধ’—তাহাতেও পিছাইও না। এই গোটা সম্মোহনটিকেই দূর করিয়া দাও।

এই তত্ত্ব প্রথমে শুনিতে হয়। শুনিয়া দিনের পর দিন উহা চিন্তা করিতে থাক। অহোরাত্র মন এই ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ।

‘আমিই ঐ পরম সত্য। আমিই বিশ্বের অধিপতি। মোহ কখনও ছিল না।’ মনের সকল শক্তি দিয়া এইভাবে ধ্যান করিতে থাক, যত দিন না বাস্তবিক প্রত্যক্ষ কর যে, এই দেওয়ালগুলি, গৃহগুলি, চারিদিকের সব কিছু গলিয়া যাইতেছে, শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিষয়

অদৃশ্য হইতেছে। ‘একাকী আমি দাঁড়াইয়া থাকিব। আমি সেই এক।’ চেষ্টা করিয়া চল। ভাবনা কিসের? আমরা চাই মুক্তি; অলৌকিক শক্তি আমাদের কাম্য নয়। সকল পৃথিবী আমরা ত্যাগ করিলাম; সকল স্বর্গ, সকল নরক আমরা তুচ্ছ করিলাম। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, এই ঐশ্বর্য, অমুক বিভূতি—এ-সকল লইয়া আমি কি মাথা ঘামাইব? মন বশীভূত হইল কি না হইল—তাহাতেই বা আমার কি আসে যায়? মন যদি দৌড়াইতে চায়, দৌড়াক। আমি তো মন নই, সে যথা রুচি চলুক।

সৎ অসৎ দুয়েরই উপর সূর্য সমভাবে কিরণ দেয়। কাহারও চোখের দোষের জন্য সূর্যের কি কোন হানি হয়? ‘সোঽহম্’। মন যাহা কিছু করে, তাহা আমাকে স্পর্শ করে না। অপরিচ্ছন্ন স্থানে সূর্যের আলোক পড়িলে সূর্য তো তাহা দ্বারা অপবিত্র হয় না। আমি সৎস্বরূপ।

ইহাই হইল অদ্বৈত-দর্শনের ধর্ম। ইহা কঠিন। কিন্তু সাধন করিয়া চল। সকল কুসংস্কার দূর করিয়া দাও। গুরু বা শাস্ত্র বা দেবতা বিদায় হউন। মন্দির, পুরোহিত, প্রতিমা, অবতার—এমন কি ঈশ্বরকে পর্যন্ত বিদায় দাও। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, সে ঈশ্বর আমিই। সত্যান্বেষী দার্শনিকগণ, উত্তিষ্ঠত। অভীঃ। ঈশ্বর ও জগৎরূপ কুসংস্কারের কথা বলিও না। ‘সত্যমেব জয়তে।’ আর ইহাই সত্য। আমিই অনন্ত।

ধর্মের কুসংস্কারসমূহ অসার কল্পনামাত্র ...। এই সমাজ—এই যে আমি তোমাদিগকে সম্মুখে দেখিতেছি, তোমাদের সহিত কথা বলিতেছি—এ সবই মিথ্যা প্রতীতি। এ সবই ত্যাগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক হইতে গেলে কি প্রয়োজন হয়! এই সাধনপ্রণালীকে জ্ঞানযোগ বলে—জ্ঞান বিচারের পথ। অন্যান্য পথ সহজ ও মন্থর ... কিন্তু জ্ঞানপথে প্রচণ্ড মনের বল আবশ্যক। দুর্বল ব্যক্তির জন্য ইহা নয়। তোমার বলা চাইঃ

‘আমি আত্মা—নিত্যমুক্ত; আমার কখনও বন্ধন ছিল না। কাল আমাতে বিদ্যমান, আমি কালে নই। আমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম। যাঁহাকে পিতা ঈশ্বর অথবা বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বলা হয়, তিনি আমারই মানস-সৃষ্ট।’

তোমরা যদি নিজেদের দার্শনিক বল তো কাজে উহা দেখাও। এই পরম সত্যের অনুধ্যান ও আলোচনা কর। পরস্পর পরস্পরকে এই পথে সাহায্য কর এবং সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জন কর।

প্রাণায়াম *

২৮ মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ সান্ ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ-অভ্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া আসিতেছে। এমন কি ইহা মন্দিরদর্শন বা স্তবস্তোত্রাদি পাঠের মত ধর্মচারণের একটি অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে। ... আমি এই বিষয়ের প্রতিপাদ্যগুলি তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব।

তোমাদিগকে আমি বলিয়াছি, ভারতীয় দার্শনিক কিভাবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দুটি বস্তুতে পর্যবসিত করেন—প্রাণ ও আকাশ। প্রাণ-অর্থে শক্তি। যাহা কিছু গতি বা সম্ভাব্য গতি, চাপ, আকর্ষণ ... বিদ্যুৎ, চুম্বকশক্তি, শরীরের ক্রিয়ানিচয়, মনের স্পন্দন প্রভৃতি-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সবই সেই এক মূলশক্তি প্রাণের অভিব্যক্তি। প্রাণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইল—যাহা মস্তিষ্কে বুদ্ধির আলোকরূপে অভিব্যক্ত।

শরীরে প্রাণের যত কিছু অভিব্যক্তি, তাহার প্রত্যেকটিকে মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। ... শরীরকে সম্পূর্ণভাবে মনের অধিকারে আনা চাই। আমাদের সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়; বরং আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতটিই সত্য। যাহা হউক আমাদের লক্ষ্য হইল—মনকে এমনভাবে তৈরী করা, যাহাতে খুশীমত সে শরীরের প্রত্যেক অংশ শাসন করিতে পারে। ইহাই তত্ত্ববিচার ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য আমরা বাস্তব-ক্ষেত্রে যখন আসি, তখন ইহা খাটে না। তখন আমরা গাড়ীটিকে ঘোড়ার আগে স্থাপন করিয়া বসি। শরীরই তখন মনের উপর কর্তৃত্ব করে। আঙুলে কেহ চিমটি কাটিলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি। দেহেরই প্রভাব মনের উপর চলিতে থাকে। দেহে অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিলে আমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না, আমার মনের সাম্যচ্যুতি ঘটে। এই অবস্থায় শরীরই আমাদের মনের প্রভু।

আমরা দেহের সহিত এক হইয়া যাই। নিজদিগকে শরীর ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারি না।

তত্ত্বদর্শী আসিয়া আমাদিগকে এই দেহাত্মবুদ্ধির বাহিরে যাইবার পথ দেখান। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দেন। তবে যুক্তিবিচার দ্বারা বুদ্ধিতে ইহা ধারণা করা ও স্বরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি—এই দুই-এ সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন একটি বাড়ীর নক্সা ও বাস্তব বাড়ীটির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। অতএব ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নানা প্রণালী থাকা চাই। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অনুশীলন করিতেছিলাম—আত্ম-স্বরূপে দাঁড়াইয়া সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করা—আত্মার মুক্তস্বভাব ঘোষণা করা—শরীরের সাহায্য না লইয়া শরীরকে জয় করা। গীতা বলেন, ইহা খুবই কঠিন। সকলের জন্য এই পথ নয়। দেহাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই সাধনা দুষ্কর। (গীতা, ১২।৫)

কিছু স্থূল সহায়তা পাইলে মন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মন নিজেই এই চরম আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভূতি যদি সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তদপেক্ষা সঙ্গত আর কিছু আছে কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন তাহা পারে না। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে স্থূল সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজযোগের প্রণালী হইল—এই স্থূল সাহায্যগুলি গ্রহণ করা। উহা আমাদের শরীরের ভিতর যে-সব শক্তি ও সামর্থ্য রহিয়াছে, সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি উন্নত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং মনকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া উহাকে তাহার হৃত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে। কেবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া কেহ যদি চরম আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা তো অতি উত্তম। কিন্তু আমরা অনেকেই তো উহা পারি না। সেজন্য আমাদিগকে স্থূল সাহায্য অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তিকে লক্ষ্যপথে লইয়া যাইতে হইবে।

... সমগ্র জগৎ হইল বহুত্বে একত্বের একটি বিপুল নিদর্শন। মাত্র এক সমষ্টি মন রহিয়াছে। উহারই বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন নামে পরিচিত। মনরূপ মহাসমুদ্রে ঐগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত। আমরা একই সময়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টি। এইভাবে খেলা চলিতেছে ...। বাস্তবপক্ষে একত্বের কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। জড় পদার্থ, মন এবং আত্মা—তিন-ই এক।

এই-সকল বিভিন্ন নাম মাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু একটিই সত্য আছে, পৃথক্ দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা উহাকে প্রত্যক্ষ করি। একটি দৃষ্টিকোণে উহা জড়বস্তুরূপে প্রতীত হয়, অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে উহাকেই দেখি মনরূপে, দুই বস্তু কিছু নাই। একজন একটি দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করিয়াছিল। ভয়ে অস্থির হইয়া সে অপর একজনকে সাপটিকে মারিবার জন্য ডাকিতে লাগিল। তাহার স্নায়ুমণ্ডলীতে কম্পন শুরু হইল, বুক ধড়াস ধড়াস করিতে আরম্ভ করিল। ভয় হইতেই এই-সব লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অবশেষে সে যখন আবিষ্কার করিল, উহা দড়ি, তখন সব বিকার চলিয়া গেল। আমরাও চিরন্তন সত্য-বস্তুকে এইরূপ নানা মিথ্যা আকারে দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, উহাও সেই সৎস্বরূপ। তবে আমরা যেভাবে দেখিতেছি, উহা তাহা নয়। যে-মন দড়ি দেখিয়া উহাকে সাপ বলিয়া ভাবিয়াছিল, সে-মন যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা নয়; তাহা হইলে সে কিছুই দেখিত না। একটি জিনিষকে অপর জিনিষ বলিয়া দেখা, একেবারে যাহার অস্তিত্ব নাই—এমন কিছু দেখা নয়। আমরা শরীর দেখিতেছি, অনন্তকে জড়বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি। আমরা সত্যেরই সন্ধান করিতেছি। আমরা কখনও প্রবঞ্চিত নই। সর্বদাই আমরা সত্যকেই জানিতেছি, তবে সত্যের প্রতিচ্ছবি কখনও কখনও আমাদের কাছে ভুল হইতেছে, এই মাত্র। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কেবল একটি বস্তুকেই দেখা চলে। যখন আমি সর্পকে দেখিতেছি, রজ্জু তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত। আবার যখন রজ্জু দেখি, তখন সর্প আর নাই। এক সময়ে একটি মাত্র বস্তু প্রত্যক্ষ

হইতে পারে।

আমরা যখন জগৎ দেখিতেছি, তখন ঈশ্বরকে দেখিব কিরূপে? ইহা মনে মনে বেশ ভাবিয়া দেখ। 'জগৎ' অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বহু বস্তুরূপে প্রতীয়মান ঈশ্বরই। যখন তুমি সাপ দেখিতেছ, তখন দড়ি আর নাই। যখন চৈতন্য সত্তার বোধ হইবে, তখন অপর যাহা কিছু সব লোপ পাইবে। তখন আর জড়বস্তুকে দেখিবে না, কেননা যাহাকে জড়বস্তু বলিতেছিলে, তাহা চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ই বহুর 'অধ্যাস' লইয়া আসে।

জলাশয়ের সহস্র সহস্র তরঙ্গে একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র সূর্যের সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন আমি ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকাই, তখন উহাকে জড়বস্তু ও শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যান করি। একই সময়ে উহা এক ও বহু। বহু একেকে নষ্ট করে না, যেমন মহাসমুদ্রের কোটি কোটি তরঙ্গ সমুদ্রের একত্বকে কখনও ব্যাহত করে না। সর্বদা উহা সেই এক মহাসমুদ্র। যখন জগৎকে দেখিতেছ, মনে রাখিও— আমরা উহাকে জড় বা শক্তি দুইয়েতেই পরিণত করিতে পারি। আমরা যদি কোন বস্তুর বেগ বাড়াইয়া দিই, উহার ভর (mass) কমিয়া যায় ...। পক্ষান্তরে ভর বৃদ্ধি করিলে বেগ হ্রাস পায়। ... এমন একটি অবস্থায় প্রায় পৌঁছান যাইতে পারে, যেখানে বস্তুর ভর সম্পূর্ণ লোপ পাইবে।

জড়কে শক্তির কারণ অথবা শক্তিকে জড়ের কারণ বলা চলে না। উভয়ের সম্পর্ক এমন যে, একটি অপরটির মধ্যে তিরোহিত হয়। একটি তৃতীয় পক্ষ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, উহাই মন। বিশ্বজগৎকে জড় বা শক্তি কোনটি হইতেই উৎপন্ন করা যায় না। মন জড় নয়, শক্তিও নয়, অথচ সর্বদাই জড় ও শক্তির প্রসব করিতেছে। আখেরে মন হইতেই সকল শক্তির উদ্ভব। 'বিশ্ব-মন'—এর অর্থ ইহাই— সকল ব্যষ্টি-মনের সংহতি। প্রত্যেক ব্যষ্টি-মন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে,

আর সব সৃষ্টি একত্র যোগ করিলে অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ খাড়া হয়। বহুত্বে একত্ব—একই সময়ে বহু ও এক।

ব্যক্তি-ঈশ্বর হইলেন সকল জীবের সমষ্টি, আবার তাঁহার একটি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যও আছে—যেমন আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি, কিন্তু গোটা দেহটির একটি পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

যাহা কিছুর গতি আছে, উহা প্রাণ বা শক্তির অন্তর্গত। এই প্রাণই নক্ষত্র সূর্য চন্দ্রকে ঘুরাইতেছে; প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ ... ।

অতএব প্রকৃতির যাবতীয় শক্তিই বিশ্বমনের সৃষ্টি। আর আমরা ঐ বিশ্ব-মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশরূপে ভূমাপ্রকৃতি হইতে প্রাণকে আহরণ করিয়া নিজেদের ব্যষ্টি-প্রকৃতিতে দেহের ক্রিয়া, মনের চিন্তা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজে লাগাইতেছি। যদি বল—চিন্তা সৃষ্টি করা যায় না, তাহা হইলে কুড়ি দিন না খাইয়া দেখ, কিরূপ বোধ হয়। ... চিন্তাও আমাদের ভুক্ত খাদ্য দ্বারাই উৎপন্ন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে-প্রাণ সব কিছুকে চালাইতেছে, উহাকে আমাদের দেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের নাম 'প্রাণায়াম'। সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেহের যাবতীয় ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস। নিঃশ্বাস বন্ধ করিলে দেহের ব্যাপারও বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় শ্বাস লইলে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তবে প্রাণায়ামের লক্ষ্য শ্বাস-নিরোধ মাত্র নয়, শ্বাসের পশ্চাতে এক সূক্ষ্মতর শক্তিকে বশে আনা।

জনৈক রাজা মন্ত্রীর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া একটি উচ্চ গম্বুজের উপর তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। মন্ত্রীর স্ত্রী রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিলে মন্ত্রী বলিলেন, 'কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই বরং সুকৌশলে আমাকে একটি দড়ি পাঠাইয়া দিও।' মন্ত্রীপত্নী একট গুবরে পোকার একটি পায়ে একগাছি রেশমের সুতা বাঁধিয়া উহার মাথায় খানিকটা মধু মাখাইয়া উহাকে ছাড়িয়া

দিলেন। রেশমের সুতার সহিত প্রথমে খানিকটা মোটা সুতা এবং পরে মোটা টোয়াইন সুতার গুটি সংলগ্ন ছিল। টোয়াইনের গুটিটিতে বাঁধা ছিল একগাছি শক্ত মোটা দড়ি। মধুর গন্ধে পোকাটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে বুরুজের মাথায় উঠিল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন এবং ক্রমশঃ সিল্কের সুতা, মোটা সুতা এবং টোয়াইনের সুতা ধরিয়া মোটা দড়িগাছিটি নীচ হইতে উপরে টানিয়া তুলিলেন এবং উহার সাহায্যে বুরুজ হইতে পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন ঐ রেশমী সুতা। উহাকে আয়ত্ত করিলে ক্রমশঃ আমরা স্নায়ুমণ্ডলীরূপে মোটা সুতা এবং চিন্তারূপে টোয়াইনের সুতাকে ধরিতে পারি। অবশেষে আমরা হাতে পাই প্রাণরূপ শক্ত রজ্জু। প্রাণ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করি।

জড়স্তরের বস্তুর সাহায্যে আমাদিগকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে উপস্থিত হইতে হইবে বিশ্বজগৎ একটিই সত্তা, উহার যে বিন্দুতেই স্পর্শ কর না কেন, সব বিন্দুই ঐ এক বিন্দুরই হেরফের। একটি একতা সর্বত্র অনুস্যূত। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে স্থূল ব্যাপারকে ধরিয়াও সূক্ষ্ম চৈতন্যকে অধিগত করা যায়।

এখন শরীরের যে-সব স্পন্দন আমাদের জ্ঞানগোচর নয়, প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা উহাদিগকে আমরা ক্রমশঃ অনুভব আরম্ভ করি। আর ঐ-সব স্পন্দন-অনুভবের সঙ্গে উহারা আমাদের বশে আসে। আমরা বীজাকারে নিহিত চিন্তাগুলিকে দেখিতে পাইব এবং উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিব। অবশ্য আমাদের সকলেরই যে ইহা সম্পাদনের সুযোগ বা ইচ্ছা বা ধৈর্য বা শ্রদ্ধা আসিবে তাহা নয়, তবে এই-সম্পর্কীয় সাধারণ জ্ঞানও প্রত্যেকের কিছু না কিছু উপকার সাধন করে।

প্রথম সুফল স্বাস্থ্য। আমাদের শতকরা নিরানব্বই জন যথাযথভাবে নিঃশ্বাস লই না। ফুসফুসে যথেষ্ট বাতাস আমরা টানিয়া লই না। ...

শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিতে পারিলে শরীর শুদ্ধ হয়, মন শান্ত হয় ... । লক্ষ্য করিয়া থাকিবে—মনের যখন শান্তি থাকে—তখন নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে এবং তালে তালে পড়িতে থাকে। সেইরূপ নিঃশ্বাসকে যদি স্থির ও ছন্দোবদ্ধ করা যায় তো মনেরও শান্তি আসে। অপরপক্ষে মন যখন উদ্বিগ্ন, তখন নিঃশ্বাসের তালও কাটিয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে মনের শান্তি অবশ্যই সুলভ্য। মন যদি উত্তেজিত হয়, ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ কর এবং মনকে স্থির করিবার চেষ্টা না করিয়া দশ মিনিট তালে তালে নিঃশ্বাস লইতে থাক। দেখিবে মন শান্ত হইয়া আসিতেছে। এই ধরনের অভ্যাসগুলি হইল সাধারণ লোকের উপযোগী এবং উপকারী। অপরগুলি যোগীদের জন্য।

গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াগুলি ধাপমাত্র। বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য প্রায় চুরাশীটি আসন আছে। কেহ কেহ প্রাণায়ামকে জীবনের প্রধানতম অনুশীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিঃশ্বাসের গতিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা কোন কাজই করেন না। সর্বদা তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে কোন্ নাকে বেশী শ্বাস বহিতেছে। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাসের গতি থাকিলে তাহারা কতকগুলি কাজ করিবেন, বামদিকে শ্বাস বহিলে অন্য কতকগুলি কাজ। যখন উভয় নাসাপথেই শ্বাসগতি সমান থাকে, তখন তাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন। শ্বাসের এইরূপ অবস্থায় মনঃসংযম সহজ হয়। শ্বাসের দ্বারা দেহের স্নায়ুপ্রবাহকে ইচ্ছামত শরীরের যে কোন অংশে চালিত করা যায়। কোন অঙ্গ পীড়িত হইলে প্রাণপ্রবাহ সেই অঞ্চলে নিয়োজিত করিয়া পীড়ার উপশম করা চলে।

আরও নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া প্রচলিত আছে। কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, যাহারা শ্বাস-ব্যাপারকে থামাইয়া রাখিতে চায়। তাহারা এমন কিছু করিবে না, যাহাতে বেশী নিঃশ্বাস লইতে হয়। তাহারা একপ্রকার ধ্যানস্থ হইয়া থাকে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ তখন প্রায় সবই বন্ধ। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও একপ্রকার স্তব্ধ। ... এই সব

ক্রিয়ায় খুব বিপদ আছে। আরও কতকগুলি কঠিন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য উন্নততর যৌগিক শক্তি লাভ করা। কাহারও চেষ্টা থাকে—শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শরীরকে হাল্কা করিয়া ফেলা। তখন তাহারা শূন্যে উঠিতে পারে। আমি কখনও কাহাকেও এইরূপ শূন্যে উঠিতে বা বাতাসে উড়িতে দেখি নাই। তবে যোগের পুঁথিতে এইরূপ ক্ষমতার উল্লেখ আছে। এই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভান আমি করিতে চাই না। তবে আমি অনেক আশ্চর্য যৌগিক ক্রিয়া দেখিয়াছি। ... একবার এক ব্যক্তিকে শূন্য হইতে ফল ও ফুল বাহির করিতে দেখিয়াছিলাম।

... যোগী যোগশক্তি দ্বারা স্বীয় দেহকে এত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিতে পারেন যে, উহা এই দেওয়ালকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। আবার তাঁহার শরীরকে এত ভারী করাও সম্ভব যে, দুই শত লোক তাঁহাকে তুলিতে পারিবে না। যদি ইচ্ছা করেন তো তিনি পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবেন। কোন যোগীর কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতালাভ করা সম্ভব নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এক যোগী হয়তো সৃষ্টি করিতেন, অপর এক যোগী উহা ধ্বংস করিয়া দিতেন। ... যোগবিষয়ক গ্রন্থে এই-সকল কথা আছে। আমার নিজের পক্ষে এইসব বিশ্বাস করা কঠিন, তবে আমি অবিশ্বাসও করি না। নিজের চোখে যে-সব বিষয় দেখিয়াছি, সেইগুলিতে কোন সন্দেহ নাই।

জগতের জ্ঞান-আহরণ যদি সম্ভবপর হয় তো উহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা নয়, মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। পাশ্চাত্যদেশীয়রা বলেন, 'ইহা আমাদের স্বভাব, আমরা উহা বদলাইতে পারি না।' কিন্তু এই প্রকার মনোভাব দ্বারা সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না, জগতেরও কোন উন্নতি ঘটে না।

বলবানরা সব কিছু গ্রাস করিয়া লইতেছে, দুর্বলেরা দুঃখভোগ করিতেছে। যাহার কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা

আছে, তাহার লোভেরও সীমা নাই। বঞ্চিতেরা ধনীর প্রতি প্রবল ঘৃণা লইয়া নিজেদের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসিবে, তখন তাহাদের আচরণও হইবে অনুরূপ। ইহাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতি, অনিয়ন্ত্রিত ভোগপ্রবৃত্তির পরিণাম। সমস্যার সমাধান হইতে পারে শুধু মানুষের মনকে সুপরিচালিত করিয়া। ... মানুষ যাহা করিতে চায় না, তাহা তাহাকে আইনের জোরে করান যায় না। ...সে যদি আন্তরিক সৎ হইতে চায়, তবেই সে সৎ হইতে পারে। আইন-আদালত কখনও তাহাকে সৎ পথে আনিতে পারে না।

মানুষের মনেই সকল জ্ঞান। একটি পাথরে কে জ্ঞান দেখিয়াছে? জ্যোতির্বিদ্যা কি তারাগুলিতে? মানুষই জ্ঞানের আধার। আসুন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা অনন্ত শক্তিস্বরূপ। মনের ক্ষমতার সীমা কে টানিতে পারে? আমরা সকলেই সেই অনন্ত মনস্বরূপ, আসুন আমরা ইহা অনুভব করি। প্রত্যেকটি জলবিন্দুর সহিত সমগ্র সমুদ্রটি রহিয়াছে। মানুষের মন ঐ মহাসমুদ্রের মত। ভারত-মনীষা মনের এই শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির আলোচনা করিয়াছে এবং উহাদের বিকাশসাধনে সে তৎপর। পূর্ণতার উপলব্ধি সময়-সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা চাই। যদি পঞ্চাশ হাজার বৎসর লাগে, তাহাতেই বা কি? মানুষ যদি স্বেচ্ছায় তাহার মনের মোড় ফিরাইয়া পূর্ণতার অভিলাষী হয়, তবেই পূর্ণতার উপলব্ধি সম্ভবপর।

রাজযোগে বিঘোষিত সব বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উহা হইল মানুষের দেবত্বলাভের সামর্থ্য। মানুষ যখন তাহার নিজের মনের চিন্তাসমূহের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করে, তখনই ঐ দেবত্ব-বিকাশ সম্ভবপর। ... মনের ভাবনা ও ইন্দ্রিয়সমূহ আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আমার চালক নয়—এইরূপ অবস্থা আসা চাই, তবেই সব অশুভ লোপ পাইবে।

মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ

যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করিয়া তোলা এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ। মনকে যদি একটি বিন্দুতে একাগ্র করিতে চাই, উহা সেখানে যাইবে; আবার যে মুহূর্তে আমি উহাকে ডাক দিব, উহা সেই বিন্দু হইতে যেন ফিরিয়া আসিতে পারে।

ইহাই বিষম সঙ্কট। অনেক কষ্টে আমরা কিছু একাগ্রতার শক্তি লাভ করি। মন কতকগুলি বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনাসক্তির ক্ষমতা আমরা অর্জন করি না। মনকে একটি বিষয় হইতে ইচ্ছামত টানিয়া আনিতে পারি না, এমন কি অর্ধেক জীবন দিতে রাজী হইলেও না।

মনকে একাগ্র করা ও বিযুক্ত করা—দুই ক্ষমতাই আমাদের থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এই দুইটিতেই নিপুণ, তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছাড় খাইতেছে শুনিলেও তিনি দুঃখী হইবেন না। এইরূপ স্থিরতা কি পুঁথি পড়িয়া লাভ করা যায়? রাশি রাশি বই পড়িতে পার ... শিশুর মাথায় এক মুহূর্তে পনর হাজার শব্দ ঢুকাইয়া দিতে পার, যতকিছু মতবাদ, যতকিছু দর্শন আছে, সব তাহাকে শিখাইতে পার ... মাত্র একটি বিজ্ঞান আছে, যাহা দ্বারা মনের প্রভুত্ব লাভ করা যায়—মনোবিদ্যা ... প্রাণায়াম হইতেই ইহার আরম্ভ।

ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে মনের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং অবশেষে মন বশে আসে। ইহা সুদীর্ঘ অভ্যাসের ব্যাপার। হাল্কা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা কখনই অভ্যাস করা উচিত নয়। যাহার যথার্থ আগ্রহ আছে, সে একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করে। রাজযোগ কোন বিশ্বাস, মতবাদ বা ঈশ্বরের কথা বলে না। যদি তোমার দুই হাজার দেবতার উপর আস্থা থাকে, বেশ তো ঐ বিশ্বাসের পথেই চল না। ক্ষতি কি? কিন্তু রাজযোগে পাওয়া যায় ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য তত্ত্ব।

মহা মুশকিল এই যে, আমরা বচন ও মতবাদ ঝাড়িতে বৃহস্পতি। কিন্তু এই বাক্যের বোঝা অধিকাংশ মানুষকে কোনই সাহায্য করে না। তাহাদের প্রয়োজন বাস্তব জিনিষের সংস্পর্শ। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলিলে তাহারা ধারণা করিতে পারিবে না, তাহাদের মাথা গুলাইয়া যাইবে। সরল শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাসের কথা অল্প অল্প করিয়া শিক্ষা দিলে বরং তাহারা বুঝিতে পারিবে এবং অভ্যাস করিয়া আনন্দও পাইবে। ধর্মের ইহা প্রাথমিক পাঠ। শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাস দ্বারা প্রচুর উপকার হইবে। আমার মিনতি—আপনারা শুধু উপর উপর কৌতূহলী হইবেন না। কয়েকদিন অভ্যাস করিয়া দেখুন। যদি ফল না পান, আসিয়া আমাকে গালি দিবেন।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি পুঞ্জীভূত শক্তি। ঐ মহাশক্তি প্রতি বিন্দুতে বর্তমান। উহার এক কণাই আমাদের সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি আমরা জানি কি করিয়া উহা আয়ত্ত করা যায়।

‘অমুক কাজ আমাকে করিতেই হইবে’—এই বুদ্ধিই আমাদিগকে নষ্ট করিতেছে, ইহা ক্রীতদাসের বুদ্ধি। ... আমি তো চিরমুক্ত। আমার আবার কর্তব্যের বন্ধন কি? আমি যাহা করি, তাহা আমার খেলা। একটু আমোদ করিয়া লই ... এই পর্যন্ত।

প্রেতাত্মারা দুর্বল। তাহারা আমাদের নিকট হইতে কিছু প্রাণশক্তি পাইতে চেষ্টা করিতেছে।

একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রামিত করা যায়। যিনি দেন, তিনি গুরু; যে গ্রহণ করে, সে শিষ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়।

মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়সমূহ মনে লয় পায়, মন লীন হয় প্রাণে। আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় মন ও প্রাণের খানিকটা অংশ সঙ্গে লইয়া যান। সূক্ষ্ম-দেহের ধারক হিসাবে কিছু সূক্ষ্ম উপাদানও নেন।

কোন প্রকার বাহন ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে না। ... প্রাণ সংস্কারসমূহে আশ্রয় পায়। নূতন শরীর পরিগ্রহ কালে উহা পুনরায় পৃথক্ হয়। যথাকালে নূতন দেহ ও নূতন মস্তিষ্ক নির্মিত হয়। আত্মা উহার মাধ্যমে পুনরায় অভিব্যক্ত হন।

প্রেতাত্মারা শরীর সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা খুব দুর্বল, তাহারা যে দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিতে পারে না। তাহারা অপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর কিছু ভোগসুখ লাভ করিবার চেষ্টা করে। যে-কেহ ঐ প্রেতাত্মাদের প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে, কেননা প্রেতাত্মারা তাহার জীবনীশক্তি শোষণ করে।

এই জগতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই চিরন্তন নয়। ... মুক্তি-অর্থে সত্যকে জানা। আমরা নূতন কিছু হই না, আমরা যাহা তাহাই থাকি। আত্মসত্যে শ্রদ্ধা আনিতে পারিলেই মুক্তি সম্ভব, কর্ম দ্বারা নয়; ইহা জ্ঞানের প্রশ্ন। তুমি কে—ইহা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, আর কিছু নয়। সংসার-স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যাইবে। তোমরা এবং অন্যান্য সকলে এই পৃথিবীতে নানা স্বপ্ন দেখিয়া চলিয়াছ। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া আবার নূতন এক স্বপ্ন দেখা শুরু হইবে। ঐ স্বপ্ন চলিবে কিছুকাল। উহার অবসান ঘটিলে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আসা—হয়তো খুব সদ্‌ভাবে জীবনযাপন, অনেক দান-ধ্যান। কিন্তু তাহা তো আর আত্মজ্ঞান আনিয়া দিবে না। প্রকৃত দান অর্থে হাসপাতাল নির্মাণ নয়—ইহা আমরা কবে বুঝিব?

বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, 'সকল বাসনা আমা হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমি আর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যাইব না।' তিনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া কঠোর সাধনায় লাগিয়া যান। অবশেষে একদিন দেখিতে পান—এই জগদ্‌বৈচিত্র্য কী মিথ্যা কল্পনা, কী দুঃস্বপ্ন, আর স্বর্গ বা লোক-লোকান্তরের প্রসঙ্গ আরও নিকৃষ্টতর ফাঁকি!—তখন তিনি হাসিয়া

উঠেন।

যোগের মূল সত্য*

৫ এপ্রিল, ১৯০০, সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

ধর্মের অভ্যাস সম্বন্ধে কাহারও ধারণা নির্ভর করে—সে নিজে কার্যকারিতা বলিতে কি বুঝে এবং কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে সে শুরু করিতেছে, তাহার উপর। তিন ভাবেই আমরা ধর্মের অভ্যাস করিতে পারি—কর্মকে অবলম্বন করিয়া, পূজাপ্রণালীর মাধ্যমে কিম্বা জ্ঞানবিচার দ্বারা।

যিনি দার্শনিক, তিনি চিন্তা করিয়া চলেন ...। বন্ধন ও মুক্তির পার্থক্য—জ্ঞান ও অজ্ঞানের তারতম্য হইতেই ঘটে। দার্শনিকের লক্ষ্য হইল সত্যের উপলব্ধি, তাঁহার নিকট ধর্মের ব্যবহারিক উপযোগিতার অর্থ তত্ত্বজ্ঞানলাভ। যিনি উপাসক, তাঁহার ব্যবহারিক ধর্ম হইল ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষমতা। কার্যকর ধর্ম বলিতে কর্মী বুঝেন—সৎ কাজ করিয়া যাওয়া। অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই অপরের আদর্শের কথা মনে রাখি না। সারা পৃথিবীকে আমরা আমাদের নিজেদের আদর্শে বাঁধিতে চাই।

হৃদয়বান্ ব্যক্তির ধর্মাচরণ হইল—মানুষের উপকার-সাধন। যদি কেহ হাসপাতাল-নির্মাণে তাঁহাকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাঁহার মতে সে একান্তই অধার্মিক। কিন্তু সকলকেই যে উহা করিতে হইবে, তাহার কোন যুক্তি আছে কি? দার্শনিকও এইরূপে যে-কেহ তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না, তাহাকে হয়তো প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিতে থাকিবেন। কেহ কেহ হয়তো বিশ হাজার হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছে, দার্শনিক ঘোষণা করিবেন, উহারা তো দেবতাদের ভারবাহী পশু। উপাসকেরও কার্যকর ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা ও আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহার মতে যাহারা ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না, তাহারা যত বড় কাজই করুক না কেন, ভাল লোক নয়। যোগী

মনঃসংযম এবং অন্তঃপ্রকৃতির জয়ে উদ্যোগী। তাঁহার প্রশ্ন শুধুঃ ঐ দিকে কতটা আগাইয়াছ? ইন্দ্রিয় ও দেহের উপর কতটা আধিপত্য লাভ করিয়াছ? আমরা যেমন বলিয়াছি, ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী অপরের বিচার করিয়া থাকেন।

আমরা সর্বদাই ব্যবহারিক ধর্মের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই ব্যবহারিকত্ব আমাদের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী হওয়া চাই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে। প্রোটেষ্টাণ্টদের আদর্শ হইল সৎকর্ম। তাঁহারা ভক্তি বা দার্শনিক জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না, তাঁহারা মনে করেন, উহাতে বেশী কিছু নাই। 'তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আবার কি? মানুষের কিছু কর্ম করা চাই'—ইহাই হইল তাঁহাদের মনোভাব। ... মানবহিতৈষণার একটু ছিটাফোঁটা! গীর্জাসমূহ তো মুখে দিবারাত্র সহানুভূতিহীন অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তবুও মনে হয় কার্যতঃ উহারই দিকে তাহারা দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। নীরস উপযোগবাদের ক্রীতদাস! উপযোগিতার ধর্ম! বর্তমানে তো দেখা যাইতেছে—এই ভাবটিই খুব প্রবল। আর এইজন্যই পাশ্চাত্যে কোন কোন বৌদ্ধমত খুব জনপ্রিয় হইতেছে। ঈশ্বর আছেন কিনা, আত্মা বলিয়া কিছু আছে কিনা, তাহা তো সাধারণ মানুষের জ্ঞানগোচর নয়, অথচ জগতে অশেষ দুঃখ। অতএব জগতের কল্যাণচিকীর্ষাই প্রত্যক্ষ নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য যোগ-মতের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এরূপ নয়। ইহা বলে যে, মানুষের আত্মা সত্যই আছে এবং উহারই মধ্যে সকল শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি শরীরকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারি, তাহা হইলে অন্তরের ঐ শক্তি বিকশিত হইবে। আত্মাতেই সকল জ্ঞান। মানুষের এত সংগ্রাম কেন? দুঃখের উপশমের জন্য ...। শরীরের উপর আমাদের আধিপত্য নাই বলিয়াই আমরা যত দুঃখ ভোগ করি। আমরা অশ্বের পুরোভাগে শকটটিকে যুতিয়া দিতেছি। উদাহরণস্বরূপ সৎকর্মের কথা ধরা যাক।

আমরা ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি ... দরিদ্রের সেবা করিতেছি। কিন্তু আমরা দুঃখের মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। ইহা যেন একটি বালতি লইয়া সাগরের জল ছেঁচিতে যাওয়া—যেটুকু জল খালি করা গেল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী জল সর্বক্ষণ হাজির হইতেছে! যোগী দেখেন, ইহা অর্থহীন প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় হইল—প্রথমে দুঃখের মূল অন্বেষণ। ... ব্যাধি যদি দুশ্চিকিৎস্য হয়, তাহা হইলে উহা আরোগ্য করার চেষ্টা নিরর্থক। জগতে এত দুঃখ কেন? আমাদেরই নির্বুদ্ধিতার জন্য। আমরা আমাদের শরীরকে আয়ত্ত করি নাই। যদি নিজের দেহের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পার তো জগতের সকল দুঃখ দূর হইবে। প্রত্যেকটি হাসপাতাল চায়, বেশী বেশী রোগী যেন আসে। যতবার তুমি কিছু দান করিবার কথা ভাবিতেছ, ততবারই তোমাকে—তোমার দান যে গ্রহণ করিবে, সেই ভিক্ষুকের কথাও ভাবিতে হয়। যদি বল, 'হে ভগবান্, পৃথিবী যেন দানশীল ব্যক্তিতে ভরিয়া যায়'—তোমার কথার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবী যেন ভিক্ষুকের দ্বারাও পরিপূর্ণ হয়। লোকহিতকর কাজে যদি জগৎ পরিব্যাপ্ত দেখিতে চাও তো জগৎকে দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ দেখিতেও প্রস্তুত থাকিও।

যোগী বলেন, দুঃখের কারণ কি—তাহা প্রথমে বুঝিলে ধর্মের ব্যবহারিক উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম হয়। জগতের যাবতীয় দুঃখ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট। সূর্য, চন্দ্র অথবা তারাসমূহের কি ব্যাধি আছে? যে আগুন দিয়া ভাত রাঁধিতেছ, উহাই শিশুর হাত দগ্ধ করিতে পারে। উহা কি আগুনের দোষ? অগ্নি ধন্য, এই বিদ্যুৎশক্তি ধন্য, ইহারা আলোক দিতেছে। ... কোথাও তুমি দোষ চাপাইতে পার না। মূল ভূতগুলির উপরও না। জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়, জগৎ জগৎই। আগুন আগুনই, উহাতে যদি তুমি হাত পোড়াও, সে তোমারই বোকামি। যদি আগুনকে রন্ধন এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে লাগাইতে পার তো তুমি বিজ্ঞ। ইহাই পার্থক্য; কোন অবস্থা-বিশেষকে কখনও ভাল বা মন্দ বলা চলে না। ভাল বা মন্দ ব্যক্তি-

মানবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জগৎকে ভাল বা মন্দ বলার কোন অর্থ আছে কি? ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি-মানবই সুখ বা দুঃখের অধীন হয়।

যোগীরা বলেনঃ প্রকৃতি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গুলির স্পর্শ হইতেই সুখ বা দুঃখ, শীত বা উষ্ণের জ্ঞান হয়। আমরা যদি ইন্দ্রিয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারি এবং এখন যেমন সেগুলি আমাদিগকে চালাইতেছে, সেইরূপ না হইয়া যদি আমরা তাহাদিগকে খুশীমত চালাইতে পারি, আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। বর্তমান অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, সর্বদাই বোকা বানাইতেছে।

ধরুন এখানে একটি দুর্গন্ধ রহিয়াছে। উহা আমার নাকের সংস্পর্শে আসিলে আমি বিরক্তবোধ করিব। আমি যেন আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোলাম। তাহা যদি না হইতাম, তাহা হইলে আমি ঐ দুর্গন্ধের পরোয়া করিতে যাইব কেন? একজন আমাকে কটুকথা বলিল। উহা আমার কানে ঢুকিয়া দেহ ও মনের মধ্যে রহিল। আমি যদি আমার দেহেন্দ্রিয় মনের প্রভু হই, তাহা হইলে আমি বলিব, 'ঐ শব্দগুলি চুলোয় যাক, আমার কাছে ঐগুলি কিছুই নয়, আমার কোন কষ্ট নাই, আমি গ্রাহ্য করি না।' ইহাই হইল পরিষ্কার সরল সহজ সত্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারেঃ ইহা কি কাজে পরিণত করা যায়? মানুষ কি নিজের দেহমনকে এই ভাবে জয় করিতে পারে? ... যোগবলে ইহা অবশ্যই সম্ভব। ... যদি না-ও হয়, যদি তোমার মনে সংশয় থাকে, তবু তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। নিষ্কৃতির অন্য পথ নাই।

তুমি সর্বদা সৎ কাজ করিয়া যাইতে পার, তথাপি তোমার ইন্দিয়সমূহের দাসত্ব ঘুচিবে না, তোমাকে সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; হয়তো তুমি প্রত্যেক ধর্মের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছ।

এদেশে তো লোকে গাদা গাদা বই লইয়া ফিরে। তাহারা পণ্ডিত মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সুখদুঃখ-বোধ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী। তাহারা দুই-হাজার বই পড়িতে পারে, তাহাতে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যেই একটু কষ্ট আসিল, তাহাদের দুর্ভাবনার আর অন্ত থাকে না। ... ইহাকে কি মনুষ্যত্ব বল? ইহা তো চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

মানুষ আর পশুতে প্রভেদ কি? ... আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবিস্তার তো সকল প্রাণীর সাধারণ ধর্ম। মানুষের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, সে এগুলি আয়ত্ত করিতে পারে এবং এগুলির উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। পশুর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। পরোপকার-সাধনে মানুষের বিশেষ কি কৃতিত্ব? ইতরপ্রাণীও পরোপকার করিতে পারে। পিপীলিকা, কুকুর—ইহাদের মধ্যেও উহা দেখা গিয়াছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য হইল আত্মজয়ে। কোন কিছুর সংস্পর্শ-জনিত প্রতিক্রিয়াকে সে বাধা দিতে পারে। ইতরপ্রাণীর এই সামর্থ্য নাই। সর্বত্র সে প্রকৃতির রজ্জু দ্বারা বাঁধা। মানুষ প্রকৃতির অধীশ্বর, পশু প্রকৃতির ক্রীতদাস—ইহাই হইল একমাত্র প্রভেদ। প্রকৃতি কি?—পঞ্চেন্দ্রিয় ...।

যোগমতে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়ই নিষ্কৃতির পথ। ... ভগবানের জন্য ব্যাকুলতাই ধর্ম। ...সৎকর্ম প্রভৃতি মনকে একটু স্থির করে—এই মাত্র। যোগাভ্যাস—পূর্ণতার উপলব্ধি আমাদের পূর্বসংস্কারের উপর নির্ভর করে। আমি তো সারাজীবন ইহাই অনুশীলন করিতেছি, তবু এখন পর্যন্ত সামান্যই আগাইতে পারিয়াছি। তবে ইহাই যে একমাত্র খাঁটি পথ, তাহা বিশ্বাস করিবার মত সুফল আমি পাইয়াছি। এমন দিন আসিবে, যখন আমি আমার নিজের প্রভু হইতে পারিব। এ জন্মে না হয় তো অপর এক জন্মে নিশ্চয়ই ইহা ঘটিবে। চেষ্টা আমি কখনও ছাড়িব না। কিছুই নষ্ট হইবার নয়। এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার সমুদয় অতীত সাধনা আমার সঙ্গে যাইবে। মানুষে মানুষে

পার্থক্য কিসে হয়? তাহার পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা। অতীত অভ্যাস একজনকে করে মনস্বী এবং অপরকে করে নির্বোধ। অতীতের অর্জিত শক্তি থাকিলে তুমি পাঁচ মিনিটেই হয়তো কোন কাজ সিদ্ধ করিবে। শুধু বর্তমান দেখিয়া কোন কিছু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। আমাদের প্রত্যেককেই কোন না কোন সময়ে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

যোগীরা ব্যবহারিক যে-সব অভ্যাস শিক্ষা দেন, সেগুলির অধিকাংশই মনকে লইয়া—একাগ্রতা ধ্যান ইত্যাদি। আমরা এত জড়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছি যে, নিজেদের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা কেবল আমাদের শরীরটিই দেখি। দেহই আমাদের আদর্শ হইয়াছে, আর কিছু নয়। অতএব শারীরিক কিছু অবলম্বনের দরকার।

প্রথম, আসন। এমন একটি ভঙ্গীতে বসিতে হইবে, যে-অবস্থায় অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকা যায়। শরীরের স্নায়ুপ্রবাহগুলি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মেরুদণ্ড শরীরের ভার ধারণ করিবার জন্য নয়। অতএব এমন আসনে বসা প্রয়োজন, যাহাতে দেহের ওজন মেরুদণ্ডের উপর না পড়ে। মেরুদণ্ডকে সকল চাপ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় আছে। খাদ্য ও ব্যায়ামের গুরুতর প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য।

খাদ্য খুব সাদাসিধা হওয়া উচিত। মাত্র একবার বা দুইবারে দিনের সমগ্র আহার্য উদরসাৎ না করিয়া অল্পমাত্রায় কয়েকবার খাওয়া ভাল। কখনও ক্ষুধা-পীড়িত হইও না। যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, তিনি যোগী হইতে পারেন না। যিনি বেশী উপবাস করেন, তাঁহারও পক্ষে যোগ কঠিন। অতিমাত্রায় নিদ্রা বা অধিক রাত্রি জাগরণ, একেবারে কাজ না করা বা অত্যন্ত পরিশ্রম করা—এগুলিও যোগের অনুকূল

নয়।
৬
যোগে সাফল্যের জন্য নিয়মিত আহার ও পরিশ্রম, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—এই-সব প্রয়োজন। যথাযোগ্য খাদ্য কি, তাহা নিজেদেরই স্থির করিতে হইবে। অপর কেহ উহা বলিয়া দিতে পারে না। একটি সাধারণ বিধি এই যে, উত্তেজক খাদ্য বা বেশী মশলা-দেওয়া রান্না বর্জনীয়। ... আমাদের কাজের পরিবর্তনের সহিত খাদ্যেরও যে পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, আমাদের যত কিছু সামর্থ্য, তাহা আমরা খাদ্য হইতেই লাভ করিয়া থাকি।

অতএব যে পরিমাণে ও যে ধরনের শক্তি আমরা চাই, আমাদের আহার্যও তদনুযায়ী নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। ...

প্রচণ্ড ব্যায়ামের কোন প্রয়োজন নাই। ... মাংসল শরীর যদি চাও, যোগ তোমার জন্য নয়। বর্তমানে যে দেহ আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্মতর একটি যন্ত্র নির্মাণ করিতে হইবে। গুরুতর কায়িক পরিশ্রম যোগের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। ... যাহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এমন লোকের ভিতর বাস করিও। প্রচণ্ড মেহনত না করিলে দীর্ঘায়ু হইতে পারিবে। অপরিমিত-ভাবে জ্বালাইলে প্রদীপ যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ মাংসপেশীকে বেশী মাত্রায় খাটাইলে উহার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। যাহারা মস্তিষ্কের কাজ করে, তাহারা অনেক কাল বাঁচে। ... প্রদীপকে ধীরে ধীরে এবং মৃদুভাবে জ্বলিতে দাও। বেশী জ্বালাইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহা পুড়াইয়া ফেলিও না। প্রত্যেকটি উদ্বেগ, প্রত্যেকটি উদ্দাম লম্ফ-ঝম্প—শারীরিক অথবা মানসিক যাহাই হউক—তোমার আয়ুকে ক্ষয় করিতেছে, মনে রাখিও।

যোগীরা বলেন, প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুযায়ী তিন প্রকারের মন

আছে। প্রথম— তামস মন, উহা আত্মার আলো ঢাকিয়া রাখে। দ্বিতীয় —রাজসিক মন, যাহা মানুষকে খুব কর্মব্যস্ত রাখে। তৃতীয়—সাত্ত্বিক মন, উহার লক্ষণ হইল স্থিরতা ও শান্তি।

এমন লোক আছে, যাহাদের জন্ম হইতেই সর্বক্ষণ ঘুমাইবার ধাত; তাহাদের রুচি— পচা বাসী খাদ্যে। যাহারা রজোগুণী, তাহারা ঝাল ও ঝাঁজযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে। ... সাত্ত্বিক লোক খুব চিন্তাশীল, ধীর ও সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়; তাহারা অল্প পরিমাণে খায় এবং কখনও উগ্র দ্রব্য খায় না।

লোকে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, 'মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিব কি?' আমার গুরুদেব বলিতেন, 'তুমি কোন কিছু ছাড়িতে যাইবে কেন? উহাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।' তুমি নিজে প্রকৃতির কিছুই বর্জন করিতে যাইও না, নিজেকে বরং এমন করিয়া গড়িয়া তোল, যাহাতে প্রকৃতি নিজেই তোমার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে। এমন এক সময় আসিবে, যখন তোমার পক্ষে মাংস খাওয়া স্বভাবতই সম্ভব হইবে না। উহা দেখা মাত্রই তোমার ঘৃণার উদ্রেক হইবে। এমন দিন আসিবে, যখন এখন যে-সব জিনিষ ছাড়িবার জন্য তীব্র চেষ্টা করিতেছ, সেগুলি আপনা হইতেই বিরস ও ন্যক্কারজনক মনে হইবে।

শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের নানা প্রণালী আছে। একটি অভ্যাস করিতে হয় তিন ধাপে—নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ রাখা এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া। কতকগুলি প্রণালী বেশ কঠিন। কতকগুলি জটিল প্রণালী যথাযোগ্য আহার্য বিনা অভ্যাস করিতে গেলে খুবই বিপজ্জনক হইতে পারে। যেগুলি খুব সরল, সেইগুলি ছাড়া অন্য প্রণালীগুলি তোমাদিগকে আমি অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিব না।

একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়া ফুসফুস পরিপূর্ণ কর। ধীরে ধীরে উহা ছাড়িয়া দাও। এইবার এক নাকে শ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে অপর নাক

দিয়া উহা বাহির করিয়া দাও। আমাদের কেহ কেহ পুরা শ্বাস লইতে পারি না, কেহ কেহ বা ফুসফুসকে যথেষ্ট বাতাস ভরিয়া দিতে সমর্থ নই। উপরি-উক্ত অভ্যাসগুলি এই ক্রুটি বেশ সংশোধন করিবে। সকালে ও সন্ধ্যায় আধঘণ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে পারিলে তুমি নূতন মানুষ হইয়া যাইবে। এই ধরনের শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ আদৌ বিপজ্জনক নয়। অন্যান্য অভ্যাসগুলি আস্তে আস্তে আয়ত্ত করিতে হয়। নিজের শক্তি আন্দাজ করিয়া চলিবে। দশ মিনিট যদি ক্লান্তিকর লাগে তো পাঁচ মিনিট করিয়া কর।

যোগীকে নিজের শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। এই-সব প্রাণায়াম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর সহায়তা করে। দেহের সর্বত্র বায়ুপ্রবাহে যেন ভরিয়া যায়। নিঃশ্বাস-গতি দ্বারা আমরা সকল অঙ্গের উপর প্রভুত্ব লাভ করি। শরীরের কোথাও অসাম্য ঘটিলে স্নায়ুপ্রবাহ ঐ দিকে চালিত করিয়া উহা আয়ত্তে আনিতে পারা যায়। যোগী বুঝিতে পারেন, শরীরের কোন্ স্থানে কখন প্রাণশক্তির ন্যূনতাবশতঃ যন্ত্রণা হইতেছে। তাহাকে তখন প্রাণসাম্য দ্বারা ঐ ন্যূনতা দূর করিয়া দিতে হয়।

যোগসিদ্ধির একটি অন্যতম শর্ত হইল পবিত্রতা। সকল সাধনের ইহাই মূল ভিত্তি। বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলের পক্ষেই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা প্রয়োজন। ইহা অবশ্য একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, তবে আমি তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। সর্বসাধারণের কাছে এই বিষয়ের আলোচনা এদেশে রুচিসম্মত নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলি লোক-শিক্ষকের ছদ্মবেশে একশ্রেণীর অতি হীন ব্যক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। ইহারা নরনারীকে উপদেশ দেয় যে, যদি তাহারা যৌন-সংযম অভ্যাস করে তো তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই-সব তথ্য ইহারা কোথায় পাইল? ... আমার নিকট এই প্রশ্ন লইয়া বহু লোক আসে। তাহাদিগকে কেহ বলিয়াছে যে, পবিত্র জীবন যাপন করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। ... এই-সব শিক্ষক ইহা জানিল

কিরূপে? তাহারা নিজেরা ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে কি? এই অপবিত্র নির্বোধ কামুক পশুরা সমগ্র জগৎকে তাহাদের পর্যায়ে টানিয়া আনিতে চায়!

আত্মত্যাগ বিনা কিছুই পাওয়া যায় না। ... মানব-চেতনায় যাহা পবিত্রতম—মহত্তম বৃত্তি, তাহাকে কলুষিত করিও না। ... পশুস্তরে উহাকে নামাইয়া আনিও না। নিজদিগকে ভদ্র করিয়া তোল। ... হও শুচি, হও পবিত্র। ... অন্য পথ নাই। যীশুখ্রীষ্ট কি অপর কোন পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন? ... যদি তোমার যৌনশক্তিকে রক্ষা করিয়া যথাযথ প্রয়োগ করিতে পার, তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া যাইবে। ইহার বিপরীত যাহা আসিবে, তাহা নরকতুল্য।

বাহিরের ব্যাপারে কিছু করা অনেক সহজ, কিন্তু পৃথিবীর যিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তিনিও যখন মনঃসংযম করিতে যান, তখন নিজেকে শিশুর ন্যায় অসহায় বোধ করেন। অন্তঃসাম্রাজ্য জয় করা আরও বেশী কঠিন। তবে নিরাশ হইও না। উঠ জাগ, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইও না।

বিবিধ

আমার জীবন ও ব্রত

[২৭ জানুআরী ১৯০০ খ্রীঃ ক্যালিফোর্নিয়া, প্যাসাডেনা শেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত।]

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আজ সকালে আলোচনার বিষয় ছিল ‘বেদান্তদর্শন’। বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হইলেও একটু নীরস ও অতি বিরাট।

ইতোমধ্যে আপনাদের সভাপতি এবং উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা ‘আমার কাজ ও এতদিনের কার্যক্রম’ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয়টি কাহারও কাহারও নিকট আকর্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে নয়। বস্তুতঃ কেমন করিয়া যে আপনাদের নিকট এ-সম্বন্ধে বলিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ-বিষয়ে এই আমার প্রথম বলা।

আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এতদিন কি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার জন্য আপনাদিগকে কল্পনায় ভারতবর্ষে লইয়া যাইতেছি। বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি ও বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনার সময় আমাদের নাই। একটি বৈদেশিক জাতির সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপ কিছুটা আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত বিশাল অট্টালিকার মত। প্রথম দর্শনে কোন আশাই জাগে না। এ এক বিগতশ্রী বিধ্বস্ত জাতি। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া লক্ষ্য করিলে এই রূপের পশ্চাতে ভারতের আর একটি সত্য দেখিতে পাইবেন। মানুষটি যে-আদর্শ ও মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ, সে-আদর্শ ও মূলনীতি যতদিন ব্যাহত বা বিনষ্ট না হয়, ততদিন মানুষটি বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহার আশা আছে। আপনার পরিধানের জামা কুড়িবার চুরি হইয়া গেলেও তাহা আপনার মৃত্যুর কারণ হয় না। আর একটি নূতন জামা আনিতে পারিবেন। জামা এ-

ক্ষেত্রে অপ্রধান। ধনবানের ধনরাশি অপহৃত হইলে তাহার প্রাণশক্তি অপহৃত হয় না। মানুষটি বাঁচিয়া থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে কি দেখিতে পাই, তাহা পরে বলিতেছি।

এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষ এখন আর একটি রাজনৈতিক শক্তি নয়, ভারতবর্ষ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি জাতি। নিজেদের শাসনকার্যে ভারতবাসীর কোন হাত নাই। ত্রিশকোটি পরাধীন দাস ভিন্ন ভারতবাসী আর কিছুই নয়। ভারতবাসীর জনপ্রতি মাসিক আয় গড়ে দুই শিলিং মাত্র। জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে উপবাসই স্বাভাবিক অবস্থা। ফলে আয়ের বিন্দুমাত্র স্বল্পতা ঘটিলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সামান্য দুর্ভিক্ষের অর্থ বহু লোকের মৃত্যু। এই দিক্ দিয়া দেখিলে শুধু ধ্বংসস্তূপ—আশাহীন ধ্বংসাবশেষই দেখিতে পাই।

কিন্তু আমরা জানি, ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করে নাই। পৃথিবীর যে- কোন জাতি অপেক্ষা বিপুলতর অর্থসম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতবাসী কোন দিন অর্থের জন্য লালায়িত হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ এক শক্তিমান্ জাতি ছিল, কিন্তু তাহার কখনও ক্ষমতার লোভ ছিল না। অন্য জাতিকে জয় করিবার জন্য ভারতবাসী কখনও বাহিরে যায় নাই। নিজেদের সীমার মধ্যেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল, বাহিরের সহিত বিবাদে রত হয় নাই। ভারতীয় জাতি কখনও সাম্রাজ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। পরাক্রম ও সম্পদ এ-জাতির আদর্শ ছিল না।

তবে? ভারতবাসী ভুল করিয়াছিল কি ঠিক পথে চলিয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই একটি জাতিই গভীরভাবে বিশ্বাস করিত—এই জীবনই একমাত্র সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য। সুখে দুঃখে তিনিই তাহার আশ্রয়স্থল। ভারতবর্ষের অধঃপতনকালে এইজন্যই সর্বপ্রথম ধর্মের অবনতি ঘটিয়াছিল।

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে, ধর্মের ভাবে দস্যুবৃত্তি করে।

আপনারা কি কখনও এমন দেশ দেখিয়াছেন? সেখানে যদি আপনি দস্যুদল গঠন করিতে চান, তবে দলের নেতাকে কোনরূপ ধর্ম প্রচার করিতে হইবে, তারপর কতকগুলি অসার দার্শনিকতত্ত্ব সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, 'এই দস্যুবৃত্তিই ভগবান্-লাভের সবচেয়ে সুগম ও সহজ পন্থা'। তবেই নেতা তাহার দল গঠন করিতে পারিবে। অন্যথা নয়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এ-জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি—ধর্ম। এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই বলিয়াই জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে।

রোমের কথা মনে করুন। রোমের জাতীয় লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও উহার বিস্তার। যে মুহূর্তে এই সাম্রজ্যবাদে বাধা পড়িল, অমনি রোম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধ্বংস হইল। গ্রীসের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি। যে মুহূর্তে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিল, গ্রীসও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ঠিক এই অবস্থাই বর্তমান কালের স্পেন ও অন্যান্য নবীন দেশগুলির হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। যতক্ষণ এই লক্ষ্যটির উপর কোন আঘাত না আসে ততক্ষণ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জাতি বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই আদর্শটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতিরও মৃত্যু ঘটে।

ভারতে সেই প্রাণশক্তি আজিও অব্যাহত। এই শক্তি ভারতবাসী কখনও ত্যাগ করে নাই। ভারতীয়দের সর্বপ্রকার কুসংস্কার সত্ত্বেও এই প্রাণশক্তি আজিও জাতির জীবনে সমভাবে প্রবাহিত। অতি ভয়ানক ঘৃণ্য কুসংস্কারসকল ভারতবর্ষে বর্তমান। তাহাতে কিছুই আসে যায় না। জাতির জীবনপ্রবাহ ও জীবনোদ্দেশ্য আজিও তেমনই আছে।

ভারতবাসীরা কোনকালেই একটি শক্তিশালী বিজয়ী জাতি হইতে পারিবে না। কোনদিন তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে না। এ-কাজ তাহাদের নয়। বিশ্বসভায় ইহা ভারতবর্ষের ভূমিকা নয়। ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষের আদর্শ—ভগবান্, একমাত্র ভগবান্। যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

অতএব বিশ্লেষণান্তে আপনার সিদ্ধান্ত হইবে, বাহিরের এই দুঃখ-দারিদ্র্য অকিঞ্চিৎকর, ইহা অন্তরের মানুষটিকে মারিতে পারে নাই; সে মানুষটি আজিও বাঁচিয়া আছে, এখনও তাহার আশা আছে।

দেখিতে পাইবেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া ধর্মবিষয়ক কার্যধারা চলিয়াছে। এমন একটি বৎসর আমার মনে পড়ে না—যে-বৎসর কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই। স্রোত যত তীব্র হয়, ততই উহাতে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হইতে থাকে। সম্প্রদায়সমূহ অবনতির লক্ষণ নয়—জীবনের পরিচায়ক। সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও বাড়িতে থাকুক। এমন দিন আসুক, যখন প্রত্যেক মানুষ এক একটি সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইবে। সম্প্রদায় লইয়া কলহের কোন কারণ নাই।

এখন আপনারা নিজেদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি কোনরূপ সমালোচনা করিতেছি না। এদেশের সামাজিক বিধিবিধান, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি সব কিছুই ইহজীবনের যাত্রাপথ সুগম করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন খুব সুখে থাকিতে পারে। আপনাদের রাস্তাঘাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন! কি সুন্দর সব শহর! কত উপায়েই না মানুষ অর্থোপার্জন করিতে পারে! জীবনের সুখ-সম্ভোগের কত পথ! কিন্তু যদি কেহ এখানে বলে, 'আমি কোন কাজ করিতে চাই না, শুধু ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিব', তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। কোন সুযোগই তাহাকে দেওয়া হইবে না—

কোন সুযোগই নয়। সকলের সহিত তাল মিলাইয়া চলিলেই এ-সমাজে মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। ইহলৌকিক সুখসম্ভোগের মত্ততায় তাহাকে যোগ দিতে হইবে, অন্যথা মৃত্যু অনিবার্য।

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে যদি কেহ বলে, ‘পর্বতশিখরে ধ্যানাসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব’, সকলেই তাহাকে বলিবে, ‘যাও, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন’। একটি কথাও তাহাকে বলিতে হইবে না। কেহ তাহাকে একখণ্ড পরিধেয় বস্ত্র দিবে, অনায়াসে তাহার অভাবপূরণ হইবে। কিন্তু যদি কেহ বলে, ‘এ-জীবনটা আমি একটু উপভোগ করিতে চাই’, অমনি সমস্ত দরজা তাহার নিকট বন্ধ হইয়া যাইবে।

আমি বলি, উভয় দেশের ধারণাই অযৌক্তিক। এদেশে যদি কেহ স্থির আসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চায়, তবে কেন সে সুযোগ পাইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। অধিকাংশ লোকে যাহা করে, প্রত্যেকের পক্ষেই এখানে কেন তাহাই কর্তব্য হইবে? আমি ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আবার ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি কেন ইহজীবনে সুখ-সম্ভোগ ও অর্থোপার্জন করিবে না, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু দেখুন, জোর করিয়া কোটি কোটি লোককে তাহাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহা ঋষিমুনিদের অত্যাচার। এ-অত্যাচার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের, মনীষীদের, এ-অত্যাচার অধ্যাত্মবাদীর, জ্ঞানী পুরুষের। আর মনে রাখিবেন, অজ্ঞ-জনের অত্যাচার অপেক্ষা জ্ঞানবানের অত্যাচার অনেক বেশী শক্তিশালী। নিজেদের মত অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানেরা সহস্র বিধিনিষেধের প্রচলন করিয়াছেন। যে-সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা অজ্ঞ-জনের সাধ্য নয়।

আমি বলি, এ অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। একজন আধ্যাত্মিক

মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়া লাভ নাই। যদি এমন কোন সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক মহামানবেরও আবির্ভাব হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সকলেও সুখে থাকিবে, ভাল কথা; কিন্তু যদি কোটি কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করিয়া একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা অন্যায়। বরং বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য একজন মহাপুরুষের দুঃখভোগ শ্রেয়।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আপনাকে সেই জাতির বিশিষ্ট পন্থা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সেই ব্যক্তির নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে হইবে। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় যদি ধর্মপ্রচার করিতে যান, তাহা হইলে রাজনৈতিক পন্থা অনুসারে আপনাকে কাজ করিতে হইবে। সেখানে পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ভোট-ব্যালট, প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন প্রভৃতি দ্বারা সংস্থা ও সমিতি গঠন করিতে হইবে, কারণ উহাই পাশ্চাত্যজাতির ভাষা ও রীতি। পক্ষান্তরে আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে ধর্মের ভাষায় কথা বলিতে হইবে। অনেকটা এইভাবে বলিতে হইবেঃ যে-ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে তাহার গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার অশেষ পুণ্য হইবে, সে স্বর্গে যাইবে অথবা ঈশ্বর লাভ করিবে। ঐভাবে না বলিলে তাহারা শুনিবে না। এ শুধু ভাষার ব্যাপার। বিষয়বস্তু কিন্তু একই। কিন্তু কোন জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইলে আপনাকে সেই জাতির ভাষায় কথা বলিতে হইবে। কথাটি খুবই ন্যায়সঙ্গত—এ-বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়।

আমি যে-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাকে বলা হয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। 'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ 'যে-ব্যক্তি সম্যকরূপে ত্যাগ করিয়াছে।' ইহা অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। যীশুর জন্মের ৫৬০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যতম সংস্কারক মাত্র। এত

প্রাচীন এই সম্প্রদায়! পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও আপনি সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাইবেন। প্রাচীন ভারতে নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক নরনারীকে শেষ জীবনে সমাজ হইতে বিদায় লইয়া একমাত্র স্বীয় মুক্তি ও ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহা ছিল চরম ঘটনা—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি বিশেষ। সুতরাং প্রাচীনকালে বৃদ্ধগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। পরবর্তী কালে তরুণ যুবকগণ সংসার ত্যাগ করিতে লাগিল। যুবকগণ কর্মঠ। বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সর্বক্ষণ মৃত্যুচিন্তা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তাহারা ধর্মপ্রচার, বিভিন্ন সম্প্রদায়-গঠন প্রভৃতি কার্যে ব্রতী হইল। এইরূপে যুবক বুদ্ধ তাঁহার মহান্ সংস্কারকার্য আরম্ভ করেন। তিনি যদি বৃদ্ধ হইতেন, তবে অবশ্যই নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই নীরবে নির্বাণ লাভ করিতেন।

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বলিতে 'চার্চ' বুঝায় না এবং সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা পুরোহিত নন। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতবর্ষে সমাজিক জীবনের অন্যান্য কাজের মত পুরোহিত-বৃত্তিও একটি জন্মগত পেশা। সূত্রধরের পুত্র যেমন সূত্রধর হয়, কর্মকারের পুত্র যেমন কর্মকার হয়, ঠিক সেইভাবে পুরোহিতের সন্তানও পুরোহিত হয়। পুরোহিতকে বিবাহ করিতে হয়। অবিবাহিতকে হিন্দুরা অসম্পূর্ণ মনে করে। তাই ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানে অবিবাহিতের অধিকার নাই।

সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি থাকে না, তাঁহারা বিবাহ করেন না। তাঁহাদের কোন সংস্থা নাই। তাঁহাদের একমাত্র বন্ধন গুরুশিষ্যের বন্ধন। এই বন্ধনটি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। শুধু শিক্ষাদানের জন্য যিনি আসেন এবং সেই শিক্ষার জন্য কিছু মূল্যদান করিয়াই যাঁহার সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যায়, তিনি প্রকৃত শিক্ষক নন। ভারতবর্ষে ইহা সত্যসত্যই দত্তক গ্রহণের মত। শিক্ষাদাতা গুরু আমার পিতার অধিক, আমি তাঁহার সন্তান—সব দিক্ দিয়া আমি তাঁহার সন্তান। সর্বাগ্রে—

পিতারও অগ্রে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিব; কারণ ভারতবাসীরা বলে, পিতা আমার জন্মদান করিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সুতরাং গুরু পিতা অপেক্ষা মহত্তর। আজীবন আমরা গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই সম্বন্ধই বর্তমান। আমি আমার শিষ্যদিগকে দত্তকরূপে গ্রহণ করি। অনেক সময় গুরু হয়তো তরুণ, শিষ্য বয়োবৃদ্ধ। তাহাতে কিছু আসে যায় না। শিষ্য সন্তান, সে আমাকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিবে; আমাকেও তাহাকে পুত্র বা কন্যারূপে সম্বোধন করিতে হইবে।

এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পাইয়াছিলাম, তিনি এক অদ্ভুত লোক। পাণ্ডিত্য তাঁহার কিছুই ছিল না, পড়াশুনাও বিশেষ করেন নাই। কিন্তু শৈশব হইতেই সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। স্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনার আরম্ভ। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্য দিয়া সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদায়গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করিতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর পর আবার তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ে যাইতেন। এইভাবে সকল সাধনার অন্তে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—সব মতই ভাল। কোন ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করিতেন না; তিনি বলিতেন, বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই সত্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র। আর তিনি বলিতেনঃ এতগুলি পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়, কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হইত, তবে হয়তো উহা একজন ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী হইত। পথের সংখ্যা যত বেশী থাকিবে, ততই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যলাভের সুযোগ ঘটিবে। যদি এক ভাষায় শিখিতে না পারি, তবে আর এক ভাষায় শিখিবার চেষ্টা করিব, সকল ধর্মমতের প্রতি তাঁহার এমনই শ্রদ্ধা ছিল।

যে-সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সেগুলি তাঁহার চিন্তারাশিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহাদের একটিও আমার নিজস্ব নয় শুধু মন্দগুলি ছাড়া। আমার উক্তির মধ্যে যাহা মিথ্যা ও মন্দ, সেইগুলিই আমার। সত্য ও কল্যাণকর যে-সকল কথা আমি উচ্চারণ করিয়াছি, সবই তাঁহার বাণীর প্রতিধ্বনিমাত্র। আপনাদিগকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার রচিত তাঁহার জীবনচরিত
১
পড়িয়া দেখিতে বলি।

তাঁহারই চরণপ্রান্তে কয়েকজন যুবকের সহিত একত্র আমি এই ভাবধারা লাভ করিয়াছি। তখন আমি বালকমাত্র। প্রায় ষোল বৎসর বয়সে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। অন্যান্য সঙ্গীদের কেহ আরও ছোট, কেহ বা একটু বড়। সবসুদ্ধ বার জন বা কিছু বেশী হইবে। সকলে মিলিয়া এই আর্দশ-প্রচারের কথা ভাবিলাম। শুধু প্রচার নয়, এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিলাম। ইহার অর্থ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, খ্রীষ্টানের কর্মপ্রবণতা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়া তোলা। প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'এই মুহূর্তেই আমরা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রবর্তন করিব; আর বিলম্ব নয়।'

আমাদের বৃদ্ধ গুরুদেব কখনও মুদ্রা স্পর্শ করিতেন না। সামান্য খাদ্য, বস্ত্র যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন, বেশী কিছু নয়। অন্য কোনরূপ দান তাঁহাকে নেওয়ান যাইত না। আশ্চর্য আধ্যাত্মিক ভাবরাশির সহিত এই নির্বিঘ্নতার ফলে তাঁহার কোনরূপ বন্ধন ছিল না। ভারতীয় সন্ন্যাসী আজ হয়তো রাজবন্ধু, রাজ-অতিথি—কাল তিনি ভিখারী, বৃক্ষতলশায়ী। সকলের সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হইবে। সর্বদা তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রবাদ আছে, 'গড়ান পাথরে শেওলা জমে না।' গত চৌদ্দ বৎসরকাল আমি কোন স্থানে তিন মাসের বেশী থাকি নাই—সর্বদা ঘুরিয়াছি। আমরা সকলেই

ঐরূপ করিয়া থাকি।

মুষ্টিমেয় ঐ কয়টি বালক এই মহান্ ভাবধারার প্রেরণায় নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল। সর্বজনীন ধর্ম, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি তত্ত্বের দিক্ দিয়া খুবই ভাল—কিন্তু কাজে এগুলি ফুটাইয়া তোলা চাই।

তারপর একদিন গুরুদেবের প্রয়াণকাল উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিলাম। আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না। এই সব অদ্ভুত ধারণা-পোষণকারী তরুণদের কথা কে-ই বা শুনিবে? অন্ততঃ ভারতবর্ষে তরুণেরা তো কিছুই নয়। একবার ভাবিয়া দেখুন, বারটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিত। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

তারপর আসিল দারুণ দুঃসময়—ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের পক্ষেও। কিন্তু আমার পক্ষে সে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য। একদিকে মা ও ভাইয়েরা। পিতার মৃত্যুতে আমরা তখন চরম দারিদ্র্যে উপনীত। বেশীর ভাগ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। পরিবারের একমাত্র আমিই আশা-ভরসা—সাহায্য করিবার উপযুক্ত ছিলাম। আমার সম্মুখে তখন দুইটি জগৎ। একদিকে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে না খাইয়া মরিতে দেখিতে হইবে; অপর দিকে বিশ্বাস করিতাম যে, গুরুদেবের ভাবধারা ভারতের তথা জগতের পক্ষে কল্যাণকর, সুতরাং এই আদর্শ জগতে প্রচার করিয়া কার্যে পরিণত করিতেই হইবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দ্বন্দ্ব চলিল। কখনও কখনও পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতাম। সে কি হৃদয়-বেদনা! আমি তখন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম! তরুণ

হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ আত্মীয়গণের দিকে টানিতেছে—অতি প্রিয়জনদের দুরবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অপর পক্ষে সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই। বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার জন্য অপরকে এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতি কাহারই বা সহানুভূতি জাগিতে পারে? একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।

সেই একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিল। তিনি এক নারী। আমাদের মহাযোগী গুরুদেব তাঁহাকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। পতি যৌবনে ধর্মোন্মাদনায় মগ্ন থাকাকালে একবার পত্নী তাঁহার সহিত দেখা করেন। অতিশৈশবে বিবাহ হইলেও বড় না হওয়া অবধি পত্নী স্বামীকে বিশেষ দেখিতে পান নাই। পরবর্তী কালে পত্নীর সহিত দেখা হইলে পতি বলিলেন, ‘দেখ, আমি তোমার স্বামী। এই দেহের উপর তোমার দাবী আছে। কিন্তু বিবাহিত হইলেও যৌন-জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে বিচারের ভার তোমাকেই দিলাম।’ পত্নী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, ‘ভগবান্ তোমার সহায় হউন, তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি কি তোমাকে অধঃপাতে লইয়া যাইব? যদি পারি, তোমাকে সাহায্যই করিব। তুমি তোমার সাধনা লইয়া থাক।’

সেই নারী এরূপ প্রকৃতির ছিলেন। সাধনায় মগ্ন হইয়া স্বামী ক্রমে নিজের ভাবে সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। দূর হইতে পত্নী যথাশক্তি সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যখন অধ্যাত্ম-জগতে এক বিরাট পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন। বলিতে গেলে তিনিই তাঁহার প্রথম শিষ্যা। অবশিষ্ট জীবন তিনি স্বামীর সেবায় অতিবাহিত করিলেন। বাঁচিয়া আছেন, কি মরিয়া গিয়াছেন—ঐ লোকোত্তর মহাপুরুষের সে খেয়াল ছিল না। কথা বলিতে বলিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসিলেও তাঁহার হুঁশ হইত না। জ্বলন্ত অঙ্গার! সদাসর্বদা তিনি ছিলেন এমনই দেহজ্ঞান-

রহিত।

সেই নারী তাঁহারই সহধর্মিণী, তিনি ঐ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার কোন শক্তি ছিল না। আমাদের অপেক্ষা তিনি দরিদ্র ছিলেন। যাহা হউক আমরা সংগ্রামে ঝাঁপ দিলাম। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে, এই ভাবধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্তিপরায়ণ করিয়া তুলিবে এবং নানা দেশ এবং নানা জাতির কল্যাণসাধন করিবে। এই বিশ্বাস হইতেই স্থির প্রতীতি জন্মিল যে, এই ভাবরাশি নষ্ট হওয়া অপেক্ষা কয়েক জন লোকের দুঃখ-বরণ করা ভাল। একজন মা ও দুইটি ভাই যদি মরে, কি আসে যায়? এও তো ত্যাগ। ত্যাগ কর—ত্যাগ ছাড়া কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বক্ষ চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিতে হইবে এবং সেই রক্তসিক্ত হৃদয় বেদীমূলে উৎসর্গ দিতে হইবে। তবেই তো মহৎ কার্য সাধিত হয়। অন্য কোন পথ আছে কি? কেহই সেই পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আপনাদের মধ্যে যে-কেহ কোন মহৎ কার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেই ভাবিয়া দেখিতে বলি। সে কী বিরাট মূল্য! সে কী বেদনা! কী নিদারুণ যন্ত্রণা! প্রত্যেকের জীবনে প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখভোগ থাকে, তাহা তো আপনাদের সকলেরই জানা আছে।

এইভাবেই আমাদের সেই তরুণ দলটির দিন কাটিতে লাগিল। চারিপাশের সকলের নিকটে অপমান ও লাঞ্ছনাই পাইলাম। অবশ্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এখানে ওখানে দু-এক টুকরা রুটি মিলিত। একটি অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ী বাসস্থান হিসাবে জুটিল, উহার তলায় গোখুরা সাপের বাসা, তাহাদের ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাইত। অল্প ভাড়ায় বাড়ী পাওয়ায় আমরা সেই গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতোমধ্যে ভারতের সর্বত্র

পরিভ্রমণ করিলাম। উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ এই ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা। দশ বৎসর কাটিয়া গেল—কোন আলোকরেখাই দেখিতে পাইলাম না! দশটি বৎসর! সহস্রবার হতাশা আসিল; কিন্তু একটি জিনিষ আমাদের সর্বদা আশান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল—সেটি হইল আমাদের পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা। প্রায় একশত নরনারী আমার চারিপাশে রহিয়াছে; কাল যদি আমি সাক্ষাৎ শয়তান হইয়া যাই, তাহারা বলিবে, 'আমরা এখনও আছি! আমরা তোমাকে কখনই ত্যাগ করিব না!' এই ভালবাসাই পরম আশীর্বাদ।

সুখে দুঃখে, দুর্ভিক্ষে যাতনায়, শ্মশানে, স্বর্গে বা নরকে যে আমাকে কখনই ত্যাগ করে না, সে-ই তো বন্ধু। এ বন্ধুত্ব কি তামাসা? এমন বন্ধুত্বের দ্বারা মোক্ষ-লাভও সম্ভব। আমরা যদি এমনভাবে ভালবাসিতে পারি, তবে এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তি আনিয়া দিবে। এই বিশ্বস্ততার মধ্যেই একাগ্রতার সার নিহিত। যদি তোমার সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি, সেই ভালবাসা থাকে, তবে জগতে তোমার কোন দেবার্চনার প্রয়োজন নাই। সেই দুঃখের দিনে এই ভালবাসাই আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। সেই ভালবাসাই আমাদিগকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত পরিচালিত করিয়াছিল।

সেই তরুণদলটি এইভাবে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধাচরণ পাইলাম, সাহায্য আসিল অতি অল্পক্ষেত্রে। কারণ একটি দোষ আমাদের ছিল—আমরা ছিলাম দুঃখদারিদ্র্যে রুক্ষচিত্ত। জীবনে যাহাকে নিজের পথ নিজেই করিয়া লইতে হয়, সে একটু রুক্ষ হয়; শান্ত কোমল ও ভদ্র হইবার—'ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া' ইত্যাদি বলিবার বেশী সময় তাহার থাকে না। নিজেদের জীবনেই আপনারা উহা সর্বদা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি যেন একটি আধারে অযত্নরক্ষিত অমসৃণ হীরকখণ্ড।

আমরা ঠিক সেইরূপ ছিলাম। 'কোন আপস চলিবে না।'—এই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র। 'ইহাই আদর্শ এবং এ আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে হইবে। মরিয়াও—রাজার নিকট যেমন এ আদর্শ প্রচার করিব, চাষার নিকট তেমনি এ আদর্শ তুলিয়া ধরিব।' স্বভাবতই আমরা বিরোধিতার সম্মুখীন হইলাম।

কিন্তু মনে রাখিবেন, ইহাই জীবনের অভিজ্ঞতা; যদি আপনি যথার্থই পরের মঙ্গল কামনা করেন, বিশ্বজগৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কিছুই করিতে পারিবে না। আপনার শক্তির নিকট তাহারা পরাস্ত হইবেই। যদি আপনি আন্তরিক ও প্রকৃতই নিঃস্বার্থ হন, স্বয়ং ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি আপনার মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া সমস্ত বাধা বিপত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে। সেই বালকের দল এমনি ছিল। তাহারা ছিল প্রকৃতির হাত হইতে সদ্যোনিঃসৃত শিশুর মত পবিত্র; গুরুদেব বলিতেন, 'ভগবানের বেদীমূলে আমি অনাঘ্রাত পুষ্প ও অস্পৃষ্ট ফলই নিবেদন করিতে চাই।' মহাপুরুষের সেই বাণী আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিত। কলিকাতার পথে তিনি যে-সব বালককে যেন কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। 'এই ছেলেটি বা ঐ তরুণটি ভবিষ্যতে কী হয়, দেখিও'—তাঁহার এই ধরনের কথা শুনিয়া লোকে ঠাট্টা করিত। অবিচলিত বিশ্বাসে তিনি বলিতেন, 'মা আমাকে ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি নিজে দুর্বল হইতে পারি, কিন্তু মা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ভুল হওয়া কখনও সম্ভব নয়। এইরূপ হইবেই।'

দশটি বৎসর কোন আশার আলো ছাড়াই কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কখনও রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার কখনও ভোরে আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে—এবং সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভিখারীকে কে-ই বা ভাল খাবার দেয়? আবার ভাল জিনিষ দিবার সামর্থ্যও ভারতবাসীর নাই। শুধু

একবেলা আহারের জন্য বেশীর ভাগ সময় পায়ে হাঁটিয়া, তুষারশৃঙ্গ চড়াই করিয়া, কখনও দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করিয়া চলিয়াছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খাম্বির দেয় না। কখনও কখনও এই খাম্বির-না-দেওয়া রুটি বিশ-ত্রিশদিন ধরিয়া সঞ্চিত রাখা হয়, তখন ইহা ইঁটের চেয়েও শক্ত হয়। ভিখারীকে সেই রুটির অংশ দেওয়া হয়। একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত। তদুপরি এই ইঁটের মত শক্ত রুটি চিবাইতে গিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িত। এই রুটি চিবাইতে সত্য সত্যই দাঁত ভাঙে। নদী হইতে জল আনিয়া একটি পাত্রে ঐ রুটি একটি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিতাম। মাসের পর মাস ঐভাবে থাকিতে হইয়াছে—ফলে শরীর অবশ্যই খারাপ হইতেছিল।

তারপর ভাবিলাম, ভারতবর্ষে চেষ্টা করিয়াছি, এবার অন্য দেশে করা যাক। এমনি সময় আপনাদের ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে একজনকে ঐ সভায় প্রেরণ করিতে হইবে। আমি তখন একজন ভবঘুরে। তবু বলিলাম, 'ভারতবাসী তোমরা আমাকে প্রেরণ করিলে আমি যাইব। আমার কোন ক্ষতির ভয় নাই, ক্ষতি যদি হয় তাহাও গ্রাহ্য করি না।' অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অনেক দিনের আপ্রাণ চেষ্টায় শুধু আসিবার খরচ যোগাড় হইল; এবং আমি এদেশে আসিলাম। ধর্ম-মহাসভার দুই-এক মাস পূর্বে আমি আসিলাম, এবং পরিচয়হীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

তারপর ধর্ম-মহাসভা আরম্ভ হইল, সেই সময় কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর সহিত আলাপ হইলে তাঁহারা আমাকে খুবই সাহায্য করিলেন। কিছু কিছু অর্থ-সংগ্রহ, দুইটি পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যৎসামান্য কাজ আরম্ভ করিলাম। তারপর ইংলণ্ডে গেলাম। সেখানেও কাজ চলিল। সেই সময় আমেরিকায় থাকিয়াও ভারতের জন্য কাজ চালাইলাম।

ভারতের জন্য আমার পরিকল্পনা যেভাবে রূপ পাইয়াছে এবং কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহা এইঃ আমি আপনাদিগকে ভারতের সন্ন্যাসীদের কথা বলিয়াছি। কেমন করিয়া আমরা কোনরূপ মূল্য গ্রহণ না করিয়া অথবা একখণ্ড রুটির মূল্যে দ্বারে দ্বারে ধর্মপ্রচার করিয়া থাকি, তাহাও বলিয়াছি। সেইজন্যই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তিও ধর্মের মহত্তম ভাবরাশি ধারণ করে। এ সকলই এই সন্ন্যাসীদের কাজ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'ইংরেজ কাহারা?' সে উত্তর দিতে পারিবে না। হয়তো বলিবে, 'পুঁথিতে যে-সব দৈত্যদানবের কথা আছে—ইংরেজরা তাহাদেরই বংশধর—তাই না?' 'তোমাদের শাসন- কর্তা কে?' 'জানি না।' 'শাসনতন্ত্র কি?'—তাহারা জানে না। কিন্তু দর্শনের মূলতত্ত্ব তাহারা জানে। যে ইহজগতে তাহারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, সেই জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞানেরই অভাব। এই সব লক্ষ লক্ষ মানুষ পরলোকের জন্য প্রস্তুত—এই কি যথেষ্ট? কখনই নয়। একটুকরা ভাল রুটি এবং একখণ্ড ভাল কম্বল তাহাদের প্রয়োজন। বড় প্রশ্ন এই, এ-সকল লক্ষ লক্ষ পতিত জনগণের জন্য সেই ভাল রুটি আর ভাল কম্বল কোথা হইতে মিলিবে?

প্রথমেই আপনাদিগকে বলিব, তাহাদের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ পৃথিবীতে তাহারা সবচেয়ে শান্ত জাতি। তাহারা যে ভীরু, তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা অসুর-পরাক্রমে যুদ্ধ করে। ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত। মৃত্যুকে তাহারা গ্রাহ্য করে না। তাহাদের মনোভাব এইঃ 'এ জন্মের পূর্বে অন্তত বিশ বার মরিয়াছি, হয়তো তারপর আরও অসংখ্যবার মরিব। তাহাতে কী আসে যায়?' তাহারা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। বিশেষ ভাবপ্রবণ না হইলেও যোদ্ধা হিসাবে তাহারা ভাল।

তাহাদের জন্মগত প্রবৃত্তি অবশ্য কৃষিকর্মে। আপনি তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লউন, তাহাদের হত্যা করুন, করভারে জর্জরিত করুন, যাহা

ইচ্ছা করুন—যতক্ষণ তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করিতে দিতেছেন, তাহারা শান্ত ও নম্র থাকিবে। তাহারা কখনও অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। 'আমাদের ভাবানুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করিবার অধিকার আমাদের দাও আর সব কাড়িয়া লও'—ইহাই তাহাদের মনোভাব। ইংরেজরা যখনই ঐ জায়গায় হস্তক্ষেপ করে, অমনি গণ্ডগোল শুরু হয়। উহাই ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ—ধর্ম লইয়া নির্যাতন ভারতবাসী সহ্য করিবে না। ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াই বিশাল মুসলমান রাজ্যগুলি একেবারে ফাটিয়া বিলয় পাইল।

অধিকন্তু ভারতের জনসাধারণ শান্ত, নম্র, ভদ্র—সর্বোপরি তাহারা পাপাসক্ত নয়। কোনপ্রকার উত্তেজিত মাদকদ্রব্য প্রচলিত না থাকায় তাহারা অন্য যে কোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এখানকার বস্তি-জীবনের সহিত তুলনা করিয়া আপনারা ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের সুন্দর নৈতিক জীবন বুঝিতে পারিবেন না। বস্তি মানেই দারিদ্র্য! কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের অর্থ পাপ, অশ্লীলতা ও অপরাধ-প্রবণতা নয়। অন্যান্য দেশে এমন ব্যবস্থা যে, নোংরা ও অলস ব্যক্তিরাই দারিদ্র্য হয়! নগর-জীবন ও উহার বিলাসব্যসন চায়, এমন মূর্খ বা বদমাশ ব্যতীত আর কাহাকেও এ-সব দেশে দরিদ্র থাকিতে হয় না। তাহারা কিছুতেই গ্রামে যাইবে না। তাহারা বলে, 'আমরা এই শহরেই বেশ ফূর্তিতে আছি। তোমরা অবশ্যই আমাদের আহার যোগাইবে।' ভারতবর্ষের ব্যাপার এরূপ নয়, সেখানে গরীবেরা উদয়াস্ত খাটিয়া মরে, আর এক জন আসিয়া তাহাদের শ্রমের ফল কাড়িয়া লয়। তাহাদের সন্তানেরা উপবাসী থাকে। লক্ষ লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্বচিৎ কখনও একটি কণা কৃষকের মুখে যায়। আপনারা পশু-পক্ষীকেও যে শস্য খাওয়াইতে চান না, ভারতের কৃষক সেই শস্যে প্রাণধারণ করে।

এই পবিত্র সরল কৃষককূল কেন দুঃখভোগ করিবে? ভারতের

নিমজ্জমান জনসাধারণ ও অবনমিত নারীসমাজের কথা আপনারা এত শুনিতে পান, কিন্তু কেহই তো আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন না। অনেকে বলেনঃ 'তোমরা যদি আমাদের নিজেদের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন কর, তবেই তোমরা ভাল হইবে, তবেই তোমাদের সাহায্য করা চলে। হিন্দুদের সাহায্য করা বৃথা।' কিন্তু ইঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস জানেন না। ভারতবাসী যদি তাহাদের ধর্ম ও আনুষঙ্গিক রীতিনীতিগুলি পরিবর্তন করে, তবে আর ভারতবর্ষ থাকিবে না, কারণ ধর্মই ভারতবাসীর প্রাণশক্তি। ভারতীয় জাতিই লুপ্ত হইয়া গেলে আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য সেখানে আর কেহই থাকিবে না।

আর একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, বস্তুতঃ আপনারা কাহাকেও সাহায্য করিতে পারেন না। আমরা কে কাহার জন্য কি করিতে পারি? আপনি আপনার রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিতেছেন, আর আমি আমার ভাবে। সকল পথই শেষ পর্যন্ত রোমে আসিয়া মিলিত হয়—এ কথাটি মনে রাখিয়া আমি হয়তো আপনাদের জীবনে কিছুটা গতি সঞ্চার করিতে পারি। জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ পর্যন্ত কোন জাতিগত সভ্যতাই সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। ঐ সভ্যতাকে কিছুটা আগাইয়া দাও, তবেই উহা স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছিবে। ঐ সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করিবেন না। একটি জাতির প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি বাদ দিলে তাহার আর কী অবশিষ্ট থাকে? ঐগুলিই জাতিকে সংহত করিয়া রাখে।

কিন্তু অতি পণ্ডিত এক বিদেশী আসিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমাদের সহস্র বৎসরের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন ছাড়িয়া দিয়া আমার এই নিরেট পাত্রটি গ্রহণ কর।'—ইহা নিতান্ত মূর্খতা।

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের আর একটু অগ্রসর হইতে হইবে। সাহায্য করিতে গিয়া নিঃস্বার্থ

হওয়ার প্রয়োজন। ‘আমি তোমাকে যেরূপ করিতে বলি, ঠিক সেরূপ করিলে তবে তোমায় সাহায্য করিব, নতুবা নয়।’—ইহার নাম কি সাহায্য?

অতএব হিন্দু যদি তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে চায়, সে সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্ন থাকিবে না; সাহায্য—সেবা, পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। আমি দিলাম, এখানেই উহা শেষ। আমার নিকট হইতে উহা চলিয়া গেল। আমার মন, আমার শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর কিছু নয়। অনেক সময় দেখিয়াছি, যাহারা অর্ধেক পৃথিবী শোষণ করিয়া ফিরিয়াছে, তাহারাই ‘অসভ্য’ হিদেনদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার কাজে কুড়ি হাজার ডলার দান করিয়াছে। কিসের জন্য? ঐ হিদেনদের উপকারের জন্য, না তাহাদের নিজেদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি।

পাপের সমুচিত ফল ফলিতেছে। আমরা মানুষেরা নিজের চক্ষুকেই ফাঁকি দিতে চাই। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে স্ব-স্বরূপে তিনি সদা বিরাজিত। তিনি তো কোনদিন ভোলেন না। আমরা কোনদিনই তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারি না। তাঁহার চোখকে কখনই ফাঁকি দেওয়া যায় না। যথার্থ পরোপকারের প্রেরণা সহস্র বৎসর পরেও ফলবতী হয়। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্রের মত ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকে—সংবাদপত্রে শিরোনামার সমারোহ

এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ করিলেও উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবেই। আমি কোন প্রকার গর্ব করিয়া বলিতেছি না, কিন্তু মনে রাখিবেন—আমি আপনাদিগকে সেই মুষ্টিমেয় যুবকদের কথা বলিতেছি। আজ ভারতবর্ষে এমন একটি গ্রাম নাই, এমন নরনারী নাই, যাহারা তাহাদের কাজ জানে না এবং তাহাদিগকে আন্তরিক

আশীর্বাদ করে না। এমন একটি দুর্ভিক্ষ নাই, যেখানে এই যুবকদল ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যতগুলি মানুষকে পারে বাঁচাইবার চেষ্টা করে না। এই সেবা হৃদয়কে স্পর্শ করিবেই। দেশবাসী তাহাদের কথা জানিতে পারিয়াছে। যখনই সম্ভব, তাহাদের সাহায্য করুন, কিন্তু সেই সাহায্যের পিছনে কী উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে, লক্ষ্য রাখিবেন। স্বার্থপূর্ণ হইলে সেই দান দাতা বা গ্রহীতা—কাহারও উপকারে আসিবে না। সাহায্য যদি নিঃস্বার্থ হয়, তবে উহা গ্রহীতার পক্ষে কল্যাণকর হইবে, এবং লক্ষগুণ কল্যাণকর হইবে আপনার নিজের পক্ষে; আপনার জীবন যেমন সত্য, এ-কথা তেমনি নিশ্চিত সত্য, জানিবেন। জগদীশ্বরকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। কর্মফলকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমার পরিকল্পনাগুলি ভারতের জনগণকে লক্ষ্য করিয়া। ধরুন, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে শুরু করিলেন, তথাপি আপনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? চার বৎসরের একটি ছেলে বরং লাঙ্গল ধরিবে, অথবা অন্য কোন কাজ করিবে, তবু সে আপনার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে না। তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব। আত্মরক্ষাই মানুষের প্রথম প্রেরণা। কিন্তু যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। আমি বলি, শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না? চাষার ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায়—যেখানে সে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাও। শত সহস্র সন্ন্যাসী জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিদ্যা দান করিতেছেন; কেন এই সন্ন্যাসীরাই জাগতিক ক্ষেত্রেও বিদ্যাবুদ্ধি বিতরণ করিবেন না? জনসাধারণের কাছে তাঁহারা ইতিহাস বা অন্যান্য বহু বিষয়ের কথা বলিবেন না কেন? শ্রবণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ হয়। যে শিক্ষা আমরা মায়েদের কাছ হইতে কানে শুনিয়া লাভ করিয়াছি, উহাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। গ্রন্থাদি অনেক পরে দেখা দিয়াছে। পুঁথিগত বিদ্যা কিছুই নয়। কানে শুনিয়া আমরাই চরিত্র-গঠনকারী

শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহ পাই। তারপর জনসাধারণের আগ্রহ যখন বাড়িবে, তখন তাহারা আপনাদের বইও পড়িবে। প্রথমে কাজ শুরু করিয়া দেওয়া যাক—ইহাই আমার মনোভাব।

দেখুন, আপনাদিগকে অবশ্যই বলিব সন্ন্যাস-ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী বিশ্বাসী নই। ঐ ব্যবস্থার অনেক গুণ আছে, অনেক দোষও আছে। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কিন্তু ভারতে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতিই সমস্ত শক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক। সন্ন্যাসী রাজার চেয়ে বড়। ভারতবর্ষে এমন কোন শাসক-নৃপতি নাই, যিনি 'গৈরিকবসন'-ধারীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাহস করেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। যদিও এই সন্ন্যাসীরাই জনগণের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন। তবুও ভাল লোকের হাতেও এত ক্ষমতা থাকা ঠিক নয়। সন্ন্যাসীরা পৌরোহিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাঁহারা জ্ঞানবিস্তার ও সংস্কারের কেন্দ্রস্বরূপ! ইঁহারা ঠিক য়াহুদীদের ভাববাদীদের (Prophets) মত, এই মহাপুরুষগণ সর্বদা পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীরাও এই ধরনের। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এতখানি ক্ষমতা সেখানে ভাল নয়। অন্য কোন উন্নততর পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু স্বল্পতম বাধার পথেই কাজ করা সম্ভব। সমগ্র জাতির আত্মা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। আপনি ভারতবর্ষে গৃহস্থরূপে কোন ধর্ম প্রচার করুন, হিন্দু জনসাধারণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করিবে। যদি আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুরা বলিবে, 'লোকটি ভাল, সংসার-ত্যাগী, খাঁটি লোক, মুখে যা বলে কাজেও তাই করে।' আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা এই যে সন্ন্যাস একটি অসাধারণ শক্তির প্রতীক। আমরা এইটুকু করিতে পারি, ইহার রূপান্তর সাধন করিতে পারি, অন্য রূপ দিতে পারি—পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের হাতে অবস্থিত এই প্রচণ্ড শক্তির রূপান্তর ঘটাইতে হইবে, উহাই জনসাধারণকে উন্নত করিয়া তুলিবে।

পরিকল্পনাটি এতক্ষণে কাগজে কলমে সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলি, আমি আদর্শবাদের স্তর হইতেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি শিথিল ও আদর্শবাদীই ছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই উহা সংহত ও নিখুঁত হইতে লাগিল; প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আমি উহার ত্রুটি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলাম।

বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিতে গিয়া আমি কী আবিষ্কার করিলাম? প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসীদের কি ভাবে লোকশিক্ষা দিতে হইবে সেই বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, আমার একটি লোককে আমি ক্যামেরা দিয়া পাঠাইলাম; তাহাকে ঐ-সকল বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রায় সব লোকই অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী বহু কেন্দ্র প্রয়োজন। ইহার অর্থ কি দাঁড়ায়?—টাকা। আদর্শবাদের জগৎ হইতে আপনি প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেন।

আমি আপনাদের দেশে চার বৎসর ও ইংলণ্ডে দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। কয়েকজন বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের একজন আজ আপনাদের মধ্যেই এখানে আছেন। আমেরিকান ও ইংরেজ বন্ধুরা আমার সঙ্গে ভারতে গিয়াছেন এবং অতি-সাধারণভাবে কাজের সূচনা হইয়াছে। কয়েকজন ইংরেজ সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক বেচারী তো অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ভারতে মৃত্যুই বরণ করিলেন। এক ইংরেজ দম্পতি অবসর গ্রহণ করিয়া, নিজেদের সামান্য যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহা দ্বারা হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার দ্বারা স্থাপিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' (Awakened India) নামে একটি পত্রিকার ভার দিয়াছি। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজে ব্রতী আছেন। আমার আর একটি কেন্দ্র আছে কলিকাতায়। সকল বৃহৎ আন্দোলনই

রাজধানী হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। রাজধানী কাহাকে বলে? রাজধানী একটি জাতির হৃৎপিণ্ড। সমুদয় রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হয়, সেখান হইতে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়; তেমনি সব সম্পদ্, সব ভাবাদর্শ, সব শিক্ষা, সব আধ্যাত্মিকতা প্রথমে রাজধানীর অভিমুখে গিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চারিত হয়।

আপনাদিগকে আমি আনন্দের সহিত বলি যে, সাধারণভাবে কাজটি আরম্ভ করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু ঠিক ঐরূপ কাজ আমি সমান্তরালভাবে মেয়েদের জন্যও করিতে চাই। আমার আদর্শ—প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হইবে। আমার সাহায্য শুধু দূর হইতে। ভারতীয় নারী, ইংরেজ নারী এবং আশা করি, আমেরিকান নারীরাও এই ব্রত গ্রহণ করিবে। যখনই তাহারা কাজে হাত দিবে, অমনি আমি হাত গুটাইয়া লইব। কোন পুরুষ নারীর উপর হুকুম চালাইবে না। কোন নারীও পুরুষের উপর হুকুম চালাইবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা কেবল প্রীতির বন্ধন। পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। একটি প্রারম্ভিক ভুল লইয়া আমি কাজ শুরু করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং শেষ অবধি এত বৃহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহা হইলে নারীরা কখনও ঐ নির্ভরতার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না—উহাই প্রথা হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু আমার একটি সুবিধা আছে। আপনাদিগকে আমার গুরুদেবের সহধর্মিণীর কথা বলিয়াছি। আমাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তিনি কখনও আমাদের উপর হুকুম চালান না। সুতরাং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কর্মের এই অংশটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার

[৬ জুন, ১৮৯৬ খ্রীঃ লণ্ডন হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্'

২

পত্রিকার জন্য লিখিত।]

'ব্রহ্মবাদিন্'—সম্পাদক মহাশয়,

আমাদের 'ব্রহ্মবাদিনের' পক্ষে কর্মের আদর্শ চিরকালই থাকিবে—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নয়—তথাপি কোন অকপট কর্মীই খানিকটা জানাজানি এবং সমাদর লাভ না করিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে পারেন না।

আমাদের কার্যের আরম্ভ খুবই ভাল হইয়াছে, আর আমাদের বন্ধুগণ এই বিষয়ে যে দৃঢ় আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন, শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেও পর্যাপ্ত বলা হইল বলিয়া বোধ হয় না। অকপট বিশ্বাস ও সৎ অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে, আর এই দুই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও নিশ্চয়ই সর্ববিঘ্ন পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

কপট অলৌকিক জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে। অলৌকিক জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব—তাহা নয়, তবে বন্ধুগণ, তোমরা জানিবে যে, আমাদের এই জগতে যাহারা এরূপ জ্ঞানের দাবী করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই-জনের কাম-কাঞ্চন-যশঃস্পৃহারূপ গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, আর বাকী দশজনের মধ্যে নয়জন লোকের দরকার দার্শনিকগণের অপেক্ষা চিকিৎসকগণের সতর্ক মনোযোগ।

আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—চরিত্রগঠন, যাহাকে ‘প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা’ বলা যায়। ইহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক, ব্যক্তির সমষ্টি সমাজেও তদ্রূপ। প্রত্যেক নূতন উদ্যম, এমন কি ধর্মপ্রচারের নূতন উদ্যমও জগৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া বিরক্ত হইও না। তাহাদের অপরাধ কি? কতবার কত লোকে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে! যতই সংসার কোন নূতন সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখে, অথবা উহার প্রতি কতকটা বৈরভাবাপন্ন হয়, ততই উহার পক্ষে মঙ্গল। যদি এই সম্প্রদায়ে প্রচারের উপযুক্ত কোন সত্য থাকে, যদি বাস্তবিক কোন অভাব-মোচনের জন্যই উহার জন্ম হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই নিন্দা প্রশংসায় এবং ঘৃণা প্রীতিতে পরিণত হয়। আজকাল লোকে ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করে। এই বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম। যে ধর্ম কেবল সাংসারিক সুখের উপায়স্বরূপ, তাহা আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। আর অবাধে ইন্দ্রিয়সুখভোগ ব্যতীত মনুষ্যজীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই—এ-কথা বলিলে ঈশ্বরের এবং মানুষের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করা হয়।

যে ব্যক্তিতে সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা বর্তমান, স্বর্গে মর্ত্যে বা পাতালে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাঁহাকে চাপিয়া মারিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষে দাঁড়াইলেও একলা এক ব্যক্তি সেই প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে পারে।

সর্বোপরি আপস করিতে যাওয়া বিষয়ে সাবধান! আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলি অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর; যদি এখন কোন সাহায্যকারী না পাও,

সময়ে পাইবে। তাড়াতাড়ির আবশ্যকতা কি? সমস্ত মহৎ কার্যেরই আরম্ভের সময় উহার প্রাণশক্তির অস্তিত্বই যেন ধরিতে পারা যায় না।

কে ভাবিয়াছিল যে, সুদূর বঙ্গীয় পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ও উপদেশ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন দূরদেশে গিয়া পৌঁছিবে, যাহা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও কখনও ভাবেন নাই? আমি ভগবান্ রামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ-সম্বলিত একখানি গ্রন্থ্ লিখিতে প্রস্তুত আছেন! অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম। কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে-কোন সম্প্রদায়-মত বা জাতিভুক্ত হউন না কেন—তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'—আমার ভক্তেরা যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইহা কি সত্য নয়?

কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন; তারপর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং ঐগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে পূজা করিবে?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্তিবিশেষ। তিনি স্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁহার সহিত মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান

পুস্তকাগার (Bodleian Library) দেখাইলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিলেন, আর আমাদিগকে এত যত্ন কেন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সহিত তো আর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় না।'

তাঁহাকে দেখিয়া বাস্তবিক আমি নূতন দৃষ্টিলাভ করিয়াছি। সুন্দর-উদ্যানসমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষবয়ঃক্রম সত্ত্বেও তাঁহার স্থির প্রসন্ন আনন, বালসুলভ মসৃণ ললাট, রজতশুভ্র কেশ, ঋষি-হৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির অস্তিত্বসূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁহার সমগ্র জীবনের (যে-জীবন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের চিন্তারাশির প্রতি সহানুভূতি-আকর্ষণ, উহার প্রতি লোকের বিরোধ ও ঘৃণা-অপনয়ন এবং অবশেষে শ্রদ্ধা-উৎপাদনরূপ দীর্ঘকালব্যাপী দুঃসাধ্য কার্যে ব্যাপৃত ছিল) সঙ্গিনী সেই উচ্চাশয়া সহধর্মিণী, তাঁহার সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধ ভাব ও নির্মল আকাশ—এই সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় আমাকে প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবময় যুগে লইয়া গেলে—যখন আমাদের ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ, এবং উচ্চাশয় বাণপ্রস্থিগণ বাস করিতেন—সেই অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠাদির যুগে।

আমি তাঁহাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিতরূপে দেখি নাই, দেখিলাম যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতেছে, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক অবান্তর বিচাররূপ মরুতে দিশাহারা, সেখানে তিনি এক জীবনপ্রদ উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার হৃৎস্পন্দন প্রকৃতই উপনিষদের সেই ছন্দে ধ্বনিত হইতেছে, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—সেই এক আত্মাকে জান, অন্য কথা ত্যাগ কর।

যদিও তিনি একজন পৃথিবী-আলোড়নকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক,

তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া চৈতন্যসত্তার সাক্ষাৎকারে সমর্থ করিয়াছে, তাঁহার অপরা বিদ্যা বাস্তবিকই তাঁহাকে পরাবিদ্যালাভে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই প্রকৃত বিদ্যা—বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। জ্ঞান যদি আমাদিগকে সেই পরাৎপরের নিকট না লইয়া যায়, তবে জ্ঞানের সার্থকতা কি?

আর ভারতের উপর তাঁহার কী অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ-সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সমগ্র সত্তায় উহার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে।

ম্যাক্সমূলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিকই বেদান্ত-রূপ রাগিণীর নানা স্বর-বিস্তারের ভিতর উহার প্রধান সুরটিকে ধরিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করিতেছে, উহা সেই এক তত্ত্ব, সমুদয় ধর্মই যাহার কার্যে পরিণত রূপমাত্র। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্বাভাস—তাঁহার ভিতর দিয়াই সকল জাতি আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিবে। চলিত কথায় আছে, জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, ইহা বিস্ময়ের বিষয় না যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্র উদিত হইলেই, ভারতবাসিগণ উহার মহত্ত্ব বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য ঋষি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন!

আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ‘আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন? ভারতবাসীর পূর্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে লোকের

সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং ভারতের সকলেই আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হইবে।' বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু যেন দেখা দিল, মাথা একটু নাড়িয়া ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আপনাদিগকে সেখানেই আমাকে চিতায় সমর্পণ করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। কে জানে, হয়তো কবি যাহা বলিয়াছিলেন, ইহা তাহাই—

'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্ ।
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি ।।'

তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্বের কথা ভাবিতেছেন। তাঁহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন বর্তমান শরীর ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার জীবনে বহু বর্ষ কাটিয়া যায়।

ডক্টর পল ডয়সন

১৮৯৬ খ্রীঃ ‘ব্রহ্মবাদিন্’-সম্পাদককে লিখিত।

দশ বৎসর অধিক অতীত হইল, কোন মধ্যবিত্ত পাদরির আটটি সন্তানের অন্যতম, জনৈক অল্পবয়স্ক জার্মান ছাত্র একদিন অধ্যাপক ল্যাসেনকে একটি নূতন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে—ইওরোপীয় পণ্ডিতবর্গের পক্ষে তখনকার কালেও সম্পূর্ণ নূতন ভাষা ও সাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুনিল। এই বক্তৃতাগুলি শুনিতে অবশ্য পয়সা লাগিত না, কারণ এমন কি এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন ইওরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিখাইয়া অর্থোপার্জন করা অসম্ভব—অবশ্য যদি বিশ্ববিদ্যালয় তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।

অধ্যাপক ল্যাসেন জার্মানীর সংস্কৃতবিদ্যা-প্রবর্তকগণের—সেই বীরহৃদয় জার্মান পণ্ডিতদলের একরূপ শেষ প্রতিনিধি। এই পণ্ডিতকুল বাস্তবিকই বীরপুরুষ ছিলেন, কারণ জ্ঞানের প্রতি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম ব্যতীত তখন জার্মান মনীষিগণের ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের অন্য কি কারণ বিদ্যমান ছিল? সেই বহুদর্শী অধ্যাপক ‘শকুন্তলা’র একটি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আর সেদিন আমাদের এই যুবক ছাত্রটি যেরূপ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ল্যাসেনের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল, এরূপ আগ্রহবান্ শ্রোতা আর কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। ব্যাখ্যাত বিষয়টি অবশ্য চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু আরও বিস্ময়কর ছিল সেই অপরিচিত ভাষা; উহার অপরিচিত শব্দগুলি—অনভ্যস্ত ইওরোপীয় মুখ হইতে উচ্চারিত হইলে উহার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেরূপ কিম্ভূতকিমাকার শোনায়, সেইরূপভাবে উচ্চারিত হইলেও যুবককে অদ্ভুতভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে নিজ বাসস্থানে ফিরিল, কিন্তু যাহা শুনিয়াছিল, রাত্রির নিদ্রায় তাহা ভুলিতে পারিল না। সে যেন এতদিনের অজ্ঞাত অচেনা

দেশের চকিত দর্শন পাইয়াছে, এই দেশ যেন তাহার দৃষ্ট অন্য সকল দেশ অপেক্ষা বর্ণে অধিকতর সমুজ্জ্বল; উহার যেমন মোহিনীশক্তি, এই উদ্দাম যুবক-হৃদয় আর কখনও তেমন অনুভব করে নাই।

তাহার বন্ধুবর্গ স্বভাবতই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে এই যুবকের তীক্ষ্ণ মেধা সম্যক পরিস্ফুট হইবে। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সে কোন উচ্চ-শিক্ষিতের বৃত্তিতে প্রবেশ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইবে, সর্বোপরি উচ্চ বেতন ও পদমর্যাদার ভাগী হইবে। কিন্তু কোথা হইতে এই সংস্কৃত আসিয়া জুটিল! অধিকাংশ ইওরোপীয় পণ্ডিত তখন ইহার নামও শুনেন নাই। আর উপার্জনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইয়া অর্থোপার্জন করা পাশ্চাত্য দেশে এখনও অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি যুবকটির সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ অতি প্রবল হইল।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় আমাদের পক্ষে বিদ্যার জন্য বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহটা কিরূপ ব্যাপার, তাহা বুঝাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি আমরা এখনও নবদ্বীপ, বারাণসী ও ভারতের কোন কোন স্থানে পণ্ডিতগণের ভিতর, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের ভিতর বয়স্ক ও যুবক উভয় শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাই, যাঁহারা এইরূপ জ্ঞান-তৃষ্ণায় উন্মত্ত। আধুনিক ইওরোপীয়ভাবাপন্ন হিন্দুদের বিলাসোপকরণশূন্য, তাহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে অধ্যয়নের অল্পসুযোগবিশিষ্ট, রাত্রির পর রাত্রি তৈল-প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে হস্ত লিখিত-পুঁথির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি (যাহাতে অন্য যে কোন জাতির ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইত), কোন দুর্লভ পুঁথি বা বিখ্যাত অধ্যাপকের অনুসন্ধানে শত শত ক্রোশ ভিক্ষামাত্রোপজীবী হইয়া পদব্রজে ভ্রমণকারী, বৎসরের পর বৎসর যতদিন না কেশ শুভ্র হইতেছে এবং বয়সের ভারে শরীর অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, ততদিন নিজ পঠিতব্য বিষয়ে অদ্ভুতভাবে দেহমনের সমুদয় শক্তি-প্রয়োগে নিযুক্ত—এইরূপ ছাত্র ঈশ্বরকৃপায় আমাদের দেশ হইতে এখনও

একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখন ভারত যাহাকে নিজ মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অতীত কালে তাহার উপযুক্ত সন্তানগণের এরূপ পরিশ্রমের ফল। ভারতের প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও সারবত্তা এবং স্বার্থগন্ধহীনতা ও উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতার সহিত আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষায় যে-ফল লাভ হইতেছে, তাহার তুলনা করিলেই আমার উপযুক্ত মন্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্ট হইবে। যদি আমাদের দেশবাসিগণ অন্যান্য জাতির মধ্যে ভারতের ঐতিহাসিক অতীতযুগের উপযুক্ত নিজ পদগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার উঠিতে চায়, তবে তাহাদের জীবনে যথার্থ পাণ্ডিত্যের জন্য স্বার্থহীন অকপট উৎসাহ ও সাগ্রহ চিন্তা আবার প্রবলভাবে জাগরিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান-স্পৃহাই জার্মানীকে তাহার বর্তমান পদবীতে জগতের সমুদয় জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হউক, শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম পদবীতে—উন্নীত করিয়াছে।

এই জার্মান ছাত্রের হৃদয়ে সংস্কৃত শিক্ষার বাসনা প্রবল হইয়াছিল। অবশ্য এই সংস্কৃত শিক্ষা পর্বতারোহণের মত সুদীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রমসাধ্য। এই পাশ্চাত্য বিদ্যার্থীর জীবন ও অন্যান্য সফলকাম বিদ্যার্থিগণের চিরপরিচিত কাহিনীর মত—তাঁহাদের সেই কঠোর পরিশ্রম, অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ কিন্তু অদম্য উৎসাহের সহিত নিজব্রতে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিয়া যথার্থ বীরজনোচিত সাফল্য লাভের গৌরবময় পরিণতি। এইভাবে যুবকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আর এখন শুধু ইওরোপ নয়, সমগ্র ভারতও এই কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পল ডয়সনকে জানে। আমি আমেরিকা ও ইওরোপে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক দেখিয়াছি, তাঁহাদের কেহ কেহ বৈদান্তিক ভাবের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি তাঁহার মনীষা ও নিঃস্বার্থ কার্যে উৎসর্গীকৃত জীবন দেখিয়া মুগ্ধ। কিন্তু পল ডয়সন (অথবা ইনি নিজে যেমন সংস্কৃতে 'দেবসেনা' বলিয়া অভিহিত হইতে পছন্দ করেন) এবং বৃদ্ধ

ম্যাক্সমূলারকে ভারতের ও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া ধারণা হইয়াছে। কিয়েল নগরে এই উৎসাহী বৈদান্তিকের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাত, তাঁহার ভারতভ্রমণের সঙ্গিনী ধীরপ্রকৃতি সহধর্মিণী ও তাঁহার প্রাণপুত্তলী বালিকা কন্যা, জার্মানী ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া আমাদের একসঙ্গে লণ্ডনযাত্রা এবং লণ্ডনে ও উহার আশেপাশে আমাদের আনন্দপূর্ণ দেখাসাক্ষাৎ—আমার জীবনের অন্যান্য মধুর স্মৃতিগুলির অন্যতম বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে।

ইওরোপের প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমালোচনাশক্তি অপেক্ষা অধিক কল্পনাশক্তি লইয়া সংস্কৃত-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জানিতেন অল্প, সেই অল্প জ্ঞান হইতে আশা করিতেন অনেক, আর অনেক সময় তাঁহারা অল্পস্বল্প যাহা জানিতেন, তাহা লইয়াই বাড়াবাড়ি করিবার চেষ্টা করিতেন। আবার সেই কালেও 'শকুন্তলা'কে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করার পাগলামিও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। ইহাদের পরে স্বভাবতই একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্থূলদর্শী সমালোচকের অভ্যুদয় হইল, যাঁহাদিগকে প্রকৃত পণ্ডিত-পদবাচ্যই বলা যাইতে পারে না। ইঁহারা সংস্কৃতের কিছু জানিতেন না বলিয়াই হয়তো সংস্কৃত-চর্চা হইতে কোন ফললাভের আশা করিতেন না, বরং প্রাচ্যদেশীয় যাহা কিছু তাহাই উপহাস করিতেন। প্রথমোক্ত দলের—যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যে কল্পনার চক্ষে কেবল নন্দনকাননই দর্শন করিতেন, তাঁহাদের বৃথা কল্পনাপ্রিয়তার ইঁহারা কঠোর সমালোচনা করিলেন বটে, কিন্তু নিজেরা আবার এমন সব সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, বেশী কিছু না বলিলেও ঐগুলিকে প্রথমোক্ত দলের সিদ্ধান্তের মতই বিশেষ অসমীচীন ও অতিশয় দুঃসাহসিক বলা যাইতে পারে। আর এই বিষয়ে তাঁহাদের সাহস স্বভাবতই বাড়িয়া যাইবার কারণ—ভারতীয় ভাবের প্রতি সহানুভূতিশূন্য এবং চিন্তা না করিয়া অতি ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তকারী এই-সকল পণ্ডিত ও সমালোচক এমন শ্রোতৃবর্গের নিকট

তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়গুলি বলিতেছিলেন, যাঁহাদের ঐ বিষয়ে কোন মতামত দিবার একমাত্র অধিকার ছিল তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। এইরূপ সমালোচক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক হইতে নানারূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রসূত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে! হঠাৎ বেচারা হিন্দুরা একদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের নিজস্ব বলিয়া যাহা ছিল, তাহার কিছুই নাই—এক অপরিচিত জাতি তাহাদের নিকট হইতে শিল্পকলা কাড়িয়া লইয়াছে, আর একজাতি তাহাদের স্থাপত্য কাড়িয়া লইয়াছে, আর এক তৃতীয় জাতি তাহাদের প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি ধর্মও তাহাদের নিজস্ব নয়! হাঁ—ধর্মও এক পহ্লবী প্রস্তর-নির্মিত ক্রুশের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছে! এইরূপ মৌলিক গবেষণা-পরম্পরারূপ উত্তেজনাপূর্ণ যুগের পর এখন অপেক্ষাকৃত ভাল সময় আসিয়াছে। এখন লোকে বুঝিয়াছে, যথার্থ গভীর বিদ্যাবত্তার কিছু মূলধন না লইয়া কেবল হঠকারিতাবশতঃ কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসা, প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণা-ব্যাপারেও হাস্যোদ্দীপক ব্যর্থতাই প্রসব করে এবং ভারতের প্রাচীন ভাবধারাগুলিকে সদম্ভ অবজ্ঞা সহকারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। কারণ ঐগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা লোকে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।

সুখের বিষয়, ইওরোপে আজকাল একদল নূতন ধরনের সংস্কৃত পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইতেছে, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, সহানুভূতিসম্পন্ন ও যথার্থ পণ্ডিত। ইঁহারা শ্রদ্ধাবান্—কারণ ইঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চদরের মানুষ, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন—কারণ ইঁহারা প্রকৃতই বিদ্বান্। আর আমাদের ম্যাক্সমূলারই প্রাচীনদলরূপ শৃঙ্খলের সহিত নূতন দলের সংযোগগ্রন্থি। আমরা হিন্দুগণ পাশ্চাত্য অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অপেক্ষা ইঁহারই নিকট অধিক ঋণী। তিনি যৌবনে যুবকোচিত উৎসাহের সহিত যে সুবৃহৎ কার্য আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সাফল্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিতে গেলে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ইঁহার সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখ—হিন্দুদের

চক্ষেও অস্পষ্ট লেখা প্রাচীন হস্তলিখিত-পুঁথি লইয়া দিনরাত ঘাঁটিতেছেন—উহা আবার এমন ভাষায় রচিত, যাহা ভারতবাসীর পক্ষেও আয়ত্ত করিতে সারাজীবন লাগিয়া যায়; এমন কোন অভাবগ্রস্ত পণ্ডিতের সাহায্যও পান নাই, যাঁহাকে মাসে মাসে কিছু দিলে তাঁহার মস্তিষ্ক কিনিয়া লইতে পারা যায়—আর 'অতি নূতন গবেষণাপূর্ণ' কোন পুস্তকের ভূমিকায় তাঁহার নামটির উল্লেখ মাত্র করিলে ইহার কদর বাড়িয়া যায়। এই ব্যক্তির কথা ভাবিয়া দেখ—সময়ে সময়ে সায়ণ-ভাষ্যের অন্তর্গত কোন শব্দ বা বাক্যের যথার্থ পাঠোদ্ধারে ও অর্থ-আবিষ্কারে দিনের পর দিন এবং কখনও কখনও মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতেছেন। (তিনি আমাকে স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন), এবং এই দীর্ঘকালব্যপী অধ্যাবসায়ের ফলে পরিশেষে বৈদিক সাহিত্যরূপ অরণ্যের মধ্য দিয়া অপরের পক্ষে চলিবার সহজ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিতে কৃতকার্য হইয়াছেন; এই ব্যক্তি ও তাঁহার কার্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, তারপর বল—তিনি আমাদের জন্য বাস্তবিক কি করিয়াছেন! অবশ্য তিনি তাঁহার বহু রচনার মধ্যে যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেই-সবের সহিত আমরা সকলে একমত না হইতে পারি; এরূপ সম্পূর্ণ একমত হওয়া অবশ্যই অসম্ভব। কিন্তু ঐকমত্য হউক বা নাই হউক, এই সত্যটির কখনও অপলাপ করা যাইতে পারে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের সাহিত্য রক্ষা ও বিস্তার করিবার জন্য এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য আমাদের মধ্যে যে কেহ যতদূর সম্ভব আশা করিতে পারি, এই এক ব্যক্তি তাহার সহস্রগুণ অধিক করিয়াছেন, আর তিনি এই কার্য অতি শ্রদ্ধা-ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে করিয়াছেন।

যদি ম্যাক্সমূলারকে এই নূতন আন্দোলনের প্রাচীন অগ্রদূত বলা যায়, তবে ডয়সন নিশ্চয়ই যে উহার একজন নবীন অগ্রগামী রক্ষিপদবাচ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রখনিতে যে-সকল ভাব ও আধ্যাত্মিকতার অমূল্য রত্নসমূহ নিহিত আছে, ভাষাতত্ত্বের আলোচনার আগ্রহ অনেক দিন ধরিয়া সেগুলিকে আমাদের দৃষ্টির

অন্তরালে রাখিয়াছিল। ম্যাক্সমূলার সেগুলির কয়েকটি সম্মুখে আনিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া তাঁহার কথার যে প্রামাণ্য তাহারই বলে তিনি ঐ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। ডয়সনের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার দিকে সেরূপ কোন ঝোঁক ছিল না। বরং তিনি দার্শনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীস ও বর্তমান জার্মান তত্ত্বালোচনা-প্রণালী ও সিদ্ধান্তসমূহ তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। ডয়সন ম্যাক্সমূলারের পথ অনুসরণ করিয়া অতি সাহসের সহিত উপনিষদের গভীর দার্শনিক তত্ত্বসাগরে ডুব দিলেন; তিনি দেখিলেন, ঐগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বুদ্ধিবৃত্তি তপ্ত করে—তখন তিনি পূর্ববৎ সাহসের সহিত ঐ তথ্য সমগ্র জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে একমাত্র ডয়সনই বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার মত খুব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত যেমন 'অপরে কি বলিবে', এই ভয়ে জড়সড়, ডয়সন কখনও সেইরূপ মনে করেন নাই। বাস্তবিকই এই জগতে এমন সাহসী লোকের আবশ্যক হইয়াছে, যাঁহারা সাহসের সহিত প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। ইওরোপ সম্বন্ধে এ-কথা আবার বিশেষভাবে সত্য—সে দেশের পণ্ডিতবর্গ সমাজের ভয়ে বা অনুরূপ কারণে এমন সব বিভিন্ন ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার দুর্বলভাবে সমর্থন করেন এবং সেগুলির দোষ চাপা দিবার চেষ্টা করেন, যেগুলিতে সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে যথার্থভাবে বিশ্বাসী নন। সুতরাং ম্যাক্সমূলার ও ডয়সনের এইরূপ সাহসের সহিত খোলাখুলিভাবে সত্যের সমর্থনের জন্য বাস্তবিক তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার ভাগী। তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রসমূহের গুণ-ভাগ-প্রদর্শনে যেরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ সাহসের সহিত উহার দোষভাগ—পরবর্তী কালে ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীতে যে-সকল গলদ প্রবেশ করিয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের সামাজিক প্রয়োজনে উহাদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে-সকল ত্রুটি হইয়াছে—তাহাও যেন সাহসের সহিত প্রদর্শন করেন। বর্তমান কালে আমাদের এইরূপ খাঁটি বন্ধুর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—যাঁহারা ভারতে যে রোগ দিন দিন

বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, উহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। রোগটি হইল এইঃ একদিকে দাসবৎ প্রাচীন প্রথার অতি-চাটুকারিতা —প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারকে আমাদের শাস্ত্রের সার সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, আবার অপরদিকে পৈশাচিক নিন্দাবাদ—যাহা আমাদের মধ্যে ও আমাদের ইতিহাসের মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না এবং পারে তো এই ধর্ম ও দর্শনের লীলাভূমি আমাদের প্রাচীন জন্মভূমির সমুদয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখনই ভাঙিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিতে চায়। উপরিউক্ত ভারত বন্ধুগণ এই উভয়বিধ চূড়ান্ত একদেশী ভাবে, গতিরোধ করিতে পারেন।

অধিকারিবাদের দোষ

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট কথিত।

প্রাচীন ঋষিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে জনসমাজে লোকশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষাপ্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর মনে করি। ঐ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্বদাই 'ইহা কর, উহা করিও না' ইত্যাদি-রূপ বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'কেন এই কাজ করিতে হইবে? কেন ইহা করিব না?'—বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর—ইহাতে যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকের ঘাড়ে কতকগুলি অনর্থের বোঝা চাপান হয় মাত্র। এই বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের নিকট গোপন করিয়া রাখিবার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, তাহারা ঐ উদ্দেশ্য বুঝিবার যথার্থ অধিকারী নয়—সেইজন্য তাহাদের নিকট বলিলেও তাহারা উহা বুঝিবে না। এই অধিকারিবাদের অনেকটা খাঁটি স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহারা যে-বিষয়ে বিশেষ চর্চা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, লোককে যদি তাহা জানাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা আর তাঁহাদিগকে আচার্যের উচ্চ আসনে বসাইবে না। এই কারণেই তাঁহারা অধিকারিবাদের মতটা বিশেষভাবে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সামর্থ্যরহিত বলিয়া যদি কোন লোককে তোমরা উচ্চ বিষয় জানিবার অনধিকারী বা অনুপযুক্ত মনে কর, তবে তো তোমাদের তাহাকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিয়া যাহাতে সে ঐ তত্ত্বসকল বুঝিবার শক্তি-লাভ করিয়া উপযুক্ত হয়, সেজন্য চেষ্টা করা উচিত; তাহার বুদ্ধি যাহাতে মার্জিত ও সবল হয়, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সে যাহাতে ধারণা করিতে পারে, সেজন্য তাহাকে অল্প শিক্ষা না দিয়া বরং বেশী শিক্ষা দেওয়াই তো উচিত। এই অধিকারিবাদ-মতাবলম্বিগণ—মানবাত্মার মধ্যে যে গূঢ়ভাবে সমুদয় শক্তি রহিয়াছে

—এ কথাটা যেন একেবারে ভুলিয়া যান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, যদি তাহাকে তাহার ভাষায়, তাহার উপযোগিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। যে আচার্য অপরের জ্ঞানোন্মেষ করিতে পারিতেছেন না, তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিন্দা না করিয়া এবং উচ্চতর জ্ঞান তাহাদের জন্য নয়, এই বৃথা হেতুবাদে তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ফেলিয়া না রাখিয়া তিনি যে তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায়, তাহাদের উপযোগিভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দিতে পারিতেছেন না, সেজন্য যেন বিরলে অশ্রুবিসর্জন করেন। সত্য যাহা, তাহা নির্ভয়ে সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়া বল—দুর্বল অধিকারিগণের ইহাতে বুদ্ধিভেদ হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। মানুষ নিজে ঘোর স্বার্থপর, তাই সে চায় না যে, সে যতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অপরেও তাহা লাভ করুক—তাহার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মানিবে না, সে অপরের নিকট হইতে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, অন্যের নিকট হইতে যে বিশেষ সম্মান পাইতেছে, তাহা আর পাইবে না। সেইজন্য সে তর্ক করিয়া থাকে যে, দুর্বলচিত্ত লোকের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিলে তাহাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যাইবে। অতএব আমরা শ্লোক শুনি—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। কিন্তু জ্ঞানী যুক্তভাবে কর্মসমুদয় স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন।

আলোকের দ্বারা অন্ধকার দূর না হইয়া পূর্বাপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে—এই স্ববিরোধী বাক্যে আমার বিশ্বাস হয় না। অমৃতস্বরূপ সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিলে মানুষ মরে—এ কথা যেমন, পূর্বোক্ত কথাটিও তদ্রূপ। কি অসম্ভব কথা! জ্ঞানের অর্থ—

অজ্ঞানজ ভ্রমসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া! সেই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম আসিবে—জ্ঞানালোক আসিলে মাথা গুলাইয়া যাইবে!! ইহা কি কখনও সম্ভব! এইরূপ মতবাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এই যে, মানুষ সাধারণ লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইবার ভয়ে খাঁটি সত্য যাহা, তাহা প্রচার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা সনাতন সত্যের সহিত ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কারগুলির একটা আপস করিতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য এই মতবাদের পোষকতা করে যে, লোকাচার ও দেশাচার মানিতেই হইবে। সাবধান, তোমরা কখনও এইরূপ আপস করিতে যাইও না; সাবধান, এইরূপে পুরাতন ভাঙাঘরের উপর এক পোঁচ চুণকাম করিয়া উহাকে নূতন করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিও না। মড়াটার উপর কতকগুলো ফুল চাপা দিয়া উহার বীভৎস দৃশ্য ঢাকিতে যাইও না। ‘তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ’—তথাপি মনে মনেও লোকাচার লঙ্ঘন করিবে না—এইসব বাক্য গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও। এইরূপ আপস করিতে গেলে ফল এই হয় যে, মহান্ সত্যগুলি অতি শীঘ্রই নানা কুসংস্কাররূপ আবর্জনাস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া যায়, আর মানুষ ঐগুলিকে পরম আগ্রহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নির্ভীকভাবে গীতার যে মহান্ সত্যসমূহ প্রচার করিয়া গেলেন উহারাও পরবর্তী কালের শিষ্য প্রশিষ্যদের হাতে অসম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা লাভ করিয়াছিল। ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রটির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ ঢুকিয়াছে, যাহা মানুষকে পথভ্রান্ত করিতে পারে।

এই আপসের চেষ্টা আসে ঘোর কাপুরুষতা হইতে, লোকভয় হইতে। তোমরা নির্ভীক হও। আমার শিষ্যগণের সর্বোপরি খুব নির্ভীক হওয়া চাই। কোন কারণে কাহারও সহিত কোনরূপ আপস করা চলিবে না। উচ্চতম সত্যসমূহ অধিকারিনির্বিশেষে প্রচার করিতে থাক। লোকে তোমাকে মানিবে না অথবা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বাধিবে—এ ভয় করিও না। এইটি নিশ্চয় জানিও যে, সত্যকে পরিত্যাগ করিবার শত শত প্রলোভন সত্ত্বেও যদি তোমরা সত্যকে ধরিয়া থাকিতে পার, তোমাদের ভিতর এমন এক দৈব বল আসিবে, যাহার সম্মুখে মানুষ

—তোমরা যাহা বিশ্বাস কর না, তাহা বলিতে সাহসী হইবে না। যদি তোমরা চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া সত্য পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ক্রমাগত সত্যের যথার্থ সেবা করিতে পার, তবে তোমরা লোককে যাহা বলিবে, তাহাকে তাহার সত্যতা বুঝিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপে তোমরা সর্বসাধারণের মহা কল্যাণ করিতে পারিবে, তোমাদের দ্বারা লোকের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা সমুদয় জাতিকে উন্নত করিতে পারিবে।

সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ

[বেলুড় মঠে তদীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ]

সন্ন্যাসীদের কার্যে যথা, মঠ ও মণ্ডলী-পরিচালনা, জনসমাজে ধর্মপ্রচার ও অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রবর্তন, ত্যাগ ও ধর্মমতামত-সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তার সীমানিরূপণ ইত্যাদিতে সংসারী ব্যক্তির কোন মতামত দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নহে। সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না—তার কাজ গরীবকে নিয়ে। সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম যত্নের সহিত প্রাণপণে গরীবদের সেবা করা আর এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সকল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যেতে বসেছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁর কায়মনোবাক্যে এটা ত্যাগ করা উচিত। এভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নয়। কাম-কাঞ্চনত্যাগীই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূলমন্ত্র, সুতরাং ঘোর কাম-কাঞ্চনে মগ্ন ব্যক্তি কি করে তাঁর শিষ্য বা ভক্তরূপে পরিগণিত হতে পারে? তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করতেন, 'মা, কথা কইবার জন্যে আমার কাছে এমন একজন লোক এনে দে, যার ভেতর কাম-কাঞ্চনের লেশমাত্র নেই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ জ্বলে গেল।' তিনি আরও বলতেন, 'সংসারী এবং অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না।' তিনি 'ত্যাগীর বাদশা' ছিলেন—সংসারী লোক কখনও তাঁকে প্রচার করতে পারে না। সংসারী গৃহস্থ লোক কখনও সম্পূর্ণ অকপট হতে পারে না, কারণ তার কিছু না কিছু স্বার্থপর উদ্দেশ্য থাকবেই। ভগবান্ স্বয়ং যদি গৃহস্থরূপে অবতীর্ণ হন, আমি তাঁকে কখনও অকপট বলে বিশ্বাস করতে পারি না। গৃহস্থলোক যদি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা হয়, তবে সে ধর্মের নামে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে, আর তার ফল এই হয় যে, সম্প্রদায়টি একেবারে আগাগোড়া গলদে পূর্ণ হয়ে

যায়। গৃহস্থগণ যে-সকল ধর্মান্দোলনের নেতা হয়েছেন, সবগুলিরই ঐ এক দশা হয়েছে। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম দাঁড়াতেই পারে না।

এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, ঠিক ঠিক কাঞ্চন ত্যাগ কাহাকে বলা যায়?' স্বামীজী হেসে বললেনঃ হাঁ, তোর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝেছি। সংসার ত্যাগ করে এসেই আমার এবং মঠের টাকাকড়ি রাখবার ভার তোর ওপর পড়েছে কিনা, তাই তোর মনে এই সন্দেহ হয়েছে। এখন এর মধ্যে বুঝতে হবে এইটুকু যে, উপায় আর উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, উদ্দেশ্য একই, কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য—নিজের মুক্তিসাধন এবং জগতের হিত করা—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আর ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান উপায়—কাম-কাঞ্চনত্যাগ। কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'ত্যাগ' অর্থে মনের আসক্তি-ত্যাগ —সর্বপ্রকার স্বার্থের ভাব ত্যাগ। নইলে আমি অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখলাম—হাতে টাকা ছুঁলাম না, কিন্তু টাকা দ্বারা যে-সব সুবিধে হয়, সব ভোগ করতে লাগলাম—তাকে কি আর ত্যাগ বলা যায়? যে সময়ে গৃহস্থেরা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উপদেশ মেনে সন্ন্যাসী অতিথিদের জন্য তাদের খাদ্যের কিয়দংশ পৃথক্ করে রেখে দিতেন, সে-সন্ন্যাসীর পক্ষে কাছে পয়সা-কড়ি কিছু না রেখে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করলে কাঞ্চনত্যাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। এখন কিন্তু কাল-ধর্মে গৃহস্থের সে ভাব বড়ই কম—বিশেষতঃ বাঙলাদেশে তো মাধুকরী ভিক্ষের প্রথাই নেই। এখন মাধুকরী ভিক্ষের ওপর নির্ভর করে থাকবার চেষ্টা করলে অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হবে,
৩
কিছু লাভ হবে না। ভিক্ষের বিধান কেবল সন্ন্যাসীর পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয়ের সিদ্ধির জন্য, কিন্তু ঐ উপায়ে এখন আর সে উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হবে না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি কোন সন্ন্যাসী নিজের জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র অর্থ সংগ্রহ করে যে উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তার সিদ্ধির জন্যে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তা হলে তাতে সন্ন্যাসধর্মের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ হয় না। অনেক সময় লোকে অজ্ঞতাবশতঃ উপায়কেই উদ্দেশ্য করে তোলে। দু-একটা দৃষ্টান্ত ভেবে দেখ। অনেক লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। তার উপায়রূপে সে টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য ভুলে উপায়ের প্রতি এতদূর আসক্ত হয় যে, টাকা-সঞ্চয়ই করতে থাকে, তা ব্যয় করে যে ভোগ করবে, তার ক্ষমতা পর্যন্ত তার থাকে না। আরও দেখ, কাপড়-চোপড় কাচবার উদ্দেশ্য—শুচি ও শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে কাপড়-চোপড় শুধু একবার জলে ফেলে নিংড়িয়ে নিলেই শুচি হলাম মনে করি। এই-সব জায়গায় আমরা উপায়কে উদ্দেশ্যের আসনে বসিয়ে গোলমাল করে ফেলি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কখনই ভুল করা উচিত নয়।

ধর্মালোচনা-প্রসঙ্গে কথিত

দক্ষিণ ভারতে অত্যন্ত প্রতাপশালী এক রাজবংশ ছিল। বিভিন্ন কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জন্ম হইতে গণনা করিয়া কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া রাখার একটি নিয়ম তাঁহারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ-সব কোষ্ঠীতে নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন এবং পরে সঙ্ঘটিত বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তুলনা করিতেন। প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এইরূপ করার ফলে তাঁহারা কতকগুলি ঐক্য খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করিয়া এক বিরাট গ্রন্থ প্রণীত হইল। কালক্রমে সেই রাজবংশ লুপ্ত হইলেও, জ্যোতিষীদের বংশটি বাঁচিয়া রহিল এবং সেই গ্রন্থটি তাহাদের অধিকারে আসিল। সম্ভবতঃ এইভাবেই ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। যে-সকল কুসংস্কার হিন্দুদের প্রভূত অনিষ্ট-সাধন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইল এই জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি অত্যধিক মনোযোগ।

আমার ধারণা ভারতে ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যা গ্রীকগণই প্রথম প্রবর্তন করে এবং তাহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া ইওরোপে লইয়া যায়। ভারতে বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত অনেক পুরাতন বেদী দেখিতে পাওয়া যায় এবং নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থানকালে কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হইত। সেজন্য আমার মনে হয়, গ্রীকগণ হিন্দুদের ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যা দিয়াছে এবং হিন্দুরা তাহাদের দিয়াছে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

কয়েকজন জ্যোতিষীকে আমি অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যে কেবল নক্ষত্র বা সেই জাতীয় কোন ব্যাপার হইতে ঐ-সব উক্তি করিতেন, এইরূপ বিশ্বাসের কারণ আমি পাই নাই।

অনেক ক্ষেত্রে তাহা নিছক অপরের মনকে বুঝিবার ক্ষমতা। কখনও কখনও আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে-সব সম্পূর্ণ বাজে কথা।

লণ্ডনে আমার কাছে এক যুবক প্রায়ই আসিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, 'আগামী বছর আমার অদৃষ্টে কী আছে?' আমি তাহার ঐরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলে, 'আমার সব টাকাপয়সা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি এখন খুবই গরীব।' অনেকের কাছে টাকাই একমাত্র ভগবান্। দুর্বল লোকগুলি যখন সব কিছু খোয়াইয়া আরও দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা যত অপ্রাকৃত উপায়ে টাকা রোজগার করিবার ধান্ধায় থাকে এবং ফলিত জ্যোতিষ বা ঐ ধরনের জিনিষের আশ্রয় নেয়। 'কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়'—সংস্কৃত প্রবচনে এইরূপ আছে। কিন্তু যিনি শক্তিমান্ তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলেন, 'আমিই আমার অদৃষ্ট গড়িব।' যাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহারাই নিয়তির কথা বলে। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেঁষে না। গ্রহসমূহের প্রভাব হয়তো আমাদের উপর রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের বেশী কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহারা নক্ষত্র গণনা, এরূপ অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবকা অর্জন করে, তাহাদের সর্বদা বর্জন করিবে।' তাঁহর উক্তি নির্ভরযোগ্য, কেননা তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই। নক্ষত্রগুলি আসুক, তাহাতে ক্ষতি কি? একটি নক্ষত্র দ্বারা যদি আমার জীবন বিপর্যস্ত হয়, তবে আমার জীবনের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। জ্যোতিষ-বিদ্যায় বা ঐ ধরনের রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে বিশ্বাস সাধারণতঃ দুর্বল চিত্তের লক্ষণ; অতএব যখনই আমাদের মনে সে-সব জিনিষ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে, তখনই আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া, উত্তম খাদ্য খাওয়া ও উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করা।

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা যদি তাহার স্বকীয় প্রকৃতির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে বাহিরে তাহার কারণ সন্ধান মত আহাম্মকি। জগৎ

যদি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে, তাহা হইলে বাহিরে ব্যাখ্যা খুঁজিতে যাওয়া নির্বোধের কাজ। মানুষের জীবনে এমন কিছু কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ, যাহা তাহার নিজের শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না? সুতরাং নক্ষত্র বা জগতের অন্য কিছুর নিকট যাইবার কি প্রয়োজন? আমার নিজের কর্মই আমার বর্তমান অবস্থার যথোচিত ব্যাখ্যা। স্বয়ং যীশুর বেলায়ও এই একই কথা। আমরা জানি, তাঁহার পিতা ছিলেন সামান্য একজন ছুতার মিস্ত্রী। তাঁহার শক্তির ব্যাখ্যা খুঁজিবার জন্য আমাদের অন্য কাহারও কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই। যীশু তাঁহার নিজ অতীতেরই ফল, যে অতীতের সবটুকুই ছিল তাঁহার আবির্ভাবের প্রস্তুতিপর্ব। বুদ্ধ বারবার জীবদেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে ঐ-সকল জন্মের মধ্য দিয়া তিনি পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহারও বিবরণ তিনি দিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য নক্ষত্রের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন আছে কি? নক্ষত্রগুলির সামান্য প্রভাব হয়তো থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনোযোগ না দিয়া এবং না ঘাবড়াইয়া আমাদের কর্তব্য হইল ঐগুলিকে উপেক্ষা করা। আমার সমস্ত শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কথা এইঃ যাহা কিছু তোমার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা আনে, তাহা পায়ের আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিবে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি রহিয়াছে, তাহার বিকাশই ধর্ম। অনন্ত শক্তি যেন একটি স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে রহিয়াছে এবং সেই চাপা শক্তি ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। নানা দেহ ধারণ করিয়া ইহা নিজেকে বিকাশ করিতে চায়। যে দেহগুলি এই বিকাশের অনুপযুক্ত, সেইগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ শক্তি উন্নততর দেহ গ্রহণ করে। ইহাই মানুষের ইতিহাস—ধর্ম, সভ্যতা বা প্রগতির ইতিহাস। সেই বিশালবপু শৃঙ্খলিত দৈত্য প্রমিথিউসের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সর্বত্রই এই শক্তির বিকাশ। জ্যোতিষ প্রভৃতি অনুরূপ ভাবের মধ্যে কণামাত্র সত্য থাকিলেও সেইগুলি বর্জন করা উচিত।

একটি পুরানো গল্পে আছে, জনৈক জ্যোতিষী রাজার নিকট আসিয়া

বলিল, ‘আপনি ছয় মাসের মধ্যে মারা যাইবেন।’ রাজা ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন এবং তখনই তাঁহার মরিবার উপক্রম হইল। কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন চতুর ব্যক্তি; তিনি রাজাকে বলিলেন যে, ঐ জ্যোতিষীরা নেহাতই মূর্খ। রাজা তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। সুতরাং জ্যোতিষীরা যে নির্বোধ, তাহা রাজাকে দেখাইয়া দিবার জন্য জ্যোতিষীকে আর একবার রাজপ্রসাদে আমন্ত্রণ করা ছাড়া মন্ত্রী অন্য কোন উপায় দেখিলেন না। জ্যোতিষী আসিলে তাহার গণনা নির্ভুল কিনা মন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী বলিল, তাহার গণনা ভুল হইতে পারে না, কিন্তু মন্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য সে আবার আদ্যোপান্ত গণনা করিয়া অবশেষে জানাইল যে, তাহা একেবারে নির্ভুল। রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মন্ত্রী জ্যোতিষীকে বলিলেন, ‘আপনি কখন মরিবেন, মনে করেন?’ উত্তরে সে বলিল, ‘বার বৎসরের মধ্যে।’ মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁহার তরবারিখানি বাহির করিয়া জ্যোতিষীর মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন; তারপর রাজাকে বলিলেন, ‘দেখছেন, কত বড় মিথ্যাবাদী! এই মুহূর্তেই ইহার পরমায়ু শেষ হয়ে গেল।’

যদি তোমাদের জাতিকে বাঁচাইতে চাও, তবে ঐ-সব জিনিষ হইতে দূরে থাক। যাহা শ্রেয়ঃ তাহার একমাত্র পরীক্ষা হইল—উহা আমাদের বলবান্ করে। শুভের মধ্যেই জীবন, অশুভ মৃত্যুস্বরূপ। এই-সব কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে এবং বস্তুর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে অসমর্থ নারীগণই ঐগুলি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ—তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলেও এখনও বোধশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। কোন উপন্যাসের গোড়া হইতে কয়েক লাইনের একটি কবিতার উদ্ধৃতি মুখস্থ করিয়া কোন মহিলা বলেন—তিনি গোটা ব্রাউনিং জানেন। আর একজন খানতিনেক বক্তৃতা শুনিয়াই ভাবেন, তিনি জগতের সব কিছু জানিয়া ফেলিয়াছেন। মুশকিল এই, তাঁহারা নারীর সহজাত কুসংস্কারগুলি ছাড়িতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের প্রচুর অর্থ আর কিছু বিদ্যা আছে; কিন্তু তাঁহারা যখন পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী অবস্থা অতিক্রম করিয়া

শক্ত হইয়া দাঁড়াইবেন, তখনই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন তাঁহারা কতকগুলি বচনবাগীশের হাতের পুতুল। দুঃখিত হইও না, কাহাকেও আঘাত করার ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতেই হইবে। দেখিতে পাইতেছ না কি, তোমরা কিভাবে এ-সবের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইতেছ? দেখিতেছ না কি, এই-সব মেয়েরা কতখানি ঐকান্তিক এবং সকলের অন্তর্নিহিত দেবত্ব কখনও মরিতে পারে না। সেই দিব্যভাবকে আহ্বান করিতে জানাই সাধনা।

যতই দিন যাইতেছে, প্রতিদিন ততই আমার ধারণা দৃঢ়তর হইতেছে যে, প্রত্যেক মানুষ দিব্যস্বভাব। পুরুষ বা স্ত্রী যতই জঘন্য চরিত্রের হউক না কেন, তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিনাশ নাই। শুধু সে জানে না, কিভাবে সেই দেবত্বে পৌঁছিতে হয় এবং সেই সত্যের প্রতীক্ষায় আছে। দুষ্ট লোকেরা সর্বপ্রকার বুজরুকির সাহায্যে সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে প্রতারিত করার চেষ্টা করিতেছে। যদি একজন অপরকে অর্থের জন্য প্রতারণা করে, তোমরা বল—সে নির্বোধ ও বদমাশ। আর যে অন্যকে অধ্যাত্মপথে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, তাহার অন্যায় আরও কত বেশী! কী জঘন্য! সত্যের একমাত্র পরীক্ষা এই যে, ইহা তোমাকে সবল করিবে এবং কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবে। দার্শনিকের কর্তব্য মানুষকে কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে লইয়া যাওয়া। এমন কি এই জগৎ, এই দেহ ও মন কুসংস্কাররাশি মাত্র; তোমরা অনন্ত আত্মা! আকাশের মিটমিট-করা তারাগুলি দ্বারা তুমি প্রতারিত হইবে! সেটা লজ্জার কথা। দিব্যাত্মা তোমরা—মিটমিট-করা ক্ষীণালোক নক্ষত্রগুলি তাহাদের অস্তিত্বের জন্য তোমারই কাছে ঋণী।

একদা হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আমাদের সম্মুখে ছিল সুদীর্ঘ পথ। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী আমরা; যানবাহন কোথায় পাইব? সুতরাং সমস্ত পথ আমাদের পায়ে হাঁটিতে হইল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু। কয়েকশত মাইল চড়াই-উৎরাইয়ের পথ তখনও পড়িয়া আছে—সেই দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ সাধু বলিলেন,

‘কিভাবে আমি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিব? আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না; আমার হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে।’ আমি তাঁহাকে বলিলাম, ‘আপনার পায়ের দিকে তাকান।’ তিনি উহা করিলে আমি বলিলাম, ‘আপনার পায়ের নীচে যে-পথ পড়িয়া আছে, তাহা আপনিই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এবং সামনে যে-পথ দেখিতেছেন, তাহাও সেই একই পথ। শীঘ্রই সেই পথও আপনার পায়ের নীচে আসিবে।’ উচ্চতম বস্তুগুলি তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য নক্ষত্র। এ-সব বস্তুই তোমাদের পায়ের তলায়। ইচ্ছা করিলে তোমরা নক্ষত্রগুলি মুঠিতে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিতে পার, তোমাদের যথার্থ স্বরূপের এমনই শক্তি! বলীয়ান হও, সমস্ত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠ এবং মুক্ত হও।

ঐক্য

[১৯০০ খ্রীঃ জুন মাসে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার স্মারকলিপি।]

ভারতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ—হয় ঐক্যের একটি মূল ভাব অথবা দ্বৈতভাব থেকে বিকাশ লাভ করেছে।

মতবাদগুলি সবই বেদান্তের অন্তর্গত এবং বেদান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। তাদের শেষ সার কথা হল ঐক্যের শিক্ষা। যাঁকে আমরা বহুরূপে দেখছি, তিনিই ঈশ্বর। বস্তুজাত পৃথিবী এবং বহুবিধ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান আমরা অনুভব করি, তবু মাত্র একটি সত্তাই বিদ্যমান।

এই-সমস্ত বিভিন্ন নাম কেবল সেই 'এক'-এর প্রকাশের মাত্রাগত পার্থক্যকে দেখিয়ে দেয়। আজ যে কীট, কাল সে দেবতা। এই যে-সকল স্বাতন্ত্র্যকে আমরা এত ভালবাসি, সে-সবই এক অনন্ত সত্তার অংশমাত্র, এবং সেগুলির ভেদ কেবল প্রকাশের মাত্রায়। সেই অনন্ত সত্যকে জানাই মুক্তিলাভ।

উপাসনার প্রণালী সম্পর্কে আমাদের যতই বিভ্রান্তি ঘটুক না কেন, বস্তুতঃ মুক্তির জন্যই আমাদের সকল চেষ্টা। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না; চাই মুক্তি। এই একটি লক্ষ্যের মধ্যেই আছে মানুষের সকল অতৃপ্ত তৃষ্ণার মূল রহস্য। হিন্দুও বলে, বৌদ্ধও বলে—মানুষের তৃষ্ণা হল অধিক ও অধিকতরকে পাবার জন্য একটি জ্বলন্ত অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা

।

তোমরা আমেরিকানরা সর্বদা আরও সুখ আর সম্ভোগের সন্ধান

করছ। এ-কথা সত্য যে, বাইরে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে না, কিন্তু ভিতরে—গভীরে তোমরা যা খুঁজছ, তা হল মুক্তি।

এই বাসনার বিশালতা বস্তুতঃ মানুষের নিজের অনন্তত্বের লক্ষণ। যেহেতু মানুষ অনন্ত, তাই বাসনা এবং বাসনাপূর্তি অনন্ত আকার ধারণ করলেই সে পরিতৃপ্ত হতে পারে।

তাহলে কোন্ বস্তু মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে? কাঞ্চন নয়, সম্ভোগ নয়, সৌন্দর্য নয়। শুধু এক অনন্তই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এবং সেই অনন্ত সে নিজেই। এ-কথা যখন সে উপলব্ধি করে, কেবল তখনই মুক্তি আসে।

'এই বাঁশিটি তার রন্ধ্ররূপী সকল ইন্দ্রিয়, সকল চেতনা, অনুভূতি ও সঙ্গীত নিয়ে শুধু একটি রাগিণীই গাইছে। যে-বন থেকে তাকে ছেদন করা হয়েছিল, সেখানেই ফিরে যাবার সে প্রত্যাশী।'

'—নিজেকে উদ্ধার কর নিজের দ্বারা,
নিজেকে ডুবতে দিও না কখনও,
কারণ তুমিই তোমার পরম বন্ধু,
আবার তুমিই তোমার পরম শত্রু।'

অনন্তকে সাহায্য করতে পারে কে? অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যে হাতখানা তোমার কাছে আসছে, তাকেও তোমার নিজেরই হাত হতে হবে।

ভীতি ও বাসনা—এই দুটি কারণই এ-সবের মূলে। কে তাদের সৃষ্টি করে? আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন যেন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে যাত্রা। অনন্ত স্বপ্নের স্রষ্টা মানুষ সীমাবদ্ধ স্বপ্ন দেখে চলেছে!

আহা! বাইরের কোন বস্তুই যে নিত্য বস্তু নয়—এ যে কী অপূর্ব আশীর্বাদ! এই আপেক্ষিক জগতে কিছুই চিরন্তন নয়—এ-কথা শুনে যাদের বুক কেঁপে ওঠে, তারা ঐ কথাগুলির অর্থ জানে না।

আমি যেন অনন্ত নীলাকাশ। আমার উপর দিয়ে এই নানা রঙের মেঘ ভেসে চলে যায়, কখনও বা এক মুহূর্ত থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি সেই চিরন্তন নীলই থেকে যাই। আমি সব কিছুর সাক্ষী, সেই চিরন্তন সাক্ষী। আমি দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি না দেখলে প্রকৃতি থাকে না। আমাদের কেহই কিছু দেখতে বা কিছু বলতে পারতাম না, যদি এই অনন্ত ঐক্য এক মুহূর্তের জন্যও ভেঙে যেত।

হিন্দু ও গ্রীকজাতি

তিনটি পর্বত মানুষের অগ্রগতির সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মানঃ হিমালয়—ভারতীয় আর্য-সভ্যতার, সিনাই—হিব্রু-সভ্যতার, অলিম্পাস—গ্রীক-সভ্যতার। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখী হইয়া ধর্মের উন্নতিসাধন করিল। তাহারাই আবিষ্কার করিল যে, মানবমনের শক্তি সীমাহীন; অতএব তাহারা মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইহার মাধ্যমে তাহারা শিখিল যে, মানুষের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা লুক্কায়িত আছে, এবং ঐ সত্তা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই সত্তার বিকাশ-সাধনই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইল।

আর্যজাতির অপর একটি শাখা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রীস দেশে প্রবেশ করিল। গ্রীসের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হওয়ায় তাহাদের কার্যকলাপ বহির্মুখ হইয়া পড়িল এবং এইরূপে তাহারা বাহ্যশিল্প ও বাহিরের স্বাধীনতার বিকাশ-সাধন করিল। গ্রীকজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুসন্ধান করিয়াছিল। হিন্দুগণ সর্বদাই আধ্যাত্মিক মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। উভয় পক্ষই একদেশদর্শী। জাতীয় সংরক্ষণ অথবা স্বাদেশিকতার প্রতি ভারতীয়গণের তত মনোযোগ নাই, তাহারা কেবল ধর্মরক্ষায় তৎপর; অপর পক্ষে গ্রীকজাতির নিকট এবং ইওরোপে (যেখানে গ্রীক সভ্যতার ধারা অনুসৃত হইয়াছে) স্বদেশের স্থান অগ্রে। সামাজিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রযত্ন ত্রুটিবিশেষ, কিন্তু উহার বিপরীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল সামাজিক মুক্তির জন্য যত্নবান হওয়া আরও দোষাবহ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক—উভয়বিধ মুক্তির জন্যই চেষ্টা প্রয়োজন।

হিন্দু ও গ্রীকজাতি

তিনটি পর্বত মানুষের অগ্রগতির সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মানঃ হিমালয়—ভারতীয় আর্য-সভ্যতার, সিনাই—হিব্রু-সভ্যতার, অলিম্পাস—গ্রীক-সভ্যতার। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখী হইয়া ধর্মের উন্নতিসাধন করিল। তাহারাই আবিষ্কার করিল যে, মানবমনের শক্তি সীমাহীন; অতএব তাহারা মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইহার মাধ্যমে তাহারা শিখিল যে, মানুষের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা লুক্কায়িত আছে, এবং ঐ সত্তা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই সত্তার বিকাশ-সাধনই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইল।

আর্যজাতির অপর একটি শাখা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রীস দেশে প্রবেশ করিল। গ্রীসের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হওয়ায় তাহাদের কার্যকলাপ বহির্মুখ হইয়া পড়িল এবং এইরূপে তাহারা বাহ্যশিল্প ও বাহিরের স্বাধীনতার বিকাশ-সাধন করিল। গ্রীকজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুসন্ধান করিয়াছিল। হিন্দুগণ সর্বদাই আধ্যাত্মিক মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। উভয় পক্ষই একদেশদর্শী। জাতীয় সংরক্ষণ অথবা স্বাদেশিকতার প্রতি ভারতীয়গণের তত মনোযোগ নাই, তাহারা কেবল ধর্মরক্ষায় তৎপর; অপর পক্ষে গ্রীকজাতির নিকট এবং ইওরোপে (যেখানে গ্রীক সভ্যতার ধারা অনুসৃত হইয়াছে) স্বদেশের স্থান অগ্রে। সামাজিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রযত্ন ত্রুটিবিশেষ, কিন্তু উহার বিপরীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল সামাজিক মুক্তির জন্য যত্নবান হওয়া আরও দোষাবহ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক—উভয়বিধ মুক্তির জন্যই চেষ্টা প্রয়োজন।

অভিব্যক্ত হয়ে গেলে জীবে জীবে অনেক প্রভেদ। অভিব্যক্ত জীবরূপে তুমি কখনও খ্রীষ্ট হতে পারবে না। মাটি দিয়ে একটি হাতী গড়, আবার সেই মাটি থেকেই একটি ইঁদুর গড়। তাদের জলে ডোবাও—দুটিই একাকার হয়ে যাবে। মৃত্তিকারূপে তাদের চিরন্তন ঐক্য, নির্মিত বস্তু হিসাবে তাদের চিরন্তন পার্থক্য। ঈশ্বর ও মানুষ—নিত্যই হল উভয়ের উপাদান। নিত্যরূপে সর্বব্যাপী সত্তারূপে আমরা সকলে এক; অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বর চিরন্তন প্রভু এবং আমরা চিরন্তন ভৃত্য।

তোমাদের মধ্যে তিনটি জিনিষ আছেঃ দেহ, মন ও আত্মা। আত্মা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, মনের জন্ম-মৃত্যু আছে, এবং দেহেরও আছে। তুমি সেই আত্মা, কিন্তু সচরাচর তোমার ধারণা শরীরটাই বুঝি তুমি। এক ব্যক্তি যখন বলে, 'আমি এখানে' তখন সে শরীরটার কথাই ভাবে। তারপর আসে আর একটি মুহূর্ত, যখন তুমি সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজ করছ; তুমি তখন বল না, 'আমি এখানে'। তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালাগালি করে বা অভিশাপ দেয়, তোমার কোন ক্রোধ বা বিরক্তি হয় না, কারণ তুমি হলে আত্মা। 'যখন নিজেকে মন বলে ভাবি, তখন হে চিরন্তন অগ্নি, আমি তোমার স্ফুলিঙ্গমাত্র। আর নিজেকে যখন আত্মা বলে অনুভব করি, তখন তুমি ও আমি অভেদ'—এক ভক্ত বলেছিলেন ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে। তাহলে মন আত্মার অগ্রবর্তী হয় কি করে?

ঈশ্বর যুক্তিবিচার করেন না; যদি সত্যই জান, তবে যুক্তিবিচার করবে কেন? গোটাকতক তথ্যকে জানবার জন্য এবং তার ভিত্তিতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দাঁড় করাবার জন্য আমরা যে কীটের মত সন্ধান করে ফিরছি, সেই চেষ্টায় গড়ে ওঠা সমস্ত জিনিষগুলি আবার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এ-সবই আমাদের দুর্বলতার চিহ্ন।

মন ও যাবতীয় বস্তুর উপর আত্মা প্রতিফলিত হয়। আত্মার আলোকই মনকে চেতনায় স্পন্দিত করে। সব কিছুই আত্মার প্রকাশ; মনগুলি অসংখ্য দর্পণের মত। যাকে তোমরা ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, পুণ্য বা পাপ বল, সব কিছুই আত্মার প্রতিফলন; প্রতিফলকটি নিম্নস্তরের হলে প্রতিফলনও ভাল হয় ।

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি অভিন্ন?

আমার একটা বিশেষ ধারণা হল বুদ্ধই খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'পাঁচ-শ বছর পরে আবার আমি আসব' এবং পাঁচ-শ বছর পরে খ্রীষ্ট এসেছিলেন। এঁরা সমগ্র মানব-প্রকৃতির দুই আলোকস্তম্ভ। দুটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; এঁরা দুটি বিরাট শক্তি—দুটি প্রচণ্ড বিশাল ব্যক্তিত্ব, দুটি ঈশ্বর। জগৎটাকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর যেখানেই সামান্য জ্ঞান আছে, সেখানেই মানুষ বুদ্ধ কিম্বা খ্রীষ্টের নামে মাথা নোয়ায়। তাঁদের মত আর হওয়া খুবই কঠিন, তবে আশা করি, আরও হবে। পাঁচ-শ বছর পরে এলেন মহম্মদ, আরও পাঁচ-শ বছর পরে প্রোটেষ্টাণ্ট তরঙ্গ নিয়ে এলেন লুথার, এবং তারপরে আবার পাঁচ-শ বছর কেটে গেছে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে যীশু ও বুদ্ধের মত দু-জন মানুষ জন্মান একটা বিরাট ব্যাপার। এমন দু-জন মানুষই কি যথেষ্ট নয়? খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন, অন্যেরা হলেন ধর্মাচার্য। এই দুজনের জীবন অনুশীলন কর এবং তাঁদের মধ্যে শক্তির বিকাশ লক্ষ্য কর—দেখ কী শান্ত, অপ্রতিরোধের জীবন—ঝুলিতে একটি কপর্দকও নেই, এমন দরিদ্র ভিক্ষুকের মত, সারা জীবন ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, ধর্মদ্রোহী ও নির্বোধ বলে কথিত—আর ভেবে দেখ, সমগ্র মানবজাতির উপর কী বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁরা মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

পাপ থেকে পরিত্রাণ

অজ্ঞান থেকে মুক্তি পেলে তবেই আমরা পাপ থেকে নিস্তার পাব। অজ্ঞতাই কারণ, পাপ হল তার ফল।

[আলোচনামুখে ছোট ছোট মন্তব্য]

তাঁহাকেই পূজা কর, যিনি সর্বদা আমাদের নিকট রহিয়াছেন, আমরা ভাল অথবা মন্দ যাহাই করি না কেন, যিনি কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না; কারণ ভালবাসা কখনও হীন করে না, ভালবাসায় বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই।

রাম ছিলেন বৃদ্ধ নৃপতির জীবনস্বরূপ; কিন্তু তিনি রাজা, সুতরাং তাঁহাকে অঙ্গীকার পালন করিতেই হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, 'রাম যেখানে গমন করিবেন, আমি সেখানেই যাইব।'

হিন্দুগণের নিকট জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ মাতৃসমা।

অবশেষে তিনি দিগন্তরেখার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ক্ষীণ শশিকলার ন্যায় ম্লান ও কৃশ সীতাকে দেখিতে পাইলেন।

সীতা সতীত্বের প্রতিমূর্তি; স্বীয় পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গ তিনি কদাচ স্পর্শ করেন নাই।

রাম বলিয়াছিলেন, 'পবিত্র? সীতা পবিত্রতা স্বয়ং।'

নাটক ও সঙ্গীতমাত্রই ধর্ম। সঙ্গীতমাত্রেই—তাহা প্রেমের অথবা অন্য যে-কোন সঙ্গীত হউক না কেন—যদি কেহ তাহার সমগ্র হৃদয় সেই সঙ্গীতে ঢালিয়া দিতে পারে, তবে তাহাতেই তাহার মুক্তিলাভ। আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কাহারও আত্মা সঙ্গীতে মগ্ন হয়, তবে তাহাতেই তাহার মুক্তি। লোকে বলে, সঙ্গীত একই লক্ষ্যে লইয়া

যায়।

পত্নী সহধর্মিণী। হিন্দুকে শত শত ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। পত্নী না থাকিলে একটি অনুষ্ঠানেও তাহার অধিকার নাই। পুরোহিত পতি ও পত্নীকে একত্র আবদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করে এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকে

।

রাম দেহ বিসর্জন করিয়া পরলোকে সীতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

সীতা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত।

ধাত্রী যখন কোন শিশুকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে, মা হয়তো তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পাঠায়। শিশু তখন খেলায় মত্ত, সে বলে, 'যাব না; আমি খেতে চাই না।' খানিক বাদেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিশু বলে, 'আমি মার কাছে যাব।' ধাত্রী বলে, 'এই দেখ নতুন পুতুল', কিন্তু শিশুটি বলে, 'না, না, পুতুল চাই না, আমি মার কাছে যাব' এবং যতক্ষণ না যেতে পারে কাঁদতে থাকে। আমরা সবাই এক একটি শিশু। ঈশ্বর হলেন জননী। আমরা টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ইহজগতের এইসব জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সময় আসবেই, যখন আমাদের খেলা ভাঙবে; এবং তখন এই প্রকৃতিরূপ ধাত্রী আমাদের আরও পুতুল দিতে চাইলেও আমরা বলব, 'না, ঢের হয়েছে, এবার ঈশ্বরের কাছে যাব।'

ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিসত্তা নেই

আমরা যদি ঈশ্বর থেকে অবিচ্ছিন্ন এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদাই একসত্তা হই, তাহলে আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে কি কিছুই নেই? হ্যাঁ আছে; তা হল ঈশ্বর। আমাদের ব্যক্তিসত্তা হল ঈশ্বর। তুমি এখন যা, সেটা যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়। সে এক সত্যের দিকে তুমি এগিয়ে চলেছ। স্বাতন্ত্র্য কথাটার অর্থ হল যাকে ভাগ করা যায় না। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, তাকে কেমন করে স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা বলবে? এখন এক ঘণ্টা তুমি এক-রকম চিন্তা করছ, আবার পরের ঘণ্টায় অন্যরকম এবং দু-ঘণ্টা পরে আর এক-রকম। স্বাতন্ত্র্য হল তাই, যা অপরিবর্তনীয়। বর্তমান অবস্থা চিরকাল বজায় থাকলে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাপার হবে, তাহলে চোর চিরকাল চোরই থেকে যাবে, বদমাশ চিরকাল থাকবে বদমাশ। শিশু অবস্থায় যে মরবে, তাকে চিরদিন শিশুই থাকতে হবে। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হল তাই, যার কখনও পরিবর্তন হয় না এবং কখনও হবে না; এবং তা হল আমাদের অন্তরে সমাসীন ঈশ্বর।

ভারতবর্ষে যা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলতে তাই বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলতে যা বুঝায়—সীতা তাই।

সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির বিশ্বস্তা, চির বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁর সমস্ত দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই। ‘সীতা ভব!’—সীতা হও।

খ্রীষ্ট আবার কবে অবতীর্ণ হবেন?

এ-সব ব্যাপারেও আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমার কাজ হল মূলনীতি নিয়ে। ভগবান্ বার বার আবির্ভূত হন, আমি শুধু এ-কথাই প্রচার করি; রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে তিনি ভারতে এসেছেন এবং আবার তিনি আসবেন। এ-কথা প্রায় স্পষ্টভাবেই দেখান যেতে পারে যে, প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবী নিমজ্জমান হয় এবং তখন প্রচণ্ড একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ আসে, আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে থাকেন একজন খ্রীষ্ট।

সারা জগতে এখন একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে এবং সেটি একই চক্রপথে ঘটছে। মানুষ দেখছে, সে জীবনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছে; তাদের গতি কোন্ দিকে? নিম্নে না ঊর্ধ্বে? ঊর্ধ্বে নিশ্চয়ই। নিম্নে কিরূপে হবে? ভাঙনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়; নিজের দেহ দিয়ে, জীবন দিয়ে সেই ফাটল ভরাট কর। তোমরা বেঁচে থাকতে কি করে দুনিয়াকে তলিয়ে যেতে দেবে?

১৮৯২-৯৩ খ্রীঃ মান্দ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে

হিন্দুধর্মের তিনটি মূল তত্ত্বঃ ঈশ্বর, আপ্তবাক্যস্বরূপ বেদ, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস। যদি কেহ ঠিক ঠিক মর্ম গ্রহণপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করে, তবে উহার মধ্যে সে সমন্বয়ের ধর্ম দেখিতে পাইবে।

অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের পার্থক্য এই যে, হিন্দুধর্মে আমরা সত্য হইতে সত্যে উপনীত হই—নিম্নতর সত্য হইতে ঊর্ধ্বতর সত্যে, কখনও মিথ্যা হইতে সত্যে নয়।

ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতে বেদ অনুশীলন করা উচিত। একত্বের উপলব্ধিরূপ ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম-চেতনার অগ্রগতির সমগ্র ইতিহাস উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বেদ অনাদি ও নিত্য। ইহার অর্থ এরূপ নয়—যেমন কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে, উহার বাক্য (শব্দ)-সমূহই অনাদি, শাশ্বত; কিন্তু উহার আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহই অনাদি। এই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত নিয়মগুলি বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ বা ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কতকগুলি বিস্মৃত ও কতকগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

যখন বহু লোক বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব হইতে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন নিজ নিজ দৃষ্টি অনুযায়ী সমুদ্রের এক একটি অংশ প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেকে বলিয়া থাকে, সে যাহা দেখিয়াছে, তাহাই প্রকৃত সমুদ্র; তাহাদের সকলের কথাই সত্য, কারণ তাহারা সকলেই সেই এক বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া থাকে। সেইরূপ যদিও বিভিন্ন শাস্ত্রে উক্তিসকল পৃথক্ ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সেগুলি সবই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, কারণ ঐ-সকল উক্তি এক অনন্ত সত্তার বিভিন্ন বর্ণনা।

যখন কেহ সর্বপ্রথম মরীচিকা দেখে, তখন উহা তাহার নিকট সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, পরে তৃষ্ণা-নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিয়া সে হৃদয়ঙ্গম করে যে, উহা মরীচিকা। কিন্তু ভবিষ্যতে যখনই ঐ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হয়, তখন উহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও সে যে মরীচিকা দেখিতেছে, এ-ধারণা তাহার মনে সর্বক্ষণ বিরাজ করে। জীবন্মুক্তের নিকট মায়ার জগৎ এইরূপ।

যেমন কতকগুলি ক্ষমতা কোন বিশেষ পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান থাকে, তেমনি বৈদিক রহস্যের কতকগুলি কোন কোন পরিবারের মধ্যেই কেবল জানা ছিল। এই পরিবারগুলির বিলোপ-সাধনের সহিত ঐ-সকল রহস্যও অন্তর্হিত হইয়াছে।

বৈদিক শব-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা আয়ুর্বেদীয় বিদ্যা অপেক্ষা কম পূর্ণাঙ্গ ছিল না। শরীরের বহু অংশের বিভিন্ন নাম ছিল, যেহেতু যজ্ঞের জন্য তাহাদের পশু ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত। সমুদ্র অর্ণবপোতে পূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয়। সমুদ্রযাত্রার ফলে সাধারণ লোক বৌদ্ধ হইয়া যাইবে, কতকটা এই আশঙ্কাহেতু পরবর্তী কালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধধর্ম বৈদিক পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নব-গঠিত ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। বৌদ্ধধর্ম হইতে উহার সার গ্রহণ করিয়া লইয়া হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সকল আচার্যের প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে মিলন স্থাপন। শঙ্করাচার্যের উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ এতদূর বিকৃত করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালের কোন কোন সংস্কারক আচার্যের অনুগামিগণকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ইহা ঠিকই হইয়াছে।

স্পেন্সারের 'অজ্ঞেয়' কি বস্তু? উহা আমাদের মায়া। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ অজ্ঞেয়ের প্রসঙ্গে ভয় পান, কিন্তু আমাদের দার্শনিকগণ

অজানার উদ্দেশ্যে একটি বিপুল অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উহাতে তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শকুনির ন্যায় ঊর্ধ্বে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নিম্নে গলিত শবের প্রতি। অজানাকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না, অতএব পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক সর্বশক্তিমান্ ডলারকেই পূজা করিয়া থাকেন।

জগতে উন্নতির দুইটি ধারা আছে—রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক। প্রথমটিতে গ্রীকরাই সব—আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রীসের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ মাত্র; শেষেরটিতে অর্থাৎ ধর্মের উন্নতির ব্যাপারে হিন্দুদেরই একচেটিয়া অধিকার।

আমার ধর্ম এরূপ একটি ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম যাহার একটি শাখা ও বৌদ্ধধর্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান।

যখন একটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়—যাহা হইতে অপর পদার্থগুলির উপাদান সিদ্ধ হয়, তখনই রসায়নবিদ্যা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অন্যান্য শক্তিসমূহ যে-শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, সেই মূল শক্তিপ্রাপ্ত হইলে পদার্থবিদ্যার উন্নতির অবসান ঘটে। সেইরূপ আধ্যাত্মিক একত্বের সন্ধান পাইলে ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুধর্মে তাহাই ঘটিয়াছে।

বেদে নাই—এরূপ কোন ধর্ম-সম্বন্ধীয় নূতন ধারণা কোথাও প্রচারিত হয় নাই।

প্রত্যেক বিষয়ে দুই জাতীয় বিকাশ বর্তমান—বিশ্লেষণমূলক (analytical) ও সমন্বয়মূলক (synthetical)। প্রথমটিতে হিন্দুগণ অন্যান্য জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শেষেরটিতে তাঁহাদের স্থান শূন্য।

হিন্দুগণ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করিবার ক্ষমতা অনুশীলন করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কোন জাতি পাণিনির ন্যায় ব্যাকরণ উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই

।

রামানুজের বিশিষ্ট কাজ হইতেছে জৈন ও বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে লইয়া আসা। রামানুজ মূর্তিপূজার একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক। তিনি প্রেম ও বিশ্বাসকে মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

এমন কি ভাগবতে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের অনুরূপ চব্বিশ অবতারের উল্লেখ আছে। ঋষভদেবের নাম উভয়ের মধ্যে বর্তমান।

যোগাভ্যাস করিলে সূক্ষ্ম বস্তু ধারণা করিবার ক্ষমতা হয়। সিদ্ধপুরুষ বিষয় হইতে গুণসমূহকে পৃথক্ করিয়া এবং বস্তুসত্তা প্রদানপূর্বক তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ। অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে এখানেই সিদ্ধপুরুষের শ্রেষ্ঠতা।

দুইটি বিপরীত বস্তু চরম অবস্থায় গিয়া সর্বদা মিলিত হয় এবং একরূপ দেখায়। শ্রেষ্ঠ আত্মবিস্মৃত ভক্ত, যাঁহার মন অনন্ত পরব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন এবং অত্যন্ত হীন মদ্যপায়ী উন্মাদ—এই দুইজনকে বাহ্যতঃ একরূপ দেখায়। সময় সময় উহাদের সাদৃশ্যহেতু একটিকে অপরটিতে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া যাই।

অত্যন্ত দুর্বল-স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধার্মিক হিসাবে কৃতকার্য হয়। তাহাদের মাথায় কিছু ঢুকিলে ঐ-বিষয়ে তাহারা অত্যধিক উৎসাহী হইয়া উঠে।

জনৈক ঈশ্বর-ভক্তকে উন্মাদ বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর

দিয়াছিলেন, ‘এ-জগতে সকলেই উন্মাদ—কেহ কাঞ্চনের জন্য, কেহ কামিনীর জন্য এবং কেহ ঈশ্বরের জন্য। ডুবিয়া মরাই যদি মানুষের অদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা দুগ্ধ-সাগরে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ।’

অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর এবং মহৎ ও অনন্ত প্রেমের পাত্রকে নীলবর্ণরূপে চিত্রিত করা হয়। কৃষ্ণের রঙ নীল, সলোমনের
৫
প্রেমের ঈশ্বরের রঙও নীল। ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যাহা কিছু গভীর ও অসীম, তাহাই নীল রঙের সহিত যুক্ত। এক অঞ্জলি জল গ্রহণ কর, উহার কোন রঙ নাই। কিন্তু গভীর বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকাও, দেখিবে উহা নীল। তোমার সন্নিহিত যে শূন্যস্থান, উহার কোন বর্ণ নাই, কিন্তু সীমাহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে উহা নীল।

আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কি দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার ও অস্বাভাবিক মূর্তি। হিন্দু মন্দিরে কি নজরে পড়ে? ‘চতুর্ভঙ্গ’ নারায়ণ বা ঐ-জাতীয় কোন মূর্তি। কিন্তু কোন ইতালীয় পট অথবা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ হস্তে একটি নারীর চিত্র-অঙ্কনের জন্য হয়তো একজন বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিল।

হিন্দুগণ আত্মসমীক্ষাপ্রসূত বিজ্ঞানসমূহে উন্নতি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন-প্রকৃতি মানুষের জন্য বেদে বিভিন্ন ধর্মাচরণের বিধান দেওয়া হইয়াছে। বয়স্ককে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলে না।

গুরু হইবেন মানুষের চিকিৎসক। তিনি শিষ্যের প্রকৃতি অবগত হইয়া

তাহার পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই প্রণালী শিক্ষা দেবেন।

যোগাভ্যাসের অসংখ্য পথ আছে। কোন কোন প্রণালী কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে সাধারণভাবে সকলের পক্ষে দুইটির গুরুত্ব অধিক—(১) ইন্দ্রিয় ও মনের যাবতীয় প্রত্যয়কে লয় করিয়া চরম সত্যে পৌঁছান, (২) আমিই সব, তুমিই সমগ্র বিশ্ব, এইরূপ চিন্তা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতির সাধককে প্রথমটি অপেক্ষা দ্রুততর লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিলেও উহা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ নয়। সাধারণতঃ ঐ প্রণালী-অবলম্বনে মহা বিপদের আশঙ্কা আছে এবং ইহা সাধককে বিপথে পরিচালিত করিয়া উদ্দেশ্য-লাভে বিঘ্ন জন্মায়।

খ্রীষ্টধর্মে ও হিন্দুধর্মে উপদিষ্ট প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়, কারণ আমরা ইচ্ছা করি যে, প্রতিবেশীরাও আমাদিগকে ভালবাসুক। হিন্দুধর্মে প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ ভালবাসিতে—বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বলে।

সচরাচর একটি বেজিকে লম্বা শিকলে বাঁধিয়া কাঁচের আলমারিতে রাখা হয়, যাহাতে সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। আলমারির বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কোন বিপদের আভাস পাইলেই সে একলাফে কাঁচের আলমারিতে ঢুকিয়া পড়ে। যোগী এই পৃথিবীতে এভাবেই বিচরণ করেন।

সমগ্র বিশ্ব এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা; ইহার একপ্রান্তে জড় জগৎ ও অপর প্রান্তে ঈশ্বর—কতকটা এইরূপ ভাব দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নীতি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বেদের বহু উক্তি সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক। দীর্ঘকাল উপাসনার ফলে ঋষিগণ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন এবং অজ্ঞাত রাজ্যের রহস্য

উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে ইহা যাচাই করিতে আহ্বান করিয়াছেন। দাম্ভিক লোকেরাই ঋষি-নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়া এবং তাঁহাদের উপদেশ পালন না করিয়া সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ করে। এখনও পর্যন্ত এমন কেহ সাহসপূর্বক বলিতে পারে নাই যে, ঋষিদের নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়াও তাহার কোন প্রকার অনুভূতি হয় নাই এবং ঋষিগণ মিথ্যাবাদী। এরূপ বহু লোক আছে, যাহারা বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। জগৎ এরূপ যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি আমাদিগকে কোন সান্ত্বনা না দেয়, তবে আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ।

একজন ধার্মিক প্রচারক প্রচারকার্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার তিনটি পুত্র মারা যায়। ঐ ব্যক্তির পত্নী প্রিয় পুত্র তিনটির মৃতদেহ একখণ্ড বস্ত্রে আবৃত করিয়া গৃহের ফটকে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাঁহাকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিন্, আপনার নিকট কেহ কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং আপনার অনুপস্থিতিকালে আসিয়া হঠাৎ উহা ফেরৎ লইয়া গিয়াছেন। আপনি কি সেজন্য দুঃখিত হইবেন?' স্বামী উত্তর দিলেন 'নিশ্চয় নয়।' তখন পত্নী তাঁহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া বস্ত্রখণ্ড সরাইয়া মৃতদেহ তিনটি তাঁহাকে দেখাইলেন। স্বামী শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া শবদেহগুলি যথোচিত সৎকার করিলেন। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার নিয়ন্তা করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, তাঁহারা ঐরূপ মনোবলের অধিকারী হন।

অখণ্ডকে কখনও চিন্তা করা যায় না। সীমাবচ্ছিন্ন না হইলে আমরা কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারি না। অনন্ত ঈশ্বরকে সান্তরূপেই ধারণা ও পূজা করা সম্ভব।

জন ব্যাপটিস্ট ছিলেন একজন 'এসীন' (Essene)। উহা এক

বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ। দুইটি শিবলিঙ্গকে আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিলেই উহা খ্রীষ্টধর্মের ক্রুশে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও বৌদ্ধপূজার্চনার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি 'রাগের' বা সুরের প্রচলন আছে। ঐ রাগগুলিকে স্বতন্ত্র মনে করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রধান ষড়্‌রাগ হইতেই ঐগুলির উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা বা শব্দের দোদুল্যমান স্পন্দনের প্রয়োগ খুব কম। সেখানে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতযন্ত্রের ব্যবহারও দুর্লভ। দক্ষিণদেশের বীণাযন্ত্র প্রকৃত বীণা নয়। আমাদের সামরিক সঙ্গীত বা সামরিক কবিতা—কোনটাই নাই। ভবভূতি কিয়ৎপরিমাণে বীররসপ্রিয় কবি।

যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহার ধর্ম মূলতঃ কেবল সন্ন্যাসীদের উপযোগী। তাঁহার শিক্ষার সারমর্ম—'ত্যাগ কর'; আর অধিক কিছু নাই। এই শিক্ষা কতিপয় বিশেষ অধিকারীরই উপযোগী।

'অপর গাল ফিরাইয়া দাও'—এই শিক্ষা কার্যতঃ অসম্ভব, অসাধ্য। পাশ্চাত্যগণ ইহা জানে। যাহারা ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণত্ব-লাভ, তাহাদের জন্যই ঐ উপদেশ। সাধারণ লোকের ধর্ম হইল—'নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হও।' সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ—সকলের নিকট একই প্রকার নৈতিক উপদেশ প্রচার করা যাইতে পারে না।

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মই ধরিয়া লইয়াছে যে, সব মানুষই সমান। বিজ্ঞান কিন্তু উহা সমর্থন করে না। মানুষের শারীরিক পার্থক্য অপেক্ষা মানসিক পার্থক্য অধিক। হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি হইল প্রত্যেক মানুষই পৃথক্—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এমন কি, মদ্যপ ও বেশ্যাসক্তের জন্যও হিন্দুধর্মে কিছু মন্ত্রের বিধান রহিয়াছে।

নীতি একটি আপেক্ষিক শব্দ। জগতে বিশুদ্ধ নীতি বলিয়া কোন পদার্থ

আছে কি? ঐ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই আদর্শের দ্বারা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগের প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ অবস্থার অধীন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য। এক সময়ে গোমাংস-ভক্ষণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন জলবায়ু শীতল ছিল এবং খাদ্য-শস্যের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। খাদ্যের মধ্যে মাংসই ছিল প্রধান, সুতরাং সেই যুগে ও সেই সময়ে মাংস একরূপ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোমাংস-ভক্ষণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

ঈশ্বরই একমাত্র অপরিবর্তনীয়। সমাজ চলমান। জগৎ শব্দের অর্থ যাহা অনবরত চলিতেছে। ঈশ্বর অচল।

আমার কথা হইতেছে—‘সংস্কার’ নয়, কিন্তু ‘অগ্রসর হও—চরৈবেতি।’ জগতে উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে আমরা নিজদিগকে বিভিন্ন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলার মধ্যেই জীবনের সকল রহস্য নিহিত। উহাই জীবন-বিকাশের অন্তর্নিহিত মূল নীতি। বহিঃপ্রকৃতি আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে চায়, উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে আমরা নিজদিগকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার অথবা পরিবেষ্টনীর সহিত খাপ-খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা লাভ করি। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার ক্ষমতা যাহার মধ্যে বেশী, সে-ই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। আমি এই তত্ত্ব প্রচার না করিলেও সমাজ পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবেই। মানুষকে হয় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা অনাহারী থাকিতে হইবে—এই প্রয়োজনই জগতে কার্য করিতেছে, খ্রীষ্টান ধর্ম অথবা বিজ্ঞান নয়।

হিমালয়ের মহোচ্চ শিখরেই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ সেখানে কিছুকাল বাস করে, তবে পূর্বে সে

যতই অস্থির-চিত্ত থাকুক না কেন, অবশ্যই মানসিক শান্তি লাভ করিবে।

ঈশ্বর যাবতীয় বিশ্ব-বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। ঈশ্বরের সত্যকে একবার জানিতে পারিলে অন্যান্য সব কিছুকে ইহার অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পতনশীল বস্তুগুলির ক্ষেত্রে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের যে স্থান, ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বরেরও সেই স্থান।

প্রত্যেক পূজাই উচ্চস্তরের প্রার্থনা। যে-ব্যক্তি ধ্যান অথবা মানস-পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষেই পূজা বা আনুষ্ঠানিক অর্চনার প্রয়োজন। তাহার পক্ষে কোন স্থূল বস্তু প্রয়োজন।

সাহসী ব্যক্তিরাই অকপট হইতে পারে। সিংহের সহিত শৃগালের তুলনা কর।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহাকে ভালবাসা শিশুর পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক বস্তুকেও ভালবাসিতে হইবে। সন্তান যখন দুঃখ দেয়, তখনও পিতা তাহার প্রতি স্নেহ পোষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি মানবজাতির উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোপীলীলা প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠা, এই প্রেমে সকল ব্যক্তিত্ব লোপ পায় এবং পরম মিলন ঘটে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন, 'আমাকে পাইবার জন্য অন্যান্য সকল বন্ধন ত্যাগ কর'—গোপীলীলায় এই তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বৃন্দাবন-লীলার শরণ লও। এ-বিষয়ে বহু সংখ্যক পুস্তক আছে। ভক্তি ভারতবর্ষের সর্বজনীন ধর্ম। হিন্দুজাতির বৃহত্তম অংশ শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী।

দরিদ্র, ভিক্ষুক, পাপী, পুত্র, পিতা, পত্নী—শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই ঈশ্বর।

আমাদের সর্বপ্রকার মায়িক সম্বন্ধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়া তিনি এগুলিকে পবিত্র করেন এবং পরিণামে মুক্তি প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্ দার্শনিক ও পণ্ডিতের নিকট নিজেকে লুকাইয়া রাখেন, প্রকট হন অজ্ঞ ও শিশুর নিকট। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস ও প্রেমের দেবতা—পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। গোপীদিগের নিকট প্রেম ও ঈশ্বর এক বস্তু। তাহারা জানিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য শিক্ষা দিতেছেন, বৃন্দাবনে প্রেম। তাঁহার বংশধরগণ দুর্বৃত্ত বলিয়া তিনি তাহাদের পরস্পরের বিনাশ নিবারণ করেন নাই।

ঈশ্বর সম্বন্ধে য়াহুদী ও মুসলমানগণের ধারণা যে, তিনি একজন আদালতের বড় বিচারক। আমাদের ঈশ্বর বাহিরে কঠোর, কিন্তু অন্তরে প্রেম ও করুণায় পূর্ণ।

অদ্বৈতবাদ কি, তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ উহার উল্টা অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ আবার কি? পাপ-পুণ্যের কি প্রভেদ—এগুলি সব মানুষের কুসংস্কার। ফলে তাঁহাদের আচরণে তাঁহারা কোন নৈতিক সংযম পালন করেন না। ইহা নিছক বদমাশি। এই ধরনের প্রচারের দ্বারা প্রভূত অনিষ্ট হয়।

পাপ ও পুণ্য—অনিষ্টকর পাপ ও হিতকর পুণ্য—এই দুই প্রকার কর্মের দ্বারা দেহ গঠিত। শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে ঐ কণ্টকটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য অপর একটি কণ্টকের প্রয়োজন, পরে দুইটিই ফেলিয়া দিতে হয়। সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কেহ পুণ্যরূপ কণ্টকের দ্বারা পাপরূপ কণ্টক দূর করেন। ইহার পরও তিনি জীবনধারণ করিতে পারেন এবং শুধু পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় তাঁহার দ্বারা পুণ্যকর্মই অনুষ্ঠিত হয়। জীবন্মুক্তের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় তিনি জীবিত

থাকেন, কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই শুদ্ধ।

যাহা কিছু উন্নতির দিকে লইয়া যায়, তাহাই পুণ্য; যাহা হইতে আমাদের অবনতি, তাহাই পাপ। মানুষের মধ্যে তিন প্রকার গুণ আছে—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব। যাহা দেবত্বের উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই পুণ্য। যাহা দ্বারা পশুভাব বৃদ্ধি পায়, তাহাই পাপ। পাশব প্রকৃতি নাশ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে—অর্থাৎ প্রেমিক ও দয়ালু হইতে হইবে। এই অবস্থাও অতিক্রম করিয়া তোমাদিগকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে হইবে—অগ্নির তেজ অথচ দাহ নাই, অপূর্ব প্রেম অথচ জাগতিক প্রেমের দুর্বলতা নাই, দুঃখবোধ নাই।

ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রের অনুশাসনে দৃঢ় বিশ্বাসকে 'বৈধী ভক্তি' বলে। রাগানুগা ভক্তি পাঁচ প্রকার—(১) শান্ত—খ্রীষ্টধর্মে ইহা রূপায়িত হইয়াছে। (২) দাস্য—রামের প্রতি হনুমানের আচরণে উহা পরিস্ফুট। (৩) সখ্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ভাবের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত। (৪) বাৎসল্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেবাদির যে-ভাব, তাহাই বাৎসল্য। (৫) মধুরভাব—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের জীবনে মধুরভাবের (পতি-পত্নীর সম্বন্ধ) বিকাশ দেখা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন সমাজকে একটি ডিম্বাকার (elliptic) কক্ষে পরিভ্রমণশীল গ্রহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর কেন্দ্রগত সূর্য। গ্রহকক্ষের যে-বিন্দুটি সূর্যের নিকটতম, সমাজ কখনও সেই বিন্দুটির মত ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়, আবার কখনও সূর্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত বিন্দুটির ন্যায় ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যায়। অবতার আসিয়া ইহাকে ঈশ্বরের সমীপবর্তী করেন। পরে আবার ইহা দূরে সরিয়া যায়। কেন ঐরূপ হইবে? বলিতে পারি না। অবতারের প্রয়োজন কি? সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর কেন আমাদের সকলকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন না? ইহাই লীলা, ইহা আমাদের

জ্ঞানের অগোচর।

মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি কেহ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রচিত সৃষ্টি দেখাও। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি তাঁহার নিজের কল্পনামাত্র। ঐ সৃষ্টিকে বিশ্বামিত্রের নিয়মে চলিতে হইত। যদি যে-কেহ স্রষ্টা হইতে পারেন, তবে বহু নিয়মের সংঘর্ষের ফলে এই জগতের অবসান ঘটিবে। জগতের ভারসাম্য এরূপ সুন্দর যে, যদি একটি পরমাণুরও সাম্যাবস্থা ভঙ্গ কর, তবে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইবে।

এমন সব মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের সহিত আমাদের বিপুল পার্থক্য কোন গাণিতিক অঙ্ক দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত তুলনায় তাঁহারাও জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় সবই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিলে বিশ্বামিত্র একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য-পতঙ্গ ব্যতীত আর কি?

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ-নীতির আদি প্রবর্তক হইলেন পতঞ্জলি।

জীব সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা দুর্বল, নিজেকে ঐ অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কখনও কখনও তাহার ঐ উপযুক্ততা লাভের প্রচেষ্টা প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া যায়। উহার ফলে তাহার সমগ্র শরীরের জাত্যন্তর ঘটে। নন্দী একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্রতা এত বেশী হইয়াছিল যে, মানব-শরীরের পক্ষে উহা ধারণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাহার দেহকোষস্থিত পরমাণুগুলি দেব-দেহে পরিণত হইয়াছিল।

প্রতিযোগিতারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রই সবকিছুকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। আমরা যদি আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে

আমাদিগকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইতে হইবে। মানসিক শক্তিই প্রকৃত বল। ইওরোপীয়দিগের সংগঠন-ক্ষমতা তোমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। তোমাদের নিজেদের শিক্ষিত হওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করিতেই হইবে।

এই-সকল চিন্তা সমাজে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা সকলেই ইহা জান, কিন্তু তোমরা কেহই ইহা কার্যে পরিণত করিতে সাহস কর না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? উপযুক্ত সময়ে এক অদ্ভুত মহাপুরুষের আগমন হইবে। তখন সকল ইঁদুরই সাহস লাভ করিবে।

যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন সমুদয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি যেন উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ডের মত। তিনি যেন কামানের গোলার স্ফুলিঙ্গ। তাঁহার কথায় কিছু একটা আছে—আমরা তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছি।

কৃষ্ণ কি চতুর ছিলেন? না, চতুর ছিলেন না। যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্যোধনই যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। কিন্তু একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়—কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইহাই ধর্ম। পশ্চাৎপদ হইও না, উহা কাপুরুষতার পরিচায়ক। একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে, এক ইঞ্চিও আর নড়া উচিত নয়—অবশ্য ইহা কোন অন্যায় কার্যের জন্য নয়। এই যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ।

শয়তান নানা ছদ্মবেশে আসে—ক্রোধ ন্যায়ের বেশে, কামনা কর্তব্যের রূপ লইয়া। শয়তানের প্রথম আবির্ভাব লোকে জানিতে পারিলেও পরে ভুলিয়া যায়। যেমন উকিলের বিবেকবুদ্ধি—প্রথমে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, সমস্তই দুষ্টামি (বদমাশি)—তারপর মক্কেলের প্রতি তাহাদের কর্তব্যবুদ্ধি আসে। অবশেষে তাহারা কঠোর হয়।

যোগিগণ নর্মদার তীরে বাস করেন, সেখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের বাসের পক্ষে উত্তম। ভক্তগণ অবস্থান করেন বৃন্দাবনে।

সিপাহীরা শীঘ্র মারা যায়; প্রকৃতি ত্রুটিপূর্ণ; মল্লবীরগণের শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ভদ্রশ্রেণী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, আর দরিদ্রেরা সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু। কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ফলাহারই উপযুক্ত হইতে পারে। মস্তিষ্কের কাজ করিতে হয় বলিয়া সভ্য মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং খাদ্যের সহিত তাহাকে মশলা ও চাটনি গ্রহণ করিতে হয়। অসভ্য লোকেরা প্রতিদিন চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল হাঁটে, সাদাসিধা খাদ্যই তাহাদের রুচিকর। আমাদের ফলগুলি সবই কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক আম অতি সামান্য ফল। গমও কৃত্রিম।

ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া দেহে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কর।

গৃহস্থের আয় অনুযায়ী ব্যয় করিবার নিয়ম আছে। সে আয়ের এক চতুর্থাংশ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, এক চতুর্থাংশ দানকার্যে, এক চতুর্থাংশ নিজের জন্য ব্যয় করিবে এবং এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিবে।

বহুত্বে একত্ব, সমষ্টিতে ব্যষ্টি—ইহাই সৃষ্টির রীতি।

শুধু কারণকে অস্বীকার করিতেছ কেন? কার্যকেও অস্বীকার কর। কার্যের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই কারণের মধ্যে রহিয়াছে।

খ্রীষ্টের জীবন মাত্র আঠার মাস সাধারণের নিকট প্রকাশিত ছিল। ইহার জন্য তিনি বত্রিশ বৎসর ধরিয়া নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে মহম্মদের চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জাতি-প্রথা আবশ্যক হয়। যাহাদের

কোন বিশেষ কার্যের প্রবণতা আছে, তাহারা একশ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির শ্রেণী নির্ণয় করিবে কে? কোন ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন, অধ্যাত্মবিদ্যাচর্চায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে শূদ্রের সহিত মিলিত হইতে তিনি ভয় পান কেন? কোন বলবান্ অশ্ব কি নিস্তেজ অশ্বের সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতে ভয় পায়?

'কৃষ্ণ—কর্ণামৃতের' রচয়িতা ভক্ত বিল্বমঙ্গলের জীবনী উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি নিজের দুইটি চোখ উৎপাটন করিয়াছিলেন। বিপথগামী ভালবাসাও যে পরিণামে প্রকৃত প্রেমে পরিণত হইতে পারে তাঁহার জীবন উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অত্যন্ত আগে ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং সর্ববিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি—এই দুইটির জন্য হিন্দুগণ সর্বদা উচ্চতর তত্ত্ব লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার ফলে তাঁহারা ঐহিক বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। হিন্দুগণকে পাশ্চাত্যের নিকট কিঞ্চিৎ বস্তুতন্ত্রবাদ শিক্ষা করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে পাশ্চাত্যকে কিছু আধ্যাত্মিকতা শিখাইতে হইবে।

তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলিবার তোমরা পুরুষরা কে?

ভাঙ্গী ও পারিয়াগণের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কাহারা? আমাদের হৃদয়হীন ব্যবহার ও সেই সঙ্গে অদ্ভুত অদ্বৈতবাদ-প্রচার—ইহা কি আঘাতের উপর অপমান নয়?

এই জগতে সাকার ও নিরাকার পরস্পর সম্বদ্ধ। নিরাকারকে সাকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা যাইতে পারে, আবার নিরাকারের পটভূমিতেই সাকারকে চিন্তা করা যাইতে পারে। আমাদের চিন্তারই বাহ্যরূপ জগৎ। প্রতিমা ধর্মেরই অভিব্যক্তি।

ঈশ্বরে যাবতীয় জীবপ্রকৃতি বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ আমরা কেবল মানব-প্রকৃতির মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। যেমন পিতা বা পুত্ররূপে আমরা মানুষকে ভালবাসি, তেমনি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি। নর ও নারীর মধ্যে যে প্রেম, তাহাই প্রবলতম প্রেম, উহাও আবার যত গোপনীয় হইবে ততই দৃঢ়তর হইবে। এই প্রেম শ্রীভগবানের প্রতি কিভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে।

মানুষ পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এ-কথা বেদে কোথাও কোথাও নাই। মানুষকে পাপী বলা মনুষ্যত্বের ঘোরতর অমর্যাদা করা।

সত্যকে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করার অবস্থা লাভ করা সহজ নয়। সেদিন সমগ্র চিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বিড়ালটিকে কেহ খুঁজিয়া পায় নাই, যদিও চিত্রের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াই বিড়ালটি ছিল।

কাহাকেও আঘাত করিয়া তুমি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পার না। সৃষ্টি এক অদ্ভুত যন্ত্র। ঈশ্বরের প্রতিশোধ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই।

কাম অন্ধ, মানুষকে নরকে লইয়া যায়। ভালবাসাই প্রেম, ইহা স্বর্গে লইয়া যায়।

কৃষ্ণ-রাধার প্রেমে কামের লেশ নাই। রাধা কৃষ্ণকে বলেন, ‘তুমি যদি আমার বুকে পদা স্থাপন কর, তাহা হইলে আমার সকল কাম দূরীভূত হইবে।’ ভগবানের প্রতি অনুরাগ হইলে কাম চলিয়া যায়, তখন থাকে শুধু প্রেম।

জনৈক কবি এক রজকিনীকে ভালবাসিতেন। স্ত্রীলোকটির পায়ে গরম ডাল পড়িয়াছিল, তাহার ফলে কবির চরণ পুড়িয়া যায়।

শিব ঈশ্বরের সুশান্ত প্রকাশ, কৃষ্ণে প্রকাশ ঈশ্বরের মাধুর্য। প্রেম ঘনীভূত হইয়া নীলরঙে পরিণত হয়। নীলরঙ প্রগাঢ় প্রেমের দ্যোতক। সলোমন 'কৃষ্ণ'কে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে (ভারতে) অনেকেই কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছে।

এখনও হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম জাগিলে রাধাকে দর্শন করা যায়। রাধা হইয়া যাও এবং মুক্ত হও। নান্যঃ পন্থাঃ। খ্রীষ্টানেরা সলোমনের সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের মতে—ইহা চার্চের প্রতি খ্রীষ্টের গভীর অনুরাগের প্রতীক—ভবিষ্যদ্বাণী। তাহাদের নিকট ঐ সঙ্গীত অর্থহীন এবং সেজন্য উহার সম্পর্কে কোন কাহিনী সৃষ্টি করে।

হিন্দুগণ বুদ্ধকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবান্ আছেন কি নাই, বৌদ্ধেরা তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে কর্মে তৎপর করিবার জন্যই বুদ্ধের আবির্ভাব। সৎ হও, রিপুগুলি দমন কর। তখন নিজেই জানিতে পারিবে, দ্বৈত বা অদ্বৈত দর্শনের কোন্‌টি সত্য—তত্ত্ব এক বা বহু। বুদ্ধ হিন্দুধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন।

একই ব্যক্তির মধ্যে মাতা দেখেন সন্তানকে, আবার পত্নী দেখেন অন্যভাবে। ইহার ফলও বিভিন্ন। মন্দ ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে দেখে মন্দ, ধার্মিক তাঁহার মধ্যে দেখেন পুণ্য। ঈশ্বরকে সকল রূপেই চিন্তা করা যায়। প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন। বিভিন্ন পাত্রে জল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু সকল পাত্রেই জল আছে। অতএব সকল ধর্মই সত্য।

ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আবার নিষ্ঠুর নন। তিনি সর্বভূতে আছেন আবার নাই। অতএব তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাবময়। প্রকৃতিও পরস্পর-বিরোধী ভাবরাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও অদ্ভুত বটে; তবুও আত্মিক শক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্রসভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে, তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সে-ই কেবল সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পার, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্তুতঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ ‘প্রকৃতি’ বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্যপ্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা।

পাশ্চাত্য দেশে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানব জাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধহয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্ত-লালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই—তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।

পত্রালাপে প্রশ্নোত্তর

[ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি প্রশ্ন ও স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত উত্তরঃ ১৯০০ খ্রীঃ ২৪ মে, সান্ ফ্রান্সিস্কো]

প্রশ্ন—পৃথ্বীরায় ও চাঁদ যখন কান্যকুব্জে স্বয়ম্বরে যেতে মনঃস্থ করেন, তখন তাঁরা কাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন—তা মনে করতে পারছি না।

উত্তর—উভয়েই চারণের বেশে গিয়াছিলেন।

প্র—পৃথ্বীরায় যে সংযুক্তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তা কি এই জন্য যে, সংযুক্তা ছিলেন অসামান্যা রূপসী এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দুহিতা? সংযুক্তার পরিচারিকা হবার জন্য তিনি কি নিজের একজন দাসীকে শিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং এই বৃদ্ধা ধাত্রীই কি রাজকুমারীর মনে পৃথ্বীরায়ের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল?

উ—পরস্পরের রূপগুণের বর্ণনা শুনে ও আলেখ্য দেখে তাঁরা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আলেখ্য-দর্শনে নায়ক-নায়িকার মনে পূর্বরাগের সঞ্চার ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রীতি।

প্র—কৃষ্ণ যে গোপবালকদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তার কারণ কি?

উ—এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কৃষ্ণ কংসকে সিংহাসনচ্যুত করবেন। পাছে জন্মের পর কৃষ্ণ কোথাও গোপনে লালিত পালিত হন, সেই ভয়ে দুরাচার কংস কৃষ্ণের পিতামাতাকে (যদিও তাঁরা ছিলেন কংসের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি) কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল এবং এই আদেশ দিয়েছিল যে, সেই বৎসরে রাজ্যের মধ্যে যত বালক জন্মাবে, সকলকেই হত্যা করা হবে। অত্যাচারী কংসের হাত থেকে বাঁচাবার

জন্যই কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে গোপনে নদী পার করেছিলেন।

প্র—তাঁর জীবনের এ অধ্যায় কিভাবে শেষ হয়?

উ—অত্যাচারী কংসের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিজে ভাই বলদেব ও পালক-পিতা নন্দের সঙ্গে রাজসভায় যান। অত্যাচারী তাঁকে বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। তিনি অত্যাচারীকে বধ করলেন, কিন্তু নিজে রাজ্য অধিকার না করে কংসের নিকটতম উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসালেন। কর্মের ফল তিনি নিজে কখনও ভোগ করতেন না।

প্র—এই সময়কার কোন চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে পারেন কি?

উ—কৃষ্ণের এই সময়কার জীবন অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। শৈশবে তিনি বড়ই দুরন্ত ছিলেন। দুষ্টামির জন্য তাঁর গোপিনী মাতা একদিন তাঁকে মন্থনরজ্জু দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজ্জু একত্র জুড়েও তার দ্বারা তিনি তাঁকে বাঁধতে পারলেন না। তখন তাঁর চোখ খুলে গেল, আর তিনি দেখলেন যে, যাঁকে তিনি বাঁধতে যাচ্ছেন, তাঁর দেহে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ভগবান্ তখন তাঁকে আবার মায়া দ্বারা আবৃত করলেন; আর তিনি শুধু বালকটিকেই দেখতে পেলেন।

পরব্রহ্ম যে গোপবালক হয়েছেন, এ-কথা দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশ্বাস হল না। তাই পরীক্ষা করবার জন্য একদা তিনি ধেনুগুলি ও গোপবালকদিগকে চুরি করে এক গুহার মধ্যে ঘুমপাড়িয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন যে, সেই-সব ধেনু ও বালক কৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছে! তিনি আবার সেই নতুন দলকে চুরি করলেন এবং লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, তারা যেমন ছিল, তেমনি সেখানেই রয়েছে। তখন তাঁর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হল, তিনি দেখতে পেলেন—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সহস্র সহস্র ব্রহ্মা কৃষ্ণের

দেহে বিরাজমান।

কালীয় নাগ যমুনায় জল বিষাক্ত করছিল বলে তিনি ফণার উপর নৃত্য করছিলেন। ইন্দ্রের পূজা তিনি বারণ করাতে ইন্দ্র কুপিত হয়ে এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করলেন যেন সমস্ত ব্রজবাসী বন্যার জলে ডুবে মরে, তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ একটিমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মত ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, আর তার নীচে ব্রজবাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করল।

শৈশব থেকেই তিনি নাগপূজা ও ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন। ইন্দ্রপূজা একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। গীতার সর্বত্র ইহা স্পষ্ট যে, তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন না।

জীবনের এই সময়েই তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পনর বৎসর।

একটি অপরূপ পত্রালাপ

[এই পত্রালাপটি যথাযথভাবে উপভোগ করিতে হইলে পাঠকদের জানিতে হইবে, কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই পত্রালাপ শুরু হয় এবং পত্র ব্যবহারকারীদের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল। প্রথম পত্রের গোড়ার দিকে স্বামীজী লিখিয়াছেন, তিনি জোড় আঘাত দিয়াছেন। সেটা আর কিছু নয়, নিজ আচরণের সমর্থনে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১ ফেব্রুয়ারী একটি অত্যন্ত কড়া চিঠি তিনি পত্রোদ্দিষ্টাকে লিখিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব পত্রটিতে স্বামীজীর সন্ন্যাসী-সত্তা অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাকার পত্রগুচ্ছ পড়িবার পূর্বে সেই পত্রটি পড়া প্রয়োজন। পত্রোদ্দিষ্টা মেরী হেল মিঃ ও মিসেস হেলের (স্বামীজী যাঁহাদের ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ বলিতেন) দুই কন্যার একজন। ঐ দুই হেল-ভগিনী এবং তাঁহাদের সম্পর্কিত আরও দুই ভগিনীকে স্বামীজী নিজের ভগিনীর মত দেখিতেন, এবং তাঁহারাও স্বামীজীকে পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর কয়েকটি মূল্যবান্ চিঠি এই ভগিনীদের উদ্দেশে লেখা।

বর্তমান পত্রালাপে স্বামীজীকে এক নূতন আলোকে দেখা যায়—রঙ্গপ্রিয় অথচ একান্ত গম্ভীর পরিহাসের মধ্যেও তাঁহার জীবনের মূলভিত্তি ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পত্রালাপের প্রথম চিঠিটি নিউ ইয়র্ক হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী লেখা। সম্পাদক]

শোন আমার বোনটি মেরী,
হয়ো না দুখী—যদিও ভারী
ঘা খেয়েছ, তবুও জান
জান বলেই বলিয়ে নাও—
আমি তোমায় ভালবাসি
সারাটা এই হৃদয় দিয়ে।

বলতে পারি বাজি রেখে—
সেই শিশুরা বন্ধু আমার
রইবে চির দুঃখে সুখে,
আমিও তাদের বন্ধু তেমন,
জান তুমি মেরী-শিশু
ভালভাবেই জান তাহা।

*সর্প যদি পদাহত ধরে তার ফণা,
অগ্নি যদি সমুদ্যত—শিখা লক্‌লক্,
প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে রিক্ত মরুভূমে
দীর্ণবক্ষ সিংহ যবে গর্জে ঘোর রোষে।

বিদ্যুতের বাণবিদ্ধ মহামেঘরাশি
বন্যাশক্তি উন্মোচন করে বজ্রস্বরে,
সেইমত মহাপ্রাণ মুক্ত মহাদানে
আত্মা যবে আলোড়িত সত্তার গভীরে।

ম্লান হোক আঁখি-তারা, প্রাণ হোক ক্ষীণ,
বন্ধু নাই, প্রেম হোক অবিশ্বাসে লীন,
ভয়ঙ্কর ভাগ্য যদি হানে মৃত্যুভয়,
ঘনীভূত অন্ধকারে রুদ্ধ যদি পথ,

প্রকৃতি বিরূপ যদি ভ্রুকুটি-কুটিল
তব ধ্বংস চায় তবু জেন—তুমি সেই।
তুমি দিব্য, ধাও ধাও, সম্মুখেতে শুধু,
ধাও নিজ লক্ষ্য পানে নিত্যগতি ধরি।

দেব নহি, আমি নহি পশু কিম্বা নর,
দেহ নহি, মন নহি, নারী বা পুরুষ,
শাস্ত্র স্তব্ধ সবিস্ময়ে আমা পানে চাহি,
আমার প্রকৃতি ঘোষে—'আমি সেই' বাণী।

সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের জন্মিবার আগে
ছিনু আমি, যবে নাহি ছিল পৃথ্বী ব্যোম্,
নাহি ছিল মহাকাল, 'সেও' নাহি ছিল,
ছিলাম, রয়েছি আমি, রব চিরকাল।

এ পৃথিবী অপরূপা, এ সূর্য মহান্
চন্দ্রমা মধুর এত, তারকা আকাশ—
কার্য-কারণেতে বাঁধা সৃষ্টি সকরুণ
বন্ধনে জীবন তার, বন্ধনে মরণ।

মন তার মায়াময় জাল ছুঁড়ে দেয়,
বেঁধে ফেলে একেবারে নির্মম নিষ্পেষে;
পৃথিবী, নরক, স্বর্গ—ভাল ও মন্দের
চিন্তা আর ভাবনার ছাঁচ গড়ে ওঠে।

জেন কিন্তু—এ সকলই ফেনপুঞ্জবৎ
স্থান কাল পাত্র আর কার্য ও কারণ,
আমি কিন্তু ঊর্ধ্বচারী ইন্দ্রিয় মনের
নিত্য দ্রষ্টা সাক্ষী আমি এই সৃষ্টি মাঝে।

দুই নয়, বহু নয়, এক—শুধু এক,
তাইতো আমার মাঝে আছে সব 'আমি',
অনিবার তাই প্রেম,—ঘৃণা অসম্ভব;
'আমি' হতে আমারে কি সরান সম্ভব?

স্বপ্ন হতে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ
হও অভী, বল বীরঃ নিজ দেহ-ছায়া
ভীত আর নাহি করে, ওগো মৃত্যুঞ্জয়
আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়।*
৬

আমার কবিতা এই পর্যন্ত। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। মাদার চার্চ এবং ফাদার পোপকে ভালবাসা জানিও। আমি এত ব্যস্ত যে মরবার সময় নেই, এক ছত্র লেখবার পর্যন্ত সময় নেই। অতএব ভবিষ্যতে যদি লিখতে দেরী হয় ক্ষমা কর।

তোমাদের চিরকালের
বিবেকানন্দ

মিস্ মেরী হেল উত্তরে লিখে পাঠালেনঃ

‘কবি হব আমি’ এই সাধনায়
সন্ন্যাসী মহাবীর
সুর ভেঁজে যান প্রাণ পণ রেখে,
নিতান্ত গম্ভীর।

ভাবে ও বচনে অজেয় যে তিনি
সন্দেহ কিছু নাই,
গোল এক শুধু ছন্দ নিয়েই
কেমন যে সামলাই!

কোন ছত্রটি অতি দীর্ঘ যে
কোনটি অতীব হ্রস্ব,
রূপ মেলে নাকো ভাবের সহিত—
কবিতা হয় না অবশ্য।

মহাকাব্য না গীতিকাব্য সে
কিম্বা চৌদ্দপদী?
সেই ভাবনায় খেটে খেটে হায়
হল অজীর্ণব্যাধি।

যতদিন থাকে ঐ কবি-ব্যাধি
অরুচি খাদ্যে তাঁর,
সে খাদ্য যদি নিরামিষ হয়,
লিয়ন৭ রাঁধুনী যার।

তবুও চলে না, চলিতে পারে না;
স্বামীজী ব্যস্ত অদ্য,
সযতনে রাঁধা খানা পড়ে থাক,
লিখিছেন তিনি পদ্য।

একদিন তিনি সুখাসীন হয়ে
একান্ত ভাবমগ্ন,
সহসা আলোক আসিয়া তাঁহার
চারিপাশে হল লগ্ন।

‘শান্ত ক্ষুদ্র কণ্ঠ’ একটি
নাড়া দিল ভাব তাঁর
শব্দ জ্বলিতে লাগিল যেমন
জ্বলন্ত অঙ্গার।

সত্যই তারা অঙ্গার যেন
আমার উপরে হায়
বর্ষিত হল, অনুতাপে মরি,
বোনটি যে ক্ষমা চায়।

ভর্ৎসনা-ভরা পত্রের তরে
দুঃখের সীমা নাই,
বারবার বলি, ক্ষমা চাই আমি
চাই, চাই, ক্ষমা চাই!

যে-কটি ছত্র পাঠায়েছ তুমি,
তোমার ভগিনীগণ
নিশ্চয় জেন স্মরণে রাখিবে
বাঁচিবে যতক্ষণ।

কারণ তাদের দেখায়ে দিয়েছ
অতীব পরিষ্কার—
'যাহা কিছু আছে, সব কিছু তিনি'
ইহাই সত্য সার।

উত্তরে স্বামীজী লিখলেনঃ

সেই পুরাকালে
গঙ্গার কূলে—করে রামায়ণ গান
বৃদ্ধ কথক বুঝায়ে চলেন
দেবতারা সব—কেমনে আসেন যান
অতি চুপে চুপে
সীতারাম-রূপে
আর, নিরীহ সীতার—চোখের জলেতে বান!

কথা হল শেষ
শ্রোতারা সকলে ঘরে ফিরে চলে
পথে যেতে যেতে মনের মাঝেতে
ভাসিছে কথার রেশ।

তখন জনতা হতে

একটি ব্যাকুল উচ্চ কণ্ঠ লাগিল জিজ্ঞাসিতে—
'ঐ যে সীতারাম
কিছুই না বুঝিলাম,
কারা ওঁরা তাই বলে দিন আজ, যদি বুঝি কোন মতে।'

তাই মেরী হেল, তোমাকেও বলি—
আমার শেখান তত্ত্ব না বুঝে, সকলি করিলে মাটি!
আমি তো কখনও বলিনি কাকেও—
'সব ভগবান্'—অর্থবিহীন অদ্ভুত কথাটি!
এটুকু বলেছি মনে রেখে দিও
ঈশ্বরই 'সৎ', বাকী যা অসৎ—একেবারে কিছু নয়।
পৃথিবী স্বপ্ন, যদিও সত্য বলে তা মানতে হয়!

একটি মাত্র সত্য বুঝেছি জীবন্ত ভগবান্
যথার্থ 'আমি'— তিনি ছাড়া কিছু নয়!
পরিণামশীল এ জড়জগৎ আমি নয়, আমি নয়।
তোমরা সকলে জানিও আমার ভালবাসা অফুরান।

বিবেকানন্দ

মিস্ মেরী হেল লিখলেনঃ

বুঝতে পেরেছি অতি সহজেই
তফাতটা কোথা রইল—
তৈল-আধার পাত্রের সাথে
পাত্র-আধার তৈল!
সে তো সোজা অতি—সোজা প্রস্তাব
একটি প্রত্যবায়—
প্রাচ্য যুক্তি বুঝতে সাধ্য
শক্তি নাইকো হায়!
যদি 'ভগবান্ কেবল সত্য
মিথ্যা যা কিছু আর,'
যদি 'পৃথিবীটা স্বপ্ন' তা হলে
রইল কি বাকী আর

ভগবান্ ছাড়া? তাইতো শুধাই
তুমি যে বলেছ দাদা,
'বহু দেখে যারা তাদের মরণ',
এবং বলেছ সাদা—
'একের তত্ত্ব যাহারা বুঝেছে,
মুক্তি তাদের স্থির'—
তবুও আমার সামান্য কথা
বলিতেছি অতি ধীরঃ
সব কিছু তিনি, এই কথা ছাড়া
আর কিছু নাহি জানি,
আমি যদি থাকি, তাঁহার ভিতরে
আমারও ভিতরে তিনি।

স্বামীজী উত্তরে লিখলেনঃ

মেজাজটা খর, বালা অপূর্ব,
প্রকৃতির কিবা খেয়াল মরি!
সুন্দরী নারী, সন্দেহ নেই,
দুর্লভ-আত্মা কুমারী মেরী।

গভীর আবেগে ঠেলেঠুলে ওঠে
চাপা দিতে তার সাধ্য নাই,
দেখতেই পাই মুক্ত সত্তা
আগ্নেয় তার স্বভাবটাই।

গানে বাজে তার রাসভ-রাগিণী,

পিয়ানোতে বাজে মধুর রেশ!
ঠাণ্ডা হৃদয়ে সাড়া যে পায় না
মনেতে যাদের বরের বেশ!

শুনেছি ভগিনী তাদের মুখেতে
তোমার রূপের প্রভাব ঘোর!
সাবধানে থেক, নুয়োনা, প'রোনা
যত মধুর হোক—শিকল ডোর।

শীঘ্র শুনিবে আর এক সুর
চাঁদে-পাওয়া সেই তোমার সাথী;
তার সাধে বাদ তোমার কথায়,
নিবে যাবে তার জীবন-ভাতি।

এ-কটি পঙ্‌ক্তি ভগিনী মেরী,
প্রত্যুপহার গ্রহণ কর।
'যেমন কর্ম তেমনি তো ফল'—
সন্ন্যাসী জেন জবাবে দড়।

ইতিহাসের প্রতিশোধ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অগষ্ট মাসের শেষের দিকে বিবেকানন্দ অধ্যাপক জে. এইচ রাইটের এনিস্কোয়াম গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। নিউ ইংলণ্ডের একটি ছোট্ট শান্ত পল্লীতে স্বামীজীর আবির্ভাব এমন এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি এখানে আসামাত্র এই অপরূপ সুন্দর বিরাট-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি কোথা থেকে এসেছেন, তাই নিয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাঁদের ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর আচার-ব্যবহার কিছুই মিলল না। তখন তাঁকে সঠিক জানবার জন্য এবং তাঁর কথা শোনবার জন্য একদিন রাত্রির আহারের পর সকলে আধ্যাপক রাইটের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। বৈঠকখানায় কথোপকথনরত স্বামীজী তখন মধুর স্বরে বলছিলেনঃ

‘এই সেদিন—মাত্র কয়েকদিন আগেও—চার-শ বছরেরও বেশী হবে না—হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, তিনি বলতে লাগলেনঃ দুর্গত জাতির উপর তারা কি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচারই না করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিচার তাদের ওপর নিশ্চয়ই একদিন নেমে আসবে। ইংরেজ! মাত্র অল্পকাল আগেও এরা ছিল অসভ্য। এদের গায়ে পোকা কিলবিল করত, আর তারা তাদের গায়ের দুর্গন্ধ ঢেকে রাখত নানা সুগন্ধ দিয়ে। ... কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! সবেমাত্র বর্বরতার অবস্থা পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

যাদের সমালোচনা তিনি করছিলেন, তাদের মধ্যে একজন শ্রোতা বলে উঠলেন, ‘এটা একেবারে বাজে কথা। এটা অন্ততঃ পাঁচ-শ বছর আগেকার ব্যাপার।’

আমি কি বলিনি, ‘এই কিছুদিন আগেও? মানুষের আত্মার অনন্তত্বের

পরিমাপে কয়েক-শ বছর আর কতটুকু?’ তারপর গলার স্বর পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ সুরে বললেনঃ তারা একেবারে অসভ্য। উত্তরাঞ্চলের প্রচণ্ড শীত, অভাব অনটন এদের বন্য করে তুলেছে। এরা কেবল পরকে হত্যা করার কথাই ভাবে। ... কোথায় তাদের ধর্ম? মুখে তারা পবিত্র ঈশ্বরের নাম নেয়, প্রতিবেশীকে তারা ভালবাসে বলে দাবী করে, খ্রীষ্টের নামে তারা পরকে সভ্য করার কথা বলে। কিন্তু এ-সবই মিথ্যা। ঈশ্বর নয়—ক্ষুধাই এদের সভ্য করে তুলেছে। মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা কেবল তাদের মুখে, অন্তরে পাপ আর সর্ব প্রকার হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা মুখে বলে, ‘ভাই, আমি তোমাকে ভালবাসি,’ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গলায় ছুরি চালায়। তাদের হাত রক্তরাঙা।

তারপর তাঁর সুমিষ্ট গলার স্বর গম্ভীর হয়ে এল, তিনি আরও ধীরে বলতে লাগলেনঃ কিন্তু ঈশ্বরের বিচার একদিন তাদের উপরেও নেমে আসবে। প্রভু বলেছেন, ‘প্রতিশোধ নেব আমি, প্রতিফল দেব।’ মহাধ্বংস আসছে। এই পৃথিবীতে তোমাদের খ্রীষ্টানেরা সংখ্যায় কত? সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও নয়। চেয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ চীনাদের দিকে, ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসাবে তারাই নেবে এর প্রতিশোধ। তারাই তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর একবার চালাবে হুন অভিযান। তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, ‘তারা সমগ্র ইওরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোন কিছুরই অস্তিত্ব রাখবে না। নারী, পুরুষ, শিশু—সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে আবার অন্ধকার-যুগ।’ এ-কথা বলার সময় তাঁর গলার স্বর এত বিষণ্ণ হয়েছিল যে, তা অবর্ণনীয়। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘আমি—আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে পৃথিবী আরও ভালভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু মহাধ্বংস আসছে। ঈশ্বরের প্রতিশোধ ও অভিশাপ নেমে আসতে আর দেরী নেই।’

তারা সকলেই প্রশ্ন করলেন, ‘শীগ্‌গিরই কি সেই অভিশাপ নেমে

আসবে?’

‘এক হাজার বছরের মধ্যে ঘটনা ঘটবে।’

বিপদ আসন্ন নয় শুনে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, ‘ঈশ্বর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেনই। আপনারা ধর্মের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে হয়তো তা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারে বারে এমনই ঘটেছে, ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। আপনারা যদি জনগণকে অত্যাচার ও পীড়ন করেন, তবে তার জন্য আপনাদের দুঃখভোগ করতেই হবে। চেয়ে দেখুন না ভারতের দিকে, কি করে ঈশ্বর আমাদের কাজের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে যারা ছিল ধনী মানী, তারা ধন-দৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গত জনের কান্না তাদের কানে পৌঁছয়নি। তারা যখন অন্নের জন্য হাহাকার করেছে, ধনীরা তাদের সোনারূপার থালায় অন্নগ্রহণ করেছে। তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানরা, এদের কেটে কুচি-কুচি করলে। তরবারির জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হল। তারপর বহুকাল ও বহু বছর ধরে ভারত বার বার বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ। যত জাতি ভারতে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল এই ইংরেজ। ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা?—স্তূপীকৃত ব্র্যাণ্ডির ভাঙা বোতল—আর কিছু নয়। তবুও ঈশ্বর আমাদের দয়া করেননি, কারণ আমরা অন্যের প্রতি কোন দয়া-মমতা দেখাইনি। আমাদের দেশবাসীরা তাদের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র সমাজকে নীচে টেনে এনে নামিয়েছে। তারপর যখন তাদের প্রয়োজন হল জনসাধারণের, তখন জনসাধারণের কোন ক্ষমতা রইল না তাদের সাহায্য করার। ঈশ্বর

প্রতিশোধ নেন—মানুষ এ-কথা বিশ্বাস না করলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণের অধ্যায়টি সে অবশ্যই অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাস ইংরেজের কৃতকার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে—দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ-তৃপ্তির জন্য পান করে নিয়েছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে। চীনারাই আজ তার প্রতিশোধ নেবে—তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ যদি চীনারা জেগে ওঠে ও ইংরেজকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়, যা তাদের উচিত প্রাপ্য—তাহলে সুবিচারই হবে।

তারপর তাঁর সব কথা বলা হলে তিনি চুপ করে রইলেন। সমবেত জনগণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে চাপা গুঞ্জরন উঠল; তিনি সব শুনলেন, বাইরে থেকে মনে হল যেন কান দিলেন না। উপরের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'শিব! শিব!' ক্ষুদ্র শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি ও ভাববন্যার প্রবাহে চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মনে হয়েছিল এই অদ্ভুত লোকটির শান্ত মনোভাবের অন্তরালে যেন আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোতের মত এই ভাবাবেগ ও ভাববন্যা প্রবহমান। সভা ভঙ্গ হল, শ্রোতারা বিক্ষুব্ধ মনে চলে গেলেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সপ্তাহের শেষের একটি দিন। তিনি কয়েকদিনই এখানে ছিলেন।... এখানে যেসব আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তিনি বরাবরই সেগুলি ছবির মত নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প উপাখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই সুন্দর গল্পটিও স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ এক নারী তার স্বামীকে তার দুঃখ-কষ্টের জন্য গালাগালি দিত, অন্যের সাফল্য দেখে তাকে গঞ্জনা করত এবং তার দোষত্রুটিগুলির কথা তাকে সবিস্তারে

বলত। স্ত্রী বলতঃ ভগবানকে এত বছর সেবা করার পর তোমার ভগবান্ কি তোমার জন্য এই করলেন? এই তার প্রতিদান? স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বললেন, 'আমি কি ধর্মের ব্যবসা করি? এই পর্বতের দিকে তাকিয়ে দেখ। এ আমার জন্য কি করে, আর আমিই বা তার জন্য কি করেছি? কিন্তু তা হলেও আমি এ পর্বতকে ভালবাসি। আমি সুন্দরকে ভালবাসি বলেই একে (হিমালয়কে) ভালবাসি—আমাকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আমার প্রকৃতি। ভগবানকে আমি এজন্যই ভালবাসি।'

তারপর স্বামীজী এক রাজার কাহিনী বললেন। এক রাজা জনৈক সাধুকে কিছু দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধু তাঁর প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখান করেন। প্রাসাদে এসে রাজা তাঁর দান গ্রহণের জন্য সাধু্কে আবার বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রাজবাড়ীতে এসে সাধু দেখলেন, রাজা ধন-সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভিক্ষা চাইছেন। সাধু কিছুক্ষণ তাঁর এই প্রার্থনা অবাক হয়ে শুনলেন, তারপর তাঁর মাদুরটি গুটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা চোখ বুঁজে প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনার পর চোখ খোলা-মাত্র দেখলেন যে, সাধু চলে যাচ্ছেন। রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো আমার দান গ্রহণ করলেন না?' সাধু উত্তরে বললেন, 'আমি ভিক্ষুকের কাছে দান নেব?'

ধর্মই সকলকে রক্ষা করতে পারে এবং খ্রীষ্টানধর্মে সকলকে রক্ষা করার শক্তি আছে—কোন ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করলে স্বামীজী তাঁর বড় বড় চোখ দুটি মেলে বললেন, 'খ্রীষ্টানধর্মে যদি রক্ষা করার শক্তি থাকত, তবে এই ধর্ম কেন ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়ার লোকদের রক্ষা করতে পারল না?'

স্বামীজীর মুখে প্রায় এই কথাটি শোনা যেতঃ কোন সন্ন্যাসীর প্রতি

ইংরেজরা এ-রকম করতে সাহস পাবে না। কোন কোন সময়ে তিনি তাঁর আকুল মনের এই ইচ্ছাও প্রকাশ করতেন ও বলতেন, 'ইংরেজ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলুক। তাহলে আমার মৃত্যুই হবে তাদের ধ্বংসের সূত্রপাত।' তারপর হাসির ঝিলিক লাগিয়ে বলতেন, 'আমার মৃত্যু-সংবাদ সমগ্র দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে।'

সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসির রাণীই ছিলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে বীর নারী। তিনি রণক্ষেত্রে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। বিদ্রোহীদের অনেকেই পরে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সাধুদের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রকমের জেদী মনোভাব দেখা যায়, এই হল তার অন্যতম ইতিহাস। এই বিদ্রোহীদেরই একজন তার চার-চারটি সন্তানকে হারিয়েছিল, শান্ত সুস্থির ভাবে তার সেই হারান সন্তানদের কথা বলত, কিন্তু ঝাঁসির রাণীর কথা উঠলেই তিনি আর চোখের জল রাখতে পারতেন না, দরদর ধারায় বুক ভেসে যেত। তিনি বলতেন, রাণী তো মানবী নন, দেবী। সৈন্যদল যখন পরাজিত হল, রাণী তখন তলোয়ার নিয়ে পুরুষের মত যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন। এই সিপাহী বিদ্রোহের অন্য দিকের কাহিনী অদ্ভুত মনে হয়। এর যে অন্য দিক্ আছে, তা আপনারা ভাবতেই পারবেন না। কোন হিন্দু সিপাহী যে কোন নারীকে হত্যা করতে পারে না, সে-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেননা অভিজ্ঞতামূলক সত্য হিসাবে ইহা শিখান হয় না। এইরূপ উচিত নয়। যাহা হউক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে অতীন্দ্রিয়বাদী বা মরমী (mystic) বলা হইয়া থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই মরমীগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্ম- বিজ্ঞান। জগতে স্থানভেদে যেরূপ গণিতের (গাণিতিক সত্যের) তারতম্য হয় না, এই অতীন্দ্রিয় সত্যদ্রষ্টাগণের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাঁহাদের প্রকৃতি একই প্রকার, অবস্থান-রীতিও একই ধরনের। তাঁহাদের উপলব্ধি এক এবং এই উপলব্ধ সত্যই নিয়মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ধর্মসংস্থার তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিগণ প্রথমে ধর্ম-সম্বন্ধীয় একটি মতবাদ শিক্ষা করেন, পরে সেইগুলি অনুশীলন করেন। প্রত্যক্ষানুভূতিকে তাঁহারা বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন না। কিন্তু মরমী হইলেন সত্যসন্ধানী, তিনি আধ্যাত্মিক সত্য প্রথমে উপলব্ধি করেন, মতবাদ সৃষ্টি করেন পরে। ধর্মযাজক-প্রচারিত ধর্ম অপরের উপলব্ধি-প্রসূত, মরমী- প্রচারিত ধর্ম স্বীয় উপলব্ধি-প্রসূত। যাজকীয় ধর্ম বাহিরকে অবলম্বন করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, অতীন্দ্রিয়বাদীর যাত্রা অন্তর হইতে বাহিরে।

রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রকৃতি-রাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপরপক্ষে ধর্ম-শিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। ঋষিগণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, কেননা তাঁহারা যে

গ্রন্থ পাঠ করেন অর্থাৎ অন্তর-গ্রন্থ, তাহাতে উহার খবর নাই। বৈজ্ঞানিকও সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ, কেননা তিনিও ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ কেবল বাহিরের পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

প্রতি বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ ধারা (পদ্ধতি) আছে; ধর্মবিজ্ঞান অনুরূপ ধারা-বিশিষ্ট। বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া ইহার অনুশীলন-ধারাও অনেক।অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সমজাতীয় নয়। স্বভাবের বিভিন্নতাবশতঃ ধর্মবিজ্ঞান প্রণালী বিভিন্ন হইবেই। যেমন কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা হেতু কাহারও শ্রবণশক্তি প্রখর, কাহারও বা দর্শনশক্তি, সেইরূপ মানস ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যও সম্ভব এবং এই বিশেষ দ্বারপথেই মানুষকে তাহার অন্তর্জগতে উপনীত হইতে হয়। তথাপি সকল মনের মধ্যে একটা ঐক্য আছে এবং এমন একটি বিজ্ঞানও আছে, যাহা সকল মনের পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে। এই ধর্ম- বিজ্ঞান মানবাত্মার বিশ্লেষণমূলক। ইহার কোন নির্দিষ্ট মতবাদ নাই।

কোন একটি ধর্ম সকলের জন্য নির্দিষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেকটি ধর্মমত একসূত্রে গ্রথিত এক একটি মুক্তার ন্যায়। সর্বোপরি আমাদের উচিত প্রত্যেক ধর্মমতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটি বুঝিতে চেষ্টা করা। মানুষ কোন বিশেষ ধর্মমত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; ধর্ম তাহার ভিতরেই রহিয়াছে। যে-কোন ধর্মমত ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিতে চায়, তাহাই পরিণামে ভয়াবহ। প্রত্যেক জীবন এক একটি স্রোত-প্রবাহের ন্যায় এবং সেই স্রোত-প্রবাহই তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। ঈশ্বরোপলব্ধিই সকল ধর্মের চরম উদ্দেশ্য। ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশিক্ষার সার। যদি প্রত্যেক মানব তাহার আদর্শ নির্বাচনপূর্বক নিষ্ঠার সহিত তাহা অনুশীলন করে, তবে ধর্মসম্বন্ধীয় সকল বিসম্বাদ ঘুচিয়া যাইবে।

মানুষ এ পর্যন্ত ঈশ্বরকে যত নামে অভিহিত করিয়াছে, তন্মধ্যে 'সত্য'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্য উপলব্ধির ফলস্বরূপ; অতএব আত্মার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান কর। পুস্তক ও প্রতীকসকল দূর করিয়া আত্মাকে তাহার স্ব-স্বরূপ দর্শন করিতে দাও। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'আমরা গ্রন্থ-রাজির চাপে অভিভূত ও উন্মত্ত হইয়া গিয়াছি।' যাবতীয় দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে যাও। যে মুহূর্তে তুমি মতবাদ, প্রতীক ও অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব মনে করিলে সেই মুহূর্তেই তুমি বন্ধনে পড়িলে; অপরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঐ-সকলের সম্পর্ক রাখিতে পার, কিন্তু সাবধান, ঐগুলি যেন তোমার বন্ধন না হইয়া পড়ে। ধর্ম এক, কিন্তু উহার প্রয়োগ বিভিন্ন হইবেই। সুতরাং প্রত্যেকে তাহার মতবাদ প্রচার করুক, কিন্তু কেহ যেন অপর ধর্মের দোষানুসন্ধান না করে। যদি তত্ত্বালোক প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তাহা হইলে সকল প্রকার বেষ্টনী হইতে মুক্ত হও। ভগবদ্-জ্ঞান-সুধা আকণ্ঠ পান কর। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া যে 'সোঽহম্' উপলব্ধি করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ কর ও অনন্ত শক্তি লইয়া ফিরিয়া আইস। ক্রীতদাস সত্যের অনুসন্ধানে যায়, এবং মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

স্বার্থ-বিলোপই ধর্ম

বিশ্বের অধিকারসমূহ কেহ বণ্টন করিতে পারে না। ‘অধিকার’ শব্দটিই ক্ষমতার সীমা-নির্দেশক। ‘অধিকার’ নয়, পরন্তু দায়িত্ব। জগতের কোথাও কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে আমরা প্রত্যেকে তাহার জন্য দায়ী। কেহই নিজেকে তাহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যাহা ভূমার সহিত সংযোগ স্থাপন করে, তাহাই পুণ্য; এবং যাহা উহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে, তাহাই পাপ। তুমি অনন্তের একটি অংশ, উহাই তোমার স্বরূপ। সেই অর্থে ‘তুমি তোমার ভ্রাতার রক্ষক’।

জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আনন্দলাভ; জ্ঞান ও আনন্দ মুক্তির পথে পরিচালিত করে। কিন্তু যে পর্যন্ত না জগতের প্রত্যেকটি প্রাণী—পিপীলিকা বা কুকুর পর্যন্ত মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সকলে সুখী না হওয়া পর্যন্ত কেহই সুখী হইতে পারে না। যেহেতু তুমি ও তোমার ভ্রাতা মূলতঃ এক, অন্যকে আঘাত করিলে নিজেকেই আঘাত করা হয়। যিনি সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্বভূত প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী। আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, আত্মোৎসর্গই বিশ্বের উচ্চতম বিধান।

‘অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না’—যীশুর এই উপদেশ কার্যে পরিণত না করাতেই জগতে এত অন্যায় পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র নিঃস্বার্থতাই এই সমস্যার সমাধানে সক্ষম। প্রচণ্ড আত্মোৎসর্গের দ্বারা ধর্ম সাধিত হয়। নিজের জন্য কোন বাসনা রাখিও না। তোমার সকল কর্ম অপরের জন্য অনুষ্ঠিত হউক। এইভাবে জীবন যাপন করিয়া ঈশ্বরে স্বীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি কর।

আত্মার মুক্তি

দৃশ্যবস্তুর সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত যেমন আমরা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি না, সেইরূপ আত্মাকেও তাহার কার্যের ভিতর দিয়া ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিম্নভূমিতে আত্মাকে আনিতে পারা যায় না। আত্মা স্বয়ং কারণের বিষয়ীভূত না হইয়াও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের কারণ। যখন আমরা নিজেদের আত্মা বলিয়া জানিতে পারি, তখনই আমরা মুক্ত হইয়া যাই। আত্মা অপরিণামী। ইহা কদাপি কারণের বিষয় হইতে পারে না, কেননা ইহা স্বয়ং কারণ। আত্মা স্বয়ম্ভূ। আমাদের মধ্যে যদি এমন কোন বস্তুর সন্ধান পাই, যাহা কোন কারণের দ্বারা সাধিত নয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমরা আত্মাকে জানিয়াছি।।

অমৃতত্ব ও মুক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। মুক্ত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে যাইতে হইবে। বিধিনিষেধ ততদিন, যতদিন আমরা অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আমাদের ভিতরে যে স্বাধীনতা রহিয়াছে উহারই নাম নিয়ম। ইচ্ছা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না, কারণ ইহা কার্য-কারণ-সাপেক্ষ। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে অবস্থিত ‘অহং’ স্বাধীন, এবং উহাই আত্মা। ‘আমি মুক্ত’ এই বুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে ও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মুক্তির অর্থ অমৃতত্ব।।

হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি—অনুধ্যান ও গভীরচিন্তা-মূলক দর্শনশাস্ত্র এবং বেদের বিভিন্ন অংশে নিহিত নৈতিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলির মতে এই বিশ্ব অনন্ত ও নিত্যকাল স্থায়ী। ইহার কখনও আদি ছিল না, অন্তও হইবে না। এই জড়-জগতে আত্মার চৈতন্য- শক্তির—সীমার রাজ্যে অসীমের শক্তির অসংখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে; কিন্তু অনন্ত নিজে স্বয়ং বিদ্যমান—শাশ্বত ও অপরিণামী। কালের গতি অনন্তের চক্রের উপর কোন রেখাপাত করিতে পারে না।

মানব-বুদ্ধির অগোচর সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই।

মানবাত্মা অমর—ইহাই বেদের শিক্ষা। দেহ ক্ষয়-বৃদ্ধিরূপ নিয়মের অধীন, কারণ যাহার বৃদ্ধি আছে, তাহা অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দেহী আত্মা দেহমধ্যে অবস্থিত, অনন্ত ও শাশ্বত জীবনের সহিত যুক্ত। ইহার জন্ম কখনও হয় নাই, মৃত্যুও কখনও হইবে না। বৈদিকধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেয়—এই পৃথিবীতে জন্ম-পরিগ্রহই মানবাত্মার আদি, অপরপক্ষে—বৈদিক ধর্ম দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া থাকে, মানবাত্মা অনন্ত সত্তার অভিব্যক্ত মাত্র এবং পরমেশ্বরের মতই ইহার কোন আদি নাই। সেই শাশ্বত পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে দেহ হইতে দেহান্তরে—অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমনকালে সেই আত্মা বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে। অবশেষে সেই পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির পর তাহার আর অবস্থান্তর ঘটিবে না।

বৈদিক যজ্ঞের বেদী হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

দেবতা বা দিব্যপুরুষের আরাধনাই ছিল পূজার ভিত্তি। ইহার ভাব এইঃ যে দেবতা আরাধিত হন, তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত হন ও সাহায্য করেন। বেদের স্তোত্রগুলি কেবল স্তুতিবাক্য নয়, পরন্তু যথার্থ মনোভাব লইয়া উচ্চারিত হইলে উহারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়ায়।।

স্বর্গলোকসমূহ অবস্থান্তর মাত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও উচ্চতর ক্ষমতা আরও অধিক। পার্থিব দেহের ন্যায় ঊর্ধ্বস্থিত সূক্ষ্ম দেহও পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজীবনে এবং পরজীবনে সর্বপ্রকার দেহেরই মৃত্যু ঘটিবে। দেহগণও মরণশীল এবং তাঁহারা কেবল ভোগ সুখ-প্রদানেই সমর্থ।।

দেবগণের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা—ঈশ্বর বর্তমান, যেমন এই দেহের পশ্চাতে এক উচ্চতর সত্তা অবস্থিত, যিনি অনুভব ও দর্শন করেন।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের শক্তি সর্বত্রবিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী দেবগণেরও নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান।।

‘অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর, ঊর্ধ্বলোক-নিবাসী সকলে শ্রবণ কর, সকল সংশয় ও অন্ধকারের পারে আমি এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি। আমি সেই সনাতন পুরুষকে জানিয়াছি।’ উপনিষদের মধ্যে এই পথের নির্দেশ আছে।।

পৃথিবীতে আমরা মরণশীল। স্বর্গেও মৃত্যু আছে। ঊর্ধ্বতম স্বর্গলোকেও

আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হই। কেবল ঈশ্বরলাভ হইলেই আমরা সত্য ও প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হই।।

উপনিষদ্ কেবল এই তত্ত্বগুলিরই অনুশীলন করে। উপনিষদ্ শুদ্ধ পথের প্রদর্শক। উপনিষদে যে পথের নির্দেশ আছে, তাহাই পবিত্র পন্থা। বেদের বহু আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও স্থানীয় প্রসঙ্গ বর্তমানে বোঝা যায় না। কিন্তু উহাদের মাধ্যমে সত্য পরিস্ফুট হয়। সত্যের আলোক-প্রাপ্তির জন্য স্বর্গ ও মর্ত্য ত্যাগ করিতে হয়।

উপনিষদ্ ঘোষণা করিতেছেনঃ।

সেই ব্রহ্ম সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহারই। তিনি সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহান্ কবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী; সূর্য ও তারকাগণ যাঁহার ছন্দ—তিনি সকলকে যথানুরূপ কর্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।।।

যাঁহারা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা মনে করেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চই সর্বস্ব, তাঁহারাও অন্ধকারে রহিয়াছেন। এই-সকল ভাবনার দ্বারা যাঁহারা প্রকৃতির বাহিরে যাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

তবে কি কর্মানুষ্ঠান মন্দ? না, যাহারা প্রবর্তক মাত্র, তাহারা এই-সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হইবে।

একটি উপনিষদে কিশোর নচিকেতা কর্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছেঃ মানুষের মরণ হইলে কেহ বলেন, তিনি থাকেন না; কেহ কেহ বলেন, তিনি থাকেন। আপনি যম, মৃত্যু স্বয়ং—আপনি নিশ্চিতই এই সত্য অবগত আছেন; আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। যম উত্তর

করিলেন, 'মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাগণের মধ্যেও অনেকে ইহা জ্ঞাত নন। হে বালক, তুমি আমাকে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিও না।' কিন্তু নচিকেতা স্বীয় প্রশ্নে অবিচলিত রহিলেন। যম পুনরায় বলিলেন, 'দেবতাগণের ভোগ্যবিষয়সকল আমি তোমাকে প্রদান করিব। ঐ-প্রশ্ন বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না।' কিন্তু নচিকেতা পর্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। অতঃপর মৃত্যুদেবতা বলিলেন, 'বৎস, তুমি তৃতীয়বারেও সম্পদ্, শক্তি, দীর্ঘজীবন, যশ, পরিবার সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। চরম সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার মত যথেষ্ট সাহস তোমার আছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। দুইটি পথ আছে—একটি শ্রেয়ের অপরটি প্রেয়ের। তুমি প্রথমটি নির্বাচন করিয়াছ।'

এখানে সত্যবস্তু প্রদানের শর্তগুলি লক্ষ্য কর। প্রথম হইল পবিত্রতা—একটি অপাপবিদ্ধ নির্মল চিত্ত বালক বিশ্বের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা না রাখিয়া কেবল সত্যের জন্যই সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য সম্বন্ধে উপদেশ না আসিলে উহা ফলপ্রদ হয় না। গ্রন্থ উহা দান করিতে পারে না, তর্কবিচারে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যিনি সত্যের রহস্য অবগত, তাঁহার নিকটই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

এই রহস্য জানিবার পর শান্ত হইয়া যাও। বৃথা তর্কে উত্তেজিত হইও না। আত্মসাক্ষাৎকারে লাগিয়া যাও। তুমিই সত্যলাভ করিতে সমর্থ।

ইহা সুখ নয়, দুঃখ নয়; পাপ নয়, পুণ্যও নয়; জ্ঞান নয়, অজ্ঞানও নয়। ইহা তোমাকে বোধে বোধ করিতে হইবে। ভাষার মাধ্যমে আমি কেমন করিয়া তোমার নিকট ইহা বর্ণনা করিব?

যিনি অন্তর হইতে কাঁদিয়া বলেন, প্রভু, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই—প্রভু তাঁহারই নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। পবিত্র হও, শান্ত হও; অশান্ত চিত্তে ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না।

‘বেদ যাঁহাকে ঘোষণা করে, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া থাকি, ওম্ (ওঁ) সেই অব্যক্ত পুরুষের পবিত্র নামস্বরূপ।’ এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দের মধ্যে পবিত্রতম। যিনি এই শব্দের রহস্য অবগত, তিনি প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন। এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ কর। যে কেহ এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিকট পথ উদ্ঘাটিত হয়।

প্রথমতঃ ধ্যান নেতিমূলক হইবে। সমস্ত চিন্তা বিলয় করিয়া দাও। যাহা মনে আসে, তাহা প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া নিরস্ত কর।

অতঃপর দৃঢ়তার সহিত আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তৎসম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট হও—সৎ, চিৎ, আনন্দ—অস্তি-ভাব, জ্ঞান-স্বভাব এবং প্রেমস্বরূপ।

ধ্যানের মধ্য দিয়াই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ঐক্যানুভব হইয়া থাকে। ধ্যান করঃ

ঊর্ধ্ব আমা-দ্বারা পরিপূর্ণ; অধঃ আমাতে পরিপূর্ণ; মধ্য আমাতে পরিপূর্ণ। আমি সর্বভূতে এবং সর্বভূত আমাতে বিরাজিত। ওম্ তৎ সৎ, আমিই সেই। আমি মনের ঊর্ধ্বে সৎস্বরূপ। আমি বিশ্বের একমাত্র আত্মাস্বরূপ। আমি সুখ নই, দুঃখ নই।

দেহই পান করে, আহার করে ইত্যাদি। আমি দেহ নই, মন নই। সোঽহম্।

আমি সাক্ষি-স্বরূপ, আমি দ্রষ্টা। যখন দেহ সুস্থ থাকে, আমি সাক্ষী; যখন রোগ আক্রমণ করে, তখনও আমি সাক্ষি-স্বরূপ বর্তমান।

আমি সচ্চিদানন্দ। আমিই সার পদার্থ, জ্ঞানামৃত-স্বরূপ। অনন্তকালে আমার পরিবর্তন নাই। আমি শান্ত, দীপ্যমান, পরিবর্তন-রহিত।

দেশ, কাল ও নিমিত্ত এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করে। পার্থক্য আকারেই বিদ্যমান, বস্তুতে নয়। রূপ (আকার) বিনষ্ট হইলে উহা চিরতরে লোপ পায়; কিন্তু বস্তু একরূপই থাকে। বস্তুকে কখনও ধ্বংস করিতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যেই ক্রম-বিবর্তন, আত্মায় নয়—প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন, আত্মার প্রকাশ।

সাধারণতঃ যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, মায়া সেরূপ ভ্রম নয়। মায়া সৎ, আবার সৎ নয়। মায়া সৎ, কারণ উহার পশ্চাতে প্রকৃত সত্তা বিদ্যমান, উহাই মায়াকে প্রকৃত সত্তার আভাস প্রদান করে। মায়ার মধ্যে যাহা সৎ, তাহা হইল মায়ার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান প্রকৃত সত্তা। তথাপি ঐ প্রকৃত সত্তা কখনও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ, এবং উহার প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, প্রকৃত সত্তার উপরেই উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

অতএব মায়া হইল কূটাভাস—সৎ অথচ সৎ নয়, ভ্রম অথচ ভ্রম নয়। যিনি প্রকৃত সত্তাকে (সৎস্বরূপকে) জানিয়াছেন, তিনি মায়াকে ভ্রম বলিয়া দেখেন না, সত্য বলিয়াই দেখেন। যিনি সৎস্বরূপ জ্ঞাত নন, তাঁহার নিকট মায়া ভ্রম এবং উহাকেই তিনি সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।

জীবন-মৃত্যুর বিধান

প্রকৃতির অন্তর্গত সমুদয় বস্তু নিয়ম অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকে। কিছুই ইহার ব্যতিক্রম নয়।মন ও বহিঃপ্রকৃতির সমুদয় বস্তু নিয়ম দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি, মন ও জড়বস্তু, কাল ও দেশের মধ্যে অবস্থিত এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধ।

মনের মুক্তি
ভ্রমমাত্র। যে মন
নিয়ম দ্বারা বদ্ধ ও
নিয়ন্ত্রিত, তাহার
মুক্তি কিরূপে
সম্ভব? কর্মবাদই
কার্য-কারণবাদ।

আমাদিগকে মুক্ত হইতেই হইবে। আমরা মুক্তই আছি; আমরা যে মুক্ত—উহা জানিতে পারাই প্রকৃত কাজ। সর্বপ্রকার দাসত্ব ও সর্বপ্রকার বন্ধন পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদিগকে যে কেবল সর্বপ্রকার পার্থিব বন্ধন এবং জগদন্তর্গত সর্বপ্রকার বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি বন্ধন ত্যাগ করিতে হইবে—তাহা নয়, পরন্তু স্বর্গ ও সুখ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে।

বাসনার দ্বারা আমরা পৃথিবীতে বদ্ধ, আবার ঈশ্বর স্বর্গ দেবদূতের নিকটও বদ্ধ। ক্রীতদাস ক্রীতদাসই, মানব ঈশ্বর অথবা দেবদূত যাহারই ক্রীতদাস সে হউক না কেন। স্বর্গের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখময় জীবন যাপন করে—এই ধারণা বৃথা স্বপ্নমাত্র। ইহার বিন্দুমাত্র অর্থ বা যৌক্তিকতা নাই। যেখানে সুখ, সেখানে কোন না কোন সময় দুঃখ আসিবেই। যেখানে আনন্দ, সেখানে বেদনা নিশ্চিত। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, যেভাবে হউক প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকিবেই।

স্বাধীনতার আদর্শই হইতেছে মোক্ষলাভের প্রকৃত আদর্শ। তাহা ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব আনন্দ বা বেদনা, ভাল বা মন্দ যাবতীয় বিষয় হইতে মুক্তি।

ইহা হইতেও অধিক—আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে; এবং মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। জীবন মৃত্যুরই ছায়া মাত্র। জীবন থাকিলেই মৃত্যু থাকিবে; সুতরাং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হও।

আমরা চিরকালই মুক্ত, কেবল আমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতে হইবে, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা চাই। তুমি অনন্ত মুক্ত আত্মা, চিরস্বাধীন—চিরধন্য। যথেষ্ট বিশ্বাস রাখ—মুহূর্ত মধ্যে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

দেশ কাল ও নিমিত্তের সমুদয় বস্তু বদ্ধ। আত্মা সর্বপ্রকার দেশ কাল ও নিমিত্তের বাহিরে। যাহা বদ্ধ, তাহাই প্রকৃতি—আত্মা নয়!

অতএব তোমার মুক্তি ঘোষণা কর, এবং তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হও—সদামুক্ত, সদানন্দময়।

দেশ কাল ও নিমিত্তকেই আমরা মায়া বলিয়া থাকি।

যাহা কিছু স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহারই রূপ আছে। স্থান (দেশ) নিজেই রূপ বা আকার ধারণ করে। হয় তুমি স্থানের (দেশের) মধ্যে অবস্থিত, নতুবা স্থান তোমাতে অবস্থিত। আত্মা সর্বপ্রকার দেশের অতীত। দেশ আত্মায় অবস্থিত, আত্মা দেশে অবস্থিত নয়।

আকার বা রূপ কাল ও দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কার্য-কারণের দ্বারা আবদ্ধ। সমুদয় কাল আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আমরা কালের মধ্যে অবস্থিত নই। যেহেতু আত্মা স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত নন, সমুদয় কাল ও দেশ আত্মায় অবস্থিত; অতএব আত্মা সর্বব্যাপী।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমাদের নিজ নিজ চিন্তার প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন ফরাসী এবং সংস্কৃতের মধ্যে মিল আছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সহিত ঈশ্বরের অভেদ-কল্পনা অর্থাৎ প্রকৃতি-পূজাই ছিল ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রাচীন যুগের ধারণা। পরবর্তী ধাপ হইল গোষ্ঠীগত দেবতা। রাজাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা হইল পরবর্তী ক্রম।

ঈশ্বর স্বর্গে অবস্থান করেন—এই ধারণা ভারতবর্ষ ব্যতীত সকল জাতির মধ্যেই প্রবল। ঐ ধারণা অত্যন্ত অপরিণত।

অবিচ্ছিন্ন জীবনের কল্পনা হাস্যজনক। যে পর্যন্ত আমরা জীবন হইতে মুক্তিলাভ না করি, সে পর্যন্ত মৃত্যু হইতেও মুক্তি নাই।

দ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি চিরকাল পৃথক্। বিশ্ব ও প্রকৃতি অনন্তকাল ধরিয়া ঈশ্বরাধীন।

চরম অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ তারতম্য করেন না। সর্বশেষ বিচারে তাঁহারা ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, তাঁহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হয়; ঈশ্বর এই বিশ্বের অনন্ত জীবনস্বরূপ।

তাঁহাদের মতে অসীম ও সসীম—কেবল শব্দমাত্র। ভেদবুদ্ধিবশতই বিশ্বজগৎ প্রকৃতি প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। প্রকৃতি স্বয়ং বিভিন্নতার স্বরূপ।

‘ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন কেন?’ ‘যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি এই অপূর্ণ সৃষ্টি করিলেন কেন?’ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলি তর্কানুসারে অযৌক্তিক। যুক্তির স্থান প্রকৃতির এলাকার মধ্যে; প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, সুতরাং ‘কেন তিনি এইরূপ করিলেন, কেন তিনি ঐরূপ করিলেন?’— ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। যদি তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা নিশ্চয় কোন লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ এবং উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ঐ উপায় ব্যতিরেকে ঈশ্বর লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে পারেন না। ‘কেন? ও কোথা হইতে?’—ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সেই বস্তুর সম্বন্ধেই উঠিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে।

ধর্ম সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন হইলঃ কি কারণে ধর্ম এত অবৈজ্ঞানিক? ধর্ম যদি একটি বিজ্ঞান, তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় উহার সত্যতা অবধারিত নয় কেন? ঈশ্বর, স্বর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমুদয় ধারণা—অনুমান ও বিশ্বাস মাত্র। ইহার সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, মনে হয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। মন সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রবাহস্বরূপ!

মানব কি আত্মা, এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (পদার্থ) অথবা নিত্য পরিবর্তনশীলতার সমষ্টিমাত্র? প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত সমুদয় ধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্মা, এক অভিন্ন সত্তা, এক, অদ্বিতীয়—যাহার মৃত্যু নাই, অবিনশ্বর।

প্রাচীন বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থাবিশেষ এবং অসংখ্য দ্রুত অবস্থান্তরের প্রায় অনন্ত পারম্পর্যের মধ্যেই তাহার চৈতন্য নিহিত। প্রত্যেকটি পরিবর্তন অপর পরিবর্তনগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একক অবস্থান করিতেছে। এইভাবে কার্যকারণবাদ ও পরিণামবাদের কোন অবসর নাই।

যদি অদ্বিতীয় 'সমগ্র' বলিয়া কিছু থাকে, তবে বস্তুও (সত্তা) আছে। অখণ্ড সর্বদাই মৌলিক। মৌলিক কোন পদার্থের সংমিশ্রণ নয়। অন্য কোন পদার্থের উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। উহা একাকী বিরাজমান ও অবিনশ্বর।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, সমুদয় বস্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন; অখণ্ড বলিয়া কিছু নাই; এবং মানব একটি পূর্ণ বা অখণ্ড—এই মতবাদ কেবল বিশ্বাসমাত্র, উহা প্রমাণ করা যাইতে

পারে না।

এখন প্রধান প্রশ্ন হইলঃ মানুষ কি এক পূর্ণ অথবা নিত্য পরিবর্তনশীলতার স্তূপমাত্র? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার—প্রমাণ করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। মনের চাঞ্চল্য রুদ্ধ কর, দেখিবে মানুষ পূর্ণ মৌলিক বা অবিমিশ্র, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। সমুদয় পরিবর্তন আমার মধ্যে চিত্তে বা মনরূপ পদার্থে, আমি পরিবর্তনসমূহ নই। যদি তাহা হইতাম, তবে পরিবর্তনসমূহ রোধ করিতে পারিতাম না।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও অপরের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে যে, জগতের সবই অতি সুন্দর, এবং সে সম্পূর্ণ সুখী। কিন্তু যখন সে স্থির হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা অনুসন্ধান করে, তখন উপলব্ধি করে, সে যে ইহার এবং উহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে—নানা বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তাহার কারণ —উহা না করিয়া উপায় নাই। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সে নিজেকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে যে, সত্য সত্যই তাহার নানা বস্তুর প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি নিজেকে যথার্থভাবে বুঝাইতে সমর্থ হয় যে, তাহার সময় খুব ভাল যাইতেছে, বুঝিতে হইবে—তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য অতি উত্তম। ঐ ব্যক্তি কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাসনা চরিতার্থ করে। তাহার ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার বশেই সে কার্য করিয়া থাকে। ঐ শক্তি তাহাকে বলপূর্বক কার্যে প্রবৃত্ত করে এবং দেখায় যেন সে ঐরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়াই করিয়াছে। কিন্তু যখন সে প্রকৃতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হয়, যখন বহু আঘাত সহ্য করিতে হয়, তখন তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সকলের অর্থ কি? যত অধিক সে আঘাত লাভ করে ও চিন্তা করে, ততই সে দেখে যে, তাহার আয়ত্তের বাহিরে এক শক্তির দ্বারা সে ক্রমাগত চালিত হইতেছে এবং সে কার্য করিয়া তাকে, তাহার কারণ—তাহাকে

করিতেই হইবে। অতঃপর সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তখনই সংগ্রাম শুরু হয়।

কথা হইল এই যে, যদি এই-সকল উৎপাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। আমরা সর্বদাই প্রকৃত সত্তা কি, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। সহজাত সংস্কারবশেই উহা করিয়া থাকি। জীবাত্মার অন্তর্গত সৃষ্টিই ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া থাকে; আর এই কারণেই ঈশ্বরের আদর্শ সম্বন্ধে এত প্রভেদ বিদ্যমান। সৃষ্টির বিরাম ঘটিলেই আমরা নির্বিশেষ সত্তাকে জানিতে পারি। নির্বিশেষ পূর্ণ বা অসীম সত্তা আত্মাতেই বিদ্যমান, সৃষ্টর মধ্যে নয়। সুতরাং সৃষ্টির অবসান ঘটিলেই আমরা পূর্ণকে জানিতে পারি। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে আমরা শরীর সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া থাকি; এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে তাঁহাকে দেহধারীরূপেই চিন্তা করিয়া থাকি। যাহাতে আত্মার প্রকাশ ঘটে, সেজন্য মনের চাঞ্চল্য দমন করাই প্রকৃত কাজ। শিক্ষার আরম্ভ শরীরে। প্রাণায়াম শরীরকে শিক্ষিত করিয়া সৌষ্ঠব দান করে। প্রাণায়াম–অভ্যাসের উদ্দেশ্য ধ্যান ও একাগ্রতালাভ। যদি মুহূর্তের জন্য তুমি সম্পূর্ণ স্থির বা নিশ্চল হইতে পার, তবে লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছ—বুঝিতে হইবে। মন উহার পরেও কাজ করিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্বে মন যে অবস্থায় ছিল, তাহা আর পাইবে না। তুমি নিজেকে জানিতে পারিবে, তোমার প্রকৃত স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিবে। এক মুহূর্তের জন্য মন স্থির কর, তোমার যথার্থ স্বরূপ সহসা উদ্ভাসিত হইবে এবং বুঝিবে মুক্তি আসন্ন; আর কোন বন্ধন থাকিবে না। তত্ত্বটি এইরূপ—যদি তুমি সময়ের এক মুহূর্ত অনুধাবন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সমগ্র সময় বা কাল জানিতে পারিবে, যেহেতু একেরই দ্রুত অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য হইল ‘সমগ্র’। এক-কে আয়ত্ত কর, এক মুহূর্তকে সম্পূর্ণভাবে জান—মুক্তি লাভ হইবেই।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ ব্যতীত সকল ধর্ম ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাসী। আধুনিক

বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাস করেন। ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৌদ্ধগণের পর্যায়ে পড়েন।

আর্নল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' পুস্তকে বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা বেদান্তবাদই অধিক প্রদর্শিত।

উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদ

প্রকৃতির সুশৃঙ্খল বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বস্রষ্টার এক অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছে, এই ধারণা বা 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে উত্তম। যেহেতু ঐ ধারণা ধর্মজগতে যাহারা শিশু তাহাদিগকে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্বে পরিচালিত করিবার জন্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য, শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ধারণা বা মতবাদের কোন উপকারিতা নাই, এবং উহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিলে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকৃতি যদি ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সৃষ্টির মূলে কোন অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা আছে, এই তত্ত্ব তাহার ত্রুটিও প্রদর্শন করে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ হইলে কোন কার্যের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা বা মতলবের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই উহা সম্পন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন বিতর্ক, কোন উদ্দেশ্য বা কোন পরিকল্পনা নাই।

মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের পরিণাম হইতেছে জড়জগৎ। মানুষ যখন তাহার দেবত্ব জানিতে পারে, তখন আমরা এখন জড়বস্তু এবং প্রকৃতি বলিয়া যাহা জানিতেছি তৎসমুদয়ই লোপ পায়।

কোন উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়োজনরূপে এই জড়জগতের স্থান সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে ঈশ্বর বিশ্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেন। ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে এই জগৎ বিদ্যমান, এ-কথা বলার অর্থ ইহা নয় যে, মানুষকে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণবশতঃ বা ঈশ্বরের প্রয়োজনের নিমিত্ত এই জগৎ বিদ্যমান।

মানুষের প্রয়োজনেই জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয়। বিশ্ব-

পরিকল্পনায় ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান্ হইলে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য কিরূপে থাকিতে পারে? কোন কার্য-সাধনের জন্য তাঁহার কোন পরিকল্পনা, মতলব বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হইবে কেন? তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে, ইহা বলার অর্থ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা ও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তারূপ বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন প্রশস্ত নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তুমি দেখিলে—নদীটি এত চওড়া যে, সেতু-নির্মাণ ব্যতীত ঐ নদী উত্তীর্ণ হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেতু-নির্মাণের প্রয়োজন, এই ঘটনার দ্বারা সেতু নির্মাণ করিবার সামর্থ্য তোমার শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেও উহা দ্বারাই তোমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও অকিঞ্চিৎকরতাও প্রকাশ পাইবে। তোমার ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ না হইত, যদি তুমি উড়িয়া অথবা নদীতে ঝাঁপ দিয়া নদী অতিক্রম করিতে পারিতে, তবে তোমাকে সেতু নির্মাণ- রূপ প্রয়োজনীয়তার বশবর্তী হইতে হইত না। সেতু-নির্মাণ দ্বারা তোমার মধ্যে সেতু-নির্মাণের শক্তি প্রমাণিত হইলেও উহা দ্বারা আবার তোমার অপূর্ণতাও প্রদর্শিত হইল। অন্য কিছু অপেক্ষা তোমার ক্ষুদ্রতাই অধিক প্রকাশ পাইল।

অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ মুখ্যতঃ এক। ভেদ শুধু প্রকাশে। দ্বৈতবাদিগণ যেমন পিতা ও পুত্র ‘দুই’ বলিয়া গ্রহণ করেন, অদ্বৈতবাদিগণ তেমন উভয়কে প্রকৃতপক্ষে ‘এক’ বলিয়া মনে করেন। দ্বৈতবাদের অবস্থান প্রকৃতির মধ্যে, বিকাশের মধ্যে এবং অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপে।

প্রত্যেক ধর্মেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবার উপায়স্বরূপ।

চৈতন্যকে চৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষ করাই ধর্ম, জড়রূপে দেখা নয়।

ধর্ম হইতেছে বিকাশ। প্রত্যেককে নিজে উহা উপলব্ধি করিতে হইবে। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস, মানবের পরিত্রাণের নিমিত্ত যীশুখ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমাদের নিকট উহা একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসেই নিহিত তোমাদের মুক্তি। আমাদের নিকট মুক্তির সহিত বিশিষ্ট মতবাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকেরই স্বীয় মনোমত কোন মতবাদে বিশ্বাস থাকিতে পারে; অথবা সে কোন মতবাদে বিশ্বাস না করিতেও পারে। যীশুখ্রীষ্ট কোন এক সময়ে ছিলেন, অথবা তিনি কোনদিন ছিলেন না, তোমার নিকট এই উভয়ের পার্থক্য কি? জ্বলন্ত ঝোপের (burning bush) মধ্যে মুশার ঈশ্বর-দর্শনের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? মুশা জ্বলন্ত ঝোপে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, এই তত্ত্বের দ্বারা তোমার ঈশ্বর-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই যদি হয়, তবে মুশা যে আহার করিয়াছিলেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তোমার আহার-গ্রহণে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। একটি অপরটির মতই সমভাবে যুক্তিযুক্ত। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের বিবরণসমূহ আমাদিগকে তাঁহাদের পথে অগ্রসর হইতে ও স্বয়ং ধর্ম উপলব্ধি করিতে প্রণোদিত করে, ইহা ব্যতীত অপর কোন কল্যাণ সাধন করে না। যীশুখ্রীষ্ট, মুশা বা অপর কেহ যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করা ব্যতীত আর কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষ স্বভাব আছে, উহা তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্য তাহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে। উহার মধ্য দিয়াই তাহাকে মুক্তির পথ খুঁজিতে হইবে। তোমার গুরুই তোমাকে বলিয়া দিবেন, তোমার নির্দিষ্ট পথ কোন্‌টি এবং সেই পথে তোমাকে পরিচালিত করিবেন। তোমার মুখ দেখিয়া তিনি বলিয়া দিবেন, তুমি

কোন্ অবস্থায় ও কিরূপ সাধনার অধিকারী এবং ঐ বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকিবে। অপরের পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা উহা তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট, তোমার জন্য নয়। নির্দিষ্ট পথ পাইলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা ব্যতীত আর কিছুই করিবার নাই, স্রোতই তোমাকে মুক্তির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অতএব যখন সেই নির্ধারিত পথ পাইবে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইও না। তোমার পন্থা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কিন্তু উহা যে অপরের পক্ষেও শ্রেয়ঃ হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চৈতন্যকে চৈতন্যরূপেই প্রত্যক্ষ করেন, জড়রূপে নয়। চৈতন্যই প্রকৃতিকে গতিশীল করে, চৈতন্যই সত্য বস্তু। ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান, চৈতন্যে নয়। চৈতন্য সর্বদা এক, অপরিণামী ও শাশ্বত। চৈতন্য ও জড় প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু চৈতন্য স্ব-স্বরূপে কখনই জড় নয়। জড় কখনও জড়সত্তা-রূপে চৈতন্য হইতে পারে না। আত্মা কখনও ক্রিয়া করেন না। কেনই বা করিবেন? আত্মা বিদ্যমান—ইহাই যথেষ্ট। আত্মা শুদ্ধ, সৎ ও নিরবচ্ছিন্ন। আত্মায় ক্রিয়ার কোন আবশ্যকতা নাই।

নিয়ম দ্বারা তুমি বদ্ধ নও। উহা তোমার মায়িক প্রকৃতির অন্তর্গত। মন প্রকৃতিরই এলাকায় ও নিয়মাধীন। সমগ্র প্রকৃতি স্বীয় কর্মজনিত নিয়মের অধীন এবং এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। প্রকৃতির একটি নিয়মও যদি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হও, তবে মুহূর্তমধ্যে প্রকৃতি ধ্বংস হইবে, প্রকৃতি বলিয়া কিছু থাকিবে না। যিনি মুক্তিলাভ করেন, তিনিই প্রকৃতির নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিতে সমর্থ, তাঁহার নিকট প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতির কোন প্রভাব আর তাঁহার উপর থাকে না। প্রত্যেকেই একদিন চিরকালের জন্য এই নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিবে, আর তখনই প্রকৃতির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব শেষ হইয়া যাইবে।

গভর্ণমেণ্ট, সমিতি প্রভৃতি অল্পবিস্তর ক্ষতিকর। সকল সমিতিই

কতকগুলি দোষযুক্ত সাধারণ নিয়মের উপর স্থাপিত। যে মুহূর্তে তোমরা নিজেদের একটি সঙ্ঘে পরিণত করিলে, সেই মুহূর্ত হইতে ঐ সঙ্ঘের বহির্ভূত সকলের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ হইল। যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অর্থ নিজের উপর গণ্ডী টানা ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করা। প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে সর্বোত্তম স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাধুতা যত বাড়ে কৃত্রিম নিয়মও তত হ্রাস পায়। ঐগুলি বাস্তবিক পক্ষে নিয়মই নয়। কারণ—উহা যদি সত্যই নিয়ম হইত, তবে কখনই উহা লঙ্ঘন করা যাইত না। এই তথাকথিত নিয়মগুলি যে ভাঙিয়া ফেলা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐগুলি প্রকৃত নিয়ম নয়। যথার্থ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

যখন কোন চিন্তা দমন করিয়া ফেল, তখন উহা স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্যভাবে চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। সুযোগ পাইলেই মুহূর্তমধ্যে—দমনের ফলে সংহত সমস্ত রুদ্ধশক্তি লইয়া সবেগে বাহির হইয়া আসে, এবং তারপর যাহা ঘটিতে বহু সময় লাগিত, কয়েক মুহূর্তে তাহা ঘটিয়া যায়।

প্রতিটি ক্ষুদ্র সুখ বৃহৎ দুঃখ বহন করে। শক্তি এক—এক সময়ে যাহা আনন্দরূপে ব্যক্ত হয়, অন্য সময়ে তাহারই অভিব্যক্তি দুঃখ। কতকগুলি অনুভূতির অবসান হইলেই অপর কতকগুলি আরম্ভ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যক্তিগণের কাহারও মধ্যে দুইটি, এমন কি একশত বিভিন্ন চিন্তা একই সময়ে কার্য করিতে থাকে।

হইতেছে স্বীয় স্বভাবের পরিণতি—মানসী ক্রিয়া অর্থে সৃষ্ট। শব্দ চিন্তার ও রূপ (আকার) শব্দের অনুসরণ করে। মনে আত্মা প্রতিফলিত হইবার পূর্বে মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার কার্য করিবার সঙ্কল্প রুদ্ধ করা প্রয়োজন।

ধর্মের অনুশীলন

[১৮ মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত আলামেডায় প্রদত্ত।]

আমরা বহু পুস্তক পড়িয়া থাকি, কিন্তু উহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানলাভ হয় না। জগতের সমুদয় 'বাইবেল' আমরা পড়িয়া শেষ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্মলাভ হইবে না। যে-ধর্ম কেবল কথায় পর্যবসিত, তাহা লাভ করা অতি সহজ, যে-কেহ উহা লাভ করিতে পারে। আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম। কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের ধারণা হইতেছে সৎকর্মের অনুষ্ঠান—জগতের হিতসাধন।

হিতসাধনের বা পরপোকারের ফল কি? হিতবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়, ধর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক হাসপাতালে আসুক—ইহাই প্রত্যেকটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের আকাঙ্ক্ষা। পরহিতৈষণার অর্থ কি? উহা অত্যাবশ্যক নয়। প্রকৃতপক্ষে পরহিতৈষণার অর্থ জগতের দুঃখে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা—দুঃখের উচ্ছেদ সাধন নয়। সাধারণ লোক নাম-যশের প্রার্থী, এবং নাম-যশোলাভের উদ্দেশ্যেই সে তাহার সমুদয় প্রচেষ্টা পরোপকার ও সৎকর্মের চাকচিক্যময় আবরণে ঢাকিয়া রাখে। অপরের জন্য কাজ করিতেছি, এই ভান করিয়া বস্তুতঃ সে নিজের কাজই গুছাইয়া লয়। প্রত্যেকটি তথাকথিত পরোপকারের উদ্দেশ্য হইতেছে—যে অশুভটি নিবারণ করিতে চাহিতেছ, উহাকেই উৎসাহ দান।

হাসপাতাল বা যে-কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া বলনৃত্যে যোগদান করে এবং সারারাত্রি নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পশুর ন্যায় আচরণ শুরু করে; ফলে পৃথিবীতে দলে দলে পাষণ্ড ব্যক্তির উৎপত্তি হয় এবং কারাগার, পাগলাগারদ ও হাসপাতাল ঐ-প্রকার ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপই চলিতে থাকে, আর হাসপাতাল-স্থাপন

প্রভৃতি সৎ কর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। সৎ কর্মের আদর্শ হইতেছে জগতের সমুদয় দুঃখের হ্রাস অথবা উচ্ছেদ-সাধন। যোগী বলেন, মনঃসংযমে ব্যর্থতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। যোগীর আদর্শ জড়-জগৎ হইতে মুক্তিলাভ। প্রকৃতিকে জয় করাই তাঁহার কর্মের মানদণ্ড। যোগী বলেন, সমুদয় শক্তি আত্মায় বিদ্যমান, এবং শরীর ও মন সংযত করিয়া আত্মশক্তিবলে যে-কেহ প্রকৃতিকে জয় করিতে সমর্থ।

দৈহিক কর্মের জন্য যতটা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত মাংসপেশী যে পরিমাণ বেশী জমিবে, সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে। অত্যধিক কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়, উহা ক্ষতিকর। কঠোর পরিশ্রম না করিলে দীর্ঘজীবী হইবে। অল্প আহার গ্রহণ কর ও অল্প পরিশ্রম কর। মস্তিষ্কের খাদ্য সংগ্রহ কর।

নারীর পক্ষে গৃহকর্মই যথেষ্ট। প্রদীপ তাড়াতাড়ি পুড়াইয়া শেষ করিও না, ধীরে ধীরে পুড়িতে দাও।

যুক্তাহারের অর্থ সাদাসিধা খাদ্য, অত্যধিক মশলাযুক্ত খাদ্য নয়।

বেলুড় মঠ—আবেদন

হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বহুনিন্দিত আমাদের ধর্মমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা অর্জন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে প্রচারকার্যের জন্য একদল যুবক সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিবার আশা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে। একদল যুবককে বৈদিক গুরুগৃহবাস প্রথায় শিক্ষা দিবার চেষ্টাও করা হইতেছে।

কয়েকজন ইওরোপীয় এবং আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

অল্প দিনে এই কাজের কোন প্রত্যক্ষ ফললাভ করিতে হইলে চাই অর্থ; অতএব যাঁহারা আমাদের এই চেষ্টার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহাদের নিকট আমাদের এই আবেদন।

আমাদের ইচ্ছা—মঠের কাজের এইরূপ প্রসার করিতে হইবে, যাহাতে এই অর্থানুকূল্যে যতজন সম্ভব যুবককে মঠে রাখিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। উহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত তাহাদের গুরুর নিকট বাস করিয়া পুরুষোচিত নিয়মানুবর্তিতা অর্জন করিবে।

লোকবল ও অর্থবল হইলে কলিকাতার নিকটস্থ প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক দেশের অন্যান্য স্থানেও ক্রমশঃ শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

এই কাজের স্থায়ী ফললাভ করিতে সময় লাগিবে। আমাদের যুবকদের পক্ষে এবং যাঁহাদের এই কার্যে সাহায্য করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে এজন্য প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন।

আমরা বিশ্বাস করি, এজন্য জনবল প্রস্তুত। অতএব যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম ও দেশকে সত্যিই ভালবাসেন এবং কার্যতঃ সহানুভূতি দেখাইতে পারেন, তাঁহাদের কাছে আমরা এই আবেদন জানাইতেছি।

অদ্বৈত আশ্রম, হিমালয়

[১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামীজী এই লেখাটি মায়াবতী (আলমোড়া, হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের পরিচয়-পুস্তিকায় (Prospectus) প্রকাশ করার জন্য পত্রযোগে প্রেরণ করেন।]

যাঁহার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, আবার যিনিই এই ব্রহ্মাণ্ড; যাঁহার মধ্যে আত্মা, যিনি এই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, এবং যিনিই এই মানবাত্মা; তাঁহাকে, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডকে, আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিলে আমাদের সমস্ত ভয় ও দুঃখের অবসান হয় এবং পরম মুক্তিলাভ হয়। যেখানেই প্রেমের প্রসারণ কিম্বা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি দেখা যায়, সেখানেই উহা—'সর্বপ্রাণীর একত্ব'রূপ শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি, প্রত্যক্ষানুভূতি ও কার্যকারিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। পরাধীনতাই দুঃখ; স্বাধীনতাই সুখ।

অদ্বৈতই একমাত্র সাধনপ্রণালী, যাহা মানুষকে তাহার পূর্ণ স্বাবলম্বন প্রদান করে, এবং তাহার সমস্ত পরাধীনতা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করিয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা ও কার্য করিবার সাহস প্রদান করে; পরিশেষে উহাই আমাদিগকে পরম মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম করে।

দ্বৈতভাবের দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এতদিন এই মহান্ সত্য প্রচার করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণে আমাদের ধারণা—এই ভাব মানবসমাজের কল্যাণে সম্যক প্রচারিত হয় নাই।

এই মহান্ সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন ও পূর্ণতর প্রকাশের সুযোগ দিয়া মানব-সমাজকে উন্নত করিতে আমরা হিমালয়ের ঊর্ধ্ব প্রদেশে—যেখানে ইহা প্রথম উদ্গীত হইয়া- ছিল—এই অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিতেছি।

এখানে সমস্ত কুসংস্কার এবং বলহানিকারক মলিনতা হইতে অদ্বৈত ভাব মুক্ত থাকিবে, আশা করা যায়। এখানে শুধু 'একত্বের শিক্ষা' ছাড়া অন্য কিছুই শিক্ষা দেওয়া বা সাধন করা হইবে না। যদিও আশ্রমটি সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন, তবুও ইহা অদ্বৈত—কেবলমাত্র অদ্বৈত—ভাবের জন্যই উৎসর্গীকৃত হইল।

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমঃ আবেদন

[১৯০২ খ্রীঃ ফেব্রুআরী মাসে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম কার্যবিবরণীসহ প্রেরিত একটি পত্র।]

প্রিয় ...

ইহার সহিত বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গত বৎসরের একটি কার্যবিবরণী আপনার জন্য পাঠাইতেছি।

এই শহরে যে-সকল ব্যক্তি, সাধারণতঃ বৃদ্ধ নরনারী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য আমরা যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহা হইতে পাইবেন।

বর্তমান শিক্ষাজাগরণ ও জনমতের ক্রমবর্ধমানের দিনে হিন্দুর তীর্থসমূহ, তাহাদের বর্তমান অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই তীর্থ হিন্দুদিগের নিকট পবিত্রতম, সেজন্য ইহার সমালোচনাও কঠোরতম।

অন্যান্য তীর্থস্থানগুলিতে লোকে পাপমোচনের উদ্দেশ্যে যায়। সেজন্য তাহাদের সহিত তাহাদের সম্পর্কও সাময়িক—মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু আর্য-সভ্যতার এই প্রাচীনতম ও সজীব ধর্মীয় কেন্দ্রে—এই নগরে—বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত নর-নারীগণ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করিয়া যাহাতে চরম মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সেজন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে থাকেন।

ইহা ছাড়াও আর যাঁহারা জগদ্ধিতায় সর্বত্যাগী হইয়াছেন ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও শৈশবের সকল সম্পর্ক হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও এ শহরে বাস করেন। মানুষের সাধারণ নিয়তি—দৈহিক রোগাদির দ্বারা তাঁহারাও আক্রান্ত হন।

শহরের ব্যবস্থাপনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি আছে, পুরোহিতবর্গের উপর সাধারণতঃ যে-সকল কঠোর সমালোচনা বর্ষিত হয়, হয়তো তাহাও সত্য। তথাপি ভুলিলে চলিবে না—জনসাধারণ যেমন, পুরোহিতও তেমনি। যদি লোকে জোড়হাতে কেবল একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও দুঃখের এই দ্রুত প্রবাহ—যাহা তাহাদের গৃহের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সন্ন্যাসী ও গৃহীদিগকে অসহায় দুর্ভোগের সাধারণ আবর্তে টানিয়া ফেলিতেছে—কেবল দেখিতে থাকে এবং ঐ প্রবাহ হইতে কাহাকেও বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়া তীর্থের পুরোহিতকুলের অন্যায় কার্যের শুধু বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমালোচনা করে, তাহা হইলে এই দুর্ভোগের এককণাও কমিবে না, এক ব্যক্তিও সাহায্য পাইবে

প্রশ্ন এই—শিবের এই চিরন্তন স্থান মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, আমরাও কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে চাই? যদি তাই হয়, তবে মরণার্থী ব্যক্তিগণের বৎসরের পর বৎসর এখানে আসিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া আমাদের আনন্দলাভ করাই উচিত। দুঃখিগণের মোক্ষলাভের এই চিরন্তন ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমাদের শ্রীভগবানের নামের জয়গান করাই কর্তব্য।

যে-সব দুঃখার্ত ব্যক্তি এই স্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আসে, তাহারা স্বকীয় জন্মস্থানের প্রাপ্য সমস্ত সাহায্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তাহারা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাহাদের যে কী অবস্থা হয়, তাহা অনুভব করিবার ভার ও হিন্দু হিসাবে আপনারা উহার কি প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার ভার আপনাদের বিবেকের উপর ন্যস্ত করিতেছি।

ভ্রাতৃগণ! অন্তিম বিশ্রামের প্রস্তুতির এই অদ্ভুত স্থানের আশ্চর্যকর আকর্ষণের বিষয় স্থিরচিত্তে আপনারা কি চিন্তা করিতে পারেন না?

মৃত্যুর মাধ্যমে মোক্ষের দিকে অগ্রসর তীর্থযাত্রীদের বহু প্রাচীন বিরামহীন এই স্রোত আপনাদিগকে কি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট করে না? যদি করে, তবে আসুন আমাদিগের এই কাজের জন্য আপনাদের সদয় হস্ত প্রসারিত করুন।

আপনাদের দান হয়তো অতি সামান্য, আপনাদের সাহায্য হয়তো নগণ্য, তবুও কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। প্রাচীন প্রবাদ আছে—তৃণগুচ্ছগুলি একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিলে সর্বাপেক্ষা মদমত্ত হস্তীকেও উহা দ্বারা বাঁধিয়া রাখা যায়।

বিশ্বনাথাশ্রিত সর্বদা আপনাদের
বিবেকানন্দ

বৌদ্ধভারত

[শেক্‌স্‌পীয়র ক্লাব, পাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া-২ ফেব্রুআরী, ১৯০০, সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা।]

আজ সন্ধ্যায় বৌদ্ধভারত আমাদের আলোচ্য বিষয়। আপনারা অনেকেই হয়তো এডুইন আর্নল্ডের পদ্যে লিখিত বুদ্ধের জীবনী পাঠ করেছেন। কেউ কেউ হয়তো এ-বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনাও করে থাকবেন। কারণ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় বৌদ্ধ-সাহিত্যের উপর প্রচুর পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মই জগতের সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি। সুতরাং এর অনুশীলন স্বতই বিশেষ আকর্ষণীয়।

বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও ভারতে এবং অন্যত্র নানা ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেগুলি অল্পবিস্তর নিজ নিজ জাতির পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু, য়াহুদী, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির প্রত্যেকেরই মহান্ ধর্ম ছিল। কিন্তু সে-সবই মোটের উপর জাতি-বিশেষের নিজস্ব ধর্ম—সার্বভৌম ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের বিশ্ববিজয়রূপ বিচিত্র একটি অভিযানের সূত্রপাত। যে মতবাদ ও বাণী বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হয়েছিল, যে সত্যসমূহ তার শিক্ষার অঙ্গীভূত—সে-সবের কথা বাদ দিলেও ধর্মজগতে সেই প্রথম এক বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সে ধর্মের জন্মলগ্নের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধশ্রমণগণ নগ্নপদে ও মুণ্ডিতমস্তকে তৎকালীন সভ্যজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন কি ল্যাপল্যাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অপর প্রান্ত অবধি তারা প্রচার করেছিল। এইভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মূল ভারতভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তবে ভারতবর্ষ কখনও সমগ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি। সে ধর্মের পরিধির বহির্ভাগেই ভারতবর্ষ চিরদিন দণ্ডায়মান ছিল। ফলে খ্রীষ্টধর্ম য়াহুদীদের মধ্যে যে পরিণতি লাভ করেছিল, অর্থাৎ অধিকাংশ য়াহুদী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি—বৌদ্ধধর্মও ভারতবর্ষে অনুরূপ পরিণতিই লাভ করেছিল এবং এভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের ধারা অব্যাহত ছিল।

কিন্তু তুলনাটির পরিসমাপ্তি এখানেই। কারণ খ্রীষ্টধর্ম য়াহুদী জাতিকে নিজ পরিধির মধ্যে গ্রহণ করতে সমর্থ না হলেও সমগ্র দেশকে নিজ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যে-সব স্থানে প্রাচীন য়াহুদীধর্ম প্রচলিত ছিল—অতি অল্পকাল মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম সে-সব স্থানেও প্রবেশ করে তাকে যেন বাতিল করে দিয়েছিল।

সেজন্য প্রাচীন য়াহুদীধর্ম শুধু বিক্ষিপ্তভাবেই পৃথিবীর এখানে সেখানে টিকে থাকল। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মরূপী শিশুটিকে তার প্রসূতি নিজেই যেন গ্রাস করে ফেলেছিল এবং আজ বুদ্ধের নামও যেন ভারতবর্ষে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে আজ সে-দেশের অধিকাংশ নরনারী অপেক্ষা আপনারাই হয়তো বৌদ্ধধর্মের কথা বেশী অবগত আছেন। তারা বড়জোর সেই মহাপুরুষের নামটি মাত্র শ্রবণ করেছে। তিনি একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন, ভগবানের অবতার ছিলেন—এই পর্যন্ত সংবাদ তারা হয়তো রাখে, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

সিংহল অবশ্য আজও বুদ্ধদেবের সাম্রাজ্য, এবং হিমালয়ের কোন কোন অংশেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এখনও কিছু আছে। এ-ছাড়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে ভারতের বাইরে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুগামীদের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বাধিক এবং এ-ধর্ম পরোক্ষভাবে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসনকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিতও করেছে।

একদা বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামও একসময়ে বড় কম ছিল না। খ্রীষ্টধর্মের আদিযুগে নষ্টিক (Gnostics) প্রমুখ যে-সব সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের আচার-আচরণ, মতি-গতি বৌদ্ধদেরই অনুরূপ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে রোমক আইনের অধীন যে ধর্মগত সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছিল—তারই দানে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়।

বৌদ্ধধর্মের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক্—তার ধর্ম এবং আচার-আচরণাদি অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয়। এবং বিপুলশক্তিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিজয়ী ধর্মরূপে তার যে প্রথম আত্মপ্রকাশ—তার মাধুর্যও কম নয়।

আজকের ভাষণে আমি মূলতঃ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাই। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এবং তার প্রসার কতকাংশে অনুধাবন করতে হলেও—সে মহান্ ধর্মগুরুর আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল—সে-বিষয়ে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সেদিনের ভারতবর্ষে এক বহুবিস্তৃত বিরাট ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ধর্মের সুসম্বদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ—বেদ। বেদসমূহ বাইবেলের মত একটি গ্রন্থমাত্র ছিল না। পরন্তু নানা গ্রন্থের সমবায়ে বেদ ছিল একটি সাহিত্য-বিশেষ। অবশ্য বাইবেলও বিভিন্ন যুগের রচনার সমষ্টি, বিভিন্ন লেখকের হাতের সৃষ্ট সম্পদ। কিন্তু বেদ-সংগ্রহ অতি বিশাল। আর তার সব গ্রন্থ পাওয়াই যায় না, এমন কি তাদের সবগুলির নাম পর্যন্ত ভারতবর্ষেও কেউ অবগত নয়। কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে-গ্রন্থের সবগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হত, তবে এই প্রশস্ত কক্ষটিতেও তাদের স্থান সঙ্কুলান হত না।

সে এক বিরাট—এক বিপুল সাহিত্য-সংগ্রহ। সেই মহান্ শাস্ত্রকার শ্রীভগবানের কাছ থেকেই এই সাহিত্য বংশ-পরম্পরায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেজন্য ভারতবর্ষে শাস্ত্রবিষয়ক ধারণা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ছিল, গোঁড়ামিতে পূর্ণ ছিল।

আপনারা গ্রন্থপূজার গোঁড়ামি সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু এ সম্পর্কে হিন্দুর মনোভাব জানতে পারলে আপনারা কি ভাববেন—কে জানে? হিন্দু বিশ্বাস করে যে, বেদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্ঞান। বেদসহায়েই এই বিশ্ব-চরাচর সৃষ্ট হয়েছে এবং বেদে নিহিত বলেই তাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। একটি গাভী এই স্থূল জগতে বিরাজ করছে, কারণ 'গাভী' শব্দটি বেদে রয়েছে। একটি মানুষ এই পার্থিব জগতে বিদ্যমান, কারণ 'মানুষ' শব্দটি বেদমধ্যে উল্লিখিত আছে। এরই মধ্যে সেই মতবাদের জন্মসূত্র দেখা যায়—যেটি উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ বর্ধিত করেছিলেন এবং এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন—'সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং শব্দ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল।'—এ তত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব; এ তত্ত্বের ভিত্তির উপরই শাস্ত্রের শক্তির ভাবরাশি দণ্ডায়মান। অবশ্য এ-কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শব্দ-মাত্রই ঐশী শক্তির আধার। বহির্বিশ্ব ভাবের মূর্তপ্রকাশ-স্বরূপ। সুতরাং প্রকাশমাত্রেই জাগতিক ক্ষেত্রে স্থূল প্রকাশ এবং শব্দমাত্রেই বেদ, আর সংস্কৃতই দেবভাষা। একদা দেবমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল ভাষা। সে-ভাষা সংস্কৃত ভাষা অথবা দেবভাষা। সেজন্য ভারতীয়দের মতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই নিম্নপর্যায়ের পশুকণ্ঠ-নিঃসৃত ভাষার মত। আর সে-সব ভাষাভাষীরাই 'ম্লেচ্ছ' শব্দে অভিহিত। গ্রীকদের পরিভাষায় 'বর্বর' শব্দটি যেমন, এ 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিও (সংস্কৃত) সেইরূপ।

বেদসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, দেবতামণ্ডলীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় তারা বিদ্যমান। ভগবান্ অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত এবং সেই অনন্ত জ্ঞানসহায়েই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই জগতের

সবকিছু বিধৃত, তার বাইরে কিছু নেই। মানুষের যত কিছু নীতিজ্ঞান, ভালমন্দ বিচার—সবই ঐ গ্রন্থের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ ঐশ্বরিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে মানুষ উঠতে পারে না।—ভারতীয় গোঁড়ামির এই হল মূলকথা।

বেদের শেষাংশ উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। আর প্রথমাংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল।

বেদগ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেই 'এটি ভাল নয়, ওটি ভাল নয়'—এরূপ মন্তব্য আপনারা করে থাকেন। কিন্তু কেন? 'বহু অনভিপ্রেত এবং মন্দ অনুশাসন এর মধ্যে নিহিত আছে'। এইজন্য? তা হয়তো আছে। কিন্তু ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও তো এ-জাতীয় ব্যাপার আছে। প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই এমন বহু বিচিত্র মত, বহু উদ্ভট চিন্তার উল্লেখ আছে, যা আজকের দিনে আমরা পছন্দ করব না।

'এ মতবাদটি ভাল নয়', 'আমার নীতিবোধে এটি বাধে'।

এ-জাতীয় উক্তির 'কারণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করলে. অথবা কেন আপনার নীতিতে বাধে—এ কথা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর আসে—'না, এর মধ্যে কোন প্রশ্ন বা যুক্তির অবকাশ নেই।' ... এই যদি অবস্থা হয় তবে স্তব্ধ হও, দূরে সরে থাক।

বেদের যে নির্দেশ, সেটি পালন করাই বিধি। বেদ-নির্দিষ্ট ভাল-মন্দই শেষ কথা। সে-বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা মানুষের অধিকার-বহির্ভূত।

এখন বিপদ তো এইখানেই। বেদ-বিরোধী কোন উক্তির সমর্থনে কোন হিন্দুকে যদি কেউ বলে যে—'আমাদের বাইবেলে তো এ-কথা নেই।' তবে তন্মুহূর্তে উত্তর হবে—'ওঃ, তোমাদের বাইবেল? ও তো সেদিনের একটি অতি-আধুনিক ইতিহাস। বেদ ভিন্ন আবার শাস্ত্র

কোথায়? গ্রন্থ কোথায়?’ ভগবানই সর্বজ্ঞানের আকর। কাজেই পুনঃপুনঃ একাধিক বাইবেলের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দেবেন, এটা সম্ভব নয়। বেদগ্রন্থের মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষার প্রথম প্রকাশ। সে কি তবে ভুল? মিথ্যা? উত্তরকালে উচ্চতর কোন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদ বা বাইবেল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—এমন ঘটনা কি সম্ভব?

‘বেদগ্রন্থের মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নেই। অন্য সকল গ্রন্থই বেদের অনুগামী, বেদের অনুকরণে রচিত।’ আপনাদের কথা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। আবার খ্রীষ্টানগণও বাইবেল গ্রন্থটি দেখিয়ে বলবেন, ও-সকল উক্তি প্রতারণামাত্র। ভগবানের উক্তি অভ্রান্ত এবং তা একবার মাত্রই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

এখন এ-সবই বিশেষভাবে চিন্তা করবার বিষয়। গোঁড়ামি অবশ্যই অতি বিষম বস্তু।

যদি কোন হিন্দুকে কোন সামাজিক সংস্কার-বিষয়ে আপনারা অনুরোধ করেন, যদি বলেন, ‘এরূপ করা সঙ্গত’ অথবা ’এরূপ করা সঙ্গত নয়’, তবে উত্তরে সে বলবে, ‘এ-সব কি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নির্দিষ্ট হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে ও-সবের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই। কোন পরিবর্তন করবার পক্ষপাতী আমরা নই।’ কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে যে, আমাদের ব্যবস্থাই কল্যাণপ্রদ।

যদি বলা হয়, ... ‘তোমাদের সমাজপ্রতিষ্ঠানগুলি উৎকৃষ্ট নয়।’ তবে সঙ্গে সঙ্গে তারও উত্তর আসবে—‘বটে! তুমি সে-কথা জানলে কি ভাবে? তোমার অভিমতের ভিত্তিটি কি?আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সমাজ-সংস্থাসমূহ তোমাদের সমাজব্যবস্থার তুলনায় উন্নততর। অপেক্ষা করলে চার-পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই দেখতে পাবে যে,

কালকে অতিক্রম করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর তোমাদের মৃত্যু ঘটেছে।' ... এ-ধরনের কথাই তারা বলবে।

এই হচ্ছে উৎকট গোঁড়ামি আর ভগবানের আশীর্বাদে সে মহাসঙ্কট-সমুদ্র আমি অতিক্রম করেছি।

এই গোঁড়ামি ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু গোঁড়ামি ভিন্ন আর কি ছিল? ছিল — বিচ্ছিন্নভাব ও বিভাগ। সমগ্র সমাজটিই—আজকের মত বহু জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর সে-সব বিভাগ আজকের তুলনায় কঠোরতর ছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে লক্ষ্য করবার মত। অধুনা নূতন নূতন জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি করবার দিকে একটি প্রবণতা পাশ্চাত্ত্যেও এসেছে।

আমি নিজে অবশ্য জাতির বাইরে। জাতিগত বন্ধন ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে বন্ধন আমি ছিন্ন করেছি। জাতির ভাল দিকও অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু ভগবান্ করুন—আমি যেন জাতিবন্ধনে আবদ্ধ না হই। 'জাতিগোষ্ঠী' শব্দে আমি কোন্ বস্তুটি বোঝাতে চাই—তা হয়তো আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারণ মনুষ্যসমাজ অতি দ্রুত একে গ্রহণ করে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে বৃত্তির উপরই জাতি নির্ভরশীল। প্রাচীনযুগে হিন্দুদের জীবনলক্ষ্য ছিল সুখ-শান্তিপূর্ণ সাবলীল এক জীবনধারা। কি উপায়ে জীবনের সব কিছু প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে—এই প্রশ্ন। আর তার উত্তর—প্রতিযোগিতা। কিন্তু বংশগত বৃত্তি প্রতিযোগিতা নষ্ট করে দেয়। তুমি কাষ্ঠশিল্পী? সূত্রধর? উত্তম। তোমার পুত্র সূত্রধর হবে।

তুমি? তুমি কর্মকার? কর্মকার-বৃত্তি তো একটি জাতিগত বৃত্তি—অতএব তোমার পুত্রও কর্মকার হবে। ভারতবর্ষে এক বৃত্তির মধ্যে অন্য বৃত্তির কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কাজেই নিরুপদ্রবে একটি বৃত্তি নিয়েই মানুষ জীবন-ধারণ করে।

তুমি যুদ্ধব্যবসায়ী, যোদ্ধা? অথবা তুমি পুরোহিত? উত্তম। তোমার বৃত্তির ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে তোল। পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক। অন্যান্য বৃত্তিও তাই। আবার নিরঙ্কুশ উচ্চক্ষমতা বা উচ্চাধিকারের কথা যদি চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, তারও একটি বিশেষ দিক্ আছে। সে দিকটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রতিযোগিতা সে বরদাস্ত করে না। তবে এরই ফলে এই জাতি-বিভাগের পরিণতিতেই—ভারতবর্ষ মহাকালের প্রভাব অতিক্রম করে বেঁচে রইল, আর অন্যান্য বহু জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্যভাবে এর একটি মন্দ দিকও আছে। এতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ব্যাহত।

সূত্রধরের পুত্রকে কাঠের কাজই করতে হবে—তা সে পছন্দ করুক, আর নাই করুক।বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই এ ব্যবস্থা ভারতীয় শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেই প্রাক-বৌদ্ধযুগের কথাই আমি এখন বলছি।

আধুনিক যুগের সমাজতন্ত্রবাদ এরই অনুকৃতি। এরও ফল হয়তো পরিণামে ভালই হবে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন একটা থেকে যাবে বৈকি। আমার মতে স্বাধীনতাই মূলকথা। ... মুক্ত হও। দেহে মনে ও আত্মায় পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ বন্ধনহীনতা—এই আমার আজীবন কামনা। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনতার সঙ্গে কোন মন্দ কাজ করতেও রাজী আছি, কিন্তু পরাধীনভাবে কোন সৎকাজ করতেও রাজী নই।

যাই হোক, বর্তমানে যে-সব বস্তুর জন্য পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা চীৎকার করছে—ভারতের অসংখ্য নরনারী বহু যুগ পূর্বেই তার অনুশীলন করেছে। ভূমি জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ জাতিবিভাগও ভারতবর্ষে ধিক্কৃত ছিল। ভারতের মানুষ মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রবাদী। কিন্তু এরও ঊর্ধ্বে আর একটি সম্পদ ছিল ভারতবর্ষে; সে সম্পদ ব্যক্তিত্বের। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিনিষেধ আরোপের পরও তারা প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিল। সব কিছুর জন্যই

অবশ্য তারা নীতি-নিয়ম প্রণয়ন করেছে। পান, আহার, নিদ্রা, মৃত্যু—সবই সেখানে নিয়মে বিধৃত। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করবার মুহূর্ত থেকে রাত্রিতে নিদ্রিত হবার কাল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি কর্ম শাস্ত্রীয় বিধানে নিয়মিত। নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম! এ-কথা কি চিন্তা করা যায় যে, একটা জাতি এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে? আইন তো প্রাণহীন। যে দেশে আইন যত বেশী সে দেশের অবস্থা তত মন্দ! সেজন্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ-কামনায় আমরা পাহাড়ে যাই, পর্বতে আত্মগোপন করি—যেখানে কোন আইন নেই, কোন সরকার নেই। যেখানে যত আইন, সেখানে তত পুলিস—তত দুর্জনের প্রাধান্য। আর দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এই বিধিনিয়মের কড়াকড়ি প্রচণ্ড। যে মুহূর্তে একটি শিশুর জন্ম হল, সেই মুহূর্তে সে প্রথমে বর্ণের দাস হল, তারপর হল জাতির।দাসত্বশৃঙ্খলে সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে গেল। তার প্রত্যেকটি কাজ, তার আহার-বিহার, ওঠাবসা—সবই নিয়ন্ত্রিত হবে আইনে, নিয়মে।

আহারকালে গ্রাসে গ্রাসে তাকে প্রার্থনা করতে হবে, জল পান করতেও তাই। দিনের পর দিন—জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ ও সর্বমুহূর্তে এমনি নিয়মাধীন হয়েই তাকে থাকতে হবে। ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয়। অব্যাহত এই প্রণালী অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু তাঁরা চিন্তাশীল লোক ছিলেন—সন্দেহ নাই। তাঁরা জানতেন যে, এমন নিয়মাধীনতায় প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয় না, সেজন্য যথার্থ মুক্তিলাভের একটি ঋজুপথও তাঁরা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। মোটের উপর বিধান এই ছিল যে, শুধু জাগতিক ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক জীবনেই নিয়মাদি প্রযুক্ত হবে; কিন্তু যে-মুহূর্তে কেউ কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করবে, জাগতিক সুখ বিসর্জন দেবে, তন্মুহূর্তে সে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কোন বিধিনিষেধ আর তার উপর প্রযুক্ত হবে না। এদের নাম সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁরা অতীতে কিম্বা বর্তমানে

—কোন কালেই কোন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হননি। তাঁরা এক অনাসক্ত ও মুক্ত মানবগোষ্ঠী—পুরুষ ও নারী উভয়েই তাঁদের মধ্যে আছেন। তাঁরা কখনও বিবাহ করেন না, বিত্ত আহরণ করেন না। তাঁরা কোন নিয়মের অধীন নন, এমন কি বেদবিধি মেনে চলতেও তাঁরা বাধ্য নন। বেদশীর্ষে তাঁদের স্থান। আমাদের সমাজ-সংস্থার ঠিক বিপরীত বিন্দুতে যেন তাঁরা দণ্ডায়মান। জাতিগত বিধি-নিষেধে তাঁরা আবদ্ধ থাকেন না। তাঁদের নিয়মিত করবার মত কোন শক্তিই বিধি-নিষেধের নেই। তাদের সীমিত গণ্ডীকে অতিক্রম করেই সন্ন্যাসীর জীবন। শুধু দুইটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। তাঁরা চিরনিঃসম্বল থাকবেন, চিরকুমার থাকবেন। অর্থ তাঁদের থাকবে না, বিবাহ তাঁরা করবেন না। এই অবস্থায় সমাজের কোন নিয়ম বা অনুশাসন তাঁদের উপর প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা বিবাহ করবেন অথবা অর্থোপার্জন করবেন—সেই মুহূর্তে সমাজের প্রত্যেকটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে, অবশ্য পালনীয় হবে। এই সন্ন্যাসীরাই ছিলেন জাতির জীবন্ত দেবতা এবং এঁদের মধ্য থেকেই শতকরা নিরানব্বই জন মহাপুরুষ উদ্ভূত হয়েছিলেন।

যে-কোন দেশেই হোক, আত্মার পূর্ণ মহিমার উপলব্ধি ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষের উপর নির্ভর করে এবং সে উৎকর্ষ সমাজ-বন্ধনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। বিকাশোন্মুখ ব্যক্তির সমাজ-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই বন্ধনকে সে ছিন্ন করে ফেলতে চায়। যদি কোন সমাজ বাধাস্বরূপ হয়, তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সে নিজেকে বিকশিত করতে চেষ্টা করে।

এই দুই বিপরীত শক্তির মাঝখানেই একটি সহজ পন্থা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, যদি তুমি সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে তুমি যদৃচ্ছা প্রচার করতে পার, শিক্ষা দিতে পার। দূর থেকে আমরা শুধু তোমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব।

ফলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর ও নারীর উদ্ভব তখন সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁরাই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এমন কি সেই মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী উপস্থিত হলে রাজাও নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকতে সাহসী হতেন না। তাঁকে আসন ত্যাগ করে দাঁড়াতে হত। এ যেমন একদিকে, অন্যদিকে, হয়তো আধ-ঘণ্টার মধ্যেই সেই সন্ন্যাসী এক অতি দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষার্থী হয়ে দণ্ডায়মান হতেন এবং এক টুকরা রুটি ভিক্ষা-স্বরূপ গ্রহণ করে প্রস্থান করতেন।

সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ছিল। আজ হয়তো এক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সন্ন্যাসীর রাত্রিযাপন, আবার পরদিন রাজপ্রাসাদের মনোরম শয্যায় তাঁর সুখনিদ্রা। একদিন রাজগৃহে স্বর্ণপাত্রে তাঁর ভোজন, অন্যদিন সম্পূর্ণ অনাহারে এবং বৃক্ষতলে দিনযাপন। এই ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। সমাজ এঁদের অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত। কখনও কখনও নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করতে গিয়ে কোন সন্ন্যাসী হয়তো উৎকট ধরনের কিছু করেও বসত। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তাতে ক্ষুব্ধ হত না, কিছু মনেই করত না। সে শুধু দেখতে চাইত—সন্ন্যাসীর মূল দুটি ধর্ম—পবিত্রতা ও ত্যাগব্রত অব্যাহত রয়েছে কিনা।

তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রবল ছিল বলে তাঁরা নূতন চিন্তা এবং তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। নূতন দেশে তাঁরা যেতেন। পুরাতনের গণ্ডী অতিক্রম করে নূতনের সন্ধান তাঁদের করতে হত। নিয়মাবদ্ধ সমাজে সকলে চাইত পুরাতন গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে—একই ধরনে চিন্তা করতে। কিন্তু মানুষের নিগূঢ় প্রকৃতি এ ধরনের সংস্কারবদ্ধতা বরদাস্ত করে না। নির্বুদ্ধিতার চেয়ে মানুষের সদ্বুদ্ধি অধিক শক্তিশালী। দুর্বলতার চেয়ে সবলতাই অধিক ক্রিয়াশীল; অসদ্বস্তু থেকে সদ্বস্তু সবলতর। সেইহেতু গণ্ডীবদ্ধ মানুষের একঘেয়েমী বজায় রাখবার চেষ্টা সফল হয়নি। যদি হত, যদি তারা

সকল মানুষকে একই ধরনের চিন্তাধারায় গ্রথিত করতে সমর্থ হত, তবে আমরা জড়ত্বপ্রাপ্ত হতাম। চিন্তাজগতে আমাদের মৃত্যু হত।

বস্তুতঃ এখানে এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যার কোন জীবনীশক্তি ছিল না, যার সদস্যগণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। পরস্পরকে সাহায্য করতে তারা বাধ্য ছিল। নিয়ম-বন্ধন এত কঠোর এবং নির্মম ছিল যে, কোন কাজই নিয়ম-বহির্ভূত হবার উপায় ছিল না। কিভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে, কিভাবে হাতমুখ প্রক্ষালিত হবে, এক কথায়, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি—সবই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

আর, এ-সব গণ্ডীবদ্ধতার বাইরে ছিল সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ব্যক্তিস্বাধীনতা। আর সেই শক্তিশালী সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকেই নিত্যনূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হচ্ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। একটি নারীর এরূপ কাহিনী আছে, তিনি বয়স্কা ছিলেন। তাঁর ধরন-ধারণ একটু অস্বাভাবিক রকমের ছিল। কিন্তু নিত্যনূতন চিন্তার অবতারণা তিনি করতে পারতেন। তাঁকে অবশ্য অনেকে অনেক সময় সমালোচনা করত। আবার তাঁকে সমীহও করত, নীরবে তাঁর নির্দেশ পালনও করত। এ-ধরনের নরনারী প্রাচীনযুগে একাধিক ছিলেন।

আবার সেই নিয়মবদ্ধ সমাজে ক্ষমতা ছিল পুরোহিত-শ্রেণীর হস্তে। সমাজের স্তরবিন্যাসে—বর্ণশ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকেই পুরোহিত হতেন এবং তাঁদের যে কাজ ছিল—তাতে ‘পুরোহিত’ শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দে তাঁদের অভিহিত করা যায় বলেও আমার মনে হয় না। অবশ্য এদেশে যে-অর্থে ‘পুরোহিত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। পুরোহিতগণ ধর্ম বা দর্শন শিক্ষা দিতেন না। সমাজে নির্দিষ্ট বিধিবিধানসমূহ যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, সেটি দেখা এবং সে-বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের কাজ ছিল। বিবাহ

দেওয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে উপাসনা করাও তাঁদের কাজ ছিল। ফলকথা, সমাজের ক্রিয়াকর্মে, উৎসবানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য ছিল শ্রেষ্ঠ আশ্রম। প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে—এই ছিল অনুশাসন। বিবাহ ভিন্ন কোন ধর্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মাত না। অবিবাহিত পুরুষ বা নারী পূর্ণ মানুষ বলে বিবেচিতই হত না! অবিবাহিত পুরোহিতেরও ক্রিয়াকর্মে অধিকার থাকত না। অবিবাহিত ব্যক্তি সমাজে বেমানান বলেই বিবেচিত হত।

এ-কালে পুরোহিতের ক্ষমতা খুব বেড়েছিল। যাঁরা সমাজপতি, আইন-প্রণয়ন যাঁদের কাজ, তাঁদের নীতিই এমন ছিল, যাতে পুরোহিতগণ সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। এদেশেরই মত একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁদের মধ্যেও ছিল, যার প্রভাব পুরোহিতবর্গের হাতে অধিক অর্থ যেতে পারত না। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পুরোহিতদের, সামাজিক মর্যাদাই বড় হোক, আর্থিক মর্যাদা নয়।

এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরোহিতগণ সব দেশেই মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে আবার সে মর্যাদা এত বেশী ছিল যে, অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণও আজন্ম সামাজিক মর্যাদায় রাজা অপেক্ষা উন্নত। সমাজব্যবস্থা তাঁকে চিরদারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করবে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে সম্মান দেবে প্রচুর। তাঁদের জন্য বাধানিষেধ ছিল সহস্র ধরনের। আবার যার বর্ণ যত উচ্চ, তার ভোগ-সুখের পথে বিধিনিষেধ ছিল তত কঠিন। তাছাড়া, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আহারাদির উপরও প্রচুর নিয়মবিধি আরোপিত ছিল। বর্ণ যত উন্নত হবে, আহারাদির ব্যবস্থা তত কঠোর হবে এবং আহার্য-বস্তুনিচয়ের সংখ্যা তত সীমাবদ্ধ হবে। জীবনধারণের জন্য যে-সকল বৃত্তি তাঁরা অবলম্বন করতে পারবেন, সেগুলিও অতি অল্প কয়েকটি বৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই ছিল ব্যবস্থা। আপনাদের কাছে তাঁদের জীবন একটি অন্তহীন কঠোরতার নিদর্শন বলে মনে হবে। আহারে, বিহারে,

পানে, গ্রহণে—সর্বক্ষেত্রেই অফুরন্ত বিধিনিষেধ।

আবার সে-সব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে যে-সকল শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাও নিম্নতর বর্ণের থেকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বহুগুণ নির্মম ছিল। একজন নিম্নবর্ণের লোকের জন্য মিথ্যাভাষণের দণ্ড যতি হত এক টাকা, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে—তাঁর উচ্চতর জ্ঞানের জন্য দণ্ড হত শতগুণ।

প্রারম্ভিক অবস্থায় অবশ্য ব্যবস্থাটি অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু উত্তরকালে এমন একটি সময় উপস্থিত হল, যখন এই পুরোহিত-সম্প্রদায় প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তখনই তাঁরা এই মূল কথাটি বিস্মৃত হলেন যে, তাঁদের ক্ষমতার রহস্য দারিদ্র্যের মধ্য নিহিত; বিস্মৃত হলেন যে, তাঁরা এমন একটি মানবগোষ্ঠী, যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন, চিন্তা করবেন—এবং সে সুযোগ দানের জন্যই সমাজ তাঁদের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের ভোগ-পিপাসা জাগ্রত হল এবং অর্থলাভের জন্যও তাঁরা হাত বাড়াতে লাগলেন। আপনাদের পরিভাষায় যাদের ‘অর্থগৃধ্ন’ 'money-grabbers' বলে—তাঁরা তাই হয়ে উঠলেন এবং অন্য সব কিছু বিস্মৃত হলেন।

ব্রাহ্মণের পর দ্বিতীয় জাতি হল ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন—এই ছিল তাঁদের কাজ। প্রকৃত ক্ষমতা এঁদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। আর তাঁদের মধ্য থেকেই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উদ্ভব হয়েছে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে নয়। সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। অবতারপুরুষ বলে আমাদের সমাজে যাঁরা পূজিত, তাঁদের সকলেই ক্ষাত্রকুলোদ্ভব, একটিও ব্যতিক্রম নেই। মহামনীষী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঐ ক্ষত্রিয়কুল থেকে। রামচন্দ্রও ক্ষাত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশের খ্যাতনামা দার্শনিকগণ প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন এবং রাজসিংহাসন থেকেই ত্যাগব্রতী দার্শনিকদের উদ্ভব হয়েছে।

আবার ঐ রাজসিংহাসন থেকেই নিয়ত এ-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে —'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর'।

যুদ্ধব্যবসায়ীরা দেশের শাসনকর্তা, তাঁরাই দার্শনিক, তাঁরাই উপনিষদের প্রবক্তা।চিন্তায়, ধীশক্তিতে পুরোহিতবর্গ অপেক্ষা এঁরা উন্নত ছিলেন। ক্ষমতাও এঁদেরই অধিক ছিল, কারণ এঁরাই ছিলেন রাজা। অথচ আধিপত্য করতেন পুরোহিতগণ এবং ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টাও তাঁরা করতেন। ফলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—এই দুই বর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার প্রথম ভাষণটিতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষে দুইটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান—একটি আর্য, অপরটি অনার্য। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই তিন বর্ণের বাহিরে যে জনসমষ্টি, সেটি সমগ্রভাবে 'শূদ্র' নামে অভিহিত, আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তই তারা নয়। বহু বিদেশী পর্যটক বাহির থেকে এসে এই শূদ্রদেরই দেখেছে। তারাই ছিল দেশের আদিবাসী। যাই হোক, কালক্রমে অনার্যগোষ্ঠীর বিপুল জনসমষ্টি এবং আরও যারা নানাজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়ে অনার্য জাতির দেহে মিশে গেল, তারা সবাই ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠতে লাগল এবং আর্যদের অনুরূপ অধিকার-লাভের জন্য প্রয়াসী হল।

তারা শিক্ষালাভের জন্য আর্যদের মত বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে চাইল; উপবীত ধারণ করতে চাইল; ক্রিয়া, কর্ম ও উৎসবের অধিকার চাইল। ধর্ম এবং রাজনীতিতেও সমান অধিকার দাবী করল।

অবশ্য পুরোহিতগণ স্বভাবতই এ দাবীর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলেন। পৃথিবীর সর্বদেশেই পুরোহিতবর্গের এই রীতি। তাঁরা স্বতই অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে থাকেন। আর যতদিন পৌরোহিত্য

একটি বৃত্তি থাকবে, ততদিন এ গোঁড়ামি থাকবেই। কারণ তাঁদের নিজ স্বার্থের খাতিরেই এ গোঁড়ামির প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং অনার্যগোষ্ঠীর সে দাবী এবং বিক্ষোভ দমন করবার জন্য পুরোহিতগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। আবার আর্যগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রবল ধর্মবিক্ষোভ দেখা দিল এবং সে বিক্ষোভ পরিচালনা করলেন ঐ ক্ষত্রিয়গণ।

আরও এক সনাতনপন্থী সম্প্রদায় ছিল ভারতবর্ষে—সে জৈন সম্প্রদায়। সে সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়াও বটে, প্রাচীনও বটে। হিন্দুশাস্ত্র বেদের প্রামাণিকতাই এরা অস্বীকার করেছিল। তারা নিজেরা কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিল এবং এ-কথাও ঘোষণা করেছিল যে, তাদের প্রণীত গ্রন্থাদিই যথার্থ বেদ। আর যেগুলি বেদ-নামে প্রচলিত —সেগুলি সর্বসাধারণকে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা রচনা করেছিল। অবশ্য তাদের কর্মপন্থাও ঐ একই ধরনের ছিল।

এ-কথা মনে রাখতে হবে যে—নিজ ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে হিন্দুদের যে যুক্তি, সে যুক্তি নিরসন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেজন্য জৈনদের দাবীও হিন্দুদেরই অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তাদের ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেই সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে। আর সর্বসাধারণে প্রচলিত যে ভাষা, শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও সেই ভাষাতেই রচিত।

তখনই সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। তার সঙ্গে তৎকালীন কথ্যভাষার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল, যেমন সম্পর্ক দেখা যায়—বর্তমান ইতালীয় ভাষার সঙ্গে প্রাচীন লাতিন ভাষার। জৈনধর্মাবলম্বিগণ পালিভাষায় নিজ শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করেছিল, সংস্কৃত ভাষায় নয়। কারণ তারা বলত সংস্কৃত আর সজীব ভাষা নয়, ওটি মৃতভাষার পর্যায়ভুক্ত।

তাদের আচার-প্রণালীতেও তারা ছিল স্বতন্ত্র। তাদের আচার-

পদ্ধতিতেও তারা স্বতন্ত্র ছিল। বস্তুতঃ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র এই বেদ এক বিশাল শাস্ত্র-সংগ্রহ। এর কতকাংশ একেবারে স্থূল ও অসার, অপরাংশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পূর্ণ—এ-অংশ থেকেই ধর্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। আর এ-সব সম্প্রদায়ের সকলেই বেদের ঐ অংশটুকই প্রচার করে বলে দাবী করে থাকে।

প্রাচীন-বেদে আবার তিনটি স্তরবিভাগ দেখা যায়। প্রথমে কর্ম, দ্বিতীয়তঃ উপাসনা এবং তৃতীয়তঃ জ্ঞান। কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করলেই ভগবান্ মানুষের অন্তরে প্রতিভাত হবেন। তিনি যে নিরন্তর অন্তরেই অধিষ্ঠিত—এ-উপলব্ধিও তখন তার হবে। অন্তরের বিশুদ্ধতার ফলেই এ-উপলব্ধি সম্ভব হয়। শুধু কর্ম এবং উপাসনার দ্বারাই মন পবিত্র হতে পারে। সেই একমাত্র পন্থা। মুক্তি তখন করায়ত্ত হয়। অতএব কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই তিনটি সোপান-বিশেষ। যে সম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাঁদের বিচারে কর্মের অর্থই অপরের উপকার-সাধন। এ-কথার তাৎপর্য অবশ্যই একটি আছে। কারণ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কর্মের অর্থই ছিল বিস্তৃত উৎসবানুষ্ঠান—গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুবলি অথবা অন্যবিধ প্রাণীদের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি-প্রদান।

এখন জৈনধর্মাবলম্বিগণ এ-সব কর্মের বিরুদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ করত। তারা বলত যে, এ-সব কর্ম কর্মই নয়। অন্যকে আঘাত দেওয়া কখনও সৎকার্য হতে পারে না। পরন্তু এ-সব কর্মে এ-কথাই প্রমাণ করে যে, ব্রাহ্মণদের বেদ মিথ্যা; সেটি পুরোহিতদের তৈরী একটি পুস্তকমাত্র। কারণ কোন মহৎ গ্রন্থ মানুষকে প্রাণিহত্যা করতে নির্দেশ দেবে—এটা অসম্ভব, এটা অবিশ্বাস্য। অতএব প্রাণিহত্যা, পশুবলি প্রভৃতির যে-সব নির্দেশ বেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্মণদেরই রচনা। কারণ সেগুলি তাদেরই স্বার্থের অনুকূল, তাদেরই অর্থাগমের সহায়ক। কাজেই সে-সবই পুরোহিতদের কৌশলমাত্র।

জৈনদের আর একটি মত হচ্ছে এই যে, ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, আর সেই সূত্রে ধনসম্পদ সংগ্রহ করার জন্য পুরোহিতদেরই সৃষ্টি—এই ভগবান্। সবটাই এক বিরাট ধাপ্পা। অস্তিত্ব আছে প্রকৃতির, অস্তিত্ব আছে আত্মার। ব্যস্, আর কিছু নেই, ভগবান্ অবাস্তব—অস্তিত্বহীন।

এ-জীবনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আত্মা জড়িয়ে পড়েছে। দেহ যেন একটি বহির্বাসরূপে তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সুতরাং সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে যাও। সেটিই পথ।

এদের মতবাদ থেকেই জড়বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছিল। এরাই জগতে কৃচ্ছসাধনার প্রথম শিক্ষক। অপরিশুদ্ধতা থেকেই যদি দেহের জন্ম হয়, তবে দেহটি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নয়। যদি কেউ কিছুকাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—উত্তম, সেটি তার শাস্তিস্বরূপ হয়ে গেল। যদি অকস্মাৎ দেয়ালে মাথাটি ঠুকে যায়, তবে সেটিও একটি আকাঙ্ক্ষিত শাস্তিমাত্র।

একদা ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ—সেণ্ট ফ্রান্সিস তাঁদের অন্যতম—কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেছিলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সহযাত্রী পথ চলছিলেন। কথা হচ্ছিল এই নিয়ে যে, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁরা যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা করবেন কিনা, তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন কিনা। সহযাত্রীটি বললেন, খুব সম্ভব তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করবেন না—প্রত্যাখ্যান করবেন। তদুত্তরে সেণ্ট ফ্রান্সিস বলেছিলেন, 'তাঁর প্রত্যাখ্যানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বন্ধু! যদি দ্বারে আমাদের করাঘাত শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের দূর করে তাড়িয়ে দেন, তবে সেটাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না; অথবা তিনি যদি আমাদের হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেন, তাহলে সেটিও পর্যাপ্ত হল বলে আমি মনে করব না;

তবে যদি আমাদের হাত-পা সব দৃঢ়ভাবে বেঁধে, বেত্রাঘাতে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্তমোক্ষণ করিয়ে তিনি আমাদের ঘরের বাইরে বরফের মধ্যে ফেলে রাখেন, তবে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য- লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে।'

এমনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার একটি মনোভাব সে-যুগে বিদ্যমান ছিল।

বস্তুতঃ জৈনরাই ছিল কৃচ্ছ্রসাধনার পথিকৃৎ। তবে সেই সঙ্গে তারা কিছু কিছু মহৎকার্যও সম্পন্ন করেছিল। তাদের কথা ছিল—কাউকে আঘাত কর না, দুঃখ দিও না, যথাশক্তি অপরের উপকার সাধন কর। এই কর্ম, এই নীতি ও সদাচার—এ-ছাড়া আর যা কিছু সবই ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া বাজে জিনিষ; সেগুলি বর্জন কর।

এই মতবাদের ভিত্তিতেই তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং এটিকেই নানাভাবে পূর্বাপর তারা বিস্তৃত করেছিল। সে এক বিচিত্র আদর্শ। শুধু অ-বৈরী ও পরোপকারের ভিত্তিতে সকল নৈতিক আদর্শকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—একটি অভিনব আদর্শ বৈকি!

বুদ্ধদেবের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্বেকার এই সম্প্রদায়। আবার বুদ্ধদেবও খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে-পাঁচশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। এরা সমগ্র প্রাণিজগৎকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যে সর্ব নিম্নস্তরের যে জীব, তার মাত্র একটি ইন্দ্রিয় বর্তমান, সেটি স্পর্শেন্দ্রিয়। তার উপরের স্তরে রয়েছে স্পর্শ ও আস্বাদন-ইন্দ্রিয়। তারও উপরে—স্পর্শ-স্বাদ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়। চতুর্থ স্তরে আবার—পূর্বের তিনটির সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় যুক্ত হয়।আর সর্বশেষ স্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সবই বর্তমান থাকে।

এক বা দুই ইন্দ্রয়বিশিষ্ট যে-সব প্রাণী—তারা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। তারা জলমধ্যে অবস্থান করে। এদের—এই অতি-নিম্নপর্যায়ের প্রাণীদের হত্যা করা অতি ভয়াবহ কার্য।

এ-যুগে প্রাণিজগতের এ-সকল তত্ত্ব অতি অল্পদিন আগে মাত্র জানা গেছে। তৎপূর্বে এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। জৈনদের মত এই ছিল যে, সর্ব নিম্নস্তরে প্রাণীদের এক স্পর্শানুভূতি ভিন্ন আর কিছু নেই। তার উপরের স্তরের প্রাণীরাও অদৃশ্য। জৈনরা জানত যে, এ-সব প্রাণী শুধু জলেই বাস করে এবং জল ফুটালে এরা মারা যায়। কজেই জৈনসন্ন্যাসীরা তৃষ্ণায় মরে গেলেও নিজেরা জল ফুটিয়ে পান করতেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থী হয়ে কোন গৃহে গেলে গৃহস্থ যদি জল পান করতে দিত, তবে সে জল তাঁরা গ্রহণ করতেন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণিহত্যার দায় ছিল গৃহস্থের, আর জল পানের সুবিধাটুকু মাত্র ছিল তাঁদের নিজেদের।

অহিংসার ধারণাটিকে এরা ক্রমশ এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। যেমন—স্নানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় মনে করে এরা স্নানই করত না। এরা নিজেরা মরতে প্রস্তুত ছিল। কারণ মৃত্যু এদের কাছে এক অতি তুচ্ছ পরিণতি ছিল। আর অপর কোন প্রাণীকে হত্যা করে বেঁচে থাকতেও এরা প্রস্তুত ছিল না।

এদেরই সমসাময়িক কালে আরও নানা কৃচ্ছসাধন-পরায়ণ সম্প্রদায় ছিল এবং এই কৃচ্ছসাধনার কালেই পুরোহিত এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে রেষারেষি ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা বিক্ষুদ্ধ সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল।

আরও কঠিন সমস্যা ছিল জনসাধারণকে নিয়ে। কারণ এ-কালেই জনসাধারণ সর্ববিষয়ে আর্যদের সম-অধিকার দাবী করছিল। প্রকৃতির নিত্য-প্রবহমান স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে জল পানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া তাদের পক্ষে যেন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই মহাসন্ধিক্ষণেই সেই বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবন এবং চরিতকথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। নানা অলৌকিক ঘটনা বা কাহিনীতে মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও—যা মহাপুরুষ মাত্রেরই জীবনে হয়ে থাকে—বুদ্ধদেব জগতের ইতিহাস-স্বীকৃত মহাপুরুষগণের অন্যতম। বস্তুতঃ এদিক থেকে মাত্র দুজন মহাপুরুষের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র উভয়েই একমত, একজন সুপ্রাচীন বুদ্ধদেব, অপরজন হজরত মহম্মদ। সুতরাং এঁদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অন্যান্য মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের উক্তি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু আমাদের হাতে নেই।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আপনারা জানেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার-পুরুষরূপে তিনি পূজিত। তাঁর কাহিনী বহুলাংশে আখ্যান-চরিত মাত্র।

শুধু তাঁর অনুগামী শিষ্যগণই তাঁর জীবনের অধিকাংশ কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর ফলে, অনেক সময় একই ব্যক্তির মধ্যে যেন একাধিক ব্যক্তি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে।বস্তুতঃ বহু অবতারপুরুষ সম্বন্ধেই আমরা খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ শত্রু ও মিত্র—উভয়পক্ষই তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আরও একটি কথাঃ মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে যত কাহিনী, যত অলৌকিক গল্প ও উপাখ্যান জড়িত হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাহ্য কাহিনীসমূহের অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সত্তা, একটি আভ্যন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে। কিন্তু এ মহাপুরুষটির জীবনে কোন স্তরে কোন সময়ে স্বকীয় প্রয়োজনে কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে কোন আখ্যায়িকা রচিত হয়, তখনই সেই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ও মহিমায় সেটি অনুরঞ্জিত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের বেলায়ও তাই হয়েছিল সত্য;

কিন্তু তাঁর জীবন বা চরিত্র নিয়ে যত উপাখ্যান রচিত হয়েছে, তার কোনটিতে কোথাও কোন অসদাচরণ বা নীচকার্যের ইঙ্গিত নেই। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর প্রশংসাই করেছে।

জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ এত পবিত্র ছিলেন, এত নির্মল ছিলেন যে, যে-ই তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছিল, সে-ই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরিত্রাণ লাভ করেছিল। ফলে দেবতাগণ এক সভা আহ্বান করে নিজেদের অসহায় অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। কারণ যাগযজ্ঞের উপরই ছিল দেবতাদের নির্ভর, যজ্ঞভাগই ছিল দেবতাদের প্রাপ্য। আর বুদ্ধের প্রভাবে সেই যাগযজ্ঞই বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে দেবতাদের আহার যেমন বন্ধ হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁদের প্রভাবও তেমনি বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং দেবতাগণ তখন এ-কথাই ঘোষণা করেছিলেন, ‘যেমন করেই হোক, বুদ্ধকে পতিত করতে হবে। তাছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। তার পবিত্রতা আমাদের পক্ষে দুঃসহ।’

এ-সিদ্ধান্তের পরই দেবতামণ্ডলী বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে সৌম্য, তোমার কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমরা একটি মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করেছি। সেজন্য একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে হবে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করেও এমন একটি পবিত্র স্থান আমরা বের করতে পারলাম না, যেখানে সে অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়। তবে এখন সে স্থানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তুমি যদি নিজ বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে শয়ন কর, তবে তোমারই বুকের উপর আমরা অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে পারি।’

বুদ্ধ বললেন, ‘তাই হবে। আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন।’ দেবগণ বুদ্ধের বুকের উপর বিশাল অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং ভাবলেন যে, অগ্নির উত্তাপে বুদ্ধের মৃত্যু হবে। কিন্তু তা হল না। বুদ্ধ মরলেন না। তখন দেবতাগণ একান্ত হতাশ হলেন এবং তাঁদের হাতাশার ভাব

সর্বত্র প্রকাশ করতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেবকে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বুদ্ধকে হত্যা করা গেল না।

তখন সে অগ্নিকুণ্ডের নীচ থেকে এই প্রশ্ন শব্দিত হলঃ 'আপনারা এ বৃথা শ্রম করছেন কেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী?' উত্তর হল, 'তোমার পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে যে-ই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে-ই শুদ্ধ হয়ে যায়, আর কেউ আমাদের উপাসনা করে না, সেজন্য তোমার ধ্বংস আমরা কামনা করছি।'

তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন, 'তাহলে আপনাদের পরিশ্রম বৃথা। পবিত্রতা কখনও ধ্বংস হয় না।'

এই কাহিনী বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের রচনা। অথচ এর মধ্যেও বুদ্ধচরিতের প্রতিকূলে শুধু এই দোষটুকুই আরোপিত হয়েছে যে, তিনি এক অদ্ভুত ধরনের পবিত্রতা প্রচার করেছিলেন। আর কিছু নয়। বুদ্ধের মতবাদ সম্বন্ধে আপনাদের অনেকে কিছু কিছু অবগত আছেন।

বর্তমান কালের যে-সব চিন্তাশীল মনীষী অজ্ঞেয়বাদী বলে পরিচিত, তাঁদের কাছে বুদ্ধের মতবাদের বিশেষ একটি আবেদন আছে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান্ প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর কথা এই ছিলঃ 'আর্য-অনার্য-নির্বিশেষে জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে—প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে ধর্মের উপর, অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের উপর, স্বাধীনতার উপর।অতএব সে-অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকেই আমি আহ্বান করি।'

কিন্তু এ-ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হতেই তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। একদা পাঁচজন তরুণ—সকলেই ব্রাহ্মণ—একটি প্রশ্নের উপর তর্ক-বিতর্ক করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। 'সত্য-লাভের পথ কি?'—এই ছিল

তাদের প্রশ্ন। তাদের একজন বলল, 'আমাদের মতে—এইটি সত্যের পথ। আমার পূর্ব- পুরুষগণ এ-কথাই প্রচার করেছেন।'

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি কিন্তু অন্যরূপ শিক্ষা লাভ করেছি, এবং আমার বিশ্বাস আমাদের নির্দিষ্ট পথটিই সত্যলাভের একমাত্র পথ।'

'হে আচার্য—এখন এর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

বুদ্ধদেব তখন তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে এই কথা বলেছিলেন, 'তোমাদের আত্মগোষ্ঠী সবাই সত্যলাভের জন্য এক একটি পথ নির্দেশ করেছেন। উত্তম! কিন্তু তুমি নিজে কি ঈশ্বর দর্শন করেছ? অথবা তোমাদের পিতা কিম্বা পিতামহ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'

'না, তাঁরা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেননি. তাঁদের পিতা-পিতামহও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

'আচ্ছা, তোমাদের আচার্যদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'

'না, তাঁরাও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

সকলের মুখেই এক উত্তর। সকলেরই এক কথা। কেউ তারা ঈশ্বর দর্শন করেননি।

তখন বুদ্ধদেব সেই পঞ্চ-তরুণকে একটি উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন; বলেছিলেনঃ দেখ, একবার এক গ্রামে হঠাৎ কোথা থেকে একটি যুবক উপস্থিত হয়েছিল। সে কখনও কাঁদছে, কখনও বিলাপ করছে, কখনও চীৎকার করছে। বলছে, 'আহা আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি, নিবিড়ভাবে ভালবাসি।' তার চীৎকারে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে তুমি ভালবাস? কে সে?' 'তা আমি

জানি না।’ ‘কোথায় থাকে সে কন্যা? তার চেহারাই বা কেমন?’ ‘হায়, আমি সে-সব কিছুই জানি না। কোন সংবাদ রাখি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি।’

এখন এই যুবকটি সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কি—তা আমি জানতে চাই।

তরুণগণ তখন সবাই একযোগে বলে উঠল, ‘কেন মশাই, ও তো একটি আস্ত নির্বোধ! যাকে সে জানে না চেনে না, যাকে কখনও দেখেনি—এমন একটি অবাস্তব মেয়ের জন্য যে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে, তাকে একান্ত বেকুব ভিন্ন আর কি বলা যাবে?’

তখন বুদ্ধ বললেন, ‘তাহলে তোমরাও কি অনেকাংশে তাই নও! তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ যে, তোমরা কিম্বা তোমাদের পিতা, পিতামহ কেউ কখনও ঈশ্বর দর্শন করেনি। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বংশ পরম্পরায় তোমাদের কারও নেই। অথচ সেই ঈশ্বর নিয়েই তোমরা তর্ক করছ, পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চাইছ। একি পাগলামি নয়?’

তখন তরুণগণ বিব্রত হয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন করল, ‘তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত—তাই বলুন।’ বুদ্ধদেব বললেন, ‘বেশ, তবে শ্রবণ কর। আচ্ছা, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ কখনও কি এমন কথা বলছেন যে, ভগবান্ কোপনস্বভাব, ভগবান্ অসৎ?’ ‘আজ্ঞে না, তেমন কথা তাঁরা কখনও বলেননি। তিনি চির-সৎ, চির-পবিত্র—এই তাঁরা বলেছেন।’

‘তাহলে হে তরুণগণ—তোমরা যদি কায়মনোবাক্যে সৎ হও, সর্বভাবে পবিত্র হও, তবেই ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবে। তর্ক-বিতর্ক করে বা পরস্পরকে আক্রমণ করে ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব আমার নির্দেশ এই যে—পবিত্র হও, সৎ হও। সর্বান্তঃকরণে

অপরকে ভালবাস। ভগবানলাভের এই চিরন্তন পথ, অন্য পথ কিছু নাই।’

বুদ্ধের জন্মকালেই প্রাণিহত্যা না করবার এবং জীবে দয়া প্রদর্শন করবার নীতি আদর্শ রূপে গৃহীত ছিল—এ-কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নূতন কিছু করেননি; কিন্তু তিনি নূতন যেটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে—জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত। তাছাড়া আরও একটি অভিনব কাজ বুদ্ধদেব সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশ জন শিষ্যকে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরণ করেছিলেন এই নির্দেশ দিয়েঃ ‘বৎসগণ, তোমরা সকল দেশের সকল মানুষের সঙ্গেই উদার ভাব নিয়ে মিলিত হবে, জাতিধর্মনির্বিশেষে মিলিত হবে, এবং সকলের কল্যাণ-সাধনকল্পে মহাবাণী প্রচার করবে।’

অবশ্য এজন্য হিন্দুরা সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে নির্যাতিত করেনি। তিনি পূর্ণবয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। বরাবর তিনি অতি কঠোর জীবনযাপন করেছেন। কোন দুর্বলতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর বহু মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না। না, সত্যি বিশ্বাস করি না। আমি বরং বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন হিন্দুদের বেদান্তবাদ অনেক বেশী চিন্তাপূর্ণ; বেদান্তের জীবনদর্শন অপূর্ব। বুদ্ধের কর্মপদ্ধতি যে আমি অপছন্দ করি, তা অবশ্য নয়। তবে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা তাঁর মহত্ত্ব এবং তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি। তাঁর মস্তিষ্কে কোন জটিলতা ছিল না। যখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য তাঁর পাদমূলে এসেছিল, তখনও তাঁর মধ্যে তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি; তখনও তাঁর মধ্যে এই মনোভাব সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল—‘আমি আর দশজনেরই মত একজন সাধারণ মানুষ।’

আপনারা জানেন, হিন্দুরা মানুষ-পূজা করতে ভালবাসে, সেদিকে

তাদের আগ্রহ ঐকান্তিক। যদি আপনারা কিছু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, তবে দেখতে পাবেন, আমাকেও বহু লোক পূজা করবে। যদি হিন্দুদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মপ্রচার করে, তবে জীবিতকালেই তাঁকে তারা পূজা করতে শুরু করে। ফল-কথা, কাউকে পূজা করবার আগ্রহ এবং প্রবণতা তাদের চিরন্তন। অথচ তাদেরই মধ্যে বাস করেও বিশ্ব-বিখ্যাত বুদ্ধদেব আজীবন এ ঘোষণাই করে গেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ-মাত্র। এ ছাড়া অন্য কোন উক্তি তাঁর কণ্ঠ থেকে তাঁর কোন ভক্ত কখনও বের করতে পারেনি।

তাঁর অন্তিম বাক্যগুলি চিরদিন আমার অন্তরে একটি অব্যক্ত স্পন্দন জাগ্রত করেছে। তিনি তখন বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী; ঠিক সে-সময়ে একজন অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল; সে গলিত মাংসভোজী। হিন্দুরা সেই জাতের কাউকে লোকালয়েই প্রবেশ করতে দেয় না। সেই শ্রেণীর একটি লোক সশিষ্য বুদ্ধদেবকে তার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে দীন দরিদ্র ব্যক্তিটির নাম চুন্দ। সে তার সাধ্যমত, যুক্তি বিবেচনামত সেই মহান্ আচার্যকে আপ্যায়িত করতে চেয়েছিল। তাই প্রচুর শূকর-মাংস এবং অন্ন প্রস্তুত করে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যগণকে সে পরিবেশন করল। বুদ্ধদেব একবার সেই আহার্যগুলি তাকিয়ে দেখলেন। শিষ্যেরা সবাই ইতস্ততঃ করছিল —তারা সেই ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে কিনা। বুদ্ধদেব তখন তাদের বললেন, 'এ আহার্য তোমরা কেউ গ্রহণ কর না, তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তিনি নিজে শান্তভাবে আসনে বসে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন। তিনি সমদর্শী, তিনি আচার্য; অতএব তিনি চুন্দ-প্রদত্ত খাদ্যও গ্রহণ করবেন— এমন কি শূকরের মাংসও খাবেন! তাই তিনি খেলেন, স্থিরভাবে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন।

তিনি তখন মরণাপন্নই ছিলেন। এখন মৃত্যু একেবারে আসন্ন উপলব্ধি করে বললেন, 'ঐ বৃক্ষের নীচে আমার জন্য শয্যা করে দেওয়া হোক। আমার মনে হচ্ছে—আমার প্রয়াণের সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তারপর সেই বৃক্ষমূলেই তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন, আর সেই শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেননি। ঐ বৃক্ষতলে শুয়ে তিনি প্রথমেই জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেন, ‘চুন্দের কাছে গিয়ে তাকে জানিয়ে এস, তার মত উপকারী বন্ধু আমার আর কেউ নেই, কারণ তার দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেই আমি নির্বাণ লাভ করতে চলেছি।’

এর পরও কতক লোক তাঁর কাছে উপদেশ লাভের জন্য এসেছিল। একজন শিষ্য তাদের উদ্দেশ্য করে বলছিল, ‘প্রভুর খুব কাছে তোমরা যেও না। তিনি এখন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হতে চলেছেন।’ কিন্তু সে-কথা শোনামাত্র বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, ‘না, না, ওদের আসতে দাও।’ আবার কয়েকজন লোক এল, আবার শিষ্যেরা তাদের বাধা দিতে গেল; কিন্তু আবার বুদ্ধদেব তাদের নিকটে আহ্বান করলেন। তারপর তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডেকে বুদ্ধদেব বললেন, ‘বৎস আনন্দ! আমি চলে যাচ্ছি, সেজন্য শোক কর না। আমার জন্য চিন্তা কর না। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু অবধারিত। তোমরা নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা কর। তোমরা প্রত্যেকেই সর্বাংশে আমারই মত। আমি তোমাদেরই একজন ছাড়া আর কিছু নই। অশেষ তপস্যায় আমি আমার জীবন গঠিত করেছি, সুতরাং তোমরাও অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পার।’

বুদ্ধের শেষ অক্ষয় বাণী ছিল এইরূপঃ ‘কোন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য, তা সে যত প্রাচীন গ্রন্থই হোক, মেনে নিও না। শুধু পূর্বপুরুষগণের উক্তি বলে কোন কথায় বিশ্বাস কর না, অথবা আর দশজন লোক বিশ্বাস করে বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ কর না। প্রতিটি জিনিষ পরীক্ষা কর, যাচাই কর তারপর বিশ্বাস কর। আর যদি কোন কিছু বহুজনের হিতকর হবে বলে মনে কর, তবে সকলের মধ্যে সেটি বিতরণ কর।’—এই শেষ বাণী উচ্চারণ করেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন।

এই মহতী প্রজ্ঞাবাণী অনুধাবনযোগ্য। তিনি দেবতা নন, দানব নন, দেবদূতও নন। না, সে-সব কিছুই তিনি নন। তিনি শুধু একজন দৃঢ়চিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ নিখুঁত, পরিপুষ্ট এবং জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সতেজ ও ক্রিয়াশীল। মোহ নেই, ভ্রান্তি নেই—এই বুদ্ধের স্বরূপ। তাঁর অনেক মতবাদের সঙ্গেই আমি একমত নই, আপনাদের অনেকেও হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু আমি ভাবি—আহা, তার মহাশক্তির এক কণাও যদি আমার থাকত! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান দার্শনিক তিনি। প্রবল ব্রাহ্মণ্যশক্তির অত্যাচারের কাছে কখনও তিনি মাথা নত করেননি। না, কখনও না। সর্বত্র সহজ ও ঋজু—এই তাঁর প্রকৃতি ছিল। দুঃখীর দুঃখে তিনি দুঃখী, তাদের সাহায্যে তিনি মুক্তহস্ত। আবার সঙ্গীতসভায় তিনি মহাসঙ্গীতজ্ঞ। শক্তিমানের মধ্যে তিনি মহাশক্তিমান্। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক প্রাজ্ঞ মনীষী, সেই সমর্থ শক্তিমান্ পুরুষ।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর মতবাদের সবকিছু আমার বোধগম্য নয়। আপনারা জানেন—হিন্দুমতে মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করেন, সেই আত্মাকে তিনি স্বীকার করেননি। আর আমরা—হিন্দুরা এ-কথা বিশ্বাস করি যে, মানুষের মধ্যে শাশ্বত একটি পদার্থ আছে—যেটি অপরিবর্তনীয়, যেটি অনন্তকাল স্থায়ী। সেই পদার্থ আত্মা; তার আদি নেই, অন্ত নেই—সে-ই ব্রহ্ম। কিন্তু বুদ্ধদেব এই আত্মা, ব্রহ্ম—দুই-ই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলতেন, কোন বস্তুর চিরস্থায়িত্বের কোন প্রমাণ নেই। ... সবই নিত্যপরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। নিত্যপরিবর্তনশীল যে চিন্তাস্রোত—তারই সমষ্টিকে 'মন' বলে। একটি ঘূর্ণায়মান মশাল যেন এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করছে, কিন্তু ঐ 'অলাতচক্র'টি মায়া। অথবা একটি নদীর উপমা গ্রহণ করা যেতে পারে—একটি নদী যেমন অবিরাম প্রবাহে গতিশীল, প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে নূতন জলরাশি আসছে এবং চলে যাচ্ছে—জীবনও ঠিক তেমনি; দেহ, মনও তেমনি।

কিন্তু আমি তাঁর মতবাদ ঠিক বুঝতে পারি না। হিন্দুরা কখনও বুঝতে পারেনি। তবে তাঁর মতবাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি আমি বুঝতে পারি। আহা, সেটি একটি মহান্ উদ্দেশ্য—বিরাট উদ্দেশ্য! বুদ্ধদেব বলতেন, জগতে স্বার্থপরতাই প্রচণ্ড অভিশাপ। আমরা স্বার্থপর, তাই আমরা অভিশপ্ত বটে। স্বার্থপরতার কু-মতলব পরিহার করা কর্তব্য। একটি ঘটনা প্রবাহেরই মত জীবন বয়ে চলেছে। নদীপ্রবাহের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে। ঈশ্বর নয়, আত্মা নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও। সৎকাজের জন্যই সৎকাজের অনুষ্ঠান কর—শাস্তির ভয়ে নয়, কোন আকাঙ্ক্ষিত লোকে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েও নয়।

সুবুদ্ধি নিয়ে দাঁড়াও, মতলব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াও। সৎকাজ সৎ বলেই আমি তার অনুষ্ঠান করব, অন্য কোন কারণে নয়—এই হবে উদ্দেশ্য। কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র এই মতবাদ! আমি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে কোন সময়েই একমত নই, এ-কথা পূর্বেই বলেছি; কিন্তু তাঁর নৈতিক প্রভাব আমাকে যেন উৎসাহিত করে তোলে। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করুন, দেখুন তাঁর মত নির্ভীকতা নিয়ে, শক্তি নিয়ে-এক ঘণ্টাও নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াতে পারেন কিনা! আমি তো পাঁচ মিনিটেই যেন ভয় পেয়ে যাই, একটি অবলম্বন যেন আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি—আমি কত ভীরু, কত দুর্বল! আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট মহামানবের কথা চিন্তা করে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। তাঁর যে প্রচণ্ড মহাশক্তি, তার কাছাকাছি যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন শক্তি-প্রকাশ জগৎ ইতঃপূর্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। আমি নিজে তো এরূপ শক্তি এ-পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।

বস্তুতঃ আমরা তো ধর্মভীরু। নিজেকে বাঁচাতে আমরা সর্বদা সচেষ্ট, আর সেটি হলেই আমরা তৃপ্ত হয়ে থাকি। প্রচণ্ড ভীতি, নিগূঢ় স্বার্থপরতা সর্বদা আমাদের মধ্যে কাজ করছে; তারই ফলে আমাদের

ভীরুতার শেষ নেই, ভয়ের অবধি নেই। অথচ এর মধ্যে দাঁড়িয়েই তাঁর এই ঘোষণা—'সৎ বলেই সৎকার্য অনুষ্ঠান কর। কোন প্রশ্ন উত্থাপন কর না, সে-সবই নিরর্থক। গল্পে উপাখ্যানে, সংস্কার-সহায়ে মানুষকে সৎকার্যে প্রণোদিত করা হয়ে থাকে। তথাপি সুযোগ পেলেই সে অসৎকার্যে লিপ্ত হয়। শুধু সৎকর্মের জন্যই যে ব্যক্তি সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে, সে-ই যথার্থ মহৎ। কার্য-মাধ্যমে তার চরিত্রেরই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।'

একদা বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মৃত্যুর পর মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সবই থাকে, সবই থাকে।' কিন্তু মানুষের মধ্যে অক্ষয় পদার্থ কোন্‌টি, সেটি তার চরিত্র—তার দেহ নয়, আত্মা নয়, অন্য কিছুই নয়। আর সেই চরিত্রই কালজয়ী হয়ে জীবিত থাকে। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা তাঁদের চরিত্ররূপ মহাসম্পদই শুধু রেখে গেছেন, রেখে গেছেন আমাদের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য। আর কালে কালে সেই চরিত্র-প্রভাব কাজ করে চলেছে।

বুদ্ধের কথাই বলুন আর যীশুখ্রীষ্টের কথাই বলুন ... এ-জগৎ তাঁদের চরিত্র-মহিমায় উদ্ভাসিত! মহাশক্তি-সমন্বিত এই মতবাদ। যা হোক, আসুন আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই, কারণ সে-প্রসঙ্গে এখনও আমরা পৌঁছাইনি। (সকলের হাস্য।) কাজেই আজ সন্ধ্যায় আরও দু-চারটি কথা আমায় বলতে হবে। ... বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—তাঁর কর্মপন্থা, তাঁর সংগঠন। আজ গীর্জা সম্বন্ধে, ধর্মসংস্থা সম্বন্ধে আপনাদের যে মত ও ধারণা গড়ে উঠেছে—সে-ও তারই চরিত্র থেকে। তিনি মামুলি ধরনের ধর্মসংস্থা পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে একত্র করে নূতন একটি সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। সেই সঙ্ঘে—যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচ-শ বছরেরও পূর্বে ভোটপত্র-সহায়ে মতামত দেবার প্রথা পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল এবং তাঁর সংগঠনও সর্বাংশে নিখুঁত ছিল।পূর্বতন ধর্মসংস্থার বাইরে—এই নূতন ধর্মসঙ্ঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং

ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে প্রভূত সেবামূলক কাজ করেছিল।

এর তিন-শ বছর পরে এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দু-শ বছর পূর্বে মহান্ সম্রাট্ অশোকের আবির্ভাব হয়। পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ‘দেবোপম সম্রাট্’ বলে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তাঁর পিতামহ ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক এবং সে-সময় থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

অধুনা প্রায় প্রত্যহই মধ্য এশিয়ায় কোন শিলালিপি বা ঐ-জাতীয় কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষ তো বুদ্ধ বা অশোকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ এখানে স্তম্ভগাত্রে বা শিলাখণ্ডে প্রাচীন হরফে বহু বাণী উৎকলিত ছিল। কিন্তু সেগুলির পাঠোদ্ধার করতে কেউ সক্ষম ছিল না। ... প্রাচীন মোগল সম্রাটের কেউ কেউ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক ঘোষণা করেও সেগুলির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হননি।

কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে-সব লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পালি-ভাষায় সে-সব বাণী লিখিত। প্রথম শিলালিপিটি এইরূপঃ “ ...

অতঃপর যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং করুণ দুঃখকাহিনী বিস্তারিতভাবে উৎকলিত হয়েছে। এর পরই অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিলালিপিতে লিখেছিলেনঃ ‘অতঃপর, আমার বংশধরগণের মধ্যে কেউ যেন অন্য কোন জাতিকে যুদ্ধে জয় করে যশোলাভের প্রয়াসী না হয়। যদি তারা যশস্বী হতে চায়, তবে অন্য জাতিকে সাহায্য করেই যেন তারা যশ অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাঁরা শিক্ষক ও আচার্য— বিভিন্ন দেশে যেন তাঁদের প্রেরণ করা হয়। তরবারির সহায়তায় যে যশ অর্জিত হয়, সেটা যশই নয়।’

এর পরেই দেখা যায়—কিভাবে অশোক বিভিন্ন দেশে, এমন কি সুন্দর আলেক-জান্দ্রিয়ায় পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছেন। আর বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে ঐ-সব অঞ্চলের সর্বত্র নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল—থেরাপুত্ত, এসিনি প্রভৃতি নামে যাদের খ্যাতি। এ-সব সম্প্রদায় কঠোর নিরামিষাশী।

মহামতি সম্রাট্ অশোক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন মানুষের জন্য তো বটেই, পশুর জন্যও। নানা শিলালিপিতে এই সব চিকিৎসালয় স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে—দেখা যায় ।যখন কোন গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং তার মনিব দারিদ্র্যবশতঃ আর সেটিকে প্রতিপালন করতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে, দয়া করে হত্যা করা হবে না। সে-সব চিকিৎসালয় জনসাধারণের অর্থেই পরিচালিত হত। বহির্বাণিজ্যের ব্যবসায়ীরা বিক্রীত বস্তুর ওজনের উপর হন্দর-হিসাবে যে শুল্ক দিত, সে-সবই ঐ-সকল চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয়িত হত। কাজেই কারও উপর কোন চাপ দেওয়া হত না, অথচ সুব্যবস্থা ছিল সকলের জন্য। তোমার পালিত গাভীটি বৃদ্ধ হয়েছে, তুমি আর রাখতে চাও না, তাকে পশুচিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দাও, তারা রাখবে সেটিকে। এমন কি বিড়াল ইঁদুর প্রভৃতি নিম্নতর প্রাণীদেরও স্থান ছিল সেখানে। মেয়েরা শুধু এগুলিকে মেরে ফেলতে চাইতেন, তাঁরা কখনও কখনও দলবদ্ধ হয়ে নানা বিষাক্ত খাদ্য নিয়ে যেতেন এবং তাই খাইয়ে বহু প্রাণী মেরে ফেলতেন।

কিন্তু অশোকের অভিমত ছিল এই যে, মানুষের জীবন রক্ষা যেমন সরকারের কর্তব্য, প্রাণীদের জীবনরক্ষাও তেমনি সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রাণিহত্যা করা হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে? কোন সঙ্গত যুক্তি নেই তার পশ্চাতে। তবে মানুষের আহারের প্রয়োজনে পশুবধ নিষিদ্ধ করবার পূর্বে সর্বপ্রকার সব্জির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেইজন্যে নানাদেশ থেকে তরকারির বীজ সংগ্রহ করে দেশে বপন

করেছিলেন তিনি এবং সেগুলি আহারোপযোগী হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ-পত্র জারি করেছিলেন যে—প্রাণিহত্যামাত্রই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যে-কোন যোগ্য সরকারের পক্ষে প্রাণীদের রক্ষা করাও অবশ্য করণীয় কার্যরূপে গণ্য হওয়া উচিত। নিজের আহারের জন্য গো ছাগ প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করবার কি অধিকার মানুষে আছে?

এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। কালক্রমে অবশ্য ধর্মপ্রচারকদের নানা অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছিল। তবে তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসাবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তারা কখনও তরবারির সাহায্য গ্রহণ করেনি। আর সেই সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এক বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্মই রক্তপাত না করে এক পা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। মাত্র মস্তিষ্কের শক্তি দিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে ধর্মান্তর গ্রহণ করান —অপর কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। না, কোথাও হয়নি, কোন যুগে হয়নি।

আর আপনারা ঠিক এই জিনিষই করতে চলেছেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। তরবারি দিয়ে ধর্ম শেখান—এই তো আপনাদের প্রণালী! এই তো ধর্মযাজকগণ প্রচার করে থাকেন! বলপ্রয়োগে জয় করে, হত্যা করে ধর্মশিক্ষা দেওয়া! ধর্মশিক্ষার এক বিচিত্র প্রণালীই বটে!

আপনারা জানেন—কিভাবে মহামতি সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে তিনি খুব সৎ লোক ছিলেন না। তাঁর এক ভাই ছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে একবার প্রচণ্ড কলহ হয়। অশোক পরাজিত হয়েছিলেন সেই কলহে। সেই প্রতিহিংসায় নিজ ভ্রাতাকে হত্য করবার সঙ্কল্প করেছিলেন অশোক। তাঁর ভ্রাতা তখন আত্মরক্ষার জন্য এক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে অশোক সেই বিহারে নিজে গিয়ে দাবী করলেন— ভ্রাতাকে তাঁর হাতে সমর্পণ

করবার জন্য। তখন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে এই বাণী প্রচার করেছিলেনঃ ‘প্রতিহিংসা ভাল নয়। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর। ক্রোধ কখনও ক্রোধ দ্বারা শান্ত হয় না, ঘৃণাও ঘৃণা দ্বারা দূরীভূত হয় না। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর—হিংসা জয় কর। হে বন্ধু, একটি অন্যায়ের পরিবর্তে তুমি যদি আর একটি অন্যায় কার্য কর, তবে তার দ্বারা প্রথম অন্যায়টির প্রতিকার হয় না, বরং সংসারে আরও একটি নূতন অন্যায় সাধিত হয়ে থাকে।’ উত্তরে সম্রাট্ বলেছিলেন, ‘ঠিক কথা, ঠিক কথা! কিন্তু তুমি একটি মূর্খ! ঐ ব্যক্তির জীবনরক্ষার জন্য তোমার নিজ জীবনটি বিসর্জন দিতে তুমি প্রস্তুত আছ কি?’

‘হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি সম্রাট্।’ এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্ন্যাসী সম্রাটের সম্মুখে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সম্রাটও তরবারি কোষমুক্ত করে বলেছিলেন— ‘তবে প্রস্তুত হও,’ কিন্তু তরবারির আঘাত আনতে গিয়ে সহসা তিনি সেই সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকালেন। প্রশান্ত সে মুখমণ্ডল, চোখের পলকটি পর্যন্ত যেন পড়ছে না! সম্রাট্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি এ সাহস, এ অকম্পিত ভাব কোথা থেকে আয়ত্ত করলে—ভিক্ষুক সন্ন্যাসী?’

তখন সে সন্ন্যাসী আবার বুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং সম্রাটও বিস্মিত, মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত বাণী আরও শোনাবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এইভাবে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর কাছে অশোক আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে তিনটি জিনিষ আছে। স্বয়ং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও তাঁর সঙ্ঘ। প্রথমে সেই ধর্ম অত্যন্ত সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল। তাঁর মৃত্যকালে তদীয় শিষ্যগণ প্রশ্ন করেছিলেন—‘প্রভু, আপনার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি?’ আপনার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিরূপ স্মৃতিস্তম্ভ আমরা নির্মাণ করব?’

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে নিয়ে তোমাদের কিছুই করণীয় নেই। যদি ইচ্ছা হয়, আমার চিতাভস্মের উপর একটি মাটির স্তূপ নির্মাণ কর। অথবা তাও করবার আবশ্যকতা নেই।’ কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হল। বিশাল মন্দির ও স্তূপাদি বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে নির্মিত হল। বৌদ্ধরাই মূর্তিপূজা প্রচলিত করল, অথচ তার পূর্বে মূর্তিপূজার বিষয় মানুষের জানাই ছিল না, বুদ্ধের নানা অবস্থার মূর্তি, ভোগ-নিবেদন, উপাসনা—সবই এসে গেল। এবং সঙ্ঘের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-সবের জটিলতাও বর্ধিত হতে লাগল। ক্রমে বৌদ্ধমঠগুলি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হল; আর পতনের বীজও উপ্ত হল সেই সঙ্গে।

সন্ন্যাস যদি অল্পসংখ্যক যোগ্য অধিকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেটি ভাল, কিন্তু যখন সেই সন্ন্যাস এমনভাবে প্রচারিত হতে থাকে যে, যে-কোন পুরুষ বা নারী সামান্য আগ্রহ বা অনুপ্রেরণাবশেই সমাজ ও সংসার ত্যাগ করে সেটি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখনই বিপদ; যখন দেখা গেল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক মঠ বা আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং এক-একটিতে শত সহস্র সন্ন্যাসী বাস করছে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ হাজার পর্যন্ত ভিক্ষু একই মঠ-বাড়ীতে বাস করছে—বিরাট বিশাল সব পাকা মঠ বা আশ্রমের বাড়ী, অবশ্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপেই সেগুলি পরিচালিত, তখনই যথার্থ বিপদের কাল—কারণ জাতীয় জীবনস্রোত তখনই ব্যাহত হয়। সৎ গৃহীর অভাবে সৎ পুত্রকন্যা আর সমাজে তখন যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করত না। সবল ও শক্তিমানগণ চলে গেল সমাজের বাইরে, আর দুর্বলের সংখ্যাধিক্য ঘটল সমাজে। ফলে শক্তি ও বীর্যের অভাবেই জাতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল।

এবার বিচিত্র বৌদ্ধসঙ্ঘের কথা কিছু বলব। বিরাট ছিল সে সঙ্ঘ; তবে চিন্তা এবং মতবাদ এক কথা, আর বাস্তবভূমিতে তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্য কথা।

অহিংসা, মৈত্রী—এ সব তত্ত্ব-হিসাবে উত্তম, কিন্তু আমরা সবাই যদি সত্যি সত্যি অহিংস নীতি অবলম্বন করে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দণ্ডায়মান হই, তাহলে এ নগরের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ তত্ত্ব-হিসাবে ঠিক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার সার্থক প্রয়োগের পথ কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। আরও একটি কথা। সেটি বর্ণ বিচার-সম্পর্কে। রক্তের বিশুদ্ধতার দিক্ থেকে বর্ণবিচারের কিছুটা অর্থ আছে। বংশ-ক্রমিকতা অনস্বীকার্য। এদিক থেকে নিগ্রো কিম্বা রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আপনারা নিজেরা কেন রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করতে চান না, সেটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রকৃতিই এর প্রতিকূল হয়ে থাকে। প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা-হেতুই এরূপ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। কোন অদৃশ্য শক্তিই যেন এইভাবে বিভিন্ন জাতিকে রক্ষা করে থাকে। বস্তুতঃ এইটিই আর্যদের বর্ণবিভাগ। তার অর্থ এ নয় যে, নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণদের সমপর্যায়ের নয়, কিম্বা বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। তবে এটা আমরা জানি যে, রক্তের অবাধ মিশ্রণে জাতির অবনতি হয়। আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে কঠোর জাতিবিচার সত্ত্বেও বর্ণবিভেদের প্রাচীর কতকাংশে তারা অপসারিত করেছিল এবং তারই ফলে একাধিক বহিরাগত জাতি তাদের অদ্ভুত আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। পরিচ্ছদে এদের শালীনতা ছিল না, মৃতদেহের গলিত মাংস এরা আহার করত। তথাপি প্রথমাবস্থায় খানিকটা বাহ্য ভব্যতা বজায় ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এদের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, নরবলিপ্রথা, গোষ্ঠীগত কদাচার—সবই ধীরে ধীরে এসে মূল সমাজে প্রবেশ করল। প্রথম দিকে খানিকটা প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরে ঐ-সব দোষই অত্যন্ত প্রবল হল, প্রকট হয়ে উঠল।তাতে সমগ্র জাতি নীচু হয়ে গেল, অসবর্ণ-বিবাহের মধ্য দিয়ে উচ্চ এবং নিম্নবর্ণের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটল এবং জাতি হীনবীর্য হয়ে গেল।

অবশ্য দূর ভবিষ্যতে এটিও শুভ ফলপ্রসূই হয়ে থাকে। ধরুন,

আপনারা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে কিম্বা রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কে মিশ্রিত হন, তবে নিঃসন্দেহ—বর্তমান সভ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বহু শতাব্দী পরে এই মিশ্রণের ফলেই এক দুর্ধর্ষ জাতির উদ্ভব হবে—যার বলবীর্য হবে অতুলনীয়। কাজেই সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে সুফল লাভ হয়ে থাকে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, জগতে মাত্র একটিই সুসভ্য জাতি আছে—সেই জাতি আর্যজাতি। এ একটি বিচিত্র বিশ্বাস সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারি না, কারণ এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমি পাইনি। এই আর্যজাতির শোণিত-মিশ্রণ লাভ করতে না পারলে নূতন সভ্যজাতির উদ্ভব সম্ভব নয়। কোন প্রকার শিক্ষার দ্বারা সেটি হতে পারে না। আর্যজাতির রক্ত হচ্ছে প্রাথমিক প্রয়োজন, তারপর তার সঙ্গে শিক্ষা—এতেই নূতন সভ্যতা জন্মলাভ করে, কেবলমাত্র শিক্ষায় নয়।

আপনাদের দেশের কথা ধরুন—আপনারা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণে সম্মত হন, তবে নিগ্রোদের মধ্যে উচ্চতর সংস্কৃতি-প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সেরূপ রক্ত-মিশ্রণে কি সম্মত হবেন আপনারা?

হিন্দুরা বর্ণবিভাগ পছন্দ করে। ঠিক বলতে পারি না, তবে হয়তো আমার মধ্যেও সে বর্ণবিভাগের ছোঁয়া লেগে থাকতে পারে। পূর্বগ আচার্যগণের আদর্শে আমি বিশ্বাস করি। সে আদর্শ মহান্ আদর্শ। কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ খুব সার্থক হয়নি এবং উত্তরকালে ভারতীয় জাতির অধঃপতনের সেটি অন্যতম কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এর ফলে আবার এক প্রচণ্ড সংমিশ্রণও সঙ্ঘটিত হয়েছিল। যেখানে নানাজাতির রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে—কেউ শ্বেত, কেউ পীত, কেউ আমারই মত কৃষ্ণকায়—অর্থাৎ নানা বিপরীত বর্ণের সংমিশ্রণ, অথচ কোন জাতিই নিজ নিজ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করছে না—সেখানে ধীরে ধীরে এক অভাবিত রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটছে এবং তার

ফলে যথাকালে এক মহাবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপাততঃ সে মহাদৈত্য ঘুমিয়ে থাকবে, তার জাগরণের দেরী আছে। বিভিন্ন জাতির রক্ত-মিশ্রণের এই পরিণাম।

বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির কালে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সমগ্র জগৎ একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত। এক জ্ঞানই সত্য—বহুজ্ঞান অজ্ঞান; সেটি ভ্রম, সেই একত্বের ধারণা থেকেই দ্বৈতবর্জিত অদ্বৈতবাদের উদ্ভব। ভারতীয় চিন্তায় সেই বিশিষ্টতা। যুগ যুগ ধরেই সেই অদ্বৈত মতবাদ ভারতবর্ষে বর্তমান। জড়বাদের উদ্ভব হলে কিম্বা নাস্তিকতা দেখা দিলেই সেই অদ্বৈততত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তাই হল। বৌদ্ধধর্মের মুক্তদ্বারপথে নানা জাতীয় বর্বর তাদের বিচিত্র রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল, আর তারই ফলে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতীয় সমাজে। সেই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন একজন তরুণ সন্ন্যাসী—তিনি আচার্য শঙ্কর। কোন নূতন মতবাদের প্রচার না করে বা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা না করে তিনি বৈদিক ধর্মকেই পুনর্বার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। কাজেই আধুনিক হিন্দুধর্ম—প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপাদানেই গঠিত, বেদান্তের প্রভাব ও প্রাধান্য এখানে প্রবল। তবে যে বস্তু একবার লুপ্ত হয়, তা আর পূর্ব জীবনীশক্তি নিয়ে ফিরে আসে না। কাজেই হিন্দুধর্মের পুরাতন উৎসবানুষ্ঠানাদি আর জীবন্ত হয়ে ফিরে এল না। আপনারা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, প্রাচীন প্রথানুসারে—যে-হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না, সে খাঁটি হিন্দুই নয়। কোন কোন উৎসবে তাকে গোবধ করতেই হত, গোমাংস ভক্ষণ করতেই হত। আর আজ সেই প্রথা একেবারে বীভৎস বলে গণ্য হয়ে থাকে। অন্য সব বিষয়ে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মত-পার্থক্য থাকলেও এ-বিষয়ে আজ সবাই একমতাবলম্বী। কেই আর এখন গোমাংস ভক্ষণ করে না। প্রাচীন যুগের দেবদেবী, প্রাচীন যুগের পশুবলি সবই লুপ্ত হয়েছে, চিরদিনের মত লুপ্ত হয়েছে। আর বর্তমান ভারতবর্ষ বেদের আধ্যাত্মিক অংশটুকু

গ্রহণ করেছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ভারতের প্রথম ধর্মসম্প্রদায়। এই ধর্মসম্প্রদায়ই এ-কথা প্রথমে প্রচার করেছিল যে, বৌদ্ধধর্মের নির্ধারিত পথই একমাত্র পথ—সেই পথের আশ্রয় ভিন্ন মুক্তির আর কোন পথ নেই—সেই পথই সত্য পথ। কিন্তু হিন্দুরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাকায় অন্যান্য দেশের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকদের মত তত নিষ্ঠুর এরা হতে পারেনি। কাজেই অন্যদেরও মুক্তি হবে, তবে বহু বিলম্বে এবং ধীরে ধীরে সেটি হওয়া সম্ভব—এ-কথাও তারা বলত। হিন্দুরক্তের প্রভাবের ফল ছিল সেটা। খুব বেশী নির্মম হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল নির্দেশ।

এদিকে হিন্দুদের মতে অন্য সম্প্রদায়ে যোগদান করা ঠিক নয়। যে যেখানে আছ, সেইখানেই থাক—সেই স্থানটি যেন পরিধি, সেখানে থেকেই কেন্দ্রবিন্দুতে যাত্রা করা যেতে পারে। এইটি ঠিক। হিন্দুধর্মের সুবিধা এই যে, মত বা সূত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব হিন্দুধর্ম আরোপ করে না, আরোপ করে জীবনের উপর। জগতের সর্বোত্তম দার্শনিক মতবাদের অনুগামী হয়েও কেউ যদি আচারে-ব্যবহারে মূর্খ হয়—নির্বোধ হয়, তবে তার জ্ঞান ব্যর্থ। আর যদি জীবনে এবং ব্যবহারে কেউ সৎ হয়, তবে তার আশা আছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে বৈদান্তিকগণ সকলের জন্যই অপেক্ষা করতে পারেন। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে এই যে, এক অদ্বয় বস্তুই নিত্য সত্যরূপে বিরাজিত—তিনিই ব্রহ্ম। স্থান, কাল, কার্যপরম্পরা প্রভৃতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি সৎ, তিনি চিৎ এবং তিনি আনন্দময়—এ-ছাড়া অন্য কোন ভাবে আর তাঁকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি একক সত্য। আমি, তুমি—সজীব, নির্জীব—যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি সত্যরূপে অনুস্যূত। সেই পরজ্ঞানের উপর

আমাদের সমুদয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমানন্দেই আমাদের সকল আনন্দ বিধৃত। মানুষ যখন এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করে, তখন সেই পরম সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়। সে এবং অদ্বৈত সত্য অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব সর্ব মলিনতা অপসারিত হলে, সর্ব স্থূলতা দূরীভূত হলে—সৎ ও পবিত্র স্বভাবের মধ্য দিয়ে মানুষ উপলব্ধি করে—যীশুখ্রীষ্ট যেমন বলেছিলেন—'আমি এবং আমার পিতা এক ও অভিন্ন।'

বৈদান্তিকগণ সকলের জন্য ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে পারেন। যেখানে যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, 'আমি এবং পরমপিতা ঈশ্বর অভিন্ন'—এ উপলব্ধিই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। এটিকে উপলব্ধি করতে হয়। যদি মূর্তিপূজা এ উপলব্ধির সহায়ক হয়, তবে মূর্তিপূজাই বিধেয়। যদি কোন মহাপুরুষ এ-বিষয়ে সাহায্য করতে সক্ষম হন, তবে তাঁকেই পূজা কর। যদি মহম্মদকে পূজা করলে কাজ হয়, তবে তাই কর। কিন্তু যা-ই করবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কর। বেদান্ত-মতে নিষ্ঠাই সিদ্ধির ধ্রুব সহায়ক। কেউ বাদ যাবে না, কেউ প্রত্যাখ্যাত হবে না। তোমার চিত্ত—যেখানে সর্বসত্য নিহিত—ধীরে ধীরে পর্যায়ে পর্যায়ে বিকশিত হবে এবং চরমে এই পরমতত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করবে, 'তুমি ও তোমার পরমপিতা এক ও অভিন্ন।'

মুক্তি কি? ব্রাহ্মী স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু কোথায় সেই ব্রাহ্মী স্থিতি? সর্বত্র, সর্বস্থানে ও সর্বকালে যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাকেই 'মুক্তি' বলে।

এই যে বর্তমান মুহূর্তটি, বর্তমান ক্ষণটি—মহাকালের বুকে যে-কোন মুহূর্তেরই মত সেটি পরম মূল্যবান এই হচ্ছে প্রাচীন বেদের মহতী বার্তা। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এই বার্তা পুনর্জীবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে সে এক অক্ষয় চিহ্ন রেখে গিয়েছে—দাক্ষিণ্যে ও জীবজন্তুর প্রতি

অহিংসায় ।আর আজ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বৈদান্তিক মতবাদ তার বিজয় অভিযান শুরু

আজ সন্ধ্যায় বেদের একটি কাহিনী তোমাদিগকে বলিব। বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও বিশাল সাহিত্য, ইহার শেষাংশ অর্থাৎ বেদের শ্রেষ্ঠভাগ নামে অভিহিত। ইহাতে নানাবিধ তত্ত্ব ও দর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন সংস্কৃতে রচিত, এবং স্মরণ রাখিবে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক ব্যক্তি একমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করেন। হিন্দুধর্মে যজ্ঞের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। যজ্ঞ নানাপ্রকার। যজ্ঞে বেদী নির্মিত হয়, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় এবং নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে দান করা হয়। প্রত্যেক যজ্ঞে বিশেষ বস্তু দান করা হয়। একপ্রকার যজ্ঞ ছিল, যাহাতে অনুষ্ঠাতাকে সর্বস্ব দান করিতে হইত। যে ব্যক্তির কথা আমরা বলিতেছি, তিনি ধনী হইলেও কৃপণ স্বভাব ছিলেন এবং এই অতি কঠিন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া সুনাম অর্জন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যজ্ঞে সর্বস্ব দান না করিয়া তিনি শুধু অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও দুগ্ধ দেওয়া শেষ হইয়াছে এমন সব গাভী দান করিলেন। কিন্তু নচিকেতা নামে তাঁহার গুণী যুবা-পুত্র লক্ষ্য করিল যে, পিতা শুধু জরাজীর্ণ গাভীগুলি দান করিতেছেন এবং ভাবিল ইহা দ্বারা যজ্ঞে কোন সুফল লাভ হইবে না। অতএব সে নিজেকে দান করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। পিতার নিকট গিয়া বালক বলিল, পিতা আমাকে তুমি কাহার হাতে অর্পণ করিবে?পিতা কোন উত্তর দিলেন না। বালক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার একই কথা জিজ্ঞাসা করিল। ইহাতে পিতা বিরক্ত হয়ে বলিলেন, ‘তোকে যমের হাতে দিলাম—মৃত্যুর কাছে অর্পণ করিলাম।’ বালক সরাসরি যমের বাড়ীতে গেল। যম তখন বাড়ীতে ছিলেন না, অতএব বালক যমের জন্য অপেক্ষা করিল। তিনদিন পর যম বাড়ীতে ফিরিয়া বালককে দেখিয়া বললেন, ‘ব্রাহ্মণ তুমি আমার অতিথি: তুমি আমার বাড়ীতে তিনদিন অনাহারে আছ। নমস্কার, তোমার এই কষ্টের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমাকে তিনটি বর

দিব।’

তারপর বালক প্রথম বর চাইল, ‘আমার প্রতি বাবার ক্রোধ যেন শান্ত হয়।’ দ্বিতীয় বরে বালক একটি যজ্ঞের বিষয়ে জানিতে চাহিল। তৃতীয় বরে বালক জানিতে চাহিল—‘মানুষ মরিলে কোথায় যায়? কেহ কেহ বলে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। আবার কেহ কেহ বলে তাহার অস্তিত্ব থাকে। দয়া করিয়া ইহার উত্তর দিন। ইহাই আমার তৃতীয় বর’ ।তারপর যম উত্তর করিলেন, ‘প্রাচীনকালে দেবতারা এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এই রহস্য এত সূক্ষ্ম যে ইহা জানা কঠিন। অন্য কোন বর চাও; এই বরটি চাহিও না। শতায়ু জীবন চাও, গোধন অশ্ব ও বৃহৎ রাজ্য চাও। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিও না। মানুষের যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সে-সব চাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব, কিন্তু এই রহস্য জানিবার ইচ্ছা করিও না। বালক বলিল, ‘না, মহাভাগ, মানুষ বিত্ত দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না; আপনার দর্শন পাইয়া বিত্ত চাহিলে আমরা বিত্ত পাইয়া থাকি। আপনার ইচ্ছায় আমরা দীর্ঘজীবীও হইতে পারি। সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃতি জানিয়া পৃথিবীর কোন মরণশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অজর ও অমর দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘায়ুলাভে তৃপ্ত হইবে? অতএব পরলোকের এই মহান্ রহস্যটি আমাকে বলুন, আমি অন্য কিছুই চাহি না।’ নচিকেতা এই মৃত্যু-রহস্যই জানিতে চাহিতেছে। যম ইহাতে প্রসন্ন হইলেন।

পূর্বের দুই-তিনটি বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, এই জ্ঞান মনকে প্রস্তুত করে। অতএব তোমরা দেখিতেছ, প্রথম প্রস্তুতি এই—মানুষ সত্য ছাড়া আর কিছুই চাহিবে না, এবং সত্যের জন্যই সত্য চাহিবে। যম নচিকেতাকে যে-সকল বস্তু দিতে চাহিয়াছিলেন, বালক সে-সবই প্রত্যাখ্যান করিল। শুধু এই জ্ঞানের—এই সত্যের জন্য বালক ধন-সম্পদ দীর্ঘায়ু সব-কিছুই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল। এইভাবেই সত্যলাভ হয়। যম প্রসন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, ‘দুইটি পথ আছে

—প্রেয় ও শ্রেয়। এই দুইটি নানাভাবে মানুষকে আবদ্ধ করে। এই দুইটির মধ্যে যিনি শ্রেয়ের (নিবৃত্তির) পথ গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয় আর যে প্রেয়ের পথ অবলম্বন করে সে অধোগামী হয়। নচিকেতা, আমি তোমার প্রশংসা করি। তুমি ভোগ্যবস্তু চাও নাই। তোমাকে ভোগের দিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তুমি সবই প্রত্যখ্যান করিয়াছ—তুমি জানিয়াছ যে, ভোগ অপেক্ষা জ্ঞান বহুল পরিমাণে মহত্তর।

'তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—যে ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে আছে এবং ভোগের জীবনযাপন করে সে পশুর সমান। তথাপি অনেকে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকিয়াও গর্ববশতঃ নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত মনে করে, তাহারা অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় কুটিল পথে পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। হে নচিকেতা, যাহারা অজ্ঞ শিশুদের মত কয়েক টুকরা মাটির ঢেলায় বিভ্রান্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে এই সত্য কখনও প্রতিভাত হয় না। তাহারা ইহকাল ও পরকাল দুই-ই প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনঃপুনঃ আমার শাসনাধীন হয়। এই পরলোক-তত্ত্ব শুনিবার সুযোগ অনেকেরই হয় না; অনেকে শুনিয়াও জানিতে পারে না, কারণ বক্তা ও জ্ঞাতা হইবেন আশ্চর্য পুরুষ আর শিষ্য ও শ্রোতা হইবে কুশল বা নিপুণ। বক্তা বা আচার্য যদি জ্ঞানে সমুন্নত না হন, তাহা হইলে শ্রোতা বা শিষ্যা শতবার শুনিলেও এবং শতবার উপদিষ্ট হইলেও সত্যের আলো তাহার হৃদয়কে কখনও উদ্ভাসিত করে না। নচিকেতা, বৃথা তর্কে তোমার মনকে উদভ্রান্ত করিও না; শুদ্ধচিত্তেই এই সত্য প্রতিভাত হয়। যাঁহাকে অতি কষ্টে অনুভব করিতে পারা যায়, যিনি প্রাকৃত বিষয়বুদ্ধি দ্বারা প্রচ্ছন্ন, যিনি হৃদয়গুহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, সেই পুরাতন আত্মাকে বাহিরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া যায়। যিনি এই রহস্য অবগত আছেন, তিনি সব বৃথা বাসনা ত্যাগ করেন, এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন এবং সর্বদা ধন্য হন। নচিকেতা, ইহাই শ্রেয়োলাভের পথ। তিনি গুণাতীত, নিরঞ্জন, কর্তব্যাকর্তব্যের

অতীত, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতে ভিন্ন; যিনি ইহা জানেন, তিনিই জ্ঞাতা।

যাঁহাকে সকল বেদ অনুসন্ধান করে, যাঁহাকে দেখিবার জন্য মানুষ সর্বপ্রকার তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন করে—আমি তোমাকে তাঁহার নাম বলিব। তিনি 'ওম্'। এই সনাতন ওম্-ই ব্রহ্ম-তিনি অমৃত; যিনি ইঁহার রহস্য অবগত আছেন তিনি যাহাই চান, তাহাই পান। নচিকেতা, এই আত্মা—যাঁহার সম্বন্ধে তুমি জানিতে চাও, কখনও জন্মানও না, কখনও মরেনও না। দেহনাশে এই অনাদি অনন্ত সনাতন আত্মা নষ্ট হন না। হত্যাকারী যদি মনে করে যে, সে হত্যা করে এবং হতব্যক্তি যদি মনে করে যে, সে হত হইয়াছে, তবে তাহারা উভয়েই অজ্ঞ, কারণ আত্মা হত্যা করিতেও পারেন না, হতও হন না। অণু অপেক্ষাও অণীয়ান, মহৎ অপেক্ষাও মহীয়ান সর্বেশ্বর আত্মা সকলের হৃদয়-গুহায় বাস করেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি আত্মার কৃপায় তাঁহাকে সর্বমহিমময় দর্শন করে। (আমরা দেখিতেছি, পরমেশ্বরের কৃপা তাঁহাকে উপলব্ধি করার অন্যতম কারণ।) আত্মা উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন। পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণাবলীর মিলনভূমি ঈশ্বরকে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ? বিভিন্ন দেহে অশরীরীরূপে বর্তমান এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিদ্যমান সেই মহান্ ও সর্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীমান ব্যক্তি শোক করেন না। এই আত্মাকে প্রবচন অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন অথবা মেধা বা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন বা অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটেই আত্মা নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন। যে অবিরত দুষ্কৃতিপরায়ণ, যাহার মন শান্ত ও সমাহিত নয়, যে সতত চঞ্চল ও অস্থির, সে হৃদয়-গুহায় প্রবিষ্ট এই আত্মাকে ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে না। নচিকেতা, এই দেহ রথ, ইন্দ্রিয়বর্গ অশ্ব, মন লাগাম বা প্রগ্রহ, বুদ্ধি সারথি, আত্মা রথের স্বামী। যখন আত্মা বুদ্ধিরূপ সারথি এবং বুদ্ধির সাহায্যে মনরূপ

লাগামের সহিত, আবার মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়বর্গরূপ অশ্বের সহিত যুক্ত হয়। তখনই জীবাত্মাকে ভোক্তা বলা হয়; সে অনুভব করে, কাজ করে, ক্রিয়াশীল হয়। যাহার মন সংযত নয় এবং যাহার বিবেকবুদ্ধি নাই, তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির হস্তে দুষ্ট অশ্বের মত অসংযত। কিন্তু যাঁহার বিবেকবুদ্ধি আছে, যাঁহার মন সংযত, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি রথচালকের হস্তে উত্তম অশ্বের মত সর্বদা সংযত। যাঁহার নিত্যানিত্য-বিচারবুদ্ধি আছে, যাঁহার মন সত্য অবধারণ করিতে সতত প্রস্তুত, যিনি শুদ্ধচিত্ত—তিনি সেই সত্যকে গ্রহণ করেন, যাহা লাভ করিয়া পুনর্জন্ম হয় না, নচিকেতা ইহা অতি দুষ্কর, পথ দীর্ঘ, ইহা দুর্লভ। যাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতি লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই এই সত্যদর্শন করিতে পারেন, অবধারণ করিতে পারেন। তথাপি ভয় পাইও না। উঠ, জাগ, সক্রিয় হও, উদ্দেশ্যলাভ না করা পর্যন্ত থামিও না, কারণ ঋষিগণ বলেন এই পথ অতি দুর্গম—ক্ষুরের ধারের মত শাণিত ও দুরতিক্রমণীয়। যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন শাশ্বত, অনন্ত, নির্বিকার বুদ্ধির অগম্য, অক্ষয়—তাঁহাকে জানিয়াই আমরা অমৃতত্ব লাভ করি বা মুক্ত হই।'

এ-পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, যম আমাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ভাব এই—নিত্যবস্তুকে জানিয়াই আমরা জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ এবং সংসারের বিবিধ বিপর্যয়কে অতিক্রম করিতে পারি। নিত্যবস্তু কি?—বিকারহীন অপরিবর্তনীয় মানবাত্মা, বিশ্বাত্মা। আবার ইহাও বলা হয়, নিত্যবস্তুকে জানা অতি কঠিন। 'জানা' শব্দের অর্থ শুধু বুদ্ধির স্বীকৃতি নয়, ইহার অর্থ উপলব্ধি। আমরা পুনঃপুনঃ পড়িয়াছি যে, এই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। আমরা ইহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পারি না, ইহাকে জানিতে হইলে সূক্ষ্মানুভূতির প্রয়োজন। স্থূল অনুভূতি দ্বারা দেওয়াল ও বইগুলির ধারণা হয়, কিন্তু সত্যকে জানিতে হইলে সূক্ষ্মানুভূতি চাই। ইহাই এই জ্ঞানের সমগ্র রহস্য। যম বলেন, মানুষকে শুদ্ধ হইতে হইবে। ইহাই সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিবার উপায়। তারপর যম অন্যান্য

উপায়ের কথা বলিতে থাকেন। সেই স্বয়ম্ভূ আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ, কিন্তু স্বয়ম্ভূ আত্মা অন্তর্মুখ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাকে জানিবার ইচ্ছাই বিশেষ প্রয়োজন। বাহ্য প্রকৃতিতে আমরা এই যে-সকল সুন্দর জিনিষ দেখি, সেগুলি সবই ভাল, কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার পথ ইহা নয়। আবৃতচক্ষু বা অন্তর্মুখ হইবার শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বাহ্যবস্তু দেখিবার আগ্রহকে সংযত করিতে হইবে। যখন তুমি কর্মব্যস্ত রাস্তায় কাহারও সঙ্গে হাঁটিতে থাক, তখন চলমান গাড়ীর শব্দের জন্য কথা শুনিতে পাওয়া খুব শক্ত—অত্যধিক গোলমালের দরুন সে তোমার কথা শুনিতে পায় না। মন বহির্মুখ এবং তোমার পার্শ্ববর্তী জনের কথা শুনিতে পাও না। তেমনি এই বাহ্য জগৎ এত অধিক গোলমাল করে যে, ইহাতে মন বহির্মুখ হয়। আত্মাকে কিরূপে দেখিতে পারি? এই বহির্মুখিতাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহাই চক্ষুকে অন্তর্মুখ করা। যখন এরূপ হইবে, তখনই অন্তরাত্মা মহিমা দেখিতে পাইবে।

এই আত্মা কি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা বুদ্ধিরও অতীত। কঠোপনিষদ্ হইতে আমরা জানি যে, এই আত্মা অনাদি অপরিবর্তনীয় সর্বগ; তুমি আমি এবং আমরা সকলেই সর্বত্র বিদ্যমান। এই সর্বগ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। দুইটি সত্তা সমভাবে সর্বগ হইতে পারে না—ইহা কিরূপে হইতে পারে? দুইটি সত্তা অনন্ত হইতে পারে না, এবং ফলে প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র আত্মাই আছেন, এবং তুমি আমি ও সমগ্র বিশ্ব এক, শুধু বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। ‘যেমন একই অগ্নি বিশ্বে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মা প্রতি জীবদেহে প্রতিভাত হইতেছেন।’ কিন্তু প্রশ্ন এইঃ যদি এই আত্মা পূর্ণ ও শুদ্ধ, এবং বিশ্বের একমাত্র সত্তা হন, তাহা হইলে অশুদ্ধ শরীরে, পাপীর দেহে, পুণ্যবানের দেহে এবং অন্যত্র প্রবেশ করিলে ইঁহার কি গতি হয়? কিরূপে ইহা পূর্ণ থাকিতে পারেন। একই সূর্য প্রতি চক্ষুতে দৃষ্টির হেতু, তথাপি কাহারও চক্ষুর দোষ সূর্যকে স্পর্শ করে না। কাহারও ‘ন্যাবা’ হইলে সে সব জিনিষই

হরিদ্রাভ দেখে। তাহার দৃষ্টির হেতু সূর্য, কিন্তু তাহার সব জিনিষকে পীতাভ দেখার রোগ সূর্যকে স্পর্শ করে না। ঠিক তেমনি এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ যদিও প্রত্যেকের আত্মা, তথাপি বাহিরের শুচি-অশুচি ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অনিত্য বিনাশশীল পৃথিবীতে যিনি নিত্য আত্মাকে জানেন, এই জড়জগতে যিনি চৈতন্যস্বরূপকে জানেন, এই বিচিত্র জগতে যিনি অখণ্ড আত্মাকে জানেন এবং নিজের মধ্যে দেখেন, তাঁহারই শাশ্বত সুখ, অন্য কাহারও নহে। সেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশ করে না, বিদ্যুৎও প্রকাশ করে না, অগ্নি আবার কিরূপে প্রকাশ করিবে? তিনি দীপ্তিমান বলিয়া সবই দীপ্তিমান, তাঁহার জ্যোতিতে এই সবই জ্যোতির্ময়। যখন হৃদয়ের সকল বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই মানুষ অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। যখন হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হয়, হৃদয়ের সকল বক্রতা দূরীভূত হয়, সকল সন্দেহের নিরসন হয়, তখনই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। ইহাই পথ।

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন যেন আমাদিগকে রক্ষা করে, আমাদিগকে পালন করে, আমাদিগকে শক্তি ও বীর্য দেয়, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। শান্তি, শান্তি, শান্তি। ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনা-ধীতমস্তু মা বিদ্বিষাববৈ। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

বেদান্ত দর্শনে তোমরা এই চিন্তাধারা দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থে নিবদ্ধ ভাব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি ভাব বেদান্ত দর্শনে আছে। অন্যান্য গ্রন্থের মত বেদের প্রাচীন অংশে একই প্রকার অনুসন্ধান চলিয়াছিল—সেই অনুসন্ধান ছিল বাহিরে। কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিলঃ আদিতে কি ছিল? যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন অন্ধকার অন্ধকারকে আবৃত্ত করিয়াছিল, তখন কে ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল? অতএব অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

দেবদূত, দেবতা এবং আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ের কথা বলা হইতে লাগিল, পরে আমরা দেখিতে পাই—এই অনুসন্ধান নৈরাশ্যপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সেই সময়ে অনুসন্ধান চলিয়াছিল বাহিরে এবং কোন ফল পাওয়া যায় নাই; কিন্তু আমরা বেদে দেখিতে পাই পরবর্তী কালে এই স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের অনুসন্ধান চলিয়াছিল ভিতরে। বেদের এই একটি মূল ভাব আছে যে, নক্ষত্ররাজিতে নীহারিকায় ছায়াপথে—এই সমগ্র বাহ্য জগতে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই, জীবন ও মৃত্যুর সমস্যা, কখনও মীমাংসিত হয় নাই। অন্তর্জগতের বিস্ময়কর কার্যপ্রণালী ও রহস্য বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছিল, বিশ্লেষণের ফলে বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইল; নক্ষত্র অথবা সূর্য ইহা করিতে পারিত না। মানুষের শরীর বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল—মানুষের শরীরকে নয়, আত্মাকে নিরূপণ করিতে হইয়াছিল। সেই আত্মাতেই অনুসন্ধানের উত্তর পাওয়া গেল। কি উত্তর পাওয়া গেল? উত্তর মিলিল—দেহের পিছনে, এমন কি মনের পিছনে স্বয়ম্ভূ আত্মা আছেন। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই স্বয়ম্ভূ আত্মা সর্বগ, সর্বত্র বিরাজমান, কারণ তিনি অমূর্ত। যাহা নিরবয়ব, নিরাকার দেশ বা কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা কোন স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। ইহা কিরূপে পারে? আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বগ, আমাদের সকলের মধ্যে সমভাবে অনুস্যূত।

মানুষের আত্মা কি? এক সম্প্রদায় বলিত, ঈশ্বর একজন আছেন; ইহা ছাড়া অসংখ্য জীবাত্মা আছে, যাহারা ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ চির পৃথক্। ইহা দ্বৈতবাদ। এটা প্রাচীন অপরিণত ভাব। অন্য এক সম্প্রদায় উত্তরে বলিত, জীবাত্মা অনন্ত পরমেশ্বরের অংশ। যেমন এই দেহ স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ এবং ইহার পশ্চাতে আছে মন বা চিন্তা, এবং ইহারও পশ্চাতে আছেন আত্মা, তেমনি সমগ্র জগৎ একটি শরীর, ইহার পশ্চাতে সর্বজনীন মন, এবং তৎপশ্চাতে বিশ্বজনীন আত্মা। যেমন এই দেহ সর্বজনীন দেহের একটি অংশ, তেমনি এই মন সর্বজনীন মনের একটি অংশ এবং মানুষের আত্মা বিশ্বজনীন

আত্মার (পরমাত্মার) অংশ। এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। এক্ষণে আমরা জানি বিশ্বজনীন আত্মা অনন্ত। অসীম বা অন্তরের অংশ কিভাবে হইতে পারে? ইহাকে কিভাবে ভাঙা যায়, ভাগ করা যায়? ইহা খুবই কবিত্বের কথা হইতে পারে যে, আমি অসীম অনন্ত পরমেশ্বরের একটি স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু চিন্তাশীল মনের কাছে ইহা অসম্ভব। অনন্তকে ভাগ করার অর্থ কি? ইহা কি কোন জড়বস্তু, যাহা তুমি খণ্ডিত বা পৃথক্ করিতে পার? অনন্তকে কখনও ভাগ করা যায় না। যদি ইহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ইহা আর অনন্ত থাকিত না। তবে সিদ্ধান্ত কি? সিদ্ধান্ত এইঃ সর্বজনীন আত্মাই তুমি; তুমি সর্বজনীন আত্মার অংশ নও, সমগ্র। তুমিই পরমেশ্বরের সমগ্র। তাহা হইলে এইসকল ভেদ বা বৈষম্য কি? আমরা কোটি কোটি জীবাত্মাকে দেখিতেছি। তাহারা কি? যদিও সূর্য লক্ষ লক্ষ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়; প্রতি জলবিন্দুতে সূর্যের সম্পূর্ণ আকৃতি বা ছায়া পড়ে; কিন্তু সেগুলি শুধু ছায়া বা আকৃতি, প্রকৃত সূর্য মাত্র একটি। অতএব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আপাত-প্রতীয়মান আত্মা আছেন, তিনি ঈশ্বরের ছায়া বা আকৃতি মাত্র, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পশ্চাতে যিনি প্রকৃতসত্তা আছেন, তিনি সেই এক ঈশ্বর। আমরা সকলেই সেখানে এক। আত্মারূপে বিশ্বে কেবল একজনই আছেন। সেই আত্মা তোমাতে ও আমাতে এবং মাত্র একটি। সেই এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মারূপে প্রতিবিম্বিত। কিন্তু আমরা ইহা জানি না; আমরা মনে করি, আমরা পরস্পর পৃথক্ এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। এবং যতদিন আমরা এরূপ ভাবি, ততদিন জগতে দুঃখ থাকিবে। ইহাই মায়া।

তারপর দুঃখের অন্য মহৎ কারণ—ভয়। কেন একজন আর একজনের অনিষ্ট করে? কারণ তাহার আশঙ্কা—সে যথেষ্ট ভোগ করিতে পারিবে না। একজন আশঙ্কা করে যে, হয়তো তাহার যথেষ্ট অর্থ হইবে না, এবং এই আশঙ্কাবশতই সে অপরের অনিষ্ট করে এবং অর্থ লুণ্ঠন করে। যেখানে কেবল এক সত্তা আছে, সেখানে ভয়ের স্থান

কোথায়? যদি আমার মাথায় একটি বজ্রপাত হয়, আমি-ই সেই বজ্র, কারণ আমিই একমাত্র সত্তা। যদি প্লেগের আবির্ভাব হয়, আমিই সেই প্লেগ; যদি একটি ব্যাঘ্র আসে, আমিই সেই ব্যাঘ্র; যদি মৃত্যু আসে, আমিই সেই মৃত্যু। আমি জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই। আমরা দেখিতেছি যে, বিশ্বে দুইটি সত্তা আছে—এই ধারণা হইতেই ভয় আসে, 'পরস্পরকে ভালবাস'—এ-কথা প্রচারিত হইতে আমরা সর্বদা শুনিয়া থাকি। কিন্তু কি জন্য সকলকে ভালবাসিব—তাহার ব্যাখ্যা এখানে। আমি প্রত্যেককে ভালবাসিব কেন? কারণ তাহারা ও আমি এক। আমার ভ্রাতাকে ভালবাসিব কেন? কারণ সে ও আমি এক। এই একত্ব—এই সমগ্র বিশ্বের অখণ্ডত্বই ভালবাসার কারণ। পদতলবিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম জীব পর্যন্ত সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক আত্মা। সকল মুখ দিয়াই তুমি খাও; সকল হাত দিয়াই তুমি কাজ কর; সকল চোখ দিয়াই তুমি দেখ। লক্ষ লক্ষ দেহে তুমি স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছ, লক্ষ লক্ষ শরীরে তুমি ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। যখন এই ভাব আসে এবং আমরা ইহা উপলব্ধি করি, দেখি, অনুভব করি, তখনই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও চলিয়া যাইবে। আমি কিরূপে মরিতে পারি? আমাকে ছাড়া কিছুই নাই। ভয় চলিয়া যায়, এবং কেবল তখনই পূর্ণ সুখ ও পূর্ণ প্রেম আসে। সেই অবিনাশী সর্বজনীন সহানুভূতি, সর্বজনীন প্রেম, সর্বজনীন সুখ মানুষকে সর্ববস্তুর উপরে তুলিয়া ধরে। ইহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই, কোন দুঃখ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু জগতের এই সামান্য পান-ভোজন সর্বদাই একটি প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। ইহার সমগ্র হেতু এই দ্বৈতবাদ—বিশ্ব হইতে ভগবান্ হইতে আমি পৃথক্, এই ভাব। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, 'আমিই তিনি, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি চিরসুখী, চিরমুক্ত', তখনই আসিবে প্রকৃত প্রেম, চলিয়া যাইবে সব ভয় এবং অবসান হইবে সকল দুঃখের।

মুক্তির পথ

[১৯০০ খ্রীঃ ১২ মার্চ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ।]

‘ওকল্যাণ্ড এনকোয়ারার’ (Oakland, Enquirer) পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতে ‘মুক্তির পথ কি?’—এ বিষয়ে বক্তৃতা শুনিবার জন্য গত সন্ধ্যায় ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এর ওয়েণ্ড্টে হল-এ (Wendte Hall) বিপুল শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্বামী যে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এটিই সেগুলির শেষ বক্তৃতা। তিনি অংশতঃ বলেনঃ

কেহ বলে—ঈশ্বর স্বর্গে আছেন। আর একজন বলে—ঈশ্বর প্রকৃতিতে এবং সর্বত্রই বিদ্যমান। কিন্তু মহৎ বিপর্যয় উপস্থিত হইলে আমরা দেখিতে পাই, উদ্দেশ্য একই। আমরা সকলেই বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করি, কিন্তু পরিণাম ভিন্ন হয়।

প্রত্যেকটি মহান্ ধর্মের দুইটি মহৎ নীতিবাক্য—ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ। আমরা সকলেই সত্য চাই, এবং জানি যে, আমরা চাই বা না চাই সত্য আসিবেই। কিছু পরিমাণে আমরা সকলেই সেই সত্যের (শ্রেয়ের) জন্য চেষ্টা করিতেছি। সত্যলাভের প্রতিবন্ধক কি? আমরা নিজেরাই। আপনাদের পূর্বপুরুষগণ এই প্রতিবন্ধককে ‘শয়তান’ বলিতেন; কিন্তু ইহা আমাদের নিজেদের মিথ্যা ‘অহং’। আমরা দাসত্বের মধ্যে বাস করি, এবং দাসত্ব না থাকিলে আমরা মরিয়া যাইতাম। আমরা সেই লোকটির মত, যে নব্বই বৎসর ঘোর অন্ধকারে থাকার পর প্রকৃতির সূর্যালোকে আনীত হইলে পূর্বেকার সেই অন্ধকার কক্ষেই ফিরিয়া যাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়। আপনারা এই গতানুগতিক পুরাতন জীবনযাত্রা ছাড়িয়া নূতন অধিকতর উন্মুক্ত স্বাধীনতায় যাইতে চাহিবেন না।

প্রকৃত ঘটনার গভীরে প্রবেশ করাই প্রধান সমস্যা। ব্যাপারগুলি হইতেছে—অমুক জ্যাকের ছোটখাট নিকৃষ্ট বিভ্রান্তিসকল, যে জ্যাক মনে করে, বিভিন্ন ধর্মবিষয়ে সে যতই সামান্য হউক না কেন, তাহার একটি অসীম আত্মা আছেন। ধর্ম-হিসাবে এক দেশের মানুষ বহুপত্নীক; অন্যদেশে একজন নারীর অনেক পতি আছে। সুতরাং কোন কোন লোকের উপাস্য দুই দেবতা, কাহারও উপাস্য এক ঈশ্বর, কেহ কেহ কোন ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না।

কিন্তু কাজ ও ভালবাসার মধ্যে আছে মুক্তি। আপনারা কোন একটি বিষয় সম্যক রূপে শিখিয়াছেন; যথাসময়ে হয়তো সেই বিষয় স্মরণ করিতে পারিতেছেন না, তথাপি জিনিষটি আপনাদের আন্তর চেতনায় ডুবিয়া গিয়াছে এবং আপনাদের অঙ্গীভূত হইয়া আছে। অতএব আপনারা যখন কাজ করেন, সেই কাজ ভালই হউক বা মন্দই হউক, তখন আপনারা নিজেদের ভাবী জীবন ধারা গঠন করেন। যদি আপনারা কর্মের ভাবে ভাবিত হইয়া—কর্মের জন্যই কর্ম হিসাবে—সৎ কর্ম করেন, তবে আপনাদের ভাব অনুযায়ী স্বর্গে গমন করিবেন এবং স্বর্গের স্বপ্ন দেখিবেন।

পৃথিবীর ইতিহাস মহাপুরুষ ও উপদেবতাদের ইতিহাস নয়, উহা সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত, যেগুলি সমুদ্রের স্রোত-তাড়িত বস্তুখণ্ডসমূহ হইতে আপনা-আপনি মহাদেশ- রূপে গড়িয়া উঠে। তাহা হইলে প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত আত্মোৎসর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যের মধ্যে নিহিত আছে পৃথিবীর ইতিহাস। মানুষ তাহার নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করে না বলিয়াই ধর্ম গ্রহণ করে।

মানুষ ঈশ্বরকে যেরূপে গভীরভাবে ভালবাসে, সেরূপে ভালবাসার মধ্যেই তাহার মুক্তি নিহিত আছে। আপনার পত্নী বলেন, ‘জন, তোমাকে ছাড়া থাকিতে পারি না’। কেহ কেহ অর্থ হারাইলে তাহাদিগকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে হয়। আপনারা কি আপনাদের

ঈশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ অনুভব করেন? আপনারা যখন অর্থ, বন্ধু, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ও ইহজগতের সব কিছু পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন এবং শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনি তাঁহার প্রেমের কিঞ্চিৎ আপনাদিগকে দান করেন, তখনই আপনারা মুক্তিলাভ করিবেন।

আমি যে আমিই

[১৯০০ খ্রীঃ ২০ মার্চ, সান্ ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।]

আজ সন্ধ্যায় বক্তৃতার বিষয় ‘মানুষ’—প্রকৃতির সহিত বৈষম্যে মানুষ। দীর্ঘকাল ‘প্রকৃতি’ শব্দ বাহ্য প্রকৃতিকে বুঝাইবার জন্য প্রায় স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইত। এই-সব বাহ্য প্রকৃতিকে সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করিতে দেখা যাইত; এবং ইহারা প্রায়ই পুনরাবৃত্ত হইত—পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবার ঘটিয়াছে, কিছুই শুধু একবার ঘটে নাই। এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, প্রকৃতি সর্বত্র ও সর্বকালে একরূপ। প্রকৃতির ধারণার সহিত একরূপতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; ইহা ছাড়া বাহ্যপ্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না। আমরা যাহাকে ‘বিধি’ বলি, তাহার ভিত্তি এই একরূপতা।

ক্রমশঃ ‘প্রকৃতি’ শব্দ ও একরূপতার ধারণা অন্তঃপ্রকৃতি, জীবন ও মনের প্রকৃতি বুঝাইতেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যাহা কিছু পৃথক্ করা যায়, তাহাই প্রকৃতি। চারাগাছ, প্রাণী ও মানুষের গুণকে প্রকৃতি বলে। মানুষের জীবন নির্দিষ্ট প্রণালীতে আচরিত হয়; তাহার মনও সেইরূপ করে। চিন্তারাজির যখন তখন উৎপত্তি হয় না, উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের একটু নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাহ্য প্রকৃতিগুলি যেমন প্রণালীবদ্ধ, অন্তঃপ্রকৃতি অর্থাৎ মানুষের জীবন এবং মনও তেমনি বিধিবদ্ধ।

যখন আমরা মানুষের মন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে বিধির কথা বিবেচনা করি, তখন ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন অস্তিত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না। কিভাবে পাশব প্রকৃতি বিধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা আমরা জানি। মানুষের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; মানব-প্রকৃতিও বিধিবদ্ধ। মানব-মনের বৃত্তিগুলি যে বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকে কর্মের প্রণালী বলে।

কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই; মনে যদি কিছু জাগে, তাহাও কোন কিছু হইতে অবশ্য উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যখন স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলি, ইহার অর্থ এই যে, ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না; ইচ্ছা জাত হইয়াছে; এবং যেহেতু ইহা জাত হইয়াছে, ইহা স্বাধীন হইতে পারে না—ইহা বিধিবদ্ধ। আমি যে আপনার সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছুক এবং আপনি আমার কথা শুনিতে আসিয়াছেন, ইহাও একটি বিধি। আমি যাহা কিছু করি বা ভাবি বা অনুভব করি, আমার প্রত্যেক আচরণ বা ব্যবহার, আমার প্রত্যেক গতিবিধি—সবই উৎপন্ন বা জাত হয়, সুতরাং স্বাধীন নয়। আমাদের জীবনও মনের এই নিয়ন্ত্রণকেই কর্মের বিধি বা প্রণালী বলে।

যদি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ তত্ত্ব প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলে তুমুল হইচই পড়িয়া যাইত। পাশ্চাত্যের মানুষ ভাবিতে চায় না যে, তাহার মন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতের প্রাচীনতম দর্শন যখন এই বিধি প্রবর্তন করে, তখনই ভারতবাসী উহা গ্রহণ করিয়াছিল। মনের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই, ইহা হইতে পারে না। এই শিক্ষা ভারতীয় মনে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করিল না কেন? ভারত ইহা শান্তভাবে গ্রহণ করিল; ইহাই ভারতীয় মনীষা বা চিন্তার বৈশিষ্ট্য; এখানেই ভারতীয় ভাবধারা জগতের অন্যান্য ভাবধারা হইতে পৃথক্।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু নয়; ইহারা প্রকৃতপক্ষে এক। প্রকৃতি সকল বাহ্য দৃশ্যের সমষ্টি। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু চলমান, তাহারই অর্থ 'প্রকৃতি'। বস্তু ও মনের মধ্যে আমরা প্রচণ্ড বৈষম্য করি, আমরা ভাবি মন বস্তু হইতে একেবারে পৃথক্। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একই প্রকৃতি, ইহার এক অর্ধ অপরার্ধের উপর ক্রিয়াশীল। নানাপ্রকার উত্তেজনার আকারে বস্তু মনের উপর চাপ দিতেছে। এই উত্তেজনাগুলি শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাহিরের উত্তেজনা ভিতরের উত্তেজনার উদ্দীপক। বাহিরের শক্তিতে সায়

দেওয়ার অথবা বাহিরের শক্তি হইতে দূরে থাকার ইচ্ছাকে আমরা চিন্তা বলি, তাহা হইতেই ভিতরের শক্তি হয়।

বস্তু ও মন দুই-ই শক্তি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছু নয় এবং যদি তোমরা এ-দুটিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, মূলতঃ উহারা এক। বাহিরের শক্তিকে কোন প্রকারে উদ্দীপিত করিতে পারে—ইহাতেই বুঝা যায় যে, কোন স্থানে ইহারা পরস্পর মিলিত হয়—ইহারা অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন হইবে, সুতরাং উহারা মূলতঃ একই শক্তি। যখন তোমরা বস্তুগুলির মূলে গিয়া পৌঁছাও, তখন উহারা সরল ও সাধারণ হয়। যেহেতু একই শক্তি এক আকারে বস্তুরূপে এবং অন্য আকারে মনরূপে আবির্ভূত হয়, তখন বস্তু ও মনকে পৃথক্ চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। মন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, বস্তু মনে রূপান্তরিত হয়। চিন্তাশক্তি স্নায়ু ও পেশীশক্তি হয়; পেশী ও স্নায়ুশক্তি চিন্তাশক্তি হয়। বস্তু অথবা মন যেরূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, প্রকৃতি এইসব শক্তি।

সূক্ষ্মতম মন ও স্থূলতম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণের। অতএব সমগ্র বিশ্বকে মন অথবা বস্তু বলা যাইতে পারে, কোন্‌টা—তাহাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা মনকে বিশুদ্ধ বস্তু, অথবা শরীরকে, স্থূল বা বাস্তব মন বলিতে পার, কোন্‌টাকে কি নামে ডাক তাহাতে সামান্য পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে বিরোধজনিত যে-সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলির কারণ ভুল চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে এই দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমার ও নিম্নতম শূকরশাবকের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণের। শূকরশাবকের মধ্যে শক্তির প্রকাশ কম, আর আমার মধ্যে শক্তির প্রকাশ বেশী। কখনও আমি নিকৃষ্ট, কখনও শূকরশাবক উৎকৃষ্ট।

মন অথবা বস্তু—কোন্‌টি প্রথমে আসে, ইহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। মনই কি প্রথম—যাহা হইতে বস্তু আসিয়াছে? অথবা বস্তুই

কি প্রথম—যাহা হইতে মন আসিয়াছে? এ-সকল অর্থহীন প্রশ্ন হইতে দার্শনিক যুক্তির অনেকগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা অনেকটা ‘ডিম আগে না মুরগী আগে?’—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মত। দুই-ই প্রথম এবং দুই-ই শেষ—মন ও বস্তু, বস্তু ও মন। যদি আমি বলি, বস্তুর অস্তিত্ব প্রথমে এবং বস্তু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া মন হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, বস্তুর পূর্বে মনের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই থাকিবে। যদি না থাকিত, বস্তু কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? মনের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব, বস্তুর পূর্বে মনের অস্তিত্ব আছে। ইহা আগাগোড়া ‘মুরগী ও ডিমের’ প্রশ্নের মত।

সমগ্র প্রকৃতি নিমিত্তের বিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং দেশ-কালের অন্তর্গত। দেশের বাহিরে আমরা কিছু দেখিতে পারি না, তথাপি আমরা দেশ জানি না। কালের বাহিরে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারি না, তথাপি আমরা কাল জানি না। কার্য-কারণের ভাষায় না বলিলে আমরা কিছু বুঝিতে পারি না, তথাপি কার্যকারণ কি তাহা আমরা জানি না। দেশ কাল নিমিত্ত—এই তিনটি প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অনুস্যূত আছে, কিন্তু উহারা দৃশ্যবস্তু নয়। বুঝিতে পারিবার পূর্বে ইহারা যেন বিভিন্ন আকার বা ছাঁচ, যেগুলিতে ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে অবশ্যই ঢালিতে হইবে। দেশ-কাল-নিমিত্তের সমবায়ে বস্তু একটি সত্ত্ব। দেশ-কাল-নিমিত্তের সমবায়ে মন একটি সত্ত্ব।

এই তত্ত্বটি অন্যভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্ব—নাম ও রূপের সমবায়ে। নাম ও রূপ আসে এবং যায়, কিন্তু সত্ত্ব চিরদিন একই থাকে। সত্ত্ব, নাম ও রূপ এই জলপাত্রটিকে গড়ে। ভাঙিয়া গেলে ইহাকে আর ‘পাত্র’ নামে অভিহিত কর না, অথবা ইহার পাত্র-রূপ দেখ না। ইহার নাম ও রূপ থাকে না, কিন্তু ইহার সত্ত্ব থাকে। নাম ও রূপের দ্বারা বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য হয়। এগুলি যথার্থ নয়, কারণ ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহা অবিনাশী ও বিকারহীন সত্ত্ব নয়। দেশ কাল ও নিমিত্তই প্রকৃতি।

নাম ও রূপই প্রকৃতি। প্রকৃতিই মায়া। যে নাম ও রূপে প্রত্যেক বস্তুকে ঢালা হয়, তাহাকে ‘মায়া’ বলে। মায়া সত্য নয়, মিথ্যা। মায়া সত্য হইলে ইহাকে আমরা বিনাশ অথবা পরিবর্তন করিতে পারিতাম না। সত্ত্ব হইতেছে অজ্ঞাত ও বস্তুজগতের গুণাগুণশূন্য এবং শুধু বুদ্ধি দ্বারা অধিগম্য বিষয়, আর মায়া হইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ। প্রকৃত ‘আমি’কে কিছুই বিনাশ করিতে পারে না। কাঁচা বা পরিদৃশ্যমান ‘আমি’ সতত পরিবর্তনশীল ও নশ্বর।

আসল কথা এই—পার্থিব বস্তু মাত্রেরই দুইটা দিক্ আছে। একটা দিক্ নিত্য, বিকারহীন ও অবিনাশী; অপর দিক্ অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। মানুষ স্বরূপতঃ সত্ত্ব, আত্মা। এই আত্মা—এই সত্ত্ব বিকারহীন অবিনাশী। কিন্তু ইহা নামরূপাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নাম ও রূপ বিকারহীন বা অবিনাশী নয়; ইহারা চিরপরিবর্তনশীল ও নশ্বর। তথাপি মানুষ এই পরিবর্তনশীল দেহ ও মনে নির্বোধের মত অমরত্ব খোঁজে—শাশ্বত একটি দেহ পাইতে চায়। আমি সেরূপ অমৃতত্ব চাই না।

প্রকৃতি ও আমার মধ্যে কি সম্বন্ধ? প্রকৃতি নাম ও রূপ অথবা দেশ কাল ও নিমিত্তের প্রতীক; আমি প্রকৃতির অংশ নই, কারণ আমি মুক্ত, অমৃত, অপরিণামী ও অনন্ত। আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি নাই—এই প্রশ্ন আসে না। আমি যে-কোন ইচ্ছারই অতীত। যেখানেই ইচ্ছা, উহা কখনও স্বাধীন নয়। ইচ্ছার কোনই স্বাধীনতা নাই। নাম ও রূপ ইচ্ছাকে ধরিয়া দাস করিলেও ইহার স্বাধীনতা বজায় থাকে। সেই সত্ত্ব—আত্মা যেন নিজেকে নামরূপের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলেন এবং অচিরে বদ্ধ হন, অথচ পূর্বেই তিনি মুক্ত বা স্বাধীন ছিলেন। তথাপি ইহার মূল স্বভাব থাকিয়াই যায়। এজন্যই শাস্ত্র বলেন, ‘আমি মুক্ত; এ-সব বন্ধন সত্ত্বেও আমি মুক্ত’। এবং ইহা কখনই এ-কথা বিস্মৃত হয় না।

কিন্তু যখন আত্মার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা আর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বা মুক্ত নয়। প্রকৃতি শিকল ধরিয়া টানে, এবং প্রকৃতি যেমনই নাচাইতে চায়, তেমনই ইহাকে নাচিতে হয়। এভাবে তুমি ও আমি বর্ষ-বর্ষ নাচিয়াছি। আমরা যাহা কিছু দেখি, করি, অনুভব করি ও জানি, আমাদের সকল চিন্তা ও কার্য প্রকৃতির নির্দেশানুয়াযী নৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন কিছুতেই ইহার কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং নাই। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল চিন্তা ও কার্য প্রণালীবদ্ধ, এবং এগুলির কোনটিই আমাদের প্রকৃতস্বরূপগত নয়।

আমার যথার্থ স্বরূপ সকল বিধির বাহিরে। দাসত্ব ও প্রকৃতির সহিত সমভাবাপন্ন হও, এবং তুমি নিয়মানুগ হইয়া চল, নিয়মের বশবর্তী হইয়াই তুমি সুখী হইবে। কিন্তু যতই তুমি প্রকৃতি ও উহার নির্দেশকে মানিয়া চলিবে, ততই বদ্ধ হইবে। যতই তুমি অজ্ঞতার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবে, ততই তুমি বিশ্বের সব কিছুর অধীন হইবে। প্রকৃতির সহিত এই সামঞ্জস্য, এই নিয়মানুগামিতাই কি মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও নিয়তির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন? কোন খনিজ পদার্থ কখনও বিধি বা নিয়মের সহিত বিবাদ করিয়াছে? কোন বৃক্ষ অথবা চারাগাছ কখনও কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে? এই টেবিলটি প্রকৃতি ও নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু ইহা সর্বদা টেবিলই থাকিয়া যায়, ইহা অপেক্ষা ভাল হয় না। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করে। সে অনেক ভুল করে, অনেক কষ্ট পায়। কিন্তু পরিণামে সে প্রকৃতিকে জয় করে এবং নিজের মুক্তি উপলব্ধি করে। যখন সে মুক্ত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার দাস হয়।

বন্ধন সম্বন্ধে আত্মার সচেতন এবং শক্তিপ্রকাশে সচেষ্ট হওয়াকেই 'জীবন' বলে। এই সংগ্রামে সফলতাকেই বলে ক্রমবিকাশ। সর্বপ্রকার দাসত্ব দূর করিয়া পরিণামে জয়লাভ করাকেই 'মুক্তি', 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ' বলে। বিশ্বে সবই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। যখন আমি প্রকৃতি, নাম-রূপ ও দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ, তখন

আমার যথার্থ স্বরূপ জানি না। কিন্তু এই দাসত্বেও আমার যথার্থ স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। আমি বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি; বন্ধনগুলি একে একে ভাঙিয়া যায়, এবং আমার স্বাভাবিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই। তারপরই আসে পূর্ণ মুক্তি। আমার স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করি—জানি যে, আমি অনন্ত আত্মা, প্রকৃতির প্রভু, কিন্তু প্রকৃতির দাস নই। সকল ভেদ ও সমবায়ের অতীত, দেশ কাল ও নিমিত্তের অতীত 'আমি সেই আত্মা, আমি সেই ব্রহ্ম।'

ধর্মীয় ঐক্যের মহাসম্মেলন

['চিকাগো সাণ্ডে হেরল্ড' **(**২৪ সেপ্টেম্বর**,** ১৮৯৩**)** পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তৃতার রিপোর্ট**]**

এই ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানবজাতির সৌভ্রাত্রই বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। স্বভাবসিদ্ধ অবস্থারূপে এই ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, কারণ আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। অনেক ধর্মসম্প্রদায় ঈশ্বরের অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যদি আমরা ঐ-সকল ধর্মসম্প্রদায়কে আমল দিতে ইচ্ছা না করি—এবং তাহা হইলে আমাদের সৌভ্রাত্র সর্বজনীন হইবে না—সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিবার মত প্রশস্ত মিলনভূমি আমাদের থাকিবে। এই মহাসম্মেলনে বলা হইয়াছে যে, মানবজাতির হিতসাধন করা আমাদের কর্তব্য, কারণ মন্দ বা নীচ কর্ম-মাত্রই কর্মকর্তার উপর প্রতিক্রিয়ারূপে ফিরিয়া আসে। প্রথমে আমরা নিজেরা, পরে আমাদের ভ্রাতারা—এই ভাবটিতে দোকানদারির ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। আমি মনে করি—ঈশ্বরের পিতৃত্বে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, ভ্রাতাকে আমাদের ভালবাসা উচিত, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক মতবাদ মানুষের দেবত্ব স্বীকার করে। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, উহা যেন কোন প্রকার ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যই কাহারও কোন অনিষ্ট করা উচিত নয়।

প্রাচ্য নারী

[চিকাগোর জ্যাকসন ষ্ট্রীটে নারীদের সভাগৃহে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের নারী-পরিচালক সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিসেস পটার পামার কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় স্বামীজী প্রাচ্য নারীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বক্তৃতাটি চিকাগো ডেলি ইণ্টারওশ্যান পত্রিকায় (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) প্রকাশিত।]

কোন জাতির উন্নতির শ্রেষ্ঠ পরিমাপক তাহার নারীজাতির প্রতি আচরণ। প্রাচীন গ্রীসে পুরুষ ও নারীর অবস্থায় কোন পার্থক্যই ছিল না—পূর্ণ সাম্যের ভাব বিরাজ করিত। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কোন হিন্দু পুরোহিত হইতে পারে না—ভাবটি এই যে, অবিবাহিত ব্যক্তি অর্ধেক অর্থাৎ অসম্পূর্ণ মানুষ। পূর্ণ নারীত্বের ভাব পূর্ণ স্বাধীনতা। সতীত্বই আধুনিক হিন্দু নারীর জীবনের মুখ্য ভাব। বৃত্তের কেন্দ্র পত্নী—এই কেন্দ্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তাহার সতীত্বের উপর। এই প্রকার ভাবের আতিশয্য হইতেই হিন্দু বিধবারা মৃত পতির চিতায় আত্মবিসর্জন করিত। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য নারীদের অপেক্ষা হিন্দু নারীগণ অধিকতর ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না। যদি আমরা চরিত্রের এই সুন্দর গুণরাজি রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীগণের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতের হিন্দুনারী জগতের আদর্শ নারী হইবে।

সরলতাই রহস্য। আমার গুরুদেবের কথ্য অথচ গভীরভাব-প্রকাশক ভাষাই আমার আদর্শ। যে-ভাব প্রকাশের অভিপ্রায় থাকে, সেই ভাবই প্রকাশ করিবে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষাকে নিখুঁত করিবার চেষ্টা করিলে উহা বাঁধাধরা ভাষায় পরিণত হইবে। ঠিক ঠিক বলিতে গেলে বাঙলা ভাষায় ক্রিয়া নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতায় ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবি-কঙ্কন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ গদ্য; ইহার ভাষা বলিষ্ঠ। হিতোপদেশের ভাষা মন্দ নয়, কিন্তু কাদম্বরীর ভাষা অপকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত।

বাঙলা ভাষা বরং পালির ধাঁচে গঠিত হওয়া উচিত, সংস্কৃতের ধাঁচে নয়। কারণ বাঙলার সহিত পালির অধিকতর সাদৃশ্য আছে। বাঙলায় পরিভাষা-শব্দ সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে এবং নূতন নূতন শব্দ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টাও করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে যদি সংস্কৃত অভিধান হইতে ঐ সকল শব্দ সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে বাঙলা ভাষা গঠনের প্রভূত সহায়তা হইবে।

উক্তি-সঞ্চয়ন

[ভগিনী নিবেদিতার **Master as I saw Him** প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উক্তি চয়ন।**]**

১। মানুষের জন্ম প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই, তাহাকে অনুসরণ করার জন্য নয়।

২। তুমি যখন নিজেকে দেহমাত্র বলিয়া ভাব, তখন তুমি বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন; নিজেকে যখন জীব বলিয়া ভাব, তখন তুমি সেই শাশ্বত মহান্ জাতির একটি কণিকামাত্র; আর যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া ভাব, তখন তুমিই সব কিছু।

৩। ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন নয়—ইহা কার্যকারণের গণ্ডীরই মধ্যস্থ ব্যাপারবিশেষ; কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির পিছনে এমন কিছু আছে, যাহা স্বাধীন।

৪। সততা এবং পবিত্রতাই শক্তির আকর।

৫। বিশ্বজগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ।

৬। নিজের উপর বিশ্বাস না আসিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসে না।

৭। 'আমার দেহ'—এই ভ্রমই সকল অমঙ্গলের মূল। আদি পাপ বলিয়া যদি কিছু থাকে, ইহাই সেই পাপ।

৮। একদল বলেন, চিন্তা—জড় হইতে উৎপন্ন; আবার অপর দলের মতে চিন্তা হইতে জড়-জগতের উৎপত্তি। এই দুইটি মতবাদই ভুল। জড়বস্তু এবং চিন্তা পরস্পর-সহগামী। তৃতীয় এমন একটি বস্তু আছে, যাহা হইতে জড় এবং চিন্তা দুই-ই উদ্ভূত।

৯। আকাশের ভিত্তিতে যেমন সমস্ত জড়কণা একত্র হয়, তেমনি কালের ভিত্তিতে সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ মিলিত হয়। সকল জড় পদার্থ

যেমন আকাশে (দেশে) সীমাবদ্ধ, সকল চিন্তাও তেমনি কালে সীমাবদ্ধ।

১০। ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে যাওয়া মানে পিষ্টপেষণ করা, কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা—যাহাকে আমরা জানি।

১১। ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

১২। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতিরই স্থূল প্রকাশ মাত্র।

১৩। উদ্দেশ্য দ্বারাই কোন কাজের মূল্য নিরূপিত হয়। তুমি ঈশ্বর, নিম্নতম মানুষটিও ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্য আর কি থাকিতে পারে?

১৪। মনোজগতের ঘটনাবলী পরীক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষিত এবং খুব সবল হওয়া প্রয়োজন।

১৫। মনই সব কিছু, চিন্তাই সব কিছু—এরকম ভাবা একটি উন্নত ধরনের জড়বাদ মাত্র।

১৬। এই পৃথিবী একটি বিরাট ব্যায়ামাগার, এখানে আমরা আসি নিজেদের সবল করিয়া তুলিতে।

১৭। একটি চারাগাছকে বাড়ান তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, একটি শিশুকে শিক্ষা দেওয়াও তোমার পক্ষে ততটুকু সম্ভব, তার বেশী নয়। তুমি যেটুকু করিতে পার, তাহার সবটাই 'নেতি'র দিকে—তুমি শুধু তাহাকে সাহায্য করিতে পার। শিক্ষা ভিতর হইতে বিকাশ হয়। নিজের প্রকৃতিকে শিশু বিকশিত করিতে থাকে; তুমি কেবল বাধাগুলি অপসারিত করিতে পার।

১৮। সম্প্রদায়-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বিরোধিতা করা হয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সত্যই বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়াছে, তাঁহারা বেশী কথা বলেন না, কিন্তু তাহাদের কাজগুলিই উচ্চকণ্ঠে উহা ঘোষণা করে।

১৯। সত্যকে হাজার রকম বাক্যে প্রকাশ করা চলে, এবং প্রতিটি কথাই সত্য।

২০। তোমাকে ক্রমশঃ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে বিকশিত হইতে হইবে; ইহা কেহই তোমাকে শিখাইতে পারে না, কেহ তোমাকে ভগবৎপরায়ণ করিয়া দিতে পারে না। তোমার নিজের অন্তরাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শিক্ষক নাই।

২১। একটি অন্তহীন শৃঙ্খলের কয়েকটি শিকলির সহিত পরিচয় ঘটিয়া থাকিলে একই উপায়ে অপর অংশগুলিরও পরিচয়-লাভ সহজ।

২২। কোন জড় পদার্থ যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

২৩। সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।

২৪। সত্যের অনুসন্ধান মানে শক্তির প্রকাশ—এটা দুর্বল বা অন্ধের মত হাতড়ান নয়।

২৫। ঈশ্বর মানুষ হইয়াছেন—মানুষ আবার ঈশ্বর হইবে।

২৬। মানুষ মরে এবং স্বর্গে যায়—ইহা তো ছেলেমানুষী কথা। আমরা কখনও আসি না। যাইও না। আমরা যেখানকার সেখানেই আছি। যত

জীবাত্মা আজ পর্যন্ত হইয়াছে বা আছে এবং হইবে—সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত।

২৭। যাঁহার হৃদয়-বেদ খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। গ্রন্থের একমাত্র কাজ হইল অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। গ্রন্থগুলি তো অন্যের অভিজ্ঞতা মাত্র।

২৮। সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। দুঃস্থদের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। সমস্ত প্রাণীকে ভালবাস। কাহারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইও না এবং অপরের দোষ দর্শন করিও না।

২৯। মানুষ কখনও মরে না বা কখনও জন্মায়ও না। মৃত্যু হয় দেহের; কিন্তু আত্মা কোনদিন মরে না।

৩০। কোন ধর্মমত লইয়া কেহ জন্মায় না; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

৩১। প্রকৃতপক্ষে চরাচর বিশ্বে এক আত্মাই আছেন; অন্য সব কিছু তাঁহারই বিকাশ মাত্র।

৩২। উপাসকের অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীর, বীর কেবল দু-একজন, উপাসকদিগকে শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

৩৩। যদি এইখানে—এবং এই মুহূর্তেই পূর্ণত্ব লাভ করা সম্ভব না হয়, তবে অন্য কোন জীবনে যে আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিব, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

৩৪। একতাল মাটি সম্বন্ধে যদি আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, তবে পৃথিবীতে যত মাটি আছে, সে সম্বন্ধেও আমি জানিতে পারি। ইহা হইল তথ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কিন্তু ইহার ক্ষেত্রানুযায়ী রূপ বিভিন্ন হইতে

পারে। যখন তুমি নিজেকে জানিতে পারিবে, তখন সবই জানা হইয়া যাইবে।

৩৫। বেদের যতখানি অংশ যুক্তিসিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ততটুকু গ্রহণ করি। বেদের কোন কোন অংশ আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী। দিব্যপ্রেরণালব্ধ বাণী (Inspired) বলিতে পাশ্চাত্য ভাষায় যাহা বুঝায়, এগুলি ঠিক তাহা নয়, বরং এগুলিকে ঈশ্বরের জ্ঞানসমষ্টি বা সর্বজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। কল্পারম্ভে এই জ্ঞানের স্ফূর্তি ও বিস্তার হয় এবং কল্পশেষে এগুলি আবার সূক্ষ্মাকার প্রাপ্ত হয়। আবার যখন কল্প আরম্ভ হয়, তখন ঐ সঙ্গে এই জ্ঞানেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই পর্যন্ত এই মতবাদটি ঠিকই আছে। কিন্তু বেদ নামে অভিহিত শুধু এই বইগুলিই ঈশ্বরের জ্ঞান, এ-কথা বলা বৃথা তর্ক মাত্র। মনু এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, বেদের যে অংশ যুক্তিসম্মত, সেইটুকুই বেদ নামের যোগ্য, অন্য কিছু নয়। আমাদের দার্শনিকেরা অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩৬। জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদই কেবল ঘোষণা করেন যে, বেদের অধ্যয়নও গৌণ। ‘যাহা দ্বারা আমরা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারি’ তাহাই প্রকৃত বিদ্যা এবং এই বিদ্যা কেবল বেদপাঠ, বিশ্বাস বা বিচার—এগুলির কোনটিই হয়, উহা অতিচেতন অনুভূতি বা সমাধি।’

৩৭। আমরাও এক সময়ে নিম্নতর প্রাণী ছিলাম। আমরা ভাবি যে, তাহারা আমাদের হইতে ভিন্ন। পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের বলিতে শুনি—আমাদের ভোগের জন্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যাঘ্রদের বই লিখিবার ক্ষমতা থাকিলে তাহারাও বলিত যে, তাহাদের ভোগের জন্যই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সব প্রাণীর মধ্যে মানুষই পাপিষ্ঠ, কেননা তাহারা সহজে বাঘের নিকট ধরা দিতে চায় না। যে কীট তোমার পায়ের তলায় আজ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেও একদিন

ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে।

৩৮। নিউ ইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেনঃ আমাদের দেশের মেয়েরা তোমাদের মত বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করুক, ইহা আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয়, তবে নয়। তোমরা যাহা জান, তাহার জন্য তোমাদের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তোমরা যেভাবে মন্দকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া ভাল বল, তাহা আমি পছন্দ করি না। বুদ্ধিচার্তুযই শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্যই আমাদের সাধনা। আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন শিক্ষিতা নয় বটে, কিন্তু তাহারা অনেক বেশী পবিত্র। নারীর কাছে নিজ স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষই সন্তান, প্রত্যেক পুরুষের নিকট নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর সকল নারীই মাতৃসদৃশ মনে হওয়া উচিত। আমি যখন আশে-পাশে তাকাই, তখন তোমরা যাহাকে নারীজাতির প্রতি পুরুষসুলভ সৌজন্য (gallantry) বল, তাহা দেখিয়া আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া যততিন না তোমরা মানবিকতার সাধারণ ভিত্তি-ভূমিতে পরস্পর মেলামেশা করিতে পারিতেছ, ততদিন তোমাদের নারী-সমাজের যথার্থ উন্নতি হইবে না। তাহারা ততদিন তোমাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র হইয়া থাকিবে, তার বেশী নয়। এইগুলি হইল বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ। তোমাদের পুরুষেরা নত হইয়া মেয়েদের অভিবাদন করে এবং বসিতে চেয়ার আগাইয়া দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে প্রশংসাবাদ। তাহারা বলিতে থাকে, ‘মহোদয়া, আপনার চোখ-দুটি কি সুন্দর!’ এইরূপ করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? পুরুষ কি করিয়া এতদূর সাহসী হইতে পারে এবং তোমরা মেয়েরাই বা কি করিয়া এসব অনুমোদন কর? এই ভাব-অবলম্বনে মানব-জীবনের অপেক্ষাকৃত নিম্ন দিকটাই প্রকাশিত হয়। এগুলির দ্বারা মহৎ আদর্শের দিকে যাওয়া যায় না। আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী, বরং আমরা যেন ভাবি আমরা মানুষমাত্র। জীবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের

জন্ম। কোন যুবক ও যুবতীকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে অমনি যুবকটি যুবতীর স্তুতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এবং একজন কাহাকেও বিবাহ করার আগে হয়তো দেখা যাইবে, সে দুই-শ জনের নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে। কি জ্বালা! আমি যদি বিবাহকারীদের দলে ভিড়িতাম, তবে অত না করিয়া একজন প্রেয়সী যোগাড় করিতে পারিতাম।

৩৯। তিনি আমেরিকায় বলিলেনঃ যে-দেশ সভ্যতার জন্য এত গর্বিত, সে-দেশের নিকট যেরূপ আধ্যাত্মিকতা আশা করা যায়, তাহা কোথায়?

ভারতে থাকা-কালে যখন আমি দূর হইতে এই-সব লক্ষ্য করিতাম, তখন শুনিয়াছিলাম, এ-সব দোষের নয়; এগুলি একটু আমোদ-প্রমোদ মাত্র, আর আমি তাহা বিশ্বাসও করিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, ইহা ঠিক নয়, এগুলি দূষণীয়; কেবল পাশ্চাত্যবাসী তোমরা চোখ বুজিয়া থাক আর বল এ সব ভাল। পাশ্চাত্য জাতিগুলির ত্রুটি এইখানে যে, তাহারা নূতন জাতি, নির্বোধ, অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং ঐশ্বর্যশালী। এইগুলির যে-কোন একটিই কত না ক্ষতিকর হইতে পারে; আবার যখন এগুলির তিনটি বা চারিটি একত্র হয়, তখন সাবধান হওয়া উচিত।

স্বামীজী স্বভাবতঃ সকলেরই কঠোর আলোচনা করিলেও বষ্টনবাসীদের প্রতি কঠোরতম ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেনঃ বষ্টনই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ওখানকার মেয়েরা হুজুকপ্রিয়, অব্যবস্থিত-চিত্ত; সব সময় কিছু অভিনব এবং অদ্ভুত জিনিষের পিছু পিছু ছুটিতে ব্যস্ত।

৪০। 'ইহলোক' এবং 'পরলোক' এই-সব শব্দ শুধু শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য। সব কিছুই 'এখানে'। ইহলোকে—এই দেহেই ভগবানকে অবলম্বন করিয়া ভাগবত জীবন যাপন করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করা প্রয়োজন, সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করিতে হইবে। ভারতে এরূপ পুরুষ আছেন; এদেশে সে-রকম মানুষ কোথায়? তোমাদের (আমেরিকার) ধর্মপ্রচারকেরা স্বপ্নবিলাসীদের নিন্দা করেন। কিন্তু এদেশে আরও বেশী স্বপ্নবিলাসী থাকিলে এদেশের মঙ্গল হইত।

স্বপ্নবিলাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দাম্ভিকতার মধ্যে তফাত অনেক। সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণ, পাপে নয়। এস, আমরা একে অপরকে সাহায্য করি, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।
৪১। অর্থ নারী ও যশ উপেক্ষা করিয়া আমি যেন আমার শ্রীগুরুর মত প্রকৃত সন্ন্যাসীর মৃত্যু বরণ করিতে পারি। এগুলির মধ্যে যশের আকাঙ্ক্ষাই হইল সর্বাধিক শত্রু।
৪২। আমি কখনও প্রতিহিংসার কথা বলি না। আমি সব সময়ে শক্তির কথাই বলিয়াছি। সমুদ্রের এই একটু জলকণিকার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগে কি? তবে হাঁ, একটা মশকের নিকট উহা খুবই মারাত্মক বটে।

৪৩। একবার আমেরিকায় স্বামীজী বলিলেনঃ এটি একটি মহান্ দেশ, কিন্তু আমি এখানে বাস করিতে চাই না। আমেরিকানরা বড় বেশী অর্থের কথা ভাবে। অন্য কোন বস্তু অপেক্ষা তাহারা অর্থের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। তোমাদের দেশের লোকেদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। তোমাদের জাতি যখন আমাদের মত প্রাচীন হইবে, তখন তোমাদের জ্ঞান আরও পাকা হইবে।

৪৪। এমনও হইতে পারে যে, আমি হয়তো বুঝিব—এই দেহের বাহিরে চলিয়া যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোষাকের মত ফেলিয়া দেওয়াই আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোনদিন কর্ম হইতে ক্ষান্ত হইব না। যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করিতেছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা জাগাইতে থাকিব।

৪৫। আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যাহা হইবে, তাহার সব কিছুরই মূলে আছেন—আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে সেই সর্বানুস্যূত অতি আশ্চর্য এক একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা

প্রচার করিয়াছিলেন।

৪৬। জিহ্বাকে যথেচ্ছ চলিতে দিলে অপর ইন্দ্রিয়গুলিও যথেচ্ছ চলিবে।

৪৭। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

৪৮। ধর্ম কল্পনার জিনিষ নয়, অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। যিনি কোন একটি ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত অপেক্ষা বড়।

৪৯। স্বামীজী একবার একজনের খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, ইহাতে পার্শ্বস্থ একজন বলিয়া উঠিলেন, 'তিনি কিন্তু আপনাকে মানেন না।' এই কথা শুনিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তিনি কি এমন কোন আইনে আবদ্ধ যে, আমাকে মানিতে হইবে। তিনি সৎ কাজ করিতেছেন, তাই তিনি প্রশংসার যোগ্য।'

৫০। প্রকৃত ধর্মের রাজ্যে পুঁথিগত বিদ্যার প্রবেশাধিকার নাই।

৫১। কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর যেদিন হইতে ধনীদের তোষণ করা আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসও আরম্ভ হয়।

৫২। তোমার যদি কোন অন্যায় করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা তোমার গুরুজনদের চোখের সামনে কর।

৫৩। গুরুর কৃপায় কোন বই না পড়িয়াও শিষ্য পণ্ডিত হইতে পারে।

৫৪। পাপ বা পুণ্যের কোন অস্তিত্ব নাই, আসলে আছে অজ্ঞান। অদ্বৈত অনুভূতির দ্বারা এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়।

৫৫। একাধিক ধর্মান্দোলন একসাথেই আসে; তাহাদের প্রত্যেকটি অপরগুলিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের একটিই প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সমসাময়িক অপর আন্দোলনগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে।

৫৬। রামনাদে থাকাকালে কথোপকথন প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেনঃ রাম পরমাত্মা, সীতা দেবী জীবাত্মা এবং প্রত্যেক নারী বা পুরুষের দেহই লঙ্কা। এই দেহরূপ লঙ্কায় বন্দী জীবাত্মা সব সময়েই পরমাত্মা বা শ্রীরামের সহিত মিলন কামনা করে, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহা হইতে দেয় না। রাক্ষস মানে চারিত্রিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ বিভীষণ সত্ত্বগুণ, রাবণ রজোগুণ এবং কুম্ভকর্ণ তমোগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণের অর্থ সাধুতা; রজোগুণের অর্থ কাম ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা; তমোগুণের অর্থ অজ্ঞান, জড়তা, লোভ, হিংসা ও অন্যান্য সহগামী দোষসমূহ—এই গুণগুলি দেহে আবদ্ধ জীবাত্মাকে বা লঙ্কার বন্দিনী সীতাকে পরমাত্মা বা শ্রীরামের সহিত মিলিত হইতে দেয় না। এইরূপে বন্দিনী সীতা যখন তাঁহার প্রভুর সঙ্গে মিলিবার জন্য ব্যাকুল, তখন তিনি হনুমান অর্থাৎ গুরু বা পরমার্থ-বস্তুর উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পান। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দেখান। এই অঙ্গুরীয়ক হইল ব্রহ্মজ্ঞান বা সর্বোত্তম অনুভূতি, যাহা সকল ভ্রান্তি নিরসন করে। এইরূপ সীতা শ্রীরামের সান্নিধ্যলাভের উপায় দেখিতে পান অর্থাৎ অন্য কথায় বলিতে গেলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বানুভূতি হয়।

৫৭। যে প্রকৃত খ্রীষ্টান, সে প্রকৃত হিন্দুও বটে, আবার যে প্রকৃত হিন্দু, সে প্রকৃত খ্রীষ্টানও বটে।

৫৮। সমাজের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহার বিকাশের ফলেই সামাজিক শুভ পরিবর্তনগুলি সঙ্ঘটিত হইতেছে। এই শক্তিগুলি সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ হইলে সমাজও নিজেকে তদনুরূপ গড়িয়া তুলিবে। প্রত্যেককেই যেমন নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং তাছাড়া উপায় নাই, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধেও একই কথা। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার যে-সব নিজস্ব ভাল বিধিব্যবস্থাদি আছে, ঐগুলিরই উপর ঐ-সব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং ঐগুলিকে অন্য জাতির ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়া চলে না। যতদিন না কোন উন্নততর বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়, ততদিন পুরাতনগুলিকে ভাঙিয়া ফেলার চেষ্টা করা মারাত্মক। উন্নতি সব সময় ক্রমশঃ ধীর গতিতে হইয়া থাকে। সব সামাজিক রীতিনীতি অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া ঐগুলির ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া খুবই সোজা। কিন্তু তিনিই মনুষ্য-জাতির যথার্থ কল্যাণকামী, যিনি মানুষ যে-কোন সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জীবন যাপন করুক না কেন, তাহার অপূর্ণতা দূর করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেন, ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সমাজ ও জাতির উন্নতি হইবে।
ধার্মিক ব্যক্তিগণ সমাজের দোষ ত্রুটি ধরিতে যান না, কিন্তু তাঁহাদের প্রেম সহানুভূতি ও সততা তাঁহাদিগকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করে। উহাই তাঁহাদের নিকট অলিখিত শাস্ত্র। যে-সকল জাতি বা সমাজ ক্ষুদ্র লিখিত শাস্ত্রীয় গণ্ডীর উপরে উঠিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। সৎলোকেরা এই শাস্ত্রীয় গণ্ডীর উপরে উঠেন ও তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাহাদিগকে এইরূপ উঠিতে সাহায্য করেন। ভারতের মুক্তিও সেইজন্য ব্যক্তির শক্তি-বিকাশ ও তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম-উপলব্ধির উপরই নির্ভর করে।

৫৯। জড়বাদ না গেলে আধ্যাত্মিক কখনও আসিতে পারে না।

৬০। গীতার প্রথম অধ্যায়টি রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৬১। যথাসময়ে ষ্টীমার ধরিতে পারিবেন না ভাবিয়া উদ্বিগ্ন একজন মার্কিন ভক্ত মন্তব্য করিলেন, 'স্বামীজী, আপনার কোন সময়-জ্ঞান নাই।' স্বামীজী শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'ঠিক কথা; তুমি আছ সময়ের ভিতর, আমি আছি অনন্তে।' ৬২। আমরা সর্বদাই ভাবপ্রবণতাকে আমাদের কর্তব্যবুদ্ধির স্থান অধিকার করিতে দিই, অথচ আমরা এই মনে করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করি যে, আমরা প্রকৃত ভালবাসার প্রেরণাতেই কাজ করিতেছি।

৬৩। ত্যাগের শক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই ভাবপ্রবণতার বাহিরে যাইতে হইবে। ভাবপ্রবণতা পশুদের বৃত্তি। তাহারা পুরোপুরি ভাবাবেগেই চলে।

৬৪। নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য ত্যাগকে উচ্চতর ত্যাগ বলা যায় না। পশুরাও ঐরকম করিয়া থাকে এবং যে-কোন মানব-মাতাই যতখানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ত্যাগ করেন, তাহারাও ঠিক ততখানি করে। ঐরূপ করাটাই ভালবাসার প্রকৃত পরিচয় নয়; উহা তো শুধু অন্ধ ভাবপ্রবণতা।

৬৫। আমরা চিরকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, আমাদের দুর্বলতাকে শক্তিরূপে দেখাইতে, ভাবপ্রবণতাকে ভালবাসা বলিয়া চালাইতে, কাপুরুষতাকে সাহসের রূপ দিতে, এবং এইরূপ আরও কত কি।

৬৬। দাম্ভিকতা, দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে বলঃ এগুলি তোমার সাজে না, এগুলি তোমার সাজে না।

৬৭। কোন স্বামী কখনও তাহার স্ত্রীকে 'স্ত্রী' বলিয়া ভালবাসে নাই বা স্ত্রীও তাহার স্বামীকে 'স্বামী' বলিয়াই ভালবাসে নাই। স্ত্রীর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকেই স্বামী ভালবাসে, এবং স্বামীর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকেই স্ত্রী ভালবাসে। প্রত্যেকের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন,

তিনিই আমাদের হৃদয়ে ভালবাসার প্রেরণা জাগান। ঈশ্বর একমাত্র প্রেমস্বরূপ।

৬৮। আহা! যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের জানিতে পারিতে তোমরা আত্মা, তোমরাই ঈশ্বর! যদি কখনও আমি তোমাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছি, জানিও।

৬৯। প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া।

৭০। আধ্যাত্মিক জীবনের যদি আনন্দ না পাই, তবে কি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান করিতে হইবে? অমৃত না পাইয়া কি নর্দমার জল পান করিতে হইবে? চাতক কেবল বৃষ্টির জল পান করে; উড়িতে উড়িতে সে শুধু ভাবে—ফটিক জল, ফটিক জল। কোন ঝড়-ঝঞ্ঝাও তাহার পাখার গতি থামাইতে পারে না বা জল পানের জন্য তাহাকে ধরাপৃষ্ঠে নামাইতে পারে না।

৭১। ঈশ্বর-উপলব্ধি সহায়ক যে-কোন সম্প্রদায়কেই স্বাগত জানাও। ঈশ্বরানুভূতিই ধর্ম।

৭২। নাস্তিক দয়াবান হইতে পারে, কিন্তু ধার্মিক হইতে পারে না। পরন্তু ধার্মিককে দয়াশীল হইতেই হইবে।

৭৩। গুরুর আসন গ্রহণ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন, এমন সব মহাত্মা ছাড়া আর সকলেই গুরুগিরি করিতে গিয়া ভরাডুবি করেন।

৭৪। পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরত্ব—এই তিনের সমষ্টিতেই মানুষ।

৭৫। গরম বরফ, অন্ধকার, আলো বলিতে যাহা বুঝায়, ‘সামাজিক

উন্নতি’ বলিতে অনেকটা তাহাই বুঝায়। শেষ পর্যন্ত ‘সামাজিক উন্নতি’ বলিতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৭৬। বাহিরের কিছুর উন্নতি হয় না, জগতের উন্নতি করিতে গিয়া আমরাই উন্নত হই।

৭৭। আমি যেন মানুষের সেবা করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য।

৭৮। নিউ ইয়র্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী অতি মৃদুভাবে বলিলেনঃ না, আমি কোন অলৌকিক বিদ্যায় (Occultism) বিশ্বাস করি না। কোন জিনিষ যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহা নাই; যাহা মিথ্যা, তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাগুলিও প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই অন্তর্গত। আমি এগুলিকে বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই মনে করি। সে-হিসাবে এগুলি আমার নিকট গুপ্তবিদ্যার বিষয় নয়। আমি কোন গুপ্তবিদ্যা-সঙ্ঘে আস্থা রাখি না। তাহারা ভাল কিছুই করে না, করিতে পারে না।

৭৯। যুক্তিবাদী, ভাবপ্রবণ, রহস্যবাদী এবং কর্মী—সাধারণতঃ এই চারি স্তরের লোক দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেক স্তরের জন্যই উপযুক্ত সাধন-পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। যুক্তিবাদী আসিয়া বলিলেন—আমি এ রকম সাধন-পদ্ধতি মানি না, আমাকে বিশ্লেষণমূলক যুক্তিসিদ্ধ কিছু বলুন; যাহাতে আমার মন সায় দিতে পারে। সুতরাং বিচারবাদীর জন্য দার্শনিক বিচারই হইল সাধন-মার্গ। তারপর কর্মী আসিয়া বলেন, আমি দার্শনিকের সাধন-পদ্ধতি মানি না। আমাকে মানুষের জন্য কিছু করিতে দিন। অতএব তাঁহার সাধনার জন্য কর্মই পথ-হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। রহস্যবাদী (mystic) এবং ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের জন্যও তাঁহাদের উপযুক্ত উপাসনা-মার্গ নির্ধারিত হইয়াছে। এই-সব লোকেরই জন্য ধর্মের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা

রহিয়াছে।

৮০। আমি সত্যানুসন্ধিৎসু। সত্য কখনও মিথ্যার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না। এমন কি সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও অবশেষে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৮১। যেখানেই দেখিবে মানবহিতৈষণার উদারভাবগুলি সাধারণ জনতার হাতে পড়িয়াছে, সেখানেই সর্বপ্রথমে তুমি লক্ষ্য করিবে, ঐগুলির অধোগতি ঘটিয়াছে। শিক্ষা এবং বুদ্ধি থাকিলেই কোন কিছুর সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকে। সমাজের কৃষ্টিসম্পন্ন সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও দর্শনের বিশুদ্ধতম রূপটি রক্ষা করিতে পারে। আর উহা হইতেই ঐ জাতির সামাজিক এবং মানসিক গতি-প্রকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

৮২। স্বামীজী একবার আমেরিকায় বলিলেনঃ আমি নূতন ধর্মমতে তোমাদের দীক্ষিত করিবার জন্য এখানে আসি নাই। আমি চাই তোমাদের স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অটুট থাকুক। আমি একজন মেথডিষ্টকে ভাল মেথডিষ্ট, প্রেসবিটেরিয়ানকে ভাল প্রেসবিটেরিয়ান, ইউনিটেরিয়ানকে ভাল ইউনিটেরিয়ান করিতে চাই। আমি তোমাদিগকে শিখাইতে চাই—কি করিয়া সত্যকে জীবনে রূপায়িত করিতে হয়, কি করিয়া তোমাদের অন্তর্নিহিত জ্যোতিকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হয়।

৮৩। দুঃখের রাজমুকুট মাথায় পরিয়া সুখ মানুষের সামনে হাজির হয়। যে তাহাকে স্বাগত জানায়, সে দুঃখকেও স্বাগত জানাইতে বাধ্য।

৮৪। যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন এবং যিনি শান্তিকামী, এই পৃথিবীতে তিনিই মুক্ত—তিনিই মহৎ। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পাইয়াও কেহ যদি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এবং বাসনার দাস হয়,

তবে সে প্রকৃত মুক্তির বিশুদ্ধ আস্বাদ পাইতে পারে না।

৮৫। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বর এবং নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ। বিভিন্ন শাস্ত্র শুধু ধর্মলাভের উপায় নির্দেশ করে।

৮৬। বিচারের সহায়ে সত্য যখন বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, তখন উহা অনুভূতির উৎস হৃদয়েই অনুভূত হয়। এইরূপে হৃদয় ও মস্তিস্ক দুই-ই একক্ষণে আলোকিত হইয়া উঠে এবং তখনই উপনিষদের কথায় বলিতে গেলে—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'—হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়।
প্রাচীনকালে এই জ্ঞান ও এই ভাব যখন যুগপৎ ঋষির অন্তঃকরণে বিকশিত হইয়াছিল, তখন শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি কবিতার ভাষায় রূপায়িত হয় এবং তখনই বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র রচিত হয়। এই কারণে এগুলি অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান ও ভাবের দুইটি সমান্তরাল রেখা অবশেষে বেদের স্তরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

৮৭। বিশ্বপ্রেম, স্বাধীনতা, সাহসিকতা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রভৃতি আদর্শগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়াছে। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য—এই-বিষয়ে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় প্রায়ই অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বিমত এবং সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এই পাপ ও পুণ্যের পথের বিষয়ে ঝগড়ায় মত্ত। প্রত্যেক পথই অল্পবিস্তর উন্নতির পথে সাহায্য করে। গীতা বলেন, 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।' আগুন যেমন ধূমে আবৃত থাকে, সমস্ত কর্মের সঙ্গেই তেমনি দোষ মিশ্রিত থাকে। অতএব পথগুলি অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণ থাকিবেই, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু নিজ

নিজ শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া উচ্চতম ধর্মভাব লাভ করাই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন ঐগুলিকে অনুসরণ করার জন্যই আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া ঐগুলিকে যুক্তি ও বিচার-সহায়ে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমরা যতই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই পাপপুণ্য-সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে।

৮৮। আজকাল আমাদের দেশে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা শুধু ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ শিখিয়া ঐগুলির দ্বারা মাথার মধ্যে গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছেন। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম এবং উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাঁহারা কেবল শব্দ লইয়া মারামারি করেন। শাস্ত্র যদি সমস্ত লোককে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সাহায্য করিতে না পারে, তবে সে শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র যদি কেবল সন্ন্যাসীর জীবনের পথপ্রদর্শক হয়, যদি গার্হস্থ্য জীবনের কোন কাজে না আসে, তবে এই একদেশদর্শী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি প্রয়োজন? যাঁহারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছেন, শাস্ত্র যদি কেবল তাঁহাদের জন্যই হয়, শাস্ত্র যদি কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যে, অনুশোচনাময় হতাশ হৃদয়ে, নিপীড়িতের আত্মগ্লানিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার মধ্যে, লোভে, ক্রোধে, সুখে, বিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের অন্ধকারে এবং অবশেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষকে আশার আলো জ্বালাইবার উপায় দেখাইতে না পারে, তবে দুর্বল মানুষের কাছে এই শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বই নষ্ট হইয়া যাইবে।

৮৯। ভোগের মধ্য দিয়াই কালে যোগ আসিবে। কিন্তু হায়, আমাদের দেশবাসীর ভাগ্য এমনি যে, যোগ আয়ত্ত করার কথা দূরে থাকুক, তাহারা সামান্য ভোগও পায় না। সর্বপ্রকার অপমান সহ্য করিয়া অতি কষ্টে তাহারা জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মাত্র মিটাইতে সমর্থ হয়;

তাহাও আবার সকলে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন দূরবস্থাও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া আমাদিগকে আশু কর্তব্যের প্রতি সচেতন করিতে পারে না।

৯০। তোমাদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার জন্য তোমরা যতই আন্দোলন কর না কেন, স্মরণ রাখিও, যতদিন না তীব্র জাতীয় সম্মানবোধ জাগাইয়া আমরা সত্যসত্যই নিজেদের উন্নত করিতে পারিতেছি, ততদিন এই সুযোগ ও অধিকার লাভের আশা 'আলনাস্কারের দিবাস্বপ্নে'র তুল্য।

৯১। যখন কোন বংশ কোন প্রতিভাবান্ বা বিশেষ বিভূতিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই বংশে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং সমধিক সৃজনশীল প্রতিভা থাকে, তাহা যেন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টির জন্য নিঃশেষে তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হয়। এই কারণে আমরা দেখি, ঐ বংশে পরবর্তী কালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা হয় নির্বোধ অথবা অতি সাধারণ- বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র এবং কালে ঐ বংশ বহুক্ষেত্রেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

৯২। এই জীবনে যদি মুক্তিলাভ না হয়, তবে পরবর্তী এক বা বহু জীবনে যে মুক্তিলাভ ঘটিবে, তাহার প্রমাণ কি?

৯৩। আগ্রার তাজমহল দেখিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিলেনঃ ইহার যে-কোন এক-টুকরা মার্বেলকে নিংড়াইলে ইহা হইতে বিন্দু বিন্দু রাজকীয় প্রেম ও দুঃখ ক্ষরিত হইবে। তিনি আরও বলিলেনঃ ইহার অন্তর্ভাগের এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের সৌন্দর্য ঠিক ঠিক উপভোগ করিতেই ছয় মাস লাগিবে।

৯৪। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ললিতকলার ক্ষেত্রেও ভারত সমস্ত পৃথিবীর আদি গুরু।

৯৫। স্থাপত্য-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেনঃ লোকে বলে কলিকাতা প্রাসাদপুরী। কিন্তু বাড়ীগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুলি বাক্সকে উপর উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এগুলি কোন বিশেষ ভাবের দ্যোতক নয়। প্রকৃত হিন্দু স্থাপত্য রাজপুতানায় এখনও অনেক দেখা যায়। কোন ধর্মশালার দিকে তাকাইলে মনে হইবে, উহা যেন মুক্ত বাহু প্রসারিত করিয়া যাত্রীকে আহ্বান জানাইতেছে—তাহারা সেখানে আশ্রয় ও আতিথেয়তা লাভ করিতে পারে। উহার ভিতরে ও বাহিরে দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। গ্রাম্য কুটীর দেখিলেও তৎক্ষণাৎ উহার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত কুটীরটিই মালিকের নিজস্ব আদর্শ এবং প্রকৃতির দ্যোতক। ইতালী ব্যতীত অন্য কোন দেশে আমি এই জাতীয় ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্যশিল্প দেখি নাই।

১। স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হইল, 'বুদ্ধের মত কি এই যে, বহুত্ব সত্য এবং একত্ব (আত্মা) মিথ্যা? আর হিন্দু (বেদ) মতে তো একত্বই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা।' স্বামীজী বলিলেনঃ হ্যাঁ, এবং এর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং আমি যাহা যোগ করেছি, তা এই যে, একই নিত্য বস্তু একই মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়।

২। একবার এক শিষ্যকে বলিলেনঃ মনে রাখিও জীবাত্মারই বিকাশের জন্য প্রকৃতি, প্রকৃতির জন্য জীবাত্মা নয়—ইহাই ভারতের শাশ্বত বাণী।

৩। পৃথিবী আজ চায় এমন কুড়িজন নরনারী, যাহারা সামনের ঐ পথে সাহসভরে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে যে, ভগবান্ ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। কে আসিবে? কেন, ইহাতে ভয় কি? যদি এটি সত্য হয়, তবে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি এটি সত্য না হয়, তবে আমাদের বাঁচিয়া কি লাভ?

৪। আহা, পরমাত্মার স্বরূপ যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কাজ কতই না শান্ত! বাস্তবিকপক্ষে লোকের দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া ছাড়া তাঁহাদের অন্য কিছু করণীয় থাকে না। আর যাহা কিছু, তাহা আপনিই হইতে থাকে।

৫। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এক মহৎ জীবনযাপন করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন এবং সেই জীবনের তাৎপর্য-নির্ণয়ের ভার দিয়া গিয়াছেন অপর সকলের উপর।

৬। একজন শিষ্য কোন একটি বিষয়ে স্বামীজীকে সংসারের অভিজ্ঞতাসম্ভূত পরামর্শ দিলে স্বামীজী বিরক্তির সহিত বলিলেনঃ

পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা! এই জন্যই পাশ্চাত্যবাসীরা কখনও কোন ধর্মমত গঠন করিতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কখনও পারিয়া থাকে, তবে তাহা কয়েকজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী মাত্র, যাহাদের পরিকল্পনা বলিতে কিছু ছিল না। পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা কখনও ধর্মপ্রচার হয় নাই।

৭। পাশ্চাত্যের সমাজ-জীবন দেখিতে একটি হাসির হুল্লোড়ের মত, কিন্তু একটু নীচেই উহা কান্নায় ভরা। ইহার শেষ হয় হতাশ ক্রন্দনে। কৌতুক উচ্ছলতা সবই সমাজের উপর উপর, বাস্তবিকপক্ষে ইহা বিষাদে পূর্ণ। এদেশে (ভারতে) আবার বাহিরে হয়তো নিরাপদ ও বিষাদ, কিন্তু ভিতরে গাম্ভীর্য, নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ।

তোমরা জান, গুরু নানকও এই রকম এমন একজন শিষ্যের খোঁজ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি তাঁহার শক্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে পারেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের কাহাকেও উপযুক্ত মনে করিলেন না। তাঁহার সন্তানসন্ততিরা তাঁহার কাছে

আমাদের একটি মতবাদ আছে—ঈশ্বর স্বয়ং লীলাচ্ছলে নিজেকে জীবজগতে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং এই সংসারে অবতারেরা লীলাচ্ছলে দেহধারণ করিয়া জীবন যাপন করেন। সবটাই লীলা, সবই খেলা। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? সেটাও সম্পূর্ণ খেলা। মানব জীবনের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাও ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়ামাত্র। বল, ‘সবই লীলা, সবই খেলা।’ খেলা ছাড়া তুমিও আর কিছু কর কি?

৮। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, এক জীবনেই কেহ নেতা হইয়া উঠিতে পারে না। তাহাকে শক্তি লইয়াই জন্মাইতে হয়। কারণ সংগঠন বা পরিকল্পনা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। নেতার পরীক্ষা—প্রকৃত পরীক্ষা হয় বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের সাধারণ সহানুভূতির সূত্র ধরিয়া, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখার ক্ষমতায়। চেষ্টা করিয়া নয়, অজ্ঞাতসারেই ইহা হইয়া থাকে।

৯। প্লেটোর ভাববাদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘তাহা হইলে তোমরা দেখিতেই পাইতেছ যে, বড় বড় ভাবগুলির ক্ষীণতম বিকাশ এই-সব যাহা কিছু। ঐ ভাবগুলিই সত্য এবং সম্পূর্ণ। একটি আদর্শ ‘তুমি’ কোথাও আছে এবং সেইটি জীবনে

অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া মনে হইল। তারপর তিনি এক বালকের সন্ধান পাইলেন, তাহাকে ঐ শক্তি দিলেন, এবং দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তোমরা বলিতেছ, ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কালীর অবতার বলা হইবে কি? হাঁ, আমিও মনে করি, কালী তাঁহার কার্য সম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহযন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন। দেখ, আমার পক্ষে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই যে, কোথাও এমন এক বিরাট শক্তি নিশ্চয় আছেন, যিনি নিজেকে কখনও কখনও

রূপায়িত করার জন্যই এখানে তোমার যত চেষ্টা। চেষ্টা হয়তো অনেক দিক্ দিয়াই ত্রুটিপূর্ণ হইবে, তবু চেষ্টা করিয়া যাও। একদিন না একদিন সে আদর্শ রূপায়িত হইবে।'

১০। জনৈক শিষ্যা নিজের ভাব ব্যক্ত করিয়া মন্তব্য করিলেন, ব্যক্তিগত মুক্তি—জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা যে-সকল উদ্দেশ্য সাধন করা আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, সেইগুলি সম্পাদন করার জন্য বারবার সংসারে ফিরিয়া আসা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। ইহাতে স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'ইহার কারণ তুমি উন্নতি করিবার ধারণার ঊর্ধ্বে উঠিতে পার না; কিন্তু কোন জিনিষই উন্নততর হয় না। ঐগুলি যেমন তেমনই থাকে। ঐগুলির রূপান্তর ঘটাইয়া শুধু আমরাই উন্নততর হই।'

১১। আলমোড়াতে একজন বয়স্ক লোক স্বামীজীর নিকট আসিলেন। তাঁহার মুখে এমন একটা পরনির্ভরতার ভাব ছিল, যাহা দেখিলেই সহানুভূতি জাগে। তিনি কর্মবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, 'যাহারা নিজ কর্মদোষে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিতে বাধ্য হয়, তাহাদের কর্তব্য কি?' স্বামীজী ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'কেন, সকলকে ঠেঙাইবে, আবার কি? এই কর্মবাদের মধ্যে তোমার নিজের অংশটা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার—বিদ্রোহ করিবার অধিকার তোমার সব সময়ই আছে।'

১২। একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, 'সত্যের জন্য কি মানুষের মৃত্যুকেও বরণ করা উচিত, অথবা গীতার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা উদাসীন থাকিতে চেষ্টা করা উচিত?' স্বামীজী ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ থামিয়া থামিয়া বলিলেন, 'আমি উদাসীন থাকার পক্ষপাতী।' তারপর আবার বলিলেন, 'এটি সন্ন্যাসীর জন্য; গৃহীদের পথ আত্মরক্ষা।'

নারীরূপে কল্পনা করেন এবং তাঁহাকে লোকে ‘কালী’ এবং ‘মা’ বলিয়া ডাকে। আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি। আর আসল ব্যাপারটা কি সব সময় ঠিক ঐরূপই নয়? ... যেমন সংখ্যাতীত জীবকোষের সমষ্টিতেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, যেমন একটি নয়—বহু মস্তিষ্ক-কোষের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনি নয় কি? একত্ব মানেই বৈচিত্র্য। ইহাও ঠিক সেইরকম। ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বা ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্তা, কিন্তু তবু তিনিই আবার বহু দেবতাও হইয়াছেন।

আমাদের সমাজে এটা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে, মানুষের সব

১৩। সবাই সুখ চায়—এ-কথা ভুল। প্রায় সমসংখ্যক লোক জন্মায় দুঃখকে বরণ করবার জন্য। এস, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর হিসাবেই পূজা করি।

১৪। আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেনঃ ঠিক যে-ভাষায় অপরে কথা বলে ও যে-ভাষা বোঝে, তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত।

১৫। নিজ জীবনে কালীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে তাঁহার সন্দেহ-বিজড়িত দিনগুলিকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্যকলাপে আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার ছ বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁহাকে মানিতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আসল কথা এই, আমি যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসিতাম; তাহাই আমাকে ধরিয়া রাখিত। আমি তাঁহার অপূর্ব পবিত্রতা দেখিয়াছি। আমি তাঁহার আশ্চর্য ভালবাসা অনুভব করিয়াছি। তখনও পর্যন্ত তাঁহার মহত্ত্ব আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই। পরে যখন আমি তাঁহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তখন ঐ ভাব আসিয়াছিল। তাহার পূর্বে আমি তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক একটি শিশু বলিয়া ভাবিতাম, মনে করিতাম—এই জন্যই তিনি সর্বদা অলৌকিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘৃণা করিতাম। তারপর আমাকেও মা-কালী মানিতে হইল। না, যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা একটি গোপন রহস্য, এবং উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে। সে-সময় আমার খুবই ভাগ্য বিপর্যয় চলিতেছিল। ... ইহা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিল। আর (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন। এই কথাই বলিয়াছিলাম, ‘আমি তোমার দাস।’ রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন! অদ্ভুত ব্যাপার! এই ঘটনার পর তিনি মাত্র দুই বছর জীবিত ছিলেন এবং ঐ কালের অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য নষ্ট হইয়া যায়।

১৬। যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই মনে হয়, বীরত্বের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। ইহাই আমার নূতন বাণী।

আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্যই আমাদের জীবন অনেক বিধি-নিষেধের অধীন। এগুলি সৌন্দর্যহীন মনে হইলেও ইহা শক্তি ও আলোকপ্রদ। আমাদের সমাজের উদারপন্থীরা সমাজের শুধু কুৎসিত দিকটা দেখিয়া ইহাকে দূরে বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা প্রবর্তন করিলেন, তাহা তেমনি খারাপ। তারপর নূতন প্রথাগুলির শক্তি লাভ করিতে পুরাতন প্রথাগুলির মতই দীর্ঘ সময় লাগিবে।

১৭। ‘কোন কোন সমাজে নরমাংস-ভোজন স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অঙ্গীভূত’—ইওরোপে এই মতের উল্লেখ শুনিয়া স্বামীজী মন্তব্য করিলেনঃ এটা কি সত্য নয় যে, যুদ্ধে হিংসার বশবর্তী হইয়া বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ছাড়া কোন জাতিই কখনও নরমাংস ভোজন করে না? তোমরা কি ইহা বুঝিতে পার না? সমাজবদ্ধ প্রাণীদের ইহা রীতি নয়, কারণ ইহাতে সমাজ-জীবনের মূলোচ্ছেদ হইবে।

১৮। মৃত্যু বা কালীকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন করি—তাহাকে যেন কোমলতর হইতে অনুরোধ না করি, আমরা যেন দুঃখের জন্যই দুঃখকে বরণ করি।

১৯। পাঁচ-শ বছর নীতির অনুশাসন, পাঁচ-শ বছর মূর্তিপূজা এবং পাঁচ-শ বছর তন্ত্রের প্রাধান্য—বৌদ্ধধর্মের এই তিনটি যুগ। তোমরা যেন কখনও না ভাব যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম নামে এমন কোন ধর্মমত ছিল, যাহার স্বতন্ত্র ধরনের মন্দির, পুরোহিত প্রভৃতি ছিল; এ-রকম কোন কিছুই ছিল না। বৌদ্ধধর্ম সব সময়ই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত ছিল। কেবল কোন এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সমস্ত জাতিতে সন্ন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

পরিবর্তন করিলেই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয়

২০। যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে আদর্শ বলিতে শুধু আত্মসমর্পণই বুঝায়। কিন্তু তোমাদের আদর্শ হইল সংগ্রাম। ফলে জীবনকে উপভোগ করি আমরাই, তোমরা কখনই

পার না। তোমরা সব সময় আরও ভাল কিছুর জন্য তোমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করিতে সচেষ্ট, কিন্তু ঈপ্সিত পরিবর্তনের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সাধিত হওয়ার আগেই তোমরা মরিয়া যাও। পাশ্চাত্যের আদর্শ হইল—কোন কিছু করা এবং প্রাচ্যের আদর্শ হইল—সহ্য করা। ‘করা’ এবং ‘সহ্য করা’—এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়েই পূর্ণ জীবন গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব নয়।

না, বরং উহা দুর্বল ও পরিবর্তনের অধীন হইয়া পড়ে। তবে আমাদের সব সময়েই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিজস্ব করিয়া লওয়ার মধ্য দিয়াই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর হয়। আর পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র বস্তু, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা ইহার প্রশংসা করিয়া থাকি। সতীদাহ-প্রথায় সতীগণ সকলের প্রশংসা অর্জন করেন, যেহেতু এই প্রথার ভিতর দিয়া দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পায়।

স্বার্থপরতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। জীবনে যখনই কোন ভুল করিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, তাহার মূল কারণ হইল আমি আমার স্বার্থবুদ্ধিকে উহার মধ্যে আনিয়াছিলাম। যেখানে আমার স্বার্থ ছিল না, সেখানে আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইয়াছে।

স্বার্থবুদ্ধি না থাকিলে কোন ধর্মমতই গড়িয়া উঠিত না। মানুষের নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে তোমরা কি মনে কর যে, তাঁহার এই-সব প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতি থাকিত? হয়তো বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা অপর কিছু দেখিয়া কখনও কখনও সামান্য একটু স্তুতি করিত, ইহা ছাড়া সে ঈশ্বরের কথা কখনও ভাবিত না। সর্বদা ভগবানের স্তুতি ও প্রার্থনায় রত থাকাই তো উচিত। কিন্তু হায়! আমরা যদি এই স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িতে পারিতাম!

যুদ্ধ-বিগ্রহ অগ্রগতির লক্ষণ—এই কথা যখনই ভাব, তখনই তুমি সম্পূর্ণ ভুল কর। ব্যাপারটি মোটেই ঐ রকম নয়। অগ্রগতির লক্ষণ—গ্রহণশীলতা। কোন কিছুকে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লওয়া হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া আমরা কখনও মাথা

ঘামাইতাম না। অবশ্য আমাদের নিজ বাসভূমি রক্ষার জন্য কখনও কখনও অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধকে নীতি হিসাবে কোনদিনই আমরা গ্রহণ করি নাই। প্রত্যেক জাতিকেই ইহা শিখিতে হইয়াছে। অতএব নবাগত জাতিগুলি কিছুদিন ঘুরপাক খাইতে থাকুক, অবশেষে সকলেই হিন্দুধর্মের (ভাবের) অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে।

কেহ কেহ হয়তো প্রাচীন গ্রন্থে, গবেষণাগারে বা স্বপ্নে ভারতবর্ষকে যেমন দেখিয়াছেন, তাহাকে আবার সেইভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন। আমি সেই ভারতকেই আবার দেখিতে চাই, যে-ভারতে প্রাচীন যুগে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ছিল, তাহার সহিত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিকভাবে মিলিত হইয়াছে। এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি ভিতর হইতেই হইবে, বাহির হইতে নয়।

২১। কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হইলেন সগুণ ঈশ্বর। সমষ্টির ইচ্ছাকে কিছুই রোধ করিতে পারে না। নিয়ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই; ইহাকেই আমরা শিব, কালী বা অন্য নামে ব্যক্ত করি।

২২। ভীষণের পূজা কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃথা; সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ইহাই শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা কাপুরুষের এবং দুর্বলের মৃত্যুবরণ নয় বা আত্মহত্যাও নয়—ইহা শক্তিমান্ পুরুষের মৃত্যুবরণ, যিনি সব কিছুর অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই।

২৩। যাহারা তাহাদের কুসংস্কারগুলি আমাদের দেশবাসীর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সঙ্গে আমি একমত নই। মিশর তত্ত্ববিদগণের মিশরের প্রতি কৌতূহল পোষণ করার মত ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও লোকের কৌতূহল পোষণ করা সহজ, কিন্তু উহা স্বার্থ-প্রণোদিত।

সেজন্য আমি
কেবল উপনিষদই প্রচার করি। তোমরা লক্ষ্য করিবে যে, আমি কখনও উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু আবৃত্তি করি না। আবার উপনিষদের যে-সব বাক্যে শক্তির কথা আছে, সেগুলিই বলি। শক্তি —এই একটি শব্দের মধ্যেই বেদ-বেদান্তের মর্মার্থ রহিয়াছে। বুদ্ধের বাণী ছিল অপ্রতিরোধ বা অহিংসা; কিন্তু আমার মতে, সেই অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শক্তির ভাব, একটি উন্নততর উপায়। অহিংসার পিছনে আছে একটি ভয়ঙ্কর দুর্বলতা; দুর্বলতা হইতেই প্রতিরোধের ভাবটি আসে। আমি সমুদ্রের একটি জলকণিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার বা ইহাকে এড়াইবার কথা কখনও চিন্তা করি না। আমার নিকট ইহা কিছুই নয়, কিন্তু একটা মশার কাছে এটা বিপজ্জনক। সব রকম হিংসার ব্যাপারেই এই একই কথা—শক্তি এবং নির্ভীকতা। আমার আদর্শ সেই মহাপুরুষ, যাঁহাকে লোকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হত্যা করিয়াছিল এবং যিনি বুকে ছুরিকাহত হইলে মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘তুমিও তিনিই।’

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার—এই চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণের স্থান কোথায়? তাঁহার ছিল অদ্ভুত জীবন, এক অত্যাশ্চর্য সাধনা, যাহা অজ্ঞাতসারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও তাহা জানিতেন না। তিনি ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডবাসীদের সম্বন্ধে—তাহারা সমুদ্রপারের এক অদ্ভুত জাতি—এইটুকু ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু তিনি এক মহৎ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন এবং আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি। কোনদিন কাহারও একটি নিন্দাবাদ তিনি করেন নাই। একবার আমি আমাদের দেশের এক ব্যভিচারী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করিতেছিলাম। আমি তিন ঘণ্টা ধরিয়া বকিয়া গেলাম, কিন্তু তিনি শান্তভাবে সব শুনিলেন। আমার বলা শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন, ‘তাই না হয় হল, প্রত্যেক বাড়ীরই তো একটা খিড়কির দরজা থাকতে পারে; তা কে জানে?’

আজ পর্যন্ত যত ভারতীয় ধর্ম হইয়াছে, সেগুলির দোষ এই যে, ধর্মগুলিতে দুটি কথা স্থান পাইয়াছে—ত্যাগ ও মুক্তি। জগতে কেবল মুক্তিই চাই! গৃহীদের জন্য কি কিছুই বলিবার নাই? কিন্তু আমি গৃহীদের সাহায্য করিতে চাই। সকল আত্মাই কি সমগুণসম্পন্ন নয়? সকলেরই লক্ষ্য কি এক নয়? সুতরাং শিক্ষার মধ্য দিয়া জাতির ভিতর শক্তির স্ফুরণ হওয়া আবশ্যক।

এইরূপে এমন একটি ধর্মের উৎপত্তি হইল, যাহা ক্রমে বিষ্ণুর উপাসনাতে পর্যবসিত হয় এবং ঐ উপাসনাতে আমাদের জীবনরক্ষা ও সাংসারিক সুখ ভোগকেও ভগবান্ লাভের উপায়রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের শেষ ধর্ম-আন্দোলন হইল শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদ। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ঐ মতবাদেও ভোগের কথা আছে। অন্যদিকে জৈনধর্ম আবার আর একটি বিপরীত চরম ভাবের দৃষ্টান্ত। ইহাতে আত্ম- নিগ্রহের দ্বারা ধীরে ধীরে শরীর ধ্বংস করা হয়। অতএব তোমরা দেখিতে পাইতেছ, বৌদ্ধধর্ম হইল জৈনধর্মের এক সংস্কৃত রূপ এবং বুদ্ধ যে পাঁচজন তপস্বীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ ইহাই। একদিকে চরম কৃচ্ছ্রতা, অপরদিকে সম্ভোগ—এই সব বিভিন্ন স্তরের দৈহিক সাধনায় রত ধর্মসম্প্রদায়সমূহ ভারতবর্ষে প্রত্যেক যুগে একের পর এক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেইসব যুগেই আবার এমন কতকগুলি দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদের কেহবা ঈশ্বর-লাভের উপায়স্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োজিত করিয়াছে আবার কেহবা উহার জন্যই ইন্দ্রিয়গুলিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। এইভাবে দেখা যায়,

২৪। হিন্দুধর্মের সু-উচ্চ ভাবগুলি জনতার কাছে পৌঁছিয়া দিবার চেষ্টা হইতেই পুরাণগুলির উৎপত্তি। ভারতবর্ষে একজনই মাত্র এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, এবং সম্ভবতঃ তিনি মানবেতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

হিন্দুধর্মের মধ্যে সর্বদাই যেন দুটি বিপরীত সর্পিলগতি সিঁড়ি (spiral staircase) একই অক্ষ-অবলম্বনে কখনও বা ঊর্ধ্বগামী, কখনও বা অধোগামী হইয়া পরস্পরের অভাব পূরণ করিয়া চলিয়াছেন।

হাঁ, বৈষ্ণবধর্মের মতে তুমি যাহা কিছু করিতেছ সবই ভাল, তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং সন্তানের প্রতি এই যে তীব্র ভালবাসা, ইহার সবই ভাল। এগুলির সবই ঠিক, তুমি ভাবিতে পার যে, কৃষ্ণই তোমার সন্তান, আর সন্তানকে যখন কোন খাবার দাও, তখন যদি ভাবিতে পার যে, তুমি কৃষ্ণকেই খাওয়াইতেছ। এই ছিল চৈতন্যের বাণী—'সব ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি ঈশ্বরেরই পূজা কর।' ইহার বিপরীত ভাব বেদান্তে বলা হইয়াছে—'ইন্দ্রিয়কে সংযত কর, ইন্দ্রিয়কে প্রতিহত কর।'

আমার দৃষ্টিতে ভারত যেন নবযৌবনসম্পন্ন এক জীবন্ত প্রাণী বিশেষ, ইওরোপও যৌবনশালী এবং জীবন্ত। দুইটির কোনটিই তাহাদের উন্নতির এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যেখানে আমরা নির্বিবাদে তাহাদের সমাজের ব্যবস্থাগুলি সমালোচনা করিতে পারি। উভয়েই দুই বিরাট পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছে। কোন পরীক্ষাই এখনও সম্পূর্ণ নয়। ভারতে আমরা পাই সামাজিক সাম্যবাদ, যাহা অদ্বৈতের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত [প্রত্যেকের ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন]। ইওরোপে সামাজিক দৃষ্টিতে তোমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, কিন্তু তোমাদের চিন্তাধারা যাহা দ্বৈতমূলক [ব্যক্তি-কল্যাণ চাহিলেও তোমরা সেই সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ চাহিতেছ] অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাম্যবাদী।

অতএব দেখা যাইতেছে, একদিকে আছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বেড়া দেওয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অপরদিকে আছে সাম্যবাদের বেড়া দেওয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজ।

এখন ভারতীয় পরীক্ষা যে-ধারায় চলিতেছে, ঠিক সেই ভাবেই চলিতে আমরা ইহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিব। যে-সমস্ত আন্দোলন কোন বিষয়বস্তুকে ঠিক তাহারই দিক্ হইতে সাহায্য না করে, সেগুলি সেই হিসাবে ভাল নয়। উদাহরণ হিসাবে ইওরোপে বিবাহ করা এবং বিবাহ না করা—এই উভয় ব্যবস্থার প্রতিই আমি গভীর শ্রদ্ধাশীল। ভুলিয়া যাইও না, মানুষের জীবনকে মহৎ এবং সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে গুণগুলি যতটা কাজে লাগে, দোষগুলি ঠিক ততটা লাগে। অতএব যদি ইহা প্রমাণিতও হয় যে, কোন জাতির চরিত্রে কেবল দোষই আছে, তবুও আমরা যেন ঐ জাতির বিশেষত্বকে একেবারে উড়াইয়া না দিই।

ভ্রমাত্মক কোন বিষয় সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যক্ষানুভূতি তখনই প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হতে পারে, যদি প্রত্যক্ষ অনুভব যে যন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছে সেই যন্ত্রটি, অনুভবের পদ্ধতি এবং স্থায়িত্ব-কালের পরিমাপ বিশুদ্ধ হয়। শরীরিক রোগ বা কোনরূপ ভাবপ্রবণতা এই পর্যবেক্ষণকে

২৫। তোমরা হয়তো বলিতে পার যে, প্রতিমা বস্তুতঃ ঈশ্বর। কিন্তু ভগবানকে শুধু প্রতিমা বলিয়া ভাবিও না (ভাবারূপ ভুলটি সর্বদাই এড়াইয়া চলিতে হইবে)।

২৬। একবার হটেনটটদের জড়োপাসনাকে নিন্দা করার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করা হইল। তিনি উত্তর দিলেন—জড়োপাসনা বলিতে কি বুঝায়, আমি জানি না। তখন একটি বিবরণ দিয়া তাঁহার সামনে একটি বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখান হইল, কিরূপে একই বস্তুকে পর্যায়ক্রমে পূজা, প্রহার এবং স্তবস্তুতি করা হয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমিও তো এই রকম'। কিছুটা বাদেই অবহেলিত এই লোকগুলির প্রতি তাহাদের অসাক্ষাতে এইরূপ অবিচারে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমরা কি দেখিতেছ না যে, জড়োপাসনা বলিয়া কিছুই নাই? দেখ, তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাই তোমরা বুঝিতে পার না যে, শিশুরা যাহা করে, তাহাই ঠিক। শিশুরা সব কিছুকেই জীবন্ত দেখে। জ্ঞানী হইয়া আমরা শিশুর সেই দৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। অবশেষে উচ্চতর জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা আবার সেই দৃষ্টি ফিরিয়া পাই। পাহাড়, কাঠ, গাছ এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই সে একটা জীবন্ত শক্তি দেখে। আর ইহাদের পিছনে কি সত্যই একটা জীবন্ত শক্তি নাই? ইহা প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা নয়। বুঝিলে কি? সুতরাং ভগবানের নামই সব—তোমরা কি ইহা বুঝ না?'

২৭। একদিন তিনি সত্যভামের ত্যাগ সম্বন্ধে গল্পটি বলিতে গিয়া বলিলেন, কিভাবে একটুকরা পত্রের ওপর 'কৃষ্ণ' কথাটি লিখে দাঁড়িপাল্লায় নিয়ে এবং অপর দিকে কৃষ্ণকে বসিয়ে দেওয়ার ফলে দাঁড়িপাল্লা কৃষ্ণনামের দিকে নেমে গিয়াছিল। তিনি আবার বলিলেন, গোঁড়া হিন্দুদের কাছে শ্রুতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ—সব কিছু। এই জিনিষটি হচ্ছে পূর্ব থেকে

ভ্রমপূর্ণ করতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার একটি উপায় মাত্র। সুতরাং সব রকম মানবিক জ্ঞান, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, তা অনিশ্চিত এবং ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত সাক্ষী কে? বিষয়টি যার প্রত্যক্ষ-গোচর হয়েছে। বেদসমূহ সত্য, কেননা এইগুলি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের বা আপ্তপুরুষগণের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাক্ষ্য-বিবরণ; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অনুভবের শক্তি কি কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ? না। ঋষি, আর্য এবং ম্লেচ্ছ সবারই সমভাবে এই জ্ঞান হতে পারে। নব্য ন্যায়ের অভিমত এই যে, এইরূপ আপ্তপুরুষের বাক্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত, উপমা বা হেত্বাভাস যথার্থ অনুমানের সহায়ক নয়। সুতরাং প্রকৃত প্রমাণ বলতে আমরা দুটি জিনিষ পাই—প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অনুমান।

একদল লোক আছে, যাহারা বহিঃপ্রকৃতির বিকাশকেই প্রাধান্য দেয়,

অস্তিত্ববান্ একটি চিরন্তন ভাবের সামান্য বিকাশমাত্র। ঈশ্বর নিজেই এই অনন্ত মনে এই ভাবের একটি স্থূল প্রকাশ। তুমি যে ব্যক্তি, এর চেয়ে তোমার নাম অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর অপেক্ষাও ঈশ্বরের নাম বড়। অতএব বাক্-সংযম কর।

২৮। আমি গ্রীকদের দেবতা মানি না। কেননা তারা মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল তাঁদেরই পূজা-উপাসনা করা উচিত, যাঁরা ঠিক আমাদেরই মত, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মহত্তর। আমার ও দেবতাদের মধ্যে যে ব্যবধান, তা গুণগত তারতম্য মাত্র।

২৯। একটি পাথর পড়ে একটি কীটকে গুঁড়িয়ে দিল। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি সমস্ত পাথরখণ্ডই পড়ে গেলে কীটদের গুঁড়িয়ে দেয়। এই রকম একটি যুক্তি কেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব? অভিজ্ঞতা একটি ক্ষেত্রেই হয়েছে, কিন্তু মনে কর—এটি একবারই মাত্র হল। একটি শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে দাও, সে কেঁদে উঠবে। এটা পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতা? কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করব? এর কারণ—কতগুলি জিনিষের মধ্যে একটি প্রকৃত সম্পর্ক—-একটি ব্যাপ্তিশীলতা থাকে। আমাদের শুধু দেখতে হয় যে, গুণ দৃষ্টান্তের চেয়ে খুব বেশী বা কম না হয়ে পড়ে। এই পার্থক্য নিরূপণের উপরই সব মানবিক জ্ঞান নির্ভর করে। [উহাতে যাতে কোনরূপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ না থাকে।]

আবার অপরদল অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশকে। কোন্‌টি আগে—ডিমের আগে পাখী, না পাখীর আগে ডিম? পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র? এই সমস্যার কোন মীমাংসা নেই। ছেড়ে দাও এ-সব। মায়া থেকে বেরিয়ে এস।

সেটা ছিল বর্ষার রাত। তিনি বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মধ্যে সেই গো-পালকের কুঁড়েঘরে চালার নীচে দেওয়াল ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্রমে বৃষ্টি জোরে এল এবং বাতাসও বেড়ে উঠল। ভিতর থেকে জানালা দিয়ে সেই গো-পালককে একজনকে দেখতে পেয়ে চিন্তা করতে লাগল—হাঃ হাঃ কাষায়ধারী, ঐখানেই থাক। ঐ স্থানই তোমার উপযুক্ত। তারপর সে গান ধরলঃ

আমার গরুগুলো সব গোয়ালে আছে,

৩০। জগৎ না থাকলেই বা আমার কি? আমার মতে তাহলে তো খুব চমৎকার হবে! কিন্তু বাস্তবিক যা কিছু আমার প্রতিবন্ধক, সে-সবই শেষে আমার সহিত মিলিত হবে। আমি কি তাঁর (কালীর) সৈনিক নই?

৩১। হাঁ, একজন বিরাট পুরুষের অনুপ্রেরণাতেই আমার জীবন পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু তাতে কি? প্রেরণা জিনিষটা এই পৃথিবীতে কোন একজনের মাধ্যমে আসেনি। এটা সত্য যে, আমি বিশ্বাস করি—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রত্যাদিষ্ট (দ্রষ্টা) পুরুষ ছিলেন, সুতরাং আমি নিজেও তাহলে প্রত্যাদিষ্ট হব এবং তোমরাও, তোমাদের শিষ্যেরাও হবে, তারপর তাদের শিষ্যেরাও। এইভাবে বরাবর চলতে থাকবে। তোমরা কি দেখছ না যে, নির্বাচিত কয়েকজনকে উদ্বুদ্ধ করার যুগ আর নেই। এতে ভালই হোক বা মন্দই হোক, সে দিন চলে গেছে, আর কখনও আসবে না। ভবিষ্যতে সত্য পৃথিবীতে অবারিত থাকবে।

৩২। সমস্ত পৃথিবীকে উপনিষদের যুগে উন্নীত করতে হবে—এই রকম চিন্তা করে বুদ্ধ এক মস্ত ভুল করেছিলেন। মানুষের স্বার্থ-চিন্তা সব নষ্ট করেছিল। এ-বিষয়ে কৃষ্ণ ছিলেন বিজ্ঞতর, কারণ, তিনি রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। কিন্তু বুদ্ধ কোন আপসের পক্ষপাতী ছিলেন না। আপস করার জন্য এর আগে কত অবতারের শিক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরা লোক-স্বীকৃতি পাননি, অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। বুদ্ধ যদি মুহূর্তের জন্যও আপস করতেন, তবে তাঁর জীবিতকালেই সারা এশিয়াতে তিনি ঈশ্বর বলে পূজিত হতেন। তাঁর উত্তর ছিল কেবল এই—বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা-প্রাপ্তি মাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। বস্তুতঃ দেহধারীদের মধ্যে তাঁকেই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায়।

৩৩। পাশ্চাত্যে লোকে স্বামীজীকে বলেছিল, বুদ্ধের মহত্ত্ব আরও হৃদয়গ্রাহী হত, যদি তিনি

আগুন ভালভাবেই জ্বলছে। আমার স্ত্রী নিরাপদে রয়েছে এবং শিশুরা সুন্দর ঘুমোচ্ছে। অতএব ওহে মেঘ, তুমি আজ রাতে যত ইচ্ছা বর্ষণ করতে পার।

ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে তিনি রোমক বর্বরতা বলে অভিহিত করেছিলেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কর্মের প্রতি যে আসক্তি, তা হল খুব নিম্নস্তরের এবং পশুসুলভ। এই কারণেই জগতে মহাকাব্যের সমাদর সব সময়ে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতে এমন এক মিল্টন জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি মানুষকে সোজাসুজি গভীর অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলবেন। ব্রাউনিং-এর একটি লাইন বরং তার স্থানে দিলে ভাল হয়। গল্পটির মহাকাব্যিক চমৎকারিত্বই রোমানদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটাই রোমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার বললেনঃ হাঁ, হাঁ, তোমরা পাশ্চাত্যেরা কাজ চাও। জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলির মধ্যেও যে-কাব্য রয়েছে, তা তোমরা এখনও অনুভব করতে পারনি। সেই যে অল্পবয়স্কা মা তার মৃত পুত্রকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, সেই গল্পের চেয়ে চমৎকার গল্প আর কি হতে পারে? অথবা সেই ছাগশিশুর ঘটনাটি? দেখ, মহান্ ত্যাগ যে জিনিষ, তা ভারতে কিছু নূতন নয়। কিন্তু পরিনির্বাণের পর, এখানেও যে একটি কাব্য আছে, তা লক্ষ্য কর।

বুদ্ধও বাইরে দাঁড়িয়ে এর উত্তর দিয়ে বললেনঃ আমার মন সংযত, আমার ইন্দ্রিয়বর্গ সংহৃত করেছি এবং আমার হৃদয় সুদৃঢ়। অতএব হে সংসার-মেঘ, তুমি আজ যত ইচ্ছা বর্ষণ করতে পার।

সেই গো-পালক আবার গেয়ে চললঃ আমার শস্য কাটা হয়ে গেছে, খড়গুলি সব ঘরে আনা হয়েছে। নদী জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, পথগুলি ভালই আছে। অতএব হে মেঘ, তুমি আজ ইচ্ছামত বর্ষণ কর।

... এইভাবে চলতে লাগল, অবশেষে সেই গো-পালক অনুতপ্ত এবং বিস্মিত হয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

আবার সেই নাপিতের গল্প। তার চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে?

একজন পবিত্র লোক আমার বাড়ীর ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি যে নাপিত—আমার বাড়ীর নিকট দিয়ে! আমি ছুটে গেলাম, তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এবং অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, 'প্রভু, আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?' এবং তিনি বলিলেন, 'হাঁ নিশ্চয়।' তিনি আমার মত নাপিতকেও 'হাঁ' বললেন! তারপর আমি বললাম, 'আমি কি আপনার অনুসরণ করব?' তিনি বললেন, 'করতে পার'। আমি যে সামান্য নাপিত আমাকেও তিনি কৃপা করলেন!

মন্দিরের ভিতর বেদীর সবচেয়ে নীচের ধাপে যে কলসীটা, তা যেন সব সময় জলে পূর্ণ থাকে এবং তামিল দেশে যে মাখনের প্রদীপ, সেগুলি সব সময় জ্বেলে রাখা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে যদি বরাবরের জন্যে উপাসনাদির ব্যবস্থা রাখতে পার, তবে হিন্দুভাবের দিক্ থেকে আর বেশী কিছু করার থাকবে না। কিন্তু যে অনুষ্ঠানগুলি পালন করবে, সেগুলি যেন বৈদিক হয়। একটি বৈদিক মতের বেদী থাকবে, যাতে পূজার সময় বৈদিক (যজ্ঞের) অগ্নি জ্বালা হবে। এ-রকম একটি ধর্মানুষ্ঠান ভারতের সব লোকেরই শ্রদ্ধা

৩৪। বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এইঃ বৌদ্ধধর্ম বলছে—সমস্ত কিছু ভ্রম বলেই জেন; আবার হিন্দুধর্ম বলছে—জেন যে, এই ভ্রমের (মায়া) মধ্যে সত্য বিরাজ করছে। এটি কিভাবে হবে, হিন্দুধর্মে এ-বিষয়ে কোন কঠিন নিয়ম নেই। বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাস-ধর্মের, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই অনুশাসনগুলি জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই অনুসরণ করা যেতে পারে। সব পথই সেই একসত্যে পৌঁছিবার পথ। এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম কথাগুলির একটি—একজন ব্যাধের (মাংস-বিক্রেতার) মুখ দিয়া বলান হয়েছে; একজন বিবাহিতা নারীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি একজন সন্ন্যাসীকে ঐ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই ভাবে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ধর্মে পরিণত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম সন্ন্যাস-জীবনকে সর্বোচ্চ স্থান দিলেও জীবনের প্রাত্যহিক কর্তব্যপালনকে ঈশ্বর-লাভের অন্যতম পথ হিসাবে নির্দেশ করেছে।

৩৫। নারীদের সন্ন্যাস-জীবন-বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেনঃ তোমাদের জন্য কি কি নিয়ম হবে, তা স্থির কর; তারপর ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোল এবং পারলে তার মধ্যে একটু সর্বজনীনতা রাখ। কিন্তু স্মরণ রেখ যে, কোন সময়েই পৃথিবীতে এই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত এমন লোক আধ-ডজনের বেশী পাবে না। সম্প্রদায় গঠনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সম্প্রদায়গত ভাবের উপরে উঠারও প্রয়োজন। তোমাদের উপায় তোমাদেরই উদ্ভাবন করতে হবে। আইন তৈরী কর কিন্তু আইন এমন ভাবে কর যে, লোকে যখন আইনের অনুশাসন ছাড়াই চলতে অভ্যস্ত হবে, তখন যেন তারা আইনগুলি দূরে ফেলে দিতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণ কর্তৃত্ব যুক্ত করার মধ্যেই আমাদের বৈশিষ্ট্য নিহিত। সন্ন্যাসী-জীবনাদর্শেও এ জিনিষটি করা যেতে পারে।

৩৬। দুটি ভিন্ন জাতির একত্র মিশ্রণের ফলেই তাদের মধ্যে থেকে একটি শক্তিশালী বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হয়। এরা মিশ্রণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চায় এবং জাতির উৎপত্তি এখান থেকেই। এই আপেলের কথাই ধর। ভাল জাতের যেগুলি, সেগুলি মিশ্রণের দ্বারাই হয়েছে, কিন্তু একবার মিশ্রণ করার পর আমরা সেই জাতটা যাতে ঠিক থাকে, সেজন্য চেষ্টা করি।

৩৭। মেয়েদের শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেনঃ দেবতাদের পূজায় তোমাদের জন্য মূর্তি অবশ্যই প্রয়োজন। তবে এই মূর্তিগুলির পরিবর্তন তোমরা করতে পার। কালীমূর্তি যে সর্বদা একই রকম থাকবে, তার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে বিভিন্ন নূতন ভাবে যাতে আঁকা যায়, এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য মেয়েদের তোমরা উৎসাহিত কর। সরস্বতীর এক-শ রকম বিভিন্ন ভাব কল্পনা হোক। তাদের ভাবগুলিকে অবলম্বন করে তারা ছবি আঁকুক, ছোট পট-মূর্তি তৈরী করুক এবং রঙের কাজ করুক।

আকর্ষণ করবে।

সব রকম জন্তু-জানোয়ার যোগাড় কর। গরু থেকে আরম্ভ করলে ভাল হয়, কিন্তু তার সঙ্গে বেড়াল পাখী এবং অন্যান্য জন্তুগুলিও রেখ। ঐগুলিকে খাওয়ান, যত্ন করা প্রভৃতি কাজ ছেলেমেয়েদের করতে দাও।

তারপর জ্ঞানযজ্ঞ। এটি সবচেয়ে সুন্দর জিনিষ। তোমরা কি জান যে, প্রত্যেক বই-ই ভারতে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়—কেবল বেদই নয়, ইংরেজী ও মুসলমানদের বইগুলিও সবই পবিত্র।

প্রাচীন শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তন কর। জমান দুধ দিয়ে ফলের বিভিন্ন খাবার কিভাবে প্রস্তুত করা যায়, মেয়েদের সে-সব শেখাও। শৌখিন রান্নাবান্না শেলাই-এর কাজ শেখাও। তারা ছবি আঁকা, ফটোর কাজ, কাগজ কেটে বিভিন্ন রকমের জিনিষ তৈরী করা, সোনা রুপোর উপর সুন্দর সুন্দর কাজ করা ইত্যাদি শিখুক। লক্ষ্য রাখ—তারা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।

মানুষকে কখনও ভুলো না। সেবার দৃষ্টি নিয়ে মানুষকে পূজা করার ভাবটা ভারতে সূক্ষ্মাকারে বর্তমান, কিন্তু এটা কোন দিনই বিশিষ্ট মর্যাদা পায়নি। তোমার ছাত্রেরা এ-বিষয়ে চেষ্টা করুক। এদের বিষয়ে কবিতা রচনা কর, শিল্প সৃষ্টি কর। হাঁ, প্রত্যহ স্নানের পর খাওয়ার আগে কেউ যদি ভিখারীদের পায়ে গিয়ে পূজা করে, তবে তার হাত এবং মাথা দুটিরই আশ্চর্য-রকম শিক্ষা হবে। আবার কখনও কিছুদিন ছোট শিশুদের বা তোমাদের ছাত্রদেরও হয়তো পূজা করলে অথবা কারও নিকট থেকে শিশুদের চেয়ে এনে তাদের খাওয়ালে, পরিচর্যা করলে। মাতাজী১ আমায় যা বলেছিলেন, তা কি?—স্বামীজী, আমি অসহায়, কিন্তু এই যে পবিত্রাত্মা এরা, এদের যে পূজা করি, এরাই

আমায় মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। দেখ, তাঁর ভাব হল যে, একটি কুমারীর মধ্য দিয়ে তিনি উমারই সেবা করছেন। এই ভাবদৃষ্টি এবং তা দিয়ে একটি বিদ্যালয়ের পত্তন করা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

প্রত্যেকেই এইরূপে তার নিজের জগৎকেই দেখে—এই জগৎ তার কর্মফলেই সৃষ্ট হয়, আবার তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। অবশ্য অপর যারা বন্ধনগ্রস্ত, তাদের কাছে এর অস্তিত্ব তখনও থাকে। নাম এবং রূপই জগৎ। সমুদ্রের একটি ঢেউ নাম এবং রূপের দ্বারা সীমিত বলেই তার নাম ঢেউ। ঢেউ মিলিয়ে গেলে সমুদ্রই পড়ে থাকে। নাম-রূপও কিন্তু চিরকালের জন্য সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়, জল ব্যতিরেকে এই ঢেউ-এর নাম এবং

৩৮। সব সময় আনন্দের অভিব্যক্তিই হল ভালবাসা। এর মধ্যে দুঃখের এতটুকু ছায়াও হল দেহাত্মিকতা এবং স্বার্থপরতা।

৩৯। পাশ্চাত্যে বিবাহ জিনিষটা আইনগত বন্ধন ছাড়া আর কিছুর উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ভারতে এটি চিরকালের জন্য দুজনকে মিলিত করবার একটি সামাজিক বন্ধন। এই জীবনে বা পর জীবনে তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, তারা দুজন একে অপরকে বরণ করে নেবে। একজন অপর জনের সমস্ত শুভকর্মের অর্ধাংশের অংশীদার হবে। এদের মধ্যে একজন জীবনের পথে যদি পিছিয়ে পড়ে, তবে পরে যাতে সে আবার তার সহযাত্রী হতে পারে, তার জন্য চেষ্টা অপর জনকেই করতে হবে।

৪০। চৈতন্য হচ্ছে অবচেতন মন এবং পূর্ণজ্ঞানাবস্থা—এই দুই সমুদ্রের মাঝে একটা পাতলা ব্যবধান মাত্র।

৪১। আমি যখন পাশ্চাত্যের লোকদের চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে শুনি, তখন নিজের কানকেই বিশ্বাস করিতে পারি না। চৈতন্য! কি হয়েছে চৈতন্যে? কেন, অবচেতন মনের অতল গভীরতা এবং পূর্ণ চৈতন্যাবস্থার উচ্চতার তুলনায় এটা কিছুই নয়। এ-বিষয়ে

রূপ কোনদিনই সম্ভব নয় এবং এই নাম-রূপই জলকে ঢেউ-এ পরিণত করেছে, তবুও নাম এবং রূপ—এরা কিন্তু ঢেউ নয়। ঢেউ জলে মিলিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ঢেউ বর্তমান থাকায় তাদের নাম-রূপ থাকে। এই নাম-রূপ হল মায়া এবং জল হল ব্রহ্ম। ঢেউটির যতক্ষণ অস্তিত্ব ছিল, ততক্ষণ এটি জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তবু ঢেউ হিসাবে এর একটি নাম এবং রূপ ছিল। আবার এই নাম ও রূপ ঢেউকে বাদ দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে পারে না, যদিও জল হিসাবে এই ঢেউ নাম এবং রূপ থেকে অনন্তকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই নাম এবং রূপকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখা অসম্ভব, অতএব এগুলির কোন বাস্তব সত্তা নেই। অথচ এগুলি শূন্যও নয়। এরই নাম মায়া।

আমার কোন দিনই ভুল হবে না, কেননা আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেছি, তিনি কোন ব্যক্তির অবচেতন মনের খবর দশ মিনিটের মধ্যই জানতে পারতেন এবং তা দেখে তিনি ঐ ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ এবং শক্তিলাভ প্রভৃতি সবই বলে দিতে পারতেন।

৪২। এই-সব অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারগুলি সব গৌণ বিষয়। এগুলি প্রকৃত যোগ নয়। আমাদের কথাগুলির যাথার্থ্য পরোক্ষভাবে নির্ণয় করতে এ-সকলের কিছু কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। এ বিষয়ের সামান্যতম অনুভূতিতে মানুষ বিশ্বাসবান্ হয় যে, জড়-জগতের পিছনে একটা কিছু রয়েছে। তবুও এই-সব জিনিষ নিয়ে যারা কালক্ষেপ করে, তারা ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়ে। এই-সব যৌগিক শক্তিগুলি বাহ্য ঘটনা মাত্র। এগুলির সাহায্যে কোন জ্ঞান হলে কখনই তার স্থিরতা বা দৃঢ়তা থাকে না। আমি কি বলিনি যে, এগুলি বাহ্য ঘটনা মাত্র? সীমারেখা সব সময় সরে যাচ্ছে।

৪৩। অদ্বৈতের দিক্ দিয়ে বলা হয় যে, আত্মা জন্মানও না, মরেনও না। বিশ্বের এই-সব স্তর আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন সৃষ্টিমাত্র। অর্থাৎ সবচেয়ে যে নিম্ন স্তর বা ঘনীভূত স্তর, তা হল সৌরলোক; দৃশ্যমান জগৎকে নিয়েই এর পরিমিতি, এর মধ্যে প্রাণ বা জীবনীশক্তি এবং আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থরূপে প্রতিভাত। এরপর চন্দ্রলোক—এটি সৌরমণ্ডলকে ঘিরে রয়েছে। এটি কিন্তু চন্দ্র বলতে যা বোঝায়, মোটেই তা নয়। এটি দেবতাগণের আরামভূমি। এখানে প্রাণ জীবনীশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা পঞ্চভূতরূপে প্রতিভাত। এরপরই আলোকমণ্ডল (বিদ্যুৎ-মণ্ডল)—এটি এমন একটি অবস্থা যে, একে আকাশ থেকে পৃথক্ করা যায় না এবং তোমাদের পক্ষে বলা খুবই অসম্ভব যে, বিদ্যুৎ জড় অথবা শক্তিবিশেষ। এরপর ব্রহ্মলোক—এখানে প্রাণ ও আকাশ বলতে আলাদা কিছু নেই, দুটি একীভূত হয়ে মনে সূক্ষ্মশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রাণ বা আকাশ কিছুই না থাকায় জীব সমস্ত বিশ্বকে সমষ্টিরূপে মহৎ তত্ত্ব বা ‘সমষ্টি মন’রূপে চিন্তা করে। ইনিই পুরুষরূপে বা সমষ্টি সূক্ষ্ম আত্মারূপে আবির্ভূত হন। এখানে তখনও বহুত্ব-জ্ঞান আছে, তাই এই পুরুষ নিত্য নন। এখান থেকেই জীব শেষে একত্ব উপলব্ধি করে। অদ্বৈতমতে জীব—যার জন্ম মৃত্যু কোনটাই নেই, তার কাছে এই পর্যায়গুলিও পর পর ভেসে উঠতে থাকে। বর্তমান সৃষ্টিও সেই একভাবেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। সৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্যায়ে হয়, একটি ভিতরে চলে যাওয়া এবং আর একটি বাহিরে বেরিয়ে আসা মাত্র।

৪৪। আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস। সেই মহাপ্রাণ প্রভুর মত কেউ কি কখনও হয়েছে?

তিনি নিজের জন্য একটি কর্মও করলেন না, তাঁর হৃদয় দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই রাজকুমার এবং সন্ন্যাসীর এত দয়া যে, তিনি একটা সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য নিজের জীবন দিতে উদ্যত হলেন; তাঁর এত ভালবাসা যে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর সামনে নিজেকে সঁপে দিলেন, একজন অন্ত্যজের আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি যখন সামান্য বালকমাত্র, তখন আমি তাঁকে আমার ঘরে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, কারণ আমি জেনেছিলাম যে, তিনি সেই প্রভু স্বয়ং।

৪৫। শুক হলেন আদর্শ পরমহংস। মানুষের মধ্যে তিনিই সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরের এক গণ্ডূষ জল পান করেছিলেন। অধিকাংশ সাধকই তীর থেকে এই সাগরের গর্জন শুনে মারা যান, কয়েকজন মাত্র এর দর্শন পান এবং আরও স্বল্প সংখ্যক এর স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি এই অমৃত-সাগর থেকে পান করেছিলেন!

৪৬। ত্যাগকে বাদ দিয়ে যে-ভক্তি তার অর্থ কি? এটি অত্যন্ত অনিষ্টকর।

৪৭। আমরা সুখ বা দুঃখ কোনটিই চাই না—এ-দুটির মধ্য দিয়ে আমরা সেই বস্তুর খোঁজ করছি, যা এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে।

৪৮। শঙ্করাচার্য বেদের মধ্যে যে একটি ছন্দ-মাধুর্য, একটি জাতীয় জীবনের সুরপ্রবাহ আছে, তা ধরতে পেরেছিলেন। বাস্তবিকই আমার সব সময়ই মনে হয় যে, তিনি যখন বালক ছিলেন, তখন আমার মত তাঁরও একটা অন্তর্দৃষ্টি হয়েছিল এবং এই দৃষ্টি দ্বারাই তিনি সেই সুপ্রাচীন সঙ্গীত-ধারাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর সারা জীবনের কার্যাবলী বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এটি বেদ ও উপনিষদের মাধুর্যের ছন্দিত স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪৯। যদিও মায়ের ভালবাসা কোন কোন দিক্ দিয়ে মহত্তর, তথাপি পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ভালবাসা, তা যেন ঠিক পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার সম্পর্কের মত। আদর্শকে এত বেশী জীবন্ত করে তুলতে ভালবাসার মত কিছুই নেই। ভালবাসার ফলে একজনের কল্পনার ছবি অপর জনের মধ্যে বাস্তব হয়ে ওঠে। এই ভালবাসা তার প্রিয়কে রূপান্তরিত করে ফেলে।

৫০। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে সিংহাসনে বসে সম্পদ্, যশ, স্ত্রীপুত্রাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে জনকের মত হওয়া কি এতই সহজ? পাশ্চাত্যে একের পর এক অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা ঐ অবস্থা লাভ করেছেন, আমি কেবল বলছি যে, এমন বিরাট পুরুষগণ ভারতে তো জন্মগ্রহণ করেন না!

৫১। এই কথা তোমরাও ভুলো না এবং তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষা দিতে ভুলো না যে, একটি জোনাকি পোকা ও জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যে, একটি ছোট ডোবা ও অসীম সমুদ্রের মধ্যে এবং একটা সর্ষের বীজ ও মেরুপর্বতের মধ্যে যে তফাত, গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে ঠিক সেই রকম তফাত।

৫২। সব কিছুই ভয়ান্বিত, ত্যাগই কেবল নির্ভয়। যে সব সাধু জাল (ঠকবাজ) বা যারা জীবনে আদর্শ-রক্ষায় অসমর্থ হয়েছে, তারাও প্রশংসনীয়, যেহেতু আদর্শের সঙ্গে তাদের সম্যক্ পরিচয় হয়েছে, এবং এ দ্বারা তারা অপর সকলের সাফল্যলাভে কিছুটা সহায়ক। আমরা যেন আমাদের আদর্শ কখনও না ভুলি! রম্‌তা সাধু বহতা পানি—যে-নদীতে স্রোত আছে সে-নদী পবিত্র থাকে, তেমনি যে-সাধু বিচরণশীল, তিনিও পবিত্র।

৫৩। সন্ন্যাসীর টাকার কথা ভাবা ও টাকা পাওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল!

৫৪। মহম্মদ বা বুদ্ধ মহান্ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এতে আমার কি? এর দ্বারা আমার কি কিছু ভাল বা মন্দ হবে? আমাদের নিজেদের তাগিদে এবং নিজেদের দায়িত্বেই নিজদিগকে ভাল হতে হবে।

৫৫। এ দেশে তোমরাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাবার ভয়ে খুবই ভীত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলতে যা বুঝায়, তা তোমাদের এখনও হয়নি। তোমরা যখন তোমাদের নিজ নিজ প্রকৃতি জানতে পারবে, তখনই তোমরা যথার্থ ব্যক্তিত্ব লাভ করবে, তার আগে নয়। আর একটা কথা সব সময় এদেশে শুনছি যে, আমাদের সব সময়ে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত। তোমরা কি জান না যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যা উন্নতি হয়েছে, সবই প্রকৃতিকে জয় করেই হয়েছে? আমাদের কোনরূপ উন্নতি করতে হলে প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করতে হবে।

৫৬। ভারতবর্ষে লোকে আমায় সাধারণের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা না দেওয়ার জন্য বলে, কিন্তু আমি বলি যে, একটি শিশুকেও এই জিনিষটা বুঝিয়ে দিতে পারি। উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলির শিক্ষা একেবারে প্রথম হইতেই দেওয়া উচিত।

৫৭। যত কম পড়বে, তত মঙ্গল। গীতা এবং বেদান্তের উপর যে-সব ভাল ভাল গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলি পড়। কেবল এইগুলি হলেই চলবে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সবটাই ভুলে ভরা। চিন্তা করতে শেখবার আগেই মনটা নানা বিষয়ের সংবাদে পূর্ণ হয়ে উঠে। মনকে কেমন করে সংযত করতে হয়, সেই শিক্ষাই প্রথম দেওয়া উচিত। আমাকে যদি আবার নূতন করে শিখতে হয় এবং এই বিষয়ে আমার যদি কোন মতামত দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে, আমি প্রথমে আমার মনকেই আয়ত্তে আনার চেষ্টা করব এবং তারপর প্রয়োজন বোধ করলে অন্য কোন বিষয় শিখব। কোন বিষয় শিখতে লোকের অনেক দিন লেগে যায়, তার কারণ হল তারা ইচ্ছামত মনকে সন্নিবিষ্ট করতে পারে না।

৫৮। দুঃসময় যদি আসে, তবে হয়েছে কি? ঘড়ির দোলন আবার অন্যদিকে ফিরে আসবে। কিন্তু এটাও খুব একটা ভাল কিছু নয়। যা করতে হবে, তা হল একে একেবারে থামিয়া দেওয়া।

পাদটীকা - আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্টঃ

আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্টঃ

১	ঐসময়ে আমেরিকার খবরের কাগজসমূহে স্বামী বিবেকানন্দের নাম নানা ভাবে বানান করা হইত। রিপোর্টগুলিতে ভুল-ভ্রান্তিও থাকিত প্রচুর।
২	আমেরিকান সাংবাদিকগণ স্বামীজীর নামের সঙ্গে নানা মনগড়া বিশেষণ বসাইয়া দিত। যেমন: রাজা, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ইত্যাদি।
৩	ধর্ম-মহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

৪	ধর্মান্তরীকরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর যুক্তি যে রিপোর্টার জায়গায় জায়গায় ধরিতে পারেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট। তথাপি যেটুকু তিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে স্বামীজীর ভাবধারার সহিত পরিচিত পাঠক স্বামীজীর এখানকার কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।
৫	স্বামীজী যে সন্ন্যাসীর বিবাহ সম্বন্ধে উপর্যুক্ত মন্তব্য করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সংবাদপত্রের রিপোর্টার কি বুঝিতে কি বুঝিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা সুবিদিত যে, সন্ন্যাসী স্ত্রী গ্রহণ করিলে হিন্দুসমাজে পতিত হন।
৬	‘অন্যদের নিকট হইতে তোমরা তোমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহাদের প্রতিও তোমরা সেইরূপই আচরণ করিবে।’ যীশুর এই উপদেশকে ‘গোল্ডেন রুল’ **(Golden rule)** বলা হইয়া থাকে।—বাইবেল নিউ টেষ্টামেণ্ট, ম্যাথ্যু, ৭/১২

৭	ঐ সময়ে সাংবাদিকরা সাধারণতঃ স্বামীজীর নাম দুইভাগে লিখিতেন, যথা—বিবে কানন্দ **(Vive Kananda)**। তাঁহারা মনে করিতেন, প্রথমাংশটি তাঁহার নাম, দ্বিতীয়টি তাঁহার উপাধি।

৮	রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসোল **(১৮৩৩-৯৯)** আমেরিকার প্রসিদ্ধ আইনজীবী, অজ্ঞেয়বাদী **(Agnostic)** বক্তা এবং লেখক।

৯	ইংরেজী রিপোর্টে **'Virgin'** শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

	রিপোর্টে আছেঃ **'Sabatimini'.**

১০	
১১	রিপোর্টে আছেঃ **'Cura makunda'** অর্থাৎ **Karma-kanda.**
১২	মাস্ **(Mass):** যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার বার জন অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ শেষ নৈশ ভোজন **(Last supper)** কালে এক টুকরা রুটি ভাঙিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা আমার শরীর, এবং পানীয় মদ্যকে তাঁহার দেহের রক্ত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ক্যাথলিক গীর্জায় যীশুখ্রীষ্টের এই শেষ নৈশ ভোজনের স্মরণে রুটি এবং মদ্য বিশেষ পূজাকৃত্যের সহিত আহুতি দেওয়া হয়। পুরোহিতের মন্ত্র ও স্তবাদি উচ্চারণের ফলে অতীন্দ্রিয় শক্তির আবেশে ঐ রুটি ও মদ্য খ্রীষ্টের দিব্যদেহের মাংস ও রক্তে পরিণত হয়, ক্যাথলিক ধর্মমতের ইহা একটি প্রধান বিশ্বাস। ভক্তেরা পরে উহা 'প্রসাদ' স্বরূপ গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য খ্রীষ্টের বিরাট দেহের সহিত একাত্মতা এবং তাঁহার অভয়
	আশীর্বাদ **(Benediction):** ক্যাথলিক গীর্জায় উপাসনার পর পুরোহিত বা ধর্মযাজক কর্তৃক উপাসকদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ঈশ্বরের অভয় ও

পাদটীকা - সংক্ষিপ্ত লিপি-অবলম্বনে

সংক্ষিপ্ত লিপি-অবলম্বনেঃ

১	এই অংশটিরও অনুবাদ করিয়াছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।
২	এখানে অনুবাদে কিছু স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। যিনি নোট লইয়াছেন, তিনি স্বামীজীর কথা গুলাইয়া ফেলিয়াছেন, মনে হয়।—অনুবাদক।
৩	কঠ উপ., ২।২।১৫; মুঃ উপ., ২।২।১০; শ্বেঃ উপ., ৬।১৪

৪	কঠ উপ., ২।১।১

৫	শ্বে. উপ., ৪।৬; মুঃ উপ., ৩।১।১

*	**Vedanta and the West** পত্রিকার **১৯৫৮,** নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।

*	**Vedanta and the West** পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫৭ সংখ্যায় **‘Breathing and Meditation’** নামে প্রকাশিত।

৮	গীতা ৬।১৬

পাদটীকা - বিবিধঃ

বিবিধঃ

১	**'Ramakrishna: His Life and Sayings' by Prof. Max Muller.** ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রথমে লণ্ডনে প্রকাশিত। **১৯৫১** খ্রীঃ অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত।
২	মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা।
৩	অবশ্য ইহাতে এইরূপ বুঝায় না যে, স্বামীজী মাধুকরী ভিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি অনেক সন্ন্যাসী-

	শিষ্যকে ভিক্ষা করাইয়াছেন এবং স্বয়ংও অনেক দিন উহা করিয়াছেন।
৪	**Synthesis** এখানে বৈজ্ঞানিক সামান্যীকরণ।
৫	**O.T., The Song of Solomon, I, 5, 7, 14.**
৬	তারকা মধ্যস্থ অংশ ‘বীরবাণী’-সংগ্রহে ‘জীবন্মুক্তের গীতি’ নামে পৃথক্‌ভাবে অনূদিত হইয়াছে; ৭ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।
	লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ স্বামীজীর এক শিষ্য;

৭	কিছুদিন স্বামীজীর সঙ্গে এক বাসায় ছিলেন।

পাদটীকা - উক্তি-সঞ্চয়নঃ

উক্তি-সঞ্চয়নঃ

১	কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতাজী।

=*=সমাপ্ত=*=